CUK-H14857-46-291561

রূপ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

"রূপম মন্ডল"

46

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১৩শ সংখ্যা] শুক্রবার, ১৮ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ প

বোরোলীন এই প্রবল গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে তপ্তদিনে
স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার মত আরামপ্রদ।

রুক্ষ, শুষ্ক, জীর্ণ, তাপদগ্ধ ত্বকে এ সময়ে
বিশেষ করে চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিধ সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনা অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরো কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিঞ্চিত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম, সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪

মিত্র ঘোষের আর একটি সগর্ব ঘোষণা!

দুদিন পরে 'যাযাবরের' নূতন বই

'পাত'-এ যে প্রতিভার জয়যাত্রার শুরু, 'জনান্তিক'-এ যে প্রতিভা মধ্যগগনে সেই পরিণত প্রতিভার অপরূপ অবদান

যাযাবর-এর

দ্রুব ভদ্রা

।। চার টাকা ।।

আশাপূর্ণা দেবীর
ইন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
প্রথম প্রতিশ্রুতি নূতন মুদ্রণ ১৮,

প্রমথনাথ বিশীর
ইন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস
রীসাহেবের মুন্সী (নূতন মুদ্রণ) ১২,

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
দুইখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
কাজললতা ৬॥ **নূপুর** ৫,
নীলতারা ৬, **নিশিপদ্ম** ৬,

জরাসন্ধের
শ্রেষ্ঠ গলপ ৬॥

বিমল মিত্রের
অবিস্মরণীয়
উপন্যাস
আসামী হাজির
(স্রোত সপ্তাহে প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত)

মিত্র ঘোষ পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স্
দ্বিতীয় দফার বই: আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনা

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥

বনফুলের
স্থাবর ৬,

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬,

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩,

। চারখানি একত্রে ষোল টাকা ।

বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বই
জ্যোতির্ময়ী দেবীর
সোনা রূপা নয় ১৫,

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা **অমৃত**
সম্পাদক/শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ॥

বেরোচ্ছে
১৫ আগস্ট
১৯৭৭।

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

কাঞ্চন রাগিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একটি শিকার কাহিনী

বিশ্বনাথ বসু গারো হিলের গুণ্ডা হাতি

বারটি গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
সতীকান্ত গুহ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাই ভট্টাচার্য
শ্রীলেখা বসু বুদ্ধদেব গুহ চণ্ডী মণ্ডল শৈলেন রা
কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র দত্ত সমীর রক্ষিত

আজকের পশ্চিম বাঙলা

ভূমিসংস্কার, কৃষি ও কৃষক সমস্যা শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
ভবতোষ দত্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা
প্রবুদ্ধনাথ রায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ
পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পূর্ণ চক্রবর্তী
পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
ধীরেশ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের রোপন ও যন্ত্রচালিত শিল্প
সম্পৎ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণশিল্প
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি সমস্যা সন্তোষ ভট্টাচা

স্বাদেশিকতা ও সাহিত্য
যাত্রা মঞ্চ চলচ্চিত্র খেলাধুলা

ভবানী মুখোপাধ্যায় . বিশু মুখোপাধ্যায়
রঞ্জন মজুমদার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
শিব ভট্টাচার্য . শিবদাস চক্রবর্তী
রাণা বসু ক্ষেত্রনাথ রায়

দাম তিন টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
কলকাতা-৩

অমৃত

১৩ সংখ্যা

মূল্য ·৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Aug. - Oct. 1973.

3rd August, 1973 শুক্রবার, ১৮ শ্রাবণ, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক
সম্পাদকীয়		
বিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
আমাদের এ বসতি	(কবিতা)	—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ
রাতে	(কবিতা)	—শ্রীজয়ন্ত কুমার
মাতবাসে ফাল্গুনী	(কবিতা)	—শ্রীসুধীর দত্ত
গুণীন	(গল্প)	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
নীর রেনেসাঁস		—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
লোকটা		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
ত্য ও সংস্কৃতি		—শ্রীঅভয়ঙ্কর
য় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
রী ফিরে এল	(রহস্যোপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

র নাম প্রথমা : পঁয়তিরিশ-বাইশ-পঁয়তিরিশ,
ইংরেজির ছাত্রী আধুনিক মন-মনন।

প্রকাশিত হলো

ীরের একটা ছোটো শহরে প্রথমা
র মাস কাটাতে এসেছে।
ে তার শেষ দিন। এখন
সমুদ্রের গর্জন।
চঞ্চল প্রথমা।
নব পটভূমি বদলাচ্ছে
ব্যাংকুয়েট হলে
লছে? উল্লাসের?
উল্লাস ? উদ্দাম কিছু ?
গর্জন কি বাড়লো ?.....

স্বপ্নটগ্ন আদতে
অমলেন্দু শূর

প্রকাশিত হলো

তরুণ লেখকের এক রোমান্টিক
হের উপন্যাস। দাম : পাঁচ টাকা।

ব্রত	— শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে	৫·০০
রীন্দ্র নন্দী	— রাঙ্গা শিমুল	৫·০০
া	— ইন্দোচীনে পাঁচটি রাত	৮·০০
র সেন	— খুনের পর খুন	৫·০০
নন্দ	— বার্নার্ড সাহেবের বেগম	৫·০০

ক প্রকাশনী—৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ—৯

বিদ্যোদয়ের বই

নিখিল সেনের
এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০·০০

সুপ্রকাশ রায়ের
ভারতের কৃষকবিদ্রোহ
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯·০০

মোহিতলাল মজুমদারের
কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০
সাহিত্য বিচার ৮·৫০
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০

বাংলার নবযুগ ৮·০০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০

কানাই সামন্তের
চিত্রদর্শন ২৫·০০

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
লেখকদের প্রেম ৩

সর্বজনপাঠ্য কয়েকখানি গ্রন্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ময়ূরপঙ্খী ৬·০০
মকরমুখী ৬·০০

সাগরদাঁড়ী ৭·০০

মনোরঞ্জন ঘোষের
পরিবর্তন ৩·৫০

সমরাজিৎ কবের
ভয়ংকর সেই মানুষটি ৩·২৫

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২·৫০

শিবরাম চক্রবর্তীর
আমার ভালুক শিকার ৩·০০

শ্রীকথকঠাকুরের
অথ ভারত কথকতা ৩·০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
কালোর জয়ডঙ্কা বাজে ৪·০০

নীল ঘূর্ণি ৭·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

পাঁচটি শব্দ যাবে নিখরচায়

টেলিগ্রামের ঠিকানায়

আপনি যে টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছেন তার ঠিকানা দীর্ঘ হলে উদ্বিগ্ন হবেন না।

এরকম ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচটি শব্দের জন্য পয়সা লাগে বটে তবে তার পরের পাঁচটি শব্দের জন্য কিছু দিতে হয় না।

একানায় সম্পত্তির বেশী শব্দ থাকলে অবশ্য অতিরিক্ত শব্দগুলির জন্য পয়সা লাগে।

ঠিকানায় শহরের নাম লেখার পর সেখানকার পিনকোডও লিখে দেবেন। এর জন্য কোনও খরচ পড়বে না।

মনে রাখবেন সঠিক ও সম্পূর্ণ ঠিকানা লিখলেই কেবল টেলিগ্রাম যথাস্থানে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

davp 73/173

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৯	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪১	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৪৭	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৪৯	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৩	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৫৭	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষণক
৫৯	হিপির কান্না		—শ্রীসৌমেন মুখোপাধ্যায়
৬১	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৬৩	কিছুই বলা যায় না	(গল্প)	—ইবনে ইমাম
৬৭	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬৮	বিবাহ বিচিত্রা		—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৭০	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৭১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

বয়ঃসন্ধির প্রেমের গল্প ॥

সম্পাদনায় : বীরেন্দ্র দত্ত ও ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ থেকে বিশ শতকের ছ-এর দশকের মধ্যে লিখিত—বয়সের জটিল কয়েকটি সন্ধিলগ্নের প্রেমভাবনার বিচিত্র গল্প সংকলন। ৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ ॥

সম্পাদনায় : ডঃ অরুণকুমার বসু, পি-আর-এস, ডি-ফিল ও অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।

৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ শাক্তপদাবলী সংকলন (সমগ্র) ॥

সম্পাদনায় : ডঃ অরুণকুমার বসু।

৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের **দেবী চৌধুরাণী** সম্পাদনায় : ডঃ অরুণকুমার বসু

বিভূতিভূষণের **পথের পাঁচালী** অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস ও অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের **শেষের কবিতা** অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ **ঘণ্টা ঘাড়**

বংশীধারী দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **কোথায় পা রাখি।**

সুনীল হাজরার প্রথম কাব্যগ্রন্থ **রোদ্দুরে হৃদয় রেখে।**

পবনেশ মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ **আমার কাছে কমলপুর।**

দেবব্রত ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ **আর নয়।**

বটকৃষ্ণ দাসের কবিতা

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

রত্নাবলী ঃ ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা ৯

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্নিদগ্ধ

নক্ষত্রের জন্ম ৩-০০

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

লাভার্স লেন ৩-২৫

স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটক

রাজা বদল ৩-০০　শতাব্দীবধূ ৩-০০

কবর থেকে বলছি ৩-০০　দ্রৌপদী ৩-০০

মনোজ মিত্র

চাকভাঙ্গা মধু ৩-৫০

ধীরু মুখোপাধ্যায়—বাঘা যতীন ৪-০০

বাসুদেব বসু—নেফা রহস্যময়ী নেফা ৪-০০

সলিল সেন—উৎসর্গ ২-৫০

উমানাথ ভট্টাচার্য—জন্মমৃত্যু ৩-০০

শক্তিপদ রাজগুরু—মসনদ ২-৫০

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়—চরৈবেতি ৩-৫০

শচীন ভট্টাচার্য—অবতার ৩-০০

ভোলা দত্ত—স্বপ্ননয় ৩-০০

রতন ঘোষ—সমুদ্র শঙ্খ ২-০০

রতন ঘোষ—প্রতিবাদ ২-০০

সমর মুখোপাধ্যায়—মৃতদেহ ৩-২৫

—ঐ— হে মোর পৃথিবী ২-৫০

দিলীপ মৌলিক—ছায়াছায়া আলো ২-০০

মণীন্দ্র রায়ের কাব্য নাটক—

নাটকের নাম ভীষ্ম ৩-৫০

দিলীপ মৌলিক ও শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

আজকের একাঙ্ক ৫-০০

লিখেছেন ঃ—

অমর গঙ্গোপাধ্যায়—এই পৃথিবী

উমানাথ ভট্টাচার্য—দিবারাত্র

কিরণ মৈত্র—অঘোষ

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়—সাগর সঙ্গমে

ভোলা দত্ত—খেলা

মনোজ মিত্র—তক্ষক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়—রাজপাখী

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য—মাশুল

নীহার গুপ্ত সম্পাদিত

নতুন রীতির একাঙ্ক ৬-০০

লিখেছেন ঃ—

সলিল মজুমদার—উন্মোচন

মানবব্রত মুখোপাধ্যায়—বিনিময়ে কিছু

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়—এ আমরা চাইনি

সত্যেন ভদ্র—রক্তাক্ত শপথ

তপনকুমার ঘোষাল—নতুন জোয়ার

শান্তি বর্ধন—অনাহারে নয়

লিপিকা, ৩০/১এ, কলেজ রো, কলি-৯।

শারদীয় অমৃত
১৩৮০

মহালয়ার আগেই প্রতি বছরের মতো বিশিষ্ট রচনা ও
চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

এবার উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীর রক্ষিত

একটি বিস্ময়কর ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তাছাড়া, প্রায় দু ডজন গল্প,
একটি পূর্ণদীর্ঘ শিকার কাহিনী,
এবং সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ এবং
নিবন্ধ, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা, গৃহসজ্জা ইত্যাদি
বিষয়ে সুলিখিত সচিত্র রচনা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা তিন

সম্পাদকীয়

পরমাণু অস্ত্রের নির্লজ্জ পরীক্ষা

এই শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, পরমাণু বোমা নিষিদ্ধ করা না হলে একদিন-না-একদিন এই মারণাস্ত্র পৃথিবীর ধ্বংস ডেকে আনবে। ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় হোক, কোনো-না-কোনো শক্তি এই অস্ত্র আকস্মিকভাবে ব্যবহার করে ফেলবে। আইনস্টাইনের এই আশঙ্কার কথা অনেকেরই মনে পড়বে, সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে মোরুরুয়া প্রবাল-বলয়ে ফরাসী সরকারের পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষায়। পরমাণু বোমার অন্যতম আবিষ্কর্তা ডাঃ ওপেনহাইমার আমেরিকার নেভাদা মরুভূমিতে প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করার পর সখেদে বলেছিলেন, বিজ্ঞান এ কি ভয়ানক অস্ত্র রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিল! বিজ্ঞানীদের এই আশঙ্কা আজও সত্য। আজও সেই সন্ত্রাস সমস্ত বিশ্ববাসীর মাথার ওপর ঝুলছে ডেমোক্লিসের তরবারির মতো। রাজনীতিকদের বিচার-বুদ্ধির ভুলে যে কোনো সময় পৃথিবী পরমাণু যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

পরমাণু অস্ত্র প্রথম পরীক্ষা করে আমেরিকা। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহর দুটি এই বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কয়েক লক্ষ লোক এই নিদারুণ মারণাস্ত্রের আঘাতে প্রাণ হারায়। আরও বহু লোক তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির আক্রমণে সারা জীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যায়। হয়তো বা কয়েক প্রজন্ম ধরেই এই বিক্রিয়ার জের চলবে। ১৯৪৫ সালে যে অ্যাটম বোমা বর্ষণ করা হয়েছিল সে তুলনায় এখন পরমাণু অস্ত্র বহুগুণ বেশী শক্তিশালী হয়েছে। তখন একমাত্র আমেরিকাই ছিল এই অস্ত্রের অধিকারী। এখন রাশিয়া, চীন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ১৯৬৩ সালে মস্কো চুক্তি অনুযায়ী আংশিকভাবে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। বলা হয় যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বা সমুদ্রের জলে আর এই মারাত্মক অস্ত্র পরীক্ষা করা হবে না। কেবলমাত্র ভূগর্ভেই এই অস্ত্র পরীক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে। আশ্বাস দেওয়া হয় যে, যাদের পরমাণু অস্ত্র নেই তাদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র ব্যবহার করা হবে না। বরং তাদের পক্ষে গ্যারান্টি থাকবে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী পরমাণু অস্ত্রধারী রাষ্ট্রসমূহ। অনেক রাষ্ট্রই সে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। ভারতও করেছিল। কিন্তু পরমাণু অস্ত্রধারী চীন এবং ফ্রান্স সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি। এই দুটি রাষ্ট্র আজও বায়ুমণ্ডলে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করে যাচ্ছে। যার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে, মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন। অর্থাৎ পরমাণু যুদ্ধ না হলেও তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে পৃথিবীর মানুষের রেহাই নেই। কারণ, বিজ্ঞান যে শক্তি রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিয়েছে, তার মারাত্মক ফল মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে।

ভারতবর্ষ সব সময়েই পরমাণু অস্ত্র তথা পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে তার বক্তব্য পৃথিবীবাসীর সামনে রেখে আসছে পৃথিবীকে যুদ্ধভয়মুক্ত করতে না পারলে শান্তি ও সমৃদ্ধির ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অপুষ্টিতে অনগ্রসর, অন্ধকার জগতে বাস করছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ চেয়েছিল সমৃদ্ধ দেশগুলোর সহায়তায় অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন। সমৃদ্ধ দেশগুলোর জাতীয় আয়ের এক শতাংশ যদি তারা মানবিক কল্যাণে দান করত তাহলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার ভাগ্য ফেরানো সম্ভব হত। কিন্তু সেই প্রত্যাশিত অর্থ পাওয়া যায় নি। কারণ, উন্নত দেশগুলোর যারা মধ্যমণি সেই বৃহৎ শক্তিগুলো পরমাণু অস্ত্রের পাল্লায় মেতেছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হচ্ছে শুধু মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্য। এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতা পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলেছে। ফ্রান্সের মতো দেশ কি উদ্দেশ্যে এই মারাত্মক প্রতিযোগিতায় নেমেছে তা বোঝা মুস্কিল। নিজেকে বৃহৎ শক্তি হিসেবে মনে করার জন্যই তার এই আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা। ক্ষোভের কথা এই যে, সে পরীক্ষা চালাচ্ছে নিজের দেশের মাটিতে নয়, প্রশান্ত মহাসাগরে তার উপনিবেশে। এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পৃথিবীর বহু শান্তিকামী দেশের মানুষ। নিউজিল্যান্ডের একজন মন্ত্রীকে নিয়ে একটি জাহাজ নীরব প্রতিবাদ জানাবার জন্য মোরুরুয়ার দিকে গিয়েছিল। কিন্তু শক্তিমদমত্ত ফ্রান্স কোনো প্রতিবাদেই কান দেয় নি। তারা এই বিধ্বংসী পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। এ থেকে এই শিক্ষাই মানুষ নেবে যে, শক্তির দম্ভের কাছে ন্যায়নীতি, শান্তি ও সহযোগিতার কথা কত অর্থহীন। ফরাসী দেশেই একদিন স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির নামে জনগণের ঐতিহাসিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। সেই ফরাসী সরকার একদিকে বাস্তিল দিবসের উৎসব পালন করছেন, অন্যদিকে পৃথিবীর মানুষকে ভয় দেখাচ্ছেন পরমাণু অস্ত্রের। এর বিরুদ্ধে সমগ্র শান্তিকামী মানুষের আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। ভারত সরকার এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পরমাণু অস্ত্র দিয়ে যারা পৃথিবীকে নিজেদের আধিপত্যের আওতায় রাখতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক শক্তির জাগরণ আজ অপরিহার্য। শক্তি নয়, শান্তির পথেই পৃথিবীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। পরমাণু অস্ত্র সেখানে অবান্তর ও পরিত্যাজ্য।

দেশ বিদেশে

স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ছকে এতদিন ইরানের বিশেষ কোন স্থান ছিল না। যদিও ভারতের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক দীর্ঘকালের, যদিও সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে তখনকার পারস্যের সঙ্গে এদেশের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, পরবর্তীকালে যদিও ভারতে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে প্রধানত পারস্যের মাধ্যমে এবং যদিও পারস্য ছিল অবিভক্ত ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম অঞ্চলের স্বাধীন ভারতবর্ষ তার পররাষ্ট্রচিন্তায় ইরানকে বিশেষ আমল দেয়নি।

এই উদাসীনতার একটি কারণ হল, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পরিকল্পনাকারেরা ইরান সম্পর্কে পূর্ববর্তী বৃটিশ শাসকদের নীতিই অনুসরণ করে গেছেন, নতুন পরিস্থিতিতে এই নীতি বদল করার দরকার আছে কিনা তা নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাননি। ইরান রাশিয়ার করতলে চলে যেতে পারে বলে এক সময়ে বৃটেনের যে ভয় ছিল সেটা সে ১৯০৭ সালের পর কাটিয়ে ওঠে। ঐ বছর বৃটেন ইরান সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তিতে স্থির হয় যে ইরানে বৃটিশ প্রভাবাধীন এলাকা ও রুশ প্রভাবাধীন এলাকা পৃথকভাবে চিহ্নিত থাকবে এবং একে অপর এলাকায় নাক গলাবে না। ঐ চুক্তির পর থেকে বৃটেন ইরানের তেল ছাড়া আর কিছু নিয়েই মাথা ঘামায় নি। মধ্যে একবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরানের বুকে জার্মান এজেন্টদের কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃটেন ইরান আক্রমণ করেছিল। এই আক্রমণের ফলে ইরানের তৎকালীন শাহেনশাহ ও পেহ্‌লবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রেজা শাহ সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাঁর পুত্র বর্তমান শাহেনশাহ মহম্মদ রেজা শাহ পেহ্‌লবি সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং বৃটিশ ও রুশ সৈন্যবাহিনী ইরান থেকে যুদ্ধপরিচালনার অধিকার লাভ করেন। তার পর থেকে বৃটেন আবার ইরান সম্পর্কে তার পুরনো অভ্যস্ত উদাসীনতার নীতিতে ফিরে যায়। স্বাধীন ভারতবর্ষ ইরান সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সেই বৃটিশ নীতিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে, ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে ভারত বড় বেশি মাথা ঘামায় নি।

ইরানের প্রতি ভারতের এই উদাসীনতার আরও একটি কারণ ছিল। মোসাদ্দেগের অভ্যুত্থান, শাহের দেশত্যাগ, সি-আই-এ-র হস্তক্ষেপে মোসাদ্দেগের পতন, শাহের প্রত্যাবর্তন, দেশের ভিতর কম্যুনিষ্টপন্থী তুদে পার্টির আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা নিয়ে ইরান প্রথম দিকে এত ব্যস্ত ছিল যে, বিশ্ব রাজনীতিতে কোন রকম কার্যকরী ভূমিকা পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইরানের প্রতি ভারতের নীতি অতীতের ঐতিহ্যের ধারা এতটাই আচ্ছন্ন ছিল যে, ইতিমধ্যে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছিল সেগুলির দিকেও ভারত ভালভাবে নজর দেওয়ার অবকাশ পায়নি। শাহ দেশে ফিরে এসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, রাজপরিবারের জমি সহ বহু জমি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়ে একটি 'শ্বেত বিপ্লব' সম্পন্ন করলেন, বৃটিশ তেল কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে নীতি প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেগ প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন সেই নীতি অনুসরণ করে তিনি তেল থেকে তাঁর দেশের আয় বাড়িয়ে ফেললেন। বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার মত রাজনৈতিক স্থিরতা ও বৈষয়িক সামর্থ্য ইরান অর্জন করল। সে বাগদাদ চুক্তিতে (পরবর্তীকালে 'সেন্টো' নামে অভিহিত) যোগ দিল। ১৯৫৯ সালেই শাহেনশাহ মহম্মদ রেজা শাহ পেহ্‌লবি ঘোষণা করলেন, ইরান তার প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করে পৃথিবীর এই অঞ্চলে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে। ১৯৭১ সালে ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাড়ম্বর উৎসবের আয়োজন করে ইরান সারা পৃথিবীকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে দিল। শাহেনশাহ 'আর্যমেহর' (আর্যসূর্য) উপাধি ধারণ করলেন।

ঘরের পাশে যখন এইসব ঘটনা ঘটছিল তখনও কিন্তু ভারতবর্ষ সেদিকে তেমনভাবে নজর দেয়নি। দিল্লি এইসব ঘটনার তাৎপর্য বোঝারও চেষ্টা করেনি, তাদের ভবিষ্যতে ইরান বিশ্ব রাজনীতিতে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে সেটাও ভারত অনুধাবন করার চেষ্টা করে নি।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইরান সম্পর্কে ভারতের কতকটা চোখ খুলেছিল। সেই সময়ে ভারত বুঝেছিল যে, ভারতবর্ষের প্রতি পাকিস্তানের বৈরী আচরণ ইরানের প্রশ্রয় লাভ করেছে ও করবে।

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে ইরানের ভূমিকাটা অনেক স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে ১৯৭১ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর। তেহেরান এখন খোলাখুলিভাবেই বলছে, সুয়েজের পূর্বে ও জাপানের পশ্চিমে বৃহত্তর শক্তি হওয়া তার লক্ষ্য। সুয়েজের পূর্ব থেকে বৃটিশ শক্তির অপসারণের ফলে যে 'শূন্যতা' সৃষ্টি হয়েছে ইরান সেই 'শূন্যতা' পূরণ করতে চায়। যে হরমুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মোট তৈলবাণিজ্যের ৮০ শতাংশ চলাচল করে সেই জলপথের উপর ইরান তার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্তত চারটি উদ্দেশ্যে ইরানের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে:—(১) সোভিয়েট রাশিয়াকে ইরানের উত্তরে আটকে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুশ প্রভাবের দক্ষিণমুখী বিস্তারের সম্ভাবনা বন্ধ করতে চায়। (২) ভারতের বিরুদ্ধে আর একটা পাল্টা শক্তি তৈরি করে রাখার যে নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতদিন অনুসরণ করে আসছে একাত্তরের যুদ্ধের পর এখন শুধু পাকিস্তানকে দিয়ে সেই নীতি কার্যকর করা যাবে না, এটা আমেরিকা বুঝতে পারছে। সেই কারণে এখন সে ইরান ও পাকিস্তানের যুক্ত সামরিক শক্তিকে ভারতের বিরুদ্ধে খাড়া করতে চাইছে। (৩) হরমুজ প্রণালীতে ইরানের আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করা আমেরিকা তার তৈলস্বার্থের অনুকূল বলে মনে করে। (৪) তেল বাতানি করে ইরান ডলারের যে বিপুল মেদভার সঞ্চয় করছে সেটা হ্রাস করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল ইরানকে আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র ও সামরিক সাজসরঞ্জাম বিক্রি করা। নগদ দামে ইরানকে মারণাস্ত্র বিক্রি করে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি মেটাবার এই সুযোগ ছাড়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিক এইসব ঘটনার যোগফল হল—ইরানের প্রায় ২০০ কোটি ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা সেন্টো চুক্তির পুনরুজ্জীবন, তেহেরান-ওয়াশিংটন যুক্ত অভিসন্ধির সঙ্গে পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী স্বার্থ ও চীনের রুশ-বিরোধী স্বার্থের মেলবন্ধন। আর ভারতের দিক থেকে এইসব ঘটনার যোগফল হল—দিল্লি-তেহেরান সম্পর্কের দ্রুত অবনতি।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শাহেনশাহের সাম্প্রতিক কয়েকটি বিবৃতি দুই দেশের সম্পর্ককে অবনতির পথে ঠেলে দিতে সাহায্য করেছে। যেমন, একজন বিদেশী সংবাদদাতাকে তিনি বলেছেন, 'অকস্মাৎ আমরা দেখলাম, কয়েক ডিভিসন সৈন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে এল। দেখলাম, পাকিস্তান খণ্ডিত হল, জনসংযোগের মাধ্যমগুলি বাহবা দিতে লাগল, রাষ্ট্রসঙ্ঘ আরও একবার বিবশ হয়ে রইল, বৃহৎ শক্তিগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকল আর এই সব কিছুই ঘটল সোভিয়েট-ভারত চুক্তির পর। পশুশক্তি প্রয়োগ করা হল, একটা দেশের জায় দখল করা হল, অথচ এব্যাপারে কেউ কিছু করতে পারল না।'

এই বিবৃতি ও এই ধরনের আরও কয়েকটি প্রকাশ্য বিবৃতির মধ্য দিয়ে তেহেরান এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখে নি যে, ভারত সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রভাব ইরান পরোপুরি বিশ্বাস করেছে। ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে ইরান যে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়াবে, সেটাও সে খুব খোলাখুলিভাবেই বলেছে।

ভারত-ইরান সম্পর্কের অবনতির আর একটি সাম্প্রতিক কারণ হল ইরাকের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব। আফগানিস্থানে মহম্মদ দাউদ খাঁর অভ্যুত্থানও ইরানের উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

*

এই সব দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও, ভারত যে ইরানের সম্পর্ক যতটা সম্ভব পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী হয়েছে সেটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পরিপক্কতার লক্ষণ বলতে হবে। বিশ্ব রাজনীতির বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দুটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব মধুর না হতে পারে। কিন্তু

সেটা ঐ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে কোন বাধা নয়। আর এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরিণামে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসেও কিছুটা সহায়তা করে। ইদানীং এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি।

ভারত নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছে যে, এমনকি সোভিয়েট রাশিয়াও ইরানকে সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে দেয়নি। মার্কিন শিবিরের সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও আলেকসি কোসিগিন তেহেরানে গিয়ে শাহের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। গত বছর অকটোবর মাসে শাহও মস্কোতে গিয়েছিলেন। আমেরিকা যদিও ইরানকে অস্ত্রসম্ভার দিচ্ছে তাহলেও ইরান বৈষয়িক সহায়তা লাভ করছে সোভিয়েট রাশিয়ার কাছ থেকে। ইরানে একটি ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য দিতেও সোভিয়েট রাশিয়ার আটকাচ্ছে না।

সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ভারত-ইরান সম্পর্কের বর্তমান অবস্থায়ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং তেহেরানে সফর করে এলেন এবং এই উপলক্ষে দুই তরফ থেকেই কিছু কিছু ভাল ভাল কথা বলা হল।

এই সফর উপলক্ষে তেহেরানের সংবাদপত্রে যে সংবাদ বেরিয়েছিল তা যদি সত্য হয় তাহলে মাস দুয়েক আগেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য নয়াদিল্লি ও তেহেরানের মধ্যে গোপন আলাপ-আলোচনা চলছিল। স্বরণ সিংহের সফরের প্রাক্কালে ভারতীয় সাংবাদিক গিরিলাল জৈন তেহেরানে গিয়েছিলেন শাহ-এর সঙ্গে কথা বলতে। শ্রীজৈনের মারফৎ কিছু প্রবোধবাক্য শুনিয়ে শাহ স্বরণ সিংহের এই সফরের পথ সুগম করারও চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীজৈনকে তিনি বলেছিলেন, ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ না করলে ইরান তার অস্ত্রশস্ত্র ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে দেবে না।

সফর সম্পর্কে মন্তব্য করে তেহেরানের একটি সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে, স্বরণ সিংহের এই সফর ভারত-ইরান সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণের সূচনা করছে। স্বরণ সিংও এই সফর থেকে ফিরে এসে বলেছেন, এই সফর 'আবহাওয়া অনেকটা পরিষ্কার করে দিয়েছে এবং এখান থেকে দুই দেশের মধ্যে সার্থক সহযোগিতার সূচনা' হতে পারে। ইরান সরকার নাকি এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে ভারতের সঙ্গে আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকা সমস্যাগুলির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইরাণ পাকিস্থানের ওপর তার প্রভাব প্রয়োগ করবে বলেও নাকি আশ্বাস দিয়েছে এবং এবিষয়ে ভারত ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে ইরান নাকি তার তারিফও করেছে। তাছাড়া, মাদ্রাজের তৈল শোধনাগার সম্প্রসারণে সহযোগিতা করতে ইরান নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

ইরান সম্পর্কে আমাদের আশা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে মে মাসে তেহেরানে ইরান সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এম সি চাগলা বলেছিলেন, ইরান নাকি কথা দিয়েছে, আর একবার ভারত-পাকিস্থান সঙ্ঘর্ষ হলে সে পাকিস্থানকে সমর্থন করবে না। ইরান চাগলার এই কথার প্রতিবাদ করতে দেরি করে নি। অতীতের এই নজীর মনে রাখলে এখন ভারত-ইরান সম্পর্কের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নয়াদিল্লি থেকে যেসব কথা বলা হচ্ছে সেগুলির উপর পুরোপুরি আস্থা রাখা কঠিন।

'পাকিস্থান ভারতের দ্বারা আক্রান্ত হলে' ইরান তার মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে পাকিস্থানের পাশে এসে দাঁড়াবে, এই প্রতিশ্রুতি ইরান প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্থান সঙ্ঘর্ষ ঘটলে কে আক্রমণকারী আর কে আক্রান্ত সেটা ইরান ভারতের কথা শুনে ঠিক করবে বলে মনে হয় না। অতীতেও সে তা করে নি, স্বরণ সিং ইরানের নেতাদের কাছে ভারতের শান্তিপ্রিয়তার কথা যতই বলে আসুন না কেন, ভবিষ্যতেও সে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাবে বলে মনে হয় না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং যেদিন তেহেরান থেকে দিল্লিতে ফিরলেন সেদিনই মস্কো সফর থেকে ফিরলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম। দিল্লির বিমান বন্দরে সাংবাদিকরা ইরানের অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে দুই মন্ত্রী দুই রকম উত্তর দিলেন। ইরানের অস্ত্র পাকিস্থানের হাতে পড়ার সম্ভাবনার বিষয়টি স্বরণ সিং সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। আর জগজীবন রাম বললেন, ইরানের অস্ত্রসজ্জার তাৎপর্য সম্পর্কে ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়া একমত।

দুই মন্ত্রীর এই দুই রকম প্রকাশ্য বিবৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, ইরানের অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে জোর দেওয়া হবে, অথবা কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে ইরানের সামরিক শক্তিকে ভারতের সীমান্ত থেকে যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করা হবে, এবিষয়ে ভারত সরকারই এখন পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেন নি।

স্বরণ সিংয়ের তেহেরান সফরের পরই ইরানের শাহ ওয়াশিংটনে গেলেন প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। পথে লন্ডনে পাকিস্থানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সঙ্গেও তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা হল। আমেরিকায় গিয়ে শাহ সেদেশের সর্বাধুনিক ফিনিকস ক্ষেপণাস্ত্রসজ্জিত এফ-১৪ 'টমক্যাট' বিমান কেনার কথা পাকা করে এলেন। প্রত্যেকটি প্রায় ১৪ কোটি টাকা দামের এই বিমান ইরানী নৌবহরকে শক্তিশালী করে তুলবে। কিন্তু আমেরিকান সাংবাদিকদের ক্রমাগত প্রশ্নের উত্তরেও ইরানের শাহ ভেঙে বলতে রাজী হন নি, এই মারাত্মক অস্ত্রসজ্জা তিনি করছেন কোন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

আপাতত দেখা যাচ্ছে, শাহ ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্যা নিয়ে ভাঙাভাবেই মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন। সংবাদে প্রকাশ যে, ইসলামাবাদে ভারত-পাকিস্থান সম্মেলনের প্রাক্কালে শাহ একটি মীমাংসার সূত্র দিয়েছেন।

২৭-৭-৭৩ —পুনশ্চ

শেকসপীয়র রচনাবলী

বঙ্গদর্শন

বাংলায় বের হচ্ছে। রেক্সিনে বাঁধাই ও খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী টাকা প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় ৮ টাকা হিসেবে দিতে হবে। ১ম খণ্ড ১৫ই আগষ্ট বের হবে।

মনিঅর্ডার পাঠান, গ্রাহক হবার ঠিকানা:
রিক্লেক্ট পাবলিকেশন
৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
(পুরবী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাঝে)

বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সবকটি সংখ্যা ৯ খণ্ডে বের হচ্ছে। মূল্য ৮০ টাকা। ৮ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী টাকা প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় ৮ টাকা করে দিতে হবে। ১ম খণ্ড ২৭ সেপ্টেম্বর বের হবে।

আমাদের এ বসতি ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

আমাদের এ বসতির যেখান থেকেই ওপরের দিকে তাকাও—
দেখতে পাবে পাহাড়ের উঁচুতে লাইট-হাউসের ছটা ঘুরছে.....
নীচে কিনার ঘেঁষে ঢেউয়ে দুলতে থাকে লণ্ঠন ঝমেত নৌকাগুলো—
যাদের সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ রাত্রির জলযাত্রা .....
যেন বাতাসে বরুণে অন্ধকারে আর নক্ষত্র-ফেনায়
তাদের ভাগ্য গিয়েছে জড়িয়ে.....
অকলঙ্ক ইস্পাতের মত পুরুষের পথ
চেয়ে আছে আজো মোমবাতির মত মেয়ে.....
সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত
হুঁসিয়ারী হানে আলোক-স্তম্ভ ...
খাড়া নারকেল ও তালগাছে ঘেরা আমাদের এ বসতি
কাটিয়ে উঠেছে তিন-তিনটে সামুদ্রিক ঝড়.....
স্বপ্নে শুনেছে সৈকতপ্রান্তে হাঙরের মাছ শিকারের শঙ্খ.....
যে যতই সরে থাকুক,
হারিকেনের সময় এসে পড়েছিল আর সবার খুব কাছাকাছি.....

মধ্যরাতে ॥

জয়ন্তকুমার

মধ্যরাতে কে আমাকে ডাকে?
ঘড়ির ডায়াল দেখে মনে হলো, আমি আছি
প্রার্থিত ঋতুতে।

এখন শৈশব নয়, সন্ন্যাসের কাল।

কিনীত দুহাত দিয়ে দরজা খুলে দেখি,
দেয়ালে আলোর ছায়া—
ত্রিশূল! ত্রিশূল!
সমস্ত সময় যেন আহত ঘোড়ার মতো ডাকে!

মধ্যরাতে টেলিফোন? টেলিফোনে
কে আমাকে ডাকে? আমাকে সাবধান করে—
বসন্তে, বৈশাখে!

অজ্ঞাতবাসে ফাল্গুনী ॥

সুধীর দত্ত

আমার দুহাতে গাণ্ডীব তুলে দাও।
কপট পাশায় অজ্ঞাতবাস,
নির্বাসন,
ঘুমের মধ্যে দ্রৌপদীর বেণী খোলে,

শ্মশান শমীতে অক্ষয় তূণ,
বুকের গভীরে খাণ্ডব দাহ,
কোথায় কিরাত? পাশুপত দাও,
অজ্ঞাতবাস অসহ্য!

জতুগৃহের ভস্মে এখনও
জ্বলাসঙ্কাশ চাকা,
হৃদয়ে আমার গ্লানি,
সখা, বৃহন্নলার সাজ খুলে নাও
সাজাও ফাল্গুনী।

শরৎ গুনীন

শান্তিপদ রাজগুরু

—বোঝলেন বাবু, ভূতির মাথাটা বড়ো, আর জ্যানপরীর মাথাটা ছোট্ট তয় দাড়ি আছে। আর দানো যারে কন্ তার চারডা হাতপা বাদাবনে চরি বেড়ায়।

ভূত, জিনপরী আর দানোর এমন সহজ সরল পরিচয় শুনে অবাক হয়ে চেয়ে থাকি লোকটির দিকে। মুখে বয়সের দাগ, চোখ দুটো কেমন ঘোলাটে. বলিষ্ঠ হাতের রোমগুলোয় পাক ধরেছে, আর চুলগুলো শনের মত সাদা। বয়স হয়ে গেছে তবু সারাদেহে বলিষ্ঠ কাঠিন্য।

নাবান পরিচয় করিয়ে দেয়।

—শরৎদা, আমাদের হেডমিস্ত্রী।

ওই সব ভূত পেত্নী বাদাবনের জানোয়ার অপদেবতা যা বলেন সব ওর কাছে ঠান্ডা।

মেহের আলি সর্দার মাঝি, তার চোখের চাহনিতে বাদাবনের কাঠিন্য, অকূল গহিন গাং আর গহন সুন্দরবন এলাকার মানুষ তারা। এখানের মাটি আর বন, ওই গাং-এ রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। জলে কামট, কুমীর। মানুষ পড়লে কেটে টুকরো করে দেবে গাংএ তলিয়ে যাবার আগেই। আর বনে রয়েছে বিষাক্ত সাপ বাঘের দল। এখানে মৃত্যুটাই বড়—জীবন এখানে অসহায়। নিষ্ঠুর প্রকৃতির এই মুখোমুখী চ্যালেঞ্জের সামনে ওরা বসত করে আসছে. নৌকায় ওদের ঘরবসত। সুন্দরবনের গরান, কেওড়া সুন্দরী গাছ কাটে, এই বাদাবনেই কোনদিন বাঘের হাতে, সাপের ছোবলে প্রাণ দেয়, নয়তো গহিন গাংএর ভুফানে নৌকাডুবিতে নিখোঁজ হয়।

এই ওদের জীবন. মেহের আলি পাতলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে জানায়, —গুস্ত গুনীন বাবু আমাদের শরৎ ভাই, ওর সাহসেই তো বাদাবনে বইছি। শরৎ এর কোঁকড়ানো মুখে একটু হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। চুপ করে হুঁকোটা টানছে সে।

শান্ত রাত্রি নেমেছে সুন্দরবনে। লোকালয়এর সীমানা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখানে শুধু আদিম অরণ্য। ঘন অন্ধকারে খালের জলটা চিক চিক করে, দুপাশে ওর কালো আঁধার জমা ঘন বন, মাঝে মাঝে টুনি বাল্বের মত ছোট ছোট নীল বিন্দুগুলো জ্বলে ওঠে, হরিণের চোখ, আঁধারে ওরা খালের ধারের বনের আড়াল থেকে নৌকাবসতের দিকে চেয়ে থাকে। বড গাং-এর দিক থেকে আসে বাতাসের হিংস্র গর্জন বনের গাছ-গাছালির জমাট দেওয়ালে বাধা পেয়ে ফুঁসিয়ে উঠছে বনভূমির বুকে ক্ষুব্ধ গর্জনধ্বনি আদিম হিংস্র আরণ্যক পরিবেশে নৌকা কতকগুলো যেন হারিয়ে গেছে, মানুষের অস্তিত্বটুকু এখানে অকারণ. বনের কাঠ কাটতে এসেছে ওরা, মহাজনী নৌকায় চালান যাবে বনের নিহত বংশধরের দল, ওরা তাই এখনে অবাঞ্ছিত।

তারাগুলো জ্বলছে প্রদীপ্ত আভায়। নৌকাগুলো মাঝখানে গায়ে গায়ে ছিটে নোঙর করে আটকানো। বনের ধারে কাছে থাকলে সুন্দরবনের বাঘ হানা দেবে নৌকায়, দু'একজন বাওয়ালি—কাঠুরিয়া ওদের কবলে যায় তবুও। একটা নীরব আতঙ্ক নামে নৌকাবসতে। দু'একটা লন্ঠন জ্বলছিল এতক্ষণ, সেগুলোর অধিকাংশ

নিভে আসে। ওদিকের নৌকাতে কোন রসিক বাওয়ালি গলা ছেড়ে গান গাইছিল, ভাওনা গাজীর গান।

—পুবাল দ্যাশে যাইও বন্ধু
সিধা উজান বাইয়া—

তার একক সুরটা ক্রমশ রাত গভীরের অরণ্য আদিমে কোথায় হারিয়ে যায়। ক্লান্ত মানুষগুলো কাঁথা-ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে নৌকার ছই এর মধ্যে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়ছে।

...শরৎ নাথ এই জীবনটাকে দেখেছে বহু বছর ধরে। জোয়ান বয়সে বাপের কাছে হাতুড়ি বাটালি ধরতে শিখেছিল বসন্তপুরের মহাজনের ঘরে। পাকা মিস্ত্রী ছিল তার বাবা, ও অঞ্চলের নামকরা লোক। বসন্তপুর-হিঙ্গুলগঞ্জ থেকে শুরু করে ভাটি অঞ্চলের বা শিবসা নদীর গাংএ তার হাতের তৈরী নৌকার কদর ছিল। বাওয়ালি জান ওই নৌকা। তার ভরসাতেই রায়-মঙ্গল-পসর-শিবসা-ছায়াকুপা পাড়ি দিয়ে বাদাবনে যেতো তারা।

শরৎ বাপের কাছে ওই কাজ শিখেছিল। ওর হাতের বেতনাই-টাপুরী-ছিপ—মায় চৌধুরী নৌকা এখন মিত্তিরবাবুদের কারবারে খাটছে।

চলতি ডিঙ্গিগুলো দু' দাঁড়ে চার দাঁড়ের নৌকাকে পিছনে ফেলে শন্‌শনিয়ে যায় জল কেটে, লোকে জানে শরৎ নাথের হাতের কারসাজি।

...সেই শরৎ নাথ ক্রমশ এদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

—বাবু হাতের কাজ এর সঙ্গে সঙ্গেই বাদাবনে ঘোরা শুরু হয়ি গেল, তখন থেকেই ওই বিদ্যা শেখলাম। বাদাবনে ওনাদের রাজত্বি। মুখবন্ধন—দেহবন্ধন—ক্ষেত্রবন্ধন—

শরৎ নাথ তার নিজের মনের চাপাপড়া কথাগুলোই বলে চলেছে। বোধহয় রাতের জোয়ার এসেছে। এতক্ষণ পর মানুষগুলো একটু নিশ্চিন্ত হয়। কারণ ভাটার সময় গাংএর জল আট দশ হাত কমে যেতে খালের দুদিকে কালো পুরু পলিকাদা বের হয়ে পড়ে, নৌকাগুলো তীরের কাছে এসে যায়। বনের মধ্য থেকে বাঘ ইচ্ছে করলেই এসে লাফ দিয়ে পড়তে পারে নৌকায়।

মেহের আলি বলে—পুরু পলি হুজুর, বড়শিয়ালেরও জানের ডর আছে না? একবার পলিতে সেঁদিয়ে গেলি আর ফিরতি পারবেন তিনি? বৈঠার ঘায়ে আর কুড়ুলের কোপে সেবার এক কত্তারে খতম্ করছিলাম না? আর কুমীরের কথা কন? কি রে মদনা?

মদনা ওপাশে ঝিমুচ্ছিল। বলিষ্ঠ কালো ইস্পাতপেটা স্বাস্থ্য, মদনা বলে—

একখান কুড়ুলই চলি গেল। কুমীরের ঘাড়ে এইসা কোপ মারলাম কুড়ুলখান বিবেক সেঁদিয়ে গেল, আর সেই কুড়ুল গতরে গাঁথি কুমীরটাও ডুবল? কে জানে শালা কোথায় মরি ভেসে ওঠেনি। তাই কই, ডরান কেনে? শুয়ি পড়েন রাত হই গেছে।

শীতের আমেজ এই জলের বিস্তারে কিছু কম, সমুদ্রের কাছাকাছি বনাঞ্চল। তবু একটু মিষ্টি আমেজ জমে রাত-গভীরে। ঘুম আসছে।

শরৎ নাথ এমন উদগ্রীব শ্রোতাদের ছেড়ে নিজের নৌকায় যেতে চায় না। গল্পটা জমছে বেশ। নারানবাবু ততক্ষণে নৌকার ছই-এর মধ্যে ব্যাগ মুড়ি দিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করেছে।

অগত্যা শরৎ নাথ বলে—নির্ভয়ে শুয়ি পড়েন বাবু, সব বন্ধন করি রাখছি। কুন ভয় নাই। যই, কাল আবার নৌকার কাম আছে।

অর্থাৎ মন্ত্রের বাঁধনে শরৎ আমাদের নিরাপদ পরিবেশেই রেখেছে।

রাত হয়ে গেছে। শরৎ বুড়ো চলে যেতে নারানের নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়।

র‍্যাগের আবরণ সরিয়ে চোখ খুলে বলে,

—বুড়ো গ্যাছে? উঃ—ওই জ্যান পরীর গল্প শুনতে শুনতে গেলাম। জানাই লোকটা ভালো। বাদাবনে তবু এত লোককে ভরসা দিয়ে রেখেছে।

নারান মিত্তিরের কাঠের কারবার অনেকদিনের। সুন্দরবনের নামকরা কাঠের কারবারী। ওর বাবার আমল থেকেই এই কারবার করে তারা বেশ দু' পয়সা কামিয়ে কলকাতায় বাড়ি গাড়ি—কাঠের গোলা করাতকল করেছে। ভাইরা সেইসব কারবার দেখে। নারানও বাদাবনের সঙ্গে যেন জড়িয়ে পড়েছে।

নারাণ আমার কথাটা হয়তো মনে মনে সমর্থন করে। একটা নির্শ্চিন্ত ভরসা না পেলে এই আদিম অরণ্যে মানুষ বাঁচতে পারে না। বুড়ো শরৎনাথের চোখে আমি দেখেছিলাম রাতের অন্ধকারে সেই আদিম জগতের চিহ্ন, যেখানে বাস করে ভূত জিনপরী, দানো আর ওই বাঘ কামট কুমীরের দল।

অবছা তারাগুলোর আলোর ঝিকিমিকি ওঠে গাং-এর জলে, ক্রমশ-কুয়াশার চাদর জড়িয়ে রহস্যময়ী আদিম রাত্রি বন-ভূমিকে নিবিড় আলিঙ্গনে ঢেকে দেয়। এ তাদের জগৎ, অশরীরি মায়াবিনীদের জগৎ।

ভোরের আগেই আবার আলোর মেলা বসে যায়, হাজারো পাখী কলকলিয়ে ওঠে। কেওড়া-গরান সুন্দরী-গর্জন গাছের মাথা ছাড়িয়ে আলোর রং লাগে আকাশে, দিগন্ত জোড়া গাং এর বুকে।

খালের ধারে একটু উঁচু জমি, আশ-পাশে শুরু হয়েছে বন আর বন। ওই জমির উপরই দু' একটা নৌকা তোলা রয়েছে। মেরামত করা হচ্ছে। কোনটায় পিচ আর টোয়েন সুতোর কাপিশ দিয়ে জল ঢোকা পথ বন্ধ করা হচ্ছে। কোনটায় হাল—না হয় গলুইএর জোড়কে পোক্ত করা হচ্ছে কাঠ বাটাম লাগিয়ে। শরৎনাথকে দেখেছি, বুড়ো সকালেই লোকজন নিয়ে কাজে নেমেছে। হাতুড়ি-বাটালি করাতের শব্দ ওঠে।

বাওয়ালির দল সকালেই নৌকা থেকে ছোট ডিঙ্গিতে নেমে জল তুলে স্নানপর্ব শেষ করেছে। জলে কেউ নামে না—কামট কুমীরের ভয়ে। তাই এই ব্যবস্থা। ওদিকে বড় একটা নৌকায় ওদের জন্য ভাত আর পেঁয়াজ দুচার টুকরো আলু কুমড়ো দিয়ে লঙ্কার আধিক্যে লাল ঝোলমত করা হয়েছে। ভাত তরকারী খেয়ে ওরা মালসায় কিছু পান্তা নিয়ে ছোট ছোট ডিঙ্গিতে বনের ভিতরে চলে যায় কাঠ কাটতে। শরৎ নাথের নজর সবদিকে। কাঠ চিরতে চিরতেই বলে—চান না করি কুন সম্বন্ধী কোপে যাবি নি। মা বনবিবির ঠাঁই। বনে নামবি মায়েরে হাঁক দিই, সেলাম করি। যা নির্ভয়ে চলি যা।

ডিঙ্গি ভর্তি মানুষগুলো কুড়ুল বৈঠা সম্বল করে ওই গহনবনে ঢুকলো কাঠের সন্ধানে। দূরে কোথায় বনের গভীরে কাঠ কাটার কর্কশ শব্দ ওঠে—ঠক্ ঠক্ ঠক্।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে শব্দটা গাং-এর বিস্তারে।

এ সময় নৌকাবসত ফাঁকা হয়ে যায়। দু' চারজন থাকে ওই শরৎ নাথের মিস্ত্রী লোকজন। আমাদের নৌকাখানাও বাঁধা রয়েছে। ছোট ডিঙ্গিতে করে নামলাম মাটিতে।

শরৎ হাঁক পাড়ে—বাদাবনের দিকে যাবেন না বাবু।

চারিদিকেই বন। ওর সাবধানী দৃষ্টি যেন আমাদের ঘিরে রেখেছে। কদিন নৌকাবসতে এসেছি। ডিঙ্গিতে করে এক-আধটু ঘোরা ছাড়া আর কোনো কাজও নেই। শরৎ নাথের ডাকে ওই নৌকাগুলোর দিকে এগিয়ে গেলাম।

বনের একপাশের ওই জায়গাটুকুতে নৌকাগুলো কাঠ দিয়ে কাৎ করা হয়েছে। নোনা গাং পাড়ি দিতে হয়, তাই নৌকার এমন যত্ন নেওয়া দরকার। নাহলে সামান্য ফাটাফুটো নৌকাও তলিয়ে যেতে পারে অতল গাংএ যে কোন সময়।

কাঠের উনুনে পিচ গলানো হচ্ছে। করাত বাটালি হাতুড়ির শব্দ ওঠে। শরৎ

বলে—বাদাবনেই কারখানা বানাইছি বলেন। লা'এর চাতুরির কথা বলছিলাম। দ্যাখেন ওই 'বেতনাই' খান। সরকারী জল-মার্কায় মাপ এর কচ্ ওতে আড়াইশো ছুপ। কিন্তুক মাল ধরবে নি ছরশ' মণ নির্ঘাস? বাবুর জন্যি লা খান্ বানাই-ছিলাম—

সুন্দরবনের কাঠ এর জন্য সরকারকে মাশুল দিতে হয় ওজন হিসাবে। তার একটা গড় মাপ এর রীতিও আছে। কিন্তু নৌকায় মাল তুললে মালের ভারে নৌকাটা জলে খানিকটা বসে যাবেই। সেই অনুপাতে নৌকায় জলমাপ এর উপর চিহ্নিত করা হয়।

কিন্তু কৌশলী হিসেবী মিস্ত্রীর হাতের নিপুণভাবে তৈরী নৌকা এই হিসাবকে ঠকাতে পারে; নৌকার গঠন-শৈলী এমনভাবে হবে যে তাতে জল মাপ-এর ওজন ঠিক হিসাবে মিলবে না।

বুড়ো শরৎ নাথ তেমনি মিস্ত্রী।... নিজের কৃতিত্বের পরিচয়টা দেখাবার জন্যই যেন বিশেষ কৌশলে একখানা মাত্র নৌকার সে নমুনা রেখেছে।

চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। বলিষ্ঠ পেশীগুলো এখন সক্ষমতার পরিচয় দেয়। ওরা নৌকার কাজ করছে।...বাতাসে ওঠে পিচ পোড়ার গন্ধ, রোদ বেড়ে ওঠে—জোয়ারের জল ভাটার টানে নেমে গেছে, খালের বুকে কালচে পলি থিক থিক করছে, কেওড়া গাছের সবুজ হলুদ পাতায় যৌবনদৃপ্ত রোদের সতেজ চাপল্য।. হঠাৎ বনের ভিতর থেকে একটা কলরব ওঠে। দূরে কাঠুরিয়ার দল কাঠ কাটতে গেছে—তারা যেন চীৎকার করছে।

একটা নৌকার গলুইএ কাঠ মারছিল শরৎ নাথ, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে ওই চীৎকারটাকে আমরাও শুনেছি। ভীত আর্তনাদটা বন থেকে ভেসে আসছে, হঠাৎ শরৎ নাথ বলে—নৌকার খোলে সেঁদিয়ে পড়েন বাবু। জলদি—

লোকগুলোও চমকে উঠেছে। নিমেষের মধ্যে শান্ত বনের সেই সুন্দর রূপটা বদলে যায়, ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস।... ওই বনভূমির কুটিল হিংস্র রূপ নগ্নতর হয়ে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সেই হিংস্র স্বরূপটা গর্জে ওঠে। কাঁপছে বনের গাছগাছালি। গাং-এর স্রোতও যেন কেঁপে ওঠে আরণ্যক বীভৎসতার গর্জনে।

—হুঁসিয়ার! বাবা দখিণরায়ের দোয়া মা বনবিবির আজ্ঞে।

নৌকার গলুই এর উপর থেকে বুড়ো শরৎ নাথ জোরালো কণ্ঠে হেঁকে ওঠে।

স্তব্ধ ভীত কটা মানুষ সামনে হলুদ কালো ডোরাকাটা নিশ্চিত মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে। বাতাসে পিচ গলার শব্দ উঠছে, তার সঙ্গে মিশেছে ওই বাঘটার গায়ের বিশ্রী উৎকট গন্ধ। শ্বাপদ প্রতিহিংসার পৈশাচিক অস্তিত্ব আমাদের সব চিন্তাশক্তিকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বনের গাছগাছালির সীমার বাইরে বাঘটা এসে থমকে দাঁড়ালো, বিরাট বলিষ্ঠ দেহ—চোখ দুটোয় নীল আভা...ল্যাজটা মাটিতে গাছের ডালে সাপটাচ্ছে আর চাপা গর্জন করছে।

শরৎ নাথএর সাদা শনন্ড়ির মত চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, দুচোখ জ্বলছে—মুখের সব ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেছে কি কাঠিন্যে। বিরাট ভরাট গলায় সে চীৎকার করে কি যেন বলছে দুর্বোধ্য ভাষায়, আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ছে—বাবা দখিনরায়ের দোয়া—মা বন-বিবির আজ্ঞা।

কতক্ষণ কেটেছিল জানি না, হাত দুটো অসাড় হয়ে আসছে, মনে হয় নৌকার খোলে গড়িয়ে পড়বো? কাঁপছে সারা শরীর। ঘামে জামা গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে। চোখের সামনে থেকে সেই হলুদ কালো মৃত্যুদূত হঠাৎ একটা উজ্জ্বল রেখার মত বনের দিকে মিলিয়ে গেল। ঠিক ভাবতে পারছি না।

—বাবু! ... বাবু!

ডাকছে শরৎ নাথ। নৌকার মিস্ত্রীরাও বের হয়েছে এখান ওখান থেকে, পিচের গড়িয়ে পড়া খানিকটা তরল পদার্থে আগুন লেগে জ্বলছে। কালো ধোঁয়া উঠছে। শরৎ-নাথ বলে—মুখবন্ধনে, দেহবন্ধনে, ক্ষেত্র-বন্ধন-এর মাহাত্ম্য দেখলেন বাবু? এই বত্রিশ কাঠা জায়গায় ক্ষেত্রবন্ধন দিই দিলাম, কুই আসতি পারলো বড়শিয়ালের পুো? গন্ডীর বাইরেই দাপন দুপন দেখাই সারি পড়ল বাজান।

অন্যান্য মিস্ত্রীদের মুখে চোখে ভয়ের চিহ্নটা মুছে গেছে। শরৎ নাথ হাঁক পাড়ে—বাকিকাতরা গলাই নৌকায় দিন্তি থাক, কাপিশ দে — আমি রইলাম। বাটালি মার গলুই-এ মরদ, কাম সারতি লাগবো না? লা খান জলে নামাতি হবে দু-চার দিনের মধ্যি, হুঁশ থাকে যেন!

আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো কাজের মেজাজ আর অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে শরৎ। যেন কিছুই হয় নি এখানে। তবু বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আদিম হিংস্র সেই মৃত্যুদূতের কথা, উদ্যত আক্রমণটাকে না চালিয়ে সরে গেল সে নীরবে। ব্যাপারটা রহস্যের মতই ঠেকে কোন একজন লোককে মুখে করে তুলে নিয়ে গেলেও বাধা দেবার কিছুই ছিল না। কিন্তু তবু সেটা ঘটে নি। কোথায় একটা প্রশ্ন জাগে।

নারান মিস্ত্রির বলে, ওসব বুড়ো শরতের বুজরুগি, নেহাৎ দয়া করে ফিরে গেল বাঘটা। বলে না ঝড়ে কাক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে।

শরৎ বাটালি ঠুকছিল, কথাটা তার কানে যেতে হাতের কাজ থামিয়ে একটু হেসে বলে—বনের বাঘ-জানোয়াররা জলের কুমীরেরও বশ করতি পারি, ভাবলা মন্দ বুঝ করাতে পারি মেজবাবু. মানুষের পারা ভার। গুরুর কাছে সে বিদ্যে পাই নি। কন যা ইচ্ছা কন।

শরৎ নাথ যেন একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। আমার কাছে শরৎ একটা প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

বাওয়ালী কাঠুরিয়ার দল আজ বেলা পড়বার আগেই ফিরেছে। ডিঙিগুলো আসছে। হেড মাঝি মেহের শুকনো মুখে এগিয়ে আসছে। ও চাইছে নৌকা বসতের দিকে। আমাদের দেখে ও যেন একটু নিশ্চিন্ত হয়। তবু শুধোয়।

—কিছু দেখেছিলেন বাবু? একটা বড়শিয়াল ঘেরে ঢুকে কান্ড বাধাইছিল। কাঠুরিয়াদের এক ঠাঁই করি টিন বাজাই, আগুন জ্বালি, তবে হইলো? কি গো শরৎদা? কাল কোপে যাই ক্যামনে?

শরৎ নাথ সেই হুঁকো হাতে টেনে চলেছে। মেহের আলির কথায় কিঞ্চের মত

শিব্রাম রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে ছোটদের সমগ্র রচনাবলী, গ্রাহকমূল্য—৫০ টাকা, প্রতি খণ্ড মূল্য ১৫ টাকা। কেবল গ্রাহকদের জন্য ১০ টাকা।

অগ্রিম ৫ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হোন।

প্রতিটি খণ্ড ম্যাপলিথো আর্টপেপার ছাপা, সোনার জলে নাম লেখা, বোর্ডিনে বাঁধাই। ছোট বড় সবার হাতে তুলে দেওয়ার মতন একমাত্র গ্রন্থ।

শিব্রাম চক্রবর্তীর বই এর দোকান (রচনা সংগ্রহ প্রকাশন বিভাগ)
এম. টি. ৫৩/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা

বজ—কিছু ভাবনা মেহের বাজান ইথা-বনাও এসেছিল।

চমকে ওঠে মেহের—তাই নাকি?

—জিগাও কবুরে? ইযা কুলে চেহারা। বাজান এসে না কোয়া গাই বলদ দুটো আমিও হাক পাড়লাম যাবা দক্ষিণরায়ের দেয়া, মা বনবিবির আজ্ঞা, ক্ষেত্রবন্ধন, মুখবন্ধন করছি। বাজান বুঝালেন—দুবের ল্যাজটা সাপটাই পিছু হটতি হল।

ও বাঘাগুলির দল মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনছে ওর কথাগুলো। জীর্ণ শরৎ বুড়োকে আমিও সেই মুহূর্তে দেখে-ছিলাম নোতুন একটা মানুষ। ওই নৌকার গলুই-এ দাঁড়িয়ে কি এক অমিত শক্তি-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আদিম হিংস্রতাকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তার সেই মুহূর্তের জ্বলন্ত চোখের চাহনি, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সেই চেহারাটাকে ওই জীর্ণ স্থবির লোক-টার মাঝে এখন খুঁজে পাই না।

শরৎ নাথ বলে চলেছে—কাল কোপে যাবা তোমরা।

আবছা আলো-আঁধারীর মাঝে ডিঙি থেকে নামছে অর্ধনগ্ন ভয়ার্ত মানুষ-গুলো। তাদের অনেকে দেখছে বুড়ো বাঘকে ওই বনে ঘুরতে আজ তারই ওদের সামনে এসে পড়েছিল। নেহাৎ বরাত জোরে বেঁচে এসেছে।

তাই তাদের অনেকেই বলে, দু-এক-দিন কোপ বন্ধ রাখো সর্দার।

নারান মিত্তির চমকে ওঠে। একবার ভয় পেয়ে গেলে ওরা সহজে বনে নামবে না, বাঘও টের পেয়ে যাবে আর সেই অবকাশে তারাও মরিয়া হয়ে উঠে আক্রমণ চালাবে এদের দুর্বলতার খবর জেনে। তাছাড়া দু-চারদিন কাজ বন্ধ থাকা মানে সমূহ লোকসান। এত লোককে বসিয়ে খাওয়াতে হবে, মাইনে দিতে হবে মাসিক হিসাবে। তাই বলে সে, এত ভয় তোদের? ধ্যাৎ।

অবশ্য নারান মিত্তিরের ভীত চকিত মুখখানা আড় চোখে দেখছি লোকগুলোকে সে ভরসা দেবার চেষ্টা করে, হোম-পটকা ফাটানো হবে।

তবু ওরা বাড়ী নাকি বলে, কোপ খাওয়ার সময় বাঘ, এমন বাঘিনীর সন্ধানে ওগুলোও এসে পড়তে পারে। আরও বড়শিয়াল এ ঘুরে আসবে।

একটা নীরব অনুনয়ের ছায়া নামে। সকলেই স্তব্ধ হয়ে ভাবছে। কালের আদিম অন্ধকারে ওরা এই নিশ্চিত মৃত্যুর রূপটাকে দেখে শিউরে উঠছে। শরৎ নাথ এতক্ষণ তামাক টানছিল, তামাক টানা থামিয়ে সে বলে ওঠে—কাল কোপে যাবা সর্দার, আর আগম নৌকায় বনে নামবো আমি। আমিও সাথে যাবো। ডরাইবা মন্দ? এ্যা—বাওয়ালি হইয়া বড় শিয়ালের ডর?

ওরা চমকে ওঠে ওর তেজী গলার শব্দে। মেহের আলি দেখছে ওকে।

—কাল যাবা তুমি?

শরৎ নাথ হাসছে। ও বলে ওঠে, —হ্যাঁ মিঞা। ওই ঘেঁটুরে বন্ধন দিই আসকি হবে না? আর এমন ক্ষণ দিব তা বুঝতি পারবে ওই বাজানের দল।

ওদের জমাট কালচে থমথমে মুখে হাল্কা আভাষ জাগে। শরৎ গুণীন-এর মন্ত্রের তেজ আজ স্বচক্ষে দেখেছে ওরা। বাঘকে গণ্ডীর বাইরে থেকে আপসে ফিরে যেতে হয়েছে।

রাত্রি নামে।

নারান মিত্তির একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে। বাওয়ালিদের নৌকাবহরে আবার টেমির আলো জ্বলে, ভাবনা গাজীর বন্দনা গান গাইছে কেউ। রসিক বাওয়ালী আবার কোন পরবাল দেশের প্রেমিকার উদ্দেশ্যে কলজের দরদের খবর পাঠাচ্ছে।

শরৎ নাথ আজও আমাদের নৌকায় বসেছে তার অভিজ্ঞতার বিচিত্র পশরা নিয়ে।

নারান মিত্তির খাতির করে সিগ্রেট দিয়েছে ওকে। শরৎ নাথ বলে চলেছে, —ছখন ভূতি ধরেছে তারে। দেখেই তো শিউরি ওঠলাম বাবু।

এতক্ষণ তবু চুপ করে ছিল নারান মিত্তির। কোথায় ভূতে-পাওয়া কোন বৌ-এর ঘাড় থেকে ভূত নামাতে গিয়েছিল সাতক্ষীরার কছে কদমতলি গাঁয়ে তারই কাহিনী শুরু করেছে শরৎ নাথ। কিন্তু একটা নিরীহ বৌ-এর ঘাড়ে ছ' ছ'খান ভূতকে যুগপৎ চড়ে বসতে শুনে নারান মিত্তির ফুঁসিয়ে ওঠে। —আবোল গুলবাজি শুরু করলে বুড়ো কত্তা? ছখান ভূতে ধরলে মানুষ বাঁচে?

শরৎ নাথের ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিকিয়ে ওঠে। ও শোনায়।

—কথাটা শ্যাষ করতি দ্যান!

আমিই ওকে অভয় দিই—বলো তুমি!

শরৎ নাথ শুরু করে—তেল দর্পণ করি দেখলাম, নখের উপর তেল দিই মন্ত্র পড়ি দেখা ভূত থাকলি দেখতি পাবেন। তায় দিই দেখলাম ছখান ভূত। তা আমি বললাম—আজ দেহবন্ধন করি থুছি। কাল প্রাতঃকালে আসবো মোড়ল, এখনের কাম না।

হঠাৎ একটা কলরব ওঠে বাইরে। অন্ধকার খালের বুকে টর্চের আলো পড়ছে, মাঝি বাওয়ালিদের চিৎকার শোনা যায়।

—ডিঙিখান বাঁধ, বাবুদের ছোট ডিঙিতে তোল। ...ডুবৎ লাগছে—

কাদের চিৎকার শোনা যায়—জলদি! ভয় নাই—

...নারান মিত্তিরের সঙ্গে আমিও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। সামনেই খালের জলে একটা ডিঙি ডুবছে, জল ঢুকেছে ফাটল দিয়ে। আর সেই ডিঙিতে ছিল ফরেস্টের হেড গার্ড অমর ঘোষ আরও দুজন। তারা অন্য একটা নৌকায় উঠেছে—ততক্ষণে তাদের কাপড়-জামাও ভিজে গেছে। তবুও গর্জাচ্ছে—ওই হতো ডিঙি-খানা ভাসালি কি বলে? এখুনি গাং-এ কুমীর-কামটের পেটে যেতাম।

নারান মিত্তিরও চটে ওঠে, ওরা এখানে এসেছিলেন, ওদের ফরেস্টের বোট পৌঁছে দেবার জন্য ডাঙ্গা থেকে ওই ডিঙিখানা নামিয়েছিল তার বাওয়ালিরা। কিন্তু সেটা যে ঠিকমত মেরামত করা হয় নি তা জানতো না ওরা, ফলে এই বিপদ ঘটতে চলেছিল।

ডুবন্ত ডিঙিটাকে দড়ি বেঁধে আটকে রেখেছে মাত্র, সেটা জলে তলিয়ে গেছে।

নারান ধমকে ওঠে, এই তোমার লোক-দের কাজ মিস্ত্রীমশাই? লোককে ডুবিয়ে মারবে নোনা গাং-এ।

শরৎ নাথ স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলে বলে,—কোন কাওয়ালী ডাঙ্গার থেকে পুছভাল না করে গাং-এ ডিঙি নামায় মেজকত্তা? মেরামতি হল না হল পুছবে না?

নারান মিত্তির ওর যুক্তিটা বুঝে চুপ করে। শরৎ নাথ তবু বলে, আশ্বাসের সুরে—তয় হয় নি তো কিছু?

নারান মিত্তির কিছু বলবার আগে ওই নৌকার উদ্ধার প্রাপ্ত সওয়ারী অমর ঘোষ বলে ওঠে—হতে বাকী ছিল আর? না দেখলে কতা ভরাডুবি হতো?

ডিঙিখানাতো ডুবছে।

শরৎ নাথ জানায়—ডিঙি ভাসতেও ছতক্ষণ, ডুবতেও ততক্ষণ। ওর কথা ছাড়ান দ্যান। বলি কারোও কিছু হয়েছে? হবে না!

অবাক হয় নারান মিত্তির—হবে না? মানে?

—হবে না। শরৎ নাথ যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বিচিত্র কণ্ঠস্বরে জানায়!

—হতি পারে না। সব বাঁধি থুছি।

নারান মিত্তির অবাক হয়—এ্যাঁ! কি বলছো তুমি? সব বাঁধি রাখছো?

—হ্যাঁ বাবু। আমি থাকতি ঘোর কোন-দিন বিপদ আপদ কিছু হয়েছে? বলু? সব বাঁধি রাখছি। আমি যাদ্দিন আছি কিছু হবে না। নিভয়ে থাকুন।

শরৎ নাথ কথাগুলো বলে ওই আবছা অন্ধকারে নৌকা বসাতে এ নৌকায় সে নৌকার পা দিয়ে তুল হইচৈ পুরোনো নৌকাখানায় গিয়ে উঠল।

কি একটা বিচিত্র বিশ্বাস ওর মনে রয়ে গেছে। নিজেও সেই শক্তিটাকে যেন চেনে না। এই অশরীরির জগৎ থেকে সেটা স্বতন্ত্র নয়। বাদাবন রাতের কুহেলীঘেরা জগৎ—দিগন্ত-প্রসারী নোনাগাং এর বুকে দিনবদলের বর্ণ বৈচিত্রের মতই সেটা অধরা—অজানা। চকিত আলোর উদ্ভাসের মত সেই অনুভূতিটা তার মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাড়া তুলে আবার হারিয়ে যায় দিন শেষের রঙ্গীন আলোর মতই।

আমি ওই বিচিত্র মানুষটার সেই ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়কে হয়তো দেখেছি। তাই ওকে বিচিত্র বোধ হয়। ওর কথাগুলোয় ওই বুনো বাওয়ালীদের মত আমিও আস্থা খুঁজে পাই। ওর চোখে দেখেছি বন্য আদিম পৈশাচিকতাকে জয় করার প্রদীপ্ত তেজ। এই নৌকাবসতের বিচিত্র পরিবেশে এ ভিন্ন এক একটি সত্তা।

ক'দিন পরেই চলে আসি বাদাবন থেকে মানুষের জগতে। গহন বন, দুস্তর গাং পাড়ি দিয়ে আসতে হবে নৌকায়। দুদিনের পথ। ওই শরৎ নাথই বলে নির্ভয়ে চলে যান বাবু, পাবেন তবে বাদাবনে আবার আসবেন। দেখবেন এ বন—এ গাং এবে ভালোবাসাল; মা বলি পেন্নাম করলি সব বিপদ কাটি যাবে। আবার আসার জন্য মন করবে।

নৌকা বসত ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলাম। সত্যি কোন বিপদ হয়নি। নিরাপদেই ফিরে-ছিলাম। সে আজ ক'বছর আগেকার কথা।

মাঝে মাঝে সুন্দরবনের গহন সবুজ স্নিগ্ধতার কথা মনে পড়ে, ধূ ধূ গাং—অন্তর্বিহীন সমুদ্রের স্বাদে যেন মেতে উঠেছে। ঢেউগুলো ফুঁসছে আর তার তীরে সবুজ কেওড়া-গরাণ-পশর গাছের ভিড়ে উজ্জ্বল হলুদের ছোঁয়া নিয়ে মাথা তুলেছে হিতাল বন। কেমন যেন ডাকে।

সেবার নারাণ মিস্তিরই বলে—তাহলে আবার চললেন সুন্দরবনে? প্রবাদ আছে এ বনে যে আসে একবার, সে আবার আসবেই। ওই আদিম হিংস্র সুন্দর অরণ্যের এই মায়া-হাতছানি দিয়ে যেন মৃত্যু বারবার ডাকে মানুষকে; এ অরণ্যও তেমনি ডাকে।

চেনাপথ, ওই বাঘমঙ্গলের বিস্তৃত বুকে দু'একটা সি সোয়ালো বলিষ্ঠ ডানা মেলে উড়ছে। দূরে হলুদ সবুজ অবণ্যসীমা। নৌকাটা ভেসে চলেছে ভাঁটার টানে।

নৌকাবসতে পেঁছলাম তখন সন্ধ্যা নামছে। নারাণ মিস্তির বলে—এবার এখানের জঙ্গলে খুব বিপদের মাঝে কাজ করছি।

ওরদিকে চাইলাম। নারান মিস্তির বলে,

পথে ডাকাতের উপদ্রব, বাংলাদেশ এর দিক থেকে তাড়া খেয়ে কিছু লোক স্টেনগান-রাইফেল নিয়ে এদিকেও হানা দিচ্ছে। আবার ঘেরে বাঘের উপদ্রবও বেড়েছে। একজনকে চোট করেছে ক'দিন আগে।

নৌকা বসতের লোকদের মুখেও দেখেছি থমথমে আতঙ্কের ছায়া। ক'বছর আগেও এসেছি। দেখতাম কাজ থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন নৌকায় ওদের আসর জমতো। সুর উঠতো। আজ সব চুপচাপ।... কি আতঙ্কে ওরা যেন মুখ বুজে আসে। পুরোনো সর্দার মাঝি মেহের আলিও এসেছে, ইমতাজ বাওয়ালিকেও দেখলাম। ওদের মুখে ক্লান্তির আভাষ।

একজনের কথা মনে পড়ে। বিচিত্র সেই মানুষটিকে আগেই এখানে দেখবো ভেবে-ছিলাম, না দেখেই তাই শুধালাম। —শরৎ নাথকে দেখছি না?

ওদের সকলের মুখে একটা বেদনার ম্লান ছায়া নামে। কথাটা জানায় নারান।—সে তো নেই। পরক্ষণে শুধরে নেয়—বেঁচে নেই। সেবার বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় গাঁয়ে ছিল। ছুটি নিয়ে গেছল বাড়িতে।

নিষ্ঠুর সেই আক্রমণের ছবিটা আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। গ্রামের ঘর বাড়ি-গুলো জ্বলছে। হিংস্র জন্তুর মত আক্রমণ সুরু করেছে নিষ্ঠুর খান সেনার দল।

গ্রামের লোকদের এনে জমায়েৎ করেছে মসজিদের সামনে। শরৎ নাথ পালাতে পারে নি। ওর অপরাধ ও হিন্দু স্থানে নাকি কাজ করে। কি কাজ করে তা বুঝে নিয়েছে তারা তাই গর্জন করে পিশাচের দল—শয়তান কাঁহিকা। ঠিকসে বলো—

শরৎ নাথের সামনে ওই জীবন্ত পিশাচ-দের নীল চোখ জ্বলে ওঠে। বাদাবনের বাঘের চেয়েও ওরা হিংস্র, পিশাচ দানোর চেয়েও বীভৎস ওদের সেই হাসি। জবাব দিতে পারে নি শরৎ নাথ।

গুলির সামনে তাই প্রাণ দিয়ে গেল। নারাণ মিস্তির বলে—ওদের হাতেই প্রাণটা হারালো শেষকালে।

রাত্রির আদিম অন্ধকার নামে সুন্দরবনে। নদীর গর্জন শোনা যায়—বাতাসে বনের বুক থেকে হাহাকার ওঠে। দূরে কোথায় একটা বাঘ গর্জন করে ফিরছে। অসহায় মানুষগুলো জমাট আতঙ্কে মুখ বুজে আছে। রাত নামছে—কুয়াসার রহস্যঘেরা রাত।

শরৎ নাথের সেই উজ্জ্বল চাহনি তার কঠিন কণ্ঠস্বরকে ভুলিনি আজও। সে বলতো —যতদিন এখানে আছি কোন ভয় নাই বাবু, সব বাঁধি রাখছি। নির্ভয়ে থাকুন—

আজ শরৎ নাথ নেই। তার কথাটা মনে পড়ে।

—বাদাবনের বাঘ গাং এর কুমীর কামট-দানো এদের মুখবন্ধন করতি পারি। মানুষের বশ করার মন্ত্র গুরু দ্যান নি গ।

মানুষ বোধহয় তাদের থেকে অনেক গুণে হিংস্র—আদিম। তাদের হাতেই শরৎ গুণীন খতম হয়ে গেল। তাদের আদিম হিংস্রতাকে বুঝতে আজও কোন গুণীনই পারে নি।

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও বেতার বলেছেন—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮

গৌরীমা

—শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত—যুগান্তর:—তিনি একাধারে পরিব্রাজিকা তপস্বিনী, কর্মী এবং আচার্যা। ঘটনার পর ঘটনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫

সাধনা

বেদ উপনিষৎ গীতা মহাভারত পুরাণ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি বহু সুন্দর সাড়ে তিন শত রাগ-রাগিণী ও ছায়ালীন সংগীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বসুমতী বলেন—এমন মনোরম সুকান্ত গীতি পুস্তক বাঙ্গলায় আর নাই।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ—৬

দুর্গামা

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মানসকন্যা :

—শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং বিভিন্ন পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

...জীবনীটি পড়ে এইটিই একটি বিস্ময়ের মত মনে হয় যে এমন একটি মানুষ আমাদেরই সমসাময়িক কালে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় সনাতন এক আদর্শকে আপনার জীবনে ধারণ লালন ও প্রতিষ্ঠিত করে জীবন অতিবাহন করে গেলেন। এ জীবন পবিত্র এ জীবন সুন্দর সুশোভন ও মহিমান্বিত। আমি এই জীবনকথা পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি এবং পাঠকজনের কাছে অকুণ্ঠভাবে বইখানি তুলে ধরে বলতে পারি তাঁরাও এই গ্রন্থপাঠে অনুরূপ তৃপ্তি লাভ করবেন॥

বহুচিত্রশোভিত প্রথম মুদ্রণ—৮

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইটালীর বেলা যেমন গ্রীস বাংলার বেলা তেমনি ইংলণ্ড। ইটালীর বেলা যেমন প্রাচীন যুগ বাংলার বেলা তেমনি পূর্ববর্তী চার শতাব্দী। তবে উভয়ক্ষেত্রেই পুরাতন বিদ্যার স্থান অধিকার করে নূতন বিদ্যা। নতুন ধরনের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি। তবে রেনেসাঁস কেবল বিদ্বানদের ব্যাপার নয়। শিল্পীদেরও ব্যাপার। ইউরোপের রেনেসাঁসের নায়কদের মধ্যে ছিলেন একদিকে যেমন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনো ইরাসমাস প্রভৃতি জ্ঞানী তেমনি অপরদিকে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফেল, বতিচেলি প্রমুখ শিল্পী। জ্ঞানীদের উপর নির্যাতন যতখানি হয় শিল্পীদের উপর ততখানি নয়। কারণ তাঁরা খৃস্টীয় বিষয়েও ছবি আঁকতেন, মূর্তি গড়তেন, আবার পেগান বিষয়েও। রেনেসাঁসের জ্ঞানের দিকটা খৃস্টীয় চার্চের কোপদৃষ্টিতে পড়লেও শিল্পের দিকটা নীতির নামে পুনরায় অর্গলবদ্ধ হয় না। তবে লেওনার্দোকেও ভয়ে ভয়ে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীরতত্ত্ব শিখতে হতো একান্ত গোপনে। না শিখলে নতুন যুগ আনতে পারতেন না চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে।

নীতিনিপুণদের বিষদৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বা তার থেকে বাঁচিয়ে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয় ও নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। তেমনি নগরে নগরে যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি ও কনসার্টহল তৈরি হয়। রেনেসাঁসের পূর্বে ধর্মীয় সঙ্গীত ও ধর্মীয় শিল্পের চর্চা ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হলো সেকুলার সঙ্গীত ও শিল্প। যা কিছু মানবিক তার মর্যাদা ও মূল্য অকস্মাৎ বেড়ে গেল। ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দিল মানবিকবাদ। বিষয় সংগ্রহ করা হলো কতক প্রাচীন গ্রীক রোমক উৎস থেকে, কতক দেশবিদেশের ইতিহাস বা কিংবদন্তী বা রূপকথার ভাণ্ডার থেকে, কতক বা পরিচিত জনজীবন থেকে। শেকসপীয়ারের নাটক এই তিনটি সূত্র থেকে বিষয় আহরণ করে থিয়েটারের গতি নির্দেশ করে দেয়। এরপরে আর পিছুটান থাকে না। ধর্মনাট্য তার জনপ্রিয়তা হারায়। শেকসপীয়ারের যুগে অভিনেত্রীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে নারীর ভূমিকায় নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়।

কলকাতার পত্তনের পর থেকে স্থানীয় সম্প্রদায় নিজেদের জন্যে বইপত্র ও শিল্পকর্ম আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত নৃত্যনাটক প্রভৃতিরও আয়োজন করে। ভারতীয়রা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাদের বড়লোকদের নজর পড়ে গাড়ী বাড়ী আর আসবাবের উপর। ঔপনিবেশিক বাস্তু-রীতির অনুসরণ করতে বাধে না। তারপর খানা বাদ দিয়ে পিনার উপর। স্বয়ং জাহাঙ্গীর বাদশাহ সেটার সূত্রপাত করে দিয়ে যান কলকাতার পত্তনের পূর্বে। ইউরোপীয় চিকিৎসাবিদ্যাও প্রবেশ পায় মোগল অন্তঃপুরে। অস্ত্রশস্ত্রও আদৃত হয়। পলাশীর আগেই ভারতের মাটিতে পাশ্চাত্য মিশাল জীবনযাত্রা শুরু হয়ে যায় ইউরোপীয় সমাজে তো নিশ্চয়ই, ভারতীয় হিন্দু মুসলিম সমাজেরও উপরতলায়। খৃস্টধর্মে আগ্রহ আকবর বাদশাহের ছিল, কিন্তু আর কারো ছিল না। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার প্রতি ঔৎসুক্য আরো অনেকের ছিল। তা বলে তাঁরা কেউ পরাধীন হতে চান নি।

ইউরোপীয় আগন্তুকরাও জাহাজ বোঝাই করে এদেশের মরিচমশলা শাল-দোশালা ভোগ্যপণ্য ওদেশে নিয়ে যেতেন। কেউ কেউ নিয়ে যেতেন এদেশের অভ্যাস। কেউ কেউ এদেশের পুরাকীর্তি ও পুঁথি-পত্র। একদা পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের যোগা-যোগ ছিল, আদানপ্রদানও চলত। গ্রীস ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও গ্রীসের কাছে নতুন নয়। তেমনি রোমও ভারতের কাছে নতুন নয়, ভারতও রোমের কাছে নতুন নয়। মাঝখানে হাজারখানেক বছর পুরানো পথঘাট বন্ধ হয়ে যায় আরবদের দাপটে। আরবরা হয়ে যায় মুসলিম আর গ্রীক রোমানরা খৃস্টান। কতকটা ধর্মীয় কারণে, কতকটা অর্থনৈতিক কারণে, কতকটা রাজনৈতিক কারণে দুই পক্ষের এমন রেষারেষি হয় যে গ্রীস-রোমের লোক ভারতে আসার পথ খুঁজে পায় না, ভারতের লোক গ্রীস-রোমে যাবার পথ ফিরে পায় না। বাণিজ্যটা আরব-দের হাত দিয়ে হয়, ওরাও মুনাফা লোটে। শেষকালে পর্তুগালের নাবিকরা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়ে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আসতে সমর্থ হয়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে ভারতীয় নাবিকরাই আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে। কী করে তারা জানবে যে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনছে!

পর্তুগাল অবশ্য রোম নয়, ইংলণ্ডও নয় গ্রীস। এবারকার যোগাযোগটা ইউরোপের পূর্বপ্রান্তের সঙ্গে নয়, পশ্চিম-প্রান্তের সঙ্গে। কিন্তু রেনেসাঁসের কল্যাণে পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তই এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। আর পর্তুগাল ও ইংলণ্ড থেকে যারা এসে হাজির হয় তারাও ভারতের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গে পূর্ব প্রান্তকে সমুদ্রপথে সংযুক্ত করে। মাঝখানে যে সংযোগও আরবদের দ্বারা ছিন্নপ্রায় হয়েছিল। স্থল-পথের যোগসূত্রও ছিল ক্ষীণ। ভারতবর্ষ বলতে যা বোঝাত তা ইউরোপের মতোই একটা মহাদেশ বা উপমহাদেশ। যেখানে এক রাষ্ট্র বা এক নেশন কোনোদিন গড়ে ওঠে নি, মাঝে মাঝে চক্রবর্তী রাজারা স্থাপন করেছেন সাম্রাজ্য। যেমন ইউরোপেও। সকলেই হিন্দু, এটা তেমনি একটা তথ্য যেমন ইউরোপের সকলেই খৃস্টান। খৃস্টান হলেই একজাত হয় না, হিন্দু হলেও একজাত হয় না। খৃস্টানরা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দুরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাঠান ওরফে তুর্কদের প্রশ্রয় দিয়েছে। তুর্করা আরবদেরও পদানত করে। মুসলমান বলে তুর্ক আর আরব একজাত হয় না। পরে তো খৃস্টধর্মী ইউরোপীয়রাই তুর্কদের হাত থেকে আরবদের উদ্ধার করে। অবশ্য নিজেদের স্বার্থে। এখন আর কেউ আরব তুর্ক ভাই ভাই বলে না।

ইউরোপের রেনেসাঁস বাণিজ্যসূত্রে সমুদ্রপথে ভারতের উপকূলে পৌঁছয়। কিন্তু পর্তুগালের ধর্মান্ধতা তাকে রেনেসাঁসের বাহক করে না। করে ইংলণ্ডকে, ফ্রান্সকে। তাই রেনেসাঁসের প্রধান পীঠ হয় কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সেই সঙ্গে পণ্ডিচেরী। ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে হেরে যাবার পর পণ্ডিচেরীর প্রাধান্য হ্রাস পায়। কলকাতা ইংরেজদের রাজধানী হবার পর থেকে কলকাতার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। বাঙালীরা এই আকস্মিকতার সুযোগ লাভ করে। এটা দৈবলব্ধ। এর জন্যে তাদের আত্মপ্রসাদ সাজে না। তাদের কৃতিত্ব এইখানে যে তারাই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে সাগরপারের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের রূপ-কথার রাজপুত্রদের স্বপ্ন সার্থক করবে। তারা সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে দেশ

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২ আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

Shilpi-SPL 14/73 ben

দেশান্তরে যাবে। যেমন যেত জাভায় সুমাত্রায় সিংহলে। কে জানে কতকাল আগে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলা-দেশেই যে রেনেসাঁস সবচেয়ে বেশী জমল তার কারণ ওই সাগরপারের স্বপ্ন। রামমোহনকে, দ্বারকানাথকে যা অস্থির করে তুলল। মধুসূদনকে তো খৃস্টান করে ছাড়ল। সাগরপারের আকর্ষণ এত তীব্র না হলে এঁরা সাগরপারের চিন্তার ও বিদ্যার প্রতি এত সহজে আকৃষ্ট হতেন না। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই স্বাদেশিকতা প্রবল ছিল। এঁরা কেউ ঘরের থেকে বিযুক্ত হতে চান নি। অথচ বাইরের সঙ্গে যুক্ত হতে ব্যাকুল হয়েছিলেন এঁরা ও এঁদের মতো আরো অনেকে।

গ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকলে, শক্তি না থাকলে, লোক না থাকলে ইউরোপীয়রা যা বহন করে নিয়ে এস তা কলকাতা শহরের সাহেবপাড়ায় তাদের কাজে লাগত। তাদের দীপশিখা থেকে আর কারো দীপসলিতায় সঞ্চারিত হতো না। দেশের মন প্রস্তুত না থাকলে বহিরাগত জ্ঞান বা শিল্পরস কোথাও ফুল ফোটায় না, ফল ধরায় না। ইউরোপেও এক দেশ থেকে অপর দেশে সঞ্চারিত হতে অনেক সময় লেগেছে। রাশিয়ার রেনেসাঁস ভারতের রেনেসাঁসের সমকালীন। জাপানের রেনেসাঁস আরো পরবর্তীকালের।

নতুন অ ইডিয়ার জন্যে বাংলার মন প্রস্তুত ছিল। পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃত ও পারসিক-চর্চা প্রস্তুতির কাজ করে রেখেছিল। বহু-কালের কর্ষিত ক্ষেত্রে নতুন বীজ বপন করতে না করতেই তা অঙ্কুরিত হলো। সাত সমুদ্র পারের অচেনা ভাষা অচেনা ভাব আত্মসাৎ করতে এক পুরুষও লাগল না। দেখা গেল ডিরোজিওর শিষ্যরা ইংরেজীতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখছেন সহজাত প্রতিভার সঙ্গে। অথচ স্বদেশপ্রেম বিসর্জন না দিয়ে। টমাস পেইনের 'যুক্তির যুগ' বইখানি প্রথমে এক টাকা দামে, তারপরে পাঁচ টাকা দামে বিকায়। পাঠকদের কাছে দেশ যেমন প্রিয় যুগও তেমনি। দেশকে বাদ দিয়ে যুগ নয়, যুগকে বাদ দিয়ে দেশ নয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যুগের সঙ্গে মন মিলিয়ে নেয়। মানুষের মন দেশের বেড়া মানে না। সমকালীন মনের সঙ্গে সাযুজ্য অন্বেষণ করে। তার জন্যে যে পারে সে সশরীরে সাগর পাড়ি দেয়। যে পারে না সে ঘরে বসেই সাগরপারের হাওয়া খায়। এর নীট ফল একপ্রকার "সী চেঞ্জ"।

আমাদের যে রেনেসাঁস সেটা একপ্রকার "সী চেঞ্জ"। সামুদ্রিক পরিবর্তন। একে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী তরুণের অপকর্ম বলে উড়িয়ে দেওয়া বা বড়িয়ে দেখা কোনোটাই যথার্থ নয়। যে মদ এদের মাতাল করেছিল সেটা নতুন বিদ্যা নতুন ভাব নতুন ইণ্ডিয়া, নতুন প্রকাশভঙ্গী, নতুন জীবন-যাপনের ধারা। কয়েক শতক আগে ইটালীতে বা ইংলণ্ডেও অনুরূপ দেখা গেছে। সমকালে রাশিয়াতেও লক্ষিত হয়েছে। সেই মুহূর্তে উৎসাহীদের খেয়াল ছিল না যে দেশটা পরাধীন বা সমাজটা জমিদারদের অধীন। রেনেসাঁসের উদয়লগ্নে কোথাও কারো খেয়াল থাকে না। পরবর্তীকালে উন্মাদনা কেটে যায়। যেটা থেকে যায় সেটা ওই "সী চেঞ্জ"। রূপান্তর একবার ঘটলে আর অঘটিত হয় না। পাল্টা যেটা ঘটে সেটা একপ্রকার কাউন্টার-রেনেসাঁস। এদেশে সেটা রিভাইভালের আকার নেয়। দেশের লোক স্বদেশচেতন অতীতসচেতন, অধীনতাসচেতন, শোষণসচেতন হয়। কিন্তু ওই সামুদ্রিক পরিবর্তনটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। ওটা অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানে নয় যে ওটাতে জনগণের যোগ ছিল না। কোন দেশের রেনেসাঁসেই বা ছিল? আমাদের রেনেসাঁসের অপরাধ এখানেও নয় যে ওটা পরাধীন দেশের ও ফিউডাল সমাজের ফসল। একই অপরাধ অন্যত্রও দেখা যায়। কেউ কি বলতে পারেন যে স্বাধীন ভারতে ও শ্রেণী-শূন্য রাশিয়ায় নতুন এক রেনেসাঁস ঘটেছে? গণচীনের রেনেসাঁসের খবর কি কেউ রাখেন!

তা নয়। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এইখানে যে ওর কোনো ক্লাসিকাল বনেদ ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ছিল। সেটা প্রাচীন গ্রীসের বনেদ। রামমোহন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়ে-ছিলেন ধর্মে। বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সমাজে। বাংলা গদ্যের পথিকৃৎরা অন্বয় রক্ষা করতে চেয়েছিলেন ভাষায়। সংস্কৃতানুসারী ভাষায়। কিন্তু কলেজে গিয়ে যাঁরা নতুন বিদ্যার পাঠ নিতেন তাঁদের সকলের আদর্শ ছিল ইংরেজী কাব্য নাটক উপন্যাস ও প্রবন্ধ। তাঁদের আদর্শ ছিল ইউরোপীয় থিয়েটার, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, বাস্তুরীতি, উদ্যানরীতি। পরবর্তী-কালে এর বিরুদ্ধে একটা স্বদেশী বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু বিদ্রোহীরাও ক্লাসিকাল বনেদ খুঁজে পেলেন না। বড়জোর ছবি আঁকা হলো পৌরাণিক বিষয়ে, কিন্তু যে ধারায় আঁকা হলো সেটা কি দু হাজার বছরের পুরাতন ধারা? পুরাণ যে যুগের সে যুগের। ভাগ্যক্রমে অজন্তা আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু অজন্তার আদর্শে যা আঁকা হলো তার বিষয় কি বৌদ্ধ জাতক? একালের চিত্রকররা আবার আধুনিক ইউরোপের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। যাঁরা লোকচিত্র বা পটচিত্র নিয়ে আছেন তাঁদের সেটা ক্লাসিকাল বনেদ নয়।

আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এখানেও নয় যে তার জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকাশ পশ্চিমের তুলনায় বিলম্বিত ও খর্বাঙ্গ। এই দেড় শতাব্দীতে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদেশে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমরা খুব বেশী পেছিয়ে নেই। তেমনি সাহিত্যেও কাজ যা হয়েছে তার চেয়ে বেশী এত কম সময়ের মধ্যে হতো না। কটিকম মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো দেশের আধুনিক সাহিত্যে বিরল। আমাদের রেনেসাঁসের দুর্বলতা এই-খানে যে তার শিল্পের দিকটা কাঁচা। যা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা হয় প্রাচীনের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ, যেমন কথাকলি বা ভারতনাট্যম্ বা মার্গসঙ্গীত। আর নয়তো লোকনৃত্য বা লোকগীতি বা লোক-নাট্য। তার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অতি পুরাতন। মধ্যযুগের মতোই। শিল্পে শিল্পে নতুন যুগ এসেছে, যেমন বিদ্যায় নতুন যুগ এসেছে, একথা বলতে পারি কি আমরা? যেটুকু এসেছে সেটুকু পশ্চিমী প্রকৃতির ও পদ্ধতির।

তাছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের খৃস্টীয় ইউরোপে যেসব বিষয় ও যেসব রীতি শিল্পীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল মধ্যযুগের হিন্দু ইউরোপে সেসব নিষিদ্ধ ছিল না। মন্দিরচিত্র বা মন্দির ভাস্কর্যেও শিল্পীরা নরনারীর মিলন বর্ণনা করেছে। গোপীদের বস্ত্রহরণের দৃশ্যে নগ্নতার কতটুকু বাকী ছিল। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও প্রেমের অভিব্যক্তি শিল্পীদের যে অসীম স্বাধীনতা দিয়েছিল সে স্বাধীনতা সমসাময়িক ইউ-রোপে অকল্পনীয়। তাই রেনেসাঁসের বন্ধন-মুক্তির প্রশ্নই ওঠেনি হিন্দুশাসিত ভারতে। মুসলিমশাসিত ভারতেও রাজপুত সামন্তরা তাঁদের শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। তবে যেখানে মন্দিরনির্মাণ একে-বারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে মন্দিরভাস্কর্য বা মন্দিরচিত্রও বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা ইউরোপের মতো ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়। দক্ষিণ ভারত ছিল হিন্দু শাসনে। আর মুসলিম শাসনও সর্বত্র সমান অনুদার ছিল না।

শিল্পের মুক্তির জন্যে রেনেসাঁসের প্রয়োজন এদেশের ইতিহাসে ছিল না, যেমন ছিল ইউরোপের ইতিহাসে। তাহলে কি রেনেসাঁস বলতে যা বোঝায় তা এদেশের শিল্পের ক্ষেত্রে একেবারেই ঘটেনি বা ঘটবে না? না, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমাদের আধুনিক শিল্পীরা কেউ দশানন বা পঞ্চানন আঁকেন না। দশভুজা বা চতুর্ভুজাও গড়েন না। ওসব পূজার সময় ফরমাস দিয়ে গড়িয়ে নেওয়া হয়। ওকে ভাস্কর্যের নমুনা বলা হয় না। আর্ট থেকে অতিপ্রাকৃত অন্তর্হিত হয়েছে। প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ কেউ চান না, কিন্তু প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এই পরিবর্তনটা এদেশে ইউরোপের রেনেসাঁসের ধারা বেয়ে এসেছে, প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে নয়।

জীবনের সমূহ বিভাগের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ কোথাও কোনোকালে একসঙ্গে ঘটেনি। সামগ্রিক পরিবর্তনও এক আধ শতাব্দীর ব্যাপার নয়। পাঁচ শতাব্দীকালও ইউরোপের পক্ষে যথেষ্ট হয়নি। আমাদের নতুন বিদ্যার প্রবর্তনের পর তো দেড় শতাব্দীও কাটেনি। একে যদি তিন ভাগে বিভক্ত করি তো এর প্রথম পর্বটা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে জ্ঞানবুদ্ধি মিলিয়ে নেওয়ার। দ্বিতীয় পর্বটা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চেতনা মিলিয়ে নেওয়ার। তৃতীয় পর্বটা অভূতপূর্ব গণজাগরণের সঙ্গে ছন্দ

মিলিয়ে নেওয়ার। প্রথমটার অস্তিত্ব এখনো অনুভব করা যায়। সেটা এখনো অতিক্রান্ত হয়নি। দ্বিতীয়টাও যে সমাপ্ত হয়েছে তা নয়। প্রাচীনের চেয়ে আরো প্রাচীনের আবিষ্কার প্রতিনিয়ত চলেছে। তৃতীয়টার তো সবে সূত্রপাত। তিনটি পর্ব যেন তিনটি স্রোত। পাশাপাশি প্রবহমান। একটির সঙ্গে আরেকটি সংযোগও ঘটছে, সংঘর্ষও। গতি ও প্রতিক্রিয়া উভয়ই সজীব।

রেনেসাঁসের মহত্ত্ব এইখানে যে স্বর্গ ও নরক, পরলোক ও পরলোকের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মানুষ রিয়ালিটির সন্ধানে লেগে যায়। ইহলোকে ও ইহকালে পরিপূর্ণ জীবনই হয় তার আদর্শ। সেটা যেমন ব্যক্তির বেলা তেমনি সমষ্টির বেলা। পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে দেহেরও অংশ আছে, মনেরও আছে, হৃদয়েরও আছে, বিবেকেরও আছে। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মার পরিত্রাণের উপর জোর দিতে গিয়ে এদের যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হতো না। রেনেসাঁস এদেরও গুরুত্ব দেয়। এদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়তো আত্মার পরিত্রাণের প্রশ্নটাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেয় না। এতকাল যাঁরা গুরুজন ছিলেন তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তবে রেনেসাঁস রেভলিউশন নয় যে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরের পুত্রকে বা তাঁর চার্চকে বা প্রতিনিধিকে সরাসরি অস্বীকার করবে। রেনেসাঁস রিফরমেশনও নয় যে ঈশ্বরকে ও তাঁর পুত্রকে রেখে রোমান ক্যাথলিক চার্চকে বা পোপকে সরাসরি অস্বীকার করবে। এসব পরবর্তীকালের বিবর্তন। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের আদিপর্ব বিশ্বাসী খৃস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা উপভোগ করেছিল।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে যা হিউমানিজম বা মানবিকবাদ বলে অভিহিত হয় তারও পরবর্তীকালে বিবর্তন ঘটেছে। সেকালের মানবিকবাদীরা মানবের পরিপূর্ণ বিকাশে উৎসাহী হলেও মানবসত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ সত্যেও বিশ্বাস করতেন। একালের মানবিকবাদীদের মধ্যে তাঁরাও যেমন আছেন তেমনি আছেন আরো একদল যাঁরা ঐশকে মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত বা প্রমাণাতীত বলে মানবিক ব্যাপারের বাইরে রাখতে চান বা স্রেফ অস্বীকার করেন। মানুষের কাজ মানুষকে নিয়েই থাকা। আর মানুষের বাইরের ও ভিতরের প্রকৃতিকে। ভাগবত সত্তাকে নিষ্ক্রিয় বলে স্বীকার করলে মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ খর্ব হয়। আর আত্মশক্তির বিকাশই মানুষকে একদিন সর্বশক্তিমান করবে। জীবনকে করবে জরাব্যাধিমুক্ত। সংসারকে অভাবশূন্য।

রেনেসাঁসের পূর্বেও শোনা গেছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও শোনা গেছে যে, 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' তার মানে ভগবানকেও মানুষ বলে গণ্য করা হয়েছে। মানবিকবাদ মানুষকে বরাবরই উচ্চস্থান দিয়ে এসেছে, কিন্তু রেনেসাঁসের পর যে প্রস্থান দেয় তা সাধুসন্ত আউল বাউল সুফী মিস্টিকদের দেওয়া স্থান নয়, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক শিল্পীদের দেওয়া। বাইবেল বর্ণিত বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে অচলিত হয়ে যায়। আমাদের দেশেও পৌরাণিক বিষয়ে ছবি আঁকা মূর্তি গড়া ধীরে ধীরে কমে আসছে। অবশ্য ওই যাঁদের চিরাচরিত বৃত্তি তাঁদের কথা আলাদা।

রেনেসাঁসের পরেই মানুষ ইউটোপিয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে। এমন এক রাজ্যের যেখানে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখী, জীবনের সম্পদ সকলের ভাগ্যে, কেউ বঞ্চিত নয়। যেখানে আইন নিখুঁত, রাজনীতি নিখুঁত অর্থনীতি নিখুঁত, কেউ কাউকে ফাঁকি দেয় না, শোষণ বা শাসন করে না। যেখানে অপরাধ ঘটে না, অন্যায় ঘটে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সৌহার্দ্যের। যেসব আদর্শ এতকাল স্বর্গের জন্যে তোলা ছিল এখন মর্ত্যের জন্যেও প্রত্যাশা করা হলো। প্রত্যাশাটা স্বর্গের দেবতাদের কাছে নয়, মর্ত্যের প্রভুদের কাছে। স্বর্গের দেবতাদের সরানো যাব না, মর্ত্যের প্রভুদের উপর হতাশ হলে তাদের সরানো যায়। পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে পাল্টানো যায়। পুরাতন বলে সে সনাতন নয়। মানুষের জন্যেই তার স্থিতি, তার জন্যে মানুষের স্থিতি নয়।

রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউটোপিয়ার স্বপ্ন একভাবে না একভাবে মানুষকে প্রবৃত্ত করেছে এমনসব কর্মে যা পরলোকে বা পরকালে কাজে লাগবে না। যা এই জগৎটাকেই ও এই জীবনকেই আর একটু উপভোগ্য করবে, অন্তত আর একটু কষ্টশূন্য। ধর্মের মধ্যেও সমাজকল্যাণের নির্দেশ ছিল, কিন্তু মানবিকবাদ যে নির্দেশ দিল তা আত্মার পুণ্যের জন্যে নয়, তা ঈশ্বরের প্রীতির জন্যে নয়, তা মানবিক পূর্ণতার জন্যে। পারফেকশন তার লক্ষ্য। মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে প্রকৃতিকে বশ করতে পারলে এই জগতেই লক্ষাভেদ করা সম্ভব। ধর্ম বলে আসছিল অন্তঃপ্রকৃতিকে বশ করতে। মানবিকবাদ বলল বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করতে। বিজ্ঞানের কাছে তাঁদের অসীম প্রত্যাশা।

রেনেসাঁসের মানুষ বলতে বোঝায় সাধুসন্ত বা মিস্টিক নয়, সর্বজ্ঞাতা ও সর্বাসাচী মানুষ যাঁরা এই পৃথিবীকে প্রতিদিন বদলে দিচ্ছেন আরো সুন্দর ও আরো উপভোগ্য পৃথিবীর জন্যে। সফল হয়তো হচ্ছেন না, কিন্তু বিফলতাও সফলতার সোপান। তাঁদের বিশ্বাস একালে যা হলো না ভাবীকালে তা হবে। ভাবীকাল মানে পরকাল নয়। তেমনি এ পুরুষে যা হলো না পরবর্তী পুরুষে তা হবে। পরবর্তী মানে পরজন্ম নয়। রেনেসাঁস যেদেশে ঘটে সেদেশের মানুষ ইহলোকের উপরেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে প্রবর্তনা দেয়।

ঠিক এই অর্থে রেনেসাঁস ভারতের মাটিতে হয়েছে, না মাটির গুণে অন্য রূপ নিয়েছে সেটা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কয়েকজন মানুষ এদেশে জন্মেছেন যাঁদের বলা যেতে পারে রেনেসাঁস যুগের মানুষ। এঁরা না হলে রেনেসাঁস হতো না, রেনেসাঁস না হলে এঁরা হতেন না। রেনেসাঁস স্বীকার না করলে এঁদের জীবনের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, মনে হয় এঁরা প্রক্ষিপ্ত। স্বীকার করলে ব্যাখ্যা মেলে, লক্ষণ মিলে যায়।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বহমান যে ধারা সে ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার বা ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিক নয়। তার ধারাবাহিকতা খুঁজতে হলে যেতে হয় পশ্চিম মুখে আধুনিক ইউরোপে ও অতীত মুখে প্রাচীন ভারতে। তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন যুগের দিক থেকে আধুনিক আর দেশের দিক থেকে বাঙালী বা ভারতীয়। ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ তো আধুনিক ছিলেন না। কার কাছ থেকে তাঁরা তাঁদের আধুনিক ধারা পেতেন, যদি ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কাব্য উপন্যাসকে বিদেশী বা সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতন্ত্রী বলে বর্জন করতেন? ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস বলতে যা ছিল তা মান্ধাতার আমলের। সেই মজা নদী থেকে যা পাবার তা ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদরাও পেয়েছিলেন। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যদি তার বেশী ও তার থেকে ভিন্ন কিছু না পেতেন তাহলে তাঁরাও হতেন মধ্যযুগের সামিল। তাঁদের কীর্তিও হতো সেই ধরনের ও সেই মাপের।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁরা গতানুগতিকের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেননি। আর সে স্রোতও তো মজা নদীর স্রোত। গা ভাসাতে চাইলেও গা ভাসে না। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা। দুকূল ভাসানো এক প্লাবনের প্রয়োজন ছিল। সেটা স্বদেশ থেকে নয়, অতীত থেকে নয়, বিদেশ থেকে ও আধুনিক যুগ থেকেই আসতে পারত। দেশ মোগলশাসিত হলেও আসত। মারাঠাশাসিত হলেও আসত। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানকে বর্জন করে কোনো দেশই নতুন কিছু করতে পারত না। গতানুগতিকে লোকের অরুচি জন্মাত। রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীন ও অর্থনৈতিক অর্থে শ্লাবলম্বী হলেও সংস্কৃতির রূপান্তরের জন্যে ভারতের জ্ঞানী বিজ্ঞানী কবি ঔপন্যাসিকরা দেশের চারদিকের জানালা দরজা খুলে বাইরের আলো হাওয়াকে আমন্ত্রণ জানাতেন ও নিজেরাই তার খোঁজে বেরিয়ে পড়তেন। যেটা অত্যাবশ্যক সেটা কেমন করে হবেছে তার চেয়ে বড়ো কথা সেটা যথাকালে হয়েছে। নইলে রামমোহনের নাম কে জানত, বিদ্যাসাগরের কথা কে শুনত। মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের প্রতিভার মতো গৃহকোণের হতো। হতো অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো সেকেলে।

ঘটনাচক্রে গ্রীক পণ্ডিতদের কনস্টান্টিনোপল থেকে ইটালীতে শরণার্থী হয়ে আগমন যেমন সেদেশে রেনেসাঁসের সূচনা করে তেমনি ঘটনাচক্রে ইংরেজ বণিকদের বাংলাদেশে শাসনভার গ্রহণ ও তাদের নতুন বিদ্যার প্রতি এদেশের ভদ্রলোক শ্রেণীর আকর্ষণ এদেশে রেনেসাঁসের সূত্রপাত করে। আপাতদৃষ্টিতে যা ঘটনাচক্র ইতিহাসের বিচারে সেটা যুগপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। মধ্যযুগ মানুষকে নিশ্চয়ই অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছিল, ইউরোপের গথিক ক্যাথিড্রাল ও ভারতের দেবমন্দির তার সাক্ষী। কিন্তু মানবের অগ্রগতি সেইখানেই রুদ্ধগতি হতো, যদি সে আধুনিক যুগে পদার্পণ না করত। ইউরোপের রেনেসাঁস তাকে আধুনিক যুগে রূপান্তরিত করে। তেমনি ভারতের রেনেসাঁস ভারতকে কবে আধুনিক যুগে যুগান্তরিত। যুগান্তরিত যে হয় সে ধীরে ধীরে রূপান্তরিতও হয়। রিফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট প্রভৃতি পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যায়। তবে একই রকমভাবে নয়, একই অর্থে নয়।

যে রেনেসাঁস চার শতাব্দীকাল সময় পেয়েছে ও যে রেনেসাঁস সবে আরম্ভ হয়েছে তাদের একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা করলে দ্বিতীয়টিকে নিষ্প্রভ মনে হবেই। তাছাড়া ইউরোপের পরিমণ্ডল ও ভারতের পরিমণ্ডল তো এক নয়। ইতিহাস ও ভূগোল, সমাজ ও ধর্ম, জাতি ও বর্ণ তাদের বিভিন্ন করেছে। তবে কিছু প্রচ্ছন্ন মিলও ছিল। সংস্কৃত ও লাটিন ভাষা সুদূর অতীতে এক পরিবারের ভাষা ছিল। আর সেই পরিবারটির আদিভূমি ছিল সম্ভবত একই। আদিভূমি যেখানেই হোক সেটার স্মৃতি কোনো পক্ষেরই নেই। ভারতীয়দের বিশ্বাস ভারতই সেই আদিভূমি। তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংরেজরা আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। যা নিয়ে এসেছে সেটা সম্পূর্ণ পরকীয় নয়। বেশ চেনা চেনা ঠেকছে।

রামমোহন রায় বা সার উইলিয়াম জোন্স অনাত্মীয়তা বোধ করেননি। একজন প্রাচ্যের প্রতি ও অপরজন পাশ্চাত্যের প্রতি জাতি-সুলভ মনোভাব পোষণ করেছিলেন। এক-জনের কৌতূহল প্রাচীনের প্রতি অপরজনের আধুনিকের প্রতি। অবশ্য এটাও ঠিক যে একজন হলেন স্বাধীন দেশের লোক ও অপরজন পরাধীন দেশের। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র গণনা? রামমোহনও তো ভাবতে পারতেন যে তিনি অতি প্রাচীন দেশের সন্তান, তাঁর উত্তরাধিকার পরাধীনতার দ্বারা আচ্ছন্ন হবার নয়। আর পরাধীনতাও তাঁর দেশের পক্ষে মঙ্গলের হতে পারে। বিধাতা তো এভাবেই না নিজের কাজ করে যান। আর যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তি যদি [illegible] দেবত না হন তো কী আসে যায়। তাঁর বর্ণও তো একদিক থেকে শ্রেষ্ঠ।

রামমোহনের মধ্যে, দ্বারকানাথের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে মর্যাদাবোধ ছিল তা সমকক্ষের। তাঁরা মাথা উঁচু রেখেই করমর্দন করেছিলেন। তবে অবশ্য শ্রেষ্ঠতার বড়াই করেননি। ভারত সব বিষয়েই বড়ো এটা তাঁদের বক্তব্য ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজদের ব্যবহার বদলে যায়। তারা ভারতীয়দের মর্যাদাবোধে আঘাত করে। যে ব্যক্তি বর্ণে ব্রাহ্মণ সে ব্যক্তিও তাদের চোখে কৃষ্ণবর্ণ। যে ব্যক্তি মোগল ঘরানা বা রাজপুত ঘরানা সে ব্যক্তিও তাদের চোখে নিম্নবর্ণ। 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডন' বা 'লেসার ব্রীডস' শুনলে কার না রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অসহযোগই তখন মর্যাদারক্ষার স্বাভাবিক নীতি। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে কেউ কাছে যেতেও চায় না, সেলাম করতেও চায় না, শিখতেও চায় না, শেখবার কিছু আছে এটা স্বীকার করতেও চায় না। এমনি করে দেশাভিমান ও জাত্যাভিমান জন্মায়। বর্ণবিদ্বেষ দেখা দেয়। যাঁরা ইংরেজ শাসনকে বিধাতার বিধান বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের পৌত্রেরাই তাকে শয়তানের শাসন বলে বর্জনের সংকল্প নেন।

পরবর্তী কালকে পূর্ববর্তী কালের উপর আরোপ করা উচিত নয়। সকালবেলা যেটা নিয়ে উৎসাহ বিকেলবেলা সেটা নিয়ে অবসাদ। সকালবেলা জোয়ার, বিকেলবেলা ভাঁটা। দেশের ইতিহাসেও একই ব্যাপার। রেনেসাঁসের জোয়ার নেমে যাবার পর ভাঁটার সময় আসে। তখন তার সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। যারা তার কাছে আরো অনেক কিছু আশা করেছিল তারা হতাশ হয়। যাদের বুদ্ধিমূল ধারণাগুলো তার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়েছে তারা তাকে ক্ষমা করে না। রেনেসাঁস মানুষকে দেবতাও করে না, দানবও করে না। দেবতাও মানে না, দানবও মানে না। তার অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে মানুষ আর বিশ্ব-প্রকৃতি, ইহলোক আর ইহকাল। পারে তো এইখানেই সে আদর্শ জগৎ গড়ে তুলবে। না পারে তো বাস্তবকে নিয়েই ঘর করবে। সমালোচকরা এতে সন্তুষ্ট নন। তাই দুই দিক থেকে কথা শুনতে হয়।

পূর্ববর্তী কালে ইংরেজ শাসন ছিল এক জিনিস, রেনেসাঁস ছিল আরেক। ব্রিটিশ অধিকৃত সব অঞ্চলে রেনেসাঁস হয়নি, হয়েছিল যেখানে একদল অগ্রদূত ছিলেন। পরবর্তী কাল একথা ভুলে যায়। তার দৃষ্টিতে রেনেসাঁস ও ইংরেজ শাসন একাকার। আরো পরবর্তী কালের চোখে রেনেসাঁস ও বুর্জোয়া প্রাধান্য একাকার। ইংরেজের পিণ্ডি ও বুর্জোয়ার পিণ্ডি রেনেসাঁসের ঘাড়ে চাপানো হয়। তখন সে আর রেনেসাঁস বলে স্বীকৃতি পায় না। সেটা তাহলে কী? একটা বিভ্রম? ইংরেজ আর বুর্জোয়া তো আরো অনেক অঞ্চলে ছিল। কোথায় তাদের রেনেসাঁস! মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বড়লোকের অভাব তো ছিল না। ওরাও বাস করত ইংরেজ শাসনে। কোথায় ওদের রেনেসাঁস। [illegible] ইংরেজ শাসন ও রেনেসাঁস এক জিনিস নয়, বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস এক জিনিস নয়, বুর্জোয়া প্রাধান্য ও রেনেসাঁস নয় এক জিনিস।

যে দেশ যত প্রাচীন নবীনত্বের প্রয়োজন তারই তত বেশী। তাকেই যুগে যুগে নবীন হয়ে উঠতে হয়। সে নবীনত্ব বাইরের সাজ-বদল বা খোলসবদল নয়। অন্তরে যদি রং ধরে তাহলেই তা নবীনত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের তথা ভারতের অন্তরেও রং ধরেছিল, শুধু আপিসে আদালতে বা দোকানে বাজারে নয়। বাইরে থেকে কতবার কত বিদেশী এসেছিল, কেউ বা লুটপাট করতে, কেউ বাণিজ্য করতে, কেউ রাজত্ব করতে। কিন্তু বাইরে থেকে এলেও তারা একই যুগের মানুষ। তারা সমকালীন। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল তারা ভিন্ন যুগে বাস করে, তারা আধুনিক যুগের মানুষ। আর তাদের তুলনায় ভারতের লোক তিন চার শতাব্দী পেছিয়ে রয়েছে। আধুনিক যুগে পৌঁছয় নি। এই যে কালগত ব্যবধান এটা দেশগত ব্যবধানের চেয়ে দুরতিক্রম্য। একে অতিক্রম করার একমাত্র উপায় কালোপযোগী শিক্ষা ও সম্ভব হলে সমুদ্রযাত্রা। কালোপযোগী শিক্ষাই অন্তরে রং ধরায় ও সমুদ্রযাত্রা সেই রংকে আরো উজ্জ্বল করে।

যাঁরা কালোপযোগী শিক্ষাও গ্রহণ করেননি, সমুদ্র পার হয়ে দেশভ্রমণও করেননি, তাঁরা আধুনিক যুগের মানুষই নন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেহধারণ করলেও তাঁদের মন মধ্যযুগীয়। এঁরাও বই কাগজ লেখেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদেরও স্থান আছে। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রবাহ এঁদের নিয়ে নয়। যাঁরা মনেপ্রাণে আধুনিক তাঁরাই রেনেসাঁসের পথিকৃৎ ও পথিক। রামমোহনের ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল কালোপযোগী ও অতি সহজেই তিনি বহু শতাব্দী অতিক্রম করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও ঘরোয়া পড়াশুনা ছিল ইংরেজী। সমুদ্রযাত্রা অবশ্য তাঁর বেলা ঘটেনি। তবে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। সেটাই সমুদ্র-যাত্রার কাজ করত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সেই নবীনত্ব আসে যা দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কদের সঙ্গে আসেনি। সে সময় এসেছিল আরবী ফারসী শিক্ষা। সে শিক্ষা বিদেশী হলেও আধুনিক ছিল না। ছিল মধ্যযুগীয়। কয়েকটা বিষয়ে কিছু উনিশ-বিশ ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার মতো সব বিষয়ে অগ্রসর নয়। আরবী ফারসী শিক্ষাও ছিল থিয়োলজি কবলিত। কারো সাধ্য ছিল না স্বাধীনভাবে চিন্তা করে বা প্রকাশ করে। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োগ থিয়োলজির সঙ্গে বিরোধ ডেকে আনত। সে বিরোধে পুরাতন বিশ্বাসের জিৎ নিশ্চিত। আর নতুন চিন্তার শাস্তি ভয়ঙ্কর। আরবভাষী জগতে যেটুকু জাগরণ এসেছিল সেটুকু তুর্কদের ভারতে প্রবেশ করার পূর্বেই থেমে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই নতুন চিন্তা জয়ী হয়, পুরাতন বিশ্বাস হেরে গিয়ে পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখে।

জীবজগতের অপার বিস্ময় এই মানুষ। এই মানুষের মধ্যেও কয়েকটি লোক যেন আরো বেশি বিস্ময়। না, মহৎ মানুষের কথা বলছি না, অর্থাৎ সেইসব স্মরণীয় ব্যক্তি যাঁরা অন্যদের চেয়ে বড় মাপের। বলছি বরং সেইসব সাধারণ মানুষের কথা, যারা সকলের মধ্যে থেকেও একটু আলাদা,—আহারে-বিহারে, স্বভাবে-চরিত্রে একটু যেন কেমন খাপছাড়া, বেমানান। তাদেরই কয়েকজনের রেখাচিত্র তুলে ধরা হল এই বিভাগে। এই ছবিগুলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ হয়তো আপনারও মনে হবে, আপনিও এদের চিনতেন।

সেই লোকটি

ডুয়ার্স। মেটেলির চোবা হাট। আমরা যখন ঢুকেছি তখন একটা বড় দড়ি-ঘেরা এলাকায় মুরগীর জোর লড়াই চলছে। খেড়িয়া, মেচ, মদেশিয়া, সাঁওতাল বাগিচা-শ্রমিকে একমুঠো মাঠ টুপুর টুপুর ঠাসা। দুজন করে এগিয়ে আসছে। একজনের হাতে কালো মুরগী। আরেক-জনের হাতে শাদা। একটু ঠাহর করলে দেখা যায়, মুরগীগুলোর বাঁকানো নখের সঙ্গে মাজা সুতো দিয়ে ধারালো লিকলিকে ছোট্ট হাঁসুয়া বাঁধা। প্রতিদ্বন্দ্বী মুরগী দুটির ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে তাদের মালিকরা তাদের ছেড়ে দিচ্ছে মাঠে। একটু পরেই দুজনে দুজনের দিকে তেরিয়া ছুটে আসছে। দড়ির বাইরে থেকে একগাদা গলার আওয়াজ উঠছে, বেটিং হচ্ছে—সাদামে আঠান্নি, কালামে চার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা এলাকা অসংখ্য লড়াকু মুরগীতে ছেয়ে গেছে। পেঁয়াজের খোসার মত সাদা কালো লালচে পালক উড়ছে, রক্তমাখা পালক, মাটি ভিজে যাচ্ছে টুপটাপ রক্তে। হিস্টেরিক রুগীর মত চেঁচাচ্ছে সারা মহল্লা—সাদামে আট, কালামে চার। একটি তাগড়া চেহারার লোক দড়ির ওপর উপুড় হয়ে পড়া লোকজনকে একটা গাছের ডাল দিয়ে মাঝে মাঝে মৃদু পিটুনি দিচ্ছে, হাঁকচে—তফাৎ যাও, হামি ডুয়ার্সের চাম্পিয়ন ভাঁড়ু সর্দার!

কিছুক্ষণ মুরগীর লড়াই দেখে পেছন ফিরেছি, হঠাৎ একটি রোগা জিরজিরে লোক পল্টনের সামনে এসে কাঁধে বুকে হাত ঠেকিয়ে কাতর গলায় বলল—টুকচা খা। জোহান-ও একটু তফাত রেখে বসে পড়ল। বাটি হাতে নিয়ে পল্টনকে বলল—তুই খাওয়াবি? পল্টন বলল—খা। সেই বলাই কাল হল আমাদের। আমরা দুবাটি শেষ করতে না করতে চার-পাঁচ বাটি চোঁ-চোঁ মেরে দিল জোহান। নাছোড়বান্দা বাচ্চা যেমন মায়ের দুধ আর ছাড়তেই চায় না, টানছে তো টেনেই যাচ্ছে। মদেশিয়া মেয়েটি শুধু মাঝে মাঝে যান্ত্রিক গলায় হিসেব করে চলেছে—সাত...আট...নয়...দশ। ঠক্ করে বাটি নামিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পল্টন জোহানের চুলের মুঠি ধরে তুলল। সশব্দে চড় কসাল তার গালে। ডিম ফাটা কুসুমের মত চেহারা তখন জোহানের চোখের। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে পল্টনের দুপা সবলে জড়িয়ে ধরল। বলল, সারারাত ওদের পাড়ায় পরব হবে। নাচ গান শুয়োরের মাংস হাঁড়িয়া উপাসনা চলবে। পল্টনকে যেতেই হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

যেভাবে লোকে শরীর থেকে কেষো ঝেড়ে ফেলে দেয়, তেমনি পল্টন হটিয়ে দিল জোহানকে। পাইনের জঙ্গলে তখন শোঁ-শোঁ বাতাস দিচ্ছে। মনে পড়ে গেল, সেদিনটা ছিল পঁচিশে ডিসেম্বরের সন্ধে। এলোমেলো হাওয়া তখন মহুয়া আর চালের পচাইয়ের গন্ধে মাতাল। জিয়ল মাছের মত একবার থরথরিয়ে কেঁপে উঠল জোহানের পিনখাড়ু শরীর। তারপর সে চড়াই বেয়ে ছুটে নামতে লাগল। গলায় গান—মা মেরীর নামে বাঁধা দিশি সুরের গান। আমি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম। পাইনধূপি ছাড়িয়ে সে গান তখন মিলিয়ে যাচ্ছে বনে বাঁশের ভালুকথাবা জঙ্গলের বুকের মধ্যে। পেছন থেকে ছুটন্ত থাবা মেলে আটকালো পল্টন। মাথা না ঘুরিয়ে স্ট্যাচু বনে গেলাম। সামনে তাকিয়ে দেখি পাইনের একরাশ বর্শাফলকের ওপরে তখন দুধের বাটির মত টলমল চাঁদ উঠেছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মহাসাধিকা মা আনন্দময়ী

একজন তরুণী ফরাসী মহিলা গত বছর এ দেশে এসেছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট. তাঁর নাম মিলেনা সিলভ্যানি। মেয়েটি ক্যাথলিক ধর্ম আশ্রিতা, এবং প্রতি রবিবার নিয়ম করে তাঁকে চার্চে যেতে দেখতাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আনন্দময়ী মাকে বারাণসীতে দুবার দেখেছি। কিন্তু আরও একবার দেখার বাসনা. কাজের চাপে পেরে উঠছি না।

প্রশ্ন করলাম—বাংলা বা হিন্দি আপনার জানা নেই একথা জানি। আনন্দময়ীরও ফরাসী জানা নেই। কিভাবে কথাবার্তা হল? তিনি বললেন : কোনো কথা নয়। আমি তাঁর অপরূপ দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে বেশ কয়েক ঘন্টা বসে রইলাম। আমার এক আশ্চর্য আত্ম উপলব্ধি হয়।

সেদিন মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই বিদেশিনী কি পেয়েছেন আনন্দময়ীর কাছে যে সহস্র কর্মের মধ্যেও তাঁর মন চঞ্চল হয়ে আছে; আনন্দময়ী দর্শনের আকুলতাটুকু লক্ষ্য করে আমি কিন্তু বিস্মিত হইনি। যুগে যুগেভারতের সাধক-সাধিকারা এইভাবে দেশ-দেশান্তরের মানুষকে আহ্বান করে এনেছেন ভারতের পুণ্যভূমিতে।

যাঁর খ্যাতি আজ ভুবন বিস্তৃত, তাঁকে মনে হয় বাংলার মানুষ আজো সে ভাবে জানতে পারেনি। ঠিক এই মুহূর্তে শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজী ভাষায় 'এ মিসটিক সেজ—মা আনন্দময়ী' এই নামে এক মহাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা কারণে এই গ্রন্থটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ গ্রন্থটি জননী আনন্দময়ীর জীবনী-গ্রন্থ নয়। তাঁর জীবনের পিছনে যে আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং শৃঙ্খলা বর্তমান, লেখক তারই সন্ধান করেছেন। এই মহাযোগিনীর ধ্যানমৌন জীবনের খুঁটিনাটির সন্ধান ও ব্যাখ্যা করা একটা সহজ কর্ম নয়, কিন্তু লেখক শ্যামানন্দ পরিণত বয়সে পৌঁছে পরিণত জ্ঞান নিয়ে আনন্দময়ী রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন এবং আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন।

দিব্য-জীবনের কথা সর্ব সময়ে সর্বকালেই বিস্ময়কর। লেখক মহোদয় ভক্তিমার্গে আকুল হয়ে উচ্ছ্বাস ভরে মা আনন্দময়ীর গুণ ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস করেন নি। তিনি শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ভারতের অন্যান্য সাধকদের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন।

প্রথমেই মহাসাধিকা আনন্দময়ীর জীবন-কথা বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই প্রাতঃস্মরণীয়া মহাযোগিনীর বিষয়ে বাংলার মানুষ মনে হয় উপযুক্ত তথ্যাদি বিষয়ে তেমন অবহিত নন। কারণ তা যদি হত তাহলে বাজার চলতি দুএকখানা জীবনী-গ্রন্থ এতদিনে প্রকাশিত হত।

বাংলাদেশের এক পরিচয়হীন গ্রামে ১৮৯৬ খৃঃ ৩০ এপ্রিল তাঁর আবির্ভাব। ত্রিপুরা জেলার ঘেওবায় মাতা মোক্ষদাসুন্দরী ও পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের পর্ণকুটিরে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর প্রথম জীবনের নাম নির্মলাসুন্দরী। আনন্দময়ীর পিতা-মাতা দুজনেই অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং মাতা মোক্ষদাসুন্দরী মুক্তানন্দগিরির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ওপর সন্ন্যাসজীবন পালন করেন।

মাত্র বারো বছর বয়সে ঢাকার আটপাড়া অঞ্চলের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে নির্মলাসুন্দরীর বিবাহ হয়। স্বামীর প্রতি নির্মলাসুন্দরীর ছিল অবিচল শ্রদ্ধা। কিন্তু বিবাহের মাত্র নয়বছর পরেই তাঁর মানসিকতায় রূপান্তর ঘটল। স্বামী তখন স্ত্রীকেই গুরু বলে গ্রহণ করলেন। নির্মলাসুন্দরী নির্মোহ, নিরাশক্ত, স্বামীর প্রতিও এই নিস্পৃহ ভাব প্রকট হয়।

অষ্টগ্রামে স্বামীগৃহে থাকার সময় তাঁর মধ্যে নানারূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে। সেই সময় গ্রামবৃদ্ধ ক্ষেত্র চক্রবর্তী ও হরকুমার রায় নির্মলাসুন্দরীর দিব্য-জ্যোতি লক্ষ্য করে তাঁকে 'জননী দুর্গা' বলে সম্বোধন করতে শুরু করেন। হরকুমার বলেছিলেন—'একদিন তুমি বিশ্বজনের জননী হয়ে উঠবে।'

রমণীমোহন যখন বাজিতপুরে বদলী হয়ে আসেন (১৯১৮—১৯২৪) তখন নির্মলাসুন্দরী সুগৃহিণীর মত কাজ করলেও ধ্যান-ধারণা ও সাধন-ভজনেই তাঁর অধিক সময় ব্যয়িত হত। পরমাশক্তির সঙ্গে মিলনের যে-আনন্দ সে-আনন্দ তাঁর সর্ব অঙ্গে। এদিকে প্রতিবেশীরা মনে করে তিনি ভূতগ্রস্তা, ওঝা ডাকা হল, কিন্তু অল্পকাল পরে সেই যন্ত্রণায় আকুল হয়ে লুটিয়ে পড়ল। রমণীমোহন স্ত্রীকে বললেন : ওকে বাঁচাও। নির্মলাসুন্দরী তাকে যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ করলেন। লোকটি বলল—এঁর অবস্থা উচ্চমার্গের, এঁকে আপনারা বিরক্ত করবেন না।

১৯২২-এ নির্মলাসুন্দরী দীক্ষা লাভের একটা আকুলতা অনুভব করলেন। কিন্তু গুরু কোথায়? অবশেষে তিনি নিজেই আত্ম-দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

এর পাঁচ মাস পরে তিনিই তাঁর স্বামীকে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা দিলেন।

১৯২৪-২৬এ রমণীমোহন চাকরীহীন হয়ে ঢাকায় আসেন এবং আশ্চর্যভাবে ঢাকার নবাবদের জমিদারীতে 'ম্যানেজারে'র কাজ পেলেন। এই ঢাকায় শাহবাগ, রমনা, ঢাকা এই তিনটি স্থানই নির্মলাসুন্দরীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্র। তাঁর চোখের ভাব এমনই আবেগময় যে সবাই মনে করত তিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বা ভূতগ্রস্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্ত সমাবেশের অভাব ঘটল না।

লেখক কিন্তু এক দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছেন। তিনি দিব্যজীবনের কথা বলতে গিয়ে সারা বিশ্বের মরমী সাধক বা মরমীয়াবাদের গভীরে প্রবেশ করার প্রয়াস করেছেন। মিস্টিসিজম বা মরমীয়াবাদ প্রাচ্যের বস্তু, হলেও তার প্রভাব সর্বত্র কিঞ্চিত।

লেখক যখন বিভ্রান্ত হয়ে অকূলপাথারে তখন সহসা আনন্দময়ী মা-র কথা তাঁর মনে জাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ বারাণসী যান। অভীষ্ট বস্তুর সন্ধান তিনি সেখানেই পেলেন। পূর্ব থেকে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর মহিয়সী জননী কাত্যায়নী দেবী আনন্দময়ী মার সেবিকা এবং শেষ জীবন পর্যন্ত আনন্দময়ীর সান্নিধ্যলাভ করেছেন।

রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মত রোমাঞ্চকর অভিনব রহস্য উপন্যাস

শান্তি দাশগুপ্তা

রাতের গভীরে ৫·০০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥ ২২।২এ ॥ বাগবাজার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৩ ॥

লেখক বলেছেন — আনন্দময়ী মার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার জীবনের এক পরম অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন—

They were something more, windows on the TERRA INCOGNITA of the Soul I was granted the gracious privilege of not only sitting at her feet for a few days in blissful seclution but I could hear her unique mystical experience of ethereal visions and above all her featureless Absolute. In her I found 'that light, whose smiles kindle the Universe".

তাঁর হাসির মধ্যে সেই আলো যে আলোকে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত। আনন্দময়ী মার এই বৈশিষ্ট্য। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বলেছেন যেন অবগাহন স্নানের শুচিতার স্পর্শলাভ করলেন। লেখক তাঁর নিজের জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে জননী আনন্দময়ীর সংস্পর্শে এসে শান্তি ও স্বস্তিলাভ করেছেন আর তারই ফলশ্রুতি 'এ মিসটিক সেজ : মা আনন্দময়ী'।

অবশ্য এই গ্রন্থের প্রথম পাঁচটি পরিচ্ছেদে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছেন, প্রাসঙ্গিকভাবে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথাও এসেছে। উপনিষদ, গীতা এবং সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

লেখক বলেছেন—মা আনন্দময়ী স্বয়ং এক অলৌকিক রহস্য। ঠিক এই কথাই বলেছেন ক্রিসটোফার ঈশারউড শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে। যাঁরা সাধক তাঁরা সকলেই এক 'ফেনোমেনন'— তাঁরা যোগবলে যে অবস্থায় উন্নীত হন তা মর্তের সাধারণ মানুষের কাছে সত্যই এক অলৌকিক ব্যাপার, সেই জন্য অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞান ব্যক্তির কাছে এর মূল্য নেই, যেমন উন্মাদের কাছে শাদা-কালোর পার্থক্য নেই। কিন্তু যাঁদের বিচারশক্তি আছে, যাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট তাঁরাই এসব অলৌকিক চরিত্র নিজস্ব রূপ নিয়ে প্রকাশিত হন।

এই প্রসঙ্গে ওটো-র 'মিসটিসিজম' নামক গ্রন্থ থেকে ব্যবহৃত একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা গেল, মিসটিসিজম বা মরমীবাদ সম্পর্কে এই কথাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তিনি বলেছেন :

"Whether the flower of mysticism bloom in India or in China, in Persia, or the Rhine and in Erfurt, its fruit is one. Whether it clothe itself in the delicate Persian verse of Jelleluddin Rumi or in the beautiful middle German of Meister Eckhart in the scholarly sanskrit of the Indian Sankara, or in laconic riddle of Sino-Japanese Zen school, these forms could always be exchanged one for the other".

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের মরমিয়া সাধকদের মধ্যে একটা সংযোগ সূত্র বর্তমান। মরমিয়া সাধকের কোনো বাঁধা আশ্রয় নেই, দেশ-কাল অতীত এক বিশ্বজগতের নাগরিক তিনি, তিনি সত্যের সন্ধানে সমগ্র বিশ্বকে পরিক্রমণ করছেন, সেটা সর্বক্ষেত্রে শারীরিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে ঘটে থাকে।

লেখক বলেছেন যে, উপনিষদ বর্ণিত 'তত্ত্বমসি, অহম ব্রহ্মাস্মি' এই তত্ত্ব শ্রীশ্রী আনন্দময়ীর জীবনে পরিস্ফুট। মরমীয় ঐক্য সাধনা বা অতীন্দ্রীয় ঐক্যবাদ শঙ্করাচার্য বলেছেন তা আনন্দময়ীতে রূপায়িত।

এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। রমনা ঢাকায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এক কালীপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর মধ্যে এক তীব্র আবেগ অনুভূত হল, তিনি প্রতিমার সঙ্গে একত্র হয়ে বসলেন এবং দেবীর পূজার অর্ঘ ও অঞ্জলি স্বয়ং গ্রহণ করলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই সময় তাঁর গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত হয় এবং তাঁকে দেবীর মতই দেখায়। এর এক বছর পরে তিনি যখন চট্টগ্রামের কক্সবাজারে সমুদ্রোপকূলে ভ্রমণরত তখন সহসা বাহুমূলে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলেন। পরে জানা গেল ঠিক সেই সময়েই রমনার কালিবাড়িতে দুর্বৃত্তরা প্রবেশ করে দেবীর অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করে এবং তাঁর হাত ভেঙ্গে দেয়।

কালি ব্রহ্মের শক্তি রূপ, সেই শক্তির সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে এক অতীন্দ্রিয় সাধনায় মগ্ন হয়েছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'হার এক্সট্রাঅর্ডিনারি পাওয়ার্স' এই শিরোনামায় লেখক এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এমন একটি তথ্যসমৃদ্ধ দার্শনিক আলোচনার একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত। গ্রন্থটিতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। গ্রন্থটি বহু মূল্য কাগজে মুদ্রিত ও মূল্যবান কাপড়ের প্রচ্ছদ শোভিত।

গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাক্তন বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"Readers and spiritual aspirants will find this a unique book"

আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।

—অভয়ঙ্কর

A MYSTIC SAGE—MA ANANDAMAYI: (Life and work) By SHYAMANANDA BANERJEE : Published by him from P 469 C.I.T Keyatala. Calcutta—29. Price Rs. 30|-

নতুন বই

মূক ধরণীর মৌন জীবন-গান—সম্কর্ষণ রায়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ছয় টাকা।

'চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিকাশ' প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত এই বইটি একাধারে বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী, এবং যাকে বলা হয় রম্য-রচনা—তাও। লেখক নিজে একজন ভূ-বিজ্ঞানী, কর্মসূত্রে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, 'বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রত্যক্ষ' করেছেন তার 'নিজস্ব প্রকৃতিপাঠের' মধ্যে, 'বিজ্ঞানের ছকে বেঁধে ফেলতে' পেরেছেন জল-স্থল, মাটি-পাথর, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, জলপ্রপাত, হ্রদ সমুদ্র, উষ্ণ প্রস্রবণ, আগ্নেয়গিরি, হিমবাহ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যকে (লেখকের উক্তি)। বিশেষ করে ভারতের ভূ-প্রকৃতির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে লেখক সাবলীল ভঙ্গিতে ভূ-বিজ্ঞানের কিছু গোড়ার কথা বলতে পেরেছেন—যেমন, পাথর বালি শিলা

শৈলেন রায়ের
দুখানি অসাধারণ উপন্যাস

তরাই ১০·০০

টোপাদি ঘাড় কাত করে আমাকে দেখতে লাগল। নাক সিঁটকে বললে, 'জঘন্য, অ-মানুষ, ইতর, ছোটলোক।'

'আর ?'

'আঃ ছাড়। ছাড় বলছি। চীৎকার করব।'

'কর।'

টোপাদি নিস্তেজ হয়ে আসছিল। চুপি চুপি বলল, 'ছাড় নাটু। কে এসে পড়বে। তোর বিয়ে হয়ে গেছে। যূথিকা যদি জানতে পারে—'

সোনালী দুপুর ৪·০০

ভাল খাবার দেখে কোন ক্ষুধার্ত মানুষকে কাঁদতে দেখেছিস অসীম ? আমি সেদিন কী উন্মাদের মতন যে কেঁদেছিলাম। একটা মিষ্টিও মুখে তুলতে পারি নি। লোকটি শেষ পর্যন্ত সব মিষ্টিগুলো একটা বাক্সে ভরে আমার হাতে দিয়ে বললে, বাড়ি নিয়ে যাও, সবাইকে দিয়ে খেও।

বাক্‌সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নদী সমুদ্র মরুভূমি হ্রদ ইত্যাদি, কি-ভাবে স্তর ভাঁজ চ্যুতি ইত্যাদির কথা, এবং কোথা থেকে জলপ্রপাত উষ্ণপ্রস্রবণ গুহা ইত্যাদি হল—এইটিই বইয়ের বিশেষত্ব। সঙ্গে সুনশীয়ানার সঙ্গে যুক্ত করেছেন ভ্রমণ-বিবরণ ও রক্তমাংসের মানুষের প্রেম-ভালোবাসা-বিরহের গল্প। পাঠকদের কাছে শেষোক্ত দুটি আকর্ষণও কম নয়।

তবে 'বিজ্ঞানের ছকে বেঁধে ফেলা' বলতে এই বইয়ে পাওয়া যাবে ভূ-বিজ্ঞানের কিছু বিবরণ ও বিশ্লেষণ মাত্র, সামগ্রিক কোনো ধারণা নয়। অথচ, অন্তত ভূ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সামগ্রিক ধারণা না থাকলে কোটি কোটি বছর ধরে ব্যাপ্ত পরিবর্তনগুলোর বিরাটত্ব ও বিপুলতা এবং অনিবার্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 'সামান্য পাথরের টুকরোটি যেন পৃথিবীর একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ'—এই কথাটি বলা সহজ, বোঝানো শক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিই। 'স্তর' সম্পর্কে লেখক বলছেন—'পাললিক শিলার বিশেষত্ব হ'ল তার স্তরবিন্যাস। কোটি কোটি বৎসর আগেকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশেষ (জীবাশ্ম) তার স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হয়। পৃথিবী ও জীব-জগতের বিবর্তন ও ক্রম-বিকাশের ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে তার বিভিন্ন স্তরে। স্তরীভূত পাললিক শিলা আমাদের পৃথিবীর ইতিহাসের ধারাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুবর্তনের প্রেরণা দিয়েছে। ক্রমেই যে প্রকৃতির নিয়ম এবং সভ্যতা যে স্তরে স্তরে নির্মিত হতে থাকে, তার শিক্ষাও সম্ভবতঃ এই পাললিক শিলার স্তরবিন্যাস থেকে লাভ করেছি।' (পৃঃ ১১৯) ভূ-বিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন, শিলাস্তর ও শিলালিপি হচ্ছে ভূ-বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কিন্তু এই বইয়ে সামনে গল্প, পিছনে গল্প, মাঝখানে অন্য বিবরণ জুড়ে দেওয়া চার পৃষ্ঠার লেখায় মোটামুটি উদ্ধৃত অংশ থেকেই বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে হবে। একজন ভূ-বিজ্ঞানী এ-সম্পর্কে আরো বিশদ হবেন, আরো সহজ ও সরল, এ আশা নিশ্চয়ই করা যেতে পারে। লেখার সঙ্গে গল্প না থাকলেও বিজ্ঞানের পাঠকের কোনো ক্ষতি হত না।

বইয়ের নাম থেকে মনে না হলেও বইটি বিজ্ঞানের বই হিসেবেই ধর্তব্য। তাহলে এমন আশা অসঙ্গত নয় যে, বর্ণনার ভাষাতেও থাকবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই বইয়ে আশাভঙ্গ হবার কারণ ঘটেছে, যেমন এই লাইনগুলিতে : 'যেন দিগ্বিদিক জুড়ে অসুরদের মত অনুসন্ধান থেকে অমৃত-ভান্ডারকে বনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এই নদী-খাতে লুকিয়ে রেখেছেন দেবতারা।' (পৃঃ ৩৯—৪০, জলপ্রপাতের বর্ণনা)। 'মাটির উদ্দেশ্যে মৃত্যুদন্ড সোচ্চার হয়ে উঠেছে যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে—রুদ্র মহাদেবের তৃতীয় নয়ন আকাশময় যেন উন্মীলিত।' (পৃঃ ৭০, নাগপুরের গ্রীষ্মের দুপুরের বর্ণনা)। ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর হৃদয়ের উষ্ণতা তরলিত হয়ে বেরিয়ে আসা (পৃঃ ৪৬), হিমবাহের জলে মুখ গুঁজে থাকা (পৃঃ ৭৭) ইত্যাদিও মেনে নেওয়া সহজ নয়।

মুখ গুঁজে থাকা বাদ দিলেও হিমবাহ সম্পর্কে লেখকের উক্তি—'আয়তনের বিপুলতার দরুণ সেটা (হিমবাহ) সমুদ্রের জলের মধ্যে মুখ গুঁজে ভারসাম্য বজায় রাখে' (পৃঃ ৭৭)—সম্পূর্ণ ভুল। ব্যাপারটা মোটেই আয়তনের বিপুলতার দরুণ নয়।

আরো একটি কথা। এই বইয়ের দু-জায়গায় বলা হয়েছে পৃথিবীর উৎপত্তি সূর্য থেকে, এতই সুনিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে, অনবহিত পাঠক ধরেই নেবেন পৃথিবীর উৎপত্তির এটাই একমাত্র তত্ত্ব। কিন্তু এটা যে অনেক তত্ত্বের একটি, তাও সম্প্রতিকালে মোটামুটি বর্জিত—ভূ-বিজ্ঞানের বইয়েও তার স্বীকৃতি থাকা উচিত। ভূ-বিজ্ঞানের বাইরে অন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনি অযথার্থতার দৃষ্টান্ত এই বইয়ে আরো আছে।

যাই হোক, বইটি পড়ে বোঝা যায় নিজস্ব বিষয়ে লেখক বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী। তাঁর দুর্লভ সৌভাগ্য, জীবিকায় কর্মে ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁর জীবনে কোনো বিরোধ নেই। সারা ভারতে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ তিনি পান। অতএব আশা করব, সাধারণভাবে ভূ-বিজ্ঞানের, বিশেষভাবে ভারতের ভূ-বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের দিক থেকে সমগ্র, প্রকৃত বিজ্ঞানের বই তিনি লিখবেন।

একশ বছরের বাংলা থিয়েটার (প্রথম খন্ড)—শিশির বসু। নাভানা। মূল্য—৩০ টাকা।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ-পূর্তির বৎসরে নানা দিক দিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হচ্ছে: শিশির বসু প্রণীত 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার'—প্রথম খন্ড। আমরা জানি, কলকাতা শহরে সাধারণ্যের মধ্যে টিকিট বিক্রয় করে বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত যুবকগণ পরিচালিত 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রথম যাত্রা শুরু করে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে। কিন্তু সে ত মধুসূদন সান্যালের জোড়া-সাঁকোস্থ ষাঁড়ের উঠানটিকে মাসিক চল্লিশ টাকা হিসাবে ভাড়া নিয়ে। প্রথমে মাত্র শনিবারে, পরে ১৫ জানুয়ারী, ১৮৭৩ থেকে শনি ও বুধবারে অভিনয় চলতে থাকে। কিন্তু নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করে অভিনয়?—সে কবে হয়েছিল? সে থিয়েটারের নাম কি? —একথা কজন জানেন? এবং একথাই বা কজন জানেন যে, সেই থিয়েটারটি ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট থেকে যাত্রা শুরু ক'রে ১৯০১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে গিরিশচন্দ্র ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্তভাবে নিজস্ব ধারায় অভিনয় করে নাট্যজগতে একটি অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে আছে? এই বা কজন জানেন যে, এই থিয়েটারটিই প্রথমে সাধারণ বারবণিতাদের স্ত্রী-ভূমিকাতে অবতীর্ণ করায়? এবং সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে নাটকাভিনয় (মোহান্তের এই কি কাজ?) করে জনপ্রিয়তালাভ করবার কৃতিত্ব এই বেঙ্গল থিয়েটার-এরই? এছাড়াও আছে। প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে নাটকরূপে উপস্থাপিত করেছে যেমন এই থিয়েটারই তেমনই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পাত্র-পাত্রীর সংলাপের আকারে পরিবেশন করার কৃতিত্বও এই থিয়েটারেরই; মনে রাখতে হবে, মঞ্চে 'মেঘনাদ বধ'-এর অভিনয়ের সাফল্যই গিরিশচন্দ্রকে গৈরিশ ছন্দে পৌরাণিক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে।

দীর্ঘদিনব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার হ্যান্ডবিল, ব্যঙ্গ-চিত্র প্রভৃতি থেকে বেঙ্গল থিয়েটার এবং অপরাপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলা রঙ্গালয়গুলির ইতিবৃত্ত, তাদের অভিনীত নাটক সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ও সমালোচনা, প্রতিটি রঙ্গালয়ের বিশিষ্ট গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ইত্যাদি সংকলিত করে বাংলার সাধারণ নাট্যশালার এই যে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসটি নাট্যামোদী পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন গ্রন্থকার শিশির বসু, এর জন্যে তিনি বাঙালী মাত্রেরই আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করবেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার মন্মথ রায় ঠিকই বলেছেন যে, নৈষ্ঠিক শিল্পসাধনার ফলশ্রুতি 'একশ বছরের বাংলা থিয়েটার' বিষয়গৌরবে এবং তথ্যের প্রামাণিকতায় জাতীয় সম্পদরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।' প্রথম খন্ডটির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ-কর্ম, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট দেখে আমরাও শ্রীরায়ের সঙ্গে বলছি, বইটির প্রকাশনা করে নাভানা কর্তৃপক্ষ একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

মনোজ বসু : জীবন ও সাহিত্য—দীপক চন্দ্র। এম সি সরকার এন্ড সন্স, ১৪নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ—১২। দাম—৬৲।

আধুনিককালের যে-সব বয়স্ক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা সম্প্রতি হচ্ছে, এটা আনন্দের বিষয়। সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এঁদের জীবনকাহিনীর খুঁটিনাটি তথ্য নিরপেক্ষভাবে সংকলন করে রাখা, তাঁদের যাবতীয় লেখার তালিকা প্রস্তুত করা। গ্রন্থ সমালোচনাও অবশ্য হতে পারে পরেও তা হবে। কিন্তু তথ্যের ভিত্তিটি দৃঢ়ভাবে এখন থেকে তৈরি করে রাখলে ভবিষ্যৎ সমালোচক-গবেষকদের কাজের সুবিধা হবে। দীপক চন্দ্র এ জাতীয় একটি সাহিত্যিক প্রয়োজন সম্পাদন করেছেন। মনোজ বসুর জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কিত সংকলনাংশ নির্ভুল বলে মেনে নিতে বাধা নেই।

মনোজ বসুর মত প্রতিভাবান লেখক সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার জন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা খুবই আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই। কাব্যিক ভাষা, বাঙালীর সদ্য হারিয়ে যাওয়া আবেগস্নাত জীবনের হাসিকান্নার বিচিত্র পালা, বনগ্রামের ছায়ানিবিড়তা, স্বদেশী আন্দোলন

ও আত্মোৎসর্গের অকৃত্রিম উত্তেজনার দিনগুলি, পরিবার জীবনের ঈষৎ অম্লমিশ্র মধুর প্রেমলীলা মনোজ বসুর এই জগত—আজ হয়ত কিছু স্বপ্ন মনে হয়। কিন্তু আসলে তা আমাদের বিধ্বস্ত কৈশোর এবং বার্ধক্যের কামনা। দীপকবাবু আজকের মধ্যে যে গতকাল তার পর্দা তুলে ধরেছেন। শুধু একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মূল্যায়নই নয়, এই বইটি আমাদের নিজেদের চিনবার একটি জানলাও।

অনুশীলার দেহমন (উপন্যাস)। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। জাতীয় প্রকাশক, ৬৪।২, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। ছয় টাকা।

একটি নিটোল কাহিনী রচনা করে এবং তার মধ্যে গভীর ঘটনা, বিচিত্র চরিত্র যোজনা করে শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ তাঁর 'অনুশীলার দেহমন' নামের সদ্য প্রকাশিত উপন্যাসটি আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রধানতম চরিত্র অনুশীলা। তার কামনা-বাসনা, রূপ-গর্ব, অভিমান, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সর্বশেষ দেহ থেকে মুক্তির জন্য আত্মহননেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। অনুশীলার জীবনে এসেছে মনোতোষের মত অধ্যাপক স্বামী, সমরেন্দ্র-র মত 'বারমুখী মন'-এর অধিকারী উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ। এসেছে মিনতিদির মত নারী যে সমরেন্দ্রকে বিবাহ করলেও তার স্বামীর প্রেম ও পাণিগ্রহণে উৎসুক। অনুশীলার চরিত্র স্বামীর বিপরীত। তাই পাশের ফ্ল্যাটের সমরেন্দ্র-র প্রতি তার আকর্ষণ। আবার মিনতির সঙ্গে মনোতোষের স্বভাব ও মানসিকতায় কোথায় যেন মিল। প্রেম-অপ্রেম নিয়ে এই কাহিনী, দেহ-মনের দ্বন্দ্বে এই কাহিনী জীবন্ত, অনুশীলার মানসযন্ত্রণা, মনোতোষের ধীর-স্থির মতি ঔদার্য, সমরেন্দ্র-র অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কাহিনী শেষে মিনতির আত্মনিবেদন লেখক যথার্থ শিল্পী-সুলভ সংবেদনায় চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসটি সাধারণ পাঠকদের রসবোধ তৃপ্ত করবে।

স্মারকগ্রন্থ। সম্পাদক—নির্মলকুমার খাঁ। পাবলিকেশন সাব-কমিটি, ২৭, অম্বদা-প্রসাদ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া—১।

ভারত পাঠাগারের রজত-জয়ন্তী বর্ষের স্মারক গ্রন্থটি শ্রীনির্মলকুমার খাঁ-এর সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সম্মানিত ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা-ধন্য এই সংকলনটি মূল্যবান ইংরাজী ও বাংলা রচনায় সমৃদ্ধ। সম্পাদকের নিজের সংগৃহীত পৃথিবীর পুরাতন ও প্রধান প্রধান লাইব্রেরীর দীর্ঘ তালিকাটি বাস্তবিকই এই স্মারকগ্রন্থটির অতি মূল্যবান অংশ। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, দেশী-বিদেশী লাইব্রেরী সংক্রান্ত সংবাদ, শিক্ষা প্রসারে লাইব্রেরীর ভূমিকা সংক্রান্ত ইংরাজী ও বাংলা আলোচনাগুলি গবেষণামূলক। 'ভারত পাঠাগারে'র ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনাগুলি সর্বস্তরের সর্বকালের ও সর্বদেশের লাইব্রেরীকে প্রেরণা যোগাবে বলে আমরা মনে করি। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের পক্ষে এ ধরনের স্মারকগ্রন্থ নিজেদের প্রয়োজনেই সংগ্রহযোগ্য।

কোন পাপ নেই (কাব্য-গ্রন্থ)—বিষ্ণু সামন্ত। লৌকিক প্রকাশ, নিউ সিনেমা মোড়, কন্টাই, মেদিনীপুর। এক টাকা।

'আদি জন্মস্থান' ও 'ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ক্ষয়ের উৎস অনুসন্ধান করে বিষ্ণু সামন্ত উপলব্ধি করেছেন : 'সব কিছুর ভেতরটা দেখতে পেলেই/সব সত্য সূর্য হয়ে ওঠে।' কিছুটা ম্লান, বিষণ্ণ তাঁর কণ্ঠস্বর।

এই সংকলনের কবিতাগুলি মূলত রোম্যান্টিক স্মৃতিচারণা ও নগর-মনস্কতার ফসল। ত্রুটিহীন নয় নিঃসন্দেহে। তবুও ভাবায়। পাঠককে চিন্তিত করে। আমাদের বিশ্বাস, সময়ের সংলগ্নতায় তরুণতর যে-কোনো কবিরই তিনি প্রতিবেশী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী।

ভিয়েতনামের কবিতা—সম্পাদনা : কমলেশ সেন ও অসিত সরকার। কবিতা শান্তি পরিষদ। কথা ও কাহিনী। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম তিন টাকা।

ভিয়েতনামের কবিতা, ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের আর এক ইতিহাস। বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ থেকে সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা যে পিছিয়ে থাকেন নি, তার স্পষ্ট পরিচয় ওঁদের লেখার মধ্যেই রয়েছে। যে সমাজচেতনা থেকে জেগে ওঠে দেশ এবং মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ তারই এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে শিল্পীমানসিকতায়।

কমলেশ সেন ও অসিত সরকার হো-চি-মিন থেকে শুরু করে সম্প্রতিকালের কবিদের কবিতার এই অনুবাদ সংকলন সম্পাদনা করেছেন। কবিতাগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করবার সুদৃঢ় সংকল্প উচ্চারিত, সেই সঙ্গে এসেছে ব্যক্তিগত জীবনের নানান মুহূর্ত। চিত্রকল্পের অভিনবত্বে এবং ভাবনার সুসংবদ্ধতায় অধিকাংশ কবিতাই উল্লেখযোগ্য। অনুবাদকরা দায়িত্ব পালন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে।

রবীন্দ্র রঙ্গ : সরোজকুমার বসু। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা—১২। আট টাকা।

ডক্টর সরোজকুমার বসু ১৯৪৩-৪৪ সালে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গবেষণাসূত্রে 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস' নামে একখানি বই লেখেন। বর্তমান বইটি পূর্ণতর আলোচনা। এই আলোচনার তিনটি পর্ব; প্রথম পর্বে বিশেষভাবে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস ও হাস্যরস সৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্যের উল্লেখ,—দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রচনার বিস্তৃত আলোচনা,—তৃতীয় পর্বটি দ্বিতীয়েরই বিস্তার এবং সেই সঙ্গে আলোচকের নিজের অভিমত —অর্থাৎ এ আলোচনার উপসংহার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গদ্য-রচনা, নাটক সকল প্রদেশই এই বিশ্লেষণের বিষয়ীভূত। 'পরিশিষ্ট' অংশে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক রচনাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা আছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, হাস্যরস—'একটা নৈতিক গুণের মতই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার রচনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সৌরভের ন্যায় অনুপ্রবিষ্ট।' ডক্টর বসু সেই মন্তব্যই বিশদ করেছেন। তাঁর এই আলোচনায় প্রচুর পরিশ্রমের নিদর্শন আছে। বইখানির নাম হওয়া উচিত ছিল—বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের রঙ্গকলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। বইয়ের নাম হিসেবে এ-নাম অবাঞ্ছিত রকম দীর্ঘ বটে, কিন্তু 'রবীন্দ্র রঙ্গ' নামটিও বিষয়ের বিস্তারের দিক থেকে উপযুক্ত সংকেত বলে মনে হয় না। ডক্টর বসুর এই পান্ডিত্য-পূর্ণ গবেষণাগ্রন্থে পরবর্তী গবেষকদের ভাববার বিষয় আছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

জাগরী (বৈশাখ)—সম্পাদক অপূর্বকুমার সাহা (অবৈতনিক)। ৭৪।৫এ, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩। এক টাকা।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবাদর্শে বিশ্বাসী পত্রিকাটির এই সংখ্যা বেরিয়েছে 'নিশিকান্ত স্মরণ সংখ্যা' হিসেবে। লিখেছেন উভয় বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরা। সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই পত্রিকাটি পাঠযোগ্য।

আজকাল (জ্যৈষ্ঠ)—সম্পাদক শিবনাথ চক্রবর্তী ও সুনীল সেনগুপ্ত। হারপ বাগনান, হাওড়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

গাঁয়ের চাষবাসের অবস্থা, সেচ প্রণালী, শিক্ষা ও শিক্ষকের অবস্থা, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে আলোচনাগুলি ভালো। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক। কবিতা, রম্যরচনাও ছাপা হয়েছে।

জান মান মাটি
বিকাশ-এর চমকপ্রদ উপন্যাস ৬.
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ
হেনা চৌধুরী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ১০.
শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন
কোনান ডয়েল।অদ্রীশ বর্ধন ১০.
আপনার বই প্রকাশ করবেন?
পান্ডুলিপি পাঠালে দশ দিনের মধ্যে সম্পাদকীয় মন্তব্য পাবেন।
অ্যালফা-বিটা
পাবলিকেশন্‌স্‌ লিমিটেড
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

কথায় কথায়

আমাদের পাড়া থেকে ফুটবল খেলার মাঠে যেতে পথে একটা বাজার পড়তো। সেই বাজারের মধ্য দিয়ে আমরা কয়েকটা কাপড়ের দোকানের ঝাঁপের নিচ দিয়ে খেলার মাঠে যাতায়াতের পথে শর্ট-কাট করতাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুই দলের খেলোয়াড়, রেফারি ইত্যাদি সমেত প্রায় আঠারো উনিশজন আমরা একসঙ্গে ফিরছি, আমার হাতেই ফুটবল, আমার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে গমগমে। যখন সেই কাপড়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক বুড়ো মুসলমান ভদ্রলোক এত ছেলের মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখে যাচাই করে নিয়ে আমাকেই ডাকলেন। তিনি দোকানদার নন, ক্রেতা। একগাদা ছোট বহরের ডুরে শাড়ি সামনে নিয়ে বাছাই করছেন। তিনি আমাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে ভালো করে দেখে দোকানীকে বললেন, 'হ্যাঁ, এইরকমই লম্বা হবে,' এবং এই বলে একটা শাড়ি তুলে নিয়ে আমার কোমরের কাছে ধরে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেখলেন; 'আরেক সাইজ বড় চাই' বলতেই দোকানদার আরেকটা রঙীন ডুরে শাড়ি এগিয়ে দিলেন, এটা একটু বড়। আবার বুড়ো ভদ্রলোক আমার কোমরের কাছ থেকে মাপ নিলেন এবং খুশি হয়ে সেটাই পছন্দ করলেন।

এতক্ষণ আমি ফুটবল হাতে বিমূঢ় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। পুরো ঘটনাটা মিনিট দেড়েকের মধ্যে ঘটে গেলো। কোনো এক দূর গ্রামের অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে সম-উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ার জন্যে তার শাড়ির মাপ নেওয়ার কাজে আমাকে ব্যবহার করা হলো; আমার চারপাশে তখন দেড়-ডজন বন্ধু আমাকে ঘিরে রয়েছে, অনেকেই মুখ টিপে হাসছে।

তখন আমার বারো-তেরো বছর বয়েস হয়েছে। বালকত্ব পার হয়ে প্রায় প্রথম যৌবনই বলা যায়। এই সময়ে এই ঘটনায় আমার পৌরুষ যেভাবে আহত হয়েছিলো, বিশেষ করে বান্ধব-সমাজে আমার মর্যাদা যেভাবে পতিত হয়েছিলো, তা হয়তো এখন আর কাউকে বোঝানো যাবে না।

আমার জীবনে চিরকালই এইরকম হয়ে আসছে। চিরকাল আমার আশেপাশের লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এমন সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিয়েছে যা কল্পনা করাই কঠিন।

একবার আমার বারান্দায় রাত বারোটা থেকে শুরু করে একেবারে ভোর হওয়া পর্যন্ত দুটো হুলো-বেড়াল এমন ঝগড়া করলো, তিনবার বিছানা থেকে উঠে দরজার বার হাতে নিয়ে তাড়িয়ে দিলাম, তবু আবার ফিরে এসে ঘুরে ঘুরে সারারাত ধরে কর্কশ কণ্ঠে ঝগড়া করেই চললো, সেই রাতে একবিন্দু ঘুম হলো না। কিন্তু ভেবে দেখুন পরদিন সকালবেলায় শুনলাম বাড়িশুদ্ধ লোক, এমনকি পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনী পর্যন্ত বললেন যে কাল রাতে আমি নাকি এমন নাক ডাকিয়েছি তাতে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেছে।

হায়, ঈশ্বর, কি করে বোঝাবো! কি করে বোঝাবো যে, কালীপুজোর রাতে মুখে ছুঁচো কালি মেখে, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে পাড়ার মোড়ে যে লোকটা থানার জমাদারসাহেবকে ভয় দেখিয়েছিলো সে আর যেই হোক আমি নই, সে রকম যোগ্যতাই আমার নেই। কি করে বোঝাবো যে, ডাম্বু নামে পাড়ার যে কুকুরটা পাগল হয়ে আমার চিরশত্রু ধনপতিবাবুকে কামড়িয়ে দেয়, সেই ডাম্বুকে আমি মাঝে মাঝে সকালবেলা বাসি রুটি খাওয়াতাম বটে কিন্তু সেই জন্যে সে পাগল হয়নি; কেউ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে আমি কখনো জানতামই না যে কুকুরটা ভবিষ্যতে পাগল হতে পারে, পাগল হয়ে ধনপতি-বাবুকে কামড়াতে পারে। এ ব্যাপারে আমার যে কোনো প্ররোচনা, অভিসন্ধি, কলকৌশল ছিলো না, পাড়ার কেউই বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে আড়ালে পেলেই হেঁহেঁ করে হেসে বলে, 'দাদা, আপনার মত ভুখোড়...!'

সেই কবে এক সরল গ্রাম্য ভদ্রলোক মাড়ির মাপ দিয়ে শুরু করেছিলেন তারপর থেকে সারাজীবন ধরে যা নয় তাই। চিরকাল আমি শিশুদের ভালো-বেসেছি, আর সকর্ণে আড়াল থেকে শুনেছি, শিশুর মায়েরা শিশুদের ভয় দেখাচ্ছে, 'সাবধান, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, না হলে এখুনি তারাপদকে ডেকে আনবো,' এবং তারপর স্বচক্ষে পর্দার পিছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি ভয়ে নীল হয়ে শিশুরা প্রাণপণ খেয়ে নিচ্ছে। একবার-দুবার নয়, এরকম ঘটনা পৌনঃপুনিক দশমিকের মতো আমার জীবনে ঘুরে ঘুরে বারম্বার।

না হলে কেউ বিশ্বাস করতে পারে, এই কয়েকদিন আগে চিৎপুর আর লাল-বাজারের মোড়ে সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্যে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আবার সেই একই ঘটনা ঘটলো। কিম্বা বলা উচিত, তার চেয়েও মারাত্মক।

চিৎপুরের এই মোড়টায় কয়েকটা দোকান আছে যেখানে চামড়ার বেল্টে লাগানো ঘুঙুর বেচে। আমি জানতাম এগুলো নর্তকীরা নাচবার সময় পায়ে পরে নেয়। সেইখানে এক দোকানে এক অভিজাত

চেহারার ভদ্রলোক ঐ রকম একটা ঘুঙুর লাগানো বেল্ট কিনছিলেন, হঠাৎ তাঁর কি মনে হলো তিনি বেল্টটা হাতে করে নিজের গলায় একবার লাগিয়ে নিয়ে তারপর আমাকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই ঘুঙুরটা শক্ত করে ধরে, 'দাদা, কিছু মনে করবেন না,' শুধু এইটুকু ভূমিকা করে আমার গলায় লাগিয়ে গর্দানের মাপ নিলেন। আমি তো বিস্মিত, অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এই মোটা ঘাড়ের মাপের গোদা পায়ের নর্তকী কেমন করে নাচবে? আমার বিস্মিত ভাব দেখে ভদ্রলোক নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, তাঁর প্রিয় ছাগলের গলার জন্যে এটা কিনছেন, সেই ছাগলের গলার মাপটা নাকি তাঁর নিজের গলার চেয়ে একটু চওড়া, প্রায় আমার গর্দানের মত।

—তারাপদ রায়

রহস্য উপন্যাস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফেরারী ফিরে এল

।। আঠাশ ।।

সেই রাত্রেই।

হোটেল একেবারে নিয়ন্ত্রণ। শহরেও বিশেষ শব্দ নেই। হোটেলের নীচের সড়কে দু-একটা মোটর, কি টাঙার ছুটে যাওয়ার শব্দ ছাড়া। হোটেলেরই কোথাও ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল। অপ্রশস্ত একালে দুটো চৌকি, আলাদা আলাদাই শুয়ে ছিল দুজনে, রঘু উঠে গিয়ে সোরাই থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছে থাকোমণি উল্টোদিকে মুখ করে শুয়েছিল, ঘাড়টা ফেরাল। 'তোমার দোব জল?' —প্রশ্ন করল রঘু।

'একটু আগে উঠে খেয়েছি।' থাকো উত্তর করল। বলল—'নিজে গড়িয়ে নিলে, আমায় ডাকলেই পরতে।'

একটু ম্লান হাসি নিয়ে চাইল রঘু।

'সে অ্যাসেসের অভ্যেস অনেকদিন ছেড়ে গেছে।' কথাটা বলতে বলতে ওর চৌকির কিনারায় গিয়ে বসল—প্রশ্ন করল—'ঘুম হচ্ছে না, নয়?'

'ওদিকে একটু হয়েছিল যেন, ছমছমে। ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।'

'আমার একেবারেই হয়নি' হওয়ার লক্ষণও দেখছি না কোন।...

একটি কথা—তোমার কথাগুলো শুনতাম। কষ্ট হবে তোমার? তাহলে না হয় থাকই।'

উঠে বসেছে থাকোমণি বলল—'তোমার তাহলে তো আরও ঘুম আসবে না। সুখের তো নয়।...'

'সব চেয়ে যেটা দুঃখের ছিল সেটা তো...'

মুখ থেকে বের হওয়ার আগেই থেমে গেল রঘু, বুঝিয়ে নিয়ে বলল—'না, থাকো শুনেই নিই। ঘুম হচ্ছে না বুকপুকুনি লেগে থাকার জন্যেও। তাছাড়া এমন নিরিবিলি হঠাৎ পাবও না। নাবো; চলো।'

রেলিঙের ধারে এসে পাশাপাশি দাঁড়াল দুজনে। থাকোমণি একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল—

'যেদিন এলাম বাড়ি ছেড়ে সেদিন থেকেই তাহলে আরম্ভ করি।.. হ্যাঁ, একটা কথা ছেড়ে যাচ্ছে—ঐ রকম উৎকট ভয়টা দেখাবার পরই পিসির ভাবটা কিন্তু একেবারেই বদলে গেল। দুটো দিন যে ছিলাম তারপরেও—এত মিষ্টি কথা, এত আদর, এত আতিস্যি, বোধহয় জীবনে আগে কখনও পাইনি ওর কাছে। বাড়ির কিই একরকম, তবে ছেলেবেলায় মা মারা যাওয়ায়—বাবাকেও হারালাম যখন বছর সাতেক বয়েস—কাকা সংসারের কর্তা—কর্তা অবশ্য নামেই, কাকীমাই সব—তেমনি উগ্রস্বভাব—আমার সঙ্গে তো...সে সৎ মায়েও এমন করে না—হবে না কেন বলো? ভাই নেই—সম্পত্তিতে বাবার হকটা...'

হঠাৎ থেমে গেল। একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে বলল—'দ্যাখো। কী বলতে কী কথা এসে পড়ছে। কোথায় ছিলাম?'

'বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল তোমার?'

—তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে ওর মুখেই প্রথম ওর আসোল পরিচয় শুনে যাচ্ছিল বলে প্রশ্নটা আপনা হতেই অন্যমনস্কভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল রঘুর।

একটু বেদনার হাসি ফুটল থাকোমণির অধরে, বলল—'ওটা লুকুতে হয়েছে বলে এটাও লুকুতাম—কপালের সিঁদুর নিজের হাতে মুছে?'

'মাফ করো আমায় মণি, ভুল হয়ে গেছে।' কাতর হয়ে ওর একটা হাত নিজের মুঠোয় ধরে নিল রঘু। বলল—'বলো। তারপর?'

'কোথায় যেন বলছিলাম?' —আরম্ভ করল থাকোমণি—'হ্যাঁ, পিসির ব্যবহার একেবারেই উলটে গেল। আমার কিন্তু তখন ঠিক হয়ে গেছে—ওবাড়িতে আর থাকা চলবে না আমার। ঐ ভয়, তুমি আসা একরকম বন্ধ করে দিয়েছ, কিন্তু যত দেরি করে আস, ততই খারাপ মেজাজে, পিসির সঙ্গে ঝগড়াটা ততই ঘোরালো হয়ে উঠে—যদি রাগের মাথায় পিসি বলেই ফেলে কথাটা। আর একটা ভয় গয়নার ব্যাকসটা একদিন না একদিন বের করিয়ে দেখবেই—কমে কমে খান পাঁচেক গয়না ছাড়িয়েছে, ও কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইবে না—হয়তো জোর করে বেখেই নেবে। ও নিজের জন্যে না নেবে না সে-বিশ্বাস আমার ছিল এত[illegible]ওয়ার পর মেয়ের বাড়[illegible]ছে আমার—কিন্তু [illegible] না করতে ওই [illegible] গিয়ে মা কাজ[illegible] ছিল—সে ক[illegible] শুনে অবধি[illegible] কতখানি ব[illegible] নিয়েই আ[illegible] এসে[illegible]

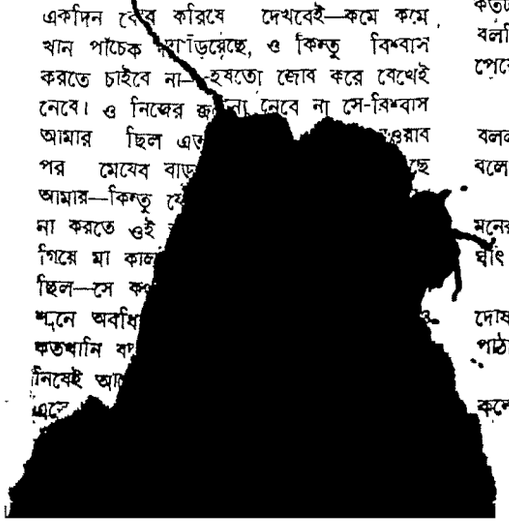

তোমায় হারাবার সঙ্গে গয়নাগুলোও খুইয়ে আমি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়ব। কাকে বলি, কি করি। সে যে দুটোদিন কী করে কাটল—একেবারে পাগলের মতন হয়ে পড়লাম আমি। আরও সব ব্যাপার হতে লাগল, সেও এই রকম একটা সন্দেহ এসে পড়াতেই। আমি ভয়ে দিশেহারা হয়ে যতই মুখ বন্ধ করে থাকি—অভিমানও যে তার সঙ্গে থাকে না এমন নয়—ঐ পিসিই সব করেছে তো একসময়—সব মিলিয়ে যতই বোবা হয়ে যাই, পিসির দরদ ততই যায় বেড়ে—কথা কওয়াবার চেষ্টা, মিষ্টি কথা। ফল হয় উল্টো, তবে কি ভুলিয়ে-ভালিয়ে গয়না কটা হাতাবার মতলব?'

ক্রমেই আরও দিশেহারা হয়ে পড়ছি। থাকা এখানে চলবে না। কিন্তু যাই বা কোথায়—কি করে? গেরস্তর বৌ একা কখনও বাড়ির বাইরে পা দিইনি।' হঠাৎ থেমে গিয়ে ওর দিকে চেয়ে বলল—'এরপরে তুমিই বলতে পারবে।'

রঘু একটু চমকে উঠেই বলল—'আমি! আমি কি বলব?'

'আসা বন্ধ করে দেওয়ার পর কয়েকদিন পরে তোমার একটা লোক আমার সঙ্গে দেখা করে, সমস্ত দিন ওৎ পেতে থেকে সন্ধ্যের পর। পিসি সমস্ত দিনের পর কি একটা কাজে বাইরে গেছে। ভৈরবও মঠ থেকে ফেরেনি, চুপিসাড়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তোমার একটা চিঠি দিল। লিখেছ অসুখে পড়ে রয়েছ কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে। টাকা আর হাতে করে থেকেছে—সামান্য যে কটা নগদ ছিল, সে হাত ছাড়া করে পাথর-বসানো আংটিটা দিয়ে দিই।.. পেয়েছিলে সেটা? কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে তাও তো জানি না তাই বলছিলাম—এরপর তুমিই বলতে পারবে। পেয়েছিলে সে আংটি?'

রঘুর মুখটা একটু রাঙা হয়ে উঠল। বলল—'আর লজ্জা দিয়ে কি হবে? বলে চলো।' একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

থাকোমণি আবার শুরু করল—'যখন মনের এই রকম অবস্থা, সেই লোকটা আবার ঘুঁৎ বুঝে আমার সঙ্গে দেখা করল...'

'আবার!' —চমকেই উঠল রঘু একটু। দোষ স্খালনের স্বরেই বলল—'কৈ, আমি আর পাঠাইনি তো—বিশ্বাস করো...'

'চিঠিও ছিল না এদিনকে!'—নির্লিপ্ত কণ্ঠেই জানাল থাকোমণি। বলল—'চাইতে

জানাল অসুখটা একটু বাড়াবাড়ি হওয়ায় চিঠি দিতে পারেনি। চেনা হয়ে গেছে তো—এমনিই পাঠিয়ে দিয়েছে।'

আমার তখন তো সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার অবস্থা নেই। পালাতে হবে, তোমার কাছে যাওয়ারই লোক পেয়ে গেছি—অসুখের কথাতেও মনটা খারাপই হয়ে গেছে, সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, যা একটু সম্বল আছে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে উঠতে পারব—এইটাই আমার কাছে তখন সবচেয়ে বড় কথা।

দুপুরের ব্যাপার সেদিন। ওকে বললাম— সন্ধ্যে সন্ধ্যে দিনের বেলায় হবে না, ও যেন একেবারে মাঝ রাতের দিকে আসে; আমি সব জোগাড় করে রাখব। আমার ঘরের পেছনে তরিতরকারির বাগানটা যত্ন তদারকের অভাবে আগাছার জঙ্গল হয়ে গেছে। ঠিক হোল দুপুর রাতে ও জানলার নীচে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে; জানলা খোলাই থাকবে আমার, পিসি আর ভৈরবকাকা ঘুমিয়ে পড়ে বাড়ি নিশুতি হয়ে পড়লে জানলায় এসে ওকে ইসারা করব, তারপর খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়ব।

সেদিন বিকেল থেকেই সূর্যোগের লক্ষণ। আকাশে মেঘের চলাচল, তার সঙ্গে একটা যে হাওয়া উঠেছিল, সেটা বেড়েই যেতে লাগল রাত, এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে। বামনঠাকরুণ সকলা সকাল রান্নার পাট সেরে আমাদের খাইয়ে দাইয়ে চলে গেলেন, আমরাও শুয়ে পড়লাম।

দুদিন থেকে ডেকে, কথা বলে তেমন সাড়া পাচ্ছে না। সেদিনও খেতে ডাকলে শরীর খারাপের ছুতো করে যেতেই চাইনি, একটা যে কিছু এঁচে রেখেছি, পিসি নিশ্চয় আন্দাজ করেছিল, সর্বদাই যেন চোখে চোখে রাখছিল আমায়। তুমি একেবারেই আসা বন্ধ করার পর পাশের ঘরেই শুতো এদানি বড় বেশি নাক ডাকে বলে আমার ঘরে শুতে না পেরে। তবে মাঝখানে একটা দোর ফুটিয়ে নিয়েছিল, যতক্ষণ জেগে ছিল, কয়েকবারই সাড়া নিলে 'থাকো ঘুমুলি?... ঘুমিয়ে পড়...কী যে হবে আজ রাত্তিরে'। যেন জোর করে নিজেকেই জাগিয়ে রাখবার জন্যে। তারপর নাক ডাকার শব্দ হোল। খানিকটা সময় যেতে দিলাম, নাক ডাকার শব্দ বেড়ে যাচ্ছে—এক সময় আস্তে আস্তে উঠে জানলার ধারে চলে গেলাম। আসেনি লোকটা—কী যেন নামটা বলেছিল সে...।

'বিলেস'—রঘু জুগিয়ে দিল। ফোঁস করে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল নাক দিয়ে।

থাকোমণি বলল—হাঁ, বিলেস। দেখলাম আসেনি তখনও। ঘুম ছিল না। চোখে মনটা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল। বিছানাতেই খানিকটা ছটপট করে আবার জানালার ধারে গিয়ে ওকে দেখতে না পেয়ে বেরিয়ে বারান্দায় বসে ভাবছি কি করব, পিসি লণ্ঠন হাতে ক'রে বেরিয়ে এল। তুই এখানে। এই দুষমণ রাত।' বললাম—'ঘুম হচ্ছে না।' 'হবে ঘুম।' বলে হাতটা ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। আরও ঘন ঘন সাড়া নেয়া। দিয়ে যেতে যেতে একসময় আমি ইচ্ছে করেই বন্ধ করে দিলে, উঠে এসে সাড়া নিলে, আস্তে আস্তে, পাছে ভেঙে যায় ঘুম, চোখে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেখলেও, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি এবার আরও বেশিক্ষণ নাক ডাকতে দিলাম বেশ বেড়ে উঠলে, জানলার ধারে চলে গেলাম। বিলেস এসে গেছে, বললাম—খিড়কির দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে। আমার সব ঠিক, করাই ছিল গয়না কটা আর কিছু টাকা, নোটে, একটা গেঞ্জের তোষকের নিচে রাখা, বের করে নিয়ে পেটকাপড়ে গুঁজে খুব আস্তে আস্তে গিয়ে খিড়কির দোর খুলে বেরিয়ে পড়লাম বিলেস দাঁড়িয়েও ছিল।'

'এলে বেরিয়ে তুমি!' ও লোকটার অকরণীয় হেন কাজ নেই।' একেবারে স্তম্ভিত হয়ে শুনতে শুনতে শিউরে উঠে বলল রঘু।

থাকোমণি একটু চেয়ে দেখল ওর দিকে যেন মনশ্চক্ষে বিপদটা দেখে নিল একবার, তারপর সহজ গলাতেই বলল—'তাই নাকি? আমার তো তখন ওসব ভাববার ক্ষমতা নেই। তবে এখন তুমি বলতে মনে পড়ছে, আমিও সঙ্গে যাব বলতে একটু যেন হকচকিয়ে চুপ করে যায়—তখনই কিনা সামলে নিয়ে যেন খুঁটি... আপনি নিজে যাবেন? ...ভালো।'

...কের স্বরেই প্রশ্ন

...ক কণ্ঠেই উত্তর

...মনে পড়ছে।

...গোয়ালঘরের

...লে গেলাম।

...সামনে

...খে

এগিয়ে চললাম আমরা। তুমি এদানি ওদিকে যাওনি। গাঁয়ে শেষ বাড়িই ওদের। নজরে পড়ে যাওয়ার ভয় ওদেরই, আকাশে ঘন ঘন ঝিলিক দিতেও আরম্ভ করেছে, বিলেসকে টুকে দিয়ে আমরা বাড়ির সামনেটা ঝোপ-ঝাপের আড়াল হয়ে এগিয়ে গেলাম। বাড়িটাও তো...'

রঘু বাধা দিয়ে একটু অবান্তরভাবেই প্রশ্ন করল—'নিধের এখনও সে দোষগুলো আছে?'

'কি দোষ?' একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে চাইল থাকোমণি।

'পেশাদার সি'দেলই তো, আরও নানা দোষ। তোমার স্বামী দেবতাটির মাথায় করবার হ'ত বুলিয়েছেন সে সব দিনে' মৃদু হেসে বলল রঘু।

হয়েছে। একসঙ্গে নাম করতে হবে না। রাগ করল থাকো, বলল—স্বামী দেবতা নিজের পয়সা খরচ করেছেন, ভালো-মন্দ যেভাবে হোক। কার বলবার কি আছে?'—একটু গায়ে গা ঘে'ষে কথাটা বলে আবার সরে দাঁড়াল, বলল—'শুনে যাও, সেসব বাজে পুরনো কথা তুলতে হবে না। কি বলছিলাম?—হ্যাঁ, মালাকারের বাড়িটা পেরিয়ে গেলাম আমরা। বিষ্টিটা আরম্ভ হয়ে গেছে, ঝড়টাও আরও গেছে বেড়ে তেমনি আকাশের ডাক আর বিদ্যুৎ। কখনও তো আসিনি এদিকে, তবু মনে হল আমরা গ্রামটা ছাড়িয়ে বাইরে এসে পড়েছি। একটা বেশ ফাঁকা মাঠ, তবে চষা নয়, ফসল তোলার পর অনেকদিন ছাড়া থাকলে যেমন হয়, ঘাস জন্মে গেছে। এতক্ষণ নিশ্চিতে পাওয়ার মতন একটানা চলে আসছিলাম—ছোটখাটো ডাল-পালা ভেঙেও পড়েছে হু'স হয়নি। এগিয়ে গেছি, এবার বিদ্যুতের ঝলক ফাঁকা মাঠ দেখে প্রথম গা ছমছম করে উঠল। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—'এবার কোনদিকে যেতে হবে? আমার তো জানা নেই—এতটাও চলে এসেছি ঝোঁকের মাথায়।'

বিলাস বললে—'ভয় নেই আমার তো জানা আছে। যেতে হবে সোজা মাঠ পেরিয়ে ঐ আম বাগানের মধ্যে ঢুকতে হবে। তা আপনি এক কাজ করুন—যা এনেছেন সঙ্গে, আমায় দিয়ে দিন। বাগানটার বদনাম আছে। ওসব ব্যাটাছেলের কাছে থাকলেই ভালো।'

রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। এই সময় বিদ্যুৎ চমকে উঠে ওর মুখের ওপরও নজর পড়ে গেল। মাথায় বড় বড় চুল জলেতে ভিজে গিয়ে যেন আরও কিরকম দেখাচ্ছে। তবু মেয়েছেলের সোনাদানার মায়া, আমি বললাম—'এখন বের করতে গেলে বিষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। নোটই তো, একটু ধরন হলে না হয় দিবে দেবো।'

জিজ্ঞেস করলে—'আর, গয়নাটয়না নেই? কার ভরসায় রেখে এলেন সেখানে?'

বললাম—'পেসাদী পিসিই তো রাখে ওগুলো, তবু দু-একখানা যা সরিয়ে এনেছি, একসঙ্গে দিয়ে দোবো।'

'তবে তাই দেবেন আমায়? —মুখটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ভালো করে, তবে

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!
Benisons-2141 BEN

গলার আওয়াজে মনে হোল যেন মনের মতন হয়নি কথাটা। কিন্তু তখন আমার ওদিকে ততটা খেয়াল নেই, পা বাড়ালাম। চারিদিকেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফাঁকা মাঠে—ঝড়-বিষ্টির দাপটটাও আরও বেড়েছে। বেশ অনেকখানি গিয়ে বাগানটা পেলাম। যেন জমাট অন্ধকারের চাপ একটা। গরুর গাড়ি যেতে পারে এই রকম একটা কাঁচা রাস্তা ভেতর দিকে চলে গেছে। সামনে এসে পড়ে আবার দাঁড়াল বিলেস, বলল—'যা আছে দিয়ে দিলে পারতেন আমায়। বললাম না? বাগানটার বদনাম আছে। অবশ্য তার ওষুধও আছে আমার সঙ্গে—যার কাছেই থাকুক ক্ষেতি নেই—সামনে এলেই এই...'

ভিজে জামাটা তুলে কাপড়ের কষি থেকে একটা ছোরা বের করলে, বিদ্যুতে ঝকমকিয়ে উঠল ছোরাটা—'

'উস, কী ভুলটাই যে করেছিলে!'—চাপবার চেষ্টা করলেও আওয়াজটা একটু উঠেই পড়ল রঘুর। থাকো বলল—'ভুলে যাচ্ছ আমি আমি তো সামনেই রয়েছি তোমার।'

একটু হাসবার চেষ্টা করল, তারপর গম্ভীর হয়ে পড়েই বলল—'কী যে ভুল করে বসেছি, এতক্ষণে আমার হুঁস হোল, চকমকে প্রায় হাতখানেকের ছোরাটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে আমার। বললাম—তা হলে তুমিই রাখো সেই ভালো।'

একটু সরে দাঁড়িয়ে পেটকাপড়ের ভেতর থেকে টাকা-গয়না সুদ্ধু সমস্ত গেঁজেটা খুলে নিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়ে বললাম—'আর কিছু নেই আমার কাছে কিন্তু। কোন ভয় নেই তো আর আমার?'

বলল—'না, ভয় কিসের? আমি রয়েছি। মেয়েছেলে, ঝাড়া হাতপা থাকাই ভালো, তাই নিয়ে রাখলুম।' আমার হাতের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—'রুলি জোড়াও হাতে না থাকলেই ভালো।'

আমার তখন সারা শরীর ঝিমঝিম করছে ভয়ে, রুলি দুটো খুলে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। আর কিছু রইল না তো ভয়ের?'

খোসামোদ করে নিজে হতেও বললাম—'ঠিক বলেছ। এবার আমি নিশ্চিন্দি। তুমি রয়েছ, বিশ্বাসী বন্ধু বলেই পাঠিয়েছেন তোমায়।' জিজ্ঞেস করলাম—'আর কতটা পথ হবে?'

বলল—'কিছুটা আছে এখনও। কোশ ছয়েক পথ, আমরা প্রায় আদেকটা এসেছি।'

তারপর একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল—'থাক, আমবাগানের পথটা ছেড়েই দিই। ঝড়টা যে রকম মাতামাতি লাগিয়েছে, ডাল-টাল ভেঙে পড়তে কতক্ষণ? এটাকে কাটিয়ে একটু ঘুরে যাই চলুন—একটু না হয় বিলম্বই হবে।'

বিদ্যুতের আলোয় দেখে দেখে আমরা বাগানটার পাশ দিয়ে দিয়ে এগুলাম। ফুরুতে চায় কি সে পেল্লায় বাগানের বেড়?...'

রঘু ভ্রু চেপে কি যেন মিলিয়ে নিচ্ছিল, বলল—'কোন বাগান? বাঘ-আঁচড়ায় যেতে অতবড় আমবাগান তো আছে ব'লে মনে হয় না। উঃ, কী ফাঁড়াটাই গেছে সেদিন।'

থাকো আবার সেই রকম সহজ কণ্ঠেই বলল—'সর্বস্ব তুলে দিয়ে তখন প্রাণটুকু হাতে নিয়ে চলেছি, কারুর মুখেই আর কথা নেই। দুর্যোগ? অমন দুর্যোগ জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না বাড়তে বাড়তে তখন এমন অবস্থা, এক একবার ঝড়ের দমকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দেবে; নেহাৎ গাছগুলোর পাশে পাশে রয়েছি বলে কোনওরকমে পা-পা করে যাচ্ছি এগিয়ে একটু। তেমনি বিষ্টি, তেমনি বাজের গর্জন। বাঁদিকে মাঠের মাঝখানে একটা তাল গাছ বাজ পড়ে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ডানদিকে গাছের ডালগুলো মটমট করে ভেঙে পড়ছে। একটু দাঁড়াবার আশ্রয় নেই বলেই আমরা গায়ের সব শক্তি দিয়ে এগিয়ে চলেছি। এই করে এদিকেও যখন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক চলেছি, বাগানটা পেরিয়ে আমরা আবার একটা মাঠে এসে পড়লাম। সামনে বেশ একটা বড় জলাও খুব ঢেউ উঠছে, বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়।... তোমার কি তাহলে মনে হয়, বাঘ-আঁচড়ার পথই নয় ওটা?'

ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করল রঘুকে। খুবই অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল রঘু, একটু চকিত হয়ে উঠেই বলল—'এ্যাঁ, মোটেই নয়, তাই মিলিয়ে দেখছিলাম। উঃ, কী ফাঁড়াটা গেছে সে রাত্তিরে!'

'সে কথা একশ'বার। তবে, কী নিশ্চিহ্ন ক'রে ফাঁড়া কাটিয়েও যে দিলেন তিনি! আজও দেখছি সেদিনও দেখেছিলাম—দয়া যখন করেন...'

অভিভূত হয়ে কণ্ঠস্বর দ্রব হয়ে এল, আঁচলটা তুলে চোখে চাপল থাকোমণি। রঘু পিঠে বাঁহাতটা রাখল আলগাভাবে, বলল—'তখন তেমনি করেই করেন বৈকি। করেন না?'

কিছুক্ষণ একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল দুজনে, পরে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকো আবার শুরু করল—'ঝড়টা তখন অনেকটা কমে এসেছে, মেঘেও মাঝে মাঝে ফাটল ধরে শেষরাতের চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। জলাটার ধার দিয়ে এগুতে এগুতে আমরা একটা কি বড় গাছের নীচে একটা ঘরের কাছাকাছি এসে পড়লাম। পাকা একটা ছোট ঘর। যতদূর দৃষ্টি যায় আর কোথাও কিছু নেই। বিলেস বলল—'চলুন, ওটা মন্দির একটা, ভেতরে গিয়ে আমরা কাপড় জামা নিংড়ে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিগে। দুর্যোগটা একেবারে কেটে গেলে বেরিয়ে পড়ব।'

আমার যেন কিরকম বোধ হতে লাগল। সেই ভয়-ভয় ভাবটা আবার ফিরে এল। বললাম—'একটানা চলেই যাই চলো; ভেজবার যা তাতো ভিজেই গেছি।'

একটু জিদ করেই বলল—'না, চলুন। পথে আশ্রয় ছিল অথচ এইভাবে একটানা নিয়ে এসেছি—তিনিই বা কি বলবেন আমায়? চলুন।'

আমার অবস্থা বুঝতেই পার, ছোরাটা দেখবার পর থেকে ওর কথায় না বলবার ক্ষমতা নেই আমার। 'বেশ চলো' বলে দুর্গা নাম জপ করতে করতে চললাম পেছনে পেছনে। খোসামোদটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ, বেশ চলো, তাঁর বন্ধুই যখন রয়েছে সঙ্গে।'

ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ইটের ছাতের খুব পুরনো একটা ঘর। ছোট দরজাটা আধ ভাঙা হয়ে ঝুলে পড়েছে, চৌকাঠটাও পচে গেছে। একটা বিদ্যুতের ঝিলিকে দেখলাম—ঠাকুর কোনও নেই। বললামও ওকে। বলল ছিল, শিবলিঙ্গ, গাঁয়ের লোকে তুলে নিয়ে গেছে।' তারপর ভেতরটা দেখিয়ে বলল—'যান, কোণে গিয়ে জামা-কাপড় নিংড়ে নিন ভালো করে।' ওর চোখের দৃষ্টিটা একেবারেই ভালো লাগছে না। হঠাৎ নিরুপায় হয়ে আমি যেন মরিয়া

হয়ে পড়লাম। কোথা থেকে একটা বুদ্ধিও মাথায় জুগিয়ে গেল, বললাম—'তুমিই আগে যাও, ভেতরটা একেবারে অন্ধকার—আমার ভয় করছে—ভয়টা তাহলে ভেঙ্গে যাবে।'—ঠিক করে নিয়েছি, ভাঙা হোক যাই হোক, ভেতরে গেলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে শেকলটা তুলে দিয়ে ছুটব। ঘর রয়েছে যখন—হয়তো কোন ঠাকুরও ছিলেন এককালে, তখন কাছে পিঠে গ্রামও আছে নিশ্চয়।

কি একটু ভাবল বিলেস, তারপর বলল—'বেশ, যখন বলছেন—মানিবেরই পরিবার তো...'

চলে গেল ভেতরে। আওয়াজে বুঝলাম নিংড়ুচ্ছে কাপড়। সে-যে কী গেছে ঐটুকু আমার! সময় যাচ্ছে, এক লহমার এদিক ওদিক কী হয়ে যাবে। অথচ সাহস হচ্ছে না যে এগিয়ে তাড়াতাড়ি শেকলটা তুলে দিই। নিংড়ুতে নিংড়ুতে এগিয়েও এল দরজার হাতখানেক ভেতরে। বলল—আসুন এবার'

বললাম—'তুমি এসো বিরেয়ে তবে তো।'

আবার মরিয়া হয়ে গেছি, বললামও একটু ইকুমের টোনেই।

চটে গেল এবার—'খালি অবিশ্বাস! আবার ভিজতে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে? তবে...' —বলে কোমরের ছোরার বাঁটটা মুঠিয়ে ধরে এগিয়েছে, কড় কড় করে শব্দ হয়ে গাছের একটা বড় ডাল ভেঙে পড়ল ছাতের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছাতটাও। একেবারে বিলেসকেও নিয়ে। মাগো!' বলে একটা চিৎকার তারপরই সব শেষ।

'চুপ করল থাকোমণি' এবার যেন সমস্ত দৃশ্যটার স্মৃতিতে সম্মোহিত হয়েই, আর কি হোতে পারত যেন তার আতঙ্কেও। রঘুও যেন সমস্ত ঘটনাটুকু প্রত্যক্ষই করছে। একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল—'উঃ, তারপর?'

বেশ সহজ ভাবটা ফিরে এসেছে থাকোমণির, অতীতের ঘটনাটা একেবারে সামনে এসে পড়েছিল, আবার অতীতে চলে গেছে। বলল—'তুমি আমায় ভীতু বলতে বরাবর, তাই না? সে রাত্তিরে আমায় দেখা উচিত ছিল। ঝড়টা কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। আকাশও বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে একেবারে নীচের দিকে চাঁদের ফালিটুকু রাঙা হয়ে উঠেছে। নির্জন, একটা লোক ছিল সেও নেই। তারপরেই নজর পড়ল জঙ্গলের ধারে পোড়া কাঠ কতগুলো ছড়ানো রয়েছে। জায়গাটা তাহলে শ্মশান।

একা শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই একটা লোক মরে পড়ে রয়েছে—এই মিনিট কয়েক আগে পর্যন্ত জীবন্ত ছিল। আমার কিন্তু একেবারে ভয় নেই। এখন মনে হবে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে বলতে যতটুকু গা ছমছম করছে ততটুকু নয়। এটা যে কি কবে সম্ভব হয়েছিল তখন, এখনও বুঝতে পারি না। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম বিলেসের লাসটা পড়েছে এমনভাবে যে কোমরের ওপরের ধড়টা ভেতরে পড়ে একরাশ ইটে চাপা পড়ে গেছে। বাকিটা এদিকেই। অতগুলো না হোক, তবু ইট রয়েছে এদিকে, তাছাড়া একটা কড়ি আড়াআড়ি পড়েছে কোমর চেপে, দোরের কাছেই। আমি ইটগুলো সরিয়ে কড়িকাঠটাও সরিয়ে দিলাম। ছোট ঘরের কড়িকাঠ, মোটা নয়, পচেও গেছে কিছু কিছু। সব পরিষ্কার করে গোঁজেটা খুলে নিলাম ওর কোমর থেকে। নীচের দিকে পড়েছিল—তবু দুটো গয়না ভেঙে গেছে, বাকিটা একটু একটু তোবড়ানো। নোট ছিল শ'খানেকের কিছু বেশি, তার মধ্যে একটা নব্বরী একশ টাকার। একটা লম্বা টিনের কৌটোয় রাখি। ভেজেনি। যতক্ষণে আমার এদিকে শেষ হয়েছে ততক্ষণে ফর্সাও হয়ে এসেছে। বাইরে কাপড়জামা নিংড়ে, গোঁজেটা আবার পেটকাপড়ের নীচে বেঁধে তোবের হয় নিলাম। চারিদিকে মাঠ আর জঙ্গল। তবে একটা শ্মশান যখন রয়েছে, তখন গ্রাম কাছাকাছি থাকবেই। দু' তিনটে যে সরু পায়েহাঁটা পথ এসে মিশেছে জায়গাটায়, তার একটা ধরে এগুলাম। কপাল দোষে মনে হোল সবচেয়ে দূরে গ্রামের পথটাই ধরে থাকব। যখন পৌঁছুলাম তখন মাথার ওপর সূর্য্যি অনেকখানি উঠে এসেছে। তাইনছ করে দিয়ে গেছে গ্রামটা, তারই মধ্যে সামনে ঢুকতেই যে বাড়িটা পেলাম তাইতে উঠে পড়লাম আমি।...আজ এই পর্যন্ত থাক।'

চুপ করল থাকোমণি।

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছ না?'—রঘু বলল।

'অমন ভয়ংকর রাত তো জীবনে আর আসে নি, সবটা আবার মনে পড়ে গেল তো।' বাইরের দিকে চেয়েই বলে যাচ্ছিল, ঘুরে চাইল ওর দিকে থাকো।

'থাক তবে।'—বারণ করল রঘু। বলল—'তুমি শুয়ে পড়গে।'

'আর তুমি? রাতও তো হয়েছে অনেক।'

'থাকি বাইরে একটু। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, ঘুম হবে না।'

'আমারও তো ঐ অবস্থা।'

'বাঃ, তোমার তো গরম হওয়ার সঙ্গে ভেজাও হয়েছে।'—হেসে একটা হালকা রসিকতা করল রঘু। বলল—'না, দুজনে একসঙ্গে থাকলে শোনবারই ইচ্ছে হবে তো। পাখা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ো গে, লক্ষ্মীটি।

'তুমিও দেবি কোর না, লক্ষ্মীটি।'

যেতে যেতে ফিরে বলে একটু হেসেই ফেলল থাকোমণি। রঘুও ফেলল হেসে।

অনভ্যাসের লজ্জায় একটু তাড়াতাড়িই ভেতরে চলে গেল থাকোমণি।

।। উনত্রিশ ।।

হঠাৎ কতো আগে সেই গৌড়ার রাতগুলো থেকে একটা যেন ফিরে এসেছে। একটি মিষ্টি শব্দের আদান-প্রদানে...মানুষের এই কতদিনের কত রাতের দুঃসহ স্মৃতি সব একেবারেই মুছে দিয়ে।

ওরা উঠল অনেক দেরি করেই। তবে দুজনেই বেশ প্রফুল্ল। রঘুই একটু আগে উঠেছে থাকোমণি ঘুম ভেঙেই তাকে দেখে বলে উঠল—'হ্যাগো, এবার তো আমরা বাড়ি যাব?'

সদ্য ঘুমভাঙা চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রঘু বিছানাতেই পা ঝুলিয়ে বসে ধীরে ধীরে সিগারেট টানছিল, নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল—'এত তাড়াতাড়ি কিসের?'

গালে বাঁহাতের তর্জনীটা চেপে ধরল থাকো, চোখ কপালে তুলে বলল—'ওমা কি বলছ তুমি! তাড়াতাড়ি নেই? আজ বছরখানেক ধরে যাবা নাকি বাড়ির মুখ দ্যাখেনি! এমন ছিষ্টিছাড়া কথা...'...

হেসে ফেলল রঘু—সেই পুরনোদিনের নূতন থাকোমণিকে আর একবার এনে ফেলবার জন্যে রহস্যটুকু—একটু বেফাঁস কথা বললেই—সেই চোখ কপালে তোলা, নিজের গাল টিপে ধরাব সেই মুদ্রাদোষ। একটু চেয়ে থেকে হেসে ফেলে বলল—'হয়েছে, হয়েছে; এসো, বোস দিকিন এখানে এসে। বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ করবার জন্যে বসে আছি সেই থেকে, তা যা ঘুম!'

'আমি বাড়ির স্বপ্নই তো দেখছিলাম।' —আপত্তি জানিয়ে এমন ভ্রু কুঁচকে দৃষ্টি হেনে পাশে এসে বসল থাকোমণি যে, রঘু একটু দুলেই হেসে উঠল। ওর পিঠে হাত দিয়ে মুখটা ঝুঁকিয়ে বলল—'তাহলে আর কি? বেশ তো বাড়িতেই ছিলে।'

ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়ে বলল—'না, সেকথা নয়। যেতে তো হবেই—আর একদন্ড মন টেঁকে এখানে? আমি তোমার ঘুম ভাঙবার জন্যেই বসে আছি। তুমি এক কাজ করো। চান-টান সব সেরে নাও, আমি ততক্ষণ একবার ইস্টিশানে গিয়ে গাড়ির সময়টা জেনে আসি। আমার চান বাদে আর সব হয়ে গেছে, এক কাপ চা পর্যন্ত।'

'আজই যাবে? এখুনি?....একটা কথা ছিল। যদি রাখো!'—ভঙ্গি বদলে একটু মিনতির স্বরেই বলল থাকো।

কৌতুকে রঘুর চোখদুটো আবার চিকচিক করে উঠল, মুখের দিকে চেয়ে বলল—'তোমার অন্ত পাওয়া ভার। এই—'তাড়াতাড়ি কিসের?'—বলতে এক ভাব, সঙ্গে সঙ্গে ইস্টিশানে গাড়ি দেখতে যাচ্ছি বলতে.....'

'মাত্র একটা দিন, তাইতেই হয়ে যাবে'—আবদারে অল্প একটু গড়িয়ে পড়ল গায়ে থাকোমণি, বলল—'আগ্রা, এটা নাকি এক দেখবার মতন জায়গা—দেশবিদেশ থেকে দেখতে আসে সবাই—তেরো নম্বরে আমাদেরই মতন দুজন বাঙালী এসে রয়েছে—বৌটি বলতে গেলে ছেলেমানুষই—কাল আলাপ হোল—দেখতেই বেরিয়েছে দুজনে—সব দেখা হয়ে গেছে—কাল তাজমহল দেখতে গিয়েছিল। আমার শুধু নাম শোনা আছে মাত্র—বলছিল সে নাকি একটা তীর্থস্থান—কোন বাদশার বেগম মারা যেতে—নাকি বড্ড ভালবাসতো তাকে বাদশা...

—বলতে বলতে রঘুর বুকে মুখটা গুঁজে দিল থাকোমণি। অশ্রু নেমে এসেছে চোখে। নিঃশব্দে কেঁদেই যেতে দিল রঘু। নিজের মনটা স্মৃতির ভারে টনটন করে

উঠেছে, কোথায় সে বাদশার স্নেহাস, কোথায় তার নিজের নির্বাচন।

একটু পরে ঝুঁকে একটু চেপে নিয়ে বলল—'এ আর এমন কি শক্ত কথা মাসি? যাব দেখতে। আমারও হয়নি দেখা কখনও, নাম শুনেছি অনেক।'

কন্টু থেমে, সিগারেটে একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—'তোমার বাকি গল্পটা শোনার ইচ্ছে ছিল। তা নয় হবেখন পরে। বেশ, তাই ঠিক থাক তবে। ইন্টিশানটা আমি হয়েই আসি ততক্ষণ।'

ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সমস্ত-দিনের ফুরোনে একটা ট্যাক্সি করে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। এদিকে যা দেখবার সব দেখেশুনে সন্ধ্যের সময় তাজমহলে এসে উঠল। পূর্ণিমা যা তার কাছাকাছি না হলেও জ্যোৎস্নারাত্রিই। গাইডের সাহায্যে সব ভালো করে দেখেশুনে ওরা একটা চাতালে বসল। সমস্ত দিনের পর্যটনে ক্লান্ত, তার ওপর আত্মার যেন সবটুকুই বিষণ্ণতা। এই এত নামকরা তাজমহল পর্যন্ত। শরীরের ক্লান্তির সঙ্গে মনটাও ভার হয়ে রয়েছে, বিশেষ করে থাকোমণির। কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিতান্ত দু'একটা এদিকওদিক মন্তব্য ছাড়া ওরা চুপ করেই বসে রইল। গাইডকেই বলে দিয়েছিল রঘু, ক্যান্টিন থেকে একটা লোক একটা প্লেটে করে চায়ের সরঞ্জাম আর টোস্ট নিয়ে এসে সার্ভ করে গেল। ওরা অল্প-বিস্তর এদিকওদিক গল্পর সঙ্গে শেষ করল। রঘু রুমালে হাত মুছতে মুছতে বলল—হুঁ, তারপর? এবার বলো, নিশ্চিন্দি হয়ে শোনা যাক।'

ট্যাক্সিতে ছাড়াছাড়া কিছু গল্প হয়েছে থাকোমণির—সেদিন গ্রামে পৌঁছুবার পর থেকে। সে-রাত্রের মত উগ্রতার কিছুই নেই। গল্পর চেহারা সাদামাটা। সে-রাত্রের দুর্যোগে কত লোক চাপা পড়ে মারা গেছে, কত লোক ওর মতোই ঘর ছেড়ে ছিটকে পড়েছে, পথে যেতে যেতেই থাকোমণি যে একটা কাহিনী রচনা করে রেখেছিল বাড়ির লোকে বিশ্বাস করেই নেয়। বাঘ-আঁচড়ার নামটা আর করে না থাকো, নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি একটা গ্রামের নাম করে বলে, সেখান থেকে এক আত্মীয়ের সঙ্গে বাপের বাড়ি আসছিল মালীপাড়ার গোরুর গাড়িতে, রাস্তাতেই ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে গাড়োয়ান আর যার সঙ্গে আসছিল দুজনেই মারা যায়। গাড়িটা একেবারে যায় ভেঙে, একটা বলদ জখম হয়ে পড়ে, একটা পালায়; ও সমস্ত রাত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এখানে এসেছে। বেশ ভালো গৃহস্থই, তাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে, সেইদিকেই মন সবার, বেশি জিজ্ঞেসবাদ না করে শুকনো শাড়ি,সায়া দিয়ে নিজেদের গোরুর গাড়ি করে পাঠিয়ে দিল।

মালীপুরের সম্বন্ধের কথাও বলল থাকোমণি। এই প্রথম। তখন পাকিস্থানের কথা বলতে কলমের ডেকে পড়ার প্রকৃত সম্বন্ধের দিকটা আর বলা হয়নি। ওরা কেউ নয়, এমনকি একজাতও নয়। পাকিস্থান থেকে এনে এইদিকে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার জন্যে সমস্তটাই প্রসাদীর বানানো। তবে, বিয়ের আগে দিনকতক সে ছিল সেখানে, তারপর বিয়ের অনেক পরেও সে বার দুই আসে, হলধর বেঁচে থাকতেই, তাতে সবাই জানত ভালো করেই। ওকে ভালওবাসত সবাই। ছোট সংসারই—কর্তা, গিন্নি, গিন্নির একটি বোন, বালবিধবা, দিদির বাড়িতেই থাকে। একটি ছেলে, থাকোর যখন বিবাহ হয়, তখন ছেলেমানুষই, বছর দশেক বয়েস, বিয়েটা যখন হয় তখন ওসব বোঝবার ক্ষমতা নেই তার। তারপর অবশ্য জানতে পারে কিছু, তবে ওপারের আত্মীয়র বোন, এপারে নিয়ে এসে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই পর্যন্ত। এক জাতেরও যে নয়, সে সব কিছু জানে না। একটু হাঁদা গোছেরও ছেলেটা থাকোমণির খুব নেওটো হয়ে পড়েছিল কটা দিনে।

থাকোমণি পৌঁছাল সন্ধ্যার সময়। শেষ-বার যে আসে তারপর ছ-সাত বছর বাদ দিয়ে এই এল। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কর্তা মারা গেছেন। ছেলের অনেকদিন আগেই বিবাহ হয়ে যায়, তাঁর সময়েই। এখন দুটি শিশু সন্তান।

বেশ একটু অবাক হোল ওরা ওকে এ সময়, এভাবে দেখে। এখানে দুটো গল্প চালু করতে হোল থাকোমণিকে। একটা, যা আগের গ্রামে বলে এল, গাড়োয়ানটাও রয়েছে। জানত গিন্নির কাছে এটা চলবে না। তবে গিন্নি চালাক মেয়েছেলে, শ্বশুর-বাড়িতে যে একটা অশান্তি চলছে, কিছু কিছু খোঁজ রাখতেন। মুখের পানে সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চুপ করে শুনেই গেলেন তখন। তারপর রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমিয়েছে, থাকোমণিকে ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—'কি ব্যাপার বল্ দিকিন? আমি তো জানি কিছু কিছু।'

'আর টেঁকতে পারলাম না মাসি, বাবা মারা যেতে শেষপর্যন্ত পেসাদী পিসিমাও বৈরী হয়ে পড়ল, পালিয়ে এলাম তোমার কাছে'—বলে হাঁটু দুটো জড়িয়ে কেঁদে পড়ল থাকোমণি।

চুপ করিয়ে বললেন—'তা বেশ করেছিস, আমরা দুবোনে তিথি করতে বেরুচ্ছি। বুনীর দিকে চাইতে পারতাম না—(বর্নমালা ওঁর বোনের নাম)—এখন আবার নিজের কপাল পুড়েছে, আর ভাল লাগে না। ছেলেটা মানুষ হয়েছে, বৌটিও পেয়েছি বেশ কাজের, চালিয়ে নিক দিনকতক। সামনে এবার প্রয়াগে কুম্ভ একটা বেশ দাঁও পেয়েছি। বেশ ভাল হোল, তুই থাক। তারপর ফিরে এসে বোঝা যাবে।

থাকো আবার কেঁদে পড়ে পা জড়িয়ে ধরে বলল—'আমাকেও নিয়ে চলো মাসি সব থাকতে আমারও তো কপাল পুড়েছে.....'

রাজি করাল।

থাকোমণি চুপ করল। দুটো আঙুলে সিগারেট ধরে শুনছিল রঘু, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে একটা করে টান দিয়ে, প্রশ্ন করল—'তারপর?'

'না হয় আজ থাকই না এই পর্যন্ত। ...একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব নিয়ে বলল থাকো—'এমন রাতটা নষ্ট করব?'

চাঁদটা ক্ষয়ে আধখানা হয়ে আকাশের মাঝমাঝি তাজমহলের গম্বুজের ওপর থেকে সরে এসেছে। থাকোমণি একবার দেখে নিয়ে রঘুর দিকে চেয়ে বলল—'সত্যিই, তাহলে পূর্ণিমার রাতে কত সুন্দর হয়ে উঠে, না গা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে গেল রঘুর বুক থেকে। অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, একটু চকিত হয়ে উঠে বলল—'এ্যাঁ, হাঁ, তা বৈকি।'

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

কালাচাঁদ গীতা ৪র্থ সংস্করণ ৩·০০

নিমাই সন্ন্যাস (নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০০

নরোত্তম চরিত ৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ (২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩·০০

প্রাপ্তিস্থান :—

পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

ভাবের ঘোর এসে যাওয়ার জন্যে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল থাকোমণি। বলল—'বড় বেশি যেন ভাবচ। আর তো আমরা হয়ে পড়েছি একসঙ্গে...না হয় বলবই বাকিটুকু?...তাই না হয় শোন। হ্যাঁ, তাই বলি না হয়। এ দিকটা বেশ ভালোও—এই যে আমরা তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম। প্রথমে সোজা দক্ষিণেই চলে যাই—রামেশ্বর, ধনুষ্কোটী, কাঞ্চীধাম, তাকে নাকি আবার দক্ষিণের কাশীধামই বলে। বেশ আনন্দেই কাটল কটা মাস—যতদিন কাটল ওদিকে—একে একে বলব তোমায়...শুধু এইদিকে আবার কিছুদিন হোল ফিরে এসে যখন লোকটার কাছে শুনলাম...সে কথা থাক এখন।...তোমার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত শোনা হয়নি, তা বলছি। বেশ ফাঁকি দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছ আমায়...'

একটু আবদারের টোনে, কি আঘাতে কোথায় রঘুর মনটা পড়ে আছে, ফিরিয়ে আনবার জন্য, নিজের অপ্রতিভ ভাবটুকুও কাটিয়ে ওঠবার জন্যে।

একটু হাসল রঘু। বলল—'আমার কথা শুনলে এ জ্যোৎস্নাটুকুও নিভে যাবে, মণি।'

ওর পিঠে একটু চাপ দিয়ে সান্ত্বনার স্বরেই বলল—'তবু শুনবে বৈকি, সবটাই যে দুঃখের এমনও নয়। নাও, ওঠো, রাত দশটার মধ্যে ট্যাকসিটাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

।। ত্রিশ ।।

হোটেলে এসে ভালো করে গা হাত ধুয়ে আহারও সেরে নিল দুজনে। রঘু গিয়ে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল, থাকোমণি বিছানা ঠিক করে, ঘরটাও একটু গুছিয়ে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল। বলল—চুলটা আঁচড়ালেও না ভালো করে। দোব আঁচড়ে আমি?'

'তোমার খারাপ লাগে তো দাও।'—একটু হেসে বলল রঘু। 'অমনি ঠাট্টা॥ আমার সব তাতেই ভালো। তবে থাক।'

একটু থেমে গিয়ে বলল—'আমি বলছিলাম, তুমি যেন আজ সমস্ত দিন অন্যমনস্ক, ইস্টিশান থেকে ফেরা অবধি। কোনও দিকে যেন খেয়াল নেই—চুলটা একটু আঁচড়ে নেবে তাও...কেন, এবার তো আমরা বাড়ী যাচ্ছিই কেমন...'

'ঠিক, বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না এখন মণি।'

'সেকি! কেন? কি হোল? এই কাল বললে—'

'যাব বাড়ি, ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবে এখন সোজাসুজি সেখানে গিয়ে উঠলে বিপদ আছে...'

'কি বিপদ আবার! নিজেদের বাড়ি—দুজনেই রয়েছি..'

'তুমি তখন কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলে—দক্ষিণের তীর্থ থেকে ফিরে এসে এখানে কোথায় কার কাছে কি একটা কথা শুনে অবধি'...

'হ্যাঁ, একদিন বিন্ধ্যাচলে কয়েকজন নাগা সাধুর আশ্রম দেখে ফিরছি, গাড়িতে তাদেরই কথা বলছিলাম আমি, দুজন আধবুড়ী গোছের যাত্রীকে—কেমন ছেলে-মানুষের মতন আপনভোলা সাধু সব। তারাও দেখতে যাবে বলে একটু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে করে শুনছে, একটা লোক সামনে বেঞ্চের কোণে বসে ঝিমোচ্ছিল, হঠাৎ একটু যেন চমকে উঠে বললে—'নাগা সন্ন্যাসীর দল বলে না মা-মণি, তা আছে তারা সেখানে এখনও?'

ওরকম করে ধড়মড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করবার জন্যেই একজন বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—'আপনি যাবেন নাকি দেখতে?'

লোকটা বললে—'যেতে হবে বৈকি। হাপিত্তেশ করে রয়েছি, যাব না?'

বুড়ি জিজ্ঞেস করলে—'কিছু দোন-ট্যান ও'রা?'

লোকটা বললে—'নগদ পাঁচ হাজার টাকা—বাগিয়ে জটা চেপে ধরতে পারলেই।'

আমরা তিনজনেই অবাক হয়ে গেছি ওর রকমসকম আর বসবার ঢং দেখে। বুড়ি বললেও—'বুঝলাম না তো আপনার কথা বাবা।'

নিজের মাথার ওপর হাতটা ঘুরিয়ে বললে—বৌকে খুন করে ফেরার হয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে—মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়া। এইসব দলেই তো থাকবে। যেতে হবে বৈকি।'

শুনেই মনটা ছাঁৎ করে উঠেছে—যদিও তেমন আর কারণ কি?—এ ধরনের মিথ্যে ভেকধরা সাধুসন্ন্যাসীর কথা তো কতই শোনা যায় তীর্থ জায়গায়—কিন্তু তারপরেই অন্য বুড়ি, সে চুপ করে শুনছিল তার মুখের কথা শুনে সর্বশরীর হিম হয়ে গেল। সে বললে—'শুনছিলাম যেন কার মুখে—তাদেরই গাঁয়ের এক গেরস্তর ছেলে, গাঁয়ের নামটা তার মনে নেই, তবে আসামীর নামটা তোমারই বললে। দিন দশেক হতে চলল। সেই থেকে আমার যে কী অবস্থা গেছে, তোমায় না দেখা পর্যন্ত!

সন্ধ্যের পরের কথা, গাড়িটা মথুরার আগের ইস্টিশানে পেঁছুতে লোকটা উঠে কোণটাতে বসেছে।'

'তোমার মালীপুরের মা-মাসীমা?'—রঘু প্রশ্ন করল।

ওরা বেঞ্চে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই কোন সকালে বেরুনো গেছে বিন্ধ্যাচল ছেড়ে, হাক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দলের আর সবারও ঐ অবস্থা, কেউ জেগে, কেউ ঘুমিয়ে, তবে তারা আমার কথা তো জানে না, মাসি জেগে থাকলে যে কী হোত। হ্যাঁ গা, এক্ষুণি যদি ট্রের পায় কেউ!...'—ভীত-উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

রঘু বুকের কাছে টেনে নিল। বলল—'কী আর হবে? তখন বললাম না তোমায়? দুজনে একত্র হয়েছি, আর ভয় নেই।' আর একটু বুকে চেপে নিয়ে বলল—'তুমিই তো আমার রক্ষা-কবচ এখন।'

'তবে যে বলছ আবার এখন বাড়ি যাওয়া চলবে না, বিপদ আছে। না বাপু—তোমার কথার যেন আজ কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না, বড় এলোমেলো বলছ।'

অন্যযোগ অভিমানে মাথাটা গুঁজে দিল ওর বুকে।

সত্যই তাল রাখতে পারছে না রঘু আজ। সোজা বাড়িতে গিয়ে ওঠার বিপদের কথাটা বলতেই যাচ্ছিল, থাকো কার মুখে কি কথা শুনেছে জিজ্ঞেস করে যে ফলটা হোল—আবার ওর সেই আতঙ্কের ভাব—তাতে আর বলল না বিপদের কথাটা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে নিল প্রসঙ্গটা, তবু মনের চঞ্চলতার জন্য আবার একটু হয়েই গেল ভুল। আগের সব দিনের কথা ভুলে গিয়ে বলে ফেলল—'বাড়িতে কে কেমন কোথায় আছে একবার খোঁজ নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে। তাই মনে করছি আগে একবার বেচুর সঙ্গে দেখা করব—সে কোলকাতায়...'

'বেচু! —কোন বেচু? —বেচারাম?...'

একটা ঝাঁকানি দিয়ে রঘুর হাতের আগল থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল থাকো। আতঙ্কে চোখ দুটো ঠেলে আসছে, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। রঘু একেবারে হতভম্ব মেরে গেছে। কি করে সে সামলাবে মাথায় আসছে না। একটা চেষ্টা করল, খুব শান্ত কণ্ঠে বলল—'বেচু আর সে বেচু নেই, মণি...'

'বেচু কখনও বদলাতে পারে না—না, তুমি তার কাছে যেতে পারবে না—যাবে তো আগে আমায় শেষ করে যমুনার জলে ভাসিয়ে দিয়ে..'

বলতে বলতেই হাতের আঁজলায় মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে উঠল থাকোমণি।

রঘুও কি করে সামলাবে ভেবে না পেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর এগিয়ে গিয়ে আবার একটু জড়িয়ে ধরেই বলল—'তুমি আমার দিকটা তো শোন নি এখনও মণি। আজ না হয় সেইটেই শোন। এসব কথা কাল হবে যা হয়।'

পাকিস্থান ছাড়ার পর থেকে সবটা বলে গেল, তবে অনেক নরম করে, যাতে কোন রকম আঘাত না পায় থাকোমণি। পাকিস্থানী সেপাইদের হাতে নির্যাতন বাদই দিল—নুটবিহারীর কথা, এমন কি যাদব দাসের এ দিকের কথাও, যদিও বুঝেছে, বিন্ধ্যাচল থেকে ফিরতে থাকোমণির তারই সঙ্গে হয় দেখা। কলকাতায় এসে তো ভালই ছিল, সেই দিকটাতে জোর দিল, রং ফর্সা বেশি। বিশেষ করে তাতে বেচারামের যতখানি ভূমিকা।

শুনতে শুনতেই থাকোমণির মুখের ভাবটা নরম হয়ে এসেছে, বলল—'বেচারামকে সে লোক বলে মনেই হয় না। যা সব শুনতাম আগে!

'তোমার নিজের মানুষটিকেই কি সেই লোক বলে মনে হয়?'—একটু হেসে প্রশ্ন করল রঘু। একদিন বেচারামকেই সে কথা বলেছিল, থাকোকেও বলল সেই কথাটা—'কয়লা হাজার ধুলেও রং বদলায় না, বদলায় কখন জান মণি? পুড়লে!'

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল থাকোমণির, বলল—'আর পোড়ার কথা বলতে হবে না। ...বেশ, তাহলে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করেই যা ঠিক হয় করো।'

(ক্রমশঃ)

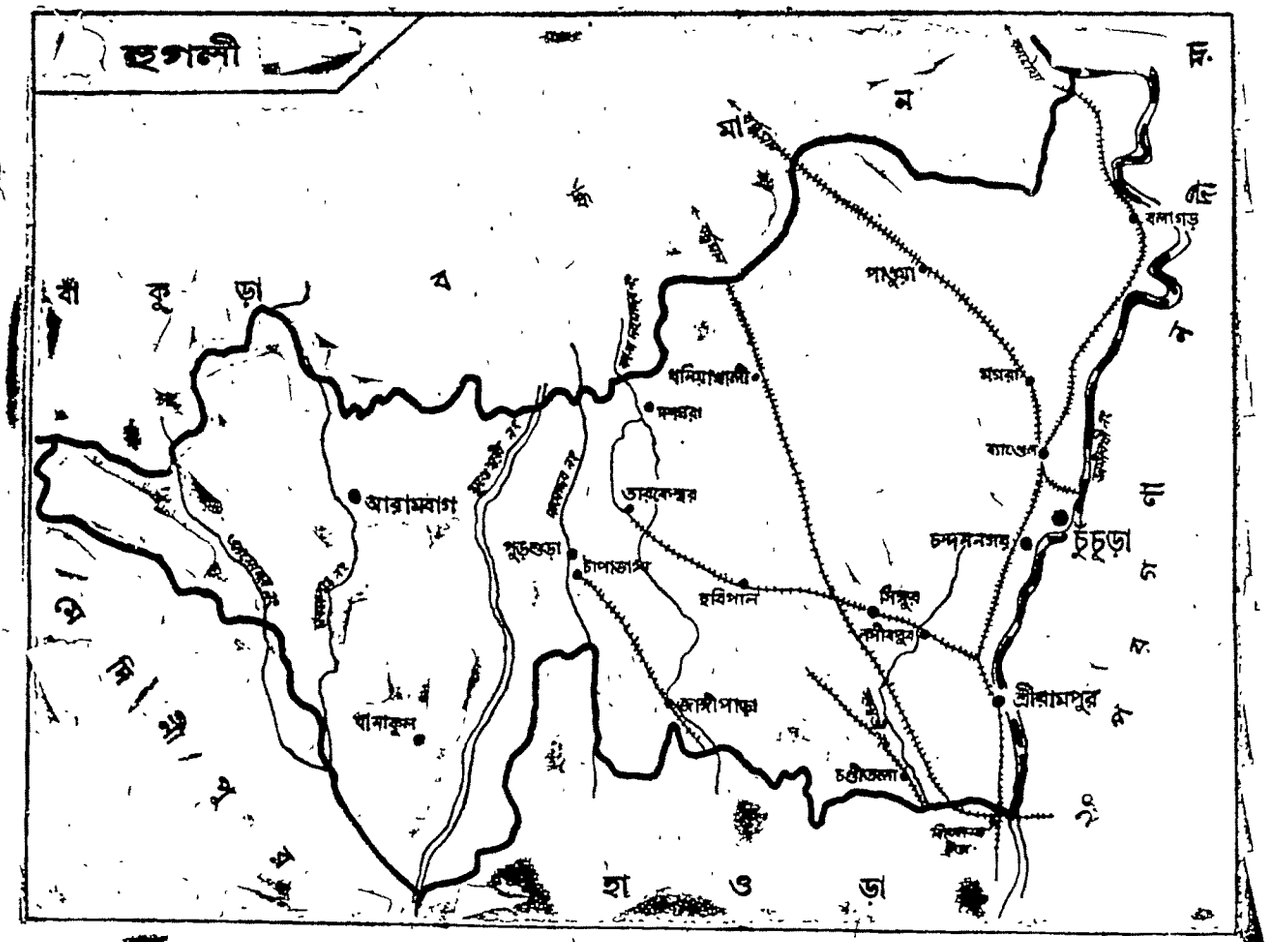

এই আমাদের দেশ

হুগলী :

রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, হাজি মহম্মদ মহসীন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যে জেলার সন্তান সেই রত্নপ্রসূতির অন্য পরিচয় না থাকলেও চলে। কিন্তু অন্য পরিচয়েও হুগলী অনন্য। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি আর ইতিহাসের ভাঙাগড়ার খেলায় হুগলীর অবদান বলে শেষ করা যায় না। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূচনাকাল থেকে হুগলী জঙ্গম, মাহেশের রথ থেকে হিন্দ মোটর্স পর্যন্ত হুগলীর ইতিহাস শুধু চলার ইতিহাস।

ভারত ইতিহাসের প্রথম যুগে সব রাজশক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হত উত্তর-পশ্চিমের গিরিসঙ্কটে, মধ্যযুগের রক্তক্ষরা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে পানিপথের রণক্ষেত্র, আর আধুনিক কালের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে হুগলীর গঙ্গাতীরে। এ প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা যে একদিন পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসি, গ্রীক, জার্মান বণিকের দল এসে ভিড় করেছিল হুগলীর ঘাটে ঘাটে। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে দেশ-বিদেশের পালতোলা জাহাজ এসে নোঙর ফেলত হুগলীর বন্দরে বন্দরে।

আমরা জানি, ইংরেজ শাসনকালে, উনিশ শতকের সূচনায় কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদের উদ্যোগে প্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হয়, বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশের সূচনা হয়। কিন্তু একথাও কি সকলের জানা আছে যে, ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ মিশনারীদের উদ্যোগে প্রথম বাংলাগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার মুদ্রণ শুরু হলেও সেই সূচনা স্থল কোন ইংরেজ-শাসিত অঞ্চল ছিল না? এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার বা এদেশীয় ভাষার উন্নতির ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের প্রথম দিকে বিমুখ থাকায় কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীদের কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়েছিল ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুরে। দিনেমার সরকার সেদিন সদয় না হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবযুগের সূচনা হয়ত অনির্দিষ্টকালের জন্য পেছিয়ে যেত।

প্রথম মুদ্রিত বাংলাগ্রন্থ রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) বা প্রথম বাংলা সাময়িক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) দিনেমার শাসিত হুগলীর শ্রীরামপুর শহর থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের জন্মের পর শ্রীরামপুর ইংরেজ সরকারের শাসনাধীনে আসে।

হুগলীতে বিদেশী শাসনের বিস্তারিত ইতিহাস এই স্বল্প পরিসরের রচনায় লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাই এখানে শুধু তার উল্লেখ মাত্র করা হচ্ছে। সুপ্রাচীন ও তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম বন্দরে প্রথম আসে পর্তুগীজরা, তারপর ব্যাণ্ডেলে তাদের বড় ঘাঁটি হয়। শ্রীরামপুর ছিল দিনেমারদের আর চন্দননগর ফরাসিদের। ওলন্দাজদের কর্তৃত্ব ছিল চুঁচুড়ায় আর ইংরেজরা এসে ঘাঁটি গাড়ে হুগলী শহরে। বিষড়ায় কিছুদিন গ্রীকদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল আর ভদ্রেশ্বরে ছিল জার্মান বণিকদের।

পর্তুগীজরা অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠলে মোগল সম্রাট শাহজাহান তাদের বাংলা থেকে উৎখাত করেন। শুধু কিছু জায়গার নামে, গীর্জায় ও সমাধিক্ষেত্রে পর্তুগীজ স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে। ডেনমার্ক ও বৃটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের শাসনকর্তৃত্ব ইংরেজ সরকারের হাতে অর্পিত হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতে দিনেমার শাসনের অধ্যায়েরও পরিসমাপ্তি ঘটে। চন্দননগর ছিল সমগ্র উত্তর ভারতে ফরাসিদের একমাত্র উপনিবেশ এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসানেরও পর, ১৯৫০ সালে চন্দননগর

স্বাধীন ভারতের অংশ হয়। ওলন্দাজ, গ্রীক, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান বণিকরা অবশ্য মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করার কোন সুযোগ এ দেশে পায় নি।

জেলা গঠনের ইতিহাস

হুগলী জেলার সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, মাহেশ প্রভৃতি স্থান সুপ্রাচীন ও কোন কোন স্থানের নাম প্রায় সহস্রাব্দ কাল পূর্বের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। যেমন লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত 'পবনদূতম' গ্রন্থে সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। কিন্তু হুগলী নামের অর্থ বা উৎপত্তিকালের ইতিহাস কিছুই প্রায় জানা যায় না।

অনুমান করা হয় যে, গঙ্গার ধারে আগে হোগলার বন ছিল, এবং সেই থেকেই হুগলী শব্দের উদ্ভব। হুগলী নামটি পর্তুগীজদের দেওয়া বলে যে অনেকে মনে করেন সেটা ঠিক নয়। কারণ পর্তুগীজরা হুগলী আসার আগে, এমন কি ভাস্কো দ্য গামা ভারতে আসার আগে লেখা বিপ্রদাস পিপলাইর মনসামঙ্গল কাব্যে (১৪৯৫) চাঁদ সদাগরের যাত্রাপথের বর্ণনায় যেসব স্থানের উল্লেখ আছে তার মধ্যে গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম প্রভৃতির সঙ্গে হুগলী নামেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং হুগলী পঞ্চদশশতাব্দীতেই একটি পরিচিত স্থান ছিল। কিন্তু হুগলী পরবর্তীকালের ভারত-বিজয়ী ইংরেজদের প্রথম ঘাঁটি ছিল বলে সামান্য খ্যাত হুগলী ক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বৃহৎ বর্ধমান জেলাকে যখন দ্বিধাবিখণ্ডিত করা হয় তখন স্বাভাবিক কারণেই বর্ধমানের বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ অংশের নাম হয় হুগলী।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে হুগলী একটি জেলার নাম। কিন্তু সে জেলার সঙ্গে আজকের হুগলী জেলার অনেক পার্থক্য। তখন আরামবাগ মহকুমা হুগলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, আবার সমগ্র হাওড়া জেলা ও মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা ছিল হুগলীর অংশ।

১৮৭২ সালে হুগলী জেলা থেকে হাওড়া জেলা ও মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা বিচ্ছিন্ন করা হয়। তখনই হুগলী জেলা সবচেয়ে ছোট হয়ে যায়। সে সময় জেলার মহকুমা ছিল দুটি—হুগলী (সদর) ও শ্রীরামপুর। সদর মহকুমার থানা ছিল—হুগলী, বাঁশবেড়িয়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি; শ্রীরামপুর মহকুমার—দেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, হরিপাল, কৃষ্ণনগর ও চণ্ডীতলা। হাওড়া জেলা গঠিত হওয়ার সময় খানাকুল তার অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ১৮৮১ সালে বর্ধমান থেকে জাহানাবাদ (আরামবাগ) ও গোঘাট থানা এবং হাওড়া থেকে খানাকুল হুগলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ঐ তিন থানা নিয়ে গঠিত হয় 'জাহানাবাদ' মহকুমা। বাঁশবেড়িয়ার বদলে পোলবা হয় নতুন থানা ও বৈদ্যবাটির থানা সিঙ্গুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদ মহকুমার নাম হয় আরামবাগ।

১৯৫০ সালের ২মে চন্দননগরে ফরাসি কর্তৃত্বের অবসান হলে চন্দননগর হুগলী জেলার একটি থানা হয় এবং ১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর নিয়ে গঠিত হয় হুগলীর চতুর্থ মহকুমা চন্দননগর।

১৯৫৪ সালের ২ অক্টোবর থেকে হুগলীর আয়তন ও প্রশাসনিক বিভাগ অপরিবর্তিত আছে। ৪৪৬ বর্গমাইল আয়তনের সদর মহকুমার থানা—চুঁচুড়া, ধনিয়াখালি, পোলবা, মগরা, বলাগড় ও পাণ্ডুয়া; ১৬০ বর্গমাইল আয়তনের শ্রীরামপুর মহকুমার থানা—শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা, জাঙ্গীপাড়া; ৪১৩ বর্গমাইল আয়তনের আরামবাগ মহকুমার থানা—আরামবাগ, পুরশুড়া, গো-ঘাট, খানাকুল; ১৯৩ বর্গমাইল আয়তনের চন্দননগর মহকুমার থানা—চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল তারকেশ্বর ও সিঙ্গুর। জেলার আয়তন ১২১৩ বর্গমাইল।

হুগলী জেলায় মিউনিসিপ্যাল শহর আছে বারোটি, তার মধ্যে চন্দননগর পৌরসভা কর্পোরেশন নামে ও পৌরপ্রধান মেয়র নামে আখ্যায়িত। জেলার গ্রামের সংখ্যা ১৯১৭। গ্রামের অনেকগুলিই সমৃদ্ধ ও জনবহুল এবং সেগুলিকে আধা-শহর বলা যায়।

শহরগুলি হল—সদর মহকুমার হুগলী-চুঁচুড়া ও বাঁশবেড়িয়া; শ্রীরামপুর মহকুমার শ্রীরামপুর, রিষড়া, বৈদ্যবাটি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর ও কোতরং; আরামবাগ মহকুমার আরামবাগ ও চন্দননগর মহকুমার চন্দননগর চাঁপদানি ও ভদ্রেশ্বর। এছাড়া তারকেশ্বর, শিয়াখালা, চণ্ডীতলা, জনাই প্রভৃতি স্থান শহর পদবাচ্য না হলেও কোনো না কোন কারণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐসব স্থানে জনজীবনের তৎপরতা শহরাঞ্চলের মতোই।

হুগলীর বিভিন্ন ইতিহাসখ্যাত জনপদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রসঙ্গে দেওয়া হল।

মগরা থানার অন্তর্গত প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান সপ্তগ্রাম হিন্দু ও মুসলিম শাসনকালে এবং ইংরেজ শাসনের সূচনায় একটি বন্দর হিসাবে খ্যাত ছিল। কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী ও বিপ্রদাস পিপলাইর মঙ্গলকাব্যে, মাধবাচার্যের চণ্ডী ও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত 'পবনদূতম' গ্রন্থে সপ্তগ্রাম পত্তনীর উল্লেখ মেলে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগত শিষ্য উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে জন্মান। সে কারণে সপ্তগ্রাম বৈষ্ণবদেরও তীর্থক্ষেত্র। সপ্তগ্রামের অন্তর্গত কৃষ্ণপুরও বৈষ্ণবদের পুণ্যস্থান। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনকালেও সপ্তগ্রাম বড় বন্দর ছিল। কিন্তু সরস্বতী নদী মজে যাওয়ার সঙ্গে সপ্তগ্রামও তার গৌরব ও গুরুত্ব হারায়।

ত্রিবেণী প্রাচীন হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী প্রয়াগে মিলিত হয়ে এখানে আবার ত্রিমুখী হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। একারণে ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামেও পরিচিত। তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও বন্দর ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র রূপেও ত্রিবেণী খ্যাত ছিল। এখন অবশ্য ত্রিবেণী সামান্য গ্রাম ছাড়া কিছুই নয়। তবে এখানে কয়েকটি দর্শনীয় মন্দির আছে এবং বিভিন্ন পালাপার্বণে বহিরাগতের ভিড়ে ত্রিবেণী লোকারণ্যে পরিণত হয়। সপ্তগ্রামের ত্রয়োদশ শতাব্দীর শাসক জাফর খাঁ এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমানদের পালাপার্বণে ঐ প্রাচীন মসজিদ প্রাঙ্গণে বেশ লোক সমাগম হয়।

তারকেশ্বর প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ। দশনামী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ, ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় ক্ষত্রীয় রাজবংশী ভূস্বামী রাজা বিষ্ণু দাস অযোধ্যার জৌনপুর থেকে এসে তারকেশ্বরের তিন মাইল দূরবর্তী রামনগরে বসতি স্থাপন করেন। তখন ঐসব এলাকা ঘন বনে আচ্ছন্ন ছিল। বিষ্ণু দাস নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর কাছ থেকে দেড় হাজার বিঘা জমি লাভ করেন। শিবভক্ত বিষ্ণু দাসই তারকেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবত শিবলিংগটি আরও প্রাচীন এবং রাজা বিষ্ণু দাস স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তারই উপরে মন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ঐ মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে গেলে বর্ধমানের মহারাজা পুনর্নির্মাণ করেন। মন্দিরটি আটচালা ধাঁচের। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই তারকেশ্বর জনপদ গড়ে উঠেছে। প্রতিদিন নানা স্থান থেকে আগত ভক্তের সমাগমে তারকেশ্বর মুখর থাকে।

মাহেশ এই জেলার আর একটি সুপ্রাচীন স্থান। কাশীরাম দাসের মহাভারতে মাহেশ পল্লীর উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব খড়দহে যাওয়ার পথে একবার এই গ্রামে আসেন। সেই পুণ্যময় স্মৃতি মাহেশকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বর্তমানে মাহেশের খ্যাতি তার সুপ্রাচীন রথ-উৎসবের জন্য। মাহেশের রথের মেলা মনে করলেই মনে পড়ে যায় ফুলের মতো ছোট মেয়ে রাধারাণীর কথা যে ফুলের মালা বিকোতে এসে মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল।

বৈদ্যবাটি আর এক প্রাচীন পল্লী। শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে এই গ্রামে বিশ্রাম নেন, সে কারণে বৈদ্যবাটি বৈষ্ণবদের তীর্থক্ষেত্র। নিমাই তীর্থঘাট আছে এখানে। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে ও চৈতন্যজীবনীতে নিমাই তীর্থঘাটের উল্লেখ আছে।

বংশবাটি মগরা থানার অন্তর্গত প্রাচীন জনপদ। বাঁশবন কেটে বসত তাই চলতি নাম বাঁশবেড়িয়া। এখানকার নয়রত্ন হংসেশ্বরী মন্দির সুপ্রাচীন ও সুন্দর। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। দক্ষিণমুখী মন্দির পাথর ও ইঁটের তৈরি, দেবীমূর্তি কাঠের। মন্দির সংলগ্ন বাসুদেবের মন্দিরটিও দর্শনীয়, সুন্দর টেরাকোটার অলংকরণ। কয়েক বছর আগে এই মন্দিরের বিগ্রহ অপহৃত হয়।

তিনটি গ্রাম-শ্রীপুর, মোহনপুর ও গোপীনাথপুর নিয়ে শ্রীরামপুর গড়ে ওঠে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এখানে রাধাবল্লভ জিউর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামপুর ছিল ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেনমার্কের উপ-

নিবেশ, তারপব বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি অনুসাবে এর শাসন দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের হস্তে ন্যস্ত হয়। বাংলাব শিক্ষা সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে শ্রীরামপুরের অবদান অমেয় ও অবিস্মরণীয়। কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীদেব উদ্যোগে এই স্থান থেকেই প্রথম বাংলা গ্রন্থ মুদ্রিত হয় ও বাংলা পত্রপত্রিকা প্রকাশেব সূচনা হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, কিন্তু তার গ্রন্থাদি সরবরাহ কবা হত শ্রীরামপুর থেকে। দিনেমাব সবকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীবামপুব কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২০ সালে। বর্তমান বাংলার এইটিই প্রাচীনতম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পোলবা আর একটি সুপ্রাচীন জনপদ। পালবংশের আদিপুরুষ নারায়ণ পাল ও তাঁর ভাই জনার্দন পাল ৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। পালবংশের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থানটি পালবাস নামে পরিচিত হয়। পরে পালবাস থেকে পালবা ও তাই থেকে পোলবা।

গুপ্তিপাড়া বলাগড় থানার প্রাচীন জনপদ। বিভিন্ন প্রবাদ ও ছড়ায় নদীযার শান্তিপুর, দিগনগর প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে গুপ্তিপাড়ার নিকট সম্পর্ক বোঝা যায়। ১৭৭০ সালে আঁকা ষ্টাভোনিরাসের মানচিত্রে গুপ্তিপাড়ার উল্লেখ আছে। বৈদ্যপ্রধান গ্রাম, সম্ভবত সেই কারণে গুপ্তিপাড়া নাম। এখানকার বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয়। গ্রামের পূর্বদিকে চারটি মন্দির আছে। মন্দিরগুলি চৈতন্যদেব, বৃন্দাবনচন্দ্র, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির নামে পরিচিত, সব কটি মন্দিরকে একসঙ্গে বৃন্দাবনচন্দ্রের মঠ বলা হয়। গুপ্তিপাড়ার রথের মেলাও প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ফ্রেঞ্চ লং ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা বিভিউ' পত্রিকায় গুপ্তিপাড়ার রথের কথা লেখেন। ঐ মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশের কথা বলা হয় এবং ঐ বছর মেলা যাত্রীদের একটি নৌকা গঙ্গায় ডুবে যাওয়ায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়।

উত্তরপাড়া খুব প্রাচীন না হলেও বর্ধিষ্ণু ও নানা কারণে সুপরিচিত স্থান। উনিশ শতকের সূচনায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রাজা পিয়রীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরপাড়া উন্নত ও সমৃদ্ধ নগরীর মর্যাদা লাভ করে। ১৮২৭ সালে এখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৮৫৯ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার। ঐ গ্রন্থাগার ভবনের দ্বিতলে কবি মাইকেল মধুসূদন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কিছুকাল বাস করেন।

জনাই ও বাকসা এই অঞ্চলের দুটি সুপ্রাচীন পল্লী। চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত বাকসার রঘুনাথ জীউর নবরত্ন মন্দির স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখ যোগ্য নিদর্শন। তাছাড়া আছে দ্বাদশ শিবের মন্দির।

কোন্নগর সুপ্রাচীন স্থান। বিপ্রদাস পিপ্পলাইর মনসামঙ্গল কাব্যে কোন্নগরের উল্লেখ আছে। রাজা দিগম্বর মিত্র, শিবচন্দ্র

হুগলীর ইমামবাড়ি

দেব, ডাঃ কে ডি ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের বাবা) কোন্নগরের বিশিষ্ট সন্তান।

বলাগড় থানার জিরাট আর একটি ঐতিহ্যময় পল্লী। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা আছে এই গ্রামে।

চুঁচুড়া সুপ্রাচীন বন্দর। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনকালে চুঁচুড়া গুরুত্ব লাভ করে এবং সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চুঁচুড়ার সার্বভৌম কর্তৃত্বের কয়েকবার হাত বদল হয়। প্রথমে এটি ছিল পর্তুগীজদের উপনিবেশ, কিন্তু তারা ঐ এলাকায় নানারকম অত্যাচার শুরু করলে সম্রাট শাহজাহান ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের ওখান থেকে বিতাড়িত করেন এবং ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' মোগল সম্রাটের অনুমতি নিয়ে চুঁচুড়ায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে তারা নির্মাণ করে গ্যাল্টডস দুর্গ, যেটি পলাশির যুদ্ধের আগে ক্লাইভের নির্দেশে ইংরেজ সৈন্যরা বিধ্বস্ত করে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা চুঁচুড়া দখল করে কিন্তু দু বছর পরে আবার হল্যান্ডকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর ১৮২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে বৃটেন ও হল্যান্ডের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ লাভ করে সিংহল দ্বীপ ও চুঁচুড়াসহ ভারতের ওলন্দাজ উপনিবেশগুলি ইংরেজ সরকারকে দিয়ে দেয়। চুঁচড়ার আর্মেনিয়ান গীর্জা প্রাচীনতম খৃষ্টীয় ধর্মমন্দির, নির্মাণকাল ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দ। স্থানীয় ষন্ডেশ্বর মন্দিরে যে দুটি পিতলের ঢাক আছে সে দুটি ওলন্দাজ সরকারের দান। ১৮৬৫ সালে হুগলী ও চুঁচুড়াকে নিয়ে একটি পৌরসভা গঠন করা হয়। হাজি মহম্মদ মহসীন প্রদত্ত অর্থে নির্মিত হুগলীর ইমামবাড়া একটি দর্শনীয় স্থাপত্য কীর্তি। ১৮৪১ সাল থেকে '৬১ সাল পর্যন্ত সময়ে ইমামবাড়ার নির্মাণ কাজ শেষ হয়। বিশাল ভবনটির প্রবেশ পথের দুধারে আছে আশি ফুট উঁচু মিনার, ভিতরে মসজিদের দেওয়ালে লিখিত আছে কোরানের বাণী। প্রাঙ্গণে আছে মহম্মদ মহসিনের সমাধি।

ব্যান্ডেল ছিল পর্তুগীজদের উপনিবেশ এবং ব্যান্ডেল নামটিও তাদের দেওয়া। যার অর্থ হল ফুলের বাগান। ব্যান্ডেলে পর্তুগীজরা প্রথম গীর্জা নির্মাণ করে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কিন্তু ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে মুসলিম আক্রমণে সে গীর্জাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। তারপর বর্তমান গীর্জাটি নির্মাণ করেন গোমেজ ডি সোটো ১৬৬০ সালে। কিন্তু ১৫৯৯ সালে নির্মিত প্রথম গীর্জার তাবিথযুক্ত ভিত্তি প্রস্তরটি তাঁর কাছে ছিল বলে তিনি সেটি নবনির্মিত গীর্জার নদীতীরবর্তী পূর্বদিকের ফটকে সংযুক্ত করেন। গীর্জা সংলগ্ন সমাধিগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হল এলিজাবেথ ডি সিলভার সমাধি (১৭৫৬)।

চন্দননগর সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ ও ঐতিহাসিক কারণে খ্যাত। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল ও মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে চন্দননগরের নাম আছে। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ঔরংজেবের কাছে সনদ পেয়ে ফরাসীরা এখানে কুঠি নির্মাণ করে। খলসী, বেড়ো ও গোন্দলপাড়া এই তিন

ব্যাণ্ডেল চার্চ

পল্লী নিয়ে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগর গঠিত হয়। পলাশির যুদ্ধের আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ক্লাইভ চন্দননগর দখল করেন, ইংরেজ-ফরাসির সপ্তবর্ষ যুদ্ধের শেষে চুক্তি অনুসারে ফরাসিরা আবার চন্দননগর ফিরে পায়। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের দিনে চন্দননগরের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ভারতের বহু মুক্তি সংগ্রামী তখন গ্রেপ্তারি এড়াতে চন্দননগরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫০ খৃঃ ২ মে, চন্দননগরের জনগণের ইচ্ছানুসারে ফ্রান্স চন্দননগরের শাসন দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে ন্যস্ত করে।

বাধানগর ও দেবানন্দপুর গ্রাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে জগনায়ক রাজা রামমোহনও অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম স্থান রূপে। বিদ্যাসাগরের জন্মপল্লী বীরসিংহ ঘাটাল মহকুমার হুগলী এবং ১৮৭২ সালে ঘাটাল মহকুমা হুগলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন বাহান্ন বছর।

হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে অবস্থিত হুগলীর আর এক অবিস্মরণীয় গ্রাম কামারপুকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মর্তলীলার সূচনা এই গ্রামে. ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারী এই দরিদ্র পল্লীর এক জীর্ণ কুটিরের ঢেঁকি-শালে ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। আর সে কারণে বেথেলহেমের মতো কামারপুকুর আজ কিংবতীর্থে পরিণত। যে কুটিরে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন তার নানা চিহ্ন আজও বর্তমান আছে. ঠাকুর শৈশবে গৃহ প্রাঙ্গণে যে আম্র বৃক্ষটি রোপন করেন সেটি আজও ফলবতী। ঠাকুরের ঠিক জন্মস্থানের উপর সারা বিশ্বের রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের অকৃপণ দানে নির্মিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মন্দির। সুন্দর মন্দিরের অভ্যন্তরে মর্মর বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে ঠাকুরের ধ্যানমগ্ন মূর্তি।

জেলার মানুষ

সারা ভারতে প্রথম লোকগণনা ১৯৭২ সালে হলেও হুগলী জেলা শাসকের উদ্যোগে ১৮৩৭ সালে এই জেলায় লোক গণনার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। সেই গণনায় জানা যায় তখন হুগলী জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৯ হাজার। কিন্তু ১৮৭২ সালের গণনায় দেখা যায় হুগলীর লোক সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৫৮ হাজার। পঁয়ত্রিশ বছর বাদে জেলার লোকসংখ্যা না বেড়ে চার লক্ষ হ্রাস পাওয়ার কারণ বোঝা কঠিন নয়। ১৮৩৭ সালে সমগ্র হাওড়া জেলা ও মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ১৮৭২ সালে যা ছিল না। তাবপব প্রথম গণনা খুব সঙ্গত কারণেই নির্ভুল ছিল না। আব ১৮৬২ সালে বর্ধমান জ্বর নামে যে দারুণ সংক্রামক ম্যালেরিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই দশক ধরে চলে যার তান্ডব লীলা, তাতে হুগলীর কয়েক লক্ষ লোক মাবা যাব। একাবণে ১৮৮১ সালেব গণনায হুগলীব লোকসংখ্যা আরও কমে হয ১০ লক্ষ ১৩ হাজার। স্বাধীনতাব আগে পর্যন্ত হুগলীব লোকসংখ্যা কোন সময়েই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাযনি। ১৯৪১ সালেও হুগলী জেলার লোকসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার। অর্থাৎ ষাট বছরে হুগলীর লোক বাড়ে মাত্র ৮২ হাজার।

কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রথম গণনায় ১৯৫১ সালে দেখা যায় হুগলী জেলার লোকসংখ্যা হয়েছে ১৬ লক্ষ ৪ হাজার, আরও দশ বছর বাদে, ১৯৬১ সালে ২২ লক্ষ ৩৪ হাজার। আর ১৯৭১ সালে হয়েছে ২৮ লক্ষ ৭৩,৭৭৯। হঠাৎ এইরকম দুর্নিবার গতিতে হুগলী জেলায় লোকবৃদ্ধির কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। উদ্বাস্তু আগমন এর কারণ নয়, কারণ দেখা যায় যে, ১৯৬১ সাল পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৩১ হাজার হুগলীবাসী নিজেদের উদ্বাস্তু বলে পরিচয় দিয়েছেন। '৭১ সালে জেলায় পূর্ববঙ্গের পুনর্বসতি মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়ত দুলক্ষ হয়েছে। আর স্বাধীনতার পব জেলায় শিল্পসমৃদ্ধি অবশ্যই কিছু লোকবৃদ্ধিব কারণ হয়েছে। কিন্তু এতে তিন দশকে জেলার লোকসংখ্যা প্রায় তিন গুন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গত কারণ মেলে না। '৭১ সালের গণনা অনুসারে হুগলীর প্রতি বর্গমাইলে জন-ঘনত্ব ১৮৪১।

হুগলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দীর্ঘ তালিকা ও তাঁদের কৃতি-পবিচয় সংক্ষেপেও এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু কিছু ব্যক্তির উল্লেখ না করলে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথমেই নাম করা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর। তিনি ছিলেন সপ্তগ্রামের ভূস্বামী গোবর্ধন দাসের পুত্র; সংসার ও রাজঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও বৃন্দাবনে অবশিষ্ট জীবন কাটান। তাঁর কাছ থেকেই চৈতন্যদেবের লীলা-কাহিনী শ্রবণ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও সম্ভবত হুগলীর লোক ছিলেন।

হুগলীর প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ (কিংবা '৭২) সালে হুগলীর খানাকুল থানার রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'আধুনিক এশিয়ার প্রথম জাগ্রত পুরুষ' বলে খ্যাত রামমোহন চাকরির জন্য জেলা ত্যাগ করে দীর্ঘকাল রংপুর ও মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত করেন। কিন্তু পরিশেষে জেলাব শ্রীরামপুর ও কলকাতা শহরই হয় তাঁর সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র। ১৮২১ সালে রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'।

রাজা রামমোহনের পর স্বভাবতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়ে। এই মহান সমাজবিপ্লবী ও বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বীরসিংহ গ্রাম হুগলীর অন্তর্গত ছিল, হুগলীবাসীদের পক্ষে এটা ভোলা সম্ভব নয়। কিন্তু না হলেও বিদ্যাসাগরকে মেদিনীপুরের মানুষ বলাই সঙ্গত হবে। কারণ তা না হলে একই কারণে রাজা রাম-মোহনকে বলতে হবে বর্ধমানের লোক। রামমোহন যখন রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন তখন সমগ্র হুগলীই বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গ সাহিত্যের আধুনিক কালের প্রথম বিশিষ্ট কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর সাগরদিয়া গ্রামের লোক ছিলেন। কবির জন্ম ১৮২৭ সালে। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' কবিতা একদিন পরাধীন বাঙালির মনকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কবির বিশেষ দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তা হলেও একথা সত্য যে, রঙ্গলালই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী কবি।

বঙ্গ সাহিত্যের আর এক নবযুগের স্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) হুগলীর পানিশেওলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তবে তাঁর জন্ম কলকাতার নিমতলায়, ১৮১৪ সালে। বাংলায় কথ্যভাষার প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং বাঙ্গলা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক" বলেছেন।

বিদ্যাসাগরের সমকালীন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, লেখক ও সমাজসংস্কারক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। কবি মধুসূদনের সহপাঠী ভূদেব ছিলেন তীব্র জাত্যাভিমানী এবং ইংরেজের অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী। চিন্তাশীল লেখক, সত্যনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী ও দাতারূপে ভূদেব চিরস্মরণীয়।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৩৮ সালে, হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে। বাংলা কাব্যসাহিত্যে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের কবির বিশিষ্ট স্থান সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর স্বদেশী গানগুলিও একদা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। কবি মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় লেখেন—বঙ্গ-কবি-সিংহাসন শূন্য হয় নাই...মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।

বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র একই বর্ষে জন্মগ্রহণ করেন এবং দুজনের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। বঙ্কিম তাঁর চাকুরিজীবনে যখন চুঁচুড়ায় বসবাস করতেন তখন হেম-বঙ্কিমের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়। সেই সময় বয়োজ্যেষ্ঠ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁদের নিত্য যাওয়া আসা ছিল, এবং শোনা যায় যে, বঙ্কিম, ভূদেবের পরামর্শে তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের কয়েকটি শব্দ ও পদের পরিবর্তন করেন।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম শক্তিশালী প্রবন্ধকার অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার নিয়মিত লেখক। সাহিত্য, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর পাণ্ডিত্য ও লিখন পারদর্শিতা। বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখেন—অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্যলেখক অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলা ও হিন্দীতে প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতা, প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মাহেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত হিন্দী বিশ্বকোষ মহাত্মা গান্ধীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৭৬ সালে। বঙ্গ সাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর বিভিন্ন কাহিনীতে হুগলীর নানা পল্লী ও জনপদের উল্লেখ আছে। তাঁর পরিকল্পিত সমাজ হুগলী ও রূঢ়বঙ্গের সমাজ।

সাহিত্যসম্রাজ্ঞী আখ্যায় সম্মানিতা মহিলা লেখিকা অনুরূপা দেবীর জন্ম চুঁচুড়ায়, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। মা, মন্ত্রশক্তি, মহানিশা প্রমুখ উপন্যাসের স্বনামধন্যা লেখিকার কৌলিক পরিচয় তিনি জ্ঞানতাপস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী।

এককালের উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতা ও কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হুগলীর লোক। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীর খানাকুল-কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম হয়। ১৯১৪ সালে মাদ্রাজে কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

এই জেলার আর একজন খ্যাতনামা জাতীয়তাবাদী নেতা কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৪৭ সালে খলিয়ান গ্রামে তাঁর জন্ম হয় এবং অল্পবয়সে তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। কংগ্রেসের সূচনাকাল থেকে তিনি ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পট্টভি সীতারামিয়া তাঁর 'জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেন যে, কালীচরণবাবু আর কয়েক বছর জীবিত থাকলে অবশ্যই কংগ্রেস সভাপতি হতেন। কংগ্রেস যে সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রমাণ দিতে মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ও কংগ্রেসে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করেন।

অশান্ত বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন কালীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ১৮৬১ সালে। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে প্রথমজীবনে খৃষ্টান হন, পরে আবার হিন্দু হয়েছিলেন। একদা করাচী থেকে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতেন, পরে ইংলণ্ডে গিয়ে বেদান্তের ব্যাখ্যা করে অনেক ভাষণ দেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। একদা রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপে শান্তিনিকেতন গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ভূ-পরিচয়

হুগলীর পাললিকভূমি বৈচিত্র্যহীন ও সমতল। উত্তর-পূর্বকোণে গো-ঘাট অঞ্চলের আবহাওয়া শীত গ্রীষ্মে কিছুটা চরম, কিন্তু আর সব স্থান গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের মতো আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ।

গঙ্গা নদী হুগলীর গুরুত্ব ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ হলেও গঙ্গা জেলার অভ্যন্তরে কোথাও প্রবেশ করেনি। জেলার সমগ্র পূর্ব সীমান্ত চিহ্নিত হয়েছে গঙ্গা বরাবর, যার ওপারে আছে উত্তরে নদীয়া ও দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা। গঙ্গা যেখানে হুগলী স্পর্শ করেছে সেইখান থেকে শেষ পর্যন্ত হুগলী নদী নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নদী হল দামোদর। ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ভূত দামোদর বর্ধমানের মধ্যদিয়ে হুগলী জেলায় প্রবেশ করেছে এবং হুগলী জেলায় দামোদরের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। জেলার প্রায় মধ্য দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত দামোদর নদীর পশ্চিমদিকে রয়েছে আরামবাগ মহকুমা ও পূর্বদিকে অপর অংশ।

সরস্বতী একদা ছিল হুগলীর বিশিষ্ট নদী, কিন্তু আজ সে নদী অস্তিত্বহীন। গঙ্গার গতি পরিবর্তনের জন্যই সরস্বতী গতিহীন হয়ে পড়ে। রূপনারায়ণ নদী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। জেলার অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর ও মেদিনীপুর থেকে আগত শিলাই নদী যেখানে মিলিত হয়েছে সেই সঙ্গম থেকে রূপনারায়ণ

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।

অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬ কটন স্ট্রীট কলিকাতা—৭

নদীর সূচনা। দ্বারকেশ্বর বর্ধমান জেলা থেকে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় প্রবেশ করেছে, তারপর আরামবাগ ও গোঘাট থানার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে খানাকুল থানার বন্দর নামক স্থানে মেদিনীপুর থেকে আগত শিলাই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

উল্লিখিত নদীগুলি ছাড়াও জেলায় আছে কানা দামোদর, কানা দ্বারকেশ্বর, মাদারিয়া প্রভৃতি ছোটবড় অনেকগুলি জলধারা। এছাড়া আছে বহু খালবিল। যেমন, দীর্ঘ নয় মাইল ডানকুনি খাল বৈদ্যবাটির নিকটবর্তী গঙ্গা থেকে বালীর নিকটবর্তী গঙ্গা পর্যন্ত প্রবাহিত। ১৮৭৪ সালে ঐ খাল খনন করা হয়। দামোদর নদী থেকেও অনেক খাল কেটে জেলার অভ্যন্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনায় উপকৃত হয়েছে ধনিয়াখালি, পাণ্ডুয়া, পলতা, তারকেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা ও জাঙ্গীপাড়া থানা আর আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দীঘি পুষ্করিণীর সংস্কার করেও হুগলীর সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে।

অবশ্য দামোদরের খাল হুগলীর জীবনে অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। জেলার গড় বৃষ্টিপাত ১৫২০ মিলিমিটার অর্থাৎ ৬০-৬২ ইঞ্চি মতো। কিন্তু একটু বেশি বৃষ্টিপাত হলেই দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও সরস্বতীর বাড়তি জল পশ্চিমে আরামবাগ, পুরশুরা, খানাকুল ১ ও ২নং ব্লক ও পূর্বে পোলবা ও চণ্ডীতলা থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভেসে যায়। এ প্রায় প্রতি বছরের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুগলীর মাটি সুফলা ও বিবাট সম্ভাবনাময়, কিন্তু বন্যা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এই জেলার কৃষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েই থাকবে।

জেলার একদিক যেমন বন্যাক্রান্ত হয়, অন্যদিকে তেমনই অনাবৃষ্টির জন্য প্রতি বছর ফসল নষ্ট হয়। গত বছর খরার জন্য জেলার প্রায় ৬০ হাজার একর জমির বোরো ফসল ও অর্ধেক পাট নষ্ট হয়ে যায়। খরার জন্য হুগলীর বিখ্যাত আলুর চাষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খরাক্রান্ত অঞ্চলে গত বছর প্রায় আট হাজার একর জমির আউশ ধান নষ্ট হয়ে যায়।

জেলার প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ একর জমির ফসলের উপর ২১ লক্ষ কৃষিজীবী মানুষের ভাগ্য নির্ভরশীল অথচ প্রতি বছরই খরায় অথবা প্লাবনে প্রায় ৪০ শতাংশ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। হুগলীর কৃষকরা বুদ্ধিমান, কর্মপটু এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতি তাঁরা নির্দ্বিধায় ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তবু যে তাঁদের প্রতি বছর যে অনিশ্চিত অবস্থায় চাষ করতে হয় এবং একটি বড় অংশকে খরায় ও প্লাবনে বারবার মার খেতে হয়, তার জন্য তাঁরা দায়ী নন। এমন কি তাঁদের অদৃষ্টকে দায়ী করেও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। খরা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নলকূপ বসিয়ে ও প্লাবন-প্রবণ অঞ্চলে বাঁধ বেঁধে ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে এর প্রতিকার করতে হবে।

পঞ্চম যোজনায় হুগলীর ফসলের লক্ষ্য রাখা হয়েছে বছরে দশ লক্ষ টন। সেজন্য তিন লক্ষ একর জমিকে বহু ফসলি করা হবে, সাত হাজার অগভীর নলকূপ ও ১৬৮টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে এবং বাঁধ বেঁধে ত্রিশ হাজার একর জমির ফসল রক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ১৮ কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প উন্নয়নে হুগলীর বিশিষ্ট ভূমিকা। পঞ্চম যোজনার লক্ষ্য পূরণ হলে হুগলী এই রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি পূরণেও বড় ভূমিকা নিতে পারবে।

শিক্ষায় অগ্রগতি

শিক্ষাক্ষেত্রে হুগলী, মিশনারীদের কল্যাণে, অন্যান্য জেলার তুলনায় অনেক এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। শ্রীরামপুর কলেজে শিক্ষাদান শুরু হয় ১৮২০ সালে। হাজি মহম্মদ মহসিনের অর্থে হুগলী মহসিন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৬ সালে। চন্দননগরে ডুপ্লে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। প্রথম ইংরেজি স্কুল খোলা হয় চুঁচুড়ায়, ১৮১৪ সালে, মিশনারী মার্শম্যানের স্ত্রী হ্যানা মার্শম্যানের উদ্যোগে ১৮২৪ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর ও তার চারপাশের পল্লীতে মোট তেরটি বালিকা শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাব অনুসারে হুগলী জেলায় শিক্ষিতের হার ৩৮-৬০ শতাংশ। এ ব্যাপারে হুগলী শুধু কলকাতা ও হাওড়ার চেয়ে পেছিয়ে আছে। হুগলীর ২৮ লক্ষ ৭৪ হাজার লোকের মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ ১০ হাজার লিখনপঠনক্ষম। তার মধ্যে পুরুষ ৭ লক্ষ ২৪ হাজার ও নারী ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার।

শিল্প সমৃদ্ধি

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ শিল্পের শতকরা ৪৩ ভাগ আছে চব্বিশ পরগণায়, ১৫ ভাগ আছে কলকাতায়, প্রায় ১৮ ভাগ হাওড়ায় ও ১১ ভাগ হুগলীতে। বর্ধমানের ভাগ ১১-৩৯ শতাংশ। এই থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র হুগলীর ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

জেলার মোট আয়ের শতকরা ৩৩ ভাগ আসে শিল্প থেকে। মোট ১৭টি বৃহৎ শিল্প এই জেলায় রয়েছে, যার মধ্যে ভারতের প্রথম মোটর কারখানা হিন্দ মোটর্স ও ডানলপের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্প আছে সাত শ ইউনিট।

জেলায় পাটকল আছে তেরোটি। ১৮৫৫ সালে রিষড়ায় প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। পাটকলগুলি আছে রিষড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, চাঁপদানী, গোন্দলপাড়া ও বাঁশবেড়িয়ায়। পাটকলে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার।

বস্ত্রশিল্পে হুগলীর বরাবরই খ্যাতি, এখানকার উন্নতমানের রেশম ও সুতির কাপড় ইউরোপে চালান যেত। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় যখন বিদেশি কাপড় বর্জন শুরু হয় সেই সময়, ১৯০৬ সালে শ্রীরামপুরে গড়ে ওঠে রাজ্যের প্রথম কাপড় কল বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলাই বস্ত্র শিল্পে সবচেয়ে উন্নত। এখানে কাপড় কল আছে ছ'টি, তাছাড়া ত্রিবেণীতে আছে কেশোরাম রেয়ন ও শ্রীরামপুরে আছে রেশম শিল্পের বড় কারখানা শ্রীরাম সিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। এছাড়া সারা জেলায় তাঁত আছে প্রায় দশ হাজার এবং তাঁত সমবায় আছে ত্রিশটি। বস্ত্র বয়ন বিদ্যা শেখানোর জন্য রিষড়ায় উইভিং স্কুল আছে একটি।

হুগলী জেলায় ছোটবড় অনেকগুলি ইস্পাতের কারখানা আছে। তার মধ্যে জেকে ষ্টীল বিশেষ উল্লেখ্য। কাঁচের কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। কোন্নগরে আছে কুসুম বনস্পতির কারখানা, প্লাস্টিকের কারখানা ও হিউম পাইপের কারখানা। রিষড়ায় আছে রাসায়নিক সারের কারখানা।

সাহাগঞ্জে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ডানলপ রবার কোম্পানি। যাবতীয় যানের চাকার টায়ার তৈরি হয় এই কারখানায়। এটি ভারতের অন্যতম বৃহৎ কারখানা। আর ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উত্তরপাড়ায় ভারতের প্রথম মোটর কারখানা হিন্দ মোটর্স।

হুগলীর কারখানার তালিকা দীর্ঘ, তার ইতিহাস আরও দীর্ঘ যা এই নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবু এই জেলায় এখন বেকারের সংখ্যা চল্লিশ হাজার। বর্তমান কারখানাগুলি সম্প্রসারিত করা ও নতুন নতুন কারখানা খোলা ছাড়া এই উদবৃত্ত লোকবলকে উৎপাদনমূলক করা সম্ভব নয়। এই জন্যই এত শিল্প সম্প্রসারণ ঘটা সত্ত্বেও হুগলীকে সম্প্রতি শিল্পে অনুন্নত জেলা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে ছোট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির ব্যাঙ্ক থেকে সহজ হারে সুদ পাওয়া সম্ভব হবে।

হুগলীর হিন্দ মোটর্স, ডানলপ প্রভৃতি বৃহৎ ও সম্ভাবনাময় শিল্পগুলিকে আরও সম্প্রসারিত করার অনুমতি দিলে সমাজবাদের আদর্শ ক্ষুণ্ন হবে কিনা জানি না, কিন্তু এই জেলার বেকার সমস্যা ও ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সঙ্কট সমাধানের আর কোন পথ আছে বলে মনে হয় না। হুগলীকে সমৃদ্ধ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্য, যেমন তার কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত করে একেকগুন উৎপাদন বাড়াতে হবে, তেমনই তার শিল্প সম্ভাবনাকেও সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে।

—[illegible]

দিনকালের হিসেব

একদা যাহার অর্ণবপোত—(২)

ভারতের বহির্বাণিজ্যের কথা লিখতে বসে অনেকদিন আগে পড়া স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজকে'র একাংশের কথা মনে পড়ল। খুঁজে খুঁজে স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে অংশটুকু বের করলাম : 'মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধহয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সুতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে (পরিব্রাজকের রচনাকাল ১৮৯৯) পর্যন্ত, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমি বা কিংখাব ইত্যাদি এদেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান—ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত, একটি ডাঙ্গাপথে আফগানি ইরানী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড-সী হয়ে। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর বোগদাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল—আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্ক্রিয়া।...

এদিকে পোর্তুগিজরা ভারতের নূতন পথ—আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন, পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ...

হে ভারতের শ্রমজীবী! তোমার নীরব অনবরত নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজান্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি?—কে ভাবে এ কথা!'...

সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের অবস্থা :

এই পর্যন্ত পড়ে চিন্তাধারা আমার অন্যপথে গেল—ভাবতে লাগলাম স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের বাহির্বাণিজ্যের ভার ভারতের নিজেরই হাতে রয়েছে। তবে কেন নিয়মিত বাণিজ্য-ঘাটতি আর লেনদেন-ঘাটতি, কেনই বা ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্য আশানুরূপ সম্প্রসারিত হচ্ছে না—ভারতীয় পণ্য অন্য দেশে কেন আদৃত নয়? গত বছর (১৯৭২-৭৩) সালে যে হঠাৎ যে রপ্তানি অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে হিসেব করা হয়েছে, তাকে কি সত্যিই সুদিনের লক্ষণ বলে মনে করা চলে, না সুজন্মার পরেই যেমন এদেশে দেখা যায় অজন্মা, সেইরকম আবার বর্তমান বছর (১৯৭৩-৭৪) থেকেই কি শুরু হবে ভাঁটার টান?

হ্যাঁ, সাম্প্রতিক অতীতে অনেকবারই এইরকম হয়েছে—আমাদের বহির্বাণিজ্যের মোড় ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে আবার এদিকে ফিরছে। ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাধীন সময় থেকে ধরলে লেনদেন-উদ্বৃত্ত মোটা-মুটিভাবে প্রতিকূলই হয়েছে। আর লেনদেন উদ্বৃত্তই যে বহির্বাণিজ্যের ব্যারোমিটার তা ত' সকলেরই জানা।

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪১৬ কোটি টাকা —অনুমিত ঘাটতির চেয়ে ৩৬৬ কোটি টাকা বেশী। চতুর্থ পরিকল্পনাতেও ঘাটতি অব্যাহত থাকবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, তবে বার্ষিক ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে রপ্তানির আশা করে ঐ ঘাটতির পরিমাণ হ্রাসের পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

সম্প্রসারণশীল অর্থ-ব্যবস্থার পক্ষে লেনদেন-ঘাটতি অস্বাভাবিক কিছু নয়,—সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে রপ্তানির চেয়ে বেশী আমদানির প্রয়োজন হয়ই। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, লেনদেন ঘাটতির পরিমাণ দিন দিন কমে আসছে কিনা এবং বিভিন্ন লক্ষণ-বিচারে বহির্বাণিজ্য সুসংগঠিত কিনা।

বহির্বাণিজ্যের লক্ষণ-বিচার :

লক্ষণ-বিচারে দেখা যায় যে বহির্বাণিজ্য মোটেই সুসংগঠিত নয়। প্রথমত, এ পর্যন্ত যা লেনদেন-ঘাটতি হয়েছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল খাদ্য আমদানি। এমনকি চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম দু' বছরেই খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৪৭৪ কোটি টাকা। তারপর দু' বছর খাদ্য আমদানির পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পেলেও এ বছর আবার খাদ্য আমদানির ওপর বিশেষ নির্ভর করতে হচ্ছে। সুতরাং গত বছরের আশাবাদ এ বছর কতটা অব্যাহত থাকবে বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, ভারতকে বর্তমানে কাঁচামাল আমদানি করতে হয়। বলা যায়, এই বৈশিষ্ট্য শিল্পোন্নত দেশের বাহির্বাণিজ্যের অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু জিজ্ঞাসা বিষয় হল যে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণও আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা, এবং কাঁচামাল যোগানের সম্ভাবনা বিচার করে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা? বোধহয় নয়, কারণ দেখা যায় যে এমন অনেক শিল্পই স্থাপন করা হয়েছে যাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্যে আমাদের বহুদিন এবং বহু পরিমাণে আমদানির ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। এমনকি সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ বা নিউজপ্রিন্টের ব্যাপারেও আমরা স্বয়ম্ভরতায় পৌঁছতে সমর্থ হইনি। তৃতীয়ত, মূল্যস্ফীতি অন্যতম বিশ্বজনীন ব্যাধি (এ গ্লোব্যাল পেস্টিলেন্স) হলেও অনেক দেশের চেয়ে ভারতে মূল্যস্ফীতির হার অনেক বেশী—সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে মূল্যস্ফীতি বা ফাঙশানাল প্রাইস রাইজ দিয়ে যতটা সমর্থন করা যায় তার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশী। এই অবস্থায় আভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের মধ্যে অসমতা রপ্তানি বাণিজ্যকে ব্যাহত না করে পারে না। চতুর্থত, ভারতের রপ্তানি পণ্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া হয়নি এবং বলা যায়, অন্যান্য দেশের অন্যান্য প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধেও যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করবার জন্যে যে বহু পরিমাণ যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানি করতে হচ্ছে তা আমাদের অর্থব্যবস্থার কাঠামোগত অসমব্যবস্থারই (স্ট্রাকচারাল ডিসইকুইলিব্রিয়াম) নির্দেশক। কাঁচামালের মত, মোট আমদানির মত এই খাতে আমদানির পরিমাণও দিন দিন হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল। অন্যদিকে অবশ্য সম্প্রসারণের হার অনেক বেশী বলে এই আমদানিকে যুক্তিযুক্ত বলে সমর্থন করা যেত।

অবলম্বিত ব্যবস্থার বিশ্লেষণ :

এখন দেখা যাক, লেনদেন-ঘাটতির বিরুদ্ধে কোন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং তার কি রকম ফলপ্রসূই বা হয়েছে। প্রথমত, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে 'বৈদেশিক অন্ন থেকে মুক্তির' (ফ্রীডম ফম ফরেন ব্রেড) প্রচেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা যে সার্থক হয়নি তা ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন

নেই। দ্বিতীয়ত, তৃতীয় পরিকল্পনার জোরালো ভাষায় ঘোষিত আত্মনির্ভরশীল সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে শিল্প ও রপ্তানি পণ্যের জন্যে কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যও মূলত সফল হয়নি। তৃতীয়ত মূল্যস্ফীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টা যে একরকম ব্যর্থই হয়েছে তা বিতর্কের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে। চতুর্থত, আমদানি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা কতকটা সফল হলেও অর্থ-ব্যবস্থার উল্লিখিত কাঠামোগত অসাম্যাবস্থা যতদিন বর্তমান থাকবে ততদিন মোট আমদানিকে বিশেষ সঙ্কুচিত করা মোটেই সম্ভব নয়, এবং পরিকল্পনার আকারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমদানির প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। যেমন, সমগ্র তৃতীয় পরিকল্পনায় আমদানির পরিমাণ ছিল ৬১৭৫ কোটি টাকার মত, কিন্তু চতুর্থ পরিকল্পনায় আমদানির পরিমাণ ৯৯১০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছে (সংশোধিত হিসেব)। পঞ্চমত, রপ্তানি প্রসারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা—যেমন বিভিন্ন পণ্যের ওপর রপ্তানি-শুল্ক হ্রাস, বিভিন্ন রপ্তানি প্রসার পরিষদ গঠন, রপ্তানি ঝুঁকি বীমার ব্যবস্থা, রপ্তানিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, শিল্প-বাণিজ্য সংক্রান্ত শুভেচ্ছা দল প্রেরণ, রপ্তানি প্রসারের জন্য বিশেষ বিশেষ সংস্থা গঠন, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি —যথেষ্ট ফলদায়ক হয়নি। আরও বলা যায়, সেদিন পর্যন্ত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য কয়েকটি চিরাচরিত পণ্যের (ট্রাডিশানাল একস্‌পোর্টস) ওপর নির্ভরশীল ছিল—এই বাণিজ্যে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য আনয়নের বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়নি।

এইসব কারণের ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রাক্কালে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ছিল ছিল না দেখা যায়। পরিসংখ্যানের সাহায্য নিয়ে বলা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে বিশ্বের মোট রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের অংশ ছিল ১.২ শতাংশ, চতুর্থ পরিকল্পনার সূচনায় ঝড়তিপড়তি বাদ পড়ে তা কমে দাঁড়ায় ১ শতাংশে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় রপ্তানি প্রসার :

এই পটভূমিকায় চতুর্থ পরিকল্পনায় বছরে ৭ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে রপ্তানি প্রসারের আশা করা হয়েছে। পরিকল্পনার শেষ বা বর্তমান বছরে (১৯৭৩-৭৪) ১৯০০ কোটি টাকার রপ্তানি সহ সমগ্র পরিকল্পনাধীন সময়ে ৮৩০০ কোটি টাকার রপ্তানির লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে কৃষিজ, খনিজ ও শিল্পজ-পণ্যের যে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে সেই লক্ষ্য অনুসারে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে, এবং রপ্তানি প্রসারের জন্যে ১৯৬৮ সালে গৃহীত ১১-দফা কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

এই কার্যক্রম কতটা এবং কি পরিমাণ ঐকান্তিকতার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে তা বিতর্কের বিষয় হলেও ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানি প্রসার সত্যিই আশাতীত প্রথমে প্রাথমিকভাবে হিসেব করা হয়েছিল যে ঐ সালে—চতুর্থ পরিকল্পনার চতুর্থ বছরে—রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৮৮০ কোটি টাকার মত, বা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ২৭৪ কোটি টাকা বেশী। দিন পনের পরে বাণিজ্যমন্ত্রী ডকটর দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে ঐ বছরে মোট রপ্তানির পরিমাণ ১৯০০ কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং ফলে ১৯৭২-৭৩ সালের চেয়ে রপ্তানি হয়েছে ৩০০ কোটি টাকার মত বেশী। এবং শেষ বছরে (১৯৭৩-৭৪) ১৯০০ কোটি টাকার রপ্তানিতে পৌঁছোনই হল চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য।

অবশ্য বাণিজ্যমন্ত্রী মহাশয় সতর্ক করে দিয়েছেন যে গত বছরের কৃতিত্বের পুনরাবৃত্তি বর্তমান বছরে নাও ঘটতে পারে; তাই প্রচেষ্টায় যাতে কোনরকম শিথিলতা দেখা না দেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই সতর্কতার প্রসঙ্গেই গত বছরে আশাতীত রপ্তানি প্রসারের কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ

কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মূল্য-স্ফীতি বা প্রাইস ইনফ্লেশানের দরুন প্রত্যেক দেশেরই রপ্তানি বাণিজ্যের আর্থিক মূল্য স্ফীত হয়েছিল—অর্থাৎ সমপরিমাণ বা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যাদি রপ্তানি করেও বিভিন্ন দেশ টাকা-কড়ির অঙ্কে বেশী পরিমাণ রপ্তানি করেছিল দেখা গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন মুদ্রার নিয়ত পরিবর্তনশীল বিনিময় হারও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের অঙ্ককে স্ফীত দেখাতে সাহায্য করেছিল। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হওয়ায় বহির্বাণিজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। বাংলাদেশে রপ্তানির মধ্যে আছে ধান ও সাহায্যস্বরূপ 'অনুদান' খাতে রপ্তানি। এর পরিমাণ কত তা ঠিক এখনও জানা যায় নি। যখন জানা যাবে মাত্র তখনই ১৯৭২-৭৩ সালে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের হার নির্ণয় করা সম্ভব হবে। অবশ্য সমুদ্রজাত পণ্য, কাজু বাদাম ও অন্যান্য ফল, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদির রপ্তানির পরিমাণ, যে বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আভাস :

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চাশা পোষণ করা যায় না। মূল্য-স্ফীতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে বিশ্বের মুদ্রা ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আসবে না, বাংলাদেশকে ঋণ ও সাহায্য দিয়ে যেতে পারব, বা বাংলাদেশের পক্ষে তার প্রয়োজন হবে—এরকম কোন কিছু আমরা ধরে নিচ্ছি না। যদি এসবের দরুন আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে তবে আমরা ঠিক তাকে সম্প্রসারণ বলব না। সম্প্রসারণ বলব তাকেই যখন প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের মত আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ (ভলিউম) সত্যিই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্মরণ রাখতে হবে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময় (বার্টার) ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতএব, সমুদ্রজাত দ্রব্য, চর্মজাত দ্রব্য—ইত্যাদির রপ্তানি প্রসারের মধ্যেই রয়েছে আশার আলো। কাজু বাদামের মত খাদ্য-দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি মোটেই বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। দেশে যখন খাদ্যাভাব—খাদ্য যখন আমদানি করতে হচ্ছে তখন যে কোন প্রকারের খাদ্য রপ্তানির ঔচিত্যের প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের রপ্তানিও বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আশানুরূপ নয়। নতুন নতুন পণ্যের (নেন-ট্রাডিশানাল একসপোর্টস) রপ্তানির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

কয়েকটি দেশে ভারতের তাঁত শিল্পজাত জামার কাপড়ের বেশ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। এ চাহিদা কিন্তু সাময়িক—ফ্যাশান পাল্টালেই চাহিদা কমে যাবে। সুতরাং চাহিদা বজায় রাখবার জন্যে উৎপাদনে নিয়ত বৈচিত্র্য সম্পাদন করে যেতে হবে এবং নতুন নতুন বাজারের সন্ধানে নিয়োজিত থাকতে হবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী মহাশয়ের মতে, পণ্যজাত ও দেশগত ভিত্তিতে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘ-কালীন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিবৃতিবিহীন বিচার করে সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। এটা সম্ভব হলে তবেই আমরা পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে গড়ে শূন্য বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। আমরা বলি : এই ব্যবস্থার পথে চললে ঠিক উক্ত লক্ষ্যে না হলেও লক্ষ্যের কাছাকাছি যে পৌঁছুব তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লিখতে লিখতে আবার অতীত এসে ভর করল। মনে পড়ল সেদিনের কথা যেদিন আমাদের অর্ণবপোত সপ্তসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য সম্ভার পৌঁছে দিত। মনে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি :... 'উর্বরতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মত দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তুলো, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল হীরে মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বছর আগে পর্যন্ত তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত।' ভাবলাম, আর আজ? কি করে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়, কোন কোন পণ্য বিদেশের সামনে ধরা যায়—তাই হল আজকের দিনের চিন্তা। স্বামী বিবেকানন্দের আর একটি উক্তিও মনে পড়ল : 'অতীত আমাদের গৌরবময় সন্দেহ নেই, কিন্তু ভবিষ্যৎ হবে নিশ্চয়ই আরও গৌরবময়।' এই আশাবাদ কি আমাদের বহির্বাণিজ্যকেও অনুপ্রাণিত করবে? জানি না।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এনজিন সারেঙ মেসরুমের বাইরে ছিল। জোরজার করে ছোটবাবুকে মাংস খাওয়ানো হবে বলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছোটবাবুর মুখে রা নেই। এনজিন সারেঙ মেসরুমে ঢুকে বলল, মৈত্র মশায় কেন জোরজার করছেন। আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে। জোরজার করলে এই ভীতু ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে যাবে।

মৈত্র, জাহাজের বড় টিণ্ডাল। মৈত্রকে সারেঙ যথেষ্ট সমীহ করে কথা বলছে এবং মৈত্র ওই জাহাজের একটা প্রধান মানুষ বুঝতে পেরে ছোটবাবু বলল, তাই মৈত্রদা। সময় সব ঠিক করে দেবে।

তবু মৈত্র কেমন গুম হয়ে বসে থাকল। —চল নিচে। ওরা নিচে নেমে গেলে দেখল ডেক-জাহাজি বঙ্কু অনিমেষ ওদের বাংকে বসে রয়েছে। অমিয়, মৈত্র এবং ছোটবাবুর থালা গ্লাস ধুয়ে এনেছে। ও এখনও নামে নি।

মৈত্র ভিতরে ঢুকেই গজগজ করছিল— হয়েছে বেশ, জাহাজে যে কেন আসা। মৈত্র টান মেরে লকার খুলে ফেলল, জামা কাপড় টেনে বের করছে। এ-সব দেখে ওরা ঠিক বুঝল না মৈত্র এখন কি করতে চায়। মৈত্র তারপর একটা টিন বের করে বাংকের নিচে কি খুঁজছে। অমিয় এসে গেলে, ওর হাত থেকে একটা প্লেট টেনে তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছল। অমিয়র সেই টিনটা। ওতে মুড়ি মোয়া নাড়ু আছে। গতকাল ওরা দুটো একটা করে খেয়েছে। অমিয় ঝাউডুলে স্বভাবের ছেলে। সে দুটো একটার বেশি নিজে খায়নি। কিন্তু এখন যেন মৈত্র নিজের টিন থেকে মুড়ি বের করে দিচ্ছে। একবার অমিয়র দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

ছোটবাবুর মনে হল এটা ঠিক হচ্ছে না। অমিয়কে ওর মা সফরে যাচ্ছে ছেলে, কবে ফিরবে ঠিক কি, পূজাপার্বণে ছেলের কথা মনে হবে, ছেলের জন্য বেশ যত্ন করে মোয়া নারকেলের নাড়ু তিলের তক্তি সব কত যত্ন করে করে দিয়েছে। এ-ভাবে শেষ করে দেওয়া ঠিক না। সে বলল, মৈত্রদা আমার কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

—খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন? সারা-দিন খেটে তো চোখ কোথায় গেছে। মুখ চোখতো একেবারে ঈশ্বরের পুত্রের মতো করে রেখেছ। কে যে তোমাকে জাহাজে আসার ছাড়পত্র দিলো!

—সেই তো মৈত্রদা।

অমিয় বলল, খা না। কিছুতো একটা খেতে হবে।

বঙ্কু বলল, আরে জাহাজে বাবা মা কেউ কারো আসে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের বাবা মা। সংকোচের কিছু নেই।

ছোটবাবু বলল, রাখো। খাচ্ছি।

তখন পোর্টহোল দিয়ে জেটির ও-পাশের ক্রেন দেখা যাচ্ছে। কিনারায় লোক ঘরে ফিরে যাচ্ছে। একটা জাহাজ ঢুকছে লকগেট দিয়ে চোঙ মুখে পাইলট দুপাশের মানুষদের দড়িদড়া ঢিলে দেবার অথবা টেনে ধরার নির্দেশ দিচ্ছে। কোথাও না আবার অন্য জাহাজে গিয়ে ধাক্কা খায়। বেশ সুন্দর উজ্জ্বল রোদ সূর্য গগণাব ও-পাশে পাটকলের চিমনি পার হয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় নেমে যাচ্ছে সে কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে খাচ্ছিল। ওকে ঘিরে ওরা চারজন নানারকম গল্প চালিয়ে যাচ্ছে আর ক'দিন জাহাজ আছে, আর ক'দিন এ-ভাবে থেকে এক দিন জাহাজ গিয়ে সমুদ্র পড়বে। সে কিছুই ভাবছে না। একটা কথা সে বলতে চাইছিল কেবল। জ্যাক এতক্ষণে যদি বাবাকে বলে দেয়, যদি বলে দেয়, আমাকে বাবা ঠাট্টা করেছে এবং সে এ-ভাবে এক সময় সেজেগুজে গিয়ে ওপরে দাঁড়াল। দেখল, ডেকের পাশে মাস্তুলের নিচে জাহাজিরা বসে বসে তাস খেলছে। সে কেবল ভাবছিল, কখন সারেঙ ডাকবে, ছেলে তোকে ডাই নংরুমে বাড়িয়ালা ডেকেছে। এবং এ-ভাবেই ক্রমে রাত্রি বাড়ে। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই বলে বেশ নীল আকাশ।

আর অজস্র নক্ষত্র। চারপাশে জাহাজ, জেটির লাল নীল আলো। সেই পরিচিত আবহাওয়া। ঠিক সে যেমন রেলিঙে দাঁড়িয়ে ভদ্রা জাহাজে কত কিছু ভাবত, আজও তেমনি এক সময় ভাবতে গিয়ে দেখল বোট-ডেকের ও-পাশে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে নীল রঙের আলো। উইংসের আলোই সেখানে বেশ একটা মহিমময় স্নিগ্ধ সুষমা সৃষ্টি করেছে। তার কেন জানি নিমেষে সব ভয় কেটে গেল।

এবং এ-সবই কেবল বিকেলে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে যাবার মতো। সে যে কতদিন কোনো মাঠের ঘাসের ওপর ধীরে ধীরে হেঁটে যায় নি। তার ভাবি ইচ্ছা কাল বিকেলে সে চলে যাবে বড় ময়দানে। একা একা হেঁটে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের রেমপার্টে

শর্মা ষ্টোর্স
বেনারসী • সিল্ক • তাঁত
মিল বস্ত্র • গেঞ্জি
হোসিয়ারী
৪৫/৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া

বসে থাকবে। যে ক'দিন জাহাজ এ-বন্দরে আছে, মাঠের ঘাসে বসে থাকবে। একা থাকলে সে নিজের সঙ্গে অজস্র কথা বলতে পারে। তার তখন কোন কষ্ট থাকে না।

জাহাজ বোঝাই প্রায় শেষ। সবই চটের গাঁট। সামনে পেছনে চারটা ফল্কাতেই সমান পাটের গাঁট আছে। ওপরে রয়েছে কিছু চায়ের পেটি। এবং জাহাজ ছাড়ার আগের দিন এল বড় বড় খাঁচায় সব সারস পাখি। পাখিগুলো ডেকের ওপরই রাখা হল। পাখিদের আসায় জাহাজটা মোটামুটি বোঝাই শেষ। ক্রেনগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চব্বিশ ঘণ্টায় ফ্ল্যাগ উড়ছে। সকালে জ্যাক পাখিদের খাবার দিচ্ছে। জ্যাক বেশ একটা ভাল কাজ পেয়ে চুপচাপ। সে আর কারো দিকে তাকাচ্ছে না। ছোটবাবু বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। সে আর কখনও কাছে যায় না। জ্যাক পোর্ট-সাইড ধরে হাঁটলে, ছোটবাবু যায় স্টারবোর্ড সাইড ধরে। মুখোমুখি হতে ছোটবাবু ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

সারেঙকে ছোটবাবু সব খুলে বলেছিল। সারেঙ জবাবে বলেছে, খুব বেঁচে গেছ। ওর নালিশ দেবার স্বভাব না। সে কখনও বাপকে লাগায় না। এমন অতিষ্ঠ করে তুলবে, তুমিই শেষপর্যন্ত বাড়িয়ালার কাছে ছুটবে। যতটা পার এড়িয়ে যাবে।

সে খুবই এড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও জ্যাকের মুখ ভারি সুন্দর, জ্যাককে কখনই খারাপ লাগার কথা না, অথচ ছোটবাবু আর তাকায় না। বরং ছোটবাবু দেখল জাহাজ লকগেট দিয়ে নামার সময় বড় মিস্ত্রি, মেজ মিস্ত্রি দুবাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। মেজ-মিস্ত্রি বাইনেকুলারে কিছু দেখছে।

ছোটবাবু জানে, বাইনেকুলারটা মেজ-মালোমের। তিনি এখন কাজে ব্যস্ত। জাহাজ নদীতে না নামা পর্যন্ত তিনি অবসর পাবেন না। সে জাহাজে উঠেই মেজ-মালোমকে দেখেছে মাঝে মাঝেই তিনি বসে থাকেন বোট-ডেকে। চোখে থাকে বাইনেকুলার। অনেক দূরের কিছু দেখার আশা। খুব কাছে বড় বড় হয়ে দেখা দিলে বুঝি সব কিছুর মানে অন্যরকম তার কাছে।

জাহাজের ওয়াচ আরম্ভ হয়ে গেছে। ছোটবাবুকে কোন ওয়াচে রাখা হয়নি। এটা সারেঙ নিজেই ঠিক করেছে। ওয়াচ ভাগের দায়িত্ব তার। জাহাজে দুজন কোলবয় ফালতু। ওদের পাঁচ নম্বর অথবা চার নম্বর মিস্ত্রির সঙ্গে হেলপার হিসাবে কাজ করার কথা। ছোটবাবুকে ফালতু রাখা হয়েছে সেজন্য।

যেহেতু জাহাজ যাচ্ছে কলম্বোতে বোর্ডে লেখা হয়েছে কথাটা, তারপর জাহাজ যাবে লরেঞ্জোমরকুইস এবং পরে ডারবান কেপ-টাউন হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টিসে। তারপর বুয়েনস-এয়ার্স। এই পর্যন্ত বোর্ডে লেখা রয়েছে। তারপর জাহাজ কোথায় যাবে, কেউ জানে না। এমনকি কাপ্তান পর্যন্ত বলতে পারবে না। আর ব্যাঙ্ক লাইনের সফর বড় বেশি লম্বা সফর। কবে জাহাজ ফিরবে হোমে কেউ জানে না। আদৌ ফিরবে কিনা, কারণ সমুদ্রের মায়ায় ভীষণভাবে মানুষেরা পড়ে যায়। তখন বুঝি পৃথিবীতে মাটি গাছপালা পাখি বলে কিছু আছে মনে থাকে না।

এবং এভাবেই সংসারে এক ভীষণ ইচ্ছা কখনও কখনও মানুষকে ভীষণ পাগল করে দেয়। কাপ্তানের পায়চারি দেখলে সেটা টের পাওয়া যায়। তিনি অন্যমনস্কভাবে হেঁটে যাচ্ছেন কেবল। তিনি কেবল জানেন, জাহাজের দুর্বলতম স্থান কোনটা। একটার পর একটা মেরামত করা হচ্ছে। আবার অন্য জায়গায় ফুটোফাটা হয়ে যায়। বালকেডে নানারকম হিজিবিজি লোহার পাত লাগানো। কোনোটা সরে গেলে অথবা কোনকারণে ফুটোফাটা হয়ে গেলে কি হবে তিনি জানেন। এসব জানেন বলেই ব্যালেস্টের ওপর খুব নজর। একটা নয়, দুটো ব্যালেস্ট রেখেছেন। এবং এ জাহাজেই আছে একমাত্র উত্তরাধিকার তার। তিনি তাকে নিয়ে উঠেছেন। তার যে ভারি সখ ছিল —অন্তত একটা ছেলে। ছেলে না হলে এমন যে একটা পৃথিবী আছে, যার তিনভাগ জল, একভাগ স্থল, সমুদ্রে বের না হলে যা টের পাওয়া যায় না। এবং সমুদ্রের এক ভারি আশ্চর্য টান আছে। এই সমুদ্রে তিনি জাহাজ নিয়ে এই যে প্রায় বারতীয় দেশ এবং সমুদ্রের দ্বীপ গাছপালা, ঝড় টাইফুন, তিমি মাছ, ডলফিনের ঝাঁক অথবা সিন্ধুঘোটক দেখে বেড়িয়েছেন, তাঁর মতো সেই উত্তরাধিকারও পুরুষানুক্রমে যাঁর ধারা টেনে নিয়ে যাবে এবং এভাবেই তিনি ভেবে থাকেন। মেয়েটাকে ছেলে বানিয়ে রাখেন। ছেলেটাকে সঙ্গে নেন। আসলে ওসব বলতে হয় চিফকে।—দ্যাখো বাবা দ্যাখো নদী দ্যাখো। এর নাম কলকাতা বন্দর, হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর। তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এ বন্দরে প্রথম জাহাজ নিয়ে এসেছিল। তুমি এসব দেখে রাখো।

বাবা বাপের পাশে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সব দেখছে। সে স্থির। গরমকাল। সে গগলস পরেছে চোখে। যখন দূরবীন পরছে না, তখন গগলস পরে থাকছে। এটা গ্রীষ্মের বিকেল, এবং সারা দিনের প্রচণ্ড টেরাপ জাহাজ ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বোট ডেক কাঠের ডেক জাহাজীরা জল মারছে এখন। জাহাজ বেশ দুপাশে বয়া রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এনজিনে খুব একটা স্টিমের দরকার হচ্ছে না। দুটো বাংকারে দুজন কোলবয় একটু ফাঁক পেয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এবং একটা গর্ত সাইড-বাংকার থেকে সোজা স্টোক-হোলডে নেমে গেছে, তার দুপাশে দুটা সাইড-বাংকার, অথবা সুট বলা যেতে পারে। কয়লা হুড়হুড় করে নেমে গেলে আবার সুট ভরে ফেলতে হচ্ছে। ক্রস-বাংকার খোলা আছে। ওর কয়লা ছাদ পর্যন্ত বোঝাই। দরজা খুলে বেলচা মেরে দিলেই হুড়হুড় করে নেমে আসে। তিনজন ফায়ারম্যান উইনড্রস-হোলের নিচে দাঁড়িয়ে স্টিম দেখছে। খুব একটা স্টিম লাগছে না। একশো আশি হলেই হয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়লা খাচ্ছে। এখনও স্টোক-হোলড তেমন গরম হচ্ছে না। বালকেডগুলো হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে। আসলে কাজ আরম্ভ এখনও ঠিকমতো হয়নি। মৈত্রের ওয়াচ। সে মাঝে মাঝে হেঁটে যাচ্ছে। ওর মাথায় নীল রঙের টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে পুরোনো বুট জুতো, সে মাঝে মাঝে ফার্নেস-ডোর খুলে দেখছে, কোনটায় কয়লা মেরে দিতে হবে, কোনটায় র‍্যাগ মেরে ছাই ফেলে দিতে হবে, অথবা কোনটাতে স্লাইস মেরে কয়লার চাঙ ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। সে নিজেই দেখে যায়। কখনও এযার বালব ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে এনজিন-রুম থেকে গ্রীজার ছুটে আসে। মেজ-মিস্ত্রি ছুটে আসেন। কম, কম স্টিম মাংতা। আসলে জাহাজটা যাচ্ছে ভীষণ ধীরে ধীরে। কলকাতা বন্দরকে ভারি অবিশ্বাস সকলের।

তখন ছোটবাবু দেখল বেশ নিবিবিলি একজন মানুষ বোট-ডেকে ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মানুষটা সবসময় চুপচাপ থাকে। একেবারে হৈচৈ-প্রিয় নয় মানুষটা। পাশে মেস-রুম-বয় কফি রেখে গেছে। একটা ছোট টিপয়ে দুটো বই। বইয়ের ওপর আপেল একটা। ছোটবাবুও তখন স্নান সেরে ডেক ধরে উঠে যাচ্ছে। অমিয় এবং মৈত্রের ওয়াচ আছে। ওরা চারটার ওয়াচ শেষ করে উঠে এসেছে। ওদের স্নান সারতে সময় লাগবে। এসময় বাথরুমে ভীষণ ভিড়। সে একটু পায়চারি করবে বলে ডেক ধরে উঠে যাচ্ছে। আসলে ওর ফোকসালে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কত কথা মনে হচ্ছে। এখনও সে এ-দেশের গাছপালা, বাড়িঘর, কলের চিমনি এবং জেলেডিঙ্গি অথবা জাহাজ ঢুকছে খাড়িতে এসব দেখতে পাচ্ছে। এখনও সে দেখতে পাচ্ছে দুপাশে কি সুন্দর নারকেল গাছ, মানুষের ছায়া। ঘুরে ফিরে মা, ছোট ভাইবোন, বাবার মুখ চোখ নদীর জলে ভেসে উঠছে।

মেজ-মালোমের পাশ কাটিয়ে সে নেমে যাচ্ছিল। আসলে সে চুরি করে মেজ-মালোমের দূরবীনটা দেখতে চাইছে। ওর ভারি সখ দূরবীন চোখে দিয়ে দুপাশের গাছপালা পাখি দেখে। কিন্তু সে তো সবচেয়ে ছোট কাজ করে। সে যদিও জাহাজিদের ভিতর সবচেয়ে পড়াশোনাজানা আদমি, এটা জাহাজে সবেতেই

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ভূমিকা
সম্বলিত গবেষণা গ্রন্থ
ডঃ অপর্ণা মৈত্র প্রণীত
ত্রয়ী বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
প্রাপ্তিস্থান :—
দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট । কলিকাতা-১২

ভারতের মহান ঐতিহ্যকে
আধুনিক সজ্জায় রূপায়িত করুন
শিঙ্গার কুমকুম লাগান
শিঙ্গার কুমকুম - ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক
শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম তৈরী করে···সোনালী ও রুপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যাব···যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে···আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও গ্লসী ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।
প্যারামাউণ্ট প্রডাক্টস্
বোম্বাই-৪০০ ০০৪
শিঙ্গার
everest/596/SP-bn

প্রচার করে দিয়েছে, সবাই খতটত লেখাবার জন্য আসবে সেটাও ঠিক, এবং সুন্দর ইংরেজি বলতে পাবে বলে ফাইভারও বেশ পছন্দ করে ওকে কাজের সময়। চার নম্বর মিস্ত্রি দেখেছে; ছেলেটিকে কোন কাজ একবার বললেই বুঝে নেয়। বার বার প্রশ্ন করে বিরক্ত করে না। সেই মানুষটা এখন মেজ-মালোমের একটু দূরে দাঁড়িয়ে আকাশ নদী এবং নক্ষত্রেরা কখন উঠবে সে আশায় বুঝি বোট-ডেকে জেগে থাকবে। সে জানে না দূরবীনে চুরি করে মানুষের ছায়া দেখার স্বভাব মেজ-মালোমের।

মেজ-মালোমের মনে হচ্ছিল, এই যে ছেলেটি যাচ্ছে জাহাজে, যার চোখ ভারি আশ্চর্য মিষ্টি, মুখে গোঁফের রেখা, গালে দাড়ি মাত্র কালো হয়ে উঠেছে এবং প্রায় যেন লম্বা গাছের মতো, কেমন নুয়ে নুয়ে চলার স্বভাব, কোন গির্জার বয়স্ক ফাদারের মতো শান্ত নিরীহ, কিছু বলতে চায় না, জাহাজে উঠেই চুপ মেরে গেছে তাকে একবার ডেকে বলতে হয়, তুমি বাবু জাহাজে উঠেই মে মেরে গেলে কেন? তারপরই মেজ-মালোম ডাকল, হেই।

সে কাছে গিয়ে খুব সুন্দর এবং স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, আমাকে ডাকছেন স্যার।

—হুঁ।

সে ছুটে গিয়ে আরও সামনে দাঁড়াল।

—এসব জায়গায় কি নাম?

—ফলতা হবে। তবে আমি স্যার ঠিক বলতে পারব না।

—তোমার দেশ, তুমি জান না।

—এখানে তো কখনও আসিনি স্যার।

—কিছু নেই!

—ছোটবাবু বলল, না স্যার, গাছপালা বাড়িঘর গ্রাম মাঠ সব আছে।

—না কিছু নেই।

—না স্যার, সব আছে।

—কিছু নেই। তুমি দ্যাখো, কিছু দেখা যায় কিনা, বলেই তিনি কফি খেতে থাকলেন।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখতে পেল, বেশ সব বড় বড় গলের চিমনি, কি যে বড়, আকাশে উঠে গেছে যেন একটা নারকেল গাছ, তারপর একটা বাঁধানো ঘাট, মানুষজন নেই, একটা শ্মশান, চিতায় আগুন টাগুন আছে। সে দেখছে আর বলে যাচ্ছে, সব আছে স্যার। মানুষের যা দরকার সব আছে স্যার।

—আসল জিনিসটা নেই। তিনি আপেল খাচ্ছেন কামড়ে। তার গালে সামান্য দাড়ি মুখে প্রবীণতার ছাপ। চোখ দুটো খুব তাজা। বেশ খচমচ করে খেয়ে যাচ্ছেন। ভালো করে দ্যাখো। আমার দেখতে দেখতে চোখ ধরে গেছে।

ছোটবাবু দেখছিল সব। সে বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কেমন ছায়াছবির মতো সব সরে যাচ্ছে।

মেজ-মালোম বললেন, সব বললে হে, কিন্তু একটা কথা বললে না।

—কি স্যার?

—ওম্যান! ওম্যানের কথা বললে না।

—তা স্যার দেখলাম নাতো।

—তাহলে তুমি বলছ মানুষের জন্য যা যা দরকার সব আছে।

—না স্যার ঠিক বলিনি। ছোটবাবু কি যে ফ্যাসাদে পড়ে গেল। সে মুখ খুব কাঁচুমাচু করে রেখেছে।

—মানুষের জন্য যা যা দরকার সব আছে। শুধু আসল জিনিসটাই নেই জাহাজে। বুঝবে ঠ্যালা। সমুদ্রযাত্রা কাকে বলে বুঝবে। বলেই সে থু করে আপেলের বোঁটটা মুখ থেকে ফেলে দিল। —এজন্য বসে থাকি। বসে থাকি আর ভাবি, বেশ দিনকাল কেটে গেল। জীবনের সবটাই জাহাজে কেটে গেল। আসল জিনিসটাই মাঝে মাঝে কেমন জীবন থেকে হারিয়ে যায়। খুঁজি, খুঁজে যখন পাই, তখন বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দেয়।

ছোটবাবুর ভারি মজা লাগছিল। বেশ মানুষটি। সে পরে আছে সাদা প্যান্ট। গা খালি। গায়ের রং শংখের মতো সাদা অথবা মানুষের চামড়া তুলে নিলে যে রং হয়—তেমনি, সাদা-লালে এক আশ্চর্য কঠিন রং এবং গরমে পুড়ে কেমন ফোসকা পড়ার মতো। পিঠের ওপরে ঠিক কাঁধের নিচে ঘা। কিছু মলম-টলম মাখানো।

এটা হয়। যারা শীতের দেশের মানুষ, তাদের এই গরমে রোদে ঘোরাঘুরি করলে ফোসকা পড়ে যায়। মানুষটার কোন কষ্ট হচ্ছে বোঝাই যায় না। বেশ শুনে যাচ্ছে। তারপর? —জাহাজ যাচ্ছে। জল কেটে জাহাজ যাচ্ছে। আর বাতাস কেটে ছায়া-ছবির মতো সব পার হয়ে যখন ছোটবাবু দেখল সূর্য অস্ত যাবার মুখে তখন মজ ওঠে বললে, নাসিব খারাপ। সে দুটো একটা যে বাংলা জানে ছোটবাবুকে এমন বলে জানাতে চাইল। —নো ওম্যান। ঠোঁট উল্টে সিঁড়ি ভেঙে নিচে তড়তড় করে নেমে গেল। যেন চোখের ওপর থেকে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা।

সে একা দাঁড়িয়ে থাকল। উইংসে ডেকের মাস্তুলে ডেরিকে, কেবিনে কেবিনে সব আলো জ্বলছে, লাল নীল রঙের আলো। ছোটখাটো একটা যেন শহর নিয়ে ছোটবাবু নদী ধরে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। এনজিনের একটানা শব্দ উঠে আসছিল। সমস্ত আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের ছবি। সে এখানে দাঁড়িয়ে শৈশবে যেসব নক্ষত্রের নামটাম মুখস্থ করে রেখেছিল সে সব মনে করার চেষ্টা করল। কবে একবার একটা বিদেশী ছবিতে কোন ধর্মীয় সঙ্গীতের সময় সে শুনেছিল এক আশ্চর্য সিমফনি। নির্জনতা একাকীত্ব সে সিমফনির সুরে সুরে ভরা। ওর মনে হল, এইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে মনে হল, সে ভীষণ একা। ভীষণ সে অসহায়। সে কোথায় যাচ্ছে জানে না, কোথায় এর শেষ জানে না, কবে ঘরে ফিরবে জানে না। এমন নিরুদ্দেশে যাত্রা মানুষের হয় তার জানা নেই। কে যেন বলেছিল এ-বংশের একজন না একজন নিরুদ্দেশে যাত্রা করে থাকে। তারা কেউ আজ ফিরে আসে না। তুমি তোমার জেনারেশনে সেই মানুষ ছোটবাবু। তুমি বোধহয় ফিরে আসছ না।

মনে হল তখন কেউ পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে দেখল, মৈত্রদা। —কিরে মন খারাপ! দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিস বলে মন খারাপ। মৈত্রদা না এলে সে সত্যি ভীষণ যেন এখন ভয় পেয়ে যেত।

ছোটবাবু ঘুরে দাঁড়াল।

—ভোর এমন হবার কথা নাতো। মন খারাপ হবে আমাদের। বিয়ে করেছি। বৌ থাকল ঘরে। আমি ভেসে গেলাম সমুদ্রে। কিছু একটা হলেও কিছু করার থাকবে না। ছুটে আসতে পারব না। কত সব চিন্তা। ভাবলে ঘুম আসে না।— আর একা একা থাকবি না। জাহাজে একা একা থাকা খুব খারাপ। গল্পটল্প করে সব ভুলে থাকবি।

—এখানে আমি আছি কে বলল তোমাকে!

—আমরা জানি কে কোথায় থাকতে পারে। বড়ো হাসল। তুমি যে বোট-ডেকে থাকবে আমরা জানতাম। তোমার খুব যে ইচ্ছা কাস্তানের ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক সেটা আমরা বুঝি!

—না মৈত্রদা। সত্যি তা না। এখান থেকে চারশাশটা স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে মানুষজন কম থাকে, এখানে মেজ-মালোম দূরবীন চোখে বসেছিলেন। আমার ভারি সখ ছিল দূরবীনে পড়ের গাছপালা দেখি।

(ক্রমশঃ)

পড়েছেন কি?

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা কাহিনী—

পেসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্মিণী হয় কজন ৪.১০

তরুণ কবি "চক্ষুশূলের"— আজ আমি বেকার ১.২০

পরিবেশক—দে বুক কোম্পানি-১৯ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তকম-শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। অভ্রজিত মুখার্জি-২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

মনের খবর

পূর্বে উল্লিখিত পঞ্চম প্রশ্নের বিষয় ছিল—অনেক জটিল বিষয়ের বা সমস্যার সমাধান, মীমাংসা স্বপ্নে পাওয়া কি করে সম্ভব হতে পারে। একথা ঠিক যে কোনও কোনো সময় যে বিষয়ের মীমাংসা অনেক চিন্তা করে, ভেবে পাওয়া যায় না, তার সমাধানের পথ স্বপ্নে পাওয়া যায়। এমন উদাহরণ খুব প্রচুর না হলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। লেখক বা চিত্রশিল্পীর কথা শুনেছি তাঁরা লেখার প্লট বা কাহিনীর অংশ বিশেষ অথবা ছবির বিশেষ অংশ বা রং ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের স্বপ্নে দেখতে পেয়ে কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি নাটকের প্লটও স্বপ্ন থেকে নেওয়া হয়েছে। আরও অনেকের সম্বন্ধে এ রকম শুনেছি। কলেজে পড়বার সময় একটি অংক একদিন কিছুতেই ঠিক হচ্ছিল না, বারে বারেই ভুল হচ্ছিল। অনেকবার চেষ্টা করে যখন হল না তখন আর হবে না বলে ক্লান্ত হয়ে চেষ্টা করা সেদিনের মত ছেড়ে দিই। পরের দিন দেখি মনে স্বস্তি পাচ্ছি না। আবার সেই অংকটাই নিয়ে বসলাম। সেদিনও মেলাতে না পেরে কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল। বহুবার পর পর চেষ্টা করতে করতে সেদিনও ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দিলাম। অপরের সাহায্য না নিয়ে যেমন করে হোক অংকটা ঠিক মত করবই মনে মনে এই জেদ তখন পেয়ে বসেছে। সব চেষ্টা সেদিনও বিফল হল। সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম—আমি সেই অংকটাই করছি আর বেশ সহজেই সেটা মিলে গেল। স্বপ্নের মধ্যে নিজেরই অবাক লাগছিল—এমন সহজ অংকটা কেন এতবার করেও ঠিকমত করতে পারছিলাম না। ভুলটা কোথায় কোথায় হচ্ছিল তাও যেন বেশ বুঝতে পারলাম। বেশ স্বস্তি বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখনই উঠে বসে অংকটা আবার করতে লেগে গেলাম। অতি সহজেই এবার মিলেও গেল। স্বপ্নে যেমন দেখেছিলাম সেই রকমেই অংকটা মিলে গেল। তখন খুব অবাক হয়েছিলাম। পরে আমার শিক্ষক মহাশয়কে ঘটনাটা বলেছিলাম। তিনি অংকটা দেখে ওটাকে ঠিক পদ্ধতিতেই করেই মিলেছে বলেছিলেন একথা মনে আছে কিন্তু কেন দুদিন চেষ্টা করে না-পেরে শেষে স্বপ্নে দেখা উপায়ে করতে গিয়ে তা মিলে গেল সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। ঘটনাটা আমার আজও মনে আছে—কিন্তু সেই অংকটা।—এখন আর মনে নেই। তারপর প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে। তবু ঘটনাটা মনে আজও ছাপ রেখে গেছে। এখন প্রশ্ন হল এটা বা এরকম ঘটনা কি করে সম্ভব হয়। এর একটা সম্ভাব্য উত্তর দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমরা যখন কোনও বিষয় চিন্তা করি তখন আমাদের মন সে-বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি দিক মাত্র বিবেচনার মধ্যে আনে। আরও বহু দিক বাদ পড়ে যায়। যার ফলে অনেক সময় আমরা বিচার-বিবেচনায় যে সিদ্ধান্তে আসি, বাস্তব ক্ষেত্রে তা মেলে না। অর্থাৎ যা করলে যেমন হবে মনে করি, ফলত তা ঠিক হয় না। তার কারণ আমাদের বিচারে বিষয়টির সঙ্গে যে অন্যান্য নানা বিষয় কম-বেশী যুক্ত থাকে, সেগুলির উপযুক্ত মূল্যায়ন হয় না অথবা কিছু কিছু যুক্ত বিষয় বিচারে বাদ পড়ে যায়, যার ফলে হিসেবে শেষ পর্যন্ত গরমিল হয়ে যায়। তা ছাড়া আর একটি স্বভাবের দিকে নজর দেবার দরকার আছে। সেটি হচ্ছে যে বিষয়টির সম্বন্ধে বিচার করতে বসেছি সেটির সম্বন্ধে আমার মনে চাওয়া না-চাওয়ার বিশেষ কতকগুলি ইচ্ছা জড়িত থাকে। তার ফলে বস্তুগত বিচারের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তাগিদটাও যুক্ত হয়ে গিয়ে বিষয়টির বস্তুগত নৈর্ব্যক্তিক তালগোল পাকিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে এমন একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, যে অবস্থায় মন ঠিক মত বিচার করতে পারে না। অধিকাংশ বিচারেই তাই, আমাদের বিশেষ ঝোঁকের ফলে, কিছুটা একদেশদর্শিতার দোষ দেখা দেয়। এইজন্যই কোনো কোনো সময় হাজার চেষ্টা করেও সুফল পাওয়া যায় না। নিজের ঝোঁকে চলে মন বিপাকে পড়ে। আর বারে বারে একই বিষয় ভুল হতে থাকলে তখন মন একদিকে যেমন ক্লান্ত হতে থাকে অপর দিকে একই পথে বারে বারে চলার ফলে অন্য দিকগুলির সম্বন্ধে যেন একটা আচ্ছন্ন মনোভাব, বিভ্রম ইত্যাদির সৃষ্টি হতে থাকে। এই তালগোলে পড়ে মন যেন থেই হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় মনের এই ঝোঁকটা দূর করবার জন্য বেশ কিছুকাল বিশ্রাম দিয়ে আবার সেই কাজটা করতে গেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। মন যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ছোটখাট ঘটনা, দেখা-শোনা, করার থেকে অস্পষ্টভাবে আমাদের অজান্তে বহু তথ্য সংগ্রহ করে সে কথা আগে বলেছি। যেমন আমরা যখন কোনও একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি—তখন সেই জিনিসটা আমাদের মনের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গে তার চারদিকের আরও অনেক বস্তু বা অবস্থার প্রতিও আমাদের নজর চলে যায়। অনেক সময় এই রকমের গৌণ বিষয়গুলি আমাদের মনে থাকে না—কিন্তু প্রয়োজনের সময়, আমাদের সঞ্চিত এই সব অভিজ্ঞতা নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে। এইসব সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে আমরা তেমন সজাগ থাকি না। তাই যখন সেগুলির প্রভাবে কোনও কাজ আমরা করি তখন কেন তা করলাম তার কারণ খুঁজে পাই না। যতক্ষণ আমি সচেষ্ট হয়ে একই ঝোঁকে অংকটা করে চলেছিলাম তখন আমার অন্য কোনও দিকে আবশ্যক নজর দেওয়া হয়নি। যার ফলে অংকটার শুধু ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একবার ভুল করতে শুরু করলে যতক্ষণ মনের ঝোঁক না বদলাবে ততক্ষণ ভুল হতেই থাকে। সাধারণ গুণ অংকে তিন-দু-গুণে ছয় না লিখে পাঁচ লেখার মত ভুল দেখতে পাওয়া যায়। মনে মনে তিন-দু-গুণে ছয় বলে লেখবার সময় পাঁচ লিখতে থাকে। এই ভুলের কারণ নিজের নির্জ্ঞান মনেই খুঁজে পাওয়া যায়। আমার বারে বারে অংক ভুল করার অন্তরালেও নির্জ্ঞান মনের কোনও ইচ্ছা কাজ করেছিল। এই ইচ্ছাই সজ্ঞান মনকে অন্তত আংশিক আচ্ছন্ন করে রাখে বলেই আমাদের সজ্ঞান মন চোখ থাকতেও দেখতে পায় না, কান থাকতেও শুনতে পায় না। জানা নামতায় ভুল করে বসে ইত্যাদি নানা বিভ্রাট ঘটাতে থাকে। আবার নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাকে দমন করবার জন্যেও অহং যে শক্তি প্রয়োগ করে অবদমন করতে চায় তার ফলেও ঐ অবদমিত ইচ্ছার সঙ্গে কোনও প্রকারে যুক্ত অনেক ইচ্ছা, মনের ক্ষমতা ইত্যাদি অর্ধদমিত বা অবদমিত হতে পারে, এমন কি নানা রকমের বিকৃতিও দেখা দিতে পারে। সে আলোচনা মানসিক রোগ বিষয় বলবার সময় করা যাবে। এখন এইটুকুই বলা থাক। যা বলছিলাম সেই কথায় ফিরে আসি। মনের যে অবস্থার কথা বলা হয় সেই অবস্থার অবসান ঘুমের সময় হতে পারে। যে দ্বন্দ্ব জাগ্রত জীবনে চলতে থাকে, ঘুমের সময় অহং খানিকটা নিষ্ক্রিয় হলে পরে দ্বন্দ্ব কমে যায়। তার ফলে যে বাঁধনে জাগরণে বাঁধা পড়ে মন একই পাকে পাক খেয়ে ঘুরছিল তার থেকে মুক্তি পেতে পারে। তখন নির্জ্ঞান মনের নিহিত ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনেক তথ্য সহজেই স্বপ্নে ধরা দিতে পারে। এই জন্যই, অর্থাৎ বাধা কমে যাওয়ায় মন তখন সীমিত গণ্ডির বাইরে গিয়ে আরও পথের সন্ধান পেতে পারে। স্বপ্নে যখন তা দেখা দেয় তখন মন, দ্বন্দ্ব বিরতির ফলে, স্বস্তি বোধ করে, আর এই নতুন পথের নির্দেশ কোনো কোনো সময় বাস্তবের সার্থকতার ইঙ্গিত দিতে পারে। সব সময়ই যে মন স্বপ্নে যা দেখায় তাই ঠিক হয় তা কিন্তু নয়। আরও জটিল আলোচনা বাদ দিয়ে এইটুকু বুঝতে পারলে স্বপ্নে কেমন করে সমস্যার সমাধানের উপায় পাওয়া যেতে পারে তা বুঝতে পারা যাবে। যে কতকগুলি ঐ রকম স্বপ্ন সময় মত বিশ্লেষণের জন্য পেয়েছি তার মধ্যে কয়েকজন স্বপ্ন বিশ্লেষণের জন্য যে অবাধ ভাবানুষঙ্গ দেবার প্রয়োজন হয় তা দিতে পারেন নি বলে তাঁদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা সম্ভব

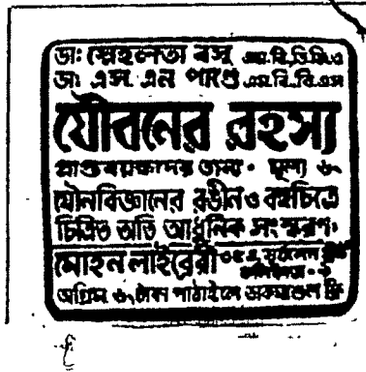

হয়নি। যে স্বপ্নগুলি বিশ্লেষণ করা গেছে তা থেকে যা জানতে পারা গেছে সেই কথাই সংক্ষেপে বললাম। এ সম্বন্ধে অন্য মনঃসমীক্ষকদেরও কিছু কিছু আলোচনা আছে। তাদেরও মূল বক্তব্য প্রায় এই রকমই। সে সম্বন্ধে তাই বিস্তারিত আলোচনা করে লাভ নেই। একথা আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বাইরের উদ্দীপক যতক্ষণ নির্জ্ঞানের বা অসংজ্ঞানের কোনও ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করতে না পারে, ততক্ষণ স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ আমাদের সংজ্ঞান মনের সীমা পার হয়ে অসংজ্ঞান বা নির্জ্ঞান মনের কোনও ইচ্ছার কিছু প্রকাশ না থাকলে স্বপ্ন হতে পারে না। যা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব সমস্যার সমাধানের সূত্র বলে মনে করা হয় স্বপ্নে দেখা সেই সমস্যা, তার সমাধানের সূত্র প্রভৃতির সঙ্গে নির্জ্ঞানের আরও অনেক ইচ্ছার অংশ ও তাদের নিয়ে অহমের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির বহু তথ্য জড়িত থাকে। প্রয়োজন বোধ না করায় সে-সব বিষয় জানবার বুঝবার দিকে আমাদের তাগিদ থাকে না। কিন্তু স্বপ্নের প্রকৃত পূর্ণতর অর্থ বুঝতে হলে তাদের বাদ দেওয়া চলে না। ঐ জাতীয় স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে স্বপ্নদ্রষ্টার বিশেষ কোনও বিষয়ের মীমাংসা বা গল্প উপন্যাসাদি অথবা চিত্রাদির বিষয়ে কোনও অংশে কেন বাধা সৃষ্টি হয়েছিল তারও মূল কারণ জানা যায়।

এই প্রসঙ্গে অনেক সময় আলাপ করতে করতে নাম ভুলে যাওয়া, ঘটনার অংশ ভুলে যাওয়া বা কোনো জিনিস কোথাও রেখে খুঁজে না পাওয়া, জরুরী কাজ করতে ভুলে যাওয়া ইত্যাদি নানা রকমের সাময়িক ভুলের কথা উল্লেখ করা যায়। এই জাতীয় ভুল যখন হয় তখন বিশেষ কোনও কারণে মনের সেই ভুলে যাওয়া দিকটা যেন অহম পরদা দিয়ে ঢেকে দেয়। যে বাধার জন্য এই আবরণ রচনা করে সেই কারণটা মিটে গেলে অথবা সেই সম্বন্ধে স্বপ্নটা মিটে গেলে তখন আবার ভুলে যাওয়া নাম, কাজ ইত্যাদি মনে পড়ে যায়।

এই সঙ্গে একথাও বলা দরকার যে সকলের স্মৃতিশক্তি সমান থাকে না। এমন লোককে জানি যিনি দুই তিনবার পড়েই পুরো গীতা মুখস্থ করে নিতে পেরেছেন। একবার পড়ে রবীন্দ্রনাথের মাঝারি রকমের বড় কবিতা নির্ভুল আবৃত্তি করে যেতে পারেন। আবার ঠিক এর বিপরীত রকমের লোক অনেক আছেন যাঁরা চেষ্টা করলেও সহজে কিছু মুখস্থ করতে পারেন না। অনেক রকমের এই স্মৃতিশক্তি ও তাদের স্বভাব দেখতে পাওয়া যায়। ছোট বেলায় এ সম্বন্ধে একটা সূত্রের মত শুনেছিলাম—সেটা মনে পড়ে গেল। শিক্ষা সম্বন্ধে এটার প্রয়োগ হতো বলে মনে হচ্ছে। স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে কথাটা খাটে। স্মৃতিশক্তির চারটি শ্রেণী ভাগ করতে যেন বলা হতো—বেগ বেগা, চির বেগা, বেগ চিরা, আর চির চিরা। অর্থ হল বেগে (তাড়াতাড়ি) শিখে আবার তাড়াতাড়ি যারা ভুলে যায় তারা হল বেগ বেগা। যারা অনেক চেষ্টায় অনেক সময় নিয়ে শিখে বা মুখস্থ করে তাড়াতাড়ি ভুলে যায় তাদের বলা হয় চির বেগা। যারা আবার তাড়াতাড়ি শিখে নিয়ে অনেকদিন ধরে মনে রাখতে পারে তাদের বলা হয় বেগ চিরা। আর যারা অনেক চেষ্টায় অনেক সময় নিয়ে শিখে বা কিছু মুখস্থ করে তা অনেককাল মনে রাখতে পারে তাদের বলা হয় চির-চিরা। চলতি কথার এই শ্রেণী ভাগ খুব কার্যকরী —নিশ্চয় অর্থবোধক ও সত্যজ্ঞানবহ। আমাদের চলতি কথায় এমন বহু জ্ঞানের বিষয় সহজ কথায় ব্যক্ত হয়ে থাকে! আমাদের বহু প্রবাদ বাক্যগুলিকে একটু লক্ষ্য করে দেখলে তার মধ্যে কেমন সহজ কথায় সত্য পরিবেশিত হয়েছে তা বোঝা যাবে। সে-কথার আলোচনা এখানে আর নয়।

যেকথা বলা হল তা থেকে দেখা যাবে যে আমাদের স্মৃতি সম্বন্ধে মনের আচরণ সকলের সমান হয় না।—তার মানে অবশ্য এ নয় যে বেগ-বেগা শ্রেণীর লোক চেষ্টা করতে থাকলেও কোনও বিষয় শিখে দীর্ঘদিন কখনই মনে রাখতে পারবে না। তেমনি অন্য তিন শ্রেণী সম্বন্ধেও তাদের সাধারণ রকমের পরিবর্তন কখনই হবে না—এমন বলা যায় না।

আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসা যাক। চেষ্টা করে যা করতে পারি না, বুঝতে পারি না, কেমন করে স্বপ্নে তা বুঝতে জানতে পারা যায়—তা সংক্ষেপে বলেছি। মনের কোনো বাধা আমাদের অজ্ঞাতে থেকে এই সমস্যার সৃষ্টি করে। জাগর অবস্থায়ও এক একটা যে কোঁক সময় সময় পেয়ে বসে তারও কারণ আছে। হঠাৎ কিছু একটা ঘটে যায় না। আমাদের নির্জ্ঞান মনে যে সব ইচ্ছা সর্বদা বাইরে এসে পূর্ণতার জন্য চেষ্টা করতে থাকে তাদের সঙ্গে অহমের হামেশা বিরোধ বাধে। তা ছাড়া আমার যে চেষ্টার সঙ্গে একসময় অহম বিশেষ করে যুক্ত হয়ে গিয়ে কাজটা করার চেয়ে আমি কাজটা করি বড় হয়ে ওঠে—অর্থাৎ কাজটার চেয়ে আমির অহংকারটাই যখন বড় হয়ে উঠতে থাকে তখন বাস্তবের অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হতে পারে না। অহংকারের অন্ধতায় তখন বাস্তব অবস্থাটা ঠিকমত বুঝতে পারার ক্ষমতা আমাদের কমে যায়। অহংকার বেশী উগ্র হয়ে বাস্তব জ্ঞান যে কেমন বিকৃত হতে পারে সে সম্বন্ধে মানসিক রোগ আলোচনার সময় বলা যাবে। ঝোঁকে পড়ে পথ গুলোনর কারণ এইখানেই থাকে। ঝোঁক চাপে বিরোধের ফলে, আর সেই বিরোধের সময় ব্যক্তির অহংকার যদি গর্জে উঠতে থাকে তবে স্বাভাবিক বুদ্ধি চাপা পড়ে গিয়ে অহংকারের জবরদস্তি প্রবল হয়ে আপন দাপাদাপি সুরু করে দেয়। তখন আর বুদ্ধি যুক্ত চিন্তার সম্ভব হয় না। যে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে মন বিচার করতে পারে অহংকারের দামালির সময় সেই পূর্ব-অভিজ্ঞতার লব্ধ জ্ঞান আড়াল পড়ে থাকে। তাই বিচারে ভুল ত হতে থাকে। প্রবল প্রক্ষোভ (ইমোশান) ও প্রবল আবেগ (ইম্পাল্স) অনেক সময় সুস্থ বিচারের ক্ষমতাকে আবৃত করে দিয়ে আমাদের নানা বিপাকে ফেলতে পারে। সময়মত কোনও বিষয়ের মীমাংসার পথ খুঁজে না পাওয়ার মূলে প্রক্ষোভ বা আবেগের প্রভাব কম থাকে না। একই কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে থাকলে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন অতি সাধারণ কাজ করতে বা অতি সহজ বিষয় চিন্তা করতেও ভুল হয়ে যেতে দেখা যায়। এক সময় সমস্যার মীমাংসার সূত্র খুঁজে না পাওয়ার নানা কারণগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা হল, কেমন করে পরে একসময় যা স্বপ্নে সে মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়—তাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে।

বাকি প্রশ্নের উত্তর পরের বারে দিতে চেষ্টা করব।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

প্রকাশিত হল

বর্ষপঞ্জী ১৩৮০

(২৭শ বর্ষ চলছে)

বাংলা ভাষায় ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট ইয়ার-বুক (তথ্যগ্রন্থ)

বর্ষপঞ্জী বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। যে-সকল প্রগতিশীল নরনারী 'নতুন জরুরী' ও চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চান বর্ষপঞ্জী তাদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান সংখ্যার বহু নতুন বিভাগের মধ্যে 'অলিম্পিক ক্রীড়া', 'বাংলাদেশের নতুন সংবিধান' ও 'পাকিস্তান' উল্লেখযোগ্য। বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ, মূল্য ৯ টাকা ৫০ পঃ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক : এস আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫।৪, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা—৬ । ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

প্রদর্শনী পরিক্রমা

এন, কৃষ্ণ রেড্ডির ছাপের ছবি

যে সামান্য কয়জন ভারতীয় চিত্রকর, ভাস্কর ও ছাপের-ছবি নির্মাতা তাঁদের কাজ দিয়ে বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন শ্রীএন. কৃষ্ণরেড্ডী তাঁদের অন্যতম। এঁদের মধ্যেও আবার কৃষ্ণ রেড্ডীর খ্যাতি কথঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তাঁর সম্মান অন্যান্যদের তুলনায় দৃঢ় ভিত্তিক। এমনটা কেন সেটা অনুসন্ধান করে দেখা যাক।

বিদেশে, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার ভারতবর্ষ, ভারতবাসী এবং তার সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি সত্য-লালিত ধারণা আছে। ঐ ধারণার ভারতীয় সংস্কৃতি ইহজাগতিক বিষয় নির্লিপ্ত এবং পরমার্থ-চিন্তা-সর্বস্ব। এবং যেহেতু ভারতীয় জীবন পরমার্থ ও অধ্যাত্মচিন্তা সম্বল করে জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত, সেহেতু ইহজাগতিক জীবনের তাবৎ দ্বন্দ্ব-জনিত দুঃখ, দুর্দশা, দৈন্য, ক্লেশ ঘৃণা অনীহা, তাকে সুখ সন্ধানে তাড়িয়ে বেড়ায় না চঞ্চল সচল করেনা। ফলতঃ ভারতীয় মানসিকতা স্থিতি, স্থিতিস্থাপক, প্রশান্ত; এক শাশ্বত অধ্যাত্মবিশ্বাসের ঐতিহ্য ভারতীয় মানুষের ধ্যান-ধারণা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই শাশ্বত অধ্যাত্মময়তা ভারতীয় মানুষকে দ্বন্দ্ব এবং গতির অনির্দেশ্যতা থেকে চিরকাল রক্ষা করে এসেছে। প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা 'শ্রেষ্ঠ ভারতীয়' তাঁর পরম প্রজ্ঞা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব-সম্ভবের কর্মকে নির্বুদ্ধির প্রকাশ বলে জেনে বিশুদ্ধ মননে সব দ্বন্দ্বের সমাধান করে পরম যোগী হয়েছে। তাই এত জাগতিক দ্বন্দ্বজনিত দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ সত্ত্বেও ভারতীয় জীবন এত শান্ত সমাহিত ধীর অচঞ্চল। সৎ-ব্রাহ্মণ ভারতীয় রক্তাক্ত বিপ্লবের পক্ষ নেয়না অহিংসা মন্ত্র জপে দারিদ্রকে নারায়ণত্ব দিয়ে শান্ত রাখে। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে হাল আমলের মার্কিন ভারততত্ত্ববিদ মরিস ডেভিড মরিস পর্যন্ত সব পশ্চিমী ভারতবিদ্‌ই এবম্বিধ ধারণার সরিক এবং ধারক। কার্জন মাক্স-মুলার, কারমাইকেল, রোনাল্ডসে, আর্চার দামিয়েল্‌-র মতন পুরাতাত্ত্বিক, প্রাচীন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ববিদ, সাম্রাজ্য-শাসক শিল্পবোদ্ধারা এই 'ভারতীয়'কে গুণ বলে প্রচার করে সব ভারতীয়কে নিষ্কর্মা ধ্যানী এবং পরমার্থ-যোগী হয়ে থাকবার উপদেশ দিয়েছেন। ঐতিহ্যচর্চার রাস্তা বাৎলেছেন। আর অন্যদিকে মাক্স হেবরের, ভেরা অ্যান্স্টে মরিস ডেভিড মরিস-এর মতন আর্থিক-অকল্পা বিশ্লেষক, সমাজতাত্ত্বিক এবং আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌রা এই 'ভারতীয়তাকে ভারতীয়দের দুর্মোচনীয় আদিম পাপ বলে মনে করেছেন। এই দু'দল পাশ্চাত্য ভারতবিদ্‌দেরই কিন্তু উদ্দেশ্য (সচেতন, অবচেতন, অচেতন উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন) এক; তাহল এটা প্রমাণ করা যে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন এবং তজ্জনিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক এ্যাম্বুয়ি ভারতের দুর্দশার জন্য দায়ী নয়, দায়ী ঐ 'ভারতীয়তা'। এবং ভারতীয়কে 'ভারতীয়' হয়ে থাকতে হলে ধ্যানযোগে ঐ 'ভারতীয়তা'র চর্চা করে যেতেই হবে। ভারতীয় যদি অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক প্রগতির জন্য শিল্পায়ন এবং নাগরীকীকরণের রাস্তা গ্রহণ করে তবে সে তো ব্যর্থ হবেই, উপরন্তু দ্বন্দ্ব, বিভেদ, দৈন্য সচেতন হয়ে নিজের অধ্যাত্মিক সম্রাহিতির শেষ ভেকে আনবে। অতএব হে ভারতীয় তুমি ইহজাগতিক বিষয় সচেতন হইও না তুমি বৈরাগ্য সাধন করিয়া মুক্তি চর্চা করিয়া যাও।

পাশ্চাত্য শিল্পকলাবোদ্ধারা ভারতীয় শিল্প ও শিল্পীদের কাছে এ দাবী পেশ করার ব্যাপারে কথঞ্চিৎ বেশী সরব। ফলে সেই সব ভারতীয় শিল্পকলা ও শিল্পী পাশ্চাত্যে কদর লাভ করেন, যে শিল্পে বা শিল্পীর কর্মে অনড়-অচল লৌকিক জীবনের ছায়া শোভন সুন্দর আলঙ্কারিক পোশাকে উপস্থাপিত বা যে সব শিল্পে ইহজাগতিক জীবনের দ্বন্দ্ব, গতি, দুঃখ দৈন্য দুর্দশা ইত্যাদির বদলে তথাকথিত অধ্যাত্মিক সমাহিতি দৃশ্যমান। পাশ্চাত্য শিল্পবোদ্ধা এবং শিল্প সংগ্রাহকদের কাছে আধুনিক ভারতীয় জীবন-সম্পর্ক-রহিত সেই সব শিল্পবস্তুই শিল্পবস্তু হিসাবে আদরণীয়। বলা বাহুল্য বিশুদ্ধ শিল্পভাবনা চালিত হয়ে এ-জাতীয় ভারতীয় শিল্পকে যুগপৎ 'ভারতীয়' এবং 'সৎ শিল্প' বলে এই পশ্চিমী বোদ্ধারা ঘোষণা করেন না। কিন্তু বিদেশী বাজার এবং সাহেব বোদ্ধাদের বাহবা পাবার জন্য বহু ভারতীয় শিল্পী এই চোরাবালিতে পা বাড়ান এবং অভিজ্ঞতা অনধিত 'লৌকিক' রীতি বা 'অধ্যাত্মবাদী' শিল্পচর্চায় মগ্ন হন, অভিজ্ঞাত জীবন অনাদরে পড়ে থাকে। বিদেশে খ্যাতিমান অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পীই পশ্চিমী ধারণার 'ভারতীয়তা'কে অবলম্বন করেই খ্যাতিলাভ করেছেন। অবিনাশ চন্দ্র, নটবর ভাবসার, মোহন সামন্ত প্রায় সবাই। ব্যতিক্রম বোধ হয় ফ্রান্সিস নিউটন সুজা এবং কৃষ্ণ রেড্ডি।

এন কৃষ্ণ রেড্ডি (জন্ম ১৯২৫) বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে তাঁর প্রাথমিক শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত করে লণ্ডনের স্লেড স্কুলে যান উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে। শান্তিনিকেতন এবং লণ্ডন দু জায়গাতেই তিনি ভাস্কর্যে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি অসিপ জাদকিন এবং মারিনো মারিনির কাছ থেকেও ভাস্কর্যের তালিম নেন। কিন্তু যে মাধ্যম তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছে তা ভাস্কর্য নয়, তা ছাপের ছবি এবং বিশেষ করে রঙিন এচিং। ১৯৫৩ সালে তিনি পারীর বিখ্যাত আতেলিয়ে ১৭-তে যান স্ট্যানলী উইলিয়ম হেটারের কাছে ছাপের ছবির কাজ শেখার জন্য। আজ তিনি সেখানেই হেটারের সঙ্গে আতেলিয়ের সহযোগী পরিচালক।

কৃষ্ণ রেড্ডি নিঃসন্দেহে একজন উঁচু ধরনের গ্রাফিক শিল্পী। হেটারের ভাষায় একজন 'মেজর আর্টিস্ট'। কিন্তু কারিগরী কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে যদি তিনি একজন মেজর উদ্ভাবক না হতেন এবং রঙিন এচিং-এর ক্ষেত্রে একজন সর্বজনমান্য গুরু না হতেন তবে পশ্চিম তাকে এই 'মেজর আর্টিস্ট'-এর স্বীকৃতি দিত কিনা সন্দেহ। কারণ কৃষ্ণ রেড্ডি শিল্প, পশ্চিমের ধ্যানের 'ভারতীয়' শিল্প নয়। কেউ অবশ্য বলতে পারেন, যে উদ্ভাবনার জন্য কৃষ্ণ রেড্ডিকে মেজর উদ্ভাবকের আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সে উদ্ভাবনা তিন জনের যৌথ উদ্ভাবনা এবং সেই উদ্ভাবনায় কায়কোবাদ মোতিওয়ালার ভূমিকা কৃষ্ণ রেড্ডির তুলনায় অনেক তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা হওয়া সত্ত্বেও কায়কোমোতির খ্যাতি রেড্ডির তুলনায় অনেক কম; তাতে কি এই প্রমাণ হয় না যে, শিল্পক্ষেত্রে কারিগরী কলা কৌশলের উদ্ভাবনার জন্য কেউ সম্মান লাভ করে না, করে শিল্পগুণের

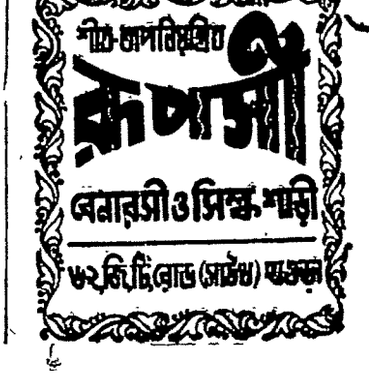

জন্মাই ? এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে একটা কথাই বলতে পারি, যে শিল্পগুণের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করেও অনেক শিল্পী তাঁর যথাযোগ্য সম্মান পান না। রেড্ডি যে তা পেয়েছেন তার কারণ তাঁর উদ্ভাবন শক্তি এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁর ভূমিকা।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ায় হেটার এবং কায়কোমতি যৌথভাবে চেষ্টা করছিলেন যাতে এচিং-এ একটি মাত্র ছাঁচ বা প্লেট থেকে একাধিক রঙের ছাপ তোলা যায়, রেড্ডি এসে অতোলিয়ে ১৭-তে তাঁদের কাজে হাত লাগাবার পর ইনট্যাগ্লিও প্রিন্টিং-এ একটি মাত্র ছাঁচ বা প্লেট থেকে বহু রং বিশিষ্ট ছাপ নেবার পদ্ধতিটি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হয়। ইনট্যাগ্লিও প্রিন্টিং-এ রঙের প্রয়োগ এর ক্ষেত্রে এরপর থেকে রেড্ডি হেটারের সমকক্ষ গুরু। [redacted]

অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য ললিতকলা আকাদেমি এবং অন্ধ্র প্রদেশ আর্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসগৃহে সম্প্রতি কৃষ্ণ রেড্ডির ৩৫টি রঙিন ইনট্যাগ্লিও প্রিন্ট, অন্য একটি প্রিন্ট (এটির মাধ্যম আমি চিনতে পারিনি। আমার মনে হয়েছিল প্ল্যানোগ্রাফিক প্রিন্ট, কিন্তু আমার এক ছাপের ছবি নির্মাতা বন্ধু বললেন স্টেনসিল প্রিন্ট) এবং ২০টি ভাস্কর্যের ফটোগ্রাফের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। কলকাতায় রেড্ডির কাজের এটিই প্রথম প্রদর্শনী। কিন্তু প্রদর্শনী উদ্‌যাপনে কোনই ত্রুটি নেওয়া হয়নি। ক্যাটালগ ছিল না, দুটি ছবি উল্টো টাঙান হয়েছিল এবং প্রচারের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি।

এচিং কথাটি এসেছে জর্মন আলজেন শব্দটি থেকে, যার অর্থ খাওয়ান। তামার বা দস্তার পাতকে অ্যাসিডে খাইয়ে এচিং-এর ছাঁচ নির্মাণ করতে হয়। রেড্ডি শব্দার্থেই এচিং করেন বা অ্যাসিডে খাইয়ে ছাঁচ নির্মাণ করেন। নিডল বা বুরিন ব্যবহার বড় একটা করেন না। স্টপার ভার্নিস ও তুলি দিয়ে একটা প্রাথমিক ড্রইং করে বা না করেই তিনি প্রথমে তাঁর পাতকে বেশ খানিকটা অ্যাসিড দিয়ে খাইয়ে নেন। পরে সেই খাওয়ান পাতের উপর সযত্নে কাজ করে তাকে প্রয়োজনানুযায়ী রূপ দেন এবং প্রয়োজনানুসারে আসতে আসতে খাওয়ান। একোয়াটিন্ট করার প্রয়োজন থাকলে প্রথমে অথবা প্রাথমিক খাওয়ানোর পরেই একোয়াটিন্ট করে নেন; অন্ততঃ তাঁর ছাপ দেখে তাই মনে হয়। সফট গ্রাউন্ড এবং লিফট গ্রাউন্ড করার প্রয়োজন থাকলে প্রথমে বা প্রাথমিক খাওয়ানোর পরে তা করেন। ছাঁচ তৈরী হবার পর ছাপ নেবার জন্য যখন রঙ লাগান তখন গভীরতম ইনট্যাগ্লিও এবং মধ্যম ইনট্যাগ্লিও অংশে রঙ লাগান জাপানী প্রথায় পুটুলীর সাহায্যে, পশ্চাত্য প্রথায় নরম বা মধ্যম রেলোরের সাহায্যে নয়। শুধু উর্ধ্বতম অংশে রঙ লাগান একাধিক শক্ত রোলারের সাহায্যে। [redacted]

রেড্ডির ছবির প্রধানতম সম্পদ তার রঙ, রেড্ডি প্রাথমিক ভাবে একজন বর্ণপ্রেমী। আর তাই বোধহয় তিনি রঙিন এচিং-এর উন্নতি সাধনে তাঁর উদ্ভাবন ক্ষমতার ব্যবহার করেছেন। গভীরতম ইনট্যাগ্লিও অংশে রেড্ডি সাধারণত ঘোর অথবা উষ্ণ বর্ণ ব্যবহার করেন, আর সেই বর্ণক্ষেত্র ছাঁচের পুরো ক্ষেত্রের খুব সামান্য অংশেই ব্যাপ্ত থাকে, ফলে সেই সব ঘোর অথবা । এবং উষ্ণ বর্ণ ক্ষেত্র ছবির দৃষ্টি কেন্দ্র তৈরী করে। মধ্যম ইনট্যাগ্লিও অংশে তিনি ব্যবহার করেন মধ্যম বা ইন্টারমিডিয়েট বা ট্রানসিস্ট্যান্ট রঙ। তারা চিত্রক্ষেত্রের আরও বেশী অংশ জুড়ে বিরাজ করে। উর্ধ্বতম অংশের জন্য তিনি ব্যবহার করেন পাতলা অল্পশক্তিসম্পন্ন উজ্জ্বল অথবা মেদুর বর্ণ। এই সব রঙ চিত্রক্ষেত্রের বড় অংশ জুড়ে বিরাজ করে এবং প্রধান রঙের ভূমিকা গ্রহণ করে। ইনট্যাগ্লিও এবং মধ্যম ইনট্যাগ্লিও অংশে রেড্ডি সাধারণত একজাত সম্পন্ন রঙ চ্যাপ্টা করে লাগান, কোন টোনাল গ্রেডেশন বা বর্ণান্তর ঘটান না। কিন্তু ঘোর এবং উষ্ণ ও মধ্যমশক্তি সম্পন্ন বর্ণের এবং ভিন্ন আয়তনিক বর্ণক্ষেত্রের পারস্পরিক অবস্থানের ফলে খানিকটা টোনাল এফেক্ট আসে। এই টোনাল এফেক্ট, কালার পারসপেকটিভ বা বর্ণগত প্রেক্ষিত সৃষ্টি করে। আপাতদৃষ্ট দ্বিমাত্রিক বিন্যাসকে ত্রি-মাত্রিক প্রাকৃতিকতা দান করে। অর্থাৎ প্রকৃতি আসে রঙে পথ ধরে। প্লেটের উর্ধ্বতম অংশে রেড্ডি দুটি পরিপূরক (একটি ব্লাইট অন্যটি মেলো) রঙের সহায়তায় কিছু বর্ণান্তর সৃষ্টি করেন। এই অংশে অনেক সময়ে একটি ওয়াশ এর আমেজ পাওয়া যায়। উপরিভাগের উজ্জ্বল এবং মেদুর বর্ণের বর্ণান্তরের কারণেই হোক বা এই অংশের সমধিক বিস্তারের কারণেই হোক বা বর্ণগত প্রেক্ষিতের হস্তবাহী প্রাকৃতিক পরিমন্ডল সৃষ্টির কারণেই হোক রেড্ডির বর্ণবিন্যাসে অবনীন্দ্রনাথের ছবির একটা দূরাগত আমেজ পাওয়া যায়।

রেড্ডির ছবির দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য একক বুনট বা টেকসচার। অবশ্য টেকসচার বা বুনট এচিং মাধ্যমেরই নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্য; এচিং মাধ্যমের চরিত্রকে স্বপ্রকাশ করতে হলেই বুনট বা টেকসচারের ক্ষমতায় আস্থাবান হতে হবে। বুনটের আকার, আকৃতি আয়তন এবং স্থানানুভূতিক বা ট্যাকটাইল কোয়ালিটির বৈচিত্র্য আনবার জন্য এবং বুনটের সমাহারকে অর্থপূর্ণ বা ব্যঞ্জনাময় করে তোলার জন্য রেড্ডি কোথাও একোয়াটিন্ট, কোথাও সফট গ্রাউন্ড কোথাও লিফট গ্রাউন্ড এবং কোথাও বা সরাসরি খোদাইয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোথাও প্রকরণের আতিশয্য নেই ; কোন অংশ সরবে বলেনা। দেখো এখানে একোয়াটিন্ট আছে, বা এখানে সফট গ্রাউন্ড। কি দিয়ে সফট গ্রাউন্ড করা হয়েছে—জাল, না কাপড় বড় কথা নয়, বড় কথা দৃশ্যত কি সৃষ্ট হয়েছে।

রেড্ডির ছবির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদ তার ছন্দ। এ ছন্দ কিন্তু রেখাশ্রয়ী বা রৈখিক ছন্দ নয়, কারণ রেড্ডির ছবিতে রেখার ভূমিকা নেহাতই গৌণ। কখনও সখনও তিনি রূপবন্ধ সৃষ্টির অভিপ্রায়ে রেখার সাহায্য নিয়েছেন বটে কিন্তু তা কখনই মুখ্য হয়ে ওঠেনি। অনেক সময়ে রেখা সৃষ্ট হয়েছে গৌণ ভাবে, দু'দল বুনটের মাঝের ক্ষেত্র রেখার আকার নিয়েছে। রেড্ডির ছবির ছন্দ নির্ভর করে বুনটের এবং রঙিন ক্ষেত্র বিন্যাসের উপর। রেড্ডির ছবির বুনটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভক্ত তল, বর্ণক্ষেত্র এমন ছন্দে বিন্যস্ত যা জলের প্রবহমানতা, ঢেউ এবং ঘূর্ণিচক্রের কথা স্মরণ করায়।

আদিম অন্তহীন জলপ্রাণের আদিমতম উৎস, বহতা জল প্রাণের বিবর্তনের ইতিহাসের দৃশ্যমান সাক্ষী। জলই শক্তির উৎস, জলই একমাত্র ধ্রুব। দৃশ্যমান জগতের আর আর সব কিছুই অনিত্য। সব কিছু জলে ছায়ার মতন। স্থির জলে জাগতিক বস্তুর ছায়া হয় ভারহীন, কখন বস্তু লম্বাকৃতি হয়ে যায়, কখনও খর্বকায়, কখনও বক্রাকৃতি। জলে ঘূর্ণি উঠলে সেই বস্তুছায়াই টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, কখনও বা ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়। রেড্ডির ছবি এই জলের পুরাণ। জগতের পুরাণও বটে। এই অনিত্য ইহজগতে বিশ্বাস স্থাপন যখন কষ্টকর হয়ে উঠেছে, তখন শিল্পী প্রাণের আদিমতম উৎস জলের দিকে ফিরেছেন। রেড্ডির ছবিতে তাই আমরা সব কিছুকেই জলের মধ্যে দেখি। রেড্ডি তাঁর ভূয়োদর্শন-কে রঙের এবং ছন্দের গীতিময়তা দিয়ে দৃশ্যমান করেছেন।

কৃষ্ণ রেড্ডির ছবির ভারতীয়তা কোন ঐতিহাসিক ভারতীয় শিল্প-শৈলীর সাযুজ্যজনিত নয়, নয় কোন গ্রামীন-লৌকিক শিল্প শৈলীর সাদৃশ্যজনিত। কৃষ্ণ রেড্ডির ভারতীয়তা একান্তভাবে আধুনিক নাগরিক ভারতীয় জীবন-উদ্ভূত বা ধ্যান-ধারণা উদ্ভূত। রেড্ডি ফরাসী শিল্পী নন। কোন আধুনিক পশ্চিমী শিল্পী জীবনের বিচ্ছিন্নতা সচেতন হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের সাযুজ্য বিধানে এতটা তৎপর হয়ে বিচ্ছিন্নতার প্রতিকার চাইবেন না। তা একমাত্র চাইতে পারেন, এখনও প্রকৃতিনির্ভর ভারতীয়; কারণ প্রকৃতি তার কাছে এখনও অর্থময়। এই বিশ্বাস বোধ এবং বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েও এই ফল্গুণাহীন বিষাদবোধ পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পশ্চিমী মনসসম্ভব নয়। আর এইখানেই রেড্ডির ভারতীয়তা, রেড্ডির আধুনিকতা।

—প্রণবরঞ্জন রায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এদিকে মস্কো যুদ্ধের ব্যর্থতার জন্য হিটলারী শিবিরে নিদারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কারণ, একদিকে আমেরিকা কর্তৃক জার্মানী বা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং অন্যদিকে মস্কো রণাঙ্গনে হিমাঙ্কের নীচে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ঠান্ডা পড়ার সংবাদে বার্লিনের অধিবাসীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ছড়াইয়া পড়িল। ঐতিহাসিক আর্ভিড ফ্রেডবোগ সেই সময় বার্লিনে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'নৈরাশ্যবাদীরা নেপোলিয়নের পরিণামের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন' 'আর গণকদের বরাৎ খুলিয়া গেল, ভাগ্যগণনার ধুম পড়িয়া গেল?' (২)

লালফৌজের হাতে প্রচন্ড মার খাইয়া অপরাজেয় জার্মান বাহিনীকে মস্কোর দ্বারদেশ থেকে ফিরিয়া আসিতে হইল। হিটলার ক্রুদ্ধ হইলেন। জার্মান সৈন্যেরা বরফে, কাদায়, ঠান্ডায় বিপন্ন হইয়া এবং সোভিয়েত বাহিনীর প্লান্টা আঘাতে জর্জরিত হইয়া যতই পিছনে হটিতে লাগিল, ততই বিভিন্ন রণক্ষেত্রে জার্মান সেনাপতিদের মাথাও মাটিতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দক্ষিণ রণক্ষেত্রের অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেডের পদচ্যুতির কথা আগেই বলা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে মধ্যরণাঙ্গনে যখন বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল, তখন অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল ফন বোকের সেই আগেকার পেটের ব্যথা আবার মোচড় দিয়া উঠিল। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি অপসারিত হইলেন এবং তাঁর জায়গায় স্থান নিলেন ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লুজ, কিন্তু তাঁর চতুর্থ আর্মিকেও মস্কোর উপকণ্ঠ থেকে 'চিরদিনের জন্য' পিছু হটিতে হইল। এমন কি, স্বাধিক যুদ্ধের এত বড় পান্ডা জেনারেল গুডেরিয়ান পর্যন্ত রেহাই পাইলেন না। তিনি হাইকমান্ডের বিনা অনুমতিতে কেন তাঁর সৈন্যদলকে পিছু হটিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁকে অপমানিত এবং পদচ্যুত করা হইল খৃষ্টমাস পর্বের দিন! আর একজন প্রতিভাদীপ্ত ট্যাঙ্ক-কমান্ডার জেনারেল হোয়েপনার, যাঁর সৈন্যেরা উত্তর দিকে মস্কোর নিকটবর্তী হওয়ার পর পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁকেও হিটলার একই কারণে হঠাৎ পদচ্যুত করিলেন। কেবল পদচ্যুতি নয়, তাঁর র‍্যাঙ্ক বা পদমর্যাদা কাড়িয়া নেওয়া হইল এবং তাঁকে ইউনিফর্ম পরিতে পর্যন্ত নিষেধ করা হইল! আর একজন নামকরা সেনাপতি জেনারেল হ্যান্স কাউন্ট ফন স্পোনেক, যিনি অগের বছর হল্যান্ডের যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাবার জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন তাঁর অদৃষ্টে জুটিল মৃত্যুদন্ড! ২৯শে ডিসেম্বর তারিখ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বুশরা সমুদ্রপথে তাঁর পিছনে সৈন্যদল অবতরণ করাইবার ফলে স্পোনেকের অধীন এক ডিভিসন সৈন্যের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়িল। অতএব তিনি পশ্চাদপসরণ করিলেন। কিন্তু এই সংবাদে হিটলার মহা খাপ্পা হইলেন, বিনা অনুমতিতে পিছু হটার জন্য তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করা হইল। কেবল তাই নয়, তাঁর পদমর্যাদা সোজাসুজি কাড়িয়া নেওয়া হইল, তাঁকে বন্দী করা হইল। তাঁকে কোর্ট মার্শেল বা সামরিক আদালতে বিচার করা হইল এবং হিটলারের আদেশে তাঁকে প্রাণদন্ড পর্যন্ত দেওয়া হইল। (৩)

জার্মান সামরিক হাইকমান্ড O K W-এর প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, যাঁকে মার্কিন ঐতিহাসিক হিটলারের 'পোষা কুকুরের মত বংশবদ' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, সেই কাইটেল পর্যন্ত বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। কারণ, মস্কো রণাঙ্গনে বিপর্যস্ত জার্মান বাহিনীর পশ্চাদপসরণ না করিয়া উপায় ছিল না। অথচ হিটলার কিছুতেই সেনাপতিদিগকে অনুমতি দিবেন না। তবু কাইটেল সাহসে ভর করিয়া হিটলারের নিকট গিয়াছিলেন এই বিষয়ে কিছু ওকালতি করিতে। কিন্তু সুপ্রীম কমান্ডার হিটলারের কাছে তিনি এমন ধমক খাইলেন যে, হাইকমান্ডের চীফ মহোদয় একেবারে মুষড়ে পড়িলেন। হাইকমান্ডের আর একজন ধুরন্ধর জেনারেল জড্‌ল কাইটেলের কক্ষে গিয়া দেখিলেন যে, কাইটেল তাঁর ডেস্কে বসিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিতেছেন এবং পাশেই একটা রিভলবার পড়িয়া আছে। জড্‌ল নিঃশব্দে রিভলবারটি তুলিয়া নিলেন এবং হিটলারী অপমান হজম করিবার জন্য তাঁকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশ্য কাইটেলকে বুঝাইতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইল না। তিনি আর পদত্যাগ করিলেন না এবং আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই অপমান হজম করিয়া গেলেন।

এদিকে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ৬ই ডিসেম্বর যখন জেনারেল জুকোভের পাল্টা আক্রমণ শুরু হইল, তখন তিনি পরদিন ৭ই ডিসেম্বর পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। ১৭ই ডিসেম্বর তিনি পুনরায় হিটলারকে অনুরোধ করিলেন তাঁকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য। দুইদিন পর হিটলার নিয়মমাফিক ভাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এত চট করিয়া তিনি যখন খোদ প্রধান সেনাপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে প্রধান সেনাপতির প্রতি তাঁর মনোভাব কিরূপ ছিল? তিন মাস পর তিনি গোয়েবলসের নিকট বলিয়াছিলেন—

— 'A vain, cowardly wretch... and a nincompoop'

'একটা দাম্ভিক, কাপুরুষ, হতভাগা এবং নীরেট মস্তিষ্ক'—প্রধান সেনাপতি সম্পর্কে হিটলারের এই ছিল উক্তি এবং তিনি তাঁর মোসাহেবদের কাছে অবজ্ঞার সুরে বলিয়াছিলেন—'ব্রাউসিৎস? —ওটা কোন লড়াকুই নয়, একেবারেই অপদার্থ। যদি আরও কিছুকাল ও তার পদে থাকতো, তবে একেবারে বিপর্যয় ঘটে যেতো।'

অতএব অসম্মানের মধ্যেই প্রধান সেনাপতি পূর্ব রণাঙ্গন থেকে বিদায় নিলেন।

এভাবে পূর্ব রণাঙ্গনের সর্বাধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎসসহ বড় বড়

(২) The Second World War — J. F. C. Fuller — P. 175

(৩) দি রাইজ এন্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ—১০০৪ পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার মিঃ শাইরার লিখিয়াছেন যে, জেনারেল স্পোনেকের প্রাণদন্ড তখন 'কার্যকর করা হয় নাই। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে হিটলার হত্যার ষড়যন্ত্রের ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে গুলী করিয়া মারা হয়। যদিও ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর কষ্টের ঝঞ্ঝাটও আসে

জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনার অসময়ে কাজে আসে

আপনি নিশ্চয়ই কলেজের কোনো উৎসব থেকে বাদ পড়তে চান না! ধরুন কলেজে কোনো ভালো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে— আর আপনি কোমরের যন্ত্রণা আর অস্বস্তির দরুণ প্রায় শয্যাশায়ী! এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবে জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন!

অ্যানাসিনের গুণ অনেক। এ যে শুধু যন্ত্রণা থেকে আরাম দেয় তাই নয়—যন্ত্রণার দরুণ যে হতাশভাব আসে তাও দূর করে দেয়। আপনাকে চটপট আরাম আর স্বস্তি দিয়ে, অ্যানাসিন আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এই অসহায় দিনগুলিতে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করে পড়ে থাকবেন না। আজ যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনাকে চটপট আরাম দেয়, চাঙ্গা করে তোলে। আপনি অক্লেশে আপনার রোজকার কাজকর্ম করতে পারেন।

মেয়ে হয়ে জন্মানো মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি অ্যানাসিনের সাহায্যে সে ঝঞ্ঝাট দূর করে—জীবনের সকল আনন্দ পুরো উপভোগ করতে পারেন। প্রয়োজনের জন্যে হ্যাণ্ডব্যাগে সবসময় অ্যানাসিন রাখুন—মস্ত বড় সুবিধে!

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

আরতে ব্যথা-বেদনার উপশমকারী ওষুধগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

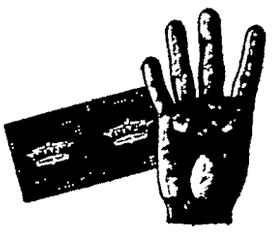

Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

সেনাপতিদের মুণ্ডু গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। জার্মান জেনারেল স্টাফের সঙ্গে হিটলারের খুব একটা সদ্ভাব ছিল না। তিনি এই সমস্ত 'প্রোফেশন্যাল' বা বৃত্তিধারী সেনাপতিদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন না। বরং তাঁর নিজের 'সামরিক প্রতিভার' উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং যদিও প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সামান্য একজন কর্পোরাল মাত্র ছিলেন, তবু তাঁর ধারণা ছিল যে, রণবিদ্যায় ও রণনীতিতে তিনি একজন বিশারদ এবং ১৯৩৯ সাল থেকে সমস্ত যুদ্ধে অতি সহজে বিদ্যুৎ-গতি জয়লাভ করিয়া এই ধারণা তাঁর আরও দৃঢ় হইল। কেবল তাঁর নিজের নয়। তাঁর সৈন্য ও সেনাপতিদের অধিকাংশের মধ্যেই এমন বিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িল যে, হিটলার যেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং রণবিদ্যায় তাঁর 'স্বাভাবিক পটুত্ব' রহিয়াছে। সুতরাং তাঁর আজ্ঞাবহ হওয়া কিম্বা তাঁর আদেশ মানিয়া লইতে কোন দ্বিধা ছিল না। বিশেষত সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় জার্মান জেনারেল স্টাফ ও হিটলারের মধ্যে বিশেষ কোন মতবৈষম্য ছিল না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মান সেনাপতিরা আত্মদোষ স্খালনের জন্য সমস্ত দায়দায়িত্ব একমাত্র হিটলারের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং নিজেদের স্মৃতিকথায় বা ডায়েরীতে অনেক অতিরঞ্জন করিয়াছেন—অন্তত সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের এই অভিমত। পশ্চিম জার্মানীর লেখকরাও তাদের প্রুশিয়ান অভিজাত সমরনেতাদের মান রক্ষার উদ্দেশ্যে-একমাত্র হিটলারকেই দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু সেটা বাস্তবতাসম্মত নয়। আসলে জার্মান হাইকমান্ড এবং হিটলার উভয় পক্ষই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন এবং নাৎসী মতবাদের বাহকরূপে কমিউনিস্ট বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া 'বলসেভিক বর্বরদের' ঝাড়েবংশে সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ মাস যুদ্ধের পরেও যখন লালফৌজ ধ্বংস হইল না এবং আক্রমণের প্রধান তিনটি লক্ষ্যস্থল—ইউক্রাইন, মস্কো ও লেনিনগ্রাদের মধ্যে একমাত্র প্রথমটি ছাড়া বাকী দুইটিই অজেয় রহিয়া গেল, তখন ফুরার ও তাঁর নাৎসী সমরনেতাদের মোহভঙ্গ হইতে লাগিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি ঢাকিতে গিয়া হিটলারের রাগ পড়িল সেই সমস্ত সেনাপতির উপর যাঁরা সৈন্যদলসহ পশ্চাতে হটিতে চাহিতেছিলেন। সুতরাং ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎসকে পূর্ব রণাঙ্গনের পরিকল্পনার দায়িত্ব থেকে 'বিদায়' দেওয়া হইল। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় এতগুলি প্রবীণ সেনাপতির বিতাড়ন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা। কারণ, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠিল পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ পরিকল্পনায় সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব কে নিবেন? জার্মানী সেনাপতি মহলে যখন এটা একটা মুখরোচক ও উত্তেজনাপূর্ণ গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিল, তখন দেখা গেল যে, হিটলার স্বয়ং চট্ করিয়া এই গুরুতর প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়া ফেলিয়াছেন। ১৯শে ডিসেম্বর হিটলার হ্যালডারকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ'এর পদ গ্রহণ করিতেছেন, যদি হ্যালডার ইচ্ছা করেন, তবে, তিনি আগের মতই 'চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ'এর পদে থাকিতে পারেন!

অবশ্য এমন গুরুতর ঘটনায়ও জার্মান সেনানীমহলে নূতন করিয়া খুব বিস্ময়ের কারণ ঘটিল না। কারণ, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নায়ক হিসাবে তিনি পূর্বেই সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার ও সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর ছিলেন। এক্ষনে তিনি নিজ হাতে সৈন্যদল পরিচালনার দায়িত্বও গ্রহণ করিলেন। কারণ, তাঁর মতে—

This little matter of operational command is something anyone can do . ...

—'রণক্রিয়া পরিচালনার এই সামান্য ব্যাপারটা যে কোন ব্যক্তিই করিতে পারেন!' (৪)

অতএব হিটলার স্বয়ং এবার খাস রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নিলেন। তিনি সেনাপতিদের উপর আর ভরসা রাখিতে পারিতেছিলেন না। মস্কোর দ্বারদেশে আসিয়া তাঁকে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং নেপোলিয়নের গ্রান্ড আর্মির মত পশ্চাদপসরণ করিতে গিয়া ধ্বংস বরণ করিতে হইবে, এই চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। অতএব 'ভীরু, কাপুরুষ, অপদার্থ' সেনাপতিদিগকে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে বিদায় করিয়া দিলেন এবং হুকুম জারি করিলেন ঠাণ্ডা, বরফ, তুষার ইত্যাদি সত্ত্বেও আর পিছু হটা চলিবে না—

He forbade any further withdrawals.

কিন্তু ফুরারের এই একগুঁয়েমি এবং জিদ নিয়া জার্মান সেনানীমহলে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও বৃশ রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর সেই দুর্দিনে এই হুকুমনামা পর্বদস্ত সেনাদলের আত্মরক্ষার পক্ষে শেষ পর্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া একশ্রেণীর সেনাপতি মনে করেন। এই প্রসঙ্গে কোন কোন জার্মান সেনাপতি হিটলারের 'লৌহসদৃশ ইচ্ছাশক্তি'র প্রশংসাও করিয়াছেন।

জেনারেল ব্লুমেনট্রিট মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলারের সেই 'বেপরোয়া আদেশ' সঠিক ছিল। কারণ, সেই অসম্ভব অবস্থার মধ্যে জার্মান সৈন্যদিগকে যদি পিছু হটিতে হইত, তবে, রণক্ষেত্র ভাঙিয়া পড়িত এবং বরফে ও তুষারে সৈন্যেরা দলে দলে মারা পড়িত। পশ্চাতে আশ্রয় নেওয়ার মত কোন সুসজ্জিত ব্যূহ বা লাইন ছিল না।

জেনারেল ফন্ টিপেলস্কার্শ (Tippel Skirch) বলিয়াছেন—It was Hitler's one great achievement

হিটলারের এটা একটা প্রকাণ্ড সাফল্য। .....যদি সৈন্যেরা পিছু হটিতে শুরু করিত, তবে, ব্যাপারটা হইত ত্রাসের পলায়ন—'panic flight'.

কিন্তু মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পর নভেম্বর-ডিসেম্বর-জানুয়ারীর শীত-কালে জার্মান সামরিক মহলে 'ত্রাসের মনোভাব'ই দেখা দিয়াছিল (৫)

* * *

কিন্তু হিটলারের মনে সম্ভবত কোন ত্রাস ছিল না। সমস্ত ব্যর্থতার দায়িত্ব তিনি সেনাপতিদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন * এবং একথা আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস, দক্ষিণ ও মধ্যরণাঙ্গনের দুই প্রধান নায়ক ফিল্ড মার্শাল রুন্ডস্টেড ও ফিল্ড মার্শাল ফন্ বোক, যান্ত্রিক বাহিনীর জেনারেল গুডেরিয়ান, উত্তর রণাঙ্গনের ফিল্ড মার্শাল ফন্ লীব প্রমুখ বিখ্যাত সেনাপতিদিগকে হিটলার অপসৃত করিলেন। রুন্ডস্টেডের বদলে ফিল্ড মার্শাল রাইখনাউ সৈন্যপত্যে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু সহসা স্ট্রোক বা হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মারা গেলেন।

---

(৪) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—১০৩৫ পৃষ্ঠা

(৫) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১০৩৭।

* 'সেনাপতি শীতের' বিরুদ্ধে দোষা-রোপের কথা পরে আলোচিত হয়েছে —লেখক

বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল উডেট রিভলভারের গুলীতে আত্মহত্যা করিলেন—১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১। এই শীতকালীন ব্যর্থ অভিযানের পর আরও ৩৫ জন কোর, ও ডিভিসনাল কমাণ্ডারকে পদচ্যুত করা হইল।

সেনাপতিদের বিরুদ্ধে এই হিটলারী 'পাল্টা অভিযান' অবশ্য এখানেই শেষ হইল না। নুরেমবার্গের আদালতে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের মামলায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, ১৭ জন ফিল্ড মার্শালের মধ্যে ১০ জনকেই রণাঙ্গনের ব্যর্থতার জন্য 'বিদায়' করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হিটলারের প্রাশনাশের চক্রান্তের (২০শে জুলাই, ১৯৪৪) অভিযোগে ৩ জন ফিল্ড মার্শালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। মাত্র একজন ফিল্ড মার্শাল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়াছিলেন। ৩৬ জন শীর্ষস্থানীয় জেনারেলের মধ্যে অধিকাংশই পদচ্যুত এবং কয়েকজন খতম হইয়াছিলেন। মাত্র ৩ জন জেনারেল রেহাই পাইয়াছিলেন।

এভাবে 'কর্পোরেল' হিটলার তাঁর ফিল্ড মার্শাল ও জেনারেলদের 'সমুচিত শিক্ষা' দিয়া ছাড়িয়াছিলেন সোভিয়েত রণাঙ্গনের যুদ্ধে অকৃতকার্যতার জন্য। কিন্তু সেখানেই তিনি থামিয়া থাকিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি আরও ক্ষমতা দখলের জন্য অগ্রসর হইলেন। একাধারে তিনি জাতির নেতা, রাষ্ট্রপতি, সমর-মন্ত্রী, সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ও স্থলবাহিনীর (আর্মির) প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন এবং তার পর বশংবদ জার্মান রাইখস্ট্যাগের (পার্লামেন্টের) মাধ্যমে ইচ্ছামত এক 'আইন' পাশ করাইয়া এক অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জন করিলেন যে, পৃথিবীতে কোন সম্রাট, রাজা কিম্বা প্রেসিডেন্ট কিম্বা প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন গোষ্ঠিপতি সর্দারও এত ক্ষমতা কখনও অর্জন করেন নাই। ইতিহাসে এটা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪২, রাইখস্ট্যাগে এমন এক আইন গৃহীত হইল, যার দ্বারা হিটলার যে কোন জার্মান নাগরিকের জীবন-মৃত্যুর সর্বময় নিয়ামকরূপে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। ইতিহাসে এমন ঘটনা অভূতপূর্ব। নীচে সেই আশ্চর্য আইনটির মর্ম উদ্ধৃত করা হইল :—

> ..... In the present war, in which the German people are faced with a struggle for their existence or their annihilation, the Fuehrer must have all the rights postulated by him which serve to further or achieve victory Therefore — without being bound by existing legal regulations — in his capacity as Leader of the nation, Supreme Commander of the Armed Forces, Head of Government and Supreme executive chief, as Supreme Justice and Leader of the Party — the Fuehrer must be in a position to force with all means at his disposal German, if necessary, whether he be common soldier or officer, low or high official or judge, leading or subordinate official of the party, worker or employer — to fulfill his duties. In case of violation of these duties, the Fuehrer is entitled after conscientious examination, regardless of so-called well-reserved rights, to mete out due punishment and to remove the offender from his post, rank and position without introducing prescribed procedures." — 6.

এই অদ্ভুত আইনের উপর চোখ বুলাইলে যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক উপলব্ধি করিবেন যে, হিটলার যেমন বেপরোয়া ছিলেন, তাঁর পার্লামেন্টও তেমনি বেপরোয়া ছিল। অন্যথা একজন মানুষের হাতে এমন সর্বাত্মক ক্ষমতা কিভাবে অর্পিত হইতে পারে? অর্থাৎ জার্মান রাষ্ট্রনায়ক হিটলারকে আইনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া দিয়া আইনের প্রতিমূর্তিরূপে ঘোষণা করা হইল।

মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরার মন্তব্য করিয়াছেন—

> "Truly Adolf Hitler had become not only the Leader of Germany but the Law. Not even in medieval times nor further back in the barbarous tribal days had any German arrogated such tyrannical power, nominal and legal as well as actual, to himself." — 7.

কিন্তু হিটলার সমগ্র জার্মান বাহিনীর, এমন কি সমগ্র জার্মান জাতির অপ্রতিরোধ্য ও সর্বাত্মক দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইলে কি হইবে, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে, অথবা আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় যে, মস্কোর রণাঙ্গনে ফুরারের ইচ্ছামত ও হুকুম মত আর যুদ্ধের গতি নিয়ন্ত্রিত হইল না। সমুদ্রের তরঙ্গকে যেমন হুকুম দিয়া আটকাইয়া রাখা যায় না, তেমনি লালফৌজের তরঙ্গকেও জার্মান সুপ্রীম কমাণ্ডার হিটলার ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ডিসেম্বরের দারুণ ঠাণ্ডায় ও বরফে, লালফৌজ নতুনতর বিক্রমে যে প্রত্যাক্রমণ শুরু করিল, তার ফলে সমগ্র রণাঙ্গনের উদ্যোগ ও আধিপত্য সোভিয়েত সৈনাপত্যের হাতে চলিয়া গেল।

*

'সেনাপতি শীত' ও 'সেনাপতি হিটলার'

কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গনে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের লজ্জা কিভাবে গোপন করা যায় এবং কিভাবেই বা হিটলার জার্মান জনগণের নিকট মুখ দেখাইবেন?—বিশেষত স্বয়ং হিটলার ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা যখন তারস্বরে বার বার ঘোষণা করিতেছিলেন যে, রাশিয়ার দফা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তার আর উঠিবার শক্তি নাই। ঠিক সেই মুহূর্তে মস্কোর দ্বারদেশে এই শোচনীয় পরাজয় হিটলারী 'প্রতিভার' পক্ষে বজ্রাঘাতের তুল্য। সুতরাং চতুর ফুরার তাঁর এই পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি দোষ ও দায়িত্ব চাপাইয়া দিলেন রাশিয়ার ঠাণ্ডা ও শীতের ওপর। ইউরোপের এবং বিশেষভাবে রাশিয়ার নিদারুণ শীতের প্রকোপ সর্বজনবিদিত। এই শীত একটা ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে ১২৫ বছরেরও বেশী পূর্বে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়নের সৈন্যদের বিপর্যয়ের জন্য। ১৮১২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নেপোলিয়ন সসৈন্যে মস্কোতে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরাজিত হইয়া ১৯শে অকটোবর মস্কো থেকে পিছু হটিতে শুরু করিয়াছিলেন বরফাচ্ছন্ন পথ ধরিয়া যার ফলাফল অতি শোচনীয় হইয়াছিল। রাশিয়ার ঠাণ্ডা ও বরফের মধ্যে নেপোলিয়নের এই বিপর্যয়ের জন্যই রাশিয়ার স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে 'সেনাপতি শীতের' নাম! 'সেনাপতি শীতের' সঙ্গে অবশ্য 'সেনাপতি কর্দম'ও দেখা দিয়া থাকে, যখন জমাট বরফ গলিয়া রাস্তাঘাট কাদায় ও জলে প্রায় অগম্য হইয়া উঠে। হিটলার ও নাৎসী প্রচারকেরা মস্কোতে তাঁদের পরাজয়ের দায়িত্ব 'সেনাপতি শীতের' ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চাহিলেন। কেবল তাই নয়, পূর্ব রণাঙ্গনে এই অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের জন্য হিটলার তাঁর সেনানীমণ্ডলীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন এবং প্রধান সেনাপতিকে (ফিল্ড মার্শাল ব্রাউসিৎস) ও অন্যান্যকে পদচ্যুত করিয়া নিজেই সর্বোচ্চ সেনাপতিরূপে সমগ্র বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, একথাও আগেই সবিস্তারে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার এই যে, মস্কোর যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনীর হাতে জার্মান বাহিনীর এই পরাজয়ের গুরুত্ব গোপন বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে হিটলার ও গোয়েবল্‌স যে প্রচার কার্য শুরু করিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে পশ্চিমী লেখকদের কৃপায় সেটাই প্রায় সত্য বলিয়া গৃহীত এবং প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এটা অর্ধ সত্য, অর্ধ মিথ্যা এবং রাজনৈতিক মতবাদের বৈষম্যের জন্য বিকৃত প্রচারকার্য মাত্র। কেননা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মস্কো থেকে প্রকাশিত নানা দলিলপত্র, ইতিহাস, প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণী, সৈন্য ও সেনাপতিদের বক্তব্য এবং অন্যান্য সূত্রে প্রকাশিত তথ্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, মস্কোর যুদ্ধে হিটলারী বাহিনীর পরাজয় অকস্মাৎ 'অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা' পড়ার জন্য ঘটে নাই। ঘটিয়াছে লালফৌজের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য।

(ক্রমশঃ)

---

(৬) উইলিয়াম সাইরার—পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ১০৩৬

(৭) ঐ ঐ

কখনো রাত কখনো দিন

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

(২৮)

বাবার চোখে জল।

—তাও কোনো মৃত্যু-শোকেটোকে নয়। নয়।

—মেয়ের হতাশ প্রেমে।

ভাবাই যায় না।

বাবার চোখ দিয়ে জল পড়লো, মার তো পড়েই আছে, এবং দিদির তো কথাই নেই—চোখের জলেই ভাসছে অহোরাত্র। বাল্মীকি মুনিও যেন একবার মুখটা অন্য দিকে ফেরালেন, কে জানে চোখের দুর্বলতা ঢাকতে কিনা।

অসম্ভব কি?

ক্রৌঞ্চমিথুনের বিরহ বেদনা যদি দস্যু রত্নাকরের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরে থাকে, জলজ্যান্ত একটা মানুষের সেই বেদনা বাল্মীকি মুনিকে স্পর্শ করবে না?

কিন্তু সকল দুঃখই তো এখনি ঘুচে যেতে পারে। সেই বুদ্ধু মহোদয় যখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপানলে দগ্ধ হয়ে বুড়ো দাদামশাইটিকে দূত পাঠিয়ে ভুল সংশোধন করতে চেয়েছেন তখন দিদির সঙ্গে একটা মান-অভিমানের পালা চুকিয়ে ফেলতে পারলেই তো আহ্লাদের সাগরে বান ডাকে।

কিন্তু তা হবার জো নেই।

'কথা দেওয়া হয়ে গেছে।'

এই শব্দ অমোঘ।

যেন বিধাতা পুরুষের কলমে ললাট-লিপি লেখা হয়ে গেছে।

যার ললাটে এ লিপি খোদাই হয়ে গেল সে এরপর সারাজীবন ললাটে করাঘাত করে মরুক। ভয়ানক একটা ছটফটানি এলো।

বিষটা তো আর হজম যাচ্ছে না?

কতো জনের তো শুনেছি বিষের পিঁড়ি থেকে বর উঠে গিয়েও বর বদল হয়ে যায়। আর এক্ষেত্রে এখনো সত্যি অনুষ্ঠান বলতে কিছুই হয়নি। শুধু কথা।

আচ্ছা কোন মতেই কি সেই অদৃশ্য শক্তিমান 'কথা'র মান রক্ষা করেও দিদিটার প্রাণ রক্ষা করা যায় না?

আমি বরাবরই একটু বোকারোয়া বেহাম ছিলাম জানি, কিন্তু কতোটা তার ওজন তখন করতে পারিনি, এখন সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে ভাবলে বুঝতে পারি কী দারুণ বেহায়াই ছিলাম। তবে হয়তো কাণ্ডজ্ঞানহীন অবোধও।

তাই বাবার কাছে গিয়ে একটা প্রস্তাব করে বসলাম।

হ্যাঁ বাবার কাছেই।

মার কাছে বলিনি, কারণ এটা জানতাম মাকে বলে কাজ কিছুই হবে না, শুধু হৈ-চৈ হবে।

বাবাকেই বললাম।

বাবা তখন অফিস থেকে ফিরে চা-টা খেয়ে বিষের হিসেব পত্রের খাতা নিয়ে বসেছেন।

কাছে গিয়ে বসলাম।

বুকের মধ্যে যাকে বলে ঢেঁকির-পাড় পড়ছে। তবু ধাঁ করে বলে ফেললাম 'বাবা! আমিও তো তোমার মেয়ে?'

বাবা চমকে উঠে বললেন, 'কী বলছিস?'

'বলছি—আমিও তো তোমার মেয়ে?'

বাবা কী বুঝলেন কে জানে, আমার দিকে চেয়ে দেখলেন মনে হলো। তবে আমি তো আর চোখ তুলে চাইছি না। উত্তর দিলেন কিন্তু একটু হেসেই। বললেন, 'কে বলেছে তুমি আমার পিসিমা?'

ঘাম ছুটে যাচ্ছে সেমিজের ভিতরে, তবু ডুবছি না ডুবতে আছি, বলে ফেললাম, 'না বলছি যে ওরা তো তোমার একটা মেয়ের সঙ্গেই বিয়ের কথা বলেছে? দিদির বদলে আমাকে চালিয়ে দেওয়া যায় না?'

'দিদির বদলে তোকে চালিয়ে দেব? ঠকিয়ে?'

বাবা থেমে থেমে ছাড়াছাড়াভাবে প্রশ্ন করলেন।

ততক্ষণে আমার বারাঙ্গনার মনোবল এসে যাচ্ছে, বললাম, আহা ঠকিয়ে কী আর? কিছু বলে টলে। এও তো বলা যায় আমার ছোট মেয়েটাই লম্বা বেশী—মানে দেখতে বড়—ওরই আগে—

বলে ফেলেই অবশ্য বুঝলাম যুক্তিটা কী হাস্যকর হলো।

বাবাও হেসেই ফেললেন। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, 'তা কি হয়?'

'বাবা! তুমি যদি বুঝিয়ে টুঝিয়ে বল ওদের—'

বাবা তেমনি গভীর গাঢ় গলায় বললেন, 'তোমার তো যারা বিয়েতে পণ্টন নেয় তাদের ওপর খুব ঘেন্না?'

মাথা নীচু করে বললাম, 'তা' আর কী করা যাবে? দাদুর কথাটা তো রাখা হবে?'

বলতে যাচ্ছিলাম, 'দিদির তো প্রাণটা রক্ষা হবে।' সামলে নিলাম। এতো বাচাল হওয়া যায় না। যা হয়েছে তাই তো ঢের।

বাবা বললেন, 'ওদের সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেছে রুচি।'

—আমি মরীয়া হয়ে বলে ফেললাম, 'কথা তো থাকছেই বাবা! তুমি তো আর বিয়ে ভেঙ্গে দিচ্ছো না? টাকা-কড়ি যা দেবার সবই দেবে। শুধু একটা মেয়ের বদলে আর একটা মেয়ে। সেও তো তোমারই মেয়ে।'

বাবা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে আস্তে একটা হাত একবার আমার মাথায় রেখেই বোধহয় সেই আবেগটা ঢাকতে মাথাটা একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি একটি পাগল! ওরা রাজ্যি উজাড় করে ফর্সা মেয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার দিদিকে পছন্দ করেছে ফর্সা বলে। আমার মযলা মেয়েকে নেবে কেন?'

নেবে কেন?

তাই তো। একথাটা ভাবিনি এতোক্ষণ! ছি-ছি কী বেকুব আমি। কেবলই মনে করছিলাম দিদির জন্যে একটা ত্যাগ স্বীকার করতেই বসেছি। ওই অভদ্রদের বাড়িতেও খেতে রাজী হচ্ছি।

হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে কী একটা ঠেলে উঠলো, কান দুটো গরম আর চোখ দুটো ভিজে হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে আসতে

ইচ্ছে করছে, অথচ উঠতেও পারছি না কে যেন আমায় পুঁতে দিয়েছে মাটির মধ্যে।

বাবা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে বলেন, 'যার যা ভাগ্যলিপি, তা খণ্ডন হয় না রে রুচি। তা নইলে এদের সঙ্গে কথা হবার আগেই তো ভটচায খুড়ো আসতে পারতেন। মাঝখান থেকে আনন্দটা—! হয় না রে রুচি, ভাগ্যলিপি খণ্ডন হয় না। এই যে মানুষ পৃথিবীতে এসে কাজ কচ্ছে, অকাজ করছে, সুখ পাচ্ছে দুঃখ পাচ্ছে—এতে তার নিজের হাত সামান্যই আছে। একটি অদৃশ্য হাত তার ভাগ্যকে চালিত করছে।'

প্রসঙ্গর একটু বদল হওয়ায় নিজেকে কিছুটা সামলে নিতে পারলাম। যদিও বুকের মধ্যে সেই দুঃখের চাপটা ঠেলা মারছেই।

'তোমাকে নেবে কেন!'

ছি-ছিঁ কী লজ্জা।

আমারও যে দিদির মতন গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

যাক প্রসঙ্গটা অন্য দিকে বয়েছে।

বলে নিলাম বাবাকে, 'ভগবানের কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই বাবা? এতো কোটি কোটি লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে মরছেন তিনি?'

বাবা হেসে ফেলে বললেন, 'তা মরছেন বৈকি। এতোগুলোকে যখন সৃষ্টি করে মরেছেন!'

আমি তো তর্কের গন্ধ পেলে নেচে উঠি! (ভাষাটা মার) তাই বলি, 'তা নিজের সৃষ্ট জীবদের এতো কষ্ট দেবার উদ্দেশ্য কী?'

'আছেই কিছু উদ্দেশ্য।'

'কী উদ্দেশ্য, তা বলবে তো?'

'তাই যদি বুঝতে পারবো তাহলে তো তোদের বাবা ভগবানের থেকেও বুদ্ধিমান হয়ে গেল রে। এইটাই ভেবে নিতে হয়, আছেই কিছু উদ্দেশ্য।'

আমি বেশ ভল্ল করে জাঁকিয়ে বসে বলি—'আচ্ছা বাবা, তুমি এসব সত্যি বিশ্বাস করো?'

বাবা যেন অন্য কথা ভাবছিলেন মনে হলো। একটু চমকে বললেন, 'কী সব কথা?'

'এই যে ভগবানই সব করেন, ভাগ্যছাড়া পথ নেই—'

বাবা হেসে বলেন, 'চিরকাল বিশ্বাস করতাম না।' একটু থেমে বললেন, 'বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অসহায়তাটা টের পাচ্ছি। আর অনুভব করছি, মানুষ যেটাকে 'আমি করছি,' ভেবে আত্মগৌরব পায়, কিম্বা আত্মগ্লানি ভোগ করে তার কোনোটাই তার নিজের করা নয়। সেই অদৃশ্য হাতের নির্দেশে এসব করতেই হবে তাকে। এই যে যুদ্ধটুদ্ধ হয় হাজার হাজার মানুষ মরে, এক-একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায়, এ কী শুধুই মানুষের কীর্তি? ওই ধ্বংস, ওই মৃত্যু সবের দরকার আছে পৃথিবীতে।'

সত্যি বলতে বাবার এই যুক্তি বা মতামত মোটেই পছন্দ হল না, বিশ্বাসও হল না। মনে হলো বাবা বোধহয় কোনো ধর্ম পুস্তকটুস্তকে পড়ে হঠাৎ কথাটা শিখেছেন। কই আগে তো কখনো 'ভাগ্য ভগবান' এসব কথা শুনিনি বাবার মুখে।

কিন্তু আগে কবে বাবার সঙ্গে এমন তর্ক যুদ্ধে নেমেছি? প্রশ্নও ছিল না, সাহসও ছিল না।

বাবা আবার কথা বললেন।

বললেন, 'তা' বলে আমার ধারণাটারণা কারোর মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবারও পক্ষপাতী নই। জীবনের পথে চলতে চলতে যার যেমন অভিজ্ঞতা ঘটে, তার কাছে সেটাই সত্যি। তা তুই এতোটুকু মেয়ে তোর এতো চিন্তা কেন?'

'আমার খুব রাগ হয় বাবা!'

'রাগ হয়?'

'হয়ই তো। মানুষ এতো দুঃখ-কষ্ট পাবে, তবু বলতে হবে, আহা ভগবান কী দয়াময়। এতো কী!'

বাবা হেসে ফেলে বলেন, 'তবে আসল আসামীর সঙ্গেই ঝগড়া কর বসে বসে। তা পারলে তো তরেই যাবি।'

তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, 'তোর জন্যেই আমার ভাবনা। তোর মধ্যে নানান চিন্তা, নানান প্রশ্ন, এগুলো নিয়ে হয়তো মুস্কিলেই পড়বি। বাঙ্গালীর মেয়ে, কোথায় কার ঘরে গিয়ে পড়তে হবে—'

বাবার শেষের কথাগুলো যেন নাটকের নেপথ্যোক্তির মত।

বলতে বলতে থেমে গেলেন।

আমিও একটু থেমে থেকে তারপর সঙ্কোচের গলায় বলি, 'আর তোমার বড় মেয়ে? তার জন্যে তোমার ভাবনা হয় না?'

কিন্তু উত্তরে বাবা কিনা অনায়াসেই বললেন, 'না। ওর জন্যে ভাবনা করি না।'

ওর জন্যে ভাবনা করেন না।

বলে ফেলবো না কি এই সুযোগে। বাবা গো ওর জন্যেই ভয়ঙ্কর ভাবনা। ও অনেক গভীর অনেক চিন্তাশীল। ওর আমার মত ফড়ফড়ানি নেই বলেই বুঝতে পারো না তোমরা। জানোও না কী ভয়ঙ্কর ভাবনা করার দরকার ওর জন্যে।

কিন্তু বলা হল না।

ঠিক এই সময় মা এসে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। ব্যস হয়ে গেল!

যেখানে মা উপস্থিত সেখানে আর কার কথা বলার অধিকার আছে? মার মেয়েদের তো অন্ততঃ নয়।

মা আমায় বাবার কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে গল্প করতে দেখে বলে উঠলেন, 'ময়দাটা মাখা হয়েছে?'

সতেজে বললাম, 'হয়েছে।'

বাগুনতলার বাড়ীর গায়ে লেগেছে মার। কাউকে গল্প করতে দেখলেই, তার কর্তব্যকর্ম স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বাসনা জেগে ওঠা।

মা আবারও বললেন, 'দাদাদের ঘরের বিছানা পাতা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'বাবাঃ। মেয়ের মেজাজ দেখো। যেন মিলিটারী।... ইহসংসারে সবাই মেজাজ দেখিয়ে পার পেয়ে যায়, শুধু আমিই সাত জন্মে মেজাজ দেখাতে পেলাম না।'

মা আক্ষেপোক্তি করলেন।

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'কখনো পেলে না?'

'কবে আর পেলাম? ছোটবেলায় তোমার মার'—

বাবা কথাটা থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি এখন তোমার জীবনের ইতিহাস শোনাবে বলেই এসে বসলে?'

মা ঠাট্টা তামাসা মোটে সহ্য করতে পারেন না।

ছেলেবেলায় একমাত্র মেজদা যখন ক্ষ্যাপাতো হেসে ফেলে বলতেন, 'বকিসনে বাবা থাম। সর বাবা সর! এতও জানিস।'

এই রকম।

নচেৎ মার ভাজেরা, ননদেরা বা ভগ্নিপতি কি ননদাই' এঁরা কিছু ঠাট্টার কথা বললেই মা হয় রেগে ওঠেন, নয় কেঁদে ফেলেন।

কাঞ্চনতলাতেও সবাই বুঝে ফেলেছিল, ন বৌয়ের সঙ্গে তামাসা চলবে না।

ঝরা বলতেন, 'ওটা লিভার খারাপের লক্ষণ। পরিপাক শক্তি ভালো থাকলে তারা গলদা চিংড়ি মাছের মুড়ো আর ঠাট্টা-তামাসা সমানভাবেই হজম করে নিতে পারে।'

মা অবশ্যই তাতেও চটে যেতেন।

তবে মায়ের এই ধাত সবাই আমরা জেনেই আছি। সাবধানেই কথা কই।

—বাবা কখনো কখনো একটু কৌতুকের কথা বলতেন বটে, কিন্তু খুব সাবধানে।

একেবারে ধার বাঁচিয়ে।

হলে কি হবে রেগে ওঠাটাই মার প্রকৃতি।

মা বেগে উঠে বললেন, 'শোনাতে বসলেই যে তোমরা শুনবে কান পেতে? যা বলতে এসেছি তাই বলেই চলে যাচ্ছি। ঠাকুর মশাইকে তো অনেক বলেও একটা দিন থাকতে রাজী করাতে পারলাম না। বললেন কাজ আছে।'

'সে তো শুনলাম।'

'তা তোমার দেশের খবর তো কিছু শুনলে না? দুপুরে ভাত খাবার সময় আমার সঙ্গেই যা কথা হলো—'

বাবা বললেন, থাকবেন না তা বুঝেই ছিলাম। কিন্তু সকালে তো সময় ছিল না আর! তা কী খবর টবর?'

খবর অনেক।

আমরা তো শুনেছি তখন।

খবর হচ্ছে, সেজ জ্যাঠারা তো ভিন্ন ছিলেনই, জ্ঞাতিরাও যে যার। নতুনকাকা আর বড়জ্যাঠারা ছিলেন একত্র। ওঁদেরও নাকি এখন হাঁড়ি ভিন্ন হবার তাল চলছে।

নতুন কাকা নাকি আবার জমিজমাও ভাগ করে নিতে চাইছেন।...

সর্বেশ্বরের ভোগটোগের ব্যাপারেও নাকি পালা করে হবে।

তার মানে এরপর আর সর্বেশ্বরের সংসার থাকবে না।

আর না থাকলেই বা কী?

সংসারটা সর্বেশ্বরেরই বলে যিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন তিনি তো হাওয়া।

নীরোপিসি না কি আর তাঁর সেই শ্বশুরবাড়ি থেকে ফেরেননি। তিনি নাকি এখন তল্লাস করে দেখতে বসেছেন, তাঁর শ্বশুরের কোথায় কি জমিজমা বিষয়-আশয় আছে, এবং এযাবৎ তাঁর দ্যাওর কী পরিমাণ ঠকিয়ে এসেছে নিজের দাদাকে। কিন্তু চিরদিন তো ঠকিয়ে খাওয়া যায় না? নীরোপিসি গিয়ে এখন হাল ধরেছেন। অন্যায় বরদাস্ত করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, তাই নিজের সর্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন ওই দীর্ঘকাল চলে আসা অন্যায়ের প্রতিকারে।

ওনার স্বামী (যাঁকে অবশ্য নীরোপিসি স্বামী বলে গ্রহণও করেননি) না কি যখন গ্রাম ছাড়া হয়ে থেকেছেন, তখন দৈন্য-দারিদ্র্যে পড়ে ভাইকে জানিয়েছিলেন ভাই বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। খেতে না পেয়ে নিরুপায় হয়েই চলে এসেছেন জগদীশ দেশের বাড়িতে। ব্যাধিতে জরজর শরীর, তাই বাড়ির মধ্যে জায়গা জোটেনি, বাইরে আস্তানা গেড়েছেন। তাও খেতেটেতে ভাল দেয় না, রোগের চিকিৎসা করায় না। নীরোপিসি এইসব দেখে রেগে জ্বলে গিয়ে বলেছেন 'এর একটা হস্তনেস্ত না করে আমি এ ভিটে ত্যাগ করছি না।...

আর একটা খবর—সেটাই সব থেকে দুঃখের খবর ফুলিকে নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায় দিয়ে বাপের বাড়িতে ফেলে দিয়ে গেছে।

কারণ? কারণ ফুলি বিয়ের ক' মাস পরেই অসময়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েছিল। তাতে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা দারুণ চটে গিয়ে ওখানে ফেলে দিয়ে গেছে। অপবাদ দিয়ে বলেছে, 'অসময় নয়।'

শুনে বুকটা কেঁপে উঠেছিল আমার।

যদিও ভটচায দাদু কথাটা খুবই সংক্ষেপে নিতান্তই মর্মবেদনার সঙ্গে বলেছিলেন।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমাদের।

ফুলির সেই ভয় ভয় শাকমূর্তি চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কি জানি শেষ অবধি ভুগে ভুগে মরেই যাবে হয়তো। শুনি তো—'সূতিকা' না কি, ওটা হলে আর বাঁচে না। সেটাই তো হয়েছে।

ফুলির জন্যে কান্না পেয়েছিল।

[illegible] জানে বেচারার শত অসুখ করেছে বলেই [illegible] এড়াবার জন্যে ওরা অমন অপবাদ দিয়েছে, না সত্যিই—

আর ভাবতে পারি নি। মনে হয়েছে, 'না না তা হতে পারে না।' সারা দিন ফুলির কথা ভেবেই মনটা খুব খারাপ ছিল। বোধ হয় সেই জন্যেই শক্তি সঞ্চয় করে বাবার কাছে গিয়ে পড়ে অমন একটা বোকার মত প্রস্তাব করে বসলাম।

মনে হচ্ছিল, যদিই দিদির দুর্মতি কাটে, বেঁচে টেঁচে থেকে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে যায়, না জানি কি পরিস্থিতিতে পড়বে। হয়তো ফুলির মতই নিষ্ঠুর শ্বশুর বাড়ি জুটবে ওর।

এমনিতে তো কিছুই বোঝা যায় না।

দেখেছিলাম তো ফুলির সেই বরকে আর তার ভাইটাইকে। খুব খারাপ তো মনে হয় নি।

তখনো এ বোধ আসে নি, পুরুষ জাতির প্রতি যতই দোষারোপ করা হোক, আসলে মেয়েদের হাতেই মেয়েদের যত লাঞ্ছনা নির্যাতন অত্যাচার। মেয়েরা কোন দিনই স্বজাতিকে প্রীতির চক্ষে দেখে না। তার মনোভাব প্রতিপক্ষের মত।

ছোট্ট একটা মেয়ে, পরের বাড়ি থেকে গিয়ে পড়েছে তোমাদের কাছে, কোথাও নেই তার সহায়, অথবা পৃষ্ঠবল, আর তোমরা, ডজন খানেক মহিলা আছ বাড়িতে নানা বয়সের নানা সম্পর্কের। তোমরা কেবলই খরদৃষ্টি ফেলে দেখতে থাকছো কি খুঁৎ বার করা যায় বার তেরো কি জোর চোদ্দ বছরের মেয়েটার।

এক ছটাক দুধে একসেরি ঘটি ভরতে পারে না।

তোমাদের অগাধ অসীম অফুরন্ত প্রত্যাশার ভাণ্ডটি সেই ছোট মেয়েটা পূর্ণ করবে কোন ক্ষমতায়?

কিন্তু সে কথা কে বোঝে?

তোমাদের মনেও পড়ে না তোমরাও একদা ওর মতই অসহায় ছিলে। মনে পড়ে না তাই তোমরা কড়া শাসন চালাও।

বৌ হয়ে এসেছো, কর্তব্যজ্ঞান নেই? আক্কেল নেই? বোধশোধ নেই? গতর নেই? নেই তো কেঁদে মাটি ভিজোও। কে তোমার দুঃখু দেখতে আসবে? কার দায়?

শুধু নিজেরা দুর্ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট নন মহিলারা, সেই বৌ বেচারীকে যে ছেলেটা একটু মমতার চোখে দেখে আর কানের কাছে বৌয়ের শত শত নিন্দে করে করে তাকেও বিমুখ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা। বিমুখ যদি সত্যিও না হয়, গুরুজনদের মন আর মান রাখতে। বৌয়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা না দেখিয়ে উপায় নেই তার। চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস আছে তো? ভয়ও আছে বৌয়ের. প্রতি দরদ দেখাতে আসবে? মা তাহলে কাশী চলে যাবেন?

ফুলির ঘরের হয়তো এই দশাই হয়েছিল। নইলে তাকে দেখে তো ভালই মনে হয়েছিল।...তার কানে যদি অবিরত নিন্দে ঢালা হয়, তার মনে যদি সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কি করবে সে?

তখন তো আর পুরুষ জাতির সকল সুখ-সুবিধে কেড়ে নিতে 'একাধিক বিবাহের' বিরুদ্ধে বিল পাশ হয় নি?

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!
গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুঁড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ
১০০% খাঁটি হয়
'ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ
জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

একটা রুগিয়ে যাওয়া বৌকে দূর করে দিয়ে আর একটা বৌ আনতে কতক্ষণ?

বৌয়ের ওপর মায়া-মমতা?
বেটা ছেলের?
গলায় দড়ি। গলায় দড়ি।

এই রকমই তো মহিলাদের মতিগতি। দিদির ভাগ্যেও যে ওই রকম হবে না, কে বলবে?

নিজের সম্পর্কে আমার ভয় করে না। সত্যিই করে না।

আমার নিজের ওপর অটল বিশ্বাস আছে। আমাকে আর কারুর পেড়ে ফেলতে হবে না। দিদি যদি আমার দুঃসাহসের এক দশমাংশও পেতো।

ঘরে গিয়ে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে বললাম, দিদি, তোর জন্যে নিজেকে তোর হাঁড়িকাঠে তুলে খাঁড়ার নীচেয় রাখতে চেয়েছিলাম। হল না। খুঁৎওলা পাঁঠা বলি হয় না।'

দিদি মাটিতে বসে কি যেন করছিল পা ছড়িয়ে বসে, বললো 'কি যে দুম দুম করে বলিস এক এক সময়। কোনো মানে আছে?'

মনে দেখাতে পারলাম না, আর কী বলবো! কি করছিস অমন মন দিয়ে?

'কিছু না।'

বলে যেন আড়াল করেই বসলো দিদি।

কিন্তু আমি ছাড়বো কেন?

টপ করে খাট থেকে নেমে পড়ে কাছে গিয়ে দেখি। হায় কপাল।

দিদি তার বহু দিন কিম্মতে পরিত্যক্ত পুতুলের বাক্সটা কোথা থেকে যেন টেনে বার করে গোছাতে বসেছে।

'কী রে দিদি। নতুন করে আবার পুতুল খেলবি না কি?'

দিদি বললো, খেলবো আবার কী, একটু গুছিয়ে রাখছি।'

বলে কেন তাড়াতাড়ি তুলে ফেলতে লাগলো। কেন ঢাকছে। কী রে বাবা, প্রেম-পত্তর-টত্তর নেই তো? আমার অজানতে কিছু হয় নি তো? ফস করে দিদির সেই বিচ্ছিরী পুতুলটায় টান মারি। যার পরণে মার পরণী শাড়ীর ছেঁড়া টুকরো ছিল, মাথায় খুনোর আটা দিয়ে কালো পশম আটকে মস্ত একটা খোঁপা বাঁধা ছিল, গলায় বড় দানা পুঁতির মালা ছিল। দিদির বড় সাধের গিন্নী এটি।

কিন্তু টান মারার সঙ্গে সঙ্গে এক কাণ্ড ঘটলো। ওই পরণী শাড়ির অন্তরালে লুকানো ছোট ছোট দুটো কাঁচের শিশি ছিটকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হলো।

আর সারা ঘর আইডিনের গন্ধে ভরে গেল।

দিদি হঠাৎ খুব রেগে আমার একটা ঠেলা মেরে চাপা গর্জনে বলে উঠলো, 'সব সময় আমাকে জ্বালাতে আসা চাই!'

সব সময় জ্বালাতে আসি আমি। দিদিকে।

অপমানে প্রাণ খান-খান হয়ে গেল। যে দিদির জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা নই, সেই দিদির এই উক্তি?

কিন্তু কখনো তো দিদির মুখে এমন গর্জন শুনিনি। কারণটা কী।

পুতুলের বাক্সেই বা আইডিনের শিশি কেন? আইডিনই তো? না অন্য কিছু?

আস্তে কম ভাঙ্গা শিশির ভগ্নাংশটুকু তুলে দেখলাম।

আইডিনই বটে।

পরিষ্কার করে লেখা রয়েছে আইয়োডিন পয়জন।' তার নীচের বাংলায় লেখা বিষ।

'দিদি!'

দিদি আজে-বাজে করে সব পুরে ফেলে বাক্সটা খাটের তলায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'তুই পূর্ব জন্মে আমার পরম শত্রু ছিলি।'

আমি আস্তে কাঁচগুলো কুড়োতে কুড়োতে গম্ভীর ভাবে বলি, 'পূর্বজন্মে কেন? এ জন্মেই। তোর কত কষ্টে সঞ্চয় করা বিষটা আমি ফেলে ভাঙলাম। তাই ভাবি হঠাৎ হঠাৎ আইডিনের শিশি কোথায় যায়। সেদিন মার আঙুল কেটে গেল, আইডিনটা খুঁজে পাওয়া গেল না। তার আগে একদিন বামুনঠাকুরের পায়ে হামান দিস্তের ডাঁটি পড়ে গেল তুই কোথা থেকে যেন তুলোয় করে এনে দিলি। এখন সব রহস্যই ভেদ হলো। আস্তে আস্তে জমানো হচ্ছে!...হায়রে অবোধ। তুই কি ভেবে আহ্লাদে ডগমগ করছিলি ওই দু' আউন্স আইডিনের জোরে ভবলীলা সাঙ্গ করবি? কিস্যু হবে না দিদি, ওতে কিস্যু হবে না। শুধু ধাউমো সার হবে।'

'ওই দিয়ে কী করবো, তা তোকে বলেছি?'

'নাই বা বললে। পুতুলের বাক্সে বিষ। এর আবার অন্য কী মানে আছে?'

"দিদি কেঁদে ফেলে বললো,
'কেন হতো না? ঠিকই হতো। তুই আমার সব পণ্ড করলি।"

'দিদি, এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি তোর ভালো করলাম না ক্ষতি করলাম।'

ভালো? স্বয়ং ভগবানেরও সাধ্য নেই আমার ভালো করে।'

দিদি শুয়ে পড়লো এসে।

পড়ুক।

আপাততঃ আমার মাথা দিয়ে আহ্লাদের বরফ জল গড়িয়ে পড়লো। আমি অন্তত ঘন্টাখানেক বাঁচবো। দিদির হাতিয়ারটা হাত-ছাড়া হয়ে গেল আজ।

দিন নিজের নিয়মে কাটছে।

দিদি গুম হয়ে কাটাচ্ছে, আমার সঙ্গে কথাবার্তা খুব সংক্ষিপ্ত।

আমি তাতে ভয় পাচ্ছি না, শুধু বাড়ি তল্লাস করে কোথাও কোনো বিষ আছে কিনা খুঁজে সরাচ্ছি। ছিল একটা তেলচিটে শিশিতে আধশিশি মালিশের ওষুধ।

সরালাম সেটা।

এসবের অবকাশে গায়ে-হলুদও হয়ে গেল।

'ওবাড়ী থেকে বাবার দিকের এবং মামার বাড়ির দিকের এযো মহিলাকুল এসে দিদিকে কেন্দ্র করে যতো পারলেন হুল্লোড় করলেন, হাসলেন, হৈ-চৈ করলেন হলুদ মাখালেন নেমন্তন্ন খেলেন এবং বিকেল-বেলার দিকে পান সুপুরি হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন।

যাবার সময় মা সবাইকে ধরে ধরে বললেন, পরশু সকালবেলা থেকে আসতে হবে।

পরশু অর্থাৎ সেই তারিখ।

বিয়ে।

মার ব্যবহারে আহ্লাদের কোনো ঘাটতি দেখছি না আর। উৎসবের রস মাকে উল্লসিত করে তুলেছে। মার নিজের বাড়িতে একটা বিয়ে ঘটছে, মা গিন্নী হয়ে সকলকে আদর আপ্যায়ন করছেন; এর মধ্যে একটা উল্লাস পুলক আছে বৈকি। এইতো প্রথম।

অন্য অন্য বাড়িতে 'এয়ো কামানো'র সময় পান সুপুরির সঙ্গে একখানা করে বড় বাতাসা দেয় মা বাতাসার বদলে এক-জোড়া করে সন্দেশ দিয়েছেন, সবাই এয়োদের মাথায় নারকেল তেল ছোঁওয়ায়, মা সেখানে কুন্তলীনের শিশি এনে বসিয়ে দিয়েছেন, মার আমোদ হবে না?

কিন্তু হয়তো বাবার কথাই ঠিক। নিয়তিই সব।

সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ সেই আনন্দের ওপর পড়লো বাজ।

পুলিশ এসে বাড়ি সার্চ করে দাদাকে ধরে নিয়ে গেল। দাদার ঘরে একখানা গীতা পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই কি কম ডেঞ্জারাস নাকি? গীতার মূল কথা কী?

যুদ্ধের প্ররোচনা নয়?

দাদা বলেছিল, 'আমি এ বিয়েতে থাকবো না।'

নিয়তিই দাদার প্রতিজ্ঞা পালনে সহায়তা করলো। আমরা শুষ্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, দাদা বাবা মাকে প্রণাম করে চলে গেল। আর দিদিকে বলে গেল, 'তোর বিয়েতে থাকবো না' বলেছিলাম বলে ভাবিসনি যেন এসব ষড়যন্ত্রের ফল। হয়ে গেল বুঝলি? মন খারাপ করিস না।'

মুখে আশীর্বাদ করতে জানে না, তাই করলো না।

কপালে হলুদের ছাপ কোরা নতুন পাড় শাড়ী পরা দিদি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

কিছু দিন ধরে 'অমৃত' পত্রিকায় 'বিবাহ-বিচিত্রা' নামে একটি তথ্যবহুল ও কৌতূহলোদ্দীপক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তার মধ্যে গত ২৮শে আষাঢ় ১৩৮০ তারিখের ১০ম সংখ্যাটিতে উক্ত বিভাগের লেখিকা মহারাষ্ট্রীয় বিবাহ প্রথার নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠানের কথা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি এই শুভ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের যেভাবে আহারাদির দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধেও অনেক কথা লিখেছেন।

উক্ত প্রবন্ধটি পড়তে-পড়তে বসন্ত-কুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আর্যাবর্ত' পত্রিকার ১৩১৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা' নামক প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। এটি যে বহুকাল পূর্বের তা সহজেই অনুমেয়। ৬৩ বৎসর পূর্বে যে সামাজিক প্রথা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল, তাতে আজ বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। যদি বর্তমানে কিছু হয়েও থাকে, তাহলেও, এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং পূর্বের এই প্রথা-পদ্ধতি-গুলি আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল নিরসনের সহায়ক হবে।

'মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা' নিবন্ধটি এখানে আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম। এটি তৎকালে চুঁচুড়া হিন্দু সমিতির সাধারণ অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা

ভারতবর্ষের মত জাতিবহুল দেশ জগতে আর কোথাও নাই। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, বেশভূষা, ভাষা, সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন। পাশাপাশি এমন ঘর বাঁধিয়া থাকিয়াও যে আমরা কেহ কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত নহি, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। যে মহারাষ্ট্রীয় গাথা, মহারাষ্ট্রীয় বীরত্ব আজ আমাদের কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মূলীভূত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন পুস্তকে সেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির এমন কোনও বর্ণনা নাই যাহার দ্বারা আমরা এই বিরাট জাতির একদিকও জানিতে পারি।

একটি জাতির সহিত পরিচিত হইতে গেলে নানা দিক দিয়ে তাহাকে দেখিতে হয়। ব্যক্তিগত পরিচয়ে সম্যক বুঝিতে না পারা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে, অথবা সমাজের অধিবেশনে জাতির যেরূপ কৌলিক ও অবিমিশ্র ভাব দেখা যায়, এমন আর কোনও সময়েই লক্ষিত হইবার সুবিধা হয় না।

আমি যে নিমন্ত্রণের কথা বলিতেছি, ইহাও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। এইরূপ প্রথাই যে তাহাদের কৌলিক, তাহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিমন্ত্রণ বা যে কোনও কাজকর্মে পুরনারীগণই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। ইঁহারা বাজারের বা দোকানের খাদ্য যতদূর পারেন বর্জ্জন করেন, এমন কি মিঠাই পর্যন্ত ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। ঘরে প্রস্তুত কথার অর্থে ঘরে ময়রা আনাইয়া প্রস্তুত করান নহে, বাটীর মহিলাগণ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এস্থলে সন্দেশ রসগোল্লার তাদৃশ ধুমধাম নাই, শুধু আছে। ইহার

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
সুখের আড়াল ৫·৫০
অনিল রায়-এর
চাঞ্চল্যকর নতুন উপন্যাস
সোনার পাতায় রক্ত ৮·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আজকের উপন্যাস
তোমার আমার ৪·০০
নীললোহিতের চোখের সামনে ৫·০০
আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস
তরঙ্গহীন ৫·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
সরমা ও নীলকান্ত ৬·০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নতুন উপন্যাস
এক বোন পারুল ৬·০০ বন করবী ৬·৫০
সাহিত্য-সংস্থা, ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

উপর যদি কেহ ক্ষীরের বা ছানার কোনও সামগ্রী প্রস্তুত করিতে চাহেন তবে করিয়া লইতে পারেন। অধিকন্তু ন দোষায়, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ে স্ত্রীলোকের একাধিপত্য।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে সেই সময় সকলে আসিয়া সমবেত হয়েন। ভোজনের পূর্ব্বে বসিয়া থাকার প্রথা ইঁহাদিগের নাই। যদিই অপেক্ষা করিতে হয় তবে খুব সামান্য সময়ই অপেক্ষা করিতে হয়। কারণ, নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সকলেই ব্যস্ত। ভোজনাদিও যথাসম্ভব সত্বর শেষ হয়। বেলা ৯টা হইতে ১২টার মধ্যেই প্রায় সমস্ত শেষ হয়।

আমাদের দেশে যেমন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাটী ফিরিতেই সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হয়েন, এবং দিবসের নিমন্ত্রণ শুনিলেই সেদিন রাত্রিতেও গৃহে আহার বন্ধ করিতে হয়, এস্থলে সেরূপ আশঙ্কার কারণ হয় না।

আমাদের দেশে (অধিকাংশ স্থলেই) ভূম্যাসনে বসিয়াই—মহাসমারোহ ব্যাপারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়, এবং অগ্রে বসিয়া —'পাতা নিয়ে এসো', এদিকে পাতা পড়ে নাই' ইত্যাদি রূপে কোলাহল করিতে হয়, কিন্তু এস্থানে ব্যবস্থা তাহার একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ চা' খড়ির গুঁড়া এবং গুলান (আবীর) দিয়া বর্গ দুই হস্ত পরিমিত এক-একটি রাঙ্গোড়ী (ঘর) কাটিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে এক একখানি (১) পাঠ (পিঁড়), গ্লাস (জলপূর্ণ), থালা বা পাতা পূর্ব্ব হইতেই সাজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কর্ম্মকর্ত্তা এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের নাম ধরিয়া ডাকিবেন, ইহার উদ্দেশ্য, সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছেন কিনা জানা। তখন সকলে বিনা কোলাহলে এক একজন এক একটি টোকা অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত আসন পতা ঘর অধিকার করিয়া বসিবেন। সকলে যখন স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলেন, তখন পুরাঙ্গনাগণ উচ্চৈঃস্বরে হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভোজন পরিবেশন আরম্ভ করিলেন আমাদের দেশের মত পুরুষরা এস্থানে আহার্য্য বিতরণ করেন না। বাটীস্থ পুরুষরাও এই সঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নিন্দিত হইতে হয় না।

প্রথমে লবণ ও চাটনি দেওয়া হয়। চাটনি প্রায় ৪।৫ প্রকারের। আদার, দধির, আচার, কাসুন্দি এবং 'পঞ্চামৃত'। পৃথক পৃথক পাত্রে প্রথমতঃ এইগুলি দেওয়া হয়। 'পঞ্চামৃত' অর্থাৎ আদা, মরিচ, তেঁতুল, চিনি এবং ছোট ছোট করিয়া ভাঙ্গা চিনা বাদাম। এই অমৃত পঞ্চের মধ্যে দ্বিতীয় অমৃতটির প্রাবল্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট।

যেমন লবণ ও চাটনি প্রদত্ত হইল অমনই প্রত্যেক ভোক্তার পার্শ্বে এক একটি উদ্‌বাত্তি (ধূপশলাকা) জ্বালিয়া দেওয়া হইল। অগ্রে ধূপদীপ দুই-ই ছিল, এখন সে প্রথা 'কন্তু' হইয়া শুধু ধূপে দাঁড়াইয়াছে। সুগন্ধে মন প্রফুল্লিত হয়, এবং আহারে রুচি বৃদ্ধি হয় বলিয়া এরূপ ধূপ দীপ দেওয়া হয়। এই সময় ভোক্তৃগণ সকলে তারস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন—

'হরির্দাতা হরির্ভোক্তা
হরিরন্নং প্রজাপতিঃ।
সোঽহি সর্ব্বাত্মা ভোক্তাচ
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে হরি।।'

এই শ্লোকটি সকলে উচ্চৈস্বরে গান করিলে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। প্রথমে চাটনি দেওয়ার পর যত প্রকার তরকারী থাকিবে, সমস্ত দেওয়া হইবে, তাহার পর পাঁপর ভাজা, কুড়ডাই ও সমস্ত প্রকার ভাজা পরিবেশিত হয়। কুড়দাই — ময়দা (জিলাপির আকার করিয়া) ঘৃতে ভর্জ্জিত হয়, জিলাপি শেষে রসে ফেলিয়া মিষ্টি করা হয়। কুড়ডাই রসে ফেলা হয় না। তাহার পর পুরী। যেমন পুরী পর্য্যন্ত দেওয়া হইল, অমনি সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তারপর লাড্ডু, কাঢ়ি (ঘোলের তরকারি) ও শ্রীখণ্ড। শ্রীখণ্ড বস্তুটি অতিশয় তৃপ্তিদায়ক, দধি ও চিনি একত্র মিলাইয়া জাফরান মিশ্রিত করিয়া একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ। এই গেল ভোজন পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়।

এগুলি যেমন খাওয়া শেষ হইল, অমনই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রথমে আবার কাঢ়ি আসিল, তারপর বাঙ্গালীর জীবন ভাত, কিন্তু অতি সামান্য পরিমাণে, এক হাতা কি দেড় হাতা। মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের 'শত অন্ন' মাত্র। তাহার পর ডাল ও ঘৃত। ঘৃতও এক হাতা পরিমাণ।

এই ত গেল ভোজ্য দ্রব্যের নাম ও প্রকার। ইহার মধ্যে কিছু বেশী বা কিছু কমও হইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ এই-গুলিই হইয়া থাকে। এই স্থলে এই কথাটি বলিয়া রাখি, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা সকলেই নিরামিষাশী, এমনকি, ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেও অনেকগুলি শাখায় মৎস্য মাংস ব্যবহৃত হয় না।

আমাদের দেশের প্রথা যেমন পরি-বেশকগণ যথেচ্ছ পরিবেশন করিয়া কাজ সারিয়া যায়েন, কোনও পাতে কোনও দ্রব্য অতিশয় কম পড়িল, কিম্বা কোনও পাতে পড়িয়া নষ্ট হইল, এস্থলে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পৌরাঙ্গনাগণ প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে পরিবেশন করেন, তাহার পর যাঁহার যত ইচ্ছা, তাঁহাকে তত দেওয়া হয়। একেবারে উপর্য্যুপরি ভাতের পর ডাল, ডালের পর তরকারি দিয়া ভোক্তাদের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া ধীরে ধীরে এক একটি করিয়া আহার্য্য বিতরণ করা হয়। অনেকে লাজুক থাকিতে পারেন, তাঁহারা একেবারে অধিক পরিমাণে কোনও জিনিষ পাতে রাখিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং অনেক সময় আহারেও অসুবিধা হইতে পারে। কিম্বা পাতে পড়িয়া বৃথা নষ্ট হইবে বলিয়া এস্থানে সকল দ্রব্যই অল্প পরিমাণে বিতরিত হয়। পরিবেশিকা পৌরাঙ্গনাগণ নির্ব্বারোধে আদৃত ভদ্রমণ্ডলীকে অন্ন-পূর্ণারূপে খাদ্য বিলাইবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন না। বাটীস্থ ব্যক্তবর্গ মধ্যস্থ হইয়া নিমন্ত্রিতগণের অভাব জ্ঞাপন ও মোচন করেন।

আমাদের দেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ একে একে নিমন্ত্রক মহাশয়ের বাটীতে চরণরেণু প্রদানকরতঃ চন্দ্রাতপনিম্নে বসিয়া ভোজনের পূর্ব্বে তামাক সেবন করেন, কিন্তু ভোজনান্তে সকলেই ক্ষুত্তসমস্ত হইয়া (এমন কি মুক্ত কচ্ছ হইয়া) গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে ব্যস্ত হয়েন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথা ইহার ঠিক বিপরীত। ভোজনান্তে সমস্ত আমন্ত্রিত ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিবেন। সেস্থানে থালাভরা পান ও অন্যান্য পাত্রে কাটা সুপারি, ধনের চাব, লবঙ্গ, এলাচি ইত্যাদি প্রস্তুত থাকে। এই স্থানে আমার ধূমপায়ী পাঠক ভাবিতেছেন যে, এক ছিলাম তামাক হইলে বড় ভাল হয়, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা ধূমপানকে অতিশয় ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। তবে ধূমপায়ীও আছেন, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। আহারান্তে তাম্বুলচর্ব্বনে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয়, ইহাতে বেশ বিশ্রামের কাজ হয়। তাহার পর নিমন্ত্রক-গণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে যথাযোগ্য প্রণাম, সম্মান ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি লেপনপূর্ব্বক বিদায় দিয়া থাকেন।

ভোজনান্তে এরূপভাবে বিশ্রাম করিবার কারণ, আমার বোধ হয় নিমন্ত্রকের বাটীস্থ পুরুষরাও এক সঙ্গে ভোজন সমাপন করেন, কাজেই সকলে মিশিয়া বেশ বিশ্রম্ভালাপ করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশে নিমন্ত্রিতগণ যদি আহারের পরও মজলিশ করেন, তবে হয়ত নিমন্ত্রক-দের ভোজনেও অনেক বিলম্ব হয়, কারণ সকলকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা খান না— প্রথা নাই, এই জন্যই বোধ হয় সকলে সত্বর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমাদের দেশেও যেমন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির পৃথক পৃথক ভোজনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় মহারাষ্ট্রীয় দেশেও সেই-রূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

—কপর্দ্দক

---

(১) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা আসনে বসিয়া অন্ন গ্রহণ করেন না। কারণ, যদি সূতার আসন হয় তবে অশুচি। লোমের হইলেও তাঁহারা অশুচি বলিয়া জ্ঞান করেন। কাজেই তাঁহারা আসনে বসিয়া ভোজন করিলে নিষ্ঠাহানি হয় বিবেচনা করেন। কিন্তু আমাদের মত ইঁহাদের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান নাই।

হিপির কান্না

সৌমেন মুখোপাধ্যায়

সত্যিই ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। হ্যাঁ অদ্ভুতও বটে আবার কিম্ভূতও। যদিও সমস্ত ব্যাপারটাই একটা গবেষণার বিষয়, তবে ওই গবেষণা-টবেষণা আমার দ্বারা হয় নি, আর সুদূর ভবিষ্যতে হবে বলেও কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। তাই ছোট্ট আর মারাত্মক ঘটনাটা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করতে পারলেই আমি রেহাই পাব। তারপর আপনারা যাঁরা গবেষণা করতে চান করুন কিম্বা রহস্যোদ্ঘাটন করতে চান তাও করতে পারেন। তবে আমাকে আর জড়াবেন না।

এই কলকাতায় শহরে সকাল থেকে শুরু করে চব্বিশ ঘণ্টার পরের সকাল পর্যন্ত সব অদ্ভুত কিম্ভূত ঘটনা ঘটে চলেছে। আর আমরাই তার সাক্ষী। তাই নয় কি?

আচ্ছা, যদিও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী না হোক, তবে এটা শোনা যায় যে, সংসারের সমস্ত কিছুর উপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে শান্তি খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে এই হিপিরা। শান্তি পেল কি পেল না তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কিছুই নেই। তবে এই সমস্ত অদ্ভুত দর্শন হিপি নামক মানুষগুলোকে দেখলেই আমরা কিরকম কিম্ভূত কিমাকার চিন্তা করি বোধ হয়। এই হিপিরা যদি হাসে তাও অদ্ভুত, হিপি যদি নাচে তাও অদ্ভুত, হিপি যদি থাক্ক তাও অদ্ভুত এবং হিপি যদি কাঁদে তাও...। না না সে কি করে হয়? তারা ত সংসারের ওপর থেকে সমস্ত মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, তবে কাঁদবে কেন? তার কি এমন হয়েছে যে সে কাঁদবে?

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো ঘণ্টার বাস্তবতায় পরিপূর্ণ ডালহৌসী স্কোয়ারের মস্ত বড় পোস্ট অফিসটার নীচে একটা বেশ মস্ত বড় জটলা দেখে স্বভাবমত সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। কলকাতার নানারকম আশ্চর্যজনক ঘটনার মত এটা নিশ্চয় কোন আশ্চর্যজনক কিছু নয় যে এই ভরদুপুরে কাঠফাটা গরমের মধ্যে ঘামে সেদ্ধ হতে হতেও সকলে নিশ্চয় উজবুক ধরনের কিছু দেখছে! নিশ্চয় সমস্ত বাসিন্দাদের মত আমিও আমার স্বভাবটাকে চাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলে এগিয়ে গেলাম ওই দিকে। ব্যাস, ওখানে গিয়েই যা হয়, অন্যান্য সকলের মত আরম্ভ করে দিলাম ঠেলা-ঠেলি। এই গরমে অজস্র ধারায় ঘাম ঝরছে আর প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে ঠেলে অন্যের মত আমিও সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলাম। আমার মত সকলেই ঠেলছে আর মুখে অনর্গল জিজ্ঞাসা করে চলেছে—কি হল দাদা? এখানে কি হয়েছে কি?' আমও স্বর-লিপিটা ভুল করলাম না। আসল বস্তুটি যে কি অথবা আসল ঘটনা যে কি সেটা তখনও জানি না। কারণ এগোতেই পারি নি যে দেখতে পাবো কিছু। সবাই ঠেলছে তাই আমিও ঠেলছি, সবাই বলছে তাই

আমিও বলছি। নিশ্চয় সামনে রসাল কিছু আছে।

কলকাতার শহর একটা মাদারীর খেলার জায়গা। তাই কোন কিছুতেই বা অল্প কিছুতেই ভিড় হয়ে যায়। এখানকার মানুষ মজা উপভোগ করে বা উপভোগ করার খোরাক খুঁজে বেড়ায় সমস্ত কিছুর মধ্যেই। এ শহর যেমন আজব এখানকার বসবাসকারী লোকেরাও আরও আজব।

হঠাৎ দেখি একটি ছেলে ভিড়ের মধ্যে ঠেলা দিয়ে প্রাণপণে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমিও, সেই গোল্ডেন অপার-চুনিটিটা না ছেড়ে তাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করতে লাগলাম এবং সেই গ্যাপ-টাকে ফিল-আপ করতে লাগলাম। জিজ্ঞাসা করতেও ভুললাম না—এই যে ভাই কি হচ্ছে কি?'

ছেলেটি আমার অদ্ভুত জিজ্ঞাসায় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল—হিপি কাঁদছে—আর—হিপিনি সান্ত্বনা দিচ্ছে।

অ্যাঃ ঃ সে কি রে! হিপি কাঁদছে! হিপি কাঁদবে কেন? এত বড় আজব ব্যাপার! এইরকম নানা ধরনের প্রশ্ন করতে করতে পিছনের সারির দর্শকরা দেখি দেখি করে ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিল আর সামনের সারির দর্শকদের মধ্যে একটা কোলাহল উঠল—আঃ কি হচ্ছে কি দাদারা? একটু আস্তে। দেখবেনই ত এত ব্যস্ত হবার কি আছে?

কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন দেখি! হিপি কাঁদছে আর আমরা হাঁ করে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। কত মানুষই ত কাঁদে, কই কখনও ত আমরা একবারও ত দাঁড়িয়ে দেখি না? যেহেতু সাদা চামড়ার লোকটা কাঁদছে তাই আমরা দেখছি। যেন তারা কাঁদলেও অদ্ভুত কিছু সৃষ্টি হয়! পাগল কে নয় বলতে পারেন? আমি, আপনি বা আর সকলে যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি তারা প্রত্যেকেই বোধ করি কিছু-না-কিছু ছিটগ্রস্ত। এ যেন চিড়িয়া-খানার জন্তু দেখা! হয়ত বলবেন হিপিরা আসল জন্তু না হোক তবে মানুষরূপী জন্তু।

কি আর করি। এদিকে-ওদিকে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো ভদ্রলোককে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—দাদু কি হয়েছে কি? ওরকমভাবে ও কাঁদছে কেন?

কাস, আর যায় কোথা? একে এই গরম তার ওপর এই ধরনের কথা? দাদু সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসারের পারাটা চড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—আমি কি জানি? ওরা কি আমার ফ্যামিলির কেউ হয় নাকি?

অঃ হাঃ, না হয় কেউ হল না। তাই বলে অত চটছেন কেন?

না আমি জানি না। বলেই তিনি গট-গট করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেলেন।

সত্যিই ত জানবেনই বা কি করে বা বুঝবেনই বা কি করে! এ যে রহস্যময় কান্না, একেবারে বিদেশী কান্না। একেবারে সদ্য আমদানীকৃত কান্না। তাই বোঝা খুবই দুষ্কর। এই সব সাত-পাঁচ ভাবছি। এরই মধ্যে একজন লোক হঠাৎ বলে উঠলেন—'ওর বাবা মারা গেছে, তাই কাঁদছে।'

বাস, আর যায় কোথা? এতক্ষণ ধরে এই গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাবলিক ত এই রকমই একজন লোক খুঁজছিল! সমস্ত জোড়া চোখগুলো হিপিদের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে একেবারে সোজাসুজি দৃষ্টিপাত করল ওই লোকটির ওপর। ঘিরে ফেলল সকলে মিলে। শুরু হল এক এক করে প্রশ্ন আর তার উত্তর। এতগুলো লোক যে কথা বলার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল এখন তা বোঝা গেল।

ওর বাবা মারা গেছেন?

হাঁ।

কি করে মারা গেলেন?

জানি না।

কবে মারা গেলেন?

জানি না।

কেন মারা গেলেন?

জানি না।

ভিড়ের মধ্যে একজন চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছিল? অসুখ না হার্টফেল?

জানি না তো।

আর একজন আর একদিক থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি প্রত্যক্ষদর্শী?

ছোট্ট অথচ কাঁপা গলায় উত্তর—না।

আপনি কি করে বুঝলেন যে ওর বাবা মারা গেছেন?

ওই যে ওর হাতে চিঠিটা রয়েছে, ওটা পড়েই ও কাঁদতে আরম্ভ করে দিল।

ভদ্রলোকের উত্তর দেবার ভঙ্গী দেখে মনে হল বোধ হয় আর একটু বাদে উনিও কাঁদবেন। কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলে লোকটিকে ধরে জেরা করতে আরম্ভ করে দিল। একেবারে পুলিশের জেরা। ভদ্রলোক পালাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু পালাতে দেবে কে? ওঁর অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ওঁনার অবস্থাও ধীরে ধীরে হিপির রূপ নিতে আরম্ভ করেছে। এই কাঠফাটা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ওই জেরার চোটে ঘামতে ঘামতে একেবারে স্নান করে ফেলেছেন আর মাথার চুলগুলো চোখে মুখে ঝুলছে।

আবার শুরু হল প্রশ্ন—

আচ্ছা দাদা আপনিই কি চিঠিটা ডেলিভারী দিয়েছিলেন?

ভদ্রলোক প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাবে গর্জে উঠলেন—আমি কি পিওন?

ছেলেগুলিও আরও মোলায়েমভাবে জিজ্ঞাসা করল — তবে আপনি জানলেন কি করে?

ওরা পড়ছিল।

কি পড়ছিল?

তা কি করে বলব কি পড়ছিল। হঠাৎ পড়তে পড়তে কাঁদতে শুরু করে দিল। তাই ভাবলাম হয় বাবা কিংবা মা মারা গেছেন, তাই ওরকমভাবে কাঁদছে।

ওঃ এই ব্যাপার! তা আপনি কি করে বলেন বাবা মারা গেছেন? মা-ও ত মরতে পারে?

ভদ্রলোক এবার আর কোন উত্তর দিলেন না দেখে ছেলেগুলো প্রশ্ন করলো—আপনি কি ওর বাবাকে দেখেছেন?

এবার আর ভদ্রলোক থাকতে না পেরে —ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন আর বললেন — আমাকে ক্ষমা করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আর বলব না। এই নাকে খৎ দিচ্ছি। বাস ছেলেগুলি ভদ্র-লোককে এইরকম পাঁজাকোলা করে তুলে ধরেই ওই হিপির পাশে বসিয়ে দিলে।

কি দৃশ্যটা বলুন ত? একজন বিদেশী হিপি কাঁদছে আর তার পাশে একজন দেশী হিপি কাঁদছে। একজনের কান্নার কোন কারণ জানতে পারা যাচ্ছে না, আর একজন কাঁদছে ভয়ে আতঙ্কে।

ঠিক এই সময়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে ঠ্যালা দিয়ে বেরিয়ে এসে এক বুড়ো ফোকলা দাঁতে চিৎকার করে বলে উঠলেন—এ্যাই, এ্যাই ব্যাটাচ্ছেলেরা, কি হয়েছে কি তোদের?

হিপিটা কিছু বুঝতে পারল কি না জানি না। তবে এইরকম ভরদুপুরে ওই-রকম সুরেলা গলার চিৎকারটা ঠিক ওর কাছে ভাল ঠেকল না! তার ওপর তার পাশে এসে বসা সদ্য ভারতীয় হিপিকে দেখে সে যেন একটু অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তা করতে লাগল।

বৃদ্ধ আবার গলা খাঁকারী দিলেন—সব কিছু ছেড়েই ত বাবা উদাসী হয়ে দেশ থেকে বেরিয়েছে। তখন মনে ছিল না? এখন আবার কান্না পায় কেন? যত সব উদ্ভট-কিম্ভূতের আবির্ভাব।

কথাটা শেষ করেই মুখ দিয়ে একটা হুঁঃ শব্দ করে গট গট করে চলে গেলেন। আর হিপিটা কিছু বুঝল কি না সেটা বুঝলাম না—তবে হিপি আর হিপিনি দুজনে দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সকলের দিকে একবার তাকাল আর তার পাশে বসে থাকা লোকটিকে দেখে নিয়েই নির্বিকার চিত্তে হাঁটতে শুরু করল! যেন ওদের কিছুই হয় নি। কিসের জন্য কাঁদল তা আর বোঝা গেলই না আর কেন যে কান্না উবে গেল তাও বোঝা গেল না।

শুধু হিপির পাশে বসে-থাকা লোকটা তখন হিপিগুলোর দিকে আর লোক-গুলোর দিকে চুলের ফাঁক দিয়ে জ্বল-জ্বল করে তাকিয়ে রইল।

আপনি কেমন আছেন

পেটের অসুখ

শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রাচ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই বেশির ভাগ মানুষ আজকাল অসুস্থ হন পেটের অসুখে, ফুস-ফুসের ব্যাধিতে এবং জ্বরে। বিশেষ করে শিশুদের অকাল মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হল পেটের অসুখ; তাতে ইন্ধন যোগায় অপুষ্টি।

অথচ দুরন্ত রক্ত আমাশা, দূষিত খাদ্যের বিষক্রিয়া কিংবা কলেরার মত মারাত্মক কিছু না ঘটলে পেটের অসুখকে সাধারণত বিশেষ পাত্তা আমরা দিই না। প্রথমদিকে চলে গাঁদাল-থানকুনি-কাঁচকলার ঝোল, ভাত বা চিঁড়ের মণ্ড, বার্লি ইত্যাদির সঙ্গে যার যেমন জ্ঞানের বহর সেইমত গৃহ-চিকিৎসা বা আত্মচিকিৎসা। তাতে না সারলে টুকিটাকি তথাকথিত হোমিওপ্যাথি। তাতেও কুল না পেলে খবরের কাগজে বা মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পড়ে শেখা এটাসেটা পেটেন্ট ওষুধ। তাও নিয়ম মাফিক নয়। ফলে রোগটা পুরান বা ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায়, দেখা দেয় নানা উপসর্গ। এদিকে পথ্যের নামে অর্ধাহার কিংবা কুপথ্য দেওয়ার সংস্কার রোগকে অনেক সময় আরও জটিল করে তোলে। এবং এই জটিলতা বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় শিশুদের ক্ষেত্রে। শেষ পর্যন্ত পেটের অসুখের মত সাধারণ অসুস্থতার অকালমৃত্যু যদি নাও হয়, রোগজীর্ণ স্বাস্থ্যহীন ভবিষ্যৎ অবধারিত।

পেটের অসুখ বলতে সাধারণত বোঝায় বারবার পাতলা দাস্ত, সঙ্গে কখনো শ্লেষ্মা কখনো বা শ্লেষ্মা ও রক্তপাত, পেটে ব্যথা বা অস্বস্তি, দুর্বলতা, জ্বর বা অন্যান্য উপসর্গ। চলতি কথায় মিউকাস বা শ্লেষ্মাকে বলা হয় আমাশার উৎপত্তি অন্ত্রের গায়ে শ্লেষ্মাঝিল্লীর প্রদাহ থেকে। আমাদের অন্ত্রের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রচুর ব্যাকটিরিয়া বা বীজাণু থাকে যেগুলো দেহের পক্ষে হানিকর নয়। পেটের অসুখের উৎপত্তি হয় যখন বাইরে থেকে কতকগুলো রোগ সৃষ্টিকারী বীজাণু, কীটাণু ও ক্রিমি অন্ত্রে ঢুকে অন্ত্রের গায়ে প্রদাহ ও ক্ষত সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত খাওয়ার বা খাওয়ানর ত্রুটিতে বদহজম হয়েও পেটের অসুখ সৃষ্টি হতে পারে। তৃতীয়ত, পাচন ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু দেহযন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যেও পেটের অসুখের লক্ষণ দেখা যায়।

পেটের অসুখ সৃষ্টিকারী বাহিরাগত এজেন্টগুলি খালি চোখে দেখা যায় না, ধরা পড়ে অণুবীক্ষন যন্ত্রে। মল পরীক্ষায়। মানব দেহে তাদের অনুপ্রবেশ ঘটে দূষিত জল ও খাদ্য, অপরিচ্ছন্ন হাত ও থালা-বাসন এবং মাছির মারফৎ। মোটকথা, পেটের অসুখ হতে পারে নানা কারণে এবং রোগের উৎস বা বাহক অনুসারে তাদের চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন। ব্যাধির পূর্ণ ইতিহাস না শুনে, রোগীকে এবং রোগীর মল পরীক্ষা না করে সুচিকিৎসা শুধু কঠিন নয়, ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে।

কীটাণু সংক্রমণ কীটাণু সংক্রমণে পেটের অসুখ দেখা যায়, সাধারণত দুই ধরনের—(১) অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রী, (২) জিয়ার্ডিয়াসিস। অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রী বা এক জাতীয় রক্ত-আমাশা হয় এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা নামক কীটাণুর আক্রমণে। জিয়ার্ডিয়াসিসের উৎপত্তি জিয়ার্ডিয়া ল্যামবলিয়া কীটাণুর থেকে। অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রীতে ঘন ঘন শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত মল ত্যাগ হয়, জিয়ার্ডিয়া সংক্রমণে দাস্ত হয় বদহজমের মত। এছাড়া ট্রাইকোমোনাস নামে পরিচিত আর এক জাতের কীটাণুর আক্রমণ দাস্ত হয় তরল অথবা আধা তরল; কীটাণু সংক্রমণের তীব্রতা এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লীর প্রদাহ অনুপাতে মলের সঙ্গে শ্লেষ্মা বা আম থাকতে পারে, নাও পারে।

কোলাইটিস নামে যে কঠিন আমাশা রোগ সারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, তার সঠিক কারণ আজও অজানা। অনেক সময় কোলাইটিস রোগীর মলে এন্টামিবা কোলাই কীটাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। কারও কারও মতে কোলাইটিসের উৎপত্তি স্নায়বিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণে; আবার কেউ কেউ মনে করেন, আপাত নিরীহ কোলাই কীটাণু ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত স্নায়বিক কারণেই ব্যাধির এজেন্টে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। কারণ যাই হোক, ক্রনিক অ্যামিবিয়াসিসের মত ক্রনিক কোলাইটিসেও অন্ত্রের গায়ে শ্লেষ্মাঝিল্লীর বিস্তৃত প্রদাহ এবং ক্ষত সৃষ্টি হয় বলে মলের সঙ্গে শুধু শ্লেষ্মা কিংবা শ্লেষ্মা ও রক্ত দেখা যায়।

অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রী, জিয়ার্ডিয়াসিস এবং ক্রনিক কোলাইটিসের চিকিৎসা তাদের উৎপত্তির কারণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন।

বীজাণু সংক্রমণঃ বীজাণু ঘটিত পেটের অসুখ যা সব দেশেই কমবেশি দেখা যায় তার নাম ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রী। উৎপত্তি সালমোনেলা শীগা ও ফ্লেকসনার উপজাতীয় বীজাণু থেকে। এ হল আর এক ধরনের রক্ত-আমাশা। অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রীর মতই বারে বারে শ্লেষ্মা ও রক্ত মিশ্রিত দাস্ত হলেও চিকিৎসা কিন্তু এক রকম নয়, আলাদা। অন্ত্রের যক্ষ্মাতেও আমাশার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে, এবং যক্ষ্মা বীজাণু যেসব ওষুধে ধ্বংস হয়, এক্ষেত্রেও সেইগুলিই প্রযোজ্য। চলতি ধারণা অনুসারে ঠিক পেটের অসুখ হিসাবে গণ্য না হলেও

—একটি আনন্দ সংবাদ—

বাংলা রহস্যোপন্যাস-জগতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে বইটি আলোড়ন এনেছে

কল্লোল সেনগুপ্তের

সেই শিহরণময় অপরাধ-উপন্যাস

ডামি ৭

হিন্দী ও গুজরাটি ভাষায় অনুবাদের জন্য বিবেচিত হয়েছে।

• বইটি সর্বত্র পাবেন •

কসমো-ডিক্সপ্ট

১১, নিতাইবাবু লেন, কলিঃ-১২

কলেরা (এবং টাইফয়েডও) বীজাণু ঘটিত অন্ত্রের রোগ; এজেন্ট-কোমা ও সালমানেলা সইফী ব্যাসিলাস। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে ঘন ঘন পাতলা দাস্ত বা তার সঙ্গে রক্তপাতের লক্ষণ দেখা যায়। আগে মনে করা হত, তার কারণ বুঝি কোন বিষক্রিয়া রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি। এখন ধরা পড়েছে, কোন কোন মারাত্মক রোগ বীজাণুও এই বিষক্রিয়া সৃষ্টিতে সহযোগীর ভূমিকা নিয়ে থাকে।

কৃমি সংক্রমণ: সুস্পষ্ট পেটের অসুখ বা বারে বারে পাতলা দাস্ত না হলেও কতকগুলি কৃমি সংক্রমণে বদহজম, পেট-ব্যথা, অ্যানিমিয়া, অপুষ্টি ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণত যেসব কৃমি, পৈটিক গোলযোগ ঘটায় তারা হল—রাউন্ড-ওয়ার্ম, পিন-ওয়ার্ম, হুইপ-ওয়ার্ম ও টেপ-ওয়ার্ম। মাঝে মাঝে মলের সঙ্গে পরিণত দেহী কৃমিগুলি দেখতে পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের ডিম। কীটাণু ও বীজাণুর মত এই সব ডিম ধরা পড়ে অণুবীক্ষণে। তাদের চিকিৎসাও পৃথক।

বদহজম: শুধু কৃমি-কীট-বীজাণু সংক্রমণে নয়, খাওয়ার বা খাওয়ানর ত্রুটিতেও পেটের অসুখের প্রকোপ আমাদের দেশে যথেষ্ট ব্যাপক। বিশেষ করে শিশুর খাদ্যে চর্বি বা শর্করার আধিক্য ঘটলে পাতলা ফেনাফেনা সবুজ বা পীতাভ-সবুজ দাস্ত হতে পারে। মায়ের দুধ ছাড়ানর পর শিশু খাদ্যে প্রোটিনের অভাব থেকে যে কোয়াসিয়রকর রোগ হয়ে থাকে, তার অন্যতম লক্ষণ হল পেটের অসুখ। তেমনি স্নেহজাতীয় খাদ্য হজম করতে না পারার জন্যেও ছানাকাটা তরল বা আধা-তরল দাস্ত হওয়া সম্ভব। শিশুদের দুধ বারে বারে ফোটালে স্নেহপদার্থ বিষক্রিয় হয়ে এমনি বদহজম সৃষ্টি করে থাকে। আবার অন্ত্রের মধ্যে পিত্তের প্রবেশ কোন কারণে ব্যাহত হলেও স্নেহপদার্থের পরিপাক ব্যাহত হয়ে একই রকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। খাওয়ার পরই যাদের পাতলা দাস্ত হয়, সন্দেহ করা যেতে পারে, কোন কারণে তাদের পাকস্থলীতে পাচক রসের ক্ষরণ কম হচ্ছে বলে খাদ্য দ্রুত নেমে আসছে বা বদহজম হচ্ছে। প্যাংক্রিয়াসের ক্ষরণ কমে যাওয়াও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাশা বা বদহজমের যে লক্ষণ দেখা যায় তার আসল কারণ হয়ত শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের আধিক্য কিংবা স্নেহ-পদার্থ পরিপাকে অক্ষমতা। কোলাইটিসের কথা আগেই বলা হয়েছে। অত্যধিক আবেগপ্রবণ কারও কারও দেখা যায় মানসিক উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কোন কারণ ঘটলেই ঘন ঘন পাতলা দাস্ত হচ্ছে। একে বলে নার্ভাস ডায়ারিয়া—যার কারণ স্নায়বিক। অন্ত্রের ক্যানসারও পাতলা দাস্ত একটি উপসর্গ। বলা বাহুল্য এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে চিকিৎসা পদ্ধতি পৃথক হতে বাধ্য, পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক।

মোট কথা, পেটের অসুখের লক্ষণ দেখা দিলেই যাঁরা আমাশার বড়ি খেয়ে রোগ দমনের চেষ্টা করেন, তাঁরা ভুলে যান যে রোগের কারণ অনুসন্ধান না করে এই ধরনের আত্মচিকিৎসা রোগকে অযথা জটিল ও কঠিন করে তোলে।

পথ্য: আগেই বলা হয়েছে, পেটের অসুখ অনেক সময় জটিল হয়ে পড়ে কঠোর খাদ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে ভুল পথ্য দেওয়ার জন্যে। পেটে ব্যথা ও অস্বস্তি, অক্ষুধা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মলত্যাগের বেগ অনুভব করায় রোগীও খেতে ভয় পায়। পুরান পেটের অসুখের রোগীরা তাই প্রায়ই দেখা যায় শীর্ণ, বিবর্ণ, দুর্বল ও খিটখিটে স্বভাবের।

রোগীকে পথ্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুধু ক্ষুধা মেটান নয়, তার স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া চালাতে, ক্ষয় পূরণ করতে এবং রোগের বিরুদ্ধে লড়াইতে বাড়তি শক্তি অর্জন করতে সাহায্য করা। অর্থাৎ অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকার পরিবর্তে ওষুধের সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দিতে হবে সহজপাচ্য, পুষ্টিকর এবং কিছু বাড়তি ক্যালরী সম্পন্ন খাদ্য ও পথ্য। রোগ ও রোগীর বিশেষ অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে পথ্য নির্ধারণ করা উচিত চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে। তা সত্ত্বেও পেটের অসুখের পথ্য সম্পর্কে কয়েকটি মূল নীতি মনে রাখা ভাল।

(১) বার বারে বারে পাতলা দাস্ত হচ্ছে, স্বভাবতই তার শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুত হারে। সুতরাং এরকম অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে তরল খাদ্য দিতে হবে ঘন ঘন।

(২) জলের সঙ্গে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম লবণও বেরিয়ে যায় বলে দেহে জল ও লবণের সমতা নষ্ট হয়, পেশীর টান কমে যায়, দেখা দেয় বমি অক্ষুধা এবং আরও নানা রকম উপসর্গ। সুতরাং রোগীকে দিতে হবে টাটকা ফল বা ফলের রসের মত বা ডাবের জলের মত পটাসিয়াম লবণযুক্ত পথ্য।

(৩) একজন বয়স্ক সুস্থ মানুষের দৈনিক ক্যালরীর প্রয়োজন যদি হয় ২৭০০ তবে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তার পথ্য হওয়া উচিত দিনে ৩০০০ ক্যালরীর সমান।

(৪) পেটের অসুখে যেহেতু অন্ত্রের প্রদাহ ও ঘা হওয়ার জন্যে প্রোটিন অবশোষণে ব্যাঘাত ঘটে অথচ তার ক্ষয় পূরণের জন্যে প্রোটিন যেহেতু একান্ত প্রয়োজন, তাই সহজপাচ্য প্রোটিন—যেমন আধাসিদ্ধ ডিম, নরম মাছ বা সুসিদ্ধ মাংসের কাথ দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

(৫) দুষ্পাচ্য শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য কমিয়ে বা প্রয়োজনবোধে বন্ধ করে দিতে হবে কিংবা ভাল করে সিদ্ধ করে দিতে হবে। আঁসযুক্ত সবজি হজম করা শুধু কঠিন নয়, তাতে পেটের অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা। বার্লি পেটের অসুখের পথ্য হিসাবে অনুপযুক্ত।

(৬) শিশুদের দুধ বন্ধ করা চলবে না। খাঁটি দুধ হজম করতে না পারলে মাখন তুলে বা তরল ছানা কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। চিনি বা মিষ্টি বেশি দিলে পেটে গ্যাস হতে পারে।

(৭) পেটের অসুখে লোহা ও ভিটামিন আত্মস্থ করার ক্ষমতা কমে যায় বলে সবুজ সবজি সিদ্ধ এবং টাটকা ফল দেওয়া উচিত পরিমিত পরিমাণে।

(৮) একসঙ্গে বেশি না খাইয়ে পথ্য দেওয়া উচিত বারে বারে।

(৯) কঠোরভাবে একঘেয়ে পথ্য না দিয়ে পুষ্টিকর খাদ্যের বিস্তৃত তালিকা থেকে রোগীর পছন্দ মত পথ্য রান্না করা উচিত। কোলাইটিসের রোগীরা যেহেতু খাদ্য সম্পর্কে অতি সতর্ক হয়ে নিজেই নিজের অপুষ্টি করে থাকেন, তাই তাঁদের মনে এই আস্থা ও সাহস ফিরিয়ে আনা দরকার যে পুষ্টিকর পথ্য তাঁদের পক্ষে ওষুধেরই কাজ করবে।

পেটের অসুখ এমনিতে মারাত্মক নয়, কিন্তু অবহেলায় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হতে পারে।

—অশ্বিনী সামন্ত

কিছুই বলা যায় না

ইবনে ইমাম

এই আজব শহর কলকাতা নামক প্রকাণ্ড গোলকধাঁধার অনেক গলি, অনেক রাস্তা। তারই একটি রাস্তার নাম হগ্ স্ট্রীট। সে রাস্তা আপনারা সবাই চেনেন। আর সেই হগ্ স্ট্রীটে আমার বন্ধু আব্দুর রশীদের অফিস। ট্রাভেল এজেন্টের অফিস। তাই হগ্ স্ট্রীটে আমার প্রায় নিত্য আনাগোনা। কারণ, আমার আর রশীদের দিনে অন্তত একবার দেখা না হলেই চলে না। পুরনো জুতো আর মনের মতো বন্ধুর চেয়ে এমন আরামের জিনিষ আর কী আছে আমি জানি না।

সেদিন দুপুরবেলায় অফিসে বসে আব্দুর রশীদ আর আমি গল্প করছি, এমন সময় বেশ ঝকঝকে চকচকে একজোড়া দম্পতির আবির্ভাব হল।

লোকটি বড্ড বেশী কালো। চেহারাটাও মোটেই সুশ্রী নয়। তার উপর বড্ড মোটা। কিন্তু বেশ ভালো স্যুটবুটে ঝকঝকে। বৌটি খুবই সুন্দরী। ফর্সা। অল্প বয়েসী। বর্ষার নতুন চিকন লতাটির মতো ছলছলে, ঝলমলে।

আব্দুর রশীদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে এহ্‌তেশাম, এস, এস।' আমি বসে বসে তোমারই অপেক্ষা করছি। তোমার জাহাজের বুকিং হয়ে গেছে। এই মাসের কুড়ি তারিখে তোমার জাহাজ ছাড়বে। এই নাও তোমার টিকিট।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ওহো, তোমাদের আলাপ নেই, না? এ হচ্ছে আমার বন্ধু এহ্‌তেশাম

হোসেন আর এ হচ্ছে ও'র স্ত্রী মিসেস নাজমা হোসেন। এরা একেবারে নতুন বিবাহিত বললেই চলে। মাত্র বছর দেড়েক হল এদের বিয়ে হয়েছে। আর এ আমার বন্ধু আব্দুর রহিম। নামকরা সাহিত্যিক। রহিম, তুমি বোধ হয় জানোনা এহ্‌তেশাম এ্যাসিস্ট কোরাপ্‌শনে একজন বেশ বড় রকমের অফিসার। খুবই কড়া অফিসার। কোরাপশন করে ও'র কাছে কারো ক্ষমা নেই।'

আমি বললুম, 'বাঃ, তাই না কী? এই তো চাই। শুনে ভারি খুশী হলুম। আপনার মতো আর কয়েকজন এরকম অফিসার থাকলে আমাদের এই কোরাপশনে ভর্তি দেশের আর ভাবনা ছিল না। দেশটা দিন দিন কোরাপশনের নরক হয়ে উঠছে।'

এহ্‌তেশাম একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'যা বলেছেন! আমার মোটো হচ্ছে দুর্নীতি বন্ধ করতেই হবে, দুর্নীতির ক্ষমা নেই। যে দুর্নীতির পূজারী সে মানুষ নয়।'

রশীদ বলল, 'এহ্‌তেশাম আর নাজমা—এরা দু'জনেই এত আধুনিক তো, কিন্তু এরা যে কতখানি ধর্মপ্রাণ তুমি জানো না। এরা স্বামীস্ত্রী দু'জনেই এবারে হজে যাচ্ছে। ও'দের জাহাজের বুকিংটা আমিই করে দিলুম।

আমি বললুম, 'বাঃ, এরকম তো সাধারণত দেখা যায় না,—বিশেষ করে এত অল্প বয়েসে। অল্প বয়স আর আধুনিক হলেই দেখেছি তারা ধর্মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলতে চায়।'

এহ্‌তেশাম সিগারেটে দম দিয়ে বলল, 'মশাই, ধর্মের কাছে, সত্যিকার ধার্মিক হওয়ার কাছে কোনো বয়েস নেই। তাছাড়া ধর্ম মেনে চলি বলেই গোঁড়ামি আমি পছন্দ করি না। ধর্ম মেনে চলি বলেই আধুনিক হতে বাধা কী!'

আমি বললুম, 'মোটেই না। ধর্ম মেনে চললেই আধুনিক হওয়া যাবে না কেন! আমাদের ধর্মেও কোথাও গোঁড়ামির নাম-গন্ধ নেই, ধর্ম কোথাও আধুনিক হতে বাধা দেয়নি। যত রকমের গোঁড়ামি আছে কুসংস্কারের ডিপো ওই অশিক্ষিত ব্যক্তিদের বিধানে।'

নাজমা খুশী হয়ে বলল, 'যা বলেছেন! এই আজব জীবরা যে আমাদের সমাজ থেকে কত দিনে শেষ হবে কে জানে! ধর্মের মুখোশ পরে এই কুশিক্ষিতরা ধর্মের কলঙ্ক, সমাজের কলঙ্ক। ধর্মের বন্ধুর ছদ্মবেশে এরা ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু।'

আমি বললুম, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারি খুশী হলুম। মুসলমান সমাজে এরকম ধর্মপ্রাণ অথচ আধুনিক কালচার্ড দম্পতি অন্তত আমাদের এ বঙ্গে খুবই কম। আপনারা থাকেন কোথায়?'

এহ্‌তেশাম বলল, 'আব্দুল আলী রোডে।'

আব্দুর রশীদ রসিকতা করে বলল, 'আব্দুল আলী মানে জানো তো? আলী হচ্ছে খোদার নাম। তাহলে আব্দুল আলী মানে হচ্ছে খোদার দাস। আধুনিক হলেও এরা ধর্মপ্রাণ, দুর্নীতিকে ক্ষমা করে না, এবার দু'জনেই হাজী হয়ে আসছে অর্থাৎ এরা হচ্ছে আব্দুল আলী রোডের আব্দুল আলী!'

তার রসিকতায় আমরা সবাই হেসে উঠলুম। আমি বললুম, 'এই মাসের কুড়ি তারিখেই তো আপনারা হজে চলে যাচ্ছেন? আপনারা দু'জনে হজ করে ফিরে আসুন, তারপর আপনাদের সঙ্গে বেশ করে আলাপ পরিচয় জমানো যাবে। মাঝে মাঝেই রশীদকে ধরে নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে হানা দোব। রাস্তার নাম তো জানাই হয়ে গেল।'

নাজমা বলল, 'আসবেন। খুবই খুশী হব। সাহিত্যেও আমাদের দু'জনেরই বেশ শখ আছে।'

এহ্‌তেশাম বলল, 'হ্যাঁ মশাই, সরকারী কর্মচারী বটে, দুর্নীতি আর অপরাধ ঘাঁটাই কাজ, কিন্তু আমরা দু'জনেই সাহিত্য-রসিক। বিশেষ করে নাজমা তো খুবই সাহিত্যের ভক্ত।'

এহ্‌তেশামরা চলে গেলে আমি বললুম, 'আচ্ছা, এই আজব দুনিয়ার আজব নিয়মে যত রূপসী মেয়েদের ভাগ্যেই কী যত কুশ্রী স্বামী জোটে!'

আব্দুর রশীদ হেসে উঠে বলল, 'খাসা কথা বলেছ! তোমার এই আজব দুনিয়ার আজব নিয়মে আর একটা জিনিষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ?'

'কী?'

'যত সুন্দর পুরুষের কপালেই যত বিশ্রী বৌ জোটে!'

আমি খুব খানিক হেসে নিয়ে বললুম, 'সত্যি, ঠিকই বলেছ! এ এক আজব ব্যাপার! বৌকে দেখতে খারাপ হলে ছেলেদের মনে একটা খুঁতখুঁতুনি থেকেই যায়, কিন্তু স্বামীকে দেখতে খারাপ হলে মেয়েদের মনে কোনো অখুশীভাব থাকে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় মেয়েদের বোধহয় শুধু একটা পুরুষ হলেই হয়! তাই সে পুরুষের রূপ না থাকলেও চলে। সেইজন্যেই বোধহয় দেখতে পাই সুন্দরী সুন্দরী ডানাকাটা পরীর মতো মেয়েগুলো কিম্ভূতকিমাকার কালো ভূতের মতো বাঁদরমুখো একেকটা স্বামী নিয়ে বেশ খুশীতেই থাকে! কিন্তু পুরুষের শুধু একটা মেয়ে হলেই হয় না, তার সঙ্গে তার রূপ থাকা চাই, যৌবন থাকা চাই—অনেক কিছুই থাকা চাই!'

আব্দুর রশীদ বলল, 'আসলে মেয়েদের কাছে সব পুরুষই মনের মতো, আবার কোনো পুরুষই মনের মতো নয়।'

আমাদের হাসিতে হগ্ স্ট্রীট থেকে হগ্ মার্কেট পর্যন্ত চমকে উঠল।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। একদিন সকালে হঠাৎ আব্দুর রশীদ আমার বাড়ীতে এসে হাজির। এসেই বলল, 'যাক, তুমি বাড়ীতে আছ। সারা সকাল কত বন্ধুর কাছে যে একশোটা টাকা ধার চেয়ে বেড়ালুম তার ঠিক নেই। কিন্তু কারো কাছে পেলুম না। শেষে তোমার কাছে এলুম। আমার হঠাৎ একশোটা টাকা ভীষণ দরকার পড়েছে।'

আমি বললুম, 'তোমায় তো কতবার বলেছি ওরকম বেহিসেবীর মতো দু'হাতে করে টাকা উড়িও না, টাকার দাম বুঝতে চাও তো, বেশী নয়, মোটে একটা টাকা কারো কাছে ধার চেয়ে দেখ!'

আব্দুর রশীদ হেসে বলল, 'আজ আমি হাড়ে হাড়ে টাকার দাম বুঝেছি ভাই! এ যন্ত্রণা তো তুমি উদ্ধার কর।'

আমি হেসে বললুম, 'তা না হয় করছি, কিন্তু তোমার এই ধারের অভ্যেস ছেড়ে দাও, ও'তে কোনো কাজ হয় না। ধারে যদি কোনো কাজ হ'ত তাহলে বৌদেরও ধার পাওয়া যেত!'

আব্দুর রশীদ এমন হাসাই হাসল যেন সারা কলকাতার লোক শুনতে পেলো। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আর একটা ভালো খবর শোনো। আমাদের বিয়েটা বোধহয় সামনের মাসেই আমরা সেরে ফেলছি।'

আমি বললুম, 'বল কী! এই এক মাস হল মোটে তোমরা প্রেমে পড়লে আর এরি মধ্যে বিয়ে!'

আব্দুর রশীদ বলল, 'হ্যাঁ, আর দেরী করে কী হবে? আমাদের দু'জনের সবদিক থেকেই আশ্চর্য রকম মেলে।'

আমি একটু হেসে বললুম, 'এই তোমার প্রথম প্রেম, তাই তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই! ও কথা আর ছ'মাস পরে বলবে। প্রথম প্রথম প্রেমে পড়ে নেশার ঘোরে দুনিয়ার সব ছেলেমেয়েরই মনে হয় আমাদের দু'জনের সবদিক থেকেই আশ্চর্য-রকম মিলছে! দু'জনে এমন মিল আর হয় না! তারপর দু'মাস যেতে না যেতেই নেশার ঘোরটা কেটে গেলে তাদেরই মনে হয় আমাদের দু'জনের কোনোদিক থেকেই মিলছে না! তখন শুরু হয় বিবাদ। এই হচ্ছে প্রেমের নিয়ম। তাই বেশীর ভাগ প্রেমই দু'দিন না যেতে যেতে ডিমের মতো ভেঙে যায়! সুতরাং প্রথম প্রথম প্রেমে পড়েছ—সাবধান! এখনি বিয়ে করো না। অন্তত এক বছর যেতে দাও। আমি বহু প্রেমের আগুনে পুড়েছি। আমার কথা শোনো। নইলে পরে পস্তাবে!'

আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আব্দুর রশীদ বলল, 'সেই এহ্‌তেশামকে মনে আছে তো?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

আব্দুর রশীদ বলল, 'আরব থেকে তার চিঠি পেয়েছি। আজ সে আরব থেকে হাজী হয়ে ফিরবে। প্লেনে আসছে। চল না আজ বিকেলে এয়ারপোর্টে যাই? সে বারবার করে আমাকে এয়ারপোর্টে যেতে লিখেছে। এক-

মাত্র বিধবা বুড়ী মা ছাড়া তার তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই তো।'

আমি বললুম, 'বেশ তো চল না। ওঁদের দু'জনকে সত্যিই সেদিন আমার বেশ ভালো লেগেছিল। শ্বশুরবাড়ীর দিকের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?'

আব্দুর রশীদ বলল, 'না। নাজমার মা বাবা কেউ নেই। মামার বাড়ীতে থেকে মানুষ হয়েছিল। মামাও এখন আর কলকাতায় থাকেন না, বাংলাদেশে চলে গেছেন।'

আমি বললুম, 'ঠিক আছে, যাব, চল।'

বিকেললোয় আমরা ঠিক সময়ে এয়ার-পোর্টে গেলুম। চোখ মুছতে মুছতে প্লেন থেকে নেমে এলো সদ্য হাজী এহ্‌তেশাম হোসেন।

আব্দুর রশীদ বলল, 'তুমি একা এলে! নাজমা কোথায়?'

এহ্‌তেশাম চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'মক্কায় পৌঁছে নাজমা হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে।'

আমরা দু'জনেই আর্তনাদ করে উঠলুম, 'এ্যাঁ!' আমরা একেবারে থ হয়ে গেলুম। এর বেশী আর কোনো কথা আমাদের মুখ থেকে বেরোল না।

এ খবরের জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। হঠাৎ যেন কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীর সব আলো নিভে গেল। এই সেদিন যে ঝলমলে মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হল আজ আর এই পৃথিবীর কোথাও সে নেই, সে হজ্‌ করতে গিয়ে মারা গেছে যেন বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ল। মনটা সত্যিই বড় খারাপ হয়ে গেল।

এহ্‌তেশাম চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'দু'জনে এক সঙ্গে হজ্জে গেলুম, ফিরে এলুম একা!'

আব্দুর রশীদ বলল, 'কই, চিঠিতে তো তুমি এসব কথা কিছু লেখনি?'

এহ্‌তেশাম বলল, 'ইচ্ছে করেই লিখিনি। কী আর হ'ত লিখে! জীবনে বোধহয় সে অনেক পুণ্য করেছিল, তাই হজ্‌ করতে গিয়ে হজ্‌ করা তার কপালে না হলেও মক্কার পবিত্র মাটিতে সে কবর পেলো। একী কম ভাগ্যের কথা! ওসব কথা থাক, বড় কষ্ট হচ্ছে, ভিতরটা যেন আগুনে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমার আত্মার অর্ধেকটা যেন আমি আরবের মাটিতে চাপা দিয়ে এসেছি! নাজমা যে আমাকে ছেড়ে এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে আমি ভাবতেও পারিনি। নাজমাকে আমি কোনো-দিন ভুলতে পারব না। আমার বুকের তাজমহলে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। আমাদের যে কী ভালোবাসা ছিল তোমরা কেউ বুঝবে না। মমতাজ শাহজাহানেও বোধহয় এত ভালোবাসা ছিল না।' বলতে বলতে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

আবদুর রশীদ তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'ছিঃ কেঁদোনা। নিজেকে শান্ত কর। সব দুঃখ চুপচাপ সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। যে চলে গেছে তাকে তো আর কেঁদেও ফিরে পাবে না। চল আমরা ধরে যাই।'

আমিও বললুম, কেঁদে আর কী করবেন, মানুষের জীবন-মরণের উপরে তো কারো হাত নেই। যেতে সবাইকে হবেই, কে কখন যাব সেইটেই শুধু জানা নেই। হজ্‌ করতে গিয়ে আমার ওপর দিয়ে যে এত বড় দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে আমাদের কল্পনারো বাইরে ছিল। ছাড়তে সবাইকে হবেই। কাউকেই আমরা ধরে রাখতে পারব না। কেঁদে কী হবে!'

দিন পনেরো পরে একদিন বিকেলের দিকে হগ স্ট্রীটে আবদুর রশীদের অফিসে যেতেই সে লাফিয়ে উঠে বলল, 'ওঃ! তুমি এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এইমাত্র আমার একটা ভীষণ দস্যুবৃত্তি করতে ইচ্ছে করছিল।'

আমি জানি সে খুব রসিক, তবও থতমত খেয়ে গিয়ে বললুম, 'তার মানে?'

আবদুর রশীদ বলল, 'এইমাত্র দেখতে পাচ্ছিলুম আমার অফিসের সামনে দিয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে নিউ-মার্কেটের দিকে যাচ্ছে। মেয়েটার চেহারা আর ফিগার এমনই মাথা খারাপ করা সুন্দর যে আমার ইচ্ছে করছিল ছেলেটাকে খুন করে ফেলে মেয়েটাকে যদি আমি দস্যুর মতো নিজের মুঠোয় ছিনিয়ে আনতে পারতুম।'

আমি হেসে বললুম, 'ওঃ, এই ব্যাপার! তা আর অসম্ভব কী! একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে এরকম ইচ্ছে হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। নইলে আর মেয়েদের নিয়ে পৃথিবীতে আদিকাল থেকে এত বড় বড় যুদ্ধ, এত গোলমাল, হানাহানি হয় কেন!'

আবদুর রশীদ বলল, 'যা বলেছ।'

আমি বললুম, 'মানুষের মনের মধ্যে যে সর্বক্ষণ কত কুটিল চিন্তা কত ষড়যন্ত্র, কত মতলব, কত ভাবনা, কত লোভ কত পাপ কত ইচ্ছে খেলা করছে! ভাগ্যি মানুষের মনটাকে দেখা যায় না! কে কী ভাবছে, কখন কার কী ইচ্ছে করছে যদি দেখা যেত তাহলে কী হত! মনটাকে দেখা গেলে কোনো মানুষ আর বাঁচতে পারত না।'

আবদুর রশীদ হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যিই, সেদিক থেকে খোদা আমাদের মস্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'আমার কাছে যা বলে ফেলেছ—বলে ফেলেছ, কিন্তু সেই যার সঙ্গে তোমার সবদিক থেকে আশ্চর্যরকম মিলছে তার কাছে এসব বেফাস কথা বলে ফেলো না যেন! বললে তোমাকে আর আস্ত রাখবে না, বেড়ালের মতো নখ কষে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেবে। মেয়েরা হচ্ছে বেড়ালের মতো। ওঁদের মুখমণ্ডলের থাবার মধ্যে নখ লুকোনো থাকে। দরকারের সময় মুখমণ্ডলের ভিতর থেকে সেই নখ বার করে!'

আবদুর রশীদ হেসে বলল, 'এ সময়ে এসে পড়েছ ভালোই হয়েছে। একটু বস, এখুনি আমার এক হিচ হাইকার বন্ধু আসবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার কাছে দেশ-বিদেশের অনেক কাহিনী শুনতে পাবে। ইয়োরোপ আর মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ হিচ হাইকিং করে ঘুরে সে এই দিন তিনেক হল ফিরে এসেছে। তার নাম আবু সঈদ। আমরা একই গ্রামের ছেলে। ছোটবেলা থেকেই সে মহা ডানপিটে আর অ্যাডভেনচারাস।'

ঠিক সেই সময় এসে পড়ল হাজী এহ্‌তেশাম। আবদুর রশীদ বলল, 'কী খবর এহ্‌তেশাম, তুমি এ সময়?'

এহতেশাম রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'নাজমার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না, দিন-রাত যেন বুকের ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। সে যে আমার কত-খানি ছিল, প্রেম যে এত বড় জিনিস তাকে হারিয়ে আজ আমি সে কথা বুঝতে পারছি। নাজমাকে আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। আমাদের ভালোবাসা সে এক আশ্চর্য অতুলনীয় জিনিস ছিল। সে যে আমার কতখানি ছিল তোমাদের কাউকে বোঝাতে পারব না। সে আমার বুকের তাজমহলে গোপনে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু যে চলে গেছে তার কথা ভেবে ভেবে তো সংসার ধর্মকে অবহেলা করা যায় না,—আমি আর বিয়েই করব না ভেবেছিলুম, কিন্তু শুধু ওই সংসারধর্ম পালন করতে আর মায়ের চাপে পড়ে আবার আমায় বিয়ে করতে হচ্ছে।'

বশীদ বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'আ! এরি মধ্যে আবার বিয়ে করছ! চমৎকার! হাত তালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে!'

আমারো কোথায় যেন বড্ড জোরে ঘা লাগল। সেই আঘাতে আকাশ-পাতাল যেন আমাকে নিয়ে ঘুরপাক খেয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, 'বলেন কী! স্ত্রীর শোকে এত কাতর আপনি, আর স্ত্রী মারা যেতে না যেতেই আবার এরি মধ্যে বিয়ে করছেন!'

এহতেশাম বলল, 'আমার যে বুকের ভিতরটা নাজমার শোকে কী রকম পুড়ে

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্‌ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

যাচ্ছে আপনাদের বোঝাব কেমন করে। সে শুধু খোদাই জানেন। কিন্তু তবুও শুধু সংসারধর্ম পালন করতেই আবার আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে। সংসারধর্ম পালন না করা মস্ত অন্যায়। ওটাও আমাদের একটা ধর্মের কাজ। আমি আধুনিক হলেও ধর্ম মেনে চলি। নইলে আমি আর বিয়েই করব না ভেবেছিলুম, নাজমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পুড়ে পুড়েই জীবনটা কাটিয়ে দোব ভেবেছিলুম, কিন্তু শুধু ধর্ম রক্ষা করতে আর মায়ের চাপেই আবার আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে। মায়ের কথা না শোনা, মাকে খুশী না করা মহা অধর্মের কাজ। ধর্ম বলে স্বর্গ মায়ের পায়ের তলায়। এই সামনে রবিবারে আমার বিয়ে।'

আবদুর রশীদ তীব্র ব্যংগর সুরে বলল, 'বাঃ! বৌ মরতে না মরতে ফের বিয়ে ঠিক,— দিন পর্যন্ত ঠিক। চমৎকার! চমৎকার! তুমিই দেখালে।'

এহতেশাম বলল, 'নাজমাকে হারিয়ে আর আবার আমাকে বিয়ে করতে হচ্ছে বলে আমার বুকের ভিতরে যে কী হচ্ছে তোমরা বুঝবে না। এই আমার বিয়ের কার্ড। তোমাদের দাওয়াত দিতে এসেছি।'

ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ রী রী করে জ্বলতে লাগল।

রশীদ সেই রকম ব্যংগ করেই বলল, 'বাঃ। বাঃ। কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। বিয়ের দাওয়াত দিতে এসেছ! ঢং করে আর চোখ মুছ না, বরং বিয়ের এই কার্ডগুলো হাতে নিয়ে খুশীতে থেই থেই করে নাচতে নাচতে বাড়ী যাও। তুমিই নাজমাকে করর দিয়েছ বটে! তোমার মতো এমন করে বৌকে করর দিতে আমি আর কাউকে দেখিনি।'

এমন সময় এসে পড়ল তার হিচহাইকার বন্ধু আবু সঈদ। আবদুর রশীদ বলে উঠল, 'আরে এস এস আবু সঈদ এস, আমরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এই আমার বন্ধু আবদুর রাহমান, সাহিত্যিক...।'

আবু সঈদের সংগে ততক্ষণে এহতেশামের চোখোচোখি হয়েছে আর চোখোচোখী হতেই দেখি এহতেশামের মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত উড়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। যেন সে হঠাৎ যমের মুখে পড়ে গিয়েছে আর কী! আমিও অবাক। রশীদও অবাক।

আবু সঈদ একটু ব্যংগর সুর মিশিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, 'আরে হাজ্জী সাহেব যে! আপনি এখানে! কবে ফিরলেন?'

এহতেশাম থতমত করতে করতে যেন ভিমি খেতে খেতে বলল, 'আ-আ-আপনি— মানে আ-আ-আপনি এখানে!' যেন চেয়ার থেকে পড়ে যাবে আর কী!

আবদুর রশীদ অবাক হয়ে আবু সঈদকে বলল, 'তোমরা চেনো নাকী!'

আবু সঈদ বলল, 'হ্যাঁ, সৌদি আরবে দৈবাত আমাদের পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন সৌদি আরবে হিচ হাইকিং করছি।'

এহতেশাম মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আ-আ-আমি যাই, তো-তো তোমরা কথা বলো—' বলেই সে চোখের নিমেষে পালালো।

আমাদের বিস্ময়ের কোনো সীমা নেই।

আবদুর রশীদ অবাক হয়ে বলল, 'ও তোমার সামনে পড়ে গিয়ে ওরকম করে ভয়ে পালালো কেন?'

আবু সঈদ বলল, 'বলছি। ও লোকটার সংগে তোমাদের পরিচয় আছে না কী?'

আবদুর রশীদ বলল, 'হ্যাঁ। আমার বন্ধু।'

আবু সঈদ বলল, 'বন্ধু। ওকে খুব সাবধান। মস্ত মহাপুরুষ!'

আবদুর রশীদ বলল, 'তার মানে?'

আবু সঈদ বলল, 'লোকটা হজ্জে গিয়ে করেছে কী জানো? হজ করতে নিয়ে গিয়ে বৌকে চুপিচুপি গোপনে জোর করে সৌদি আরবের এক স্লেভ-ট্রেডারের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছে।'

আমি আর আবদুর রশীদ একসংগে বলে উঠলুম, 'এ্যাঁ!!!'

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন মহা প্রলয়-কান্ড শুরু হয়ে গেল। কিছুই যেন মাথায় ঢুকছে না। আমি একেবারে স্তম্ভিত, নির্বাক হয়ে গিয়েছি। আকাশপাতাল সবকিছু যেন ভেংগেচুরে যাচ্ছে।

আবদুর রশীদ বলল, 'কী বলছ তুমি!'

আবু সঈদ বলল, 'ওর বৌ বেচারী নিশ্চয়ই এতদিনে সেই স্লেভ-ট্রেডারের কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকায় হাত বদল হয়ে গিয়ে বাঁদী হয়ে কোনো এক আরব শেখের হারেমে খোজা গোলামদের পাহারায় নিরুপায় বন্দী জীবন কাটাচ্ছে। অর্থাৎ হারেমে সেই আরব শেখের যত রকমের পারভার্টেড লাস্ট স্যাটিসফাই করছে আর কী! মেয়েটি খুবই সুন্দরী ছিল তো। ভারতীয় সুন্দরী মেয়েদের যে আরব শেখেরা কী ভয়ানক পছন্দ করে আর পেলে যে স্লেভ-ট্রেডারদের কাছ থেকে কী অসম্ভব টাকা দিয়ে হারেমে কিনে নিয়ে যায় সে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

আবদুর রশীদ বলল, 'হজ করতে নিয়ে গিয়ে বৌকে বিক্রী করে দিয়ে এসেছে, আর এদিকে হজ করে দেশে ফিরে এসে চোখ মুছতে মুছতে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে, মক্কায় পৌঁছে বৌ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছে!'

আবু সঈদ বলল, 'তবে কী বলে বেড়াবে হজ করতে গিয়ে বৌকে আসলে বিক্রী করে দিয়ে এসেছে!'

আবদুর রশীদ বলল, 'উঃ! কী ভয়ংকর স্কাউন্ড্রেল। ক্রিমিন্যাল। ভন্ড। অমানুষ! ও আবার অ্যান্টি কোরাপশনের একজন অফিসার। কোরাপশন করে ওর কাছে কারো ক্ষমা নেই! বাস্তবিক, বাস্তব অভিজ্ঞতার আয়নায় মানুষের বাইরের মুখোশের আড়ালে লুকোনো আসল চেহারা দেখতে পেলে দেখা যায় মানুষের বুদ্ধি মানুষকে যে কোনো জানোয়ারের চেয়ে অধম জানোয়ার করে দিয়েছে!'

আমি বললুম, 'মানুষ মুখোশ পরা জীব। কে যে আসলে কী রকম কিছুই বলা যায় না।'

আবু সঈদ বলল, 'যা বলেছেন। কিছুই বলা যায় না! সৌদি আরবের সেই স্লেভ-ট্রেডারের সংগে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে বলেছিল, সে নাকী ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, হজে নিয়ে এসে স্বামী হয়ে তুমি তোমার নিরীহ, সুন্দরী বৌকে এভাবে জোর করে বিক্রী করে দিচ্ছ কেন? তার উত্তরে তাকে ও কী বলেছিল জানো? বলেছিল, দেশে ফিরে আবার বিয়ে করলেই আবার এরকম সুন্দরী বৌ অনেক পাওয়া যাবে, আমাদের দেশে মেয়ে খুব সস্তা, তাই বিয়ে করা খুবই সহজ কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা তো এক চোটে সবসময় পাওয়া যাবে না!'

আবদুর রশীদ বলল, 'পয়সার জন্যে মানুষ যে কী না পারে, কোথায় নামতে না পারে ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়! নাজমা যে কত নিরীহ আর অসহায় মেয়ে আমি জানি। হজে নিয়ে গিয়ে সেই অসহায়, নিরীহ, সরল মেয়েটাকে যখন ওই জানোয়ার স্বামী হয়ে চুপিচুপি জোর করে সেই ভয়ংকর আরব স্লেভ-ট্রেডারের কাছে বিক্রী করে দিচ্ছিল তার মনের অবস্থাটা কী হয়েছিল আমি শুধু তাই ভাবছি! কান্নার বদলে আমার চোখ ফেটে যেন রক্ত ঝরতে চাইছে।'

আমি একটু ধাতস্থ হয়ে শুধোলাম, 'কিন্তু আপনি বলছেন কী! এই বিংশ শতাব্দীতেও পৃথিবীতে এখনো এই আদিম অসভ্য জিনিস স্লেভ-ট্রেড চলে?'

আবু সঈদ বলল, 'হ্যাঁ, এই বিংশ শতাব্দীতেও কোথাও লুকিয়ে লুকিয়ে, কোথাও খোলাখুলিভাবে এখনো স্লেভ-ট্রেড চলে। অবশ্য বাইরের লোক অনেকেই সে খবর এখনো জানে না। যে কোনো যুগে আপনার এই মুখোশ পরা জীবের দ্বারা কী না হতে পারে কিছুই বলা যায় না!'

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

অঞ্জনা

আজকের ভাবনা

এক ভদ্রলোক বাসে বসেই কথাগুলো বলছিলেন। পাশে ছিল তাঁরই অফিসের সহকর্মী। কথায় বুঝলাম ভদ্রলোক সম্প্রতি তাঁর এক কন্যাকে পাত্রস্থ করেছেন। ভদ্রলোক খুব সম্ভবত দিনকয়েকের আগের কোন ঘটনাকে ফলাও করে বলছিলেন, 'আরে মশাই বাজারে জিনিসের যা দাম বেড়েছে তাতে আর সংসার চালানো যাবে না। তার ওপর যদি বাড়তি লোক হয় তবে তো কথাই নেই। মেয়ে-জামাই এলেও ভয় পাই। এই পরশুদিন আমার মেয়ে নতুন জামাতা-বাবাজীকে নিয়ে তো সন্ধ্যায় হাজির। অবশ্য কিছু কেনাকাটার দরকার ছিল। ওদের মফস্বলে সব সময় তো আর পছন্দ মতো জিনিস মেলে না। তাই আগে থেকে কোন কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এসেছে। আমার স্ত্রী অর্থাৎ নতুন জামাতার শাশুড়ীঠাকরুণ তো ভাবে গদগদ। জামাই-এর কোন অহংকার নেই, অত্যন্ত অমায়িক, নেমন্তন্ন ছাড়াই এসেছে এ চিন্তার উচ্ছ্বাসে কি যে করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। শিরে সংক্রান্তি হলেও জামাই-এর নিরহংকারে আমিও যথেষ্ট পুলকিত হয়েছি সেটাই প্রকাশ করতে চেষ্টা করলাম। আসলে সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই, মেয়ে-জামাই হলে কি হবে বিয়ের খরচের পর আমি যে কত কষ্টে সংসার চালাচ্ছি তা শুধু আমি আর ভগবানই জানি। জামাই বলে কথা—তার জন্য স্বতন্ত্র কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে এটাই চিরাচরিত নিয়ম। তার ওপর আবার নতুন জামাই।' একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে ভদ্রলোক রুমালে মুখ মুছলেন তারপর বাইরে একবার তাকিয়েই নতুন উদ্যমে শুরু করলেন।

'সবে সাড়ে ছটা, মেয়ে-জামাই কেনাকাটা সারতে বেরুলো। ফিরে এলো রাত নটা হবে। জামাই-এর হাতে ঝুলছে দুটো বড় ইলিশ। গিন্নী এবার তো আরও খুশী জামাই-এর কর্তব্যজ্ঞান দেখে। আমি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে প্রায় বোবা হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবলাম এত বাড়াবাড়ি না করলেই ভাল হতো। গিন্নী কথলা বাঁচাতে গিয়ে কখন উনুনের আঁচ ফেলে দিয়েছে। জামাই-এর জন্য তো একটু ভালই আয়োজন করেছে আর আমাদের শুধু পেট-ভরালেই হল। জামাই-এর ইলিশ কালকের জন্য তো আর তুলে রাখা যাবে না। সামনের জিনিস। গিন্নী চুপিচুপি এসে স্মরণ করিয়ে দিল তেল একেবারে বাড়ন্ত। দিন-দুই আগে থেকেই গিন্নী তেলের জন্য তাগাদা দিচ্ছিল—এ দুদিন সেদ্ধ-ভাত সামান্য ঝোল ঝাল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। ছুটলাম শিশি হাতে তেলের সন্ধানে। জোগাড়ও করলাম, তবে নগদ দামে নয় ধারে। ধারের তেলে মেয়ে-জামাইকে আপ্যায়ন করলাম। কিন্তু জামাই আদর আর নিজেদের ভাল খাওয়া হলে কি হবে ধারের টাকা শোধ করার কথাই ভাবছি।'

বাসযাত্রী ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে খানিক বাড়তি রস মিশিয়ে কথা বলছিলেন কিন্তু এটাই তো আমাদের অধিকাংশের সংসারের হাল। দূরের লোকের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম মেয়ে-জামাইকে দেখলে পর্যন্ত আঁতকে ওঠে এমন সংসার অনেক আছে। তবুও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের নিয়েই তো আমাদের জীবন। ভাবুন তো এ ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে অতিথি-অভ্যাগতদের কি করে আপ্যায়ন করবো? এ-প্রশ্ন শুধু কোন নব-বিবাহিতা কন্যার পিতার নয়, এটা সকলের প্রশ্ন। কর্তা, গিন্নীর এক আতংকিত জিজ্ঞাসা।

অতিথি-অভ্যাগত নেই এমন সংসার বিরল। অথচ এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁদের আপ্যায়ন করতেই হবে। শহরে যারা বাস করেন তাঁদের কাছে নানা ধরণের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সমাগম হয়। ডাক্তার দেখানো কলেজে ভর্তি করা, ইনটারভিউ, ফুটবল-ক্রিকেট ম্যাচ দেখা, দ্রষ্টব্য স্থান দেখা, উৎসবাদির কেনাকাটা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনে বাইরের লোকেরা শহরের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী উপস্থিত হবেনই। এ সমস্ত অতিথির অনাদর করা চলবে না সে যত অসুবিধা বা টানাটানিই থাক।

অতিথিকে আপ্যায়ন করার সময়ে গাল-ভরা হাসিটুকু সব সময় রাখতেই হবে। ভাবখানা এমন হবে যে ওদের পেয়ে গৃহ-কর্তা অত্যন্ত খুশী, মনে মনে ওদেরকেই কামনা করছিল। সাধ্যমত ছিমছাম সাজানো ঘরে ওদের বসিয়ে দিয়েই চায়ের আয়োজনটা সেরে ফেললে ভালো। ওদের সঙ্গ দিতে গিয়ে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খবরের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীর সকলের সংবাদ সংগ্রহ অবশ্যই করতে হবে। কেউ অসুস্থ থাকলে তাঁর জন্য ভাবনা প্রকাশ করে ওদের খুশী করতে পারা গৃহকর্ত্রীর বিরাট গুণ।

অতিথিরা যদি গ্রামাঞ্চলের হন তবে সম্ভব হলে বাড়ীর কাউকে তাঁদের সঙ্গে দিয়ে একটু ঘুরে আসবার সুযোগ দিয়ে নিজের রান্নাটা চটপট সেরে ফেলুন। সে সুবিধা না হলে অতিথি সংখ্যায় একজন হলে তাঁকে একটা ম্যাগাজিন পড়তে দিতে হবে। রান্না শেষ হবার সময় হলেই তাঁকে খেতে দেবার আয়োজন করতে হবে যাতে খাবারটা গরম থাকে। খাবার ঠাণ্ডা হলে গরম করতে কখনোই ভুলবেন না। সাধ্য কুলোলে অতিথির পছন্দমতো খাবার তৈরী করতে হবে নয়তো সেটা তৈরি করতে না পারি বলে লজ্জিত সেটা অন্তত প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেন। তাতে অতিথি ভাববে আপনি তাঁর সম্বন্ধে অত্যন্ত যত্নশীলা।

এই দুর্মূল্যের বাজারে দিনকয়েকের অতিথিকে দেখে অনেকেই ভীত ও বিরক্ত হন। কদাচ এই বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না বা তাঁকে ভালভাবে আদর-আপ্যায়নের পর কখনোই শোনানো চলবে না চাল, ডাল, তেল নুনের দাম কত সাংঘাতিক বেড়েছে। সংসার চালাতেই জীবন দুর্বিসহ। কর্তা টাকার চিন্তায় অস্থির হয়ে যাচ্ছেন অথবা আজকালকার লোকেদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—কোন জিনিসের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকুও নষ্ট হয়ে গেছে। এ ধরনের মন্তব্য করলে অতিথি মনঃক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তিনি ভাববেন তাঁর উপস্থিতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই এসব গল্পের অবতারণা।

অতিথি উপস্থিত থাকাকালে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না শেষ করে রান্না-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেখাতে হবে আপনি কত পরিশ্রমী ও কত চটপট কাজ করতে পারেন। সেই সঙ্গে নিজেদের শোবার ঘর, বসার ঘর, অতিথির ঘরও একটু নতুন করে সাজিয়ে ফেলতে হবে। তোলা জানলা-দরজার পর্দা বিছানার চাদর নামিয়ে অতিথির ঘর সাজাতে হবে। সম্ভব হলে একটু ফুল কিংবা শুধু সবুজ পাতায় অতিথির ঘরের বৈচিত্র্য আনা দরকার। সেই সঙ্গে নিয়মিত ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পরিবেশটা সুন্দর করতে হবে। অতিথি গৃহ-কর্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে চাইলে তিনি অসুবিধা সত্ত্বেও সঙ্গী হতে চেষ্টা করবেন।

অতিথির প্রিয়জনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতে হবে আর নিজের প্রশংসা শুনলে তা এড়িয়ে যেতে পারলে বা সে প্রসঙ্গ বদল করতে পারলে তবে গৃহকর্ত্রী প্রকৃতই প্রশংসার অধিকারিণী হবেন।

অতিথিকে বাদ দিয়ে সভসারজীবন সম্ভব নয়। তবে বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে গৃহকর্ত্রী বা গৃহস্বামী ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করে ফেলেন। হয়তো তার সবচেয়ে বড় কারণ সংসারে অর্থের অপ্রাচুর্য, তার ওপর বাড়তি লোকের খরচ চালানো দুরূহ। এমনও হতে পারে অতিথিবৎসল হতে গিয়ে ধার-কর্জের পরিমাণও বেড়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা—যার যেমন আয়, সেই বুঝেই ব্যয় করবেন। কিন্তু একটু মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার করতে তো কোন খরচ লাগে না, সেটুকু করতে তো আর অসুবিধে নেই। অতিথিকে সাধ্যের মধ্যে মুখরোচক ও রসবদল খাবার খাইয়ে খুশী করুন সেই সঙ্গে একটু সুন্দর ব্যবহার। সুন্দর ব্যবহার সাধ্যের দরিদ্রতাকে ঘুচিয়ে আদর্শ অতিথি-সেবায় সুগৃহিণী নিশ্চয়ই তৈরী করবে।

অঞ্জলি চৌধুরী

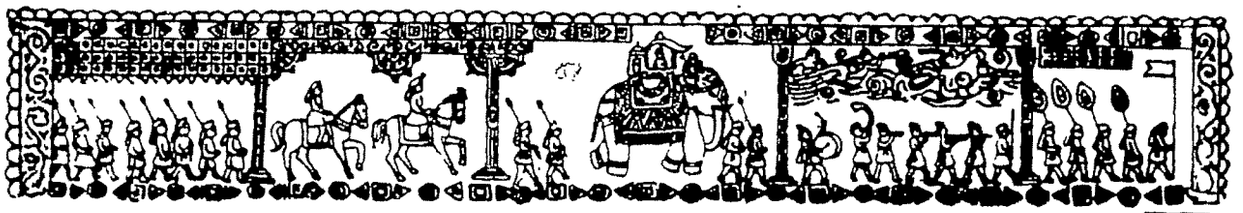

বিবাহ বিচিত্রা—(৮) কেরালা

উপযুক্ত ছেলে মেয়েব মধ্যে বিবাহের সম্বন্ধ এলে প্রথমে জ্যোতিষী উভয়ের 'জাতকম' অর্থাৎ ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেন। ঠিকুজি মিললে ছেলের বাবা মা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেবা মেয়ে দেখতে আসেন। ছেলেপক্ষেব আত্মীয়-স্বজনদের পাত্রী পছন্দ হলে ছেলে নিজে মেয়ে দেখতে আসে। ছেলেমেয়ে উভয়ের মতামত নেওয়া হয় এবং দুজনেব দুজনকে পছন্দ হলে জ্যোতিষী পঞ্জিকা দেখে বিবাহের শুভ মুহূর্ত স্থির করেন। এরপর একদিন মেয়েপক্ষের বাড়ীতে ছেলের বাবা এবং মহিলারা ছাড়া ছেলেব অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা আসেন। সেইদিনই দুপক্ষের তরফ থেকে বিয়ের পাকা কথা ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'নিশ্চয়ম' বলা হয়। সমস্ত বিবাহ অনুষ্ঠানটিকে মালয়ালম ভাষায় বলে কল্যাণম্। ছেলে-পক্ষের আত্মীয়-স্বজনদের সেদিন নিরামিষ ভোজন ও মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়।

বিয়ে বেশীর ভাগই দিনের বেলায় হয়। সেযে ভোরবেলা স্নান করে নতুন শাড়ী পরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে শিব-পার্বতী বা রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে যায়। তার সঙ্গে থাকে নারিকেল, ফুল, ঘি কলা, ত্রিমধুরম (তিন রকমের মিষ্টান্ন) ও ফুলের মালা। পুরোহিত প্রথমে ত্রিমধুরম ও ফুল দিয়ে গণপতির পূজা করেন তারপরে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করা হয়। বিয়ের দিন মেয়েব বাড়ীতে নাদস্বরম অর্থাৎ সানাই বাজানো হয়। উঠোনে একটি বিবাহের মন্ডপ তৈরী করা হয়। মন্ডপের চারদিকে চারটি স্তম্ভ থাকে—এই স্তম্ভগুলি শাদা ফুলের মালা জড়িয়ে সাজানো হয়। মন্ডপের ওপরটা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে—তাতেও সাজানো থাকে ফুলেব মালা। মন্ডপে কার্পেট পাতা থাকে। মন্ডপের সামনে একটি ধান মাপার পাত্রে ধান ভরে রাখা হয়। এই পাত্রের নাম 'পারা'। ধানের ওপর একটি নারকোল ফুলের মঞ্জরী লাগানো থাকে।

বিয়ের সময় মেয়েকে কৃষ্ণ বা ঘিয়ে রঙের শাড়ী পরানো হয়—তাতে জরির পাড় থাকে। শাড়ীতে দুটি পৃথক পৃথক খণ্ড থাকে। কোমরে বাঁধার টুকরোটিকে বলা হ

মুণ্ড' এবং আঁচলের খণ্ডটিকে বলা হয় 'নেরিয়দ'। আলাদা টুকরো দুটো একত্রে মিলিয়ে পরলে ঠিক শাড়ীর মতোই মনে হয়। মাথায় কাপড় দেওয়ার নিয়ম নেই। মেয়ের বাবা সামর্থ অনুযায়ী অলঙ্কার দেন—বিয়ের সময় এই সব অলঙ্কারও মেয়েকে পরানো হয়। বিয়ের কাপড় সাধারণত মেয়ের মামীমা দেন। বিয়ের সময় ছেলের পরণে থাকে জরির পাড়ওয়ালা ধুতি, তাকেও বলা হয় মুণ্ড এবং গায়ে থাকে শার্ট। ছেলের বাবা মা ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন সকলেই বরের সঙ্গে বরযাত্রীরূপে আসতে পারেন। কন্যাপক্ষের কুমারী মেয়েরা থালায় ফুলের মালা, লেবু, প্রদীপ সাজিয়ে নিয়ে বরকে অভ্যর্থনা করতে যায়। মেয়ের মামীমা নতুন কাপড়, আয়না, পান-সুপারী, সোনা, রুপো, চন্দন এবং ফুল এই আট রকমের মঙ্গল চিহ্ন একটা থালায় সাজিয়ে বরকে বরণ করতে যান—একে বলা হয় 'অষ্টমঙ্গল্যম্'। মেয়ের মামীমার হাতে লম্বা একটি পিতলের দীপাধার থাকে। মেয়ের ছোট ভাইও সঙ্গে থাকে—তার হাতে থাকে এক কমণ্ডুলু জল। সেই জল দিয়ে সে তার হবু জামাইবাবুর পা ধুইয়ে দেয়। তারপর মেয়ের মামীমা বরকে আরতি ও বরণ করে 'অষ্টমঙ্গল্যমের' থালা থেকে চন্দন নিয়ে বরের কপালে তিলক চিহ্ন পরিয়ে দেন। কুমারীরা হাতের থালায় রাখা মালা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এরপরে বরকে বিবাহ-মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর-কনেকে পাশাপাশি বসানো হয়। কনে বরের বামদিকে বসে।

কন্যার বাড়ীতে চারগাছি সুতো একত্রে জড়িয়ে হলদে রঙ করা হয় এবং তাতে একটি সোনার তৈরী মাঙ্গলিক প্রতীক চিহ্ন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই সূত্র ও স্বর্ণ পদককে বলা হয় 'তালি'। এটিই হল কেরালাবাসী রমণীদের সোহাগের চিহ্ন। বধূ বসে থাকে, বর উঠে দাঁড়িয়ে এই 'তালি' বধূর গলায় পরিয়ে দেয়। তারপর বর-বধূর আঙুলে সোনার আংটি পরিয়ে দেয় এবং বধূ বরের আঙুলে সোনার অঙ্গুরীয় পরিয়ে দেয়। অঙ্গুরী বদলের পর হয় 'জয়মালার' অনুষ্ঠান। মেয়ের বাবা মেয়ের হাতে একটি ফুলের মালা দেন—বর ও বধূ দুজনেই বিবাহের মণ্ডপের মধ্যে উঠে দাঁড়ায়। বধূ তার পিতৃদত্ত মালা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে ছেলের বাবা তাঁর ছেলের হাতে একটি ফুলের মালা দেন। ছেলে সেই মালাটি বধূর গলায় পরিয়ে দেন। মাল্যদানের পর বর বধূকে একটি স্টীলের থালায় দুটি শাড়ী ও কিছু টাকা দেয় অর্থাৎ তার বধূকে ভবিষ্যতে ভরণ-পোষণ করবার দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'কল্যাণোহড়াবা'। এরপরে মেয়ের বাবা মেয়ের হাত ছেলের হাতে সমর্পণ করে দেন। বিবাহ-মণ্ডপে উঁচু পিতলের দীপাধারে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। বর ও বধূ হাত ধরাধরি করে তিনবার ওই দীপাধার প্রদক্ষিণ করে। কেরালীয় বিবাহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কোন প্রয়োজন হয় না বা অন্যান্য রাজ্যের বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো যজ্ঞাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত করা হয় না—দীর্ঘাকৃতি দীপাধারই এখানে যজ্ঞাগ্নির প্রতিভূ।

জয়মালা অনুষ্ঠানের পর বর-বধূ হাত ধরাধরি করে ঘরে এসে বসে। কনের মা একটা বাটিতে দুধ নিয়ে তাঁর জামাইকে আগে খাওয়ান, তারপর সেই উচ্ছিষ্ট দুধ-টুকু তাঁর কন্যাকে খাইয়ে দেন। এরপর ওই রকমভাবেই প্রথমে জামাইকে এবং তারপরে মেয়েকে উচ্ছিষ্ট কলা খাইয়ে দুজনকে নৈকট্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন। এরপর নিমন্ত্রিতদের ভোজ খাওয়ানো হয়। এই ভোজও সম্পূর্ণ নিরামিষ। নানাবিধ অম্ল-ব্যঞ্জন ও পায়েস খাওয়ানো হয়। সেইদিনই পঞ্জিকার নির্দেশ অনুযায়ী শুভ মুহূর্তে মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর গৃহে যাত্রা করে। বিদায় নেওয়ার আগে বর-বধূ প্রণম্যদের প্রণাম করে এবং প্রণম্যরাও তাঁদের আশীর্বাদ করেন। এই সময়েই কনের বাবা তাঁর মেয়েকে যৌতুকের সব জিনিসপত্র দেন।

বধূ স্বামী-গৃহে এসে পৌঁছলে ছেলের মা নব-দম্পতিকে প্রথমে নুন-হলুদের জল দিয়ে আবর্তি করে সেই জল মাটিতে ফেলে দেন—যাতে ওদের ওপর কারুর কুদৃষ্টি না পড়ে, তারপর তাদের প্রদীপ দিয়ে আরতি করে কপালে চন্দনের মঙ্গল তিলক লাগিয়ে দেন। এরপরে বর-বধূকে ঘরে এনে পাশাপাশি বসিয়ে একটি বাটি থেকে প্রথমে ছেলেকে তারপর বধূকে দুধ খাওয়ান—এই রকমভাবে কলাও খাওয়ানো হয়। মেয়ের বাড়ী থেকে মেয়ের সঙ্গে মেয়ের মামীমা ও ভাইও আসেন মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে। ছেলের মা তাঁদের নতুন কাপড় দেন ও আদর যত্ন করে খাওয়ান। সেই রাত্রেই হয় ফুলশয্যার অনুষ্ঠান। শয্যা ও কক্ষ ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। নব বর-বধূ নিভৃতে একত্রে তাদের জীবনের প্রথম রাত্রি যাপন করে। বিবাহ অনুষ্ঠানের চারদিন পরে বধূ তার বরকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃগৃহে আসে। বর তার বধূর গলার 'তালির' হলদে সুতো খুলে তার পরিবর্তে তালির পদকটিতে সোনার চেন লাগিয়ে দেয় ও বধূর গলায় পরিয়ে দেয়। পূর্বেকার তৈরী বিবাহ মণ্ডপেই এই অনুষ্ঠান হয়। এরপর মেয়ের বাড়ীতে বিবাহের জন্যে যে মণ্ডপটি তৈরী করা হয়েছিল সেটি শুভ সময় দেখে খুলতে আরম্ভ করা হয়। এইভাবেই কেরালীয় বিবাহ-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

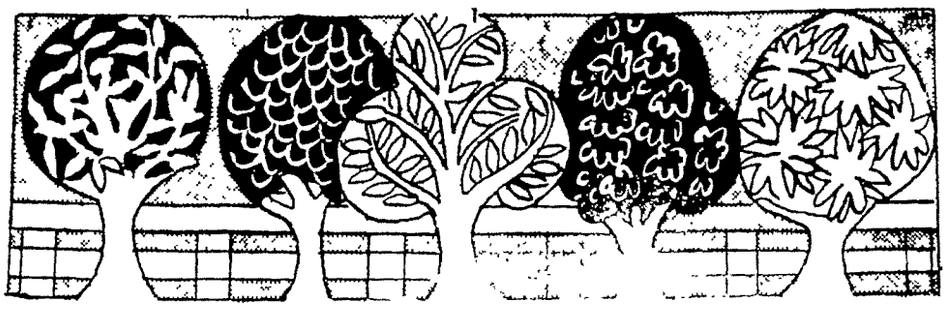

সাতদিনের শুভাশুভ

(৪ আগষ্ট থেকে ১১ আগষ্ট)

গ্রহসন্নিবেশ : মেষে মঙ্গল, মিথুনে শনি, কেতু, কর্কটে, বুধ ও রবি, সিংহে শুক্র, ধনুতে রাহু, মকরে বক্রী বৃহস্পতি।

মেষ : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থাকবে। আর্থিক উদ্বেগ থেকে কিছুটা মুক্তি পেতে পারেন। আয় মন্দ নয়। ব্যবসায়ে উন্নতির সম্ভাবনা। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল। মেয়েদের পারিবারিক বিষয়ে দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ৩, ৬ আগস্ট।

বৃষ : শরীর চলনসই। পেটের রোগে সামান্য ভোগ হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সুবিধার নয়। ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য বিঘ্নিত হতে পারে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৪, ৮ আগস্ট।

মিথুন : মাথার যন্ত্রণা, মাথাঘোরার জন্য উদ্বেগ হলেও তা সাময়িক। পারিবারিক ক্ষেত্রে চলনসই। আর্থিক উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্মে সুখ্যাতি ও সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ সময় : ৫, ৮ আগস্ট।

কর্কট : শরীর চলনসই। পারিবারিক দুশ্চিন্তা চলবে। কিন্তু আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করতে পারেন। কাজকর্ম ভালই চলবে। কিন্তু আত্মীয় বা বন্ধু-বিচ্ছেদের আভাষ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। প্রেমের ক্ষেত্রে বিফলতার সম্ভাবনা। শুভ তারিখ : ৪, ৮ আগষ্ট।

সিংহ : শরীর ও মন ভাল থাকবে। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। আর্থিক ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কিন্তু ব্যয়াধিক্যের চাপ কমবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতি, পরিবর্তনের যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৪।৭ আগষ্ট।

কন্যা : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। আয় ও ব্যয়ে সমতা আসবে। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের মানসিক আনন্দ বৃদ্ধির যোগ আছে। শুভ তারিখ : ৪, ৫, ৯ আগষ্ট।

তুলা : পারিবারিক কলহের লক্ষণ আছে। কিন্তু কোন ঝামেলা হবে না। শরীর বেশ ভালই চলবে। আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল হবে। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে বাধাবিঘ্ন এলেও সাফল্য ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ৯, ২১ আগষ্ট।

বৃশ্চিক : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক অস্বস্তির ভাব থাকবে। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকলেও আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শুভ তারিখ : ৬, ৮, ১০ আগষ্ট।

ধনু : শরীর সম্পর্কে উদ্বেগ, সন্তানদের পীড়া ইত্যাদির সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের পরিবেশ থাকলেও তা সাময়িক এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পারিবারিক উন্নতি হবে। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্র আশানুরূপ। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ৫, ৬, ৯ আগষ্ট।

মকর : শরীর মন্দ নয়। কিন্তু মানসিক ও পারিবারিক অস্বস্তির যোগ আছে। আয় ভাল। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্ম ভালই চলবে। মেয়েদের পক্ষ শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৪, ৫, ৯ আগষ্ট।

কুম্ভ : পারিবারিক পরিবেশ থেকে দূরে থাকার লক্ষণ আছে। শরীর সুবিধার নয়। ব্যয়াধিক্যজনিত উদ্বেগ থাকবে। আয় চলনসই। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ৭, ১০ আগষ্ট।

মীন : শরীর ভাল নয়। কিন্তু পারিবারিক ও আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ে উন্নতির লক্ষণ আছে। কাজকর্মে সুখ্যাতির সম্ভাবনা। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৮, ৯ আগষ্ট।

—শুভাচার্য

দীপক দে-র রম্য রচনা

কলকাতা দেখেছি

(২য় সংস্করণ) ৩·০০

ডি. এন. লাইব্রেরী | লিপিকা
৪২, বিধান সরণি | ৩০/১, কলেজ রো

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ...

আপনার প্রশ্ন ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

জলসা

রবিতীর্থের তাসের দেশ

সংগঠক ও শিল্পী দুটি বিপরীত শব্দ। নানা কারণেই শিল্পীর পক্ষে সংগঠক হওয়া যেমন সম্ভব নয়, ঠিক ততখানিই অসম্ভব অপর পক্ষের শিল্পী পর্যায়ে আপনাকে অচলপ্রতিষ্ঠ রাখা। কিন্তু এই নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র। একাধারে প্রযোজক ও শিল্পীর সৃজনশক্তি ও কল্পনার মিলিত ঐশ্বর্যে ঝলমল করেছে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে রবিতীর্থের ব্যানারে শ্রীমতী মিত্র প্রযোজিত 'তাদের দেশ'—গত ২২ জুলাই।

প্রতি শিল্পীর কাছ থেকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করতে জানেন বলেই বহু-প্রদর্শিত 'তাসের দেশ'ও এক অসামান্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল হয়ত বা তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসাদগুণেই।

প্রাণহীন প্রথার বিরুদ্ধে উচ্ছল প্রাণের বিদ্রোহ ও গতির বিদ্যুৎমন্ত্রে জড় মনকে আবেগের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার আনন্দ ও কৌতুক জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাসের দেশের প্রতি ছত্রে।

তাসের দেশে রবীন্দ্রনাথের পরিমার্জিত মনের কৌতুক নির্ঝর প্রকাশ-ভঙ্গীর যে সহজ মাধুর্যে উৎসারিত তারই সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলেছে এ নৃত্যনাট্যের মঞ্চসজ্জা। রূপসজ্জা, আলো-গান সব কিছুই। বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে যে কৃতিটি সেটি হল এই যে, 'তাসের দেশ' যে নৃত্যনাট্য এ সত্য সম্বন্ধে এ অনুষ্ঠানের স্রষ্টা প্রতি মুহূর্তে সচেতন ছিলেন বলেই নৃত্য ও নাট্যের এমন উজ্জ্বল সমন্বয় সম্ভব হয়েছে। প্রথার ওপর প্রাণের জয়ধ্বজা উড়েছে, তাই নৃত্যের চলমান ধারা থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিষয়বস্তু বিচ্যুত হয় নি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—রাজপুত্রের ভূমিকায় শিবশঙ্করম্ যখন হরতনীর ভূমিকায় আরতি মজুমদারকে নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার ছলে তার ভেতর উতল হাওয়ায় ভেসে যাবার উচ্ছ্বাসকে জাগিয়ে তুলছেন ঠিক সেই মুহূর্তেই নবীনা শিক্ষার্থিনীর ভাবান্তর, বিস্ময়, নতুন অনুভূতির সঙ্গে পরিচয়ের চমকদোল যেন এক চিরন্তন লীলার বিচিত্র ছবিখানি হয়ে উঠেছে। কিম্বা 'তোমার পায়ের তলা যেন গো রং লাগে'তে শান্তি বসুর তাসের দেশের কন্যার সাথে রং লাগাবার ছলে মনে রং লাগাবার প্রয়াস (নাচেরই ছন্দে) কম উপভোগ্য নয়। অধিকাংশ নাচেই কথাকলির নাটকীয় রসের সুষ্ঠু প্রয়োগ এক পূর্ণাঙ্গ শিল্পকৃতি হয়ে উঠেছে। জায়গা বিশেষে (বিশেষ করে [illegible] পুষ্পধন্বী [illegible]

পূর্ণ করেছে। অন্যান্য নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শম্ভু ভট্টাচার্য, রামগোপাল ভট্টাচার্য, অলকানন্দা, ধ্রুবটি সেন, আদিত্য মিত্র, পিনাকী রায়, ইন্দ্রা সেন, সন্তু মুখোপাধ্যায়, সুনীত বসু, ভারতী পুরকায়স্থ ও নৃত্য-পরিচালক রামগোপাল ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে কোন বিশেষ শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রশংসা করলে অন্যের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই আপনাপন নৈপুণ্য দিয়ে টিমওয়ার্ককে জোরাল করে তুলেছেন। আরতি মজুমদারের অভিনয় ও নৃত্যের অফুরন্ত সুষমা তাঁর 'মানব কন্যা'র নৃত্যাভিনয়ের উচ্চ মান বজায় রেখেছে।

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ও শিবজেন চৌধুরীর পরিচালনায় গানগুলি সুপরিবেশিত। মাঝে মাঝে গানগুলি যেমন 'তোমার পায়ের তলায়' গানটির সূচনায় কিছু জড়তা হয়ত ছিল। তবে সে ত্রুটি সংশোধিত হতে দেরী হয় নি। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে শোনা গেল—'বনে ফুল তুলিতে এলেম বনে', 'ঘরেতে ভ্রমর এল' ও 'কেন নয়ন'। তরুণ শিল্পী সুমিত্রা রায় (মুখার্জি) সুন্দর গেয়েছেন 'বল সখি' ও 'বিজয়মালা' গান দুটি।

পটভূমিকার সঙ্গীত রচনার কৃতিত্বের একটা বড় অংশের দাবীদার শ্রীদীনেশ চন্দ। বিশেষ করে 'কেন নয়ন আপনি ভেসে যায়' শুরু হবার আগে সেতারে বিলাসখানি টোড়ির রূপাভাসে তাঁর কল্পনা-প্রবণ মনটির প্রতিভাস ভোলার নয়। সুচিত্রা মিত্রর প্রাণোচ্ছল ভাষ্যপাঠে ছিল আর এক আকর্ষণ। অন্যান্য যাঁরা ভাষ্যপাঠে কণ্ঠদান করেছেন তাঁরা হলেন প্রদীপ ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ, সবীর মিত্র, তুষার ভঞ্জ ও শ্রীলা সেন।

সংলাপ সংক্ষেপ করে নৃত্য ও গানে রূপান্তরিত করায় উপভোগ্যতার মাত্রা বেড়েছে। মঞ্চ ও সজ্জার সুরেন চক্রবর্তী, ননী দাসগুপ্ত ও আলোকসম্পাতে কণিষ্ক সেন সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক হয়ে উঠেছেন।

স্টার এট্রাকশনের আলম নৃত্যোৎসব : রঞ্জিতমল কাংকারিয়া ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "স্টার এট্রাকশন"—গড়ে উঠেছে এক সুদূরপ্রসারী স্বপ্ন নিয়ে। উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সংস্কৃতি বিনিময়।

এদের বর্তমান পরিবেশন তালিকায় আছে রঙ্গশ্রী লিটল ব্যালে থিয়েটারের কয়েকটি নৃত্যনাট্য। আগামী ৬ থেকে ১১ আগষ্ট পর্যন্ত রবীন্দ্রসদন মঞ্চে এঁরা উপহার দেবেন রামায়ণ, ক্ষুধিত পাষাণ (রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" কাহিনীর ভিত্তিতে), ডিস্কভারী অফ ইণ্ডিয়া (পণ্ডিত নেহেরুর) ও ময়ূরভঞ্জের ছৌ-নৃত্যের আঙ্গিকে "ভৈরবী"। এঁরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, [illegible] শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষের কাছে এই নৃত্যোৎসবের যথাক্রমে উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবার আবেদন জানিয়েছেন।

গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মিনিস্ট্রি অফ কালচার ও সংগীত নাটক একাডেমীর সেন্সীল বোর্ড এই নৃত্যনাট্যগুলিকে প্রমোদকর বিরহিত করবার জন্য সুপারিশ করেছেন। বিহারে এই প্রথা কার্যকরী হয়েছে।

১৯৫২ অব্দে বোম্বেতে লিটল ব্যালে গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তি বর্ধনের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানায়। নৃত্যগুরু উদয়শঙ্করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রীবর্ধনের গঠনমূলক নৃত্যরচনায় তাঁর প্রগতিশীল মনটির পরিচয় মেলে। ১৯৫৪ খৃঃ তাঁর অকালমৃত্যু সমসাময়িক নৃত্যধারার ইতিহাসে এক দুর্ঘটনা। শ্রীমতী গুল বর্ধন ও শ্রীবিক্রম দাস সিরালী দেশ-বিদেশে সাংস্কৃতিক সফরের মাধ্যমে শ্রীবর্ধনের এই শিল্পকলার ধারাকে প্রবাহিত রাখার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন।

প্যারিস, হলাণ্ড ফেস্টিভেল এবং এডিনবার্গ ফেস্টিভেলে এই প্রতিষ্ঠান ৪টি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও চীন, নেপাল, রাশিয়া, জার্মাণী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, মরোক্কো, তিউনিশিয়া, ব্রিসিল, চিলি, আর্জেন্টিনিয়া, ইংল্যাণ্ড, লেবানন, বুলগেরিয়া, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, হংকং ও থাইল্যাণ্ড এঁদের নৃত্যনাট্য-কলারসিকদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে।

৬ থেকে ১১ আগষ্ট কোলকাতার পর আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা সফরও এঁদের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

গত শনিবার রিট্‌জ কণ্টিনেন্টাল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী গুল বর্ধন, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও রঞ্জিতমল কাংকারিয়া এই তথ্যগুলি পেশ করেন। পাপেট-স্যাঙ্গকে এবং শান্তি বর্ধনের এই নৃত্যরচনায় সঙ্গীত পরিচালক হলেন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও অবনী দাসগুপ্ত। সর্বসমেত ২৭ জন শিল্পীগঠিত এই সম্প্রদায়ের 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্য বাল্মীকির রামায়ণানুসারী হলেও তুলসী রামায়ণের চৌপায়ীরও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

—চিত্রাঙ্গদা

•ঘড়ি•
•জায়না•
গ্যারাণ্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
8, জলহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

একদা ভাস্কর চৌধুরী এবং রীতা ভাদুড়ী

হিন্দী ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রী জীনৎ আমন। ফটো : অমৃত

ধীরেন গাঙ্গুলী এবং অলীকবাবুর
বিশেষ অভিনয়

স্বর্গলোক থেকে দেবগণ, বোধকরি, স্টার থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন গেল মঙ্গলবার, ২৪ জুলাই সন্ধ্যায়। সারা পৃথিবীর মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে একটি একান্ত বিরল ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে এবং আমরা হলপ করে বলতে পারি, তাঁরা নিশ্চয়ই ব্যর্থমনস্কাম হননি। আমাদের নিজেদের কথা যদি শুনতে চান, তো বলবো, ৮১ বৎসর বয়স্ক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যুবক অলীকপ্রকাশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের আশাতিরিক্ত আনন্দদান করেছেন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর অভিনয় আমাদের রীতিমত দমফাটা হাসি হাসতে বাধ্য করেছে। এক এক সময় লক্ষ্য করেছি, সারা প্রেক্ষাগৃহ যেন তুমুল হাসি হাসতে হাসতে আসনের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। আরও একটি যে-জিনিস বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, সেটি হচ্ছে, মঞ্চের ওপর ৮১ বৎসর বয়স্ক ধীরেন্দ্রনাথই ছিলেন সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্র গতিবিশিষ্ট শিল্পী। যেখানে গদাধরবেশী গোবিন্দ গাঙ্গুলী অলীকপ্রকাশরূপী ধীরেন্দ্রনাথকে ছুরি হাতে তাড়া করছেন, সেখানে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল ডি-জি (এই নামেই ধীরেন্দ্রনাথ সমধিক পরিচিত) যে-ভাবে মঞ্চের ওপর রাখা আসবাবপত্রের বাধাকে অতিক্রম করে মঞ্চে ইতস্তত ছোটাছুটি করেছেন তাতে মনে হয়, একদা ডি-জি হার্ডল রেস চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। ডি-জির মুখের 'আরে বাপরে, এযে দেখছি, যা বলছি, তাই সত্যি হয়ে যাচ্ছে' সংলাপটি আমাদের বহু বহু দিন মনে থাকবে। হেমাঙ্গিনী-রূপিণী রীণা ঘোষের পা জাপটে ধরে মঞ্চের ওপর পড়ে থাকা অবস্থায় ডি-জিকে যখন শ্রীমতী ঘোষ বেশ কিছুদূর পর্যন্ত হিঁচড়ে নিয়ে যান এবং পরক্ষণেই ডি-জি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করেন, তখন তাঁর যৌবনোচিত বিক্রম দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

ডি-জির দেহ দেখে বুঝবার উপায় ছিল না, তিনি যুবক না বৃদ্ধ। মাত্র তাঁর মুখমণ্ডলটি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছে, তাঁর যে বয়েস হয়েছে, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়েছে। আমাদের মনে হয়, প্লাস্টিক মেক-আপ দ্বারা এই ত্রুটীর সংশোধন হতে পারত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল পরিষ্কার, শ্রুতিগ্রাহ্য। তবে সম্ভবত তাঁর স্মৃতিশক্তি এখন আর তত প্রখর নয়, তাই তিনি তাঁর ভূমিকার কর্তব্য মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছিলেন এবং স্মারকও তাঁকে হয়ত সাহায্য করতে পারছিলেন না তিনি প্রম্পটিং শুনতে অভ্যস্ত নন বলে।—তবু, তবু, যা তিনি সেদিন তাঁর অভিনয় মারফত উপহার দিয়েছেন, তা হচ্ছে আমাদের জীবনের একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা—বলতে পারি, দুর্লভতম অভিজ্ঞতা। আমাদের সতীর্থ যে-সব নাট্যসমালোচক সে-সন্ধ্যায় উপস্থিত হননি, আমরা তাঁদের জন্যে সমবেদনা বোধ না করে পারছি না।

অবশ্য ঐ সন্ধ্যার অভিনয়ে ডি-জির সঙ্গে ছিলেন সত্যসিন্ধুর ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং জগদীশপ্রকাশের ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুজন প্রবীণ নট অভিনয়ের সামগ্রিক সাফল্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তবে সবচেয়ে বেশী যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন গদাধরের ভূমিকাভিনেতা গোবিন্দ গাঙ্গুলী। বলা যেতে পারে, দর্শকদের কৌতূহল একমাত্র তিনিই দৃঢ়হস্তে ধরে রেখেছিলেন। চীনেম্যান, মারওয়াড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপশয্যায় তিনি ছিলেন কৌতুকের প্রস্রবণ। অলীকপ্রকাশের মদাপ বন্ধুর ভূমিকায় দীপক গাঙ্গুলী গানে, অভিনয় দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। নায়িকা হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় রীণা ঘোষ অঙ্গভঙ্গী, বচন ও গান গাওয়া—সব দিক দিয়েই দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন।

প্রেক্ষাগৃহ

৮১ বছর
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তাঁর কণ্ঠস্বর যদি কিছুটা সতেজ হ'ত তাহলে ভূমিকাটি আরও উপভোগ্য হয়ে উঠত। পরিচারিকা প্রসন্ন-এর ভূমিকায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সু-অভিনয় করেছিলেন ডি-জি কন্যা মঞ্জুলিকা।

২৪ জুলাই, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে ডি-জি প্রমুখ অভিনীত 'অলীক বাবু' একটি চিরস্মরণীয় মঞ্চাভিনয়রূপে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

মেট্রোতে মুক্তিপ্রতীক্ষিত 'বিলাত ফেরত'

চিদানন্দ দাশগুপ্ত রচিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত বিচিত্র কমেডি 'বিলাত ফেরত' শীঘ্রই কলকাতার মেট্রো সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে। তিনজন বিভিন্ন বিলাতফেরত যুবকের কাহিনী অবলম্বনে তিনটি ছোট ছবির সমন্বয়ে এই 'বিলাত ফেরত' গঠিত। এই তিনটি চরিত্রে রূপদান করেছেন যথাক্রমে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার। অপরাপর ভূমিকায় আছেন অপর্ণা সেন, শ্যামল ঘোষাল, কৃষ্ণ কুণ্ডু, দিলীপ বসু, নীতা সেন, অনীতা দত্ত, পার্থপ্রতিম রায়চৌধুরী এবং নবাগত সোহাগ সেন। শ্রীদাশগুপ্ত নিজেই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন এবং নেপথ্য কণ্ঠদান করেছেন জয়শ্রী রায় এবং ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ারের সভ্যবৃন্দ।

যান্ত্রিকের পরবর্তী ছবি 'নগর দর্পণে'

শ্রীগিরধরী পিকচার্স প্রযোজিত ও পরিবেশিত 'নগর দর্পণে' ছবির চিত্রগ্রহণ ২৮ জুলাই থেকে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে শুরু হয়েছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—পার্থপ্রতিম চৌধুরী। পরিচালনা করছেন—যান্ত্রিক। প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন—উত্তমকুমার ও কাবেরী বসু।

মঞ্চাভিনয়

'অব্যয়ে'র 'ভোরের মিছিল' : যে সমাজটাকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে আমরা স্বপ্নের মালা গাঁথি, সোনালী দিনগুলোর পদধ্বনি মনের আকাশে শুনতে পাই; তার আসল চেহারা মাঝে মাঝে আমাদের মর্মান্তিকভাবে হতাশ করে দেয়। ক্ষুব্ধ হয়ে তখন ভাবতে বসি, এ সমাজ ব্যবস্থায় তো শুধু ভাঙ্গন আর অবক্ষয়; শুধু না পাওয়ার গ্লানি আর ব্যথা। তবুও আমরা চলি, অন্ধকারের অরণ্যে আলোর সন্ধান করি। নতুন ভোরের দিকে আমাদের মুখর মিছিল—এই তো জীবন-সত্য। 'অব্যয়' প্রযোজিত 'ভোরের মিছিল' নাটকটির মর্মমূলে জীবনানুভূতির এই গভীরতাই রয়েছে লুকিয়ে। রতনকুমার ঘোষের এই রসোত্তীর্ণ বলিষ্ঠ নাটকটির প্রযোজনা উপস্থিত করে 'অব্যয়ের' শিল্পীরা নাট্যচর্চায় তাঁদের শৈল্পিক নিষ্ঠাই প্রমাণ করলেন।

জীবনরস সমৃদ্ধ এই নাটকটির মর্মের আলোয় সপ্রতিভ করে তুলতে যাঁর আন্তরিকতা ও শিল্পবোধের কথা প্রথমেই মনে আসে, তিনি হোলেন নির্দেশক দিলীপকুমার বসু। শ্রীবসু নাটকের প্রতিটি মুহূর্তকেই প্রাণচঞ্চল করে তোলবার জন্য যে নিবিড় চেষ্টা করেছেন, তার নজীর প্রযোজনায় আছে।

অভিনয়ের ব্যাপারে শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে প্রত্যাশিত আবেগ এনে চরিত্রচিত্রণকে মোটামুটি মর্মস্পর্শী করে তুলতে পেরেছেন। বিশেষ করে সুশান্তকুমার মৈত্র (বিলাসবাবু), সন্তোষ চক্রবর্তী (হরেন) তাঁদের অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত করেন। 'পদ্মর' ভূমিকায় সীমা দে ভালোই করেছেন, কিন্তু আর একটু প্রাণময়তা তাঁর চরিত্রচিত্রণে আসা উচিত ছিল।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন দীপক শীল, শঙ্কর বসু, প্রদীপ বসু, সত্যপ্রিয় সরকার, দিলীপ রায়, সন্তোষ রাহা, বাবলু সিংহরায়, দেবদাস ভট্টাচার্য, সুভাষ বসু।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতও মূল নাটকের গতিবেগকে অটুট রাখতে সাহায্য করেছে।

বন্দর : অমৃতবাজার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা এবারে যে নাটকের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছেন, তার নাম হোল 'বন্দর'। বীরু মুখার্জীর এই সামাজিক নাটকটির নির্দেশনায় রয়েছেন শ্রীদিলীপ মৌলিক।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেবেন প্রবীর সেন, সমীর মিত্র, মলয় ব্যানার্জী, নিশীথ বড়াল, প্রশান্ত বসু, অজিত ঘোষ, জগবন্ধু ভাণ্ডারী, অচ্যুত সিনহা, কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, দেবদাস ব্যানার্জী, দিলীপ দত্ত, গোপাল মুখার্জী, সত্যেন বসু, অঞ্জলী ভট্টাচার্য, গীতা কর্মকার, মালা দাস, মন্দিরা রায় ও দিলীপ মৌলিক।

সকালের জন্য : ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট সি পি ডবলু ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'সকালের জন্য' নাটকটি রঙমহলে পরিবেশন করলেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নেন তারকেশ্বর রায়চৌধুরী।

সুঅভিনীত এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন মৃগাঙ্ক গোস্বামী, নৃপেন্দ্রমোহন

মুক্তঅঙ্গন ৪৬-৫২৭৭

শৌভনিক ॥ সন্ধ্যা ৬/৩০

আগষ্ট মাসের অভিনয়সূচী

৪ঠা/১৮ই আগষ্ট :
মলাটের রঙ মুহূর্ত

৫।১১।১২।১৯।২৫ ও ২৬শে
আধে অধরে (বাংলা)

১৫ই/২১শে : **ছুটির ফাঁদে**

আগামী নাটক : **শংকরের**
স্থানীয় সংবাদ

শুক্রবার, ৩রা আগষ্ট থেকে

• দুর্গম মরুপথে শোনে মহামিলনের আহ্বান •

বিস্ময়কর 'অবধূত'-এর অবিস্মরণীয় থিরুমল আর কুন্তী.....

মিনার-বিজলী-ছবিঘর ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

পরিবেশনা : মোক্ষদা ফিল্মস, ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলি-১৩

মরুতীর্থ হিংলাজ/সাবিত্রী ও উত্তমকুমার

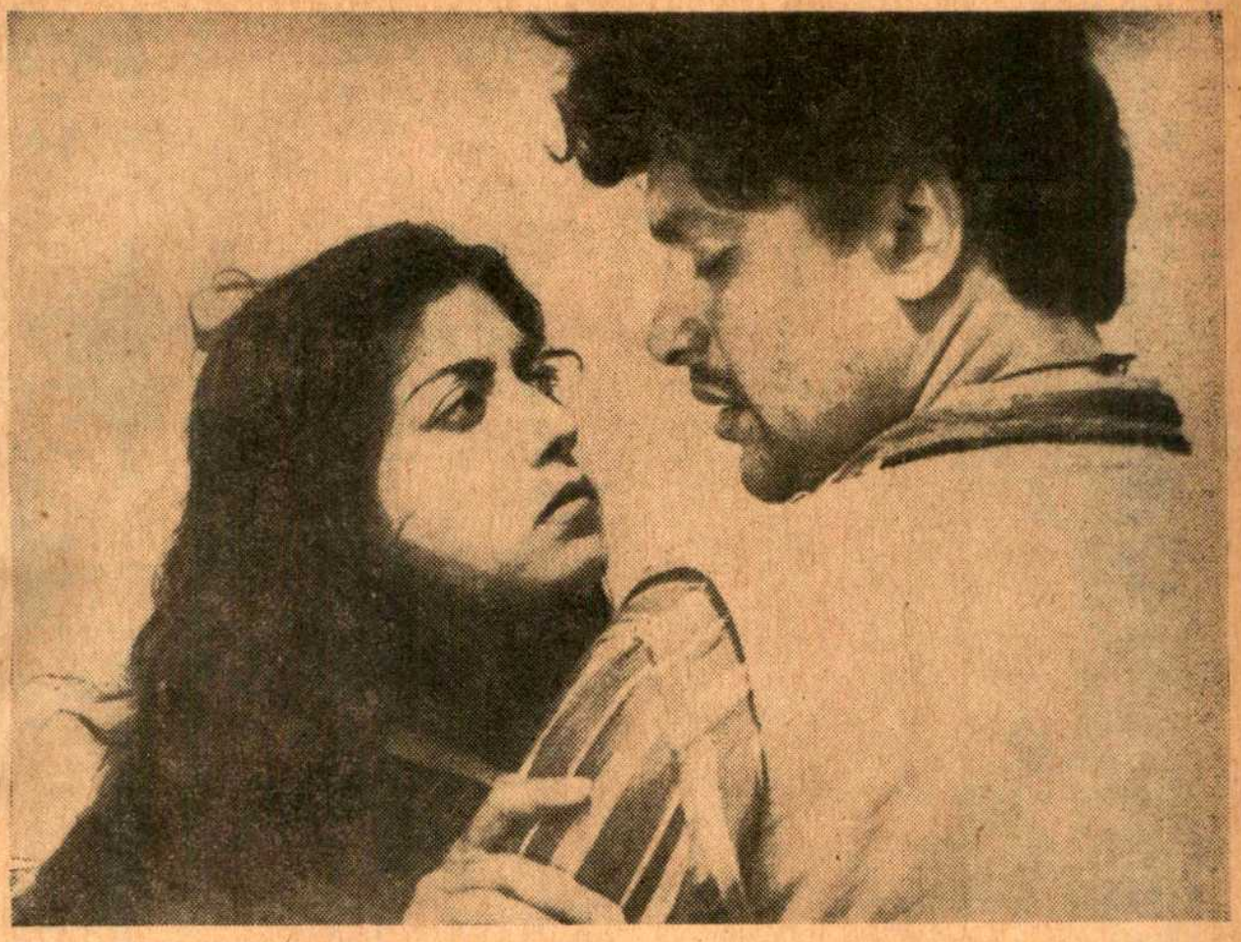

মৈত্র, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কাননজিৎকুমার সেন, তারকেশ্বর রায়চৌধুরী, বাদলচন্দ্র ভট্টাচার্য, দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, রামপদ হালদার, শ্যামানন্দ বোস, প্রভাতকুমার পাল, অরুণ বসু, মধুসূদন সরকার, নিমাইচাঁদ ঘোষ, কবিতা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাকড়সার জাল ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ যাত্রানুষ্ঠান কমিটি পর্ষদের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'মাকড়সার জাল' নাটকটি পরিবেশন করেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নেন রাসবিহারী মহাপাত্র।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন বঙ্কিম দাস, রাসবিহারী মহাপাত্র, তারাপদ রায়, কুন্তল রায়, দীপক চক্রবর্তী, নবকুমার চ্যাটার্জী, সমীর দাশগুপ্ত, শঙ্করী মহাপাত্র, মৃত্যুঞ্জয় বসু, জ্যোৎস্না দেবনাথ, হরিপদ বসু, বিমল দাস লীলা মিত্র, অশোক সেন, শঙ্কর দত্ত।

উত্তাল তরঙ্গ ঃ রাণাঘাট অ্যাথলেটিক ক্লাবের সভ্যরা কয়েক দিন আগে রাণাঘাট রবীন্দ্রভবনে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'উত্তাল তরঙ্গ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন। নাট্য নির্দেশনায় ছিলেন প্রদ্যোৎ বসাক।

চরিত্রচিত্রণে ছিলেন নারায়ণ প্রামাণিক, সুজন ঘোষ, প্রীতিময় দেচৌধুরী, রবীন্দ্র প্রামাণিক, অচিন্ত্য হালদার, সুনীত মল্লিক, স্বপন পাল, তপন চক্রবর্তী, জ্যোতি কুণ্ডু, মলয় কুণ্ডু, নৃসিংহ দে, রাজর্ষি দেচৌধুরী, নির্মল দেবনাথ।

মুকুরের 'থানা থেকে আসছি' ও 'কানাই বলাই' ঃ নাটকের বিষয়বস্তুতে কোন অসাধারণ দীপ্তি না থাকলেও শুধু দলগত অভিনয় নৈপুণ্যেই যে নাটকটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, এমন নজীর অনেকই আছে। কয়েক দিন আগে কলকাতা শহরের বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী 'মুকুরের' শিল্পীরা এই সত্যকেই মুক্তঅঙ্গনের মঞ্চে প্রোজ্জ্বল করে তুললেন। সেদিনের নাটক ছিল দুটি—'থানা থকে আসছি' ও 'কানাই বলাই'। প্রথম নাটকটির সংঘাত গড়ে উঠেছে একটি মেয়ের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে। শুভদিনে মেয়েটির এই দুর্ঘটনাকে ঘিরে পরিবারের অন্য সবাই উদ্বিগ্ন। তাদের নানা রকম এলোমেলো চিন্তা থেকে একথাই হয়তো প্রমাণিত হয়েছে যে কোন না কোন ভাবে সবাই এই আত্মহত্যার মূলে পরোক্ষ ভূমিকা নিয়েছে। এই আত্মহত্যার দায়ভাগ এড়ানো বোধ হয় কারো পক্ষে সম্ভব নয়। একটি সাব-ইন্সপেকটরের সঙ্গে সংলাপের মধ্য দিয়ে এই সত্যের ওপরেই হয়তো আলোকপাত করা হয়েছে।

'কানাই বলাই' নিছক হাসির হিল্লোলে উচ্ছল নাটক। একটি দম্পতিকে কেন্দ্র করে নাটকটির গতিবেগ সমৃদ্ধ হয়েছে। সিরিয়াস কোন চিন্তার প্রতিফলন নেই এই নাটকে।

দুটি নাটকই অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন শ্রীশ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য। শ্রীভট্টাচার্য যে একজন কুশলী নাট্য-নির্দেশক তা নাট্যপ্রযোজনার বহু মুহূর্তেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

দুটি নাটকেই যেসব শিল্পীরা অংশ নেন তাঁরা সবাই চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে

সাগর সেনের
পরিচালনায়
রবিরশ্মির সর্বজনপ্রিয় অনুষ্ঠান
শ্রাবণ সন্ধ্যা
নৃত্য / সঙ্গীতসমৃদ্ধ
১২ই আগষ্ট রবিবার রবীন্দ্রসদনে ৬৷৷
সঙ্গীতে ঃ দেবব্রত - চিন্ময় - অশোকতরু
সাগর - সুমিত্রা - বনানী - পূর্বা - বাণী
নৃত্য-পরিচালনা ঃ মঞ্জুলিকা দাস
টিকিট ঃ ১০৲ ৭৲ ৫৲ ও ৩৲
স্টাইলো, অলোডি ট্রেডার্স ও সদনে

পেরেছেন। আলাদা করে কারো অভিনয় উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই মনে হয়।

দুটি নাটকের শিল্পী তালিকায় ছিলেন শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখার্জি, দীপা হালদার, বন্যা মুখার্জি, কমল দাস।

সেই তিমিরে : আই সি আই হেড অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রসদনে অভিনীত হোল 'সেই তিমিরে' নাটকটি। বিস্মিত হবার মতো চমক নাটকাহিনীতে ছিল না, গতানুগতিক ধারাতেই নাটকের গতি হয়েছে বিধৃত। তবুও শেষ পর্যন্ত নাটকটি দর্শকদের যে ধরে রাখতে পেরেছিল তার মূলে রয়েছে মহিলা শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনয়। অফিসের মহিলা কর্মীরাই স্ত্রী-চরিত্রে রূপদান করেন। এঁরা যে বিভিন্ন চরিত্রচিত্রণে রীতিমতো দক্ষ, সেদিনের অভিনয় তা প্রমাণ করে দিয়েছে। সফল প্রযোজনায় নির্দেশক গরীশ চক্রবর্তীর অবদানও কম নয়।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন লীনা মুখার্জি, শান্তি চ্যাটার্জি, রবীন ব্যানার্জি রবীন দাস, অনিমা রায়, ব্যোমকেশ মল্লিক মীনাক্ষী জৈন, নন্দ ব্যানার্জি, নীলাঞ্জনা সেন, সন্তোষ বসু, অনুরাধা চক্রবর্তী মিনতি ভট্টাচার্য, রথীন ব্যানার্জি, ছন্দা গুপ্তা শ্যামল ব্যানার্জি, সুবিমল রক্ষা, চিত্তরঞ্জন আচার্য, মলি ব্যানার্জি।

তবে আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা সব সময়ে নাটকের মেজাজকে পরিস্ফুট করে তুলতে পারেনি।

'নাট্যম'র দুটি একাঙ্ক : কাশীপুর গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর কর্মিবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত 'নাট্যম' সংস্থা সম্প্রতি প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'রঙ্গনা'য় দুটি একাঙ্ক নাটকের প্রযোজনা করলো। নাটক দুটি হোল ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাবনা' ও সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছয়ছ ড়ার ছাউনি'। দুটি একাঙ্কিকার নির্দেশনায় ছিলেন অনুপম কানুনগো।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন তাপস তালুকদার, অলক মিত্র, দীপক নন্দী লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য, নারায়ণ চক্রবর্তী রামপদ চক্রবর্তী, দিলীপ পাত্র, শ্রীকান্ত সাঁতরা, সোমেন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা হালদার অনুপম কানুনগো।

পাহাড়ী ফুল : শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটকটি সম্প্রতি 'রঙমহলে' পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন শুভম্ নাট্যগোষ্ঠী। সুমিত দেব নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন সুমিত দেব, তপন ধর, কমলেশ ভট্টাচার্য, তাপস রায়, বিকাশ মজুমদার, অমলেন্দু ব্যানার্জি শ্যামল পোড়ে, অশোক ঘোষ, সুশীল দত্ত, নিতাই ঘোষ, বন্দনা বিশ্বাস, আরতি ঘোষ।

প্রশ্নের উত্তর

প্রণয় গোস্বামী, নয়াদিল্লী

সারা ভারতে ফিল্ম সেন্সার বোর্ড কি একটাই? না ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জন্যে আলাদা সেন্সার বোর্ড আছে? হিন্দী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছায়াছবি সেন্সারের ক্ষেত্রে কি একই ধরনের নিয়ম বিধি অনুসরণ করা হয়?

—সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সার এদেশে একটাই। তবে এই কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একটি করে রিজিওন্যাল ফিল্ম সেন্সার অফিস আছে। এঁদের সুপারিশক্রমেই কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড আঞ্চলিক চিত্রকে সেন্সার সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকেন। সেন্সার পলিসি সর্বত্র এক, অন্তত আমরা তাই বিশ্বাস করি কিন্তু প্রায়শ যেটা চোখে পড়ে, বিসদৃশ লাগে তা হচ্ছে—সব ভারতীয় হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে সেন্সার যতটা উদারতা দেখিয়ে থাকেন, আঞ্চলিক চিত্রের ক্ষেত্রে বোধহয় ততটা দেখান না।

সুশীল মুখার্জি, অল্পনা মুখার্জি
কলকাতা-১৭

কাগজে দেখতে পাই বিদেশ থেকে সোনা-দানা স্মাগল হয়ে আসে এদেশে, ফিল্ম আসে কি?

খুব চমৎকার প্রশ্ন করেছেন। হ্যাঁ, ফিল্ম-ও স্মাগল হয়ে আসে এদেশে। খোশলা রিপোর্টে এ-ব্যাপারে আলোকপাত ভাবে একটা উল্লেখও আছে। বিশেষ করে সস্তা শ্রেণীর নাইট সিরিজ, বন্ড-ক্রাইম, সেক্স ও সায়েন্স ফিকশান মার্কা ছবিগুলি ইউরোপ থেকে চোরা পথে তো বটেই, এমন কি প্রকাশ্যে সরকারী কর্তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়েই চালান হয়ে আসে। অপারেশনটা হয় এইভাবে : রোম থেকে একদিন এক ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটে সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে এসে নামল জনৈক ভারতীয় যাত্রী, সে সোজা কাস্টমস কাউন্টারে গিয়ে ঘোষণা করলো—সঙ্গে একটি ফিল্মের রীল রয়েছে, উচিত জরিমানা দিয়ে সেটির ছাড়পত্র চায় সে। এক রীল ফিল্ম—কোন নিষিদ্ধ বস্তু নয়, কাস্টমস মূল্য কষে দিতেই লোকটি টাকা জমা দিয়ে ফিল্মের ডাব্বা বোগলদাবা করে শহরে চলে গেল। কেউ জানলো না—নাইট সিরিজের একটি ছবির এক নম্বর রীলটি এদেশে ঢুকে পড়লো কোনরকম সরকারী অনুমতি বা আমদানী লাইসেন্স ছাড়াই। এর কয়েকদিন বাদে সান্তাক্রুজে আরও একজন যাত্রী নামলো, তার সঙ্গে পূর্বোক্ত ছবির দু-নম্বর রীল। একই পদ্ধতিতে সে টাকা জমা দিয়ে ছবি নিয়ে চলে গেল। এইভাবে কয়েকদিন পর পর বিভিন্ন যাত্রীর হাত দিয়ে ছবির পুরো চোদ্দ পনেরটা রীল এদেশে চলে এলো। এবার স্মাগলাররা সেন্সার কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিয়ে আবেদন করলো—দয়া করে আমাদের এই বিদেশী ছবিটা যেন সেন্সার করে দেওয়া হয়। দেওয়াও হলো সামান্য কাট-ছাঁট করে। সেন্সারের ছাড়পত্র- সেই সঙ্গে কাস্টমসের রসিদ দেখিয়ে এবার স্মাগলাররা সরকারের কাছে আবেদন করলো কোটা ফিল্মের কোটার জন্য—ফিল্মের কয়েকটি ডুপ্লিকেট কপি তৈরী করবার উদ্দেশ্যে। যথাকালে তা মঞ্জুর হলো। তারপর একদিন এদেশে শুরু হলো সেই স্মাগল করা ছবির ব্যবসাভিত্তিক প্রদর্শনী। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের মধ্যে পরিষ্কার কোন কো-অর্ডিনেশান না থাকায় এতবড় একটা বে-আইনী ব্যাপার ঘটে গেল, কেউ একবার প্রশ্নও করলো না ছবিটি এদেশে এলো কি

আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃত পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত
মাধুরী রায় বিরচিত
পার্বতী
(পর্বতকন্যাদের অপরূপ কাহিনী)
মূল্য—৩-৫০
প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থভারত, রাসবিহারী এভেন্যু

কবিরাজ মহেশ বিদ্যারত্নের
চুলিজল
চুলির অব্যর্থ ঔষধ
হার্বাল ড্রাগ কর্পোরেশন
৪০৩-২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়। মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

ভাবে বা কারা আনলো বা এর জন্যে কোন সরকারী অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিনা!

মঞ্জু প্রামাণিক, অতনু প্রামাণিক,
ডায়মণ্ডহারবার

কাগজে পড়লাম রবি ঘোষ 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা' ছবিটি পরিচালনা করছেন; তাই কি?

—খানিকটা তাই বটে। এই ছবির আসলে 'একলব্য' পরিচালক গোষ্ঠীর আড়ালে রয়েছেন দুজন—রবি ঘোষ ও নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য—পরিচালনা ও'রা দুজনেই করছেন বলে আমার অনুমান। ছবির কাহিনীকার অবশ্য রবি ঘোষ নিজেই।

শঙ্কর রায়চৌধুরী, কলিকাতা-২৫

অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী কোন হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন কি? যদি করেন তাহলে সে-ছবির নাম কি?

—হ্যাঁ করছেন। ছবির নাম গ্রহণ, বিমল করের কাহিনী, পুণা ফিল্ম ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র সুনীল ঘোষ এই শাদা-কালো হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করছেন। বসন্ত চৌধুরীর বিপরীতে ওই ছবিতে অভিনয় করেছেন নূতন ও সুহাসিনী মুলে ('ভুবন সোম' খ্যাত)।

—পত্রপাঠক

বাঙলাদেশের ছবি

অনির্বাণ

পরিচালক কামাল আহমেদের 'অনির্বাণ' এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ ছবিরও কাহিনীকার সৈয়দ শামসুল হক। চিত্রগ্রহণে আবদুল লতিফ বাচ্চু। সম্পাদনায় এনামুল হক। অভিনয়ে আছেন রাজ্জাক, কবরী, রওশন জামিল, মেহফুজ, আনিস, সাত্তার, মতিন ও আনসার। সংগীতে সুবল দাস। ছবিটি বর্তমানে মুক্তির দিন গুনছে বলে পরিচালক জানিয়েছেন।

তবুও মা

আশীষকুমার লোহের কাহিনী অবলম্বনে 'তবুও মা' নামে একটি ছবি তৈরী হচ্ছে। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন খসরু নোমান। প্রযোজনা করছেন কৌতুক অভিনেতা রাণুভাই ও সাবেক সাংবাদিক সৈয়দ শাইজাহানি। পরিবেশনার দায়িত্ব নিচ্ছেন রূপালী কথাচিত্র। ছবির শিল্পী এখনও চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়নি।

দয়াল মুরশিদ

মিথুন বাণী চিত্রের প্রথম চিত্র ঘাঁ 'দয়াল মুরশিদ' পরিচালনা করছেন রূপসনাতন। ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন সুচন্দা, আনোয়ার হোসেন, মেসবাহ, আনিস, মেহফুজ, রাজ, রুমী জালাল মতি ও শিউলী। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন কালিদাস। ক্যামেরায় রয়েছেন এ টি এস ইসহাক, সুর দিয়েছেন মরহুম সরদার আলাউদ্দীন ও ভারপ্রাপ্ত সংগীত-পরিচালক এম মনসুর। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন দাতা কথাচিত্র। ছবিটি মুক্তির দিন গুনছে।

দসুরাণী

সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া পরিচালিত ছবি 'দসুরাণী' চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে বলে ছবির পরিচালক ভূইয়া সাহেব জানালেন। এ ছবির মূল চরিত্র 'দসুরাণী'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাবানা। এ ছবি সব শ্রেণীর দর্শকদের দেখার উপযোগী হবে বলে পরিচালক মত প্রকাশ করলেন। এ ছবিতে তিনজন মরহুম শিল্পী অভিনয় করেছেন। এরা হলেন রাজু আহমদ, শিউলী আহমদ এবং এম, রহমান। উল্লেখ থাকে যে, উল্লিখিত শিল্পী তিনজন চলতি বছর মারা গেছেন। একজন গুলী-বিদ্ধ হয়ে, একজন অগ্নিদগ্ধ হয়ে এবং একজন হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে।

'দসুরাণী'র নায়ক চরিত্রে একজন নবাগত আছেন। নাম আলমগীর। অন্যান্য চরিত্রে যারা অভিনয় করছেন, তারা হলেন সামাদ, রাণী সরকার, সবিতা, এনাম আহমদ, সাইফুদ্দীন, আলাউদ্দীন, রবিউল এবং মতি প্রমুখ। আগামী ২৩ তারিখে ছবিটির সেন্সার হবে এবং ২৫ তারিখে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে বলে আশা করা যাচ্ছে। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন যমুনা কথাচিত্র।

প্রবেশ নিষেধ

শতদল কথাচিত্রের ব্যানারে শিবলী সাদিক পরিচালিত 'সমর্পণ' নামে যে ছবিটি তৈরী হবার কথা ছিল, তার কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। ছবির নামকরণ পরিবর্তন হবার কথা চলছে। সম্ভবতঃ নতুন নামকরণ হবে 'প্রবেশ নিষেধ'। এ ছবিরও পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন যমুনা কথাচিত্র।

হারানো সুখ

বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় রূপালী কথাচিত্রের প্রথম অবদান 'হারানো সুখ' ছবির কাজ বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। এর কারণ সম্পর্কে সৈয়দ শাহজাহান জানালেন, ছবির প্রধান দুটি চরিত্র অর্থাৎ নায়ক নায়িকা মাধবী ও নির্মলকুমার বর্তমানে কোলকাতায় অন্যান্য ছবিতে ব্যস্ত থাকায় 'হারানো সুখের' কাজ আপাততঃ বন্ধ রয়েছে। তবে চলতি মাসের শেষের দিকে সুটিং পুনরায় শুরু হবে।

ছবিটি পরিচালনা করছেন চিত্রকর-গোষ্ঠী। সংগীত পরিচালনা করছেন—রাজা শ্যাম। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন এফ, রহমান। প্রযোজনায় মোমতাজউদ্দীন আহমদ।

অভিনয়ে আছেন—মাধবী নির্মলকুমার ছাড়া সুচন্দা, মোস্তফা, অরুণ রায়, শমিতা বিশ্বাস, নারায়ণ চক্রবর্তী, দীপ্তি, প্রবীর, রাণু, রবিউল, ফরিদ আলি, নৃপতি চ্যাটার্জি, আনিস, বীণা প্রমুখ।

ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন রূপালি কথাচিত্র।

দুই পর্ব

খসরু নোমান পরিচালিত 'দুই পর্বে'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন আনোয়ার পারভেজ। চিত্রগ্রহণে সিরাজ। প্রযোজনায় আলতাফ খসরু। অভিনয়ে আছেন রাজ্জাক, কবরী, আনোয়ার হোসেন, সুমিতা, রাজু, রাজ, আশিষ, শিউলী, আলতাফ প্রমুখ।

বাংলার ২৪ ঘন্টা

এম আলী পরিচালিত এ-ছবিটির কাজ শেষ পর্যায়ে। অভিনয়াংশে রয়েছেন কায়েস, কবিতা, জাভেদ, কাবেরী, জরিনা, কালিদাস, আনোয়ার হোসেন ও শওকত আকবর প্রমুখ। ফটোগ্রাফিতে রয়েছেন বি বি মিস্ত্রী ও সুরারোপ করেছেন ওমর ফারুক।

বিবিধ সংবাদ

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ এ বছর সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে গত এপ্রিল

শ্যামলকুমার গুপ্ত কলকাতা বেতারের নিয়মিত গীটার শিল্পী। বহু সংগীত-আসরে বাজিয়ে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিভার পরিচয় রাখছেন। সংগীতকুশলী পরিবারে জন্ম। রামনিধি গুপ্তের ('নিধুবাবু') বংশধর। পিতা সংগীতজ্ঞ ডাঃ সারদা গুপ্ত। হাতেখড়ি কাকা বরদা গুপ্তের কাছে। বর্তমানে 'আওয়ার অর্কেস্ট্রা'য় ক্লাসিকালের চর্চা করছেন।

মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। ইতিমধ্যেই দুটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এতে রঙ্গালয়ের শতবর্ষ পরিক্রমায় যাঁরা পথিকৃত তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সমীক্ষা করা হয়েছে। এই সকল সভায় শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডকটর উষা রায় প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগ দিয়েছেন। এবার আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে এঁরা ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত নৃত্যগীতবহুল চিরনূতন নাটক 'পালিবাবা' মঞ্চস্থ করছেন। শক্তিশালী সংসদ শিল্পীগোষ্ঠী এই নাটকে অংশ গ্রহণ করছেন। সংসদ সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানান যে, এর পর আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান করা হবে এবং এই সকল সভায় ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ উৎসব সম্পন্ন করা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ-স্মরণী এঁরা সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন ও বহু সুধী লেখকের লেখায় শতবর্ষে নাট্যশালা কিভাবে এগিয়ে চলেছে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে।

"নৃত্যের তালে তালে"র শিল্পমেলা : "নৃত্যের তালে তালে"-র অধিকৃত নৃত্যশিল্পী মীরা দাশগুপ্তের পরিচালনায় সম্প্রতি কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে নিখিল ভারত শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্রকলা, সূচীশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

অনেক ছোট্ট, সুন্দর ছবিতে শিশু শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তাধারার ছাপ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। এছাড়াও শম্পা দাসগুপ্তের তৈরী মুগের ডাল, মুসুর ডাল, সরষের সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি প্রতিকৃতি দেখবার মতই। রত্না লালওয়ানীর কাঠপেন্সিলের কাঠ দিয়ে তৈরী ছবি, চম্পা মুখোপাধ্যায় ও পূরবী শীলের বাটিকের কাজ বিশেষ করে চাদরগুলি লোভনীয়। সূচীশিল্পের কাজগুলির মধ্যে সবিতা দত্ত, ছায়া মণ্ডল ও রীতা রায়ের কাজও প্রশংসার দাবীদার। আর এক আকর্ষণ ছিলো ইরাণী সরকারের ছোটো ছোটো শিশি দিয়ে তৈরী একটি তাজমহল। ফুল সাজানোর কারিগরীতে শিল্পকৃতি দেখিয়েছেন রীতা সরকার, চম্পা মুখার্জী, স্বপ্না রুদ্র।

প্রথম দিনে অনুষ্ঠানের সুরুতে নৃত্যশ্রী মীরা দাসগুপ্তা পরিচালিত ও পরিকল্পিত রবীন্দ্রনাথের 'দারুণ অগ্নিবাণ' সংগীতালেখ্য দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

সমাপ্তি দিবসে প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডি-পি চট্টোপাধ্যায়, রণেন আয়নদত্ত ও শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সনৎকুমার দাসগুপ্ত।

দিশারীর পঞ্চম বার্ষিক মানপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

গেল ১৪ জুলাই ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেণ্টারে অনুষ্ঠিত এক সভায় দিশারী গোষ্ঠী ১৯৭২ সালের নাটক, যাত্রা ও মার্গসঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত গুণিজনদের মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথি ও পুরস্কারবিতরকরূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের উপমন্ত্রী ধরমবীর সিংহ, চিত্রসাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও কালচারাল সেমিনারের প্রতিনিধি, সমর মুখোপাধ্যায় দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল দাশ সলিল পাল রঞ্জিত গাঙ্গুলী শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় স্বপ্না মিত্র, (যাত্রা) আগন্তুক নিউ প্রভাস অপেরার প্রতিনিধি পঞ্চানন মিত্র স্বপনকুমার, মোহন চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, বন্দনা দেবী, শিব ভট্টাচার্য (মার্গসঙ্গীত), মানস চক্রবর্তী, তৃপ্তি চক্রবর্তী, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, মৃন্ময় ধর, সলিল চট্টোপাধ্যায় ও বন্দনা সেন।

রঙ্গশ্রী লিট্‌ল ব্যালে ট্রুপ

১৯৫২ সালে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শান্তি বর্ধন তাঁর 'লিট্‌ল ব্যালে ট্রুপ' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে ১৯৬৪ সালে শ্রীমতী গুল বর্ধন ও বিষ্ণুদাস শিরালী এই সংস্থাটিকে বোম্বাই থেকে গোয়ালিয়রে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ব্যালে নৃত্য সম্পর্কে শিক্ষাদান কার্যও করতে থাকেন। সম্প্রতি রঙ্গশ্রী লিট্‌ল ব্যালে ট্রুপ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া ও সত্যেন চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'স্টার অ্যাট্রাক্‌সান্স' এই ট্রুপটিকে ৬ থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত ছ'দিন রবীন্দ্রসদনে উপস্থাপিত করছেন তাঁদের ব্যালে নৃত্য দেখাবার জন্যে। এঁরা এই ছ'দিন ভাগাভাগি করে (১) রামায়ণ, (২) ক্ষুধিত পাষাণ, (৩) ডিস্‌কভারি অব ইণ্ডিয়া এবং (৪) ভৈরবী পরিবেশন করবেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদামী এই ব্যালে প্রদর্শনীটিকে করমুক্ত করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন।

'তালা-চাবির যুদ্ধ' : আজকের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অনেক নাটকেরই পটভূমিকা বর্তমান যুবসমাজের মর্মান্তিক যন্ত্রণা। এই স্বাদেরই একটি জীবননিষ্ঠ নাটক সেদিন 'মুক্ত অঙ্গনে' পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন 'অনির্বাণ নাট্য গোষ্ঠী'র শিল্পীরা। নাটকের নাম 'তালা-চাবির যুদ্ধ'। নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্য স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন। সুপ্রযোজিত এই নাটকটির একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হোল প্রাণবন্ত চরিত্রচিত্রণ। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন চঞ্চল ভট্টাচার্য, গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, হর্ষ চট্টোপাধ্যায়, অমিত রায় কল্যাণ অধিকারী। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীত—এই তিনটিই নাটকের গতিকে অটুট রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলতে হবে।

রঙ্গনান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
আগস্ট ১৯৭৩
প্রতি বৃহস্পতি ও শনি ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
প্রতি রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
১৫ই আগস্ট ৩টে ও ৬॥টায়
শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চারু শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
ফোন ৫৫-১৬১৯
বৃহ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥
দেবনারায়ণ গুপ্তের নাটক
বিচারক নায়ক

চিত্রপ্রভা
প্রথম সংখ্যা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত।
প্রথম সংখ্যার জন্য দেরীতে যাঁরা অর্ডার পাঠিয়েছিলেন তাঁদের পত্রিকা পাঠাতে পারি নি বলে আমরা দুঃখিত।
দ্বিতীয় সংখ্যার অর্ডার এই বিজ্ঞাপন দেখেই পাঠান।
দ্বিতীয় সংখ্যা ২৬শে আগষ্ট বেরুচ্ছে।
দাম ৭৫ পয়সা
চিত্রপ্রভা | ১৮৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট | কলকাতা ৯

খেলাধুলা

দর্শক

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

শ্রীমতী বিলি জিন কিং ১৯৭৩ সালের উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনটি খেতাব (সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস) জয়ের সূত্রে মোট ৩,৫৫০ স্টার্লিং নগদ পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৬৭ সালের প্রতিযোগিতায় এই তিনটি খেতাব জয়ের দরুন যে ৭০ স্টার্লিং পুরস্কার পেয়েছিলেন, তার থেকে এ-বছর ৩,৪৮০ স্টার্লিং বেশী পেলেন। শ্রীমতী কিং তাঁর সাড়ে পাঁচ বছরের পেশাদার-খেলোয়াড় জীবনে টেনিস খেলা থেকেই এপর্যন্ত মোট ১৭৩,৪৩০ স্টার্লিং উপার্জন করেছেন। টেনিস খেলায় উপার্জনের দিক থেকে তিনি আজ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়া মহিলা টেনিস খেলোয়াড়।

অঘটনঘটনপটীয়সী নারী

আন্তর্জাতিক টেনিস জগতে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতই বিস্ময়কর। আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে অঘটনঘটন-পটিয়সী হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি তাঁর কুমারী জীবনের (তখন বিলি জিন মোফিট) মাত্র ১৭ বছর বয়সে উইম্বলেডন টেনিস আসরে যোগ-দানের প্রথম আবির্ভাব লগ্নে কারেন হান্টজের সহযোগিতায় মেয়েদের ডাবলস ফাইনালে ৩নং বাছাই মার্গারেট স্মিথ এবং লেহান জুটিকে হারিয়ে ডাবলস খেতাব পান। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৬১ সালের বাছাই তালিকায় তাঁরা কোন স্থানই পাননি। ১৯৬২ সালের উইম্বলেডন আসরে অবাছাই খেলোয়াড় কুমারী বিলি জিন মোফিট (বিবাহিত জীবনে বিলি জিন কিং) সিঙ্গলস খেলার প্রথম রাউণ্ডেই ঐ বছরের ১নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথকে (বিবাহিত জীবনে মার্গারেট কোর্ট) ১—৬, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে হারিয়ে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮৭ বছরের ইতিহাসে মেয়েদের সিঙ্গলস খেলার প্রথম রাউণ্ডের খেলায় এইভাবে একজন অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে ১নং বাছাই খেলো-য়াড়ের পরাজয়ের নজির দ্বিতীয় নেই। ১৯৬৩ সালের বাছাই তালিকায় শ্রীমতী কিং কোন স্থান না পেয়েও ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন এবং ফাইনালে ১নং বাছাই মার্গারেট স্মিথের কাছে তাঁর পরাজয় মোটেই অগৌরবের হয়নি। এই-

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

খানেই তাঁর অসাধারণ কর্মকাণ্ডের ছেদ পড়েনি। ১৯৫৬ সালের বাছাই তালিকায় মাত্র ৪র্থ স্থান পেয়ে ১৯৬৫ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৬৬ সালের ১নং বাছাই কুমারী মার্গারেট স্মিথকে পরাজিত করেন এবং ফাইনালে ২নং বাছাই এবং তিনবারের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ব্রেজিলের মারিয়া বুনোকে ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—১ গেমে হারিয়ে প্রথম উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব জয় করেন।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৮৭ বছরের ইতিহাসে পুরুষ ও মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক খেতাব জয়ের রেকর্ড (১৯টি) করেছেন আমেরিকার মহিলা খেলোয়াড় এলজাবেথ রায়ান। তাঁর পরই শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের ১৭টি খেতাব জয়ের স্থান। দুজনের মধ্যে তফাৎ এই যে, রায়ান কখনও সিঙ্গলস খেতাব পাননি, অপরদিকে শ্রীমতী কিং ৫টি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। উইম্বলেডনের আসরে পুরুষ ও মেয়েদের পক্ষে সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব (৮টি) পেয়েছেন আমে-রিকার কুমারী হেলেন উইলস মুডী (বিবাহিত জীবনে শ্রীমতী রোয়ার্ক)। হেলেন উইলস মুডীর এই রেকর্ড ভাঙ্তে শ্রীমতী বিলি জিন কিংকে আরও ৪টি সিঙ্গলস খেতাব জিততে হবে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ২৮ বছরের ইতিহাসে (১৯৪৬—৭৩) পুরুষ ও মেয়ে-দের পক্ষে শ্রীমতী বিলি জিন কিং-ই সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব জয়ের রেকর্ড (৫টি) করেছেন। এ-বিষয়ে পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল পুরুষদের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের এবং মেয়েদের পক্ষে আমেরিকার লুই ব্রাউয়ের—দুজনেরই ৪টি করে সিঙ্গলস খেতাব। রড লেভার তাঁর সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছিলেন ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯ সালে এবং লুই ব্রাউ ১৯৪৮-৫০ এবং ১৯৫৫ সালে। মেয়েরা কিন্তু একটা বিষয়ে পুরুষদের খুব জোর টেক্কা দিয়েছেন। গত ২৮ বছরে (১৯৪৬—১৯৭৩) যেখানে কোন পুরুষ খেলোয়াড় উপর্যুপরি তিন বছর সিঙ্গলস খেতাব পাননি, সেখানে তিনজন মেয়ে এই হ্যাট্ ট্রিক করেছেন—লুই ব্রাউ (১৯৪৮—৫০), মোরীন কনোলী (১৯৫২—৫৪) এবং শ্রীমতী বিলি জিন কিং (১৯৬৬—৬৮)। এরা তিনজনেই আমেরিকার।

উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিলি জিন কিং (কুমারী জীবনে বিলি জিন মোফিট) এপর্যন্ত ১৭টি খেতাব জয়ী হয়েছেন—সিঙ্গলস খেতাব ৫ (১৯৬৬-৬৮, ১৯৭২ ও ১৯৭৩), ডাবলস খেতাব ৯ (১৯৬১-৬২, ১৯৬৫, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৭০-৭৩) এবং মিক্সড ডাবলস খেতাব ৩ (১৯৬৭, ১৯৭১ ও ১৯৭৩)। শ্রীমতী কিং যে ৮-বার

সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলেছেন তার ফলাফল : জয় ৫-বার এবং হার ৩-বার।

রাশিয়া বনাম আমেরিকা

১৯৭৩ সালের রাশিয়া বনাম আমেরিকার শ্বেত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় রাশিয়া মোট ২১৬-১৬৩ পয়েন্টে জিতেছে। রাশিয়া পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রথম স্থান পেয়েছে—পুরুষদের বিভাগে ১২১-১১২ পয়েন্টে এবং মেয়েদের বিভাগে ৯৫-৫১ পয়েন্টে। পুরুষ বিভাগের মোট ২৯টি বিষয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রথম স্থান সমান সমান। অপর দিকে মেয়েদের মোট ১৪টি বিষয়ে রাশিয়ার প্রথমস্থান ১১টি এবং আমেরিকার মাত্র ৩টি।

রাশিয়া বনাম আমেরিকার এই ১৯৭৩ সালের একাদশ শ্বেত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতায় দুই দেশেরই একাধিক অলিম্পিক পদক জয়ীরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মেয়েদের ৮০০ মিটার দৌড়ে মিউনিখ অলিম্পিক রৌপ্যপদক বিজয়িনী নিয়েল সাবেটকে (রাশিয়া) অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করে আমেরিকার ১৪ বছরের অখ্যাত অ্যাথলীট মেরী ডেকার প্রথম হন। ডেকার ২ মিনিট ০২'৯ সেকেণ্ডে ৮০০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেন। মিউনিখ অলিম্পিকে সাবেট ১ মিঃ ৫৮'৭ সেকেণ্ডে ঐ দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পদক পেয়েছিলেন। সাবেট ছাড়া মিউনিখ অলিম্পিকের আরও দুজন পদক বিজয়ী অ্যাথলীট খায়েল হয়েছিলেন—পুরুষদের লংজাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী ব্যারি উইলিয়ামস (আমেরিকা) রাশিয়ার ভালেরী শ্চলুখিনের কাছে হেরে যান। মিউনিখ অলিম্পিকের লংজাম্পে ব্যারি ৮'২৪ মিটার দূরত্ব লাফিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। কিন্তু আলোচ্য প্রতিযোগিতায় তাঁর লাফের দূরত্ব দাঁড়ায় ৭-৯৩ মিটার। অপর দিকে ভ্যালেরী ৮-০৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। মিউনিখ অলিম্পিকের জ্যাভেলিন নিক্ষেপে রৌপ্যপদক বিজয়ী জানিস লুসিস (রাশিয়া) আমেরিকার গ্যারি ফিলক্রানের কাছে হেরে যান। রাশিয়ার নাদেজদা —মেয়েদের তিনটি বিষয়ে স্বর্ণপদক পান—১০০ মিটার দৌড় (সময় ১১-৪ সেঃ), ২০০ মিটার দৌড় (সময় ২৩-৫ সেকেণ্ড) এবং ৪০০ মিটার রীলে রেসে।

অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার প্রথম যোগদান ১৯৫২ সালে। এই সময় থেকে বে-সরকারী পদক জয় এবং পয়েন্ট অর্জনের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার নিয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। ১৯৫২ সালে রাশিয়া অলিম্পিক গেমসে তার প্রথম যোগদানের বছরেই আমেরিকার সমান ৪৯৪ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে বে-সরকারী পয়েন্ট তালিকার যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছিল। পরবর্তী উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক গেমসে (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) প্রথম স্থান পায় রাশিয়া এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা। ১৯৬৮ সালের মেকসিকো অলিম্পিক গেমসে আমেরিকা প্রথম স্থান এবং রাশিয়া দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। পরবর্তী ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে রাশিয়া পুনরায় প্রথম স্থানে উঠে যায়, অপর দিকে আমেরিকা নেমে আসে দ্বিতীয় স্থানে।

চ্যাম্পিয়ান হয়েছে রাশিয়া আটবার, আমেরিকা দুবার এবং সমান পয়েন্টের ফলে সিরিজ অমীমাংসিত একবার (১৯৭১ সালে)। এ পর্যন্ত পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান পেয়েছে আমেরিকা আটবার এবং রাশিয়া তিনবার। অপর দিকে মেয়েদের বিভাগে রাশিয়ার প্রথম স্থান দশবার এবং আমেরিকার একবার।

ডেভিস কাপ

ইউরোপীয় অঞ্চল

১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন-টেনিস প্রতিযোগিতার ইউরোপীয় অঞ্চলের ফলাফল: 'এ' সেকসনের সেমি-ফাইনালে রুমানিয়া ৪-১ খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে এবং রাশিয়া ৩-২ খেলায় ফ্রান্সকে পরাজিত করেছে। অপরদিকে 'বি' সেক্সেনের সেমি-ফাইনালে ইতালী ৩-২ খেলায় স্পেনকে এবং চেকোশ্লোভাকিয়া ৩-২ খেলায় পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে জয়ী হয়েছে। 'এ' সেক্সেনের ফাইনালে খেলবে দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও রুমানিয়া এবং 'বি' সেক্সেনের ফাইনালে সমাজতান্ত্রিক দেশ

পয়েন্টের খতিয়ান রাশিয়া বনাম আমেরিকা

	পুরুষ বিভাগ		মহিলা বিভাগ		মোট পয়েন্ট	
বছর	আমেরিকা	রাশিয়া	রাশিয়া	আমেরিকা	রাশিয়া	আমেরিকা
১৯৫৮	১২৬	১০৯	৬৩	৪৪	১৭২	১৭০
১৯৫৯	১২৭	১০৮	৬৭	৪০	১৭৫	১৬৭
১৯৬১	১২৪	১১১	৬৮	৩৯	১৭৯	১৬৩
১৯৬২	১২৮	১০৬	৬৬	৪১	১৭২	১৬৯
১৯৬৩	১১৯	১১৪	৭৫	২৮	১৮৯	১৪৭
১৯৬৪	১৩৯	৯৭	৫৯...	৪৮	১৫৬	১৮৭
১৯৬৫	১১২	১১৮	৬৩-৫	৪৩-৫	১৮১ ৫	১৫৫ ৫
১৯৬৯	১২৫	১১০	৬৭	৭০	১৭৭	১৯৫
১৯৭০	১১৪	১২২	৭৮	৫৯	২০০	১৭৩
১৯৭১	১২৬	১১০	৭৬	৬০	১৮৬	১৮৬
১৯৭৩	১১২	১২১	৯৫	৫১	২১৬	১৬৩

অলিম্পিক গেমসের বিগত ৬টি আসরে (১৯৫২, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪, ১৯৬৮ ও ১৯৭২) রাশিয়ার প্রথম স্থান ৪ বার, আমেরিকার একবার এবং সমান পয়েন্টের দরুন উভয়েরই যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান একবার (১৯৫২ সালে)।

অলিম্পিক গেমসের মতই রাশিয়া বনাম আমেরিকার শ্বেত অ্যাথলেটিকস আসরে রাশিয়া সর্বাধিকবার (মোট আটবার) প্রথম স্থান পেয়েছে। রাশিয়া বনাম আমেরিকার শ্বেত অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৫৮ সালে। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত ১১টি আসর বসেছে। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সংগৃহীত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে খেলবে ইতালী। এখানে উল্লেখ্য, গত বছর (১৯৭২) 'এ' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৩-২ খেলায় রাশিয়াকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে স্পেন ৩-২ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারিয়ে গ্রুপ প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকার বিপক্ষে রুমানিয়া ২-৩ খেলায় হেরেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ২৭ বছরের খেলায় (১৯৪৬-৭২) ইউরোপের কোন দেশই ডেভিস কাপ জয়ী হয়নি। তবে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে খেলে রানার্স-আপ হয়েছে এই চারটি দেশ—রুমানিয়া তিনবার (১৯৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭২), ইতালী ২বার (১৯৬০-৬১) স্পেন দুবার (১৯৬৫ও ১৯৬৭) এবং পশ্চিম জার্মানী একবার (১৯৭০)।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ ১নং মাধব ঘোষ লেন, পোঃ হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

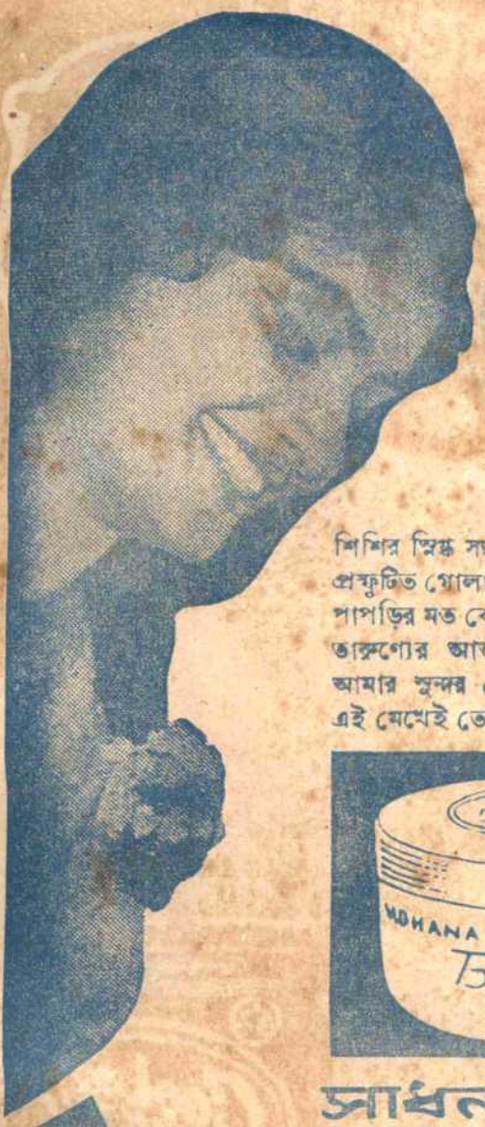

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3.

AMRITA

Friday 3rd August, 1973
Phone : 55-5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

6 AUG 1973

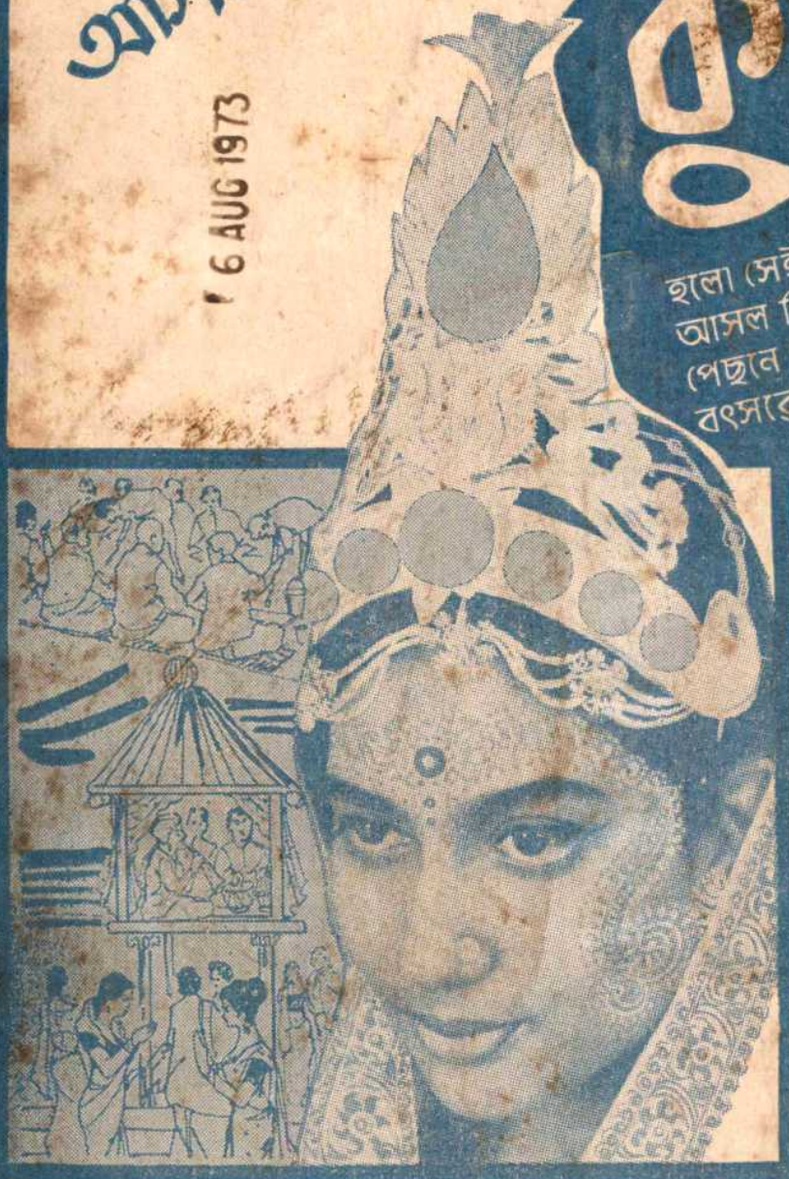

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লোগোতে
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

jaa/KCD

অমৃত

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

[১৩ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা] শুক্রবার, ২৫ শ্রাবণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

অধরা রূপ ধরা দিল, আধকোটা রূপ ফুটলো,
ফিরে এল হারানো রূপ।

ফেমিলা স্নো

চোখ ধাঁধানো মন মাতানো রূপের জলুস
দেখাতে হলে অবশ্য চাই ফেমিলা-স্নো

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম, সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮১

নিগূঢ়ানন্দের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

* বইটি পড়ার পর সহৃদয় পাঠক- পাঠিকাদের মতামত কামনা করছি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

আর এক সাজে ৬·০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন রচনা

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

বিশ্বাসের বাইরে ৫·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের মিষ্টি-মধুর রচনা

মোগলসরাই জংশন ৪·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নতুন রচনা

আকাশের আয়না ১০·০০

সুবোধ ঘোষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ

গল্প মণিঘর ১৪·০০

প্রফুল্ল রায়ের স্মরণীয় উপন্যাস

সুধা পারাবার ৬·০০

শঙ্কু মহারাজের স্মরণীয় সৃষ্টি

মধু বৃন্দাবনে রজ্জ পর্ব ১০-০০ বন পর্ব ১০-০০

শ্রীহংস-এর সার্থক রচনা

গাইনিক ওয়ার্ড ৮·০০

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের বিপ্লব-ইতিহাসের এক অলিখিত অধ্যায়

নৌ-বিদ্রোহের ইতিহাস

প্রকাশ অপেক্ষায়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাস

যুগস্বাক্ষর ১০·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

নয়া বসত ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

সতী অসতী ৫·০০

অমরেন্দ্র দাসের উপন্যাস

অন্য তরঙ্গ ৮·০০

নীলকণ্ঠ-এর উপন্যাস

জীবনরঙ্গ ৬·০০

সুনীলকুমার ঘোষের উপন্যাস

কারা প্রাচীর ১০·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রাইশোনআজ ৬·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

রূপসী প্রতিবেশী ১২·০০

বনফুলের উপন্যাস

ভূয়োদর্শন ৪·০০

পরিতোষ মজুমদারের

আলোর সন্ধান ৪·০০

শ্রীপান্থ-এর

আজব নগরী ৫·০০

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের

লৌকিক অলৌকিক ৬·০০

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

অন্বেষণ ৫·০০

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

কুমারী কন্যা ৮·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

উত্তরাংশ ৯·০০

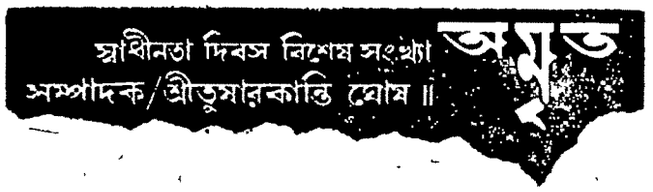

বেরোচ্ছে
১৫ আগস্ট
১৯৭৩

একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস

কাঞ্চন রাগিনী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একটি শিকার কাহিনী

বিশ্বনাথ বসু গারো হিলের গুণ্ডা হাতি

বারটি গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
সতীকান্ত গুহ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাই ভট্টাচার্য
শ্রীলেখা বসু বুদ্ধদেব গুহ চণ্ডী মণ্ডল শৈলেন রায়
কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন্দ্র দত্ত সমীর রক্ষিত

আজকের পশ্চিম বাঙলা

ভূমিসংস্কার, কৃষি ও কৃষক সমস্যা শ্যামাদাস ভট্টাচার্য
ভবতোষ দত্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা
প্রবুদ্ধনাথ রায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ
পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পূর্ণ চক্রবর্তী
পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
ধীরেশ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের রোপন ও যন্ত্রচালিত শিল্প
সম্পৎ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণশিল্প
পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি সমস্যা সন্তোষ ভট্টাচার্য

স্বদেশিকতা ও সাহিত্য
যাত্রা মঞ্চ চলচ্চিত্র খেলাধুলা

ভবানী মুখোপাধ্যায় বিশু মুখোপাধ্যায়
রঞ্জন মজুমদার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়
শিব ভট্টাচার্য শিবদাস চক্রবর্তী
রাণা বসু ক্ষেত্রনাথ রায়

দাম তিন টাকা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥
কলকাতা-৩

১৩শ বর্ষ

অমৃত

১৪ সংখ্যা
মূল্য ·৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 10th August 1973. শুক্রবার, ২৫ শ্রাবণ, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৭	সম্পাদকীয়		
৮	বন্দে মাতরম্ ও ভারতের নব জাতীয়তাবাদ		—শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী
১১	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১২	আরেকবার ডানার জন্য	(কবিতা)	—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী
১২	আকস্মিক ভাবেই প্রেম	(কবিতা)	—শ্রীসত্য গুহ
১২	নারী তুমি কৃষ্ণচূড়া	(কবিতা)	—শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩	ক্রীতদাস	(গল্প)	—শ্রীসত্যেন্দ্র আচার্য
১৬	নতুন বই		
১৯	ফেরারী ফিরে এল	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

॥ বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া ॥

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনের তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনকথা। কয়েকটি ছবি। [১০·০০]

॥ কালিকট থেকে পলাশী ॥

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্যজাতিগুলির প্রাচ্য-অভিযান কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৬·০০]

॥ বাঁকুড়ার মন্দির ॥

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শৈলী ও ইতিহাস। ৬৩ আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

॥ উদ্বাস্তু ॥

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা। বাংলায় একমাত্র বই। [১০·০০]

॥ উপনিষদের দর্শন ॥

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহে নিহিত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। [৭·০০]

॥ উপনিষদের কথা ॥

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহের ইতিহাসগত আলোচনা। [৪·০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

বিদ্যোদয়ের বই

সর্বজনপাঠ্য সর্বকালের উপন্যাস
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
নীল ঘূর্ণি ৭-০০
কালের জয়ডংকা বাজে ৪-০০
মনোরঞ্জন ঘোষের
পরিবর্তন ৩-৫০
সমরজিৎ করের
ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি ৩-২৫
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ময়ূরপঙ্খী ৬-০০
মকরমুখী ৬-০০
সাগরদাঁড়ী ৭-০০
ড্রাগনের নিঃশ্বাস ২-২৫
শুক্লে যারা গিয়েছিল ৩·০০
গল্প আর গল্প ২·২৫
শ্রীকথক ঠাকুরের
অথ ভারত কথকতা ৩-০০
স্বপনবুড়োর
কৌতুক কাহিনী ২-৮০
সুখলতা রাওয়ের
আলি ভুলির দেশে ৩-০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
নাবিক রাজপুত্র ও
সাগর রাজকন্যা ২-০০
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২·৫০
শিবরাম চক্রবর্তীর
চোরের পাল্লায়
চকর-বর্তি ৩-০০
আমার ভালুক শিকার ৩-০০
সুশীল জানার
গল্পময় ভারত
(প্রথম খণ্ড ৩-০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩-০০)
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
কঙ্কাবতী ৩-৫০
শ্রীজয়ন্ত কুমারের
চীনের উপকথা ২-০০
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের
সুন্দরবনের চিঠি ১-৬২
সুধীর করণের
অরণ্যপুরুষ ৪·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭

শারদীয় অমৃত
১৩৮০

মহালয়ার আগেই প্রতি বছরের মতো বিশিষ্ট রচনা ও
চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

এবার উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীর রক্ষিত

একটি বিস্ময়কর ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তাছাড়া, প্রায় দু ডজন গল্প,
একটি পূর্ণদীর্ঘ শিকার কাহিনী,
এবং সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ এবং
নিবন্ধ, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, গৃহসজ্জা ইত্যাদি
বিষয়ে সুলিখিত সচিত্র রচনা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা তিন

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৩	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
২৫	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৩০	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৩২	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৩৫	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৩৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৯	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪৯	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষণিক
৫১	বাবাকে ঘিরে	(গল্প)	—শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত
৫৪	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৫	বিবাহ-বিচিত্রা		—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৫৮	কুতবমিনার	(গল্প)	—শ্রীপরিতোষ মজুমদার
৬৩	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
৬৫	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬৭	বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব		—শ্রীসবল সেন
৭০	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৮	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর এস, এন, ঘোষালের

THE INDIAN DRAMA

সুবিখ্যাত জার্মান ভারততত্ত্ববিদ্ **Dr. Sten Konow**-র জার্মান ভাষায় বিরচিত **'Das Indesche Drama'—The Indian Drama** -এর প্রাঞ্জল ইংরেজি অনুবাদ সর্বপ্রথম বাহির হইল। সমালোচনা প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলিয়াছেন :

'.....Das Indesche Drama has been one of the notable works of Dr. Konow. By translating it into English Dr S. N. Ghosal has brought it within the reach of Indians whose knowledge of German is even less than English.' .....

: মূল্য কুড়ি টাকা :

শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা বসু, এম-এ, বি-লিট্ (অকস্‌ফোর্ড)-এর

CLASSICAL INDIAN DANCING

প্রাচীন ভারতীয় 'ক্লাসিক্যাল' নৃত্যসম্পর্কিত গবেষণার উদ্দেশ্যে শ্রীমতী মন্দাক্রান্তা বসু অকসফোর্ডের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস, প্যারীর বিব্লিওথিক ন্যাশনেল এবং কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত যাবিষয়ক পুঁথিসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখিকার অভিনিবেশ ও বুদ্ধি-পূর্ণ পরিশ্রমের পরিচয় বর্তমান। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বলেন :

'.... This book is undoubtedly a scholarly work which has doubtless involved a great deal of painstaking care.'

: মূল্য পঁচিশ টাকা :

জেনারেল বুকস

এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—১২

সৌরীন সেন

দিল্লীতে এসেই

রাজনৈতিক উপন্যাস ॥ ১০-০০

নিমাই ভট্টাচার্য

ওয়ান আপ টু ডাউন

উপন্যাস ॥ ৬-০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বরফের রঙ লাল

উপন্যাস ॥ ৮-০০

সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলির রাজা হরিশ্চন্দর

আদিবাসী সম্পর্কে উপন্যাস ॥ ৪-৫০

হো-চি-মিন

ভিয়েতনাম সম্পর্কে

রাজনৈতিক দলিল ॥ ৪-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কয়েকটি মুহূর্ত

গল্প-সংগ্রহ ॥ ৫-০০

চিরঞ্জীব সেন

কালোটাকা চোরাপথ

স্মাগলিং-এর কাহিনী ॥ ৬-০০

অমিতাভ গুপ্ত

গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ

মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব

জীবনী ॥ ২৫-০০

নারায়ণ সান্যাল

আমি নেতাজীকে দেখেছি

প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী ॥ ১৫-০০

আমি রাসবিহারীকে দেখেছি

প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী ॥ ১২-৫০

কলিঙ্গের দেব-দেউল

(নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)

মন্দির ভাস্কর্যের ইতিহাস ॥ ১২-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চতুষ্ক

উপন্যাস ॥ ১৮-০০

বন্যাকন্যা

উপন্যাস ॥ ১৯-০০

আসামী ঈশ্বর

গল্প-সংগ্রহ ॥ ৬-০০

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র

জীবনী ॥ ১০-০০

: শুভ্র প্রকাশন :

৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২ আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

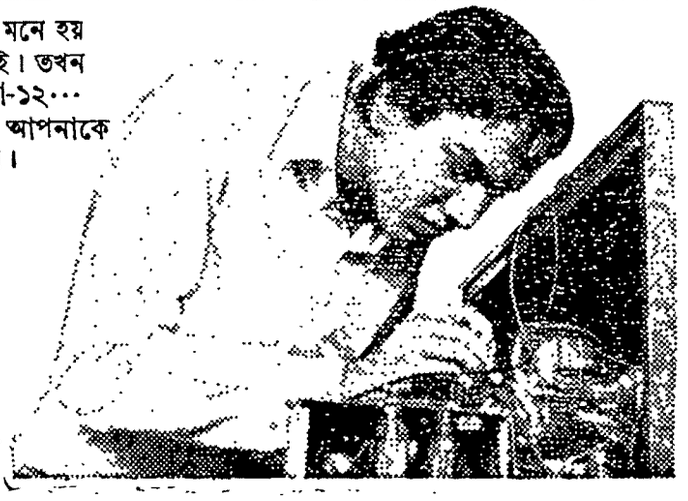

Shilpi-SPL 1A/73 bmb

সম্পাদকীয়

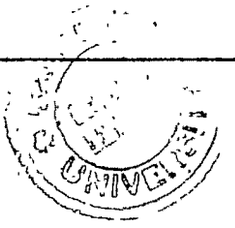

খাদ্যসংকট নিয়ে দুশ্চিন্তা

সারা দেশেই এবার অন্নকষ্ট দেখা দিয়েছে। মহারাষ্ট্র, কেরল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার কোন রাজ্যই আর স্বস্তিতে নেই। তার মধ্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বেশ কাহিল। গত কয়েক মাস ধরে এই রাজ্যে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে চালের দামও। বিশেষ করে বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় চালের বরাদ্দ কমিয়ে দেবার ফলে খোলা বাজারে চালের টান পড়ছে এবং এই সুযোগে ব্যবসায়ীরা মুনাফা লুটছে। রেশনে এখন যে পরিমাণ চাল দেওয়া হয়, সপ্তাহে মাথা পিছু মাত্র ৭৫০ গ্রাম, তাতে চলা দায়। এ দিকে চালের অভাবের দরুন বাজারে গমের দামও বেড়ে গেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে গত বৎসর চালের উৎপাদন এমন কিছু কম হয়নি। চাল সংগ্রহে আশানুরূপ সাফল্য সরকার দেখাতে না পারাতেই খাদ্য নিয়ে বিস্তর দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

রেশন এলাকায় চাল সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছেন না। আংশিক রেশন এলাকার জনসাধারণের দুর্ভোগ তো সহজেই অনুমেয়। কেন্দ্রীয় সরকার মাসে মাসে পশ্চিম বাংলার রেশন এলাকার জন্য যে চাল দিতেন তা সম্প্রতি কমিয়ে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। তার ফলেই রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে রেশনে চালের পরিমাণ কমিয়েছেন। কারণ, যিনি জোগানদার তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত জোগান না পেলে রাজ্য সরকারই বা রেশন এলাকার মানুষকে চাল খাওয়াবেন কোন ভাণ্ডার থেকে? এখন শোনা যচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মাসিক বরাদ্দ কুড়ি হাজার টনও কমে যাবে। তাতে এই রাজ্যের জনসাধারণের দুশ্চিন্তা বাড়ছে সঙ্গত কারণেই। এখনই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাজারে চাল কিলোপ্রতি প্রায় চার টাকায় পৌঁছেচে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তা যে আরও বাড়বে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যুক্তফ্রন্টের আমলে চালের দর পাঁচ টাকায় উঠেছিল, কিন্তু তখন অন্যান্য জিনিসের দর এতটা বাড়েনি। এখন সংসার চালাতে গিয়ে সাধারণ মানুষ সম্পূর্ণ দিশেহারা। গ্রামাঞ্চলে হাহাকার পড়ে গেছে। অনাহার, অর্ধাহারের খবরও আসছে। সুতরাং এখনই সরকারের সতর্ক হবার সময়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও চড়া দামের বর্তমান অবস্থায় উদ্বিগ্ন। নিত্য প্রয়োজনীয় এমন জিনিস নেই যার দাম বাড়েনি। বাজারে গেলেই তা টের পাওয়া যায়। টাকার ক্রয়মূল্য কমতে কমতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা অর্থনীতিবিদরা নিশ্চয় বলতে পারবেন। এর সবটাই কি জিনিসপত্রের অভাবের দরুন, না পিছনে মুনাফাশিকারীদের হাত আছে? সরকার এ বিষয়ে যদি কঠোর না হন তাহলে খাদ্য নিয়ে গণ্ডগোল হবার আশংকা।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গত সপ্তাহে একটা পরিষ্কার কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারেরই নির্দেশে, পশ্চিমবঙ্গে অনেক জমিতে ধানের বদলে পাটের চাষ করা হয়। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য পাটের মূল্য খুব বেশি। চাষীরা এই পাট চাষ করে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করছেন। অথচ চালের অভাবে অন্নভোজী বাঙালী আজ হাহাকার করছে। তবু তো দু'বেলা ভাত খাওয়া প্রায় উঠেই গেছে। অনেকেই আজকাল একবেলা গম খাচ্ছেন। কিন্তু একবেলাও যদি পেটপুরে খাবার মতো চাল না জোটে, তাহলে চাষীরা কোন ভরসায় ধানজমিতে পাটের চাষ করবেন? প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তাই সঙ্গত ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে পশ্চিম বাংলা তার বারো লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করেও যদি তার প্রাপ্য চাল না পায়, তাহলে পশ্চিম বাংলা পাট চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। জানি না, এতে কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়বে কিনা? কারণ, পশ্চিম বাংলার দুঃখে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। থাকলে তাঁরা ক্রমাগত রেশন এলাকার জন্য বরাদ্দ চাল কমাতেন না এবং রেশনিংও প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে যেত না।

দ্রব্যমূল্য ও খাদ্যসংকটে ভারতের অনেক রাজ্যই আজ বিপর্যস্ত। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চয়ই ভাবতে হচ্ছে। খাদ্যের জন্য নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটে গেছে। পশ্চিম বাংলা কিন্তু ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে এই দুঃখ সহ্য করে যাচ্ছে। গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হানাহানির পর পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা এসেছে। তার কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশাও অনেক। রাজ্য সরকার এই প্রত্যাশা পূরণের যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা নিশ্চয়ই তাঁরা আশা করতে পারেন। একদিকে বেকারী এবং অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্যসংকট— কোনো রাজ্য সরকারের পক্ষেই এ চিত্র সুখকর নয়। তবু রাজ্য সরকার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে যে-সংগ্রাম করছেন কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার গুরুত্ব উপলব্ধি না করেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আশা করি, সেই দুর্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার ডেকে আনবেন না।

বন্দেমাতরম্ ও ভারতের নব্য জাতীয়তাবাদ

শিবদাস চক্রবর্তী

যামিনী 'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত', সামনে অবারিত প্রান্তর। পাশাপাশি পথ চলতে চলতে দুজনে প্রান্তর পার হয়ে গেলেন। মহেন্দ্র নীরব, শোককাতর, গর্বিত কিন্তু কৌতূহলী। আর তাঁর সঙ্গী 'ভবানন্দ হাস্যমুখ, বাঙ্ময়, প্রিয়সম্ভাষী...। কথাবার্তার জন্য বড়ো ব্যগ্র'। কিন্তু মহেন্দ্র একেবারেই নীরব। তখন অগত্যা ভবানন্দ আপন মনে গাইতে শুরু করলেন—

'বন্দে মাতরম্।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

বিস্ময়ে অভিভূত মহেন্দ্রর মূক কণ্ঠ এবার মুখর হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা মাতা কে?

ভবানন্দ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গাইতে লাগলেন—'শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্...। মহেন্দ্র বললেন—'এ ত দেশ, এ ত মা নয়'—

ভবানন্দ জবাব দিলেন—'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।

আত্মস্থ হয়ে মহেন্দ্র বললেন—'তবে গাও।'

ভাবাবেগে তন্ময় হয়ে ভবানন্দ সম্পূর্ণ গানখানি গেয়ে চললেন। গাইতে গাইতে তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মহেন্দ্র প্রশ্ন করলেন—'তোমরা কারা?'
ভবানন্দ বললেন—আমরা সন্তান'।
মহেন্দ্র।—সন্তান কি? কার সন্তান?
ভবানন্দ।—মায়ের সন্তান।

ভবানন্দর জনক বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন হয়তো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নি, তাঁর সন্তানের কণ্ঠ থেকে দুটি কথায় গাঁথা যে গানের কলি নির্গত হলো, কত তার শক্তি, কী তার মাহাত্ম্য! নইলে আদি কবি বাল্মীকির মতো বঙ্কিমচন্দ্রও সেদিন 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে উঠতে পারতেন—কিমিদং বাহূতং ময়া? এ আমি কী বললাম?

১৮৮২ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুদশকের কিছু বেশী। ১৮৮২-তে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আত্মবোধনের মন্ত্ররূপে যে ধ্বনি বাণীবদ্ধ হলো, ১৯০৫-এ স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় যুগে তা-ই স্বরাজ-কামী ভারতসন্তানের কণ্ঠে সংগ্রামী ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলো। যা ছিল একান্তভাবে কবির স্বপ্ন, তা সর্বত্র জাতির সাধ্যবস্তুরূপে দেখা দিল।

বন্দে মারতম্ রচিত হবার তিন বছর পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হয়। কংগ্রেসকে জাতীয় সঙ্গীতের অনুসন্ধান করতে হয়েছে কিন্তু বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি। বন্দে মাতরম্ রচিত হবার পরের বছরেই দুটি বড়ো রকমের আন্দোলন ঘটে। একটি হলো ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতিগত সমানাধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে ইলবার্ট বিল আন্দোলন; অপরটি হলো রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বিচারের বিরুদ্ধে তরুণসম্প্রদায়ের আন্দোলন। কিন্তু কোনো আন্দোলনের সময়েই কারও কণ্ঠে বন্দে মারতম্ ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে বলে জানা যায় না। একমাত্র ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম্ গান করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সময়কার অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীত—'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,' কিংবা 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী'র চেয়ে 'বন্দে মাতরম্' যে বেশী কোনো গুরুত্ব লাভ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। একবার কবি-কণ্ঠকে আশ্রয় করেই বন্দে মাতরম্ আবার লোক-শ্রুতির অন্তরালে চলে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে ঐ শতাব্দীর শেষ দুদশকে বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনায় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। বৃটিশ রাজের কথা ও কাজের মধ্যে বারংবার অসঙ্গতি লক্ষ্য করে নব্যশিক্ষিত বাঙালী-সম্প্রদায়ের একাংশের মনে এযাবৎ-পোষিত বৃটিশ রাজের প্রতি আস্থার ভিত্তিতে ফাটল দেখা দিতে থাকে। অন্যদিকে দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়ে তাদের মনে একটা ধারণা দানা বেঁধে উঠতে থাকে যে ভারত-বর্ষে বৃটিশ শাসন বিধাতার অমোঘ বিধান নয়, ভারতবাসীরই দুর্বলতার প্রতীক। সুতরাং মোহ-নিদ্রার ঘোর কাটিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে পারলেই তার অপসারণ অনিবার্য। এই ধরনের চেতনা সংগঠনী চিন্তার দিকে আকৃষ্ট করলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধব্যাপী বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস এই ধরনের ব্যাপক সংগঠনী প্রয়াসের কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

বাঙালীর ক্রমবর্ধমান সংহতি, ক্রম-বর্ধমান জাতীয়তাবোধ সহজেই বিদেশী সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলো। তাঁরা প্রতিষেধকের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অনেকদিন যাবৎ অনেক রকমভাবে চিন্তা করে তাঁরা প্রশাসনিক অসুবিধার অজুহাতে বাংলার জনমত অগ্রাহ্য করে বাংলাকে দুভাগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই ঘটনার অবতারণা করে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন—

'We felt that we had been insulted humiliated and tricked. We fell that....it was a deliberate blow aimed at the growing solidarity and self-consciousness of the Bengali-speaking population'.

এই অপমানে বিক্ষুব্ধ বাঙালীর অন্তরাত্মা সেদিন রাষ্ট্রগুরুর কণ্ঠকে আশ্রয় করেই গর্জে উঠেছিল—'আমরা নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে (সেটল্‌ড ফ্যাক্ট) নিশ্চিত (আনসেট্‌ল) করবো।

১৯০৫-এর ১৬ই অকটোবর ছিল সরকারীভাবে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করবার নির্ধারিত দিন। এই কালো দিনটিকে সামনে রেখেই ৭ই আগস্ট কলকাতা টাউন হলে এক প্রতিবাদ সভা আহূত হলো। বিশাল সেই সভায় তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। সেই ঐতিহাসিক সভাতেই স্বদেশী এবং বয়কটের শপথ কণ্ঠে নিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের জন্ম হলো। সেই ঐতিহাসিক সভাতেই শত সহস্র কণ্ঠ থেকে উৎসারিত বন্দে মাতরম্ ধ্বনি আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করতে

লাগলো। বাংলার জনমনোভূমিতে বন্দে মাতরম্-এর বীজ রোপণ এই প্রথম। ভূমি উর্বরা ছিল বলে রোপিত বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমে কালবিলম্ব হলো না। ১৯০৫-এ ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> 'The streets and lanes of Calcutta and of the rest of the provnce resound with the solemn watch-word, Bande Mataram, has stirred the hearts of the people to their depths'.

শত সহস্র কণ্ঠ থেকে বিন্দু বিন্দু শক্তি চয়ন করে বন্দে মাতরম্ অচিরেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠলো। বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শাসকসম্প্রদায়ের কানে অতর্কিত বোমার আওয়াজের মতো আতঙ্ককর হয়ে উঠলো। ১৯০৬-এর এপ্রিলে বরিশাল শহরে অনুষ্ঠেয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে বরিশাল শহরে বন্দে মাতরম্-ধ্বনি উচ্চারণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি তৎকালীন শাসকসম্প্রদায়ের সন্ত্রস্ত মনোভাবের ঐতিহাসিক প্রমাণ।

দেখতে দেখতে স্বদেশী আন্দোলন দাবানলের মতো মফস্বল বাংলায় ছড়িয়ে পড়লো। বাংলার ঘোর দুর্দিনে বেদনাহত বাঙালীর পাশে এসে দাঁড়ালেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়, মহারাষ্ট্রগৌরব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। যুব-বাংলার জপমন্ত্র হলো 'লাল-বাল-পাল'। লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক এবং বিপিনচন্দ্র পাল। বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখনও অরবিন্দ-জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে নি। স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থকদের নিয়ে নব্য রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হলো। ইতিহাসে এই দল গরমপন্থী বা জাতীয়বাদী (এক্সট্রিমিস্ট বা ন্যাশনালিস্ট) নামে চিহ্নিত।

দলের আত্মপ্রসারের জন্য প্রচার অবশ্যপ্রয়োজন এবং প্রচারের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত মুখপত্র। সমকালীন জাতীয়তাবাদী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নব্য ভাবধারা প্রচার সম্ভব ছিল না। এমন কি বিপিনচন্দ্রের নিজস্ব ইংরেজী সাপ্তাহিক 'নিউ ইন্ডিয়া'র পক্ষেও সংগঠনী জাতীয়তাবাদ প্রচারের পথ পরিত্যাগ করে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ প্রচারের পথে পদক্ষেপ সম্ভব ছিল না। একমাত্র ব্রহ্মবান্ধব উপধ্যায়ের সান্ধ্য বাংলা দৈনিক 'সন্ধ্যা' ১৯০৪ থেকে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করে আসছিল। কিন্তু তাতে যে পরিমাণ উত্তেজনার খোরাক ছিল, সে পরিমাণে চিন্তার খোরাক ছিল না। তাছাড়া নব্য জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সর্বভারতীয় স্তরে প্রচার করতে হলে প্রাদেশিক ভাষায় তা করা চলে না।

এই অভাব পূরণের জন্য বিপিনচন্দ্র নিজেই অগ্রণী হলেন। কারণ, মনীষী বিনয় সরকারের ভাষায় বিপিনচন্দ্রই সে যুগের আসল নেতা। অরবিন্দ তখন সদ্য বরোদা থেকে স্থায়িভাবে কলকাতায় এসে বাংলার রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এসম্পর্কে পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দের জবানী অনুসরণ করে বলা হয়েছে—

> 'Bipin Pal, who had been long expounding a policy of self-help and non-co-operation in his weekly journal, now started a daily with the name 'Bande Mataram" with only Rs 500/- in his pocket..He asked Sri Aurobindo to join him to which a ready consent was given.

পরমাণুর মাপে প্রাণশক্তির পরিমাপ হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে (অবশ্য একদিন আগে—৬ই আগস্ট, ১৯০৬) জন্মলাভ করে 'বন্দে-মাতরম্' ১৯০৮-এর ২৯শে অকটোবর পর্যন্ত আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছিল। কিন্তু আয়ুষ্কাল সীমিত হলেও জীবদ্দশায় এর প্রাণশক্তি ছিল প্রচন্ড এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তনে এর অবদানও অপরিমেয়। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বন্দে মাতরমের সীমিত আয়ুষ্কালকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে, প্রথম স্তরের বিস্তৃতি ১৯০৬-এর ৬ই আগস্ট থেকে ১৮ই অকটোবর; এই স্তরে প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। দ্বিতীয় স্তরের বিস্তৃতি ১৯০৬-এর অকটোবরের মাঝামাঝি থেকে ১৯০৮-এর ৩০শে এপ্রিল—আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দের জড়িত হবার পূর্ব পর্যন্ত; এই স্তরে প্রধান সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ। তৃতীয় স্তরের বিস্তৃতি ১৯০৮-এর মে থেকে ২৮-এ অকটোবর পর্যন্ত; এই স্তরে প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। এছাড়া সর্বস্তরেই আর যাঁরা সম্পাদকমন্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয় চ্যাটার্জির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে অরবিন্দের মতে বিপিনচন্দ্র ছিলেন তখন—

> ..the best and the most original political thinker in the country, an excellent writer and a magnificent orator'.

আর বিপিনচন্দ্রের মতে—

> Aravinda was the leading sprit, the central figure. In t. new journal'

কবি দান্তে-রচিত ইতালীয় ঐক্য সঙ্গীতকে দেশের বাস্তব প্রয়োজনের ব্যবহারে ম্যাৎসিনি এবং গ্যারিবল্ডির যে ভূমিকা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম'কে দেশের বাস্তব প্রয়োজনে ব্যবহারে বিপিনচন্দ্র এবং শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা প্রায় তার অনুরূপ।

এই 'বন্দে মাতরম'-এর পৃষ্ঠাতেই ভারতবাসীর পক্ষ থেকে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবি উচ্চারিত হয়। ১৯০৬-এর ৬ই সেপ্টেম্বর 'দি নিউ স্পিরিট-২' শীর্ষক প্রবন্ধে মডারেট নরমপন্থীদের দিকে অঙ্গুলি

শেকসপীয়র রচনাবলী

বঙ্গদর্শন

বাংলায় বের হচ্ছে। রেজিনে বাঁধাই ৩ খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী টাকা প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় ৮ টাকা হিসেবে দিতে হবে। ১ম খণ্ড ১৫ই আগষ্ট বের হবে।

মনিঅর্ডার পাঠান, গ্রাহক হবার ঠিকানা:
রিপ্লেক্ট পাবলিকেশন
৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
(পূরবী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাঝে)

বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'মাসিক বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সবকটি সংখ্যা ৯ খণ্ডে বের হচ্ছে। মূল্য ৮০ টাকা। ৮ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। বাকী টাকা প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় ৮টাকা করে দিতে হবে। ১ম খণ্ড ২৭ সেপ্টেম্বর বের হবে।

নির্দেশ করে ঐতিহাসিক ঘোষণায় বিপিনচন্দ্র বলেন—

'They desire to make the Government in India popular without ceasing in any way to be essentially British; We desire to make it autonomous, absolutely free of the British control'.

কলকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী কর্তৃক স্বরাজের দাবি উচ্চারণ এর কয়েক মাস পরের ঘটনা।

জাতীয়তাবাদ ছিল নব্য দলে দেশচর্চার ভিত্তি কিন্তু তাই বলে সে জাতীয়তাবাদ স্বভাবে সঙ্কীর্ণ ছিল না। তার সুদূর লক্ষ্য ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ বা বিশ্বমানবতা। এই নব্য জাতীয়তাবাদের স্বরূপ ও লক্ষ্যের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রথম স্মরণ বার্ষিকীতে (১৬ই অকটোবর, ১৯০৬) 'দি নেশন ডে' শীর্ষক প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ প্রবক্তা বিপিনচন্দ্র মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

'....and blessed, thrice blessed is that Universal Life of Humanity wherein is the fulfilment and fruition of all national life and aspirations'.

জাতীয়তাবাদী বা গরমপন্থীদের সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার ছিল—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স। যদিও শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বিপিনচন্দ্র ছিলেন 'দি ফার্স্ট প্রীচার অব প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স', তাহলেও শ্রীঅরবিন্দই বন্দেমাতরমের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে (১৯০৭-এর ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩-এ এপ্রিলের মধ্যে) এই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তোলেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মূল মন্ত্র ছিল—

'No control, no assitance'.

ইতিহাসের বিচারে পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 'অসহযোগ' এই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' সন্তান। পরাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বাঙালী রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদদের এক অসামান্য অবদান। ১৯০৭-এর ৪ঠা জুলাই কলেজ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণে লোকমান্য তিলক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-তত্ত্বের প্রশংসা করে বলেছিলেন—

'This is what we must do systematically in future.....'

স্বদেশী যুগে নব্য জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার যেমন ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, তেমন সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বরাজ লাভ। বঙ্গভঙ্গরহিতের জন্য যে আন্দোলনের উদ্ভব, অচিরেই সে তার খণ্ড লক্ষ্যকে অতিক্রম করে বৃহত্তর লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছিল। এই বন্দে মাতরমের পৃষ্ঠাতেই শ্রীঅরবিন্দ স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে এবং উপায়ের প্রতি সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'স্বরাজ য়্যান্ড দি কামিং য়্যানার্কি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে (মার্চ ২, ১৯০৮) তিনি বলেন—

'Swaraj is the life-belt, Swaraj the pilot, Swaraj the star of guidance'.

কিন্তু সে স্বরাজ যে ইউরোপীয় ধরনের রাজনৈতিক স্বাধীনতা মাত্র নয়, তার চেয়ে বেশী, সে কথা পরিস্ফুট করে আর একটি প্রবন্ধে (মে ৩, ১৯০৮) শ্রীঅরবিন্দ বলেন—

'Swaraj as the fulfilment of the ancient life of India under modern conditions, the return of Satyajuga of national greatness the resumption by her of her role of teacher and guide....this is the true Swaraj for India'

কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন

'All political ideals must have relations to the temperament and past history of the race'.

সংগঠনী এবং সংগ্রামী চিন্তার পরিবেশকরূপে বন্দে মাতরম্ পত্রিকা সে সময় ভারতীয় জনমানসে অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। বন্দে মাতরম যেমন ভারতবাসীর সামনে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেছিল, তেমনি সে আদর্শ রূপায়ণের জন্য পূর্ণ কর্মসূচীও দান করেছিল। তাছাড়া এই পত্রিকা দেশবাসীর মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে ভীরু সখের স্বদেশসেবার দিন আর নেই। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হবার দিন এসেছে।

এমন প্রচার অব্যাহতভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। শুধু বন্দে মাতরম নয়, ভিন্ন সুরে হলেও একটু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এর সংগে কণ্ঠ মিলিয়েছিল 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' এবং 'নবশক্তি'। ফলে শাসকসম্প্রদায় সংবাদপত্র দলনে অগ্রসর হলেন। 'যুগান্তর' 'সন্ধ্যা' নবশক্তি প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিকে রাজদ্রোহমূলক সম্পাদকীয় প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত করা হোল। কেবলমাত্র বন্দে মাতরম-এর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ দাঁড় করানো গেল না। কারণ, বন্দে মাতরম-এর সম্পাদকীয় ছিল অতি সাবধানী ভাষায় লেখা। 'স্টেটসম্যান' এক সময় আক্ষেপ করে লিখেছিল—

'....the paper reeked with sedition patently visible between every line, but it was so skillfully written that no legal action could be taken'.

তাই বাধ্য হয়ে সরকারকে নতুন প্রেস আইনের সন্ধানে উদ্যোগী হতে হলো। স্যার হার্ভে য়্যাডামসনের চেষ্টায় ১৯০৮-এর ৮ই জুন রাজকীয় আইন পরিষদের মাধ্যমে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী প্রেস আইন পাশ হয়ে গেল। এই আইনের নাম হলো—'নিউজ পেপারস (ইনসাইটমেন্ট টু অফেনসেস) অ্যাক্ট'।

অল্পদিনের মধ্যেই 'যুগান্তর' এই আইনের ক্ষিপ্ত আক্রমণে মৃত্যু বরণ করলো। ১৯০৮-এর ৬ই জুলাইয়ের পর 'যুগান্তর' আর প্রকাশিত হয় নি। এর পরেই এই আইনের রোষদৃষ্টি পড়লো 'বন্দে মাতরম'-এর উপর। অরবিন্দ তখন আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হয়ে বিচারাধীন বন্দীরূপে জেল-হাজতে এবং বিপিনচন্দ্র বিলাতে। ২৯-এ অকটোবরের পর সরকারী আইনের নিষ্পেষণে বন্দে মাতরম-এর কায়িক মৃত্যু ঘটলো।

বন্দে মাতরম পত্রিকার কণ্ঠ স্তব্ধ হলো বটে, কিন্তু বন্দে মাতরমের ভাবধারা, বন্দে মাতরম-ধ্বনি সমগ্র জাতির আত্মায় প্রবেশ করে তাকে অনাগত কালের অনায়ত্ত সিদ্ধির স্বপ্নে বিভোর করে তুললো। পরবর্তীকালে দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগী কত তরুণ যে বন্দে মাতরম-ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে হাসতে হাসতে ফাঁসির রশি গলায় নিয়েছে—দেশের ইতিহাস তার সাক্ষী।

১৯০৭-এর ১৬ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বলেছিলেন—

'A great nation which has had that vision can never again be placed under the feet of the conqueror'.

সত্যিই তাই। অনেক আত্মত্যাগ, অনেক রক্তক্ষয়ের ভিতর দিয়ে ভারতবাসী শ্রীঅরবিন্দের এই প্রাজ্ঞোক্তিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

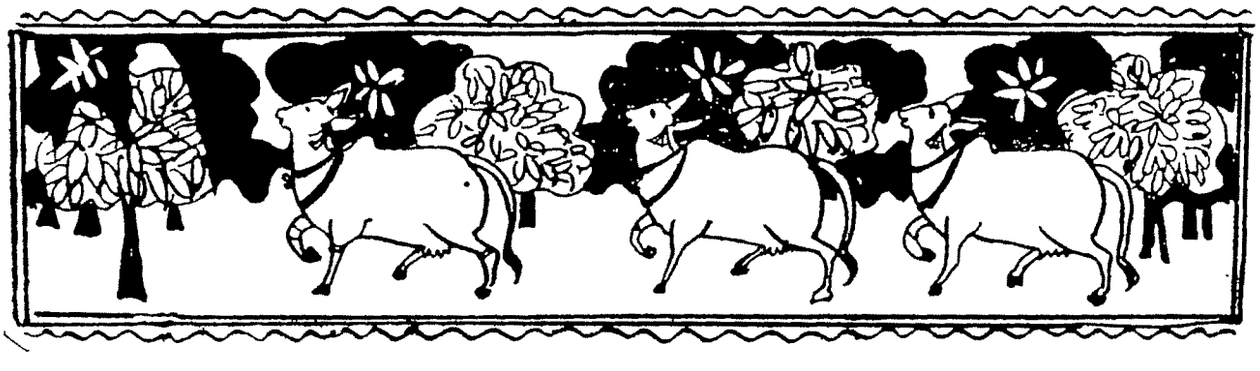

জীবজগতের অপার বিস্ময় এই মানুষ। আর মানুষের মধ্যেও কয়েকটি লোক যেন আরো বেশি বিস্ময়। না, মহৎ মানুষের কথা বলছি না, অর্থাৎ সেইসব স্মরণীয় ব্যক্তি যাঁরা অন্যদের চেয়ে বড় মাপের। বলছি বরং সেইসব সাধারণ মানুষের কথা, যারা সকলের মধ্যে থেকেও একটু আলাদা,—আহারে-বিহারে, স্বভাবে-চরিত্রে একটু যেন কেমন খাপছাড়া, **বেমানান**। **তাদেরই** কয়েকজনের রেখাচিত্র তুলে ধরা হল এই বিভাগে। এই ছবিগুলো দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ হয়তো আপনারও মনে হবে, আপনিও এদের চিনতেন।

সেই লোকটি

পাড়ার পুরোনো লোকজন বলত—নির্মলেন্দু লাহিড়ীর মতো গলা শম্ভুদা-র। দুর্গাদাস বাঁড়ুজ্যের মতো চেহারা। শম্ভু দা—মানে আমার শম্ভু দা, আমার বাবা-কাকারও শম্ভু দা। আমাদের পাড়ার আদি ও অকৃত্রিম শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিশিরকুমার-নির্মলেন্দু অহীন্দ্র নন, নটসম্রাট-নটশেখর-নটতিলক বলতে আমরা বাগবাজারের ছেলে-মন্দা-বুড়োরা বুঝতাম ঐ একজন লোককেই। এক হাতে বাজারের বোঝাই থলি আর এক হাতে কেরোসিন তেলের টিন নিয়েও বাজার মত চলাফেরা করতে পারে একমাত্র যে লোকটি—সেই শম্ভু দা-কে।

পাড়ার গলিতে-গলিতে ক্লাব—পনের বিশটা নাটক নামত ফি বছর সময়ে অসময়ে। অজাতশত্রু ছিলেন শম্ভু দা। সব জায়গার তাঁর সাদা আসন, তাঁকে পাওয়া নিয়ে এ ক্লাব ও ক্লাবের রেষারেষি। প্রসন্ন মুখে পান চিবুতে চিবুতে মহড়ার ঘরে ঢুকতেন গৌর-বর্ণ দোহারা চেহারার মানুষটি, সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াত। বোঁটা থেকে দাঁতে চুন কাটতে কাটতে প্রশ্ন করতেন—কি পালা রে?

ঘন্টা দেড়েক-দুয়েক থাকতেন শম্ভু দা। তিনি চলে যাওয়ার পর, নাটুকেরা দেখত তাদের পুরো প্ল্যানটাই ভেস্তে গেছে। শম্ভু দা ছেলেদের একটু এধার ওধার হাঁটিয়ে, একটু আধটু কথাবার্তা শুনে, এক লহমার জন্য আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে শুধু নায়ক-উপনায়ক-খলনায়ক পালটে দেন নি, মায় নাটক পর্যন্ত বদলে দিয়েছেন। বহু সাধ-সাধনার পর পাড়ার যে মেয়েটিকে পার্ট করার জন্য আনা হয়েছিল, এক সেকেন্ডের মধ্যে তাকে হয়তো পুরোপুরি বাতিল করে দিয়েছেন শম্ভু দা।

তবু এ হেন লন্ডভন্ডকারী ব্যক্তিটিকেই অন্তত দু-পুরুষ ধরে অথরিটি মানত পাড়ার লোকেরা। কারণ মহড়ার প্রথম দিন থেকে অভিনয়-রজনীর যবনিকা না পড়া পর্যন্ত শম্ভু দা জান লড়িয়ে দিতেন। আপিস-কাছারি মাথায় উঠত। কয়েক দিনের মধ্যেই সব কটা পার্টের সংলাপ ঠোঁটে ঠোঁটে ঘুরত তাঁর—সকালে যেতেন অপ্রস্তুত নায়িকার বাড়িতে, দুপুরে নায়কের আপিসে বারবার ডায়লগ বলাতেন, সুযোগ পেলে পশ্চাৎ দেখিয়ে দিতেন বারকয়েক। এককথায় বলা চলে যে সব স্থলমেধে অভিনয় করত, লাইফ হেল ক'রে দিতেন তাদের।

চার-পাঁচটি বড়-গুঁড়ো মেয়ে শম্ভু দা-র, কুল্যে একটি মাত্র ছেলে তাও সব্বার ছোটো। সামান্য চাকরি করতেন বড়বাজারের এক সদাগরি আপিসে, নাটকের মরশুম এলে ছুটি-ছুতোয় প্রায়ই কামাই করতেন। পিতৃদত্ত একখানা ছোট বাড়ি ছিল, দুখানা ঘর ভাড়া দিতেন, বেশ কষ্ট ক'রেই চলত। বড় মেয়ে দুটি পাড়াতেই প্রেম ক'রে বিয়ে করেছিল, একটি তো দুবছর বাদে সেই বাচ্চা কোলে ক'রে বাপের বাড়ি ফিরে এল তারপর থেকে নট নড়ন-চড়ন। তা' শম্ভু দা এসব খুব একটা তোয়াক্কা করতেন ব'লে মনে হয় না, যখন কলেজে পড়ি, তখন কতদিন আমাকে বলেছেন—খাওয়া থাকা যাই হোক, মেজোজটা সব সময় দরাজ রাখবি বুঝলি। হাই থিংকিং—আসল কথা হাই থিংকিং।

বাবা-কাকারা জিজ্ঞেস করতেন, পেশাদারি মঞ্চে শম্ভু দা অভিনয় করেন না কেন। ছোঃ—একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতেন ঠোঁটের কোণে—আর্টের সঙ্গে সিকি-আধলিকে মেলাতে রাজি নই ভাই। তাও অল্প বয়েসে বোকার মত শ্রীরঙ্গমে গিয়ে ধরেছিলাম বড়বাবুকে (শিশিরকুমার ভাদুড়িকে শম্ভু দা কেন জানি না সব সময়ই 'বড়বাবু' বলে সম্বোধন করতেন)। পাঁচ-পাঁচটি বছর দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা ডায়লগ পর্যন্ত পেলাম না। তারপর থেকে নমস্কার জানিয়েছি পাবলিক স্টেজকে।

আমাদের গোঁফ ঘন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সাবেক আমল বিদায় নিল। আর পাঁচটা পাড়ার মত আমাদের এলাকাতেও নব নাট্যের জোয়ার এল। পুরোনো নাটক, পুরোনো চিন্তা, পুরোনো ঢঙের অভিনয়ের দিকে রুমাল উড়িয়ে দিলাম আমরা, নতুন একটা কিছু করার তাগিদে মহড়া শুরু করলাম রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকের এবং কয়েকদিনের মধ্যে তাঁকেও বিদায় দিয়ে ধাওয়া করলাম উল্কট থেকে উল্কটতর কিমিতি থেকে কিং কিমিতি বাদী নাটকের পিছু পিছু। শম্ভু দা-কে আর আমাদের দরকার নেই, কিন্তু তিনি আমাদের ছাড়তে চাইতেন না। অনেক সেধে এক পুজোয় 'রক্তকরবী' নাটকে রাজার পার্ট চেয়ে নিলেন, কিন্তু শেষ-মেশ ঐ বোলে আমরা তাঁকে নামাতে পারলাম না। অনেক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কিন্তু-কিন্তু করে আমাদের সিদ্ধান্ত জানানো হল শম্ভু দা-কে। এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য—সেই প্রথম শম্ভু দা তাঁর রাজার মাথা নিচু ক'রে মন্ত্রীর পায়ে মহড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর ঘর-ভরা ছেলেমেয়ে পাথরের চোখে তাঁর অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাদের লাগোয়া বাড়ি শম্ভু দা-র। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে বাথরুমে চোখে মুখে জল দিচ্ছি, হঠাৎ ও বাড়ির ছাদের ওপর থেকে যেন মেঘ গর্জনের আওয়াজ ভেসে এল। কৌতূহলী হয়ে দোতলায় আমার শোবার ঘরের জানলা খুলে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, শম্ভু দা ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। দুহাত অহীন্দ্র চৌধুরীর ভঙ্গিতে সামনের দিকে বাড়ানো। এককালে হাজার হাজার লোকের বুকে শিহরণ জাগানো ভরাট ঢেউ খেলানো গলায় হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে শম্ভু দা আবৃত্তি করে চলেছেন—আমার হৃদয় গলে যাচ্ছে জাহানারা ..

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

আরেকবার ডানার জন্য ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

অন্ধকার ডিম ভেঙে, কষ্ট দিয়ে,
তুমি আমায় বের ক'রে এনেছিলে—
সেই প্রথম।

সেই প্রথম অনুভব করেছিলাম
আমার ডানা এবং পালক
এবং পালকের নিচে উষ্ণ উত্তেজনা।
তুমি আমায় উড়তে শিখিয়েছিলে, এবং
আমি ঋতুর পর ঋতু
উড়েওছি ঢের।

তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছিলে
তারপর আমি
সবাইকে মুগ্ধ করলাম, বোকা বানালাম।

আজ পাহাড়ের চূড়া ভেঙে পড়েছে
এবং আমি গভীর খাদে,
উপত্যকায় কুয়াশা ঝড়, আমি নিচে পড়ে আছি।

আজ তুমি কেন
আমাকে আরেকবার
উড়তে সাহায্য কোরছো না?

আকস্মিক ভাবেই প্রেম ॥

সত্য গুহ

আকস্মিক ভাবেই প্রেম, সেদিন সন্ধ্যাবেলা
কেবল শীতশীত ভাব লাগা হাওয়া সামনে কার্তিকের মাস
মাঠে বুঝি সবুজ ধানে দুধ ধরেছে বা একটু
হিম ও কুয়াশার মধ্যে, একান্ত আকস্মিক ভাবেই,
প্রেম অথবা মৃত্তিকা
পুরোনো পাণ্ডুলিপিতে প্রসিদ্ধ উপমানগুলো আবর্জনা ক'রে
চুল চোখ স্তন নাভী ইত্যাদি যেমন যেমন থাকা উচিত ও
থাকলে সুন্দর হয়
একটুও না-বদলে
আমার বাহুবন্ধনে সে রমণী ও বিস্ময়

ছেলেবেলা দুহাতের চেটোয় দুধের বাটি ধরে তেমন চুমুক দেয়া
তার নিগ্রোবটু ধরণের পুরুষ্ট অধর আমার আলজিভ অব্দি
বঙ্গোপসাগরের ধ-দ্বীপে নদী ও সমুদ্রের পরস্পরের মধ্যে
সেঁধিয়ে যাওয়া
সে কেমন যোদ্ধা-প্রতিযোদ্ধার তৎপরতা, আমার অজানা
নিখিল পৃথিবীর ভাবং সৃজনশীল উত্তাপ আমার রক্তে এবং শক্ত
মৃত্তিকা মাটিআ মাটি আমি সংগীতের শান্তি অনুভব করি,
আমার মনে হয়
একে ঈর্ষা করেই বুঝিবা মানুষের প্রতি ঐশ্বরিক শত্রুতা
জীবনের উজান ঠেলে উড়ে যাবার সাহসে আমার গান
চিরসখা হে মোর ছেড়ো না ছেড়ে যেয়ো না
এবং তিলোত্তমা অব্দি শুষে নিয়ে তান্ত্রিক তার দুহাত ভরা কারণ
পাত্রের দিকে চেয়ে থাকে

সেই থেকে আমার বুকের মধ্যে আকাশবাতি
নষ্ট পৃথিবীর মাঝখানে উঁচিয়ে ধরা আমার প্রেম।।

নারী তুমি কৃষ্ণচূড়া ॥

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

নরম থোড়ের মত সাদা পা নিয়ে
কোথায় চলেছ তুমি নারী?
কানের লতিতে বৃষ্টি
মুক্তোবিন্দুর মত টপ্‌টপে,
বুকে তোমার চাঁদের পাহাড়!
নারী তুমি কৃষ্ণচূড়া!
কোথায় চলেছ?

সমুদ্রে নুলিয়াদের মত
ঝকঝকে চকচকে হাসি
জ্যোৎস্নার পরতে মোড়া
তোমার নিতম্বের চারপাশে
নিজেকে নিয়ে খেলছে, গড়াচ্ছে!

তোমার মণিবন্ধে নিঃশেষিত সময়,
ক্ষীণ কটিতটে মাথুরের আর্তনাদ;
নারী তুমি কৃষ্ণচূড়া
কোথায় চলেছ?

তবুও সময়ের সিঁড়িতে ঘাড় ফেরালে
কখনও কখনও সমাসীনা তুমি
রাজেন্দ্রাণীর গৌরবে।
অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বিভ্রান্ত নীহারিকা;
সমস্ত শরীর তমিস্র তল্লাট জুড়ে
দুরন্ত আগ্নেয়গিরি।
নারী তুমি কৃষ্ণচূড়া!
কোথায় চলেছ?

এক্সট্রা ক্লাস

সত্যেন্দ্র আচার্য

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর, সেই বোধহয় প্রথম ভালবাসার পাত্রপাত্রীদের ওপর প্রথম আমার করুণা হয়েছিল। লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতেই আমি তো অবাক। সান্ত্বনার সুর এসেছিল গলায়। লোকটাকে সাহস দিয়েছি আমি। বুঝিয়েছি, ছিঃ, কেঁদ না। তুমি না পুরুষ মানুষ?

অথচ সে লোকটাই। স্টেশন পার হয়ে লেভেল ক্রসিং-এর মুখেই চোখাচোখি বিস্ময়ে চীৎকার করেছি, আরে, সুব্রত না?

সুব্রত চোখ কুঁচকেছে। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা খানিক কামড়ে ধরে কী যেন ভেবেছে। তারপর, অবাক হয়েই উচ্চারণ করেছে রুনু না?

এখানে?

ও আবার হাসল। বারে, এখানে ওমনি নাকি? এমন পান্ডব-বর্জিত দেশে নিরুদ্দেশে থাকবার মত পাত্র আমি নই। শ্বশুরবাড়ীর দেশ এটা। আমি বিয়ে করেছি রুনু। হাত তুলে লাল রেল কোয়ার্টারে তাকাল। তারপর কোন আগ্রহ প্রকাশ না করেই বলল, কত যায়, কত আসে, কে কাকে চিনে রাখে বলো? রেলের চাকরী, কত যে এমনি দেখা হয়ে যায়? সোজা হয়ে দাঁড়াল সুব্রত। তুমি বুঝি এই ট্রেনেই এলে?

হ্যাঁ।

এখানে তোমার কে থাকেন?

আমার দেশ এটা। জন্মভূমি।

আজো ঠিক তেমনি আছে সুব্রত। কথা বললে ঠোঁট কামড়ায়। চোখ নাচায়। গলা ছেড়ে একটা নাটুকে হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে যায় একসময়। সুব্রত কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে যাবার জন্যে পা বাড়াল। যেতে যেতে আবার থমকাল। হাসল তেমনি। কথার স্বর আর হাসির শব্দে লোকটা যেন কোথায় আলাদা। একটা লোকের ভেতর দুটো সত্তা চুপচাপ পাশাপাশি জেগে আছে। হাসে একজন। কথা বলে অন্য কেউ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, একদিন দাঁড়িও এসে স্টেশনে। দেখবে কত আসছে, কত যাচ্ছে। কে কার হিসেব রাখে বল, না? হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হল সুব্রত। তারপর চলে গেল।

সুব্রত চলে গেলে আবার নতুন করে সব মনে পড়ল। এই লোকটাকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কী আশ্চর্য করুণাটাই না সেদিন করেছিলাম। সেই তিনটি বছর পেছনে অফিসের আমরা কজন কনফারেন্সে বসেছি। সবচেয়ে পেছনের সীটে বসে মাথা নিচু করে ফুলে ফুলে কাঁদছিল লোকটা। নিতান্ত ছাচ্ছিল্যে ফিরেও তাকাইনি আমরা কজন। একে একে সব চলে গেলে চুপি চুপি আমার কাছে এসে হাতদুটো খপ করে ধরে ফেলে নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমার চোখের ভেতর কী যেন আবিষ্কার করে বলেছিল, পারি না আর পারি না রুনু। বুক আমার জ্বলে।

চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল ওর নীলণ্ঠ বুকের ওপর। মিস সেনকে তোমরা বুঝিয়েছ, আমি লম্পট, হিংস্র, অমানুষ। একটা অসুস্থ মনের লোক আমি। নির্জন ঘরটার ভেতর আমার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে কাঁদছিল। বল না, তোমাদের কী লাভ হল তাতে?

লাভ? কী বলছ তুমি সুব্রত? এ তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সুব্রত। আমাকে তুমি জড়িও না। আমাকে তুমি দায়ী কর না। এসব আমি জানিই না কিছু।

শোননি?

অত আমার সময় কোথায় বল? তোমার মিস সেনের কোন সুধীজন আমি ছাড়া কিছু শুনিনি আমি।

তোমরা কেউ আমায় দেখতে পার না। কেউ একটা প্রাণ খুলে কথা পর্যন্ত বল না। কিন্তু তুমি রুনু তেমন নও। সুব্রত চোখের জল মুছছিল না। তুমি বড় ভাল। ঠোঁট কামড়াচ্ছিল ও। পারি না আর পারি না রুনু। বড় নিঃস্ব। তুমি কিন্তু আমায় ঘৃণা কর না।

লোকটা কদমতলার পাশ দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেলে আমি আমার পথ ধরলাম।

রাঙাদি বলেছিল, চল না, ঘুরে আসি। সবাই যাচ্ছি আমরা রুনু। তোর ছুটি তো এখন।

হ্যাঁ।

রাঙাদি অন্তরঙ্গ গলায় বুঝিয়েছিল, হাজার হোক জন্মভূমি তো? না হয় দেখেই এলি গ্রামটাকে একবার। সেই রুগন ফুলের চত্বর, গাছগাছালি, ঘাস ফুল আর গঙ্গা ফড়িং, একেবারে যা তুই চাস। একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল, লীলারাও আছে এখনো। যতবার চিঠি লেখে তোর কথা জিজ্ঞাসা করে।

জামাইবাবু আগেই চলে এসেছিল। সঙ্গে লটবহর আর হরেকরকম টুকিটাকি। সেই সঙ্গে জামাইবাবুর হাফডজন বন্ধুর ভেতর আমি বোধহয় হাঁফিয়ে উঠব বলে বলেছিলাম, তোমরা যাও, দুদিন পরে ঠিক দেখো হাজির হয়েছি আমি। জামাইবাবু বলেছিল ঘাস কিন্তু রুনু। স্টেশনে থাকতে পারি।

শরৎ সবে ফুরিয়ে যেতে বসেছে এখন। গাছের পাতা ঝরে ঝরে এরি মধ্যে কেউ পত্রবিরল, কেউ এখনো বেশ সজীব হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত বেলার রোদ তাদের গায়ে লেগে বেশ উজ্জ্বল কেউ কেউ। কচি পাতার ওপর থেকে এখন পড়ন্ত রোদের ছায়া শুকিয়ে যাচ্ছিল। মাঠ ফাঁকা। দুটি কিশোর আমার আগে হাঁটছিল। আমাকে দেখছিল মুখ ফিরিয়ে। হয়ত নতুন মুখ মনে করে ওরা কী সব বলাবলি করছিল। এমন পড়ন্ত বেলায় এই স্টেশন চত্বরে কত এসেছি আগে। কিন্তু সে এক যুগ আগে। এখন কত বদলেছে মাঠের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা চলে গেছে বালি খাল পর্যন্ত। প্রচন্ড গ্রীষ্মে শুকনো বালি খালের ওপর বাঁশের সাঁকো নেই আর। কাঠের পুল পাব হয়ে ইঁট-খোলার পাশ দিয়ে আমার সেই জন্মভূমির পথ ধরলাম। এই সাঁকোর ওপর কত উঠেছি আগে। আমি আর লীলাদি। কত ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। টেলিতারের সোঁ সোঁ শব্দ শুনেছি। কেবিন ঘরের পাশ দিয়ে কতদিন হেঁটে যেতে যেতে লীলাদিকে বলেছি তোকে নিয়ে রেল গাড়ীতে চড়ে বসে সব-চেয়ে সুন্দর নামের একটা স্টেশনে গিয়ে নামব লীলাদি।

লীলাদি তাকিয়েছে। লাইনের দিকে চুপ-চাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছে আচ্ছা তুই আমাকে লীলা বলতে পারিস না?

ধ্যেৎ। তুমি না বড় সাতদিনের। বলতে নেই।

আছে।

নেই।

না। দিদি বলবি না। লীলাদি না। তাহলে আমি তোর সঙ্গে রেলে চড়ব না। লীলা বলবি। চড়ব তাহলে।

বলব। সিগন্যাল পোস্ট থেকে কান সরিয়ে বলেছি।

মাথা নীচু করেছে লীলাদি। মাঠে মাঠে শীত পাখির ঝাঁক। উড়ন্ত পাখির ছায়া খুঁজতাম আমরা। খুঁজে খুঁজে খুব ক্লান্ত হলে লীলাদি বলত, আমাকে নাম ধরে না ডাকলে উড়ন্ত পাখির ছায়া তোর চোখে পড়বে না।

ডাকব।

আমাদের গ্রামের নামে স্টেশনের নাম হল না বলে আমি বেজায় দুঃখ পেতাম ছোট-বেলায়। তখন এই দক্ষিণের বারান্দার সকলের চোখ থেকে সরে এসে ভাবতুম। এই দক্ষিণের বারান্দায় আজ একটু আগেও রোদ ছিল। সেই রোদের ওপর আমি এখন বসেছিলাম। বসে বসে ভাবছিলাম। সেই ভাবনার ভেতর কখন লীলাদি এসে দাঁড়িয়েছিল আমি লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কী অত ভাবছ সেই কখন থেকে বসে বসে?

ও তুমি? আমার ভাবনার সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে, লীলাদির চোখে তাকিয়েছি। অভিযোগের সুর এনে গলায় বলেছি, এতদিনে বুঝি সময় হল?

লীলাদি খুব প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, বারে, একথা বুঝি আমি বলতে পারি না? সময় আমার অঢেল। লীলাদি অন্তরঙ্গ গলায় বলল, এসেছ বেড়াতে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তো আর নয়। জন্মভূমি দেখতে। তাই আসিনি। ঠোঁটের ওপর থেকে হাসির রেখা মুছে দিয়ে বলল, পাছে যন্ত্রণা পাও, তাই।

আমার দীর্ঘশ্বাস চুপি চুপি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছি। কপট অভিমান গলার ভেতর জমিয়ে রেখে বলেছি, তোমাকে তো কবেই ভুলে গেছি।

লীলাদি তাকাল না। কোন কথা বলল না।

এই দক্ষিণের বারান্দা থেকে ট্রেন লাইন চোখে পড়ে। কালভার্ট পার হয়ে ট্রেনটা ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে ইঞ্জিনের আলোয় অংশত এ বাড়ীটা এবং এই দক্ষিণের বারান্দার সবটা হঠাৎ আলো-কিত হয়ে ওঠে। সে আলোয় কত গল্প করেছি আগে। আলো পড়বার আগেই কত-দিন আমি আর লীলাদি দরজার বজায় রেখে তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে সরে বসেছি।

লীলাদি আমার পাশে বসল। বলল, তুমি খুব বদলে গেছ রুনু।

আমি এবার তাকিয়েছি। লীলাদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মুছে নিয়ে বলল, একদিন তো যেতে পারলে না। তোমাদের তো তেমন কোন আত্মীয় আমি নই, সম্পর্ক তো প্রতিবেশীর।

আমার গলা কেমন বুঁজে আসছিল। বলেছি, তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব সে মুখ আমার নেই। তুমি আমায় ক্ষমা কর লীলাদি।

ধ্যেৎ, খুব পেছনের দিকে যাচ্ছ তুমি। খুব স্বাভাবিক গলায় যেন লীলাদি কথা বলতে চাইল। তুমি দুঃখ কর না। লীলাদি উঠল।

সন্ধ্যা খুব গাঢ় হয়ে নামেনি এখনো। লীলাদি হাত ছাড়িয়ে নিল। উঠি। ও'র আবার ডিউটি আছে রাত্তিরে।

লীলাদি চলে গেলে সন্ধ্যাটা যেন খুব ঘন হয়ে চোখের ওপর ফুটল। চাতাল, চিলে-কোটা, কামিনী গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার শাদা আলো পড়ে খুব স্পষ্ট সব আমার চোখের ওপর ভাসছিল। লীলাদি চলে গেলে সব কেমন ওলটপালট হয়ে গিয়ে একটা ধাঁধায় পরিণত হচ্ছিল আমার চোখের ওপর।

লীলাদি আবার ফিরে এল। কী, এখনো বসে যে?

তুমি ফিরলে যে?

অই যে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম, ভাই।

কী?

কবে যাচ্ছ?

আজই।

আজই?

হ্যাঁ, রাত্তিরের ট্রেনে। ভোরে পৌঁছব। সকালে অফিস।

ছুটি শেষ?

শেষ।

এলে যখন, আরো কিছুদিন থেকে গেলে পারতে। রাঙাদিরা তো থাকছেন কিছুদিন। জল হাওয়া এখন ভাল, স্বাস্থ্যটা না হয় একটু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে।

এখন আমি চুপচাপ বসে থাকলে লীলাদি বলল, আবার কবে আসছ? আঁচলের প্রান্তভাগ আঙুলে জড়ালো লীলাদি।

দেখি।

এলে তো একযুগ পরে। এবার? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীলাদি। এস।

তুমি এখন বিবাহিতা লীলাদি। পেছনের দিনগুলোকে চোখের ওপর তুলে এনে লাভ কি বল? তোমার স্বামী আছেন ঘরে।

একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ল লীলাদি। বাব্বা! কথা শিখেছ বটে? আগে শুধু লীলাদির শরীর থেকে সুখ নেবার বেলায় যত বুদ্ধি যোগাত ঘটে।

এই প্রথম আমি নাম ধরে ডেকেছি। বলেছি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি লীলা।

আমার পাপের জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও। আমার গলার স্বর বুজে আসছিল। ধরা গলায় বলেছি তুমি খুব অসুখী লীলা, রাঙাদির মুখে শুনেছি। লীলা একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

উঠলাম। আমি বাত্তিরের ট্রেনে ফিরব বলে রাঙাদি সব কিছু তৈরী করে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে রাঙাদি ইটখোলার বাকি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল সঙ্গে কেউ রইল না। সেই কোন রাত্তিরে ট্রেন, অনেকদিনের অচেনা, সাবধানে যাস বুনু।

বাঁক পার হয়ে এগোলাম। সাঁকো এখন নেই বলে আবার দুঃখ হল আমার। পুলের ওপর উঠতেই চোখেচোখি।

লীলা হাসল। খুব উচ্ছল গলায় বলল, কি চিনতে পারছ না? ভূতটুত নই কিন্তু। লীলা।

এত রাত্তিরে?

ধ্যাৎ। রাত্তির না ছাই। তোমার কাছে কী আজ অচেনা। তাই। সবে তো দশটা। সব কিছু তাই অবাক লাগছে তোমার।

জ্যোৎস্নায় সব শাদা। ওর চোখ, চুল, ভুরু এবং গলার নিচেটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। ও আবার হাত ধরল আমার। দুঃখ কেউ চায়না বলে কত লোক সুখের আশায় গা ছেড়ে চলে গেল। আবার হাসল। খুব ভয় পেয়েছিলে, না?

না।

চল মাঠে নামি। আমার হাত ধরে টানল লীলা।

পুল পার হয়ে এখন আমরা স্টেশনের পথ ধরে হাটছিলাম। দুধারে মাঠ। লীলা বলল, চল নামি।

কেন?

কেন আবার। লীলা হাসল। সেই আগের দিনে ফিরে যাব বলে।

আকাশের দিকে দেখল লীলাদি। অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ শাদা। লীলাদি বলল, তেমনি সিগন্যাল পোস্টে কান পাতবে তুমি, সেই যেমন পাততে। সোঁ সোঁ শব্দ শুনবে খন। দেখবে সব তোমার মনে পড়বে। লীলাদি থমকে দাঁড়াল। হোটবেলার সব শব্দ তোমার কানে গেলে আমি তৃপ্তি পাব।

লীলাদি হাত ধরে টানলে বোকার মত লীলাদির সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলাম। রাস্তার পাশে বন্ধ্যা বিস্তৃত প্রান্তর। কাবলা আর কিছু অন্য জাতের মাথা উঁচু গাছ মাঠের মাঝে মাঝে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। শুকনো ঘাসগুলো এখন ভিজে ভিজে। লীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিলাম, কই, তাতো জিজ্ঞেস করলে না?

কোথায়? আমি অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করেছি।

স্টেশনে।

স্টেশনে? কেন? অবাক গলায় প্রশ্ন করেছি আমি।

তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব বলে। তারপর হো হো করে হেসে বলল, না গো না, আমার স্বামী আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। তোমার ট্রেন, রাতের শেষ গাড়ি। তোমাকে নিয়ে চলে গেলে তবে দুজনে ফিরব।

সে তো দেরী অনেক।

স্টেশনে এতক্ষণ আমরা খেলব। লীলাদি এবার ম্লান হাসল। আমার স্বামীর পেশাকে অনেক আমি সম্মান দিই, জানো?

আমি তাকিয়েছি।

আমরা এখন এই জ্যোৎস্নায় অফিস অফিস খেলব।

অফিস?

হ্যাঁ গো। লীলা আবার লম্বা করে উচ্চারণ করল। যে অফিসে আমার স্বামী আগে চাকরী করতেন সেই অফিসের খেলা। লীলা এখন আর হাঁটল না। বলল, উনি গল্প করবেন অফিসের। পুরনো দিনের। ভালবাসার।

ভালবাসার?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তেমনি দোলায়িত উচ্চারণ করল আবার। সেই ভালবাসার পাত্রী কিন্তু আমি। অথচ কোনদিন আমি কলকাতা দেখিনি।

রাত এখন অল্প নয়। মাঠের পুব দিগন্তে দু'একটা আলো। দূরে। আলেয়ার মত। হয়ত খেত খামার চৌকি দিচ্ছে কেউ কেউ। কিম্বা বালিখালে জাল নামিয়ে বসে আছে হয়ত।

লীলাদি বলল, শেখানো কথাগুলো মুখস্ত করে ফেলেছি করেই। আমার কাছে এসে দাঁড়াবেন উনি। আমি বলব, এত দেরী যে?

কাজ ছিল একটু। উনি জবাব দেবেন।

কাজ আর কাজ। অভিমান আনতে হবে গলায় আমাকে।

আপনি বিশ্বাস করুন মিস সেন।

বিশ্বাস করি বলেই তো তোমার পথ চেয়ে বসে থাকি। আচ্ছা,

বল।

না।

কেন, বলই না।

তুমি আমায় ভালবাস?

একটু হাসবেন এখন উনি। বলবেন, এখন থেকে তুমি আর মিস সেন নও, শুধু সুমিতা। আপনি নয়। তুমি। সুমিতাকে আরো ছোট করে ডাকব এবার।

সুনি।

তারপর এখন কি হবে জানো?

কি? লীলার প্রশ্নের জবাবে এতক্ষণ পরে আমি কথা বলেছি।

তোমার ট্রেন আসবে। মানে রাতের শেষ গাড়ি এখন চলে যাবে। উনি ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবেন। সিগন্যাল দেবেন। লাইন ক্লীয়ার দেবেন আলো ফেলে। তারপর?

সব ফাঁকা তারপর। ইস্টিশানের কুলিটি হিন্দী গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরবে। হেডাবের কালো নিবে যাবে। সব কেমন চুপ, তেমন ফাঁকা আর শূন্যের মত এই স্টেশনটা সকালের অপেক্ষায় পড়ে থাকবে। শুধু আমরা জাগব। আবার অভিনয় আমাদের সুরু হবে। আমি বলব, তুমি ভণ্ড, ইতর, নীচ, তোমাকে বিশ্বাস নেই।

উনি বলবেন, তুমি যা শুনেছ সব মিথ্যে। ওরা তোমায় মিথ্যে বলেছে। আমাকে ওরা হিংসে করে তোমার সঙ্গে আমার প্রেম বলে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলে সুনি।

ক্ষমা করুন আমাকে।

না না, এ কি বলছ তুমি? আমি লম্পট নই, হিংস্র নই। মানুষ। ভালবাসার কাঙাল। তুমি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পার না?

আমি তখন চোখের দিকে তাকাই আমার স্বামীর। সুব্রত সেনের। এরপর দুজনে বাড়ী ফিরি। বলত এখন, কেমন লোক আমার স্বামী?

আমার কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করে লীলা বলল, চল চল, রাত থাকতে ছায়া খুঁজি চল।

আমি লীলার হাত ধরে গাছের দিকে তাকালাম। চোখে পড়বে?

নাইবা পড়ল। তুমি আমি পাশাপাশি হাটছি, আগের মত এতদিন পরে হাটছি, এটাইতো সব।

এই রাত্তিরে ক্রীতদাসের মত ওর পিছু পিছু হাটলাম। বললাম, মড়ার বেলা জাত নেই, তেমনি ক্রীতদাসের কোন জুড়ি নেই লীলা। দেখ না, কত সহজে, তোমার স্বামী, তুমি এবং আমি কেমন ক্রীতদাস হয়ে গেছি?

ও কথায় লীলার কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেখ—

কী?

এ জায়গায় একটা বাঁশ পোতা ছিল আগে। মনে পড়ে? বাঁশের মাথায় হাঁড়ি মাথায় কাকতাড়ুয়া?

পড়ে।

মাঝে মাঝে একটা নীলচে গোখরো পাখি এসে বসত না।

হ্যাঁ।

তুমি কাকতাড়ুয়াকে ভেঙেছ। পাখিটাকে লাফিয়ে লাফিয়ে তাড়াতে। উঠতে চাইত না।

তাই।

একবার তেমনি করে ভেঙেও না?

আমি অবলীলায় মুখ বিকৃতি করে ভেঙালাম।

লীলা হাঁটতে হাঁটতে বলল, এখানে ছিল একটা উঁচু ঢিপি। ওপরে উঠে, তুমি লম্বা না আমি, তা মাপতাম। বল, মাপতাম না?

হুঁ।

এখন এস দেখি, লীলা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এস মাপি।

আমি মাপলাম।

সামনে আবার এগোলো লীলা। দেখ? ও হাত ধরল আমার। ঠিক ওখানটায় গাছটার ওপরে শঙ্খচিল উড়ত ঘুরে ঘুরে। তুমি ঘুরতে কে ছুঁতে পার আগে। আমিও।

ঠিক মনে আছে তোমার।

ছায়া ধরবার জন্য লীলাদি কোমরে আঁচল জড়াল। তারপর ঠিক সেই আগের মত অবলীলায় ঘুরতে লাগল।

নতুন বই

বিদ্রোহী নায়ক (নাটক)। দেবনারায়ণ গুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, বিধান সরণি, কলকাতা-৬। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

'বিদ্রোহী নায়ক' জীবনকাহিনীমূলক নাটক। শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত এই নাটক বর্তমানে কলকাতার একটি বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত সফল অভিনয়-ধন্য হয়ে বহু প্রশংসিত হয়েছে। নাটকটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—এর বিষয় রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগের এক কিম্বদন্তিপ্রায় নাট্যকারের কাহিনী। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষে উপেন দাসের মত এক নাট্য-রঙ্গমঞ্চের অসাধারণ কীর্তিত্বের স্মরণ ও তাঁকে কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসনের দমন নীতির স্বরূপ, রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সেকালের নবজাগ্রত উদার-চেতনার তীব্রতম সংঘাত ও এসব থেকে উঠে আসা বিদ্রোহী স্বভাবের ধ্রুব-প্রাণের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে নাট্যকার আলোচ্য নাটকে যে অসাধারণ শিল্পকৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই অভিনন্দনযোগ্য। উপেন দাস, তাঁর স্ত্রী মনোমোহিনী, উপেন দাসের পিতা শ্রীনাথ, মা রমণীসুন্দরী, উপেন দাসের দ্বিতীয়া স্ত্রী সৌরভিনী ইত্যাদির চরিত্র নাট্যক্রিয়ায় সপ্রাণ হয়ে উঠেছে, রেনেসাঁ-উজ্জীবিত উনিশ শতককে, বিশেষ করে নাটক সৃষ্টি ও অভিনয়ের ভিত্তিকে নাট্যকার বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ইত্যাদি চরিত্রায়ণে স্পষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। নাটকের মূল প্রাণ হল 'অ্যাকশান'। জীবনীমূলক নাটক সবচেয়ে দুরূহ এই কারণে যে সেক্ষেত্রে নাট্যকারকে যাঁর জীবনকথা নিয়ে নাটক লিখতে বসেছেন, তাঁরই বাঁধা পথে তাঁকে চলতে হবেই। নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত উপেন দাসের জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনা ও অংশ বেছেছেন এবং উনিশ শতকের এমন এক অধ্যায়ের মধ্যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করেছেন, যা নাটকের অ্যাকশানকে ঘরিত করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, নাট্যকার নাটকের কোথাও 'কালানুচিত্যদোষ' ঘটান নি। নাটক অভিনয়ের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা পায়। 'বিদ্রোহী নায়ক', আজও মঞ্চসফল নাটকরূপে অভিনীত হয়ে চলেছে—এই সংবাদ প্রমাণ করে, নাট্যকার বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ সহৃদয় বাঙালী দর্শকপ্রাণ জয় করতে কতটা সক্ষম হয়েছেন। বাংলা জীবনী নাট্য সাহিত্যের ধারায় বর্তমান নাটকটি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

চলচ্চিত্র (কাব্য সংকলন)। সামসুল হক। কবিতা গ্রন্থাগার, ১৮ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা-২০। তিন টাকা।

সামসুল হক একজন তরুণ প্রতিষ্ঠিত কবি। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ছোট বড় পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু কবিতা আমরা পড়েছি। পূর্বে-প্রকাশিত কবিতাগুলি একটি সংকলনে গ্রথিত হওয়ায় কবিকে বোঝার এবং তাঁর সামগ্রিক কবিক্ষমতা বোঝা সহজ হয়েছে। 'চলচ্চিত্র' কাব্য সংকলনে কবি সামসুল হকের তারুণ্য অ-দৃষ্ট নয়। 'আগামী বৎসর আমি সব লজ্জা খুলে ফেলে নিশ্চয় চেঁচাবো'—এই ধরনের পংক্তিতে কবির তারুণ্যদীপ্ত মনের আপ্রাণ আত্মপ্রকাশের গোপন শপথ আঁকা হয়ে আছে। 'আমাকে আজ যেতেই হবে শিব পাহাড়ের / শিবের সভায়', বা 'কে আছো বেহুলা এসো/উঠে এসো বিপ্লবে/মান্দাসে, অথবা 'ভুলের মধ্যে এক জীবনের বাগান বাড়ি/কাঁপিয়ে দিয়ে উড়ছে শুধু শূন্য পাড়ি'—এইসব উজ্জ্বল, অভিজ্ঞতা পরিশীলিত সুন্দর চিত্রল পংক্তি রচনা করে কবি সামসুল হক তাঁর কবিক্ষমতার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সুহৃদয় পাঠকের সহমর্মিতাও অবলীলায় কেড়ে নিয়েছেন। স্তবক, ছন্দ, চরণ ও যাত্রারীতি নিয়ে আলোচ্য কবি যেসব পরীক্ষা করেছেন, তা কবির ফর্ম-সচেতনার পরিচায়ক। অন্তর্নিহিত আবেগ-অনুভূতি ও জ্বালা-যন্ত্রণা প্রকাশে কবি যে অস্থিরচিত্ত—তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা তা প্রমাণ করে। কবি-প্রাণের সজীবতা ও সুস্থতা এখানেই।

শূন্য সরণী (উপন্যাস)। মদন চৌধুরী। প্রকাশক—জহরলাল রায়, ১২২, আপার চিৎপুর রোড, কলকাতা-৬। আট টাকা।

'শূন্য সরণী'। শ্রীমদন চৌধুরী রচিত একটি কাহিনীপ্রধান উপন্যাস, পুরাতন মদ্যপ জমিদার রাজশেখর রায় এবং তার মদ্যাসক্তি ও লাম্পট্যের কাহিনী দিয়ে উপন্যাস শুরু। পরে তার পুত্র কুমারেশ এবং তারই অবৈধ কন্যা হাসনুর আকর্ষণের কাহিনী দিয়ে গ্রন্থের বিস্তার, শেষে হাসনুর আত্মহত্যায় কাহিনী শেষ হয়েছে। জমিদার-কাহিনীটি গতানুগতিক, বানানো ঘটনায় তা বেশ উজ্জ্বল। বহু ঘটনা মেলোড্রামাটিক। কুমারেশের জন্ম, সেই উপলক্ষে জমিদার রাজশেখর রায়ের সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠান, সোহিনী বাঈজি ও তার প্রেমিক হাসানাৎ-এর আগমন, সোহিনীর প্রতি জমিদারের আকর্ষণ ও হাসনুর জন্ম, হাসনুর শেষে কাশীতে হাসানাৎ-কে পিতারূপে গ্রহণ, একদা পদ্মা-প্রিয়াকে বিবাহ করার পরেও কাশীতে হাসনুকে দেখে কুমারেশের মুগ্ধ হওয়া ও হাসনুকে বাগানবাড়িতে নিয়ে আসা, সেখানে বৃদ্ধ দেওয়ানজীর কাছে কুমারেশের অতীত ইতিহাস জেনে হাসনুর আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা শিল্পবিচারে ভূরিম হলেও চমৎকার সাজানো। যাঁরা নিছক কাহিনী ও ঘটনার চমকের মধ্যে ডুবে থেকে উপন্যাস পাঠের আনন্দ পেতে চান, তাঁরা 'শূন্য সরণী' পড়ে তৃপ্তি পাবেন। গদ্য, সংলাপ কাঁচা, অপরিণত।

রাতের গভীরে (রহস্যোপন্যাস)। শান্তি দাশগুপ্তা। প্রকাশক—অর্চনা প্রেস, ৩৮।১, শিবনারায়ণ দাশ লেন, কলকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

সার্থক রহস্য-উপন্যাসে প্রধানতম শর্ত হল একাধিক সাসপেন্স সৃষ্টি করে কাহিনীকে রুদ্ধশ্বাস করে তোলা। সেই সমস্ত সাসপেন্স নিশ্চয়ই যুক্তিনিষ্ঠ এবং বাস্তব জীবন ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এও এক শর্ত। রাতের গভীরে গ্রন্থের লেখিকা শ্রীশান্তি দাশগুপ্তা দুই ভাই বিকাশ ও বিমানের মধ্যেকার মনস্তাত্ত্বিক সংঘর্ষ এবং বিমানের স্ত্রী চন্দনার অসহায়তার চিত্রকে যেভাবে নিটোল কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্র-ন্যায়ে উপস্থাপিত করেছেন, তা উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষ। ছোট ভাই-এর স্ত্রী রূপবতী চন্দনার প্রতি বড়ভাই বিকাশের কামজ লোভ, বিমানের পূর্ব প্রেমিকা মালতীর আত্মত্যাগ, বিকাশ-বিমান যমজ ভাই হওয়ায় বিকাশের দিক থেকে আকৃতিতে এক হওয়ার সুযোগ গ্রহণ, একটি মার্জারের রহস্য উদ্ঘাটনে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বহু ঘটনা যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তবতার ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। লেখিকা কাহিনীর আদ্যন্ত রুদ্ধশ্বাস অবস্থাকে বজায় রেখেছেন। রহস্য উপন্যাসের উপযোগী কাহিনী রচনা ও গদ্য সৃষ্টিতে লেখিকা সিদ্ধহস্ত।

রামমোহন রচনাবলী : প্রধান সম্পাদক : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা—১২। দশ টাকা।

রামমোহন রায়ের দ্বিশততম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্বল্প-মূল্যের সুমুদ্রিত রামমোহন রচনাবলীর জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমন্ডলী ও প্রকাশক অভিনন্দনীয়। রামমোহন এদেশে আধুনিক চিন্তার আদি-প্রবর্তক,—শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সকল সাধনার নেতা ছিলেন তিনি। সম্পাদকের একটি দীর্ঘ ভূমিকা এবং তার-পর রামমোহনের গ্রন্থাবলী,—'পরিশিষ্ট' অংশে তাঁর সম্পূর্ণ পত্রাবলী, নির্বাচিত ইংরেজি রচনা, পত্রাবলী ও ইংরেজি রচনার পরিচিতি, জীবনী, জীবনপঞ্জী, সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী—'সংযোজন' অংশে বিবদমানবাদীদের রচনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বেদান্তচন্দ্রিকা, বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ, চারিপ্রশ্ন, পাষন্ডপীড়ন—তাছাড়া সংস্কৃত রচনার বঙ্গানুবাদ, ফার্সী রচনার বঙ্গানু-বাদ, রামমোহন সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি,—তাঁর সম্পর্কে রচিত কিছু বইয়ের তালিকা এবং পাঁচটি চিত্র এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ভূমিকায় ডঃ ঘোষ রামমোহনের কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েছেন। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা মূল বইগুলি পুরো-পুরি পড়বার সময় বা উৎসাহ পাবেন না, তাঁরাও প্রয়োজনমতো এই পরিচিতি থেকে আলোচিত বিষয়ের ধারণা পেতে পারেন। এছাড়া 'গ্রন্থ-পরিচয়' (পৃঃ ৪১৫-৪২৭) আছে—সেটিও প্রয়োজনীয়।

রামমোহনের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণ বা তাঁর জীবৎকালের কোনো সংস্করণ এখন দুষ্প্রাপ্য। উপস্থিত গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি সেইরকম কোনো কোনো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে এবং তাছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলীর সঙ্গে ও বসু-বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত 'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী'র সঙ্গে মিলিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট অংশে রামমোহনের জীবনীটি (পৃঃ ৫৮২-৬০২) বিশদ ও সুরচিত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের সঙ্গে সম্পাদক-মন্ডলীতে শ্রীযুক্ত মণি বাগচী, ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী ও আবদুল আজীজ আল্-আমানের নাম ছাপা হয়েছে। এঁদের প্রচেষ্টায় এই কঠিন দায়িত্ব যে সুসাধিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কে কোন্ অংশের দায়িত্ব নিয়েছেন তার উল্লেখ থাকলে ভাল হোতো।

—হরপ্রসাদ মিত্র

গোধূলিতে জ্যামিতি (কাব্য সংকলন)। লোকনাথ ভট্টাচার্য। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ৬, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা—১৭। তিন টাকা।

কবি লোকনাথ ভট্টাচার্য ইতিমধ্যে কাব্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। 'গোধূলিতে জ্যামিতি' কাব্যগ্রন্থটি ওঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটির কবিতাগুলিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—'ত্রিকোণের এক বাহু', 'ত্রিকোণের আরেক বাহু' এবং 'ত্রিকোণের শেষ বাহু'। বস্তুত কবি নিজেরই প্রতিকৃতি অনুসন্ধানে তৎপর। ঊর্ধ্বের আকাশ, শিল্প, প্রকৃতি, কবিসত্তা—সব মিলিয়ে কবির চেতনায় যে অজস্র রং-বেখার খেলার জন্ম দেয়, যা কবিকে এক নিঃসীম রহস্যের মধ্যে নিক্ষেপ করে—যাকে জ্যামিতির অজস্র রেখা, বিন্দু, জ্যামিতির ত্রিকোণ থেকে উঠে-আসা মনেরই এক কোমল কোণের সন্ধান দেয়, আলোচ্য গ্রন্থে কবির অনুভূতির মুহূর্তগুলি তারই উজ্জ্বল অস্তিত্ব সন্ধানে তৎপর। কবি এ শতাব্দীর মানুষ, কিন্তু তিনি চান তাঁর এই অস্তিত্বের সীমারেখা বিলুপ্ত হোক, শত শত শতাব্দীর অজানা অন্ধকারকে এই অস্তিত্ব আলোকিত করুক। নিজ অস্তিত্বের সীমা-বদ্ধতা কাটিয়ে আলোর পিপাসা এই কাব্য-সংকলনের কবিসত্তার ঘোষণা। কবি চরণ ও স্তবক সাজিয়েছেন টানা গদ্যে, কিন্তু কবির কবিভাবনা বক্তব্যানুযায়ী স্বতঃ-স্ফূর্ততা লাভ করেছে।

আদি জগত-জন-পূজ্যা (ধর্মগ্রন্থ)—শ্রীমতী সুমতি দেবী। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চসতী সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, গান্ধারী, দময়ন্তীর ওপরে লেখা পাঁচটি মনোজ্ঞ আলোচনার সংকলন। পড়তে ভালো লাগে। ভাষা ঝরঝরে। লেখিকা তাঁদের চারিত্রিক মাহাত্মকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, আলোচ্য রচনা-গুলিতে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

পার্থসারথি (বিবেকানন্দ সংখ্যা)। সম্পা-দক— শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। পার্থ-সারথি কার্যালয়, ৫এ, অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা-৪। তিন টাকা।

ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা 'পার্থসারথি'-র চতুর্দশ বর্ষের স্মারক বিবেকানন্দ সংখ্যা সম্প্রতি শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকসূচীতে আছেন সর্বশ্রী অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু, স্বামী নিরাময়ানন্দ, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, স্বামী বুধানন্দ, প্রীতিকুমার ঘোষ, শান্তশীল দাশ, কবিরাজ জ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন ইত্যাদি। বিবেকানন্দের বন্দনায় কবিরা যেমন সোচ্চার, তেমনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর নানাদিক তুলে ধরেছেন প্রতিষশা প্রাবন্ধিকরা। সংকলনটি প্রত্যেক গবেষক ও সহৃদয় পাঠক এবং বুদ্ধিজীবীর অবশ্য সংগ্রহ-যোগ্য।

গীতায় সাধনা (প্রবন্ধ)। শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। পার্থসারথি প্রকাশন, ৫-এ, অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা-৪। দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ইতিপূর্বে শ্রীমদ্ভাগবদ-এর বহু ব্যাখ্যা টীকাসহ আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ রচিত 'গীতায় সাধনা' গ্রন্থটি সেই ধারায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গীতার মোক্ষমার্গ চারটি—জ্ঞানযোগ, ভক্তি-যোগ, ব্রহ্মযোগ ও কর্মযোগ। এদের প্রত্যেকটিই অন্যনিরপেক্ষ মোক্ষমার্গ। গ্রন্থকার গীতায় উল্লিখিত বিভিন্ন যোগ-মার্গ সম্পর্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শ্লোক-গুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়েছেন বলেই গ্রন্থটি পাঠে এবং সামগ্রিক রসগ্রহণে সহজ হয়েছে।

মন (প্রবন্ধ)। রমেশ দাস। ভোলানাথ প্রকাশনী, ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

মোট সতেরোটি মন-বিষয়ক প্রবন্ধের সঙ্কলনগ্রন্থ হল শ্রীরমেশ দাশ রচিত আলোচ্য 'মন' গ্রন্থটি। মানুষের মনের রহস্য অপরিসীম। এই দুর্জ্ঞেয় মনকে নিয়েই পৃথিবীর সমস্ত শিল্পীর রচনা। মনের জটিলতা, বিচিত্রতা, বহুসাময়তা এবং তার অসীম শক্তির কথা অত্যদ্ভুত মননের মাধ্যমে

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দ মীমাংসা ৩·৭৫ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-সুভাষিত ১২·০০ রবীন্দ্র রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার
দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫·৫০ শিক্ষতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ৮·০০ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
ছৌ ডান্স অব্ পুরুলিয়া ১০·০০ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
শিব-ভাবনা ৯·৫০ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ১০·০০ সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ৪·৭৫ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬·৫০ ডক্টর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
সংগীতরত্নাকর ১৮·০০ শার্ঙ্গদেব (ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত)
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৬·০০ ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ
এনালিটিক্যাল স্টাডি অব্ দি ফোর নিকায়স্ ৩৭·৫০ ডঃ দীপককুমার বড়ুয়া
রিফর্ম এন্ড রিজেনারেসন ইন বেঙ্গল ১৬·৫০ ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭

লেখক রমেশ দাশ এ গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। যাঁরা মনস্তত্ত্ব বিষয়ের ছাত্র ও গবেষক এবং যাঁরা উৎসাহী পাঠক—সকলেই এ গ্রন্থ পাঠে যথোচিত উপকৃত হবেন।

মরসুমী ফুল। রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নবচেতনা, ৩৯, ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া। তিন টাকা।

'মরসুমী ফুল' গ্রন্থটি 'চিঠি' নামে একটি উপন্যাসোপম বড়গল্প ও 'পাণ্ডুলিপি' বিভাগীয় নামে কয়েকটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ। লেখক শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আপন শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন এ গ্রন্থে। কণা, দিনেশ, অসিত ইত্যাদি কয়েকটি চরিত্রকে রাজনৈতিক আবর্তে রেখে তাদের সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা বলেছেন লেখক তাঁর ছোট নভেলেটটিতে। কবির খুব বড় কোন কবিক্ষমতার পরিচয় 'পাণ্ডুলিপি' বিভাগের কবিতাগুলিতে নেই।

তালোকিত ইচ্ছার মুহূর্তগুলি (কাব্য সংকলন)। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, অজিত পাণ্ডে, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভাশিস দাশগুপ্ত। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩, টেমার লেন, কলকাতা—৯। তিন টাকা।

চারজন তরুণ কবির কাব্য সংকলন হল 'আলোকিত ইচ্ছার মুহূর্তগুলি'। গ্রন্থের প্রথম কবি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মোট বারোটি ছোট-বড় কবিতা সংকলিত। মানুষকে ভালবাসেন কবি। তাই বলেছেন—'মানুষের কাছে নতজানু হয়ে/কবে আর ক্ষমা চাইবে?/এখনই সময় প্রায়শ্চিত্ত কর।' কবি কোন কবিতায় ব্যঙ্গ, কোন কবিতায় বা আশার কথা শুনিয়েছেন। সমকাল সম্পর্কে কবি সচেতন। দ্বিতীয় কবি অজিত পাণ্ডে কাব্য বিষয়ে চিত্রকল্প যোগাড় করেছেন আদিবাসিদের জীবনভাবনার মধ্যে, কখনো বা কোন স্যানাটোরিয়ামে। জীবনকে গভীরভাবে ভালবাসেন বলেই 'মুনিয়া মেঝেনে'র কথা বলেছেন, বলেছেন বাড়ির পুরনো বধূর বুকে কচি শিশুর কথা। একেবারে আধুনিক সমাজসচেতন মানুষের গভীরতম যন্ত্রণার কথা অজিত পাণ্ডে-র কবিতাগুলিতে কবির সহমর্মিতায় ব্যক্ত। তৃতীয় কবি তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ও আদিবাসিদের কথা ভোলেন নি। শ্লেষ-ব্যঙ্গ এ কবির কাব্যে কম-বেশী ওতপ্রোত। কোন কোন কবিতার অন্ত্যমিল ভালো লাগেনি, বক্তব্য কাব্যময়তা-বিচ্ছিন্ন প্রকট হওয়ায় মাঝে মাঝে পাঠকের গভীর অনুভূতিতে আঘাত দেয়। শুভাশিস দাশগুপ্তের কবিতায় স্মৃতি, অস্তিত্ব-ভাবনা, ভালবাসা—এসব আছে। হাল আমলের রাজনৈতিক চিত্র এঁর 'ইমেজ'-এর কাজ করেছে—অবশ্য সংকলিত প্রায় প্রতি কবিরই কবিতায় তা আছে। এই কবি ছড়ার ছন্দে, কখনো বা ন্যূনাধিক্যে অতি সহজতায় কাব্য-বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। সংকলনভুক্ত কবিদের প্রত্যেকেই কবিভাবনা ও কাব্য-বক্তব্যে আন্তরিক ও আধুনিক।

কালের যাত্রার ধ্বনি (কবিতা সংকলন)—সম্পাদক শিবব্রত দেওয়ানজী। প্রকাশক ক্ষিতীশ দেব-শিকদার, কোয়ার্টার নং ২।এ, এভিনিউ 'বি', সেকটর ২ ভিলাই, মধ্যপ্রদেশ।

'অঙ্কুর' পত্রিকার উদ্যোগে এই সংকলনটি বেরিয়েছে একচল্লিশ জন কবির একচল্লিশটি কবিতা নিয়ে। বেশ ভালো কবিতা যেমন আছে, তেমনি চলনসই কবিতার সংখ্যাও কম নয়। বিষ্ণু দে-র 'তবুও আশ্চর্য বৃষ্টি' এ সংকলনের শ্রেষ্ঠতম কবিতা।

বন্ধু এখন (কাব্য সংকলন)। প্রফুল্ল মিশ্র। প্রকাশক—তীর্থপতি দত্ত, ৪, মধু পাল লেন, কলকাতা। দু' টাকা।

নবীন কবি প্রফুল্ল মিশ্র রচিত 'বন্ধু এখন' কাব্যগ্রন্থটি বেশ কিছু ছোট-বড় কবিতার সংকলন। কবিতা অনেক এগিয়েছে। এগোনোর অর্থ—বিষয় ও আঙ্গিকে আজকের কবিতা অনেক বেশী গুণাত্মক, পরীক্ষাধর্মী এবং কবির বাস্তবিক আত্মযন্ত্রণার প্রতীক প্রতিম রূপ। কবি প্রফুল্ল মিশ্র এসব থেকে একেবারেই বঞ্চিত। অকারণ দুরূহ শব্দ ব্যবহার করেছেন ছন্দজ্ঞানেও কোন নৈপুণ্য তো নেই-ই, বহু ছন্দ-প্রযোগ ভুল। অন্ত্যমিল না দিলেই গদ্যছন্দ হয়—এটা যে ঠিক নয়, কবি তা বোঝেন না। কবি শব্দের অদ্ভুত সব বানান গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। বিষয়-ভাবনা, চিত্রকল্প কিছুই তেমন দানা বাঁধেনি।

কেন জলশব্দে প্রলোচিত হলে মালবিকা (কাব্যগ্রন্থ) — ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ অতনু চট্টোপাধ্যায়, ৩, সেন্ট্রাল পার্ক, কলকাতা—৩২। তিন টাকা।

ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায় মূলত প্রেমিক। তাঁর কবিতার উৎসে প্রেম বড় গভীরভাবে সঞ্চারিত। এবং তাঁর উপলব্ধি পাঠককে নির্দ্বন্দ্বতার নিবিড় হতে উৎসাহিত করে।

এই সংকলনের কয়েকটি কবিতা গদ্যে লেখা। ইমেজের তাৎপর্যে, শব্দের ব্যবহার বেশ চমকপ্রদ। পারসোনাল ইমেজ প্রায় নেই বললেই চলে। সোবায়ত অনুষঙ্গে কয়েকটি কবিতা অন্য ডাইমেনশান পেয়েছে।

বইটি ছাপানো এবং বাঁধাইয়ের ব্যাপারে আরেকটু যত্ন নেওয়া উচিত ছিল। তবুও লেখার বিশিষ্টতায় তিনি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ।

এবং সীমা (কাব্য সংকলন)। উত্থানপদ বিজলী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মোট চল্লিশটি কবিতার সংকলন গ্রন্থ হল শ্রীউত্থানপদ বিজলী রচিত 'এবং সীমা'। কবির কোন কোন কবিতায় উচ্চ কল্পনার পরিচয় আছে, কিন্তু প্রকাশ করার উপযোগী ছন্দ, চিত্ররচনা শব্দজ্ঞান নেই গদ্যছন্দে লেখা কবিতাগুলির চরণ-বিন্যাস, শব্দ দিয়ে চিত্ররচনা প্রয়াস অক্ষম কবি-মানসিকতার পরিচায়ক।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কিন্তু (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক পরিতোষকান্তি পাল ও অসিতকুমার ব্রহ্ম। ১৪৮ এম বি রোড, নিমতা, কলকাতা—৪৮। পঞ্চাশ পয়সা।

সম্পাদক আহ্বান জানিয়েছেন 'কবিতার জন্য কিছু স্বার্থ ত্যাগ' করতে। তাই বলে পত্রিকাটি নিছক কবিতা বিষয়ক নয়। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। লিখেছেন মূলত তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সমালোচকেরা। পড়তে ভালো লাগে। চিন্তার খোরাক জোগায়।

অন্বিষ্ট (পট সংকলন)। সম্পাদক—বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৯।১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩। তিন টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ, এলিয়ট, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাস সংখ্যার পর অন্বিষ্ট ত্রৈমাসিক 'পটসংখ্যা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। পট সংকলনটি নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য, কারণ এ ধরনের পটের ওপর বিশেষ সংখ্যা এর আগে অন্য কোন পত্রিকার তরফ থেকে প্রকাশিত হয় নি। বর্তমান সংকলনটি লোক সাহিত্যের ছাত্র অনুসন্ধিৎসু গবেষক এবং সর্বস্তরের সহৃদয় পাঠকদের অবশ্য গ্রহণযোগ্য। সংকলনে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র সাক্ষাৎকার ও যামিনী রায়ের প্রবন্ধ ছাড়া অন্নদা মুন্সী রজনী চিত্রকর, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ইত্যাদির রচনা উল্লেখযোগ্য।

পূর্বাভাস ঃ সম্পাদক—স্বরাজ সেনগুপ্ত ও মনোজ দত্ত। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা—১২। এক টাকা।

প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। এ সংখ্যায় লিখেছেন অম্লান দত্ত, অমল চট্টোপাধ্যায়, সলিল বিশ্বাস, দীপঙ্কর রায়, নিরঞ্জন সর, টেলমন এ বি শাহ, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বরাজ সেনগুপ্ত ও প্রীতিকুমার রায়-চৌধুরী। যে-কোনো সিরিয়াস পাঠক সংখ্যাটি হাতে পেলে খুশি হবেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

কিঙ্কর ঃ সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। ১৮।১, ডেভার টেরেস, কলকাতা—১৯। পঞ্চাশ পয়সা।

নানা মন নানা রং (কাব্যগ্রন্থ)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়। বিমলাঞ্জন প্রকাশন, ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। তিন টাকা।

মুক্তো যোগীন্দ্রম (কাব্যগ্রন্থ)—বিমলেন্দু দত্ত। শতাব্দী প্রকাশনী, দীঘা রোড, কাঁথি, মেদিনীপুর। দু'টাকা।

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

রহস্য উপন্যাস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফেরারী ফিরে এল

(একত্রিশ)

রঘুর মনটা যে সমস্ত দিন অত চঞ্চল হয়েছিল, সোজা বাড়িতে গিয়ে ওঠাও যে বন্ধ করে দিল, তার গোড়ায় নিতান্ত হাওয়ায়-উড়ে-আসা কয়েকটা কথা। শুনে ফেলা।

আজ সমস্ত দিন আগ্রা দেখে বেড়াবে দু'জনে, সময় পাবে না, দেশে ফেরবার ট্রেনের সময় জানতে গিয়েছিল স্টেশনে। কলকাতাটা বাদ দিতেই চায়, সুবিধা হ'লে ব্যান্ডেল-নৈহাটি হয়েই যাবে বেরিয়ে, বাড়ির জন্যে মনটা ছটপট করছে।

এনকোয়ারি অফিসের কাছে লাইনে কয়েকজনের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, কানে গেল—'বাঃ আমার বৌ বলে দাবি করলেই হোল অমনি। আইন নেই, প্রমাণ দিতে...'

চমকে উঠে ফিরে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাটা মিলিয়ে গেল ভিড়ের গোলমালের মধ্যে। যে দু'জনের মধ্যে হচ্ছে, তারা ততক্ষণে গেট পেরিয়ে প্ল্যাটফরমে ঢুকে পড়েছে। শুনেই বুকটা ধক্ করে উঠেছিল, তখনই বুঝল—না, তাকে নিয়ে নয়। দু'জন ভদ্রবেশি যুবক, সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেকেন্ড ক্লাসে উঠে পড়ল দু'জনে। গাড়িটা ছেড়ে দিল। মনটা কথা কটা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। একটা কাহিনীর ভগ্নাংশ, ভালোমন্দ দুই হ'তে পারে, তবে তার নিজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব মনে হওয়ায় মিলিয়ে গেল মন থেকে। ট্রেন সম্বন্ধে খবর নিল, এখান থেকে ছাড়বার, ব্যান্ডেলে পৌঁছে নৈহাটির গাড়ি, তার পরেও। বেরিয়ে এল স্টেশন থেকে। একটা ট্যাক্সিও ঠিক করল সমস্ত দিন ঘুরে দেখবার জন্যে।

এই সব করতে ব্যাপারটা মিলিয়ে গিয়েছিল মন থেকে, এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর কিন্তু আবার এল ফিরে। এবার অন্যরূপে। একটা যে প্রফুল্লতা এসে গিয়েছিল মনে, সম্পূর্ণ নতুন হয়ে নিজেদের পুরানো বাড়িতে উঠবে—তার একটা রঙিন চিত্র—সেটা একেবারে গেল উলটে। প্রমাণ করতে হবে যে এ-থাকোমণি সেই থাকোমণি.. তার আগে পর্যন্ত সে তো স্ত্রীহন্তা রূপেই, সাঁড়াশি উঠানো থানার লোক এসেছে.. সব কিছুর মধ্যেই সমস্ত দিন চঞ্চল হয়ে রইল মনটা।

তারপর বেচারামের কথা মনে পড়ে গেল। রঘু যেদিন ভোরে খিদিরপুরে থেকে পালায় তার দুদিন আগে দুই বন্ধুতে পার্কে বসে পরামর্শ হয়—প্রসাদী যখন চায় রঘু ফিরে আসুক, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সমস্ত পণ ক'রে বাঁচাবে তাকে—তখন সে রঘুর মনিব খিদিরপুরের উকিলের পরামর্শ নিক, আসামী যে ধরা দিতে চায় তার প্রকৃত প্রমাণ দিয়ে। একটা চিঠিও এই মর্মে লেখে ওরা দুজনে মিলে, প্রসাদী বলবে জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠিক হয়, প্রথমে রঘুর কথা না বলে অন্য নাম দিয়ে চালাবে সলাপরামর্শ, পরে সুবিধা বুঝে খোলাখুলিভাবে সব পরিচয় দিয়ে রঘুকে নিয়ে আসবে সামনে। এখন সবটাই অন্ধকার, অনিশ্চিত। এখন তো থাকোমণি পাশেই—ঠিক সে-ধরনের ভয় আর নেই, তবু আইনের যদি 'থাকেই কোনও খোঁচ-খাঁচ তা হ'লে একজন ভালো উকিলের রায় নিয়ে এগুনোই ভাল। ওর রয়েছেও যখন সুবিধা।

পরদিনই বেরিয়ে সকালে হাওড়ায় পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ক'রে ওরা বেচারামের মনিবের বাড়ির কাছাকাছি একটা হোটেলে দুসেটের ঘর নিয়ে উঠল। খেয়ে দেয়ে দুপুরে খানিকটা আরাম ক'রে রঘু বিকালের দিকে কলেজের দোতলাতেই গিয়ে উপস্থিত হোল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই দেখল বেচারাম লম্বা, বিদ্যুৎবাতি-জ্বালা করিডোরের মাঝামাঝি প্রিন্সিপালের আফিসের সামনে উর্দি চাপরাস প'রে বেঞ্চটায় ব'সে আছে। সঙ্গে আরও দুজন, বোধহয় অন্য ঘরের চাপরাশি, বা, কেউ দেখা করতে এসেছে। কয়েক পা এগুতেই চিনল রঘুকে, ভ্রূ কুঁচকে চেয়েও রইল, তবে রঘুর যেমন কোন কথা কইল না, একটু সন্তর্পণেই গেল এগিয়ে, বেচারামও নির্বাক কৌতূহলের দৃষ্টিতেই চেয়ে রইল ওর দিকে। এইভাবে বোঝাপড়াটা হয়ে গেল ওদের মধ্যে। রঘু এগিয়ে গিয়ে বলল—'আমি বেচারাম শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমার নামই বেচারাম''—দাঁড়িয়ে উঠে বলল বেচারাম, ভেতরকার উদ্বেগে নিশ্বাসটা ঘন হয়ে উঠেছে।

রঘু ওর হোটেলটার নাম ক'রে বলল—'আপনার গাঁয়ের এক ভদ্দরলোক আমাদের হোটেলে উঠেছেন, একবার দেখা করতে বলেছেন আপনাকে। কি দরকারী কথা আছে।'

'করব দেখা'—বেচারাম বলল। এরপর সূক্ষ্ম চোখের ইসারায় ওদের দেখা করার সময় আর জায়গাও ঠিক হয়ে গেল। সেই আগের পার্ক, সন্ধ্যার পর, যখন বেচারামের ছুটি থাকে।

রঘুই আগে থাকতে গিয়ে বসেছিল, বেচারাম পৌঁছাতেই প্রথম প্রশ্ন—'একটু বেশি সাবধানই হলাম। তারপর—হুলিয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কলকাতায়?.'

বেচারাম বলল—'থাম, বলব,তার তো আর অন্য কাজ নেই! তবু ভালোই করেছিলি হঠাৎ দেখে তোর ছদ্মনামটা ভুলে ঐ নাম ধরেই কতকটা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। তারপর, ব্যাপার কি? উকিলের পরামর্শ নেওয়াতে হবে প্রসাদী পিসিকে দিয়ে। একবার দেখেশুনে নেব জায়গাটা—গিয়ে শুনি রাতারাতি চম্পট দিয়েছে সহদেব চাপরাশি। ভাগ্যিস বাইরে বাইরেই মালীর কাছে, খবরটা পেয়ে যাই, নৈলে থানা পুলিসের হাতেই গিয়ে পড়তে হোত।'

'উঠেছিল কোনও গোলমাল?'—প্রশ্ন

'তাই, দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব কবল রঘু।

নাকি?. তারপর হঠাৎ কোথা থেকে?'

'সে অনেক কথা, পরে হবে। তার চেয়ে ঢের দরকারী কথা আছে। তুই আগে একটা বিড়ি বের কর দিকিন তোর মার্কামারা। অনেক দিন খাইনি।.. উঃ, তোকে দেখে যে কী আনন্দ হচ্ছে রঘু!'

'বুঝলাম।'—পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির কৌটো আর দেশলাই বের ক'রে ওর হাতে দিতে দিতে বলল বেচারাম। প্রশ্ন করল—'কিন্তু এতদিন ডুব দিয়ে ছিলি কোথায়?'

রঘু টিপে টিপে একটা বিড়ি ধরিয়ে কৌটো দেশলাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল- 'বৌকে খুঁজতে।'

'খুন করে?'—একটু গম্ভীর হয়ে পড়েই মন্তব্য করল বেচারাম; বলল—'রাগ করিস তো কি করা যাবে? যে ভাবেই হোক, বৌটা গেল তো তোর জন্যেই।'

'গিয়েছিলই তো আবার এলো কি করে?'

'তার মানে!'—বিড়িটায় আগুন দিতে গিয়ে থেমে গেল বেচারাম, বলল—'ঠাট্টা রাখ রঘু, সব কথায় ঠাট্টা ভালো লাগে না—

যদি আবার বিয়ে করে থাকিস—তাও পারিস তুই .'

'আমার ঐটেই ছিল ঠাট্টা। একটা ভোজ-বাজি দেখালাম...।'

'তার মানে?'

দেশলাইয়ের আগুনটা আঙুল পর্যন্ত এগিয়ে আসতে কাঠিটা ফেলে দিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল বেচারাম। তাত লেগেছে, দুটো আগুলের ডগা আস্তে আস্তে ঘসতে লাগল।

রঘু বলল—'ঢাকার মধ্যে ছিলই যে লাস থাকোব—তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? আগাগোড়া ঢাকা—পেসাদী পিসির সে একটা কারচুপি নয়—আদপে কোন লাসই যে ছিল না ভেতরে—ও-যা মেয়েমানুষ—সবই তো পারে।...'

অনেক দিন পরে পুরনো বন্ধুকে পাওয়া—পেয়েছেও যখন বিপদ অনেকখানি কেটে গেছে—আগেকার মতো ঠাট্টা-মস্করায় মনটা হালকা করে নিচ্ছে রঘু। সেই প্রথম দিন উঠোনে দারোগার সওয়ালের জবাবে যা শুনেছিল গোয়ালঘরের ভেতর থেকে, তার ওপর কল্পনা ফলিয়ে বলতে বলতে ওকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে দেখে হেসে উঠে কাঁধে একটা চড় মারল, বলল—'মাথা গুলিয়ে গেছে ছোঁড়ার। তা, সত্যি দেখলে করবি তো বিশ্বাস? চঙ্গ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'বৌদিকে?...মানে, তোর বউ...মানে, সেই থাকোমণি?...কোথায় আছে?'

'হোটেলেই'—রঘু বলল।

'তা, চল যাই.....

উঠতেই যাচ্ছিল, রঘু কাঁধে চাপ দিয়ে বলল—'একটু ধৈর্য ধরতে হবে। প্রমাণ করতে হবে তো সেই থাকোমণিই...'

বেচারাম ঝেড়ে উঠে পড়ল। বেশ রেগেই বলল—'আমায় তাহলে ছেড়েই দে রঘু, হেঁয়ালি ভালো লাগে না। একটা দরকারি কাজের মধ্যে থেকেই মনিবের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। ...হয় তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, না হয়..।'

রঘু বসে বসেই ওর হাতে টান দিয়েই আবার বসিয়ে দিল, এবার গম্ভীর হয়েই বলল—'বোস, বোস, শোন সব কথা। শুনেই মাথা খারাপ হয় কিনা দ্যাখ, আমি তো ভুগেও আছি সমলে এখনও।'

অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হোল ওদের। ওরই একটানা বলে যাওয়া, বেচারাম রুদ্ধ-শ্বাসে শুনে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন।

কালীঘাটে নর্তবিহারীকে একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি পিঠের কাছে দেখা থেকে, বৈষ্ণবীদের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে দোবা—যাদব দাসের কথায় আতঙ্কে আবার পালানো—ধর্মশালায় হঠাৎ থাকোমণির সঙ্গে দেখা। তারও কথা কিছু কিছু—প্রসাদীর অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালানো; রঘুর কাছে যাচ্ছে এই বিশ্বাসে—দেশে যাওয়ার তোড়জোড়—তারপর নিতান্ত আকস্মিকভাবে আইনের পরিপন্থী কথাটা কানে যেতে বেচারামের কাছে চলে আসা। সব বলে গিয়ে প্রশ্ন করল—'তারপর?—তুই গিয়েছিলি প্রসাদী-পিসির কাছে? কি বলে?'

'যাই নি? বললাম না?—ফিরে এসে দেখি...'

—গভীর আগ্রহের সঙ্গে একরকম রুদ্ধশ্বাসেই শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রশ্নে অন্যমনস্ক হয়ে একটু রাগের সঙ্গেই বলে উঠেছে বেচারাম, রঘু বলল—'শুনলে সব, তবু সেই কথা ধরে থাকবে। পালিয়েছিলাম বলেই তো পেলাম থাকোকে, সে কথাটা ধরবে না!'

বেচারাম অপ্রতিভ হয়ে পড়ে একটু হেসে বলল—'সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক। .. সে দিন নাকি রাগটা বড় বেশি হয়ে করছিল। প্রসাদীপিসির কথা জিজ্ঞেস করছিল? সে তো শুনেই লাফিয়ে উঠল। চিঠি পেয়ে আরও খুশী, তবে ওর মতে খিদিরপুরে এসে সলাপরামর্শর দরকার কি? পালিয়েছে, আগে তো সেই ধরনের লোক বলেই ধরে নেবে, শেষ পর্যন্ত যখন তোকে এনে ফেলতেই হবে। এর ওপর, যদি ঐ সময় বরাবর কিছু জিনিস খোওয়া গিয়ে থাকে বাড়ি থেকে তো তোকেই টানবে আগে। বড়-লোকের বাড়ি, মনিবের খয়ের-খাঁ ছিলি, শত্রু থাকাও আশ্চর্য নয়; অপবাদ দিয়ে দিতে কতক্ষণ? ..'

'মাগির মাথা আছে, দেখছিস!'—শুনতে শুনতে প্রশংসায় চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে রঘুর, বলল—'আমাদের ওদিকে খেলাই যায় নি। সত্যিই তো...'

'আর একটা জিনিস যা এই থেকে বেরিয়ে আসছে'—বাধা দিয়ে বলল, বেচারাম—'তা এই যে, ও সত্যিই চায় তুই ভালোয় ভালোয় ফিরে আসিস বাড়ি, কোনও অনিষ্ট না হয় তোর। নয় কি?'

'মানতে হয় বৈকি। আরও একটা কথা ভেবে দেখ রঘু...'

বেচারাম হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল—'পরে হবে। তারপর শোন। আরও একটা দরের কথা প্রসাদীপিসি যা বলছে—একে-বারে অত বড় কৌসিলের কাছে না গিয়ে তোদের যে জানাশোনা মোক্তার আছে—এক-রকম বাড়ির মোক্তারই। কৃপাসিন্ধু মল্লিক—ভালো মন্দ কত ফৌজদারি কেস করেছে তোদের জমিদারি নিয়ে—আগে তার সঙ্গে পরামর্শ করবে—বেশ মন খোলসা করে সব কথা বলা যাবে তাকে—গোড়া থেকে তোকেই এনে ফেলে। কাজ কি অত লুকোচুরির? এরপর তিনি যদি দরকার বোঝেন, তিনিই ঠিক করে দেবেন কোনও নামকরা কৌসিল।

থেমে গিয়ে প্রশ্ন করল—'কেমন বুঝছিস?'

'ভালোই, খুবই ভালো। আমার কি মনে হচ্ছে জানিস বেচু?—ভাগ্যিস আগ্রা স্টেশনে কথাগুলো কানে এসে লাগে, একরকম কাগের মুখে, বকের মুখেই তো—নইলে সোজা তো বাড়িই চলে যাচ্ছিলাম! অবস্থাটা কি দাঁড়াতো? ...যাক সে কথা। তাহলে তুই করে যাচ্ছিস? এখন তো আরও ভালো হয়ে গেল। তখন ছিল খুনী আসামী, ফিরে এসে বলছে সে করেনি খুন। প্রমাণ দেওয়া। এখন তো যে খুন হয়েছে বলে গুজব সে সশরীরে হাজির, অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা যাচ্ছে বইকি, তবে...'

'বুঝেছি—তবে খুন হোলটা কে? তা যদি বলিস তো—আমি তখন ঠাট্টা করে বললাম বটে, কিন্তু সত্যিই কি এমন হতে পারে না যে ঢাকার নীচে লাসটাস কিছুই ছিল না? সব প্রসাদীপিসির কারচুপি। সেদিন গোয়ালঘর থেকে উঠোনে দারোগার জেরায় শুনলাম কিনা—পুরু কাঁথার ওপর সুজনি দিয়ে আগাগোড়া ঢাকা—কাউকে মুখ খুলতে দেয়নি প্রসাদীপিসি। আগে অতটা ভাবিনি, এখন সব মিলিয়ে দেখে...'

'একেবারে এতটা!—অবিশ্বাসের হাসি হাসল বেচারাম। বলল—'তাছাড়া থানা আছে, ময়না তদন্ত আছে, দাহ আছে...'

'যে টাকায় জোরে সব ঢাকা পড়ে যায়। আর প্রসাদীপিসি যা ঘোড়েল মেয়ে!...'

প্রশংসার ঝোঁকে অবিশ্বাসের কোটায় উঠে গেছে রঘু। একটু অপ্রতিভের জিদ ধরেই কথাটা বলে চলল—'থাক, সেসব প্রসাদী আর কৃপাসিন্ধু মল্লিক বুঝবে। আমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? চল রাত হয়ে গেছে। থাকো একলা বসে আছে।'

উঠবে, বেচারাম বসে থেকেই বলল—'তুই যানা, আমায় আবার কেন?' অল্প হাসির সঙ্গে একটু কুণ্ঠা ফুটে মুখটা রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। রঘু থমকে পড়ে প্রশ্ন করল—'আর তুই?'

'হবেই তো দেখা এরপর কোন সময়।'—সেইরকম একটু অপ্রতিভ হাসি নিয়েই বলল বেচারাম।

রঘু একটু চোখ তুলে ভেবে নিয়ে বলল—'ও! বুঝেছি। তা তোকে এত আকাশে তুলে দিয়েছি থাকোর কাছে যে... নে, ওঠ, আর ন্যাকামি করতে হবে না।'

উঠে পড়ে ওরও হাত ধরে টেনে তুলল। বেচারাম হাসতে হাসতে বলল—'উস্। কী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রে! কাণ্ডেনি করে গেছিস, আমি না হয়—কি যে বলে...'

'সেই কথাই বলিস বৌকে, মুখে সর-বতের গেলাস ধরবে।'

লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল দুজনে।

(ত্রিংশ)

হোটেলে সাক্ষাৎকারটা একটু অস্বস্তি-করই হোল।

পাড়াগাঁয়ের পুরাতনপন্থী সমাজ, তাতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটা আভিজাত্যও রয়েছে, বন্ধুপত্নী হলেও এবং রঘুর চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট বলে প্রতিবেশী সম্পর্কে দেবর হলেও, থাকোমণির সঙ্গে অবাধ মেলামেশা কখনও ছিল না বেচারামের। নূতন বিবাহের পর যে ক'টা বৎসর ভালো-ভাবে কেটেছে, ভরা সংসার, তখনও নয়; তারপর যখন রঘুর কাণ্ডেনির প্রধান চেলা হিসাবে বদনাম উঠে গেছে বেচারামের তখন তো আরও নয়, যাওয়া-আসাই বন্ধ হয়ে গেছে ওদের বাড়িতে।

আজ অবশ্য প্রস্তুত ছিল থাকোমণি। রঘুর কাছে ওর নূতন পরিচয় পাওয়ার পর স্নেহ বা প্রীতিমিশ্রিত একটা আগ্রহও লেগেছিল, তবে কোনরকম এতটুকুও উদ্বেগে

সেটা প্রকাশ পেল না বা পাবলই না প্রকাশ করতে। পর্দার পেছনে ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল, একটা সহজ দেবর-ভাজের ভাবটা বজায় রাখবার জন্যে দুই বন্ধুর ম্যানমতো, 'বৌদি আসব?' বলে দরজায় টোকা দিতে এগিয়ে এসে 'এসো ভাই' বলে অভ্যর্থনা করল। তবে আধঘোমটা টানা, একবার চোখ তুলে দেখবার পরই দৃষ্টি সংযত, মুখটাও আরক্তিম হয়ে উঠেছে। একটা টেবিল দুটো চেয়ার ঘরে। ওরা দুজনে গিয়ে বসল। রঘু ঘরে একটা স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া এনে ফেলবার জন্য ভরা আওয়াজে একটু ব্যঙ্গের টেনেই বেচারামকে টেনে থাকোমণিকে উদ্দেশ করে বলল—'আসতেই চায় না তো! প্রায় টেনেই নিয়ে আসতে হোল, বললাম...'

'ভুলে গেছেন আমাদের বোধহয়!'—থাকোমণিরও বোধহয় সহজভাব ফোটাবার চেষ্টা একটা। তবে ঐ পর্যন্ত। খাবার আনিয়ে রেখেছে, কথাটা বলার সঙ্গে একবার বেচারামের দিকে একটু হাসির সঙ্গে ফিরে তাকাবার চেষ্টা করে হেঁটমুখে সেগুলো প্লেটে সাজিয়ে দিতে লাগল। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুদৃশ্য করে গোছাতে গোছাতে। শেষ হলে রঘুকেই প্রশ্ন করল—'চায়ের কথা বলে দেবে, না আরেকোয়াশ ঠিক করে দোব? আনিয়ে রেখেছি?'

'ঐ মিলিয়ে নে বেচু, তোকে বললাম না তখন?' স্বচ্ছন্দভাব এনে ফেলবার আর একটা সুযোগ পেয়ে বেচারামের দিকে চেয়ে বলে উঠল রঘু। থাকোমণিকে বলল—'না, সরবতই করে দাও ভালো করে। বেচু বলছিল, কবে তোমার হাতের সরবৎ খেয়েছিল, এখনও জিভে লেগে আছে ওর।'

বেচারামের বিস্মিত চোখের ওপর দৃষ্টি তুলেই কথাটা বলে মন্তব্য করল—'আর চা সে তো বেচারাম নিয়ে যাবে। না রে?'

"গবনও তো যাচ্ছে?"—বেচারাম টিকা করল। একটু মড়লে শাসানিও হানল।

থাকোমণি হেঁটমুখে সরবৎ প্রস্তুতিতেই নিযুক্ত রেখেছে নিজেকে এদের দিক থেকে, খানিকটা পেছন ফিরে; তোয়ের করে 'নিন' বলে গেলাসটা টেবিলে বেচারামের দিকে আস্তে সরিয়ে দিয়ে, রঘুকে প্রশ্ন করল—'তোমাকেও দেব করে?'

'কর, ভালো"—বলে রঘু একটা ছোট্ট কামড় দিয়ে। একটু অনুযোগের স্বরেই বলল—'দাওই না হয়, বেচুর এত প্রশংসাটা বসের দেখতাম।'

একটু যেন দিল এতক্ষণে থাকোমণি, ঘাড়টা ঘুরিয়ে বেচারামের দিকেই একটু চেয়ে নিয়ে বলল—'শুনলেন তো?'

বেচারাম বলল—'ওর কথায় কান দেবেন না, ঘরে ঢুকেছে পর্যন্ত নাগাড়ে আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে। ..দেখুন না, চমৎকার হয়েছে, একটু চাইতাম, তার পথ বন্ধ করে দিলে।'

একটু হাসি ফুটে থাকবে থাকোমণির ঠোঁটে, তবে এবার সেটা আর দেখা গেল না। ঘুরে গেলাস থেকে ওর গেলাসটা ভরে দিয়ে আবার তোয়ের করতে লাগল।

এবার যেন একটু বিলম্বিত লয়ে। হাতটা বার দুই যেন একটু কেঁপে গেল। একবার আঁচল তুলে কপালের ঘাম মুছে চোখের ওপর দিয়েও আঁচলটা টেনে দিল।

দুই বন্ধুতে পরস্পরের মুখের দিকে চাইল।

সরবৎ শেষ হলে খাবারের প্লেটটা বেচারামের দিক এগিয়ে দিতে রঘু বলে উঠল—'আর আমাব? বাঃ!'

'এখুনি খেতে দেবে...ভাই।'—বলে থাকোমণি একটু চোখ বড় করে বেচারামকে সাক্ষী মানছে, রঘু বড় বাজভোগটা তুলে নিয়ে একটা কামড় দিয়ে বলল—'অত ভাজের আদর খায় না।'

'দ্যাখো! অবাক কাণ্ড!'—বলে একটু হঠাৎই ওদের দিকে পেছন করে অরেঞ্জ-স্কোয়াশের বোতল, প্লেট, গেলাস নিয়ে অযথাই নাড়াচাড়া করল থাকোমণি। কোনও রকমে ওদের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত নিজেকে সামলে রাখবার চেষ্টা করছে। তবে শেষ পর্যন্ত আর পারল না; তড়িৎগতিতে কোনরকমে বিছানা পর্যন্ত গিয়ে যেন মুষড়ে পড়ল বালিসে মুখ গুঁজে। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না—কী হবে? এত সুখ যে আমার সয় না—কখনও যে সইল না—ভয় করে আবার কি অমঙ্গল আসছে—কি করি আমি?—বলুন আমায় কি করি?—যখনই একটু সুখের মুখ দেখেছি—কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়!—মা গেলেন—বাবা গেলেন—উঃ!—কি করি আমি?—কী হবে?...'

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষে শুধুই কান্নার একটানা সুর—কোপানিতে ভেঙে ভেঙে যাওয়া—মাঝে মাঝে—'উঃ! বাবাগো!—কোথায় যাই?'

দুজনে হতভম্ব হয়ে বসে আছে, প্লেটটা টেবিলে রাখা। এমন আনন্দের মুখে হঠাৎ এসে-পড়া ব্যাপারটা, কোনও কথা যোগাচ্ছে না। এক সময় বেচারাম বলল—'বলু না রঘু, আর তো ভয়ের কিছু রইল না—এখন উনি না বুক বাঁধলে আমরা কোথায় বল পাব? যেটুকু আছে বাকি বাড়ি ফিরে যেতে, কি করে সেটুকু সামলে নোব?'

নিজেই চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে গেল পাশে। মাথাটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল—'শুনছেন, বৌদি? আপনি এমনভাবে ভেঙে পড়লে রঘু যে দিশেহারাই হয়ে পড়বে আরও। চুপ করুন। আমি বলে যেমে যাচ্ছি। এখন শুধু বাকি রইল—কিভাবে গিয়ে উঠতে হবে বাড়িতে। অনেকগুলো ব্যাপার হয়ে গেল সেখানে এই বছর খানেকের মধ্যে তো। তবে ভরসা—কোনটারই হাত নেই। আর মাত্র কটা দিন একটু ঠিকঠাক হয়ে নিতে, তারপরেই না কাঁদবেন না আপনি আর। চুপ করুন—কথা রাখুন, নৈলে আমিও ভাবব—ক্ষমা করতে পারেননি ছোটভাইকে।

বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের **বিশেষ কমিশন দেওয়া হবে।** আগামী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১। **বিচিত্রা** ॥ ২৩টি বিভাগে রবীন্দ্রনাথের সর্ববিধ রচনার বিচিত্র সংকলন। মূল্য ১৮·০০, ২০·০০ টাকা

২। **ভারতপথিক রামমোহন রায়** ॥ নবযুগের পথিকৃৎ মহাত্মা রামমোহনের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি। মূল্য ৪·৫০ টাকা

৩। **রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা** ॥ রবীন্দ্র-চর্চামূলক পত্রিকা। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসু গবেষক, শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।
প্রথম খণ্ড ১৫·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০·০০

৪। **জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ** ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত মৌলিক নাটকের সংকলন। মূল্য ১৪·০০, ১৬·০০

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০ টাকা
পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০·০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট । কলিকাতা ১৬

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

উঠল, লক্ষ্মীটি।—ওরও কণ্ঠস্বর ভেঙে আসছে।

কান্না থেমেই গিয়েছিল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো দিকে মুখ করে আধবসা হয়ে উঠে বসল থাকোমণি।

বেচারাম যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছ থেকে আবার ঘুরে এসে দরজায় মুখ গলিয়ে বলল—'রঘু একবার আসবি, কথা আছে একটা।'

নীচেই চলে গেল দুজনে, ফুটপাথে। একটু নিরিবিলি জায়গায় দাঁড়িয়ে বেচারাম বলল—'কাল যাচ্ছি না আমি: কথা হচ্ছে, যেমন দেখা যাচ্ছে, তোদের তো এখন বেশ দিনকতক বাইরেই থাকতে হবে নয় কি?'

'তা হবে বইকি।'—রঘু উত্তর করল, প্রশ্ন করল—'কতদিন আন্দাজ করিস? কি রকম চঞ্চল হয়ে পড়েছে দেখছিস তো?'

'তা বেশ কিছু দিন মনে হয়। যে ক'দিনই হোক, এখানে তো থাকা চলবে না।"

'আমিও তোকে বলব মনে করছিলাম। যদি এ রকম কান্নাকাটি করে...' একটু কিন্তু ভাবেই চেয়ে বলল রঘু।

বেচারাম বলল—'সে তো আছেই। দুজন বেটা-ছেলে, একজন মেয়ে-ছেলে—কান্নাকাটি করছে—হোটেলের ব্যাপার—আমি ঐ জন্যেই একবার বাইরে বেরিয়ে গেলাম—পাশের দুটো দোরেই তালা ঝোলানো, তবে খোলা থাকতেই বা বাধা কি? সন্দেহ হলেই হাঙ্গাম তো কলকাতা জায়গা।'

কিন্তু ভাবেই চেয়ে রইল রঘু, যেন এতটা তলিয়ে ভাবেনি। বেচারাম বলল চলল—'আর একটা কথা বোধহয় ভুলে যাচ্ছিস থাকোকে পেয়ে।'

'কি?'

'তোর মাথার ওপর পাঁচ হাজার টাকার হুলিয়াটা এখনও রয়েছে। নিজে হাতে আত্মসমর্পণ করা পুলিসের হাতে, আর ফেরারী বলে কারুর ধরিয়ে দেওয়া, দুটোর মধ্যে ঢের তফাৎ। সব প্ল্যান উলটে যাবে আমাদের।'

'তাহলে?...সত্যিই থাকো আর তোকে পেয়ে খানিকটা নিশ্চিন্দি আছি, অস্বীকার করতে পারি না একথা। বিশেষ করে তোকে পেয়ে,—একজন নিজের মতন করে ভাববার লোক।'

—চিন্তিত ভাবেই চেয়ে থেকে বলল রঘু।

'অবিশ্যি চিন্তার অনেক কিছুই কমেছে একথাও ঠিক, তবে সাবধানে থাকতে হবে বৈকি। হোটেল ছেড়ে দিতে হবে আর একটা কারণে। সেইটেই সব চেয়ে বড় কথাও। কৃপাসিন্ধু মোক্তার যে মকদ্দমার মহলা দেবে সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে সে তো এখনে একেবারেই হতে পারেনা। কাকে কিভাবে তালিম দিতে হবে, তোরা ছাড়া আরও কাদের দাঁড় করাতে হবে—তার মধ্যে প্রসাদী পিসি আর ভৈরব তো আছেই। কৃপা মোক্তার টাকা খাইয়ে সরকারী পক্ষের অনেককেও টেনে নিতে পারে কিছু কিছু করে—যেমন ধরো রহমৎ শেখ চৌকিদার। আরও যদি কিছু সাক্ষী দাঁড় করাতে হয় কৃপা মোক্তার বুঝবে তা। এখন তোদের বাড়ীতে বা মোক্তারের নিজের বাড়ীতে এসব তো হবে না...'

'কি করে হবে?'—সায় দিল রঘু, অবোধের মতোই চেয়ে থেকে।

'তাই বলছিলাম, একটা বাসা ঠিক করতে হবে মাস খানেকের ভাড়া দিয়ে। কাল আর গ্রামে গেলাম না আমি। একটা নিরিবিলি দেখে বাড়ি খুঁজে বের করি। একদিনে না হয় ছুটি নিয়ে আরও দু এক দিন যা লাগে। ঠিক করে তারপর গ্রামে যাওয়া, প্রসাদী পিসি আর কৃপাসিন্ধুর সঙ্গে দেখা করা।'

'তাই কর তবে। হাঁ, সেই। ঠিক হবে।...কিছু তোর হাতে দিয়ে রাখছি। আগাম চাইবে তো বাড়িওলা।'

'হাঁ, সে কথাও তো তোকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আছে কত তোর কাছে আর?'

একটু গম্ভীর হয়েই বলল—'থাকো অরেঞ্জকোয়াস আর মিষ্টিতে অন্তত দশটা টাকা খরচ করেছে। তাকে অবিশ্যি বলবি নি, তবে আমার খুব ভালো লাগেনি রঘু।'

রঘু বলল—'আছে হাতে কিছু। এ ক' মাসে তো এক রকম কিছুই খরচ হয়নি আমার, শুধু থাকোর আসার পর যা একটু..'

অপ্রতিভ ভাবে চাইল।

'তবু?...ওদিকে ক' মাসের মাইনেই তো?'

'তাই। শুধু দুটো গয়না—আমার কাছে যা ছিল—ক্ষীরোদা দেয়..'

'ঐ পর্যন্তই থাক।'—একটু হুকুমের টোনেই বলল বেচারাম। হাতটা বাড়িয়ে বলল—'আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর রঘু, থাকোর গয়নায় আর হাত দিবিনি।'

দি নি বেচ। আর দোবও না। এই শপথ করছি। কিন্তু..'

চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

বেচারাম বেপরোয়া ভাবেই বলল—'আর কিন্তু কি? এবার থেকে তো প্রসাদী পিসি। সে সরকারী লোক ওর মুঠোর মধ্যে। অনেক গুছিয়েও নিয়েছে পিসি তাছাড়া, আমিও তো সামলে নিয়েছি।'

ওর পিঠে দুটো লঘু আঘাত দিয়ে, একটু রসিকতা করে হেসে বলল—'গোড়ায় কিছু দিন অবিশ্যি কাশেন হাবা হয়ে দিশেহাবা হয়ে পড়ি।.. যা, থাকো আবার কি ভাবছে। একটা কিছু বানিয়ে বলবি তাকে। আর একটা কথা রঘু, ওকে একা ফেলে বাইরে যাবিনি কখনও।'

আর একটু রসিকতা করে বলল—'বরং যদি সেজে-গুজে দুজনে একটু-আধটু হাওয়া খেতে বেরুস ট্যাক্সিতে, রিক্সায়, রাজি আছি। যা।'

দু পা এগিয়েই আবার ঘুরে এবার গম্ভীর ভাবেই বলল—'নারে, ইয়ার্কি নয়, সত্যিই তাই করবি। তাতে, পাঁচটা জিনিস দেখে শুনে ওর মনটাও এদিক থেকে ঘুরে যাবে। যা, চললাম আমি।'

প্রায় সপ্তাহখানেক লেগে গেল পছন্দমতো বাসা পেতে, তবে শেষ পর্যন্ত পেল। আমহার্স্ট স্ট্রীটের শেষে সার্কুলার রোডের কাছাকাছি একটা গলিতে একটা তেতলা ফ্ল্যাট বাড়ি, তার একেবারে তেতলায় দুখানা ঘর। রান্নাঘর বাথরুম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সবই আছে। একটা বিশেষ সুবিধা, ফ্ল্যাটের বাড়ি যেমন পাশাপাশি দুটো করে থাকে, এ সেরকম নয়। তেতলায় ঐ একটি ফ্ল্যাট সামনে খোলা ছাত খানিকটা। ফ্ল্যাটই তোয়ের করতে গিয়ে কোন কারণে ছেড়ে দেওয়া, বা স্থগিত রাখা। আদলটা রয়েছে।

ঠিক যেমনটি দরকার ওদের। বাড়ির অন্য অংশের সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই। শুক্রবার দিন হোটেল ছেড়ে উঠে এল ওরা। দুটো দিন গোছগাছ করে নিতে লাগল। ছোটখাট সংসারই একটা। ছুটি এদিকে আর নেয়নি বেচারাম, অবসর সময়েই ঘুরে ঘুরে ঠিক করেছে বাসাটা, কয়েকজনকে বলেও রেখেছিল। রবিবারের সঙ্গে আরও দুটো দিন ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেল।

ছুটি কাটিয়ে যখন ফিরল, মঙ্গলবার বিকালে, ওর সঙ্গে প্রসাদী। বুকে এক-রকম ঝাঁপিয়ে পড়েই খুব একচোট কাঁদল থাকোমণি, নীরবে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, 'চুপ কর, চুপ কর'—বলে প্রসাদী পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে আঁচল তুলে নিজের চোখ মুছছে।

অনেকক্ষণ গেল। উচ্ছ্বাসটা কমে এলে বলল—'চুপ কর।..চল কি রকম কি ব্যবস্থা করলি দেখি, বাড়িটা তো বেশ পেয়েছিস।' চারজনে 'মলে ঘুরে ঘুরে দেখল, ভেতর-বার। অনেকটা যেন থাকোর মনটা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যেও। গোছানো বিশেষ করে হেঁসেল, ভাঁড়ারের ব্যবস্থা নিয়ে একটু-আধটু শুধরেও দিল, বলল—'এটা এইরকম হবে।.. কখনও তো করতে হোল না নিজের হাতে। এবার কিন্তু সেখানে আমার ছুটি থাকো, এখন থেকেই বলে রাখছি।'

ওদের দুজনকেও টেনে, ওদের মুখের দিকে চেয়ে—'আর কেন বলো? নিজের সংসার নেবে না বুঝে?'

বেচারাম বলল—'বুঝে নেওয়ার মতন বুদ্ধি তো ঐ দেখছেন, দুটো ঘরেই এত খুঁৎ।'

একটু হাসি উঠল।

(ক্রমশঃ)

কথায় কথায়

একই জাতের সব মাছি একরকম দেখতে বটে, আসলে সব এক রকম নয়। একটা মাছির সঙ্গে আরেকটা মাছির মিল যতটা তার চেয়ে প্রভেদ অনেক বেশি।

চার্লি চ্যাপলিনের একটা সিনেমায় ছিলো, একটা মাছি ঘুরে ঘুরে বারবার তাঁকে বিরক্ত করছিলো; কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরে খানিক বাদে তিনি মাছিটাকে ধরেও ফেললেন, তারপর মারতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে না এটা সে মাছি নয় যেটা এতক্ষণ ধরে তাঁকে বিরক্ত করছিলো, এটা একটা অন্য, আলাদা মাছি। তখন চ্যাপলিন সেটাকে ছেড়ে দিলেন।

চার্লি চ্যাপলিনের এই সিনেমাটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তাঁর প্রতিভাও আমার নেই। একটা মাছি থেকে আরেকটা মাছিকে আলাদা করে চেনার জন্যে যে অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি দরকার তার আমার একান্ত অভাব।

কিন্তু অন্য এক অসাধারণ ব্যক্তির একটি অসামান্য পাণ্ডুলিপি পাঠ করে আমি জেনে গেছি, সব মাছি একরকম নয়। রোগা মাছি যেমন আছে তেমনি আছে মোটা মাছি, যদিও সাদা চোখে সেটা কখনোই বোঝা যায় না। এই দিক দিয়ে একরকম দেখতে দুটো মাছির একজনে দেড়গুণ-দুগুণ তারতম্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এবং শুধু শারীরিক দিক দিয়েই নয় চরিত্রের দিক দিয়েও একেকটা মাছি একেক স্বভাবের। কিছু মাছি আছে অত্যন্ত অলস স্বভাবের, দেয়ালে চুপচাপ বসে থাকে, খুব খিদে না পেলে কিছুতেই নড়তে চড়তে চায় না। আবার কিছু মাছি আছে অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির, সারাদিন কেবলই ভন্‌ভন্‌ করে বেড়ায়। কোনো কোনো মাছি অত্যন্ত রাগী, ও হিংসুক প্রকৃতির; এদের নাকি যত্ন করে লক্ষ্য করলেই এদের স্বভাব বেশ বোঝা যায়—একদিকে কাৎ হয়ে বসে রাগের চোটে চোখের মণি ঘোরাচ্ছে। আবার নরম স্বভাবের মাছিও আছে, তাদের নীল চোখ দেখলে মায়া না করে পারা যায় না।

সেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটির 'মাছি তত্ত্ব' পরিচ্ছেদে আমি এই তথ্যগুলি পেয়েছি। এ ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি পরিচ্ছেদ এই বইটিতে আছে, বইটির নাম 'ভেবে দ্যাখো'। লেখকের নাম যে পাতায় লেখা ছিলো সেই প্রথম পৃষ্ঠাটি পাণ্ডুলিপি থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু একটু পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায় এক অক্লান্ত, অনলস গবেষণাকারীর আজীবন পরিশ্রমের ফল এই গ্রন্থটি।

প্রতিটি পরিচ্ছেদই জ্ঞানগর্ভ এবং বিষয়-বস্তুর আপাত সামান্যতা সত্ত্বেও প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণীয়। আমাদের সামান্য পরিসরে 'ভেবে দ্যাখো' গ্রন্থের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়। আমরা মাত্র দু-একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

যেমন 'দেশলাই কাঠি' অধ্যায়টির কথা ধরা যাক। দেশলাই কখনো জ্বালায়নি এমন লোক দেশে-বিদেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটা দেশলাই কাঠি কতক্ষণ জ্বলে? একটা ইলেকট্রিক বালব্‌ কতক্ষণ জ্বলে আমাদের মোটামুটি ধারণা আছে, একজোড়া টর্চের ব্যাটারি কিংবা একটা সাধারণ মোম-

বাতির আয়ুষ্কাল সম্পর্কেও আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান নেই তা নয়। কিন্তু একটা দেশলাই যা আমরা প্রতিনিয়ত জ্বালাই তার একটা পুরোপুরি জ্বালালে কতক্ষণ জ্বলবে; 'ভেবে দ্যাখো' বইয়ের একশো সতেরো পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে যে তালিকা দেয়া আছে তাতে দেখা যায় আড়াই সেকেন্ড থেকে সোয়া পাঁচ সেকেন্ড। উত্তরটি আমি যত সহজে এখানে উপস্থাপন করলাম, বিষয়টি অত সহজ মোটেই নয়। যে কাঠি দিয়ে দেশলাই কাঠি প্রস্তুত হয় শ্রেণী ও গুণগত বিচারে তাকে যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একইভাবে দেশ-লাইয়ের বারুদকেও পরিমাণ ও গুণগত বিশ্লেষণ করে ক থেকে ঝ পর্যন্ত এই নয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন যদি ক শ্রেণীর কাঠিতে ক শ্রেণীর বারুদ লাগানো থাকে, সেই হলো সর্বোত্তম। সেই কাঠি বন্ধঘরে হাওয়ার আধিক্য বা অভাব না থাকলে সোয়া পাঁচ সেকেন্ড ধরে জ্বলবে। অনুরূপভাবে একই পরিবেশে ঝ শ্রেণীর বারুদযুক্ত ঙ শ্রেণীর কাঠি মাত্র আড়াই সেকেন্ড জ্বলবে।

এই বিষয়টি 'ভেবে দ্যাখো'র গ্রন্থকার যত সহজ করে বুঝিয়েছেন আমার ক্ষমতায় সেটা সম্ভব হলো না, বড় জটিল করে ফেললাম। বরং একটা সহজ বিষয়ে আসি, 'লেজের আকার ও প্রকার।'

প্রথমেই মাছের লেজ। বানরের বা কুকুরের লেজ নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা নেই, এমন কি পাখির কিংবা টিকটিকির লেজ নিয়েও নয়। এদের শরীরের কোন্‌ অংশটুকু লেজ সেটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মাছের লেজ মাছের শরীরের কোন্‌ স্থান থেকে সুরু। গ্রন্থের লেখক এ বিষয়ে বিভিন্ন মৎস্যবিজ্ঞানী, জেলে, মাঝি, নিকারি এবং মাছওয়ালার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেসব মাছের (ইলিশ, রুই ইত্যাদি) পেটি হয় তার পেটির পর থেকে লেজ আর সিঙি, মাগুর ইত্যাদি পেটি-হীন মাছের শরীরের পিছন দিকের এক-পঞ্চমাংশ লেজ।

কিন্তু সাপের লেজ? সাপের তো পেটি গাদা কিছুই নেই, তার লেজের দৈর্ঘ্য কি-ভাবে মাপা যাবে। লেখক আসামের ও নাগা-ভূমির গহন জঙ্গলে গিয়ে জীবন সংশয় করে সর্পভুক জাতির লোকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা তার বক্তব্য কিছুই বুঝতে পারেনি, উল্টে তাকে খুন করতে চেষ্টা করেছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি আগামী যুগের গবেষণা-কারীদের কাঁধে এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে গেছেন, সাপের শরীরের কোন্‌ অংশটুকু লেজ তাদের অবশ্যই বের করতে হবে।

আশা করি আর বিস্তৃত বর্ণনার প্রয়ো-জন নেই। একজন প্রকাশক পেলেই 'ভেবে দ্যাখো' বইটি বার করা যায়, তখন সকলে আরো অনেক তথ্য জানতে পারবেন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতেই হবে।

তারাপদ রায়

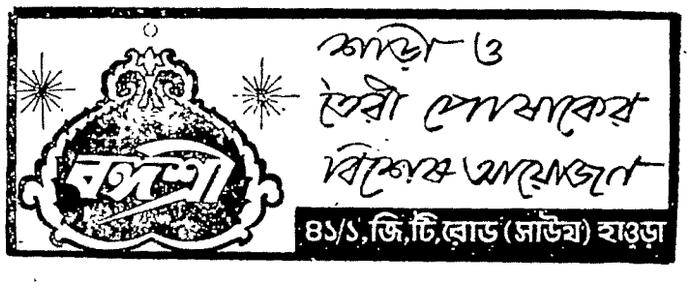

এই আমাদের দেশ

হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে হাওড়া প্রায় সব ব্যাপারেই 'সিলভার মেডালিস্ট'। এই রাজ্যের বৃহত্তম নগরী কলকাতার পরেই স্থান হাওড়া শহরের। শিল্প-সমৃদ্ধিতে চব্বিশ পরগণা প্রথম, তারপরেই স্থান হাওড়ার। এ ক্ষেত্রে কলকাতাকে তৃতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শিক্ষিতের শতকরা হিসাবেও হাওড়া দ্বিতীয়, কলকাতা প্রথম।

নগরে জনঘনত্বেও হাওড়া দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, আর কলকাতা রয়েছে তার ওপরে। কলকাতায় প্রতি বর্গমাইলে ৭৩,৬৪২ জনের বাস, আর হাওড়া জেলার শহরগুলিতে প্রতি বর্গমাইলে বাস ১৮,৫৫৪ জনের। তৃতীয় স্থানাধিকারী মালদহ জেলার শহরে প্রতি বর্গমাইলে ১৬,৭০৬ জন বাস করে। সর্বাধিক গ্রামময় জেলা মালদহের শহরে জনঘনত্ব অত্যধিক হওয়ার কারণ সেখানে শহর মাত্র একটিই আছে। হাওড়া জেলায় শহর আছে চারটি।

একমাত্র গ্রামের জনঘনত্বে হাওড়া প্রথম স্থানাধিকারী। হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চল অত্যধিক ঘনবসতিপূর্ণ, সেখানে প্রতি বর্গমাইলে ২,৩৫৩ জনের বাস। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হুগলী জেলার গ্রামাঞ্চলে জনঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ১,৪১৪। হাওড়ার প্রতি গ্রামের গড় লোকসংখ্যা ১৫৪২, আর দ্বিতীয় স্থানাধিকারী নদীয়া জেলার প্রতি গ্রামে গড় লোকসংখ্যা ১০৮৯।

হাওড়া পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির সবার নীচে শুধু আয়তনে। রাজ্যের এটি ক্ষুদ্রতম জেলা, অবশ্য কলকাতাকে বাদ দিয়ে। কিন্তু আয়তনে ক্ষুদ্রতম হলেও জনসংখ্যার তালিকায়, কলকাতা নিয়ে ষোলটি জেলার মধ্যে হাওড়া ষষ্ঠ স্থানাধিকারী।

জেলার নাম হাওড়া কেন হল বলা কঠিন। শব্দটি সম্ভবত হাওর থেকে উদ্ভূত, যার মানে হল জলাভূমি। নদীনালা আর পুকুর ডোবায় ভরা সারা হাওড়া জেলা।

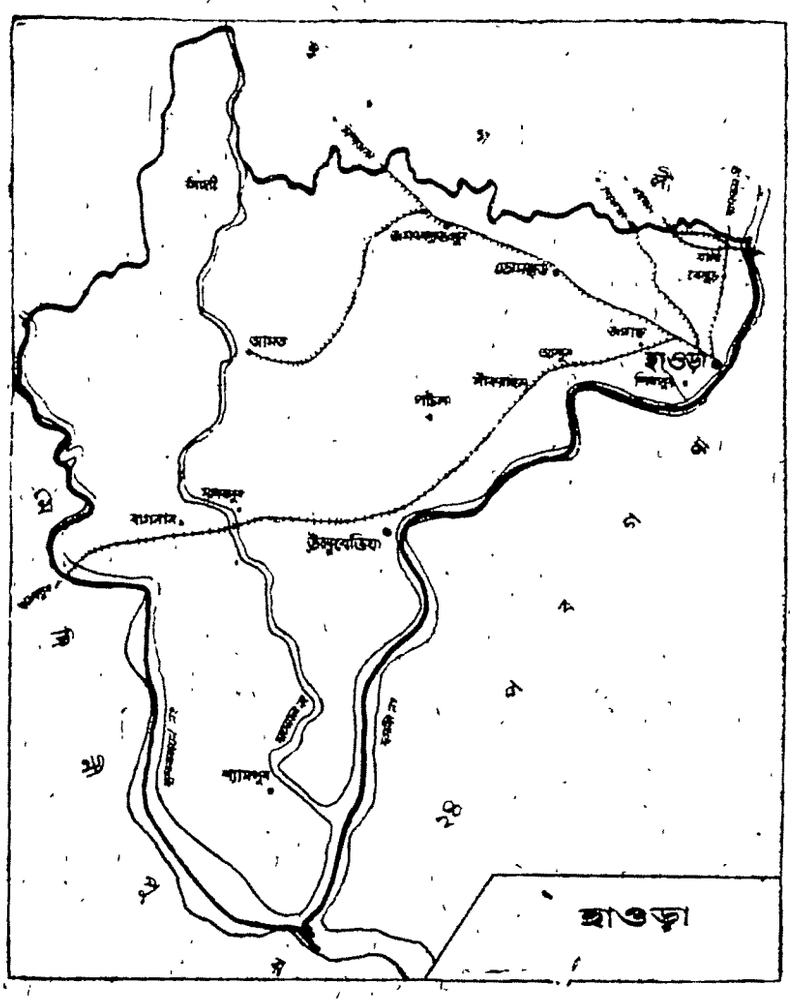

জেলার স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই বললেই হয়। তবে সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের সন্নিকটবর্তী এই স্থান যে খৃষ্ট-পূর্বকাল থেকেই সভ্য মানুষের বাসভূমি তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাওড়ার সভ্যতা ও সংস্কৃতি রাঢ় বঙ্গের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় সারা বাঙলার সঙ্গে হাওড়াও মুসলিম শাসনাধীনে আসে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলিম শাসন-কালেরও কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হাওড়ায় মেলে না।

হাওড়ার কোন কোন স্থানের নামের প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ মেলে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে লেখা বিপ্রদাস পিপলাইর মনসা-মঙ্গল কাব্যে। চাঁদ সদাগরের বর্ধমান থেকে সমুদ্র যাত্রাপথের যে বর্ণনা আছে ঐ গ্রন্থে তাতে বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঘুসুরি ও বাতোর নামক স্থান দুটির উল্লেখ মেলে। ঘুসুরি হল বর্তমান হাওড়া শহরের উত্তর অংশ, আর বাতোর শিবপুরের দক্ষিণাঞ্চল। বাতোরে চাঁদ সদাগর দেবী বেতাইচণ্ডীর উপাসনা করেন। বাতোর নামক স্থানটির পরবর্তী উল্লেখ মেলে ভেনিসের পর্যটক সিজেয়ার ফেডেরিকির ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে লেখা ভ্রমণ লিপিতে। সে সময় বাতোর ছিল সপ্তগ্রামমুখী জাহাজ-গুলির জন্য একটি গঞ্জ।

হাওড়াবাসীরা যে জন্য সত্যই আফশোষ করতে পারেন তা হল যে, জব চার্নক ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে প্রথমে উলুবেড়িয়াকে বেছে নিয়ে ছিলেন। জব চার্নকের সে বাছাই যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেত তা হলে উলুবেড়িয়াই হত ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী। উলুবেড়িয়া বেঙ্গল কাউন্সিলের মনোমত না হওয়ায় চার্নক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগস্ট তৃতীয়-বারের জন্য সুতানুটিতে আসেন ও কলকাতা শহরের পত্তন করেন।

জেলা গঠনের ইতিহাস

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার একাংশ বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বছর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বলবৎ হওয়ার পর উল্লিখিত অংশগুলি নিয়ে হুগলী জেলা গঠন করা হয়। ১৮১৪ সালে রাজাপুর (বর্তমান ডোমজুর) ও ১৮১৯ সালে কোটরা (বর্তমান শ্যামপুর) ও

উলুবেড়িয়া থানা চব্বিশ পরগনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

হাওড়া জেলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সূচনা হয় ১৮৪৩ সালে, যখন হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করে হাওড়া, সালকিয়া, আমতা, রাজাপুর, উলুবেড়িয়া, কোটরা ও বাগনান থানা নিয়ে একটি ম্যাজিস্ট্রেট শাসিত এলাকা গঠন করা হয়। জেলার বিচারব্যবস্থা তখনও হুগলী জেলা জজের অধীন থাকে। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। তখন পর্যন্ত হাওড়ার জেলা ও দায়রা জজ হাওড়াস্থ হুগলীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নামে অভিহিত হতেন। ১৯৩৮ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে হাওড়া সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জেলায় পরিণত হয়।

হাওড়া জেলার আয়তন, সার্ভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়ার হিসাবে ৫৬৮-২ বর্গমাইল আর রাজ্য সরকারের ল্যান্ড রেকর্ডস ও সার্ভে-এর হিসাবে ৫৬০-১ বর্গমাইল। জেলার দুটি মহকুমা—হাওড়া (সদর) ও উলুবেড়িয়া।

১৭৪ বর্গমাইল আয়তনের সদর মহকুমার ১১টি থানা—হাওড়া, ব্যাটরা, গোলাবাড়ি, মালিপাঁচঘরা, শিবপুর, বালী, ডোমজুর, জাগাছা, সাঁকরাইল, জগদ-বল্লভপুর ও পাঁচলা। জেলার সদর শহর হাওড়ার অভ্যন্তরে আছে হাওড়া, ব্যাটরা, গোলাবাড়, মালিপাঁচঘরা ও শিবপুর থানার একাংশ।

৩৮৬ বর্গমাইল আয়তনের উলুবেড়িয়া মহকুমার থানা হল—আমতা, বাগনান, উলুবেড়িয়া, শ্যামপুর ও বাউড়িয়া।

হাওড়া জেলায় শহররূপে স্বীকৃত হাওড়া, বালী, উলুবেড়িয়া ও বাউড়িয়া।

জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ৮৪৭ তার মধ্যে নয়টি জনহীন এবং ২৩টি মৌজা আছে চারটি শহরের মধ্যে। অর্থাৎ ৮১৫টি মৌজা নিয়ে হাওড়ার গ্রামাঞ্চল।

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত হাওড়া জেলার আকৃতি একটা অনিয়মিত ত্রিকোণের মতো। তার উত্তর সীমান্তে রয়েছে হুগলী জেলা, পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পূর্বে গঙ্গার ওপারে চব্বিশ পরগনা, যার মধ্যে হাওড়া শহরের প্রায় মুখোমুখি রয়েছে কলকাতা। জেলার উত্তরাংশ হাওড়া মহকুমা ও ত্রিভুজাকৃতি দক্ষিণাংশ উলুবেড়িয়া। হাওড়া ও চব্বিশ পরগনার মধ্যে গঙ্গা যেমন স্বাভাবিক সীমান্ত রচনা করেছে, হাওড়া ও মেদিনীপুরের মধ্যে তেমনই আছে রূপনারায়ণ নদীর ব্যবধান। শুধু উত্তরে, হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্যে কিছু অংশে বালী খাল ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা নেই। পূর্ব-পশ্চিমে হাওড়া জেলার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল ও উত্তর-দক্ষিণে ৪০ মাইল।

জেলার ভূপ্রকৃতি

সমগ্র জেলাটি সমতল ও পলিমাটির সৃষ্টি। পলিমাটির চাপে অনেক ছোট নদী গতিহারা হয়ে এই জেলার অভ্যন্তরে আটকে গেছে। তাই ছোট বড় খাল বিলে ভরা এই জেলা, আর সমস্ত এলাকারই আবহাওয়া স্যাতসেতে।

জেলার প্রধান নদী তিনটি। প্রথম গঙ্গা (হুগলী) ও তার শাখা নদী সরস্বতী। দ্বিতীয়, দামোদর ও তার দুই শাখা—কানা দামোদর বা কৌশিকী ও পুরানো দামোদর। তৃতীয়, রূপনারায়ণ। এ ছাড়া আছে অগণিত খাল। যেমন হুগলী নদী থেকে বেরিয়েছে বালী, রাজগঞ্জ সাঁকরাইল, সিজবেড়িয়া ও চাঁপা খাল। এগুলি সবই জোয়ারের সৃষ্টি। দামোদর নদীতে এসে পড়েছে ডজনখানেক খাল আর রূপনারায়ণে প্রায় তার অর্ধেক। দামোদরের খালগুলির মধ্যে বড় মাদারিয়া, বাঁশপাতি, গাইঘাটা আর রূপনারায়ণের খালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঁকা খাল।

বালীর কাছে হুগলী নদী হাওড়া জেলার সীমানা স্পর্শ করেছে। তারপর হাওড়া শহর পর্যন্ত মোটামুটি দক্ষিণমুখি এগিয়ে একটু একটু করে পশ্চিমমুখি এগিয়েছে। তারপর উলুবেড়িয়ার কাছ থেকে হুগলী প্রায় সরাসরি দক্ষিণ দিকে চলে গেছে।

ওদিকে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার মধ্যে সীমান্তসৃষ্টিকারী রূপনারায়ণ পূব দিকে ঠেলে দক্ষিণমুখি এগিয়ে চলে হুগলীতে এসে মিশেছে। হুগলী ও রূপনারায়ণের সংগমস্থল হাওড়া জেলার শেষ দক্ষিণ-পূর্ব বিন্দু।

সরস্বতী নদী হুগলী শহরের কয়েক মাইল উত্তরে, ত্রিবেণীর কাছে হুগলী নদী থেকে নির্গত হয়ে বালুটির কাছে হাওড়া জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর ঐ সংকীর্ণ ও অগভীর জলধারা ধীরে ধীরে সর্পিল গতিতে ডোমজুর ও আন্দুল থানার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সাঁকরাইলের কাছে আবার হুগলী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আন্দুল পর্যন্ত সরস্বতী নদী অল্পভার নৌকার পক্ষে নাব্য।

দামোদর নদী হাওড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। উত্তর-পশ্চিমে মাইল সাতেক সীমান্ত চিহ্নিত করে দামোদর জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। আমতার কাছে দামোদরের বাম দিক থেকে এসে পড়েছে মাদারিয়া খাল ও আরও তিন মাইল দক্ষিণে ডান দিকে এসে পড়েছে গাইঘাটা খাল। তারপর দামোদর বোরালো পথে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে বাগনানে পৌঁচেছে। পরে আরও দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলে ফলতা পইন্টে হুগলী নদীতে মিশে গেছে। জেলার অভ্যন্তরে দামোদরের দৈর্ঘ্য পঁয়তাল্লিশ মাইল।

বোটানিক গার্ডেন বা কোম্পানির বাগান জেলার একটি বিশেষ সম্পদ, কিন্তু তার বাইরে কোন উল্লেখযোগ্য বনভূমি নেই। যা ছিল তাও ঘনবসতির চাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বনের সঙ্গে বন্যপ্রাণীও জেলা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। উলুবেড়িয়া মহকুমায় এবং সদরের জগদবল্লভপুর থানার কোনাজঙ্গলে এখনও কিছু বুনো শুয়োর আছে। হুগলী ও দামোদর নদীর চরে শীতকালে মাঝে মাঝে কুমির দেখা যায়।

পুজোয় চাই নতুন বই

নতুন স্বাদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার

সলিল মিত্রের

দুর্গম দ্বীপের রহস্য	২·৫০
আন্দামানের বিভীষিকা	২·৫০

দৈতেহাসি কাষ্ঠহাসি মুচকিহাসি ও অট্টহাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর

অনেক হাসি	২·০০

পরিচয় গুপ্তের

খেয়ালী রাজার কাণ্ড	২·০০
ভূতের বিয়ে	২·২৫
লম্বুদার গপ্প	২·০০
গোয়েন্দা সম্রাট লম্বুদা	২·৫০

সুরজিৎ মজুমদারের

ভূতের পাল্লায়	২·২৫

রহস্য ও রোমাঞ্চ ভরা এ্যাডভেঞ্চার

হরিপদ ঘোষের

রহস্যময় গুহা	২·৫০
বাঘের দেশে বিভীষণ	২·৫০

পারলৌকিক ও শিকার কাহিনী

ছায়া-কায়া	২·০০
জ্যান্ত বাঘের কবর	২·০০

রূপকথার গল্প

সুজিতকুমার নাগের

রূপকথার ঝাঁপি	২·০০

শ্যামল চক্রবর্তীর

দৈত্যের পাহাড়ে	২·০০

বিঃ দ্রঃ— ভি, পিতে বই লইতে হইলে কিছু অগ্রীম পাঠাইবেন

সূচীপত্র ৭৫সি, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

শীতে কিছু কিছু দূরদেশের পাখি এখনও ও উলুবেড়িয়া মহকুমার কোন কোন স্থানে। ওলুবেড়িয়া মহকুমার কোন কোন স্থানের ঝিলেও ধানের ক্ষেতে উড়ে আসে।

এবার বোটানিক গার্ডেনের কথা। পলাশির যুদ্ধের পর তখনও তিন-দশক অতিক্রান্ত হয়নি, ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে কোম্পানির এক ইঞ্জিনীয়ার ও তৎকালে খিদিরপুর ডকইয়ার্ডের সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্নেল রবার্ট কিড কোম্পানির কাছে বোটানিক গার্ডেন তৈরির একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কর্নেল কিডের ছিল ফুল ও ফলের সখ এবং আগেই শালিমারে তিনি একটি সুন্দর বাগান গড়ে তুলেছিলেন। শালিমার তখন ছিল কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দাদের অবকাশ ভোগের জন্য নির্মিত একটি সুরম্য উদ্যান নগরী। লাহোরে মোগল সম্রাটদের উদ্যান শালিমারের নামানুসারে কর্নেল কিড ঐ স্থানের নাম রাখেন শালিমার। দেশ-বিদেশ থেকে ফুলফলের চারা এনে কিড আগেই শালিমারকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। তারপর তাঁর বোটানিক গার্ডেনের পরিকল্পনা কোম্পানির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করলে তিনি বোটানিক গার্ডেন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কর্নেল কিডই বোটানিক গার্ডেনের প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং তিনিই ঐ বিশাল বিচিত্র উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা।

কলকাতার রাজভবন থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে, গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত বোটানিক গার্ডেনে যে দেশ-বিদেশ থেকে নানা জাতের অগণিত গাছ নিয়ে এসে লাগানো হয়েছে তা মুখ্যত উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য করা হলেও সাধারণ মানুষের কাছেও তার আকর্ষণ কম নয়। ইট-সিমেন্টের এই কলকাতা নগরীর অদূরে নদীর ধারে এমন একটি শ্যামল সুনিবিড় বনস্পতিশোভিত ও পাখির কূজনে মুখরিত প্রান্তর সৃষ্টির পরিকল্পনা সত্যই তারিফ করার মতো।

যারা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের কৌতূহলী ছাত্র নয় এবং প্রকৃতির বিরাট বৈচিত্র্য দর্শনেই যারা পরিতৃপ্ত, তাদের কাছে বোটানিক গার্ডেনের বিশাল বটবৃক্ষ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বাগানের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিবিড় ঘন এই বিশাল বৃক্ষটি একের পর এক ঝুরি নামিয়ে আজও তার অধিকার বিস্তার করে চলেছে। এই আদি বৃক্ষটির বয়স কত তা কেউই সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারেননি। ১৮৯৫ সালে, ঐ বাগানের তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জর্জ কিং এক প্রবন্ধে লেখেন, লোকমুখে তিনি শুনেছেন যে ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েই গাছটি বেশ বড় ছিল এবং এক ফকির ঐ গাছতলায় রোজ বসতেন। তাই জর্জ কিং অনুমান করেছেন, বাগান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় গাছটির বয়স ছিল অন্তত দেড়শ বছর। তাঁর যুক্তির সমর্থনে তিনি লর্ড ভ্যালেন্টিয়ার ভ্রমণলিপির উল্লেখ করেছেন, যাতে লেখা আছে ১৮০৩ সালে কলকাতা দেখতে এসে লর্ড ভ্যালেন্টিয়া বোটানিক গার্ডেনের বটবৃক্ষের কথা শুনতে পান এবং সেই বৃক্ষ দেখে তিনি মুগ্ধ হন।

জর্জ কিং-এর লেখায় আছে ১৮৯৫ সালে বটবৃক্ষটির মূল কাণ্ডের পরিধি ছিল ৫১ ফুট এবং ঝুরির সংখ্যা ৩৭৮। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর বয়সের এই বৃক্ষটির মূলকাণ্ড কীটদষ্ট হয়ে বিনষ্ট হয় এবং বৃক্ষটির স্বাস্থ্যরক্ষার্থে সেটিকে অপসৃতও করা হয়েছে। আজ এক বিশাল সবুজ চাঁদোয়ার মতো বটবৃক্ষটি দাঁড়িয়ে আছে তার অগণিত ঝুরির উপরে।

জেলার প্রত্নসম্পদ ও লোকধর্ম

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে তিব্বতের তাসি লামা ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে ঘুযুরিতে একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। গঙ্গা হিন্দুদের মতো বৌদ্ধদেরও পবিত্র নদী। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রদত্ত যে জমিতে তিব্বতী মন্দিরটি নির্মিত হয় সেটি ভোটবাগান নামে পরিচিত। দোতলা এই প্রার্থনাভবনটির উল্লেখযোগ্য কারুকার্য কিছু নেই, কিন্তু এর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অনুপেক্ষণীয়।

জেলার প্রাচীনতম মন্দির হল আমতার মালাই-চণ্ডীর মন্দির। প্রস্তরফলকে লেখা তারিখ অনুসারে মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৬৪৯ খৃস্টাব্দ। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি অত প্রাচীন বলে মনে হয় না। সম্ভবত প্রাচীন মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষের উপর বর্তমান মন্দিরটি কোন এক সময়ে নির্মিত হয়। এটিকে একটি পীঠস্থান বলেও দাবি করা হয়।

আমতা থানার পেরো বসন্তপুরে একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেটি সম্ভবত লক্ষ্মণ সেনের আমলের। পেরো-বসন্তপুর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের বাসভূমিরূপেও খ্যাত। নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম কলিকাতা। এই নামকরণের কারণ সম্বন্ধে দুটি মত আছে। সম্ভবত গ্রামে যে চুনারী সম্প্রদায়ের বাস তাদের পূর্বপুরুষের কলিচুনের কারবার ছিল। আর সেই কলি থেকেই কলিকাতা নামের উদ্ভব। আবার অনেকে বলেন, এই অঞ্চলে একদা নীলের চাষ হত বলে অনেক সাহেবের বসবাস ছিল এখানে; আর গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল যে, সাহেবদের বাসস্থান মাত্রই কলিকাতা। গ্রামে একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়।

আমতার গড় ভবানীপুর গ্রামেও একটি দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল যার কোন চিহ্নই আজ নেই। গড়ভবানীপুরের শিবমন্দিরটি প্রাচীন। এটি মণিনাথ মহাদেবের মন্দির।

সদর মহকুমার ডোমজুড় থানার মাকড়দহ গ্রামে আছে মাকড় চণ্ডীর মন্দির। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা থেকে এক সপ্তাহ পঞ্চম দোলের মেলা বসে এখানে। মেলাটি অন্তত দেড়শ বছরের প্রাচীন।

ডোমজুড় থানার হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথে চণ্ডীতলার অদূরে আছে পঞ্চানন ঠাকুর ও কালীর মন্দির। মন্দিরগুলি খুব প্রাচীন নয়। মউইগ্রামে সরস্বতী নদীর ধারে আছে শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির। প্রাচীন মন্দির, কিন্তু স্থাপত্যশৈলী উল্লেখযোগ্য নয়।

জগদবল্লভপুরের কিংরা গ্রামে আছে গড়চণ্ডীর মন্দির। মন্দিরটি দেড়শ বছরের বেশি প্রাচীন ও বৃহৎ, তবে একেবারে সাদাসিধে। গ্রামে ছোট মন্দিরও আছে কয়েকটি।

মেলার মধ্যে প্রধান হল রামরাজাতলার রামনবমী উৎসব ও মেলা। চৈত্রমাসে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীতে উৎসবের শুরু, চলে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত। এত দীর্ঘ মেলা পশ্চিমবঙ্গে আর নেই। মেলা উপলক্ষে রামরাজার তেইশ ফুট উঁচু মূর্তি নির্মিত হয়। তাছাড়াও থাকে ২৪টি বিগ্রহ। দুশ বছর আগে স্থানীয় জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী এই পূজা ও মেলার প্রবর্তন করেন। পূজা চলে একপক্ষকাল, কিন্তু প্রতিমা বিসর্জন হয় শ্রাবণের শেষ রবিবার। মেলা চলে ততদিন, এবং বিসর্জনের দিন লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়। রামচন্দ্রের পূজা ও মেলা থেকেই স্থানের নাম হয় রামরাজাতলা।

শ্যামপুর থানার পিছলদহ গ্রামে প্রতি বছর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় যে মহাপ্রভু আবির্ভাবের উৎসব হয়, সেটিও ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কারণে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদেব উৎকল ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্তনের পথে তাম্রলিপ্ত থেকে নৌকাযোগে বূপনারায়ণ পার হয়ে এই গ্রামে আসেন ও কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। মহাপ্রভুর সেই পুণ্য আবির্ভাবের স্মরণে এই উৎসব। উৎসবটি প্রাচীন ও সর্বজনীন।

জেলায় লোক দেবতার সংখ্যাও কম নয়। বথ, চড়ক-গাজন, নীল মনসা শীতলা পূজা ত আছেই গ্রামে গ্রামে, তাছাড়াও আছে বিশালাক্ষ্মী, রতনমালা প্রমুখ দেবীর পূজা। পঞ্চানন্দ শিব ঠাকুরের লৌকিক রূপ। কারও গরু ছাগল হারালে পঞ্চানন্দের কাছে গাজা-কল্কে মানত করতে হয়। পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজো সবসময় চলে, তবে বৈশাখ সংক্রান্তিতে ব্যাপকভাবে হয়। ধর্মরাজের পূজো হয় ভাদ্র সংক্রান্তিতে।

মুসলমান পীরদের স্মরণেও নানা উৎসব ও মেলা প্রচলিত আছে হাওড়া জেলায়। যেমন জগৎবল্লভপুর থানার রামুনপাড়া গ্রামে কতোয়ালি সাহেব পীরের তিরোভাব উপলক্ষে মাঘ মাসের পয়লা তারিখে মেলা বসে, চলে এক মাস। ডোমজুড় থানার গয়েশপুর গ্রামে চৌঠা মাঘ থেকে শুরু হয় গয়েশুদ্দিন পীরের উৎসব, চলে বয়েকদিন। উলুবেড়িয়া থানার বানিবন গ্রামে ২৯ পৌষ শুরু হয় জঙ্গল বিলাস পীরের স্মরণে উৎসব, চলে পাঁচদিন। উৎসবটি প্রায় দুশ বছরের প্রাচীন। উদয়নারায়ণপুরের সিংটি গ্রামে ভইখা পীরের স্মরণোৎসব হয় পয়লা মাঘ। এটিও প্রাচীন উৎসব ও মেলা। শ্যামপুকুর থানার সীতাপুর গ্রামে পয়লা মাঘ অক্ষিণ স্নান হয়। গ্রামের একটি পুকুরে সূর্যোদয় থেকে মধ্যাহ্ন কাল পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম সকলেই স্নান করে।

স্নানান্তে দানধ্যানের রীতি প্রচলিত আছে। শতাধিক বছরের প্রাচীন এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানটিও দেওয়ান সাহেব নামে জনৈক পীরের স্মরণোৎসব।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বিশ্বময় প্রচারকল্পে বেলুড়ে একটি মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। সারা বিশ্বে যে প্রায় একশত রামকৃষ্ণ মিশন আছে তার প্রধান কার্যালয় এই মঠ। গঙ্গাতীরে গড়ে ওঠা এই মঠের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে ১৯৩৮ সালে আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে নিবেদিত প্রাণ দেশ-বিদেশের শিষ্যাশিষ্যারা। লাল বেলেপাথরে গাঁথা এই দক্ষিণমুখি মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ২৩৩ ফুট ও প্রস্থ ১০৯ ফুট। মার্বেল পাথরের মেঝে বিশাল হলঘরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পূর্ণমূর্তি, শিল্পসৌকর্যে মনোরম মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম মন্দির।

বেলুড়মঠে রামকৃষ্ণ দেবের মন্দির ছাড়াও আছে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির ও বাসভবন, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির ও শ্রীসারদা দেবীর মন্দির। প্রতিটি মন্দিরই সুন্দর, ভাবময় ও ভক্তিপ্লুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মতো।

সব মন্দিরে নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি মঠের প্রধান উৎসব। ঠাকুরের জীবনের অন্যান্য স্মরণীয় দিনগুলিও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে পালিত হয়। দুর্গোৎসব মঠের আর একটি বড় উৎসব।

জেলার মানুষ

বর্তমানে যে থানাগুলি নিয়ে হাওড়া জেলা ১৮৭২ সালে তার লোকসংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ১৬ হাজার। ১৯২১ সালে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর বাদে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯ লক্ষ ৯৭ হাজার। আবার তার পঞ্চাশ বছর বাদে ১৯৭১ সালে হাওড়ার লোকসংখ্যা হয়েছে ২৪,২০,০৯৫। অর্থাৎ প্রথম পঞ্চাশ বছরে এই জেলার লোকসংখ্যা চার লক্ষ বাড়লেও, দ্বিতীয় পঞ্চাশ বছরে বেড়েছে সোয়া চোদ্দ লক্ষ।

বর্তমানে হাওড়ার প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব ৩,৬৩৯। কলকাতা বাদ দিলে কোন জেলারই জনঘনত্ব হাওড়ার কাছাকাছি নয়। দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হুগলী জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ১৮৪১ জনের বাস। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলের জনঘনত্ব প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যেখানে মেদিনীপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৭৭২ জনের বাস এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় গড়ে ৭৮৪ জনের, সেখানে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে ২,৩৫৩ জন। যেখানে মেদিনীপুরে প্রতি গ্রামে গড়ে ৩৭৭ জনের বাস, সেখানে হাওড়ায় প্রতি গ্রামে বাস করে গড়ে ১৫৪২ জন। শিল্পসমৃদ্ধ হাওড়ার শ্রমিকরা সপরিবারে হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে বাস করেন বলেই সেখানকার লোকসংখ্যা এত বেশি। হাওড়া জেলায় অন্য প্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। এছাড়া '৬১ সালের হিসাব অনুসারে, এই জেলায় পুনর্বাসিত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ৮১ হাজার।

হাওড়া শহরের পশ্চিমে জাগাছা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সাঁকরাইল সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল। কিন্তু ঐ দুই থানার জনঘনত্ব যথাক্রমে ৪,৯০৪ ও ৪,০০৭। গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গমাইলে এত ঘন লোকবসতির কারণই হল কারখানার শ্রমিকদের ব্যাপক বসবাস। এই দুই থানায় কোন বৃহৎ শিল্প নেই, শহর পদবাচ্য কোন জনপদ নেই, তবুও এখানকার লোকবসতির ঘনত্ব শহরাঞ্চলের মতো এবং কার্যত জাগাছা ও সাঁকরাইল এখন হাওড়া শহরের শহরতলী অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

হাওড়ার জমির উর্বরতা, রেলপথের সম্প্রসারণ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিস্তীর্ণ এলাকার পুনর্বন্ধার, গ্রামাঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্বের বিশেষ কয়েকটি কারণ।

জেলার অগ্রগতি

শিক্ষাক্ষেত্রে হাওড়ার অগ্রগতি কলকাতার পরেই। '৭১ সালের জনগণনা অনুসারে জেলার শতকরা ৩৯-৬৭ জন শিক্ষিত। জেলার ২৪ লক্ষ ২০ হাজার লোকের মধ্যে পুরুষ ১৩ লক্ষ ১৮ হাজার ও নারী ১১ লক্ষ ২ হাজার। পুরুষের মধ্যে ৬ লক্ষ ৫১ হাজার অর্থাৎ ৪৯-৪২ শতাংশ ও নারীদের মধ্যে ৩ লক্ষ ৯ হাজার, অর্থাৎ ২৮-০১ শতাংশ লিখনপঠনক্ষম। নারী শিক্ষার ব্যাপারে কলকাতা বাদে একমাত্র হুগলী জেলা হাওড়ার চেয়ে সামান্য এগিয়ে আছে। কলকাতার নারীদের মধ্যে শতকরা ৫৪-৪০ শতাংশ ও হুগলীর নারীদের মধ্যে শতকরা ২৮-৩২ শতাংশ শিক্ষিত। সুতরাং সামান্য ভগ্নাংশের জন্য হাওড়া এক্ষেত্রে তৃতীয় স্থানে নেমে গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে হাওড়া জেলার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। কলেজটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮০ খৃস্টাব্দ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ নেই, এবং মুখ্যত সেই কারণেই হাওড়া জেলা বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও হাওড়া জেলার কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় হাওড়া জেলায় সাধারণ শিক্ষার কলেজ ছিল মাত্র একটি—নবাসংহ দত্ত কলেজ, এবং সে কলেজও ছিল ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হাওড়ায় প্রথম কলেজ হয় উলুবেড়িয়ায়, ১৯৪৯ সালে। এখন অবশ্য হাওড়া জেলায় অনেকগুলি কলেজ হয়েছে। হাওড়া শহরে হয়েছে মেয়েদের একটি কলেজ ও নবাসংহ দত্ত কলেজে সহ-শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। কলেজটিও স্নাতক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া শিবপুরে হয়েছে দীনবন্ধু কলেজ। সুতরাং শহরে এখন তিনটি কলেজ। বেলুড়ে আছে রামকৃষ্ণ মিশনের কলেজ ও কারিগরি শিক্ষার কলেজ; তাছাড়া লালবাবা কলেজ। শ্যামপুর, বাগনান, জগদবল্লভপুরেও কলেজ শুরু হয়েছে। জেলার প্রাচীনতম স্কুল, জেলা স্কুল, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৫ সালে। উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক মিলিয়ে জেলায় স্কুলের সংখ্যা ১৭০ এবং প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ৮৫০।

হাওড়া জেনারেল হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬১ সালে। এটি কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বড় হাসপাতাল। এছাড়াও হাওড়ায় বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি বড় হাসপাতাল আছে; যেমন সালকিয়ায় আছে সংক্রামক রোগের হাসপাতাল। জগদবল্লভপুরের হাসপাতালও বড়। উলুবেড়িয়ায় আছে মহকুমা হাসপাতাল এবং সব থানায় আছে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। হাওড়া জেলায় জল নিকাশী ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক।

জল নিকাশী ও সেচ ব্যবস্থা

জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একমাত্র কৃত্রিম খাল হল, উলুবেড়িয়া থেকে মেদিনীপুর জেলার মোহনপুর পর্যন্ত প্রবাহিত প্রায় ৭০ মাইল দীর্ঘ উলুবেড়িয়া খাল বা মেদিনীপুর খাল। এই লকগেট খালটি উলুবেড়িয়া থেকে বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত গিয়ে দামোদর অতিক্রম করেছে, তারপর কুন্টাপাড়া থেকে কাটাপুকুর হয়ে রূপনারায়ণে মিশেছে। আবার রূপনারায়ণ পার হয়ে চলে গেছে মেদিনীপুরের মধ্যে। ১৮৭৩ সালে এই খাল কাটা হয় এবং রেলপথ চালু হওয়ার আগে এই জলপথ দিয়ে কলকাতা ও মেদিনীপুরের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হত। এছাড়া গাইঘাটা ও বক্সি খালের সংস্কার করে পরিবহন ও সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়েছে।

হাওড়া জেলার সবচেয়ে বেশি উপকার হয়েছে হাওড়া ও রাজাপুর জলনিকাশী ব্যবস্থায়। হাওড়া জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয় ১৮৮৫ সালে ও রাজাপুর জলনিকাশী ব্যবস্থা ১৮৯৪-৯৫ সালে। দুটি পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৫০ ও ২৭০ বর্গমাইল জলাভূমি উদ্ধার করে চাষ ও বাসের উপযোগী করা হয়। এছাড়া ১৮৭৩ সালে যে ডানকুনি জলনিকাশী ব্যবস্থার কাজ শেষ হয় তাতে মুখ্যত হুগলীর চন্ডীতলা থানা উপকৃত হলেও হাওড়ার ডোমজুড় থানার উত্তরাংশেও চাষবাসের সুবিধা হয়। তিনটি জলনিকাশী প্রকল্পে হাওড়া জেলার অর্ধেকেরও বেশি স্থান শুধু যে চাষবাসের উপযোগী হয়েছে তাই নয়, এতে সেচের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত হয়েছে এবং ডোমজুড় ও জগদবল্লভপুর থানার জনস্বাস্থ্যের অশেষ উন্নতি হয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থা

জেলায় জলের অভাব নেই এবং মাটিও উর্বর। সে কারণে চাষের অবস্থা সন্তোষজনক। জেলার মোট ৩,৫৮,৪৬৪ একর জমির মধ্যে চাষ হয় ২,৫২,৫০০ একর জমিতে। শিল্পসমৃদ্ধ ও ঘনবসতিপূর্ণ হাওড়া জেলায় চাষের জন্য পাওয়া সম্ভব

কাজের ফাঁকে বিশ্রামে উষ্ণ স্বাদু নেস্‌কাফে

টেলিফোন বাজে।
কাজে বাধা পড়ে।
এক কাপ
নেস্‌কাফের জন্য
ব্যাকুল হয়ে
ওঠে মন।

মধ্যদিনে শরীর মনকে
তাজা করে
তুলতে সারা
পৃথিবীতে
নেস্‌কাফের তুলনা নেই।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

ACIL486 2416

নয় এমন জমির পরিমাণ প্রায় ৮০ হাজার একর। সুতরাং হাওড়ায় চাষের জমি বাড়ানোর সুযোগ খুব বেশি নেই।

প্রধান ফসল ধান। আমন, আউশ ও বোরো মিলিয়ে ধান চাষ হয় দুই লক্ষ ১৮ হাজার একর জমিতে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ ফসল ডাল। খেঁসারি, মুগ, মুসুর ও মটর ডালের চাষ হয় এই জেলায়। রবিশস্যের চাষ হয় ১৭,৫৫০ একর জমিতে।

জেলার উত্তরাঞ্চলে ধানের পর বড় ফসল পাট। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের তৈলবীজ, আখ ও তামাকের কিছু কিছু চাষ হয়। সবজির মধ্যে পটল ভাল হয় দামোদরের চরে, আর ওল চাষ হয় সাঁতরাগাছি ও জগদ-বল্লভপুরে। আম, পান, আনারস, আলু ও সবজির চাষের জমির মোট পরিমাণ ৬,২৩০ একর।

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

হাওড়া জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প, বিশেষ করে তাঁত শিল্প সুপ্রাচীন। বতোরে কাপড়ের বড় বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ ১৫৮০ খৃস্টাব্দের বৈদেশিক পর্যটন লিপিতে পাওয়া যায়। এখনও ডোমজুড়, জগদবল্লভপুর, আমতা ও বাগনান থানায় তাঁত শিল্প ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। ধুতি, চাদর, শাড়ি, গামছা প্রভৃতির বয়নে হাওড়ার তাঁতীরা বিশেষ পারদর্শী। বেশি ভাগই মোটা কাপড় তবে ডোমজুড়ে কিছু পরিমাণে মিহি কাপড়ও বোনা হয়।

ডোমজুড়, আমতা ও জগদবল্লভপুর থানার গ্রামের কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা চিকনের কাজে বিশেষ পারদর্শী। ঐসব সূক্ষ্ম কাজের চাহিদা কলকাতা ও বাইরের বাজারেও আছে। এছাড়া কামার, কুমোরের কাজও আছে। সারা জেলায়। আমতা ও বাগনান থানার মুসলমানদের একাংশ বালিকাগঞ্জ উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু এই হস্তশিল্পটি কারখানার উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকে থাকতে পারছে না। বালীর শোলার কাজ, ডোমজুড়ের হুঁকো তৈরির কাজ প্রভৃতিরও উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৃহৎ শিল্প

গঙ্গার দুপাশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংরেজরা যেসব বড় শিল্পোদ্যোগের সূচনা করে তার প্রায় সবটাই করে তারা তাদের জাহাজি কারবারের প্রয়োজনে। হাওড়ায় প্রথম গড়ে ওঠে ১৭৯৫ সালে, সালকিয়ায়। ১৮০০ সালে গোলবাড়িতে আর একটি ডক নির্মিত হয়। গোলবাড়িতে আরও একটি ডক নির্মাণ করেন তারকনাথ প্রামাণিক, ১৮৫০ সালে, যার পরে নাম হয় কমার্শিয়াল ডক। সালকিয়ায় ১৮৪৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া ডক নির্মাণ করেন বামকানাই সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার বসু। কিন্তু অংশীদারদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ১৮৬৫ সালে ঐ ডক বন্ধ হয়ে যায়। এইভাবে ১৮৭২ সালের মধ্যে হাওড়া থেকে ঘুষুড়ির মধ্যে আটটি ডক গড়ে ওঠে। তখনকার দিনে ডক ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন লাভের ব্যবসা।

জাহাজের প্রয়োজনে আর একটি কারবার প্রায় ডকের সঙ্গেই গড়ে ওঠে। তা হল জাহাজের দড়ির কারখানা। 'ঘুষুড়ি রোপ ওয়ার্কস', যা এখনও আছে হাওড়ায়, সেটি ১৮০১ সালে কারবার শুরু করে। এছাড়া আছে শিবপুরে শালিমার রোপ ওয়ার্কস, গ্যাঞ্জেস রোপ ওয়ার্কস, ভিক্টরি স্টীম রোপারী প্রভৃতি।

হাওড়ার প্রথম লোহা কারখানা 'এলবিবন মিলস' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১১ সালে। তারপর এখন সারা হাওড়ায় ছড়িয়ে গেছে লোহা কারখানা ও ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস। একমাত্র বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা ছাড়া এত লোহা কারখানা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও নেই। হাওড়া জেলার মেটাল রোলিং (রোস) কারখানা আছে বারোটি, টিউব ও তার তৈরির (ফেবাস) বড় কারখানা তিনটি। মেটাল ফাউণ্ডিং (ফোরাস) কারখানা আছে ৭৬টি, মেটাল এক্সট্রাক্টিং ও রিফাইনিং (নন-ফেরাস) বড় কারখানা আছে দুটি, মেটাল রোলিং (নন-ফেরাস) বড় কারখানা তিনটি, নাট-বল্টু-পেরেক-চেন প্রস্তুতের কারখানা ১৯টি। এছাড়া ছোটবড় আরও অগণিত কারখানা। লোহার কারখানা-গুলির কাজে মুখর হয়ে থাকে হাওড়া, ধর্মতলা, বেলুড়, ঘুষুড়ি, সালকিয়া, শালিমার, লিলুয়া প্রভৃতি স্থানগুলি।

হাওড়ার সুতাকলগুলিও প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বাউড়িয়ায় সুতাকল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২২ সালে। এছাড়া আছে অনন্তপুরে সিন্ধেশ্বরী কটনমিল, আর ঘুষুড়ি, রামকৃষ্ণপুর, সালকিয়া ও দাসনগরের কাপড়কল।

উলুবেড়িয়ায় জেলার প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৮৭৩ সালে, তারপর হাওড়ায় ও শিবপুরে ১৮৭৫ সালে। হাওড়ায় বর্তমানে উলুবেড়িয়া, ঘুষুড়ি, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, সাঁকরাইল, চেঙ্গাইল, বালী, বেলুড়, সালকিয়া প্রভৃতি স্থানে মোট ২৫টি জুটমিল হয়েছে।

হাওড়ার ময়দাকলগুলিও শতাব্দী-কালের প্রাচীন। বর্তমানে হাওড়া শহর, শিবপুর ও রামকৃষ্ণপুরে চারটি বড় ময়দা-কল আছে।

তেলকলগুলিও অনেকদিনের। ১৮৩০ সালে জেসপ এণ্ড কোম্পানি গঙ্গার ধারে প্রথম সর্ষের তেল তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। সে কারণে ঐ ঘাটের নাম হয়ে গেছে তেলকলঘাট। বর্তমানে হাওড়ায় বড় তেলকল আছে সাতটি। এছাড়া আছে চালকল, ডাল-ভাঙাই কল, পাউরুটির কারখানা, জর্দার কারখানা, পনেরোটি হোসিয়ারি মিল, তিনটি ছাতার কারখানা, চারটি সাবানের কারখানা, দুটি কর্ক কল, একটি প্লাইউডের কারখানা, হার্টাট কাচের কারখানা, সাতটি প্লাস্টিকের কারখানা, প্রভৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা হাওড়া, কিন্তু শিল্প উৎপাদনে তার স্থান দ্বিতীয়। রাজ্যের মোট শিল্প উৎপাদনের ১৮ শতাংশ হাওড়ার অবদান, এবং এ ব্যাপারে তার স্থান কলকাতা, বর্ধমান ও হুগলীর উপরে।

কর্মই হাওড়ার মাটি ও মানুষের প্রাণ-মন্ত্র। তাই ভারতের প্রথম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাওড়ায়, কর্ম-যোগী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন তার মূল কর্মকেন্দ্র, কর্ম-বীর আলামোহন দাসের সারা জীবনের সাধনার, সাক্ষাৎরূপ গড়ে উঠেছে দাসনগর। ভাষাচার্য ডঃ শহীদুল্লার দীর্ঘদিনের কার্য-ক্ষেত্র ছিল হাওড়া, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রও ছিল হাওড়া। বঙ্গ-ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হাওড়া জেলার মানুষ। এবং গণশত্রু ঘোষণার স্নেহান্ধ জনক, চিরকুমার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জন্মসূত্রে হুগলীর লোক হলেও তিনি হাওড়ারই সম্মানিত নাগরিক।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

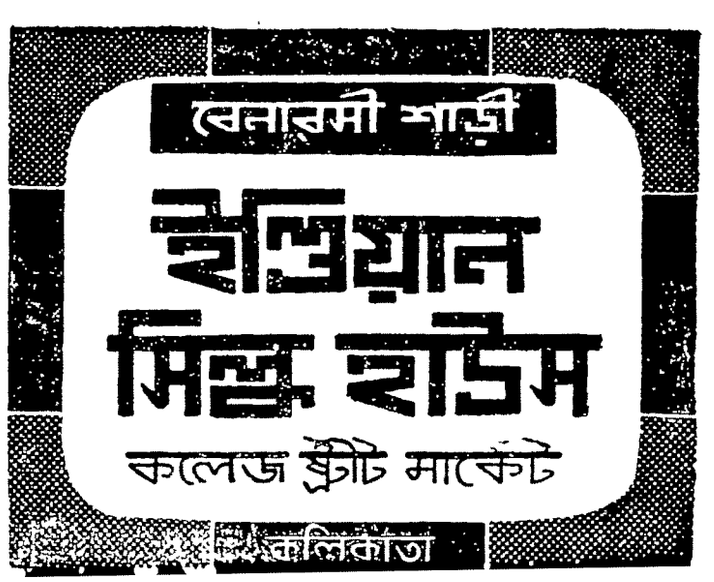

দিনকালের হিসেব

আসিছে সেদিন আসিছে

একদিনের অভিজ্ঞতা ঃ

কলকাতায় যখন বাস করি তখন এ অভিজ্ঞতা অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নি। কারণ, কাজের দিন বিকেল ৫টা নাগাদ এসপ্লানেড অভিমুখে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে নি। মাত্র সেদিনই ঘটেছিল। তবে একদিনেই যে এতগুলো অভিজ্ঞতা একসঙ্গে ভিড় করে এসে স্মৃতিভাণ্ডারে জড়ো হতে চাইবে, তা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে। ট্রামে যাচ্ছিলাম কলেজ স্ট্রীট থেকে এসপ্লানেডের দিকে। মোটামুটি খালি ট্রাম, ডানদিকে জানালার ধারের নন-লেডিজ সীটে জায়গাও পেয়েছিলাম, আর স্বাভাবিকভাবে রাস্তার দিকেই চেয়ে ছিলাম।

মেডিকেল কলেজের সামনের ট্রাম-স্টপ। ডানদিকে নিশ্চয়ই বাস-স্টপ, বেশ কয়েকজন বাসে ওঠার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছেন মনে হল। একজন প্রৌঢ় অভ্যেসের-বশে হাত তুলেও নামিয়ে ফেললেন, হু-হু করে স্টেট বাস চলে গেল। আমাদের ট্রামও স্টপ ছেড়ে বিপরীত দিকে যাত্রা করল। গতিসম্পন্ন হবার আগেই কিন্তু সেই প্রৌঢ়ের অজৈব পরিবহনকে পরমীয় ভ্রাতা সম্বোধন এবং হতাশাব্যঞ্জক উক্তি শুনতে পেলাম ঃ—এল্। —অর্থাৎ ঐভাবে আখ্যাত যানটি হল রাষ্ট্রীয় পরিবহনের লিমিটেড স্টপের বাস। শুনেছিলাম পরিবহন-সমস্যার গুরুত্ব অন্তত কিছুটা লাঘব করার উদ্দেশ্যে এই অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে।

পাশের সীটটা খালিই ছিল। বৌবাজারে একজন উঠে তা দখল করলেন। তাকিয়ে দেখলাম আমাদের জগাদা। একটু অবাকই হলাম, কারণ জানতাম জগাদার অফিস চৌরঙ্গী অঞ্চলে। কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। —কি জগাদা এখান থেকে, প্রশ্নটি শেষ করবার আগেই জগাদা উত্তর দিলেন ঃ আর এখান থেকে। কিছুদিন বাদে যে হাতীবাগান থেকে উঠতে হবে!

জগাদার বাড়ী আমাদের পাড়ায়—বাগবাজারে।

তারপর ব্যাপারটা জানলাম। অফিস থেকে একটু সকাল সকাল—পৌনে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে জগাদা রোজই শ্যামবাজারের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেন। তারপর এস-প্ল্যানেডগামী শ্যামবাজার বা বেলগাছিয়ার খালি ট্রাম পেলেই উঠে পড়েন। প্রথম দিকে ওয়েলিংটন অবধি হাঁটলেই ট্রাম পাওয়া যেত, এখন তা বৌবাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। এর পর হয়ত কলেজ স্ট্রীট, তারপর হয়ত বিবেকানন্দ রোড, তারপর হয়ত হাতীবাগান,—জগাদা একটু দম নিলেন, তারপর ত আর দরকারই হবে না।

বিচিত্র অভিজ্ঞতা মন ঠিক মেনে নিতে চাইছিল না, মন্তব্য করলাম ঃ এ ট্রামটা ত খালিই ছিল।

—হ্যাঁ এইটেই খালি ছিল, জগাদা স্বীকার করলেন, তাই ত উঠতে পারলাম। তবে এখন আর খালি নেই।

তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই খালি নেই—সব আসন পূর্ণ, কয়েকজন দাঁড়িয়েও আছেন।

ট্রাম ওয়েলিংটন-এ এসে পৌঁছুল এবং তারপর ধর্মতলা স্ট্রীট ধরতেই শুরু হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অধ্যায়। প্রতি স্টপে হুড়-হুড় করে লোক উঠতে লাগল। সবাই জগাদার শ্রেণীর। সুতরাং শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রশ্ন নেই, তবে অন্তর্দ্বন্দ্ব যথেষ্ট। কনুই ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে কে আগে উঠতে পারে তারই একরকম প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। বাক্যবাণেরও বিরাম নেই। জীবন যে যুদ্ধক্ষেত্র তা কে অস্বীকার করতে পারে?

আসন সংগ্রহের যে আশা নেই তা অধিকাংশ ব্যক্তিই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু দু-একজন যে হাল ছাড়েন নি তা একটু পরেই বুঝলাম। জগাদার পাশে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক চারধার নিরীক্ষণ করে শেষ পর্যন্ত আমার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ব্যাপারটা বুঝে জগাদা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যাবে কোথায়?

—এসপ্লানেড, বলামাত্রই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে দণ্ডায়মান ভদ্রলোক আদেশ মিশ্রিত আদেশবাক্য ছুঁড়ে দিলেন ঃ তবে পরের স্টপেই নেমে পড়ুন।

পরের স্টপ! অবাক না হয়ে পারলাম না তারপরও যে তিন-চারটে স্টপ বাকি থাকবে। আমার বিমূঢ় ভাব দেখে জগাদাই ব্যাখ্যা করলেন ঃ হ্যাঁ, নেমেই পড়, পরে নামতে পারবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তর্কাতীত সত্যকে উপলব্ধি করে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু নামা কি সোজা? এবার মুহূর্ত মধ্যে শুরু হল শ্রেণীসংঘাত। আমি বাড়ী ফেরার দলের নই, হয়ত ময়দানে হাওয়া-খাওয়ার বা চৌরঙ্গী অঞ্চলে ঘোরাফেরা করা দলের লোক। এককথায় অন্তত এই মুহূর্তে আমি মেহনতী জনপ্রবাহের শ্রেণীভুক্ত নই। অতএব, বিশেষ মেহনত করে যাঁরা ট্রাম নামক বিদ্যুৎচালিত যানে প্রবেশ করতে সমর্থ হচ্ছেন কিছুক্ষণের জন্যও তাঁদের সামিল হয়ে থাকবার কোন অধিকার আমার নেই।

জামা-কাপড় ঠিক বাঁচাতে পারি নি, তবে কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে নেমেই পড়লাম। তখনও বেশ খানিকটা দূরে—তিনটে স্টপ ত বটেই। মনে পড়ল এক চিকিৎসকের উপদেশ ঃ বোজ যতটা পারেন হাঁটবেন। তবে কলকাতার রাস্তায় ত হাঁটতে ইচ্ছে করে না, তাই কিছু ট্রাম-বাস থেকে গন্তব্যস্থলের দু-তিন স্টপ আগেই নেমে পড়ে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটেই যাবেন।

ডাক্তারবাবুর উপদেশের শেষাংশটুকু ভূয়োদর্শনজাত কিনা জানি না। হয়ত তিনিও আমার মত একদিন বিকেলবেলা ট্রামে করে চৌরঙ্গীর দিকে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর অবচেতন মনে উপদেশের এই অংশটুকু স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

হ্যাঁ, ময়দানই ছিল গন্তব্যস্থল তবে উদ্দেশ্য ঠিক হাওয়া খাওয়া নয়, একটা ফুটবল ক্লাবের তাঁবু থেকে চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করা।

হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলাম, এ অবস্থা আর বেশী দিন নয়। ছ' বছরের মধ্যেই ১৯৭৯ সালে পাতাল রেল চালু হলেই জগাদার শ্রেণীর লোকের দুর্দশার অবসান ঘটবে, আর আমার মত যাত্রীর পক্ষে দুতিন স্টপ আগে নেমে পড়ার দরকার হবে না। তখন হয়ত জগাদা অবসর গ্রহণ করবেন আর আমারও চ্যারিটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহের কোন উৎসাহ থাকবে না। কিন্তু 'পশ্চাতে আসিছে যারা' তারা সুখে না হলেও স্বস্তিতে কলকাতার পরিবহনে পরিভ্রমণ করতে পারবে। চক্রবেড় রেলের মত পাতাল বা সুড়ংগ রেল আর কাহিনী বা স্বপ্ন নয়, সত্যিই প্রকল্প প্রণয়ন করে রূপায়ণ করা হচ্ছে। এর ফলে এই বহুনিন্দিত, অবহেলিত কলকাতা মহানগরী অন্যান্য শহরকে অন্তত একদিক দিয়ে ছাড়িয়ে যাবে। —দিস টাইম উই আর নট এলাউয়িং এনি আদার সিটি টু স্টিল এ মার্চ ওভার আস, উক্তি করেছিলেন বৃহত্তর কলকাতার পরিবহন প্রকল্পের একজন কর্মকর্তা। উক্তিটির পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

লর্ড ডালহৌসীর সময় প্রথম কলকাতা থেকেই রেলগাড়ী চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তও সমাপ্ত হয়। কিন্তু দুটি 'দুর্ঘটনার' জন্যে কলকাতা

নয়, বোম্বাই ভারতে রেলগাড়ী চালানতে প্রবর্তকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সমর্থ হয়ঃ আমদানীকৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিনকে ভুল করে কলকাতার বদলে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠান হয়, এবং যে জাহাজটি করে রেলগাড়ীর কামরা আনা হচ্ছিল তা বন্দরে ঢোকবার আগেই বালির চড়ায় (স্যান্ড হেডস) আটকে ডুবে যায়। এরপর বোম্বাই-এ বন্দোবস্ত শেষ হয় এবং ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে বোরিবন্দর (বর্তমান ভিকটোরিয়া টার্মিনাস বা সংক্ষেপে ভি, টি) অবধি ৩৪ কিলোমিটার পথে প্রথম রেলগাড়ী চলে। কলকাতায় প্রথম রেলগাড়ী চালান সম্ভব হয় এর প্রায় ১৬ মাস পরে—১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে।

এবার কিন্তু কলকাতাই অগ্রবর্তী। বোম্বাই দিল্লী ও মাদ্রাজে প্রকল্প প্রণয়ন করার কাজ চললেও কলকাতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে—নিশ্চিতভাবে বলা যায় কলকাতাতেই প্রথম পাতাল বা সুড়ঙ্গ রেল চলবে।

এক নিদারুণ সমস্যা ঃ

টেলিভিশনের মত অনেক কিছুই যখন কলকাতাতে প্রথম হয়নি তখন পাতাল-রেলের ব্যাপারেই বা কলকাতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল কেন? উত্তর হল এটা ঠিক উন্নয়ন বা উৎকর্ষসাধনের প্রশ্ন নয়, একটা নিদারুণ সমস্যার সমাধানের প্রয়াস—পরিমানগত দিক দিয়ে যে সমস্যা কলকাতার নিজস্ব। সমস্যাটিকে 'মহানগরীর অন্তর্নিহিত পীড়াদায়ক পরিবহন-সমস্যা' বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, বোম্বাই দিল্লী বা মাদ্রাজে কোথাও বাসে এইরকম বাদুড় ঝোলা কখনও দেখিনি, আর এই রকম ট্রাফিক-জ্যাম—তাও অকল্পনীয়। ট্রাম অবশ্য বর্তমানে ভারতের আর কোন শহরে নেই। দিল্লীর সমস্যা একটু স্বতন্ত্র। অজ্ঞাত কারণে সেখানে বাসের সংখ্যা এত কম যে বাসস্টাণ্ডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে 'রুই ধরে যায়।' রুই হল উইপোকা এবং উক্তিটি হল এক হুগলী জেলা নিবাসীর। রিডিং রোডের এক বাসস্টাণ্ডে স্বাভাবিক সময়ের অনেক বেশী সময় অপেক্ষা করার পর আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আগত একজন ভ্রমণকারী উক্তি করেছিলেন ঃ ডেলহি ইজ্ দি লার্জেস্ট ভিলেজ ইন্ দি ওয়ার্ল্ড। দিল্লি যদি লার্জেস্ট ভিলেজ হয় তবে কলকাতা হল লার্জেস্ট ডানজুন. অন্তত অফিস-টাইমে যাঁরা বহুজন বাহনে যাতায়াত করেন তাঁরা তাই মনে করেন।

সমস্যাটি শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। তার আগে আমরা যখন গড়ের ওপার থেকে আসতাম তখন পন্টুন ব্রীজ পেরিয়ে এপারে এসে ট্রাম ধরতাম। উঠতে পারব না, দু-তিনটি ট্রাম ছেড়ে দিয়ে তার পর একটাতে কোন রকমে ঝুলতে হবে—এ রকম ব্যাপার ছিল দুঃস্বপ্নেরও অতীত। তা ছাড়া ছিল মিড-ডে ফেরার, ট্রান্সফার টিকিট ইত্যাদি সুবিধে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের পরিকল্পনাও তখন করা হয়নি। নাই বা হল, ট্রাম আর বেসরকারী বাসই ছিল যথেষ্ট। ট্যাকসি চাপার কল্পনাও তখন সাধারণ লোকে করত না।

তারপর স্বাধীনতার সঙ্গে এল দেশ-বিভাগ এবং শুরু হল উদ্বাস্তু প্রবাহ। এই ছিন্নমূল মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশ কলকাতার আশেপাশেই ভিড় করতে লাগল। ফলে মহানগরীর মধ্যে পরিবহন-সমস্যা প্রথম প্রকাশ পেল। দিন দিন এই সমস্যা হয়ে উঠতে লাগল ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির। বৃহত্তর মহানগরী দিন দিন আরও বৃহত্তর হতে লাগল এবং আসল কলকাতার জনসংখ্যাও সমতালে বেড়ে চলল। ১৯২১ সালে আসল কলকাতার জনসংখ্যা ছিল ১০-৫ লক্ষের মত, ১৯৬১ সালে ২৯ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালে এই ২৯ লক্ষ মাত্র ৩১ লক্ষে পৌঁছুলেও বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা হয় ৭৬ লক্ষ (১৯২১ সালে ছিল ২৫ লক্ষ)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭১ সালের জনগণনার ফলে বৃহত্তর কলকাতা ভারতের সর্বপ্রধান জনবহুল নগরীর স্থান পুনরাধিকার করে। ১৯৬১ সালের জনগণনায় এই স্থান অধিকার করেছিল বোম্বাই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে বৃহত্তর কলকাতায় শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। এর ফলে অন্যান্য রাজ্য থেকে জীবিকাসন্ধানীর সংখ্যাও অকল্পনীয়ভাবে বেড়ে চলে। আবার আসল কলকাতায় স্থানাভাবের জন্যেই শহরতলী থেকে প্রত্যহিক যাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন স্ফীত হতে থাকে। হাওড়া ও শিয়ালদহ এই দুই স্টেশন থেকে লক্ষ লক্ষ লোক দিনের বেলায় কাজকর্মের জন্যে কলকাতায় আসে এবং সন্ধ্যার আগে থেকেই অদৃশ্য হতে শুরু করে। জোয়ার-ভাটায় ভেসে চলার মত এই জনতা ভূপৃষ্ঠ-পরিবহনের (সারফেস-ট্রান্সপোর্ট) ওপর যে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশমনকর ব্যবস্থা ঃ

সমস্যা দিন দিন জটিল ও ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির হলেও গোড়া থেকেই কিছু কিছু প্রশমনকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে আসছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের প্রবর্তন করা হয়েছে, ট্রামের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে, দোতলা বাস চালান হয়েছে, স্বল্প-সংখ্যক বা লিমিটেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেদিন—বর্তমান কংগ্রেস সরকারের আমলে—মিনি বাস ছাড়া হয়েছে। এছাড়া ট্রাম ও বাস স্টপ আলাদা করেও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে কতটুকু? এখনও লোক যাতায়াতের জন্যে বাস—বিশেষ করে বেসরকারী বাস—এবং ট্রামের ওপর নির্ভরশীল।

আসল সমস্যা ঃ

অথচ ট্রাম-বাসের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ উপায় নেই, কারণ আনুপাতিক হিসেবে কলকাতায় রাজপথের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কলকাতার মত জনবসতির ঘনত্ব সমন্বিত শহরে মোট জমির অন্তত ২০ শতাংশ জুড়ে রাজপথ থাকা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। কলকাতায় কিন্তু রাজপথের পরিমাণ মোট জমির ৬-২ শতাংশ মাত্র এবং যাকে রোড ক্যাপাসিটি বলে তা বাড়ানোর বিশেষ সুযোগ নেই। অতএব, যাই করা হোক না কেন, ভূপৃষ্ঠ-পরিবহন —সারফেস ট্রান্সপোর্ট —কলকাতার পরিবহন সমস্যার কোন সমাধানই করতে পারবে না। এদিকে যে কোন প্রচেষ্টাই করা হোক না কেন, তাকে বৃহত্তর কলকাতা পরিবহন প্রকল্পের (রেলপথ) জেনারেল ম্যানেজারের ভাষায়, বড়জোড় পচন-নিবারক সমাধান -- এ্যান্টিসেপটিক সলিউসান বলে গণ্য করা চলে।

উপলব্ধি ও পরীক্ষানিরীক্ষা ঃ

এই পরিপ্রেক্ষিতেই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞগণ সমস্যাটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায় একজন ফরাসী বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে আনেন কলকাতার মাটি পরীক্ষা করে বলবার জন্যে সত্যিই পাতাল বা সুড়ঙ্গ রেলপথ কলকাতায় চলতে পারে কিনা। এই বিশেষজ্ঞ দল দুটি পাতাল রেলপথের জন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-সাপেক্ষ প্রকল্প প্রণয়ন করে। একটি ছিল পাইকপাড়া থেকে কলিঘাট পর্যন্ত এবং অপরটি হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশনের মধ্যে। আরও অনেক কমিটি কমিশন গঠিত হয়। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে রেল মন্ত্রকের অধীনে বৃহত্তর কলকাতা পরিবহন প্রকল্প গঠিত হয়। এই সংস্থা পাতাল রেলের জন্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে এবং রিপোর্টটি অনুমোদিত হয় সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই সোবিয়েত বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ অনুসারেই পূর্বে প্রণীত চক্রাকার রেলের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ভারত সরকার প্রকল্পের বিভিন্ন দিকের বিচার-বিবেচনা করে ১৯৭২ সালের জুন মাসে পরিকল্পনাটির অনুমোদন করে নির্দেশ দেন ঃ এগিয়ে যাও। ফলে কাজ শুরু হয়েছে দমদম জংশন থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল-রেলের। তাহলে পাতাল রেল আর কাহিনী নয়, স্বপ্ন নয়, ব্লু-প্রিন্ট নয়—সত্যিই পাতাল রেল আসছে।

এর বিবরণ, এ সম্পর্কে প্রত্যাশা এবং অন্যান্য দিকের আলোচনা করব পরবর্তী এক সংখ্যায়।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

মনের খবর

স্বপ্ন কথা—(৫)

এবার ষষ্ঠ প্রশ্নের বিষয় কিছু বলা দরকার। প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছেন স্বপ্নে দেখা অধ্যাত্ম বিষয়ের ব্যাখ্যা কি মনঃসমীক্ষণের রীতিতে পাওয়া সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে। তার প্রথমটি হল অধ্যাত্ম বিষয় বলতে আমরা কি বুঝব। কোনও দেবদেবী বা আত্মার সম্বন্ধে কিছু অথবা কোনও বিশেষ অলৌকিক অভিজ্ঞতা যা আমাদের সাধারণ জীবনে আমরা অনুভব করি না। বেশ কিছুদিন আগে এক সাধকের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পড়বার সুযোগ হয়েছিল। লেখকের নাম বা পুস্তিকার নাম আজ মনে করতে পারছি না। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে আমরা যা কিছু অনুভব করি দেখি শুনি ইচ্ছা করি ধ্যান-ধারণা করি অভিজ্ঞতা লাভ করি সবই মনের মাধ্যমে করি। মনকে বাদ দিয়ে ঐসব কোনও ক্রিয়া হতে পারে না। যে জ্ঞান লাভ করি না কেন তার সঙ্গে মনের যোগ না ঘটলে তা জ্ঞানের পর্যায়ে যেতে পারবে না। লিখতে বসে তাঁর সে কথাগুলি মনে পড়ে গেল। মনোবিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করতে গেলেও ঐ সাধকের কথাকেই সমর্থন জানাতে হয়। মনোবিদের কাছে মন হল বিচারের প্রধান ক্ষেত্র। মন কি করে, কেমন করে করে ইত্যাদি অনুসন্ধান করা বিচার করা মনোবিদের প্রধান কাজ। সেজন্য মনই তার পর্যালোচনার বিষয়, মনই তার কর্ম-ক্ষেত্র বলা যায়। যোগদর্শনেও চিত্তবৃত্তির পূর্ণ নিরোধ ঘটানো যে কত কঠিন আর তা যে কত কম সংখ্যক সাধকের পক্ষে সম্ভব হয় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিত আছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা করার এখানে প্রয়োজন নেই। আর সে বিষয়ে সম্যক আলোচনার অধিকারীও আমি নই। সুতরাং সে চেষ্টা করতে যাবো না। যেখানে সাধনার ফলে পরমেশ্বর ও প্রকৃতি বিযুক্ত হয়ে যায়, যেখানে কেবল চেতনাবস্থা বিরাজ করে সেখানে চিত্তের ও মনের বিলোপ ঘটে। সেই অবস্থার সম্বন্ধে স্বভাবতই মনোবিদের হস্তক্ষেপ বলার অধিকার থাকে না। অন্ততঃ আমার সে সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। যে সাধনায় ঐ নির্গুণ আত্মায় স্থিতি লাভ সম্ভব বলা হয় সে সাধনার কিছুই আমার নেই। সুতরাং সে কথা থাক। এ লেখায় জীবাত্মা পরমাত্মার কথা আনার সার্থকতা নেই। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আমাদের মনের সাহায্য ছাড়া ঘটতে পারে না, সেরকম যে-কোনও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেই মনঃসমীক্ষণ রীতিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তা ছাড়া অধ্যাত্ম বিষয়ই হোক বা অন্য যে কোনও বিষয়ই হোক, স্বপ্নে যদি তা ধরা দেয় তবে তা মানস ক্রিয়ার গণ্ডিতেই আছে বলা যেতে পারে। স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্বে এ কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছি যে স্বপ্ন একপ্রকারের মানস ক্রিয়া, যার মাধ্যমে মনের নানা রকমের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা চলে। এসম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি দরকার হবে না। যা বলা হয়েছে তা থেকে একথা সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে যে অধ্যাত্ম বিষয়ও যদি স্বপ্নে ধরা দেয় তখন তাও স্বপ্নের উল্লিখিত ক্রিয়াদির নিয়মের মধ্যে এসে পড়ে। ফলে তেমন স্বপ্নও অন্য যে কোনও স্বপ্নের মতই মনঃসমীক্ষণ রীতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নে দেখা বা অনুভব করা কোনও ভগবৎ কৃপার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বপ্নে দৈব কৃপা করুণা বা রোষের চিত্র, অনেক দেখতে পাওয়া যায়, অনেক অনুভূতির কথাও শুনতে পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ প্রণালীতে সেই সব স্বপ্নের বিশ্লেষণ করতে বিশেষ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। সময় সময় অবশ্য স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর বিশেষ অনুভূতির সম্বন্ধে তাঁর অবাধ ভাবানুষঙ্গ দিতে পারেন না। ভাবানুষঙ্গ না পেলে স্বপ্নের অর্থ বোঝা যে সম্ভব হয় না তা অনেকবার বলেছি। এখানেও সেই কারণেই স্বপ্নে প্রকৃত অর্থ বুঝতে হয়ত বাধা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তাই বলে তেমন স্বপ্ন বৈজ্ঞানিক রীতিতে বিশ্লেষণের বাইরে এমন কথা বলা যায় না। অবাধ ভাবানুষঙ্গ দেওয়া অনভ্যস্তের পক্ষে সহজ হয় না। কিছুদিন অভ্যাস করলে অনেকের পক্ষেই স্বপ্নের বিষয় অবাধ ভাবানুষঙ্গ দেওয়া সম্ভব হয়। একথাও ঠিক যে, সংখ্যায় খুব কম হলেও, কিছু কিছু স্বভাবের মানুষ ঐ ভাবানুষঙ্গ উপযুক্ত মত, চেষ্টা করেও, দিতে পারেন না। তাঁদের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা কঠিন, সে যেরকম স্বপ্নই হোক না কেন। অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষক তাঁদের দেখা সেরকম স্বপ্ন থেকেও, নিজের অভিজ্ঞতার ফলে, মোটামুটি একটা অর্থের ইঙ্গিত পেতে পারেন কিন্তু তা থেকে স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। একই কারণে কোন কোন মানসিক রোগীর স্বপ্নও ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়। নানা বাধা থাকায় সকলের সব স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। ঐ রকম কোনও

দুরূপনের বাধার জন্য কোন কোন অধ্যাত্ম বিষয়ের স্বপ্নও হয়ত ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা ঘটতে পারে। তা না হলে অধ্যাত্ম বিষয়ক স্বপ্নও মনঃসমীক্ষণ রীতিতে বিশ্লেষণ করা যায়।

এরপর সপ্তম প্রশ্ন বা শেষ প্রশ্নটির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। প্রশ্নটি বেশ জটিল, যুক্তিসঙ্গত ও সার্থক বলে মনে করি। প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছেন—স্বপ্নের অর্থ বুঝতে হলে যে ভাবানুষঙ্গ থেকে তা বুঝতে হয় তাতে ত অনেক কথা আসতে পারে. এত কথা থেকে কোন কথাগুলি নিয়ে স্বপ্নের অর্থ বোঝা হবে তা ঠিক করা যায় কি করে? আর একই ভাবানুষঙ্গ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সমীক্ষক কি একই অর্থ বের করতে পারেন?

প্রশ্নটি যদিও এক সঙ্গে করা হয়েছে তবু প্রশ্নটির দুটি ভাগ আছে। বলা ভাল যে প্রশ্ন একটি নয় প্রশ্ন রয়েছে দুটি। এক হল ভাবানুষঙ্গ থেকে কোন্ কোন্ অংশ নিয়ে স্বপ্নের অর্থ ঠিক করা হবে। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, একই ভাবানুষঙ্গ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মনঃসমীক্ষক কি একই স্বপ্নার্থে পৌঁছবেন?

স্বপ্ন সম্বন্ধে যে সব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে এখানে আবার তার উল্লেখ করব না। যাঁরা সে বিষয় পড়েছেন তাদের সে সব মূল বক্তব্য মনে আছে ধরে নিয়েই যা বলবার আছে বলছি। বারে বারে একই কথায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

স্বপ্নদ্রষ্টা যে স্বপ্ন বলেন—তাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে নিয়ে পৃথকভাবে এক এক অংশের ভাবানুষঙ্গ দেবার জন্য স্বপ্নদ্রষ্টাকে বলা হয়। স্বাভাবিক নিয়মেই এক-কথায় অনেক কথা এসে পড়ে। সেসব কথাই লেখা হয়ে থাকে। এইভাবে যখন স্বপ্নের সবগুলি অংশের ভাবানুষঙ্গ পাওয়া গেল তখনই সমীক্ষকের কাজ শুরু হয়। ভাবানুষঙ্গে অনেক রকমের অনেক কথা বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন অংশের ভাবানুষঙ্গের মধ্যে মূল একটা যোগসূত্র ভেতরে ভেতরে কাজ করে যায়। এই যোগসূত্রটিকে ধরতে পারা, বুঝতে পারাই মনঃসমীক্ষকের প্রধান কাজ। বিশেষ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা না থাকলে এই সূত্র ধরতে পারা কঠিন। শিক্ষার অভাবে সেখানে ভুল করার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। প্রত্যেক স্বপ্নের ঐ মূলসূত্র বা মূল অর্থ একটিই থাকে। কিন্তু তার শাখা-প্রশাখা অনেক থাকতে পারে। তাদের মধ্যেও কোনওটা হয়ত কিছু বিস্তৃত, কিছু স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়, আবার অনেকগুলি কেবলমাত্র আভাসে ইঙ্গিতে একটু জানান দিয়ে মিলিয়ে যায়। মূল অর্থের সঙ্গে এই শাখা-প্রশাখারও যোগ থাকে, তাদের মধ্যেও একরকমের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সেই সম্পর্ক বুঝে তাদের কি রকম প্রভাব মূল অর্থে এসে পড়েছে তা বুঝতে পারা যায়। এখানেও বলতে হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলে ও সেই শিক্ষার প্রয়োগ কৌশল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অর্জন করতে না পারলে এই সব জটিল সম্পর্ক ধরা অতি কঠিন এমন কি প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। স্বপ্নে যেমন অতিপ্রয়োজনীয় অংশ সাধারণ এমন কি অতিসংক্ষেপে বা অস্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে পারে—তেমনই ভাবানুষঙ্গ দিতে গিয়েও মন অবদমনের প্রভাবে বিশেষ অংশের অনুষঙ্গ বিস্তৃত করে দিয়ে মূল অংশ সংক্ষেপে সেরে দিতে চেষ্টা করে, এমন কি বিভিন্ন স্বপ্নাংশের ভাবানুষঙ্গে মন একই চাতুরী করে যেতে পারে। অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষকের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়া উচিত এবং অধিকাংশ সময়ই তা ধরা পড়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা হিসেবে একথা মানতে হবে যে যত অভিজ্ঞই হোন না কেন, স্বপ্নের এমন ভাবানুষঙ্গের অংশ পাওয়া যেতে পারে যা অভিজ্ঞ সমীক্ষকেরও দৃষ্টি সাময়িকভাবে এড়িয়ে যেতে পারে। যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, তিনিও যে মানুষ তাঁরও যে ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব একথা স্বীকার করে নিতে হবে। বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞের সুবিধা এই যে, তাঁদের ভুল খুব কম হবার সম্ভাবনা থাকে আর একবারের বদলে দুতিনবার করে একই ভুল হওয়া প্রায় অসম্ভব। মনে রাখতে হবে সমীক্ষক নিজেও সর্বজ্ঞ নন, তার জ্ঞানও সীমিত। ব্যক্তিগত কারণে মনের বিশেষ কোনও দিক যদি তাঁর সুষ্ঠুভাবে স্বপ্নদমুক্ত না হয়ে থাকে তবে অপরের মনের সেই দিকগুলির দিকেও তার অন্ধতা কাজ করতে পারে। যদি তা হয় তবে স্বপ্নের যে সূত্র মনের ঐ দিকে চালিত হবে সে সূত্র সেই সমীক্ষকের কাছে ধরা দেবে না। সেখানে তাঁর ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। পরে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলব।

যদি তেমন কোনও বাধা সমীক্ষকের নিজের না থাকে আর যদি স্বপ্নদ্রষ্টা তার দেখা স্বপ্নের বিভিন্ন স্বপ্নাংশের ভাবানুষঙ্গ দিতে পারেন তবে সেই ভাবানুষঙ্গ থেকে স্বপ্নার্থের মূল সূত্রটি ধরে নিতে অসুবিধা হয় না। তারপর ঐ মূল সূত্রের সঙ্গে যে অন্যান্য শাখা প্রশাখার উল্লেখ থাকে তাদের মধ্যে কোনটাকে গ্রহণ করলে মূলার্থের বিষয় বুঝতে স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে সহজ হবে তা বুঝে নিয়ে প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। যার দীর্ঘ দিন ধরে সমীক্ষা চলতে থাকে তাকে স্বপ্নের ও তার রোগ-লক্ষণের বিভিন্ন অংশগুলি ক্রমে বিস্তৃত করে দেখানো হয়ে থাকে। প্রথমাবস্থায় তা করা উচিত নয়। যা বলা হল তা থেকে বুঝতে পারা যাবে যে ভাবানুষঙ্গ যত বিস্তৃত ও বিভিন্ন বিষয়ে ভরে থাকুক না কেন তার মধ্যে থেকে মূল অর্থটুকু বের করে নেওয়া অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পক্ষে সাধারণত কঠিন হলেও অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। এবং তা হয়ও না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই সমীক্ষকের নিজের দিকে তাকাতে হয়। বস্তু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যেকের বেলাতেই তিন-দুগুণে ছয় হয়, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমন নির্দিষ্ট করে সব সময় বলা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এখানে ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও বোধ-অনুভূতির প্রশ্ন এসে জটিলতার সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন একজনে যদি বলেন 'এই হলদে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন একজন অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী ফরহ্যান্স পেষ্ট সহজ প্রাপ্য করার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। পাঁচ বছরের ওপর হয়ে গেল আমি এই টুথপেষ্ট ব্যবহার ক'রে আসছি। এই টুথপেষ্ট আমার দারুণ প্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, এই শহরে আমার কিছু বন্ধুরাও ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।"

—এম.এ. অনন্তরামন, বম্বে

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফোটোস্ট্যাট) জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পারেন)

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাত্রে আর সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স ওরাল অ্যাকশন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন—আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনামূল্যে ! তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" পেতে হলে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে ১। ১১টি ভাষায় পাওয়া যায়।

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট—এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

104F-102 Ben.

গোলাপটা কী সুন্দর!' ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু বলতে পারেন 'হলদে গোলাপ আবার একটা গোলাপ নাকি', গোলাপ হবে লাল, গন্ধে ভুবভুর করবে তবে তা!' এটা হল ব্যক্তিগত রুচি ইত্যাদির পরিচায়ক—গোলাপের বিশেষ মূল্যায়ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও এই ভাললাগা না লাগার কারণ ইত্যাদি বুঝতে পারা যাবে না—যতক্ষণ বৈজ্ঞানিক তাঁর বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি বজায় রেখে গোলাপের মূল্য

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুঁড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
বিজ্ঞানিক
১০০% খাঁটি হয়

'ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

বিচার ও অন্য বিচারকারীর মনোভাব বিচার করে চলতে পারবেন না। যদি সেই মান রক্ষা করে তিনি চলতে না পারেন তবে সেটা বিজ্ঞানের দোষ নয়, দোষ হবে বৈজ্ঞানিকের শিক্ষার ও সামর্থ্যের। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে বলবার সময় লিবিডোর বিষয় আলোচনা করেছি। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ফ্রয়েড কাম অর্থে কেবল যৌন কামকে বোঝাননি। কামনাযুক্ত যে কোনও ভোগ-লিপ্সা জড়িত ইচ্ছাকে কামজ ইচ্ছা বলা হয়েছে। সেই সূত্রে আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-স্থানগুলির সঙ্গে যে আমাদের কাম জড়িত থাকে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের যেমন লৈঙ্গিক কাম আছে তেমনই মুখকাম, পায়ুকাম ইত্যাদি কামবৃত্তিও আছে। যদি এমন কোনও সমীক্ষক থাকেন যাঁর মুখকাম (ওরাল লিবিডো) উপযুক্তরূপে উপযোজিত (অ্যাডজাস্টেড) হয় নাই, তবে তাঁর পক্ষে সমীক্ষা করবার সময় নিজের মুখকামের যোগ্য সমাধান (অ্যাডজাস্টমেন্ট) না হওয়ার ফলে, অপরের মুখকামের সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মূল্য আরোপ করে বা তার বিপরীত মুখকামের বিশেষ মূল্য না দিয়ে, সমীক্ষার্থীর দেওয়া ভাবানুষঙ্গের ব্যাখ্যায় তথা তার স্বপ্ন ব্যাখ্যায়, তাঁর নিজের অন্ধতার জন্য, ভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। অভিজ্ঞতা ও নিজের দিকে নজর রেখে যে সমীক্ষক চলেন, তাঁর পক্ষে এই দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তা না হলে একদেশ-দর্শিতার ত্রুটি তাঁর বিচারে থেকেই যাবে। এইখানেই সমীক্ষকের যোগ্যতা ও পার-দর্শিতার প্রশ্ন এসে পড়ে। সাধারণ দৈহিক রোগ যেমন অধিকাংশ চিকিৎসকই ধরতে পারেন চিকিৎসা করতে পারেন বলা যায়, কিন্তু বিশেষ কোনও জটিলতা দেখা দিলে যেমন চিকিৎসকের মধ্যেও যাঁরা বিশেষ খুশলী তাঁদের সাহায্য নিতে হয়, মনঃ-সমীক্ষণের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। ঠিক এই কারণেই একই ভাবানুষঙ্গের অর্থ বিভিন্ন সমীক্ষকের ব্যাখ্যায় কিছু ইতর-বিশেষ হতে পারে। কিন্তু তা মূলেই গোল-মাল হওয়া উচিত নয়। যদি কোনও সময় তা ঘটে তবে একজনের বিচারে কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে বা একান্ত দোষদুষ্ট হচ্ছে মনে করতে হবে। অবশ্য অভিজ্ঞতার অভাবেও এ ধরনের কিছু কিছু ভুল হতে পারে। তবে মনের প্রকৃতি এমন যে যতক্ষণ তার সমস্যার সমাধান না হচ্ছে ততক্ষণ মন তার সমস্যার ক্ষেত্রগুলি বারে বারে নানা উপায়ে সমীক্ষকের কাছে তুলে ধরতে থাকে। সমীক্ষক যদি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেন তবে একবার দুবার ভুল করলেও বারে বারেই একই ভুল করতে পারেন না। যদি না তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সমীক্ষণের মধ্যে বিশেষ কোনও ত্রুটি থেকে যায়। সেরকম হতে থাকলে সমীক্ষককেও পুনঃসমীক্ষণের ব্যবস্থা হতে হবে। মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রে এই নির্দেশই দেওয়া আছে। সমীক্ষক নির্ভুল ও সর্বদোষত্রুটি মুক্ত হয়ে পরোৎকর্ষ (পার্ফেকশন) লাভ করেছেন এমন মনে করা ভুল।

শিক্ষা দেবার যেমন ত্রুটি থাকতে পারে তেমনই শিক্ষা লাভ করার মধ্যেও ক্ষমতার কম-বেশী ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে। সব চিকিৎসক একই পরীক্ষা পাশ করেও চিকিৎসায় সমান পারদর্শিতা লাভ করতে পারেন না। কারও গ্রহণ করার মধ্যে ভুলত্রুটি থেকে যায়, কারও গ্রহণ করবার ক্ষমতা কম-বেশী থাকে আবার কারও বা যা শেখা হয়েছে তাও প্রয়োগ করতে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। মনঃসমীক্ষকেরও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমা আছে, যা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাছাড়া যেসব ব্যক্তিগত আবেগের বাধা-বিপত্তি কাজের সময় জটিলতা বাড়ায় তারও প্রভাব কিছু কম নয়। নিজের এইসব নানা বাধা অসুবিধা ও পরোজনের অভাব যে থাকা সম্ভব সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। এবং সে সম্বন্ধে নিজে ভাবানুষঙ্গ নিয়ে নিজেকে আরও ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করে যেতে হয়। তা না হলে ক্রমে ক্রেদ জমে জমে একরকমের মানসিক অন্ধতার সৃষ্টি করে। যার ফলে অপরের সমীক্ষার কাজেও বাধা দেখা দেয়। সমীক্ষক সর্বদা সজাগ থেকে চলবেন, রোজ নিজের সমীক্ষণ করবেন—এটা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তা না হলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ ত দূরের কথা আংশিক সার্থকতা লাভও হয়ত সম্ভব হবে না। এখানে আবার বলে রাখা দরকার যে মনঃসমীক্ষণের শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার্থীদের কিভাবে নিজের ও অপরের মনের সমীক্ষণ করে যেতে হয়, সেই প্রণালীটাই শেখান হয়। আর সেই সঙ্গে তার মূল গুচ্ছৈষাগুলির (কমপ্লেকস) সমাধান ও উপযোজনার (অ্যাডজাস্টমেন্ট) দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষা দেওয়া হয়। এতে তার পরোৎকর্ষের (পার্ফেকশন) কথা ওঠে না। যেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকবে সেখানে তাদের বিচারের ফলেও কিছু পার্থক্য থাকা অসম্ভব বলা যায় না। এই সামান্য পার্থক্যের সম্ভাবনা মেনে নিলেও স্বপ্নের যে ভাবানুষঙ্গ পাওয়া যায় তা থেকে মোটামুটি একই রকম মূল অর্থ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু তার মধ্যেও মতবাদের বিভিন্নতার ফলে একই ভাবানুষঙ্গ থেকে ভিন্ন রকমের মূল অর্থ বোঝা হতে পারে। যেমন ফ্রয়েড, ইয়ুথ ও আডলারের ভিন্ন মতবাদানুসারে একই স্বপ্নের কিছু কিছু পৃথক অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের একটু তলিয়ে দেখলে এই বিভিন্ন মতবাদের গভীরেও একটা সমার্থকতা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সে আলোচনার দরকার নেই। মোটামুটি এই কথাই বলা চলে—বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ বাধা হয়ে না দাঁড়ালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই ভাবানুষঙ্গের একই অর্থ বিভিন্ন সমীক্ষকের সমীক্ষায় পাওয়া যায়।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

(২৯)

নতুন করে আবার খুব ধরপাকড় শুরু হলো। এখন যেন জানাচেনাদের মধ্যে থেকেও কাউকে কাউকে ধরে নিয়ে যেতে শুনছি।

আশ্চর্যের কথা আমাদের পাড়ারই একটা মেয়েকে নাকি ধরে নিয়ে গেছে। তাদের বাড়িতে ঢাকঢাক চুপচুপ! বলতে চেষ্টা করছে মেয়ে ইস্কুল থেকে পিসির বাড়ি চলে গেছে।...সেকথা কি আর টেঁকে?

বাড়িতে ঝি নেই?

আরাই সংবাদদাতা নয় পাড়ার?

ওই ঝিটিই অন্য অন্য বাড়িতে গিয়ে বলে আসছে পিসির বাড়ি নয়, মামার বাড়ি'।

গায়ে হলুদের জন্যে তো আমাদের বাড়ি ভর্তি লোক, সবাই মানে অবশ্য মহিলাকুল, বলাবলি করতে লাগলেন, 'মামার বাড়ি' তো গেলেন মেয়ে, কিছুদিন পরে ঘুরেও আসবেন, তখন? ওই জাত-যাওয়া মেয়েকে নিয়ে কী করবে মা বাপ।

জাত যাওয়া?

তা নয়?

জেলখানার ভাত খাবে, পুলিশের হাতে পড়ে আরো কি অকথা লাঞ্ছনা হবে ভগবান জানেন, আর জাতটি অটুট থাকবে?

আমার তো অসহ্য কথা শুনলেই জিভ সুড়সুড় করে, বলবো না ভেবেও বলে ফেলি, 'আর এই যে ছেলেরা ঘরে আসছে, দাদা ঘুরে এলো?'

কে জানতো তার ক ঘন্টা পরেই দাদাকে আবার উল্টোমুখো ঘুরতে হবে।

যাক এক মহিলা বোধহয় মাসীমার কোনো জা, তিনি বলে উঠলেন, শোনো কথা! ছেলে আর মেয়েয় সমান হলো? জাত মেয়েমানুষেরই যায় বাছা। বেটাছেলের আর কে কবে জাত যেতে দেখেছে? তারা মোছল-মানের দোকানের মুর্গীও খাচ্ছে লুকিয়ে-চুরিয়ে, মদভাঙও খাচ্ছে, স্বভাবচরিত্রও খারাপ করছে, কে আর তাকে জাতে ঠেলা করছে?"

'তা জাতটা যায় কোনখান দিয়ে বলুন তো? ছেলেদেরটা যেতে দেখা যায় না, মেয়েদেরটাই দেখা যায়?',

উনি ভাবলেন, আমি ও'কেই ব্যঙ্গ করলাম, উনি রাগ করে উঠে গেলেন।

আচ্ছা কেউই কেন কিছু তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে না। আগে তো শুনেছি হাসপাতালে গেলেও জাত যেতো। আমা-দের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেই শুনেছি, শক্ত অসুখে কি প্রসব হতে গিয়ে মরে গেল, তবু হাসপাতালে নিয়ে গেল না। কারণ না বাঁচলো তো না বাঁচলো, পৃথিবীর নিয়ম পালন করলো। কিন্তু বাঁচলে? সেই অশুচি অশুদ্ধ দেহটা নিয়ে আর জাত-যাওয়া জীবনটা নিয়ে তার কী গতি হবে?

সত্যি কতো শুনেছি হতো এরকম।

এখন তো তা হচ্ছে না?

এখন তো তেমন মরণবাঁচন কাণ্ড দেখা দিলে নিয়ে যাচ্ছে মেডিক্যাল কলেজে।

বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনীর স্রষ্টা
নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো

সাধারণের বই সংগ্রহে সুবিধার্থে মাত্র পাঁচ টাকা জমা নিয়ে গ্রাহক করা চলছে। গ্রাহকদের ২০% কমিশন দেওয়া হবে। জমার টাকা শেষ খণ্ড থেকে বাদ যাবে। প্রতি খণ্ডের দাম দশ টাকা।

এ যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখিকা
আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

ওরা বড় হয়ে গেল

প্রকাশিত হলো — দাম পাঁচ টাকা

বিমল মিত্রের
সাড়া জাগানো উপন্যাস
আমি ১০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অসাধারণ সৃষ্টি
অশনি সংকেত ৫॥

বর্তমান সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ লেখক
সুমথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা

প্রকাশিত হচ্ছে — দাম পাঁচ টাকা

অমর সাহিত্য প্রকাশন — ৭ টেমার লেন, কলি-৯

বেঁচে ফিরে এলে, একবার গঙ্গাস্নান করিয়ে নিচ্ছে আর মহাপ্রসাদ খাইয়ে নিচ্ছে। তা জেলফেরৎ মেয়েকেও না হয় তাই করবি?...

তা নয়।

সে মেয়ে শেষ হয়ে গেল।

তার আর বিয়ের আশা নেই।

দূর!

এসব কথা বেশীক্ষণ এগোল না, গায়ে-হলুদের তত্ত্ব এসে গেল, সবাই পাত্রপক্ষের 'নজরের' সমালোচনায় তৎপর হলেন, তারপর তো ক' ঘন্টা পরেই দাদা চলে গেল।

তবু বিয়ে দিতেই হবে যথাদিনে যথালগ্নে। সেই অমোঘ শক্তি সব করিয়ে নেবে।

যেটা দেওয়া হয়ে গেছে।

রাত্তিরে দিদিকে কড়া করে বললাম, 'দেখ দিদি! সারা জীবনে মরবার অনেক সময় পাবি। সুযোগেরও অভাব হবে না। মরাটা তো নিজের মুঠোয়। এখন আর বাবাকে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিসনে খবরদার! এই দুটো দিন শক্ত হয়ে থেকে বিয়েটা উদ্ধার করতে দে বাবাকে।'

দিদি ক্ষীণগলায় বললো, 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলি? তবুও ভাল। একটু মায়া-মমতার পরিচয় দেখালি। আমিও তাহলে ঘুমিয়ে বাঁচি. দুটো দিন। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার চোখ খারাপ হবে বাবার জোগাড়।'

দিদি নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ঘুম আসবে তোর? দাদার কথা মনে পড়বে না?'

'পড়লেও, ঘুম আসবে। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা মন্দই বা কী?.....ওই লালবাড়ির মেয়েটার মত আমারও জেলে যেতে ইচ্ছে করছিল।'

দিদি ঝাঁঝালো গলায় বললো, 'তা তুমি পারো। যা মেয়ে তুমি!'

'তুমিও কম মেয়ে নয়। পুতুলবাক্সে বিষ পুঁজি করছিলে।'

'থাম। চুপ কর রুচি। দুদিন পরেই তো চলে যাবো, আর ঝগড়া করতে হবে না।'

আমার চোখে হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক পুকুর জল এসে গেল।

আমি দুহাতে দিদিকে আঁকড়ে ধরলাম। সেই ছেলেবেলায় গায়ের লেপ সরে গেলে শীত করলে যেমন আঁকড়ে ধরতাম।

দিদিও আমার পিঠের ওপর হাতটা রাখলো।

তারপর দিদি চুপিচুপি যা বললো, তার সার অর্থ হচ্ছে বিয়ের শিশিটা ভেঙে যাবার পর ওর একটা দিব্যজ্ঞান এসেছে, তাহলে এখনো 'সময়' আসেনি ওর। আরো কিছুদিন লড়তে হবে।

তারপর বাবার এই কষ্ট দুঃখ জ্বালা।

সত্যিই এখন দিদি যদি ওই কার্পেট পরে বসে, বাবা হয়তো হার্টফেল করে বসবেন।

বাবার কথাই মনে এসেছে দিদির। বলেছে, 'মা তবু কাঁদেন কাটেন মনের ভার কমে, বাবার জন্যেই ভাবনা। তবে মরতে আমায় হবেই। এইসব র‍্যালাগুলো মিটলেই—'

যাক আপাততঃ তো নিশ্চিন্দি।

বিয়েটা যখন হবেই তখন সবই হবে।

হলও।

যথারীতি আলো জ্বললো, শাঁখ বাজলো, লোকে বাড়ি ভরে গেল। লুচি-ভাজার গন্ধ রাস্তার মোড় থেকে পাওয়া গেল' বরযাত্রীরা এসে ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করলো, আবার তাদের খোসামোদ করে ঠাণ্ডা করতে হল।

খেয়ে যাবার পর মেয়েদের সঙ্গে ছাঁদা দেওয়া হল, ছোট ছেলেরা পানের রসে সিল্কের পাঞ্জাবি খতম করেও আবার পান সঙ্গমে মন দিল।

নিমন্ত্রিতেরা রান্নার সুখ্যাতি আর পরিবেশনের অখ্যাতি করতে করতে বিদায় নিলেন, দু-দশজন বাসর জাগাতে রয়ে গেল। এবং তারস্বরে বরের 'গোমড়া মুখের ব্যাখ্যানা করতে লাগলো।

মানে বিয়েবাড়িতে, (মানে মেয়ের বিয়ের) যা যা হয় তার এক তিলও ত্রুটি হল না।

তবে বাড়তির মধ্যে সবাই যাবার সময় একবার বাবাকে 'আহা' করে গেল।

আর শুধু একটা জিনিস ভুল হয়ে গেল, সেই পদ্য বিয়ের সেই 'প্রীতি উপহার' সেগুলো আর বিলোনো হল না। যেমন প্যাকেটসুদ্ধু আলমারীর মাথায় তুলে রাখা হয়েছিল তেমনি তোলাই রয়ে গেল।

কারুরই তার কথা মনে পড়লো না।

মনে পড়লো পরদিন সকালে দিদি নিজেই।

একসময়, যখন মুখটুখ ধুতে বাসর ছেড়ে বর চলে গেছে নীচের তলায় গাঁঠ-ছড়ার ভারটা কনের ঘাড়ে চাপিয়ে, আর কনে সেটাকে সামলে সামলে মুখ ধুচ্ছে চুল বাঁধছে কাপড় ছাড়ছে তখন। একবার বুঝি যে চুল বাঁধছিল সে আরো কাঁটা অনাতে গেছে, তখন দিদি আমায় ডেকে বললো, 'হ্যাঁরে, সেই পদ্যগুলো কাল বিলানো হয়নি?'

দিদির মুখে খুব দুঃখের ছাপ দেখলাম।

আমিও অবশ্য দুঃখিত না হয়ে পারলাম না, আমার গুণপণাটা মাঠে মারা গেল। তবে দিদি এতো দুঃখিত হচ্ছে দেখে অবাক লাগলো।

দিদির দুঃখের কারণ দুটো।

এক হচ্ছে কেউ দেখলো না।

দিদির বিয়ের যে একটা পদ্য হয়েছে টেরই পেল না কেউ। দ্বিতীয় হচ্ছে দিদি নাকি বরের কাছে বলে ফেলেছিল খবরটা, মানে বরযাত্রীরা পেয়েছে দেখেছে ভেবেই বলেছিল, তাতে নাকি বর হেসে বলেছে 'লিখেছে বুঝি আমার ওই শালীটি? তা কিসে লিখেছে? অদৃশ্য কাগজে, অদৃশ্য কালিতে?

সেই থেকে রাগে অপমানে জ্বলছে দিদি।

আমায় বললো, 'দে বার করে ওর নাকের সামনে। রীতিমত প্রতিপক্ষ ভাব।'

আমি বললাম, 'বেশ তো ভাব জমিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। তুই দে না তোর বরকে।'

দিদি বললো, 'আমি দেব? আলমারির মাথায় হাত যায় আমার?'

অগত্যাই আমাকে আমার নতুন জামাই-বাবুর নাকের সামনে ছুঁড়ে মারতে হলো তাঁদের বিবাহের প্রীতি-উপহার'টি।

কিন্তু কপাল আমার, জামাইবাবুর সপ্রশংস দৃষ্টি লাভের সুযোগ আর হলো না, 'বরকনে নিতে এসেছে, বরকনে নিতে এসেছে' রব শুনে ছুটতে হলো এদিক ওদিক।'

অতঃপর কনে বিদায়ের পালা।

'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কন্ব মুনি হয়েও বিচলিত হয়েছিলেন, অতএব গেরস্থরা কোন ছার।

কনকাঞ্জলী দিয়ে মা তো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন, বাবাকে শেষ অবধি খাড়া থাকতে হবে। বাবা অবিরত পাঞ্জাবির হাতাটা কপালের কাছে তুলছেন, যেন ঘাম মুছতে।

আমার কথা আর বলছি না।

আমার মধ্যে যে আবার এতো দুর্বলতা ছিল তা কে জানতো?

দিদির তো কেঁদে কেঁদে অনেকদিন থেকেই চোখের অসুখ ধরে যাবার জোগাড়। এবার বোধহয় অন্ধ হয়ে যাবে।

তবে এসব আন্দাজের মধ্যে ছিল।

যেটা ছিল না, সেটা হচ্ছে মেজদার ব্যাপার।

মেজদাকে দিদি যেই প্রণাম করলো, মেজদা ওর মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলতে গেল, 'যাবো যাবো দেখতে যাবো।'

মেজদার গলাটা ধরে গিয়ে ভেঙে গেল, বলতে পারলো না। মেজদা হঠাৎ সরে পড়লো।

সকালবেলা দিদি যখন সেই পদ্যর কথা বলছিল, তখন যেন আশা হচ্ছিল, হয়তো দিদি আস্তে আস্তে সংকল্পচ্যুত হয়ে যাবে।

কিন্তু যাবার সময় যা মুখ দেখলাম ওর তাতে আবার ভরসা হারালাম।

আর আশ্চর্য, দিদি চলে যাবার পর দিদির জন্যে মন কেমন করার বদলে হঠাৎ ফুলির জন্যে বেজায় মন কেমন করতে লাগলো।

কি জানি ফুলির শ্বশুরবাড়ির মতনই বিচ্ছিরী শ্বশুরবাড়ি হবে কিনা দিদির।

বরগুলোকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না।

চেলি চন্দন পরে ভালমানুষের মত মুখ করে বসে থাকে, নিজভূমিতে গিয়ে অন্য মেজাজ ধরে।

(ক্রমশঃ)

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বিজ্ঞানের কথা

আকাশ-আঁচড়ানো অট্টালিকা ও ঝোড়ো বাতাস

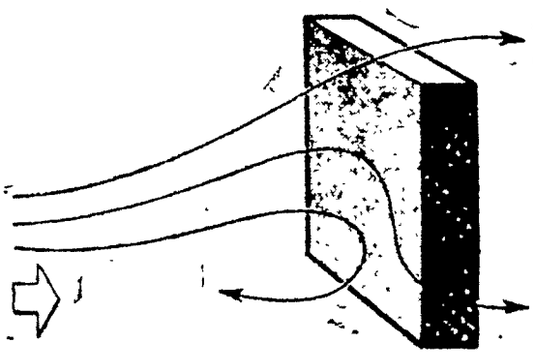

১নং চিত্র। উঁচু অট্টালিকায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বাতাস, উপর দিয়ে ও পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বাতাসের চেহারা।

স্কাইস্ক্রেপার, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আকাশ-আঁচড়ানো অট্টালিকা, কলকাতা শহরে এখন আর নতুন দৃশ্য নয়। পার্ক স্ট্রীট থেকে শেকসপীয়র সরণি (থিয়েটার রোড) পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) ধরে এগিয়ে গেলে গোটা কতক চোখে পড়ে। অন্যত্রও আছে এবং আরো হবে। দেশলাই-এর বাকসের মতো চেহারার এই অট্টালিকাগুলো অন্তত চোখের দেখায় প্রীতিকর নয় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শতবার্ষিকী ভবনের জায়গায় পুরনো সেনেট ভবনের কথা ভাবুন), কিন্তু সে আলোচনার স্থান অন্য। তবে ধরে

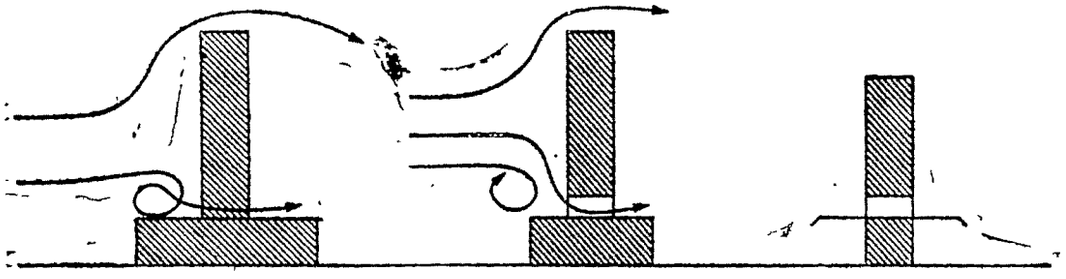

২নং চিত্র। পথচারীদের নিরাপত্তার জন্যে উঁচু অট্টালিকা কি-ধরনের ব্যবস্থা সমন্বিত হওয়া উচিত তার চেহারা।

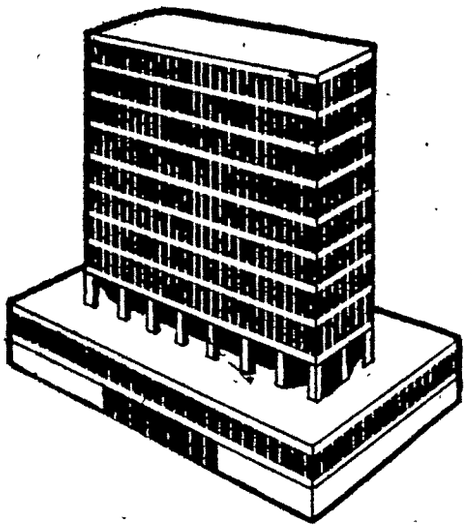

৩নং চিত্র। ছোট বেদীর ওপরে তোলা উঁচু অট্টালিকা, একটি তলা তাই ফাঁকা রাখা হয়েছে। পথচারীরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। অট্টালিকাটিরও ক্ষতিগ্রস্ত হবার কোনো আশঙ্কা নেই।

নেওয়া চলে, আধুনিক একটি শহরে স্কাই-স্ক্রেপারকে ঠেকানো যাবে না, সে আসবেই। এ-সপ্তাহের বিজ্ঞানের কথায় এই স্কাই-স্ক্রেপারের সঙ্গে সম্পর্কিত অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়ে আলোচনা তুলতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে—আশেপাশের অন্যান্য অট্টালিকার তুলনায় আচমকা অনেক উঁচু একটি অট্টালিকা থাকার দরুণ বাতাসের গতি-পরিবর্তন ও তীব্রতা বৃদ্ধি এবং সেই হেতু পথচারীদের বিপদের আশঙ্কা বা এমনকি খোদ অট্টালিকাটি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা। বিষয়টি গুরুতর, ইউরোপ ও আমেরিকার যে-সব শহরে স্কাইস্ক্রেপারের প্রাধান্য সেখানকার স্থপতিরা বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করছেন।

গুরুতর এ-কারণে যে ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে গিয়েছে—আমাদের দেশে নয়, বিলেতে। আশি বছরের এক মহিলা একটি স্কাইস্ক্রেপারের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, অট্টালিকার কোণার কাছে পৌঁছতেই বাতাস তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যায় ও আছড়িয়ে ফেলে। মাথার খুলিতে চোট পেয়ে তিনি মারা যান। ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৭২ সালের এপ্রিলে, ১৬তলা উঁচু একটি ফ্ল্যাটবাড়ির সামনের ফুটপাথে।

কলকাতার কোনো স্কাইস্ক্রেপারের সামনের ফুটপাথে এ-ধরনের দুর্ঘটনা এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু এমনও মনে

বেগে প্রবাহিত বাতাস এবং তার ফলে সৃষ্ট সাক্‌শনের ফলে অট্টালিকা কি-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এই চিত্র থেকে বোঝা যায়। আরো বোঝা যায়, বাতাস ও তজ্জনিত সাক্‌শনের তীব্রতা অট্টালিকার কোণার দিকেই সবচেয়ে বেশি। ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি অট্টালিকার ছয় ও সাত তলায়।

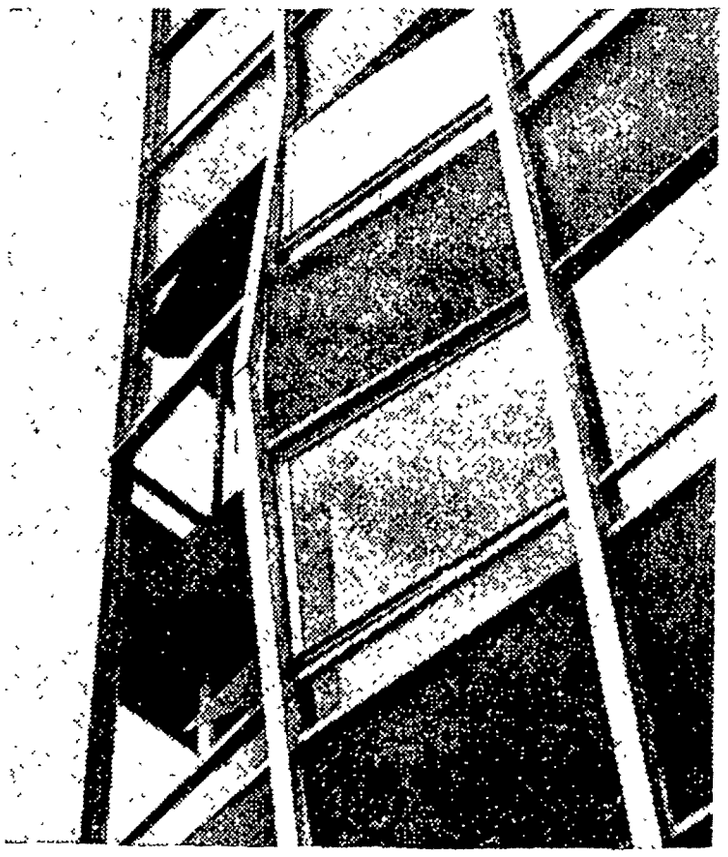

হয় না যে, এ-ধরনের দুর্ঘটনা নিবারক ব্যবস্থা সমন্বিত হয়ে এই আকাশ-আঁচড়ানো অট্টালিকাগুলো তোলা হয়েছে। সাইনবোর্ডের ঘোষণা থেকে জানা যায়, এই এলকায় আরো স্কাইস্ক্রেপার উঠছে। এই সমস্ত স্কাই-স্ক্রেপারের যাঁরা স্থপতি তাঁরা যদি আগে থেকেই মডেল তৈরি করে নিয়ে বাতাস-চলাচলের ব্যাপারটিও পরখ করে দেখেন তাহলে ভালো হয়। ব্যাপারটা খরচের বটে, কিন্তু স্কাইস্ক্রেপার তোলার খরচ যাঁরা বহন করতে পারেন তাঁদের কাছে হাজার কয়েক টাকা হয়তো খুব বেশি নয়। কলকাতা শহরে বিশেষ বিশেষ সময়ে এমনিতেই বাতাসের দাপট খুব বেশি (যেমন কালবৈশাখীর ঝড়ের সময়ে), মাত্র একটি স্কাইস্ক্রেপার থাকার দরুন বিশেষ একটি এলাকায় সেই দাপট কয়েক গুণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন, মানুষ কেন, আরোহী সমেত গোটা একটি গাড়িও মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

অট্টালিকা খুব উঁচু হলে প্রচুর পরিমাণ বাতাস তাতে বাধা পায়। এই বাধাপ্রাপ্ত বাতাসকে একটা কোথাও যেতে হবে। কোন্‌-দিকে যাবে? কিছু অংশ অট্টালিকায় ধাক্কা খাবার পরে ঘুরে যায় নিচের দিকে, তার-পরে মাটিতে ধাক্কা খেয়ে আবার ঘুরে যায় অট্টালিকা থেকে দূরের দিকে—অর্থাৎ, বাতাস যেদিকে বইছে তার বিপরীতদিকে। পথচারীর কাছে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? বাতাস যে-দিক থেকে বইছে অট্টালিকার সেই দিকে যদি তিনি থাকেন তাহলে তাঁর কিন্তু মনে হবে বাতাস বইছে অট্টালিকার দিকে নয়, অট্টালিকা থেকে বিপরীত দিকে এবং তার তীব্রতাও অনেক বেশি (১নং ছবি দেখুন)।

বাতাসের সবটাই এমনিভাবে অট্টালিকার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় না, বেশ খানিকটা অট্টালিকার কোণাগুলো দিয়ে পার হয়ে যায়। ফলে অট্টালিকার কোণাগুলোতে বাতাস হয়ে ওঠে বিশেষ রকমের প্রবল। অট্টালিকা না থাকলে যতোটা প্রবল হত, অট্টালিকা থাকার দরুণ তার দ্বিগুণ প্রবল।

অট্টালিকার নিচের তলায় যদি পথ খোলা রাখা হয়, কিংবা খোলা জায়গা, তাহলে আটক-পড়া বাতাস বেরিয়ে যাবার পথ পেতে পারে। সেখানেও কিন্তু বাতাসের তীব্রতা হবে অট্টালিকা না থাকলে যা হত তার তিনগুণ।

পথ খোলা রাখা বা খোলা জায়গা রাখা আকাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে, কেননা তার জন্যে পুরো একটি তলা কোনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সে-ক্ষেত্রে, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা সুপারিশ করছেন, অট্টালিকাটিকে স্থাপন করা উচিত একটি বড়ো বেদীর ওপরে (২নং ছবি দেখুন)। বেদীটি থাকার দরুণ বাতাসের তীব্রতা বৃদ্ধি হবে বেদীর ছাদের ওপরে—একতলা কি দোতলার উচ্চ-তায়। ফলে পথচারীরা নিরাপদ। এই বেদী যদি ছোট হয় তাহলে কিন্তু বাতাস পার হবার জন্যে একটি তলা ফাঁকা রাখা চাই। এমনকি এক্ষেত্রে বেদী না রাখলেও চলে। তবে, যে-কথা আগে বলেছি, শুধু বাতাস পার হতে দেবার জন্যে পুরো একটি তলা ছেড়ে দেওয়া আকাঙ্ক্ষিত নাও হতে পারে।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ-ধরনের ব্যবস্থা সমন্বিত না হলে উঁচু অট্টালিকার সামনে দিয়ে মানুষ চলাচলের পথ থাকা উচিত নয়, এমনকি দোকানপাটও নয়। থাকলে বিপদ ঘটতে পারে।

উঁচু অট্টালিকা বলতে কত উঁচু? দেখা গিয়েছে, অট্টালিকা যদি ২৫ মিটারের বেশি উঁচু হয় (ছ'তলা) বা আশেপাশের অট্টালিকা থেকে দ্বিগুণ উঁচু হয় তাহলে সেই অট্টা-লিকা থেকে ঝোড়ো বাতাসের উদ্ভব হতে পারে। সাধারণত ধরে নেওয়া হয়, বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে ৫ মিটার (ঘণ্টায় ১১ মাইল) পর্যন্ত সহনীয়। কিন্তু এই বেগের বাতাসও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে—চুল ওড়ে, পোশাক এলোমেলো হয়ে যায়, ইত্যাদি। বাতাসের বেগ আরেকটু বেশি হলে ধুলো ও টুকরো কাগজ উড়তে শুরু করে। সাধারণ একটি নগর-কেন্দ্রে বাতাসের বেগ সেকেণ্ডে পাঁচ মিটারের বেশি হয়ে থাকে কদাচিৎ, কিন্তু উঁচু অট্টালিকার আশেপাশে প্রায়শই।

সবচেয়ে বড়ো সমস্যা এই বাতাসকে নিয়েই। বাতাসের প্রবাহ যাতে মসৃণ ও সমান হয়, সেজন্যে বিমান-প্রস্তুতকারকরা বাতাস চলাচলের সুড়ঙ্গ-পথের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মাটির কাছাকাছি বাতাস হয়ে থাকে এলোমেলো। তার বেগ মাটির কাছা-কাছি কম, ওপরে বেশি। এ-অবস্থায় বাতাসের বেগ ঠিক মাপে রাখার জন্যে বাতাস চলাচলের সুড়ঙ্গ-পথের মুখে স্লেট-পাথর সাজিয়ে রাখা চলে। তবে কথা এই যে অট্টালিকা নির্মাণের স্থান সর্বত্র এক-রকম নয়। আশেপাশের অট্টালিকায় অবশ্যই ভিন্নতা থাকে। এজন্যে উঁচু অট্টালিকা তোলার আগে গোড়াতেই গোটা এলাকার একটি মডেল তৈরি করে নিয়ে পরীক্ষা করে নেওয়াই ভালো। এই মডেলে অবশ্যই আশে-পাশের অট্টালিকার জানলা-দরজাও যথা-স্থানে থাকা দরকার।

আরো একটি কথা আছে। অট্টালিকার একদিকে যদি বাতাসের চাপ থাকে তাহলে অন্যদিকে সৃষ্টি হয় সাক্‌শন বা টান। আবার অট্টালিকার দুই পাশ দিয়ে বেগে বাতাস প্রবাহিত হবার সময়েও সাক্‌শন তৈরি হয়ে থাকে—যেমন হয় বিমানের ডানায় (যার দরুণ বিমান ওড়ে)।

কলকাতায় যে-হারে স্কাইস্ক্রেপার উঠছে, আশেপাশের অট্টালিকার তুলনায় দ্বিগুণ উঁচু অট্টালিকা উঠছে, তাতে মনে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই বাতাস-চলাচলের ব্যাপারটির দিকেও সবিশেষ মনো-যোগ দেওয়া উচিত। নইলে যে-কোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

—অমৃতকান্ত

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

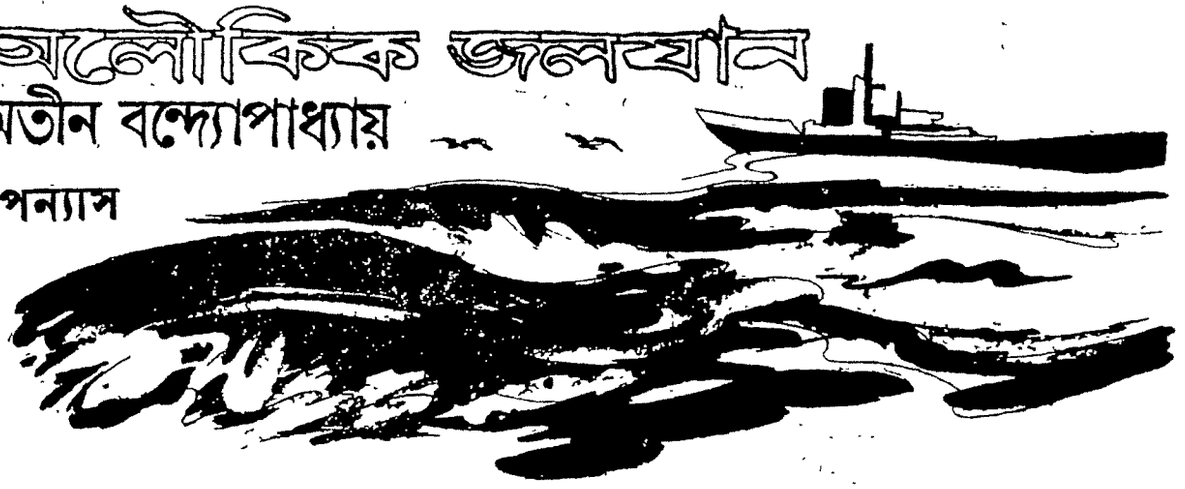

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—বেশ করেছ। এখন এস। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো খেয়ে নাও। কাল সকালে সমুদ্রে পড়ব। তখন আর ঠিকমতো খেতে পারবে না। জাহাজে পিচিঙ আরম্ভ হয়ে যাবে।

মৈত্র এভাবে কখনও ছোটকে তুই তুকারি করে কখনও তুমি তোমার করে। এভাবে সে-রাতে ছোটবাবু বেশ পেট ভরে খেল। মনে হল জাহাজে খুব একটা পরিশ্রমের কাজ থাকে না। যা শুনেছে তা এমন কি ভীতিকর সে বুঝছে না। যদিও সমুদ্রে জাহাজ পড়বে কাল সকালে। তিন জোয়ারে জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। ফলতার কাছে-ওদের একবার নোঙর ফেলতে হয়েছে, বাস্তে এক রেগাস, সকালে সমুদ্র। সমুদ্র দেখতে মন না জানি হবে।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে মনে হল একেবারে থেমে গেছে। বোধহয় গেছে। ছোটবাবু ওপরে উঠে গ। সে চিনতেই পারছে না। নেমে যাচ্ছে জাহাজ থেকে। শ এসে দাঁড়িয়েছে। মাথার বড় বড় পাখি। যেন একটা পুরানো টের পেয়েছে, প্রচুর রা মাস্তুলের ওপর রয়েছে। আর সেই জলরাশি। ছোটবাবু এবং ঠিক ওজন ণ। পাখাপাখিহীন সমুদ্র মিলে এক ন। এভাবে একটা র ভিতর নীল থাকলে আশ্চর্য খিগুলো সাদা তা অনবরত সেই ছোটবাবু এমন এমন একটা

ধীর স্থির সমুদ্র আছে জানত না। পাইলট সিপটাই ছিল ডাঙ্গার শেষ সূত্র। সেও ক্রমে দূরে দূরে সরে একসময় সমুদ্রের ঢেউয়ের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোটবাবু ডেকের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর। জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। বেশ দ্রুতগতিতে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ হেলছে দুলছে। মাস্তুল ডেরিক দড়িদড়া হেলছে দুলছে। এভাবে দাঁড়ালে বেশিক্ষণ সে ডেকে দাঁড়াতে পারবে না। সে দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ছিল, তার-পর সামনে পিছনে বেশ ঝুঁকে ঝুঁকে তাল রেখে হেঁটে গেল। টুইন-ডেক পার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল সামনে। জাহাজের আগিলে সে উঠে দাঁড়াল। শেষবারের মতো বোধহয় পাইলট সিপটাকে সে দেখতে চায়। কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। সে ফিরে আসছে। জাহাজের পিচিঙ আরম্ভ হবে গেল বলে মাথা পেট গোলাচ্ছে। অথচ তার কাজ ফাইবারের সঙ্গে। তাকে এ-জাহাজে এভাবে এ সফরে কাজ করে যেতে হবে। সে আর থামতে পারে না। ফিরে যেতে পারে না।

সে ফিরে আসার মুখেই দেখল জ্যাক মাংস কেটে পাখিদের খাওয়াচ্ছে। জ্যাক লম্বা বয়লার সুট পরেছে। পায়ে কেডস জুতো। ছোটবাবু সন্তর্পণে পালাচ্ছে। পালাবার সময়ই মনে হল কেউ সহসা ডাকছে—হেই। সে পড়ে যেতে যেতে কোন-রকমে উঠে দাঁড়াল দেখল আড়চোখে তাকে দেখছে জ্যাক। সে এবার প্রায় ছুটে পালাল। জাহাজে পিচিঙ. এভাবে ছুটলে সে পড়ে যেতে পারে তার তাও মনে থাকল না।

।। তিন ।।

বারোটা-চারটার ওয়াচ শেষ করে সিঁড়ি ভেঙ্গে সোজা ওপরে উঠে এল মৈত্র। জাহাজের পিচিঙ ক্রমে বাড়ছে। সমুদ্রে বেশ বাতাস আছে। তবু আকাশ পরিষ্কার থাকলে তেমন ভয় থাকে না। ভয় অমিয় এবং ছোটবাবুকে নিয়ে। এরা দুজনই নতুন। এদের দুজনেরই প্রথম সফর। ছোট-বাবু হয়ত পিচিঙ কোন রকমে সামলাবে। কারণ তাকে বাংকারে কাজ করতে হচ্ছে না। কিন্তু অমিয় এ-ওয়াচেই যা দেখলে। সুট খালি করে ফেলেছে। নীচে সে দাঁড়াতে পারছে না। র‍্যাগ দিয়ে আগুন ফার্ণেস থেকে টেনে নামানোর সময় অমিয় জল জল করছিল। একসঙ্গে তিনজন ফায়ার-ম্যানের আগুন টানার ভিতর বেচারা নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিল না। ছাই, আগুনের উত্তাপ, আর আগুনের ওপর জল ঢেলে দিলে প্রচণ্ড গ্যাস। সে গ্যাসের ভিতর নতুন জাহাজির সাধ্য কি দাঁড়ায়। তার ওপর ইণ্ডিয়ান কোল। একেবারে অসাড়।

ওপরে এসেই টের পেল অমিয়র কাজ শেষ হয় নি। অমিয় আগে উঠে ফানেলের গোড়ায় বসে থাকে। কিন্তু সে নেই। আকাশ বেশ মেঘলা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এ-সব লক্ষণ ভাল না। ঝড় অথবা সাইক্লোনের লক্ষণ। এমনিতেই রক্ষা নেই, ঝড়ের ভিতর যে অমিয়টা কি করবে! পাশের বাংকারের কোলবয়, বয়সী মানুষ। তার এই নিয়ে এগারো সফর। সে সব কায়দা-কানুন জানে। সে জানে ওয়াচের পরও কাজ করতে হবে। অন্ততঃ এক ঘন্টা এক নাগাড়ে ওয়াচের পর কাজ না করলে সুট ভরতে পারবে না। অথবা সে এমন-ভাবে এক নাগাড়ে কাজ করে যায়, কোন তাড়াহুড়ো নেই আবার অস্তেও নয়, সে বেশ সোজা সরলভাবে কাজটাকে নিয়ে ফেলেছে। বয়স হলেও মানুষটা গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। সফরের অভিজ্ঞতায় সে সি-সিকনেস হজম করে ফেলেছে।

মৈত্র, বড়-টিণ্ডাল বলে ওয়াচের দায়-দায়িত্ব তার। স্টিম ঠিক রাখার দায়-দায়িত্ব থেকে সব কিছু। সুট এসে ভর্তি না পেলে পরের ওয়াচের ছোট-টিণ্ডাল

অমিয়কে বেগার খাটিয়ে মারবে। ওরা নিচে নেমে গেছে। নেমে এখন আগুন টানছে ফার্নেস থেকে। ফার্নেসের ছাই ঝেড়ে ভিতরে কয়লা হাফড়াবে। এর ভিতর অমিয় সুট ভরে না দিতে পারলে রক্ষে নেই। মৈত্র তাড়াতাড়ি ফের নেমে গেল। ভিতরে একটা লম্ফ জ্বলছে। লম্ফটা আবছা মতো দেখা যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়ো উড়ে চার পাশটা ভীষণ অন্ধকার। প্রথমে ঢুকে কিছু দেখা গেল না। তারপর চোখ সয়ে এলে দেখল, কয়লা সুট থেকে বেশী দূরে নয়। সুটে কয়লা এনে ফেলছে অমিয় আর মনে হচ্ছে সব কয়লা গড়-গড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে। সে আপন মনে দুটো-একটা খিস্তি করছে। দুটো-একটা অশ্লীল চিৎকার এবং চোখ লাল, ঘামে ওর জামা প্যান্টটা জবজবে। টুপি ভিজে গেছে। চোখ আগুনের মতো লাল। সে টলছে। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। বোধ হয় দু-একবার হড-হড করে জল খেয়ে বমিও করেছে।

মৈত্র তাড়াতাড়ি নিজেই গাড়িটা টেনে পর পর কয় গাড়ি খুব দ্রুত কয়লা ভরে ফেলে দিল। অমিয়কে বলল, তুই কোস। এভাবে সুট ভরে না। এতক্ষণ কি করছিলি!

ইচ্ছা হল অমিয়র, বেলচে দিয়ে ঠাস করে মৈত্রের মাথায় একটা বাড়ি মারে। সে এতক্ষণ বসেছিল বুঝি মৈত্র মনে করেছে! সে বলল, টিণ্ডেলে তোমাকে কে আসতে বলেছে। যাও শালা। ভাগো। আমার কাজ আমি যেভাবে পারি করব। কাউকে ডাকি নি তো। শালা নবাবী দেখাতে এয়েছে।

এসব কাজে মাথা গরম হয়। মৈত্র অনেক সফরে এমন সব দেখেছে। সেজন্য সে কিছু বলল না। কেবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কয়লা ভরে যেতে থাকল। বলল, হাত লাগা আমার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকিস না।

এবং এক সময় সুট ভরে গেলে ওরা ওপরে উঠে দেখল, বৃষ্টিতে ডেক ভিজে গেছে। ছোটবাবু কি করছে কে জানে! সে দু দিন থেকে দেওয়ানিতে ভুগছে। কিছু খেতে পারছে না। সব ওক দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। এখন তো আরও বেশী হবার কথা। ছোটবাবু পিচিণ্ডের জন্য ভাল করে রাতে ঘুমোতে পারছে না। হয়ত গিয়ে দেখবে, সে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে বাংকে। চোখে ঘুম নেই। তবু চোখ বুজে আছে। এভাবে নতুন জাহাজীদের হ্যাপা সামলাতে সামলাতে ওর সফর শেষ হয়ে যায়। কোম্পানীগুলো এসব অভিজ্ঞতা দেখিয়ে, নানাভাবে এই সব নতুন জাহাজীদের নিতে চায় না। মৈত্র বোঝে এতে তার দেশের সুনাম নষ্ট। কোম্পানীগুলো এভাবে দুর্নাম ছড়িয়ে ক্রমে এ-দেশের থেকে ক্রু নেওয়া কমিয়ে দিচ্ছে। ওরা বেশী করে এখন চালনা অথবা চাঁদপাঁ থেকে ক্রু তুলে সামলাচ্ছে এখন। এবং এভাবে কিছু দিন চালিয়ে যেতে পারলেই অমিয় ঠিকঠাক একদিন সব নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।

চার পাশটা অন্ধকার। সমুদ্রে সোনা রঙ ফুটে উঠছে না। সকাল হতে এখনও অনেক সময়। অবশ্য সে এ-সময়টা গোল-মালে জামা-কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়ে না। সে নিজেই চা করে নেয়। অমিয় এবং ছোটবাবুকে দেয়। তারপর বেশ সকাল হলে যখন ডেক জাহাজীরা কাজে বের হয়ে যায় তখন সে গড়িয়ে নেয়। ছোটবাবু চা খেয়েই যা সামান্য কিছু আরাম বোধ করছে।

নুন জল মাঝে মাঝে মৈত্র খেতে দিচ্ছে ছোটবাবুকে। এতে দেওয়ানি কমে শরীরের মাথা তেমন ঘোরে না। ওক ভাবটা কমে আসে। সে ডেক ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারল, দেওয়ানি তাকেও কিছু কাহিল করেছে। প্রথম প্রথম সবাই কিছু-না-কিছু কাহিল হয়ে যায়। কিন্তু ছোটবাবুর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। দু-তিন দিনেই চোখ কোথায় ঢুকে গেছে। সুন্দর সুশ্রী মুখ চুপসে গেছে। আর মনে হয় কি যেন একটা ভয় সব সময় তার। ছোটবাবু এসেও কিছু বলছে না। ঝড়ের সময়ই সব চেয়ে বেশী আশংকা। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে মৈত্র ভীষণ রেগে যায়। কেন আসা জাহাজে! কে দিব্যি দিয়েছে। তারপরই মনে হয় কেউ দিব্যি দেয় না। কিনাবায় কাজের কোন সুরাহা না হলে এই সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা জাহাজে চলে আসে। সবারই ভেতরে একটা ইতিহাস থাকে। দুঃখের ইতিহাস। কেউ সখ করে জাহাজে মরতে আসে না। তখন তার ভীষণ মায়া হয় সবার জন্য।

সে গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। খুব আস্তে আস্তে নামতে হয়। কেউ যেন পায়ের শব্দে জেগে না যায়। সারা সময় স্টিয়ারিঙ এনজিনের একটানা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। প্রথম প্রথম অমিয়ও ছোটবাবুর ঘুম আসত না। সম্পূর্ণ একটা আলাদা জীবনে এসে ছোটবাবু কেমন হয়ে গেছে।

অমিয় কোন রকমে জামা-কাপড় ছেড়ে বাংকে গা এলিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু মৈত্র কিছুতেই ওকে বাংকে বসতে দিল না। একজন স্বাভাবিক জাহাজীর মতো অমিয় থাকুক সে চায়। সে বলল, এই ওঠ। স্নান না করে এলে তোমাকে শুতে দেওয়া হবে না। এমন কিছু হয় নি, স্নান না সেরে তুমি বাংকে শুয়ে পড়বে। যাও। ওঠো। সে এই সব কথাগুলো খুবই আস্তে আস্তে বলছিল। যদি ছোটবাবুর চোখে সামান্য ঘুম লেগে থাকে। সে এমনকি আলো জ্বালল না। ছোট হোলের কাঁচটা বন্ধ করে রেখেছিল। গুমোট ভাব। পাইপ থেকে ঠিকমত হাওয়া বের হচ্ছে না। [illegible] পাইপের মুখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দিল। বেশী হাওয়া লাগলে ছোটবাবুর ঘুম ভাল হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য ছোটবাবু চোখ বুজেই বলছে, মৈত্রদা আমি যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি।

মৈত্র কেমন ক্ষেপে গেল, না দাঁড়াতে পারলে আমি কি করব!

—আমাকে বাথরুমে যেতে হবে। কতবার চেষ্টা করেছি। তুমি একটু ধরবে।

মৈত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওঠ, ওঠ! কে বলছে দাঁড়াতে পারছিস না। যত সব বাজে কথা!

—না, সত্যি মৈত্রদা দাঁড়াতে পারছি না। সকাল হয়ে যাচ্ছে ভয়ে আর ঘুম আসছে না। সারেঙের টাং টুং শব্দ কেবল শুনতে পাচ্ছি।

—ওঠ ওঠ বলছি। সে ঠেলে তুলে দিল। সে প্রায় যেন লাথি মারার মতো ঘাড় ঠেলে বের করে দিল ছোটবাবুকে। —যা যা বলছি। পেচ্চাপ করে আয়।

শরীর টলছে বলে সে একটু গিয়েই বাল্কেড ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

এবার মৈত্র খিস্তি করে বলল, কেন যে মরতে আসা। কেউ নেই তোমার জাহাজে। যাও ছোটবাবু। না গেলে সমুদ্রে হাবিয়া করে দেব। তবু সুনাম নষ্ট হতে দেব না আমাদের।

অমিয় ভয়ে ভয়ে আগেই উঠে গেছে। সে স্নান করছে। স্নান করলে শরীরটা ভীষণ হাল্কা লাগছে। সে এখন আর ক্লান্তি বোধ করছে না। ছোটবাবুর জন্য মৈত্র এখনও চেঁচাচ্ছে। এবং সবাই জেগে গেছে। সবাই ফোকসাল ছেড়ে চলে এসেছে। সারেঙ বলছে, তুই মৈত্র ওর পেছনে লেগেছিস কেন!

—কি বলছে শুনুন। এই যা বলছি পেট খালি করে আয়। চা করে দিচ্ছি তারপর ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সবাই যে যার ফোকসালে চলে [illegible] নতুন জাহাজীদের নিয়ে এমন ঘটনা এই জাহাজের ইতিহাসে আছে। রেড-সিতে একবার এ[illegible] জাহাজী স্টোক হোলডের গরমে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে [illegible] ছিল। অথবা একবার [illegible] সি-সিকনেস এমন হয়ে ভিতর দিয়ে এনজিনে [illegible] করেছিল। কেউ কেউ [illegible] যায়। এ-সব ব্যাপারে [illegible] থাকে না।

সারেঙ শুধু [illegible] এয়েছিস যখন, [illegible] যা। দ্যাখ না [illegible] এ-স[illegible] আর প[illegible] অপূর্ব প্রজাপতির মা[illegible] ঐ উড়ে বেড়াচ্ছে [illegible] নিথর জগৎ [illegible]

পণ্ডস ডিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক

ভোরের স্নিগ্ধ পরশের আমেজে সারাদিন আপনাকে ঘিরে রাখে

শীতল জলে স্নানে যেমন সুখের শিহরণ
জাগে···শিশির-ধোয়া ভোরে যেমন
খুশীর পরশ লাগে···পণ্ডস ডিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্‌ক মাখলে তেমনি মনে হবে
ঝরঝরে মনোরম···সারাদিন, সারাক্ষণ।
হালকা-সুবাস জড়ানো এই ট্যাল্‌ক
ঘাম টেনে নেয় নিমেষে আর অঙ্গ
সৌরভ আপনাকে ক'রে তোলে
প্রিয়-সঙ্গিনী! এই ট্যাল্‌ক সারা
বছর সারা শরীরে মাখা যায়।

৩ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ফ্যামিলি, লার্জ, মিডিয়াম

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে
পণ্ডসই রূপসীদের প্রিয়।

চীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস এ.তে সংস্থাপিত)

P-5588

পারব। দ্যাখো পারব। ওরা আমাকে সময় দিচ্ছে না। সে আর দাঁড়াল না। সে উঠতে গিয়ে হুমড়ী খেয়ে পড়ে গেল। মৈত্র ধরতে গেলে বলল, ধরবে না মৈত্রদা। আমি দেখছি পারি কিনা। ভদ্রা জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার, চ্যাটার্জির শেষদিনের বক্তৃতার সময়ের মুখ চোখে ভেসে উঠল। তিনি যেন বলছেন, আমার জাহাজী বন্ধুরা. আজ তোমাদের যাবার দিন। জাতীয় সংগীত গাইবার পরই বিউগিল বেজে উঠেছিল। ডাইনিং হলে সব মাসতাব দিলে তিনি বক্তৃতার মতো করে বলে যাচ্ছিলেন। বলতে বলতে ওঁর গলা ধরে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন জাহাজী বন্ধুরা! আমি তোমাদের নানাভাবে টরচার করেছি। তোমাদের সহ্যসীমা কতদূর দেখেছি। আমার বিশ্বাস তোমরা পারবে। এর চেয়েও অনেক অনেক কষ্ট তোমাদের জন্য জাহাজে অপেক্ষা করছে। হলিস্টেটসে তোমাদের হাতের রক্তপাত আমাকেও ভীষণভাবে টরচার করত। সিনিয়র রেটিঙসদের র‍্যাগিংয়ের কথাও তোমাদের মনে থাকবে। সবই জাহাজে একজন ভালো জাহাজী হবার জন্য। আমার বিশ্বাস যাবার দিনে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে। এখন না পারলেও জাহাজে গেলে ঠিক পারবে। আমার তখন দুঃখ থাকবে না।

আরও অনেক কথা। সব মনে পড়ছে না। এখন সব মনে পড়ার কথাও নয়। তবু সব কথার ভিতর এমনই একটা নির্বাক ছিল। ছোটবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনরকমে এবার উঠে দাঁড়াল। সহজভাবে দাঁড়াতে চাইল। মাথা ঘুরছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু অন্ধের মত ওপরে উঠে প্যান্ট খুলে সামনেই পেশ্চাপ করে দিল। নেমে যাবার ক্ষমতা ক্রমে এভাবে, হারিয়ে ফেললে কি যে হবে। অহঙ্কার শরীরে ফুলে ফুলে উঠছে। সে বলল, স্যার আপনি এত বড় জানতাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আমি যে কিছুতেই পারছি না। আমাকে তো সবাই নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। আমাকে এখনও বাংকারে পাঠায় নি। জানি না পাঠালে আমার কি হবে!

সে প্রায় চোখ বুজেই হাত ধরে ধরে নেমে এল। সমুদ্র থেকে প্রচণ্ড বাতাস উঠে আসছে। সমুদ্রের ঢেউ প্রবল। কিছু কিছু জলকণা শরীরে এসে লাগছে। সে বুঝতে পারল, এখন মে-জুনের সময়। এখন এ-সমুদ্রে ঝড়ঝঞ্ঝা লেগে থাকারই কথা। এ কদিন ঝড়-বৃষ্টি হয় নি সে কপাল ভাল বলে। নিচে নেমে গেলে মৈত্র সোজা দাঁড়িয়ে রাখল ওকে কিছুক্ষণ। এখন শোবি না। আর যখন ঘুম আসবে না। বসে থাক। আমি চা করে আনছি।

ছোটবাবু বলল, এত সকালে কিছু খাব না। খেয়ে আবার ফোকসাল পরিষ্কার করতে হবে।

—সে দেখা যাবে। আমি না পারি টোপাস করে যাবে। টোপাস আছে কি করতে।

—বেশ ভাল বলছ। আমি ঘষি করে ভাসাই, আর ওরা পরিষ্কার করবে।

—বাছা তোমার মুখ থেকে তো এখনও বস্তু উগলে ওঠেনি। এতেই টোপাসের জন্য তোমার এত ভাবনা।

ছোটবাবুর কাছে এর চেয়ে কষ্টের কি আছে জানা নেই। তবু সে চায় না এ-সব কথা আবার দু কান হোক। সে বলল, মৈত্রদা তুমি চেঁচামেচি না করলেই পারতে। বাড়িয়ালা শুনলে কি বলবে! কি ভাববে!

—কিছু ভাববে না। জাহাজে সবারই প্রথম প্রথম এমন হয়। আমারও হয়েছে। সারেঙেরও হয়েছে। তবে ভেঙ্গে পড়বি না। মনে জোর রাখ। কাজ করতে এয়েছিস। বসে থাকতে তো আসিস নি। এখন না হয় মোটর ভেসেল, অয়েল এনজিন এসব হয়েছে, আগে তো এ-সব ছিল না। তোর মতো মানুষেরাই কোম্পানীর আমল থেকে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গেছে। কোম্পানীর জাহাজ সমুদ্রে থেমে থাকে নি। সে লকার থেকে চা, চিনি কনডেন্সড মিল্কের টিন বের করে তরতর করে উঠে গেল। জলটা গ্যালিতে বসিয়ে স্নান করে নেবে বাথরুমে। জল গরম হতে হতে ওর স্নান হয়ে যাবে। নানাভাবে অমিয় এবং ওকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে। শেষের কথা গুলো মৈত্রদার ভারী মজার। যেন এতক্ষণ যে চেঁচামেচি করেছে তার জন্য লজ্জিত। এখন কি করে যে এদের একটু তোয়াজ করবে ভেবে পাচ্ছে না। ছোটবাবু বালকেডে হেলান দিয়ে বসে মনে মনে হাসছিল।

আসলে জাহাজে এভাবেই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, এভাবেই বিদ্রোহ গড়ে ওঠে, এভাবেই জাহাজীরা কখনও কখনও আপন প্রতিপক্ষ হয়ে যায়। যেমন কাপ্তানের ছেলেটা উঠে উঠে ওর সংগে কেমন শত্রুতা আরম্ভ করে দিয়েছে। সে তো কখনও তাকায় না। কিন্তু কি যে ভয়, সে না তাকিয়েও পারে না। তাকালেই দেখতে পায় বড় বড় চোখে ওকে দেখছে। সে তখন ভেবে পায় না এমন করে তাকাচ্ছে কেন। ভয়ে বুক গলা শুকিয়ে যায়। দুটো চোখ এভাবে ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে বুঝি লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। সে ঠিকমতো কাজ করতে পারে কিনা, না সে কাজে ফাঁকি দেয় সে এ-জাহাজে একজন অক্ষম মানুষ, এসব খবর পৌঁছে দেওয়া ওর স্বভাব হতে পারে।

এভাবে সকাল হয়ে যায়। সে চা খেয়ে আজ বমি করে নি। শরীরটা হাল্কা লাগছে। সে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। পোর্টহোলের কাঁচটা বন্ধ করে দিল, সেটা আবার কে খুলে দিয়েছে। পিচিঙ বাড়ছে বলে, জল পোর্টহোল দিয়ে মেঝেতে এসে পড়ছে। সে এবার নিজেই উঠে বসল, এবং বালকেডে একটা পা রেখে মুখের সামনে কাঁচটা বন্ধ করে দিল। ঢেউয়ের ঝাপটায় সব ভিজে যাচ্ছিল।

সবাই ক্রমে সকাল হলে উঠে পড়ছে। সকালের দিকে সূর্যের লাল আলো এসে ফোকসালে পড়ছে। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল, ওপরে উঠে বসে থাকে, কিন্তু, ওপরে বসতে পারবে না। কারণ জাহাজ সামনে-পিছনে দুলছে। এখন সোজা হয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। পিছনে-সামনে ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে সাবেঙ টান্ডু না বললে সে উঠছে না। যতক্ষণ পারে সে এভাবে শুয়ে থাকবে।

এবং কাজের সময়ে সে ফাইভারের সংগে দুটো-একটা কথায় হাসতে পারল না। সমুদ্রে জাহাজটার সাদা রঙ, আর অতিকায় সব ঢেউ চারপাশে। আকাশ আবার মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ কি ভীষণ জোরে হাওয়া দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ডেকের ওপর সমুদ্রের জল। উইনচের নীচে ছোটবাবু কাজ করছিল—ওর প্যান্ট-জামা জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে। সারস-পাখিগুলো জলের ঝাপটায় কোঁ কোঁ করে উঠছে। এখন আসছে আবার সেই ছেলেটা। ফাইভার বুঝতে পারছিল, ছোটবাবুকে সি-সিকনেসে খুব কাবু করেছে। ওকে আজ সে খাটাচ্ছে না। সে নিজেই কাজ করছে। ছোটবাবু পাশে বসে কেবল নাট-বোল্ট, তেল এসব এগিয়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও বা দু পা ছড়িয়ে বসে থাকছে ডেকে। দূরের দিগন্তরেখায় সমুদ্রের অজস্র ঢেউ, ওপরে সমুদ্র-পাখিদের বিচরণ কখনও বা একঘেয়ে নিরিবিলি শান্ত সমুদ্রের ভিতর থেকে জাহাজে এনজিনের শব্দ—আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। এভাবে একটানা শব্দ করে চলেছে এনজিনটা। আর মাস্তুলে ডেক-জাহাজী ইমরান উঠে গেছে। সে ডেক-টিন্ডাল জাহাজের। ফলগুণ বাঁধতে সে ওপরে উঠে গেছে। এ-ঝড়ের দরিয়ায় মাস্তুলে রঙ হবে ভাবতে ওর কেমন গা আবার গুলিয়ে উঠল।

এবং তখনই জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে বোট-ডেক থেকে নেমে আসছে। সে অবলীলায় এ-ঝড়ের সমুদ্রে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে বেশ ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে যাচ্ছে। শরীরে ব্যালেন্স রেখে হেঁটে যাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে ডেক পার হচ্ছে। সে পড়ে যাচ্ছে না। উইনচের ফাঁক দিয়ে ছোটবাবু এমন দেখে অবাক। কাপ্তানের ছেলেটা তো তার চেয়েও কমবয়সী। অথচ কি শক্ত সমর্থ। যখন ঢেউ এসে ডেক ভিজিয়ে দিচ্ছে, তখন এ কি খেলা তার, জল থৈ থৈ করছে ডেকে। সে জল নিয়ে খেলা করছে। সে পরেছে গামবুট। সে সারসপাখিগুলোকে ফুৎকার কাঠে কাল দিচ্ছে। সমুদ্রের জল ততটা এখনও উঠতে পারছে না। সে লম্বা একটা দড়ি দিয়ে

কাঠের বাকসগুলোকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেলছে। এবং কাজ করে যাচ্ছে ঠিক একজন পাকা নাবিকের মতো। ছোট-বাবু উইনচের ফাঁক দিয়ে এ-সব দেখতে-দেখতেই মনে হল, জ্যাক কাউকে এবই ভিতর খুঁজছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশের ওবারপিন-ড্রামের ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। না, আর এখান থেকে ওকে জ্যাক দেখতে পাবে না। তখন পঁচিশ টাকার খালাসী উঠে গেছে মাস্তুলের ডগায়। সে দুলে দুলে সার্কাসের ট্র্যাপিজের খেলা দেখানোর মতো রঙ লাগিয়ে যাচ্ছে।

এখন ভাণ্ডারিয়া কুদেব রসদ নিয়ে ফিরছে। চীফ কুক এপ্রন জড়িয়ে একবার দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। কার্পেণ্টার লম্বা একটা সুতোয় বাঁধা গেজে জাহাজের সাউণ্ডিং নিচ্ছে। মার্কনি সাব বেলিঙে ভর করে সমুদ্র দেখছেন। মেজ-মালোম ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন। ওর চোখ লাম্বাস লাইনের দিকে। কোয়ার্টার মাস্টার কম্পাসের কাঁটা মিলিয়ে স্টিয়ারিঙ সোজা করে রেখেছে। জাহাজ যতই কাত হোক, হেলতে-দুলতে থাকুক, সে কখনও কাঁটা থেকে নড়বে না। কাপ্তান তখনও ঘুমোচ্ছেন। কারণ দিনের বেলায় জাহাজের তেমন ভয় থাকে না। বাতটাই সব সময় সমুদ্রে নানাভাবে কষ্টদায়ক। কি যে গভীর অন্ধকার। তবু তিনি শৈশব থেকে এভাবে সমুদ্রে বিচরণ করে কি অন্ধকার, কি আলোতে, সমুদ্রের ক্ষমতা কতটুকু ধরে ফেলেছেন। যেন সমুদ্রেরও একটা খেলা আছে—এইসব অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র কাগজের নৌকার মতো। জাহাজ এই সেদিন ওর বুকে ভেসে এল। এই সেদিন সমুদ্র দেখছে, ক্রমে এক-দুই, তারপর শয়ে, হাজারে। কি যে তাদের রূপ! কোনটা সাদা, কোনটা কালো কোনটা নীল রঙের। নানা রংয়ের বাহার। আর যখন সমুদ্রে সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, অথবা জ্যোৎস্নার কি যে মায়াবিনী এক খেলা। মাঝে মাঝে ঝড়ের ভিতর এই এক খেলায়, অথবা নিচে কত সব প্রবালের দ্বীপ, বরফের পাহাড়, চোরা স্রোতে জাহাজ আটকে যেতে পারে—তবু এক খেলা, অসীমে এলে এই খেলার রহস্য ধরা যায়। কেবল লুকোচুরি খেলা। খেলায় কাপ্তান দেখেছেন, প্রায়ই জিতে গেছেন তাঁরা। কারণ সমুদ্রেরও বুঝি আছে অসীম ভালবাসা। মানুষের জন্য অসীম আকাঙ্ক্ষা। মানুষের এই সব অতিকায় জাহাজ অতি ক্ষুদ্র কাগজের নৌকার মতো ভেসে বেড়ালে সমুদ্রের ছেলেমানুষী হাতগুলো আকাশের দিকে লাফিয়ে ওঠে। পোষা বেড়াল-ছানার মতো ধরতে চায়। আর জাহাজ-গুলোও বেশ জল কেটে, ঢেউ কেটে ক্রমে সুদূরে চলে যায়। তখন আকাশের নিচে নীল রঙের ছায়ায় আশ্চর্য ছবি। কাপ্তানের স্ত্রী মজা লাগে দেখতে। সমুদ্রের জন্য তখন-প্রায়ই মন-কেমন করে। তিনি ছেলে ফিরে বেশিদিন একা একা থাকতে পারেন না। সমুদ্র তাঁকে টানে।

ছোট-টিণ্ডালের আজ এমন অবস্থা। টিণ্ডাল দেখছিল, ঝড়ে পড়ে বয়লারগুলো ভীষণ মারমুখো হয়ে উঠছে। স্টিম কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তিন নম্বর মিস্ত্রি ছুটে স্টোকহোলডে চলে আসছে। এনজিনের শব্দে কিছু শোনা যায় না বলে, দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার করছে, স্টিম স্টিম, আর তখন স্টোকহোলডে, তিনজন ফায়ারম্যান, দুজন কোলবয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ফার্ণেস ডোর খুলে অনবরত কয়লা হাফড়াতে হচ্ছে। মুখে আগুনের আভা, দাঁড়ানো যাচ্ছে না। গতকালের চেয়ে পিচিঙ আরও বেড়েছে। সমুদ্রের অবস্থা ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ডেকে হিবিঙ-লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন এখন আর বোট-ডেক ধরে উঠে না যায়। দিনের বেলাতে গেলেও রাতের বেলাতে কেউ যেন না যায়। নিচে টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে—সেখান থেকে একটা সোজা সিঁড়ি প্রপেলার স্যাফটের গোড়া দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। এনজিন-জাহাজীরা যেন সেখান দিয়েই যাওয়া-আসা করে—সারেঙ এই বলে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।

এখন টিণ্ডালের মুখেও ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রত্যেকটা ফার্ণেস ডোরে উঁকি দিয়ে দেখছে। এয়ার-বালব সব খুলে দিয়েছে। স্লাইস মেরে ফার্ণেসের ভিতর সব আগুন ঘেঁটে দিচ্ছে। ছাই ঝেড়ে দিচ্ছে আবার। আবার নতুন কয়লা ফায়ার-ম্যানদের অনবরত হাঁফড়াতে বলেছে। সে হাত তুলে যাচ্ছে আর বলছে, জলদি, জলদি, কয়লা হাঁফড়া। ফার্ণেস জ্বালিয়ে দে। সব পুড়িয়ে দে। কসরীর কলজে উপড়ে আন। বলেই সে কখনও মনে ঐশীশক্তি পাবার লোভে, দু হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে ওঠে, আলা-হু-আকবর। অর্থাৎ যারা এই স্টোকহোলডে আছে তাদের প্রত্যেকে তখন এই এক ধ্বনি মিলে একসঙ্গে খুসু পেয়ে যায়। কেউ যখন ফার্ণেস ডোর খুলে কয়লা হাঁপড়াচ্ছে, কেউ যখন ভীষণভাবে আগুনের জ্বলন্ত কঠিন চাঙগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে, কেউ যখন শ্বাস ফেলতে না পেরে উইণ্ডাস-হোলের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে তখন শাঁ শাঁ করে জল নেমে আসছে ফানেলের গোড়া দিয়ে।

এভাবে টিণ্ডাল বুঝতে পারে দরিয়া ক্ষেপে গেছে। দরিয়া ক্ষেপে গেলে মজা পায় বয়লারগুলো। ওদের তখন ভিতরে ভিতরে খেলা। স্টিম গেজের কাঁটা তখন আর উঠতে চায় না। সব স্টিম হুজম করে বসে থাকে। তখন লড়াই মানুষে আর এই বয়লারে। তখন এনজিনিয়ার ছুটে আসে বার বার। এবং যা কিছু গালাগাল আছে সব সে অনায়াসে বলে যেতে পারে। টিণ্ডাল তখন এ-সব গালাগাল শুনতে হবে ভেবে ফের হল্লা এবং ঐশীশক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে উপায় নেই। বিশাল সমুদ্রের বুকে বড় বেশী অসহায় এই মানুষের তৈরী কল—এবং বোধ হয় সেজ-মিস্ত্রির ইতর কথাবার্তা না শোনার জন্যও ফের চিৎকার সকলে মিলে, আল্লা-হু-আকবর। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়াল পালায় জানালা টপকে, সেজ-মিস্ত্রি সুড়-সুড় করে সবে পড়ে। কারণ জানা আছে অনেক ঘটনা এমন। ঝড়ের দরিয়ার বয়লারের পেটে কত যে এনজিনিয়ার এভাবে হাপিজ হয়ে গেছে। ধর-ধর শালোকে। আন ধরে, ক্ষিপ্ত লালায় চোখ, এবং অমানুষের মতো মুখ-চোখ এই সব ফায়ারম্যানদের তখন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, যেন ওরা মানুষ না আসলে দানব, দানব হয়ে যায়, এবং ফার্ণেস ডোর খুলে ঠেলে দেয়, যাও জাহান্নামে। মিস্ত্রি মানুষেরা সেজন্য ঝড়ের দরিয়ায় খুব একটা স্টোক-হোলডের ভিতর ঢোকে না। গলা বাড়িয়েই বলে চলে যায়—স্টিম মাংতা।

তখন সমুদ্রের জল স্টকহোলডের ভিতরে। জাহাজ ভীষণ কাত হয়ে যাচ্ছে। আবার উঠে যাচ্ছে, আবার ডানদিকে হেলে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউ বোট-ডেক উঠে আসছে। মনে হচ্ছে ঝড় মাস্তুলের জড়িদড়া উড়িয়ে নিচ্ছে। আকাশের নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে শুধু সমুদ্র গভীর জল, নীল অন্ধকার অন্য ট্রেনের চাকার যেমন শব্দ তেমনি এনজিন শব্দ চলছে, আর যাচ্ছি না আমি, যেতে পারছি না আমি। এনজিন এবং বয়লার ক্রমাগত যেন এমন বলে চলে যাচ্ছে।

এবং এরই ভিতর সেই অমানুষের মতো দানবের চোখ মুখ, হিংস্র ভয়াল দেখলে বোঝাই যায় না, গনি, জব্বার, মান্নান এদের নাম। লম্বা উঁচু চেহারা। মাথায় ফেজ টুপি, কালো বঙ। বকলারের ছাই টানায় মুখ সাদা ফ্যাকাশে। ওপরে অন্ধকারে কেউ নেই, শুধু লম্ফ জ্বলছে। নিচে কোল-বয় দুজন জল খাচ্ছে আর যে আগুন নিচে স্টোক-হোলডে টেনে নামানো হয়েছে, তা জল দিয়ে নেভাচ্ছে। ওরা মাত্র দুজন। তিনজন ফায়ারম্যান আযাসে যা করছে, ওরা জীবন দিয়েও যেন সেটা নেভাতে পারছে না। কি প্রচণ্ড আগুনের তাপ, সারা স্টোক-হোলড লাল এবং মনে হয় এর ভিতরটা আগুনের উত্তাপে লাল হয়ে গেছে। ওরা দুজন, অর্থাৎ দুজন কোলবয় ক্রমান্বয়ে জল মেরে ছাই এম-রিজেকটারে হ্যাপিজ করে যখন উঠে যাচ্ছে তখন ওদের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। যে দুটো পোকা লোহার রেলিং ধরে উঠছে, উঠতে উঠতে একটু দাঁড়িয়ে পড়ছে, জাহাজ কাত হলে ওরা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। জাহাজের ওপর দিয়ে জল গড়ালে ওরা বেলিঙের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে উঠতে উঠতে ওপরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে না।

আর ঠিক সাতটার সময় পিছিলে হঠাৎ খবর এসে গেল, একজন পড়েছে।

কে পড়েছে! সবার মুখ নীল।

পড়েছে। নাম, লতিফ। লতিফ মানে সেই বুড়ো রোগা লোকটা। সারেঙ যাকে ধরে এনেছিল। সে কান্নাকাটি করেছে—যাবে না, এখন বলেছে। যে সিপিং অফিসে এ-জাহাজে আসতে হবে ভেবে, নদীর পাড়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। যাকে এনজিন সারেঙ প্রায় টানতে টানতে লাইনে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

বড় নিরীহ মুখ। বয়সের ছাপ মুখে ভীষণ। বয়স নাড়িতে কি আছে ঈশ্বর জানে। কিন্তু মুখ চোখ দেখলেই মনে হয়, ভিতরে ভিতরে সে অসহায়। কয়লার জাহাজের নাম শুনলেই মুখ ফ্যাকাসে। সে যেতে চায় না। আর এস এম সিডল ব্যাঙ্ক আসছে শুনলে, সে লাথি থেকে বের হয় না। না খেয়ে থাকে, টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায় তবু মানুষটা কয়লার জাহাজে যাবে না। সেই মানুষটাই পড়েছে।

কেউ ডেক ধরে যেতে পারছে না। ঝড় বৃষ্টিতে সমুদ্র আবছা মতো। জাহাজ কাত হয়ে জলের কাছাকাছি যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। সব পাখিগুলোর খাঁচা বোট-ডেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। মোটা মোটা দড়ি দড়ায় বাঁধা। একটা খাঁচা এর মধ্যে কখন যে ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে কেউ জানে না। ওপরে ওঠা যাচ্ছে না। দুজন একজন অতি প্রাচীন নাবিক, খুব দরকারি কাজে ডেকের ওপর দিয়ে হিবিং লাইনে ঝুঁকে ঝুঁকে বোট ডেকে উঠে যাচ্ছে। বেশ একটা খেলার মতো যেন ওরা ব্যালেন্সের খেলা দেখাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ ওপর দিয়ে ভেসে গেলে ওরা হিবিং লাইন ধরে জানায় মাছ হয়ে যায় মাঝে মাঝে।

অর্থাৎ ওরা লম্বা হয়ে যায়। প্যারালাল বারে খেলা দেখাবার মতো। খুব অনায়াসে ওরা ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে বের করে দিতে পারে। তারপর স্নান করে আসার মতো। নোনাজলে শরীর তখন জবজবে ভেজা। এমন যখন জাহাজের অবস্থা এখন ছোটবাবু দেখল, কেউ নড়ছে না। বেশ বসে গল্প গুজব করছে সবাই।

ছোটবাবুর এখন ডেকে কাজ। সে আজ চপাটি কিছুটা খেতে পেরেছে। সে খুব দুর্বল ভিতর থেকে। তবু সে শক্তভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করছে। যখন মানুষটা বাংকারে পড়েছে তখন নিশ্চয় সবাই সেখানে এখন ছুটে যাবে।

সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময়ই বুঝল, আসলে সে এখন কিছুই তাড়াতাড়ি করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য কেউ পিছিলে কোন তাড়াহুড়া করছে না, কেমন যেন এটা জাহাজে সব সময়ই হয় ভাব। কেউ বলছে, কে পড়ল রে! ট্যারা লতিফ না বুড়া লতিফ।

জাহাজে দুজন জাহাজি, লতিফ নামে। একজন ফায়ারম্যান। অন্যজন কোলবয়।

—বুড়া লতিফ।

—বুড়া মানুষের হাড় শক্ত। এটা কি নামের কথা। বুড়া জানে জাহাজ চলে ভাল।

আরও সব রসিকতা, কেউ বড় একটা এই নিয়ে ভাবছে না। মৈত্র এখন ঘুমোচ্ছে অমিয় ঘুমোচ্ছে। ওদের শরীর একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে হেলে যাচ্ছে। তবু ওরা নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। ওপরে ছাদের গ্যালিতে থালাবাসন পড়ার শব্দ। এবং ঝড় ঝঞ্ঝা হলে যা হয়, একটা চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ, আর স্টিয়ারিং এনজিনের কফ্ কফ্ শব্দ। অতিকায় সব প্যানিয়ানের ভিতর কফ কফ্ আওয়াজ উঠলে ছোটবাবু ঘাবড়ে যায়। এটা যে কি হচ্ছে! বুড়ো লতিফের জন্য কেউ ভাবছে না। এবং যেতে যেতেই সে শুনল, কে যেন বলছে, বেটা কুড়ের বাদশা। কতদিন থেকে সফর করে। সেই কয়লায়ালা। আর এক ধাপ এগোচ্ছে না।

যেন এটা ধারণা মানুষের বিশেষ করে এই সব জাহাজিদের, পড়ে যাওয়া মানে দুবলা লোক, দুবলা লোকের জায়গা জাহাজে নয়, সরমের কথা, এবং এদের জন্য মায়া মমতা দেখানো পাপ। যেন এটা ঠিকঠাক থাকে, সমুদ্রে সাইক্লোন টাইফুন অথবা কঠিন হিমবাহের পাশাপাশি জাহাজ চালিয়ে নেওয়া, কখনও কখনও কলকব্জার ভিতর মারামারি লেগে যায় অথবা যদি ইন্ডিয়ান কোল থাকে জাহাজে তবে তো একটা কঠিন মারামারি। এসব জয়ের ভিতর জাহাজী জীবনের হামেসা সুখী হওয়ার ব্যাপারটা থেকে যায়। এবং যারা এ-সব পারে না, তারা জাহাজিদের মুখে কালি দেয়। তাদের জন্য মায়া দ্যাখানো ঠিক না।

একবার ইচ্ছা হল মৈত্রদাকে ডেকে তোলে। এখনও মৈত্রদাই তার কাছে যাবে। সুখে দুঃখে সব পরামর্শ সে দেয়। কিন্তু ওয়াচের পর ঘুম, ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক না। এমন একটা যখন কঠিন মারামারি, মার মার কাট কাট বয়লারে, তখন ওদের ঘুমোতে দেওয়াই উচিত। ওপরে উঠতে পারলে ঝড়ের দরিয়াটা একবার দেখা যেত। সে একবার গ্যালির ওপরে উঠেও গিয়েছিল, কিন্তু সেই সমুদ্রের অতিকায় সব ঢেউ পাহাড়প্রমাণ ছুটে আসছে দেখলে কেমন মাথা ঘুরে যায়। এবং সেই চাপা আওয়াজ, লক্ষ লক্ষ দানবের হাহাকারের শব্দ। সে ভয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে না উঠে, নিচে সোজা টানেলপথে নেমে গেল। এবং ক্রমে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে যেতে, অনেক নিচে নেমে যেতে যেতে কিছুটা প্রায় পাতালে নেমে যাবার মতো, সে প্রপেলার স্যাফটের পাশ কাটিয়ে নুয়ে নুয়ে এনজিনরুমে ঢুকে গেল। তারপর যেন দেখতে না পায় কেউ, কিছুটা চুপিচুপি, তার কাজ যদিও ফাইভারের সঙ্গে কিন্তু ডেকের ওপর সমুদ্রের ঢেউ এসে ঝাপটা মারছে বলে হয়তো ফাইভার নিয়ে কোন কাজটাজ করবে, ফাইভারকে খুঁজতে স্টোক-হোলডে ঢুকে গেল। এখানে কাজকর্ম ঠিক চলছে। সে ছোট টিন্ডালকে দেখতে পেল না। আর সবাই কাজ করে যাচ্ছে। কে বলবে, এই জাহাজে একজন মানুষ বাংকারে পুড়ে আছে। অজ্ঞান, হয়তো জ্ঞান লোপাট।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শ থেকে
আরাম পাবার
জন্য
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!
Bensons-2141 BEN

সে আবার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে গেলেই দেখল, সারেঙ নেমে আসছে। সারেঙকে দেখে ছোটবাবু না বলে পারল না, চাচা লতিফ পড়ে গেছে শোনলাম।

—হুঁ।

—পড়ে গেছে কেন?

—তুই নিচে যা। এখন ওদিকে যাস না।

—কেন!

—না। বলছি, যাস না।

—কে আছে ওর পাশে।

—কেউ না।

—আমি একটু দেখে আসছি চাচা।

সহসা সারেঙ ওর হাত ধরে ফেলল। —যাবে না। যাবে না বলছি। চোখ গরম করে বলল, নিজের কাজ করগে।

—কিন্তু.....।

—কিন্তু টিন্তু জাহাজে না...।

তবু মানুষের কি হয়ে যায়। সে বলল, না আমি যাব।

সারেঙ বলল, যাও। গেলে মরবে।

মানুষের এমন হয়, এমন হয়ে থাকে, এটা মানুষের স্বভাব। ছোটবাবু ঠিক বোঝে না, জাহাজে এলে মানুষেরা এমন কঠিন হয়ে যায় কেন। সে বোঝে না, এটা মানুষের তো স্বভাব না। মানুষতো এমন-ভাবে সব কিছু এড়িয়ে যেতে চায় না। ভিতরে ভিতরে তার যে অসহায় ভাবটা ছিল কেন জানি সেটা ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। বড় মিস্ত্রি, মেজ মিস্ত্রি, সেজ-মালোম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বাংকারে ভীষণ অন্ধকার। একটা মাত্র লম্ফ জ্বলছে বলে সে প্রথমে দেখল সাদা সাদা পোশাকে তারা ঘোরাফেরা করছে। যেমন ভূতের মতো যেন এবং কাছে গেলে সে আর ফিরে আসতে পারল না, দেখল লতিফ লম্বা হয়ে পড়ে আছে। হাত-পা ছড়ানো। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। চোখ কেমন ওপরে উঠে গেছে। এবং মুখের রঙ কয়লার ধুলোতে কালো। পিছনে পাহাড়প্রমাণ কয়লার ঢিবি। ছাদ পর্যন্ত ঠেকে আছে। কয়লার গাড়িটা উল্টে গেছে। সুট থেকে কয়লা হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে। এবং কয়লা টেনে সুট একেবারে খালি করে ফেলেছে।

তখনই যেন পেছন থেকে হাঁক। কারণ ছোটবাবু বুঝেছিল ওখানে ওর থাকা ঠিক না। সে পালাবে। কিন্তু তখনই শব্দ—হেই।

সে ফিরে তাকাল। দেখল মেজ-মিস্ত্রি খুব শক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

মেজ-মিস্ত্রি ফের চিৎকার করে বলছে, গো অন!

সে ঠিক বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং বোধ হয় মেজ-মিস্ত্রি জানে এও সেই জাহাজি মানুষ, অক্ষরজ্ঞান নেই মূর্খ এবং কথা বোঝে না। মেজ-মিস্ত্রির লম্বা হাত-পা নুয়ে বেলচাটা তুলে কয়লার ঢিবির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর এক দুই করে বেলচায় কিছু কয়লা তুলে দেখাল। এ-কাজটা ছোটবাবুর এখন করার দরকার। না হলে জাহাজ চলবে না। সুট খালি হয়ে গেছে। নিচে যমুনাবাজুর ফায়ারম্যানের কাছে কয়লা নেই।

ছোটবাবুর অন্য কাজের কথা, তব. মেজ-মিস্ত্রি জাহাজে সব। ওদের অন্তত সব। ওর ওপরে ফায়ারম্যান, তার ওপরে গাঁজার, তারপর টিন্ডাল, সারেঙ, সারেঙের মা-বাপ জাহাজে মেজ-মিস্ত্রি। ছোটবাবুর কোন কিছু করার নেই। সে হাতে বেলচে নিয়ে প্রায় যেন ভূত দেখার মতো গাড়িটা কয়লার পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল। এবং সে জানে এই জাহাজে সে ঠিক এখন লতিফের মতো। অন্ধকার বাংকারে দিনের পর দিন তার কাজ। সে ঠিক বুঝতে পারল না, সে কাজ করছে। সে জানে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম মেজ-মিস্ত্রি। প্রায় তার কাছে তিনি সেই প্রাচীন কালের ফারাওদের মতো। অসীম ক্ষমতা। ছোটবাবু গড় গড় করে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আর ষাঁড়ের খেলার মতো অসীম উৎসাহ মানুষটার, যেন লাল রুমাল উড়িয়ে দেওয়া, সাবাস। জলদি। আরও জলদি। জোরে। দু হাত ওপরে তুলে, হারি আপ। ম্যান হারি আপ। থামো মাত। চালা জলদি। কাম ঠিক মাংতা। এবং ছোটবাবুর হুঁস ছিল না। সে একটা তাঁতের মাকুর মতো সুটের কাছে গাড়ি ভরে, আসছে যাচ্ছে। অন্ধকারে সে এখন কয়লার গুঁড়োর ভিতর অস্পষ্ট দেখছে সব। কয়লা হড়হড় করে নেমে আসছে নিচে। পায়ের কাছে। গাড়ি ভরে সে হাতল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভিতরে রয়েছে জ্যাক। জ্যাক মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে ওকে। কখনও কখনও অপলক। তখন ছোটবাবুর ভিতর কি করে যে ভয়টা কেটে গেছে। সে বেশ মানুষের মতো ভাবছে নিজেকে। সে সত্যি ভয় পাচ্ছে না। আর তখনই মনে হল মেজ-মিস্ত্রি লতিফের মুখের কাছে জুতোর টো নিয়ে আসছে। জুতোর টো দিয়ে দেখছে, মানুষটা কেমন আছে। অর্থাৎ মুখ নেড়ে দিতে যাচ্ছে। এবং তখনই ছোটবাবুর সেই সব দিনের কথা, কেউ যেন হাতি চড়ে যায়, রাজার মতো নিরুদ্দেশে যায় সব মনে পড়ে যায়। এবং বড় এক নদীর কথা মনে পড়ে। নদীর পাড়ে পাড়ে সেই সব প্রাচুর্যের দিনগুলো মনে পড়লেই ভিতরে সাহস বেড়ে যায়। সম্মানবোধ বেড়ে যায়। মানুষ হিসাবে সে কালো বলে কালো মানুষের ওপর তার প্রীতি বেড়ে যায়। এই যে মেজ-মিস্ত্রি মাঝে মাঝে টো দিয়ে মুখ নেড়ে দিচ্ছে, জ্ঞান ফিরে এসেছে কিনা দেখছে এটা সারেঙ সাব দেখেও কিছু বলতে পারছেন না। তিনি চুপচাপ। এবং দেখছেন, অর্থাৎ যা ভেবেছিলেন ছোঁড়াটা নিজের দোষে মরল। এবং রাগে তিনি আর ছোটবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন না।

সারেঙের মাথায় এখন নানা ভাবনা। কি করে এটাকে বোট-ডেকে তোলা যাবে। এখানে পড়ে থাকলে চলবে না। ওপরে তুলে নুন জল খাওয়াতে হবে। ভাল করে স্নান করিয়ে দিতে হবে। এবং মধ্যে মাঝে সেই জুতোর ঢৌ এগিয়ে আসছে, ওরা সাহেব-মানুষেরা লতিফকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছে। ছোটবাবু দেখছে সব। ভিতরে যে এমন একটা রক্তপ্রবাহ মানুষের মাঝে মাঝে থেকে যায় সে জানে না। মাথাটা কেন যে গরম হয়ে যাচ্ছে। সে কাজে কোন অবহেলা দেখাচ্ছে না। তবু আবার জুতোর ঢৌ মেজ-মিস্ত্রি লতিফের মুখের দিকে এগিয়ে আসলে সে গাড়ি উল্টে দিল, বেলচেটা দূরে ফেলে দিল, এবং কাছে এসে খুব আলতোভাবে যেন কত বিনয়ের সঙ্গে সে মেজ-মিস্ত্রির পায়ের কাছ থেকে করুণ ভিক্ষার মতো লতিফের মুখটা সরিয়ে নিল। তারপর চোখ তুলে তাকাল মেজ-মিস্ত্রির দিকে। ছোট-বাবু লম্বা মানুষ। সে এই বেঁটে ছোটখাট মানুষটাকে কাঁধে ফেলে নিল এবার।

সারেঙ কেমন ঘাবড়ে গেল। লতিফকে এভাবে তোলা যাবে না। সে তোলার জন্য দাঁড়দড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিল। আর ছোটবাবু ভোরবাতের দিকে বমি করেছে, ওপরে উঠতে পারত না, যেমন নির্জীব মানুষ. সে কিনা এখন এই ঝড়ের সমুদ্রে এমন একটা ভয়াবহ কাজে জড়িয়ে পড়ছে। মেজ-মিস্ত্রি প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি, সে একটা নেটিভ ইণ্ডিয়ানের কাছে কি আশা করতে পারে, অথচ নেটিভ-ইণ্ডিয়ানটা অনায়াসে বের হয়ে যাচ্ছে টলতে টলতে। পড়ে গেলেই নিচে, স্টোক-হোলডে। দুটোই গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু এমনভাবে কাঁধের ওপর ফেলে নিয়েছে যে এখন আর কিছু বলাও যায় না। সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। ফানেলের গুঁড়ি ধরে সমুদ্রের ঢেউ তখন থেকে থেকে উঠে আসছে। আর সে উঠে যাচ্ছে। সে উঠে যাচ্ছে লোহার সিঁড়ি ধরে। সে টলছে। সে কাঁপছে। কিন্তু ওর হাত পা ভীষণ শক্ত, মজবুত। সে বোট-ডেকে উঠেই আর পারল না। বমির মতো উঠে আসছিল, সে চায় না বমিটা এখানে হোক। সে তাড়াতাড়ি লতিফকে বোট-ডেকে রেখে আবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যেতে থাকল এবং বাংকারে ঢুকে দেখল, কয়লা অনেক নিচে নেমে গেছে। যেন সে সারা মাস বৎসর কাজ করেও এই পাতালে নেমে যাওয়া সুটের ভেতরটা ভরতে পারবে না। বমিটা এবার সজোরে নাকমুখ দিয়ে বের হয়ে এল। এবং তাজা নোনতা স্বাদ। চ্যাট-চ্যাট করছে। কেমন কালো রঙ। অন্ধকার বাংকারে সে বুঝতে পারছে না, আসলে এটা কি। সে বেলচেটা আবার তুলে নিল। মুখটা মুছে ফেলল ভারি তোয়ালে দিয়ে। আসলে ওর মুখ এখন হিজিবিজি নিগ্রো দুঃখী মানুষদের মতো দেখতে হয়ে গেছে। তার যতসব স্বপ্ন, সব এখন হিজিবিজি খাঁজকাটা একটা মাকড়সার জালের মতো। সব ছিঁড়ে যাচ্ছে। হাত দিলেই ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সে জানে সে থেমে গেলেই হেরে যাবে। সে জানে ঐ যে পাশে এক অজগর পাতালের দিকে নেমে গেছে, তার সঙ্গে এক লড়াই তার। না-হলে সেই হাসি ঠাট্টা। মসকরা করবে, সে করুণার পাত্র হয়ে যাবে। সে দাঁড়াতে পারছে না—এমন আর কখনও ভাববে না। সে বেশ আছে, ভালো আছে, মাগো আমি ভাল আছি। টাকা পেলে কিনা জানাবে। কম টাকা, তবু তোমাদের কিছু অন্তত হয়ে যাবে। আমি এখন যাচ্ছি কলম্বো, তারপর আফ্রিকা, তারপর আমেরিকা, আমি যে কত বড় হব বলে নিরুদ্দেশে চলে এসেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অনেক, আমি সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে বাঁচতে চাই। আমি হেঁটে যাব মা, চার-পাশে মানুষেরা বলবে, ঐ যে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে। আমি স্বপ্ন দেখব মা, হ্যাঁ স্বপ্ন, পাশে স্টারবোর্ড-সাইডের বাংকারে এখনও গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মনু কাজ করছে এখানে। খুব পরিশ্রমী মনু, মৈনুল হক, তা তুমি তো বেশ কাজ করে যাচ্ছ। আমার এমন ভাব উঠে আসছে কেন! বার বার। এই নিয়ে সাত বার। তুমি কি এখন একবার এ-বাংকারে আসবে। এসে খোঁজ নেবে আমি পারছি কিনা! সারেঙসাব বলে গেছে দেখতে, মাঝে মাঝে দেখতে। তুমি আমাকে দেখবার আগে বলছি, ঠিক সুট ভরে দেব। তোমায় আগে ভরে ফেলব।

এ-ভাবে সে এসানুর একটি মাকুর মতো বাংকারের অন্ধকারে কাজ করতে করতে এক সময় দেখল, কয়লার সুট ভরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িটা প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে হাত তুলে হৈ হৈ করে উঠলেই ছুটে এসেছিল মনু। সে দেখতে পেয়েছিল, ছোট-বাবু হাত দিয়ে সুটের কয়লা সাজিয়ে দিচ্ছে। সে কেমন একটা গন্ধ পেল বাংকে। তাজা রক্তের গন্ধ যেন। এমন হয় সে জানে, এবং মনু তাড়াতাড়ি ওর কাছে লম্ফ নিয়ে গেল। লম্ফ তুলে দেখল। মুখটা ভীষণ বীভৎস। চোখ লাল। কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে হাসিটা ভারি কষ্টের। মনু বলল, তোর বাংকারে বাস কেন রে!

—কোথায় বাস!

—তাজা খুনের বাস!

—ষাঃ

—হ্যাঁ। পাচ্ছি। দ্যাখতো...বলে সে লম্ফটা নিয়ে অস্পষ্ট আলোতে খুঁজতে থাকল। তারপর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, এখানে তুই বমি করেছিস।

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ।

—এসে দেখ কি করেছিস।

ছোটবাবু বলল, আমি আর উঠতে পারছি না। আমার ওয়াচ শেষ, আমিও শেষ।

তবু মনু ওকে ধরে নিয়ে গেল। ছোটবাবু দেখল, লাল তাজা রক্তে ভেসে গেছে ডেক। সঙ্গে সঙ্গে আবার ওক ওঠে এল ভিতর থেকে। তারপর টলতে টলতে পড়ে গেল নিচে। ছোটবাবু যথার্থই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। সমুদ্রে ঝড়ের ঝাপটা যখন আরও বেগে নামছে। জাহাজ উঠছে নামছে। ফুলছে। ক্ষেপা সমুদ্র। মেঘলা আকাশ। প্রচণ্ড ঝড়ে দানবের মতো নীল রঙের ঢেউ। মাথায় সাদা ফেনা। এ্যালবাট্রস পাখিদের আর্তনাদ কখনও ঢেউয়ের মাথায়—ওরা উড়ে উড়ে ভেসে যাচ্ছে। অস্পষ্ট এক কুয়াশার ছবি যেন চারপাশে।

এবং খবর চারপাশে আবার ছড়িয়ে পড়ল। ছোটবাবু পড়েছে। মৈত্রের এখন ওয়াচ। সে নেমে যাবার মুখে এমন শুনল। মেজমিস্ত্রি আবার এসে নেমেছে। তার যা স্বভাব! জ্যাকও এসে নেমেছে। সে পাশে দাঁড়িয়ে দেখল ছোটবাবু কাত হয়ে পড়ে আছে। সে পাশে বসবে ভাবল, কিন্তু মনে হচ্ছে সেকেণ্ড পা তুলে আছে। এমন যারা ছোট কাজ করে তাদের মুখে হাত দিয়ে দেখা পাপ। সম্মান থাকে না বুঝি! পা বাড়িয়ে মুখটা নেড়েচেড়ে দেখা! সত্যি পড়েছে না ভয় পেয়ে এমন করছে। মুখে রক্তের দাগ দেখেও মায়া হয় না! জ্যাক এবার উঠে দাঁড়াল। ঠিক পাশে। এবার পা তুলতে যাচ্ছে সেকেণ্ড। সে স্নান সেরে নেমে এসেছে। পায়ে তার বাথরুম শ্লিপার। বুড়ো আঙুল বের হয়ে আছে। জ্যাক এখনও শক্ত বুটজুতো পরে আছে। পা-টা উঠে আসছে। ডান পা সে তুলে ছোটবাবুর মুখের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। আর তখন ঠিক পাশে সেকেণ্ডের বাঁ পা, পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় জ্যাক তার গোড়ালির সব শক্তি দিয়ে চাপ দিতেই চিৎকার করে উঠল সেকেণ্ড।—ওহো গেলাম! গেলাম!

সেকেণ্ডের বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভীষণভাবে থেঁতলে গেছে। না দেখে এমন একটা কাজ করে ফেলেছে জ্যাক। সে চোখ টেনে বলল, সরি সেকেণ্ড। কোথায় লাগল। উপুড় হয়ে পায়ের কাছে বসতেই দেখল, সেকেণ্ড পাটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এক পায়ের ওপরে নাচছে। জ্যাকের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল; কিন্তু মৈত্র তখন ছোট-বাবুকে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে জ্যাক ঘাবড়ে গেছে। মুখ থেকে ছোটবাবুর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জ্যাক কেমন নিশি পাওয়া মানুষের মতো ছোটবাবুর পেছনে হেঁটে যেতে লাগল। সে হাসতে পারল না, কাঁদতেও পারল না।

(ক্রমশঃ)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু সেদিন হিটলার লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ শুরু হওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, রাইখস্ট্যাগের বক্তৃতায় রাশিয়ার আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার উপর দোষারোপ করিয়া বলিলেন—

'Marching in the boundless expanses pushing on in the heart, tormented by thirst, often driven to despair by the delays caused by impassable roads, halted from the White Sea to the Black Sea by foul weather and the climate, in the heat of July and August and the snowstorms of November and December, suffering from the mud and freezing in the ice and snow, they fought on the soldiers of the Eastern Front'

এই বক্তৃতায় হিটলার খুব কৌশলে এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে জার্মান সৈন্যেরা মস্কোর ও পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধক্ষেত্রে গ্রীষ্ম বা শীতের কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু লালফৌজের হাতে যে তিনি বা তাঁর সৈন্যদল মার খাইতেছিলেন, সেই কথাটি সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন।

অতঃপর ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালীন যুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনী যে দুর্দশায় পড়িয়াছিল, সেই প্রসঙ্গেও তিনি প্রধানত রাশিয়ার শীত ও নিদারুণ আবহাওয়াকেই দায়ী করিয়াছিলেন। ২৬ এপ্রিল, ১৯৪২, রাইখস্ট্যাগের বক্তৃতায় হিটলার বলিলেন—

'গতবার যখন আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তখন পূর্ব রণাঙ্গনে এমন এক নিদারুণ শীত পড়েছিল, যেটা ৪০ বছরেরও বেশী কালের মধ্যে রুশদের নিকটও অজ্ঞাত ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাপমান যন্ত্র শূন্য ডিগ্রী থেকে নীচের দিকে ৪৭ ডিগ্রীতে— minus forhtyseven degress grade'

য়ে, নেমে গেল। এমন কি, তার চেয়েও কমের দিকে গেল। অপ্রত্যাশিতভাবে চার সপ্তাহ আগেই সমস্ত রণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। যে রণাঙ্গন সম্মুখের দিকে অগ্রসরমান ছিল, তা পিছনেও হটতে পারলো না, কিম্বা যেখানে ছিল সেখানেও তিষ্ঠিতে পারলো না। সুতরাং মোটামুটিভাবে ভ্যাগানস্রগ থেকে লাভোগা প্রান্ত পর্যন্ত একটি সাধারণ লাইন ধরে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল।

'আজ আমি বলতে পারি যে, এই রণক্রিয়া কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা মারাত্মক রকমের কঠিন ছিল। এমন চরম মুহূর্তও এসেছিল, যখন মানুষ ও বন্দুক উভয়েই জমে যাওয়ার জো হয়েছিল। যাঁরা পূর্ব রণাঙ্গনের বিশালতার দিকে তাকান, তাঁদের বুঝা উচিত যে, ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের গ্র্যান্ড আর্মি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।...' (৮)

এই হিটলারী বক্তৃতাই মস্কোর রণাঙ্গনে এবং সাধারণভাবে শীতকালীন যুদ্ধে জার্মান বাহিনীর ভাগ্যবিপর্যয়ের একমাত্র সাফাই হিসাবে নাৎসী সরকারী ভাষ্যরূপে গৃহীত হইল। গোয়েবলস ও লেঃ জেনারেল ডিটমার প্রভৃতি হিটলারের প্রোপাগান্ডাবিশারদগণ উচ্চকণ্ঠে এই প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন।...

দুর্ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধের পরেও পশ্চিম জার্মানী বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পশ্চিমী জগতের বিখ্যাত লেখক, সামরিক ঐতিহাসিক এবং সেনাপতিবৃন্দের স্মৃতিপুস্তকে মস্কো যুদ্ধে হিটলারী বাহিনীর পরাজয়ের প্রধান কারণরূপে 'সেনাপতি শীত' ও 'সেনাপতি জর্দান'—এই দুইকে দায়ী করা হইল। জেনারেল গুডেরিয়ান, জেনারেল ব্লুমেনট্রিট জেনারেল হ্যালডার প্রমুখ প্রধান প্রধান জার্মান সেনানায়ক, কুট ফন টিপেলস্কার্চ, পল ক্যারল প্রমুখ জার্মান সমর-ঐতিহাসিক, জেনারেল ওমর ব্রাডলী প্রভৃতি মার্কিন শীর্ষ সেনাপতি, রবার্ট ই শেরউড, উইলিয়াম শাইরার, এল স্নাইডার প্রমুখ মার্কিন ঐতিহাসিক, এ্যালান ক্লার্ক, মেজর-জেনারেল জে এফ সি ফুলার, ক্যাপ্টেন লিডেল হার্ট, এলান বুলক প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৃটিশ সামরিক ঐতিহাসিকগণ রাশিয়ার ঠাণ্ডা, শীত, তুষার ও কাদার উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। এমন কি, স্বয়ং চার্চিল পর্যন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে 'অর্ধ জমে যাওয়া' জার্মান সৈন্যদের কথা উল্লেখ করিয়া পরোক্ষে ঠাণ্ডার প্রকোপের উপরেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

কোন কোন জার্মান সেনাপতি ঠাণ্ডার এমন ভয়াবহ বর্ণনা দিয়াছেন যে, পড়িলে আক্কেল গুড়ুম হওয়ার জো। যেমন, জেনারেল গুডেরিয়ান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১০ই ডিসেম্বর মস্কো রণাঙ্গনে ঠাণ্ডা 'হিমাঙ্কের নীচে ৬৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড

(৮) গ্রন্থকার প্রণীত রুশ-জার্মান সংগ্রাম, ১৯৪৭, পৃঃ ১৮৭-৮৮

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জি
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৪৪৭

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা
Lichensa
● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
DZ-1672-BEN

নামিয়া গিয়াছিল এবং জার্মান বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক ও গুরুতর অসুস্থতা দেখা দিয়াছিল। সেই সময় বাইরে অবস্থানের অর্থ ছিল মৃত্যুকে বরণ করা। পাইখানা করিতে গিয়া পর্যন্ত অনেকে মারা পড়িয়াছিল, কেন না ঠাণ্ডায় মলদ্বার জমাট বাঁধিয়া যাইত, আর ঘোড়ার মাংস, এমন কি মাখন পর্যন্ত শুকাইয়া এমন কঠিন পাথর হইয়া যাইত যে, সেগুলিকে কাটিবার জন্য কুড়ুল বা করাত দরকার হইত! (৯)

অথচ কোন সোভিয়েত দলিলপত্রে ঠাণ্ডার স্বপক্ষে এমন অস্বাভাবিক রঙীন বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায় না।...

কিন্তু মহাযুদ্ধের শেষে অন্তত ২৫ বছর (১৯৭০-৭১) ধরিয়া রাশিয়ার প্রাক্তন মিত্রপক্ষের তরফ থেকে অসংখ্য পুঁথিপত্রে স্মৃতিকথায়, সরকারী বিবরণীতে মস্কো ও শীতকালীন যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কেও এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারকার্য চলিতে থাকায় সোভিয়েত ঐতিহাসিক ও লেখকগণ ক্ষুব্ধ চিত্তে এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে স্বয়ং মার্শাল জুকোভের অত্যন্ত স্পষ্ট, তীব্র এবং ক্রুদ্ধ বিবৃতি। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, স্ট্যালিনগ্রাদ, কুর্স্ক ও বার্লিন—এই কয়টি ইতিহাস প্রসিদ্ধ রণাঙ্গনে তিনিই ছিলেন অন্যতম সেরা অধিনায়ক এবং সোভিয়েত পক্ষের সর্বাপেক্ষা রণ-বিশারদ ও প্রতিভাশালী সেনাপতি। তিনি লিখিয়াছেন যে, মতাদর্শের পার্থক্যহেতু পশ্চিমী জগতের বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ও সেনাপতিরা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে ও মস্কো যুদ্ধে লালফৌজের বীরত্ব, কৃতিত্ব ও জনগণের ত্যাগ স্বীকারকে লঘু করিয়া দেখাইয়াছেন এবং হিটলার যে মস্কো জয়ে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, তার কারণ-স্বরূপ একমাত্র কদর্য আবহাওয়া, নিদারুণ ঠাণ্ডা ও কর্দমাক্ত রাস্তাঘাটের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু মস্কো যুদ্ধের অন্যতম অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি ইতিহাসের এই জঘন্য বিকৃতির বিরুদ্ধে তীব্র রোষ প্রকাশ করিতেছি' এবং 'ঘোষণা করিতেছি যে, না, কর্দম বা তুষারপাতের জন্য নয়, হিটলার পরাজিত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিলেন জনগণের, সোভিয়েত জনগণের বাধাদানের জন্য!

> 'No, it was not the mud or the frosts which checked Hitler's troops after their break through to Vyazma and their emergence on the approaches to the capital It was not weather, but the people—the Soviet people!" — 10.

অতঃপর মার্শাল জুকোভ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মস্কোর প্রতিরক্ষা যুদ্ধের অতি সঙ্কট সময়ে স্বয়ং জোসেফ স্ট্যালিন রাজধানীর ভাগ্য সম্পর্কে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিয়াছিলেন—

'না, মস্কো আত্মসমর্পণ করিবে না!'

প্রবন্ধের উপসংহারে জুকোভ মন্তব্য করিয়াছেন যে, সোভিয়েতের শত্রুপক্ষের সমস্ত অপপ্রচার সত্ত্বেও মস্কো যুদ্ধের অবিস্মরণীয় গৌরবকাহিনী শতাব্দীর-পর- শতাব্দী ধরিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া থাকিবে।

কিন্তু সোভিয়েত ও সোভিয়েত বিরোধীদের এই বিতর্ক প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, সমস্ত প্রসিদ্ধ সমর-ঐতিহাসিকেরাই নাৎসীদের প্রচারিত সেনাপতি শীতের' কাহিনী অপ্রতিবাদে মানিয়া লন নাই। যেমন, যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই ১৯৪৪ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি রাশিয়ান ক্যাম্পেইনস অব ১৯৪১—৪৩' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকারদ্বয় ডবলিউ ই ডি এ্যালেন এবং পল মুরাটোফ অত্যন্ত জোরের সঙ্গে হিটলারের দাবীর (নেপোলিয়ানের আক্রমণের সময় মস্কোয় ঠাণ্ডা ছিল ২৫ ডিঃ সেন্টিগ্রেড, আর তাঁর বা হিটলারের সময় ছিল ৫২ ডিঃ সেন্টিগ্রেড। অতএব নেপোলিয়ানের তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব অনেক বেশী) বিরুদ্ধে লিখিয়াছিলেন যে, একমাত্র ঠাণ্ডার জন্যই মস্কোর যুদ্ধে হিটলারী সৈন্যরা হারিয়া গিয়াছিল এটা যুক্তিসঙ্গত কথা নয়। বরং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, শীতকালীন যুদ্ধ সম্পর্কে ফুরার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন, অধিকন্তু কঠিন বরফের উপর দিয়া যান্ত্রিক বাহিনীর চলাচলের পক্ষে সুবিধা হওয়ারই কথা ছিল। আর নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা? গ্রন্থকারদ্বয় হিটলারের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ১৮১২ সালে একমাত্র ঠাণ্ডার জন্যই নেপোলিয়ানের গ্র্যান্ড আর্মির বিপর্যয় ঘটে নাই, অন্যান্য

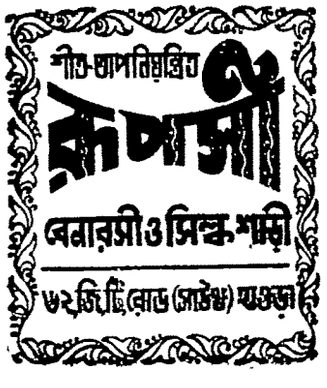

গুরুতর কারণও ছিল—যেমন, (১) বরোডিনের যুদ্ধে সৈন্যবলের নিদারুণ ক্ষতি, (২) রুশ পোড়া মাটির নীতি, (৩) পার্টিশান বা গেরিলাদের আক্রমণ এবং (৪) অতি দীর্ঘ ও বিপজ্জনক যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৯৪১ সালে হিটলারও অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন বটে। কিন্তু তাঁর যোগাযোগ ও রেলপথের ব্যবস্থা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। আর নেপোলিয়ানের আমলে রেলপথই ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ান তবু দাবী করিতে পারিতেন যে, তিনি মস্কো দখল করিয়াছিলেন, কিন্তু হিটলার তাও পারেন নাই! অতএব নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা দেওয়া 'নিতান্তই হাস্যকর!'...(১১)

আমেরিকার প্রসিদ্ধ সাংবাদিক-ঐতিহাসিক উইলিয়াম শাইরারও লিখিয়াছেন যে, রাশিয়ার শীত ভয়ঙ্কর ছিল সন্দেহ নাই এবং সোভিয়েত সৈন্যেরা স্বভাবতই জার্মানদের তুলনায় ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে ভালোভাবে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু একথা মানিয়া লওয়ার পরেও স্বীকার করিতে হইবে যে, 'আসলে আবহাওয়ার জন্য নয়, সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে লালফৌজের হিংস্র যুদ্ধ এবং হার স্বীকার না করার জন্য তাঁদের অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি। সেই সময়কার শীর্ষ জার্মান সেনাপতিদের ডায়েরী থেকেই এর প্রমাণ মিলিবে। কেননা, এই দৈনন্দিন লিপিগুলিতে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণের ভয়াবহ তীব্রতা ও জার্মান পক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়-ক্ষতির জন্য হতাশা ও বিহ্বলতা প্রকাশ করা হইয়াছে।'

মিঃ শাইরার আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিটলারী সৈন্যেরা মস্কোতে বড়দিনের উৎসব পালন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল হইল উল্টা। সেই নিদারুণ ঠাণ্ডায় তাঁরা মস্কো থেকে বহু দূরে বিতাড়িত হইলেন! (১২)

সুতরাং দেখা যাইতেছে 'সেনাপতি হিটলার' 'সেনাপতি শীতের' ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়াও শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের বিচারে রেহাই পাইলেন না! তবে, সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, মস্কোর ঠাণ্ডার মধ্যে লড়িবার জন্য হিটলারী হাইকমান্ড আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ৮ সপ্তাহের যুদ্ধে কিম্বা আগষ্ট মাসের মধ্যেই 'বর্বর বলসেভিক' রাশিয়া খতম হইয়া যাইবে!

---

১ — Barbarossa — Allár Clark Penguin, 1966, P. 213

(10) Truth about Battle of Mospow — Marshal Zhukov. Blitz (Weekly Bombay)

11 — The Russian Campaigns of 1941-43, p. 54-55.

(12) The Rise and Fall of the Third Reich, p. 1080-1088 17 July, 1971, p. 10.

পুনশ্চ

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যু-বার্ষিকী সম্প্রতি উদযাপিত হয়েছে। তিনি মাত্র ৪১ বছর বয়সে ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় (ইং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন) পরলোকগমন করেন। রবীন্দ্র-যুগের কবি হয়েও তিনি যে অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন, তা অনায়াসে বলা যায়। তাঁর বহুমুখী সৃজন-শক্তি, দেশাত্মবোধ, অপাঙ্‌ক্তেয় অবহেলিত জনগণের প্রতি দরদ, মাতৃভাষাকে সর্বাঙ্গীনভাবে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা করার অক্লান্তি ও ছন্দ-কুশলতার নিদর্শন এদেশে দুর্লভ বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

ছান্দসিক হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ সর্বজন-বিদিত পরিচয় ব্যতীত, ভাষান্তর কার্যেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বললেও যেন তাঁর সম্পর্কে সব বলা হয় না! বিদেশীয় ভাষা থেকে এমন হৃদয়গ্রাহী মিষ্টি-মধুর সার্থক অনুবাদ এদেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এর প্রকৃষ্ট পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' ও 'মণি-মঞ্জুষা' নামক তিনখানি বহুজনসমাদৃত মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে। সারা পৃথিবীর কবিকুলের উৎকৃষ্ট রত্নরাজী তিনি ধরে দিয়েছেন এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে। 'তীর্থরেণু' পাঠ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।'

সত্যেন্দ্রনাথের পিতামহ ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম জ্ঞানযোগী অক্ষয়-কুমার দত্ত এবং তাঁর পিতার নাম ছিল রজনীনাথ দত্ত। ২৪ পরগণা জেলার শিমতা গ্রামে, মাতুলালয়ে, সত্যেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ (ইং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী।) বাল্যকাল থেকেই সত্যেন্দ্রনাথের ছিল কাব্য-রচনার প্রতি অনুরাগ। পরবর্তী-কালে কয়েক বছরের মধ্যে ফুলে-ফলে তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। তৎকালীন পত্রিকাগুলি, বিশেষ করে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী', 'সাহিত্য' ও 'দেবালয়' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রতি মাসেই তাঁর দীর্ঘ ও নাতিদীর্ঘ কবিতাসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। নানা বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব-গভীর এই সকল কবিতাগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে।

'সবিতা' কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। অতঃপর 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'হসন্তিকা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি কাব্যরসিকদের প্রভূত আনন্দদান করে। সর্বসাকল্যে সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থ-সংখ্যা প্রায় ১৯খানি। কিন্তু সকল-গুলিই যেমন তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, তেমনি সকলগুলিই তাঁর কাব্যগ্রন্থ নয়। কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধের বইও তিনি রচনা করেছেন। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কাব্যসৃষ্টি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ রচনায় তিনি এমনই পারংগম ছিলেন যে, তাঁকে সাহিত্যের সর্বাসাচী বললেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত এখনও তাঁর বিবিধ রচনাসম্ভার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এই ধরনের একাধিক প্রবন্ধ তিনি নবকুমার কবিরত্ন সলিলোলাস সাতরা, ত্রিবিক্রম বামন, বসুতাত্ত্বিক চূড়ামণি প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের 'বিবিধ' পর্যায়ে এই ধরনের অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা এস্থলে সত্যেন্দ্রনাথের গভীর সাহিত্য-চিন্তার নিদর্শনস্বরূপ 'যুগোত্তর সাহিত্য' নামক একটি নিবন্ধ ১৩২৩ সালের 'ভারতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে পুনশ্চ উদ্ধৃত করে দিলাম।

যুগোত্তর সাহিত্য

পদ্মকে যে-পণ্ডিত পঙ্কজ-নামে প্রথম অভিহিত করেছিলেন, তিনি যে একজন অতি-পণ্ডিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কারণ, তাঁর অতিবুদ্ধিটি ডুবুরীর মত ডুব-মারে মাটি-ঘোলা মৃদ্‌গরের মাছের মতন একেবারে পাঁকের তলায় তলিয়ে 'গয়ে, শেয়ে, পদ্ম বেচারীর নাড়ী-নক্ষত্র এবং হাঁড়ির খবর হাটের মাঝে ফাঁস করে দিয়েছে। কিন্তু পাঁকের মধ্যে জন্মানোটাই কি পদ্মের প্রধান বিশেষত্ব? শালুক-শাপলা, হোঁজা-হেলো—এমনি হাজারো ফুলের গোড়াপত্তন ওই পাঁকের মধ্যেই; এরাও সবাই পুকুরের জলেই জলসা করে থাকে, পদ্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে একটুও তফাৎ নয়। এরা শতদলের সঙ্গে এক সূর্যেই পাপড়ি মেলেছে, এক হিমালয়েই দরদোয়, কিন্তু শতদলের বিশেষত্ব মোটেই লাভ করতে পারেনি। পেলা পারেনি পারেনি, তার কারণ, শতদল সে বিশেষত্ব পাঁকের কাছেও লাভ করেনি, পুকুরের কাছেও পায়নি, এমনকি সূর্যের কাছেও না, সে বিশেষত্ব তার নিজস্ব। পারিপার্শ্বিক অবস্থা শতদলকে গড়ে তুলতে পারে না,—ফুটে ওঠার অবকাশ দিতে পারে মাত্র।

পদ্মের সঙ্গে পঙ্কের যে সম্পর্ক, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের বা যুগেরও ঠিক তাই। পাঁক যে পদ্মকে রস জুগিয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মধু জুগিয়েছে বলে একটু বেশী বলা হয়। সে জিনিসটাকে তাকিক করার কথা মনে জাগলে, অবশ্য পাকুক বাহুব না হয়, পদ্মকেই দেওয়া উচিত। শেক্সপীয়রের মুগ্ধ পাঠক এলিজাবেথের যুগের খুন খারাপী করলে ধনবাদটা অপাত্রেই গিয়ে পড়ে। যে সাহিত্যে যে রস-রচনায় মুগ্ধতের ঝোঁক অধিক, তা কখনো সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্বে-পূর্বি মনঃপূত হতে পারে না সেকালের তা গ্রাহ্য নয়। যে পঙ্কজ পাঁকেতে তা দেবতার পূজায় লাগে না।

বিশ্ব-লীলা বিশেষজ্ঞের লীলা-রসের লীলা তার হৃদয়ের বাণ্ড করা কবিকে, যারা প্রকৃত কবি, বিশ্বচক্রের নর্তিত এক রসের চক্র প্রবর্তন করে চলেছেন। যিনি মন সৃষ্টি করেছেন, তাকে মনের সৃষ্টি দিয়ে সংবর্ধিত করেছেন। তিনি সমাজের-সিংহাসনে বিরাজমান, তাঁর তলায় কল্পনার বাঙ্ময় পাদপীঠ নির্মাণ করেছেন। যদি আছে, যদি বিশ্বজনের পায়ের ধুলো কোথাও পড়ে, তবে সে এই কল্পনার কনক পাদপীঠেই পড়বে। কারণ এটি মনেরই নিজের তৈরি জিনিস, ওটি আমাদের খাসমহল। শুধু ওইখানেই মানুষ যেন স্রষ্টাকে পায়ের ধুলো দেবার নিমন্ত্রণ করবার স্পর্ধা রাখে।

এমনি করে কত যুগান্তর এসে সাহিত্যের সৌভরাজ্য গড়ে উঠছে এবং উঠছে। জীবনের স্রোতে জন্মলাভ করে জীবনকে এ ছাপিয়ে চলেছে। এই সৌভরাজ্য কখনো আকাশে ভেসে বেড়ায়, সূর্যাস্তকিরণে রঙীন হয়, জ্যোৎস্নায় সুন্দর হয়, কখনো কখনো ঝড়ে বেড়ায়। এ সমস্তের চমৎকৃত করে, সোৎসুক করে, কিন্তু ধরা-ছোঁয়া দেয় না। এই রাজ্যের ছায়াস্তরিক জীবের অনেক থেকে মাঝে মাঝে কত প্রয়োজনের পক্ষপাতীদের নেমিয়ে কত তোলে কিন্তু এর প্রতি আকর্ষণ করে। কারণ এ-রাজ্য কারো নাগালের মধ্যে নেই কোন বাঁধ-ধরার মধ্যে নেই— এ নিজের আইন চলে, সে আইনের নাম কবির খেয়াল।

লোকের চমৎকার, এ ফুলের মৃত্যুঞ্জয়। যা যুগধর্মের অধীন, তা যুগের সঙ্গেই মরে যায়, দেওয়ালী পোকার পক্ষ দেওয়ালীর আলোতেই পোড়ায়। যা যুগ ধর্মের অতীত বা যুগোত্তর, তাই চিরকালের জিনিস। ভাব-জগতে যারা মানুষ পুরুষ ধারা প্রতিভাবান, তাদের চৈতন্য যুগের প্রভাব অতিক্রম করে। তাদের মন নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি নিজের যুগকে, চলতিকে, এমন কি নিজেকেও অতিক্রম করে চলে। যারা পাঁচী রকমের লেখক তাদের লেখায়ই যুগের কালের জনমনের ছাপ চেপে বসে থাকে। তার কারণ তাদের নিজের মনের তেমন সুস্পষ্ট রূপ নেই যে পারিপার্শ্বিকের ছাপ সে মনোধর্মের চেপে বিকৃত করে তাদের রচনাতেই আত্মপ্রকাশ করে বসে।

(২)

বিচিত্র রীতি এই সৌভরাজ্যের। সাহিত্যের সৌভরাজ্যে বসন্তসেনা বেশ্যা নয়; ব্রজগোপী কলঙ্কিনী নয়; অহল্যা, দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া। সহমর্ম্মিতা সে-রাজ্যের ধর্ম্ম মরমী-জনের হৃদয় সে রাজ্যের দখলী স্বত্ববান প্রজা। সমাজের বা সংহিতার পরিবর্ত্তনশীল নিয়মকে সেখানে কেউ সনাতন বলে ভুল করে না। সে-রাজ্যে গুরুও নেই, শিষ্যও নেই; আছে কেবল সুহৃদের সহৃদয়তা। সেখানে ভ্রাতৃব্যের সঙ্গে পরিণয় প্রশস্ত, কি শ্যালীর সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ—এ নিয়ে কোন তর্ক নেই; প্রজাতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে ঝগড়া নেই;—তা থাকলে শেক্সপীয়রের রচনা এতদিন ফ্রান্স ও আমেরিকায় অপাঠ্য হয়ে পড়ত। কারণ শেক্সপীয়র প্রজাতন্ত্রের ধার মোটেই ধারেন না। এ রাজ্যে প্রবেশ করলে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ভুলে মানুষকে কল্পিত শোকে অশ্রুবর্ষণ করতে হয়, কিন্তু সে পুত্রশোকের কান্না নয়;—মড়াকান্নার জায়গা সাহিত্য-রাজ্যে নেই এ ছায়া সুষমার রাজ্য। এ রাজ্যের রাজকার্য্য শুধু ভাবোচ্ছ্বাস জাগানো; তার বেশী নয়। ভাবাবেগ এখানে কর্ম্ম-প্রেরণার জনক নয়।

গোলাপের আতর জোলাপের জন্য তৈরী হয়নি; তবে কেজো লোকেরা যদি সুন্দর জিনিসকে কুৎসিত কাজে লাগায়, তবে তার জন্যে আতরের কারবারী জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। রস-সাহিত্য রোগীর পথ্য বা শিশুর খাদ্য নয়; ও জিনিস পরিণত মনের উপভোগের সামগ্রী, চিত্তপ্রসাধনের এবং চিত্তবিনোদনের উপাদান। সমাজ যখন মানুষকে পেষণ করতে চায়, সংসার যখন পীড়া দেয়, সত্য যখন সুন্দরের সুষমা থেকে ভ্রষ্ট বলে মনে হয়, তখন সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্বাস ফেলে মানুষ বাঁচে। খাঁচার পাখী এইখানে অন্ততো কল্পনায় ডানা মেলতে পায়। পরাধীন এখানে অবাধীন। নিশ্ছিদ্র নিরেট বস্তুতন্ত্র জগতের মধ্যে এই ফাঁকটুকু আছে বলেই মানুষের ভাবুক-সত্ত্বা বেঁচে আছে। বিশ্বমানবের আনন্দময় কোষ এই কল্পনার রাজ্য,—এই খানেই রাম জন্মাবার ষাট হাজার বছর আগে রামায়ণ রচনা সম্ভব হয়েছিল; আর বাল্মীকি তা না জানলেও কৃত্তিবাসের তা জানতে আটক হয়নি, তাই বাল্মীকির কাব্য অনুবাদ করেও কৃত্তিবাস কবি।

(৩)

যুগে যুগে যুগধর্ম্মকে অতিক্রম করে চলেছে মানুষের এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি—এই রস-সাহিত্য। সাহিত্যের সৌভরাজ্যে যুগ-ধর্ম্মের কিছুমাত্র প্রভাব যদি থাকত, তবে স্যাফো হতেন থিয়োক্রিনস, বা থিয়োক্রিনস হতেন স্যাফো। বায়রন হতেন ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কিম্বা ওয়ার্ডসোয়ার্থ হতেন বায়রন। ড্রাইডেন তাহলে মিলটন হতেন, বা মিলটন হতেন ড্রাইডেন। মাইকেল ভূদেব হতেন, ভূদেব মাইকেল হতেন। মতিলাল রায় হতেন ডি এল রায়, বা ডি এল রায় হতেন মতিলাল রায়। কিন্তু তা যে হয়নি তার মানে এই যে, কাব্যজগতে কবির ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বই হচ্ছে প্রধান; দেশের জাতির বা যুগধর্ম্মের প্রভাব তার শতাংশের একাংশ মাত্র। কবির চিত্তধাতুর বিশেষত্বই এক্ষেত্রে প্রভু। প্রাচীন-কালের একজন রসিক বলেছেন—

'অপারে কাব্যসংসারে
কবিরেব প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং
তথেদং পরিবর্ত্ততে।।'

সত্যিকার সংসারের এলাকার বাইরে যে কাব্য-সংসার আছে, কবিই সেখানকার প্রজা-পতি, বিধানদাতা বিধাতা। কবি যখন সংসারকে মধুর দেখেন, তখনই সে প্রকৃত-পক্ষে মধুর; কবি যখন বিশ্বকে কিম্বা মনে করেন, তখন সে একান্তই স্বাদহীন। তাঁর মনের রঙের ছোপ লেগে জগৎসংসার নিত্য নতুন রঙে রঙিন হচ্ছে।

'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে
জাত রসময়ং জগৎ।
স চেৎ কবিরবীতরাগো
নীরসং ব্যক্তমেব তৎ।।'

কবির বীণায় যখন অনুরাগের সুর ধ্বনিত হয়, বিশ্ব তখন রসে ভরপুর; আবার যখন বৈরাগ্যের একতারায় কবি সুর লাগান তখন মনে হয়—

'সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।'

(৪)

যাঁদের ভাবতন্ময়তা নেই, সাহিত্যের সৌভরাজ্যেও যাঁরা পাশ করা এঞ্জিনীয়ারের প্ল্যান অনুসারে সৌধ রচনার ফর্ম্মায়েস করে থাকেন, তাঁদের পক্ষে যুগোত্তর সাহিত্যের যথার্থ রস উপলব্ধি করা কঠিন। স্যাফো বা হাইন, রুমি বা রবীন্দ্রনাথ, হাফিজ বা কবীর ভাবাবেশের মহেন্দ্র-ক্ষণে যে যুগোত্তর সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই রস-রচনার 'চমৎকার সার' রসকেই অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলেছে, 'বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরাঃ।' এই হল যুগোত্তর সাহিত্য; মর্ত্ত্য মানুষের অমর সত্ত্বা। এ দেশ-কালের অতীত, বিশ্বমানবের চির-সম্পদ। ইবান দেশ জন্মের তলায় তলিয়ে গেলেও হাফিজ থাকবে, সুফিধর্ম্ম লোপ পেলেও রুমির কবিতা লুপ্ত হবে না, আর বাঙালী জাতি ম্যালেরিয়ায় মরে গেলেও রবীন্দ্রনাথের গীতি-মাল্য বিশ্বদেবতার ও বিশ্বমানবের কণ্ঠে অমর হয়ে বিরাজ করবে।

যুগোত্তর সাহিত্যের পরবর্তী স্তরে যে সাহিত্য, তাকে যুগন্ধর সাহিত্য বলা যেতে পারে। এই শ্রেণীর সাহিত্যের উপর যুগেরও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও খানিকটা প্রভাব থাকে, আবার যুগের উপরেও এর নিজের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্তু-ভিত্তির বিপুল পৃষ্ঠে যুগকে এ ধারণ করে, কিন্তু রস-সম্পদের প্রাচুর্য্যে দেশ-কালকে অতিক্রম করে। এই শ্রেণীর সাহিত্যকে লক্ষ্য করেই একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন—

'The relation of literature to life is a double-sided relation',

এ সাহিত্য যে পরিমাণে যুগকে অতিক্রম করে, সেই পরিমাণে অমরতা অর্জ্জন করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি এবং ফরাসীর গদ্য-মহাভারত 'লে-মিজারাবল' এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বাল্মীকি-ব্যাস, হোমার-দান্তে যুগন্ধর কাব্য-রচয়িতা, শেক্সপীয়র-সোফোক্লিস যুগন্ধর নাট্যকার; হিউগো-সিঙ্কিভিচ যুগন্ধর ঔপন্যাসিক; গায়টে-রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-বিয়োর্নসেন যুগন্ধর সাহিত্যিক।

এর নীচের স্তরে 'যুগোদ্ধারণে-সাহিত্য; যুগের ধর্ম্ম এ বদলে দিয়ে যায়, কিন্তু এর দৌড় খুব বেশী নয়। টলষ্টয় এই সাহিত্যের ধুরন্ধর। আর্টের হিসাবে অনিন্দ্য হলেও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এবং গোর্কির 'মাদার' এই শ্রেণীর বই। পৃথিবীর সমস্ত যুদ্ধ-সঙ্গীত ও জাতীয়-সঙ্গীত এই কোঠাতেই পড়ে। স্পেনের 'দন কয়োতে' এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। কিন্তু এই সব রুগ্ন সমাজের ঔষধ—মৃগনাভি, ব্রান্ডি বা মধুমিশ্রিত কড়লিভার অয়েল; সুস্থ শরীরের খাদ্য নয়। এ যে পরিমাণে কেজো, সেই পরিমাণে পঙ্গু; আর যে অনুপাতে রসের বসদ জোগায়, সেই অনুপাতে সচল ও সজীব। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' মিসেস ষ্টোর 'টম কাকার কুটীর' এবং ইবসেন ও তদশিষ্য বার্ণার্ড শ'র অধিকাংশ রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তার নীচের স্তরে যে সাহিত্য তা চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর সাহিত্য;—তা যুগানুগ, যুগোচ্ছিষ্ট ও যুগোচ্ছ সাহিত্য। অনুকরণে এর জন্ম, অনুসরণে এর পুষ্টি, আর যুগধর্ম্মের অনুসরণে এর মৃত্যু। ছেঁড়া মতে জোড়া-তালি দেওয়া এর কাজ। আধ-মরা আবেগের আধ-কপালে রোগে এর মাথা-ব্যথা, মানুষের মনুষ্য মূর্ত্তি এখানে পদে পদে সঙ্কোচিত। এর ভাবোচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত সংহিতা-শাসিত; চিদ্ ধাতুর কোনো চিহ্নই এতে নেই। সাময়িক পত্র এর প্রধান বাহন, বঙ্গালয় এবং চায়ের দোকান এর দুর্গ। তোতাপণ্ডিত এবং হাতুড়ে সমালোচকের প্রশস্তি এর পুরস্কার। এই শ্রেণীর সাহিত্য হচ্ছে—

পাতি-লেখকের প্রিয় আদর্শ,
মিডিওক্রেটির হৃদয়-হর্ষ,
খাড়া-বড়ি-খোড়ে মহোৎকর্ষ
সাধিত হতেছে ইথে!
বাদলা-ফড়িং ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে—
পিঁপড়ে উড়িছে ভর দিয়ে পাখে,
—ভয় শুধু পাছে ধরে খায় কাকে
পাখনা না পালটিতে।

(৫)

প্রথম-শ্রেণীর সাহিত্য অর্থাৎ যুগোত্তর সাহিত্য এই বকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর সাহিত্যের অর্থাৎ যুগোচ্ছিষ্ট সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত নয় বলে যাঁরা নিন্দা করে থাকেন; তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই।.....

—ক্ষপণক

শংকর দাশগুপ্ত

আমাদের বাবা শুয়ে আছেন ঘরের মাঝখানে। পশ্চিমে পা রেখে, পুবদিকে মাথা বাবার। আমরা চার ভাই। বাবাকে অনেকে ঠাট্টা করে দশরথ বলে ডাকতেন। আমাদের বড়দার নাম নীলু। সেজো ভায়ের নাম টুলু। ছোট ভায়ের নাম ছোটাই। আর আমি মেজো, আমার নাম বিলু। আমরা চারজন মাতৃহীন সহোদর। ছেলেবেলায় আমরা আমাদের মাকে হারাই। ছোটাই হবার পর থেকেই মার শরীর ভেঙে যায়। ছোটাই তখন একেবারে কোলের এমন এক সময় গ্রীষ্মের শেষ বিকেলে আমাদের মা মারা যান। সে অনেক দিন আগের গ্রীষ্মের এক শেষ বিকেল। আমরা তিন ভাই এককোণে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বড়দার কোলে ছোটাই। বাইরে উঠানের পাশে জামরুল গাছের পাতায় রোদ লেগেছিল ছায়ার মত। তাপ ছিল না রোদের, আলোর মত আভা ছড়িয়েছিল। সেই অনেক দিন আগের গ্রীষ্মের এক শেষ বিকেলে, আমি প্রথম মৃত্যু দেখেছিলাম। আমাদের মা খুব নিঃশব্দে আমাদের চারজনকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আমাদের মা মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন আগে।

আর আজ, শীতের এই শেষ রাতে, আমাদের বাবাও মারা যাচ্ছেন। আমরা চার ভাই বাবাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। পায়ের কাছে হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে আমাদের বৌদি। মাথার কাছে অবিনাশ দাদু। সারা মুখ দাড়িগোঁফ ঢাকা, পরনে লাল রঙের ফতুয়া ধুতি লুঙ্গির মত করে পরা, আরক্ত-চোখ ঈষৎ রক্তাভ, লণ্ঠনের আলোয় রহস্যময় মুখ—ছেলেবেলায় বাবার মুখ থেকে অবিনাশ দাদুর তন্ত্রসাধনার অনেক অলৌকিক গল্প শুনেছি আমরা। নিজের দাদু নন, দূর-সম্পর্কের, তবে বড় আপন হয়ে গেছেন অবিনাশ দাদু আমাদের।

আমরা মাতৃহীন চার সহোদর। ছেলে-বেলায় বাবার শাসনের মধ্যে দিয়ে কেটেছে আমাদের দিনকাল। ঘুরে বেড়াতাম আমরা চার ভাই। বাবা করতেন মাস্টারী। অবসর সময়ে বাগান। নদীর ধারে, মাঠে, বন্ধুদের মার দিকে তৃষ্ণার চোখে তাকিয়ে, হিংস্র রোদের আকাশ আর মাতৃহীনতার ছায়াহীন দিনকাল কেটে যেতো আমাদের। বাবার সঙ্গে একই বিছানায় শুতাম আমরা। দেশ-বিদেশের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম কখন। ভোরবেলায় ডেকে তুলতেন বাবা। বাগানে দাঁড়িয়ে আমরা চার ভাই বাবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সূর্যের মন্ত্র আবৃত্তি করতাম। নিঃশব্দে বাগান মাঠ আর চরাচর জুড়ে ভোর হতো। মাঠের মাঝখানে মহানিম গাছের

আড়াল থেকে উঠে আসতো সর্বপাপঘ্ন সূর্য।

সেসব রবিবার ছেলেবেলার ভোর। উন্নত, সটান শালবৃক্ষের মত ছেলেবেলায় মনে হয়েছে বাবাকে। দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ আমাদের বাবা জীবনে কম সময়েই তাকে অসুস্থ দেখেছি আমি। অথচ শেষ বারের মত ডাক্তার এসে বলে গেছেন, হার্টের অবস্থা খুব খারাপ, বড়জোর আজকের রাতটা।

বড়দা আর টুলু দাঁড়িয়ে আছে বাবার ডানপাশে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বড়দা বাবার দিকে। চোখ ছলছল করছে বড়দার। বাবার মত চোখ পেয়েছে বড়দা। বড়দার মনের অনুভব বড় স্পষ্ট ধরা পড়ে চোখে। বাবার চোখও ঠিক এমনি ছিল। চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতাম, আমাদের অপরাধ। কষ্ট হতো না বুঝতে কখন শাস্তি এবং কখন ভালোবাসা। ঠিক তেমনি চোখ পেয়েছে বড়দা। কিছুক্ষণ আগে অবিনাশদাদু বোঝাচ্ছিলেন বড়দাকে, জ্যেষ্ঠের কর্তব্য, মুখাগ্নির দায়িত্ব কতখানি। বড়দার চোখে ছায়া নেমে আসছিল ক্রমে। যেন মাটির সরায় নাভি, হাতে করে বড়দা ভাসিয়ে দিতে যাচ্ছে নদীর গেরুয়াজলে।

বড়দার চোখে এইভাবে দুঃখ ধরা পড়ে যায় সহজেই। ছেলেবেলায় আমি দেখেছি বড়দার চোখে একবার রাগ। রাগ, না ঘৃণা, কি ছিল সেদিন বড়দার চোখে? আমি তাকালাম। বাবার দিকে চেয়ে আছে বড়দা। চোখে লেগে আছে সঠিক দুঃখ। আগুনের দিকে চেয়েছিল সেদিন বড়দা। সে অনেক দিন আগের এক দুপুরে। কি ছিল সেদিন বড়দার চোখের তারায়?...

ছেলেবেলায় খুব ছবি আঁকার সখ ছিল বড়দার। গ্রামের দৃশ্য, মহাপুরুষের প্রতিকৃতি নানারকমের মুখ আর ফুল-টুল এঁকে প্রায় দু-তিনটে ড্রইং খাতা ভরিয়ে ফেলেছিল ও। নানা রকমের মুখগুলো দেখতে দেখতে, সরস্বতী ঠাকুরের মুখটা খুব চেনা চেনা লেগেছিল আমার। অনেক ভেবে, সে মুখের সঙ্গে পাশের বাড়ীর পোস্টমাস্টার মশাইয়ের মেয়ে মালতীর সঙ্গে অনেকটা মিল খুঁজে পেয়েছিলাম আমি। তারপর যে কোন মেয়ে, যে কোন দেবীর মুখ বড়দা আঁকলেই, আমি দেখতাম, সে মুখ অনেকটা মালতীর হয়ে যেতো।

সামনে বড়দার ফাইনাল পরীক্ষা। কি একটা কারণে বাবার স্কুল সেদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ঝনঝনে রোদে তিন মাইল সাইকেল চালিয়ে বাড়ী ফিরে বাবা দেখেছিলেন, তখন আর কয়েক দিন বাকি বড়দার পরীক্ষার অথচ টেবিলে ঝুঁকে বড়দা তখন একটা ছবির মেয়ের শাড়ীর আঁচলে ফুল আঁকছে। মাথায় আগুন চড়ে গিয়েছিল বাবার। অসম্ভব মেরেছিলেন সেদিন বড়দাকে।

খাঁ খাঁ দুপুরে আমাদের বাগানের এক কোণে কেয়া ঝোপের আড়ালে শুকনো পাতা, ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়েছিল বড়দা। একটার পর একটা ড্রইং খাতা ফেলে দিয়েছিল সেই আগুনে। রোদে, আগুনের আভায় টকটকে লাল লাগছিল বড়দার ফর্সা মুখ। বুকে হাওয়ায় দাউ দাউ করে জ্বলছিল শুকনো পাতা, ডালপালা, রঙীন গ্রামের দৃশ্য। জ্বলে যাচ্ছিল ফুল এবং মালতীর মত সব দেবীদের মুখ। হাওয়ায় হাওয়ায় কেয়া ফুলের গন্ধ। তলোয়ারের মত দুলছিল কেয়াফুলের ধারালো পাতা। আগুনের ফুলকি হাওয়ায় উড়ছিল।

দাত দিয়ে ঠোঁট চেপেও কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল বড়দা। বড় অবহেলায় আর অহংকারে আগুন গ্রাস করছিল সবকিছু। আগুনের হলকার ওপারে বড়দা, এপারে আমি। বোদে, আগুনের আভায় আর কান্নায় জ্বলজ্বলে মুখ বড়দার। আর সেই আশ্চর্য দুটো চোখ। বাবার মত অবিকল যাতে ধরা পড়ে সবকিছু। দপদপ করে জ্বলেওঠা সে চোখে ঘৃণা, না রাগ ছিল সেদিন আমি বুঝিনি। ছেলেবেলা বড় অমল বয়স। কারো চোখে ঘৃণা বোঝা যায় না তখন। আমিও বুঝিনি।

বুঝেছিলাম পরে। সময় বড় সেয়ানা। আমাকে তখন সে শিখিয়ে দিয়েছে কাকে বলে ঘৃণা, সন্দেহ এবং দুঃখ। আমি জেনে গেছি বাবার মত বড়দার চোখও আয়নার মত। তাতে সবকিছু নিখুঁত ছায়া ফেলে।

আই এস সি পাশ করলে, বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে চেয়েছিলেন বড়দাকে। বড়দা রাজী হয়নি। কারণ জানতে চাইলে, স্পষ্টগলায় অসম্মতি জানিয়ে বলেছিল 'ইঞ্জিনিয়ারিঙে অনেক ছবি আঁকতে হয়, ছবি আমি আঁকতে পারি না।' বহুদিন পর বড়দার চোখে বহুদিন আগের এক খাঁ খাঁ দুপুরের আগুন আমি আবার জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম, বড়দা পুরোনো এক শোধ তুলছে। প্রতিশোধের অবিকল ছায়া আমি স্পষ্ট দেখেছিলাম বড়দার চোখে।

অথচ সে ছাপা এখন কই? অ্যাকাউন্টস অফিসের ক্লার্ক এখন বড়দা, আশ্চর্য মমতার চোখে তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। নড়ে গেছে উন্নত শালের শিকড়। বড়দাকে মনে হচ্ছে যেন যুবক বয়সের বাবা।

বাইরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। এক চিলতে উঠোনে ছেঁড়া শীতলপাটির মত জ্যোৎস্না। কোনরকমে মাথা গোঁজার মত দুখানা ঘর আমাদের। ছাত টিনের, দেয়াল বাখারী বেড়ার। ইলেকট্রিক আলো আসে নি এখনো বালোনীতে। লণ্ঠন জ্বলছে টুলুর ওপর। অবিনাশদাদু একবার বাবার ওপর ঝুঁকে, কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন। লণ্ঠনের আলো মুহূর্তের জন্য খেলা করল দাদুর চোখে মুখে।

পরপর তিন রাত জাগছে বৌদি বাবার খাটের পাশে। দাদার বিয়ের পর, আমরা মাতৃহীন তিন ভাই বহু দিন আগের মার স্নেহ ফিরে পেয়েছিলাম আবার বৌদির কাছ থেকে। বাবার শরীর সম্পর্কে বৌদির উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। বাবার সবকিছু নিয়মে বাঁধা পড়েছিল বৌদির কাছে। বাবাও স্নেহ করতেন খুব।

বিয়ের পর নিজের বাবাকে হারিয়েছিল বৌদি। বৌদির বাবার মৃত্যুর সঙ্গে আশ্চর্য একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি জানি, বৌদির প্রতি বাবার যে গভীর স্নেহ, তার একটা লুকানো কারণ আছে। বৌদির বাবার মৃত্যুর জন্য আমাদের বাবার গোপন এক অপরাধবোধ আছে আমি জানি।

বিয়েতে সেলাইয়ের মেশিন দেওয়া তথা ছিল বৌদির বাবার। শেষ পর্যন্ত আর দিতে পারেন নি। বৌদির একমাত্র চাক্ষুষে দাদা হঠাৎ একসিডেন্টে মারা যান। তাই আজও সেই মেশিন না দেওয়াই থেকে গেছে।.. মনে আছে, একদিন কথা কাটাকাটির পর 'মিথ্যেবাদী.. জোচ্চোর' বলে গালি দিয়েছিলেন বাবা বৌদির বাবাকে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন বৌদির বাবা। কোন প্রতিবাদ করেন নি।... চলে আসার সময় পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে, বৌদিকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে শিশুর মত কেঁদে ফেলেছিলেন বৌদির সত্তর বছরের বাবা। আমাদের বাড়ী থেকে স্টেশন প্রায় দেড় মাইল। হেঁটে আসতেন হেঁটে যেতেন ভদ্রলোক। কোন দিন আমি রিকশায় চড়তে দেখিনি। টানারের ছেঁড়া চটিতে পথের ধুলো জড়িয়ে থাকতো।. টলমলে পায়ে সেদিন রিকেলের মরা রোদে দুঃখীর মত হেঁটে যেতে দেখেছিলাম আমি, অপমানিত এক অসহায় বৃদ্ধকে। তারপর আর বহুদিন আসেন নি তিনি। চিঠির শেষে ভাগ্যহীন কয়েক সন্তানের নাম লেখা, কালো বর্ডারের একটা চিঠি এসেছিল কয়েক মাস পর।. সারাদিন লুকিয়ে ঘরের কোণে কেঁদেছিলো বৌদি।

সে দুঃখ, সে অপমান আজও কি মনে আছে বৌদির? তিন রাত জেগেছে বৌদি বাবার পায়ের কাছে। বৌদি, তুমি কি ভুলে গেছো সে রিকেলের কথা? বড় শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে বৌদি বাবার দিকে। সমস্ত কিছু নিয়মে বেঁধেও বাবাকে শেষ পর্যন্ত ধরে না রাখতে পারার দুঃখ লেগে আছে বৌদির চোখে। হাত ছুঁয়ে আছে বৌদির, বাবার দুটো পা। দুই চোখ অভিমানহীন। পরপর তিন রাত জেগে আছে বৌদি বাবার পাশে।. একে কি প্রতিশোধ নেয়া বলে?

টুলু দাঁড়িয়ে আছে বড়দার পাশে। আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে টুলু সবচাইতে লম্বা। রোগাও। টুলু বেকার। একটু একবোখা ধরনের। গোপনে রাজনীতি করে টুলু। রাতে প্রায় বাড়ীতেই থাকে না। পরপর তিন রাত টুলু বাড়ীতে। সকাল হবার আগেই চলে যায়। শান্ত ভালো মানুষ সেই ছেলেবেলার টুলু যখন দিন বদলের কথা বলে, তখন বড় আশ্চর্য লাগে আমার। লুকানো আগুন তখন ঝলসে উঠে টুলুর চোখে। অথচ টুলু ছেলেবেলায় ছিল ভীতু এবং ভালো মানুষ। এই ভালো মানুষীর জন্য অনেক বকুনি খেয়েছে ও বাবার কাছে, মারধোরও। টুলু আজ বোধ হয় ভুলে গেছে সেসব কথা। এখন টুলু দায়িত্বশীল, সতর্ক

ও সাবধানী। টুলু যখন গভীর কথাগুলো বলে, মনে হয় না টুলুর ছেলেবেলা অত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। কোথায় ছিল তখন টুলুর প্রতিবাদ, চোখের আগুন। টুলু ভেবে আসে বাবার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে টুলু? বুঝতে পারে নি এই বাবা লোকটা সব জীবনে। শুধু ভোগ্যপণ্য হয়ে গেছে দুটী হীন মাতৃহীন মাতৃহীন চার সন্তানকে মানুষ করা, লালন করেছে শুধু। আজ সে জন্যে মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। যেন ভুল পথে না যায় মাতৃহীন বালকেরা। ...কিন্তু কি ভুল পথে গিয়েছিল সেদিন টুলু?...

ক্লাস এইট পড়ার সময় পুরোনো বইগুলো টুলু বাবাকে জিজ্ঞেস না করেই নীচের ক্লাসের একটা ছেলেকে দিয়ে দিয়েছিল। জানতে পেরে বাবা খুব বকেছিলেন ওকে নববাবুপুত্তুর, দানছত্র খুলেছো না? আমাকে একবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনও বোধ করলে না তুমি। বড় লায়েক হয়ে গিয়েছো তুমি, না?' ধমকের শেষে চড় থাপ্পড়ও খেয়েছিল টুলু। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল ওর।

বাবাকে মাঝে মাঝে কেমন যেন লাগতো আমার। উঁচু শাল বৃক্ষের মত ব্যক্তিত্ব বাবার। স্নেহ আর ভালোবাসার শিকড় তার গভীরে। তবুই ছায়ায় বড় হয়ে উঠেছি আমরা চারজন মাতৃহীন সহোদর। আমাদের জীবনের প্রদক্ষ বলতেও বাবা। অথচ মাঝে মাঝে কেমন ভয় লাগতো আমার বাবাকে। একটা সেলাই মেশিন কয়েকটা টাকা—এসব ছোটখাট লোভ কেন বাবার ভাবতে গিয়ে কোন উত্তর খুঁজে পাই নি সেদিন। বাবাকে ছোট ভাবতে দুঃখও হত আমার।

সে রাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছিল টুলু।

কিরে ছমস নি বাবা বকেছে বলে, টুলু, এই টুলু?'

ছেলেটা খুব গরীব তাই নয় চাই নি তখনো কে জানতো টুলু বাবা আমাকে মারবার যে ছেলেটার মা বাড়ীতে কাজ করতে আসে মাঝে মাঝে।

খুব ভালো করেছিস। তোর মন খুব ভালো রে টুলু' বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলাম টুলুকে। কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল টুলু।

আজ টুলু ভুলে গেছে সেসব কথা। সহজ ভালোমানুষ এবং ভিতু সে টুলু এখন বদলে গেছে। নিরাপদ না ভেবেও ও এসেছে এ পড়ন্ত। কোন দাবী, কোন অভিযোগ নেই ওর বাবার বিরুদ্ধে। টুলু আজ ভুলে গেছে ওর ছেলেবেলা। নির্বিবিজি সেই বিপদহীন দিনগুলো। বিপদের মধ্যে দিয়ে ও আজ এসে দাঁড়িয়েছে, বুকের অসুখের পাশে।

ভোর হয়ে আসছে বাইরে। অন্ধকার খুব ধীরে সরে যাচ্ছে। অনিবাশ দাদুর গলায় লাল পাথরের মালা। বৌদি ছুঁয়ে আছে বাবার পা। বড়দার মুখ গম্ভীর। অবিনাশ দাদুর কপালে গোলা সিঁদুরের লম্বা টিপ। বাবার মাথার কাছে টেবিলে ওষুধের ছোট-বড় শিশি। মাঝে মাঝে দপ দপ করে উঠছে লণ্ঠনের শিখা। বাবার বুকটা ওঠা-নামা করছে। কাছেই কোথায় যেন কুকুর ডেকে উঠল। টিনের চালে শেষ রাতের শিশির পড়ার শব্দ।

দাদা বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে রে' পাশ থেকে ছোটাই বলে উঠল নীচু গলায়।

আমাদের চার ভায়ের মধ্যে সবচাইতে ছোট ছোটাই। চিরদিন ও খুব চুপচাপ। বাবাকে ও ছেলেবেলা থেকে খুব ভালবাসতো। আমাদের চারজনের মধ্যে ছোটাই মায়ের ভালোবাসা প্রায় একটুও পায় নি। ছোটবেলা থেকে তাই আমরা ওকে ঘিরে রাখতাম। ছোটাই দুঃখ পেলে বড় কষ্ট হত আমাদের। অথচ বাবার স্নেহ ছিল সমান। ছোটাই তার ভাগ এতটুকু বেশী পায় নি।

পুজোয় একবার ভেলভেট কর্ডের প্যান্টের বড় সখ হয়েছিল ছোটাইয়ের। অথচ বাবার নিয়ম চার ভায়ের এক জামা-প্যান্ট। চার ভাইকে ভেলভেট কর্ডের প্যান্ট দেয়া বাবার পক্ষে অসম্ভব।

আমরা বাবাকে বলেছিলাম 'এ বছর আমরা না হয় প্যান্ট নেবো না, তুমি শুধু ছোটাইকেই একটা ভেলভেট কর্ডের প্যান্ট বানিয়ে দাও। ওর বড় সখ'

'আমার এক কথা' বাবা আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'প্রত্যেক বার যা হয়ে আসছে তাই। সুতীর প্যান্ট চার ভাই-ই পাবে। স্কুল মাস্টারের ছেলের এত বাবুগিরি কিসের শুনি?'

ভেলভেট কর্ডের প্যান্ট শেষ পর্যন্ত পায় নি ছোটাই। এক জামা-প্যান্ট পরে চার ভাই হাত ধরাধরি করে প্রতিমা দেখতে বের হয়েছিলাম। আমার হাতে ছোটাইয়ের হাত বার বার টান লাগছিল সে হাতে। চমকে দেখেছিলাম, প্রতিমা দেখছে না ছোটাই, ভেলভেট কর্ডের প্যান্ট-পরা, প্যাণ্ডেলে সমবয়সী ছেলেদের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে আছে। সেদিন সেই সুখী মানুষদের ভিড়ের এককোণে, আমরা চার-জন মাতৃহীন অসহায় বালক, ছোটাইকে তার মধ্যে আমার সব চাইতে স্নেহহীন দুঃখীর মত লেগেছিল।

সে অভিমান আজ ভুলে গেছে ছোটাই।

'বাবার বড় কষ্ট হচ্ছে যে মেজদা' কান্নার মত শোনাচ্ছে ছোটাইয়ের কণ্ঠস্বর।

'শেষ সময় উপস্থিত' দাদুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। নিচু হয়ে বাবার নাড়ি দেখছেন দাদু। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বাবার বুকটা ভীষণ জোরে ওঠা-নামা করছে।

আমরা চার ভাই দাঁড়িয়ে আছি বাবাকে ঘিরে। আমার পাশে ছোটাই। বাবার পায়ের কাছে বৌদি। তারপর বড়দা। বড়দার পাশে টুলু। মাথার কাছে অবিনাশ দাদু। বাবা শুয়ে আছেন মাঝখানে। বাবাকে ঘিরে ছিল আমাদের ছেলেবেলা। আমাদের ইচ্ছে দুঃখ, লোভ এবং অভি-মান। মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা বাবাকে আমাদের মনে হয়েছে কখনো স্বার্থপর, কখনো নিষ্ঠুর।

ছেলেবেলাকে পেছনে ফেলে এসেছি আমরা বহুদিন। আজ বড়দা অ্যাকাউন্টস অফিসের কেরানী, টুলু বেকার ছোটাই কলেজে পড়ে। আর উত্তরাধিকারের মত বারুইপুর জুনিয়ার হাইস্কুলের মাস্টার আমি। আমরা এখন সকলেই ভুলে গেছি ছেলেবেলা। ছবি আঁকা ভুলে গেছে বড়দা, টুলু ভুলে গেছে সরলতা এবং ভয়, সখের পায়েন্টের কথা ভুলে গেছে ছোটাই। আর আমি, দিনের-পর-দিন মাস্টারী করে বুঝেছি, বাবা কত অসহায় ছিলেন। এই অসহায়তাই মানুষকে স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর করে তোলে। একটা সেলাইয়ের মেশিন অথবা বই-বেচা কয়েকটা টাকার লোভ এই অসহায়তায় অনেক বড় মানুষকে ছোট করে ফেলে।

অসহায়তার মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরও। সেখানে দুঃখ থাকবে। থাকবে অভিমান অথবা ঘৃণা। আমরাও থাকবে, পাশ পাশি। আর থাকবে অলক্ষ্যে জমে ওঠা অভিযোগ। কি অভিযোগ আমরা করব বাবার বিরুদ্ধে? কোন্ সাহসে?

'সব পাপ বিনির্মুক্ত দিব্যান লোকের গন্ধ হয়' বাবার শরীর ছুঁয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে উঠছেন দাদু ও কালী কৈবল্যদায়িনী ও কলী ও কালী!'

আয়ত রক্তাক্ত চোখ দাদুর ছলছল করছে। বড়দা, টুলু, ছোটাই দাঁড়িয়ে আছে মাথা নীচু করে। বাবার পায়ে মাথা ছুঁইয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে বৌদি।

ভোর হয়ে আসছে বাইরে। ভোরের প্রথম আলোর পথ ধরে চলে যাবেন আমাদের বাবা। সে পথে কোন অভিমান, কোন দুঃখ বা অভিযোগ নেই। আমাদের বৌদি, আর চারজন মাতৃহীন সহোদরের ভালোবাসায় উদ্ভাসিত সে পথ।

শান্তু নিমীলিত চোখে ঘুমিয়ে আছেন আমাদের বাবা। পুবে মাথা রেখে পশ্চিমে পা বাবার। মাথার কাছে জানালার চার পাশ ক্রমে আলোকিত হয়ে উঠছে।

অঞ্জনা

পানকে ঘিরে

ব্যাগ থেকে ডিবে খুলে মুখে একটা কিছু পুরে দেবার ফাঁকেই প্রায় লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা। ব্যাগটাও ভাল করে বন্ধ করবার ফুরসত পান নি। তারপর নামী স্টেশনের ঐ প্রচণ্ড ভীড়। ভদ্রমহিলা ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠেই যেমন-তেমন করেই হোক নিজের একটু বসার জায়গা করে নিলেন। তারপর শুরু হয় কিছুক্ষণের জমাটি আড্ডা। মিনিট চল্লিশের পথ। সকলেই প্রায় পূর্বপরিচিতা, বহুদিনের যাত্রী—প্রায় সেই ইলেকট্রিক ট্রেনের শুভ জন্মদিন থেকে এঁরা যাতায়াত করছেন।

গল্পের ফাঁকে ফাঁকে চলে ডিবে খুলে মুখে ঢোকানো, সেই সঙ্গে আশেপাশের দু'একজনকে বিলি করা। এই ডিবে খোলার নেশাটা দিনকে দিন চাকুরিজীবী মেয়েদের বেড়েই চলেছে। এতো হলো এক বর্ষীয়সী মহিলার কথা। যার কর্মজীবন শেষ হয় অবসর নেবার আর বেশী দেরি নেই।

টিফিনে বেয়ারার হাতে চুপি চুপি পয়সা দিয়ে অল্পদিনের চাকুরী পাওয়া একটি মেয়ে ফিস-ফিস করে কি বললো। বছর তিনেক চাকুরীতে ঢুকেছে মেয়েটি। এরই মধ্যে সকলের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছে। হাল-ফ্যাশনের মেয়ে। শাড়ী-ব্লাউজ সুন্দর ম্যাচ। হাতেও মাঝে মাঝে ঝোলে মানানসই একটি ব্যাগ। চোখ, মুখ, ঠোঁট সুন্দর, সহজ পালিশে উজ্জ্বল। সব মিলিয়ে দেখতে বেশ। এ হেন মেয়েও বেয়ারাকে চুপ চুপি ডেকে হাতে পয়সা দেয়।

বেয়ারা যথারীতি কলাপাতা মোড়া বস্তুটি এনে তার টেবলের এক কোনে রেখে দিয়ে দিদমণির সম্মতি নিয়েই ফিরে যায়। চা-টায় শেষ চুমুক দিয়ে কলাপাতার আবরণ ছাড়িয়ে মেয়েটি সেটিকে গালে পুরে দেয়। ভাবতে অবাক লাগে সুন্দরী, আধুনিকা মেয়েরাও কেন এ বস্তু খায়। চাকুরিজীবনের এ স্বল্প সময়ে এ কিসের নেশায় ধরে। ওর ঠোঁটে তো এখনও সেই হাল্কা লিপস্টিকের রং লেগে আছে।

সেকালের কুলবধূরা ঠোঁট রাঙাতেন পানের রসে। তাঁদের তখন ছিল না কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী। প্রকৃতি থেকেই তারা তাঁদের প্রসাধনের জিনিষকে সংগ্রহ করতেন। বর্তমানের মেয়েদের তো হাতের নাগালেই সব। ঠোঁট রাঙাতে লিপস্টিক ওদের নিত্য-দিনের সাথী।

জনাকয়েক মেয়ের ভীড় লেগেই আছে বড় রাস্তায় বা গলির ছোট দোকানটিতে। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই ছোট ছেলেরা এসেছে হৈ-হৈ করে কলেজের ক্লাসের অবসরে পান চিবোতে। এমনি দলে দলে ওরা আসে। কখনো একবার, কখনো তারও বেশী। ওরা বলে মসলার সুগন্ধে ওরা পান চিবোতে আসে। ক্রমে তা খানিক অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায়। নিয়মিত একটা না চিবোলে আর শেষরক্ষা হয় না।

সিনেমা, থিয়েটার দেখে ফেরার পথে খানিক সময় দাঁড়িয়ে দু'চারজন অল্পবয়সী বা বেশী বয়সী মহিলা পান কিনে তা চিবোতে চিবোতে বাড়ী ফেরেন। পানের প্রতি একটা ভালবাসা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আগেও মেয়েরা পান খেতো, বহুলাংশে তা সীমাবদ্ধ থাকতো বয়স্কাদের মহলে। দুপুরের আড্ডার ফাঁকে বসে পা ছড়িয়ে গল্প জুড়তেন পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে, সামনে থাকতো পানের ডিবে। কাজের ফাঁকে পানের রসের আস্বাদ নিতে একদল মহিলা সবসময়ই অগ্রণী ছিলেন সেকালেও যেমন একালেও তেমন আছেন।

শুধু পান চিবিয়েই আজকালকার চাকুরিরত মেয়েরা ক্ষান্ত নয়। সে সঙ্গে আছে জর্দার মনমাতানো গন্ধকে পানে পুরে খাওয়ার নেশা। আমি মাঝারি বয়স্কাদের কয়েকজনকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ অভ্যেসটা কেন করলেন।' সকলেরই প্রায় এক উত্তর। একজন বললেন, 'আমার পাশের চেয়ারটাই এ রোগ ধরিয়েছে। ভদ্রমহিলা বয়স্কা ছিলেন। বিট্রায়ার করেছেন বছর পাঁচেক হলো। প্রথম প্রথম তাঁর ডিবে থেকে সুযোগ পেলেই মুখে সুপুরী ছুঁড়তাম। তারপর মাঝে মধ্যে পান নেবেন। শেষে কেমন অভ্যেস হয়ে গেলো যে এটাকে বোধহয় আর কোনদিন ছাড়তে পারবো না।

বয়স্কাদেরও প্রায় সেই অভিমত। তাদের কেউ কেউ বললেন, 'আমার শাশুড়ী, কারো বা ননদ পান সাজিয়ে খাইয়ে এটা অভ্যেস করিয়ে দিয়েছেন।'

অল্পবয়স্কারাও জিজ্ঞাসার উত্তরে কেউ কেউ পরিষ্কার বলেই ফেললো 'কেমন ভালো লাগে। দলবল মিলে খেলে বেশ আমেজ আসে।'

আসলে এই আমেজটাই মারাত্মক। এই আমেজেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থায়ী রোগে পরিণত হয়। বিশেষ করে চাকুরিজীবী মহিলাদের তো কথাই নেই। পুরনোদের সঙ্গে নতুনেরাও অল্পকালের মধ্যে একটু আধটু এর রসে অধর রঞ্জিত করতে চান। এই অধর রঞ্জন থেকেই সংক্রামক ব্যাধির মত পান খাওয়াটা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে থাকে পান চিবোনোর ভাল লাগা।

পান কি শুধু বাংলার মেয়েদের প্রিয় না, বাংলার বাইরেও মেয়েদের পানের প্রতি বিরাট আকর্ষণ আছে। বাংলার পান বাংলার বাইরে বারাণসী, গোণ্ডিয়া, এলাহাবাদ ছাড়া নেপালের বাজারে ছড়িয়ে আছে।

* * *

সম্প্রতি একটি স্ট্যাটিস্টিকস্-এর সেন্ট্রাল বোর্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, জীবিকা হিসেবে বাঙ্গালোরিয়ার মেয়েরা অন্যান্য অনেক কাজের মত শিক্ষকতার কাজও অনেকে পছন্দ করেন। ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমস্ত কর্মীর শতকরা ৪৪-১ ভাগ মহিলাকর্মী। বর্তমানে সেই হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক ও জীবিকার ক্ষেত্রে মেয়েদের মান পূর্বের অপেক্ষা অধিক উন্নত হয়েছে। দেশের মোট বিশেষজ্ঞের শতকরা ৪৮-৩ ভাগ মহিলা। মোট ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি, নকশাকার ও কৃষিকাজের তিনভাগের একভাগ মহিলা, চিকিৎসক প্রায় আধাআধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই অধিক অগ্রণী।

বাঙ্গালোরিয়ার ছশো মহিলা বিশেষ উচ্চ ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিতা। তার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, কৃষিবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, গবেষণা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাজে মেয়েদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জীবিকা ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেদের মান উন্নয়ন করতে বাঙ্গালোরিয়ার মহিলারা সামাজিকক্ষেত্রেও যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী হয়েছেন।

সোভিয়েত দেশের নারীরাও দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছেন। 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকায় সোভিয়েত মহিলাদের জীবিকার যে ক্রমোন্নতির তালিকা দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত নারী-দের মধ্যে ডি-এস-সি ডিগ্রিধারীর সংখ্যা ৩,১০০, মাস্টার ডিগ্রিধারী ৬০,৭০০, অধ্যাপিকা ও বিজ্ঞান এ্যাকা-ডেমির 'করেসপণ্ডিং' সদস্যের সংখ্যা ১,৮০০। সারা দেশে বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে রত মহিলার সংখ্যা শতকরা ৪৭ শতাংশ।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা আদালতেও জটিল বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করে থাকেন। দরকারমত তাঁরা কঠিন শাস্তিরও রায় দিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ বিচারালয়ের বিচারের কাজ সকল্স দশটা থেকেই শুরু হয়। আইনজীবীর কাজেও সোভিয়েতের অনেক মহিলাই নিযুক্ত। মোট আইনজীবীর মধ্যে ৪,৯৮৫ জন মহিলা অর্থাৎ মহিলার সংখ্যা শতকরা ৩৫-৪। গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেই সংখ্যা যথাক্রমে পাঁচ শতাংশ ও ৩-৫ শতাংশ। কৃষিতে ২৯ শতাংশ পরিবহনে ৪৪ শতাংশ ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ৭২ শতাংশ।

—অঞ্জলি চৌধুরী

জান মান মাটি

বিকাশ-এর চমকপ্রদ উপন্যাস ৬.

এ লড়াই বাঁচার লড়াই

দুর্বাদল চাটার্জীর সংগ্রামমুখর নাটক ৩.

শার্লক হোম্‌স্ ফিরে এলেন

কোনান ডয়াল/আদ্রীশ বর্ধন ১০.

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্ লিমিটেড

৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

বিবাহ বিচিত্রা—(৯) ঃ বিহার

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তের প্রতিবেশী রাজ্য বিহার। এর উত্তর দিকে ভারত-নেপাল সীমান্ত, দক্ষিণাংশ এসে মিলিত হয়েছে উড়িষ্যার সঙ্গে– পশ্চিমে আছে উত্তরপ্রদেশের বিস্তৃত মালভূমি। গঙ্গা ও তার উপনদী বিধৌত এই সমভূমি-রাজ্য ভারতের শস্য ভান্ডার। এর দক্ষিণাংশে আছে ছোটনাগপুরের মালভূমি—ভারতের খনিজ সম্পদের আকর। একদিকে কৃষিকার্য, অন্যদিকে খনিজ-উত্তোলন ও শিল্পশ্রম এখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা। এখানকার অধিবাসীরা সহজ সরল ও অনাড়ম্বরভাবে জীবন কাটান। এই রাজ্যের বিবাহ-অনুষ্ঠান এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মতো সাবল্য ও সুষমামণ্ডিত। পশ্চিমবঙ্গের বিবাহ-অনুষ্ঠানের সঙ্গে এখানকার বিবাহ-অনুষ্ঠানের অনেক সাদৃশ্য ও স্বতই চোখে পড়ে।

বিবাহের উদ্যোগপর্বে প্রথমে পাত্রপাত্রী পছন্দ করা হয় তারপর ছেলেমেয়ের সাতপুরুষের ইতিহাস খতিয়ে দেখা হয়—তারা কোন রকমভাবে নিম্ন শ্রেণীতে বিবাহ করে সমাজে পতিত হয়েছে কিনা। বংশপরম্পরায় কুলপুরোহিতেরা এগুলো লিখে রাখেন এবং বিহারী ভাষায় একে বলা হয় 'পঞ্জিকা'। তারপর দেখা হয় সাতপুরুষের সম্বন্ধে কোন রকমভাবে বর কনে ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে পড়ে কিনা—যদি না পড়ে তবেই কথাবার্তা সুরু হয়। কথাবার্তা সুরু হওয়াকে বলা হয় 'সিদ্ধান্ত' সুরু হওয়া। মেয়ে পছন্দ হলে দেনাপাওনার কথা ওঠে—বরপণকে বলা হয় 'তিলক' বা 'দহেজ'।

তারপর পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে যান। সাধারণত ছেলের মা বাবা বা আত্মীয়-স্বজনেরাই মেয়ে পছন্দ করেন। মেয়ে দেখতে যাওয়া মানেই একরকমভাবে বিয়ের কথা পাকা হয়ে যাওয়া—কারণ তার আগেই ছবি দেখে, ঠিকুজি মিলিয়ে ও অন্যান্যদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মেয়ে পছন্দ করে নেওয়া হয়। পাত্রপক্ষের তরফ থেকে মেয়ের জন্যে শাড়ী, আংটি ইত্যাদি উপহার নিয়ে যাওয়া হয়। পাত্রপক্ষের থেকে আগতদের

মধ্যে যিনি সবচেয়ে বয়স্ক তিনিই মেয়েকে এই উপহার দেন। বয়োজ্যেষ্ঠরা ধান দূর্বা পান সুপুরী মেয়ের আঁচলে দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেন। মেয়ে বড়দের প্রণাম করে। তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা একদিন ছেলের বাড়ীতে যান। সেদিন যে অনুষ্ঠান হয় তাকে বলা হয় 'ফলদান' বা 'ছেঁকা'। এখানে 'ছেঁকার'র অর্থ ছেলেকে আগলানো—অর্থাৎ সে আর এ সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে না। সেদিন একজন পুরোহিত সঙ্গে নিয়ে মেয়ের বাবা কাকারা পাত্রপক্ষের বাড়ীতে যান। মেয়ের বাবা ছেলের যুগ্মহাতের অঞ্জলিতে নারকোল পান সুপুরি ও আংটি উপহার দেন। পুরোহিত এই সময়ে মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন এবং পরে আংটিটা ছেলের আঙুলে পরিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানেই বিয়ের কথা একদম পাকা হয়ে যায়। ফলদানের দিনই 'তিলকের' দিন ও বিয়ের তারিখ ঠিক করে নেওয়া হয়।

'তিলকের' দিন মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে সবশুদ্ধ পাঁচজন আসেন। এঁদের মধ্যে একজন কন্যার পিতৃস্থানীয় বা পিতা, একজন পুরোহিত, একজন ক্ষৌরকার এবং বাকী দুজন কন্যার কোন ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয় বা ভ্রাতা। মহিলারা কেউ আসেন না মেয়ে পক্ষের তরফ থেকে। 'তিলক' অনুষ্ঠান রাত্রিতে হয়। ছেলের বন্ধু, আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা এই অনুষ্ঠান দেখতে আসেন। 'তিলক' অনুষ্ঠানে মেয়ে পক্ষকে ছেলে পক্ষের পূর্ব দাবী অনুযায়ী নগদ টাকা, বাসনপত্র এবং অন্যান্য যৌতুকের সামগ্রী নিয়ে যেতে হয়। যদি কোন কারণে মেয়েপক্ষ ছেলেপক্ষের দাবী পূরণ করতে না পারেন তাহলে খুবই অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং যে সময় পর্যন্ত মেয়েপক্ষ দাবী অনুযায়ী সেই সব জিনিষপত্র না দিতে পারেন বিয়ের তারিখ সেই সময় পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ছেলের বাড়ীর উঠানে যজ্ঞবেদীতে হোমাগ্নি জ্বালা হয়। ছেলেপক্ষের পুরোহিত প্রথমে কুলদেবতার পূজা করেন—তারপর 'তিলক' অনুষ্ঠানের মন্ত্র পাঠ করেন। ছেলে ও পুরোহিতের নির্দেশ অনুযায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে থাকে। মেয়েপক্ষের পুরোহিত এই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র সাক্ষী হয়ে নিশ্চুপ বসে থাকেন। পূজোর পর ছেলে পক্ষের পুরোহিত চন্দন, কুঙ্কুম (এক রকমের শুকনো গুঁড়ো রঙ যা টিপ হিসেবে অনেকে পরেন) ও দইয়ের ফোঁটা অর্থাৎ 'তিলক' ছেলের কপালে পরিয়ে দেন। 'তিলক' অনুষ্ঠান যখন চলতে থাকে মহিলারা নানা ধরণের গান গান। রামসীতা ও শিব-পার্বতীর বিবাহ সংক্রান্ত গানই বেশী গাওয়া হয়। তারপর কন্যাপক্ষের আগন্তুকদের ভুরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। এই ভোজ্য কিন্তু সম্পূর্ণ নিরামিষ। খাদ্যতালিকায় থাকে পুরী কচুরী ভাত তরকারী চাটনী রাবড়ি মিষ্টি ইত্যাদি আহার্য। তিলকের দিন কন্যাপক্ষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দু' পক্ষের পুরোহিতকে ও ক্ষৌরকারকে ধুতি চাদর ইত্যাদি উপহার দেন। বিয়ের একদিন আগে কন্যাপক্ষের বাড়ীতে কনের 'হলদী' অনুষ্ঠান হয়। সেদিন কনের গায়ে সধবা মহিলারা হলুদ ও উপটান (অর্থাৎ বাংলায় যাকে বলা হয় রূপটান—দুধের সর দিয়ে মুসুরির ডাল বাটা) লাগিয়ে দেন—তারপর মেয়েকে স্নান করানো হয়।

ফুল দিয়ে সাজানো মোটরে গাড়ীতে বা পালকীতে করে বিয়ের দিন বর আসে—সঙ্গে আসেন বরযাত্রী বা 'বরাতি'র দল। বরযাত্রীতে বরপক্ষের সকলেই যেতে পারেন তবে অল্প বয়সী বাচ্চা মেয়ে ছাড়া অন্য কোন মহিলা যান না। বরের পরণে থাকে ধুতি হলুদ রঙের রেশমী কুর্তা (পাঞ্জাবী) মাথায় মখমলের ওপর সলমা চুমকির কাজ করা টুপি বা সিল্কের পাগড়ী এবং পায়ে লাল নাগরা জুতো। মেয়ের বাড়ীর দরজায় পৌঁছলে ছেলের মাথার পাগড়ী বা টুপি খুলে নিয়ে ছেলের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা 'মোর' (শোলার তৈরী রঙীন কাগজ ও অয়নার টুকরো বসানো এক রকমের মুকুট) পরিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েপক্ষের সবাই আসেন দরজার কাছে। মেয়ের মার হাতে থালায় আরতি দীপ ও ফুল থাকে। বরকে কনের মা আরতি করেন। সধবারা বরের গায়ে পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন এবং মহিলারা বিয়ের গান গান। বস্তুত 'ফলদান' অনুষ্ঠানের দিন থেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বর ও কনের বাড়ীতে বিয়ের গান গাওয়ার ধুম পড়ে যায়। কনে বিয়ের সময় বিশেষ সাজগোজ করে না। তার পরণে থাকে হলুদ রঙের সুতী শাড়ী এবং মাথায় হলুদ রঙের উড়নির ঘোমটা। কনে এসে এই সময়ে বরের গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। বরের কাছে থালায় করে এই সময়ে

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কষ্টিপাথরে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৩৲ টাকা পাঠাইলে ভাকমাশুল ফ্রি

॥ বিশেষ ঘোষণা ॥
পৃষ্ঠপোষকদের শুভেচ্ছায়—তাঁহাদের সুবিধার্থে আগামী ১৬ই আগস্ট, ১৯৭৩ ৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ আমাদের নূতন কাউন্টারের শুভ উদ্বোধন হইবে। ঐদিন যে সমস্ত পুস্তক বিক্রেতা বন্ধুগণ অন্যূন একশত টাকার পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহাদের প্রাপ্য কমিশন ছাড়াও সামান্য কিছু অতিরিক্ত দেওয়া হইবে।
মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ কলি-৭৩
নূতন কাউন্টার—৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড (কলেজ স্ট্রীট অংশন), কলিকাতা-৯

একটা ফুলের মালা নিয়ে আসা হয়—বরও সেটা কনের গলায় পরিয়ে দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে 'বরপূজা' বলা হয়। বর-পূজার পর ছেলের বড় ভাই কনেকে দেখতে আসেন ও তাকে শাড়ী গহনা মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'কন্যা-নিরীক্ষণ'। তারপর কনেকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে যান—বর সমেত বরপক্ষের সবাইকে এক জায়গায় বসিয়ে খেতে দেওয়া হয়। এই সময় বর ও কনে উভয় পক্ষের উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের পালা চলে। কোন পক্ষ যেন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে সে পক্ষের সম্মানহানি হয়—অনেকটা সেকালের পণ্ডিতদের তর্ক-যুদ্ধের মতো এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিক।

তারপর বরকে কনের বাড়ীর আঙিনে পিঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। উঠানে একটি কাঠের ছাউনি খুব সুন্দর করে ফুল পাতা কাগজ ও তার দিয়ে সাজিয়ে মণ্ডপ (বিহারী ভাষায় 'মড়বা') তৈরী করা হয়। এই মণ্ডপের নীচে আলপনা দেওয়া হয়। মাঝখানে থাকে যজ্ঞবেদী। এই মণ্ডপে যজ্ঞ-বেদীর সামনে বর ও কনে এসে মুখোমুখি বসে। বর বিয়ের মণ্ডপে বসলে কন্যাপক্ষের তরফ থেকে দেওয়া একটা হলুদ রঙের সিল্কের চাদর তার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কনের পরণে তখনও সেই হলুদ রঙা শাড়ী ও মাথায় উড়নী। কন্যা ও বরপক্ষের পুরোহিত একসঙ্গে মন্ত্রপাঠ করেন। হোমাগ্নি প্রথম থেকেই প্রজ্বলিত করে রাখা হয়। প্রথমে গণেশ, তারপর কুলদেবতা ও তারপর পূর্বপুরুষের পূজা করার পর বিবাহের মন্ত্রপাঠ সুরু হয়। প্রত্যেক পূজার পর পুরোহিত অগ্নিতে ঘি যব, চাল, ধনে ইত্যাদি আহুতি দেন। বিবাহের মন্ত্র-পাঠ সুরু হলে বর ও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করতে সুরু করে। মন্ত্রপাঠ শেষ হলে পুরোহিত বরের চাদরের প্রান্তভাগ ও মেয়ের উড়নীর প্রান্তভাগ গ্রন্থিবদ্ধ করে দেন। তারপর প্রথমে বর ও তার পেছনে কনে তিনবার হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ করে। চতুর্থ বারে আগে কনে থাকে ও পিছনে থাকে বর। এই চারবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটি অভীপ্সিত বস্তুর দ্যোতক। তারপর হয় 'সিন্দুরদান' (সিঁদুর কৌটো) ছেলের হাতে দেওয়া হয়। বর সেই কৌটোর সিঁদুর কনের সিঁথিতে ঢেলে দেয়। বিয়ের সময় কনের হাতে থাকে লাল গালার চুড়ি, হাতে মেহেদী, পায়ে আলতা। কাঁচের চুড়ি ও পায়ের মধ্যম আঙুলের রুপোর আংটি (যাকে হিন্দিতে 'বিছিয়া' বলা হয়) হল উত্তর ভারতীয় হিন্দু রমণীর আয়তির চিহ্ন। মন্ত্রপাঠের পর বিয়ে শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে যায়। সেই রাতেই বর কনে একঘরে শয়ন করে। একে বলা হয় 'কোহবর'। 'কোহবরের' সময় বরের বাড়ী থেকে দেওয়া শাড়ী ও গহনা পরিয়ে কনেকে সাজানো হয়। 'কোহবরের' এই রাত্রিই সদ্যবিবাহিত বিহারী তরুণ তরুণীদের জীবনে প্রথম শুভরাত্রি—হিন্দিতে যাকে বলা হয় 'সোহাগ-রাত'। কোথাও কোথাও আবার প্রথা অনুসারে কনের শ্বশুরবাড়ীতে বিয়ের চারদিন পরে এই 'কোহবর' অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে এই কদিন বর ও বউ আলাদা ঘরে শয়ন করে।

তারপর দিন সকালে নববধূকে উঠোনের মাঝখানে এনে বসানো হয়। বধূর মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকে। তার পাশে বসে থাকে ক্ষৌরকারিনী। বরপক্ষের বয়োঃজ্যেষ্ঠরা কনে দেখতে আসেন—কারণ বিয়ের আসরে তাঁরা কেউই উপস্থিত থাকেন না। ক্ষৌরকারিনী একবার ঘোমটা খুলে নববধূর মুখ উপস্থিত সকলকে দেখিয়ে দেয়। সকলে একে একে এসে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী শাড়ী, অলঙ্কার, টাকা ইত্যাদি দিয়ে বধূকে আশীর্বাদ করেন। বধূ মাথা নিচু করে সকলকে প্রণাম করে।

তারপর আসে বরযাত্রী ও দুলহা দুলহিন (বরকনের) বিদায় গ্রহণের পালা। মেয়েপক্ষের বয়োঃজ্যেষ্ঠরা বরকনেকে আশীর্বাদ করেন—বরকে টাকা দেন। বরকনে সকলকে প্রণাম করে। বাপের বাড়ী থেকে বিদায় দেওয়ার সময় কনেকে বরপক্ষের দেওয়া শাড়ী ও গহনা পরানো হয়। বরকে পণের টাকা ও কৌতুকের জিনিষপত্র এই সময় দেওয়া হয়ে থাকে। বর ও কনের জন্য কাপড় গহনা ঘড়ি ইত্যাদি আলাদা আলাদা বাক্সে সাজিয়ে দেওয়া হয়। কনেকে এ ভাবে বাড়ী থেকে বিদায় দেওয়াকে বলা হয় 'কন্যাবিদায়'।

কনের শ্বশুর বাড়ীতে সেদিন ছোট ছোট টুকরি বা ঝুড়িতে নানারকম শস্য—যেমন চাল, গম, যব, ধান ইত্যাদি স্তূপাকারভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ওই টুকরিগুলোতে পা রেখে রেখে নববধূ স্বামীগৃহে প্রবেশ করে। একে বলা হয় 'অন্নপূর্ণা অনুষ্ঠান'। এর তাৎপর্য হল এই যে নতুন বধূর আগমনে শ্বশুর-গৃহ অন্নে ভরে উঠবে। বরপক্ষের মহিলারা এবং ছেলের মা এসে নববধূর মুখ দেখেন। তাঁরা বরকে আশীর্বাদ করেন ও উপহার দেন। ছেলের মা তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে নববধূর পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা আশীর্বাদ করলে বধূ তাদের প্রণাম করে। কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ী থাকার পর বধূ বাপের বাড়ী ফিরে যায়। পুরোহিতের নির্দেশ মতো শুভদিন দেখে বর শ্বশুর বাড়ী গিয়ে তাকে আবার নিজের পিতৃগৃহে ফিরিয়ে আনে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় দ্বিরাগমন বা গওনা। এই ভাবেই বিহারের হিন্দু কন্যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয় এক সদ্য বিবাহিত তরুণ-তরুণীর ঘাত-প্রতিঘাতময় সংসার জীবনে প্রবেশ করে।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

প্রকাশিত হল

বর্ষপঞ্জী ১৩৮০

(২৭শ বর্ষ চলছে)

বাংলা ভাষায় ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট ইয়ার-বুক (তথ্যগ্রন্থ)

বর্ষপঞ্জী বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। যে-সকল প্রগতিশীল নরনারী 'নতুন ভারত' ও চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চান বর্ষপঞ্জী তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান সংখ্যার বহু নতুন বিভাগের মধ্যে 'অলিম্পিক ক্রীড়া', 'বাংলাদেশের নতুন সংবিধান' ও 'পাকিস্তান' উল্লেখযোগ্য। বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ, মূল্য ৯ টাকা ৫০ পঃ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক : এস আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫।এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা—৬ । ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

বুমুবামিনার

পরিতোষ মজুমদার

পর পর তিনটে রাত্রি। হাঁ, আজ তিনটে রাত পার হয়ে গেলো। অটো, ভেবে-চিন্তে কোনো কূলকিনারা পায় না। ভাবনার সাগরে লগির থই তো দূরের কথা, সামান্য একটু ইসারা যদি বা থাকে। অবরাম সূচিমুখ একটা জিজ্ঞাসা দংশন করে চলেছে। এই দংশনের যেন আর শেষ নেই। রোজ যখন রাতের পরিক্রমা শেষ হয়, নতুন দিনের মুখোমুখি হয়েই প্রতিজ্ঞা করে অটো; আর নয়। এবার যে করেই হোক, সবকিছু মুছে ফেলবে। মনটাকে দুটো বছর পিছিয়ে দিতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি আর তা সম্ভব? এ তো আর খড়ির দাগ নয়, যে সহজেই মুছে ফেলা যাবে! মনের শ্লেটে অবচেতন মনে যে লেখা হয়ে গেছে, তার হাত থেকে নিস্তার কই। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি চাইলেই কি আর পাওয়া যাবে! বেনোজলের ঘূর্ণিস্রোতেই তো আজ তিন রাত্তির ধরে ঘুরে মরছে।

সোফা ছেড়ে উঠে পড়ে অটো। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ায়। সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়। খোলে। সিগারেট নেই। এস্-ট্রেটার দিকে তাকায়। পোড়া সিগারেটের ছাই জমেছে। উপচে কিছু মেঝের কার্পেটের ওপরেও পড়েছে। সব সিগারেট যে পুরোটা খেয়েছে, তা নয়। কোনোটা অর্ধেক খেয়ে চিন্তার সূত্রে খেই না পেয়ে এস-ট্রের ওপর চেপে ধরেছে। অধৈর্য পায়ে ঘরের ভেতরেই পায়চারী করেছে। কোণের ইলেকট্রিক হীটারটা অন করেছে। কফি তৈরী করে কফির কাপটা নিয়ে ফিরে এসে আবার সোফায় বসেছে। তবু চিন্তার সমুদ্রে কোনো কূলের দেখা পায় নি। অন্ধকারেই ভেসে বেড়িয়েছে। যেখান থেকে সুরু করেছিলো, সেখানেই ঘুরপাক খেয়েছে।

জানালা দিয়ে সিগারেটের শূন্য প্যাকেটটা বাইরে ছুঁড়ে দেয় অটো। কোটের পকেট হাতড়ে নতুন প্যাকেট বার করে সিগারেট ধরায়। রাস্তার ওপাশে ব্যারিয়াল গ্রাউন্ড। সমাধিস্তম্ভগুলো শেষ রাতের আলোয় স্পষ্ট নয়। কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছে। রাতের দিল্লী ঘুমে অচেতন, শুধু ঘুম নামে নি অটোর চোখে। বিছানায় গেলেও ঘুম আসবে না। বরং এপাশ-ওপাশ করে জ্বালা বাড়বে। তার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। দূরের কোনো একটা গীর্জায় রাত তৃতীয় প্রহর শেষ হবার ঘন্টা।

অনেকক্ষণ ধরে ঘন্টার ধ্বনিটা হাওয়ায় ভাসতে থাকে। ঠান্ডা শির-শিরানি বাতাসটা ওর রাত-জাগা শরীরে স্নিগ্ধতা আনে। এতোক্ষণের অসাড় মনটায় যেন হঠাৎ সচেতনতার চাবুক পড়ে।

না ঘুমোলেও ঘন্টাখানেক বিছানায় গড়াগড়ি করে নেওয়ার দরকার। নইলে আবার সারাটাদিন শরীরটা মাজ মাজ করবে। কাজের তো কমতি নেই। এয়ার-লাইনস অফিসে সকালেই ছুটতে হবে। প্যাসেজ বুকড হলেও এখনো কনফার্মড হয় নি। শেষ সময়ে ঝামেলা ভালো লাগে না। এদিকে ওদিকে ও টুকিটাকি কাজকর্ম কম পড়ে নেই। দুটো বছর তো দেখতে দেখতেই পার হয়ে গেলো। পেছনের দিকে তাকালে মনে হয় এই তো সেদিন সকালে মা এসে ভান এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে ওকে লুফথ হানসার বোয়িংয়ে তুলে দিয়ে গেলো। তারপর—।

এক চুমুকে রাতটাকে নিঃশেষ করে দিয়ে প্লেনটা যখন দিল্লীর আকাশে চক্কর মারছে, তখন ভোর হয়—হয়। চারদিকের আলো তখনো পরিষ্কারভাবে ফুটে বেরোয় নি। জানালার ধারেই সিট পেয়েছিলো অটো। বরাতজোরেই বলতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই ভাগ্যের ব্যাপার। নইলে অটো কি কখনো ভেবেছিলো স্বপ্নের দেশ ইন্ডিয়ায় আসতে পারবে? দলছাড়া হয়ে কেন-ই বা ও হঠাৎ ইসলামিক কালচার বিষয়বস্তুটা রিসার্চের জন্য বেছে নেবে? তখন থেকেই নজর ছিলো প্রাচ্যের ওপর। সুযোগ আসতেই এতো সব নগর-সভ্যতা ছেড়ে নিয়ে বেছে নিয়েছিলো দিল্লীকে। কারণ ইতিহাসের ঝড় এতোবার করে গেছে শহরটার ওপর দিয়ে যে ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

প্লেনটা পালম বানওয়ের ওপর স্থির হয়ে বসলে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে কাসটমস অফিসে ডিক্লারেশন দিয়ে ট্যাকসি ধরে সোজা নিজেদের দেশের এ্যামবাসীতে এসে উঠেছিলো অটো। সেই এ্যামবাসী থেকেই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছিলো রামকৃষ্ণপুরমের যে পরিবারে পেয়িং গেষ্ট হিসাবে থাকবে, সেইখানে। বেশ ভালোই লেগেছিলো অটোর। ছিমছাম পরিবার। স্বামী, স্ত্রী দু জনেই চাকরি করে। শহরের এদিকটা নতুন হয়েছে। জার্মানীর ইন্ডিয়ান এামবাসী থেকেই দিল্লীর একটা গাইড-বুক জোগাড় করেছিলো অটো। আসার আগে এবং প্লেনে বসে বলতে গেলে বইটা একরকম মুখস্থ করে ফেলেছে। তাজ, হুমায়ুন টুম, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা। তবে সব-চেয়ে বেশী ওকে টেনেছে কুতব মিনারটা। কতোবার যে গাইড বুকে কুতবের ছবিটা দেখেছে তার ইয়ত্তা নেই। হিন্দু সভ্যতাকে চাপা দিয়ে গড়ে ওঠা ইসলামিক আর্কি-টেকচার। তাই ভেবেছিলো দিল্লীতে পা দিয়ে আগেভাগেই ছুটবে কুতবে। তারপর বাকী সব কাজকর্ম। গৃহস্বামী মিস্টার রামচন্দ্রনকে বলতে আগেভাগেই রাজী হয়ে গিয়েছিলো রামচন্দ্রন। হবেই বা না কেন? বরং ওর উৎসাহে অবাক হয়েছিলো। তবু বলেছিলো,—এতো দূর থেকে এলে, শরীরের ওপর তো ধকল কম যায় নি। আজ না হয় বিশ্রাম নাও, কাল নিয়ে যাবোখন।

কিন্তু অটো রাজী হয় নি। বলেছে, আপনি কিছু ভাববেন না মিস্টার রামচন্দ্রন। এর জন্যই এতোদূরে থেকে ছুটে এসেছি। ওর আগ্রহ দেখে রামচন্দ্রন আর কোন কথা বলতে পারে নি। সন্ধ্যের মুখে রামচন্দ্রনের সঙ্গে গেছে কুতব মিনার দেখতে। শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে। নিরালা নির্জন পরিবেশ। প্রথম নজরেই ওর মন কেড়েছিলো কুতব মিনার। খুটিয়ে না দেখতে পারলেও বলতে গেলে সেই মুহূর্তগুলোতেই কুতবের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো অটো। এর পরে সময় পেলেই ছুটে গেছে কুতব মিনারে। শহর বন থেকে কয়েক মাইল দূরে বাংগোডেস্বার্গে মার কাছে বড়ো বড়ো যেসব চিঠি লিখেছে, তাতে আগ্রার তাজ, পুরোন দিল্লীর লাল-কেল্লা অথবা লাহোর দরোজার থেকে অনেক বেশী জায়গা জুড়ে লিখেছে কুতবের কথা। আলিয়া দরওয়াজা, আলিয়া মিনার, আলতামাসের এবং আলাউদ্দিনের সমাধি। প্রভৃতি।

ইতিমধ্যে হঠাৎ-ই ঘটনাটা ঘটে গেলো। প্রায়দিনের মতো সেদিনও অটো গিয়েছিলো কুতবে। কাঁধে ক্যামেরা, দৃষ্টিতে সেই একই বিস্ময়। ঘুরে ঘুরেই দেখছিলো। ইতি-হাস যেন এখানে বাঙময়। সেই একাগ্র মনটায় ছেদ পড়লো।

—শুনছেন?

হিন্দী-ইংরেজী মেশানো দেশোয়ালী ভাষায় ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় অটো। তারপর এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে,—আমায় বলছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি। আর কাকে বলবো বলুন?

অটো চারিদিকে তাকিয়ে দেখে,—সত্যি তো লোকজন বলতে খুব বেশী একটা নেই। দলছুট দু'একজন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোক ক'টার চোখের ইসারা বুঝতে না পেরে অটো প্রশ্ন করে,—কি বলছেন?

—আপনি কি ট্যুরিস্ট?

ওদের জিজ্ঞাসায় কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে অটো উত্তর দেয়,—হ্যাঁ জার্মানী থেকে আসছি। কিন্তু আপনাদের কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের? চোখের ঠারে লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালাচালি করে ওর কাছে এগিয়ে এসে বলে, আমাদের আর কি দরকার থাকবে স্যার। এই আপনাদের মতো ট্যুরিস্টরা সব এদেশে আসে, ইন্ডিয়ান রু-সিক্ক কিউরিও নিয়ে যায়; সুযোগ সুবিধে পেলে—। আর আমরাও দু চারটে পয়সা পাই। বোঝেন তো স্যার। তাই বলছিলাম—।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে অটো বলে—কি ব্যাপার খুলেই বলুন না?

—একটু দয়া করে আসুন না স্যার, মুখে বলে লাভ কি। মাল যখন রেডী তখন পেটি ঢাকা আর দি কেন, একেবারে দেখিয়েই দিচ্ছি।

কথাগুলো স্পষ্ট অনুধাবন করতে না পেরে লোকগুলোর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে আলাউদ্দিনের সমাধির পেছন দিকের ঝোপের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা খোলসা হয়েছিলো অটোর।

ঝোপের আড়ালে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। উগ্র লাল রঙের শাড়ী পড়া। চোখে মুখে প্রসাধনের মোটা প্রলেপ। বয়েস বোঝার উপায় নেই। মেয়েটাকে দেখিয়ে লোকগুলো বলে—একেবারে কলেজ গার্ল স্যার। পার্ট টাইম করছে। অনেক কষ্টে আপনার জন্য রাজী করিয়েছি। শত হলেও ইন্ডিয়ান তো একটা প্রেস্টিজ আছে। ফরেনার্সদের তো আর যা তা মাল গছিয়ে দিতে পারি না। তা ছাড়া রেটও কম। ইন্ডিয়ান কারেন্সীতে একশো টাকা। আর আমাদের যা টুরেস্ট পারসেন্ট কমিশন। বুঝলেন না স্যার।

এ জিনিস অটোর অজানা নয়। ইউ-রোপের অনেক শহরেই এর ঘাটতি নেই। হামবুর্গ, কেমেন বন্দর-শহর বলে এসব জিনিসের ছড়াছড়ি। প্যারীর সাঁজেলিজে অথবা লন্ডনের হাইডপার্কে এর দেখা কিছু কম পায় নি। তবু কুতবের পরিবেশে এবং পট-ভূমিকায় এটাকে ভাবতে যেন মন সায় দেয় না। মেয়েটার দিক থেকে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে কোনোরকমে লোকগুলোকে এড়িয়ে বাইরে আসে অটো। ট্যাকসি ধরে। সোজা একেবারে নতুন দিল্লী। রামকৃষ্ণপুরম।

এর পর বেশ কিছুদিন আর কুতব মুখো হয় নি অটো। লাইব্রেরী আর থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে। সময় সুযোগ পেলেই ছুটে গেছে ভারতের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। মহারাষ্ট্রের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোগ্রেস, পাঞ্জাবের গ্রীন রেভ্যুলিয়ুসন, বেংগলের টেমপল্ ইত্যাদি। কিন্তু কোনো কিছুই ওর মনটাকে ভরাতে পারে নি। স্থিতও হতে দেয় নি। টেনে এনেছে দিল্লীতে। আর দিল্লী আসা মানেই সেই কুতব মিনার। কী একটা আক-র্ষনে যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

দুপুরবেলা একা একা ঘরে বসে বিরক্তি লাগে। মিস্টার ও মিসেস রামচন্দ্রন অফিসে। এতো বড়ো ফ্ল্যাটে অটো কি করবে স্কেচ প্যাডটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাস-

গোডেসবার্গে মাকে নিজে হাতে একটা স্কেচ করে পাঠালে মন্দ হয় না।

মিনারের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আলিয়া মিনারের কাছাকাছি বসে পড়ে অটো। এখান থেকে বেলে পাথরের মিনারটা স্পষ্ট দেখা যায়। সোজা ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। দুপুর শেষ হয়ে গিয়ে বিকেল পড়ে এসেছে। সূর্যটা পশ্চিমে ঢলেছে। লালরঙের ছিঁটে লাগা সাদা সাদা হাল্কা মেঘগুলো আকাশ-পারে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকায় অটো।

—স্যরি, আপনাকে ডিসটার্ব করলাম।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অটো বলে, —না, না। দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমি একটুও ডিসটার্ব হয় নি। তবে—।

—তবে? অবাক হচ্ছেন আমাকে দেখে, তাই না? মেয়েটা হাসে। তারপর ওর পাশেই বসে পড়ে।

অটো জানে, এরা নির্লজ্জ। ভদ্রতা-টদ্রতা এদের কাছে অন্ততঃ আশা করাটা অন্যায়। তবু নিজেকে কিছুটা বিমূঢ় লাগে। অস্বস্তিও বোধহয়। ঝোপের আড়ালে দাঁড়ানো মেয়েটা আজ যে একেবারে পাশা-পাশি এসে বসবে ভাবতে পারে নি অটো। তবু নিজেকে মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে সামলে নিয়ে আবার স্কেচের প্যাডে মন দেয়। কিছুটা মেয়েটার উপস্থিতি আবহা করার উদ্দেশ্যেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মেয়েটা বলে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

অটো জানে এ ধরণের মেয়েরা সব দেশেই গায়ে পড়ে আলাপ করে। তবু চুপ করে তো থাকা যায় না। প্যাডের কাগজের ওপর হাতের পেন্সিল আর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই অটো উত্তর দেয়—বলুন।

—আপনি ছবি আঁকেন?

এবার হাতের স্কেচটা ওকে থামাতেই হয়। গলার স্বরটাকে যতোটা সম্ভব গম্ভীর করে উত্তর দেয় অটো,—না। এটা আমার হবি।

—ওঃ। মেয়েটা চুপ করে।

অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ। গুমোটও বটে। পরিবেশটাকে ওড়াতেই অটো জিজ্ঞাসা করে—আমার সঙ্গে আপনার কিছু দরকার আছে?

মেয়েটা যেন এতোক্ষণে ভেতরে ভেতরে প্রত্যয় ফিরিয়ে এনেছে। জোরেই সঙ্গেই বলে— না, কোনো দরকার নেই। দেখলাম আপনি ছবি আঁকছেন, তাই বসলাম।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—কেন, ঘেণা লাগছে?

—ঘেণা? শব্দটা উচ্চারণ করে মৃদু হাসে অটো। তারপর বলে,—ঘেণা করবো কেন আপনাকে? ঘেণা করার মতো তো কিছু করেন নি।

—না, সেদিন যে অবস্থায় আমায় দেখে-ছেন?

—তাতে কি হয়েছে? ওটা তো সিমপ্লি একটা প্রফেসন। যার যে রকম।

ওর কথায় মেয়েটা স্বস্তি পায়। সহ-জিয়াও হয়।

জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে অটো। স্কেচ করার মুড একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। ওকে উঠতে দেখে মেয়েটাও উঠে পড়ে। শাড়ীটা গোছগাছ করে নিয়ে ওকে বলে,—আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি যাবো নতুন দিল্লী। কেন বলুন তো?

—যদি একটা লিফট দেন, ভালো হয়। আমি যাবো কনট প্লেসে।

—চলুন।

অটো উদার হয়।

ট্যাক্সিতে উঠে একটা সিগারেট ধরায়। প্রথম দিকে মনে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে-ছিলো, তার অনেকটা কেটে গেছে। তবু কী কথা বলবে? নিশ্চুপেই পথ চলে। কিছুটা এগিয়ে এসে মেয়েটা অটোকে বলে,—ট্যাক্সি-টাকে একটু দাঁড়াতে বলুন না। নামবো।

অটো ড্রাইভারকে সাইডিং করতে বলে। ট্যাক্সিটা থামে। কনট প্লেসের একটু আগে। মেয়েটা ট্যাক্সি থেকে নামে। রাস্তাটা পার হয়। তারপর আলোর ঝলমলে কনট প্লেসের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ মেয়েটার অপ সরমাণ অবয়বটার দিকে তাকিয়ে থাকে অটো। মেয়েটা কনট প্লেসের মানুষের ভীড়ে মিশে গেলে অটোর সংবিত ফেরে। ড্রাইভারকে বলে, চলো ড্রাইভার। সোজা রামকৃষ্ণপুরম।

রামকৃষ্ণপুরমের চৌহদ্দির ভেতর ট্যাক্সিটা ঢোকার মুখে মনে পড়ে যায় অটোর। ক'দিন আগে মিস্টার এবং মিসেস রামচন্দ্রন বলেছিলো, আজকে সন্ধ্যায় ওকে কোনো এনগেজমেন্ট না রাখতে। কারণ আজ ওদের বিবাহ-বার্ষিকী বলে ছোটখাটো একটা পার্টি দেবে। সুতরাং ট্যাক্সিটাকে মুখ ঘোরাতে বলে একটা গভর্নমেন্ট এমপোরিয়ামে আসে অটো। কয়েকটা টুকিটাকি গিফট কিনে এনে আবার ট্যাক্সিতে ওঠে।

বাড়ীতে ঢুকে দেখে পার্টি সুরু হয়ে গেছে। অবশ্য পার্টি মানে ছোট্ট জমায়েত। এ কোয়ার্টার, সে কোয়ার্টারের কয়েকজন ভদ্র-লোক এবং মহিলা। কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন ও উভয়ের অফিসের জনাকয়েক বন্ধু-বান্ধব। এই রকম সহজ সাদাসিধে ঘরোয়া অনুষ্ঠানই ভালো লাগে অটোর। হৈ চৈ আর মদের বন্যার মাঝে নিজেকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না।

অটো ঘরে ঢুকতেই আসর জমে ওঠে। ওদের বসার ঘরটায় রঙ বালব্ লাগিয়ে বেশ একটা স্বপ্নালু পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। হাসি-ঠাট্টা গান-গল্পে পরিবেশটা বেশ সহজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই অটো নিজেকে সঁপে দেয়। মিসেস রামচন্দ্রনের বীণাবাদনের পর পররাষ্ট্র দপ্তরের লেডী স্টেনো মিস মঙ্গলার গান, আর তারপরেই সবাই ধরে বসে অটোকেই। হ্যাঁ, যেমন হোক একটা গান করতেই হবে। অটো আসর থেকে উঠে গিয়ে নিজের ঘরের থেকে গীটারটা নিয়ে ফিরে আসে। গান গায়। রাইনের মাঝিদের গান। যে গান গেয়ে গেয়ে মাল্লারা রাইনের জল থেকে ওঠা পাহাড়ের গায়ের আঙুরক্ষেতগুলো পাড়ী দেয়।

পার্টি শেষ হ'তে হ'তে রাত গভীর। সবাই প্রায় এ মহল্লারই বাসিন্দে। সুতরাং বাড়ী যাওয়ার অসুবিধে নেই।

ঘরে এসে শুয়ে পড়ে অটো। লোকজনের ভীড়-ভাট্টায় বিকেলবেলার ঘটনাটা আর মনে পড়ে নি। মনটা একটু স্থিতু হ'তে সেটাই আবার মনের কোণে এসে জমে। ভাবে অটো। জীবনে ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি আর হয় নি। রাতের দিল্লী অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ভাবতে ভাবতে একসময় অটোও ঘুমিয়ে পড়ে।

এর পরে প্রায়ই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হ'তো। কুতুবমিনারে গেলেই। সরলরেখার মতোই সে পরিচয় এগিয়েছে। মেয়েটাও বলেছে যে ওর নাম,—নয়না কাপুর। থাকে পুরোন দিল্লীর সবজীমুণ্ডি এলাকায়। বাবা আগে নাকি একটা প্রাইমারী স্কুলের টিচার ছিলো। বর্তমানে প্যারালিসিসে শয্যাশায়ী। পায় পঙ্গু। ছোট ছোট করেকটা ভাইবোন। সবারই ভরণপোষণের দায়িত্ব নয়নার ওপর। মা তো বেশ কিছুদিন আগেই এই পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণার হিসেব নিকেশের ল্যাটা চুকিয়ে দিয়েছে। আর বাবার কাছে আজ বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা। ভাব চেয়েও বড়ো যন্ত্রণা যে মেয়ের রোজগারে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বলে। তবু যদি জানতো—।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৬৭-২৩৫১।

বাকীটা আর নয়না বলেনি। কিন্তু অটোর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। হবার কথাও নয়।

অটোও মন খুলে সব বলেছে। নয়নাকে। ওর জীবনের অনেকটাই। ওর পুরো নাম অটো হেফনার। বাবাকে হারিয়েছে ছোট্ট-বেলায়। মা'র মুখে শুনেছে, বাবা নাকি পানসার অর্থাৎ জার্মান ট্যাংক ডিভিসনে কর্ণেল ছিলো। লেলিনগ্রাদ অবরোধের সময় সে দলের সংগে যুদ্ধ করেছিলো। তারপর আর ফিরে আসেনি। মা অনেক খুঁজে-পেতে নিখোঁজের তালিকায় নামের খোঁজ পেলেও বাবা আর ফিরে আসেনি। হয়, লেলিনগ্রাদের মাটিতে চিরদিনের জন্য শুয়ে রয়েছে, নয়, নাম-ধাম দেশ ভুলে গিয়ে পোল্যাণ্ড বা রাশিয়ারই কোন মেয়েকে বিয়ে করে আবার নতুন ঘর-সংসার পেতেছে। সোজা কথা ওদের কাছে আর ফিরে আসে নি। কতো কষ্টে ইস্ট জার্মানী থেকে রাতের অন্ধকারে রাইফেলের নলের মুখ পালিয়ে ওরেস্ট জার্মানীতে পালিয়ে এসেছে। ডেরা পেয়েছে শহর বন থেকে মাইল কয়েক দূরের বাড্‌গোডেসবার্গে। রাইনের তীরে বাড্‌গোডেসবার্গ। ওপারে বয়েল। শীতের বরফ-জমা রাইনের ওপর দিয়ে কতোদিন স্কি করেছে অটো। গভর্নমেন্টের দেওয়া কয়েকটা মার্ক আর এব ক্ষেতে ওর ক্ষেত আলু বুনে বা তুলে কতো নিদারুণ কষ্টে ওর মা ওকে পড়িয়েছে। আশা করে বসে আছে, কবে ও দেশে ফিরবে! ওকে বিয়ে সাদী দিয়ে ঘর-সংসারী দেখে তবে—। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সেদিন সকাল থেকেই কোনো কাজে মন বসাতে পারছিলো না অটো। কেন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিলো। কিন্তু কোথায়-ই বা যাবে? হুমায়ুন টুম, নিজামুদ্দিনের দরগা প্রভৃতি সব জায়গাই দেখা হয়ে গেছে। সুতরাং দ্রষ্টব্য বলতে কিছু আর বাকী নেই। বিকেলের মুখোমুখি বেরিয়ে পড়ে অটো। মনে মনে ভাবে, নয়নাদের বাড়ী গেলে হয়। নয়না কয়েকবার ওকে বলেছিলো। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা ভালো না হওয়াতেই বোধহয় তেমন জোর করেনি। অটো ব্যাপারটা বুঝে তাই খুব একটা আগ্রহও দেখায় নি। কি হবে মিছিমিছি একজনকে অপ্রস্তুতে ফেলে। তবু আজ মনে হয়, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ওকে ইণ্ডিয়া ছেড়ে যেতে হবে। জীবনের পথের বাঁকে আর হয়তো বা কোনোদিনই পরস্পরের দেখা হবে না। সুতরাং একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিলে মন্দ হয় না।

সবজিমুণ্ডির ঠিকানাটা ডায়েরী থেকে টুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অটো। রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠে। ঝকমকে নতুন দিল্লী পার হয়ে পুরোন দিল্লীর রাস্তা ধরে ট্যাক্সিটা ছুটে চলে। পৃথিবীর আর কোনো শহরের দুই প্রান্তের মধ্যে বোধহয় এতো প্রচণ্ড ফারাক নেই। সরু সরু রাস্তা, মোগল ঢঙের গম্বুজওয়ালা ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি বাড়ীঘর। অটোর মনে হয়, পথ চলতে চলতে যেন হঠাৎ ইতিহাসের গর্ভে ঢুকে পড়েছে।

বড়ো রাস্তার ওপরেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেয় অটো। নইলে যা সর্পিল গলিঘুঁজি। ট্যাক্সি একবার ঢুকলে আর বেরোতে পারবে কিনা সন্দেহ। পকেট থেকে ঠিকানা লেখা চিরকুটটা বার করে রাস্তার নামটা আবার ঝালিয়ে নেয়। তারপর একে ওকে জিজ্ঞাসা করে, এ-গলি সে-গলি পেরিয়ে অনেক কষ্টে বার করে বাড়ীর ঠিকানাটা। বিরাট বড়ো সেকেলে বাড়ী; হয়তো বা কোনো নবাবের। সংস্কারের অভাবে প্রায় ধসে পড়ার উপক্রম। সেটাকেই ভাগাভাগি করে অনেক-গুলো পরিবার একসংগে মাথা গুজেছে। বিহারী ঠেলাওয়ালা, পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেডিকেল রিপ্রেজেন-টেটিভ ইত্যাদি। অনেক কসরত করে তবে বার করে নয়নাদের ফ্ল্যাটটা। দরজায় টোকা দিতে নয়না-ই এসে খুলে দেয়। পরনে সায়া-ব্লাউজ। ওকে দেখে চট্ করে সরে গিয়ে পাশের দড়ির থেকে একটা সাড়ী টেনে নিয়ে কোনোরকমে জড়িয়ে তারপর দরজাটা খুলে বিস্ময়ে বলে,—আপনি?

অটো উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, আমি।

—হঠাৎ?

নয়নার জিজ্ঞাসায় অটো হেসে বলে,—কেন, আসতে নেই বুঝি? কাজ ছিলো না হাতে, ভাবলাম যাই ঘুরে আসি।

ওর কথার ধরনে একটু লজ্জা পেয়ে নয়না বলে,—আমি বুঝি তাই বলেছি? আসুন। ভেতরে আসুন।

অটো ভেতরে ঢোকে। বড়ো একটা ঘরকেই চট্ ঝুলিয়ে দু-তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আব্রু বজায় রাখতে। ঘরে ঢুকে ভাঙ্গা একটা চেয়ারে বসে অটো। চারিদিকে তাকায়। দরিদ্রতা ঘরের প্রতিটি জিনিসে ছাপ ফেলেছে। এমন কি ঝোলানো ছবিগুলো পর্যন্ত বিবর্ণ। পুরোন। দেখলেই বোঝা যায় অভাবের সংসার। পেছনের দিকটা আড়াল দিয়ে রান্নাঘর আর বাথরুম করা হয়েছে।

চটের ওপাশ থেকে খক্-খক্ করে এক নাগাড়ে কাশির শব্দ আসে। তারপর জিজ্ঞাসা করে—কে রে নয়না? সেই বজ্জাতটা আবার এসেছে নাকিরে?

নয়না বেশ মুখিয়ে উঠেই ধমক দেয়,—কেউ না। শুয়ে আছো চুপ করে শুয়ে থাকো না।

অটো জানে, নয়না কি করে সংসারের চাকায় তেল জোগায়। হয়তো বা সেই সুবাদেই কোনো খদ্দেরের উদ্দেশে এই বিশেষণ।

নয়নার ধমকে চুপ মেরে যায় বৃদ্ধ গলাটা।

—আপনি একটু বসুন। আমি চা করে নিয়ে আসছি।

ওকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই নয়না রান্নাঘরে চলে যায়।

দেওয়ালের গায়ে গুরু নানকের একটা ছবি ঝোলানো। কোনো পুরোন ক্যালেণ্ডার থেকে কাটা ছবিটা। রোজ তা'তে ধূপ-ধুনো দেওয়ার চিহ্ন।

কিছুক্ষণ পরে চায়ের কাপ নিয়ে ফিরে আসে নয়না। ওর সামনে কাপটা রেখে বলে, —আপনার খুব কষ্ট হলো তো?

—কেন, কষ্ট হ'তে যাবে কেন?

—না, একা একা এতোক্ষণ বসে থাকতে হলো!

—আমার একা থাকা অভ্যাস আছে।

কথাটা শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দেয় অটো। নতুন কাপ-ডিস। হয়তো বা পাশের কোনো ফ্ল্যাটের থেকে একফাকে চেয়ে এনেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অটো নয়নাকে জিজ্ঞাসা করে,—ঘরে কোনো কাজ আছে নাকি?

—কেন বলুন তো?

—তাহলে কিছুটা ঘুরে আসা যেতো!

—আমিও ভাবছিলাম একটু বাইরে বেরবো। আজ দু-দিন ঘর ছেড়ে একেবারে নড়তে পারিনি। বাবার হাঁফানির টানটা বেড়েছিলো। জানেন, পেটের ধান্দায় বাইরে বেরোতে বেরোতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, একটা পুরো দিন ঘরে থাকলে হাঁফিয়ে উঠি।

—আপনি চা খেয়ে নিন। আমি জামা-কাপড় বদলে আসি।

নয়না পাশের ঘরে যায়।

অটো চায়ের কাপটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরায়।

একটু পরে জামা-কাপড় বদল করে নয়না আসে। অটোর নজর এড়ায় যে নয়না আজ সেজেছে। তবে প্রত্যহের মতো উগ্র সাজ-সজ্জা নয়। বরং নরম। রুচিসম্মত হালকা নীলরঙের সিল্কের একটা শাড়ী পড়েছে। বুকের ওপরে সেই রঙেরই একটা ওড়না আলতো হাতে জড়িয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, এই পোষাকটা ও সচরাচর ব্যবহার করে না। বিশেষ কোনো দিনের জন্য হয়তো বা সযত্নে তুলে রাখা। ওর দিকে তাকিয়ে তির্যক একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে নয়না,—চা খাওয়া হয়ে গেছে?

অটো উত্তর দেয়,—হ্যাঁ।

—তবে চলুন।

সিগারেটের শেষাংশটুকু পরিত্যক্ত চায়ের কাপে গুজে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অটো।

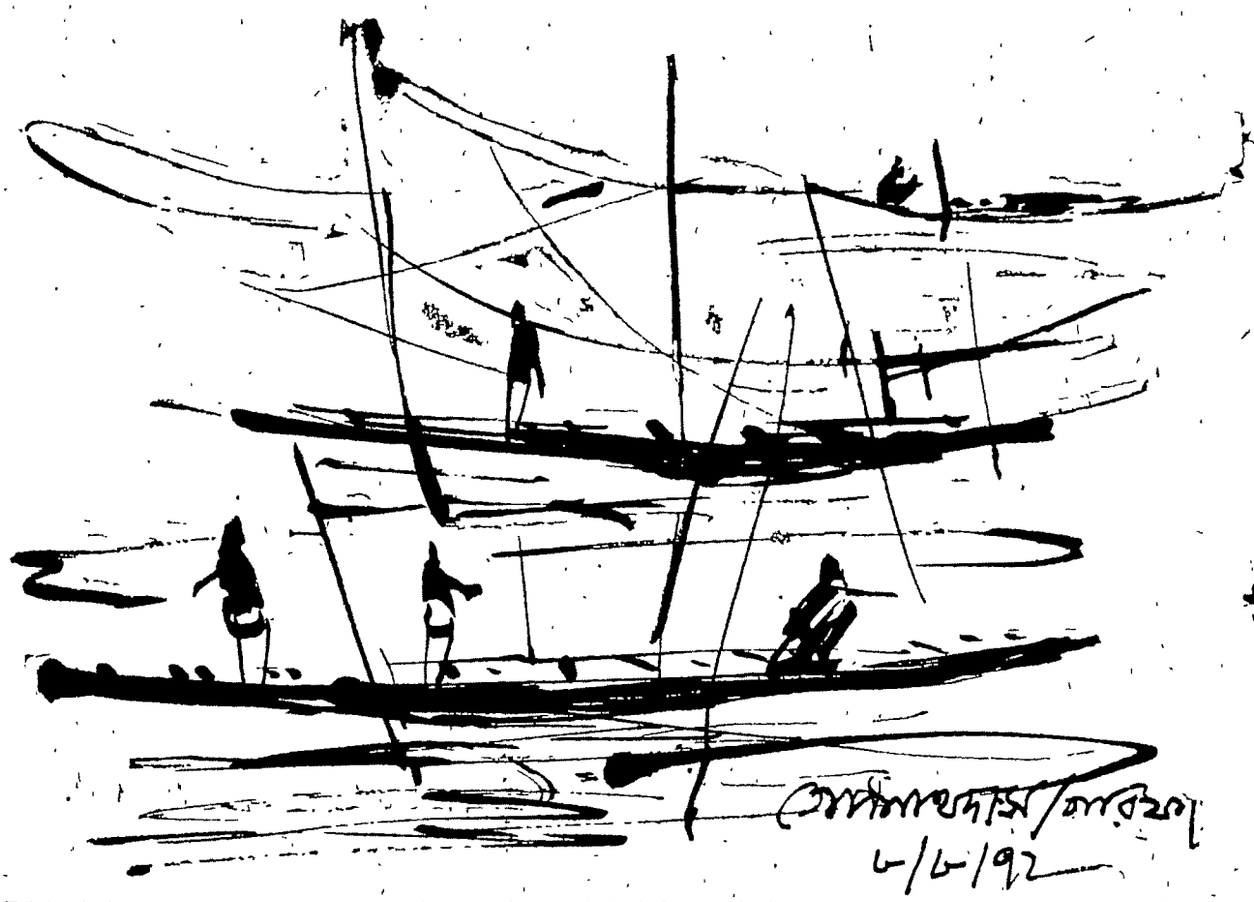

নয়নার পেছনে পেছনে বাহিরে আসে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সিঁড়িতে আলো নেই। বাবোয়ারী বাড়ীর সিঁড়িতে কারই বা দায় পড়েছে আলো দেওয়ার। কোনোরকমে অন্ধকার সিঁড়িগুলো পার হয়ে উঠোন ডিঙিয়ে গলিতে এসে পড়ে। গলি পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে হাঁফ ছাড়ে অটো। এতোক্ষণ যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। রাস্তায় বেরিয়ে অটো জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবেন?

—আমি? একটুক্ষণ চুপ করে থেকে নয়না বলে—শহরের ভীড়-ভাট্টা আজ আর ভালো লাগছে না। আপত্তি না থাকলে চলুন যমুনার দিকে যাই।

হাতের ইসারায় অটো একটা ট্যাক্সি ডাকে। ট্যাক্সি এলে পাশাপাশি বসে। অন্যান্য দিনের চেয়ে নয়নাকে আজ অনেক আলাদা লাগছে। অনেক বেশী হাসিখুশী দেখাচ্ছে ওকে। অটোর বুঝতে অসুবিধে হয় না, যে কোনো কারণেই হোক ওর মনের নৌকোর খুশীর পালে আনন্দের হাওয়া লেগেছে। তাই প্রতিটি মুহূর্তে যে সংগ্রাম করে ওকে বাঁচতে হয়, মুহূর্তকয়েকের জন্য হলেও তা ভুলতে চায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্যাক্সিটা যমুনার পাড়ে ওদের নামিয়ে দেয়। একটা নিরালা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ে দুজনে। কিছুটা দূরে লালকেল্লা। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না।

নয়না বলে,—লালকেল্লা দেখেছেন আপনি?

—বারে, একবার নয়; বেশ কয়েকবার। দিল্লীতে এসে লালকেল্লা দেখবো না?

নয়না বলে,—এই দুর্গের প্রাকারে দাঁড়িয়েই শাহাজাহান নুরজাঁহাকে পাশে নিয়ে যমুনাকে দেখতেন।

কথায় কথায় রাতের বয়েস বাড়ে। যমুনার বুকের ওপর ইতস্তত ছোটো ছোটো ডিঙি ভেসে বেড়াচ্ছে। জেলেদের। মাছ ধরছে। সেই ডিঙির লণ্ঠনগুলো দুলছে। ঢেউয়ের তালে তালে। আলেয়ার মতো মনে হয় এতোদূর থেকে! হাওয়ায় নয়নার ওড়নাটা উড়ছে। মাঝে মাঝে অটোকে স্পর্শ করছে। নয়না অটোর গা ঘেঁষে বসেছে। সমস্ত পরিবেশটাই তন্ময় করে দেওয়া। অটো হাত বাড়িয়ে নয়নাকে ধরার উপক্রম করতেই ছিটকে সরে আসে নয়না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—কিছু মনে করবেন না। দিনের পর দিন যে রোজগারে আমায় সংসার চালাতে হয়, সেটাই আমাকে কোনো পুরুষকে শ্রদ্ধা করতে দেয়নি। কিন্তু জীবনে একটা পুরুষকেও যদি আলাদা করে দেখতে না পারি, তবে বাঁচবো কি নিয়ে বলতে পারেন?

অন্ধকারেও অটো অনুভব করে নয়নার দুচোখে জলের মুক্তো টলটল করছে। যে কোনো সময়ে গালে উপত্যকা ছাড়িয়ে নীচে নামতে পারে।

এর পরের দিনগুলো ইচ্ছে করেই অটো পাশ কাটিয়ে গেছে; আর চেষ্টা করেছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যেতে। একটা দিনও আর ইণ্ডিয়াতে থাকতে মন চায়নি। যদি বেলোয়ারী কাঁচের মতো আকস্মিক কোনো ঘটনায় শ্রদ্ধাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

পালাম এয়ারপোর্টে আসে অটো। ঈগল পাখীর মতো বোয়িংটা রানওয়ের ওপর নিশ্চল। লাউঞ্জে অপেক্ষা করে। একসময় লাউডস্পীকার মুখর হয়। অটো ধীরে ধীরে রানওয়ের দিকে এগিয়ে যায়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্লেনটা ইণ্ডিয়ার আকাশ সীমা পেরিয়ে যাবে। প্লেনে ওঠে। সিটবেল্ট বাঁধে। প্রপেলার ঘোরে। ইঞ্জিনগুলো একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে। চাকার গতি জাগে। থরথর করে কেঁপে ওঠে প্লেনের বিরাট বড়ো শরীরটা। অটো বুঝতে পারে না, ওর কাছে কে বেশী বিস্ময়? কুতব মিনার না-কি নয়না কাপুর?

দেশ বিদেশে

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

রাওয়ালপিণ্ডি ও ইসলামাবাদে দূত-পর্যায়ে আট দিনব্যাপী বৈঠকের পর ভারত-পাকিস্তান আলোচনা একটা স্পষ্ট পরিণতির কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। বৈঠক যখন চলছিল সেই সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা পি এন হাকসার পাকিস্তানী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, আমরা যে কথাবার্তা বলছি তাতেই বোঝা যাচ্ছে, আমরা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি। সাংবাদিকরা এই কথা শুনে হেসে উঠলে শ্রীহাকসার বলেন, কথাবার্তার ব্যাপারটাকে এমন হাল্কা করে দেখবেন না।

শ্রীহাকসারের এই মন্তব্যের তাৎপর্য বোঝা খুব কঠিন নয়। এই ধরনের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আলোচনায় সাধারণ যে সুপরিচিত কৌশল অবলম্বন করা হয় শ্রীহাকসার সম্ভবত তারই ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। কৌশলটি হল, ভাঙতে না দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যাতে প্রতিপক্ষ এক সময়ে হয়রান হয়ে গিয়ে কিছুটা ছেড়েছুড়ে দিয়ে মীমাংসায় আসতে বাধ্য হন। এই ধরনের কূটনৈতিক আলোচনা চূড়ান্ত ধৈর্যের পরীক্ষা, কে কার আগে ভেঙে পড়েন তার পরীক্ষা। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিণ্ডিতে সেই পরীক্ষাই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এইভাবে দেখলে এই ভারত-পাকিস্তান আলোচনা দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধেরই সম্প্রসারণ। তবে স্যার উইনস্টন চার্চিলের কথা ধার করে বলা যায়, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া ভাল।'

রাওয়ালপিণ্ডির এই আলোচনা কোন সফল সমাপ্তিতে এসে পৌঁছয় নি, আবার আলোচনা ভেঙেও দেওয়া হয় নি। ১৮ অগস্ট পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হয়েছে। তার মানে কি এই যে, উভয় পক্ষ তাঁদের নিজ নিজ বক্তব্য আঁকড়ে ধরে রেখেছেন? ধৈর্যের পরীক্ষায় কি এখনও কোন হার-জিৎ হয় নি?

দিল্লীতে এই পর্যায়ের পরবর্তী বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর পাওয়া যাবে না। দিল্লী বৈঠক সম্পর্কে উভয় পক্ষই সাফল্যের আশা প্রকাশ করেছেন। এই আশা কতদূর সার্থক হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে ইতিমধ্যে পিণ্ডি বৈঠকের একটি ব্যালান্স শীট তৈরীর চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই ধরনের ব্যালান্স শীট এখন পর্যন্ত যে ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে জমার দিকটাই বেশী ভারী তাতে সন্দেহ নেই। বিনিময়ে কোন বড় রকমের ছাড় না দিয়ে পিণ্ডি বৈঠক থেকে ভারতীয় প্রতিনিধি দল কিছু সুবিধা আদায় করে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছেন।

প্রথমেই যেটা নজর করার জিনিস তা হল, পাকিস্তানকে ভারত ও বাংলাদেশের গত ১৭ এপ্রিলের যুক্ত ঘোষণার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করা গেছে। পাকিস্তানকে এতে রাজি করান সহজ হয় নি। পাকিস্তান যে যুদ্ধে হেরেছে এবং পরাজিত পক্ষ হিসাবে সে যে বিজয়ীর উপর সর্ত চাপিয়ে দিতে পারে না, এটা পাকিস্তান সহজে বুঝতে চায় নি। এমন কি সে এটাও বোঝার চেষ্টা করে নি যে, ভারত ও বাংলাদেশ পাকিস্তানের সামরিক পরাজয়ের গ্লানিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কিছুই করে নি, বরং মানবিক সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিক সমস্যা থেকে পৃথক করার জন্যই সে বাংলাদেশের সঙ্গে মিলিতভাবে ১৭ এপ্রিলের প্রস্তাব দিয়েছে। পাকিস্তান অবশ্য কিছুকাল যাবৎ বুঝতে পারছিল যে, বাংলাদেশে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যদি দেশে ফিরিয়ে আনতে হয় তাহলে ১৭ এপ্রিলের ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণার পথ ধরে এগোন ছাড়া অন্য উপায় নেই। ভারতে আটক প্রায় ৯৩ হাজার সামরিক ও অসামরিক পাকিস্তানী বন্দীর নাম করে পাকিস্তান সারা দুনিয়ায় যে কাঁদুনি গেয়ে বেড়িয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণা সেই প্রচারের বেলুন ফুটো করে দিয়েছে। ঐ যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ দেখিয়ে দিয়েছে যে, যুদ্ধবন্দীদের সমস্যাটাই একমাত্র মানবিক সমস্যা নয়, বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রতি অনুগত অধিবাসীরা ও পাকিস্তানবাসী বাংলাদেশীরাও মানবিক অনুকম্পা লাভের যোগ্য। সারা বিশ্বের জনমত এই তিন দফা মানবিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর থেকেই ইসলামাবাদ ধীরে ধীরে ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত ঘোষণার দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তবু পিণ্ডি বৈঠকে পাকিস্তান এই যৌথ ঘোষণাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা নাকি সিমলা চুক্তি থেকে আলোচনা আরম্ভ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারতের যা করণীয় ছিল, সেটা ভারত করে নি, পাকিস্তান এই অভিযোগ আনতে চেয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিদল খুব তাড়াতাড়ি একথা বুঝিয়ে দেন যে, এভাবে ভারতকে কাঠগড়ায় তোলার চেষ্টা করে বেশী দূর এগোন যাবে না, কারণ তাহলে ভারতও পাল্টা অভিযোগ আনবে। অগত্যা পাকিস্তান ভারত-পাকিস্তান যৌথ ঘোষণা সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে আসতে বাধ্য হল।

দ্বিতীয় আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষ হিসাবে বাংলাদেশকে এই দ্বিপাক্ষিক আলোচনার

নতুন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র পদত্যাগ করায়, পৌরদপ্তরের বর্তমান প্রতিমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ খাদ্য সরবরাহ ও ডেয়ারী উন্নয়ন দপ্তরের ভার গ্রহণ করেছেন। ক্রীড়া দপ্তরের ভার তাঁর হাতেই আছে। সুন্দরবন উন্নয়নের যে ভার কাশীবাবুর হাতে ছিল, তা গ্রহণ করেছেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ।

সঙ্গে প্রতি সমভাবে যত্ন রাখতে ভারত সমর্থ হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশের জুটি ভাঙার জন্য পাকিস্তান চেষ্টার কসুর করে নি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী আগা শাহী সোমবার সাংবাদপত্র সম্মেলন ডেকে ঘোষণা করে দিলেন যে ভারত নাকি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের প্রবেশ ইত্যাদি যৌথ ঘোষণার বহির্ভূত প্রশ্ন তুলেছিল এবং সে জন্যই নাকি শেষ মুহূর্তে কোন মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভব হয়নি। এই রটনার দ্বারা পাকিস্তান ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শ্রী পি এন হাকসরের সতর্কতা ও দৃঢ়তার ফলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের নেতা আজিজ আহমেদ ইসলামাবাদে একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও রাষ্ট্রসংঘে তার সদস্যপদ লাভের প্রশ্নগুলি ভারত নতুন প্রশ্ন হিসাবে উত্থাপন করে নি, ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা যখন দিল্লী ঘোষণার (ভারত-বাংলাদেশ ঘোষণা) তত্ত্ব বিষয়গুলি থেকে উপমহাদেশ বিরোধ মীমাংসার কাজের বিষয়টি উত্থাপন করেন তখন আপনা-আপনিই ঐ সব প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। আজিজ আমেদ আরও বলেছেন যে, দিল্লী ঘোষণায় যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির নিষ্পত্তির সঙ্গে অন্য কোন প্রশ্ন জড়ান হবে না, এটা তাঁর থেকে স্বীকারই করে নেওয়া হয়েছিল।

একথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না যে, পিণ্ডি বৈঠকে পাকিস্তানের জন্যে ঘরে একেবারে কিছুই পড়ে নি। যদিও সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় নি তাহলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ভারত ও বাংলাদেশ পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করার ব্যাপারে খুব একটা তাড়াহুড়ো করতে চাইছে না। বাংলাদেশ এই ব্যাপারে আইন তৈরী করে প্রস্তুত হয়েছে সত্য, কিন্তু যে ১৯৫ জনের বিচার করা হবে বলে জানান হয়েছে তাদের এখনও ভারত বাংলাদেশের হাতে তুলে দেয় নি। পিণ্ডি বৈঠকের প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছিলেন, পাকিস্তানের বাইরে একজন বন্দীরও বিচার হলে বিরোধ মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পাকিস্তানে বাঙালীদের পাল্টা বিচার করা হবে বলে শাসাতেও কসুর করা হয় নি। প্রকাশ, বৈঠকে জানান হয়েছে যে, প্রায় শ দুয়েক বাঙালীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে রেখেছেন।

যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা বা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার। পাকিস্তান যদি তাঁদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারত তাহলে ভাল হত। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশ সরকারকে এখন পর্যন্ত স্বীকৃতি না দিয়ে নিজেই সেই পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছে। দিল্লী ঘোষণায় যুদ্ধবন্দীদের বিচার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার বাইরে আর একটি কথাও ভারত বলতে পারে না বাংলাদেশের সঙ্গে কথা না বলে। এমনকি এই বিষয়ে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে এমন কোন কথা বলা বা কোন কাজ করাও ভারত বর্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই বাংলাদেশে সরকার-বিরোধীরা অনেকে প্রচার করছেন যে, ভারতবর্ষের চাপেই নাকি বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বেছে বেছে মাত্র ১৯৫ জনের বিচার করছে। মোসাদ্দেক ভাসানী আবার বলছেন যে, ৯৩ হাজার জনের সকলকেই যখন যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার করা হচ্ছে না তখন এই প্রহসন বন্ধ রেখে বরং পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনা হোক। বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে ভারত এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চায় না। সুতরাং, এটা পরিষ্কার যে, যে বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত নেই সেই বৈঠকে ভারত যুদ্ধবন্দীদের বিচার সম্পর্কে কোন পাকা কথা দিতে পারবে না। ভারত যেটুকু পারে সেটা হল যুদ্ধবন্দীদের বিচার সম্পর্কে ইসলামাবাদের বিস্তারিত বক্তব্য সে ঢাকায় পৌঁছে দিতে পারে।

পিণ্ডি বৈঠকের পর বিষয়টি এখানেই আটকে আছে বলে মনে হয়। তবে, এইটুকু অনুমান করা যায় যে, দরকষাকষির মধ্য দিয়ে পাকিস্তান ভারত ও বাংলাদেশকে যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে আপাতত রয়েসয়ে চলতে রাজি করাতে পেরেছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ছাড়া অন্য যে প্রশ্নে পিণ্ডি বৈঠক আটকে গিয়েছিল বলে প্রকাশ সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। দিল্লী ঘোষণায় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ যেমন পাকিস্তানবাসী বাঙালীদের গ্রহণ করবে তেমনি পাকিস্তানকেও সাধারণভাবে 'বিহারী' নামে পরিচিত এই সব বাংলাদেশবাসী পাকিস্তানীকে স্থান দিতে হবে। বাংলাদেশে এমন প্রায় দু লাখ ৬০ হাজার অবাঙালী আছেন যাঁরা পাকিস্তানের প্রতি নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও অন্যান্য রাষ্ট্রসংঘ সংস্থার সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের দাবী এই ২ লাখ ৬০ হাজার মানুষকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মানবিক সমস্যার সমাধান করতে হবে। ১৭ এপ্রিলের যৌথ ঘোষণায়ও এই দাবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান ঘোষণার সপক্ষে এটাও উল্লেখযোগ্য জয় বলতে হবে যে, এবারকার বৈঠকে পাকিস্তান সরাসরিভাবে ঐ দাবীর বিরোধিতা করে নি। বরং, পাকিস্তান নীতিগতভাবে দাবীটি মেনে নিয়ে কত লোককে পাকিস্তানে পুনর্বসন দেওয়া হবে সে বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছে। (এর আগে বলা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ থেকে 'বিহারীদের' নিয়ে নিলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দেবে তার গুরুতর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে। একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া পাকিস্তানের আর কোন প্রদেশেই উদ্বাস্তুদের নিতে রাজি নয়।) 'পাকিস্তানী' সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারের কথা। পাকিস্তান সরকার মানছেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য উদ্বাস্তু সমস্যাটি যথাসম্ভব হাল্কা করে নেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রস্তাব হল, বাংলাদেশের সেই সব অধিবাসীকেই পাকিস্তানী হিসাবে গ্রহণ করা হবে যাঁদের বাপ-ঠাকুর্দার জন্ম হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে অথবা যাঁরা আত্মীয়তার সূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানবাসী পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ আছেন। এইভাবে ধরলে পাকিস্তানের হিসাবে বাংলাদেশ পাকিস্তানীর সংখ্যা হাজার পঞ্চাশেকের বেশী হবে না।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মত এই প্রশ্নেও বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া, কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় আসা যাবে না। আলোচনা চলতে চলতে এই সব বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পরামর্শ করার অসুবিধা হতে পারে অনুমান করেই ভারত এবারকার বৈঠক পাকিস্তানের বদলে ভারতে করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের পীড়াপীড়িতে রাওয়ালপিণ্ডিতে এই বৈঠক বসল। এই বৈঠকের প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট ভুট্টা ও পুরো বৈঠকের সময়টায় প্রধানমন্ত্রী মুজিবুর রহমান বিদেশে থাকায় যোগাযোগ রক্ষা করার অসুবিধা হচ্ছে। আগামী ১৮ অগস্ট যখন এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বৈঠক হবে তখন আর এই অসুবিধা হবে না। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে, এই বৈঠকেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

৩-৮-৭৩ পুণ্ডরীক

সাতদিনের শুভাশুভ

(১১ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট)

গ্রহ সন্নিবেশ : মেষে মঙ্গল, মিথুনে শনি ও কেতু, কর্কটে রবি ও বুধ, কন্যায় শুক্র, ধনুতে রাহু, মকরে বৃহস্পতি।

মেষ : শরীর ও মন ভাল নয়। পারিবারিক বিষয়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। মেয়েদের মানসিক উন্নতির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ১২, ১৭ আগস্ট।

বৃষ : শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র ক্রমশ ভাল হবে। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্মে বাধাবিঘ্ন এলেও ক্ষতির কোন লক্ষণ নেই। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ১৪, ১৭ আগস্ট।

মিথুন : শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায়ে সাফল্য আসবে। কাজকর্মে সাফল্যের যোগ প্রবল। মেয়েদের পক্ষে ফলটা আশানুরূপ। এ-সপ্তাহে শুভ তারিখ নেই।

কর্কট : শরীর চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। আর্থিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। ব্যবসায়ে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। মেয়েদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ১২ ১৭ আগস্ট।

সিংহ : শারীরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ এবং সুখের। আয় বৃদ্ধি হলেও ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্মে নতুন শুভ সুযোগ আসতে পারে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১১ ও ১৩ আগস্ট।

কন্যা : শারীরিক ক্ষেত্র চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। ব্যবসায় ভাল নয়। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। কাজকর্ম মোটের উপর চলনসই। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১২, ১৬ আগস্ট।

তুলা : পারিবারিক ক্ষেত্রে অসুস্থতার ভাব থাকছে। শরীর চলনসই। ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল হলেও আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায় আশানুরূপ। কাজকর্মে শত্রুতা থাকলেও উন্নতি অব্যাহত থাকবে। শুভ তারিখ : ১১, ১৫ আগস্ট।

বৃশ্চিক : শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ব্যাপারে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যবসায় ভাল। কাজকর্মে শুভ পরিবর্তন ও উন্নতির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়। শুভ তারিখ : ১৬ আগস্ট।

ধনু : শরীর সুবিধার নয়। স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। দেশভ্রমণের যোগ আছে। আয় ভাল। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। এ-সপ্তাহে শুভ তারিখ নেই।

মকর : মানসিক দুশ্চিন্তা ও পারিবারিক অসুস্থতা ক্রমশ কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ১২ আগস্ট।

কুম্ভ : শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। পারিবারিক অস্বস্তি চলবে। আয় আশানুরূপ। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ১২ ১৬ আগস্ট।

মীন : শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক অস্বস্তি থাকছে। আয় মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুখ্যাতির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ১২, ১৫ আগস্ট।

—শ্রীশুভাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

উপমা চট্টোপাধ্যায় (হুগলী) : ৩৮ বছর বয়সের পর (রা—বু) ভাল সময় আসবে।

প্রেমাংশু বশিষ্ঠ (কলি-৫৮) : অধ্যাপনার কাজেই প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ বেশী।

কানন চক্রবর্তী (শিলং) : পুত্র সন্তান সম্ভব।

বিমান চক্রবর্তী (শিলং) : এম্যাসেই হবে এবং সুখেরই হবে।

মিনতি মজুমদার ও দীপালি পাল (বিরাটি) : জন্ম সন তারিখ ও সময় পাঠাবেন।

উমা মুখার্জী (পাটনা-১) জন্ম সাল-তারিখ জানাবেন।

নির্মলকান্তি চৌধুরী (শিলচর) : ২৭ বছর বয়সের পর (রা—শ) থেকে উন্নতি হতে থাকবে।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় : ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের পর পরিবর্তন হবে।

রতন মুখার্জী (ধানবাদ) : ৩১ বছর বয়সের পর বুধের দশায় উন্নতি হবে।

বিজলী দাস (বার্ণপুর) : তারিখ ও বারের অমিল আছে। ঠিক করে জানাবেন।

সুব্রতা মুখার্জী (কলি-৬) : ২৫ বছর বয়সের পর অনেকটা কমবে।

রবীন্দ্রনাথ সেন : আপনার প্রেরিত জন্মকুষ্ঠি ইংরাজী না বাংলা জানাবেন।

গৌতম দাস (বর্ধমান) : ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে স্থানান্তরে চাকরী হবে।

কৃপা সরকার (বজবজ) : জন্ম সন তারিখ সময় ঠিক করে পাঠাবেন।

মধুমিতা পাল : পাশের আশা কম।

বিশ্বপদ মুখোপাধ্যায় (গৌহাটি) : অর্থভাগ্য ভাল।

মন্দিরা মজুমদার (রাঁচী) : আশানুরূপ হবে না।

গোপাল দে (গৌহাটি-৮) : জন্ম সন তারিখ সত্বর পাঠাবেন।

অবন্তী ভট্টাচার্য (কলি-২৬) : ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের সময়ের পরিবর্তন হবে। কোনো স্বাধীন বৃত্তিতে আপনার উন্নতি।

দীপক বসু (বিহার) : ৩০ বছর বয়সের পর উন্নতি হবে তবে পারিবারিক অশান্তি থাকবে।

রতন ঘোষ (ধুবড়ী) : বর্তমানে শনি-বৃহস্পতি অশুভ থাকায় অনার্স পাবে কিনা সন্দেহ।

প্রতিমা ব্যানার্জী : ৭ মে রাহু থাকায় দাম্পত্য অশান্তি থাকবে। সন্তানের বিদ্যা মধ্যম প্রকার।

সরযূতা বন্দ্যোপাধ্যায় : মিথুন রাশি। মিথুন লগ্ন।

প্রদীপ রক্ষিত : বর্তমানে শনি-বৃহস্পতি থাকায় কৃতকার্যের আশা কম।

সাধনা পাল : মঙ্গল-শুক্র যোগ থাকায় স্বেচ্ছায় বিবাহ সম্ভব এবং ১৯৭৪ সালে।

কৃষ্ণা চক্রবর্তী : স্বামীর সংগে বিদেশ যাত্রার যোগ আছে।

সনৎ কাঁড়ার : বর্তমানে অধিকাংশ গ্রহ অশুভ থাকায় পাশ করা অসম্ভব।

জ্যোৎস্না সরকার (রাঁচী) : ভাল হবে।

ইউ, বসু (জামসেদপুর) : ১৫, স্বাতী নক্ষত্র, তুলা রাশি, তুলা লগ্ন, দেবগণ। ২৪ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব। মধ্যম হবে।

যাদল ভট্টাচার্য : বর্তমানে আশা কম। ১৯৭৪—ফেব্রুয়ারী মাসে বৃহস্পতি কর্ম স্থানে গেলে কর্মোন্নতি সম্ভব।

বাবলে ভট্টাচার্য : তোমার জন্ম তারিখ ও প্রেরিত রাশির মিল না থাকায় প্রশ্নোত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

রত্না দেব : বর্তমানে বিদ্যাস্থান শুভ থাকায় কম্পারমেণ্টাল পরীক্ষায় পাশ করবে।

সুবিমল দাস পুরকায়স্থ (ডিব্রুগড়) : সবি-বৃহস্পতি শুভ থাকায় হোমিওপ্যাথিক পড়া হবে।

রামানন্দ পাল : ১৯৭৪—ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে কর্মারম্ভ। ৩২ বছর বয়সের পর প্রকৃত উন্নতি হতে থাকবে।

সুপ্রিয় গাঙ্গুলী : ১ অশ্বিনী নক্ষত্র, মেষ রাশি, কুম্ভ লগ্ন। বর্তমানে শনি-বৃহস্পতি প্রতিকূল থাকায় উন্নতির আশা কম।

অসিত সরকার : ১৯৭৪—জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে বদলী সম্ভব। ২৮ বছর বয়সে উন্নতি হবে।

অশোক সরকার : ২২ বছর বয়স থেকে কর্মারম্ভ হবে। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে।

নিশীথ সরকার : শনি-বৃহস্পতি শুভ থাকায় পরীক্ষার ফল ভালই হবে।

প্রদীপ সরকার : বর্তমানে কর্মান্তর নেই।

চন্দ্রশেখর সরকার : ১৯৭৪—মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে কর্মোন্নতি হবে।

রাজা চৌধুরী : ৩ বছর বয়সের পর প্রতিষ্ঠা হবে। তারপ থেকে স্বাস্থ্য ভাল হবে এবং চলতে পারবে।

খুকু ব্যানার্জী (কলি-৩৬) : নিজের মতে বিবাহ হবে।

মালবিকা পোদ্দার : আশা খুবই কম।

বিনয় ঘোষাল : জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

তপতী হাজরা : ব্যক্তিগতভাবে পত্রের মাধ্যমে জবাব দেওয়া হবে না।

অসিত মুখার্জী : বর্তমানে মঙ্গলের অশুভ হেতু শারীরিক কষ্ট কিছুটা থাকবে।

চিন্ময় দত্ত : আগামী জুন মাসের আগে নয়।

আশাকরী সেন : না।

স্মৃতিকণা : সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

অশোক বড়াল : সম্ভব নয়।

রীতা গোস্বামী : জন্ম সময় জানাবেন।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

এবারের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব

সরল সেন
(বার্লিন)

'অশনি সংকেত' চিত্রের একটি দৃশ্য

দীর্ঘ দিনের একটি প্রত্যাশা পূর্ণ হোল। শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতিতে ভূষিত হোল শিল্পী জীবনের সাধনা, স্বপ্ন। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্যজিৎ রায়ের কাছে নতুন কিছু নয়, নতুন নয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ। বার্লিন থেকেও ইতিপূর্বে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু এবছরের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠতম ছবি উপহার দেবার গৌরব লাভ করলেন তিনি এই প্রথম। এই প্রথম একটি পূর্ণদৈর্ঘের ভারতীয় ছবি সুবর্ণ ভল্লুক লাভ করল। এতই সর্বাংগ সুন্দর সত্যজিৎ রায়ের এই নবতম সৃষ্টি যে, 'অশনি সংকেত' নিয়ে আলোচনা চলতে পারে কিন্তু সমালোচনা দুরূহ।

এবারের ত্রিবিংশতিতম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলিকে সামান্য মনোযোগসহকারে দেখলেই বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র শিল্পের স্রোতস্বিনী নতুন খাতে প্রবাহিত হতে চলেছে। গত বছরের বার্লিন উৎসবে যা ছিল শুধুমাত্র ইংগিত, এ-বছর তা সুস্পষ্ট রূপরেখায় তাৎপর্যময়। যৌন আবেদনে-ভরা ছবি—শয্যায় যার শুরু, শয্যায় যার শেষ—এবারের উৎসবে উল্লেখযোগ্য-ভাবে বিরল। তাই ভাল ছবির সংখ্যা একারে কম ছিল না। যে দর্শকরা যৌন-জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে সিনেমা হলকে বর্জন করে-ছিল, আবার তারা বিপুল সংখ্যায় ছবি দেখতে এসেছে। তাই প্রতিযোগিতার কুড়িটি ছবির ভেতর থেকে শ্রেষ্ঠ ছবির নির্বাচন বিচারকদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। উৎসবের শেষ প্রতিযোগী ছবি 'অশনি সংকেত', বিচারকরা দেখেছেন সমাপ্তির একদিন আগে। কিন্তু এই ছবি দেখার পরে কোন সন্দেহই ছিল না যে, ভারতের পক্ষে এবারের সুবর্ণ ভল্লুক লাভ প্রায় নিশ্চিত। দুপুর থেকে রাত দুটো পর্যন্ত প্রায় চোদ্দ ঘন্টা ধরে বিচারকরা 'অশনি সংকেতের' চুলচেরা বিচার করেছেন ছবির প্রতিটি দিক নিয়ে বিতর্ক করে-ছেন। তারপর চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন : 'অসামান্য শিল্প-সুষমায় ভরা এই ছবিতে ব্যাপকতম অর্থে মনুষ্যত্বকে চিত্রিত করা হয়েছে, যা দেশকালের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়।'

এখন পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে সত্যজিতের অবদান উনিশটি পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি। কনেদী বাড়ীর জলসাঘরের বাতিদানে উনিশটি বাতিই যে সমানভাবে আলোক বিচ্ছুরণ করেছে, তা নয়। কয়েক বছর আগে এই বার্লিনেই প্রশ্ন উঠেছিল, সত্যজিৎবাবু দেবীমূর্তিতে আর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করছেন না বা করতে পারছেন না কেন! কাঞ্চনজংঘার সুউচ্চ চূড়ায় বসে উদিত সূর্যকে দেখতে গিয়ে সত্যজিৎ-সূর্য কি অস্তমিত হতে চলেছে? কিন্তু 'অশনি সংকেত' দেখার পরে সত্যজিৎ-প্রতিভার সৃজনী পরিপক্কতায় কোন সন্দেহ থাকে না। 'আপনার মতে কোন্‌টি আপনার শ্রেষ্ঠ ছবি?'—বার্লিনের সাংবা-দিক সম্মেলনে সত্যজিৎবাবুকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'সব সময়েই শেষের ছবিকেই আমার শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে ভাবতে ভাল লাগে।' 'অশনি সংকেত' সত্যজিৎবাবুর শ্রেষ্ঠ ছবি কিনা তা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে, তবে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম—এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

'অশনি সংকেত' বিভূতি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মর্মস্পর্শী উপন্যাস। ১৩৫০-এর মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের উত্তর পর্ব এর কাহিনী। তাই এই ছবির উপজীব্য দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। 'অশনি সংকেতে' দরিদ্র ব্রাহ্মণ গংগাচরণের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিশেষ করে অনংগর ভূমিকায় বাংলাদেশের অভিনেত্রী বরিতার অভিনয় অবিস্মরণীয়। গ্রাম্য ব্রাহ্মণের জটিল চরিত্রকে সৌমিত্র যে দক্ষতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। যদিও ছবির শুরুতে মাত্র কয়েক মিনিট তাঁকে যেন একটু শহুরে মনে হয়েছিল কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সৌমিত্র যেন গংগাচরণের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। আর দুঃস্থ অথচ সদাহাস্যময় ব্রাহ্মণীর চরিত্রে বরিতা—বিশেষ করে কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্তকে জীবন্ত করে তোলায় তার অসাধারণ ক্ষমতা দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে।

আগেই বলেছি, সত্যজিৎবাবু এই ছবিতে দুর্ভিক্ষের ডকুমেন্টারী তোলেননি। অভাবে পিষ্ট অনাহারের তাড়নায় নিরন্ন মানুষ পাপ-পুণ্যবোধ হারিয়ে ফেলে। একমুঠো অন্নের লালসায় ছুটকী (সন্ধ্যা রায়) তার প্রিয়তম স্বামীকে মৃত্যুর গহ্বরে ছেড়ে এক অতি কুৎসিত পুরুষের যৌন-তাড়নার শিকার হোল। কিন্তু সেই মুহূর্তে, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় ক্ষুধা, তীব্র ক্ষুধায় জর্জরিত ছুটকী বলতে ভোলেনি, 'ওরে নরকে গিয়েও যেন একমুঠো ভাত খেতে পাই।' 'অশনি সংকেত' বিদ্রোহের সংকেত দেয়নি কিন্তু ছুটকীর এই আর্তনাদ মানুষের অনু-ভূতিতে যে প্রচণ্ড নাড়া দেয়, তা বিদ্রোহের সংকেতের চেয়ে কম স্ফুলিংগ ছড়ায় না।

নিরন্ন মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলছে ঠিকই। কিন্তু রঙিন ছবি 'অশনি সংকেতে' একজোড়া প্রজাপতি বারবার সুন্দরের জয় ঘোষণা করছে। গর্ভবতী অভুক্ত অনংগ নিজে নিরন্ন থেকে,

বার্লিনে জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে সত্যজিৎ রায় এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

স্বামীর জন্য রেখে-দেওয়া ওল-কচুর অন্ন মৃত্যুপথযাত্রিনী গ্রাম-বান্ধবী মোতির দিকে এগিয়ে দেয়। মানবতার এর চেয়ে বড় পুজো আর কি হতে পারে! ছবির শেষে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হাজার বছরের সংস্কারকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এগিয়ে যায় নিজের হাতে তথাকথিত অস্পৃশ্য মোতির শব সৎকার করতে। সমাজের, ধর্মের রক্ত-চক্ষুকে সে আর ভয় করে না। কিন্তু তার বধূ, তার প্রেমিকা তাকে ধর্মচ্যুত করবে না তো? গংগাচরণ অনংগর কাছে জানতে চায়—'তোমার অমত নেই তো?' অনংগ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ছবির শেষে বিদেশী দর্শকদের জন্য পর্দার উপরে বড় বড় সাদা অক্ষরে লেখা ইতিহাসের একটি পংক্তি : '১৯৪৩ সালের মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল।' ছোটখাট দুর্বলতা সত্ত্বেও 'অশনি সংকেত' এক অসাধারণ ছবি। দুর্বলতার কথা বলতে গেলে বিশেষ করে দুটি দৃশ্যের উল্লেখ করতে হয়। সত্যজিৎবাবু এই ছবিতে চাল লুঠের দৃশ্য দেখিয়েছেন। ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এক বাটি ফেন ভিক্ষা করে প্রাণ দিয়েছে কিন্তু জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার মানসিকতা সেদিন তার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অনংগর উপর পাশবিক অত্যাচারে উদ্যত যুবককে প্রহারের (অথবা পিটিয়ে মারা?) দৃশ্য। 'অশনি সংকেতে' ছবির প্রয়োজনে এই বীভৎস, রক্তাক্ত দৃশ্যের অবতারণার প্রয়োজন আদৌ সার্থকতা আছে কিনা, তা নিয়ে [illegible] প্রশ্ন উঠতে [illegible]

কিন্তু এই সামান্য দুর্বলতা সত্ত্বেও 'অশনি সংকেত' এক অসামান্য ছবি, সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী সৃষ্টি।

ভারতের দ্বিতীয় ছবি মৃণাল সেনের 'এক আধুরী কহানী' সরকারী প্রতিযোগিতার বাইরে 'ফোরাম অব ইয়ং ফিল্মস'-এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। পরিচালক হিসেবে মৃণালবাবু নিঃসন্দেহে ভারতের প্রথম সারির কয়েকজন পরিচালকের অন্যতম। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্যের স্পষ্টতায়, এমনকি শুধুমাত্র ছবি হিসেবে 'এক আধুরী কহানী' কতটা উৎরেছে তা বিতর্কের অবকাশ রাখে। পঞ্চাশ দশকের 'নীল আকাশের নীচে' থেকে শুরু করে এই সেদিনের 'ভুবন সোম', 'ইন্টারভিউ' কিংবা 'কলকাতা-৭১'-এর মত বলিষ্ঠ ছবির জনক মৃণাল সেনকে 'এক আধুরী কহানী'তে কেমন যেন রক্তশূন্য মনে হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়। বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবক সঞ্জয় বিহারের এক চিনির কলে ক্যাশিয়ারের চাকরী নিয়ে আসে। উত্তর তিরিশের বিশ্বব্যাপী মন্দার সুযোগে মালিক শ্রমিক ও কৃষকদের বঞ্চিত করে মুনাফার উচ্চাসনে আরোহণে উদ্যোগী হয়। শ্রমিক ও কৃষকের মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত 'বাঙালীবাবু' সঞ্জয়ের কাছেও আহ্বান আসে এই আন্দোলনে—ধর্মঘটে সামিল হবার। সে যেন সাড়াও দিয়ে। কিন্তু পরমুহূর্তে আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে।

মৃণালবাবুর এই ছবির ঘটনা ১৯২৯-৩০ সালের। বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের সংকট দেখাতে গিয়ে মৃণালবাবু চমৎকারভাবে 'ফ্লাশ ফরওয়ার্ড' টেকনিক ব্যবহার করে জার্মানীতে হিটলারের উত্থান, জাপানের যুদ্ধ-প্রস্তুতি দেখিয়েছেন। কিন্তু এই সময় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতজোড়া বিক্ষোভের কোন ছায়া 'এক আধুরী কহানী'তে পড়েনি। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সংকটের পটভূমিকায় ভারতের একটি চিনির কলে শ্রমিকদের নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনের ছবি তুলে মৃণালবাবু সম্ভবতঃ ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করেননি। 'এক আধুরী কহানী'র চিনির কল আগে ছিল নীলকুঠি, পরে এক

ডেভিড হেমিংস পরিচালিত রৌপ্য ভল্লুক পুরস্কারপ্রাপ্ত বৃটিশ ছবি দি ফোর্টিন-এর একটি দৃশ্য

ইংরেজ নীলকুঠি ভেঙে চিনির কল বসায় এবং কালক্রমে অর্থাৎ দ্বিতীয় দশকে এক মারোয়াড়ী মালিকের দখলে আসে। স্বভাবতঃই এই তিনটি যুগকে বিবৃত করে মৃণালবাবু ভারতীয় পুঁজিবাদের বিকাশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উত্তর তিরিশে ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল কি? তাছাড়া, এই ছবির নায়ক বাঙালীবাবু সঞ্জয় তার মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্রের তাগিদেই প্রথমদিকে দোদুল্যমান এবং সর্বশেষে শ্রমিক-কৃষকের মিলিত আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল। মৃণালবাবু মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী। মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি মধ্যবিত্ত চরিত্র দোদুল্যমান। কিন্তু মার্কসীয় দর্শনেই, বিশেষ করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যবিত্ত সমাজকে শ্রেণীশত্রু হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়নি। এই ছবিতে 'শ্রেণীশত্রু' এই সঞ্জয়কে বারবার 'বঙালীবাবু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার হিন্দী-ভাষাভাষী শ্রমিক অঞ্চলে এবং পশ্চিমবাংলার আশেপাশে এই মধ্যবিত্ত 'বঙালীবাবু'রা এখনো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রথম সারিতে আছেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয়, এমন শ্রমিকদের মধ্যে হিন্দি ছবি 'এক আধুরী কহানী' এই বাঙালীবাবুদের সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। তাছাড়া, ধর্মঘট চালানর জন্য শ্রমিকনেতা কারখানার ক্যাশঘর থেকে টাকা চুরি করতে যায়, এমন অবাস্তব কল্পনা রাজনৈতিকসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরোধী।

এই সমস্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও 'এক আধুরী কহানী' নিছক ছবি হিসেবে ভাল হতে পারত যদি পরিচালক মৃণাল সেন সুবোধ ঘোষের এই ছোটগল্পের চলচ্চিত্রিক রূপায়ণে আরো বেশী আন্তরিকতা দেখাতেন। কারণ, অভিনয়ের দিক থেকে বিভিন্ন চরিত্রে শেখর চ্যাটার্জি, বিবেক চ্যাটার্জি, আরতি ভট্টাচার্য, শোভা সেন এবং সামান্য নাটকীয়তা সত্ত্বেও উৎপল দত্ত সুন্দর অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে মৃণালবাবুর সম্পর্কে এই লেখকের প্রচণ্ড দুর্বলতা আছে, আর বোধহয় সেই কারণেই মৃণালবাবুর ছবির দুর্বলতা অসহনীয় মনে হয়। এজন্য নিজেকে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত মনে হয়।

সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন ছাড়াও এবারের বার্লিন উৎসবে শ্রীমতী বিনয়া রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিতা, সন্ধ্যা রায়, 'অশনি সংকেতে'র প্রযোজিকা শ্রীমতী সবাশী ভট্টাচার্য ও শ্রীভট্টাচার্য এসেছিলেন। বোম্বের অন্যতম পরিচালক ও প্রযোজক শক্তি সামন্ত 'আরাধনা' ও 'অনুরাগ' ছবিদুটি উৎসবসূচীর বাইরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যান্য দেশ থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লী মারভিনের নাম উল্লেখযোগ্য।

ছয়টি দ্বিতীয় পুরস্কার: দ্বিবিংশতিতম বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে আঁদ্রে স্যাটে পরিচালিত ফরাসী ছবি 'নো স্মোকিং উইদাউট ফায়ার' বর্তমান সামাজিক পটভূমিকায় কাহিনী নির্বাচনে ও তার রূপদানে সাহসিকতার জন্য বিশেষ পুরস্কার রৌপ্যভল্লুক লাভ করেছেন। নির্বাচনে দুর্নীতি এই ছবির বিষয়বস্তু। ডেভিড হেমিংস পরিচালিত 'দি ফোর্টিন' একটি উন্নতমানের বৃটিশ চলচ্চিত্র। এই ছবিতে পরিচালক চোদ্দজন শিশু ও কিশোর অভিনেতাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাদপ্রদীপের সামনে হাজির করেছেন। 'দি ফোর্টিন' চোদ্দজন অনাথ ভাইবোনের পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টার কাহিনী। দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অন্যান্য ছবিগুলি হচ্ছে নোরবার্ট কুকেলমানের পশ্চিম জার্মান ছবি 'দি এক্সপার্টস্', ব্রাজিলের ছবি আরনালডো জাবর পরিচালিত ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনী 'অল নুডিটি উইল বি পানিস্ড', আর্জেন্টিনার লিওপোলডো নিলসনের 'দি রেভলিউসান অব দি সেভেন ম্যাড মেন' এবং ফ্রান্সের 'দি ব্লুড উইথ ওয়ান বস্যাক শু'। শেষোক্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইভেস রবার্ট। শারুলের ছবি সম্পর্কে অনেকেই আশা প্রকাশ করলেও শারুলকে এবারে পুরস্কার না নিয়েই ঘরে ফিরতে হয়েছে।

পরিশেষে এ-কথা বলা যায় যে, এবারের বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে জৌলুস কম ছিল ঠিকই, কিন্তু ভাল ছবির অভাব ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে, সরকারী প্রতিযোগিতামূলক চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি 'ফোরাম অব দি ইয়ং ফিল্মস'-এর জনপ্রিয়তা। অসংখ্য নতুন নতুন পরীক্ষামূলক ছবি এই ফোরামের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসী পরিচালক গদার এবারে তাঁর ছবি 'ফোরামে' পাঠিয়েছেন। এবং এই ফোরামে প্রতিটি ছবি দেখানোর শেষে পরিচালকরা দর্শকদের সঙ্গে ছবি সম্পর্কে মতামত বিনিময় করেছেন। যার ফলে উভয় পক্ষই উপকৃত হয়েছেন, একথা মনে করলে অন্যায় হবে না।

তাই আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও এবারের বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল একটি সার্থক উৎসব হিসেবেই পরিগণিত হবে।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি হাউস
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ফর্ম ও অফিসের জন্য ষ্টেশনারী, কাগজ, সার্ভে, ড্রইং, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যাবতীয় উৎকৃষ্ট ছাপার কাজের সলভ প্রতিষ্ঠান।
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১
ফোন—২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪; গ্রাম: অরারদিন—হাওড়া পোষ্ট বক্স—৩৮, হাওড়া

সব্যসাচী
সুপ্রিয়া দেবী।
পরিচালনা ঃ পীযূষ বসু
ফটো ঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

দি আনডীফীটেড (অপরাজিত)—একটি তথ্যচিত্র

লাইট হাউস মিনিয়েচার থিয়েটার ৩১ জুলাই একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখানো হল সিনেগ্রাফ অ্যাসোসিয়েটস নিবেদিত এক রীলের তথ্যচিত্র 'দি আনডীফীটেড' বা অপরাজিত।

আসামের নামরূপ শহরে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার যে শাখা অফিস আছে। তাতে উচ্চতর বিভাগের অন্যতম সরকারী (আপার ডিভিসন অ্যাসিস্ট্যান্ট) রূপে কাজ করেন নরেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ। বাল্যে একটি দুর্ঘটনায় পড়ে নরেন্দ্রকুমারের হাত-পা—দুই-ই কাটা যায়। দুই হাতেরই পাতা নেই। শ্রীমানের ভবিষ্যৎ নিয়ে ওর বাপ-মায়ের ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু দৈবের কাছে নরেন্দ্রকুমার হার স্বীকার করেননি। তিনি লেখাপড়া তো শিখেইছেন। তার ওপর কৃত্রিম পায়ের সাহায্যে কোনো রকম লাঠি বা ক্রাচ ছাড়াই শুধু চলাফেরাই করেন না, রীতিমত ফুটবলও খেলেন। হাতের পাতা নেই? — তাতে কি? মনিবন্ধ পর্যন্ত হাত দিয়েই ভাত খাওয়া থেকে শুরু করে আফিসে টাইপ করা অবধি সমস্ত কাজই নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারেন। অফিস ফাইলের ফিতে খোলা ও বন্ধ করা, আলপিন তোলা ও কাগজে বা পিন-কুশনে গাঁথা—কিছুই তাঁর আটকায় না। প্যান্ট, সার্ট, নেকটাই পরতেও তাঁর অপরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।—আশ্চর্য স্বাবলম্বী এই নরেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ! না, তিনি দৈবের কাছে পরাজয় স্বীকার করেননি। তিনি অপরাজিত—দি আনডীফীটেড।

এই অপরাজিত নরেন্দ্রনাথের দৈনন্দিন কার্যকলাপকে অত্যন্ত ছন্দোময়ভাবে চিত্রায়িত করেছেন চিত্রনাট্যকার, সম্পাদক পরিচালক দুলাল সাহা। দর্শক কৌতূহলকে

সম্পূর্ণ বজায় রেখে তিনি এমন সুকৌশলে শ্রীপূরকায়স্থর জীবনযাত্রাকে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে, বিস্মিত দর্শক শেষ পর্যন্ত অভিভূত না হয়ে পারেন না। চিত্রনাট্য রচনা, পরিচালনা ও সম্পাদনা এককভাবে করার দরুণ একদিকে যেমন শ্রীসাইকিয়াকে গুরুভার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই ছবিটি একটি ছন্দোময় শিল্পসৃষ্টিতে পরিণত হতে পেরেছে। ইন্দুকল্প হাজারিকার চিত্রগ্রহণ কৌশল প্রায় নিখুঁতের পর্যায়ে পৌঁছেচে। মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় অজিত বড়ুয়া ছবির জন্যে যেমন উপযোগী আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন, তেমনই বিষয়ানুগ পরিমিত নেপথ্য ভাষণ দ্বারা ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছেন জগন্নাথ গুহ।

এখানে উল্লেখের প্রয়োজন আছে যে, দুলাল সাইকিয়া যেমন পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সম্পাদনায় ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্র, ইন্দুকল্প হাজারিকাও তেমনই ওখানকার চিত্রগ্রহণে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ছাত্র।

মঞ্চাভিনয়

শ্রীমঞ্চ প্রযোজিত 'প্রচ্ছন্ন মহিমা'

কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা হচ্ছেন সত্যদ্রষ্টা। বনফুল লিখেছিলেন 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' বেশ কয়েক বছর আগে। 'প্রচ্ছন্ন মহিমাতে তিনি যে চিত্র অংকিত করেছেন, আমাদের দুর্ভাগ্য, আজ সেই চিত্র দৈনন্দিন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এবং সেই কারণেই গণেন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত নাট্যরূপটি তাঁরই নির্দেশনায় শ্রীমঞ্চ সংস্থা যখন রঙ্গনা মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন, তখন দর্শক যেন আজকের কলকাতার একটি বিশিষ্ট সমাজরূপকে প্রত্যক্ষ করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় যেমন আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে বনফুল লিখিত কাহিনীটির নাট্যরূপ দিয়েছেন, তেমনি তীব্র গতিময় হয়েছে তাঁর নাট্যপ্রযোজনা। বর্তমানের দর্শক-মন অত সহজেই দুই দূরস্থপূর্ণ স্থানের মধ্যে যেমন সমন্বয় সাধন করতে পারে, তেমনই পারে বর্তমান থেকে অতীতে যেতে বা অতীত থেকে বর্তমানে আসতে। দর্শক-মনের এই ত্বরিতে বিচরণশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর নাট্যরূপদানে ও প্রযোজনা তথা নির্দেশনায়। এবং সেই কারণেই সম্ভব হয়েছে নাট্যান্তর্গত ৫৪টি চরিত্রকে মাত্র ১৬জন শিল্পী দ্বারা অভিনীত করানো।

জওহরলাল নেহেরু যখন গদিতে বসেন নি, তখন তিনি বলেছিলেন, 'যারা খাদ্য বা ঔষধে ভেজাল দেয়, কালোবাজারী করে, ক্ষমতা পেলেই আমি তাদের নিকটতম রাজপথের বাতিস্তম্ভ (ল্যাম্পপোস্ট) থেকে ঝুলিয়ে দেব।' কিন্তু ক্ষমতার আসনে বসে তাঁর মন হয়ত উদার, দরাজ হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে ভারতে যখন একটিও কালোবাজারী ভেজালদারের থাকবার কথা নয়, তখন কালোবাজারীর সংখ্যা রাবণের বংশ বা ছারপোকার বংশের মতোই সারা ভারতে ছেয়ে গেছে। আজ তারাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান। ভারতের বুকে তারা ভূতের নৃত্য করছে। তারা অর্থের লোভে শুধু চোরাই চালানই করছে না, খাদ্য, ঔষধ বা বেবীফুডে ভেজালই মেশাচ্ছে না মানুষের খাদ্যশস্যকে গুদামজাত করে কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি দ্বারা কালোবাজারের কারবারকে ফলাও করছে না,

রত্ন তিলক/অলকা (বোম্বে), কিংবদন্তি এবং সুপ্রিয়া দেবী। পরিচালনা : কিংবদন্তি। ফটো : অমৃত

গুণ্ডামি, রাহাজানি পকেটমারগিরি স্ত্রী-লোকেদের দেহ নিয়ে ব্যবসায় প্রভৃতি যতরকম ঘৃণ্য পাপপথে উপার্জন সম্ভব, সেইসব পথেই দ্বারা নেতৃত্ব দিচ্ছে। এবং আশ্চর্য! টাকার দ্বারা তারা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী পর্যায়ে ব্যক্তি থেকে শুরু করে সামান্য কনস্টেবলকে পর্যন্ত নাকি কিনে রেখেছে।। অন্তত বনফুল তো সেই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন : 'তার (কালোবাজারীর) লক্ষিত বিপুল প্রতাপে আজ রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি ব্যষ্টি, রাজনীতি সাহিত্য, বস্তুত মানব সভ্যতার সব কিছু ভীত, অভিভূত। সে টাকা দিয়ে সবকিছু কিনতে পারে। সব কিছু কিনতে চায়।'

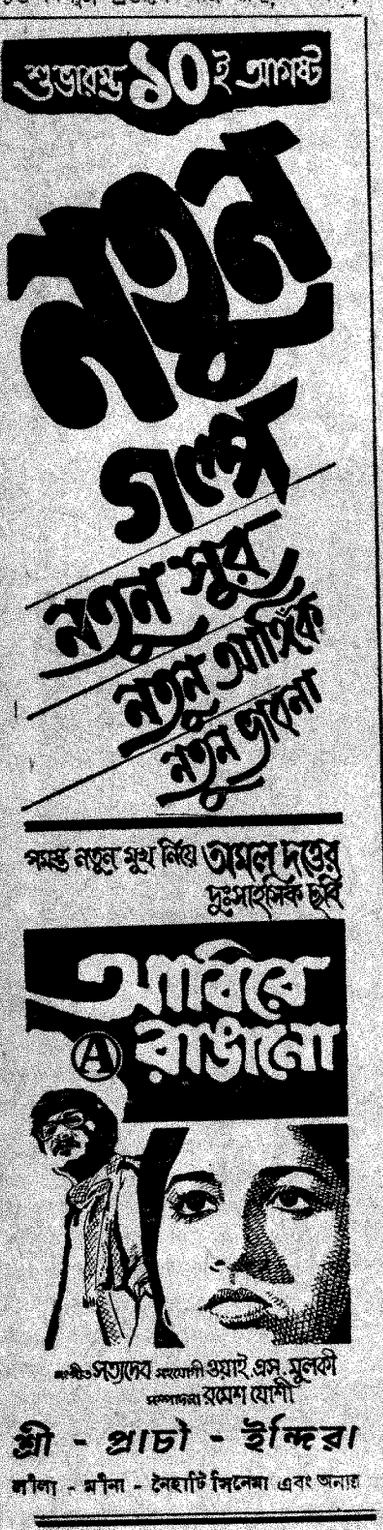

এইরকম একজন কালোবাজারীর প্রচ্ছন্ন মহিমা দেখা যাচ্ছে আলোচ্য নাটকে। সে তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত পণ্য রাখে খুশীমনে। তার চর নিযুক্ত থাকে সুন্দরী যুবতীকে ফুসলিয়ে বেশ্যালয়ে তোলবার জন্যে। সে মাস-মাহিনা দিয়ে রাখে পকেটমারের দল, চোরাই চালানে সাহায্যকারী গুন্ডাশ্রেণীর ব্যক্তি। সে নিজে ঘোরাফেরা করে সমাজের উচ্চ মহলে—অনবরত স্নো-পাউডার করে যায় দিল্লী বোম্বাই; খানা-পিনা করে বিরাট বিরাট লোকের সঙ্গে, ককটেল পার্টি দেয় তাদের খুশী রাখবার জন্যে।—অপরদিকে নাটকের নায়ক একজন শিক্ষিত, অথচ একদালালপুট যুবক। বর্তমানে লাম্পট্যে তার অরুচি; সে দেখেছে জীবনে বিভ্রান্ত বঞ্চিত লোকের সংখ্যাই বেশী। সে চিন্তা করল এই যে অগণ্য নরনারী—শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—বঞ্চিত বিভ্রান্ত হচ্ছে, এর কারণ কি? কে বা কারা এর জন্যে দায়ী? সে তার দলে টানল একদল বস্তিবাসী সমাজ-দ্রোহীকে। তাদের মধ্যে সুপ্ত বুদ্ধিকে জাগ্রত করে সে তাদের সমস্ত রোষকে সংহত করল সেই আপাতঅদৃশ্য ব্যক্তির ওপর, যার পিশাচের মতো অর্থলালসা তাদের দুঃখের কারণ হয়েছে। এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে সে চরম প্রতিশোধ নিল সেই দুর্নীতিপরায়ণ কালোবাজারীর ওপর, তার মুন্ডহীন দেহটিকে শহরের প্রকাশ্য স্থানে টাঙিয়ে দিয়ে।—এই কাজের জন্যে পুলিশ তাদের প্রত্যেককে গুলীর আঘাতে ধরাশায়ী করেছে—কিন্তু তারা অটল থেকেছে তাদের প্রতিজ্ঞায়।

কৃষ্ণবর্ণের পশ্চাদ্‌পটের সামনে প্রায়শ কালো কাপড়ে মোড়া একটি মাত্র সেটে আঞ্চলিক আলোক প্রক্ষেপের (জোনাল লাইটিং-এর সহায়তায় সমগ্র নাটকটি অভিনীত হয় একটি নিরন্ধ্র ছকে বাঁধা ক্ষিপ্র গতি-ময়তার মাধ্যমে। শিল্পীগণ মঞ্চে এসেছেন গেছেন, ঘুরেছেন ফিরেছেন, কথোপকথন করেছেন যেন ঘড়ির কাঁটা ধরে—কোথাও একটু লয়ভঙ্গ বা ঢিলামি নই—সমস্তই যেন যন্ত্রচালিতবৎ।

সমস্ত ঘটনার সাক্ষী যেন লেখক বা কবি স্বয়ং—নাটকের নায়ক ব্রজ বা মহাপুরুষদা তাঁকেই সমস্ত জানিয়েছেন।—এই কবির ভূমিকায় দুর্লভ মুখোপাধ্যায় এমন একটি নির্লিপ্ত দ্রষ্টার ভাবকে সর্বক্ষণ ধরে রেখে দেন, যা দর্শককে অভিভূত না করে পারে না। ব্রজ বা মহাপুরুষদার জীবনযন্ত্রণাকে সংবেদনশীলভাবে প্রকাশিত করেছেন সুজিত বসু; তাঁর কণ্ঠ স্বর এবং সামগ্রিক চেহারা ভূমিকাটির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। জীবন ও রহিম কসাইবেশে গেতম লাহিড়ী সার্থক অভিনয় করেছেন। যে-কটি বিভিন্ন চরিত্রে মমতা চট্টোপাধ্যায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে অমিলা সেন, রাজলক্ষ্মী ও রানীবালা বিশ্বাস। এই ভূমিকা তিনটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর অভিনয়ের গুণে। স্বাতী লাহিড়ীর ক্ষেপ্তি ও সোনা দৃষ্টিআকর্ষক। অপরাপর ভূমিকায় অসীম বসু (বুড়ো কিংবাস এবং অন্যান্য), নিধীর ভট্টাচার্য (রোখন মিশির), বৈদ্যনাথ কর্মকার (বিশু, মিনুবাবু এবং অন্যান্য), সুনীলকান্তি দাশগুপ্ত (জগজিৎ ড্রাইভার এবং অন্যান্য), হেমন্ত মিত্র (শেঠজী, ভর্তা এবং অন্যান্য) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাইবাবার ভূমিকায় সুনীলবরণের অভিনয় ও গান বেশ কিছুটা যাত্রা ঢংয়ের; মনে হয় মঞ্চে নাটকা-ভিনয়ের সঙ্গে এই যাত্রা-ঢং বেশ খাপ খায় না।

শ্রীমণ্ড নিবেদিত 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' একটি আশ্চর্য যুগোপযোগী নাটক।

স্বপ্নদর্শন : নাটকের নাম 'স্বপ্নদর্শন'। নাম থেকেই এর কাহিনী বা বক্তব্যের আভাস সুস্পষ্ট। নিতাইচন্দ্র মণ্ডলের এই নাটকটি গড়ে উঠেছে মানুষের চন্দ্র অভি-যানের ব্যাপার নিয়ে। চন্দ্রপৃষ্ঠে নির্বাসিত চীনে মহিলার সঙ্গে মার্কিন মহাকাশচারীর দেখা হোল এবং বিনিময় হোল প্রেমের জন্মে। এরই সঙ্গে ভারতীয় চাঁদের বুড়ির আবির্ভাব ঘটেছে। সব শেষে উচ্চারিত হয়েছে শান্তি ও মৈত্রীর মন্ত্র। এই ফ্যানটাসি ধরনের নাটকটি কয়েকদিন আগে পরিবেশন করলেন লিলুয়ার যুব নাট্য সংঘের শিল্পীরা। শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ে নাটকটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, গোরাচাঁদ গোস্বামী, রাধেশ্যাম খাড়া, দিলীপ চ্যাটার্জি, হেমন্তকুমার দাস, অমর লাহিড়ী, ধীরেন ব্যানার্জি, শংকর সেনগুপ্ত, কেতকী গাঙ্গুলী, বাসনা দে, চারুবালা সরকার। নাটকটি সুক্ষ্মভাবে পরিচালনা করেন সন্তোষ ধর।

সংক্রান্তি : বীরু মুখার্জির বহু অভিনীত নাটক 'সংক্রান্তি' সম্প্রতি স্টারে অভিনীত হোল। প্রযোজনা করলেন সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কলেজ স্ট্রীট স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন অনিল মিত্র। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন ভাস্কর ভাট্টাচার্য, সমীর প্রামাণিক, গোবিন্দলাল সাহা, তপন মৈত্র, নারায়ণ কুণ্ডু, মধুসূদন চক্রবর্তী, ভীমচন্দ্র সাউ, অনিল দত্ত, অমিত শেঠ, শিশির দাস, বঙ্কিম দাস অম্বর মুখার্জি, অপিতা ঘোষ, অজন্তা দেবী, শিপা ভাট্টাচার্য, বাণী রায় ও বেবী ভট্টাচার্য।

সাজাহান : ন্যাশনাল কোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি অভিনীত হোল সাজাহান নাটক। বিশ্বরূপায় অভিনীত এই

নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নেন ঠাকুরদাস মিত্র। রূপায়ণে এই নাটকের শিল্পী তালিকায় ছিলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, মৃণাল সাহা, অমলেন্দু গুপ্ত, সঞ্জয় চৌধুরী, কমল গাঙ্গুলী, গীতা দে তাপস ভট্টাচার্য, কমল গাঙ্গুলী, সীমা ঘোষ, সুব্রত মজুমদার, শশাঙ্ক চক্রবর্তী, প্রণব মুখার্জি অজয় গাঙ্গুলী নিশীথ ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎ মুখার্জি, নলিনী চ্যাটার্জি নন্দিতা দে বাণী ভারমা, সুমিতা চ্যাটার্জি।

নীচের মহল : ম্যাকসিস গোর্কির 'লোয়ার ডেপথ' অবলম্বনে রচিত 'নীচের মহল' নাটকটি সম্প্রতি ষ্টার থিয়েটারে পরিবেশন করলেন স্টেট ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়ার ষ্টাফ এসোসিয়েশন (শ্যামবাজার শাখা)। নাটকটি নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচালনা করেন মাণিক রায়চৌধুরী।

বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শান্তিভূষণ সাহা, রতনকুমার ভট্টাচার্য মায়া ঘোষ, নির্মল সাহা, অশোক ব্যানার্জি সমীর দে, নির্মল ভট্টাচার্য, পাঁচুগোপাল বসু, বসাক, পুলিন ব্যানার্জি নারায়ণ চক্রবর্তী ইন্দ্রাণী লাহিড়ী ও বাণী দত্ত প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, রাণী ব্যানার্জি, কৃষ্ণা চ্যাটার্জি।

বিবিধ সংবাদ

১৫ আগস্ট 'অশনিসংকেত'এর শুভমুক্তি

বার্লিনে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে স্বর্ণ ভল্লুক (গোল্ডেন বেয়ার) দ্বারা সম্মানিত, সর্বানী ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অশনিসংকেত' আগামী স্বাধীনতা দিবস—১৫ আগস্ট তারিখে মিনার, বিজলী, ছবিঘর এবং শহরতলীর অপরাপর চিত্রগৃহে মুক্তি লাভ করবে। এতদিন পাঠকমাত্রই নিশ্চয় জেনেছেন যে, এই ইস্টম্যান কলারে তোলা রঙীন ছবিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে ১৩৫০-এর সেই সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝেই মানুষের চক্রান্তের ফলে যা এই বাংলা দেশে (তখনও ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়নি) সৃষ্ট হয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের জীবনহানির কারণ হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের অশুভ পদক্ষেপকে বিষয়ীভূত করে কথা-শিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশনি-সংকেত' নামে যে মর্মন্তুদ কাহিনী রচনা করেছিলেন, তাকেই উপজীব্য করে সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করেছেন আলোচ্য ছবিখানি। 'অসামান্য শিল্পগুণ এবং একটি সার্বজনীন গুরুত্বপূর্ণ মানবিক পরিস্থিতিকে অবাধ আবেদনপূর্ণ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রূপায়ণের জন্য' আন্তর্জাতিক জুরি ছবিখানিকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

চিত্রটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ববিতা (বাংলাদেশ), সন্ধ্যা রায়, শেলী পাল, সুচিতা রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, রমেশ মুখোপাধ্যায়, তপন

স্মরণী—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

দত্ত, ননী গাঙ্গুলী, ডালিম গৃহ এবং অন্যান্য বহু শিল্পী। বরাবরের মতো এ ছবিতেও শ্রীরায় পরিচালনা ছাড়াও চিত্র-নাট্যরচনা ও সুর সংযোজনার দায়িত্ব পালন করেছেন। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে সৌমেন্দু রায় ও দুলাল দত্ত।

'নষ্ট দুনিয়া নয়ে লোগ'-এর শুভমুক্তি

নীতিন ফিল্মস ইন্টার ন্যাশনাল-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি 'নষ্ট দুনিয়া নয়ে লোগ' গেল কাল বৃহস্পতিবার ৯ আগস্ট তারিখে প্লেজ সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। মাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য বলে চিহ্নিত এই ছবিখানি রচনা ও পরিচালনা করেছেন বি আর ইশারা এবং প্রযোজনা ও সম্পাদনা করেছেন আই এস কুন্দু। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ড্যানী, রীণা রায়, মনোমোহন কৃষ্ণ, অজিত সেন, নাদিরা এবং নবাগত সতোন। ছবিতে সুর সংযোজনা করেছেন। স্বপন জগমোহন।

মস্কোতে অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব

'চলচ্চিত্র শিল্পে মানবিকতার জন্য, পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য'—এই আদর্শনীতি অনুসারে সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কোতে অষ্টম বার্ষিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবটি গেল ১০ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত সতেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল। এবারের উৎসবে মোট ৮৬টি দেশ যোগদান করেছে। ভারত থেকে স্বয়ম্ভরম্' নামে একটি তামিল ছবি পূর্ণ দীর্ঘ কাহিনী চিত্রের প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। ভারত থেকে যে প্রতিনিধি দল ওখানে গিয়েছিল, তার নেতৃত্ব করেছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী

একদা / ভাস্কর চৌধুরী ও চিন্ময় রায় / পরিচালনা : চিত্রদূত

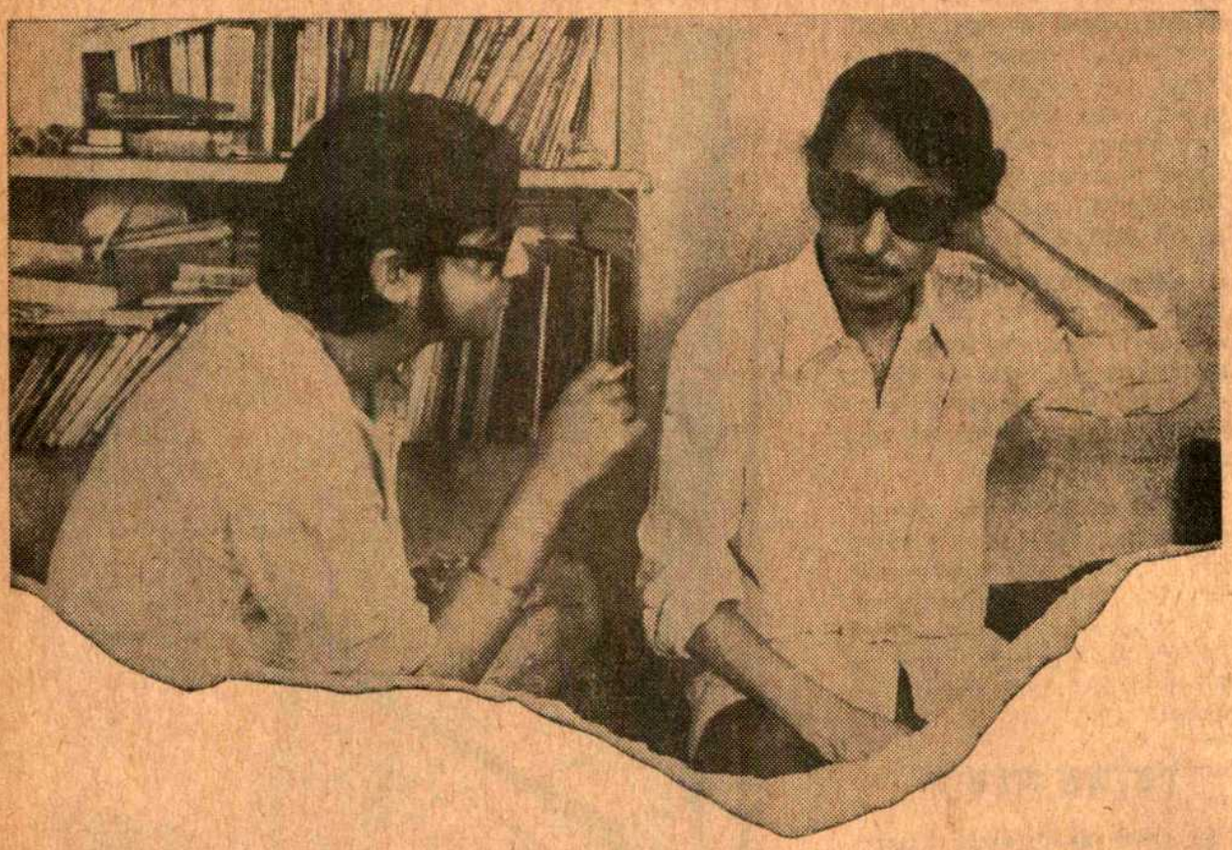

ইন্দ্রকুমার গুজরাল। যে একত্রিশটি ছবির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনখানি ছবি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়ে স্বর্ণ-পদক লাভ করেছে : (১) আমেরিকার স্ট্যানলে ক্রামের পরিচালিত 'ওকলাহোমা রুড'; (২) রাশিয়ার ভী. জালাকিভিসাস পরিচালিত 'দ্যাট সুইট ওয়ার্ড লিবার্টি' এবং (৩) বুলগেরিয়ার লুডমিল স্টেকভ্ পরিচালিত 'লাভ'।

সেন্সর বোর্ড সম্বন্ধে আই কে গুজরালের ঘোষণা—

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার দপ্তরের রাষ্ট্র-মন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, খোসলা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী চলচ্চিত্রের সেন্সার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্যে ভারত সরকার লোকসভার আগামী অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক বিল পেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। স্মরণ থাকতে পারে, খোসলা কমিটি সেন্সার ব্যাপারে নেতিমূলক দৃষ্টি-ভঙ্গী ত্যাগ করে উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন। দেখা যাক, সরকারী বিল কোন দিকে পা বাড়ায়।

মিলান (ইতালী) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি

মণি কাউল পরিচালিত 'উসকী রোটী' মিলান (ইতালী) আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে রৌপ্যপদক অর্জন করেছে।

১৯৭২ সালের চলচ্চিত্র বিষয়ক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

২৯ জুলাই তারিখে ১৯৭২ সালের চলচ্চিত্র বিষয়ক রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের বিষয়টি ঘোষণা করা হয়েশে। জানা গিয়েছে যে, এবারে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে মালয়লম ছবি 'স্বয়ম্ভরম্'। স্মরণ থাকতে পারে, এবারের মস্কোয় অনুষ্ঠিত অষ্টম বার্ষিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে এই ছবিটিকেই ভারত থেকে পাঠানো হয়েছিল প্রতিযোগিতা করবার জন্যে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির রৌপ্য পদক লাভ করেছে মৃণাল সেন কৃত বাংলা ছবি 'কলকাতা ৭১'। হিন্দী ছবি 'কোশিশ'-এ অভিনয়করবার জন্যে সঞ্জীবকুমার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিবেচিত হয়েছেন (একটি মূক বধিরের ভূমিকা)। 'স্বয়ম্ভরম্'-এ অভিনয়ের জন্যে সারদা বিবেচিত হয়েছেন এ বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। এই দ্বিতীয়বার সঞ্জীবকুমার এবং সারদা অভিনয় বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হলেন (প্রথমবার হিন্দী 'দাস্তাক'-এ অভিনয়ের জন্যে সঞ্জীবকুমার ১৯৭০ সালে এবং মালয়ালম ছবি 'তুলাভরম্'-এ অভিনয়ের সারদা ১৯৬৮ সালে)। জাতীয় সংহতির 'আদায়ুম বাপ্পায়ুম'। শিশুচিত্রের পর্যায়ে 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলেও মাত্র একটি সম্মানপত্র পাবে। 'কোশিশ'-এর জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার রূপে পুরস্কৃত হবেন গুলজার। শচীন দেববর্মণ শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসেবে পুরস্কার পাবেন 'জিন্দগী, জিন্দগী' ছবির জন্য। 'রাণুর প্রথম ভাগ' ছবিতে অভিনয়ে নীরা মালিয়া শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী রূপে নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক ও গায়িকা যথাক্রমে হেমু দাস ও লতা মঙ্গেশকর। এবারের 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সুরশিল্পী পঙ্কজকুমার মল্লিককে। স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৬৯ সালে প্রবর্তিত এই পুরস্কার পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে লাভ করেছেন দেবীকারাণী (১৯৬৯), বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯৭০) এবং (১৯৭১-মরণোত্তর)।

রঙ্গনা নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
অগাস্ট ১৯৭৩
প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
প্রতি রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
১৫ই বুধবার ৩টে ও ৬॥টায়
শের আফগান
২১শে জন্মাষ্টমী ৩টে ও ৬॥টায়
নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

CENTRAL LIBRARY. UNIVERSITY.

শিল্পী সংসদের বার্ষিক অধিবেশনে শিল্প ও শিল্পীদের কল্যাণকল্পে বহুমুখী পরিকল্পনার খসড়া রচনা

কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে গেল ২০ জুন শিল্পী সংসদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সংসদ সভাপতি উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাধারণ সম্পাদক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর বার্ষিক বিবরণীতে দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য নির্মিত 'বনপলাশীর পদাবলী' ছবির ঐতিহাসিক সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন—'শিল্পীদের কল্যাণে এইরকম প্রচেষ্টা শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বেও সর্বপ্রথম'। এখনও পর্যন্ত ঐ ছায়াছবির লভ্যাংশের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮৪,৪৮৮ টাকা। তিনি আশা করেন, এই ছবি থেকে শিল্পী সংসদ প্রায় ৪ লাখ টাকা সংগৃহীত করতে পারবেন। ছবিটির সার্থকতার জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানান।

ঐদিনের সাধারণ অধিবেশনে এক কোটি টাকার একটি বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দক্ষিণ কলকাতায় শিল্পী সংসদের বহুতলবিশিষ্ট একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণ করা হবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকেও বিশেষ অনুদান পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতায় ১ একর জমি সংগৃহীত হবে। এতে ৭ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মিত হবে। ঐ ভবনে থাকবে ১৫০০ দর্শকের বসার মতো তিনটি হল ঘর, এছাড়া অভিনয় ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অন্যান্য ব্যবস্থা। ৩০টি রিহার্সেল রুম থাকবে। এছাড়াও থাকবে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট, একটি আন্তর্জাতিক অতিথিশালা, সেমিনার হল, লাইব্রেরী, ২টি মিনিয়েচার অডিটোরিয়াম, সংগীত ও নৃত্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেডিক্যাল সেন্টার প্রভৃতি।

শিল্পী সংসদ এছাড়াও দুঃস্থ ও ক্ষমতাহীন শিল্পীদের জন্য আরও কয়েকটি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। শিল্পীদের জন্য দুই এবং তিন কামরা বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থা, কলকাতার প্রতিটি হাসপাতালে অসুস্থ শিল্পী ও তাঁদের আত্মীয়দের জন্য ৫টি করে শয্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

উত্তমকুমার তাঁর বক্তব্যে প্রস্তাব করেছেন, এই রাজ্যের ছেলেদের টেলিভিশনে ট্রেনিং দেবার জন্য বিশেষ ভাবে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। প্রমথেশ বড়ুয়ার নামে পূর্বাঞ্চলের জন্য পুণার মতো একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হোক, আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফিল্ম টেকনোলজি বিভাগ খোলা হোক, তিনি এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে শিল্পীদের প্রতিনিধিত্বের দাবীও জানানো হয়।

শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় আগামী দিনে পর পর চারটি বাংলা ছবি তৈরী হবে। পরিচালনায় থাকবেন উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উক্ত ছবিগুলিতেও শিল্পী সংসদের সভ্য-সভ্যবৃন্দ সংগীতে, নৃত্যে, অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেবেন না।

শিল্পী সংসদের যুগান্তকারী প্রচেষ্টা 'বনপলাশীর পদাবলী' বাংলাদেশেও প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। লভ্যাংশের অর্ধাংশ বাংলাদেশের শিল্প ও শিল্পীদের উন্নতিকল্পে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে সংসদ সভাপতি ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে শীঘ্রই আলোচনা করবেন।

উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে শিল্পী সংসদের ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্য কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছেন—**সভাপতি**—উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়, **সহ-সভাপতি**—অমলাশঙ্কর, চিন্ময় লাহিড়ী, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল পাল, ও বিকাশ রায়। **সাধারণ সম্পাদক**—অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্যামল মিত্র ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। **কোষাধ্যক্ষ**—জহর রায়। **কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ**—

সেদিন দুজনে/সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও দেবরাজ রায়

ঈশ্বর
শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
ফোন ৫৫-১৬১৯
বুধ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥
দেবনারায়ণ গুপ্তের নাটক

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অমিত মিত্র, অসীমকুমার সরকার, অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকান্তি ঘোষ বাসবী নন্দী ও শ্যামলী গাঙ্গুলী। জনসংযোগ ও প্রচার অধিকর্তাঃ পঞ্চানন দত্ত। দপ্তর সম্পাদকঃ প্রফুল্ল রায় ও মধু বসু।

বার্ষিক সাধারণ সভায় আরও যাঁরা বক্তব্য পেশ করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জহর রায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শান্তিগোপাল পাল, পঞ্চানন দত্ত ও বিকাশ রায়, সংসদের প্রধান সদস্য সত্য দ চট্টোপাধ্যায় সংসদের নবনির্বাচিত সভাপতি উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়কে মাল্যভূষিত করেন।

ময়ূরমহল ঃ বেঙ্গল এনামেল স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে নীহাররঞ্জন গুপ্তের 'ময়ূরমহল' নাটকটি পরিবেশন করলেন। সুপ্রযোজিত এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন সুকুমার ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী, রত্না ভট্টাচার্য, কমল দত্ত, তাপস দাস, বীরেন পাল, নানু চিত্রকর, ভূপাল ভট্টাচার্য, আশা বোস, মেনকা দাস, রবীন দে, সমীর চক্রবর্তী, অর্জুন নাগ, দিলীপ ব্যানার্জি, কানাই চক্রবর্তী, জয়ন্ত চ্যাটার্জি, তুষার চক্রবর্তী।

একটি পয়সা ঃ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একটি পয়সা' নাটকটি সম্প্রতি 'বশ্ব রূপা মঞ্চে পরিবেশন করলেন উত্তর কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী 'মঞ্জরী'র শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন ধীরেন দাস। সুঅভিনীত এই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন রবীন ঘোষ, মদন দে, অনাথ সাহা, প্রতিমা দাস, গোবিন্দ ঘোষ, দুর্লভ হাইত, সুরেন্দ্রকুমার, রবীন দে, বিমল রায়, শ্যামাপ্রসাদ বসু, সুনীল দত্ত, মিলন দে, নীলিমা দাস, অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বুলবুল দে।

বাংলাদেশের ছবি

'একাত্তর' ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়াবহ বছর। একটা জীবনমৃত্যুর বছর।

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়েছে। একাত্তর ও বাহাত্তর ছিল মূলতঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য ভাঙ্গা কোমর সোজা করে দাঁড়াবার বছর।

দেখতে দেখতে ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে বাহাত্তর বিদায় নিয়ে তিয়াত্তরের শুরু হয়েছে।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জন্য 'বাহাত্তর' নানা দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বছর।

একাত্তরে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছবি মুক্তি পায়নি এবং ১লা মার্চের পর মূলতঃ কোন ছবিই সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি পায় নি।

সত্তরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মোট সংখ্যা ছিল ৩৪টি।

সত্তরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে মোটামুটি একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ ছিল।

বাহাত্তরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বহু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ 'কাঁচা ফিল্মের' অভাব, ছবি তৈরীর মত প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব, পর্যাপ্ত সিনেমা হলের অভাব প্রভৃতি।

তবুও অবাক করার মত খবর হল, বাহাত্তরে অসংখ্য প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলাদেশে মোট ২৯টি ছবি মুক্তি পেয়েছে (২৬টি বাংলা ও ৩টি উর্দু)।

একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চলচ্চিত্রের জন্য নিঃসন্দেহে এটা রীতিমতো গর্বের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে বাহাত্তরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা যে আরো বেশী হতো—তা বলাই বাহুল্য।

বাহাত্তরের মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবির নাম মোস্তফা মাহমুদের "মানুষের মন" এবং শেষ ছবি আজিজুর রহমানের "স্বীকৃতি।"

বাহাত্তরে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভিত্তিক ৪টি ছবি যথা—চাষী নজরুল প রচালিত 'ওরা এগারোজন', সুভাষ দত্ত পরিচালিত 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', মোমতাজ আলি পরিচালিত 'রক্তাক্ত বাংলা' এবং আনন্দ পরিচালিত 'বাঘা-বাঙ্গালী' মুক্তি পেয়েছে।

বাহাত্তরে মুক্তিপ্রাপ্ত ২৯টি ছবির মধ্যে ৩টি ছবি সুবর্ণ জয়ন্তী ও ৮টি ছবি রজত জয়ন্তী পালন করেছে।

বাহাত্তরে কাজী জহীর পরিচালিত ছবি 'অবুঝ মন' পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবসায়িক রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

বাহাত্তরে বাংলাদেশে ক'জন নতুন পরিচালক দর্শকমন জয় করেছে। তাদের মধ্যে চাষী নজরুল ইসলাম (ওরা এগারোজন), রুহুল আমিন (নিজের হারায়ে খুঁজি), এম-এ কাশেম (বাহুরাম বাদশা) ও হাসান ইমাম (লালন ফকির)।

নতুন শিল্পী হিসেবে নায়িকা অলিভিয়া সহ নায়িকা সুচরিতা ও নায়ক ইফতিখার দর্শকদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। ইত্যাদি নানা কারণে বাহাত্তর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য বছর হিসেবে গণ্য হবে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ বাহাত্তরে নানা দিক দিয়েই পূর্বরেকর্ড ভঙ্গ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্পও তাদেরই একটি। সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মাঝেও বাহাত্তরে আমাদের যে চলচ্চিত্র যে রেকর্ড পরিমাণ ছবি মুক্তি দিয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তারই আলোকে বিনাদ্বিধায় বলা চলে, চলচ্চিত্র শিল্প তিয়াত্তরে তার সর্বপ্রকার পূর্বরেকর্ড ভঙ্গ করতে সক্ষম হবে।

বাহাত্তরে যে ২৯টি ছবি মুক্তি পেয়েছে সেগুলি হল যথাক্রমে 'মানুষের মন',

দূর থেকে কাছে
মেহমুজ ও শওকত আকবর

'সমাধান', 'জয়বাংলা', 'কমল রাণীর দিঘী', 'মুন্না আউর বিজলী (উর্দু), 'ওরা এগারোজন', 'লালন ফকির', 'নিমাই সন্যাসী', 'রাঙ্গাবৌ', 'ছন্দ হারিয়ে গেল', 'চৌধুরী বাড়ী', 'কাঁচের স্বর্গ', 'প্রতিশোধ', 'অশ্রু দিয়ে লেখা', 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি', 'শপথ নিলাম', 'দিল এক শীশা' (উর্দু), 'পানছি বাওরা' (উর্দু), 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', 'অবুঝ মন', 'জীবন সঙ্গীত', 'রক্তাক্ত বাংলা', 'বাঘা বাঙ্গালী', 'দাসী', 'গান গেয়ে পরিচয়', 'বাহরাম বাদশা', 'পলাশের রং' 'এরাও মানুষ' ও 'স্বীকৃতি'।

তিয়াত্তরের সূচনাও শুভ।

তিয়াত্তরের এটা মে মাস। অর্থাৎ ৫ মাস প্রায় অতিবাহিত হতে চলেছে। গত ৫ মাসে বাংলাদেশে অনেকগুলো ছবি মুক্তি পেয়েছে। যেমন "রংবাজ, জীবনতৃষ্ণা, বধূমাতা কন্যা, খেলাঘর, ঝড়ের পাখী, বলাকামন, ধীরে বহে মেঘনা, ময়না (উর্দু), যাহা বলিব সত্য বলিব, প্রিয়তমা, ইয়ে করে বিয়ে, রাতের পর দিন" প্রভৃতি।

আশা করা যাচ্ছে চলতি মাসে এবং আগামী মাসে যে কটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে—তার সংখ্যাও কম হবে না। যেমন—হাসমত পরিচালিত 'এখানে আকাশ নীল'। নায়ক-নায়িকা রাহাক ও সুজাতা।

সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া পরিচালিত 'দস্যুরাণী।' নায়ক নায়িকা নবাগত আলমগীর ও শাবানা। রূপ সনাতন পরিচালিত 'দয়াল মুরশিদ।' নায়ক নায়িকা আনোয়ার হোসেন ও সুচন্দা। শেখ আনোয়ার পরিচালিত 'সতী নারী।' নায়ক নায়িকা জাভেদ ও শামিনা (মহিউদ্দীন পরিচালিত 'দুরন্ত দুর্বার, নায়ক নায়িকা আনোয়ার হোসেন ও রোজী সামাদ। সরু নোমান পরিচালিত 'দুই পর্ব।' নায়ক

দুই পর্ব
শাহানব ও আনোয়ার হোসেন

নায়িকা রাহাক কবরী। রাজেন তরফদার পরিচালিত 'পালঙ্ক।' নায়ক নায়িকা সন্ধ্যা রায় ও আনোয়ার হোসেন। আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'বাংলার মুখ।' নায়ক নায়িকা আনোয়ার হোসেন ও রোজী সামাদ। এছাড়া বেশ কটি ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যে কোন দিন মুক্তি পেতে পারে বলে আশা করা যেতে পারে।

সামগ্রিক হিসেবে আশা করা যাচ্ছে যে, তিয়াত্তরের বাংলাদেশে মুক্তি প্রাপ্ত ছবির সংখ্যা ৪০ এর কম হবে না।

অবশ্য একথা বলাই-বাহুল্য, ভালো ছবি নয়, ব্যবসায়ি ভিত্তিক সফল ছবির সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মরহুম অথবা নিখোঁজ জহীর রায়হানের প্রথম ছবি 'কখনও আসে নি' ১৯৬১ সালে জন্ম নেয়। (নায়ক নায়িকা আনিস ও সুমিতা), দ্বিতীয় ছবি 'সোনার কাজল' (নায়ক নায়িকা সলিল ও সুমিতা), তৃতীয় ছবি 'কাঁচের দেয়াল' (নায়ক নায়িকা আনিস ও সুমিতা) আজও আমাদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অমর সম্পদ হয়েই রয়েছে। কখনও আসেনি-র পর আমরা ১২ বছর পার হয়ে এসেছি। কিন্তু তা শুধুই সময়ের হিসেবে। মূলতঃ ১২ বছরেও আমাদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ১২ পা এগোতে সক্ষম হয়নি। আশা করি আমার বক্তব্যের সঙ্গে সুধীজন একমত হবেন।

অপবাদ

চারুলতা চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় ছবির নাম 'অপবাদ।' এ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন জনাব বাবুল চৌধুরী। ছবির কাজ বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ ছবির সঙ্গীত পরিচালনার আছেন সত্য সাহা। বেবী জামান প্রযোজিত 'অপবাদের' পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন আলোছায়া। ছবিতে যারা অভিনয় করছেন তাঁরা হলেন, সুচন্দা, ববিতা, উজ্জ্বল, ফতেহ লোহানী, শওকত আকবর, হাসমত, রাজু, বেবী জামান ও দারাশিকো প্রমুখ। নায়ক নায়িকা ববিতা উজ্জ্বল। সুচন্দা নায়িকার মা-র চরিত্রে, শওকত আকবর নায়কের বন্ধুর চরিত্রে ফতেহ লোহানী নায়কের বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন। অতিথি শিল্পী হিসেবে আছেন টেলিভিশন খ্যাত নাট্যকার আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

অপবাদ
ববিতা ও আবদুল্লাহ আলমামুন

ডুইট স্টোন্স (আমেরিকা) ৭ ফিট ৬½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে হাইজাম্পে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করছেন। পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড ছিল ৭ ফিট ৬½ ইঞ্চি।

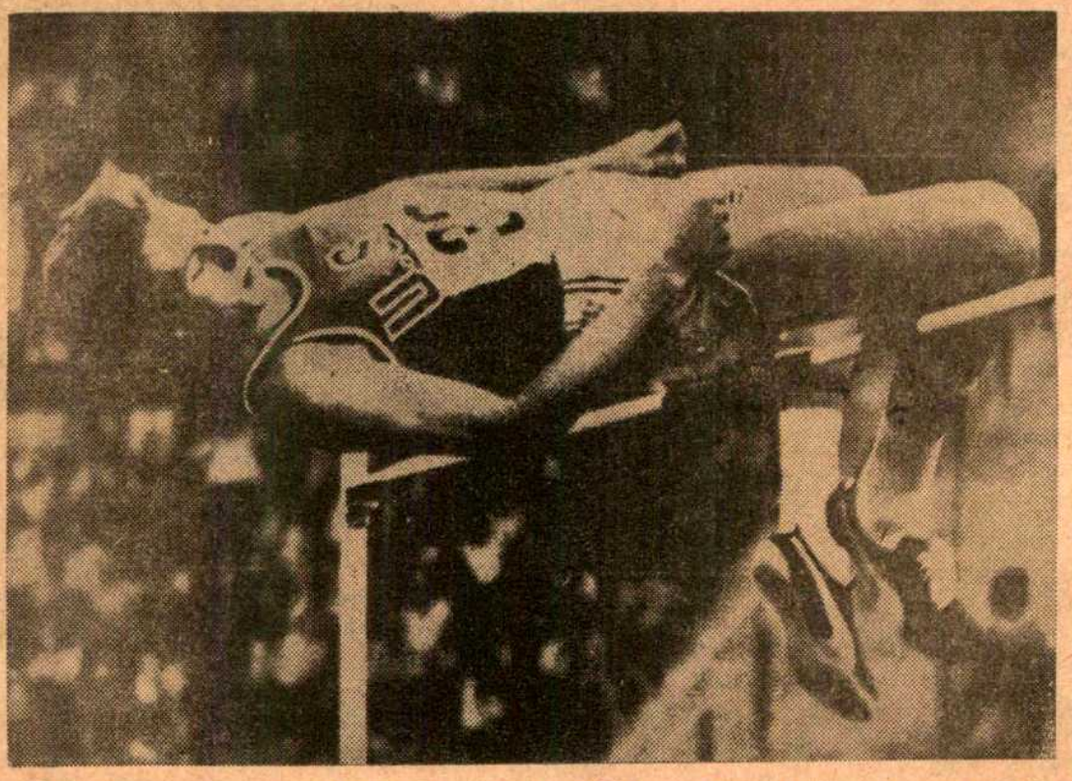

খেলাধুলা

দশক

ইংল্যান্ড ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেষ্ট খেলা

ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড-ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১৯৭৩ সালের টেষ্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৫৮ রাণে জিতে রাহুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের ৩রা মার্চ অকল্যাণ্ডের ১ম টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ৫ উইকেটে জয়লাভের পর তাদের এই দ্বিতীয় জয়। এই দুই জয়ের মাঝখানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে যে ২০টি টেষ্ট ম্যাচ খেলেছিল তার একটিতেও জিততে পারে নি—খেলার ফলাফল দাঁড়ায় হার ৬ এবং ড্র ১৪। একসময়ের বে-সরকারী বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সে কি দৈন্যদশা।

আলোচ্য ওভালের প্রথম টেষ্টে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক রোহন কানহাই টসে জিতে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। দলের ৬৪ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ার পর লয়েড এবং কালিচরণ (৮৩ রান) ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১৯১ মিনিটের ২০৮ রাণ তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ চারটে উইকেট খুইয়ে ২৭৫ রাণ তুলেছিল। লয়েড ১৩২ রাণ করে নট আউট ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ১ম ইনিংস ৪১৫ রাণের মাথায় শেষ হলে বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ১১৭ রাণ সংগ্রহ করেছিল। বয়কট ৫৫ রাণ করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অলরাউণ্ডার কিথ বয়েস ব্যাটিং ও বোলিংয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। দলের ৩০৯ রাণের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে গেলে বয়েস খেলতে নামেন এবং প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে দু ঘণ্টা পনের মিনিটে ৭২ রাণ করেন। তারপর ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের দুটো উইকেট পান।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২৫৭ রাণের মাথায় শেষ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৫৮ রাণে এগিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট খুইয়ে ৯৫ রান তুলেছিল।

এইদিন বয়েস এবং সোবার্সের আরাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডের শেষ ৫টা উইকেট মাত্র দশ রাণের বিনিময়ে পড়ে যায়। ২৪৭ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম এবং ২৫৭ রানের মাথায় ৯ম ও ১০ম উইকেট। বয়েস ৫০ রাণে ৫টা এবং সোবার্স ২৭ রাণে ৩টে উইকেট পান। আগের দিনের নট আউট ব্যাটসম্যান বয়কট মাত্র তিন রাণের জন্যে সেঞ্চুরী হাতছাড়া করেন। তাঁর ২৪৫ মিনিটের খেলায় ১৩টা বাউণ্ডারী এবং ১টা ওভার বাউণ্ডারী ছিল।

চতুর্থদিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ২য় ইনিংস ২৫৫ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৪১৪ তুলতে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রাণ তুলেছিল। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ইংল্যান্ড জয়লাভের লক্ষ্য ৪১৪ রাণ থেকে ২৮৮ রাণ দূরে। এদিকে হাতে জমা মাত্র ৫টা উইকেট এবং একদিনের খেলা।

এই দিন ৫ম উইকেটের জুটিতে কালিচরণ (৮০ রাণ) এবং সোবার্স (৫১ রাণ) ৬০ মিনিটের খেলায় দলের ৬০ রাণ যোগ করেন। কালিচরণ ১ম ইনিংসেও ৮০ রাণ করেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংস ২৫৫ রাণের মাথায় শেষ হলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৫৮ রাণে জিতে যায়। ইংল্যান্ড এই দিন তাদের শেষ পাঁচ উইকেটে পূর্ব দিনের ১২৬ রাণের (৫ উইকেটে) সঙ্গে ১২৯ রাণ যোগ করেছিল। ইংল্যান্ডের নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক হেজ তাঁর খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেষ্ট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী (নট আউট ১০৬ রাণ) করেন। ৭ম উইকেটের জুটিতে অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ (৪০ রাণ) এবং হেজ (১০৬ নট আউট) দু

ঘন্টার খেলায় দলের ৯৩ রাণ যোগ করে রাণের ঢেহারা কিছুটা ভদ্রস্থ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ড-ওয়েষ্ট ইন্ডিজের এই প্রথম টেষ্ট খেলাটি ওয়েষ্ট ইন্ডিজের অল-রাউন্ডার কিথ বয়েসের নামে অভিহিত করা যায়। তিনি ১ম ইনিংসে ৭২ রান করেছিলেন এবং খেলায় ১৪৭ রানে ১১টা উইকেট পেয়েছিলেন (৭০ রাণে ৫ ও ৭৭ রাণে ৬ উইকেট)—ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ফাষ্ট বোলারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বোলিং সাফল্য।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ঃ ৪১৫ রাণ (লয়েড ১৩২, কালিচরণ ৮০ এবং বয়েস ৭২ রান। আরণল্ড ১১৩ রাণে ৫ উইকেট)।

ও ২৫৫ রাণ (কালিচরণ ৮০, সোবার্স ৫১ এবং হেডলে ৪২ রাণ। স্নো ৭২ রাণে ৩, আরণল্ড ৪৯ রানে ৩ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫০ রাণে তিন উইকেট)।

ইংল্যান্ড ঃ ২৫৭ রাণ (বয়কট ৯৭ রাণ। বয়েস ৭০ রাণে ৫ এবং সোবার্স ২৭ রাণে তিন উইকেট)।

ও ২৫৫ রাণ (হেজ নট আউট ১০৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৪০ রাণ বয়েস ৭৭ রানে ৬ এবং গিবস ৬১ রানে তিন উইকেট)।

মেয়েদের বিশ্ব ক্রিকেট কাপ

ইংল্যান্ডে আয়োজিত মেয়েদের প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট কাপটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইংল্যান্ড ৯২ রাণে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম বিশ্ব কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ফাইনাল খেলার আসর বসেছিল বার্মিংহামের এজবাস্টনে। ইংল্যান্ড নির্দিষ্ট ষট ওভারের খেলায় তিন উইকেট খুইয়ে ২৭৯ রাণ সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের এলিন বেকওয়েল সেঞ্চুরী (১১৮ রাণ) করেন এবং প্রথম উইকেটের জুটিতে লীন টমাসের (৪০ রাণ) সহযোগিতায় দলের ১০১ রান এবং দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে দলের অধিনায়ক রাখেল হিয়ার্ন্টের (৬৪ রাণ) সহযোগিতায় দলের ১২৭ রাণ তুলে ইংল্যান্ডের জয়লাভের পথ সুগম করেন। অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া নির্দিষ্ট ষট ওভারের খেলায় নয় উইকেটের বিনিময়ে ১৮৭ রাণ তুলেছিল।

এখানে উল্লেখ্য ১৯৫১ সাল থেকে ইংল্যান্ডের মহিলা ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক টেষ্ট ক্রিকেট পর্যায়ে একটা খেলাতেও হারে নি।

অনেক আলাপ আলোচনা করেও আজ পর্যন্ত পুরুষদের বিশ্ব ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার আসর তৈরী হল না। মেয়েরা এ বিষয়ে কিন্তু পুরুষদের খুবই টেক্কা দিয়েছে। মেয়েদের এই প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা ছিল ইংল্যান্ড উইমেন্স ক্রিকেট এসোসিয়েশন। এই অপেশাদার সংস্থার অধীনে আছে মাত্র ১০০টি বড়দের ক্লাব। ইংল্যান্ডে ৮০টির মত মেয়েদের স্কুল কলেজে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা আছে। এসোসিয়েশনের আকার ছোট হলেও তারা যে সুষ্ঠুভাবে বড় কাজ করতে পারে তা পুরুষদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ করেছে।

মেয়েদের এই প্রথম বিশ্ব ক্রিকেট কাপের খেলায় যোগদান করেছিল এই সাতটি দল—ইংল্যান্ড, ইয়ং ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জামাইকা, ত্রিনিদাদ-টোবাগো এবং ইন্টারন্যাশানাল একাদশ (বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত)। প্রথমে খেলা হয়েছিল লীগ-প্রথায়, তারপর নকআউট পর্যায়ে।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল

তামিলনাড়ুর ভারত রেড্ডির নেতৃত্বে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল ছয় সপ্তাহের ইংল্যান্ড সফরে গেছে। দলের ১৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে পশ্চিম বাংলা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এই দু'জন—রাণী রাসমণি স্কুলের উদয়ভানু ব্যানার্জি এবং তীর্থপতি ইনস্টিটিউসনের সৌরভ বসু। দলের সঙ্গে ম্যানেজার হয়ে সফর করছেন প্রখ্যাত প্রাক্তন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিজয় মঞ্জরেকার।

এ পর্যন্ত (জুলাই ৩১) ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলটি ইংল্যান্ড সফরে যে পাঁচটি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে তার ফলাফল, জয় ১, ড্র ৩ এবং পরাজয় ১ (১ম টেষ্ট খেলায় ৭ উইকেটে)।

বিশ্ব রেকর্ড

পূর্ব জার্মানীর শ্রীমতী রেনেট স্টেচার সম্প্রতি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙা-গড়ার সূত্রে

শ্রীমতী রেনেট স্টেচার

আন্তর্জাতিক আসরে বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গত জুন মাসে শ্রীমতী স্টেচার ১০০ মিটার দূরত্ব ১০-৯ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে তাঁর নিজের গড়া (সেই সঙ্গে আরও চারজনের) ১১-০০ সেকেণ্ডের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দেন। এখানে উল্লেখ্য, মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে তিনিই সর্বপ্রথম ১১

বিজয় অমৃতরাজ

সেকেণ্ডের বেড়া ভাঙেন। গত জুলাই মাসে তিন ১০০ মিটার দৌড় ১০-৮ সেকেণ্ডে শেষ করে স্বপ্রতিষ্ঠিত ১০-৯ সেকেণ্ডের বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন। এর পর ড্রেসডেনের জাতীয় অ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে শ্রীমতী স্টেচার ২০০ মিটার দৌড় ২২-১ সেকেণ্ডে শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন। এখানে উল্লেখ্য, এই ২০০ মিটার দৌড়ে পূর্ব বিশ্ব রেকর্ডের (২২-৪ সেঃ) অংশীদার ছিলেন তিনি এবং তাইওয়ানের চি চেং। বর্তমানে মেয়েদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড একমাত্র তাঁরই—১০০ মিটারে ১০-৮ এবং ২০০ মিটারে ২২-১ সেকেণ্ড।

শ্রীমতী স্টেচার গত ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে মেয়েদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তাছাড়া ২০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড (২২-৪) করে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইলমা রুডলফের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক জয়ের পর ১৯৭২ সালের শ্রীমতী স্টেচার অলিম্পিক গেমসের একই আসরে স্প্রিণ্টের এই 'ডাবল' খেতাব পান। (অর্থাৎ ১০০ ও ২০০ মিটার স্বর্ণপদক জয়) ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসে প্রথম যোগদানের আগেই শ্রীমতী স্টেচার আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি ১০০ মিটার দৌড়ে আমেরিকার নিগ্রো অ্যাথলীট কুমারী উইমা টিয়াস প্রতিষ্ঠিত ১১-০ সেকেণ্ডের

বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি তাঁর কুমারী জীবনের মেসনার পদবী প্রতিযোগিতায় ব্যবহার করেছেন। স্টেচার পদবী তাঁর বিবাহ সূত্রে পাওয়া। তাঁর স্বামী গার্ট স্টেচার মোটর জেনা স্পোর্টস ক্লাবের একজন অ্যাথলীট।

মেয়েদের ডিসকাস নিক্ষেপে রাশিয়ার ফেইনা মেলনিক ৬৭-৫৮ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তিনি ১৯৭২ সালের অলিম্পিক গেমসের ডিসকাসে ৬৬-৬২ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।

বিজয় অমৃতরাজ

ব্রেটন উডসে (নিউ হ্যামসায়ার) আয়োজিত আন্তর্জাতিক ভেলভো টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৭নং বাছাই বিজয় অমৃতরাজ ৭—৫, ২—৬ ও ৭—৫ গেমে ২নং বাছাই আমেরিকার জিমি কোনোর্সকে হারিয়ে ৫,০০০ ডলার নগদ পুরস্কারের সঙ্গে ৬,০০০ ডলার দামের নতুন ভেলভো স্পোর্টস মোটরগাড়ী পেয়ে রাতারাতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্ববিশ্রুত পেশাদার খেলোয়াড় ১নং বাছাই রড লেভারকে (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৭, ৭—৬ ও ৬—৪ গেমে এবং সেমি-ফাইনালে ৩নং বাছাই জন অ্যালেকজান্ডারকে (অস্ট্রেলিয়া) ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। সুতরাং তাঁর এই প্রথম পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটা মোটেই 'বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া' নয়। এখানে আরও উল্লেখ্য, গত মাসে উইম্বলেডন টেনিস আসরে পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউণ্ডে অবাছাই খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ ৭নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার ডোভিডসনের বিপক্ষে জিতেছিলেন।

এম পি গণেশ
অধিনায়ক—ভারতবর্ষ

বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতা

আগামী ২৩ আগস্ট আমস্টারডামে দ্বিতীয় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় হকি দল গড়া হয়েছে। আগে কোন ভারতীয় হকি দলেই নির্বাচিত হননি এমন খেলোয়াড় এই দলে আছেন এই তিনজন—ব্যাক সুরজিৎ সিং (রেলওয়ে), হাফ-ব্যাক ভাস্করণ (তামিলনাড়ু) এবং লেফট আউট চাঁদ সিং (রেলওয়ে)। আমস্টারডামগামী এই ভারতীয় হকি দলে আছেন রেলওয়ের ৬ জন, পাঞ্জাবের ৩ জন, দু'জন করে সার্ভিসেস ও তামিলনাড়ুর এবং একজন করে হরিয়ানা, বোম্বাই ও দিল্লীর। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে ভারতীয় দলটি খেলতে গিয়েছিল, তার ১১ জন খেলোয়াড় বর্তমান দলে নির্বাচিত হয়েছেন। অপরদিকে ১৯৭১ সালে স্পেনিলোনায় প্রথম বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতায় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র এই তিনজন সেণ্টার-হাফ অজিতপাল সিং (অধিনায়ক), গোলকিপার সেড্রিক পেরেরা এবং ফুলব্যাক বলদেব সিং-কে বর্তমান দলে নেওয়া হয়েছে। সার্ভিসেস দলের এম পি গণেশ দলের অধিনায়ক এবং ১৯৭১ সালের প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক সেণ্টার-হাফ অজিতপাল সিং সহ-অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। মিউনিখ অলিম্পিকের ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমিক সিং দলে যা নির্বাচিত হয়েছেন, কোন দায়িত্ব পাননি।

নির্বাচিত ১৬ জন খেলোয়াড়

গোল : সেডরিক পেরেরা (বোম্বাই) এবং চার্লস কর্ণেলিয়াস (পাঞ্জাব)

ব্যাক : সুরজিৎ সিং (রেলওয়ে), বলদেব সিং (হরিয়ানা) এবং মাইকেল কিন্ডু (সার্ভিসেস)

হাফ-ব্যাক : বীরেন্দর সিং (রেলওয়ে) অজিতপাল সিং (পাঞ্জাব), হরমিক সিং (পাঞ্জাব) এবং ভি ভাস্করণ (তামিলনাড়ু)

ফরোয়ার্ড : এম পি গণেশ (সার্ভিসেস)—অধিনায়ক, অশোককুমার (দিল্লী), বি পি গোবিন্দ (তামিলনাড়ু), ভি জে ফিলিপস, অজিত সিং, চাঁদ সিং (রেলওয়ে) এবং হরচরণ সিং (সার্ভিসেস)

ভারতের খেলা

২৪ আগস্ট : বনাম জাপান
২৫ আগস্ট : বনাম পঃ জার্মানী
২৬ আগস্ট : বনাম কেনিয়া
২৮ আগস্ট : বনাম নিউজিল্যাণ্ড
২৯ আগস্ট : বনাম স্পেন

এই দ্বিতীয় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশ সমান দু'ভাগ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর দুই গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দল নিয়ে নক আউট পর্যায়ের খেলা হবে। ১২টি দেশকে লীগ প্রথায় খেলার জন্যে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে :

'এ' গ্রুপ : ভারতবর্ষ, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, কেনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং স্পেন।

'বি' গ্রুপ : পাকিস্তান, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, মালয়েশিয়া এবং বেলজিয়াম।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সাধনা
ভাস্কর লবণ

অম্ল, অজীর্ণ,
অম্বুধা, অগ্নিমান্দ্য,
কোষ্ঠকাঠিন্য
প্রভৃতি পেটের
পীড়ায় অব্যর্থ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
শাখা ভারতের সর্বত্র

SPL-2/73

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3.

AMRITA

Friday 10th August, 1973
Phone : 55-5231 (14 Lines)

17/8/73

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেলে
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (শ্যাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

jaa/KCD

স্বাধীনতা দিবস বিশেষ সংখ্যা

অমৃত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

নিতাই ঘোষ

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

২৩ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা] শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য তিন টাকা

বোরোলীন এই প্রবল গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে তপ্তদিনে
স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার মত আরামপ্রদ।

রুক্ষ, শুষ্ক, জীর্ণ, তাপদগ্ধ ত্বকে এ সময়ে
বিশেষ করে চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

বর্ষাকালে অসুখ বিসুখ এড়াতে হলে হরলিক্‌স খান।

"এর পুষ্টি-গুণ রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে আর স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।"

—একথা বলেন সুচিত্রা দেবীর ডাক্তার।

বর্ষাকালে দেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে একটা না একটা অসুখ লেগেই থাকে। তাই সুচিত্রা দেবী এমনিতেই সাবধানে থাকেন আর এই সময়টাতে বাড়ীর প্রত্যেককে **হরলিক্‌স** খেতে দেন যাতে অসুখ বিসুখ না হয়।

ওঁর ডাক্তারও সেই পরামর্শ দেন—কারণ **হরলিক্‌সে** পুষ্টির সব কটি গুণ আছে—যা রোগ প্রতিরোধের শক্তি গড়ে তোলে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

দুনিয়ার সর্বত্র মায়েদের ভরসা **হরলিক্‌স** আর প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তাররাও এটি খেতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

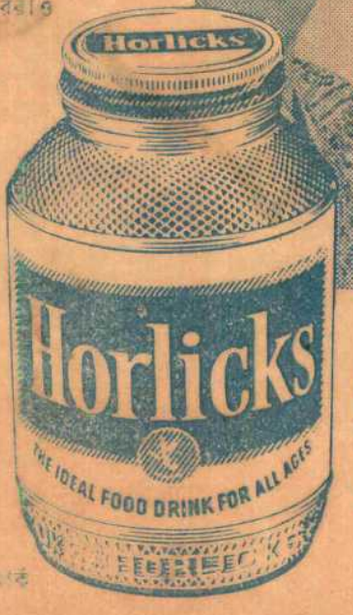

হরলিক্‌স
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্স' রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

HMM—3206A. BEN-1

স্বাধীনতা দিবসে

মিত্র ঘোষের আর একটি স্মরণীয় ঘোষণা

বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে বরনীয় অবদান

বরযাত্রী, রাণুর কাহিনীসমূহ, নীলাঙ্গুরীয়, স্বর্গাদপি গরীয়সী, প্রমুখ অমর-সাহিত্য-রচনার অমর স্রষ্টা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনাবলী

আগামী নভেম্বর মাসে লেখকের জন্মদিন হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে

●

যাঁহারা আমাদের প্রকাশিত বিভূতি রচনাবলী বা তারাশংকর রচনাবলীর গ্রাহক ছিলেন বা আছেন তাঁহারা এই রচনাবলীর গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক হইলে দয়া করিয়া তাঁহাদের পূর্বতন গ্রাহক সংখ্যা জানাইয়া পত্র লিখিলে কোন অগ্রিম জমা ব্যতিরেকেই গ্রাহক করা হইবে। তবে এই নূতন গ্রাহক কার্ড যাঁহারা ডাকে লইবেন তাঁহাদের রেজেস্ট্রী ডাক খরচা টঃ ১·৩০ পঃ পাঠাইতে হইবে, অথবা নির্দেশ পাইলে উহা ঐ খরচের জন্য ভিঃ পিঃ যোগে পাঠানো হইবে।

যাঁহারা আমাদের ঐ দুটি রচনাবলীর গ্রাহক ছিলেন না এমন নূতন গ্রাহকদের মাত্র পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা দিতে হইবে, ঐ টাকা শেষ খণ্ডের মূল্য হইতে শোধ যাইবে।

●

রচনাবলীর যখন যে খণ্ড প্রকাশিত হইবে তাহা গ্রাহক কমিশন বাদে নগদ মূল্যে কিনিতে হইবে। ডাকে কিনিতে হইলে মূল্য ও ডাক খরচা দয়া করিয়া অগ্রিম পাঠাইবেন। গ্রাহকদের রচনাবলী ভিঃ পিঃতে পাঠানো সম্ভব নহে।

○

গ্রাহকগণ শতকরা কুড়ি টাকা অর্থাৎ টাকাপিছু কুড়ি পয়সা কমিশন পাইবেন।

গ্রাহক হওয়ার শেষ তারিখ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩

বহুদিন পর "দৃষ্টিপাত"-স্রষ্টা

যাযাবরের

আর একটি নূতন অবদান

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

।। চার টাকা ।।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কোমল গান্ধার

॥ আট টাকা ॥

বিমল করের

সেতু ৫.

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

প্লাবন ৫.

পেপার-ব্যাক ক্ল্যাসিক্স্

দ্বিতীয় দফার চারখানি নূতন বই

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী ৬.

অন্নদাশংকর রায়ের বনফুলের

পথে প্রবাসে ৩ স্থাবর ৬.

প্রবোধকুমার সান্যালের

মহাপ্রস্থানের পথে ৩·৫০

॥ চারখানি একত্রে ষোল টাকা ॥

জ্যোতির্ময়ী দেবীর

এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত বই

সোনা রূপা নয়

॥ শোভন সংস্করণ—পনেরো টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। ৩৪-৩৪৯২; ৩৪-৮৭৯১

বিদ্যোদয়ের বই

প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য

মোহিতলাল মজুমদারের শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২-০০ কবি শ্রীমধুসূদন ১২-০০ সাহিত্য-বিতান (যন্ত্রস্থ) বাংলার নবযুগ ৮-০০ সাহিত্য-বিচার ৮-৫০ বঙ্কিম-বরণ ৬-৫০ নিখিল সেনের এশিয়ার সাহিত্য ২৮-০০ গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত বিদ্যাসাগর ১১-০০ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০-০০ শ্রীমন্তকুমার জানার রবীন্দ্র মনন ৮-০০ সুপ্রকাশ রায়ের ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯-০০ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ২০-০০ ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮-০০ ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০-০০ শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫-০০ কানাই সামন্তের চিত্রদর্শন ২৫-০০ ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০-০০ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভারত মহিলা ৩-৮০ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার পরিচালনা ৩-৭৫ দীনেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (সংকলন ও সম্পাদনা) বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬-০০ নারায়ণ চৌধুরীর সাহিত্য ও সমাজমানস ৬-০০ কপিল ভট্টাচার্যের বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা ৪-৫০ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য ৫-০০ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখকদের প্রেম ৩-০০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ত্ব বসুর (সংকলন ও সম্পাদনা) অর্ধশতাব্দী ৪-০০ অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩-৫০ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (এম পি)-এর ভারতবর্ষের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড ৭-৫০ গ্রীসের পুরাকাহিনী ৩-৫০ সুশীল জানা সম্পাদিত বাংলা প্রবন্ধ ও ভাষাশিল্প ৬-৫০

আগামী প্রকাশ ॥ সুপ্রকাশ রায়ের পরিভাষা প্রসঙ্গ ॥ ডঃ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ ॥ নগেন্দ্রনাথ সোমের মধু-স্মৃতি

উপন্যাস-গল্প-স্মৃতিচিত্রণ

অমরেন্দ্র ঘোষের উপন্যাস একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী ৫-০০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোগোন্দা-উপন্যাস গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা ৪-৫০ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপ্লবী জীবনের তথ্যবহুল স্মৃতিচিত্রণ বিপ্লবের সন্ধানে ১৩-০০ অনন্ত সিংহের অগ্নি-যুগের স্মৃতিকাহিনী অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম : প্রথম খণ্ড ১১-০০ সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস মধুমিতা ৬-০০ জীবনে প্রথম প্রেম ৪-৫০ মন্বরাক্ষী ৪-০০ গৃহকপোতী ৬-০০ সোমলতা ৪-০০ বেদুইনের উপন্যাস ও স্মৃতিচিত্রণ বেগম নাজমা ফ্রাংকাইন ৩-৫০ যশাইডাঙার ঘাট ৩-০০ পথে প্রান্তরে প্রথম পর্ব ৩-৫০ দ্বিতীয় পর্ব ৪-৫০ মনীশ ঘটকের উপন্যাস কনখল ৭-০০ শ্রীমন্তের উপন্যাস নয় তারা রূপসী ৩-৫০ কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পুরুষিকা ৩-২৫ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে মীর আম্মানের অমর কাহিনী চাহার দরবেশ ৩-৫০ সুধীর করণের দেশপ্রেমিক কাহিনীগুচ্ছ অবনীপুরুষ ৪-০০ সুশীল জানার উপন্যাস বেলাভূমির গান ৬-০০ গুণময় মান্নার উপন্যাস লখীন্দর দিগার ৫-০০ ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস মণ্ডমায়া ৩-৫০ কে এম পানিক্করের উপন্যাস কেরল সিংহল (অনুবাদ) ৬-০০ সৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস দুই স্বপ্ন ৩-৭৫ শিশির সরকারের উপন্যাস গিরিকন্যা ২-৫০ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচিত্রণ চলমান জীবন : প্রথম খণ্ড ৫-০০।

কিশোর সাহিত্য

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে নীল বিদ্রোহের রক্তাক্ত সংগ্রাম কাহিনী নীল ঘূর্ণী ৭-০০ কালের জয়ডঙ্কা বাজে ৪-০০ প্রেমেন্দ্র মিত্রের ময়ূরপঙ্খী ৬-০০ মকরমুখী ৬-০০ সাগরদাড়ী ৭-০০ শঙ্কে যারা গিয়েছিল ৩-০০ ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস ২-২৫ গল্প আর গল্প ২-২৫ মনোরঞ্জন ঘোষের পরিবর্তন ৩-৫০ সমরজিৎ করের ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি ৩-২৫ শ্রীকণ্ঠক ঠাকুরের অথ ভারত কথকতা ৩-০০ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী ৩-৫০ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২-৫০ শিবরাম চক্রবর্তীর চোরের পাল্লায় চক্রবর্তি ৩-০০ আমার ভালুক শিকার ৩-০০ সুশীল জানার গল্পমঞ্জরী ভারত প্রথম খণ্ড ৩-০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৩-০০ স্বপনবুড়োর স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী ২-৮০ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা ২-০০ সুখলতা রাওয়ের আলি ভুলির দেশে ৩-০০ শ্রীজয়ন্তকুমারের চীনের উপকথা (অনুবাদ) ২-০০ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুন্দরবনের চিঠি ১-৬২ শৈল চক্রবর্তীর ছোটদের ছোট বই ১-০০ গোপেন্দ্র বসুর স্বর্ণমুকুট ২-৫০।

আগামী প্রকাশ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাদা ঘোড়ার সওয়ার ॥

Some of our English Books

Dr. S. P. Sengupta's **Studies In Browning** 11.50 **Some Aspects Of Shakespeare's Sonnets** 6.50 **Trends In Shakespearian Criticism** 8.50 Dr. D. N. Sen's **From Raj To Swaraj** 16.00 **The Paradox Of Freedom** 5.00 **Revolution By Consent?** 10.00 Prof. B. Dutta Gupta's **Contemporary Social Problems In India** 15.00 Prof. S. Das Gupta's **Marxian Economics — A Study** 10.00 Prof. N. Bose's **Modern Bengal** 3.00 A. K. Coomarswamy & I. B. Horner's **Gotama The Buddha** 3.00 Dr. S. K. Chatterjee's **Scientific & Technical Terms In Modern Indian Languages** 2.00 Prof. P. N. Dutta's **Glimpses Into The History Of Assam** 3.50 Prof. A. Dutta's **Six Ages In English Literature** 2.50

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ ৭০০০০৯

ফোন : ৩৪-৩১৫৭ অফিস : ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯ গ্রাম : গ্রন্থাগার

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

১৩শ বর্ষ

স্বাধীনতা

১৫ সংখ্যা
মূল্য ৩·০০

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির অধিভুক্ত"

Friday 17th August, 1973 শুক্রবার, ৩২ শ্রাবণ, ১৩৮০ Rs. 3.00

স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৮০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
১১	সম্পাদকীয়	
১২	ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র	—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়
১৭	কেমন আছ (গল্প)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
২০	আগুন ফুল শিশু (গল্প)	—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
২৮	পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা	—শ্রীভবতোষ দত্ত
৩৪	কাঞ্চন রাগিণী (উপন্যাস)	—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭৭	ভূমি সংস্কার কৃষি ও কৃষক সমস্যার কয়েকটি দিক	—শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য

সুশীলকুমার নাগের

দ্রৌপদী প্রেম ৬·০০

বাংলা সাহিত্যে নবাগত লেখকের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। এর নায়ক তিনজন, কিন্তু নায়িকা অদ্বিতীয়া। গতানুগতিক ত্রি-কোণ প্রেমের কাহিনী এ নয়। কারণ নায়কেরা কেউ কারও বিরোধিতা করছে না। সমস্ত সংঘাত আর বিরোধের মূলে নায়িকার অস্থির মানসিকতা।...তীব্র বক্তব্যে এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় বর্তমান প্রেম-পর্বের এক অপূর্ব বিবরণ।

বাসুদেব বসুর স্মরণীয় সৃষ্টি

রাজগৃহে রাজা নেই ৪·০০

কাঁদিছে মৃত্তিকা ৫·০০

ফণিভূষণ আচার্যের

জ্যোৎস্নায় বাঘবন্দী খেলা ৫·০০

নটরাজন-এর সার্থক সৃষ্টি

ওরা সেই পুলিশ ১২·০০

নিশাচর-এর রহস্য-কাহিনী

রক্ত ঝরা সন্ধ্যায় ৫·০০

তিন তাসের খেলা ৫·০০

বনহরিণী ৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

পুনর্নবা ৪-০০
সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

এই জীবন ৫-০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস

রহস্যের ধোঁয়া ৫-০০
পরিচয় গুপ্তের রহস্যোপন্যাস

শপথ নিলাম (২য় সং) ৫-০০
শৈলেশ দে'র বিপ্লব-কাহিনী

বনে বনান্তরে ৭-০০

স্বর্ণ মৃগয়া ৫-০০
শক্তিপদ রাজগুরুর নতুন উপন্যাস

আনন্দ চুমকী ৮-০০
যাদুকর এ সি সরকারের উপন্যাস

স্বপ্নের ধ্বনি ৮-০০
নিখিলচন্দ্র সরকারের উপন্যাস

আসা যাওয়ার পথের ধারে ৫-০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

একটি শিশির বিন্দু ৫-০০

লৌকিকতার পরিবর্তে ৭-০০
বহুরূপীর দুইটি অসাধারণ গ্রন্থ

মধু গন্ধে ভরা ৪-০০
দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

হিমালয়ের তিন সঙ্গী ১২
ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ-কাহিনী

পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন,
কলিকাতা—৯ ।। ফোন ঃ ৩৪-৯৫৯২

রূপচেতনা ও জীবনদৃষ্টির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একালের প্রসিদ্ধ কবি **হরপ্রসাদ মিত্রের**

ঝাউয়ের শব্দ ৩.

দীপক চৌধুরীর সর্বশেষ উপন্যাস

স্বাদ ৬.

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আজকের উপন্যাস

সামনে আড়ালে ৭.

অনিল রায়-এর ১৯৭৩ সালের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী উপন্যাস

নগ্ন প্রহর ৭.

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নতুন উপন্যাস

নীলযমুনার তীরে ৭.

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন রহস্য বই

ধূপের ধোঁয়া ৬.

এবার পূজায় ছোটদের কয়েকখানি মনের মত বই প্রকাশিত হ'ল

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর

এক যে ছিল বাঘ ৩.

নিখিল সেন-এর

ব্ল্যাক বয় ৩.

অবনী সাহার

রেজগীবাবুর রাজগীর ভ্রমণ ৩.

নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মর্জিনা আবদুল্লা ৩.

অমরনাথ রায়-এর

মজার বই ৩.

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর

রঙমশাল ৩.

অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত দেশাত্মবোধক কবিতার বই

দেশপ্রেমের কবিতা

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নতুন উপন্যাস

সাজঘরের নায়িকা ৭.

দিলদার সম্পাদিত

মনীষী

রাজা রামমোহন ৫.

নটরাজনের নতুন উপন্যাস

মেয়ে পুলিশের ডায়েরী ৭.

দেবনারায়ণ গুপ্তের নতুন বই

নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ ৫.

বহুরূপীর নতুন বই

সানাই ৬.

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নতুন উপন্যাস

নীল শূন্য ৬.

নিশাচরের নতুন রহস্য উপন্যাস

জীবন রহস্য ৫.

কুহেলিকা ৫.

রূপশংকর-এর নতুন উপন্যাস

জেনে শুনে বিষ করেছি পান ৭.

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ॥ কলিকাতা-৯

স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৮০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮১-৮৩	মেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে	(গল্প)	—শ্রীসতীকান্ত গুহ
৮৪	সময়ে ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী	(গল্প)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯১	পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন		—শ্রীপ্রবুদ্ধনাথ রায়
১০৩	তাম্রপত্র	(গল্প)	—শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
১০৭	সূর্যাস্তের রঙ	(গল্প)	—শ্রীশ্রীলেখা বসু
১১১	আরক্ত রাত্রি	(রহস্য গল্প)	—শ্রীকৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬	পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
১৩১	আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি সমস্যা		—শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য
১৩৩	একটি হলুদ মাঠ ও অনাদৃত ছিপ্পটম	(গল্প)	—শ্রীবুদ্ধদেব গুহ

মহাকবি সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের উপন্যাস রূপ

অনুবাদক—অশোক গুহ

প্রতি খণ্ডের দাম আড়াই টাকা

ওথেলো
কিং জন
ম্যাকবেথ
হ্যামলেট
সিম্বেলিন
কিং লিয়ার
দি টেম্পেস্ট
কোরিওলেনাস্
রিচার্ড দি থার্ড
রোমিও জুলিয়েট
দি উইন্টার্স টেল
টুয়েলফথ নাইট
জুলিয়াস সীজার
কমেডি অফ এরর্স
টেমিং অফ দি শ্রু
হেনরী দি এইটথ
মেজার ফর মেজার
রিচার্ড দি সেকেণ্ড
টিমন অফ এথেন্স
লাভস লেভার লস্ট
য়্যাজ ইউ লাইক ইট
মার্চেন্ট অফ ভেনিস
টাইটাস এণ্ড্রোনিকাস
মাচ য়্যাডো এবাউট নাথিং
এ মিড সামার নাইটস ড্রিম
অ্যান্টনী অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা
টু জেন্টেলমেন অফ ভেরোনা
মেরী ওয়াইভস অব উইণ্ডসর
পেরিক্লিস দি প্রিন্স অফ টায়ার
অলস্ ওয়েল দ্যাট এণ্ডস্ ওয়েল

বিশ্ব বিশ্বাসের
স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত ৭
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ৫ বিপ্লবী সূর্যসেন (৩য় সং) ৪
জয় বাংলার মুক্তিযুদ্ধ ৫ শহীদ ভগৎ সিং ৭
বিপ্লবী সতীন সেন ৪ বীর বিপ্লবী বাঘা যতীন ৬
বিক্ষুব্ধ বাংলা (২য় মুদ্রণ) ৬

শৈলেশ দে-র
রক্তের অক্ষরে ৯
বিনয়-বাদল-দীনেশ (৪র্থ সং) ৫ ক্ষমা নেই ৪

সনৎ মিত্রের
কমরেড লেনিন ৭ হোচিমিন ৫

মনোরঞ্জন ঘোষের
চট্টগ্রাম বিপ্লব ৬ অগ্নিশিশু ক্ষুদিরাম ৫

সচ্চিদানন্দ সরকারের বাংলার দামাল ছেলে ৫

সুজিতকুমার নাগের মানব দরদী ইন্দিরা ৫

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। ফোন ঃ ৩৪-১৮৩৬

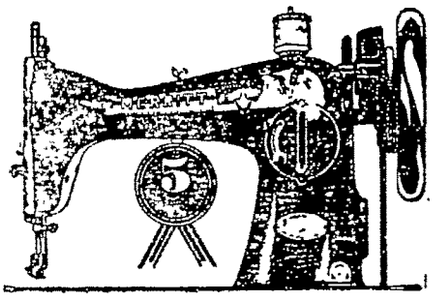

বিশেষ সুযোগ !

৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত

সিঙ্গার

ভ্যারাইটি

মেরিট

সেলাই কল কিনলে পাবেন

বিনা মূল্যে ! ৪০৲ মত দামের ইস্ত্রি

যোগাযোগ করুন ঃ

বসন্ত ট্রেডিং কোং প্রাঃ লিঃ

অনুমোদিত সিঙ্গার ডিলার

৫৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা.

ফোন ঃ ৩৪-৬৭৪০

স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৮০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৪০	নন্তলার ঝুল বারান্দা	(গল্প)	—শ্রীসমীর রক্ষিত
১৪৫	পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি		—শ্রীপ্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়
১৪৯	গাবো হিলের গুম্ভাহাতী	(শিকারকাহিনী)	—শ্রীবিশ্বনাথ বসু
১৬৪	সুখের ঘুঘু	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৭৩	সেকালের মানুষ	(গল্প)	—শ্রীশৈলেন রায়
১৭৬	স্বাদেশিকতা ও সাহিত্য		—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়
১৮০	বাঙলা ছবিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
১৮৪	যাত্রায় জাতীয়তাবাদী নাটক		—শ্রীশিব ভট্টাচার্য
১৮৬	চলচ্চিত্রে দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টা		—শ্রীরঞ্জন মজুমদার

সারস্বতের নতুন বই

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি

সুকোমল চৌধুরী

ভারতে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল পালশাসিত বাংলা দেশ। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনেও বাংলা দেশের গুরুত্ব অপরিসীম। তার ইতিহাস এবং বাঙালী বৌদ্ধদের প্রচলিত ধর্ম সংস্কার ও সংস্কৃতির কথা এই প্রথম বাংলা ভাষায় সচিত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। দাম ঃ দশ টাকা।

সুকান্ত-সমগ্র

নতুন সংযোজিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। দাম ঃ ১৬-০০

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

ছাড়পত্র	৩·৫০	অভিযান	২·৫০
ঘুম নেই	৩·৫০	হরতাল	২·০০
পূর্বাভাস	২·৫০	গীতিগুচ্ছ	১·৫০
মিঠেকড়া	২·৫০	সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত আকাল	৩·০০

সারস্বত লাইব্রেরী ঃ ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬

সৌরীন সেন
দিল্লীতে এসেই
রাজনৈতিক উপন্যাস ॥ ১০-০০

নিমাই ভট্টাচার্য
ওয়ান আপ টু ডাউন
উপন্যাস ॥ ৬-০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য
বরফের রঙ লাল
উপন্যাস ॥ ৮-০০

সারদা বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিব রাজা হরিশ্চন্দর
আদিবাসী সম্পর্কে উপন্যাস ॥ ৪-৫০

হো-চি-মিন
ভিয়েতনাম সম্পর্কে
রাজনৈতিক দলিল ॥ ৪-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
কয়েকটি মুহূর্ত
গল্প-সংগ্রহ ॥ ৫-০০

চিরঞ্জীব সেন
কালোটাকা চোরাপথ
স্মাগলিং-এর কাহিনী ॥ ৬-০০

অমিতাভ গুপ্ত
গতিবেগ-চঞ্চল বাংলাদেশ
মুক্তিসৈনিক শেখ মুজিব
জীবনী ॥ ২৫-০০

নারায়ণ সান্যাল
আমি নেতাজীকে দেখেছি
প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী ॥ ১৬-০০

আমি রাসবিহারীকে দেখেছি
প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী ॥ ১২-৫০

কলিঙ্গের দেব-দেউল
(নরসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত)
মন্দির ভাস্কর্যের ইতিহাস ॥ ১২-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
চতুষ্ক
উপন্যাস ॥ ১৮-০০

বন্যাকন্যা
উপন্যাস ॥ ১৫-০০

আসামী ঈশ্বর
গল্প-সংগ্রহ ॥ ৬-০০

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
জীবনী ॥ ১০-০০

ঃ শঙ্খ প্রকাশন ঃ
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা বিচিত্র রচনা সম্ভারে পুষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়। এ-বছরেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। এই পত্রপত্রিকার ভীড়ে **'চিত্রপ্রভা'** সামিল হবার জন্য এগিয়ে এসেছে। আপনি নিশ্চয়ই পছন্দমতন পত্রিকা কিনে থাকেন। কিন্তু নতুন পত্রিকা যদি উল্লেখযোগ্য রচনাসম্ভার এবং মুদ্রণপারিপাট্য নিয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। **'চিত্রপ্রভা'** সেই দাবী নিয়ে এবারের শারদীয় সংখ্যা উপস্থিত করছে। উপন্যাস ৫টি লিখছেন—

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম লেখক **বিমল মিত্র**

মহিলা সাহিত্যিকদের অগ্রগণ্যা **আশাপূর্ণা দেবী**

গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী**

সমকালীন তরুণদের প্রথমসারির— **অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়**

এবং বয়েসে এখনও নবীন, রসসম্রাট— **শিবরাম চক্রবর্তী**

৫টি উপন্যাসই ভিন্ন স্বাদ, রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে আপনার মন ভরিয়ে দেবে। অন্য পত্রপত্রিকার মতন ছোট উপন্যাস ও সংখ্যায় দশটি নয়।

১০টি গল্প লিখছেন—রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ দাস, আশা দেবী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবী।

২টি উপন্যাসোপম বড় গল্প লিখছেন—একালের দুই শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক—

বিমল কর এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রম্যরচনায়— দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমিতাভ চৌধুরী এবং হিমানীশ গোস্বামী।

এ-ছাড়া—***কলকাতা, বোম্বাই-এর সিনেমা জগতের ফিচার, ছবির মিছিল এবং নেপথ্য সংবাদ।***

আপাতত এই নৈবেদ্য। আরো নতুন বিষয় যোগ হবে। মনোরম প্রচ্ছদ ০ সুমুদ্রণ ০ দাম মাত্র পাঁচ টাকা

চিত্রপ্রভা

এজেন্টরা এখনি যোগাযোগ করুন—
১০৬।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা—৯

স্বাধীনতা সংখ্যা ১৩৮০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
১৯০	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১৯৩	পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সমস্যা		—শ্রীসম্পৎ মুখোপাধ্যায়
১৯৬	নিমন্ত্রণ	(গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
২০১	পশ্চিমবঙ্গের জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা		—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
২০৫	পশ্চিমবঙ্গের রোপণাত্মক ও যন্ত্রচালিত শিল্প		—শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য
২০৭	ইউনিভার্সিয়াড গেমস		—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

এবার
আর ঘনাদার
গল্প নয়।
একেবারে
সত্যিকারের উপন্যাস।
দু' দু'শ পাতায়
যার কথা
আশ মিটিয়ে
পড়তে না পড়তে
ফুরিয়ে যায়
সেই ঘনাদার
প্রাণভরে
পড়বার উপন্যাস
প্রকাশিত হল।
দাম : ৪-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

এই লেখকের অন্য বই
ধূমে পাহাড় ৫-০০ হার্মাদ ৩-০০
ঘনাদার জুড়ি নেই ৪-০০
শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও চিকিৎসা
বই মূল্য ৭৲

মূল বিক্রয়কেন্দ্র আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয়
ও হেড অফিস।
চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় :
১১৪, আশুতোষ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৫ ফোন ৪৭২৩১৮
৫৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন ৫৫৪২২৯
হেড অফিস : ৩৬বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ ফোন ৪৭৫০৮১

পাইকারী ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করুন।

সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

উপন্যাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দত্তা ৫-০০ পথের দাবী ৮-০০
শেষের পরিচয় ৭-০০ বিপ্রদাস ৫-০০

বুদ্ধদেব বসু

রাতভরে বৃষ্টি ৩-০০
আয়নার মধ্যে একা ৫-০০
শোনপাংশু ৪-০০
যেদিন ফুটলো কমল ৯-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

অসমাপিকা ৩-০০ বিশল্যকরণী ৫-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

অনিমিত্তা ৪-৫০

আশাপূর্ণা দেবী দিনান্তের রং ৬-৫০
প্রেমেন্দ্র মিত্র মনুস্বাদশ ৩-৫০
বিমল মিত্র অন্যরূপ ৫-৫০
প্রাণতোষ ঘটক রঙ্গায় রঙ্গায় ৯-০০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এবার প্রিয়ংবদা ৬-০০

দীপক চৌধুরী

পাতালে এক ঋতু ৬-০০ শঙ্খবিষ ৫-৫০
এই গ্রহের ক্রন্দন ৬-০০
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রেমতারা ৫-০০
সুশীল রায় ত্রিনয়না ৫-০০
ধীরাজ ভট্টাচার্য মন নিয়ে খেলা ৫-০০

গল্পসংগ্রহ

পরশুরাম

গড্ডলিকা ৪-০০ কজ্জলী ৪-০০
কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প ২-৫০
হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প ৪-০০
নীলতারা ইত্যাদি গল্প ৩-০০
আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প ৪-০০
চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প ৪-০০
অন্নদাশঙ্কর রায় কথা ১৫-০০
সুবোধ ঘোষ ফসিল ৩-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রাঙাঘুলো ৩-০০

বুদ্ধদেব বসু

ভালো আমার ভেলা ১২-০০

গল্প-সংগ্রহ

দক্ষিণারঞ্জন বসু জীবনযৌবন ৩-০০

তুষারকান্তি ঘোষ

বিচিত্র কাহিনী ৪-০০
আরো বিচিত্র কাহিনী ৪-০০

ভবানী মুখোপাধ্যায়

জার্মানীর ছোট গল্প ৬-০০
চন্দ্রমল্লিকা ২-৫০
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প ৫-০০
সুধীরচন্দ্র সরকার কথাগুচ্ছ ১২-৫০
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রালী ৬-০০
ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নিশিদিন ৪-০০

কাব্যগ্রন্থ

পরশুরাম পরশুরামের কবিতা ২-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আজন্ম সুরভি ৩-০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র অথবা কিন্নর ৩-৫০
মণীশ ঘটক বিদূষী বাক্ ৩-০০

বিষ্ণু দে

একুশ বাইশ ৮-০০ আলেখ্য ২-৫০

হুমায়ুন কবির

স্বপন সাধ ২-০০ সাথী ১-৫০

সদ্য প্রকাশিত

সুধীরচন্দ্র সরকার
গৌরাঙ্গিক অভিযান ১৬-০০

কানন দেবী
সবারে আমি নমি ৮-০০

উৎপল দত্ত
শেক্সপীয়রের সমাজচেতনা ১৮-০০

বুদ্ধদেব বসু
আমার ছেলেবেলা ৩-০০

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়
ইতিহাস অভিধান ১৫-০০

ভ্রমণ কাহিনী

প্রবোধকুমার সান্যাল
দেবতাত্মা হিমালয় (দুই খণ্ড একত্রে) ২০-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়

যেরা ৫-৫০ জাপানে ৮-০০
পথে প্রবাসে ৪-০০

বুদ্ধদেব বসু

দেশান্তর ১০-০০ জাপানী জার্নাল ৩-৫০

বন্দনা গুপ্ত

স্বপ্নমাদার দেশে ৩-০০

সুরেশচন্দ্র সাহা

মালয় থেকে মালয়েশিয়া ৪-০০

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

হামেশাবাহুর ৭-০০

জীবনী

অন্নদাশঙ্কর রায় গান্ধী ৬-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১ম) ৭-০০
(২য়) ৫-০০
(৩য়) ৭-৫০

পত্রসাহিত্য

সুভাষচন্দ্র বসু পত্রাবলী ১২-০০

রম্যরচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোলযুগ ৭-৫০

বুদ্ধদেব বসু

স্বাগত বিদায় ৪-০০
রিল্‌কের কবিতা ৫-৫০
যে আঁধার আলোর অধিক ৩-০০
দময়ন্তী দ্রৌপদীর শাড়ী ৪-০০
হ্যেল্ডারলিনের কবিতা ৩-৫০

হরপ্রসাদ মিত্র

সাঁকো থেকে দেখা ৩-০০

চিত্রকলা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্পের কাহিনী ২৫-০০

মহাকাব্য

রাজশেখর বসু

বাল্মিকী রামায়ণ ১৪-০০
মহাভারত ১৭-০০

জ্যোতিষ

দাশরথি সোম

মানবজীবনের দিকযন্ত্র জ্যোতিষ ৮-০০

বিবিধ

সুলেখা সরকার রান্নার বই ৬-০০

বিশু মুখোপাধ্যায়

বিখ্যাত বিচার কাহিনী ৩-৫০

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পাখীর পৃথিবী ৫-০০

সমালোচনা

বিশু মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র সাগর সঙ্গমে ১০-০০

এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

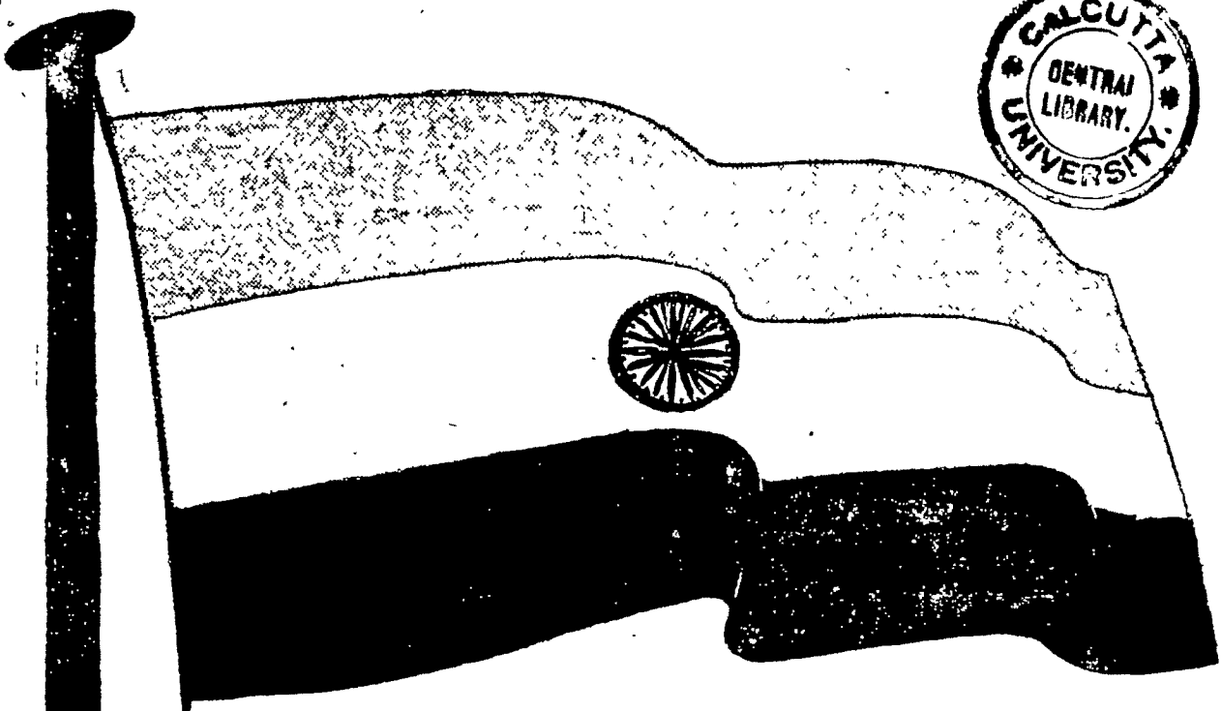

স্মরণীয় দিন, বরণীয় দিন

স্বাধীনতার দিনটি আমাদের কাছে স্মরণীয়। পনেরোই আগস্ট আমাদের কাছে চিরবরণীয়। এই পুণ্য দিনে আমরা দেশবাসীর উদ্দেশে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। যাঁদের আত্মত্যাগে ভারতবর্ষের বন্ধনশৃংখল মোচন সম্ভব হয়েছিল সেই মহান বিপ্লবীদের উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল এশিয়া ও আফ্রিকায়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আন্দোলন প্রেরণা জাগিয়েছিল এই মহাদেশের উপনিবেশসমূহে। জাগরণের ঢেউ স্পর্শ করেছিল তথাকথিত অন্ধকার আফ্রিকায়। সুতরাং ভারতবর্ষ শুধু তার নিজের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করেনি। তার স্বাধীনতার আন্দোলন ছিল পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহের কাছে এক নতুন প্রেরণা। ঔপনিবেশিক অন্ধকারে তা ছিল এক উজ্জ্বল মশাল।

স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব সদ্য উদ্‌যাপিত হয়েছে দেশের সর্বত্র। এই আড়াই দশকে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার অধিকারকে গণতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে প্রয়োগ করেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একটা জাতির শেষ কথা নয়। জনগণের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক সমৃদ্ধি ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন। ভারতবর্ষ প্রবল বাধাবিপত্তির মুখেও দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধান রক্ষা করেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের গৌরব সে অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি মানুষকে জাতিধর্মনির্বিশেষে দেওয়া হয়েছে ভোটাধিকার। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কারণ, আমরা দেখেছি, ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ অগণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের কবলিত হয়েছে। ভারতবর্ষ তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু দারিদ্র্য ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকেই সংগ্রাম শুরু করা হয়েছিল। জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পরিকল্পিত অর্থনীতি গৃহীত হয় দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য। জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্যও সযত্ন প্রচেষ্টা করা হয়। আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি, সাহিত্য আকাদেমি গঠন এবং ললিতকলার প্রতি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশ কর্মসূচীর এক একটি গণনীয় অধ্যায়। অনুন্নত, অনগ্রসর জাতিসমূহের বিকাশ ও তাদের উন্নয়নের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সংবিধানেরই নির্দেশে। বহুজাতি, বহুভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় জাতীয়তার ঐক্যসাধনই এই কর্মনীতির লক্ষ্য। এই মহৎ পরীক্ষায় ভারতবর্ষ কতখানি সাফল্য লাভ করবে তা নির্ভর করবে জনগণের সচেতন উপলব্ধি ও সহযোগিতার ওপর। স্বাধীনতার জন্য যেমন মূল্য দিতে হয়, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও তেমনি জাতিকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। পঞ্চম পরিকল্পনার মুখে এসে আমরা এক সংকটের আভাস পাচ্ছি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা আশানুরূপ সদ্গতি না রাখতে পারার জন্যই এই সংকট। আশা করব, জাতির শ্রম ও নিষ্ঠায় এই সংকট আমরা উত্তীর্ণ হতে পারব। সে সংকট স্থায়ী হবে না।

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র

বিশু মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আজও প্রায় প্রতি বছর হয়ে থাকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। সম্প্রতি কলকাতার লবণ হ্রদ অঞ্চলে কিধাননগরে এই কংগ্রেসের ৭৪তম অধিবেশন সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়ে গেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এই কংগ্রেসই এখনও ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে ভারতশাসন করে আসছে।

ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে এই কংগ্রেসের অবদান অনির্বচনীয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। কিন্তু তার ৬২ বছর পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালে। সেই থেকে আসমুদ্রহিমাচল বিশাল ভারতভূমির কোটি কোটি নিরস্ত্র জনগণের দুর্বার ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনা করে এসেছে এই কংগ্রেসই, এবং এর মধ্যে সেই মহান্ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে আজও যাঁরা ত্যাগ ও শ্রদ্ধায় জাতির পূত-পবিত্র এই ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় নিশানকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছেন, তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন সাধনার পরম্পরা আছে, যার ফলে কংগ্রেসের নামে আজও দেশের মানুষ সর্বপ্রকার ক্লেশ ও পরিতাপ বিস্মৃত হয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় কংগ্রেসের দিকে—জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তেজনা বোধ করে।

এই কংগ্রেসের সূচনায়, অর্থাৎ প্রথম অধিবেশনে যে বাঙালী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন, আজ স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসবের দিনে, নতুন করে আবার তাঁকে স্মরণ করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করি। এই পুণ্যকীর্তি মহামতি পুরুষ হলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ওরফে ডবলু সি বোনার্জি। তাঁর নামে কলকাতার উত্তরাঞ্চলে একটি রাস্তাও আছে।

কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে। বোম্বাইয়ে শুধু এই একবারই নয়, ১৮৯২ সালেও আর একবার উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদে। বাঙালী হিসাবে কেবলমাত্র উমেশচন্দ্রই নয়, আরও বহুজন, যথা : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলাদেশের যে পরিমাণ ব্যক্তি কংগ্রেসের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তা আর অন্য কোন প্রদেশের ক্ষেত্রে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উমেশচন্দ্রের জীবন-কথা যেমন বিচিত্র তেমনি ঘটনাবহুল। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে খিদিরপুরের সোনাই গ্রামে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর।

উমেশচন্দ্রের ডাকনাম ছিল মতি। কিন্তু বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে তাঁর মোটেই মতিগতি ছিল না, পরন্তু অত্যন্ত চঞ্চল ও দুরন্ত প্রকৃতির উমেশচন্দ্র একদা পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে বিবাদ করে বাড়ি থেকে সোজা রাণীগঞ্জে পালিয়ে যান। তখন সবেমাত্র হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল হয়েছে এবং এই রেলে চড়া দারুণ উত্তেজনা ও আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে ছেলেদের মধ্যে। উমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পালিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র উত্তেজনা বা আনন্দের ছিল না, তিনি ঐ অল্প বয়সেই রাণীগঞ্জে গিয়ে কয়লার খনিতে একটি চাকরিও যোগাড় করে নেন। তখন চাকরির বাজার তো আর এখনকার মত আকাশকুসুম চিন্তা ছিল না, তাছাড়া বাঙালী ছেলেদের তখন ভারতের সর্বত্রই সম্মান ছিল এখনকার তুলনায় অনেক বেশী।

এই চাকরি অবশ্য উমেশচন্দ্রকে কয়েক দিনও করতে হয়নি, কারণ তাঁর পিতা গিরীশচন্দ্র খবরাখবর নিয়ে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠিয়ে তাঁকে রাণীগঞ্জ থেকে নিয়ে আসেন। উচ্চশিক্ষায় ছেলের মনোযোগের অভাব দেখে গিরীশচন্দ্র উমেশকে আর্টিকেল ক্লার্ক করার জন্য তখনকার সময় গিলেণ্ডার্স নামে একটি নামকরা ইংরেজ এ্যাটর্ণির অফিসে ঢুকিয়ে দেন।

গিরীশচন্দ্র নিজেও এ্যাটর্ণি ছিলেন। বিশেষ করে প্রথম দিকে যেসব বাঙালী এ্যাটর্ণি হন, গিরীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি এই কাজে। গিরীশচন্দ্র বিবাহ করেন ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের প্রপৌত্রের পৌত্রী সরস্বতী দেবীকে। উমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন, তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের এ্যাটর্ণি মেসার্স ফলিয়ার বার্ড এণ্ড কোম্পানীর অফিসে মুৎসুদ্দী। তখনকার সময়ে ইংরেজ এ্যাটর্ণি দেশীয় মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যম হিসাবে আইনে জ্ঞানসম্পন্ন এই ধরনের বাঙালী মুৎসুদ্দীদের নিয়োগ করতেন। পীতাম্বর যেমন উপার্জনও করেছিলেন, তেমনি বদান্যতাতেও তাঁর খ্যাতি ছিল, এবং সেই কারণেই জনসাধারণের মধ্যে তিনি 'রাজা পীতাম্বর' নামে পরিচিত হন।

রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রসজ্ঞ

রামমোহন রায় প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সমসাময়িক ছিলেন যেমন রাজা পীতাম্বর, তেমনি এঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। উমেশচন্দ্রের এই পিতামহ তিনটি বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন উমেশ-চন্দ্রের পিতা গিরীশচন্দ্র এবং উমেশচন্দ্র গিরীশচন্দ্রের মধ্যম পুত্র।

অল্পবয়সেই উমেশচন্দ্র এ্যাটর্ণি অফিসে শিক্ষানবিশ হিসাবে প্রবেশ করলেও, এই সময় কাজে তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না এবং তিনি বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় প্রায়ই অফিসে না গিয়ে এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়ে বেড়াতেন। এ্যাটর্ণি অফিসের গিলেন্ডার সাহেব স্বয়ং তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে একদিন তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁর পিতার কাছে সমস্ত ব্যাপারটি জানাবেন বলে সতর্ক করে দেন। অতঃপর উমেশচন্দ্রের চরিত্রে দেখা দেয় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এবং জীবনে তিনি মানুষ হয়ে উঠবেন বলে সংকল্প করেন। তাঁর এই চারিত্রিক দৃঢ়তা শিক্ষার প্রতি তাঁকে অনুরাগী করে তোলে এবং তিনি বিলেত গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন বলে মনস্থ করেন। সময়মত সে-সুযোগও তাঁর এসে যায়। মানুষ কোন বিষয়ে একনিষ্ঠ হয়ে পরিশ্রম করলে ঈশ্বরও যে তাঁর সহায় হন, উমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষীভূত হয় অল্প বয়সেই। বিলেতে তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য গমন করার সুযোগ আসে।

সেটা ১৮৬৪ সাল। সেই সময় স্যার জামসেদজী নামে জনৈক পার্শী ধনাঢ্য ব্যক্তি, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ থেকে এক-একজন উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিয়ে বিলেত পাঠাবার জন্য ভারত সরকারের হাতে এক লক্ষ টাকা তুলে দেন। উপযুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের সরকার যে কমিটি গঠন করেন সেই কমিটি এ-দেশের কয়েকজন প্রার্থীর মধ্যে উমেশচন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত করেন।

সেকালে অনেক গোঁড়া হিন্দু পরিবারে সমুদ্রপার হয়ে বিদেশযাত্রা যেমন সমাজে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হত, তেমনি অধিক বয়সে বিবাহও ছিল সমাজবিরুদ্ধ কাজ। সম্ভবতঃ সেই কারণেই উমেশচন্দ্রের বয়স যখন সবেমাত্র পনের বছর, তখনই গিরীশচন্দ্র তাঁর পুত্রের বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন বহু-বাজারের বিখ্যাত ধনী নীলমণি মতি-লালের দশ বছরের মেয়ে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে।

কিন্তু কৈশোরে যে পিতৃআজ্ঞা পালন করে তিনি সমাজব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন, যৌবনে তাকে অবহেলা করেই একদিন

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের — সমরেশ বসু

মার্কসবাদ ও মুক্তমতি — জগদ্দল

দাম : ৭-৫০ — ২য় মুদ্রণ ১৫.০০

সুরেশ চক্রবর্তী—সম্পাদিত — নারায়ণ চন্দ-র

অতুলপ্রসাদ সেন — পাখির পরিচয়

সচিত্র সং ১০.০০ — দাম : ৮.৫০

শংকর-এর

চৌরঙ্গী — এপার বাংলা ওপার বাংলা

২৪শ মুদ্রণ ১২.৫০ — ২৯শ মুদ্রণ ১০.০০

মানচিত্র — পাত্রপাত্রী — রূপতাপস — এক দুই তিন

২১শ মুদ্রণ ৬.০০ — ১৩শ মুদ্রণ ৩.০০ — ৯ম মুদ্রণ ৪.৫০ — ১৫শ মুদ্রণ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর

বিদূষক — আলোকপর্ণা — অসবর্ণ

দাম : ৪.৫০ — দাম : ১০.০০ — দাম : ৫.০০

বনফুলের — জরাসন্ধ-র

অধিকলাল — স্বীকৃতি — মসিরেখা — আশ্রয়

২য় মুদ্রণ ৪.৫০ — দাম : ৫.০০ — ৫ম মুদ্রণ ৯.০০ — ৮ম মুদ্রণ ৩.৫০

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত — ডঃ নবগোপাল দাসের

কবিসত্যেন্দ্রনাথেরগ্রন্থাবলী — দুইনারী

১ম খণ্ড ২০.০০ — ২য় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে — দাম : ৬.০০

নিমাই ভট্টাচার্যের — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উইং কমান্ডার প্রণয় — পাশা — ব্যর্থ নায়িকা

২য় মুদ্রণ ৬.০০ — ২য় মুদ্রণ ৬.০০ — ২য় মুদ্রণ ৪.৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের — বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের — চাণক্য সেনের

কুয়াশা — তাঞ্জাম — তিন তরঙ্গ

দাম : ৩.০০ — দাম : ৪.০০ — ৩য় মুদ্রণ ৭.০০

নমিতা চক্রবর্তীর — ননীমাধব চৌধুরীর — ওঙ্কার গুপ্তের

অহল্যারাত্রি — আবির্ভাব — ব্যাপারবহুতর

দাম : ৯.০০ — দাম : ১০.০০ — দাম : ৫.০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

পৌষফাগুনের পালা — গরীয়সী — গৌরী

৫ম মুদ্রণ ১৮.০০ — ৫ম মুদ্রণ ৬.০০

বিমল মিত্রের — সতীনাথ ভাদুড়ীর

এরনাম সংসার — গল্পসম্ভার — জলভ্রমি

৫ম মুদ্রণ ১০.০০ — ৫ম মুদ্রণ ১৬.০০ — ২য় মুদ্রণ ৩.৫০

আমাকে বাঁচতে দাও আমাকে জাগতে দাও

৪.০০ ॥ মণীন্দ্র রায়

মন্থ বসুর — দেবলদেব বর্মার

আমার জীবন — অথৈ জলে মানিক

১৫.০০ ॥ — দাম : ৬.০০

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

তিনি পিতার অজ্ঞাতসারেই বিলেতযাত্রা করেন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ আছে ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখার্জির জীবনী 'কল্যাণ-প্রদীপ' নামক গ্রন্থে। এই প্রখ্যাত ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার হলেন, উমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিদুষী মোক্ষদা দেবীর দৌহিত্র। দৌহিত্রের এই জীবনীর মধ্যে মোক্ষদা দেবী একস্থানে লিখেছেন, '১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কার্তিকের ঝড়ের পরেই উমেশচন্দ্র ব্যারিস্টার হবার জন্য লুকাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৬৮ খৃঃ উমেশচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করিতে আরম্ভ করেন। সেই বৎসর তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র পরলোকগমন করেন।'

তখনকার সময় বাঙালী ব্যারিস্টারের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তবু যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁদের সকলের তুলনায় উমেশচন্দ্র জুনিয়ার হলেও, স্বল্প কিছু-দিনের মধ্যেই তাঁর ভীক্ষ্ণবুদ্ধি, অনন্য-সাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং ইংরেজী ভাষার উপর দখল সকলকেই যেন টেক্কা দিয়েছিল। বিশেষ করে তাঁর কাশ্মিতা ও আইন সম্বন্ধে জ্ঞান সে যুগে ব্যবহারজীবীদের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল। এই আইন ব্যবসায় তিনি সেকালে কল্পনাতীতভাবে মাসিক বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করে গিয়েছেন। এবং সেই জন্যই গবর্নমেণ্ট তাঁকে দু'তিনবার হাইকোর্টের বিচারপতি করার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। সম্ভবত ১৮৮২ সালে উমেশচন্দ্র ভারত সরকারের স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল নিযুক্ত হন এবং সে সময় এই পদ কম গৌরবের বিষয় ছিল না,—কারণ তাঁর পূর্বে এই পদে কখনই কোন ভারতীয় নিযুক্ত হননি।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে উমেশ-চন্দ্রের পদার্পণ করার ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তেমনি ঘটনাবহুল। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের চেষ্টায় যে সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ ক্রমা-ন্বয়েই বর্ধিত হচ্ছিল এবং সংঘবদ্ধভাবে কোন একটি সমিতির মাধ্যমে তা রূপ পরিগ্রহ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিল, সেই সময় কলকাতায় ইলবার্ট বিল নিয়ে ঘটে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এই বিল নিয়ে আন্দোলন কালে ব্রানসন নামক এক খ্যাতনামা ইংরেজ ব্যারিস্টার ভারতীয়দের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ করলে, কলকাতার এ্যাটর্নিরা সমবেতভাবে তাঁকে বয়কট করেন। এর ফলে উমেশচন্দ্রের প্রচুর সুবিধা হয় এবং ব্রানসনের সমস্ত কেস উমেশ-চন্দ্রের উপর এসে বর্তায় বটে, কিন্তু সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁর মধ্যে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

তখনকার সময় প্রধানত সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে যোগ দেবার কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না, সেই সময় আকস্মিক-ভাবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং স্বনাম-ধন্য বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র নানাবিধ কারণে এই বিষয় নেতৃত্ব করার সুযোগ লাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে ইংরেজ শাসকরা তাদের শাসন ও শোষণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দেশের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে এমন একটা সংকটের মধ্যে এনে ফেলে যে, চতুর্দিকেই ভয়াবহ অবস্থার চিত্র ফুটে উঠতে থাকে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, হাহাকারে দেশের চাষী মজুর শ্রেণী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, বিভিন্ন স্থানে কৃষী-বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা প্রকাশ পেতে থাকে।

তখনকার এই অবস্থা বিচক্ষণ ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বিশেষ চিন্তিত করে তোলে। এই সম্ভাব্য বিপদকে এড়িয়ে যাবার উপায় হিসাবে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ হিউম নামক একজন দূরদর্শী সিভিলিয়ান একথা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে এ বিষয় যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারলে অচিরেই অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ইংরেজদের জীবন এখানে দুর্বিসহ করে তুলবে।

এই চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ হিউম তৎকালীন গভর্নর লর্ড ডাফরিনের কাছে এই বলে এক প্রস্তাব পাঠালেন যে, প্রতি বৎসর দেশের রাজনৈতিক নেতারা যাতে একত্রে মিলিত হতে পারেন এবং সেই মিলন ক্ষেত্রে তাঁরা যাতে দেশের ও সমাজের সমস্যাসমূহ আলোচনা করতে পারেন তার একটা ব্যবস্থার জন্য। লর্ড ডাফরিন অত্যন্ত চালাক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিঃ হিউমের প্রস্তাবের তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং একথা বুঝতে তাঁর মোটেই অসুবিধা হয় না যে, ভারতবাসী-দের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ নানাদিক থেকে ধূমায়িত হয়ে উঠছে, তাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চস্তরের নেতৃত্বে একটা রাজ-নৈতিক সংস্থার মাধ্যমে যদি সুষ্ঠুভাবে

সম্প্রতি প্রকাশিত আমাদের কয়েকখানি অনবদ্য বই

জন্মান্তরবাদের উপর অবিশ্বাস্য বই
কে ডাকে আমায়
তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ॥ ৭·০০

মিষ্টি প্রেমের কাহিনী
মোহনা
বিমল কর ॥ ৪·৫০

পর্বত অভিযানের উপর লেখা শ্রেষ্ঠ বই
দেওবনের দিগন্তে
সুনীল চৌধুরী ॥ ৮·০০

এক বিন্দু সুখ
প্রফুল্ল রায় ॥ ৬·৫০

তখন হেমন্তকাল
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

মার্কিনী ষড়যন্ত্র
চিরঞ্জীব সেন ॥ ৬·০০

হৃদয় জ্বালা
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ৫·০০

জানু ভানু কৃশানু
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১২·৫০

সঙ্গী তিনজন
অজ্ঞাতশত্রু ॥ ৯·০০

রক্তাক্ত খাইবার
কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৯·০০

আলাপ থেকে প্রলাপ
(আসন্ন প্রকাশ) বাসুদেব বসু

নির্বান্ধব
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

সাহিত্য প্রকাশ ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

পরিচালিত করা যায়, তাহলে হয়ত একটা সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যেতে পারে। অনুরূপ চিন্তার সামান্য কিছুকাল পরে লর্ড ডাফরিন মিঃ হিউমকে তাঁর যে পরিকল্পনা জানান, তার মধ্যে থেকে ফুটে ওঠে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলাভের সম্ভাবনা। অবশ্য মিঃ হিউম ভারতীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে লর্ড ডাফরিনের এই পরিকল্পনা যে গোপন রেখেছিলেন সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে যে গণ-প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সংগ্রাম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ স্বাধীনতা আনয়নে সক্ষম হয়েছিল, সেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন ইংরেজ শাসক লর্ড ডাফরিন। একথা উমেশচন্দ্রও ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স' নামক ইংরেজী গ্রন্থে প্রকাশ করে গিয়েছেন।

অতপর ভারতীয় রাজনীতিকদের সহযোগিতায় লর্ড ডাফরিনের এই পরিকল্পনা মিঃ হিউম রূপ দেন ১৮৮৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে। সেখানেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ভারতের সর্বশ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য ও শিক্ষিত বাঙালী ব্যারিস্টার ডব্লু, সি, বোনার্জি ওরফে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্বাচিত হন। এর পর উমেশচন্দ্র কংগ্রেসের স্থায়ী সম্পাদকরূপে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং ১৮৯২ সালে পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের প্রতি সেসময়কার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও শিক্ষিত বিশ্বজন সমাজ যাতে আকৃষ্ট হন সেজন্য উমেশচন্দ্র কেবলমাত্র তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেই নয়, প্রভূত আর্থিক সহযোগিতার দ্বারাও এই প্রতিষ্ঠানকে উজ্জীবিত করে তোলেন।

১৮৮৮ সালে স্বাস্থ্যের জন্য উমেশচন্দ্রকে একবার ইংলণ্ড যেতে হয় এবং সে সময় তিনি লণ্ডনে একটি বাড়ি ক্রয় করেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির সহায়তায় একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। এই দলটি বিলেতের নানাস্থানে সভা-সমিতির দ্বারা ইংরেজদের কাছে ভারতের অভাব-অভিযোগের কথা প্রায়শঃই প্রচার করতেন। সেই সময় মিঃ হিউমের সম্পাদনায় বিলেত থেকে 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার জন্য উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষ থেকেই প্রচুর টাকা ব্যয় করতেন। কথিত আছে যে, ১৮৮৬ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উমেশচন্দ্র প্রতি বৎসর এই কাগজের জন্য যে দশ-বার হাজার টাকা লোকসান যেত তা অকাতরে পূরণ করে গেছেন।

১৯০২ সাল উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডের প্রিভি কাউন্সিলে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। একজন ভারতীয় তথা কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বাঙালীর পক্ষে এ কাজ কম দুঃসাহসিকতার ছিল না, কিন্তু তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারই কিছুকাল পরে এক দুরারোগ্য 'ব্রাইটস' রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্রয়ডনে নিজের বাড়িতেই ১৯০৬ সালের ২১শে জুলাই সেই মহান পুরুষ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্রের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। তাঁরই নির্দেশ অনুসারে তাঁর দেহ ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা হয় এবং ভস্মাবশেষ প্রোথিত করা হয় গোল্ডন গ্রীনে।

উক্ত ভস্মাবশেষের উপর স্থাপিত প্রস্তরফলকে লেখা আছে :-

"Here lies Woomesh Chandra Bonnerjee — a Hindu Brahmin who on his way to his native country fell a victim to Bright's disease".

দীর্ঘকাল সাহেবীয়ানার মধ্যে কাটালেও উমেশচন্দ্র মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশপ্রাণ ভারতীয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহেও তাঁর প্রভূত নিষ্ঠা ও আগ্রহ ছিল। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি এমন দানধ্যান ও অর্থব্যয় করেছিলেন যে, সেকালের লোকের মুখে মুখে তা আলোচিত হত। তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান সংকীর্ণ জেনেও, তাঁর স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী এদেশে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার সময় উমেশচন্দ্র হেমাঙ্গিনী দেবীকে একটি মর্মস্পর্শী পত্র লেখেন, এবং সেই পত্র থেকেই তাঁর জাতীয়তা-বোধের নিদর্শন ও ভারতীয় নীতি ও আদর্শের প্রতি তাঁর অনবদ্য নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন, 'তোমার ধর্মবিশ্বাসে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। যদি তুমি খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হয়ে থাক, তুমি উক্ত ধর্ম অবলম্বন করতে পার, কিন্তু আমার উক্ত ধর্মে বিশ্বাস নেই। আমি আমার পৈতৃক ধর্ম ছাড়ব না। আমি জানি হিন্দু সমাজে আমার স্থান অতি সংকীর্ণ, তথাপি আমি আমার পিতা-পিতামহের ধর্ম—যাতে তাঁরা বিশ্বাস করে প্রাণবায়ু ত্যাগ করেছেন তা আমি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।'

কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণের গর্বও উমেশচন্দ্রের বেশ ভালই ছিল। কংগ্রেসের প্রতিনিধি তালিকায় তিনি নিজেকে 'ব্রাহ্মণ ব্যবহারজীবী' বলে পরিচিতি লিখতেন। উমেশচন্দ্র অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন বলে বিদ্যাসাগর মশায় তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ব্যারিস্টারি করার সময় উমেশচন্দ্র যদিও সাহেবপাড়ায় পার্ক স্ট্রীটের এক বাড়িতে থাকতেন, কিন্তু তাহলেও, প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে তিনি পায়ে হেঁটে বহুরাম দে স্ট্রীটের বাড়িতে এসে মাকে প্রণাম করে যেতেন।

উমেশচন্দ্র তাঁর মাকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করতেন, অনুরূপ শ্রদ্ধা ছিল তাঁর মাতৃভাষার উপর। ১৮৯৩ সালে একবার বিচারপতি উইলসনের এজলাসে একটি বাঙলা দলিলের ব্যাখ্যা নিয়ে সে সময়কার অস্থায়ী এড-ভোকেট জেনারেল জে টি উডরফের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। উডরফ মিঃ বোনার্জী বাঙলা ভাষা ভুলে গেছেন বলে অভিযোগ করেন। তার উত্তরে উমেশচন্দ্র বলেন, 'মাতৃভাষা আমি কখনই ভুলে যেতে পারি না; তাছাড়া ইংরেজী ভাষারও প্রশংসা আমি শুনতে চাই না।' এ-ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত উডরফ সাহেবকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।*

* এই রচনার জন্য কিছু কিছু প্রাচীন পত্রিকার সাহায্য গৃহীত হয়েছে।

ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র (দুই খণ্ডে)

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। দুই খণ্ডের সাধারণ মূল্য ২৮ টাকা। গ্রাহকেরা পাবেন ১৮ টাকায়

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমস্ত বাংলারচনার সামগ্রিক গ্রন্থন প্রয়াস এতে থাকবে।

• উপন্যাস
কঙ্কাবতী, ফোকলা দিগম্বর, ময়না কোথায়, পাপের পরিণাম, সেকালের কথা (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত)

• গল্পগ্রন্থ
ভূত ও মানুষ, মুক্তামালা, মজার গল্প, ডমরুচরিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গল্প
১। রূপসী ছিন্নমস্তা (বাঙ্গাল নিধিরামের উপসংহার)
২। আমার সেই অমূল্য মণি।

• প্রবন্ধাবলী
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা, ভারতে সংবেশ লৌহ, ইস্পাত, বিড়াল, পশম, এরণ্ড বা রেড়ি, গজদন্ত পাথুরে কয়লা, গ্যাস, নূতন বৃক্ষ, সুগন্ধ প্রভৃতি।

• দুষ্প্রাপ্য সংযোজন
১ রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়-চন্দ্র সরকার প্রমুখ তৎকালীন সাহিত্যিক-দের ত্রৈলোক্য সমা-লোচনা পুনর্মুদ্রণ।
২। ত্রৈলোক্যনাথের আত্মকথা।
৩। ত্রৈলোক্যনাথের দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র
৪। ত্রৈলোক্যনাথের সুধীমুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পিতৃস্মৃতি'।

রবীন্দ্রযুগের বিশিষ্ট লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সমস্তরচনা—
শরৎকুমারী রচনাসংগ্রহ (এক খণ্ডে) গ্রাহকমূল্য : ৮·০০

মধুসূদন দত্তের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর নির্বাচিত রচনাবলী—
রাজনারায়ণ রচনাসংগ্রহ (এক খণ্ডে) গ্রাহকমূল্য : ১০·০০

গ্রাহক কেন্দ্র : **গ্রন্থমেলা** এ-১২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

১। মধুসূদন সাহিত্য পরিক্রমা
ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ৪-৭০
২। বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য/
অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬-০০
৩। কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহন স্মারকগ্রন্থ/
ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তারাপদ ভট্টাচার্য, সুবোধরঞ্জন রায় প্রমুখ কর্তৃক শশাঙ্কমোহন সেনের সাহিত্যকৃতির সমঞ্চক আলোচনা।
সম্পাদনা : শচীন্দ্রনাথ গুহ ৩-০০
৪। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি
[হাসির গল্পসমষ্টি] শিবরাম চক্রবর্তী ১-৮০
৫। কালপুরুষ
[কিশোর উপন্যাস] খগেন্দ্রনাথ মিত্র ১-৮০
৫। দানোর জন্তগলে
[কাব্যগ্রন্থ] রণজিৎ মুখোপাধ্যায় ১-০০
৭। জননী জন্মভূমি
[কাব্যগ্রন্থ] ঐ ২-৫০
৮। সূর্য সেন স্মৃতি/
গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর লিখিত রোমাঞ্চকর কাহিনী ও ৫০ জন শহীদের আলেখ্য-সম্বলিত ৬-০০
৯। বিদ্রোহী চট্টগ্রাম/
স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদানের ইতিহাস। (যন্ত্রস্থ)
সম্পাদনা : শচীন্দ্রনাথ গুহ
১০। তুমি আর আমি
বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘতম প্রেমের কবিতা
সাধন চৌধুরী ৪·০০

কেমন আছ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কেমন আছ?

জিজ্ঞেস করলেই শুনি : এই এক-রকম। কিংবা এই কেটে যাচ্ছে। কিংবা আমাদের আবার থাকা!

কী নেই, কোথায় কতটুকু বাদ পড়েছে, কী পায়নি, কোথায় কে অবিচার করেছে তারই নালিশ পেশ করে। কত যে আছে, কত যে পেয়েছে, কত যে এখনো হারায়নি তার হিসেব ভুলে যায়। জীবনের বিরুদ্ধে কেবল অভিযোগ, জীবনের সপক্ষে কোনো কৃতজ্ঞতা নয়, কোনো অভিনন্দন নয়। গ্রীষ্মে বলে কবে বৃষ্টি নামবে? বৃষ্টি নামলে বলে, থামবে কবে? বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, বাস আসবে কখন? এলে বলে, দাঁড়াতে পারলে হয়। দাঁড়াতে পেলে বলে, যদি একটু বসতে পেতাম! বসতে পেলে আবার বলে, নামতে পারব তো!

তিনটি মেয়ে এসেছে। দুটি চেনা, একটি অচেনা।

'তোমার নাম কী?' অচেনা মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম।

কুণ্ঠিত মুখে হাসল মেয়েটি। সঙ্গিনী-দের দিকে তাকাল। যেন নাম বলতে ইচ্ছুক নয়।

'নাম বলতে আপত্তি কী।'

'নামটা একটুও ভালো নয়।' মেয়েটি কাতর স্বরে বললে, 'অন্নপূর্ণা—'

সপ্রশংস স্বরে বললাম, 'বা, সুন্দর নাম।'

'বড্ড সেকেলে। চার অক্ষরে নাম কি আজকাল চলে? নামটাই আমাকে পিছিয়ে রেখেছে।'

'তবু আম্মাকালী তো নয়। পুরো নাম বলো।'

'কুমারী অন্নপূর্ণা ঘোষ—'

'আচ্ছা, এ সব বিশেষণ কেন লাগবে?' সঙ্গিনী দীপালি ঠিকরে উঠল : 'ছেলের বেলায় তো কেউ কুমার বলে না। আমি আমি। আমি কুমারী না বিবাহিত, মিস না মিসেস—এটা নামের সঙ্গে ঘোষণা করার মানে কী? পুরুষের বেলায় এমনি কি কোনো চিহ্ন থাকে?

আমি বললাম, 'শ্রীমতী বলতে পারো।'

'তাই বা কেন বলব? পুরুষ কখনো নামের সঙ্গে শ্রীমান বলে? বড়জোর শ্রী বলে।'

'কই, শ্রীও আজকাল উঠে গেছে।'

'তাই ভালো। সব উঠে যাক।' দীপালি তপ্তস্বরে বললে, 'যে যার নামের জোরে দাঁড়াক। তারও কি উপায় আছে? অন্নপূর্ণা ঘোষের যদি আজ মহাদেব মিত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়, অন্নপূর্ণা অমনি অন্নপূর্ণা মিত্র হয়ে দাঁড়াবে। কী অত্যাচার! নামের অত্যাচার তারপর আবার পদবীর অত্যাচার!'

'তবে তুমি কি মহাদেবকে ঘোষ হতে বলো?'

'না। আমি বলি মহাদেব মিত্রই' থাকুন, ওকে বিয়ে করার পরেও অন্নপূর্ণাও ঘোষেই বহাল থাকুক। মেয়েদের এ দাসত্ব কেন? আপনারা আমাদের মানুষ বলেই স্বীকার করতে চান না।'

'সে কী বলছ?' সম্ভ্রমের সুরে বললাম, 'তোমরা পূজ্যাহা গৃহদীপ্তয়ঃ।'

'রাখুন।' দীপালি আবার ঝঙ্কার দিল: 'মানুষ বলতে শুধু পুরুষ বোঝায়, মেয়ের বেলায় মেয়েমানুষ। স্ত্রী ছেড়ে আর সকল মেয়েই স্ত্রীলোক। সব সময়েই আমাদের পিছনে লোক কিংবা মানুষ লেগে থাকবে। এ কী নির্যাতন!'

হেসে বললাম, 'তোমরা ব্যক্তি। আমরা সকলে ব্যক্তি। এই ব্যক্তিত্বেই প্রতিষ্ঠিত হও।'

'তাই তো বলছি। আমরা যার-যার ব্যক্তিত্বে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র। বেশ, সমাজ আমাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ করে দিক।' হঠাৎ নরম হল দীপালি: 'আপাতত একটা চাকরি দিন আমাকে।'

'তোমার চাকরির কি খুব দরকার?'

'দরকার মানে? নিদারুণ দরকার। বুড়ো বাপ-মা, ছোট ছোট তিনটি ভাই-বোন—আমি ছাড়া কেউ নেই—'

'কেন, তোমার চাকুরে দাদা ছিল না?'

'সে বিয়ে করে বউ নিয়ে মফস্বলে সরে পড়েছে। তার মাইনেতে তার নিজের খরচই চলে না, তায় আমাদের দেখবে! ঐ তো আপনার মানুষের নমুনা। স্বার্থপরের মত শুধু নিজের দিকে ঝোল টানা।

'তুমিও বিয়ে করে দিব্যি কেটে পড়ো না!'

'আমি গর্হিত, আমাকে কে বিয়ে করবে? তা ছাড়া এই তো রূপের ছিরি—'

'রূপ তো অন্তরের জিনিস।'

'রাখুন। কোথাও একটা দশটা-পাঁচটার চাকরি জুটিয়ে দিন। তিন বেলা টিউশানি করে আর পারছি না।'

'কী চাকরি করবে?'

'যে কোনো চাকরি। অফিসের চাকরি। চাকরি করছি দেখলে যদি কেউ আয় বাড়াবার লোভে বিয়ে করতে আকৃষ্ট হয়।'

'চাকরি থেকে বিয়ে! মন্দ নয়।' গম্ভীর মুখে বললাম, 'কিন্তু বিয়ের পর আবার চাকরি কেন?'

'এই দেখুন না রচনাকে। বিয়ের পরেও চাকরি করছে।'

তাকালাম রচনার দিকে। বললাম, 'তোমার নামটি সুন্দর। তুমি বিধাতার রচনা।'

'আর মানুষের রটনা' রচনা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: 'চাকরি করি, তায় বিয়ে হয়ে গেছে হিংসুকেরা দুর্নাম রটায়। হিংসুকের মধ্যে হিংসুটিই বেশি।'

'চাকরিটা তাহলে ছেড়ে দিলেই পারিস।' দীপালি রুখে উঠল। বললে, 'ছাড়লে অন্যের একটা ওপনিং হয়। স্বামী যখন চাকুরে তখন আর তোর চাকরির কী দরকার!'

'কী দুর্মূল্যের বাজার!' ক্লিষ্ট মুখে রচনা বললে, 'একার রোজগারে কি সংসার চলে? আমাদের দুজনের আয় মিলিয়ে টায়েটুয়ে চলে যায়। স্ত্রী হয়েছি কি শুধু ঘোড়ার ঘাস কাটতে? স্বামীকে আয়ে-ব্যয়ে সাহায্য করার জন্যেই স্ত্রী হওয়া।'

'ওর খুব লাক!' দীপালি হিংসুটে গলায় বললে, 'ওর শাশুড়ি আছে। ও বাচ্চাটাকে দিব্যি শাশুড়ির জিম্মায় রেখে নিশ্চিন্তে অফিস করতে পারে।'

'আর বাড়ি ফিরে এসে রান্না করতে হয় না?'

'ব্যাক টু কিচেন!' আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'আসলে সব প্রগতিই গোল হয়ে ঘোরে। ঘুরে ঘুরে ফিরে-ফিরে আসে। মেয়েদের বল্কল ফিরে এসেছে, ছেলেদের চাপদাড়ি।'

'কী যে বলেন!' কান্নাধরা গলায় রচনা বললে, 'আমার সমস্ত ওভারটাইম বান্নাঘরে।'

'কিন্তু তোদের অফিসের রীতা চাকরি করে কেন?' দীপালি বলসে উঠল: 'ওর—ওর স্বামী তো মোটা অফিসর, ওদের সচ্ছল অবস্থা, বাড়িতে কাজের লোক রান্নার লোক আছে। ওদের সংসার চালাতে রীতার মাইনের দরকার নেই।'

'সত্যি এ অত্যন্ত অন্যায়। ওর যখন টাকার দরকার নেই তখন ও কেন চাকরি আঁকড়ে থাকছে? ও ছেড়ে দিলে সেখানে একজন সত্যিকার বেকারের ভরণ-পোষণ হয়। গোটা একটা পরিবার বাঁচে।' রচনাই বেশি করে মাতল রটনায়: 'ওর আলমারিতে তিনশো খানা শাড়ি। এর কোনো মানে হয়? রব উঠেছে গরিবি হটাও। আমি বলি রব হওয়া উচিত, আমিরি হটাও।'

রীতার সন্ধান নিলাম। কেমন আছ?

'ভালো না।' ক্লিষ্টমুখে রীতা বললে, 'একটা গাড়ি নেই। ট্রামে-বাসে অফিস যেতে প্রাণান্ত।'

'তোমার চাকরি করার কী দরকার?'

'কী দরকার মানে? বিয়ের আগে থেকে আমার চাকরি। আপনি বলতে চান বিয়ের পর সেই পাকা চাকরিটা ছেড়ে দেব? ঘুমিয়ে আর নভেল পড়ে দুপুর কাটাব? আর মোটা হব? মাই লর্ড! আমি চাকরিতে কনফার্মড হয়ে গেছি। অফিস-মাইন্ডেড হয়ে পড়েছি। দুপুরে বাড়িতে বন্দী থাকতে গেলে আমার ব্লাডপ্রেসার বাড়বে, ঘুম হবে না, আমি পাগল হয়ে যাব।'

সাহিত্যশ্রী'র বাংলা বই:—

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ১৪·০০

ডঃ জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্যান্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ৪·০০

রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি-চেতনা ১৮৲

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

সমাজচিত্রে

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন ৩০·০০

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য

(১৮৫০ হইতে ১৯০৫) [যন্ত্রস্থ]

পুস্তক-তালিকার জন্য লিখুন:—

সাহিত্যশ্রী ॥ ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল), কলিকাতা—৯

'কিন্তু আলমারিতে তিনশোখানা শাড়ি!'

'ও সব রচনার রটনা। শাড়ির সংখ্যা গুনে দেখিনি, শখানেক হতে পারে। কেনই বা হবে না শুনি? যদি পারি সংসারের অবস্থাটা একটু সচ্ছল করব না? এতে কি কোনো আইনের বাধা আছে না নীতির বাধা আছে? আমারটাই ওরা বেশি দেখল! কিন্তু শিমি-দির কী অবস্থা? ওদের তো নিজেদের বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। উঃ, মানুষের আর তবে কী চাই? ওর স্বামীর দু হাজার টাকা মাইনে। তবু ও চাকরি করে কেন? ও তো বংশানুক্রমিক বড়লোক, ওর তো অবস্থা সচ্ছল করবারও কথা ওঠে না। ওকে বলতে পারেন না চাকরি ছেড়ে দিতে? ওর চাকরিতে তিনটে বেকারের হিল্লে হয়।'

শ্যামলীকে চিনতাম। শ্যামলী থেকে শ্যামা না হয়ে শিমি হয়েছে।

ওকে ডাকালাম। কেমন আছ?

'ভালো নয়।' মুখভার করে শিমি বললে, 'একটা বাড়ি খুঁজছি।'

'বাড়ি খুঁজছ মানে? তোমাদের—মানে তোমার স্বামী তপনের তো নিজের বাড়ি আছে।'

'তা আছে। কিন্তু সেটা শাশুড়ির বাড়ি।'

'শাশুড়ির বাড়ি মানে? তোমার শ্বশুর ব্রজবাবুই তো করেছেন ও-বাড়ি।'

'তা করেছেন। কিন্তু করেছেন শাশুড়ির নামে। শ্বশুর তো বেঁচে নেই, শাশুড়িই এখন সে বাড়ির মালিক।'

'তোমার শাশুড়ির একমাত্র সন্তান তপন। ও বাড়ি তো তোমাদেরই হবে।'

'সে শাশুড়ি গত হলে তো? কিন্তু যতদিন গা-গতরে বেঁচে আছে, দাবড়ে বেড়াচ্ছে। শ্বাস উড়ি যায় বলেই তো শাশুড়ি। হিটলার যদি গোঁফ কামিয়ে শাড়ি পরে আসে তাহলে আমার শাশুড়ির হুঁদিস মিলবে।'

'তোমার উপর তিনি চটা কেন?'

'আমি চাকরি করছি, ভাই।'

'সত্যি, তোমার চাকরি করার কোনো মানে হয় না। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, তোমার স্বামী উঁচু মাইনের জাঁদরেল অফিসর—'

'আর আমি যে এম-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাশ পাওয়া মেয়ে—আমি বয়ে যাব? বিয়ে করে আমার সমস্ত বিদ্যার জলাঞ্জলি দেব? আমার সমস্ত দীপ্তি মুছে ফেলব? আমি দেশের কাজে লাগব না? আমার ফার্স্ট ক্লাশ পাবার কৃতিত্ব কি বাসি উনুনের ছাই হয়ে যাবে? দিন না একটা বাড়ি খুঁজে—দিন না—'

'তোমরা কি তোমার শাশুড়ির সঙ্গে থাকবে না?'

'না, না, তিনি মা, তাঁকে ছাড়ব না। কিন্তু তিনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন, আমরা তাঁর বাড়িতে থাকব না। শুধু এইটুকুই যা তফাৎ।'

'এই তো বাড়ি-গাড়ির চেহারা।

নিজের একলার বাড়িতেও সমাধান নেই চন্দনার। না, সে শাশুড়ি নয়, বউ নয়, মা নয়—সে এক একাকিনী মেয়ে।

'কোথায় থাকব বলতে পারেন?' হতাশের মুখে জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'তুমি রিটায়ার করেছ?'

'এবার করব। আর একসটেনশান পাওয়া যাবে না। এখনই তো আসল সমস্যা। কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হবে। এখন থাকি কোথায়? কোথায় মাথা গুঁজি?'

'কেন, তোমার বাড়ি কী হল?'

'সে একটা করেছিলাম মনের মত করে—ছোট একটা একতলা বাড়ি, কিন্তু থাকতে গেলে তো লোক লাগে—আমার লোক কোথায়?'

'তোমার আত্মীয়স্বজন নেই?'

'এক দঙ্গল পঙ্গপালের মত আত্মীয়। কিন্তু আমার সঙ্গে থাকবে কে? যাকে ডাকব সেই লাঠিবাজি করবে।'

'তবে বাড়ি করতে গিয়েছিলে কেন?'

'কে জানে কেন। সবাই করতে চায়, আমিও করেছিলাম। সম্পত্তিতে যে কত হাঙ্গামা তা তখন বুঝিনি। ভেবেছিলাম একসটেনশান নিতে নিতেই পরকালে একসটেন্ডেড হয়ে যাব। কিন্তু তা হবার নয়। এখন আমাকে দেখে কে, শোনে কে, ডাকে কে—'

'কোনো আত্মীয়ের সংসারে গিয়ে থাকো।'

'ওরে বাবাঃ, আত্মীয় না কালসাপ। সেখানে গিয়ে থাকা মানেই কথায় কথায় ছোবল খাওয়া।'

'বাড়ি কী করবে?'

'বেচে দেব। কোথাও আমাকে একটা ছোট ঘর পাইয়ে দিতে পারেন? কিন্তু শুধু একটা ঘর হলেই চলে? লোক কই? মানুষ কই?'

মানুষ থাকলেই তো আবার প্রশ্ন—স্থান কই, সঙ্গতি কই, ব্যক্তিস্বাধিকারের ক্ষেত্র কই?

শীত এল তো আগুন কই? আগুন এল তো ফায়ার ব্রিগেড কই? ফায়ার ব্রিগেড এল তো হোস-পাইপে জল নেই একফোঁটা।

'আরে, পার্বতী না?'

ডাকতেই প্রণাম করল নত হয়ে।

'কেমন আছ?'

'ভালো আছি।' সরল উচ্ছ্বাসে নির্মল হেসে উঠল পার্বতী।

মুখের দিকে তাকালাম অবাক হয়ে: 'কী করছ?'

'সংগ্রাম করছি।'

মনে হল নিয়ত সংগ্রাম করার মধ্যেই বুঝি নিরবচ্ছিন্ন ভালো থাকা।

'কাজটা কী?'

'কিছু ঠিক নেই। যা পাই তাই। একটা কাজ ছুটে যাচ্ছে আবার একটা নিচ্ছি। আবার ছাঁটাই হচ্ছি, আবার দরজায় ঘা মেরে-মেরে আরেকটা আদায় করছি।'

'সংগ্রামে তোমার অস্ত্র কী?'

'ধৈর্য, সন্তোষ, আত্মবিশ্বাস।'

'পাচ্ছ কী?'

'আর কিছু না পাই, মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি। কাজ করিয়ে মাইনে না দিতে পারে কিন্তু ভালোবাসিয়ে কেউ ভালোবাসা না দিয়ে পারে না।' আবার উজ্জ্বল চোখে হাসল পার্বতী।

কে কেমন আছে চোখ দেখলেই বোঝা যায়। আর কে কেমন হয়েছে তা বোঝা যায় তার মুখ দেখে।

পার্বতী যে ভালো আছে তাই নয়, সে এমন একটি ভালো বাসার বাসিন্দে হয়েছে যার থেকে তার আর উৎখাত নেই।

ভগবান করুন, তার সঙ্গে যেন আর কোনোদিন দেখা না হয়। তার আজকের মুখখানিই যেন আমার স্মৃতিতে অটুট থাকে।

গ্রাহক হবার শেষ তারিখ ২৫শে আগস্ট

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। পাঁচ টাকা দিয়ে গ্রাহক হলে দশ টাকা করে প্রতি খণ্ড পাওয়া যাবে।

শেকস্‌পীয়ারের সমগ্র রচনাবলী (সনেট সহ) শব্দগত ও ভাবগত যাথার্থ্য বজায় রেখে সরল ও আক্ষরিক গদ্যানুবাদের পূর্ণাঙ্গ ও বিপুল প্রয়াস বাংলা ভাষায় এই প্রথম। প্রথম খণ্ডে থাকবে : রোমিও ও জুলিয়েত, এ্যাজ ইউ লাইক ইট, ওথেলো, মার্চেন্ট অব ভেনিস, জুলিয়াস সিজার ম্যাকবেথ, কমেডি অব এরারস। ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুধেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত।

নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র রহস্য উপন্যাস

রিপু সংহার ৬৲ লভিনু সঙ্গ তব ৬৲ সূর্যমহল ৬৲

তুলি-কলম : ১, কলেজ রো. কলকাতা-৯। ফোন : ৩৪-৮১৮০

একটা পাখি কুরকুর করে ডেকে উঠল। ভারি মিঠে আওয়াজ। এক সঙ্গে সব কটা কান খাড়া হয়ে উঠল।

আর সেই সঙ্গে এক আঁজলা ঠান্ডা হাওয়াও বুঝি তারা আশা করল, গায়জুড়োনো মুঠো মুঠো শীতল ছায়া। যেন অনেকটা কাঠফাটা রোদ ভিঙিয়ে ছাতিফাটা তেষ্টা নিয়ে ঝিরঝির ঝর্ণার কাছে এসে দাঁড়ানো। অর্থাৎ তেমন একটা তৃপ্তি, মোহাচ্ছন্নতার পেয়ে বসে মানুষগুলিকে।

তবে এর সবটাই যে একটা ঠাট্টা; প্রকাণ্ড রসিকতা ছাড়া কিছু নয়—বুঝতে এক থেকে দেড় মিনিটের বেশি দেরি হয় না কারো।

বাসটা ছেড়ে দেয়।

কিন্তু তখনও কিছু কিছু চোখ জানা-আর বাইরে উঁকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করলেই কি আর সফল হয়। যাকে বলে নারকেল বোঝাই হয়ে আছে গাড়িটা। বিশেষ করে সহদেবনগরের বাস। মেলা থেকে ফিরছে সব। হাজার চেষ্টা করলেও যেখানে গাড়ি জানালার নাগাল পাওয়া কঠিন। গাদাগাদি হয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে যাত্রীরা এর মাথা ও খাচ্ছে, ওর ঘাড় এ ভাঙ্গছে।

তবে দু চার জোড়া চোখ যে এর ঘাড়ের তলা দিয়ে ওর কানের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে বাইরে ছিটকে যাচ্ছে না তা নয়। ঐ পর্যন্ত। বাইরের দৃশ্য দেখে সেসব চোখে কিছু মায়াঞ্জন লাগছে কি। আগুন-ঝরা রোদ ও ধুলোর রাশ ছাড়া কিছুই দেখছে না কেউ। অতৃপ্তির নিশ্বাস ঝরতে থাকে তখন। ক্ষোভ ক্রোধ বিরক্তি ও হতাশা নিয়ে এক একটা চোখ জানালা থেকে সরে আসছে।

এটা কি পীরপুর!

উঁহু, পীরপুর হবে কেন। হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে একটা মুখ আর একটা মুখের দিকে তাকায়। হাসিমপুর।

প্রতিবাদের ভঙ্গিতে আবার একটা মুখ তখন চেঁচিয়ে ওঠে। হাসিমপুর হবে কেন, এ হল পায়রাডাঙ্গা, পায়রাডাঙ্গার জামতলা ইস্টপে বাসখানা ধরল দেখলেন না।

হুঁ, তা বটে, তা বটে! পায়রাডাঙ্গায় বিখ্যাত জামতলার কথা কে না শুনেছে। বিশেষ করে এই বাসে যারা চলাফেরা করে।

আগুন ফুল শিশু

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সঙ্গে সঙ্গে অন্তত বিশ জোড়া চোখ আবার জানালার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু জামতলার স্টপ ছেড়ে বাসটা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। জামতলার সারি সারি তিনটে বিশাল জামগাছ আর দেখা হয় না।

তবে একেবারে জানালার ধার ঘেঁষে যারা বসে তারা গলা বাড়িয়ে তখনও পিছনটা দেখছিল, দেখতে পারছিল মাঝের জামগাছটার গুঁড়িটা সবচেয়ে মোটা। একটা হলদে সাইনবোর্ড ঝুলছে সেখানে। বাতের তেল না হাঁপানির ওষুধ যেন। অক্ষরগুলি দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে যদিও। তবে ঐ তিনটে গাছের কোনো একটার ডালে যে পাখিটা মিষ্টি গলায় ডেকে উঠে যাত্রীদের চমকে দিয়েছিল এটা তারা বুঝতে পারল।

এবার বাসটা ঘোড়া হয়ে ছুটছে। আর গাছ নেই। রাস্তার দুধারে ধু ধু মাঠ। অফুরান রোদ ধুলোর রাশ আর আগুন ঝরানো হাওয়া।

'জামের কড়া এয়েছে দেখলেন?'

'চোত কাবার হতে চলল, রাত পোহালে বোশেখ মশাই, জামের কড়া আসবে না বলেন কি!'

'আ, মশাইরা আছেন আনন্দে—চোত কাবার হয়ে গিয়ে বোশেখ আসছে, জন্তি পড়তে পাকা টুসটুসে কালো জাম গালে পুরবেন, তাই না?' জানালা ঘেঁষে বসা একটি মানুষ, একটি না দুটি—না না, তিন-জন তিনটে মুখ বেজায়রকম থমথমে হয়ে উঠল। তাদের বুক ঠেলে গভীর নিশ্বাস উঠে আসছে পরিষ্কার বোঝা গেল। এই মাত্র বাইরে গলা বাড়িয়ে পায়রাডাঙ্গার তিনটে প্রকাণ্ড জাম গাছ তারা দেখে নিয়েছে সুতরাং তাদের চেয়ে বড় সাক্ষী আর কে আছে। তাদের মতামত অগ্রাহ্য করবে বা হেসে উড়িয়ে দেবে সেই ক্ষমতা কারো আছে কি! তিনজনের একজন টুসটুসে কালো জাম টপাটপ কি করে গালে পুরতে হয় হাতের ও মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে চটপট দেখিয়ে দিল। তারপর গোটা বাসটা কান পেতে কথাগুলি শুনল।

'একটা জামের কড়া গাছে নেই, খরায় শুকিয়ে সব ঝরে পড়েছে।'

'একটা পাতা সবুজ নেই, জ্বলেপুড়ে হলদে হয়ে তিন তিনটে গাছের কী চেহারা করেছে কারো কি নজরে পড়ল।'

কি করে পড়বে নজরে যেখানে কুমড়ো বোঝাই হয়ে যাচ্ছে সব। মাথার পিঠে মাথা। কাঁধের সঙ্গে কাঁধ ঠেকানো। বড় ধরে ঝুলছে কত। ঠ্যাং-এর সঙ্গে ঠ্যাং জড়ানো, পায়ের ওপর পা। চুল মাথা গাল গলা পিঠ কনুই ছাড়া কিছুই কারো চোখে পড়ছে না যে!

'মরবে, সব মরবে, গাছ তো গাছ গরু মোষ ছাগল ভেড়া ধপাস ধপাস পড়ছে আর চোখ উল্টে দিচ্ছে—' জানালার ধারের তিন-জনের একজন খেঁকিয়ে ওঠার মতন গলার আওয়াজ করল। 'কাল কাশীপুরের শ্মশানের ধারে দুটো শেয়াল মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে স্বচক্ষে দেখলাম।'

'বলে কিনা শেয়াল! জলের অভাবে যেখানে মানুষ—' সেই তিনজনের একজন চাপা গলায় আরও কিছু যেন বলল, বাসের ঘড়ঘড় আওয়াজের জন্য সবটা শোনা গেল না।

প্রচণ্ড উত্তাপে দরদর ঘাম, সেই সঙ্গে ডিজেলের বিদঘুটে পোড়া গন্ধ, এতক্ষণ যাত্রীরা বিরক্তি ক্রোধ হতাশা নিয়ে ভুগছিল, এখন দেখা গেল প্রত্যেকটা চোখে বরফের চাঙ্গড়ের মতন বড় বড় আতঙ্কের ডেলা ঝুলছে।

কাজেই পাখির মিঠে বোলের মতন রসালো কালো জাম, সিঁদুরেবরণ লিচু ও সেই সঙ্গে গ্রীষ্মপাতি হিমসাগর টিয়া-ঠুঁটি আম, ক্ষীরের মতন ঘনরসের সুপক্ক কাঁঠাল, উঁহু, কেবল পাকা কেন, ইঁচড় আছে না? এ সময়ে লোকে কাঁচা কাঁঠাল রেঁধে খায় না? কিন্তু এখন এই সহদেব-নগরের বাসে কেউ একবার এসবের নাম উচ্চারণ করুক দেখি? যেখানে ফুল কড়া মুচি শুকিয়ে কালো জিরজিরে হয়ে পাঁঠার মেটুলীর রং ধরে টুপটাপ গাছ থেকে খসে পড়ছে? একসঙ্গে দশটা মুখ খিঁচিয়ে উঠবে। বৈশাখের বাঁইচিফল, জ্যৈষ্ঠের করমচা আষাঢ়ের সরস কামরাঙ্গা? খুব খাবেন এবার।

বলে কিনা ধপাস ধপাস গরু ছাগল মোষ—

ভয়ে আর কেউ কথা বলছিল না। গুম মেরে থেকে বাসের ঝাঁকুনি খাচ্ছিল। আর ঘড়ঘড় ঝরঝর আওয়াজ শুনছিল। যেন অনেক দিনের পুরোনো গাড়ি, কাঠমোটা নড়বড়ে হয়ে রীতিমত হেকড়া হয়ে গিয়ে এত সব শব্দ করছিল। অথচ বাস-কোম্পানীর লোক, তারাও রসিক কম না, 'পাসিঞ্জারদের' সঙ্গে ঠাট্টা করতে গাড়িটার আষ্টেপৃষ্ঠে কেমন চোখ জুড়োনো কচিপাতা রং বুলিয়ে দিয়েছে। তারা জানে ছাতি-ফাটা তেষ্টা নিয়ে খরার আকাশের নিচে রাশি রাশি রোদ ভেঙ্গে এই গাড়ি সহদেব-নগর পায়রাডাঙ্গা হাসিমপুর বনগাঁর পথে সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যে অবধি কম করেও চারটে 'টিরিপ' দেবে।

ইতিমধ্যে জানালার ধারে কেউ একজন আবার বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে।

'কোথায় এলাম গো আমরা?'

'বিবিরহাট।'

'পাটের অবস্থা কেমন দেখেন?' দুঃসাহস, দুঃসাহসে ভর করে ভিতর থেকে একজন উঁচু গলায় শুধোয়ঃ 'ধানক্ষেত চোখে পড়ে?'

'সব ক্ষেতের এক অবস্থা।' জানালার মানুষটা এদিকে মুখ না ঘুরিয়ে খরখরে গলায় উত্তর করে, 'বেবাক ক্ষেতে ধকুন উড়ছে।'

ভিতর থেকে আর একজন কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। বিবিরহাট স্টপে বাসটা দাঁড়িয়ে। তেমন একটা যাত্রীটাত্রী উঠল না। বরং সেই যে সহদেবনগরের মেলা থেকে ফিরছিল, মাথায় মাথায় লাল গামছা জড়ানো পরনে হলদে কাপড়, কপালে গায়ে গঙ্গা-মাটির ছাপ, গাঞ্জনের সন্নেসীর বড় দলটা নেমে যাওয়ার ফলে গাড়িটা অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল। এবার যাত্রীরা একজন আর একজনকে দেখতে পায়। অর্থাৎ এখন আর কেবল চোখ মুখ নাক কি চুল নয়, হাত-পা কোমর পেট উরু নিয়ে এক একটি মানুষের পুরো মূর্তিটা দেখতে আর অসুবিধা নেই। দুধারের বেঞ্চির সারিও চোখে পড়ে। কতজন দিব্যি পা ঝুলিয়ে আরাম করে বসে আছে। ঠাসাঠাসি গাদা-গাদি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি বেঞ্চির মানুষগুলিকে এখন ঈর্ষার চোখে দেখছিল।

কিন্তু কথা সেটা নয়, আসল হল ফুলের গন্ধটা। একেবারে টাটকা সদ্যফোটা বকুলের গন্ধ। সেই মেলার জরুরা সহদেব-নগর থেকে বাসটা যখন ছাড়ে তখন থেকে টের পাওয়া যাচ্ছিল। অবশ্য কিছু যাত্রী মাঝরাস্তা থেকে ওঠে। গাড়িতে ওঠার পর তাদের নাকেও ফুলের গন্ধটা লাগে। তবে মাঝে মাঝে গন্ধটা চাপা পড়ে গেছে। তখন আর এই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। যেমন হলুদ কাপড় লাল গামছা পরা সন্নেসীদের গা থেকে কড়া গাঁজার গন্ধ উঠে আসছিল। পায়রাডাঙ্গায় এক দঙ্গল জেলে গাড়িতে ওঠার পর গাড়ির ভিতরটা মাছের আঁশটে গন্ধে ছেয়ে যায়।

এখন আর তারা কেউ নেই। হাসিম-পুর নাস ধরতে জেলের দলটা নেমে গেছে। আর এই মাত্র বিবিরহাটে গাঞ্জনের সন্নেসীরা নেমে গেল। কাজেই বকুলের গন্ধটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে যাত্রী-দের উন্মনা করে তুলল। এখন একটা মস্ত সুবিধে ভিড় কমল বলে চোখ ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে তারা গাড়ির ভিতরটা খুঁজছিল, খুঁজতে পারছিল। খুঁজতে খুঁজতে এক-দিকের একটা বেঞ্চির কোণায় তাদের দৃষ্টিটা গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। অন্য কোনো দিকেই আর তাদের চোখ ফেরাবার দরকার পড়ে না তখন। তারা এইবার মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, একমাত্র এই শরীর থেকে, ওই চুল থেকে বা কৃষ্ণচূড়ার রঙের টকটকে জামা ও সূর্যমুখীর রংয়ের চমৎকার শাড়িখানা থেকে ফুলের গন্ধটা উঠে আসছে।

গাড়িতে যে আর মেয়েছেলে ছিল না তা নয়। ছিল। তবে চোদ্দ থেকে পনেরো বছর, এমন আর একটি ছিল কি! যেন একটা ফুল যে জন্য যাত্রীরা চোখ বুজে এখন বলে দিতে পারছিল, যদি ওই চুল কি শাড়ি জামা থেকে টাটকা বকুলের গন্ধটা উঠে না আসে, অর্থাৎ তেল সাবান পাউডার-টাউডারের মতন ওটা যদি বাইরের কোনো গন্ধ না হয়ে থাকে তো নির্ঘাৎ মেয়েটার নিশ্বাসের সঙ্গে বুক থেকে গন্ধটা উঠে আসছে। অন্তত এমন একটা বিশ্বাস আঁকড়ে ধরার সুযোগ পেয়ে সকলেই খুব তৃপ্তি পাচ্ছিল। কেননা তাদের বিশ্বাস বার বার ভেঙে চুরমার হচ্ছিল। কোনো সত্যই আর সত্য থাকছিল না। চৈত্রের দুঃসহ জ্বালা ঘর্ম গাড়ির পোড়া তেলের গন্ধ শুকনো খটখটে আকাশ বাতাস ও এলো-পাথাড়ি ধুলোর ঝড় ছাড়া তাদের চোখের সামনে সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছিল। তা না হলে সামান্য একটা পাখির ডাক, এক ছড়া কালো জাম, আর চিরকালের চেনা জিনিস, সেই ধান-পাটের কথাও কিনা আজ ঠাট্টার মতন শোনাবে!

কাজেই চোখ বড় করে নরম মেয়েটিকে দেখে তারা খুশি হয়। যেন একটা সত্যকে তারা হাতের কাছে পেয়েছে—চোখের সামনে দেখছে। চুরি করার মতন চাপা গভীর শ্বাস টেনে টেনে কেউ কেউ ফুলের গন্ধটা বুকে পুরে নিতে চেষ্টা করল।

মেয়েটির খালি পা। এই গাড়ির প্রায় সকলেরই খালি পা। উদোম গা কতজন। চাষাভূসো গাঁয়ের মানুষ সব। হাঁটু অবধি ধুলো। বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসেছে বলে মেয়েটির ধুলো মাখা রাঙ্গা পা দুটো সকলেরই চোখে পড়ছিল। তাতেই যাত্রীরা টের পাচ্ছিল দেশ জুড়ে যেমন ধুলোর ঝড় বইছে তেমনি সহদেবনগরের মেলায়ও কম ধুলো উড়ছিল না। হাতে একটা তালপাতার পাখা ও দুটো মাটির সরা। মুখের আদলে বোঝা গেল পাশে বসা বাচ্চা ছেলেটি ভাই। বছর পাঁচ বয়স হবে। কালো হাফপ্যান্ট। ফচুপাতা রংয়ের জামা। ছেলেটির এক হাতে একটা মাটির ঘোড়া। আর এক হাতে—হঠাৎ মনে হবে রসে টুসটুস একটা পাকা জামরুল বুঝি। তা নয়, ভাল করে নজর করলে বোঝা যায় অবিকল জামরুলের সাইজের, তেমনি সাদা ধবধবে, একটা প্ল্যাস্টিকের বাঁশী। কিন্তু কিছুতেই বাঁশীটা সে বাজাতে পারছে না। যতবার ঠোঁটে ঠেকাতে যায়, বেঞ্চির এধারে বসা লম্বা নাকের রোগা কালো খিটখিটে মানুষটা এমন কটমট করে তাকায়, তক্ষুনি ছেলেটি ভয় পেয়ে হাতটা মুখের কাছ থেকে নামিয়ে আনে। তারপর মুখ কালো করে জানালাটা দেখে। বোনটিও মুখ কালো করে জানালার দিকে তাকিয়ে। যেন একভাবে ঘাড়টা ঘুরিয়ে রেখে অনেকক্ষণ ধরে সে বাইরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর ও ধুলোর মেঘ দেখছে। চোখের পলক পড়ছে না। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওর ঝড় বড় পালক-ঘেরা চোখের সামনে ধুলো ও রোদ্দুর ছাড়াও অন্য একটা ছবি যেন আটকে আছে, অন্য একটা ভাবনা। যে যে জন্য কিছুতেই ঘাড়টা এদিকে ঘুরিয়ে বাসের ভিতরটা সে একবারও দেখছে না। চিবুকটা শক্ত হয়ে আছে। গভীর কিছু চিন্তা করলে, মনের মধ্যে একটা আলোড়ন চলতে থাকলে এভাবে ঠোঁটে ঠোঁট বসে গিয়ে চোয়াল চিবুক শক্ত হয়ে থাকে না মানুষের।

কিন্তু ঐ বয়সে এমন কি ভাবনা, এমন কি দুর্ভাবনার ছবি কালো চোখ জোড়ার সামনে অবিরাম ঝুলছে সেটাও চিন্তা করার বিষয়।

কাজেই যাত্রীদের কারো কারো মনে হতে পারে আসলে ছোট ভাই-টার জন্য মন খারাপ করে মেয়েটি এমন মুখ ভার করে বসে আছে। ভাই বাঁশী বাজাতে পারছে না। বাজাতে গেলেই সামনে বসা রোগা লোকটা কটমট করে তাকাচ্ছে। আর তখনি মিইয়ে গিয়ে ছেলেটি অসহায় চোখ দুটো তুলে ধরে বাসের মানুষগুলিকে দেখছে—অর্থাৎ সে যে এত শখ করে মেলা থেকে এতটা পথ কষ্ট করে বয়ে-আনা বাঁশীটায় একবারও ফুঁ দিতে পারছে না, ফুঁ দিতে গেলেই একজন তাকে নিষেধ করছে, তাতে যাত্রীদের মনে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাড়ীর ভিতরের সবগুলি মুখ একবার করে দেখে নিচ্ছিল।

এক সময় দেখা গেল বাঁশী বাজানোর সব আশা ছেড়ে দিয়ে দিদির পিঠের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে ঘাড় গুঁজে চুপ করে ছেলেটি

বের হয়েছে ঃ

নতুন ভুবন ৫-০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস।

বাসনার অন্তরালে দেবদূত ॥ ৬·০০

সীমাস্বর্গ প্রলয় সেন ॥ ৮·০০

রাতের সমুদ্র হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৭·০০

কামনার সুখদুঃখ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ ৬·৫০

মানুষ যখন পশু হয় বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪·৫০

অপরিচিতা রূপসী চিরঞ্জীব সেন ॥ ৪·৫০

রামায়ণী প্রেমকথা সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ৬·৫০

অন্য নাম নরক অজাতশত্রু ॥ ৬·৫০

মুক্তির যুদ্ধে বাংলা দেশ কণাদ ॥ ৮·০০

জুলেখাবাঈ শ্রীনবকুমার ॥ ৮·০০

চুপি চুপি আঁধারে কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫·০০

অগ্নিগন্ধা সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ॥ ১০·০০

প্রফুল্ল গ্রন্থাগার ঃ ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেষিত গ্রন্থাদির নির্বাচিত তালিকা

যোগেশচন্দ্র বাগল : হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত ৮-০০ ॥ সুরেশচন্দ্র দে : স্বাধীনতা সংগ্রামে নবাবগঞ্জ ৩-০০
Kalyan Kumar Banerjee Indian Freedom Movement : Revolutionaries in America ₹0.00

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, সাহিত্য ও সমালোচনা

পম্পা মজুমদার : রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ৩২-০০ ॥ ডঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ৬-০০ ॥ ডঃ সত্যব্রত দে : রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা ২২-০০ ॥ ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায় ৮-০০ ॥ ধীরেন্দ্র দেবনাথ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৬-০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী ৪-০০ সুনীলচন্দ্র সরকার : রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ৬-০০ ॥ গৌরীপ্রসাদ ঘোষ : রবীন্দ্র কাব্যে শিল্পরূপ ৪-০০ হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় : নৌকাডুবির পরে ৪-০০ ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ৪-৭৫ ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন : ছন্দ পরিক্রমা ৪-০০ ॥ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : পদাবলী তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ ৫-০০ ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : কাব্য-পরিমিতি ৩-০০ ॥ ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য ১২-০০ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : পাঁচশত বৎসরের পদাবলী ৭-০০ ॥ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য ১৫-০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় : বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ১২-০০ ॥ অমিয়সূদন ভট্টাচার্য : বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন ১২-০০ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১২-৫০ ॥ প্রমথনাথ বিশী : বাংলা সাহিত্যে নরনারী ৬-০০ ॥ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র শিল্পতত্ত্ব ৮-০০, দুই মনীষী ৬-০০ ॥ ডঃ ভবতোষ দত্ত : কাব্যবাণী ১০-০০, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ৮-০০ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিতা (বঙ্কিমচন্দ্র) ২০-০০ ॥ ডঃ নবেন্দু সেন : গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭-০০ ॥ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৭-৫০ ॥ আজহারউদ্দীন খান ও ডঃ ভবতোষ দত্ত : মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ ১৬-০০ ॥ ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য ২০-০০ ॥ উমা সেন : প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ ১২০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী : আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ৩-৫০ ॥ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ১২-০০ ॥ প্রবোধ সেন : রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি ৩-০০ ॥ অশ্রুকুমার সিকদার ও দেবেশ রায় : বিদ্যাসাগর ৫-০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য (ক্লেচে) : শিল্পতত্ত্ব ১৫-০০ ॥ ডঃ সুকুমার বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান পরিচয় ৭-৫০ ॥ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস : কিশোর বিজ্ঞানী ২-৫০ ॥ বেলাবাসিনী গুহ ও অহনা গুহ : জগদীশ ও নজরুল ২০-০০ ॥ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭-৫০।১০-০০ শিবনাথ শাস্ত্রী : যুগান্তর ৮-০০ ॥ নবশঙ্কর রায়চৌধুরী : তখন আমি প্যারিসে ৬-০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী : রামায়ণের কথা ২-২৫।৩-০০ ॥

জীবনী ও ধর্মপ্রসঙ্গ

অজিতকুমার চক্রবর্তী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২৫-০০ ॥ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫-৫০ ॥ সুধাকান্ত রায়চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-স্মৃতিকথা ৬-০০ ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পিতৃস্মৃতি ১৬-০০ ॥ সীতাদেবী : পুণ্যস্মৃতি ১০-০০ ॥ ডঃ সুশীল রায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১০-০০ ॥ ডঃ পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : সমসাময়িকের চোখে শ্রীঅরবিন্দ ১০-০০ ॥ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : কান্তকবি রজনীকান্ত ১০-০০ ॥ শশাঙ্কমোহন চৌধুরী : কালপরিক্রমা ৬-০০ বারবেলার বৈঠক ৬-০০ ॥ অবন্তী দেবী : ভক্তকবি মধুসূদন রাও ও উৎকলে নবযুগ ৬-০০ ॥ মণি বাগচী : কেশবচন্দ্র ৪-৫০, দেবেন্দ্রনাথ ৪-৫০, মাইকেল ৭-০০ রমেশচন্দ্র ৫-০০, রামমোহন ৬-০০ সুরেন্দ্রনাথ ৬-০০, প্রফুল্লচন্দ্র ৪-৫০ ॥ নমিতা চক্রবর্তী : বিদ্যাসাগর ৬-০০ ॥ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : মনীষী স্মরণে ১০-০০ ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় : শেলী ২-৫০ ॥ স্বদেশরঞ্জন দাস : মানবেন্দ্রনাথ—জীবন ও দর্শন ২৫-০০ মানবেন্দ্রনাথ রায় ২-০০ ॥ অমিয়নাথ সান্যাল : স্মৃতির অতলে ৭-০০ ॥ শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় : মহাত্মা গান্ধী ১-৫০ ॥ ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য : গান্ধীজীর জীবনপ্রভাত ২-০০ ॥ চট্টোপাধ্যায়, সেন ও বসু : গান্ধীমানস ৩-০০ ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত ১০-০০ ॥ সুধা সেন : মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর ৮-০০, ভারতাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ১০-০০ ॥ গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ ৬-০০ রামকৃষ্ণ ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫-০০ ॥ মাখন গুপ্ত : শ্রীরামকৃষ্ণায়ণ ৪-০০ ॥ কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী : ভক্তিরস প্রসঙ্গ ২-৫০ ॥ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা ১০-০০ ॥ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী : গীতায় সমাজদর্শন ৪-০০, সম্ভবামি যুগে যুগে ৪-০০ ॥ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার : শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ১২-০০ ॥ সুভূতিরঞ্জন বড়ুয়া : বুদ্ধপথ ৬-০০ ॥ অতুলচন্দ্র সেন : উপনিষৎ নবক ১৬-০০ ॥ হরলাল ভট্টাচার্য : সহজ গীতা পরিচয় ৩-০০ ॥ রামপ্রসাদ সেন অনূদিত : ধম্মপদ ৩-০০ ॥

সঙ্গীত, কবিতা ও বিবিধ

শুভ গুহঠাকুরতা : রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা ৮-০০ ॥ অমল মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিক্রমা ৪-০০ ॥ দিলীপকুমার রায় ও প্রফুল্লকুমার দাস : কান্তগীতিলিপি ১ম খণ্ড ৫-০০ ॥ বিমল রায় : ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ ৬-০০ ॥ প্রফুল্লকুমার দাস : রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রসঙ্গ—১ম, ২য় ৫-০০ রাগাঙ্কুর ১০-০০ ॥ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য : সঙ্গীতে সুন্দর ৫-০০ ॥ দীপঙ্কর সেন : য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী ৪-০০ ॥ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার দাস : হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস ২-৫০ ॥ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় : সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু ৬-০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্নপ্রয়াণ ৭-০০ ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : মন্দ্র ৭-০০ ॥ কালিদাস : পুষ্পবাণ বিলাস ৪-০০, মেঘদূত ৫-০০ ॥ পবমানন্দ সরস্বতী : আহিতাগ্নি ৩-৫০ আনন্দজাতক ৩-০০, কালমৃগয়া ৩-০০, নির্জন প্রহর ৩-০০, নির্জন স্বাক্ষর ৩-৫০ পঞ্চমুখ ৩-০০, বসন্তবহ্নি ৩-০০ ॥ হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন : আসাম বুরঞ্জি ৬-০০ ॥ অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় : সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান ৪-০০ ॥ সুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় : আফ্রিকার চিত্র ১-৫০ · খাজা আহমেদ/নেপালশঙ্কর সরকার : কেবে নাই শুধু একজন ৫-০০ ॥ মানবেন্দ্রনাথ রায় : নব মানবতাবাদ ৪-০০ ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : যুক্তিবাদ, আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা ৩-৭৫ ॥ ভূপেন্দ্রনাথ বসু : পরচর্চা ৩-০০ ॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় : লাইবেরিয়ার উপকথা ১-৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন : কানু পরিবাদ ও শ্যামলী খোঁজা ২-৫০, মুক্তাচরি ২-৫০, রাখালের রঙ্গচরি ২-৫০ সুবলসখার কাণ্ড ২-৫০ রাসরঙ্গ ২-৫০, ঝড়ুডম্বরু ১-৫০, বরাগ্রোণ ও কুশধ্বজ ১-২০ বেহুলা ১-৬০, পৌরাণিকী ৬-০০, বাংলার পুবনারী ৮-০০ রামায়ণী কথা ৪-০০ সতী ১-৩০, ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য ১২-০০ ॥

সত্বর প্রকাশিতব্য

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, ভূদেব চৌধুরী : লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, সত্যনারায়ণ দাস : অঙ্গদর্শন ও বাঙালির মননসাধনা, রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলার গীতিকার, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাংলাভাষা প্রসঙ্গে।

॥ জিজ্ঞাসা ॥ কলিকাতা-৯ ।। কলিকাতা-২৯

বসে আছে। ছোট মুখখানা অভিমানে থমথম করছে। ঘাড় নীচু করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাতের বাঁশীটা কেবল দেখছে তখন।

গাড়ির গতি মন্দ হয়ে এল।
'এটা কোথায় এলাম গো মশায়?'
'রসুলপুর।'

বাসটা ধরল। দুজন উঠল। তিনজন নেমে গেল। ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ি আবার ছুটল।

'অ্যাঁ, রসুলপুর!' রড ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা মানুষ রীতিমত হকচকিয়ে উঠল। জানালার কাছে বসা যাত্রীদের দিকে তক্ষুনি গলাটা বাড়িয়ে দিল। 'তাহের মিঞার আনারস বাগানটা দেখলেন আপনারা?'

'তাহের মিঞার আনারস ক্ষেত বাস থেকে দেখা যায় না।'

'দেখা যায় দেখা যায়—আমি কিছু পয়লা এ-বাসে চড়ছি না। ডাইনে তাহেরের সুপুরী বাগ, বাঁয়ে আনারসের বাগান।' দাঁত ছড়িয়ে মানুষটা হাসতে যাচ্ছিল, ওধার থেকে একজন ভেংচি কাটার মতন চেহারা করল।

'তাহের মিঞার আনারস ক্ষেত কি আর আছে, সবটাই ফণীমনসার জঙ্গল।'

'তাই তো হবে', এক কোণ থেকে একজন মন্তব্য করল, 'ওটি হল অজস্মার ফসল, যার নাম কাঁটা ফনীমনসা—ধরা যত বাড়বে তত ওই পাপের ঝড় লকলকিয়ে উঠবে।'

আর কারো মুখে শব্দ নেই। ছেকড়া গাড়ির মতন ঝরঝর আওয়াজটা চতুর্গুণ হয়ে সকলের কানে বাজছিল। আগের চেয়ে অনেক বেশী ধুলো উড়ছিল। এলোমেলো হাওয়ায় পাক খেয়ে খেয়ে এতটা করে ধুলো এক-একবার ভিতরে ঢুকে যাত্রীদের চোখ কানা করে দিচ্ছিল। প্রত্যেকটা মুখ এখন অনেক বেশি সাদা দেখায়। সঙের মতন দেখায় মানুষগুলিকে। চুল ও ভুরুর রং আলাদা করে বোঝা যায় না। বুড়োর আর ছেলেছোকরার মাথার তফাত নেই। সব এক রং, ধুলোর রং।

বাসটা বিবিরহাটে ধরার আগ পর্যন্ত মেয়েটির কপাল ও কানের দু পাশের কালো চুল রেশমের মতন চিকচিক করছিল। এখন সবটা মাথা সাদা। দেখলে মায়া হয়।

তেমনি ছোট ছেলেটা ও লম্বা নাকের খিটখিটে মানুষটা। ধুলোয় নেয়ে উঠেছে। ছেলেটার কালো প্যান্টের ভাঁজে ভাঁজে ধুলো, জামার আর কচুপাতা রং নেই, ধূসর হয়ে গেছে।

নিশ্চয় রোগা লোকটা বাবা হবে। কখন কবে মেয়েটির টিকলো নাক ও কপালের দু পাশের ঢালু দেখে, সেই সঙ্গে ছেলেটির নাক ও কপালের দুটো পাশ দেখার পর যাত্রীরা কুঁচকানো বয়স্ক মুখটা খুঁটিয়ে যাচাই করে এক সময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বাবা সহদেবনগরের মেলায় গিয়েছিল।

'বাজাক না, ছেলেমানুষ শখ করে বাঁশীটা কিনে এনেছে,' যাত্রীদের মধ্যে একজন আর চুপ থাকতে পারল না। 'দু-একটা ফুঁ দিতে দিন না গো মশাই।'

'হুঁ, বাজাবে!' ভিড়ের মধ্যে বক্তার সঠিক মুখটা ঠাহর করতে না পেরে রোগা মানুষটা যে খুব একটা বিচলিত হল তা নয়। কথাটা যে-ই বলুক, একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার, তাই যেন মুখটা হঠাৎ এদিকে ঘুরিয়ে, বিশেষ একজনকে নয়, গাড়ির সব যাত্রীকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা বলছেন বটে, কিন্তু আমি মনে করি এটা বে-আদবি, এখানে বাঁশী বাজানো কেন, একটা পাবলিক বাস,—বাজাবার অন্য জায়গা আছে, সময় আছে—কাজেই...'

রোগা হলেও গলায় জোর আছে, বক্তৃতার মতন শোনাল কথাগুলি কেউ আর শব্দ করছিল না। এদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলার পর লোকটা অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'বুঝেছেন, নিজের সন্তান বলে একটা আখুখুটে আবদারের প্রশ্রয় দেব, আমি সেই ব্যক্তি নই, তাছাড়া আপনারা পাঁচজন বলছেন বাজাক, কিন্তু আর পাঁচজন যে বিরক্ত হবেন না তা কে জানে।'

হুঁ, মানুষটার আত্মসম্মান জ্ঞানও টনটনে, যাত্রীরা চিন্তা করল। ওদিকে ছেলেটি যেন আরও চুপসে গেছে, তার বাঁশী বাজান নিয়ে এত সব কথা, যে জন্য লজ্জায় সে আর একবারও চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না। তেমনি দিদিটি। ঠোঁট দুটো আগের চেয়েও শক্ত ঘন হয়ে চিবুকের সঙ্গে এঁটে বসে গেছে, আগের মতন মুখটা জানালার দিকে ফেরান, থম-

বয়ঃসন্ধির প্রেমের গল্প ॥

সম্পাদনায় ঃ বীরেন্দ্র দত্ত ও ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ থেকে বিশ শতকের ছ-এর দশকের মধ্যে লিখিত—বয়সের জটিল কয়েকটি সন্ধিলগ্নের প্রেমভাবনার বিচিত্র গল্প সংকলন। ৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনা সংগ্রহ ॥

সম্পাদনায় ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু। পি-আর-এস, ডি-ফিল ও অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ শাক্তপদাবলী সংকলন (সমগ্র) ॥

সম্পাদনায় ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু।
৫-০০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে।

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের **দেবী চৌধুরাণী**	সম্পাদনায় ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু
বিভূতিভূষণের **পথের পাঁচালী**	অধ্যাপক সত্যরঞ্জন দাস ও অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের **শেষের কবিতা**	অধ্যাপক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

মণীন্দ্র রায়ের কাব্যগ্রন্থ	**ঘণ্টা ঘাড়**
বংশীধারী দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ	**কোথায় পা রাখি।**
সুনীল হাজরার প্রথম কাব্যগ্রন্থ	**রোদ্দুরে হৃদয় রেখে।**
পরমেশ মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ	**আমার কাছে কমলপুর।**
দেবব্রত ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ	**আর নয়।**
বটকৃষ্ণ দাসের কবিতা	

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প

রত্নাবলী ৫৯এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা ৯

থমে দৃষ্টি ক্রমশ আরও গভীর বিষন্ন হয়ে উঠেছে।

'বাঁশী!' যেন বক্তৃতা করার এমন সুযোগ আর আসবে না। এতগুলি মানুষ কান পেতে শুনেছে, এতগুলি চোখ তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে, বোগা লোকটার গলার জোর আরও বেড়ে গেল, একটা গর্ব অহংকারের ভাব চোখে মুখে ফুটে উঠল, উত্তেজনায় কপালের দু পাশের রগ দপদপ করছিল।কাজেই আরও ভাল ভাল কথা মূল্যবান কথা গড় গড় করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ঃ 'অজন্মায় খরায় দেশ জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে গেল, গাছে একটা পাতা নেই, মাঠে এক কণা ঘাস নেই, ধপাস ধপাস গরু মোষ হাঁস মুরগি ছাগল ভেড়া পড়ছে আর মরছে, বাঁশী বাজানর চমৎকার দিন এসেছে বৈকি, মেলার সেই খেলনা বাঁশীর দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বার বার কথাটা আমার মনে হয়েছে—বুঝেছেন, বার বার মনে হয়েছে—'

'ঠিক কথা ঠিক কথা—' একটা নতুন গলা শোনা গেল, একটু আগে রসুলপুরে বাস ধরতে লাফিয়ে মানুষটা উঠে পড়েছে, বড় বড় চুল গাল ভর্তি দাড়ি রোগা পাতলা গড়ন না, জোয়ান জবরদস্ত চেহারা, বসবার জায়গা না পেয়ে রড ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঃ 'আপনারা খবর রাখেন কিনা জানি না. দেশে খাদ্য নেই, জল নেই, কেবল কি ছাগল গরু হাঁস মুরগি, আর শনিবার আমাদের বসন্ত-পুরে—'

কথাটা তাকে শেষ করতে দিল না, পিছন থেকে একজনের বেজায় খরখরে গলা শোনা গেল 'আহা, এমন করে বলছেন সাহেব' যেন আমরা দেশের মানুষ না, 'বিদেশ থেকে এয়েছি, খাদ্য নেই জল নেই, বলি আমরা কি চোখ বুজে আছি না ঘুমের ঘোরে আছি যে সিঁদেল চোরের মতো খরা অজন্মায় সব্বনাশ করে যাচ্ছে আর আমরা টের পাচ্ছি নে?'

'বলে কিনা সিঁদেল চোর—' কোনার দিকে একজন তৎক্ষণাৎ টিপ্পনি কাটল ঃ 'ডাকাত খুনে—বান বলুন খরা বলুন ভগবানের রাজ্যে এত বড় এক একটি খুনে ডাকাত আর আছে নাকি, খুনে ডাকাতেরও বাড়া, এমনভাবে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে—টের পাবে না আবার কোন যাদু!'

'হেঁ হেঁ—জন্মের টের পাইয়ে দিচ্ছে' আর একজন সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়, 'গাছের পাতা শেষ হয়েছে, এবার খাবলা খাবলা মাটি খেয়ে মানুষ কূল পাবে না দাদারা, হুঁ মাটি খেয়ে—'

এত সব আওয়াজ। দাড়িওয়ালা মানুষ-টার চুপ থাকা উচিত ছিল। থাকল কি। মাতব্বরের মতন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল 'তাই তো আমি বলতে চাইছিলাম গো মশাইরা কেবল কি হাঁস মুরগি গোরু মোষ, আর শনিবার আমাদের বসন্তপুরে একটা জলজ্যান্ত মানুষ মরে গেল—ড্রপ উপোস থেকে—'

'হেঁ হেঁ, আর শনিবার বসন্তপুরে এক-জন গেছে, কাল শুনবেন কেষ্টপুরে গেছে

মণীন্দ্র ঘটকের সর্বাধুনিক উপন্যাস

পতঙ্গ নয় ৮

'মানুষ, মানুষই। পতঙ্গ নয়, তবু জীবন জুড়ে কেন এই বিভ্রান্তি! বার বার আগুনে পুড়ে মরা অথচ চেতনা কোথায়?' ..... উপন্যাসটির প্রতিটি ছত্রে লেখকের সাবলীল বাচন ভঙ্গী আপনাকে ভাবাবে, রোমাঞ্চিত করবে, এ বই একবার পড়তে আরম্ভ করে শেষ না করে ওঠা যায় না।

দ্বৈপায়নের

রাজতরঙ্গিনীর দেশে ৮
এই রোদ এই বৃষ্টি ৭

শেখর সেনগুপ্তের

গেরিলা বিপ্লব মুক্তি ৭

পিটার রঙ্গনাথমের

সুইসাইড স্কোয়াড ৭

সম্রাট সেনের

দোলনচাঁপা ১০

কারাজিত বসুর

শীতল সূর্য ১০

বরুণ সেনের

চট্টগ্রাম একাত্তর ৯

ইন্দ্রনীল চৌধুরীর

ইন্দিরা গান্ধী ও সমাজতন্ত্র ৮

আসন্ন প্রকাশ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

টুকুনের অসুখ ১২

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র পর লেখকের আর এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

ফাহিয়েনের

কুহকিনী কুগতী ৮

উপন্যাস নয়, আজকের বিভ্রান্ত জীবন-যৌবনের ক্যানভাস

কনিষ্ঠ পাণ্ডবের

সময়ের প্রতীক ৬

উপন্যাস নয়, আজকের বিভ্রান্ত জীবন-যৌবনের ক্যানভাস

Communism in India 27-50
(Unpublished Documents 1925 - 1934)
Edited by : Subodh Roy

বর্ণালী ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

দুজন পরশু খবর পাবেন হাসিমপুরে চোখ উল্টেছে পাঁচজন—' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একজন ভেংচি কাটল। 'উপোসে মরা কি নতুন খবর সাহেব, মানুষের মরার এখন দাম আছে কিছু!'

'খাঁটি কথা, খুব খাঁটি কথা।' কোণের দিকের সেই লোকটা আবার গলা উঁচু করে ধরল। 'বসন্তপুরের মানুষটার মতন আজ আমি মরতে পারি, কাল আপনি মরতে পারেন পরশু—মরাটাই যে এখন সস্তা না কি বলেন আপনারা?'

'খাঁটি কথা খুব খাঁটি কথা।'

বস্তুত বসন্তপুরের একটা মানুষের মরার খবর শুনে গাড়ির ভিতরটা যে আতঙ্কে জমাট বেঁধে গেল মোটেই তা নয়। বরং একটু আগে ধানক্ষেতে শকুন উড়ছে শুনে যাত্রীরা কিছুক্ষণ বোবা বিমূঢ় হয়ে থেকে বার বার মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। এখন এমন একটা হৈ-চৈ হট্টগোল শুরু হল। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য।

'শিমুরালী শিমুরালী!' ঘন্টী বাজিয়ে কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে উঠল। আর একটা স্টপ এসে গেছে। ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা দাঁড়ায়।

'অ বুড়ি বিষ্ণুর হাত ধর, আমরা এসে গেছি।' লম্বা নাকের রোগা মানুষটা সীট ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। দেখা যায় কোনার জানালার কাছের বেঞ্চি ছেড়ে দিয়ে ছোট ভাইটির হাত ধরে মেয়েটি দরজার কাছে আগেই সরে এসেছে।

'হুঁ, আয় আয়!' বাপ তাড়া দেয়। 'শক্ত করে চেপে ধর ভাষের হাতটা ওর পায়ে না লাগে। সাবধান!' তিনজন নেমে পড়ল। বাস ছেড়ে ছিল। রাস্তাটা হঠাৎ কেমন ফাঁকা দেখায়। ধুলোর মেঘটা উড়তে উড়তে ওপাশের একটা খেজুর গাছের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গাছ না, মনে হচ্ছিল একটা কঙ্কাল। আকাশ মাঠ রাস্তা খাঁ খাঁ মরুভূমি। সূর্য ঢলে গেছে। রোদের তবু কী জ্বালা!

তিনজন হাঁটতে আরম্ভ করে।

বুড়ি কথা বলছিস না কেন। কেমন গোমড়া হয়ে আছিস!'

বুড়ি মুখ তোলে না। ভাইয়ের হাত ধরে হাঁটে।

'কি রে বিষ্ণু!' বাপ এবার ছেলের সঙ্গে কথা বলে। বাঁশীটা বাজা, এমন চুপচাপ কেন। হাঁটতে হাঁটতে বাজা।'

'ওর জল তেষ্টা পেয়েছে।' ভাইয়ের হয়ে বোন ফস্ করে উত্তর করে।

'হুঁ, খাবি, ঘরে ফিরে জল খাবি, এখানে জল কোথায়!' বকের মত সরু ঘাড়টা ঘুরিয়ে রোগা বাবা চারদিকে তাকায়। লম্বা নিশ্বাস ফেলে। ওরা আগে হাঁটে, নিজে পিছনে। বিষ্ণুর হাতের মাটির ঘোড়াটা এখন বুড়ির হাতে। বিষ্ণুর হাতে শুধু বাঁশী।

'তখন বাসে কতরকম লোক, তাই তো বারণ করেছিলাম বাজাতে, বুঝলি না।' পিছন থেকে বাপ আবার বলে, 'এখন বাজা না খুব করে—এখানে বাজাতে আপত্তি নেই।'

ভাই বোন কথা না বলে হাঁটে।

'একটু জিরিয়ে নিবি?' নরম গলায় বাপ শুধায়।

'ছায়া কোথায়, কোনখানে বসে জিরোব।' বুড়ি ও বিষ্ণু একসঙ্গে ঘাড় ফেরায়। বাবার মুখটা দেখে।

তা-ও বটে। একটা গাছের পাতা নেই, এক ছিটে ঘাস চোখে পড়ে না এই রাজ্যে। এতবড় একটা ধুলোর পিণ্ড কোন দিকে থেকে নাচতে নাচতে ছুটে এসে তিনজনের চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই জন্য অবশ্য তারা হাঁটা বন্ধ করল না।

ডাইনে মোচড় দিতে কালীতলার রাস্তা। তারপর—

খাল। ভাই বোন অস্ফুটে শব্দ করে উঠল। থমকে দাঁড়াল।

স্বাধীনতার পবিত্র দিবসে
সর্বস্তরের জনসাধারণ ও
চিকিৎসকদের শুভেচ্ছা
ও ভালবাসা জানাচ্ছি।

The Calcutta Orthopaedics

Orthopaedics & Physical Medicine
Appliances

Near Lady Duffrin Hospital) 3, Amherst Street, Cal-9

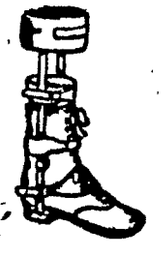

'হুঁ, কালীতলার মজা খাল।' বাপ হেসে ঘাড় কাত করে। ধুলো উড়ছে খালের বুকে। এক ফোঁটা জল নেই। বালু চিকমিক করে। 'ভালই হল।' লম্বা নাকটা আকাশের দিকে উঁচু করে ধরে রোগা মানুষটা হাত নাড়ে। 'খাল পেরিয়ে মাঠ কোণাকুশি চলে যাব আমরা সকাল সকাল বাড়ি পৌঁছে যাব।'

বুড়ি খুশি হয়, বিষ্ণুও খুশি হয়।

কষ্ট করে আর সাঁকোর ওপর ওঠে না তিনজন। খালে নেমে খালুয়ে ওপর দিয়ে হেঁটে তরতর করে ওপাড়ে উঠে যায়। বুড়ির পায়ে এখন অনেক ধুলো। বিষ্ণুর হাঁটু অবধি ধুলো। বাপ পিছন থেকে দেখে। যেন সাদা মোজা পরেছে দুটিতে।

কিন্তু তীরের তাল বেয়ে ওদিকের মাঠ নামতে গিয়ে তিনজন অবাক। চকচকে সবুজ পাতা ও আগুনের মতন থোকা থোকা ফুল নিয়ে মস্তবড় গাছ।

'কৃষ্ণচূড়া।' বাপ বিড়বিড় করে উঠল।

'তখন যে বাগদী পাড়া ঘুরে গিয়ে আমরা বাস ধরেছিলাম। এমন একটা বাহারের বিরিক্ষ এখানে লুকিয়ে আছে চোখেই পড়েনি।' আহ্লাদে দাঁত ছড়িয়ে মানুষটা হাসল।

'কত ফুল ফুটছে বাবা।' বুড়ির কালো চোখ রীতিমত চকচক করে উঠল। বিষ্ণুর চোখের পলক পড়ে না।

'হুঁ, এই তো মজা। খরায় কি কেবল ফণীমনসা লকলকিয়ে ওঠে, কেষ্টচূড়া ফোটে খুব। রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এর জেল্লা বাড়ে।'

বুড়ি চুপ। বিষ্ণু হাঁ করে তাকিয়ে বাবার দিকে। বাবা গেলে।

'তবেই বুঝে দ্যাখ্ ভগবান বেটা কেমন ভোজবাজী না খেলছে মানুষের সাথে আকাশে আগুন এক ফোঁটা রস নেই মাটিতে এদিকে কিনা ফুলের ছড়াছড়ি—আয়, খানিকটা জিরিয়ে নেওয়া যাক চমৎকার ছায়া।'

'তুমি জিরোও বাবা।' ভাই বোন এক সঙ্গে কথা বলে। 'গাছতলায় বসে তুমি আরাম কর।'

'তোরা?'

'আমরা ফুল কুড়োব।'

তাই তো কম ফুল নিচে ছড়িয়ে। বাসি বৃষ্টিচূড়া ঝরে ঝরে খরার শক্ত ঠনঠনে মাটি লাল করে রেখেছে, যেন এই মাত্র কত খুন-খারাপি হয়ে গেছে জায়গাটায়। বাপ ধপ্ করে বসে পড়ল।

ভাই বোন তখন পাগল ছুটোছুটি করে ফুল কুড়োতে লেগে গেছে। ওদের প্রাণের শখ অন্যরকম। গাঢ় নিশ্বাস ফেলে রোগা মানুষটা ভাবে। ঠাণ্ডা ছায়ায় বুড়ির গায়ের বকুলের গন্ধটা আবার তেজী হয়ে উঠল না। বিষ্টুটাকে মনে হচ্ছে খরগোসের বাচ্চা। তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে আর এদিক ওদিক ছুটছে।

'এই বিষ্টু বাঁশীটা বাজা বাবা।' শুকনো ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে বাপ আদুরে গলায় ডাকে। 'তখন বুকলিনে কতরকম লোক গাড়িতে ভাই তো আমি—'

বাঁশীর দিকে এখন খুব মন কিনা বিষ্টুর। বাঁশীটা মাটিতে পড়ে আছে। দাদাটা দেখে তেতোমতন একটা ঢোক গিলল বাবা।

'কি করছিস ওখানে কি করিস তুই।' খিটখিটে মানুষটা হঠাৎ শোয়া ছেড়ে উঠে বসল। মোটা গাছটার ওপাশে কাঁটা ঝোপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছেলে কি যেন টেনে টেনে আনছে। তারপর এক ছুটে বাপের সামনে এসে আহ্লাদে নাচতে আরম্ভ করল।

'ইস ইস, ফেলে দে ফেলে দে।' পিছন থেকে বুড়ি চেঁচায়। 'অ মা, কী ঘেন্না করছে আমার!'

দুটো কাঠবেড়াল। খরার আগুনে মনে শুকিয়ে কাঠের মতন শক্ত হয়ে আছে। বিষ্টুর ভারি আনন্দ। লেজে ধরে দু হাতে দুটোকে শূন্যে তুলে ঘোরায় আর হি হি করে হাসে। যেন দুটো মজার খেলনা।

'তোর কি ভয় ডর নেই, ঘেন্নাপিত্তি নেই।' বুড়ি কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল।

'কি করে থাকবে ভয় আর ঘেন্না।' বাপ একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ঝাড়ল। চারদিকে গরু মোষ মরছে হাঁস মুরগি মরছে তার ওপর মানুষ মরা গল্প শুনছে কত ওর কাছে, —ওর মতন আরো পাঁচটা বাচ্চা ছেলের কাছে মরা জিনিসটাই যে এখন জলভাতের সামিল হয়ে গেছে।'

বুড়ি দু হাতে চোখ ঢাকল।

॥ রামানুজ সম্প্রদায়ের ॥
কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থ

স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সংকলিত

ভগবদ্রামানুজ বিরচিত	
ব্রহ্মসূত্র শ্রীভাষ্যসহ	
১ম খণ্ড (চতুঃসূত্রী)	৬-৫০
২য় খণ্ড (১ম ও ২য় অধ্যায়)	১৫-০০
গীতাভাষ্য	৭-৫০
বেদান্তসার	৬-০০
বেদার্থসংগ্রহ	৫-০০
নিত্যারাধন গ্রন্থ	১-৫০
গদত্রয়	২-০০
শ্রীযামুনাচার্য বিরচিত	
শ্রীমদ্গীতার্থসংগ্রহ	১-৫০
শ্রীআলবন্দার স্তোত্র	১-২৫
শ্রীলোকাচারী স্বামী ও শ্রীবরবরমুনি কৃত বা ব্যাখ্যাত	
শ্রীবচনভূষণ	৮-০০
শ্রীবচনভূষণসার	১-৫০
তত্ত্বত্রয়	৪-৫০
অর্থপঞ্চক	০-৩৭
উপদেশরত্নমালা	২-০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৫-০০
শ্রীঅন্তাল আড়বার বিরচিত ও শ্রীকৃষ্ণপাদস্বামী ব্যাখ্যাত	
শ্রীব্রত (তিরুপ্পাবৈ)	৩-০০
শ্রীশঠকোপ আড়বার বিরচিত	
সহস্রগীতি (তিরুবায়মোড়ী)	১২-০০

শ্রীবিষ্ণুচিত্ত আড়বার বিরচিত	
তিরুপ্পাল্লাণ্ডু	১-৫০
শ্রীপরাশর ভট্টর ব্যাখ্যাত	
শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রম্	১-৭৫
শ্রীরঙ্গরামানুজমুনি ব্যাখ্যাত	
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ভাষ্যম্	২-৫০
শ্রীবলরামস্বামী বিরচিত	
প্রতিমাগৃহপদ্ধতি	০-৭৫
শ্রীরামজয়ন্ত্যাদি দিক্‌প্রদর্শন	০-৫০
শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য বিরচিত	
গুরুবর বলরাম (১ম খণ্ড)	১০-০০
২য় খণ্ড ৬-০০ একত্রে	১৫-০০
শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম (১ম খণ্ড)	৮-০০
বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও ইহার প্রাচীনতা	১-৫০
মানব-উজ্জীবন	২-৫০
আড়বার	২-২৫
তত্ত্ব ও তথ্য	৪-৫০
অন্তিম বার্তা	২-২৫
।। অন্যান্য ।।	
রামায়ণসার	৬-৫০
ব্রহ্মসূত্র	৪-০০
প্রপন্নপারিজাত	২-২৫

পোঃ বলরাম ধর্মসোপান ॥ শ্রীবলরাম প্রকাশনী ॥ ১০১, বিবেকানন্দ রোড
খড়দহ (২৪ পরগণা) কলিকাতা—৬

(বিস্তারিত বিবরণ-তালিকার জন্য লিখুন)

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক সমস্যা

ভবতোষ দত্ত

সূচনা

ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পেরা ইতিহাসের সূচনা হয় গঙ্গানদীর তীরে কলকাতার আশেপাশে। কলকাতার বন্দর এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে ক্রমে আসে রেলপথ, আর তার ফলে যোগসূত্র স্থাপিত হয় নিকটবর্তী কয়লাখনির সঙ্গে, বিস্তৃত কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্রের সঙ্গে, আসাম থেকে আগ্রা-অযোধ্যা পর্যন্ত শহরে-গঞ্জে বাজারের সঙ্গে। উনিশ শতকেই বোম্বাই আর আমেদাবাদে কাপড়ের কল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে ধানবাদ পর্যন্ত অঞ্চলই ছিল আমাদের শিল্পসমৃদ্ধির প্রধান কর্মক্ষেত্র এবং এর মধ্যেও পীঠস্থান ছিল বজবজ থেকে হুগলী পর্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট কলকারখানার সমষ্টি—পাটের কল, কাপড়ের কল, কাগজ তৈরির কারখানা, লোহা ও ইস্পাতের তৈরি জিনিসের কারখানা। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে জামসেদপুরে টাটার ইস্পাতনগরী স্থাপিত হোল, নানারকমের ধাতুর উৎপাদন, ব্যবহার ও রপ্তানি বাড়ল। এইরকমের সব অগ্রগতিরই সহযোগী ও অংশভাগী ছিল কলকাতা অঞ্চল। উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনের প্রসার কিম্বা উত্তরবঙ্গ ও আসামে চা-বাগানের অগ্রগতি সবকিছুই ছিল কলকাতার সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। স্বদেশী আন্দোলন যে নূতন উৎসাহ এনে দিয়েছিল তার ফলে স্থাপিত হোল বাসায়নিক শিল্প, নূতন কাপড়ের কল, নূতনতর এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। প্রথম মহাযুদ্ধের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের শিল্প-বিস্তারের ইতিহাস মূলত বঙ্গদেশ ও বোম্বাই অঞ্চলেরই ইতিহাস এবং তার মধ্যেই মুখ্য ভূমিকা ছিল কলকাতা অঞ্চলের।

শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতেও পরিবর্তন এসেছিল—নিম্ন-হিমালয় ও আসাম অঞ্চলে চা-বাগানের প্রসারে এবং উত্তর ও পূর্ববঙ্গে পাটের চাষে। এই দুটি কৃষি-পণ্যেরই প্রাধান্য শুরু হয় উনিশ শতকে। ধানের চাষও ক্রমে ক্রমে বাড়ছিল—পাট-উৎপাদনের প্রসার সত্ত্বেও। বরিশাল জেলার বাড়তি চাল কলকাতার বাজারের সরবরাহ বাড়াতো। পূর্ববঙ্গের মাছ কলকাতার দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেকটা মিটিয়ে দিত। সারা বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের বাণিজ্য স্রোত প্রবাহিত হোত কলকাতার বন্দর ও রেল ষ্টেশন দিয়ে। আবার সমস্ত পূর্বাঞ্চলের বৈদেশিক আমদানী ও রপ্তানী কলকাতার বন্দর দিয়েই আনাগোনা করত। কলকাতার ব্যাঙ্ক, বীমা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতার সুনাম ছিল সুদূরবিস্তৃত। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সুনামের অধিকারী ছিল বিদেশী সংস্থাগুলি, কিন্তু ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠছিল।

ডঃ ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের নাম শুধু অর্থনীতিবিদরা নন, শিক্ষিত সমাজের কে না জানে? প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক, ডি পি আই, এডুকেশন সেক্রেটারী ইত্যাদি তাঁর কোন পরিচয়ই নয়। তিনি একজন বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ। ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ সব কমিশনের কাজে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে সহায়তা করবার জন্যে তাঁর ডাক সব সময়েই পড়ে। তাঁর লেখা শুধু চিন্তার খোরাকই জোগায় না, পথনির্দেশও করে।

বেকার জীবনের অবসান চান? তবে ফরমূলা সমেত
'স্বদেশ ও শিল্প' খ্যাত লেখক সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
সাবান শিল্প ৪-৫০ পড়ুন
প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ। ভি, পি, যোগে পেতে হলে অগ্রিম পাঠান।
ট্রানজিস্টার রেডিও তৈরী ও মেরামত ৮
রকমারি বুক হাউস, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্পোদ্যোগ বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে নানাকারণে যে অঞ্চল এগিয়ে যায়, তার গুরুত্ব চিরকাল অব্যাহত থাকবে এটা আশা করা অসঙ্গত। পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার, শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার এবং নূতন নেওয়া সরকারী সংরক্ষণ নীতি ইত্যাদির ফলে কাপড়ের কল, চিনির কারখানা, দেশলাই ইত্যাদি ও অন্যান্য শিল্প ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের প্রাধান্য তখনো একেবারে ক্ষুণ্ণ হয়নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগ

ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী মন্দাতে আমাদের সব প্রদেশই আহত হয়েছিল, কিন্তু আঘাতটা বেশি করে পড়েছিল পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে পাট-জাত জিনিসের রপ্তানীর সংকোচনে। এই আঘাতও কাটিয়ে ওঠা হয়তো অসম্ভব হোত না, যদি পরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ এবং তারও পরে দেশবিভাগ বঙ্গদেশকে বিপর্যস্ত না করত। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অনেকদিক থেকে আমরা উপকৃত হয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে পৌঁছে গিয়েছিল। যুদ্ধের চাহিদা-জনিত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হোল না, দেখা দিল বর্ধিত চাহিদার ফলে অভাবনীয় মূল্য-বৃদ্ধি। মহাযুদ্ধেরই ফলে দেশে এল এমন একটা দুর্ভিক্ষ, যার তুলনা সরাসরিভাবে এ[illegible] পড়েছিল প্রধানত পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের উপরে। পাটের কলগুলি থেকে গেল গঙ্গানদীর তীরে। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার তীরবর্তী পাটের ক্ষেতগুলি চলে গেল পূর্ববঙ্গে। উর্বর পূর্ববঙ্গের কৃষি-সমৃদ্ধি এবং সেখানে শিল্পজাত দ্রব্যের যে বাজার ছিল পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে বিচ্যুত হোল। আসাম থেকে বাণিজ্য চলাচল কঠিন হয়ে পড়ল। এবং, সর্বোপরি, লক্ষ লক্ষ লোক—যাদের মধ্যে শ্রমক্ষমতাহীন শিশু স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধের সংখ্যাই বেশি—পূর্ববঙ্গ থেকে গৃহহারা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিল।

স্বাধীনতা ও দেশবিভাগের পর থেকে সারা ভারতবর্ষেই নূতন অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি সমস্যার আয়তন ও গুরুত্ব অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। প্রথম দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে দেশের অর্থনৈতিক পটভূমিকাতে উন্নতি হয়েছিল নানা

কবিতা

উত্তরাকাশের তারা	বিমল ঘোষ	২·০০
রুশতী পঞ্চাশতী	বিষ্ণু দে	২·০০
হিরোসিমা	জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	২·০০
নতুন দিনের রুশ কবিতা	অনিল রায়	২·০০
বাংলাদেশের কবিতা : এক সংকলন	বিষ্ণু দে সম্পাদিত	৬·০০
শেভচেঙ্কোর স্বপ্ন ও অন্যান্য কবিতা	—অনুবাদক গোলাম কুদ্দুস	৩·০০

গল্প উপন্যাস

কলিযুগের গল্প	সোমনাথ লাহিড়ী	৪·৫০
রূপনারাণের কূলে	গোপাল হালদার	৬·০০
শব্দের খাঁচায়	অসীম রায়	৬·০০
দিয়াড়া	রবীন সিংহ	৫·০০
গোবিন্দ সামন্ত	মালবিহারী দে	৪·৫০
দুই দেশ	গৌরী ঘটক	৪·৫০
কমরেড	"	৪·০০
আর্টা মোনোড গোষ্ঠী	মাক্সিম গোর্কী	২·৫০
মস্তক বিনিময়	টমাস মান্	৪·০০
বসন্তবাহার ও অন্যান্য গল্প	ভিনি ব্রেভল ও অন্যান্য	৩·০০

শিশু কিশোরদের জন্য

বিজ্ঞানের ছড়া	সুকোমল দাশগুপ্ত	১·৫০
মেঘনাদ সাহা	কমলেশ রায়	২·০০
হাসির ঘণ্ট	যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার	১·০০

প্রবন্ধ

মানুষের পার্থিব সম্পদ	লিও হুবার ম্যান্	১০·০০
শ্রমিক আন্দোলনে হাতে খড়ি	অনিল মুখার্জি	১·০০
সার্থকতার পথে মানুষের স্বপ্ন		৩·০০
মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা	বিষ্ণু দে	৮·০০
কোয়ান্টাম বলবিদ্যা	ডি ব্লিডনিক	৩·০০
ছোটদের রাজনীতি	নীহার সরকার	২·০০
ছোটদের অর্থনীতি	"	২·০০
যে সংগ্রামের শেষ নেই	প্রমথ গুপ্ত	৪·০০
রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী।	চিন্মোহন সেহানবীস	১৮·০০
অপুঁজিবাদী পথ	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	১·২৫

English

Reichstag Fire Trial	:	Georgi Dimitrov	5.00
India Today	:	Rajani Palme Dutt	45.00
Indian Atheism	:	Debiprosad Chaetopadhya	20.00
Natya Sastra Vol. I (Chapter I — (XXVII) edited & translated by Dr. Manomohan Ghose			
Part I Sanskrit Text Part II English Translation		Per set	100.00
Annals of Rural Bengal	:	W. W. Hunter	20.00
Sociology in India	:	Bela Dutta Gupta	55.00
Tagore : A Study	:	Dhurjati Prosad Mukherjee	7.50

MANISHA GRANTHALAYA PVT. LTD.
4/3B, BANKIM CHATTERJEE ST., CA-12.

দিকে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের সমস্যাগুলির আয়তন এতই বড় ছিল যে প্রথম দশবারো বছর পার হবার পরেও উন্নতির পথে মূল অন্তরায়গুলি দূর করা সম্ভব হয়নি। তবুও আশা ছিল যে প্রথম দুটি পরিকল্পনায় যে বনিয়াদ তৈরি করা হোল তার উপরে নূতনতর উন্নতির কাঠামো গড়ে উঠবে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দু বছর অতিক্রান্ত হবার আগেই ক্রমে ক্রমে এল চীন আক্রমণ, আর্থিক অনটন, বৈদেশিক সাহায্যে ঘাটতি, শিল্পে মন্দা, পাকিস্থানের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং মূল্যবৃদ্ধি। যে আশা নিয়ে পরিকল্পনার দূরপ্রসারী রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল সে আশাকে প্রতিরুদ্ধ করতে হোল। এর সবটাই সারা ভারতবর্ষের সমস্যা—কিন্তু দেশবিভাগের বিপর্যয়, শরণার্থীর অবারিত স্রোত ইত্যাদি কারণে প্রত্যেক সমস্যাই পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর রূপ নিল। বেকার সমস্যা এখানে ভীতিপ্রদ, খাদ্য সমস্যা অনেক বছরেই ভীতিপ্রদ এবং মূল্যবৃদ্ধির হারও অন্য অনেক অঞ্চল থেকে দ্রুতগতি।

KEDAR GHOSH

FREEDOM OR FRAUD OF THE PRESS

'Freedom or Fraud of the Press' is a tournament of reason.

Kedar Ghosh was awarded 'Padmashri' by the President of India for championing the cause of honest and bold Journalism He retired from **The Statesman** as Deputy Editor (News)

(Rs. 12.00)

●

BENEDETTO CROCE
AESTHETIC

As science of expression and general linguistic.

Translated from the ITALIAN By **DOUGLAS AINSLIE**

'Croce's masterpiece' – ***The Spectator***

Rs. 45.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700012

Also at:
Allahabad : Bombay : Delhi

জনসংখ্যা ও বেকার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমস্যার একটা মূল কারণ। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১, এই দশ বছরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছিল শতকরা ২১-৬, আর পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩২-৮। পরের দশ বছরে অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৭১এ, সর্বভারতীয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২৪-৮, আর পশ্চিমবঙ্গের হার ছিল শতকরা ২৬-৯। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার দিক থেকে ভাবতে প্রথম স্থান কেরলের (৫৪৯), দ্বিতীয় স্থান পশ্চিমবঙ্গের(৫০৪)। বাসযোগ্য বা কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণের দিক থেকে দেখতে গেলে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিরাট জনসংখ্যাকে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে স্বাবলম্বী করে তোলা, বা সব কর্মপ্রার্থীকে কাজ জোগানো কত কঠিন।

এই কর্মপ্রার্থীর মধ্যে আছে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী, নিকটবর্তী রাজ্যের বহু শ্রমিক, যারা কলকাতার আকর্ষণে অগণিত সংখ্যায় এখানে চলে আসে, আর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থী। পশ্চিমবঙ্গের মোট সাড়ে চার কোটি জনসংখ্যার মধ্যে আছে প্রায় ৬৫ লক্ষ অন্য প্রদেশবাসী এবং প্রায় ৫০ লক্ষ পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু। বেকারের মোট সংখ্যা এখানে কত তার সঠিক পরিমাপ করা শক্ত; একটি সরকারি হিসাব অনুসারে এই সংখ্যা ২৮ লক্ষের বেশি, এবং এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। গত কুড়ি বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম নিয়োগের সুযোগ বাড়ে নি, বিশেষত গত সাত বছরে নূতন কর্মসংস্থানের পরিমাণ খুবই কম হয়েছে। তাছাড়া গ্রামের বহু লোকের মধ্যে ছড়ানো কৃষিকর্ম ইত্যাদিতে বছরে কয়েক সপ্তাহের কাজের মধ্যে যে বেকারত্ব লুকানো ছিল, সেটা এখন নানা কারণে প্রকাশ্য বেকারত্বে পরিণত হয়েছে। এই বিরাট বেকার সমস্যার সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফলের দিকে না গিয়েও শুধু অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বর্তমান অবস্থা হোল সম্ভাবনাময় উৎপাদন ক্ষমতার অব্যবহার। যে দেশে সাধারণের ভোগ্য জিনিসপত্রের প্রচণ্ড অভাব, সে দেশে কোন রকমের বেকারত্ব একটা সামাজিক অপচয়।

খাদ্য সমস্যা

গত দশ বছরে এই বেকার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে যে আর একটি সমস্যা আশঙ্কাজনক হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হোল খাদ্যসমস্যা। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় শতকরা সাতাশ এবং তার আগের দশ বছরে শতকরা তেত্রিশ—অর্থাৎ কুড়ি বছরে প্রায় শতকরা সত্তর। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকমের খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বা সরবরাহে কমবেশি ঘাটতি দেখা দিয়েছে—ডাল, তরকারি, তেল, মাছ, মাংস, দুধ কোন জিনিসের সরবরাহ-ই প্রয়োজন অনুপাতে বাড়ে নি। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হোল খাদ্যশস্যের—চাল ও গমের। পশ্চিমবঙ্গে চিরকালই চালের তুলনায় গমের চাহিদা কম ছিল, কিন্তু গত কয়েক বছরের অবস্থা পরিবর্তনে, এ রাজ্যের লোক গম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছে। চাল এবং গম এই দুটি খাদ্যশস্যই আমাদের বহুলাংশে অন্য রাজ্য থেকে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের ভাণ্ডার থেকে আমদানি করতে হয়। রাজ্যের মধ্যে গমের উৎপাদন এখনও কম, আর চালের উৎপাদন যতটা বাড়তে পারত ততটা বাড়ে নি, কৃষিনীতিতে দূরদর্শিতার অভাবে আর পাট চাষের প্রবর্তন ও প্রসারে। অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক অঞ্চল স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করলে সবশুদ্ধ উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় হয়—যে অঞ্চলে যে জিনিস সস্তায় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করা যায়, সেভাবে উৎপাদন বিভাগ করে নিয়ে আদান-প্রদানের মাধ্যমে সর্বত্রই সরবরাহ বাড়ানো যায়। সেদিক থেকে পাট-চাষ করে সারা ভারতের জন্য বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে আমরা দেশের যে উপকার করি তার প্রতিদানে অন্ততঃ ন্যূনতম প্রয়োজনের খাদ্যশস্য এ অঞ্চলে পাওয়া যাবে এটা আশা করা খুবই সঙ্গত। এই আশা সব সময়ে সফল হয় না, এবং তাই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

শিল্পনীতি

শিল্প ও কৃষি দুই ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় আমাদের উন্নতির গতিবেগ কম। অনেক আগে থেকে শিল্প-উদ্যমের সূচনা হওয়াতে এখনো আমাদের স্থান খুব উঁচু, কিন্তু অগ্রগতির হারটা যদি কমতে থাকে বা তুলনামূলকভাবে কম হয় তাহলে নূতন কর্ম নিয়োগে সংকোচ দেখা দেবে অবশ্যম্ভাবী হয়ে, আর ভবিষ্যতের অবস্থা অনেক নীচে নেমে যাবে। সীমান্তে অবস্থান, শ্রমিক অসন্তোষ, কাঁচামালের অভাব এবং শিথিল পরিচালন ইত্যাদি অনেক কারণে পশ্চিমবঙ্গে নূতন মূলধন বিনিয়োগ কমে গিয়েছে—যে সব কলকারখানা পশ্চিমবঙ্গে আছে তাদের সম্প্রসারণও এখানে না হয়ে অন্যত্র হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যে নানাভাবে সুবিধা দিয়ে নূতন শিল্পকে আকর্ষণ করা হয়েছে, নূতন শিল্পোদ্যমের প্রারম্ভিক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। নানা কারণে বহু দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিল্পনীতিতে রাজ্যের প্রয়োজনানুগ কর্মধারা গৃহীত হয়নি। সম্প্রতি এদিক থেকে একটা পরিবর্তনের সূচনা দেখা গিয়েছে, কিন্তু এই সূচনা যদি দৃঢ় পদক্ষেপে পরিণত না হয় তাহলে শিল্পজগতে আমাদের পশ্চাদপসরণ অবধারিত।

সর্বভারতীয় শিল্পনীতিও আমাদের কোনো কোনো বিষয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করেছে, বা যে সব সুবিধা আমাদের ছিল তার পূর্ণ সুযোগ নেবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। যেমন, কয়লা আর ইস্পাত পশ্চিমবঙ্গে খুব সামান্য পরিবহন ব্যয়ে পাওয়া

উচিত এবং অন্য রাজ্যের তুলনায় এ দুটি জিনিসের ব্যবহারে আমাদের শিল্পজাত জিনিসের উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ার কথা। কিন্তু ভারত সরকারের নীতি অনুসারে এ দুটি জিনিস প্রায় একই দামে সারা ভারতে সরবরাহ করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলগুলিকে অনেকটা পরিবহন-ব্যয় বহন করে পশ্চিম ভারত থেকে তুলা আনতে হয় এবং ফলে প্রতিযোগিতায় অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সরকারি প্রচেষ্টায় নূতন শিল্পোদ্যমের ক্ষেত্র যখন স্থান নির্বাচন করা হয়, তখন অনেক সময় অর্থনীতিসম্মত বিচার-বিবেচনা অবহেলা করে, অন্য কারণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য সর্বভারতীয় কার্যধারার উপরে দোষ চাপিয়ে আমাদের নিজেদের অবহেলার দোষের ক্ষালন করা যায় না। বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিরাট ঘাটতির কারণগুলি কিছুটা সর্বভারতীয় কিন্তু একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সেচ সেবা নিষ্কাশন এবং রাস্তাঘাট তৈরি—যার ফলে আর্থিক উন্নতি সব জায়গায় ও সব ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া যায়—এর কোনোটি সম্বন্ধেই আমরা দীর্ঘকালীন সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করিনি।

আঞ্চলিক অসাম্য

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বড় সমস্যা আছে। এতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে যা বলা হোল তার সবটাই পুরো রাজ্যটিকে একটি অঞ্চল ধরে নিয়ে বলা। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সমস্যার একটা বড় দিক হোল রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অসাম্য। নানা ঐতিহাসিক কারণে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থা বিশেষভাবে কলকাতা-কেন্দ্রিক। বজবজ থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত গঙ্গার দুই তীর, আর তার সঙ্গে যদি দুর্গাপুর - আসানসোল অঞ্চল যোগ দেওয়া যায়, তাহলে বাকি পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এক উত্তরবাঙ্গলের চা বাগান ছাড় আর প্রায় কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিরাট বাকি অংশ কৃষি-প্রধান, কিন্তু বর্ধমান - হুগলীর কিছু অঞ্চল বাদ দিলে এই অংশের কৃষি-ব্যবস্থাও অনুন্নত। মোট শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত থেকে দারিদ্রের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই অনুপাত হাওড়া জেলাতে পাওয়া যায় ৩০-৩, বর্ধমানে ৫৩-৮ এবং হুগলীতে ৫৪-৪, অন্যদিকে এই অনুপাত বীরভূমে শতকরা ৭৮-৭, বাঁকুড়াতে ৮০, মেদিনীপুরে ৭৯-৩, মুর্শিদাবাদে ৭৪-২, পুরুলিয়াতে ৭৮-৪ মালদহে ৭৯-১, কুচবিহারে ৮২-৬ আর পশ্চিম দিনাজপুরে ৮৫-৯। এটাও উল্লেখযোগ্য যে মোট জনসংখ্যার যে অংশ শহরে থাকে, সেটাও আনুপাতিকভাবে একই হারে স্থির হয়ে আছে অনেক বছর ধরে।

কলকাতা ও গ্রামাঞ্চল

১৯৭২-এর জুনের শেষে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কের অফিস ছিল ৭৬০টি, তার মধ্যে ২৯৩টি কলকাতাতে, আর ১০১টি চব্বিশ পরগণাতে। এর সঙ্গে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান যোগ করলে দেখা যায় যে, ৫৫৩টি, অর্থাৎ শতকরা ৭৩টিই এই অঞ্চলে; বাকি এগারোটি জেলাতে ছিল মাত্র ২০৭টি। ঐ সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৮০৬ কোটি টাকা—এর মধ্যে কলকাতাতে ৭৬০ কোটি, বর্ধমানে ১৩ কোটি, হাওড়াতে ৯ কোটি, ২৪ পরগণাতে ৭ কোটি, আর বাকি বারোটি জেলাতে মোট ১৭ কোটি। বড় শিল্প ফ্যাকটরির মোট সংখ্যার শতকরা ৮০টিই কলকাতা, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণাতে। ক্ষুদ্র-শিল্পের বেলাতেও এই একই অবস্থা—মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ কুচবিহার বা পুরুলিয়াতে ফ্যাকটরির সংখ্যা যেমন কম, ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যাও তেমনি কম। এটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙ্কের দেওয়া কৃষি-ঋণের অধিকাংশই কলকাতাতে—এর কারণ, কৃষি-ঋণের বেশিরভাগই কৃষকের কাছে যায় না যায় চা-বাগান ইত্যাদির মালিকের কাছে এবং এই মালিকদের কারবার হয় কলকাতার ব্যাঙ্কের অফিসে।

কলকাতা অঞ্চলের সমৃদ্ধির প্রভাব গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হবার যে সম্ভাবনা ছিল সেটা সফল হয়নি। এই প্রভাব সাধারণত দুইভাবে হতে পারে। প্রথমত, শহরাঞ্চলে শিল্পোন্নতির ফলে গ্রামে উৎপন্ন কাঁচামালের চাহিদা বাড়তে পারে এবং গ্রামের উৎপাদকের আয় বৃদ্ধি হতে পারে। আর, দ্বিতীয়ত, শহরের সমৃদ্ধিতে সেখানকার লোকের আয় বাড়লে তার ফলে গ্রামে উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্যের জন্য শহরের চাহিদা বাড়তে পারে। এই সহজ প্রভাব-বিস্তার আমাদের রাজ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হয়ে ওঠেনি নানা কারণে। পাট-শিল্পের প্রসারে কাঁচা পাটের চাহিদা তৈরি হয়েছে, কিন্তু এটা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কাঁচামাল পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে এ-রকম উদাহরণ কম পাওয়া যাবে। অন্যদিকে কলকাতা অঞ্চলের অধিবাসীদের চাহিদার কিছুটা অবশ্য আশে পাশের গ্রামের কৃষি উৎপাদকেরা মিটিয়ে থাকে, কিন্তু এই প্রভাবও খুবই সীমিত।

ব্যাপক কর্মসংস্থান

পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। কলকাতার শিল্পোন্নতির ফলে শতাব্দীকাল ধরে যে শ্রমিক নিয়োগের বৃদ্ধি হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অংশ কম। এর জন্য অন্য প্রদেশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—নীচু আয়ের অঞ্চল থেকে উঁচু মজুরির অঞ্চলে কর্মসন্ধানীরা আসবেই। বরং আমাদের গ্রামবাসীদের পুরাতন পেশা ছেড়ে নূতন ধরনের কাজের জন্য শহরে আসবার প্রবণতা বহুকাল ধরে খুবই কম ছিল। এটাও মনে রাখা উচিত যে বঙ্গ বিভাগের আগে ঢাকা বা চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আসা যতটা কঠিন ছিল, ছাপরা বা কটক থেকে আসা তার চেয়ে অনেক কম কঠিন ছিল। আর তা-ছাড়া, যে সব অঞ্চল থেকে আমাদের কারখানার শ্রমিকেরা এসেছিল সে সব অঞ্চল ১৯১১ পর্যন্ত বঙ্গদেশের মধ্যেই ছিল। পুরানো দিনের কারণের দিকে না তাকিয়ে এখন আমাদের দেখা উচিত কীভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নূতন কর্মসংস্থান দিয়ে সমাধান করতে পারি। এটা বেকার-শ্রমিককে কেন্দ্রীভূত কর্মস্থলে এনে করা যেতে পারে কিন্তু তার চেয়ে অনেক সহজ-সাধ্য ও ফলপ্রসূ হবে কর্ম সংস্থানের সুযোগ গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করে দেওয়া।

গত কুড়ি বছরের পরিকল্পনাতে আমরা বড় বড় চমকপ্রদ প্রকল্পের দিকে নজর দিয়েছিলাম বেশি—সারা রাজ্যে বিস্তৃত কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে নজর যথেষ্টভাবে দিইনি। দুর্গাপুরে বহুশত কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে, তার অনুপাতে শ্রমিক নিয়োগ খুবই কম হয়েছে, যে উৎপাদন আশা করা গিয়েছিল সেটা হয়নি, অন্য নূতন শিল্প অসাধারণভাবে

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডঃ জিতেন্দ্র ঘোষ

গ্রীক ট্রাজেডির তিন কবি

এসকিলাস সোফোক্লিস য়ুরিপিদিস জীবনী ও নাট্যালোচনা। ৫ টাকা

গ্রীক ও রোমক কমেডির চার রূপকার

আরিসতোফেনিস, মিনান্দার, প্লুতাস তেরেনস : জীবনী ও নাট্যালোচনা। ৫ টাকা।

ডঃ জিতেন্দ্র ঘোষ ও ডঃ অরূপ সান্যাল

সাহিত্যকোষ

সাহিত্য বিষয়ক পরিভাষা ও পদসমূহের বিস্তৃত পরিচয়। ১২ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, জিজ্ঞাসা, দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কলি-১২ ডি এম লাইব্রেরী, কলি-৬

গড়ে তোলার যে আশা ছিল সেটাও সফল হয়নি। অন্যদিকে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের অভাবে সর্বাঙ্গীন উন্নতি আনবার মত কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প পরিকল্পনা আমরা নিতে পারিনি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, রাস্তাঘাট তৈরি, সেচ ও জল নিষ্কাশন ইত্যাদি পরিকল্পনাতেও আমাদের দুরদৃষ্টির অভাব দেখা গিয়েছে। কলকাতার রাস্তাঘাট, ভূগর্ভ রেল ইত্যাদিকে আমরা যতটা প্রাধান্য দিয়েছি গ্রামের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতিকে আমরা ততটা প্রাধান্য দিইনি।

শিল্প-প্রধান বলে যে পশ্চিমবঙ্গের খ্যাতি আছে, সেখানে বেশির ভাগ জেলাই প্রায় পুরোপুরি কৃষি-উৎপাদনের উপরে নির্ভরশীল—এমন কি বর্ধমানের মত জেলাও। অথচ গত কুড়ি বছরে আমরা সেচ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি করলেও জল নিষ্কাশনের কাজে অমার্জনীয় অবহেলা করেছি। জমির সরের সরবরাহে ঘাটতি আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সার বণ্টনে প্রশাসনিক শৈথিল্য বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। জমিদারি অধিগ্রহণের প্রায় কুড়ি বছর পরেও জমি ব্যবস্থাকে উৎপাদনমুখী করবার কাজে বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। সমবায় ব্যবস্থা যেটুকু করা হয়েছিল তার অনেকখানিই বিফল হয়েছে। খাদ্যশস্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা এখনো নেওয়া হয়নি। রাস্তাঘাট প্রসারে আমরা অনেক রাজ্য থেকে পিছিয়ে আছি—আর ব্যাপক বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা মাত্র সম্প্রতি অবহিত হয়েছি।

জেলা-ভিত্তিক পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গে গত কুড়ি বছরে নূতন যে-সব ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলি সরকারি চাহিদা বা কয়েকটি বড় শিল্পের চাহিদার উপরে নির্ভরশীল ছিল খুব বেশি। কোনো কারণে সরকারি চাহিদা কমে গেলে বা বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের হয় কমিয়ে দিলে বা উচিত মূল্য যথা সময়ে না দিলে এগুলি অচল হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে সরকারি ব্যয় সংকোচের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যে ক্ষুদ্রশিল্প দেশের বিরাট জনগণের চাহিদার উপরে সরাসরিভাবে নির্ভর করে সেগুলি গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়নি। গ্রামের কাঁচামাল গ্রামেই ব্যবহার করবার মত ছোট-শিল্প অনেক জেলাতেই গড়ে তোলা যায়। আবার শহরের বড় কারখানাতে তৈরি জিনিস দিয়ে নূতনতর জিনিস তৈরি করাও গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রশিল্পে হতে পারে—যেমন মিলের কাপড় থেকে তৈরি জামা-কাপড়, কারখানাতে উৎপন্ন কাগজ থেকে স্কুলের ছেলেদের বাঁধানো খাতা। এর প্রত্যেকটার জন্যই প্রয়োজন বিদ্যুৎ এবং রাস্তাঘাট। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা দিয়ে যদি আমরা রাজ্যের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য দূর করতে চাই তাহলে প্রধান বড় পরিকল্পনা হবে রাস্তা এবং বিদ্যুতের। তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে প্রত্যেক জেলার উন্নতির জন্য কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের পরিকল্পনা। কৃষি উন্নতির জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষৎ যে সর্বাত্মক আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রস্তাব করেছেন তার কার্যকারিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। পরীক্ষামূলকভাবে তিন-চারটি জেলাতে পর্ষৎ প্রস্তাবিত যৌথ কৃষি পরিকল্পনা পরীক্ষা করে দেখা উচিত—কাজে নামলে কী কী নূতন অসুবিধা দেখা দিতে পারে এবং কীভাবে তার সমাধান হতে পারে সেটা এই পরীক্ষা থেকেই প্রকাশ পাবে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের পরিকল্পনা সংযুক্ত করে দেওয়া সহজ হবে এবং দুটি পরিকল্পনা পরস্পরের পরিপূরক হবে।

প্রত্যেক জেলার জন্য বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি সম্বন্ধে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে সমীক্ষা করতে বলা হয়েছিল—সে সমীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্য ফিনান্স কর্পোরেশন এবং শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতেও বহু তথ্য আছে। অবশ্য, আরো বিশদ সমীক্ষা করবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। কিন্তু বেশি কালক্ষয় না করে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তারই সাহায্যে জেলা-পরিকল্পনা তৈরি করা এখনই সম্ভব। এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তবর্তী জেলাগুলির জন্য এবং সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য। সারা ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতির হারের সঙ্গে যদি আমরা সমতা না রাখতে পারি, তাহলে রাজ্য পরিকল্পনা আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার পারস্পরিক সম্বন্ধ ভাল করে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে যে আর্থিক অসাম্য রয়েছে এক অঞ্চল ও অন্য এক অঞ্চলের মধ্যে, সেটা দূর করতে না পারা বা অন্তত কমাতে না পারা আমাদেরই অক্ষমতা। দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে যদি শতকরা চল্লিশজনেরও বেশি লোক ভারতবর্ষে এখনো থাকে, তাহলে মনে রাখা উচিত যে চল্লিশ একটা গড় সংখ্যা মাত্র। কোথাও যদি এই হারটা চল্লিশের নীচে হয়, তাহলে আর কোথাও সেটা চল্লিশের বেশি। কোনো কোনো সরকারী হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা প্রায় সত্তরজনই দারিদ্র্যের সীমারেখার নীচে। এটাই যদি ঠিক হিসাব হয় তাহলে কলকাতা হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা বাদ দিলে হিসাবটা হবে আরো ভয়াবহ। আমাদের পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই আঞ্চলিক অসাম্য দূরীকরণ।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

আঞ্চলিক অসাম্য দূর করবার জন্য জেলা ভিত্তিক কৃষি ও শিল্প পরিকল্পনা কার্যকরী করলে বেকার সমস্যা ও খাদ্য সমস্যা দুটিরই সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। বড় বড় শহরে—কলকাতা, আসানসোল বা দুর্গাপুরে—প্রকাণ্ড শিল্পনগরী স্থাপন করে বেকারকে কাজ দেওয়া যায় নিশ্চয়ই, কিন্তু এই রকমের শিল্পনগরী অনেক দূর দেশ থেকেও অন্য বেকারদের আকর্ষণ করে আনে। কর্মনিযুক্ত লোকের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু আশে পাশে বেকারের সংখ্যাও বাড়ে। অন্যদিকে, উন্নত কৃষি ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্রশিল্পের বিস্তার করে যদি কাজের সুযোগ গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে স্থানীয় কর্মীদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা ও লাভ। এতে আঞ্চলিক অসাম্য কমে আসবে উৎপাদনে, মাথাপিছু আয়ে এবং শ্রমনিয়োগ। এই উৎপাদন বৃদ্ধির অনেকটাই হবে খাদ্যশস্যে কাঁচামালে আর নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রে। উন্নত কৃষি পরিকল্পনায় যদি বছরে একটি বা দেড়টি ফসলের জায়গায় দুটিও উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের খাদ্যশস্যের অভাব অনেকখানি মিটে যায়। মনে রাখতে হবে যে আগামী দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি থেকে বেড়ে সাড়ে পাঁচ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। যে বেকার সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার কথা আজ আমরা ভাবছি সে-সব সমস্যাই এই পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করা উচিত। সারা রাজ্যে ছড়ানো ব্যাপক কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী অথচ অবিলম্বে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটময় হয়ে উঠবে।

সংকটের মুখোমুখি এসে পড়লে অনেক সময় এমন সব প্রকল্প আরম্ভ করে দেওয়া হয় যাতে অর্থ ব্যয় হয় প্রচুর, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কাজ প্রায় বিশেষ কিছু হয় না। শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য এরকম বিপদ-বারণ প্রকল্পের কথা অনেক সময়েই শোনা যায়। আর্থিক উন্নতির সবচেয়ে বড় কথা উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তার জন্য প্রয়োজন উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি। শ্রমনিয়োগ অনেক ভাবে বাড়ানো যায়, এবং মন্দার সময়ে যে কোনো ভাবে শ্রমিকের আয় বাড়ালেই দেশের অনেকটা উপকার হতে পারে। কিন্তু যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ক্রমবর্ধমান আর্থিক উন্নতি সে পরিকল্পনাতে শ্রমনিয়োগ, কৃষি ও শিল্পের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ সব এক সঙ্গে হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে নূতন বৃহৎ শিল্প স্থাপনের প্রয়োজন নেই এটা মনে করা ঠিক হবে না—বরং বিশেষভাবে দেখা উচিত যে বৃহৎ শিল্পগুলি আমাদের আছে সেগুলিকে কীভাবে আধুনিক করে তোলা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একদিকে রাজ্যব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট, সেচ ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে সমগ্র গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত উন্নত কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের সুসংহত পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক উন্নতির অর্থ অনেক কমে যায় যদি সে উন্নতির সুফল সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

আরেকটি উৎকৃষ্ট ভেট উৎপাদন : নতুন তিন ভাবে কার্যকর **ভেট** পাউডার—

সাদা কিম্বা নীল : কাপড় ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে। রঙীন কাপড় সবচেয়ে উজ্জ্বল ক'রে।
কাপড় আর হাতের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।

Shilpi HPMA-388/72 Bon

কাঞ্চন রাগিণী

উপন্যাস

খবরটা জানা গেল কিনা সকালের খবরের কাগজ দেখে।

নমিতা ঘোষালের ঘরের মানুষের খবর, যে-মানুষ রোজকার মতো এই ঘরে তাঁর পাশে শুয়ে রাত কাটিয়েছে, যে-মানুষের সঙ্গে তাঁর সহজ স্বাভাবিক বাক্যালাপে ব্যাঘাত ঘটার মতো কোনো কারণও ঘটেনি। বেশি কথা বলার ধাত নয় মানুষটার এ অবশ্য আজ আঠের বছর ধরেই দেখে আসছেন তিনি। অনেক সময়েই খুঁচিয়ে পেট থেকে কথা বার করতে হয়। তা বলে এমন খবরও কাগজ পড়ে জানতে হবে, ভাগ্নে-ভাগ্নির মুখ থেকে শুনতে হবে। উত্তেজনায় হৈ-হৈ করে ওরা তাঁর ওপর এসে চড়াও হতে নমিতা দেবী নিজেই বিমূঢ় খানিক। ব্যাপারখানা কি তাও মাথায় ঢোকেনি চট করে। বড় ভাগ্নে সুদেব বলল, মামীমা তুমি সুদ্ধু মামার স্বভাবখানা রপ্ত করেছ, এমন খবরটা স্রেফ চেপে বসে আছ।

ওর প্রায় সমবয়সী মাসতুতো ভাই প্রবীরের লোক-চরিত্রের ওপর দখল বেশি, এই বয়সে অনেক ভোগান্তির ফলে তার জ্ঞানগম্যির তীক্ষ্ণ দিকটা বাড়ির লোকেরা একরকম মেনেই নিয়েছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসি ঝরিয়ে ও বলল, মিথ্যে মামীর দোষ দাও কেন, এক বাক্স মোহর পেলে তুমিও মাটি মাখিয়ে জলুস ঢাকতে—এই দিনের এটাই নিয়ম।

ওর বোন রেবা গেল বারে বি-এ ফেল করে এবারে আবার পরীক্ষা দেবার জন্যে বইপত্র ঝাড়া-মোছা করে সাজিয়ে নিয়েছে।

সে কলকল করে উঠল, এবারে আমি আর কোনো কথা শুনছি না মামী, মামাকে বলে আমার জন্যে একজন ইকনমিকস-এর মাস্টার রেখে দিতেই হবে। ওর ছোট বোন শিপ্রা ক্লাস এইটে পড়ে—ওদের ভাইবোনের মধ্যে এই মেয়েটা সুশ্রী, ফর্সা রং, ডাগর চোখ। দিদি আর দাদাদের আনন্দ দেখে ওরও কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। বলল, আর আমাকে সুইমিং ক্লাবে ভর্তি করে দিতে হবে।

নমিতা ঘোষাল বড় বড় চোখ করে ভাগ্নে-ভাগ্নিদের হাসি-মাখা মুখগুলো দেখলেন এক দফা। তারপর বললেন, এত আনন্দের কি হল হঠাৎ আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না -লটারির টিকিট-ফিকিট কিছু পেয়েছে নাকি তোদের মামা?

পয়সার মুখ দেখতে হলে এ ছাড়া আর কোনো পথ আছে বলে ভাবতে পারেন না নমিতা দেবী। বস্তুত, এই লটারি বস্তুটার ওপরই একটু যা দুর্বলতা তাঁর। সব কটা রাজ্যের সমস্ত সরকারই এই খেলা চালু করে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার উৎসাহ যোগাচ্ছে সকলকে। নমিতা ঘোষাল স্বামীর অগোচরে এ-যাবত দেশ-বিদেশের কম লটারির টিকিট কেনেননি। টিকিট কিনেই গোড়ায় গোড়ায় কল্পনায় তিন লক্ষ টাকা বাক্সবন্দি করে ফেলতেন। তারপর ওই টাকা দিয়ে কি হতে পারে না পারে তাই নিয়ে সীরিয়াস হিসেবের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন। এটা বেশ একটা মজার নেশার মতো। আর আকাশ-কুসুম স্বপ্নই বা এটাকে বলবেন কেন তিনি। একজন না একজন তো পেয়েই চলেছে লটারির প্রথম পুরস্কার। টিকিট না কিনে তিনি যদি প্রাপ্তির সুখ-কল্পনায় মগ্ন হতেন, সেটা হাস্যকর ব্যাপার হত। কাগজে লটারির ফলাফল বেরুলে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে নিরিবিলি অবকাশের অপেক্ষায় থাকতেন তিনি। সুযোগ এলে কাগজখানা নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করতেন। তারপর ট্রাংক থেকে সন্তর্পণে টিকিট বার করে নম্বর মেলাতে বসতেন। তখন বুকের তলায় কেমন একটা ঠক-ঠক কাঁপুনি ধরত। প্রথম সারির নম্বর মেলানো হয়ে গেলে একটা দুটো বড় নিঃশ্বাস পড়ত, অথচ একটু স্বস্তিও বোধ করতেন। উত্তেজনা উপশমের স্বস্তি সম্ভবত। ...দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ থেকে শুরু করে আরো হাজারো পুরস্কারের নম্বরের তালিকা থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজে টিকিটের সঙ্গে সেই সব নম্বরগুলিও মিলিয়ে দেখতেন একবার। না, তলার দিকের কোনো নম্বর মিলুক এটা তিনি চান না। ভাগ্য ফেঁসে যাবার সম্ভাবনা তাহলে। মিললে ওই প্রথম নম্বরটিই মিলুক, নইলে একটাও না।

যাই হোক, বছরের পর বছর অতগুলো টিকিটের একটারও নম্বর ভাগ্যের জালে আটকাতে না পেরে টিকিট কেনা এখন একেবারেই কমে এসেছে। হঠাৎ ঝোঁকের বশে কখনো সখনো দুই একটা কিনে বসেন। ঝোঁক হয়, কারণ ভাগ্যের ব্যাপারে তাঁর আস্থা এখনো একেবারে ঘষা-মোছা হয়ে যায়নি। তাঁর ঠিকুজিতে দুটি ব্যাপারে নাকি গ্রহনক্ষত্রের প্রবল প্রসন্ন দৃষ্টি। এক সপ্তমে বৃহস্পতি—সেটা স্বামীস্থান। দ্বিতীয় টাকার ঘরে তুঙ্গ শনি—বহু টাকার মুখ দেখার কথা নমিতা ঘোষালের। এই দুটো জোরালো ভাগ্যের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছিলেন, বিশ্বাস করতেও ভালো লাগত। বিয়ের পর স্বামী নিয়ে একটু আধটু বিচার-বিশ্লেষণও সংগোপনে করেছেন। একেবারে যে না মেলে এমন নয়—বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুশ্রী। কিন্তু তা বলে কল্পনার মানুষের সঙ্গে খুব যে একটা মেলে এমনও নয়। সেটা বিত্তের জলুস এত কম বলেও হতে পারে। অবিবাহিত মেয়েদের কল্পনার মানুষ সর্বদাই বিত্তবান। তাছাড়া আরো কি মেলে না নমিতা ঘোষাল ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেন না। সেটা সম্ভবত লোকটার এই চরিত্র—সকলের মধ্যে

থেকেও কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন একটু। নমিতা ঘোষালের বয়স এখন সাইতিরিশ, এই লোকের জীবনে এসেছেন উনিশে—কিন্তু এই আঠের বছরেও ওই লোকের বুকের তলার খুব একটা অন্তরঙ্গ হদিস পেয়েছেন বলে নিজেরই মনে হয় না। অবশ্য, এটা বাইরে প্রকাশের কথা নয়, মনের কথা। দীপন ঘোষাল, অর্থাৎ স্বামীরও স্ত্রীটির ঠিকুজির ভাগ্যের কথা শোনা ছিল। তিনি হেসে ঠাট্টাও করেছেন এই নিয়ে অনেক। বলেছেন, স্বামীর জায়গায় বৃহস্পতি বসে থাকলে তুমি আর টাকার মুখ দেখবে কি করে, ওই দেবতাটির তো শুধু চাল-কলা জোগানোর মুরোদ শুনি—

ঠাকুর-দেবতার নামে এমন অবজ্ঞার কথা শুনতে ভালো লাগে না নমিতা ঘোষালের। অথচ টাকার মুখ কোন ভাগ্যে দেখবেন তাও ভেবে পেতেন না। তুঙ্গস্থ শনি কি করতে পারেন না পারেন সে-সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। উল্টে শনির কথা শুনলে কেমন ভয় ভয় করে। তাছাড়া ওই তুঙ্গস্থ শনি তাঁর নিজের—স্বামীর নয়। তাঁর নিজের দ্বারা কি আবার হতে পারে? ঘষে মেজে বি-এ পাস করার আগেই বিয়ে হয়ে গেছল। দীপন ঘোষালের না-ছোড় তাগিদের চোটে বালির কাঁকরের মতো কাঁপতে কাঁপতে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর পাস করেছেন খবর বেরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর তাঁর নিজেরই ভক্তিশ্রদ্ধা কমে এসেছিল। দীপন ঘোষাল এম-এ পড়ারও তাগিদ দিয়েছিলেন—কিন্তু স্ত্রীটি তখন মুখের ওপর বলেছিলেন—কড়ুল দিয়ে কোপালেও এই মাথায় আর কিছু হবে না।

অতএব নিজের তুঙ্গ শনির বলে অঢেল টাকার মুখ দেখবেন সেই সম্ভাবনা বাতিল। কিন্তু সম্ভাবনাটা ফিরে আবার মাথায় ঢুকেছিল—রাজ্যে বাজ্যে লটারির হিড়িক পড়ে যেতে। ভাগ্য অনুকূল হলে কি না হতে পারে? আর স্বামীর ভাগ্যেই যে সব সময় সব-কিছু হবে তার কি মানে?

মোট কথা এই সব বিগত চিন্তা কাজ আর বিশ্লেষণের ফলেই ভাগ্নে-ভাগ্নিরা এসে চড়াও হতে স্বাগ্রে লটারির টিকিটের কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেটা যে কত অসম্ভব পরক্ষণে নিজেরই মনে হয়েছে। সব পুরস্কার হাতে গুঁজে দেবার লোভ দেখালেও ওই মানুষকে দিয়ে লটারির টিকিট অন্তত কেনানো যাবে না।

মামীর কথা শুনে সুদেব আকাশ থেকে পড়ল যেন। —কি কাণ্ড! মামা তোমাকেও বলেনি! লটারি বলছ কি, লটারির বাপ-ঠাকুর্দার চৌদ্দগুষ্টি সুদ্ধু পেয়ে গেছে মামা—এই দেখো, এই ভদ্রলোককে চেনো? হাতের ভাঁজ করা কাগজটা মামীর সামনে খুলে ধরল সুদেব। ছবির ওপরে বড় হরপের ছাপা নামও দেখালো।—দীপন ঘোষাল—এই নামটাও তোমার জানা আছে নিশ্চয়?

মামীর সঙ্গে এই রকমই অন্তরঙ্গ কথা-বার্তার ধরন-ধারণ ওদের। কাগজে স্বামীর ছোট ছবি দেখে প্রথমেই বুকের ভিতরটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল নমিতা ঘোষালের। তাঁদের মতো অতি সাধারণ ঘরের লোকের ছবি শুধু অঘটন ঘটলেই ছাপা হয়ে থাকে। ...কিন্তু না, খারাপ খবর ছেড়ে তেমন ভালো খবর না হলে এরা এভাবে ছুটে আসবে কেন!

—কি ব্যাপার পড়তো, আমি কিছুই জানি না!

কাগজ পড়ার আগেই রেবা ফড়ফড় করে বলে উঠল, মামার হাতের মুঠোয় এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকার দখল এসেছে—পরে আরো আসবে। এ ছাড়া এগারোখানা বড় বড় বাড়ি।

মাথাটা আচমকা কেমন ঝিমঝিম করে উঠল নমিতা দেবীর। দিনেদুপুরে হঠাৎ জেগে স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন তিনি? কি বলছে মেয়েটা পাগলের মতো। এক কোটি মানে একশ লক্ষ, তার সঙ্গে আরো উনসত্তর লক্ষ—তার ওপর এগারোখানা বড় বড় বাড়ি!

নমিতা ঘোষাল কাগজের খবর শোনার তাগিদ ভুলে ফ্যালফ্যাল করে রেবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

যাই হোক, এর পর সুদেবের আগ্রহে কাগজের খবর তার কানের ভিতর দিয়ে একটু একটু করে মগজে বসতে লাগল। সংবাদের সার মর্ম :

সোনাঝোড়ার বৃদ্ধ কুমার দেব বাহাদুর তাঁর বিপুল সম্পদ এবং বিষয়-আশয়ের এক অংশ জনহিতকল্পে দান করেছেন। একটি নবগঠিত বোর্ড (দেব-ট্রাস্ট) অব ট্রাস্ট-এর হাতে এই দানের বিত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হয়েছে। কুমার দেব বাহাদুরের দানের এটি প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ে তিনি নগদে এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা এবং শহরের বিভিন্ন অভিজাত এলাকায় এগারো-খানা প্রাসাদোপম অট্টালিকা বোর্ডের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই বাড়িগুলো থেকেও দেব-ট্রাস্ট এর তহবিলে মাসে দুলক্ষ টাকার ওপর জমা পড়বে। বোর্ডের জনহিত অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কুমার বাহাদুর আরো কিছু দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বৃদ্ধ কুমার দেব বাহাদুর জনহিতের এই সামান্য কাজে আসতে পারার জন্য নিজের এবং ট্রাস্ট-এর সভ্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বিশেষ করে একটি মানুষের প্রতি তিনি তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন—যে মানুষটি হলেন তাঁর নিজস্ব উকিল। বহু পেশা অগণিত লোক এই কর্মপরিকল্পনায় এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি অধ্যাপক দীপন ঘোষাল। তিনি এই বোর্ড অব ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি। বোর্ড অব ট্রাস্ট-এর প্রধান এবং গুরু দায়িত্বভার তাঁর যোগ্য হাতে অর্পণ

কথাশিল্প সম্ভার

কল্লোলের কাল ১৫·০০
জীবেন্দ্র সিংহ রায়
একদল তরুণের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের যে পালাবদল ঘটেছিল তারই অনবদ্য প্রামাণ্য কাহিনী। কল্লোলের সমগ্র সূচীপত্র-সম্বলিত।

রবীন্দ্রসম্ভব কাব্য ১৪·০০
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
হীরেন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখেন তখন এমন উপভোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় যা পাঠকমাত্রেরই কাম্য।

ভারতীয় সঙ্গীত কোষ ১৬·০০
বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ঘরাণার আনুপূর্বিক তথ্যসহ ভারতীয় ভাষায় সঙ্গীতের একমাত্র কোষগ্রন্থ। আনন্দমেলা পারফরমেন্সপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

শ্রীনন্দলাল বসু ৬·৫০
কানাই সামন্ত
বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্ম বিষয়ে রসজ্ঞ আলোচনা ও মুখ্য চিত্রপঞ্জী। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

কথাশিল্প : ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা — ১২

করতে পেরে তিনি নিশ্চিন্ত এবং আনন্দিত।

কাগজে বড় করে প্রথমে কুমার দেব বাহাদুরের ছবি তারপর ছোট করে দীপন ঘোষালের।

সব জানার পরেও ভাগ্যের এমন সাংঘাতিক কি উত্থান ঘটল নমিতাদেবী ভেবে পেলেন না। বলেই ফেললেন, এ তো সব পরের ব্যাপার, এতে নিজেদের কি হল?

চৌকস ভাগ্নে প্রবীর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠল ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাতে তার নিজের কি হল?

ওর মন্তব্যটা সুদেব আর একটু বিশ্লেষণ করে দিল। —চাকরি করেও আজকের দিনে তুমি কোন যুগে যে বাস করছ মামী, তুমিই জানো। সবকিছু আজকের দিনে নির্ভর করে কন্ট্রোলের ওপর—কন্ট্রোলটা কার দেখতে হবে। ওই গোছের এগারোখানা বাড়ির দামই আজকের দিনে ছ-সাত কোটি টাকা, তার ওপরে নগদ—এমন এক বিরাট ব্যাপারের কর্তৃত্ব পাওয়া কি জিনিস বুঝছ না। মামা এবপর হাত ঝাড়লেই ধুলোর বদলে সোনা ঝরবে।

ভাগ্নে চাকরির খোঁটা দিলেও সৌভাগ্যটা গোটাগুটি মাথায় ঢুকল না নমিতাদেবীর। আজ দুবছর হল বাড়ির কাছের একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে চাকরি করছেন তিনি, মাইনে সর্বসাকুল্যে দেড়শ টাকা, মনটেসরি ট্রেনিংটা নিয়ে ফেলতে পারলে আরো কিছু বাড়ে সেই চিন্তা মাথায় আছে।

কলেজের মাস্টার স্বামীটি রাতারাতি সম্পন্ন হয়েছেন এটুকুই বুঝলেন তিনি। এর ফলে মাসের আয় কতটা বাড়ল বা আদৌ বাড়ল কিনা তাতে সন্দেহ আছে। হয়তো না বিনা পয়সাতেই খাটা-খাটনির দায় নিয়ে বসে আছেন। কলেজের কত মাস্টার ছেলে পড়িয়ে মাসে চার-পাঁচশ টাকা বাড়তি রোজগার করে শোনেন। আর, বাড়ি এসে ছেলে-মেয়েরা তাঁর ঘরের লোকের কাছে বিনা পয়সায় পড়ে যায়। সময়ে অসময়ে আবার তাদের চা-জলখাবার খাওয়ানোরও তাগিদ।

এতোক্ষণ বাদে একটা অভিমান ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগল। ভাগ্নে-ভাগ্নিদের বিশ্বাস অথবা আনন্দের ভাগীদার হতে পারলেন না। যাই হোক সুখবর তো একটা বটে, এমন বিপুল সম্পদ নাড়াচাড়া করার ছাড়া কজনের হয়। কিন্তু এ খবর তাঁকে জানতে হল খবরের কাগজ থেকে আর এখনো মুখ থেকে। জীবনের সঙ্গে সত্যিও তিনি যে ওই লোকের কাছাকাছি নেই তাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে।

একটা তির্যক ঝাপটা মেরে ওদের ঘর থেকে বিদায় করতে চাইলেন নমিতা ঘোষাল। —তবে আর কি, মামা হাত ঝাড়লে সোনা ঝরবে আর তোরা সেই সোনা ধুয়ে জল খাবি, এখন বাতাসে ভাসগে যা সব—আমার অত আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখার সময় নেই। যে বড়লোক হয়েছে তার কাছে যা।

অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড ১৪·০০

আনুমানিক ৯ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। ১০·০০ টাকা অগ্রিম দিয়ে ২০শে আগস্টের মধ্যে গ্রাহক হ'লে প্রথম খণ্ড ১৪·০০ টাকার স্থলে ১২·০০ টাকায় পাবেন। অন্যান্য খণ্ডে ২০% কমিশন পাবেন। শেষ খণ্ড নেওয়ার সময় অগ্রিম বাদ যাবে।

চটজলদী কবিতা ও বাদশাহী গল্প ৪·০০

শিবনারায়ণ রায়ের
কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা ৭·৫০

বিনয় ঘোষের
বাংলার বিদ্বৎ সমাজ ৭·৫০

দেবল দেববর্মার নতুন উপন্যাস
বাড়ি ৮·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর
সতীনাথ বিচিত্রা ৮·৫০
দিগ্‌ভ্রান্ত ৯·০০
জাগরী ১২শ মুদ্রণ ৭·০০

চাণক্য সেনের
রাজপথ জনপথ নতুন মুদ্রণ ১০-০০

নারায়ণ সান্যালের
নাগচম্পা ২য় মুদ্রণ ৯-০০

যজ্ঞেশ্বর রায়ের
বালজাক দাম ঃ ৫-০০

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সোনার চেয়ে দামী ১ম ২·২৫

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরোগ্য নিকেতন ৮ম মুদ্রণ ১১-০০

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তীর
মধুবন দাম ঃ ৭-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
হাঁসের আকাশ দাম ঃ ৪-০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
মন্দাক্রান্তা দাম ঃ ৬-০০

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের
রুদ্ধ যাযাবর ৮-৫০

বিমল মিত্রের
কথাচরিত মানস ৬-০০

বনফুলের
সন্ধিপূজা দাম ঃ ৬·৫০

প্রবোধকুমার সান্যালের
অগ্নিসাক্ষী দাম ঃ ৪·৫০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
বরযাত্রী ও বাসর দাম ঃ ১০·০০

আমাকে জাগতে দাও আমাকে বাঁচতে দাও ৪-০০ ॥ মণীন্দ্র রায়
আমার জীবন ১৫-০০ ॥ মধু বসু
অথৈ জলে মানিক ৬-০০ ॥ দেবল দেববর্মা

জরাসন্ধ-র
লৌহকপাট ৩য় খণ্ড ৬·০০
ন্যায়দণ্ড ৭ম মুদ্রণ ৭·০০
উত্তরাধিকার দাম ঃ ১০·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
আবার আমি আসব ৬·৫০
বলাকার মন ৭·০০

প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সুদেব বলল, বা রে মামা কি বাড়িতে বসে আছে নাকি, কাগজ আসার আগে সেই কোন সক্কালে চা খেয়েই বেরিয়ে গেছে, সেই জন্যেই তো তোমার কাছে জানতে এলাম ব্যাপারখানা কি—এখন দেখছি তুমিও আমাদের মতোই অন্ধবিশ্বাসী জানো।

জ্বালার ওপর নুন ছড়িয়ে চোকস ভাগ্নে বীরু অর্থাৎ প্রবীর মন্তব্য করল, মামা সিক্রেট সার্ভিসে ঢুকলে এর থেকে ঢের বেশি উন্নতি করতে পারত। রা-খবর! ডান হাতের খবর বাঁ-হাতের কাছেও গোপন!

বিরক্ত মুখে নমিতাই ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন। তাঁর তাড়া আছে বইকি। সকাল আটটায় স্কুল, কিন্তু সাতটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। পাশের লোক বিছানা ছেড়ে যায় ভোর সাড়ে চারটায়, পাঁচটার মধ্যে বেবা প্রথম দফা চা করে দেয় তাকে। ওই মেয়েটাকে রাত থাকতে ওঠা অভ্যেস। ঘুম থেকে উঠে নমিতা আর চোখে মুখে পথ দেখেন না। এক ঘন্টার মধ্যে নিজের চান পর্যন্ত সেরে, চা-বিস্কুট গলাধঃকরণ করে রাঁধুনিকে রান্না বুঝিয়ে দিয়ে স্কুলে ছোটেন। কাছেই স্কুল, তবু হাঁপ ধরে যায়। দু-চার মিনিট লেট হলেও কিন্ডারগার্টেনের মালিক শিক্ষয়িত্রী বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। তাঁর মতে ছোট মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করা ভালো রকমের অপরাধ। দুই শিফট-এর স্কুল। আটটা থেকে এগারোটা আর বারোটা থেকে তিনটে। ফলে কয়ে সকালের শিফট বদলে নেওয়া চলে হয়তো, কিন্তু দুপুরে তাহলে বাড়ি খালি পড়ে থাকে। রাঁধুনি আর ঝি দুটোই ঠিকে। সাড়ে এগারোটার পরে ছুটি ওদের। এগারোটা বেজে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে নমিতা স্কুল থেকে চলে আসেন। সপ্তাহের মধ্যে বেশির ভাগ দিনই দীপন ঘোষালের ধারোটার ক্লাস—তিনি আবার দিন-রাত দুই শিফট-এই পড়ান কলেজে। ফলে সকাল থেকে নমিতার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় দুপুরে আধ ঘন্টার জন্যে আর রাত নটার পরে। ছুটির দিন ভিন্ন বাক্যালাপের অবকাশ এমনিতে কম। তা বলে এরকম একটা খবর না বলতে পারার মতো কম নয়।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নমিতা ঘোষালের মেজাজ্জা বিগড়েছে। দ্রুত তালে বেরুবার জন্য তৈরি হতে হতে মনে মনে ভেবে নিলেন। দুপুরের শিফট এ বদলি হবার জন্য আজই তিনি অরুণাদির কাছে তদবির করবেন। সাত সকালে এভাবে ছোটাছুটি করতে বয়ে গেছে তাঁর। দুপুরে বাড়ি পাহারার জন্য লোক রাখুক, বা যে ব্যবস্থা হয় করুক। একজন আদরের ভাগ্নের (বীরু) তো দুপুরের খাওয়া সেরে রোজ, হাওয়া খেতে বেরুনো চাই—তাকে বলুক বাড়ি পাহারা দিতে। তাঁর রোজগারের দেড়শ টাকা সংসারে কাজে লাগে না এমন কথা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে? স্ত্রীকে হাতখরচ দিতে হয় না জামা-কাপড় জোগাতে হয়? স্নো ক্রিম পাউডার ছেড়ে সকলের দাঁত মাজার পেস্টও তা তাঁকেই কিনে আনতে হয়। এছাড়া সংসারের খুঁটি-নাটি অনেক খরচও তাঁর তবিল থেকেই হয়। মাস গেলে দেড়শ টাকার দেড় টাকাও বাঁচে না।

এসব চিন্তা নমিতা ঘোষাল আগে কখনো করেননি। কিন্তু আজ না করে পারছেন না। একটা লোক সর্বব্যাপারে চোখ বুজে থাকলে কতকাল সহ্য হয়? কিন্তু স্কুলে গিয়ে অরুণাদিকে কিছুই বলা হল না। মনেও থাকল না। একগাদা কচি-কাঁচা নিয়ে তিনটি ঘন্টা হিমসিম দশা।

বাড়ির দিকে পা বাড়ানোর পর মনে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষোভ কিছুটা হাল্কা হয়েছে। কয়েক কোটি টাকা খরচের কর্তৃত্ব পেয়েছে তাঁর ঘরের মানুষ চিন্তা করতে গেলে মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো ব্যাপার। এরকম কর্তৃত্ব তাঁর হাতে এলে হার্টফেল করতেন হয়তো। স্কুলের অরুণাদির কর্তৃত্ব করার বরাত দেখেই মনে মনে অনেক সময় হিংসে হয় নমিতাদেবীর। কিন্তু কোটি টাকার কথা শুনলে ওনারও চক্ষু ছানা-বড়া হবে বোধ হয়। বাড়িভাড়া আর বাড়ির দাম ছাড়লেও নগদ হাতে এসেছে এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা।

—মেমসাব, জেবা দেখকে চলিয়ে।

নমিতা ঘোষাল লাফিয়ে ফুটপাথে উঠে বাঁচলেন। মুখ লাল। বক্র কটাক্ষে রসিকতা করে ট্যাকসি ড্রাইভার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। লোকটার দোষ কি, নাক বরাবর গাড়িটা আসছে দেখেও তাঁর হুঁস নেই—ফুটপাথ ছেড়ে কখন রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে শুরু করেছিলেন তাও জানেন না।

নিজের ওপরেই রাগ হয়ে গেল নমিতার। মোটা অংকের টাকার নামেই তাঁর অমন মাথা গরম হয়ে যায় কেন! জীবনের স্বপ্ন আর সাধ-আহ্লাদ অবশ্য কিছু ছিল। সে-সব মেয়েরই থাকে। শতকে একটা মেয়েরও জীবনে সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে আসে না, সব সাধ আহ্লাদ মেটে না। তা বলে তাঁর মতো টাকার কথা ভাবতে ভাবতে ট্যাকসি চাপা পড়তে যায় কে!

রাগটা এবারে আবার স্বামীর দিকেই মোড় ঘুরল। আসলে ওই লোকের ব্যবহারেই তাঁর অমন মাথা গরম হয়ে যায়। কি হল না হল বা কি হতে যাচ্ছে না যাচ্ছে তাঁকে খোলাখুলি বলে গেলে মাথায় সতের চিন্তার জট পাকাতো না। স্বামীর সুখ-দুঃখের কতটা অংশীদার তিনি ওই ভাগ্নে-ভাগ্নির গুষ্টিও খুব ভালো করেই টের পেয়েছে।

একাকী জোনাকি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

আলোড়নসৃষ্টিকারী, বাস্তবধর্মী ও নবতম উপন্যাস। ৫৲

অনেক দূরের পথ
বিশ্বনাথ রায় ৫৲

দুর্জয় দুর্গ
শ্রীপান্থ ৬৲

নিভৃত আকাশ
আশাপূর্ণা দেবী ৫৲

কুবেরের অভিশাপ
গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৫৲

বিচার চাই
বেদুইন ৮৲

আরেক ফাল্গুন
জহির রায়হান ৫৲

লেন বাই লেন
কনিষ্ক ৭৲

ইষ্টিশান আমলাপুর
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৲

কিশোর-সাহিত্যের পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ॥

গোপা প্রকাশনী ॥ ১৯ শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

...রাগের মুখেও নমিতাদেবীর মাথায় এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকার অংকটাই ঘুর ঘুর করছে।...এক কোটি মানে একশ লক্ষ...তার সঙ্গে আরো উনসত্তর লক্ষ... তার সঙ্গে মাসে আরো দু'লক্ষ বাড়ির আয়.. না মাথাটা ভয়ানক ঝিমঝিম করছে। আসলে তাড়াহুড়োয় আজ চান করে আসা হয়নি, এই জন্যেই ওরকম হচ্ছে ভাবতে চেষ্টা করলেন। ...কিন্তু এরকম একটা কান্ড কি করে ঘটল? মাস-দেড়েক যাবত কর্তাটিকে ভয়ানক ব্যস্ত দেখছিলেন বটে। বাড়ি ফিরতে এক-একদিন রাত এগারোটা হচ্ছিল। তারপরেও রাত জেগে আর ওদিকে সকাল থেকে কিসব লেখা-পড়ায় তন্ময় দেখেছেন। নমিতাদেবী ধরেই নিয়েছিলেন কলেজের যা ছাত্র পড়ানোর বেগার খাটনি কিছু। লোকের উপকার করে বেড়ানোর নেশা থাকে কারো কারো, তাঁর ভদ্রলোকটিরও তাই। ভাঙ্গন-ভাঙ্গন পরিবৃত এ সংসারে এসেই তিনি সেটা টের পেয়েছেন। তারপর এত বছরে আরো কতো দেখেছেন। যাক যা ভাবছিলেন এখন মনে হচ্ছে ইদানীংকালের ব্যস্ততা আর কাজের তন্ময়তা এই জন্যে—এত বড় এক ব্যাপার নিয়ে পড়ে ছিল বলে।

...তবু অসাধ্যসাধন ছাড়া আর কি? কি করে এমন এক কান্ড তাঁর ঘরের লোক করে উঠতে পারল জানার জন্যে ভিতরটা উসখুস করছে। দাতা মানে যে বুড়ো একবারে এতবড় দান করে বসলেন—সোনা-জোড়ার সেই কুমার দেব বাহাদুরকে নমিতা ঘোষাল গত ছ'বছরের মধ্যে কম করে আট-নবার দেখেছেন তিন হাতের মধ্যে বসে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন, ছয় বছরে তাঁর দেওয়া ছয় দফা সোনার গয়না নিরাপদে রাখার জন্য ব্যাঙ্কের লকার ভাড়া করতে হয়েছে—সোনার দর এখন চারশ টাকার মতো, ছ বছরে অন্তত তিরিশ ভরি, বেচলে দাম হবে বারো হাজার টাকা—নমিতার কাছে এটুকুই ঐশ্বর্যের মতো। এ ছাড়া ছ বছরে বারোখানা দামী শাড়ি এসেছে ওই বুড়োর কাছ থেকে, অনুষ্ঠানে উৎসবে তাঁর পরনে সেই শাড়ি দেখে অরুণাদিরও চোখ ঠিকরে গেছে। বুড়ো কথায় কথায় মা-লক্ষ্মী মা-লক্ষ্মী করেন তাঁকে, ওই সব উপহারের ব্যাপারে কর্তা গোড়ায় গোড়ায় জোরালো বাধা দিতে চেষ্টা করেছেন, বুড়ো তখন তাঁকেই চোখ রাঙিয়েছেন, ছেলে তাঁর মা-কে দিচ্ছে তার মধ্যে তুমি কথা বলার কে হে!

...তাঁর বসত বাড়ি দেখেও চোখ কপালে উঠেছিল নমিতা ঘোষালের, গোটা তিনেক প্রাসাদ জুড়ে একখানা বাড়ি করা হয়েছে—বিশাল মহলের পর মহল পেরুলে তবে অন্দরমহল। বুড়োর তিন ছেলে, তাদের বিষয়-সম্পত্তি আলাদা। বুড়ো চোখ বুজলে ওই বাড়িও তারা ভাগ করে নেবে। কিন্তু এত বিত্তের কুমার বাহাদুর বা তাঁর ছেলেদের দেখে গোড়ায় গোড়ায় হাসি চাপা দায় হত নমিতার। দামী ধুতি খাটো করে পরা চাই বাড়িতে, ময়লা বা আধ-ময়লা হলেও ভ্রূক্ষেপ নেই, গায়ে সেই গোছের ফতুয়া, পায়ে রবারের চপ্পল থাকতে পারে না-ও থাকতে পারে। শ'-দেড়শ টাকা মাইনের বাজার সরকারদের যেমন বেশবাস হয়। শুনেছেন, পাড়া-পড়শীরা সকাল-সন্ধ্যায় নমস্য পর্যন্ত করে না ওই পরিবারের—কৃপণতার কৌলিন্য তাঁদের এমনই অথচ এই বিশাল সম্পত্তি বা টাকা এমনি হয় নি, বংশগত আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা ছিল তাঁদের, নিজেদের জাহাজ ছিল, বহু লোক খাটা-খাটনি করত, জীবিকা অর্জন করত। ছেলেদের অত বড় ব্যবসা চালানোর অযোগ্যতা দেখে তাঁদের বিচক্ষণ বাপটি বেশ চালু অবস্থাতেই বিপুল অর্থের বিনিময়ে কোম্পানী অপরের হাতে তুলে দিয়েছেন। সুদে টাকা খাটানোর নেশা বুড়োর সম্প্রতি গেছে, কিন্তু তাঁর ছেলেরা এখনো এই কারবারটিই ভালো বোঝেন। নিজস্ব রোজগারের এই দিকটা তাঁরা এখনো ধরে বসে আছেন। এ ছাড়া পৈতৃক সম্পত্তিও অঢেল ছিল।

এঁদের পারিবারিক আচার-আচরণ আজও অনেকটা সে-কালের পাতায় আঁকা আছে। বাড়ির বৃদ্ধ কর্তাকে ছেলেরা এখনো 'বাবামশায়' বলেন। নমিতা ঘোষালকে সেই বৃদ্ধ মা ডেকেছেন, অতএব অত বড় বড় ছেলেরা তাঁকে ঠাকুমা ডাকেন, পায়ের দিকে চেয়ে কথা বলেন। গোড়ায় গোড়ায় লজ্জায় মুখ লাল হত নমিতার, এখনো অস্বস্তি বোধ করেন।

এ হেন পরিবারকে এত বড় দানের মধ্যে টেনে নিয়ে আসা কম কথা নয়। এই অসাধ্য-সাধন যে মানুষটি করতে পেরেছেন এটা নমিতা ঘোষাল বিশ্বাস করেন। লোকের উপকার করে বেড়ানোর নেশা এবারে টাইটম্বুর হবে। বিশাল বিত্তের

শিশুসাহিত্যের সম্রাট সুনির্মল বসুর রচনাসম্ভার ছাপা চলছে, পুজোর পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে।

সুনির্মল রচনা-সম্ভার

দু' খন্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক মূল্য ২০৲। ৫৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। সম্পাদক ঃ নির্মলেন্দু গৌতম ও হরিবন্ধু মুখটী।

ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী ২৫৲ রঙ্গলাল রচনাবলী ৯৲

যথাক্রমে ৩ খন্ডে এবং ১ খন্ডে সম্পূর্ণ। প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন।

নবীনচন্দ্র সেনের রচনাবলীও ছাপা চলছে, প্রথম খন্ড পুজোর পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে।

নবীনচন্দ্র রচনাবলী

চার খন্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহক মূল্য ৪০৲ টাকা। লাইনো ছাপা। অতীব সুন্দর বাঁধাই। এখনও ১০৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে পারেন।

পুস্তক বিক্রেতাগণ আগামী ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত বিশেষ সুযোগ পাবেন। সত্বর যোগাযোগ করুন।

দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শাখা ঃ দত্ত চৌধুরী, ডি এম লোহিয়া রোড, তিনসুকিয়া, আসাম।

অধিকারী ওই মানুষটির ওপর দখল বিস্তারের এমন যোগাযোগ কি করে ঘটল মনে পড়তেই নমিতা ঘোষাল শিউরে উঠলেন এক দফা, যখনই মনে পড়ে শরীরের রক্ত সিরসির করে পা বেয়ে নামতে চায়। ঠাকুর রক্ষা করেছেন রক্ষা করে তারপর এইভাবে মুখ তুলে চেয়েছেন।

নমিতা দেবী বাড়ির দরজায় পৌঁছুলেন। বাড়িটার দিকে চেয়েই আজ যেন চোখে কাঁটা বিঁধল তাঁর।...ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেই কি, সকলে তাঁর দাক্ষিণ্য নিতে পারলে তো। স্বামীর পৈতৃক বাড়ি এটা, জরাজীর্ণ বিকল-দশা। এমন নামী রাস্তার ওপর বাড়ি, সংস্কার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে পারলে ছবির মতো দেখাতো। হাজার, বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ করে কিছু বাড়িয়ে কিছু মেরামত করে, নতুন ধাঁচের ডাইনিং স্পেস আর বাথরুম বানিয়ে আগাগোড়া রং পালিশ করে নিতে পারলে বাড়িটার চেহারা কেমন হয় কল্পনায় সেই ছবি নমিতা ঘোষাল বহুবার দেখেছেন। বিশেষ করে যখন খুব লটারীর টিকিট কিনতেন, তখন। সে-ভাগ্য না থাকুক, অন্য ভাগ্য দোর-গোড়ায় সেধে এসে-ছিল। কোটি-কোটি টাকার দান-ছত্র খুলে বসতে পারার আনন্দে বিভোর হয়ে আছে যে মানুষ, মুখ ফুটে সে একটু আভাস দিলে ওই বুড়ো কুমার বাহাদুরই সানন্দে করে দিতেন সব। বাড়িতে ঢোকার মুখে আজই সেই অবহেলিত সুযোগের কথাটা সব থেকে বেশী করে মনে হল নমিতা ঘোষালের। সেই সঙ্গে এও মনে হল, শুধু বাড়ি কেন, সর্ব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে কাল কাটানোর মতো ব্যবস্থাও হতে পারত। আভাসে ইঙ্গিতে ওই কুবের-বুড়ো সেই টোপ অনেকবার ফেলেছেন—এই করে বামুনের রক্তপাতজনিত অকল্যাণের ভাবনা ঘোচাতে চেয়েছেন। নমিতা দেবীর নিশ্চিত ধারণা, অন্য যে-কোন লোক দিন-ফেরানোর সেই সুযোগ লোল আনায় নিত। কিন্তু তাঁর ভদ্রলোকটি কানে তুলো গুঁজে শুধু হেসেছে আর ঘরে বসে বুড়োর উদ্দেশে টিপ্পনী কেটেছে।

আশা আর বাসা বড় করতে না জানলে বরাত যাবে কোথায়।

বাইরের দরজা খোলাই ছিল।

একটা ক্ষোভভরা তপ্ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নমিতা ঘোষাল ভিতরে পা দিলেন।

।। দুই ।।

বিরক্ত মুখ এগিয়ে এসে বীরু তড়বড় করে বলে উঠল, সেই কখন থেকে ঘর-বার করছি, বেরুনো ভয়ানক দরকার, কারো পাত্তাই নেই—

নমিতা দেবী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। রোদে-গরমে মুখ তেতে আছে। মনে মনে বললেন, বেরিয়ে তো আমাদের উদ্ধার করবি। —কেন, তোর মামা এরই মধ্যে কলেজে চলে গেলেন?

—কলেজ! মামার মাথায় কোটি-কোটি টাকা গিসগিস করছে এখন আর তোমার মাথায় কলেজ ঘুরছে — ফেরেই নি এখনো।

ক্লান্ত পায়ে সে তার ভয়ানক দরকারী কাজে চলল। নমিতা দেবী ফিরে দরজার দিকে এগোলেন, দরজা বন্ধ না করলে চোর ছ্যাঁচড় ঢুকে পড়বে।

দরজা বন্ধ করা হল না। একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল। আর তার থেকে নামলেন দীপন ঘোষাল। স্ত্রীকে একবার দেখে নিয়ে ট্যাকসির ভাড়া মেটাবার জন্য ব্যাগ বার করলেন। ওদিকে ভাগ্নে বীরুও গজ দশেক দূরে রাস্তার ওপরেই দাঁড়িয়ে গেছে। ট্যাকসি থেকে মামা নামল দেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আবার।

ভাড়া মিটিয়ে ওকে দেখে দীপন ঘোষাল দাওয়ায় উঠতে উঠতে জিজ্ঞাসা করলেন, চললি কোথায়?

এই ফাঁকটুকুর মধ্যেই নমিতা দেবী তাঁর মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করে নিলেন। শ্রান্ত মূর্তি। কোটি-কোটি টাকার কোন চেকনাইয়ের ছিটে-ফোঁটাও নেই ওই মুখে—ট্যাকসি থেকে নামল এটুকুই যা ব্যতিক্রম।

তাঁর পিছনে দাওয়ার দিকে পা বাড়িয়ে বীরু জবাব দিল, হ্যাঁ...না বেরুলেও চলে অবশ্য, কিছু দরকার আছে?

না বেরুলে চলে এমন কথা ওর মুখে বড় একটা শোনা যায় না। নমিতা দেবী হঠাৎ তেতে উঠলেন কেন নিজেও জানেন না। —এই না একটু আগে বললি বেরুনো ভয়ানক দরকার তোর—কোটি টাকার গন্ধ পেয়ে দরকার শেষ হয়ে গেল?

বীরু দাঁড়িয়ে গেল। মামার পিছন থেকে মামীকে একটা ভেঙচি কাটল, তার-পর হাসিমুখে সত্যিই প্রস্থান করল।

সামনে এগিয়ে দীপন ঘোষাল কটাক্ষে স্ত্রীর মুখখানা দেখে নিলেন একবার। —কি ব্যাপার, ওর ওপর অত ঝাঁঝ কেন?

নমিতা দেবী জবাব দিলেন না। শব্দ করে দরজা বন্ধ করে হুড়কো তুলে দিলেন। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন।

—তুমিও স্কুল থেকে এই ফিরলে বুঝি?

জবাব না পেলে ঘুরে তাকাবে। জবাব দিলেন। —হ্যাঁ।

দোতলার তিন ঘরের মধ্যে আলাদা করে বসার ঘর বলে কিছু নেই। পাশাপাশি বড় দুই ঘরের একটাতে নিজেরা থাকেন, অন্যটায় রেবা আর শিপ্রা থাকে। কোণের ছোট খুপরিটা দীপন ঘোষালের একেবারে নিজস্ব এবং প্রায় নিষিদ্ধ এলাকা। সমস্ত ঘর বইয়ে ঠাসা, মাঝে একখানা মাত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনবেদ
হেনা চৌধুরী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ১০৲
শার্লক হোমস্ ফিরে এলেন
কোনান ডয়াল/অদ্রীশ বর্ধন ১০৲
বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা (পুরস্কৃত) ১০৲
জান মান মাটি
বিকাশ-এর উপন্যাস ৬৲
অজানিতার সন্ধানে (উপন্যাস)
গর্ডন ডিকসন/আদিত্য ভট্টাচার্য ৪·৫০
যা দেখেছি যা বুঝেছি
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (পুরস্কৃত) ২·৫০
এ লড়াই বাঁচার লড়াই
দুর্বাদল চ্যাটার্জী (নাটক) ৩৲
বাঁচতে সবাই চায় ৩·৭৫
কেটে যাবে মেঘ ২·৫০
অবাঞ্ছিত শিশু ৩৲
বিয়ের আগে ভালোবাসা ৩৲
ডঃ অসীম বর্ধন

আপনার বই প্রকাশ করবেন?
পাণ্ডুলিপি পাঠালে দশ দিনের মধ্যে সম্পাদকীয় মন্তব্য পাবেন।
অ্যালফা-বিটা
পাবলিকেশন্স্ লিমিটেড
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

দীপক দে'র রম্যরচনা
কলকাতা দেখেছি ৩·০০
মৃগাঙ্কর — "অম্ল-মধুর সমালোচনায় বেশ মুন্সীয়ানা রয়েছে।"
বসুমতী — "আধুনিক কলকাতার রূপটাই ফুটে উঠেছে।"
ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ বিধান সরণি। লিপিকা, ৩০।১ কলেজ রো

চেয়ার আর একটা ছোট টেবিল—মাথার ওপর ছোট পাখা।

দীপন ঘোষাল দেওতলায় উঠে সোজা ওই ঘরের দিকে চলে গেলেন।

নমিতা দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে দেখলেন।

...জামার পকেট থেকে এক গোছা কাগজপত্র বার করে টেবিলে রাখা হল, তারপর ওদিক ফিরেই গায়ের জামা খুলে চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে পাখার সুইচ টেনে দিয়ে চেয়ারে বসা হল।

এদিক ফেরার আগেই নমিতা দেবী ঘরে ঢুকে গেলেন। অসহিষ্ণু হাতে পাখার রেগুলেটারের সবটাই ঘুরিয়ে দিয়ে শব্যাগ বসলেন তিনিও। ঠাণ্ডা থাকতে চেষ্টা করছেন অথচ ভিতরটা সেই থেকে গনগনে হয়েই আছে।

মিনিট কতক কাটল। নমিতা ঘোষালের বাইরেটা ঠাণ্ডা কিন্তু ভিতরটা এমনিতেই ছটফটে ধরনের। কতক্ষণ আর চুপচাপ বসে থাকা যায়। উঠলেন। পাখা বন্ধ করলেন। পরনের শাড়ি আর জামা বদলে গামছা আর এক দফা ধোয়া শাড়ি ব্লাউস কাঁধে ফেললেন। তারপর মাথায় তেল মাখতে শুরু করলেন। কিন্তু ওদিক থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই এখনো।...ট্যাকসি থেকে নামাটা নমিতার খুশি হবার মতোই ব্যতিক্রম, সমস্ত রকমের বাজে খরচ চক্ষুশূল লোকটার—তেমন সাংঘাতিক দরকার পড়লে ট্যাকসি চাপো আপত্তি নেই। বাজে খরচা এবং খরচসাপেক্ষ বাজে অভ্যেসের জন্য ভাগ্নে-ভাগ্নিদের অনেক উপদেশ শুনতে হয়।...স্কুল কলেজেও আজ ছুটি থাকার কোনো হেতু নেই, নিজের স্কুল ছিল শিপ্রা স্কুলে গেলে, রেবা কলেজে—তাহলে ধরে নিতে হবে এই লোকের আজ কলেজ কামাই। এটা আরো বিস্ময়কর ব্যতিক্রম।... একবারই তিন সপ্তাহের ছুটি নিতে দেখেছিলেন সেটা আজ থেকে বছর পনের আগে। অন্য যে-কোনো লোক হলে তিন মাস ছুটি নিত, স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে চলে যেত। দেহের সংকটের থেকে নমিতার মনের সংকট কম ছিল না তখন।.. বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ছেলেপুলে হয়নি কারণ ওই লোকের তখন সেটা কাম্য ছিল না। নতুন লেকচারার, পড়ানোর এতটা দামও হয়নি তখনো, পোষ্যসংখ্যা তখন আরো বেশি—শাশুড়ী বেঁচে, বিধবা দুই বোন তাঁদের মুখাপেক্ষী. ওদের এই ছেলেপুলেগুলোও ছোট—মাস চালাতে হিমসিম অবস্থা। তার মধ্যে অনাদরের আগন্তুক কোনো সুস্থবুদ্ধির মানুষ চায় না।

...কিন্তু সুদিনের মুখ দেখার আগেই এক মারাত্মক ফাঁড়ার মধ্যে পড়ে গেলেন নমিতা। রোগের বৃত্তান্ত অত আর মনে নেই, মোট কথা ধার-দেনা করে একটা মস্ত অপারেশনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সেই সংগে কোন সম্ভাবনা নির্মূল হয়ে গেল তখনো তিনি সেটা জানেন না। ওই লোক

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

১৯৭৩-৭৪-৭৫

দর্শন (Philosophy)

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

ভারতীয় দর্শন ১ম খণ্ড—৭ম সংস্করণ (Indian Philosophy) 9.00
ভারতীয় দর্শন ২য় খণ্ড—২য় সংস্করণ (Indian Philosophy) 3.50
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—৯ম সংস্করণ (Western Philosophy) 9.00
পাশ্চাত্ত্য দর্শন (দর্শনের ইতিহাসসহ)—৩য় সংস্করণ 12.00
নীতিবিজ্ঞান —৮ম সংস্করণ (Ethics) 9.00
সমাজদর্শন—৮ম সংস্করণ (Social Philosophy) 9.00
মনোবিদ্যা —৬ষ্ঠ সংস্করণ (Psychology) 18.00
Handbook of Social Philosophy — 2nd edition 13.00
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— ২য় সংস্করণ (বেকন হিউম) 9.00
ধর্মদর্শন (Philosophy of Religion) 12.00

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

শিক্ষাতত্ত্ব—২য় সংস্করণ (Principles of Education) 10.00
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—৩য় সংস্করণ (Edu. Problems) 12.00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—৩য় সংস্করণ (Edu. Psychology) 16.00

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ভারতের সংবিধান (Indian Constitution) 5.00
আধুনিক সংবিধান (Modern Constitution) 6.00

বাংলা সাহিত্য (Literature)

ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী প্রণীত

কুলীন কুলসর্বস্ব (নাটক) 10.00

ডক্টর সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রণীত

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমালোচনার ধারা 8.00

শিক্ষক শিক্ষণ (B. Ed., P.G. Basic)

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ (General Methods) 15.00
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান (Eco. & Civics) 10.00
ভারতের শিক্ষা-সমস্যা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) 3.00

অধ্যাপক হালদার ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস (History of Education) 15.00

অধ্যাপক ঘোষ ও রায় প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব (Principles and Practice) (যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত, রায় ও ঘোষ প্রণীত

শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান (Psychology) 20.00

শ্রীমতী দীপিকা পাল প্রণীত

শিশুমনের সহজ কথা (Pre-Primary) 3.00

BP

ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯। ফোন ৩৪-৭২৩৪

কোনদিন বলত কিনা সন্দেহ। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফেরার দিন কয়েকের মধ্যে শাশুড়ীর খেদ থেকে ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। সন্তান সম্ভাবনা নাকচের বিনিময়ে জীবন নিয়ে ফিরেছেন তিনি।

...সেই সময় ওই তিন সপ্তাহের ছুটি। ...এরপর ছ'বছর আগে আর একবার মাত্র সেই তিন মাসের ছুটি। মনে পড়লেও নমিতার গায়ে কাঁটা দেয় সেই ছুটি চিরকালের ছুটিও হতে পারত। ঠাকুর রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে-ছুটি কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো হিসেবের মধ্যে ধরেননি। একদিনও ছুটি না কেটে তিন মাসের পুরো মাইনে দিতে পেরে ওঁরা বরং গর্ব অনুভব করেছেন। তাছাড়া ঝড়জলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ুক বা মারামারি কাটাকাটির রক্তগঙ্গা বয়ে যাক—কোনদিন কলেজ কামাই করতে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

হাতের চেটোয় মাথায় তেল বসাতে বসাতে নমিতা ঘর থেকে বেরিয়ে পাশে কোণের ঘরের দরজার দিকে এগোলেন।.. মাথার ওপর ফুল স্পীডে পাখা ঘুরছে, শ্রান্ত মুখ, কিছু একটা গভীর চিন্তায় তন্ময়—আনন্দের ছিটে-ফোঁটাও চোখে পড়ল না। ঠিক যে মুখ দেখলে নমিতার অনেক সময় মায়া হয়, মুখখানা বুকে চেপে ঝাঁকড়া চুলের মাথায় চুপচাপ হাত বুলোতে ইচ্ছে করে—সেই রকম।...কিন্তু এই ইচ্ছেটার দিকে নমিতা তাঁর সাঁইতিরিশ বছরের জীবনে কোনদিন হাত বাড়াতে পেরেছেন কি? অন্তত মনের মতো করে পারেননি। কারণ, অন্তরঙ্গ নিভৃতেও একটা অনুভূতির দৈন্য তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেন না। মনে হয়, চিন্তার জগতে এই লোকের অনেক পিছনে পড়ে আছেন তিনি—চেষ্টা করলেও সেই জগতের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারবেন না। উল্টে তিনি নিজে কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক যাতনার মধ্যে পড়লে ওই লোক যখন তাকে আদর করে বা সান্ত্বনা দেয়, তখন নিজেকেই কেমন যেন ছোট মেয়ের মতো মনে হয় তাঁর।

তবু গলা দিয়ে আজ একটু ঠেসের সুরই বেরিয়ে এলো নমিতার। —এর নাম দিবা-স্বপ্ন নাকি?

তন্ময়তায় ছেদ পড়ল। নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলেন দীপন ঘোষাল।— না। তুমি চান করে বেরোওনি আজ?

—সময় পেলাম কোথায়, কাগজে কোটি কোটি টাকার ফিরিস্তি পড়ে ওরা যে রকম চিৎকার চেঁচামিচির হাট বসিয়ে দিল—ওদের ধারণা এতবড় খবরটা আমি সুদ্ধ ওদের কাছে চেপে গেছি।

হুঃ, মস্ত খবর, চিনির কলদ হয়েছি।

নমিতার ভিতরটা খরখরে হয়ে উঠতে লাগল।—তুমি যা-ই বলো কেউ তো আর তা ভাবছে না। সকালের কাগজ পড়ে ওরা নাচতে নাচতে এসে আমাকে গিসগিস করে ধরল যখন আমি অপ্রস্তুত—কাল রাতেও তুমি খবরটা আমাকে বলতে পারতে—

একটা বিরক্তিসূচক হাই তুলতে তুলতে দীপন ঘোষাল জবাব দিলেন, বললে কি আর হত, তুমি ওদের আগেই নাচ শুরু করে দিতে, কদিন ধরে মাথারই ঠিক নেই আমার, তোমরা আছ তোমাদের তালে—

আঘাত দেবার জন্য বলেন না, এই রকমই কথাবার্তা ভদ্রলোকের। জেনেও আঘাত পেলেন মহিলা। মুখের দিকে থমকে চেয়ে রইলেন একটু। বললেন, একলাই নাচো তাহলে, মাথা ঠিক হয়ে যাবে।..আজ আর কলেজ যাওয়া আছে কি নেই?

দীপন ঘোষাল বিড়বিড় করে জবাব দিলেন, আর কলেজ—কলেজ-ফলেজ সবই হয়ে গেল।

ভিতরে ভিতরে বেশ একটা ধাক্কা খেলেন নমিতা দেবী। তাঁর সেই এক বান্ধবীর স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল, যুক্তফ্রন্টের আমলে এক মন্ত্রী-বন্ধুর উৎসাহের আফিম গিলে যে-ভদ্রলোক চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেশ-সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজ কি নিদারুণ দৈন্যদশা সেই বান্ধবীর। লটারির টিকিট কিনে অনেক টাকার স্বপ্ন দেখে-দেখে মাঝখান থেকে একটা রোগ সঞ্চয় করেছেন নমিতা দেবী। বাস্তবের সঙ্গে সেই স্বপ্নের এত ফারাক যে দিন-যাপনের এই অতিসাধারণ বাস্তবকেই ভয় করেন তিনি—তার ওপরে আবার এতটুকু অনটনের ছায়া দেখলেই ভিতরে ভিতরে আতঙ্ক হয়।

মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কথাগুলো। বোঝা গেল না। ফলে রাগ চড়ল। কাঁহাতক আর পেটের থেকে টেনেটেনে কথা বার করা যায়। ক্ষোভের মুখে ঘুরে দাঁড়িয়েও আবার ফিরলেন বেলা বারোটা বেজে গেল, চানে উঠবে? খাওয়া-দাওয়া আছে?

—হ্যাঁ, উঠি—

—তুমি আগে যাবে না আমি যাব?

—তুমিই আগে সেরে এসো।

—আমার দেরি হবে কিন্তু।

আর জবাব পেলেন না। নমিতা দেবী চলে গেলেন। সত্যিই অনেকক্ষণ ধরে টান করলেন। সকাল থেকে মাথার মধ্যে হিজি-বিজি ব্যাপার চলেছে যতো—সেই সব ধুয়ে ফেলে হালকা হতে চেষ্টা করলেন। মনের কোণ থেকে কিছু একটা ভালো লাগার অনুভূতি ছড়াতে লাগল। এক ছুটির দিন ভিন্ন একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাওয়া হয় না কখনো। তিনি স্কুল থেকে ফেরেন যখন, ওই লোক খেয়ে দেয়ে কলেজে বেরুনোর জন্য প্রস্তুত। ছুটির দিনেও খাওয়ার সময় নিরিবিলি অবকাশ জোটে না। ডাইনে ভাগ্নিরা থাকে—একসঙ্গে বসে খায় সকলে।

স্নান সারা হল। ভালো লাগছে। তিনি বেরুতে দীপন ঘোষাল চানে গেলেন। তাঁর বড়জোর দশ মিনিট লাগে। নমিতা দেবী ভিজে নিংড়নো শাড়ি আর জামা বাইরের বারান্দার তারে মেলে দিলেন। ঘরে এসে পবনের শাড়িটা একটু যত্ন করে পরলেন। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়ালেন,

উপহারে অনন্য
ব্যক্তিগত সংগ্রহে অবশ্য
বিমল করের
রচনা-সংগ্রহ
দুটি উপন্যাস :
ফানুসের আয়ু। জীবনায়ন
চারটি গল্প :
বাঘ, শীতেরমাঠ, অশ্বত্থ, ম্যাপ
একটি নাটক : ঘাতক
এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ঝকঝকে ছাপা। রুচিশীল মনোরম প্রচ্ছদ
দাম : সাড়ে বারো টাকা
পাণ্ডুলিপি প্রকাশন
৯ চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা—৯

তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
তীর্থ-পথে
১ম-উত্তরখণ্ড ও রাজস্থান ৮-০০
২য়-সৌরাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র ও মধ্যভারত ১০-০০
৩য়-দাক্ষিণাত্য ১০-০০
ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট; কলিকাতা-৯

সেই ফাঁকে আড়চোখে নিজেকে দেখতেও লাগলেন। দুটো হাতই মাথার ওপর, এক হাতে চিরুনি অন্য হাতে ভিজে চুলের গোছা—চিরুনি চালাতে গিয়ে শরীরের ঊর্ধ্বভাগ পিছনের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। ছেলেপুলে নেই, সংসারের সত্যেব ঝামেলা নেই, খেতে-দেতেও ভালই বাসেন, রাতেও ঘুমেব ব্যাঘাত নেই—ফলে এই সাঁই-তিরিশেও স্বাস্থ্য অটুট। বেবা অবশ্য বলে মামী তুমি মোটার দিক ঘেঁসছ, খাওয়া আর ঘুম কমাও বাপু। মেজাজ ভালো থাকলে নমিতা জবাব দেন, আমার কাজ শেষ, তুই তোর নিজের ভাবনা ভাবগে যা। আয়নায় নিজের দিকে চেয়ে বিশেষ কি চোখে পড়ল তিনিই জানেন, একলা ঘরেই যেন লজ্জা পেলেন একটু। গালের কাছে টোল খেল। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস। চিরুনি রেখে মুখে পাউডার বোলালেন. তারপর কপালে আর সিঁথিতে যত্ন করে সিঁদুর চিহ্ন আঁকলেন। এ-সব বোজই করে থাকেন, অন্য দিন তাড়াহুড়োর মধ্যে করতে হয় এই যা তফাত।

বাথরুম থেকে জল ঢালার ঝপঝপ শব্দ আসছে। নমিতার অকারণে হাসি পেল। মোট কথা এখন সবকিছুই ভালো লাগছে। ছেলে-মানুষি ব্যস্ততাব ওই ঝপঝপ জল ঢালাটাও।

ঘর ছেড়ে সামনের সরু বারান্দায় এলেন। রাস্তা নির্জন, এই দুপুরে রোদে কে আর সখ করে পথে বেরোয়। কোণের ঘরের দিকে চোখ গেল। টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো। কিছু চাপা দেওয়া হয়নি। পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ডান-দিকে মোটা মোটা টাকার অঙ্ক টাইপ করা—বাঁদিকে কোন কোন খাতে ওই টাকা খরচ করা যেতে পারে তার লিস্ট বোধহয়। একটা দুটো পাতা নয়, এক গোছা কাগজ ওইরকম টাইপ করা।

কাগজের গোছা তুলে নিয়ে নমিতা দেখে যেতে লাগলেন। একেবারে নীরস ব্যাপার। কত রকম অজস্র জনহিতকর কাজে টাকা খরচ করা যেতে পারে তারই একটা খসড়া। এরই থেকে সাগ্রহে কি রস গ্রহণ করছেন তিনিই জানেন।

—আঃ! ওগুলো নিয়ে আবার ঘাঁটা-ঘাঁটি কবছ কেন, সবেতে তোমার হাত দেওয়া চাই—রেখে দাও!

পুরুষের বিরক্তি-ভরা উক্তির এই এক ঘায়ে সমস্ত ভালো লাগার সুরটুকু মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। কাগজের গোছা হাতে করেই নমিতা আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন।

দাড়ি-টাড়ি কামানোর জন্য এঘরেব দেয়ালেও একটা ছোট আয়না ফিট করা আছে। চিরুনিও আছে। সেটা তুলে নিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়না দিয়ে দীপন ঘোষাল অসহিষ্ণু চোখে আবার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, হাঁ করে দেখছ কি, ওগুলো তোমার কোন্ কাজে লাগছে—জায়গা মতো রেখে দাও।

এ-ঘরের বইটই বা কাগজপত্রে হাত দেওয়া অপছন্দ, নমিতাদেবী সেটা জানেন। সবকিছু ঠিক জায়গামতো না থাকলে মেজাজ বিগড়ায়। কিন্তু আজকের এই অনু-শাসনে নমিতাদেবীর মেজাজ দ্বিগুণ বিগড়লো। এই কাগজগুলো তুলে নিয়ে ভিতরেব চাপা লোভটাই যেন উদ্ঘাটন করে ফেলা হয়েছে আব তারই জন্যে যেন এই বিরক্তি, এই অসহিষ্ণুতা। স্ত্রীকে সুখ-দুঃখের সত্যিকারের দোসর ভাবলে এ-রকম আঘাত কেউ করতে পারে না।

নমিতা ঘোষাল হাতের কাগজের গোছা টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন।

ও-ভাবে রাখছ কি, একটা কিছু চাপা দাও, উড়ে যাবে!

—এ-ভাবেই ছিল এগুলো উড়ে যেতে পারে ভেবেই ঘরে ঢুকেছিলাম—কিন্তু তুমি আমাকে ভাবো কি. বাড়ির কি-টি কেউ?

উল্টো মেজাজ দেখে দীপন ঘোষাল বিমূঢ় একটু।—কেন? কি হল—

জবাব না দিয়ে নমিতা ঘোষাল দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে এলেন। খাবার টেবিলে ডিশ-বাটি সাজানোর সময় ওগুলো আছড়ে ভাঙতে ইচ্ছে করল। না, এত রাগ তাঁর আর শিগগীর হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ওই লোকের কাছে তাঁর অস্তিত্ব কতটুকু এ যেন আজ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। রাগের দাপটে আব একটা সংকল্প মাথায় এসে গেল। খাবারের সরঞ্জাম সব টেবিলে এনে রাখলেন। তারপর ডিশ আর বাটিতে চাকতের মধ্যে শুধু এক-জনের আহার্য সাজিয়ে ফেললেন। আর সব এক-ধারে, বাসনের মধ্যেই পড়ে থাকল—ডিশ বা বাটিতে নেমে এলো না।

তারপর ঘরে ঢুকে নমিতা ঘোষাল সরাসরি শয্যায়।

একটু বাদে পুরুষের চপ্পলের শব্দ কানে এল। সামনের ওই সরু বারান্দা দিয়ে ঘুরে ভিতরেব ঢাকা-বারান্দায় ডাইনিং স্পেসের দিকে চলল শব্দটা। নমিতা ঘোষাল উৎকর্ণ। চপ্পলেব শব্দ এক্ষুনি আবার এই ঘরের দিকে ফিববে।

কিন্তু তার বদলে চেয়ার টানার আওয়াজ। খেয়াল না করেই বসে পড়া হল। খেয়াল হতে কতক্ষণ। নমিতা দেবী প্রস্তুত হয়ে আছেন।

চেয়ার ঠেলে আবার উঠে যাওয়ার শব্দটা কানে আসছে না। আরো একটু সময় কাটল। চুপচাপ বসে তাব অপেক্ষা করে আছে নাকি! শয্যা ছেড়ে নমিতা অবশেষে উঠে বসলেন আস্তে আস্তে। সামনের বুককেল এ-পাশের দরজা দিয়ে ডাইনিংয়ের দিকটা দেখা যায়।

যে দৃশ্য দেখলেন, মুহূর্তের মধ্যে নমিতা ঘোষালের পিত্তি জ্বলে গেল একেবারে। স্বামীটি আহারে মন দিয়েছে।

যোগেশচন্দ্র বাগলের সর্বশেষ রচনা

মুক্তির সন্ধানে ভারত

কংগ্রেস-পূর্ব যুগ

প্রথম সংস্করণ

সংগ্রামী বাঙ্গালীর ইতিহাস ১৫·০০

সমর বসু কৃত সংক্ষিপ্ত অরবিন্দ দর্শন

মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ২·৫০

বিশু মুখোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত হত্যা কাহিনী

সত্য ও ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড। ৫·৭৫

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের

শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

সেই ঘর অন্য মন ১২·০০

সদ্য প্রকাশিত হল

বান ডাসি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ৩·৭৫

চর হাসিল শান্তিপদ রাজগুরু ৬·০০

দি মডার্ন পাবলিশার্স

৮-এ, কলেজ রো; কলিকাতা—৯

শ্রীঅরবিন্দায়ন

নীরোদবরণ

সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন, বাণী ও সাধনা। মূল্য ৪·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-২৩৭৬

সঙ্গে কিছু একটা চিন্তায় তন্ময়। আর কেউ খেল কি খেল না সেই ভাবনার ধারে কাছেও নেই।

ঝুঁকে পরদার ফাঁক দিয়ে সরোষে দেখতেই লাগলেন নমিতা ঘোষাল। চান সারা হতে না হতে দস্তুর মতো খিদে পেয়ে গেছল তাঁর। উপোস কোনোকালেই বরদাস্ত করতে পারেন না। বিয়ের গোড়ার দু' তিন বছর শাশুড়ী শিবরাত্রির উপোস করিয়েছিলেন তাঁকে। রাতে শিবের মাথায় ফুল জল দিয়ে তবে খাওয়া—নির্জলা উপোস নয় শাশুড়ীর মতো। কিন্তু তাতেই কাহিল অবস্থা—সেটা টের পেয়ে তাঁর ভদ্রলোকটিই মাকে বলে শিবরাত্রির উপোস রাতিল করেছিলেন।

...ওদিকে খাওয়া আধা-আধি হয়ে এলো। শেষ হলে মুখ হাত ধুয়ে আবার ওই কোণের ঘরে গিয়েই বসা হবে বোধ-হয়। কোটি কোটি টাকার চিন্তা মাথায়, শয্যায় গড়াগড়ির ফুরসত হবে না হয়তো। তারপর ওই শূন্য টেবিলে একলা গিয়ে খেতে বসার কথা ভাবতেই মাথার ভিতরে দপদপানি শুরু হল নমিতার। শয্যা ছেড়ে নামলেন। শাড়ির আঁচল কাঁধে তুলে দিয়ে থমথমে মুখে পরদা সরিয়ে কাছে এলেন।

অন্যমনস্ক দীপন ঘোষাল মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন।

—আর লাগবে কিছু? [illegible]!

—না।

মুখ দেখেই হোক বা কণ্ঠস্বর শুনে হোক একটু বোধ হয় খটকা লাগল এবারে। সামনের বাসনের আহার্য সামগ্রি একবার দেখে নিয়ে দীপন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, বললে না যে, কি করছিলে এতক্ষণ?

—তোমার কি মনে হয়, চুরি করে আবার তোমার ওই সম্পত্তির হিসেব-নিকেশ দেখতে গেছলাম?

ওই তুচ্ছ কথায় স্ত্রীর এই মেজাজ দেখতে অভ্যস্ত নন দীপন ঘোষাল। কি হয়েছে সঠিক বুঝলেন না। জবাব দিলেন, তা মনে হয় না ... খেতে বসছ না কেন?

—আমি খাই না খাই তোমার তাতে কি, তোমার সেজন্য কোনো ভাবনা-চিন্তা আছে?

দীপন ঘোষাল হতভম্ব একটু। কিছু একটা ঘটেছেই বটে, কিন্তু কি সেটা ভেবে পেলেন না।

—কি ব্যাপার বলো তো?

জবাব না দিয়ে নমিতা ঘোষাল সরোষে চেয়ে রইলেন শুধু।

—আঃ! কি হয়েছে বলো না, দেখছ কি?

নমিতা ঘোষাল তপ্ত জবাব দিলেন, কোটি কোটি টাকা খরচের দখল-পাওয়া মুখ দেখছি—দেখার তো সবে শুরু!

বিমনা ভাবটা গিয়ে দীপন ঘোষালের চোখে কৌতুকের ছোঁয়া লাগল। বললেন, তোমার মেজাজ দেখে মনে হচ্ছে ওই টাকাটা তুমিই হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছ। ... বসে পড়ো, পেঁয়াজের রস-টস দিয়ে রাঁধুনি মোচার বড়াটা আজ ভালই করেছে।

এও খোঁচা ভাবলেন নমিতা দেবী। মোচার বড়া তাঁর প্রিয়বস্তুর একটা ওই মানুষের জানা আছে। চোখ আর মন দিলে এই লোক অনেক কিছুই ঠিক-ঠাক দেখে, জানে। কিন্তু ওই চোখ আর মনের ওপর সংসারের কারো এতটুকু দখল নেই বলেই খেদ। রাঁধুনিকে এক মাসের মধ্যে আর মোচার বড়া করতে দেবেন না ঠিক করে ফেললেন নমিতা। অসহিষ্ণু হাতে চেয়ারটা টেনে বসেই বাটির তিনটে বড়ার দুটো তুলে দীপন ঘোষালের ডিশে ফেললেন। তারপর অসহিষ্ণু হাতে ভাত ডাল তরকারি একসঙ্গে নিজের ডিশে নামিয়ে নিলেন।

দীপন ঘোষাল সকৌতুকে লক্ষ্য করছেন স্ত্রীটিকে। এ-রকম মেজাজ নতুন লাগছে। সাধারণত অল্পেতে তিনিই রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকেন। একটা বড়া তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে-দেখে বেশ আয়েস করে খেলেন। তারপর অন্যটাও তুলে নিয়ে আড় চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। কিন্তু না খেয়ে সেটা আবার তার ডিশেই ফিরিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রুষ্ট নেত্রে নমিতা চোখ তুলে তাকালেন।

—কি হল, আজ তোমার স্কুলের অরুণাদি এক-হাত নিয়েছে-টিয়েছে নাকি?

—কি? অত সাহস কারো নেই—যত হেনস্থা বাড়িতে।

স্কুলের থিটমিটে অরুণাদিকে ভয়-ভক্তি দুই-ই করেন বাড়ির লোকের তা অগোচর নেই জেনেও বললেন। এই মেজাজের মাথায় অরুণাদি সামনে এসে দাঁড়ালেও পরোয়া করতেন কিনা সন্দেহ।

—বাড়িতে হঠাৎ তোমার নতুন করে কি হেনস্থা হল?

নমিতা খেতে লাগলেন। রাগ আর খিদে দুইই চনমনে এখন। ঝাঁঝ দেখাবার মতো প্রসঙ্গও মাথায় মজুত। —না, নতুন করে আর কি হবে, তোমার চোখে আমি কোনদিনই কিছু না। যাক, শোনো—সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি আর স্কুলে ছুটতে পারি না, দেরি হলেই অরুণাদি খিটখিট করে, ডিসিপ্লিন ভাঙলে সে সহ্য করবেই বা কেন—আমি ঠিক করেছি আমার ডিউটি ডে-শিফটএ চেঞ্জ করে নেব।

—ডে-শিফট মানে কটা থেকে কটা?

—বারোটা থেকে তিনটে।

স্ত্রীর এই রাগত মুখে খাওয়ার দৃশ্যটা মন্দ লাগছিল না দীপন ঘোষালের। জিজ্ঞাসা করলেন, দুপুরে বাড়িতে কে থাকবে তাহলে?

—আমি জানি না, সে-দায় আমার নাকি?

বি, এ, পরীক্ষার্থীর জন্য

এস ব্যানার্জি সম্পাদিত—পরিচয় সিরিজ

সোনার তরী	শ্রীকান্ত (১ম পর্ব)
বিচিত্র প্রবন্ধ	দেনাপাওনা
রক্তকরবী	কমলাকান্তের দপ্তর
মালিনী	নীলদর্পণ
বৈকুণ্ঠের খাতা	প্রফুল্ল
সাহিত্যতত্ত্ব	ছন্দ ও অলঙ্কার
বৈষ্ণব পদাবলী	আধুনিক বাংলাসাহিত্য

এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

গম্ভীর কৌতুকে দীপন ঘোষাল বললেন, না তোমার কেন—সে দায় মতির মায়ের।

খাওয়া থামিয়ে নমিতা সরোষে মুখের দিকে তাকালেন। —সকালে উঠে আমি আর এভাবে ছোটাছুটি করতে পারব না, আমার সাফ কথা।

স্বামীটি খুব সহিষ্ণু প্রকৃতির নয় জেনেও নমিতা ঘোষাল গলার সুর না চড়িয়ে পারলেন না। কিন্তু এর পরেও দীপন ঘোষাল তেতে ওঠা বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, মগজের সেই একঘেয়ে চিন্তার জাল থেকে একটু যেন ছাড়া পেলেন। মুখভাব নির্লিপ্ত তেমনি। —ছোটাছুটি কোরো না, চাকরি ছেড়ে দাও।

ব্যস, খাওয়া মাথায় উঠল নমিতার। এ-রকম অকৃতজ্ঞের মতো কথা বাড়িতে আর কে বলতে পারে। তপ্ত ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠল, ছেড়ে দেব? তুমি তাহলে এবার থেকে অনেক টাকা আনছ?

—তুমি যেমন লটারির টিকিট কিনে লাখ-লাখ টাকার স্বপ্ন দেখো, সে-রকম অনেক নয়, যা পাচ্ছিলাম তার থেকে কিছু বেশি—তোমার ওই দেড়শ টাকা পুরিয়ে দেওয়া যাবে।

মুখের দিকে চেয়ে নমিতা থমকালেন একপ্রস্থ। টাকার গন্ধ পেলে তাঁর ভিতরটা একটু উৎসুক হয়ে ওঠে সত্যি কথা, তা বলে এ-রকম খোঁচা বরদাস্ত করা সহজ নয়। তাঁর রোজগারের দেড়শ টাকার দেড় টাকাও বাঁচে না বটে, কিন্তু মনের তুষ্টির তহবিলে কিছু জমা পড়ে। সে জায়গায় এই লোক ওই দেড়শ টাকাটাকে কোন চোখে দেখে সেটা যেন আজই স্পষ্ট ধরা পড়ল।

কিন্তু বাড়তি আয়টা যদি এমনই হয় যার ওপর নির্ভর করে স্ত্রীর ঘরে বসে ঘর আগলানোই উচিত, তাহলে একথার ওপর ঝাঁঝ দেখানোটা আর যাই হোক, যুক্তি-নির্ভর নয়। রাগটা এবারে অভিমানের দিকে গড়াতে থাকল। ঘরে একটা ছেলেপুলে নেই, চাকরি ছাড়লে তার কি করে সময় কাটে সে ভাবনা এই লোকের কোনদিন মাথায় আসবে না। চাপা ক্ষোভে বলে উঠল, ঠিক আছে, কালই তাহলে আমি ও-প্যাট চুকিয়ে আসছি।

দীপন ঘোষালের গম্ভীর মুখ থেকে কৌতুকের ছায়া সরেনি তখনো। একটু চেয়ে থেকে বললেন, খাওয়াটা সেরে ফেল। —তারপর ঠিক-ঠাক বলো মেজাজের আজ এই অবস্থা কেন, কি হয়েছে?

—আমার আবার কি হবে, তুমিই রাতা-রাতি মস্ত বড়লোক বনে গেছ দেখতে পাচ্ছি।

—কি রকম?

ভাতের থালায় মন দিয়ে নমিতা জবাব দিলেন, তা না হলে আমার দেড়শ টাকার চাকরি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেল কি করে? .. এ পর্যন্ত সংসারে আমার চাকরির যতো টাকা খরচ হয়েছে তাও মিটিয়ে দেবে তো?

এই খোঁচাও হাসিমুখেই বরদাস্ত করলেন দীপন ঘোষাল। মাথা নেড়ে বললেন

— নিউ এজ-র —

কয়েকটি মূল্যবান বই

শশিভূষণ স্মারক গ্রন্থ ঃ বহু মূল্যবান প্রবন্ধের সংকলন ১৫·০০

বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ নৃপেন্দ্র গোস্বামী ১৫·০০
বৈদিক জীবনধারার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকল্পের তাৎপর্য বিশেষ করে 'মাতৃকাচর্য ও মাতৃতন্ত্র' পরিচ্ছেদটি তথ্যচয়নের নৈপুণ্যে মনোজ্ঞ ও অনবদ্য—রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা।

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৪·৫০
আমার সৌভাগ্য আমিই তার একমাত্র বন্ধু যার কাছে তার জীবনের গোপনতম কথাটি পর্যন্ত সে অকপটে প্রকাশ করেছে।'। কবি নজরুলের এই জীবনী সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য।

কালের পুতুল ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ ৩·৫০
॥ আধুনিক বাংলা কবিতার প্রতি যাদের ঔৎসুক্য রয়েছে তাদের অবশ্য পাঠ্য ॥

রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য ঃ বুদ্ধদেব বসু ঃ ৩·৫০
রবীন্দ্র কথা-সাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে যথাযোগ্য সম্মান পায় নি। এজন্য এখনকার মতো কথা-সাহিত্যের আলোচনায় দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হলো—লেখক

লেখকের কথা ঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২·৫০
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ পুস্তক। লেখা, সাহিত্য, প্রতিভা, জীবন; পাঠক; উপন্যাসের ধারা, সাহিত্য সমালোচনা, সাহিত্যিক ও ভণ্ডামি এবং আধুনিক বাংলা সম্পর্কে লেখকের তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা।

নিষিদ্ধ কথা আর
নিষিদ্ধ দেশ ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪·০০
সোবিয়েত সমাজের বিস্তৃত আলোচনা। সমাজতান্ত্রিক জীবনের সব সমস্যার সমাধানের তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

লোকায়ত দর্শন ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৫·০০
সুপ্রাচীন লোকায়ত সংক্রান্ত নানা অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে দার্শনিক মত হিসাবে লোকায়ত বলতে এক প্রকার প্রাচীন বস্তুবাদই উল্লিখিত হয়েছে—লেখক

রামতনু লাহিড়ী
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ৮·০০
॥ বাংলাদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের বিস্তৃত আলোচনা ॥

রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা ঃ নীহাররঞ্জন রায় ২৫·০০
॥ এক কথায়, আমার উদ্দেশ্য, দেশ ও কালের পটভূমিকায় রবীন্দ্র মানসের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন—লেখক ॥ রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন।

বাঙালীর ইতিহাস ঃ নীহাররঞ্জন রায় ৫·০০
সংক্ষেপিত ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়
॥ বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস নতুন করে জানালেন ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় ॥

আমার বাংলা ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২·৫০
আমার বাংলা পরিচয় সাধনার ইতিহাস। বাঙালিকে দিয়েছে ঐশ্বর্যের সন্ধান। জানিয়েছে তার যথার্থ আত্মপরিচয়।

পাবলো নেরুদার
শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ পাবলো নেরুদা ৬·০০
বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা। মানুষের কবি, সংগ্রামের কবি, সমগ্র নিপীড়িত মানুষের সুপ্ত আকাংখাকে কবি যে কবিতায় বিধৃত করেছেন, যে কবিতার জন্যে তাঁকে ১৯৭১ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেই সমগ্র কবিতার সংকলন।

নিউ এজ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

না, মাত্র চারশ টাকা বাড়তি আয়ে অতটা হবে না।

ভাতের থালা থেকে আবার মুখ তুলে নমিতা চোখের দিকে না তাকিয়ে পারলেন না। যে টাকায় যে-ভাবে সবদিক বজায় রেখে সংসার চালান তিনি, সেটা সম্পূর্ণ নিজের কৃতিত্ব ভাবেন। নিজে একটু সুখে থাকতে চান আর বাড়ির সব কাঁটা প্রাণীকে একটু সুখে রাখতে চান। এজন্য তাঁকে দস্তুর মতো প্ল্যান করতে হয়, মাসের বাজেট কষতে হয়। এজন্য ভাগ্নে-ভাগ্নিরাই যা একটু তারিপ করে, এই লোকের মুখে একটা প্রশংসার কথাও শোনা যায় না কোনদিন। তা না গেলেও সকলকে সুখে রাখার কথা তিনি ভাবেন। আর এই কারণেও একটু আধটু টাকার স্বপ্ন দেখতে তাঁর ভালো লাগে। তা বলে সর্বদাই ওই অবাস্তব স্বপ্নের নৌকোয় বিহার করে বেড়ান না। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা আয় বাড়লেও এই সংসার-চিত্র আর একটু মনোরম করে তোলা যায় কি করে তাও তিনি মগজে ছকে রেখেছেন। এমনকি মাসে আর তিরিশ টাকা আয় বাড়লেও লোককে মাসে দুদিন অন্তত মাংস খাওয়ানো যেতে পারে কিনা, সেই হিসেবেও তাঁর আগে থাকতেই কষা আছে। পঞ্চাশ টাকা আয় বাড়লে তো দুতিন মাসের মধ্যেই ঘরে ঘরে একটা করে টিউব লাইট বসাবেন ঠিক করাই আছে। তার বেশি আয় হলে কয়লার রান্না বাতিল করে গ্যাস রেঞ্জ এনে বসাবেন সে-ও মাথায় ছকা আছে। এসব ছাড়া অরুণাদির বাড়িতে ফ্রিজও দেখেছেন (এমন ধপধপে সুন্দর সাদা যে দেখলে সন্তর্পণে ওটার গায়ে হাত বোলাতে ইচ্ছে করে), কিন্তু ফ্রীজ-এর চিন্তাটা কোনো বাস্তব ছকের মধ্যে পড়ে না, কাল্পনিক টাকা খরচ করতে বসলেই শুধু ওটার চাহিদা সবার আগে এসে হানা দেয়। মোট কথা, বিশ-তিরিশ থেকে বড়জোর একশ টাকা বাড়তি আয়জনিত সুব্যবস্থার পরিকল্পনা মাথায় আছে তাঁর, এর মধ্যে একেবারে চারশ টাকা বাড়তি ঘরে আসার বাস্তবতাটা ভিতরে একদফা নাড়াচাড়া দিয়ে যাবার মতোই ব্যাপার। কিন্তু এই মেজাজ আর অভিমানের মুখে ঔৎসুক্য বা কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলাটাও তেমনি বিসদৃশ। অতএব খাওয়া ফেলে নমিতা মুখ তুলে তাকালেন শুধু।

এটুকুর ফলেই মাসে চারশ টাকা বাড়তি আয়ের ফিরিস্তি দাখিল শুরু করলেন দীপন ঘোষাল। —কলেজের দুই শিফটএ মিলিয়ে মাসে আটশ টাকা পাচ্ছি তো—

উক্ত গম্ভীর স্বরে নমিতা সঙ্গে বাধা দিলেন, হাতে সাড়ে ছ'শ পাচ্ছ—

—মোট টাকাটাই ধরো না, আটশ পাচ্ছিলাম ম্যানেজিং ট্রাস্টি হিসেবে সে জায়গায় এখন বারোশ নেব ঠিক হল—কুমার বাহাদুর অবশ্য দেড় হাজার নেবার জন্যেই পীড়াপীড়ি করেছিলেন...পাবলিক ওয়েলফেয়ারের টাকা ... আমার অত নিতে বাধল।

বাড়ির ওয়েলফেয়ার যে এ-লোকের কাছে কিছু নয় সেই খেদ আর নতুন করে কি প্রকাশ করবে। নমিতা ঘোষাল অবাক অন্য কারণে। —তাহলে চারশ টাকা বাড়ল কি রকম, কলেজের চাকরি কি হবে?

—একাজ নিলে চাকরি আর করব কখন?

দু' শিফট-এর কাজই ছেড়ে দেবে?

—হুঃ এই এক ব্যাপার নিয়েই প্রাণান্ত, যাক গে, এ-সব তুমি বুঝবে না।

কিন্তু যেটুকু বোঝার নমিতা বুঝে নিয়েছেন। রাগ আর অভিমান গিয়ে একটা অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তার কাঁটা খচখচ করে উঠল।.....বহুকালের চাকরি, সিনিয়র প্রোফেসর, তা ছাড়া বই পড়া আর ছেলে পড়ানো দুই-ই নেশার মতো। এমন অনায়াসে সে চাকরি ছাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে শুনে কেন যেন একটুও ভালো লাগল না। কিন্তু নমিতার আসল ভয় একেবারে অন্যাকারের বাস্তব কারণে।

বড় বড় দুই চোখ স্বামীর মুখের ওপর এঁটে বসল। জিজ্ঞাসা করলেন, কলেজের চাকরির শেষে মোটা প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটি পেতে, এখানে সে-সব আছে?

স্ত্রীর চোখ এড়িয়ে মাথা নাড়লেন। নেই।

নমিতা থমকে চেয়ে রইলেন খানিক। অনাগত ভবের ছায়ার সঙ্গে নিঃশব্দে যুঝে নেলেন একটু। —এ ছাড়া বছরে য়ুনিভার্সিটির খাতা দেখেও পাঁচ-ছ'শ টাকা পেতে—

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও দীপন ঘোষাল হেসে ফেলে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন। —এসব হিসেব আমার ঢের আগে তোমার মাথায় আসবে আমি ঠিক ভেবেছিলাম।...ব্যাপার কি জানো, বুড়ো কুমার বাহাদুর হুট করে দেড় হাজার টাকা ড্রইং-এর প্রস্তাব দিয়ে বসতে কি-রকম গণ্ডগোল হয়ে গেল, ও-সব কিছুই মনে পড়ল না—শুধু মনে হল অত কেন। ...পরে অবশ্য সব হিসেবই মাথায় এসেছে, যাকগে, বড় কাজে হাত দিলে নিজের কথা অত ভাবলে চলে না।

উঠতে যাচ্ছিলেন, থমথমে মুখে নমিতা আবার বললেন, কলেজে তোমাদের বছরে পাঁচ মাস ছুটি—গেল বারে বলেছিলে ছাত্রদের জন্য একটা ভালো বই লেখায় হাত দেবে—তাও হয়ে গেল বোধ হয়?

স্ত্রীর এই চিন্তাচ্ছন্ন রাগত মুখখানা দেখতে আজ মন্দ লাগছে না দীপন ঘোষালের। রসিকতা করে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কেন, বইয়ের প্রাপ্য টাকাও তোমার বাজেটের মধ্যে এনে ফেলেছিলে নাকি?

ঠাট্টাটা অপমানকর মন হল। সবকিছুর মধ্যে তাঁর লোভটাই যেন কড় করে দেখার চেষ্টা। প্রশ্নটা করে জবাবের অপেক্ষায় দাঁড়ায় নি আর, মুখ ধুতে চলে গেছে। নমিতা ক্রুদ্ধনেত্রে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

মুখ ধোয়া সেরে ফিরে এসেও হাসছেন দীপন ঘোষাল। বললেন ওই বাড়তি চারশ টাকাটাই ভবিষ্যতের পুঁজি হিসেবে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করো—হরে-দরে সেই একই দাঁড়াল।

নমিতা তীক্ষ্ণ ঝাঁজে জবাব দিলেন, সেটা হয় কি হয় না সে-বুদ্ধি তোমার আছে! সব ঠিক-ঠাক করে এসে তারপর বলছ—কেবল স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতেই তোমার মান খোয়া যায়, কেমন?

এ-রকম ঝাঁঝালো কথা শুনতে দীপন ঘোষাল অভ্যস্ত নন। দরকার মতো চেঁচামিচি বা রাগারাগি তিনি নিজেই করে থাকেন। স্ত্রীটি ভিতরে ভিতরে সমীহ করেন তাঁকে, আর একটু-আধটু ভয়ও করেন সেটা অনুভব করতে পারেন। এই উগ্র মূর্তি আর কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় তিনি। তারপরেই মেজাজ চড়ল।

তরুণ লেখক
সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীমতী যে ডাকে
৬·৫০ পয়সা
নেপালের পটভূমিকায় একটি নতুন ধরনের মিষ্টি উপন্যাস। হিমালয়ের কোলে ব্যবসা বাড়াতে গিয়ে সেলস ম্যানেজার নিজের মনকে হারিয়েছিলেন অজান্তেই.....কিন্তু তারপর.....!!

আপনি কি বেকার? ব্যবসা করতে চান? তাহলে পড়ুন
সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
স্বদেশ ও শিল্প ১০
আপনার বেকারত্ব ঘুচিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান দেবে এই বইটি। ব্যবসা করতে গেলে টাকা চাই। কোথায় গেলে টাকা পাবেন তার খবরও দেওয়া আছে বইটিতে।

নিরঞ্জন দত্তের—
ট্রানজিসটর রেডিও তৈরী ও মেরামত ৮.

রকমারি বুক হাউস ঃ ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড ঃ কলকাতা-৯

—টাকার ব্যাপারে কিছু ঘটলেই মাথাটা বেশ ভালো-রকম গণ্ডগোল হয়ে যায়, কেমন? কেন তোমার সঙ্গে পরামর্শ করি না সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার আছে? নিজের লাভ আর নিজের লোভ ছাড়া আর কিছু তুমি দেখতে জানো, বুঝতে পারো? এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, হাজার হাজার লোকের তাতে কি লাভ কি সুবিধে হতে পারে সে-চিন্তা একটুও করেছ? সে-সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছ?

ধমক খেয়ে নমিতা ঘোষাল চুপ একেবারে। কিন্তু অপমানের যন্ত্রণাটা সর্বাঙ্গে ওঠা-নামা করছে। এই লোক সর্ব কাজে সর্ব আচরণে তাঁকে শুধু লোভ আর লাভের হিসেব কষতেই দেখে, আর কিছু দেখে না। একটা ছেলেপুলের আশা নেই কোনদিন, তাঁর সমস্ত স্বপ্ন তাই এই সংসার-চিত্রটাকে ঘিরে আছে। এটা তিনি নিশ্চিন্ত-সুন্দর করে তুলতে চান, এই তাঁর অপরাধ। নিজেকে সকলের হাসি-খুশির নিয়ামক আর উৎস ভাবতে ভালো লাগে এই তাঁর অপরাধ। স্বামীর মন্ত্রী-বন্ধুর পাল্লায় পড়ার ফলে যে-বাধকীর আজ হাড়ির হাল, তার দিকে তাকাতে তার কথা ভাবতে ভয় করে—এই তাঁর অপরাধ।

...এই লোক শুধু তাঁর লোভের মূর্তি দেখে, শুধু লাভের হিসেব কষতে দেখে। নমিতা তর্ক করতে পারেন না, যুক্তি দেখাতে পারেন না। এ-ভাবে ধমক খাওয়ার পরেও নিজেকে এতটুকু দোষী বা লোভী ভাবতে রাজি নন। সম্ভব হলে চাকরির ব্যাপারে এ-রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ব্যবস্থা করে আসার দরুন ডবল গলা চড়িয়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেন। তাও সম্ভব নয় বলেই রাগে আর অপমানে বিবর্ণ মুখ।

উত্তেজনায় সেখানেই একটা পাক খেয়ে নিয়ে দীপন ঘোষাল আবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। গলার স্বর তেমনি অনুচ্চ, কিন্তু বিরক্তিভরা। —দেখো নমি, তোমাকে আমি আগেও বহুবার বলেছি আজও বলছি, টাকা-পয়সার ব্যাপারে তোমার অত মাথা ঘামানো আমার পছন্দ নয়, ইচ্ছে হয় চাকরি করো, ইচ্ছে না হয় ছেড়ে দাও। যখন যে-রকম রাখব সেই অবস্থায় খুশি থাকবে নিজের ভেতর থেকে এ-রকম একটা জোরের দিক বড় করে তুলতে চেষ্টা করো—পারলে তোমারও ভালো, আমারও ভালো।

শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে এলেন দীপন ঘোষাল। খরখরে দুচোখ তুলে নমিতা সেদিকে চেয়ে রইলেন। অপমানের যন্ত্রণাটা এখন দেহ ছেড়ে মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। পিছন থেকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, সত্যিকারের ভালো বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই—নিজের অবস্থা ফেরানোর চেষ্টার নাম লোভ নয়—পরের উপকারের আদর্শের বোঝা নিজের মাথায় চাপিয়ে এ-সংসারে একমাত্র তুমিই পথে বসতে পারো—বিপাকে পড়লে কেউ ফিরেও তাকাবে না তোমার দিকে সে-চিন্তা শুধু তোমারই মাথায় আসে না!

এই অব্যক্ত কথাগুলোই ভিতরে তোলপাড় করে গেল। খাওয়া শেষ হয়েই এসেছিল, রাগে আর বিতৃষ্ণায় বাকিটুকু মুখে তোলার রুচি গেছে। অবুঝের মতো যে-কাজ করে এলো তার জন্যে অনুশোচনা নেই, বড় বড় কথা আবার। সামনে পেয়ে ওঠেন না, কিন্তু আড়ালে সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর উষ্মা উপযুক্ত জবাব খুঁজছে একটা। মুখ হাত ধুতে ধুতে মনে হল, এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে রাজ্যের লটারীর টিকিট আছে সব একটা-দুটো করে কিনে নিয়ে আসবেন। এনে চোখের ওপর খোলা ফেলে রাখবেন। রেখে বুঝিয়ে দেবেন, ওই লোকের ওপর নির্ভর করার থেকে এই প্রাপ্তির আশাও ঢের বেশী বাস্তব। এই উপযুক্ত জবাব।

জ্বলতে জ্বলতে নিজের ঘরে এলেন। ভাতের পর একটা পান মুখে দিয়ে শোয়ার অভ্যেস দুপুরে। রাগে আর যন্ত্রণায় পান সাজার ধৈর্য থাকল না। একটা পানের আধখানা ছিঁড়ে চিবুতে চিবুতে শয্যায় এসে বসলেন। দুপুরের রোদ মাথায় করে সত্যিই এক্ষুনি লটারীর টিকিট কিনতে বেরুবেন না তা বলে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা কোণের ঘর পর্যন্ত ছুটে যেতে পারল না, তার আগে নিজের ঘরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

নমিতা ঘোষাল শুয়ে পড়লেন। পাশ বালিশটা বুকের ওপর চেপে ধরলেন। রাগের ফলটা এবারে চোখ দিয়ে বেরুতে লাগল। দু গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নামল।

প্রকাশিত হ'য়েছে

আন্তর্জাতিক মাটি ছাড়া চাষ সংস্থার একমাত্র ভারতীয় সদস্য
বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের

মাটি ছাড়া চাষ পুকুর ছাড়া মাছ ৪·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

নীললোহিতের আয়না ৫·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

নির্বাসনের দিন ৬·০০

অবধূতের

উত্তর রাম চরিত ৫·০০

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষের

পার্টি গার্ল ৬·০০

বীরেন্দ্র দত্তের

শীতের বেলা ৫·০০

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

কুশাঙ্কুর ১২·০০

জ্যোতির্ময় ৭·০০

দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ
৫৭/সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অন্তত বাচ্চাদের কথা ভেবে খাঁটি মশলা কিনুন—

সানরাইজ

হ'ল সেই মশলা-
১০০% খাঁটি-
স্বাদে গন্ধে ভরপুর

শুধুমাত্র স্বাদের জন্যই নয়—মশলা তৈরীর ব্যাপারে আমরা সবার আগে বিশুদ্ধতার দিকে নজর দিই। খাঁটি কাঁচামাল কেনা হয়—আধুনিক মেশিনে তৈরী হয় সানরাইজ মশলা—নিজস্ব ল্যাবরেটারীতে পরীক্ষা করা হয়। তাইতো সানরাইজ আজ দেশের সেরা মশলা।

দোকানে খাঁটি মশলা চাইলেই ▷ সানরাইজ পাবেন।

প্রকাশ ব্রাদার্স ৭৪/এ, নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা-৭ ফোনঃ ৩৩-৮৩০১

Newfields P.B. 12.73.

এ-দিকে ও-ভাবে বকাবকি করে আসার ফলে দীপন ঘোষালেরও ভিতরে ভিতরে অনুশোচনা হল একটু। খাওয়ার সময় এ-ভাবে না বললেই হত। এই রকমই স্বভাব, দপ করে জ্বলে উঠতে সময় লাগে না, ঠাণ্ডা হতেও না। কোন্ কোন্ খাতে দান করা যেতে পারে কমিটিতে পাস করানোর আগে তার লিস্টটা খুব ভেবে-চিন্তে ফাইন্যাল চেক করে ফেলবেন মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সেদিকে মন দেওয়া গেল না। স্ত্রীর সুখের সংসার চিন্তাজনিত সমস্ত আচরণের মধ্যে লোভ ছাড়া একটা ছেলে-মানুষি মিষ্টি দিকও যে আছে সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। ভাগ্নে-ভাগ্নিগুলো কিছু এসে চাইলে মুখে বকাঝকা করলেও শেষ পর্যন্ত না দিয়ে পারে না, তাও লক্ষ্য করেছেন। অপচয় দেখে পাছে তিনিই রেগে ওঠেন সে-জন্য উল্টে তাঁকেই গোপন করার চেষ্টা। ধরা পড়লে বিড়ম্বিত মুখ। —কি করব, নিজের ছেলেপুলে থাকলেও তো কত রকমের আব্দার করত—

...লটারীর টিকিট কাটার বাতিকটা বেশী ছিল যখন, তখনো লোভ ছেড়ে ওই মিষ্ট দিকটাই বেশী চোখে পড়ত। তিন লক্ষ টাকা পাওয়ার চিন্তাটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে দেখা গেছে অনেক চেষ্টা করেও খরচের ফর্দটা ষাট-সত্তর হাজারের বেশী তুলতে পারে না। তার মধ্যেই বাড়ি-ঘর মেরামত করে নতুন করে সাজানো, নতুন আসবাবপত্র আনা, টিউব লাইট আনা এমন কি ফ্রীজ আনা পর্যন্ত হয়ে যায়। আর কিছু ভেবে না পেয়ে তাঁকে বলেছিল, বছরের দুটো ছুটিতে দুবার আমি চেঞ্জে নিয়ে যাবই তোমাকে দেখে নিও—তোমার শরীর ভালো থাকে না বলেই মেজাজ এত খিটখিটে। আর একবার অবাক হয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, লোকে তাহলে অত টাকা দিয়ে কি করে বলো তো?

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। স্ত্রী শয্যায় শয়ান। খাওয়া হল কিনা কে জানে। বারান্দা ঘুরে খাওয়ার জায়গায় এলেন। থালায় সামান্যই অবশিষ্ট আছে। খাওয়া মোটামুটি হয়ে গেছল ধরে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলেন।

...পাশ বালিশটা বুকের ওপর থেকে সরে গেছে। সেই সঙ্গে বুকের কাপড়ও বিস্রস্ত খানিকটা, নমিতার খেয়াল নেই। চোখের ওপর একটা বাহু চাপা দিয়ে শুয়ে আছেন।

কেন যেন অভিমানাহত এই শোয়ার ভঙ্গিটা বেশ লাগল দীপন ঘোষালের। মাথার ওপর পুরো দমে পাখা ঘুরছে। চুলের চার ভাগের তিন ভাগ পিঠের ওপর পড়ে আছে, বাকী চুলের গোছা আকুলি-বিকুলি করছে। বুকের কাপড়ও বাতাসে নড়াচড়া করছে। ফর্সা মুখে হাসি হাসি মুখ, স্ত্রীটির ফর্সা কাপড় অঙ্গে ওঠে না।

হঠাৎ সচকিত তিনি। বাহুর ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে জলের ধারা চোখে পড়ল। শুকনো দাগের ওপর আবার জল নেমে আসতে কানের পাশ ঘেঁষা, গালের একদিক চিকচিক করছে। আর তখনই তিনি টের পেলেন নমিতা নিঃশব্দে কাঁদছেন।

দেখা মাত্র মেজাজ বিগড়ুলো আবার। এই এক ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারেন না তিনি। কাউকে কাঁদতে দেখলে ভয়ানক অস্বস্তি হয় তাঁর। এমন কি অতি বিনয়ে অথবা অতি কৃতজ্ঞভাবে কেউ কিছু চাইলেও বিরক্ত হন। তার থেকে দাবীর জোরটা অনেক বেশি পছন্দ করেন। এই কারণেই ভাগ্নে-ভাগ্নিদের মধ্যে বীরু বেশি স্নেহের পাত্র।

ঘুরে মাথার দিকে এলেন দীপন ঘোষাল। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর চোখ-ঢাকা বাহু সরাতে চেষ্টা করলেন।

হাতের স্পর্শে বাহু আপনি সরে গেল। জলে-ভেজা লালচে চোখে নমিতা পলকে তাকালেন। তারপরেও শুয়েই থাকলেন। চেয়েই থাকলেন। তাঁর হাতের ছোঁয়া থেকে আস্তে আস্তে নিজের বাহু সরাতে গিয়ে নিজের অগোচরেই বুকের ওপর আঁচলটা টেনে দিলেন।

পাশে বসলেন দীপন ঘোষাল। গম্ভীর। —কাঁদছ কেন?

নমিতা নিরুত্তর। জলে-ভেজা চোখের কালো তারা তাঁর মুখের ওপর সামান্য নড়ল কি নড়ল না।

ভুরুর মাঝে একটা দুটো ভাঁজ পড়ল দীপন ঘোষালের। —অন্যায় যদি কিছু করে থাকি বা বলে থাকি মুখের ওপর সেটা বলে দিতে পারো না কেন? এভাবে শুয়ে শুয়ে কান্নার কি মনে হয়?

উদ্গত অভিমান ঠেকানোর চেষ্টার নাকের কাছটা বার দুই ফুলে উঠল নমিতার। জবাব না দিয়ে বাহুতে আবার চোখ ঢাকতে গেলেন। পারা গেল না। বাহুর কাছটা টেনে ধরে রাখলেন দীপন ঘোষাল। সামনে ঝুঁকলেন একটু। অভিমানের মুখে তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন থমকালেন এক-

মোহগ্রস্ত মানুষকে মোহমুক্ত করতে আমাদের প্রকাশিত বই পড়ুন

স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও কেন সাধারণ মানুষের স্থান নেই, কোথায় তার গলদ তা জানতে হলে অবশ্যই পাঠ্য। শিক্ষা সম্পর্কে একটি মার্কসবাদী মূল্যায়ন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহের

শিক্ষা ও শ্রেণী সম্পর্ক ৩·৫০

আমাদের দেশের শাসক কংগ্রেস দাবী করেন—গান্ধীজীই নাকি তাঁর গান্ধীবাদের দ্বারা দেশকে স্বাধীন করেছেন, দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা কি এসেছে? একজন লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদের একটি মার্কসবাদী পর্যালোচনা, সৈয়দ শাহেদুল্লাহের অনবদ্য সৃষ্টি

লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ ৭·০০

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধে কে আক্রমণকারী তারই এক তথ্যপূর্ণ দলিল, অপ্রিয় রায়ের

ভারতের চীনযুদ্ধ ১২·০০

শেখ মুজিবের নেতৃত্ব কিভাবে বাঙলাদেশের প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধকে ব্যাহত করেছে তার এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণসহ প্রকাশিত হয়েছে ওপার বাঙলার বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ইন্দু সাহার

পূর্ব বাঙলার গণ আন্দোলন ও শেখ মুজিব ১০·০০

নবজাতক প্রকাশন ঃ এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

প্রশ্ন। ওই চোখের গভীরেও কি যেন একটা অশান্তি আর চিন্তা জমাট বেঁধে আছে।

গলার স্বরও কেমন অস্বাভাবিক মৃদু-গম্ভীর শোনালো। আরো একটু ঝুঁকেছেন সামনের দিকে। — নমি, ওভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলার পর আমার নিজেরই খারাপ লেগেছে। তুমি কি খবর রাখো আমার কিভাবে দিন কাটছে রাত কাটছে? তুমি কি জানো পর পর পাঁচটা রাত কেটে গেল, আমি একটা ঘণ্টার জন্যেও ঘুমুতে পারিনি?

হঠাৎই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যেতে লাগল নমিতার বুকের মধ্যে। বড় বড় চোখ করে রুদ্ধশ্বাসে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আরো কাছে ঝুঁকেছেন দীপন ঘোষাল। —নমি, তুমি কি জানো ভাগ্যের এমন একটা খেলা শুরু হতে না হতে আমি কতো একা কতো নিঃসঙ্গ হয়ে গেছি?

মোচড়ের ওপর মোচড় পড়ছে। রাগ ক্ষোভ অভিমান সব ভুলে আচমকা দু-হাত বাড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে মানুষটাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিয়ে এলেন। এত শক্তি আর এমন আকুতি কোথায় ছিল জানেন না। ঘরের দুটো দরজাই হাঁ করে খোলা সে খেয়ালও নেই।

আচমকা এ-রকম একটা প্রবল আকর্ষণের জন্য ওই মানুষও আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে, চুল ঘেঁষা কপালের কাছ থেকে যে শুকনো ক্ষতটা গভীর হয়ে মাথার ভেতর পর্যন্ত চলে গেছে, সেটার স্পর্শ বুকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ সিরসির করে উঠল নমিতার। ঘাড়ের পিছন দিয়ে দু-হাত চালিয়ে আরো কাছে টানার চেষ্টা করতে ঘাড়ের পিছনের শুকনো দু-তিনটে ক্ষতর স্পর্শও হাতে আর আঙুলে লাগতে সমস্ত গায়ে যেন কাঁটা কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।

এ-রকম একটা আবেগের মুখে পড়ে দীপন ঘোষাল হকচকিয়ে গেছেন একটু। হাসতে চেষ্টা করে বলতে চাইলেন, কি হল হঠাৎ, অ্যাঁ?

কিন্তু সবটা বলা হল না। আকুল আবেগে স্ত্রীটি নিজের নাকমুখ ঠোঁট গাল তাঁর মুখে ঘষে চলেছেন। জীবনে এই প্রথম যেন সম্পূর্ণ নিজের জোরে এক দূরের মানুষকে খুব কাছে একেবারে দখলের মধ্যে টেনে আনতে পেরেছেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, আরো কাছে এসো, আমাকে ধরে থাকো, আমার সমস্ত গা কাঁপছে..

।। তিন ।।

রেবা বেশ জোরে ডাকতে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন নমিতা। সঙ্গে সঙ্গে বুকের বসন খুলে পড়তে ব্যস্ত হাতে সামলাতে চেষ্টা করলেন। কলেজ থেকে রেবাই সাধারণত সকলের আগে ফেরে। চকিত হাতে বেশবাস সুবিন্যস্ত করার ফাঁকে আড় চোখে পাশের শূন্য শয্যার দিকে তাকালেন একবার। কখন উঠে গেছে টের পাননি। .. একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকত, বাবার আগে ডেকে দিয়ে গেলেও তো পারত।

রেবার দু চোখ তাঁর মুখের ওপর পাক খেল একবার। হাসি চেপে বলল, বাবাকে বাবা, কি ঘুম তোমার—এর আগে আরো দুবার ডেকে গেছি। উঠে আগে আয়নায় মুখখানা ভালো করে দেখে নাও। ঘুমের মধ্যে মজার স্বপ্নটপ্ন দেখছিলে কিছু?

শয্যায় বসেই চকিতে অদূরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে মুখ ফেরালেন। এখান থেকেই দেখা যায়। কপালে সিঁদুর লেপটে আছে। চোখ পড়া মাত্র ওই সিঁদুরের আভা যেন সমস্ত মুখে ছড়াতে লাগল। সিঁদুরের দাগ মোছার অছিলায় শাড়ির আঁচল কপালে তুললেন। ভালো-মুখো মেয়ে তলায়-তলায় সেয়ানা হয়ে উঠেছে, দেখলে মনে হবে ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। এদিকে সামনের ওই বোসপাড়ার এক বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে রসের ব্যাপার চলেছে।

বললেন, গরম কখন ঘাম মুছতে গিয়ে লেপটে গেছে—তুই বুখ-হাত ধোগে যা, আমি আসছি।

রেবা নড়ে না। মামী সিঁদুরের দাগ মুছেই চলেছে।

—বাবা, এই জোর পাখার নীচেও ঘাম তোমার, দিনকে দিন যা মুটোচ্ছ না—

—দেখ্ ফড়ফড় করিস না, ভাগ এখন।

রেবা তবু দাঁড়িয়েই থাকল, মুখ থেকে আঁচল নেমে আসতে সকৌতুকে চেয়ে রইল একটু। —সত্যি বলছি মামী, তোমাকে মোটাই বলি আর যা-ই বলি, দেখতে কেমন যেন বেশ সুন্দর লাগছে এখন, সমস্ত মুখে কেমন একটা লাল-লাল ভাব—

মামী চোখ পাকাতে চেষ্টা করলেন, তুই যাবি এখন এখান থেকে? ধৈর্য ধরে আর কিছুদিন সবুর কর, সিঁদুর লেপটে গেলে তোর মুখও দেখতে লাল-লাল হবে।

রেবা পালালো। একা ঘরে নমিতার মুখ সত্যিই লাল তখনো। ...অস্তিত্বের কণায় কণায় হঠাৎ কি-যে একটা ব্যাপার ঘটে গেছল, নইলে এ-বয়সে এমন কাণ্ড করে বসলেন কি করে। মাথার কাছের দরজাটা পর্যন্ত এক পাট খোলা ছিল, আর ভাগ্যিস তার সামনের তারে রঙিন শাড়িটা ঝুলোছিল, নইলে রাস্তার ও-দিকের বারান্দায় কেউ দাঁড়ালেই সোজা ঘরের মধ্যে চোখ চলে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এর থেকেও বড় সংকট গেছে—রেবা এক-একদিন যখন-তখন কলেজ থেকে চলে আসে, আর বইখাতা ফেলেই এ-ঘরে এসে উঁকি দেয়—কোনদিন বা তাঁর পাশে শুয়ে ঘুম লাগায়। ও যদি আজও এসে যেত..

অঘটনটা ভাবতে গিয়ে নমিতার সমস্ত মুখ আবার আরক্ত। সমস্ত লজ্জা ভয় সংকোচের মাথা এভাবে খেয়ে বসেছিলেন কি করে সেও এক বিস্ময়।

শয্যা ছেড়ে তাড়াতাড়ি কলঘরে চলে গেলেন। শাড়ির আঁচলে ভেজা মুখ মুছতে মুছতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালেন আবার। কপালে বা কোথাও সিঁদুরের চিহ্নও নেই আর। কিন্তু আধভেজা মুখে তার আভা যেন এখনও ছড়িয়ে আছে। আঁচলে ঘষে সেটুকু লোপ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

রেবা ফিরে এলো আবার। হাব-ভাব চটানি উৎসুক বেশ। জিজ্ঞেস করল, মামা কি আজও সেই রাত দশটায় কলেজ করে ফিরবে নাকি?

উৎসাহের আতিশয্যে নটা সাড়ে ন-টাকে দশটা বানিয়ে ফেলল। চিরুনি হাতে করে নমিতা ঘুরে তাকালেন ওর দিকে।—কেন, ও-ঘরে নেই?

—না তো! রেবা অবাক। —ও-ঘরে থাকবে মানে, মামা আজ কলেজ যায়নি?

এবারে আবার ওর দৃষ্টি এড়াতে চাইলেন নমিতা। আয়নায় চোখ রেখে মাথায় চিরুনি বোলাতে বোলাতে জবাব দিলেন, না।

সমাচার শোনার আগ্রহে রেবা উন্মুখ তখনি। কিন্তু চিরুনির কাজ শেষ করে মামী দেখে-শুনে কপালে সিঁদুরের বসাতে ব্যস্ত।

অতএব প্রসঙ্গটা রেবাই তুলল। মামী, এত বড় একটা ব্যাপারের মা[illegible] সারে সর্বেসর্বা কাগজে ছবি দেখ[illegible] কলেজের অনেক মেয়েই জেনে ফে[illegible]

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জিক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টসের তৈরী

নমিতা এবারে ভ্রূকুটি করে তাকালেন ভাগ্নির দিকে। —ছেলেরা কেউ জেনে ফেলেনি?

—যাঃ! তুমি একটা যাচ্ছেতাই—

—মামী! বইয়ের ব্যাগ কাঁধে ঝোলানো অবস্থাতে ঘরের মধ্যে এক-পা ঢুকে পড়েই ক্লাস এইটে পড়া ভাগ্নি চার আঙুল জিভ কেটে দাঁড়িয়ে গেল। বাইরের জুতো নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকলে মামী চটে যায়। চট করে পা তুলে নিয়ে শিপ্রা তার খুশির উত্তেজনা সম্পূর্ণ করল। —মামী, আমাকে তুমি বাইশ পয়সা দেবে—টিফিনের জমানো পয়সা থেকে সুগান্তর কিনে সব মেয়েদের মামার ছবি দেখালাম—মামা যে কত বড় একজন হয়েছে ভালো করে বুঝতেই পারে না কেউ, আমি বোঝাতে তবে বুঝল।

ওর কথা শুনে হাসি চাপার চেষ্টায় নমিতা আয়নায় মুখ ফেরালেন আবার। সিঁদুর টিপ আর একটু গোল করার জন্য আঙুল তুলে বসতে যাচ্ছিলেন, তুই কি বোঝালি শুনি? কিন্তু বলা হল না। তার আগেই চোখে পড়ল, চোখ মুখ মচকে শিপ্রা তার দিদিকে কি ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে রেবার সচকিত মুখ তাঁর দিকে ফিরল। তারপর শিপ্রার পাশ ঘেঁষে তার আগেই লঘু পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। নমিতার মনে হল যাবার আগে ও শিপ্রার গায়ে আঙুলের একটা খোঁচা মেরে গেল। শিপ্রা তার পিছু নিল।

দরজার কাছে এসে নমিতা গলা বাড়ালেন একটু। কাপড়ের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে শিপ্রা একটা খাম বার করে দিদির হাতে দিল। রেবা তাড়াতাড়ি সেটা আঁচলের আড়াল করে ফিসফিস করে বলল, তুই একটা যাচ্ছেতাই মেয়ে, মামীর ঘরে দাঁড়িয়ে ইশারা করতে কি দরকার ছিল, দু মিনিট দেরি হলে আমি মরে যেতাম!

বারান্দা পেরিয়ে দরজার ও-ধারে দাঁড়াল বোনকে নিয়ে। আঁচলের আড়ালে হাতের মুঠোয় খাম।

—তুই চিঠি আনতে গেলি কেন, কেউ দেখে ফেললে?

গলা খাটো করে শিপ্রা জবাব দিল, অঞ্জনদা সেই কাঁচা ছেলে আর কি, আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে লেখার খাতা দেখতে চেয়ে পাতার মধ্যে খাম গুঁজে দিয়েছে—আর সেই সঙ্গে এক প্যাকেট চকোলেট! অঞ্জনদাকেও আমি খবরের কাগজ দেখিয়েছি দিদি—

উৎসুক চাপা গলায় রেবা জিজ্ঞাসা করল, দেখে কি বলল?

—হাসল। বলল, আগেই দেখেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে রেবা চমকে লাফিয়ে উঠল একেবারে। তারপরেই মাথায় বজ্রাঘাত একেবারে। মামী পিছনে দাঁড়িয়ে। রেবার হাতের খাম এখন তার হাতে। পিছন থেকে এসে প্রথমেই খাম টেনে নিয়েছেন।

ভেবাচেকা খেয়ে শিপ্রা দুড়দাড় ছুটে পালালো। রেবার মুখ আমসি। মামীর কঠিন চাউনি।

খাম হাতে নমিতা ভিতরের দরজা ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকলেন। একটা অদৃশ্য টানে কাচপোকার মতো রেবাও পিছনে এলো। মামীকে যে খুব একটা ভয় করে এমন নয়, কিন্তু অঘটন এত আকস্মিক যে রেবার বুকের ভিতরটা কাঠ একেবারে।

গলার স্বর যতটা সম্ভব কঠিন করে নমিতা জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কতদিন শুরু হয়েছে?

—না, ইয়ে সত্যি বলছি মামী, এই প্রথম।

—এই প্রথম?

—না, দ্বি-দ্বিতীয়। গলা দিয়ে আওয়াজ বার করতে পেরে রেবা আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল।—তোমার পায়ে পড়ি মামী, চিঠিটা দাও, আর কক্ষনো এ-রকম—

—তোদের লজ্জা করে না একটা ছোট মেয়ের হাত দিয়ে চিঠি চালাচালি করিস? ওর মাথাটা খাচ্ছিস সে খেয়াল আছে? আসুক—চিঠি যার হাতে দেওয়া উচিত তাকেই দেব।

দু হাতে রেবা সত্যিই তাঁর হাঁটুর কাছটা জড়িয়ে ধরল একেবারে।—মামী গো মামী, এই বারটি—মামার হাতে ওই চিঠি পড়লে আমি বেরিয়ে যাব—আত্মহত্যা করব—সত্যি বলছি মামী, চিঠিতে ও কক্ষনো কোনো খারাপ কথা লেখে না—

—তাহলে আমিই আগে দেখি কি লিখেছে।

—না না না মামী পায়ে পড়ি তোমার, শিপ্রার হাত দিয়ে চিঠি পাঠাবার জন্য আমি ওকে যাচ্ছেতাই করে বকে দেব—ওটা দাও মামী—আজ মামার এমন একটা শুভ দিনে তুমি ও-রকম করো না—লক্ষ্মীটি—

নমিতার রাগ আগেই পড়ে এসেছিল। এখন হাসি চাপা দায়। রাগ করা উচিত, অথচ গোড়া থেকেই সে-রকম একটা রাগ করে উঠতে পারছিলেন না। এখন শুভ দিনের কথা বলে মেয়েটা যেন একেবারেই ঘায়েল করে ফেলল তাঁকে। শুভ দিনের অনুভূতিটা এখনো সর্বাঙ্গে লেগে আছে।

তবু কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। এত সহজে নিষ্কৃতি দিতে পারেন না ওকে। —কার চিঠি, সেই বে-ছেলেটার জন্য মামার কাছে ধমক খেয়ে মরেছিলি একদিন—তার?

মাস চারেক আগে পরীক্ষার ফল বেরুতে মামা সত্যিই চটে মটে হঠাৎ মামীর উদ্দেশে চিৎকার করে বকাবকি করে উঠেছিল।—ফেল করবে না তো কি? আজেবাজে ছেলের সঙ্গে মেশে আরো হাওয়া খেয়ে বেড়াতে বলো——আমি চোখ বুজে থাকি এবোরে না? জিজ্ঞেস করে এসো কেন ফেল করল।

পরীক্ষায় ফেলের জন্য মন খারাপ করবে কি, মামার গলা আর ওই কথা শুনে রেবার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি। কলেজে রাত নটা পর্যন্ত দুই শিফটের ক্লাশ করে মামা ওদের লেকে বেড়াতে দেখল কেমন করে রেবার মাথায় ঢোকেনি। পরে অঞ্জনই ওকে তাঁকে ধরা-পড়ার সম্ভাব্য কারণ বলেছে। মামার কলেজের এক প্রোফেসারের লেকের ধারে বাড়ি, ফাঁক পেলে তিনি লেকে হাওয়া খান। তাঁর চোখেই পড়ে থাকবে।

নমিতা বুঝেছিলেন, মামার সমস্ত কথাই মেয়ের কানে গেছে। তারপর সময় মতো ওকে জেরা করে ব্যাপার বুঝে নিয়েছিলেন।... বোসপাড়ার অঞ্জন চ্যাটার্জি, অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, গেল বারে ভালো মতো এম-এ পাস করে চাকরি খুঁজছে, ইত্যাদি।

কি করে লেকে বেড়ানোর মতো ঘনিষ্ঠতা হল জানার লোভ হয়েছিল নমিতার। কিন্তু একে স্কুল টিচার তায় মামী। লোভ সংবরণ করে সাবধান করে দিতে হয়েছিল, খবরদার, এরপর বেশি মিশলে-টিশলে মামা আস্ত রাখবে না বলে দিলাম।

কিন্তু মেশামেশি যে বন্ধ হয়নি সেটা ওর মুখ দেখেই টের পেতেন। ফেলের দুঃখ ঘুচে গিয়ে পাশ করার জন্য মেয়ের ভবল

উৎসাহ এখন। এবারে পাশ করবেই, পণ। এক গল্পের বই ছাড়া অন্য বই হাতে নিলে যে মেয়ের হাই ওঠে তাকে এত উৎসাহ কে জোগালে সেটা তিনি বিলক্ষণ আঁচ করতে পারেন। কিন্তু স্বামীর কাছে সেটা প্রকাশ করতে পারেন নি, শুনলেই তো চেঁচামেচি করে উঠবে। ওদের মুখ চেয়ে এ-রকম অনেক ব্যাপারই ঘরের লোকের কাছে গোপন করে যেতে হয় তাঁকে। বড় ভাশুর ওই সুদেব ছোঁড়াও তার আপিসের কোন মেয়ের সঙ্গে ভিড়েছে কানে এসেছে। আপিসে এত কাজ এখন যে ফিরতে সন্ধ্যা গড়ায় রোজই। ব্যাপারটা দিনকতক আগে প্রবীরই তাঁর কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল। ওটার আবার মনে মুখে লাগাম নেই। বলেছিল, দুশ সাতাত্তর টাকা মাইনের দেবুদা যে কি করে সামলাবে সে-ই জানে, আপিসের কাজের আলোচনার জন্য ছুটির পর গঙ্গার ধারে যে মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাকে দেখলে মনে হয়—দু হাজার সাতাত্তরও যথেষ্ট নয়।

পরে জেরা করে শুনেছেন, দেবুর আপিসেরই মেয়ে সে, আর বীরুর ধারণা, ও-মেয়ের সমস্ত মাসের মাইনে তার পোশাক-আশাকেই খরচ হয়ে যায়। সেই মেয়ে দেখতে কেমন বা কি জাত শোনার পর দেবুর ওপরেও ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট তিনি—কিন্তু এ ব্যাপারও কোনদিন ওদের মামাকে ঘুণাক্ষরে জানান নি। ভরটা যেন ওঁর নিজেরই। আসলে দেবুর ইঙ্গিতেই যে বীরু তাঁকে খবরটা জানিয়ে রেখেছে সেকথা মনে হয়নি। তাঁর আচরণে রুকমফের না দেখে দেবুও মনে মনে খুশি। শুধু দেবু কেন, মামার কোপ থেকে আগলে রাখা হয় বলে ভাগ্নে-ভাগ্নিরা সকলেই খুশি তাঁর ওপর। উদ্বেগ শুধু তাঁরই। ওরা এরপর সব দিক সামলাবে কি করে!

...রেবারও বিশ্বাস, মামী যতো রাগই করুক, শেষ পর্যন্ত মামাকে কিছু বলবে না। জেরার জবাবে মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ চিঠি সেই ছেলেরই।

—চাকরি-বাকরি জুটেছে অ্যাদ্দিনে না জোটেনি—

—বাইরের কলেজে কাজ পেয়েছিল, যায় দি...।

—তা যাবে কেন, ঘরে বসে চিঠিচার্খানি করবে। খামটা গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। —যা, দূর হ'।

চিঠি নয়, হাতের মুঠোয় প্রাণখানা নিয়ে রেবা নিজের ঘরে ছুটল।

নমিতা পাশের খুপরি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন একটু। টেবিলের ওপরে সেই ছাপানো লিস্টটা নেই। নমিতা ভ্রূভঙ্গি করলেন একটু ঘুম বা নাওয়া-খাওয়ার সময় হবে কি না এরপর কে জানে। পরোপকার করার সাধ ছিল এতদিন, সাধ্য ছিল না। এখন আর পায় কে।

কিন্তু সত্যিই মনের তলায় আর এতটুকু ক্ষোভ বা বিরক্তি নেই নমিতার। উল্টে কোথায় যেন নিজের একটা জোরের সন্ধান পেয়েছেন। মনে মনে বললেন, যতো কাজই থাক, যাতে না ঘুমনো আর নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া বার করছি। ঘরের মলিনদশা আজই যেন চোখে পড়ল। টেবিল কুথটা বিবর্ণ, ঘরের কোণায় ঝুল, বইয়ের তাকগুলোতে বাজোর ধুলো-বালি জমেছে মনে হল। সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিজের হাতের একটু স্পর্শ রাখার লোভটাও এই প্রথম অনুভব করলেন। কিন্তু লোভ দমনও করলেন আপাতত। যা করার সামনে বসিয়ে রেখেই করবেন, যে খুঁতখুঁতে স্বভাব—এসে নাড়াচাড়া পড়েছে দেখলেই একটা হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেবে।

মেয়ে দুটো জলখাবারের ব্যবস্থ করার জন্য খাওয়ার ঘরে এসে ঢুকলেন। ঠোঁটের ফাঁকে প্রসন্ন হাসির আভাস একটু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রেবা কাছে এলো। ওর চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে একটা চাপা খুশির আভা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

কর্তব্যবোধে নমিতা ভ্রূকুটি করলেন একটু।—শিপ্রাকে ডাক।

রেবা বলল, ওটা ভয়ের চোটে ঘরে সেঁধিয়ে আছে।

ছদ্মকোপে নমিতা বললেন, আর তুই আনন্দে একেবারে ডগমগ করছিস। লজ্জাও করে না—

—লজ্জার মাথা খেয়ে তাহলে একটা জিনিস দেখাই তোমাকে। নমিতার দু হাত জোড়া, রেবা সবুজ কাগজে লেখা চিঠিটা তাঁর সামনে খুলে ধরল।

নমিতা থমকে তাকালেন সেদিকে। পড়ার ইচ্ছে নেই কিন্তু মুখ ফেরাবার আগেই দু লাইন মাত্র লেখা পড়া হয়ে গেল।

সুচরিতাসু, কাগজে মামাবাবুর ছবি দেখলাম আর খবর পড়লাম। তাঁর জয়-জয়কার হোক।—অঞ্জন'

রেবা একটা হালকা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে মামীর দিকে তাকালো। অঞ্জন যে আর পাঁচটা খটাটে ছেলের সগোত্র নয় এই চিঠিই যেন তার প্রমাণ। মুহূর্তের মধ্যে ছেলে-টার সম্পর্কে নমিতারও সত্যিই ধারণা বদলে গেল। এটুকুর মধ্যেই ছেলেটার শিক্ষা আর রুচির পরিচয় পেলেন। তবু মামীসুলভ গাম্ভীর্যে বলে উঠলেন, যা লিখেছে এনে দেখালি, আর যা লেখে নি, সেটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি আমার নেই ভাবিস—কেমন? ওই ছোট মেয়ের হাতে চিঠি পাঠিয়ে তোকে এটুকুই বা লেখার কি দরকার পড়েছিল!

রেবা উঠে পালালো!

দশ মিনিটের মধ্যে সুদেব আর বীরুও বাড়ি এসে হাজির। এই ব্যতিক্রম দেখেও নমিতা মনে মনে হাসছেন। বিকেলের জল-খাবার রুটি তরকারী টেবিলে আসতেই বীরু চেঁচামেচি করে উঠল, তুমি তো রাম কেপ্পন দেখি মামী। আজকের দিনেও সেই শুকনো রুটি আর তরকারীর ঘ্যাঁট—বলি কোটি কোটি টাকা নামেরও তো একটা স্পার্ক আছে—কি বলো দেবুদা?

সুদেব ওর থেকে মাত্র মাস চারেকের বড়ো। পরামর্শ বা মন্ত্রণার দরকার হলে সে-ই সর্বদা মাসতুতো ভাইয়ের শরণাপন্ন হয়। এখন দাদার গাম্ভীর্যে সায় দিল, আমি তো ভেবেছিলাম মাংস পরোটা দেখব—

নমিতার মেজাজও সত্যিই প্রসন্ন। তবু যতটা সম্ভব গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, কোটি-কোটি টাকার স্পার্কের চোটে বিকেলের জল-খাবার বন্ধ হয় কিনা দেখ্ আগে—

ফিলিপস্ রেডিও বিক্রয়
ও মেরামতের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

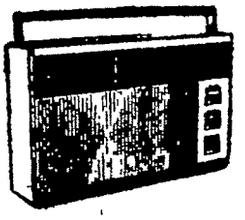

মধ্য কলিকাতার বিশিষ্ট অনুমোদিত
ফিলিপস্ রেডিও বিক্রেতা ঃ —

বিভিন্ন মডেলের— 1E Battery Charger পরিবেশক ঃ—

স্ট্যাণ্ডার্ড রেডিও সার্ভিস্
৮, শ্যামাচরণ স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ ফোন ঃ ২৩-১৪১৫

—কেন? কেন? দু ভাই-ই উন্মুখ।

ওদের ঘাবড়ে দেবার মতো করেই নমিতা জবাব দিলেন, কলেজের চাকরি হয়ে গেল—

সুদেব সত্যিই ঘাবড়ালো। রেবাও সচকিত একটু। শিপ্রা সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হওয়ার বায়না পেশ করার তালে ছিল, সে-ও হকচকিয়ে গেল। কিন্তু বীরু সেয়ানা ছেলে। দুশ্চিন্তার কারণ কিছু থাকলে মামীর এই মুখ দেখা যেত না। গলা দিয়ে তাচ্ছিল্যের একটা শব্দ বার করে বলল, সে-তো হয়ে যাবেই, অমন চাকরি মামাই কতজনকে দেবে ঠিক নেই—চাকরির বদলে ঘরে কি আসছে সেই হিসেবটা দাখিল করো দেখি—নিজে হাওয়া খেয়ে আর সকলকে হাওয়া খাইয়ে তো মামা জন-কল্যাণের সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে না।

নমিতা বললেন, প্রায় সে-রকমই অবস্থা, মামাকে চিনিস না!...ওঁরা দেড় হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন, তোদের মামা সেটা বারো-শ'য় টেনে নামিয়েছে—প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, বছরান্তে পরীক্ষার খাতা দেখে পাঁচ-ছ'শ টাকা ঘরে আসত তাও গেল—খুব মাংস পরোটা খাবি তোরা।

তবু লাভ লোকসানের কোনদিকটা ভারী হল সুদেব বা রেবা-শিপ্রা চট করে ঠাওর করে উঠতে পারল না। প্রবীর বলে উঠল, মামা একেবারে ওয়ার্থলেস...আমার মতো একজন কড়া প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার তাঁর এখন, বুঝলে? কিন্তু আমার পোষাবে না, নিজে বারো শ' টাকা নিলে আমাকে আর কতো দেবে—তাছাড়া ব্যবসা ছাড়া আর কিছুতে নাক গলানোর ইচ্ছে আমার নেই। যাকগে, কিছু ভেবো না মামী, ওই কোটি-কোটি টাকা নামেই সব হয়ে যাবে—মতির মা এসে থাকলে তাকে রাজভোগ আনতে পাঠাও।

এই ভাগ্নের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর নমিতারও কিছু আস্থা আছে। এ-সব ব্যাপারে ছেলেরা যতো বোঝে মেয়েরা তার সিকিও বোঝে না বলে ধারণা নিজেরই। কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোটি-কোটি টাকা নামেই সব হয় কি-রকম, ওই টাকা কি আমাদের নাকি!

রুটি তরকারী মুখে ঠেসে বীরু জবাব দিল, দুনিয়ার হাল তুমি কি-ছু জানো না।..মিলিয়ন পাউন্ড নোট দেখেছ?

মামী অবাক। —কার কাছে দেখব?

—ধেৎ ছাই। ওটা একটা ইংরেজি ছবি। ওতে দেখানো হয়েছে, মিলিয়ন ডলার নোট দখলে থাকলেই বাজার হালে কাল কাটানো যায়, ওটা কখনো ভাগ্যানোরও দরকার হয় না।

ভাগ্নের কথা শুনে মামী অবাক।

ঠিক সেই সময়েই নীচে বাড়ির দরজায় গাড়ি থামার আর দুটো-তিনটে পরিচিত হর্ণ-এর শব্দ কানে এলো। সকলেই উৎসুক একটু। রেবা তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঁকি দিয়েই ছুটে ফিরে এলো আবার। —মামী! সোনাজোড়ার কুমার বাহাদুর—তাঁর মস্ত গাড়ির পিছনে আবার একটা চকচকে বড় গাড়ি!

খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। সুদেব আর প্রবীর ছুটে নেমে গেল। ব্যস্ত পায়ে নমিতাও সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোক একলা এলে ওপরে নিয়ে আসা

চিরায়ত গানের

স্বরলিপির বই

মনোরঞ্জন সেন কৃত নজরুল—স্বরলিপিমালা

নীলাম্বরী নিশিরাতে রিম্‌ঝিম্‌ বাদল নূপুর, নীলাম্বরী শাড়ী, পরি', আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয়, আগুন জ্বালাতে আসি নি, গগনে কৃষ্ণমেঘ দোলে, বঁধু আমি ছিনু বুঝি, প্রিয়তম এত প্রেম দিয়োনা গো, যাই গো চ'লে যাই, হাসিমুখে বাসি ফুল প্রভৃতি ২৬টি গানের সংকলন।

আনন্দ-সুন্দর ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে, প্রভাতবীণা তব বাজে, রাত্রিশেষের যাত্রী আমি, সে চলে গেছে বলে, আমি চাঁদ নহি, মাটির প্রতিমা, দোল ফাগুনের দোল লেগেছে, এখনো ওঠেনি চাঁদ, প্রেম-পাগলিনী রাধা প্রভৃতি ২৮টি গানের সংগ্রহ।

মালবিকা মোরে একটুখানি দাও অবসর বরিষণ-শেষে ডাকিয়া যূথীকে মোর না মিটিতে আশা ঘুম টুটেছে ফুল-কলিদের নির্ঝর ধারা বহে নবীন আশা জাগল যেবে আজ আমি সূর্যমুখী ফুলের মত মঞ্জরাতে মঞ্জরী আমি গো মাগো আমি তান্ত্রিক নই প্রভৃতি ২৭টি গানের সংকলন।

প্রতি বইয়ের দাম পাঁচ টাকা

দিনেন্দ্র চৌধুরীর

পূর্ববাংলার লোকসঙ্গীত ৮-০০

গ্রাম বাংলার আকুল-করা গানের সংগ্রহ

মনোরঞ্জন সেনের আরো ২টি অনন্য গ্রন্থ

কান্ত-গীতি-মাল্য তুমি অরূপ সরূপ, কবে তৃষিত এ মরু, প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে, শ্যামল শস্যভরা, ঐ বধির যবনিকা, আমি দেখেছি জীবন ভ'রে চাহিয়া কত, ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়, কেড়ে লহো নয়নের আলো প্রভৃতি রজনীকান্তের ২০টি গানের সংগ্রহ।

ভজনমঞ্জরী মীরা, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, নানক প্রভৃতি মরমী কবিদের রচিত ২২টি মূল হিন্দি গানের প্রচলিত সুরের স্বরলিপি-সংকলন।

প্রতি বইয়ের দাম চার টাকা

বিমান মুখোপাধ্যায়ের

মুকুন্দদাসের গান ৪-০০

স্বদেশী আন্দোলনের স্মরণীয় ও বরণীয় গান

ভি, পি,তে পুস্তক লইতে অর্ডারের সহিত অর্ধমূল্য অগ্রিম পাঠান

সান্যাল য়্যাণ্ড কোং ১/১এ কলেজ স্কোয়ার, কলি-১২

হয়, সঙ্গে দুটো গাড়ি রক্ষক, আরো কে এলো কে জানে।...মাসের শেষ, নমিতা চকিতে ক্যাশ বাকসে কত টাকা আছে স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কিছু টাকা আলাদা তোলা আছে। স্বস্তি।

প্রবীর আর সুদেব বুড়ো ভদ্রলোককে একলাই ওপরে তুলে নিয়ে এলো। সিঁড়ির মুখে নমিতাকে দেখে দু পাটি ঝমঝকে বাঁধানো দাঁত বিকশিত করে ফেললেন।—এই যে মা জননী, আজ এমন একটা আনন্দের দিন যে ছেলে তার মাকে ছুটে দেখতে না এসে পারল না। মায়ের অসুবিধে হল না তো? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দু হাত জড়ো নত হলেন কুমার দেব বাহাদুর।

মাথায় কাপড় আরো দু আঙুল টেনে দিয়ে নমিতা হাসিমুখেই জবাব দিলেন, মায়ের কাছে এলে কোনো মায়ের অসুবিধ হয়! আসুন, আমাদের অনেক ভাগ্য—

এর সামনে নমিতার নত হয়ে হাত জোড় করারও উপায় নেই। একে বামুনের ঘরের মেয়ে, তার ওপর মা। নত হলে পুণ্যের ভবা-ডুবি যেন।

বুড়ো সিঁড়ি ভাঙা শেষ করে নমিতার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে হা-হা শব্দে হাসলেন। বললেন, যে দিনকাল পড়েছে, মায়ের ঘরে ছেলে এসে দাঁড়ালে মায়েরই ভাগ্য বটে! স্বার্থ ছাড়া এক পা কে নড়ে বলো, মনে হল শুভ দিনে মায়ের মুখখানা দর্শন করলে আরো পুণ্যি, বাস ছুটে চলে এলাম।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস. এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, সূর্যসেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ভাকমাশুল ফ্রি

বাইরে জুতো খুলে ঘরে ঢুকে বেশ আরাম করে শয্যায় ঠেস দিয়ে বসলেন তিনি। মায়ের কাছে এসে বাইরের লোকের মতো চেয়ারে বসতে আপত্তি।

ক্ষুণ্ণ মুখে নমিতা ভাগ্নেদের দিকে ফিরে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কে এসেছেন?

বীরু মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আর কেউ না। নমিতা তবু বারান্দায় এসে একবার রাস্তায় উঁকি দিলেন। সামনেরটা কুমার বাহাদুরের চেনা গাড়ি। সেখানে দুজন লোক বসে, একজন ড্রাইভার এবং আর একজন চলনদার। পিছনের প্রায় নতুন গাড়িটাতে একজন ড্রাইভার শুধু বসে। নমিতা ধরেই নিলেন ওটা পিছনে পাহারা দিতে দিতে এসেছে।...সেই ভয়ের দিন বুড়োর মন থেকে মুছে যায় নি বলেই হয়তো এখনো এত সাবধান। যা-ই হোক, ওদের জন্যেও খাবার আনতে না দিলে মান থাকে না। শুধু ওদের জন্য কেন, নমিতার দরাজ হাত আজ। বীরুটা রাজ-ভোগ খেতে চেয়েছিল, কিছু বেশী টাকা বার করবার জন্য বুড়োর পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে হাঁটু মুড়ে বসে শব্দ না করে ট্রাঙ্ক খুলতে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কুমার দেব বাহাদুর ঘাড় বাঁকিয়ে ঠিক দেখে নিলেন।—মা জননীর কি হচ্ছে?

নমিতা সপ্রতিভ জবাব দিলেন, মায়ের কাছে এলে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হয়।

—নিশ্চয় হয়, মিষ্টি না খেয়ে নড়ছে কে! কিন্তু ছোঁড়াটা বাড়ি নেই শুনলাম, আমার ওখানেই চলে গেল না তো?

টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে নমিতা বললেন, কিছু তো বলে যান নি..

—ওই একটি রোগ তোমার ভদ্রলোকের, চার ভাগের তিন ভাগ কথা পেটের মধ্যে।..আমার বাড়িতে একটা টেলিফোন করে খবর নেওয়া যায় না?

সুদেব বলল, আমি এক্ষুনি সামনের দোকান থেকে টেলিফোন করে আসছি।

—দেখো তো একবার। একটা টেলি-ফোন পর্যন্ত নেই বাড়িতে..পেলে একটা ট্যাকসি নিয়ে এক্ষুনি চলে আসতে বলবে।

টেলিফোন নম্বর আর মামীর কাছ থেকে মিষ্টির টাকা নিয়ে সুদেব চলে গেল।

আধ-ঘণ্টার মধ্যেই দুটো গাড়ির পিছনে ট্যাকসি থামল। দীপন ঘোষাল নেমে ভাড়া মিটিয়ে ওপরে ছুটলেন।

ঘরে বেশ আনন্দের হাট বসেছে দেখলেন। সকলের হাতে মিষ্টির ডিশ—এমন কি নমিতার হাতেও। সকলের হাতে খাবার দেখে তবে বুড়ো নিজেরটা তুলে নিয়েছেন।

—বাঃ, আমি ছোটাছুটি করে মরছি, আর আপনি দিব্যি এখানে বসে!

কুমার দেব বাহাদুর ছদ্ম গাম্ভীর্যে জবাব দিলেন, যার যেমন বরাত, আমরা রাজভোগ খাচ্ছি, তুই ধৃতরোর ফল চিবোগে যা—

দীপন ঘোষালকে ভোলানাথ বলে ডাকেন ভদ্রলোক। তাঁর নির্লোভ অন্তঃ-করণটি অনেকভাবে যাচাই হয়ে গেছে বলেই হয়তো। সেই প্রসঙ্গে ওই ঠাট্টা।

নমিতা স্বামীর দিকে তাকাতে তিনি মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ এখন খাবার আনার দরকার নেই। অতিথির দিকে ফিরলেন, আপনার সঙ্গে গোটা কতক দরকারী আলোচনা আছে।

কুমার দেব বাহাদুর রাজভোগ চিবুতে চিবুতে ভুরু কুঁচকে খানিক চেয়ে রইলেন। তারপর জল খেয়ে হাত-মুখ খালি করে জিজ্ঞাসা করলেন, কলেজের চাকরি রিজাইন করা হয়ে গেছে?

আজ ফাইন্যাল জানিয়ে এসেছি, কাল চিঠি দেব। কেন?

—চিঠি দিতে হবে না।

বিরক্তগম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে দীপন ঘোষাল বুঝে উঠলেন না কি বলতে চান। জিগেস করলেন, তার মানে?

—তার মানে চাকরি রিজাইন করতে হবে না। তোকে আর আমার দরকার নেই।

রাগ বা অভিমান হলে বুড়ো এই সুরেই কথাবার্তা বলেন তাঁর সঙ্গে। দীপন ঘোষাল হাসলেন, সেটা কখন ঠিক হল?

—এখানে মায়ের কাছে এসো। তেমনি ধমকের সুরেই বলে গেলেন, ম্যানেজিং ট্রাস্টি করছি বলে কি তোকে আমি ফকির হতে বলেছি। মাসে দেড় হাজার টাকা নেবার কথা বলতে চোখ এমন কপালে তুলে ফেললি যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গিলতে বলা হয়েছে—টেনে হিঁচড়ে বারো শ টাকায় নামালি সেটা—এখন?

দীপন ঘোষাল অবাক। —এখন কি?

—এখন কি! টাকার অঙ্ক কমাবার সময় বারো শ টাকাও বেশী বলিস নি?... চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির হিসেব করেছিলি? পরীক্ষার খাতা দেখার টাকা ধরেছিলি? যতো সব—

পড়েছেন কি?
বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা কাহিনী—
পেসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—
স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্মিণী হয় ক'জন ৪.৯০
তরুণ কবি "চক্ষুশূলের"— আজ আমি বেকার ১.২৫
পরিবেশক—দে বুক কোর্ট-১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তকম-শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। সত্যজিত মুখার্জি-২বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিমেষে সমস্ত মুখ সাদাটে হয়ে গেল দীপন ঘোষালের। ভাগ্নে-ভাগ্নিরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। দীপন ঘোষালের স্থির কঠিন এই চোখ স্ত্রীর দিকে ঘুরল।

নমিতার বিড়ম্বিত মুখ। ভিতরে ভিতরে বেশ ভয়ই ধরে গেল। তবু হাসতে চেষ্টা করে বৃদ্ধের উদ্দেশে বললেন, ওই দেখুন, উনি ভাবছেন আমি আপনার কাছে নালিশ করেছি—

ছদ্ম কোপে কুমারদেব বাহাদুর চোখ পাকালেন। —এই আমার মায়ের দিকে অমন কটমট করে কি দেখছিস—তোর মতো বুদ্ধি নিয়ে আমি এই বিষয়-আশয় করেছি! কার ঘাড়ে কতটা লাভ-লোকসান চাপালাম সেটা বার করতে আমার ক' মিনিট লাগে? তুমি কি-ছু ভেবো না মা জননী, ওর মুখ চেয়ে থাকলে তোমাকে ...য় বসতে হবে—এর বিহিত আমিই ...।

একথার পরেও দীপন ঘোষালের অব্যক্ত কঠিন দৃষ্টি আবার স্ত্রীর মুখের ওপরেই স্থির হল। ভিতরসুদ্ধ দেখে নিচ্ছেন যেন। ওই অপলক চোখে স্ত্রীর লোভের মূর্তিটাই যেন কদর্যরকমের বড় হয়ে উঠছে। নমিতা সেটা বুঝতে পারছেন বলেই হাঁস-ফাঁস অবস্থা। না, লোভের বশবর্তী হয়ে ওই রাজবৃদ্ধকে তিনি কিছু বলেন নি ঠিকই। স্বামী দেড় হাজার টাকা প্রাপ্যটাকে বারো শ টাকায় টেনে নামিয়েছে বুড়োর মুখে সেই প্রসন্ন প্রশস্তি শুনে নমিতা তাঁকে সঠিক হিসেবটা জানিয়ে দেবার লোভটুকু শুধু সংবরণ করতে পারেন নি। পাছে ভদ্রলোক ভাবেন ওই বারো শ' টাকাও স্বামীর উপার্জনের অনেক বেশী, তাই বলেছিলেন, ওতেই আমাদের চলে যাবে, হবে-দরে আয় এক-রকমই থাকল—

কুশাগ্রবুদ্ধি মানুষটি তখন 'হবে-দরে আয় এক রকমই থাকল' কথাটার তাৎপর্য খুঁটিয়ে বুঝে নিয়ে ছেড়েছেন।

স্ত্রীর মুখ দেখা শেষ হল দীপন ঘোষালের। অপলক দুই চোখ কুমারদেব বাহাদুরের দিকে ফিরল। বরফে মাজা গলার স্বর। —কমিটির আপনি কেউ নন, আপনি বিহিত করার কে?

হাসি মুখেই বৃদ্ধ ঝাঁকিয়ে উঠলেন, আমি কমিটির কেউ না হলেও দুই ছেলে সুদ্ধ তোদের কমিটির এগারোজনের আটজনই আমার লোক—আমাকে কমিটি দেখাস!

—শুনুন, গলার স্বর আরো মৃদু কঠিন, আপনি এ-ব্যাপারে বিহিতের একটা কথা তুললে, কলেজের চাকরি তো ছেড়েইছি, এ-কাজের মধ্যেও আপনি আর আমাকে পাবেন না।

বেগতিক দেখে কুমারদেব বাহাদুরও হাসতে লাগলেন। নমিতার বিব্রত মুখের দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন, আমরা পড়েছি একটা ষণ্ডের হাতে, দুই-একটা ঢুঁ খেতেই হবে—কি বলো মা? পরক্ষণে গম্ভীর তিনি। দীপন ঘোষালকে বললেন, এবারে ঠাণ্ডা মাথায় কাজের কথা শোনো। আমার সঙ্গে ড্রাইভারসুদ্ধ আর একটা গাড়ি এসেছে—গাড়িটা নতুনই প্রায়—তোমাদের কমিটির মাতব্বরদের সঙ্গে পাকা ব্যবস্থা করেই আমি এটা নিয়ে এসেছি—ওটা ম্যানেজিং ট্রাস্টির ব্যবহারের জন্য থাকবে—এটাকে আর দয়া করে বাবুয়ানী ভেবো না, কত সময় কাঁচা টাকা থাকবে সঙ্গে, চেকবই-টই তো থাকবেই—নিজের হেপাজতের গাড়ি ছাড়া ঘুরে বেড়ানো রিস্কি। আজ ড্রাইভারকে গাড়ির মালিক বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—কালকের মধ্যে এ-পাড়ায় একটা গ্যারেজ ঠিক করে নিতে হবে।

গম্ভীর মুখেই যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। —আর একটা কথা, টেলিফোনের এক মুরুব্বির সঙ্গে চেনা-জানা আছে, তাকে এ-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছি—ট্রাস্ট কর্জ-এর খাতিরে দু-চার দিনের মধ্যেই টেলিফোন বসানোর জন্য লোক আসবে, দয়া করে তাদের ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া করো না—দুদিন গেলে দেখবে এটাও এসেনশিয়াল। গাড়ি আর টেলি-ফোনের সব খরচ ট্রাস্ট ফাণ্ড দিতে বাধ্য। এ-সব যে বোকা বাজে খরচ ভাববে, তাকে এত বড় ট্রাস্ট ফাণ্ডের মাথায় বসানোও বোকামি।

দীপন ঘোষাল নির্বাক তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ভাগ্নে-ভাগ্নিদের মুখে অকল্পিত খুশির তরঙ্গ দেখে অনুমান করে নিলেন খবরটা এরাও এই প্রথম শুনল।

কেবল নমিতার মাথা নীচু।

...তাঁর বুকেও অভাবিত খুশির দোল লেগেছে বইকি। কিন্তু সেই সঙ্গে ওই অগোচরের অপরাধের বোঝাটাও কম ভারি নয়। খুশির এতটুকু অভিব্যক্তি ওই লোকের চোখে পড়লেও অপরাধের ওজনটা আরো বাড়বেই শুধু।

রাত্রি।

দীপন ঘোষাল নিঃশব্দে শুয়ে আছেন। শিয়রের কাছে নমিতা বসে। ঘর অন্ধকার।

বুকের তলায় মোচড় পড়ছে। এই প্রথম থেকে থেকে মনে হচ্ছে, দুপুরে যে প্রাপ্তির গভীরে ডুবে যেতে পেরেছিলেন, সে-তুলনায় ভাগ্যের এমন অভাবিত পরি-বর্তনও এমন বড় কিছু নয়। কিন্তু সেটা তিনি প্রকাশ করবেন কি করে।

আলতো করে একখানা হাত তাঁর কপালে ছোঁয়াতে সেই পুরনো কাটা-দাগের স্পর্শে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। কপালের কাছ থেকে আঙুলগুলো সরে গিয়ে ঘাড়ের ক্ষতচিহ্নগুলোও স্পর্শ

নতুন নাটক

নীহার গুপ-এর নাটক

যন্ত্রণার কণ্ঠস্বর

জমাট সাসপেন্স। মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ নাটক। ১টি নারী। ১টি সেট। ৪-০০

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক

নায়কের সন্ধানে

আজ জীবন যে রকম, ঠিক সেই নাটক পূর্ণাঙ্গ। ১টি নারী। ১টি সেট। ৪-০০

বাদল সরকারের নাটক

রাম শ্যাম যদু

মঞ্চসফল জনপ্রিয় পূর্ণাঙ্গ নাটক। দুটি নারী চরিত্র। দুটি সেট। ৪-০০

অগ্নিদূত-এর নাটক

পটভূমি অন্ধকার

প্রোগ্রেসিভ সিবিয়াস পূর্ণাঙ্গ নাটক। একটি নারী চরিত্র। একটি সেট। ৪-০০

শচীন ভট্টাচার্যের নাটক

অগ্নিদগ্ধ পিরামিড

লেখকের সর্বাধুনিক সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। একটি সেট। দুটি নারী চরিত্র। ৪-০০

রাধারমণ ঘোষের নাটক

ইতিহাস কাঁদে
অথস্বর্গ বিচিত্রা

একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত দুটি একাঙ্ক একত্রে, ১টি নারী। নারীবর্জিত। ৩-৬০

শ্যামাকান্ত দাসের নাটক

সামনে পাহাড়

নীচুতলার মানুষদের নিয়ে নতুন পূর্ণাঙ্গ দুটি নারী। ১টি সেট। ৪-০০

গঙ্গাপদ বসুর নাটক

জীবনায়ন

কাহিনীমূলক জমাট সামাজিক পূর্ণাঙ্গ। দুটি সেট। দুটি নারী চরিত্র। ৪-০০

অজন চৌধুরীর নাটক

ওদের বাঁচতে দাও

নারীবর্জিত জমাট পূর্ণাঙ্গ। ২-০০

পরিবেশক—নব গ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

করল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কিন্তু দুপুরের মতো নমিতা ওই বুকে মাথা গুঁজতে পারলেন না।

।। চার ।।

কপালের ওপর দিক ঘেঁষে মাথার আর পিছনের ওই ক্ষতচিহ্নগুলো ছ বছর আগের। আচমকা মৃত্যু এসে একটা তরতাজা জীবনের ওপর চড়াও হয়ে বসেছিল। একটানা একুশ দিন মৃত্যুর অধরে একখানা জীবন দুলছিল।

শহর কলকাতায় আর আশপাশের চতুর্দিকে জীবন তখন সব থেকে সস্তার জিনিস। কিন্তু তারই মধ্যে বিশ্বসংসারে বেঁচে থাকার শক্তিটাও যে কত বড় দীপন ঘোষালকে যারা তখন দেখেছে, তারা অন্তত অনুভব করতে পেরেছে।

কলকাতা তখন সমাজবিরোধীদের স্বর্গ। কোনরকম রাজনৈতিক চেতনা অথবা রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব নেই যাদের, তারাও যে-যার সুবিধে মতো এক-একটা দল গড়ে আপন স্বার্থসিদ্ধির লাড়বে মেতে উঠেছে। উত্তর কলকাতার কাছাকাছি মাত্র দশ পনের জনের এই রকমই একটা দল দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিল। ছোট থেকে এক-একটা বড় দুঃসাহসিকতার অভিযানে পাড়ি দিয়ে তারা বুঝে নিয়েছে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ কত অসহায়। অল্পেতে ভীত ত্রস্ত তারা। তাদের আসল শক্তির পুঁজি এই। দুঃসাহস যাদের আছে, চুরি শঠতা বা রাহাজানি রাস্তা ছেড়ে বুক টান করে তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছে। সেই অস্ত্রের প্রয়োগও দরকার হয় না সব সময়, হুমকিতেই কাজ হয়। শিকার বেছে নিয়ে মৃত্যুর মতোই ঠাণ্ডা নোটিস পাঠায়। অত টাকা চাই, অন্যথায় চরম বিপদ অনিবার্য। কোথায় কার কাছে কিভাবে টাকা দিতে হবে সেও তারাই বাতলে দেয়। গোড়ায় গোড়ায় অনেক রক্ত ঝরিয়ে এই হুমকিটাকে ত্রাসের বস্তু করে তুলেছে তারা। বেশীর ভাগ শিকার এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সকাতরে রফা করে তখনকার মতো প্রাণ বাঁচায়—।

...টাকা পেলে ফুর্তির বন্যায় সেটা উবে যেতে সময় লাগে না। আবার নতুন শিকার ধরে, নয়তো পুরনো শিকারকেই আবার টেনে এনে শোষণের যূপকাষ্ঠে ফেলে। লোভের এই মশাল একবার জ্বলে উঠলে তার আগুনে নিজেরা ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত ওটা নেভে না।

ওই দলটি ভেবে-চিন্তে মাত্র চল্লিশ হাজার নগদ টাকার দাবি পেশ করেছিল সোনাজোড়ার বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুরের কাছে। তাঁদের বাড়ি ঝাঁট দিলে ওই টাকা বেরিয়ে আসতে পারে সে-খবর তাদের জানা আছে। কিন্তু যেখানে ভবিষ্যতের অনেক আশা, দাবিটা সেখানে প্রথমেই আকাশ-ছোঁয়া করে তোলার মতো বোকা নয় তারা। একবার রফার মধ্যে টেনে আনতে পারলে পঁচিশ তিরিশ হাজারেও আপত্তি নেই তাদের। স্নায়ু বিধ্বস্ত করে দিতে পারাটাই আসল কথা। ওটার ওপর একবার চেপে বসতে পারলে দশবারও পারা যাবে।

বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুর ঘাবড়েছেন ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নি। দশ লাইনের হুমকির চিঠিতে সাতটা বানান ভুল। এই দেখেই উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলেদের ভয় দেখে চিন্তিত হয়েছেন। এ কোন্ দলের কাণ্ড ছেলেরা যথার্থ আঁচ করেছেন। তাদের কার্যকলাপ দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে না, মাত্র দশ-পনেরজন বেপরোয়া মানুষ এমন অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। অতএব বাবাকে বুঝিয়ে ছেলেরা পরামর্শ দিয়েছেন, আগুন নিয়ে খেলা না করে নিঃশব্দে একটা রফা করে ফেলা উচিত।

চিন্তাচ্ছন্ন বৃদ্ধ জবাব দিয়েছেন, তোমাদের ভয়টা যদি সত্যি হয় তাহলে এ রফারও শেষ নেই।

অনেক ভেবে শেষে নিজের ভবিতব্যের ওপরেই নির্ভর করেছেন কুমারদেব বাহাদুর। লোকজন নিয়ে লালবাজারে গিয়ে চিঠি যথাস্থানে পেশ করেছেন। তাঁরা আশ্বাস দিয়ে সাময়িক প্রহরার ব্যবস্থা করেছেন। বলেছেন, ঘাবড়াবেন না একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন, আমরাও যা পারি করছি।

এদিকে অন্দরমহলের একজনের ওপর চড়াও হয়েই ওই দুর্ধর্ষ সমাজবিরোধী দলটি সমস্ত খবর জেনে নিয়েছে। প্রাণের ভয়ে লোকটা কাঁপতে কাঁপতে ভিতরের সব খবর ফাঁস করে দিয়েছে। বাড়ির ছেলেরা ভয় পেয়ে টাকা দিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন, বুড়ো কুমারদেব বাহাদুর তাঁদের কথা শুনতে চাননি। আর বুড়ো যে লালবাজারে হানা দিয়েছেন সে ব্যাপারে ওরা নিজেরাই দৃষ্টি রেখেছিল।

অতএব টাকার টোপ ফেলে ওদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ।

কুমারদেব বাহাদুর আর তাঁর ছেলেরা যতটা সম্ভব সাবধানেই ছিলেন। টাকার জোর আছে, একাধিক সশস্ত্র রক্ষীরও অভাব হয়নি। কিন্তু যন্ত্রে যারা হাত ডুবিয়েছে তারা কত চতুর সে-সম্পর্কে কারো ধারণা ছিল না। যন্ত্রের নেশায় আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেও তারা সুযোগ আর সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে জানে।

তারা অনেক রকমের বিবেচনা করেছে। ছেলেদের নয়, ওই বুড়োকেই সরিয়ে দিতে হবে বরাবরকার মতো। ছেলেদের বুকের পাটা কতো সেটা তাদের জানা—বাপকে তার স্পর্ধার মাশুল দিতে দেখলেই সুড়সুড় করে তারা পথে আসবে!

মাসখানেক না যেতে মাথা খাটিয়ে তারাই ভবের মুখোশ পরে পুলিশের কাছে বে-নামী চিঠি পাঠালো। চিঠিতে জনাকতক উঠতি সমাজবিরোধীর নাম-ধাম—তারাই সদাশয় কুমারদেব বাহাদুরকে হত্যার চেষ্টায় আছে গোপনে পুলিশকে এই খবর জানানো হচ্ছে। পুলিশ তড়িঘড়ি তাদের কর্তব্য পালন করল। তাদের ধরে এনে প্রথমে ঠেঙিয়ে আধমড়া করল তারপর আনির্দিষ্টকালের জন্য গারদে চালান করল। সোনাজোড়ার কুমারদেব

ঘড়ি
জাড়োয়া গহনা
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
ঘোষ কাজিন ও কোং
ওয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।
শ্রীঘৃত
শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ
অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭

বাহাদুর জানলেন, হুমকি যারা দিয়েছিল তাদের বেশির ভাগই ধরা পড়েছে।

তবু সাবধানের মার নেই। কিন্তু মানুষ কতকাল আর সে-রকম সাবধানে থাকতে পারে। পুলিশের প্রহরা অনেক আগেই উঠে গেছে। মাসের পর মাস বিপদের কোনরকম আভাস মাত্র না দেখে ভয় কমে এলো, সতর্কতা শিথিল হতে লাগল।

টানা ছ'মাস ধরেই শিকারের আশায় সুযোগের অপেক্ষায় কাল গুনেছে ওরা। তারপর সেই ভয়ংকর সুযোগ এসেছে।

দিনে দুপুরে মধ্যকলকাতা ছাড়িয়ে কিছুটা উত্তর দিকের প্রশস্ত রাস্তার ওপর আচমকা একটা নৃশংস ঘটনার সূচনা দেখল পথের লোক। এ-পথে ট্রাম-বাস চলে না বটে, কিন্তু এমনি গাড়ি বা লোক চলাচলের বিরাম নেই। রাস্তার এই জীবনস্পন্দন হঠাৎ থেমে গেল। একটা বড় গাড়ির গতি-রোধ করলে আর একটা গাড়ি। চারটে মাত্র লোক—পঁচিশের থেকে তিরিশের মধ্যে চোখের পলকে নেমে এলো। দুজনের হাতে ছোরা, একজনের হাতে রিভলভার, একজনের হাতে এবং ঝোলাতে বোমা। প্রচণ্ড শব্দে দু-তিনটে বোমা ফাটতেই একটা হতচকিত ছোটাছুটির ধুম পড়ে গেল। নিমেষে দুটো গাড়ির সামনে পিছনের রাস্তা ফাঁকা।

একটা গলি দিয়ে ঠিক সেই সময়েই একজন অল্পবয়সী লেকচারারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেছেন দীপন ঘোষাল। বোমার শব্দে আর লোকজনের ছোটাছুটিতে বিভ্রান্ত কয়েক নিমেষ। ছোরা হাতে একটা লোক বড় গাড়ির এদিকের পিছনের দরজা খুলে এক-জনকে টেনে নামাতে চেষ্টা করছে। তার পাশেই রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন। যে লোককে হাত ধরে টেনে নামানোর চেষ্টা হচ্ছে সে যে আসল শিকার নয় সেটা এদিকের কেউ বুঝতে পারছে না। অন্যদিকের দরজার কাঁচ তোলা সেদিকের দিশেহারা বুদ্ধিটা আর কোনো উপায় না দেখে জানলার কাঁচ তুলে ভিতর থেকে লক করে দিয়েছেন। ছোরা উঁচনো দ্বিতীয় লোকটা দমাদম পাশের আঘাতে সেদিকের দরজাটা ভেঙেই ফেলতে চেষ্টা করছে।

এদিকে যে লোকটাকে টেনে নামানোর চেষ্টা তার আর্তরব আর যোঝাযুঝির ফলে তার কাঁধে এক ঘা ছোরা বসে গেছে। সে সামনের দিকে ঢলে পড়তে দরজা দিয়ে তাকে আধখানা টেনে বার করা গেছে—ফলে রিভলভার হাতে লোকটা তার পাশের বন্ধুকে গুলী করার ফাঁক খুঁজে পাচ্ছে না। অবিশ্যি হয়ে এক হাত বাড়িয়ে সেও ওই সামনের লোককে হিঁচড়ে নামাতে গেল।

সেই মুহূর্তে মাথার মধ্যে কি যেন হয়ে গেল দীপন ঘোষালের। চোখের পলকে পাগলের মতো ছুটে এসে পিছন থেকে রিভলবার হাতে লোকটাকে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা দিল একটা—সামনের গাড়ির সঙ্গে তার নাক মুখ মাথা চেপটে গেল যেন। কিন্তু রিভলভারটা হাত থেকে ফসকালো না, উবুড় হয়ে পড়তে পড়তেও অন্ধের মতোই গুলি চালালো একবার—অদূরে বোমাহাতে প্রহরারত লোকটার গা ঘেঁসে সেই গুলি বেরিয়ে যেতে আচমকা ভয় পেয়ে আট-দশ গজ দূরে ছুটে গেল সে। দীপন ঘোষাল পড়ন্ত লোকটাকে জাপটে ধরে প্রাণপণে রিভলভারটা হাত থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছেন। ছোরা হাতে ক্ষিপ্ত লোকটা ততক্ষণে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথারি ছোরা চালাচ্ছে তিন-চার ঘা। সামনের লোকটাকে সজোরে জাপটে ধরেই দীপন ঘোষাল মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ওই লোকটারও প্রচণ্ড ধাক্কায় নাক মাথা ফেটে আগেই অজ্ঞান অবস্থা, তার হাত থেকে রিভলভার খসে পড়েছে। জ্ঞান হারাবার আগে দীপন ঘোষাল পা দিয়ে সেটা গাড়ির নীচে ঠেলে দিলেন।

এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে যেতে দেড় মিনিটও লাগেনি। এই গোছের সাহসেরও একটা ছোঁয়াচে প্রভাব আছে বোধহয়। ফুট-পাথের দেয়াল ঘেঁসে সে লোকগুলো স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেছল, দীপন ঘোষালের ওপর উপর্যুপরি কটা ছোড়ার আঘাত পড়তেই হৈ-চৈ করে এদিক-ওদিক থেকে জনা-শতক লোক ছুটে এলো। বোমাবাজ লোকটা দু-তিনটে বোমা ছুঁড়ে তাদের বাধা দিতে দিতে পাগলের মতো ছুটে এসে নিজেদের গাড়িতে বসল, চোখের পলকে ছোরা হাতে লোক দুটোও—ওদের তখন প্রাণ নিয়ে পালানোর তাগিদ। দীপন ঘোষাল যাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে পড়ে আছে তার দিকে তাকানোরও ফুরসত নেই।

কিন্তু বেশিদূর তারাও পালাতে পারল না। সাহসে উদ্বুদ্ধ জনতা পিছু ধাওয়া করলে কতদূরে আর পালাবে?

বিকেলে রেডিও খুলেই ঘরের টুকটাক কি কাজ সারছিলেন নমিতা ঘোষাল। হঠাৎ গান থামিয়ে শহর কলকাতায় দিনে-দুপুরে এক দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল ধরা পড়ার ঘোষণা কানে আসতে খবরটার দিকে মন দিলেন। জনারণ্যে যে একটি মাত্র মানুষের দৈহিক সাহসে এরকম একটা ব্যাপার সম্ভব হয়েছে তাঁর নাম কানে আসতে নমিতা ঘোষাল কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দেবু-বাঁরু তোরা কোথায়! বলে একটা আর্তনাদ করে উঠলেন।

রেডিওতে তখন সেই দৈবপ্রেরিত দুঃসাহসী মানুষটির সংকটাপন্ন অবস্থার কথা বলা হচ্ছে।

বিবর্ণ মুখে নমিতা কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়েছেন।

ভাগ্নে-ভাগ্নিরা সকলেই বাড়ি ছিল। মামীর আর্তনাদ শুনে ছুটে এসেছে। রেডিওর ঘোষণা শেষ। মামীর চোখে মুখে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিপদ রাজগুরু

সার্বজনীন ৭৲ আমি শুধু একা ৭৲

বনফুল-এর বনফুল-এর

মানদণ্ড ৭৲ শ্রেষ্ঠ গল্প ৮৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের রহস্য উপন্যাস

ক্লান্ত বিহঙ্গ ৫৲ তারা ওঠার আগে ৬৲

দূর বলাকা ৫৲ প্রজাপতি রঙ ৬৲

চিরঞ্জীব সেন বনফুল-এর নাটক

অদৃশ্য হাত ৬৲ আসন্ন ৪৲

বিশ্বনাথ বসু হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অরণ্য গভীরে ৭৲ অগ্নিগড় ৫৲

শক্তিপদ রাজগুরু কিরীটী রায়

প্রতি ঘরে ঘরে ১০৲ অপরাধী ৭৲

নিশাচর-এর রহস্য উপন্যাস

অন্ধ অতীত ৬৲ ডেড বডি ৬৲

ডি জি পাবলিশার্স C/o আধুনিক

১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-০৩৭২

জল ছিটিয়ে তাকে সুস্থ করার ঝুঁকি অঘটনের খবর শুনল তারা। কিন্তু কোন হাসপাতালে মামাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওই শক-খাওয়া অবস্থায় মামীর তা জানে ঢোকেনি। তবু মামার কলেজের কাছের ঘটনা যখন মেডিক্যাল কলেজেই হবে ধরে নিয়ে ট্যাক্সি আনার জন্য বীরু নীচে ছুটল।

তার দরকার হল না। সিঁড়ি পেরুবার আগেই বাড়ির দোরে ঘন ঘন মোটর হর্ন। উদভ্রান্ত মূর্তিতে সেই অল্পবয়সী স্লেভ-চাকরটি দাঁড়িয়ে। হাসপাতালের ব্যবস্থা শেষ হতে সে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে এসেছে।

...তারপর মৃত্যুর স্তব্ধতা।

বাড়িতেও হাসপাতালেও। প্রথম সাতদিন ওই হিম মৃত্যুর ছায়া যেন আমোঘ পদক্ষেপে কাছে সরে এসেছে। তারপর যেন থমকে দাঁড়িয়েছে। আর একদল মানুষের অক্লান্ত যুদ্ধের পরে ওটা যেন দরজার দিকে পিছু হটতে শুরু করেছে।

একুশ দিনের দিন বড় ডাক্তার সগর্বে জীবনের আশ্বাস ঘোষণা করলেন।

কিন্তু মুখ আর সমস্ত মাথা ব্যান্ডেজে মোড়া শয্যার ওই নিশ্চল দেহের দিকে তাকালে তখনো বোঝার উপায় নেই ওই মানুষ জীবনের তপস্যায় মগ্ন কি মৃত্যুর।

ইতিমধ্যে নমিতা হৃতচেতনের মতোই অনেক কিছু দেখে গেছেন।

...পরদিনের সমস্ত কাগজে দীপন ঘোষালের ছবির ছড়াছড়ি। বাড়িতেও রিপোর্টারের ছোটাছুটি। বড় বড় হরপে দুঃসাহসিক ঘটনার বিবরণ, দীপন ঘোষালের আত্মস্বার্থরহিত অপরিসীম সাহসের শুচিশুভ্র নজিরের ঢালা স্তুতি, সরকারের পুরস্কার ঘোষণা এবং বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সমাবেশে একটি মহৎ প্রাণ বাঁচানোর সংকল্প গ্রহণ, কোন বিশিষ্ট বৃদ্ধ কুমার বাহাদুরের প্রাণরক্ষা হয়েছে তার বিবরণ ইত্যাদি। আট-দশ দিনের মধ্যে ওই দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের বাকি ছ-সাতজনেরও ধরা-পড়ার সংবাদ ছাপা হয়েছে।

উত্তেজিত ভাগ্নে-ভাগ্নিরা সেসব কাগজ এবং খবর সংগ্রহ করেছে। ফাঁক মতো মামীকে দেখাতেও চেষ্টা করেছে। নমিতা দেখেছেন কি দেখেননি জানেন না।

মস্ত কেবিনে চিকিৎসার রাজসিক ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য দুজন করে নার্স মোতায়েন ছিল। কত বড় বড় ডাক্তার যাওয়া আসা করেছেন, তিনি শুধু চোখ চেয়ে দেখে গেছেন। মন্ত্রীরা দীপন ঘোষালকে দেখতে এসে তাঁর সঙ্গেও কথা বলে গেছেন—সান্ত্বনার কথা, গর্বের কথা। কিন্তু দেখা বা শোনার কোনো কিছুই নমিতার ভেতর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। নির্বাক বসে তিনি শুধু ওই মৃত্যুর ছায়ার সঙ্গে যুঝেছেন।

আশার একটু তাপ বুকে লাগতে লক্ষ্য করেছেন, প্রতিদিনই একটি বৃদ্ধ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবিনের এক কোণে বসে থাকেন। সংসার লোকজন তাঁকে রেখে যায়, আর নিয়ে যেতে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তিনি তাদের ফিরিয়ে দেন।

অনুমান, তিনিই সোনাজোড়ার কুমার-দেব বাহাদুর।

অনুমান যথার্থ। তৃতীয় সপ্তাহের গোড়ায় এক দুপুরে কোণের চেয়ার ছেড়ে নমিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। ঘরে তখন নার্স ভিন্ন আর কেউ নেই।

বললেন, মা, তোমার সিঁদুরের জোর আছে, আমার মনে বলছে ব্রহ্মহত্যার পাতক হব না। ...মা, তোমার ওই দেবতার মতো স্বামীটি কি পাগল? এত লোকের মধ্যে নিজের সর্বনাশ করার জন্য কেন ও এভাবে ছুটে এলো? আমি তো অনেক বেঁচেছি, এমন সর্বনাশের বদলে আর না বাঁচলে কি ক্ষতি হত! মা, তুমি কি আমাকে অভিসম্পাত করছ?

ওই শেষের কথায় নমিতার চেতনা ফিরল যেন। বৃদ্ধের থপথপে শাদা দুই গালে জলের রেখা দেখলেন। নমিতারও গলা বুজে আসছে। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লেন শুধু।

—কিন্তু সেই থেকে নিজেকে আমি অভিসম্পাত করে চলেছি। কেন এরকম হল কেন?

—অস্ফুট স্বরে নমিতা এবারে জবাব দিলেন, অভিসম্পাত করবেন না। ঈশ্বরের যে ইচ্ছেয় উনি এ-কাজ করেছেন সেটা তাহলে মিথ্যে হয়ে যাবে।

উনি, অর্থাৎ স্বামী।

বৃদ্ধ চেয়ে আছেন। জলে ভেজা দুই চোখে যেন আলো ঠিকরচ্ছে। বললেন, হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছে—ঈশ্বরের ইচ্ছেয় নরক দেখেছি আমি, আর এই হর-গৌরী দেখছি। আমি বলছি, ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তোমারও সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে, ওকে ফিরতে হবে—হবে হবে হবে।

দীপন ঘোষাল ফিরেছেন। দু মাস বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। আরো এক মাস বাড়িতে বিশ্রামের পর সম্পূর্ণ ক্ষমক্ষম হয়েছেন।

.. ওই ক্ষতচিহ্ন থেকেই গেছে।

খবরের কাগজে কলেজের সামান্য প্রোফেসার দীপন ঘোষালের খবর আরো একবার ছাপা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের খবর সেটা। একটা নজির স্থাপনের উদ্দেশ্যে সরকার দীপন ঘোষালকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন সাব্যস্ত করেছিলেন।

দীপন ঘোষাল সবিনয়ে সে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই সঙ্গে বক্রকটাক্ষও করেছেন একটু। বলেছেন, যেটুকু কর্তব্যবোধ দেশ তার সকল সন্তানের কাছেই আশা করতে পারে, দাবি করতে পারে, তার বিনিময়ে পুরস্কার গ্রহণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি অপ্রত্যাশিত কিছু করেছেন। কিন্তু চারদিকের এত হতাশার মধ্যেও পুরস্কার গ্রহণ করে মানবগোষ্ঠীর এই দেউলে চিত্রটা তিনি মেনে নিতে রাজি নন। সরকারকে ধন্যবাদ।

এ-সংবাদ ছেপে সমস্ত কাগজই তাঁকে যোগ্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন। চেনা-অচেনা ছাত্রছাত্রী-থেকেও অনেক প্রশংসা

শ্রীঅরবিন্দ শতবার্ষিকী সংস্করণ

Words of Sri Aurobindo

যোগ সাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·০০
মাতৃবাণী	শ্রীমা	১·৫০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		১·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম	ঐ	
অরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে. আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ-জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা	পশুপতি ভট্টাচার্য	৩·৫০
দিব্য জীবনের সন্ধানে	ঐ	যন্ত্রস্থ
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1.80

শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

এসেছে। বাড়ির লোকের মধ্যে রেবা তখন ছোট, শিপ্রা আরো ছোট, তাদের কোনরকম প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু অন্য দুই ভাগ্নে বা নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হাসি গোপন করতে হয়েছিল দীপন ঘোষালের।

—দেবু, বীরু ওরা কি বলে?

নমিতার জবাব, ওরা বলছিল সরকারী টাকা হাত পেতে না নেওয়ার কোনো অর্থই হয় না।

—ও। আর ওদের মামী কি বলে?

—মামী আবার কি বলবে।

নির্লিপ্ত ভালো মুখ দীপন ঘোষালের। —কেন, মামী ওদের বলতে পারত, লোকটা যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে সেটাই বড় পুরস্কার, হাত পেতে আর কোনো পুরস্কার ভিক্ষে করে কাজ নেই।

প্রকারান্তরে কথাগুলো যে তাকে বলা অল্পস্বল্প বোঝার মতো বুদ্ধি নমিতার আছে। কিন্তু মৃত্যুর সেই অনড় কালো ছায়ার স্মৃতি এরই মধ্যে মন থেকে মুছে যায়নি। শোনা-মাত্র দশ হাজার টাকার খেদ ঘুচেছে। ওই প্রচ্ছন্ন তিরস্কার প্রাপ্য মনে হয়েছে। আর মুখের দিকে চেয়ে একটা আবেগ যেন ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে চেয়েছে। —বলব। আবার কথা উঠলেই বলব।

দীপন ঘোষালের মুখে প্রসন্ন হাসি দেখা দিয়েছে।

কিন্তু সোনাজোড়ার বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুর এত সহজে অব্যাহতি দেবার পাত্র না। বিশ্রামের এক মাসের মধ্যে বহুবার বাড়িতে এসেছেন তিনি। বুড়োর মুখে অজস্র বার সেই মা-মা ডাক শুনে নমিতা ক্রমে লজ্জা আর সংকোচ কাটিয়ে উঠেছেন। বুড়ো বড়লোক এটুকুই শুধু জানেন, কিন্তু কত বড়লোক সঠিক ধারণা নেই। প্রায়ই রাশি-কৃত খাবার এনেছেন, ঝুড়ি বোঝাই ফল এনেছেন। দীপন ঘোষাল আপত্তির কথা তুললেই রাগ করে চলে যেতে চেয়েছেন, নয়তো ডবল রাগ দেখিয়ে গ্যাট হয়ে বসে উল্টে বকাবকি করেছেন। নমিতাকে ডেকে অভিমান প্রকাশ করেছেন, মা, তোমার ছেলে যে তোমাদের কেউ নয়, সেটা ওই হতভাগা আমাকে আর কতভাবে বোঝাবে? তুমি শাসন করতে পারো না?

দীপন ঘোষালের সঙ্গে বুড়োর সম্পর্কটা ততদিন ওই রকমই সহজ হয়ে গেছে।

একবার এসে বসলে তিন চার ঘণ্টার আগে নড়েন না। সরকারী পুরস্কার নাকচ করার খবর পেয়েও আনন্দ ছুটে এসেছিলেন। হা-হা শব্দে হেসেছেন, কৃতিত্ব যেন সব তারই।—আমার ভোলানাথকে দশ হাজার টাকার কাঙ্গাল ভেবেছে! ব্যাটাদের আক্কেল হয়েছে—

কিন্তু তাঁর নিজের কোনো প্রস্তাব নাকচ করলেই গোমড়া মুখ। হাসপাতাল থেকে ফেরার পরে কোন বাড়ির কেমন ঘরে থাকা হয় এবং হবে দেখতে এসে খুঁতখুঁত করে-ছেন। ওই এক মাসের জন্য এ-বাড়ির সকলকে নিয়ে বাইরের কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে যেতে চেয়েছেন। সে-প্রস্তাব বাতিল হতে বাড়ি বদলের সংস্কার করে দিতে চেয়েছেন। তাতেও আপত্তি দেখে রেগে গেছেন।

—আমি যদি করি তুই কি করবি রে শালা?

নমিতা সর্বদাই মা, কিন্তু রেগে গেলে ভোলানাথ শালা। দীপন ঘোষাল হেসে জবাব দিয়েছেন, কি আর করব, বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

রাগ করে ওই বুড়োই তখনকার মতো চলে গেছেন। নমিতাকে বলেছেন, মা আমি আর আসছি না—

দুদিন না যেতে আবার এসেছেন। মাস গেলে কাজে যোগ দেওয়া হবে শুনে আবার খুঁতখুঁতানি। —তুই আমাকে এরকম জ্বালাস কেন বল তো, কি দরকার তোর ওই ঘোড়ার ডিমের চাকরি করতে যাওয়ার—ওই তাকাতের আর কেউ নেমোও বাপটি মেরে আছে কিনা ভাই বা কে বলতে পারে!

শোনামাত্র নমিতার বুক দুরু দুরু।—আমিও একথা বলেছি, কানেই তোলে না।

রাগত মুখে দীপন ঘোষাল স্ত্রীকেই বলেন, কুমারদেব বাহাদুরের সেরেস্তার গোমস্তাই হয়ে বসি তাহলে?

—কি বললি? কি বললি তুই? উল্টে আমি তোর সেরেস্তার গোমস্তাগিরি করছি দেখতে পাস না? বৃদ্ধ বিষম ক্রুদ্ধ। —তুই আমাকে একথা বলতে পারলি?

হালকা হেসে দীপন ঘোষাল একই সুরে জবাব দেন, কেন বলব না, আপনারই বা এত ভিক্ষে দেবার লোভ কেন?

ঋষি দাসের

রাজা রামমোহন ১০·০০

যে মানব-বিহঙ্গ প্রতিভার ঊর্ধ্বলোক থেকে ভারতের ভাবী মানচিত্রকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন—করেছিলেন আধুনিক ভারতের সূচনা ও ভিত্তি স্থাপন, তাঁরই পূর্ণাঙ্গ জীবন কথা।

এতে আধুনিকতম লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রামমোহন সম্পর্কে বহু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে, বহু অজ্ঞাত ও অলক্ষিত দিকের উপর করা হয়েছে নূতন আলোকপাত। এই গ্রন্থ তাঁর জীবনের খণ্ডিত পার্শ্বচিত্র নয়, তাঁর বিচিত্র জীবন ও প্রতিভার একটি সামগ্রিক রূপায়ণ, রামমোহনের জীবন ও প্রতিভাকে বুঝবার জন্য যা অপরিহার্য।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের

বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র ৭·০০

প্রকৃত ইতিহাস জাতীয় উন্নতি ও অবনতি-এ উভয়েরই সংবাদ বহন করে, কারণ তাহা না হইলে দেশের ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মে না। কুলজী গ্রন্থের এই দিক দিয়া একটি বিশেষ অবদান আছে।

পরিতোষ দাসের

চৈতন্যোত্তর প্রথম চারিটি সহজিয়া পুঁথি ১০·০০

"এই চারিখানি পুঁথিতে অনেক রহস্য সুগোপনে বলা হইয়াছে, যাহার তাৎপর্য আজকালকার পাঠক সহজে ধরিতে পারিবেন না। বিদ্বান সংকলক প্রস্তাবনা ও ভূমিকা এবং গ্রন্থমধ্যে টিপ্পনী সংযোজনের দ্বারা তাহার উপর আলোকপাত করিয়াছেন।" —গোপীনাথ কবিরাজ

নারায়ণ সান্যালের

অপরূপা অজন্তা (রবীন্দ্র-পুরস্কার-ধন্য) ১২·০০

ভারতী বুক স্টল

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯ : ৩৪।৪৬৯৭৮

—ভিক্ষে! বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠেছেন প্রায়। —শুনলে গো মা ওর কথা। সঙ্গে সঙ্গে শিথিল দেহ ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান। —আর তুই যে শাল আমাকে একেবারে প্রাণ ভিক্ষে দিয়ে বসলি তার আমাকে সেটা হাতে পেতে নিতে হল।

হালকা কৌতুকে দীপন ঘোষালের তাও অস্বীকারের চেষ্টা। —আমি আবার কে, আপনি তো নিজেই কতবার বলেছেন, সবই আপনার ভগবানের খেলা।

কি বলতে গিয়েও থমকেছেন। —আমার ভগবান মানে? তোর ভগবান নেই?

—নাঃ, আমি তার খবরটবর রাখি না।

রাগত মুখে খানিক চেয়ে থেকে বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠেছেন, মা জননী, একটা আয়না এনে ওর মুখের সামনে ধরো তো, শালাকে ভগবানের খবর জানাই।

এমনিই রঙ্গ হাসি আর কৌতুকের মধ্যে দিন কেটেছে। তারই ফাঁকে ওই কুশাগ্রবুদ্ধি বৃদ্ধ প্রলোভনের আরো অনেক কোষ্টপাথরে যাচাইও করে নিয়েছেন লোকটাকে। এক-এক সময় গো চেপেছে তাঁর, মিষ্টি আবেদনের আড়ু পরিয়ে প্রলোভনের এক একটা এমন ব্যাপার সামনে তুলে ধরেছেন বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে যে শুনলে যে-কোনো মাঝারি অবস্থার মানুষের মাথা ঝিমঝিম করবে। বৃদ্ধ যতো হেরেছেন, ততো তাঁর শ্রদ্ধা বেড়েছে। বুকের ভেতরটা যেন ততো ভরে গেছে। নমিতার সঙ্গে দেখা হলে হাসি মুখে খেদ প্রকাশ করেছেন, ভোলানাথের ভস্মই অলংকার মা-জননী, ওটার জন্যে আর আমি কোনো দুর্ভাবনা রাখব না।

মুখে বলেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্য চিন্তা দানা বেধে উঠছিল তাঁর। কিন্তু সেটা কখনো প্রকাশ করেননি। কলেজে গাড়ি পাঠান, ছুটির দিনে বাড়িতেও। আবেদন, মা-কে দেখতে ইচ্ছে করছে, আসতে হবে। দুজনকেই যেতে হয়। নমিতা এক-এক সময় ভেবে পান না এমন মানুষেরও শত্রু থাকে কি করে।

বছর দুই পরের কথা। তাঁর বাড়িতে বসেই বিষয়-আশয়ের প্রসঙ্গ উঠেছিল কি করে যেন। তখন নিজের বিষয়-সম্পত্তির মোটা-মুটি একটু আভাস দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। শুনে দীপন ঘোষালের চক্ষু স্থির আর নমিতার দুচোখ কপালে।

দীপন ঘোষাল নীরস মন্তব্য করেছেন, লোকের আর দোষ কি, তাহলে লোভের ছোরা তাবা আপনার দিকে উঁচোবে না কেন...।

শুনে নমিতা বিব্রত বোধ করেছেন। বৃদ্ধও আহত একটু। —কেন, হকের পৈতৃক সম্পত্তি নিজের উদ্যমে আমি তিনগুণ চার গুণ করেছি—এতে পাপ কোথায় দেখলি?

দীপন ঘোষালের সাদাসাপটা জবাব, উপার্জনে পাপ নেই, সেই উপার্জন জমা করার মধ্যে পাপ জমেছে। হাজারটা রঙ্গ-ভোগ হাতে পেয়ে সব নিজে খেতে পারেন না কেন? বিলিয়ে দেন কেন?

—অত খাবার ক্ষমতা নেই বলে, আর হজম হবে না বলে।

—তাহলে অত টাকা হজম করার ক্ষমতা জন্মালো কি করে? ছেলেদের যা আছে সাত-পুরুষের চলে যাবে, আপনি তাহলে ওই টাকা দিয়ে কি করবেন, সঙ্গে নিয়ে যাবেন?

বুড়ো হেসে জবাব দিয়েছেন, তা নিতে পারব না। তোকে তো কত করে বলেছি, একটু হালকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করিস না কেন?

—আমার দায় পড়েছে, আপনি ফকির হয়ে সব ত্যাগলে থাকবেন। ..কিন্তু তাও পারবেন না, বাড়তটুকু সেধে না বিলোলে লোকে একদিন কেড়ে নেবে, ওই রকম ছোবা বসিয়ে আদায় করে নেবে।

এ উক্তি নমিতার কেন যেন একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু পরক্ষণে বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আর তাঁর আকৃতি দেখে অবাক। বৃদ্ধ কে ওই লোকের দুহাত আঁকড়ে ধরেছেন। উত্তেজনায় ভরাট ফিসফিস কথা। —শোন্ ভোলানাথ, আমার প্রাণ বাঁচাতে যেদিন তুই রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে রক্তে ভাসতে লাগলি, গাড়িতে বসে ঠিক সেই সময়েই আমার মনে হল আমার সমস্ত টাকার গায়ে রক্ত লেগে গেল। টাকার জন্য কত লোভ কত আসক্তি আর কত মায়া ছিল তুই জানিস না। একদিন পাঁচটা টাকার জন্যেও আমি ওই ঘাতকদের মতই কঠিন হতে পেরেছি। একজন অজানা-অচেনা অনাত্মীয় আর একজনের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে এভাবে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করতে পারে আমার ধারণা ছিল না।...তার পর হাসপাতালে আর তোদের বাড়িতে তোর যতো মুখ দেখি ততো যেন টাকার প্রতি ওই আসক্তি আর লোভ আর মায়া খসে খসে যায়। যত যায়, টাকার গায় রক্তের দাগ আরো বেশি দেখি। তুই আমার ভোলানাথ একটা ব্যবস্থা করে দে, আমাকে একটু মুক্ত হওয়ার পথ বাতলে দে। দিবি না?

এই আকৃতি দেখে ভিতরে ভিতরে একটু নাড়াচাড়া খেয়েছেন দীপন ঘোষালও। তবু হাসতেই চেষ্টা করেছেন। —আমাকে কি ভেবেছেন আপনিই জানেন, সেদিন যা করেছি একটা ইম্পালস-এর মাথায় করেছি, দরকার হলে আবার করতে পারব কিনা নিজেই জানি না। সত্যিই যদি চান কিছু করতে, কত বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে যারা আপনার দান মাথায় তুলে নেবে—তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

...ও, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব? আর তুই ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসবি না কেমন? তুই একটা এক নম্বরের স্বার্থপর—তোর সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বুঝলি?

প্রকাশিত হইল বেদুইনের নতুন বই

অশান্ত চিলি

ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্ক চিলি। তাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তার ভয়াবহ গুপ্তচরচক্র সিয়ার সাহায্যে কি অত্যাচার চালাচ্ছে, তারই জ্বলন্ত বিবরণ এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে।
এই সঙ্গে চিলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে দলিলদস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। মূল্য : আট টাকা।

বেদুইনের অপর দুটি চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক উপন্যাস

প্যালেস্টাইন কম্যাণ্ডো ও আরাফাত ১০৲

পাপনগরী সায়গন ১০৲

পূর্বাচল—৮২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

শিশু সাহিত্যের মণিমুক্তা

সুকুমার সমগ্র রচনাবলী

প্রকাশিত/অপ্রকাশিত সমগ্র রচনা মূল ছবি সহ ২ রঙে ২ খণ্ডে বেরুচ্ছে। দুই খণ্ডের গ্রাহক মূল্য মাত্র ২০·০০, ৫·০০ দিয়ে গ্রাহক হন। সম্পাদনায় ঃ পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও কল্যাণী কার্লেকর।

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

মূল ছবি সহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখা ২ খন্ডে বের হচ্ছে। প্রথম খন্ড আগষ্টে বেরুবে। গ্রাহক মূল্য ২০·০০, ৫·০০ দিয়ে আপনার কপি বুক করুন। সম্পাদনায় ঃ লীলা মজুমদার।

লুই ক্যারল সমগ্র রচনাবলী

শিশু জগতে হুলুস্থুলু ফেলা সেই 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড', 'অ্যালিস থ্রু দি লুকিং গ্লাস'-এর লেখক 'ছয় থেকে ষাট' সবার প্রিয় লুই ক্যারলের সমগ্র রচনা বাংলা ভাষায় এই প্রথম ৩ খণ্ডে বেরুচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ২৯·০০, ৫·০০ দিয়ে গ্রাহক হন।

হ্যানস্ অ্যান্ডারসন সমগ্র রচনাবলী

বিশ্ব শিশু সাহিত্যের রূপকথার যাদুকর অ্যান্ডারসনের সমগ্র রচনাবলী বাংলায় এই প্রথম ২ খন্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। অনুবাদ করছেন ঃ লীলা মজুমদার। গ্রাহক মূল্য ২০·০০। গ্রাহক চাঁদা ৫·০০।

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

একদিন সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দেওয়া বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্লাসিক 'যকের ধন'সহ হেমেন্দ্রকুমার ৫০টিরও বেশী—উপন্যাস, ভূতের গল্প, অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র নিয়ে প্রথম খন্ড অতি দ্রুত ছাপা হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য ১০·০০, ৫·০০ দিন এখন।

এডওয়ার্ড লিয়র রচনাবলী

লিমেরিকের স্রষ্টা লিয়রের মজাদার লিমেরিক, আজগুবি গল্প, কবিতা এবং বিচিত্র রচনার সঙ্গে মজায় ভরা মূল ছবির আর এক আশ্চর্য জগৎ। দু' রঙে ছাপা। অনুবাদ ঃ অশোককুমার মিত্র ও শৈলশেখর মিত্র। গ্রাহক মূল্য ৫·০০। গ্রাহক হন ২·০০ দিয়ে।

প্রতিটি বই লাইনো টাইপে ঃ ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা ঃ সচিত্র ঃ আনুমাণিক ৫০০ পাতার [লিয়র ছাড়া] বই ঃ মজবুত রেক্সিন বাঁধাই। সোনালী হরফে নাম।

মণিঅর্ডারে/মূল গ্রাহক কেন্দ্র ঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২, ফোন ঃ ৩৪-২৩৮৬।

শাখাকেন্দ্র ঃ নিউ আলিপুর বুক হাউস, ৩৮, টালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা। হীরাপুর বুক স্টল, স্টেশন রোড, বার্দপুর। স্টুডেন্ট কর্ণার, বহরমপুর, কাদাই। বীণাপাণি পুস্তকালয়, খড়্গপুর। গ্রন্থভারতী, জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি।

মুখে যা-ই বলুন, নমিতার অগোচরে এর পরেও দিনের পর দিন বছরের পর বছর বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুর কানে ওই এক মন্ত্র দিয়ে গেছেন দীপন ঘোষালের। একটা কিছু কর ভোলানাথ—

ফলে কি করা যায় বা কিছু করা যায় কিনা তিনিও ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় কম, পরের চার বছরের মধ্যেও যথার্থ মনস্থির করে কোনো পরিকল্পনা ঠিক করে উঠতে পারলেন না।

মাত্র তিন মাস আগে ওই বৃদ্ধই ট্রাস্ট গঠনের একটা পাকাপোক্ত ছক এনে ফেললেন তাঁর সামনে। দানের অঙ্ক দেখেও দীপন ঘোষাল স্তব্ধ অনেকক্ষণ। সেই দানও প্রথম পর্যায়ের, দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিশ্রুতিও আছে। মনে মনে দীপন ঘোষাল সত্যিই সেদিন প্রণাম করেছিলেন ওই বৃদ্ধকে।

কলেজের সময়টুকু বাদ দিয়ে দিনের পর দিন এই বিষয়েই আলোচনা এগিয়েছে তারপর। এগারো জনের কমিটিতে বৃদ্ধ ভাব দুই ছেলে এবং পাঁচজন অভিজাত বিশিষ্ট লোককে জুড়ে দিয়েছেন। দীপন ঘোষালের সংগ্রহের তিনজনও বিশিষ্ট ব্যক্তি।

..দীপন ঘোষালকে নিয়ে এগারোজনের কমিটি। কিন্তু বৃদ্ধর এক গোঁ, বাকি সকলে পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবেন, সমস্ত দায়দায়িত্ব এবং কাজের ভার দীপন ঘোষালকে নিতে হবে। কমিটির তিনিই চেয়ারম্যান এবং তিনিই ম্যানেজিং ট্রাস্টি হবেন। প্ল্যান অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের সমস্ত নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও তাঁর হাতেই থাকবে প্ল্যানের বাইরে কিছু করতে হলে তখনই শুধু কমিটির মতামত নিতে হবে।

এই একটি শর্ত মেনে না নিলে কুমারদেব বাহাদুর এক পা-ও এগিয়ে আসতে রাজি নন।

..এই শর্ত সকলেরই যে মনঃপূত এমন নয়। বিশেষ করে ছেলে দুজনের খুব খুশি মুখ দেখেননি দীপন ঘোষাল। কিন্তু বৃদ্ধের মুখের ওপর একটি কথা বলারও সাহস নেই বলে তাঁদেরও নীরব সমর্থন মিলেছে।

দীপন ঘোষাল প্রথমে এই দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু বুড়ো আর কোনো আপত্তি কানে তুলতে রাজি নন। দীপন ঘোষাল ভেবেছেন আর ভেবেছেন। যতো ভেবেছেন ততো আবদ্ধ হয়েছেন। মানুষের কল্যাণসাধনের এমন সুযোগ থেকে সরে আসা পাপ মনে হয়েছে, কাপুরুষতা মনে হয়েছে। এমন ভাগ্য কে আশা করতে পারে, জীবনে এর থেকে বেশি আর কি কাম্য?

সমস্ত দ্বিধা বিসর্জন দিয়েই দীপন ঘোষাল এগিয়ে এসেছেন।

।। পাঁচ ।।

দেব ট্রাস্ট-এর আবির্ভাবের পর একটা আস্ত বছর ঘুরেছে। প্রথম সকালের আয়নায় যদি সমস্ত দিনের চেহারার আভাস মেলে, দেব-ট্রাস্টের প্রথম বছরের পরিপ্রেক্ষিতে সামনের ভবিষ্যতটা তেমন আশাপ্রদ উজ্জ্বল বলা যাবে না তাহলে। দীপন ঘোষাল খুব নিঃশব্দে অথচ প্রাণপণে এই অস্বস্তির সঙ্গে যুঝে চলেছেন।

চৌরঙ্গীর অভিজাত এলাকায় নিজেদের অর্থাৎ ট্রাস্টের বাড়ির সমস্ত দোতলা জুড়ে আপিস। আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর মোটামুটি একটা ব্যস্ত চেহারাও আছে। প্রার্থীর আনাগোনার বিরাম নেই। দুজন জুনিয়র অফিসার তাদের আবেদন-নিবেদন শোনে, নোট করে এবং গুরুত্ব বুঝে তাদের কেস ম্যানেজিং ট্রাস্টির কাছে পেশ করে। তিনজন কেরানি প্রার্থীদের চিঠি এবং অভিযোগাদি পড়ে দাগ দিয়ে সর্ট করে ওই জুনিয়র অফিসারদের কাছে পাঠায়। তাদের মন্তব্য বিবেচনা করে ম্যানেজিং ট্রাস্টি সাহায্য বরাদ্দ করবেন অথবা বাতিল করবেন। দুজন টাইপিস্ট সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চিঠির জবাব আর মণিঅর্ডার ফর্ম টাইপ করেই নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না। ব্যক্তিগত সাহায্যের দিক বিবেচনা করলে ট্রাস্ট-এর দায় বাড়ছে বই কমছে না। পাঁচ দশ বিশ ত্রিশ থেকে শুরু করে একশ দুশ টাকার মণিঅর্ডার রোজ শয়ে শয়ে যাচ্ছে। কোন্ রোগী চিকিৎসা চালাতে পারছে না, কোন্ ভালো ছেলের টাকার অভাবে পড়া বন্ধ, কার পরীক্ষার ফীস আটকেছে, ছেলেপুলে নিয়ে কোন বিধবার উপোস চলছিল, কোন বিধবার মেয়ের বিয়ে ঠিক অথচ টাকার অভাবে সমূহ সংকট, পঙ্গু হবার ফলে কার সংসার অচল, ইত্যাদি হাজারো রকমের আবেদনের সত্যাসত্য যাচাই করে সাহায্য পাঠানো হয়। এসব কেস যাচাই করার জন্যেও দুজন ইনসপেকটর বহাল আছে। তাদের বাইরে ঘোরা কাজ। কিন্তু সাহায্যের শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগে দীপন ঘোষাল প্রতিটি কেস নিজেও একবার যাচাই করে নিতে চেষ্টা করেন। মফস্বলের ছোট কেসএ সেটা সম্ভব হয় না, কিন্তু স্থানীয় ব্যাপার হলে প্রার্থীকে ডেকে পাঠানো হয়।

কিন্তু এতবড় ট্রাস্ট-এর যে কর্মসূচী একেবারে গৌণ, তারই প্রার্থী বাড়ছে শুধু। ব্যক্তিগত সাহায্যের ব্যাপারটা ট্রাস্ট-এর আসল লক্ষ্য নয়। হাসপাতাল, শিক্ষা, ব্যবসাসম্প্রসারণ, ধর্মীয় সেবা-প্রতিষ্ঠান, সরকারী বেসরকারী সাহায্যকেন্দ্র ইত্যাদির শুকনো উৎসগুলো যতটা সম্ভব পুষ্ট করে তোলাই আসল লক্ষ্য। তেমন প্রয়োজনে এর পিছনে বহু হাজার বহু লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার কম সূচী দেব-ট্রাস্টের পরিকল্পনায় লিপিবদ্ধ আছে। ফলে ছোট-বড় বহু প্রতিষ্ঠানের হোমরা-চোমরা কর্মকর্তাদেরও নৈমিত্তিক আনাগোনার বিরাম নেই। দীপন ঘোষাল নিজে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন। ট্রাস্ট-কমিটির অন্যান্য মেম্বরদের সুপারিশ নিয়েও অনেকে বড় সাহায্যের প্রত্যাশায় আসেন।

কিন্তু ইদানীং দীপন ঘোষালের তীক্ষ্ণ যাচাইয়ের পরীক্ষায় বেশির ভাগ আবেদনই শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়। তাঁরা নিরাশ হন তো বটেই, কিন্তু দীপন ঘোষালও কম অস্বস্তি ভোগ করেন না।

একরকম যাচাইয়ের কারণও আছে। কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে আর ওপর ওপর পর্যবেক্ষণ করে পূর্ণ বিশ্বাসে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। পরে দেখা গেছে টাকা পাওয়ার আগ্রহ তাদের যতো প্রবল, ট্রাস্ট-এর শর্ত পালনের নিষ্ঠা ততোটাই কৃত্রিম। বিধিমতো হিসেব দাখিল করেন না, হাসপাতালে ট্রাস্টের ফ্রী-বেডে টাকার বিনিময়ে পেসেন্ট ভর্তি হয়, অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছেলেদের টিফিন আর স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য বরাদ্দ টাকা ভিন্ন রাস্তায় খরচ হয়ে যায়। এই গোছের কোনো

স্বামী তত্ত্বানন্দের নূতন বই
মহামানব বুদ্ধ ৩·৫০ মহামানব শঙ্কর ৩·৫০
নীতিগল্প ৪·০০
চণ্ডী (সং-ইং) ৬-৫০
Quintessence of Vedanta 10.00
বি সেন, ১৪।২৯ গল্‌ফ ক্লাব রোড, কলিকাতা—৩৩
ছবি শিব, বুদ্ধ, শঙ্কর (প্রতিটি) ·৬০

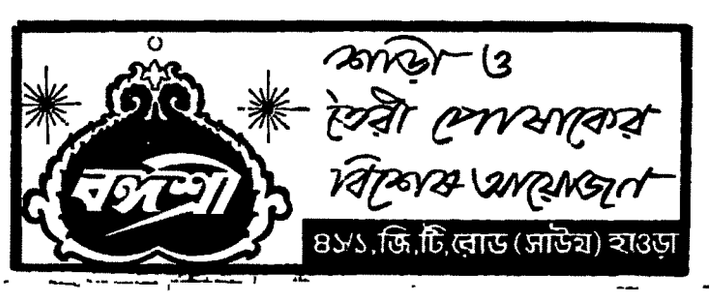

রিপোর্ট কানে এলেই দীপন ঘোষাল ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

ফলে বড় সাহায্যের ব্যাপারে সর্বদা সজাগ এবং সতর্ক এখন তিনি। যাচাইয়ের পরীক্ষা অনমনীয়। যে পদস্থ কর্মকর্তারা সাহায্যের প্রত্যাশায় আসেন এই কঠিন সতর্কতা বেশির ভাগই তাঁদের মনঃপূত নয়। দীপন ঘোষাল সেটুকুই সততার অভাব ধরে নিয়ে সরাসরি প্রস্তাব বাতিল করে দেন। সততার সংশয় একবার মনে এলে আর কোনরকম আপোস-মীমাংসায় রাজি নন তিনি।

ওই গোছের প্রার্থী ছেড়ে কমিটির কোনো-কোনো মেম্বরও এই কারণে ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ দীপন ঘোষালের ওপর। তাঁরা ভাবেন তাঁদের সুপারিশের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হল না।

এটা তাঁরা কেউ ভাবতে পারেন না, তাঁদের অদ্ভুত চরিত্রের ম্যানেজিং ট্রাস্টিটি যোগ্যস্থানে উদার সাহায্য এগিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়িয়েই আছেন, সেরকম মনের মতো সুযোগ পাচ্ছেন না বলেই ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু তিনি।

প্রত্যাশার ব্যাপারে মানব চরিত্রের খুব একটা রকমফের নেই বোধ হয়। বাড়ির রেস্টনীর মধ্যেও তিনি বেশ একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছেন এই এক বছর ধরে। সেখানেও সকলেই যেন ছোট বৃত্ত থেকে হঠাৎ একটা বড় বৃত্তের মধ্যে পা ফেলেছে। তাদেরও আচরণ আর প্রত্যাশা বদলেছে, ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ তারাও।

ছেলেবেলায় একটা মজার গল্প পড়েছিলেন দীপন ঘোষাল। হঠাৎ-হঠাৎ ইদানীং সেই গল্প মনে পড়ে যায়। ছেলেপুলে নাতি-নাতনির ভরাটে সংসার ছিল এক গরিব বুড়ির। গরিব হলেও মনের মিতালি ছিল। কিন্তু মনের তলায় বুড়ির ছিল রত্নের প্রতি লোভ। একবার এক ছদ্মবেশী দেবদূত বুড়ির আতিথ্যে খুশি হয়ে তাকে একখানা দুর্লভ রত্ন দিয়ে গেল। সেই রত্নের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম সকলের।

ব্যস, গরিব বুড়ির সংসারের সুখ-শান্তি সব দেখতে দেখতে উবে গেল। সেই রত্নের লোভে মারামারি খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়ে গেল। কারো মনে আর শান্তি নেই। সুখের সংসার ছারখার। বুড়ি তখন সেই দেবদূতকে ডেকে চোখের জলে ভেসে কাকুতিমিনতি করে সেই রত্ন ফেরত দিয়ে তবে বাঁচে।

গল্পটা মনে পড়লে দীপন ঘোষাল কৌতুক বোধ করেন বটে। কিন্তু সবটাই কৌতুক নয়...।

মামার দখলে এত টাকা, কিন্তু শিপ্রা আজও সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হতে পারল না বলে খেদ। পাড়ার সকলে তার গাড়ি-অলা মামাকে চেনে এখন তার কিনা এই দুর্দশা।

রেবার সংকল্প ছিল বিএ পাস করতেই হবে এবারে, অথচ তার জন্য একজন মাস্টার রাখা হলই না শেষ পর্যন্ত। পরীক্ষা হয়ে গেছে, পাস করা হবে কিনা ভগবান জানে। তার মুখ শিপ্রার থেকেও বেশি ভার। রেবার মাস্টারের জন্য স্ত্রীও আবেদন জানিয়েছিলেন। ভাগ্নির কেন এবারে পাস করা দরকার তার আভাসও দিয়েছেন।.. যে ছেলেটা ওকে পছন্দ করে তাদের ভালো অবস্থা, ছেলেটাও এম-এ পাস, তার বড় দুই ভাইয়ের বউও বি-এ পাস—তাই ছেলেটার সাফ কথা বি-এ পাস না করা পর্যন্ত বিয়ের কথা নেই।

শোনা-মাত্র দীপন ঘোষাল দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন, বিয়ের কথা নেই তো এক-ঘন্টা ধরে টেলিফোনে কি কথা থাকে! ও-সব আমি পছন্দ করি না স্পষ্ট জানিয়ে দিও। তোমরা ভেবেছ কি আমাকে, একশ দেড়শ টাকা দিয়ে আমি একটা মাস্টার রাখতে পারি! পাস করার ইচ্ছে থাকলে আমার কাছে আসে যেন পড়তে।

বলা বাহুল্য, রেবা একদিনও পড়তে আসেনি, আর তার নিজেরও কখনো ডেকে নেওয়ার সময় হয় নি।

...ওই টেলিফোন নিয়েও বাড়িতে তুমুল হয়ে গেছে। টেলিফোন বসানো হয়েছিল ভিতরের বারান্দায়। সেই টেলিফোন কারো না কারো কানে লেগেই আছে। স্ত্রীর তার স্কুলের অরুণাদির সঙ্গে আলাপচারি চলে এক একদিন আধঘন্টা ধরে। তাঁর সঙ্গে অরুণা বাগচীর এখন সব থেকে বেশি ভাব। স্ত্রীর দখলে একটা গাড়ি দেখেই তার মেজাজ এবং আচরণ পালটেছে। এই দশ মিনিটের পথও নমিতা এক-একদিন গাড়িতে যান। বুড়ো কুমারদের বাহাদুর সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গাড়ির ওপর তাঁর মায়ের পূর্ণ অধিকার থাকবে, তাঁর গাড়ির দরকার থাকলে ভোলানাথ যেন নিজের দরকারে ট্রাস্টএর পয়সায় ট্যাক্সিতে যাতায়াত করে। স্ত্রীর দরকারটা মাঝে মধ্যে তাঁর অরুণাদির দরকারের দিকেও গড়িয়েছে। অবশ্য ছুটির দিনে।

স্বামীর মেজাজ জেনেও অরুণাদি চাইলে নমিতা না বলতে পারেন না। মুখ কাঁচুমাচু করে গাড়ি পাঠানোর অনুমতি চান, বলেন, চেয়ে বসলে কি করি বলো, সকলে জানে আমাদেরই গাড়ি—

সারা বিশ্বে যে বই বিরাট আলোড়ন এনেছিল এবং যে বই পড়ে ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিলকেও বলতে হয়েছিল যে, বইটি পড়া শেষ না করা অবধি তিনি ঘরের আলো নেভাতে পারেন নি, সেই বিশ্ববিখ্যাত চাঞ্চল্যকর গুপ্তচর-কাহিনী, মাত্র ম্যাক্সেনা রচিত "আই ওয়াজ এ স্পাই" অবলম্বনে

শ্রীইন্দুভূষণ দাস রচিত

স্পাই মেয়ে মাধা—৮·০০

নারী গুপ্তচরের এ-রকম অসমসাহসিক কাহিনী আর আছে কিনা সন্দেহ। প্রতিটি লাইব্রেরী পাঠাগার এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার জন্য এ বই অপরিহার্য।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্যে কয়েকখানা অপরিহার্য পুস্তক :

আই. বি. দাস রচিত

- A GUIDE TO CLERKSHIP EXAMINATION 6.00

লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ও সাব-জেলার পদের জন্যে পরীক্ষার্থীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়িকা

- ENGLISH FOR COMPETITIVE EXAMIANTION 3.00
- GENERAL KNOWLEDGE & CURRENT AFFAIRS 4.00
- SPOKEN ENGLISH 3.50 : বাজারে সর্বশ্রেষ্ঠ বই

আই বি, দাস ও পি, কে বিশ্বাস রচিত

- CLERKS' GRADE EXAMINATION 6.00 (guide)
- INTERVIEW GUIDE : : যেকোনো চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দেবার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী পুস্তক।
- INTERVIEW & VIVAVOCE 4.00

চাকরির জন্যে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করলেও বহু যুবক ভাইভাভোসী টেস্টে (মৌখিক পরীক্ষায়) ফেল করে চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এ বইটি তাঁদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

প্রকাশক :

সপ্তর্ষি প্রকাশন : C/o. জ্ঞান নিকেতন, ১৮-এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দীপন ঘোষাল কখনো গুম হয়ে থাকেন, কখনো বা তিক্ত ঝাঁঝে বলে ওঠেন, সকলকে এই মিথ্যেটা সত্যি বলে জানতে দিয়েছে কে? আমি?

...স্ত্রীর অরুণাদির আচরণ বদলানোর আরো একটা বিশেষ কারণ দীপন ঘোষাল ইদানীং বুঝে নিয়েছেন। সেটা পরের অপ্রিয় প্রসঙ্গ।

স্ত্রীর পরে দেবু আর বীরুর কানে টেলিফোন, বেবার কানে টেলিফোন, এমন কি যখন-তখন ওই ছোট মেয়ে শিপ্রার কানেও। ক্লাসের বন্ধুদের কাছে তারও অনেক দরকার বেড়েছে।

...প্রথম দফায় বিল উঠেছিল তি-শ টাকার কাছাকাছি। রাগারাগি চেঁচামেচি করার পরেও দ্বিতীয় কোয়ার্টারের বিল এসেছিল সোয়া তিনশ' টাকা। সন্ধ্যার মুখে সেই বিল হাতে করে ওপরে উঠে দেখেন কুমারদেব বাহাদুর জমাটি আসর বসিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যেই ফেটে পড়েছিলেন দীপন ঘোষাল। আমি কালই টেলিফোন সরিয়ে নেবার জন্য লিখে দিচ্ছি, টেলিফোন আমার দরকার নেই—বুঝলেন?

বুড়ো তার হাতের বিল আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপার বুঝেছেন। কারণ এই প্রসঙ্গে আগের বারেও তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তবু নিরীহ মুখে শুধোন, খুব ভয়ানক কিছু ব্যাপার নাকি?

—আমার কাছে ভয়ানক, গেল বারে তিনশ টাকা উঠেছে বলে রাগারাগি করেছিলাম, এবারে তিনশ পঁচিশ টাকা।

ছদ্মগাম্ভীর্যে এবং বিস্ময়ে বুড়ো ঘরের সকলের মুখগুলো একবার দেখে নেন। সকলেই চুপ একেবারে। —খুব অন্যায় কথা, টেলিফোনটা এবার আমি মায়ের নামে করে দিচ্ছি, শোনো মা—ট্রাস্টের কোনো ফোন হলে তুমি কড়া হিসেব রাখবে।

—শুনুন, আমি এ-সব—

—তুই আমার কথা শোন্। তাঁকে থামিয়ে বুড়ো পাল্টা তর্জন করে উঠেছেন। —এই সামান্য ব্যাপারে আমার সামনে আমার মা আর ছেলেমেয়েগুলোকে অপ্রস্তুত করলে সত্যিই আমি আলাদা ফোন এনে বসাব এখানে, আমি ছোটাছুটি করে মায়ের কাছে আসতে পারব না—ফোন আমার দরকার, দেখব তুই কি করে ঠেকাস! আসল কাজের ব্যাপারে তিন পা এগনো গেল না, উনি এই সামান্য ব্যাপারে মাথা গরম করতে এসেছেন। শিগগীরই তোদের ফান্ডে আরো দেড় কোটি টাকা ঢালতে যাচ্ছি আমি, এ-ই সামলে উঠতে পারিস না, তখন কি করবি তাই নিয়ে মাথা গরম করগে যা—

এইভাবেই বুড়ো ওদের আসকারা দিতে শুরু করেছেন। তিক্তবিরক্ত হয়ে দীপন ঘোষাল বাধা দেবেন না ভেবেও সবদা চুপ করে থাকতে পারেন না।

বড় ভাগ্নে সুদেবের কেরাণীর চাকরি আর ভালো লাগছে না। মামীর মারফৎ ট্রাস্ট বোর্ডে একটা ভালো কাজের জন্য অনেকবার সুপারিশ করেছে। বেশ ভালো মাইনেয় ক'জন লোক নেওয়া হয়ে গেল, অথচ মামা ভাগ্নের দিকে তাকালেন না। আত্মীয় হওয়াটাই যেন অপরাধ। এ-ব্যাপারে নমিতাও প্রায় অবুঝ। শেষে ধমকে নিরস্ত করতে হয়েছে।

পরের ভাগ্নে বীরুর আশা আর কামনাটা অন্যরকম। ওর মামীরও ধারণা, সুযোগ পেলে বীরু মস্ত একজন হয়ে উঠতে পারে—তার ব্যবসার মাথা, ব্যবসার ঝোঁক। মামীর বক্তব্য, এবার ওকে সে-সুযোগ একটা করে দেওয়া উচিত। কিন্তু বীরু কারো সুপারিশের ধার ধারে না। মামীকে সামনে রেখে নিজেই তার বক্তব্য পেশ করেছে। তিন বন্ধু আর সে মিলে একটা পাবলিসিটি ফার্ম খুলেছে ছোট করে। বারো হাজার করে তিন বন্ধু ছত্রিশ হাজার টাকা ফেলেছে এতে—বীরুর কিন্তু টাকা ফেলতে না পারার দরুন তার জোর কম। ফার্ম ভালোমতো চালু করতে হলে আরো বিশ হাজার টাকা দরকার। এই বিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে বীরুই ওই ফার্মের কর্ণধার হয়ে বসতে পারে। তার ধারণা মামা এবারে ইচ্ছে করলেই সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন।

—কি করে পারি? দীপন ঘোষালের মাথা গরম তক্ষুনি। —ট্রাস্ট ফান্ড থেকে টাকা দেব?

নমিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেন, সেটা হয় না বুঝি?

—না না, হয় না। ট্রাস্ট শুধু পড়ন্ত কটেজ ইনডাস্ট্রি ডেভেলপ করার জন্য টাকা দিতে পারে, তারও অনেক বাইন্ডিং—তোমরা সব ভেবেছ কি আমি জানতে চাই—যা হোক একটা বায়না নিয়ে এসে হাজির হলেই হল।

বীরু দমবার পাত্র নয়। বলল, ট্রাস্ট ফান্ড থেকে টাকা দিতে হবে না, তুমি রাজি হলে টাকার ব্যবস্থা আমিই করে নেব।

দীপন ঘোষাল অবাক। —কি করে?

—ব্যাঙ্ক থেকে। আমি ব্যাঙ্কের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করে কথা-বার্তা বলেছি। সেই ভদ্রলোক আমাদের ফার্মও দেখে এসেছে। তুমি সিওরিটি দাঁড়ালেই টাকা দিয়ে দেবে বলেছে। নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্ট ছেড়ে আসল টাকাও আমি কয়েক বছরের মধ্যে শোধ করে দেব।

শোনা-মাত্র চাউনি ধারালো হয়ে উঠল দীপন ঘোষালের। —কোন্ ব্যাঙ্কের এজেন্টের সঙ্গে এ-সব কথা হয়েছে?

এবারে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে ব্যাঙ্ক এবং এজেন্টের নাম করল প্রবীর। সঙ্গে সঙ্গে দীপন ঘোষাল ক্ষিপ্ত। ওই ব্যাঙ্কে ট্রাস্টের কম করে কোটি টাকা খাটছে। ব্যাঙ্কের ওই এজেন্ট সেই কারণে তাঁকে একটু তোয়াজ করার জন্য সদা ব্যস্ত। উনি সিওরিটি দাঁড়ালে ওই ভদ্রলোক বিশ হাজারের ডবল টাকাও অনায়াসেই দিয়ে দেবেন সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। ট্রাস্ট যার হাতে এবং যার পৈতৃক বাড়ি—তিনি গ্যারান্টার দাঁড়ালে টাকা দিতে ভাবনা কি। আর এই চতুর ভাগ্নে বেছে বেছে ওই ব্যাঙ্কের ভদ্রলোকের সঙ্গেই দেখা করেছে!

ভাগ্নেকে ছেড়ে প্রবীর ওপরেই ফেটে পড়েছেন। ধরাকে সরা ভেবেছ সব, কেমন? তুমি—তোমার আসকারা পেয়েই ওরা একদিন পথে বসাবে আমাকে—বুঝলে।

—মামীকে বলছ কেন, যা বলার আমাকে বলো, পথে বসাবার কি দেখলে এর মধ্যে? তুমি রাজি আছ কি নেই, সাফ বলে দাও।

—না না—নেই। যা খুশি করগে যা—দূর হ এখান থেকে।

জ্ঞান বয়েস থেকে মামাই সব। মামার এ ধরনের কথায় ওদের মান খোয়া যায়। তপ্ত রোষে প্রস্থান করেছে। পরে মামীকে বলেছে, বড় কিছু করার মতো বুকের পাটা মামার নেই—বুঝলে? ওই অন্যের টাকা নেড়েচেড়েই দিন যাবে, দেখে নিও।

নমিতার শুনতে ভালো লাগেনি, কিন্তু জোর দিয়ে প্রতিবাদও করতে পারেন নি। তাঁর এখনো বিশ্বাস সুযোগ পেলে বীরুটা বড় হবে, কিন্তু ঘরের লোক কোন ব্যাপারে না বই হাঁ বলতে জানে না।

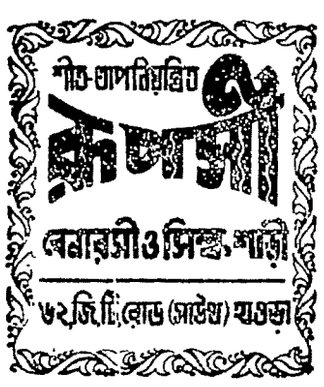

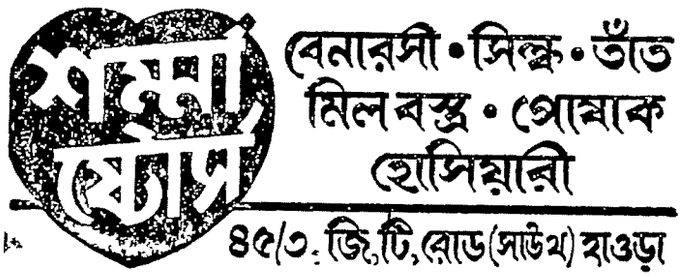

দীপন ঘোষালের সঙ্গে সব থেকে বড় খটাখটিটা লেগে গেল নিজের স্ত্রীরই। তার বুড়ো ছেলের প্রশ্রয়ে স্ত্রীটি এমন অনেক কাজ করে যাচ্ছে যা তাঁর পছন্দ নয়। বেশি বকাবকি করলে ইদানীং রাগের মাথায় তর্কও করে।

মাস ছয়েক আগের কথা। বিরোধের বড় সূত্রপাত নমিতার অরুণাদির স্কুল নিয়ে। ওই অরুণাদি স্ত্রীর চোখের মণি এখন। সকলকে ডিঙিয়ে উনি এখন সেই মহিলার একমাত্র বান্ধবী এবং পরামর্শদাত্রী হয়ে বসেছেন—এই আনন্দে ভিতরে ভিতরে ভগমগ। আসলে অরুণাদির প্রতি তাঁর দুর্বলতা আগের থেকেও ঢের বেশি এখন।

সেই অরুণাদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাঁর নাকি ভয়ানক দরকার। আর নমিতার সাহায্যও সব থেকে বেশি দরকার। কিন্তু কি দরকার সেটা আগে ফাঁস করেন নি, একবারে বলবেন।

আনন্দের থেকেও নমিতা উতলাই বেশি। ঘরের লোককে বার বার বলেছেন, দেখ, অরুণাদি নিশ্চয় কিছু একটা প্রস্তাব নিয়ে আসছেন, কিছু করতে পারো আর না পারো, ভালো করে কথা বোলো—মস্ত মানী মহিলা, আমাকে অপ্রস্তুত কোরো না।

কি আবার অসম্ভব আব্দার হবে ভেবে নমিতার কথায় দীপন ঘোষাল দেখাই করতে চান নি। বলেছেন, বলে দিও খুব ব্যস্ত।

কিন্তু অরুণাদিকে নমিতা সে-কথাই বা বলেন কি করে?

মাথা খাটিয়ে অরুণাদিকেই একটা পরামর্শ দিলেন তিনি। বললেন, এত ব্যস্ত যে কথা বলারই ফুরসত মেলে না, এক কাজ করো অরুণাদি, তুমি এক্ষুনি একটা টেলিফোন করো দেখি—এখন বাড়িতে কি-সব হিসেব নিয়ে বসেছেন দেখে এসেছি—

দিন পনের হল, অরুণাদির তাগিদেই আলাপচারী এখন 'তুমি'তে এসে ঠেকেছে।

অরুণাদি ফোন করলেন এবং সেই সন্ধ্যাতেই বাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন।

দীপন ঘোষাল দশটার আগেই খেয়ে-দেয়ে আপিসে চলে যান। ফলে স্কুল থেকে ফেরার পর দুপুরে আর নমিতার সঙ্গে দেখা হয় না। দেখা হয় কোনদিন বিকেলে কোনদিন সন্ধ্যায়, কোনদিন বা একেবারে রাত্রিতে।

সেদিন বিকেলেই ফিরলেন দীপন ঘোষাল। হাতমুখ ধোবার পর জলখাবার এগিয়ে দিয়ে নমিতা চাপা খুশিতে বললেন, আমার কথায় হল না, টেলিফোনে অরুণাদির গলা বুঝি খুব মিষ্টি লাগল।

ভুরু কুঁচকে দীপন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলোতো...কেন দেখা করতে চায়, আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

নমিতা জবাব দিলেন। আমি কি জানি! পরক্ষণে হাসলেন ফিক করে, কিছু একটা সম্পর্ক গড়তে চায় নিশ্চয়, দেখো যাদু আমাকে আবার পথে বসিও না, মহিলা আবার দেখতেশুনতেও ভালো—

ঝাচালতা দেখে দীপন ঘোষালও হেসেই ফেললেন।

যথাসময়ে অরুণা বাগচী এলেন। মহিলা সুশ্রীই বটে। বেশ বাসে সুরুচি-সম্পন্না। নমিতার বয়সীই হবেন, দীপন ঘোষাল এক নজর তাকিয়ে বুঝে নিয়েছেন স্ত্রীর তুলনায় মহিলা ঢের বেশি বুদ্ধিমতী। ছোট হলেও একটা স্কুলের সর্বময়ী কর্ত্রী যখন, বুদ্ধি থাকারই কথা।

শোবার ঘর নমিতা আগেই সাজিয়ে রেখেছিলেন। অরুণাদিকে সেখানেই এনে বসালেন। ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে স্বামীকে খবর দিয়ে এলেন। তারপরেই এক ডিশ খাবার এনে হাজির করলেন অরুণাদির সামনে।

দীপন ঘোষাল হাসি মুখে ঘরে ঢুকে নমস্কার জানালেন। অরুণা বাগচীও সুশোভন তৎপরতায় প্রতিনমস্কার জানালেন।

—বসুন। দীপন ঘোষাল নিজেও একটা চেয়ার টেনে সামনে বসলেন।

ফিরে বসে অরুণাদি অন্তরঙ্গ ধমকের সুরে নমিতাকে বললেন, তোমার মাথা খারাপ, এত কে খাবে। তাছাড়া আমি খেতে এসেছি নাকি, আমি এসেছি ভিক্ষে করতে।

শুনেই ভিতরে শুকোলো নমিতার। জোর দিয়ে বললেন, আগে খেয়ে নাও, তার আগে কোনো কথা নয়—

দীপন ঘোষাল সহাস্যে বললেন, আমি সামান্য ছা-পোষা মানুষ, স্ত্রী আপনার স্কুলে চাকরি করে আমাকে সাহায্য করেন—আপনার কথা শুনে বিব্রত বোধ করছি—

স্বামী এমন সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন নমিতা এই প্রথম জানলেন যেন। অরুণা বাগচীর চোখে মুখে সুচারু বিড়ম্বনা। —আমি তাহলে পালাই নমিতা, আপনার স্ত্রী না থাকলে আমার স্কুল কানা, এটুকুই আপনি জেনে রাখুন।

চারভাগের তিনভাগ খাবার তুলে দিয়ে অরুণা বাগচী জলযোগ সেরে নিলেন। তার-পর আবেদন পেশ করলেন।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
নতুন উপন্যাস
সুখের আড়াল ৫·৫০
অনিল রায়-এর
চাঞ্চল্যকর নতুন উপন্যাস
সোনার পাতায় রক্ত ৮·০০
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আজকের উপন্যাস
তোমার আমার ৪·০০
নীল লোহিতের চোখের সামনে ৫·০০
আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস
তরঙ্গহীন ৫·০০
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস
সরমা ও নীলকান্ত ৬·০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নতুন উপন্যাস
এক বোন পারুল ৬·০০ বন করবী ৬·৫০
সাহিত্য-সংস্থা, ১৮সি, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

তাঁর বক্তব্য, ছোট এক-তলা দালানে স্থানের অভাব দিনকে দিন প্রকট হয়ে উঠছে। জায়গার অভাবে ছোটদের স্কুল যে-ভাবে সাজানোগোছানো দরকার, তাও পারা যাচ্ছে না। দেবট্রাস্ট যদি অনুগ্রহ করে বিলডিংটা দোতলা করে দেন তাহলে আর কোনো সমস্যা থাকে না। কন্ট্রাক্টর দিয়ে তিনি হিসেব করে নিয়েছেন, ওটুকু করতে মাত্র হাজার টাকা দরকার।

শুনে নমিতা ভিতরে ভিতরে আঁতকেই উঠলেন প্রায়। সশঙ্ক নেত্রে স্বামীর দিকে তাকালেন।

দীপন ঘোষালের নির্লিপ্ত মুখ। সবিনয়েই জানালেন, এটা সম্ভব নয়, গরিবের স্কুল অচল হলেই তবে তাঁরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন। এটা সে-পর্যায়ের স্কুল নয়, এখানে টাকা দিতে হলে অনেক রকম হিসেবনিকেশের ব্যাপার আছে, কতো ছেলেমেয়ে, কতো মাইনে দেয় তারা, কি-ভাবে সে টাকা খরচ হয়, মালিকের কি লাভ থাকে এবং কত থাকা উচিত, কমিটি এ-সবই দেখতে চাইবে।

অরুণাদি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। —দেখাব। আমাদের প্রয়োজনটাই বা আপনারা ছোট করে দেখবেন কেন?

—ছোট করে দেখছি না, কিন্তু এতে এগিয়ে আসার ব্যাপারে আমাদের অনেক অসুবিধে আছে। তাছাড়া কমিটির কাছে এ-প্রস্তাব দাখিল করা আমার পক্ষে ঠিক সম্ভব হবে না।

নমিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে বসল, আমি ওই স্কুলে কাজ করব বলে?

বুদ্ধ গাম্ভীর্যে স্ত্রীর দিকে তাকালেন দীপন ঘোষাল। —সামান্য বুঝেছ, সবটা বোঝা তোমার পক্ষে মুশকিল।

কাজের প্রসঙ্গে কথা-বার্তার এই নীরস সূত্রটা নমিতার অপছন্দ। হাল্কা করেই গোঁ ভরে জবাব দিল, দেখো অরুণাদির সামনে আমাকে বকা-ঝকা কোরো না—আমার জন্যে অসুবিধে হলে আমি না-হয় স্কুল ছেড়ে দেব—আর কি অসুবিধে আমি না বুঝলেও অরুণাদি বুঝবেন, তাঁকে বুঝিয়ে বলো।

অরুণা বাগচী দমবার পাত্রী নন। প্রথমে নমিতাকে বললেন, তোমাকে ছাড়তে হলে আমার দোতলায় কাজ নেই। হাসি মুখে দীপন ঘোষালের দিকে ফিরলেন, আপনাকে জানি বলেই আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস করিনি, এ-ব্যাপারে আগে আমি আপনার কমিটির একজন মেম্বর আর আপনার অফিসারদের সঙ্গেও আলাপ করে নিয়েছি। তাঁদের ধারণা, আপনি সদয় হলে আর কোনো বাধা হবে না।

ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হয়ে উঠলেও দীপন ঘোষাল সেটা প্রকাশ করলেন না। জবাব দিলেন, তাঁরা ভেবে-চিন্তে কিছু বলেন নি। আপনি অ্যাপ্লিকেশন পাঠালে কমিটি সেটা বাতিল করবে, আর আমার চেষ্টায় বাতিল না করলেও আপনাদের কর্তৃত্বের এমন সব ব্যাপারে নাক গলাবে যেটা আপনাদের পছন্দ হবে না।

ভিতরে ভিতরে হতাশ হলেও অরুণাদির মুখের হাসি ঘোচে নি। বলেছেন, আবার আসবেন। বলেছেন, স্কুল বড় হলে ওই নাক গলানো তাঁরা বরদাস্ত করতে পারবেন। আবেদন না-মঞ্জুর হয়ে গেল এটা তিনি ধরে নিচ্ছেন না জানিয়ে এবং সদয় বিবেচনা প্রার্থনা করে সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছেন।

তিনি চলে যাবার পর নমিতা বললেন, কেন এ-জন্যে টাকা দেওয়া যায় না অরুণাদিকে সেটা ভালো করে বুঝিয়ে বললেই তো পারতে। কারণ তো স্পষ্ট করে কিছুই বললে না—

এবারে গলা ছেড়ে কথা বলার সুযোগ পেলেন দীপন ঘোষাল। তিক্ত বিরক্ত। কেন তোমরা এ-সব আবদার নিয়ে আমার কাছে আসো? বুঝিয়ে কি বলব? আমার আপত্তি বলেই টাকা দেওয়া যায় না। স্টাইলের স্কুল করে নবাবী করার জন্যে কেউ দানছত্র খুলে বসে নেই, বুঝলে?

অরুণাদির ব্যাপার বলেই ধমক খেয়েও নমিতা চুপ করে থাকতে পারলেন না। —না জেনেশুনে তুমি স্টাইলের স্কুল বলছ কেন, আর এর মধ্যে নবাবীটাই বা কি দেখলে?

—যাও যাও, বিরক্ত কোরো না।

—বিরক্ত হচ্ছ কেন? একজন মহিলা তার স্কুল বড় করতে চায় এতে দোষের কি হল?

—কষ্ট করে স্কুলের উপার্জন বাঁচিয়ে আর ব্যাঙ্কের টাকা খরচ করে দোতলা ছেড়ে পাঁচতলা তুললেও কেউ দোষ দিতে আসবে না, বুঝলে? তোমার অরুণা বাগচী যা চায় তার মধ্যে পরোপকারের নামগন্ধও নেই, বুঝলে?

নমিতা চুপ তখনকার মতো। আগে হলে তিনিও তাই ভাবতেন। কিন্তু ইদানীংকালের হৃদ্যতার পর স্কুল বড় করার এই উদ্দীপনাটাকে নমিতা কোনমতেই ছোট করে দেখতে পারলেন না। ওই স্কুল নমিতাদির ধ্যান-জ্ঞান বলেই অনেকের কাছে তাপ্রিয় ওই মহিলা।

অরুণাদি নমিতার ওপর বিরূপ হওয়া দূরে থাক, তাঁকেই যেন আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন। বুড়ো কুমারদেব বাহাদুরের সঙ্গে নমিতার সম্পর্কের গল্প অরুণাদির কাছে নিজেই করেছেন। ফলে সঙ্কট তাঁরই। ক্রমাগত যুক্তি প্রলোভন আর সাহসের ইন্ধন যোগাতে লাগলেন তিনি। স্কুল বড় হলে তাঁরা দুজনেই সর্বেসর্বা হবেন।

সাহসে বুক বেঁধে স্বামীর অনুপস্থিতিতে নমিতা একদিন তাঁর বুড়ো ছেলের কাছে প্রসঙ্গটা তুললেন। ছোট ছেলেবেলাদের স্কুল-বিলডিং দোতলা করার ব্যাপারে ট্রাস্টের সাহায্য করার উপায় আছে কি নেই।

কিছু না ভেবেই কুমারদেব বাহাদুর জবাব দিলেন, কেন থাকবে না, এতো ভালো কাজ—ভোলানাথকে বলো।

বলার ফল কি হয়েছে নমিতা তাও জানালো। আর বলল, আপনাকে বলেছি এ-কথা শুনলেও কিন্তু আমাকে রক্ষে থাকবে না।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর অন্য মূর্তি। —কি! আমার মায়ের রক্ষে থাকবে না? দেখি কোন্ শালা আটকায়, তুমি কালই দরখাস্ত পাঠাতে বলো আমি দেখছি।

বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব অবদান।
বিশ্ব গুণী জ্ঞানী মণীষীদের সমাদৃত লেখক (ভারতের ডক্টর রাধাকৃষ্ণান যুক্তরাষ্ট্রের রাজকবি জন ম্যাসফিল্ড ও যুক্তস্টেটের পুলিটজার পুরস্কার প্রাপ্ত কবি কাল সর্পিবো)
এন. মুখোপাধ্যায়ের
অপরিণীতা মূল্য ২৮ টাকা
উপন্যাস ৯৪৮ পৃষ্ঠা।
বৃহৎ চিন্তাধর্মী সামাজিক উপন্যাস। প্রেম ও প্রাণের মহান প্রকাশ। যৌবনের ঘাত, সংঘাত ও প্রতিঘাত।
অঞ্জলি গীতিকাব্য। মূল্য ৫৲
৩৫৪টি গানের সমাবেশ।
রবীন্দ্র প্রতিভাদীপ্ত সঙ্গীতের ধারা। সঙ্গীত সাধকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের পরে এ ধরণের পুস্তক আর বাহির হয় নাই। বই দুখানি যুগান্তর ও আনন্দবাজার কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। সাধক ও মহাভারত এ দুটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।
দি বুক হাউস ১৫ কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২।

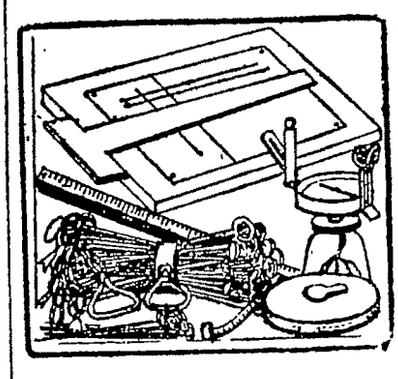
স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম ও অফিসের জন্য ষ্টেশনারী, কাগজ, সার্ভে, ড্রইং, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যাবতীয় উৎকৃষ্ট ছাপার কাজের সলিড প্রতিষ্ঠান।
রুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই বাধাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা—১
ফোন—২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪; গ্রাম: অয়রবিপন—হাওড়া পোষ্ট বক্স-৩৮, হাওড়া

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

১০৬।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

স্বাধীনতার পঁচিশবর্ষ পূর্তিতে রামায়ণী প্রকাশ ভবনের আবির্ভাব। তার প্রকাশিত উপন্যাস, গল্প সংগ্রহ, কবিতা গ্রন্থ প্রবন্ধমালা ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে সাড়া জাগিয়েছে। এবং এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই যে ভাল এবং দুর্লভ গ্রন্থমালা রামায়ণী ক্রমান্বয় প্রকাশ করে যাবে। এবং যে বই আজও পড়া হবে কালও পড়া হবে।

যেমন ইতিমধ্যেই রামায়ণী প্রকাশ করেছে :

প্রথম পর্যায় : আমরা সবাই একসঙ্গে
রমাপদ চৌধুরী
বিমূর্ত পাপ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
নয়ন-শ্যামা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ডাকবাংলো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পর্যায় : নক্সা কাটা ঘর আশাপূর্ণা দেবী
সোনার মলাট পরা শঙ্কর
শ্যামল চক্রবর্তী
অন্নপূর্ণা অভিযান
গৌরকিশোর ঘোষ
শেষ প্রহরে শান্তি শিশির লাহিড়ি
শিক্ষা ও সাহিত্য প্রবোধরাম চক্রবর্তী

তৃতীয় পর্যায় : ছোটদের দেবযান
বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাথমিক শিক্ষক দর্পণ
মুখার্জী ও ঘোষাল
প্রাথমিক শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ানো
সুখময় সেনগুপ্ত

খোঁজ নিন, স্যাম্পলসহ পাবলিসার্স কনসার্ণ, ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

অরুণাদি আবেদন পাঠাবার পরে দিনকতক যথার্থই ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছেন নমিতা।

...এরপর দীপন ঘোষাল অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন, কমিটির এগারোজনের মধ্যে দশজনই সেই আবেদন টেনে বার করে সকলে একবাক্যে ষাট হাজার টাকা মঞ্জুরের রায় দিয়েছেন। ছোট ছেলেমেয়েরাই দেশের ভবিষ্যত—এতে ন্যায় ভিন্ন অন্যায় কিছু নেই।

পুজোয় চাই নতুন বই

নতুন স্বাদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার

সলিল মিত্রের

দুর্গম দ্বীপের রহস্য ২·৫০
আন্দামানের বিভীষিকা ২·৫০

দেড়হাসি কাঠহাসি মুচকিহাসি ও অট্টহাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর

অনেক হাসি ২·০০

পরিচয় গুপ্তের

খেয়ালী রাজার কান্ড ২·০০
ভূতের বিয়ে ২·২৫
লম্বুদার গল্প ২·০০
গোয়েন্দা সম্রাট লম্বুদা ২·৫০

সুবীরাজৎ মজুমদারের

ভূতের পাল্লায় ২·২৫

রহস্য ও রোমাঞ্চ ভরা এ্যাডভেঞ্চার

হরিপদ ঘোষের

রহস্যময় গুহা ২·৫০
বাঘের দেশে বিভীষণ ২·৫০

পারলৌকিক ও শিকার কাহিনী

ছায়া-কায়া ২·০০
জ্যান্ত বাঘের কবর ২·০০

রূপকথার গল্প

সুজিতকুমার নাগের

রূপকথার ঝাঁপি ২·০০

শ্যামল চক্রবর্তীর

দৈত্যের পাহাড়ে ২·০০

বিঃ দ্রঃ— ভি, পিতে বই লইতে হইলে কিছু অগ্রীম পাঠাইবেন

সূচীপত্র ৩৫সি, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

টাকা মঞ্জুর হয়েছে।

আপিস থেকে বেরিয়ে দীপন ঘোষাল সোজা কুমার বাহাদুরের কাছে গেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, এই রকমই চলবে তাহলে?

এক-গাল হেসে বুড়ো জবাব দিয়েছেন, শুধু আমার মায়ের বেলায় চলবে, আর কারো বেলায় আমি একটি কথাও বলব না। পরে সান্ত্বনা দেবার সুরে বলেছেন, আমার মা যে কি মেয়ে তুই নিজেও জানিস না রে ভোলানাথ, তোর হাসপাতালে থাকার সময় মায়ের সেই মূর্তি আমি জীবনে ভুলব না।

আবেদন পাঠানোর সাতদিনের মধ্যে এই ব্যাপার। বাড়ি এসে থমথমে মুখে দীপন ঘোষাল স্ত্রীকে বলেছেন, তোমার প্ল্যান সফল হয়েছে, আমার অমতে টাকা মঞ্জুর হয়ে গেছে—অরুণা বাগচীকে টাকা আনার ব্যবস্থা করতে বলো।

শোনামাত্র বুকের তলায় দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছল। কিন্তু মুখ ফুটে স্বামীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি। ফাঁক মতো অরুণাদিকে ফোনে খবরটা জানিয়েছেন। পারলে অরুণাদি টেলিফোনের তারের ভেতর দিয়েই জড়িয়ে ধরেন তাঁকে।

নমিতার মনে হতে লাগল মানুষটা কেমন যেন দূরে সরে গেল তাঁর কাছ থেকে একটু। রাতে আলতো করে একখানা হাত তাঁর মাথায় রেখেছিলেন। হাত সরিয়ে দিয়ে দীপন ঘোষাল বলেছেন, বিরক্ত কোরো না।

...ছ'মাসের ঢের আগেই স্কুল বিলডিং দোতলা হয়েছে। নমিতা ঘোষাল সেই স্কুলের সহকারী হেড মিসট্রেস। মাইনে দেড়শ থেকে এক লাফে তিনশয় উঠে গেছে। অরুণাদির চেখের মণি এখন তিনি। এত আনন্দের মধ্যে ঘরের মানুষের আচরণও গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ঠিক কি চেয়েছিলেন আর কি হল না বা হচ্ছে না জিজ্ঞাসা করলে দীপন ঘোষাল হয়ত উত্তর দিতে পারবেন না। অথচ ভিতরে ভিতরে এরই মধ্যে একটা হতাশার ছায়া পড়ছে তাঁর। নতুন উৎসাহে সেটা ঠেলে সবাতে চেষ্টা করেন ট্রাস্ট-এর দাক্ষিণ্য যতটা সম্ভব ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবেন কিন্তু মনের মতো সে-কথা ক্ষেত্রও যেন পেয়ে ওঠেন না। ফলে ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। এদিকে কুমারদেব বাহাদুরের শরীর সুস্থ যাচ্ছে না খুব, তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের দান সেরে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। দীপন ঘোষাল সেটাও ঠেকিয়ে রেখেছেন।

এই সময়ে বাইরে থেকে দুজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। সৌম্যদর্শন, ধপধপে সাদা থান বেড় দিয়ে পরা, গায়ে সাদা আলখাল্লা। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু মিষ্টি চাউনি। সন্তানপীঠ-এর সেবক বলে নিজেদের পরিচয় দিলেন। তাঁদের আবেদন, দীপন ঘোষালকে একটিবার তাঁদের সঙ্গে গিয়ে সন্তান-পীঠ দেখে আসতে হবে—তাঁর সম্পর্কে সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করেই এই আশাটুকু নিয়ে তাঁরা আশী মাইল পথ ভেঙে এসেছেন।

কথাবার্তা বলে কেন যেন লোকদুটিকে বেশ ভালো লাগল দীপন ঘোষালের। জিজ্ঞাসা করে তাঁদের আরো পরিচয় বার করে নিলেন। দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, এককালে পোলিটিক্যাল আসামী ছিলেন, অনেক বছর জেলও খেটেছেন। পৈতৃক সম্থান কিছু ছিল, রাজনীতি ছেড়ে বহুদিন দুই বন্ধু নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁদের সন্তান-পীঠ-এর বয়স মাত্র দুবছর এখন তিনটি ছেলে নিয়ে পীঠ-এর আবির্ভাব—সন্তান-সংখ্যা এখন চৌদ্দ। কি তাঁদের স্বপ্ন তাও শুনলেন দীপন ঘোষাল। বাস্তব নয় খুব, তবু অদ্ভুত ভালো লাগল।

সামান্য সাময়িক সাহায্য কিছু দিতে পারতেন, কিন্তু ভদ্রলোক দুটি হাসিমুখেই সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, সাহায্যের জন্যেই তো আসা কিন্তু আগে আপনি দয়া করে একবার এসে দেখুন সাহায্য আমাদের প্রাপ্য কিনা, বা আমরা ভাঁওতা দিয়ে কিছু চাইছি কিনা।

দীপন ঘোষাল যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সময় করে উঠতে পারছিলেন না। পর-পর চিঠি লিখে শেষে ওঁদের একজন আবার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। নমিতাকেও ধরে পড়েছেন ভদ্রলোক দুজনকেই যেতে হবে, বলেছেন, একটিবার আসুন মা আপনাদের গোটাকয়েক ছেলে আছে সেখানে, আজ পর্যন্ত কোনো মায়ের আশীর্বাদের চোখ ওদের ওপর পড়েনি।

পরের দিনটাই ছুটির দিন। নমিতা সমাদরে বাড়িতে রেখেছেন তাঁকে সেদিন। ফলে বিড়ম্বনার একশেষ। ভদ্রলোক বিছানায় শোবেন না, বা এক বাটন ভিম খাবেন না। সন্তানরা যা পায় না তা তিনি গ্রহণ করবেন কি করে। বলার ভঙ্গিটুকু এত সুন্দর আর প্রাণখোলা যে অনুরোধ করাও চলে না।

নমিতা সত্যিই যাবেন দীপন ঘোষাল ভাবেননি। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ার কথা। স্ত্রীকেও প্রস্তুত দেখে ভদ্রলোকের সামনে আর বাধা দিতে পারলেন না।

কলকাতা থেকে আশী মাইল পথ। অত ভোরে বেরুনোর দরুন গাড়িতে ঘন্টা আড়াই মাত্র লাগল। নদীর ধারে এক নির্জন জায়গায় তিনটি ছাপরা ঘর। সামনে মস্ত একটা অশ্বত্থ গাছ, সেটার চার পাশে ঘিরে মস্ত একটা বেদী। আট থেকে বারোর মধ্যে চৌদ্দটি ছেলে। পরনে হাফ প্যান্ট, খালি গা। সুন্দর স্বাস্থ্য। সরল মিষ্টি চাউনি। এসে টিপ টিপ করে প্রণাম করে সার বেঁধে দাঁড়াল।

ওদের দিকে চেয়ে নমিতার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কেমন।

ওদের কাজে যেতে ইশারা করে ভদ্রলোক দুজন হাসিমুখে জেরার জন্যে খাড়া হলেন।

দীপন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন এই ছেলে-গুলোকে যোগাড় করলেন কোত্থেকে?

একজন জবাব দিলেন, এই দেশে ছেলের অভাব! যে দিনকাল পড়েছে, রাস্তা থেকেও চৌদ্দর বদলে একশ চল্লিশজন কুড়িয়ে আনতে পারেন। এই আশপাশের গাঁ থেকেই তো কত মা-বাবা তাদের ছেলে এনে রাখার জন্য ঝোলাঝুলি। রাখার ইচ্ছে আছে সন্তান-পীঠ বড় করে তোলার ইচ্ছেও আছে—তার জন্যে মানুষও চাই সংস্থানও চাই। দুইয়েরই বড় অভাব।

বিজ্ঞান যুগের আধুনিক জ্ঞানের ভিতর দিয়েই সনাতন ভারতের আদর্শে লোভশূন্য ভয়শূন্য স্বার্থশূন্য ঈর্ষাশূন্য কিছু সন্তান গড়ে তোলার আদর্শ তাঁদের। কালের এই যোগভ্রষ্ট কর্মের শিকলে বাঁধা পড়বে না এমন কিছু মানুষ গড়ার গবেষণা। কর্মযজ্ঞে ভারত-আত্মার মশাল তুলে ধরতে পারে এমন কিছু মানুষ গড়ার গবেষণা।

যোগভ্রষ্ট এই দেশে আজ সব থেকে বড় অভাব মানুষের।

শ' তিনেক টাকা জোর করে হাতে গুঁজে দিয়ে দীপন ঘোষাল বলেছেন, আমার ডিসক্রিশন শ-দুই তিন টাকা আমি মাসে আপনাদের দিতে পারি—কিন্তু তাতে কি হবে?

তাঁরা জানালেন, ওটুকুও তাঁরা মাথা পেতে নেবেন, কিন্তু সত্যিই ওতে কিছু হবে না—ঝড়ে জলে ছেলেগুলো বড় কষ্ট পায়, পড়ার মাত্র ওই একটি বেদী কম করে শতখানেক ছেলে নিয়ে এই মোহড়ায় নামার ইচ্ছে তাঁদের—তাছাড়া শিক্ষারও বহু সরঞ্জাম আনা দরকার—ছেলেগুলোর একটিকেও শুধু মন্ত্র আওড়ানো ঋষি বানিয়ে তুলতে চান না তাঁরা। তাই ট্রাস্টের কাছে ঢের বড় আশা তাঁদের।

দীপন ঘোষাল জানালেন, এ ব্যাপারে তাঁর হাত নেই, তবে তিনি চেষ্টা করবেন। হেসেই বললেন, আদর্শ মানুষ গড়ার গবেষণায় টাকা ঢালার প্রভিশন আমাদের ট্রাস্ট অ্যাক্ট-এ নেই—আর নতুন করে এ-প্রস্তাব কেউ মেনে নেবেন সে আশাও কম। যেটুকু দেওয়া যাবে বলছি সেও ওই মাথাপিছু দুঃস্থ ছেলে হিসেবে আদর্শের জন্যে নয়। তবু চেষ্টা করব।

গাড়িতে উঠেই নমিতা বললেন, কি সুন্দর ব্যাপার দেখলে চোখ জুড়োয়, শুনলে কান জুড়োক—তোমাদের ট্রাস্ট এতে বেশি টাকা দিতে রাজি হবে না কেন?

দীপন ঘোষাল জবাব দিলেন, তোমাদের সঙ্ঘের স্কুলে যারা টাকা ঢালে তারা এ-সবের মর্ম বোঝে না।

নমিতা বললেন, আবার আমার স্কুল নিয়ে টানাটানি কেন!

—তোমরা কোথায় পৌঁছতে চাও আর এরা কোথায় পৌঁছতে চায় এ-কথা একটুও বুঝে থাকো তো চুপ করে থাকো। একটু থেমে আবার বললেন, আমার সাধ্য থাকলে এদের সব উজাড় করে দিয়ে দেখতাম কিছু হয় কি না।

ও'দের স্কুলের জন্য ষাট হাজার টাকা বার করে আনার ক্ষোভ এখনো যায়নি নমিতা সেটা খুব ভালো করেই জানেন।

দীপন ঘোষালের ধারণা মিথ্যে নয়। সন্তানপীঠের ব্যাপারটা এক-ধরনের ভাব-প্রবণতা ভিন্ন কেউ কিছু ভাবেননি, কমিটির কেউ কোনরকম আগ্রহও প্রকাশ করলেন না। উল্টে এত-সব বড় বড় প্রতি-ষ্ঠানের দাবি নাকচ করে কোনরকম সন্তান-পীঠ-এর জন্য দরদ দেখে কেউ কেউ কটু মন্তব্য করলেন, ছেলে পিছু কিছু পয়সা টাকা দেওয়া ঠিক করা হয়েছে সেটাই বেশি—মানুষ গড়ার এক্সপেরিমেন্টের জন্য এক দেওয়াটা ট্রাস্ট-এর কোনো পর্যায়ে তাঁদের তালিকার মধ্যে পড়ে না।

দীপন ঘোষাল ক্ষুব্ধ জবাব দিলেন, পড়ে না বলেই এই আলোচনা, পড়লে আপনা-দের ডাকার দরকার হত না। তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছিলাম, আপনারাও দেখে এসে বিবেচনার কথা বললে আমি খুশি হতে সেই ব্যবস্থা করে দিতাম।

ঠগী কাহিনী ৪·৫০

শ্রীধর মুনসি সম্পাদিত

কর্নেল টেলর-এর ডকুমেন্টারী কাহিনী কনফেসন অফ এ ঠগ-এর সংক্ষেপিত ভাবানুবাদ। ১৯শ শতকের এক বীভৎস ভয়াবহ রোমাঞ্চকর জীবনচরিত, ঠগী সর্দার আমির আলির আত্মকথা। এই কাহিনী একবার পড়লে চিরদিন মনে থাকবে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্তর
রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা ঃ ৪·০০

ডঃ হরিসাধন গোস্বামীর
মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ঃ ৩·০০

ফণিভূষণ বিশ্বাসের
শিশুশিক্ষার গোড়াপত্তন ঃ ৪·৫০

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
হাসির গল্প ঃ ৫·০০

মুকুল রায়ের
এই আবর্ত ঃ ৪·৫০

মনোরম গুহঠাকুরতার
দেশবিদেশের লেখা ঃ ৩·৫০

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ীর
আজব দেশের যাদুকর ঃ ৩·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধরের
জননী ২·৫০
বিশ্বসাহিত্য ঃ ৩·৫০
গান্ধী মহারাজ ঃ ২·৫০
বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প ঃ ৫·০০

ডঃ মনোরঞ্জন জানার
রবীন্দ্র পরিচয় ঃ ২০·০০

ঋষি দাসের
সোভিয়েট দেশের ইতিহাস ঃ ১৫·০০

প্রমথনাথ পালের
দেশপ্রাণ শাসমল ঃ...৮·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা কাহিনী

কলির ভীমের কাণ্ড ঃ...৪·০০
পেতনীদহের হীরা ঃ ৫·৫০
চীনের চক্র ঃ ৫·০০
দুরন্ত দস্যু ঃ ৪·৫০
শয়তান ঃ ৫·৫০
মরণ ফাঁদ ঃ ২·৫০
কালো বিড়াল ঃ ৩·০০
মৃত্যু সঙ্কট ঃ ৩·৫০
গুপ্তঘাতক ঃ ২·৫০
দ্বীপান্তরের আসামী ঃ ৪·০০
রাজদ্রোহী ঃ ৩·০০
দুষ্ট গ্রহ ঃ ৩·০০
ডাক্তার সাটিরা ঃ ১·৫০
দস্যু গোয়েন্দা ঃ ৭·৫০
কন্টকে কমল ঃ ৪·০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

কমিটির মিটিং-এ ইদানীং এই গোছের একটু-আধটু উষ্ণ ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। আসলে কমিটির কোন সভ্যই দীপন ঘোষালের ওপরে তুষ্ট নন খুব। গত এক বছর চার মাসের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান কোনো না কোনো মেম্বারের বিশেষ সুপারিশ নিয়ে সাহায্যের জন্য এসেছে। কিন্তু ম্যানেজিং ট্রাস্টির তীক্ষ্ণ বিচারবিশ্লেষণ এবং তদারকে অবধারিত কিছু না কিছু ফাঁক ধরা পড়েছে, ফাঁক ধরা পড়েছে। দীপন ঘোষাল তৎক্ষণাৎ সাহায্যের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন।

সভ্যদের মধ্যে এই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে না থাকলে সন্তানপাঠ হোক বা মাতৃপীঠ হোক, ম্যানেজিং ট্রাস্টি প্রস্তাব করা মাত্র খুশি চিত্তে চোখ-কান বুজে পঞ্চাশ ষাট সত্তর হাজার টাকার বিশেষ অনুমোদনে স্বাক্ষর করে বসতেন। দীপন ঘোষাল তাঁদের ক্ষোভের কারণ বোঝেন। কেউ কল্পনাও করতে পারেন না, যোগ্যস্থানে সাহায্য পাঠাবার জন্য তিনিই সব থেকে বেশি ব্যগ্র—সাগ্রহে দু'হাত বাড়িয়েই বসে আছেন।

ট্রাস্ট-এর ফান্ড-এ খরচের স্রোত আসা দূরে থাক বরং মোটা সুদের টাকা বাড়ছে। বাড়ি ভাড়ার মাসিক দু লাখ আড়াই লাখ টাকাই খরচ করে উঠতে পারেন না।

অশান্তি বাড়ছেই দীপন ঘোষালের। ট্রাস্ট-এর এত বৈভব শুধু যেন তাঁরই বুকের ওপর চেপে বসছে। সময়ে সময়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্যের বড় আবেদন এলেই নতুন উৎসাহ আর উদ্যমে দেখতে ছোটেন দেবার মন নিয়েই তদারক এবং পর্যবেক্ষণে যান। তারপরেই দ্বিগুণ হতাশা।

তাঁর এই অসহিষ্ণু পরিবর্তনটা বুড়ো কুমারদেব বাহাদুরও খুব ভালোই লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন, কি হল রে তোর ভোলানাথ?

দীপন ঘোষাল সেদিন বলে বসলেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর এ দায়িত্ব নিতে পারছি না অন্যদের কথা ছেড়ে দিন, আপনার ছেলেরা পর্যন্ত আমার ওপর খুশি নন।

—কেন? কেন ভোলানাথ? উদ্‌বেগে প্রায় আর্ত মুখ তাঁর।

দীপন ঘোষাল বললেন কেন। বললেন, লোকের উপকারে লাগতে পারাটা ভাগ্য ভাবতুম কিন্তু অবাক লাগছে ইচ্ছে থাকলেও উপকার করা যায় না চারদিকে কেবল দাও-দাও রব কেবল চাওয়ার হাহাকার কিন্তু কেউ যোগ্যতার দাবির ওপর নির্ভর করে দাঁড়ায় না আমাদের সততার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে—সততা দেউলে হয়ে গেছে—আমি কার জন্যে কি করব বলতে পারেন? কেন আর আপনি আমাকে এর মধ্যে ধরে রাখবেন—আমি তো এক পাও এগোতে পারছি না।

বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুর গভীর দৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলেন। পরে হাল্কা করেই জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কলেজে ফেরার রাস্তা এখনো খোলা আছে বুঝি?

—না। থাকলেও সে ইচ্ছে আর নেই।

—পাগলামি করিস না, ঠাণ্ডা মাথায় কাজ কর। ভগবান পথ দেখাবেন, দেখে নিস।

পরদিন মাস প্রথম। আপিস থেকে দীপন ঘোষাল আগের দিন তিনশ টাকা এনে রেখেছিলেন। ওই ভদ্রলোকদের আসার অপেক্ষায় না থেকে সকালে নিজেই তিনি সন্তানপীঠ-এ যাবেন স্থির করেছেন। আসলে মন টানছিল।

বাড়িতে সকালের খাবার রান্নার দরকার নেই জানাতে নমিতা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় খাবে তাহলে, কোথায় যাচ্ছ?

কোথায় যাচ্ছেন শুধু তাই বললেন।

নমিতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের টাকা দেওয়া যাচ্ছে?

গম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে দীপন ঘোষাল জবাব দিলেন, দেওয়া যাচ্ছে তবে ষাট হাজার টাকা নয়, তিনশ টাকা।

জবাবের মধ্যে প্রচ্ছন্ন খোঁচা ছিল। তবু গায়ে না মেখে নমিতা খেদোক্তি করলেন, ইস, আমার ছুটি থাকলে আমিও যেতাম—আচ্ছা, অরুণাদিকে একটা ফোন করে ছুটির চেষ্টা করব?

দীপন ঘোষাল বক্রোক্তি করে উঠলেন, থাক—ওটা সখের বেড়াবার জায়গা নয়।

নমিতা মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। —আচ্ছা, তুমি এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন বলো তো সব কথাতে রাগ আর ঠেস—কাল সন্ধ্যায় কুমার বাহাদুরও অনেকক্ষণ ধরে তোমার কথাই বললেন, তোমার জন্য তাঁর ভয়ানক চিন্তা—

কথা শেষ হবার আগেই দীপন ঘোষাল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সন্তানপীঠের ভদ্রলোকদুটি আজ তাঁকে না খাইয়ে ছাড়েন নি। এক বাজনে আহার, কিন্তু তৃপ্তিতে মন ভরে গেছে। সেখান থেকে সোজা আপিসে এসেছেন যখন, বেলা প্রায় দেড়টা। কমিটি যা-ই বলুক সন্তানপীঠের ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনার উদ্দেশ্যে দীপন ঘোষাল টেলিফোন তুলে কুমারদেব বাহাদুরের নম্বর ডায়েল করলেন।

সেখান থেকে জবাব শুনে অবাক। বুড়ো নাকি দীপন ঘোষালের বাড়িতেই গেছেন।

একটু বাদে বাড়িতে ফোন করলেন। আরো অবাক। ফোন বেজেই চলল। দু-তিনবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ফোন কেউ ধরলই না।

বিকেলে ফিরে নমিতাকে বাড়িতেই দেখলেন। —দুপুরে কুমারদেব বাহাদুর এসেছিলেন?

নমিতা বিকেলের জলখাবার গোছা-চ্ছিলেন। চমকে ফিরলেন। —তোমাকে কে বলল?

দীপন ঘোষাল আবার জিজ্ঞাসা করলেন, দুপুরে বাড়ি তালাবন্ধ করে তাঁকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছিলে নাকি? অতবার টেলিফোন করলাম কেউ ধরলই না!

খতমতো খেয়ে নমিতা হাসলেন একটু, বললেন, কি করব, বুড়ো তার মা-কে নিয়ে বেরুবেই, কিছুতে ছাড়বে না—

স্ত্রীর বিব্রত মুখ আর অস্বস্তি লক্ষ্য করেছেন দীপন ঘোষাল। চেয়ে আছেন, কিন্তু কাজের অছিলায় স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন। তিক্ত শ্লেষে বলে উঠলেন, বড় রকমের উপহার-টুপহার কিছু ঘরে এসেছে তাহলে?

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রাহক করা হচ্ছে

রমেশ রচনাবলী

সম্পাদক—ডঃ আশুতোষ দাস এম-এ, ডি ফিল, ডি লিট

তিন খণ্ডে সমগ্র বাঙলা রচনা ঃ গ্রাহক-মূল্য ২৫৲ টাকা। অগ্রিম ৭৲ টাকা দিয়ে গ্রাহকভুক্ত, প্রতি খণ্ড নেবার সময় ৬৲ টাকা করে বাকী ১৮৲ টাকা দেয়।

সত্যেন্দ্র রচনাবলী

সম্পাদক—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি এইচ ডি

চার খণ্ডে সমগ্র রচনা ঃ গ্রাহক মূল্য ৩৩৲ টাকা। অগ্রিম ৫৲ টাকা দিয়ে গ্রাহকভুক্ত, প্রতি খণ্ড নেবার সময় ৭ টাকা করে বাকী ২৮৲ টাকা দেয়।

গ্রাহক কেন্দ্র ও মনিঅর্ডার পাঠানোর ঠিকানা ঃ

ইউনাইটেড পাবলিশার্স ৷৷ ৩-১৩৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

নমিতা রাগত মুখেই ফিরলেন আবার। —আপিস থেকে এসেই আমাকে নিয়ে পড়লে কেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করোগে না—আমি উপহারের জন্য সর্বদা একেবারে হাঁ করে বসে আছি—না?

আবার ঘুরে বসলেন। কিন্তু এই রাগও তেমন যেন অকৃত্রিম মনে হল না দীপন ঘোষালের। ভুরু কুঁচকে প্রস্থান করলেন তিনি।

কিন্তু এর পরেও তাঁর আচরণে কেমন একটু ব্যতিক্রমের আভাস পেতে লাগলেন দীপন ঘোষাল। তাঁর উপস্থিতিতে উতলা হাবভাব। আর ভিতরে কি-যেন একটু চাপা অস্বস্তি। অথচ ব্যস্ত-সমস্ত চলাফেরা। এ-দিকে বীরুর সঙ্গে কিছু একটা শলা-পরামর্শ চলছে স্ত্রীটির, তাও টের পেলেন। অনেক দিন বাদে বীরুকে আবার হাসি-খুশি দেখছেন ইদানীং। বহুদিন পর্যন্ত বীরু বাড়ির সকলের ওপরেই বিরূপ হয়ে ছিল। এখন তার উল্টো। মামীর সঙ্গে কি পরামর্শ চলছে তার, দীপন ঘোষাল আঁচ করতে পারেন নি। সেদিন সামনে গিয়ে দাঁড়াতে দুজনেই সচকিত। আনন্দ সামলে বীরু সরে পড়ল তক্ষুনি। স্ত্রীটির উতলা মুখ।

—বরুর যেন বেশ ফুর্তি দেখছি আজকাল?

নমিতা জবাব দিলেন, ব্যবসা ভালো চলছে তাই আনন্দে আছে বোধ হয়।

বলতে বলতে তিনিও কি কাজে চলে গেলেন। দীপন ঘোষাল আন্দাজ করতে পারলেন না কি ব্যাপার। বেশী মাথাও ঘামালেন না। মন মেজাজ তাঁরও নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত।

এরই মধ্যে একটা হাস্যকর ব্যাপার ঘটে গেল। কিন্তু হাসির মেজাজ নয় দীপন ঘোষালের, উল্টে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি—যার ফলে পনের দিনের মধ্যে বেবার বিয়ে হয়ে গেল।

রেবার কানে টেলিফোন দেখলেই দীপন ঘোষাল ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হতেন। কিন্তু ওর পরীক্ষা হয়ে গেছে, পড়ার তাড়া দেওয়া যায় না। স্ত্রীকে অনেক দিন বলেছেন, ও কার সঙ্গে এত কথা বলে?

আমতা-আমতা করে নমিতা একদিন বলেছিলেন, কলেজের কোনো মেয়ে-টেয়ে হবে—

—সব জেনে বোকা সেজো না—মেয়ে নয় ছেলে—আমি নিজে কদিন ওকে ডেকে দিয়েছি আর ওই ছোট মেয়েটা পর্যন্ত পাশে ঘুরঘুর করে, কি কথা হয় শুনতে চেষ্টা করে—তোমরা এত বড়লোক হয়ে গেছ আজকাল যে এ-সবও চোখে পড়ে না আর।

বড়লোক হওয়ার খোঁটা ইদানীং প্রায়ই শুনতে হয় নমিতাকে। পারতে জবাব দেন না। রেবাকে ধমকে দিতে ও একটু সতর্ক হয়েছে। আর ছোট মেয়েটা অর্থাৎ শিপ্রার পিঠে গুমগুম্মি কিল বসিয়েছে।

বেচারী শিপ্রা। ওর জন্যেই বাড়িতে একটা সোর-গোল পড়ল যার ফলে তার দিদির বিয়ে।

...সেদিন আপিস থেকে ফিরে দীপন ঘোষাল সবে গাড়ি থেকে নেমেছেন। দু-তিনখানা বাড়ি পরের একজন চেনা-মুখ ভদ্রলোক তাঁর হাতে একটা ভাঁজকরা কাগজ দিয়ে সবিনয়ে বললেন, অবসর মতো এটা পড়বেন।

দীপন ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

মৃদু হেসে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ওটা একটা চিঠি, আপনার চৌদ্দ বছরের ভাগ্নি আজ সকালে আমার সতের বছরের ভাইপোর হাতে গুঁজে দিয়ে গেছল, আর মুশকিলের মধ্যে আমি দোতলার ঘরের জানলা থেকে সেটা দেখে ফেলেছিলাম।

দীপন ঘোষাল হতভম্ব খানিকক্ষণ।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, দিদি আর অঞ্জনদার চিঠি দেওয়া-নেওয়া করতে করতে ওরও মনের তলায় একটু রংয়ের ব্যাপার ঘটে গেছল। চিঠি লিখতে ইচ্ছে করত, কাকে লেখে? শেষে তিন-বাড়ি পরের ওই হিমুকেই পছন্দ হল—কিছুকাল আগেও রাস্তায় ছোটাছুটি করেছে ওদের সঙ্গে, সেই ছেলে এখন একটু লায়েক হয়েছে। চিঠি লেখার পাত্র হিসেবে তাকে বেছে নেবার দুটো কারণ। প্রথম, ছেলেটার চেহারাপত্র বেশ ছিমছাম। দ্বিতীয়, শিপ্রার মনে হত ওর স্কুলে যাবার সময় ছেলেটা রোজই তাদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আর ওকে দেখেও।

প্রথম লেখা চিঠির বয়ানটুকুও চিত্তাকর্ষক। —ভাব করা ছেড়ে দিয়ে এমন গেটের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকো কেন? আমরা বড় হয়েছি, এখন অবশ্য আগের মতো ভাব করা যায় না। কিন্তু চিঠিতে আবার আমরা ভাব করতে পারি।

কালজয়ী কাহিনীর অপরাজেয় অনুবাদ

আমাদের নতুন বই

লু শুন এর আ-কিউ

এক সহজ সরল মানুষের জীবন ও জীবিকার অতি সরল অথচ মন-ছোঁয়া কাহিনী

বাংলা রূপান্তর * অর্ণব রায়, দাম পাঁচ টাকা

জেমস্ হেডলি চেজ • একটু বিষের ছোঁয়া সাত টাকা

অন্যান্য বই | আমার সোনার হরিণ চাই ন টাকা

স্যর আর্থার কোনান ডয়েল

সে কি মায়া, মরণ-ছায়া পকেট বই, দাম সাড়ে চার টাকা

ককটেল পাবলিশার্স/শিক্ষাভারতী, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯

দিদি আর অঞ্জনদা কতো চিঠি লেখা-লেখি করে। আমারও খুব ইচ্ছে তুমি আমাকে চিঠি লেখো। লিখলে আবার আমি লিখব। আর এ চিঠি কাউকে দেখাতে হয় না, খবরদার তোমাকে আর তোমার চিঠি যদি আমার ভালো লাগে তাহলে দিদি আর অঞ্জনদার মতো আমরা টেলিফোনেও কথা-বার্তা কইতে পারব।—শিপ্রা চ্যাটার্জি।

দীপন ঘোষাল চিৎকার চেঁচামেচি যা করলেন সবই স্ত্রীর ওপর। সেই রাগ দেখে বাড়ির অন্য সকলেও তটস্থ। আর বেচারী শিপ্রা ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘর-থর করে কেঁপেছে। তিন বার করে দীপন ঘোষাল স্ত্রীকে বলেছেন, কত বড়লোক আর কত আধুনিক হয়েছ তোমরা এইবার বোঝো।

বড়লোকের খোঁটা খেলে নমিতা আগে জবাব দিতেন। কিন্তু আশ্চর্য, ইদানীং চুপ তিনি।

দীপন ঘোষাল পরদিনই টেলিফোনে অঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন আগামী মাস থেকে কলকাতার কাছেই একটা মফঃস্বল কলেজে কাজে যোগ দেবে। তার সঙ্গে কথা বলে সেদিনই ওর বাবার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি যে পাড়ার একজন বিশেষ সম্মানী লোক অঞ্জনের বাবার আদর আপ্যায়নে সেটা প্রকাশ পেল। ছেলের পছন্দ শুনে তিনি একবারও আপত্তি করলেন না। দেনা-পাওনার প্রশ্নেও বুদ্ধিমানের মতো জবাব দিলেন, আপনি কৃতী মানুষ, কেমন মানায় তেমনি করবেন।

দীপন ঘোষাল বলে এলেন, আমি কৃতী-মানুষ নই, তবে আপনার কথার মর্যাদা রাখতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

...প্রবীর মাথা চুলকে একটু আপত্তি জানাতে এসেছিল। বলেছে, মামা, তুমি তো অনেক করেছ, ওঁরা আর একটা বছর অপেক্ষা করতে রাজি হলে বোনের বিয়ের খরচের দায় অনেকটা আমিই নিতে পারতুম।

দীপন ঘোষাল প্রথমে তেড়ে মারতে এসেছিলেন তাকে। পরে বলেছেন, আরো একটা বোন সেয়ানা হয়ে উঠছে, তখন খরচের মুরোদ দেখাস—

কলেজ থেকে পাওয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির জমা-টাকা তুলে ঘটা করেই ভাগ্নির বিয়ে দিয়েছেন দীপন ঘোষাল। রেবতী শ্বশুরবাড়ির মানুষেরাও তাঁর বড় নজরের প্রশংসা করেছেন।

তাতেও মেজাজ খুব প্রসন্ন নয় দীপন ঘোষালের। স্ত্রীকে বলেছেন, ওই বড় নজরের প্রশংসা তোমার প্রাপ্য, আমার নয়।

।। ছয় ।।

বড় উৎসাহের মুখে পর পর আঘাত দুটো বড় রকমের ঘা খেলেন দীপন ঘোষাল আর কমিটির মেম্বাররা দেখলেন বড় পরিকল্পনার সূচনায় মানী লোকদের অপমানকর আঘাত দিয়ে শুরুতেই পরিকল্পনার ওপর যবনিকা টেনে দিলেন ম্যানেজিং ট্রাস্টি দীপন ঘোষাল। দুটো ব্যাপারেই কমিটির কম করে চার-পাঁচজন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, বাকিদেরও সমর্থন ছিল।

শুরুতে সমর্থন যে দীপন ঘোষালেরই সব থেকে বেশি ছিল সেটা আর অকৃত্রিম ভাবতে পারলেন না এঁরা কেউ।

কুটির শিল্পের একটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যক্তিরা বহু দক্ষ এবং অদক্ষ কারিগর নিয়োগ করা যেতে পারে এমন একটা বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে দেবট্রাস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সরকারী সমর্থনের একটা বড় প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। সব দেখে শুনে আলাপ আলোচনা এবং বিষয় বিশ্লেষণ করে দীপন ঘোষাল কমিটির সুপারিশে বিশ লক্ষ টাকা নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রায় স্থির করেই ফেলেছিলেন। কর্মকর্তারা এই প্রায়-সফল অনুষ্ঠানের শেষ আলোচনা এক নামী হোটেলে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করলেন। কমিটির সকলেই আমন্ত্রিত সেখানে। শুভেচ্ছাসূচক নির্দোষ আনন্দ-বিনোদন হাল ফ্যাশানের ব্যাপার ধরে নিয়ে দীপন ঘোষাল আপত্তি করেন নি। সদলে গিয়ে দেখেন দস্তুরমতো পানাহারের ব্যবস্থা সেখানে। দীপন ঘোষাল এবং কমিটির অনেকেই ড্রিঙ্ক করেন না শুনে উদ্যোক্তারা মৌখিক দুঃখও প্রকাশ করলেন।

...দ্বিতীয় দফা ড্রিঙ্ক পরিবেশনের মাঝেই ম্যানেজিং ট্রাস্টি দীপন ঘোষাল সোজা উঠে চলে এলেন। মুখের ওপর সোজা বলে এলেন এই উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেবট্রাস্ট কোনোভাবে যুক্ত হবেন না।

পরের ঘটনা ভিন্নগোছের। একটা বড় কো-অপারেটিভের কার্যসূচী বিশ্লেষণ করে টাকা নিয়োগের ব্যাপার এ-ক্ষেত্রেও অনেকটাই এগিয়ে ছিল। তাদের দাবি পনের লক্ষ—দীপন ঘোষাল সবদিক বিবেচনা করে এগারো লক্ষ দেওয়া সাব্যস্ত করেছেন। এর পিছনেও ম্যানেজিং কমিটির অনেকের বিশেষ সুপারিশ আছে। আরো চার লক্ষ টাকা পাওয়ার লোভে কো-অপারেটিভে উদ্যোক্তারা আকারেপ্রকারে একটা লোভের টোপ ফেললেন ম্যানেজিং ট্রাস্টির সামনে। ওই চার লক্ষ টাকা মঞ্জুর হলে বিনিময়ে তাঁরাও কিছু করতে পারেন। চার লক্ষ টাকা পেলে শতকরা তিন টাকা অর্থাৎ থোক বারো হাজার টাকার ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারেন।

প্রস্তাবটা প্রথমে মাথায়ই ঢোকেনি দীপন ঘোষালের। ঢুকল যখন গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে গেল।

ভাবনার বই

সুনীলকুমার নন্দীর
নতুন কাব্যগ্রন্থ

পিচ্ছিল গুহার জল

অর্জনে প্রবীণ ও আবেগে তরুণ এই অসামান্য কবি সুনীলকুমার নন্দীর কবিতায় চড়াই-উৎরাই ভেঙে-নামা জলের সেই গভীর প্রবাহ—যার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নানা জট-জটিলতার বাঁকঘোরা বিচিত্র অনুভূতির নিগূঢ় অভিজ্ঞান। মিতব্যয়ী শব্দ-বিন্যাস, গাঢ় ধ্বনি-সংকলন ও বস্তুর মতো সহজাত অথচ বহস্যময় চিত্রকল্প বেয়ে-বেয়ে এ-গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায় যেন উঠে আসে দুঃখের সান্ত্বনা অথবা আনন্দের উৎসাহ অথবা মুক্তির উৎসব। বস্তুত কবিতাগুলির মূল কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ ও মানুষের সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা। দাম : ৪·০০

জীবনানন্দ দাশের গল্প

আম কাঁঠাল বাঁশের জঙ্গলে হারিয়ে গেলে। তারপর তোমাকে একটা পাংলা সরপুঁটির মতো কানকোতে বেঁধে একটা বাচ্চা বুইয়ের মতো নদীতে ভেসে এলাম আমি। সেই নদী—নলের গন্ধ—রাত—অন্ধকার—নক্ষত্র—ভিজে বালির চর—তোমার ঠাণ্ডা শরীর কতদিন আমার হৃদয়কে শাসন করেছে।' এমনি সব তাঁর ইন্দ্রিয়ময়তায় ও তীক্ষ্ণ ভিতর-বিশ্লেষণে গল্পগুলিতে কবি জীবনানন্দের আর একটি উজ্জ্বল দিগন্ত উন্মোচিত। দাম : ৫·০০

প্রকাশিত হচ্ছে

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ / শঙ্খ ঘোষ

গত শতকের প্রেম

পূর্ণেন্দু পত্রী

পরিবেশক : দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২

এই দুটো ব্যাপার নিয়েই ম্যানেজিং কমিটির প্রতিটি সভ্য ক্রুদ্ধ, অপমানিত। দিন-কালের যা দস্তুর সেই মতোই ওই দুই পার্টির আচরণ—তুমি সৎ সাধু মানুষ,—খুব ভালো কথা, সেটা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছ—ফুরিয়ে গেছে। তার জন্য সব ভেস্তে দেবার কি আছে, হাতে মাথা কাটার মতো কিছু অপরাধও কেউ করেনি।

কিন্তু দীপন ঘোষালের সাফ জবাব, সততা আর নিষ্ঠার ভিত যাদের এইরকম ট্রাস্ট তাদের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে রাজি নন।

সভ্যরা রুখে উঠেছেন, ট্রাস্ট বলতে কি শুধু আপনি?

দীপন ঘোষালের উত্তর, তাঁরা পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু আসল দায়িত্ব তাঁরই। আপনারা আমাকে ম্যানেজিং ট্রাস্টি পদ থেকে সরিয়ে দিন আমি একটি কথাও বলতে আসব না।

কিন্তু সেরকম কোনো বিধিও নেই।

বচসার ফলে তিক্ত, মন নিয়ে দীপন ঘোষাল সেদিন তাড়াতাড়িই বাড়ি চলে এলেন। বিকেলের দিকে মনে হল একবার কুমারদেব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। ভেতরটা এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে যে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

বেরুতে গিয়ে দেখেন গাড়ি নেই। তারপর খেয়াল করলেন নমিতাও নেই। জামাকাপড় বদলে স্বামীকে কোণের ঘরে বসতে দেখে তিনি ধরেই নিয়েছেন গাড়ির প্রয়োজন আজকের মতো ফুরিয়েছে। এরকম অনেক দিনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি।

নমিতা ফিরলেন সন্ধ্যারও বেশ পরে। স্নায়ু তখন বশে নেই দীপন ঘোষালের। দেখা মাত্র চাবখানা হয়ে ফেটে পড়লেন, প্রকাণ্ড বড়লোক হয়ে গেছ তাই না? গাড়ি ছাড়া দু'পা বেরুতে হলে এখন মান খোয়া যায় তোমার—কেমন?

স্বামীকে বেবুবার পোশাকে দেখেই রাগের হেতু বুঝেছেন। আমতা-আমতা করে বললেন, তুমি বেবুবে বুঝতে পারিনি... ড্রাইভারকেও তো কিছু বলে রাখোনি...।

—বুঝতে পারো বা না পারো, কাউকে বলি বা না বলি—তোমার এত বড়লোকি চাল কেনা? শুধু গলা দিয়ে নয়, চোখ দিয়েও তপ্ত আগুন ছুটেছে দীপন ঘোষালের।

এই এক কথা শুনতে শুনতে অনেকদিন বাদে নমিতারও মেজাজ বিগড়ল। জবাব দিলেন, বড়লোকি মেজাজ তো তোমারও কম হয়নি, কিন্তু সে-কথা বলে কে? রেবাটার শরীর ভালো না শুনে ফাঁক পেয়ে দেখতে গেছলাম— এতই যদি দরকার ছিল, ট্রামে বাসে না গিয়ে একটা দিন ট্যাক্সিতেও তো যেতে পারতে—বড়লোকি চাল আমার না তোমার?

স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দীপন ঘোষাল থমকে গেলেন কেমন। নিজের সেই কোণের ঘরে চলে এলেন। কোথায় যেন বড় রকমের ঘা পড়েছে একটা। বেরুনোর কথা ভুলে গেলেন।...সত্যিই তো নিজের এতবড় পরিবর্তনটা চোখে পড়েনি। ট্রাম-বাসে অথবা ট্যাক্সিতে যাওয়ার কথা একবার মনেও পড়ল না কেন? স্ত্রী কোন প্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে গেছে একটিবার সে-খোঁজও না করে তিনি অমন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন কেন?

নমিতা টের পেলেন, রাতটাও প্রায় বিনিদ্র কাটল পাশের লোকের। যতবার ঘুম ভেঙেছে টের পেয়েছেন মানুষটা জেগে আছে। কিন্তু সাহস করে হাত বাড়াতে পারেন নি।

দিন তিনেক পরে। কলকাতার এক মোটামুটি নামী অথচ হাল্কা মেজাজের কাগজের প্রথম পাতাতেই বেশ ফলাও করে চটকি খবর বেরুলো একটা। ও-কাগজের এই জিনিসগুলোই বৈশিষ্ট্য। খবরটা অনেকের চোখে পড়ল, অনেকের বা পড়ল না।

কিন্তু একটি মানুষ এবং তাঁর সংসারে বিপর্যয় নেমে এলো।

খবরের সার মর্ম :

আজ প্রায় দু'বছর হল, নগদ এক কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকা এবং কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে এগারোখানা প্রাসাদোপম অট্টালিকার খাসদখল নিয়ে জনহিতার্থে দেব-ট্রাস্ট-এর শুভ অভ্যুদয় ঘটেছে। সেই সব অট্টালিকার ভাড়া এবং সুদ সহ ট্রাস্ট-ফান্ড-এর মাসিক আয় অন্যূন তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু এ-যাবত ট্রাস্ট-ফান্ডএর গোড়া এবং কড়া ম্যানেজিং ট্রাস্টি ব্যক্তিগত সাহায্যের খাতে পাঁচ-দশ বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ টাকা করে মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা ভিন্ন জনহিতসম্পাদনের মতো কোনো বৃহৎ কর্ম করে উঠতে পারেননি বা নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যয়ের উৎসও খুঁজে পাননি। ফলে জনহিতের সঞ্চিত টাকা সুদে আসলে বেড়েই চলেছে। তবে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে কাজ যে একেবারে হয়নি এমন নয়। ট্রাস্টের দশ হাজার টাকা দানে ছোট ছেলেমেয়েদের একটি স্কুলের বিল্ডিং দোতলা হয়েছে—স্বয়ং ম্যানেজিং ট্রাস্টির সহধর্মিণী যে স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী। দুষ্ট লোকে কানাকানি করছে, ম্যানেজিং ট্রাস্টির একটি পোষ্য ভাগিনেয় হঠাৎ মোটা টাকা নিরোগ করে একটি ব্যবসায় কর্ণধার হয়ে বসেছে। ট্রাস্টের কর্মে ম্যানেজিং ট্রাস্টি সদাব্যস্ত তার প্রমাণ তাঁর বাসস্থ টেলিফোনের দরুন ট্রাস্টের খরচ হয় কোয়ার্টারে সাড়ে তিনশ টাকা এবং তাঁর মোটরগাড়ির পিছনে মাসে অন্যূন পাঁচশত টাকা। দেবট্রাস্ট এবং তাঁর ম্যানেজিং ট্রাস্টির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

কাগজটা হাতে নিয়ে দুপুরে তিনটের সময়েই দীপন ঘোষাল নিঃশব্দে আপিস

বাংলাভাষায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একমাত্র
পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের
অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ১২-০০ :

*

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার

MILITANT NATIONALISM IN INDIA

১৮৯৭-১৯১৭, প্রধানতঃ এই বিশ বৎসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস
॥ দাম দশ টাকা ॥

*

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলাদেশের ইতিহাস

প্রাচীন যুগ : ১০ ০০ ॥ মধ্যযুগ (২য় সং) ২০·০০ ॥ আধুনিক যুগ : ২৫·০০

দিলীপকুমার রায়

*

যুগঋষি শ্রীঅরবিন্দ

এই পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত শতবার্ষিকী সংস্করণের পরিশিষ্টে আছে হরিদ্বারের গঙ্গাবক্ষে দিলীপকুমারের দিব্য প্রেরণায় রচিত 'সাবিত্রী'র শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনের মর্মবাণী।

॥ মূল্য দশ টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

থেকে বেরুলেন। গাড়িতে সোজা এলেন বীরুর পাবলিসিটি ফার্ম-এ। বীরু তাঁকে দেখে অবাক, থমথমে মুখ দেখে শঙ্কিত।

—এই ব্যবসাতে তোর ক্যাপিটেল কতো?

বীরুর মুখ শুকনো।—কেন বলো তো?

—আমার কথার জবাব দে। কত টাকা ফেলেছিস এতে?

—বি-বিশ হাজার...।

—টাকা কোথায় পেলি?

বীরু নিরুত্তর।

চাপা গর্জন করে উঠলেন দীপন ঘোষাল।—কোথায় পেলি টাকা?

—মামী দিয়েছে।

দীপন ঘোষাল স্তব্ধ কয়েক মুহূর্ত। মামী টাকা কোথায় পেল?

—সেটা আমি ঠিক জানি না, মামীর সঙ্গে কথা ছিল আমার লাভের তিন ভাগের এক ভাগ তাঁর—একবার মামীকে তাঁর অংশ কিছু দেওয়া হয়েছে।

আর একটি কথাও না বলে দীপন ঘোষাল গাড়িতে উঠলেন আবার।

বাড়ি।

এই মূর্তি দেখে নমিতা আঁতকে উঠলেন প্রায়। কি হয়েছে?

—কিছু না। বীরুকে তুমি বিশ হাজার টাকা দিয়েছ কোথা থেকে?

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু নমিতার।

তীব্র তীক্ষ্ণ নেত্রে চেয়ে আছেন দীপন ঘোষাল। —কুমারদেব বাহাদুরের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়েছ বোধহয়?

অস্ফুট স্বরে নমিতা বললেন, ভিক্ষে নয়, তিনি জোর করে আমাকে বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কে ধরে নিয়ে গিয়ে টাকা লিখে দিয়েছেন।

—বা বা বাঃ! চমৎকার! দু'চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকরছে। —আমাকে গোপন করা হয়েছে কেন? অনিচ্ছা সত্ত্বেও কত টাকা তিনি তোমাকে লিখে দিয়ে ছেড়েছেন?

—এক লক্ষ টাকা...আরো দিতে চেয়েছিলেন...

দীপন ঘোষাল চেয়ে আছেন—চেয়েই আছেন। এত কুৎসিত আর বুঝি কখনো কোনো রমণীকে দেখেন নি তিনি।

পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘরে ঢুকেছেন বৃদ্ধ কুমারদেব বাহাদুর। উদবেগ-কাতর মুখ।

—আমি তোর আপিসে গেছলাম, সেখানে তোকে না পেয়ে এখানে...এ-কি? আমার মায়ের মুখ এমন শুকনো কেন! ওকে তুই কি বলছিলি?

গলা দিয়ে দীপন ঘোষালের শ্লেষ ঠিকরে বেরুলো যেন। বলল, ওর সম্পদের খবর জেনে ফেলেছি বলেই শুকনো দেখছেন বোধহয়, কিন্তু ঘাবড়াবেন না দু'পাঁচ দিনের মধ্যেই আবার বেশ খুশি দেখবেন!... আপনার দেওয়া এক লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র তো বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে—বাকি আশী হাজার মজুত আছে—আর ওই বিশ হাজারেরও লাভ আসছে—ওর আনন্দ ঠেকায় কে?

কুমারদেব বাহাদুর স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইলেন খানিক। তারপর আস্তে আস্তে শয্যার একধারে বসলেন। দম নিলেন একটু। নমিতার বিবর্ণ মুখও দেখে নিলেন একবার। তারপর দীপন ঘোষালের দিকে ফিরলেন। বললেন, তোর হাতের ওই কাগজের খবর চোখে পড়তে তোর কাছে ছুটে গেছলাম। আগে আমার কথার জবাব দে, ট্রাস্ট থেকে রিজাইন করে সব বুঝে নেবার জন্য বেছে বেছে আমার ছেলে দুটোকেই ডেকেছিস কেন...কাগজে ওই রিপোর্ট বেরুনোর পিছনে তারাও আছে ভাবিস?

—আমি কিছুই ভাবি নি। তাঁদের ডেকেছি তাঁদের বাপের দান বুঝে নেবার জন্য। আপনি তাঁদের বাধা দেবেন না, আর আমাকেও কিছু অনুরোধ করবেন না।

কুমারদেব বাহাদুরের হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল যেন। অনুরোধ আবার কাকে করব, তোকে এর মধ্যে ধরে রাখা যাবে না সে-কথা কবে আমি আমার মা-কে বলে রেখেছি জিগেস করে দ্যাখ। তোকে আমার চিনতে বাকি?

তপ্ত টিপ্পনীর সুরে দীপন ঘোষাল বললেন, আর সেই ভয়েই চুপিচুপি ওর একটু সংস্থানও করে রেখেছিলেন, কেমন?

জোর দিয়ে কুমারদেব বললেন, হ্যাঁ সেই জন্যে—সেই ভয়ে। ছ'মাস আগে তোর মুখের দিকে চেয়ে আর তোর কথা শুনে এই পরিণাম আমি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলাম—তুই আমার মা-কে অপমান করিস কেন, তোর ওপর এতটুকু ভরসা নেই বলে আমি মা-কে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে হাতে ধরে অনুনয় করে এ-টাকা তার হাতে তুলে দিয়েছিলাম, মা নিলে আরো দিতাম, নিল না—

বক্র কটাক্ষে স্ত্রীর পাংশু মূর্তিটা একবার দেখে নিয়ে দীপন ঘোষাল বললেন, এখন দিয়ে যান, আর নিতে কোনো বাধা নেই।

নমিতার দিকে চেয়েই কুমারদেব বাহাদুর সরোষে বলে উঠলেন, ও একটা ষণ্ড, ও কোনো কিছুর মর্ম বোঝে না—কেন মা তুমি ওকে টাকার কথা বলতে গেছ, বারবার তোমাকে নিষেধ করেছিলাম না!

তিক্ত শ্লেষে দীপন ঘোষালই জবাবটা দিলেন। —আপনার উপদেশ ও খুব সংসংগোপনেই রক্ষা করে আসছিল...ফাঁস হয়ে গেল সেও আমার ওই ষণ্ড স্বভাবের দোষে। যাক, খুব ভালো কাজ করেছেন আপনারা, এখন আমার নিশ্চিন্ত ছুটি।

অসামান্য গ্রন্থাবলী

আশাপূর্ণাদেবীর রচনাসম্ভার

আশাপূর্ণাদেবীর অর্ধশতাব্দীব্যাপী লিখিত বাংলা সাহিত্য জগতের অবিস্মরণীয় কীর্তি—যাবতীয় উপন্যাস, গল্প ও নাটক গ্রন্থাবলীর আকারে কতকগুলি খণ্ডে খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য ঃ প্রতি খণ্ড—১৫.০০।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর সর্বাধুনিক গ্রন্থ

বড়, ছোট এবং মাঝারি দাম ঃ ১২.০০

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বনফুলের অদ্ভুত রসের ২ খানি অভিনব উপন্যাস

পিতামহ মূল্য ঃ ১১.০০ সপ্তর্ষি মূল্য ঃ ৭.০০

হিন্দুযুগের একমাত্র ঐতিহাসিক কহ্লণ বিরচিত

রাজতরঙ্গিণী দাম ঃ ১৬.০০

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃরমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত।

ডি, ভরদ্বাজ অ্যান্ড কোং ঃ ২২-এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

স্ত্রীর মুখের ওপর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দীপন ঘোষাল পাশের ভোগের ঘরে চলে এলেন।

নমিতা স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে। অসহায় চোখে বৃদ্ধ একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে পাশের খুপরি ঘরে চলে এলেন। —নিশ্চিন্ত ছুটি মানে? তোর মতলবখানা কি?

নমিতা নিজের অগোচরেই দেয়ালের আড়ালে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড-সুদ্ধু স্তব্ধ যেন। ও-ঘরের মানুষদের দেখা যায় না, কথা শোনা যাচ্ছে।

দীপন ঘোষাল উঠে চেয়ারটা সামনে এগিয়ে দিলেন, বসুন—।

বৃদ্ধ অবসন্নের মতো বসে পড়লেন। —নিশ্চিন্ত ছুটি মানে কি, তুই চলে যাবি এখান থেকে?

দীপন ঘোষালের মুখে তিক্ত হাসি। —না গিয়ে এখানেই স্ত্রীর গলগ্রহ হয়ে থাকতে বলছেন? একটু থেমে আবার বললেন, আপনি মিথ্যে উতলা হবেন না, টাকা থাকল বাড়ি থাকল, আপনার মায়ের কোনো অসুবিধে হবে না, আমি থাকলেই বরং নানা বাধা—

হঠাৎ ভেঙেই পড়লেন বৃদ্ধ। —ভোলানাথ, তুই একদিন আমার জীবন দিয়েছিস, তার বদলে আমি তোর এই সর্বনাশ করলাম? তোকে নিজের কাছে টানতে গিয়ে এই করলাম শেষে।

এই আর্ত আকুতির ফলে দীপন ঘোষালের ভিতরটা শান্ত হল আস্তে আস্তে। বললেন, যা হয়েছে তার সবটুকুই আমার পাওনা ছিল কুমার বাহাদুরে, ও-রকম ভেবে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন?...লোকের উপকার করব সে-অহংকার গেছে, নিজের সততার অহংকারও গেছে। দু'বছরের মধ্যেই গাড়ি ছাড়া আমিও এক পা নড়তে পারি না, নমিতা সেটা চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিতে নিজের দিকে চেয়েই অবাক আমি। এভাবে আরো কত উন্নতি হত আমার কে জানে।...আপনি কিচ্ছু ভাববেন না যা হয়েছে সবই ভালোর জন্যে। দুটি অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার কল্যাণেই আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা বলছিলেন, সব-কিছুর আগে মানুষ চাই—মানুষ নেই। এ-যে কত বড় অভাব, আজ বুঝেছি। এর পর এ-জীবনে যদি আমি পাঁচশ ছেলেকেও মানুষ পরিচয়ের দিকে এগিয়ে দিতে পারি, আমার আর কোন খেদ থাকবে না কুমার বাহাদুর।

বাইরে নমিতা নিষ্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে।

।। সাত ।।

পাঁচটা দিন কাটল। পাঁচটা রাত কাটল। নমিতা স্কুলে যাচ্ছেন। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে দীপন ঘোষাল আপসে যাচ্ছেন। দেবু, বীরু তাদের কাজে যায়—শিপ্রা স্কুল করে। বাইরে থেকে খুব একটা পরিবর্তন নেই। কিন্তু ভিতরে পাষাণের স্তব্ধতা।

নিজের ঘরে বইপত্র সব এরই মধ্যে কোন লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন দীপন ঘোষাল। ঠাণ্ডা মুখে নমিতা দেখেছেন। ঠাণ্ডা মুখেই জিজ্ঞাসা করেছেন, যাওয়ার দিন কবে?

দীপন ঘোষালও শান্ত মুখেই বলেছেন কবে। কালকের দিনটা কাটলে পরশু সেই দিন।

পাঁচ দিন পাঁচ রাতের মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে আর একটি কথাও হয় নি। পাশাপাশিই শুয়েছেন দুজনে। মাঝখানে নীরবতার সমুদ্র।

পরদিন কুমারদের বাহাদুরের দুই ছেলে আর কমিটির অন্য মেম্বরদের সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন দীপন ঘোষাল। কাল থেকে আর আসার দরকার হবে না। বেলা তখন সবে বারোটা সাড়ে বারোটা। কাজ এক-রকম শেষ।

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন সন্তানপীঠের সেই দুই ভদ্রলোক। কি-রকম যেন বিস্ময়াভিভূত চাউনি দুজনেরই। দীপন

প্রকাশিত হলো

ডঃ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রভাতকুমার ঃ জীবন ও সাহিত্য ১০.০০

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১২.০০

[পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ]

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলার লোকসাহিত্য\ প্রবাদ ২৫.০০

দীনবন্ধু মিত্র-এর **নীলদর্পণ** ৫.০০

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত ১৬.০০

মণি বাগচি

যুগমানব শ্রীঅরবিন্দ ১১.০০

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ১০.০০

* শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে *

আবু সয়ীদ আইয়ুব	পান্থজনের সখা
দীপ্তি ত্রিপাঠী	আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	বাংলা সাহিত্যে মা
ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	গীতিকবি শ্রীমধুসূদন
ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	কালের প্রতিমা
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	পদাবলী পরিচয়
অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	গিরিশচন্দ্র

দে'জ পাবলিশিং C/o. দে বুক স্টোর

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২.

ফোন ঃ ৩৪-৫০০৫

ঘোষাল হাসি মুখে উঠে এলেন। বললেন, আপনাদের কথা আমি ভাবছি কদিন ধরে, আর আপনারাই হাজির।

ওঁরা আরো অবাক। একজন বললেন, আপনি টাকার ব্যাপারটা জানেন তাহলে?

এবারে দীপন ঘোষাল হাঁ।—টাকার ব্যাপার মানে? আচ্ছা, আসুন—

তাঁদের পাশের খালি ঘরে এনে বসালেন। তারপর যে-খবর শুনলেন, দীপন ঘোষাল হতভম্ব।

...ওই ভদ্রলোক দুটি ছুটে এসেছিলেন নমিতা ঘোষালের জরুরী চিঠি পেয়ে। বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কোন কথা না বলে উনি তাঁদের সঙ্গে করে ওমুক ব্যাঙ্কে চলে এলেন। আর তারপর নিজের অ্যাকাউন্টের বিরেশি হাজার তিন তিপ্পান্ন টাকা পঁচাত্তর পয়সার সবটাই সন্তানপীঠ-এর নামে ট্রান্সফার করে দিলেন।

ব্যাঙ্কের সঙ্গে বোধহয় আগেই কথা-বার্তা বলে রেখেছিলেন। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই কাজ শেষ। ভদ্রলোকেরা দু পাঁচশ ডোনেশন পাচ্ছেন ভেবে ফর্ম-টর্ম ফিল-আপ করেছিলেন। পাস বই চেক বই আনতে দেখেন এই ব্যাপার।

স্বামীর নির্দেশ মতো এই ব্যবস্থা করা হল কিনা জিজ্ঞাসা করতে নমিতা নাকি কেবল হেসেছেন। পরে বলেছেন, কিছু ভাববেন না, ওঁরই সব—ওর ইচ্ছেতেই সর্বদা সব-কিছু হয়ে থাকে। আর বলেছেন, স্বামীকে নিয়ে কালই সন্তানপীঠে বাস করার জন্যে যাচ্ছেন তিনি—যত শিগগীর সম্ভব দুজনের মতো একটা ছাপরা ঘর যেন তুলে নেওয়া হয়—অন্য ঘর যেমন আছে তার থেকে একটুও ভালো দরকার নেই।

ভদ্রলোকেরা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছে, আপনি সেখানে গিয়ে থাকবেন?

নমিতা নাকি হেসে জবাব দিয়েছে, মা ছাড়া ছেলে মানুষ হয়?

...কিন্তু ভদ্রলোকেরা স্বামীর সঙ্গে দেখা করে যাবেন শুনেই নমিতা নাকি আঁতকে উঠেছে, আর তারপর বার বার করে বলে দিয়েছে, তাঁরা যেন সোজা সন্তানপীঠে চলে যান। নমিতার আচরণে কেমন একটু খটকা লাগতে তাঁরা এখানেই এসেছেন।

একজন বললেন, এখন দেখছি আপনি কিছুই জানেন না...যাক, আপনি উতলা হবেন না, যা বলবেন তাই করব।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন দীপন ঘোষাল। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসির আভাস। জবাব দিলেন, আমার স্ত্রী যা বলেছেন তাই করুন।

গাড়িটা আজ আর ব্যবহার করবেন ভাবেন নি দীপন ঘোষাল। ভদ্রলোকদের বিদায় করে আধ ঘন্টার মধ্যেই বাড়ির দিকে ছুটলেন।

নীচের রকে নমিতা আর শিপ্রা দাঁড়িয়ে। মেঝেয় একটা ছোট বিছানা বাঁধা, পাশে স্যুটকেস, একটা বেতের ঝুড়িতে একগাদা বই-খাতা।

দীপন ঘোষাল আবার অবাক। শিপ্রা ছুটে এসে চিপ করে একটা প্রণাম করল তাঁকে। ওর চোখে জল।

—কি ব্যাপার?

নমিতা খুব স্বাভাবিক সুরেই বললেন, তুমি এসেছ বাঁচা গেছে—সেই থেকে একটা ট্যাক্সির আশায় দাঁড়িয়ে আছি, এক ঘন্টার জন্য গাড়িটা ছাড়তে পারবে? শিপ্রা হস্টেলে চলে যাচ্ছে আজ, তিন দিন ঘোরাঘুরি করে ব্যবস্থা করা গেছে—আমরা চলে গেলে ওকে হস্টেলে না রেখে উপায় কি!

দীপেন ঘোষাল নির্বাক।

ড্রাইভারকে দিয়ে জিনিস কটা তুলিয়ে নমিতা ডাকলেন, আয়, অত করে বোঝানোর পরেও ধাড়ী মেয়ের কাঁদতে লজ্জা করে না। আমরা কি বিবাগী হয়ে যাচ্ছি নাকি!

হাত ধরে টেনে তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

ফিরতে ফিরতে বিকেল। বললেন, মেয়েটা কি সহজে ছাড়তে চায়—

দীপন ঘোষাল তাঁকে দেখতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু নমিতার দাঁড়াবার ফুরসৎ নেই। দেবু বীরুও আজ তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। ওদেরও চোখ ছল-ছল, মুখ ভার। খাবার এগিয়ে দিয়ে নমিতা বলেছেন, তোরা বয়সেই বেড়ে ছস, আসলে খোকা সব। দেবু, তুই যাকে আনবার বিয়ে করে এনে ফেল, আমাকে আগে থাকতে খবর দিস। আর বীরু, আমার ভাগের টাকা দিয়ে বোনের খরচ চালাবি—শিপ্রার যেন একটুও অসুবিধে না হয়। আর ওই আসলটা শিপ্রার বিয়ের সময়ে দিবি। আমাকে চিনিস তো, এক কড়াক্রান্তিও ছাড়ব না কাউকে।

নির্বাক স্বামীর দিকে একবার আড়-চোখে তাকিয়ে চলে গেলেন। তাঁর কত কাজ আর গোছগাছ বাকী।

ইচ্ছে করেই একটু বেশি রাতে পান চিবুতে চিবুতে ঘরে ঢুকে নমিতা দেখলেন, শয্যায় তাঁর ভদ্রলোক আধ-শোয়া। তাঁরই প্রতীক্ষায় যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটা অননুভূত আনন্দে বুকের ভিতরটা ভরে উঠছে নমিতার। আনন্দের এই স্বাদ ভুলতেই বসেছিলেন যেন।

শয্যায় উঠে কাছে এলেন। —অমন জেগে শুয়ে আছ যে?

দীপন ঘোষাল জবাব দিলেন না। চেয়ে আছেন।

নমিতার একটা হাত অনায়াসে তাঁর কপালের চুল ঘেঁষা ক্ষতচিহ্নটার ওপর উঠে এলো। ওটার ওপরেই ছোট করে চুমু খেয়ে বসলেন একটা। হাতটা পিছনের দিকের ক্ষতচিহ্নের ওপর গভীর একটা মমতার স্পর্শ ছড়িয়ে দিতে লাগল যেন। হালকা খুশি-ভরা গলায় বললেন, দেখো, সেই থেকে তুমি এমন করে তাকাচ্ছ যেন আমি কি না কি করেছি—আসলে বরাবর আমি নিজের স্বার্থ দেখি, এবারে সেটা সবথেকে বেশি দেখেছি—বুঝলে? নিজের সর্বনাশ কোন্ বোকায় করে?

দীপন ঘোষাল অপলক চেয়েই আছেন তাঁর দিকে।

এমন চাউনি যে বিড়ম্বনার একশেষ যেন। —ক রে, কি দেখছ অমন করে?

দীপন ঘোষাল বললেন, তোমাকে।

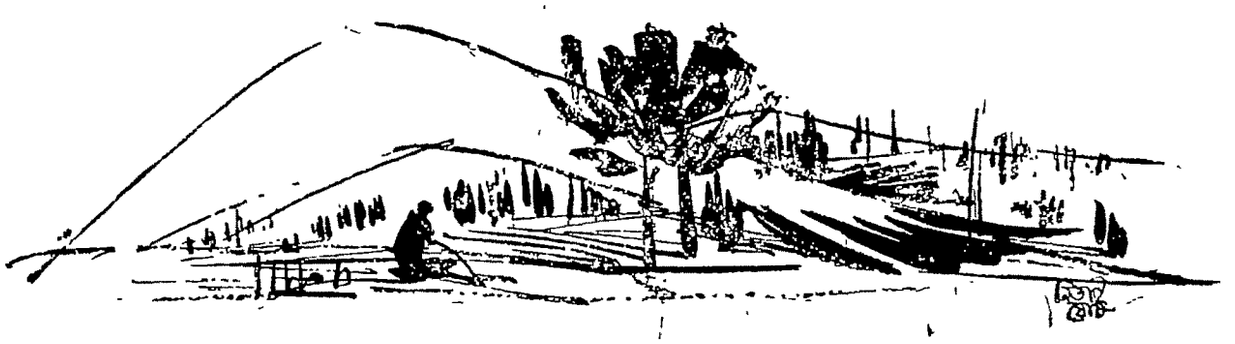

ভূমিসংস্কার, কৃষি ও কৃষক সমস্যা কয়েকটি দিক / শ্যামাদাস ভট্টাচার্য

ভূমি কার? কেউ বলেন, গোপালের। উপনিষদ বলেন, কস্যস্বিদ্ ধনম্? সমস্ত সম্পত্তি ঈশ্বরের, বিশেষভাবে কারো হবে কি করে? কেউ বলেন, যিনি চাষ করেন, জমি তাঁর। কেউ আবার বলেন, ভূমি জাতীয় সম্পত্তি, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আবার কেউ সোজাসুজি বলেন, ভূমি দাপটের, যার গায়ে জোর এবং হাতে লাঠি, তারই। গায়ের জোরের সঙ্গে আইন-আদালতের জোর সংযুক্ত হলে, চিত্রটি কেমন দাঁড়াতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত নীচে পাওয়া যাবে।

'আপনি কি রেভিনিউ মিনিস্টার আছেন?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে মন্ত্রী মশায় চমকে উঠলেন। সামনে দাঁড়িয়ে এক-জন দীর্ঘকায় ব্যক্তি, পরনে হ্রস্ব ধুতি এবং আজানুলম্বিত খদ্দরের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের ফোঁটা, সদ্য পুজো সেরে এসেছেন বোঝা যাচ্ছে।

মন্ত্রী মশায় সামলে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি রেভিনিউ মিনিস্টার। আপনি কিছু বলতে চাইছেন?'

ভদ্রলোক বেশ একটু উষ্মা মিশিয়ে উত্তর দিলেন, 'না, আমি কিছু জানতে চাইছি না, আমি শুধু এই কথা বলতে চাইছি যে আপনার লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মামলা কোরলো, কিন্তু কিছু করতে পারলো না।'

মন্ত্রী বললেন, 'ওঃ এই কথা! আপনার অনেক জমি আছে বুঝি? কতো জমি আছে আপনার?'

ভদ্রলোক এবার সগর্বে বুক ফুলিয়ে জবাব দিলেন, 'আমার দুশো বিঘা জমিন আছে।'

মন্ত্রী মশায় এবার [illegible] ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নিরাপদ বোধ করছেন। তাই দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তাহলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করা ঠিকই হয়েছে। আপনি তো এত জমি রাখতে পারবেন না।'

মন্ত্রী মশায় আরো অনেক কথা বলবার জন্যে আগ্রহ বোধ করলেন। এবং বক্তৃতা দেওয়ার একটা চান্স এসেছে দেখে উৎসাহিত হয়ে বলতে চাইলেন, জমির ঊর্ধ্ব-সীমা নির্ধারণ করার দরকার কেন হোল, প্রকৃত চাষীর হাতে জমি দেওয়ার কতখানি প্রয়োজন, এতদিনের বঞ্চিত কৃষককুলকে তাদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করে, ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও কৃষির উন্নতি সাধনের সরকারী উদ্যোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অভ্যস্ত কথা, পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে যার অর্থ গেলে মুছে, মূল্য হোল দীন,' কিন্তু ভদ্রলোকটি সে সুযোগ আর দিলেন না মন্ত্রীকে, বলে উঠলেন, 'আপনি কিছু কোরতে পারবেন না। আপনার অফিসাররা নাকে খত দিয়ে আমার সব জমি ফেরত দিয়ে গেলো। আমি হাই-কোর্ট করলাম। আমার বিলকুল সব জমি ফেরত দিতে হোল আপনাকে।'

একটি জ্বালাময়ী ভাষণ দিবার আশায় উদ্দীপ্ত মন্ত্রী মশায় একেবারে নিভে গেলেন। তিনি অনুভব করলেন, নাসিকা মর্দিত যদি কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনিই হয়েছেন, তাঁর অফিসাররা নয়।

মন্ত্রী মশায়ের নাসিকা-পীড়নের জ্বালা উপশম হল কি না, এবং হলে কী-ভাবে হোল, সে আলোচনা এখন স্থগিত রেখে এই কথা বলা যেতে পারে যে, গল্প হলেও সত্যি সিরীজের' এই কাহিনীটি আমাদের ভূমি সংস্কারের সর্বপ্রকার সাধু প্রচেষ্টার যেখানে যেখানে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে, তারই প্রতীক। এই কাহিনীটির মধ্যেই আমাদের ব্যর্থতার অনেকগুলি কারণ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

পশ্চিম বংলা এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় এই কাহিনীর ভগবান দাসরা অনেকে ছড়িয়ে ছিলেন—এখনও যে নেই, সে ভুল করবার কারণ নেই।—যাঁরা অতি সজ্জন ব্যক্তি, দান-ধ্যান করেন, বিনোবাজীর সভায় দু বিঘা জমি দান করে নাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন, এদিকে আইন ফাঁকি দিয়ে বাড়তি জমি লুকিয়ে রেখে বাহাদুরি করেন। এঁরা সেই সব লোক যাঁরা আইন-এর বজ্র-বাঁধুনির মধ্যে ফাঁক-ফোকরের সুযোগ খুঁজে বার করেন। এঁরা ব্যবহার

* লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতী ছাত্র—বাণিজ্য (এম-কম) ও আইন উভয় বিষয়েই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। অধ্যাপনাই তাঁর বৃত্তি, বর্তমানে কলকাতার একটি কলেজের অধ্যক্ষ। তবে একাদিক্রমে এক দশকের বেশী পশ্চিম-বঙ্গের ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন। ভূমি-সংস্কারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তাঁর মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা সমগ্র দেশে বেশী নয়, পশ্চিমবঙ্গে ত নয়ই।

সদ্য প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

ছোট পাখি নীল আকাশ ৫·০০

আনন্দ বাগচীর উপন্যাস **পরমায়ু** ৮·০০

আবদুল জব্বার এর সর্বাধুনিক উপন্যাস

বদর বাউল

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

মিত্র প্রকাশনী ঃ ২০৬, বিধান সরণী। কলিকাতা—৬

জীবীদের ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং বিস্ময়কর তর্কশক্তিকে কাজে লাগিয়ে, মহামান্য আদালতের অপার উদারতার উদ্রেক করে অনুকূল রায় অর্জন করতে পারেন, এবং ভূমি সংস্কার আইনকে বছরের পর বছর পিছিয়ে দিতে পারেন।

এই সেদিন পর্যন্ত প্রদত্ত সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায়, বড় বড় জোতদারদের লক্ষাধিক একর ন্যস্ত জমি আদালতের আদেশে সরকারের কাছে আকাশের চাঁদের মতই অনধিগম্য ছিল। আজও আদালতের করুণায় সহস্র সহস্র একর জমি সরকার স্পর্শ করতে পারেন না। এদিকে যে কৃষককুলের উন্নতির জন্যে ভূমি-সংস্কার আইনে এই সব জমি গ্রহণ করা দরকার ছিল, সেই কৃষককুলের দুরবস্থা তীব্র হয়ে উঠল অনেকের হাত যেটুকু জমি ছিল, তাতেও টান পড়ল ক্রমবর্ধমান অভাবের তাড়নায়।

বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি উদ্ধারের জন্যে এবং ভূমি সংস্কার আইন ফাঁকি দিয়ে জমি হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য আইন সংশোধন করা হয়েছে বার বার আইন ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রাখা জমি উদ্ধারের জন্যে মামলা দায়ের হয়েছে অনেক, আর আদালতের দরজায় হোঁচট খেয়ে সরকারকে জখম হতে হয়েছে অনেক বার।

আইনের ভুলত্রুটি থাকলে হারতেই হবে সরকারকে। সংবিধান-বহির্ভূত আইন নিশ্চয় আদালত কর্তৃক সমর্থিত হবে না। তবে, সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত মামলার বিচারে কোথাও কোথাও রক্ষণশীলতার প্রবণতা লক্ষণীয়। সম্পত্তি দখল বা অধিগ্রহণের প্রশ্নে দেখা যায় এক শ্রেণীর আইনবিশারদ সম্পত্তির মালিককে নিপীড়িত ও বঞ্চিত ধরে নিয়ে সাহায্য করার জন্যে কোমর বেঁধে এগিয়ে আসেন।

আদালতের গৌরবমণ্ডিত উচ্চমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা বা আদালতের নিরপেক্ষ বিচারের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কটাক্ষ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু কোথাও কোথাও ভূমি আইনের বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে আদালতের এমন একটি মনোভাব ফুটে উঠেছে যে দুঃখ ও বেদনা বোধ না হয়ে পারে না।

আদালত যদি বলেন যে আইন সভার সদস্যরা আইন প্রণয়নের নীতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এবং তাঁরা কোনও আইনের ধারাগুলির বিন্যাসে ভুল করেছেন, তাহলে আদালতের এমন মন্তব্য করার স্বাধীনতা সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তুলবেন না। কিন্তু আদালত যদি এই মন্তব্য করেন যে জমিদারী ও জোতদারী উচ্ছেদের আইনের পেছনে রয়েছে অন্যায় লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি এবং যাঁরা এই সব আইন রচনা করছেন, তাঁরা দুনিয়ার ধ্বংসকামী বুদ্ধিবাজদের সগোত্র, তাহলে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে। একটি রায়ের একটি মাত্র বাক্য উদ্ধৃত করলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

> "It is the same hands which tore open the Earth to get at the minerals, which befouled oceans, rivers, takes, tanks and fisheries, the same hands which today threatens to devastate the globe with war and whose fingers are already scratching at the sky and polluting the atmosphere have produced this piece of legislation namely, the West Bengal Estates Acquision Act, 1953' (Ambhjaksha Mukherjee is the State, LLR (1965) p. 542).

এই একটি মাত্র রায় থেকে সাধারণভাবে সমস্ত রায় সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা উচিত নয়। তবু একথা দুঃখের সঙ্গে মনে না হয়ে পারে না যে, কারণ যাই হোক, আদালত আমাদের সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছাবার পথে সহায়ক, যাকে শ্রীগজেন্দ্র গড়কর বলেছিলেন, সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় স্বরূপ (an instrument of social change) তা হয় নি।

তবে, বাধা যে শুধু বাইরে তা নয়, আসল বাধা অন্তরে। আমরা যত কথা বলি, তার চেয়ে অনেক কম কাজ করি এবং অসাফল্যের জন্যে বাইরের বাধাকে বড় করে দেখি। বাইরের বাধা যে নেই, তা নয়, তবু নিজেদের অন্তরের দুর্বলতা ও বিশ্বাসহীনতা, যাঁদের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব, তাঁদের এবং তাঁদের কর্মীদের কর্মোদ্যমের অভাব, এসব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

জমিদারী ও অন্যান্য সর্বপ্রকার মধ্যস্বত্ব এবং জোতদারী প্রথা বিলোপ করে প্রকৃত কৃষকের হাতে জমি দিতে হবে, কৃষির দ্রুত উন্নয়নের সহায়ক ভূমি-নীতি প্রবর্তন করতে হবে প্রভৃতি কথা বহুদিনের পুরাতন অতি-কথিত উক্তি। আজ এই সব কথাকে কাজে পরিণত করাই একমাত্র কথা।

বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার চেয়ে কম, আর আইন যতখানি হয়েছে, বাস্তব রূপায়ণের কাজ হয়েছে তার চেয়ে কম—এই হোল রূঢ় সত্য। আজও ভাগচাষী, ক্ষুদ্র কৃষক এবং ক্ষেতমজুর তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ নন; অবশ্য, যে সব জায়গায় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সে সব জায়গায় কৃষকরা অনেক পরিমাণে সচেতন। এঁদের সপক্ষে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত আইনের ধারাগুলি অনেক জায়গায় এখনো আইনের বই-এর পাতায় নিবদ্ধ। বর্তমান সরকারের কর্ণধারগণের ঐকান্তিক আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে গ্রাম স্তরের কর্মীদের এবং উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষের সক্রিয় সমর্থন সংযুক্ত হলে প্রশাসনিক কর্মীদের সাহায্যে ভূমি সংস্কারের বিরাট কাজে সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে। ভূমি সংস্কারের পূর্ণ রূপায়ণের বেলায় গ্রামস্তরের অনেক কর্মীর স্বার্থে আঘাত লাগতে বাধ্য। নিজের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে জেনেও সহযোগিতার হাত বাড়াতে গেলে যে উদারতা ও আদর্শানুরক্তি দরকার, তা সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হতে পারে। তাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে প্রথম, তাহলে দেশব্যাপী জাগ্রত এবং নূতন সমাজ গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবশক্তিকে এই গঠনমূলক কাজে সংহত করে দেশব্যাপী আন্দোলনের পথে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

বিগত কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়েছে। সুনিশ্চিত সেচ ও জল নিকাশী ব্যবস্থা আরও উন্নত হবার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদন অনেক বেশী বাড়ানো সম্ভব। সেচ, জল নিকাশ, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধাদি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—সব কিছু যোগানের উন্নতি আবশ্যক, এসব বিষয়েই অনেক কিছু করবার বাকী আছে। তবু, একথা অনস্বীকার্য যে ফসল উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ফসলের মূল্যও বেড়ে চলেছে। তাই, কৃষিকার্য আজ এক শ্রেণীর লোকের কাছে অতীব লাভজনক ব্যাপার। আর পাঁচটা ব্যবসা-বাণিজ্যের তুলনায় কৃষিকার্যে মূলধন বিনিয়োগের প্রতিদানে প্রত্যাশিত মুনাফা অনেক স্থলে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। তাছাড়া, আছে কৃষির আয়কে প্রত্যক্ষ করের দায় থেকে অনেক পরিমাণে মুক্ত রাখার

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের শ্রদ্ধাপূত নিবেদন :

চিরঞ্জীব সেনের নতুন ধরণের রহস্যোপন্যাস **নিহত কুমারী** ৬·০০

চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ উপন্যাস **ছায়া ধূসর** ৮·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নবস্বাদের বড়গল্প সংকলন **সীমান্ত বাহিনী** ৬·৫০

সুবোধ চক্রবর্তীর **উত্তাল পদ্মা উত্তাল মেঘনা** ১০·০০

॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর আলেখ্য ॥

সুপ্রকাশন : : ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯ ॥

...না। তাই, আগে যারা চাষের দিকে ...তেন না, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী- ...ি করতেন, তাঁরা অধিক লাভের আশায় ...দিকে ঝুঁকেছেন। সরকারী সাহায্যে ...সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করা ...দের পক্ষে সহজসাধ্য; নিজেদের বিদ্যা- ...দ্ধি, অর্থসঙ্গতি এবং কর্তৃপক্ষীয়দের ...ঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে স্থাপিত যোগসূত্র সব ...ছুই এঁদের অনুকূলে। পরিণাম স্বরূপ ...ই দেখা যায় যে, ফসল উৎপাদন বাড়ার ...গ ঐ ক্ষুদ্র চাষী, ভাগচাষী এবং ভূমিহীন ...দের সংখ্যাও বাড়ছে। ১৯৭১ সালের ...দমশুমারী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে খেটে- ...ওয়া লোক সংখ্যার শতকরা ৫৭-৫০ ভাগ ...খতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ থেকে দশ ...রে কৃষিজীবীদের সংখ্যা বেড়েছে দশ ...ক্ষের বেশী, এবং কৃষিজীবীদের মধ্যে ...ভূমিহীনদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ।

গ্রামের চিত্র মোটামুটি এই যে স্বচ্ছল কৃষক মূলধন সংগ্রহ করে এবং আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বচ্ছলতর হচ্ছেন। আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্র কৃষক সুযোগ-সুবিধা অভাবে দরিদ্রতর হচ্ছেন। বর্ধিষ্ণু কৃষক নানা উপায় অসহায় দরিদ্র কৃষকের জমি হস্তগত করছেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের কয়েকটি বিখ্যাত লাইন এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

"জীবের শত্রু জীব, মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য। ব্যাঘ্রাদি বৃহজ্জন্তু ছাগাদি ক্ষুদ্র জন্তুকে ভক্ষণ করে; রোহিতাদি বৃহৎ মৎস্য সফরীদিগকে ভক্ষণ করে; জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।" জমিদারবাবুরা মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের নিয়ে আর টানা-টানি করা সমীচীন নয়। তবে, উদ্ধৃতির মধ্যে জমিদার কথাটির বদলে "বুদ্ধিমান জোতদার" কথাটি বসালে সম্পূর্ণ উক্তিটি আজও সম্পূর্ণ সত্য।

গ্রামের বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় এবং উন্নতি-ধনী কৃষক নানাভাবে ক্ষুদ্র চাষীর জমি সংগ্রহ করছেন। ভাগচাষীরা হঠে যাচ্ছেন অনেক জায়গায়। প্রসঙ্গক্রমে, যাঁদের হাতে সরকার আজ এক-এক টুকুরো জমির পাট্টা তুলে দিচ্ছেন, তাঁদের কথা এসে পড়ে। ভূমিহীন কৃষককে দু-এক টুকরো জমি দিলেও, এঁদের তা হাতে ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। অভাবের চাপে এবং অধিক মূল্যের লোভে এঁরা অনেক জায়গায় প্রাপ্ত জমি বিক্রী করে দিতে বাধ্য হবেন। গ্রাম-সমাজে ভূমি-হীন কৃষকের মর্যাদা খুবই সামান্য। সামান্য দুএক টুকরো জমির মালিক হলেও, কৃষকের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বাড়ে। তাছাড়া এঁরা অপরের জমিতে সারা জন্ম শুধু শ্রমিক মজুর হিসাবে খেটে কোনও মতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত প্রাণ যাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের ক্ষুদ্র জমিতে প্রাণ দিয়ে খেটে সোনা ফলাবার চেষ্টা করবেন, একথাও সত্য। কিন্তু, দরিদ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্পদ, বঙ্কিমচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি

বঙ্গদর্শন

।। ১২৭৯-১২৮৯ বঙ্গাব্দ ।। ।। ৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ৯·০০ টাকা ।।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে যা ছিল চির-উজ্জ্বল, তিনি বলেছেন—
"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।"
ডক্টর সুশীল রায় ও অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত প্রামাণিক সংস্করণ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমগ্র সাহিত্য এই বঙ্গদর্শনেই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এতৎসহ এই পত্রিকায় আরও যাঁদের রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।
'বঙ্গদর্শন আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য'—রবীন্দ্রনাথ।

মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী

[বঙ্গাক্ষরে মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা সহ]
সম্পাদনায়-শ্রীধ্যানেশনারায়ণ-চক্রবর্তী এম-এ শাস্ত্রী, বাচস্পতি, অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ।। ৪ খণ্ডে/প্রতি খণ্ড ৯·০০

সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ প্রভৃতির বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী
সম্পাদনায় কবিশেখর কালিদাস রায় ।। ৫ খণ্ডে — প্রতি খণ্ড ৯·০০

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী

প্রকাশিত সমগ্র রচনা এবং অপ্রকাশিত বহু রচনা ও দুর্লভ পত্রাবলী সমন্বিত
সম্পাদনায় ডঃ সুশীল রায় ।। ৫ খণ্ডে — প্রতি খণ্ড ৯·০০

কবিশেখর কালিদাস রায়ের

প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সমগ্র রচনাবলী ।। ১০ খণ্ডে — প্রতি খণ্ড ৯·০০
উপরোক্ত প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫·০০ টাকা করে অগ্রিম জমা দিয়ে গ্রাহক হোন। মনি অর্ডারেও টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হতে পারেন।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত মূল্যগুলি কেবলমাত্র গ্রাহকদের জন্য।
প্রতিটি খণ্ড সুন্দর কাগজে ছাপা, সোনার জলে নাম লেখা ও ফুল রেক্সিন বাঁধাই হবে।

বুক হাউস
[রচনা সংগ্রহ প্রকাশন বিভাগ]
২৭, সূর্য সেন স্ট্রীট [রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের মধ্যে]
কলিকাতা-৯ ঃঃ ফোন : ৩৪-৭০৭৪

কৃষকের পক্ষে, উপযুক্ত সাহায্যের অভাবে, নিজের টুকরো জমিতে ভাল ফসল উঠানো অসাধ্য। এই কারণে, নিত্য অভাবের পীড়নে নিজের জমিটুকু বিক্রী করে দিতে বাধ্য হবেন। সুতরাং দারিদ্র্য-পীড়িত ভূমিহীন কৃষককে জমি দিবার বেলায়, বিক্রী করার অধিকার দান করা উচিত হবে না, বরং বিক্রয় করা অধিকারবিহীন, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করার অধিকার সহ তাকে জমি দিয়ে, তাকে উপযুক্ত পরিমাণ জল, সার, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করে উন্নত জীবন-যাপনের পথে যাত্রা করার সাহায্য দেওয়া সময়োচিত হবে। এই ধরনের সামান্য কৃষকের জমি যাতে ধনী ব্যক্তিরা কিনে নিতে না পারেন, সে জন্যে উপজাতিদের জমি হস্তান্তর সম্পর্কিত বাধা-নিষেধের অনুরূপ সর্ত আরোপ করার কথা বিবেচনা করার যোগ্য।

নিছক মুনাফাবাজ ব্যবসায়ী শ্রেণী ছাড়াও, সম্পন্ন কৃষকরা আজ শুধু তাদের অতিরিক্ত শস্য নয়, ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে তাদের অভাবের সুযোগে কিনে নেওয়া শস্য সংগ্রহ করে, চড়া দামে বিক্রী করার আশায় মজুত রাখছেন, বাজারে ছাড়ছেন না। শস্য সংগ্রহের সরকারী লক্ষ্য-মাত্রা আয়ত্তাতীত থাকার কারণগুলির মধ্যে অধিক লাভের উচ্চাশাতাড়িত সম্পন্ন কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এক-ফসলী জমির বর্তমান ফলন অন্ততঃ পাঁচগুণ বাড়ানো যেতে পারে। পশ্চিম বাংলায় যত জমিতে চাষ হয়, তা যদি বর্তমান ভূমিহীনসহ সমস্ত কৃষক পরিবারের মধ্যে সমান হারে বণ্টন করে দেওয়া যায়, তাহলেও প্রতিটি কৃষক পরিবারকে ২-৫ একর জমি দেওয়া সম্ভব, এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে এই প্রত্যেকটি পরিবার ঐ জমি থেকে বছরে যা আয় করবেন তা বর্তমান দারিদ্র্য-সীমার উপরে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উন্নয়ন পর্ষদ কর্তৃক রচিত আঞ্চলিক কৃষি ভিত্তিক সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা নামক চিন্তা-কর্ষক ও শিক্ষণীয় পুস্তিকা থেকে এই তথ্য সংগৃহীত। পর্ষদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হলে, ভূমি সংস্কারের বর্তমান কাঠামোর মধ্যে থেকেই বর্তমান বিধি-বিধানগুলি যথাযথ প্রয়োগ করে এবং কিছু পরিমাণ প্রয়োজনীয় সংশোধন করে, কৃষি ও কৃষকের প্রভূত উন্নতি বিধান সম্ভব। সাধারণ কৃষকের সামনে আজ সুস্থ ভবিষ্যতের দিগন্ত প্রসারিত। হৈমন্তী ধানের ফসল কাটার পর, সারা শীত ও গ্রীষ্মকালে যে বিস্তীর্ণ মাঠ রুক্ষ তৃণহীন অবস্থায় ধু-ধু করত, আজ সেই সব মাঠে মাঝে মাঝে সবুজের স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে। এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমিতে পরিণত করে তিন গুণের বেশী ফসল ফলানো যায়, একথা সাধারণ কৃষকের আজ অজানা নয়। অজানা শুধু এই যে সমস্ত মাঠ ভরে সবুজ-বিপ্লব হবে কবে, তার কতখানি ফসল ঘরে উঠবে। ফসল উৎপাদনের সঙ্গে অধিক মূল্য আর, গরীব কৃষককে কম মূল্যে ধান করে বেশী মূল্যে কিনতে বাধ্য অধিক উৎপাদনের সঙ্গে অধিক অসা এসব চললে সবুজ-বিপ্লব রক্ত-বিপ্ল পরিণত হবে।

ভূমি সংস্কারের ধারাগুলি প্রয়ো করার সরকারী নীতি দৃঢ়তর করে, কৃষ সংগঠন, যুব ও ছাত্র সংগঠন এবং রা নৈতিক দলগুলির দলবাজী বর্জিত স যৌথভাবে সর্বাত্মক আন্দোলনের পথে কৃষি ও কৃষকের উন্নতির কাজে সাফ অর্জন সম্ভব।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পা স্পরিক মত-পার্থক্য যতই থাকুক না কেন ভূমি সংস্কার বিষয়ক আইন সম্পর্কে মত-ভেদ বেশী নেই। ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য এবং পন্থা সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য আছে। তবু, ভূমি সংস্কার আইন আলোচনার সময় প্রায় কোনও রাজনৈতিক দলই প্রস্তাবিত মূল ধারাগুলির বিরোধিতা করেন নি। অনেকের মতে হয়ত যতটা অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ছিল, ভূমি সংস্কার আইনে তার চেয়ে অনেক কম, অনেক কুণ্ঠিত পদক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু যতটুকু ভূমি সংস্কার হয়েছে, তাকে প্রত্যাখ্যান না করে, বিরোধী দলগুলি বরং স্বাগত জানিয়েছেন। কাজেই, ভূমি সংস্কারের ধারাগুলি পুরোপুরি কার্যকরী করার জন্যে সকল দলের একযোগে কাজ করার পথে দুস্তর কোনও বাধা নেই। চাই উপযুক্ত নেতৃত্ব। আইনের প্রতি সমর্থন ও আন্তরিকতার অভাব নেই। তবু, সংকীর্ণ রাজনৈতিক সুবিধার খাতিরে এবং ভবিষ্যৎ ভোটারদের তুষ্ট রেখে, শুধু ফাঁকা আওয়াজ তুলে, ডন কুইকসোটের মত হাওয়ার সঙ্গে লড়াই-এর অভিনয় করার দিকেই ঝোঁকটা বেশী। গঠনমূলক কাজের যে-যে ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ দল অভিন্ন মত পোষণ করেন, সেসব ক্ষেত্রে একযোগে কাজ করার পথে যে বাধা, তা বেশীর ভাগ সংকীর্ণতা-দুষ্ট মানসিক বাধা। একযোগে যেসব ক্ষেত্রে সবাই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে কাজ করা যেতে পারে, তার মধ্যে ভূমি সংস্কার অন্যতম। সমস্ত দলের ঐকান্তিক আগ্রহে, যুব শক্তির সাহায্যে, গণ-আন্দোলন গঠনের মধ্যেই আছে ভূমি সংস্কারের পূর্ণ রূপায়ণের এবং কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পথ। একে অলস, অবাস্তব পরিকল্পনা বলে উপহাস করা মূঢ় প্রাজ্ঞজনের কাজ হবে মাত্র।

— দুইখানি নতুন বই —

স্টার থিয়েটারে অভিনীত
মন্মথরায় প্রণীত নাটক

বিদ্রোহী নায়ক

দাম : ৩-৫০

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত
উপন্যাস

জল-মাটির গন্ধ

দাম : ২-৫০

— অন্যান্য উপন্যাস —

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
গৌড়মল্লার ৪-৫০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
সরোবর ২-৭৫

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়
পিপাসা ৪-৫০

শান্তিপদ রাজগুরু
কাঞ্চনজঙ্ঘার কাহিনী ৫-০০

ভোলা সেন
উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

রামপদ মুখোপাধ্যায়
কল্প-কল্লোল ৪-৫০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্তরঙ্গিনী ৩-০০

— অনবদ্য উপহার গ্রন্থ —

নরেন্দ্র দেব
ওমর খৈয়াম ৮-৭৫
মেঘদূত ৭-০০
কুমার-সম্ভব ৫-০০

— বিবিধ গ্রন্থ —

পঞ্চানন ঘোষাল
শ্রমিক-বিজ্ঞান ৫-৫০

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম
১ম খণ্ড। দাম—৩-

ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ
পঞ্চাশের পরে
স্বাস্থ্য-তত্ত্ব। দাম : ২-৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

দেহ দিয়ে প্রাণ দিয়ে

সতীকান্ত গুহ

নিখিলেশ ও সুবাসিনীকে সুখী দম্পতি বললেও মনে হত সবটা বলা হল না। দম্পতি কথাটায় মিলের আড়ালে একটা প্রকৃতিগত অমিলের, স্ত্রী ও পুরুষের চিরন্তন ভেদের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কিন্তু নিখিলেশ ও সুবাসিনী একে অপরের ভিতর এতটা নিবিষ্ট ছিল যে তাদের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও পুরুষের ভেদ একান্ত অবান্তর মনে হত। সুদূর প্রাক পৌরাণিক অতীতে স্ত্রী ও পুরুষ অভিন্ন ছিল, নিখিলেশ ও সুবাসিনীকে দেখে বিশ্বাস্য বলে মেনে নেওয়া সম্ভব বোধ হত।

নিখিলেশের অগাধ পৈতৃক ঐশ্বর্য তাদের দাম্পত্যজীবনের অলৌকিক একত্বতায় ইন্ধন যুগিয়েছিল। তাছাড়া বিপত্নীক পিতার মৃত্যুর পর নিখিলেশের তিনকুলে আপন বলতে কেউ ছিল না। বিমান দুর্ঘটনায় সুবাসিনীর শৈশবে তার পিতামাতা একযোগে লোকান্তরিত হবার ফলে সুবাসিনীর তিনকুলের হিসেবও অনুরূপ ছিল। আত্মীয়হীন সমাজে তাদের জীবন ছিল দাম্পত্যপ্রেমের নোঙর বাঁধা নৌকোর মতো। ফলে তারা পরস্পরকে এত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল যে তাদের সংসারে সখ্যের দাবী নিয়ে কেউ আসতে ভরসা পেতেন না। তাদের সংসারে তৃতীয় ব্যক্তির জন্য কোনো স্থায়ী স্থান বা ব্যবস্থাও ছিল না। তারা নিঃসন্তান ছিল। এ ঘটনায় কতটা অদৃষ্টের কতটা তাদের ইচ্ছাশক্তির হাত ছিল, জোর দিয়ে বলা যেত না।

তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে অসংখ্য মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিরাট জগতটা জৈবিক প্রয়োজনে মেনে নিয়েও জীবনের গভীর অর্থের ক্ষেত্রে তারা প্রায় ষোলোআনা অস্বীকার করে বসেছিল। প্রেমের ব্যাপারে তারা মত্ত বললে ভুল হত বরং পারস্পরিক বাদ্যতে সম্মোহিত এই মন্তব্য মনাতো। প্রায় দশ বছর নিখিলেশ ও সুবাসিনী সুখ ও সম্ভোগের অনুকূল স্রোতে ভেসে এসে একদিন তাদের জীবনের প্রথম সঙ্কটের, লৌকিক বিচারে শেষ সঙ্কটের মুখে এসে থেমে গেল। তখন নিখিলেশের বয়স চৌত্রিশ, সুবাসিনীর ঊনত্রিশ কিংবা ত্রিশ।

একদিন সন্ধ্যায় সুবাসিনী নিখিলেশ-এর সম্মুখে এসে মেঝেয় বসে তার হাঁটুর উপর আলগোছে মাথা রেখে বলল, 'আমার যে কী হয়েছে! শরীর নিয়ে আর পারছি না। সব সময়েই মনে হয় ক্লান্ত।'

নিখিলেশ নিবিড় অনুরাগে সুবাসিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'লোকে কী বলবে! দশ বছর যেতে না যেতেই ক্লান্ত!'

সুবাসিনী নিখিলেশের হাঁটুর উপর মাথার চাপ দিয়ে বলল, 'ছিঃ, কী যে বলো!' তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'একবার ডাক্তারকে নয় টেলিফোন করে আসতে বলো। আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না।'

এক ঘন্টার ভিতরই ডাক্তার এলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুবাসিনীকে পর্যবেক্ষা করলেন। রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে গোটা কয়েক প্রশ্ন করলেন। তারপর নিখিলেশকে ইঙ্গিতে তাঁকে অনুসরণ করতে বলে ড্রয়িং-রুমে এলেন। নিখিলেশ কোনো প্রশ্ন করার আগেই ডাক্তার চাপা গলায় বললেন, 'ফুস-ফুসের মারাত্মক ব্যাধি। এরকম কেস খুব কমই দেখেছি। মিথ্যে আশা দেব না, সেজন্য কোনো আশাই দিতে পারছি না। কতদিন টিকবেন বলা কঠিন। তবু একটা হেস্ত-নেস্ত হওয়া দরকার। ডকটর মুখার্জিকে ডাকুন। আমি তো আছিই।'

প্রায় পক্ষকাল প্রচুর অর্থব্যয়ে হেস্ত-নেস্তর পালা মহাসমারোহে চলবার পর নিখিলেশ ও সুবাসিনীর নাটক শেষ দৃশ্যে পৌঁছল। এই পক্ষকাল সুবাসিনী ধীরে ধীরে নিভেছে। শেষদিন সলতের শেষ আগুনের মতো সুবাসিনী দপ করে জ্বলে উঠল।

ডাক্তার জবাব দেবার পর ড্রয়িংরুমে ফাঁকা করে দিয়ে নিখিলেশ সুবাসিনীর ডান হাতখানা কোলে নিয়ে বিছানায় এসে বসে-ছিল। সুবাসিনী হঠাৎ চোখ মেললো। স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি। বলল, 'শোনো।'

নিখিলেশ বলল, 'কি সুবাসিনী?'

সুবাসিনী হাসল। সেই সঙ্গে তার দুচোখের দুপ্রান্ত বেয়ে অশ্রুর ক্ষীণ ধারা নামলো। বলল, 'চললাম। অনেক চেষ্টা করলাম। পারলাম না। যেতেই হল।'

গভীর আবেগে নিখিলেশ বলল, 'তুমি যেও না সুবাসিনী। তুমি ছাড়া আমি একা। অত্যন্ত একা।'

সুবাসিনী হতাশ স্বরে বলল, 'কিন্তু কী করি! কোনো উপায়ই তো নেই।'

নিখিলেশ সুবাসিনীর ডান হাত শক্ত মুঠিতে ধরে বলল, 'একটা উপায় করতেই হবে। যে করেই হোক তোমাকে বাঁচতেই হবে সুবাসিনী।' নিখিলেশের সংযমের বাঁধ ভাঙলো। সে অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো।

সুবাসিনীর বুক থেকে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস বার হয়ে এল। তার দুচোখের মণি স্থির হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার দু-চোখের পাতা বুজে এল।

নিখিলেশ বুঝলো। সুবাসিনীর ডান-হাতটা আলগোছে নামিয়ে রেখে সে অদূরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। সুবাসিনী নেই। এই নিদারুণ সত্য সে কী করে সহ্য করবে এই কঠিন সমস্যা সম্মুখে রেখে সে তার জীবনের কঠোরতম ধ্যানে বসল।

নিখিলেশ ও সুবাসিনীর প্রেমালাপের একটা সংলাপ থেকে থেকে নিখিলেশের মনে পড়ছিল। সুবাসিনী প্রায়ই নিখি-লেশকে বলত, 'যদি একসঙ্গে মরি কোনো ল্যাঠাই নেই। দুজনে হাত ধরাধরি করে যেখানে যাবার যাবো। কিন্তু যদি কেউ আগে মরি, অন্যকে দেখা দিয়ে যাবো।'

নিখিলেশ পরিহাসচ্ছলে বলত, 'আমি অন্তত দেখা দেব না। তোমার যা ভূতের ভয়। ওঝা ডেকে নাকালের একশেষ করবে।'

এ পরিহাসে সুবাসিনীর চোখ জলে ভরে উঠত। বলত, 'যাকে ভালোবাসা যায় ভূত হলেই বুঝি সে পর হয়?'

নিখিলেশ যতক্ষণ না তাকে বুকে টেনে নিত তার চোখের জল থামতো না।

একদিন, নিখিলেশের মনে পড়ল, সুবাসিনী বলেছিল, 'আমি মারা গেলে খানিকক্ষণ তুমি ছাড়া ঘরে কেউ থাকবে না। খুব ফাঁকা করে কপাট দিয়ে দিও। বলা যায় না, যদি পারি তখনই একবার বলে যাবো—'

নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করেছিল। 'কী বলে যাবে সুবাসিনী?'

সুবাসিনী দুটি চোখ বুজে বলেছিল, 'বলে যাবো, ভেবো না। দুঃখ কোরো না। যেখানেই থাকি না কেন আছি। তোমারই আছি।'

অতীতের সংলাপের এ অংশ মনে পড়তে নিখিলেশ ত্রস্তে উঠে কপাট বন্ধ করল।

রাত নটায় সুবাসিনী শেষ নিশ্বাস ফেলেছে। দেয়াল ঘড়িতে এগারোটা বাজতে নিখিলেশ ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘরে আলো জ্বলছে। শয্যায় স্তব্ধ নিস্পন্দ সুবাসিনী। আর নিখিলেশ একা। মৃতা সুবাসিনীর সঙ্গে একা। হাতের কাছেই টেলিফোন। সহজেই ডাক্তারকে খবর দেওয়া চলে। সৎকারের আয়োজনও টেলিফোনে অনা-য়াসে করা চলে। নিখিলেশ উঠতে গেল। কিন্তু উঠতে গেলে যেটুকু শক্তির দরকার, খুঁজে পেল না। না কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে বাধা দিল।

কখন আরো দু ঘন্টা সময় কেটেছে নিখিলেশের হুঁশ ছিল না। একটার ঘন্টা বাজতে সে উঠে বসল। অকারণে নয়। ফিস-ফাস করে কেউ তার নাম উচ্চারণ করেছে। ঘরে সে একা নয়। আর কেউ উপস্থিত। ইচ্ছা ও অনিচ্ছা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অনুভূতির আকর্ষণে নিখিলেশ সুবাসিনীর দিকে তাকালো। সেই মুহূর্তে সুবাসিনী চোখ মেলল। নিষ্পলক পূর্ণ দৃষ্টি।

বিস্ময় ও আনন্দের চেয়ে নিখিলেশের কণ্ঠে যেন অবিশ্বাসই বেশী প্রকাশ পেল। বলল, 'সুবাসিনী! তুমি বেঁচে উঠেছো?'

সুবাসিনী হাসল। নিখিলেশ সুবা-সিনীর মুখে এরকম হাসি কখনো দেখেনি। এ হাসির বিশ্লেষণ শুধু দুরূহ নয়, অসাধ্য।

সুবাসিনী নিখিলেশকে দৃষ্টিবিদ্ধ করে ভর্ৎসনার সুরে বলল, 'মরে কেউ বাঁচে নাকি? এটুকু বোঝো না?'

নিখিলেশ গভীর আবেগে সুবাসিনীর ডান হাত শক্ত মুঠিতে ধরে বলল, 'আমারই বুঝবার ভুল। ভেবেছিলাম তুমি মরেছ।

সুবাসিনী বলল, 'ঠিকই বুঝেছিলে। মরেছিলাম। কিন্তু বেঁচে উঠিনি। তা সম্ভব নয়।'

সুবাসিনীর ডান হাত থেকে নিখি-লেশের হাতের মুঠো শিথিল হয়ে এসে-ছিল। কঠোর মুষ্টিতে তার হাত ধরে সুবা-সিনী ধীরে ধীরে বলল, 'বেঁচে উঠিনি। ফিরে এসেছি।'

সুবাসিনীর মৃত্যুর সময় নিখিলেশ ছাড়া ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। ফলে তার মৃত্যু ও অলৌকিক উজ্জীবন সম্বন্ধে কেউ বিন্দুবিসর্গ জানলো না। সকলে সবিস্ময়ে শুনলো ডাক্তার জবাব দেবার পর সুবাসিনী শিবের অসাধ্য ব্যাধিকে হার মানিয়ে সেরে উঠেছে। সবচেয়ে বিস্মিত হলেন ডাক্তার। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে নিখিলেশ ও সুবাসিনীর ভিতর একটা সূক্ষ্ম বিরোধের সূত্রপাত হল। নিখিলেশ বিশ্বাস করত সুবাসিনী আদৌ মরেনি। কোনো দুজ্ঞেয় কারণে তার হৃদযন্ত্র কয়েক ঘন্টার জন্য থেমে গিয়েছিল। সুবাসিনী তার ধারণায় অটল রইল যে তার পূর্বের অগণিত কোটি কোটি মানুষের মতো তার মৃত্যু হয়েছিল। এবং সে বেঁচেও ওঠেনি। ফিরে এসেছে। কেন? তা কি নিখিলেশ জানে না? কী করে? তা শুধু সুবাসিনীই জানে। আর কারো জানার কথা নয়।

তাদের এই অন্তর্বিরোধের বিষয় একে অপরের কাছে উল্লেখ করত না। কিন্তু নির্বাক সংলাপে তারা প্রতিমুহূর্তে পরস্পরের যুক্তি ও বিশ্বাস খণ্ডন করত। তাদের এই অন্তর্বিরোধের ছায়া তাদের সংসারের ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর পড়ল। দিনের আলো, রাতের অন্ধকার, জীবনের খুটিনাটি প্রতিটি জিনিসের যেন স্বাদ বদলে গেল।

একদিন উত্তরের বারান্দায় চা খেতে খেতে নিখিলেশ বলল, 'কি হতে কি হল সুবাসিনী, আমাদের জীবনের সব আনন্দ কে কেড়ে নিল! আমি আছি, তুমি আছো। আমাদের সংসার আছে। কিন্তু কেউ, কিছুই যেন থেকেও নেই।'

সুবাসিনী কোনো কথা বলল না।

নিখিলেশ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'জীবন কোন্ নিয়মে কোন্ যুক্তিতে চলে বুঝবার চেষ্টা করেও বুঝলাম না। ধরো তুমি যদি ভেসে যেতে যেতে যদি ডাঙা পেতে, আমরা

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলো, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৬৭-২০৫৯।

ভারত-জার্মান সহযোগিতার সাফল্যের নিবিকাঠি কোথায়?

ভারতীয় ও জার্মান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ত : নানা ক্ষেত্রীয়ভাবে, মাত্রাধিক ফলপ্রসূতার ও সমগ্র মানব-কল্যাণের প্রতি উৎসর্গীকৃত।

ভারতের এবং ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর অর্থমন্ত্রী গত ২৫ মার্চ এবং এই উদ্দেশ্যে অধিক সহযোগিতার উন্নয়নযোগ্য সম্ভাবনার মধ্যে আলাপ আলোচনা করেছেন।

এক নজরে
ভারত-জার্মান আর্থনীতিক সম্পর্ক :

ভারতকে আর্থনীতিক সাহায্য (১৯৭১'এর ডিসেম্বর পর্যন্ত)

-কারিগরী সাহায্য (প্রযুক্তি)	টাঃ	৩৫৭	কোটি
রিপাবলিক ফুডমন্ত্রী সাহায্য			
ঋণবিষয়ক সুদে ও সর্তে অনুদান	টাঃ	১৬৮·৭১	কোটি
মহাজনী সাহায্য			
আই. ডি. এ. মারফত ঋণ	টাঃ	৩৬·০	কোটি (আনুমানিক)

ভারত ও ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ (১৯৭১'এর ডিসেম্বর পর্যন্ত) টাঃ ৫১৮·৩ কোটি

ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী
—এক নির্ভরশীল সহযোগী

[illegible] রিপাবলিক অফ জার্মানীর অনুমতিক্রমে ভারত সিরিজ, ৯ ফ্রেডরিক মার্ক রোড, কলিকাতা-২৯ কর্তৃক প্রচারিত।

জানোয়ারের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনতে, আমাদের সংসারে আলো স্নিগ্ধমুখ তেজে জ্বলন্ত। কিন্তু মৃত্যু, যার চেয়ে বড় বিপদ প্রাণীর নেই, তার কবল থেকে তুমি ফিরে এলে, অথচ—'

সুবাসিনী উৎকর্ণ হয়ে নিখিলেশের কথা শুনছিল। বলল, 'অথচ, অথচ কী?'

নিখিলেশ গলা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি সবই জানো বোঝো সুবাসিনী।'

সুবাসিনী ধীরে ধীরে মুখ তুললো। নিখিলেশকে দেখতে দেখতে বলল, 'আর তুমি? তুমিও কি বোঝো না?'

নিখিলেশ কোনো জবাব দিল না। সে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সুবাসিনীর মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে এল। তারপর তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ম পালন করতে দুজনে লাইব্রেরীঘরে গিয়ে টেবিলের দুই প্রান্তে একখানা করে বই নিয়ে বসল।

ইহলোক পরলোকের চেয়ে কম বিস্ময়কর স্থান নয়। তাদের অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও এই আশ্চর্য ইহলোকে নিখিলেশ ও সুবাসিনীর পক্ষে এক সংসারে আজীবন বাহ্যিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রেখে বসবাস করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু নিখিলেশের মনে একটা আপত্তি ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। এই আপত্তির কারণ সূক্ষ্ম, অপ্রত্যক্ষ ও প্রমাণাতীত। সুবাসিনীর মৃত্যুপর্বের দিন পর্যন্ত নিখিলেশ ও সুবাসিনীর যৌথ সংসারে নিখিলেশই ছিল সর্বময় কর্তা। তাদের দুজনের একাত্মতার সঙ্গে নিখিলেশের কর্তৃত্বের কোনো বিরোধ ছিল না। কিন্তু সুবাসিনীর অলৌকিক ব্যাধিমুক্তির পর থেকে সংসারের সকল ব্যাপারে তিলে তিলে নিখিলেশের জোর কমে যেতে লাগল। একদিন নিখিলেশ আবিষ্কার করল কর্তার আসন শূন্য, কিন্তু কর্ত্রীর শূন্য আসন অকস্মাৎ পূর্ণ হয়েছে। একটা বিষয় লক্ষ্য করে সে অবাক হল। সুবাসিনী যে জোর করে তার দখল কেড়ে নিচ্ছে তা নয়। সে দখল রাখতে পারছে না বলেই সুবাসিনী যেন স্বাভাবিক কারণেই সংসারে ক্রমে ক্রমে দখল নিচ্ছে। এই দখলের ব্যাপার মনের স্তর থেকে শরীরের স্তরে বিস্তৃত হল। নিখিলেশ সভয়ে লক্ষ্য করল সুবাসিনী কাছে এলে সে দুর্বল বোধ করে। এক শয্যায় শুয়ে চিরাচরিত কর্তব্য পালন করেও মনে হয় সে গৌণ ভূমিকায় নেমে এসেছে। নিখিলেশ অবাক হয়ে চিন্তা করে সে কী কারণে সুবাসিনীর কাছে প্রায় অকারণেই হটে যাচ্ছে।

নিখিলেশ ও সুবাসিনী খুব কমই বাড়ি থেকে বার হত। যখন বার হত এক সঙ্গেই গাড়ি করে যেত। কদাচিৎ বিশেষ প্রয়োজনে নিখিলেশ একা বার হত। এই রকমই একটা গুরুতর প্রয়োজনে নিখিলেশ একদিন দুপুরে বার হতে যাচ্ছে, পিছন থেকে সুবাসিনী ডাকলো, 'শোনো?'

নিখিলেশ বাধা পেয়ে পিছনে তাকাতে সুবাসিনী বলল, 'কোথায় যাচ্ছো?'

নিখিলেশ বলল, 'এই একটা কাজে।'

সুবাসিনী সহজকণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও। আমি আসছি।'

নিখিলেশ মরিয়া হয়ে বলল, 'সামান্য ব্যাপারে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

সুবাসিনী বলল, 'প্রয়োজন আছে কি নেই আমি বুঝবো। দাঁড়াও।'

দুজনে একসঙ্গে বার হয়ে কাজের শেষে বাড়ি ফিরলো। নিখিলেশ উত্তরের বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। তাকে যতটা না ক্ষুণ্ণ মনে হল, তার চেয়ে ঢের বেশী চিন্তিত দেখাল।

কয়েকটা দিন বিষয়টা নিয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করে নিখিলেশ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল। মোটামুটি সিদ্ধান্তটা এই : হৃদযন্ত্র চারঘন্টা বন্ধ থাকার ফলে সুবাসিনীর সাময়িক মৃত্যু হয়েছিল। এই চারঘন্টায় কোনো অজ্ঞাত কারণে তার কয়েকটি মানসিক বৃত্তি, যা এতকাল অকেজো ছিল, বিশেষ সক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে তার ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বে একটা অস্বাভাবিক জোর এসে গিয়েছে। এই সঙ্গে পরের মনে ঢুকবার একটা অসাধারণ ক্ষমতাও সে পেয়েছে। এবং এ সবেরই প্রতিক্রিয়ায় তার মস্তিষ্কবিকৃতিও ঘটেছে।

খবরের কাগজে শ্রীনগেশের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পড়ে নিখিলেশ তাঁর হোটেলে হাজির হল। শ্রীনগেশ শুধু একজন মহাপণ্ডিত মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন না। সম্মোহন, পরাবিদ্যায় ও তন্ত্রে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও দখল ছিল। পরিণত বয়সে বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে তিনি নিখিলেশের কাছে ইংরাজী ভাষা শিখেছিলেন। এ কারণে এবং তাঁর বিদেশ সফরের আংশিক ব্যয় নিখিলেশ বহন করেছিল এজন্য তিনি নিখিলেশের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া নিজ চরিত্রগুণে নিখিলেশ তাঁর হৃদয়ে একটি স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিল।

নিখিলেশ ঘরে ঢুকতে শ্রীনগেশ নিবিড় আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাকে বসতে বলে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুখের সংসার ছেড়ে তুমি সশরীরে আমার হোটেলে আবির্ভূত হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার সৌভাগ্যের কারণ কী বুঝে উঠতে পারছি না।'

নিখিলেশ বিষণ্ণস্বরে বলল, 'একমাত্র কারণ আমার দুর্ভাগ্য।'

শ্রীনগেশ বললেন, 'দুর্ভাগ্য? কী বিষয়ে?'

নিখিলেশ জবাবে বলল, 'স্ত্রীসংক্রান্ত বিষয়ে।'

শ্রীনগেশের মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে বিষয়টা আগাগোড়া শুনতে চাই।'

নিখিলেশ ম্লান হেসে বলল, 'আমিও আজ আমার সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়ে মনটা হালকা করতে চাই।'

নিখিলেশের মুখে তার দাম্পত্যজীবনের সাম্প্রতিক অধ্যায়টা আগাগোড়া শুনে শ্রীনগেশ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বুঝলাম। আমার কিছুই বুঝতে বাকী নেই।'

ব্যগ্রস্বরে নিখিলেশ জিজ্ঞাসা করল। 'কী বুঝলেন?'

শ্রীনগেশ বললেন, 'তুমি একটি গুরুতর বিষয়ে সুবাসিনীকে অবিশ্বাস করেছ। ফলে সে বিগড়ে গিয়েছে।'

নিখিলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে শ্রীনগেশ বললেন, 'সুবাসিনী তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতো। এখনও বাসে। তোমার জন্যে সে একটি দুরূহ কাজ করেছে। পরলোক কিম্বা তার প্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। অথচ তুমি, কৃতজ্ঞ হওয়া দূরের কথা, তাকে বিশ্বাস করছ না।'

নিখিলেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি করেন?'

শ্রীনগেশ বললেন, 'আমি সুবাসিনীর কথা বিশ্বাস করি কি না তাতে তার কিছু আসে যায় না। তুমি না করলে তার কাছে ব্যাপারটা মর্মান্তিক হয়ে পড়ে। সুবাসিনী যা সত্য মনে করে কোনো গভীর কারণে

কথক : মণিপুরী : ভরতনাট্যম : কথাকলি : লোকনৃত্য আধুনিক নৃত্যের
ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ
মঞ্জুলিকা রায়চৌধুরীর
নৃত্যভারতী
সর্বজন প্রশংসিত : দাম—মাত্র দশ টাকা
প্রাপ্তিস্থান : ডি এম লাইব্রেরী, ৩২ বিধান সরণী, কলি—৬

কিংবা আমাদের জ্ঞানাতীত কোনো যুক্তিতে যদি মিথ্যা না হয় তাহলে তার দিক থেকে একটা মস্ত নালিশ থেকে যায়। হয়তো ইহ-লোকে ফিরে আসার জন্য তাকে কোনো কঠিন মূল্য দিতে হয়েছে। কত কঠিন তা হয়তো আমরা কল্পনা করতে পারি না।'

নিখিলেশ বলল, 'মূল্য? কী মূল্য?'

শ্রীনগেশ হাসলেন। দুর্বোধ্য ম্লান হাসি। বললেন, 'কি করে তোমাকে বোঝাবো নিখিলেশ। সুবাসিনী যদি সত্যিই ফিরে এসে থাকে তবে সে জন্মমৃত্যুর কঠোর নিয়মভঙ্গ করেছে। তাকে শাস্তি পেতে হবে। কঠিন মূল্য দিতে হবে।'

নিখিলেশের মুখ বিবর্ণ হল। কিন্তু শ্রীনগেশের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টায় সে জোর করে হাসল। বলল, 'আপনি পরলোক বিশ্বাস করেন? মৃত্যুর পর কী থাকে? নিষ্প্রাণ দেহ। হয় চিতায় পুড়ে ছাই হয়, নয় মাটির তলায় পচেগলে ক্ষয় হয়ে মাটিতে মিশে যায়। আত্মার কথা যদি বলেন, আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিলেও সে তো মৃত্যুর পর পরমাত্মায় মিলিয়ে যায়।'

নিখিলেশ এ পর্যন্ত বলে শ্রীনগেশের দিকে সমর্থনের জন্য তাকালো।

শ্রীনগেশ বললেন, 'তোমার বক্তব্য শেষ করো। শুনে আমার কথা বলব।'

নিখিলেশ বলল, 'সুবাসিনী আসে নি। কোনো কারণে তার হৃদযন্ত্র কিছু-ক্ষণের জন্য থেমে গিয়েছিল। পরে চলতে শুরু করে। সে মরছে এই জ্ঞান নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জেগে উঠে ভাবছে মরে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে। আমি তাকে আমার জন্য বাঁচতে বলেছিলাম। এ কথা শোনার পর সে জ্ঞান হারিয়েছিল। হয়তো হৃদযন্ত্র যতক্ষণ বন্ধ ছিল ঐ সময়ে সে পরলোক থেকে ফিরে এসেছে এই রকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল।'

শ্রীনগেশ বললেন, 'মরবার সময় তুমি সুবাসিনীকে বলেছিলে, একটা উপায় করতেই হবে। যে করেই হোক তোমাকে বাঁচতেই হবে।'

নিখিলেশ বলল, 'আমি বাঁচতে বলে-ছিলাম। বেঁচে উঠতে বলিনি।'

শ্রীনগেশ ভর্ৎসনা করে বললেন, 'বিষয়টা ব্যাকরণ নয়। মানুষের হৃদয় ও আত্মা নিয়ে কথা হচ্ছে। সুবাসিনী যদি স্বপ্নে দেখে থাকে সে তোমার ভালবাসার মূল্য দিতে গিয়ে পরলোক থেকে ফিরে আসছে, সে কথা তোমাকে বলার পর সে যদি বুঝতে পারে তুমি তাকে অবিশ্বাস করছ, তার রুষ্ট হবার যথেষ্ট কারণ আছে।'

নিখিলেশ বলল, 'একটা ভুলের ভিতর তার সারাটা জীবন কেটে যাবে, সেই ভুল মেনে নিয়ে আমাকে মিথ্যাচারণ করতে হবে, কী করে সম্ভব? সম্ভব হলেও অনুচিত। অন্যায়। সে একটা বিরাট ভুলের ভিতর রয়েছে, তাকে বোঝানো দরকার।'

শ্রীনগেশ বললেন, 'বোঝাতে চেষ্টা করেছ?'

নিখিলেশ হতাশকণ্ঠে বলল, 'কে কাকে বোঝাবে! সে সুবাসিনী নেই। এ আর এক সুবাসিনী। এ সুবাসিনী আমাকে তার নিয়মে বাঁধতে চায়। আমাকে চালাতে চায়। যে লতার মতো অসহায় ছিল, সকল ব্যাপারে আমার মুখাপেক্ষী ছিল, কোথা থেকে সে এত শক্তি পেল ভেবে পাই না। সে শুধু স্বপ্নই দেখেনি, অজ্ঞান অবস্থায় কী করে এক প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এসেছে!'

শ্রীনগেশ বললেন, 'কোথা থেকে? কী করে? প্রশ্ন তুমিই তুলেছ নিখিলেশ।'

নিখিলেশ বলল, 'সাধ করে তুলিনি। চুপে যেতে পারতাম। কিন্তু সুবাসিনী এমন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মর্মান্তিক প্রশ্ন নিয়ে অসহায়ের মতো আপনার কাছে না এসে পারিনি।'

শ্রীনগেশ বললেন, 'তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়ে থাকো। বাইরে তাকে মেনে নাও। সুযোগের অপেক্ষায় থাকো। যদি সে ভুল করে থাকে একদিন বুঝবে। ভুল ভাঙবে। না হলে বুঝতে হবে ভুল তোমারই।'

নিখিলেশ বলল, 'অর্থাৎ—'

শ্রীনগেশ বললেন, 'সত্য অনন্ত ও অশেষ। তার কতটুকু আমরা জানি? যে সত্যের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় নেই, তার বিচার কী করে করি? যুক্তির দিক দিয়ে সুবাসিনী সম্বন্ধে তুমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছ তা সহজেই মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু কোনো কারণে তোমারই কথার ভিতর দিয়ে সুবাসিনী আমাকে আকর্ষণ করছে। তার বিশ্বাস ও সত্যকে অবিশ্বাস করতে পারছি না।'

নিখিলেশ তন্ময় হয়ে কী চিন্তা করছিল। সে যখন কথা বলতে শুরু করল মনে হল সে যেন একা। অসহায়, জীবনের মূল বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত। সে যেন পৃথিবী গ্রহের প্রথম মানুষ। একটা বিরাট বিশ্বাসের আশ্রয় না হলে সে টিকবে না। সুবাসিনী তাকে তার বিশ্বাসের কোটর থেকে বার করে এনে জীবনের মহাশূন্যে ফেলে দিয়েছে।

একটি বিশেষ ঘোষণা

শেষ সংকেত

অলৌকিক ও ভৌতিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

সুন্দর প্রচ্ছদপট নিয়ে ২৭৪ পৃষ্ঠার বইটির দাম ২.৫০

ম্যানড্রেক ও বেতালের থেকেও দুর্ধর্ষ কমিকস আর **প্ল্যানচেট ও একটোপ্লাজমের বিচিত্র রচনার সঙ্গে আর্ট প্লেটে ছাপা বিদেহী আত্মাদের ছবি এবং মৃত্যুর পর আত্মার প্রকাশ-ভঙ্গি নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর।**

উপন্যাস গল্প লিখেছেন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত, চিরঞ্জীব সেন, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, অনিশ দেব, বীরু চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর রাহা, উপেন মান্না, কনিষ্ঠ পাণ্ডব, শ্রীপার্থ, বোম্মানা বিশ্বনাথম, জয়ন্ত দত্ত, দেবীপদ মুখোঃ, পূর্ণেন্দু সেন, দ্বৈপায়ন, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোঃ, অঞ্জন রায় আরও অনেকে।

শারদীয়া সংখ্যার লেখকসূচী আগামী সপ্তাহের অমৃতে পাবেন

'শেষ সংকেত' বি. এস. পাবলিকেশনস * ১২৪।১এ মানিকতলা স্ট্রীট কলি-৬

শ্রীনগেশ নিখিলেশকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন। জিগ্যেস করলেন, 'নিখিলেশ। কী ভাবছো?'

কাষ্ঠহাসি হেসে নিখিলেশ বলল, 'ভাবছি সুবাসিনী কতদূর থেকে ফিরে এল। হোটেল থেকে আমার বাড়ি মাইল তিনেক পথ। সঙ্গে গাড়িও রয়েছে। তবু মনে হচ্ছে এ তিন মাইল এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। অতিক্রম করি সে সাহস বা শক্তি নেই। সুবাসিনী ফিরেছে। আমি ফিরি কী করে?'

শ্রীনগেশ নিখিলেশের মুখে এক বর্ণনাতীত ভয়ের প্রকাশ দেখলেন। বললেন, 'কেন ফিরবে না? কে তোমার পথ আটকাবে? তবে তুমি বিচলিত। বিশ্রাম করো। না হয় রাতটা এখানে কাটিয়ে দাও। আমি সুবাসিনীকে জানিয়ে দেব। দরকার হলে তোমার সঙ্গে যাবো।' শ্রীনগেশ উঠলেন। শক্তহাতে নিখিলেশকে ধরে সোফা থেকে তুলে শোবার ঘরে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাকে ভয়? কিসের ভয়? সুবাসিনী তোমার এ কথা ভুলো না। যে তোমার এত আপন তার জন্য ভয় নয় নিখিলেশ। তার জন্য ভালবাসা।'

সুবাসিনীর একটা কথা নিখিলেশের মনে পড়ল। সুবাসিনী বলেছিল, 'যাকে ভালবাসা যায়, ভূত হলেই কি সে পর হয়?' কথাটা বলতে গিয়ে গলায় আটকে গেল। বলতে পারল না। সে শয্যায় আশ্রয় নিল।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙতে নিখিলেশ দেখল সে তার গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে। কখন সে হোটেল থেকে বার হয়ে গাড়িতে উঠেছে টের পায়নি। একি কোনো সুবিন্যস্ত স্বপ্নের দৃশ্য? কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। ডানহাতে হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল হোটেল, বাঁয়ে লোয়ার সার্কুলার রোড বেঁকে উত্তর দিকে গিয়েছে। সম্মুখে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ত্রিমাথা। দেখতে না দেখতে গাড়ি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড ডাইনে ফেলে গুরুসদয় রোড-এ ঢুকলো। ডানধারে জওয়ানদের ক্যাম্প। বাড়ির ফটকে গাড়ি ঢুকলো। নিখিলেশ দেখল বারান্দায় আলো জ্বলছে। সরু একটা থাম-এ ঠেস দিয়ে সুবাসিনী দাঁড়িয়ে।

গাড়ি থামতে সুবাসিনী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলল, 'এসো। কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রেখেছ বলো তো?'

সাহস সঞ্চয় করে নিখিলেশ বলল, 'কেন? শ্রীনগেশ টেলিফোন করেননি?'

সুবাসিনী মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'করেছিলেন। তবে আজকের রাতে কেউ ওরকম টেলিফোন করে?'

নিখিলেশ ধীরে ধীরে নিজেকে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল 'আজকের রাত—আজকের রাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে দেখবে চলো।' সুবাসিনী নিখিলেশকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে শোবার ঘরে নিয়ে গেল। এতদিনের প্রাণ্ত রাতের আলোর স্মারক পরিচিত ঘর। আজ চেনা যায় না। ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। ঘরে ছাতের খিলানে ঝোলানো যে ঝাড় কচিৎ জ্বলে আজ একশ বাতিতে চোখ ঝলসে দিয়ে জ্বলছে। বিছানা চিরদিনের আটপৌরে সাজ খুলে ফেলে রেশমের সার্টিনে চকমক করছে। আজ রাতে তাকে দেখে পুষ্পধনুর বেদী বলে ভ্রম হয়।

নিখিলেশ অবাক হয়ে সুবাসিনীর দিকে তাকালো। সুবাসিনী বলল, 'আজ আমাদের বিয়ের রাত নয়? এতও তুমি ভুলতে পারো?'

নিখিলেশের মনে পড়ে। কী মনে হতে সুবাসিনীর দিকে তাকিয়ে দেখে তার কপালে চন্দনের তিলক। সে সালংকারা। তার বধূবেশ।

সুবাসিনী নিখিলেশের হাত ধরে বলল, 'এসো।'

নিখিলেশ জিগেস করল, 'কোথায়?'

'কোথায় আবার। ড্রেসিংরুমে। আমি একা সাজলেই বুঝি হল। তুমি সাজবে না?'

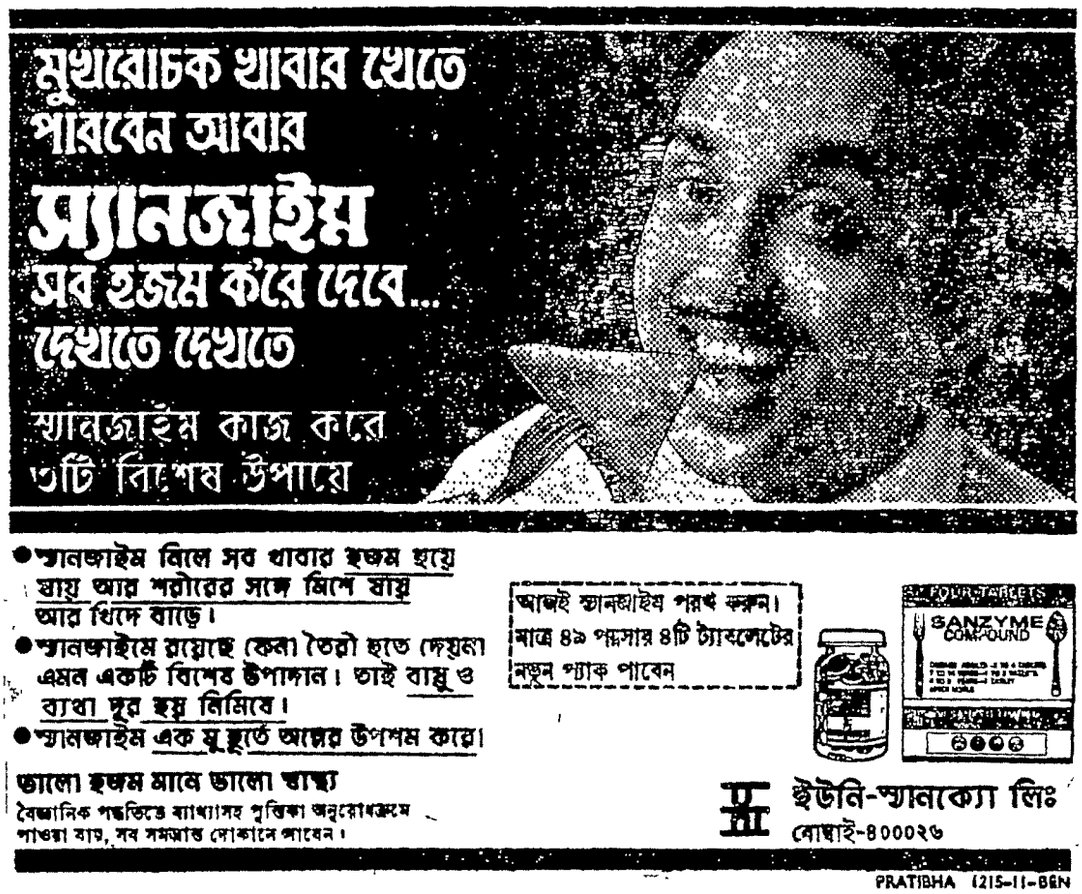

কলিকাতার পরিবেশক ঃ মেসার্স আনন্দ মেডিসিন কোম্পানী, ৭৯/৮০, কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক ঃ মেসার্স প্রেমিয়ার মেডিক্যাল সাপ্লাইজ এন্ড স্টোরস, ৪৪, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বরবেশে নিখিলেশ সুবাসিনীর সঙ্গে শোবার ঘরে এল। বিছানায় উঠে বসে সুবাসিনী নিখিলেশকে পাশে বসালো। নিবিড় অনুরাগে নিখিলেশকে দেখতে দেখতে বলল, 'সেই বিয়ের রাতে দুজনে সেজেছিলাম। তারপর এই দশ বছরে এত কখনো সাজিনি। দুজনে এত চোখভরে কখনো দুজনকে দেখিনি।'

নিখিলেশ বলল, 'আজ রাতে তুমি আমাকে কোনো কঠিন কথা বলতে চাও সুবাসিনী! তাই এত আলো, এত সজ্জা। উৎসব দিয়ে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঢাকতে চাও!'

সুবাসিনীর চোখ জলে ভরে উঠল। কোনোকালে করেনি, আজ সে নিখিলেশকে গড় হয়ে প্রণাম করল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বলল, 'একবার আমাকে বুকে নাও। শেষ কথা বলার সাহস দাও।'

নিখিলেশ অনুভূতির কোনো এক পর্দার সংকেত পেল। বুঝলো আজ রাতে তার ঘরে ইহলোক ও পরলোকের কোনো একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে মিটবে। তার পরিণাম কী হতে পারে ভেবে তার বুক কেঁপে উঠল।

নিখিলেশ বলল, 'শ্রীনগেশ বলছিলেন—'

বাধা দিয়ে সুবাসিনী বলল, 'জানি। কিছুটা হয়তো বুঝেছ। কিন্তু সবটা বুঝবে না। যারা শুধু যায় তারাও বোঝে না। যারা গিয়ে ফেরে, আমার মতো, তারা কজনই বা, তারাই শুধু বোঝে।'

নিখিলেশ চারদিকে তাকালো। এ কি সত্য? চোখের বা কানের ভ্রম নয়? এ কি সুবাসিনী কথা বলছে? তার গলায় অনন্তের সুর এল কী করে? সত্যই কি—

নিখিলেশের চিন্তা বাধা পেল। সুবাসিনী বলল, 'তুমি বাঁচতে বলেছিলে। পারিনি। তাতে আমার হাত ছিল না। কিন্তু ফেরার ব্যাপারে হাত ছিল। ফিরে এলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহলোক থেকে ফেরার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।'

নিখিলেশের এবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। বলল, না। না। শ্রীনগেশকে বলব। পথ বার হবে।'

ম্লান হেসে সুবাসিনী বলল, 'শতকোটি শ্রীনগেশের সাধ্য নয়। কালের অমোঘ বিধান।' একটু থেমে বলল, 'তবু, তবু তোমাকে সঙ্গ দেবার জন্য ফিরে না এসে পারলাম না। ইহলোকে তোমার এই সংসারে কয়েকটা বছর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাসের চেয়ে বেশী নয়। তবু অনন্তকালের আশ্রয় জলাঞ্জলি দিয়ে এলাম। তোমার কাছে না এসে পারলাম না।'

নিখিলেশের কণ্ঠে আত্মগ্লানির সুর বাজলো। বলল, 'আর আমি তোমাকে কি না অবিশ্বাস করতে শুরু করলাম!'

সুবাসিনী বলল, 'বেশ করেছ। হয়তো আমার অভিসন্ধিটের পেয়েছিলে। তাই অবিশ্বাস করে শাস্তি দিয়েছিলে।'

নিখিলেশ হতবুদ্ধি হয়ে বলল, 'অভিসন্ধি! কী অভিসন্ধি!'

সুবাসিনী রুদ্ধকণ্ঠে বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আটকে ফেলব। তোমাকে ফিরিয়ে এনে আমার মতো তোমারও ইহলোক থেকে ফেরার পথ বন্ধ করব। দিনরাত এই চিন্তায় মগ্ন থাকতাম। তোমাকে চোখে চোখে রাখতাম। ভয়ে মরতাম তুমি যদি পালাও, আমাকে ফাঁকি দাও।'

নিখিলেশ বলল, 'আজ রাতে একথা বলছ কেন সুবাসিনী?'

সুবাসিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমার সময় হয়েছে। আজ তুমি খণ্ডকাল থেকে অনন্তকাল-এ যাচ্ছো। তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি যাও। পূর্ণ হও।'

নিখিলেশ বলল, 'তুমি? তুমি কোথায় যাবে সুবাসিনী?'

সুবাসিনী বলল, 'আমি কোথায় যাবো? আমার যাবার জায়গা নেই। আমার মৃত্যু নেই, ক্ষয় নেই। মুক্তি নেই। যে কটা বছর সম্ভব হয় তোমার বাড়ি আগলে থাকবো। তারপর সৃষ্টির চোখের আড়ালে দেশেদেশান্তরে ফিরবো। চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার শেষ আছে। আমার মতো যারা ফিরে আসে তাদের শেষ নেই।'

নিখিলেশ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ে জিগ্যেস করল. 'আমার আর কত সময় আছে সুবাসিনী?'

সুবাসিনী বলল, 'সময় নেই। তৈরী হও। ভেবো না। দুঃখ কোরো না। আমি থাকবো। তোমারই থাকবো।'

নিখিলেশ গম্ভীর হেসে বলল, 'কে বলে থাকবে না। থাকবেই। তবে এখানে নয়। আমার সঙ্গে অনন্তকাল-এ।'

সুবাসিনী ফিসফাস করে বলল, 'তা হয় না। তা হয় না। নিজের শান্তির পথে কাঁটা হোয়ো না।'

নিখিলেশ বলল, 'কেন হবে না? হয়। তুমি আমি কখনো আলাদা ছিলাম না। তুমি আমি এক। এ শহরের সকলেই জানে। যে খবর সাধারণ মানুষ রাখে, বিধাতা রাখেন না? এসো।'

সকালে শ্রীনগেশ নিখিলেশের ঘুম ভাঙাতে গিয়ে তার নিস্পন্দ দেহ আবিষ্কার করেন। নিখিলেশের বাড়িতে সুবাসিনীর ঘরে সকালে চা দিতে গিয়ে বেয়ারা কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে পাশের বাড়িতে খবর দেয়। ফুলশয্যায় সুবাসিনীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার মুখে স্মিত হাসি, অপার্থিব শান্তি।

রাতের চৌকিদার বলে অনেক রাতে সে নিখিলেশকে গাড়ি করে ফটকে ঢুকতে দেখেছিল। তবে সে বাড়ি থেকে আবার বার হয়েছিল কিনা এবং বার হলেও কখন বার হয়েছিল এ বিষয়ে সে কিছুই জানতো না। নিখিলেশের গাড়িটা সকালে হোস্টেলের সম্মুখেই রাখা ছিল।

বিমল মিত্র-র

সর্বাধুনিক উপন্যাস

লজ্জাহরণ ৬·০০

চাণক্য সেন-এর

সর্বাধুনিক উপন্যাস

সবে শুরু ৬·০০

প্রকাশিত হয়েছে

বিশ্ববাণী প্রকাশনী । ৭৯।১এবি মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

সময়ে ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকালে ওদের ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে গেল। এত বেলায় কেউ ওরা ওঠে না। ইরা ঘুম থেকে উঠেই টিপুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডেকেছিল, এই ওঠো। কি বেলা হয়ে গেছে!

টিপু উঠে দরজা খুলে দিয়ে বলেছিল, সত্যি খুব বেলা হয়েছে! রামলাল কত কি না ভাবছে!

ইরা হাসল। কারণ ইরা টিপুর দুঃখটা ধরতে পারে। টিপুর ভাল ঘুম হয়নি। চোখমুখ দেখে ইরা এটা বুঝতে পারল। অথবা টিপু সারারাত হাল্কা একটু স্বপ্নের ভিতর ছিল। ওর ভাবি ইচ্ছা, যেন তার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, টিপু কাল তুমি কি কি স্বপ্ন দেখছিলে। স্বপ্নে আমি কোথাও কি ছিলাম না।

টিপু বলল, আমার সিগারেট প্যাকেটটা দেখেছ!

—আমার ঘরে।

ইরা ওর ঘর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দিলে টিপু বলেছিল, কি পবিত্র পবিত্র লাগছে না!

ইরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে টিপু দুষ্টুমী করতে পারে, সে একটু সরে দাঁড়াল। খুব বেশি দূরে টিপু এগোতে পারছে না এবং বোধহয় সেজন্য টিপু সারা-রাত কাল ঘুমোতে পারেনি, এবং নিজেও ইরা আয়নায় চোখ দেখেছে, ওরও কাল ঘুম হয়নি। এভাবে ঘুম হবার কথা না। যতটা সহজ ভেবেছিল, এখন দেখছে, ততটা সহজ নয়। মনের দিক থেকে সায় থাকছে না। সে ইচ্ছা করলেই সব দিয়ে-থুয়ে সন্ন্যাসিনী হতে পারে, কিন্তু যে মানুষটাকে সে ভেবে বেখেছে তার ভীষণ নিজের, যাকে সে ইচ্ছে করলেই সে কোন সময় নিজের করে নিতে পারে, তাকে সঙ্গে এমন পালিয়ে পালিয়ে গাছপালা খুঁজে বেড়ানো কেমন অবিশ্বাসের। সে বলল, রামলাল দরজা-জানালা খুলে দিচ্ছে।

সুতরাং দরজা জানলা খুলে দিলে ওরা দেখল, সেইসব কোলিয়ারির চিমনি, অথবা ধাওড়া এবং কুলিকামিনদের নেমে যাওয়া, সকাল থেকেই ওরা কাজের জন্য নিচে নেমে যাচ্ছে। ঠিক পিপীলিকার মতো মনে হচ্ছে, আবার কখনও সকালের ঠাণ্ডা বাতাস, কোথাও ধানের চাষ নিচে সবুজ ধানের চারা রোপণ করে চলেছে কেউ। এখনই রামলাল চা দেবে। কাল কেউ আসেনি আলাপ করতে। সকালের দিকে কেউ কেউ আসতে পারে। আজ রববার বলে ছুটির দিন। এবং সে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে নিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর রংয়েরঙের জামা, ঢিলে-ঢালা ট্রাউজার পরে বারান্দায় এসে বসল। এরপর সে জানে ইরা এখন বাথরুমে যাবে। ওর দেরি হবে। রামলাল ইতিমধ্যেই এক কাপ চা রেখে গেছে। বেশ পরিপাটি মনে হচ্ছে নিজেকে, শান্ত-ধীর-বাতাস, লম্বা

লাল নীল পাথরের প্রশস্ত বারান্দা, নানা রকম সোফা সেট এবং যবতীয় আরাম এই অমিতাভর বাংলোতে আর সেই ফুল সব বাগানে ক্রমান্বয়ে ফুটে চলছে। ঝরে পড়ছে। সে চা খেতে খেতে কেমন সুন্দর একটা ফুলের গন্ধ পেয়েছিল।

কি ফুল ফুটছে এখন! সে তো এমন সুন্দর গন্ধ কখনও পায়নি। যেন সে চারপাশে সেই ফুলের সৌরভ খোঁজার জন্য তাকাতে থাকল। এটা কি মাস, এ-মাসে কি কি ফুল ফোটে, ভুঁইচাঁপার এমন সুন্দর গন্ধ হতে পারে, সে এমনসব ভেবে যখন পাশে তাকাল তখন আশ্চর্য ইরা পাশে খুব সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সাজতে সে ইরাকে কখনও দেখেনি। এই অসময়ে সে কেন যে এমন সেজে এল, এবং সে বুঝতে পারছে, মেয়েরা ঋতুমতী হলে গায়ে নানারকম সৌরভ মাখতে ভালবাসে, ইরা সব দামী দামী এসেন্সের ভিতর নিজের শরীরের গন্ধ ভেসে থাকতে দেয় না, এবং এই যে সে ভুইচাপা ফুলের গন্ধ, অথবা বলা যায় সুঘ্রাণ সব পাশের শাড়ি শায়া থেকে, এবং অন্তরালে থাকে কি যে মহিমা, চোখে কি যে থাকে আকর্ষণ, সে ভেবে পায় না এই অসময়ে ইরার এমন সাজগোজ কেন! সে বলল, ইরা এভাবে এভাবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে মরে যাব।

—যাঃ কি যে বলে।

—তুমি এত সুন্দর ইরা!

মেয়েরা প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। টিপুর সেসব মেয়ে ভুলানো কথা আসে না। আসলে ওর যা মনে হয় তাই বলে ফেলে। ইরাকে সে কতবার যে বলেছে, তুমি এত সুন্দর ইরা। ইরা ঠিক সাজগোজ করলেই এটা মনে হয় টিপুর। বড় খোঁপা বাঁধলে, বাঙিন ছাপা শাড়ি পরলে এবং পায়ে আলতা দিলে, সত্যি আর ইরার দিকে তাকানো যায় না। যেন সব দিয়েথুয়ে বনবাসে চলে যেতে ইচ্ছা হয়। এবং বনবাসে থাকবে এক তপোবনের মতো আশ্রম, ইরা সীতা সেজে থাকবে, সে রামচন্দ্র। এবং এসব মনে হলেই সে বলবে, আমি কিন্তু ইরা রামচন্দ্রের পর্ব এখনও ভালো চালিয়ে যাচ্ছি।

ইরা বলল, সীতার পার্ট আমারও খারাপ যাচ্ছে না।

—দেখি কে কতদিন এভাবে থাকতে পারে। টিপু বলেই চোখ তুলে ইরাকে দেখল, কে কত বড় সতী সাবিত্রী দেখব।

—আমিও দেখব, কে কত বড় যুধিষ্ঠির!

—দেখবে।

ইরা বলল, সকালেই দুঃখের কথা আরম্ভ করলে।

—জানো ইরা, আমার রাতে ভাল ঘুম হয়নি।

—ঘুম হয়নি, ডাকলে না কেন?

—ডাকলে কি হত!

—ডাকলে কি হত আবার। বলে মুখ নিচু করে হাসল।

তখন আর টিপুর অভিমান থাকে না। কিছুক্ষণ আগের কথা ওরা একেবারে ভুলে যায়। ওরা যে জেদ ধরে আছে এ-কথা ভুলে যায়। টিপু তবু চায় ইরা নিজে না এলে সে কিছু করবে না। জানালায় সে গত রাতে ইরাকে কাঁদতে দেখেছে, ইরা বোধহয় সত্যি ভয় পেয়েছিল।

অথচ ইরার তো ভয় পাওয়ার কথা না। ইরা এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞ। ওর শিক্ষা-দীক্ষা সব ওকে কেন্দ্র করে, কিসে কি হয় সে জানে, কিসে কতট কষ্ট তাও সে নিশ্চয়ই জানে। এবং কতটা সুখ তার অভিজ্ঞতায় না থাকলেও সে টের পায় মনে মনে। আর ইরা নাবালিকা নয়, যে কিছু বোঝে না জানে না, অথচ নাবালিকার প্রেম হরণে যে ভয় ভীতি ঠিক তা রাতে ইরার চোখেমুখে ধরা পড়েছিল। এবং এমন দেখে মনে মনে টিপু বরং হেসেইছিল। ইরা এ-বয়সেও ভীষণ ছেলে-মানুষ, মেয়েদের বয়স বোধহয় কখনও বাড়ে না। এবং এভাবেই সে ভেবে নিয়েছিল, ইরাকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। ইরার যখন ইচ্ছা হবে, তখনই সে তাকে কাছে টেনে নেবে। জোরজবু করে কিছু করবে না। অথবা নিজে থেকে সে আর ইরাকে বলবে না, আর পারছি না ইরা, আমার কষ্টের শেষ নেই। তুমি পাশে রাত কাটলে সব কষ্ট আমার নিঃশেষে মুছে যাবে। যদিও সে জানে, ইরা না এলেও সে তার কষ্ট নিয়ে রাত যাপন করবে না, সে হয়ত ইরা অথবা তার সংগোপনে এক প্রেম প্রেম খেলা আরম্ভ করে দিলে, একসময় দেখতে পায়, তার কষ্ট লাঘব হচ্ছে, বিন্দু বিন্দু মুক্তাবাজি সারা আকাশময় অথবা ভুবনময় এবং এভাবে কি যে মনোহারি শরীরের সব ক্রিয়াকলাপ সে ভেবে পায় না। এবং পরে সে যখন শান্ত হয়ে যায় এভাবে তখন চোখে ঘুম চলে আসে। ইরাকে সে বুঝতেই দেয় না, সংগোপনে এক প্রেম প্রেম খেলায় সারারাত ধরে সে ইরার শরীর মনে মনে ভোগ করেছে।

ইরা এখন তার সামনে বসে রয়েছে। কাঁচ দিয়ে গেছে রামলাল। কিছু ক্রিমক্রেকার। মচ মচ করে ইরা ভাঙছে, এবং মুখে একটু একটু করে আলতোভাবে ফেলে দিচ্ছে, আর চোখেমুখে ভীষণ দুষ্টুমীভরা চাপা হাসি। যেন টিপু বেশ জব্দ হয়েছে কাল। ওর শাড়ির ভিতর থেকে আশ্চর্য সুন্দর কোমল অংশ খানিকটা নিচু জায়গায় কি যে ধরে থরে সাজানো। এবং মনে হয়, ওর সেই কোমল শরীরে হাত রাখলে ভীষণ ঠাণ্ডা এক ভাব, সে ইরাকে শেষপর্যন্ত না বলে পারল না, আচ্ছা ইরা একটা কথা বলব?

—কী!

—কাল তুমি জানালায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলে কেন?

—কখন কাঁদলাম!

—ভুলে গেছ।

—কি জানি, মনে পড়ে না তো।

—তুমি ইরা আমার সঙ্গে তো ছল করো না কখনও।

—তা তো করি না।

—তবে যে বলছ, কখন-কেঁদেছ!

—কেন যে-এভাবে কান্না গলায় উঠে এল বুঝতে পারি নি।

—সত্যি বুঝতে পারনি? একটু থেমে বলল, বিয়ের আগে এভাবে সত্যি আমাদের আসা উচিত হয়নি।

—না টিপু।

—আমি ভাবলাম আবার, তোমার জোরজার করে কিছু করে ফেলব ভয়ে কাঁদছ!

—তা কাঁদব কেন। আমার তো খুব ইচ্ছে করে। অমিতাভবাবুর এমন সুন্দর বাংলো!

—তবে কাল এলে না কেন!

—কি জানি। কি একটা ভিতরে যে হয়ে গেল। মনে হল, এতদিনের এমন সংগোপনে রাখা, তোমাকে পালিয়ে তা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলে যেন তুমি আমি দুজনেই ছোট হয়ে যাব। তুমি যদি আমার কাছে ছোট হয়ে যাও, তবে আমার কি থাকল! আমি যদি তোমার কাছে ছোট হয়ে যাই তবে তোমার কি থাকল! কিছু হলে, আমি তুমি ছোট হয়ে যাব মনে হয়েছিল আমার। আর তার জন্য ভয়ে ভীষণ কান্না পাচ্ছিল।

—এখন ভয় পাচ্ছে না তো!

—না।

—তবে চল না আমরা বরং কলকাতায় চলে যাই। যেজন্যে আসা, সেটা যখন হচ্ছে না।

—হবে।

—কবে!

—হবে তো বলছি। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে না তো!

—আমি এভাবে কিন্তু রাতের পর রাত একা শুয়ে থাকতে পারব না। নিজের ওপর বিশ্বাস কম। কিছু হয়ে গেলে তুমি আমাকে ভীষণ খারাপ ভাববে।

—খারাপ ভাবব না।

—তবে কাল যে ভেবেছিলে।

—কাল এমন মনে হয়েছিল।

—আজ অথবা যেদিন কিছু হয়ে যাবে, এমন ফের মনে হবে না কে বলতে পারে।

—যখন হবে তখন দেখা যাবে। বলেই ইরা উঠে দাঁড়াল। ইরা খুব সুন্দর করে শাড়ি পরতে জানে। তার অহমিকায় সে নাভির নিচে শাড়ি পরে কাছে এলে টিপুর যে কি হয়। মাথার ভিতর তখন মনে হয় কিছু থাকে না। এবং নিবিড় এক সুষমা ইরার শরীরে। ইরাকে তখন আলতোভাবে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা হয়। চুমু খেতে ইচ্ছা হয়, এবং এই সকালের নীল রোদে ওকে নিবে গালপাতার ভিতর হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়।

ইরা বলল, যাবে?

—কোথায়।

—খোরাইর ধারে। আমরা জল নিয়ে খেলা করব।

—বেলা হবে না! চল। এই রামলাল, আমরা নিচে নেমে যাচ্ছি। আমাদের দশের

সামান্য কফি করে দাও। বেশি কিছু রান্না করবে না। মুরগির মাংস ভাত। আর কিছু না।

এভাবে ওরা নুড়ি-বিছানো জলে নেমে গেল। রেখে গেল দু'পাশে সব ছোট ছোট ফুলের গাছ, নানা রকমর সবুজ অথবা হলুদ রঙের ক্যাকটাস, পাঁচিলের পাশে সেই বড় অশোক গাছ, যার ছায়ায় গভীর শান্তির প্রবাহ। যেন সব মিলে নিচে, আরও নিচে ওদের নিয়ে যাচ্ছে। এবং ওপরে যেসব বাংলো বাড়ির জানালা, এবং ফুল ফলের গাছের ছায়ায় যেসব ঝুল-বারান্দা অথবা ছোট্ট এক উপত্যকা, সেখানে যেন গভীর মমতার স্পর্শ, ওরা দেখতে পাচ্ছে, একাউন্টস্ অফিসার অমিতাভবাবুর বন্ধু এবং বন্ধু-স্ত্রী নিচে কেমন ছেলেমানুষের মতো ছুটে ছুটে হেঁটে যাচ্ছে। বয়সে এমন হয়, যাদের বয়েস আছে, ওরা ভাবল, সময় হলে ওরাও যাবে কোথাও এবং এভাবে নেমে যাবে, আর যাদের বয়স গেছে ওরা দেখল, সামনের যে ঢালু জমি সহসা যেন আশ্চর্য রকমের সজীব হয়ে গেছে। ওরা আর এভাবে কোনদিন নামতে পারবে না।

ইরা ডাকল, হেই। ওরা আমাদের দেখছে। ওরা কিন্তু সত্যি ভাবছে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

টিপু বলল, এই থামো। আমার হবু বৌ বড় ছুটছে।

—তুমি কী!

—আমি কী!

—আমার সঙ্গে পারছ না!

টিপু বলল, পেছনে সবাই দেখছে।

—দেখুক।

টিপু বলল, আমরা আর ফিরে যাব না।

ইরা বলল, আমিও না।

—কোথায় থাকব।

—কোনো বনের ভিতর।

—কি খাব?

—ফলমূল।

—কোথায় শোব?

—গাছের ছায়ায়, পাথরের ওপর। অথবা কোন গুহা পেয়ে যাব ঠিক।

—সত্যি কি সুন্দর সব পাহাড় সামনে। যাবে একদিন?

—কবে?

—যেদিন খুশি।

ওরা এভাবে সামনে নেমে যাচ্ছিল। ক্রমে ধাপে ধাপে জমি নেমে গেছে। কোথাও আল বেঁধে রাখা হয়েছে। বৃষ্টির জল জমানো হয়েছে। চাষাবাদের কাজ আরম্ভ হবে, কোথাও আরম্ভ হয়ে গেছে। কোথাও নানারকম সবজি, যেমন পটলের লতা, খরমুজের লতা আর নীল রঙের পটল দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইরা বলল, পটল ভাজা খাব।

টিপু ছুটে নেমে গেল আর বলল, যাবার সময় তুলে নিয়ে যাব।

ইরা ঠিক খোয়াইর পাশে গিয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তারপর হেঁকে বলল, লোকে জানতে পারলে মারবে।

—মারবে কেন?

—চুরি করলে মারবে না!

—অঃ। ব্যাপারটা সহজেই বোধগম্য হলে কোন আর অশ্লীলতা থাকে না, আসলে এই হয় বুঝি। মানুষের এবং টিপুর মনে হয়, কেউ নেই, এমনকি খোদ সেই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরেরও সাধ্য নেই সামান্য অশালীন না হয়ে, দ্রৌপদীর গোটা ব্যাপারটা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। সে বলল, আচ্ছা ইরা তোমার যদি পঞ্চপাণ্ডব থাকে, পারবে তুমি?

—পারব না কেন!

—পারবে বলছ!

—খু-উ-ব। বলেই হা হা করে হেসে দাঁতে ঘাস কাটতে থাকল। ইরা যে বাইরে এসে এমন হালকা এবং সুগন্ধী হয়ে যাবে, এবং চঞ্চল, সে তো দেখেছে ইরা গম্ভীর, গম্ভীর থাকলে ইরাকে ডাক্তার বাদে আর কিছু ভাবা যায় না। এবং ইরার পক্ষে এমন একটি প্রফেসানই যেন মানিয়েছে। অথচ এখানে ইরা নাবালিকার মতো উচ্ছল। টিপু ঘাসের ভিতর চিৎকার করে বলল, আমি মরে যাব ইরা।

—আমিও মরে যাব টিপু। তারপরই ইরা ঘাসের ভিতর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পা দুটো ঝুলিয়ে দিল নিচে। একটু চেষ্টা করলেই পায়ের আঙ্গুলে জল লেগে যাচ্ছে। আর কি নিদারুণ আকাশ। এবং রোদ বলতে তেমন কিছু নেই। খণ্ড খণ্ড মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে। বাধহয় রাতে অথবা কখনও কোথাও ভীষণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, বেশ ঠাণ্ডা বাতাস, বোদ ভীষণ ভাল লাগছে। মনেই হয় না জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের বোদ। এবং পাহাড়ী এলাকাতে বৃষ্টিপাত ঘটলে বোধহয় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। ইরা এভাবে যখন আকাশ দেখছিল, পায়ে খোয়াইর জল লাগছিল আর উঁচুতে সেই সব পাহাড়শ্রেণী সারি সারি এবং আরও নিচে তাকালে একটা সমান্তরাল রেখা, শাড়ির পাড়ের মতো হুবহু এই উপত্যকাকে মনোহারিণী করে রেখেছে, তখন চোখ বুজে আসছিল ইরার। টিপু চুপচাপ পাশে বসে রয়েছে। পায়ের কাছে খোয়াইর জল নির্মল জলের রেখা এঁকে-বেঁকে ক্রমে উপত্যকার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর কি যে সুন্দর দৃশ্য এভাবে চারপাশে, ইরা জলে কিছুটা পা ডুবিয়ে রেখেছে, সে জলে পা নাচাচ্ছে, আর জলে কখনও ওদের প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব ভেঙে ভেঙে জলের ছায়ায়, নিচে, আরও নিচে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেসে যাচ্ছে। ইরা এবং টিপু দেখল, জলে পা ডোবালে প্রতিবিম্ব ভেঙে যায়, ভেসে যায়। ওরা চুপচাপ উপত্যকার এই ধানসিঁড়ি জমিতে বসে কত কিছু ভাবল। এমন উদার আকাশের নিচে সারাজীবন যেন এভাবে বসে থাকা যায়। ভাবল, এভাবে পৃথিবী কেন সবার কাছে শেষ হয়ে যায় না। ইরা বলল, কি ভাবছ?

টিপু বলল, কিছু না।

—না, কিছু ঠিক ভাবছ।

—সত্যি বলছি কিছু না।

—এখানে মিথ্যা কথা বললে পাপ হবে।

—কেন পাপ হবে।

—আমরা তো আর কখনও এভাবে আসতে পারব না।

—কি যে বল।

—সত্যি বলছি। এবারে গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলব। অনেকদিন তোমাকে অপেক্ষায় রেখেছি। আমিও এভাবে আর বেশিদিন থাকতে পারছি না।

—কি যে মজা হবে।

—সত্যি বলছ মজা হবে?

—হবে না!

—কি হবে?

—আমি তো ভাবতেই পারি না একটা আস্ত মেয়ে আমার পাশে, আমাকে জড়িয়ে রাতে, সারারাত, সারাজীবন...না না ভাবতে পারছি না!

—সত্যি ভাবতে পারছ না।

—সত্যি পারছি না। স্বপ্নের মতো।

—সত্য হবে বলে মনে হয় না!

—না।

ইরা টিপুর হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বলল, আমার আর আপত্তি নেই।

—সত্যি!

—সত্যি।

সরল বালকের মতো টিপু ঘাসের ভিতর তখন চুপ করে ডুবে গেল। ইরা, পৃথিবীর শব্দ গন্ধ সব তোমার আঁচলে বাঁধা। আমাকে দাও। তারপর সে, সব শব্দ গন্ধ ইরার শরীরে ঘাসের সবুজ আভাষ, খোয়াইর নির্মল জলে সন্ধান করে বেড়াতে থাকল। আর শরীরে টিপু টের পাচ্ছে এক মহামহিম ইচ্ছা, আহা কি যে আপন আর নিজস্ব। লজ্জায় ইরা মুখ দু'হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে। টিপু সবুজ ঘাসে অলৌকিক দ্বীপের মতো কোনো ভূখণ্ড কেবল হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যেন নাগাল পাচ্ছে না। এবং একমাত্র ঈশ্বর তার প্রতিদ্বন্দ্বী এমন ভাবছে। সে বলল, ইরা ঈশ্বর আমাকে হিংসা করছেন। আমি পাচ্ছি না। সময়ে বুঝি ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ইরার কি যে হয়ে যায়, গভীরেকি যে থাকে এবং সে কেমন ঘাস মাটির মতো এক সুনিবিড় ইচ্ছায় ডুবে গিয়ে বলে, টিপু, আমার টিপু, আমি এখানে। বলে সে টিপুর কাছে শান্ত ধরণীর মতো নিজেকে খুলে দিল। আজীবন প্রোথিত হবার বাসনা রীজের। ঘাসেরা এখন আমূল প্রোথিত হতে হতে আপন মহিমায় পৃথিবীকে কি যে আশ্চর্য সুন্দর করে ফেলছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন

প্রবুদ্ধনাথ রায়*

প্রাক ইংরেজ যুগ

ইংরেজরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে পদার্পণ করে তখন সম্পদে বঙ্গদেশের স্থান ছিল শীর্ষে। এমন ঐতিহাসিক নজিরও আছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গদেশের ঐশ্বর্য বৃটেনের খাতককেও ম্লান করে দিয়েছিল। তুলনামূলক বিচারে তদানীন্তন বঙ্গদেশের রাজধানী মুর্শিদাবাদের বিত্তবৈভব নাকি ছিল লন্ডনগরীর চেয়েও বেশী। এ তো ক্লাইভ সাহেব নিজেই স্বীকার করে গেছেন। বস্তুতপক্ষে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হলেও বঙ্গদেশের আকর্ষণ ইংরেজদের কাছে ছিল অনেক বেশী। কি শিল্প কি আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্যে তৎকালীন বঙ্গদেশের তুলনা দুর্লভ। এই উন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি শুধু যে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যেই সম্ভব হয়েছিল তা মনে হয় না। সঙ্গে ছিল বঙ্গবাসীর শ্রমপ্রবণতা ও নির্ভীকতা। নদীমাতৃক বঙ্গদেশের উর্বর ভূমি যেমন একদিকে শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধি এনেছিল তেমনি বাঙ্গালীর শিল্প প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেছিল। তৎকালীন বাংলার প্রধান দুটি শিল্পের (তুলা ও রেশমের) বাজার তখন শুধু ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নয় বাইরেও প্রসারিত ছিল। রপ্তানি বাণিজ্যে বঙ্গদেশ তখন ছিল বিশেষ সমৃদ্ধ। বঙ্গোপসাগর ভৌগোলিক অবস্থানও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে ছিল বিশেষ অনুকূল। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য নদী মারফৎ বাণিজ্য চলত প্রচুর। উত্তর ভারতের অধিকাংশ বাণিজ্যই ছিল বঙ্গদেশনির্ভর। বহু শতাব্দী ধরে তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ছিল বঙ্গদেশের দুটি কর্মমুখর বন্দর। তাছাড়া এ দুটি বন্দর ছিল জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র। এইসব জাহাজেই বহু পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি হত। তুলা ও রেশম শিল্পের জন্য কাঁচা তুলা ও রেশমের চাহিদা বঙ্গদেশ নিজেই মেটাতে পারত। তুলাশিল্পের প্রসার ছিল প্রায় সবকটি জেলাতেই। রেশম শিল্পের প্রসার ছিল কিছুটা কম। বিশ্ববিখ্যাত ঢাকাই মসলিনের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। দেশজ গাছগাছড়া থেকে বস্ত্রশিল্পের জন্য রং তৈরী হত, নীলচাষের ইতিহাস তো সর্বজনবিদিত। এ ছাড়া ছিল চিনি, নুন ও শোরা শিল্প। এসব থেকে তৈরী জিনিসপত্রও বাইরে রপ্তানি হত। রপ্তানি বাণিজ্যে বঙ্গদেশের উদ্বৃত্ত হত বিনিময়ে বিদেশ থেকে বঙ্গদেশে আসত সোনা ও অন্যান্য রত্ন। শিল্পে বঙ্গদেশের সুনাম ছিল তুলনাহীন। বঙ্গের রেশমশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত বৃটেনের অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে শেষ পর্যন্ত ১৭০১ সালে ইংরেজরা তাদের দেশে বঙ্গদেশ থেকে রেশম সামগ্রীর আমদানি একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

ইংরেজ যুগ

ইংরেজ যুগে বাংলার ইতিহাস সর্বাত্মক আর্থিক শোষণের এক লোমহর্ষক ইতিহাস। প্রাক-ইংরেজ যুগেও বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থা কখন কখন বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হয়নি এমন নয়। আরব-শক্তির অভ্যুদয়ের পর জলপথে বাণিজ্য অনেক সময়েই বিঘ্নিত হয়েছে। পর্তুগীজ ও আরাকান জলদস্যুদের উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গামার মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে আর্থিক দুর্গতি। কিন্তু বৃটিশ যুগে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যে যে সুপরিকল্পিত বিনাশসাধনের প্রচেষ্টা শুরু হয় তার কোন তুলনা নেই। ১৬৫০ খৃঃ হুগলীতে ইংরেজদের প্রথম বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তারপর এই কেন্দ্র ১৬৯০ খৃঃ নাগাদ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৭১৭ খৃঃ দিল্লির মোগল দরবারের এক ফরমানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের যে অধিকার লাভ করে তাকেই অসদুপায়ে কাজে লাগিয়ে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলার নবাবের অর্থভাণ্ডারের প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। ১৭৫৭ খৃঃ সিরাজদ্দৌল্লার পতনের কয়েক বছর পর ১৭৬৫ খৃঃ ইংরেজরা বঙ্গ দেশের দেওয়ানী অর্থাৎ সর্বময় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করে। এরপরই শুরু হয় বঙ্গশিল্পের ধ্বংসসাধন। রেশম ও তুলা শিল্পের কারিগরদের কোম্পানি কর্তৃপক্ষ বলপূর্বক নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করে। এই কারিগরদের ইংরেজ ব্যবসাদারদের কাছ থেকেই কাঁচামাল কিনতে হত এবং তাদের কাছেই তৈরী মাল বিক্রি করতে হত। ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের সূচনা ১৭৭০ খৃঃ। কোন কোন লেখকের মতে বাংলার লুণ্ঠিত ধনসম্পদই এই শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি রচনা করেছিল। তাছাড়া শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে যে বাড়তি উৎপাদন শুরু হল তার জন্য অন্যতম প্রধান বাজার ছিল এই বঙ্গদেশ। বিনাশুল্কে ইংলণ্ডের পণ্যসামগ্রী বঙ্গদেশে আমদানি হত আর বঙ্গদেশের শিল্পসামগ্রী চড়া শুল্কে ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ করত। পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বাংলার তুলা, রেশম, চিনি, নুন, রং এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাক-ইংরেজ যুগে যে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য ছিল তার অবসান হয়েছে এবং শিল্প থেকে বিতাড়িত শ্রমিক কৃষিকে ভারাক্রান্ত করেছে। বাংলার অর্থ-নৈতিক কাঠামোর ওপর এই ভারসাম্যহানির ফলাফল কতখানি সুদূরপ্রসারী হয়েছে তা আজ সকলেরই জানা আছে।

*কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার। এম আই টি-তে অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসনের অধীনে গবেষণা করেছিলেন।

শৈলেন রায়ের উপন্যাস

তরাই ১০-০০

নির্বিকার মুখে জবাব দিলাম, 'আকাশের তারা গুণছি।' টোপাদি ছাদের কোণায় সরে গিয়ে পানের পিক ফেলে এসে হেসে বলল, 'কটা গুণলি?'

'তিনটে।'

টোপাদি হেসে গড়িয়ে পড়ল। 'মাত্র তিনটে? এত তারা আকাশে আর মাত্র তিনটে তারা গুণলি তুই?'

গম্ভীর মুখে বললাম, 'আমার আকাশে তিনটে তারা।'

সোনালী দুপুর ৪-০০

যুদ্ধের চরম ক্ষতিকর অধ্যায় কোনটা জানিস অসীম? লোকের জীবন বিনাশ হওয়া না কিংবা বাড়ি-ঘর রাস্তা-ঘাট ধ্বংস হয়ে যাওয়া না। কিছু লোক মরে গেলে একটা দেশের কী আর হয়! আবার নতুন মানুষ জন্মায় শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে মনুষ্যত্ব নিঃশেষ হয়ে যায় সেখানকার শূন্যতা বড় ভয়ঙ্কর।

বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

শিল্পবিনাশের পর শুরু হল কৃষি-বিনাশ। নীলচাষের প্রবর্তন ১৭৭১ খৃঃ। বাংলার কৃষককুলকে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হল। ব্রিটেন ও ইউরোপের রং-এর ঊর্ধ্বমুখী চাহিদা মেটাবার জন্য বাংলার কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর শুরু হল কঠোর নির্যাতন। এই নির্যাতনের প্রতিবাদেই ১৮৫৯ খৃঃ জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। রাসায়নিক-প্রক্রিয়ায় রং তৈরীর পদ্ধতি প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত নীল চাষের অবসান ঘটেনি।

এরপর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়ে পাট ও চায়ের ওপর। এক্ষেত্রেও চাষীরা সর্বস্ব হারিয়েছে আর মুনাফা লুটেছে ব্যবসায়ীরা। বৃটেনের শ্রেজাজমর্জি অনুযায়ী বাংলার শস্যোৎপাদনের ধরন-ধারণ নির্ধারিত হয়েছে। নীল, পাট ও চায়ের চাষের ব্যাপকতায় ধীরে ধীরে তুলা চাষের অবসান ঘটেছে। শস্যোৎপাদনে পরিবর্তন ঘটাতে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছে জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে আর কর্ণওয়ালিশ সাহেবের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এই জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টিতে দিয়েছে সরাসরি সাহায্য।

ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির তালিকায় শিল্পের ধ্বংসসাধন এবং কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তনই শেষ কথা নয়। এর পর আছে রাজস্ব আদায়ের বিচিত্র পদ্ধতি। কোম্পানির আমলে করব্যবস্থা থেকে যে রাজস্ব আদায় হত তার একটা অংশ দিয়েই বৃটেন বঙ্গদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যসামগ্রীর ব্যয়ভার বহন করত। অর্থাৎ ইংরেজরা বিনামূল্যে বঙ্গদেশ থেকে আমদানি করত। অপরপক্ষে বাঙালীকে বৃটিশ পণ্য কিনতে হত মুনাফালোভী ইংরেজ ব্যবসায়ীদ্বারা নির্ধারিত দরে। মন্টগোমারি মার্টিন সাহেবের উক্তিতে পাওয়া যায় যে বাংলা থেকে বৃটেনে ত্রিশ বৎসরে প্রায় ৭২৪ কোটি টাকার মুনাফা পাচার হয়। পরবর্তীকালে এই প্রকাণ্ড মুনাফার একটি অংশ রেলপথ নির্মাণ ও জনকল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগের জন্য চড়া সুদের হারে অবশ্য ভারতেই ফিরে এসেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা দ্রুত এগিয়ে চলে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইএ ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এই দুটি প্রদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের হাল ভাল ছিল না। তাছাড়া এই প্রদেশ দুটিতে প্রশাসনজনিত ব্যয়ভারও ছিল বিপুল। বাংলা থেকে এখানে রপ্তানির পরিমাণ আমদানির চেয়ে অনেক বেশী ছিল। বাংলার এই উদ্বৃত্ত রপ্তানি ইংরেজ সরকার সুপরিকল্পিত উপায়ে ঐ দুটি প্রদেশের অনগ্রসর বৈষয়িক ব্যবস্থা সামলাতে নিয়োজিত করেছিল। জন কোম্পানি অ্যাট ওয়ার্ক বইটিতে হলডেন ফারবার লিখেছেন ১৭৮৩-৮৭ খৃঃ বাংলা থেকে মাদ্রাজে ভরতুকি গেছে এক কোটি টাকার। এই ভরতুকি নিয়মিতভাবেই যেত। অথচ মাদ্রাজের উন্নতির কোন লক্ষণই দেখা যায়নি। ১৭৯০-৯১ খৃঃ মাদ্রাজে ব্যয় হয় ৫০ লক্ষ প্যাগোডা (১ প্যাগোডা—৮ শিলিং তখনকার বিনিময় হারে) অর্থাৎ তখনকার ২০ কোটি বাংলা টাকা। এতে বাংলার দান ছিল তিন-চতুর্থাংশ। বাংলা থেকে বোম্বাইতে ভরতুকির পরিমাণও প্রায় অনুরূপ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকারী আয়ব্যয় নীতি সম্পর্কে ইংরেজদের নিজেদের স্বীকৃতিতেই পাওয়া যায় যে সাম্রাজ্যের রাজস্বে বাংলাকে সব সময়েই তার দেয় অংশের চেয়ে বেশী দিতে হয়েছে, অথচ, সাম্রাজ্যিক তহবিল থেকে সামরিক, প্রশাসনিক ও বৈষয়িক ব্যয় বাবদ প্রদেশ-গুলো যে মঞ্জুরী পেত তাতে বাংলার অংশ প্রাপ্যের এক-চতুর্থাংশও হয়নি। রাজস্বে বাংলার প্রায় সব সময়েই থাকত উদ্বৃত্ত আর অন্যান্য প্রদেশের ঘাটতি। অতএব ইংরেজ সরকার বাংলায় অর্জিত উদ্বৃত্তের সাহায্যেই অন্যান্য প্রদেশের ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ পর্যন্ত বাংলার নূনশিল্প প্রদেশের সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারত। এমন কি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কিছুটা চাহিদাও বাংলার নূনেই মিটত। অথচ এই শিল্প ইংরেজ জাহাজমালিকদের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাংলা থেকে মাদ্রাজে জাহাজ বোঝাই হয়ে যাল যেত অথচ জাহাজগুলোকে বাংলায় ফিরতে হত শূন্য হাতে। জাহাজ-মালিকরা বললেন মাদ্রাজের নূন বাংলায় পাঠানো হোক। তাতে আর জাহাজগুলোকে শূন্য ফিরতে হবে না। ফলে মাদ্রাজে নূনশিল্পের উন্নতি সুরু হল এবং বাংলার নূনশিল্পের হল অবসান। এই জাহাজ-মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে বাংলার আরেকটি শিল্প ধ্বংসের কবলে পড়ে। জাভা থেকে বাংলায় চিনি আমদানিতে ইংরেজ সরকার কোন বাধানিষেধ আরোপ করেনি। ফলে চিনি শিল্পও ধীরে ধীরে বাংলা থেকে লোপ পায়।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝতে পারা যাবে কিভাবে প্রাক-ইংরেজযুগের বাংলার বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক কাঠামো, যে কাঠামো কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে ইংরেজ নীতির ফলে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যায়। শিল্প উন্নয়নে সেকালে বাঙালীর শ্রম বা উদ্যোগের কোন অভাব ঘটেনি। ইংরেজ-দের আবির্ভাবের পর সহজবোধ্য কারণেই সেই শ্রম ও উদ্যোগে ভাটা পড়েছিল। তবু একথা বলা চলে না যে ইংরেজ আমলে বাঙালী উদ্যোগের কোন পরিচয় মেলে না। একাধিক ক্ষেত্রে সে উদ্যোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্যোগী বাঙালীদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা ছিলেন শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৩০ খৃঃ ও ১৮৪০ খৃঃ দ্বারকানাথ ইউরোপীয় ব্যব-সায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতায় নেমেছেন। ১৮২৯ খৃঃ তিনি ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া কয়লাশিল্পের তিনি অন্য-তম পথিকৃৎ। তাঁর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত খনিগুলোর সমন্বয়েই গড়ে ওঠে বেঙ্গল কোল কোম্পানী। দ্বারকানাথ ভাবতীয় নদী-পথে বাষ্পীয় যান ব্যবহারেও পরম উৎসাহ দেখিয়েছেন। তিনি ম্যানেজিং এজেন্সী সিসটেমের স্রষ্টা বলেও আধুনিককালে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে নীলকমল সেনের নাম শুনতে পাওয়া যায়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের পর বাঙালী উদ্যোগী ও ব্যবসায়ীদের মনে স্বভাবতঃই ইংরেজ সহযোগিতার ভালমন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। তথাপি ১৮৬০ খৃঃ পাট রপ্তানি ব্যবসায়ে এম এম বসাক অ্যান্ড ব্রাদার্স প্লেফেয়ার ডানকান অ্যান্ড কোম্পানির পার্ট-নার ছিল। কিন্তু তখন লন্ডন ধীরে ধীরে বিশ্বমুদ্রার বাজারের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল। ফলে ইংরেজরা অনায়াসেই

• সবরকম মডেল পাবেন
তাছাড়া পাবেন : রেডিওগ্রাম স্টিরিও সিস্টেম, রেফ্রিজারেটর এইচ এম ভি রেকর্ড ও প্লেয়ার (রেকর্ড শুধু থিয়েটার রোডে) টেপ রেকর্ডার প্রভৃতি।
জি রজার্স অ্যাণ্ড কোং
শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত শো-রুম :
১২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট
কলিকাতা-১ • ২৩-৫৪৮৩
৫১, থিয়েটার রোড,
কলিকাতা-১৭ • ৪৪-০৭৭১
Progressive/GR-1/72

তাদের বাঙালী সহকারীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে একমাত্র স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ছাড়া বিশেষ কোন বাঙালীর কথা শোনা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ডাক্তার নীলরতন সরকার ন্যাশনাল ট্যানারী এবং ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং বৈকুণ্ঠ সেন ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস স্থাপন করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালী উদ্যোগে সাধারণভাবে যে ভাটা পড়েছিল বলে মনে হয়, তার কারণ প্রধানত ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ব্যবসায়ীদের পক্ষে বাণিজ্য বা শিল্পের চেয়ে জমিদারি ক্রয়ে অর্থ-বিনিয়োগ বেশী লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। আবার একথাও সত্যি যে ব্যাঙ্কিং, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংরেজরা ভারতীয় বিতাড়নের যে নীতি গ্রহণ করেছিল বাঙালীরাও তার কবলে পড়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিল। একথাও অনেকে বলে থাকেন যে, বাঙালীর শিল্পোদ্যোগের অভাবের একটি উৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত নজির হোল এই যে, বাংলার পাটশিল্প বিদেশী শিল্পপতিদের প্রচেষ্টার ফল এবং মহারাষ্ট্রের বা গুজরাটের তুলাশিল্প ভারতীয় উদ্যোগের ফল। যে পাট উৎপাদনে বাংলার প্রায় একচেটিয়া স্থান ছিল সেই পাটের ভিত্তিতে বাঙালী শিল্প গড়তে পারেনি। অথচ যে তুলার উৎপাদনে মহারাষ্ট্র বা গুজরাটের কোনক্রমেই একচেটিয়া স্থান ছিল না তার ভিত্তিতে অবাঙালী উদ্যোগ শিল্প-পত্তনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। বিষয়টা একটু তলিয়ে দেখা যাক। প্রথমত পাট ও তুলার মধ্যে দ্রব্যগত বৈশিষ্ট্যের প্রভেদটা বহু তার্কিকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। পাট মুখ্যত রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী এবং পাটজাত দ্রব্যের বাজার প্রধানত বিদেশে। পক্ষান্তরে তুলা এবং তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদা প্রধানত স্বদেশে এবং সেই কারণে বাজারও স্বদেশে। বিদেশী বাজার-নির্ভর দ্রব্যে বিনিয়োগের ঝুঁকি স্বাভাবিক কারণেই বেশী। বাংলার রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল ইংরেজদের। দ্বিতীয়তঃ পাট-শিল্প পত্তনের প্রাথমিক ব্যয়ভার অত্যন্ত বেশী। আর্থিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য একটি মিল স্থাপনের খরচ কম করে ২০ লক্ষ টাকা। অবশ্য তুলার ক্ষেত্রেও তুলাজাত দ্রব্যের মিল স্থাপনের খরচ এর থেকে কম নয়। কিন্তু ঝুঁকি কম। তৃতীয়তঃ পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে উৎকৃষ্ট জাতের তুলা উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তুলাশিল্প বৃটিশ আমলে গড়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রতি ইংরেজ-নীতির বৈষম্য লক্ষ্যণীয়। পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ শিল্পই রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। ইংরেজরা পূর্বাঞ্চলেই প্রথম ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে। এই অঞ্চলে ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্সিগুলোর উৎপত্তির বিশেষত্ব ছিল ম্যানেজিং এজেন্টরা সুরুতে ছিলেন বণিক ঠিকাদার বা ঋণদাতা। পরে এরা শিল্পে বিনিয়োগের কথা ভেবেছেন। আর এই শিল্পগুলো যেহেতু বেশীর ভাগই ছিল রপ্তানিনির্ভর শিল্প, এদের ভবিষ্যৎ এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করত বিশ্ববাণিজ্যের ক্রম-বর্ধমান আয়তনের ওপর। সে কারণে ইংরেজরা সবসময়েই বহির্বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে তৎপর ছিল। আর এই কারণেই স্বদেশী উদ্যোগের পক্ষে এই অঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ তেমন লাভ-জনক ছিল না। তাছাড়া নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজ সরকার এই অঞ্চলের শিল্পগুলোকে একচেটিয়া সরকারী সমর্থন বরাবর দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও শিল্পপতিগোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা ছিল অনেক বেশী —এদের যুগ্ম প্রচেষ্টাই ছিল ভারতীয়দের শিল্পে বা বাণিজ্যে সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ না করা। এই প্রচেষ্টার সাফল্যও এই অঞ্চলেই বেশী সম্ভব ছিল, কারণ এখানেই ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ ছিল সুদৃঢ়।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা থাকলে এই প্রদেশের আর্থিক উন্নতি বা অবনতির হার পরি-কল্পনার বহুবগুলোতে কেমন হয়েছে বুঝতে সুবিধে হবে। দেশ বিভাগের পর এই প্রদেশের আয়তন দাঁড়ায় ভারতে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম অথচ জনসংখ্যার বিচারে ভারতে পঞ্চম। জনসংখ্যার ঘনত্বে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান ছিল কেরালার পরেই সবচেয়ে বেশী এবং ভারতীয় গড়ের অনেক ওপরে। এই প্রকার ঘনত্বের একটা বিশেষ কারণ হল পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে জীবিকাসন্ধানী মানুষের ভীড়। ১৯৪৭ খৃঃ মাথাপিছু আয়ে পশ্চিমবঙ্গ ছিল শীর্ষে। ১৯৫০ খৃঃ এও ভারতের নীট জাতীয় উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের দানের শতকরা হার ছিল দ্বিতীয়। (পশ্চিমবঙ্গ ১১-৬ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ১১-১ শতাংশ। অবশ্য মনে রাখতে হবে উত্তরপ্রদেশ আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের তিনগুণ আর জনসংখ্যায় আড়াইগুণ। এই বছরেই শিল্প উৎপাদনে পশ্চিম বাংলার স্থান ছিল মহা-রাষ্ট্রের নীচেই কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য একত্র করলে এর স্থান দাঁড়ায় মহা-রাষ্ট্রের ওপরে। কৃষি উৎপাদনে স্থান ছিল দ্বিতীয়। ১৯৪৮-৪৯ খৃঃ শিল্পে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ৬২৩,২০৭, পশ্চিম বাংলায় ৬০১,৭৭২। ১৯৫১ খৃঃ পশ্চিম বাংলায় বিধি-বদ্ধ কারখানার সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী, স্থায়ী মূলধন পশ্চিম বাংলায় ৭৩ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রে ৭৯ কোটি টাকা, চলতি মূলধন পশ্চিম বাংলায় ৯০ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রে ১৫৮ কোটি টাকা। ১৯৪৭ খৃঃ কর্মীর মাথাপিছু কারসরিক আয় মহা-রাষ্ট্রে ১,৪০৮ টাকা আর পশ্চিম বাংলায় ১,০১৩ টাকা।

পরিকল্পনার দশ বৎসরেই পশ্চিম-বাংলা বিভিন্ন দিক থেকে অন্যান্য রাজ্যের পেছনে পড়তে থাকে। ১৯৫৫ খৃঃ মাথা-পিছু আয়ে পশ্চিম বাংলা সবচেয়ে এগিয়ে ছিল, ১৯৬১ খৃঃ এ ব্যাপারে মহারাষ্ট্রের স্থান প্রথম। পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয়। ঐ দশ বছরে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে মাথা-পিছু আয়ের বৃদ্ধি দেখিয়েছে। যথা, তামিলনাড়ু শতকরা ৪০-৫, মহারাষ্ট্র ২৮-৪, বিহার ২২-৯, পাঞ্জাব ১-১ এবং গুজরাট ৫-৭। সর্বভারতীয় গড় ১৩-৭। পশ্চিম বাংলায় এতে অবনতি শতকরা ২ শতাংশ, আসামে ১-৮ শতাংশ। ১৯৬১ খৃঃ পশ্চিম বাংলায় বিধিবদ্ধ কারখানার

ম্যাকসিম গর্কীর

কিম সামঘিন ১২

১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের পটভূমি ও আগের প্রেক্ষাপটে লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস

রমাঁ রঁলার

বিমুগ্ধ আত্মা ১৮

জাঁ ক্রিসতফ ১৮·০০

(১ ০ ৪ ৫ পৃষ্ঠা)

(২য় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে)

মূলক রাজ আনন্দের

দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি ৬॥

অচ্ছুৎ ৩, কুলি ৫॥

এক রাজার কাহিনী ৭·৫০

পদবেল লরকনিৎকীর

নিশো ৭॥

(পামীর অঞ্চলের উপজাতি-জীবনের ওপর উপন্যাস)

বোজেনা নেমসোভার

বাবিচ্‌কা ৬·২৫

ইভ কুরীর

মাদাম কুরী ১১

পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন ঃ

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব

৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২ আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

সংখ্যা ১৩৭৩, মহারাষ্ট্রে ১৭২৪, গুজরাটে ৭৭১। পরিকল্পনার প্রথম দশকে পশ্চিম বাংলার কৃষি উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১২-২ শতাংশ, অথচ মহারাষ্ট্রে ৬৬-৫ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৬১-২ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৫০-২ শতাংশ, পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ৩৫-৮ শতাংশ।

১৯৫৯ খৃঃ মূল বৎসর ধরে কারখানাজাত উৎপাদনের ১৯৬৬র সূচক যদিও পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে ২৪৩, ভারতের ক্ষেত্রে সেই সূচক ২৬৮। অতএব ভারতের তুলনায় পশ্চিম বাংলার উৎপাদন-হার মোটেই আশাপ্রদ নয়। তাছাড়া এই উৎপাদনে পশ্চিম বাংলার অংশ মোটামুটি শতকরা ২০তেই স্থির হয়ে আছে। যদিও একটি প্রদেশের অংশ হিসেবে এই সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়, তথাপি বৃদ্ধির হার বিচার করলে নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ১৯৬৫ খৃঃ কারখানাজাত উৎপাদনের মূল্য সংযোজন পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে ৩৫৪ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ৪২৫ কোটি টাকা।

ভারতীয় অর্থনীতিতে পশ্চিমবাংলার ভূমিকা

ভারতের কারখানার শতকরা ১৫ ভাগ পশ্চিমবাংলায় অবস্থিত। কারখানাজাত উৎপাদনে পশ্চিমবংলার অবদান প্রায় শতকরা ২০। সারা দেশের কয়লার চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ মেটায় পশ্চিম-বাংলা। এই রাজ্য পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে একচেটিয়া স্থান অধিকার করে আছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্প ও কৃষিজদ্রব্যের মোডকের উপাদান হিসেবে এর ভূমিকা অসামান্য। সারা দেশের এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের একার্ধ এই রাজ্যে অবস্থিত। তাছাড়া বসায়ন এবং ভেষজ শিল্পের একটা মোটা অংশ এই প্রদেশে। পাট ও চা রপ্তানি মারফৎ এই রাজ্য ভারতে সবচেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। ইস্পাত শিল্পের এক-তৃতীয়াংশ এই রাজ্যে। ১৯৬৮-৬৯ খৃঃ যৌথ কোম্পানির সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় ছিল ৯১৩৬। এদের আদায়ীকৃত মূলধন সারা ভারতে এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৬৭ খৃঃ এই রাজ্য তপ-শীলী ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করেছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাজ্য পরিবহণে পশ্চিমবাংলার ভূমিকা অসামান্য। কিছুদিন আগেও কলিকাতা বন্দর দিয়ে সারা দেশের শত-করা ৪০ ভাগ বাণিজ্য সম্ভব হয়েছে। কোলকাতার পশ্চাৎপ্রদেশ বহুবিস্তৃত, প্রায় ১৫ কোটি জনঅধ্যুষিত। পশ্চিমবাংলা ছাড়াও তাতে আছে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা এবং নাগাল্যাণ্ড। কোলকাতার শিল্পাঞ্চলকে বাদ দিয়েও প্রধান প্রধান কয়েকটি শিল্পকেন্দ্র এই অঞ্চলে অবস্থিত, যথা—ঋড়গপুর, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন ঝরিয়া, ধানবাদ, সিন্ধ্রী জামসেদ-পুর, রোকারো, রাঁচি, বারাউনি, রাউর-কেলা ও নুনমাটি। এই অঞ্চলে এঞ্জি-নিয়ারিং, পাট, সার, লৌহ ও ইস্পাত, চা, ভারী যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, যানবাহন, কয়লা ইত্যাদি শিল্প ও তৈলশোধনাগার রয়েছে।

অন্যান্য রাজ্যের বহু লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা পশ্চিমবাংলায়। ১৯৬১ খৃঃ আদমসুমারি অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত লোকের সংখ্যা ৩৭৪,০০০। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭-৫৮ খৃঃ এক সমীক্ষায় জানা যায় কোলকাতা শহরের উপার্জনশীল জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগ অবাঙালী। ১৯৬১ খৃঃ পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত অবাঙালীর শতকরা হার—পাট ৭৯ শতাংশ, তুলাশিল্প ৫৪ শতাংশ, এঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ৪৯ শতাংশ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৫৪ শতাংশ, কাগজশিল্প ৭৩ শতাংশ। কারখানায় নিযুক্ত কর্মীর শতকরা ৬১ অবাঙালী। কোলকাতা থেকে প্রতি বছর প্রায় ২৮ কোটি টাকা ডাকে অন্যান্য রাজ্যে পাঠানো হয়।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি

পশ্চিমবাংলার আর্থিক অবস্থার অব-নতি এবং শিল্পায়নের গতি হ্রাসের প্রমাণ স্পষ্ট। শিল্পায়নের মন্দাগতি ১৯৭১ খৃঃ আদমসুমারি থেকেও প্রমাণিত হয়। পশ্চিমবাংলার কর্মী জনসংখ্যার শতকরা ৪৬-২ ১৯৬১ খৃঃ অকৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল। ১৯৭১ খৃঃ সেই হার দাঁড়িয়েছে ৪২-৫৩। পশ্চিমবাংলার শিল্পায়নে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে এবার আলোচনা করা যাক।

১৯৬১ খৃঃ পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বেড়েছে শতকরা ২৭-২৪। অপরপক্ষে ভারতের বেড়েছে শতকরা ২৪-৬৬। এই বৃদ্ধির হার ১৯৫১-৬১ খৃঃ তুলনায় (৩২-৮০) কম হলেও ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্তু আগমনে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিতে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। খাদ্য এবং শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংস্থানে ভারসাম্যের অভাব এই রাজ্যের অর্থনীতিতে শোচনীয় বিপর্যয় এনে দিয়েছে। এই রাজ্যেও খাদ্য-শস্যের ঘাটতি প্রায় ২০ লক্ষ টনের।

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

॥ বাঙ্গলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া ॥

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। কীর্তনের তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনকথা। কয়েকটি ছবি। [১০·০০]

॥ কালিকট থেকে পলাশী ॥

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্যজাতিগুলির প্রাচ্য-অভিযান কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৬·০০]

॥ বাঁকুড়ার মন্দির ॥

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শৈলী ও ইতিহাস। ৬৩ আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

॥ উদ্বাস্তু ॥

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টা। বাংলায় একমাত্র বই। [১০·০০]

॥ উপনিষদের দর্শন ॥

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহে নিহিত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। [৭·০০]

॥ উপনিষদের কথা ॥

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। উপনিষদসমূহের ইতিহাসগত আলোচনা। [৪·০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯

একসময়ে ভারতের খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৩ খৃঃ থেকেই বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দেয়। দেশবিভাগের পর বহু উর্বর জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পশ্চিমবাংলার খাদ্যজগতে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। সঙ্কটের লক্ষণ ও ঘটনার গতি প্রকৃতি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মিল উৎপাদন ও রপ্তানির স্বার্থে পাটচাষের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, পাটশিল্পের উন্নয়নে এই নীতির প্রয়োজন ছিল তবু স্বীকার না করে পারা যায় না যে সে ক্ষেত্রে জমির ধান উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। যেখানে পশ্চিমবংলায় হেক্টর প্রতি চাল উৎপাদন মাত্র ১১৯২ কেজি, সেখানে মণিপুরে ১৭৯৬ কেজি, মহীশূরে ১৬৭৮ কেজি, অন্ধ্রে ১৪২২ কেজি। তাছাড়া এই উৎপাদন বাড়াতে পারলে বহুপরিমাণ জমি ধানচাষের বদলে বনসম্পদ, গৃহনির্মাণ মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহার করা যেত। যে পাটশিল্প পশ্চিমবাংলার প্রাণস্বরূপ তাকে বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতাক্ষম করতে উৎকৃষ্ট জাতের পাটের জন্য এখনও আমরা আমদানির ওপর নির্ভরশীল। উৎপাদনের পরিমাণ ও মানের উন্নতিবিধানের প্রয়োজন ছিল। চা উৎপাদনে পশ্চিমবাংলার অবদান এক-চতুর্থাংশ। অথচ এর উৎপাদন ব্যয়-বৃদ্ধি এবং অনুন্নত চাষ প্রণালীর সমস্যায় জর্জরিত। কৃষির উন্নতি হলে শিল্পের বাজারও সম্প্রসারিত হতে পারত। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার কৃষিনীতি কৃষির উন্নতি-সাধন বা শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা করতে পারেনি।

১৯৭১ খৃঃ আদমসুমারি থেকে যেসব তথ্য পাওয়া যায়, তাতে পশ্চিমবাংলাকে ভারতের অন্যতম শিল্পে অগ্রসর রাজ্য বলে মনে হয়। যেখানে ভারতে প্রতি পাঁচজনের একজন শহরবাসী, সেখানে পশ্চিমবাংলায় প্রতি চারজনে একজন শহরবাসী। যেখানে সারা দেশে প্রতি ছয়জনের একজন আধুনিক শিল্পে উন্নত শহরাঞ্চলে কর্মরত, সেখানে এই রাজ্যে সেই অনুপাতে চারজনে একজন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আদমসুমারি থেকে বড়জোর একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করা যায়। আরও একটু তলিয়ে বিশ্লেষণ করলে এই রাজ্য সম্পর্কে অন্যরকমের একটা চিত্র পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলার ১১০ লক্ষ শহরবাসীর মধ্যে ৭৫ লক্ষই কলকাতা এবং কলকাতা শহরতলীর বাসিন্দা। জেলাগুলিতে প্রতি দশজনে মাত্র একজন শহরবাসী। এই অনুপাত ভারতীয় অনুপাতের অনেক কম। এতো গেল নগরায়ণের মাত্রা। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় মাত্র চারটি জেলায় (যার মধ্যে আছে কোলকাতা)—হাওড়া, হুগলি, কোলকাতা ও চব্বিশ পরগণা—বিধিবদ্ধ কারখানাজাত কর্মসংস্থানের শতকরা ৮২ অংশ কেন্দ্রীভূত। বর্ধমান জেলায় এই অংশ শতকরা ৯ আর বাকি ১১টা জেলায় মিলিয়ে শতকরা ৯। অথচ এই রাজ্যের অর্ধেক মানুষের বাস ঐ এগারটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জেলায়। অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা একটি অতি অনুন্নত অঞ্চল যার ভেতরে একটি প্রকাণ্ড শহর ও শহরতলী অবস্থিত। বিশ্বের পঞ্চাশটি আদর্শ নগরাঞ্চলের নীচে কোলকাতা নগরাঞ্চলের স্থান। এখানে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এও লক্ষ্য করা গেছে যে, এই নগরাঞ্চলে শ্রমিকের সরবরাহ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে, এমনকি এই সরবরাহ ক্রমাগত কমেও আসছে। অর্থাৎ এই নগরাঞ্চল উন্নতির শিখর থেকে ক্রমশঃ নামতে সুরু করেছে। অনুন্নত শিল্পে অনগ্রসর পশ্চিমবাংলার ভবসাস্থল বর্ধিষ্ণু কোলকাতা ও শহরতলী এখন ক্ষয়ের পথে। আমাদের অর্থনীতিতে এর গতিকে সঞ্চারের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

একথা মনে রাখতে হবে যে এই রাজ্যে নগরাঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রভাব প্রদেশের অবশিষ্ট অংশের জীবনযাত্রার খুব বেশী নয়। এখানে যে পরিমাণ শ্রম ও কাঁচামাল নিয়োজিত হয় তার খুব সামান্য অংশই এই রাজ্যের পল্লী অঞ্চল থেকে আসে। অন্যপক্ষে এখানকার পল্লীঅঞ্চলের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্যের সামান্য অংশই এর নগরাঞ্চলে উৎপন্ন হয়। তাছাড়া এই রাজ্যের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী প্রধানত অবাঙ্গালী সদস্যবিশিষ্ট। ফলে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে এর সম্পর্ক এবং যোগাযোগ নিতান্তই সামান্য। পশ্চিম বাংলার শহরাঞ্চলের সমৃদ্ধি এর পল্লী অঞ্চলের বুদ্ধির হারকে মোটেই প্রভাবিত করে নি।

কোলকাতা নগরাঞ্চলের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক সংযোগের হেতুগুলি ঐতিহাসিক। কোলকাতার উন্নয়ন পর্ব শুরু হয় ইংরেজ আমলে। এর শিক্ষা এবং বন্দর চালু রাখতে ইংরেজ সরকার বাংলা ও বাংলার বাইরের খনি

বিনামূল্যে!

একেবারে নতুন
ফরহ্যান্স পুস্তিকা
"দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

তথ্যপূর্ণ এই রঙীন পুস্তিকাটি নিন, বিনামূল্যে। এই কুপনটি আজই ভরে পাঠিয়ে দিন।

ম্যানার্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট বাগ নং ১০০৩১, বম্বে—১
অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে এক কপি "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" নামে ফরহ্যান্স পুস্তিকাটি* পাঠান। এই সঙ্গে ডাক খরচ বাবদ ২০ পয়সার টিকিট পাঠালাম।

নাম _____ বয়েস _____
ঠিকানা _____ এ—৭ এ বি

*অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ-কেটে দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স-টুথপেষ্ট—এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

100F-152 BEN R

অঞ্চল এবং এই রাজ্যের রোপন এলাকার সঙ্গে কোলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্থাপনের কথাই চিন্তা করেছিল। ফলে এই প্রদেশের বৃহত্তর পল্লী অঞ্চলের সঙ্গে শহরাঞ্চলের যোগাযোগ ছিল নিতান্তই অল্প। শহরের পাট ও তুলাশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের প্রধান অংশই আসত অন্যান্য রাজ্য থেকে। এই সব শিল্পের পরিচালক গোষ্ঠীতে অবাঙালীরাই ছিলেন প্রধান। একমাত্র কেরাণী সম্প্রদায়েই বাঙালীর সংখ্যা ছিল বেশী। পল্লী অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ছিল এই কেরাণীকুলের উৎস। ফলে এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহযোগিতা থেকে গ্রামাঞ্চল সব সময়েই বঞ্চিত হত। গ্রামাঞ্চলের জমিদারেরা ছিলেন কোলকাতার বাসিন্দা। গ্রামাঞ্চলের কৃষিজাত উদ্বৃত্ত আর ঐ অঞ্চলের উন্নতিবিধানে বিনিয়োজিত না হয়ে শহরাঞ্চলে জমিদারদের বিলাস-ব্যসনের ইন্ধন জোগাত। কোলকাতার আশে-পাশে যে এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প গড়ে উঠছিল তাতে কোলকাতার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেও গ্রামাঞ্চলের অনগ্রসর অর্থনীতিতে ঐ শিল্পজাত দ্রব্যের তেমন প্রয়োজনবোধ হত না। এই শিল্পের বাজার ছিল প্রধানতঃ এই রাজ্যের বাইরে। অতএব সর্বক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের অসংযোগ এই রাজ্যের অর্থনীতিতে ভারসাম্যের অভাব সৃষ্টি করেছিল। শহরাঞ্চলের কর্মসংস্থানে গ্রামের অধিবাসীদের বড় অংশের কোন ব্যবস্থা হয় নি। ফলে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যায় পল্লী অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

পশ্চিম বাংলার কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতের আরও কিছু প্রমাণ আছে। কোলকাতা ও আশে-পাশের অঞ্চলেই উন্নয়ন সীমাবদ্ধ থেকেছে। কোলকাতা আসানসোল, দুর্গাপুর জুড়ে যে অঞ্চল তাতেই বড় বড় কারখানা। কারখানাজাত কর্মসুযোগ। শহুরে সুযোগ-সুবিধা, ব্যাঙ্কের অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভাল ভাল হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। নীট প্রাদেশিক আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ আসে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও বর্ধমান থেকে। বাকী এগারোটি জেলার অবদান শতকরা ৬০। এতেই আঞ্চলিক বৈষম্যের শেষ নয়। কলকাতার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলেই অনগ্রসর এলাকা আছে। তাছাড়া একথাও অনেকেরই জানা আছে যে, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা থেকে উদ্বৃত্ত আয় স্থানীয় অধিবাসীদের ভোগে কমই আসে। পাটশিল্পের উন্নতিকল্পে পাটচাষের জন্য অধিকতর জমি নিয়োগ করা হয়েছে অথচ এই শিল্পের সমৃদ্ধির সুফল থেকে পাট-চাষীরা বঞ্চিত হচ্ছে। জেলাওয়ারী মাথা-পিছু আয়ের বন্টন প্রণালী থেকেও আঞ্চলিক বৈষম্যের কিছু ধারণা করা সম্ভব। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য পরি-সংখ্যানের অভাব সত্ত্বেও মোটামুটি বলা যায় :—

মাথাপিছু আয় ২০০ টাকার নীচে : জেলা—পুরুলিয়া।

মাথাপিছু আয় ২০১—২৫০ টাকা : জেলা—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কোচবিহার ও মালদহ।

মাথাপিছু আয় ২৫১—৩০০ টাকা : জেলা—মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, দার্জিলিং, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর।

মাথাপিছু আয় ৩০১—৩৫০ টাকা : জেলা—জলপাইগুড়ি, হুগলী।

মাথাপিছু আয় ৩৫১ টাকার ওপরে : জেলা—বর্ধমান, হাওড়া।

পশ্চিম বাংলার বেশীর ভাগ অংশেই অর্থনৈতিক বনিয়াদ তেমন পোক্ত নয় যাতে শিল্পায়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। অথচ স্বাধীনতা-উত্তরযুগে সেই বনিয়াদ গঠনের কাজ উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সঙ্গে সংযুক্ত নয় এমন সব ভারী শিল্পের পত্তন ও উন্নয়নে অর্থব্যয় করা হয়েছে কিন্তু পরিবহন, বিদ্যুৎ, সেচ ও শিক্ষার ব্যাপারে বিনিয়োগের কথা তেমন ভাবা হয় নি। যে সামান্য অর্থ এই সব কাজে বরাদ্দ করা হয়েছে তারও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে অপচয় হয়েছে। লঘু ভোগ্য সামগ্রী, কৃষি-কার্যের জন্য সার ও কীটনাশক সামগ্রী, কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী পাম্প বা শক্তিচালিত যন্ত্রপাতি অথবা কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। অথচ শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য ঐ সমস্ত শিল্পের পত্তনই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

সরকারী নীতি :

শিল্পোন্নয়নের গতি এবং কর্মসংস্থান এ দুটি বিষয় যে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সে ব্যাপারে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই। পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের কর্ম-সংস্থান তৎসন্নিহিত শিল্পাঞ্চলে পর্যাপ্ত হয় নি। এ সমস্যা ছাড়াও আছে এ রাজ্যে বাঙলাদেশ (ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ভিড় আর অন্যান্য রাজ্য থেকে কর্মপ্রার্থী মানুষের সমাবেশ। শিল্পায়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করার তাগিদ সেই কারণেই এই রাজ্যে অনেক বেশী। মোটামুটি হিসেবে বাংলা-দেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা চার লক্ষেরও ওপরে। এখনও এই সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ পুনর্বাসনের প্রতীক্ষায় আছে। মোট আগত মানুষের শতকরা ২৮ ভাগ কোলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শিল্প অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় আছে শতকরা ৫৯ ভাগ আর রাজ্যের বাইরে মাত্র শতকরা ১৩ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মত এ অঞ্চলে আগত উদ্বাস্তুরা ফেলে-আসা

সার্থক অভিনয়ে চাই ভাল নাটক—

বাদল সরকারের		সুশীল মুখোপাধ্যায়ের	
বড়ো পিসিমা (হাসির)	৪-০০	তোমার হলো সুরু	৩-০০
বাকি ইতিহাস	৩-২৫	অমিত্রাক্ষর	৩-৫০
		বাঁধ	৩-০০
গঙ্গাপদ বসুর		গল্প বলুন	৩-৫০
অন্ধকারের বৃত্ত	৩-৫০	আজকের নাটক	৩-০০
অংশীদার	৪-০০	মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের	
শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের		অমাবস্যার মৃত্যু	৩-০০
কাঞ্চনরঙ্গ	৩-০০	জীবন জিজ্ঞাসা	৩-০০
		নায়কের সন্ধানে	৩-০০
শম্ভু মিত্রের		(৩টি একাঙ্ক)	
ঘূর্ণি	৩-০০	অমিতা রায়ের	
		হারানো চিঠি	৩-০০
নীহাররঞ্জন গুপ্তের		বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীর	
দুই রাত্রি	৩-০০	আজ অভিনয় বন্ধ	২-৫০

গ্রন্থপীঠ : ২০৯বি, বিধান সরণি কলিকাতা-৬

সম্পত্তির জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পায় নি। ১৯৫০ খৃঃ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি কার্যকরী না হওয়ায় এই উদ্বাস্তুদের ফেলে-আসা সম্পত্তিতে অধিকার স্বীকৃত হয় নি। পুনর্বাসনের ব্যাপারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের অন্যত্র পুনর্বাসনে অনিচ্ছার সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে একথা বলা যায় না। দণ্ডকারণ্যকে বসবাসের উপযোগী স্থানে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অসামর্থ্য সকলেরই জানা আছে। পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারী সাহায্যের বহর, সে ঋণ দানের ব্যাপারেই হোক, বিদেশী মুদ্রা সরবরাহের বা কাঁচা মালের যোগান বা কারিগরী সহায়তার ব্যাপারেই হোক—এ রাজ্যের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। ফলে যে উনিশটি উপনগরী পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের জন্য গড়ে ওঠে আজ তারা সমৃদ্ধিশালী শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হাওড়ার চমৎকার ক্ষুদ্র এবং মাঝারী এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পগুলো অপরপক্ষে বিদেশী মুদ্রা এবং কাঁচা মাল যোগানের অভাবে আজ বিলুপ্তির পথে।

স্বাধীন ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব সরকারের। কোন স্থানে শিল্পের পত্তন বা সম্প্রসারণ সরকারী নীতির ওপরে নির্ভরশীল। লাইসেন্স নীতির সাহায্যে এই দায়িত্ব সরকার পালন করে থাকেন। পশ্চিম বাংলার এতকালের সমৃদ্ধিশালী ভেষজ ও রাসায়নিক শিল্প প্রমাণ করে এ রাজ্যে ঐ শিল্পের নতুন ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় মালমশলা ও দক্ষতা আজও নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অথচ এ ধরনের শিল্প স্থাপনে আজ এ রাজ্য সরকারী অনুমতি পাচ্ছে না। ইস্পাতভিত্তিক শিল্প স্থাপনে এ রাজ্যের যে আপেক্ষিক সুবিধা ছিল, সারা ভারতে ইস্পাতের এক দর চালু হওয়ায় সে সুবিধা আর নেই। পশ্চিম বাংলা এবং বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের কয়লাও এক দামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের কাঁচা মালের বণ্টনবৈষম্য দূরীকরণই যদি সরকারী নীতির আদর্শ হয়ে থাকবে তবে সে যুক্তিতে তুলা ও তৈলবীজেরও সারা ভারতে এক দর হওয়ার কথা। বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় নি। দেশের বিমান বন্দর ও অন্যান্য এই ধরনের শুল্কমুক্ত এলাকায় ইলেকট্রনিক শিল্প প্রসারের যে নীতি ভারতের অন্যত্র কার্যকরী করা হয়েছে, কি কারণে দমদম বিমানবন্দর ও লবণ হ্রদ অঞ্চলে সে নীতি অনুসৃত হয় নি তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের শিল্প স্থাপনে পশ্চিম বাংলার উপযোগিতা স্বীকৃত হয় নি। হলদিয়ায় তৈল শোধনাগার এবং দুর্গাপুরে মিশ্র ইস্পাত শিল্প ছাড়া সম্প্রতিকালে সরকারী বা যৌথ উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা এ রাজ্যে দেখা যায় নি। ১৯৬৯ খৃঃ হাজারী কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, 'নবীন উদ্যোগ থেকে যে গতিবেগ আসে, লাইসেন্স নীতির ফলে পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।' এ উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য।

শিল্পোন্নয়নের মূলধন যোগানের জন্য সম্প্রতি বিবিধ সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। সেগুলোর হেড অফিস বোম্বাই বা দিল্লীতে না হয়ে কোলকাতায় হলে এখানকার শিল্পগুলো অনেক কম আয়াসে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারত, বিশেষ করে সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলায় যখন সবচেয়ে বেশী বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা। শিল্প পুনর্বাসন সংস্থার হেড অফিস কোলকাতায় হলেও তার অধিকর্তা দিল্লীবাসী। জীবনবীমা সংস্থার কোন সদর দপ্তর কোলকাতা বা পূর্বাঞ্চলে আজও স্থাপিত হয় নি। স্টেট ট্রেডিং সংস্থার কোন শাখা অফিস পশ্চিম বাংলায় না থাকায় এ রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে বেআইনী সীমান্ত বাণিজ্যের প্রসার প্রতিরোধ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সরকারী মাশুল নীতির তাৎপর্য'ও আমাদের বোধগম্য নয় — বোম্বাই থেকে চট্টগ্রাম বা চালনায় জাহাজের মাশুল কোলকাতা থেকে বাংলাদেশে জাহাজের মাশুলের চেয়ে কম।

পাট ও তুলাশিল্পের প্রতি সরকারী মনোভাবের বৈসাদৃশ্য অধুনা বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। সরকারী মতে পাটশিল্প বর্তমানে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের পর্যায়ে। অথচ বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে পাটের স্থান এখনও প্রথম। অপরপক্ষে তুলাশিল্প প্রচুর সরকারী সাহায্য ও সংরক্ষণ পাওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় তেমন স্থান করে নিতে পারে নি।

অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ পশ্চিম বাংলার আছে। ১৯৭০-৭১ খৃঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স করপোরেশনের মোট অর্থ বরাদ্দের মাত্র ১·৪ শতাংশ পশ্চিম বাংলার ভাগ্যে জোটে। এ রাজ্যের ৩২২·৫০ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনা ভাবতে নক্সা স্থান অধিকার করে। এ রাজ্যে মাথাপিছু পরিকল্পনা ব্যয় মাত্র ৭৯ টাকা। এ ব্যাপারে টাকার অঙ্ক অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে নিম্নরূপ : নাগাল্যান্ড ৮৭৫ টাকা, কাশ্মীর ৩৮২ টাকা, হরিয়ানা ২১২ টাকা, পাঞ্জাব ২০৬ টাকা।

যাতীয়কৃত ব্যাংকগুলির কার্যকলাপেও পশ্চিম বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রেরিত বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিস-এর এক স্মারকলিপিতে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পেছনে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন বিধান। ১৯৬৯—৭২ খৃঃ এই সময়ে জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলির কার্যকলাপে বা নীতিতে সেই উদ্দেশ্যসাধনের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলেই এই সন্দেহের সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ তিন বছরে মহারাষ্ট্রে আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪২ হারে আর আগাম বাড়ে শতকরা ৫৬ হারে। সেই সময়েই পশ্চিম বাংলায় আমানত বৃদ্ধির হার শতকরা ৬২ এবং আগাম বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা

ফটো-বিউটি
ভালো ছবি তোলাই আমাদের বিশেষত্ব
৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কালীবাবুর বাজার, হাওড়া।
ফোন : ৬৭-৪৫২৬

জনগণের
আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে
একসুরে বাঁধা

UNITED BANK OF INDIA

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

১৭। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপারেও বৈষম্য সুস্পষ্টফুট। ব্যাঙ্ক ঋণে এই ক্ষেত্রে শতকরা ভাগ বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ :—

	জুনের শেষ ১৯৬৯	জুনের শেষ ১৯৭২
পাঞ্জাব	২৭·৯	৩৭·৯
তামিলনাড়ু	২৫·৫	২৭·৮
রাজস্থান	১৬·৮	৩০·৫
গুজরাট	১৫·৯	৩০·৯
মহারাষ্ট্র	১২·৪	১৬·৮
পশ্চিম বাংলা	৪·৪	১১·৩

তামিলনাড়ুর তুলনায় (৭৫ শতাংশ) পশ্চিম বাংলায় (১৫ শতাংশ) বিদ্যুৎ সরবরাহ হ্রাসের পরিমাণ কম বলে এই রাজ্যের বিদ্যুৎ সংকটের প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য যুক্তিযুক্ত বলে নানা মহলের অভিমত। অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও দূরদর্শিতার অভাব এই সংকটকে আরও তীব্রতর করে তুলবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অষ্টম বার্ষিক শক্তি সমীক্ষায় বলা হয়েছে এই রাজ্যে সাঁওতালদি ও ব্যান্ডেলে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলেও বিদ্যুৎ ঘাটতির পরিমাণ আগামী ভবিষ্যতে দাঁড়াবে ১৯৭৪-৭৫ খৃঃ ৪৪০ মেগাওয়াট, ১৯৭৫-৭৬ খৃঃ ৫৭২ মেঃ ওঃ, ১৯৭৬-৭৭, এ ৬২৭ মেঃ ওঃ ১৯৭৭-৭৮ এ ৭০০ মেঃ ওঃ। এই রাজ্যের অনগ্রসর ও অগ্রসর অঞ্চলে বিদ্যুতের বার্ষিক চাহিদা যথাক্রমে ১০ শতাংশ ও ৪ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশ হারে বাড়বে এই অনুমানের ভিত্তিতে ঘাটতি নির্ধারণ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কয়েকটি সমীক্ষায় ঘনায়মান বিদ্যুৎ সংকট পরিস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। তবু ব্যান্ডেল এবং সাঁওতালদি বিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে আট বছরের ব্যবধান। একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সময় লাগে গড়ে পাঁচ থেকে ছয় বছর। তাছাড়া বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে কৃষি ও শিল্পের বিদ্যুৎ চাহিদার বহর আমলা-শাহীর বোধায়ত্ত করতে সময়ের অপচয় অনিবার্য। সম্প্রতি কালের ঘটনাস্রোতে এই তথ্য সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। বিদ্যুৎ ঘাটতির আর্থিক ক্ষতি উৎপাদন হ্রাসের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব সত্ত্বেও পরীক্ষা কর্মসূচীর ব্যাঘাত বা খাদ্য পরিবহনের বিলম্ব ইত্যাদিতে সামাজিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণও যে কম নয় তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বিদ্যুৎ ঘাটতি এ রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম হলেও বিদ্যুৎ সংকটের তীব্রতা কম একথা বলা যায় না। তার প্রধান প্রমাণ কল ও রুগ্ন কারখানার সংখ্যা এই রাজ্যেই সবচেয়ে বেশী। ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের যোজনা পর্ষদের মেদিনীপুর জেলার দাঁতনে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সুপারিশ সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কেন্দ্রের বিশ্বাস কয়লা খনি-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পই বিধেয়। অথচ এই রাজ্যের কয়লা খনি অঞ্চলের নদীগুলিতে সারা বছরের প্রবাহ সমান বা নিশ্চিত নয় কিন্তু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র জলের ওপর নির্ভরশীল। নিম্নমানের কয়লা পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়সাধ্য। অপরপক্ষে আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত দাঁতন কেন্দ্র নিধারিত কয়লা খনি থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরত্ব সীমার বাইরে, পরিচ্ছন্ন জলসম্পদ সুবর্ণরেখা নদীর নিকটবর্তী। যদুগোদা ইউরেনিয়াম খনি এবং তালচেরের ভারী জলের কেন্দ্র ও দাঁতনের খুবই কাছাকাছি। এ সমস্ত জোরালো যুক্তি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি অনুমোদন করতে নারাজ।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব বণ্টন নীতি বরাবরই এই রাজ্যকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৯৩৬ খৃঃ নেমেয়ার কর্তৃক নির্ধারিত নীতির বলে বঙ্গদেশের আয়কর থেকে প্রাপ্য ছিল ২০ শতাংশ। ঐ একই শতাংশ বোম্বাই-এরও প্রাপ্য ছিল। এই নীতির ভিত্তি স্পষ্টতই ছিল কর সংগ্রহ, জনসংখ্যা নয়, নতুবা বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে বোম্বাই-এর তিনগুণ প্রাপ্য বরাদ্দ করতে হত। দেশ বিভাগের পর ঐ একই বণ্টননীতি প্রযোজ্য হলে পশ্চিমবঙ্গ বোম্বাই-এর সমান অংশ পেতে পারত। অথচ দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পশ্চিমবঙ্গের অংশ নির্ধারিত হল মাত্র ১২ শতাংশ আর বোম্বাইয়ে ২১ শতাংশ। সরকারী অজুহাত ছিল পশ্চিমবঙ্গের আয়তন হ্রাস। এতে রাজ্য সরকারের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ কোটি টাকায়। দেশ বিভাগে পর্যুদস্ত পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারে নি। আরও ক্ষোভের বিষয় ঐ একই সময়ে পাট রপ্তানী কর থেকে প্রাপ্য অংশও এই রাজ্যের ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয়। কর্পোরেশন কর থেকে রাজ্যগুলোর জন্য ৬০ শতাংশ বিভাজনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ না করায় এই কর সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ভূমিকাও তার ন্যায্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হয়। একথাও মনে রাখা দরকার যে, কোন রাজ্যে সরকারের কর ধার্যের ক্ষমতা এবং সেখানকার সম্পদের পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয় কারণ এই সম্পদ সৃজন, রক্ষণ এবং পরিবর্ধনের ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টায় নানা রকম সেবাজাতীয় কার্য ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গঠন ইত্যাদি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু বর্তমান শাসনতান্ত্রিক আওতায় বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায়। অয়করের ওপর সারচার্জ থেকে উদ্ভূত রাজস্বের সবটাই কেন্দ্রীয় সরকার আত্মসাৎ করেন। অথচ অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই সারচার্জ চালু থাকলে আয়ের সঙ্গে সারচার্জের সংযোজন না করার কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি নেই। এ-সংযোজন সাধন কার্যকরী করা হলে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও উপকৃত হতে পারত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার নিজের স্বার্থে সংযোজন নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন রেল-ভাড়ার ওপর কর বর্তমানে রেল-ভাড়ার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তি-নীতি কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র নিজের স্বার্থেই প্রয়োগ করেন। আবগারী শুল্ক ধার্য এবং বিক্রয়-কর ধার্য যথাক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতাধীন। বহু সামগ্রীর ক্ষেত্রেই বহু রাজ্যে কেন্দ্রের জন্য বিক্রয়-কর ধার্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আরও বেশী সামগ্রীর ক্ষেত্রে বিক্রয়-কর ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে অর্পণ করা অথবা আবগারী শুল্কে রাজ্য সরকারগুলির অংশ বাড়িয়ে দেওয়া। আজও পর্যন্ত এই দুটি পন্থার কোনটিই কার্যকরী করা হয়নি।

রাজ্যের পুরানো শিল্পগুলোর অবস্থা

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় শিল্পগুলো ছিল বিদেশী মূলধন ও পরিচালনায় পুষ্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই বিদেশী শিল্পপতিরা এদেশে ইংরেজ শাসনের স্বল্পায়ুর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন এবং তখন থেকেই স্বদেশে মূলধন সরিয়ে নেওয়ার কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলো রপ্তানি-প্রধান গুণসম্পন্ন হওয়ায় মূলধন স্থানান্তরে বিদেশীদের বেশ সুবিধে হয়। সরকারের কাছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রপ্তানিকৃত মালের সঠিক মূল্য প্রকাশ করতেন না বা আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির সঠিক মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য ঘোষণা করতেন। এইভাবে মোটা টাকার মূলধন বিদেশে স্থানান্তরিত হয়। ইংরেজ আমলে এদেশের শিল্পায়নে বৃটেন থেকে খুব কমই মূলধন এসেছে। বেশীর ভাগই এদেশে

অর্জিত মুনাফা পুনর্নিয়োজিত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শিল্পগুলোর মূলধনের উৎস স্বাধীনতার আগে থেকেই বিদেশে অপসারিত হতে থাকে। ফলে এখানকার শিল্পগুলোর সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভের পর এই শিল্প-গুলো আসে স্বদেশী শিল্পপতিদের মালিকানায়। এই শিল্পপতিদের উৎপত্তি ব্যবসায়ী বা বণিকসম্প্রদায় থেকে। অতএব স্বাভাবিক কারণেই এই শিল্প-পতিরা যতটা মুনাফা অর্জনে ততটা শিল্পোন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন না। এই শিল্পপতিদের কার্যকলাপে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পগুলোর দুর্গতিও চরমে গিয়ে ঠেকেছে। এর প্রমাণ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই পাওয়া যাচ্ছে এমন নয়। ঐসব শিল্পপতি-দের কবলে যে শিল্পই পড়েছে, তারই সমান দুরবস্থা ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ভারতের বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পো-রেশন, বোম্বাই-মাদ্রাজের রিচার্ডসন ক্রুডাস্, মহারাষ্ট্রের সাসেবয়া কটন মিলস্ ইত্যাদির বর্তমান অবস্থা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পুরোনো শিল্পগুলোর মধ্যে পাট-শিল্পের ভূমিকা বিভিন্ন দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববাজারে ভারতীয় পাট রপ্তানির ভাগ ১৯৪৮-৫০ খৃঃ থেকেই হ্রাস পেতে থাকে। তথাপি এই শিল্প বছরে গড়ে ভারতের জন্য ২০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। রপ্তানি বাজারের ওপরেই এই শিল্পের সমৃদ্ধি প্রধানতঃ নির্ভরশীল। এ থেকে মনে হতে পারে বিশ্ববাজারের হালচালে পরি-বর্তনই এ-শিল্পের দুর্গতির কারণ। এ-ধারণা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। মাল বহনের নানারকম কৌশল উদ্ভাবনের পর চটের থলের চাহিদা ক্রমাগত কমতে থাকে। চটের থলের চেয়ে কম ব্যবসাধ্য কাগজের থলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই শিল্প পিছু হটতে থাকে। পাকিস্তানও এই ব্যাপারে ভারতের প্রধান প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পাট-শিল্পের সংকট কেবল-মাত্র চাহিদার হেরফেরেই উদ্ভূত নয়। পাকিস্তান সরকার নিজ দেশের পাট-শিল্প উন্নয়নে রপ্তানি ভরতুকি দেওয়ার যে-নীতি গ্রহণ করে তার চেয়ে ভারত সরকারের পাট রপ্তানি শুল্ক অপসারণ কার্যকারিতার দিক থেকে অনেক নিকৃষ্ট নীতি। এর ওপরে আছে এখানকার শিল্পে সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণে গড়িমসি।

চা-শিল্প বর্তমানে বহু সমস্যার সম্মুখীন। পাটের মত চায়ের বিশ্ব-বাজারও প্রায়ই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। অপরপক্ষে এই শিল্প আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত। চায়ের বিশ্ব-সরবরাহের অবিরাম ঊর্ধ্বগতির ফলে চায়ের দাম ক্রমাগত কমতির দিকে। চা-শিল্পপতিদের অভিযোগ সরকারী কর ও মজুরী নীতির ফলে দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে চা-শিল্প এখনও বহু পরিমাণ বিদেশী স্বার্থ বিজড়িত। দেখা গেছে চায়ের উৎপাদন-ব্যয় বিদেশী মালিকানাভুক্ত চা-এলাকায় স্বদেশী মালি-কানাভুক্ত চা-এলাকার চেয়ে বেশী। এর অন্যতম কারণ পূর্ববর্তী এলাকায় পরিচালক গোষ্ঠীর কমিশন-আয় বহুগুণে বেশী। অতএব দাম ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যের হেতু একমাত্র সরকারী কর ও মজুরী নীতি এ-কথা সত্য নয়। অপর পক্ষে, স্বদেশী মালিকানাভুক্ত এলাকায় চা-বাগানগুলোর আয়তন অধি-কাংশ ক্ষেত্রে অভিপ্রেত আয়তন-সীমার চেয়ে কম। এই এলাকায় অনুসৃত রোপণ কৌশলও চা-বাগানের পক্ষে কল্যাণকর নয়। তার চেয়েও বড় সমস্যা চা-শিল্পে উৎপাদক-দালালগোষ্ঠীর প্রাধান্য। এই গোষ্ঠীই মূল্য ও উৎপাদন-নীতি নির্ধারণ করে, এমনকি নীলাম বাজারের বিধি-বিধানও এই গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে চা-বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার কর্তৃক কলকাতায় স্থাপিত চা-বাণিজ্য সংস্থার কর্মপরিধি বিস্তারে সরকারী ঔদাসীন্যের কারণ আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের জন্মস্থানস্বরূপ। ১৯৬৫-৬৬ খৃঃ এই শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগই ছিল এই রাজ্যে। এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে হাওড়ার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ১৮২৩ সালে বিশপ হেবার হাওড়াকে প্রধানতঃ জাহাজ নির্মাতাদের আবাসস্থল বলেছেন। ভারতের প্রথম কাপড়ের কলটি এই শহরের ঘুষুড়িতে ১৮৮৮ সালে স্থাপিত হয়। তারপর গড়ে ওঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮০টি এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পই এখানে অবস্থিত। ড্রইং দেখে নিখুঁত প্যাটার্ন তুলতে, হাতের সূক্ষ্ম কাজে, ছোট ছোট যন্ত্রাংশ তৈরীতে এখনকার বাঙালী শ্রমিকদের সহজাত দক্ষতার তুলনা নেই। অথচ ১৯৭০-৭১ খৃঃ এই শিল্পের অবদান ক্রমে হয়েছে মাত্র ১৭ শতাংশ। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে সর্বভারতে এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উন্নতি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৭১-৭২ খৃঃ এই শিল্পের রপ্তানি দাঁড়ায় ১১৮ কোটি টাকায়। বেশী দিন আগের কথা নয় যখন হাওড়ার এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প এলাকা ভারতের শেফিল্ড নামে খ্যাত

বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান

ছোটদের বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষায় লেখা
শিশু ও কিশোর
পাঠকপাঠিকাদের জন্য
সচিত্র বিরাট
এনসাইক্লোপিডিয়া

(পাঁচ খণ্ডে)
চার খণ্ড ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে | প্রতি খণ্ডের দাম বারো টাকা

সম্পাদক | 'রামধনু' সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

জ্ঞানবিজ্ঞানের সবরকম জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অল্পকথায় সরস ঝরঝরে ভাষায় লিখেছেন নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিশু সাহিত্যের সুপটু লেখকেরা।

যে কোন গ্রন্থাগারে এর এক সেট বই না থাকলে সে গ্রন্থাগার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে
সুদৃশ্য ছাপা • প্রচুর ছবি • এক রঙা • দুরঙা • হাফটোন • রঙিন

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট •• কলিকাতা-৭২

ছিল। স্পষ্টতঃই আজ এই শিল্পের ভরকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র সরে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান শিল্পনীতি হচ্ছে ভারীশিল্পগুলো এই রাজ্যে রেখে দিয়ে এদের ওপর নির্ভরশীল হাল্কা শিল্পগুলো অন্যত্র নিয়ে যাওয়া। এঞ্জিনীয়ারিং শিল্প আজ এই নীতির শিকার হয়েছে। অন্য সময় হলে আঞ্চলিক সাম্যরক্ষায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় এই নীতির যৌক্তিকতা বিচারে আমাদের কোন অধিকার থাকত না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শিল্প-সংকট ও বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে আর সে-কথা বলা সম্ভব নয়। দেখা গেছে হাল্কা শিল্পের ক্ষেত্রে মুনাফা অপেক্ষাকৃত বেশী, রপ্তানির সম্ভাবনাও বেশী। এঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের মাত্র ১৭ শতাংশ এই রাজ্যের আওতায় থাকায় এই শিল্পের সমৃদ্ধির সামান্য অংশই জুটেছে পশ্চিমবঙ্গের বেলায়। সারাদেশের মোট কাগজ উৎপাদনের ২০ শতাংশ আসে এই রাজ্য থেকে। এখানেও আজ নানা কারণে সংকট দেখা দিয়েছে। এর ফলে হয় উৎপাদন কমাতে বা একেবারেই বন্ধ রাখতে হয়েছে। বাঁশ, কাঠ, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদি কাঁচামালের সরবরাহে আকস্মিক ছেদ মালগাড়ীর অভাবে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাকের সাহায্যে পরিবহন ব্যবস্থা চালু রাখতে গিয়ে উৎপাদন ব্যয় যাচ্ছে বেড়ে। তারপর আছে শ্রমিক বিরোধ এবং উৎপাদনশীলতার নিম্নমান। সর্বোপরি বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতিতে যন্ত্রপাতিও যাচ্ছে বিকল হয়ে।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্পে কাজকর্ম দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ। প্রধান কারণ সুতোর অভাব। এর ফলে হোসিয়ারী শিল্পের কাজও বন্ধ। সুতোর অভাবে দর্জিদের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর কাজ বিঘ্নিত। বিড় শ্রমিকেরাও কর্মহীন। দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার ফলে তাঁতশিল্পীদের সঞ্চিত সামান্য মূলধনও বিনিয়োগের পরিবর্তে ভোগেই নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এর প্রমাণ রাজ্য সরকার কিছু সুতো বরাদ্দ করলেও টাকার অভাবে তাঁতশিল্পীরা সেই সুতো সংগ্রহ করতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গে সুতোর অভাব বরাবরই ছিল, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সুতো বণ্টনের পুরোনো বেসরকারী ব্যবস্থা বাতিল হওয়ায় সেই অভাব আরও তীব্রতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র তামিলনাড়ুর সমবায় পরিচালিত তাঁতশিল্প বাদে ভারতের অন্যত্র সর্বত্রই সুতো-সংকট তীব্র। আশ্চর্যের বিষয়, সুতো বণ্টন ব্যবস্থা সরকারী আওতায় আসার পর যখন সুতোর অভাবে তাঁতশিল্প বিপর্যস্ত তখন শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দক্ষিণ ভারতের কাপড়ের কলগুলোতেও মজুত সুতোর সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। মজুত সুতোর পরিমাণ এত বেড়েছে যাতে স্থানাভাবের দরুন কোয়েম্বাটুরে লক্ষ্মী মিলের কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের মিল-মালিক সমিতির মতে দক্ষিণ ভারতের কাপড়ের কলগুলোতে ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার বেল সুতো জমে আছে। তামিলনাড়ুর তাঁতশিল্প সুতো-সংকটে আক্রান্ত না হওয়ার কারণ সেখানকার সমবায় স্পিনিং মিল এবং তামিলনাড়ু টেকস্টাইল কর্পোরেশন পরিচালিত মিলের সুতো রাজ্য সরকার তাঁতশিল্পকে সরবরাহ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য সরকার কল্যাণী স্পিনিং মিল ও শিল্প পুনর্বাসন কর্পোরেশন পরিচালিত মিলের সুতো বণ্টন করতে পারতেন। একদিকে তাঁতশিল্পে বস্ত্রোৎপাদন বন্ধ অন্যদিকে অধিক মুনাফার লোভে মিলের উৎপাদন হ্রাস এবং বাংলাদেশ থেকে বস্ত্রের চাহিদার ফলে বস্ত্র মূল্যবৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতেই অবশ্যম্ভাবী।

কৃষি ও খনিজভিত্তিক শিল্প

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের প্রধান ত্রুটি এই যে, এই শিল্পায়নের কাজ এই রাজ্যের বিশেষ কয়েকটা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ। এও লক্ষ্য করা গেছে যে, এর ফলে দূরবর্তী জেলা এবং সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চলের কোন আর্থিক লাভ হয়নি। এর ওপরেও আছে এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার আঞ্চলিক বৈষম্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেলাওয়ারি কৃষি ও খনিজভিত্তিক শিল্পোন্নয়নের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাজ প্রধানত ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে হবে। বহু উদাহরণ দেওয়া যায় যে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটা জেলায় ক্ষুদ্রশিল্প প্রসারের প্রচুর অবকাশ রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার কথাই ধরা যাক। এই জেলার পশ্চাদভূমিতে প্রায় ২-৫ হাজার একর জমিতে কাঁচা বাদামের চাষ হয়, ফলে এখানে কাজু-বাদাম সংরক্ষণশিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। তাছাড়া এই জেলার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে পাওয়া টাটকা মাছের অকেজো এবং বর্জিত অংশের সাহায্যে মৎস্য-খাদ্য শিল্পও গড়া যেতে পারে। নারকেল চাষও এই জেলায় বিস্তর। অতএব দড়ি অথবা কার্পেটের ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপনের সুযোগও এখানে বেশী। মুর্শিদাবাদ ও মালদহে আমের ফলন বেশী, এ দুটি জেলায় রস ও নির্যাস তৈরীর শিল্প; দার্জিলিং জেলায় কমলালেবুর চাষ বেশী সেখানে অথবা নিকটবর্তী শিলিগুড়িতে (যেখানে কয়লা ইত্যাদি কাঁচামালের পরিবহন ব্যয় কম) ঐ ফলের রস ও নির্যাস শিল্প; মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম বুনন শিল্প; পুরুলিয়ায় লাক্ষা শিল্প প্রভৃতি গড়া যেতে পারে। বীরভূম কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। সেখানে ধানের জন্য ধানকল ও তুষ তেলের কল, গমের জন্য আটাকল ও রুটি তৈরীর কারখানা। আখের জন্য আখমাড়াই কল ও চিনির কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়াও বীরভূমে অন্যান্য অনেক শিল্প যেমন চর্ম ও হাড়চূর্ণ কারখানা, মুরগীর খাদ্য উৎপাদন সংস্থা, আদাচূর্ণ তৈরীর সংস্থা, আলু বিশুষ্ককরণ সংস্থা, ধান ও তেলকলের যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা সহজেই গড়ে উঠতে পারে। বীরভূম খনিজ সম্পদেও সমৃদ্ধ। একদিকে যেমন এই জেলায় গ্রানাইট, ফেলস্পার, স্ফটিক, অভ্র প্রভৃতি পাবার সম্ভাবনা আছে, তেমনি এই জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় চীনেমাটি, পোড়ামাটি ও কালো পাথর সঞ্চিত আছে। এই কারণে এখানে চীনে মাটির কারখানা, কীটনাশক ওষুধ প্রস্তুতের কারখানা, অপ্রতিরোধক শিল্প-সংস্থা এবং কালোপাথর উত্তোলন ও ভাঙার কারখানা স্থাপিত হতে পারে।

প্রকাশিত হয়েছে

ফ্যাসিস্ট কারাগারে নিহত বিপ্লবী চেক কথাশিল্পী

জুলিয়াস ফুচিকের

বিশ্ববিখ্যাত সেই অনন্য কাহিনী

ফাঁসীর মঞ্চ থেকে

Notes From The Gallows

অসিত সরকারের তুলনাবিহীন ভাষান্তর

এ বইকে স্মরণীয় করে রাখবে ॥ ৫·০০

প্রকাশক—পত্রপুট/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী

১৩ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট-৭০০০১২

তাম্রপত্র

নিমাই ভট্টাচার্য

'যোগীনদা, তুমি তাহলে এসেছ?' পাশের চেয়ারে বসতে গিয়েই প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

যোগীনবাবু একটু ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন, 'ভেবেছিলাম আসব না কিন্তু না এসে পারলাম না। আর কিছু না হোক কিছু পুরানো বন্ধু আর সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলাম না।'

প্রভাসবাবুও হাসলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'ঐ লোভে পড়েই সবাই এসেছে। তা নয়ত কি জেল খাটার সার্টিফিকেট নিতে কেউ এসেছে?'

বিঠলভাই প্যাটেল হাউসের সম্বর্ধনা সভায় বিপ্লবীরা আসতে শুরু করেছেন। সবাই বৃদ্ধ। শীর্ণ। অনেকের চোখে মোটা কাঁচের চশমা। হাতে লাঠি। কয়েকজন ক্রাচ বগলে দিয়ে এলেন। সব কিছু মিলিয়ে গোধূলির মত বিষণ্ণ। করুণ। কেমন যেন একটা হারিয়ে যাবার সুর, ব্যর্থতার গ্লানি সবার মুখে, কথায় ফুটে উঠেছে। সবাই যেন পরাজিত নায়ক!

'আপ?...' লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এক বৃদ্ধ যোগীনবাবুর সামনে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে তাকালেন।

'আমি যোগীন্দ্র নাথ...'

বুড়ো মানুষ। আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হিজলী জেলের যোগী দাদা?'

বর্ষণক্লান্ত অন্ধকার শ্রাবণ রাত্রিতে যেমন মুহূর্তের জন্য বিদ্যুত চমকে উঠে দিশের আলোর ইশারা জানিয়ে যায়, ঠিক তেমনি মুহূর্তের জন্য যোগীনবাবুর ম্লান মুখে আত্মতৃপ্তির হাসিতে ভরে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই হিজলী জেলের যোগীদাদা! আপনি.....।'

'আরে, যোগীদাদা, আমি সুরেষ নারায়ণ। চিনতে পারেন?'

'তুমি সেই সূর্য?' আর বসে থাকতে পারলেন না যোগীনবাবু। উঠে দাঁড়িয়েই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন সুরেষ নারায়ণকে। 'তুমিই তো খড়গপুর স্টেশনে হাডসন সাহেবকে গুলী করেছিলে। তোমাকে কি এত সহজে ভুলতে পারি?'

এবার দুজনে হাত ধরে মুখোমুখি। 'আপনি তাহলে ভোলেন নি আমাকে?'

'কি যে বল সূর্য? ঐ হাডসন সাহেব বিনোদ দারোগাকে দিয়ে আমার বিধবা দিদির সর্বনাশ করায়, আর তুমি সেই হাডসন সাহেবকে গুলী করেছিলে। সে কি আমি জীবনে ভুলতে পারব?'

'কিন্তু দাদা আমি তো শালাকে খতম করতে পারলাম না।' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজের ব্যর্থতার গ্লানি প্রকাশ করলেন সুরেষ নারায়ণ।

'তুমি না শেষ করলেও ক্ষিতীশ তো ওকে শেষ করেছিল।'

দাদা, খেলায় জিতলে আনন্দ হয় কিন্তু নিজে গোল দিতে পারলে আরো বেশী আনন্দ হয়।'

'তারপর বল তুমি কেমন আছ?'

'কোন মতে বেঁচে আছি বেনীদাদা!'

'তোমার বাড়ী গয়াতে ছিল না?'

সুরেষনারায়ণ না হেসে পারে না। 'তাও মনে আছে আপনার?'

হাসলেন যোগীনবাবুও। 'তোমাদের মত

পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে করা ছাড়া এখন আর আমার কাজ কি?'

কথা যেন ফুরুতে চায় না। সুবয-নারায়ণ পাশের চেয়ারে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'গঙ্গা দিদির কি খবর?'

যোগীনবাবু চমকে উঠলেন। 'আমি তো ওর কোন খবর জানি না।'

'সে কি? আপনি গঙ্গাদিদিকে বিয়ে করেন নি?'

দুঃখেও যোগীনবাবু হাসলেন। 'গঙ্গা কি বেঁচে আছে?'

'বেঁচে নেই?'

'জানি না। আমি হিজলী জেল থেকে আন্দামান যাবার পর আর ওর খবর পাইনি।'

মন্ত্রী, এম-পির দল এসেছেন। মিটিং, বিপ্লবীদের সম্বর্ধনা সভা শুরু হবে গেছে। আগামীকাল বিকেলে লাল কেল্লায় তাম্রপত্র দেওয়া হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বরেণ্য যোদ্ধাদের। তিন-চারদিন ধরে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। তার প্রথমটি আজ হচ্ছে। একজন মন্ত্রী মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিন-চার-পাঁচটা লাউড স্পীকারে সে ভাষণ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, কিন্তু যোগীন-বাবুর কানে কিছু পৌঁছচ্ছে না। চোখেও আশে-পাশের কোন মানুষকে দেখতে পাচ্ছেন না। হঠাৎ যেন ওর কিছু কিছু ইন্দ্রিয় মরে গেল। মনে পড়ছে শুধু গঙ্গার কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ঐ একটি মূর্তি। গঙ্গা।

গঙ্গার বড়দার কাছেই যোগীনবাবু স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই কিশোরী মেয়েটা এসেই ওকে প্রথম আমন্ত্রণ জানায়, 'যোগীনদাদা, বড়দা তোমাকে একবার আশ্রমে যেতে বলেছেন।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ।'

যোগীনবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'তোমার বড়দার আশ্রমে গিয়ে কি কীর্তন গাইব?'

কথাটা শুনে গঙ্গার ভাল লাগে নি। 'গেলে বোধহয় ভালই লাগবে।'

'এই বয়সে?'

স্কুলের মেয়ে হয়ে যদি আমার ভাল লাগে তাহলে আপনারও ভাল লাগবে।'

মনে মনে খুশী না হলেও গঙ্গার বড়দার অনুরোধ উপেক্ষা করার সাহস ছিল না যোগীনবাবুর। সারা শহরের মানুষ ওকে শ্রদ্ধা করে। একদল স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে তো ওকে দেবতার মত ভক্তি করে।

'কবে যেতে বলেছেন?'

'ভোরবেলায় আমি যখন ফুল দিতে যাব তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।'

পরের দিন ভোরবেলায় যোগীনবাবু গঙ্গার সঙ্গেই বড়দার আশ্রমে গেলেন। গঙ্গাকে দেখেই বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে ভাল ফুল পেয়েছিস?'

আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে গঙ্গা বললো, 'আমার কাছে ফুল চেয়ে কবে তুমি পাওনি বলতে পারো?'

বড়দা ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো টিপে আদর করে বললেন, 'তুই যা করছিস তার তুলনা হয় না গঙ্গা। দেখিস একদিন হয়ত তোর ষ্ট্যাচু তৈরী হবে কলকাতা শহরে।'

শিকারী বিড়ালের মত দুই ভাই-বোনের চারটি চোখ একবার সতর্কভাবে চারদিক ঘুরিয়ে আনার পরই গঙ্গা আঁচলের মধ্যে থেকে ছোট একটা রিভলবার বের করে বড়দাকে দিল।

হাবা-বোবা হয়ে যোগীনবাবু দেখলেন। তারপর আপন মনেই বললেন, 'পিস্তল!'

জীবনে, যৌবনের প্রারম্ভে যোগীনবাবু ঐ প্রথম পিস্তল দেখেই প্রায় আধ মরা হয়ে গিয়েছিলেন। আর ঐ চোদ্দ বছরের মেয়েটা? খেলনার মত আলতো হাতে তুলে দিল বড়দাকে।

তারপরের কয়েকটা বছরের দিনগুলো যেন নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মত ঝড়ের বেগে অমিত বিক্রমে পার হয়ে গেল। কত প্রাণ নেওয়া হলো, কত প্রাণ দেওয়া হলো। কত-জন জেলে গেল, কতজনের ফাঁসি হলো। কত পিস্তল! কত বুলেট!

গঙ্গা জীবন বিপন্ন করে বড়দাকে ভাল ভাল ফুল এনে দিয়েছে, পৌঁছে দিয়েছে এখানে-ওখানে-সেখানে। কেষ্ট সরকারকে যেদিন নর্টন সাহেব গুলী করে মারলেন, সেদিন গঙ্গা এসে কাঁদতে কাঁদতে বড়দার কাছে অনুমতি চাইল, বড়দা, তুমি আমাকে একবার অনুমতি দাও! বেশী না, মাত্র দুটো বুলেট খরচ করব। বড়দা অনুমতি দেননি, দিতে পারেন নি, নারে গঙ্গা, তা হয় না। তুই ধরা পড়লে আমাকে এসব ভাল ফুল কে এনে দেবে রে?

তারপর একদিন।

সেই ভোরবেলায় গঙ্গা ফুল দিতে গেছে বড়দার আশ্রমে। মানিক মাইতি ঐ ফুল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে জজকোর্টে।

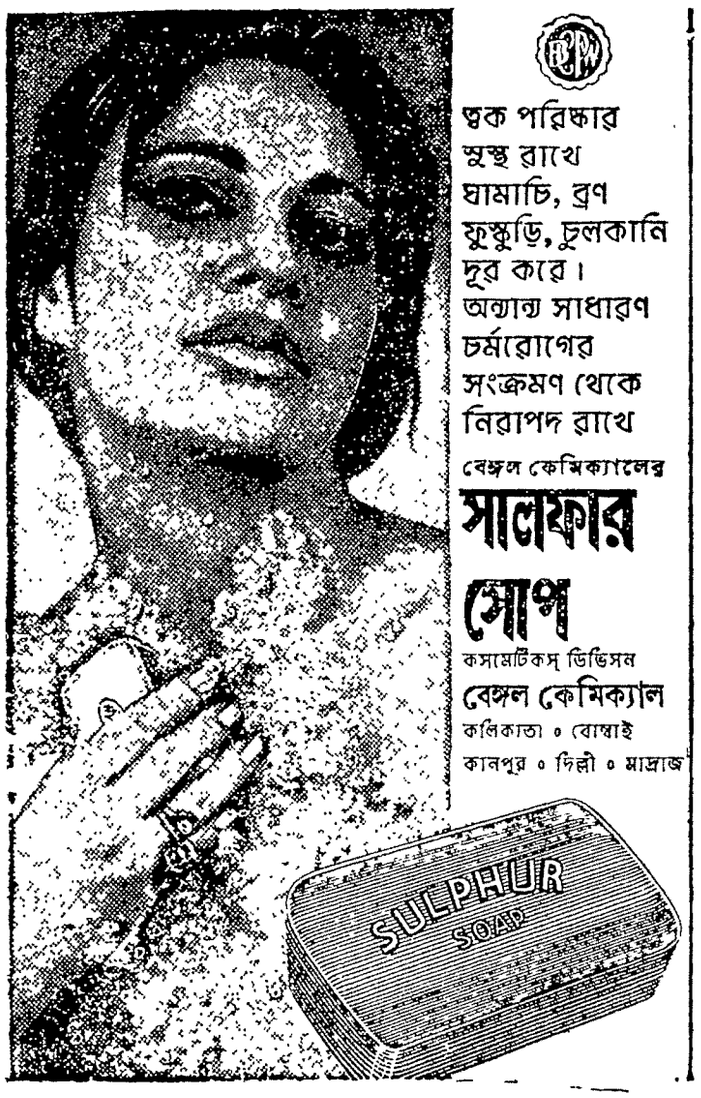

গাঙ্গুরামের

নতুন ৪টি
শ্রেষ্ঠ অবদান!

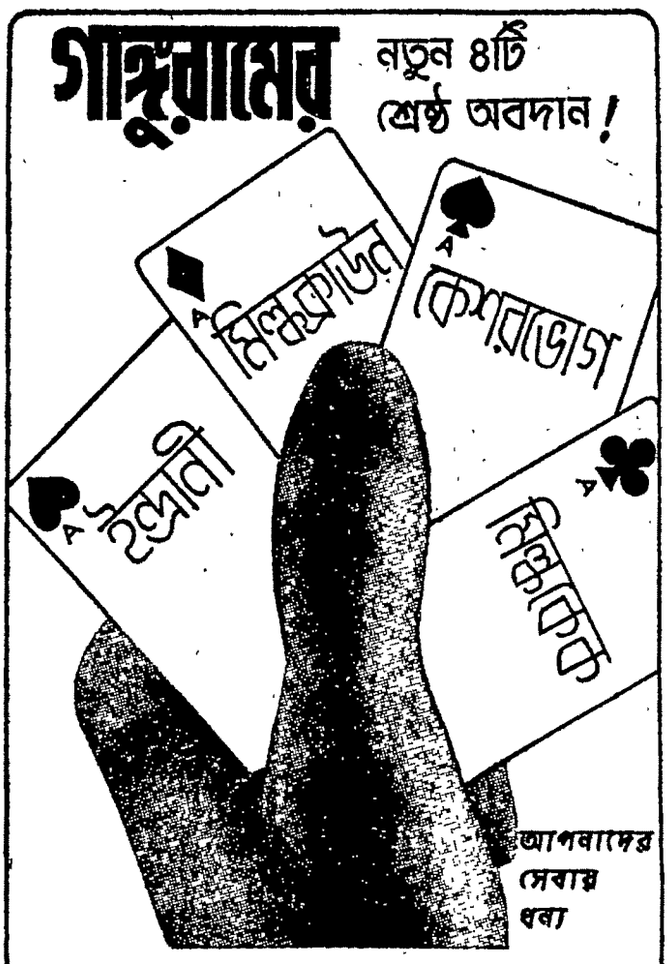

আপনাদের
সেবায়
ধন্য

গাঙ্গুরাম এ্যাণ্ড সন্স

ভবানীপুর
৪৭-২৩৭৭

কালিঘাট
৪৬-৬১৬০

চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
২৩-৮৪১৮

iaa-663/73

যোগীনবাবু আর্দালীর পোশাক পরে ঠিক সময়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাবেন। মানিক পান কিনতে এলেই আর্দালী আস্তে আস্তে কোর্টের দিকে এগুবে। কাশীনাথ আগে থেকেই কোর্টরুমে বসে থাকবে। ওরা আসার পরই কাশীনাথ নাকে নস্যি দিয়ে হাঁচতে শুরু করলেই মানিক আর যোগীনবাবু একসঙ্গে পরপর দুবার.....

হৈ চৈ শুরু হলেই কাশীনাথ।

সবকিছু ঠিক কিন্তু মানিক এলো না। যোগীনবাবু প্রথমে ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজ শেষ না করে আশ্রমে যেতে সাহস পেলেন না। প্ল্যানটা একটু অদল-বদল করে যোগীনবাবু আর কাশীনাথই একসঙ্গে পিস্তল তুলে ধরলেন জজ-সাহেবের দিকে। একটি একটি করে মাত্র দুটি বুলেট। জজসাহেব শেষ হলেন। সি-আই-ডি বিনোদ বেরার পেটে বুলেট লাগল। বুলেট লাগল যোগীনবাবুর ডান হাতের কনুইতে কিন্তু বিষ্টু হালুইকরের দোকানের পিছন দিক দিয়ে ওরা দুজনে যে কোথায় উধাও হলো, তা পুলিশ দেখতে পেল না।

কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে এক প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর কম্পোজিং রুমে এসে ওরা জানল নর্টন সাহেবের গুলীতে বড়দা আহত হয়ে জেলে আর মানিক নৈষ। গঙ্গা কোথায় পালিয়েছে কেউ জানে না। পরের দিন একটা টেলিগ্রাম এলো, ক্লাওয়ার সাপ্লায়ার প্রসিডিং বেনারস। বুঝতে অসুবিধা হলো না কারুর যে গঙ্গা বেনারসে দেবনাথপুরাব ঐ শিব মন্দিরে যাবে।

ছত্রিশ বছরের আগেকার কথা হলেও যোগীনবাবুর সবকিছু মনে পড়ছে। এই ছত্রিশ বছরের প্রতিটি দিনই একবার করে অন্তত মনে পড়েছে। গঙ্গার কথা। ইতিহাস। নর্টন সাহেবকে শেষ করার কাহিনী। আরো কত কি! বিবর্ণ, বিষণ্ণ মনে ঐ একই চিন্তা বার বার উঁকি দেয়। যোগীনবাবুর রূপ-যৌবন চলে গেছে। দেহ জরাজীর্ণ। হবনাথ দারোগার গুলীতে আংশিক পঙ্গু, রোগ-গ্রস্ত। সহায়, সম্পদ বলে কিছুই নেই। এক ভাইপোর কৃপায় কোনমতে দিনগত পাপক্ষয় করে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছেন।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে। মন্ত্রীদের চার-পাশে কিছু মানুষের ভীড়। পুরনো বন্ধু বান্ধবদের কাছে পেয়ে অনেকেই আনন্দে অধীর হয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন। যোগীনবাবু আপন মনে বসেই আছেন।

'কি হলো যোগীনদা, উঠবে না? প্রভাস-বাবু কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন।

'এই উঠছি ভাই।'

'চল চল তাড়াতাড়ি ওঠ। এক্ষুনি বাস ছেড়ে দেবে।'

'ছাড়ুক।'

'সে কি? তুমি হোম মিনিস্টারের ডিনারে যাবে না?'

উদাস হয়ে যোগীনবাবু বললেন, 'না ভাই, আমি আর ঐসব ডিনার-টিনারে যাচ্ছি না।'

'কেন যোগীনদা? যাবে না কেন?'

'আমি একটু স্টেশনে যাব।'

'কেন?'

'দেখি কালকের একটা টিকিট পাই কিনা।'

'সেকি? কাল বিকেলে লালকেল্লার ফাংশানে থাকবে না?' বোধহয় একটু বিরক্ত হয়েই প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

'ইচ্ছা নেই।'

'ওসব পাগলামী ছাড়ো তো। চল, ওঠ।' প্রভাসবাবু জোর করেই যোগীনবাবুর হাত ধরে টানলেন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যোগীনবাবু হোম মিনিস্টারের ডিনারে গেলেন। আলাপ হলো অনেকের সঙ্গে। সুরেশ নারায়ণ একজন ভদ্র-মহিলাকে সামনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যোগীদাদা, একে চেনেন?'

যোগীনবাবু অনেক কষ্ট করেও চিনতে পারলেন না। 'না ভাই চিনতে পারছি না তো।'

ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন। 'আফটার অল উই আর মিটিং আফটার এজেস। চেনা সত্যি সম্ভব নয়।'

সুরেশ নারায়ণ হাসতে হাসতে বললো, 'আরে যোগীদাদা, এইত গঙ্গাদিদি।'

অস্ফুট স্বরে যোগীনবাবু আপন মনে উচ্চারণ করলেন, 'গঙ্গা।'

'দ্যাটস রাইট যোগীনদা, আমিই গঙ্গা।'

'এতকাল পরে...!'

'আমি তো এখানে ছিলাম না বহুকাল...'

'কোথায় ছিলে?'

'মিঃ কুট্টির সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও সারা পৃথিবী ঘুরতে হয়েছে।'

'কোন মিঃ কুট্টি?'

'এ্যাম্বাসেডর কুট্টি। মাই হাসব্যান্ড। এখন অবশ্য রিটায়ার করে কলম্বিয়া ইউনি-ভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর।'

'তাহলে ভালই আছ?'

'মোটামুটি সাম হাউ...!'

সুরেশ নারায়ণ মাঝপথে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গঙ্গাদিদি, আপনিও তো তাম্রপত্র পাচ্ছেন?'

'দ্যাটস রাইট!'

পরের দিন লালকেল্লার অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র-পতির হাত থেকে সবাই তাম্রপত্র নিলেন, কিন্তু বার বার ঘোষণা করেও যোগীনবাবুকে পাওয়া গেল না।

রাজ জ্যোতিষী

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও তান্ত্রিক, জ্যোতিষশাস্ত্রে গভর্নমেন্ট উপাধিপ্রাপ্ত মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, জ্যোতিস্তীর্থ মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং হস্ত কপাল রেখা, করকোষ্ঠী নির্মাণে ও নির্ভুল কোষ্ঠী বিচারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশ্ন গণনায় সিদ্ধহস্ত। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নির্ণয়ে অদ্বিতীয়। দুর্ভাগ্যের ও কুপিত গ্রহের প্রতিকার করতে তাঁহার ক্ষমতা অনন্যসাধারণ। ভারত, বাংলাদেশ, বর্মা, সিংহল, ইংলন্ড আমেরিকা ফ্রান্স আফ্রিকা চীন জাপান প্রভৃতি দেশের বহু বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ পণ্ডিত মহাশয়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া তযাচিত সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র দিয়েছেন।

মহাশক্তিসম্পন্ন কয়েকটি জাগ্রত কবচ : তন্ত্রমতে প্রত্যেকটি কবচের **পুরশ্চরণাদি কার্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়াই কবচগুলি সদ্য ফলপ্রদ।**

শান্তি কবচ :—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও পারিবারিক ক্লেশ, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি সর্বদুর্গতিনাশক, সাধারণ—৫৲; বিশেষ—২০৲।

বগলা কবচ :—মামলায় জয়লাভ, রাজকৃপালাভ, ধন ও সম্মান বৃদ্ধি, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৪৫৲।

নবগ্রহ কবচ :—সর্বপ্রকার অশান্তি দূর হইয়া সুখ, শান্তি যশ, ঐশ্বর্যাদি লাভ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সাধারণ—২৯৲; বিশেষ—১৭৫৲।

আকর্ষণী কবচ :—শত্রুকে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ করিতে এবং অভীষ্টজনকে বশীভূত করিতে ইহার ক্ষমতা অপরিসীম। সাধারণ—১২৲; বিশেষ—৫০৲।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত হস্তরেখা বিচারের জ্যোতিষী বিদ্যার এবং তন্ত্রের সহজ ও সরল বাংলা ও ইংরাজী বই পড়ে নিজেই হাত দেখিতে এবং কোষ্ঠি নির্মাণ ও বিচার এবং তন্ত্র শিক্ষা করিতে পারিবেন।

সামুদ্রিক রত্ন (বাংলা) ২য় সংস্করণ—৬৲; ২। **জুয়েল অব পামিস্ট্রী** (ইংরাজী) ২য় সংস্করণ—১০৲; ৩। **এ গাইড টু এস্ট্রোলজি** (ইংরাজী)—১১৲। ৪। **তন্ত্রদর্শন** (ইংরাজী ও দেবনাগরী ভাষায় অনুবাদসহ)—১০৲।

হাউস অব এস্ট্রোলজি, ৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬ (হাজরা পার্কের পূর্বে), ফোন : ৪৭-৪৬৯৩

পণ্ডিত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য, বি-এ জ্যোতিষার্ণব দ্বারা পরিচালিত

জ্যোতিষ গবেষণাগার

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সর্বসাধারণ প্রতিষ্ঠান-এর সহিত যোগাযোগ করুন।
৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকা তা-২৫ (পূর্ণ সিনেমার দক্ষিণ সংলগ্ন)

সূর্যাস্তের রঙ

শ্রীলেখা বসু

মস্তবড় সূর্যমুখী ফুলটার আশে-পাশে ঝাউপাতাগুলো সাজাতে সাজাতে সংযুক্তা বললো, 'বিনয়বাবু, বাবা এক্ষুনি আসবেন।'

বিনয় বসলো। সংযুক্তা না বললেও হয়তো বসেই পড়তে হত, কারণ সংযুক্তা প্রধানের সামনে পড়লেই তার পা' দুটো কেমন দুর্বল হয়ে যায়, মাথাটা একটু ঝিমঝিম করে, আর বাক্‌শক্তি যে রহিত হয়ে যায় সেটা অবশ্য না বললেও চলে। তাছাড়া কোঁচার নিচে চটি জোড়াও লুকিয়ে ফেলা যায়। এইসব নানাবিধ কারণে বিনয় বসে পড়াটাই বেশ সংগত বোধ করলো।

'এতক্ষণে তো ওঁদের এসে যাবারই কথা', সংযুক্তা বললো 'কিন্তু কলকাতার রাস্তায় ঘণ্টায় দশ মাইলের বেশী গাড়ী চালানো যায় না তো।'

বিনয়ের শরীরে এমন একটা আনত ভংগী হলো যাতে সহজেই মনে হতে পারে যে সমগ্র কলকাতার অপরাধের ভারটা সে নিজের কাঁধেই তুলেই নিয়েছে।

'সত্যি যাস্তাঘাটের যা অবস্থা না—' বিনয়ের দিকে তাকিয়ে অন্য সুরে সংযুক্তা বললো, 'আপনি কিছু মনে করছেন না তো?'

'এই যে বিনয়বাবু, কতক্ষণ?' হাসি-খুশি প্রধানসাহেব ঘরে ঢুকলেন হাতে একগোছা রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড। বাঙালী মহিলা বিবাহ করে অবধি ভদ্রলোক নির্বিবাদে শুকতো ও রবীন্দ্র সংগীত গলাধঃকরণ করে যাচ্ছেন। 'বেচারা' ভাবতে পারতো বিনয়, কিন্তু তার মনে হলো, 'আশ্চর্য'।

'আশ্চর্য', বললেন প্রধানসাহেব। 'কি আশ্চর্য বলুন তো যে কলকাতা শহরে আপনাদের মত ট্যালেন্টেড আর্টিস্টদের একখানা ছবি বিক্রী হয় না। এমন তো নয় যে এই শহরে বড়ো বড়ো সংস্থা নেই বা দু'খানা পেন্টিং কিনে ঘর সাজানোর মত লোকের অভাব—'

'ইচ্ছের অভাব,' বিনয় বলে ফেললো।

'এগজ্যাকটলি! ইচ্ছের অভাব! তাই মস্ত আর্ট-ক্রিটিকের বাড়ী দেখবেন লক্ষ্মীর ক্যালেন্ডার দিয়ে সাজানো। আর কি জানেন,' মুচকি হেসে চোখ টিপলেন প্রধান, 'ফ্যাশানেরও অভাব। ভাবছেন কি বম্বেতে যাঁরা আর্ট গ্যালারীগুলো পেট্রো

নাইজ করেন তাঁরা সব চিত্ররসিক? আরে না মশাই, এটা হলো একটা ফ্যাশান। তবে এর একটা সুফল নিশ্চয়ই আছে। দেখতে দেখতে...ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক একটা তৃতীয় নয়ন খুলে যায়। নইলে লতিকাকে বিয়ে করার আগে এই আমিই কি ছিলুম, হ্যাঁ?' উচ্চরোলে হেসে উঠলেন প্রধান।

আর অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে বিনয় বলে ফেললো, 'আমার একটা পোর্ট্রেট আঁকার ইচ্ছে আছে।'

'পোর্ট্রেট। কার—?'

'আজ্ঞে' অস্বাভাবিক শান্তভাবে বিনয় বললো, আপনার মেয়ের।'

'সংযুক্তার?' হালকা ছায়া নেমে এলো প্রধানের মুখের ওপর, নিজের অজান্তেই তাঁর চোখ বিনয়ের আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করলো। আধময়লা জামাকাপড় না কামানো গাল, অযত্নবর্ধিত চুল, এ সবই অবশ্য ইন্টেলেকচুয়ালের লক্ষণ, তবে কিনা তার সঙ্গে চাই আত্মবিশ্বাস, চলাফেরায় একটা বিশ্বজনসাৎকারী ভংগী যার দরুন নাকি গাঁজার কলকেও মানিয়ে যায় পশ্ ড্রয়িংরুমে। এ ছোকরার আদি অন্ত জুড়ে একটা মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি বিরাজ করছে। সংযুক্তা—নাঃ।

প্রধান অমায়িক হাসলেন, 'বেশ তো, বেশ তো, তা এবারে তো ছুটি ফুরিয়ে গেল ওর। দেওয়ালীর ছুটিতে যখন আবার মামারবাড়ী আসবে তখন বরং দেখা যাবে। আর দেখ, আমার বন্ধু মিস্টার ভাটিয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ...'

...বাইরে রোদের হালকা কলরব ভীড়ে উপচেপড়া বাস, কলার খোসাটাকে সাবধানে টপ্‌কে যাওয়া। আর তারপর নড়বড়ে সিঁড়ি দুটোর পরে বাড়ীর দরজা। মা-কে পাশ কাটিয়ে নিজের ঘরে এলো বিনয়। আর ঘামে ভেজা পাঞ্জাবিটা খুলে রেখেই তুলে নিল মোটা একটা খাতা। স্কেচ...পেন্‌সিলে, কালিতে, নানান ভংগী, নানান বিষয়, কিন্তু শেষের ক'টা পাতা জুড়ে মুখ, বড়ো পরিচিত একখানি মুখ। পাশ থেকে উপর থেকে, হেলানো কোনো কোণ থেকে আশ্চর্য সেই একখানি মুখ ঝাউপাতার আড়ালে সূর্যমুখীর মত ফুটে আছে।

'কি রে, খাবার দেব?' মা ক্লান্ত গলায় বললেন।

চমক ভেঙে বিনয় বললো, 'হ্যাঁ দাও।' তারপরে ভালো করে মা-র দিকে লক্ষ্য করে, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

'খারাপ আর কি, সেই ব্যথাটা। সান্ত্বনা এসে কুটনো বাটনা করে দিয়ে গেল তাই রক্ষে। বড়ো ভালো মেয়েটি।'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই,' অন্যমনস্কভাবে বললো বিনয়, তারপরে মা তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন দেখে আবার সচকিত হয়ে উঠলো। সান্ত্বনা সম্বন্ধে মায়ের মনোভাব জানতে তার বাকি নেই। আর তার নিজের মনোভাব? তা বিশ্লেষণ করার মত কিছু নেই। সান্ত্বনাও সাধারণ, সে নিজেও সাধারণ, অতি সাধারণ একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে তারা একত্র হবে একদিন। এ সম্বন্ধে তার বিশেষ কোনো ঔৎসুক্য, অধীর কোনো আগ্রহ, স্পন্দিত কোনো প্রতীক্ষা—কিছুই নেই।

কিন্তু সত্যি কি আমি সাধারণ, খুব সাধারণ? বিনয় ভাবলো। না আমার মধ্যেও আছে অসাধারণ কিছু স্পর্শকাতর একটা মন যা তার পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে ওঠে, শিখার মত ছুঁতে চায় আকাশকে, তার বর্ণসম্ভাবকে, তার অফুরন্ত মুক্তির ঔদার্যকে?

সেই আমিই কি সত্যকার আমি যার আশেপাশে আঠার মত জড়িয়ে থাকে ঘামে ভেজা ভীড়, মাথার ওপর প্রখর রোদ, যে ধুঁকতে ধুঁকতে আপিসে পৌঁছয় একটা ক্ষুদে কেরানীর চেয়ার অলংকৃত করতে আর বড়বাবুর বক্রচক্ষুর সামনে দাঁড়ায় দুর্বল পায়ে থমকে পড়া হৃৎপিণ্ড নিয়ে। তবে এই আমি কে? যার পেনসিলের ভাঙাচোরা রেখায় অবিশ্বাস আর বিদ্রোহ,

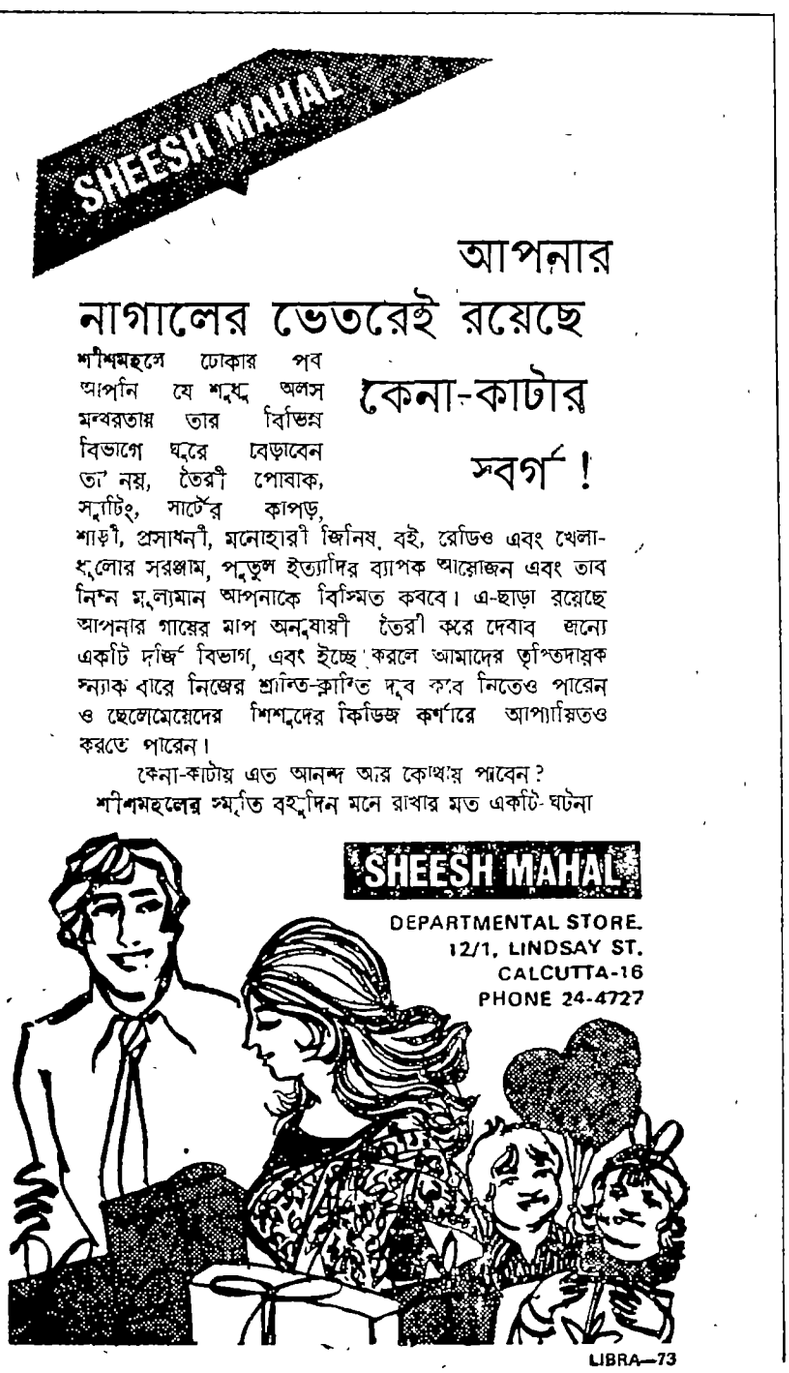

যার তুলি থেকে ঝরে যায় রঙের স্রোত—কখনো দগ্‌দগে জ্বালাধরানো, কখনো স্নিগ্ধ। কচিপাতার ওপর টলমলিয়ে ওঠে স্বচ্ছ শিশিরবিন্দু, যার রেখায় রেখায় ভংগিমা পায় সেই অপরূপ তনু, রঙের প্রলেপে জীবন্ত হয়ে ওঠে দুর্লভ সেই মুখশ্রী।

আনরিয়্যাল এই রঙীন পরিবেশ? আনরিয়্যাল এই প্রকৃতির মত ক্ষমতাশালী আমি?

'রিয়্যালিজ্‌ম্‌, বুঝলে বিনয়বাবু, রিয়্যালিজম হল সবকিছুর মূলে।' অদ্ভুত গড়নের কাপে কফি এগিয়ে দিয়ে প্রধান বললেন, 'এই যে তোমাদের সাহিত্য ফিল্ম নাটক এতো উন্নতি করেছে ঐ সবের মূলেই হল তোমাদের রিয়্যালিজম—বাস্তববোধ। আর সত্যি, কলকাতায় বাস করতে গেলে আর যাই হোক অন্তত আইভরি টাওয়ারে থাকা চলে না।' খুব আন্তরিকভাবে বলে চললেন প্রধানসাহেব, 'বেঁচে থাকার জন্যে এই যে তোমাদের স্ট্রাগল, তোমাদের এই জীবনযন্ত্রণা, এর জন্যেই তোমরা এতো ক্রিয়েটিভ। আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি বিনয়বাবু, তোমরা এস্কেপিজমের সোজা রাস্তা বেছে নাওনি, তোমরা মনে করো এই যন্ত্রণা সৃষ্টির একটা অংগ.....'

মাপ করবেন, ঠিক তা নয়,' বিদ্বেষ আর বিদ্রোহ মেশানো একটা অদ্ভুত স্বর বেরুলো বিনয়ের গলা দিয়ে। প্রধানের

স্বাধীনতার ২৬ বৎসর পূর্তী উপলক্ষে সহীদদের স্মৃতিতর্পণ

K. C. GHOSH

THE ROLL OF HONOUR ৩০·০০

পলাশীর যুদ্ধের শুরু থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত ব্যাপ্ত সশস্ত্র মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতির বিস্তৃত পুণ্য ইতিহাস। শতাধিক দুষ্প্রাপ্য চিত্র সম্বলিত এক নতুন মহাভারত।

বি, টি এবং বি, এড. ছাত্রছাত্রীদের অপরিহার্য এবং বাংলা ভাষার শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

অধ্যাপক বিষ্ণুপদ পান্ডার

(রিজিওনাল কলেজ অব্‌ এডুকেশন, ভুবনেশ্বর)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ-পদ্ধতি ৯·০০

.....শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভাল বই বাজারে নেই..... অধ্যাপক পান্ডার বইখানি 'পথিকৃৎ'-স্বরূপ হবে একথা জোরের সংগে বলা যায়।..... অধ্যাপক কে, কে. মুখার্জি

পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন

(প্রথম যুগ : ১৭৪৩—১৮৩০)

সম্পাদনা : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ

থেকে শুরু করে

উইলিয়ম্‌ কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলোকনাথ শর্মা, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, চন্ডিচরণ মুনশী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায়

প্রমুখ পুরাতন লেখকদের গ্রন্থসমূহের সংকলন। শিঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অপরিহার্য এবং গ্রন্থাগারিকদের প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রকাশিত হচ্ছে

গ্রন্থ সূচীকরণ (ক্যাটালগিং)

ডঃ বিমলকুমার দত্ত

(গ্রন্থাগারিক 'বিশ্বভারতী')

ডঃ বিমলকুমার দত্তের

ভারত শিল্প ৭·০০

বিপিনবিহারী গুপ্তের

পুরাতন প্রসঙ্গ ১ম, ২য় ও ৩য় একত্রে : ১৫·০০

ভূমিকা : প্রমথনাথ বিশী

সম্পাদনা : বিশু মুখোপাধ্যায়

বিদ্যাভারতী— ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা—৯

মসৃণ আবেগ হোঁচট খেল, সপ্রশ্ন চোখে বিনয়ের দিকে তাকালেন তিনি।

কিন্তু বিনয় আর কিছু বললো না। তার চোখ অনুসরণ করে ফিরছিলো সংযুক্তাকে। দাসী উবু হয়ে বসে ঘর মুছছিলো আর সেই ঝক্‌ঝকে করে মোছা মেঝের উপর সংযুক্তা ছড়িয়ে দিচ্ছিলো মস্ত গামলা থেকে ঝুঁকে পড়া মানি-প্ল্যান্টের লতা। কোণঠেসে করে সাজিয়ে রাখছিল বাঁকুড়ার ঘোড়া।

বিনয় ভাবলো একবার বলে, আমাদেরও ইচ্ছে করে ভালো কফির স্বাদ পেতে, মসৃণ মেঝেয় পা ফেলে হাঁটতে। যন্ত্রণা বাদ দিয়ে জীবনটা কি তা জানতে।

'আপনাকে আর এক কাপ দিই?' সংযুক্তার প্রশ্নে চমক ভাঙলো বিনয়ের। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে কখন প্রধান উঠে গেছেন কখন সংযুক্তা এসে সামনে বসেছে তা খেয়াল করেনি কেন।

'আপনি শীগ্‌গিরই ফিরে যাবেন?'

'পরশু ফিরছি আমরা।' একটু নিস্তব্ধতার পর, 'বহুরূপীর নতুন নাটকটা দেখা হলো না।'

'আবার কবে আসবেন?'

'দেখি—' হাসলো সংযুক্তা। আর বিনয় মুখ তুলে তাকালো—এই প্রথমবার স্পষ্ট করে তাকালো সেই মুখখানির দিকে যা তাকে উন্মনা করে তুলেছে বার বার? শান্ত স্পষ্ট স্বরে বললো, 'আপনার একটা পোর্ট্রেট আঁকবো ভেবেছিলুম।'

চমকে উঠলো সংযুক্তা, একটু লাল হলো, পোর্ট্রেট আঁকেন নাকি আপনি? আমি তো দেখি বেশীর ভাগই স্টিল আর ল্যান্ডস্কেপ—অবশ্য আজকাল যে কি আঁকেন আপনারা তা বোঝাই মুশকিল।'

আরো এক কাপ কফি এগিয়ে দিয়ে সংযুক্তা বললো, 'একবার বম্বে আসুন না। আমাদের বাড়ীটা সমুদ্রের ঠিক ওপরে, আর আকাশ আর সমুদ্রের সে রঙ যদি আপনি দেখেন না—পাগল হয়ে যাবেন।'

বিনয় নিঃশব্দে চেয়ে রইলো।

'এখন তো মনসুন নেমে গেছে, এখন সমুদ্রের অদ্ভুত রঙ—কালো, ছাইকালো টলমলে জল কাণায় কাণায় ভর্তি। আকাশ-জোড়া কালো মেঘ কিন্তু তার একটা কোণ ছিঁড়ে উঁকি দিচ্ছে হলদে আকাশ। অদ্ভুত সেই হলদে আভা, আশ্চর্য সেই সূর্যাস্তের রঙ।'

সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে নেমেছে গলির মধ্যে। ধোঁয়ার পর্দা গাঢ় হয়ে ছড়িয়ে আছে। বিনয় সন্তর্পণে সিঁড়ি দুটো পেরিয়ে কড়া নাড়লো।

মুহূর্তে খুলে গেল দরজা। ধোঁয়া উদ্গীরণ করা বালতির উনুনটা একহাতে ধরে সান্ত্বনা অপর হাতে দরজা খুলে দিলে। নিচু গলায় বললো, 'মাসীমার ব্যথাটা খুব বেড়েছে, ওঘরে শুয়ে আছেন।'

অন্যমনস্কভাবে চাইলো বিনয়। হঠাৎ যেন মেঘের পর্দা ছিঁড়ে গেল—কিন্তু কোণ ছেঁড়া হলুদ আলোয় উদ্ভাসিত হলো না পৃথিবী। তার বদলে ছড়িয়ে পড়লো একটা ধূসর বর্ণাভা।

বিড়বিড় করে বললো বিনয়, 'সূর্যাস্তের রঙ!'

'কি বলছেন?'

'বলছি এক কাপ চা দেবে?'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী
১ম খণ্ড ঃ পাঁচ টাকা ২য় খণ্ড ঃ পাঁচ টাকা
৩য় খণ্ড ঃ নয় টাকা
০
চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪-৬২
ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
২-০০

ভারতীয় প্রদর্শশালাসমূহের বিবরণপঞ্জী
২০-০০
০
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা—হস্তশিল্প
রচনা ঃ শ্রীআশীষ বসু
১-২৫

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই-এ-এস রচিত
বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি
৩·৭৫
(পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ২০%)

শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তীর
বাংলার উৎসব ১-২৫
শ্রীমণি বর্ধনের
বাংলার লোকনৃত্য ২-৯০
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের
বাংলার শিকারপ্রাণী ৩-০০
শ্রীভবতোষ দত্তের
দেশের গান ০·৫০

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-এ-এস রচিত
হুগলী জেলা গেজেটীয়ার ৪০·০০
বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার ২৫·০০
শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, আই-এ-এস রচিত
পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গেজেটীয়ার ১৫-০০
মালদা জেলা গেজেটীয়ার ২০·০০
(এই সিরিজের বইয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ১৫ শতাংশ)

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা:—
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্‌লিকেশন ব্রাঞ্চ)
৩৮, গোপালনগর রোড আলিপুর, কলিকাতা-২৭
নগদ বিক্রয় কেন্দ্র:—
পাব্‌লিকেশন সেল্‌স অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৫৮৮৩/৭৩

আরক্ত রাত্রি

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ধাবমান মার্ক-টুর নরম আসনের উপর আরো একটু হেলে বসলেন রামশঙ্কর। জানলার বাইরে কলকাতার বিলাসবহুল চৌরঙ্গী পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি দেখছেন, প্রাণ ভরে দেখছেন সমস্ত কিছু—তাঁর ভাল লাগছে। কুড়ি বছর আগের চেয়ে এখন কলকাতার প্রাণচাঞ্চল্য অনেক বেড়ে গেছে বলে তাঁর দৃঢ় ধারণা হল।

দেশ স্বাধীন হবার কয়েক বছর পরই রামশঙ্কর চলে গিয়েছিলেন সুদূর জাব্বালপুর। গিয়েছিলেন অবশ্য ব্যবসার সূত্রেই। আগে এখানে ড্রাইভারী করতেন। দক্ষ মোটর চালক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। এর পর কুড়িটা বছর তাঁর অর্থের সাধনায় কেটে গেছে। জাব্বালপুরের বাইরে পা দেওয়ার সুযোগ হয় নি। ঠিক বোধহয় বলা হল না। মধ্যপ্রদেশের ওই শহরের বাইরে পা দিতেই তিনি চান নি।

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্তন হয়। প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছাবার পর আর ভাল লাগল না ওখানে। স্ত্রীও তাগাদা দিচ্ছিলেন বারংবার। তাঁর যুক্তি হল, মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে। বাংলা দেশ থেকে এত দূরে পড়ে থাকলে, তাকে ভাল ঘরে কখনই দেওয়া যাবে না।

এই যুক্তি অবশ্য রামশঙ্কর মেনে নিতে পারলেন না। টাকা যখন আছে তখন যেখানেই থাকুন না কেন ভাল ঘরে মেয়েকে স্বচ্ছন্দে দিতে পারবেন। আসল কথাটা তা নয়। তাঁর নিজেরই আর এখানে ভাল লাগছিল না। প্রচুর রোজগার করেছেন। কোন কিছুই এখন আর তাঁর কাছে সমস্যা নয়। তবে কেন শেষ বয়সে বিদেশে পড়ে থাকবেন?

কলকাতার একজন সামান্য ড্রাইভার জব্বলপুরে গিয়ে মহা ধনী হয়ে উঠল কি ভাবে, এ প্রশ্নের উত্তরে এখন এটুকুই বলা চলে, সে আরেক কাহিনী। মাস আটেক হল রামশঙ্কর ওখানকার পাট চুকিয়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে এসেছেন। বাড়ী কিনেছেন দক্ষিণাঞ্চলের অভিজাত পাড়ায়। ছোটখাট লোহার একটা কারবার আরম্ভ করেছেন। কিছু করা ভাল। সারা

জীবন কাজের পিছনে ছুটে বেড়িয়ে, আজ হাত গুটিয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সমস্ত গুছিয়ে নিতে কয়েক মাস সময় লেগে গেছে। এখন রামশঙ্কর নিশ্চিন্ত। কলকাতাকে নতুন করে ভাল-ভাবে দেখে নেবার সুযোগ নিচ্ছেন এবার। দিন ছয়েক ধরে প্রতি দিনই গাড়ী নিয়ে বেরুচ্ছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহানগরীর বহুতল।

আবার নড়েচড়ে বসে রামশঙ্কর বললেন, কেমন দেখছো বেবি?

—খুব ভাল লাগছে না। মুখ ফিরিয়ে রতি বলল, জাব্বালপুর এখানকার চেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

—এক জায়গায় বহু দিন থাকার পর অন্য জায়গায় এসেছো। মন বসতে কিছু সময় লাগবেই। কলকাতা বিশাল শহর, জাব্বালপুরের পরিচ্ছন্নতা এখানে আশা করা যায় না।

রতি রামশঙ্করের একমাত্র সন্তান। গত বছর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেছে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় সে তা নয়। তবে সুঠাম দেহ আর আলগা শ্রী থাকার দরুণ সকলেরই তাকে ভাল লেগে যায়।

—এখানে এসে তুমি খুব খুশী হয়েছো না বাবা?

—আমার চেয়ে তোমার মা আরো বেশী খুশী হয়েছেন। কি রকম ঘন ঘন কালীঘাটের মন্দিরে যাচ্ছেন দেখছো তো।

কথা শেষ করে রামশঙ্কর হেসে উঠলেন। রতিও হাসল।

আধ ঘন্টাটাক পরে ঝকঝকে মার্ক-টু আধুনিক প্যাটার্নের এক বাড়ীর পোর্টিকোর নীচে এসে থামল। মেয়েকে সংগে নিয়ে

পার্লারে পৌঁছে রামশঙ্কর দেখলেন, প্রদীপ কাকে যেন ফোন করছে। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল সে। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

—কাকে ফোন করছিলে?

বিরক্তির সুরে প্রদীপ বলল, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে চেষ্টা করছি শিশির-বাবুকে ধরবার।

—টেলিফোনের ওই তো দোষ। প্রয়োজনের সময় কখনই লাইন পাবে না। শিশিরকে এই অসময় খুঁজছো কেন?

রতি আর ওখানে দাঁড়াল না। রাম-শঙ্করকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ড্রইং রুমের দিকে। এখানে আসার পর রামশঙ্কর যে নতুন ব্যবসা ফেঁদেছেন তাতে প্রদীপ হল তাঁর প্রধান সাহায্যকারী। বুদ্ধিদীপ্ত, স্মার্ট এই ছেলেটির বয়স ত্রিশ অতিক্রান্ত নয়। বহু প্রার্থীর মধ্যে থেকে অনেক চিন্তা ভাবনার পর তিনি প্রদীপকে বেছে নিয়েছেন।

—ভগবানদাস মাগানবাম এক কেলে-ঙ্কারী বাধিয়েছেন স্যার।

—কোন ভগবানদাস—ও, বম্বের সেই পার্টি। কি বলছে তারা এখন?

—পঁয়ত্রিশ টন রড ওরা বুক করেছিল আপনি তো জানেন। মাল ওখানে পৌঁছে গেছে। এখন অর্ডার বাতিল করে দিয়ে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, ক্ষতিপূরণ হিসাবে অ্যাডভান্সের টাকাটা ছেড়ে দিচ্ছে।

—তা না হয় হল। চিন্তিত গলায় রামশঙ্কর বললেন, মাল ফিরিয়ে আনার কি হবে? কোন ব্যবস্থা নিয়েছো?

—মাল আর ওখান থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছি না স্যার। আবেক দফা খরচ হবে। শিশিরবাবুকে খুঁজছিলাম তাই। উনি যদি বম্বের আর কোন পার্টিকে মালটা গছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন।

—মন্দ বল নি। শিশিরের অসাধ্য কাজ নেই। সে ঠিক একটা পার্টির ব্যবস্থা করে ফেলবে।

প্রদীপ কিছু বলতে যাবার আগেই, শিশির সোম অভাবনীয়ভাবে ওখানে এসে উপস্থিত হল। নিরেট চেহারার মধ্যবয়স্ক লোক। মুখে সব সময় বেপরোয়া হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। হার্ডওয়ার মার্কেটের ইনি একজন ধুরন্ধর ব্রোকার।

—আপনার কথাই হচ্ছিল। প্রদীপ বলল, ঠিক সময় মত এসে পড়েছেন।

শিশির সোমের মুখে একটা চওড়া হাসি দেখা দিল, সময় মত ঠিক জায়গায় উপস্থিত থাকাই হল আমার কাজ। আপনাদের সমস্যাটা কি?

সমস্ত কথা বলা হল তাকে।

চারমিনার ধরিয়ে গোটা কয়েক ছোট ছোট টান দেবার পর সোম বলল, এ কোন সমস্যাই নয়। মোটা এন্টারপ্রাইজকে ঠিক করে দিচ্ছি। মালটা ওরা নিয়ে নেবে। আমার কমিশন কিন্তু দু পারসেন্ট বেশী চাই সেনমশাই।

রামশঙ্কর মৃদু হেসে বললেন, বেকায়দায় পড়েছি বলে সুযোগ নিচ্ছ? বেশ তাই হবে। প্রদীপ, বেয়ারাকে বল আমাদের চা দিয়ে যাবে।

প্রদীপ নিষ্ক্রান্ত হবার পর সোম বলল, একটা বিশেষ কথা ছিল সেন-মশাই। যার জন্য এই সময় আসা। মেয়ের বিয়ের কথা কিছু ভেবেছেন নাকি।

—বিয়ের ঘটকালিও কর নাকি? তোমার তো অনেক গুণ দেখা যাচ্ছে।

—ঘটকালি আমি করি না। এক্ষেত্রে—মানে একজনের অনুরোধ ঠেলতে না পেরেই কথাটা আমায় তুলতে হল। পাত্র হিসাবে সমীর গুপ্তকে আপনার কেমন মনে হয়?

রামশঙ্কর একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'গুপ্ত এবং দত্ত' সলিসিটার ফার্মের সিনিয়ার পার্টনার অরুণ গুপ্তর একমাত্র ছেলে সমীর। কিছু দিন হল বাপের ফার্মে যোগ দিয়েছে। চৌকশ ছেলে বলতে যা বোঝায় সমীর তাই। এই 'গুপ্ত এবং দত্ত' ফার্মের উপরই আইনঘটিত সমস্ত সমস্যার সমাধানের ভার দিয়েছেন রামশঙ্কর।

—মেয়ের বিয়ের কথা এখনও কিছু ভাবি নি।

—ভাবতে তো হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে।

—তা ঠিক। সত্যি সময় বয়ে যাচ্ছে। এ বছরেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।

—সমীরবাবুর কথা বিবেচনা করবেন সেনমশাই। এমন ছেলে লাখে একটা পাওয়া যায়।

—তা বটে। ভেবে দেখি।

আরো দু-চার কথার পর শিশির সোম উঠল। রামশঙ্করের বাড়ী থেকে বেরিয়ে, নানা কথা ভাবতে ভাবতে ফুটপাথ ধরে এগুল সে। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর হর্ণের শব্দে চমক ভাঙ্গল তার। আটষট্টি মডেলের ফিয়েটখানা দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার ধার ঘেঁষেই।

সমীর গলা বাড়িয়ে বলল, গাড়ীতে এসে বসুন।

তামাটে বর্ণের সমীর গুপ্ত চওড়া হাড়ের মানুষ। বয়স বছর বত্রিশের বেশী নয়। চোখে বিয়ার কলারের চশমা। লেন্সের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি ঠিকরে আসছে যেন। মুখের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অন্যকে আকৃষ্ট করে।

গাড়ীতে বসতে বসতে সোম বলল, আপনি সেই থেকে অপেক্ষা করে রয়েছেন?

—গরজটা তো আমার। সমীর গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বলল, বুড়োর সঙ্গে কথা হল? প্রস্তাব পেয়ে নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছে?

মনের ভাব তো বুঝতে পারলাম না। বললে, পরে মতামত জানিয়ে দেবে।

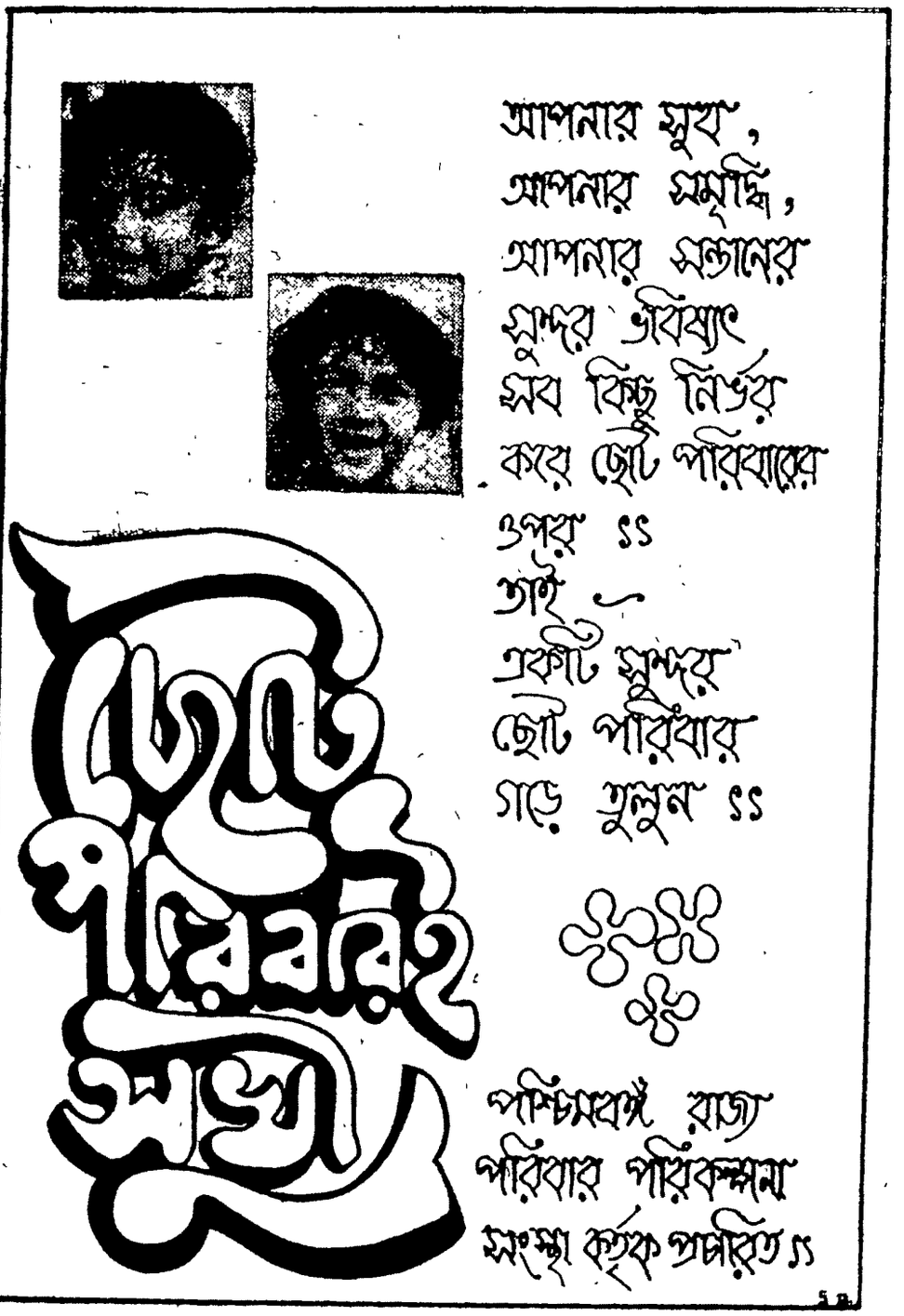
আপনার সুখ,
আপনার সমৃদ্ধি,
আপনার সন্তানের
সুন্দর ভবিষ্যৎ
সব কিছু নির্ভর
করে ছোট পরিবারের
ওপর ।।
তাই —
একটি সুন্দর
ছোট পরিবার
গড়ে তুলুন ।।
ছোট পরিবারই সুখী
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
পরিবার পরিকল্পনা
সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ।।

—ঘোড়েল লোক। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলে পাছে সস্তা হয়ে যায় তাই সাময়িক একটা অজুহাত খাড়া করেছে। কিছু দিন অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। মোট কথা কাজটা হওয়া চাই।।

—আমি তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

—বিয়ে পাকাপাকি হয়ে গেলেই মোটা টাকা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। জানেন তো আমি এক কথার মানুষ।

শিশির সোম আর কিছু বলল না।

কাঁটায় কাঁটায় করটার সময় রামশঙ্কর অফিসে পৌঁছালেন। ব্র্যাবোর্ণ রোডে তাঁর ছিমছাম ছোট্ট অফিস। জনকয়েক ক্লার্ক আছে। আছে একজন যুবতী টাইপিস্ট। ব্যবসার অন্যান্য আরো কাজ হয় বড়-বাজারের একটা ঠিকানায়। গুদামও সেখানে।

নিজের অফিস ঘরে প্রবেশ করে রিভলভিং চেয়ারে রামশঙ্কর বসলেন। কলিংপুস-এ আঙুল ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এসে উপস্থিত হল। এক গেলাস জল চাইলেন। জল খাবার পর সিগার ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ার পর বললেন, ম্যানেজারকে এখনি এ ঘরে পাঠিয়ে দিতে।

মিনিট কয়েক পরেই ম্যানেজার সুব্রত রক্ষিত দেখা দিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছা-কাছি হবে। সুবিস্তীর্ণ টাকের অধিকারী মানুষটিকে বেশ চটপটে বলেই মনে হয়।

—আমায় ডেকেছেন স্যার।

—বসুন। বাজোরিয়াদের ওখান থেকে ফোন করে আমায় জানিয়েছে টাকাটা আজই পাঠাবে। ওদের কান্ডটা দেখেছেন তো? সব সময় কাঁচা টাকায় পেমেন্ট করে। আমি তখন বলতে ভুলে গেলাম। আপনি এক্ষুনি ওদের জানান, কাঁচা টাকায় নয়, চেকে যেন পেমেন্ট করে।

—আমি ওদের জানিয়ে দিচ্ছি স্যার। কাঁচা টাকা পেলে অসুবিধাই হবে। আজ শনিবার। এখন ব্যাঙ্ক আর রিসিভ করবে না।

—তাইতো বলছিলাম। আর দেরী করবেন না। যান।

সুব্রত রক্ষিত দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। সিগার নিভে গিয়েছিল। আবার ধরিয়ে নিলেন রামশঙ্কর। পাকা নেশা কিছু নয়। দিনে গোটা তিনেকের বেশী ঠোঁটের ডগায় তোলেন না। শিলিং-এর দিকে উঠে যাওয়া কালচে হলদে ধোঁয়ার দিকে রামশঙ্কর অন্য-মনস্কভাবে তাকিয়ে রইলেন। রতির বিয়ে সম্পর্কেই যত রাজ্যের চিন্তা-ভাবনা তাঁর মাথায় চাপ বেঁধে রয়েছে এখন। মিনিট পাঁচেকও বোধহয় অতিক্রান্ত হয়নি। ব্যস্ত-ভাবে সুব্রত রক্ষিত ঘরে প্রবেশ করে বল-লেন, ক্যাসিয়ারবাবু বললেন, ওরা টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

রামশঙ্করের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। নিজের উপর একটু বিরক্তই হলেন। ওদের তখন জানিয়ে দিলেই টাকার বদলে চেক পাওয়া

শেক্সপীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডের আংশিক সূচী : টু জেন্টেলম্যান অফ ভেরোনা, দি মেরি ওয়াইভস অফ উইন্ডসর, কমেডি অব এরর্স, টেমিং অফ দি শ্রু, লাভস লেবার লস্ট এ মিডসামার নাইট ড্রীম, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস্, য়্যাজ ইউ লাইক ইট, রোমিও জুলিয়েট, টাইটাস এন্ড্রোনিকাশ, ভেনাস এ্যান্ড অ্যাডোনিস, দি রেপ অফ্ লিউক্রিস। শেক্সপীয়রের সম্পূর্ণ রচনাবলী সমগ্র সনেটসহ ও সমগ্র নাটকগুলি নাট্যরূপে বাংলায় নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হচ্ছে। তিন খণ্ডে — প্রতি খণ্ড ১০৲। রেক্সিনে

গিরিশচন্দ্র সমগ্র রচনাবলী

সম্পাদনা : দেবনারায়ণ গুপ্ত

প্রথম খণ্ডের আংশিক সূচী : মৃণালিনী, আগমনী, অকালবোধন, মেঘনাদ বধ, দোললীলা, মায়াতরু, মোহিনী প্রতিমা, আলাদিন, আনন্দ রহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার বিবাহ, বল্লবিহার, রামের বনবাস, সীতা হরণ, ভোটমঙ্গল, মলিন মালা, পান্ডবের অজ্ঞাতবাস। প্রতিটি নাটকের পূর্বকথা, প্রতিটি নাটকের প্রথম অভিনয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নাম ও দুষ্প্রাপ্য অপ্রকাশিত ছবি। সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ ভূমিকা। রেক্সিনে বাঁধাই। ৫ খণ্ড— প্রতি খণ্ড ১০৲। ফুল রেক্সিনে বাঁধাই ও ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

ভূদেব সমগ্র রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনায় : ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
দুই খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲

হেমচন্দ্র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী
দুই খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০৲

সমগ্র বঙ্গদর্শন

৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ৯৲ টাকা। [বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিবিজড়িত বঙ্গসাহিত্যের জাতীয় দলিল। সম্পাদনায়—নিখিল সেন ফুল রেক্সিনে বাঁধাই ও ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ৫৲ টাকা। গ্রাহক হবার ও মণি অর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র : জ্যোতি প্রকাশন, ২এ নবীন কুন্ডু লেন, কলি-৯ ॥ অন্যান্য কেন্দ্র : রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২, ফোন : ৩৪-৮৩৫৬ ॥ পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলি-৯; ফোন : ৩৪-৯৫৯২ ॥ নিউ বীণাপাণি লাইব্রেরী, কাঁথি, মেদিনীপুর; চয়নিকা, নবদ্বীপ, ঐকতান, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা; বোলপুর পুস্তকালয়, বোলপুর, বীরভূম। বইঘর; আলিপুরদুয়ার; চয়নিকা; কুচ-বিহার, গ্রন্থভারতি, জলপাইগুড়ি; টাউন লাইব্রেরী, বনগাঁ। মহাজাতি গ্রন্থভবন, কৃষ্ণনগর। স্টুডেন্টস কর্নার, কাদায়, বহরমপুর। বান্ধব স্টোর্স, সাঁইথিয়া, বীরভূম। দেবশ্রী বুক ডিপো, শান্তিপুর। উমা বুক স্টোর, কান্দীবাজার, মুর্শিদাবাদ।

বেত। মনের ভাব দমন করে বললেন, পাঠিয়ে দিয়েছে যখন তখন আর কি করা যাবে। কত টাকার বিল ছিল যেন?

—পঁয়তাল্লিশ হাজার একশ তেষট্টি টাকার স্যার।

—হুঁ। এত টাকা সোমবার পর্যন্ত অফিসে ফেলে রাখা যায় না। সে যাক—ব্যবস্থা যা করবার আমিই করছি। ভাল কথা, প্রদীপকে ওর ঘরে দেখলেন নাকি?

সুব্রত রক্ষিত কিছু বলার আগেই প্রদীপ এসে উপস্থিত হল।

—তোমাকেই খুঁজছিলাম। এই ফিরলে?

—হ্যাঁ স্যার। ওখানকার কাজটা—

প্রদীপকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন রামশঙ্কর, পরে সমস্ত শুনছি। তুমি ন্যাশন্যাল ক্যাটারিং কম্পানীর সঙ্গে কথা বলে নাও। জন--দশেকের মত ব্যবস্থা করলেই চলবে। ক্লাস ওয়ান ফুলকোর্স ডিনার চাই।

বিস্ময় দমন করে প্রদীপ বলল, কবে ব্যবস্থা করতে বলব?

—কাল। রামশঙ্কর এবার রক্ষিতের দিকে মুখ ফেরালেন, কাল রাতের খাওয়াটা আপনি আমার বাড়িতেই সারবেন।

—নিশ্চয় আসব স্যার। উপলক্ষ্যটা ঠিক—

—তেমন কিছু নয়। কয়েকজন মিলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করব এই আর কি। অফিস তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হবে। আপনি ক্যাসিয়ারবাবুকে বলুন, সাসপেন্স লেজার আর বাজোরিয়াদের টাকাটা নিয়ে উনি যেন এখানে আসেন।

প্রদীপ আর রক্ষিত বেরিয়ে যাবার পর রামশঙ্কর রিসিভার তুলে নিলেন। অপারেটারের কাছে একটা লাইন চাইলেন। লাইন পেতে বিশেষ বিলম্ব হল না।

—হ্যালো—পরিমল মিত্র আছেন—

ও প্রান্ত থেকে উত্তর ভেসে এল, কথা বলছি—আপনি কে—

—রামশঙ্কর—হ্যালো—কাল সন্ধ্যায় আমার বাড়ী চলে আসবে—ওখানেই সারবে খাওয়া-দাওয়াটা—

—হঠাৎ—বিশেষ কোন—

—এখনই এত ব্যস্ত হয়ে পড়ো না—এলেই সব জানতে পারবে—তাহলে ওই কথাই রইল—ছাড়ছি—

রিসিভার নামিয়ে রেখেই তিনি দেখলেন ক্যাসিয়ার কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় কথা সারলেন। তারপর বাজোরিয়া কম্পানীর টাকাটা সাসপেন্স লেজারে এন্ট্রি করে সই করলেন। যদিও গোনা আছে তবু একে একে গুনলেন সমস্ত। নোটের তাড়া রাখলেন ভি আই পি ব্যাগের মধ্যে। সোমবার অর্থাৎ ব্যাঙ্ক না খোলা পর্যন্ত টাকাটা নিজের কাছেই রাখবেন।

রবিবারের দুপুরকে যেন আলস্য জড়িয়ে রাখে। ইচ্ছা ছিল না, তবু দৈনিক পত্রে চোখ বোলাতে বোলাতে প্রদীপ কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেই বুঝতে পারেনি।

দিল্লীর নাম যখন জাহাঁপনা—তখন..... প্রকাশিত হলো

তখন বাংলাদেশে ঘটলো বিদ্রোহ। দিল্লী থেকে দুটিমাত্র গুপ্তসংকেত যাচ্ছে বাংলাদেশে। যে সংকেত বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়াতে পৌঁছোলে সুলতান ফিরুজ তুগলকের অভিযান ব্যর্থ হতে বাধ্য। দিল্লীর গুপ্তচরদলে ছেয়ে আছে

দিল্লী যখন জাহাঁপনা

পথঘাট সর্বত্র। তারই মধ্যে গোপন সংবাদ নিয়ে চলেছে বাংলাদেশের দুঃসাহসী এক তরুণ। ভালবাসা-ঘৃণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুঃসাহস আর দুর্বলতার সংঘাতে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অথচ রমণীয় এক কাহিনী। দাম ঃ ছ টাকা।

নিগূঢ়ানন্দ

মেয়েটির নাম প্রথমা ঃ পঁয়তিরিশ—বাইশ—পঁয়তিরিশ, একদা ইংরেজির ছাত্রী, আধুনিক মন-মনন। সমুদ্রতীরের একটা ছোটো শহরে প্রথমা মধুচাঁদের মাস কাটাতে এসেছে। আজকে তার শেষ দিন। এখন রাত্রি। সমুদ্রের গর্জন। অস্থির চঞ্চল প্রথমা। দ্রুত মনের পটভূমি বদলাচ্ছে প্রথমার। ব্যাংকুয়েট হলে কি নাচ চলছে? উল্লাসের? জীবনের উল্লাস? উন্মাদ কিছু? সমুদ্রের গর্জন কি বাড়লো?.....

স্বপ্নটপ্ন আদতে

অমলেন্দু শূর

সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লেখা শক্তিমান তরুণ লেখকের একটি অসাধারণ স্নায়ুশিহর রোমান্টিক উপন্যাস। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

প্রকাশিত হলো

একটি জাতির উত্থানকে সার্থক রূপদান করে যে সব বিরল সাহিত্য-কীর্তি অক্ষয় আসন দাবি করে তারই একটি। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে

শ্রীপারাবত

সদ্য প্রকাশিত

এক রাঙ্গা মনের মেয়ের আশ্চর্য প্রেম। পড়তে গায়ে কাঁটা দেয়—তবু শেষ না করে ওঠা যায় না, এমন কাহিনী। দাম ঃ পাঁচ টাকা।

রাঙ্গা শিমূল

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বেদুইন ইন্দোচীনে পাঁচটি রাত ৮·০০

চিরঞ্জীব সেন খুনের পর খুন ৫·০০

নিগূঢ়ানন্দ বার্নার্ড সাহেবের বেগম ৫·০০

পুস্তক প্রকাশনী—৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

অন্যান্য রচনাবলী

নূতন খণ্ড বাহির হইল

বনফুল রচনাবলী

'বনফুলে'র (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) অর্ধশতাব্দীব্যাপী অবিস্মরণীয় সাহিত্য সাধনার সম্পূর্ণ ফসল ১৫ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। **তৃতীয় খণ্ড** প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ১৫৲। গ্রাহকদের জন্য ১২॥

মানিক গ্রন্থাবলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনন্যসাধারণ সাহিত্যের সম্পূর্ণ সৃষ্টি ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। **নবম খণ্ড** প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ১৪৲। গ্রাহকদের জন্য ১১-২০ ॥

বিমল মিত্রের

সাহিত্য বিচিত্রা

বর্তমান যুগের অসামান্য ও শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ সংকলনের অসামান্য বই। ১২৲ ॥

সম্প্রতি প্রকাশিত অন্যান্য অবিস্মরণীয় বই

নমস্য নন্দিনীর রূপকথা
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৬৲ ॥
পলাশগ্রাম ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৮৲ ॥
জলসাঘর ॥ নরেন্দ্র মিত্র ॥ ৬৲ ॥
কাঠগোলাপের গন্ধ ॥
নিরঞ্জন চক্রবর্তী ॥ ৪৲ ॥
পিপাসা ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫৲ ॥
তীরভূমি ॥
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ৫৲ ॥
হৃষি ॥ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৪৲ ॥
শেষ বসন্ত ॥ নিরঞ্জন চক্রবর্তী ॥ ৬৲ ॥

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা ১২

ঘুম ভাঙ্গল পাঁচটা বেজে যাবার কয়েক মিনিট পরে। ঘড়ির উপর দৃষ্টি পড়তেই এক লাফে সে বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল কিভাবে ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। তার হাতে প্রচুর কাজ। সন্ধ্যায় অতিথিরা আসছেন। তাঁরা যাতে কোন রকম অসুবিধায় না পড়েন সে দায়িত্ব প্রদীপেরই। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে, জামাকাপড় বদলে সে বাগানে পা দিল।

রামশঙ্করের বাড়ীর চৌহদ্দির এক প্রান্তে গেস্ট হাউস। চাকরী পাবার পরই গেস্ট হাউসে তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। নইলে হুগলী থেকে প্রতিদিন যাওয়া-আসা করতে তার বেশ অসুবিধা হত। ওখানে মা-বাবা আছেন। মাসে দুবার গিয়ে ও'দের সঙ্গে দেখা করে আসে।

—এই—

ঝাউ গাছটার পাশে প্রদীপ থামল। ওধারে রতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রদীপ দ্রুত দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিল চারধারে। কেউ কোথাও নেই। তবুও একটু ইতস্তত করে ঝাউ-গাছের ওধারে গেল।

—কখন থেকে তোমায় খুঁজছি—রতি বলল, দারুণ কিছু শোনার জন্য কান পেতে থাক।

—পরে বললে হয় না? কেউ এসে পড়তে পারে এধারে।

—তুমি একটুতে নার্ভাস হয়ে পড়। এসে পড়লেই বা। লুকোচুরি খেলার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

—তুমি বলছো—

—তার আগে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। বাবা হঠাৎ আজ কয়েকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন বলতো?

—উনি খেয়ালী মানুষ। হয়তো—

হাসিতে মুখ ভাসিয়ে রতি বলল, বলতে পারবে না জানি। বিলিতি কায়দায় আজ সকলের সামনে উনি আমার এনগেজমেন্টের কথা প্রকাশ করবেন। অমন অবাক হয়ে তাকাচ্ছ কি? বুঝলে মশাই, আমার বিয়ে।

—বিয়ে!

—এখনও বলে দিতে হবে বিয়েটা তোমার সঙ্গে হবে?

প্রদীপ হেসে ফেলল, আমার মত ছেলেকে জামাই হিসাবে উনি কি ভাবে মেনে নিচ্ছেন! বেহায়ার মত তুমি খুব ধরা-ধরি আরম্ভ করেছিলে বোধহয়।

—ওমা, সেকি! তুমি দেখছি কিছুই জান না। বাবারই যে তোমাকে পছন্দ। এক-আপস্টার্ট বড়লোকের ছেলেকে তো আর জামাই করতে পারেন না। আজই তো সমস্ত কথা মার মুখে শুনলাম।

— এ এক অভাবনীয় ব্যাপার রতি। এক এক সময় ভেবেছি, শেষ পর্যন্ত হয়তো অপমানের বোঝা ঘাড়ে করেই এ বাড়ী থেকে যেতে হবে। এখন নিজের ভাগ্যকেই হিংসা হচ্ছে। কিন্তু তোমার বাবাতো আমায় কিছু বলেন নি?

—বলতেন। রতির মুখে মিষ্টিমিটে হাসি, আমি মাকে জানিয়ে দিলাম কিনা, তাঁদের কাজ আমরা অনেকটা এগিয়ে রেখেছি।

—সত্যি তোমার তুলনা হয় না। আমা-দের বিয়েটা হচ্ছে কবে?

—এত ব্যস্ততা ভাল নয় বাপু। আমার কথা ফুরিয়েছে। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

রতি দ্রুত অদৃশ্য হল। উড়ে গেল যেন। সত্যি, এমন মেয়ে আর হয় না। নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতেই প্রদীপ এগুলো। আকাশ তখন ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ছেয়ে গেছে। বইতে আরম্ভ করেছে ঠাণ্ডা হাওয়া।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটার সময় এসে উপস্থিত হলেন সুব্রত রক্ষিত। এরপর এলেন পরিমল মিত্র। আটটার মধ্যে বাকী সকলে অর্থাৎ শিশির সোম, সমীর গুপ্ত আর ডাক্তার অরবিন্দ সান্যাল এসে পড়লেন।

মহা সমাদরে সকলকে বসালেন রাম-শঙ্কর। রতির মা এক সময় এসে অতিথি-দের সঙ্গে আলাপ করে গেলেন। গল্প-গুজবের মধ্যেই দিয়েই নটা বাজল। এতক্ষণ ঝিরঝির করে পড়ছিল, এবার চেপে বৃষ্টি এল।

ডিনারে বসলেন সকলে। তখন মুষল-ধারায় বৃষ্টি চলেছে। অতিথিদের বেশ চিন্তিত দেখাল। সকলেই উত্তর কলকাতার বাসিন্দা। বাড়ী ফেরা এখন সমস্যা।

ডিনারের পর সকলে এসে বসলেন ড্রইংরুমে।

পরিমল মিত্র বললেন, বৃষ্টি থামলে বাঁচা যায়। এরকম চলতে থাকলে আজ আর বাড়ী ফেরা যাবে না।

—বৃষ্টি থামলেও বিশেষ সুবিধা হবে না। শিশির সোম বলল, যে রকম তোড় চলেছে তাতে অর্ধেক কলকাতা তো ডুবে যাবার কথা।

অরবিন্দ সান্যাল বললেন, মিনিট পনের বৃষ্টি হলেই নর্থে এক হাঁটু জল হয়ে

। প্রকাশিত হল ।

দুখানি অনন্যসাধারণ কাব্যগ্রন্থ

অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ৮·০০

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৬·০০

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। কলকাতা ১২

যায়। আজ যা অবস্থা দেখছি তাতে কলকাতা ডুবতে সত্যি আর দেরী নেই।

এবার রামশঙ্কর কথা বললেন, এই পরিস্থিতিতে আপনাদের বাড়ী ফেরা দুষ্কর হয়ে পড়বে। মেশিনে জল ঢুকে গেলে মোটর অচল হতে বাধ্য। আজ রাতটা সকলে আমার এখানেই থেকে যান। কোন অসুবিধা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা আমি করছি।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমীর বলল, বাড়ীতে ফোন করে ওধারের অবস্থা একবার জেনেনি।

ঘরের এক কোণে টেলিফোন স্ট্যান্ড। সমীর এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল। কথাবার্তা বলে ফিরে এল বিমর্ষ মুখে।

—অবস্থা খুব খারাপ। গাড়ী নিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

—আমি তাহলে আপনাদের শোবার ব্যবস্থা করি।

কথা শেষ করেই রামশঙ্কর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রদীপের কাছে এগিয়ে গেলেন। দ্রুত গলায় নির্দেশ দিলেন কিছু। আবার ফিরে এলেন নিজের জায়গায়। বাকী সকলে উপায়হীন পরিস্থিতিতে এখানে রাত কাটাবার ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। রামশঙ্কর সিগার ধরিয়ে নিলেন। পাশ্চাত্য কায়দায় এবার কফি পরিবেশিত হল।

—সকলের মনেই বোধ হয় এই আগ্রহ চাপ বেঁধে রয়েছে অকারণে আজ কেন আমি আপনাদের আহারের আমন্ত্রণ জানালাম। খুবই স্বাভাবিক আগ্রহ। সিগার অ্যাসট্রের উপর রেখে রামশঙ্কর বলতে লাগলেন, আমি আপনাদের কিছু বলতে চাই। কথাটা আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে। কলকাতায় আপনারাই আমার কাছের লোক। রতির বিয়ে সম্পর্কে কি স্থির করেছি তা আপনাদের বলে রাখা শ্রেয় মনে করি।

এই সময় পার্লার থেকে কথাকাটাকাটির শব্দ ভেসে এল। সকলে সচকিত হলেন। প্রদীপ আর চাকররা যেন কাউকে বাধা দেবা চেষ্টা করছে। বিস্মিত রামশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। কি হল আবার ওখানে? কি হয়েছে দেখার জন্য ড্রইংরুম থেকে অবশ্য বেরুতে হল না। একজন প্রদীপের প্রবল বাধা উপেক্ষা করে ভেতরে এল। তার ভেজা বর্ষাতি থেকে এখনও জল গড়িয়ে পড়ছে।

—স্যার, বাগানের গেট বন্ধ থাকায় পাঁচিল টপকে ইনি ঢুকেছেন। তারপর জোর করে—

—তুমি থাম হে ছোকরা।

প্রদীপের দিকে কথাটা ছুঁড়ে দিয়ে আগন্তুক গৃহকর্তার দিকে ফিরল, আমায় চিনে নিতে নিশ্চয় তোমার অসুবিধা হচ্ছে না?

রামশঙ্করের বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে উঠল। কুড়ি বছর পরে আবার কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। জীবনের যে অধ্যায়কে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিয়েছিলেন আবার তা নির্মমভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

—সোমেন, তুমি!!

—চিনেছো তাহলে। নির্বিকার ভঙ্গীতে বর্ষাতি খুলে ফেলে আগন্তুক বলল, বহু কষ্টে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি। তোমার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল আমি আর বেঁচে নেই।

—না...মানে...নিজেকে এবার সামলে নিলেন রামশঙ্কর, আর সকলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, সোমেন চৌধুরী। আমার বন্ধু। বহু দিন পরে দেখা। আপনারা আমায় দশ মিনিট সময় দিন। এঁর সঙ্গে কিছু কথা বলে নি। এস চৌধুরী—

সকলকে হতভম্ব অবস্থার মধ্যে রেখে রামশঙ্কর আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে ড্রইংরুম থেকে অদৃশ্য হলেন। সোজা চলে এলেন নিজের শোবার ঘরে। মেয়ে আর স্ত্রী দোতলায় থাকেন। সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হয় বলে শোবার ব্যবস্থা তাঁর নীচেই।

আগন্তুক দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিচিত্র সুরে হেসে নিল এক চোট। তারপর বলল, বেশ জমিয়ে বসেছো দেখছি। বাড়ী, গাড়ী, আকাশ-ছোঁয়া সম্মান — সমস্তই তোমার এখন হাতের মুঠোর মধ্যে, কি বল?

—আবার যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে—

—ভাবতে পার নি। ভেবেছিলে আমি এত দিনে ফৌত হয়ে গেছি। তোমার দুর্ভাগ্য। সশরীরে বর্তমান রয়েছি দেখতেই পাচ্ছ। জেল থেকে বেরিয়ে গত পাঁচ বছর ধরে তোমাকে খুঁজছি। মাত্র গতকাল তোমার সন্ধান পেলাম। ব্যাবোর্ণ রোডের একটা বাড়ীতে তুমি ঢুকছিলে। এর পর সহজেই তোমার বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি।

—কি চাও তুমি?

চিবিয়ে চিবিয়ে সোমেন চৌধুরী বলল, আমি তোমার মান-সম্মান সমস্ত তচনচ করে দিতে চাই। ঐশ্বর্য আর বৈভবের মধ্যে তুমি থেকেছো, আর আমি বছরের পর বছর ধরে জেলে পাথর ভেঙেছি। তবুও বলব ঈশ্বর আছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।

এস ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানীর

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ

অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তী লিখিত ভূমিকাসহ

দেবী চৌধুরাণী— বঙ্কিমচন্দ্র ৪·০০

অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী সম্পাদিত

মেঘনাদবধ কাব্য— মধুসূদন ৪·৫০

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

বৈষ্ণব সাহিত্য ৪·৫০

শাক্ত পদাবলী ৪·০০

অধ্যাপক মুরারিমোহন সেন

ভাষার ইতিহাস (১ম খণ্ড) ৩য় সংস্করণ ৮·৫০

ভাষার ইতিহাস (২য় খণ্ড) ২য় সংস্করণ ৮·০০

অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষ

ছন্দ-অলংকার দীপিকা ৫·০০

অধ্যাপক ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্য বিচিন্তা ৬·৫০

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক ৮·০০

অধ্যাপক হরনাথ পাল

কবি মোহিতলাল (পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ) ১২·৫০

এস ব্যানার্জি এণ্ড কোং

৬, রমানাথ মজুমদার, স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সেভিং স্কিম সম্বন্ধে অনেক কিছুই তো শুনে থাকেন ...

...এবার শুনুন আমাদের সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা

জেমিনি-১

জেমের জেমিনি-১ এ পাবেন বহু মূল্যবান উপহার সামগ্রী··· পুরস্কার বিজয়ীদের জন্য বহু সুযোগ...যারা জয়ী হবেননা, তারা পাবেন বিশেষ বোনাস ·এই অভাবনীয় সুযোগ না কখনো কোনো সেভিং ইউনিটে পেয়েছেন না পাবেন !

- ৯৯৯ জন সভ্যের জন্য ৫০৪টি পুরস্কার।
- ৬০ মাসের জন্য প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে জমা দিয়ে ৭২ মাসের খেলায় অংশ গ্রহণ করুন।
- পুরস্কার পেলে বাকি কিস্তির টাকা আর জমা দিতে হবেনা—কিন্তু ৬০ মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র বাম্পার খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং ৬১ মাস থেকে ৭২ মাস পর্যন্ত সব খেলাতেই অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রতি দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন পুরস্কার পেতে পারেন।
- মোট পুরস্কার ৭২ মাসের জন্য ৩,৬৭,০০০ টাকার—তার মধ্যে আছে ৫০,০০০ টাকা একটি বাড়ীর জন্য...১,১২,৫০০ টাকা ৫টি গাড়ীর জন্য···৬০,০০০ টাকা ১৫টি স্কুটারের জন্য· ·১,০২,০০০ টাকা ৫১টি মিনি-ফ্রিজের জন্য এবং সঙ্গে ৬টি সান্ত্বনা পুরস্কার ১০০ টাকা করে প্রতিমাসে দেওয়া হবে।
- যারা কোন পুরস্কার পাবেন না তারা সঞ্চিত টাকাসহ উপহার পাবেন ৩০০ টাকার বোনাস।
- ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি চাইলেই পাবেন।

মোট ৯৯৯ জনের মধ্যে মাত্র কিছু সংখ্যক সদস্যপদ খালি আছে— আজই সদস্য হোন্!

ঘোষণা ঃ আমাদের জেমিনি-১ এর প্রথম ড্রেরা ১৯৭৩ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

মনে রাখবেন একমাত্র জেম সেভিংসই পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও আপনার সঞ্চিত টাকা ফেরত দিচ্ছে।

GEM SAVINGS

জেম

সেভিংস ইউনিট প্রাইভেট লিমিটেড
৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা-১
ফোন ঃ ২২-৭৭৩১

বিনামূল্যে উপহার! জেমিনি-১ এর প্রতি সদস্যদের জন্য একটি সুদৃশ্য ক্যাশ বাক্স

জেম সেভিংস ইউনিট প্রাইভেট লিমিটেড
৮,লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা-১

- ☐ আমি জেমিনি-১ এর প্রথম কিস্তির ৫০ টাকা পাঠাচ্ছি। আমাকে সদস্য করে নেবেন।
- ☐ আমাকে বিবরণি পত্র পাঠাবেন।
- ☐ আপনাদের প্রতিনিধি পাঠান।

নাম— ----------

ঠিকানা— ----------

সঠিক স্থানে ঘথা করে চিহ্ন দিন

নিজের বিচলিত অবস্থাকে দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে রামশঙ্কর বললেন, পুরানো কথা ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কি? এখন তুমি কি চাও তাই বল?

—ন্যাকা সেজো না। আমি যে টাকা চাই বুঝতে তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়।

—কত টাকা চাও?

—তুমি যত দিতে পার।

—এ কথার কোন অর্থ হয় না। কত চাও তাই বল?

—আপাতত পঞ্চাশ হাজার।

—তার মানে তুমি দফায় দফায় টাকা চাও। আমি কিন্তু একটা ব্যবস্থায় আসতে চাইছি। তোমাকে এক লক্ষ টাকা দেব। তুমি আর কোন দিন আমার কাছে আসবে না। রাজী?

চৌধুরী মিনিট খানেক ভেবে নিয়ে বলল, এক লক্ষ! বেশ। কখন টাকাটা দেবে?

—পঁয়তাল্লিশ হাজার বাড়ীতেই আছে। বাকীটা কাল দুপুরের মধ্যেই পেয়ে যাবে।

—আমি তাহলে এখানেই থেকে যাচ্ছি। টাকাটা নিয়ে কাল যাব। কোন রকম চালাকি করবার চেষ্টা কর না। আমার একজন সাকরেদ কাছাকাছিই আছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই তোমাকে সে ছেড়ে কথা কইবে না।

খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সোমেন চৌধুরী। পকেট থেকে রিভলভার বার করে বালিশের তলায় গুঁজে দিল। তারপর গা ঢেলে দিল বিছানায়। যেন নিয়মিত এই বিছানাই ব্যবহার করে থাকে।

রামশঙ্করের সমস্ত শরীর এতক্ষণে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। তিনি এখন বেকায়দায় পড়েছেন। একথাও বুঝতে পাচ্ছেন, মুখে যাই বলুক, এক লক্ষ টাকা নিয়েও ক্ষান্ত হবে না চৌধুরী। ব্ল্যাকমেলিং-এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে।

—তুমি শুয়ে পড় তাহলে। কাল কথা হবে।

রামশঙ্কর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ফিরে এলেন আবার ড্রইংরুমে। তাঁকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। অতিথিরা নিজেদের মধ্যেকার আলোচনা থামিয়ে তাকালেন তাঁর দিকে।

—বেশ কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য দুঃখিত। রামশঙ্কর বললেন, রাত বাড়ছে। এবার আপনারা গিয়ে শুয়ে পড়ুন। প্রদীপ—

—বলুন স্যার।

—এঁদের শোবার ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়েছে। কে কোন ঘরে শোবেন দেখিয়ে দাও।

সমীর বলল, আপনি তখন কি যেন আমাদের বলছিলেন। কথাটা তো শেষ হল না?

—আজ আর নয়। কাল সকালে বলব। পরিমল তুমি এক মিনিট দাঁড়িয়ে যেও।

পরিমল মিত্র ছাড়া বাকী সকলে প্রদীপকে অনুসরণ করলেন।

রামশঙ্কর চাপা গলায় বললেন, তুমি আমাকে ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলে। তোমার কথায় বিশ্বাস করে কলকাতায় না এলে কোনদিন চৌধুরী আমাকে খুঁজে পেত না।

—ওকে দেখে আমিও কম অবাক হই নি। মিত্র বললেন, বিশ্বাস কর ভাই, জেল ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম দীর্ঘমেয়াদী কয়েদী সোমেন চৌধুরী কসস্ত রোগে মারা গেছে।

—মারা যে যায় নি তা তো তুমিও দেখলে।

—হয়তো একই নামের দুজন কয়েদী ছিল। আমার বুঝতে ভুল হয়েছে। নিশ্চয় অন্য সোমেন চৌধুরী মারা গিয়েছিল।

—তোমার ভুলের মাশুল এখন আমায় গুণতে হবে। ভীষণভাবে বেকায়দায় পড়ে গেলাম। ও এখন নিয়মিত আমাকে ব্ল্যাকমেল করে যাবে।

মিত্র কি বলবেন ভেবে পেলেন না। মহাকুণ্ঠিতভাবে তাকাতে লাগলেন এধার-ওধার।

রামশঙ্কর বললেন আবার, আমি কিন্তু এই অবস্থা মেনে নেব না। চৌধুরীর হাত থেকে আমায় রেহাই পেতেই হবে। শোন পরিমল। ভেবে-চিন্তে তুমি একটা উপায় বার কর। আমিও ভেবে দেখছি।

পরিমল মাথা নাড়লেন।

সমীর গুপ্তর ঘুম ভাঙ্গল ছটা বাজার কিছু পরে। নতুন জায়গা বলে, নইলে আরো এক ঘণ্টা স্বচ্ছন্দে ঘুমতে পারতো। আড়ামোড়া ভাঙ্গল সমীর। বিছানা থেকে নামতে নামতে ভাবল, আজ বুড়োর কাছ থেকে রতিকে বিয়ে করার অনুমতি যে কোন উপায়ে আদায় করতে হবে।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সমীরের সঙ্গে সুব্রত রক্ষিতের দেখাটা হয়ে গেল। তিনিও নিজের ঘর থেকে বেরিয়েছেন। দুজনে পার্লারের দিকে চললেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, পরিমল মিত্র, শিশির সোম আর ডাঃ সান্যাল গৃহকর্তার সঙ্গে গল্প করছেন। দেখা যাচ্ছে, এঁরা সকলেই ভোরে উঠতে অভ্যস্ত। এই সময় বেয়ারা চা দিয়ে গেল। রামশঙ্কর প্রদীপকে ডেকে বললেন, যে ভদ্রলোক কাল হঠাৎ এসে পড়েছিলেন, তাঁকে এখানে ডেকে আনতে।

প্রকাশিত হয়েছে

যে প্রশ্ন আমাদের সকলের—কোন পথে?

নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসুর

Crossroads-এর প্রথম বাংলা সংস্করণ

কোন পথে?

প্রথম খণ্ড ॥ ১২·০০

ভাষান্তর করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—পত্রপুট/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী

১৩ বঙ্কিম চাটার্জো স্ট্রীট-৭০০০১২

প্রদীপ চলে গেল। গত রাত্রের বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। এখনও সারা আকাশ মেঘে ভারী হয়ে আছে। হঠাৎ তাঁদের আলোচনায় বাধা পড়ল। তীক্ষ্ণ চিৎকারে সকলে সচকিত হলেন। কি হয়েছে বুঝতে পারার আগেই দেখা গেল উদভ্রান্তের মত প্রদীপ আসছে।

—স্যার, ভদ্রলোক মারা গেছেন।

—সেকি!

—চারিদিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কেউ খুন করেছে তাঁকে।

সকলে হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। রামশঙ্কর যতদূর সম্ভব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন পার্লার থেকে। বাকী সকলে অনুসরণ করলেন তাঁকে। প্রদীপের কথা মিথ্যে নয়, সোমেন চৌধুরী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। চারি ধারে রক্ত আর রক্ত। ভারী কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করার দরুণ এ রকম হয়েছে বুঝতে পারা যায়। শরীর স্থির নিষ্কম্প।

দরজার সামনে হুমড়ী খেয়ে সকলে ওই দৃশ্য দেখলেন। ভয় আর উত্তেজনা প্রত্যেককে অসম্ভব বিচলিত করে তুলল। এমন নির্মম হত্যাকাণ্ডর মুখোমুখি হওয়া

নিশ্চিতভাবে দুর্ভাগ্যসূচক। রামশঙ্কর পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছেন চৌধুরী কেঁচে নেই। তবু কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন ডাঃ সান্যাল কি বুঝছেন?

—বহুক্ষণ আগে মারা গেছেন। সান্যাল বললেন, আমাদের এখন এ ঘরে ঢোকা ঠিক হবে না। আপনি আর সময় নষ্ট করবেন না মিঃ সেন। পুলিশে খবর দিন।

রামশঙ্কর কাঁপতে কাঁপতে ড্রইংরুমে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁকে কিছুই করতে হল না। প্রদীপ ততক্ষণে লাইন পেয়ে গেছে। কানে রিসিভার চেপে সে বলল, হ্যালো পুলিশ স্টেশন.....

তদন্ত

বাসব মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলল, আমার পক্ষে যা কিছু করা তা আমি নিশ্চয় করব। আপনি এতক্ষণ যা বললেন, শুনলাম। মনে হয়, বললেন না এমনও বহু কথা আছে যা আমার জানা দরকার। আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হতে না পারলে তদন্ত করতে অসুবিধে হবেই।

ভয়ে ভাবনায় আধখানা রামশঙ্কর নড়েচড়ে বসলেন। দুশো একচল্লিশের কে র‍্যাণ্ডাব ফোর্ড স্ট্রীটের ড্রইংরুমে তিনি রয়েছেন। বললেন শীর্ণ গলায়, আমারই বাড়ীতে যে একটা খুন হবে আমার তা কল্পনার অতীত ছিল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। এই সঙ্গে একটা জেদও আমাকে চেপে ধরেছে। পুলিশের কাজ একটু ঢিমে তালে চলে। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। যে কোন মূল্যে আপনি হত্যাকারীকে ধরুন।

—বললাম তো সাধ্যমত চেষ্টা করব। এবার আপনি নিজেকে খোলসা করুন। নিহত ব্যক্তির পূর্ণ পরিচয় এখনও আমি পাইনি। কিসের জোরে সে আপনাকে ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল তাও আমাকে জানতে হবে। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। অনন্যোপায় না হয়ে পড়লে মক্কেলের গুপ্ত কথা আমি প্রকাশ করি না।

রামশঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। ভরসা পাবার পরও মনের মধ্যে আশঙ্কা গুলিয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অতীতের উপরকার যবনিকা তুলে ধরাই স্থির করলেন।

এরপর তিনি যা বললেন তার মর্ম হল, যৌবনে তিনি এক ধনী ব্যবসাদারের ড্রাইভার ছিলেন। সোমেন চৌধুরী ছিল ওই ব্যবসাদারের বসতবাড়ীর কেয়ার টেকার, আর পরিমল মিত্র ওখানে বাজার সরকারী করতেন। তিনজনের মধ্যে প্রণয় ছিল। একদিন কিভাবে যেন বাড়ীতে আগুন লেগে গেল। সকলে যখন প্রাণভয়ে পালাতে ব্যস্ত তখন রামশঙ্কর আর সোমেন মিলে প্রচুর গয়না আর মোটা টাকা সরিয়ে ফেলার সুযোগ পেল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল পরের দিন। ব্যবসাদার ভদ্রলোক পুলিশে খবর দিলেন। কিভাবে তারা আঁচ পেল বাড়ীতে আগুন দেওয়া আর টাকা সরান সোমেনেরই কাজ। অ্যারেস্ট হবার আগে সে রামশঙ্করকে বলল, চরম অত্যাচার সহ্য করেও সে চুরির কথা স্বীকার করবে না। প্রমাণের অভাবে আদালত তাকে রেহাই দিতে বাধ্য। ফিরে আসার পর সমস্ত কিছু দুজনে ভাগ করে নেবে।

ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াল অন্যরকম। পুলিশও বুঝতে পেরেছিল, চুরি প্রমাণ করা যাবে না। তারা সোমেনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল, ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র। বিচারে সোমেনের পনেরো বছর জেল হয়ে গেল। আনন্দে আটখানা রামশঙ্কর কালবিলম্ব না করে কাজে ইস্তফা দিলেন। তারপর সমস্ত কিছু নিয়ে হাওয়া হয়ে গেলেন কলকাতা থেকে। অবশ্য যাবার আগে পরিমল মিত্রকে হাজার দশেক দিতে হল। ব্যাপারটা তিনি মোটামুটি আঁচ করেছিলেন। মুখ বন্ধ রাখার মূল্য হিসাবে তিনি ওই মূল্য দাবী করে বসেছিলেন।

জব্বলপুরে গিয়ে লোহার ব্যবসা ফাঁদলেন রামশঙ্কর। ভাগ্য অনুকূল হওয়ায় প্রচুর বিত্তের অধিকারী হলেন কয়েক বছরের মধ্যে। একটানা পনেরো বছর ওখানে থাকার পর কলকাতার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল। পরিমলকে চিঠি দিয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ জানালেন, সোমেন জেল থেকে বেরিয়েছে কিনা। পরিমল খোঁজখবর নিয়ে জানালেন সোমেন জেলেই মারা গেছে। রামশঙ্কর নিশ্চিন্ত হলেন। তবুও ব্যবসা গুটিয়ে এখানে আসতে আরো কয়েক বছর সময় লেগেই গেল।

নিজের অতীতের বর্ণনা শেষ করার পর রামশঙ্কর বললেন, এরপরের কথা আপনাকে আগেই বলেছি।

এতক্ষণ দাঁতে পাইপ চেপে বাসব শুনছিল। এবার বলল, পরিমল মিত্র এখন কি করেন?

—বাজার সরকারী ছেড়ে দেবার পর সে একটা তেলকলে ভাল চাকরী পেয়েছিল। এখন রিটায়ার করেছে। ছেলেরা সব ভাল চাকরী করছে।

—হুঁ। আপনার তাহলে কাউকে সন্দেহ হয় না?

—না।

—আজ বিকেলে আপনার ওখানে যাব। ঘটনাস্থল ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার। আপনি আমার কথা পুলিশকে জানিয়ে রাখবেন।

—বেশ। স্থানীয় থানার হাতে আর কেসটা নেই। লালবাজার টেক-আপ করেছে।

—তাই নাকি। ভালই হল।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় রামশঙ্কর দ্রুত গলায় বললেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। সোমেন আমার শোবার ঘরে খুন হয়েছে। আলমারিতে

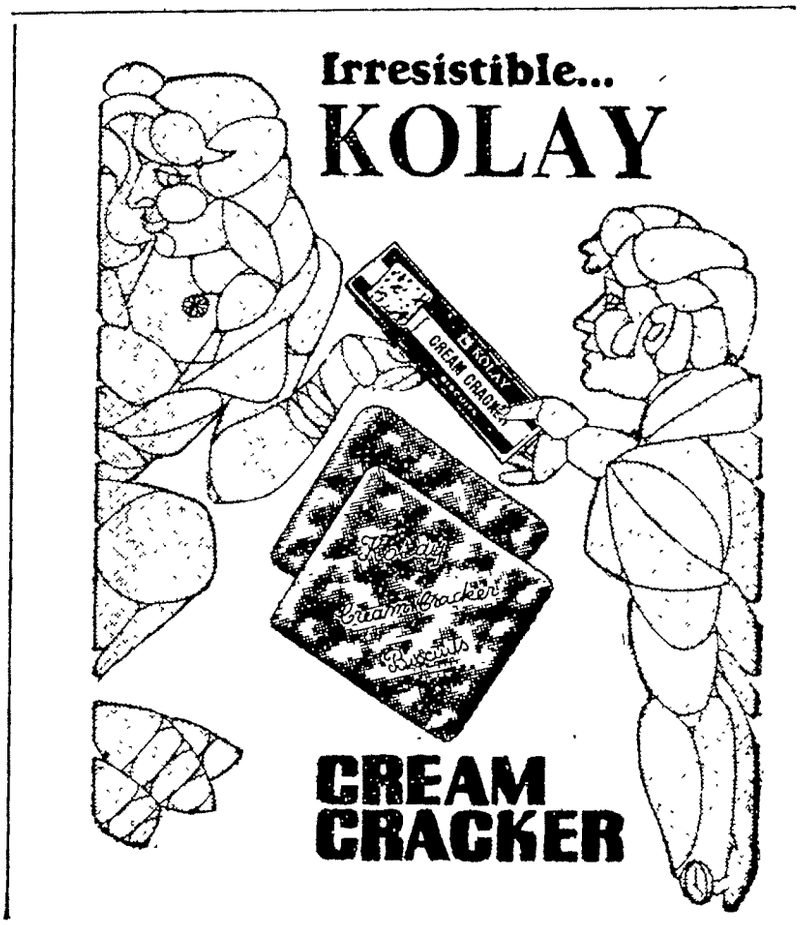

প'য়তাল্লিশ হাজার টাকা ছিল। হত্যাকারী টাকাটা নিয়ে গেছে।

- বাসব সোজা হয়ে বসল, এই কথাটা এতক্ষণ বলেন নি? এত টাকা আপনি ব্যাঙ্কে না পাঠিয়ে বাড়ীতে রেখেছিলেন কেন?

কি পরিস্থিতিতে টাকাটা বাড়ীতে এনে রাখতে হয়েছিল বললেন রামশঙ্কর।

—সোমেন চৌধুরী জানতো টাকাটার কথা?

—ওই অঙ্কের টাকা বাড়ীতে আছে বলেছিলাম। কিন্তু কোথায় আছে সে জানতো না।

—বাইরের আর কেউ জানতো?

—না।

—আর কোন প্রশ্ন করব না। আপনি এখন আসুন। আমি বিকেলে আসছি।

বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে রামশঙ্করের বাড়ী যখন পেঁছাল তখন সন্ধ্যা হতে অনেক বাকী আছে। হোমিসাইড স্কোয়াডের পুরন্দর সামন্ত ওখানেই উপস্থিত ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ভাগাড়ের সন্ধান পেতে শকুনের দেরী হয় না। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, গৃহকর্তা না আপনাকে ধরে বসেন।

বাসব মুখে হাসি টেনে বলল, এতে কি প্রমাণ হচ্ছে জানেন, সাধারণ মানুষ ক্রমেই আপনাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কি রকম বুঝছেন?

—খুব ভাল বুঝছি না। মোটিভ অবশ্য পরিষ্কার। ওই ঘরের স্টিলের আলমারিতে প'য়তাল্লিশ হাজার টাকা ছিল। হত্যাকারী টাকাটা সরিয়েছে।

—ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই রকম, টাকাটা নেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। স্টিলের আলমারি খোলবার সময় সোমেন চৌধুরীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তাঁকে হত্যা না করে উপায় ছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মিঃ সামন্ত।

—কি বলুন তো?

—খুন করার রিস্ক নিতে গেল কেন সে? সোমেন চৌধুরীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ক্লোরোফর্ম করে সহজেই কাজ হাসিল করতে পারতো।

—হয়তো ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করবার সময় সে পায়নি।

—হতে পারে। যা হোক, আমি এবার রামশঙ্কর বাবুর শোবার ঘরটা দেখে আসি। আপনি—

—ঘুরে আসুন। আমি ততক্ষণ বাড়ীর চাকরবাকরদের একটু বাজিয়ে দেখি।

বাসব আর শৈবালকে পথ দেখিয়ে প্রদীপ নিয়ে গেল। বেশ বড় আকারের ঘর। আসবাবের বাহুল্য অবশ্য নেই। খাট, স্টিলের দুটি আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বুক কেশ আর হ্যারিংটন চেয়ার—এই আছে। এই ঘরে মর্মন্তুদভাবে একজন মৃত্যুবরণ করেছে এখন বোঝবার উপায় নেই।

বাসব প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, কোন আলমারিতে রামশঙ্কর বাবু টাকা রেখেছিলেন আপনি জানতেন?

—জানতাম। সে সময় আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম।

যে আলমারি থেকে টাকা চুরি গেছে, তাতে চাবি লাগান ছিল না। বাসব পাল্লা খুলে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখল। প্রতিটি তাকেই থরে থরে ফাইল সাজান। দলিল-দস্তাবেজও রয়েছে। বাসব এবার লকারটা খুলল। টাকা এর মধ্যেই ছিল। এখন সম্পূর্ণ খালি। একই রকম চেহারার অন্য স্টিল আলমারিতে গৃহকর্তার জামা-কাপড় আছে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নেবার পর মিনিট কয়েক কি চিন্তা করল, তারপর প্রদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, রামশঙ্করবাবুকে একবার ডেকে আনুন তো:

প্রদীপের কাছে খবর পেয়ে রামশঙ্কর এসে উপস্থিত হলেন। শৈবাল জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বাসব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাচ্ছিল স্টিল আলমারি দুটোর দিকে। এবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, এ দুটো তো কোন পরিচিত কম্পানীর তৈরী বলে মনে হচ্ছে না। কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন?

—আপনি ঠিকই ধরেছেন। রামশঙ্কর বললেন, গুজরাটের নতুন এক কম্পানী অতি সম্প্রতি এই ধরনের স্টিল আলমারি বাজারে ছেড়েছে। আমি চারটে কিনে ছিলাম। দুটো এ ঘরেই দেখতে পাচ্ছেন। বাকী দুটো আছে অফিসে।

—গত রাত্রে এই আলমারি দুটোর চাবি কোথায় ছিল?

—আমার কাছে।

—একবারও হাতছাড়া করেন নি?

—না।

—চাবি দুটো এখন আপনার কাছে আছে? দেখাবেন একবার?

রামশঙ্কর সুদৃশ্য কি-কেশ পকেট থেকে বার করে এগিয়ে ধরলেন। বাসব খুঁটিয়ে দেখল চাবি দুটো। আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হবে না। স্টিলের তৈরী। তবে গোদরেজ বা অন্যান্য কম্পানীর যে ধরনের চাবি দেখা যায়, এদের চেহারা সে ধরনের নয়। সাদামাটা।

—চাবি দুটো যদি আমার কাছে কিছুক্ষণ থাকে, আপনার কোন অসুবিধা হবে?

—বিন্দুমাত্র না।

—তাহলে আমার কাছেই রইল। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ডাক্তার তুমিও এঁর সঙ্গে যাও। মিঃ সামন্তকে গিয়ে বল আমি আসছি কয়েক মিনিটের মধ্যে।

শৈবাল বুঝল, যে কোন কারণেই হোক এবার বাসব কিছুক্ষণ একলা থাকতে চাইছে। সে কোন কথা না বলে রামশঙ্করের সঙ্গে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ওদিকে বেয়ারা ড্রাইভার—এদের এজাহার নেওয়া শেষ করেছেন সামন্ত। অবশ্য কাজে লাগে এমন কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। এই সময় সামন্তর একজন সহযোগী মহা উত্তেজিতভাবে এসে উপস্থিত হল। তার হাতে হাত দেড়েক লম্বা একটা লোহার রড। রডের গায়ে রক্ত লেপে রয়েছে। দু-চার গাছি চুলও আটকে রয়েছে।

—কোথায় পেলে?

—বাড়ীর পিছন দিকের একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে ছিল স্যার। মনে হয় এই রড দিয়েই খুন করা হয়েছে।

—নিঃসন্দেহে। মারণাস্ত্রটা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। মিঃ সেন দেখুন তো, এই রডটা আপনার বাড়ীর কিনা?

রামশঙ্কর বললেন, বাগানের পাঁচিলের উপর তার বসাবার জন্য কিছু রড আনিয়েছিলাম। মনে হয় তারই একটা।

—কোথায় রাখিয়েছিলেন সেগুলো?

—গেটের পাশেই তো পড়ে আছে।

বাসব এসে উপস্থিত হল এই সময়। রডটা এক নজর দেখলেও কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করল না। নিমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁদের ঠিকানা লিখে দিতে বলল সামন্তকে।

সামন্ত প্রশ্ন করলেন, আপনি সকলকে জেরা করবেন তো?

—না। আপনাদের নেওয়া এজাহারের কপিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেব। এজাহারের কপি নিশ্চয় সঙ্গে আছে। ভাল কথা মিঃ সেন, টাকা ছাড়া আর কিছু চুরি গেছে কিনা বলতে পারেন?

চিন্তিত গলায় রামশঙ্করবাবু বললেন, আর কিছু চুরি গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

প্রদীপ বলে উঠল, সোমেনবাবুর রেন-

গীতা-নিবন্ধ

শ্রীঅরবিন্দ ১৫·৫০

(শ্রীঅরবিন্দের THE ESSAYS ON THE GITA-র শ্রীঅনিলবরণ রায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ঃ ৩৪-২৩৭৬

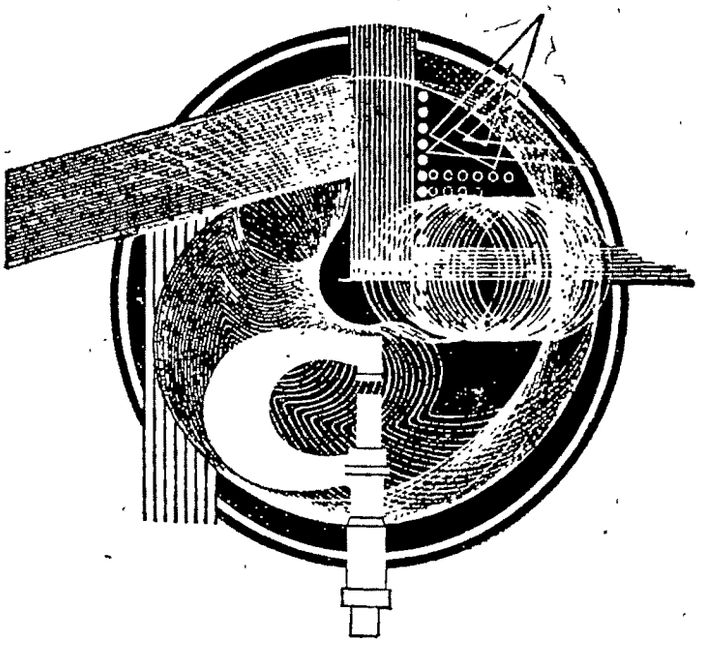

Building up a cadre of technicians

A nation's task force is its technical manpower. Without skilled workers, the finest machines will rust and raw materials will remain unutilised.

Right from the inception thirty years ago, Hindustan Motors realised that it was not enough to put up a modern automobile plant. They knew that they had to build up a balanced cadre of technicians—fitters, welders, electricians, draughtsmen, engineers, foremen, supervisors, researchmen and technologists—not merely to run their own industry but also to provide the manpower required by others.

During the past thirty years, Hindustan Motors have helped to train no less than 1,50,000 men to acquire a high degree of skill and precision. As the industry develops, thousands of others are being trained every year.

Building up a vast pool of technical manpower—this is one of the many ways in which Hindustan Motors keep India's economy moving and growing.

Hindustan Motors Limited
Keeping India's economy moving and growing

CC/HMTI-2/72

কোটটা দেখতে পাচ্ছি না স্যার। ড্রইংরুমে খুলে রেখেছিলেন। মনে হচ্ছে ওটাও চুরি গেছে।

—আছে কোথাও। সামান্য রেনকোট কে চুরি করবে!

—আমার মনে হয় উনি ঠিকই বলছেন। বাসব বলল, রেনকোটটা চুরি যাওয়াই সম্ভব।

এরপর আর কথা হল না। বাসব এজাহারের ফাইল নিয়ে বসল। ধোঁয়ার গ্লাস বুনতে বুনতে পড়া শেষ করল এক সময়। এবার বাড়ীর পিছনের অংশটা দেখে নেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। শৈবাল আর সামন্তও গেলেন সঙ্গে। সামনের অংশ যেমন চমৎকারভাবে সাজান, বাড়ীর পিছনের অংশ তেমন নয়। এখানে-ওখানে অযত্নে বর্ধিত লতার ঝোপ। বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁসে বড় বড় দুটো চৌবাচ্ছা। বাড়ী তৈরী করাবার সময় ইঁট-ধোয়ার কাজে নিশ্চয় এগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল। বাউন্ডারি-ওয়ালের ওধারে একসার বাড়ী তৈরী হচ্ছে। মনে হয় সরকারী বাড়ী। ওধারে কয়েকজন কনস্টবলকে ঘোরা-ফেরা করতে দেখা গেল। মিঃ সামন্ত রামশঙ্করবাবুর বাড়ীর চতুর্দিকে পাহারা ভালই বসিয়েছে দেখা যাচ্ছে। আর কিছু দেখার ছিল না। বাসব শৈবালকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের গাড়ীতে এসে বসল। সামন্ত ওদের নামিয়ে দিয়ে যাবেন হ্যাংগার ফোর্ড স্ট্রীটে। খাপছাড়াভাবে কথাবার্তা হতে লাগল। এক সময় শৈবাল প্রশ্ন করল, তুমি মিঃ সেনের স্ত্রী বা মেয়ের সঙ্গে কথা বললে না তো?

—কি হবে বলে? তেমন ঘোরাল ব্যাপার হলে সকলকেই নেড়ে চেড়ে দেখতাম। কেসটা অতি সাধারণ। তুমি কিছুই বুঝতে পারনি ডাক্তার?

শৈবাল উত্তর দেবার আগেই বিস্মিত পুরন্দর সামন্ত বললেন আপনি তো অবাক করে দিচ্ছেন মশাই। আমরা অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি, আর আপনি বলছেন সহজ কেস!

বাসব মৃদু হেসে বলল, কোন জায়গায় পৌঁছাতে গেলে কেউ ঘোরা পথ ধরে আবার কেউ সর্টকাট করে। আপনারা ঘোরা পথ ধরেছেন তাই অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে এগুতে হচ্ছে। ভাগ্যক্রমে আমি সর্টকাটের সন্ধান পেয়ে গেছি। এই তদন্তের দুটি মূল্যবান সূত্র হল স্টীল আলমারি আর রেনকোট। এরাই আমাকে হত্যাকারীকে চিনিয়ে দিয়েছে, এই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে টাকাটা কোথায় আছে।

—হত্যাকারী টাকাটা নিয়ে যেতে পারেনি বলছেন?

—কখন নিয়ে যাবে? সে নিউ আলিপুরের অধিবাসী নয়। দুর্যোগের মধ্যে টাকাটা অন্যত্র রেখে আবার ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। সকালে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হবার পরই পুলিশ এসে পড়ল। পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা পকেটে আঁটান যায় না। ব্রিফ-কেস বা ওই জাতীয় কিছুর প্রয়োজন হবে। তেমন কিছু হাতে নিয়ে বেরুতে গেলে পুলিশ সন্দেহ করবেই। কাজেই তাকে টাকাটা ওখানে লুকিয়ে রেখে খালি হাতে বাড়ী ফিরতে হল। পুলিশী হাঙ্গামা মিটলে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারবে। মোটা-মুটি আমি বুঝতে পেরেছি সবই, তবু তাকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। কোন স্থূল প্রমাণ আমার হাতে নেই।

—এখন কি করতে চান?

ফাঁদ পাততে চাই। এ ব্যাপারে অবশ্য মিঃ সেনের সহযোগিতা আমাদের নিতে হবে। আপনি তাঁকে বলবেন, আগামী কাল সন্ধ্যায় তিনি যেন একটা পার্টির ব্যবস্থা করেন। তাঁরাই নিমন্ত্রিত হবেন যাঁরা খুন হওয়ার রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। আমরা কেউ অবশ্য সেখানে উপস্থিত থাকব না।

—তারপর?

—মিঃ সেন কি ধরনের কথাবার্তা সকলের সঙ্গে বলবেন আমি কাল তাকে জানিয়ে দেব। আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে। নিমন্ত্রিতরা ওখানে উপস্থিত হবার আগেই পাহারার ব্যবস্থা বাতিল করে দেবেন।

শৈবাল বলল, এবার হত্যাকারীর নামটা বল?

মৃদু হেসে বাসব বলল, একটু ধৈর্য ধর। আজই তোমাদের নামটা বলব।

পার্লারের ঘড়িতে আটটা বেজে গেল। সেদিনের মত আজও রামশঙ্করের ড্রইংরুম জমজমাট। পরিমল মিত্র, শিশির সোম, সমীর গুপ্ত, সুব্রত রক্ষিত আর ডাঃ অরবিন্দ সান্যাল—সকলেই এসেছেন। মনের মধ্যে আশঙ্কা নিয়েই সকলে আছেন, না জানি আজ আবার কি হয়। জলযোগ পর্ব শেষ হয়েছে মাত্র মিনিট কয়েক আগে।

রামশঙ্কর বলছিলেন, আবার এই আমন্ত্রণে আপনারা নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। হবারই কথা। সেদিন সমস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সোমেনের উপস্থিতিতে। আমি আজ সেদিনের কথার খেই ধরতে চাই।

—আপনি নিজের মেয়ের বিয়ে সম্পর্কে—পরিমল মিত্র কথাটা শেষ করলেন না।

—ঠিকই ধরেছো। তবে—

সুব্রত রক্ষিত বললেন, আমায় ক্ষমা করবেন স্যার। মাত্র কদিন আগে একটা খুন হয়ে গেছে বাড়ীতে। আপনি কিছুটা বিব্রত। এ সময় বিয়ে সংক্রান্ত কোন কথা—

—আমারও ওই মত। ডাঃ সান্যাল বললেন, ভাল কথা, পুলিশ খুনের ব্যাপারে কতটা এগুলো?

—বলতে পারব না। তারা জোর তদন্ত চালাচ্ছে এইটুকু জানি। তবে আমাকে ঝামেলার হাত থেকে রেহাই দেয়নি। পাহারা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বাড়ীর চার-ধার থেকে। কিন্তু—

রামশঙ্করের কথা শুনে সমীর গুপ্ত দ্রুত গলায় বলল, আপনাকে আবার কি ঝামেলায় ফেলল পুলিশ।

—কাল সকালে চাকর-বাকর আর নিজের লোকদের নিয়ে এ বাড়ী আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।

—সেকি! বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়লেন সুব্রত রক্ষিত, পুলিশ আপনাকে বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করতে পারে না স্যার। আপনি এ জুলুমের প্রতিবাদ করুন।

—তদন্তের সুবিধার জন্যই তারা একথা বলেছে। মাত্র একবেলা অনুপস্থিত থাকতে হবে। খালি বাড়ী নাকি পুঙ্খনু-পুঙ্খভাবে সার্চ করতে সুবিধা হয়। আমি রাজি হয়েছি।

—একবেলা কোথায় গিয়ে থাকবেন স্যার?

সুব্রত রক্ষিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রামশঙ্কর বললেন, চাকরদের ছুটি দিয়ে দেব। আমরা কাল বিকেল পর্যন্ত পার্ক হোটেলে থাকব ভাবছি।

শিশির সোম বলল, পুলিশের কাজ হল হত্যাকারীকে ধরা। বাড়ী সার্চ করে তারা কি পাবে?

—পুলিশের ধারণা হত্যাকারী টাকাটা নিয়ে যেতে পারেনি। এ বাড়ীরই কোথাও লুকান আছে। টাকাটা উদ্ধার করার জন্যই তারা ভালভাবে সর্চ করবে। ও প্রসঙ্গ এখন থাক। আমি মূল কথায় এবার আসি। আমার মেয়ের বিয়ের বহু প্রস্তাব আসছে। পরিচিত জনের অনুরোধও পাচ্ছি। আপনারা জানেন রতি আমার একমাত্র সন্তান। তাকে পরের বাড়ী পাঠান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এমন একজনকে জামাই করতে চাই যে বরাবরের জন্য আমার কাছেই থাকবে। ভাগ্যক্রমে তেমন একজনকে পাওয়া গেছে। আমি প্রদীপের কথা বলছি। আপনারা শুনলে খুশি হবেন, শুভকাজ আগামী মাঘ মাসেই সম্পন্ন হবে।

বলা বাহুল্য, সমীর গুপ্ত আর শিশির সোম খুশি হতে পারল না। কিন্তু করার কিছুই ছিল না। বাকীরা মোটামুটি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। এরপর অবশ্য আলাপ আর তেমন জমল না। অতিথিরা একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। শেষ ব্যক্তি সুব্রত রক্ষিত যখন গেলেন তখন ঘড়িতে নটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ওদিকে—

বাড়ীর পিছন দিকে— বাউন্ডারিওয়াল ঘেঁসা একটা ঝোপের আড়ালে বাসব শৈবাল এবং স্থানীয় থানার কয়েকজনকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কেউ জানে না। এমন কি সেই বিশেষ ব্যক্তি আদৌ টোপ গিলবে কিনা এ সম্পর্কেও গভীর সন্দেহ আছে।

সময় গড়িয়ে চলল। এগারটা বাজল ক্রমে। মশার দুর্বার আক্রমণ সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কি, সমস্ত রকমের অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

আরো কিছুক্ষণ পরে বাসব নিজের রিস্টে বাঁধা রেডিয়াম ডায়েলযুক্ত সি-মাষ্টারের দিকে তাকাল, পৌনে বারটা। আকাশে ফ্লান চাঁদের আলো। বাউন্ডারি-ওয়ালের ওধারের অর্ধ সমাপ্ত বাড়ীগুলিকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। ঠিক এই সময় ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সকলে সচকিত হয়ে উঠল। হাঁচড়-পাঁচড় করতে করতে একজন পাঁচিলের উপর উঠে বসেছে। সতর্কভাবে সে তাকাল এধার ওধার। তারপর লাফিয়ে পড়ল এধারে। মাত্র হাত দশেক দূরে সেই দুটো চৌবাচ্চা। আগন্তুক সেদিকেই এগুলো।

ওধারে গাছের ছায়া থাকায় অন্ধকার কিছুটা গাঢ়। বাসব এবং তার সঙ্গীরা আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। আগন্তুক অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। অল্পক্ষণ পরে জলের শব্দ পাওয়া যেতে লাগল। যেন চৌবাচ্চার মধ্যে নেমে কেউ কিছু করছে। অনুমান অবশ্য মিথ্যা নয়। আগন্তুক সত্যি চৌবাচ্চার মধ্যে নেমেছিল। এবার উঠে এল। তার হাতে কিছু একটা রয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে—

—মিঃ রক্ষিত রেনকোটে মোড়া টাকা-গুলো আমায় দিন।

সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচটা টর্চ জ্বলে উঠেছে। সুব্রত রক্ষিত এইভাবে আক্রান্ত হবেন কল্পনা করতে পারেননি। শেষ চেষ্টা অবশ্য তিনি করলেন, পাকসাট খেয়ে দৌড় মারলেন অন্য ধারে। কিন্তু বাঁচার পথ তখন আর একটিও খোলা নেই। সামন্ত সদলবলে অন্য প্রান্ত থেকে এগিয়ে এলেন। উপায়হীন অবস্থায় হতাশভঙ্গীতে মাটিতে বসে পড়লেন সুব্রত রক্ষিত। তাঁকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। জল আর কাদায় একেবারে চুপসে গেছেন।

—মিঃ সামন্ত, আসামী হাজীর। বাসব এগিয়ে গিয়ে বলল, ওঁর হাতে ধরা রেন-কোটের পুটলির মধ্যে থেকে হারান সমস্ত টাকাই পাবেন আশা করি। এখন আমার আর কিছু করণীয় নেই। চললাম। দয়া করে কাল কোন সময় আমার বাড়ীতে আসবেন, তখন কথা হবে। এস ডার্লিং—

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বাসব বলল, এত সহজ কেস বহুদিন হাতে আসেনি। টাকার জন্যই যে এই হত্যা তাতে সন্দেহ নেই। রামশঙ্করবাবু ছাড়া, মাত্র তিনজন লোক পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বাড়ীতে নিয়ে আসার কথা জানে। তারা হল, ক্যাসিয়ার, সেক্রেটারী প্রদীপ এবং ম্যানেজার সুব্রত রক্ষিত। ক্যাসিয়ারকে বাদ দিতে হবে, কারণ সেদিন সে নিমন্ত্রিত ছিল না। প্রদীপ জামাই হতে চলেছে—সাম্রাজ্য তার হাতের মুঠোয় সুতরাং টাকা চুরি করার রিস্ক নিয়ে নিজের আখের নষ্ট করবে না। বাকী বাঁচলেন সুব্রত রক্ষিত। বুঝলাম, ঘটনার নায়ক তিনিই।

রামশঙ্করবাবুর বাড়ী থেকে ফেরার পথে কথা হচ্ছিল। নির্জন রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। স্টিয়ারিং শৈবালের হাতে। একটু থেমে বাসব আবার বলতে লাগল, এই সঙ্গে এটাও আমি আঁচ করলাম, হয়তো খুন করার ইচ্ছে ছিল না রক্ষিতের। তাঁর হয়তো ধারণা হয়েছিল গৃহকর্তা সোমেন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে অন্য কোন ঘরে রাত কাটাচ্ছেন। তবুও একটা হাতিয়ার, শ্লোহার রডটা হাতে নিয়েই ঘরে ঢুকে ছিলেন।

শৈবাল বলে উঠল, রক্ষিত আলমারি খুললেন কিভাবে? চাবি তো ছিল রাম-শঙ্করবাবুর কাছে।

—মজা ওখানেই ডার্লিং। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, রামশঙ্করবাবু বলেছিলেন, কোন এক নতুন কোম্পানীর কাছ থেকে চারটে আলমারি কেনা হয়েছিল। দুটো অফিসে আছে আর দুটো নিজের শোবার ঘরে এনে রেখেছেন। চাবিটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। দেখা গেল, একই চাবি দিয়ে রামশঙ্করবাবুর শোবার ঘরের দু আলমারিই খোলা বা বন্ধ করা যায়। এবার সমস্ত কিছু সরল হয়ে এল। বুঝলাম, ওই কোম্পানীর তৈরী সমস্ত আলমারির চাবি একই প্যাটার্নের সুতরাং অফিসে যে আল-মারি দুটো আছে তার চাবি দিয়ে বাড়ীর আলমারি খুলতে কোন অসুবিধা নেই। রক্ষিত হলেন কোম্পানীর ম্যানেজার। তাঁর কাছে অফিসের আলমারি দুটোর চাবি থাকাই স্বাভাবিক। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

—রেনকোটের ব্যাপারটা—

—রক্ষিত টাকাটা সরিয়ে ফেলার পরই অনুভব করলেন, এখনই বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ঝামেলা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে রাখতে হবে। চমৎকার প্লান করলেন তিনি। সোমেন চৌধুরীর রেনকোটে মুড়ে সমস্ত টাকা ভারী কিছুর সঙ্গে বেঁধে ডুবিয়ে দিলেন কাদা জলে ভরা চৌবাচ্চায়? রেন-কোটে মোড়া থাকায় নোট নষ্ট হবারও সম্ভাবনা রইল না। সোমেন চৌধুরীর রেন-কোট হারিয়েছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলাম। ফাঁদ পাততে হল। রামশঙ্করবাবুর মুখ থেকে সুব্রত রক্ষিত যেই শুনলেন, আগামীকাল সকালে পুলিশ বাড়ী খালি করে পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে খোঁজাখুঁজি করবে—প্রমাদ গুনলেন তিনি। টাকাটা ওখান থেকে সরাতে হবে। এবং রাত্রেই। পুলিশের পাহারা যখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তখন আর ভয় কি। এরপর যা কিছু ঘটেছে তাতো তোমার চোখের উপরকার ব্যাপার।

নিভে যাওয়া পাইপ এতক্ষণ পরে আবার ধরিয়ে নিল বাসব।

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্নিদূত

নক্ষত্রের জন্ম ৩-০০

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

লাভার্স লেন ৩-২৫

স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত পূর্ণাঙ্গ হাসির নাটক

রাজা বদল ৩-০০ শঙ্খনিধি ৩-০০

কবর থেকে বলছি ৩-০০ দ্রৌপদী ৩-০০

মনোজ মিত্র

চাকভাঙ্গা মধু ৩-৫০

ধীরু মুখোপাধ্যায়—বাঘা যতীন ৪-০০

বাসুদেব বসু—নেফা রহস্যময়ী নেফা ৪-০০

সলিল সেন—উৎসর্গ ২-৫০

উমানাথ ভট্টাচার্য—জন্মমৃত্যু ৩-০০

শক্তিপদ রাজগুরু—মসনদ ২-৫০

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়—চরৈবেতি ৩-৫০

শচীন ভট্টাচার্য—অবতার ৩-০০

ভোলা দত্ত—স্বপ্ননয় ৩-০০

রতন ঘোষ—সমুদ্র শঙ্খ ২-০০

রতন ঘোষ—প্রতিবাদ ২-০০

সমর মুখোপাধ্যায়—মৃতদেহ ৩-২৫

—ঐ— হে মোর পৃথিবী ২-৫০

দিলীপ মৌলিক—ছায়াছায়া আলো ২-০০

মণীন্দ্র রায়ের কাব্য নাটক—

নাটকের নাম ভীষ্ম ৩-৫০

দিলীপ মৌলিক ও শান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত

আজকের একাঙ্ক ৫-০০

লিখেছেন :—

অমর গঙ্গোপাধ্যায়—এই পৃথিবী

উমানাথ ভট্টাচার্য—দিবারাত্র

কিরণ মৈত্র—অমোঘ

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়—সাগর সঙ্গমে

ভোলা দত্ত—খেলা

মনোজ মিত্র—তক্ষক

মোহিত চট্টোপাধ্যায়—রাজপাখী

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য—মাশুল

নীহার গুপ্ত সম্পাদিত

নতুন রীতির একাঙ্ক ৬·০০

লিখেছেন :—

সলিল মজুমদার—উন্মোচন

মানবব্রত মুখোপাধ্যায়—শিরিষমেয়ে কিছু

লোকনাথ চট্টোপাধ্যায়—এ আমরা চাইনি

সত্যেন ভদ্র—রক্তাক্ত শপথ

তপনকুমার ঘোষাল—নতুন জোয়ার

শান্তি বর্ধন—অনাহারে নয়

দীপিকা, ৩০/১এ, কলেজ রো, কলি-৯।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

দুর্ভাগ্যক্রমেই পাড়ার এক স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছিলাম। তার চেয়ে আরও দুর্ভাগ্য যে অবৈতনিক হলেও নতুন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে (বা অধিষ্ঠানের আগে থেকেই) ঠিক বিদ্যা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নয়—সমাজ সেবায় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আশা-উৎসাহ পোষণ করে-ছিলাম। এই উৎসাহের গুম্ফলতায় সামান্য জলসেচনও করেছিলাম পরিচালক-মন্ডলীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় সভায়। বিবেচনাসাপেক্ষে প্রস্তাব করেছিলাম : পাড়ায় মেয়ে স্কুলের খুব অভাব। আমাদের স্কুল বাড়ী ত' সকালবেলায় খালি পড়ে থাকে, একটি মেয়ে স্কুল ঠিক নয়—একটি বালিকা বিভাগ খোলা যাক না কেন। প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যেই উপগোষ্ঠী থাকে এবং সংঘের মধ্যে থাকে উপসংঘ। তা' ছাড়া থাকেন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং বিরোধিতা-ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিরা। ফলে প্রস্তাবটির যথারীতি বিরোধিতা করা হল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত 'প্রস্তাবটি কার্যকর করবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হবে'—এই প্রস্তাবই সভার কার্যবিবরণীর অন্তর্ভুক্ত হল।

পরের দিনের সকালবেলা। খবরের কাগজ পড়ছিলাম এমন সময় খবর এল দুটি মেয়ে দেখা করতে চায়। গেলাম বসবার ঘরে। মেয়ে দুটি বসে ছিল, আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠল। একজন বলল : কাকাবাবু, এ আমার বন্ধু সুমিতা, (না, সুনীতা? ঠিক মনে নেই)। দুজনেই এবার বি-এ পাশ করেছি। শুনছি, আপনারা নাকি গার্লস, সেকসান খুলছেন। তাই এসেছি।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝলাম, যদিও 'কাকাবাবু' বলে সম্বোধনকারিণীকে ঠিক চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম : তোমার নাম কি?

—বারে আমাকে চেনেন না—মেয়েটি সত্যিই বিস্মিত হল, আমার নাম রেবা। আমি হরেনবাবুর—হরেন্দ্রনাথ বোসের মেয়ে।

তারপর থেকে সকাল বিকেল প্রার্থিনী আসতে লাগলেন—কেউ একা কেউ বা বাবাকে সঙ্গে করে, কেউ বা স্বামীর সঙ্গে। কয়েকজন মহিলা এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করলেন। স্কুলেও দরখাস্তের তাড়া ক্রমশ মোটা হতে লাগল, জানতে পারলাম। খবর পেলাম, পরিচালক সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও অল্পবিস্তর অনুরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করছেন। রাস্তায় দেখা হতে একজন ত' তিরস্কারের সুরেই অনুযোগ করলেন : ভ্যালা ফ্যাসাদে ফেলেছেন মশাই! দিনরাত মেয়েছেলের ভিড়ে বাড়ীতে তিষ্ঠানো দায়। —তারপর অনুরোধ করলেন : ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাববেন?

ভাবতেই শুরু করলাম : এই যে এত কর্মপ্রার্থিণী যাঁরা শুধু বালিকা বিভাগ খোলার খবর পেয়েই দরখাস্ত করতে, তদ্বির করতে, ধর্ণা দিতে আরম্ভ করেছেন এঁরা কি বেকারের দলে পড়েন? যারা কাজ খোঁজে অথচ কাজ পায় না তাদের সকলকেই যদি বেকার আখ্যা দেওয়া হয় তবে এঁদের সকলেই নিশ্চয়ই বেকারের পর্যায়ভুক্ত। অপরদিকে আবার সরকারী-বেসরকারী সূত্র থেকে বেকারত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাতে নিশ্চয়ই এদের সকলকে ধরা হয় না। এই প্রার্থিণীদের মধ্যে এতগুলি যে সদ্য পাশ করা বাচ্চা মেয়ে ছিল এদের অনেকেই বিয়ে হয়ে যাবার পর নিশ্চয়ই আর কর্মপ্রার্থিণী থাকবে না। আবার আজ যারা ঠিক প্রার্থিণী নয়—বাপের বাড়ীতে বেশ আরামেই আছে বিয়ের পর তাদের মধ্যে অনেককেই প্রার্থিণীবাহিনীর সামিল হতে হবে। মোটকথা, এই ধরনের কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সম্বন্ধে—আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে-কোন পরিসংখ্যানই মূল্যহীন।

পরিসংখ্যান :

শুধু শিক্ষিত বেকারের নয়, পশ্চিম-বঙ্গে অন্যান্য ধরনের এবং মোট বেকারত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে যে কোন পরিসংখ্যানই একরকম মূল্যহীন এবং অনেক বিভ্রান্তি-করও বটে। মূল্যহীনতার দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সহ-সভাপতি—ডাঃ অজিতকুমার বসু উক্তি করছেন : বিভিন্ন সূত্র থেকে এই রাজ্যে মোট বেকারত্বের পরিমাণ ২৩ লক্ষ থেকে ৪৫ লক্ষে ধরা হয়েছে—অর্থাৎ মোট জন-সংখ্যার ৫ থেকে ১০ শতাংশ অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এর মধ্যে নাকি ২ লক্ষ হল শিক্ষিত বেকার এবং ৮০ হাজারের মত শিক্ষিত বেকার হল স্নাতক বা স্নাতকোত্তর উপাধিধারী। প্রশ্ন হল : ২৩ লক্ষের মধ্যে ২ লক্ষ শিক্ষিত বেকার—না ৪৫ লক্ষের মধ্যে? এ-বিষয়ে ডাঃ বসুর লেখা থেকে সুস্পষ্ট-ভাবে কিছু না বোঝা না গেলেও মনেহয় ২৩ লক্ষেরই মধ্যে কারণ সরকারী হিসেব অনুসারে বর্তমানে মোট বেকারের সংখ্যা হল ২৮ লক্ষের মত এবং এর মধ্যে প্রায়

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডকটরেট। সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণেতা এবং অমৃতের নিয়মিত-লেখক।

কবি বিশ্বনাথ মৈত্রের
একখানি চিরায়ত কাব্যগ্রন্থ
মনোরমা ও বৃদ্ধচারণ
পূজোর আগেই বেরুচ্ছে।
দৈনন্দিন প্রকাশনী
বনগ্রাম : ২৪ পরগণা

সোভিয়েত দেশ নেহরু-পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক
মনোরঞ্জন মাইতি-র
অতি সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ
আত্মার যন্ত্রণা
প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক ডঃ হরিসাধন গোস্বামী বলেন—'যুগযন্ত্রণার আর্তি কবিতার ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়ে আছে—সংবাদধর্মী এই কাব্য মননশীলতার মধ্যে মানবিকতার অশ্রু-আগুনে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে।' দাম : তিন টাকা
পরিবেশক : ভারবি॥ ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা ১২

৭ লক্ষ হল শিক্ষিত বেকার। দুটো হিসেবই যদি মেনে নেওয়া হয় তবে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায় ঃ এই রাজ্যে মোট বেকারের সংখ্যা ২৩ লক্ষ থেকে ২৮ লক্ষে পৌঁছানোর ফলে শিক্ষিত বিকারের সংখ্যাও ২ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ বেকার সীমান্তে সমগ্র বৃদ্ধিটাই ঘটেছে শিক্ষিত বেকারের ক্ষেত্রে। সত্যিই কি তাই? ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে কলকারখানায় নিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৬৫ সালেই সর্বাধিক—৯ লক্ষ ১৩ হাজারের মত। তারপর থেকে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ঐ ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাসই পাচ্ছিল। এবং বর্তমানে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। মোটকথা, পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার ক্ষেত্রে নিয়োগের পরিমাণ—যাকে বলে ফ্যাকটরী এমপ্লয়মেণ্ট বিশেষ বাড়েনি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 'অশিক্ষিত' নিয়োগপ্রার্থীর দল কোথায় গেল, না, এই কর্মপ্রার্থীদের সকলেই শিক্ষিত বেকারের সামিল হয়েছেন? আবার কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ও অনুপাত বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা কতটা নির্ভরযোগ্য? ১৯৬১ সালে কৃষি-শ্রমিকরা সংখ্যায় ছিল ১৮ লক্ষের মত, ১৯৭১ সালে দেখা যায় যে তারা ৩২·৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ফলে মোট কর্মজীবীদের মধ্যে তাদের অনুপাত ১৫·৩ শতাংশ থেকে ২৫·৭৫ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি তাই হয় তবে গ্রামাঞ্চল থেকে ঐ যে হাজার হাজার লোক শহরের রাস্তাঘাটে এসে বাসা বেঁধে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কোনমতে বেঁচে আছে, ওরা কারা? এ সম্বন্ধে অমৃতেরই পর পর দু' সংখ্যায় আলোচনা করে দেখিয়েছি যে ওরা ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক ও বৃত্তি থেকে উৎখাত গ্রামীণ কারিগর। বহু ডঙ্কা-নিনাদিত ভূমি-সংস্কার সত্ত্বেও প্রায় ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকরা ক্রমশ সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ছে আর নিয়োগের অভাবে সবাই দল বেঁধে উদরান্নের জন্যে নগরাঞ্চলে এসে ভিড় করছে। জাতবৃত্তিও আজ জীবনধারণের পক্ষে কোনমতেই পর্যাপ্ত নয় বলে গ্রামীণ কারিগররাও একই পন্থা অবলম্বন করেছে। আদমসুমারির সংজ্ঞা অনুসারে এরা হয়ত যথাক্রমে 'কৃষি-শ্রমিক' ও 'স্বয়ং-নিযুক্ত' শ্রেণীভুক্ত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এরাও বেকার যারা ভিক্ষুকের পর্যায়ে নেমে এসেছে। ১৯৬১-৭১ সালের কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যা কত তা দেখান হয়নি। তাই বলেছি, বেকারত্বের পরিমাণ ও শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা শুধু মূল্য-হীনই নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে।

বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব ঃ

পাঠ্যপুস্তকে মোটামুটি চার ধরনের বেকারত্বের উল্লেখ করা হয় ঃ (ক) শিল্প-বাণিজ্যে মন্দাজনিত (সাইক্লিক্যাল), (খ) সংঘাতজনিত (ফ্রিকশ্যানাল) বেকারত্ব, (গ) সংগঠনজনিত (স্ট্রাকচারাল) বেকারত্ব এবং (ঘ) ঋতুগত (সীজন্যাল) বেকারত্ব।

কৃষিপ্রধান দেশে ঋতুগত বেকারত্ব থাকবেই এবং বেকারত্বের ফলে কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা দেয়। এই ধরনের বেকারত্ব অকাম্য হলেও মোটামুটি অন্তর্নিহিত বলে একে বেশ কিছুদিন এড়িয়ে যাওয়া চলে। উপরন্তু, এই সমস্যার সমাধান দীর্ঘকালীন উন্নয়নের প্রশ্ন। অর্থ-ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হলে তবেই এর সুষ্ঠু সমাধান আশা করা যায়। অবশ্য একে উপেক্ষা করা ভুল হবে, এবং একরকম উপেক্ষার দরুনই এই রাজ্যে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের পরিমাণ ও ফলে ভিক্ষোপজীবীর সংখ্যা বা, মোলায়েম করে বলতে গেলে, দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারী মুখপাত্রদেরই মতে, এই রাজ্যের মোট ৪·৫ কোটি লোকের মধ্যে মোটামুটি ৭০ শতাংশ বা ৩·১৫ কোটি দারিদ্র-রেখার নীচে জীবনযাপন করে। এর মূলে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের ভূমিকা কতটা তা নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে।

সংগঠনজনিত বেকারত্ব বলতে বোঝায় শিল্পের গঠন বা কাঠামোর পরিবর্তন-জনিত বেকারত্ব। শিল্পের গঠন পরিবর্তিত হওয়ার মূলে সাধারণত দুটি কারণ কাজ করে ঃ চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন এবং শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন বা টেকনিক্যাল প্রগ্রেস। এই দুটি কারণকেই পশ্চিম-বঙ্গের শিল্পক্ষেত্রের বেকারত্বের—অন্তত অ-পর্যাপ্ত নিয়োগ সম্প্রসারণের কারণ বলে ধরা যায়। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। তাঁতের কাপড়ের চাহিদা কমে গেছে, মিলের ধুতি-শাড়ীরও বিশেষ চাহিদা নেই। অপরদিকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে টেরিলিন-টেরিকট-রেয়ন-নাইলন-ভয়েল। যে তাঁতের শাড়ীর চাহিদা আছে চেকনাই তার বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গ টেরিলিন-টেরিকটে এগিয়ে যেতে পারেনি, তাঁতের শাড়ীতে প্রয়োজনীয় চেকনাই সৃজন করতেও সমর্থ হয়নি। ফলে বাঙালীর মাংসের দোকান বা ভূতপূর্ব রাজবন্দীর তৈরী বিড়ির মত পশ্চিমবঙ্গের

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে যে বই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর

প্রথম উপন্যাস

হাংরাস

সুভাষ মুখোপাধ্যায় উপন্যাস রচনার কোনে প্রথাসিদ্ধ নিয়ম মানেননি—তাই তাঁর রচনায় একটা চমৎকার টাটকা স্বাদ ফুটেছে। যেন সব কিছু চোখে দেখা বর্ণনা, অথচ বিবরণ মাত্র নয় তার চেয়ে অনেক বেশী। ...ভাষা অত্যন্ত ঝরঝরে ও স্বচ্ছ। —"দেশ"

দাম ঃ ১০·০০

এই উপন্যাসটি পাঠ করা একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯।১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলি-৯

বস্ত্রশিল্প এবং তাঁতশিল্প মার খাচ্ছে। আর বিদেশে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা যখনই কমে যায় পাটকল-শ্রমিকরা তখনই কিছু কিছু বেকার হয়ে পড়ে।

শিল্পের কলাকৌশলের পরিবর্তনও পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্রশিল্পের দুর্দশার অন্যতম কারণ। পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম শিল্পোন্নত রাজ্য যদিও এই শিল্পোন্নয়ন রাজ্যের কয়েকটি অংশে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু এই শিল্পোদ্যমকে অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা করা হয়নি—গতানুগতিকভাবেই কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যন্ত্রপাতি হয়ে পড়েছে হয় অকেজো না হয় পুরোনো ধরনের। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কাগজের কলগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরোনো চালের মত তাতে না বেড়ে পচা চালের মত তারা বর্জনীয়ই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ঝাঁপ বন্ধ হওয়ারও উপক্রম হয়েছিল। আবার আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করে কলা-কৌশলের এবং পরিচালনার প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসাধন করে কাজ চালানো হচ্ছে—ঠিক নবজীবন দান করা বোধহয় সম্ভব হয় নি। প্রধান যন্ত্রপাতি শিল্প পাটকল-শিল্পের ক্ষেত্রেও ঐ আধুনিককরণের সমস্যা এখনও বিশেষভাবে রয়ে গিয়েছে। এই শিল্পে যে নিয়োগের পরিমাণ ১৯৫১ সালে ২·৭৭ লক্ষের তুলনায় কমে ১৯৭০ সালে ২ ২০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে, তার অন্যতম কারণ হল প্রয়োজনীয় পরিমাণে আধুনিকরণে অপারগতা। এক্ষেত্রে আবার একটা বিশেষ অসুবিধাও আছে। আধুনিকরণের অন্যতম তাৎপর্য হল শ্রমহারক যন্ত্রপাতি ব্যবহার। কিন্তু শ্রমহারক যন্ত্রপাতি বসালে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায় আর বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচালনায় তা সম্ভবও নয়। এখানেই হল সঙ্কট—দুষ্টচক্র বা ভিসাস সার্কেল।

চাহিদার অস্থায়িত্ব বা সাময়িক পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা যদি বেকার হয়ে পড়ে তবে তাকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বা ফ্রিকশানাল আনএমপ্লয়মেন্ট বলা হয়—যেমন, কেশ কিছুদিন ধরে ডকে জাহাজ না এলে ডক-শ্রমিকরা কোন কাজ পায় না বর্ষাকালে বাড়ীঘর তৈরীতে ভাটা পড়ে বলে রাজমিস্ত্রী ইত্যাদি বসে থাকে। এই সংঘাতজনিত বেকারত্বের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী তবে কাঁচামাল বণ্টনের দুরবস্থা ও পক্ষপাতিত্বের দরুন অনেক শ্রেণীর শ্রমিকের চাহিদা যে মাঝে মাঝে কমে যায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেক সময়ই সিমেন্ট লোহা পাওয়া যায় না, তাঁতীরা আজ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সুতো পাচ্ছে না—এ সবের ফল নিয়োগের ওপর প্রভাব বিস্তার না করে পারে না।

শিল্পবাণিজ্যে মন্দাজনিত বেকারত্ব বা সাইক্লিক্যাল আনএমপ্লয়মেন্ট কোন বিশেষ রাজ্যের পক্ষে একক কিছু হতে পারে না। ১৯৬৫ সাল থেকে দেশ কয়েক বছরের জন্যে শিল্পবাণিজ্য মন্দার কবলে পড়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গ এর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়ার জন্যে শিল্পবাণিজ্য ও নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুরবস্থা তা পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব। বেসরকারী উদ্যোগের মূল সূত্র হল মুনাফাকে সর্বাধিক করে তোলা—ম্যাকসিমাইজ প্রফিট। সুতরাং যদি মুনাফার হ্রাস বা ক্ষতির আশঙ্কা করে উৎপাদকেরা উৎপাদনে বিরত থাকে, নতুন বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে না চায় বা অন্যত্র সরে যাবার সুযোগ খুঁজতে থাকে, তাহলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে 'শিল্পবাণিজ্যে মন্দা' আখ্যা দেওয়া যায় না কি? কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ এই ধরনের মন্দায় ভুগেছে এবং এখনও ঠিক সুস্থ হতে পারে নি। আর সুস্থ হয়ে ওঠাও কঠিন। নেড়া দ্বিতীয়বার বেলতলায় যাবার আগে ভাল করে বেলগাছটার দিকে তাকিয়ে দেখে আবার মাথা ফাটবার আশঙ্কা আছে কিনা। পশ্চিমবাংলার শিল্পপতিদের ঠিক তাই অবস্থা। সুতরাং শত আশার বাণী সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্পোদ্যোগ স্থাপন নতুন বিজিনেস করতে তাঁরা এখনই ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না। তবে এই রাজ্য থেকে সরে যাবার প্রবণতাও যে স্তিমিত হয়েছে তাও ঠিক। এইরকম স্থিতাবস্থা অবশ্য নিয়োগ সম্প্রসারণের অনুকূল নয়। এর ওপর আছে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা যার ভয়াবহ রূপ পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ প্রকট।

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা :

শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা নিয়ে পত্র-পত্রিকা সভাসমিতি ইত্যাদিতে বহু আলোচনা হয়েছে তবে প্রকৃত সমাধানের সূত্র কেউ নির্দেশ করতে পারেন নি বলেই মনে হয়। নির্দেশ করা অবশ্য কঠিন কাজ। সমস্যাটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিকও বটে। তবে পাকা সড়ক বলে কিছু নেই, আলগলি দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু আলিগলিরও এমন অবস্থা যে এগোনই দায়।

প্রতি বছর এই রাজ্যে ২·৫০ লক্ষের বেশী ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হয়। এর ওপর বৃত্তিমূলক ও পেশাদারী শিক্ষা। কলেজ ভর্তির হার প্রতি বছরে ১০ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্যে ভর্তি হচ্ছে ১০ হাজারের বেশী ছাত্রছাত্রী।

সুতরাং এই রাজ্যে উচ্চশিক্ষার প্রতি আকর্ষণ যে বৃদ্ধি পেয়েছে তা অনস্বীকার্য। বর্ধিত চাহিদা মেটাবার জন্যে কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাওয়া হয়েছে। এখন অবশ্য বলা হচ্ছে, সংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে উৎকর্ষ বৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত হল মাত্র যোগ্য ছাত্রছাত্রীদেরই উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে, সকলকে নয়। ডাঃ অজিতকুমার বসু সুপারিশ করেছেন যে হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অন্তত ৬০ শতাংশ মার্কস না পায়—অর্থাৎ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ না হয় তারা যেন আর্টস-সায়েন্স কলেজে ভর্তি হতে না পারে। তাদের জন্যে অন্যরকম শিক্ষার—নিয়োগভিত্তিক বৃত্তি মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভাল

সন্দেশ শারদীয়া সংখ্যা

ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে প্রকাশিত হবে

বিশেষ আকর্ষণ— সত্যজিৎ রায়ের

গোয়েন্দা ফেলুদার এডভেঞ্চার —সমাদ্দারের চাবি

আরো লিখবেন—উপেন্দ্রকিশোর রায়, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী পুণ্যলতা চক্রবর্তী, বাণী রায়, নলিনী দাশ, গৌরী ধর্মপাল, ধীরেন্দ্রলাল ধর, শিশির মজুমদার, অজেয় রায় ও আরো বহু প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক— রহস্য-রোমাঞ্চ-উপন্যাস-গল্প-কবিতা-ছবি পুরস্কার প্রতিযোগিতা—আরো কত কি।

মূল্য মাত্র সড়ে চার টাকা

বার্ষিক (শারদীয়া সংখ্যাসহ) সডাক মূল্য ১২-০০, প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১-০০

প্রাপ্তিস্থান (১) নিউস্ক্রিপ্ট : এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

(২) সন্দেশ কার্যালয় : ১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিঃ-২৯

অবিলম্বে গ্রাহক। এজেন্ট হবার জন্য দরখাস্ত করুন।

গৃহ বধূরা আজ স্বাধীন....

SICO

তাদের বৈদ্যুতিক
সরঞ্জামে সাজান

সিকো কিচেন

উপহার দিয়ে
বিজ্ঞানের
প্রয়োগে রান্নাঘরে
বিপ্লব এনেছে

গৃহস্থালীর কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুন্দর সমন্বয় শুধু "সিকো"তেই পাবেন।
"সিকো" সরঞ্জামের সাহায্যে খুবই অল্প সময়ে চিকেন রোস্ট, চিকেন রোল, কেক, কাস্টার্ড একই "ওভেনে" তৈরী হবে। যে কোনো খাবার ওভনে ইচ্ছেমত গরম ও তাজা রাখতে পারবেন, মনে হবে এখনি ওভেন থেকে নামান হল।
আপনার রান্নাঘর ধোঁয়া, তেলতেলে ময়লা থেকে মুক্ত থাকবে।

গৃহস্থালীর বিস্ময়কর সিকো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
কুকিং রেঞ্জ···ওভেন···হট্‌ফুড ক্যাবিনেট,
হটপ্লেট···ষ্টোরেজ ওয়াটার হিটার ইত্যাদি

SICO 1911

দি সাইচাসিক ইলেকট্রিক্যাল কোঃ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৬, তেজকারাম্বর লেন, রোড, এলাহাবাদ-২১১০০১।
এলাহাবাদ ○ বোম্বে ○ কলকাতা
○ মাদ্রাজ ○ নিউ দিল্লী ○ আহমেদাবাদে
○ হায়দ্রাবাদ ○ ব্যাঙ্গালোর

পরিবেশনায় নিয়োজিত :
ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোং লিমিটেড

কথা। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে? এইরকম কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে শিক্ষাসংকোচ বা শিক্ষাসংহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মোকাবিলা করতে কর্তৃপক্ষ সমর্থ হবেন কি? বর্তমানে যে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হতে যাচ্ছে তারও মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল একই—মাত্র যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ঐতিহ্যগত উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া। কিন্তু উদ্দেশ্য কার্যকর করা সম্ভব হয় নি আর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাও সার্থক হয় নি।

সুতরাং এই রাজ্যে শিক্ষিতের বা উচ্চ-শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেতে থাকবে—এইটে স্বীকার করে নিয়েই বেকার সমস্যার সমাধানের কার্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

দৃষ্টিভঙ্গীজনিত উপাদান :

বেকার সমস্যার সমাধানে—বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার মোকা-বিলায় দৃষ্টিভঙ্গীজনিত উপাদানগুলোয় (অ্যাটিটিউডিন্যাল ফ্যাক্টরস্) ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন-সংখ্যা সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ৮ শতাংশ কিন্তু বেকারত্বের পরিমাণ হল ভারতের মোটের ১৪ শতাংশ। ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গের কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ৬১ শতাংশ অন্যান্য রাজ্যের লোক। বর্তমানে ঐ হারের সামান্য মাত্র পরিবর্তন ঘটেছে। এই অবস্থায় যে এই রাজ্যের ছেলেদের চাকরির দাবি—জবস্ ফর সানস অফ দি সয়েল উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? জাতীয় সংহতি পরিষদ এই দাবির যৌক্তিকতা অনেকটা স্বীকারই করে নিয়েছেন দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল ? এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে? দায়ী আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পরিবেশ যা অনেকদিন ধরে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছে। বর্তমানে বাঙালীর ছেলে সবরকম কাজে লাগতে তৈরী থাকলেও নিয়োগকর্তা তাদের নিতে রাজী নয়। যেমন, বাঙালী ছেলেকে কেউ দ্বারোয়ান রাখতে চায় না, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করতেও ইতস্ততঃ করেন। সুতরাং এই প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

সম্ভাবনার বিচার :

তথ্য ও পরিসংখ্যানের নির্ভরযোগ্য-তার প্রশ্ন ছেড়ে দিয়ে ধরা যায়, ১৯৭১-৮০—এই দশকের ৪০ লক্ষের মত পদ সৃষ্টির দ্বারা নিয়োগ সম্প্রসারণের আশা করা হয়েছে। এই পরিমাণ সম্প্রসারণ পর্যাপ্ত কিনা তার বিচারও ছেড়ে দেওয়া যাক। এর মধ্যে কলকারখানায় ২০ শতাংশের বেশী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়ত সম্ভব হবে না এবং বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিতে সম্ভাবনা এর বেশী বলে মনে হয় না। তাহলে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পই ভরসা, এর মধ্যে আবার কৃষিক্ষেত্র থেকে কতটুকু আশা করা যায়? সুতরাং বাকী রইল এক—ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প। কিন্তু এই রাজ্যে এই শিল্প বিশেষ অব-হেলিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর দৃষ্টিভঙ্গী যে পক্ষপাতমূলক, সে-অভিযোগ সরকারী মুখপাত্ররাই করেছেন। সুতরাং ১০ বছরে ৪০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা সন্দেহ। ফলে অবস্থা আরও অবনতির দিকে চলবে।

উপসংহার :

যদি জিজ্ঞাসা করেন আপনার নির্দেশিত প্রতিবিধান কি, তবে বলব হ্যাঁ, সরাসরি যদি প্রতিবিধান নির্দেশই করতে পারতাম..! এ আমার ছোটমাথার কাজ নয়, একারও কাজ নয়। মনে হয়, এর জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটা কমিশন গঠন করা এবং এই কমি-শনের সুপারিশ অনুসারেই চলা উচিত। মূল্যবৃদ্ধির কারণানুসন্ধান ও প্রতিবিধান নির্দেশের জন্যে যদি কমিশন গঠন করা যায়, তবে বেকার সমস্যার মোকাবিলার উদ্দেশ্যেই বা নয় কেন? তবে জোর দিয়ে বলতে চাই, কমিশনের বিচার-বিশ্লেষণ সুপারিশ যেন রাজনীতি-ভারাক্রান্ত না হয়, এবং রাজনৈতিক চাপে বা উদ্দেশ্যে যেন সুপারিশের রদবদল করে কাজে না এগোনো হয়। হলে কিন্তু অবস্থা আরও সঙ্গীন হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। অতএব, রোগ নির্ণয় ও অস্ত্রোপচারের ভার চিকিৎসক ও শল্য-চিকিৎসকদের উপরই ছেড়ে দিতে হবে। সেখানে গৃহকর্তার ভাব নিয়ে মাথা গলানো চলবে না।

আর একটা কথা। এপর্যন্ত নিয়োগ সমস্যার প্রকৃত সমাধানের প্রচেষ্টা না করে যাকে বলে ত্রাণমূলক নিয়োগের (রিলিফ এমপ্লয়মেণ্ট) ওপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ-কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে, নিয়োগ-সেল খোলা হয়েছে, ইত্যাদি। অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন ৬·১৩ কোটি টাকার একটি নিয়োগ-প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদন করেছেন এবং আরও একটি ৯ কোটি টাকার প্রকল্প অনু-মোদনের জন্যে কমিশনের কাছে পেশ করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে এই দুই প্রকল্পেরই লক্ষ্য হল ত্রাণমূলক নিয়োগ। এতে কিছুটা আশু উপশমের আশা থাকলেও দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বিশেষ ফল ফলবে না। তাই পরিকল্পনা কমিশন সতর্ক করে দিয়েছেন যে রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং শিক্ষিত বেকারদের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া বেকার-সমস্যার—বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান মোটেই সম্ভব নয়।

সুষ্ঠু সমাধান বলতে পরিকল্পনা কমিশন উৎপাদনশীল নিয়োগের (প্রোডাক-টিভ এমপ্লয়মেণ্ট) কথাই বলেছেন। এই উৎপাদনশীল নিয়োগের দিকে দৃষ্টি দিলে তবেই অর্থনীতির ভাষায় সঞ্চয়-বিনিয়োগ ব্যবস্থা কার্যভাবে সংগঠিত হয়ে দীর্ঘ-কালীন ভিত্তিতে বেকার-সমস্যার সমা-ধানের সহায়ক হবে। নচেৎ ঘুমের বড়ির মত ত্রাণমূলক নিয়োগ-প্রকল্প নিয়তই রচনা করে যেতে হবে, আর তার আকার বা ডোজও বাড়িয়ে চলতে হবে।

JUST ! **OUT !!**

The Revolutionary History of India,
SEDITION COMMITTEE 1918 REPORT
UNDER HON'BLE Mr. JUSTICE ROWLATT
AS PRESIDENT Rs. 25/-

The first quarter of the 20th century has witnessed two major revolutionary movements — one in Russia and the other in India. In India that revolutionary movement, to seize power, was essentially an armed struggle. This is the history of that armed struggle when the young Bengal took arms to free their country from the British colonialists, history of courage conviction and commitment, a rare document, a first-hand report prepared and submitted by a committee appointed by the British Government under Mr. Justice Rowlatt as president.

NEW AGE PUBLISHERS (P) LTD.,
Phone : 34-1618
12, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12.

আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের একটি সমস্যা

সন্তোষ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, সে কথা সর্বজনবিদিত। অনেকের মতে এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা প্রতিফলন। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমাদের কথা এবং কাজের তফাৎটা বড় বেশী। হয় কথা বেশী বলি, না হয় কাজ কম করি, অথবা দুটোই।

অন্যান্য ক্ষেত্রে কথামত কাজ না হলে ফলাফল কি হয় বা হতে পারে, সেটা এই লেখার আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হোল, গত দুদশকের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর রূপায়ণের কথামত কাজ না করার ফল কি রকম মারাত্মক হয়েছে এবং হতে চলেছে। দেখা যাবে যে পরিকল্পনার যে সব ক্ষেত্রে কথার ফুলঝুরি বেশী হয়েছে, ব্যর্থতা সেই সব ক্ষেত্রেই বেশী।

ভুল বোঝাবুঝি এড়াবার জন্যে, প্রথমেই বলে রাখি যে আমি পরিকল্পনার রূপায়ণের কথা বলছি। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের কথা বলছি না। অনেকের (বিশেষ করে, যাঁরা অর্থনীতির ছাত্র নন, তাঁদের) ধারণা থাকতে পারে যে, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত প্রকল্পের যোগফলটাই হচ্ছে মোট পরিকল্পনা; প্রথমটা দ্বিতীয়ের ক্রমবর্ধমান রূপ মাত্র। যাঁদের এইরকম ধারণা, তাঁরা আলোচ্য প্রসঙ্গ উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরিস্তি হাজির করেন : দামোদর ভ্যালী, রোকারো, হলদিয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে যাঁরা সমাজবাদী, তাঁরা এই সঙ্গে যোগ করে দেন : ভূমি-সংস্কার, বীমা-ব্যাঙ্ক ইত্যাদির জাতীয়করণ, স্টেট ট্রেডিং, ইত্যাদি। কেউ কেউ হয়তো আরও খোঁজ রাখেন এবং বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট খরচের বহরটাও দেখিয়ে দেন।

কিন্তু এই ধারণাটা ভুল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য ফুটবল লীগের নিয়মে নির্ধারিত হয় না। রূপায়িত প্রকল্পগুলোর খরচের যোগফল যদি পরিকল্পিত মোট অর্থব্যয়ের আশি ভাগ হয়, তাহলেই কিন্তু (মূল্যবৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও) বলা যায় না যে পরিকল্পনা আশি ভাগ সফল হয়েছে। কারণ, পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় আয় বাড়ানো এবং তার পথ হল সমগ্র অর্থনীতির চেহারা এবং তার নিজস্ব অংশের নির্ভরতা মনে রেখে বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতিকে সমতালে বাস্তবায়িত করা।

পরিকল্পনা আশি ভাগ সফল হয়েছে তখনই বলা যাবে, যখন কিনা জাতীয় আয়ের পরিকল্পিত বৃদ্ধির শতকরা আশী ভাগ অর্জিত হয়েছে। এই নিরিখে, কোনও বিশেষ প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহের রূপায়ণেই পরিকল্পনার আনুপাতিক সাফল্য নির্দেশিত হয় না। কারণ, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে প্রকল্পগুলো পরস্পরের পরিপূরক। প্রকল্পগুলো যদি প্রয়োজনীয় তালে রূপায়িত না হয়, পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ঈপ্সিত বৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য।

(২)

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়, কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে একটা বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে ভূমি-সংস্কার (অবশ্য, জমির অসম বণ্টন সংশোধন করাও ভূমি-সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য)। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদদের মতে জমিতে মালিকানা না থাকলে চাষী উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহ পায় না, এমন কি উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে প্রয়োজনীয় সম্ভারও যোগাড় করতে পারে না। অতএব, প্রয়োজন ছিল আইনের এবং সেই আইনের প্রয়োগের। গত দুদশকে আইন আমরা অনেক পাশ করেছি, তবুও ভূমি-সংস্কার কার্যকরী হয় নি, কারণ, আইনের প্রয়োগ করা যায় নি। গত ১০ই মে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নোত্তরে কৃষি বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান যে, সিলিং আইন প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও বিহার, উড়িষ্যা, রাজস্থান এবং মহীশূরে এ পর্যন্ত এক ছটাকও উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যায় নি এবং অন্যে কিছু জমি পাওয়া গেলেও এক ছটাকও বিলি হয় নি। অন্যান্য রাজ্যেও যে বিশেষ কিছু হয় নি তাও জানা কথা। এই ব্যর্থতার গুরুত্ব কিন্তু পরিকল্পনার মোট অর্থব্যয়ের নিরিখে ধরা পড়বে না, কারণ, ভূমি-সংস্কারের জন্যে খুব বেশী অর্থব্যয় হবার কোনও প্রয়োজন নেই।

কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে আরও প্রোগ্রাম ছিল আমাদের পরিকল্পনায়। 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট', 'আই এ ডি পি', সমবায় ইত্যাদি মারফৎ কৃষি-ব্যবস্থাকে আধুনিক এবং উৎপাদনশীল করার জন্যে বহুরকম স্কীম আমাদের ছিল এবং আছে। তথাপি, বিশ বছর পরেও আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা আগেকার মতোই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। কৃষির উৎপাদন ঠিকমত হবে কি না, তা এখনও নির্ভর করে ঠিকমত বৃষ্টি হবে কি না তার উপর। খরা বা বন্যা হলেই কৃষির মূল ধরে টান পড়ে। যতটুকু বা সুযোগ এবং উৎপাদন বেড়েছে, তা ধনী চাষী এবং জোতদারদের কুক্ষিগত হওয়ায় গ্রামের বা শহরের গরীবদের কোনও উপকারে আসে নি। গমের পাইকারী ব্যবসায় হাতে নিয়ে সরকার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন যে, ভূমি-সংস্কার, সমবায় প্রথার বিস্তার ইত্যাদি প্রকল্প সফল না হওয়ার মানে শুধু দশটা প্রকল্পের গোটা দুয়েক ফিকে হওয়া নয়, পরিকল্পনার মূলেই নাড়া খাওয়া। বহুপ্রকার শিল্পের প্রসার কৃষিজাত কাঁচা-মালের জোগানের উপর নির্ভরশীল তো বটেই। উপরন্তু, খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি যদি নিশ্চিত না করা যায় এবং সেই বৃদ্ধি যদি গ্রামের এবং শহরের গরীবের কাজে না লাগে, তাহলে শিল্পের উৎপাদন-বৃদ্ধি বা বিভিন্ন দেশোন্নয়ন প্রকল্পের রূপায়ণ ব্যাহত হবেই। এর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি, যা আজ অসহনীয় পর্যায়ে এসেছে।

দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যেতে পারে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জনসাধারণের জন্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা, গ্রামে-গঞ্জে রাস্তাঘাট এবং বিদ্যুৎ, শহর এলাকার গরীবদের জন্যে বাসস্থান, ইত্যাদি প্রকল্পের কতটাই বা হয়েছে? জাতীয় সঞ্চয়ের হার কতটুকুই বা বেড়েছে? যাতে কেউ ভুল না বোঝেন, সেই জন্যে আবার বলি যে, এই সব কথার মানে এই নয় যে কোনও কিছুই হয় নি। ইদানীংকালের প্রকল্পগুলো বাদ দিলেও,

এই কলকাতা শহরে গত দু দশকে শহরতলীর রেল-ব্যবস্থার বৈদ্যুতিকীকরণ হয়েছে, টেলিফোন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় হয়েছে, হাওড়া স্টেশন এবং শিয়ালদহ স্টেশনের আধুনিকীকরণ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবলে দুর্গাপুর শিল্প এলাকা, দামোদর বাঁধ, ফারাক্কা এবং হলদিয়ার কথা মনে জাগবেই। সারা দেশেই এইরকম অনেক প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। তবুও, মোটফল হচ্ছে এই যে গত দশকে আমাদের মাথাপিছু বাস্তবিক আয় বছরে শতকরা এক ভাগও বেড়েছে কি না সন্দেহ।

(৩)

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতার একটা প্যাটার্ণ আছে। যে সব প্রকল্প প্রধানত যন্ত্রনির্ভর এবং কেন্দ্রীভূত, সেগুলো তবু মোটামুটি রূপায়িত হয় (কতটা ফলপ্রসূ হয়, সেটা স্বতন্ত্র কথা)। কিন্তু যে সব প্রকল্প বিস্তৃত এবং জন-নির্ভর, সেগুলো যেন কিছুতেই আর রূপায়িত হতে চায় না। ভূমি-সংস্কার, সমবায়-প্রথার প্রসার, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, ইত্যাদি বহু প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ জনগণের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। অথচ, এই সব প্রকল্প রূপায়ণেই আমাদের ব্যর্থতা প্রকট, যদিও আমাদের প্রধান সম্বল হচ্ছে অব্যবহৃত জনবল।

এই আলোচনার শুরুতে কটাক্ষ করেছিলাম যে জাতি হিসেবে আমাদের কথা এবং কাজে বড়ই তফাৎ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্র তার ব্যতিক্রম নয়। জনগণ-নির্ভর প্রকল্পগুলোর ব্যর্থতা কি সেই কথাই প্রমাণ করে না? এই সব প্রকল্পের প্রত্যেকটার রূপায়ণেই জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হওয়ার কথা। অথচ, জনগণের জন্যে যাদের নিয়ত অশ্রুবর্ষিত হয়, সেই রাজনৈতিক দলগুলো এই সব প্রকল্প রূপায়িত করার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে কি? পশ্চিমবঙ্গে তুলনামূলকভাবে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন অনেক বেশী শক্তিশালী। কিন্তু এখানেও, যুক্তফ্রন্টের ছত্রচ্ছায়ায় কিছু জবরদখল করা ছাড়া ভূমি-সংস্কার আইনের সুফল প্রয়োগ করার জন্যে কোনও রাজনৈতিক দলের স্থায়ী প্রচেষ্টা আছে কি? কোনও রাজনৈতিক দল দেখাতে পারবে কি যে তারা কটা প্রাথমিক স্কুল চালায়, কটা সমবায়-সমিতি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে, কটা জায়গায় ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বণ্টনের দায়িত্ব নিয়েছে, কটা গ্রামে টিউবওয়েল বসিয়েছে বা রাস্তাঘাট তৈরী করেছে, কটা শহরাঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে? অন্যান্য দলের কথা তবু বোঝা যায়, কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। কিন্তু যে কংগ্রেস দল পরিচালিত সরকারের এই সব প্রকল্প, সেই কংগ্রেস দলকেও এই সব কাজে খুঁজে পাওয়া যায় কি?

এই সব প্রত্যেকটা ব্যাপারেই কিন্তু অভাব-অভিযোগ আমাদের অনন্ত। তা নিয়ে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা এবং সদুপদেশে খবরের কাগজের পাতাগুলো রোজই ভর্তি। প্রকল্পের রূপায়ণে ব্যর্থতা দেখা দিলে আমলাতন্ত্র এবং কায়েমী স্বার্থকে তুলে ধুনতে কোনও কসুর আমরা করি না। মাঝে মাঝে বিদেশী চক্রান্তকেও দায়ী করে থাকি। থেকে থেকেই সব কিছু চেলে সাজার হুঙ্কার ছেড়ে থাকি। কিন্তু, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমার প্রশ্ন, আপনারা কোথায়? আপনারা কি কেবল জনগণের মোক্তার না কি জনগণের নেতাও? আপনারা কি ভেবেছেন যে আপনারা কেবল মাঝে মাঝে আন্দোলনের চটক লাগাবেন এবং উপদেশামৃত দিয়ে যাবেন, আর আমলাতান্ত্রিক কাঠামো মারফৎ কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো যথানিয়মে সফল হবে?

লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এবং আর্টস ফ্যাকালটির ডীন। শিক্ষালাভ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ডক্টরেট লাভ করেছেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্ল্যানটেকনিকের ওপর গবেষণা করেছেন কেশ কয়েক বছর। পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন কমিশনের সদস্য।

একটি হলুদ মাঠ এবং ডনাল্ড হিলটন

তখনো সূর্যের মুখ কুয়াশা ভেদ করে ভালো দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত গাছপালা ফুললতা তখনো শিশিরে ভিজে আছে। উটিড্যার এ অঞ্চলের ন্যাড়া ন্যাড়া মাথা উঁচু বিচিত্র বর্ণের গাছগুলোকে আধো আলো আধো ছায়ায় পিঠ উঁচোনো একদল অতিকায় প্রাণী বলে মনে হচ্ছে।

জীপটাকে পথের পাশে একটা শিমুল গাছের নীচে দাঁড় করালাম। ডনাল্ড আমার পাশে বসেছিল। খয়েরী কর্ডুরয়ের একটা ট্রেয়ার পরে, ঊর্ধ্বাঙ্গে শব্বরের চামড়ার জার্কিন, গলায় লাল সিল্কের উপর সাদা পোলকা-ডটের স্কার্ফ, মাথায় একটা খয়েরী গলফ ক্যাপ।

তখনো বেশ শীত ছিল। আমি আমার মোটা কোটের কলারটা তুলে দিয়ে, রাইফেলটা হাতে নিয়ে বললাম, 'লেটস গো ডনাল্ড।' ডনাল্ড পাইপটা ধরাচ্ছিল। বড় বাওলের পাইপটাতে সেন্ট ব্রুনো টোব্যাকো পুরে সং-ফ্রেম লাইটারের দীর্ঘ শিখা জেবলে ও পাইপ ধরাচ্ছিল। একটু পরই একরাশ ধোঁয়া এবং একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ও বলল, 'ইয়াং লেটস গো।'

অ্যামেরিকান টুরিস্টদের বাঘ এবং অন্যান্য জানোয়ার মারানোর ব্যবসায় আমি বেশীদিন নাকিনি। তৎকালীন এক মহারাজার পীড়াপীড়িতে রাজী হয়ে এ দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। বিদেশীদের বাঘে আমাদের টার্মস ছিল যে বাঘ দেখাতে পারলে দু-হাজার অ্যামেরিকান ডলার এবং বাঘ মারাতে পারলে পাঁচ হাজার ডলার। যে বাঘের পিছনে আমি ও ডনাল্ড এ কদিন হল ঘুরে বেড়াচ্ছি তার দাম সাত হাজার। কারণ বাঘটি (বাঘ নয় বাঘিনীটি) সাধা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'এ্যালাবিনো'। বাঘ দেখানো অর্থে এম্নি দেখানো নয় 'টু প্রডিউস্ আ টাইগার উইদিন সুটেবল ডিস্টান্স।' অর্থাৎ তারপরও যদি শিকারি না মারতে পারেন বাঘ, তাহলে আমাদের দোষ কি? এ বাঘ দেখাতে পারলেই চল্লিশ হাজার ডলার।

এ পর্যন্ত প্রায় জনা দশেক পুরুষ ও মহিলা অ্যামেরিকান শিকারী নিয়ে ঘর করলাম কিন্তু কাউকেই ভালো লাগে নি। বেশীর ভাগই মধ্যবয়স্ক এবং প্রৌঢ়। তাদের প্রবহমান শরীর ও বোকা ছাগলের গায়ের গন্ধের মত টাকার বোঁটকা গন্ধ নিয়ে তারা রীতিমত বিরক্ত করে ফেলেছে আমাকে এ কদিন।

কিন্তু এয়ারপোর্টে যেদিন মিঃ হিলটনকে আনতে যাই সেদিন ওঁকে দেখেই আমার দারুণ ভাল লেগে গেছিল। চেহারা দেখে মনে হয়েছিল যে উনি সাহিত্যিক অথবা দার্শনিক। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি যে উনি একজন ব্যবসায়ী। ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। ভদ্রতা, সৌম্য দোহারা চেহারা। কথা কম বলেন কিন্তু যা বলেন ভার ভার আছে। যেন তেন প্রকারেন বাঘ মারতেই হবে এ কথায় উনি বিশ্বাস করেন না। বরঞ্চ ওঁকে দেখে মনে হয় যে উনি এই জঙ্গলের প্রতিটি মুহূর্ত দারুণভাবে বেঁচে থেকে উপভোগ করছেন।

বাঘ মারা না-মারা ওঁর কাছে অবান্তর। এখানে বাঘ ছাড়াও অন্য কিছু যেন উনি খুঁজছেন। যতদিন উত্তর ভিয়েতনামে বোমা পড়বে ততদিন কোনো অ্যামেরিকানকে ভালো লাগা আমার মত নিরপেক্ষ ও নির্বিবাদী লোকের পক্ষেও মুশকিল। কিন্তু ডনাল্ড হিলটন বোধহয় ব্যতিক্রম। তাঁর লেডি-কিলারের মত চেহারা, বিদগ্ধ সাহিত্যিকের মত কথা-বার্তা, তাঁর সংযম, তাঁর রসবোধ সব মিলিয়ে তাঁকে ভালো না লাগা খুব মুশকিল। এ কদিনে দেখতে দেখতে মিঃ হিলটনের সংগে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে। উনিই একদিন সন্ধ্যেবেলা [illegible]

সেক ফরম্যালিটিস্—টুমি আমার ফারস্ট নাম ধরেই ডাকবে, আমিও তাই।

জীপটা রেখে আমরা সুড়িপথে ঢুকে গেলাম।

দুপাশে গভীর জঙ্গল। ডানদিকে একটা পাহাড় উঠে গেছে। পাহাড়ের নীচের জঙ্গলে একদল হাতী কাল সন্ধ্যারাতে কাঁচ বাঁশপাতা খেতে এসেছিল। ডাল-পালা—ঝোপঝাড় ভেঙ্গে রেখে গেছে। ডনাল্ড বলল, হাতীরা কতক্ষণ ছিল বলে তোমার মনে হয়? বেশী রাত অবধি থেকে থাকলে বাঘ নিশ্চয়ই এদিকে আসেনি।

আমি বললাম, হাতীর পুরীষ দেখে তো মনে হচ্ছে সন্ধ্যে সন্ধ্যেই ফিরে চলে গেছে। চল এগিয়ে গিয়ে দেখি। মোষটা যেদিকে বাঁধা হয়েছিল সেটা পথ থেকে প্রায় অর্ধ-মাইল। আগাগোড়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এ পর্যন্ত অন্য কোনো বিদেশী শিকারীকে দেখিনি, ভোরের বেলা নিজে এসে বেট পরীক্ষা করে। এছাড়াও আরও তিন জায়গায় মোষ বাঁধা আছে। কিন্তু সেগুলো পথের আশেপাশে। ডনাল্ড প্রত্যেকদিন এইখানেই কেন জানি না আসতে চায় এবং তাই আমাকেও সঙ্গে আসতে হয়। এই নিয়ে সাতদিন হল। কিন্তু সাদা বাঘ এখনো কোনো সাড়া করল না। অথচ সে যে আশেপাশেই আছে, ক্যাম্পের চার পাশে ঘোরা-ফেরা করছে তার চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। হিলটন সাহেবেরও ফেরার সময় হয়ে এল। আমরা রাইফেল হাতে চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিলাম। ডানদিক থেকে একটা ময়ূর ডেকে উঠলো। পাহাড়ের খোল থেকে অনেকগুলো ধনেশের ডালে ডালে ঝাঁপাঝাঁপির আওয়াজ এবং ওদের কর্কশ গলায় হ্যাঁক্ হ্যাঁক্, হক্ হক্ শোনা যাচ্ছিল। একটা বড় বাদামী কাঠ-বিড়ালি (এখানকার লোকরা বলে নেপালী ইঁদুর) শিশির-ভেজা পাতা ঝরঝরিয়ে শিশু-গাছে উপরের ডালে তরতরিয়ে উঠে গেল। ছোট ছোট সবুজ টুইপাখিরা পীটি-টুঙ, পীটি-টুঙ, পীটি-পীটি-পীটি-টুঙ করে ছোট ছোট শালের চারায় ওড়াউড়ি করতে লাগল।

ডনাল্ড একমনে চতুর্দিকের এই ভৈরবী প্রকৃতিকে তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল, আর আমি দেখছিলাম ওকে। মাঝে মাঝে লোক-টিকে আমার পাগল বলে মনে হয়। কি যেন ভাবে সব সময়, মুখ নীচু করে মাঝে মাঝেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, আর কার কথা যেন ভাবে। প্রত্যেকদিন এপথে কিসের খোঁজে যে ও আসে তা ওই জানে। বিরক্তও লাগে। এসব কাজ আমার নয়। আমি এই শিকার কোম্পানীর একজন ডিরেকটার। আমার তত্ত্বাবধানে মাইনে করা সব দু'দে দুদে স্থানীয় শিকারীরা আছে, তারাই এসব কাজ করে। বাঘ মোষ মারলে সে খবর পাবার পর তখন মাচা বাঁধানো; মাচার অতিথি শিকারীকে নিয়ে বসা আমার কাজ। তাও অনেক সময় স্থানীয় শিকারীদের দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই। কিন্তু এই ডনাল্ড হিলটন একেবারে আশ্চর্য লোক। আমাকে কষ্ট না দিলে এর ভাল লাগে না। আর একটু এগিয়ে গিয়েই অরাটাকিরি গ্রামটি। গভীর জঙ্গল ও মাথা উঁচু পাহাড়ের মধ্যে পাঁচ-ছ ঘরের এক টুকরো গ্রাম। আমাদের পথটি গেছে একটি বিস্তীর্ণ হলুদ শর্ষে-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। শর্ষেক্ষেতের মাঝ বরাবর একটি কালো পাথরের টিলা। টিলার চারধারে হলুদ ক্ষেত। ক্ষেত পেরিয়ে চতু-র্দিকেই সবুজ জঙ্গলের আঙুল। ডনাল্ড রোজ একবার করে এই টিলায় কিছুটা উঠেই বসে পড়বে। আমাকে বলবে, 'হু উ্য মাইন্ড মাই হ্যাভিং আ পাইপফুল অব স্মোক্?'

আমি অন্যদিনের মতই বলব, নট এ্যাট অল। তারপর ডনাল্ড পা ছড়িয়ে বসে পাইপ খেতে খেতে হিপ পকেটে হাত দিয়ে ওর পার্স বের করবে। পার্স বের করে পার্সটা খুলে দুহাতে পার্সটা ধরে আমাকে আড়াল করে কি যেন একটা দেখবে, তারপর আবার হলুদ শর্ষেক্ষেতের দিকে তাকাবে—এমনি করে কাটবে পাঁচ মিনিট। তারপর একসময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠে রাইফেলটা হাতে নিয়ে বলবে,—'লেটস ফাইন্ড আউট হোয়েদার দা লেডি হ্যাড কাম লাস্ট নাইট'। প্রতিদিন একই কথা বলবে। এবং প্রতিদিনই আমরা গিয়ে দেখবো মোষটা সুপ্রভাতে মহানন্দে ঘাস চিবুচ্ছে এবং তার ধারে কাছে বাঘিনীর পায়ের দাগও আছে। অথচ তাকে স্পর্শ করেনি সে।

কেন জানি আমার ডনাল্ড হিলটনকে দেখে কেবলি মনে হত, এই হলুদ মাঠ দেখতেই ও রোজ সাতসকালে উঠে শীতের ভোরে এতটা হেঁটে আসে। বাঘিনীর প্রতি বিন্দুমাত্র উৎসুক্য নেই। কেবলি ভাবতাম, কি করে এই হলুদ মাঠের রহস্য উন্মোচন করা যায়। অথচ সে আমাদের মক্কেল—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক শুধু, বাঘ-বাইসনের—তার সঙ্গে কোনো এক্তিয়ার-বহির্ভূত কথা বললে যদি সে চটে যায়, এই ভেবে কিছুই জিগগেস করা হত না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ক্যাম্পফায়ারের পাশে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে ডনাল্ড আবার কিসের ভাবনায় বুঁদ হয়ে গেল। স্লিংকস-এর সঙ্গে খাবার জন্য গুলহার কাবাব বানিয়েছিল খানসামা;

আমার অর্ডার মত রাতে চিকেন ব্রস, মাটন বিরিয়ানী, চাঁব এবং পুডিং বানিয়েছিল। হুইস্কি, ভাল খাওয়া-দাওয়া; কিছুই যেন ডনাল্ডকে আনন্দিত করত না। ভাঁটি পড়া সমুদ্রের মত ও সব সময় কেমন সমাহিত হয়ে থাকত। আমাদের মত সাধারণ দশজন লোককে যেসব আনন্দ নাড়া দিতে পারত, তা যেন ওকে স্পর্শ পর্যন্ত করত না। ডনাল্ড যেন কোন অন্য রাজ্যে বাস করত। অন্যান্য অতিথিরা বান্না মুখে দিয়ে ও-ও-হ হাউ নাইস, টেবীফিক, ইত্যাদি বলে চেঁচাতেন, হুইস্কী খেয়ে মত্ততা করতেন, কিন্তু হিলটন সাহেব গুনে গুনে চারটি ছোট হুইস্কী খেত, তারপর ডিনার সেরে কোনো একটা বই হাতে নিয়ে তাঁবুর মধ্যে চলে যেত। তারপর ক্যাম্পখাটে, মশারী গুঁজে নিয়ে, মাথার কাছে পেট্রোম্যাক্স জেবলে বই পড়ত গভীর রাত পর্যন্ত। সেদিন হুইস্কীর গ্লাশ আঙুলে নাড়তে চাড়তে ডনাল্ড বলল,—দ্যাখো লালা কাল চল আমরা বাইসনের খোঁজে যাই। বাঘিনী মারা আমার দ্বারা হবে না। এমনি বাঘিনী হলেও হয়ত একটা চান্স পেতাম। কিন্তু এই বিশেষ বাঘিনী আমার জন্যে নয়। আমার পার্বামটে ত বাইসন আছেই; কাল, চল, তুমি আর আমি বাইসনের খোঁজে যাই।

আমি অগত্যা রাজী হলাম। শিকারী ঝন্ডুযাকে বললাম,—সে আমাদের অন্য অতিথি আটলাব সাহেবকে নিয়ে বাঘিনীর খোঁজে যাবে। আর আমি যাব হিলটন সাহেবকে নিয়ে বাইসনের খোঁজে। ক্যাম্প-ফায়ারের পাশে বসে নানাবকম গল্প করল ডনাল্ড সেদিন। ডনাল্ড হিলটন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের খুব ভক্ত ছিল। এবং হেমিং-ওয়ের লেখা ও তাঁর সম্বন্ধে লেখা যত বই ছিল পড়ে ফেলেছিল। সেদিন রাতে ও হেমিংওয়ের আফ্রিকান সাফারির গল্প করছিল।

।। ২ ।।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পর ডনাল্ড হিলটনকে নিয়ে সঙ্গে আর একজন পার্সোনাল বেয়ারা-কাম-শিকারীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বুরাসাইয়ের পাহাড়ের দিকে।

মাইল আষ্টেক পথ। পথ বলতে কিছু নেই, জঙ্গলের সুড়িপথের উপর দিয়ে জোর করে জীপ চালানো। এদিকে বেশীর ভাগ কুরুস, বন্ধন, গামহারি ও তেঁতুরা গাছের ভীড়। তাছাড়া নানারকম লতাপাতা আছে। মাঝে মাঝে না-নউরিয়া ফুলের ঝোপ। লাল লাল থোকা-থোকা ফুল ধরে আছে তাতে।

জীপের সামনের উইণ্ডস্ক্রীন বনেটের ওপর শোয়ানো। হুড খোলা—আমি চালাচ্ছি, পাশে ডনাল্ড বসে আছে। পেছনে বেয়ারা রবি। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়ছে গায়ে। ডনাল্ডের পাইপের টোব্যাকোর কড়া গন্ধ নাকে আসছে। বুরাসাইয়ের পাহাড়ের নীচে পৌঁছে একেবারে পাহাড়ের খোলে জীপ ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর, হ্যাভারস্যাক্ ইত্যাদি যা মাল ছিল কাঁধে তুলে নিল রবি, ডনাল্ডের রাইফেলটাও নিল। তার-পর আমরা তিনজন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। দূর থেকে দুপুরের পাহাড়তলির সূর্যালোকিত জঙ্গলকে একটা আলোজ্বলা সবুজ এ্যাকুয়ারিয়াম বলে মনে হচ্ছিল।

যখন প্রথম পায়ের দাগ দেখা গেল বাইসনের দলের, তখন বেলা এগারোটা। দাগ দেখে বোঝা গেল যে ট্র্যাকারদের খবর ঠিকই। বিকেলের দিকে নদীর এদিকে নদীর কোল ছেড়ে উঠে আসে বাইসনেরা। এখন তাড়াহুড়োর কিছু নেই। হাতে অনেক সময়। গাছতলার পাথরে রোদে শুয়ে সকলে একঘুম ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর হ্যাভারসেক্ খুলে প্যাক-লাঞ্চ খেলাম আমরা।

বেলা দুটো বাজতে না বাজতে, সুবিধামত একটা জায়গা দেখে, একটা ছায়াচ্ছন্ন টিলার উপর ডনাল্ডকে নিয়ে বসে পড়লাম। রবিকেও সঙ্গে বসাতে চাইছিল ডনাল্ড। আমিই ওকে পেছনে গিয়ে বাইসনদের পালিয়ে যাবার পথে বসতে বললাম, যাতে ডনাল্ডের গুলি খেয়ে আহত হয়ে পালিয়ে না যেতে পারে কোনো বাইসন।

প্রায় দুঘণ্টা বসে রইলাম। ডনাল্ডকে পাইপ খেতে মানা করেছিলাম শীতের রোদ তখন গাছপালার ছায়ার বুটিকাটা আসর থেকে ছুটি চাইছে—এমন সময় প্রায় সোয়া চারটে নাগাদ বাইসনের দলকে চরতে চরতে এদিকে আসতে দেখা গেল। টিলাটার সামনে বেশ উঁচু পাহাড়। তার গা বেয়ে ওরা বাঁশ ঝোপের আড়ালে আড়ালে নেমে আসছিল। ওদের পায়ের খুরের শব্দ ও জোরালো নিঃশ্বাস ও কান ঝটপটানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। শেষ রোদে ওদের হাঁটুর কাছের এবং কপালের সাদা লোমগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

ডনাল্ডকে ফিসফিস করে বললাম, সবচেয়ে বড় সাদা বাইসনটাকে মারতে।

ও মাথা নাড়ল। রাইফেলটাকে কোল থেকে আস্তে তুললো, সেফটি-ক্যাচে হাত ছোঁওয়ালো। তারপর দলটা আর একটু কাছে আসতেই ডনাল্ড গুলি করল। গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পাহাড় বনে প্রলয়ংকরী খুরের আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে পুরো দলটা মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেল। কিন্তু

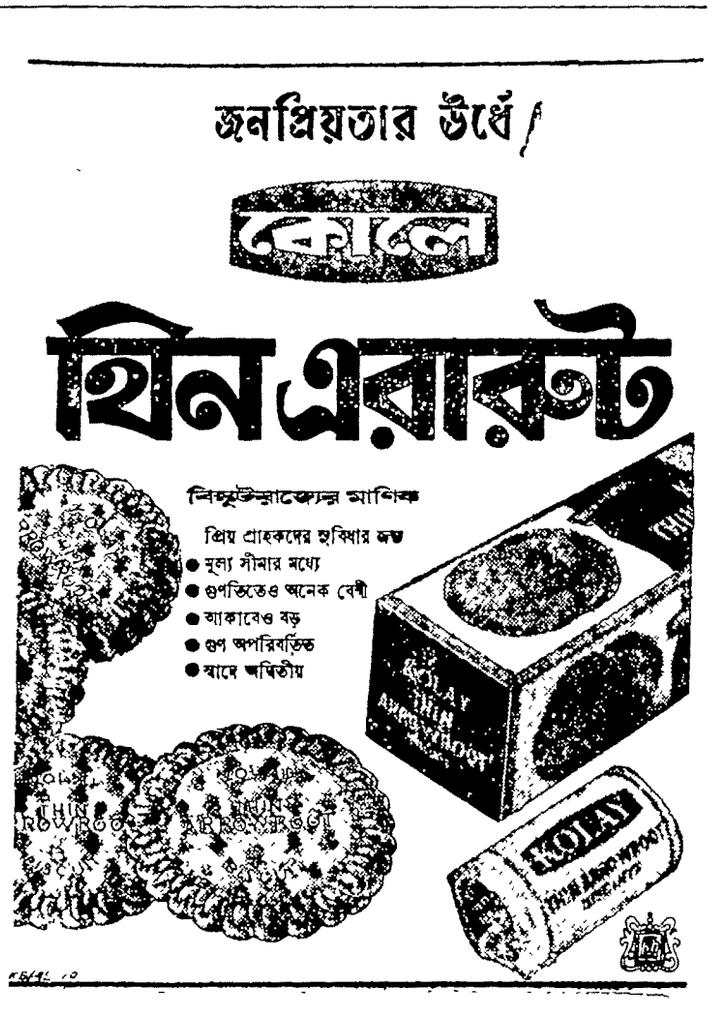

The results of our 3rd draw will commensurate with the results of 30th August '73 draw of Haryana State Lotteries.

গুলি-খাওয়া সর্দার (তার বুকে গুলি লেগেছিল) অতবড় শরীরটাকে একনিমেষে ঘুরিয়ে ফেলে আমরা যেখানে বসেছিলাম সেদিকে ঝড়ের মত তেড়ে এল।

আমিও রাইফেলে হাত রেখে আড়-চোখে তাকিয়ে ডনাল্ডকে দেখলাম। দেখলাম, ওর চোখেমুখে ভয়ের কিছুমাত্র নেই। বরং আত্মবিশ্বাস মেশানো এক অদ্ভুত হিমেল হাসি ফুটেছে ওর মুখে।

কাইসনটা আরও এগিয়ে আসতেই ডনাল্ড ওর থ্রি-সেভেনটীফাইভ ম্যাগন্যাম রাইফেলের আর একটি গুলি করল। এ গুলিটি একেবারে কপালে গিয়ে লাগল এবং একটি ছোটখাট পাহাড়ের মত বাইসনটি বাঁশঝাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ায় সমস্ত ঝাড় আন্দোলিত হয়ে উঠলো। এক্ষেত্রে যেমন বলতে হয়, তেমন উঠে দাঁড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে, মক্কেলকে বললাম, ওয়াণ্ডারফুল শুটিং,— কনগ্র্যাচুলেশনস।

ডনাল্ড আমার প্রসারিত হাতকে উপেক্ষা করেই এমন কি আমার দিকে না তাকিয়েই মুখ নীচু করে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'থ্যাঙ্ক উ।"

ওকে খুব অভদ্র বলে মনে হল সেই মুহূর্তে।

তারপর ডনাল্ড গিয়ে বাইসনটার উপরে পা ছড়িয়ে বসে পাইপ ধরালো।

বললাম, তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশী হয়েছ?

ডনাল্ড আমাকে ধমকাবার গলায়

ডনাল্ড আমাকে ধমকাবার গলায় বলল, 'কিসের জন্যে?'

'এই যে এত ভাল একটা ট্রফী পেলে'।

ডনাল্ড হাসল। বলল, কিন্তু এ ত সেকেণ্ড-বেস্ট। সাদা বাঘিনী তো মারতে পারলাম না। তারপরই বলল, তোমার কাছে হুইস্কী আছে? সেকেণ্ড-বেস্টও ত সেলিব্রেট করতে হয়। নইলে লোকে কি বলবে? রবির কাছে হ্যাভারস্যাকে হুইস্কীর বোতল ছিল। রবিকে বের করে ডোনাল্ডকে দিতে বললাম। রবি গ্লাস, জলের বোতল ও হুইস্কীর বোতল বের করে দিল। দুটো বড় টর্চও বের করেছিল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, জীপ নিয়ে ক্যাম্পে গিয়ে মিকন করার জন্যে লোক ও পেট্রোম্যাকস আলো নিয়ে আসবে কিনা। আরও জিজ্ঞেস করল, ক্যাম্পের ফোটোগ্রাফারকেও নিয়ে আসবে কিনা সঙ্গে?

ডনাল্ড বলল, ফোটো তুলতে হবে না। আমার এখন ক্যাম্পে যাওয়ারও কোনো ইচ্ছে নেই। আমরা এখানেই থাকি। আমরা ততক্ষণ একটু বসি এখানে। জীপ পাঠিয়ে দাও ক্যাম্পে।

রবি চলে গেল।

আমি বাইসনের পাশে একটা বড় পাথরে বসলাম। বাইসনের গায়ের গন্ধে এবং তাজা রক্তের গন্ধের সংগে আসন্ন সন্ধ্যার গন্ধ মিশে গেছিল।

ডনাল্ড হঠাৎ হুইস্কীর বোতলটা খুলে অনেকখানি হুইস্কী ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলল।

আমি বললাম, তুমি কখনো তো এমন করে খাও না, কি হল তোমার?'

জার্কিনের হাতা দিয়ে মুখ মুছে ডনাল্ড বলল, বোঝ ত আর সেকেণ্ড-বেস্ট ট্রফী পাইনা।

আমি বললাম, হাউ ডু উ মীন?

ও বলল, নাথিং.....। আই মীন নাথিং।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ডোনাল্ড। রোদ পড়ে আসছিল। দিকে দিকে আসন্ন সন্ধ্যার খবর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পাখিদের জানায় ডানায়, ঝিঁঝি-দের ঝিনঝিনিতে। আর আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এ লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত—লোকটার সঙ্গে এ কদিন সমানে ঘুরছি, তবু, লোকটাকে সুখী করতে পারলাম না, বুঝতে পারলাম না।

একটা আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারদিক।

আমি বললাম, একটু আগুন করি? তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না কি?

ও বলল, না না, হুইস্কীর বোতল আছে, লিকুইড ফায়ার, আগুন লাগবে না। আমাকে এই অন্ধকার তারাভরা আকাশের নীচে বসে তোমাদের জঙ্গল পাহাড়কে দেখতে দাও। তারপরই বলল, 'কি'? তোমার বোধহয় ঠাণ্ডা লাগছে, 'কি? কাম, হ্যাণ্ড আ সিপ ড্রম দ্যা বট্‌ল।'

ঠাণ্ডা লাগছিল না যে তা নয়। আমি গ্লাসে একটু হুইস্কী নিয়ে জল মিশিয়ে নিলাম ওয়াটার বটল থেকে।

অনেকক্ষণ পর ডোনাল্ড স্বগতোক্তির মত বলল, পরশু যখন ভুবনেশ্বর থেকে প্লেন ধরব তখন তোমাদের এই জঙ্গলের কথা খুব মনে পড়বে। সবচেয়ে বেশী মনে পড়বে কি জানো? সেই হলুদ ক্ষেতটির কথা, বুঝলে লালা।

তারপরই হঠাৎ বলল, তোমার বুকের মধ্যে কোনো হলুদ ক্ষেত নেই?

আমি বললাম, মানে?

ডনাল্ড বলল, কোনো মানে নেই। এমনিই জিগগেস করলাম।

তাড়াতাড়ি অনেকখানি 'র' হুইস্কী খাওয়ায় বোধহয় ডনাল্ডের নেশা হয়েছিল বিশেষ করে যখন সে কখনোই বেশী খায় না। এমনভাবে খায় না।

ডনাল্ড আবার নিজের থেকেই বলে উঠল, বুঝলে, সব মিলিয়ে এ ক'দিনে আই হ্যাভ লাইকড উ, আই হ্যাভ লাইকড ইওর কোম্পানী ভেরি মাচ। আমি জানি, রোজ সকালে যখন হলুদ ক্ষেতের উপর আমি বসে থাকতাম, আমার

এবার পুজোয় কয়েকটি নামকরা বই কিনুন

দ্বৈতভূমিকা

ভাষান্তর : ইন্দুভূষণ দাস

মল্যা ৮-০০

আর্ণল্ড বেনেটের বিখ্যাত উপন্যাস দি গ্র্যাণ্ড ব্যাবিলন হোটেল অবলম্বনে রচিত। এ বইতে পাবেন একাধারে চেজ, মোপাশাঁ আর আগাথা ক্রিস্টির সমন্বয়।

ইন্দুভূষণ দাসের আরও কখানা বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থ

মাইকেল মধুসূদন স্মৃতি : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র : বিনয়-বাদল-দীনেশ : ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী-বাঘাযতীন

প্রতিটি বই ৪-০০ হিসেবে।

এবার পুজোয় কিনুন কিশোর সাহিত্য

আঠারো জন বিখ্যাত লেখকের আঠারোটি রচনা

দের ডজন গপ্‌পো ২.০০

সুজিতকুমার নাগ রচিত

দৈত্য ও ডাইনীবুড়ী ২.০০

নতুন নাটক :

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

রচনা : নারায়ণ দে

স্ত্রীভূমিকা বর্জিত তরুণদের জন্য দেশাত্মবোধক নাটক

মূল্য ৩-০০

মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির ১৫বি টেমার লেন, কলিকাতা-৯

পার্স খুলে চেয়ে থাকতাম, তুমি বিস্ময়ে আমার দিকে চাইতে।

আমি জানি।

বলেই, ডনাল্ড আবার চুপ করে গেল।

অন্ধকারে ডনাল্ডের চোখমুখ দেখা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে যখন ও ওর মুখটা নীচু করছিল তখন ওর পাইপের আগুনটাই শুধু দেখা যাচ্ছিল। ও যখন কথা বলছিল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন বহুদূর কোনো অন্ধকার গুহা থেকে কথা বলছে।

চতুর্দিক থেকে ঝিঁঝি ডাকছিল। ফিসফিস করে শিশির পড়তে আরম্ভ হয়েছিল। গাছগাছালির পাতা থেকে।

ডনাল্ড বলল, জানো লালা, আই অ্যাম ভেরী এ্যাফ্লুয়েন্ট। আমি একজন বিলিওনীয়র। ইয়েস্, আই অ্যাম ওয়ান। আমার চার চারটে সোফাব-ড্রিভন মার্সিডিজ গাড়ি আছে; দুটো স্পোর্টস কার আছে। একটা স্লেন আছে। স্টেটসে চার জায়গায় বাড়ি আছে। সুইটজারল্যাণ্ডে কটেজ আছে। তবুও আমি সাদা বাঘিনীকে পেলাম না। জীবনেও পেলাম না; জঙ্গলেও পেলাম না। জীবনে আমার সব ছিল। ক্রাইস্টের দিব্যি, মানুষটাও আমি খারাপ নই; জীবনে কাউকে ঠকাতে চাই নি। যা কিছু চেয়েছি হৃদয়ের সব আন্তরিকতাব সঙ্গে চেয়েছি। কখনও ভণ্ডামি করিনি। ভান করিনি। অথচ তবু আমার সব জায়গায়ই সন্তুষ্ট থাকতে হলো সেকেন্ড-বেস্ট নিয়ে। যা বেস্ট, তা আমার কপালে মিললো না।

আমি বললাম, কি বেস্ট?

ডনাল্ড বলল, মিস্টার গুহা, উঁ আর আ ড্যাম ফুল।

বুঝলাম, ডনাল্ড খুব হাই হয়ে গেছে। ওর কথায় কিছু মনে করা উচিত নয়। কেন জানি না, লোকটাকে আমার প্রথম দিনই বড় ভালো লেগে গেছিল, তাই ওর এই অনবধানে বলে-ফেলা কথাগুলো শুনে লোকটার প্রতি আবো মমতা জমতে লাগল।

ডনাল্ড হঠাৎ বলল, তুমি কি বিবাহিত?

আমি বললাম, না।

'একদিন হবে।'

বললাম, জানি না।

জানি না কি? নিশ্চয় হবে। পৃথিবীর সব পুরুষকেই জীবনে সেকেন্ড-বেস্ট নিয়ে এবং বুকের মধ্যে একটি হলুদ মাঠ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। একটা হলুদ-রঙা চাপা যন্ত্রণা নিয়ে।

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, ডনাল্ড তোমার এমন চেহারা, তোমার এমন গুণ, তোমাব এত টাকা, তোমার কিসের এত দুঃখ। কেন দুঃখ?

ডনাল্ড হাসল, বলল, এত সব কিছু সত্ত্বেও তাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া হলো না।

বললাম, আমি বিশ্বাস করি না এমন কোনো মেয়ে থাকতে পারে যে তোমার মত লোককে দুঃখ দিতে পারে।

ডনাল্ড এক ঢোকে একটু হুইস্কী খেয়ে নিঃশব্দ একটু হাসল। বলল, তুমি ছেলেমানুষ। তুমি বাঘ বোঝ, বাইসন বোঝ, তুমি মেয়েদের কিছুই বোঝ না। আসলে এই নিয়ম, তুমি যাকে চাও, সে তোমাকে চায় না, তোমাকে যা চায়, তাকে তুমি চাও না। এ যদি সাদা বাঘিনী না হয়ে, এমনি কোনো বাঘিনী হত তবে হয়ত মারতে পারতাম। সাদা বাঘিনী আমার জন্যে নয়। যাকে সবচাইতে বেশী করে চেয়েছিলাম, সেও আমার জন্যে নয়।

আমি বললাম, এটা তোমার অন্যায়। বাঘিনী তো আমরা দেখাতেই পারলাম না তোমাকে। তোমাব দোষ কি?

ও বলল, না আমারই দোষ, আমার কপালের দোষ।

আমি শুধোলাম, তুমি তোমার বিবাহিত জীবনে কি সুখী নও ডোনাল্ড?

ডনাল্ড হাসল, বলল, ফুঃ স্ত্রীকে নিয়ে কেউ কি সুখী হয়? কেউ কেউ হয়ত হয়; জানি না। কিন্তু আমি হইনি।

তোমার স্ত্রী? তিনি কি তোমাকে নিয়ে সুখী নন? আমি আবাব শুধোলাম।

ডনাল্ড বলল, সেও সুখ কাকে বলে তা ভুলে গেছে। তার সিংক কোট, জুয়েলারীজ, সোফাব ডিভন, মার্সিডিস, তার মিসেস হিলটন হিসেবে প্রতিপত্তি, তাব ছেলের বাগবী ম্যাচ, মেয়ের বার্থ ডে পার্টি নিয়ে সে ভুলে আছে।

আসলে বিবাহিত লোকদের জীবনে সুখ থাকে না। যা থাকে, তা হল কর্তব্য; বাসি অভ্যেস। বুঝেছ?

আমি বললাম, এটা অন্যায় কথা। আমি কত বিবাহিত লোক দেখেছি তারা ভীষণ সুখী।

হয়ত অন্যায়, কিন্তু এটা আমার বিশ্বাস। তুমি ছেলেমানুষ। বড় হলে বুঝতে পারবে সুখ এক জিনিস, আর সুখ দেখিয়ে বেড়ানো আর এক জিনিস। আর যারা সুখী বলে ভাবে নিজেদের তারা সুখের চেহারাই দেখেনি।

অন্য দশজনকে দেখাবার জন্যে তারা জেদ করে সুখী হয়, সুখ দেখায়। সুখ যা, বতটুকু তা থাকে বুকের মধ্যে, ঐ এক টুকরো হলুদ মাঠের মধ্যে।

আমি বললাম, ডনাল্ড, তুমি যাকে চেয়েছিলে, সে কি তোমাকে একটুও ভালোবাসেনি? ফিরিয়ে দেয় নি এক কণাও

ডনাল্ড বলল, মেয়েরা আবার ভালোবাসতে জানে না কি? তারা শুধু নিতে জানে, দিতে জানে না কিছু।

সেই অন্ধকারেও ডনাল্ডের সুন্দর মুখটা ঘৃণায় বেঁকে গেল। পরক্ষণেই বলল, শুনেছি, তোমাদের দেশের মেয়েরা অন্য-রকম।

বললাম, ভুল শুনেছ।

ডনাল্ড বলল, তাহলে পৃথিবীর সব মেয়েরাই এক রকম, কি বল? ওরা ঘর সাজাতে জানে, ছেলে মানুষ করতে জানে, স্বামীদের জীবন উষ্ণতাহীন অভ্যাসে ভরে দিতে জানে। কিন্তু যদি কেউ তাদের সর্বস্ব দিয়েও ভালোবাসে তাকেও তারা দেওয়ার মত কিছু দিতে জানে না। ওদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু ছবি হয়ে থাকতে জানে, হলুদ মাঠ হয়ে থাকতে জানে; কোনো পুরুষের অতৃপ্ত অশান্ত বুকের মধ্যে।

এই অবধি বলেই, ডনাল্ড বলল, তুমি দেখবে আমার হলুদ ক্ষেত? বলে, হিপ পকেট থেকে পার্সটা বের করে আমার হাতে দিল। পার্সটা খুলে টর্চ জ্বালিয়ে দেখলাম, হলুদ সানফ্লাওয়ারে ভরা একটি মাঠের মধ্যে হালকা নীল রঙা ম্যাকসি আর সাদা স্ট্র-হ্যাট পবা একটি মেয়ের ছবি। মেয়েটি হাসছে। ছবিব উপর মেয়েলি হাতে লেখা, টু মাই ডার্লিং, ডনাল্ড।

পার্সটি ফেরত দিয়ে বললাম, তুমি ওকে পেলে না কেন?

ডনাল্ড বলল, পাইনি, ভালই হয়েছে। পেলে হয়ত ওই হলুদ ক্ষেত কালো হয়ে যেত এই রাতের মত।

তারপর একটু থেমে ডনাল্ড আবার বলল, আসলে জানো লালা, আমরা প্রত্যেক মানুষ ও মানুষীই এই মুহূর্তে শুধু সেকেন্ড-বেস্ট নিয়েই নিজেদের ভুলিয়ে রেখেছি। কনসোলেসান প্রাইজ বুকে আঁকড়ে দিন কাটাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকে।

সেকেন্ড-বেস্ট ট্রফী পাচ্ছি। (বলেই, শব্দ করে মরা বাইসনটার শিং-এ একটা লাথি মারলো) সেকেন্ড-বেস্ট নারী নিয়ে ঘর করছি আর বুকের মধ্যে একটি হলুদ মাঠ নিয়ে বেঁচে আছি। আমি, তুমি, আমরা সকলে। বুঝলে লালা, আমরা সকলে।

কতক্ষণ কেটে গেছিল হুঁশ ছিল না। আমিও যেন অন্ধকারে হুইস্কী খেতে খেতে কী সব ভাবতে ভাবতে বেহুঁশ হয়ে গেছিলাম। এমন সময় দূর থেকে জীপের আলো এবং শব্দ শোনা গেল। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম।

ডনাল্ডও দাঁড়িয়ে উঠল, বলল, উ্য সী, —দেয়ারস নো পয়েন্ট ইন লিভিং লাইক দিস...। আমার নিজের টার্মসে বাঁচতে না পারলে এ বাঁচাব কোন মানে নেই। সারা জীবন একটি শূন্যতায় ভরা হলুদ ক্ষেতের স্মৃতি নিয়ে বাঁচা যায় না। এ বড় কষ্টের; ভারী কষ্টের।

আমি এই কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

পরক্ষণেই কিছু বলার আগে, বোঝাব আগে, জীপটা এসে আমাদের কাছে পেঁছবার আগেই হঠাৎ একটা গুলীর শব্দে অন্ধকার বন-পাহাড় গমগম করে উঠল। সম্পূর্ণ অভাবনীয়ভাবে সাঁইত্রিশ বছরের ডনাল্ড হিলটন তার গুলীবিদ্ধ সেকেন্ড-বেস্ট ট্রফীর মৃত শরীরের উপর মস্তিষ্কে গুলী-বিদ্ধ অবস্থায় গড়িয়ে পড়ল। জীপের হেড-লাইটে অন্ধকার গা ছমছম ভেজা বনে হঠাৎ হলুদ আলোর বন্যা বয়ে গেল।

।। ৩ ।।

পাগল ডনাল্ড হিলটন সেদিন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমার বুকে সারা জীবনের জন্যে একটি হাহাকার তোলা হলুদ মাঠের স্মৃতি জাগিয়ে রেখে গেছিল।

কেকে বলে, আত্মহত্যা করা মহাপাপ কেন

কাজ। আমি ডনাল্ডের পাশে ছিলাম সে সময়। আর কেউ না জানুক, আমি সেদিন জেনেছিলাম যে, যে আত্মহত্যা করে সে কত বড় অভিমান নিয়ে করে। লোকে বলে যে, যে আত্মহত্যা করে, সে ভীরু, ডনাল্ডকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যে যদি তাকে ভীরু বলা চলে তবে শুধু এই জন্যেই বলতে হয় যে জীবনে সে অন্য কাউকে দুঃখ দিতে ভয় পেয়েছিল।

ডনাল্ড, বেচারা সরল ডনাল্ড, বুঝতে পারেনি যে এই পৃথিবীতে অন্যের সুখ না ছিনিয়ে নিজে কখনই সুখী হওয়া যায় না।

আজও যখনি বনে জঙ্গলে যাই, শিকারে কিংবা বেড়াতে, যখনি কোনো সবুজ পাহাড়ের রোদ ঝলমল ঢালের উপর গড়িয়ে যাওয়া কোনো হলুদ শর্ষে বা যব-গুহার ক্ষেত দেখি, তখনই আমার ডনাল্ড হিলটনের কথা মনে পড়ে যায়।

শুনেছি কলকাতার আমেরিকান কনসাল জেনারেল ডনাল্ডের আত্মীয়-স্বজন-দের অনুরোধ করেছিলেন যেন ওর কবরের চারপাশে হলুদে সানফ্লাওয়ারের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

মুঠো, মুঠো, অজস্র। জানি না এত-দিনে ডনাল্ড যেখানে শুয়ে আছে চির-দিনের মত, সে জায়গা নিশ্চয়ই হলুদ ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে কিনা।

শুধু জানতে ইচ্ছে হয়, সেই মাঠে নীল ম্যাকসি-পরা কেউ কি কখনও এসে চুপি চুপি দাঁড়ায়?

নতলার বুলবারান্দা

সমীর রক্ষিত

দীপ যখন ঘুমুতে যায় তখন সবচেয়ে সুন্দর লাগে ওকে। ছোট্ট পাশ বালিশটা বন্ধুক মানুষের মত আঁকড়ে ধরে থাকে। ভঙ্গিটা এমন যেন ও এখন বিছানায় কিংবা এ-ঘরে নেই—পৃথিবীর বাইরের কোন ভাসমান স্বপ্নের কুয়াশাময় স্তরে ঢুকছে। চুলগুলো লালচে হাল্কা, ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। মিষ্টি লাগে ওর নিদ্রালু মুখটা। ঘুমনোর সঙ্গে সঙ্গেই কী শিশুরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দেয়?

আমার হাতটা এ-সময়ে আপনা থেকে নেমে যায় ওর মাথায়, চুলগুলো নেড়ে দিয়ে বলি—'কীরে গুণ্ডা, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

নিদ্রালু গলায় গর গর শব্দ ওঠে, দীপ বলে—'আ—আমাকে গুনুদা বলো না বাবা।'

সাবধানবাণী। হেসে উঠে ওর হাতে হাত বুলিয়ে অপরাধ স্বীকার করি—'না বাবা, আর কোনদিন গুণ্ডা বলব না।'

তারপর মুখটা ওর নরম মুখের কাছে নামিয়ে ফিসফিস করি—'তুমি যেন বড় হয়ে কী হবে দীপবাবু?'

দীপ একটুও সময় নেয় না, বলে—'সাইভার।'

আমার হাসি, বেশ শব্দ উঠে আসে ভেতর থেকে, বালিশে মাথা রেখে বলি—'ড্রাইভার হবি কেন? দুঃখে রে ছেলে?' মিলুকে ডেকে বলি—শুনেছ তোমার ছেলের কথা?' মিলু ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলে চুল বাঁধছিল, সেও মুখ ফিরিয়ে হাসে—'কদিন থেকেই গাড়িতে পেয়েছে ওকে।'

বালিশে মাথা ঘোরাতে গিয়ে শুনতে পাই তলা থেকে কী সব শব্দ আসছে। নিশ্চয়ই দীপের কাণ্ড। বালিশ উল্টে দেখি দীপের সব খেলনা ঝালিশের তলায়। কাঠের গাড়িও রয়েছে একটা। বিরক্ত হতে সেগুলো সরিয়ে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখতে গিয়ে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—'কী যে করে না ছেলেটা—যেখানে সেখানে—'

হঠাৎ আবার দীপের গলায় ঘুমের প্রান্তছোঁয়া—'গাড়িগুলো লক্ করে রেখেছি, বলছি সরিও না।'

মুচকে হেসে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলি—'লক করেছ? বেশ তো তোমার গাড়িগুলো আমি গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিচ্ছি—'

ঘুম বোধহয় তার ভেতরে সম্পূর্ণ ঢুকে পড়েছে, তবু দীপের দুঠোঁট নড়ে—'হাত দিও না বলছি—ঘুষি মেরে তোমাকে মেরে ফেলব কিন্তু—'

এত স্তিমিত উচ্চারণে কথাগুলো বলছিল দীপু আমি আমার কানটা তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গিয়ে শুনলাম; কিন্তু

ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল।

কেন খারাপ হল কে জানে। মনটা বাসন্তী কেটে যাওয়া শ্লেনের মত অনেকটা, কখনো কখনো আচমকা বাম্প করে, ধক্ করে খানিকটা নীচে নেমে যায় কখনো। তখন শুধু বিষাদময় শূন্যতা। বিপদে সাঁতারকাটা।

মিলু এখন ওডিকোলন স্প্রে নিচ্ছে, মুখে হাতের নরম ত্বকে ক্রীম মাখা শেষ, নাইটি পরা হয়ে গেছে। আরেকটু পরে লাইলাক রঙের ঢাকনার ভেতরে টেবল-ল্যাম্পটা নিভে যাবে, জ্বলে উঠবে হাল্কা অলিভ গ্রীণ রঙের কমজোরী আলো। সারারাত মৃদু কুয়াশার মত রহস্যময় আলো ছড়িয়ে থাকবে ঘরে। মিলুর শরীরটা আরো মোহময় লাগবে তখন সুঘ্রাণে ভরে যাবে বাতাস। ঘরটাকে মনে হবে পৃথিবীর শেষতম প্রান্তের এক পুষ্পোদ্যান, যেখানে শান্তি আর উষ্ণতা ছাড়া কিছু নেই।

মিলু নিজেকে সাজাতে ভালবাসে, ঘর সাজাতে; তার যাকিছু সব সুন্দর সুঠাম মোহময় রাখতে। 'ছেলেটার দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত মিলু—দিন দিন কীরকম হয়ে যাচ্ছে দীপটা লক্ষ্য করেছ?'

'কী আবার হয়েছে?' —মিলু আয়নায় হাসি ছড়ায়—'আবার তোমার ব্রুডিং শুরু হল?'

'না, আমাদের আরেকটু নজর দেওয়া দরকার। কদিন কীরকম ফ্রিজ নিয়ে মেতে-ছিল, এখন আবার—'

'বাচ্চারা নতুন জিনিস দেখলে ওরকম একটু করেই—ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।'

'আমরা কী ওকে অন্যকিছু ভাববার মত দিচ্ছি? নাকি এ-সবই—'

'কেন তুমি তো দিচ্ছই, তোমার সেই নস্টালজিক ভাবনা; তুমি ভাইবোনদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে কেমন মারামারি করতে, তোমার মাকে কেমন বিরক্ত করতে খাবার সময় এসব—' আসলে মিলুর গলায় শ্লেষ। মিলু আমার এসব ছেলেবেলাকার গল্প পছন্দ করে না। এ নিয়ে মিলু আমাকে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না।

কিন্তু আমার মনে পড়ে। আমি এখনো দেখতে পাই, মাকে সাহায্য করার কেউ নেই —একলাই মা সব কিছু করে যাচ্ছে, রান্নাঘর কাচাকুচি সারাদিন ব্যস্ত। দুপুরেও বিশ্রাম নেই, সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে বসেছে। আমাদের জামাপ্যান্টে মার হাতের কারু-কার্যের অন্ত ছিল না। তপু, আমার ছোট ভাইটা খুব মেজাজী ছিল, 'এসব আর পরা যায় না মা—নতুন একটা জামা কিনে দাও না মা—' বলে ও প্রায়ই কান্না জুড়ত। মা হেসে বলত 'হবে হবে। বড় হয়ে সব পরবি—ছোটবেলায় কী কেউ অত ভাল জামাকাপড় পরে নাকি?' আমি বলতুম তপুকে—'দেখিস বড় হয়ে আমি তোকে কত জামা কাপড় কিনে দেব।' 'এই ত লক্ষ্মী ছেলে।' মা বলত।

কিন্তু তপু কোথায় আমি জানবার এখন, আর মা তো চলে গেছে কবে ধরাছোঁয়ার বাইরে। দীপ জানবে না এসব, বুঝবে না। শুধু বড়জোর শুনতে পারে। গল্পের মত।

তপুর আত্মমর্যাদায় বাধে। এখন ওর বাড়ি গেলে কেমন অতিথির মত আপ্যায়ন করে আমাকে। ওর বৌ লুচি ভেজে খাওয়ায়। ওর ছেলেমেয়েরা দীপকে দেখে দূর থেকে, তেমন কাছে ঘেঁষে না। আমার গাড়িটা দেখে জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে। গাড়িতে বসে দীপ যখন মিলুর কোলে বসে হাত নাড়ায় টা-টা করে তখন ওরা হাত নাড়ে না। তখন ড্যাবড্যাবে চোখে বিদেশী দেখার মত তাকিয়ে থাকে। কসবার এ-তল্লাটে আমরাও কোনদিন কোন প্রাইভেট কার দেখিনি, বড়জোর ট্যাক্সি আসে কখনো বছরে একটি দুটি। পাড়ার কচি-কাচাদের তখন ভিড় লেগে যায়।

অবশ্য পাড়ার বয়স্করা এ-নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্ততঃ অগ্রাহ্য করার ভান চোখে মুখে। নেহাৎ আমার পুরনো পাড়া, দুচার জন এগিয়ে এসে বলে—'ভাল আছ বিশু, তোমাদের দেখলেও ভাল লাগে।' ভাল যে লাগে মুখ দেখে কিন্তু বোঝা যায় না।

বিশুকে দেখে তো আমি অবাক। চিনতেই পারি নি। ভেবেছিলাম সে এসে জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরবে। ছেলেবেলায় প্রতিদিন একসঙ্গে ফুটবল খেলেছি। বিশু ওর বাবার চায়ের দোকানটা চালাচ্ছে এখন। প্রথমে আমি ওকে ওর বাপ বলেই ভুল করেছিলাম। ঠিক তেমনি লুঙ্গি পরনে, চায়ের গ্লাসে বেদম চামচে নাড়ছে, ভুঁড়িটা খানিক এগিয়ে এসেছে।

ওর দোকানে ঢুকতে বিশু চমকেও ওঠেনি, হকচকিয়ে যায়নি, খুশীতে লাফিয়েও ওঠেনি, আর পাঁচটা খদ্দের ঢুকলে যেমন নিরাসক্ত চোখে তাকায় তেমনি তাকিয়ে বলেছিল—'কীরে চা খাবি নাকি?'

আমি ওর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, কতদিন বাদে দেখা, ভেবেছিলাম হাতটাত ধরব। কিন্তু সে আর হয়নি ওর মুখ দেখে, আমি বলেছি—'খাওয়া এক কাপ।'

ও তখন মৃদু হেসে বলেছে—'এ চা না খাওয়াই ভাল রে, চা বলে তো গরম জল বেচি—'

'কেমন আছিস বল।' আমি অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করছিলাম।

বিশু নির্বিকার মুখে বলেছিল—'যেমন দেখছিস।'

আসলে আমি দেখছিলাম সেই ফুটবল খেলার মাঠ। মাঠ থেকে ফিরতে ফিরতে পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে কত সুখ-দুঃখের কথা। একটি মেয়েকে ভালবাসত বিশু। কিন্তু মেয়েটা ওকে গ্রাহ্য করত না। কতরকম চেষ্টা করত বিশু তার দৃষ্টি আকর্ষণের। যেচে গিয়ে মেয়েটির বাবার অনেক কাজ করে দিত, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া রেশন তোলা।

বিশু সখেদে বলত—'আমাদের শালা কী আছে বল, কী দেখে মেয়েরা ভাল-বাসবে। তোরা জুয়েল ছেলে একদিন

নাটক নাটক

স্ত্রী-বর্জিত একাংক

শৈলেশ গুহ নিয়োগীর

ভাগবান গ্রেপ্তার ॥ ভূতের মুখে রামনাম ॥ প্রাঃ এম্ব একসচেঞ্জ টেক্কা ॥ ফুঃ ॥ পলিটিকস

কিরণ মৈত্রের

এপিডেমিক ॥ কালনেমীর লঙ্কাভাগ ॥ কেঁচে গণ্ডুষ এদের রাখবো কোথায় ॥ নাটক নয় ॥ বিল পঞ্চাশ

বীরু মুখোপাধ্যায়ের

দাদা জন্মালেন ॥ সুতরাং

শাক্তপদ রাজগুরুর

বুনো ওল বাঘা তেঁতুল ॥ প্যালারাম নিরুদ্দেশ

রবিদাস সাহারায়ের

শিল্পী চাই ॥ পাত্রী চাই স্পুটনিক ॥ বরযাত্রী রঙ বেরঙ ।। লাখ টাকা

বিমল রায়ের

বিশুর বিয়ে ॥ নিউ শ্রীহরি অপেরা ॥ লেডী টাইপিষ্ট ॥

একটি স্ত্রী-চরিত্রের একাংক

শৈলেশ গুহ নিয়োগীর

ডাইভোর্স ॥ রিহার্সাল

বীরু মুখোপাধ্যায়ের

এখানে থিয়েটার হবে ॥ লালদিঘীর ধারে ॥

গঙ্গাপদ বসুর

বিশ্বাসের মৃত্যু ॥ ইদানিং

পূর্ণাঙ্গ নাটক

বারো ঘন্টা ॥ সত্য মারা গেছে ॥ কেঁচো খুঁড়তে সাপ মণিবেগম ॥ জীবন কাহিনী লজ্জারূপ ধাতুরূপ ॥ অদল বাদল ॥ ভাঙা গড়া খেলা মরণ খেলা ॥ অন্ধ দেবতা

সিটি বুক এজেন্সী

৪৪।১সি বেনিয়া টোলা লেন কলিকাতা-৯

রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

চিরমধুর রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড সংকলন। নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে পাওয়া এইচ-এম-ভির অনবদ্য অবদান।

৪৫ আর-পি-এম এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ড

ঋতু গুহ
আমার মা-ই যা হল পারে যাওয়ার
কোন্ সে ঘাটের কূল
ম্লান ভাসিল জলে
আমার পরান যাহে কী ছোঁয়া

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
নির্জন রাতে নিঃশব্দ
এবার বুঝি ভোলার বেলা
আজো যে আজ গান করে
ফুলটি ঝরে গেছে রে

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
আমার নিশীথরাতের বাদলধারা
সে যে পাশে এসে বসেছিল
তুমি যত তার দিয়েছ

নীলিমা সেন
মম দুঃখের সাধন
তবু মনে রেখো
যদি তোমার দেখা না পাই
হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল

সাগর সেন
আমার দিন ফুরালে
আমার মন মানে না
ধীরে ধীরে ধীরে ওগো
বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে

সুমিত্রা সেন
তোমার দ্বারে কেন আসি
সে কোন্ পাগল যায়
আর নাই রে বেলা
জলে নি আলো

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
হেমার জীবনারে কী হাওয়ায় মাতালে
স্নানমুখরা এ বসন্ত
ভাসিয়ে দিয়ে যাও

গৌতম মিত্র
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
যদি হায়, জীবন পূরণ মা-ই হল

সুমিত্রা ঘোষ
নীরব শাখা উজল করি
মহুলকুসুমকুঞ্জ মাঝে

পূর্বী দাস
সোদিন আমায় বলেছিলে
আমার যা আছে

অর্ঘ্য সেন
আমার প্রিয়ার ছায়া
গহনরাতে শ্রাবণধারা

প্রসাদ সেন
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা
হল না, হল না সই

অদিতি সেন
নিশীথরাতের গান
কোথা হতে বাজে

বনানী ঘোষ
যা হারিয়ে যায় তা আসবে ফিরে
ও তার পদ্ম সে

মোরা সর্বাধিকারী
আলো তো এইখানের মতো
শ্রীবিজয় মুখার্জি, বনশ্রী

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা রায় (মুখোপাধ্যায়)
আগুনের পরশমণি
আমায় বাঁধবে যদি

সুমিত্রা রায় (মুখোপাধ্যায়)
মনে রবে কি না রবে আমারে
তোমার প্রেম সোনার

মঞ্জরী দাস
ভাঙ্গ দুখি আইল প্রিয়তম
অবেলায় যদি এসেছ

নমিতা ঘোষাল
নাথ হে, প্রেমপদে মম বাঁধা
তোমরা যা বল ভাই বন্ধু

মায়া সেন
কেহ কারো মন বুঝে না
কেন রে হায় ফিরে মিছে

সুশীল মল্লিক
আকাশ শেষ পারানির কড়ি
প্রখর তপনতাপে

স্বপন গুপ্ত
একাকীত্বের আলোয় বসে
করছ কিছে দূরে থেকে

বাণী ঠাকুর
আমার মা-হারা বাণীর
হেমাঙ্গেকেলা সরোবরে

স্বপ্না ঘোষাল
এরে ভিখারি সাজায়ে
হৃদয়ের একতারা, একতারা

পূরবী মুখোপাধ্যায়
তবে সুন্দর, ধন্য ধরি
তব প্রেমের বাণী মম

বীথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
মোর পথিকের বুঝি এনেছ এবার
ছিন্ন যে পরানের অন্ধকার

কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা
প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি

লং প্লেয়িং রেকর্ড

চন্দ্রিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
হে মোর দেবতা।
সকল জনম ভ'রে।
হে শ্যামা, তালে তালে।
বন্ধু, রহো রহো সাথে।
হায় কে নিবে আর সান্ত্বনা।
ঝরন রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
বিপুল তরঙ্গ রে।
তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক
দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়।
আমি একেলা তারি দ্বারে।
কিছুই তো হল না।
দিনান্তবেলার শেষের ফসল।

সুচিত্রা মিত্র
নিশিদিন চাহো রে তাঁর পানে।
শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ।
যতক্ষণ তুমি আমায়।
আমায় বিচার তুমি করো।
পথ এখনো শেষ হয় না।
চলিয়াছি পথ-পানে।
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব।
একলা তুমি, প্রিয়।
তুমি উমার সোনার বিশু।
শেষ খেয়াঘাটে শেষের আসে।
শুকনো পাতা কে যে ছড়ায়।
এরা আমাকে ভাসাল জলে।

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ইলেকট্রনিক্স, রেকর্ড ও কমযন্ত্রনের আন্তর্জাতিক খেতে আসুন

EMI

GC 7516

দাঁড়িয়ে যাবি, তোরা জীবনে যা চাস সব পেয়ে যাবি।' আমার তখন তারুণ্যের অহঙ্কার রক্তে, আমি বলতাম—'আমি একলা দাঁড়ালে ভেবেছিস তোরা পড়ে থাকবি, তোদেরও টেনে তুলব।'

'ওসব বাজে কথা রে, কেউ কাউকে তোলে না। একজন আধজনই দাঁড়ায় বাকি সব পড়ে থাকে। এটাই নিয়ম—'

কেন, কিসের নিয়ম? আমি কোম্পানীকে যে নতুন পাম্পের ডিজাইন দিয়েছি, সে মডেলে পাম্প তৈরী করে কোম্পানী দেড় কোটি টাকা উপায় করেছে, আমাকে দিয়েছে গাড়ি—প্রেজেনটেশন। কিন্তু দেড় কোটি টাকা ভাগ বিশু চায় না, তপু পায় না। একমাত্র আমি পেয়েছি। এক হাজারে এরকম একজন, হয়তো আরো আছে, তারা গাড়ি চালায়—নতলার ওপরে তিন ঘুমের ফ্ল্যাট থেকে তারা কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দক্ষিণী হাওয়া খায়।

আমার নাকে সুঘ্রাণ তীব্র হয়ে আসে।

'কী গো, কী ভাবছ এত?' মিলুর পরীর মত শরীর। স্বচ্ছ নাইটি। সবুজে হাল্কা আলো।

'তারা দেখছি'—

'আজ তারা কোথায়, আজতো আকাশ-ভরা মেঘ।'

'তাহলে মেঘই দেখছি'—

'যাই বল সন্ধেবেলায় ঝড়বৃষ্টিটা হয়ে টেমপারেচার বেশ ডাউন হয়েছে—'

'কুলারটা তাহলে চালাব না বলছ?'

'না চালালেও হয় কিন্তু দীপটা মাঝ-রাত্তিরে উঠে পড়বে তাহলে'—

'খুব খারাপ অভ্যাস হচ্ছে'—আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে যায়।

'খারাপের কী আছে এতে? অভ্যাস অভ্যাস'—

'কিন্তু দেখ মিলু, কত লোক এমনই পরিবেশের মধ্যে থাকে তাদের কুলার দূরের কথা ফ্যানট্যানও নেই'—

বলার সময় আমার তপুর কথা মনে পড়ছিল।

'কত লোক তো রাস্তায় আধপেটা খেয়ে ফুটপাতেও কাটিয়ে দিচ্ছে, তা বলে কী আমরা ঘরে থাকব না, পেট পুরে খাব না, ফ্যান কিম্বা কুলার চালাব না?' মিলু আমার বুকের ওপর হাত রেখে হাসে, যেন আমি খুব ছেলেমানুষ এমন করে বলে—'তুমি যে কী উল্টোপাল্টা কথা বল না একেক সময়—ভীষণ হাসি পায় আমার।'

আমারও হাসি পায়। মিলুর হাতে হাত রেখে বলি—'কেন এমন হবে বলতো, যারা আধপেটা খায়, ফুটপাতে ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়—ফুটপাতে মরে—তারাও কী মঙ্গল-গ্রহের জীব, না এদেশেরই লোক?' কথা-গুলো আমার মনে আসে কিন্তু বলতে গিয়ে আমার কানেও খটকা লাগে, ভণ্ডামির মত শোনায়। তবু আমি উন্মুখ হয়ে থাকি উত্তরের আশায়।

'ভাগ্য, যে যেরকম কপাল নিয়ে জন্মেছে। তুমি ওদের কথা ভেবে কী করবে একা?'

'ভাগ্য! একে তুমি ভাগ্য বলবে? অবশ্য আরো বলতে পারো ভগবানের দান নিয়তি তাই না?'

'সেরকম বললেও অন্যায় বলা হবে কী?' মিলু নাইটি ভাল করে জড়িয়ে নেয়। সুন্দর সজল বাতাস দিচ্ছে।

'তাহলে দীপের পরে আর যে একজন এসেছিল, তাকে ভগবানের দান বলে মেনে নিয়ে পৃথিবীতে আনলে না কেন? দুমাসের প্রাণ ডাক্তারকে দিয়ে মেরে ফেললে কেন?' আমি সবজে আলোয় মিলুর চোখ দেখতে চেষ্টা করি কোন বিষণ্ণতা সেখানে আছে কী?

'তুমি ভীষণ কনভেনশনাল, আজকাল এসব কেউ মানে নাকি?'

'মানে না মিলু, মানে না। আমিও তো তাই বলতে চাই সব কিছু ভগবানের দান, ভাগ্য নিয়তি এসব কথা কী পুরনো হয়ে যায় নি? এসব কথা কী কনভেনশনাল নয়'—

হঠাৎ মিলুর গলায় বিরক্তি কড় কড় করে ওঠে—শরীর শক্ত করে সে বলে—'তুমি কী বলতে চাও তাহলে—ওদের জন্য আমরা দায়ী? আমরা ওদের এরকম করেছি?'

আমি মিলুর বুকে হাত রাখি। উষ্ণতা আমার হাত বেয়ে ওঠে. আমি মৃদু গলায় বলি—'ভাগ্য নয়, সবকিছু এখন কনডাক্‌টেড। ভাগ্যের ওপরে দোষ চাপিয়ে পালানো যাবে না মিলু, আমি শুধু একথা-টাই বলতে চাই—'

আমার হাতসরিয়ে দেয় মিলু রুষ্টস্বরে বলে—'তাহলে চল, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ফুটপাতে গিয়ে শুয়ে থাকি—পারবে? বলতো? চলো এক্ষুনি দীপকে নিয়ে?' বেশ বোঝা যায় মিলুর গলা কাঁপছে। তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতেই উত্তেজনা। একটু উত্তেজিত হলেই মিলুর বমি পায়। এটা

আমি জানি, এজন্য সস্নেহে আমি তাকে কাছে টেনে নিই।

কাছে আসে না মিলু, আমার হাত থেকে শরীর মুক্ত করে সে বলে—'আমাকে তুমি এসব কথা শোনাও কেন বলতো? একথাটা আজ পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল'—

মিলুর কণ্ঠস্বর দৃঢ়। মিলুও জেদী কম নয় আমি জানি।

আমি তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করি, অনুতপ্ত গলায় বলি—'ছিঃ মিলু, তোমাকে শোনাতে যাব কেন, আমাকে ভুল বুঝো না। আসলে এসব কথা আমাকেই শোনাই—নিজের কাছে'—

'চালাকী করো না বিজু, ওসব কথা বলে তুমি আমাকে ভোলাতে পারবে না। আমি একটু সুন্দর করে থাকতে ভালবাসি, ভদ্র সামাজিক মানুষের যেরকম বাঁচা উচিত সেরকমভাবে বাঁচতে চাই—আর সেজন্য তোমার অনেক খরচ হয়ে যায়, তাই না?'

আমি আবছা আলোয় হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকি। মিলুর দুচোখ জ্বলজ্বল করে রাগ বিরক্তি অপমানে রুষ্ট তার দৃষ্টি। আমি এমন কোন ইঙ্গিত কখনো করতে চাই না—চাইওনি। মিলু, আমার কোন কথায় দুঃখিত হোক এ আমি কখনো চাই না। আমি নিজেকেই নিজে শাসন করি প্রশ্ন করি—কেন, মিলুকে এসব কথা বলতে গেলে? কী দরকার ছিল?

আমি নরম অনুতপ্ত গলায় বলি, 'বিশ্বাস কর মিলু, সত্যি এমন কোন ইঙ্গিত আমি করি নি। তুমি যে সবকিছু সুন্দর করে রাখতে চাও, ভালভাবে বাঁচতে চাও এটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি—সবাই এরকম করে না হোক অন্ততঃ খেয়েপড়ে মানুষের মত বাঁচুক—আমি শুধু'—আমাদের দুজনের ওপাশে দীপ পাশ ফিরল। আবার বাইরে মেঘ ডাকছে, বোধহয় আরো বৃষ্টি হবে।

সহসা থমথমে মুখে মিলু তাকায় আমার দিকে—'তুমি কী ভাবো, তোমারই একমাত্র এসব কথা ভাব? আর কারো কনসায়েন্সে এসব লাগে না—না?'

'আমি একথা একবারও বলিনি মিলু, হয়তো আমার মত অনেকেরই লাগে'—

'অনেকেরই লাগে কিন্তু কেউ কিচ্ছু করতে পারে না—কেন?' মিলু উল্টে প্রশ্ন করে।

'হয়তো তাদের সবারই পিছুটান আছে, হয়তো আমারই মত হাত-পা বাঁধা।'

মিলু বলে 'আমি একটা কথা বলি রাগ করবে না?'

আমি মৃদু হেসে বলি—বল—

মিলু বলে—'কারুরই হাত-পা বাঁধা নেই, আসলে কী জানো কেউ কিছু করতে পারে না নয় করতে চায় না। সবাই চায় অন্যের দুঃখ দারিদ্র্য নিয়ে একটু আলোচনা করব সিমপ্যাথি দেখাব, আর নিজেরা যেমন আছি থাকব; আসলে সিমপ্যাথিটা তোমাদের এক ধরনের স্লেজার'—

কথাটা একটা তীক্ষ্ণ সূচের মত সহসা আমার মাথার এদিকে দিয়ে ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠি—'না না মিলু এটা ঠিক নয়, এটা তুমি ঠিক বলছ না?'

তখন গুড় গুড় করে আকাশে মেঘ ডেকে ওঠে প্রচণ্ড শব্দে। মিলু কী আমার কথা শুনতে পায়নি? সে তাহলে আমার দিকে ওরকম করে হাসতে পারছে কিভাবে? মিলুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে আমি বলি—'না মিলু না, তোমার ধারণা ঠিক না—এরকম স্লেজার কেউ পায় না, কেউ চায় না'—

মিলু বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠে হাসে—হাসতে হাসতেই বলে—'খুব খারাপ লাগছে তাই না, কিন্তু সত্যি নিজের মনে একটু ভেবে দেখ তো?'

আমি কিছু ভাবতে পারি না। আমার মাথার মধ্যে বৃষ্টি পতনের মত, মেঘ গর্জনের শব্দ বাতাসের শব্দ সব একাকার হয়ে যায়। সবুজে আলো মিলুর শরীরের সুগন্ধের সঙ্গে পাক কাদা নর্দমার গন্ধ নাকে আসে, চোখের সামনে নানা ছন্নছাড়া দৃশ্য কিলবিলিয়ে ওঠে। তপুর বাড়ির সামনে কিংবা বিশুর দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কী আমি কোনদিন কোন আনন্দ পেয়েছি, সুখ? বন্ধুবান্ধবকে গাড়িতে লিফট দিয়ে? কিংবা গাড়ির কাছে ভিড় করে আসা ভিক্ষুকদের রুগ্ন হাতে পয়সা বিলিয়ে?

আমার কানের পাশে উত্তপ্ত রক্ত ছোটাছুটি করছে, যেন প্রচণ্ড দুর্দান্ত ঢল নেমেছে কলজে থেকে—শরীরের সমস্ত শিরায় তন্ত্রীতে ছুটে যাচ্ছে। আমার দুহাতের স্নায়ু পেশী সব শক্ত দড়ির মত পাকিয়ে উঠছে। ইচ্ছা করছে দুহাতে আমি মিলুর গলাটা চেপে ধরি, বলি—ফিরিয়ে নাও মিলু তোমার কথা, বল, তুমি যা বলেছ ভুল মিথ্যে'—

আমার চোখের দিকে স্থির চোখে মিলু তাকিয়ে থাকে। যেন সে একটা ম্যাজিক শো দেখছে। তার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ঝিলিক দিচ্ছে। মিলু সে হাসি স্পষ্ট করে বলে—'দরজাটা খোলা ছাট আসছে, স্লিজ একটু বন্ধ করে দেবে?'

দক্ষিণের ঝুলবারান্দার দরজা সত্যি খোলা। তীব্র হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট আসছে। মেঘের গর্জন বিদ্যুতের চকিত আলো ঢুকে পড়ছে। আমি মাতালের মত টলতে টলতে ব্যালকনির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, নীচের থেকে হুল্লার শব্দ কানে আসে। একটু এগিয়ে গিয়ে ঝুলবারান্দার দাঁড়িয়ে নীচে তাকিয়ে দেখি—অদূরে টালি আর খোলার চালের যে বস্তিটা তাতে লোকজন ছোটাছুটি করছে হৈ-হল্লা করছে। জল উঠে পড়েছে উঠোনে, টালির চাল একদিকে ভেঙে পড়েছে। আর সেই ভাঙা চালের ভেতর দিয়ে দেখা যায় একটি বৌ কোলে বাচ্চা নিয়ে বসে আছে। তার পাশে পাঁচ-ছ বছরের একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। বাড়ির লোকটা জিনিসপত্র সরাচ্ছে।

ঠিক এমনি একটা দৃশ্য আমার মনে পড়ে গেল তখন। আমার মা তপুকে কোলে নিয়ে বসে আছে। গভীর রাতে জেগে উঠে আমিও মার পাশে দাঁড়িয়েছি। আমাদের টালির চালটা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে। বাবা জিনিসপত্র সরাচ্ছে।

'বৃষ্টিতে ভিজে গেলে যে, কী করছ?' বিছানা থেকে মিলু ডাকছে। হাওয়ার শব্দে তার কণ্ঠস্বর এলোমেলো। নীচের দিকে আরেকবার তাকাই। নতলার ঝুলবারান্দা থেকে শিশু কোলে বসে-থাকা-মা আর পাশের ছেলেটিকে অনেক নীচে খুব ছোট্ট দেখায়।

আমি অসাড় পায়ে পিছিয়ে এসে দুর্বল হাতে দরজা বন্ধ করে দিই।

'মাথাটা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'—মিলুর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। আমার পা থেকে যেন শেকড় নেমে মেঝেতে বসে গেছে। দৃশ্য স্থির। বাইরে এখন বজ্র-বিদ্যুৎ হাওয়া বৃষ্টির ভয়ঙ্কর মাতামাতি চলছে।

কবিরাজ মহেশ বিদ্যারত্নের
চুলিজল
চুলির অব্যর্থ ঔষধ
হার্বাল ড্রাগ কর্পোরেশন
২৩৩-২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

রেজিষ্ট্রি বিবাহ অফিস
মোট ১৬ টাকায় রেজিষ্ট্রি বিবাহ
এন কে ঘোষ, জে-পি
ম্যারেজ অফিসার
১১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলি-৯, ফোন : ৩৫-৩০৪৮

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি

প্রফুল্লরতন গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বেশী দরে প্রচুর চাল-গম পাওয়া যায়। কিন্তু রেশনে ছাড়া ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য পাওয়ার উপায় নেই। এ কিসের লক্ষণ? নিশ্চয়ই খাদ্যের অভাবের লক্ষণ নয়। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন চাল-গম দিয়ে প্রত্যেককে সপ্তাহে গড়ে তিন কেজির বেশী খাদ্য সরবরাহ সম্ভব। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না কেন, এই চাল গেল কোথায়? এই দুটো প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে জানতে পারা যাবে যে, এই রাজ্যের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ন্যায্য দরে সুসম বণ্টনই হোল প্রকৃত সমস্যা। অর্থাৎ সময়মতো উৎপন্ন খাদ্যশস্যের লেভি আদায়, ক্রয়-মূল্য যাতে উৎপাদনীর ব্যয়ের কম না হয়, এমন সংগ্রহ-দর স্থির করা এবং এইভাবে সংগৃহীত চাল নির্দিষ্ট দরে রেশনিং ও আধা-রেশনিং এলাকায় সুসম-ভাবে বণ্টন।

এই কাজের উপযোগী ব্যবস্থা ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই কেন্দ্রীয় ফুড কর্পোরেশনের পুনর্বিন্যাস ও দুর্নীতি দূর করা এবং চালকলগুলোর উৎপাদনের ওপর সতর্ক নজর অত্যাবশ্যক। কিন্তু সরকার কোনটাই সুষ্ঠুভাবে করেন নি। সরকারী সংগ্রহ মূল্য ও উৎপাদনী ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে স্থির করা হয়নি। তাই মুনাফাশিকারী ও অভাবসৃষ্টিকারীর দল বড় বড় মহাজনের অঙ্গুলিনির্দেশে ধান-চাল-গম মজুত করে ফেলেছে। এখন বেশী দরে বিক্রী করে প্রচুর মুনাফা লুটছে। কিন্তু প্রকৃত ছোট চাষীরা তো ধান-চাল-গম ধরে রাখতে পারেনি। তারাই দুঃস্থ। তাই অল্প দরে সরকারের এজেন্টদের কাছে ধান-চাল বিক্রী করে দিয়েছে। বড় চাষী তার উৎপন্ন শস্য গোলাজাত করেই রেখেছে।

কিন্তু রাজ্যবাসীর বেশী দরে চাল কেনার আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাই সর্বত্র উদ্বেগ ও বিক্ষোভ। রেশনে ন্যায্য মূল্যে যে চাল পাওয়ার সুযোগ ছিলো, তা কমে গেছে, গম সরবরাহ এখনও পুরান হারেই চালু আছে। বিধিবদ্ধ এলাকায় সপ্তাহে মাথাপিছু ২ কেজি সরবরাহ চালু আছে। কিন্তু আধা-রেশনিং এলাকায় চাল-গম সরবরাহ যেমন অতি অল্প, তেমনি অনিয়মিত। তাই চালের চাহিদার বেশী অংশই জনসাধারণকে খোলাবাজারে বেশী দরে কিনতে হচ্ছে। এই চাল আসছে নিশ্চয়ই বাইরের রাজ্য থেকে নয়, পশ্চিম-বঙ্গের উদ্বৃত্ত জেলাগুলো থেকে নিত্য প্রচুর চাল আসছে রেশনিং এলাকায় ও অভাবী এলাকায়। রাজ্যের বাইরেও চাল-গম পাচার হচ্ছে। সময়মতো বেশী দরে চাল কিনে বাফার স্টক করলেন না কেন তা আজও অজ্ঞাত।

সবচেয়ে পরিতাপের, যে ক্ষেতমজুর, সাধারণ চাষী খাদ্যের উৎপাদন করলো, তাকেও আজ অধিক মূল্যে চাল কিনে জীবিকানির্বাহ করতে হয়। কিন্তু তার ক্রয়-ক্ষমতা দারিদ্র্য-সীমার তলায়। তাই গ্রামে গ্রামে এতো অন্নকষ্ট, কাজের অভাব, জলের অভাব আরও খাদ্য-সংকটকে জটিল ও দুর্বিসহ করে তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের দর দ্রুত বেড়েই চলেছে। গত এক বছরে ভোগ্যপণ্যের দর গড়ে কমপক্ষে ৬০ শতাংশ বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে যেন একটা পাপচক্রের আবর্তে আমরা ঘুর পাক খাচ্ছি। এই দর বৃদ্ধি চলতে থাকলে লোকে বাঁচবে কী উপায়ে তা এখন বিরাট জিজ্ঞাসা।

পশ্চিমবঙ্গ কি ঘাটতি রাজ্য?

বহু বছর ধরে একটা বিতর্ক চলছে পশ্চিমবঙ্গ কী ঘাটতি রাজ্য? সরকারী কর্তারা বরাবরই বলছেন ঘাটতি আছে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৪ লক্ষ টন থেকে ২২ লক্ষ টন। কিন্তু রাজ্য সরকারের উন্নয়ন সেলের হিসাব এরূপ ঃ ৭১-৭২ সালে গড়ে রাজ্যের লোকেরা বছরে মাথাপিছু ১৫৭ কেজি ভোগ করেছে। ৭২-৭৩ সালে এই হারেই পাচ্ছে। রাজ্যের উন্নয়ন সেলের হিসাব হোল এই যে, ৭৩-৭৪ সালে উৎপন্ন খাদ্যশস্য দিয়ে রাজ্যবাসীকে বছরে মাথাপিছু ১৭০ কেজি করে চাল-গম সরবরাহ সম্ভব। কাজেই পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের দিক থেকে ঘাটতি রাজ্য নয় একথা বলা চলে। সি এ ডি পি পরিকল্পনার মুখবন্ধে তাই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে রাজ্যবাসীকে কীভাবে গড়ে প্রত্যহ মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম করে খাদ্যশস্য দেওয়া যায় তার জন্যই ব্যাপক ভিত্তিক কৃষি উন্নয়নের প্রকল্প।

কিন্তু রাজ্যের কৃষি দপ্তর খরা, বন্যার ফসলহানির তথ্যাদি দিয়ে দেখিয়েছেন এ-বছর খরিফ মরশুমে আশানুরূপ ফসল হয়নি। কৃষিমন্ত্রীর হিসাব অনুযায়ী খরিফ মরশুমে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের উৎপাদন ৫২ লক্ষ টনের বেশী হয়তো হবে না। এ-বছর ১০ লক্ষ টন গম এবং ১০ লক্ষ টন বোরো ধানের উৎপাদন আশা করা হচ্ছে।

অর্থাৎ সরকারী হিসাবে ন্যূনতম উৎপাদন ৭২ লক্ষ টনে পৌঁছুতে পারে। ১৯৭১-৭২ সালে ৫৬-২২ লক্ষ টন তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় খরিফ মরশুমে। এছাড়া ৯-০৭ লক্ষ টন গম এবং ৯-২ লক্ষ টন বোরো ধানের উৎপাদন হয়। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো ৭৪-৪৯ লক্ষ টন। তার মধ্যে চাল ছিলো ৬৫ লক্ষ ১০ হাজার টনের মতো। ৭২-৭৩ সালের উৎপাদনের যে হিসাবই বলা হোক না কেন তার পরিমাণ ৭১-৭২ সালের তুলনায় কম নয়। অবশ্য এই এক বছরের মধ্যে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য-চাহিদা পূরণের মতো উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে কিনা সেটা বিচার সাপেক্ষ।

খাদ্যমন্ত্রী মার্চ মাসে তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, চলতি বছরে সরকারী খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে হলে গমের ১৫ লক্ষ টন চাহিদার অতিরিক্ত আরও ৭ থেকে ৯ লক্ষ টন চালের জন্য কেন্দ্রীয় সরবরাহ প্রয়োজন। কারণ, আমন ফসলের মরসুমের জন্য রাজ্যকে ১৯৭৩ সালে অন্তত ২০ লক্ষ টনেরও বেশী খাদ্যশস্যের ঘাটতির সম্মুখীন হতে হবে।

সরকারের কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য। কিন্তু বাস্তব তথ্য হলো পশ্চিম-বঙ্গে প্রকৃত ঘাটতি নেই। গড় প্রয়োজন কত, গড় চাহিদা কত এবং কত উৎপাদন হয় তার সঠিক তথ্য শুধু অনুমানভিত্তিক

'আমাদের পঞ্চম পঞ্চবার্ষীয় পরিকল্পনার
খুঁটিনাটি দিকগুলি এখন আমরা স্থির করছি।
এর মুখ্য লক্ষ্য হল সর্ব ক্ষেত্রে পূর্ণ
আত্মনির্ভরতা অর্জন, দুর্বল শ্রেণীগুলির
সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধান এবং
পূর্বার্জিত কর্মক্ষমতার পূর্ণতর প্রয়োগ।
আমাদের সামাজিক কর্মসূচীতে-
ভূমিহীনদের জন্য আবাসভূমি,
বিরল-বৃষ্টি-এলাকার ক্ষুদ্র কৃষকদের
কৃষি উপকরণ ও কৃষি ঋণ যোগান,
বস্তি অঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণ ব্যবস্থা
সম্প্রসারণ, শিক্ষিত কর্মহীনদের
জন্য কর্ম সংস্থান প্রকল্প এবং
পরিবার পরিকল্পনার ওপর
গুরুত্ব দেওয়া হবে।'

—ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী

পূর্ণ আত্মনির্ভরতার
পথে

davp 73/247-B&W.

হওয়ার ফলে রাজ্যে এই বিতর্ক কোন কালেও মীমাংসিত হবে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি আছে, তবে তাও তো কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে প্রতি বছরে গড়ে প্রাপ্ত ২০ লক্ষ টন চাল-গম দিয়ে পূরণ হয়ে যায় এবং কিছু উদ্বৃত্ত থাকবার কথা। তবুও অভাব, চাল-গম, আটা-ময়দার কালোবাজারী এবং রেশন ছাঁটাইয়ের কবলে আমরা পড়ছি।

নীচে আজকের একটি খাদ্য-তথ্য তুলে ধরছি। এর মধ্য দিয়েই খাদ্যের ঘাটতি কি উদ্বৃত্ত তার সঠিক পরিসংখ্যান মিলবে এবং আমাদের প্রয়োজন ও বণ্টন সংক্রান্ত মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

৭২-৭৩ সালের খাদ্য তথ্য

মাথাপিছু বার্ষিক ১৫০ কেজি হারে মত খাদ্যশস্য প্রয়োজন— ৬২ লক্ষ টন

(১) বয়স্ক ৩ কোটি ৭০ লক্ষের জন্য— ৫৫ লক্ষ টনের কিছু বেশী।

(২) ৮ বছর ও তার কম বয়সের ৯০ লক্ষের জন্য প্রয়োজন প্রায় ৭ লক্ষ টন।

উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ— ৭২ লক্ষ ৫০ হাজার টন

বীজ ও ঘাটতি ১০ শতাংশ বাদে— ৬৫ লক্ষ টন

লোকসংখ্যা— ৪ কোটি ৬০ লক্ষ

উৎপন্ন শস্য সমবণ্টন করলে প্রতি লোক বছরে যত কেজি পায়— ১৫৮ কেজি

কেন্দ্র থেকে বছরে চাল-গম আসছে গড়ে— ২০ লক্ষ টন

রেশনপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা ঃ

পূর্ণ রেশন— ৮৭ লক্ষ

আধা-রেশন— ২ কোটি ৭০ লক্ষ

মোট— ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ

এ-বছর কেন্দ্র চাল কম দিলেও গমের সরবরাহ ঠিক আছে।

কৃষি দপ্তর এখন বলছেন উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ হোল ৪৪ লক্ষ টন চাল মাত্র। জানি না, কোন্ ভিত্তিতে এই হিসাব রচিত। এতে বোরো ধান-চাল ও গমের হিসাব ধরা হয়েছে কিনা। আগের হিসাবটা সবই ভুল ছিলো। তবে এটা সত্য যে, রাজ্য সরকার এই রাজ্যের অধিবাসীদের জন্য ৮৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য চাই বলে যে হিসাব ধরেছেন তা বাস্তবভিত্তিক নয়। এই হিসাবের কি ভিত্তি তা-ও সরকার কখনও বলেননি। কাজেই সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

প্রকৃত চাহিদা কত?

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের প্রকৃত চাহিদা কত?—এই প্রশ্নটির প্রকৃত মীমাংসার উপর সব বিতর্কের সুরাহা হতে পারে।

রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে তাঁর বাজেট ভাষণে আমাদের জানিয়েছিলেন যে, এই রাজ্যে অপচয়, বীজ বাবদ প্রয়োজনীয় শস্য বাদেই ৮৩-৫৫ লক্ষ টন তণ্ডুলজাতীয় শস্যের প্রয়োজন। কিন্তু মাথাপিছু বছরে গড়ে কত কেজি চাল-গমজাত খাদ্যসামগ্রী ধার্য করা হয়েছে এবং কত লোকের (সাবালক, নাবালক) জন্য প্রয়োজন তার তথ্য কৃষিমন্ত্রী জানাননি। খাদ্যমন্ত্রীও অদ্যাবধি কোন তথ্য দিয়ে এই হিসাব প্রমাণ করেননি।

কিন্তু সরকারী হিসাব আমাদের যতটুকু জানা আছে, তাতে মাথাপিছু বছরে ৪ মণ ১০ সের বা ১৫০ কেজি করেই হিসাব করে নীট প্রয়োজন ধরা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবাংলার বর্তমান মোট ৪ কোটি ৬০ লক্ষ নরনারীর জন্য নিশ্চয়ই ৮৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয় না।

মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ হোল ৮ বছর ও নীচের বয়সের বালক-বালিকা ও শিশু। কাজেই তাদের চাহিদা প্রাপ্তবয়স্কদের অর্ধেক পরিমাণ—এই হিসাব ধরাই যথার্থ ও যথেষ্ট। বাকী ৮০ শতাংশ রেশনিং-এর সংখ্যা অনুযায়ী সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। তাহলে মোট ৪ কোটি ১৪ লক্ষ বয়স্ক ইউনিটের জন্য ১৫০ কেজি করে মাথাপিছু বণ্টনের হিসাব ধরে মোট চাহিদার তথ্য নির্ণয় করা দরকার।

শুধু তাই নয়, শহরের ২৫ শতাংশ লোকের চাহিদা আর গ্রামের চাষী ক্ষেতমজুর এবং অকৃষিবর্গের লোকের চাহিদা এক নয়। শহরের মোট ১ কোটি ১৫ লক্ষ নরনারীকে (৮৯ লক্ষ সাবালক) ২ কেজি করে চাল-গম দিলে বছরে লাগে ১১ লক্ষ টনের কিছু বেশী, আর ১৫০ কেজি করে দিলে লাগে ১৩।১৪ লক্ষ টন।

গাঁয়ের লোকদের বিশেষত চাষী ও ক্ষেতমজুরদের গড়ে বছরে মাথাপিছু তিন কেজির বেশী খাদ্য দরকার। কিন্তু প্রায় ৭০ ভাগ গাঁয়ের লোকের এই পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষমতা নেই। যেটা উৎপাদন করে তার বহুলাংশও সে ভোগ করার সুবিধা পায় না। কারণ, অন্য জিনিস কেনার জন্য খাদ্যশস্য তাকে বাজারে বিক্রী করতে হয়। বেঁচে থাকার তীব্র তাগিদে তাকে কোনরকমে বছরে ৯ মাস অর্ধাহারে কাটাতে হয়। চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই গরীব মানুষ চাল-গম কিনতে পারে না, ভোগও করতে পারে না। এদের গড়ে মাথাপিছু দৈনিক ব্যয় করার ক্ষমতা হোল ৪৪ পয়সা থেকে ৮০ পয়সা। এতে মাথাপিছু দৈনিক

০·২৫ গ্রাম থেকে ০·৩৫ গ্রামের বেশী চাল-গম কেনাও সম্ভব নয়। কাজেই দারিদ্র্যের সীমায় অবস্থানকারী গ্রামের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ বছরে ১১০ থেকে ১২০ কেজির বেশী চাল-গম সংগ্রহ করতে পারে না। এই গ্রামবাসীর ন্যূনতম চাহিদা ১৭৫ কেজির বেশী। কাজেই সরকারী গড় হিসাবে (১৫০ কেজি মাথাপিছু) তার অনেক তলায় এই লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ খাদ্য গ্রহণ করছেন। কাজেই চাহিদার মোট গড় হিসাবে যা ধার্য হয় তার অনেক কম প্রকৃত চাহিদা এই গ্রামবাসীর জন্য।

অবশ্য এই চাহিদার হিসাব করার সময় চাষী, খেতমজুর, চাষের কাজে নিযুক্তির জন্য খোরাকী ও মজুরী বাবদ যে ধান-চাল পেয়ে থাকে তাও তাদের চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করলেও এদের চাহিদার স্তর সরকারী গড় চাহিদার তলাতেই থাকবে। এই সঙ্গে চিঁড়া, মুড়ি ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় চালের হিসাবও চাহিদার সঙ্গে ধরতে হবে। কারণ, শহর ও গ্রামে এর চলন এখনও প্রচুর। একটি নির্ভরযোগ্য হিসাব হোল এই যে, চিঁড়া-মুড়ি, মজুরী ও খোরাকী বাবদ ব্যয়িত চালের পরিমাণ বছরে ৭·১৮ লক্ষ টন হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার খাদ্যের প্রয়োজন ও চাহিদা এক জিনিস নয়। আন্তর্জাতিক পুষ্টির হিসাবে গড়ে প্রত্যহ ১৬ আউন্স খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে আহারের রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী চাহিদার তারতম্য ঘটছে। ক্রয়ক্ষমতাহীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত রাজ্যবাসী প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যশস্য কিনতে পারে না, সংগ্রহ ও ভোগ সম্ভব হয় না। কাজেই কোনও সঠিক হিসাব-তথ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর প্রয়োজন ও চাহিদা ধার্য করা কঠিন। এই অবস্থায় বয়স্ক অর্থাৎ ৮ বছরের উর্ধ্বে সকল বয়সের ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ নরনারীকে বছরে ১৫০ কেজি করে মাথাপিছু বণ্টন করার জন্য প্রয়োজনীয় ৫৫।৫৬ লক্ষ টন চাল-গমের সংস্থান করলেই আর বিপদ থাকবে না। এই রাজ্যেই এই পরিমাণের বেশী চাল উৎপন্ন হচ্ছে। তবুও কেন এত অভাব, এত ঘাটতির আতঙ্ক, কেন্দ্রের সাহায্য সত্ত্বেও বরাদ্দ হ্রাস তার কারণ অন্যত্র।

রাজ্য ফুড কর্পোরেশন আবশ্যক

সম্বটের কঠিন সময়, অশুভ চক্র আমাদের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে চাইছে। অতি মুনাফার লোভে, এই অবস্থাটা বুঝেও সরকার কেন্দ্রের অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা মারফৎ কেন পশ্চিমবঙ্গের সিদ্ধ চাল বেশী দরে কিনে মরশুমে বাজার স্টক করলেন না তা আজও অজ্ঞাত। ফুড কর্পোরেশনের দরে রাজ্যে চাল যখন সংগ্রহ সম্ভব নয়, সারা ভারত জুড়ে যখন অভাব, তখন ভর্তুকি দিয়েও চাল গম কেনা থাকলে তা আজ সরকার শহরে ও গ্রামে রেশনের নির্দিষ্ট মূল্যের কিছু বেশীতে বিক্রী করতে পারতেন। বরাবরই রেশনে চালের দর ১ টাকা ২৪ পয়সা ছিল না। আমেরিকান আতপ তো ১ টাকা ৬৪ পয়সায় রেশনেই বিক্রী করা হয়েছিল। সেই দরে পশ্চিমবঙ্গবাসী যদি আজ সিদ্ধ চাল পেত তাহলে তারা সরকারকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করতেন। কিন্তু এই সুযোগ হারানর পরিণতিতে কৌশলী খাদ্য ব্যবসায়ীর অংশ ও এক শ্রেণীর বড় চাষী ব্যাঙ্কের ঋণের সুযোগ গ্রহণে চালের বিরাট কালোবাজারী করছেন সরকারের নাকের ডগায়। আজকে এই চোরাকারবার বা খোলাবাজারী কারবার বন্ধ করতে গেলে হয়ত সব চাল-গম লুকিয়ে ফেলা হবে। কাজেই সেই ভয়ও সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। এ ছাড়া মনে রাখতে হবে যে, কর্ডনিং প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এফ সি আই'র উপর ভরসা করে থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় পথ নয়। এফ সি আই যখন এখানে চালের দর বেশী বলে কিনবে না, তখন রাজ্য ফুড কর্পোরেশন গড়ে তুলে তার মারফৎ সময় মত উপযুক্ত সংগ্রহ ও সুসম বণ্টনের নতুন ব্যাপক ব্যবস্থা হওয়া দরকার। তাহলে রেশনে সিদ্ধ চাল দেওয়া সম্ভব হবে। ভাল ও সাধারণ মানের দুই দরের চাল দেওয়া যাবে। ক্রেতারাও পছন্দ মত চাল ন্যায্য দরে কিনতে পারবেন।

আর রেশনিং ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। কয়েক লক্ষ ভুতুড়ে কার্ড সরকারী অপদার্থ ও দুর্নীতির জন্য অদ্যাবধি চলছে। তা দূর করা ও খাদ্য দপ্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। বাড়ী বাড়ী চেকিং ব্যবস্থা হওয়াই হল কার্যকর ব্যবস্থা।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ফুড কর্পোরেশন এই রাজ্যে যে গড়ে ২১০ কোটি টাকার (২০ লক্ষ টন) বেশী মূল্যের খাদ্যশস্য সরবরাহ করে তার সঙ্গে সরবরাহ করে অন্তত এক লক্ষ টন খাবার জাতীয় ডুলো-বালি, ভূষি ইত্যাদি। যা মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। কারণ, এফ সি আইর চালের সংজ্ঞায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ময়লা-কাঁকর মিশ্রণ ন্যায়সঙ্গত বলে ধরা হয়েছে। এফ সি আইর ওজনের তো কোন মা-বাপ নেই। এফ সি আইর চাল-গম এক-দশমাংশ এই রাজ্যেই চুরি হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া লেভী ফাঁকি, চাল-কলগুলোর কারসাজি ও অন্যান্য ত্রুটি এবং দুর্নীতির সমস্যা আছে।

আজকে রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য খাদ্য নীতির দুর্বলতম অংশগুলোর সংশোধন এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন যন্ত্র গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া দরকার। খাদ্য সঙ্কটের প্রতিকারে সকল স্তরে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতাও অত্যাবশ্যক।

উপসংহার

খাদ্য-পরিসংখ্যান, উৎপাদন, চাহিদা, বীজ ও অপচয় এবং মজুরী বাবদ ব্যয়িত খাদ্য ইত্যাদির একটা পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার পর আজ এটা বলা অন্যায় হবে না যে—

(১) তিন কেজি হারে মাথাপিছু সপ্তাহে সুসম বণ্টন করার মত খাদ্য পশ্চিমবঙ্গেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রচুর খাদ্যশস্য অপচয় হওয়ায়, চড়া দরে খোলা বাজারে বিক্রীর উদ্দেশ্যে গোলাজাত হয়ে থাকায় কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয়। এবং মোট উৎপাদনের প্রকৃত চাহিদা এবং বণ্টন সংক্রান্ত সরকারী পরিসংখ্যানে প্রচুর ত্রুটি, অসঙ্গতি রয়েছে। (২) রাজ্যের রেশনে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় চাল এই রাজ্য থেকেই সংগ্রহ ও বণ্টনা করা সম্ভব, কিন্তু সংগ্রহমূল্য বাজারের প্রচলিত দর অপেক্ষা অনেক নীচে থাকায় প্রয়োজনীয় চাল সংগৃহীত হয় না। আরও একটি কারণ হোল এই যে, কেন্দ্রীয় খাদ্য কর্পোরেশন, সরকারী প্রশাসন তাদের এজেন্ট ও চালকলের মালিক মারফৎ ধান-চাল কেনার ফলে গরীব চাষীরা প্রয়োজনের তাগিদে অল্প মূল্যেও চাল বিক্রী করতে বাধ্য হয়, আর সম্পন্ন বড় চাষী ধান-চালের লেভী না দিয়ে, লুকিয়ে রেখে ঘাটতি সৃষ্টি করে বেশী দরে তা বিক্রী করে। (৩) ভুতুড়ে রেশন কার্ড মারফৎ এবং এফ সি আইর গুদাম, রেল ওয়াগন ভেঙ্গে ও অন্যান্য কারসাজি মারফৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত চাল-গমের প্রায় ২০ শতাংশ পাচার হয়ে যায় এবং কালোবাজারে সেই খাদ্যদ্রব্য বিক্রী হয়।

গারোহিলের গুন্ডাহাতী

বিশ্বনাথ বসু

'আর পারছি না। যে মৃত্যু আমার সামনে অপেক্ষা করছে তা যে অতি বীভৎস ও যন্ত্রণাদায়ক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আত্মরক্ষার আর উপায় দেখছি না। মূর্তিমান যমদূতে যেন একটি কুৎসিত বিভীষিকার মত সর্বক্ষণ আমাদের পিছনে লেগে রয়েছে। মাত্র একটি শক্তিশালী আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে আমি আজ এই মহা দুর্বিপাকের সামনে অসহায়। অথচ এই মুহূর্তে আমার এস্টেটের অস্ত্রাগারে আছে থরে থরে সাজানো হরেক রকমের আগ্নেয়াস্ত্র। দুইশত কর্মচারীর মধ্যে প্রায় একশত জনই হচ্ছে এস্টেটের দক্ষ অফিসার। তাছাড়া আছে ডে'টেল ও সাহসী পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজের দল। বিষয় সম্পত্তির আয়ও প্রচুর। এ হেন আমি আমার প্রিয় পরিবার পরিজনদের ফেলে এসে এই জংলী কাজে নেমে বহু দূরবর্তী পাহাড়ী অরণ্যের অভ্যন্তরে অতি দুর্ধর্ষ এক বন্যপশুর হাতে বন্দী। কি প্রয়োজন ছিল আমার এই স্বেচ্ছায় অভিযানের? এর পিছনে তো আমার কোন অপরিহার্য অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ ছিল না। তবে?'

অনুতাপে জ্বলছেন লালজী। অসংখ্য প্রশ্ন তাঁর মনে। অসহনীয় চাপ পড়ছে তাঁর স্নায়ুর ওপর। শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিহ্বল তিনি। এ যাত্রায় প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে এই জংলী সখ তিনি সারা জীবনের জন্যই মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন। আর কখনও এই বিপজ্জনক কাজে নামবেন না—এই তাঁর প্রতিজ্ঞা।

উপরোক্ত তথাকথিত 'প্রতিজ্ঞার' উল্লেখসহ আসামের গৌরীপুর রাজ-পরিবারের মেজ রাজকুমার শ্রীপ্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া ওরফে লালজীর মুখ থেকে তাঁর যৌবনের সেই অতি লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার বৃত্তান্তটি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার গত বছর—অর্থাৎ ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে।

মার্চের শেষ থেকে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা মাস দেড়েকের ওপর লালজীর অতিথি ছিলাম আমি হিমালয়ের পাদদেশে ভুটান রাজ্য সংলগ্ন উত্তরবঙ্গ ও আসামের দুর্গম তরাই অরণ্যে তাঁর বুনো হাতী ধরার ক্যাম্পে। এই সময়ের শেষ কয়েকটা দিন কেটেছে আমার গৌরীপুরে তাঁরই বাড়ীতে অতি আনন্দদায়ক পারিবারিক পরিবেশে।

লালজীর বৈঠকখানার আলমারীতে আজও রক্ষিত আছে এই সুবিখ্যাত রাজবংশের বিগত প্রায় দেড়শো বছরের অমূল্য তথ্যসমৃদ্ধ শিকার ডাইরীগুলি। অগাধ জ্ঞান ও আরণ্যক অভিজ্ঞতার অধিকারী লালজী নিজেও। অসংখ্য রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে।

অস্বীকার করিনা, আমি নিজে একজন একনিষ্ঠ 'স্টোরি হাণ্টার'ও বটে। তাই এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহারও করেছিলাম পুরো মাত্রায় যে কয়দিন সেখানে ছিলাম।

সবে কলকাতায় ফিরেছি বিহারের পালামৌ ন্যাশন্যাল পার্কের বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ প্রোগ্রাম সেরে। ঘরে ফিরে বন-পাগল মনটার আমার উড়ো উড়ো ভাবটা কাটেনি তখনও। এমন সময় লালজীর ৩১-৫-৭৩ তারিখের পত্রটা হাতে এল—

লালজী তাঁর পত্রের শেষ কয়েকটি লাইনে লিখছেন—'প্রিয় বোস সাহেব, এবার বাঙ্গালী শিকার হয়নি'

(বর্ষাকালে জঙ্গলে কচি ঘাস গজালে তা খেতে বুনো হাতীর পাল নামে। দাঁড়ায় ফাঁসে বর্ষাকালের সেই হাতী ধরার অভিযানকে বলে 'গাজালী শিকার'। —লেখক।)

তিনি লিখছেন, 'বড় ডাল লাগিতেছে। জঙ্গলে না যাইতে পারিয়া দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।'

বেশ যেন একটু ভারাক্রান্ত মনের অভিব্যক্তি লালজীর চিঠির শেষ কটি লাইনে।

লালজী হামেসা আমার কাছে নিজেকে 'জংলী' বলে পরিচয় দেন। তাই তাঁর পত্রের শেষ লাইন কয়টি পড়ে এই জংলী লোকটির জন্য সত্যই মনটা আমার সহানুভূতিতে ভরে গেল। কিন্তু একটু হাসিও পেল পেছনে ফেলে আসা ১৯৪৫ সালের রোমাঞ্চ-ঘেরা

দুর্গম অরণ্যে সেদিনের সেই সৌখীন অভিযাত্রী লালজীর অস্থির ও বিহ্বল মনের প্রতিজ্ঞার কথা ভেবে।

কিন্তু একথাও তো সত্য যে পরবর্তী-কালে অপ্রতিরোধ্য অরণ্যের হাতছানি লালজীকে কোনদিনই তাঁর গন্ডীবদ্ধ ঘরের মায়ায় আবদ্ধ থাকতে দেয়নি। অবিস্মরণীয় রোমাঞ্চের অফুরন্ত প্রবাহের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিয়ে এসে লালজীর প্রৌঢ় জীবনের অপরাহ্ণ আজ সর্বোতোভাবেই অরণ্য প্রেমে বিভোর। তাইতো কড়জল মাথায় করে এমনকি বর্ষার কয়েকটা মাসের 'গাজালী শিকারে' বেরুতে না পারলে লালজীর দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় এবং পত্র লিখে এবারের সেই দুঃখের কথাটি তিনি আমাকে জানিয়েছেন।

১৯৪৫ সাল। আসাম উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত দীর্ঘ বিস্তৃত গারো হিলের গভীর অরণ্যাঞ্চল। এ অঞ্চলে বুনো হাতী ধরার এবারের মহল ছিল ১৯৪৪ সালের ১ অকটোবর থেকে ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত। লালজীর মূল ক্যাম্প পড়েছে অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিং জেলার সীমান্ত সংলগ্ন ডালু নামক গ্রামের দক্ষিণ দিককার পাহাড়ী ঢলুর গায়ে এক বিক্ষিপ্ত ঢাতালে।

গৌরীপুর দলের এবারকার অভিযানে ছিল একসঙ্গে গড় অর্থাৎ খেদা এবং মেলা শিকারের যৌথ ব্যবস্থা। (পোষা হাতীর পিঠে চড়ে বুনো হাতীর দলের মধ্যে ঢুকে বেছে বেছে কম-বয়সী হাতী দড়ির ফাঁসে ধরাকে বলে 'মেলা শিকার'—লেখক)।

খেদা তৈরী হয়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হাতী চলাচলের দন্ডীর (পথের) মুখে। মূল ক্যাম্প থেকে খেদার দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে। খেদা চালু হয়েছে মহলের সুরু, অর্থাৎ গত বছর অকটোবরের প্রথম থেকেই। কিন্তু অকটোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে খেদায় কোন হাতী পড়েনি। এমনকি এতদঞ্চলে জংলী হাতী চলাচলের কোন হদিসও মেলেনি।

বুনো হাতীর দলকে দূর থেকে সুকৌশলে নির্দিষ্ট দিকে খেদিয়ে এনে খেদার মধ্যে ঢোকাতে হয়। তার জন্য আগে থেকে দরকার তাদের অবস্থান এবং বন-পরিক্রমার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করা। সে কাজে সবদলেই সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত থাকে অগ্রগামী খোঁজারু বাহিনী।

ডালু গ্রামের মূল ক্যাম্পে বিরাট দল-বলসহ তিন মাস বেকার বসে থেকে লাল-জীর দুর্ভাবনা বাড়ছে। বুনো হাতী ধরার জংলী কাজের পিছনে গৌরীপুরের তৎকালীন ধনী রাজপরিবারের মেজ রাজ-কুমারের যুব মনে ব্যবসায়িক লক্ষ্য ও আগ্রহের চাইতে নেশার কৌকটাই ছিল প্রবল। কিন্তু সে কাজে দৈনিক খরচাও প্রচুর। তাই দুর্ভাবনাও স্বাভাবিক।

আসামের গৌরীপুর আজ প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার প্রথম দুই পুত্রের রুচি ও প্রকৃতির মধ্যে দুটি ভিন্নমুখী ধারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনকেই বিশেষজ্ঞ ও কৃতী করেছে। কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির একটি বিশেষ ভাবধারার পথিকৃৎ হিসেবে রাজা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক শিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়ার নাম আজ সারা দেশে যে পরিমাণ সার্বজনীন স্বীকৃতিতে ধন্য ও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, মধ্যম পুত্র প্রকৃতিশ বড়ুয়া অর্থাৎ লালজীর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয়নি। হয়নি তার কারণ প্রকৃতিশ বড়ুয়া প্রকৃতি-গতভাবেই আজীবন প্রচার বিমুখ লোক।

আমি যতটা জেনেছি ও দেখেছি তাতে একথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিচারে লালজীর মত সমপর্যায়ের হস্তী-বিশারদ ব্যক্তি বর্তমানে এদেশে খুব কমই আছেন। হস্তী-রূপী বিশালদেহ বন্যপশুটি সম্বন্ধেই লালজীর অসীম কৌতূহল শৈশব থেকেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই অরণ্য দানবের ইতিবৃত্তে মহাজ্ঞানী হয়েও তিনি বরাবর নীরবে নিভৃতেই রয়ে গেলেন। কখনও তাঁর অগ্রজের মত স্বচেষ্টায় আপন পান্ডিত্যে আত্মপ্রকাশ করলেন না।

সদা হাস্যময়, নিরহংকার, বন্ধুবৎসল লালজীর সংস্পর্শে দেশী বিদেশী যে আসে সেই সুখী হয়—আপন হয়। তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু তিনি সর্বপ্রকারের চটকদারী প্রচার-মাধ্যমকে এড়িয়ে তাঁর সখের আরণ্যক জীবনের পরম আত্মতৃপ্তির মধ্যে চিরদিন মগ্নগুল হয়েই রইলেন। তাই না বলে পারি না—লালজীর বন্ধুত্বে সৌভাগ্য-বান হয়েও তাঁর জীবন আমার কাছে আজও এক মহা বিস্ময়।

জানুয়ারী মাসের হাড় কাঁপানো শীতের সন্ধ্যা। তাঁবুর সামনের ধুনিটা উসকে দিয়ে তা থেকে চিমটের মাথায় এক টুকরো আগুন তুলে নিয়ে লালজী একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ আয়েস করে বসলেন। গড়ের ব্যবস্থাপনায় যারা ছিল তাদের আট জনের একটি খোঁজারু দল হাতীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে অনেক দিন হোল। তারা এখন কোথায় এবং কবে কি খবর নিয়ে ফিরবে সেই চিন্তাই লালজীর মনে প্রতিদিন ঘুর-পাক খায়। কিন্তু সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লালজীর মনে ভাবান্তর ঘটে। নিবিড় বনের নির্জনতা যেন নিকষ কালো পর্দার আড়ালে থেকে তখন লালজীর সঙ্গে কথা বলে। সে কথা বোঝার মত মন ও শোনার মত কান থাকা দরকার। লালজীর তা আছে বলেই প্রতিদিন তিনি সান্ধ্যে সেই আঁধার-ঘেরা আরণ্যক রূপান্তরের প্রতীক্ষায় থাকেন।

রাতের শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে ধুনির উষ্ণতার আমেজে চোখ বুজে কান খাড়া করে লালজী আড়ি পেতে অপেক্ষা করেন। গভীর রাতের বন ও বন্যরা কি ভাষার ইঙ্গিত ইসারায় পারস্পরিক ভাব বিনিময় ও সাবধানী সাড়ার আদান-প্রদান করে তা জানবার অসীম কৌতূহল তাঁর।

প্রতিদিন দু-বেলা কিছু সময় পোষা হাতীদের নিজের হাতে খাওয়ানো লালজীর দৈনন্দিন অবশ্য করণীয় কার্যক্রম। সেদিনও বিকেলের সে কাজ সেরে এসে লালজী ধুনির পাশে বসে সবে একটি সিগারেট ধরিয়েছেন—এমন সময় খোঁজারু দলের দুজন ফিরে এসে খবর দিলে যে এখান থেকে পশ্চিমে বহু দূরে গারো হিল এবং মৈমনসিং ও রংপুর জেলার সংযোগস্থলে একটি গ্রাম আছে—নাম মহেন্দ্রগঞ্জ। গড় থেকে সেই গ্রামের দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ মাইল। ঐ মহেন্দ্রগঞ্জ থেকে গারো হিলের জঙ্গলের চার মাইলের ভেতর বিরাট একদল হাতীর খোঁজ পাওয়া গেছে। কিন্তু তাদের তাড়িয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সত্বর কোন ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বিলম্বে হাতীগুলো এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারে। তবে সে দলের রক্ষক হচ্ছে একটা গুন্ডা হাতী। খোঁজারুরা সভয়ে একথাটাও জানাতে ভুললো না।

খবর শুনেই লালজীর মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কালবিলম্ব না করে পরদিন ভোরেই তিনি রওনা হওয়া মনস্থ করলেন। এবং দলবলকে রাতের মধ্যে গোছগাছ করে নিতে বললেন।

পূর্ব সিদ্ধান্ত মত ফর্সা হওয়ার আগেই গৌরীপুর এস্টেটের ভেটারনারি সার্জেন ওরফে 'ভেট'এর ওপর মূল ক্যাম্পের দায়িত্ব রেখে সাতটি পোষা 'কুনকি' হাতী সহ ফাঁদ, মাহুত, কামলা (হাতীর খাবার দেয় যে) ও অন্যান্য লোকজন এবং দুজন খোঁজারু গড়ওয়ালা—মোট চব্বিশজনের একটি দল নিয়ে লালজী বহুদূরবর্তী মহেন্দ্রগঞ্জের উদ্দেশ্যে পঞ্চাশ মাইলের দুর্গম কষ্টসাধ্য পথে যাত্রা শুরু করলেন। আজীবনের বিশ্বস্ত অনুচর ভবেনও এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী। একমাত্র রাইফেলটি লালজী 'ভেট'এর হেফাজতে ছেড়ে গেলেন ক্যাম্পের নিরাপত্তার প্রয়োজনে। নিজের সঙ্গে নিলেন শুধু কুড়ি পঁচিশটি গুররা ও এল জি জাতীয় গুলি সমেত পুরোনো দোনলা বন্দুকটি।

বিগত তিন মাসের ব্যর্থ প্রতীক্ষা-জনিত অসহিষ্ণুতার মধ্যে যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে স্বাভাবিকভাবেই লালজীর মনে একথা বিন্দুমাত্র কল্পনায় আসেনি যে পূর্বোক্ত বুনো গুন্ডাটার দুর্ধর্ষ আক্রমণে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই পথি মধ্যে তাঁকে দলবলসহ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হতে এবং নিরাপত্তামূলক উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে অসহায়ভাবে সম্পূর্ণরূপেই অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করতে হবে।

সময় ও পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জরুরী। লালজী তাই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে পঞ্চাশ মাইলের দুর্গম পাহাড়ী বনপথ মাত্র তিন দিনের মধ্যে পাড়ি দিয়ে এসে মূল খোঁজারু দলের সঙ্গে মিলিত হলেন।

এলাকাটির জমি সরকারী খাসের। কিন্তু জঙ্গল সরকারী রিজার্ভ জঙ্গল নয়। মধ্যে মধ্যে যেখানে জল আছে সেখানেই আট দশটি ঘর নিয়ে একটি গ্রাম। গ্রামবাসীদের অধিকার আছে এখানকার জঙ্গল এলাকায় 'জুম' চাষ করবার। গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে। ঠাসা মুলি বাঁশের

জঙ্গল। মহেন্দ্রগঞ্জের সংলগ্ন দ্বিতীয় গ্রাম ছেংগাপাড়া। এই দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পরিষ্কার জলের ঝোরা আছে। উপযুক্ত মনে করে এই ঝোরার পাড়েই লালজী অস্থায়ী ক্যাম্প বসাবার নির্দেশ দিলেন। প্রতিটি তাঁবুর সামনে জ্বললো ধুনির আগুন। ক্যাম্পের গোছ-গাছ, পোষা হাতীদের তদারকি, রান্নাবান্নার ব্যবস্থা প্রভৃতি হবেক রকমের কাজের চাপে গোটা ক্যাম্পের কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেল।

ধুনির সামনে একটি বেতের মোড়ায় সিগরেট মুখে লালজী বসে। পাশে ভবেন ও বড়-ফাঁদি। ওদিকে ধুনিকে অর্ধবৃত্তা-কারে ঘিরে গড়ওয়ালা খোঁজারু দলের সবাই উবু হয়ে বসে আগুন পোহাচ্ছে ও লালজীকে বুনো হাতীর দলটির বৃত্তান্ত শোনাচ্ছে। মাদী, মদ্দা, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বিরাট দল। তবে গুন্ডাটার হালচাল ভাল নয়। বড্ড একরোখা মনে হয়। কথাটা বলে ওরা একটু নড়ে চড়ে বসে। লালজী তাদের আশ্বস্ত করেন।

পুবে ক্যাম্পের পেছনে ঝোরা। সামনে পশ্চিমে মুলি বাঁশের সবুজে ঢাকা দীর্ঘ বিস্তৃত ঢেউ খেলানো পাহাড়ী টিলার সারি। নাক বরাবর সব চাইতে উঁচু টিলার নেড়া শিরদাঁড়াটা 'জুম' চাষের জ্বলন্তের সাক্ষী। পেছনে তার অস্তগামী গোধূলি সূর্যের সোনালী আভা। মুলি বাঁশের ঝাড়ে হিমেল হাওয়ার দোলা।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। কাপটা খালি করে লালজী মুখে খোঁজারু দলের খবরাখবর নিচ্ছেন আর আড়চোখে নেড়া পাহাড়ের শিরদাঁড়াটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন।

বড় ফাঁদি বলে—'আজ্ঞে, তাহলে কি কাল সকালেই দড়ি কাছি নিয়ে বুনোর দলে ঢুকে একবার চেষ্টা চরিত্তির করে দেখবো দু-একটাকে তোলা যায় কিনা?'

না—খেদিয়ে গোটা দলটাকে গড়ের দিকেই চালান দেব।"

বড় ফাঁদি তার প্রশ্নটা পেশ করে উত্তরের আশায় উসখুস করে। কিন্তু লালজী নিশ্চুপ। কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁর তখন পাহাড়টার মাথায় নিবদ্ধ।

'দ্যাখতো ভবেন, টিলার মাথায় ফাঁকায় হাতীর লাইন এগোয় নাকি রে?'

উপস্থিত সবাই একসঙ্গে চোখ ঘোরায় লালজীর দৃষ্টি বরাবর।

কি অভাবনীয় কান্ড? টিলার মাথার জুম চাষের ফাঁকা জমিটার ওপর দিয়ে একপাল হাতী হেলে দুলে লাইন দিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। পেছনের রক্তাভ ঊর্ধ্বাকাশের পটভূমিকায় তাদের ধূসর বর্ণের দেহ পরিষ্কার দেখা যায়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। এক দুই তিন করে একষট্টিটি বিশালদেহী বুনো হাতীর এই সুশৃঙ্খল সন্ধ্যা শোভাযাত্রা ক্যাম্পের সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করলো। লালজীও বিস্মিত বিমুগ্ধ।

জলভরা ঝোরার পাড়ে কচি ঘাসের জমি। ক্যাম্পে শুয়ে গভীর রাতে হাতী চলাচলের সাড়ায় বোঝা গেল বুনোর দলটি লোভে লোভে এসে নেমেছে ঐ ঘাস জমিতে।

বড় ফাঁদি তার বিছানায় শেষ রাত থেকেই উসখুস করছে। পুবে ফর্সা দিতেই খোঁজারু দলের কয়েকজন ওদিক পানে কিছুটা উঁকি ঝুঁকি দিয়ে এসে জানালে যে দলে কম বয়সী বেশ কয়েকটা হাতী আছে।

ভোরে লালজী উঠতেই শলা-পরামর্শ করে ঠিক হোল যে হাতীর মূল দলটাকে পুবে খেদার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেইটেই আসল কাজ যার জন্য এতদূর আসা। কিন্তু তার আগে এখানে ঝোরার পাড়ে, যদি সম্ভব হয়, কয়েকটা ছোকরা হাতীকে মেলা-শিকারে পাকড়াও করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

বড় ফাঁদির নেতৃত্বে পোষা সাতটি 'কুনকী' হাতী সহ ১৪ জনের দল তৈরী হোল। গড়ওয়ালারা আটজন তাদের তিনটি বন্দুকসহ সঙ্গী হোল। লালজীও প্রস্তুত হয়ে এলেন। এই অভিযানে তিনিও সক্রিয় অংশ নিতে চান। তিনটি মাস বৃথাই গিয়েছে। এই প্রথম সুযোগ যেন ব্যর্থ না হয়। লালজীর মনে নতুন আশা ও উৎসাহের চাঞ্চল্য।

হাওয়ার গতি বুঝে সুসজ্জিত দল নিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে লালজী জঙ্গলে ঢুকলেন। বড় ফাঁদির বক্তব্য হচ্ছে—গুন্ডাটা দলের কোন দিক পাহারা দিচ্ছে বুঝে নিয়ে তবে এগুতে হবে। খোঁজারুদের নির্দেশ দেওয়া হোল তারা যেন মাঝে মাঝে গাছে উঠে গুন্ডাটার অবস্থান এবং বাচ্চা হাতীগুলোর চলাচলের খবর ইশারায় জানায়। নির্দেশমত খোঁজারুরা জানালে যে—সেই বিরাট দলের হাতীগুলো ঝোরার পাড় বরাবর বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে একমনে চরে বেড়াচ্ছে। গুন্ডাটা এদিকে নজরে আসছে না।

যাই হোক—খোঁজারুদের ইশারায় ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ও নির্ভুল পথে এগিয়ে গুন্ডাটাকে এড়িয়ে অতি সহজে ঝটপট বাচ্চাদের চারটেকে ধরে ফেলা গেল।

কিন্তু এতে তখনকার মত হাতীর দলে কোনরূপ চাঞ্চল্যও দেখা গেল না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হোল দড়ি-দড়ার ধরপাকড়ের ঘটনাটা কচি ঘাসে উদর পূর্তির ব্যস্ততা ও অন্যমনস্কতার মধ্যে হাতীরা বিশেষ করে বাচ্চাগুলোর মায়েরা যেন অনুধাবনই করতে পারেনি।

ফলে আসল কাজ হাসিল করে হলা বন্দুকের শব্দে উত্যক্ত করতেই গোটা দলটাই হন্তদন্ত হয়ে সামনের টিলা টপকে আরও তিন তিনটে খাদ পেরিয়ে প্রায় চার মাইল পুবে চলে গেল। গড়ওয়ালারা কিছু দূর তাদের পিছু ধাওয়া করে গিয়ে ফিরে এসে জানালে যে হাতীরা পুবেই এগুচ্ছে। খবরে সবাই খুসী। এদিকে চারটি হাতীও ধরা পড়লো, ওদিকে দলটি যেদিকে আশা করা গিয়েছিল সেই গড়ের দিকেই এগুলো।

১৫ই আগস্ট পূর্বঘোষিত নির্দিষ্ট দিনেই প্রকাশিত হচ্ছে—

শেকস্‌পীয়র রচনাবলী

ঝরঝরে বাংলায় শেকস্‌পীয়রের সবকটি নাটক, সনেট ও কবিতার আক্ষরিক অনুবাদ, সঙ্গে সুচিন্তিত মূল্যবান ভূমিকা ও জীবনী। রেক্সিন-বাঁধাই ৩ খণ্ডের মূল্য ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন; বাকী টাকা প্রতি খণ্ড বই নেবার সময় ৮ টাকা করে দিতে হবে।

ম্যাক্সিম গোর্কি রচনাবলী

কালজয়ী মানবদরদী মহান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির সবকটি শ্রেষ্ঠ রচনার সাবলীল বাংলা অনুবাদ মূল্যবান ভূমিকাসহ ৩ খণ্ডে প্রায় ২৫০০ পাতায় প্রকাশিত হচ্ছে। মোট মূল্য ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন। মনি অর্ডার পাঠানো ও গ্রাহক হবার ঠিকানা:

রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন ॥ ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ (পূরবী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাঝে)

সঞ্চয়ী পরিবারই সুখী পরিবার

আপনার নিজের বার্দ্ধক্যের ও পরিবারের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য এখন থেকেই সঞ্চয় সুরু করুন।

'পিয়ারলেস'-এর সহজ ও বিশেষ লাভ-জনক সঞ্চয় পরিকল্পনায় যোগ দিয়ে ছেলেমেয়ের শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান ক'রে রাখুন। বিশদ বিবরণের জন্য আজই কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা নিকটবর্তী এজেন্টের নিকট খোঁজ নিন।

'পিয়ারলেস'-এর সঞ্চয় পরিকল্পনায় ইতি-মধ্যেই দুই লক্ষাধিক ব্যক্তি যোগদান করেছেন।

— বিনা খরচায় —

দুর্ঘটনা এবং কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যু-বীমার সুযোগ নিন—

"পিয়ারলেস"-এর মাধ্যমে সঞ্চয় করুন।

PRASA

দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ • (স্থাপিত ১৯৩২)

রেজিঃ অফিস:- পিয়ারলেস হাউস

৫/২, ফকির দে লেন • কলিকাতা-১২

গভঃ সিকিউরিটিতে লগ্নী-এক কোটি টাকার ঊর্দ্ধে (Face Value)

এতবড় একটা বুনোর দল তাদের বাচ্চাদের ফেলে এমন নির্লিপ্তের মত পিছু হটলো। ব্যাপারটা বেশ বেখাপ্পাই ঠেকে। আর সে কারণে বড় ফাঁদির মনটাও যেন কেমন কেমন করে।

বন্দী হাতী চারটির মধ্যে একটা ছিল শিশু হাতী। মা ছাড়া হয়েই সে সমানে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে। আরণ্যক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়ে সে হয়ত ইতিপূর্বে মানুষের মুখ দেখেনি। মুখোমুখিও হয়নি হয়ত কখনও সেই মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত কূট কলা-কৌশলের। পৃথিবীর প্রথম আলো তাকে যে সবুজের সমারোহ দেখিয়েছে, হস্তিনী মায়ের নিবিড় সংস্পর্শ থেকে মমতাময়ী প্রকৃতি মায়ের যে মন-জুড়ানো স্নেহের স্বাদ সে পেয়েছে তা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চায় না; চায় না বলেই সে পা চালায়। কিন্তু পারে না। চার পা তার বাঁধা।

'এরা করবে? কেনই বা আমাদের এরা বাঁধলো? কি এদের মতলব?'

এত সব প্রশ্নের উত্তর বোঝা শিশু হাতীর বুদ্ধিতে কুলোয় না। না কুলোলেও এটা সে বিলক্ষণ বুঝেছে যে তার চলবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যার জন্য এখন তার খুবই কষ্ট। আর এই কষ্টের সময় মায়ের অভাব তার অবোধ শিশু মনকে আরও বেশী আকুল করে তুলেছে। তাই সেই আকুলতা সে তার অবোধ্য বন্য ভাষায় সারাদিনই ব্যক্ত করেছে।

দিন গেল—রাত এল।

'এই সেই রাত যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাঘেরা তার আশপাশে ছুঁত ছুঁত করে ঘুরে বেড়াতো।' সেই সব রোমাঞ্চের কথাগুলো শিশু হাতীর কচি মনে একে একে উদয় হয়। তার বেশ মনে আছে—

'মা তখন তাকে নিজের দেহ দিয়ে আড়াল করে আগলে রাখতো। কোন বাঘ বেশী টাইটাই করলে দলের সঙ্গীরাও রুখে এসে মায়ের সাহায্যে দাঁড়াতো। একবারতো এক নাছোড়বান্দা বাঘকে মা বেগতিক দেখে গাছের ডাল ভেঙ্গে বাগিয়ে নিয়ে খোঁদিয়ে দিয়ে এসেছিল বহুদূর পর্যন্ত। আর একবার কি মজাটাই না হোল। এক ব্যাটা বেয়াড়া বাঘ তো কয়েক মাইল ধরে আমার পিছু নিয়েছে। মা যত আমাকে এদিক-ওদিক করে তার দেহের আড়ালে রাখে বাঘ ততো ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে এসে আমাকে তাক করে পাযতারা ভাঁজে। অমাবও ভয় করছে, মাও স্বস্তিতে চরতে পারছে না। কতক্ষণ আর এভাবে চলতে পারে? শেষ পর্যন্ত যখন দেখা গেল যে সত্যিই বাঘটাকে রোখা দায়, তখন মা মুখে একটা বিপদের সংকেত করলে। অমনি দলের সবাই রুখে এসে দু-চারজনকে মায়ের সঙ্গে আমার পাহারায় রেখে অন্যরা ছুটে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বাঘটাকে ঘিরে ফেললো। আটকা পড়ে বাঘের সে কি তর্জন গর্জন! চারিদিক থেকে সবার পায়ের দলাই মলাইতে ঝোপের ঘের যখন ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে এল, বাঘ বেচারাও তখন ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। হস্তিতম্বিতে ভয় পাবার বান্দা এরা নয় বুঝে কিছু সময় ঘাপটি মেরে থেকে কোন এক ফাঁকে একজনের পেটের তলা দিয়ে সটকে পড়ে ল্যাজ গুটিয়ে এক ছুটে পগার পার। সন্ধ্যে থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত সেদিন এই ঝামেলার মা আর আমিতো না খেয়ে না দেয়ে একেবারে নাজেহাল।'

রাত যত বাড়ে কত কথাই না শিশু-হাতীর মনে পড়ে। কিন্তু আজকের এই ধরনের ঝুট ঝামেলায় সে আগে কখনও পড়েনি। চার পা আটকা পড়ার ব্যাপার-স্যাপার তার ভাল লাগছে না। হাঁটার চেষ্টায় টানাটানিতে ব্যথায় পা টাটাচ্ছে। ভয়ও বাড়ছে। এই সময় দলবল নিয়ে মা যে কোথায় গেল? সারাদিন ধরে ডাকা-ডাকিতেও শিশু-হাতী তার মায়ের কোন সাড়া পায়নি।

'আচ্ছা, মা যখন দেখছে আমি সঙ্গে নেই, তখন সে নিজে একটু খুঁজে পেতেও-তো দেখতে পারতো।'

অভিমানে গুমরে উঠছে শিশু-হাতীর মনটা।

পেছনে বিপদের সাড়া পেয়ে সাত-সকালে হন্তদন্ত হয়ে দলের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্বে চলে আসতে হয়েছে। পেছন ফিরে দেখার সময় ছিল না। তবে এই ধরনের পশ্চাদপসরণের সময় সবাই একসঙ্গে থাকবে এই হচ্ছে নিয়ম। থাকেও সবাই। কারণ, তাড়াহুড়োয় পা চালাতে গিয়ে খোঁজাখুঁজির সময় থাকে না কারো। এক্ষেত্রে সে-সময় ছিলও না সত্যি। কারণ, দলের ওপর এ-ধরনের বিপদ এই প্রথম। তুমুল হৈ-হট্টগোলের মধ্যে মরিবাঁচি করে এক ছুটে এতটা পাহাড়ী জঙ্গল ঠেলে এসে সবাই তাই এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু বাচ্চাটারতো পেছতে এত দেরী হওয়া উচিত নয়। একেবারে দুধে-পোষ্য শিশু না হলেও মা ছাড়া হয়ে থাকবার মত বয়স তার হয়নি এখনও—যদিও দলে ওর মত ছোট বয়সের মাতৃ-নির্ভরশীল শিশু আর নেই।

হস্তিনী মায়ের উদ্বেগ বাড়ে। মনও কেমন করে। মূলি বাঁশের ঠাসা জঙ্গলে ভরা খাদের অনেকটা জায়গা নিয়ে গোটা দলটা ছড়িয়ে আছে। বাচ্চাটা হয়ত এর মধ্যেই কোথাও ঘুরপাক খাচ্ছে। খুঁজে দেখা যাক।

মা সমানে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বাঁশবনে বাচ্চার খোঁজে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে। কেউ বলতে পারে না বাচ্চাটার কথা।

দলের বড় মাতব্বর হাতীদের স্বভাব হচ্ছে সামনাসামনি বিপদে তারা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসে বটে, কিন্তু দলের সংখ্যা অর্থাৎ কে রইল বা গেল, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। নবাগত কেউ দাঁতাল হলে দলের রক্ষক ও মাতব্বরদের মনে কৌতূহল জাগে। প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হলে লড়ালড়িও হয়ে যায় এক হাত। কিন্তু মাতৃনির্ভরশীল বাচ্চা দলছুট হলে সেক্ষেত্রে তার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও দায়-দায়িত্বটা একমাত্র হস্তিনী-মায়ের ওপরই বর্তায়। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতিগত এই ধরন-ধারনটা পশু-পক্ষীর মধ্যে একই রকমের

দিনের শেষ। খাদের জঙ্গল এলাকাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও বাচ্চাটার পাত্তা মিললো না। এদিকে দলের আবার রাতের সফরে বেরুনোর সময় হোল। তারা তো এগুচ্ছে খাদ বরাবর সামনের দিকে। কি করা এখন?

শিকারীরা চলেছে

'বাচ্চা তো নিশ্চয়ই সকালের ঝামেলার সময় কে-পথে ছিটকে গিয়ে দিক ভুল করেছে। অচেনা এলাকার সারাদিন হয়ত সে সমানে জংগলের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্ধ্যার অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে। এই সময় কোন বাঘের সামনে পড়লে আর রক্ষে নেই। রক্তলোলুপ ঐ নখদন্তীদের শক্তি সাহস ও হিংস্রতার কথা মনে হতেই সন্তান-বৎসলা হস্তিনী মায়ের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। দোমনাভাবে সে দলের লাইনের সংগে কিছুটা এগোয় আবার থামে। কাতর নয়নে পেছনে তাকায়। হাওয়ারচাপে জংগল নড়ে—শব্দ ওঠে। মা ভাবে—ঐ বুঝি আমার বাচ্চা ফেরে?'

সকালে ঘাসবনে গণ্ডগোলের পর থেকে সারাদিন পেটে দানাপানি পড়েনি। সঙ্গীরা বাঁশবনে যা হোক কিছু খেয়ে নিয়েছে। কিন্তু সন্তানের চিন্তায় হস্তিনী মায়ের ক্ষুধা-তৃষ্ণার হুঁস ছিল না।

সঙ্গীদের লাইনের পেছনটা এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। এই মাত্র খাদের সামনের বাঁকটা ঘুরে গেল। দোটানায় দুলছে মায়ের মন। দু'-একটা হাঁক ছাড়লে হয় না? বাচ্চাটা যদি নিকটবর্তী কোন এলাকায় থেকে থাকে, কানে গেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে।

হস্তিনী-মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সংকেত পাঠিয়ে দিয়ে কান খাড়া করে থাকে। একবার দু'বার, তিনবার। বাচ্চার কোন সাড়া নেই। নিজের গলার আওয়াজটাই শুধু চারিদিকের পাহাড়ের কঠিন বুকে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনির কোরাস তুলে বার বার ফিরে আসে নিজের কানে।

পাহাড়ের দেওয়ালগুলো বোধহয় শব্দ আটকাচ্ছে। তাই হয়ত হস্তিনী-মায়ের জোরালো গলার ডাক যথাস্থানে পৌঁছলেও শিশু-সন্তানের ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর খাদের নীচে নামছে না।

সফরব্রত দলের অর্ধশতাধিক হাতীর জংলী দাপট ওদিক থেকে এখনও কানে আসছে। খুব বেশী দূরে এগোয়নি ওরা। মনে হয় এক জায়গায় চরছে। হয়ত খাবারের ভাল জায়গা ওটা। কাজেই বাচ্চার খোঁজে কিছু সময় টহল দিলেও দলটা হয়ত আপাতত নাগালের বাইরে যাবে না। উদ্বেগাকুল মায়ের প্রাণ আশায় বুক বেঁধে ও পা চালায় সকালের তাড়া-খাওয়া ঘাস-বনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমমুখী ফিরতি পথে।

টানাটানি, দাপাদাপি কোন কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না হস্তী-শিশু। মায়ের উদাসীনতায় মনে অভিমান থাকলেও এই বিপদ সেই মন কিন্তু মাকেই বেশী করে কাছে পেতে চাইছে। বলা যায় না মা হয়ত জংগলে ডাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। শিশু-হাতী প্রাণপণ ডাকের পর ডাক ছাড়ে। ও ত সে-ডাক তার মায়ের কানে পৌঁছয়।

হাড়-কাঁপানো শীতে জড়োসড়ো হয়ে ধুনির পাশে বসে আগুন পোহাচ্ছিল হাতীর পাহারাওয়ালারা। বাচ্চা হাতীটার চেঁচামেচিতে কান ঝালাপালা। তাকে শান্ত করানো যায়নি সেই সকাল থেকে। খাওয়াতে গেলে শুঁড়ের ঝাপটা মারতে চায়। মহা ঝামেলায় পড়া গেছে যাহোক। পাহারাওয়ালারা বিব্রত। বিব্রত লালজী ও ক্যাম্পের অন্যান্যরাও। বড় ফাঁদি শুধু বিব্রত নয়, সন্ত্রস্তও বটে। জংলী হাতী ধরার পেশায় সারা জীবন কাটিয়ে মন তার আজ এমনই সংবেদনশীল যে, বিপদ আপদের সম্ভাবনার আঁচ আগে থেকেই তার অন্তর্মনে অস্বস্তি জাগায়। সেই অস্বস্তিতেই তার সারাটা দিন কেটেছে।

দুর্লক্ষণের ইঙ্গিতবাহী হস্তী-শিশুর গলা ফাটানো চীৎকারে বৃদ্ধ ফাঁদি প্রথম রাতে তো এক মুহূর্তের জন্যও দুই চোখের পাতা এক করতে পারেনি। তাঁবুর মধ্যে কম্বলের নীচে শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে।

নিঝুম রাতের শিশির ভেজা পাতা থেকে জল পড়ে টপ টপ টপ। ঝিঁ-ঝি পোকার একটানা ঝিরি ঝিরি ডাকের একঘেয়েমি অন্ধকারের নিবিড়তাকে যেন ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়ে আরও জমাট ও শিহরণশীল করে তুলেছে।

বাচ্চাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। তার ধরা গলার ভাঙা স্বর তীক্ষ্ণ অথচ কর্কশ সুরের রেশ তুলে মাঝে মাঝে সরব হচ্ছে—আবার ঝিমিয়ে পড়ছে। গহনবনে রাতের রোমাঞ্চকর পরিবেশে সরব ও নীরবতার মধ্যবর্তী সময়টা বড় অসাড় ও ভয়াবহ ঠেকে। ঠেকে বলেই পাহারাদাররা কান খাড়া করে থাকে। সে-কানে মাঝে মাঝে ধরা পড়ে দূর থেকে ভেসে আসা বিশেষ ধরনের একটা তীক্ষ্ণ টানা আওয়াজ। অভ্যস্ত কানে সে-আওয়াজ সনাক্তকরণে অসুবিধা হবার কথা নয়। তার তাৎপর্য বুঝতেও ওদের দেরী হয় না। তাই ধুনির আগুন উসকে দিয়ে পাহারাওয়ালারা সতর্ক হয় ও একটু নড়েচড়ে বসে।

মাঝ-রাতে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল। হঠাৎ বড় ফাঁদি ধড়ফড়িয়ে বিছানায় উঠে বসলো।

'কে গো তোরা বাইরে?'

—কারা জানি বাইরে ফিসফিসিয়ে কথা বলে—।

'স্বপ্ন দেখিনি তো?'

বড় ফাঁদির দোমনা ভাব। তবু ব্যাপারটা পরখ করে দেখা দরকার। তাঁবুর পর্দা ঠেলে সে বাইরে আসে। হাতীর পাহারাওয়ালারা দু'জন দাঁড়িয়ে।

'কি খবর রে?'—বড় ফাঁদি কাঁচা ঘুমের চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করে।

ওরা ফিসফিসিয়ে খবরটা দেয়। বড় ফাঁদিও কান খাড়া করে শোনে আওয়াজটা। জংলী হাতীর ডাকই তো বটে। আর ও-ডাকের অর্থ ওর জানা। ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। লালজীকে খবর দেওয়া হোল। ক্যাম্পের লোকজনও সব জেগে গেল। সবাই শুনলো বহু দূর থেকে ভেসে-আসা সেই বংহিত আওয়াজ। কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে এলোমেলো প্রতিধ্বনির ভিড় কাটিয়ে সে-আওয়াজের নির্দিষ্ট দিক নির্ণয় করা সম্ভব হলো না। সহজেই সবার বোধগম্য হোল যে, একটা অশান্ত ও উত্তেজিত জংলী হাতী চড়াই-উৎরাই ভেঙে সারা বনাঞ্চল চুঁড়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে তার আওয়াজ কানে আসতেই বন্দী হস্তী-শিশুরও উৎসাহ বেড়েছে। সে তার ভাঙা গলায় আবার সমানে চেঁচাচ্ছে।

উৎকণ্ঠার রাত্রি অতিক্রান্ত প্রায়। বড় ফাঁদি ভাবে কোন একটা অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কা করে কাল সকাল থেকেই মনটা যে তার অস্থির হয়ে উঠেছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে সেটা নেহাৎ অমূলক নয়।

পরিস্থিতি লালজীরও চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তিনি ভবেনকে তাঁর তাঁবু থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আনতে বলে ধুনির পাশে বেতের মোড়ায় গিয়ে বসলেন। পৌষের রাত। জমাট শীত। গা মাথা কম্বলে ঢেকে শুধু কান দুটো খোলা রেখেছেন তিনি। ভ্রূ কুঞ্চিত-দুশ্চিন্তার লক্ষণ।

একটি সিগরেট ধরিয়ে নিয়ে লালজী জিজ্ঞেস করলেন—জংলীটার আওয়াজ কোন্ দিক থেকে আসছে ওরা কিছু অনুমান করতে পারে কিনা? ভবেনরা তখনও স্থির নিশ্চিত নয়। লালজী বড় ফাঁদিকে ডেকে পাঠিয়ে নিজে চোখ বুজে মাথা নীচু করে কিছু সময় চুপ করে বসে রইলেন। সবাই জানে এতে শব্দের দিক ও দূরত্ব বোঝার সুবিধে হয় এবং তিনি নিজে ও বিষয়ে যথেষ্টই পারদর্শী। জংলীটার ডাক তখনও মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

বড় ফাঁদি পাহারাদারদের সঙ্গে ওদিকে বাচ্চাটাকে খাওয়ানো ও তার ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধের চেষ্টায় ছিল। খবর পেয়ে লালজীর কাছে এসে আগুনের তাপে একটু আরাম করে বসলো। তারও চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ।

লালজী মুখ তুলে চাইলেন। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সূচীভেদ্য অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুখের ধোঁয়াটা ধীরে ধীরে দমভরে একটু ত্যারসা লাইনে ছুঁড়ে দিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর বক্তব্য শোনার জন্যই সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ঠিক এই সময় দূরের হাতীটা আর একবার ডাকলো।

'ডাকটা পুব দিক থেকেই আসছে—কি বলো হে ফাঁদি?'

'আমি এখনও ঠাওর করতে পারছি না কর্তা।'

খাটাও ভয়েল থেকে খাটাও ভয়েল ক্রেতাদের জন্যে
জরুরী খবর!

এই প্রতীক চিহ্নটি ঐতিহ্য ও সেরা গুণবত্তার গ্যারাণ্টি।

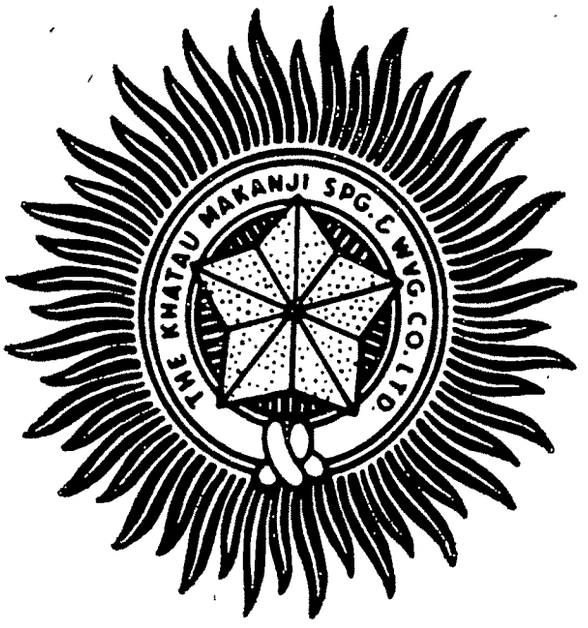

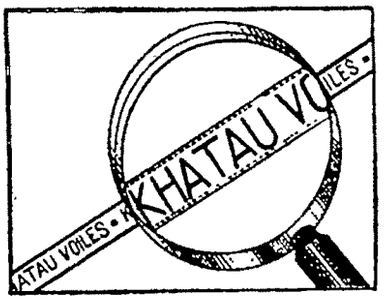

আপনাদিগকে শ্রেষ্টতম দ্রব্য সম্ভার পরিবেশন করার জন্য আমদানি করা সুক্ষ্মতম তুলো ও অন্যান্য সেরা মালমশলা দিয়ে তৈরী করা আমাদের যাবতীয় কাপড়ের প্রতি মিটারে 'খাটাউ ভয়েল' ছাপটি দেখে নেবেন। এতে আপনাদেরই স্বার্থ রক্ষা হবে।

নিকৃষ্টতম কাপড়ে আমাদেরই প্রিন্টের নকল বাজারে চলতি রয়েছে। এই সস্তা নকল হতে সাবধান হউন।

তাই, 'খাটাউ ভয়েল' ছাপটি দেখে নেবেন—এতে আপনাদের স্বার্থও রক্ষা পাবে আর আমাদের মানও বজায় থাকবে।

আমাদের মাননীয় ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত।

দি খাটাউ মাকানজি স্পিনিং এ্যান্ড উইভিং কোং লিঃ
মুখ্য কার্য্যালয়: লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই-১
মিল: হেইনস রোড, বাইকুল্লা, বোম্বাই-২৭
আড়ৎ ও দোকান: মুলজী জেঠা মার্কেট, বোম্বাই-২

—বড় ফাঁদির গলায় উৎকণ্ঠার আভাস।

'আমার অনুমান—মাদী হাতীটাই তার বাচ্চার খোঁজে বেরিয়ে ঝোরার পাড়ে সেই ঘাস বনের দিকে এগোচ্ছে। এই সময় যদি বাচ্চাটার ডাক ওর কানে যায়, তাহলে ও নির্ঘাৎ জোর পায়ে ক্যাম্পের আশ-পাশে এসে হাজির হবে। তাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতেও পারে। কাজেই সময় নষ্ট না করে এখন থেকে প্রস্তুত থাকা দরকার।

লালজীর নির্দেশে গুলি, বন্দুক, বল্লম ইত্যাদি হাতিয়ারগুলো হাতের ধারে রাখা হোল। বন্দী বাচ্চা চারটির চারপাশে আরও কয়েকটি অগ্নিকুণ্ড জেবলে নিরাপত্তামূলক বেড়াজাল দৃঢ়তর করা হোল।

বৃংহিত নাদে প্রমাণ হয় জংলীটা আরও নিকটবর্তী হয়েছে; আর তারই আসার পথের পেছন দিক থেকে পূব আকাশের গায়ে ধীরে ধীরে ভোরের আলো ফুটে উঠছে।

প্রভাতী সূর্যের সোনালী আলোর ছোঁয়ায় সুমধুর পাখীর গানে গৌরীপুরের রাজবাড়ীর যখন ঘুম ভাঙছে, ঠিক সেই সময় সেই বাড়ীরই এক খেয়ালী রাজপুত্র সুদূর গারোপাহাড়ের দুর্গম বনাঞ্চলের এক সুকঠিন চাতালে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তারই সামনে সূর্যালোকের প্রথম প্রকাশকে আড়াল করে যে পাহাড়ী টিলাটি দাঁড়িয়ে আছে তার শীর্ষদেশে সন্তানহারা এক ক্ষিপ্তা হস্তিনীর আবির্ভাবের দুর্ভাবনায়।

কুয়াশায় ঢাকা বন-পাহাড়ীর আবছা আলো ফর্সা হতেই সবার নজরে পড়লো সেই নির্দিষ্ট টিলাটির মাথায় দাঁড়িয়ে হস্তিনী তার শুঁড় উঁচিয়ে গন্ধবাহী হিমেল বাতাসে হারানো সন্তানের হদিস নিচ্ছে।

বিপদে, আপদে, পথ চলতিতে হস্তীকুলের সব চাইতে কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য সহায় হচ্ছে ওদের প্রখর ঘ্রাণশক্তি। কাজেই লালজী ইতিমধ্যে বিলক্ষণ বুঝে নিয়েছেন যে ক্যাম্পে হস্তিনীর উপস্থিতি অনিবার্য। প্রচণ্ড দাপটে লড়ে বাচ্চাকে সে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবেই। সেই লড়াইয়ে গোটা ক্যাম্পটাই না লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

ভবেন ও বড়-ফাঁদি লালজীকে জিগ্যেস, 'ঠিক নির্দেশ কর্তার?'

'মামলা যেন ঘোরালোই হতে চলেছে অনুমান করি। ডেঁটে দাঁড়িয়ে খেদিয়ে দিতে হবে জংলীকে। বেগতিক বুঝলে বাচ্চাকে ওর ছেড়ে দিতেও হতে পারে। তবে একটা অন্য ফন্দীও আমি ভাবছি। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনেছি ক্যাম্প থেকে তিন-চার মাইল দূরে ছেন্টাপাড়া নামে একটা খোলা মেলা এলাকা আছে। জংলীটা ক্যাম্পে হাজির হবার আগেই তিনটি পোষা কুনকি হাতীর পাহারায় চারটি বাচ্চাকেই আগেভাগে সেখানে পাচার করে দিলে কেমন হয়?'

মতলবটা ভবেন ও বড় ফাঁদির মনে ধরে। সিদ্ধান্ত পাকা হতেই বারো জন লোক তিনটি পোষা কুনকিসহ বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর সময় নষ্ট না করে জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে উল্টোদিকে পা চালালো ছেন্টাপাড়ার উদ্দেশ্যে। তাদের ওপর নির্দেশ রইল পথে কোথাও বিপদ ঘটলে বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে তারা যেন নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। নির্বিঘ্নে ছেন্টাপাড়ায় পেঁছনো সম্ভব হলে দু-চার দিন সেখানে কাটিয়ে বাচ্চা হাতীদের একটু ধাতস্ত করে নিয়ে ঘুরপথে যেন গৌরীপুর চলে যায়।

এদিকে রইল বাকী চারটি কুনকি হাতী সহ ক্যাম্পের দশজন ও গড়ওয়ালারা আটজন —মোট আঠারো জন লোক।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই ঘটলো। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জংলী হাতী ক্যাম্পের সামনে এসে হাজির। বাতাসে বাচ্চার গন্ধ পেয়েছে সে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রনং দেহি মূর্তি তার। ক্যাম্পের লোকেরাও লালজীর নেতৃত্বে রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, টিনের আওয়াজ, বন্দুকের শব্দে জঙ্গল তোলপাড় হচ্ছে। ক্যাম্প রক্ষা না হলে পরবর্তী হামলা হবে গ্রামের ওপর। কাজেই গ্রামের লোকেরাও ওদিকে চীৎকার করছে। এই অভাবনীয় একতাবদ্ধ প্রতিরোধের সামনে জংলী হাতী আর এগোতে সাহস পেল না।

অগত্যা অভাগিনী হস্তিনী-মা তার শিশু-সন্তানের আশা ত্যাগ করে ব্যর্থ মনোরথে পিছু হটে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর আর কখনও তাকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। দলে ফিরে এসেছিল কিনা বোঝা যায়নি।

গতকালেরই খবর ছিল মূল হাতীর দল পুবে এগিয়েছে। ওদের খেদিয়ে গড়ের পথে পাঠাতে হবে। কোন অবস্থাতেই দলটাকে নাগালের বাইরে যেতে দেওয়া হবে না। ব্যাপারটা জরুরী। কাজেই এখানে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। লালজীর হুকুম—যত শিগগির সম্ভব চা-টা কিছু খেয়ে নিয়ে ক্যাম্প তুলে পুবে এগোও।

জংলী হাতীর দলের গতকালের গমনপথ অনুসরণ করে আবার শুরু হোল পদযাত্রা।

জঙ্গল ঠেলে দুটো টিলা পেরিয়ে আসার পর পথে পড়লো মেগাপগির গ্রাম। গ্রামবাসীরা বললে—সামনের টিলার খাদে হাতীর দল আছে। লালজীর নির্দেশে ঐ গ্রামেই ক্যাম্প বসলো। ফাঁদি ও গড়ওয়ালারা গেল হাতীর হদিস নিতে। ফিরে এসে ওরা জানালে—ওটা সেই আসল দলটাই। যাই হোক দলটার নাগাল পাওয়ায় সবাই খুশি। নিশ্চিন্ত মনে সবাই খাওয়া-দাওয়ার তোড়জোড়ে মন দিলে।

পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে জানা গেল রাতারাতি হাতীর দলটা এলাকা ছেড়ে আরও পুবে এগিয়েছে।

'তোল-তোল, ক্যাম্প তোল—'

লালজীর ব্যস্ততার তড়পানিতে হুড়দুম ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে সবাই ছুটলো আবার বিনা বাক্যব্যয়ে হাতীর পিছনে।

তিন চারটি টিলা ও খাদ পেরিয়ে এসে একটি গ্রাম পাওয়া গেল। সবাই খুব পরিশ্রান্ত। একটু বিশ্রাম দরকার। স্থানীয় লোকদের মারফৎ খবর পাওয়া গেল—দাবগিরি ও বাবাগিরি নামক দুটি গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গলে হাতীর দল অবস্থান করছে। হিসাব মত তিন দিনে প্রায় পনের-বিশ মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায়তো হাতীর খাবারের কমতি নেই। সে বিচারে বিচরণশীল হাতীর দলের গতিবেগ যেন একটু বেশীই মনে হচ্ছে। এটা বোধহয় ওদের কিছুটা অস্থিরতার লক্ষণ। ওরা হয়ত আঁচ পেয়েছে যে মানুষ পিছু নিয়েছে। তাই চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে গা-ঢাকা দেবার চেষ্টায় আছে।

গড়ওয়ালাদের পরামর্শ হোল দলটাকে এখন একটু দম নিতে দেওয়া হোক। ধীরে সুস্থে ওদেরকে ক্রমান্বয়ে খেদার পথেই চালাতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে এদিক-ওদিক সরে যেতে পারে।

গড়ওয়ালাদের পরামর্শ প্রণিধানযোগ্য। ওদের কথায় বড় ফাঁদিও সায় দিলে। ঠিক হোল এখন আর বুনোর দলে ঢুকে হাতী ধরা হবে না। ধরলে কুনকি হাতী ও দলের লোকও কমে যাবে।

গ্রামের অদূরে একটা ক্ষেত। সেখানেই ক্যাম্প বসানো হোল। সেদিন ছিল পৌষ সংক্রান্তি। অরন্ধন। রান্নাবান্নার ঝামেলা ছিল না। চিঁড়ে দুধ খেয়ে সবাই কতকটা চাঙ্গা হয়ে নিলে।

তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে লালজী ক্ষেতের অবস্থানটা একটু লক্ষ্য করছেন। ক্যাম্পের গা ঘেঁসেই গিয়েছে হাতীর দণ্ডি। পূর্ব সন্ধানমত হাতীর দলটা আছে সামনে ক্যাম্পের পুবে। গত কয়েক দিন থেকে উত্যক্ত হাতীর দল যদি দিক পরিবর্তন করে পিছু হটে এসে আক্রমণ করে বসে তাহলেই সমূহ বিপদ। তাই ক্যাম্পের অবস্থানটা মোটেই নিরাপদ ঠেকছে না। আর মনে এই উদ্বেগ নিয়ে সময় কাটানোও দায়। তাই লালজী গড়ওয়ালা চারজনকে নির্দেশ দিলেন এগিয়ে গিয়ে হাতীর দলের পাত্তা নিয়ে হাতী যাতে পশ্চিমে ঘুরতে সাহস না পায় তার জন্য দণ্ডির মুখে আগুন জেবলে প্রতিরোধ তৈরী করে রাখতে।

গড় বা খেদা প্রথায় হাতীধরা পেশাদার দলগুলোকে সরকার থেকে গাদা বন্দুক দেওয়া হোত। আলোচ্য গড়ওয়ালাদের কাছেও সরকারী বন্দুক ছিল। লালজীর নির্দেশে তার দুটো নিয়ে গড়ওয়ালাদের মধ্য থেকে বগাবুড়ো, খড়গেশ্বর ও আরো দুজন রওনা হয়ে গেল হাতীর দণ্ডি বরাবর।

শীতের দুপুর। ফলাহারের পাট আগেই চুকেছে। গড়ওয়ালারা বেরিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই হোল। নিশ্চিন্ত মনে ক্যাম্পের সবাই রোদ পিঠ করে বসে গল্পগুজব করছে। এমন সময় পূর্বোক্ত গড়ওয়ালাদের চারজনের তিনজন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসে জানালে যে বগাবুড়োকে শুণ্ড হাতীতে মেরে

ফেলেছে। আচমকা খবরটা শুনে তো সবাই হতভম্ব। লালজীও সন্ত্রস্ত। ঘটনাটা যে অতি অভাবনীয় ও লোমহর্ষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেও ধীর মস্তিষ্কে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হবে।

বগাবুড়োর হাতে একটা গাদা বন্দুক ছিল। সেটা ও তার লাশটা উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু গুণ্ডাটা এখন কোথায় কিভাবে আছে কে জানে। বড়ই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কি করা যায়?

লালজীর উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে বড়-ফাঁদি, কানন সিং ফাঁদি ও রামেশ্বর এগিয়ে এসে জানালে যে তারাই যাবে মৃতের লাশ ও বন্দুক উদ্ধার করতে। লালজীর বুক ভরে গেল এই বিপদে তাঁর দলের কর্মীদের কর্তব্যবোধ ও সাহসিকতার পরিচয় পেয়ে। ওদের দেখাদেখি অন্য গড়ওয়ালদের তিন-জনও প্রস্তুত হোল। কিন্তু ঘটনাস্থলটা দেখাবে কে? বগাবুড়োর যে তিনজন সঙ্গী জান নিয়ে ফিরেছে তাদের কেউ আর ভয়ে যেতে চায় না। বড়-ফাঁদি অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সাহস দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত খড়গেশ্বর রাজী হোল। গুণ্ডাটার পুনরাক্রমণের ঝুঁকি নিয়েও ওদের সাতজনের দলটি তখন এগুলো ঘটনাস্থলের দিকে।

বড়-ফাঁদির হাতে ক্যাম্পের বন্দুকটি। লালজী ক্যাম্পের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে ওদের মঙ্গল কামনা করলেন।

বেলা পড়ে আসছে। উদ্ধারকারী দলের এখনও পাত্তা নেই। লালজীর উদ্বেগ বাড়ে। ক্যাম্পের সামনে হাতী-দণ্ডি ধরে সমানে পায়চারি করছেন তিনি ওদের ফেরার অপেক্ষায়। কয়েকদিন ধরে ও'র মস্তিষ্ক ওপর বড় বেশী চাপ পড়ছে।

সন্ধ্যার মুখে মুখে বড়-ফাঁদিরা ফিরে এল শুধু বন্দুকটা উদ্ধার করে। বগা-বুড়োর লাশ আনেনি। বিকৃত বীভৎস সে লাশ আনাও সম্ভব ছিল না। ঘটনাস্থলেই দাহ করে এসেছে ওরা। গুণ্ডাটার আর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। যতটা জানা ও বোঝা গেল তা হচ্ছে—

সামনে পুবের টিলার পিছনের খাদে হাতীর দল আছে খবর ছিল। টিলার কোমরটাকে বেড় দিয়ে গিয়ে হাতীর দণ্ডিটা বেখেয়ালে মোড় নিয়ে খাদের ঢালের দিকে নেমেছে সেই মুহূর্তটায় আগুনের কুণ্ডটা জ্বালাবার উদ্দেশ্য নিয়েই গড়-ওয়ালারা চারজন এক লাইনে এগোচ্ছিল। হাতীর দলের একটা মাকনা গুণ্ডার হঠাৎ হাওয়ার টানে মানুষের গন্ধ পেয়েছিল। মোকাবিলা করার জন্য সে দণ্ডি ঘুরে উপরে উঠে এসে টিলার গায়ের একটা সংকীর্ণ বাঁকে ঘাঁটি নিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। নিজেকে নিঃশব্দ মনে করলেও পুরোপুরি সে নিঃশব্দ ছিল না। কারণ তার শুঁড়ের একস্থানে একটা কাটা গর্ত ছিল যার ভিতর দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া বেরিয়ে একটা বেয়াড়া ফরর-ফরর শব্দ হোত।

চারজন ওরা এক লাইনে এগোচ্ছিল। সামনে খড়গেশ্বর। তার পেছনে বগাবুড়ো—হাতে বন্দুক। তার পেছনে পর পর অন্য দুজন। শেষজনের হাতেও বন্দুক। হাওয়ার গতি ছিল ওদের সম্মুখী। ফলে হাতীর কাটা শুঁড়ের অস্বাভাবিক শব্দটা একটু দেরীতেই পৌঁছেছিল ওদের কানে। তাই বাঁকটা ঘুরতেই তারা একেবারে হাতীর মুখোমুখি এসে হাজির। হাতী তো আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। তেড়ে আসতেই চারজন ওরা পেছন ফিরেই ছুট।

এগুনোর সময় খড়গেশ্বর ছিল সবার আগে। পেছন ফিরে ছুটতে গিয়ে সে পড়লো সবার পেছনে। ফলে সে প্রায় হাতীর নাগালের মধ্যেই এসে গেল। উপায়ান্তর না দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে খড়গেশ্বর টিলার ঢালের নীচের দিকে বেশ কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠে দেখে। এবার গুণ্ডাটার সামনে পড়লো বগাবুড়ো। ফিরতে বুড়ো ভুল হয়েছে বন্দুকের কথা তখন বিস্মৃত হয়ে দৌড়ে প্রাণ বাঁচাতে চাইল। কিন্তু পারলো না। গুণ্ডাটা ওকে শুঁড়ে জড়িয়ে মাটিতে মারলো এক আছাড় এবং পরমুহূর্তে সামনের এক পায়ে বুড়োর দেহটা চেপে রেখে দ্বিতীয় পায়ে এক প্রচণ্ড লাথিতে মুণ্ডুটা ভার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। এতেও গুণ্ডাটার নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ হোল না। হতভাগ্যের মস্তকহীন লাসটাকে চার পায়ের তলে দলাই-মলাই করে মাটির স্তূপের সঙ্গে মিশিয়ে দিল সে। খড়গেশ্বর বাঁশ ঝাড়ে দাঁড়িয়ে কিছুটা অনুমান করছিল ওপরে কি হচ্ছে। অন্য দুজন দূরে গাছের ওপর আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসে মাকনা হাতীর পৈশাচিক সেই গুণ্ডামি দেখে ওরা মূর্ছা যাবার উপক্রম। বগাবুড়োর দেহটাকে ধূলি কর্দমের সঙ্গে রক্তমাখা এক তাল মাংসপিণ্ডে পরিণত করার পর গুণ্ডাটা ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে নেমে গেল।

কিন্তু উদ্ধারকারী দল এসে বগাবুড়োর মাথাটাকে আর খুঁজেই পেল না। গুণ্ডাটা হয়ত সেটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল বা দূরে কোনও জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিল।

গাব্রো হিলের অভিযানে বেরুনোর পর বন্দোর দল তাদের গুণ্ডাটাকে পাঠিয়ে প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছে মেসা-শিকারীদের ওপর। বগাবুড়োর মৃত্যুকাহিনীর বর্ণনা বিবরণ শুনে লালজী মুষড়ে পড়লেন। এ কয়দিন শিকারীরা হাতীর দলের পিছনেই লেগে ছিল। দলের রক্ষক হিসেবে মোকাবিলার মতলবে গুণ্ডাটা এখন সেই [illegible]

সর্বক্ষণ না লেগে থাকে। যাই হোক সতর্ক প্রহরার মাধ্যমে বিনা ঘটনায় সে রাত কাটলো। তবুও জংলী গুণ্ডাটা যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে তাতে শিকারীদের যে কতক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে সে প্রশ্ন সবার মনেই।

ভোরে ক্যাম্পের কয়েকজন গিয়েছিল দক্ষিণ টিলাটির দিকে প্রাতঃকৃত্য সারতে। কাটা শুঁড়ের ছিদ্রপথের বাতাসের শব্দ কানে আসতেই সন্ত্রস্ত তারা নজর করে দেখে টিলার ঢাল বেয়ে গুণ্ডা নামছে। ক্যাম্পে খবর পৌঁছুলো। ধুনির আগুন উসকে দিয়ে বন্দুকে উঁচিয়ে সবাই রুখে দাঁড়ালো। গুণ্ডাটা সোজা ক্যাম্পের দিকেই নেমে এল। আক্রমণের মতলব নিশ্চয়ই। কিন্তু না—আক্রমণ করলো না। কিছু দূরে এগিয়ে এসে কি-না কি ভেবে ক্যাম্পকে বেড় দিয়ে গিয়ে ব্যাটা উত্তরের পাহাড়ে উঠলো।

ক্যাম্পের বন্দুকটা হাতে নিয়ে লালজী এতক্ষণ একদৃষ্টে গুণ্ডাটার হাবভাব লক্ষ্য করছিলেন। গুণ্ডার চোখের দৃষ্টি ও চলার ভঙ্গীতে তিনি প্রমাণ পেলেন মানুষ সম্বন্ধে তার সকালের এই উদাসীনতা উদ্দেশ্যমূলক। লালজীর একথা বিলক্ষণ জানা আছে যে বাঘ মানুষখেকো হলে যেমন অধিক চতুর ও কৌশলী হয়, হাতীও সেইরূপ গুণ্ডা হলে বেশী মতলববাজ হয়।

হালচালে প্রমাণ মেলে এই মাকনা গুণ্ডাটাই হচ্ছে বুনোর দলের রক্ষক। স্বয়ং রক্ষকই যখন মূল ঘাঁটি ছেড়ে বেপথে অন্যদিকে এগুলো, তখন বোঝা যায় গোটা দলটাও তাদের স্থান ত্যাগ করে গিয়েছে। অনুসরণ করা দরকার। গুণ্ডাটা উত্তর পাহাড়ে অদৃশ্য হলে পর লালজী নির্দেশ দিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্প গুটিয়ে নির্দিষ্ট দিশু ধরে সামনে এগুতে। গুণ্ডা অনাত্র সরে গেছে। এই হচ্ছে এগুনোর নিরাপদ সুযোগ। বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনায় লালজী হয়ত নির্ভুল ছিলেন। কিন্তু অরণ্যচারী মানুষের নির্ভুল হিসেবও যে কখনও কখনও ভেস্তে যায় নিষ্ঠুর নিয়তির কুটিল নকশায় রাজপুত্র লালজীর জীবনে সে অভিজ্ঞতা তখনও হয়নি।

প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটি টিলার মাথায় বাবাগিরি গ্রাম। জোর কদমে এগিয়ে গিয়ে এই গ্রামে খবর মিললো হাতীর দল কাছাকাছিই আছে। বাবাগিরির পরবর্তী গ্রামের নাম বাঁদরা। দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। বুনো হাতীর দলকে পেছনে ফেলে অতদূর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া একনাগাড়ে দশ-এগারো মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্যও বটে।

বিশ্রামের জন্য হাতীর দল সব সময় বেছে নেয় পাহাড়ের খাদের দিকটা। তাদের সেই অবস্থানস্থলের সমউচ্চতায় শিকারী দলের ঘাঁটি থাকা উচিত। তাতে হাতীদের চলাচল পথের ওপর নজর রেখে তাদেরকে অনুসরণের সুবিধা হয়। তাছাড়া ঘাঁটির নিকটে পানীয় জলের সুবিধা থাকাও দরকার। গ্রামবাসীরা জানালে—বাবাগিরি টিলার ঠিক পাদদেশে একটি পরিষ্কার জলের ঝরনা আছে। লালজীর নির্দেশে তখন গ্রামের নীচে উৎরাই ধরে একটি ঘাট পেরিয়ে এসে সেই ঝরনার পাড়েই ক্যাম্প বসানো হোল। ঝরনার পাড়টা খাড়া। পূর্ব-দক্ষিণে একটা ঢালু চাষের ক্ষেত। স্থানটা মন্দ নয়। ক্যাম্পের যাযাবরী গোছগাছ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি শেষ হলে পর রান্নাবান্নার তোড়জোড় সুরু হোল। প্রতিটি তাঁবুর সামনে চলতি রেওয়াজ মত ধুনিও জ্বললো।

চায়ের পাট শেষ হয়েছে। লালজীর অনুমতি নিয়ে বড়-ফাঁদি, খড়গেশ্বর ও মোন্দলা—এই তিনজনে বুনো হাতীর দলের খবর নিতে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে নিল ওরা ক্যাম্পের বন্দুকটা ও গড়ওয়ালাদের একটা গাদা বন্দুক। সর্পিল বনপথ ধরে ওরা সামনের পাহাড়ী ঘাটের দিকে যাচ্ছে। ওদের গমন পথের দিকে তাকিয়ে লালজী বসে আছেন। অরণ্য-আবাসে তাঁর ঐ একইভাবের আয়েসী বসা। বেতের মোড়া, হাতের সিগারেট সামনে ধুনি। বড় চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে ওঁকে। আজ কয়েক দিন ধরে ওঁরও মনে হচ্ছে—কি যেন একটা মহা অমঙ্গল সব সময় ওঁকে গায়ে হিলের বনপথে অনুসরণ করে চলেছে। কোথায় এর শেষ, কি ভবিতব্য সামনে অপেক্ষা করছে কে জানে?

বড়-ফাঁদিরা ওদিকে টিলার বাঁকে অদৃশ্য হয়েছে। ওরা গেছে তিনজন। আগে খেয়াল ছিল না। তিনজন যাওয়া কি ঠিক হোল? 'তিন' সংখ্যাটি অশুভ' থেকে একটা সংস্কারপন্থী না হলেও এই মুহূর্তে লালজীর মন কেন জানি খুঁত-খুঁত করে।

ঠিক এই সময় সামনের জঙ্গলের ভিতর দিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ হোল। সঙ্গে হাতীর উন্মত্ত হুঙ্কার।

পর্যবেক্ষক দল টিলার ঘাট পেরিয়ে গিয়েই গুণ্ডাটার সামনে পড়েছে। দৌড়ে গিয়ে গাছে উঠেই ওরা গুলী করেছে। সেই শব্দে ক্ষেপে গিয়ে গুণ্ডাটা ডাক ছেড়ে ওদের চার্জ করলো। ওরা ততক্ষণে নিরাপদ উচ্চতায় উঠে গিয়েছে। কিন্তু এদিকে গুণ্ডার ডাক শুনে বুনো হাতীর দল জঙ্গল ছেড়ে পাশের ক্ষেতে এসে নামলো। পোষা হাতীগুলো ওদিকেই বাঁধা ছিল। একটু পরে দেখা গেল ক্যাম্প, মানুষ, নিজেদের পোষা হাতী বুনো হাতী সব মিলে একাকার হয়ে গেছে।

কাণ্ডকারখানা দেখে ক্যাম্পের অনেকেই ঘাবড়ে গেল। লালজীরও চিন্তা হোল এই অবস্থায় জংলী হাতীর গোটা দলটা ক্ষেপে গিয়ে যদি ক্যাম্প আক্রমণ করে বসে, তাহলে সবাইকেই মরতে হবে। যা হোক শেষ পর্যন্ত আগুন-টাগুন জেলে অতিকষ্টে বুনোর দলকে তো হটানো গেল।

কিন্তু বেলা বাড়ে—বড়-ফাঁদিরা ফেরে না। মহাচিন্তায় পড়লেন লালজী। একটু এগিয়ে গিয়ে হাঁক দেওয়া হোল। ওরা সাড়া দিয়ে জানালে গুণ্ডাটা এখনও ওদের গাছের উপরে আটকে রেখেছে। তলা থেকে সরছে না। ক্যাম্প থেকে কোনরূপ শব্দ করতে ওরা নিষেধ করলে। শব্দ শুনলে গুণ্ডা অরো ক্ষেপবে।

অসীম উদ্বেগের মধ্যে সারাটা দিন কাটলো। শেষ পর্যন্ত বিকেলের দিকে ওরা তিনজন ক্যাম্পে ফিরে এল। গুণ্ডাটা সরে গেছে।

সবাই বলে বড় বেয়াড়া গুণ্ডা। বড় ফাঁদি নাকি তার জীবনে এমন শয়তান গুণ্ডা দেখে নি। খুবই দুর্লক্ষণ। রাতের দিকে অবস্থা কি দাঁড়াবে কিছুই বলা যায় না। বড় ফাঁদির পরামর্শ হচ্ছে নিজেদের পোষা হাতীগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হোক। বাঁধা অবস্থায় আক্রান্ত হলে ওরা আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

বড়-ফাঁদির কথায় লালজীও ঘাবড়ে গেলেন। তখনও হাতী সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব বেশী নয়। মুখ্যতঃ বড়-ফাঁদির ভরসায় তাঁর গারো হিলের অভিযানে আসা। সেই বড়-ফাঁদি যখন এতটা হতাশ ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় কি? কোন বুদ্ধি আর লালজীর মাথায় আসে না। স্নায়ুশক্তি যেন তাঁর অসাড় হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার আগেই ক্যাম্পের সবাই খেয়ে-দেয়ে নিল। পোষা চারটি হাতী—প্রতাপসিং, পবনপিয়ারী, নুরজাহান ও কুমার। সব কয়টি বিশ্বস্ত হাতী। এর মধ্যে শিক্ষিত ও সাহসী হাতী প্রতাপসিং লালজীর অতি প্রিয় নিজস্ব বাহন। লালজীর কথামত এই প্রতাপসিং-এর এক পায়ে লম্বা শিকল বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হোল। ছাড়া পেয়ে প্রতাপসিং স্থান ত্যাগ না করে অন্য সঙ্গীদের কাছে গিয়ে খেতে লাগলো। সারা রাত ধরে ক্যাম্পের ওপর গুণ্ডার হামলা হলেও প্রতাপসিং কিন্তু লালজীর বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছিল। সে কখনও ক্যাম্প এলাকা ছেড়ে যায় নি।

নিজেদের পোষা চারটি হাতীর লোকদের তাঁবু চারটি পাশাপাশি চতুর্ভুজের আকারে বসানো। তারই মাঝে মাঝে বড় বড় ধুনি জেলে বন্দুকে গুলী ভরে নিয়ে সবাই পাহারায় সতর্ক হয়ে বসলো।

আসলে বন্দুকের চেয়ে আগুনের ওপরই সবার ভরসা এখন বেশী। ক্যাম্পের বন্দুকটির সঙ্গে কোন বুলেট আনা হয় নি। ছররা ও এল জি কার্টিজই শুধু এসেছে। এতে হাতীর গায়ে শুধু সুড়সুড়ি দেওয়াই চলে। গাদা বন্দুক একবার

ফায়ার করলে দ্বিতীয়বার তাতে বারুদ গেঁদে গুলী ভরে তৈরী করতে সময় লাগে। আলোচ্য গুণ্ডাটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বন্দুকের শব্দ তাকে আরো বেশী উত্তেজিত করে। কাজেই তাকে তাড়াবার প্রয়োজনে বন্দুকের চেয়ে আগুনই বেশী কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। তবু মনের সাহস বাড়াবার জন্য বন্দুকও হাতে রইল।

লালজীর তাঁবুর পেছনে ঝোরার পাড়ে রান্নার জায়গা। ঝোরার খাড়া পাড় মানুষের বুক সমান উঁচু। নীচে হাত খানেক জল। স্রোত আছে।

সন্ধ্যা ঘুরে গেছে। লালজীর পাচক বসন্ত রান্নার জায়গায় খেতে বসেছে। চারিদিকে আবছা অন্ধকার। ঝোরাটা সামনে আড়াআড়িভাবে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে মোড় নিয়েছে। একটু পরে ঐ মোড়ের দিক থেকে ঝোরার জলে একটা ছপ ছপ শব্দ ভেসে এল। হাতীর জঙ্গল। বসন্ত তাই সজাগ হয়েই ছিল। শব্দটা কানে আসতেই সেদিকে সে চেয়ে দেখে একটা কালো বিশাল দেহ ধীরে ধীরে ঝোরার জল ভেঙে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে। কি সর্বনাশ! ভয়ে বসন্তর তো ভাত খাওয়া মাথায় উঠে গেল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে সে তাঁবুতে খবর দিল। খবর শুনে ক্যাম্পে হুলস্থুল পড়ে গেল।

লালজী নির্দেশ দিলেন পাহারাদারেরা যে যেখানে আছে সেখান থেকে যেন এক পাও না নড়ে। ক্যাম্পের বন্দুকটা বাগিয়ে নিয়ে তিনি সন্তর্পণে তাঁবুর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে বসন্ত, ভবেন ও বড়-ফাঁদি।

রান্নার জায়গার ঠিক নীচে ঝোরার পাড়ের গায়ে একটা হাল্কা ছোট মুলি বাঁশের ঝোপ। গুণ্ডাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঝোরার খাদে সেই বাঁশ ঝাড়ের নীচে পৌঁছে থামলো। শুঁড়, কান কিছুই নড়ছে না। পাথরের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ সে। ঝোরার পাড়ের উপর দিয়ে গুণ্ডাটার বুক পিঠই শুধু দেখা যাচ্ছে—এত বড় উঁচু দৈত্যাকার চেহারা তার।

বেশ কিছু সময় গেল। দুই পক্ষই নীরব। এখন তো নিশ্চিতই বোঝা যাচ্ছে যে মূর্তিমান শয়তান ঐ দুর্ধর্ষ জানোয়ারটা আক্রমণের মতলব নিয়েই এগিয়েছে। বগাবুড়োর প্রাণ নিয়েছে। আজ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বড়-ফাঁদিদের গাছে আটকে রেখেছিল। এখন এই অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড প্রাণঘাতী আঘাত হেনে গোটা ক্যাম্পটাকেই সে বিধ্বস্ত করে দিতে চেয়েছিল। হঠাৎ তার উপস্থিতি জানা-জানি হয়ে যাওয়ায় থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সে। মগজে তার অন্য দুরভিসন্ধির ফন্দি ঘুরছে হয়ত।

ড্যাঁটেল যুবক লালজী বুঝছেন—আক্রমণ করলে বন্দুকে ঠেকানো যাবে না। গাদা বন্দুকে বারুদের চার্জ বাড়িয়ে দিয়ে হয়ত গুলী করা যেতে পারে। কিন্তু গুণ্ডার একরোখা আক্রমণ প্রতিহত করার উপযোগী বুলেট বানানোর মত পাকা লোহার টুকরো-টাকরা কিছুই নেই। গড়-ওয়ালাদের সঙ্গে বন্দুকগুলো এনেছে ওরা শুধু ফাঁকা আওয়াজ করে দাঁড় ধরে বুনো হাতী খেদিয়ে আনবার জন্য। মন মানে না—তাই লালজী দু-চারটা এল জি কার্টিজ নিয়ে ক্যাম্পের বন্দুকটা বাগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ক্যাম্পের পিছনে। কিন্তু প্রতিপক্ষ তখনও চুপচাপ।

এভাবে একটা মতলববাজ গুণ্ডাকে সামনে নিয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায়? ওকে খেদাতে না পারলে স্বস্তি নেই। দোনলা বন্দুক হাতে। দুই ব্যারেলে তার দুটো এল জি ভরে নিলেন লালজী। কিছুই হবে না এতে। তবু যা হোক কিছু একটা করা দরকার। অসহ্য হয়ে উঠেছে এই অস্বস্তিকর অপেক্ষা। গৌরী-পুর থেকে সাহস দিয়ে যে তাঁকে এই

কবি নিশিকান্ত রচিত

কালজয়ী কাব্য

লীলায়ন

ইন্দুদুগর অঙ্কিত ৮ খানি বহুবর্ণ চিত্র ও বিবিধ রেখাচিত্র অলংকৃত

পরিবেশনে — মূল্য তিন টাকা —

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ ৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রকাশনী বিভাগ
পণ্ডিচেরী—২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দুর্গম জঙ্গলে টেনে এনেছিল সেই বড়-ফাঁদির মুখে এখন রা নেই। নিজের বুদ্ধিতে যা করণীয় করতে হবে।

এল জি কার্টিজের দু-চারটি দানা হাতীর চোখের ঢ্যালার মধ্যে গুঁজে দিতে পারলে ওকে হয়ত কিছুটা কাবু করা যেতে পারে। ঝোরার সঙ্কীর্ণ খাদে ব্যাটা দাঁড়িয়ে আছে আড়াআড়িভাবে। ডান দিক থেকে এসেছিল। কাজেই বাঁ দিকেই তার মুখ। মুলি বাঁশের ঝোপে নিশানা আটকাচ্ছে। লালজী নিঃশব্দে দু-চার পা বাঁ দিকেই সরে গেলেন। আবছা অন্ধকারে দৈহিক আকৃতিটা বোঝা গেলেও চোখটা ঠিকমত নজরে আসে না। ক্যাম্পে টর্চ আছে। কিন্তু জানা আছে টর্চের আলোয় হাতী বেশী প্ররোচিত হয়। অগত্যা হাতীর পিঠের শিরদাঁড়ার ঊর্ধ্বরেখা বরাবর মাথার দিকে দৃষ্টি চালিয়ে বাঁ চোখের অবস্থানটা কোনরকমে আন্দাজ করা গেল এবং লালজী গুলীও করলেন সেই চোখ বরাবর। গুলীর শব্দ পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হোল। কিন্তু কি আশ্চর্য—শব্দ বা আঘাতের কোন প্রতিক্রিয়াই হাতীর মধ্যে দেখা গেল না। যেমন নিশ্চল ও নিঃশব্দ ছিল সেইভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে। গুণ্ডাটা কি তাহলে অশরীরী অপদেবতা? বনাঞ্চলের সংস্কারে তাও অসম্ভব নয়।

গোটা ক্যাম্পটা যেন আড়ষ্ট নির্জীব। পার্শ্বে অপেক্ষারত ভবেন ও বড়-ফাঁদি যেন আতঙ্কে দম বন্ধ করে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দটাও তাদের কানে আসে না। লালজীর মনোবলও নিঃশেষিতপ্রায়।

বন্দুকের দ্বিতীয় নলে গুলি ভরা। পিছু হটা নিরাপদ নয়। যতদূর সম্ভব স্থির নিরিখে লালজী দ্বিতীয় গুলি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাটা প্রচণ্ড রোষে ঘুরে দাঁড়িয়ে মুলি বাঁশ ভেঙে নিয়ে মানুষের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। লালজীরা একটু পিছিয়ে গেলেন। কোন কোন বাঁশের গোটা কাণ্ডটা উপড়ে নিয়ে ব্যাটা তার গোড়াটা শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে বসন্তর বান্নার জায়গায় পেটাতে আরম্ভ করলো। বান্নার হাঁড়িকুড়ি বাসন-কোসন কিছু ভাঙ্গলো, লণ্ডভণ্ডও হোল। ঝোরার পাড় সোজা খাড়া বলে হাতীটা হয়ত চট করে উপরে উঠে আসার সুবিধে পাচ্ছিল না। বলা যায় না—চোখটাও হয়ত গুলিতে জখম হয়েছিল।

যাই হোক কিছু সময় এইভাবে যুদ্ধের প্রথম পাশবতায় বাঁশ ঝাড়টাকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে এবং হয়তবা মানুষগুলোর মনোবলের পরীক্ষা নিয়ে শয়তানটা ঘুরে আস্তে আস্তে জল ভেঙ্গে ঝোরার বাঁকের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু অবসর পেয়ে সবাই আবার ধুনির পাশে গিয়ে বসলো।

অসীম হতাশা ও ক্লান্তিতে লালজীর দেহ মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সঙ্গীরাও আতঙ্কে দিশাহারা। ধুনির পাশে পাশে তাদের চাপা গুঞ্জন কানে আসে।

লালজীর অনুমান করতে অসুবিধে হয় না পরিস্থিতির গুরুত্ব। গুণ্ডাটাকে বিশ্বাস নেই। সে নিশ্চয়ই আবার ফিরবে। পরবর্তী আক্রমণের কৌশল পাল্টাবার মতলবেই তার এই সাময়িক পশ্চাদপসরণ। সংস্কারান্ধ গড়ওয়ালারা চরম সন্ত্রাসে মুষড়ে পড়েছে।

গৌরীপুরের রাজপরিবার এই দলের অনেকেরই আজীবনের অন্নদাতা। তাই অসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবশতঃ তারা হয়ত এই জীবন-মরণ পরিস্থিতির মধ্যে লালজীকে একা ফেলে যেতে ইতস্তত করছে। বড়-ফাঁদিও যেন—যা হবার হবে—এই ধরনের হতাশাজনিত উদাসী মনে ধুনির পাশে নীরবে বসে।

'আমার আপন আর্থিক স্বার্থ ও জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে আমার মুখাপেক্ষী এতগুলি নিষ্ঠাবান ও নিরাপরাধ ব্যক্তির জীবন বিপন্ন করা কোনরকমেই উচিত নয়। সমীহবশে এরা হয়ত এই মুহূর্তে নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেও আমার পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা অন্যায় হবে। আমার উদাসীনতায় যদি কারো জীবনহানি ঘটে, সে পাপ আমাতেই বর্তাবে। পোষা হাতীগুলোর নিরাপত্তার চিন্তায় সন্ধ্যার দিকে বড়-ফাঁদি বলেছিল তাদেরকে মুক্ত করে দিতে। এখন এই রাত্রে পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণরূপেই আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে এবং সহযোগী সঙ্গীদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি যখন আমি নিজে আর দিতে পারছি না, তখন আমার উচিত হচ্ছে স্বীয় সাহস ও বুদ্ধিতে নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া।'

লালজী বিবেকের দংশন অনুভব করছেন। দেরী না করে সবাইকে ডেকে জানালেন তাঁর মনের কথা। পরামর্শ দিলেন জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে পাহাড়ের মাথায় বাবাগিরি গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিতে।

বলা মাত্র গড়ওয়ালাদের খড়গেশ্বর বাদে অন্য ছয়জন রওনা দিল। ক্যাম্পের আরো কয়েকজন ওদের সঙ্গী হোল। এদিকে রয়ে গেল শুধু বড়-ফাঁদি, ভবেন রামেশ্বর মঙ্গলা ও কাননসিং।

লালজী ভবেনকে বললেন গ্রামে চলে যেতে।

'আমার জীবনটাই কি বেশী মূল্যবান? আপনাকে এই বিপদের মধ্যে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যু যদি আসে, সবাই একসঙ্গে মরবো।'

এই বিপদের মধ্যেও ভবেনের কথায় লালজীর মন ভরে গেল। চরম হতাশার মধ্যে ঐ কথাগুলো যেন তাঁর মনের মধ্যে একটু সান্ত্বনার প্রলেপ দিল।

কিন্তু সেই সান্ত্বনায় আমেজ লালজীর অদৃষ্টে বেশী সময় সইল না। একটু পরেই গতকাল যেদিকে মানুষ মারা পড়েছিল সেই পাহাড়ী ঘাটের দিক থেকে গুণ্ডাটার আবার এগিয়ে আসার শব্দ পাওয়া গেল। সে হয়ত আসতে চাইছিল নিঃশব্দে। কিন্তু তার কাটা শুঁড়ের ছিদ্রপথে বাতাস বেরুনর যে ফবর ফরর শব্দ হয় সে শব্দ সে চাপবে কি করে?

ধুনির আগুন উসকে দেওয়া হোল। এছাড়া প্রতিরোধের আর নতুন পদ্ধতি বা উপকরণ কিইবা আছে?

দণ্ডি বরাবর টিলার বাঁকটা ঘুরে এসেই দুর্ধর্ষ জংলীটা সোজাসুজি ক্যাম্পের দিকে চার্জ করলো। ঐদিকে পোষা মাদী হাতী নুরজাহান বাঁধা ছিল। জংলীটা ঠিক ঐখানে এসে থেমে গেল এবং নুরজাহানের খাবারে ভাগ বসিয়ে তার সঙ্গে খেতে আরম্ভ করলো। কিন্তু তার সাহস বেড়েছে ও মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ দেখা গেল ক্যাম্পের দিক থেকে মানুষের আওয়াজ কানে গেলেই সে তেড়ে যাচ্ছে। ধুনির আগুনকেও পরোয়া করছে না।

গুণ্ডা তেড়ে এলে ক্যাম্পের লোকেরা তড়িঘড়ি পিছু হটে গিয়ে ঝোরার জলে নামে। তা দেখে গুণ্ডা আবার ফিরে যায় নুরজাহানের কাছে। ক্যাম্পের লোকেরা তখন জল ছেড়ে উঠে আসে ধুনির পাশে। এইভাবে তাড়াহুড়ো চললো কিছু সময় ধরে। ক্যাম্পে দিকে নড়াচড়া, কথা বলা, টর্চের আলো ফেলা কিছুই করার উপায় নেই। সব কিছুতেই গুণ্ডা খেয়ে আসে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। তার মধ্যে বারবার হাড়-কাঁপানো বরফ জলে গিয়ে নামতে হচ্ছে। অসহ্য!

লালজীর দেহ অবসন্ন। মন ভারাক্রান্ত। একটু আগে সঙ্গীদের প্রাণ বাঁচাবার উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। এখন নিজেরই চরম হতাশাজনিত মৃত্যুভয় উপস্থিত হয়েছে। কালাপাহাড়ের মত দুর্দান্ত গুণ্ডাটা অদূরে দাঁড়িয়ে। ক্যাম্পে বসে লড়ে ঐ মূর্তিমান শয়তানের হাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় নেই। হায় রে, এই সময় রাইফেলটা হাতের ধারে নেই—যার একটি মাত্র বুলেটের আঘাতে ঐ জংলী পশুটাকে ধরাশায়ী করা যেত। অনুশোচনার দগ্ধ হচ্ছেন লালজী। যমদূতকে সামনে নিয়ে ধুনির আগুন পোহাবার ধারে বেঁধে অনেক কথা মনে আসে তাঁর।

'এই সেই কিংবদন্তীর অরণ্য রাজ্য গারো ছিল। কতনা রহস্য, কতনা রোমাঞ্চ ছড়িয়ে আছে এর দুর্গমতার গভীরে কে জানে? রোমাঞ্চের পিয়াসী আমি। কিন্তু এই অসহনীয় ও অকল্পনীয় প্রাণঘাতী প্রহেলিকার প্রত্যাশী নিশ্চয়ই নই। আমার পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য থেকে আমি

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।

ডাটা
গুঁড়া মশলা

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭,মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

অরণ্যকে চিনেছি, জেনেছি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও শিখেছি। কিন্তু মানুষের চেয়ে সহস্রগুণ দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান একটা অরণ্যদানবের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াবার আমার হাতিয়ার কোথায়? নির্বোধের মত সে হাতিয়ার তো আমি প্রথম দিনই ছেড়ে এসেছি আমার মূল ক্যাম্পে।'

হতভাগা গড়ওয়ালা বগাবুড়োর বীভৎস মৃত্যুর পটভূমিকায় লালজীর চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মত একে একে ভেসে ওঠে তাঁর সাধের গৌবীপুর, পরিবার, পরিজন, প্রতিবেশী, রাজবাড়ীর পাত্র, মিত্র, সিপাই শান্ত্রী সবার কথা। তাদের মাঝে আবার তাঁকে ফিরে যেতেই হবে। এই ভয়ংকর গুণ্ডার হাতে আমার মৃত্যু তাঁর কাম্য নয়। এ মৃত্যু অর্থহীন। সুখ, শান্তি ও স্বচ্ছলতার মধ্যে দীর্ঘায়ুর প্রত্যাশী তিনি কিন্তু অথাত অজ্ঞাত এক বনভূমির নিভৃত অংশে অপ্রতিরোধ্য অকস্মাতে বুঝি তাঁর সেই আশা ও প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি ঘটে আজ।

এই সেই সৌদনের ভগনমনোরথ লালজী যাঁর কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ দিনের সাহসিকতাপূর্ণ শিকার কৃতিত্বের তালিকা কৌতূহলী পাঠকমহলের সামনে উপস্থাপিত করার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না।

লালজী প্রথম বাঘ শিকার করেছেন ১২ বছর ১০ মাস বয়সে ১৬।৩।১৯৬ খৃঃ তারিখে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাঁর বাঘ শিকারের মোট সংখ্যা ৬১। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ বাঘের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট ৫ ইঞ্চি।

প্রথম চিতাবাঘ শিকার ১০ বছর ৫ মাস বয়সে ১০।১০।২৪ খৃঃ তারিখে। চিতাবাঘ শিকারের মোট সংখ্যা ১১১। এর মধ্যে সর্ববৃহৎ দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ২ ইঞ্চি।

লালজীর হাতী ধরার হিসাব ১৯৩২ সাল পর্যন্ত:—

মেলা শিকারে অর্থাৎ পড়ির খাসে—৬৮৫
খেদা পদ্ধতিতে—২৭৮

মোট—৭৬৩

লালজীর কথায় জানা যায় তাঁদের শিকারকালীন সময়ে একদণ্ডে অসংখ্য বাঘ ও চিতাবাঘের প্রাদুর্ভাব ছিল। মানুষ ও গৃহপালিত পশুর জীবনহানি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। এই সব হিংস্র পশুর উপদ্রবের দরুন প্রজাকুলের ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবিধানের দায়িত্ব তাঁদেরকে সব সময়েই নিতে হতো। তবুও সেদিন শিকারপ্রাচুর্যে বন্য পশুর সংখ্যার হের-ফের হয়নি সেদিন কখনও।

কিন্তু দিন আজ পালটেছে। কৃষি, শিল্প ও মনুষ্য বসতি সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বনাঞ্চল শেষ হতে চলেছে—যার অনিবার্য ফলস্বরূপ বন্যপ্রাণীও নিঃশেষিতপ্রায়। বন্যপ্রাণীর এই দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার পরিবর্তন দরকার। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লালজী তাই আজ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একজন নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় সমর্থক। তিনি কলকাতায় অবস্থিত পূর্বাঞ্চল বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও শিকার সমিতির সভ্য। আসাম রাজ্য বন্যপ্রাণী উপদেষ্টা পর্ষদেরও তিনি সভ্য। তাঁর মতামত ও উপদেশকে আসাম রাজ্যসরকার যথেষ্টই গুরুত্ব দেন।

আজকের এ হেন লালজীকে ১৯৪৫ সালের সেই অশুভ রাতের বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল। জীবনে আর কখনও এই বিপজ্জনক কাজে নামবেন না। নেমেছিলেন কিনা তার পরবর্তী ইতিহাস আমি পূর্বেই জানিয়েছি। এও জানিয়েছি যে মানসিক শক্তি ও সাহস হারিয়ে সেদিনের সেই রাতের অন্ধকারে পালকী হয়েছিলেন সম্পূর্ণরূপেই বিহ্বল ও বিভ্রান্ত।

লালজী উপস্থিত সবাইকে জানালেন—'আর তপেক্ষা করা সম্ভব নয়। গুণ্ডাটার চোখে ধুলো দিয়ে যে কোন কৌশলে এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। নইলে মৃত্যু অনিবার্য। তিনি বড়-ফাঁদিকেও পালাবার কথা চিন্তা করতে বললেন।

'এই পোষা হাতীগুলো আমার দানাপানির ব্যবস্থা করে। এদের ফেলে আমি যাবো না। আপনি আপাতত ভবেনকে নিয়ে চলে যান' বড়-ফাঁদি সাফ্‌নো কথাগুলি বললো। বড়-ফাঁদির নৈতিক দায়িত্বজ্ঞান ও মহৎ মনের পরিচয় পেয়ে লালজী মুগ্ধ। অস্বীকার করে লাভ নেই কিছুটা সংকুচিতও বটে। কিন্তু উপায় নেই।

'আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর পালাচ্ছি না। আমাকে যেতেই হবে। ভয়ে ভেতরে পর থেকে সর্বশরীর কাঁপছে। এর পর হয়ত আমি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়বো। কিন্তু যাবোই বা কি করে? সে চেষ্টা করলে জংলীরা তেড়ে আসবে। বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেছে। মাত্র চার-পাঁচটি ছররা আছে। অদৃষ্টের ফেরে আজ আমরা সদলবলে একটি হিংস্র ও হিংস্র বন্যপশুর হাতে বন্দী।'

ওর কিছুটা গলার স্বর হয়ত গুণ্ডাটার কানে গিয়েছিল। কালবৈশাখীর দাপটে এই সে ছুটে এল লোকগুলোর দিকে। সবাই আবার দৌড়ে গিয়ে ঝোরার জলে নামলো। লালজী এবার বন্দুক ও বড় টর্চটা ছোট মেয়ে নিয়ে দৌড়োতে লাগলেন। ঝোরার জলে দাঁড়িয়ে বড়-ফাঁদি পরামর্শ দিল—এবার আপনারা দুজন আর ক্যাম্পে ফিরবেন না। এখান থেকেই পালিয়ে যান।

গুণ্ডা ঘুরে গেছে ততক্ষণে নুরু-সাহেলীর কাছে। বড়-ফাঁদি, খড়গেশ্বর, ঝামেশ্বর, মাংলা ও কাননসিং ধীরে ধীরে সাঁকো ছেড়ে ধুনির কাছে গিয়ে বসলো। তাড়াহুড়ি হবার আগে লালজী গুণ্ডাকে বিভ্রান্ত করার ফন্দি বৎলে দিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত মত ভবেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঝোরার জল ভেঙ্গে এগুলেন। ক্যাম্পে পড়ে রইল তাঁর টাকাকড়ি সব কিছুই।

লালজীরা বেশ কিছুটা এগিয়েছেন। ঝোরার জলে শব্দ হচ্ছে। গুণ্ডাটা তার তুলোর মত কান খাড়া করে সে শব্দ শুনলো এবং পরক্ষণেই তেড়ে গিয়ে নামলো ঝোরার খাদে। ঠিক সেই সময় পূর্ব-পরামর্শমতো ক্যাম্প থেকে বড়-ফাঁদি চেঁচিয়ে উঠলো। শত্রু এদিকে মনে করে গুণ্ডা তেড়ে ফিরে এলো আবার ক্যাম্পের দিকে। লালজীরা তখন ওদিকে চীৎকার দিয়ে জল ভেঙ্গে ছুটলেন। আর একদল শত্রু পালালো মনে করে গুণ্ডা আবার হন্তদন্ত হয়ে নামলো গিয়ে ঝোরার খাদে। বড়-ফাঁদিরা তৈরীই ছিল। ততোধিক চীৎকারে প্ররোচিত করে আবার তারা পাগলটাকে ফিরিয়ে আনলো ক্যাম্পের দিকে। ফন্দিতে কাজ হয়েছে। জংলীটা চীৎকার ও পাল্টা চীৎকারে বিভ্রান্ত হয়ে এদিকওদিক ছোটাছুটি করছে।

যাই হোক—গুণ্ডাটার দিঙ্‌মুখী দৌড়-ঝাঁপের টানাপোড়েনের সুযোগে লালজীরা ঝোরা বরাবর এগিয়ে গিয়ে বাবাগিরি গ্রামের পথ পেয়ে গেলেন। গুণ্ডাটাকে বিশ্বাস নেই। তাই তারা প্রাণপণে ছুটলেন। দম বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও ছুটছেন। উপায় নেই।

মাঝপথে একটু দাঁড়িয়েছেন ওঁরা দম নেবার জন্যে। সামনে শুকনো পাতায় শব্দ ওঠে। হাতী নাকি? বলা যায় না। অন্ধকারে কিছু বোঝাও যায় না। লালজী ভবেনকে বললেন—সামনে টর্চের আলো ফেলতে। একটা প্রকাণ্ড চিতাবাঘ সামনে পথের মাঝখানে বসে। আলো পড়ায় চোখদুটো তার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে। জ্বলুক। গুণ্ডার ভয়ে তখন পেছনোর উপায় নেই। বন্দুকের নলে কমজোরি ছররা ভরা। তা হোক। তাই বাগিয়েই লালজী এগিয়ে গেলেন। চিতাবাঘ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তর্জন গর্জনে একটু ভয় দেখাবার ভান করে এক লাফে জংগলে পড়ে লালজীকে পথ ছেড়ে দিলে।

বাবাগিরি টিলার চড়াই ভেঙ্গে আরো কিছুটা পথ উঠতেই দম ফুরিয়ে গেল। একটু বিশ্রাম একান্তই দরকার। একটা ঝরিয়া বা গুহিতে দুজনে বসলেন। কিছু ঝোপ ঝাড় রয়েছে। বুকের ধড়ফড়ানি ও হাঁফানি অবস্থাটা সবে একটু কমেছে। এমন সময় আবার ধুপধাপ শব্দ। এবার নীচের দিক থেকে। হাতী না হয়ে যায় না। এত কাণ্ডের পর হাতী হলেই বা উপায় কি আছে? দেখাই যাক মামলা আবার গড়ায় কতদূর?

হঠাৎ বাতাস করে কিছু একটা পতনের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে 'হায় রাম' বলে একটা আর্তধ্বনি। লালজী চমকে উঠলেন।

'কে রে তুই মানুষটা?'

'আমি খড়গেশ্বর কর্তা।'

কি খবর রে?' লালজী হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। ভয়-ভয়ত বা ক্যাম্পের অন্যান্যদের কোন বিপদ ঘটেছে।

না বিপদ নয়। লালজী গায়ের চাদরটা ফেলে এসেছিলেন। শীতে কষ্ট হবে বলে বড়-ফাঁদি সেটা পাঠিয়ে দিয়েছে।

ধন্য এই প্রভুভক্ত বন্যটি। কৃতজ্ঞতাবোধে লালজীর চোখে জল এসে গেল।

তিনজনে তখন পা চালালেন গ্রামের দিকে। বাবাগিরি টিলার শীর্ষদেশে প্রায় পৌঁছে গেছেন ওঁরা। ঊর্ধ্বাকাশে তারা মেলা। তারই আবছা আলোয় নজরে পড়লো গ্রামের মুখেই একটা প্রকাণ্ড হাতী দাঁড়িয়ে। কান ও দাঁত দেখা যাচ্ছে। তাহলে মাকনা গুণ্ডাটা নয়। দাঁতাল। নড়া-চড়া নেই। একভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আক্রমণের মতলব মনে হচ্ছে। টর্চ জ্বালাতে সাহস হয় না। তেড়ে আসবে। এ আবার কি জ্বালা হোল? কতক্ষণ আটকা থাকতে হবে? যা থাকে কপালে বলে টর্চ জ্বালা হোল। মুহূর্তে হাতী উবে গেল। দেখা গেল গ্রামের লোকেরা অপদেবতার পুজো দেবার জন্য দুটো মুলি বাঁশ চেঁছে সাদা করে পাশাপাশি হেলান দিয়ে রেখেছে ও তারই দুপাশে দুটো কুলো টাঙ্গানো। আবছা অন্ধকারে লালজীর বিহ্বল দৃষ্টিতে দু-জোড়া বাঁশ ও কুলো হয়েছে হাতীর দাঁত ও কান। হায়রে ভীত মন!

বাকী রাতটুকু গ্রামেই কাটলো। সকালে খবর এল বুনো হাতীর দল তাদের রক্ষক গুণ্ডাকে নিয়ে নাঝরাতেই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। ক্যাম্পের সবাই নিরাপদে আছে।

খবরটা যাচাই করে নিয়ে লালজী ক্যাম্পে ফিরলেন। ফেরা মাত্রই বড়-ফাঁদি এক কাপ গরম চা দিয়ে কর্তাকে আপ্যায়ন করলো। দুপুর নাগাদ ক্যাম্প গুটিয়ে পাঁচ মাইল দূরে বাদরা গ্রামে পৌঁছে সেখান থেকে বড় রাস্তা ধরে ডালু গ্রামের মূল ক্যাম্পে। পেছনে পড়ে রইল তখন সেই বুনো হাতীর দল ও তাদের কুখ্যাত রক্ষক সেই গুণ্ডার বিভীষিকার বাস্তব। সেই বিভীষিকার স্মৃতি আজও লালজীর এই পরিপক্ক বয়সে দুঃস্বপ্নের মত মাঝে মাঝে তাঁর মনকে আনমনা করে তোলে।

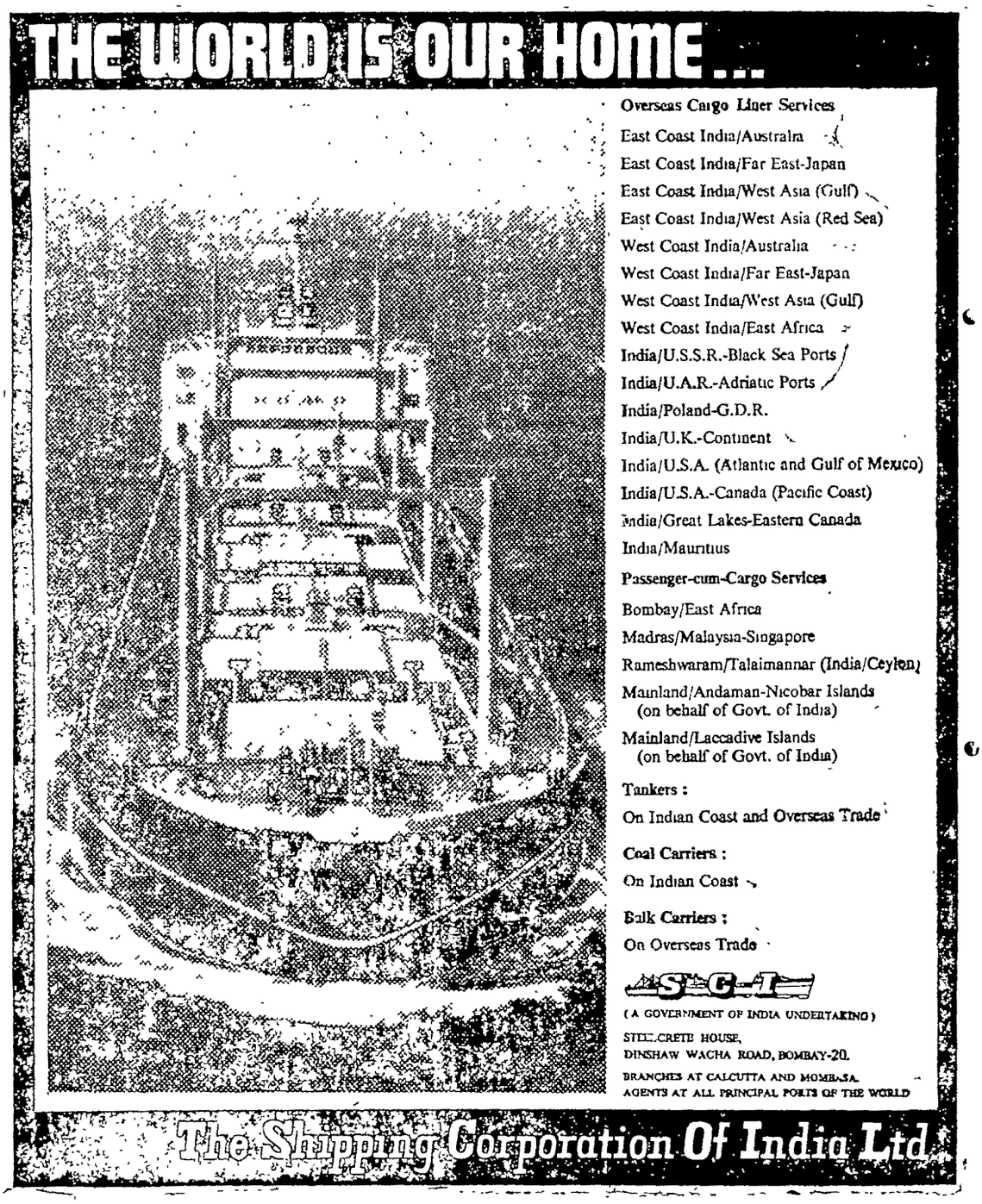

সুখের মুখ

বীরেন্দ্র দত্ত

শনিবারটা সত্যেশ্বরের অফিসের হঠাৎ একটা বিশেষ ছুটির দিন হয়ে গেছে। এমন ছুটির দিনে প্রীতিলতা রান্নাঘরে তাড়া-হুড়ো করেন না। এখন আনাজ কুটে সামনে ছড়ানো থালা-বাটিতে গুছিয়ে রাখছেন একমনে। অর্চনা ভাতের হাঁড়ির মুখে হুমড়ি খেয়ে ভাত দেখছে।

বাইরে থেকে সত্যেশ্বর সবেমাত্র ফিরে বড় ঘরের মেঝেয় দাঁড়ালেন। 'কই গো, একবার এ-ঘরে এসো।'

'কেন!' প্রীতিলতা বসে থেকেই সাড়া দিলেন।।

'কথা আছে।' এতক্ষণে সত্যেশ্বরের জামা খোলা হয়ে গেল, ভিতরের ছেঁড়া-ময়লা গেঞ্জি টেনে খোলার আগে ঘরের মাঝখানে এপাশ-ওপাশ টানা দড়ির আলনায় জামাটা ঝুলিয়ে দিলেন।

পাশের ঘর থেকে তরুণ-কল্পনা উঠে এল। 'বাবা।' কল্পনা বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'শোন্, এবার সব এক এক করে গোছাতে থাক। সামনের মঙ্গলবার চলে যাব।'

'সত্যি!' তরুণ-কল্পনা দুজনেই এক-সঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আর দুদিন পরেই।'

'কোথায় যাব বাবা?' তরুণের মুখ উজ্জ্বল।

'নিউ আলিপুরে যেটা তোরা দুবার দেখে এলি—সেইটা।'

তরুণ-কল্পনা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না। দৌড়ে ও-ঘরে গেল। মেজদা অরুণ বই মুখে ও-ঘরে বসেছিল। সামনের বছর হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে। তরুণ অরুণকে কি বলল, ভাব পরেই নীচের তলা থেকে দুজনে উধাও।

'কি, বল।' প্রীতিলতা সত্যেশ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কাপড়ে জল-হাত মুছছেন।

সত্যেশ্বর একগাল হাসি হেসে বললেন, 'যাই বল প্রীতি, এতদিনে সত্যি সত্যি সুখের মুখ দেখার সময় এল। হঠাৎ এত টাকা একসঙ্গে, তার ওপর—'

'আঃ, চুপ করতো।' প্রীতিলতা বেন চাপা ধমক দিলেন দৃষ্টি আর স্বর মিশিয়ে, 'আজ আবার কি বার যেন! তোমার সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যাচ্ছে নাকি? বলার আর কথা পেলে না।' বলতে বলতে পাশের ভাড়াটে রমাদের দালানের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে জানালা দুটো ভেজিয়ে দিলেন। তাকালেন স্বামীর দিকে। 'তোমার সব ব্যাপারটাই অনাসৃষ্টি। গলাটাও কি নামিয়ে কথা বলতে পার না? জান তো, চারপাশে শত্তুর নিয়ে বাস আমাদের।'

সত্যেশ্বর স্ত্রীর কথায় একটু দমে গেলেন। অপরাধীর মত মুখ করে আমতা-আমতা করলেন, 'না, না, এতে আর এমন কি হবে, ও এমন কিছু নয়—'

'যাক, আজে-বাজে বকতে হবে না। কাজের কি হল, বল।'

'নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটটাই ঠিক করে এলাম। গ্যারেজ তো দরকার নেই। শুধু ফ্ল্যাটটাই ছ'শোয় রাজি হতে হল। কি করি! এক মাস দিলে হত, আমি তিন মাসের এ্যাডভান্স দিয়ে এসেছি। দিতে যখন হবেই। ভদ্রলোকও বুঝলেন আমরা সজ্জন। অবশ্য বাড়িওলা খুব ভাল, আফটার অল বাঙালী তো। বলে এসেছি, সকালের খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা সেরে সামনের মঙ্গলবার দুপুরেই চলে যাব।'

'সত্যি বলছ! এত তাড়াতাড়ি যাব!' প্রীতিলতার চোখ বড়, সারা মুখে-চোখে চাপা খুশি, সমস্ত শরীর বেয়ে আহ্লাদ গড়িয়ে পড়ছে। তবে ভাড়াটা আর একটু কমলে ভাল হত।"

'কিন্তু যাই বল প্রীতি, ওসব এলাকার আমাদের ভাড়াটাই সবচেয়ে কম বোধ হয়। এও এক দৈব-যোগাযোগ বলতে পার।' সত্যেশ্বর ঝোলানো জামার পকেট থেকে এ্যাডভান্স পেমেন্টের কাগজটা বের করে প্রীতিলতার হাতে দিলেন। 'জানো, যাবার সময় ঠাকুরমশাই-এর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলাম। উনিই তো বললেন, সামনের মঙ্গলবারটা সবচেয়ে মঙ্গলের দিন।'

'তোমার ঠাকুরমশাই-এর কথা আর বোলো না। সব কথা কিন্তু মেলে না।' আমার তো সব সময় ভয় লেগে থাকে।" কৃত্রিম অভিমানে প্রীতিলতা এত বয়সেও মুখে ঈষৎ অল্পবয়সী বঙ্কিমতার ভঙ্গি করলেন।

'ও কথা বোলো না।' গলা নামিয়ে সত্যেশ্বর বললেন, 'উনি না বললে কি লটারির টিকিটটা কিনতাম চুপিচুপি? তা ছাড়া নতুন ব্র্যাণ্ডে ট্রান্সফার্ড হয়ে ডিপার্টমেন্টাল হেড হওয়া, মাইনের এমন একটা বড় জাম্প—তা-ও তো উনিই বলেছিলেন!' একটু থামলেন সত্যেশ্বর, 'আমরা উঠে যাচ্ছি এবার তুমি বলতে পার সকলকে।'

'তবু, লটারির টাকার কথা কাউকে যেন বলে ফেল না। তোমার তো, বলতে আরম্ভ করলে মুখের আগল থাকে না! বললেই নতুন নতুন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব গজাবে, সাহায্য করো, ধার দাও। কতরকম ঈর্ষা করবে। বাব্বা, সেও তো এক অভিশাপ! দরকার কি?' একটু থামলেন প্রীতিলতা, 'তবে এটা বোলো, তুমি এতদিন ধরে দিনরাত খেটে অফিসে ভাল কাজ দেখিয়ে ওদিকের এক ব্র্যাঞ্চের হেড হয়েছ! অফিসের কাজকর্মের সুবিধে, তাই বাড়ি বদলাচ্ছি ওদিকে।'

'তাহলে খুশি হয়েছ তো?' সত্যেশ্বর স্ত্রীর দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন।

'হবো না! কি বল? সেই কিয়ে করে এই একতলার ড্যাম্প ঘরে আমায় এনে তুলেছিলে, আজ পঁচিশটা বছর এই আস্তাকুড়ে দম বন্ধ করে কাটিয়েছি! আনন্দ হবে না! তোমার হচ্ছে না?'

সত্যেশ্বর নিঃশব্দে মৃদু হাসলেন। কি ভেবে তক্তপোষের ওপর বসে দেয়ালে হেলান দিলেন। হাতপাখাটা তুলে নিলেন।

'তাছাড়া ছেলেমেয়েগুলোর সবচেয়ে বেশী আনন্দ। কোথায় লোকের কাছে বলতে পারে না বাড়ির কথা। কত বড়লোক সব বন্ধু আছে বড় খোকার, অরুণের। একদিনের জন্যেও বাড়িতে এনে বসাতে পারেনি ওদের। বরুণ অরুণ কত গজগজ করে।' একটু দম নিলেন প্রীতিলতা, 'অচ না হয় অত-শত ভাবে না, কপাটার এত ছোট থেকেই কত দুঃখ বল তো? জন্ম থেকে একদিনও সুখের মুখ দেখল না।' প্রীতিলতা গলা নামালেন, 'শোন, এবার ওখানে গিয়েই অচর খুব ভাল করে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।'

'সে আর তুমি বলবে কি? আমি তো আগে থেকেই ভাবছি। বড় মেয়ে হয়ে সংসারটার জন্যে কম করেছে! অথচ একটি কথাও কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি।'

স্বামীর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে কি ভেবে প্রীতিলতা বললেন, 'আর এক কাপ চা খাবে?'

'এখন কি চা হচ্ছে?'

'আমাদের তো হচ্ছে। খাও না। প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে স্নেহ একটু বাড়ল হঠাৎ।

'দিলে একটু তাড়াতাড়ি দাও। এখুনি বেরুবো। লরির ব্যবস্থা করতে হবে, আরও অনেক ঝামেলা আছে।'

প্রীতিলতা বেরিয়ে গেলে অরুণ বাবার কাছে এল। গায়ে বুশশার্ট গলাচ্ছে, এখুনি বেরুবে। 'বাবা, স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, সোমবারই তোর আর তরুণের ঠিক করে নে। বছরের প্রথম দিক, ওদিকের স্কুলে ব্যবস্থা করে নিচ্ছি। বরুণ বড় হয়ে গেছে, ওর কলেজ পরে পাল্টালেও চলবে।'

অরুণ বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরল। 'বাবা, আমি আর তরুণ কিন্তু সেই গাছটার সোজাসুজি ঘরটা নেব। দাদাকে একেবারে ধারের ঘর দিও।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হবে।' সত্যেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে সেখানে যাই, তারপরে তো?'

রান্নাঘরে বসে অর্চনা এসব মন দিয়ে শুনছিল আর চা করছিল।

প্রীতিলতা ঢুকেই বললেন, 'অচ, বাবাকে এক কাপ চা দিয়ে আয় তো মা, তাড়াতাড়ি।'

অর্চনা এক কাপ চা নিয়ে বাবার কাছে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

'আর শোন্, তোকে রান্নাঘরে এখন আসতে হবে না, আমিই সব করে নিচ্ছি। তুই বরং ঘরদোর গুছিয়ে নে। সামনের মঙ্গলবার তো যেতে হবে, মাঝে আর মাত্র দু'দিন। আজ থেকেই কিছু কিছু করে গোছাতে থাক।'

অর্চনা মাকে একবার দেখে নিয়ে বাবার কাছে এল।

'এনেছিস! দে মা।' চা-এ চুমুক দিয়ে তাকালেন মেয়ের দিকে, 'কি রে, খুশি হয়েছিস তো?'

অর্চনা হাসতে হাসতে ঘাড় কাৎ করল।

'সবাই দুঃখ করে দেখে এল, তুই তো একবারও দেখতে গেলি না মা!' একটু থেমে আবার চায়ে চুমুক দিলেন, 'তোর আর কপার জন্যে একটা আলাদা ঘর রেখেছি। কপাও তো আর ছোট নয়, এই চোদ্দ শেষ হতে চলেছে। বেশ বড় হয়ে গেছে না?' মেয়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন, 'অনেক কষ্ট করেছিস মা, এবার একটু সুখী হবি।' সত্যেশ্বরের গলা যেন শুধু চায়ে নয়, আরও কিছুতে ভিজে ভারী হয়ে গেল হঠাৎ। দু' চোখের জমির ওপর দিয়ে যেন পাতলা দুটুকরো কুয়াশার আস্তরণ ভেসে সরে গেল।

অর্চনা বলল, 'মঙ্গলবার তো যাচ্ছি, একেবারে গিয়ে নতুন দেখব।'

ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাকি চা-টা এক চুমুকে শেষ করে সত্যেশ্বর ঘড়ি দেখলেন, 'ইস্, দেরী হয়ে গেল। এখুনি বেরুতে হবে।' উঠে দাঁড়ালেন।

সকালের দিকে বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। প্রীতিলতা রান্নাঘরে। বাড়ি বদলানোর খুশি আর আনন্দে অরুণ-তরুণ-কপা বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে চলে গেছে। অর্চনার যেন কোন কাজ নেই আর। এটো বাসনপত্তর, কাপড়িস কলতলায় নামিয়ে আবার এ-ঘরে এল।

এ-বছর ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকেই গ্রীষ্মের গুমোট গরম চারপাশ ঢাকতে শুরু করেছে। অর্চনাদের এই ঘরটাও যেন সকাল থেকে আঁচ ফেলে-দেওয়া উনুন হয়ে উঠছে। তক্তপোষে বসে ঘরটায় চোখ বুলোল। ঘরের দেয়াল কোথাও চুনবালি-খসা, কোথাও বা ময়লা তেলচটচটে। সাদা অংশটুকুও মরা ছারপোকার রক্তে হিজিবিজি। সিমেন্টের মেঝে চটা উঠে, ফাটায়, গর্তে বিশ্রী হয়ে আছে। কতদিনের পুরনো ইলেকট্রিক লাইন ঝুলে আছে দেয়াল থেকে। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় এপাশ-ওপাশ করে টেনে ভারী সুইচবোর্ডটা দেয়ালের সঙ্গে আটকে দিয়েছে অর্চনা। সিলিং বেয়ে ছোট ছোট বাদুড়ে ঝোলার মত গোছা-গোছা ঝুল থিকথিক করছে। দেয়ালের কোণে কোণে উই-এর বাসা লম্বা রেখায় নেমে আসছে।

এই ঘর ছেড়ে দেবে ওরা! অর্চনার কেন যেন দম বন্ধ হয়ে এল। এ-ঘরে

মা, অরুণ, তরুণ, কপাকে নিয়ে অর্চনা মেঝেয় শায়। মুখের কাছে এর-ওর নিঃশ্বাস, ভাই-বোনদের স্পর্শ, মায়ের শাসন, সুখ-দুঃখ—সবকিছু জড়িয়ে অর্চনারা সকলে কখন যেন অস্বস্তির মধ্যেও ঘুমিয়ে পড়ত। বাবা তক্তাপোষে শোয়। ওপাশে ছোট ঘরে বই, জিনিস-পত্তরে ঠাসা বলে বরুণ একা শোয়। সমস্ত বিছানাপত্তর ডাঁই করা আছে তক্তপোষের ওপর। মেঝেয় দেয়ালের গা ঘেঁষে পুরনো মরচে-ধরা ট্রাঙ্ক, বাসনপত্তর—কত যে জিনিস! সবকিছু অর্চনারই যত্ন করে গুছিয়ে রাখা।

একার সব বদলে যাবে! অর্চনা নিজের মনেই হাসতে হাসতে জানলার সামনে এল। পাশের বাড়ির খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল। জানলার পাশেই খুব সরু গলি। লোকজন যেতে পারে না, কারণ লম্বা গলির দু'মুখে নোংরা ছাই, ময়লা ফেলে রেখে পাশাপাশি বাসিন্দাদের ঝি-রা। এমনিতেই সব সময় গলির ভিতরটাও নোংরায় ভর্তি থাকে। গন্ধে মাঝে মাঝে মাথা ঝিমঝিম করে অর্চনার।

'বৌদি!' অর্চনা ডাকল।

'কে অচ?' প্রতিমা জানালার ভাঙা কাঠের গরাদে বুক চেপে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার? রান্না শেষ?'

অর্চনা হাসল। 'আমরা মঙ্গলবার সত্যি সত্যি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।'

'এই সামনের মঙ্গলবার। সেকি! কোথায়?'

'নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না।' অর্চনার কণ্ঠস্বর কেমন বিষণ্ণ শোনাল।

'না না, দেখা হবে না কেন!' প্রতিমা থামল। 'কিন্তু আমি যে খুব অসুবিধেয় পড়লাম!'

'কি?' অর্চনা অবাক।

'তুমি যে খুব সুন্দর রাঁধতে পার—মাংস, চাটনি—সব, আমি কিন্তু সেদিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম, আমার মাকে সব বলেছি। ঠিক করেছিলাম, ছোটবোনের পাকা দেখার দিন তোমায় নেমন্তন্ন করব তোমার নিজের রান্না খাওয়ার জন্যে। মাসিমাকেও তো কত আগে থেকে বলে রেখেছি। এখন কি হবে বল তো ভাই?'

'ওসব ভুলে যান।'

'বাঃ, ভুললেই হল আর কি? ইস্, কি ভাল রাঁধ তুমি! এই সেদিন শান্তার ভাইপোর অন্নপ্রাশনে তুমি রাঁধলে না! তাছাড়া তোমাদের দোতলার ঘোষ-গিন্নীর বড় ছেলের বউ-এর সাধও তো তুমি ভাই কম করনি! আমার তো ভীষণ ঈর্ষা হয়।'

'তাতে কি?' চাপা লজ্জায় অর্চনার কথা আটকে গেল। 'তুমি আমার রান্না তো খেয়েছ!'

প্রতিমা হেসে উঠল। 'আহ্, তা কি ভুলতে পারি! মনে করে দেখ তো এই জানলা দিয়ে কত কি তুমি খাইয়েছ আমাকে, ঠাকুরঝিকে। আমার ছোট মেয়ে রুমুনি তো তুমি চলে গেলে খাওয়া-ঘুম বন্ধ করবে।'

'বৌদি, আমি কিন্তু একা খাওয়াইনি, তুমিও তো কত কি দিয়েছ!'

'সত্যি, আমার খুব মন খারাপ লাগছে অচ। তোমরা কত বছর কি কষ্টে এখানে কাটালে! কিন্তু তোমাদের পাশে পেয়ে আমরা তো নির্ভয় হতুম। আর এখন!' প্রতিমা চুপ করল কয়েক মুহূর্ত। 'যাই বল, আমরা কিন্তু তোমাদের কিছুতেই ভুলতে পারব না।'

অর্চনা প্রতিমা বৌদির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। হঠাৎ যেন অর্চনার সারা মুখে কিসের ছায়া নেমে এল। টাকরা, নাক, দু'চোখের ভিতরটা টনটন করে উঠল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'পম্পা কোথায় বৌদি!'

'ঠাকুরঝি! ও একটু বেরিয়েছে। ও এলেই পাঠিয়ে দেব তোমাদের ওখানে।' একটু থামল প্রতিমা। 'অচ, রান্নাঘরটা একটু দেখে আসি। তুমি তো আসছ। অনেক কথা হবে। এখন যাই।'

অচনা ছলছলে চোখে হাসল। প্রতিমা আড়াল হয়ে গেল।

অর্চনার যেন এখন ঘর গোছানোর কোন কাজেই গা নেই। মা রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। নীচের তলাটা গুমোট গরম ঘাতাসে চাপা। সারা বাড়ি শূন্য। ওপাশের অন্ধকার ঘরদু'টোয় রমাদিরা থাকে। ওদের সঙ্গে মায়ের জল-কল-পায়খানা নিয়ে প্রায় দিনই ঝগড়া চলে। কথা বন্ধ হয়ে যায়। রমাদির ছোট ছেলেটা অর্চনার ভীষণ নেওটা বলে অর্চনার সঙ্গে এতটা দুরত্ব হয় না, তবু মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে কোন এক নিঃশব্দতায় অর্চনার সঙ্গেও কথা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আবার কখন যেন ঝগড়া ভুলে মা-রমাদি এক হয়ে ওঠে। অর্চনার তখন অবাক লাগে, হাসিও পায়। এখন কদিন হল কথা বন্ধ আছে।

রমাদির ঘরের দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দোতলা-তেতলা ছাদে ওঠার সিঁড়ির দিকে এগোল অর্চনা। সামনে এক চিলতে উঠোন। সিঁড়ির মুখটা ওদের ঘর থেকে একটু আড়ালে পড়ে যায়। ওপর থেকে নেমে-আসা পদশব্দে সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল অর্চনা। তাকিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল। তেতলার প্রভাতদা নামছেন। ওদের সঙ্গে অর্চনাদের মাখামাখি আজ বেশ, তবে অর্চনার সঙ্গে প্রভাতদার তেমন খুব বেশী কথাবার্তা নেই। সামনে পড়লে, বা চোখাচোখি হলে কখনো নিঃশব্দ মৃদু সুলজ্জ হাসি-বিনিময়, কখনো বা বড়-জোর 'ভাল তো!' এটুকু কথার আদান-প্রদান হয়েছে। তা-ও মূলত প্রভাতদার তরফ থেকেই।

'আরে! এই তো আপনি। নমস্কার। কি ব্যাপার বলুন তো? আপনারা নাকি চলে যাচ্ছেন নিউ আলিপুরে? ডান হাতের দু-আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট।

হঠাৎ এমন উচ্ছ্বসিত কথা বলতে দেখে অর্চনা ভিতরে কেমন এক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে গেল। প্রভাতের দিকে সোজা তাকিয়ে সলজ্জ হাসল।

'কপা একটু আগে আমার মাকে, বোনকে বলে এসেছে! সত্যি?'

'মিথ্যে বলেনি।' অর্চনা সহজ হল। চাপা ঠোঁটে হাসি জড়িয়ে আছে এখনো।

'কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। আপনারা চলে যাবেন, এ ভাবতেই পারছি না। আপনারা এত ভাল!'

'আপনারাও।' একটু থামল অর্চনা। 'আমার ছোট ভাই-এর সেই ভারী অসুখের সময় আপনার দাদা যা করেছেন!'

'ও ডাক্তার হলেই করতে হয়। তা ছাড়া ডাক্তারদের প্র্যাকটিক্যাল মানবতাবোধ একটু বেশী।' বলেই একটু বেশীই হাসল প্রভাত। 'আট্টা নয়, দেখুন, এই ফ্ল্যাটে যখন প্রথম আসি, আপনারা আমাদের জন্যে কম করেন নি! পাম্পে জল ওঠেনি, স্নান-রান্না-খাওয়া হয়নি। আপনি আর আপনার মা খাবার পাঠিয়ে কি কাণ্ডই না করেছিলেন!'

'যাক, চলে যাচ্ছি, যাবেন তো?' অর্চনা হঠাৎ কথা ঘোরাল।

'ওহ্, সিওরলি! পার্টিকুলারলি আপনার কথায় তো মা, বাবা, বোনেরা একেবারে পঞ্চমুখ। বিশেষ করে মা তো—'

'তাই বুঝি?' একটু বেশী হেসে উঠল অর্চনা। 'অথচ দেখবেন, আপনারাই আমাদের আগে ভুলে যাবেন!'

'নিউ আলিপুরের যেখানে যাচ্ছেন, ওটা কিন্তু ভয়ংকররকম এ্যারিস্টোক্রাটদের পাড়া!'

'ঠকছেন!'

'না, এমনি ভাবছিলাম।' প্রভাত সিগারেট মুখে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত এক-ভাবে অর্চনার দিকে তাকিয়ে রইল।

'জানেন, আমারও ভয় হয়, আমরা হয়ত সকলেই সকলকে ভুলে যাবো।' অর্চনার গলার স্বর হঠাৎ শান্ত, ভারী বিষণ্ণ।

কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক থেকে প্রভাত সশব্দে হেসে উঠল। 'পার্টিকুলারলি। আমি কিন্তু আপনাদের ভুলতেই দেব না। দেখবেন, গিয়ে কি রকম জ্বালাতন করি। ভাবছেন, দূরে পালিয়ে গিয়ে পার পাবেন!'

'সত্যি!'

রান্নাঘর থেকে প্রীতিলতা ডাকলেন, 'অচ, কার সঙ্গে কথা বলছিস?"

'প্রভাতদা!'

কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার মায়ের কণ্ঠস্বর কানে এল, 'একবার এদিকে আয়, ঘর থেকে দুধের বাটিটা দিয়ে যা।'

ভুবনেশ্বর বেড়াতে গেলে ক্যাজিনো এয়ার কন্ডিশনড্ রেস্টুরেন্টে যেতে ভুলবেন না!

ভ্রমণের শ্রান্তি পেতে হ'লে চাই এই সঙ্গীতমুখর রেস্টুরেন্টে সুপরিবেশিত খাদ্যের স্বাদ, যা আপনি কখনও ভুলবেন না! চাইনীজ, কন্টিনেন্টাল, ভারতীয় মোগলাই ও তন্দুরী, আপনি যা চাইবেন, তাই পাবেন। পরিবেশ ও পরিবেশন অত্যন্ত মনোরম।

Casino

এয়ার-কন্ডিশনড্ রেস্টুরেন্ট

ভুবনেশ্বর

CSM 73-562

আচ্ছা চলি, একবার যাবেন ওপরে?' বলেই প্রভাত সিগারেট মুখে ধরে মৃদু হাসতে হাসতে বাইরের দরজার দিকে এগোল।

অর্চনা দেখল প্রভাতকে। খুব স্মার্ট চেহারা, ফর্সা, বেশ ভাল দেখতে। বি-কম পাশ করে ব্যাঙ্কে চাকরী করছে। চমৎকার কথা বলে, এখন বুঝল আলাপীও বেশ। দামী সিগারেট খায়। আর সিগারেটের গন্ধ অর্চনার মন্দ লাগে না। প্রভাত দৃষ্টির আড়াল হতেই চাবিতে অর্চনার মনে হল, প্রভাতদার বয়স কতই বা হবে? তিরিশের কাছাকাছি। অন্যমনস্ক অর্চনা যেন অকারণ বিড়বিড় করল, ওরও তো এই বাইশ চলছে। নিজের মনেই হাসল, প্রভাতদার মা ওকে খুব ভালবাসে! পরে একবার ভেতলার যাবে। ওদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বিকেলে দোতলার লীলাময়ীর ঘরে বসে প্রীতিলতা বললেন 'চলে তো যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আসবেন ভাই, না হলে ভীষণ মন খারাপ লাগবে।'

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্চনা। বলল, 'হ্যাঁ মাসিমা, যেতেই হবে কিন্তু। আমি তো ভাবতেই পারছি না, সামনের বুধবার সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনাদের দেখতে পাব না। আমার তো যেতেই ইচ্ছে করছে না।'

'না না, ভুলতে পারি তোমাদের।' লীলাময়ী বলতে বলতে একবার থামলেন। 'তা ভাই, আপনাদের ভাড়া লাগছে কত?'

প্রীতিলতা একটু থামলেন। 'ভাড়া। তা চারখানা বড় বড় ঘর, বাথরুম, পাখখানা নিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, তার ওপর ওই পাড়া। লাগছে আপনার সাড়ে আটশোর মত। অবিশ্যি নীচের একটা গ্যারেজও আমরা নিয়েছি। অফিসের গাড়িটা গিয়েই একেবারে নিজেদের মত করে পেয়ে যাবো তা!'

অর্চনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। এত ভাড়া তো নয়। আর গাড়ি পাওয়ার এখনো কোন ঠিকই নেই।

'আপনার খরচও বেশ বাড়ল, বলুন।' লীলাময়ী তাকিয়ে রইলেন প্রীতিলতার দিকে।

'খরচ বাড়ছে বইকি। তবে কি জানেন, ওঁর অফিস থেকে তো বাড়িভাড়া দেয়। সেটা ছাড়ি কেন? আর বাড়িও তো করে ফেলব শীগগির। বাই বলুন, একটা ভাড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি করে উঠে যাওয়ার যে আনন্দ সে আনন্দ কি এতে পাব?'

'এরই মধ্যে বাড়ি করবেন। কোথায়?'

'ওই নিউ আলিপুরেই, আমাদের ফ্ল্যাটের কাছেই। চার কাঠার মত জমি কেনা আছে বছর পাঁচেক হল। এবার গিয়ে বাড়ি আরম্ভ করে দোব, তাই তো জমির কাছাকাছি গেলাম। আর ওঁরও অফিসের সুবিধে হল।' লীলাময়ীকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রীতিলতা বললেন, 'আপনাদের এত-দিন বলিনি, কারণ সামান্য জমি, বলার মত তো নয়, লজ্জা করে।'

অর্চনা মায়ের কথায় ক্রমশ বিরক্ত হচ্ছে। মা যেন কি! এত মিথ্যে বলারই বা দরকার কি? বিশেষ করে লীলাময়ীদের কাছে। ওঁরা কি ভাল, কতদিনের পরিচিত। অর্চনা হঠাৎ বলল, 'মা, আমি একটু ছাদে যাচ্ছি।'

'আমিও উঠছি।' বলেই উঠতে উঠতে লীলাময়ীকে বললেন, 'চলি ভাই, অচর বাবা আবার নীচে অপেক্ষা করছেন। আমি গেলে বেরুবেন। উনি তো এক মুহূর্ত বিশ্রাম পাচ্ছেন না। বাড়ি বদলানো যে কি ঝামেলা ভাই, আমারই এখন বিরক্তি লাগছে।'

'তা ঠিক। দশ বছর আগে পাতিপুকুর থেকে আমরা যখন এখানে আসি, তখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।' লীলাময়ী হাসলেন। 'আবার আসবেন ভাই, এখনো তো দুদিন সময় আছে। সেই তো মঙ্গলবারে যাবেন। আর বুঝুন, জিনিস-পত্তর বাঁধা-ছাঁদা, বা ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দরকার পড়লে বলবেন, আমার ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দোব। সবই তো আপনা-আপনির মধ্যে!'

'তবে দরকার হবে না। হলে বলব।' প্রীতিলতা হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

ছাদে এসে অর্চনা দেখল, সামনে তিন বাড়ির ছাদ পেরিয়ে বিশুদের ছাদে বিশুর দিদি শান্তা দাঁড়িয়ে। 'অচদি! চেঁচাল শান্তা, 'তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ?'

'কে বলল?' অর্চনা হাসতে হাসতে ছাদের আলসের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'অরুণ এসেছিল বিশুর কাছে।' একটু থামল শান্তা। 'আমাদের বাড়ি এসো না, কথা বলব। এতদূর থেকে বলা যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না।'

'যাচ্ছি।' অর্চনা নীচে নেমে সরু ছোট ছোট হিজিবিজি কয়েকটা গলি পেরিয়ে শান্তাদের বাড়ি ঢুকল। নীচের ঘরের বৈঠকখানায় শান্তার বাবা বসেছিলেন। অর্চনাকে দেখেই বললেন, 'কি মা, অচ, তোমরা চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ কাকাবাবু।' প্রণাম করল অর্চনা পায়ে হাত দিয়ে।

'থাক, থাক, বস।' অর্চনা বসলে বললেন, 'বাবার অফিসের গাড়িটা তো এবার তোমাদেরই হয়ে গেছে। তবে ওটা নাকি নতুন কি একটা মডেলের—তোমরা যে গ্যারেজ ভাড়া করেছিলে তাতে নাকি কুলোচ্ছে না?'

'গাড়ি!' অস্ফুটে উচ্চারণ করে অর্চনা ঢোক গিলল।

'হ্যাঁ, বেটা তোমার বাবা অফিস থেকে পেয়েছেন। অরুণ বলে গেল। ওটা করেই তোমরা মঙ্গলবার যাচ্ছ! ভালই হবে। এতটা রাস্তা।'

অর্চনার আড়ষ্টতা কাটেনি। অরুণ কি বলে গেছে আন্দাজ করল, 'অফিসের গাড়ির কথা বলছেন?'

'তা ছাড়া আর কি?' শিবনাথবাবু হাসলেন। একটু থেমে বললেন, 'খুব ভাল হল। তোমরা যে কষ্টে কাটালে এখানে! তোমার বাবাকে তো দেখেছি কি পরিশ্রম করেছেন। সকাল সাতটায় বেরিয়ে যেতেন, রাত দশটায় ফিরতেন! নিজের চেষ্টায় এতটা বড় হওয়া কম কথা নাকি?'

'কাকাবাবু আপনিও তো কম করেননি আমাদের জন্যে। আমি সব জানি।'

'তুমি বাবার বড় মেয়ে, তুমি জানবে না? তবে ওসব কথা থাক মা। বিপদে পড়লে কে না করে?' থেমে বললেন, 'বাই দি বাই, মনে পড়ে গেল, তোমাদের ফোন-নম্বরটা দিয়ে যাও তো। অরুণ তো দিতে পারল না, ভুলে গেছে। অবশ্য ভোলাই স্বাভাবিক, নতুন তো! মনে আছে তোমার?'

অর্চনা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল এবার। 'কাকাবাবু, বাবা তো আপনার কাছে আসবেন।'

শান্তা ঢুকল ঘরে। 'অর্চদি এসো, বড়দি তোমায় ডাকছে।"

'যাও, যাও, সব দেখা করে এসো। আবার কবে এদিকে আসবে দেখা হবে না। দেখা করে এসো।'

'আপনি আমাদের ওখানে যাবেন কিন্তু!'

'যাবো, যাবো। তবে রিটায়ার করার পর —যাতে যা অবস্থা হয়েছে। তবু সুযোগ পেলেই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো—'

শান্তার সঙ্গে অর্চনা বেরিয়ে এল। যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও, শিবু-কাকা ওদের চরম অভাবের সময় অনেক টাকা ধার দিয়ে উপকার করেছেন কতবার! খুব ভালমানুষ। অরুণ সেখানেও মিথ্যে কথা বলে গেছে! ওদের জন্যে অর্চনা সকলের কাছে কেমন আন্ডস্ট, একা, নির্বান্ধব হয়ে যাচ্ছে। অর্চনার ভিতরে যেন চাপা অস্বস্তি, অশান্তি গোপন-তম অসুখের মত নিশ্চুপ ঘিরিয়ে যাচ্ছে। অর্চনা এসব ভাবতে ভাবতে নীরবে শান্তার পাশে থেকে ওপরে উঠতে লাগল।

রাত্রে অরুণ বলল, 'দিদি ওই পুরনো টিনের বাক্সগুলো, পাখখানা আর চান করার ডিবেগুলো সঙ্গে নিও না যেন। বিচ্ছিরি, দেখলে লোকে যা-তা ভাববে।'

'তা বলে সব রেখে যাব।'

'কেন বাবি, জমাদার ওদের দিয়ে দাও, ওরা তো চাইছিল।'

প্রীতিলতা বললেন 'সত্যি অচ, ওসব নিস না। তবে কাউকে দিতে হবে না আমি ওসব পুরনো জিনিস যারা কিনতে আসে, তাদের দিয়ে দোব, তবু দুটা পয়সা হবে।'

বড় ভাই অরুণ বাবাকে বলল, 'বাবা ওখানে তো রান্নাঘরে গ্যাসের কানেকশান আছে। ছোট আর বড় মিলিয়ে দুটো প্রেসার কুকার কেনো, বারার জন্য ঝামেলা না বাধাই ভাল। অচটা মাসাদিন কেবল রান্নাঘরে পড়ে

থাকে. ভাল্লাগে না। রান্নার ব্যাপারটাও ভীষণ আনস্মার্ট।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল' প্রীতিলতা সায় দিলেন। মেয়েটাকে অনেক কম খাটতে হয় তা হলে।'

বরুণ বলল, 'তুমি কালই আমাকে টাকা দাও মা; আমি খাট-বিছানা, কোচ-কুশন, বাসনপত্তর সব কিছুর ব্যবস্থা করে দেব। মঙ্গলবার সকালেই সব পৌঁছে যাবে ওখানে।'

অরুণ দাদার কথাটা লুফে নিল। 'আর দাদা, বাথ টাওয়েল, কলিং বেল—এসব নিতে ভুলে যেও না যেন। ওই বাইরে থেকে নাম ধরে চীৎকার করে ডাকা ন্যাস্টি।' থেমে দিদির দিকে তাকাল। 'বিছানাপত্তরের ব্যাপারটা আগে কর। দিদি এইসব ছেঁড়া কাঁথা, নোংরা তেলচিটে বালিশ বাঁধবে ঠিক করেছে।' বলতে বলতে মেঝের এপাশে রাতের বিছানা পাতার জন্যে মোড়া, কাঁথা-কাপড় ছেঁড়া বালিশ জড়ানো পুঁটলিটায় জোরে লাথি মারল হাসতে হাসতে, 'দুত্তোর, আমার তো এসব নিয়ে যেতেই লজ্জা করছে।'

কল্পনা বলল, 'আমাকে বাবা ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করাবে বলেছে।'

'আমাকেও।' তরুণ বলল, 'তাই না বাবা?'

সত্যেশ্বর এতক্ষণ তক্তপোষের ওপর ডাই-কথা বালিশের গায়ে আরামে হেলান দিয়ে বসে ছেলে-মেয়েদের উজ্জ্বল মুখ-চোখ দেখছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ওখানে লা-মার্তেনিয়ারে কপা পড়বে, সব ব্যবস্থা করেছি। তরুণকেও একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াব। গোড়া থেকে ইংরিজিটা ভাল করে শেখা দরকার। এখনকার এম-এ পাশ ছেলেরা এক কলম ইংরিজি লিখতে পারে না! বরুণ কি বলিস?'

'তা ঠিক। আমিও ভাবছি বাবা, স্পোকেন ইংলিশটা কোন সাহেবের কোচিং-এ শিখে নেব। তুমি তো বলছিলে বিলেত পাঠাবে!'

সত্যেশ্বর সব শুনতে শুনতে এক সময় বললেন, 'অর্চনা, তুই আর বরুণ বসে লিস্ট করে ফ্যাল—এখানেই কি কি জিনিস এখনি কিনে নিয়ে যেতে হবে, বা যাবার আগেই ওখানে পাঠাতে হবে। কাল থেকেই কিনতে আরম্ভ করা দরকার।'

কি একটা কথা মনে পড়ে যেতে অর্চনা বলল, 'বাবা, তুমি একবার শিবু-কাকার বাড়ি যেও। কাকাবাবু দেখা করতে বলেছেন।'

'ও, যাবো এখন। তবে নতুন বাড়ি যাওয়ার আগে বোধহয় দেখা হবে না।'

'সেকি! আমি বলে এসেছি যে, তুমি যাবে।'

'থাক মা, ওরকম অনেকেই এখন বলবে। সম্ভব নয়। পরে সময়-টময় হলে আসব এখন।'

'কেন, তোমার তো প্রতিদিন যাওয়া-আসার পথেই পড়ে ওঁদের বাড়ি।' বলতে বলতে অর্চনা বাবার দিকে স্থির তাকাল। বাবার নিরাসক্ত মুখ দেখে হঠাৎ কেমন চাপা কিন্নয়ে, কষ্টে চুপ করে গেল।

যাবার দিন সকালে একটা লরি দুরের বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালে তরুণ হঠাৎ বলল, 'দিদি, নোংরা বিছানাটা রাস্তার মোড়ের ভিখিরিটাকে দিয়ে আসব!'

অরুণ বলল, 'ভালই তো, তবু ভিখিরিটা ছেলেমেয়ে নিয়ে শুতে পারবে। যা, ওকে দিয়ে আয় তো।'

তরুণ বলল 'আমার পুরনো প্যান্ট-জামাগুলোও দিয়ে আসি। কি হবে আর। বাবা তো ফুলপ্যান্ট-বুশশার্ট কিনে দিয়েছে। এসব আর পরবো না। বিচ্ছিরি দেখাবে।'

অর্চনা দুই ভাইকে দেখল। বলল, 'থাক না অরুণ, ওখানে একটা ছেলেকে তো কাজের জন্যে রাখতেই হবে। তাকে শুতে দিতে হবে না?'

'ইস্, তুমি কি বলছ দিদি! তা বলে চাকর-বাকরদের জন্যে তুমি বিছানা বয়ে নিয়ে যাবে—তা-ও এই! তোমার কোন প্রেস্টিজ নেই। বিউটি সেন্স তোমার এত কম!'

'দরকারটাই আগে অরুণ।'

'যখন দরকার হবে কিনে দেবে এখন। এগুলো ঘরে থাকলেই গা ঘিন-ঘিন করবে।'

প্রীতিলতা ছেলের পক্ষ নিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলছে অরুণ। অচ, ও-বিছানাটা ফেলে দে, বা দিয়ে দে।'

অর্চনা মায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তরুণ বিছানাটা তুলল। কয়েকটা আরশুলা বিছানা থেকে বেরিয়ে ছিটকে নীচে পড়ে এপাশ-ওপাশ লুকোল। ডাস্টবিনের কোন নোংরা ছুঁয়ে ফেলার ভঙ্গিতে তরুণ গোটানো বিছানাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটের বারান্দায় বিকেলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অর্চনা মনে মনে হিসেব করল। দু' মাসের ওপর হয়ে গেল ওরা এসেছে। মোট চারখানা ঘর অর্চনাদের। একেবারে নতুন বাড়ি। বাড়িটার প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে কোলাপসিবল গেট বসানো। ঘরের দেয়াল, মেঝে ঝকঝকে, রান্নাঘরে গ্যাস এনে ফেলেছে। বাথরুমে শাওয়ার, দেয়ালে দামী আর্শি, বেসিন। পায়খানা পরিষ্কার, তকতকে। দেয়ালে বসানো ছোট্ট ডিবে থেকে মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে। ডাইনিং স্পেসে খাবার টেবিল, মুখ ধোয়ার বেসিন। বারান্দার কোণেও বেসিন, সামনে আর্শি। ফ্ল্যাটের এক প্রান্তে বাবা-মার ঘর, আর এক প্রান্তে বরুণের ঘর—ওটাই সোফা-কাম-বেড বসিয়ে বৈঠক-খানা। বাবা-মার ঘরের পাশেই অর্চনা-কল্পনার ঘর, তার পাশে ছোট দুই ভাই থাকে। প্রত্যেকের সিঙ্গল বেডে আলাদা বিছানা।

অর্চনা যেন মনে মনে এসবও হিসেব করল। ওর কোন কাজ নেই। ঠিকে ঝি বাসন মাজে, রাঁধুনি রেঁধে দেয়। ঘনশ্যাম আছে ফাইফরমাশ খাটার জন্যে। সবকিছু যেন ভুলতে বসেছে অর্চনা। কি রকম যেন ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা ওকে চাপা অসুখের মধ্যে ঘিরে ধরেছে। অসুখটা বুঝি ওখান থেকেই ধরেছিল। অর্চনার বুকে যেন হাঁফ ধরল। বড় করে নিশ্বাস ফেলল। বরুণকে তো বাড়িতেই পাওয়া যায় না। অরুণ বেশ কিছু নতুন বন্ধু করেছে। তরুণও তাই। কপা নাচের স্কুল, গানের স্কুল আর পড়াশুনার স্কুল করে বাড়ি থাকেও কম। বাবা ফিরবে সন্ধ্যেয়, একমাত্র মা আর সে ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। ঘনশ্যাম নিজের মনে সব সময়ে ঘর তকতকে রাখার কাজ করে যায়।

কারোর সঙ্গে অর্চনা কথা বলতে পারে না। অর্চনার কেউই যেন আপন হল না! হবেই বা কি করে? পাশের বাড়ি-গুলোই বা কত দূরে দূরে। এখানে রক নেই, কোন আড্ডা নেই। ছাদে কেউ তেমন আসে না। সব কোথায় যায়? গাড়ি করে লেকে? সিনেমায়? পার্কে? বাবার অফিসের গাড়ি করে কপা, তরুণ, অরুণ কতবার লেক ঘুরে এসেছে। অর্চনা যায়নি।

অর্চনা সামনে তাকাল। হু-হু হাওয়ার শব্দ নির্জন রাস্তার দুপাশ সাজানো গাছের পাতা কাঁপিয়ে বয়ে চলেছে। দুপাশের নিথর নিশ্চুপ বাড়ি-গুলোর দেয়ালে ধাক্কা লেগে পরিচ্ছন্ন পিচের রাস্তায় পাক খাচ্ছে বাতাস। হিসহিস শব্দ হচ্ছে চারপাশে। কি রকম একা লাগল অর্চনার। নিজের ঘরে এল। ওর জানালার ভারি পর্দা সরিয়ে সামনে তাকাল। দূরে পাশের বাড়ির সেই ভদ্র-মহিলা জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চেহারায় অনেকটা প্রতিমাবৌদির আদল। তবে প্রতিমাবৌদি যেমন নোংরা কাপড়-জামা পরে থাকতেন বিকেলেও, ইনি তা নন। ওঁর সঙ্গে কত বার কথা বলতে চেষ্টা করেছে অর্চনা, পারেনি।

অর্চনা একভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। যদি চোখাচোখি হয় কথা বলবে। 'আপনারা কবে এলেন?' 'কাল।' 'কোথা থেকে আসছেন?' 'পাতিপুকুর থেকে।' 'পাতিপুকুরে আমার মামারা থাকতেন।' 'পাতিপুকুরে আমার বাপের বাড়ি। বিয়ের পর ওখানেই ছিলাম। ঘর পেয়ে এখানে এসেছি।' 'আমাদের বাড়ি একদিন আসবেন।' 'যাব। আপনিও আসুন।' 'আমাকে আপনি বলবেন না।' প্রথম আলাপ হয়েছিল প্রতিমাবৌদির সঙ্গে।... দূরের ভদ্রমহিলা হঠাৎ একবার তাকালেন।

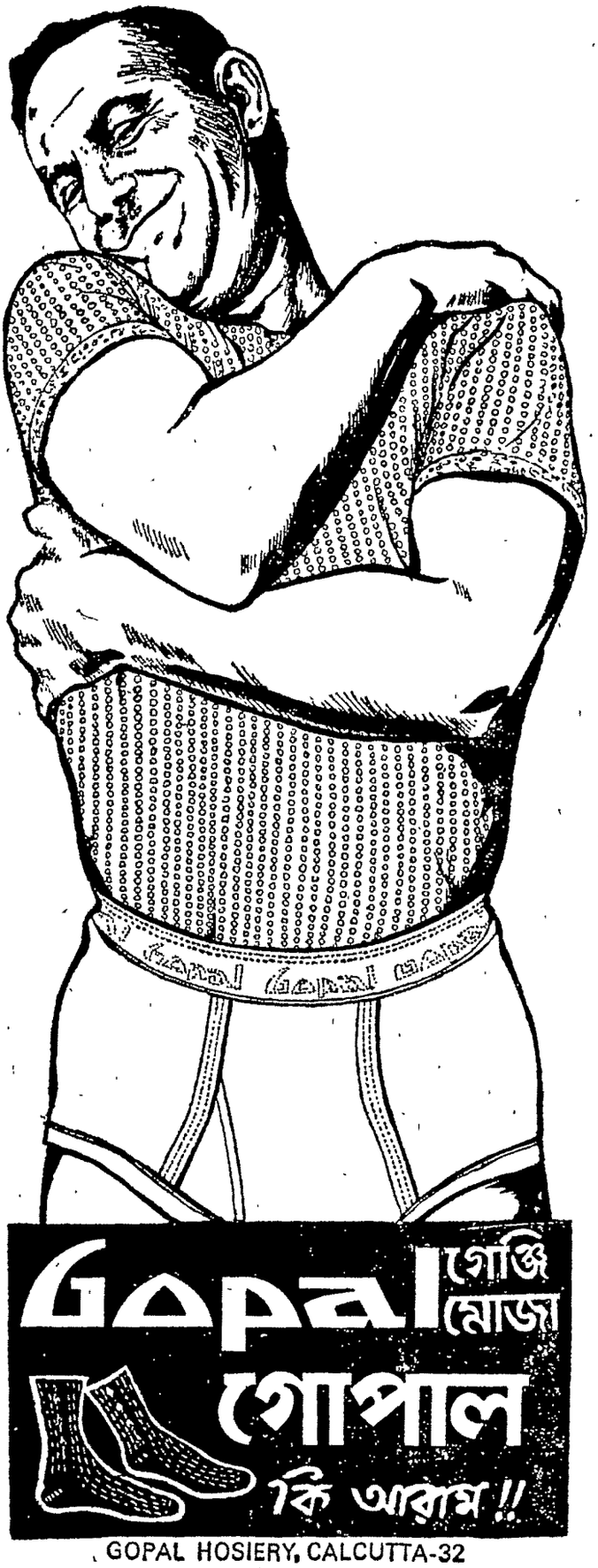

GOPAL HOSIERY, CALCUTTA-32

অর্চনার চোখে চোখ পড়তেই হাসল অর্চনা। ভদ্রমহিলা কিছু সময় গম্ভীরভাবে তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন। অর্চনার মনে হল, ভদ্রমহিলা ওকে দেখতে পাননি। আবার তাকিয়ে থাকল। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রমহিলার চোখ পড়ল অর্চনার ওপর। অর্চনা হেসে কিছু যেন বলতে যাবে, ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই সশব্দে জানালার পর্দা টেনে দিলেন, একটু পরে জানালা বন্ধ করে দিলেন।

হঠাৎ অর্চনা যেন ধাক্কা খেল। কিরকম যেন অপমান বোধ হল। মুহূর্তে চাপা অপমানে, অস্বস্তিতে জানালা থেকে সরে এল।

প্রীতিলতা নিজের ঘরে বসে নতুন কেনা গহনাগুলো দেখছিলেন। অর্চনা বলল, 'মা, আমি একটু ছাদ থেকে ঘুরে আসি।'

'যা, তোর বাবা এলে নেমে আসবি।'

অর্চনা দরজা খুলে ছাদের সিঁড়িতে পা দিতে যাবে, ওপর থেকে কারোর নামার শব্দ শুনল। চারতলার মিঃ সেনগুপ্তদের ছেলেমেয়ে। নীচে লেটার বক্সে ওদের নাম দেখেছে অর্চনা। ছেলেটি অনেকটা প্রভাতদার দাদার মতন। প্রায়ই সামনাসামনি পড়ে যায় অর্চনা, কখনো একা, কখনো বা ও'র মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে নিয়ে বেড়াবার সময়। কিন্তু কোনদিন কথা বলেনি ওরা। অথচ অর্চনা কথা বলতে চায়। ভদ্রলোকের মা ঠিক যেন শান্তার মা!

সেনগুপ্ত নীচে নামছেন। পাশে বোন —বব্-করা চুল, স্ল্যাকস্ পরে আছে। মুখখানা খুব মিষ্টি। অর্চনা তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। দু' মাস ধরে একভাবে দেখতে দেখতে কত পরিচিত ওরা! ওরা দুজন ওর দিকে একবার তাকাল। অর্চনা হাসল দুজনের দিকে তাকিয়ে। ওর সামনের ধাপে পা দিয়েই ওরা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। অর্চনা যেন এক অস্পষ্ট ছায়ায় ঢেকে নিথর দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে ছাদে উঠে এল।

...এই অর্চদি, আমাদের বাড়ি এসো না, অনেক কথা বলব। কতদিন আসনি তুমি?' ..ছাদে পা দিয়েই দূরের ছাদের মেয়েটি চোখে পড়তে অর্চনার হঠাৎ শান্তার কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই হেসে আলসের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। সামনের ছাদে ওরই বয়সী দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওরা দুজন অর্চনার দিকে একবার তাকাল। দেখামাত্র দুজনেই একটু দূরে সরে গেল।

'এই যে, শুনুন, আপনারা কি নতুন এলেন?' অর্চনা হঠাৎ কি ভেবে ডেকে বসল। মুখে সলজ্জ হাসি।

মেয়ে দুটি অর্চনার দিকে কিছু সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে আরও দূরে সরে গেল। মাঝে মাঝে ফিসফিস কথা বলছে ওরা, হাসছে, আর অর্চনাকে আড়-চোখে দেখছে।

অর্চনার হঠাৎ নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হল। মেয়ে দুটি এক সময়ে নীচে নেমে যেতেই অর্চনার বুকের মধ্যে যেন অনেক দিনের চাপা জ্বালা অম্বলের ব্যথার মত নড়ে উঠল। আলসেয় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার মধ্যে এক সময় ছায়া-ছায়া অন্ধকার নেমে এলে ও নীচে চলে এল। আগে সন্ধ্যে হলেই কণা, তরুণ, অরুণ সবাই পড়তে বসত ঘর ভর্তি করে। সারাদিনের শেষে সকলের মাঝখানে অর্চনার নিজেকে ভীষণ ভাল লাগত। আর এখনে! সারা বাড়ি কেমন নীরব, নিস্তব্ধ। মা আহ্নিকে বসেছে। বাকি কাজ করছে ঘনশ্যাম। অর্চনার নিজের কিছু করার নেই।

অরুণের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। দরজায় খিল আঁটা, বারান্দার দিকে জানালাগুলোও বন্ধ। অর্চনা দরজায় ধাক্কা দিল, 'ঘরে কে? অরুণ?'

একটু পরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ দিদি, আমি।'

'আর কে আছে?'

'অরিজিৎ। আমরা একটু ব্যস্ত আছি, এখন খুলছি না।'

...'এর নাম কি?' 'অরিজিৎ রায়।' প্রথম এ-বাড়িতে এলে অরুণ অর্চনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। গায়ে রংচং-এ ছবি-আঁকা দামী ছিটের বুশ-শার্ট, চুল শ্যাম্পুতে ফোলানো, দামী প্যান্ট পরে আছে। গলায় টাই-আঁটা। একটু লালচে রং, মোটা চেহারা। অরুণ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'জান দিদি, অরিজিতের বাবা ওর বড় জামাইবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে মদ খায়, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেয়। ওর জামাইবাবু তো স্টেটস্‌ম্যানের সাব-এডিটর। এক পাড়াতেই থাকে। দিদির সঙ্গে লাভ-ম্যারেজ তো।' অরিজিৎ হেসেছিল তখন। 'একদিন আমাদের বাড়ি যাবেন দিদি...'

'তুই আবার বেরুবি নাকি?' অর্চনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'এক ঘন্টা পরে।' ঘরের ভেতর থেকেই অরুণ জবাব দিল।

অর্চনা দরজার সামনে আর দাঁড়াল না। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মেশানো বিচিত্র এক গন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে নাকে এল অর্চনার। এ-গন্ধ ওর পরিচিত নয়। বাবার ঘরে ঢুকতে যাবে, টেলিফোন বেজে উঠল। মা আহ্নিকে বসেছে বলে অর্চনা টেলিফোন ধরল। 'হ্যালো।'

'আপনি কি কল্পনার দিদি ধরেছেন?'

'হ্যাঁ, আপনি কে?'

'আমি দীপ্তেন্দু।'

'কে দীপ্তেন্দু?'

ওপাশ থেকে হাসির শব্দ কানে এল। 'আপনার ছোট বোন কল্পনার বান্ধবী অনিন্দিতার নাম শুনেছেন তো? আমি তার দাদা।'

'ও! তা কি ব্যাপার?'

'কল্পনা গানের স্কুল থেকে অনির সঙ্গে আমাদের বাড়ি এসেছে। ওর যেতে বেশ একটু দেরী হবে। আমাদের বাড়ি একটা ছোটখাটো ফাংশান আছে। আপনারা যেন ভাববেন না।'

'আপনি কি করেন?' হঠাৎ অর্চনা প্রশ্ন করল।

'আমাকে আপনি বলবেন না। আমি এই ফার্স্ট ইয়ারে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকেছি। আপনার বোনের থেকে বড়জোর বছর-চারেক বড়।'

'তা কল্পনা নিজে ফোন করল না কেন?'

কোন শব্দ নেই প্রথমে। কি কথার ফোনের মধ্যে সমবেত হাসির শব্দ শোনা গেল। তার পরেই বলল, 'ওর ভয় করছিল, তাই।'

অর্চনা বিষণ্ণ হাসল।

'দিদি, আপনি ভাববেন না কিন্তু। আমিই গাড়ি নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি পাঠাবেন।' বলেই রিসিভার রেখে দিল। কণার বয়স কত হল— চোদ্দ! একটু অন্যমনস্ক হল অর্চনা। ওখানে কি ভয় করত কণা অরুণ, তরুণ ওকে। তার চেয়েও বেশী ভালবাসত ওরা। একদিনও দিদিকে না বলে কোথাও যেত না, 'না' বললে কোথাও যেতও না। অর্চনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ঘরের লম্বা আর্শিটার সামনে দাঁড়াল। হঠাৎ নিজেকে নিয়ে চাপা কৌতুকে নিজেই হেসে ফেলল। আর্শির ভিতরে আর বাইরে—দুই অর্চনাই কেমন নিঃসঙ্গ—ওর কাছে মজার মনে হল।

রাত্রে কল্পনা না খেয়েই শুয়ে পড়ল। তরুণও কোন্ বন্ধুর সঙ্গে বাইরে খেয়েছে। আগভাগে বিছানা নিল। করুণ ফেরেনি তখনো। প্রীতিলতা বাদে সত্যেশ্বর, অরুণ, অর্চনা খাওয়া শেষ করে বৈঠকখানায় এসে বসল।

এক সময় অর্চনা বলল, 'বাবা কাল একবার আগের বাড়ির ওখানে বেড়াতে যাব।'

'কেন, এখানে ভাল লাগছে না?' হাসলেন সত্যেশ্বর।

'না, তা ঠিক নয়। তবে কতদিন ওখান থেকে এসেছি। একবার ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে। প্রতিমাবৌদি, লীলামাসি— ওঁরা আছেন তো!'

'আর গিয়ে কি হবে দিদি?' আমার তো আর অত দূরে যেতে ভাল লাগে না। তাছাড়া এখন ওখানে যেতে কি রকম লাগে!'

'চল্ না আমার নিয়ে! বিকেলবেলা তো! না হয় তরুণও সঙ্গে যাবে। আমাকে পৌঁছে দিয়ে যেখানে যাবার যাবি। তরুণের সঙ্গে চলে আসব।'

'তা হয় না।' সত্যেশ্বর কি ভেবে বললেন, 'তবে সত্যি সত্যি যেতে হলে আমার গাড়িতে যাও।'

'হুঁ, গাড়ি ওখানে ঢুকবে নাকি? বাবা, মনে করে দেখতো, বড় রাস্তা থেকে কতগুলো ঘিঞ্জি নোংরা গলি পেরিয়ে যেতে হত।' অরুণ বলল।

প্রীতিলতা বললেন 'সত্যিই তো। গাড়িই বা ঢুকবে কোথায়? আর গাড়ি করে ছাড়া অচল তো ছাড়া যাবে না। খারাপ দেখায়।'

অর্চনা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। সত্যেশ্বর দাঁত খুঁটছিলেন। বললেন, 'এখানে তো বেশ আছিস মা, কি দরকার ওখানে গিয়ে। এমন কিছু নেই ওখানে।'

'আমিও তো তাই বলি।' প্রীতিলতা বললেন, 'গেলেই তো আবার সব আসতে চাইবে ওদের সব বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে। যা হট্টগোল-ঘরে সব। এতদিন তো দেখে এলাম। বলবে, তোমাদের গাড়ি চড়াও, খাওয়াও। তখন সামলাতে পারবে না।'

'তুমি ঠিক বলেছ।' সত্যেশ্বর দামী তামাকের গুঁড়ো সিগারেটের পাতায় পাকাতে পাকাতে বললেন, 'লক্ষ্য করেছ, এন্‌ভায়রনমেণ্টটা বাইরে-ভেতরে পুরো একটা বাস্তব! বিশেষ করে ওদিকের সব জায়গাগুলোই। তাই না? ওহ্, পালিয়ে বেঁচেছি।' সত্যেশ্বর লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালেন।

অর্চনার বুকের গভীরে কোথাও বুঝি সবুজ বৃক্ষের মত কোন কিছুর রস শুকিয়ে যাচ্ছে, কিছু বুঝি মরে যাবে। মৃতের মত শীতল, শব্দহীন, নিঃসঙ্গ করে দিচ্ছে ওকে ওর ভিতর থেকে। এ একটা অসুখ বুঝি! অর্চনা যেন ভয় পেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। 'তাহলে থাক মা। তোমরা যখন চাইছ না—' অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বলতে বলতে অর্চনা বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে এল। বেডসুইচ টিপে ডিম-লাইট জ্বালল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে।

বহুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকেও অর্চনা ঘুমোতে পারল না। চাপা অস্বস্তির জ্বালার মত অর্চনার ভিতরটা ওকে অস্থির করে তুলেছে। বিদ্যুৎ-চমক যেমন গভীরতম অন্ধকারকে আরও নিঃসঙ্গ করে দেয়, অর্চনার এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো ওকে তেমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকের জানালার সামনে এল। রাস্তায় কোন লোক নেই। শুধু শুকনো বাতাস দু-পাশের নিপাট পরিচ্ছন্ন দেয়াল, সাজানো গাছের সারির ঘন পাতা ছুঁতে ছুঁতে কালো পীচের রাস্তায় পাক খাচ্ছে। কারো-কারো বাড়ির সামনে গাড়ি গ্যারেজ করার শব্দ, কোন বাড়ির কোন কোলাহল, বিন্দুমাত্র কোন শব্দ কানে আসছে না।

অর্চনার অনেক আগের কত গভীর রাতের কথা মনে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা সারারাত জেগে দেয়ালে লিখত ভোটের সময়। দুদলে মাঝে মাঝে ঝগড়া-মারামারি হলেও ওরা অর্চনাদের কাছে চা খেতে চাইত। কখনো গভীর রাতে, কখনো ভোর-বেলা। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ছেলে সব। অর্চনার ভীষণ ভাল লাগত। অবাক হয়ে দেখত ওদের। সেখানে ও নিজের মধ্যে কি গভীর গোপন হয়ে বেঁচে থাকত! এখানে কোন দেয়ালের লিখন নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের বিছানায় এল। নরম বিছানা। ওদিকে তাকিয়ে দেখল, চোদ্দ বছরের কিশোরী কল্পনা গভীর ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখতে ও নিষ্পাপ। বাবা-মা, অরুণ-তরুণ-কল্পনাও এখানে ওর থেকে কত দূরে! অথচ ওখানে কত কাছে থাকত ওরা! পুরনো বাড়ির মেঝের শান্ত শীতলতা সকলের মধ্যে অর্চনাকে সহজেই ঘুম পাড়িয়ে দিত।

হঠাৎ কষ্ট হতেই অর্চনা ডিম-লাইট নিভিয়ে দিল। চাপা বুকধ্বংস অন্ধকারে বাইরের বাতাসের শব্দ আর ঘরের পাখার শব্দে মিশ্রিত অনুভূতি, অস্তিত্ব কানে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কত রাত কে জানে, প্রীতিলতা স্বামীকে ঠেলে ডাকলেন, 'শুনছ?'

'কি?' ঘুম ভেঙে গেছে সত্যেশ্বরের। কণ্ঠস্বরে বিরক্তি।

'অচলা বোধ হয় কাঁদছে, শোন।'

'কেন, কাঁদবে কেন! এত বড় মেয়ে!' সত্যেশ্বরের কথা জড়িয়ে গেল।

'বোধহয় তুমি ওখানে যেতে দিলে না, তাই!'

'যত্তো সব। এত পেয়েও যদি কাঁদে—' পাশ ফিরে শুলেন সত্যেশ্বর।

'এই মেয়েটাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা।' একটু থামলেন, 'মনে নেই তোমার, ছোটবেলায় যে-কোন অসুখে পড়লে বা জ্বর থেকে কোন অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময় কেমন ঘুমের মধ্যে কাঁদত। জিজ্ঞেস করলে বলত, না, ও কিরকম ভীষণ একা বলে ওর ভয় করে, তাই কাঁদত।'

'কিন্তু এখন ওর আবার অসুখ কোথায়?'

'এখানে আসা থেকে দেখছি, ওর মনটা খুব খারাপ।' উৎকর্ণ হলেন প্রীতি-লতা, 'এখন তো মনে হচ্ছে জেগেই কাঁদছে। বেচারা!'

'কাঁদুক, কাঁদতে দাও।' দাঁতে দাঁত চাপালেন সত্যেশ্বর, 'স্বভাব কোনদিনও বদলাবে না।' বলতে বলতে গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলেন।

অর্চনার ঘর থেকে যেন বা চাপা অস্বস্তি আর দীর্ঘশ্বাস জড়ানো গোঙানির মত শব্দ একটানা ভেসে আসছে এখনো।

ভদ্রটা তুলেছিলো নিখিলেশ। ও বলেছিলো, 'আগেকার দিনগুলো কিন্তু বেশ ছিল মাইরি। চিন্তাভাবনা নেই, হাত-পা ছড়িয়ে আড্ডা মারো, প্রাণভরে ঘুমোও আর পেট ভরে খাও—'

ওর কথার মাঝখানেই গণেশ তোতলাতে শুরু দিল, 'শালা, তোর আর জ্বালাটা কীসে বেশ তো খাচ্ছো দাচ্ছো ঘুরে বেড়াচ্ছো। বস্ত বা-ব্যা-ব্যা—'

অচিন্ত্য গণেশের কথা শেষ করে দিল, 'যাচ্ছেলা হচ্ছে আমাদের। বাপের জমিদারী নেই যে বসে বসে খাব।'

গণেশ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অচিন্ত্যর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, 'নিখিলেশটা বাড়িভাড়া গুনছে আর দিব্যি ভাল-মন্দ খাচ্ছে। ওর বাপ ঠাকুর্দা বাড়ি করে গিয়েছিলো, তবেই না শালা দুটো পয়সার মু-মু-মু—'

এবারেও অচিন্ত্য গণেশের সাহায্যে এগিয়ে এল। এটাই রীতি। গণেশ তোতলা হলেও অহরহ ওর কথা আটকায় না। যখন আটকায়, মারাত্মক রকমের আটকে যায়। 'ব্লেটেবিয়ারের' মত 'সকট-জ' হয়ে যায়। মুখ লাল হয়ে ওঠে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। সেই সময় অচিন্ত্য ওর সাহায্যে এগিয়ে আসে। এটাই রীতি।

কথা হচ্ছিলো সুধাময়ের বৈঠকখানায় বসে। রবিবারের সকালটা আমাদের এখানেই কাটে। বন্ধুর মধ্যে পাঁচজন। সুধাময়, নিখিলেশ, অচিন্ত্য, গণেশ এবং আমি। পাঁচজনের মধ্যে মোটামুটিভাবে চারজন সাকার শুধুমাত্র নিখিলেশই বেকার। কলকাতা শহরে গোটা চারেক বাড়ি আছে নিখিলেশের। সংসার ছোট। দিন ভালই কাটে।

গণেশের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো নিখিলেশ, 'গালাগালি দিস আর যাই করিস, সেই গোল্ডেন ডেজ কিন্তু আর ফিরে আসবে না। দু আনা দুধের সের, সিরাজদ্দৌলার পাকা পাকা বুই বাজারে গড়াগড়ি যায়, আলু পটল তো বলতে গেলে ফাউ-এর দলে—'

গণেশ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো, 'তোর শ্বশুরের বাজার ছিল সব!'

নিখিলেশ সত্যি সত্যি রেগে গেল এবার 'শ্বশুর তুলে কথা বলবি না গণশা।'

গণেশও ছাড়ার পাত্র না। সেও রুখে দাঁড়ালো, 'মিথ্যে বলবি কেন রে শা-শা-শা—'

গণেশ ক্রমাগত শা শা বলেই যেতে লাগল। বরাবরের মত অচিন্ত্য ওর সাহায্যে এবার আর এগিয়ে এল না। চুপ করে বসে রইলো।

গণেশের চোখমুখ লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ। দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। মুখে শুধু শা-শা-ধ্বনি। সে এক দস্তুরমত করুণ দৃশ্য।

আর স্থির থাকতে পারলাম না। গণেশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, 'জা।'

গণেশ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

আবার বললাম, 'ও-কালের লোক বলবে ও-কাল ভাল ছিল, একালের বলবে একাল।'

গণেশ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে নিখিলেশের ওপর, 'কিন্তু এই ব্যাটা কোন্ সে-কালের লোক। জন্মেছে একালে, কিন্তু মনটা পড়ে আছে ঘোড়ার ট্রাম-টানা যুগে। কী বলবি একে।' এক নাগাড়ে বিনা বাধায় এতগুলো কথা বলতে পেরে গণেশ গর্বিত দৃষ্টিতে নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে আবার বললো 'উত্তর দে। ও উত্তর দিতে পারবে না। যদি পারতো, অসম্ভব চেঁচাতো ও।'

নিখিলেশ কিছুক্ষণ গণেশের দিকে তাকিয়ে রইলো। যদিও নিখিলেশের মুখে কোন হাসি ছিল না, ওর চোখে কৌতুক ছিল। ধীরে ধীরে নিখিলেশ বলতে লাগলো, 'গণেশটার কিন্তু দারুণ ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। কথা একটুও আটকাচ্ছে না।'

গণেশ বুক চিতিয়ে বললো, 'পালাবার পথ খুঁজছে শালা। এ-কাল ও-কালের মীমাংসাটা কর আগে, তারপর আমার ই ই-ই-ই—' কিছুতেই গণেশ ইমপ্রুভমেন্ট কথাটা উচ্চারণ করতে পারলো না।

হাত দিয়ে গণেশকে থামিয়ে দিয়ে সুধাময় বললো, 'তুই একটু কেপ্ট নে গণেশ।' গণেশ সুধাময়ের কথা শোনে। শুধু গণেশ না, আমরা সবাই সুধাময়কে মান্য করি। যদিও সমবয়সী বন্ধু সবাই কিন্তু বিদ্যা এবং অভিজ্ঞতায় সুধাময় আমাদের চেয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে আছে। অন্তত আমরা সেরকমই মনে করি।

সুধাময় একটা চেয়ারে বসে আছে। সামনে ছোট একটা টি-পয়। তার ওপর সুধাময়ের পা দুটি তোলা। সুধাময় আসরের মাঝে এভাবে বসে। বসতে ভালবাসে। ওর দু আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট ধরা। নীলচে ধোঁয়া ক্ষীণ রেখায় ওপরে উঠছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ সিগারেটে টান দেয় সুধাময়। বেশীর ভাগ সময় সিগারেট শুধু শুধুই পোড়ে। সুধাময়ের সিগারেট খাওয়ার এটাই পদ্ধতি। সুধাময় চোখ বুঁজে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বসেছিলো। সেভাবেই বসে রইলো।

আমরা চারজন গভীর আগ্রহে সুধাময়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। সুধাময়ের ডান পায়ের বড়ো আঙুল ক্রমাগত নড়ছে। ভ্রু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। ওর ফর্সা কপালে মোটা রেখা অগভীর রেখা ফুটে উঠছে। এই মুহূর্তগুলি আমাদের অতি-পরিচিত। আমরা জানি সুধাময় এখন গভীর চিন্তায় মগ্ন রয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কথা বলতে শুরু করবে।

সুধাময়ের কথা শুনতে আমরা ভালবাসি।

ধীরে ধীরে সুধাময়ের আঙুল নড়া বন্ধ হলো। কুঞ্চিত ভ্রু উদ্যত চিলের পাখনার মত দুইদিকে প্রসারিত হলো। ললাটের রেখাগুলি ললাটেই মিলিয়ে গেল। বুঝলাম, কথা বলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সুধাময়।

একসময় সুধাময়ের কণ্ঠস্বর আমাদের কানে আসতে লাগলো, 'প্রশ্নটা জটিলও বটে, আবার সরলও বটে। সেকাল সে-কালের মত ছিল, এ-কাল এ-কালের মত হয়েছে, এটাই হয়তো সহজ উত্তর।' একটু থেমে সুধাময় আবার বললো, 'যেমন ধর, তখন বা এখন এই দুই কালেরই ছোট ছোট ছেলেদের ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, তেরো বছর বয়সে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠাকুর্দার গড়গড়ায় তামাক টানতেন। তার ছেলে আমি, জেনো না হোক, পনেরো পেরোবার আগেই বাবার প্যাকেট মেরে সিগারেট ধরেছিলাম। আসল কথাটা কী জানিস। মানুষ তখনও যা ছিল, এখনও তা-ই আছে। তবে একটা কথা—'

সুধাময় একটুক্ষণ চুপ থেকে আবার বলতে লাগলো, 'তখনকার দিনের অধিকাংশ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা হয়তো কম ছিল, সভ্য-ভব্য মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি, তারা হয়তো সব সময় সেই মাপকাঠিতে পড়তো না। বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলছি। বাড়ির কাজকর্ম, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি করতে গিয়েই তাদের জীবন কেটে যেত, বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখার ইচ্ছা বা সামর্থ্য তাদের থাকতো না। সময়ও পেত না। কিন্তু মানুষ তখন আন্তরিক ছিল। একের জন্য অপরে ফিল করতো। একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল। শোন।'

সুধাময় বলতে লাগলো 'তখন আমি নিতান্তই শিশু। কিন্তু ঘটনাটা বেশ মনে আছে।

আমাদের আদি নিবাস ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে। ঠাকুর্দা সাধারণ গৃহস্থ ছিলেন। জমিজমা ছিল, চাষবাস দেখতেন। ঠাকুর্দার একমাত্র সন্তান হলেন বাবা। ঠাকুর্দা মারা যেতে জায়গা জমি বেচে দিয়ে বাবা ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লেন একদিন। তার আগে তিনি উকীল হয়েছেন অবশ্য।

এদিক ওদিক ঘুরে শেষপর্যন্ত সিলেট-এ এসে আস্তানা গাড়লেন বাবা।

পসার ভালই জমলো। বিরাট বাড়িও তৈরী হলো। বহু দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন এসে আশ্রয় নিলেন সেই বাড়িতে। অতিথি অভ্যাগত লেগেই থাকতো। তখন এটাই রীতি ছিল। কেউ অবস্থাপন্ন হলে আত্মীয়স্বজনেরা তাকে ছেঁকে ধরতো।

যখনকার কথা বলছি তখন পুরোদমে স্বদেশী যুগ চলছে। আবহাওয়া দারুণ গরম। ফরটি-টুর মুভমেন্ট শুরু হব হব। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করেন। গোপন বৈঠক বসে। বাবা কাকা দুজনেই কংগ্রেস করেন। বার কয়েক বাড়ি সার্চও হয়ে গেছে। সে বড় মজার সার্চ।'

সুধাময় থামলো। চোখ বোঁজা অবস্থায়ই আমার দিকে হাত বাড়ালো। ওর আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দেওয়ার দায়িত্বটা সাধারণত আমার ওপরই ন্যস্ত থাকে। আমি সুধাময়ের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে দিলাম, যত্নসহকারে দেশলাই জ্বালালাম। সুধাময় দুটো টান দিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, 'থানার বড় দারোগাবাবুর নাম ছিল নিতাই বাঁড়ুজ্জে। মনে মনে গান্ধীর

বর্ষপঞ্জী ১৩৮০

(২৭শ বর্ষ চলছে)

বাংলা ভাষায় ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট ইয়ার-বুক (তথ্যগ্রন্থ)

• **সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে**

বর্ষপঞ্জী বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সংযোজন। যে-সকল প্রগতিশীল নরনারী 'নতুন ভারত' ও চলতি দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চান বর্ষপঞ্জী তাঁদের নিত্যসঙ্গী। বর্তমান সংখ্যার বহু নতুন বিভাগের মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়া', 'বাংলাদেশের নতুন সংবিধান' ও 'পাকিস্তান' উল্লেখযোগ্য। বোর্ড বাঁধাই শোভন সংস্করণ, মূল্য ৯ টাকা ৫০ পঃ ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক ঃ এস আর সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫।এ, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা—৬ । ফোন ঃ ৩৫-৪৭৯৭

খুব ভক্ত ছিলেন ভদ্রলোক। সার্চ হবার আগের দিন রাত্রে লোক মারফৎ খবর চলে আসতো, উনি পরদিন ভোরবেলায় আমাদের বাড়িতে চা খেতে আসবেন। কোড-ওয়ার্ডটা বাবাদের জানা ছিল। কাগজপত্র কিছু থাকলে রাতারাতি সরিয়ে বা পুড়িয়ে ফেলা হতো। শেষ রাত্রের দিকে বাড়ি সার্চ হতো। আমরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। গা শির-শির করতো, গলা শুকিয়ে উঠতো, তবু দেখার তো বিরাম ছিল না। কী প্রচণ্ড উত্তেজনা যে হতো! তেমন উত্তেজনা আর কি পাবো জীবনে।'

সুধাময় আবার চুপ করলো। ওর বুড়ো আঙুল আর নড়ছে না। চিন্তার কোন অতলে তলিয়ে গেছে সুধাময়। ও যেন অতীতের একটা অংশকে স্পর্শ করার চেষ্টা করছে।

'তখন মাঘের শেষাশেষি। বিকেলে খেলতে যাব, এমন সময় বড়দা এসে খবর দিল, আজ আর খেলাটেলা না, স্কুলবাড়ির সামনে মেয়েদের মিটিং হবে, সবাইকে সেখানে যেতে হবে। বয়সে আমি সবার ছোট। প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মেয়েদের মিটিং-এ আমরা কেন বড়দা?

বড়দা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর স্নেহের হাসি হেসে বললো, স্বাধীনতার সংগ্রামে আবার ছেলে মেয়ে কী! সবাইকে যেতে হবে।'

খেলা ফেলে সাত তাড়াতাড়ি স্কুলবাড়ির মাঠে গিয়ে হাজির হলাম সবাই। এর আগে পর্যন্ত পুরুষদের মিটিং দেখেছি, কিন্তু মেয়েদের মিটিং দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনও।

ধীরে ধীরে মহিলাদের সমাবেশ হতে লাগলো। ছেলে ছোকরারা স্কুলের বেঞ্চি এনে পেতে দিল মাঠে। মহিলারা সব বসলেন। দুটো তক্তপোশ জোড়া দিয়ে ডায়াস তৈরী হলো। ক্লাশ ফাইভের টেবিলটা এনে তোলা হলো সেই ডায়াসের ওপর। গোটা কয়েক চেয়ারও।

একজন মোটাসোটা মহিলা টেবিলের সামনে এসে বসলেন। ছোট একটি মেয়ে তাঁর গলায় একটা মালা পরিয়ে দিল। বড়দা ফিস ফিস করে বললো, সরোজিনী নাইডু। কী বলবো, উত্তেজনায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। খবরের কাগজে বহু ছবি দেখেছি, উনি যে একজন বিখ্যাত মহিলা সে কথাও জানি। মাত্র হাত কয়েক দূরে যে এমন একজন মানুষের দেখা পেয়ে যাব স্বপ্নেও কি ভেবেছিলাম!

দুজন মহিলা এক বৃদ্ধাকে ধরে এনে সরোজিনী নাইডুর পাশে বসালেন। বৃদ্ধার

সমস্ত মুখ ঘোমটায় ঢাকা। দেখে মনে হচ্ছিল, সচল একটি কাপড়ের পুঁটলি। সেই ছোট্ট মেয়েটি আর একটা মালা এনে তাঁকে পরিয়ে দিল। বড়দা ফিস ফিস করে বললো, মনে হচ্ছে ঠাকুমা! বড়দার গলাও উত্তেজনায় কাঁপছিলো।

মিটিং আরম্ভ হলো। সরোজিনী নাইডু দুর্ধর্ষ বক্তৃতা করলেন। খুব হাততালি পড়লো। শেষে একজন মহিলা উঠে একটা কাগজ পড়তে লাগলেন। সব কথা এখন আর মনে নেই। তবে কাগজটায় একটা রেজোলিউশন লেখা ছিল। এতদ্বারা এই সভার সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল যে, প্রয়োজন-বোধে আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজেদের উৎসর্গ করিব। প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইব না ইত্যাদি। প্রচুর হাততালির মধ্যে পড়া শেষ হলো। কিন্তু গোলযোগ দেখা দিল সেই কাপড়ের পুঁটলিকে নিয়ে। উনি কিছুতেই সম্মতি দিচ্ছেন না, স্থির হয়ে বসে আছেন। অথচ সভানেত্রীর অনুমোদন ছাড়া কোন প্রস্তাব পাশ হয় না। দু-চারজন মহিলা ঠাকুরমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপ-চুপি কী বললেন। কিন্তু ঠাকুরমা অনড়। শেষ পর্যন্ত মহিলারা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, আপনি মাথাটা অন্তত একবার নাড়ুন, না হলে তো কোন কিছুই হবে না।

অনেক কাকুতি মিনতির পর এক সময় অচল মূর্তি সচল হলো। ঘোমটা বার দুয়েক ওপর নীচ করলো। অর্থাৎ মাথা নেড়ে উনি সম্মতি দিলেন।

সভা ভংগ হলো।

সুধাময় থামলো। ওর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুধাময় বললো, 'এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম, সেটুকু গল্পের ভূমিকা। আসল গল্প শুরু হচ্ছে এখন। ফলো মি।

সভা তো ভংগ হলো। কিন্তু বাড়িতে পা দেবার সংগে সংগে দেখলাম সেখানে এক হুলস্থূল কাণ্ড চলছে। ঠাকুরমা মেঝেয় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন আর চিৎকার করে কাঁদছেন। মা এবং কাকীমা বিভ্রান্তভাবে ঠাকুরমাকে ধরে বসে আছেন। চাকর ঝিরা দরজার গোড়ায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ছ-সাতজন দুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লাম। মেজদা বরাবরই ঠাকুরমার ন্যাওটা ছিল। ও গিয়ে ঠাকুরমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঠাকুরমার কান্না আরও বেড়ে গেল। মেজদার মাথা বুকে চেপে ধরে সমানে কাঁদতে লাগলেন। সে রকম বুকফাটা কান্না জীবনে কোন দিন আর শুনতে পাই নি, পাবও না বোধ হয়।

অনেক সাধ্য সাধনার পর ঠাকুরমার কান্না কিছুটা স্তিমিত হলো। মেজদা ঠাকুরমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমায় কী হয়েছে ঠাকমা?

ঠাকুরমা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে পারলেন না। তাঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিলো। এক সময় উনি ভাঙা ভাঙা ভাবে বলতে লাগলেন, মাইয়ারা সব মরতে চললো আর আমারে দিয়া হ করাইলো।'

সুধাময় থামলো। ধীরে ধীরে চোখ খুললো সুধাময়। গণেশ এবং নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলেছিলাম না, আগেকার দিনের মানুষ হয়তো জ্ঞানগরিমায় আজকালকার মানুষের চেয়ে অনেক পেছিয়েই ছিল, কিন্তু তখন মানুষ অনেক বেশী আন্তরিক ছিল। একের জন্য অপরে ফিল করতো। অন্তত আমার তো সেরকমই মনে হয়।'

স্বাদেশিকতা ও সাহিত্য

ভবানী মুখোপাধ্যায়

রঙ্গলাল লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়—',সেই কবিতার মধ্যে দাসত্বের যন্ত্রণা অতি আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বাঙালী জাতির মনের কথা রঙ্গলাল কয়েকটি সহজ লাইনে প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে ধীরে ধীরে। রাজনৈতিক পরাধীনতা বাঙালী চিন্তানায়কের মনে এক আশ্চর্য প্রেরণা সঞ্চার করেছে আর তার ফলে দেশপ্রাণতা, পরাধীনতার জ্বালা বিদেশী শাসকের অত্যাচার ইত্যাদির অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের সাহিত্যকর্মের মধ্যে এবং বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পথে এই স্বাজাত্যবোধ আমাদের নতুন পথে চালিত করেছে। জাতীয় জীবনের বিকাশের পথে সাহিত্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রান্ত সাহিত্যের দিক থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল হয়ত তার কারণ এই যে সেই সব প্রান্তের সাহিত্যিকগণ দেশপ্রাণতাকে উপজীব্য করে সাহিত্য-রচনায় প্রয়াসী হননি।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার সরকার, মাইকেল, রমেশ দত্ত, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, দীনবন্ধু, স্বামী বিবেকানন্দ—সকলেই নিজস্ব রীতিতে সাহিত্যকর্মের মধ্যে দেশপ্রাণতার বীজ বপন করে গেছেন। তাঁরাই পথিকৃৎ। তারপর আবির্ভাব ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের, এবং যে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্য সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়েছে সেই রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটা মোটা অংশ স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। গল্প উপন্যাস, প্রবন্ধ কবিতা ও গানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মানসিকতাকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। উত্তরকালে এই জাতীয়তাবাদকে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে উন্নীত করেছেন এবং দেবতার আসনে মানুষকে বসিয়েছেন। এই বিষয়ে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামক বিশদ আলোচনা করেছেন। বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ এবং মুক্তিলাভকে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করতেন।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের মানসিকতার বিকাশ ঘটছে সেই কালে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'আনন্দমঠ'। এর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব'। এই ধর্মতত্ত্ব রচনার কালেই দেশাত্মবোধ তাঁর মনকে আলোকিত করে রেখেছে। তিনি ঈশ্বরপ্রেমের পরই দেশপ্রেমকে স্থান দিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনটি উপন্যাসকে সমালোচকগণ এক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন। এই তিনটি উপন্যাস ধর্ম ও দেশপ্রেমাত্মক চেতনার ভিত্তিতে রচিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনী সাগরে তখন পূর্ণ জোয়ার। ১২৯১-৯২ সালে 'ধর্মতত্ত্ব' রচনা শুরু হয়। হয়ত তারও কিছু পূর্বে কৃষ্ণ-চরিত্র। ধর্মতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ 'শ্রীমদ্ভাগবদ-গীতা' রচনা শুরু হয় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে। 'আনন্দমঠ' রচিত হয় ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দে, 'দেবী চৌধুরানী' ১২৮৯-৯০ বঙ্গাব্দ) এবং 'সীতারাম' (১২৯৯-৯৩ বঙ্গাব্দে। সবগুলি উপন্যাসই সমকালীন। ধর্মের মৌলনীতির ব্যাখ্যায় প্রণোদিত হয়ে তিনি উপরোক্ত উপন্যাস তিনটি রচনা করেন, এই ধর্মের নাম 'অনুশীলন', সংস্কৃতির ধর্ম। 'আনন্দমঠের' ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র অন্য অনেক কথার মধ্যে লিখে-ছিলেন—'সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।' ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'কে উপন্যাসের উপজীব্য করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের প্রায় একশত বৎসর পূর্বের ঘটনাকে তিনি উপন্যাসে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তুর্কী বিজয় নিয়ে লিখে-ছিলেন 'মৃণালিনী', মুঘল বিজয় ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'র পটভূমিকায়, 'আনন্দ-মঠে' স্বাভাবিক কারণেই ইংরেজ বিজয়ের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু একালের দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার করলে তা ভুল হবে, সমকালীনের দৃষ্টিভঙ্গী কল্পনা করে বিচার করলে সেই বিচার সার্থক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে ইতিহাসকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর পূর্বসূরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বদেশপ্রাণতা যে তাঁকে পথ-প্রদর্শন করেছে একথা বলা অনুচিত হবে না। ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্গভূমি এবং ভারতভূমি উভয়কেই মাতৃভূমি হিসাবে স্বীকার করে লিখেছিলেন 'জননী ভারতভূমি'। সেকালে কোনোরকম আদর্শ গড়ে ওঠেনি, তথাপি জন্মভূমিকে জননী হিসাবে পূজা করার প্রেরণা বঙ্কিম পেয়েছিলেন। তথাপি আশ্চর্য হতে হয় যে সেই কালেই বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' মন্তব্য করেছিলেন 'ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজম একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় পেট্রিয়টিজম ধর্মের তাৎপর্য এই যে পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।' বঙ্কিম-চন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক স্বচ্ছ ছিল তা এই উক্তিতেই বোঝা যায়। অনেককাল পরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে অনেকটা এই জাতীয় উক্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ইংরাজীতে 'নেশান' বা 'ন্যাশনালিজম' বলতে যে অর্থ বোঝায় আমাদের বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে সে বিষয়ে কোনো রকম সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের কালে 'রাজনারায়ণ-শিষ্য নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান করেন এবং 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামক পত্রিকায় 'হিন্দু' (তখন হিন্দু বলতে ভারতীয় বুঝতে হত) ন্যাশন্যালিজমের

চুল যার মাথার মণি তেল তার প্রদীপ

বাছাই করা নারকোলের শাঁস থেকে
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তৈরি ষোলআনা খাঁটি
এই মাথার তেলের হাতে
আপনার চুলের ভার ছেড়ে দিন।
তাহলে সুন্দর, সুস্থ, অঢেল চুলের গর্বে
আপনার আর মাটিতে পা পড়বে না।

প্রদীপ মার্কা
খাঁটি নারকোল তেল

প্রস্তুতকারক : ভারত কোকোনাট অয়েল মিলস্, নবদ্বীপ
প্রধান কার্য্যালয় : পি ১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
শাখাসমূহ : মেদিনীপুর ● শিলিগুড়ি ● কৃষ্ণনগর ● দুর্গাপুর

প্রতিদিন
মাথায় দিন

IPB/B/3-73B

আদর্শ তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে তাঁর 'হিন্দুমেলায় উপহার' এই উপলক্ষ্যে লিখেছিলেন এবং 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।'

১৯০০ খৃষ্টাব্দের সূচনা থেকে দেশে স্বাদেশিকতার ঢেউ এসে পড়ল। স্বদেশী আন্দোলন, আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি, অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আন্দোলন, এবং আগস্ট—১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জের ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিনটি পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

লক্ষ্য করার বিষয় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে এই বিরাট পর্বের প্রতিফলন ঘটেছে আশ্চর্যভাবে। আগস্ট আন্দোলনের কালে তিনি তিরোহিত, কিন্তু তার কিছু পূর্বেই ফ্যাসিবাদের তীব্র নিন্দা করে রোগশয্যা থেকে কবিকণ্ঠ থেকে ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মূর্তি দেখেন নি তেমনি আজাদ হিন্দ ফৌজের 'জয় হিন্দ' অভিযানও দেখে যেতে পারেন নি। তথাপি 'দেশনায়ক' নামক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে আগামী দিনের আভাস যে তিনি পেয়েছিলেন তা সহজবোধ্য।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩০-এর 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'রথযাত্রা' নামক একটি নাটিকা প্রকাশিত হয় এই নাটক পরে 'রথের রশি'। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ইতিমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি এই নাটকে বলেছেন—

'আজকের মতো বলো সবাই মিলে
যারা এতদিন মরে ছিল
তারা উঠুক বেঁচে

যারা যুগে যুগে ছিল
খাটো হয়ে, তারা
দাঁড়াক মাথা তুলে।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী আরো প্রসারিত হল রাশিয়া ভ্রমণের পর। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথের যে উচ্ছ্বাস সে শুধু স্বদেশের কথা চিন্তা করেই। তিনি তাঁর রথের রশির মন্ত্রীকে দিয়ে বলিয়েছেন—

নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ করার সময়টাই যুগান্তর। দল বেঁধে যারা আসছে তাদের বাধা দিয়ো না। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে, চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।'

অনেক কাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক যা তাঁর বাইশ বছর বয়সের রচনা 'বউঠাকুরাণীর হাটে'র রূপান্তর, পরে আরো রূপান্তরিত হয়ে তার নাম হয়েছে 'পরিত্রাণ'। সেখানে ধনঞ্জয় বৈরাগী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নায়ক। সে গণ-আন্দোলনের নেতা। এর পরে কবির পরিণত মানসের ছাপ পড়েছে 'মুক্তাধারা' নাটকে। মুক্তাধারা ১৩২৯-এ প্রকাশিত হয় এবং 'পরিত্রাণ' ১৩৩৬ সালে রূপান্তরিত হয়ে 'বার্ষিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়।

এইখানে রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া কর্তব্য। তাঁর যখন মাত্র সতের বছর বয়স তখন প্রকাশিত হয় 'কবি কাহিনী'। এই তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। কবি সেই কিশোর বয়সে প্রশ্ন করেছেন—

'যা দেখিছ, যা দেখেছ, তাতে কি
এখনো / সর্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি? / কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্য জগতে, / রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ, কোলাহল, / কত কোটি কোটি লোক অন্ধ কারাগারে / অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া / ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে।' সাহিত্যকৃতি হিসাবে হয়ত মূল্যসীমানার অভাব আছে কিন্তু চিন্তার দিক থেকে রীতিমত বৈপ্লবিক।

সতের বছরের এই কবি যখন জীবনের শেষ প্রান্তে, সেই আশী বছরে পৌঁছে লিখলেন—

'কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা / রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙিয়া / তবুও মানুষ বলি গর্ব করে

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কি ধারণা ছিল এ প্রশ্ন উঠেছে বারবার। রবীন্দ্রনাথ নিজে বললেন—'জাতীয়তা কি? জাতীয়তাবাদ কাকে বলে?' এবং নিজেই উত্তর দিয়েছেন—'সমগ্র মানবসমাজের সংগঠিত শক্তির নামই জাতীয়তা।'

শক্তির দর্শনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর দাবী ছিল সামাজিক আশাআকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা হল রাষ্ট্রের চাপ থেকে যথাসম্ভব মুক্তি। রাষ্ট্রের মধ্যে আছে একটা ভঙ্গী। যে কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তির চেয়েও রাষ্ট্র শক্তিমান। রাষ্ট্র চায় বাধ্যতা। রাষ্ট্র সেই ক্ষমতার অধিকারী যা মানুষকে বাধ্য হতে বাধ্য করে। তার নির্দেশ পালনে হুকুম দেয়। রাষ্ট্র সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। সমাজের সকল ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপর রাষ্ট্রের স্থান। এই হল রাষ্ট্রের দার্শনিক আকৃতি। সমাজে সে মঙ্গল বিধান করবে।

রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গী রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁর কাছে সমাজই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। সমাজে ব্যক্তিবিশেষের যা ভূমিকা তার ওপর ভিত্তি করেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরে রাষ্ট্রবিষয়ক এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে।

সমাজের দুর্বলতা রাজনীতির পক্ষে বিপজ্জনক আর মানুষ যেখানে সমাজসচেতন নয় সেইখানে অত্যাচার এবং উৎপাত ঘটবেই। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীন্দ্রের মুখ দিয়ে তিনি এই ধরনের কথাই বলেছেন : এই উপন্যাসটি তেমন বহুল পঠিত নয়। অনেকের এই উপন্যাস বিষয়ে সঠিক ধারণা নেই। অতীন্দ্র বলছে—

'আমি আজ স্বীকার করবো তোমার কাছে, তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সে পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমীরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকা। মিথ্যাচারণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্ভের ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিন-রাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ করতে পারা যায়।'

এর পর এলা প্রশ্ন করেছিল, আত্মঘাত যাকে বলো সে কি কেবল আমাদেরই

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়। মেরামতেরও সুব্যবস্থা আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৩৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

এর জবাবে অতীন্দ্র যা বলেছিল তা আরো কঠোর—'তা বলিনে, দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশন্যালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদে আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্য ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ জন্মের মত বলবার সময় হল না।'

রবীন্দ্রনাথ মার্কসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলতে পেরেছেন—মানুষ নিজেই তার ইতিহাস রচনা করবে। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ও 'পরিত্রাণ' নাটক দুটির সঙ্গে 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটিতেও ফুটে উঠেছে স্বাদেশিকতা ও স্বতন্ত্রতার নিজস্ব মতবাদ। 'মুক্তধারায়' তিনি বলেছেন—'পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার লাগিয়ে জয়ী হব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে—হে মন মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে—প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।'

বঙ্কিমের বন্দেমাতরম মন্ত্রের নবরূপায়ণ ঘটেছে 'গোরা'য় (১৯১০)। এখানে দেশজননীর কল্যাণীমূর্তি। গোরা জেগেছে দেশপ্রেমের চেতনায়। 'গোরা' উপন্যাসের কালেই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম উপলব্ধি ঘটে—জননী তুমি সকলের। তুমি শুধু হিন্দুর নও, মুসলমানেরও নও, ক্রিশ্চানেরও নও।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই দেখে গেলেন সমাজের পরিবর্তন, সাহিত্যে হাওয়া-বদল। তিনি দেখলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলকে। 'বল বীর, বল উন্নত মম শির—' এই উদাত্ত বাণী নিয়ে নজরুলের বঙ্গ সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে নাটকীয় প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

তিরিশের দশকেই সাম্যবাদের সম্পর্কে যে ধারণা ছিল অস্পষ্ট তাই কিছু স্পষ্টতর হয়ে উঠল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' এবং কবি বিজয়লালের 'সর্বহারার গান' একটা নতুন পথের ইঙ্গিত নিয়ে এল।

কল্লোল-কালি-কলম-প্রগতির পৃষ্ঠায় শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীশ ঘটক প্রভৃতি গল্পকারগণ এমন সব নর-নারীকে সাহিত্যের রাজদরবারে হাজির করলেন। এঁরা এতকাল অনুপস্থিত ছিলেন বাংলা সাহিত্যে। এঁরা সেই মানুষ শরৎচন্দ্র যাঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন 'যারা পেল না কিছুই', সেই সব সামাজিক জীব। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় যে রাজনৈতিক বা স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় দেখা দিয়েছিল শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে (১৯২২—২৪) তারই পরিণতি। 'পথের দাবী' অনেক উগ্র কিন্তু সমকালের মানসিকতার ছাপ সে উপন্যাসে সুস্পষ্ট। বাংলার বিপ্লববাদের প্রসারে 'পথের দাবী' নিঃসন্দেহে এক নতুন প্রেরণা এনেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৮) যদিও দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর প্রকাশিত হয়েছে তথাপি এই উপন্যাসে স্বাধীনতা লাভের প্রাক-মুহূর্তে রচিত। 'জাগরী' আর এক পথচিহ্ন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪৫-এ এক-জন নবীন লেখক, তথাপি 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' উপন্যাসে তিনি নতুন সমাজ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছেন। সামন্ততন্ত্রের অবসানে ধনতন্ত্র এবং তারপর গণতন্ত্র। বনফুলের 'সপ্তর্ষি' উপন্যাসও এই কালে লিখিত।

গোপাল হালদার একজন মননশীল লেখক। উপন্যাসকার হিসাবে তাঁর তেমন প্রতিষ্ঠা হয়ত নেই, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর 'পঞ্চাশের পথ', 'উনপঞ্চাশী', তেরশ পঞ্চাশ অবিস্মরণীয় দান। স্বাধীনতা লাভের পূর্বমুহূর্তে প্রকাশিত এই উপন্যাসাবলী শুধু সাহিত্যে নয় বাংলার সমাজজীবনে পৌরুষের প্রভাব এনেছে।

তারাশঙ্কর এই কালের এক অবিস্মরণীয় লেখক। তিনি নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক ছিলেন। অতি অল্পবয়সে লিখিত 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসটির মধ্যে তাঁর স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যাবে উত্তরকালে প্রকাশিত তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ উপন্যাস পড়ার পূর্বে তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' পাঠ করা কর্তব্য।

সুবোধ ঘোষ ছোটগল্পে যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা যেমন স্মরণীয় তেমনই স্মরণীয় তাঁর উপন্যাস 'তিলাঞ্জলী'। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসে দুই মতবাদের সংঘাত আশ্চর্য ফুটেছে।

১৯৪৮ এবং তার পরবর্তী কালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্বাভাবিক কারণেই উল্লেখ্য নয়।

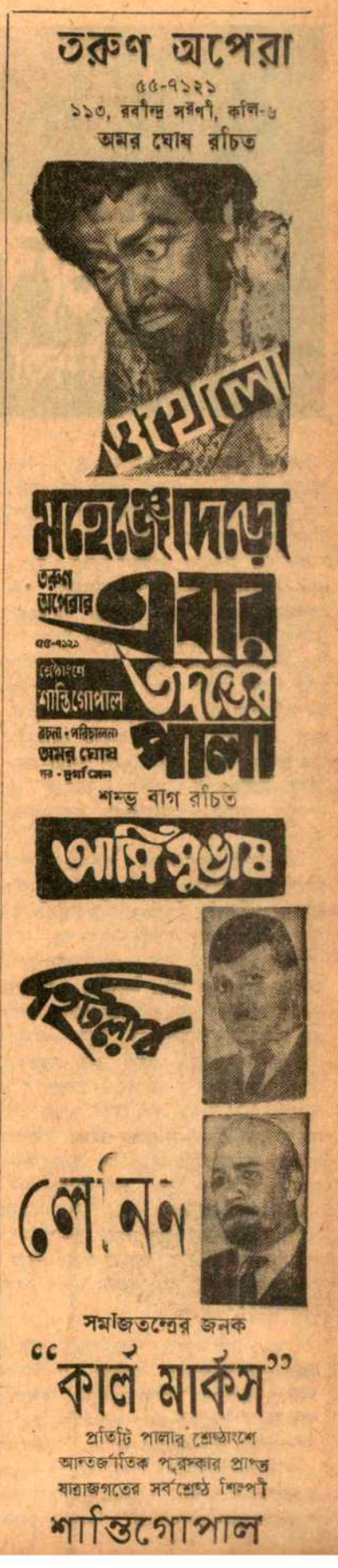

বাঙলা ছবিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য

[প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ] / পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী যুগের বাংলা ছবিকে প্রধানত দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, নির্বাক এবং দুই, সবাক ছবি। নির্বাক ছবির শুরু হয়, বলা যেতে পারে, বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সেখানে একক হীরালাল সেনের নাম প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথমে ন্যাটকের টুকরো টুকরো দৃশ্য, ছোট ছোট বিজ্ঞাপন-চিত্র নির্মাণ করবার পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই তিনি মঞ্চনট অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত 'আলি-বাবা' অবলম্বনে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী-চিত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু নির্ভরযোগ্য নজীরের অভাবে এ সম্পর্কে অধিক আলোকপাত করা সম্ভব নয়।

সকলেরই জানা আছে, কলকাতা তথা পূর্বভারতে নির্বাক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড। দক্ষিণ কলকাতার রসা থিয়েটার (বর্তমানে পূর্ণ) এবং গ্লোব গ্রান্ড অপেরা হাউস বা বিজু থিয়েটার (বর্তমানে গ্লোব থিয়েটার) ছাড়া কলকাতা শহরের অপর সব ছবিঘরের মালিকানা ছিল ম্যাডান কোম্পানীর কুক্ষিগত। এবং তাঁরা নিজেরাই যখন ছবি তৈরীর ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে পড়লেন ১৯১৮-১৯ সাল থেকে, তখন তাঁরা যে অপরের তৈরী ছবিকে তাঁদের অধিকৃত ছবিঘরে মুক্তি পেতে দেবেন না, এতো জানা কথা। এই অবস্থাতেও মাত্র দক্ষিণ কলিকাতার রসা থিয়েটারের ওপর ভরসা করে যে দুটি প্রতিষ্ঠান চিত্রপ্রযোজনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন অরোরা বায়োস্কোপ কোম্পানী এবং ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী।

১৯১৩তে মুক্তিপ্রাপ্ত দাদাভাই ফালকের প্রথম ছবি 'হরিশ্চন্দ্র' যেমন পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বন করে তোলা, অরোরার 'রত্নাকর'ও তেমনি দস্যু রত্নাকরের মহর্ষি বাল্মিকীতে রূপান্তরের কাহিনী অবলম্বন করে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই পৌরাণিক ছবির সঙ্গে সঙ্গে অরোরা তুলেছিল সমসাময়িক চরিত্র অবলম্বনে 'ডাব্বুর কেলেঙ্কারী' নামে একটি দু রীলের হাসির ছবি। ডাব্বু নামে একটি ছেলের দুষ্টবুদ্ধিজনিত কীর্তিকলাপপূর্ণ এই 'ডাব্বুর কেলেঙ্কারী'ই হচ্ছে নির্বাক যুগের প্রথম বাংলা হাসির ছবি। কিন্তু অরোরার 'রত্নাকর' ও 'ডাব্বুর কেলেঙ্কারী' রসা থিয়েটারে মুক্তি পাবার প্রায় ছ মাস আগে (এ দুখানি ছবি মুক্তিলাভ করেছিল ১৩ আগস্ট, ১৯২১) এখানে ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী প্রযোজিত 'ইংল্যান্ড রিটার্নড' বা বিলাত

সত্যজিৎ রায়ের ছবি অশনি সংকেত/ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়

ফেরত' ছবিটি প্রথম বাংলা সামাজিক চিত্র হিসেবে মুক্তিলাভ করে দর্শকমহলে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তখনকার যুগে ইংগবংগ সমাজের তরুণ-তরুণীরা কোনো-রমে একবার ইংলণ্ড যেতে পারলে জীবনটাকে ধন্য জ্ঞান করত। অনেক সময়ে বিলেত না গিয়েও মিথ্যা করে বিলাত প্রত্যাগতের ভান করত কেউ কেউ। বিলাত গমনের প্রতি এই বিচিত্র মনোভাবের ব্যংগাত্মক সমালোচনা করেই 'ইংল্যাণ্ড রিটার্নড' পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনী চিত্রটি গড়ে উঠেছিল। অথচ মজা এই যে, যাঁরা ছবিটির প্রযোজনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নীতীশ লাহিড়ী প্রমুখ অনে-কেই ছিলেন এই ইংগবংগ সমাজভুক্ত বরেণ্য ব্যক্তি। ২৬ ফেব্রুয়ারীতে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটির মাধ্যমেই ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি-জি) চলচ্চিত্রজগতে তাঁর সুদীর্ঘ পদ-যাত্রা শুরু করেন। আরও একটি কারণে 'ইংল্যাণ্ড রিটার্নড' চিত্র রসিকদের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই ছবির যিনি নায়িকা সেই সুশীলাবালা (অন্তরংগ সমাজে তিনি 'নবাবের সুশীলা' বলে পরিচিত ছিলেন) অত্যন্ত আধুনিকা ছিলেন; যথার্থ সুন্দরী সুশীলা ঘোড়ায় চড়া, মোটর ড্রাইভিং প্রভৃতিতে ছিলেন পারদর্শিনী।

ম্যাডান কোম্পানীর প্রস্তুত পৌরাণিক ছবির ঘন অরণ্যের মধ্যে দুটি বাঙ্গালী প্রতি-ষ্ঠানের তৈরী এই দুখানি ছবি—এক, ইংল্যাণ্ড রিটার্নড এবং দুই, ডাব্বুর কেলে-ংকারী—যে তখনকার সমাজ জীবনে আলোক-বর্তিকার কাজ করেছিল, এ কথা অনস্বী-কার্য। ইণ্ডো-ব্রিটিশের দ্বিতীয় ছবি নীতীশ লাহিড়ী পরিচালিত 'সাধু কি শয়তান' (১৯২২-এর ৪ মার্চ মুক্তিপ্রাপ্ত) নিশ্চয়ই কোনো বক-ধার্মিকের চরিত্রকে রূপালী পর্দায় তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল ভণ্ড-তপস্বী-দের সম্বন্ধে। এর পরই কিন্তু ম্যাডান কোম্পানীই শুরু করে দিলেন জনপ্রিয় সামা-জিক উপন্যাসগুলিকে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করা। ওঁরা প্রথমেই দর্শক সমক্ষে উপ-স্থাপিত করলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ'-এর চিত্ররূপ। ছবি হিসেবে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছিল, সেদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত না করেই দর্শক-সাধারণ ছবিটি দেখতে কাতারে কাতারে জড়ো হয়েছিল শ্যামবাজারস্থ কর্নওয়ালিস থিয়েটারে (বর্তমানে শ্রী সিনেমা) ১৯২২ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে মুক্তি পাওয়ার সংগে সংগে। বিবাহিত পুরুষের প্রতি বাল-বিধবার অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসা সমাজ-জীবনে কি অনর্থের সৃষ্টি করে, তারই এক মর্মন্তুদ চিত্র এঁকেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষ-বৃক্ষ' উপন্যাসে। অক্ষরের আকারে যে-ছবি ছিল এতদিন পুস্তকের পৃষ্ঠায় এবং যার নাট্যরূপ সাধারণ রংগমঞ্চের সীমিত দর্শককে আনন্দ দিয়ে এসেছে, সেই ছবির ছায়াচিত্র রূপ পর্দার গায়ে প্রত্যক্ষ করবার জন্যে হাজার হাজার বাঙ্গালী কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল সেদিন। এবং এই আনন্দ লাভের জন্যে সে-যুগের দর্শককে প্রবেশমূল্য দিতে হত মাত্র চার আনা কিংবা আট আনা (বর্ত-মানের ২৫ বা ৫০ পয়সা) মাত্র।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার প্রথম চিত্র-রূপ দেওয়ার গৌরব কিন্তু বাঙ্গালী প্রতি-ষ্ঠান তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর। সে-যুগের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার বি সি ঘোষের নেতৃত্বে এই সংস্থাটি গড়ে ওঠে। এঁরা প্রথমেই যে-ছবিতে হাত দেন, সেটি শরৎচন্দ্রের বড়ো গল্প 'আঁধারে আলো' অবলম্বনে শিশির-কুমার ভাদুড়ী দ্বারা পরিচালিত হয়। গংগা-স্নানের পথে যে সদ্যস্নাতা সুন্দরী তরুণীর প্রতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রের মার্জিত মন দিনের পর দিন আকৃষ্ট না হয়ে পারত না, সে যে একটি বারবণিতা ছাড়া আর কিছু নয়, এই আচম্বিত আবিষ্কার সত্যেনকে নিমিষের মধ্যেই বিজলী বাঈজীর প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল; বিজলীর শত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করেই ঘৃণাভরে সে প্রস্থান করেছিল। সত্যেন জানল না যে, বিজলীর জীবনে সে স্পর্শমণির কাজ করেছে; প্রেম তার জীবনে সকল অন্ধকারকে দূর করে দিয়ে নবসূর্যের মতো উদিত হয়েছে—কলঙ্কিত জীবনকে সে তাই জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতোই ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিল।—ছবির মাধ্যমে প্রেমের এই জয়গান তখনকার দিনের তরুণ-তরুণীর, বিশেষ করে কলেজে-পড়া ছেলে-মেয়েদের মনে তরংগ তুলেছিল নিশ্চয়ই। যদিও সত্যের খাতিরে বলতে হয়, শিশির-কুমার ভাদুড়ীর পরিচালনা কাহিনীর সত্যেন্দ্র, বিজলী ও রাধারাণীর (সত্যেনের স্ত্রী) মানসিকতাকে আশানুরূপভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। ছবিটির মধ্যে যা বিশেষ করে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠে-ছিল, তা হচ্ছে নায়িকা বিজলীর ভূমিকায় দুর্গারাণীর অসামান্য চিত্রোপযোগী দেহ-সৌষ্ঠব ও মুখমণ্ডল। রবীন্দ্রনাথের কাহিনী-কেও প্রথম চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করার গৌরব এই তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীরই। এঁদের হয়ে রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' কাহিনীটিকে চিত্রায়িত করেন নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯২৩-এর ১৮ জুন তারিখে কর্নওয়ালিসে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতেই দর্শকরা প্রথম ছবিতে দেখেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

'মানভঞ্জন'-এর নায়িকা গিরিবালা পর-নারীলোলুপ স্বামীর চোখ তার নিজের দিকে ফেরাবার জন্যে থিয়েটারে যোগ দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন গল্পটি লিখেছিলেন, তখন-কার কথা ছেড়েই দি, এমন কি ১৯২৩ সালে যখন ছবিটি মুক্তিলাভ করেছিল, তখনকার দর্শকের কাছেও গিরিবালার এই স্বামী-সংশোধনী ব্যবস্থাটি নিতান্তই কল্পনার বস্তুই ছিল, বাস্তবজীবনে ছিল একেবারেই অসম্ভব। সেই কারণে সেদিনকার দর্শক মান-ভঞ্জনকে একটি বিদেশ থেকে আমদানি-করা কাহিনীর চিত্ররূপ হিসেবেই দেখেছিল, তার বেশী কিছু নয়।

ইতিমধ্যে হেম মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, গোকুল নাগ প্রমুখ ভবানীপুর ও কালীঘাট পাড়ার জনকয়েক সিনেমা-পাগল যুবক একত্র হয়ে ফোটোপ্লে সিণ্ডিকেট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ঐতি-হাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি

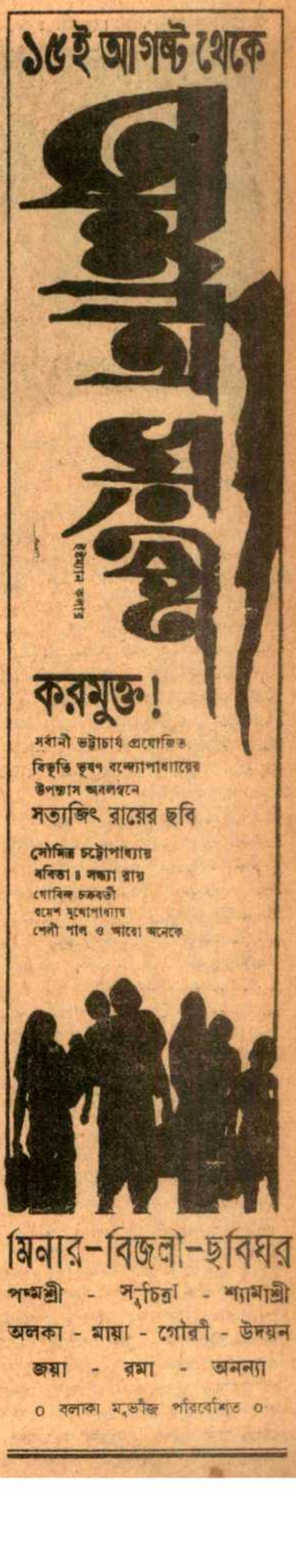

চিত্রজগতের একটি অনুষ্ঠানে উত্তমকুমার ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

মানবিক আবেদনপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে 'সোল অব এ স্লেভ' নামে একটি জাঁকজমকপূর্ণ, নয়নানন্দনকর ও হৃদয়স্পর্শী ছবি বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দকে উপহার দেন ১৯২৩-এর ৩ মার্চ যুগপৎ রিপন এবং এম্প্রেস থিয়েটার থেকে। পঞ্চাশ বছর আগে দেখা ছবির স্মৃতি আজ ঝাপসা হয়ে এলেও বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, এই প্রথম একখানি ছবি দেখে আশার অতিরিক্ত তৃপ্তি লাভ করেছিলুম। চার্লস ক্রীডের ফোটোগ্রাফী ছিল ছবিটির অন্যতম সম্পদ; এমন চোখ-জুড়ানো ফোটোগ্রাফী এর আগে কখনও বাংলা ছবিতে দেখিনি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে মানবচরিত্রের অসংগতি বা দোষকে উপজীব্য করে সাধারণের হাস্যোদ্রেককারী অতিরঞ্জিত অনুকরণকার্যের (ক্যারিকেচার করার) জন্যে চিত্তরঞ্জন গোস্বামী ও ফানিম্যান বিশেষ করে ছাত্রমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। শ্রীগোস্বামী 'বিয়ের বাজার' এবং 'খোকাবাবু' নাম দিয়ে যে দুখানি দুরীলের হাসির ছবি তৈরী করেছিলেন, তা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ম্যাডান থিয়েটারে তখন প্রধান ছিলেন দুজন বাঙ্গালী চিত্রপরিচালক—প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোম্পানীর তরফ থেকে (জামশেদজী ম্যাডানের জামাতা মিঃ রুস্তমজী দুরতিওয়ালা ছিলেন চলচ্চিত্র বিভাগের কর্তা) এঁদের বলা হল—বাঙ্গালী দর্শকের মনে ধরবার মতো সামাজিক ছবি তৈরী করুন। কিন্তু নতুন গল্প লিখবে কে এঁদের জন্যে?—এঁদের ভাঁবে ছিলেন এক আগা হাসার কাশ্মীরী এবং দুই অমর চৌধুরী। যতদূর সম্ভব এঁদের লেখা কাহিনীকে অবলম্বন করেই ম্যাডান দর্শকদের উপহার দিলেন ১৯২৩ থেকে ২৬-এর মধ্যে মাতৃস্নেহ, বিমাতা, প্রেমাঞ্জলি, পাপের পরিণাম, নবীন ভারত, সতীলক্ষ্মী, ধর্মপত্নী, জেলের মেয়ে প্রভৃতি আধা-সামাজিক ছবি। ছবির নামই তার বিষয়বস্তুর পরিচয় বহন করলেও অধিকাংশ সময়েই দেখা যেত, এমন সব উদ্ভট চরিত্র ও পরিস্থিতি কল্পনা করা হয়েছে, যা বাস্তব জীবনে কোনো দিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর থেকে জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল বা জনা, কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল বা দুর্গেশনন্দিনীর চিত্ররূপ দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন ১৯২৬-২৭ সালে, তখন তাঁরা ঢের বেশী সাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। অবশ্য কোনো সমাজনৈতিক চেতনা দ্বারা চালিত হয়ে তাঁরা যে ছবিগুলি তৈরী করেছিলেন, এমন কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, এমন ছবি তৈরী করা, যা দেখতে কাতারে কাতারে দর্শক ছুটে আসবে এবং ম্যাডানের লোহার সিন্দুকে জমা হবে টাকার ওপরে টাকা।

অথচ তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে ১৯২৪ সালে নরেশচন্দ্র মিত্র যখন 'চন্দ্রনাথ' ছবি করেন, তখন শরৎ কাহিনীর সামাজিক প্রভাবের কথাটাও ওঁদের লক্ষীভূত ছিল। সরযূর বেদনাময় জীবনকাহিনী তখন কার পাঠকদের—বিশেষ করে কলেজের ছেলেমেয়েদের মনকে সহানুভূতিতে ভরিয়ে তুলেছিল, এ-সংবাদ ছবির প্রযোজকেরা রাখতেন। তাঁরা আরও জানতেন, সে-যুগের ছেলেরা সামাজিক ছুৎমার্গকে যথাসম্ভব পরিহার করতে শিখছিলেন, তাঁদের মন হয়ে উঠছিল সামাজিকভাবে যথেষ্ট উদার। ম্যাডান যখন ১৯২৭ সালে নির্বাক চণ্ডীদাস ছবি দর্শকদের উপহার দেয়, তখন শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের অন্তরে ধ্বনিত হয়েছিল কবি চণ্ডীদাসের সেই অমর উক্তিঃ সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। তাই ঐ বছরেরই ৩ ডিসেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত দুর্গেশনন্দিনী ছবিতে জগৎ সিংহ সম্পর্কে আয়েসার সেই বিখ্যাত উক্তিটি—'বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—পর্দার গায়ে অক্ষরের মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল, তখনকার সেই প্রেক্ষাগৃহ-জোড়া উন্মত্ত করতালি ধ্বনি আজও আমাদের কানে বাজছে।

আজকাল ছেলেমেয়েরা যতটা বেশী বয়সে বিবাহিত হয়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় পাদে অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে তার থেকে ঢের কম বয়সে বিবাহিত হওয়ার প্রথা ছিল। সত্যি বলতে কি, আজকাল যেমন বেশীর ভাগই বিবাহিত হওয়ায় প্রথা চালু হয়েছে, অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা নিজেরাই দেখেশুনে ভালোবেসে বিবাহ করে, সে-যুগে তা ছিল না; সে-যুগে বাপ-মায়েই পছন্দ করে ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিতেন। তাই দেখা যেত, কলেজের পোড়ো ছেলেরও বিবাহ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুটা অল্পবয়সে বিবাহ হলেও ছেলে যতদিন না স্বাবলম্বী হচ্ছে এবং মেয়ে যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্তা হচ্ছে (মেয়েদের বিবাহ হত ১১ থেকে ১৪-র মধ্যেই বেশী), ততদিন তাদের বিবাহিত জীবনের ওপর বাপ-মা নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রয়োগ করতেন। ফলে, বিবাহিত হয়েও একটি বছর আঠার-উনিশ বয়েসের ছেলে তার বছর তেরো বা চোদ্দ বছরের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে পারত না বাপ-মায়ের কড়া দৃষ্টিকে এড়িয়ে। অথচ ফুলশয্যা রজনীর রোমাঞ্চময় স্মৃতি তাদের বারেবারে উচাটন করে তুলত।— এই ধরনের তরুণ-তরুণীর মনোবেদনা ও মিলনের গোপন প্রয়াসকে উপজীব্য করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'নিষিদ্ধ ফল' নামে যে উপভোগ্য কাহিনীটি রচনা করেছিলেন, ইণ্ডিয়ান সিনেমা আর্টস-এর হয়ে পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ যখন তার চিত্ররূপ দেন ১৯২৮ সালে, ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে তা নব্য তরুণ-তরুণীদের মধ্যে রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল।

বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাডান কোম্পানীর বুঝতে দেরী হল না যে, তাঁদের নিজের তোলা ছবি দিয়ে সারা বছর কর্ণওয়ালিস থিয়েটার ও ক্রাউন সিনেমার (১৯২৬-এ নির্মিত) চাহিদা মেটাতে পারবেন না। কাজেই তাঁরা অন্যান্য দেশী চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাজেও তাঁদের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। এই সুযোগেই লক্ষ্মীবিলাস হাউসের নগেন বসুর প্রয়োজনায় ও নরেশচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় তোলা, ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটের নিবেদন 'দেবদাস' ছবিটি মুক্তি পায় ক্রাউন সিনেমায়। এই ছবিতেই আমরা প্রথম দেখি নীতীন বসুর আলোকচিত্রের কাজ। এই ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেটের হয়েই শিশির-

কুমার ভাদুড়ী আগে তুলেছিলেন রবীন্দ্র-কাহিনী 'বিচারক-এর চিত্ররূপ। কিন্তু এক-জন হাইকোর্টের বিচারপতির গোপন প্রেমের পাপকাহিনী কাহিনীর বিষয়বস্তু বলে ছবিটিকে সাধারণো প্রদর্শনের জন্যে পুলিশী ছাড়পত্র (সেন্সার সার্টিফিকেট তখন দিতেন লালবাজারের পুলিশ অফিস কলকাতার পুলিশ কমিশনের দস্তখতে) পেতে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল এবং অনেক কাটছাঁট ও জোড়াতালির পরে ছবিটি এঁদের দ্বিতীয় ছবি 'দেবদাস'-এর পরে মুক্তিলাভ করে ক্রাউন সিনেমাতেই ১৯২৯-এর ১২ মার্চ তারিখে।

একদা রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন কাহিনী অবলম্বনে ছবি তৈরী করেছিলেন নরেশ-চন্দ্র মিত্র তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে, সেকথা আগে বলেছি। প্রায় সাত বছর পরে ঐ একই কাহিনী নিয়ে মধু বসু 'গিরিবালা' নাম দিয়ে ছবি তুললেন ম্যাডান কোম্পানীর হয়ে। যতীন দাসের ফোটোগ্রাফী ছবিটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রতি আমাদের মুসলমান ভাইদের বিরূপ মনোভাবের কথা (শুধু তাঁর ঐ একটি উপন্যাসে কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধেই ঐ কথা প্রযোজ্য) অমরা বরাবরই অবগত থাকলেও ম্যাডান কোম্পানী এবং পরিচালক জ্যোতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোধ করি, এ সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না। সেই কারণেই তাঁরা 'রাজসিংহ'-এর চিত্ররূপ দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু চিত্ররূপ দেবার পরেই হয়ত তাঁরা ছবিটির ব্যাপারে মুসলিম বিরোধিতা প্রকট হবার সম্ভাবনার কথা জেনেছিলেন। তাই তাঁরা একই সঙ্গে ছবিটির চারটি প্রিন্ট উপস্থাপিত করেছিলেন ক্রাউন, এম্প্রেস, ইম্পিরিয়াল ও খিদিরপুর সিনেমায় ১৯৩০-এর ৬ সেপ্টেম্বরে। বলা বাহুল্য, ছবিটির প্রকাশ্য প্রদর্শনী সম্পর্কে মুসলমান ভাইদের আপত্তি এমনই সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মাত্র চারদিন দেখাবার পরেই ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ম্যাডান কোম্পানী যখন বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী, রাজ-সিংহ, যুগলাঙ্গুরীয়, কপালকুণ্ডলা, রজনী মৃণালিনী, দেবী চৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের গিরিবালা, দালিয়া, নৌকাডুবি ও গিরিশচন্দ্রের কালপরিণয়, ভ্রান্তি, শাস্তি কি শান্তি প্রভৃতির চিত্ররূপ দিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানী, ইষ্টার্ণ ফিল্ম সিণ্ডিকেট, ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস, ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট, বাধা ফিল্মস প্রভৃতি ছোট-বড় প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্র, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রমুখ আধুনিকতম সাহিত্যিকের রচনা বা একেবারে মৌলিক রচনাকে তাঁদের ছবির উপজীব্য রূপে ব্যবহার করছিলেন। এইভাবেই নির্বাক চিত্র নির্মিত হয়েছিল ১৯৩৪-এর ১৫ সেপ্টেম্বরে মুক্তিপ্রাপ্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পরিচালিত অরোরা

আলোয় আঁধারে / আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা ঃ ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

ফিল্ম কর্পোরেশনের 'নিয়তি' ছবি পর্যন্ত। যতদূর জানা যায়, এই 'নিয়তি'ই হচ্ছে নির্বাক যুগের শেষ ছবি।

কিন্তু এর ঢের আগে—অন্তত তিন বছর আগেই বাংলা দেশে অর্থাৎ বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গে সবাক চিত্রের যুগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩১ সালের ২৭ জুন তারিখে ক্রাউন সিনেমায় মুক্তিপ্রাপ্ত 'জামাই ষষ্ঠী'ই হচ্ছে বাংলা ভাষার প্রথম কাহিনী-চিত্র। এই ১৯৩১-র ৩০ ডিসেম্বরে প্রথম চিত্রোপহার রূপে শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা'কে সাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে বাংলার চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে সুদৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করছেন নিউ থিয়েটার্স। স্টুডিওর মধ্যে ইলেকট্রিক আলোকে উদ্ভাসিত কৃত্রিম দৃশ্যপটের সম্মুখে সুষ্ঠু রূপসজ্জায় সজ্জিত শিল্পীদের প্রয়োজন মতো সংলাপ বলিয়ে ও গান গাইয়ে চলচ্চিত্র করতে হলে বেশ কিছুটা বিদ্যাবুদ্ধি থাকার আবশ্যকতা আছে, এই সত্য অনুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, ম্যাডান কোম্পানী চলচ্চিত্র প্রযো-জনা জগৎ থেকে যেমন তাঁতি শীঘ্রই অপসৃত হলেন, নিউ থিয়েটার্স ও তেমনই অচিরেই শুধু বাংলাতেই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

সাহিত্য এবং সমাজ যেমন চিরকালই পরস্পরকে প্রভাবিত করে, প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য নির্ভর বাংলা সবাক চিত্রও তেমনই প্রায় তার জন্মকাল থেকেই একদিকে যেমন সমাজচিন্তাকে প্রতিফলিত করে, অন্যদিকে আবার নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিতও করে।

যাত্রায় জাতীয়তাবাদী নাটক

শিব ভট্টাচার্য

যাত্রা শিল্প সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন, যাত্রা প্রাচীন শিল্প-বস্তু, প্রাচীনতার মধ্যেই সে আজও নিবদ্ধ। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে সে আজও বেরিয়ে আসতে পারেনি। আবার অনেকের মতে যাত্রা নাকি নিম্নস্তরের শিল্প।

যাত্রা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। একথা আজ স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, এই প্রাচীন লোকনাট্য যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন বা আজও আছেন, তাঁদের কেউই এ শিল্পের ব্যাপক প্রচার বা প্রসারের চেষ্টা করেন নি। ফলে যাত্রা তার অনেকখানি সময় নিয়ে নিজের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

কিন্তু এই নিজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকেও যাত্রা দেশ এবং সমাজের হীতার্থে অনেক কিছু করেছে। যুগের মধ্যে পাল্টা দিয়ে সে অনেকবার এগুতে চেয়েছে। সেখানে বাধা এসেছে বিস্তর, আঘাত এসেছে অজস্র। কিন্তু তবু থামতে চায়নি। থামাটা সে নিজের নৈতিক অপরাধ মনে করেছে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও যাত্রা একসময় নিজের স্থান করে নিয়েছে। পরাধীন ভারতে বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টি একদা এই যাত্রানাটকের ওপর পড়েছিল, ইতিহাস একথা স্বীকার করবে। সুতরাং আজ যাঁরা যাত্রার প্রাচীনতা নিয়ে চিৎকার করেন বা নিম্নস্তরের শিল্প বলে ধিক্কার জানান তাঁদের কাছে কিন্তু যাত্রার গোটা ইতিহাসটাই অজানা।

ভারতবর্ষের সেই অগ্নিযুগে যাত্রা কিভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল। উপলব্ধি করেছিল, দেশের জনসাধারণকে সে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ-কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন কুঞ্জ গঙ্গোপাধ্যায়। যাত্রায় জাতীয়তাবাদী নাটক ইনিই প্রথম লিখলেন। নাম 'মাতৃপূজা'। এটি ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হয়। এই প্রথম যাত্রার দর্শক স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাদ পেলেন, একথা বেশ হলফ করেই বলতে পারা যায়। পরের বছরেই মধুর সাহা দলে অভিনীত হলো 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' হরিপদ চট্টোপাধ্যায়-এর রচনায়। এদিকে বৃটিশ রাজশক্তি তখন যাত্রা নাটক সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছেন। হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ রচনা 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' এর ওপর নেমে এল শাসক গোষ্ঠীর খড়্গ। এ নাটকের অভিনয় বন্ধ হল।

কিন্তু তাতেও কি যাত্রা থেমেছিল। না। আগেই বলেছি, থামাটা যাত্রা নৈতিক অপরাধ মনে করেছিল। তাই রাজশক্তির কোন প্রতিরোধই তাকে স্বপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। এর পর একটির পর একটি জাতীয়তাবাদী নাটক যাত্রা আসরে অভিনীত হতে থাকে। মহাত্মা গান্ধীর অনশন ও অসহযোগ আন্দোলনের পটে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী লিখলেন 'জরাসন্ধ'। পুরনো আমলের গণেশ অপেরা এগিয়ে এলেন এটি অভিনয় করতে। আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রতাপাদিত্য' এবং ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের 'মুক্তি' এই জাতীয় নাটক, যার প্রতিটি দৃশ্যে ও সংলাপে স্বাধীনতার স্বাদ ও মন্ত্র।

কুঞ্জ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে কি যাত্রা স্বাধীনতার জন্য কিছু করেনি? চারণকবি মুকুন্দ দাস এবং কবি অশ্বিনী দত্ত তো আজ সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। নাটকের আঙ্গিক না হোক গীতি-নাট্যের মাধ্যমে যাত্রা আসরেই তো ওঁদের আবির্ভাব।

মুকুন্দ দাস, অশ্বিনী দত্ত বা তারও পরের সময়ে দেশের শিক্ষিতের সংখ্যা কত ছিল? অনুমানে বলতে পারা যায় শতকরা পাঁচজনের বেশী নয়। তাই সে যুগে জাতীয়তাবাদী নাটক এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে, তবে আজ যাত্রা কি করছে এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে।

স্বাধীনতা লাভের আগে দেশের পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। সেখানে জনসাধারণের প্রতি যাত্রার কর্তব্যও ছিল আলাদা। তাই স্বাধীনতার মন্ত্রকেই যাত্রা বেশী করে আয়ত্ত করতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের কর্তব্য ভিন্ন ধারায় বইতে থাকে। তাই যাত্রাও সে-সময় নিজেকে যুগ কর্তব্যের পথে নিয়ে যেতে শুরু করেন। এ-সময় এ রাস্তায় প্রথম এগিয়ে এলেন ভারতী অপেরা। রজেন্দ্রকুমার দে-কে নিয়ে ওঁরা লেখালেন মৃত্যুঞ্জয় 'সূর্যসেন'। পরের বছরেই ওঁরা অভিনয় করেন বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘা যতীন'। নাট্য ভারতীতে নরেশ চক্রবর্তীর 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' এ বছরেই অভিনয় হয়।

এই সময় যাত্রা জগতে তরুণ অপেরার খ্যাতি চতুর্দিকে। 'হিটলার' এবং 'লেনিন' অভিনয় করে যাত্রায় ওঁরা তখন নতুন বিপ্লব এনেছেন। সেই তরুণ অপেরাও এবার জাতীয়তাবাদী নাটক নিয়ে এগিয়ে এলেন— 'আমি সুভাষ' অমর ঘোষের রচনা।

দেশের এখন শিক্ষিতের মানুষের সংখ্যা শতকরা ত্রিশজন। যাত্রা নিশ্চয়ই শিক্ষিত মানুষের মনোরঞ্জনে সক্ষম। তা যদি না হোত 'হিটলার' 'লেনিন' কি এত জনপ্রিয়তা পেত না মৃত্যুঞ্জয় সূর্যসেন বাঘা যতীন, বিনয় বাদল-দীনেশ' আমি সুভাষ এত দীর্ঘদিন ধরে অভিনীত হোত? তবু কি এখনও লোকে বলবেন যাত্রা নিম্নস্তরের শিল্প?

চলচ্চিত্রে দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টা

রঞ্জন মজুমদার

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর জাতীয়তাবাদী এবং দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্রের উপযুক্ত এক সমীক্ষা করতে গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক কিছু বিস্মিত হয়েছেন। যে কোন কারণেই হোক, ধারণা হয়েছিল যে উপরোক্ত বিষয়-বস্তু নিয়ে এদেশে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ভালো ছায়াচিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই প্রবন্ধ লেখক অশেষ বেদনার সঙ্গে আবিষ্কার করেছেন যে বিগত '৪৭ সাল থেকে বর্তমান বছর অবধি ঝড়পরম্পরায় বছরে একখানিরও কম উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কারণ জাতীয়তাবোধসম্পন্ন এবং দেশাত্মবোধক তালিকায় যে-সব উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের নাম সংকলিত হয়েছে তার সংখ্যা একুশটিতেই সীমাবদ্ধ।

চল্লিশের দশকে আজাদ হিন্দ ফৌজের পটভূমিতে রচিত পরিচালক বিমল রায়ের কলকাতায় নির্মিত হিন্দী চিত্র 'পহেলা আদমী' ছাড়া আর যে পাঁচটি ছবির কথা জানা সম্ভব হয়েছে সেগুলি যথাক্রমে হেমেন গুপ্তর 'ভুলি নাই', জ্যোতিময় রায়ের 'অভিযাত্রী', নির্মল চৌধুরীর 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', অমর দত্তর 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশেম'। এর মধ্যে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে বলা বাহুল্য 'ভুলি নাই' ছবিটি দর্শকের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছবিটিও অল্পবিস্তর খ্যাতি অর্জন করেছিল। ইংরেজদের দ্বারা লিখিত বিকৃত ইতিহাসের তথ্যের বিরুদ্ধে 'সিরাজদ্দৌলা' এবং 'মীরকাশেম' ছবি দুটির দেশাত্মবোধক ভূমিকাও নিতান্ত কম ছিল না।

পঞ্চাশের দশকে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় মাত্র পাঁচটি ছায়াচিত্রে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবিটির নাম 'বিয়াল্লিশ'-এর জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ভূমিকাটি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল তদানীন্তন দর্শক সমাজে, ছবিটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই দশকের অন্য চারটি চিত্র ছিল যথাক্রমে হিরণ্ময় সেনের 'ক্ষুদিরাম' এবং 'বাঘা যতীন', অমর মল্লিকের 'স্বামীজী' এবং সতীশ দাশ-গুপ্তর 'আনন্দমঠ'। প্রতিটি ছবিরই জাতীয়তাবাদী চরিত্র সুস্পষ্ট ছিল কিন্তু চলচ্চিত্র হিসাবে কার কতটুকু উত্তরণ ঘটেছিল তা আজও অবশ্য বিতর্কের ব্যাপার।

ষাটের দশকে এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণ অজ্ঞাত কোন কারণে বিগত দর্শকের সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এই দশকে প্রযোজনা যতই নগণ্য হোক না, দশকটি যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা কোন সন্দেহের অপেক্ষা রাখে না। বলা যেতে পারে এই দশকটিই ছিল দেশাত্ম-বোধক ও জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বর্ণগর্ভ দশক। কারণ এই একই দশকে দুটি ছবি সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতি-যোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পায়। ছবি দুটি হচ্ছে সুধীর মুখোপাধ্যায়ের 'দাদাঠাকুর' এবং বিজয় বসুর 'ত্যাগিনী নিবেদিতা'। এছাড়া অপর তিনটি ছবির নাম হচ্ছে মধু বসুর 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (প্রবন্ধ-কারের যতদূর স্মরণ হচ্ছে, এটিই মধু বসুর সর্বশেষ চলচ্চিত্র।), বিজয় বসুর 'রাজা রামমোহন' এবং পীযূষ বসুর 'সুভাষচন্দ্র'।

সত্তরের দশকেও এই নির্মাণ সংখ্যা, পরম বিস্ময়ের কথা, পাঁচটির ওপরে কিন্তু যেতে সক্ষম হয়নি। চিত্রগুলির নাম যথাক্রমে নির্মল চৌধুরীর 'চারণকবি মুকুন্দদাস' ভূপেন রায়ের 'অগ্নিযুগের কাহিনী' অর্ধেন্দু মুখার্জির 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' দীপক গুপ্তর 'মহাবিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ' এবং শচীন অধিকারীর 'শপথ নিলাম'। সত্তরের দশকের শুরুতে এদেশের পরি-স্থিতি তে রাজনৈতিক পটভূমিতে, আর কিছু না, ছবিগুলি তৈরীর সাহসই ছিল প্রধান, ছবির ভাল বা মন্দের প্রশ্ন অতএব মন ওঠে।

উপরোক্ত ছবির সবগুলিই এই লেখকের দেখার সৌভাগ্য যে হয়েছে এমন নয়, তবে কিছু কিছু সে নিশ্চয় দেখেছে। তাতে তার মনে হয়েছে, বেশীর ভাগ ছবির গঠনশৈলী খুবই কাঁচা, খুবই দরিদ্র। এমন কি যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য তাতে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার সবটাই যে নির্ভুল, একথা হলফ করে বলাও শক্ত। যেসব দৃশ্য গুরুত্ব-পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল—অপটু হাতের কেরামতির ফলে এবং চিত্রকল্প সম্পর্কে নির্মাতাদের ধ্যান-ধারণার বিশেষ অভাব থাকার ফলে সেগুলি রীতিমত হাস্যকর প্রতীয়মান হয়েছে। তারও পর আছে অতি নাটকীয়তার ঘনঘটা। ফলে গোড়ায় যা হবার কথা ছিল চলচ্চিত্র, আবেগসর্বস্বতার ফলে এবং তৎসংলগ্ন রকমারি দৈন্যের দরুন তা হয়ে উঠেছে বায়োস্কোপ।

লেখকের মতে ফিকশানধর্মী ছবি তৈরী করা এক ব্যাপার, জাতীয় ইতিহাসের তথ্যসম্বলিত প্রামাণ্য ছবি করা ভিন্ন ব্যাপার। বরং শেষেরটিই রীতিমত কঠিন কাজ। এই ধরনের ছবি করতে চিত্রনির্মাতার যে সক্ষমতা, যত্নবোধ, ধৈর্য, অর্থ এবং ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন ঘটে, এদেশের ছবিতে তার প্রয়োগ খুব কমই চোখে পড়ে।

অথচ অনাবিল জাতীয়তা এবং দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে রীতিমত সক্ষম —এমন ছায়াছবির প্রয়োজন আজ খুবই বেশী। দেশের তরুণ যুবশক্তি, যাকে বলা যায় সত্যিকারের পজিটিভ ফোর্স, আজ ক্রমাগত বিপথে চলেছে। এই শক্তিকে এখুনি সংহত না করতে পারলে বিপর্যয় অনিবার্য। আর এই ব্যাপারে চলচ্চিত্র, লেখকের বিশ্বাস, অনেকখানি দায়িত্ব নিতে পারে। বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে চলচ্চিত্র এমনই একটা শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম, যার মাধ্যমে শুভ হোক বা অশুভ, যে কোন ধরনের বক্তব্য অনায়াসে দেশের কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়,

আলোর ঠিকানা / অপর্ণা সেন। পরিচালনা ঃ বিজয় বসু। ফটো ঃ অমৃত

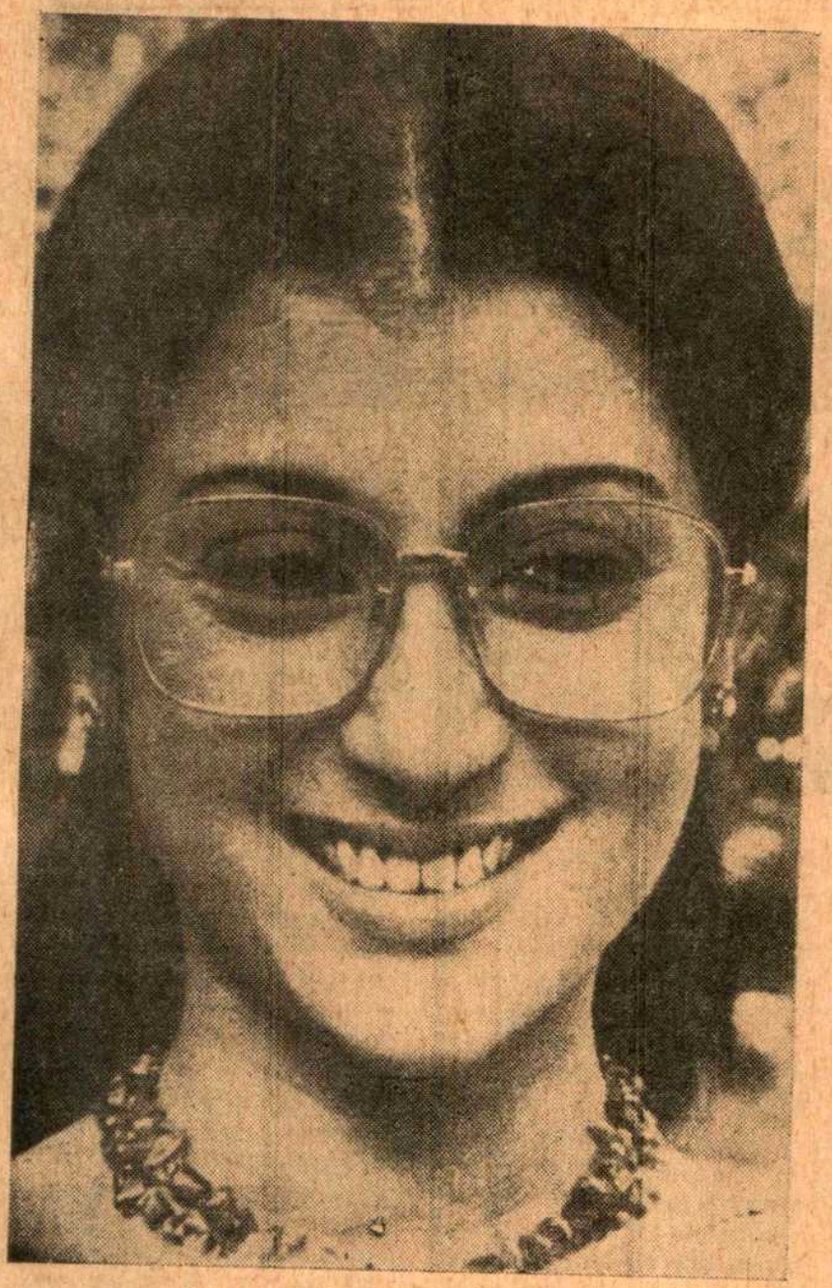

হোক না সে জনতা সাক্ষর অথবা নিরক্ষর। আজ দেশের তরুণদের কাছে যদি বাস্তবিক পরিকল্পনা সহকারে এদেশের জাতীয়তাবাদী আদর্শের, উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্ট দ্বিধাহীন ভঙ্গীতে পৌঁছে দেওয়া যায়, দিয়ে ভালভাবে বোঝান যায়, তো এটা তো ঠিক, শক্তির একটা বড় অপচয়কে আমরা রুখে দিতে পারি, এবং সুযোগ মত সেই শক্তিকে দেশ গড়ার কাজে বিনিয়োগ করতে পারি।

ক্ষুদিরাম এ দেশেরই ছেলে। ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদা তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যে 'অসম সাহসে' ভর করে, সে-শক্তি তিনি নিশ্চয় এই দেশের জল হাওয়া এবং মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। বিনিময়ে দেশ তাঁকে দিয়েছিল জীবনে এগিয়ে চলার সঠিক পথনির্দেশ। আর সেই বিশেষ চেতনা তো কস্মিনকালেও ফুরিয়ে যাবার নয়। আজও তা আছে। জীবন্ত আছে। তাই আজকের এই অশান্ত সামাজিক পটভূমিতে এদেশের পারঙ্গম চিত্র-নির্মাতারা যদি তরুণতর শক্তিকে নিজের দেশ, দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা, সে রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক যাই হোক, উপযুক্ত গুরুত্বের সঙ্গে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো কাজ হয়। আর তাতে দেশ ও দশের উপকার অবশ্যম্ভাবী। আমাদের এখানে সিরিয়াস ফিল্ম মেকারের সৌভাগ্যবশত কোন অভাবই নেই। সরকার

আসছে

শ্রেষ্ঠাংশে—ভাস্কর চৌধুরী - চিন্ময় রায় বিনতা রায় - শেখর চট্টোপাধ্যায় - সাধনা রায়চৌধুরী - কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় - হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় - শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় শ্যামল ঘোষাল - পিনাকী সেনগুপ্ত রুণু, মিঠু এবং মনোমোহন কৃষ্ণ (বম্বে)
সংগীত পরিচালনায় ঃ ওয়াই এস্ মুলেকী
পরিবেশনায় ঃ
রঙ্গলোক পিকচার্স প্রাঃ লিমিটেড

সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা / চিন্ময় রায়, রবি ঘোষ, জয়া ভাদুড়ী ও সুমন ঘোষ। পরিচালনা ঃ একলব্য। ফটো ঃ অমৃত

যদি এইসব কৃতি নির্মাতাদের সাহায্য দেন তো কেন হবে না ভাল ভাল ছবি?

আসল প্রশ্ন হচ্ছে দৃষ্টিভংগীর। শিল্পসৃষ্টির মূল শর্ত সেখানেই। প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ফলে যে শিল্পকর্ম অপরূপ হতে পারে, একই নির্মাতা ভুল জীবন দর্শনের তাড়নায় সেই অপরূপকে কুরূপেও নির্বাচন দিতে পারেন। আমাদের হয়েছে তাই। দেশকে জানার আর্টিফিউড তৈরী হবার আগেই আমরা বিদেশকে জেনে বসি। জাতীয় হবার আগেই আন্তর্জাতিক হবার স্বপ্ন দেখি। গণ্ডগোলটা পাকিয়েছে বেশী সেখানেই। বলতেই হয় যে এদেশের চলচ্চিত্র জাতীয়তা এবং দেশাত্মবোধসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রে রীতিমত অবহেলিত। ফিল্ম নিয়ে যাঁরা সিরিয়াস তাঁরা দেখেছি ওই ধরনের প্রোজেকটের কথা শুনলে নাক সিঁটকান। ক্রুদ লেলুচ, ইংগমার বার্গম্যান, ওকিরা কোরোসোয়া, গদার নিয়ে তাঁদের যত মাতামাতি, অথচ গোঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না।

ফলে এই ধরনের ছবি করতে, আমি খুব সাহসের সঙ্গেই বলছি, এক ধরনের কেরিয়ারিস্ট একত্রিত হয়েছেন যা অবশ্য সবাই নন। এঁরা জীবনে সব কিছুকেই লাভ-লোকসানের পণ্য হিসাবে জ্ঞান করেন, ফিল্ম সেক্ষেত্রে আর বড় কি? এঁদের ধারণা জাতীয় নেতা, মনীষী আর মহা-পুরুষদের নিয়ে ছবি বানালেই লোকে নির্বিচারে দেখবে, কারণ সেখানে তো ন্যাশনাল সেন্টিমেন্টের প্রশ্ন, ইমোশানের প্রশ্ন। ছবির ত্রুটি কেউ ধরবে না, অথচ ছবি তৈরীর মূল যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ টাকা রোজগার করা সেটাও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু দর্শকরা খুবই সতর্ক মানুষ, তাদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির কাছে ইতিপূর্বে বহু বেনিয়াবুদ্ধি পরাভূত হয়েছে, আশা হয় ভবিষ্যতেও হবে।

ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল দীর্ঘকালের। সেই অবিসম্বাদী আন্দোলনে এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কায়িক এবং নৈতিক সমর্থনের কোন অভাবই ছিল না। বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের তো বটেই, এদেশের বহু সাধারণ মানুষের অনন্যসাধারণ দেশপ্রেমের কাহিনী এখনো গ্রামে গঞ্জে মানুষের মুখে মুখেই প্রচলিত। লক্ষ লক্ষ মানুষের বিপুল কর্মোদ্যোগ, অপরিসীম দুঃখকষ্ট স্বীকার, পর্বতপ্রমাণ স্বার্থত্যাগ-আত্মত্যাগ —এগুলিই ছিল আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সত্যিকারের পটভূমি। সে-সব অবিস্মরণীয় কাহিনী আজও মানুষের হৃদয়ে সসম্ভ্রমে তোলা আছে, কোন কোন স্মৃতিচারণ মুহূর্তে যখন সেই কাহিনীর একটি-দুটি শোনা যায়, শ্রোতা নিশ্চয় স্তব্ধ হয়ে শোনে। আর শুনতে শুনতে যদি দেখা যায় শ্রোতার মুখে ধীরে ধীরে শ্রদ্ধা নামক এক অপার্থিব কিছু ছায়া ফেলছে, যদি দেখেন শ্রোতার বুক গর্বে ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, তাহলে জানবেন তার জন্যে দায়ী হচ্ছে দেশ, দেশমাতৃকার স্নেহ, দেশের বিরাট ঐতিহ্য, দেশের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতির অবদান—এগুলিই সেই বক্তার কাহিনীতে নিশ্চয় প্রাধান্য পাচ্ছে। যাঁরা দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী তাঁরা এই উপরোক্ত ব্যাপারটি যদি স্মরণ রাখেন তাহলে আশা হয় তাঁরা চিত্র নির্মাণে অধিক যত্ন গ্রহণ করবেন, অধিকতর আন্তরিকতা প্রদর্শন করবেন।

আর একটা কথা; স্বাধীনতা আন্দোলনের-ই হোক বা সমকালীন সামাজিক জীবনের কথা হোক, চিত্রনির্মাতারা যদি একথা স্মরণ রাখেন যে, তাঁদের নির্মিত আজকের এই ছবি ভবিষ্যৎকালের মূল্যবান ডকুমেন্ট হিসাবে আগামী বংশধরদের কাছে প্রদর্শিত হবে, তাহলে চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে সকলেই আরও সতর্ক মানসিকতায় অগ্রসর হবেন। আজকের সামান্যতম ত্রুটি ভবিষ্যৎ কালে তথ্য নির্ণয়ে যে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে, ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব লাঘব করতে পারে, এ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। অন্তত জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধসম্পন্ন যে কোন চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে কোন পক্ষেরই শৈথিল্যই বরদাস্ত হওয়া উচিত নয়। তাতে জাতীয় ঐতিহ্যই বিপন্ন হতে পারে।

আসুন বিষ্ণুপুরে পোড়ামাটির অপরূপ ভাস্কর্যের দেশে

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়া-মাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।

রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন : **ট্যুরিস্ট ব্যুরো**

৬/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ইস্ট, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TS 2008

কখনো রাত কখনো দিন

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

'মন' নামক ব্যক্তিটি বড়ই অদ্ভুত।

বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, ছদ্মবেশী। যদি অবশ্য 'মন'কে ব্যক্তি আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু তাছাড়া আর কোন বিশেষণই বা চিহ্নিত করা যায় তাকে? বস্তু? মানে জিনিস? তা কী করে বলা যায়? বস্তু তো জড়, আর মন? ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল চঞ্চল।

স্কুলে উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত যদি পড়তাম, তাহলে হয়তো এ বিষয়ে জ্ঞান জন্মাতো, তাদের সে সুযোগ ঘটেনি। জ্ঞান যা কিছু, শোনার মধ্য দিয়ে। তা চলতি কথায় 'মন' এবং 'প্রাণ'কে একই শ্রেণীতে ফেলা হয়।

'মন প্রাণ ভাল নেই', অথবা 'প্রাণ কেমন করছে, বা মন কেমন করছে।' তবু ভেবে দ্বিধেছি, ও দুটো আলাদা।

'মন কেমনটা কেবলমাত্রই বিরহ বেদনা, 'প্রাণ কেমনে'র অর্থ আরো ব্যাপক। যে-কোনো চাঞ্চল্যেই, তা সে ভয় দুশ্চিন্তা আতঙ্ক আশঙ্কা, সব কিছুতেই প্রাণ কেমন করতে পারে। আর 'মন' যেহেতু মানুষের পরিচালক সেইহেতু তাকে ব্যক্তি বলা ভুল নয়। এবং সে বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ আর ছদ্মবেশী তাতেও সন্দেহ নেই।

মনের ওই চরিত্রটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো, দিদি শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার পর। নিজের মনের চেহারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি।

ছি ছি এ কী?

চিরকাল ভেবে এসেছি, দিদি বিহনে আমার জগৎ শূন্য। দিদি নেই আমি আছি, এ অবস্থা অকল্পনীয়। দিদি আর আমি দুয়ে মিলে একটাই সত্তা।

কিন্তু হঠাৎ মনের দিকে চেয়ে দেখি কখন দিদিকে বাদ দিয়েই আস্ত একটা সত্তা গড়ে ফেলে বসে আছি, নিজস্ব একটা জগৎ! সে জগতে শূন্যতাশূন্যতার কোনো বালাই দেখতে পেলাম না।

বরং যেন, হ্যাঁ ভাবতে লজ্জায় মাথা কাটা গেলেও দেখতে তো পাচ্ছি? বরং যেন সেখানে একটি মুক্তির হাওয়া বইছে ফুর-ফুরিয়ে। নিজের জন্যে যেন অনেকখানি

অনেকদিন আগে আমাদের এক সদা-বিধবা আত্মীয়া মার কাছে বলে বসেছিলেন, 'বৌদি বৈধব্যের জ্বালা বড় জ্বালা তা সত্যি, তবু ভাই মনের অগোচর পাপ নেই, বৈধব্যে একটা আরামও আছে। যেন মুক্তি মুক্তি ভাব। রাতদিন একটা পুরুষের তাঁবেদারী করতে হচ্ছে না, তার জন্যে অহরহ ভয়ভাবনায় থাকতে হচ্ছে না এ একধরনের বেশ আরাম।'

মহিলাটি বরাবরই প্রখরা এবং মুখরা ছিলেন, আবার সবকিছু নিয়ে 'হি হি'ও করতেন, অখ্যাতি ছিলই বেশ, কিন্তু এই কথা নিয়ে ছি ছিক্কারে প্রায় দেশ ভরে গিয়েছিল।

সদ্যবিধবার মুখে এই উক্তি।

আমার খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আজ? তুলনা করা সঙ্গত নয়, অবস্থারও সাদৃশ্য নেই, তবু নিজের মনের ছবি দেখে সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে গেল আমার। খুবই লজ্জার কথা, বলতে কি ঘেন্নারও কথা, তবু মনের মধ্যে কেমন একটা আরাম।

ছি ছি।

নিজেকে যাচ্ছেতাই রকমের পাষন্ড মনে হচ্ছে এই হৃদয়হীন মনোভাবের জন্যে বহু ধিক্কার দিচ্ছি, কিন্তু 'মন' নামক ব্যক্তিটির এই ব্যবহার!

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম, আর কিছু নয় ওই যে দিদি অহরহ আমার মাথার ওপর একখানা খাঁড়া ঝুলিয়ে রেখেছিল, এ তারই প্রতিক্রিয়া। আপাততঃ খাঁড়াটা নামিয়ে রেখে গেছেন সুনীতি দেবী, তাই আমারও ফাঁড়া কাটার নিশ্চিন্ততা।

দিদি তো কথা দিয়েছে অনুষ্ঠানের পালা সব না চুকলে কিছু করবে না।

তার মানে অষ্টমঙ্গলা, সুবচনী, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি। কম করে দিন পনেরো। এই পনেরোটা দিন অন্ততঃ নিশ্চিন্ততার হালকা হাওয়ায় ভেসে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে থাকার স্বাদটি তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে

তা বলে সত্যিই কি আর একেবারেই মন কেমন করছে না? এতোই কি আমি হৃদয়হীন পিশাচ? যখন তখনই করছে।

রাতে বিছানায় শুতে এসে যখন দেখছি সেই আমার থেকে মাথায় খাটো অথচ বয়সে বড় সুন্দরী মেয়েটি বিছানার একপাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে নেই, তখন প্রাণ হু-হু করে ওঠে বৈকি।

যখন ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখি আনলার একটা কোণে দিদির পরিত্যক্ত একটা আধ-ময়লা ডুরে, আর একটা পুরো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি যেন ম্রিয়মান মুখে ঝুলে পড়ে আছে, তখন কেমন একটা বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভাব লাগে। আর খেতে বসার সময়? নাঃ তখন সত্যিই বড্ড কষ্ট হয়। দিদি যা যা খেতে ভালবাসে, সেগুলো কেন রান্না হয়, মায়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠে জমে।

মুস্কিল এই কয়েকটা বিশেষ বস্তু আবার মেজদাও ভালবাসে। যেমন ছোলার ডাল, পোস্তর বড়া, কাঁচা ইলিশের ঝাল।

মা নিজ মনেই বলেন, নতুন বৌ গেছে, কত আদর খাচ্ছে তার জন্যে আর মন কেমন করে সরিয়ে রাখতে হবে না তো। খা।'

এরকম কথায় অবশ্যই রেগে যাই, বলি, 'কে বলেছে তোমায় এসব কথা, আমার ভাল লাগছে না তাই ফেলে দিচ্ছি।'

কিন্তু তারপর দুপুরের অখন্ড অবসরে যেন আশ্চর্য একটি ভাললাগার সমুদ্রে ডুবে পড়ে থাকছি। যেন আমি একটা অগাধ ঐশ্বর্যের একাধিপত্য পেয়েছি, একটা রাজত্বের মালিক হয়েছি। আমাকে আর কারোর উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি মেলে থাকতে হবে না, কারো মন ভাল রাখার দায়িত্ব নিতে হবে না।

মেজদা একদিন দিদিকে দেখতে গেল, আর তার ফিরে আসার পর দেখলাম, একা আমারই নয়, সকলেরই মনটা উল্টো-পাল্টা জিনিস দিয়ে তৈরী।

নইলে 'সুনী দিব্যি আহ্লাদে আছে—'

CELEBRATES SILVER JUBILEE

DHAKURIA ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED

Pioneers in the manufacturing of Pneumatic Accessories & Spare Parts in India

We are 25

For these 25 years we have been looking ahead. Planning, research and development — all the time striving for the progress and prosperity of the nation. It is time we had a self-introspection. To see how we have performed and what we have achieved. Yes, of course, we have achieved something. We have made DEW pneumatic accessories and spare parts and mining equipment widely known for its dependibility, efficiency and workmanship throughout the length and breadth of the country. We have had a significant role in helping our developing economy with a diverse range of import substitution.

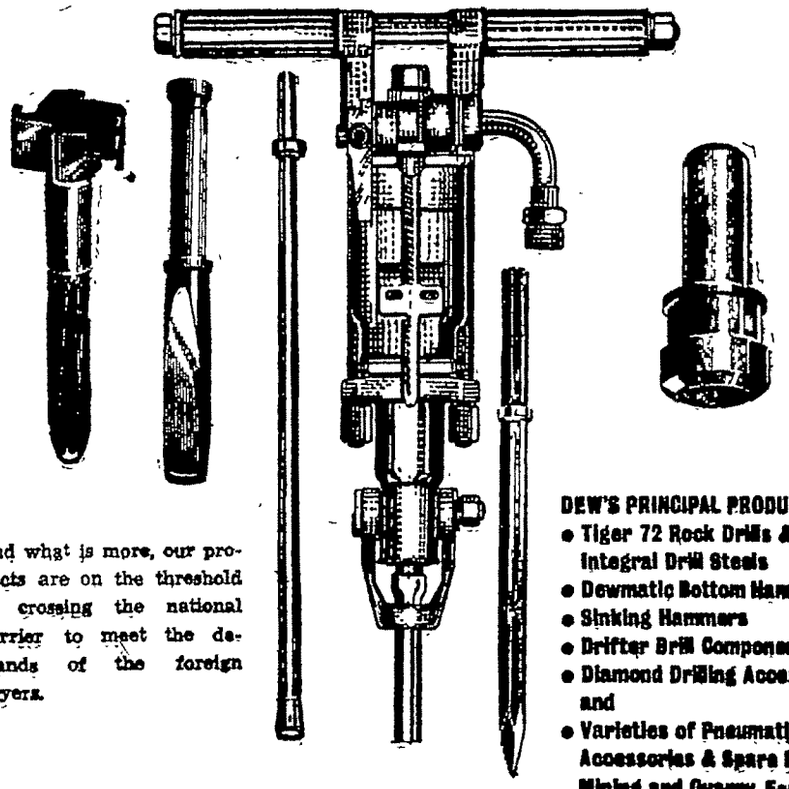

And what is more, our products are on the threshold of crossing the national barrier to meet the demands of the foreign buyers.

DEW'S PRINCIPAL PRODUCTS

- **Tiger 72 Rock Drills & Integral Drill Steels**
- **Dewmatic Bottom Hammers**
- **Sinking Hammers**
- **Drifter Drill Components**
- **Diamond Drilling Accessories and**
- **Varieties of Pneumatic Tool Accessories & Spare Parts for Mining and Quarry Equipment**

OFFICES & WORKS
CALCUTTA 13 India Exchange Place, Cal-1
Telephone : 229411, 229412 * Telegram : SMALLDEW, Calcutta
DELHI Block 'P' 1853, E.P.D.P. Colony Kalkaji, New Delhi
Telegram : SMALLDEW, New Delhi
WORKS
88 Aghore Sarani, Sonarpur, 24 Parganas West Bengal.
Telephone : 616297, 619258

DF/DEW 22

দেখে মনে হলো মেজদার যেন অন্য প্রত্যাশা ছিল। যেন এখনো দিদি তেমনি অঝোর ধারায় কাঁদছে দেখলেই খুশী হতো মেজদা। সেটা না দেখে হতাশ হয়েছে।

শুধু, শুধুই আমায় ডেকে যেন বিদ্রূপের মত বলে উঠলো, 'খুব তো জমিয়ে নিয়েছে সুনী শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে। তোদের মেয়েদের বলিহারী যাই বাবা!'

খবরটা আমারও প্রীতিপ্রদ হলো না, দিদি যদি শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে এই কদিনেই এমন জমিয়ে নিতে পারে, তাহলে শ্বশুরবাড়ির আসল লোকটির সঙ্গে জমাতেই বা কতক্ষণ? ছি ছি। তবু মেজদা 'সেকথা' জানে না। তাহলে আরো কী বলতো? কিন্তু সে তো আমার নিজের ভিতরের কথা। তা বলে মেজদা যে সমগ্র 'মেয়ে' জাতটাকেই এক-কোপে কাটবে, এতো আর সয়ে যাওয়া যায় না? আমাকে মেয়ে জাতের পক্ষ হয়ে লড়তেই হবে।

বলে উঠলাম, 'এতে বলিহারীর কী হলো মেজদা? মেয়েদের সম্বন্ধে যখন এই ব্যবস্থাই তোমাদের সমাজে চালু, তখন জমিয়ে না নিয়ে উপায়? সেখানেই যখন টিঁকে থাকতে হবে।'

'হবে তা জানি, তবু 'পারা'র কথা হচ্ছে।'

'ফেটা পারতেই হবে, না পারলে নিন্দে সেটা যে শত চেষ্টার মধ্যেও পারছে, তার জন্যেই তাদের বাহাদুরী দেওয়া উচিত মেজদা, বলিহারী বলা চলে না।'

মেজদা আমার মাথায় একটা চাঁটি মেরে বললো, 'ও বাবা! এ যে একেবারে স্বজাতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা!'

'স্বজাতি প্রীতিটিতি নয়,' আমি বেশ তাল ঠুকেই বলি, 'কথা হচ্ছে ন্যায়ের পক্ষে। একটা অসহায় ছেলেমানুষ মেয়ে, তাকে বংশছাড়া গোত্তরছাড়া করে দূর করে দেওয়া হলো একেবারে অচেনা একটা সংসারে, যেখানে সবাই বৌয়ের খুঁৎ ধরবার জন্যেই শতচক্ষু মেলে বসে আছে। আর এদিকে তাকে বাপেরবাড়ি থেকে শাসিয়ে পাঠানো হয়েছে, 'নিন্দে বেরোলে জীবনে তোমার আর মুখ দেখবো না।' কী করবে সে তাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়া ছাড়া?' পরাধীনতার জ্বালা তোমরা আর কী বুঝবে মেজদা?'

ভাবলাম মেজদা আমার যুক্তিতে জব্দ হবে, মোটেই তা হল না। বরং আমার মাথায় আরও একটি চাঁটি মেরে বললো, 'ফোঁস কেউটে ফোঁস! এ মেয়ের আর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে কষ্ট পাবার দরকার নেই। যাও বাবা সোজা ময়দানে, কি কার্জন পার্কে চলে যাও, মুষ্টিবদ্ধ হাতে পরাধীনতার জ্বালা নিয়ে স্পীচ দাওগে, দেশোদ্ধারের সৈনিকের খাতায় নাম উঠে যাবে।'

যারা জেলে যাচ্ছে, মেজদা তাদের 'দেশোদ্ধারের সৈনিক' বলছে।

মেজদা যে তখনকার স্বদেশী আন্দোলনকে কি ঠাট্টাতামাসা করতো তার মানে এ নয়, যে পরাধীনতার যন্ত্রণাবোধ ছিল না তার। কিন্তু ওই পদ্ধতিটার প্রতি আস্থা ছিল না। বলতো, 'পটাপট মার খাচ্ছি, ঝপাঝপ জেলে ঢুকছি, এর মধ্যে দিয়ে স্বরাজ এসে যাবে? শাসনের জাঁতার তলায় পেষাই হয়ে হয়ে তুমি সেটা ভাঙবে? হুঁঃ। ওই জাঁতাটার কলকাঠি কোথায় সেটা খুঁজে বার করে কস্তটার নাটবোল্টু স্ক্রু সব ঢিলে করে দিতে পারো, আশা আছে কিছু।'

'স্বরাজ' শব্দটাই বরবাস্ত করতে পারতো না মেজদা। ওইটা নিয়েই যত ঠাট্টা।

হয়তো দাদার জন্যে কষ্ট হওয়া থেকেই এটা বেড়েছিল মেজদার। বিচ্ছেদ বেদনার প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু 'বিচ্ছেদ বেদনা' জিনিসটা কি অনেকটা গরম পানীয়ের মত নয়? আমার তো কেন জানি না তাই মনে হতো। যেন গরম চা! পড়ে থাকতে থাকতে জুড়িয়ে যায়।

মাকেও তো দেখছি—

দাদার প্রথমবার জেলে যাওয়ায় মা যেমন অধীর হয়েছিলেন, এবার আর যেন তেমন হচ্ছেন না। সয়ে গেছে বলেই কি?

না কি মার বড়ছেলে সম্পর্কে মূল্যবোধ কমে যাচ্ছে? মা ধরে নিয়েছেন ওর আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই, ওর বিয়ে থাওয়া হবার আশা নেই, ওর ঘরবাসী হওয়ার মন নেই। এককথায়—ওকে নিয়ে মার আর কোন সুখের ছবি আঁকার প্রত্যাশা নেই। তবে? যেখানে প্রত্যাশা নেই, সেখানে মূল্য-বোধও ধূসর।

বাবার কথা বোঝা যায় না।

শুধু বাবা যেন বড়বেশী স্তিমিত হয়ে বড় বেশী ক্লান্ত।

খাটুনীও তো গেছে যথেষ্ট।

মনের ওপর চাপও পড়েছে কম নয়।

পুরুষ মানুষ মনের খবর প্রচার করে বেড়ায় না, তাকে ভিতরে বয়ে বেড়ায়, তাতে চাপটাতো বেশী পড়ে। তবু নিয়মিত অফিস টফিস যাচ্ছেনও, ছুটি নেওয়ার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন।

বলছেন 'এই সেদিন মেয়ের বিয়ে বলে ছুটি নিয়েছি—'

হঠাৎ একদিন, দিদি যেদিন অষ্ট-মঙ্গলায় আসবে, ঠিক তার আগের দিন, বাবা হঠাৎ বললেন, 'আজ আর অফিস যাবো না, শরীরটায় তেমন জুৎ নেই।'

তবে শুয়ে টুয়েও থাকেননি, কী যেন করে বেড়াচ্ছিলেন খুটখাট করে, সেই সময় পার্শেল পিয়ন এলো।

পার্শেল আসা বোধহয় আমাদের বাড়িতে এই প্রথম। কে কোথা থেকে পার্শেল করবে। এটা কে করলো? বাবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, বুঝতে পারছি না নেবো কিনা. প্রেরকের তো পুরো নাম দেয়নি, শুধু লিখেছে এ, এম।

এ, এম,!

এ, এম।

একটা সম্ভাবনায় মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠলো আমার।

মা বললেন, 'কার নামে এসেছে?'

'নামে তো আমারই।'

(ক্রমশঃ)

পশ্চিমবংগের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সমস্যা

সপ্তৎ মুখোপাধ্যায়

সেদিন বহু প্রচারিত একটি ইংরেজী ম্যাগাজিনে কাহিনীটি পড়ছিলাম ঃ কি করে একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার চাকরি ছেড়ে দিয়ে, অতিকষ্টে, জমান সামান্য মূলধন নিয়ে একটা ছোট কারখানার পত্তন করেন। তারপর কিভাবে ব্যাঙ্কের বদান্যতায় ঐ কারখানাটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠে আজ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই চমকপ্রদ বিবরণ। বিবরণটা মহারাষ্ট্র অঞ্চলের। কিন্তু পাঠ শেষ করবার আগেই নজরে পড়ল পৃষ্ঠার দক্ষিণ প্রান্তে ক্ষুদ্রতম অক্ষরে মুদ্রণ ঃ বিজ্ঞাপন (এডভিটি)। 'সত্য ঘটনা' বলে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমার কাছে বচনাটির মূল্য অনেক কমে গেল। শুধু আমার কেন, অনেকের কাছেই যেত। বিজ্ঞাপন আর বৃত্তান্ত ত আর এক নয়। নির্জলা সত্যি হলেও ধরে নেওয়া হয় যে, বিজ্ঞাপনে খানিকটা জল মেশান আছেই। তবুও কিন্তু তত্ত্বতল্লাশ যাঁরা রাখেন তাঁদের কাছে উক্ত বিবরণীটি সম্পূর্ণ নির্জলা বলে মনে না হলেও ওতে জলের পরিমাণ যে কম সে-সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে মহারাষ্ট্র, মহীশূর, তামিলনাড়ু এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ঐ রকম অনেক ঘটনা সত্যিই ঘটেছে—বেকার বা আধা-বেকার ইঞ্জিনীয়ার কাজ না পেয়ে কোনরকমে কিছু পুঁজি জোগাড় করে তারপর 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নীতির' অধীনে বা তৎপরবর্তী কালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের যুগে ব্যাঙ্ক-ঋণের ওপর ভর করে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে? পশ্চিমবঙ্গে কি বর্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত ১৪টি শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং স্টেট ব্যাঙ্ক—যার সঙ্গে অনেক সময় জাপানের শিল্প-ব্যাঙ্কের তুলনা করা হয়—এ ভূমিকা কি গ্রহণ করতে পেরেছে?

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণের মন্থরতার মূলে আরও অনেক কারণ অবশ্য কাজ করেছে। বিদ্যুৎ-সঙ্কটের কথাই ধরা যাক না কেন। বলতে পারেন যে বিদ্যুৎসঙ্কট একক পশ্চিমবঙ্গের কোন সমস্যা নয়—মোটামুটি সারা ভারতই আজ এই সমস্যার কবলে পতিত। মোটামুটি হলেও, দু-একটি রাজ্যে সমস্যাটি তেমন প্রকট নয়। যেমন মধ্যপ্রদেশে সমস্যাটির অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। কারণ খুব সোজা। ঐখানে বৈদ্যুতিক শক্তির যোগানের তুলনায় চাহিদার পরিমাণ অনেক কম। সুতরাং 'যত চাও তত লও..।' পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু বর্তমানে এরকম অবস্থার কল্পনাই করা যায় না। উপরন্তু ঠিক যাকে নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ (র‍্যেশানিং এণ্ড কন্ট্রোল) ব্যবস্থা বলে তা প্রবর্তিত না থাকায় কতটা যে পাওয়া যাবে তা জানাই যায় না। ফলে উৎপাদন-পরিকল্পনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা চালু রাখাও সম্পূর্ণ দৈব-নির্ভরশীল। এ ছাড়াও এক দারুণ আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিভিন্ন আনুষঙ্গিক ঝুঁকির সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত ঝুঁকি সংযোজিত হয়ে পড়ে। অন্তত শুরুতে এরকম বিরাট ঝুঁকির বোঝা নিয়ে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

প্রবন্ধের লেখক অর্থনীতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষ কৃতী ছাত্র। বর্তমানে গবেষণায় নিযুক্ত। ইংরেজী ও বাংলা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

সমস্যার গুরুত্ব ঃ

এ পর্যন্ত মাঝখান থেকেই আলোচনা করেছি। সমস্যা বিশ্লেষণের আগে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, এ-গুরুত্বের পটভূমিকা ছাড়া সমস্যার পর্যালোচনা করা ও সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া কোনটাই ঠিক সম্ভব নয়।

ভারতের শিল্প-ব্যবস্থায় গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিশিষ্ট স্থান যে রয়েছে তা বোধ হয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। প্রথমত, নিয়োগের দিক দিয়ে এই-সব শিল্পের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অপরিহার্য বললেও হয়। পশ্চিমবঙ্গে যখন বিশেষভাবে নিয়োগ-সমস্যা প্রপীড়িত তখন এই রাজ্যে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা যে করতেই হবে, তা মতবিরোধের ঊর্ধ্বে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাধিক্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে যা বিপজ্জনক তার মোকাবিলা প্রধানত এই ধরনের শিল্প-প্রসারের মাধ্যমেই সম্ভব। এছাড়াও আছে অন্যান্য প্রবল যুক্তিঃ কৃষির উপর জন-সংখ্যার চাপ কমান, শিল্প ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ, সমাজ-ব্যবস্থাকে সাম্যভিত্তিক করে গড়ে তোলা, মুনাফাখোরীর প্রতিবিধান ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি যুক্তিই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

জনবসতির ঘনত্বের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অবশ্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লীকে বাদ দিয়ে। এই রাজ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যার তুলনায়

কৃষিজমির পুনরুদ্ধার ইত্যাদির সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। বিভিন্ন কারণে যাকে বলে 'সবুজ বিপ্লব' তা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপৃত হয় নি, এবং বোধ হয় হবেও না। ওদিকে কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ দিন দিন বাড়ছে।

এই অবস্থায় পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল পার্শ্বজীবিকা হিসেবে গ্রামীণ এবং কৃষিভিত্তিক ('অ্যাগ্রো-বেসড্') শিল্পকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা। এ কাজ সম্ভব হলে তবেই ভূমিহীন কৃষিজীবীর সংখ্যা পরিমিত থাকবে। আর অন্যান্য কৃষিজীবীর আয় জীবনধারণোপযোগী হলে তাদের নগরাভিমুখিতাও হ্রাস পাবে। এইভাবে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের ('ডিসগাইস্‌ড্ আনএমপ্লয়মেন্ট') সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হলে তবেই নগরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের জন্যে ব্যবস্থার কথা ভাবা সম্ভব হতে পারে। নতুবা সব দিক দিয়ে বেকার সমস্যার আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশী, এবং তখন শ্লোগান ও শিব্যালেঞ্চ দিয়েই অক্ষমতা ঢাকবার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তা কি বেশীদিন সম্ভব?

মোটকথা, সমস্যা-প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্প্রসারণের গুরুত্ব অত্যধিক বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই দিকে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করতে আর মোটেই দেরী করা উচিত নয়। দেরী করলে কি হবে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর একটা উক্তি উদ্ধৃত করতে চাই: বিবর্তন ত্বরান্বিত না হলে বিপ্লব ঘটতে বাধ্য। অতএব গঠনমূলক এবং প্রতিরোধমূলক—উভয় দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণের অকাট্য যুক্তি রয়েছে।

সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধক:

শুধু যে অখণ্ডনীয় যুক্তি রয়েছে তাই নয় বিশেষ সম্ভাবনাও রয়েছে। ঐকান্তিকতা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় প্রচারকার্য ইত্যাদির মাধ্যমে এই রাজ্যের ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পকে সুসংগঠিত করে তোলা নিশ্চয়ই সম্ভব। কারণ, ক্ষেত্রও অনেকটা প্রস্তুত রয়েছে। ব্যাপক শিল্পগীয় ভিত্তি এবং পরিবহন-ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে গঠিত অপরিদৃশ্যমান কাঠামো (ইনফ্রা-স্ট্রাকচার) যে রয়েছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য যে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকও বর্তমান, এবং এদের প্রকৃতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র তাও স্মরণ রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই ব্যাংক ঋণ ও বিদ্যুৎ-সংকট সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া নিম্নলিখিত প্রতিবন্ধকতার উল্লেখ করা যায়।

সরকারী নীতি:

এখানে সরকারী নীতি বলতে প্রধানত শ্রমনীতি ও মজুরীনীতিকেই বোঝান হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা আপেক্ষিকভাবে একটু বেশী দাবী-সচেতন। সমাজনীতি ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিক দিয়ে এর বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। বরং হয়ত একে কাম্য বলেই স্বাগত জানান যেতে পারে। কিন্তু এই অবস্থা যে সম্প্রসারণমুখী শিল্প-ব্যবস্থার প্রতিবন্ধক এবং আপেক্ষিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছুটা অকাম্য তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পজাত পণ্যকে সমগ্র দেশের বাজারে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেশের বাইরের বাজারেও প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই প্রতিযোগিতা অনেকাংশেই হল মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা (প্রাইস-কমপিটিশন)। শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার অধিকোর দরুণ পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় অঞ্চলের গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প এই প্রতিযোগিতায় বেশ কিছুটা বিড়ম্বিত হতে বাধ্য।

শ্রমনীতির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত মজুরীনীতিও বিড়ম্বনার আর একটি প্রধান কারণ। পশ্চিমবঙ্গে যে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মজুরীর আপেক্ষিক হার বেশী তা ঠিক নয়। গলদ রয়েছে—অবশ্য গলদ যদি বলা হয়—মজুরী পদ্ধতিতে। ভারতের অনেক অঞ্চলেই মজুরী দেওয়া হয় পিস রেট অনুসারে বা কাজের পরিমাণ হিসেব করে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্পের বেলায় মজুরীর পরিমাণ মাসিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট। মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার দিক দিয়ে এই ব্যবস্থাকে অকাম্য বলে বর্ণনা করলে মোটেই ভুল হয় না, কারণ এর দরুণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্য প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত হয়ে লাট খেতে থাকে আর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পণ্যে এই রাজ্যের বাজার ছেয়ে যায়। শুধু শক্তিচালিত কুটিরশিল্পের কথাই ধরা যায় না কেন। যখন অস্তিত্ব বজায় রাখাই এই শিল্পের পক্ষে এক রকম দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে তখন অন্যান্য রাজ্যের শক্তিচালিত তাঁতশিল্পজাত বস্ত্রে এই রাজ্যেরই বাজার ছেয়ে যাচ্ছে।

শ্রমনীতি ও মজুরীনীতির চেয়ে সরকারের সম্প্রসারণ নীতিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, সরকারের আগ্রহ হল চিত্তাকর্ষক এবং প্রচারকার্যের দিক থেকে মূল্যবান প্রকল্পের প্রতি। এর দরুণ বর্তমান সংস্থাগুলিকে ঠিকমত সাহায্য করা যাচ্ছে কিনা সেকথা না ভেবেই নতুন নতুন সংস্থা স্থাপন করা হচ্ছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোনো সংস্থাগুলোর সম্প্রসারণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সংরক্ষণ করেই তবে সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হতে হবে—এই অতি সাধারণ তত্ত্ব বোঝবার বা বোঝাবার জন্যে অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আত্মহত্যার পথেই চলেছেন দেখা যায়। একদিকে যেমন নতুন নতুন কারখানা উঠছে অপরদিকে তেমনি পুরানো কারখানাগুলোর দরজাও বন্ধ হচ্ছে। ফলে উৎপাদন, আয় ও নিয়োগ ঠিক সম্প্রসারিত হচ্ছে না—হলেও হচ্ছে কাগজে-কলমে, সরকার-পরিবেশিত তথ্য ও পরিসংখ্যানে।

বিভেদাচরণের প্রশ্ন:

এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত আছে কাঁচা মাল যোগান ব্যাপারে বিভেদাচরণের প্রশ্ন। বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের জন্যে কাঁচামাল সরবরাহের দায়িত্ব হল কেন্দ্রীয় সরকারের। কাঁচামাল-বন্টন-নীতি কিন্তু মোটেই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের অনুকূল নয়। বন্টন করা হয় মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে—প্রয়োজনীয়তা, জনবসতির ঘনত্ব, বেকারত্বের পরিমাণ, ব্যবহারের সম্ভাবনা, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। ফলে সর্বাপেক্ষা জনবহুল উত্তরপ্রদেশ ও অপেক্ষাকৃত জনবহুল বিহার যে পরিমাণ কাঁচা মাল পায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে তার চেয়ে অনেক কম। অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজনীয়তা এবং এই রাজ্যে কাঁচামালের সদ্ব্যবহার সম্ভাবনা অনেক বেশী। মোটকথা, আমাদের অর্থব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদ ও পরিকল্পনার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এবং এর কুফল বহুলাংশে ভোগ করছে আমাদের মত সমস্যায় প্রপীড়িত রাজ্য।

বিষয়টিকে আর একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বন্টননীতি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ প্রয়োজনীয়তার তুলনায় কাঁচামাল কম পেলেও অনেক রাজ্য বেশীই পায়। এই উদ্বৃত্ত মালই আবার অদৃশ্য পথে পশ্চিমবঙ্গের খোলাবাজারে এসে হাজির হয়। এর দাম যে নিয়ন্ত্রিত দামের চেয়ে অনেক বেশী তা সহজেই অনুমেয়। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী হয় এবং এই অধিক উৎপাদন-ব্যয় পণ্যের দামে প্রতিফলিত হতে বাধ্য।

সেবা-সচেতনতার অভাব:

বলা হয় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রমবিমুখ। ঠিক শ্রমবিমুখ হয়ত নয়, কিন্তু যাকে বলে 'স্পিরিট অফ সার্ভিস' তা ঠিক এই রাজ্যে শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে ওঠে নি। কারণ অনেকাংশে 'সোসিওলজিকাল' এবং অনেকাংশে রাজনৈতিক। সে যাই হোক, দেখা যায় যে, এ রাজ্যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দাবী-সচেতনতাই বিশেষ প্রবল—দাবী আদায়ের জন্য তারা হেন কাজ নাই যা করতেও কুণ্ঠিত নয়। এই মনোভাব বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয় উৎপাদন হ্রাসে, পণ্যের গুণগত অবনতিতে, এবং

বিশেষ করে উৎপাদন-ব্যয়ে। মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার দিক দিয়েই এ যে বিশেষ প্রতিবন্ধক তা ব্যাখ্যা না করলেও চলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ চর্মশিল্পের কথা ধরা যাক। এ রাজ্যের ভোক্তা (কনজিওমার) বেশী দাম দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নির্মিত বলে পাদুকা কেন ক্রয় করবে?

পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখার প্রশ্ন :

পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখার প্রশ্নও এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্প যে রুচি-পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল না রাখতে পেরে অনেকটা হঠে আসছে, তা অনেকেই জানেন। এই ব্যাপারে তাঁত-শিল্পই হল প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা :

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অনেক পিছিয়ে আছে। এ শুধু কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল যোগানোর প্রশ্ন নয়, এ প্রশ্ন সরকারী সক্রিয় ক্রয়নীতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। অনেক রাজ্যে সরকার সরাসরি ক্ষুদ্রশিল্প-জাত পণ্য কিনে নেয় আর সেগুলোকেই সরবরাহ করে রেলপথ ইত্যাদি সর্ব-ভারতীয় সংস্থাকে। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ওঠা সম্ভব হয় নি। কয়েকটি রাজ্যে আবার একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের কম পণ্য সম্ভাব্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্প থেকেই ক্রয় করা হয় এবং তাদের তাড়াতাড়ি পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয়। এতে ক্ষুদ্রশিল্পগুলো বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাপানে এইভাবে শিল্প-ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য আনয়ন করা হয়েছে—সেখানে ক্ষুদ্রশিল্প-গুলো বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসেবেই কাজ করে। এ ব্যাপারেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিছুই করা হয় নি। ক্ষুদ্র-শিল্পগুলোর অভিযোগ হল, সরকারকে মাল বেচে টাকা এত দেরীতে পাওয়া যায় যে, ব্যাঙ্কগুলো ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজীই হয় না, বা রাজী হলেও মোটা সুদ উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য সুপারিশ করা হয়েছে সরকারের পক্ষে ২৫ হাজার টাকার কম পণ্যকে ক্ষুদ্র শিল্প থেকেই ক্রয় করতে হবে এবং মোটামুটি একমাসের মধ্যেই পাওনা মেটাতে হবে। সুপারিশটি এখনও বিবেচনাধীন।

ব্যাঙ্ক-ঋণ :

আবার ব্যাঙ্ক ঋণের কথায় আসা যেতে পারে। গত জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅমিয়নাথ কিসকু সরাসরি অভিযোগ করেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো পূর্বাঞ্চল থেকে যে সঞ্চয় সংগ্রহ করে তার অধিকাংশই নিয়োজিত হয় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে। অভিযোগটি সরকারী মুখপাত্রের এবং এই কারণে বিশেষ গুরুত্বের। অভিজ্ঞতা থেকেও এর সমর্থন মেলে। প্রথমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এবং পরে শীর্ষস্থানীয় ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সহায়তা করা। এই সহায়তা-কর্মসূচীর অঙ্গীভূত হল গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থসাহায্য। পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে—রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-গুলো এমন কি স্টেট ব্যাঙ্কও এই উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে চলেছে, দেখা যায়। এখানে ব্যক্তিগতভাবে ঋণপ্রার্থীকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করা হয় এবং ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতির অভিযোগও শোনা যায়। অবশ্য দুর্নীতির অভিযোগ আজ সারা ভারতব্যাপী। তবে পশ্চিমবঙ্গে এর পরিমাণ অনেক বেশী বলেই মনে করা হয়। মোটকথা, এই প্রবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের সহায়তায় একজন তরুণ ইঞ্জিনীয়ারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী এ রাজ্যে ভুক্তভোগীর কাছে রূপকথা বলেই মনে হয়।

পরিসংখ্যানের সাহায্য নিলে দেখা যায় ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণের সম্প্রসারণের হ্রাসই ঘটছে। যেমন ১৯৭০ সালের ব্যাঙ্ক ঋণের সম্প্রসারণের হার ছিল ২৩·১ শতাংশ, ১৯৭১ সালে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১১·৫ শতাংশে। বলা হয়েছে, উপযুক্ত জামিনের অভাবেই ব্যাঙ্কগুলো ঋণদানের পরিমাণ হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছে। যুক্তিতে হয়ত কোন ভুল নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল : জামিন বা নিশ্চয়তার অন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় না?

একটি নির্দেশিত প্রতিবিধান :

সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন প্রতিবিধান নির্দেশ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধকগুলো অবশ্যই দুরতিক্রম্য নয়। তাই সামান্য চিন্তাশীলতা এবং কিছুটা ঐকান্তিকতা নিয়ে চললেই সমস্যার যে অনেকটা সমাধান হবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত শ্রমিক-দের উপাদানে অংশগ্রহণ ও মুনাফার ভাগাভাগির উল্লেখ করা যেতে পারে। বহু-দিন ধরে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক শ্রেণীকে বোঝান শক্ত যে, আগে কাজ কর, পরে নিশ্চয়ই দাবী আদায় করে নিতে পারবে। সুতরাং তাদের এই মনোভাব পাল্টান দরকার এবং এর প্রকৃষ্ট পথ হল তাদেরকে মালিকানার আস্বাদনের সুযোগ দেওয়া। সুতরাং উৎপাদনে অংশগ্রহণ ও মুনাফার ভাগা-ভাগির পথেই চলতে হবে। এই পথও অবশ্য সোজা, খোলা সড়ক নয়। তবুও মনে হয় এছাড়া আর গত্যন্তর নেই। এদিকে মুখ ফেরালে তবেই আখেরে ফল ফলবে। এ ব্যাপারে অবশ্য মালিকদের মানসিকতা ও প্রয়োজনীয় মনোবৃত্তি গঠন ও উৎসাহের সঞ্চার করতে হবে। সংক্ষেপে বলা যায়, শিল্পের গণতন্ত্রই (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসী) হল ক্ষুদ্র শিল্প-ব্যবস্থার একমাত্র পথ। এই পথে চললে এবং সরকারী সচেতনতা প্রয়োজনীয় পরিমাণে দানা বাঁধলে অন্যান্য প্রতিবন্ধক মোটেই অনতি-ক্রম্য —এমন কি দুরতিক্রম্যও থাকবে না।

অন্যান্য প্রতিবিধান :

তবুও কিন্তু সংক্ষেপে এই অন্যান্য প্রতিবন্ধক দূরীকরণের ব্যবস্থাগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎশিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিমাণ হ্রাস করবার জন্যে উভয় শিল্প-ব্যবস্থাকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং এ-ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যকে নয় —জাপানকেই আদর্শ করে অগ্রসর হতে হবে। তারপর রুচি-পছন্দ ইত্যাদির পরি-বর্তনের সঙ্গে আয়তনজনিত ব্যয়সঙ্কোচের (ইকনমিজ অফ স্কেল) সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে। এ রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প-গুলো আয়তন সম্প্রসারণেই ব্যাপৃত, কিন্তু বেশী উৎপাদন করলে যে বেশী করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে—সে বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা নেই। অতএব প্রয়োজন হল রুচি-পছন্দের পরিবর্তনের সঙ্গেও তাল রাখার। সরকারী নীতিরও পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং কাঁচা মাল বণ্টননীতির প্রয়োজনীয় রদবদল করতে হবে। ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যাপারেও কার্য-কর নীতি প্রবর্তন করতে হবে। এবং সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে তবেই সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করতে হবে। অন্যভাবে বলতে হবে, প্রচারশূন্য ও চিন্তা-কর্ষক প্রকল্পের পরিবর্তে কার্যকর—উৎপাদন, আয় ও নিয়োগের দিক দিয়ে কার্যকর-ব্যবস্থার কথাই আগে ভাবতে হবে—এককথায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে, সক্রিয়ভাবে সংকল্পকে কাজে রূপান্তরিত করতে হবে।

উপসংহার :

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সমস্যা গুরুতর বলেই আশু সমাধানে যত্নবান হওয়া অপরিহার্য। রাজ-নৈতিক দিক দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। বিপুল সংখ্যাধিক্য এক-দলীয় সরকার আজ শাসনাসনে প্রতিষ্ঠিত এবং কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গেও যোগাযোগ দলীয় সূত্রে বিশেষ নিবিড়। এই অকস্থায় সমবায়ের ভিত্তিতে সহ-যোগিতা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত করা মোটেই কঠিন নয়। তবে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে এবং এর জন্যে রাজ্যের ভূমিকাকে লঘু করে কর্মের ভূমিকার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ এক অভিযান। এবং এর মধ্যেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং আনু-ষঙ্গিক সকল ধরনের মুক্তি। অন্যথায় চূড়ান্ত আশার সন্ধান করতে হবে চরম হতাশার মধ্যে।

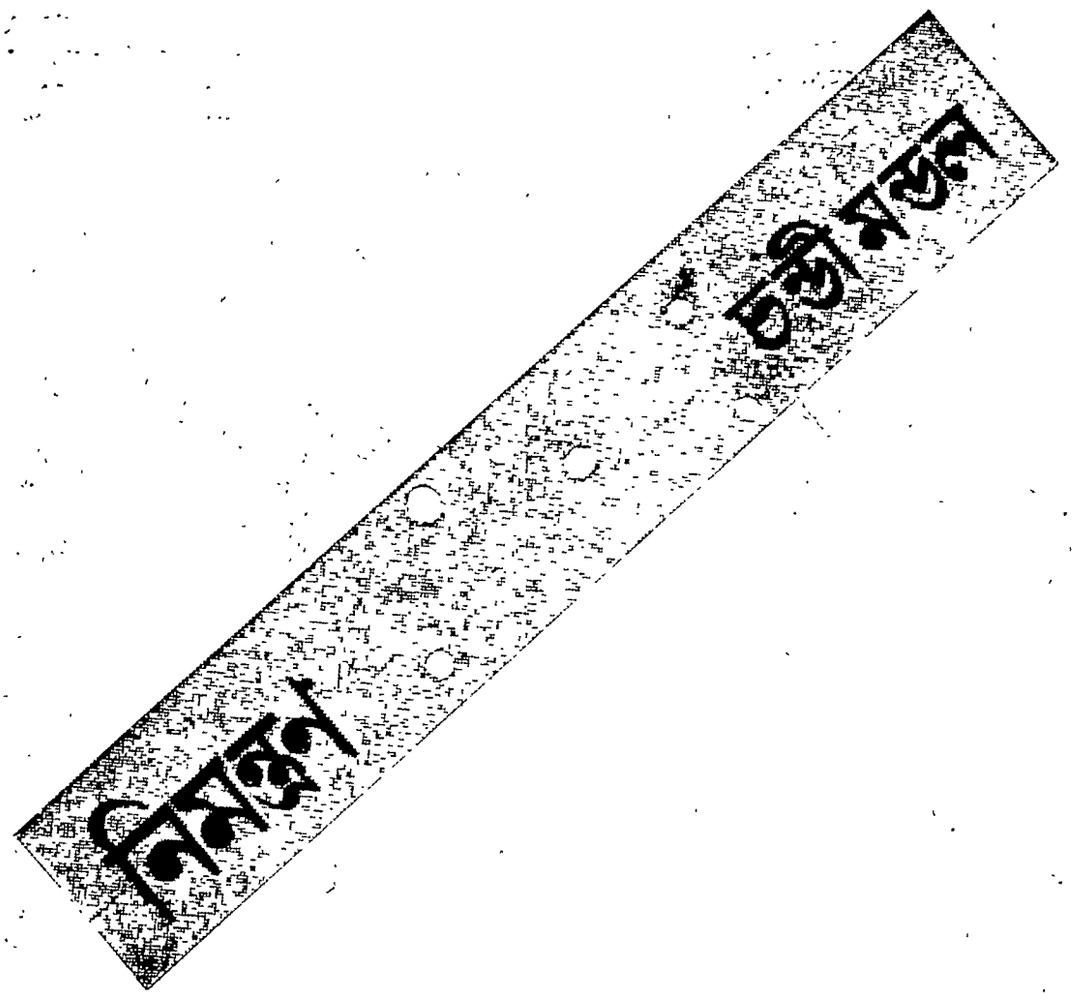

কিছু কিছু চেহারা আছে না, সফল ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, প্রথম শ্রেণীর অফিসার বা ওই শ্রেণীর উচ্চপদস্থ একজন ভাবতেই ভুরু দেখলে! এমন নামও থাকে কিছু—যেমন প্রীতীশ। প্রীতীশ যদি হয় একজন কেরানীর নাম? এবং সেই প্রীতীশ যদি হয় ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ। শুনতে এবং বিশ্বাস করতে যেমনই লাগুক প্রীতীশ, প্রীতীশ মুখার্জি কেরানীই! ব্যাঙ্ক বা বড় কোন সদাগরী অফিসের কেরানীও নয়, সরকারী অফিসের নিম্নশ্রেণীর কেরানী। মাথায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। ফর্সা, কিন্তু ফেকাসে। চোখালের ভাংগনে মুখের শ্রী গেছে লুপ্ত হয়ে। দুটি কোটরের কালিমাখা অন্তর্যামী চোখ দুটিতে কোন স্বপ্নের চিহ্ন নেই আর। স্থির বিশ্বাসে জানা হয়ে গেছে কেরানীর চাকরীতে যাকে বলে কাজ তা নেই—জীবনে কিছুই আর হওয়ার নেই, অ-কাজের জীবন বয়ে বয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার নাম কেরানীগিরি।

ঘটনার ঘনঘটা নেই কেরানীর জীবনে। তবে শরীর খারাপ হওয়া ঘটনা বৈকি। শরীর খারাপ—অসুখে নিয়মিত ভোগে প্রীতীশ। সপ্তায় একটা দিন তবু শরীরটা ভাল থাকে, অন্তত মনে তাই হয়। সেদিন দিব্যি ভুলে থাকতে পারে সে কেরানী। চলতি সিনেমার কোন হিট গানের দুকলি গায় গুনগুনিয়ে, বাস-ট্রামের সহযাত্রিনী, পথ চলার সঙ্গিনী কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে সেদিন।

সেদিন হয়ত অফিসে গুঞ্জন উঠল—দশ টাকা মাইনে বাড়বে! প্রীতীশ ভাবে, আচ্ছা, দশ টাকা মাইনে যদি সত্যিই বাড়ে কেমন হয়? —দশ টাকা নয় বাড়লে কুড়ি টাকাই যেন বাড়ে!— কুড়ি নয় পঁচিশ টাকা!— পঁচিশ টাকা কি আর বেশী টাকা!—একশ! —একশ কেন, পাঁচশ কেন নয়! পাঁচশ যদি তবে ক্ষতি কি যদি হয় হাজার! হাজার হাজার টাকা, বাড়ী গাড়ী, রূপসী মেয়ের স্বপ্নে—আত্মবঞ্চনার খেলায় কেরানী যে কী আনন্দ পায়! আশ্চর্য কিছু নয়, কেরানীর মন এমনই রোমান্টিক হয়ে ওঠে এক একদিন। ঘটনার আশায় ব্যাকুল বিরহীর দিন কাটে কেরানীর সেদিন! এমনি এক দিনে ঘটল একটা ঘটনা।

পাঁচ বছর আগের বন্ধু। বন্ধুত্বটা অতীতের শুধু নয়, পাঁচ পাঁচটা বছর অতীত হয়ে গেছে। কলেজ জীবনের সমাপ্তিতেও বন্ধুত্বেও ধ্বনিকা পড়েছিল, অন্তত দেখা সাক্ষাৎ হয়নি আর। না, চিঠির যোগাযোগও ছিল না। যে যার জীবনে ডুবে গিয়ে দুজনেই দুজনকে ভুলে গিয়েছিলো। অন্তত প্রীতীশের মনে ছিল না মিথিলকে।

এতকাল পরে এইভাবে দেখা হয়ে যাওয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে দেখেই চিনতে পারা, তারপর পাঁচ মিনিটেই পাঁচ বছর আগের মতো বন্ধুত্বে জন্ম ওঠা—

প্রীতীশের মনে হয়েছিল এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে। কিন্তু নিখিল যে এইভাবে তাকে নিমন্ত্রণ করল এই আশ্চর্যের কী ব্যাখ্যা করবে সে?

নিখিল বিয়ে করছে। প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণের চিঠি পকেটে নিয়ে বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরছে, পথে প্রীতীশের সঙ্গে এই দেখা। পাঁচ বছর আগে বন্ধুত্বটা তাদের এমন কিছু অসাধারণ ছিল না এবং গত পাঁচ বছর পরস্পরের সূক্ষ্মতম যোগাযোগও ছিল না তবু নিজের বিয়ের উৎসবে প্রীতীশকে নিমন্ত্রণ করে অস্বাভাবিক কিছু করেনি নিখিল। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরী করছে নিজেদের বাড়ী আছে গাড়ীও হবত হবে শিগগির—চেহারাটাও বর্ণাতিমত সুন্দর খুব সুন্দরী একটি কুমারীকে নির্বাচন করছে নিখিল। জীবনের বহু প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নিখিল জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে চলেছে, নিজের সেই পরম সাফল্যের মুহূর্তে অতীত এক বন্ধুর চোখ দিয়ে দেখার কৌতূহলেই হয়ত নিখিল প্রীতীশকে নিমন্ত্রণ করে থাকবে। তবে নিখিলের ব্যবহার যে আদৌ কৃত্রিম ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর পাঁচজন যা করে, নিমন্ত্রণের চিঠিখানা হাতে দিয়ে 'যাস কিন্তু, কেমন"— এইভাবে সে দায়িত্ব শেষ করেনি, প্রীতীশ ওই দিন অবশ্যই যাবে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে প্রীতীশকে দিয়ে। নিখিলের সেই আচরণে শুধু আবেগ ছিল না, হৃদয়ের উত্তাপও ছিল—প্রীতীশকে তা মুগ্ধ করেছিল।

তবে মুগ্ধ এবং অভিভূত হলেও সে আত্মবিস্মৃত হয়নি। হৃদয়ের আহ্বানে হৃদয় দিয়ে সাড়া দিয়েছিল ঠিকই, এখন মন বলছে, ওই দিন নিখিলের বাড়ী যাওয়া উচিত হবে কি? বিবেক বলছে, প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যখন, যাওয়া ত উচিত—নিখিল পুরোনো বন্ধু ত।

বন্ধু ত নিশ্চয়ই, কিন্তু এতক্ষণ বন্ধুর কি মনে আছে তাকে? বিস্মৃত এক বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মনে যে আবেগের জন্ম হয়েছিল তা যদি ক্ষণিকের হয় তবে ক্ষণকাল পরেই ত তা হারিয়ে গেছে। নিখিলের স্মৃতি থেকে প্রীতীশ নামে এক বন্ধুর স্মৃতি মুছে যেতে একটা দিন কি যথেষ্ট নয়,—আর সাতদিন, সাত সাতটা দিন এখনো বাকী নিমন্ত্রণের দিনটি আসতে; ততদিনে বন্ধুর মনে তার স্মৃতির কোন চিহ্নই অটুট থাকবে না, প্রীতীশ জানে। জানে আগামী ওই দিনটিতে বন্ধুর সঙ্গে যদি দেখা না হয়, আগামী আরো পাঁচ বছরের আগে তাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আরো জানে, নিখিলের বিয়ের উৎসবে সে যদি নাই যায় নিখিলের কিছুই এসে যাবে না।

কিন্তু তার নিজের কিছু এসে যায় বৈকি। বড় একটা ক্ষতি যে তার হয়ে যেতে

সন্দেহ নেই।—একটা দুর্লভ সুযোগ হারাবে নিশ্চয়!

নিমন্ত্রণে বিশেষত বিয়ে বা বৌভাতের নিমন্ত্রণে অতিথি হওয়ার মধ্যে এমন এক আনন্দ আছে, যা প্রীতীশই জানে, অথচ তার ট্রাজেডী—বাস্তবে সেই আনন্দের সংগ লাভের সুযোগ তার জীবনে ঘটে না, আজও ঘটেনি। কেরানীর ঘরে সেও কেরানী। দু-চার ঘর আত্মীয় বন্ধু তাদের আছে এই শহরে, কিন্তু সবই কেরানী পরিবারে। তাদেরই বিশেষ বিশেষ উৎসবে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আসে। কৌলুসহীন সেইসব উৎসবের অতিথি হয়েই যে আনন্দ সে পেয়ে থাকে তাই কত অমূল্য তার জীবনে, আর নানা রঙের সুন্দর আলপনা আঁকা, সোনালী অক্ষরে লেখা, এসেন্সের গন্ধে মধুর মাখামাখি এমন একটি নিমন্ত্রণের চিঠি, যা ছিল স্বপ্নের অতীত, এলই যদি তা অবশেষে হৃদয়জুড়ে হর্ষধ্বনি তুলে তাকে বরণ না করে প্রত্যাখ্যান করবে, এই অভিমান কি তার সাজে আজ—এই পড়ন্ত বেলায়!

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়, অমনি মনে পড়ে নিমন্ত্রণ আছে, নিমন্ত্রণ। সেই ভোর থেকে ওই খবর মনের তারে সুরের তরঙ্গ তোলে—জীবনের যত অনিশ্চয়তা যত উদ্বেগের ওপর সুরের বরষণ হয়, ব্যর্থতার ক্ষত সব মিলিয়ে যায়। মনে হয় জীবন এক অনাবিল আনন্দের স্রোত, যে স্রোতে ভাসতে ভাসতে সাতটা দিন কাটিয়ে দিল প্রীতীশ।

আজ অফিস যাবে না প্রীতীশ, অফিস যাবার বেলায় শুয়ে আছে।

মা এসে বলল, কেন রে অফিস যাবি না কেন, কি হয়েছে—শরীর খারাপ?

: না না।

: তবে?

: শরীর খারাপ না করলে কি অফিস কামাই করতে নেই একদিনো?

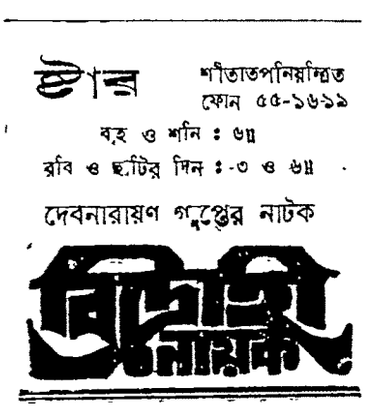

: আচ্ছা যা হোক! নেমতন্ন খেতে যাবি ত সেই সন্ধ্যেবেলা। — হ্যাঁরে, সত্যি শরীর খারাপ নয় ত খোকা?

ছোট বোন লিলি বলে উঠল : তুমি কি মা!—দেখছ না দাদার সকাল থেকে কি রকম মন খারাপ!

সত্যি নাকি কথাটা, শুয়ে শুয়ে ভাবছে প্রীতীশ, মন খারাপ? মন এতদিন ধরে এত ভাল আছে শেষ মুহূর্তে খারাপ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়!

হ্যাঁ, অ-স্বাভাবিক ভাল আছে বটে প্রীতীশের মন। ঘুমবার জন্যে যতটা ভাল থাকা দরকার তার চেয়ে অনেক বেশী ভাল আছে! ঘুম তাই আর হয় না। বার বার বিছানায় উঠে বসছে আর ছোট আয়নাটা মুখের ওপর তুলে ধরছে বার বার। চোখের কোলের অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে মনে হয়? মুখটা ত মনের মত উজ্জ্বল হল না! — বিকেল হয় না কেন! বিকেলের অনেক আগেই যদি বা বিকেল হল, পাঁচটা বাজবার আগে পাঁচটা আর বাজে না কিছুতেই। ভেবেছিল পাঁচটা থেকে সাজগোজ শুরু করবে—আগেই শুরু করে দিতে হল।

নিখিলকে ছাড়া নিখিলের বাড়ীর আর কাউকে সে চেনে না, আর অচেনা কারো সঙ্গে সে কথা বলতে পারে না—এই কথাটা আগে কেন মনে পড়ে নি! নিজেকে একটা আহম্মক ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। কাণ্ডজ্ঞান জলাঞ্জলি দিয়ে ঝোঁকের মাথায় এইভাবে চলে আসাটা যে কত মূর্খামি হয়েছে এখন মর্মে মর্মে বুঝছে প্রীতীশ।

তার চারপাশে আলোর বন্যা। সেই বন্যায় ভাসছে যুঁই, বেল আরো কত ফুল আর ফুলের মতো কত মেয়ে। নিখিল ক্ষণিকের জন্যে একবার দেখা দিয়ে চলে গেছে, বলেছিল এখনি আবার আসবে, তার আসার সময় হয় নি এখনো, অনেক-ক্ষণ হয়ে গেল! ব্যালকনির এক প্রান্তে সসংকোচে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতীশ।

রক্তে, স্নায়ুতে, অনুভূতির সবগুলি তন্ত্রীতে অনুভব করছে চার পাশের হাসি, বেনারসীর ফিসফিস, চুড়ির টুং-টাং, এসেন্সের সুবাস, আর সানাই-এর সুর। এই আনন্দের বেলায়, এই এত সুরের মেলায় বার বার একটা কথাই শুধু মনে হচ্ছে প্রীতীশের — এখানে উপস্থিত পুরুষদের মধ্যে সে ছাড়া দ্বিতীয়স্বজন কেউ কেরানী নেই নিশ্চয়।

জীবনে সফল এতগুলি মানুষের পাশে তার পরিচয় দুপুরের মতো প্রখর হয়ে উঠেছে। ব্যর্থ জীবনের করুণ এই রূপ এমন করে আগে আর কখনো ধরা পড়ে নি। এত ব্যর্থ নিজেকে তার মনে হয় নি আগে আর কোন দিন।

প্রীতীশ নিজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল, লক্ষ্য করে নি, স্থানটিকে প্রায় শূন্য করে সকলে অন্যত্র কোথায় চলে গেছে কখন। তার বিস্ময়ের কারণ কিন্তু অন্য। নির্জন ব্যালকনির এক প্রান্তে সে, অন্য প্রান্তে আর একজন।

প্রীতীশ বুঝতে পারে, ঠিক অনুভব করতে পারে, ভদ্রমহিলা তাকে লক্ষ্য করছেন—দেখছেন রীতিমত, সংকোচের ঘোমটার মধ্যে দিয়ে তাঁর গভীর দুটি চোখের ভাষা সকালের মতো প্রাঞ্জল।

প্রীতীশ চিনতে পেরেছে।

সুরমা ততক্ষণে হেসে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। — 'চিনতে পারলেন না এখনো? — অনেকক্ষণ থেকে দেখছি আপনাকে।' — সেই সুন্দর মুখ—সেই হাসি! — 'কনেযাত্রী এসেছি, আপনি?'

'আমি নিখিলের কলেজের বন্ধু।'

'তাই নাকি, আচ্ছা! — অনেক দিন পরে আপনাকে দেখছি তাই না?'

হ্যাঁ, তা অনেক দিন পরে বৈকি!' প্রীতীশ দেখছে সুরমাকে। লাল বেনারসী, ম্যাচকরা ব্লাউস, কপালে লাল টিপ কুঙ্কুমের, সিঁথিতে উজ্জ্বল লাল রেখা, আরক্ত মুখে রক্তিম হাসি—লালিমা—লালিমা!

সুরমা কোন দিনই উগ্র সুন্দর ছিল না, নম্র সৌন্দর্য বিশেষ এক মাধুর্য দিয়ে-ছিল সুরমার রূপকে, চোখকে তৃপ্তি দিত যে রূপ, মন ভরে দিত প্রশান্তিতে। সুরমার সেই মধুর রূপ আজ মধ্যাহ্নে কিছু তপ্ত—আঁচ লাগে গায়ে, একটু চঞ্চল করে—খারাপ লাগে না, আসল রূপের বাইরে এটুকু উপরি পাওনা সুরমার কাছ থেকে। কিন্তু প্রীতীশের কি বা পাওয়ার আছে।

সুরমা বলছে—'কথা বলুন! কি করছেন এখন?'

'কি করছি মানে?'

'কেমন আছেন?'

'এই—! আপনি?'

'ভাল। — জানেন ত সুষমার বিয়ে হয়ে গেছে গত বছর।'

"আমি যদি রেলের অধিকর্তা হ'তাম....."

রেল প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতাম—জনসাধারণকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে যাত্রীরা টিকিট না কিনলে ট্রেণ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাঁরা নিজের থেকে পাওনা ভাড়া দিলে আবার ট্রেণ চলাচল সুরু করা হবে।"

—মহাত্মা গান্ধী

পূর্ব রেলওয়ে

'আচ্ছা!—সুষমা কেমন আছে?'

'ভালই। সুষমার বর বেশ ভাল হয়েছে, মস্ত বড় এঞ্জিনীয়ার।'

'তাই নাকি!—বেশ ভাল খবর।—আর আপনার?'

'আমার মানে?' সুরমা হেসে ফেলল। হাসলে সুরমাকে আজো তেমনি দেখায়—সেই যেন কিছু বলতে চাইছে চোখ দুটো!—সেই চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে হেসে বলত—দেখুন ত চিনি কম না বেশী!' সেদিন সুরমার হাতে ছিল এক গাছা করে চুড়ি, আজ বালা চুড়ি মিলে অনেকগুলো করে। হাত দুখানা শুধু সেদিনের মতোই সুন্দর আছে।

সুরমা বলছে—'আপনি তখন কিন্তু এমন করে কথা বলতেই পারতেন না!'

কথাটা সত্যি। তখন সুরমার কোন কথার উত্তরে প্রায় কিছুই বলতে পারত না প্রতীশ। অবশ্য সুরমাও তখন এত কথা বলত না, কথা যা বলত ওই হাসিতে—ওই উজ্জ্বল, সুন্দর, ভীরু দুটি চোখ।

প্রতীশ নিজেকে চোখে দেখতে পাচ্ছে না, দেখলে অবাক হয়ে যেত, তবু অবাক হচ্ছে প্রতীশ। কেমন করে এত সহজে এখন সুরমার সঙ্গে কথা বলছে মুখোমুখি এত কাছে দাঁড়িয়ে। এবং কথা বলতে বলতে, সুরমার কথা ভাবতে ভাবতে, অনেক কথা ভাবতে ভাবতে একটা জিনিস লক্ষ্য করছে প্রতীশ, সে যেন সেই কেরানী প্রতীশ নয়—একেবারে অন্য মানুষ, সুরমার এমন সান্নিধ্যে আসতে গেলে প্রতীশের যে রকমটি হওয়া স্বাভাবিক, সেই প্রতীশ।

সুরমা বলল—'আসুন না একদিন আমার বাড়ীতে—।' সাদার্ন এভিন্যুতে তাদের ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিল সুরমা,—তারা দুজনে থাকে, শ্বশুর-শাশুড়ী আলাদা ফ্ল্যাটে—টালিগঞ্জে। উনি, মানে সুরমার স্বামী একটা ফরেন কোম্পানী—কী যেন নাম বলল, সুরমা—তার অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার, খুব আলাপী!'

প্রতীশ বলল—'শুনে খুব ভাল লাগল।'

'আমারও খুব ভাল লাগল।' সুরমা বলল—'খুব খুশি হব যদি একদিন আসেন।'

'দেখি,—যাব!'

'যাব নয়—নিশ্চয়ই আসবেন বলুন।'

'নিশ্চয় মানে—আচ্ছা, যাব।'

'কথা দিলেন, আসছেন তাহলে।'

এত আন্তরিকভাবে বলল সুরমা, যে হৃদয়ের নিভৃত স্বাদ কোনদিন পায় নি প্রতীশ—এই বুঝি সেই হৃদয়! যার নিশ্বাসে এমন মধুর ছিল আজ সন্ধ্যার সুরমার নিমন্ত্রণ! না, নিমন্ত্রণ ভাবতে কোন বাধা নেই। প্রতীশের মন আজ অবাধ্য হয়ে উঠেছে। নিজের সীমা ছাড়িয়ে, সময়ের সীমা পেরিয়ে বার বার ছুটে যাচ্ছে পিছনে।

ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র তখন প্রতীশ। এক সহপাঠীর সৌজন্যে ঘটেছিল যোগাযোগ—এক বছরের কিছু বেশী সময়ের জন্যে ক্লাস টেন-এ পড়ে এমন একটি মেয়ের প্রাইভেট টিউটর হয়েছিল। খুব ভাল ছাত্রী ছিল সুষমা, সপ্তায় পাঁচ দিন দু ঘণ্টা সময় বসে থাকতে হত সুষমার সামনে। সুরমা তখন কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী, চা দিতে আসত ছোট বোনের মাষ্টার মশাইকে। ক্রমে চা দিতে এসে দেখা দিতে আসত বোজ, তারপর একদিন স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল, স্বপ্নের স্বভাবেই স্বপ্ন দিনে দিনে শতদল হয়ে ফুটে উঠেছিল।

তারপর সময়ের ধুলো পড়তে পড়তে পাপড়ি ধসের হতে হতে কবে শুকিয়ে ঝরে গিয়েছিল সেই শতদল, জীবনের সব স্বপ্নের সব শতদল। জীবনের উৎসবে কোন নিমন্ত্রণ আসে নি কোনদিন। কেবল ব্যর্থ দিন কাটছিল কেরানীর। আজ এত দিন পরে এল নিমন্ত্রণ! সব পাতা ঝরে গেছে বেগাছের তার শুষ্ক শাখায় ফুটবে নাকি আবার কুসুম? কেরানীর জীবন থেকে, জন্ম হবে কেরানী নয় এমন এক জীবনের? প্রতীশের মনের সারা আকাশ আজ আলোয় আলো, আলোয় আলো।

আলো না বিদ্যুতের চমক! কে জানত আকাশের এত অতল রহস্য। এই এত আলো, এত তারা ভরেছিল যে আকাশে কখন এত মেঘ জমল—এত বিদ্যুতের চমক আকাশ জুড়ে।

মাঝপথে নামল বৃষ্টি। প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা টিপ টিপ করে, তারপর হু-হু করে—মুষল ধারে। হেমন্তর বর্ষণ নয়, নিষ্ঠুর নির্মম ধারা শ্রাবণের।

যে ধারায় ধুয়ে গেল একটি সন্ধ্যা—ধুয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সব অক্ষর, একটি নিমন্ত্রণের চিঠির।

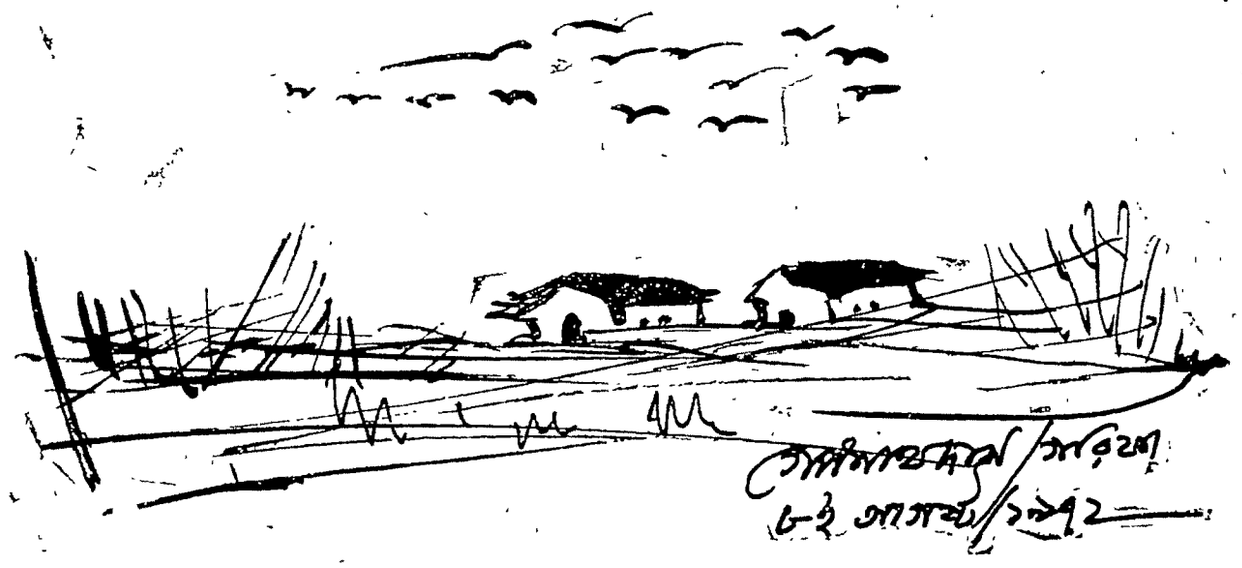

পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভূমিকা ঃ ভারতের পূর্বাংশে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি উত্তরে হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজ্যটির পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা দুইটির প্রত্যেকটি বেশ দীর্ঘ। পূর্ব সীমানা পারে ভারতের আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশ অবস্থিত। অল্পদিন হল বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয়েছে। আসাম রাজ্য এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদে পূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমানার পারে বিহার রাজ্যটি আয়তনে যেমন বৃহৎ তেমন সম্পদে পুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন ৮৮,৫৬৩ বর্গ-কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪-৬ কোটি জন। ১৯৭১ খৃঃ রাজ্যটিতে কম পক্ষে ৪৪,৪৪০,০৯৫ জন লোক বাস করত। অধিবাসীদের অনেকেই গ্রামে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে ৭০ শতাংশের বেশি লোক কৃষিজীবী। কৃষি রাজ্যের মুখ্য উপজীবিকা।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সারা ভূভাগ চারটি বিশেষ ভূপ্রকৃতির অন্তর্গত। উত্তর ভাগে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জিলাত্রয় হিমালয়ের উপ-পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে রচিত। সেখানকার ভূভাগ বন্ধুর পার্বত্য এবং ভূত্বকের মৃত্তিকা অল্প পার্বত্য মৃত্তিকা। রাজ্যটির পশ্চিম-ভাগে বর্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ ছোটনাগপুর মালভূমির অবক্ষেপণ বলে ভূপ্রকৃতি অনেকটা বন্ধুর এবং মৃত্তিকা কিছুটা কঙ্করময় ও রক্তাভ। সেখানকার মৃত্তিকা যৌগিক লৌহ-মিশ্রিত বলে রং লাল। সর্ব দক্ষিণে উপকূল বেশ ভগ্ন। অসংখ্য ধারা নদী ভূভাগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। উপকূলের ভূত্বক লবণ-মিশ্রিত ক্ষার-মৃত্তিকা দিয়া গঠিত। ইহা ছাড়া রাজ্যের অন্যত্র নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা গভীর বেধযুক্ত। নদীবাহিত পলল মৃত্তিকা দুই বিশেষ স্তরের পরিলক্ষিত হয়। গঙ্গানদীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে ঐ দুই স্তর সুস্পষ্ট। গঙ্গা নদীর উত্তর ভাগে দিনাজপুর ও মালদহ জেলাদ্বয়ে ভূভাগের মৃত্তিকা প্রাচীন পলল বা এন্টেল কাদামাটি। নদীর দক্ষিণ ভাগে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া এবং ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর উভয় জেলার অধিকাংশ আধুনিক পলল মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত বলে বেশ উর্বর। রাজ্যের এই অঞ্চলে কৃষিকার্য অনেকটা প্রগতির পথে।

রাজ্যের উত্তর ভাগে উপ-পার্বত্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও আবাদী কৃষি অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। সেখানে পরিবেশ অনুযায়ী ধাপে ধাপে কৃষি প্রচলিত থাকায় ধান ও সবজী বিশেষ ফসল। স্থানে স্থানে চা তামাক ও পাট বাণিজ্যিক ফসল হিসাবে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় তাপ ও বারিপাত অনুরূপ ফসল উৎপাদনের সহায়ক। অঞ্চলটিতে রঙ্গিত, তিস্তা ও জলঢাকা নামকরা পার্বত্য নদী।

দক্ষিণে উপকূল অঞ্চলে ক্ষার মৃত্তিকা চাষের অনুপযুক্ত। অঞ্চলটি অসংখ্য শাখা-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শাখা নদীগুলিতে প্রত্যহ দুবার জোয়ার-ভাঁটা খেলে। ফলে অনেক সময় ভূত্বক লোনাজলে ডুবিয়া যায়। এই কারণে অঞ্চলটির অনেকটা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে আবৃত। সেখানকার বনভূমি সুন্দরবন নামে অভিহিত। বনভূমির সুন্দরী, হোগলা, গরাণ, জারুল, কেয়া, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানে স্থানে জল-নিকাশের সুব্যবস্থা হওয়ায় এবং বাঁধ দিয়া জোয়ারের লবণমিশ্রিত সাগরের জল রোধ করায় অঞ্চলটিতে ধান উৎপন্ন হয়। সম্প্রতিকালে অঞ্চলটির বিশেষ বিশেষ স্থান তুলা চাষের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞের মতে অঞ্চলটিতে তুলা চাষের জমির আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। প্রাকৃতিক বারিপাত, সামুদ্রিক জলবায়ু এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ-আবাদ অঞ্চলটির আর্থিক অবস্থা উন্নততর করবে। স্থানীয় অসংখ্য শাখানদী যথোপযুক্ত মৎস্যে পূর্ণ।

অধ্যাপক চক্রবর্তী কলকাতা সিটি কলেজ অফ কমার্স অ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপাধ্যক্ষ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ল্যান্ড অ্যান্ড পিপল্‌স অফ ওয়েস্টবেঙ্গল'।

উপরি-কথিত দুই বিশেষ ভূভাগের মাঝে রাজ্যের বিস্তৃত সমভূমি উত্তর-দক্ষিণে প্রসার লাভ করেছে। সমভূমির পশ্চিম ভাগে কিছুটা ভূভাগ নিয়ে ছোটনাগপুর মালভূমির অবক্ষেপণ অঞ্চল। সেখানে কঙ্কর ও যৌগিক লৌহ-মিশ্রিত মৃত্তিকা বিশেষ বিশেষ ফলবৃক্ষ জন্মাতে ও ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। ভূগর্ভস্থ স্থানীয় খনিজ সম্পদ মনুষ্যের গোচরীভূত হলে অঞ্চলটিতে খনির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অঞ্চলটিতে বর্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমায় ও বীরভূম জেলায় সদর ও রামপুরহাট মহকুমাদ্বয়ে খনি থেকে কয়লা উত্তোলিত হয়। এই বিষয়ে রাণীগঞ্জ বিশেষ অগ্রণী। অঞ্চলটিতে শাল, অর্জুন, জারুল ও মহুয়া বিশেষ প্রাকৃতিক উদ্ভিদ। দামোদর নদ, কংসাবতী, অজয়, ব্রাহ্মণী ও দ্বারকা নামক নদীগুলি অঞ্চলটি বিধৌত করে। এই অঞ্চলে পুরুলিয়া জেলা বিশেষ বিশেষ খনিজে সমৃদ্ধ।

রাজ্যের সমভূমি গঙ্গানদী দ্বারা বিভক্ত। উত্তর ভাগে দিনাজপুর ও মালদহ জেলাদ্বয় এবং দক্ষিণ ভাগে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া এবং মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪-পরগণা জেলার অনেকটা নিয়ে তা গঠিত। জেলগুলির প্রত্যেকটি কৃষিপ্রধান। উত্তরে মহানন্দা, পুনর্ভবা ও কালিন্দি নামক নদীগুলি হিমালয় পর্বত থেকে উত্থিত হয়ে এবং উভয় জেলা বিধৌত করে গঙ্গা নদীতে মিশেছে। তারা গঙ্গার উপনদী। দক্ষিণ ভাগে শাখা-নদী ও ধারা নদী অন্যতম। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখানদীটি ভাগীরথী-হুগলী নামে অভিহিত। জলঙ্গী, ভৈরব ও ইছামতী অপর তিন শাখানদী। ইছামতী নদীটি রাজ্যের পূর্ব সীমা কিছুটা নির্দেশ করে। নদীমাতৃক এই সমভূমি কৃষিপ্রধান। ধান, পাট, ইক্ষু, ডাল, তামাক ও সব্জি এখানকার প্রধান ফসল। স্থানে স্থানে বাগিচা থাকায় নানা ধরনের ফলবৃক্ষের উপবন সৃষ্টি হয়েছে। উপবনে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল, পেয়ারা ও ফলসা

প্রচুর জন্মে। ফল উৎপন্নে ২৪-পরগণা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী নামক জেলাগুলি উচ্চ স্থান অধিকার করে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ : পশ্চিমবঙ্গের ভূগঠন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে মনুষ্য কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—রাজ্যে কৃষি, শ্রমশিল্প ও কুটির শিল্প মানুষের জীবিকার্জনের বিশেষ সহায়ক। তাদের মধ্যে কৃষির স্থান সর্বোচ্চে।

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ বিশেষ ফসল

(১৯৬৮-৬৯)

ফসল	কৃষি জমির আয়তন (লক্ষ হেক্টায়ার্স)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
চাল	৪৭	৫·৮
ডাল	৭	·৪
পাট	২৭	১৩·৪*

(* লক্ষ বেল, ১ বেল=১৮০ কিঃ গ্রাঃ)

[বিঃ দ্রঃ (১৯৭২ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৭ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৭৩ খৃঃ ৪০ লক্ষ বেল পাট জন্মাবে বলে বিশ্বাস। এই বিষয়ে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত জমিতে চাষ হয়)।

কৃষি ও জলসেচ : আবাদী জমির অনেকটা খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। প্রতি বৎসর প্রায় ৫৬ লক্ষ হেক্টায়ার্স জমিতে ৬-৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ১৯৭০ খৃঃ পশ্চিমবঙ্গে ৬-৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। সেই সময় রাজ্যে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ১২ হেক্টায়ার্স থাকে। রাজ্যে আবাদী জমির আয়তন সীমিত। লোকসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে উন্নত কৃষির প্রয়োজন। উন্নত কৃষির বিশেষ উপাদান জলসেচ। অপর দিকে রাজ্যে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা কম নয়। পশুখাদ্য হিসাবে প্রয়োজন খড় বা বিচালী, ভূষি, খইল ও ডাল প্রভৃতি সামগ্রীর তুষ। রাজ্যে চারণ-ভূমি নেই বলা চলে। সুতরাং কৃষিজাত ফসল থেকে পশুখাদ্য যোগাতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে রাজ্যে গবাদি পশুর সংখ্যা কমপক্ষে ১-২ কোটি, মহিষ—৯ লক্ষ মেষ—৫ লক্ষ এবং ছাগল—৪৫ লক্ষ। এ ছাড়া ঘোড়া, হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা কম নয়। প্রায় সকল প্রকার গৃহপালিত পশু-পক্ষীর জন্য কৃষিজ ফসলের প্রয়োজন। সুতরাং কৃষি জমির উপর চাপ যথেষ্ট।

রাজ্যে লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে কমপক্ষে ৫১০ জন। বর্ধমান বিভাগে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাদ্বয় বসতির ঘনত্ব স্বল্প। পুরুলিয়া জেলায় খনিজ সম্পদ বিদ্যমান। কিন্তু পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলাদ্বয় স্বল্প বারিপাত অঞ্চলভুক্ত। তথাপি উভয় জেলা কৃষিপ্রধান। কৃষি উন্নয়ন নির্ভর করে জলসেচের উপর। বর্তমানে সমগ্র রাজ্যে জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধি প্রায় দশ লক্ষ। সীমিত আবাদী জমিতে পরিমাণমত খাদ্যশস্য ও ভোগ্য-ফসল উৎপন্ন করতে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কৃষি প্রচলনে রাজ্য ব্রতী হয়েছে। এই কারণে প্রয়োজনবোধে রাজ্যের সকল জেলায় জলসেচ এবং কৃষিযন্ত্র, সার ও উচ্চস্তরের বীজ ব্যবহার প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে পরি-চালিত। উন্নত ধরনের বীজের গবেষণার ও উৎপাদনের ব্যবস্থা রয়েছে—চুঁচুড়া, বর্ধমান, জলপাইগুড়ি ও বারাকপুর নামক বিশেষ বিশেষ শহরতলীতে। রাজ্য সরকার ন্যায্য মূল্যে সার কটনে বদ্ধপরিকর। অদূর-ভবিষ্যতে হলদিয়া সার কারখানায় সার প্রস্তুতের ব্যবস্থা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রয়োজনমত সার ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে নীত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে জাপানী প্রথায় ধান চাষ, ধানের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। অপর দিকে রাজ্যে গমের ক্ষেত ক্রমশ বৃদ্ধির পথে। উন্নত গম বীজ সন্নিকটস্থ রাজ্যগুলি থেকে আনা হয়। পশ্চিমবঙ্গে চা ও পাট বিশেষ ভোগ্য ফসল। উহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আশাতীত সাহায্য করে। পরিমাণমত খাদ্যশস্য ও ভোগ্য-ফসল উৎপাদন করতে রাজ্যের জলসেচ প্রথা আধুনিক নীতিতে চালিত। অনেক স্থলে প্রাচীন প্রথা বাতিল করে অধুনা নলকূপ খনন করা, নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধারে জল আটকিয়ে খালযোগে আবাদী জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে জলসেচে জমির কার্যকরী আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবস্থাপনায় অনেক স্থলে গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং বিদ্যুৎচালিত পাম্পের সাহায্যে জল তুলে জমিতে জলসেচ প্রথা চালু হয়েছে। বর্তমানে খরাক্লিষ্ট জেলাগুলিতে এই ব্যবস্থা বিশেষ ফলবতী হয়েছে। আজকাল প্রায় সকল জেলায় যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধা রয়েছে, সেখানে গভীর নলকূপ প্রথায় জলসেচে বিশেষ উপকার দেখা দিয়েছে। এছাড়া নদী পরি-কল্পনায় নিত্যবহ খাল দিয়ে বর্ধমান বিভাগের অনেক জেলায় জলসেচ করা হয়। তাদের মধ্যে দামোদর নদ পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনা ও কংসাবতী নদী পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

ময়ূরাক্ষী নদী পরিকল্পনায় বিহারে ম্যাজেঞ্জার নামক স্থানে ক্যানাডা বাঁধ নির্মিত হয়। ময়ূরেক্ষী নদীবক্ষে ১৯৫৬ খৃঃ। বাঁধটি বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ির ৪০ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বাঁধের এক পাশে বিরাট জলাধার। অপর দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র। জলাধারের জলে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ৪ মেগাওয়াট জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত বিদ্যুতে ম্যাসেঞ্জার শহর এবং সিউড়ি ও তৎসংলগ্ন শহর ও শহরতলী আলোকিত হচ্ছে এবং বীরভূম জেলার বিশেষ বিশেষ কুটিরশিল্প ঐ বিদ্যুৎ যোগান হয়। বাহিত জল দিয়ে জলসেচ ব্যবস্থা রয়েছে—বিহারে নদী অধিত্যকায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলায়। সিউড়ি শহরের ৩-২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে তিলপাড়া নামক স্থানে নদীবক্ষে এক ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়। ব্যারেজের উভয় পার্শ্ব হতে খাল দিয়ে কাটা খালে জল বইয়ে নদীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বীরভূম জেলার ভিন্ন ভিন্ন থানা এলাকায় কৃষি জমিতে সেচ করায় চাষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এই পরিকল্পনায় জেলার ২-৪৬ লক্ষ হেকটায়ার্স চাষের জমিতে বর্তমানে জলসেচ হচ্ছে। জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ জেলার আর্থিক অবস্থা উন্নীত করেছে।

কংসাবতী পরিকল্পনায় কংসাবতী নদী-বক্ষে প্রথম বাঁধটি নির্মিত হয় ১৯৬৫ খৃঃ। বাঁকুড়া জেলায় কংসাবতী ও কুমারী নদী-সঙ্গমের ৩-২ কিঃ মিঃ উৎসব দিকে অম্বিকানগর নামক নগরের অনতিদূরে বাঁধটি নির্মিত হয়। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বাঁধের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হবে ১৯৭৩-৭৪ খৃঃ। দ্বিতীয় বাঁধটি কুমারী নদীবক্ষে নির্মিত হচ্ছে। বাঁধ দুটির মোট দৈর্ঘ্য ১১২০০ মিটার এবং গড় উচ্চতা ৪১২ মিঃ। বাঁধের উভয় পার্শ্বে কাটা খালের দৈর্ঘ্য ১৩০৫ কিঃ মিঃ। উভয় নদীতে বাঁধ নির্মাণে এক বিরাট জলাধারের সৃষ্টি হবে। জলাধারের জল প্রায় ৪ লক্ষ হেকটায়ার্স চাষের জমিতে সেচ হবে।

দামোদর পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত বর্ধমান জেলার দিশেরগড় নামক স্থানের অনতিদূরে দামোদর নদে পাঞ্চেৎ হিল বাঁধ ও বরাকর উপনদীবক্ষে মাইথন বাঁধ নির্মাণে দুটি জলাধার সৃষ্টি হয়েছে। উভয় জলাধার থেকে কাটা খালে জল বইয়ে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড় জেলার কিছু অংশে আবাদী জমিতে জল দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকল্পনায় বিহার ও পশ্চিম-বঙ্গ উভয় রাজ্যে ১০ লক্ষ একর জমি সেচিত হবার কথা। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ হবে। পরি-কল্পনায় আশানুরূপ ফল কি জলসেচে বা কি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে পাওয়া যায় নি। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে জলবিদ্যুতের পরিবর্তে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জলসেচ প্রথা উন্নয়নে কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। সেগুলি মধ্যমাকার সন্দেহ নেই।

কিন্তু উহাদের দান কোন অংশে হেয় নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল—

পরিকল্পনা	সেচিত জমির আয়তন (হাজার হেক্টারস)	নির্মাণ খরচ (লক্ষ টাকা)
বন্ধু	২·০২	৪২
বেরাই খাল	২·০২	২২
হিঙ্গলু	১২·৫	৯৮
করতোয়া তামলা	৮·৮	৪৬
সহর্জোরা	৪·৯	৫৬
শুভঙ্কর দাওয়া	২·৪৩	১৭

শ্রমশিল্প ও প্রগতি : রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ, অনুকূল জলবায়ু ও লোককল্যাণকর কার্যকলাপ প্রগতির পথে চালু রেখেছে। সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মধ্যে কৃষি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নীতিতে চালিত। রাজ্যে খনিজ সম্পদ উদ্ধার ও উন্নত পরিবহন শ্রমশিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেয়। রাজ্যে প্রায় ৫-৮ হাজার শ্রমশিল্প বিবিধ সামগ্রী শিল্পজাত করতে ব্রতী রয়েছে। ঐ সকল কারখানায় কমপক্ষে ২০ লক্ষ লোক জীবিকার্জন করে। শ্রমশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কয়লাশিল্প, চাশিল্প, বয়নশিল্প, লৌহ-ইস্পাতশিল্প, অ্যালুমিনিয়ামশিল্প, মোটর গাড়ী নির্মাণ শিল্প, কোকচুল্লী, সাব প্রস্তুত কারখানা, চশমার কাঁচ শিল্প, কাগজশিল্প, রেল ইঞ্জিন কারখানা, বৈদ্যুতিক তার প্রস্তুত কারখানা, রাবার কারখানা, বেষন কারখানা, টিসুশিল্প ও তৈলশোধন কারখানা। রাজ্যে তৈল-শোধনাগারটি নির্মাণের পথে। সেটা হলদিয়ায় স্থাপিত হচ্ছে।

রাজ্যে বৃহৎ শ্রমশিল্পের গণ্ডী সুস্পষ্ট — ভাগীরথী-হুগলী পর্যন্ত, দুর্গাপুর-চিত্তরঞ্জন; খড়্গপুর-মেদিনী-পুর এবং দার্জিলিং-কুচবিহার। রাজ্যে কুটিরশিল্পের অভাব নেই। বিশেষ বিশেষ সামগ্রী কুটিরশিল্পে স্থানবিশেষে প্রস্তুত হয়। এই বিষয়ে হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাগুলি অগ্রণী। রাজ্যের অন্যান্য জেলায় কোন-না-কোন কুটিরশিল্প কার্যকরী রয়েছে। বর্তমানে শ্রমশিল্প ও কুটিরশিল্প উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হচ্ছে। গ্রাম ও শহর আলোকিত করতে এবং কারখানা চালাতে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ছাড়া শহর ও শহরতলী অঞ্চলে সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশে, ঔষধাদি প্রস্তুতে ও অন্যান্য নানা কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রমাণস্বরূপ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়াস উল্লেখ করা চলে। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—

পশ্চিমবঙ্গ ও বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র

(ক) সাধারণ

উৎপাদন কেন্দ্র	অবস্থান	উৎপাদনক্ষমতা	উপকৃত অঞ্চল	নির্মাণ খরচ (কোটি টাকা)	নির্মাণ কার্যের সময়কাল শুরু	সমাপ্তি
ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ	ব্যাণ্ডেল (কলিকাতা থেকে ৬৪ কিঃ মিঃ উত্তরদিকে হুগলী নদীর পশ্চিম ভাগে)	প্রত্যেক ৮২·৫ মেগাওয়াটস উৎপাদনক্ষম চারটি কেন্দ্র	রাজ্যের দক্ষিণাংশ	৩২·৩	১৯৬২	১৯৬৬
দুর্গাপুর কোক-চুল্লী (তাপ-বিদ্যুৎ)	দুর্গাপুর	প্রথম স্তরে : প্রত্যেক ৩০,০০০ কিলোওয়াটস উৎপাদনক্ষম দুটি কেন্দ্র। অদূর-ভবিষ্যতে তাদের প্রত্যেকে ৭৫,০০০ কিলোওয়াটস বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। দ্বিতীয় স্তরে : প্রত্যেকে ৭৫০০০ কিঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম দুই কেন্দ্র। পরবর্তীকালে একটি কেন্দ্রে ১·৫ লক্ষ কিঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে।	দুর্গাপুর ও দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ	৯৫·৬	১৯৬০	১৯৭০
জলঢাকা (জলবিদ্যুৎ)	দার্জিলিং জেলায় জলঢাকা ও বিন্দু-খোলা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের ২৪৪ মিঃ নিম্নগতিতে এক ব্যারেজ নির্মাণ করে আ স' ম রেলপথে চা প ড়া মা রী রেল ষ্টেশনের ২২·৪ কিঃ মিঃ দূরে ঝালঙ্গ নামক স্থানে বিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন।	প্রথম স্তরে : প্রত্যেকে ৯০০০ কিঃ ওঃ বিশিষ্ট দুই কেন্দ্র এবং এক কেন্দ্রে ৯০০০ কিঃ ওঃ অপেক্ষল অধিক বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থা।	জলপাই-গুড়ি ও কুচবিহার জেলাদ্বয়	১০·৮	১৯৬১	প্রথম স্তরে ১৯৬৭ উৎপাদন ক্ষমতা-বৃদ্ধি— ১৯৭১
সান্তালদি (তাপবিদ্যুৎ)	পাণ্ডেত জলাধারে নদীর ঊর্ধ্বগতিতে পুরুলিয়া জে লা য় দামোদর নদীর তীরে সান্তালদি নামক স্থানে	প্রত্যেকে ১২০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম চারিটি কেন্দ্র	পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশ	৭৫·০	১৯৬৬	১৯৭৪

(খ) দামোদর পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ নির্মাণ খরচ (কোটি টাকা)

উৎপাদন কেন্দ্র	অবস্থান	উৎপাদন ক্ষমতা	উপকৃত অঞ্চল	নির্মাণের সময়কাল শুরু	সমাপ্তি	
বোকারো (তাপবিদ্যুৎ)	বিহারে হাজারিবাগ জেলায় বোকারো রেল ষ্টেশনের দুই মাইলের মধ্যে।	প্রথম স্তরে : প্রত্যেকে ৫০ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম তিনটি কেন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে : ৭৫ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম একটি কেন্দ্র।	বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের দামোদর উপত্যকা	প্রথম স্তরে ১৫·৭ দ্বিতীয় স্তরে ৪·৫	১৯৫০	১৯৬০
চন্দ্রপুরা (তাপবিদ্যুৎ)	হাজারিবাগ জেলায় চন্দ্রপুরা রেল-ষ্টেশনের ২·৪ কিঃ মিঃ দূরে।	প্রথম স্তরে : প্রত্যেকে ১৪০ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম দুই কেন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে : ১৪০ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম এক কেন্দ্র। তৃতীয় স্তরে : প্রত্যেককে ১২০ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম দুই কেন্দ্র।	বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকা ও নিকটবর্তী অঞ্চল	২৮·৯ ১৩·৫ ৩৫·৯	১৯৬০	১৯৭৩
দুর্গাপুর (তাপবিদ্যুৎ)	বর্ধমান জেলায় ওয়ারিয়া রেল-ষ্টেশনের নিকট।	প্রথম স্তরে : প্রত্যেককে ৭৫ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম দুইটি কেন্দ্র। দ্বিতীয় স্তরে : ১৪০ মেঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম একটি কেন্দ্র।	বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর উপত্যকার কিছুটা	১২·৭ ১৩·৭	১৯৫৭	১৯৬২
মাইথন (জলবিদ্যুৎ)	বিহারে বরাকর উপ-নদীতে বাঁধ দিয়ে বৃহৎ জলাধার সৃষ্ট হলে তার পাশে কেন্দ্র রচনা।	প্রত্যেকে ২০,০০০ কিঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম তিনটি কেন্দ্র।	পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছুটা	—	১৯৫১	১৯৫৮
পাঞ্চেত হিল (জলবিদ্যুৎ)	বিহারে ধানবাদ জেলায় দামোদর নদে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃজন ও বাঁধের পাশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন	৪০,০০০ কিঃ ওঃ উৎপাদনক্ষম একটি কেন্দ্র	পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছুটা	১৯·১	১৯৫২	১৯৫৯

(গ) পশ্চিমবঙ্গ নূতন বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা লিটল রিপ্তাত জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা : পশ্চিমবঙ্গে উপ-পার্বত্য অঞ্চলের এই পরিকল্পনাটি ২·৬ মেঃ ওঃ জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। নির্মাণ খরচ ২৯ লক্ষ টাকা হবে বলে বিশ্বাস।

প্যাকেট পরিকল্পনায় : দিশেরগড় ও ফরাক্কা নামক দুটি স্থানে ৯ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ পড়বে প্রায় দু কোটি টাকা। উৎপাদিত বিদ্যুতের ৬ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে দিশের-গড়ে এবং ফরাক্কায় ৩ মেঃ ওঃ।

উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গ এখন মনুষ্যহিতকর কার্যকলাপে অনেকটা প্রগতির পথে। রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে রাজ্যটি এই বিষয়ে অগ্রণী বলা চলে। মতবিভেদ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য কৃষি ও শ্রমশিল্প কারখানা উন্নয়নে কৃতসঙ্কল্প। আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে উভয়ের দান অপরিসীম। উভয় ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জল-সেচ আমূল পরিবর্তনে সাহায্য করবে। এই কারণে নদী-পরিকল্পনা ও নলকূপ খনন রাজ্য সরকারকে বিশেষভাবে ব্রতী করেছে। ১৬০০০টি অগভীর নলকূপ, ২৫০টি গভীর নলকূপ এবং ৭২৩টি নিত্যবহ নদীখাল দিয়ে জলসেচ করতে রাজ্য সরকার সম্প্রতি বিশেষ যত্নশীল। সরকারের এই প্রয়াসে গ্রামবাসী সানন্দে সহযোগিতা করলে গ্রামের রূপ সর্ব-বিষয়ে যে বদলাবে, এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনমত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সময়মত সরবরাহ করলে গ্রাম, শহর-তলী ও শহর যেমন আলোকিত হবে রাত্রিকালে তেমনি, রাজ্যের কুটিরশিল্প ও মাঝারী শিল্প পুনর্বিন্যাসে সাড়া পড়বে। চালু কারখানাগুলি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট উৎসাহ পাবে এবং স্বল্প মূল্যে উচ্চ আদরের সামগ্রী শিল্প-জাত করে রাজ্যটি কৃষিজ ও শিল্প-সামগ্রীর বাজার প্রসারে অধিকতর ক্ষমতাবান হবে। এই বিষয়ে সরকারের উৎসাহবর্ধন সময়োচিত হবে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে আজকের দিনে জলসেচ ও বিদ্যুতের দান অপরিহার্য। জনবহুল পশ্চিমবঙ্গে অভাব-অভিযোগ দূর করে আর্থিক নীতিতে রাজ্যটি উন্নয়নকল্পে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপন্নে সরকার ও জন-গণকে একজোটে কাজ করতে হবে। সমবেত চেষ্টায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা পরিবর্তিত হলে জীবিকার্জনের সুযোগ পর্যাপ্ত আসবে। বেকার সমস্যা সমাধান ও সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি দূরীকরণ রাজ্যে শান্তি ও সন্তোষ ফিরিয়ে আনবে। রাজ্য প্রগতির পথে মনুষ্যহিতকর কর্মধারা চালিত করে দিনের-পর-দিন অধিকতর সুখ ও শান্তি ভোগের অধিকারী হবে। প্রত্যেকের দেয় শ্রমে কার্পণ্য দেখালে চলবে না। পারস্পরিক শ্রমবিনিময়ে রাজ্যটি পার্থিব সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রোপণাত্মক ও যন্ত্রচালিত শিল্প

ধীরেশ ভট্টাচার্য

সন ১৮৫৪। ভারতে ইংরেজ বণিকদের মুনাফা-শিকারের অন্তরাখগুলি ততদিনে হ্রাস পেয়েছে। রাণীগঞ্জের কয়লাকে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে ছোট্ট এক টুকরো রেলপথও খোলা হয়েছে। বাংলার অন্যতম প্রধান উপজাত পাটকে যে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে মজবুত সুতীবস্ত্রে পরিণত করা যায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে স্কটল্যান্ডের অন্তর্গত 'ডান্ডী'তে। সুতরাং গঙ্গার উপকূলে রিষড়াতে সর্বপ্রথম যখন যন্ত্রচালিত পাটকল প্রতিষ্ঠিত হল কিছু স্কটল্যান্ডবাসী সাহেবদের উদ্যোগে, তখন বাংলাদেশের পুরোনো শিল্পগত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে নতুন ধারার এক শিল্প-প্রচেষ্টার দ্বার উন্মুক্ত হল বলা যায়। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলার পাটশিল্প নানা স্বাভাবিক সুবিধার জন্য পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠল, পাটজাত সুতীবস্ত্র হল ভারতের অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

এমনি আর একটি রপ্তানি দ্রব্য চা-কে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম ও প্রধান রোপণাত্মক শিল্প (plantation). চা-পাতা যদিও আসাম রাজ্যেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে ১৮৪০ খৃঃ থেকে ১৮৬০ খৃঃ এর মধ্যে। এখন ভারতের সমগ্র চা-উৎপাদনের প্রায় ২৩ শতাংশ উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। উৎকর্ষের বিচারে এবং মূল্য দিয়ে বাচাই করলে দার্জিলিং-এর চায়ের সেরা মান সর্বজনস্বীকৃত।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ। বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজের অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক এবং গোয়েঙ্কা কলেজ-অফ কমার্সের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিদেশেও অধ্যাপনা করেছেন। রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিয়ান ইকনমি' বিশেষ পরিচিত এবং তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচায়ক।

ক্রমশঃ গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের কাগজ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, নানা আকারের ও নানাবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বহুসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম লৌহপিণ্ড তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় কুলটীতে, ১৮৭৪ খৃঃ। প্রথম ইস্পাত তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে বার্নপুরে, ১৯১৮ খৃঃ। বালীতে কাগজের কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭০ সনে। মেরামতি কাজের জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার প্রবর্তন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই। পরবর্তীকালে রেলপথের বিস্তার এবং অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প স্থাপনের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছে, কিন্তু ইংরেজ সরকারের শিল্প-নীতি ছিল এ দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের বিস্তারের বিপক্ষে। সেজন্য কয়লা, লোহা ইত্যাদির সুবিধা থাকতেও এবং কলকাতার মত বিরাট বিপণন কেন্দ্রের সুযোগ পেয়েও পশ্চিমবঙ্গে তখন কোনো ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার পত্তন করা সম্ভব হয় নি।

শিল্পায়নের গোড়ার দিকের প্রথম তিন-চার দশকে যে-সব শিল্প গড়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল ইংরেজ ও স্কচ বণিকদের মূলধন ও আত্মবিশ্বাসের প্রেরণা। শিল্পে স্বাদেশিকতার উদ্ভব ঊনিশ শতকের শেষ দুই দশকে খানিকটা দেখা দিলেও তার সর্বোত্তম স্ফুরণ ঘটেছিল ১৯০৫—০৭ খৃঃ স্বদেশী আন্দোলনে। এই সময়ে দেশীয় শিল্প-প্রচেষ্টার সূচনা হয় বস্ত্রশিল্পে, রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুতির উদ্যোগে এবং আরও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে। দুঃখের বিষয় এই সব প্রচেষ্টার পিছনে সাধু উদ্দেশ্য যতটা ছিল, সংগঠন-কুশলতা সব ক্ষেত্রে ঠিক ততটা ছিল না। তবু তারই মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শক্ত ভিতের উপর দাঁড়াতে পেরেছিল এবং ব্যবসায় সম্পর্কে সাধারণভাবে বাঙালীর যে দুর্নাম রয়েছে তা ঘোচাবার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে যে-সব বাঙালী মনীষী সেদিন অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কাশিমবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং ভাগ্যকুলের সীতানাথ রায়। চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালীর শিল্পোদ্যোগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল, এই প্রচলিত ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। দেশীয় বণিক ও শিল্প-সংগঠকদের নিয়ে 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' গঠিত হয় ১৮৮৭ খৃঃ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই বৎসর পরে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত প্রাক্কালে, ১৯৪৬ খৃঃ, ভারতবর্ষের সব কটি প্রদেশের মধ্যে তুলনায় বাংলা ছিল শিল্পোদ্যোগের দিক দিয়ে অগ্রণী। আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্পের মোট উৎপাদন মূল্যের শতকরা ২৭.৫ ভাগ উৎপন্ন হত এই প্রদেশে। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এই শীর্ষ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় যে, স্বাধীনতার পরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ক্রমবিকাশ থেমে থাকে নি, বরঞ্চ কোনো কোনো শিল্পোদ্যোগে আশাতীত অগ্রগতি ঘটেছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতের সব কটি অঙ্গ রাজ্যের শিল্পায়নের দিকে সমান নজর দিতে গিয়ে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের পুরোনো প্রাধান্যকে সম্পূর্ণ বজায় রাখা যায় নি, তবু এখনও দেশের সমগ্র শিল্প-জাত জিনিষের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আসে পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানাগুলি থেকে। আয়তন এবং জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে পশ্চিমবঙ্গের এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে।

তবু সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প-প্রধান রাজ্য বলে মনে করলে ভুল হবে। এখনও যন্ত্রচালিত কারখানাগুলির প্রায় ৮০ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের একটা সীমিত ভূখণ্ডের মধ্যেই আবদ্ধ। উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলের জেলাগুলিতে কারখানা-ভিত্তিক শিল্প গড়ে ওঠেনি বললেই চলে। রোপণ-

ভুক শিল্পের মধ্যে প্রধান চা শিল্প উত্তর-বঙ্গের একান্তই কলিকাতাকেই গড়ে উঠেছে। ভেষজ শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু গাছপালা ও লতার রোপণ ও চাষ হচ্ছে কেবলমাত্র দার্জিলিং জেলায়। সিঙ্কোনা, ইপিকাক ইত্যাদি ভেষজ-গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের রোপণাত্মক শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অতি সামান্য সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতে যন্ত্রচালিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা খুবই সামান্য এবং এরও একটা বড় অংশ অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত, অন্য ভাষাভাষী, অদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিক। আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত বঙ্গ-ভাষাভাষী বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যা মোটা-মুটি ৪ লক্ষ বলে ধরে নিলে এই সংখ্যা হবে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র কর্মচারী-সংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ। এই সামান্য সংখ্যক শ্রমিককে নিযুক্ত রাখতে শিল্পে নিয়োজিত স্থির মূলধনের প্রয়োজন হয়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। আধুনিক রীতির যন্ত্রসজ্জিত শিল্পে একটি শ্রমিককে কাজ দিতে গেলে স্থির মূলধনের প্রয়োজন যে কত বেশি তা এই হিসাব থেকে খুব সহজেই ধরা পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের রোপণাত্মক শিল্পেও ফ্লোটিং পপুলেশন বা বহিরাগত শ্রমজীবীদেরই প্রাধান্য। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের দক্ষ পরিশ্রমী শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচায়। বাঙালী শ্রমিক এখনও কৃষি ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা ধরনের বৃত্তিমূলক উদ্যোগের মধ্যেই আত্মনিয়োগ করে আছে। আধুনিক রীতির শিল্পের যেটুকু বিকাশ ঘটেছে এই রাজ্যে তার সুবিধা-সুযোগের অতি ক্ষুদ্র অংশই বাঙালী শ্রমজীবীদের ভাগে জুটেছে। অবশ্য স্বাধীনতার পরবর্তী-কালে আসানসোল - দুর্গাপুর - চিত্তরঞ্জন অঞ্চলে যেসব নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে তাদের সহায়তায় বেশ কিছু শরণার্থী বাঙালী পরিবারের পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছে একথা অস্বীকার করা চলে না।

।। দুই ।।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প এক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত। এই রাজ্যের প্রধান প্রধান শিল্পজাত জিনিসের চাহিদার হ্রাস, তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য রাজ্যের মূলধন আকর্ষণ করবার ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতাই যে বর্তমানের পশ্চাদগতির জন্য দায়ী এতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৬১ খৃঃ থেকে ১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবিস্তারের অগ্রগতি ছিল মহারাষ্ট্রের তুলনায় দ্রুততর। ১৯৬৫-৬৬ খৃঃর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভারী শিল্প-গুলিতে সামগ্রিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। সেই অবনতির অশুভ প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য শিল্পে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের নানা ক্ষেত্রে। বল-বর্ধনীয় নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯৬৬ খৃঃ হ্রাস পায় প্রায় ৪০ হাজার, ১৯৬৬ খৃঃ থেকে ১৯৬৯ খৃঃ এই তিন বৎসরে আরও প্রায় ৫০ হাজার শিল্প-শ্রমিককে কাজের সুযোগ হারাতে হল। ১৯৬৬ খৃঃ থেকে ১৯৭০ খৃঃ-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের যন্ত্র-চালিত শিল্পে উৎপাদনের বৃদ্ধি হয় প্রায় ৫৫ কোটি টাকা।

অথচ পশ্চিমবঙ্গের কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে শিল্পায়নের এই স্তিমিত গতি নিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কিছুতেই করা সম্ভব নয়। অবশ্য বৃহৎ কলকারখানার যন্ত্রচালিত শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে এই রাজ্যের বেকার-সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসন করতে যে বিপুল পরিমাণের মূলধন প্রয়োজন হবে তাতে সন্দেহ নেই এবং শুধু শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধান খোঁজ করতে হবে এমন কোনো প্রয়োজন নেই। তবু এই রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার সাড়া জাগাতে না পারলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অগ্রগতির আশা কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে যদি সংগঠিত করতে হয় তবে তার জন্য প্রয়োজন কারখানায় সার তৈরি করবার, পাম্প-সেট তৈরির ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সরঞ্জামের উৎপাদনে আরও মূলধন নিয়োগ। শিল্পের অগ্রগতি মন্দা হয়ে এলে কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যেও ঢিলেমি আসে, ফলে কর্মসংস্থানের কোনো পথই সহজে খুলে দেওয়া যায় না। এ পর্যন্ত যে-ধরনের শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের প্রাধান্য ছিল তাদের প্রায় সবকটিরই অবস্থা খানিকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। চিরাচরিত পাটশিল্প কিংবা চা-শিল্পকে অবলম্বন করে পশ্চিম বঙ্গ তার বহুমুখী সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাবে এমন আশা করা বৃথা। ইঞ্জি-নিয়ারিং শিল্পে কিংবা রাসায়নিক শিল্পে প্রধানতঃ যে-ধরনের সামগ্রী পশ্চিমবঙ্গের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের চাহিদা ভবিষ্যতে খুব দ্রুত গতিতে বাড়বে বলেও মনে হয় না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকে তার গঠন বা চরিত্র বদলাতে হবে, তা নাহলে বর্তমানের এই সঙ্কট উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য সেই সঙ্গে শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বৈদ্যুতিক শক্তি এবং সাংগঠনিক কাঠামোর সমস্যার কথাও চিন্তা করতে হবে। কিন্তু শিল্পকে সঞ্জীবীত করবার পথে এগোতে হলে পুরোনো উত্তরাধিকারের দায় থেকে যতটা মুক্ত হতে হবে এবং নতুন নতুন শিল্প-সম্ভাবনার দিকে নজর ফেরাতে হবে। শিল্পের বিস্তারকে কৃষির প্রসারের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে হবে, যাতে যন্ত্রচালিত শিল্পকে এতদিন যেমন আমরা একটি সংকীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছি তার বদলে রাজ্যের সব অঞ্চলেই কোনো-না-কোনো আধুনিক শিল্প সেই অঞ্চলের অর্থ-নৈতিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম যোজনার খসড়া এখন প্রস্তুতির পথে। প্রাথমিক আভাস থেকে যতটুকু বোঝা যায় তাতে মনে হয় এই রাজ্যের যে জন্য পর্যন্ত নতুন করে শিল্পের প্রাণসঞ্চার করবে প্রয়োজনীয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু রাজ্য সরকারের সীমিত সম্পদ নিয়ে এই রাজ্যের শিল্প-সংগঠনকে এমনি নতুন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা আদৌ সম্ভব নয়, যদি না ব্যক্তিগতভাবে শিল্পপতিরা এই কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। পঞ্চম যোজনা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৭৩-৭৪ খৃঃ ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯৭৮-৭৯ খৃঃ ১৫ লক্ষে দাঁড়াবে। এর জন্য স্থির মূলধনের প্রয়োজন প্রায় ১২ শত কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের পক্ষে কেবলমাত্র নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নানা কারণে বিশেষ সুবিধাদানের নীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। এই নীতি কতটা ফলপ্রসূ হবে রাজ্যের নানা স্থানে নতুন শিল্প স্থাপনের উপযোগী ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে কিনা এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রতিযোগিতার মুখে পশ্চিমবঙ্গ যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পোদ্যোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে কিনা, এইসব প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় সারা রাজ্যের মানুষ অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকবে। রাজনৈতিক অস্থিরতার ক্ষতচিহ্নগুলি যদি মুছে ফেলা সম্ভব হয় এবং শিল্প সংগঠনকে যদি প্রকৃতপক্ষে বাস্তবানুগ চাহিদার ভিত্তিতে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়, তবে এই রাজ্যে শিল্পে স্থায়ী মন্দার সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখনও এই রাজ্যে বন ও খনিজ সম্পদ প্রচুর, যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য অনেক রাজ্যের তুলনায় উন্নততর এবং সর্বোপরি কলকাতা মহানগরীর সবরকম আকর্ষণ ভাবী শিল্পপতিদের নিকট উপেক্ষণীয় মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

ইউনিভার্সিয়াড গেমস

ক্ষেত্রনাথ রায়

সমস্ত পৃথিবীর ক্রীড়া-অনুরাগী মহলের দৃষ্টি আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কোর দিকে নিবদ্ধ। এইখানেই ইউনিভার্সিয়াড গেমসের নবপর্যায়ের ৭ম আসর আগস্ট ১৫ থেকে ২৫ পর্যন্ত বসবে। এই ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আর এক নাম 'ওয়ারল্ড স্টুডেণ্ট গেমস'। ইন্টারন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস ফেডারেশন (সংক্ষেপে এফ-আই-এস-ইউ) এই অনুষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকর্তা। এই সংস্থার ওপরই খেলার আসর নির্বাচনের দায়িত্ব।

মস্কোর আসন্ন ৭ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের বিষয় তালিকায় আছে ১০ রকমের খেলা—অ্যাথলেটিকস, ভলিবল, বাস্কেটবল, জিমন্যাস্টিক্স, টেনিস, ফেনসিং, সাঁতার, ডাইভিং, ওয়াটারপোলো, গ্রিকো-রোমান এবং ফ্রি-স্টাইল কুস্তি। খেলার অনুষ্ঠানে কুস্তি এই প্রথম তালিকাভুক্ত হল।

মস্কোর এই ইউনিভার্সিয়াড গেমসে ভারতবর্ষকে নিয়ে ৭০টি দেশের প্রায় ৪,৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর যোগদান করার কথা। ১৯৭০ সালে তুরিনের (ইতালী) ৬ষ্ঠ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২,৮০০।

মস্কোর ঐতিহাসিক সেণ্ট্রাল লেনিন স্টেডিয়ামে (লুজনিকি) ইউনিভার্সিয়াড গেমসের উদ্বোধন আসর বসবে। যোগদানকারী দেশগুলির জাতীয় পতাকা অনুষ্ঠানের শেষ সময় পর্যন্ত লেনিন স্টেডিয়ামের নির্দিষ্ট এলাকায় সগৌরবে মাথা তুলে থাকবে। সেণ্ট্রাল লেনিন স্টেডিয়াম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল ছাত্র-নিবাসে প্রতিযোগী, বিচারক এবং কর্মকর্তাদের আহার ও বসবাসের রাজকীয় ব্যবস্থা হয়েছে। ইউনিভার্সিয়াড এই আসর যাতে

সর্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তার জন্যে উদ্যোক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিয়েছে। মস্কোতে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসর এই প্রথম নয়। এখানে জিমন্যাস্টিক্স, সুটিং, বাস্কেটবল, ভলিবল, ফেনসিং, পেন্টাথলন, স্পিড স্কেটিং প্রভৃতি খেলার বিশ্ব প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন খেলার একাধিক ইউরোপীয়ান প্রতিযোগিতা মহা আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই মস্কো শহরেই সোভিয়েত

লুডমিলা তুরিসচেভা

ইউনিয়নের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের (নাম স্পার্টাকিয়াড) আসরও প্রতি চতুর্থ বছরে বসে, আধুনিক কালের প্রতিটি অলিম্পিক গেমসের ঠিক আগের বছরে। এই স্পার্টাকিয়াড তার অভিনবত্বে আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর আসরে নতুন যুগের সূচনা করেছে। স্পার্টাকিয়াড তার আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। সারা দেশ জুড়ে এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান স্পার্টাকিয়াড জনগণকে উদ্বেলিত করে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, স্কুল শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক, অফিসের কর্মচারী, কলকারখানার শ্রমিক এবং ক্ষেত-খামারের কর্মী—সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষকে তাঁদের এই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান স্পার্টাকিয়াডের প্রাথমিক বাছাই পর্বের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ফাইনাল খেলার আসর বসে মস্কোর লেনিন সেণ্ট্রাল স্টেডিয়ামে। ১৯৭১ সালের ৫ম স্পার্টাকিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৫ মিলিয়ন। অপর কোন দেশেরই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই হারে প্রতিযোগীদের অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় না।

মস্কোর ইউনিভার্সিয়াড গেমস সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। তাদেরই তো নিজস্ব খেলার আসর স্বদেশের মাটিতে এই প্রথম বসছে। বিশ্ব অলিম্পিক গেমস তাদেরই বা নয় কেন? ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে সোভিয়েত ইউনিয়ন মোট ৯৯টি পদক জয়ের সূত্রে চূড়ান্ত পদক জয় এবং পয়েন্ট সংগ্রহের বে-সরকারী তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করে। তাদের এই মোট ৯৯টি অলিম্পিক পদকের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরাই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন ৬৭টি পদক। মোট ৫০টি অলিম্পিক স্বর্ণ পদকের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের সংগৃহীত স্বর্ণ পদকের সংখ্যা ছিল ৩৮টি। দেশের এই বিরাট সাফল্যে ও-দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অবদান কত বিরাট!

মস্কোর ইউনিভার্সিয়াড গেমসে একাধিক অলিম্পিক পদক জয়ীর যোগদানের কথা আছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম ঃ ১০০ ও ২০০ মিটারের অলিম্পিক স্বর্ণ-পদক বিজয়ী ভ্যালেরী বোরজোভ (রাশিয়া), ৮০০ মিটারের অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বিজয়ী ডেভ ওয়াটল (আমেরিকা), ১০,০০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা ডেভ বেডফোর্ড

(বৃটেন), জিমন্যাস্টিক্সের বিশ্ব এবং অলিম্পিক স্বর্ণ বিজয়িনী কুমারী লুডমিলা তুরিসচেভা (রাশিয়া) প্রভৃতি। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে রাশিয়ার ভ্যালেরি বোরজোভ পুরুষদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে স্প্রিন্টে 'ডাবল' খেতাব লাভ করেছিলেন। রাশিয়ান অ্যাথলীটদের পক্ষে একই বছরের অলিম্পিক আসরে স্প্রিন্টে এই 'ডাবল' খেতাব জয়ের নজির প্রথম। এপর্যন্ত পুরুষ বিভাগে এই অলিম্পিক 'ডাবল' খেতাব পেয়েছেন ৭ জন অ্যাথলীট। শেষ পান ১৫ বছর আগে আমেরিকার বব মোরো, ১৯৫৬ সালে।

মস্কোর ইউনিভার্সিয়াড গেমসে প্রথম স্থান নিয়ে প্রধানতঃ রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে, যেমন অলিম্পিক গেমসে হয়ে আসছে। আমেরিকার পদক সংগ্রহের প্রধান উৎস সাঁতার। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকে মেয়ে ও পুরুষদের সাঁতারে যেখানে মোট পদক সংখ্যা ছিল ৮৭টি, সেখানে আমেরিকা একাই ৪৪টি পদক জয়ী হয়—পুরুষদের ২৬টি এবং মেয়েদের ১৮টি। অপর ১০টি দেশ বাকি ৪৩টি পদক ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। দুই বিভাগের মোট ২৯টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই পেয়েছিল ১৮টি (পুরুষদের ৯টি এবং মেয়েদের ৯টি) এবং বাকি ১১টি স্বর্ণ পদক পেয়েছিল এই চারটি দেশ—অস্ট্রেলিয়া ৫, জাপান ২, পূর্ব জার্মানী ২ এবং সুইডেন ২। অলিম্পিক গেমসের মতই ইউনিভার্সিয়াড গেমসের সাঁতারেও আমেরিকার প্রাধান্য। ১৯৬৭ সালের ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের সাঁতারে ২৬টি বিষয়ের মধ্যে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরা ২৪টি বিষয়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন এবং দশটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভ্যালেরী বোরজোভ

নব পর্যায়ের ইউনিভার্সিয়াড গেমসের প্রথম আসর বসেছিল ইতালীর তুরিন শহরে, ১৯৫৯ সালে। এর আগে ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর বসেছিল ৮বার—ওয়ারশতে ১৯৩৮ সালে, রোমে ১৯২৭ সালে, প্যারিসে ১৯২৮ সালে, ডামস্টাডে ১৯৩০ সালে, তুরিনে ১৯৩৩ সালে, বুদাপেস্টে ১৯৩৫ সালে, প্যারিসে ১৯৩৭ সালে এবং মন্টিকার্লোতে ১৯৩৯ সালে। এরপর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের দরুন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসের আসর বসে নি। যুদ্ধের শেষে ১৯৪৯ সালে দুটি আসর বসেছিল—নব-গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগে ইতালীর মেরোনো শহরে, অপরদিকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস সংস্থার উদ্যোগে বুদাপেস্টে। রাজনৈতিক চাপের দরুণই দুটি পৃথক আসর—ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের লড়াই। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ সালে প্যারিস বৈঠকে এই দুই নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মধ্যে যে সন্ধি হয় তার ফলেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস ফেডারেশনের উদ্যোগেই ১৯৫৯ সাল থেকে নব পর্যায়ে ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর নিয়মিত বসছে।

হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে ৪র্থ ইউনিভার্সিয়াড গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল হাঙ্গেরী—মোট পদক ৩৮। স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ১৪) এবং দ্বিতীয় স্থান আমেরিকা—মোট পদক ৩৮ (স্বর্ণ ১৬, রৌপ্য ৮ ও ব্রোঞ্জ ৯)।

১৯৬৭ সালে নবপর্যায়ের ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর বসেছিল জাপানের টোকিও শহরে। এশিয়ার ভূখণ্ডে ইউনিভার্সিয়াড গেমসের আসর এই প্রথম। টোকিওর এই আসরে উত্তর কোরিয়ার যোগদান নিয়ে প্রচণ্ড রাজনৈতিক ঝড় উঠেছিল যেহেতু জাপ সরকারের কাছে উত্তর কোরিয়ার কোন রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়, উত্তর কোরিয়া দেশ হিসাবে যোগদান না করে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ক্রীড়া সংস্থা নামে যোগদান করতে পারবে। কিন্তু কোরীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ক্রীড়া সংস্থা নাম থেকে গণতান্ত্রিক কথাটি জাপ অর্গানাইজিং কমিটি বাদ দেওয়াতে উত্তর কোরিয়া প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। উত্তর কোরিয়ার প্রতি জাপ সরকারের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ৪র্থ ইউনিভার্সিয়াড গেমসের চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশ টোকিওর ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমস বয়কট করে।

টোকিওর ৫ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসে পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে আমেরিকা—মোট পদক ৬২ (স্বর্ণ ৩২, রৌপ্য ২৪ ও ব্রোঞ্জ ৬) এবং দ্বিতীয় স্থান জাপান—মোট পদক ৬৩টি (স্বর্ণ ২১, রৌপ্য ১৭ ও ব্রোঞ্জ ২৫)।

ইতালীর তুরিনে নবপর্যায়ের ৬ষ্ঠ ইউনিভার্সিয়াড গেমসের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করেছে রাশিয়া—মোট পদক ৫৯ (স্বর্ণ ২৬, রৌপ্য ১৭ ও ব্রোঞ্জ ১৬)। ইউনিভার্সিয়াড গেমসের ইতিহাসে রাশিয়ার পক্ষে এই প্রথম শীর্ষস্থান লাভ। অন্য এই আসরে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আমেরিকা পেয়েছিল মোট ৫০টি পদক (স্বর্ণ ২২, রৌপ্য ১৭ ও ব্রোঞ্জ ১১)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত

অমৃত

সম্পাদক • শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ

CALC
GOVT
LIBRA

৩ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা] শুক্রবার, ৭ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০

অধরা রূপ ধরা দিল, আধফোটা রূপ ফুটলো,
ফিরে এল হারানো রূপ।

ফেমিলা স্নো

চোখ ধাঁধানো মন মাতানো রূপের জলুস
দেখাতে হলে অবশ্য চাই ফেমিলা-স্নো

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮৯

নিমাইচাঁদের নতুন আঙ্গিকের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

জীবন বড় জটিল। জীবনে প্রেম জটিলতর। অথচ প্রেম এমন এক মহৎ শক্তি যার আলোয় নীহারিকাপুঞ্জের রহস্যও ভেদ হতে পারে। প্রেম সীমা থেকে অসীমে নিয়ে যায় প্রেমিকের আত্মাকে, নিজের আত্মার আলোয় সুপ্রকাশ করে নিকট-দূরে এবং দূর নিকটকে। ভালবাসার আলোয় আধুনিক মানসের এক জটিল গ্রন্থি-মোচন বর্তমান উপন্যাস, যে আলো ইতিহাস আর বিজ্ঞান রাজনীতি আর সাহিত্য জীববিদ্যা আর স্থাপত্যকে এক করে মিলিয়েছে একটি বসন্ত পুষ্পের মধ্যে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

আর এক সাজে ৬·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের হাসি-কান্নার মধুর কাহিনী

মোগলসরাই জংশন ৪·০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

শঙ্কু মহারাজ-এর অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী

মধু বৃন্দাবনে ব্রজপর্ব ১০·০০ বনপর্ব ১০·০০

বৃন্দাবন যে আজও মধুময় তারই মধুময় কাহিনীর পরিচয় পাবেন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। মথুরা মধুবন তালবন কুমুদবন বহুলাবন রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন পৈঠা গুলালকুণ্ড ও গাঠুলি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণলীলা-স্থল পরিক্রমা নিয়ে রচিত। ব্রজমণ্ডলের মানচিত্র, আলোকচিত্র ও বন-পরিক্রমার পথপঞ্জীসহ সুবৃহৎ গ্রন্থ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অভাবনীয় উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫·০০

বিপ্লব ইতিহাসের বহু অলিখিত কাহিনীর অন্যতম—নৌ-বিদ্রোহ, এতে অংশ গ্রহণকারী ও ব্রিটিশ-এর দমননীতির বীভৎস অত্যাচার সহ্যকারী

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

পূর্ব পুরুষ

১ম খণ্ড ৮·০০ ঃ ২য় খণ্ড ১২·০০

আকাশের আয়না ১০·০০

রাণী কাহিনী ৭·০০

কৃপানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভোর হল বিভাবরী ৮·০০

গোধূলির কুমকুম ৮·০০

রাই শোন আজ ৬·০০

নারায়ণ সান্যালের

তাজের স্বপ্ন ৮·০০

পাষণ্ড পণ্ডিত ৬·০০

অন্তলীনা ৮·০০

ফণিভূষণ আচার্যের

পঞ্চ কন্যা ১২·০০

হারে কলকাতা ৬·০০

মহুয়ার নেশা ২·৫০

সুবোধ ঘোষের

গল্প মাণঘর ১৪·০০

বন্ধু গোপাল ৬·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর

নয়া বসত ৬·০০

মুক্তি স্নান ৬·০০

যদি জানতেম ১০·০০

শ্রীহংস-এর

ফিমেল ওয়ার্ড ৭·০০

গাইনিক ওয়ার্ড ৮·০০

মায়া মৃগয়া ৭·০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের

যুগ স্বাক্ষর ১০·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২ ।। ফোন ঃ ৩৪-৪৩৫৬

শারদীয় অমৃত
১৩৮০

মহালয়ার আগেই প্রতি বছরের মতো বিশিষ্ট রচনা ও
চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

এবার উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীর রক্ষিত

একটি বিস্ময়কর ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তাছাড়া, প্রায় দু ডজন গল্প,
একটি পূর্ণদীর্ঘ শিকার কাহিনী,
এবং সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ এবং
নিবন্ধ, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, গৃহসজ্জা ইত্যাদি
বিষয়ে সুলিখিত সচিত্র রচনা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা তিন

১৩শ বর্ষ

অমৃত

১

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 24th August, 1973 শুক্রবার, ৭ ভাদ্র, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	চিঠিপত্র	
৭	সম্পাদকীয়	
৮	দেশেবিদেশে	—শ্রীপুণ্ডরীক
১১	সেই লোকটি	—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১২	আন্তর চিত্র	(কবিতা) —শ্রীমানস রায় চৌধুরী
১২	তিনি ছিলেন	(কবিতা) —শ্রীরামচন্দ্র প্রামাণিক
১২	আমার আত্মা তখন কাঁপছিল	(কবিতা) —শ্রীকৃষ্ণা সিংহ
১৩	সীমারেখা	(গল্প) —শ্রীশান্তি পাল
১৮	বাংলা কবিতায় স্বদেশপ্রেম	—শ্রীরাণা বসু

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রাত্রি নিশীথে ৭॥
সূর্য তপস্যা ১০

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ত্রিলোকনাথের পথে ৪
কুয়ারি গিরিপথে ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

পাও নাই পরিচয় ৪
বজ্রে বাজে বাঁশী ৪

আশাপূর্ণা দেবী

ঝিনুকে সেই তারা ৫
নীল পর্দা ৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশনি সংকেত ৫॥
অরণ্য মর্মর ৭॥

জরাসন্ধ

পরশমণি ৫॥
পসারিণী ৪

শঙ্কু মহারাজ

গঙ্গাসাগর ৯
গিরিকান্তার ৯

বিমল মিত্র

তিন ছয় নয় ৮
আমি ১০

প্রবোধকুমার সান্যাল

তিন কন্যার ঘর ৭॥
অগ্নিকন্যা ৪

জয়ন্তকুমার

ভাভিনেত্রী খুন ৪
নায়কার প্রতিহিংসা ৪

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন কলি—৯

বিদ্যোদয়ের বই

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯·০০

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ২০·০০

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের

ভারত মহিলা ৩·৮০

শ্রীমন্তকুমার জানার

রবীন্দ্র মনন ৮·০০

মোহিতলাল মজুমদারের

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০
সাহিত্য বিচার ৮·৫০
বাংলার নবযুগ ৮·০০

কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০

সাহিত্য বিতান [যন্ত্রস্থ]
বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬·০০

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু সাহিত্য ১০·০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বক্তব্য ৫·০০

গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর ১১·০০

নিখিল সেনের

এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০

ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০·০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮·০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সন্ধানে ১৩·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি. পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২০১ (১৪ লাইন)

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই চরিত

(৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড (১, ৩, ৪, ৫, ৬) ৩.০০
২য় " ৪.০০

কালাচাঁদ গীতা

৪র্থ সংস্করণ ৩.০০

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২.০০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২.০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩"০০

নরোত্তম চরিত

(হিন্দী) ২.০০

নয়শো রূপিয়া ও বাজারের লড়াই

(নাটক) ২.০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

(৮ম সংস্করণ) ১.৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE

De-luxe Ed. — Rs 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE

Popullar Ed — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :—

পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২১	বাংলার রেনেসাঁস		—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
২৮	নতুন বই		
২৯	ফেরারী ফিরে এল	(উপন্যাস)	—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
৩৫	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৪১	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪৩	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীজতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৫১	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫৫	কখনো রাত, কখনো দিন	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৫৮	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৬০	কথায় কথায়		—শ্রীতাবাপদ রায়
৬১	জলতরঙ্গ	(গল্প)	—শ্রীজীবন সরকার
৬৩	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৬	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬৭	বিবাহ বিচিত্রা		—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৬৯	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৭১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৮	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৮০	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

শেকস্‌পীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

তিন খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲
লাইনো টাইপে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই

শেকস্‌পীয়রের সম্পূর্ণ রচনাবলী সমগ্র সনেটসহ ও সমগ্র নাটকগুলি নাট্যরূপে আক্ষরিক বাংলায় খ্যাতনামা বিশিষ্ট অনুবাদকের নির্ভরযোগ্য বঙ্গানুবাদে প্রকাশিত হচ্ছে।

গিরিশচন্দ্র সমগ্র রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲
রেক্সিনে বাঁধাই ও ম্যাপলিথো কাগজ

ভূদেব সমগ্র রচনা | **হেমচন্দ্র রচনা**

প্রতি খণ্ড ১০৲
প্রত্যেকটি বই দুই খণ্ডে

বঙ্গদর্শন

৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ৯৲ [বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ]
স্মৃতি-বিজড়িত বঙ্গ সাহিত্যের জাতীয় দলিল।
সম্পাদনা : নিখিল সেন
প্রতিটি বই রেক্সিনে বাঁধাই ও ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

দামোদর সমগ্র রচনা । রাজনারায়ণ সমগ্র রচনা

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲ এক খণ্ড ১০৲ টাকা। রেক্সিনে বাঁধাই।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ৫৲ টাকা। গ্রাহক হবার ও মণিঅর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র : **জ্যোতি প্রকাশন**, ২এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলি—৯। অন্যান্য কেন্দ্র : রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২, ফোন : ৩৪-৮৩৫৬ ॥ **পূর্ণ প্রকাশন**, ৮এ, টেমার লেন, কলি—৯, ফোন : ৩৪-৯৫৯২। টাউন লাইব্রেরী, বনগাঁ।

চিঠিপত্র

'এই আমাদের দেশ'

'অমৃত'-এর ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ সংখ্যায় 'এই আমাদের দেশ, বর্ধমান-২'-এর লেখক কয়লাখনি শিল্পের প্রয়োজনে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই প্রসঙ্গে দিশেরগড় সাঁকতোড়িয়া হাসপাতাল, চোরা ও সিয়ারসোল হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, খনি অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক হাসপাতালটির কথা তাঁর রচনায় সম্পূর্ণরূপে অনুল্লেখ রয়ে গিয়েছে।

এ জাতীয় রচনায় (তা যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের অপূর্ণতা আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের লেখকের নিষ্ঠা সম্পর্কে সংশয়ী করে তোলে।

আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে রেখে এবং লেখকের সঙ্গে সহযোগিতার কর্তব্যবোধে এ-প্রসঙ্গে ঐ হাসপাতালটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লাখনি শ্রমিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক হাসপাতালটির নাম 'কেন্দ্রীয় হাসপাতাল', কাল্লা (আসানসোল)। এটি কয়লাখনি শ্রমিক কল্যাণ সংস্থার পরিচালনাধীন। এটি আসানসোল শহরের উত্তরে ৩ কিঃ মিঃ দূরে কাল্লা গ্রামের নিকট ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই হাসপাতালটির মোট শয্যা-সংখ্যা ৪৭০। (৩৫০টি সাধারণ ১০০টি যক্ষ্মা-রোগীদের জন্য ও ২০টি কয়লাখনির শ্রমিক নয় এমন রোগীদের জন্য)। এখানে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্যান্সার-সহ সব বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। এই সব যন্ত্রপাতির মধ্যে টেলিভিশন একস-রে যন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য (যা নাকি পশ্চিমবঙ্গের আর কোন হাসপাতালে নেই)। সুবিখ্যাত কয়েকজন বিশেষজ্ঞসহ চিকিৎসকের সংখ্যা ৫৫। এই হাসপাতালটির সঙ্গে সংযুক্ত একটি সিনিয়র নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারও আছে।

লেখক যে দুটি হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সিয়ারশোল (যক্ষ্মা হাসপাতাল, ৬০ শয্যাবিশিষ্ট) ও চোরা (৫০ শয্যাবিশিষ্ট) হাসপাতাল দুটি এই কেন্দ্রীয় হাসপাতালেরই সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক হাসপাতাল। তাছাড়াও কল্যাণেশ্বরীর নিকট সালানপুরে একটি আঞ্চলিক হাসপাতাল (৫০ শয্যাযুক্ত) ও গুরুতর আঘাতে শক্ত কাজে অক্ষম শ্রমিকদের জন্য চিত্তরঞ্জনের নিকট সিঠারাড়ীতে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দিলীপকুমার পাত্র,
কাল্লা, আসানসোল।

।। ২ ।।

পশ্চিম দিনাজপুর নিয়ে লেখা বেরিয়েছে ১৩ জুলাই, ১৯৭৩-এ। সেখানে বলা হয়েছে এই জেলায় রয়েছে ছয়টি কলেজ। অথচ বাস্তবে রয়েছে মাত্র পাঁচটি, অর্থাৎ ইসলামপুরে বর্তমানে কোনো কলেজই নেই।

অভিজিৎ গোস্বামী,
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।
মন্মথনাথ সাহা,
কিষাণগঞ্জ, পূর্ণিয়া।

তথ্যে উল্লাসকর

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০ ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে বৃহস্পতিবারের বারবেলা আলোচনায় (ঐ সংখ্যা পৃঃ ২৬৬) উল্লাসকর সম্বন্ধে যে কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে তা ভুল তথ্য বলে মনে হয়।

'বধূটি বন্ধুদের একান্ত পরিচিত স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের জ্যেষ্ঠা কন্যা' (ঐ সংখ্যা পৃঃ ২৬৭ লাইন—২৫)। অথচ জানি, বিপিনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম 'শোভনা', ঐ নামে বিপিনবাবু তাঁর প্রথম উপন্যাস শোভনা লেখেন। শোভনা, উল্লাসকরের মামা ডঃ মহেন্দ্রনাথ নন্দীর পুত্রবধূ। উল্লাসের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল শোভনার ছোট বোন লীলার। অবশ্য লীলা তখন বিধবা। উভয়েই (উল্লাস এবং লীলা) শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিলচরে।

বিনোদবিহারী ষাকুড়া,
মানিকপাড়া,
মেদিনীপুর।

বাংলা ছবির সংকট নিয়ে

গত ৭ই আষাঢ় অমৃত মেদিনীপুর থেকে শ্রীচন্দ্র গুপ্তের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে যেটা শ্রীনান্দীকারের মতের প্রতিবাদ হিসাবে লেখা। ঐ চিঠিতে যুক্তির বদলে আছে ভাবালুতার আতিশয্য। ১৮ই জ্যৈষ্ঠের অমৃতে প্রকাশিত শ্রীনান্দীকারের কথার সমর্থনে আমি বলতে চাই যে, তিনি বাংলা ছবির মূল সংকটের দিকে সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; আত্ম-সমালোচনা করেছেন, এমনকি সংকট মোচনের আভাসও দিয়েছেন।

আমি বলতে চাই যে, শ্রীনান্দীকারের বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। কলকাতার সিনেমা পটীতে ঘুরলেই যে কেউ এর সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। শ্রীগুপ্ত মশাইকে জানাতে চাই, আপনি না স্বীকার করলেও, আমি হাল-ফিলের বাংলা ছবির কথা ভেবেই বলছি, শতকরা নব্বুইটি বাংলা ছবির গুণগত ও শিল্পগত মান অতি নিম্নস্তরের। অভিনয় গান ফটোগ্রাফীতে কলাকৌশলের দিকে টালীগঞ্জ এখন অনেক অনেক পেছনে পড়ে গেছে। বোধহয় আত্মসন্তুষ্টি আর অহমিকাই এর কারণ। টালীগঞ্জ পরিবেশিত বাংলা ছবিতে যা-খুশী থাকলেই সেটা বাংলা ছবি বলেই দর্শকদের দেখতে বাধ্য করা হবে, সেটা আর যাই হোক শিল্প-স্বাধীনতা বলা চলে না। মনে রাখতে হবে, এ-যুগের মানুষ সিনেমা দেখে থাকে চিত্ত বিনোদনের জন্য। যদি দেখা যায় হাউসগুলোতে (এখনও যে কটাতে চলে থাকে) বাংলা ছবি দেখার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ছে, তখন আপনা হতেই বাংলা ছবি দেখানোর হাউসের সংখ্যা বাড়বে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, এখনকার বাঙালী দর্শকবৃন্দ বাংলা ছবিতে চিত্ত বিনোদন কিছুই পায় না এবং সেই কারণে যদি আজকের বাঙালী দর্শক আকর্ষণীয় নাচে গানে, অভিনয়, রঙে মনোহর দৃশ্যে ভরা হিন্দী ছবির দিকে ঝুঁকে পড়ে থাকে, তবে সেটা বাংলা ছবির দোষ, হিন্দী ছবির নয়।

বাংলা ছবিকে যে আগাগোড়া 'বোম্বাই-মার্কা' ছবি হতেই হবে এ-কথা শ্রীনান্দীকার একবারও বলেননি। ভালো অভিনয়, ভালো গান বা ভালো দৃশ্যের অভাব অনেক বাংলা ছবিতেই আছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছেন। টালীগঞ্জের শ্রী ফিরলে তবে সাহসী লোক পরীক্ষামূলক ছবি করবে। ওদিকে বোম্বাই এখন অনেক বেশী পরীক্ষামূলক ছবি করতে সাহসী হয়েছে, উৎসাহ এসেছে। শ্রীগুপ্তের আরেকটি কথা বুঝলাম না যে, কেন ছবির পরিচালক গল্প লেখকের কাছে বারে বারে পরামর্শ নেবেন ছবির বিষয়।

শেষ কথা এই যে, টালীগঞ্জকে তথা বাঙালীকে এই দিকে সফল ব্যবসায়ী হতে হবে। সংকট সংকট করে অশ্রুমোচন করলে চলবে না। উদাহরণ মাদ্রাজ। এককালে চিত্রে দরিদ্র মাদ্রাজ আজ বোম্বাই-এর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলছে, আর এত তার নিজের ভাষার ছবির মান বাড়িয়েছে বলেও শোনা যায়।

মানসকুমার শেঠ,
বেলুড়, হাওড়া।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY.

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতির সতর্কবাণী

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি এবারকার স্বাধীনতা দিবসের প্রাককালে জাতির উদ্দেশে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে দেশের বর্তমান সঙ্কটের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাধারণত, এই উৎসবে আশা ও উদ্দীপনার কথাই বেশী থাকে। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বাণী রাষ্ট্রপতি শুনিয়েছেন। কিন্তু নিছক আশাবাদে যে তা সম্ভব নয় সে কথাও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন। ছাব্বিশ বৎসর স্বাধীনতা লাভের পর অতিক্রান্ত হয়েছে। আজ এই উৎসবের দিনে রাষ্ট্রপতিকে বলতে হয়, প্রাক-স্বাধীনতা যুগের জাতীয় ঐক্য ও উদ্দীপনার মনোভাব ফিরিয়ে আনতে হবে। পরশাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য দেশের মানুষ যে মহান আত্মত্যাগ ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন আজ তার অভাবই বর্তমান জাতীয় সংকটের মূল। ভারতবর্ষ নিরলসভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমাদের এই দুরবস্থা কেন? সরকারের প্রয়াস বিশেষভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এক শ্রেণীর অতিলোভী, স্বার্থপর ও সমাজকল্যাণ বিরোধী ব্যবসায়ী, কালোবাজারী ও মজুতদারদের জন্য। নতুবা যে সম্পদ আমাদের আছে, যে খাদ্য আমরা উৎপাদন করি তার সমবণ্টনে দেশের মানুষ অন্তত দুবেলা দু মুঠো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। কারণ, অজন্মা ও খরা হলেও সারা দেশে খাদ্য ঘাটতি দশ শতাংশের বেশী নয়। কিন্তু খোলা বাজারের দিকে তাকালে মনে হবে এদেশে খাদ্যের ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিদারুণ অভাব। আকাশ ছোঁয়া দাম না দিলে তা সহজলভ্য নয়।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন, মজুতদার ও মুনাফাখোরদের দেশের ও সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রমজীবী ও মালিকদের কাছেও আবেদন করেছেন, এই চরম সংকটের দিনে তিন বৎসরের জন্য ধর্মঘট এবং লক-আউট বন্ধ করা হোক। গণতান্ত্রিক পথে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে উপনীত হবার সংকল্প ভারত গ্রহণ করেছে। জনসাধারণকে যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাকে যদি স্বেচ্ছাচার রূপে কেউ গ্রহণ করতে চায় তাহলে আমাদের গণতন্ত্রের বনিয়াদই যাবে ধ্বংস হয়ে। রাজনীতিকদের মধ্যেও আজ দেখা দিয়েছে শৃঙ্খলাবোধ ও সমাজ স্বার্থের প্রতি আনুগত্যের অভাব। নতুবা সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন রাজ্যে এমন অশোভনভাবে মন্ত্রিসভার পতন ও রদবদল হবে কেন? এই সমস্ত লক্ষ্য করে রাষ্ট্রপতি গভীর বেদনাবোধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই বেদনাবোধ সমস্ত গণতন্ত্রকামী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই। কিছু দিন আগে রাষ্ট্রপতি দেশে চরিত্রের সংকটের কথাও উল্লেখ করছিলেন। যাঁদের ওপর প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁদের যেমন আদর্শের প্রতি অবিচল আনুগত্য কাম্য তেমনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেও চাই শৃঙ্খলাবোধ, সততা ও সংকল্প দৃঢ়তা। তা না হলে এই বৃহৎ দেশের বহু রকমের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংকট আজ সুতীব্র। খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থান—এই তিনটি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফৎ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীর অতিরিক্ত লোভের জন্য। কিছু দিন আগে সংসদে এই শ্রেণীর মজুতদার, কালোবাজারী ও ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় নিন্দাবাদ করা হয়। ভেজালকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ডের দাবিও তোলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিও কঠোরতম শাস্তিদানের কথাই বলেছেন। প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ন্যায্যদরে পাবার অধিকারী। তাদের জন্য এই ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না অতিলোভীদের স্বেচ্ছাচারের জন্য। তার ফলে আজ দেশে দেখা দিয়েছে এক অসহনীয় সংকট, দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য এক দিকে চাই সরকারের তৎপরতা অন্য দিকে জনসাধারণের সহযোগিতা। সমাজ শত্রুদের জনসাধারণ ভালভাবেই চেনেন। জনসাধারণ যদি এই মজুতদারী ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন চালান তাহলে সরকারের কাজ অনেকটা সহজ হয়।

সম্প্রতি এই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এবং দেশের অন্যত্রও যুবশক্তির উদ্যোগে সমাজবিরোধী মুনাফাখোর ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে খানিকটা সুফল পাওয়া গেছে। তাদের এই অভিযানে ক্রেতাদেরও প্রতিরোধ আন্দোলন যুক্ত হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক সমতা আনবার জন্য সরকার সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য কখনই পৌঁছনো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক কঠোর অভিযান শুরু করেছেন। উচ্চপদস্থ আমলাদেরও জেলে পোরা হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে। প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অসৎ ব্যবসায়ীরা আজ দেশের এই দুর্দিন ও সাধারণ মানুষের দুর্দশা ডেকে এনেছে। প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার ভাষণে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছেন, এই দুর্দশা মোচনে সরকার বদ্ধপরিকর। কালোবাজারী, মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করবেন। বস্তুত, আজকের সংকট আমাদের স্বাধীনতার অর্জিত অধিকার ও গৌরবকে ম্লান করে দিচ্ছে। যে আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা মুষ্টিমেয় মানুষের লোভ ও দুর্নীতিকে আমরা নষ্ট হতে দিতে পারি না। সরকার এই সংকট সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তাঁদের সর্বাত্মক প্রতিকার ব্যবস্থায় দেশবাসীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা তাঁরা পাবেন।

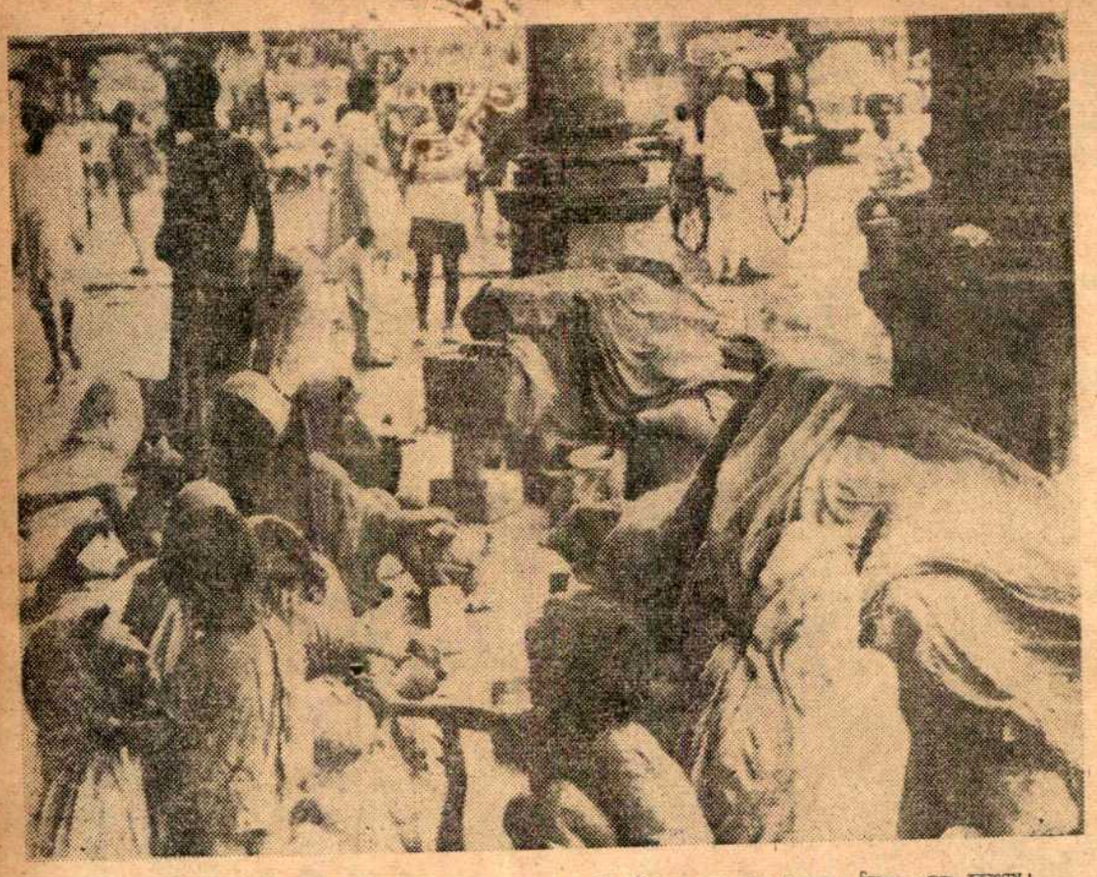

চরম খাদ্যসংকটে বিহারের মানুষ ছুটে এসেছে কলকাতায়। ফুটপাথ ওদের আশ্রয়স্থল। কিন্তু খাদ্য কোথায়!

দেশে বিদেশে

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ২৬ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন দিল্লীর লাল-কেল্লায় বক্তৃতা করছিলেন তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। ঐ বৃষ্টি শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দুটি প্রসঙ্গ তোলার সুযোগ এনে দিয়েছিল। প্রথমত, তিনি এই বাদলের সঙ্গে দেশের অর্থনীতির আকাশে, দুর্যোগের একটা তুলনা করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, ভাল বর্ষণ যে এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে, সেকথা তিনি তাঁর শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

দিল্লীর লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতা ছিল গত তিন মাসের মধ্যে তাঁর প্রথম জনসভা। গত মে মাসে উত্তরপ্রদেশে প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের অভ্যুত্থানের পর শ্রীমতী গান্ধী আর কোন জনসভায় বক্তৃতা করেন নি। যুগোশ্লাভিয়া আর কানাডা সফর শেষ করে ফিরে এসে তিনি দিল্লী থেকে বেরোন নি। এটা শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে অস্বাভাবিক ঘটনা। গত মে মাস পর্যন্ত তিনি প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে মানুষের সামনে তাঁর বক্তব্য রেখে-ছেন। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে তিনি সপ্তাহে অন্তত একবার যেতেনই। এমন কি সংসদের অধিবেশন চলার সময়ও এর অন্যথা হয় নি।

শ্রীমতী গান্ধী শুধু যে দিল্লীর বাইরে পা দেন নি অথবা জনসভায় বক্তৃতা করেন নি তা নয়, ইদানীং তিনি দলের সভা ও সংসদের অধিবেশন সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন না। কংগ্রেস পার্লা-মেন্টারী পার্টির একাধিক সভায় তিনি নিজে সভাপতিত্ব না করে দলের সহ-সভাপতি এ পি শর্মাকে সভাপতিত্ব করতে বলে নিজে শুধু সদস্যদের বক্তৃতা শুনে-ছেন। সংসদের অধিবেশনেও শ্রীমতী গান্ধী যেন আগের চেয়ে বেশী গরহাজির থাকছেন।

অর্থাৎ, মোটের উপর বলতে গেলে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী বছরের এই শেষ ভাগে এসে শ্রীমতী গান্ধী যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।

এটা কিসের লক্ষণ? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কি তবে অসুস্থ? এমন প্রশ্ন ওঠার কয়েকটি কারণ ছিল। শ্রীমতী গান্ধী যে তাঁর প্রস্তাবিত শ্রীনগর সফর বাতিল করে দিয়েছেন এবং এমন কি আলজিয়ার্সে আসন্ন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনেও

যাবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। এতে কোন কোন মহল শ্রীমতী গান্ধীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিরূপ রটনা করার সুযোগ পেয়ে যান। ইদানীং যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাঁদের কেউ কেউ তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভাল ধারণা নিয়ে ফেরেন নি। যেমন, 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকার সম্পাদক খুশবন্ত সিং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেছেন, শ্রীমতী গান্ধী বার বার হাঁচছেন ও লজেন্স জাতীয় ওষুধ মুখে দিচ্ছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে রটনা ইতিমধ্যে অনেক দূর গড়িয়েছিল। গুজরাট থেকে তাঁর পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে চিঠি দিয়েছিলেন। ঐ চিঠির জবাবে শ্রীমতী গান্ধী যা লিখেছিলেন সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ জবাবে শ্রীমতী গান্ধী খুব স্পষ্ট ভাষায় তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গের কথা অস্বীকার করেছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর এই নীরবতার দ্বিতীয় আর একটি ব্যাখ্যা শোনান হচ্ছে। সেটা হল এই যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজেই পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। দেশের মানুষকে তিনি এখন কি বলবেন সেটা বুঝে উঠছেন না। তিনি কতকটা বিমর্ষ ও হতাশাগ্রস্ত। তিনি যে পথ হাতড়াচ্ছেন তার একটি লক্ষণ হল এই যে, শেখ আবদুল্লা, শ্রীকামরাজ প্রভৃতি ভিন্নমতাবলম্বী জননায়কদের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করছেন।

শ্রীমতী গান্ধীর দ্বিধার আর একটি লক্ষণ হল এই যে, ডিণ্ডিগুল ও বাঁকা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তিনি আর কোন উপনির্বাচনের সম্মুখীন হতে চাইছেন না। অথচ, লোকসভার ১০টি ও বিধানসভাগুলির ২৭টি আসন শূন্য রয়েছে। কয়েকটি আসন বেশ কিছুকাল যাবৎই শূন্য রয়েছে।

অথচ, এইভাবে বিপদের মুখে সরে যাওয়া শ্রীমতী গান্ধীর স্বভাববিরুদ্ধ। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতেই তিনি ভালবাসেন। এই সাহস দেখিয়ে তিনি সাফল্যও অর্জন করেছেন। অনেকে তাঁকে দ্য গলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ দ্য গলের মত শ্রীমতী গান্ধীও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে অধঃপাতের পথ থেকে উদ্ধার করেছেন।

কেউ কেউ আশা করছিলেন যে, পাঁচ মাস পরে আবার জনসমক্ষে বেরিয়ে শ্রীমতী গান্ধী এবারকার স্বাধীনতা দিবসে নতুন কোন পথের দিশা দেখাবেন, নতুন আশার সঞ্চার করবেন। তাঁদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। শ্রীমতী গান্ধী দেশের বর্তমান দুরবস্থার কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, দেশের মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই দুঃখ-দুর্দশা সাময়িক এবং এই সব সাময়িক অসুবিধার জন্য মানুষকে হতাশায় ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে সেই জোর খুঁজে পাওয়া গেল না যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি নিজে এই সঙ্কটের শেষ দেখতে পেয়েছেন।

●

এবারকার এই স্বাধীনতা দিবসের পাঁচ দিন আগে রাষ্ট্রপতি বরাহগিরি বেঙ্কট গিরি তাঁর ৭৯ বছর বয়স পার করে আশীতে পা দিলেন। আগামী ২৪ আগস্ট তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে চার বছর কাটিয়ে বর্তমান কার্যকালের শেষ বছরে পা দেবেন।

কয়েকটি কারণে এবারকার স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি গিরির উপর পাদপ্রদীপের আলো এসে পড়েছিল।

গত ২৮ জুলাই লখনৌতে তিনি একটি বক্তৃতা দিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। সেখানে গান্ধী ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে একটি বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি লিখিত ভাষণের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে কয়েকটি কটু মন্তব্য করেছিলেন। দেশে যে মজুতদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি চলছে এবং তার সঙ্গে যে রাজনৈতিক দলগুলির যোগাযোগ রয়েছে, এতে তিনি তাঁর গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই অবস্থার প্রতিকার করার জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন উত্তরপ্রদেশে তাঁর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার ভয় দেখান। শ্রীমতী গান্ধী যে প্রার্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও বাঞ্ছিত ফল দেখাতে পারছেন না, সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

সাম্প্রতিককালে যে শারদীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হবে তা মাসিক পত্রিকা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবেই—

শেষ সংকেত

সুন্দর প্রচ্ছদ, আর দুর্লভ রহস্য, তান্ত্রিক, হত্যাকাণ্ড, ভৌতিক, গোয়েন্দা, অলৌকিক, রোমাঞ্চকর সায়েন্সফিকসন, ডিটেকটিভ সব মিলিয়ে প্রচুর রঙিন ছবির সঙ্গে

৩২ পৃষ্ঠার চমকপ্রদ বেতালের থেকেও দুর্ধর্ষ কমিকস। নামকরা সাহিত্যিকদের ৮টি ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের সম্পূর্ণ উপন্যাস—অনেক গল্প, অনেক পৃষ্ঠা, দাম ৬ টাকা, ১০ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

আপনার নিকটবর্তী স্টলে বলে রাখুন।

বি, এস পাবলিকেশনস। ১২৪।১এ, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

৩টি এম-১৬ রাইফেল এবং নিজের উলংগ ছেলেকে কাঁধে নিয়ে কম্বোডিয়ার এক সৈন্য নাম-পেন থেকে ২৯ মাইল দূরে তুল লিপ্-এর কাছাকাছি একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে এগিয়ে চলেছে।

রাষ্ট্রপতির এই সব বক্তব্যের মধ্যে কোন কোন বিরোধী সদস্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্ঘাত অথবা সাংবিধানিক সংকটের গন্ধ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের সেই চেষ্টা অবশ্য সফল হয় নি। শ্রীগিরির কোন সঙ্ঘাত বা সংকট ডেকে আনতে চাইছেন, এমন কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই আশী বছর বয়সে পড়ে শ্রীগিরি যে নতুন অধিকতর সক্রিয় কোন রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে চাইবেন, এমন কথা ভাবাই কঠিন।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শ্রীগিরির মত একজন মানুষ দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবেন অথবা শুধু সরকারী সিদ্ধান্তের উপর ঢেঁড়া সই দিয়েই খুশী হবেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক, শ্রমিক নেতা, রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল ইত্যাদি পদে শ্রীগিরি দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি যে প্রবীণ রাষ্ট্রনেতার দায়িত্ব পালন করতে কুণ্ঠিত নন, গত ২৮ জুলাই লখনৌতেই তিনি তার প্রথম নিদর্শন দেন নি। অনেকেই মনে করতে পারবেন যে, ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে শ্রীগিরি সংবাদপত্রগুলিতে প্রবন্ধ লিখে দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং এই সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ভগবতী কমিটি গঠন করে যে দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালনা হয়েছে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ স্থান যে এখন সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন, এগুলি রাষ্ট্রপতি গিরির পরামর্শেরই ফল।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি গিরি কিছুকাল আগে দেশে সমস্ত ধর্মঘট, লক-আউট ইত্যাদি আপাতত স্থগিত রেখে উৎপাদন চালু রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠনগুলি তাঁর এই প্রস্তাব মানতে রাজী হয় নি, তবে প্রস্তাবটি কোন মহলই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি, সবাই এটা নিয়ে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

শুধু প্রকাশ্যে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেই নয়, অন্যভাবেও রাষ্ট্রপতি গিরি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। যেমন, সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, বন্টন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব দিয়ে তিনি সরকারের কাছে একটি সাত পাতার নোট পাঠিয়েছেন।

অল্প সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি গিরি পর পর দিল্লীর একটি দৈনিক সংবাদপত্র ও একটি সাপ্তাহিক প্রতিনিধিকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। এটা একটা নতুন নজির। এর আগে আর কোন রাষ্ট্রপতি সংবাদপত্রের জন্য এমনভাবে বিশেষ সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

এই সব সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রপতি গিরি তাঁর মতামত স্পষ্টাস্পষ্টি প্রকাশ করেছেন। যেমন 'লিংক' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন আজ চরিত্রের সংকট এবং আমরা যা বলছি ও যা করছি তার মধ্যে পার্থক্য বাড়ছে। অসাধুতা ও দুর্নীতি বাড়ছে।'

চারদিকে যে হতাশা বোধ ও অভাব-অসুবিধা দেখা দিচ্ছে তার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'আমরা যদি জনসাধারণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করতে পারি ও কাজের অধিকার, পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারি শুধু তাহলেই আমরা এই হতাশা বোধ ও অভাব-অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারি।'

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এবার রাষ্ট্রপতি গিরি দেশবাসীর উদ্দেশে যে বাণী দিয়েছেন তাতে তিনি বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন ঃ—(১) মজুতদার, মুনাফাখোর ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সমাজের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে সরকার তাদের আইন অনুযায়ী কঠোরতম শাস্তি দিন। (২) শ্রমিক ও মালিকরা তিন বছরের জন্য ধর্মঘট ও লক-আউট স্থগিত রেখে উৎপাদন চালু রাখুন। (৩) নাগরিকরা ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শহরে ও গ্রামে ক্রেতা পরিষদ গঠন করুন।

১৭-৮-৭৩ —পুণ্ডরীক

সেই লোকটি

লেখাপড়ার পাট চুকে গেছে। কাজকর্ম নেই, একেবারে পূর্ণচন্দ্র বেকার, যে-কোনো একটা চাকরির জন্য একে ওকে ধরছি, ক্লাইভ স্ট্রীট—কলুটোলা করে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ পাড়ার এক দাদার সুপারিশে কয়েকদিনের জন্য সরকারী লোক-গণনার কাজ পেয়ে গেলাম।

ছোট্ট টিনের সুটকেশ আর দড়ি-বাঁধা বিছানা নিয়ে এক দুপুরে বি এন আর লাইন বেয়ে এসে নামলাম রূপনারায়ণ নদের একেবারে লাগোয়া স্টেশন মৈটেলটিতে। আমার হেড-কোয়ার্টার পানিত্রাস স্কুল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামতাবেরের বাড়ির লাগোয়া।

বিকশা নিয়ে ম্যাপকের পোলগোড়া অব্দি যেতে পারলাম। তারপর শুরু হল বর্ষার পিছল এঁটেল মাটির রাস্তা ধরে হাঁটা। আঙুল টিপে ডান-বাঁ বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আধ মাইল যেন দু-ক্রোশ পথ হয়ে গেল। পড়ো-পড়ো সন্ধ্যের সামান্য আগে এসে পৌঁছলাম পানিত্রাসে।

স্কুলের এক কোণের কুয়োয় হাত-পা ধুয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি, পায়ে গাম বুট, হাফ প্যান্ট পরে অতিকায় টর্চ হাতে দুজন যুবক বেরোনোর জন্য তৈরি। টেবিলের ওপর কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আমাকে দেখে বললেন—এতক্ষণে এলেন? নিন, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন। এই টিমের সঙ্গেই আপনাকে বেরোতে হবে।

খিদের পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে এক কাপ চা ও চারটি মিয়োনো বিস্কুট জোগাড় হল। শেষে পরিপূর্ণ এক গ্লাস জল গিলে চটপট জামা-কাপড় পালটে দুর্গা দুর্গা বলতে বলতে ঘোর সন্ধ্যে বেলা বেরোলাম আর-দুজনের সঙ্গে। একটু এগোতেই তাঁদের একজন বললে—চলুন, ঢাল বেয়ে যাই। বাঁয়ে আল গিয়েছে বরাবর। শুনেছি, সোজাসুজি বিরাটপুর যাওয়া যাবে।

জল-কাদায় পথ জনবিহীন। তিনজনের কারোরই পথ জানা নেই। টাল-মাটাল এগোতে এগোতে এক জায়গায় বাঁশের খুঁটিতে সার সার মাছের জাল ঝোলানো দেখে মনে হল জেলেপাড়া। আর একটু বাঁধে মেঘ ফেটে হঠাৎ দিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, চরের কোমরে সোঁ সোঁ ঘাঁই মারছে দামাল রূপনারায়ণ; জলের বুকে এখানে-ওখানে বেড়াজালে পেতে ইলিশ-বিজয়ে ছুটেছে সালতি-পিনিস-নৌকো—শহুরে ছেলে, দেখতে দেখতে আপনা থেকেই পা থেমে যাচ্ছিল। এক সহযাত্রী পাঁজরে কনুইয়ের গোত্তা মেরে বললে—শোভা দেখার অনেক সময় পাবেন, এখন চলুন।

জেলেপাড়া পেরিয়ে সন্ন্যাসির অন্ধকারের পেটের মধ্যে ঢুকে গেলাম। একটা সরু বাঁকের মুখে কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল জানি না, সে খনখনে গলায় বলে উঠল—কাথা যাব, গুনতির পার্টি নাকি? আমরা তিনজনই গলা বাড়িয়ে বললাম—হ্যাঁ। আমাদের একজন জিজ্ঞেস করল বিরামপুর কোথেকে শুরু? অন্ধকারের উত্তর—হাই, তাও জানো নি, বিরেমপুরেই তো এয়েছো!

ইদিক ওদিক তাকাতে দেখি, আলের বাঁ-হাতে বেশ খানিকটা দূরে একটা পোড়ো, ভাঙা ছাউনির মত কি দেখা যাচ্ছে। কেউ কি ওখানে থাকে? মনে তো হয় না। যা হোক, কি ভেবে টর্চটা সোজাসুজি খুব আমিই এগিয়ে গেলাম। বাকি দুজন একটু ইতস্তত করে আমাকে অনুসরণ করল। জলকাদা ভেঙে সামনাসামনি এসে একপাশে কাত হয়ে পড়া ঠ্যাকনা মতোন দরজার ওপার থেকে একটি পুরুষ-কণ্ঠ শুনতে পেলাম—এ্যাঁয়, চুপ! চুপ কর। উত্তরে একটি নারী-কণ্ঠ ঝিকিয়ে উঠল—কিসের চুপ? যেন মাথা কিনেছ আমার!

দরজায় দু-তিনবার টোকা দিলাম। ভেতর থেকে আওয়াজ নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফের করেকবার জোরে জোরে শব্দ তুললাম। এবারও উত্তর নেই। অধৈর্য হাতে বেশ একটু জোরে ঠেলা দিতেই হুড়-মুড় করে ঠ্যাকনাটা একেবারে এলিয়ে পড়ল। ভেতরে ঢুকলাম। দেখি, এককোণে একটা লম্ফ জ্বলছে। যত না আলো, ধোঁয়া ছাড়ছে তার চারগুণ বেশি। ভাল করে ঠাউরে দেখি, ঘরের এককোণে মার-খাওয়া জানোয়ারের মত দাঁড়িয়ে আছে একটি আধবুড়ো লোক। গায়ে কাপড়ের খুঁট জড়ানো। তার পায়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে আছে একটি ঘোমটা ঢাকা কিছু। তিনজনের টর্চ প্রায় পর পর জ্বলে উঠল। সামান্য দু-একটা হাঁড়ি-কুড়ি, কিছু শেঁড়া ত্যানা, দু-চারটে কাঠ-কুটো। একে যদি সংসার বলেন তো তাই।

লোকটা এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন এক্ষুনি ভিরমি যাবে। বললাম আমরা সেন-সাস থেকে আসছি। কি নাম গো তোমার? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লোকটা বলল—হুজুর, মাফ করুন, মাফ করে দিন এবারের মতো।

আমার এক সঙ্গী চটে উঠে জিজ্ঞেস করল—তোমার নাম বল, বাপের নাম, বয়েস?

—হুজুর গরীবের মা-বাপ, এবারের মত মাফ করুন— হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল গৃহস্বামী।

তাকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বললাম—তাড়াতাড়ি বল বাপু। আমাদের তো আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। তোমার কোনো অনিষ্ট করতে আসিনি আমরা।

এবার একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। সরু-মোটা-কান্না জড়ানো গলায় একটানা বলে যেতে লাগল—হুজুর, আপনারা সরকারী লোক হাতে মাথা নেবার মালিক এজ্ঞে। এবারটা মাফ করে দিন। ছমাসের ট্যাকসো দিতে পারিনি। খরা গেল, গায়ে খেতের কাজ-কমমো ছিল না, বাড়ি বাড়ি ঘুরে মজুরি পাইনি। একমাত্র ছেলে—পাঁচ দিনের কম্প-জ্বরে হুট করে নিকেশ হয়ে গেল। পশু তশিলদার সায়েব এসেছিল, আজ আপনারা। এবারটির মত মাফ করে দিন—আগামী মরশুমে সব পাওনা-গন্ডা মিটিয়ে দেব। জেলে দেবেন না হুজুর, বুড়িটার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। তিন কুড়ি বয়েস ডিঙোনো রোগী-ভোগী মানুষ, এধারা তরিয়ে দিন আমাকে।

লোকটা পাগল নাকি? অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমি থানা থেকে আসিনি, এসেছি সরকারের খাতায় তার নাম তুলতে। তার শুধু এক কথা আর অনর্গল কান্না—হুজুর, মাফ করুন এবারের মত। রাত হু-হু বেড়ে যাচ্ছে দেখে শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে তিনজনই বেরিয়ে এলাম। লোকটা ঐ অদ্ভুত সরল লোকটা জানল না, সরকারী খাতায় তার আর তার পরিবারের নাম উঠল না। বেঁচে থেকেও ওরা বেওয়ারিশ রয়ে গেল।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

আন্তর চিত্র॥

মানস রায়চৌধুরী

এত সহজেই তার ঘুম পায়
গাছের ছায়ায় কিংবা নদীউৎস মুখে
তার শরীরের রোমকূপ থেকে
খসে পড়ে অনবরতই শুকনো দিন
যে ঋতুই হোক ঝরে চৈত্রদিনের খিন্ন পাতা
মহানুভবতা নিয়ে তার মুহূর্তের দোলাচল
গৃহস্থকে সন্ন্যাসীর মন্ত্র বলে ঘুমের ভিতরে টলে পড়া
এই তার সহজ স্বভাব।

কিন্তু তাকে জাগানোর নৈসর্গিক পরিকল্পনায়
সমস্ত বিকেল জুড়ে মেঘ রৌদ্র লুকোচুরি খেলে
ঈথারে বিমর্ষ ঘুড়ি চমৎকার জাদুর নকলে
শূন্য থেকে শূন্যে গিয়ে অনিবার হয়
সেই ঘুম ভাঙে কি ভাঙে না ভেবে, আমার কীক্ষণ
জন্ম মৃত্যু বিবাহের পত্র রচনায় খোঁজে নির্ভুল ভাষার
বিশেষ্য ও বিশেষণ, ক্রিয়াপদ দ্যাখ ওই নদীতীরে
শান্ত শুয়ে আছে।

তিনি ছিলেন !!

রামচন্দ্র প্রামাণিক

এই মাত্র তিনি ছিলেন,
বাংলো জুড়ে
তাঁরই পায়ের চিহ্ন আঁকা,
পিছন দিকের জানলাগুলো
নিজেই খুলে হাট করেছেন,
শিশির ভেজা পায়ের চিহ্নে এই খানেতে তিনিই ছিলেন।

কিন্তু তাঁকে ডাকতে যেতে অমনি বুনোমুরগী ডাকে,
সাতহাজারী মেঘ সরে যায়
মুখ তুলে চায় ত্রিকূট পাহাড়
এবং গায়ে রৌদ্র মাখে দশ হাতে শাল-সেগুন বাগান,
উন্মি নদীর তীব বরাবব কাঠুরেদের কণ্ঠ ভাসে.

এইমাত্র তিনিই গেলেন বাংলো ছেড়ে. বন্য পথে।

আমার আত্মা তখন কাঁপছিল॥

কৃষ্ণা সিংহ

আমার আত্মা তখন কাঁপছিল—
এ কম্পন কোন শীৎকার নয়,
দু-জনের স্পর্শে প্রতিটি অঙ্গে
হৃদয় ছড়িয়ে পড়ার আচ্ছন্ন আবেশ নয়;
সত্তা আর সত্তার জ্বলজ্বলে চোখের তীর
তখন ফুঁকড়ে যাচ্ছিল—
যেমন করে ইহজগতের শেষ উৎসব
বিসর্জনের সুরে সুরে উত্থিত শিখায়
কাঁপতে কাঁপতে এক নাভির বিন্দুতে এসে মিশে যায়।
তুমি ভালোবাসার বিপরীত কারুকার্য
এঁকেছিলে সর্বাঙ্গে—
আমার আত্মা তখন কাঁপছিল।

—আমার ভয় করে, দারুণ ভয়। কথাটা অস্ফুটে বলেই ফেলল নীতা। বুকের মধ্যে জমানো হিমশীতল নিঃশ্বাসটাকে পড়ন্ত বেলার উষ্ণ হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল।

রূপেন সমস্ত সময় ওর দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিল বলেই ওর ক্ষীণ আত্মগত কণ্ঠও স্পষ্ট শুনতে পেল।

—তোমার বয়স কত? রূপেন সাজানো গাম্ভীর্যে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। যদিও রূপেনের চোখ কৌতুকে চিকচিক করছিল।

বয়স দিয়ে কি হয়! সুদাম সুচিন্তিত মন্তব্য করল, মনে মনে যে মেয়ে ছেলেমানুষ, সে বোধ হয় পঁচিশেও সাবালিকা হয় না।

—ইস, আমি ছেলেমানুষ? নীতার স্বর চঞ্চলকা হল। কাজলটানা চোখ ঘুরিয়ে সুদামকে শাসন করলো, আপনার থেকে খুব ছোট হব না বোধ হয়, খুব ভীতুও না।

সে সময় ওরা এক রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে পথে নামছিল। দেখল, শেষ বেলার আলোয় কখন বিকেলের কামরাঙা রং বিঁছিয়েছে। ঈষৎ গরম ভাব থাকলেও বাতাস বেশ বেগবান। এবং চলতি মানুষের গায়ে-পায়ে সন্ধ্যেবেলার পাখীর চঞ্চলতা।

সবুজ রুমালে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে রূপেন বলে উঠল,—উঃ, কি গরম রেস্তোরাঁর ভেতরটা।

—ভীষণ, নীতা সমর্থন জানাল, মনে হচ্ছিল যেন ফার্ণেসের ধারে বসে খাচ্ছি।

—কিন্তু ম্যাডাম, এই চৈত্রের দুপুরে আপনার খাওয়ার টেবিলে শীতল মলয় পবন বইবে, এটাও তো আশা করা অন্যায়! সুদাম মুখ চোখের ভঙ্গি করে বলে উঠল।

আর তাই দেখে হেসে ফেলল নীতা। সুদামের কথায় হৃদ্যভাবে সব সময়ই একটা লঘু চটুলতা খেলা করে, যেটা বুদ্ধির জৌলুষে মিশে একটা অসাধারণ চমৎকারিত্ব দাবী করতে পারে। আশ্চর্য, সুদামের সঙ্গে মাত্র আজ, এই ক' ঘণ্টার আলাপেই সেটা কেমন উপলব্ধি করে নিয়েছে নীতা। সুদামকে নীতার খুবই ভাল লেগেছে। অন্য কিছু নয়, কারণ নীতা জানে সুদামের সুন্দরী প্রেমিকা আছে এবং সে জন্যেই হয়ত সুদাম দেহে মনে এমন উচ্ছল, তাছাড়া, রূপেনের সঙ্গে নীতার ঘনিষ্ঠতাও এখন প্রতি মুহূর্তে গভীরতার দিকে অগ্রসরমান। আজ দুপুরে দুজনের নির্জন অভিসারে রূপেন যখন সুদামকে সঙ্গী করে এনে-ছিল, তখন কিছুটা বিরক্তই হয়েছিল নীতা, আর সেই অনিবার্য বিরক্তি দমন করতে নিজেকে গাম্ভীর্য ও কুণ্ঠার আড়ালে ঢেকে রেখেছিল। কিন্তু সামান্য সময়ের মধ্যেই সুদাম চারদিকে এমন একটা খুশীর পরি-মণ্ডল তৈরী করে নিয়েছিল যে, তখন দুপুরের রোদকেও অত প্রখর মনে হয়নি, তৃতীয় ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ভিড় ভাবা দূরে থাক, বরং দুজনের মাঝখানে মিষ্টি একটু ফুলের সৌরভ বলে বোধ হচ্ছিল।

সারা দুপুরের ঘোরাঘুরি নীতার সাজ-গোজের ওপর ক্লান্তির ছাপ ফেলেছে। নীতার চোখের টানা কাজল, সবুজ শাড়ীর

গোলাপী প্রলেপ, সবই যেন মরা আলোয় কেমন স্তিমিত, পাণ্ডুর হয়ে আসছিল। অন্তত নীতার মনে মনে ধারণা হচ্ছিল, তাই। অ্যানিটি ব্যাগে লুকোন ছোট্ট আয়নায় নিজেকে দেখে নিতে ইচ্ছে করছিল একটু, তবু দুই যুবক পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেটুকু আত্মসচেতনতা দেখাতে লজ্জাবোধ হল। শুধু হাতের ছোট রুমালটা দিয়ে নাকের দু পাশে কম্পিত ঘামের আর্দ্রতা মুছে নিল সযত্নে।

—কি ভাবছ, এত চুপচাপ? রুপেন চলতে চলতে প্রায় ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে প্রশ্ন করল।

—কি ভাবব, কিছু না। নীতা কপালের ওপর ঝুঁকে আসা চুল সরালো, তারপর এক মিনিট থেমে বলল, এবার ফিরবে তো?

—কেন, আর ভাল লাগছে না? রুপেনের গলা গাঢ় ও নিবিড় শোনাল।

—ধুৎ, তাই বলেছি! তবে—নীতা বাঁ-পাশে ঘুরে রুপেনের চোখে তাকাল। হয়ত অন্য কথা বলতে চেয়েছিল, তবু ওর উচ্চারণের সূত্র ধরে রুপেন বলে উঠল,

—তবে সেই ভয়টা এখনো মনের মধ্যে গুড়-গুড় করছে বুঝি? রুপেন ঈষৎ মমতার হাসি হাসল।

এবং সেই ভয়ের প্রসঙ্গে ফিরে এসে নীতার পাঁজরের ভেতর সত্যিই শিরশিরিয়ে উঠল। আশে-পাশে, পথের ওপর, বাসের জানালায়, ট্যাকসির কানাচে এবং মেট্রোর গাড়ীবারান্দার নীচে প্রায় সব মানুষগুলির মুখের ওপরই এক নিঃশ্বাসে চোখ বুলিয়ে আনল নীতা। বুকের গভীরে আটকে থাকা একটা শ্বাস সহজ করে কিছুতেই ফেলতে পারল না।

সুদাম তখন খুব মনোযোগ দিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত ছিল। দমকা হাওয়ায় দুবার নিভে গেছে ওর আগুন, এবার ধরিয়ে নিয়ে বলল :

—ওসব ভয়-টয় কিছু না, বুঝলেন। আজ-কালকার বয়স্ক ছেলেমেয়েরা প্রায়ই আগল ভেঙে এদিক ওদিক একটু ছিটকে যায়, সেকথা প্রত্যেক বাবা-মা জানেন, বোঝেন, সবই, আর নিজেদের অন্ধকার অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

—আমার বাবাকে আপনি চেনেন না, নীতা দৃঢ় গলায় বলল, বাবার কাছে কোন আপোষ নেই, নো কমপ্রোমাইজ। সংসারের প্রত্যেকের জন্য ওঁর নিয়ম বাঁধা। বাঁধা ছকের বাইরে গেলেই অগ্ন্যুৎপাত। আর রেগে গেলে বাবা যে কাকোর বিরুদ্ধে যে-কোন স্টেপ নিতে পারেন।

—ডিপ্লোম্যাটিক! সুদাম সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল।

—ঠিক তাই। ইদানীংকার কোন কলেজে পড়া মেয়ের মধ্যে এত ভীরুতা দেখা যায় না ওর মত, তাই না সুদাম? রুপেন নীতাকে ছাড়িয়ে সুদামের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দিল।

—একজ্যাক্টলি। সুদাম সায় দিল, আপনি সত্যি খুব বাধা মেনে। এবং এই বাধ্যতার জন্যেই আপনার মধ্যে যে একটা লাজুক ও নম্র ভাব ফোটে, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

সুদামের মুখে নিজের প্রশস্তি ভাল লাগল নীতার, তবু বাধা দিয়ে বলল :

—প্রত্যেক মেয়েই স্বভাবত নম্র আর লাজুক।

রুপেন এদের কথায় তত কান দিচ্ছিল না। নিজের কথার জের টেনেই বলে যাচ্ছিল সুদামকে :

—দ্যাখ, ওর সঙ্গে সাত মাস বাইশ দিন পরিচয়ের পর এই প্রথম ওকে এতক্ষণের জন্য রাস্তায় টেনে আনতে পারলাম। তাও সওয়া পাঁচটা পর্যন্ত সিনেমা হলের অন্ধকারে লুকিয়ে, এক ঘণ্টা রেস্তোরাঁর কোণে বসিয়ে এখনো খোলামেলা রাস্তা ভাল লাগছে না ওর, বাড়ী ফেরার জন্য ছটফট করছে। রুপেনের গলায় হতাশা ও ক্ষোভ থমথম করছিল।

নীতার খারাপ লাগছিল। রুপেনকে কখনো ও দুঃখ দিতে চায় না। রুপেনের ক্ষুব্ধ মুখখানাকে ও পৃথিবীর করুণতম ট্রাজেডি বলে মনে করে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা পেরিয়ে ওরা খোলা মাঠের ওপর চলে এসেছিল। নীতা অন্যমনস্ক ভাংগতে ঘাসের ওপর চোখ নামিয়ে চলছিল। সুদাম পরিবেশ হালকা করার জন্য বলল,

—যেখানে যত বড়-বড়াই থাক, এ যাবৎ বহু মেয়েই সব তুচ্ছ করে কলেজ পালিয়ে তাদের যুবক বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে এবং নিরাপদে বাড়ীতেও ফিরেছে। আসলে থাকা চাই ম্যানেজ করার ক্ষমতা, সে যে উপায়েই হোক। জানেন তো, রণে আর প্রণয়ে ঠিকমত মিথ্যে বলতে পারাটা একটা বড় আর্ট।

এতটা সময় ধরে এই তিনজনের সিনেমা দেখা, খাওয়া বা বেড়ানোর মধ্যে একটা শুধু বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব ভাব, আড়ালে যাই থাক, বজায় ছিল, এখন সুদামের এ ধরনের স্পষ্টোক্তিতে কানের দু-পাশ উষ্ণ হয়ে উঠল নীতার। কোন সদ্যোপরিচিত মিষ্টভাষী সদালাপী যুবকের মুখ থেকে এমনি খোলামেলা তথ্য সহৃদয় কথাবার্তা শুনলে বুকের গভীরে অতর্কিত গোপনে দারুণ আলোড়ন বয়ে যায়। নীতা ঢোঁক গিলল। স্বাভাবিক লজ্জা দমনের জন্য দূরমনস্ক হবার চেষ্টা করল। সুদামের কাছে অজানা কিছুই নেই। তার আর রুপেনের সম্পর্কের বিষয়ে সুদাম যথেষ্ট অবহিত। সম্পর্ক বলতে অবশ্য কিছু নেই এ পর্যন্ত। শুধু খানিকটা গাঢ়তর ভাললাগা, সামান্যক্ষণ পরস্পরের সঙ্গ ও কটি নিবিড় বাক্য বিনিময়ের অনির্বচনীয় তৃপ্তি। সে জানি, এতেই নীতার পাজরের সব শ্বাস তপ্ত হয়ে যায়। শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ অনেক পাওয়ার আনন্দে নেচে ওঠে। কিন্তু রুপেন তা মানতে রাজী নয়। তার দাবীর হাত আরো অনেক দূর প্রসারিত। তার স্বপ্ন অনেকখানি বাস্তবমুখীন। এবং সেই প্রসারিত হাতের সীমাবেখার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ চমকে ওঠে নীতা। বিরাট ভয়ের সমুদ্র ছলাৎ করে ওঠে বুকের অভ্যন্তরে, কারণ নীতা জানে সেই স্বপ্ন-কল্পনার দিগন্তরেখায় একটা বিশাল বলিষ্ঠ হাতের কালো ছায়া। হ্যাঁ, তখন সেটা কালো বলেই মনে হয়, সেই ছায়া সব সূর্যকে আড়াল করে নিজের দোর্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত কিছু মুহূর্তে মিথ্যে করে দিচ্ছে। এবং যেহেতু নীতা তার জন্মমুহূর্ত থেকেই ঐ বিশাল হাতের ছত্রছায়ায় শাসন-শৃঙ্খলিত, সে-কারণ নীতার কখনই সাহস হবে না সেই দুর্লঙ্ঘ্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার, সব নিগড় তুচ্ছ করে অকূলে পাড়ি দেওয়ার।

অতঃপর এই বিষাদময় পরিণতির কথা ভেবেই নীতা ইদানীং রুপেনের দিকে ভাল করে তাকাতেও ভয় পায়। যদিচ সে রুপেনের আহ্বানকে উপেক্ষা করে যাবার মত মনের জোর খুঁজে পায় না, তবু সেই একান্ত প্রিয় নির্জন মুহূর্তগুলিতে রুপেনের বলিষ্ঠ বাহুর উচ্ছ্বাসের সামনে অকস্মাৎ নিথর নির্বিকার পুতুলের মতন হয়ে যায়, আর অনিবার্যভাবেই ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় ক্রমশ ভারী হয় রুপেনের মন।

এইসব চিন্তার মধ্যখানে চারপাশের রূপসা আলোক ইতস্তত ছড়িয়ে। মানুষ-জন, দূরে দূরে সন্দোজ্বলা বিজ্ঞাপনের আলোয় চোখ ঝলসাচ্ছিল নীতা, এ সময় সুদাম বলে উঠল,—আপনাদের দুজনের প্রাইভেসীটা এবারে সত্যিই নির্জন হোক। আমাকে এইখানেই ইতি টানতে হচ্ছে।

সুদামের কথার ভঙ্গিই এমন, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হবে শুধু খানিকটা নির্মল হাওয়ার মাঝখানে টেনে আনে।

নীতা ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল, লাজুক স্বরে বলল :

—দুটুমিতে আপনি অদ্বিতীয়।

—কমপ্লিমেন্ট কিনা জানি না, তবে মন্তব্যটা মনে থাকবে।

সুদাম মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাল নীতাকে তারপর দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

—কেমন লাগল ওকে? রুপেন ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে শুধোল।

—ভালোই। বেশ জমাটি লোক।

—প্রথমে তো গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে, রাগে চোখমুখ লাল। ওকে দেখে ভেবেছিলে ডিসটার্ব, তাই না? রুপেনের গলায় কৌতুক।

—হ্যাঁ, মোটেই না। নীতার স্বরে কুণ্ঠা।

—ভাবাটা অন্যায় না অবশ্য। রুপেন বলল, কিন্তু দেখলে তো কেমন অছিলা করে বারবার দূরে সরে যাচ্ছিল আমাদের একা রেখে।

—খুব হয়েছে, তোমার বন্ধু, আশ্চর্য একজন মানুষ, হল তো! নীতা কৃত্রিম ঈষার ঝাঁঝ ফোটাল, এবার আমাকে ফিরতে দেবে না কি?

—না, একদম ইচ্ছে করছে না, রুপেন আবিষ্ট, নিবিড় কণ্ঠস্বরে বলল, মনে হচ্ছে, এই মুহূর্ত থেকে তোমাকে ছেড়ে থাকার আর কোন অর্থ হয় না।

ঘাসের ওপর পড়ে থাকা নীতার আলতো আঙুলগুলো সবল মুঠোয় নিষ্পেষিত করল রূপেন। এক ধরনের তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীর থেকে শরীরে বয়ে গিয়ে নীতার স্নায়ুশিরা নিষ্পন্দ করে দিচ্ছিল। জীবনে প্রথম একটা নিষিদ্ধ আনন্দের স্বাদে বিহ্বল হচ্ছিল সে, তবু সেই সীমারেখার উদ্যত তর্জনীর দিকে মুখ করে ছিল নীতা। ভেতরের উদ্গত নিঃশ্বাস চাপতে গিয়ে ওর মুখ বিষাদখিন্ন হয়ে উঠল।

হঠাৎ রূপেন শব্দ করে উঠে বসল। বলল,

—দ্যাখো কাণ্ড, একালের বেকার এবং পড়ুয়া ছেলে হয়ে আমি কি সব যা-তা বকে যাচ্ছি পাগলের মতন। বাবার খেয়ে এবং ছাত্রের বাবার পয়সায় পড়াশোনা চালিয়েও যে সজ্ঞানে কোন মহিলাকে নিজের করে নেবার কথা ভাবছি, এটা একটা বেশ মজার ঘটনা তাই না নীতা? এক ধরনের বেয়াদপিও বলতে পার।

—ইস, কত দেরী করে দিলে বলত, নীতা হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে চারপাশের আবছা রঙের গাছপালা কালচে ছোপধরা ঘাসের রঙ ও ইতস্তত ফেরিওয়ালা দেখল, তারপর সটান দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—আমাকে এগিয়ে দেবে চল তাড়াতাড়ি।

অগ্ন্যুৎপাত হয়ত অপেক্ষা করছিল। অতর্কিত মায়ের চোখমুখে তারই ভয়ার্ত পূর্বাভাস। পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছিল নীতার। জুতো খুলতে অনেকখানি সময় লেগে গেল। এক চিলতে দালানের কোলে দুটি চৌকো ঘর বসানো ছোট্ট কমদামী ফ্ল্যাট। ও-পাশের ঘরে পর্দা ফেলা, ভেতর থেকে বাবার টুকরো স্বর আসছে। এ-পাশের ঘর উন্মুক্ত। ঠিক মাঝখানটিতে মা দাঁড়িয়ে নীতাকে দেখে কেমন নিথর, প্রস্তরবৎ হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে একটা ফ্রিজ, একটা হিম-শীতল কুঠার আছে নীতার, যার ভেতর সব চিন্তা-ভাবনার স্বাধীনতাকে বরফ-কঠিন করে রাখা হয়। মনে হচ্ছে ক' সেকেণ্ড সেই ফ্রিজটার দরজা হঠাৎ খুলে গিয়ে তার সমস্ত অস্তিত্বটাকেই শীতল নিঃসাড় করে ফেলছে। বাবার ফেরার পরে রীতা মাত্র কয়েক স্টপেজ দূরের কলেজ থেকে ফিরছে, এ দৃশ্য এ বাড়ীতে প্রথম। ওকে দরজার ফ্রেমে স্থানুবৎ দাঁড়াতে দেখে মা কাছে ছুটে এল।

—এত দেরী যে? মার স্বর চাপা, হাঁফিয়ে ওঠার মতন।

—তোমাকে বলে গিয়েছিলাম, আজ কনকদের বাড়ী যেতে পারি।

—তুই কনকদের বাড়ী গিয়েছিলি?

—হ্যাঁ—নীতা অস্ফুটে উচ্চারণ করল।

মা খানিকক্ষণ স্থির চোখে নীতার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটু যেন উষ্ণ স্বরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে গেল,

—একটু আগেই কনক এসেছিল, বলল: তুই আজকাল তাকে পাত্তা দিস না। আরও বলে গেল, তুই নাকি বেশ কিছুদিন ধরে কলেজের একটা চ্যাংড়া ফোরুড ছেলের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছিস। আর কথাগুলো বলল তোর বাবার সামনেই। ওঁর মাথায় তো আগুন জ্বলছে শুনে। উঃ, তোর কি সাহস নীতু? কনক নীতার স্কুলজীবনের বান্ধবী। বিশ্বাস-ঘাতক। হয়ত রূপেনের জন্য তার এত জিঘাংসা। কে জানে, কারো লুকোন মনের খবর তো ওপর থেকে পড়া যায় না। নীতা প্রথমেই অঙ্কে ভুল করেছে কনককে শিখণ্ডি হিসেবে দাঁড় করাতে গিয়ে। নীতার দেহ ভাবশূন্য বোধ হচ্ছিল, মন নিষ্ক্রিয়। তার জামাকাপড়ে এখনো ফুরফুরে বাতাস হাত পায়ে ঘাস মাটির গন্ধ তবু তার চার-দিক অসম্ভব বন্ধ মনে হল, যেন অদ্ভুত গুমোটে ভরে গেছে সব।

মা তখন খানিক ধাতস্থ হয়ে নীতার জন্য কাপে চা ঢালল। কেটলীতে চা এখনো গরম ঘরের মেঝেতে কিছু খাবারের বাক্স ও ঠোঙা। ও ঘরে নিশ্চয় কেউ এসেছে, বাবা তার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। নীতা এতক্ষণে নিজেকে ফিরে পেল। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলল

—কেউ এসেছে নাকি, মা? মনে হচ্ছে যেন।

—হ্যাঁ, বাইরে গাড়ী দেখলি না নীল রঙের? মায়ের গলা ক্রমশ উজ্জীবিত হচ্ছিল।

—গাড়ী? আমাদের এই একতলা ফ্ল্যাটে? কই, দেখলাম না তো? প্রায় দৃষ্টি ও বোধশূন্য অবস্থায় নীতা বাড়ী এসে পৌঁছেছিল, এখন ব্যাপারটা লক্ষ্য করার জন্য জানালার দিকে এগিয়ে গেল। পর্দাটা সরিয়ে দেখল একটা সাধারণ নীলচে রঙ গাড়ী। সদর থেকে সামান্য দূরে দাঁড় করানো।

—শশধরের গাড়ী। মা-ও ওর সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিল জানলার পাশে এখন গাড়ীটার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিল।

—শশধরবাবুর গাড়ীও আছে? চায়ে চুমুক দিয়ে বলল নীতা।

—দেখছি তো তাই। বলল তো ওর নিজের গাড়ী।

শশধরকে এর আগে একবার দেখেছিল নীতা বাবাকে বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। মাঝারি রঙ, সাধারণ চেহারা, ছোট ছোট চোখে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। সে সময় খানিকক্ষণ ওকে দাঁড় করিয়ে পরিবারের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল বাবা নীতার সঙ্গেও। দারুণ ভাল ছেলে শশধর চলে যেতে বাবা মন্তব্য করেছিল আজকালকার ফ্রডেদের মত নয়। হবে না কেন বড় বংশের ছেলে তো,আচার-ব্যবহারই আলাদা আমাকে তো ভীষণ খাতির করে। বাবার গলায় যথেষ্ট গর্বের সুর ছিল তখন। ছিল বটে তবে নীতার মনে হয়েছিল বাবা ঐ শশধরকে ওর বিগুণে বেশী খাতির করে থাকে।

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

১০৬।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা—৯

যে বই আজও পড়া হবে কালও পড়া হবে

প্রাথমিক

শিক্ষক-দর্পণ

প্রথম দু'সপ্তাহে

তিনটি মুদ্রণ নিঃশেষিত

চতুর্থ মুদ্রণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

খোঁজ নিন: স্যাণ্ডাইন পাবলিশার্স কনসার্ণ

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

যাই হোক, যে কোন কারণবশত শশধর নীতার বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর নিজের কাকার ফার্মে ক্যাশিয়ার করে দেবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং সে কারণে নীতাদের পরিবারের সবার মনে শশধরের জন্যে এক উচ্চাসন প্রতিষ্ঠিত।

সংগুপ্ত মনে অবশ্য নীতার একটা হাসির ফোয়ারা আছে। শশক—শশধর নামটার প্রসঙ্গ উঠলেই ওর শশক শব্দটা মনে পড়ে যায় ও তৎক্ষণাৎ সেই লুকোন হাসির ফোয়ারাটা অর্গলমুক্ত ছুটতে থাকে। তখন কোনরকমে ঘরের কোণে, বইয়ের পাতায় বা আয়নার গায়ে মুখ লুকোয় নীতা। জানতে দেয় না কাউকে। বাবার কানে গেলে নির্ঘাৎ দেবেখন একরাশ বকুনি। শশধর যে সরকার ইদানীং বাবার কাছে মরুভূমিতে জলাশয়, পরম সমাদরের বস্তু।

এহেন শশধরের আগমনে যে কিছু খাবারের ঠোঙা ছড়াছড়ি যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।

—খাবি কিছু? চপ আছে একটা। মা মমতার গলায় বলল।

—না, নীতা ঢোক গিলল, এই বিকেল-বেলা কলেজের ক্যান্টিনে একটা বন্ধু এমন খাইয়ে দিল না—

নীতা কথা শেষ করল না। মাকে স্থির চোখে মুখোমুখি তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে নিল,

—শশধরবাবু এলেন কখন?

—তা প্রায় ঘন্টা দেড়েক। তোর বাবার অফিসের সঙ্গে কিসব ওর লেনদেন হয় যে। তা সেই ছুটির পর একেবারে তোর বাবাকে গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে এল।

বলতে বলতে মার গলার ঈষৎ গর্বের ছোঁয়া লাগল। পাড়ার লোক দেখেছে, নীতার বাবা কমদামী ফ্ল্যাটের মানুষ হলেও খুব একটা নগণ্য হাড়াতে নয়। তারও দু-একটি অভিজাত আত্মীয় বন্ধু আছে।

—মা, শশধরদা এক গ্লাস ঠান্ডা জল চাইলেন। ছোট ভাই সিন্টু এসে উত্তেজিত গলায় ঘোষণা করল। ওর হাতে একটা ব্যাড-মিন্টনের র‍্যাকেট।

—এই, কোথায় পেলি এটা? নীতা ওর হাত ধরে প্রশ্ন করল।

—শশধরদা দিলেন। সিন্টুর লাজুক মুখে চোখে একটা রাজত্বলাভের উল্লাস, শশধরদার গাড়ীতেই ছিল এটা, উনিও মাঝে মধ্যে খেলেন, তা বললেন আমার গাড়ী থেকে বার করে আনতে। উচ্ছ্বাসের মাথায় সব বৃত্তান্তটা দিদিকে শোনাল সিন্টু।

—ভাল হয়েছে। নীতা উৎসাহ দিল ওকে।

—বেশ দামী র‍্যাকেটটা, নারে দিদি? সিন্টু চকচকে চোখে বলল।

—হ্যাঁ। নীতা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

—নিতু, তুই জলটা ওঘরে নিয়ে যা। [illegible]

—আমি, নীতা একটু ইতস্তত করল, তারপর শাড়ীটা গুছিয়ে নিয়ে বলল, আচ্ছা দাও।

পর্দা ঠেলে ঢুকেই শশধরের মুখোমুখি হল নীতা। হাতলওলা পুরনো চেয়ারে বেশ আয়েসে বসেছিল শশধর। সামনে ছোট টেবিলে শূন্য চায়ের কাপডিশ। ফুলকাটা প্লেটে কিছু ভুক্তাবশিষ্ট। বাবা ওর বাঁপাশে তক্তপোষের ওপর বসে আছেন। তাঁর গম্ভীর অবয়বে এখন একটা সাবলীল প্রসন্নতা ঠিকরে বেরোচ্ছে। পাশেই দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে মানস অর্থাৎ মিন্টু, নীতার দু বছরের বড় দাদা, যে গতবার বি-কম ফেল করে এই বয়সেই দুমড়ে গেছে আর ধুঁকে ধুঁকে এবারের জন্যে তৈরী হচ্ছে।

নীতা টেবিলে গ্লাসটা রাখতেই শশধর টান টান হয়ে বসল। যেন এই মুহূর্তটার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে ছিল। অন্তত তার মুখচোখ সেই কথাই জানাল। নীতা সামান্য কুণ্ঠার এক চিলতে শিষ্টাচারের হাসি হাসল।

—কি ব্যাপার, এতক্ষণ দেখছিলাম না যে? খুব সহজ অন্তরঙ্গতার সুরে বলল শশধর। যেন নীতার সঙ্গে তার অনেকদিনের আলাপ।

—কলেজে গিয়েছিলাম। ফস্‌ফুটে কথাটা উচ্চারণ করে ঢোক গিলল নীতা। চকিত দৃষ্টিতে বাবার তীক্ষ্ণ চোখ আর রুক্ষ চেহারার দিকে তাকাল। বাবাকে বিশ্বাস নেই। এতক্ষণ কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন, এবার হয়ত বাইরের লোকের সামনেই বকাবকি শুরু করে দেবেন।

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ সেদিনই তো শুনেছিলাম তুমি কলেজে পড়ো। শশধর যেন ভুলে যাবার জন্যে লজ্জিত। বলল, কোন ইয়ারে পড়ছ? সায়েন্স না আর্টস?

উঃ, কি অনায়াস দক্ষতায় তুমি বলে কথা বলছে শশধর। যেন বাবার কোন বয়স্ক বন্ধু দারুণ স্নেহ ও মমত্ববোধে গলা ভিজিয়ে সম্বোধন করছে নীতাকে। অথচ লোকটার বয়স এমন কিছু না। সাজসজ্জা যুবকদের মতোই। সেদিন প্যান্টশার্টে সামান্য স্থূলতার আভাস দেখা যাচ্ছিল চেহারায়, আজ ধুতি পাঞ্জাবীতে সেটুকুও অদৃশ্য। গ্লাস থেকে অল্প অল্প জল খাচ্ছে শশধর। প্রায় ঠোঁট ভেজাবার মত। পাকামি! মনে মনে উচ্চারণ করল নীতা। চোখ তুলতে গিয়ে দেখল শৌখিন চশমার আড়াল থেকে ওর দিকে বকমকে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শশধর।

—এবারে পার্ট ওয়ান দেব, আর্টস। নীতা নিজেকে সহজ করে নিল।

—ওঃ, তাহলে তো পরীক্ষা এসেই গেছে, শশধর উচ্ছ্বসিত গলা করল, আমার এক মামাতো বোনও দেবে এবার, তাই জানতাম।

নীতাকে হাসতে হল, সৌজন্যের হাসি। নীতার মাথা নীচু করা।

—বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন, স্নিগ্ধ স্বরে বলল শশধর, পাশের চেয়ারের দিকে উদার আঙুল দেখিয়ে দিল।

এবং ওকে বসতে বলেই শশধর ফিরে তাকাল নীতার বাবার দিকে, উন্মুখ গলায় বলল,

—আপনি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, কাকাবাবু?

নীতা আর একবার চমকালো। আগে ওর বাবাকে তো ক্ষিতীশবাবু বলেই ডাকত শশধর।

—ওই মিন্টু, মানে মানসের ব্যাপারেই বলছিলাম—বাবার কণ্ঠস্বর বেশ নম্র, একটু যেন অপরিচিত ধরনের। তার অমন রাগী রাশভারী বাবার গলায় এ ধরনের প্রার্থীর দীনতা দেখে নীতার ভাল লাগছিল না। আসলে বাবার অবসর নেবার দিন অদূরাগত, তার ওপর উপযুক্ত ছেলে মানস এখনো বেকার, এসব কারণে ইদানীং ওপর শরীর মনের ওপর দিয়ে যে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে সেটা নীতার অজানা নয়।

—ওঃ, মানসবাবুর ব্যাপারটায় আপনি অত চিন্তা করছেন কেন? শশধর ডুবন্ত মানুষের উদ্ধারকর্তার মত মহান গলা করল, ওঁকে আগে ধীরেসুস্থে পরীক্ষাটা দিতে দিন, তারপর আমি তো পেছনে আছিই। বলুন দাদা, ঠিক বলছি না? শশধর উৎসাহ নিয়ে মানসের দিকে তাকাল।

ঈষৎ কুণ্ঠিত, খুশীর হাসি মানসের মুখে ছড়ালো। ওর ফর্সা, দীর্ঘ চেহারাটা কুঁকড়ে গেল আরো খানিক। একজন কৃতী, প্রতিষ্ঠিত, অথচ সমবয়সী যুবকের সামনে যেমন হয় অকৃতকার্য ছেলেদের।

—কোন প্রাইভেট ফার্ম-টার্মে ও যদি হয়, তাও ভাল। নীতার বাবা পুরনো কথার জের টানলেন। তাঁর গলায় অস্থৈর্য।

—না না, ওসব দিকে না যাওয়াই ভাল, শশধর প্রবল প্রতিবাদ জানাল। এই তো দেখছি আমার কাকার অফিস, না আছে প্রসপেক্ট, না সিকিউরিটি। ওঁর বয়স আছে যখন, উনি গভর্নমেন্ট সার্ভিসেরই চেষ্টা করে দেখুন, আমার যথাসাধ্য আমি হেলপ্ করব। আমার তো কম জানাশোনা নেই। কি জানি সৌভাগ্য কিনা, আমার অনুরোধ বড় একটা কেউ তাচ্ছিল্য করে না। প্রসন্ন বরাভয় দিল যেন শশধর।

কে জানে, হয়ত সত্যি। বাবার মুখে শুনেছে নীতা, বড় বড় মহলে শশধরের বেশ খাতির। ওর এই বুদ্ধিমান ও চটপটে স্বভাবের জন্যেই হয়ত, নীতা ভাবল, এমন অল্প বয়সেই কেবিয়ার গুছিয়ে নিয়েছে।

এরকম আরো কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছিল ওদের মধ্যে। নীতা তার মাঝখানে বসেছিল চুপচাপ। বুকের সেই গুড়গুড়ানি ভাবটা কেটে গিয়ে এখন বেশ সহজ, খোলা-মেলা লাগছে নিজেকে। অন্তত শশধর আসার ফলে আজকে পরিস্থিতি যে প্রভূত পরিমাণে হালকা হয়ে গেছে, সেটা নীতা স্বীকার করতে বাধ্য। নাহলে বাবা নিজের কানে কনকের মুখ থেকে নীতার সম্বন্ধে সবকিছু শোনার পর ঘটনা কি যে ঘটতে পারত, তা ভেবে এখনো নীতার মনের

ভেতরটা শিউরে উঠছে। হয়তো বাবা ভোলেননি কিছুই, মনের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে সব, তবু চরম মুহূর্তটি সরে গেলে অপব্যুৎপাত অনেক সহনীয় হয়ে ওঠে বৈকি।

সে কারণে মনে মনে অনিবার্যভাবেই কিছু প্রসন্নতা ছড়াচ্ছিল নীতার, এ সময় হঠাৎ কথা থামিয়ে ঘড়ি দেখল শশধর, হাই তুলে শরীরের আলস্য ছাড়িয়ে বলল,—এবার উঠি কাকাবাবু, অনেকক্ষণ কাটান গেল আপনার বাড়ীতে, বেশ ভাল লাগল।

—সে তো আমার সৌভাগ্য। বাবা বিনয় করলেন।

—বাঃ, সৌভাগ্য তো আমারই। এতক্ষণ ধরে কাকীমার এত যত্ন আদর পেলাম। তার ওপর আপনাদের সুন্দর ব্যবহার। আপনাদের বাড়ীতে এলে দারুণ লাগে, কিছু বলছ না যে তুমি নীতা?

নীতা লজ্জিত মুখ নামাল, কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

তাই দেখে শশধর অন্য প্রসঙ্গ আনল,

—তোমার পরীক্ষা এসে গেছে, এতক্ষণ এখানে বসে থেকে পড়াশোনার ক্ষতি হল না তো?

—না না, নীতা চোখ তুলল, এখনো তত বেশী পড়ছি না।

—সেকি, আমার মামাতো বোন চন্দ্রা তো রাতদিন পড়ছে। ও ভীষণ ভীতু, কিন্তু ইংলিশে দারুণ স্ট্রং।

—তাই নাকি? নীতা সৌজন্যে হাসল।

—আলাপ করিয়ে দেব তোমার সঙ্গে, দেখবে, ভীষণ আলাপী মেয়ে। খুব হাসি-খুশী আর আমুদে।

—বেশ তো আলাপ করব একদিন।

—আজই করতে পার, শশধর খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, তোমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয়। তাছাড়া আমার গাড়ী তো রয়েছেই, যাবে?

নীতা হঠাৎ ফাঁপরে পড়ে গেল। অপ্রস্তুত গলায় বলল,—আজ থাক, অন্যদিন নাহয় যাব।

শশধর একটু থমকে গেল। কিছু সময় ভেবে নিয়ে বলল,—দু-একদিনের মধ্যেই আমি বাইরে চলে যাচ্ছি, ফিরতে হয়ত মাস-খানেক লেগে যাবে, খুব জরুরী কাজ কিনা। এর মধ্যে চন্দ্রার সঙ্গে পরিচয় করে রাখলে পরীক্ষার সময় অনেক হেলপ্ পাবে। ও একটা ভাল কোচিং-এ পড়ে, অনেক ইম-পর্টান্ট সাজেশন পায়। তোমার পক্ষেই তো ভাল, কি বলুন কাকাবাবু? সমর্থনের জন্য এবার শশধর সোজাসুজি ক্ষিতীশবাবুর মুখের দিকে তাকাল।

তাকাল নীতাও। ও জানে, বাবা কখনই এ ধরনের প্রস্তাব মেনে নেবেন না। ও খুব নিশ্চিন্ত থেকেও হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখল, বাবা আজ যেন সমস্ত বিবেচনা ও রক্ষণ-শীলতার থেকে দূরে সরে এসেছেন। খুব মৃদু আমতা আমতা গলায় বাবা উত্তর দিলেন,

—তা যাক না, যদি কিছু সুবিধে হয়; তোমার বোনের সঙ্গে আলাপ করতে যাবে, তাতে আর আপত্তি কি?

নীতার কিরকম গোলমাল লাগছিল। ও জানে পর্দার আড়ালে মা দাঁড়িয়ে আছে। মা বাবার ওপর কখনই কথা বলবে না।

—তাই তো বলছিলাম, শশধর সোৎসাহে বলল, যেতে আসতে হয়ত ঘন্টা দেড়েক লাগবে মাত্র। আজ বাড়ীটা চিনে নেবে, এরপর তুমি যাবে, চন্দ্রাও আসবে। কিছু অসুবিধে নেই, এই কাছেই তো।

নীতা অসহায়ের মত ঠোঁট কামড়াল একবার। ঘরের প্রতিটি চোখ এখন তার দিকে। সামান্য ইতস্তত করে উঠে দাঁড়িয়ে বিব্রত গলায় বলল, —আমি একটু আসছি।

—না না, ড্রেস-ফ্রেস আর বদলাতে হবে না, এই বেশ সুন্দর আছে, এভাবেই চল। বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল শশধরও, ওর আর দেরী সইল না। দু চোখ দিয়ে নীতার সর্বাংগ একবার জরিপ করে নিল।

আশ্চর্য, বাবার সামনেই! এবং তথাপি বাবা নির্লিপ্ত!

কি রকম ঘোরের মতন ঘর থেকে বেরিয়ে এল নীতা, মাকে পাশ কাটিয়ে। ওর পেছনে সবাই এসে দাঁড়াল। সকলেই যেন ওকে এগিয়ে দেবার জন্যে শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়েছে। ধারে কাছে সিন্টুটাকেও দেখা যাচ্ছে না এখন, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত তবু। ও নিশ্চয় এক্ষুনি বন্ধুদের কাছে র‍্যাকেটটা দেখাবার জন্যে ছুটেছে।

—আমি এগোচ্ছি, তুমি এস। যেন আদেশের সুরে ওর উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলে সদরের দিকে এগোল শশধর। পেছন থেকে ওর চেহারা, চলার ভঙ্গি দেখে কেমন বিরক্তি ও অরুচিকর লাগল নীতার। মা বাবা দাদার ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল মন। এই তবে রক্ষণশীলতা! রুপেন বা সুদামের সঙ্গে কলেজ পালিয়ে ঘোরাটা যদি অন্যায় হয় তবে ভর সন্ধ্যেবেলা শশধরের গাড়ী চেপে বেড়ানোও পাপ! কারণ শশধরের দৃষ্টির আড়ালে চিকচিকে লোভের আগুনটা ঠিকই দেখতে পেয়েছে নীতা। ওর সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার আড়ালে যে একটা জাল বিছানোর আয়োজন, সেটা নীতাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

—কিরে, দাঁড়িয়ে রইলি যে এখনো? বাবার অবয়ব ও স্বরে সেই পুরানো গম্ভীর মেঘমন্দ্র ভাব ফিরে আসছিল।

নীতার হঠাৎ কি হল, সারাদিনের ঘোরা-ঘুরি, উদ্বেগ, উত্তেজনা ও এই বিরক্তি সব মিলে মাথায় তালগোল পাকালো, বেশ দৃঢ় গলায় ও বলে উঠল,

—না, এখন আমি যাব না, আমার ইচ্ছে নেই।

—নীতা—দাঁতের ফাঁকে চীৎকারটা রোধ করলেন বাবা। এই মুহূর্তে অবাধ্যতার বিরুদ্ধে কোন হাতিয়ার খুঁজে পেলেন না।

আর, নীতার জীবনে এই প্রথম, নীতা একদৃষ্টে চেয়ে রইল বাবার ভীষণ রাগী চোখের দিকে। নীতা জানে, কদিন আগে ভেঙে পড়া দেশের বাড়ী সারাবার জন্য বাবা বেশ কিছু ঋণ করেছেন শশধরের কাছে, কে জানে কবে শোধ হবে তা। সেই কৃতজ্ঞতা আর সম্পর্কের নিরাপত্তাটুকু রক্ষা করবার দায়িত্ব এখন বুঝি নীতাকেই পালন করতে হবে।

বাইরে গাড়ীর হর্ন বাজছে। ভেতরে কটি প্রাণী যেন মূক, বধির। নীতার মনে এত-দিনের মূল্যবোধ এখন আস্তে আস্তে চোরা-বালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। ভয়, শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসন থেকে এই মুহূর্তে বিচ্যুত হচ্ছেন বাবা। নীতার চারদিক ঘিরে বিশাল শূন্যতা। বাবার চোখে চোখ রেখে ওর পা দুটো ক্রমশ স্থবির হয়ে এল।

তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ১৫-০০

সুবোধ ঘোষের গল্পসংগ্রহ

দেবেশ রায়ের উপন্যাস ৭, অসীম রায়ের উপন্যাস ৭,

যযাতি অসংলগ্ন কাব্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

মন্বন্তর ৮, তামস তপস্যা ৭,

বারীন্দ্রনাথ দাশের উপন্যাস

দেবী চন্দ্রগুপ্ত ৮, সেদিন কৌশাম্বী ৭,

প্রাইমা পাবলিকেশন্স, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

বাঙলা কবিতায় স্বদেশপ্রেম

রাণা বসু

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটা নিকট সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশী মনোভাব ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে একদা বাংলা সাহিত্য যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার ইতিহাস যেমন অনেক বড়ো, তেমনি বলিষ্ঠ এবং উজ্জ্বল। দেশবাসীর মনে শৃঙ্খলিতা দেশ-জননীর প্রতি মমত্ববোধ ও স্বদেশ-প্রেম জাগিয়ে তোলাই ছিল সমকালের কবি ও সাহিত্যিকদের রচনার বিষয়বস্তু। আমরা পরাধীন ভারতবর্ষের বহু বাঙালি কবি-সাহিত্যিক নাট্যকার ও প্রবন্ধ রচয়িতার রচনার মধ্যে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে জাগ্রত করে তোলার মহৎ আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একটা ছোট প্রবন্ধে তার সব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা সম্ভব নয় এ-কথা অকপটে স্বীকার করে আমি কয়েকজন মাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় কবিকে নিয়েই অতি সংক্ষেপে আলোচনার সূত্রপাত করছি।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে (১৮১২—১৮৫৯) দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনার গুরুরূপে বিবেচনা করা হয়। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ তৎকালীন চিন্তানায়কেরা স্বদেশ-চেতনায় নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস মুখ্যত চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত সেই স্বদেশচেতনাবোধকে চিন্তার জগৎ থেকে হৃদয়ের ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ থেকে কাব্যের ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করেন। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যে অনুরাগ তিনি সঞ্চার করেছিলেন, দেশের যে অতীত গৌরবস্মৃতি জাগ্রত করেছিলেন এবং মাতৃভূমির দুর্দশার যে বেদনাবোধে দেশবাসীর হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছিলেন, সে-ধারাই পরবর্তীকালে গভীর ও বিশাল আকার ধারণ করে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হতে থাকে। বহু দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই, একটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকেই আমরা গুপ্ত কবির স্বদেশচেতনার পরিচয় লাভ করতে পারি।

প্রকৃতির পূজা ধর পুলকে প্রণাম কর
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে
বিশেষত নিজদেশে প্রীতি রাখ সবিশেষে
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে।
ইন্দ্রের অমরাবতী ভোগেতে না হয় মতি
স্বর্গভোগ উপসর্গ যার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম
শিবধাম স্বদেশ তোমার।।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) স্বদেশ বলতে কখনো ভারতবর্ষ কখনো তৎকালীন বঙ্গদেশকে বুঝেছেন। মধুসূদনের কাব্যে পরাধীনতার যন্ত্রণা অথবা গ্লানির কথা না থাকলেও তিনি যে মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন তার প্রমাণ তাঁর রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। এই কবিতাগুলোর মধ্যে (যেমন ঃ পরিচয়, ভারত-ভূমি, বঙ্গভূমির প্রতি প্রভৃতি) দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, পৌরাণিক মাহাত্ম্য, ঐতিহাসিক গৌরব এবং সর্বোপরি ভারতীয় মহান কবিদের প্রতি শ্রীমধুসূদন যে সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন তা অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ-জনিত। তাঁর স্বদেশপ্রীতির অনেক উজ্জ্বল পংক্তির মধ্যে যেমন ঃ

অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রঢ়ে বঙ্গে,
নিরবধি প্রাণে নাহি সয়।

কিংবা

জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত রতনে!

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭) যদিও মাইকেল মধুসূদন দত্তের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন, তবু বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তিনিই আগে এসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার মধ্যে যে দেশ প্রেম প্রকাশিত তা শান্ত, কিন্তু রঙ্গলালের কবিতায় আমরা যে দেশাত্মবোধের পরিচয় পাই, তাতে প্রকাশ পেয়েছে প্রচন্ড ক্ষোভ ও উদ্দীপনা। রঙ্গলালের স্বদেশ-প্রীতির একটি স্বাক্ষর তাঁরই রচিত 'বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'। এই প্রবন্ধে রঙ্গলাল কেবলমাত্র গভীর সাহিত্য-বোধের পরিচয় দেননি, মাতৃভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের প্রতি অসাধারণ প্রীতিরও পরিচয় দিয়েছেন।

রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কবিতাটির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আদ্যন্ত দেশাত্মবোধের উদ্দীপনায় পূর্ণ। বহু কণ্ঠে উচ্চারিত 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে/ কে বাঁচিতে চায়?' এই কাব্যের অন্তর্গত। কাব্যটির সূচনায় দেখা যায়, এক ভ্রমণকারী দেশ-পর্যটন করতে করতে রাজপুতানায় এসে চিতোরের হৃত গৌরবের নানান চিহ্ন দেখে

মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন।
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন।।
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি বিধায়িনী।।
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী।।

আলাউদ্দীনের চিতোর দখলের পর কবি বিলাপ করে লিখছেন ঃ

বিপদ-বারণ হেতু শৈলোপরি যেন কেতু
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত-দেশে স্বাধীনতা-সুখ শেষে
ছিল মাত্র রাজপুতানায়।।
কি হইল হায় হায়, সে নক্ষত্র লুপ্তকায়
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।

'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর দেশাত্মবোধ রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্যের মধ্যেও অল্প-বিস্তর প্রবাহিত এবং কবির মঙ্গল প্রেরণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'কর্মদেবী'-র মধ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে কবির পরাধীনতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

ঐতিহাসিক কাব্যের যে-আদর্শ এবং স্বদেশপ্রেমের যে-প্রেরণা রঙ্গলালের রচনায় প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু কাব্য'-এ ও নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'-এ। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে রঙ্গলালের কবিতা যে প্রাথমিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, ঐতিহাসিক বিচারে এ-সত্য স্বীকৃত।

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৯০৩) 'ভারত সঙ্গীত' দেশাত্মবোধ উদ্বোধনের অমর সঙ্গীত। 'ভারত সঙ্গীত'-এ হেমচন্দ্র ভারতের অতীত গৌরববোধে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, বীর্যহীন ভারতবর্ষের অধঃপতনে যে সুগভীর আক্ষেপ ব্যক্ত করেছিলেন, হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে যে উৎসাহ বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন, তার আবেদন শুধু সমকালে নয়, যে-কোনো কালসঞ্চারী।

এখন সেদিন নয় হক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার
এ সব দৈত্য নহে তেমন।
অস্ত্র পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গরসে হওরে উন্মদ
তবে সে বাঁচিবে ঘুচিবে বিপদ
জগতে যদ্যপি বাঁচিতে চাও।

শুধু 'ভারত সঙ্গীত'-এ নয়, হেমচন্দ্রের যে-কোনো রচনায় দেশপ্রেমের সুরই মূল সুর। 'বীরবাহু কাব্য' থেকে শুরু করে 'কবিতাবলী' 'বৃত্রসংহার' 'বিবিধ কবিতা' 'আশা কানন'—এমনকি 'ছায়াময়ী' ও 'দশ মহাবিদ্যা'-য় দেশপ্রেমের সুরই বিভিন্ন রাগিণীতে ঝংকৃত। দেশপ্রেমের অবেদন নিয়েই হেমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ, দেশপ্রেমিকরূপেই তাঁর প্রতিষ্ঠা।

স্ববশে স্বাধীন চিত্ত স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, স্বাধীন উল্লাস
সসর্প গৃহেতে বাস পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার।
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ কৈলাসে নাহি ভেদ
যেইখানে পরবশ, সেখানে খেদ।

'বৃত্রসংহার'-এ ব্যক্ত এ-খেদই কবি ও পরাধীনতার যন্ত্রণায় কাতর সকল ভারতবাসীর হৃদয়েরই বিলাপ ক্রন্দন।

বিপিনচন্দ্র পালের ভাষণ উদ্ধৃত করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে শেষ কথা বলা যায় : 'সুদিনে হেমচন্দ্রের বাণী প্রেরণা দেবে ভারতকে 'সর্বসুখসম্ভারূপে গঠন করতে, আর দুর্দিনে কবির আক্ষেপ ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?' জাতিকে জাগ্রত করবে মানের গৌরবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪) মূলত ঔপন্যাসিক হলেও তাঁর লেখা একটি গানের জন্যে এ-আলোচনায় তাঁকে অন্তর্ভুক্ত না করে পারছি না। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেশপ্রীতিকে মানব-জীবনের বৃহত্তর কর্মপরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশপ্রেম যে মানব-জীবনের অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটা, দেশ-প্রেম যে সাময়িক প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত নয়—এই কথাটা খুব স্পষ্টভাবে বঙ্কিম-চন্দ্র আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'বন্দে মাতরম্' গান ও বন্দে মাতরম্ এই দুই মহা অস্ত্র সমগ্র দেশের হৃদয়ভূমিতে যে শক্তি সঞ্চার করেছে তার তুলনা নেই। 'বন্দে মাতরম্' সংগীত আবেগপ্রধান, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমগ্র দেশবাসী, বিশেষত দেশের জন-গণ-মন অধিনায়কেরা 'বন্দে মাতরম্' গানের প্রেরণাশক্তিকে স্বীকার করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত ছিল দেশ-সন্তানদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি।

কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭—১৯০৯) স্বদেশপ্রেম গভীরতর হয়। তাঁর লেখা 'স্বায়ং চিন্তা' সেকালে অনেকেরই মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হত।

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম, আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়
আর্যবংশ কীর্তিচয়
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?

খণ্ড কবিতা 'অবকাশরঞ্জিনী'-র ছত্রে ছত্রে কবির পরাধীনতার সন্তাপ, স্বাধীন-তার জন্যে এক বাঁধভাঙা আকাঙ্ক্ষা প্রতিভাত হয়েছে। শুধু 'অবকাশ-রঞ্জিনী'-তে নয়, কবির সমগ্র রচনাবলীতে এক অনুভূতিপ্রবণ স্বদেশপ্রেমিকের পরা-ধীনতার অন্তর্দাহ আর স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনার নানান অভিব্যক্তি চিত্রায়িত হয়ে আছে। তাঁর কাব্য পড়তে পড়তে ধমনীর রক্ত উচ্ছলিত হয়, মুন্ময়ী জন্মভূমি চিন্ময়ীরূপে হয়ে আবির্ভূতা হন। 'অবকাশরঞ্জিনী'-র খণ্ড খণ্ড দেশাত্মক ভাবনাগুলো পরবর্তী 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যগ্রন্থে একটা সামগ্রিক রূপ লাভ করেছে। "পলাশীর যুদ্ধ'-এ বাঙালি সৈনিকের প্রতি মোহনলালের প্রতিবোধ আহ্বান অংশটি উদ্দীপনা ও আন্তরিক-তায় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক স্মরণীয় সংযোজন।

স্বাধীন ভারত, আমরা অনবরত যে জাতীয় সংহতির কথা বলছি, নবীনচন্দ্র বহু পূর্বে তার স্বপ্ন দেখেছিলেন। 'রৈবতক'-এর বহু পংক্তিতে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। যেমন একটি উদাহরণ :

শিখাব একত্ব মর্ম
এক জাতি, এক ধর্ম
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) শুধু কবি ছিলেন না, ভারতের উচ্চ সিংহাসনে বসে তিনি কেবল কল্পনার কাব্যজাল বুনে আপনার ইতিকর্তব্য শেষ করেননি, যুগধর্মকে স্বীকার করে দেশের সর্ববিধ কল্যাণকেও আপনার ভাবচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। দেশের যা-কিছু মহৎ, প্রাচীন ভারতের যা-কিছু গৌরবময় ঐতিহ্য, তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং স্বদেশের দীনতা-হীনতা-জড়তার প্রতি তাঁর রোষ কর্ষিত হয়েছিল। অথচ তাঁর স্বাদেশিকতা একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ থাকেনি—বিশ্বের সমস্ত জাতির সঙ্গে ঐক্য এবং প্রেমের বন্ধনে ভারতবর্ষ আপনার পূর্ণতা লাভ করুক—এই ছিল তাঁর সুগভীর প্রতীতি এবং আকাঙ্ক্ষা।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্র-নাথ চারণ কবির ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন। দেশবাসীর অন্তর মাতিয়ে তুলে-ছিলেন তিনি গানের মাধ্যমে। দেশ-মাতৃকাকে উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানিনে তোর ধনরতন
আছে কিনা রানীর মতন
(শুধু) জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।।

কিংবা

আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি...

এর পূর্বে ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' প্রসিদ্ধ গানটি রচনা করে নিজেই সেটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এই অধিবেশনেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি গাওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুর সংযোগ করে গানটি গেয়ে-ছিলেন।

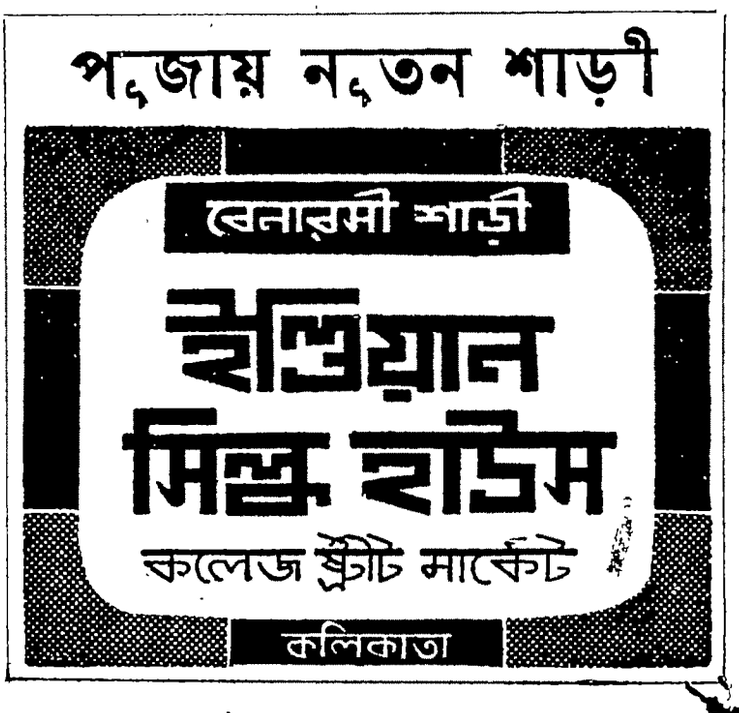

রবীন্দ্রনাথ বাল্যে হিন্দু মেলার স্বাদেশিকতার সঙ্গে, কৈশোরে অগ্রজদের প্রবর্তিত নানা স্বদেশী শিল্প-উদ্যোগের সঙ্গে, যৌবনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়াসের সঙ্গে, প্রৌঢ় বয়সে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে, পঞ্চাশোর্ধে মূলত শান্তিনিকেতন আশ্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একাধিক গঠনমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কিন্তু এই সব বিবিধ কর্ম-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কবির যে রূপটি আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, তা একজন জাতীয় রাজনীতিসচেতন ভাবুক ও কাল্পনিক চারণ কবির।

বিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ একটি রচনায় লিখছেন ঃ

পতিত ভারতে তুমি কোন্ জাগরণে
জাগাইবে হে মহেশ, কোন্ মহাক্ষণে
সে মোর কল্পনাতীত।...
জাগিয়া উঠিবে প্রাচী যে অরুণলোকে
সে কিরণ নাই আজি নিশীথের চোখে।

কবির দুর্জয় সাহস আর সার্থক আত্মত্যাগের প্রথম পরিচয় পেলুম পঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের পরবর্তী ভূমিকায়।

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ছাঁচটিকে চেনা খুবই সহজ। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই জাতীয়তাবাদী নেতা, জাতীয়তার প্রভাব অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ভাবাদর্শের বৃত্তে প্রবেশ করলেন তিনি। বলা যেতে পারে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে কী দেশীয়, কী বিদেশীয় কোনো জাতীয়তা সম্পর্কে কবির মনে মোহের কণামাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

গদ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান, অবিরাম জনতার জড়পোষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপনার একাকীত্বের মধ্যে আসীন, এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় ও ঈর্ষাকালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত। য়ুরোপে যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে সে মুক্তি ইহার কাছে নিতান্ত ক্ষীণ। সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু, তাহা স্পর্ধিত, তাহা নিষ্ঠুর; তাহা পরের প্রতি অন্ধ, তাহা ধর্মকে নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে।'

রবীন্দ্রনাথের এরকম স্বদেশচেতনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর হাজারো গান, কবিতা ও প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে যার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে একটি প্রবন্ধ অথবা আলোচনা নয় বৃহৎ আকারের একখানা বই লেখা যায়। শুরুতে শেষে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই ঃ পৃথিবীতে আর এমন কে কবি আছেন যাঁর লেখা গান দু-দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)-এর অমর সংগীত 'বঙ্গ আমার। জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ' অথবা 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি / সকল দেশের রানী সে যে—আমার জন্মভূমি' প্রভৃতি গান বাংলার অতীত কীর্তির স্মরণে মুখর। যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের এই গানগুলোর মধ্যেই আমরা স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করি, তবু এ-কথা না বলে উপায় নেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমগত যে মূল চিন্তা, তা শুধুমাত্র ওই গানগুলোতেই বিধৃত নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে মানবতা এবং স্বদেশচিন্তার যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো হেতু নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেছিলেন দেশের দরিদ্র শ্রেণী কী ভাবে শোষিত হয়। লিখছেন ঃ

ওরে ও ভাই চাষী? ওরে ও ভাই তাঁতি?
পড়িস নাক নুয়ে; জানিস এসব ফাঁকি
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে
করবে তোদের উপর রক্তবর্ণ আঁখি?
সারিবদ্ধ হয়ে একবার মাথা তুলে
দাঁড়া দেখি তোরা সবাই সোজাভাবে—
দেখবি এই যে স্পর্ধা—চূর্ণ হয়ে যাবে।
উঠে দাঁড়া দেখি—মানুষ যদি তোরা
এদের সামনে কেন মাথা নুয়ে যাবি?
সমস্বরে বল, "এই সকলেরই মাটি,
কারো চেয়ে কারো বেশী নাই ক দাবী।"

এই ধরনের সত্য দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকাশ করেছেন তাঁর বহু কবিতা, গান এবং নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে তিনি কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে মাতৃভূমিকে বীক্ষণ করেন নি, বীক্ষণ করেছিলেন বাস্তব দৃষ্টিতে। 'মন্ত্র' 'আলেখ্য' 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি গ্রন্থের কবিতাগুলোতে বারংবার দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মর্মব্যথা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গদেশ, বিহার ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য সৌন্দর্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও তার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষণা করেছেন ঃ

উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্ধ জগৎ
ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল
গান্ধার হতে জলধি শেষ
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননী।
তুই কিনা মাগো তাঁদের দেশ!

দেশের দুঃখ, দৈন্য ও অবমাননায় তিনি উপরে উদ্ধৃত গানটির মতো অজস্র গান ও কবিতা নির্মাণ করেছেন যাদের ছন্দ দৃঢ় পদক্ষেপের মতো বলিষ্ঠ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মেসোপোটেমিয়ায় গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-) তুরস্কের স্বাধীনতা উদ্যমের স্মৃতি নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে এসে সেই স্বাধীনতার উদ্যমকে তিনি আরো চাক্ষুষ করেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাঝখানে। নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করল। নজরুল স্বার্থহীন ভাষায় শাসক ব্রিটিশের ওপর সহিংস আঘাত হানার জন্যে কবিতা লিখলেন ঃ 'রক্তাম্বর পর মা এবার জ্বেলে পুড়ে যাক শ্বেতরসন/দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে তরবারির ঝনন ঝন।' ওই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অনেক রচনার মধ্যে আর একটি কবিতা ঃ

আর কতকাল থাকবি বেটী
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।

নজরুলের কবিতা ও গান সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেমন প্রেরণা জুগিয়েছিল স্বাধীনতাপ্রয়াসী বাঙালি যেমন মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন, তেমনি বিনিময়ে নজরুলকে ভোগ করতে হয়েছিল ব্রিটিশের রুদ্ধকারায় বন্দীজীবনের যন্ত্রণা। ভেবে-চিন্তে সাজিয়ে-গুছিয়ে কবিতা কিংবা গান লেখাকে নজরুল ভীরুতার লক্ষণ বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা, তাঁর প্রকাশ ছিল উলঙ্গ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা বিশেষ অধ্যায়কে গানে ও কবিতায় ধরে রেখেছেন নজরুল ইসলাম। তিনি একই কালে যুগের কবি এবং যুগোত্তীর্ণ কবি।

নজরুলের প্রাণোন্মাদনার গান কিংবা কবিতা যা একদিন পরাধীন বাঙালিকে মাতিয়েছিল, দেশ পরাধীন হবার পরও সেগুলো আমাদের প্রেরণা জোগায়। তাই স্বাধীন ভারতে কবির নিম্নলিখিত পংক্তিগুলোর আবেদন ফুরোয় নি।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা
জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন্ বলিদান?

কিংবা

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ
চার দুটো ভাত একটু নুন
বেলা বয়ে যায় খায়নিক বাছা
কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

আলোচিত কবিরা ছাড়া সম-সাময়িক আরও অনেক কবি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গান লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে কামিনী রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মুকুন্দ দাস প্রমুখের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ আমি এই বলে সমাপ্ত করতে চাই ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল করার জন্যে বাঙালি কবিরা যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা গৌরবের। বাঙালি কবিরা তাঁদের কবিতা ও গানের মধ্যে দিয়ে দেশবাসীর অন্তরে মৃত্যুভয় দূর করার মতন প্রবল শক্তিও সঞ্চার করেছিলেন। তাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালি কবিদের ভূমিকা ও অবদান আজ আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন।

বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়

।।দুই।।

রুমানিয়া থেকে একজন লেখক এসেছিলেন। বললেন, 'চার হাজার বছরের বহমান সভ্যতা আপনাদের। এর কোনোখানেই ছেদ পড়েনি। ধারাভঙ্গ হয়নি। আমাদের কিন্তু বারবার তিনবার ডিস্‌কনিউইটি ঘটেছে। একবার যখন প্রাচীন গ্রীস রোম যায়, খ্রীস্টধর্ম আসে। আবার, যখন রেনেসাঁস হয়। শেষবার, যখন মার্কসবাদ এসে ওলট-পালট করে। এইসব ডিস্‌কনিউইটি নিয়ে ইউরোপের সভ্যতা।'

পূর্বে ইউরোপের সভ্যতা, বলুন। পশ্চিম ইউরোপের লোক ওই তিনবারেরটা মানে না। তাদের বেলা এখন পর্যন্ত তেমন কোনো ওলটপালট সফল হয়নি। তা হলে ওদের চোখে ডিস্‌কনিউইটি যা তা রেনেসাসের সময়ই দ্বিতীয় ও শেষবার ঘটেছে।

আর আমাদের বেলা? একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের সভ্যতার ধারাভঙ্গ একবারও ঘটেনি তবে বাংলার রেনেসাঁস একটা কথার কথা। যার মৃত্যু নেই তার নবজন্মও নেই। যার নিদ্রা নেই তার নবজাগরণও নেই। এদেশে কতবার গ্রীক শক কুশান হূন এসেছে, তেমনি তুর্ক মোগল পর্তুগীজ ইংরেজ এসেছে। সাময়িক এক-একটা তরঙ্গ উঠে আবার মিলিয়ে গেছে এই যাকে রেনেসাঁস বলা হচ্ছে এও তেমনি একটা তরঙ্গ।

রুমানিয়ান লেখক আমাকে ভাবিয়ে তোলেন। ভেবে দেখি এদেশেও মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে। ধারাভঙ্গ হয়েছে। নয়তো মহেঞ্জো দারো ও হরপ্পা মরুপথে হারিয়ে গেল কী করে? সেই নাগরিক যুগের সঙ্গে বৈদিক আরণ্যক যুগের ধারাবাহিকতা কোথায়? সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীনতর সভ্যতার অস্তিত্বপর্যন্ত পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের জানা ছিল না। পণ্ডনদের বৈদিককেই আমরা আদি বলে বিশ্বাস করতুম। কারণ ঋগ্বেদের চেয়ে পুরাতন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই। কিন্তু পাষাণের সাক্ষ্য শাস্ত্রের চেয়েও প্রামাণিক। একদিন স্বীকার করতেই হবে যে সিন্ধু সভ্যতার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে। ছেদের পর পুনরারম্ভ। বৈদিক আর্যদের আবির্ভাব। সম্ভবত বহিরাগত আক্রমণকারীরূপে।

এই ছেদটার কথা খননকার্যের পূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এটা এত পুরাতন যে লোকমানসেও কোনো চিহ্ন রেখে যায়নি। সেইজন্যে মনে হয়েছে আমাদের সভ্যতা চিরপ্রবহমান। যা গ্রীস রোম মিশরের নয়। কিন্তু একথা আমরা সবাই জানতুম যে বৌদ্ধধর্ম একদিন অস্তমিত হয়, ইসলাম একদিন উদিত হয়। প্রায় একই ঐতিহাসিক লগ্নে বৌদ্ধদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব মুসলিমদের চেয়ে কোনো অংশে খাটা ছিল না। আর মুসলিমদের যখন গৌরবের দিন ছিল তখন সে গৌরব বেদানুগ হিন্দুদের চেয়ে কোনো অংশে খর্ব ছিল না। ভারতের ইতিহাসে বেদানুগ হিন্দুর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি প্রতিবাদী শক্তি। সেটি এককালে বৌদ্ধ, পরে মুসলিম। এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। একটি যে অপরটির উচ্ছেদের হেতু তাও নয়। কিন্তু একটির শূন্যতা অপরটি পূরণ করে। একের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে অপরের উত্থান।

তাই যদি হয় তবে আমাদের ইতিহাসেও বার দুই ডিস্‌কনিউইটি ঘটেছিল। ইতিহাস লেখার অভ্যাস নেই বলে কেউ লিপিবদ্ধ করেনি। লোকে ভুলে গেছে মহেঞ্জো দারো ও হরপ্পাকে। তেমনি অশোক কনিষ্ক হর্ষবর্ধন ও ধর্মপালকে। যদিও বাণভট্টের হর্ষচরিত ছিল সাক্ষী দিতে।

অন্য একদিক থেকেও বিবেচনা করতে পারি। সংস্কৃতভাষার গৌরবের দিন যখন গেল তখন দেখা গেল রাজকর্মে তার স্থান নিয়েছে পারসিক আর জনজীবনে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি অসংস্কৃত ভাষা। এদের অধিকাংশকেই সংস্কৃতের সন্তান বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু জয়দেবের ভাষা ও চণ্ডিদাসের ভাষার মাঝখানে নিশ্চয়ই একটা ধারাভঙ্গ ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক জয়দেব পাঠ করার পর চণ্ডিদাস পড়তে বসলেই তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করবেন যে পরম্পরাটা ধারাবাহিক নয়। মাঝখানে একপ্রকার ডিস্‌কন্টিনিউইটি। এটা না হলে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবই হতো না। সংস্কৃত ভাষা সাধারণ লোকের হৃদয়াবেগ প্রকাশের বাহন ছিল না। যাত্রায়, পাঁচালীতে, কীর্তনে, গীতিকায় কেউ সংস্কৃত শুনতেও চায় না, বুঝতেও পারে না। তাদের মনের আনন্দ জোগায় তাদেরই মুখের ভাষা।

এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে সংস্কৃতের পর বাংলা ও বৌদ্ধধর্মের পর ইসলাম অবিকল সমকালীন না হলেও মোটামুটি একই যুগের ঘটনা। সম্পর্কটা হয়তো কাকতালীয়। আমাদের মধ্যযুগকে দুইভাগে বিভক্ত করলে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ইসলামের ও বাংলার পূর্বে ছিল মধ্যযুগের প্রথমার্ধ। পরে এল দ্বিতীয়ার্ধ। জয়দেব প্রথমার্ধের কবি। চণ্ডিদাস দ্বিতীয়ার্ধের কবি। মাঝখানে একটা ছেদ। মধ্যযুগের তাতে অবসান হলো না। যুগটা অবিচ্ছিন্নই রয়ে গেল। তবু যে পরিবর্তনটা ঘটল সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মের দিক থেকে, ভাষার দিক থেকে লোকে আরো গণতান্ত্রিক হলো। ধর্ম বলতে শুধু ইসলাম নয়, মঙ্গলকাব্য ও পদাবলীর ধর্মও বোঝায়।

সংস্কৃতের স্থান নেয় রাজকর্মে পারসিক, জনজীবনে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা। কিন্তু পুরাতন জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা সংস্কৃতই রয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ফারসী। সেকালের শিক্ষিত শ্রেণী বলতে বোঝাত টোল চতুষ্পাঠী মাদ্রাসায় শিক্ষিত হিন্দু মুসলিম উচ্চতর বর্ণ বা উচ্চতর শ্রেণী। যে পদ্ধতিতে এঁরা শিক্ষালাভ করতেন সেটাকে পশ্চিমে বলা হতো স্কলাস্টিক পদ্ধতি। ইউরোপে যখন নতুন বিদ্যা প্রবর্তিত হয় তখন পদ্ধতিটাই যায় পালটে। স্বাধীন চিন্তাকে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিষ্যরা গুরুদের সঙ্গে তর্ক করতে সাহস পায়, গুরুর মত খণ্ডন করতে পারলে গুরু রুষ্ট হন না। গুরুবাদ জিনিসটাই উঠে যায়। তবে মনে রাখতে হবে যে এটা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার্চে নয়। কিংবা চার্চশাসিত বিভাগে নয়। যেমন অক্সফোর্ডে নয়। নতুন বিদ্যা নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন অনুসন্ধান, স্বাধীন গবেষণা সম্ভব হয়।

এদেশে নতুন বিদ্যার বাহন হয় ইউরোপীয় আদর্শের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের পদ্ধতি স্কলাস্টিক নয়। তাদের ভাষা সংস্কৃত বা আরবী ফারসী নয়। আরম্ভটা সম্পূর্ণ অর্বাচীন। তাই পুরাতনের সঙ্গে একটা ছেদ পড়ে যায়। শিক্ষিত শ্রেণী বললে এখন থেকে বোঝায় ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী। স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত শ্রেণী। সংস্কৃত বা আরবী ফারসীতে শিক্ষিতদের ফেলে এরা এগিয়ে যায়।

সংস্কৃতশিক্ষার যাদের অধিকার ছিল না, পারসিক শিক্ষায় যাদের প্রয়োজন ছিল না, তারাও ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পায় ও তার প্রাঙ্গণে দলে দলে যোগ দেয়। এর মতো গণতান্ত্রিক শিক্ষা পাঠশালা বাদ দিলে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের পূর্বে ও পরে আর কখনো দেখা যায় নি। এর বিপক্ষে ছিলেন গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দুরা। যেকারণে ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা বিপক্ষে ছিলেন সেই কারণে ভারতের গোঁড়ারাও। তাঁদের আশঙ্কা নতুন বিদ্যা এসে

তাঁদের চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে ঘা দেবে। তাঁদের পায়ের তলার মাটি নড়ে গেলে মন্দির মসজিদ সব টলে পড়বে। সমাজ সংসার সব ধ্বংস হবে। ছোটলোকদের বাড় বাড়বে।

ইউরোপের গোঁড়া খ্রীস্টানরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তকদের একদা পুড়িয়ে মেরেছিলেন। তাঁদের মতে ওটা শয়তানী বিদ্যা। কয়েক শতাব্দী পরে ওই শয়তানী বিদ্যাই বয়ে নিয়ে আসেন ইউরোপীয় খ্রীস্টান মিশনারীরা। তার থেকে এদেশের গোঁড়াদের ধারণা জন্মায় যে ওটা খ্রীস্টানী বিদ্যা, ওর লক্ষ্য খ্রীস্টান বানানো।

ওটা অশাস্ত্রীয়, ওটা ম্লেচ্ছ, ওটা পাশ্চাত্য, ওটা বিজাতীয়, ওটা জড়বাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করা সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই চলে, তা সত্ত্বেও ওর প্রসার রোধ করা যায় না। যারা কোনো কালেই উচ্চশিক্ষার ধারে কাছেও আসতে পারত না তারাও নতুন বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ পায় ও স্বাধিকার সচেতন হয়।

কিন্তু সংস্কৃত ও আরবী ফারসীর মতো ওর মাধ্যমটা ছিল ইংরেজী। সেটা সর্বজনবোধ্য নয়। রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগীরা আশা করেছিলেন অবিলম্বে বাংলা, হিন্দী ভাষাতেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন করতে পারা যাবে, কিন্তু তাঁদের সে আশা এক শতাব্দীর মধ্যেও পূর্ণ হয় না। প্রবর্তকরা এর জন্যে দায়ী নয়। দায়ী আমাদের ভাষাগুলির অবস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় যিনি যাই লিখতেন পদ্য আকারে লিখতেন। প্রথম ছেদ পড়ল যখন ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত বা মুনশীরা জীবনীগ্রন্থ লিখলেন বাংলা গদ্যে। সংবাদপত্রেও বাংলা গদ্য ব্যবহার করলেন মিশনারীরা। এরপর পাঠ্যপুস্তকও রচিত হয় গদ্যে। ধর্মগ্রন্থও অনুবাদ করা হয় গদ্যে।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ কতক পরিমাণে সংস্কৃত বা পারসিক শিক্ষিত লেখকদের হাতে হলেও বিপুল পরিমাণে হয় ইংরেজী শিক্ষিত লেখকদের হাতে। পদ্যের মতো গদ্যে অশিক্ষিত পটুত্বের স্থান ছিল না। থাকলে সেটা রূপকথায় বা ব্রতকথায়। তবে এটাও লক্ষ্য করবার মতো যে বাংলা গদ্য গোড়ার দিকে যেমন দুর্বোধ্য সংস্কৃত বা পারসিক বহুল ছিল পরে তেমন নয়। গদ্য ধীরে ধীরে সহজ ও সরল হয়ে আসে। সাধু রূপ ছেড়ে চলিত রূপ ধরে। ইউরোপের ইতিহাসে, চীনের ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছাপাখানারও ভূমিকা ছিল এই যুগপরিবর্তনে। ছাপাখানা ছড়িয়ে দেয় রাশি রাশি বই কাগজ। এত কম দামে দেয় যে সাধারণ লোকও কিনতে পারে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চবর্ণ বা উচ্চশ্রেণীর সম্পর্কটার একটা কারণ তো ছিল বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতা। ছাপাখানা উদ্ভাবনের পর দেখা গেল যারা কোনো কালেই বইপত্র কিনত না তারাও কিনছে, যারা কিনতে পারছে না তারাও অন্যের লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ছে। পাবলিক লাইব্রেরীও গড়ে ওঠে।

ইংরেজীশিক্ষিত ধনী বাঙালীদের শখ ছিল সাহেবদের মতো বড়ী করা, গাড়ী চড়া, আসবাব কেনা। সেইসঙ্গে আরো একটা শখ ছিল বিলিতী বই ও শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা। তাঁদের লাইব্রেরীতে সমসাময়িক ইংলণ্ডের সবরকম বই দেখতে পাওয়া যেত। তাঁদের শিল্পশালায় সমসাময়িক ইউরোপের চিত্র ও ভাস্কর্যের নমুনা বা নকল।

সরকারী চিড়িয়াখানা ছাড়াও ধনীদের নিজেদের চিড়িয়াখানা ছিল। সরকারী বটানিক গার্ডেন ছাড়াও ধনীদের নিজেদের আমদানী গাছপালার বাগান ছিল। হেন মুলুক ছিল না যেখান থেকে জাহাজে করে ফলটা ফুলটা পাখীটা জন্তুটা না আসত আর সাহেবদের দেখাদেখি বাবুদেব কৌতূহল না জাগাত। রেল টেলিগ্রাফ ষ্টীম ইত্যাদিও এমনি করে আসে ও যাদের কৌতূহলী করে তারা কেবল সাহেব নয়, বাবু নয়, সাধারণ লোক। দেখতে দেখতে লোকের অভ্যাস বদলে যায়। তারা রেড়ির তেল ছেড়ে কেরোসিন তেল ধরে। তারপর কেরোসিনের বাতি ছেড়ে গ্যাসের বা বিজলীর বাতি। তেমনি ঘুঁটে কিংবা কাঠ ছেড়ে করলা জ্বালায়। পুরুষের চুল ছেঁটে সাহেবদের মতো করা হয়। টিকি কাটা যায়। মেয়েদের গায়ে সেমিজ সাযা ওঠে।

দেশটা একটু একটু করে পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়ে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা আধুনিক যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেয়। কোন্‌টা পাশ্চাত্য, আর কোন্‌টা আধুনিক এটা পরিষ্কার ছিল না। পাশ্চাত্যকে আধুনিক ও আধুনিককে পাশ্চাত্য বলে ভ্রম হতো। এখনো হয়। জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশীলদের মনে একটা বিরূপভাবও জন্মায়। কেন, আমাদের কি আপনার বলতে কিছুই নেই যে আমরা পরেরটা নেব?

নির্বিচারে কোনোটাই নেওয়া উচিত নয়। পরেরটাও নয়, পূর্বপুরুষেরটাও নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যেমন পরেরটা নেবার সময় অতিশয্য দেখা গেল শেষ পাদে তেমনি পূর্বপুরুষেরটা নেবার বেলা অতিশয্য। এক শতাব্দীর মধ্যেই চাকা ঘুরে গিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর।' প্রাচীন ভারতের তপোবন না হলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম হবে না, ব্রহ্মচর্যাশ্রম না হলে জাতীয় শিক্ষা হবে না। রেখে দাও তোমার হিন্দু কলেজ আর ডিরোজিও।

একটি চোখ প্রাচ্যের উপরে, আরেকটা চোখ প্রতীচ্যের উপরে, একটা চোখ প্রাচীনের উপরে, একটা চোখ আধুনিকের উপরে—এই দ্বৈত রামমোহনের মধ্যেই ছিল। কিন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল একান্ত সক্রিয়। গা-ভাসানো আতিশয্য তাঁর স্বভাবে ছিল না। তিনি আধুনিক ইউরোপকে আহ্বান করলেও প্রাচীন ভারতের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগে সে সম্পর্ক বিকৃত হয়েছিল। একদিকে তিনি যেমন নতুন বিদ্যার প্রধান প্রবর্তক অপরদিকে তেমনি পুরাতন ধর্ম ও সমাজের মুখ্য সংস্কারক। সংস্কারকের কাজ তিন চার হাজার বছর আগে ফিরে যাওয়া নয়, তাকে ফিরিয়ে আনাও নয়, তার মূলে সত্যকে পুনরাবিষ্কার করা।

আধুনিক ইউরোপ এত বড়ো একটা জাজ্বল্যমান সত্য যে তাকে উপেক্ষা করার সাধ্য কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির ছিল না। অপর পক্ষে ভারতও আজকের দেশ নয়, এর ছিল অতি পুরাতন এক সভ্যতা ও নানা বিকৃতি সত্ত্বেও তার যে সার সত্য তাকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। মিশনারীরা নিজেদের ধর্মকে বড়ো করে দেখানোর জন্যে এদেশের ধর্মকে হেয় করে দেখালেও ভারততত্ত্ববিদ বহু ইউরোপীয় ছিলেন যাঁরা প্রাচীন প্রাচ্যবিদ্যাকে ইংরেজী ফরাসী ও জার্মান ভাষার অনুবাদসূত্রে পশ্চিম ভূখণ্ডের সর্বত্র পৌঁছে দেন। রামমোহনের অনুবাদগুলিও পশ্চিমে প্রচারিত হয়। অপরাপর ভাষায় পুনরায় অনূদিত হয়। রাজা যখন ইউরোপে যান তার আগেই যায় তাঁর লেখা, তাঁর নাম।

এই যে ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শুরু হয়ে যায় এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলেও পশ্চিমযাত্রীর অভাব হয় না। যান সংস্কারবিরোধী হিন্দুরাও। ইউরোপবিরোধী ভারতীয়রাও। ম্লেচ্ছ বিদ্বেষে যাঁরা অন্ধ তাঁরাও যান কালাপানির ওপারে। এমনি করে আচার অলঙ্ঘে শিথিল হয়। বিচারও ধীরে ধীরে উদার হয়। 'ওদের সব কিছু খারাপ আর আমাদের সব কিছু ভালো' এ মনোভাব আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে ক্ষয় হয়। কিন্তু 'ওরা স্বাধীন, আর আমরা পরাধীন' এ অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী অভিমান থেকে আসে ভারত সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণা, পশ্চিম সম্বন্ধে নিম্নতর। ওরা জড়বাদী, আমরা অধ্যাত্মবাদী, আমরাই শ্রেষ্ঠ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অবিরাম সংস্কৃত ও পালি চর্চা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গুহাচিত্র ও শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে ভারতের যে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব রচিত হয় তাতে ভারতের প্রাচীন গৌরব বৃদ্ধি পায়। এমন প্রাচীন গৌরব যে দেশের সে দেশ আধুনিক ইউরোপের শিষ্য হবে না গুরু হবে। মন্ত্রতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ওদের কাছ থেকে শেখবার নেই, এই ধারণায় উপনীত হন যাঁরা জার্মান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতকে দেখেন। 'মোক্ষ মূলর বলেছে আর্য।' এই আর্যামিটা রামমোহনের যুগে ছিল না। হঠাৎ শোনা গেল আমরা আর্য জাতি, আমাদের ভাষা আর্যভাষা, ধর্ম আর্যধর্ম। আর আর্যই জগতের শ্রেষ্ঠ। একটি পরাধীন জাতির পক্ষে এটা কত বড়ো একটা সান্ত্বনা।

অতীত গৌরবের পুনরাবৃত্তির নাম রেনেসাঁস নয়, বিভাইভাল। রেনেসাঁস অতীতের থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করলেও যা করতে চায় তা নতুন, নিত্য নতুন। যা জানতে চায় তা নতুন, নিত্য নতুন। যাদের বিশ্বাস বেদে বা বাই-

বেলে বা কোরানে সব কিছু আছে, তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই তাদের সেই বিশ্বাস রেনেসাঁসের অনুকূল নয়। কারণ রেনেসাঁস নতুন করে জানতে চায়, নতুন করে ভাবতে চায়, নতুন করে বিচার করতে চায়। পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন না হলে রেনেসাঁস হয় না। তার ফলে খানিকটে ধারাভঙ্গ হবেই। নয়তো সেটার নাম রেনেসাঁস নয়।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেও খানিকটে ধারা-ভঙ্গ হয়। সেটা যাদের সহ্য হয় না তারা ধর্ম ও সমাজসংস্কারেও রাজী হয় না। বলে, 'ওসব পরে। আগে তো দেশ স্বাধীন হোক।' স্বাধীনতার জন্যে যারা সব চেয়ে অধীর ধর্মসংস্কারের বেলা সমাজসংস্কারের বেলা তারা সব চেয়ে ধীর। এমন কি একেবারেই বিরূপ। জাতীয়তাবাদ প্রথমে ছিল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন। পরে দেখা গেল জাতীয়তাবাদীদের বৃহত্তর ভাগ ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারকে মনে করে জাতীয় ঐক্যবিরোধী। ঐক্যের যদি প্রয়োজন থাকে তবে যেসব প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে হবে। নয়তো যেটে ভেঙে যাবে। ভোটও হারতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ তার প্রথম পাদের প্রতি বিমুখ। রেনেসাঁসের প্রতি বিমুখ কাউন্টারেনেসাঁস। রিফরমেশনের প্রতি বিমুখ কাউন্টারিফরমেশন। আধুনিক ইউরোপের প্রতি বিমুখ প্রাচীন ভারতীয় পুনরুজ্জীবন বা রিভাইভাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তা সত্ত্বেও নতুন বিদ্যার প্রসার বন্ধ থাকে না। সেইসূত্রে ইউরোপ থেকে যে ভাবধারা আসে তা সাহিত্যকে ও শিল্পকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি জোগায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্য একটা নতুন জগৎ। গদ্যবন্ধে লেখা হয় হালকা ও গম্ভীর বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, নাটক। পরে রম্য রচনা ও ছোটগল্প। পদ্যে একা মাইকেলই লেখেন এপিক, লীরিক, সনেট। বেশীর ভাগই পশ্চিমের আদর্শে। বিষয়টা যদিও স্বদেশী। এর পরে আর কেউ ভারতচন্দ্রকে বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্বসূরী বলে গ্রহণ করেন না। করেন মাইকেলকে। মাইকেলের প্রদর্শিত পন্থায় চলতে যাঁদের অনাগ্রহ তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী, কালিদাস ও শেলী কীটস ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের পথে চলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের সঙ্গে তাঁদের মনের অমিল। নাটক যাঁরা লেখেন তাঁরা শেকস্পীয়ারকেই আদর্শ করেন। কালিদাস ভবভূতিকে নয়। বিষয় হয়তো পৌরাণিক হিন্দু। কিন্তু রীতি এলিজাবেথান বা ভিকটোরীয়।

বাংলার আধুনিক শিক্ষা যেমন প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিক্ষার থেকে ভিন্ন বাংলার আধুনিক সাহিত্যও তেমনি প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাকে আর অভিন্নতায় পরিণত করা যেত না। সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল অন্যরূপ হলেও রেনেসাঁসের ফসল অন্যরূপ হতো না। অমন যে স্বাধীন দেশ জাপান তার আধুনিক যুগ যখন এল তখন মধ্যযুগের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অপগত হলো। নতুন বিদ্যা সে দেশেও প্রবর্তিত হয়। ইংরেজী ফরাসী জার্মান ইটালিয়ান ভাষায়। এক একটা বিষয় এক একটা ভাষায় পড়ানো হতো। সাহিত্য যারা পড়ত তারা পড়ত ফরাসীতে। চিকিৎসাবিদ্যা যারা পড়ত তারা পড়ত জার্মানভাষায়। আইন ও রাজনীতি যারা পড়ত তারা পড়ত ইংরেজীতে। ইটালিয়ান ভাষায় কী পড়ত জানি নে, বোধহয় আর্ট।

আলো হাওয়ার যেমন দেশ দেশান্তর নেই। জ্ঞানবিজ্ঞানেরও তেমনি দেশদেশান্তর নেই। সাহিত্যের বেলাও শিল্পের বেলাও সেইকথা খাটে। বাংলাসাহিত্যের পুরাতন যুগেও আরবী ফারসী থেকে বড়ো কম নেওয়া হয় নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় সেই লুপ্ত অধ্যায়টির উদ্ধার হয়েছে। সংস্কৃতসাহিত্যই পুরাতন বাংলাসাহিত্যের একমাত্র উৎস ছিল না। সুতরাং ইংরেজীসাহিত্য যদি পরে অন্যতম উৎস হয়ে থাকে তার জন্যে লজ্জিত হবার কারণ নেই। ইংরেজীও তো বিভিন্ন উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে নবীন হয়েছে। এর জন্যে ইংরেজরা কেউ লজ্জিত নয়।

রাজা রামমোহনই যে আমাদের রেনেসাঁসের সূত্রধার এ বিষয়ে রেনেসাঁস বিশ্বাসীরা একমত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তাঁর নাম না থাকলেও নতুন বিদ্যার তিনিই যে প্রধান প্রবক্তা লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্রই এর প্রমাণ। রামমোহনের বক্তব্য—

> 'If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian Philosophy would not have been allowed to displace the system of Schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government. It will consequently promote a liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providin a college furnished with necessary books, implements and other apparatus".

পূর্বে প্রচলিত সীস্টেমটাই তাঁর মতে অজ্ঞতাকে অক্ষয় করার জন্যে কল্পিত। তার পরিবর্তে চাই একটি উদার আলোকিত সীস্টেম। তাতে থাকবে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর শরীর-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, তা ছাড়া অন্যান্য আবশ্যক বিজ্ঞান। রামমোহন একে উপরের দিকে নিবদ্ধ রাখতে চাননি। ইংরেজীতেও না। একে বাংলার সহায়তায় জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া চলে।

শিক্ষার সীস্টেম পরিবর্তন না করলে সমাজের বা রাষ্ট্রের সীস্টেম পরিবর্তন করা যেত না। তা বলে এমন কথা বলা চলে না যে শিক্ষার সীস্টেম পালটালেই আর সব সীস্টেম পালটাবে। একটি অতি পুরাতন দেশের হাজার হাজার বছরের বদ্ধমূল ধর্মের সীস্টেম সমাজের সীস্টেম, রাষ্ট্রের সীস্টেম, উৎপাদনের সীস্টেম অত সহজে উৎপাটিত হতে পারে না। ইউরোপেও যাঁরা নতুন বিদ্যার প্রবর্তক তাঁরাও অতদূর যাবার কথা ভাবতে পারেন নি। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করাও আমূল পরিবর্তনের বিধান দেন নি। কিন্তু যেখানে পরিবর্তনমাত্রেই নিষিদ্ধ সেখানে একবার যদি পরিবর্তনের পথ সুগম হয় তবে সেই পথ দিয়ে একটার

পর আর একটা পরিবর্তন আসে। কালে সেটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করে। রেনেসাঁস যদি ইটালীতে না হতো রেফরমেশন জার্মানীতে হতো না, পার্লামেন্টের কাছে রাজশক্তির পরাজয় ইংলণ্ডে হতো না, রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব ফ্রান্সে হতো না।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভিতরেই সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি নিহিত ছিল। মানুষ ইচ্ছা করলে এই জগতকে ও এই জীবনকে সর্বতোভাবে পরিবর্তিত করতে পারে। মানুষের অসাধ্য কী আছে? মানুষ সর্বশক্তিমান। মানুষ সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে এই যে অভিনব চেতনা এটাই নতুন বিদ্যার মহত্তম দান। পাশ্চাত্য রেনেসাঁস থেকে এটা প্রাচ্য রেনেসাঁসেও সঞ্চারিত হয়। হতো না, যদি রামমোহনের মতো মনীষীরা অগ্রণী না হতেন। ইংরেজদের মধ্যেও দুই দল ছিলেন। একদল মনে করতেন প্রাচ্যদেশের লোকের পক্ষে প্রাচ্য বিদ্যাই শ্রেয়। বেশ তো শান্তিতে আছে ওরা। কেন বৃথা পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখিয়ে ওদের অশান্ত করে তোলা? ওরা চাইবে চাঁদ পেড়ে আনতে। পারবে কেন? আরেক দল ভাবতেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রাচ্যের পক্ষেও শ্রেয়। সেই আলোর ছোঁয়া লেগে যাদের ঘুম ভাঙবে তারাই আর সবাইকে জাগাবে। একটি পুরাতন, পশ্চাদপদ, দরিদ্র জনসমষ্টি আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করবে। সে কাজ ইংরেজদের দিয়ে হবার নয়। সে দায়িত্ব ইংরেজদের নয়। এই যে দ্বিতীয় দলটি এঁরাই নতুন বিদ্যা প্রবর্তনে উৎসাহী ভারতীয়দের পক্ষ নেন। মেকলের কাস্টিং ভোট এঁদের জিতিয়ে দেয়।

ইংরেজদের মধ্যে যাদের আপত্তি ছিল তাদের আপত্তির একটা কারণ ছিল এই যে, স্কুল কলেজের পড়া সেরে যারা জীবিকার সন্ধানে বেরোবে তাদের জন্যে সরকার এত চাকরি পাবেন কোথায়? তার জন্যে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাই তার সম্ভাবনা কতদূর? ইংলণ্ডে ততদিনে শিল্পবিপ্লব জোর কদমে চলেছিল, কিন্তু ভারতেও যদি শিল্পবিপ্লব চলে তবে ভারত হবে ইংলণ্ডের ঘোর প্রতিযোগী। তাকে কাঁচামালের জোগানদার ও তৈরি মালের বাজার করে রাখাই যদি ব্রিটিশ পলিসি হয় তবে শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে বেল স্টীমার ডাকঘর টেলিগ্রাফ এদেশেও এসে হাজির হয়। এখানেও নতুন নতুন কর্মের সুযোগ মেলে। যারা সরকারী চাকরি পায় না তারা ওকালতী করে। কিংবা মেডিকাল কলেজ থেকে বেরিয়ে ডাক্তারি। জমিদার ঘরের ছেলেরা জমিদারি থেকে অনর্জিত আয় পায়। কারণ রেললাইন ও শহর বিস্তারের দরুন জমির দাম বেড়ে যায়। তারাও স্কুল বসায়, ডাক্তারখানা বসায়। ইস্কুলমাস্টার ও ডাক্তারকে কাজ দেয়। জেলা ও মহকুমা নিয়ে যে নতুন প্রশাসনের প্রবর্তন হয় তার উপরের দিকে ইংরেজ থাকলেও বাকীটা দেশীয়দের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইউরোপের মতো এদেশেও রেনেসাঁসের স্তম্ভ বলতে বোঝায় জমিদার, বার্গার বা বণিক, উকিল, ডাক্তার, সরকারী আমলা। ওদেশে ক্লাজির একাংশ রেনেসাঁসের পক্ষপাতী ছিল, এদেশেও ব্রাহ্মণদের একভাগ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিক আর নাই দিক রেনেসাঁসের পক্ষপাতী হয়। সর্বপ্রথমেই মনে আসে যাঁর নাম তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত কলেজের ভার পেয়ে সেখানে পাশ্চাত্য দর্শন পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাবলী। একখানি চিঠিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এই বলে—

> For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanskrit College That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute . While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence'.

পুরাতন বিদ্যার পাশাপাশি নতুন বিদ্যাও চলবে, এই ছিল বিদ্যাসাগরের নীতি। তিনি যেমন সংস্কৃতশিক্ষাকে সাধারণের পক্ষে সহজ করতে 'ব্যাকরণকৌমুদী' প্রভৃতি বই লিখেছিলেন তেমনি ইংরেজীশিক্ষাকে সুলভ করতে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সংস্কৃত ছিল ব্রাহ্মণদের একচেটে, হলো নতুন বিদ্যালয়গুলিতে শূদ্রদেরও অধ্যাপাঠ। এমনকি মুসলমানরাও ইচ্ছা করলে সংস্কৃত পড়তে পারত। আর ইংরেজী তো সর্বজনপাঠ্য হলোই। বাংলাও।

সমসাময়িক ইউরোপের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় আমাদের নতুন শিক্ষাব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সেকুলার ছিল। এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় একদিকে যেমন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কারমুক্ত ভারতীয়দের অন্যদিকে তেমনি ডেভিড হেয়ার ও মেকলে প্রমুখ সংস্কারমুক্ত ইউরোপীয়দের। ইতিহাসে দৈবাৎ এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ ঘটে। বলা বাহুল্য এর মধ্যে একটা বিদ্যা বেচাকেনার ব্যাপার ছিল। পাঠ্যপুস্তক লিখে বিদ্যাসাগরও যে অর্থোপার্জন করেন নি তা নয়। রেনেসাঁস অর্থোপার্জনের যেসব নতুন পন্থা খুলে দেয় এটাও তার একটা। সংবাদপত্র সম্পাদনা করে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অর্থোপার্জন করেন। কাব্য লিখে মাইকেল ও উপন্যাস লিখে বঙ্কিমচন্দ্রও অর্থলাভ করেন। স্বাধীনভাবে বাস করতে হলে স্বাধীন জীবিকা চাই। সরকারের বা জমিদারের বা ধনিকের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে বাঁচতেও পারা যায় না, লিখতেও পারা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ আমলেই এটা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সম্ভব হয়। ছাপাখানা ও শিক্ষাবিস্তার এটাকে সম্ভব করে।

তাছাড়া স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করাও একটা নতুন অভিজ্ঞতা। মুঘল বা মারাঠা রাজত্বে স্বাধীন জীবিকা কারো কারো ভাগ্যে জুটলেও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কারো নাগরিক অধিকারের অঙ্গ ছিল না। সিভিল লিবার্টির জন্যে স্বদেশে রক্তপাত করে ইংরেজরা বুঝত ওর কী মূল্য। এদেশেও হিকি প্রভৃতি সাংবাদিক তার জন্যে সংগ্রাম করেন। রামমোহনকেও তার জন্যে সজাগ থাকতে হয়। এদেশে যেসব ইংরেজ রাজপুরুষ আসতেন গোড়া থেকেই তাঁদের একভাগ ছিলেন রক্ষণশীল ও আরেকভাগ উদারনীতিক। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলতেন ছোটো ইংরেজ ও বড়ো ইংরেজ। প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরেই এঁদের দেখা যেত। উচ্চতর আদালতে উদারনীতিকদেরই ছিল প্রাধান্য। বিলেতের বিচারব্যবস্থা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা আইনত স্বীকৃত হয়। কার্যত হতে বহু বাধা। উদারনীতিক ইংরেজ ও উদারনীতিক ভারতীয় এই এক জায়গায় মিলিত হন।

ইংরেজরা তাদের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এদেশে প্রবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের স্বদেশেই তার ব্যাপ্তি হয় নি। এদেশের জনসাধারণ যে তার জন্যে প্রস্তুত ছিল তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উদারনীতিক ইউরোপীয় ও উদারনীতিক ভারতীয় মিলে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন তার কিছুদিন আগে থেকেই পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। এটা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার সমান্তরাল ও পরিপূরক। সারা ইউরোপ জুড়ে একই আকাঙ্ক্ষা। এর দক্ষিণে ছিল স্বৈরাচার ও বামে বিপ্লববাদ। এসব তরঙ্গ ভারতের মাটিতেও আছড়ে পড়ে। বিশেষত বাংলার মৃত্তিকায়। রেনেসাঁস যেখানে সবচেয়ে সক্রিয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর সর্বত্র বৈশ্যদের ধনবল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও শূদ্রদের শ্রমবল তার প্রতিপক্ষরূপে তার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল। ভারতও এর বাইরে ছিল না। কিন্তু ভারতের পরাধীনতা এটাকে আড়াল করেছিল। তা সত্ত্বেও স্বামী বিবেকানন্দের মতো দূরদর্শী পুরুষ সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। যদিও সেটা ধর্মনিরপেক্ষও নয়, নিরীশ্বরও নয়, মার্কসবাদীও নয় তবু সেটা সামাজিক ন্যায়। যা না হলে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র অপরিপূর্ণ থাকবে। সাম্যের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রও করেছিলেন। শ্রমজীবীদের জন্যে কেশবচন্দ্রেরও দরদ ছিল। জমিদারের প্রজাদের জন্যে রামমোহনও ব্যথা বোধ করতেন।

নারী ও শূদ্র সমাজের এই দুটি উপেক্ষিত ও উপেক্ষিতার মধ্যে নারীর জন্যেই কাজ হয় বেশী। সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন তো রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের অবিস্মরণীয় কীর্তি। নারীকে ব্রাহ্মমন্দিরে বেদীতে আচার্যের আসনে বসানো তেমনি কেশবচন্দ্রের। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কন্যারা পুরুষদের সঙ্গে মেডিকাল

কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। ইউরোপেও সহশিক্ষা তখনো বেশীদূর যায় নি। নতুন বিদ্যা যে নরনারী উভয়ের জন্যে এটুকু স্বীকার করতেই চার শতাব্দী লেগে যায়। অবশ্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ঘরোয়া ব্যবস্থা ধনাঢ্য পরিবারে ছিল, কিন্তু তাদের কলেজে পড়তে পাঠানো—বিশেষ করে ছেলেদের কলেজ—গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও ছিল রক্ষণশীলদের কাছে দৃষ্টিকটু। ঘরোয়া ব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডক্টর জনসন মন্তব্য করেছিলেন, "কুকুর হাঁটছে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে এটা যেমন বিচিত্র ওটাও তেমনি।"

বাঙালীর মেয়েরা কলকাতা মেডিকাল কলেজে ভর্তি হবার পরে এক মার্কিন মেয়ে স্বদেশে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ না পেয়ে জার্মানীতে যান ও সেখানেও কেউ তাঁকে পড়তে দেয় না। শেষফলে একটি কলেজ তাঁর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজী হয়, কিন্তু একটি কি দুটি বিষয় নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ। এসব কথা যখন শুনি তখন ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজসংস্কারকদের শতবার সাধুবাদ দিই। যেখানে খোদ সুপরিচিত বীটন সাহেবের মতো ইউরোপীয় শুভাকাঙ্ক্ষীদেরও বহু ধন্যবাদ। নরনারীর সাম্যবিধানের সাধনায় জাতিধর্মনির্বিশেষে যাঁরাই যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাই আমাদের নমস্য। এককভাবে এ সাধনা এত কম সময়ের মধ্যে সিদ্ধ হতো না; পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের সাফ্রাজেটরা সংগ্রাম করে যে অধিকার লাভ করেন সে অধিকার বিনা সংগ্রামে এদেশের মেয়েরাও পান।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে পুরাতন বিদ্যার পরিবর্তে নতুন বিদ্যার প্রবর্তন চেয়েছিলেন এর তাৎপর্য তাঁরা স্থিতাবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। যাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন তাঁরা সমাজের প্রবল ও সুবিধাভোগী অংশ। জনগণের তখন নিজের স্বার্থ বুঝে নেবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। বিদ্যাবুদ্ধি আসতে পারত টোল চতুষ্পাঠী মক্তব মাদ্রাসা থেকে নয়, স্কুল কলেজ থেকেই। প্রগতিশীল ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য থেকেই। তবে এটাও তাঁদের কাম্য ছিল যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরেজীর সহায়তায় যুগোপযোগী হয়ে জনশিক্ষার বাহন হয়। তার জন্যে তাঁরাও পাঠ্য প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলা এর আগে পাঠশালার উপরে উঠতে পারে নি। তাকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করাই ছিল তৎকালীন কর্তব্য। সে স্তরে বাংলা হলো অবশ্য শিক্ষণীয়। নিচের দিকে শিক্ষার মাধ্যম লোকে যাকে ইংরেজী বিদ্যালয় বলত তাতে বাংলারও স্থান ছিল। বাংলার মতো অন্যান্য ভারতীয় ভাষাও অন্যত্র স্থান পায়। এসব ভাষাকে বলা হতো "দ্বিতীয় ভাষা"। মর্যাদার দিক থেকে এরা ইংরেজীর চেয়ে খাটো। পরে এটা অসহ্য হয়।

অসহ্য হবার কারণ বাংলার অভূতপূর্ব উন্নতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কখানাই বা পুঁথি লেখা হয়েছিল। আর কীই বা ছিল তার মান। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও তাকে অবজ্ঞা করতেন। তার নিজের কোনো নাম পর্যন্ত ছিল না। শুধু "ভাষা" বলে উল্লেখ করা হতো। বিদেশীরাই নাম রাখে 'বেঙ্গলী'। তার থেকে আসে 'গৌড়ীয়'। পরে 'বাঙ্গালা'। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দীই বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সোনার কাঠির পরশ লেগে রাজকন্যার ঘুম ভাঙে। ছুঁইয়ে দেয় ভিন্‌দেশী রাজপুত্র। সেই যে জাগরণ তার চিহ্ন জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, নগরবিন্যাসে, প্রাসাদনির্মাণে, থিয়েটারে, যানবাহনে। দেশটা হয়ে ওঠে কলকাতাকেন্দ্রিক। আর কলকাতা নিজে লন্ডনকেন্দ্রিক।

এর নাম ঔপনিবেশিকতা। আমাদের সভ্যতা হয় কলোনিয়াল সভ্যতা। আমাদের সংস্কৃতিও কলোনিয়াল ধারায় চলেছে দেখে আমাদের মনীষীরা বিদ্রোহী হন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' এই বিদ্রোহের সঙ্কেত। গোড়ায় এটা ছিল সাংস্কৃতিক বিদ্রোহ। পরে অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। এরই চূড়ান্ত পরিণতি "কুইট ইণ্ডিয়া"। সঙ্গে সঙ্গে "ডিভাইড অ্যান্ড কুইট"। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে'র ভিতরেই উভয়ের বীজ নিহিত ছিল।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধটা ছিল এই যে এপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে কাঁচামাল যেত ওপারে। আর ওপার থেকে জাহাজ ভর্তি করে তৈরি মাল আসত এপারে। তেমনি এপার থেকে পুরাতত্ত্ব যেত ওপারে। আর ওপার থেকে আধুনিক বিদ্যা, আধুনিক চিন্তা, আধুনিক বিচার, আধুনিক নিয়মকানুন, আধুনিক কলাকৌশল, আধুনিক সংস্কার বা বিপ্লব আসত এপারে। পশ্চিম থেকে আসত বলেই তার অঙ্গে একটা পশ্চিমা পোশাক ছিল। সেটা যাদের ভালো লাগত তারা পোশাকটাতেই মুগ্ধ। আধুনিকতা তাদের চোখে নিছক সাহেবিয়ানা। আবার সেটা যাদের খারাপ লাগত তারা পোশাক দেখেই রুষ্ট। আধুনিকতা তাদের চোখে সাহেবিয়ানা ছাড়া আর কিছু নয়। কোন্‌টা যে পাশ্চাত্য আর কোন্‌টা যে আধুনিক, কোন্‌টা যে বিদেশী আর কোন্‌টা যে স্বযুগী, এটা প্রথমদৃষ্টিতে পরিষ্কার ছিল না।

বিদেশীর বিরুদ্ধে স্বদেশী খাড়া করতে গিয়ে যেটা হলো সেটা স্বযুগীর বিরুদ্ধে বিযুগী। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে অষ্টাদশ শতাব্দী। যারা মুসলিমবিরোধী তাঁরা পারসিকবিরোধী হওয়ায় তাঁদের বেলা অষ্টাদশ শতাব্দীই যথেষ্ট বিযুগ নয়। তাঁরা আরো উজানে গিয়ে হাজির হন দ্বাদশ শতাব্দীতে। সংস্কৃত যখন ছিল একচ্ছত্র। তাঁদের অনেকে আরো উজিয়ে যান কালিদাসের কালে। কেউ কেউ আরো দূরে উজিয়ে যান মুনি ঋষিদের কালে। ইসলাম এঁদের বাঞ্ছিত সংস্কৃতির ত্রিসীমানায় ছিল না। খৃষ্টধর্মও না। তা বলে যে এঁরা বৌদ্ধধর্মের উপর সদয় ছিলেন তা নয়। বুদ্ধ সম্বন্ধে এঁদের ধারণা জয়দেবের মতোই। বুদ্ধ নাকি বিষ্ণুরই একটি অবতার। যদিও বৌদ্ধদের মতে বুদ্ধই সব দেবতার উপরে। প্রাচীন বিদ্যা সম্বন্ধেও যতখানি মুক্ত মন চাই ততখানি এঁদের ছিল না। নতুন বিদ্যা সম্বন্ধে তো নয়ই। অথচ এর প্রেরণা আসছে যেখান থেকে সেটা হচ্ছে স্বদেশবোধ ও স্বদেশের স্বাধীনতাকামনা।

অথচ ওদিকে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হয়েছে। বোঝা তার আসছে বিদেশ থেকে। ছাপা হয়ে যাচ্ছে খবরের কাগজে। জাহাজের খবরের জন্যে কেউ সবুর করবে না। দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে পা ফেলে। প্রাচ্যের প্রাচীনতার সঙ্গে পা ফেলবে কে? দেশের লোকও পাশ্চাত্য না হোক আধুনিক হতে চায়। বাহ্যত আধুনিক। অন্তর থেকে আধুনিক হওয়া অত সহজ নয়। তেমন একজন মানুষ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তেমন একজন মানুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। এরা এঁদের পরবর্তীদের চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন, কারণ রেনেসাঁস তখনো তার গতিবেগ হারিয়ে রিভাইভালের মরুপথে ক্ষীণধারায় প্রবাহিত হয় নি।

দেশাভিমানীদের মতে ভারতীয় সাহিত্যের, দর্শনের, শিল্পের বিচার হবে

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।

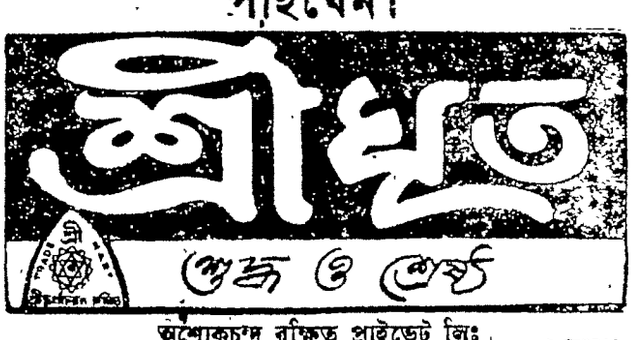

অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

ভারতীয় ঐতিহ্যবাহিত স্বকীয় স্ট্যান্ডার্ডে। আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে নয়। আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড তো প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড। তাকেই যদি প্রামাণিক বলে মেনে নেয় তবে ভারত তার আপনাকে হারাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, গ্রামীণ কারুশিল্প সব একে একে গেছে। এক সভ্যতার বাসগৃহে অপর এক সভ্যতা এসে জবরদখল নিয়ে বসেছে। থাকবার মধ্যে আছে ভারতীয় সংস্কৃতি। সেও কি তার নিজ বাসগৃহে পরমুখাপেক্ষী হবে? না, আমাদের দণ্ড আমরা পরকে ছেড়ে দেব না। সাংস্কৃতিক বিজয় ঘটতে দেব না। ভারতের আত্মা অপরাজিত। ধর্মেই এর সমধিক প্রকাশ। ধর্মের পরেই সংস্কৃতি। এই বিশুদ্ধ সংস্কৃতিকে যারা ফেরেঙ্গ সংস্কৃতিতে পরিণত করতে চায় তারা স্বদেশের শত্রু।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে প্রতিবোধ দেখা দিয়েছিল সেটা হিন্দু নামক একটি ধর্ম বা সমাজের তরফ থেকে। শেষের দিকে যেটা দেখা দিল সেটা ভারত নামক একটি দেশের তরফ থেকে। নাম ভারত, কার্যত হিন্দু ভারত। দেশের আত্মাকে বিজিত হতে দিলে এদেশ আর কোনোদিন স্বাধীন হতে পারবে না। সাংস্কৃতিক বিজয় সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী, সকলেই এবিষয়ে একমত। দিকে দিকে স্বদেশী চারুশিল্প ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়, জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের আত্মা সেইভাবে আত্মরক্ষা করে ও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক বলপরীক্ষার জন্যে শক্তি সংগ্রহ করে। নৈতিক ও মানসিক শক্তি। সামনে একটা সংগ্রাম রয়েছে, একথা যদি মনে রাখি তা হলে পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবৃত্তি দেখে আশ্চর্য হব না। দুর্বল দেশ এমনি করেই প্রবল দেশের সঙ্গে লড়তে সাহস পায়।

রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে সর্বদেশে সর্বপ্রকারে মুক্ত করতে। শাস্ত্রের হাত থেকে, দেবতার হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, পুরোহিতের হাত থেকে, রাজার হাত থেকে, সামন্তের হাত থেকে। কুসংস্কারের হাত থেকে, কুপ্রথার হাত থেকে, অধীনতার হাত থেকে, অসামোর হাত থেকে। একদিনে বা একশতাব্দীতে নয়। ধাপে ধাপে। সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। সেই হচ্ছে বিদ্যা যা মুক্তি দেয়। রেনেসাঁস এসেছিল তেমন বিদ্যা নিয়ে। আমাদের বহুভাগ্য যে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কতক লোকের মন তার জন্যে উন্মুখ ছিল। মহাসৌভাগ্য যে কলকাতা ছিল রাজধানী ও সমুদ্রপথে ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। সেই সূত্রে তথ্য ও আইডিয়ার চলাচল ছিল অব্যাহত। কিন্তু জনগণ তার অংশীদার ছিল না ও প্রাচীনপন্থীরা ছিল বিরূপ। পরে দেশাভিমানীরাও হয় বিমুখ।

আমাদের রেনেসাঁসের পরাকাষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার। তাতে করে প্রমাণ হয় যে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড বলে একটা কিছু আছে আর বাংলা সাহিত্য সেই স্ট্যান্ডার্ডে উপনীত হয়েছে। অধিকন্তু এটাও প্রমাণ হয় যে, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি একটি বিজিত দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নয়। ভারত ক্ষেত্রে অপরাজিত। এতে আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে যায়। আমরাও পশ্চিমের সঙ্গে পাল্লা দেবার সামর্থ্য রাখি। "জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব।" বাঙালী আজ গানের রাজা বাংগালী নহে খর্ব।" সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তি সব গ্লানি ভুলিয়ে দেয়।

তখনো কারো জানা ছিল না যে প্রথম মহাযুদ্ধ আসছে, তার পিঠ পিঠ রুশবিপ্লব ও তার শেষে ভারতের গণজাগরণ। যেমন পশ্চিম ইউরোপে তেমনি ভারতেও একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর আরো বিশটা বছর টেনে আনলে বলতে পারা যায় ওটা উনবিংশ শতাব্দীরও শেষ। সব দেশের বিশ্ববিপ্লবী অন্তর্গামিতমহিমা। এমনতর মোহভঙ্গ এর পূর্বে কখনো ঘটেনি। সভ্যতার স্বরূপ দেখে সভ্য মানুষ বর্বরের দিকে ঈর্ষার সঙ্গে তাকায়। কতক সভ্য মানুষ বর্বর বনে যায়ও। ইটালীতে ও জার্মানীতে। তাদের চেহারা দেখে কে বিশ্বাস করবে যে তাদের দেশে একটা রেনেসাঁস ও রেফরমেশন ঘটেছিল। প্রমাণ কোথায় যে মানবিকবাদ বিকশিত হয়েছিল।

ইউরোপের উপর মোহভঙ্গ আমাদের আপনার দেশের দিকে ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ করে। মোহভঙ্গটা শুধু পশ্চিমের উপর নয়, আধুনিকের উপরও। নাগরিকের উপরও। আমরা গ্রামে যাই। জনগণের সঙ্গে অভিন্ন হতে চেষ্টা করি। আমরা মনে প্রাণে স্বদেশী হতে গিয়ে স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমাদের চিৎপ্রকর্ষের, আমাদের বৈশিষ্ট্যের ও আমাদের সৃজনী শক্তির উৎস আবিষ্কার করি। আমাদের সত্যিকার শিকড় যেমন গ্রামে ও গ্রামীণ শিল্পে ও কৃষিকর্মে তেমনি লোকসংস্কৃতিতে ও তারই উপর ভিত্তিকরে রচিত বা গ্রথিত রামায়ণে মহাভারতে। রামায়ণ মহাভারতই আমাদের ভিতরকার ইতিহাস।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাকে বাদ দিলে ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে রামায়ণ মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য অবলম্বন করে হাজার হাজার বছর ধরে লেখা হয়েছে হাজার হাজার খন্ডকাব্য, আঁকা হয়েছে হাজার হাজার ছবি, গড়া হয়েছে হাজার হাজার মূর্তি, নাচা হয়েছে হাজার হাজার নাচ, গাওয়া হয়েছে হাজার হাজার গান, শোনানো হয়েছে হাজার হাজার কথকতা, অভিনীত হয়েছে হাজার হাজার নাটক বা যাত্রা। কোথায় তার ছেদ বা ডিসকন্টিনুইটি!

রামায়ণ বা মহাভারত একজন লেখকের একজীবনের লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। হয়ে থাকলে বহুযুগ ধরে প্রচলিত বহুজনের গাওয়া লোকগীতি অবলম্বন করে সম্পাদিত হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে আরও কাহিনী জুড়ে জুড়ে কাব্যকে যে বিশাল আয়তন দেওয়া হয়েছে তা কোষগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে আপনাকে দুটি কোষগ্রন্থে সংহত ও সংক্ষিপ্ত করে ভাবীকালের জন্যে রেখে যায়। মধ্যযুগের ভারত এই দুটির অঙ্গে আর কিছু সংযোজন করেনি। তবে সংস্কৃত থেকে বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ভাবানুবাদ যাঁরা করেন তাঁরা যেমন কতক অংশ বাদ দেন তেমনি কতক অংশ জুড়ে দেন আর চরিত্রগুলিকেও এমনভাবে রূপান্তরিত করেন যে তারা হয়ে ওঠে স্বকালের ও স্বপ্রদেশের নরনারী। তার থেকে বিষয় নিয়ে যখন যাত্রা অভিনয় হয় তখন দর্শকদের রুচি অনুসারে নতুন নতুন চরিত্রের উদ্ভাবন হয়। রামায়ণ মহাভারত জনতার অনুরোধে গ্রামে গ্রামে সুলভ হয়ে চলেছে। কেবল ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়ায় ও ইন্দোচীনে। তথা সিংহলে।

একদা যা ছিল ক্ষত্রিয়দের বীরগাথা ও রাজসভাতেই গীত বা অভিনীত হতো তা এখন সর্বজনপ্রিয়। তার সঙ্গে মিশে গেছে ধর্ম আর দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব, ধনুর্বিদ্যা ও রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র ও কামশাস্ত্র। জনতা এর সবটা চায় না ও পায় না। তারা বোঝে বীরত্ব ও বন্ধু, সেই সঙ্গে কয়েকটি মূলনীতি। পিতৃসত্যের জন্যে রাম বন গেলেন, পত্নী উদ্ধারের জন্যে তিনি যুদ্ধ করলেন, প্রজারঞ্জনের জন্যে তিনি পত্নীকে বনবাসে পাঠালেন। যুধিষ্ঠির সর্ব অবস্থায় সত্যনিষ্ঠ, সেই জন্যে স্বর্গের পথে তাঁর পতন ও মৃত্যু হলো না, তিনি সশরীরে স্বর্গে গেলেন কিন্তু একবার একটি অর্ধসত্য ও অর্ধ অসত্য উচ্চারণের কর্মফল হলো নরকদর্শন। সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর আর কোনো দেশের মহাকাব্যে আছে কি না বলতে পারব না। তবে কয়েকটা মূলনীতি ইলিয়াডেও আছে, ওডিসিতেও আছে। আছে জার্মানদের নিবেলুঙ্গেনলীড নামক প্রাচীন কাব্যে। কার কাছে কোনটা বড়ো সেটাই সার কথা।

রামায়ণ মহাভারত যতদিন বহমান থাকবে ততদিন জনমানসে ধারাভঙ্গ ঘটবে না। কিন্তু সেটা কতদিন তা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না। শিল্পবিপ্লব ভারতেও সক্রিয়। সমাজ-বিপ্লব না হোক সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ভারতীয়দেরও অন্বিষ্ট। কালক্রমে রামায়ণ মহাভারতের মহিমাও অস্তর্গামিত হবে। সে ক্ষত্রিয়সমাজ তো আর নেই। রাজারাজড়াদের যুগ গেছে। পরে বীরগাথার পাত্রবা হবে অনভিজাত। অতিপ্রাকৃতেও লোকের বিশ্বাস শিথিল হবে। সূর্য যে কী তা একবার জানবার পর তাকে বগলদাবা করা কার হনুমানেরও অসাধ্য হবে। গন্ধমাদন বয়ে আনাও অবিশ্বাসের ঠেলায় করবে। তেমনি ধনুর্ভাঙ ও গাণ্ডীবের প্রত্যঞ্চার প্রক্রিয়াও সন্দেহজনক হবে। তা বলে রামায়ণ মহাভারতের আবেদন ব্যর্থ হবে না। রামায়ণ মহাভারত নতুন করে লেখা হবে। যতদিন না জননায়করা ফতোয়া দিচ্ছেন যে,

ওই দুটি মহাকাব্য ফিউডাল সমাজব্যবস্থার ধারক ও বাহক। সুতরাং পরিত্যাজ্য। যেমন পরিত্যাজ্য চীনদেশে কনফিউসিয়াসের শিক্ষা।

ভবিষ্যতে ধারাভঙ্গ হবে না এমন কথা কেউ বলতে পারে না। আমিও বলব না। জীবন কখনো একই খাতে প্রবাহিত হয় না। বড়ো বড়ো নদীকেও মাঝে মাঝে খাত বদল করতে দেখা যায়। বড়ো বড়ো সভ্যতাও যদি তাই কবে তবে আশ্চর্য হবার কী আছে। ভারত অনেককাল ধবে বিচ্ছিন্ন ছিল বলে এতদিন হয়তো একটা ব্যতিক্রম ছিল। এখন আর তা নয়। জলপথে জাহাজ এসে তাব বিচ্ছিনতা দূর করেছে। অকাশপথে বিমান এসে তাকে অবিচ্ছেদ্য করছে। ব্যতিক্রমের মোহভঙ্গ হলে অতীতের সঙ্গে ধারাভঙ্গও হতে পারে। তবে সেটা আমাদের কাম্য নয়। আমরা চাই অতীতের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে। অন্বয় রক্ষা করে অগ্রসর হতে। অন্বয় রক্ষা মানে অতীতরক্ষা নয়। অতীতেব স্থান যাদুঘবে। সেখানেই তাকে রক্ষা করতে হবে। জীবনে স্থান দিতে হবে বর্তমানকে ও তার পরে ভবিষ্যৎকে। জীবনেও যারা অতীতরক্ষা করতে চায় তাদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটবেই।

রেনেসাঁসের সময়ও তাদের সঙ্গে অগ্রসর দলের ছাড়াছাড়ি ঘটেছিল। প্রথমে সতীদাহের প্রশ্নে। পরে ইংরেজী শিক্ষার প্রশ্নে। আরো পরে বিধবাবিবাহের প্রশ্নে। আরো পরে উপবীতত্যাগের প্রশ্নে, জাতিভেদের প্রশ্নে, নারীর অধিকারের প্রশ্নে, অসবর্ণ বিবাহের প্রশ্নে। আরো পরে বহু বিবাহের প্রশ্নে। ছাড়াছাড়ি বলতে একটা পাকে পেছনে রেখে আরেকটা পায়ের এগিয়ে যাওয়া। পেছিয়ে থাকা পা চিরদিন পেছনে পড়ে থাকে না। সেও তার নিজের সময়ে এগোয়। হয়তো একশো বছর নেয়। কিংবা আরো বেশী। সংস্কারবদ্ধ মন সহজে সংস্কারমুক্ত হয় না। এই তো সেদিনও আমাদের ধারণা ছিল হিন্দুমতে বিয়ে হয়ে থাকলে বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব। এর যাতে পুনর্বিচার হয় তার জন্যে আমি কত কষ্ট করে উপন্যাস লিখলুম। এখন দেখছি হিন্দুরা ক্যাথলিকদেরও হার মানিয়ে দিয়েছে। রক্ষণশীল পরিবারেও বিবাহবিচ্ছেদ চলতি হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও হচ্ছে। এ অসম্ভব সম্ভব হলো কী করে? হলো এইজন্যে যে মেয়েরাও শিক্ষিত হয়েছে, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে রাজী নয়, বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়ে থাকলে নতুন করে আরম্ভ করতে চায়। একই মনোভাব ছেলেদের মধ্যেও।

পুনর্বিচার, পুনর্মূল্যায়ন, পুনরারম্ভ এইসব হলো রেনেসাঁসের মর্ম। অগ্রসর অংশটাই ঐতিহ্যের দ্বারা সম্মোহিত না হয়ে তার উপর স্বাধীন বিবেক ও মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োগ করে। অহেতুক বর্জনও করে না, অহেতুক সংরক্ষণও করে না। অপরিবর্তনীয় বা সনাতন বলে তাকে নিরস্ত করতে যায় পশ্চাৎপদ অংশ। তার উপর নির্যাতনও করে। তাকে দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। ধীরে ধীরে জনমতের গতি হয় অগ্রমুখী। ইতিহাসও তাই চায়। অগ্রসর অংশের কার্যকলাপ ইতিহাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে। বলতে পারা যায় যে মানুষের ভিতর দিয়েই ইতিহাস কাজ করে যায়। এই প্রাচীন দেশের ইতিহাসের এটাও একটা পট-পরিবর্তন। এই যাকে বলা হচ্ছে রেনেসাঁস। রেনেসাঁস সম্পূর্ণ হলে প্রাচীন আর প্রাচীন থাকে না। সে হয় নবীন। ভাবতকে আমরা নবীন ভারত বলতে পারব যখন দেখব যে পশ্চাৎপদ অংশও অগ্রসর অংশের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিয়েছে।

বিশ্বাসী খৃষ্টানরা মানুষকে পুড়িয়ে মারত এই ভেবে যে তার দেহ ভস্মীভূত হলেও তার আত্মার কল্যাণ হবে। বিশ্বাসী হিন্দুরাও সদ্যবিধবাকে পুড়িয়ে মারত এই মনে করে যে সাধ্বী স্ত্রীর যথার্থ স্থান হলো স্বামীর সঙ্গে যেমন ইহলোকে তেমনি পরলোকে। নয়তো সে সাধ্বী নয়। তার সতীত্ব অপরীক্ষিত। রামমোহন ও তাঁর সমসাময়িক অগ্রবর্তীরা এর পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করেন। যে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরল ও যে তা করল না তাদের একজন কি সাধ্বী, অপরজন অসাধ্বী? সতীত্বের পরীক্ষায় তাদের একজন কি সতী, অপরজন অসতী? এটা পুরাতন বিচার। নতুন বিচার এ নয়। বেঁচে থেকেও যদি সাধ্বী হওয়া যায়, অগ্নি পরীক্ষা না দিয়েও যদি সতী হওয়া যায় তবে কেন ওই অনাবশ্যক মৃত্যু। যা কখনো আত্মহত্যা, কখনো প্রথাসিদ্ধ হত্যা। অসভ্য মানুষের নরবলির সভ্য সংস্করণ। শিক্ষিত ভদ্র হিন্দুরাও এই প্রশ্নে রামমোহনের বিপক্ষে দাঁড়ান ও প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। আইন করে সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে রামমোহনেরও দ্বিধা ছিল। কেম্ব্রিজের ছিল না। ইউরোপীয় এনলাইটেনমেন্ট বেল্টের মধ্যেই মূর্ত হয়েছিল। জনমতের জন্যে তিনি অপেক্ষা করেননি। ক্ষমতার সুপ্রয়োগ করে অমানবিককে রহিত করেন। জানতেন না যে তাতে সিপাহী বিদ্রোহকে ইন্ধন জোগানো হবে। সিপাহীরা ছিল পশ্চাৎপদ অংশ। অগ্রসর অংশ তাদের সমর্থন করে না। করে ইংরেজ রাজেরই সমর্থন।

বিধবাবিবাহের প্রবর্তনের পেছনেও ছিল পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন। যে নারী দশ বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছে সে তার স্বামীসঙ্গ থেকে ও মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলেই কি তার সেই বঞ্চিত থাকাটাই হবে সতীত্ব? সারা জীবন মৃত স্বামীর ধ্যান ও অমানুষিক কৃচ্ছসাধনই হবে সতীত্বের পরীক্ষা? তাই যদি হয় তবে সেটা হোক ঐচ্ছিক। কিন্তু সবাইকে বাধ্য করা কেন? যখন দেখা যাচ্ছে যে, অনেকেরই জীবনে ঘটছে স্খলন পতন ও সেটা প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে। নতুন করে ঘরসংসার পাতার সুযোগ পেলে তারাও হতো সচ্চরিতা পত্নী ও জননী। তারাও সতী, যদি সতীত্বের সংজ্ঞাকে উদার করি।

সতীদাহের পেছনে ছিল সতীত্ব সম্বন্ধে বহুকালের সংস্কার। তাকে টলিয়ে দিয়ে যান রামমোহন। সেটা না টললে সতী নারীর বৈধব্যের পর পুনর্বিবাহবিরোধী সংস্কার টলত না। এটাকে টলিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। এর পরের ধারা হলো বহুবিবাহ নিরোধ। বিদ্যাসাগর এর জন্যেও একটা আইন পাশ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার হয়েছিলেন বিষম সতর্ক। আইন পাশ না হলেও জনমত ধীরে ধীরে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে যায়। এখানেও সেই পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন চলছিল। এক-জন পুরুষের একাধিক স্ত্রী এতকাল কারো চোখে বিসদৃশ ঠেকেনি। লোকে এই ভেবে সমর্থন করত যে পিন্ডের জন্যে পুত্রের প্রয়োজন ও পুত্রের জন্যে ভার্যার। একটি ভার্যার যদি পুত্র না হয় তবে আরেকটি বিবাহ করাই তো সুসঙ্গত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মানবিকবাদ নারীর মূল্য বাড়িয়ে দেয়। পুত্র যার হয়নি সেও তো একটি নারী। সে বেঁচে থাকতে আর একটি নারী গ্রহণ করা কি অন্যায় নয়? এই যে অন্যায়বোধ এটা নতুন। বংশ রক্ষা যদি নাও হয়, পিন্ডদান যদি নাও হয় তা হলেও এক স্ত্রী থাকতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করা চলবে না। পরিশেষে এটা আইন পাশ করে নিষিদ্ধ হলো স্বাধীনতার পরে।

সাহিত্যে এই নতুন মূল্যবোধের প্রতিফলন হয়। ভার্যার মূল্য তো বেড়ে যায়ই, নারী মাত্রেরই মূল্য যায় বেড়ে। বিধবা পায় পুনর্বিবাহের অধিকার, কুমারী পায় নিজের পতি মনোনয়নের অধিকার, সধবা পায় বিবাহবিচ্ছেদের শর্তাধীন অধিকার পতিতা পায় সংশোধনের পর সম্মানিত জীবনের অধিকার। সব কটি অধিকারের মূলে সাম্য ও স্বাধীনতা। যেমন পুরুষের বেলা তেমনি নারীর বেলা। রেনেসাঁস না হলে এ সব কখনো হতো? রেনেসাঁস যে হয়েছে এই তার মোক্ষম প্রমাণ।

তবে এটাও ঠিক যে দেশের লোক কোনো রকম পরিবর্তনই কেবল মাত্র যুক্তিগ্রাহ্য বলে বা ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিত না। সেই জন্যে পদে পদে সংস্কৃত শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ধার করে বোঝাতে হতো যে শাস্ত্রেও এর অনুমোদন আছে। তেমনি মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত চয়ন করে প্রাচীন ভারতের নজীর দেখাতে হতো। সেইভাবেই ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হয়। ডিসকন্টিনিউইটি এড়াতে হয়।

নতুন বই

মেঘের পর রোদ (উপন্যাস)—সুনীলচন্দ্র সেন, ছুটি পাবলিশার্স, ৩৭, রসা রোড সাউথ থার্ড লেন, টালীগঞ্জ, কলিঃ—৩৩। দাম তিন টাকা।

লেখকের প্রথম উপন্যাস 'মেঘের পর রোদ' প্রেমের উপাখ্যান। আধুনিকা, সুন্দরী, শিক্ষিতা, ধনীকন্যা সুমিতা ভালবেসে বিয়ে করল সাধারণ ঘরের ছেলে সাধারণ চেহারার মেধাবী ছাত্র মানসকে। ইউনিভার্সিটির এম-এ ক্লাসের সহপাঠী ছিল ওরা। বিয়ের পর ওদের সংঘাত শুরু হোল। ওদের জীবনে মেঘ দেখা দিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে ওদের ছাড়াছাড়ির অবস্থা হোল। ঘটনাচক্রে ওদের শেষ পর্যন্ত শুভ মিলন হোল। সুখপাঠ্য উপন্যাস।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অসমাপ্ত কাহিনী (গল্প সংকলন)—নবনীকুমার রায় ও শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবন প্রকাশনী, ২, ভুবননগর (গভঃ স্কীম), পোঃ চন্দননগর হুগলী। তিন টাকা।

শ্রীনরনকুমার রায়ের চারটি গল্প ও শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি গল্প মোট আটটি গল্প নিয়ে এই সংকলন। গল্পগুলি গতানুগতিক পদ্ধতিতে লেখা। কাহিনীনির্ভর, ঘটনাপ্রধান, অন্তাচমকযুক্ত কখনো বা মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশানে উজ্জ্বল গল্পগুলি অ্যাভারেজ পাঠকদের ভাল লাগতেও পারে, বিরক্তির কারণও হতে পারে। 'অসমাপ্ত কাহিনী' নামের কি যৌক্তিকতা? কাঁচা গদ্যে ও ভাবনার আশ্রয়ে লেখা গল্পগুলি লেখক-লেখিকার তেমন কোন দক্ষতার পরিচয় দেয় না।

নরসিংহ দত্ত কলেজ পত্রিকা : সম্পাদক বিভূতিভূষণ ঘোষ। ছাত্র সম্পাদক চিত্তরঞ্জন ঘোষ ও কালীশঙ্কর ঘোষ।

কলেজের ম্যাগাজিন হলেও লেখাগুলি উপেক্ষার যোগ্য নয়। কয়েকটি কবিতা বেশ উৎরেছে। ভবানীপ্রসাদ সেন-শর্মার কবিতাটি ভালো। প্রবন্ধগুলি মোটামুটি উন্নত মানের। গল্প ছাপা হয়েছে একারোটি। লিখেছেন অসিত সাহা, স্বপন ঘোষ, মীনা কুণ্ডু, শীতল পল্লো, সঞ্জিত দাস, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, নৃপুর পালিত, মনোজিত সেন, সুখেন্দু ঘোষ ও শেখ গোলাম সুলতান। ইংরেজীতেও কয়েকটি লেখা ছাপা হয়েছে। ম্যাগাজিনটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত।

মানব মন (জুলাই-সেপ্টেম্বর) — সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দেড় টাকা।

হিস্টিরিয়া ও গণ-হিস্টিরিয়া সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রবন্ধে সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। আগেকার দিনে চিকিৎসকদের ধারণা ছিল, হিস্টিরিয়া হল জরায়ু সম্পর্কিত এক ধরনের মেয়ে-মানুষের অসুখ। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি সে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। লিখেছেন কণাদ শর্মা, মনোবিদ, পাভলভ সন্তোষকুমার দে, অনন্তবুবেই, মৃণালকান্তি সাহা ও পর্যবেক্ষক।

সন্দীপন : সম্পাদক মণ্ডলী সম্পাদিত। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ মন্দির, বেলুড়-মঠ, হাওড়া।

মূলত মাষ্টার মশাইদের লেখায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। প্রবন্ধগুলি ভালো। লিখেছেন স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ স্বামী চণ্ডিকানন্দ, চিত্তরঞ্জন কর, স্বামী ক্ষমানন্দ, দীপক বসু, লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং অনেকে। হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজীতেও অনেকগুলি রচনা স্থান পেয়েছে। যাদের জন্য লেখা, তাঁরা পড়ে আনন্দ পাবেন।

কিছু ধ্বনি (চতুর্থ সংখ্যা)—সম্পাদক বেবী আনোয়ার। বি-৯১ এফ ৭ মতিঝিল কলোনী, ঢাকা। পঁচাত্তর পয়সা।

'কিছু ধ্বনি' বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত একটি কবিতার মাসিক। প্রবন্ধ ছাপা হয় নি একটিও। কবিতা ছাপা হয়েছে অনেকগুলি। লিখেছেন এপার বাংলা, ওপার বাংলার কবিরা। আবদুল মান্নান সৈয়দ, সানাউল হক খান, মাকিদ হায়দার ও মহাদেব সাহার কবিতা কটি উল্লেখযোগ্য।

আন্তর্জাতিক আপিক (বসন্ত-গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা)—সম্পাদক রাণা সরকার। ১৯০ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

এ সংখ্যায় একটি অসামান্য সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখেছেন অজয় বসু (সুখ অসুখ ও ঋত্বিক ঘটক)। ফেলিনি সম্পর্কে ফেলিনি শীর্ষক সাক্ষাৎকারটিও চমকপ্রদ। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন গাস্তঁ বোবেরজ (অথবা পলিসি থেকে পলিটিক্যাল অথবা), সোমেন ঘোষ (ভারতীয় চলচ্চিত্রে বাংলা চলচ্চিত্রের অবদান), আলমগীর কবীর (সংস্কৃতির সংকট ও বাংলাদেশের চলচ্চিত্র), শুভেন্দু দাশগুপ্ত (জনগণের পক্ষে একজন চিত্রপরিচালক) ও কল্যাণ রায়। পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট প্রশিক্ষণ পাওয়া শিক্ষার্থীদের সমস্যা আলোচিত হয়েছে একটি সমীক্ষার মাধ্যমে। দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের লেখা অপুট্রিলজির সমালোচনাটি মূল্যবান। প্রচ্ছদে ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তর্ক গল্প'-এর কয়েকটি স্থির-চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। এককথায় সংখ্যাটি চলচ্চিত্রানুরাগী মানুষের কাছে সংগ্রহযোগ্য।

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক :

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষে দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পূজার আগেই। এই সংখ্যাটি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রামমোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত। মূল্য ৩ টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

• মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : পুষ্পেন্দু লাহিড়ী • ট্রাজেডির নায়ক : জীবনকৃষ্ণ শেঠ • বাংলা আধুনিক কবিতার মর্মসন্ধান : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • মন্বন্তরের কবি নীরেন্দ্রনাথ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় • মোহন্ত এলোকেশী সংবাদ : মল্লিকা বসু •

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র : রামমোহন রায় ॥

• বেদান্তদর্শন ও রামমোহন রায় : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য • অষ্টাদশ শতক, রামমোহন এবং যুক্তিবাদ : নির্মল ঘোষ • বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন : ভূদেব চৌধুরী • নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন : কুমুদ ভট্টাচার্য • রেনে আঁসের তাৎপর্য ও রামমোহন : দিলীপকুমার নন্দী • এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ১০ কিবণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

রহস্য উপন্যাস

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ফেরারী ফিরে এল

(তেত্রিশ)

সেই দিনই সন্ধ্যায় কৃপাসিন্ধু মোক্তারও এলেন।

প্রথম সাক্ষাতের আবেগটা কমে এসেছে; বেচারামের ঠাট্টায় হাসিটুকু ছলকে উঠে ঘরের বাতাসটা হালকা হয়ে এসে ঐ সুরেই কথা বলছে, খটখট খটখট করে বন্ধ দরজায় দুতে ঘা পড়ল।

কড়া তাগিদের ঘা। বাতাসটা মুহূর্তেই পালটে গিয়েই ঘরটা সঙ্গে সঙ্গেই থমথমে হয়ে উঠল। সবারই চোখে একটু ত্রস্ত দৃষ্টি-বিনিময়, বেচারাম প্রশ্ন করল—'কে?'

আরও কড়া খটখট আওয়াজের সঙ্গে ভারি গলা মিশিয়ে হুকুমের আওয়াজ—'দরওয়াজা খোলো।'

মুখ অন্ধকার হয়ে গেল সবার। প্রসাদীর ভ্রূ দুটো হঠাৎ একটু কুঁচকে গেল তারই মধ্যে, 'বুঝেছি।' বলে দ্বিধাছলে গটগট করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে বলল—'আসুন। ...মাথার ওপর এমন একটা মামলা, মোক্তার-দাদার তবু ঠাট্টা গেল না।'

একটা ভালো আরাম কেদারা পাতাই ছিল, বলল—'বসুন।...সোজা কাছারি থেকেই তো?'

'আর কোন চুলোয় জায়গা আছে?'

বসতে বসতে কথাটা বলে একবার বিস্মিতভাবে সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এসে বললেন—'কিন্তু আমি বলছিলাম, মামলা কোথায় রে সবাই কাল-পেঁচার মত মুখ করে বসে আছ...তা বলে তোমায় বলছি না মা থাকোমণি, তুমি গা পেতে নেবে না—শুনলাম তো, তা মামলা কোথায়? যেটুকু বা আছে, কৃপা মোক্তার এই রকম হাতের তেলোয় রেখে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে।' ডান হাতের চেটোটা চিত করে একটা ফুঁ দিয়ে বললেন—'আমার গড়গড়া কোথায়? প্রসাদ নিশ্চয় ভুলে গেছ?'

'ভুললে রক্ষে আছে?...যা তো মা থাকো, লেজেটেজেই নিয়ে আসবি একেবারে।...ভুলি? তবেই যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।'

'মোকদ্দমার কিছু নেই, তবু তোমরা ভয় পাবে, বাইরে মোক্তার, তায় কৃপাসিন্ধুই তবু তোমরা কে-না-কে ভেবে ভয়ে সারা। এ ভয়ের ওষুধ কি? তারপর, রঘু, হঠাৎ কি মনে করে?'

সবাই হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল, রঘু উঠে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—'চরণে ঠাঁই পেতে কাকা..'

গলাটা ধরে এসেছে। 'হয়েছে, হয়েছে'—বলে মাথায় হাত দিলেন কৃপাসিন্ধু। বেচা-রামও পায়ের ধুলো নিল। প্রসাদীও। গড়গড়া ঠিক করাই ছিল, কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে থাকোমণি এসে পাশে রেখে গলায় আঁচল দিয়ে গড় করল।

মহকুমার নামকরা মোক্তার কৃপাসিন্ধু। জেলার অন্য মহকুমাতেও যাতায়াত আছে, মাঝে মাঝে জেলা কোর্ট পর্যন্ত। পুরনো ঘাঘি মোক্তার, মোকদ্দমা সাজাতে বিচক্ষণ, তবে সাজানোর মধ্যে আইনের মার-প্যাঁচের চেয়ে প্রতিপক্ষকে হাত করাতেই কৃতিত্ব বেশি কৃপাসিন্ধুর। এ বিষয়ে কি বহসাময় উপায়ে কত উঁচুতে পর্যন্ত যে উঠতে পারেন তার সীমা বাঁধা নেই। প্রতিপক্ষ বলতে অবশ্য মূল বাদী বা ফরিয়াদীই নয়, তার তো নিজেরই মোকদ্দমা, তবে মোকদ্দমার চালচিত্রে সেই তো একা নয়।

মক্কেলদের কাছে মোকদ্দমার পরিভাষায় চলতি 'চালচিত্র' কথাটা ব্যবহার করতে ভালও বাসেন কৃপাসিন্ধু। দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের অর্ধবৃত্ত ধরে যখন হাতটা ঘুরিয়ে আনেন, বেশ একটি মোহনীয় ছবিই ফুটে ওঠে মক্কেলের মানসদৃষ্টির সামনে।

বয়স হয়েছে, রঘুর বাপ হলধরের প্রায় সমবয়সী, বছর তিনেক কমের দিকে। সামন্ত পরিবারের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। ওঁর যা পেশা তাই নিয়েই শুরু, তারপর সেটা বেড়ে যায়। দুটো কারণে, বয়সের দিক, যার জন্যে প্রয়োজনের পরিচয়টা একরকম বন্ধুত্বেই গিয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া গোটা তিনেক গ্রাম পেরিয়ে কৃপাসিন্ধুর বাড়িও: যার জন্যে সুবিধা আর অবসর পেলেই যাতায়াতের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানেরও একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। গতিবিধি বৈঠক-

খানা থেকে বাড়ির ভেতর পর্যন্ত। গেলেই কলকে-মাথায় গড়গড়াটি এসে পড়ে। বৈঠকখানা হলে মোকদ্দমার 'চালচিত্র সাজার' মধ্যে। ভেতরে হলে সবার সঙ্গে লঘু আলাপ-আলোচনা, হাসি-মস্করায়। ভেতরের এই ঘনিষ্ঠতার সুবাদে কৃপাসিন্ধু রঘুর মা হরকালীর দেবর, রঘু-থাকোমণির কাকা। থাকোমণির পিসি হিসাবে প্রসাদীর ওপর হাসি-ঠাট্টার ঝাপটা একটু বেশি করেই এসে পড়ত, যেখানে হলধরের ছিল ক্বচিৎ-কখনও।

মানুষটা একটু রঙ্গপ্রিয়। যেমন হোটেলে প্রবেশ করার ব্যাপারে দেখা গেল। কথা-বার্তার মধ্যে গুরুতর মোকদ্দমাও হালকা করে ফেলবার বেশ একটা ক্ষমতা আছে।

হলধরের মৃত্যুর পর সামন্তবাড়ির সঙ্গে কৃপাসিন্ধুর সম্বন্ধটা নানা কারণে শিথিল হয়ে পড়ে। বন্ধু হিসাবে হলধর নিজেই নেই। জোতজমা নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার কাজ অনেক কম, যেটুকু দরকার হোল প্রসাদী নিজেই গিয়ে ওঁকে জানিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করল, তাছাড়া রঘু নেই, তার সে-ধরনের উৎপাতও নেই আর যার জন্যেই ঘুষঘাষ দিয়ে আইনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনটা এসে পড়ে। থাকোমণির আত্মহত্যা, রঘুর অন্তর্ধান, বিষয়সম্পত্তি কোর্টের হেফাজতে—এই সব বিশৃঙ্খলার জন্যে মনটাও একেবারে উঠে গিয়েছিল সামন্তবাড়ি থেকে, বেচারাম আর প্রসাদীর মুখে সব শুনে আবার এসেছেন।

সোজা কোর্ট থেকে ট্রেনে শিয়ালদায় নেমে। গড়গড়া টানার মধ্যে লঘু আলাপ-আলোচনায় পরিবেশটা আরও সহজ করে এনে, মুখহাত ধুয়ে চা-জলযোগ সারলেন কৃপাসিন্ধু। আলাপ-আলোচনা চলছেই এটা সেটা নিয়ে, যা সামনে এসে পড়ছে, আজকের কাছারি-করা থেকে বর্তমান জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা পর্যন্ত।

ঐ প্রসঙ্গের মধ্যেই একবার একটা রাজভোগ তুলে থেমে গিয়ে রঘুর দিকে চেয়ে বললেন—'ভয় নেই, মোকদ্দমা সাজিয়ে দোব একেবারে চালচিত্রের মতন করে। বেশ পকেট ভরে দিবি-থুবি কিন্তু রঘু। দাদা যাওয়ার পর আর ওদিক থেকে আমদানি হয়নি তোর কল্যাণে।...উঃ, কি বাউন্ডুলেই হয়ে উঠেছিস, না গো প্রসাদ? সে কি সামলাতে পারা যায়! বাব্বা!'

একটা কামড় দিয়ে বললেন—'তা এ-ও বলতে হয় বড়মানুষের ছেলে বাউন্ডুলে না হলে আমাদের মোক্তারের গুষ্টি বাঁচি কি করে? নয় কি?'

'ক্ষমা দিন দাদা। আর মোক্তার বাঁচাবার জন্যে বাউন্ডুলে হয়ে কাজ নেই! ঢের হয়েছে।'

এমনভাবে শিউরে উঠে বলল প্রসাদী যে সবাই বেশ সজোরেই হেসে উঠল। কৃপাসিন্ধু পর্যন্ত। প্রসাদী তারই মধ্যে বলে চলল—'আর পকেট ভরে দেওয়া? একটা কানাকড়ি দিয়েও নয়। কী বেখেছেন সামন্তবাড়ির আর উকিল-মোক্তারে মিলে? ফোঁপরা হয়ে রয়েছে।'

হাসিটা আবার এককোঁক উছলে উঠল। 'দেখেছ? দেখেছ?'—বলে তোয়ালের হাত মুখ মুছতে মুছতে পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে আরাম চেয়ারে বসলেন কৃপাসিন্ধু। গম্ভীর হয়েই বললেন—'নাও, এবার কাজের কথায় এস তো। সব শুনেছি প্রসাদের মুখে, একবার তোমাদের নিজেদের মুখে একবার শুনে নেওয়া দরকার। কিছু কিছু সওয়ালও থাকবে। রঘুই আগে বলো। গোয়াল ঘর থেকে যতটা পারলে দেখে শুনে নিয়ে বেরিয়ে গেলে, তারপর?'

থাকোমণি এসে পালটে নূতন করে সাজা কলকেটা গড়গড়ায় বসিয়ে দিয়ে পাশের ছোট টেবিলটায় ডিবের ফরে পান আর জরদা রেখে দিল। আগে কৃপাসিন্ধু সামন্তবাড়িতে এলে এটা ওরই কাজ ছিল। কৃপাসিন্ধু ঘুরে ওর পিঠে হাত রেখে বললেন—'এই তো মার আমার মনে আছে। আর সবাই বেইমানি করে তো মা আছে আমার। লক্ষ্মী আমার রাজলক্ষ্মী হয়ে ফিরে এসেছে। নাও সুরু করো রঘু।'

সবার প্রসন্ন স্মিত হাস্যের মধ্যে রঘু আরম্ভ করল।

(চৌত্রিশ)

দিন দশেক লাগল কৃপাসিন্ধুর সব গোছগাছ করে নিতে। মোকদ্দমার মধ্যে সত্যই কিছু নেই। যার খুন হওয়া নিয়ে মোকদ্দমা সে সুস্থ শরীরে হাজির। খুনী তাকেই সাব্যস্ত রেখে আত্মসমর্পণ করেছে। ও ধারটা একেবারেই পরিষ্কার, শুধু আইনের কতকগুলো বিধিবদ্ধ পদ্ধতি পালন করে যাওয়া। হয়তো প্রমাণ করতে হবে যে এই মানুষটাই থাকোমণি, সুতরাং খুন হয়নি। প্রতিপক্ষ অবশ্য প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে, এ থাকো সে থাকো নয়। তার খুন হওয়াটাই সাব্যস্ত করবার চেষ্টা করবে। তার জন্য স্বামীস্ত্রীর প্রকৃত কটু সম্বন্ধটা প্রকাশ্যে আনবার চেষ্টা করবে একেবারে ক্ষীরোদাকে পর্যন্ত টেনে। এইগুলোই কাটিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আসামী থাকোমণি আর প্রসাদীর জবানবন্দীতে রঘুর উচ্ছৃঙ্খলতার কথায় যাতে একেবারে কোনও ইঙ্গিত মাত্র না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাক্ষীদের কথাতেও এনিয়ে প্রতিপক্ষের কোনও প্রশ্ন থাকলে অস্বীকার করে যাওয়া। এই হল মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার এক অংশ বলাই ঠিক। কেননা এ মোকদ্দমার আর একটা অংশ আছে, খুন হয়নি তো লাস কোথা থেকে এল? প্রসাদীর অভিপ্রায়টা কি ছিল এই মিথ্যাচারের?

আসলে এ একটা আলাদা কেসই। এটা শেষ হবার পরও এই নিয়ে পড়তে পারে প্রতিপক্ষ, যেহেতু প্রতিপক্ষ এখানে স্বয়ং সরকার। তবে যদি এইখানেই প্রসাদীর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায় তো তার সম্ভাবনা অল্পই থাকে।

এইগুলো ঠিক করে নেওয়া, গোপনে গোপনে। তারপর রঘুর এমনভাবে আত্মসমর্পণ করা যাতে তার হাজতের মেয়াদটা যতটা সম্ভব অল্পস্থায়ী হয়, অর্থাৎ মোকদ্দমাটা ধাপে ধাপে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে তাড়াতাড়ি রায় বেরিয়ে সে তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পেতে পারে।

হাজতে থাকার কটা দিনও যাতে তার কোনও অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করা; টাকা ঢেলে যথাস্থানে।

থানা থেকে নিয়ে কোর্ট পর্যন্ত খুব ঘোরাঘুরি চলল কদিন ধরে কৃপাসিন্ধুর। ভালো উকিল ঠিক করা। সাক্ষী-সাবুদ ঠিক করা। সাক্ষীর মধ্যে গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বর রইল, যারা সেদিন সকালের ঘটনাটা দেখেছে। তাছাড়া এদিকের সরকার পক্ষের সাক্ষী তো রয়েছেই, রহমৎ শেখ থেকে নিরু উঁচুতে পর্যন্ত। টাকা জলের মতো খরচ করে গেল প্রসাদী। ওদিকের গুলোকে হাত করতে তো লাগলই, তা ভিন্ন নিজের দিকেও সবাইকে খুশী করে রাখতে হোল। সত্য কথাও কলিযুগে একটা পণ্য, না কিনলে পাওয়া যায় না। যে পুরুত বিবাহ দিয়েছিল, তারপর সামন্তবাড়িতে বরাবর এসে পূজা-পার্বণে পৌরোহিত্য করে গেছে থাকোমণির আয়োজনেই, সেও বলল—'চিনি বৈকি, তবে নাকি বড় জটিল ব্যাপার, মাথা গুলিয়ে কি বলতে কি বলে ফেলব, তার চেয়ে বাদই দেও না হয় আমায়।'

বড় সাক্ষীই এক হিসাবে। বুদ্ধির জট খুলে রাখবার জন্যে বেশ ভালো করেই তৈল-নিষিক্ত করতে হোল তার মাথাটা।

মোকদ্দমার ভাগাড়ে মড়া পড়লে সব পাখিই শকুনি হয়ে উঠে। একটা খুব বড় সম্ভাব্য সাক্ষী ক্ষীরোদ, তার সঙ্গে বামনদাসও। প্রতিপক্ষ চাইবেই তাদের টানতে। বামনদাস জানিয়ে দিল, তাদের যখন আর ভয়ের কিছু নেই তখন তারা বাঘ-আঁচড়াতেই আবার ফিরে আসছে। তাদের অন্তত মামলা শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত টাকার মন্ত্রপূত গণ্ডী দিয়ে আটকে রাখতে হোল। এপারে এলে তাদের আলাদা ব্যবস্থা করতে পারতেন কৃপাসিন্ধু, তবে আর ভেজাল বাড়াতে চাইলেন না।

এর পর মাঝে মাঝে উকিলের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নির্দেশমতো আমহার্স্ট স্ট্রীট-লগ্ন ফ্ল্যাটে এসে সবাইকে তালিম দেওয়া, পালা করে সাক্ষীদের আনিয়ে। দু দিন উকিল নিজেও এলেন। বেরুবার তো উপায় নেই কারুর! মাথার ওপর হুলিয়া, ঘুণাক্ষরে প্রকাশ পেয়ে গেলে সমস্ত কেসটা যাবে উল্টে: আইনের নজরে ধরা দেওয়া আর ধরা পড়ায় কিন্তর প্রভেদ।

কৃপাসিন্ধু তাঁর প্র্যাকটিসের স্থল মহকুমা কাছারী থেকে বা উকিলের কাছ থেকে, অথবা অন্য কোনও জায়গায় প্রয়োজন মতো জমি ঠিক করে সন্ধ্যার পর ফ্ল্যাটে চলে আসেন, তালিম দেন। মূল সওয়াল-জবাব যেভাবে এগুতে পারে, তারপর ক্রস—যাতে বৈষম্য এসে পড়ে কেস নষ্ট না হয়।

এ মামলায় আর একটা সম্ভাবনা রয়েছে। হুলিয়ার টাকাটার লোভ, আত্ম-প্রকাশের আগেই ফাঁস করে দিয়ে টাকাটা বের করে নেওয়া। এর জন্য নিজেদের দিকের সাক্ষী নির্বাচনে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হোল। গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে যারা এ-ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তাদেরই তালিকাভুক্ত করা হোল। একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও রইল—মামলায় যখন কিছু নেই, বেরিয়ে আসবেই রঘু, তখন, আনুকূল্যের জন্য যেমন তার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, প্রতিকূলতা করতে গেলে তেমনি উগ্র প্রতিহিংসারও সম্মুখীন হতে হবে এ-ধরনের দাগাবাজকে। সবাই কৃপাসিন্ধু মোক্তারকে চেনে, প্রসাদীকে চেনে, রঘুরও পূর্বের রূপটাই জানে; গ্রামের মধ্যে থেকে সাহস করবে না। তবু থানার দিকটাও ঠিক রাখতে হল। গোপন সংবাদ তো সেখানেই পৌঁছাবে আগে। পৌঁছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাতে গ্রেপ্তারের আগে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থাটা হয়ে যায়।

মামলায় বিশেষ কিছু না থাক 'চালচিত্র' রচনায় যথেষ্টই কারুকৌশল অবলম্বন করতে হোল কৃপাসিন্ধুকে। গোড়াতেই বলা হয়েছে, আইনের মার-প্যাঁচের চেয়ে এদিকেই তার দক্ষতা বেশী। বড় বড় মামলায় এদিকটা সামলাতেই তাঁর ডাক পড়ে বেশী করে।

এর পর আত্মসমর্পণের পর কৃপাসিন্ধু যা অঘটনটা ঘটালেন তাতে সেটা এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্বের একেবারে পরাকাষ্ঠা। আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন অসুখের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের ডাক্তারি সার্টিফিকেট নিয়ে রঘুর জামীনেরও ব্যবস্থা করে সেদিক দিয়েও ওকে মুক্ত করে রাখা হোল।

খুব ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করেও থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে দশটা দিন লেগেই গেল রঘুর। এর পর থানা থেকে নিয়ে আইনসঙ্গত বিধিবিধানের পথ বেয়ে মামলা কোর্টে পৌঁছাতে সপ্তাহ তিনেক লেগে গেল।

কোর্টে তিলধারণের স্থান নেই।

খুনের মামলা, তার ওপর সাধারণ খুন নয়তো, স্বামী নিজের পরিবারকে খুন করে ফেরার হয়েছিল, আত্মসমর্পণ করেছে। যেমন খুনের কারণ নিয়ে গবেষণা চলেছে কৌতূহলীদের মধ্যে—নগদ-গহনা, পাবার লোভ, স্ত্রীর চরিত্রদোষ, ইত্যাদি, তেমনি কিভাবে খুন করা, তা নিয়েও। এর ওপর লাসের রহস্য নিয়ে একটা আলাদা গবেষণা আছে। কারুর কারুর মতে ওটা স্ত্রীরই লাস, কারুর মতে খুনী, অর্থাৎ স্বামী সে-লাস পাচার করে অন্য লাস টাঙিয়ে রেখে যায়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। এর মধ্যে প্রসাদী-নান্দী একটা জাঁদরেল স্ত্রীলোকের কারচুপি ছিল—এখন আসামী সঙ্গে এক কাকে এসে বলছে, খুন করিনি, এই আমার স্ত্রী, প্রসাদী সাক্ষ্য দেবে। সে এক বিকটদর্শন ধাড়িবাজ স্ত্রীলোক, পাকিস্থান থেকে এখান পর্যন্ত অনেক খেলা খেলেছে।

এমন কথাও তুলছে অনেকে যে প্রসাদী বলে স্ত্রীলোকটা যে সমস্ত নাটের গুরু, সে নাকি পিশাচসিদ্ধ। আসলে লাস বলে কোন বস্তুই ছিল না ঢাকার মধ্যে, ভূতপ্রেত নিয়েই প্রসাদীর একটা ভেল্কিবাজি।

উদ্দেশ্যটা কি?

না, এইসব ডাইন-যোগিনীদের উদ্দেশ্য যদি টের পাওয়াই গেল তো তারা ডাইন-যোগিনী কিসের?

এতটা এগিয়ে যাওয়ারও লোক রয়েছে, যত অল্পই হোক।

খুনী আর খুন-হওয়ারও ওপরে প্রসাদীকে ঘিরে কৌতূহলটা জমাট বেঁধে ওঠায় মামলাটা আরও রহস্যময় হয়ে দেখা দিয়েছে অনেকের কাছে।

(পঁয়ত্রিশ)

এজলাস সাজানো হয়ে গেছে, বিচারকের আসতে যা দেরী। এক সময় তিনি পাশের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে ডায়াসে উঠে আসন গ্রহণ করলেন। দর্শকমহলে যে একটা গুঞ্জন চলছিল, খানিকটা চেপে গিয়ে, ঘরটা থমথমে হয়ে উঠল। নীচের সারে যারা সম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন উকিল-মোক্তারের দল, সংশ্লিষ্ট-অসংশ্লিষ্ট, আবার নিজের নিজের স্থানে বসে পড়লেন। কৃপাসিন্ধুও রয়েছেন। পেসকার উঠে কতকগুলো কাগজে দস্তখৎ নিলেন। কেস-ফাইল সামনে রাখা, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোর্ট দৃষ্টি সামনে তুলে বললেন—"Yes"?

—পাবলিক প্রসিকিউটার, অর্থাৎ সরকারী উকিলকে লক্ষ্য করে। তিনি উঠে প্রস্তুতই ছিলেন, মামলার বিবরণ শুরু করে দিলেন। এই গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যেটুকু বা গুঞ্জন ছিল, তীব্র উৎকণ্ঠার সেটুকুও মিলিয়ে গিয়ে একটা নিটোল স্তব্ধতা এসে পড়ল ঘরটার মধ্যে। সরকারী উকিল শুরু করলেন—অমুক তারিখে অমুক গ্রামে অমুক সামন্তের বাড়ী থেকে থানায় একটা ছৈ-ওলা গাড়িতে গ্রামের চৌকিদার রহমৎ শেখের তত্ত্বাবধানে একটি স্ত্রীলোকের লাস এসে পঁহুছে, গাড়ি হাঁকিয়ে এনেছে বাড়ীর ভৃত্য ভৈরব পাল। লাস আপাদ-মস্তক ঢাকা, মৃত্যুর কারণ বলা হয় গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যা। ঢাকা অপসারণ করাতে, গায়ের মুখের নানা স্থানে ক্ষতচিহ্ন দেখে বিশেষ করে কাঁধের নীচে একটা চাপা গভীর দাগ দেখে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় কেসটা নিছক আত্মহত্যা নয় পরন্তু ভোঁতা কোনও অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে মৃত্যু ঘটিয়ে, গলা টিপে ঘরের কড়িকাঠে টাঙিয়ে রাখা হয়।

প্রকাশিত হ'ল

ডাউন গুজরাট মেল

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য উপন্যাস। দাম ৬·০০

কুইন্স পার্ক মিস্টি

সুনীলকুমার ঘোষের সাম্প্রতিক রহস্যোপন্যাস দাম ৫·০০

জাল সপাই

চিরঞ্জীব সেনের নতুন স্বাদের রহস্য উপন্যাস। দাম ৭·০০

ঝড়ের রাতে

নিশাচরের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী। দাম ৫·০০

চাঁপা ডাঙ্গার বউ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পকেট বই। দাম ২·০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স । ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

লাস যথারীতি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দিয়ে থানার দারোগা সেই দিনই বিকালে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করে দেন। আসামী সেদিন, ও ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণ অনুযায়ী, কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বাড়ি ছিল না।

এর পর তদন্তের ফল, ময়না তদন্তের ফল, ঘটনা-নির্দিষ্ট অনিবার্য সংশয়ে মৃতের স্বামী রঘু সামন্তের নামে হুলিয়া পর্যন্ত—দীর্ঘ বিবরণ শেষ করে সরকারী উকিল বললেন, ফেরারী আসামী অমুক তারিখে, অমুক সময় হঠাৎ থানায় উপস্থিত হয়ে, আত্মসমর্পণ করেছে। তার বক্তব্য এবং দাবী সে আদৌ খুন করে নি তার স্ত্রীকে, স্ত্রী গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যাও করে নি, আসামী ঘটনাচক্রে সন্দেহের ভাগী হয়ে আত্মগোপন করেছিল। প্রায় বৎসর খানেক পরে নিতান্ত দৈবযোগেই তার জীবিতা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ায় তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছে।

বিবরণ শেষ হওয়ার পর যথারীতি একে একে দারোগা, রহমৎ প্রভৃতি সরকারী পক্ষের সাক্ষীর এজাহার নেওয়া হল। প্রতি-পক্ষের জেরাও হয়ে গেল। বাকি রইল প্রসাদী, মূলত যার অভিযোগ সরকারী পক্ষে মামলা রুজু হয়, সুতরাং যে একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

প্রসাদীর ডাক পড়ল।

সমস্ত কোর্ট-ঘরটা আবার নতুন করে সজাগ হয়ে উঠল। খুনের কৌতূহলটা তরল হয়ে গিয়ে সবার উত্তেজনাটা লাস-রহস্যায় এসে জড়ো হয়েছে, এর চাবিকাঠি প্রসাদীর হাতে। তার অলৌকিক শক্তি আর আকার-প্রকার সম্বন্ধে আরও গুজব একত্র হয়ে দর্শকেরা আরও যেন কৌতূহলে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

সিধে চালে এসে নিঃসংকোচ পদক্ষেপে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল প্রসাদী থাড়া হয়ে। ধপধপে থান কাপড়, ওসারে একটু খাটো বলে পায়ের গোছের কাছে খানিকটা খালি। একটু চোয়াল-উঁচু কঠিন মুখের বেড়। খাঁড়ার মত নাক। কোটরের মধ্যে চোখ দুটো জ্বলছে। সব মিলিয়ে বেশ একটা পুরুষালি ভঙ্গি। লাস-রহস্য আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সরকার কাছে। ভূতুড়ে কাণ্ডের বিশ্বাসটা আবার জেগে উঠল কারুর কারুর মনে।

প্রসাদীর এজাহার জমে উঠল আরও কয়েকটা কারণে যার জন্যে ওর ব্যক্তিত্বটাও আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো সব দিক দিয়ে। একে তার এই পরুষ কতকটা চ্যালেঞ্জের ভাব, তার ওপর—আইনের দৃষ্টিতে যাই হোক, কার্যত বিপক্ষে বলেই সরকারী উকিল সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠে মন-মেজাজ ঠিক নেই। একটু জটিলতা এসে পড়ল অন্য কারণেও। প্রসাদীর মূল অভিযোগই সরকারী মামলার ভিত্তি হলেও, রঘু-থাকোমণির আসার পর তার থানায় এজাহার বস্তুত সরকারী মামলার ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছে, যাতে বলতে গেলে, সে এখন কার্যত বিপক্ষেরই, অর্থাৎ আসামী পক্ষেরই সাক্ষী, তার ভাবগতিকও সেইরূপ। সুতরাং তার এজাহারে তাকে যে বিশেষ সতর্কভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একথা কোর্টকে জানিয়েই অগ্রসর হলেন সরকারী উকিল।

একটু ভুলও করে বসলেন।

আর সবার এজাহারের পর একটু বিশ্রামের জন্যই হোক বা নিজের সহ-কারীকে একটু সুযোগ দেওয়ার জন্যই হোক, তাঁকেই তুলে দিলেন প্রসাদীর এজাহার নিতে। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন জুনিয়র এডভোকেট। কৃত্রিম বা স্বভাব-সিদ্ধ যাই হোক, উদীয়মান আইনজীবীর একটা স্টাইল আছে—হয়তো পদগৌরবের জন্য একটু বেশিই—একটা চনমনে ভাব। চোখে কালো-ফিতে বাঁধা 'পেঁসনে' চশমা। সেটা মাঝে মাঝে ডান হাতে নামিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় নাচাবার একটা অভ্যাস আছে।

—কোনটাই প্রসাদীর বরদাস্ত হবার মতো নয়, বিশেষ করে মনের এই অবস্থায়।

শপথ গ্রহণ আর প্রাথমিক প্রশ্নাদি শেষ হলে সহকারী উঠে 'পেঁসনেটা' নামিয়ে মুছে নিয়ে আবার নাকের ওপর কসিয়ে নীচে কাগজটা দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—

'প্রসাদী দাসী, তাই না? বেশ। আমার কথাগুলোর ঠিক ঠিক জবাব পাবো তো?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিল প্রসাদী, বলল—'শোন কথা। মিথ্যে কথা বলবার জন্যে শপথ করলুম?'

'ও, তাও তো বটে! মনে ছিল না।' অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন সহকারী, একটু রহস্যের ভান করে। বললেন—'আচ্ছা, থানায় যা যা বলে এসেছ সেসব তোমার কথাই তো?'

'নাও, আবার সেই কথা! বললুম তো ...'

এবার কোর্টের দিকেই ঘুরে আরম্ভ করেছে—সহকারী বাধা দিয়ে বললেন—'তাহলে তোমারই কথা। বুঝলাম।... বেশ ভেবে বলো। আর ছোট করে—হ্যাঁ, কিম্বা না।'

'সেই রকম জিজ্ঞেস করলেই হয়।' কোর্টের দিকেই মুখটা ফেরাতে গিয়ে বেঞ্চের দিকে সাধারণভাবে চেয়ে উত্তর করল প্রসাদী। বলল—'আমায় ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করলে আমি কেন মহাভারত এনে ফেলতে গেলুম গা?'

বেঞ্চের অনেকে কৌতুকে মাথা দোলালো। মাঝখান থেকে একটা অপ্রত্যাশিত টপ-ভাগের সামগ্রী এসে পড়ায় দর্শকরাও হয়ে উঠেছে কৌতুক-চঞ্চল।

'না তোমার মহাভারত শুনতে আমরা কেউ আসিনি নিশ্চয়।'

সহকারী এবারও একটু রসিকতার ভাব এনে কথাটা হালকা করে ফেলবার চেষ্টা করলেন। পেঁসনেটা নামিয়ে দোলাতে দোলাতে বললেন—'ঘটনার দিন দারোগাকে যা বলেছ, আর রঘু-থাকোমণি ফিরে এলে যা বলেছ দুটোই তো তোমারই কথা?...হ্যাঁ, কিম্বা না।'

—তর্জনীটা তুলে ধরলেন।

প্রসাদী একটু ব্যাজার হয়েই বিমূঢ় দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল সবার ওপর দিয়ে। বলল—'ভালো এক 'হ্যাঁ-না'র পাল্লায় পড়া গেল তো! আগে যা বলেছি, তারপর ওরা ফিরে আসতে যা বললুম—এক কথায় 'হ্যাঁ-না' বললেই খোলসা হয়ে যাবে?'

সরকারী উকিলকে উঠতে হল।

সহকারীর গাউনে ইসারায় একটু টান দিয়ে বসিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কতকটা ওঁর মুখ রাখবার জন্যেই কোর্টের দিকে চেয়ে ইংরাজিতে বললেন—

A "very obdurate witness your honour'

(বড় একগুঁয়ে সাক্ষী, ধর্মাবতার)

কোর্ট একটু মৃদু হেসে বললেন—

"So it seems. She must not be scratched the wrong way".

(তাই মনে হয়। ঘাঁটিয়ে তুলে দরকার নেই)

সরকারী উকিল প্রসাদীর দিকে চেয়ে বললেন—'ঘটনার দিন তুমি দারোগার কাছে যে এজাহার দাও, তারপর রঘু-থাকোমণি ফিরে এলে যা বল দুটোর মধ্যে কোনই মিল নেই। এটা কেন হল?'

'হ্যাঁ, না' করেই বলতে হবে?'

'না, তা কি করে হবে? যেমন চাও বলো তুমি।'

সরকারী উকিল উঠতেই মুখের ভাবটা নরম হয়ে এসেছিল প্রসাদীর, আরও শান্ত হয়ে এল। একটু চোখ ঘুরিয়ে ভাবতে দেখে উনি প্রশ্ন করলেন—'মনে করিয়ে দিতে হবে?'

'না, নিজেই বলেছি, মনে করিয়ে দিতে হবে কেন?'—শান্ত কণ্ঠেই বলল প্রসাদী, শুধু একবার সহকারীর দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনল।

'তাহলে বলো।'

—সরকারী উকিল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

'দারোগাকে আগে যা বলি সেটা বাড়ির মান বাঁচাবার জন্যে।'

'মান বাঁচানোটা কি?'

'গেরস্তঘরের বউ, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না,

উঠোনে একটা আমগাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, তার নীচে চাপা পড়েনি, সোতরাং কথা দাঁড়াবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। অপবাদের কথা নয়?'

'তারপর?' —কোর্টের লেখা শেষ হলে প্রশ্ন করলেন সরকারী উকিল।

'তারপর থাকোমণি সোয়ামীর সঙ্গে ফিরে আসতে যখন দেখলুম, সে বেঁচেই

রয়েছে, সব শুনে যখন বুঝতে পারলুম কোনও কল্পকেচ্ছার কথা নয়, হলে পেয়ারীও তাকে ফিরিয়ে আনত না ঘরে, তখন আদৎ কথাটাই বললুম, বলতে বাধা রইলো না বলেই।'

'বেশ'—বলে সরকারী উকিল একটু চিন্তা করে নিলেন। তারপর বললেন—'আপত্তি না থাকলে সমস্ত ঘটনাটা আবার হুজুরকে একবার শোনাতে পার?'

কোর্ট ইংরাজিতে বললেন—

"When this episode has no particular relevence to the main issue, why drag it uselessly?"

(আসল মামলার সঙ্গে এ কাহিনীর যখন বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই তখন বেশি টেনে নিয়ে যাওয়া কেন?)

সরকারী উকিল উত্তর করলেন—

"Witness appears to be rather imaginative, your honour. I would like to place before you how far one statement may differ from the other. For, that may chance to throw some fresh light on the case

(সাক্ষী একটু কল্পনাপ্রবণ মনে হচ্ছে, ধর্মাবতার। আমি হুজুরের সামনে উপস্থাপিত করতে চাই ওর একটা জবানবন্দী অন্যটার চেয়ে কতটা প্রভেদ হতে পারে। তাতে এই মামলার ওপর হয়তো নতুন আলোকপাত করতে পারে)

কোর্ট একটু মৃদু হেসে বললেন—

"Well, please satisfy yourself then, but better not interrupt her too much"

(নিন ধোঁকা মিটিয়ে তাহলে, তবে বেশি বাধা না দেওয়াই ভালো)

সরকারী উকিল প্রসাদীর দিকে চেয়ে বললেন—'যা বলছিলাম—পরে যা বলেছ সেটা আবার বলতে আপত্তি আছে কি?'

'একেবারেই নয়। সেখানে যখন বানিয়ে বলিনি তখন এখানে বলতেই বা বাধাটা কিসের?'

এরপর বিশেষ কিছু হল না। প্রসাদীর কাহিনীটা অস্বাভাবিক মনে হলেও এতো স্বাভাবিক যে কৃপাসিন্ধু মোক্তারকে তাতে হাত দিতেই হয়নি একরকম—বেশ সহজ কণ্ঠে সত্যের সহজ প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে গেল প্রসাদী—

'দিনটা সকাল থেকেই বাদলে ছিল। রঘুর ক'দিন থেকেই খবর নেই—সবারই মনটা খুব খারাপ, তার মধ্যে—যেমন হবারই কথা—থাকো যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছে, সেদিন দুজ্জোগের দিন বলেই আরও বেশি করেই। বেশ ভয় পেয়েই গেলুম আমি। যে-মহালে যায় রঘু সেখানে ভৈরবকে দুবার পাঠানো হয়েছিল। দেখা পায়নি।

চাপা মেয়ে থাকো ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে, এভাবে একেবারে হতাশ হয়ে পড়লে মেয়েছেলে সবই করতে পারে, আশুহত্যে পজ্জন্ত, এটা তো বুঝি, চোখে চোখে রেখে যাচ্ছি ওকে। দুজ্জোগটা বেড়েই চলেছে ইদিকে। খেলে না। জোর করে বসাতে যা খেলে তা না খাওয়াই। দুজনের ঘরের মাঝখানে একটা দরজা খোলাই রেখেছি। একবার উঠে দেখি, খাটটা খালি। লণ্ঠন নিয়ে বেরিয়ে দেখি সেই দুজ্জোগে বারান্দায় চুপ করে বসে আছে টেনে নিয়ে নিবে জামা কাপড় ছাড়িয়ে শুইয়ে দিলুম।

ক'দিন থেকে আমারও ওপর দিয়ে খুব একটা ধকোল যাচ্ছে। তার ওপর দুজ্জোগ তো নয়, যেন মন্বন্তর-পেল্লয় এসে পড়েছে। বজ্জের গজ্জন, তার বিরেম নেই। আশেপাশে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে। উঠে থাকোর ঘরে গিয়ে দেখলুম সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনটা চঞ্চল, জেগেই যাতটুকু কাটাব ভেবেছিলুম, কিন্তু আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। যখ্য ছাঁৎ করে ভাঙল ঘুমটা, তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি থাকোর বিছানা আবার খালি। তখন জল-ঝড়ের দাপট খানিকটা কমেছে। তবে, যেমন হয়, চিক্কুর হানছে খুব ঘন ঘন। বাইরে লণ্ঠন থাকে না, ঐ বিদ্যুতের ছাড়া ছাড়া আলোতে ভেতর-বার তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। সেই ঝড়ের ওপর আওয়াজ তুলে ডাকলুম। কোথাও থাকোর সাড়াশব্দ নেই। তখন একেবারে উন্মাদের মত হয়ে গেছি আমি। সদর দরজার বাইরেই আটচালায় ভৈরব ঘুমোয়। নেশার অব্যেস আছে। সেদিন বাদল দেখে আরও নেশা করে মড়ার মতন পড়ে আছে। কোনও মতে তুলতে পারলুম। না। কি করি? কিছু মাথায় আসছে না। থাকো বাড়িতে কোনখানে নেই, জ্যান্ত কি মরা। এদিকে ব্যাতই সময় যাচ্ছে ত্যাতই বিপদ যাচ্ছে বেড়ে। ক'বারই ঘর-বার করে শেষকালে বেরিয়ে পড়লুম খিড়কি দিয়ে জঙ্গলের দিকে। আমিও তখন পাগলের মতন হয়ে গেছি, তবে এটুকু জ্ঞান আছে গেরস্তর বৌ, পাগলই হয়ে যাক, কি যাই হোক, গ্রামের রাস্তা ধরবে না, খিড়কি হয়ে আগাছার জঙ্গলে জঙ্গলে গ্রামের সীমানা পেরিয়ে তারপর যা করবার তা করবে। মহালে রঘুর রুদ্দেশ করে যে বেরিয়েছে থাকো, তাতে তো আর সন্দো থাকে না।

আমি খিড়কির কলাবাগানের মধ্যে দিয়ে উঠে পড়ে এগুলুম। মাঝে মাঝে নাম ধরে চেঁচাচ্ছি। ও দিকটা এক নিধু মালাকারের আর অন্য দু-একটা ঘর ছাড়া আর বসত নেই। উঠে পড়ে এগুচ্ছি। বিদ্যুতের আলোয় সুমুখে দেখে দেখে। তাতে যেন চোখ ধাঁধিয়েই দিচ্ছে আরও। তারপর গড়গড়িদের আমবাগান পেরিয়ে মালাকারের উঠোনে পা দোব ঠিক সেই সময় এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকে উঠতে একেবারে আঁৎকে উঠলুম—একটা লাস! —প্রায় মাড়িয়েই ফেলেছিলুম—'মা থাকো' বলে একেবারে আছড়ে পড়লুম।

একটু চুপ করল প্রসাদী।

সরকারী উকিল প্রশ্ন করলেন— 'থামলে যে?'

একটু যেন বিভ্রান্ত হয়েই চোখ ঘুরিয়ে চাইল প্রসাদী। কিসের যেন একটা চেষ্টা। তারপর বলল—'আমি এখানটা ঠিক গুছিয়ে মনে করতে পারছিনে। এরপর একেবারে যা মনে পড়ছে—আমি সেই লাস কাঁধে ফেলে বন-বাদাড় ভেঙে এগুচ্ছি..'

সরকারী উকিল বললেন—'একটা গোটা মানুষের লাস পারলে তুমি বয়ে আনতে?'

ডাবাসের দিকে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে ঠোঁটের কোণে একটু হাসলেন সরকারী উকিল।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনষ
১০০% খাঁটি হয়

'ডাঁটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক' যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

প্রসাদী বলে চলল—'কী করে যে পেরেছিলুম আমারই অবাক লাগে। ঘাড়ে যেন একটা ভূত চেপেছে আসতেই হবে কোনও রকমে। তবু খানিকটে যে ক্ষ্যামতা আছে ঝোঁকের মাথায় এটা তো আমায় দেখে মানতেই হবে। কিছু গুমোর করছিনে।'

এবার শরীরটাতে ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিল প্রসাদী তারপর আবার বলে চলল—'এরপর যা হোল, তাতে তো এমন কিছু দাঁড়ায়ও না যে খুব একটা ভেলকি দেখিয়েছি। বাড়িতে এসে হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন জেবলে দেখি—থাকো নয়। মালাকার পেশ্যদার সিঁদেল; কুমতলবে নিজের ভাইঝি বলে পরচে দিবে কোথা থেকে যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিল—দুদিন এসেও ছিল আমাদের বাড়ি—সেই মেয়েটা। বয়স এই বছর কুড়ি-বাইশ হবে। ক্ষীণজীবী ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একটু খাটো বলে যেন ষোলো-সতেরোর বলে মনে হয়—কী যেন নাম বলেছিল একটু হাল ফ্যাসানের মনে নেই—সেই মেয়েটা। হালকাই, তাই অতটা মেহনৎ হয়নি।

কয়েক জায়গায় থেঁতলে গেছে কাঁধের এক জায়গায় যেন বেশি তা ভিন্ন চোট বাইরে খুব বেশি নেই। মনে হয় চাল ভেঙে পড়ছে দেখে বাইরে বেরিয়ে এসে গাছের ডাল ভেঙেই হোক বা যা করেই হোক, একটা চোরা আঘাত খেয়ে মরে পড়েছিল, আগে যেমন ভেবেছিলুম থাকোই দিশেহারা হয়ে যেতে যেতে যা করে গেছে মারা।

থাকো নয়, যেখানেই থাকুক, মরেনি তাহলে—এই কথাই যে কেন মনে হোল তা ঠিক বলতে পারব না। তবে, আর তার খোঁজে বেরুতে কেমন যেন তাগিদ পেলুম না মনের দিক থেকে। তা ছাড়া খুব ক্লান্তও হবে পড়েছি, মনটাও ঝিমিয়ে পড়েছে। মেয়েটার লাসের সামনে চুপ করে বসে আছি নানারকম ভাবনা। কখনও মেয়েটার দিকে চেয়ে বসে আছি, তার কথাই এলোমেলো ভাবছি কখনও থাকোর কথা মনে পড়ছে—তারপরে হঠাৎ একটা খেয়াল হোল—থাকো গেছে তো জন্মের মতনই গেছে—এ দুজ্জোগে ফিরতেও হবে না, কোথাও গিয়ে উঠতেও হবে না, মাঝখান থেকে সামন্ত-বাড়ির একটা কলঙ্কই তো? এক কাজ করলে কেমন হয়? মেয়েটাকে ঝুলিয়ে যদি রটিয়ে দিই যে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তো কেমন হয়? আমার য্যাতই জেবা করা হোক, আমি সে সময়ের মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারব না কী যে এলোমেলো অবস্থা যাচ্ছে? তবে, ভালো হোক, মন্দ হোক, একটা যেন কাজ পেলুম তাইতে আর এক ঝোঁক সেই ভূতে পাওয়া ক্ষ্যামতাটাও।... হ্যাঁ একটা কথা ভুলে যাচ্ছি—গলায় দড়ির কথাটা আরও এই থেকে মনে পড়ল যে, ঘাড়ের কাছটা থেঁতলে দিয়ে জিভ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে মেয়েটার।

তখন একেবারেই শেষ রাত। খুব হালকা একটু একটু আলো দেখা দিয়েছে। আমি যোগাড়যন্ত্র করে, দুদিকের দরজাই ভালো করে বন্ধ করে এসে টাঙিয়ে দিলুম মেয়েটাকে। তারপর ভৈরবকে ঠেলে ঠেলে তুললুম। তারপর দারোগাকে যা বলেছি।'

সমস্ত ঘরটায় এমন সুচ পড়লে তার শব্দটা শোনা যায়। প্রসাদী যেন একটু দম নেওয়া গোছের করে থামল। তারপর সরকারী উকিলের দিকে মুখ করে প্রশ্ন করল—'মিলেছে?'—একটু ব্যাঙ্গের টোনেই।

সরকারী উকিল একটু ফিকে হেসে বললেন—'তা একরকম মিলিয়েছে বৈকি।'

—হাসি উঠল একটু।

'আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন, না, নেমে যাব?'

'না, আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই'?

পাশে তাঁর সহকারী একটু মাথাটা ঘেঁসিয়ে এনে ফিসফিস করে মুখ ঢাকার কথা নিচু কি বলতে যাচ্ছিলেন, সরকারী উকিল নীচু গলাতেই বললেন—'থাক।'

—বসে পড়লেন।

আসামীপক্ষের উকিল উঠলেন জেরার জন্য।

'দু মিনিট। তুমি লাসের মুখের ঢাকা খুলতে দাওনি। সব সাক্ষীই বলেছে। খুলতে গেলেই কেঁদে লাসের ওপর আছড়ে পড়ে বলেছ—ভয়ানক দৃশ্য!'

'ভয়ানক দিশ্য তো বটেই—তবে...'

'হ্যাঁ তবে?' নির্ভয়ে বলো। আমার ওদিকের বন্ধুর যেন খটকা লাগছে—বানিয়ে বলার প্রমাণ খুঁজছেন তো?'

'ঢাকা খুললে সামন্তবাড়ির মান বাঁচাতে যা করেছি—লুকুনোও তো নয়—সেটা টেঁকতো?'

'আর একটা কথা—আমাদের খটকা লাগে বৈকি। আমার ও তরফের বন্ধু দুজনের তো লাগবেই—একটা গোটা লাস, মানুষ মারা গেলে আরও ভারীই হয়ে যায়, তা তুমি পারলে আনতে একলা কাঁধে করে?'

'বলেছি তো সে কথা।' —এরপরেই সরকারী উকিলের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে—'না প্রেত্যয় হয়, কেউ মরে দেখুক না, পারি কিনা।'

এবার হাসিটা সবারই হবে উঠল। নেমে এল প্রসাদী।

আসামীপক্ষের সব সাক্ষীই রঘুর দুর্ব্যবহার ও ক্ষীরোদা-ঘটিত ব্যাপার অস্বীকার করল, বা সে-সম্বন্ধে অজ্ঞতা জানাল। ইতিপূর্বে সরকারী পক্ষের সাক্ষীও প্রায় সবাই কৃপাসিন্ধুর কি অজ্ঞাত ব্যবস্থায় গোলমাল করে বলায় মামলা দুর্বল হয়েই ছিল, আরও অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ল।

থাকোমণি-ঘটিত কাহিনীটা রোমাঞ্চকর হলেও জটিলতাবর্জিত, সুতরাং তাতে বিশেষ পরিবর্তন দরকার হয়নি কৃপাসিন্ধুর, যা প্রকৃত তারই কাছাকাছি রাখা হয়েছে। এমনভাবে সাজানো হয়েছে কাহিনী যে, তাকে বেশি জেরার সম্মুখীন হতে হল না। যেটুকুই বা হল, সহজভাবেই কাটিয়ে যেতে পারল, এবং সত্যের ছাপ থাকায়, ও যে সত্যই রঘুর স্ত্রী থাকোমণি, যা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে এসেছিল, একেবারেই সন্দেহাতীত হয়ে গেল।

এরপর কোর্ট কাঠগড়ায় আসামী রঘুর দিকে চেয়ে বললেন—'সব শুনলে; তোমার কিছু বলবার আছে কি?'

'না, ধর্মবতার'—রঘু করজোড়ে বলল। —'আমার যা বলবার লিখেই দোবো। উপস্থিত আমার স্ত্রী তো সামনেই দাঁড়িয়ে।'

এরপর বিধিবিধান সংক্রান্ত বাকি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে সেদিনের মতো এজলাস উঠে গেল।

দিন সাতেক পরে রায় বেরুল—সাক্ষ্য এবং ঘটনাপরম্পরা বিচার করে থাকোমণির যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না কোর্টের সেক্ষেত্রে হত্যার অভিযোগও ভিত্তিহীন। সুতরাং আসামী বেকসুর খালাস।

একটি দুর্যোগের রাত্রি থেকে শুরু হয়ে যে মসীঘন করাল ছায়া সামন্তবাড়ীর ওপর এসে পড়েছিল, সেটা সবে গিয়ে একটা নতুনতর আলোয় ধীরে ধীরে জেগে উঠছে সামন্তবাড়ী। সে রঘু নেই। সুতরাং থাকোমণিও আর ঠিক সে থাকোমণি নয়। প্রসাদী অবশ্য সেই প্রসাদীই রয়েছে বাড়ি মহাল সামলে, তবে, সুর ধরেছে—'আর কেন? বেচু এসে পড়েছেই—দুই সাঙাতে সামলাক্—আমায় এবার রেহাই দিক। দুজনে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে তিম্বি-ধম্ম করে এল—অথচ আমারই তো পাওনা.....'

বেচারামকে অবশ্য চাকরি থেকে ছাড়িয়ে এনেছে রঘু, তবু ভয়ই পায়। থাকোমণিকে বলে—'আমার...কি যে বলে...অনব্যেসের ফোঁটা...তুমি পিসিকে বুঝিয়ে বলো...'

থাকোমণি তাচ্ছিল্যের হাসির সঙ্গে বলে—'বকে যেতে দাও না—যাওয়া কথার কথা কিনা। তোমার অনব্যেসের ফোঁটা, ওর এদিকে পায়ের শেকল, যাক না ছিঁড়ে পারে তো।'

(সমাপ্ত)

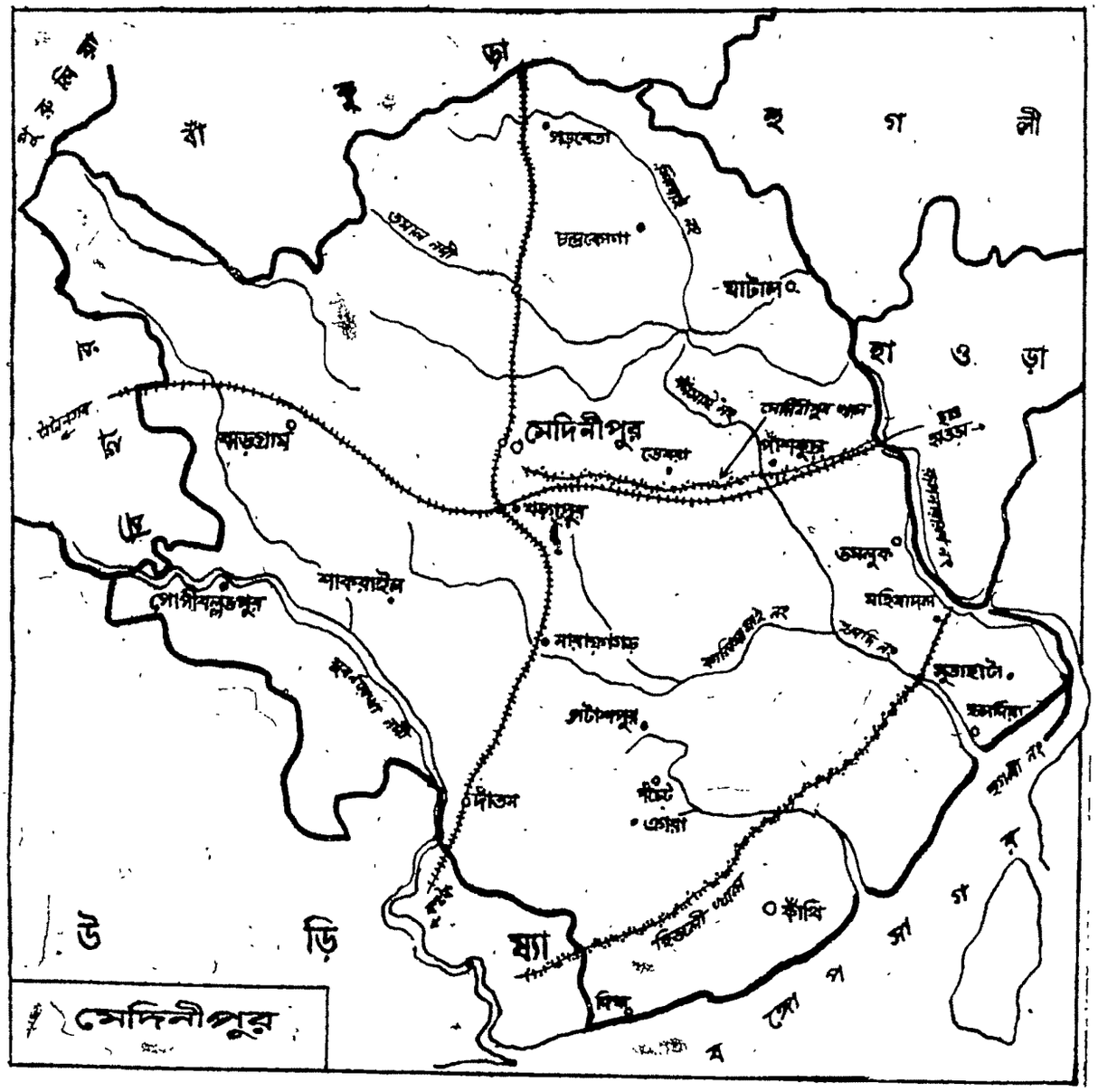

এই আমাদের দেশ

মেদিনীপুর—(১)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার মূলে রয়েছে মেদিনীপুরের অকৃপণ আত্মদান। আসমুদ্র-হিমাচল বিস্তৃত বিশাল এই দেশে বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রথম বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল মেদিনীপুরের ছেলে ক্ষুদিরামের হাত দিয়ে। পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মেরে হ্যাটট্রিক করার অনন্য কৃতিত্বও মেদিনীপুরের। আবার গণ-আন্দোলনেরও পথ দেখিয়েছে মেদিনীপুর। মুক্তির উন্মাদ আগ্রহে মৃত্যুভয়হীন মেদিনীপুরের হাজার হাজার মানুষ জাতীয় পতাকাতলে সমবেত হয়ে আইন অমান্য করেছে, পাল্টা সরকার গঠন করেছে, ইংরেজ সৈন্যদের উদ্যত বেয়নেটের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে বলেছে—তোমাদের শাসন মানি না।

সে ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে ইংরেজ, নির্বিচারে গণহত্যা করে, পেট্রোল ঢেলে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে বহ্নুৎসব করে। অত্যাচারের স্টীমরোলার চালিয়ে ওরা ভেঙে গুঁড়িয়ে শেষ করে দিতে চেয়েছে মেদিনীপুরকে। কিন্তু মৃত্যুর মধ্যে থেকে আবার জেগে উঠেছে মৃত্যুঞ্জয়ী মেদিনীপুর; আর আবার মেতেছে রক্তের হোলিখেলায়।

মেদিনীপুরের এই অনমনীয় দার্ঢ্য ও অপরাজেয় পৌরুষের দুই প্রতীক—বিদ্যাসাগর ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমল। শত বিপর্যয়ের মধ্যেও তাঁরা হার মানেন নি, আর তাঁদের জন্য মেদিনীপুরের মানুষও কখনো হার মানতে শেখেনি।

মেদিনীপুর জেলা গঠন সম্পূর্ণ হয় ১৮৭২ সালে। তার আগে জেলার একটি বড় অংশ হুগলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঝাড়গ্রামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিচিত ছিল জঙ্গলমহল নামে। অন্যান্য অংশ ছিল শক্তিশালী সামন্ত জমিদারদের অধীনে। এমনই এক শক্তিশালী রাজপুত বংশীয় সামন্ত শোভা সিংহ, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দুর্বল মোগল শাসকদের পর্যুদস্ত করে বর্ধমান, হাওড়া পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তার করেছিলেন। শোভা সিংহের জমিদারি ছিল চেতুয়া পরগণায়। তারপর তিনি পরগণা দখল করে তিনি অধিকার বিস্তার

বিদ্যাসাগরের পৈতৃক-বাড়ি

করেন। পরে চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিংহ, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহ ও ওড়িশার পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে একজোট হয়ে তিনি ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান দখল করেন। বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণস্বামী তাঁর হাতে নিহত হন। বর্ধমানের পর হুগলী শোভা সিংহের অধিকারে আসে, তখন হাওড়া সম্পূর্ণ হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ দখলের পর শোভা সিংহের সরকার হুগলীতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত ইউরোপের বণিকদের কাছ থেকেও শুল্ক ও সেলামি আদায় করতে থাকেন। ঐ সময় এক রহস্যজনক কারণে, প্রচলিত কাহিনী অনুসারে, বর্ধমানের নিহত রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার ছুরিকাঘাতে শোভা সিংহ নিহত হন ও সেই সঙ্গে তাঁর স্বাধীন রাজ্যেরও অবসান ঘটে।

মির জাফর যেমন বাঙালীর নবাব হওয়ার পর সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজদের চব্বিশ পরগণা উপঢৌকন দেন, মির কাসেম তেমনই দেন মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমান। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাব মির কাশিমের ঐ হস্তান্তর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৩৫-২০৫৯।

কিন্তু ঐ সময় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার সবটুকু ইংরেজ অধিকারে আসেনি। কাঁথি মহকুমার পটাশপুর থানা তখন ছিল ওড়িশার অন্তর্গত ও ওড়িশা ছিল মারাঠাদের শাসনাধীন।

মেদিনীপুর ইংরেজ শাসনাধীনে আসার প্রায় চার দশক পরে সেখানে একটি ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটে যা চুয়াড় বিদ্রোহ নামে খ্যাত। চুয়াড়রা ছিল জেলার আদিবাসী এবং বেশিভাগই জঙ্গলমহল অঞ্চলের লোক। তারা স্থানীয় জমিদারদের পাইক বরকন্দাজের কাজ করত এবং বেতনের বদলে নিষ্কর জমির উপস্বত্ব ভোগ করত। ঐ জমিকে বলা হত পাইকান। ইংরেজ সরকার ভূমি সংস্কারে তৎপর হলে ঐ চুয়াড়রা জমিহারা হয় এবং তাই থেকেই শুরু হয় চুয়াড় হাঙ্গামা। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ হাঙ্গামা শুরু হওয়ার পর দাবানলের মতো মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পুরুলিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় জমিদারদের প্ররোচনায় ঐ বিদ্রোহ এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে ইংরেজের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর পক্ষে তা দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়। কাছাড়ি লুঠ করা, ইংরেজ সরকারের প্রহরী ও সৈন্যদের হত্যা করা ও মাঝে মাঝে এক-একটি এলাকা দখল করে নিজেদের শাসন কায়েম করা ঐ বিদ্রোহীদের প্রধান কর্মসূচী ছিল। ডাকাতি, খুন, লুণ্ঠন তখন ঐ এলাকায় প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। চুয়াড়দের নিষ্ঠুর আচরণের জন্যই পরবর্তীকালে চুয়াড় শব্দের অর্থ দাঁড়ায় বর্বর, নিষ্ঠুর। চুয়াড় বিদ্রোহ সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে ১৮১৬ সালে।

চুয়াড় বিদ্রোহের পর একে একে লায়েক বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও সাঁওতাল বিদ্রোহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চল অশান্ত ও উত্তপ্ত করে রাখে।

জেলার পরিচয়

জেলার নাম মেদিনীপুর হওয়ার কারণ সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক লিপিতে মেদিনীপুর নামের উল্লেখ মেলে না। মোগল সম্রাট আকবরের অর্থসচিব তোডরমল বাংলাকে যে উনিশটি চাকলায় ভাগ করেন তার মধ্যেও মেদিনীপুর বা তার অন্তর্গত কোন স্থানের নাম মেলে না। হয়ত তখন এই এলাকায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি।

মেদিনীপুর নামকরণ সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুসারে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই জেলায় প্রাণকর নামে এক শক্তিশালী সামন্ত ছিলেন। সেই সামন্তের পুত্র মেদিনী করের নামানুসারে জেলার নাম হয় মেদিনীপুর। অপর মত অনুসারে, মেদিনীমল্লরায় নামে ওড়িশার এক প্রতাপশালী নৃপতি ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জয় করেন ও 'মেদিনী' বংশের শাসন কায়েম করেন। ঐ মেদিনী বংশীয় রাজাদের শাসনকালেই তাঁদের শাসিত এলাকা মেদিনীপুর নামে পরিচিত হয়।

১৮৭২ সালে মেদিনীপুর জেলা গঠিত হওয়ার পর থেকে তার আয়তনের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। ঐ সময় ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা হুগলী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার আগে, ১৮৩৬ সালে হিজলীর ভোগরাই ও আরও দুটি পরগণা এবং ১৮৭০ সালে জলেশ্বর ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল মেদিনীপুর জেলা থেকে নিয়ে ওড়িশার বালেশ্বর জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর ১৮৩৩ সালে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল ছাড়া বাকি এলাকা বিহারের মানভূম জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত, পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত মেদিনীপুর জেলার উত্তরে রয়েছে বাঁকুড়া ও হুগলী জেলা, কেবল উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি সঙ্কীর্ণ ফালি পুরুলিয়া জেলা স্পর্শ করেছে। পূর্বে হুগলী ও রূপনারায়ণ নদীর ওপারে রয়েছে হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা। সমগ্র দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। আর পশ্চিম সীমান্তে রয়েছে ওড়িশা ও বিহার রাজ্য।

জেলার আয়তন ৫,২৫৩ বর্গমাইল (১৩,৬১৮ বর্গ কিলোমিটার)। পশ্চিমবঙ্গের ১৫·৪ শতাংশ স্থান নিয়ে গঠিত মেদিনীপুর আয়তনে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। চব্বিশ পরগণা এই জেলার চেয়ে সামান্য কয়েক বর্গমাইল বড়।

মেদিনীপুর জেলা পাঁচটি, কার্যত ছটি মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমাগুলির নাম— মেদিনীপুর (সদর), ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, কাঁথি ও তমলুক। এর মধ্যে সদর মহকুমাকে প্রশাসনিক প্রয়োজনে দুভাগ করা হয়েছে। জেলায় মোট থানার সংখ্যা ৩৪।

সদর (উত্তর) মহকুমার থানা হল— মেদিনীপুর, শালবনী, কেশপুর, গড়বেতা ও দেবরা। সদর (দক্ষিণ) মহকুমার থানা— সবং, পিংলা, খড়্গপুর লোকাল, খড়্গপুর

শহর, নারায়ণগড়, দাঁতন, মোহনপুর ও কেশিয়ারি। উভয় বিভাগেরই সদর শহর মেদিনীপুর। মেদিনীপুর জেলারও সদর শহর। ঝাড়গ্রাম মহকুমার থানা—ঝাড়গ্রাম, জামবনি, বিনপুর ও গোপীবল্লভপুর, এই মহকুমার সদর শহর ঝাড়গ্রাম। ঘাটাল মহকুমার থানা—ঘাটাল, দাসপুর ও চন্দ্রকোণা; এই মহকুমার সদর শহর ঘাটাল। কাঁথি মহকুমার থানা—কাঁথি, খেজুরি, ভগবানপুর, পটাশপুর, রামনগর ও এগরা। মহকুমার সদর শহর কাঁথি। তমলুক মহকুমার থানাগুলির নাম—তমলুক, পাঁশকুড়া, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও সুতাহাটা; মহকুমার সদর শহর তমলুক।

জেলায় মৌজার সংখ্যা ১২,২৮৮, যার মধ্যে ১,৬৬১টি মৌজা জনবসতিহীন। আর ১০২টি মৌজা আছে শহরগুলির মধ্যে। জেলায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৩,২৭৯ ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৪৭০। সমগ্র জেলাকে ৫২টি উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হয়েছে।

১৯৬১ সালের জন-গণনা অনুসারে জেলায় শহর আছে ১৪টি, তার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে নয়টি শহরে। পাঁচটি করে শহর আছে সদর ও ঘাটাল মহকুমায় দুটি তমলুকে ও কাঁথি আর ঝাড়গ্রাম মহকুমায় একটি করে। '৬১ সালের গণনা অনুসারে জেলার সব চেয়ে বড় শহর খড়গপুর, তখন তার লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ৪৭ হাজার। দ্বিতীয় শহর মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা ছিল ষাট হাজার। কাঁথি তমলুক ও ঘাটাল শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১৭ হাজারের ওপর; ঝাড়গ্রামের ছিল চোদ্দ হাজার। অবশিষ্ট শহরগুলির মধ্যে সদর মহকুমার গড়বেতা ও বালিচক, তমলুক মহকুমার মহিষাদল ও ঘাটাল মহকুমার খারার, রামজীবনপুর; চন্দ্রকোণা ও কেশপুরের লোকসংখ্যা ৫ থেকে দশ হাজারের মধ্যে।

জেলার শহরবাসীদের প্রায় ৬৮ শতাংশ বাস করেন সদর মহকুমার পাঁচটি শহরে। অবশিষ্ট শহরবাসীদের পনের শতাংশের বাস ঘাটাল মহকুমায় এবং যথাক্রমে ৭, ৬ ও ৪ শতাংশের বাস কাঁথি, তমলুক ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার শহরগুলিতে।

জেলার ১০,৬১৮টি জনঅধ্যুষিত গ্রামের মধ্যে ৮,৩১৯টির জনসংখ্যা পাঁচ শ'র কম। জেলার বড় গ্রামগুলি আছে কাঁথি ও তমলুক মহকুমায়। দু হাজারের বেশি লোকের বাস এমন গ্রামের সংখ্যা সারা জেলায় ১৮৪; তার মধ্যে তমলুকে আছে ৮৪টি ও কাঁথি মহকুমায় ৫১টি।

মেদিনীপুর ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে জেলার সদর শহর। শহরে কয়েকটি সুপ্রাচীন প্রাসাদ ও মন্দির মসজিদ আছে। প্রাচীনতম হল শহরের পশ্চিমাঞ্চলের গোপ গৃহ। ভগ্ন প্রাসাদ, চারিদিকে উঁচু প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ও পরিখা। প্রাসাদটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন ইতিহাস নেই, তবে কিংবদন্তী আছে অনেক। সম্ভবত এটি একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সিপাইবাজারের সাদহাল মসজিদটি মোগল সম্রাট শাহজাহানের মেয়ের। নারায়ণপুরে ইদ্‌গাহ মসজিদ আছে, সম্রাট ঔরংজেব ওড়িশা যাওয়ার পথে সেখানে ঈদ রাত্রি অতিবাহিত করেন বলে কাহিনী প্রচারিত আছে। হিন্দু মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতম হনুমান মন্দির, কিন্তু সেটি দেড়শ বছরের বেশি প্রাচীন নয়।

শহরের দুটি ঐতিহ্যময় স্কুল বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুল, এবং ১৮৫১ সালে সেই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকরূপে কর্মজীবন শুরু করেন রাজনারায়ণ। কিন্তু সে পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন ও ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত সে পদে বহাল থাকেন। সেখানে রাজনারায়ণ গঠন করেন 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' ও 'সুরা নিবারণী সভা'। মেদিনীপুরে যে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন করেন তিনি তার প্রভাব সেদিন সারা বাংলার শিক্ষিত সমাজে অনুভূত হয়।

শহরের অপর ঐতিহ্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর টাউন স্কুল। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের এক নীরব সাক্ষী। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, অনাথ পাঁজা, নবেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ অমর শহীদগণ ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র। জাতির মুক্তির জন্য একটি শিক্ষালয়ের এতগুলি ছাত্রের আত্মদানের নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

১৯৩১ সালে মেদিনীপুরের ইংরেজ জেলা শাসক পেডিকে হত্যা করেন বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ। ১৯৩২ সালে পরবর্তী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস নিহত হন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের হাতে। ১৯৩৩ সালে তৃতীয় ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে হত্যা করেন অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত, তাঁরা ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তাঁদের সঙ্গী নবজীবন ঘোষ পুলিশের নির্যাতনে প্রাণ হারান ও অপর তিন সঙ্গী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মলজীবন ঘোষের ফাঁসি হয়।

মেদিনীপুর ও খড়গপুর শহরের মধ্যে আট মাইল পথের ব্যবধান। জেলার এই বৃহত্তম শহরটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের প্রধান কর্মকেন্দ্র, তাই শহরের দেড় লক্ষ লোকের বেশির ভাগ রেলকর্মচারি ও তাদের পরিবারভুক্ত লোক। রাজ্যের বৃহত্তম ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি' এখানে স্থাপিত হওয়ায় শহরটির আরও গুরুত্ব বেড়েছে।

মহকুমা শহর কাঁথি একদা ছিল সল্ট এজেন্সির সদর দপ্তর। কিন্তু নুন তৈরি বন্ধ হওয়ার পর শহরটির গুরুত্ব হ্রাস পায়। ১৯০১ সালে এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র আড়াই হাজার। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সমুদ্র

অমিয় রায়চৌধুরীর

পটভূমি কার্শিয়াং

৫,

সরস্বতী বলেছিল আনন্দকে,

পাহাড়ঘেরা মখমলি ফুলের মত সুন্দর আমাদের যৌবন। কে বলে ভালবাসা যৌবনের ভুল?

ফুলের যৌবন তার সৌরভ। তাও হারিয়ে যায় বাতাসে। চোখের কোণের মিষ্টি হাসিটুকু মুছে যায় চোখের জলে। তাই বলি তোমার যৌবনতাজা ভালবাসার ফুলটি এখনি আমায় দাও।

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট প্রেমের উপন্যাসের তালিকায় পটভূমি কার্শিয়াং নতুন সংযোজন।

পরিবেশক—নাথ ব্রাদার্স, শৈব্যা পুস্তকালয়, দে বুক ষ্টোর্স—কলিঃ-১২

ফ্যাশান মডেল মিনা জোহরের সঙ্গে মুখোমুখি

"ফেস পাউডার?
আমার তো না হলেই নয়!
তবে পণ্ডস হওয়া চাই"

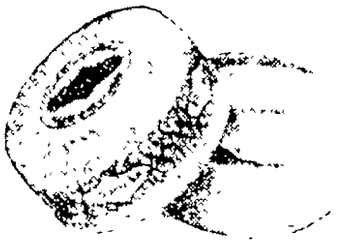

মিনা জোহরকে ভালো করে দেখুন। পণ্ডস ফেস পাউডার ওঁর সুন্দর মুখে ঝলমলে আভা এনে দেয় আর ওঁকে মনোহারিণী করে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। আপনিও পণ্ডস ফেস পাউডার মেখে দেখুন কি সুন্দর লাগে। পণ্ডস ফেস পাউডার এদেশের কলসীদের মুখের রঙের সঙ্গে মানানসই চারটি জনপ্রিয় রঙে পাওয়া যায়।

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে
সুন্দরই [illegible]

চৌধরো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
[illegible]

সন্নিকটবর্তী এই শহরটির সংযোগ সামান্যই ছিল। ১৮৬০ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাঁথির মহকুমা শাসক ছিলেন। তখন এর নাম ছিল নেগুয়া। এইখানে অবস্থানকালে বঙ্কিম দারিয়াপুরে এক কাপালিকের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাই থেকেই কপালকুণ্ডলা কাহিনীর উদ্ভব। প্রতি বছর দারিয়াপুরে বঙ্কিমের স্মরণে একটি সুন্দর মেলা হয়।

পঁচিশ বছর আগে নিভৃত নির্জন কাঁথি শহরের একটা শান্ত সুন্দর রূপ ছিল। সেদিন একজন বহিরাগত এলেও এই বিচ্ছিন্ন জনপদটিতে কৌতূহলের সাড়া জাগত। কিন্তু আজ কাঁথি বিরাট ও চঞ্চল। সাত মাইলের সেতু কাঁথির দীর্ঘপথের দুর্গমতা অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে। অদূরবর্তী দীঘার আকর্ষণে কাঁথিতে এখন প্রতিদিন অগণিত মানুষের আসা-যাওয়া। কাঁথির কেয়াবন, বালিয়াড়ি, বাদাম-জঙ্গল সবই আজ অতীতের স্মৃতি, নগরজীবনের দুর্নিবার বিস্তারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার সব বিশিষ্টতা।

কাঁথির বীর সন্তান বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ১৯২১ সালে যে চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন হয় তা সেদিন সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত বার্দোলি সত্যাগ্রহের মতোই সারা ভারতে আলোড়ন জাগায়। পরবর্তী কালের জাতীয় আন্দোলনগুলিতেও কাঁথির ভূমিকা গৌরবময়। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে লবণ আইন ভাঙতে সারা বাংলার সত্যাগ্রহীরা আসেন তমলুক মহকুমার নরঘাট ও কাঁথি মহকুমার পিছাবনিতে। পুলিশের পাঁড়নে সেদিন লন্ডভন্ড হয়ে যায় পিছাবনি, কিন্তু তবু সেদিন সেই গ্রামের নিরস্ত্র, নিঃসহায় মানুষদের হার মানানো যায় নি। 'গ্রামের নাম পিছাবনি— আমরা পিছাবো নি' —এই ছিল তাদের মুখের কথা। সেই সব হারানোর আন্দোলনের দুর্জয় দুঃসাহসী নেতা ঝাড়েশ্বর মাঝির কথা আজ স্বাধীন বাংলার ক্ষমতাসীনদের কার মনে আছে?

'৪২-এর রক্তঝরা আন্দোলনেও কাঁথির ভূমিকা গৌরবময়। গুলী, গ্রেপ্তার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ—সব কিছুকেই তুচ্ছ করে কাঁথির মানুষ। রামনগর, কাঁথি, এগরা, ভগবানপুর, পটাশপুরে গুলীর আঘাতে নিহত হন ৩৭ জন, আহত হন প্রায় দেড় শত। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কয়েক হাজার মানুষকে। তবু আন্দোলন থামে নি, পাল্টা সরকার গড়ে উঠেছিল ভগবানপুর, খেজুরি, পটাশপুরে। কিন্তু অকস্মাৎ এক বিধ্বংসী প্লাবন সমগ্র দক্ষিণ কাঁথি ধ্বংস করে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। সেদিন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এগিয়ে না এলে কাঁথিকে রক্ষা করা সম্ভব হত না।

তমলুক মহকুমার সদর শহর তমলুক আর এক প্রাচীন, ঐতিহ্যময় স্থান। রূপনারায়ণ নদীর তীরবর্তী এই শহরই সুদূর অতীতের তাম্রলিপ্ত, নগর হিসাবে যার স্বীকৃতি যীশুখৃষ্টেরও জন্মের পূর্বে ছিল। এই বন্দর দিয়েই লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, চীন প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে পূর্ব-ভারতের সংযোগ রক্ষিত হত। লঙ্কা জয়ের উদ্দেশ্যে রাঢ় দেশের সিংহ বংশীয় রাজা বিজয় সিংহ এই বন্দর থেকে কয়েকখানি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৪০৫-১১ খৃষ্টাব্দ), হিউয়েন সাং (৬৩০-৪৩) ও ইৎসিং (৬৭১-৮৫) এই বন্দরের বিস্তারিত বর্ণনা তাঁদের ভ্রমণ-লিপিতে লিখেছেন। দক্ষিণ বঙ্গে একদা তাম্রলিপ্ত নামে যে স্বাধীন রাজ্য ছিল বন্দর-নগরী তাম্রলিপ্ত ছিল তারও রাজধানী।

বর্তমানে তমলুক ৭৪৯ বর্গমাইল আয়তনের তমলুক মহকুমার সদর শহর। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তমলুকের রক্তের স্বাক্ষরও অনপনেয়। ৪২-এর বিদ্রোহে তমলুক অভ্যুত্থানের নায়ক ছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। ঐ অভ্যুত্থানে তমলুক, সুতাহাটা, মহিষাদল ও নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলীতে নিহত হন মোট ৪১ জন, আহত হন প্রায় এক শ' জন। গুলীর আঘাতে নিহতদের মধ্যে ছিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা।

ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রাম করে মেদিনীপুরের মানুষ দক্ষিণ-পূর্ব তমলুকের সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে পাল্টা সরকার গঠন করেছিলেন। সে সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক ছিলেন শ্রীসতীশ সামন্ত। জাতীয় সরকারের পুলিশ, প্রশাসন বিচার, সরবরাহ, যোগাযোগ প্রভৃতি সব বিভাগ ছিল। সপ্তমী পূজার দিন প্রবল প্লাবনে যখন দক্ষিণ মেদিনীপুর বিপর্যস্ত হয় তখন জাতীয় সরকারের স্বেচ্ছাবাহিনীই সর্বপ্রথম সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে।

তমলুক মহকুমার মহিষাদল, ময়না, গেঁওখালি প্রভৃতি স্থানগুলি সুপ্রাচীন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত বেনেলস মানচিত্রে গেঁওখালির উল্লেখ আছে। হুগলী নদীর তীরবর্তী এই স্থানটিতে পর্তুগীজদের প্রভাবে অনেকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি খৃস্টান পরিবার আছে এবং গীর্জা আছে দুটি।

১১৮৬ বর্গ মাইল আয়তনের ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রধান শহর ঝাড়গ্রাম দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গের বহু উদ্বাস্তু ঝাড়গ্রামে এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। স্থানটি স্বাস্থ্যকর।

ঘাটাল মহকুমার আয়তন ১৬৯ বর্গমাইল। মহকুমা শহর ঘাটাল ছাড়াও এই এলাকায় শহর আছে চারটি—চন্দ্রকোণা, খিরপাই, রামজীবনপুর ও খারার। পাঁচটি শহরেই মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সুপ্রাচীন শহর খিরপাইর একদা বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাতি ছিল এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকরা কাপড় কিনতে আসত এখানে। ১৭৬৩ সালে ফরাসিরা খিরপাইতে একটি ফ্যাক্টরি স্থাপন করে।

জেলার ভূ-প্রকৃতি

বিশাল এই জেলার ভূপ্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়। জেলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল শুষ্ক ও খরাপ্রবণ। দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল সমুদ্র তীরবর্তী হওয়ায় আর্দ্র। উত্তর-পশ্চিমের আবহাওয়া চরম, দক্ষিণ-পূর্বের নাতিশীতোষ্ণ। জেলার গড় বৃষ্টিপাত বছরে ৭০ ইঞ্চি, তার মধ্যে তমলুক মহকুমার গড় ৮৪ ইঞ্চি ও ঘাটাল মহকুমার প্রায় ৫৮ ইঞ্চি।

জেলার খনিজ সম্পদ সামান্য। জেলার সদর ও ঘাটাল মহকুমায় যে ল্যাটেরাইট পাথর পাওয়া যায় তা পথ ও বাস্তু নির্মাণের কাজে লাগে। মোরাম মেলে সদর মহকুমায়, আর খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম ও চন্দ্রকোণায়। বীরমাদাত, জয়পুর, লাবণী, বাঁশপাহাড়ি ও সরিষাবাসায় ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান মিলেছে। কিছু পরিমাণ নিম্নমানের লোহার সন্ধান মিলেছে ঝাড়গ্রামে। কিন্তু মেদিনীপুরের অফুরন্ত সম্পদ হল তার উপকূলবর্তী সমুদ্রের দান লবণ।

জেলার নদীগুলির মধ্যে রূপনারায়ণ, কংসাবতী (কাঁসাই) ও সুবর্ণরেখা প্রধান। রূপনারায়ণ জেলার পূর্বে প্রায় ৪৫ মাইল সীমান্ত চিহ্নিত করেছে। রূপনারায়ণের প্রধান উপনদী শিলাই মানভূম জেলা থেকে মেদিনীপুরের উত্তর দিয়ে জেলায় প্রবেশ করেছে। তারপর পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সদর মহকুমার উত্তর ভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মোড়

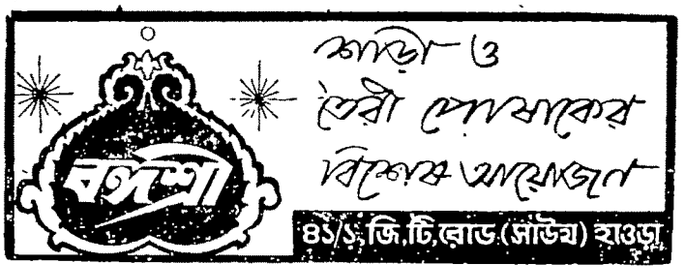

ফিরেছে, এবং আরও দক্ষিণে নেমে প্রবেশ করেছে ঘাটাল মহকুমায়। নারাজোলের কাছে পৌঁছিয়ে শিলাই আবার উত্তরে উঠেছে এবং ঘাটাল থেকে চার মাইল দক্ষিণে বন্দর নামক স্থানে রূপনারায়ণে গিয়ে মিশেছে। পুনর্ভব, গোপা, কুবাই, চাঁদুর ও বুড়ি নামে কয়েকটি ছোট স্রোতস্বতী শিলাই নদীর বিভিন্ন অংশে পড়ায় শিলাইর নিম্নাঞ্চল সারা বছরই নাব্য।

কংসাবতী বা কাঁসাই বাঁকুড়া জেলা থেকে মেদিনীপুরে প্রবেশ করেছে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলা কাঁসাই প্রথমে দক্ষিণমুখি হয়ে তারপর দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়েছে, তারপর চলেছে পুব দিকে। মেদিনীপুর শহর এই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। কাঁসাইর মূল ধারা দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলে শেষ হয়েছে মহিষাদল থানার ইটামোগরা গ্রামের কাছে হলদি নদীতে।

কেলেঘাই নদীও হলদি নদীতে এসে শেষ হয়েছে। মেদিনীপুরের পশ্চিমে উদ্ভূত এই নদী পুবদিকে এগিয়ে চলে নারায়ণগড় ও সবং থানার মধ্য দিয়ে এসে হলদিতে পড়েছে। কাঁসাই ও কেলেঘাই নদীর সঙ্গম থেকেই হলদি নদী। হলদি ও হুগলী নদীর মোহনায় গড়ে উঠছে শিল্পনগরী ও বন্দর হলদিয়া। মেদিনীপুর জেলায় হুগলী নদীতে সব দক্ষিণে এসে পড়েছে রসুলপুর নদী।

সুবর্ণরেখা নদী ধলভূম থেকে এসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে জেলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং সদর মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ও গোপীবল্লভপুর থানার মধ্য দিয়ে গিয়ে দাঁতনের দক্ষিণ হয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করেছে।

একদা জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে বনভূমি থাকলেও পরবর্তীকালে চাষের প্রয়োজনে ঐ বনভূমি সম্পূর্ণ পরিকল্পনাহীনভাবে উচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে এখন জেলার শতকরা মাত্র নয় ভাগ জমি বনাচ্ছন্ন। বনাঞ্চলের প্রধান গাছ শাল, কুসুম ও পিয়াসাল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মেদিনীপুরে নতুন করে বনভূমি সৃষ্টির উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে জেলায় মোট বনভূমির পরিমাণ ছিল ২,৯০,৪৪৭ একর, যার ৪৭ শতাংশ ছিল সংরক্ষিত বনভূমি। নতুন বনভূমিতে ইউক্যালিপটাস ও সেগুন গাছের চাষ খুব সফল হয়েছে। ১৯৬৮-৬৯ সালের হিসাবে প্রকাশ, মেদিনীপুরের বনভূমি থেকে শালের জ্বালানি কাঠ, শালের খোঁটা ও কাজু বাদাম বিক্রি হয়েছে ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার। এ ছাড়া মেদিনীপুরের জঙ্গল থেকে পাওয়া যায় লাক্ষা, তসরের গুটি পোকা, মোম, রজন, বিভিন্ন ওষুধের গাছ-গাছড়া প্রভৃতি। জলা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় হোগলা, শোলা ও মাদুর তৈরির জন্য এক ধরণের ঘাস। কাঁথির বালুকাময় প্রান্তরে একসময় আগাছার মতো বাদাম গাছ জন্মাত, এখন সুপরিকল্পিতভাবে বাদাম গাছ লাগানো হচ্ছে। দীঘা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে লাগানো হচ্ছে ঝাউগাছ। জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী জমি নারকেল-চাষের উপযোগী কিন্তু এ ব্যাপারে বেশি কিছু করা হয়নি।

জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল যখন অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল তখন আরণ্যক প্রাণীরও অভাব ছিল না। পুরানো নথিপত্রে মেদিনীপুরের বনে বাঘ, চিতা, নেকড়ে, ভালুক, হায়েনা প্রভৃতি জেলার বনাঞ্চল থেকে দু-একটি হাতীও মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রামে প্রবেশ করে সবের ফসল লন্ডভন্ড করত। বাঘ ছিল উত্তর-পশ্চিমের বনাঞ্চলে, আর দক্ষিণ-পূর্বে হলদি নদীর ধারে। রামনগর, দীঘা ও ওড়িশা সীমান্তের ঝোপঝাড়ে নেকড়ে, কুকুরবাঘের সন্ধান এখনও মেলে। উত্তর-পশ্চিম কোণের বিনপুর অঞ্চলের বনে এখনও কিছু ভালুক আছে। বছর পঞ্চাশেক আগেও কাঁথির বনাঞ্চলে চিতল হরিণের দল ঘুরে বেড়াত, কিন্তু আজ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর সঙ্গে তারাও নিশ্চিহ্ন। বনে জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে কিছুদিন আগেও অনেক খরগোস ছিল, এখন কদাচিৎ তাদের সন্ধান মেলে। বুনো মুরগি, কাদা খোঁচা, ঘুঘু হরিয়াল, ভুবুই পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াত বনে জঙ্গলে, নদীর ধারে, চড়ায়, শীতের ফসল ক্ষেতে। শিকারির জিঘাংসা চরিতার্থ করতে এখন তারাও প্রায় নিশ্চিহ্ন। বনের মতো আর এক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মেদিনীপুরের অঢেল পরিমাণে আছে তা হল মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। রূপনারায়ণের খাঁড়ির অমৃতোপম ইলশে যেমন শুধু ভাগ্যবানদের ভোগ্য, অভাজন আমিষাশীদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সামুদ্রিক মাছ। হাঙ্গরের তেল ও মাংসও অনেক প্রয়োজনে লাগে। কাঁথির অদূরবর্তী জুনপুটে মাছ ধরার ও সামুদ্রিক মাছ নানাভাবে প্রক্রিয়ণের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়।

জেলার মানুষ

১৮৭২ সালে মেদিনীপুর জেলা যখন বর্তমান আকৃতি নেয় তখন তার লোকসংখ্যা ছিল ২৫ লক্ষ ৪৫ হাজার। কিন্তু তারপর বর্ধমানের জ্বর মড়ক রূপে দেখা দেওয়ায় জেলার আড়াই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। এ কারণে ১৮৮১ সালের গণনায় দেখা যায়, জেলার লোক না বেড়ে সংখ্যায় কিছুটা কমে হয়েছে ২৫ লক্ষ ১৮ হাজার। তারপর থেকে প্রতি দশকের গণনায় জেলার লোকসংখ্যা বাড়তে দেখা গেছে। ১৯৫১ সালে মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ লক্ষ ৫৯ হাজার। ঐ গণনার বিশ্লেষণে দেখা যায়, তখন মেদিনীপুরে লোকসংখ্যার ৯১-৭৮ শতাংশ ছিল হিন্দু ও ৭-১৭ শতাংশ মুসলমান। জেলার লোকসংখ্যার ০.৬ শতাংশ তফশিলি সম্প্রদায়ের ও তফশিলি-উপজাতিভুক্ত। তফশিলি উপজাতির মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা, ১৯৫১ সালে ছিল ২ লক্ষ ৩ হাজার। তাছাড়া আছে ওরাও ও মুণ্ডা সম্প্রদায়ের কয়েক হাজার লোক। তফশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ১৯৫১ সালে ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। ভূমিজ, পোদ, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাও প্রায় অর্ধ লক্ষ করে।

মেদিনীপুরের বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিকাংশই উৎকল শ্রেণীর। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বহুতম ও সর্বাধিক প্রভাবশালী মাহিষ্য সম্প্রদায়। এছাড়া রাজু, করণ প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় আছে যাদের মেদিনীপুরের বাইরে বেশি দেখা যায় না। জেলার শতকরা ৮৫ জন বঙ্গভাষী, কিন্তু উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের বাংলার সঙ্গে পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের বাংলায় অনেক তফাৎ। কাঁথি মহকুমার দক্ষিণাঞ্চলের ও পশ্চিমের ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার সামান্য পার্থক্য। জেলায় উর্দু, হিন্দী, তেলুগু, উড়িয়া ও নেপালী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাও কম নয়। ১৯৫১ সালে জেলায় উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিল তিপ্পান্ন হাজার, হিন্দী ভাষীর সংখ্যা চুয়াল্লিশ হাজার।

১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে জেলার লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৩২০। তার মধ্যে পুরুষ ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ও নারী ২৬ লক্ষ ৭৯ হাজার। জেলার প্রতি বর্গমাইলে জনঘনত্ব ৮২৬। জনবহুলতায় মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় জেলা হলেও জনঘনত্বের তালিকায় তার স্থান দশম। অর্থাৎ আয়তনের তুলনায় মেদিনীপুর জেলার লোকসংখ্যা এখনও কিছুটা কম। জেলার জনত্ব যদি হুগলী জেলার মতো হত (১৮৪১) তা হলে মেদিনীপুরের লোকসংখ্যা লক্ষ পেরিয়ে যেত। রাজ্যের ১৫-৪ শতাংশ স্থান নিয়ে মেদিনীপুর জেলা গঠিত, কিন্তু রাজ্যের ১২-৪ শতাংশ লোক বাস করে এখানে।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ রেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এম পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬-
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও সাদাচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৩।২, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা-৬
ডাকমাশুল ও টাকা পাঠালে অবশ্যই পাঠান হয়

দিনকালের হিসেব

আসিছে সেদিন আসিছে—(২)

মাত্র ৩০ পয়সার একখানা টিকিট কেটে দমদম ষ্টেশনে ট্রেনে চেপে বসলাম। আমি টিকিট কেটে তবেই ট্রেনে চাপি, আর বর্তমান যাত্রায় বিনা টিকিটে যাবার সুযোগ নেই। কারণ, দোতলার টিকিট-ঘরে টিকিট কেটে তবে একতলার প্ল্যাটফর্মে নেমে ট্রেন ধরতে হয়—টিকিট না কাটলে দোতলা থেকে একতলার প্ল্যাটফর্মে নামতেই দেয় না! যাক যা বলছিলাম। দমদম থেকে গাড়ী এল বেলগাছিয়া ষ্টেশনে। তারপর শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরিশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল, চাঁদনী চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক ষ্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালিঘাট, রবীন্দ্র সরোবর এবং টালিগঞ্জ—সবই একটা করে ষ্টেশন। তাহলে দমদম থেকে শুরু করে ষ্টেশন সংখ্যা হল ১৭। পথের দূরত্ব মাত্র ১৬-৪৩ কিলোমিটার। পৌঁছুতে লাগল ঠিক ৩০ মিনিট। ঘড়ি দেখেছিলাম, দমদম থেকে এসপ্ল্যানেড পৌঁছুতে লেগেছিল ১৩ মিনিটের মত। যে ট্রেনে এসেছিলাম সে ট্রেনখানি ফেল করলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ আড়াই মিনিট বা ১৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে আর একখানি ট্রেন যে পাব তা জানতাম।

আধ ঘন্টার মধ্যে ১৫টা ষ্টেশন ছুঁয়ে ১৬-৪৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হলে গাড়ীর গড় গতিবেগ কি হওয়া দরকার তা হয়ত অঙ্ক কষে বের করা যেতে পারে। তবে অঙ্কের ধারে কাছে না গিয়ে যা শুনেছি তাই বলছি : গড় গতিবেগ ছিল ঘন্টায় ৩৩ কিলোমিটার এবং সর্বাধিক গতিবেগ ছিল ৮০ কিলোমিটার। আরো শুনেছি : দুটি ষ্টেশনের মধ্যে গড় দূরত্ব হল ১-০২ কিলোমিটার, ন্যূনতম দূরত্ব ০-৫৯ কিলোমিটার এবং তা চাঁদনী-চক ও সেন্ট্রালের মধ্যে। আর দমদম ও বেলগাছিয়ার মধ্যেই দূরত্বই সর্বাধিক— ২-২ কিলোমিটার।

না, গোড়া থেকেই কাল ব্যবহারে ভুল করে চলেছি। অতীত নয়, ভবিষ্যৎ কাল—নির্দিষ্ট ভবিষ্যতে কবি কি করবে—সেটে থাকলে করব ১৯৭৯ সালে—মাত্র ছ বছর পরে। আমার-আপনার কেউ কেউ না করলেও করবে আমাদের বংশধররা। তখন কলকাতার পরিবহন সমস্যার অনেকটা লাঘব হবে—ট্রাম-বাসে ভ্রমণের আতঙ্কের অনেকটা নিরসন ঘটবে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই হবে—মাত্র দমদম থেকে টালিগঞ্জ রেলে সর্ব সমস্যার সমাধান? যে সব যাত্রী অন্য পথে অফিস-পাড়ায় আসেন তাঁদের কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ পরিবহনের চাহিদাও যে বৃদ্ধি পাবে। অনুমান করা হয়েছে, বর্তমান শতকের পরিবহন-ব্যবস্থার পক্ষে ১-৪ কোটি লোকের চাহিদা মেটাতে হবে। ফলে অন্তত তিনটি পাতাল রেলপথের প্রয়োজন হবে। এছাড়াও ভূপৃষ্ঠ পরিবহন-ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারিত করতে হবে। এ অবশ্য পরের কথা। এখন যে ব্যবস্থার হাত দেওয়া হয়েছে তারই আলোচনা করা যাক।

উত্তর-দক্ষিণ পাতাল রেল :

দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেলের নাম দেওয়া হয়েছে উত্তর-দক্ষিণ পাতাল রেল—নর্থ-সাউথ টিউব। এতে লাইন থাকবে দুটো—একটি দমদম থেকে যাবার বা আপ লাইন এবং অপরটি টালিগঞ্জ থেকে ফেরবার বা ডাউন লাইন। রাস্তাপথের দৈর্ঘ্য ১৬-৪৩ কিলোমিটার হলেও এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৮-৪৩ কিলোমিটার। অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যটুকু হল উভয় প্রান্তে রেলগাড়ী ফেরাবার জন্যে এবং দমদমে রেলগাড়ীর আস্তাবলে পৌঁছুবার জন্যে।

মোট ১৮-৪৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ২-৫ কিলোমিটারের মত রেলপথ থাকবে মাটির ওপরে এবং বাকী অংশ থাকবে মাটির তলায়। লাইন দুটো হলেও ১৭টি ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থাকবে একটা করে—একটা দিকে আপ গাড়ীর জন্যে এবং অপর দিকে ডাউন-গাড়ীর জন্যে।

নির্মাণ-পদ্ধতি :

নির্মাণ-পদ্ধতি বর্ণনা ঠিক আমার কাজ নয়, আর ঠিকমত বোঝাতেও হয়ত পারব না। তবুও চেষ্টা করে দেখি। বেলগাছিয়া ও শ্যামবাজারের মধ্যে কিছু অংশ এবং দমদমের উত্তর দিকে কিছু অংশ—মোট ১০৭০ মিটার পথে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হবে, বাকী অংশের জন্যে কিন্তু মাটি কাটা ও ঢাকা দেওয়া পদ্ধতিই (কাট অ্যাণ্ড কভার মেথড) অবলম্বিত হবে। মাটি কাটা ও ঢাকা-দেওয়া পদ্ধতিতে প্রথমে এক গভীর ও বিস্তৃত পরিখা (ট্রেঞ্চ) খোঁড়া হয় এবং তারপর নির্মাণ করা হয় আবৃত-ক্ষেত্রে সিমেন্টের টিউব। টিউব নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে পরিখায় মাটি ঢাকা দিয়ে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। ফলে ভূপৃষ্ঠ পরিবহন আগের মতই চলাচল করতে পারে। খনন করা পরিখাতে যাতে ধ্বস না নামতে পারে বা পরিখা যাতে বসে না যায় তার ব্যবস্থাও করা হয়। এর ফলে পাশাপাশি বাড়ীগুলোও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। সুড়ঙ্গ অংশের ক্ষেত্রে নির্ভর করা হয় কম্প্রেস-এয়ার বা ঠাসা বায়ুর ওপর। কলকাতার ভূতকের তলার মাটির জন্যে এই কম্প্রেস এয়ারের ব্যবহার অপরিহার্য বলে মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট-এর (রেলওয়ে) জেনারেল ম্যানেজার শ্রীএস এম মুখার্জি মন্তব্য করেছেন। এই কারণেই অর্থাৎ ভূতকের তলার মাটির জন্যে উক্ত মাটি কাটা ও ঢাকা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনবেদ
হেনা চৌধুরী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ১০.
ডাঃ অসীম বর্মনের উচ্চপ্রশংসিত বই
বাঁচতে সবাই চায় ৩·৭৫
কেটে যাবে মেঘ ২·৫০
বিকাশ-এর চমকপ্রদ উপন্যাস
জান মান মাটি ৬.
অ্যালকা-বিটা পাবলিকেশনস্ লিঃ
৫৫-১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

দেওয়া পদ্ধতি কলাকৌশলগত দিক দিয়ে বিশেষভাবে অবলম্বনীয় পদ্ধতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলে আশ-পাশের বাড়ীঘরের ক্ষতির সম্ভাবনা নেই বললেই হয়, আর কম্প্রেস এয়ারের দরুণ রেলপথে নিছক শ্রমিকদের যে স্বাস্থ্যহানি ঘটবার সম্ভাবনা থাকে তার আশঙ্কাও অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

নির্মাণ পর্যায়ঃ

মেসিনের মত পাতাল রেলপথের অংশের (সেক সান্স) সংখ্যাও ১৭। 'প্রথম অংশ শুরু হচ্ছে মদমের দক্ষিণ দিক থেকে এবং শেষ হবে দমদম রোডকে কিছুটা ছাড়িয়ে এসে। এই প্রথম অংশের কাজই পুরোদমে আরম্ভ করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশের নির্মাণকার্যের বেশী সমাপ্ত হয়ে যাবে ১৯৭৫ সালের মধ্যে, অবশ্য যদি আশামত এই বর্ষার পরই কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয়। আবার সত্যিই যদি ১৯৭৯ সালে দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেল চালাতে হয় তবে ১৯৭৬ সাল থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চালানো (ট্রায়াল রানস) আরম্ভ করতে হবে এবং এর জন্যে দমদম থেকে ১ কিলোমিটারের ওপর রেলপথের নির্মাণকার্য ১৯৭৫ সনের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে। পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানোর জন্যে ৮টি টিউব কামরা (টিউব কোচেস) সংগ্রহের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এতেই আপাতত কাজ চলবে।

দুরের পরই কিন্তু এগার অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশের পরই হাত দেওয়া হবে একাদশ অংশের কাজে। এই অংশটি হল ময়দানের কাছে। তারপর আছে ৪, ১২, ১৭ এবং অন্যান্য অংশের কাজ। এইভাবে অংশ নির্মাণের অন্যতম কারণ হল যাতে ভূপৃষ্ঠে পরিবহন ব্যবস্থায় বিশেষ গোলযোগ না ঘটে তা দেখা। তবুও কিন্তু মহাত্মাগান্ধী রোড থেকে শুরু করে টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড অবধি ৫ কিলোমিটারের মত রেলপথের নির্মাণকার্যের সময় যানবাহনকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি পাতাল রেলের ঐ নির্মাণকার্য শেষ হলে ছ' মাস ড্রাইভারদের ঐ ট্রেন চালানো শেখানো হবে। এবং তারপর ১৯৭৯ সালের এক সুপ্রভাতে আপনি-আমি পাতাল রেলে ভ্রমণ শুরু করব।

অন্যান্য বিবরণঃ

প্রথম প্রথম যাকে বলে পীক পিরিয়ড সেই সময় গড়ে ১৫০ সেকেণ্ড অন্তর বা ঘন্টায় ২৪ খানা করে দু-দিকেই ট্রেন চালানো হবে। তারপর ক্রমশ ২৪কে নিয়ে যাওয়া হবে ৩২-এ। প্রতি ষ্টেশনে ৩০ সেকেণ্ড করে থেমেও ৩০ মিনিট দমদম থেকে টালিগঞ্জ পৌঁছে দেবে।

পাতাল রেল চলবে ৭৫০ ভোল্টের ডি সি শক্তিতে। এবং শক্তি যোগান দেবে তিনটি সংস্থাঃ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এবং কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশন। একটি সংস্থা যোগানকার্য চালিয়ে গেলেই পাতাল রেল ঠিকমত চলে যাবে। প্রথম প্রথম গাড়ী ইত্যাদি আমদানীই করতে হবে, পরে কিন্তু সবই তৈরী হবে পেরাম্বুরের কারখানায়।

ভাড়া ইত্যাদির বিবরণ ত আগেই দিয়েছি।

সংশয় ও শঙ্কাঃ

এ ত' সব গেল আশাবাদের কথা। সংশয় ও শঙ্কা কিছু নেই কি? অবশ্যই আছে। বলা হয়েছে, নির্মাণকার্যের সময় কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অসুবিধে যাতে ন্যূনতম হয় তার দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখবেন, তবে কিছুটা অসুবিধে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু কতটা? নির্মাণকার্যের সময় প্রধান প্রধান অনেক রাস্তাই বন্ধ রেখে যানবাহনকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে সকাল-বিকেল—পীক পিরিয়ডে সব রাস্তা খোলা থাকলেও ট্রাফিক জ্যাম ইত্যাদির অন্ত নেই, তার ওপর প্রধান রাস্তাগুলো বন্ধ রেখে যানবাহন ঘুরিয়ে দিলে অবস্থা কি দাঁড়াবে তা চিন্তা করতেও আতঙ্ক হয়। আবার ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি কাজ শেষ হবে ত? না, খোঁড়াখুঁড়ির কাজই শেষ হবে, ঢাকা দেওয়ার কাজ নয়। সি এম ডি একে লোকে উপহাস করে বলতে শুরু করেছে ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডিগিং অথরিটি বলে, পাতাল রেলের জন্যে মেট্রোপলিটান পরিবহন প্রকল্প (মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট) ঐ রকম কিছু একটা আখ্যা লাভ করবে না ত?

আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশন এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ—এই তিনটি সংস্থার যে কোন একটি থেকেই বিদ্যুতের যোগান পাওয়া গেলে পাতাল রেল চালু রাখা যাবে। কিন্তু বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে অবস্থা এবং অদূর ভবিষ্যতে যখন বিশেষ আশার আলো দেখা যাচ্ছে না তখন আশঙ্কার কারণ নেই কি? এ আবার পাতাল রেল। চলতে চলতে সুড়ঙ্গের মধ্যে হঠাৎ পাতাল রেল যদি থেমে যায়, আর সেই অবস্থায় যদি কয়েক ঘন্টা থাকে—তবে অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন ত। শুনেছি পাতাল রেল চলবে ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত। যদি মাঝ রাতে এই রকম হয়? জানি না সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে কোন কোন ষ্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে আসা সম্ভব হবে কিনা। হলেও এত রাত্রে! তাই বলি বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে তবেই পাতাল রেল চালাবার ঝুঁকি নেওয়া উচিত।

বৈদ্যুতিক ট্রেনে প্রাত্যহিক যাত্রী হিসেবে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার আছে। প্রথম প্রথম ভ্রমণ বা যাত্রা বেশ আরামপ্রদই ছিল। কিন্তু বর্তমানে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্যে কল্পনাও করতে পারবেন না—আসন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্হিত, ধরে দাঁড়িয়ে থাকবার হাতল এক সময় ছিল আজ নেই, বর্ষার সময় কোথায় গা বাঁচিয়ে দাঁড়াব তা চিন্তা করতে হয়, অথচ যা ভিড় তাতে নড়ে দাঁড়াবার জায়গায়ও অনেক সময় পাওয়া যায় না, তা ছাড়া সবাই ত ঐ রকম সময় নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। পাতাল রেলে ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত যদি এই রকম দুর্দশা হয় তবে হয়ত আজকের দিনের মত বাদুড়ঝোলা হয়ে যাওয়াই কাম্য বিবেচিত হবে। তবে পাতাল রেল ত, বর্ষার দিনে কামরার মধ্যে জল চুঁইয়ে পড়বে না।

সমস্যার কতদূর সমাধান হবে?

আগেই বলেছি, একটা পাতাল রেলপথে সর্বদুঃখের অবসান ঘটবে না। কর্তৃপক্ষের মতে, বর্তমান শতক শেষ হবার আগেই অন্তত তিনটি পাতাল রেলপথের প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা যে বর্তমান সমস্যার মোকাবিলা করবার জন্যেই বর্তমান পাতাল রেলের সঙ্গে পরিত্যক্ত চক্রবেড়ে রেলের পরিকল্পনাকে সংযুক্ত করা উচিত। তিনটি পাতাল রেলপথ কবে নির্মিত হবে জানি না, বর্তমানের জন্যেই একটি মাত্র কোনমতেই পর্যাপ্ত নয়। তবুও বলা যায়, সূচনা শুভ, এবং প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে পরিপূরক ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

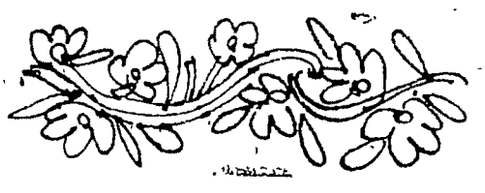

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। চার ।।

সমুদ্র ক্রমে শান্ত হয়ে এল একসময়। বন্দর পেতে বেশি দেরি নেই। জাহাজিদের এ-সফরে প্রথম বন্দর। কাজেই অনেকে, সেই সকাল থেকেই কিনার দেখার চেষ্টা করছে। কিছুই তো দেখা যায় না। কেবল নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, আর মাঝে মাঝে সমুদ্রপাখিদের উড়ে বেড়ানো। রাতের জ্যোৎস্নায়, নীল আকাশ, সবুজ নক্ষত্র এবং সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস। এক-নাগাড়ে বসে থাকলে ডেকে, মনে হয় কেমন এক গোলাকৃতি নীল বিবাট একটা টানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজটা নিশিদিন ছুটে যাচ্ছে। যেন কোন অতিকায় এক স্পেস রকেট, অথবা আরও কিছু—তখন আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। বসে থাকতে ভাল লাগে।

ছোটবাবু এখন ভালোর দিকে। বমি করতে করতে গলা চিরে যায়। এবং গলা চিরে গল গল করে রক্ত উঠে আসে। তারপর নুনজল, এবং নুনজলই জাহাজে একমাত্র অষুধ, জাহাজে বমি করলে, খেতে না পারলে, মাথা ঘুরলে একমাত্র এই জল। সমুদ্র থেকে বালতি করে জল তুলে খেয়ে ফেলা। তারপর অভ্যাস, অভ্যাসে সব কিছু সহ্য হয়ে যায়, মাথাও ঘোরে না, বমিও হয় না। কেবল তখন মনে হয় এই জাহাজের শিডিচং আবামের। চোখ বুজে আসে। ঘুম চলে আসে। কিনারায় বেশিদিন থাকলে অসুবিধা।

মেজ-মালোম আবার সেই ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। চোখে বাইনেকুলার। কিনার কাছে নেই। তবু দেখার স্বভাব। জাহাজ বন্দরের কাছাকাছি এলে তিনি সময় পাবেন না। জাহাজের বাঁধাছাঁদা সব আছে। আগলে, বড় মালোম, পিছিলে, মেজ-মালোম। দুজন দুদিকে। আর ডেক-জাহাজিরা আছে। ওরা হাবিয়া বললে, [illegible] হাপিচ বললে, দড়ি টেনে ধরছে। ওয়ারপিক ড্রামে দড়ি-দড়া টানাটানি করে বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে ছুটি। মেজ-মালোম তখন আবার ডেক-চেয়ারে বসে বেশ জুতসই বন্দরের বড় বড় গাছপালার ভিতর কিছু খুঁজে বেড়াবে। কারণ যা খবর জাহাজ এখানে থাকছে না। শুধু রসদ নেবে। রসদ নিতে কত আর সময়। সুতরাং ডেকে বসে থাকলে বাইনে-কুলারটা একমাত্র তার সম্বল। জাহাজের সময় কাটানোর পক্ষে সে একটা বেশ কাজ পেয়ে যায় এখন।

তখন নিচে মৈত্র ছোটবাবুর কাছে খবর নিয়ে এল, রাতে জাহাজ বন্দর ধরছে। মৈত্রের বারোটা চারটা ওয়াচ শেষ। রাতে ওয়াচ নেই। জাহাজ বাঁধাছাঁদা হলে একটা বয়লার শুধু চলে। জাহাজের যে সামান্য কাজ, উইনচ-চালানো, জেনারেটর চালানো, এ-সব কাজে একটা বয়লার চালালেই হয়ে যায়। তখন ছুটি ছুটি ভাব। বেশ একটা উত্তেজনা, মৈত্রকে দেখলেই বোঝা যায়। সে শিস দিয়ে নামছে। অমিয় একটা গান গাইছে। ওর গলা ভাল। বেশ গায়। সে যেন কি একটা আকাশ টাকাশ দিয়ে গান গাইছে। ডেক-সারেঙ, ডেক-জাহাজিরা ছুটি পাচ্ছে না। ওদের কাজ জাহাজ বাঁধাছাঁদা না হলে শেষ হচ্ছে না। তবে জাহাজ বাঁধাছাঁদা হবে তেবে, বন্ধু, অনিমেষ, মনু সবাই একবার করে খবর দিয়ে গেছে, সাবেঙও এসেছিল, ছেলে জাহাজ বন্দর ঢুকছে। ওপরে ওঠে না গেলে দেখবে কি

মৈত্র স্নান সেরে এসেছে। অমিয় বাক্স খুলে কি যেন খুঁজছে। বোধ হয় খাম পোস্টকার্ড। কিন্তু অমিয় জানে না, দেশে খাম পোস্টকার্ডে চলবে না। মৈত্র একটা চিঠি লিখবে শেফালিকে, যা সময়, একটু সাবধানে না থাকলে চলবে না। মৈত্র বোধ আশায় আশায় আছে। সে জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেলেই ঠিক খাম পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে ফেলবে। এবং নানাভাবে সে ভেবে রেখেছে—শেফালির জন্য সে কি কি করতে পারে। বুনোসাইবিরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু করতে পারছে না। ওখানে পৌঁছে বেশ কিছুদিন নোঙর ফেলবে। জাহাজ খালি হবে, জাহাজ বোঝাই হবে। সে কিছুদিন হয়েও যাবে। কোম্পানির ঘরে টাকা জমবে মন্দ না। সে এ বন্দর থেকে ভেবেছে কিছু কাঠের হাতি, ময়ূরের পালক কিনে নেবে। ওগুলো বেশ নামে বিক্রি হয়। সে করেও দু পয়সা হবে। এবং এ ভাবে সে শেফালিকে বেশ ভালো চিঠি পাঠাতে পারবে।

ছোটবাবুর দিকে মৈত্র তাকিয়েছিল। কিন্তু ভাবছিল, শেফালির কথা। ছোটবাবু বেশ শুয়ে আছে। মুখে একটু সাদা ভাব। রক্তপাতে এমনটা হয়েছে। শরীর [illegible] সাদা চাদর গায়ে। সে লম্বা পাতলা

গেছে। আর ডোবাকাটা পাঞ্জাবি। ওর চুল আরও বড় হয়েছে। জাহাজে উঠলে শরীরের রঙও আরও মনোরম হয়। ছোটবাবু জার্মানিতেই ভীষণ সুন্দর, সুপুরুষ, তার ওপর নোনা জল লেগে এক আশ্চর্য সুষমা মুখে। খুব ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। আদর করতে ইচ্ছা হয়। ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ফেরানো যায় না।

মৈত্র বলল, ছোটবাবু তোমার কথা জ্যাক বলছিল।

—কি বলছিল! ছোটবাবু কোনরকমে উঠে বসার চেষ্টা করল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—তুমি কেমন আছ!

ছোটবাবু বলল, যাঃ।

—সত্যি। বললাম, ভালোর দিকে।

—কেন বললে না, ভালো আছি। আমি আবার দু একদিনের ভিতর রংকারে নেমে যেতে পারব।

—এটা তোমার ছোটবাবু বাড়াবাড়ি। তুমি পারবে না। তুমি বড্ড একগুঁয়ে।

—সবাই পারলে আমি পারব না কেন! তাছাড়া সবাই কি ভাববে।

—তুমিও পারবে। পারতে তোমায় সময় লাগবে।

—এখন তো আর মাথা ঘোরে না। বেশ সহ্য হয়ে যাচ্ছে। খুব খিদেও পায়।

—শরীর ভাল হলে পারবে। তোমাকে আমার ওয়াচে নেব ভাবছি। ফালতু থাকলে, আবার কখন কোন দরিয়ায় কিসে কে পড়বে, তখন হঠাৎ পারবে না। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, দেখবে সব কাজই মানুষ পারে, মানুষ পারে না, পৃথিবীতে এমন কাজ নেই।

ছোটবাবু কিছু বলল না। চুপ করে থাকল।

মৈত্র বলল, আচ্ছা ছোটবাবু তুমি এমন চুপচাপ থাক কেন! কথা বল না!

ছোটবাবু বালকেডে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে মৈত্রের দিকে তাকিয়ে না হেসে পারল না। বলল—কথা বলি না কোথায়! বেশ কথা বলি।

—আচ্ছা ছোটবাবু জাহাজে তুমি এমন-ভাবে থাকো কেন?

—কি ভাবে।

—এই যে মনে হয় কেউ তোমার যেন নেই।

—না না। তেমনভাবে থাকি না তো।

—তুমি ভাল ছেলের মতো জাহাজে থাকলে ভীষণ কষ্ট পাবে।

—ভাল ছেলের মতো কোথায় আছ।

—তুমি ছোটবাবু যাই বল খুব চাপা স্বভাবের। আমরা ফোকসালে কত কথা বলি, তুমি তো তোমার বৌদি সম্পর্কে প্রায় মুখস্ত করে ফেলেছ।

—তা বলতে পার। এত বেশি শেফালি বৌদির কথা বল, যে মনে হয়, পৃথিবীতে আর কেউ বাস করে না। একমাত্র শেফালি বৌদিই বাস করে।

—ভাবে। আর তুমি তোমার দেশে কে আছে, কেন এমন একটা কাজে এলে, অমিয় বলল, কলেজের পড়াশোনা পর্যন্ত তোমার আছে, জাহাজের ট্রেনিঙে সব লুকিয়ে গেছ —এত সব কেন? কিনারায় একটা চাকরি দেখে নিতে পারলে না!

—তুমি তো জানো মৈত্রদা তোমার মতো, তোমার মতো কেন, আমাদের জাহাজে যারা আছে, একমাত্র এনজিন-সারেঙ বাদে সবাই আমরা পাকিস্তানের, আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। আমাদের তো কিছু একটা করে খেতে হবে। নাবিক বলতে আমরা জানি, সবাই সন্দীপ, নোয়াখালি, চিটাগাঙের লোক। এখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ওরা কতদিন আর আমাদের জাহাজ চালাবে। আমাদের তো সমুদ্র-যাত্রায় বের হতেই হবে।

—এসব বড় বড় কথা। এ-সব কথা তোমাদের ট্রেনিঙে শেখায়। আসলে এমন একটা দুঃখের কাজ, একঘেয়েমির কাজ কেউ সখ করে আসে না। নানাভাবে আসে। কিন্তু তোমার মতো মানুষ কেন আসে বুঝি না!

ছোটবাবু ফের হাসল। মৈত্রদা অভাবে সবাই আসে। আমিও এসেছি। তুমি আমার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি না ভাবলেও চলবে।

বক্কু এবং অনিমেষ পাশে বসে ছিল। অমিয় 'বিশ্বরূপ' ভাত ডাল সবজি গরম করে নিচ্ছে। একটু পরেই ওরা মেসরুমে খেতে বসবে। ছোটবাবু সকালে ওপরে উঠে গেছিল। মেসরুমে খেয়েছে। এখনও উঠতে চায়। নিচে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। পোর্টহোল দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। এখন ওপরে ওঠে সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। সমুদ্র ভীষণ শান্ত, ঠিক শিশু সরল মানুষের মতো। লতিফ ভাল আছে। সে আবার বাংকারে নেমে যেতে পারছে। ডেকে উঠে যাবার সময় সেও একবার খবর নিয়ে গেল, কেমন আছেন ছোটবাবু!

ছোটবাবু হেসে বলল, ভাল। তুই কোথায় যাচ্ছিস!

—ওপরে। নামাজের সময় পার হইয়া যায়।

এনজিন সারেঙ এসে বলল, মৈত্রমশায়, ছোটবাবুকে ওপরে নিয়ে যান। কিনার দেখা যাচ্ছে।

এই কিনার দেখার ব্যাপারটা জাহাজি-দের কাছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মতো। যেন জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল, পৃথিবীর কোথাও ডাঙ্গা আছে ভাবাই যায় না। সমুদ্রে জাহাজ চললে, নিশিদিন জাহাজ চলতে থাকলে ভাবাই যায় না, মানুষেরা ডাঙ্গায় থাকে। কোথাও মানুষ, গাছপালা, পাখি এবং মাটি আছে বিশ্বাসই করা যায় না। কিনারার নামে নতুন ডাঙ্গা দেখার জন্য সবাই পাগলের মতো ওপরে ছুটছে। যে-যার কাজ ফেলে এখন ওপরে উঠে যাচ্ছে। কেউ ফোকসালে নেই। বুড়ো ভাণ্ডারি পর্যন্ত গ্যালিতে হাতা খুন্তি ফেলে রেলিঙে এসে দাঁড়িয়েছে।

যারা নিচে কাজ করছিল, এনজিনরুমে, তারাও কেউ কেউ যেন ছোট টিণ্ডাল উঠে এসেছে। কাপ্তান ব্রীজে, বেলিঙে ভর করে দেখছেন। মেজ-মালোম ডেক-চেয়ার বসে আছে। ওর চোখে বাইনেকুলার। জ্যাক ছোট-ডেক থেকে দু-লাফে লোয়ার-ডেকে নেমে এসেছে। জ্যাকের চলাফেরা অদ্ভুত। সে কখনও জাহাজে হাঁটে না। সে লাফিয়ে অথবা দৌড়ে দৌড়ে যায়। এক ফল্কা থেকে আর এক ফল্কায় যেতে সে নিচে নেমে ওপরে উঠে যায় না। সে লাফ মেরে ফাঁকটা ডিঙ্গিয়ে যায়। ছোটবাবু ওপরে উঠেই দেখল, জ্যাক মেজ-মালোমের পাশে বসে রয়েছে। চুপচাপ। চোখে তার বাইনেকুলার। জ্যাকের বড় চুল কেটে ফেলা হয়েছে। জ্যাককে ভীষণ নেড়া নেড়া লাগছে। এত খাটো চুলে জ্যাককে দেখতে ভালো লাগছে না।

তখন যা হয়, চারপাশে সবাই তখন ডাঙ্গা খুঁজে বেড়ায়। ওরাও খুঁজতে গিয়ে দেখল, দিগন্ত বেখায় সমুদ্রের নীল জল পার হয়ে ছায়া ছায়া তীর, মেঘের মতো

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

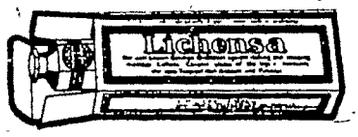

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1676 R-BEN

এক টুকরো জমির ছবি। কি যে আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ নিচে নেমে যাচ্ছে না। যেন দেখা, কিভাবে কাছে যাওয়া যায়, জাহাজ চালিয়ে কাছে যাওয়া যায়। প্রপেলার তেমনি জলের নিচে অন্তহীন ঘুরে চলছে, সাদা ব্লেড নীল জলে ঘুরছে, কেবল ঘুরছে, সাদা ফেনা তুলে দিচ্ছে পেছনে, আর অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে একটি সরল রেখার মতো ভাসমান তিমি মাছের ছবি, ছবিটা ক্রমে যেন জাহাজের সঙ্গে এগিয়ে আসছে, মনে হয় একটা না, অনেক কটা, সারি সারি, একটা আর একটার পেছনে, ছুটে আসছে। সমুদ্রের জল উঁচু হয়ে যাচ্ছে সরল রেখার মতো। প্রপেলার জল ভেঙে ভেঙে একটা এমন দৃশ্যের ছবি তৈরি করে রাখলে মনে হয় জাহাজটির পেছনে তিমি মাছেরা স্রোতের মতো জলের নিচে উঠে আসছে। ছোটবাবুর বেশ ভাল লাগছিল—সে যত দূরে যায় চোখ মেলে দিচ্ছে।

আসলে এমন একটা সুন্দর দৃশ্য সে কবে দেখেছে জানে না। সে কেমন বিস্ময়ে নড়তে পারছে না। সূর্য অস্ত গেছে। সমুদ্র এখন ভীষণ লাল। আকাশ লাল হয়ে গেছে। আর সাদা জাহাজ। সাদা জাহাজটাকে সে কিছুতেই ভাবতে পারে না জাহাজ, আসলে সেই সৌরলোকের অন্তহীন যাত্রার মতো মনে হয়, যেন চারপাশে সব গ্রহ নক্ষত্র, উপগ্রহ আর এক সৌরলোক থেকে অন্য সৌরলোকে একটা যান অনবরত ছুটছে। তারা ক'জন জাহাজি তার ভিতর বসে রয়েছে। বিরাট এক স্পেস-অডিসির মতো এই যানে তাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

জাহাজে ক্রমে আলো জ্বলে উঠল। দূরের বন্দরে আলো জ্বলছে। জ্যোৎস্না রাত সমুদ্রে আলো জ্বললে এক আশ্চর্য মায়ার খেলা। ডেকের মাস্তুলে মাস্তুলে আলো, ব্রীজের উইংসে আলো, কেবিনে কেবিনে আলো, সামনে পেছনে সব জায়গায় আলো। উগ-ওয়াচে যার 'আপিলে' পাহারা দেবার কথা তার ছুটি, জাহাজ বন্দর ধরলে, ফরোয়ার্ড পিকে পাহারা লাগে না। তাকে কোন দূরের জাহাজ অথবা পাহাড় দেখে তখন ঘণ্টা বাজাতে হয় না। সেও শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেকে।

এ-ভাবে জাহাজ ক্রমে বন্দরের কাছাকাছি চলে আসছে। কেউ নেমে যায়নি। সূর্যাস্তের জাহাজিরা রাতের খাবার মেসরুমে খেয়ে নেয়। সবাই ভুলে গেছে খেতে হবে। ভান্ডারি ভীষণ গালাগাল করছে। জাহাজিদের খাইয়ে দিতে পারলেই ছুটি। সেও তখন তার বুড়ো চোখে বন্দরের আলো, অস্পষ্ট ছায়া অথবা দূরের কোন জাহাজে ব্যান্ড বাজতে থাকলে, সুদূরে সেইসব বিদেশিনীদের কথা মনে করে জীবন অন্তহীন এক সৌর-যানের মতো—কেবল নিয়ত চলা, এমন ভাববে। নামাজের সময় মনের ভিতরে কত কথা বুড়ো বয়সে যে তার উঁকি দেয়।

আসলে ছোটবাবুকে ওপরে ধরে তুলেছিল অমিয়। এখন এ-সব দেখে মনে হচ্ছে, সেও চারপাশে এই জাহাজের চারপাশে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার শরীর দুর্বল, সে ভাল করে এখনও খেতে পারে না, গলায় খেতে লাগে, এসব মনে থাকে না। কাপ্তানের ছেলেটা তো মেজ-মালোমের পাশে একটু সময় বসে আবার কোথায় দু-লাফে নেমে গেল। পিছিলে সে আসে না। এখানে নিচে ফোর-ক্যাসেলে খালাসিরা থাকে, তার হয়তো মানা আছে এদিকটাতে আসা। তবু আজ ছোটবাবু দেখল সব বাঁধা নিষেধ ভেঙে জ্যাক ছুটে ছুটে পিছিলের রমনাবাজু দিয়ে ঢুকে গঙ্গাবাজুতে বের হয়ে গেল। সবাই তখন তটস্থ। সারেঙও দুহাত দিয়ে পিছিলের সব জাহাজিদের সরিয়ে দিচ্ছে। কোন কারণে যেন গায়ে গা না লেগে যায়।

আর ছোটবাবু তখন হাঁটছে। মৈত্র দেখছে না, ওর পাশে ছোটবাবু নেই। ছোটবাবু ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। বোট-ডেকে মেজ-মালোমের কাছে কী যে ওর আকর্ষণ। সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই মেজ-মালোম বললে, ও-কে!

সে বলল, ইয়েস ও-কে! তারপর সে বলল, এনি ওম্যান সেকেন্ড!

—নো।

ছোটবাবু চুপচাপ ওর চেয়ারের নিচে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। সেই প্রথম দিন থেকেই মানুষটিকে কেমন পাগলাটে পাগলাটে লাগে। থুতনিতে ওর লাল দাড়ি। সে সবসময় সাদা হাফ-প্যান্ট, হাফ-সার্ট পরে থাকে। পায়ে সাদা মোজা, এবং সু। সেই একমাত্র অফিসার মানুষ, ফোকসালে গিয়ে যে রোজ দেখে আসছে তাকে। কেমন আছে ছোটবাবু, এখন কি খাওয়া দরকার, সামান্য অষুধ, অন্য সব আরও যা কিছু দরকার সে দিয়ে আসছে। মানুষটিকে ছোটবাবুর ভীষণ ভালো লাগে। সে এর সঙ্গে খুব সহজে কথা বলতে পারে। কোন সংকোচ বোধ করে না। এই যে সে বলে ফেলল, এনি ওম্যান সেকেন্ড যেন এটা না বললে আর কিছু বলার থাকে না। এখনতো জ্যোৎস্না রাত, এখনতো দূরের বন্দরে নানাবর্ণের আলো, শুধু হাজার জোনাকির মতো জ্বলছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, আর জাহাজ ইতস্ততঃ চারদিকে নোঙর ফেলে আছে, অথবা বয়াতে বাঁধা। তার ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যেতে পারে না। এমন কি বাড়ি ঘর মন্দির সব অস্পষ্ট। তার ভেতরে মেয়েমানুষের ছবি দেখা স্বপ্নের মতো।

আসলে ছোটবাবুর মনে হল, মেজ-মালোম দূরবীনটা চোখে দিয়ে অন্য একটা জগতের সন্ধানে থাকে। সেখানে একটা বড় রাস্তা থাকে। দুধারে পাইনের গাছ থাকে, পাশে নীল জলের হ্রদ থাকে, সে একটা স্কুটারে বসে থাকে, পেছনে থাকে এক সুন্দরী যুবতী, যেন নিশিদিন সে স্কুটার চালাচ্ছে, আর পেছনে পিঠের কাছে যুবতী তাকে সাপ্টে বসে আছে। সে একা জাহাজে উঠে এলেও যুবতী তাকে বুঝি ছাড়ে না। তা ছাড়া মানুষের কি যে আছে, কি যে আশা কুহকিনী, আশা কুহকিনী না হলে এমনভাবে সমুদ্রের ভিতরও একটা মানুষ দূরবীন চোখে লাগিয়ে বসে থাকতে পারে না।

মেজ-মালোম বলল, তুমি ছোটবাবু এটা ধর।

—আপনি স্যার।

—আমার এখন জাহাজ বাঁধাছাঁদা আছে।

—কিন্তু স্যার।

—কিন্তু কি আবার!

—এখানে একা বসে থাকব...

মেজ-মালোম জানে ছোটবাবু জ্যাককে ভীষণ ভয় পায়। জ্যাক সম্পর্কে একটা কৃত্রিম ভয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাহাজে। সবাই জ্যাককে ভীষণভাবে এ-জন্য এড়িয়ে চলে। কিন্তু মেজ-মালোম জানে জ্যাক, শান্ত নিরীহ, সেও প্রথম প্রথম তার সম্পর্কে ভীষণ গুজব শুনেছে, এখন দেখেছে উল্টো। জ্যাক আপন মনে থাকে, সে নিজের খুশিমতো কাজ করে। তার যেখানে খুশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কাউকে বিরক্ত করে না। অথচ চিফ-অফিসার কেন যে সবাইকে জ্যাক সম্পর্কে ভীষণ সাবধান করে দিয়েছে!

মেজ-মালোম বলল, চলো তবে পিছিলে। আমার তো সেখানেই কাজ। তুমি দেখতে টেখতে পেলে সহজেই ডাকতে পারবে।

ছোটবাবু বলল, সেই ভাল স্যার। এবং এ-ভাবে সে মেজ-মালোমের পেছনে হেঁটে গেল। খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে লোয়ার ডেকে নেমে গেল। নামার সময় মেজ-মালোম বলল, কি ধরতে হবে?

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

ছোটবাবু বলল, না। আপনি এগোন আমি আস্তে আস্তে হাঁটছি। ছোটবাবু ডেকের ওপর ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। মাথার ওপর মাস্তুলের লাল আলো দুলছে। ছোটবাবুর ছায়াটা আলোর জন্য একবার বড় হচ্ছে আবার ছোট হচ্ছে।

আর কি যে জাহাজটা নিরিবিলি মনে হয় এখন। জাহাজ থেমে গেছে। খুব কাছেই বন্দর। তবু সে বুঝল, প্রায় মাইলের ওপর হবে ডাঙ্গায় যেতে গেলে। সমুদ্রের ভেতরেই জাহাজ বরাতে বাঁধাছাদা হচ্ছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে বসে রয়েছে। দূরবীন চোখে লাগালেই ডাঙ্গার সব ফাঁকফোকরগুলো কেমন চোখের ওপর ভীষণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে বসে বসে চারপাশে খুঁজতে থাকল। সে কি খুঁজছে! তার তো এ-ভাবে খোঁজার কথা নয়। সে তো এমনভাবে জাহাজে বাঁচবে বলে আসেনি। এ-ভাবে সে খোঁজাকে কেমন অসভ্যতা মনে করে থাকে, তবু বুঝি জাহাজের আছে এক অতীব কঠিন অসুখ, ছোটবাবু জানে না, এই ন দশদিনেই তার ভিতরে ভিতরে একটা অসুখের জন্ম হচ্ছে। তারও চুরি করে ডাঙ্গার মেয়ে দেখতে ভাল লাগে।

মাঝে মাঝেই হাঁক আসছে, হ্যালো ছোট, এনি ওম্যান।

—নো স্যার।

—একা দেখে ফেলবে না! ডাকবে।

—ইয়েস স্যার, ডাকব।

—এ ব্যাপারে মানুষেরা ভীষণ স্বার্থপর।

ছোটবাবু বলল, একটা স্যার কুকুর।

—কুকুর!

—হ্যাঁ স্যার, কুকুরটা মাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

মেজ-মালোম বলল, অস্পষ্ট আলোতে কুকুর, মানুষ, মেয়ে দূরবীনে একরকমের দেখায়। ভালো করে দ্যাখো।

—ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

মেজ-মালোম হাসিল ফেলে চলেও আসতে পারছে না। ডেক-জাহাজিরা এখন দড়িদড়া ঢিলা দিচ্ছে। উইনচ চালাচ্ছে বব্বু। ডেক-টিণ্ডাল হাসান কেবল হারিয়া হারিয়া করছে। হাসিল ক্রমে নেমে যাচ্ছে জলে। দুটো ছোট নৌকা জাহাজের আগে এবং পিছনে। ওরা হাতের ইসারায় ঠিক ঠিক বরাতে হাসিল বেঁধে ফেলছে। অথচ মেজ-মালোম কি যে করে! সে আবার হাই করে ডাকল,

—আছে এখনও।

—আছে।

—আর একটু। এই হয়ে গেল। এই বাস্টার টিণ্ডাল—শালা লোগ, জাহাজ জখম করে দেবে! তারপরই যেন ক্লিশিচয়ানিটির সারমর্ম বুঝে ফেলার মতো দু হাত ওপরে তুলে ফাদারের কায়দায় বলে যাওয়া—আ..স...তে, আ...স...তে। তারপরই ছুটে ছোটবাবু কাছে ফক্কার ওপরে চলে এলে শুনল, কেমন দুঃখের সঙ্গে যেন বলা, স্যার রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না।

মেজ-মালোম ছোটকে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। সে প্রায় যেন জোরজার করে কেড়ে দূরবীনটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চোখের ওপর রাখলে দেখল, শুধু অস্পষ্ট ঘর-বাড়ি, এলোবেলে রাস্তা। রাস্তা, সমুদ্রের বালিয়াড়ি, না জাহাজ, না কোন ব্রীজটিজ হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আসলে এতদূর থেকে যাতে কিছু দেখা সম্ভব না। তবু নিরিবিলি দেখলে কখনও কখনও মনে হয় একটা বড় রাস্তা অনেক দূরে, এই মিচিগান টান হবে তার দিকে চলে গেছে, সে একটা মোটর সাইকেলে বসে রয়েছে, তার শরীরে শীতের পোশাক, পিছনে কেউ যেন সাপটে ধরে আছে। চুলের মেয়েলি গন্ধ নাকে লাগছে।

এ-ভাবে সে যখনই দূরবীনে চোখ রাখে, এমন একটা গন্ধ পায়। এখন জাহাজে তার, সারা অবসর সময়ে এই একটা আশ্চর্য আলাদিনের আকাঙ্ক্ষা হাতে! এটা নিয়েই সে আছে, সে এখন এই ফক্কাতেই বসে থাকবে, কতক্ষণ বসে থাকবে সে নিজেও জানে না, তার আকাঙ্ক্ষা, কারণ কিছুদিন সমুদ্রে থাকলেই বুঝি তার মনে হয় গঙ্গা কবে সে ফেলে এসেছে। বন্দরে নেমে যেতে না পারলে ফুল ফল পাখি, মেয়েদের হেঁটে যাওয়া সব অর্থহীন।

ফক্কাতেই মেসরুম বয় এসে খবর দিয়ে গেল, রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। ডাইনিঙ হলে, কাপ্তান বসে রয়েছে। রাতের খাবারটা সবাই একসঙ্গে বসে খায়। ডাইনিঙ হলের লম্বা টেবিলের মাঝখানে কাপ্তান, পাশে জ্যাক, এ-পাশে চিফ-অফিসার, জ্যাকের পাশে সেকেণ্ড এভাবে থার্ড, মার্কনি সাব, ওপাশে, চিফ এনজিনিয়ার, দুপাশে সেকেণ্ড থার্ড এবং এভাবে ফোর্থ ফিফথ। স্টুয়ার্ড মেনু রেখে যায় প্রত্যেকের সামনে। টাইপ করা মেনুর কাগজটা হলদে রঙের থাকে। এবং ওপরে নানাবর্ণের আলো। ব্যাণ্ড বেজে উঠলেই কোন বড় হোটেলের একটা নাচের ঘর হয়ে যেতে পারে। জ্যাককে দেখা যায় তখন চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে।

আর এটা কেন যে হয়, জ্যাক ভারি সুন্দর, মেজ-মালোম এ-জাহাজে ওঠেই কেমন সেই মেয়েলি চুলের গন্ধটা জ্যাকের কাছে গেলে তখন পায়। তার তো সাহস হয় না, সে বলতে পারে না, জ্যাক, তুমি কি কেবিনে কোন মেয়ে নিয়ে রাত্রিবাস কর। তোমার শরীরে এমন গন্ধ কেন। তুমি তো বালক, সাবালকের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। বরং যে তোমার কোমর ভীষণ সরু, তুমি বেশ মেয়েদের মতো মাঝে মাঝে হেঁটে যাও। এটা কি তোমার এ-জাহাজে একটা ভীষণ নেশা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য করা। তোমার এটাকে কি বলব, এই পেছন টেছন বলতে পারি, বেশ ভারি হয়ে উঠছে। জাহাজিরা যে কি এখন করে! আসলে সেও জ্যাককে ভয় পায়। ভীষণ আদুরে ছেলে। কাপ্তান তো সেদিন দেখেও কিছু বলল না, মেজ-মিস্ত্রি বলেছে এটা ইচ্ছা করে করেছে, ইচ্ছা করে জ্যাক পা তার মাড়িয়ে দিয়েছে। এখন মেজ-মিস্ত্রি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একেবারে থেতলে দিয়েছে নোখটা।

ওর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, সে তবু উঠে পড়ল। পাশে তার কেউ নেই। ছোটকে, এনজিন-বড়-টিণ্ডাল ধরে ধরে নিয়ে গেছে। ছোট বেশ ছেলে। ভীষণ লম্বা। একটু রোগা মতো। চোখ ভারি, নাক উঁচু, কপাল বেশ বড়। চিবুক বেশ ডিমের মতো। এবং মুখে সব সময় এক আশ্চর্য সুষমা বয়ে বেড়ায়। মানুষের মুখে, বিশেষ করে ওর মুখে নরম নীল রঙের গোঁফ দাড়ি মিলে সে যেন সুদূর এক পর্বতের গুহাবাসী মানুষের মতো জীবের কেবল মঙ্গল কামনা করছে। আগে মোষ ভাল করে দেখেনি, বাংকারে পড়ে গেলেই তার কিছু কাজ পড়ে যায়। ওদের অযুধপত্র দেওয়ার একটা কাজ তাকে করতে হয়। ওতেই আসা যাওয়া। ছোটর চোখ দুটো ফোর-ক্যাসেলে গেলেই কেমন ব্যাকুলভাবে তাকাতো। সে যেতে যেতে ভাবল, সুন্দর মুখে ছোটবাবু এ-জাহাজে ক্রমে সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠছে। কেবল একটা মুগ, মেজ-মিস্ত্রি পুষে রেখেছে। সে যখন ডেকের ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে তখন এটা বোঝা যায়।

তবু সে নানাভাবে ভাবতে ভাবতে এল-ওয়েতে ঢুকে গেল। এনজিনে কোন শব্দ নেই। সে যে হেঁটে যাচ্ছে, সে নিজের জুতোর শব্দ পাচ্ছে। কেবিনের ভিতরে কেউ এখনও আছে। তার চলাফেরার শব্দ সে যেতে যেতে পাচ্ছে। ঝিকঠাক পোশাক

না পরে গেলে, কাপ্তান ভীষণ ক্ষেপে যায়। ওরও কেবিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রাতের পোশাক পরে নিতে হবে। এবং সে যখন টিপটপ হয়ে বের হয়ে এল, বয় বাবুর্চিদের খুব দৌড়াদৌড়ি। আসলে কাপ্তান এসে অনেক আগেই বসে থাকেন। একটু গল্পগুজব করা, এই যে পৃথিবীর চারপাশটা সারাজীবন ধরে দেখে ফেলার পর নানারকমের গল্প মাথায় গিজ গিজ করছে, এ-সব ঠিক বলতে না পারলে জাহাজী জীবনে মজা পাওয়া যায় না। জ্যাক কাছে থাকলে একরকমের গল্প, এই মাছ টাছের গল্প, তিমি মাছ, শুয়োক মাছ, অথবা সিল মাছের গল্প, অথবা নানাবর্ণের সব যে দ্বীপ, তার গাছপালা পাখি এবং যেতে যেতে যে মনে হয় অনেক দ্বীপে একটা কাক পর্যন্ত নেই, কেবল, নিশিদিন সমুদ্রে একা থেকে থেকে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে যদি কেউ ভেড়ার পাল নিয়ে যায়, আর হাতে সুবর্ণ লাঠি থাকে, তবে কোন বাইবেলে বর্ণিত মেষপালকের মতো দেখাবে। আর জ্যাক না থাকলে অন্য রকমের গল্প। জ্যাক অনেক সময় তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনেই খেয়ে নেয়। এতে কাপ্তান অমত করেন না। কেউ কিছু বললে, বলেন, ছেলেমানুষ, সন্ধ্যা হলেই ঘুম পায়।

অথচ মেজ-মালোম দেখেছে, জ্যাক বেশ রাত করে ঘুমোয়। ওর পাশের কেবিনে বড় বড় সব ট্রাঙ্ক। বিচিত্র সব বই। সে বই পড়তে ভালবাসে। আর বিস্ময়ের ব্যাপার জ্যাক এমন সব বই পড়ে যাতে শুধু সমুদ্রের কথাই আছে। সে কিনারার কথা জানতে চায় না। তার মনে হয় না, বড় একঘেয়েমি এ-ভাবে চলা। গত সফরের আগের সফরে সে জ্যাকের সঙ্গে এই জাহাজেই ছিল। সে দু সফর দিয়েছে এই জাহাজে। জ্যাককে সে দুবার দেখেছে। এবারে জ্যাকের শরীরে আরও বেশি ভালবাসার কথা লেখা আছে যেন। সে জ্যাক কাছে এলেই কেমন টের পায় মানুষেরা পৃথিবীর চারপাশে, বনে জঙ্গলে, কোন দ্বীপে, কোন নির্জন পরিত্যক্ত জাহাজে শুধু মেয়েদের কথাই কেবল ভাবে। জ্যাককে দেখতে, বড় বেশি মেয়েলি মেয়েলি। কিন্তু জ্যাকের কথাবার্তা পুরুষের চেয়েও কঠিন। জ্যাক খুব আস্তে কথা বলে। খুব ওজন রেখে কথা বলে। যেন বোঝে, সে জাহাজের সর্বময় কর্তার ছেলে। সে খুব একা একা থাকতে ভালবাসে। বোধহয় জ্যাকের ভীষণ অহঙ্কার—সে অহঙ্কারে ডেকের ওপর পা না মাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। মনে হয় না, জ্যাকের ভিতর এই একাকীত্বের কোন দুঃখ আছে। তখন জ্যাক শান্ত, গম্ভীর নিরীহ আবার চঞ্চল, জ্যাককে বুঝা মুস্কিল।

মেজ-মালোম তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। সে তার ড্রিংকস বোট-ডেকে পাঠিয়ে দিতে বলল। মেসরুম-বয়, একটা ইজিচেয়ার, একটা টিপয়, একটা গ্লাস, আর রেশনের মদ রেখে এলে বেশ যেমন একজন মানুষ, চান ফেলে বড়শিতে মাছ ধরার জন্য একটা সিগারেট খেতে খেতে বের হয়ে যায়, তেমনি মেজ-মালোম দূরবীন হাতে ওপরে উঠে গেল। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

তখন যেই যার শব্দ আসে, এনি ওম্যান সেকেণ্ড।

—নো।

—ইফ এনি ওম্যান?

—ডাকব। তাবৎ মনুষ্যকুলকে ডেকে বলব, এস, দ্যাখো।

জ্যাকও একবার বলে গেছে। এনি ওম্যান!

—নো।

—এনি ম্যান!

—ম্যান!

—ইয়েস ম্যান।

মেজ-মালোম বলল, ম্যান দিয়ে কি হয়!

জ্যাক বলল, ছোটকে কেমন দেখলে।

—ভাল

মেজ-মালোম বুঝল এখানেই জ্যাকের অহঙ্কার। কোন প্রশ্ন শুনতে সে চায় না। কাপ্তানের সে ছেলে, এটা মনে হতেই সে বুঝিয়ে দিয়েছে, সব প্রশ্নের জবাব তাকে দিতে হবে এমন কথা নেই।

—ছোট কি দেখছিল দূরবীনে?

—ওকে পাহারায় রেখেছিলাম। যদি মেয়েটেয়ে চোখে পড়ে।

—ন্যাস্টি।

মেজ-মালোম বলল, ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। বলে জিভে মেজ চুক চুক করতে থাকল। সে ড্রিংক করছে, চোখ বুজে ড্রিংক করছে। তার এখন দূরবীনে, চোখ রাখতেও ভাল লাগছে না।

জ্যাক প্রায় দৌড়ে তার কেবিনে ঢুকে গেল। সে দরজা বন্ধ করে দিল। পোর্টহোল খোলা। এখন ভীষণ গরম বলে পোর্টহোল খোলা রাখতে হয়। হাওয়া-পাইপ ঘর ঠাণ্ডা রাখতে পারে না। তবু জ্যাক পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। কাচের ওপর পর্দা টেনে দিল। বড় আয়না সামনে। সঙ্গে এটাচড বাথরুম। সে এখন ভাবল ঠাণ্ডা জলে ভাল করে হাত মুখ ধোবে। এইসব ইণ্ডিয়ান নেটিভদের সেকেণ্ড বাজে সব ব্যাপার শেখাচ্ছে। সেকেণ্ড-অফিসারের দূরবীনে মেয়েমানুষ খোঁজা কেমন তার অহঙ্কারে লাগে।

সে রাগেই হোক, দুঃখে হোক শরীর থেকে সার্ট খুলে ফেলল। একেবারে খালি গা। এও হতে পারে ভীষণ গরম বলে গায়ে জামা রাখা যাচ্ছে না। সারাদিন ডেকে পুরুষ সেজে থাকতে তার খারাপ লাগছে না। ডেকে, যখন জাহাজিরা দুলে দুলে মাস্তুলে অথবা ফানেলে রঙ লাগায়, তখন তার মনে হয় সেও উঠে যাবে। কখনও কখনও উঠে যায়। নিচে তখন ডেক-সারেঙ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার ভাল লাগে এ-ভাবে দড়িদড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে। কিন্তু আজ এসেই কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে শরীরের যেখানে যে-ভাবে ভালবাসার আধারগুলো ক্রমে পুষ্ট হচ্ছে, সেগুলো দাঁড়িয়ে একটু দেখে।

সে আয়নায় দাঁড়ালে বুঝতে পারে বয়স অনুপাতে সে ভীষণ লম্বা। শরীর তার হাল্কা। খুব পরিমিত শরীর। মোটাও নয়, খুব রোগাও নয়। সে হাত লম্বা করে দিলে তাকে ব্যালাড সিংগারের মতো দেখায়। আশ্চর্যভাবে সে দাঁড়ালে দেখতে পায় আয়নায়, কি সুন্দর মসৃণ বুকের ভিতর ভালবাসার আধার সামান্য উঁচু হয়ে উঠছে। সে তখন হাত রাখে। এ-ভাবে হাত রাখলে ভাল লাগে সে যেন জানত না। আজ প্রথম তার এ-সব ভারি ভাল লাগছে।

জ্যাক অন্যদিন পুরুষের মতো রাত্রির পোশাক পরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু আজ সে তার নাইটি বের করে নিল। সিল্কের নাইটির রঙ একেবারে শরীরের রঙয়ের সঙ্গে মিলে গেছে। সে যখন নাইটি পরে হেঁটে যায় তখন তার ইচ্ছা করে আলোগুলো কেবিনের জ্বালা হোক। সে যেদিকে তখন ঘুরছে তার চারপাশে একটা ছায়া ঘুরছে। মোমের পুতুলের মতো ছায়াটা চারপাশে ঘুরছে। এবং সে দেখতে পেল, তার পাতলা সিল্কের ভিতর দিয়ে আজানু স্ত্রীজাতির অহঙ্কার শরীরে ক্রমে দেখা দিচ্ছে। এখন যদিও অস্পষ্ট, এবং মাসকাল পার হলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে এখনও ঢোলা জামাপ্যান্ট পরে না। এখনও তার তেমন সব পুষ্ট নয় বলে, প্রায় অঙ্কুরোদ্গমের মতো সারা শরীরে ব্যাপারটা নিয়ত ঘটছে বলে, সে স্পর্শ

প্রকাশিত হয়েছে

বাংলা ছোট গল্প

ত্রৈমাসিক, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা শ্রাবণ

ছোট গল্প লিখেছেন ঃ
অমিয় রায়চৌধুরী, সুনীল মজুমদার
দিলীপ সেন, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
জহর সেনগুপ্ত ও স্বদেশরঞ্জন দত্ত

মূল্য ঃ পঞ্চাশ পয়সা

শারদীয় সংখ্যা ঃ এক টাকা

কার্যালয় ঃ ২৮ পদ্মপুকুর রোড,
কলিকাতা—২০

হাল্কাভাবে চলাফেরা করতে পারে। তার কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু সে এভাবে কতক্ষণ যে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবা যত দিন যাবে তত ক্রমে চুল খাটো করে কেটে দেবে। চুল কাটবার সময় বাবার সঙ্গে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে। কিন্তু সে যাই করে, কেউ কাছে না থাকলে করে। বাবার অপমান হোক সে সেটা কোনদিন চায় না।

তবু কাপ্তান বলেছিল, বনি, চুল খাটো না করে দিলে তোমাকে ঠিক কেমন যেন দেখায়।

—ভাল দেখায় না বাবা!

—না!

—ভাল না দেখাক, তুমি আমার চুল বেশি খাটো করবে না।

—না বেশি কাটছি না। দ্যাখ। বলে তিনি বনির চুল নেড়া করে দিতে দিতে বলতেন, আমি তখন জাহাজে তোর ডেক-এপ্রেন্টিসে আছি। তখন ভাল চুল ছাঁটতে জানতাম না। ব্যাক লাইনের লম্বা সফর। পোর্টে নেমে চুল কাটার সময় থাকে না। আমাদের চিফ-অফিসার বুঝলি, একটা ঘুঘু ছিল। সে আমাকে বলল, ওহে ছোকরা, জাহাজে উঠেছ, এ্যাপ্রেন্টিসগিরি করছ, চুল টুল কাটতে শিখেছো তো।

—ওঃ ঘাড় ধরে গেছে!

—এই হয়ে গেল, বলেই কাঁচি কচকচ করে চালাতে থাকল। তারপর বুঝলি বনি, একখানা যা চুল ছেঁটে দিলাম না।

—মানে

—মানে কাগে চুল ঠুকরে নিলে যেমন হয়। ঝড়ের ঘাড় ছেঁটে আমি প্রথম চুল কাটা শিখি। এখনতো সবারই ইচ্ছা বেশ চুল ছেটে দিই। আমার মতো জাহাজে কে এত ভাল চুল কাটে।

এবং এ-জাহাজে বন্দরে নেমে চুল ছাঁটা দয়া। কারণ, বেশ লম্বা পাড়ি। বুয়েনস-এয়ার্স না যাওয়া পর্যন্ত চুল ছাটার কথা ওঠে না। মাঝে যা-সব বন্দর পাওয়া যাবে, সে একদিন কি দুদিন হল্ট, কাপ্তান পর্যন্ত জানে না। এজেন্ট অফিস বলতে পারবে ব্যাপারটা। এবং বেশ যখন চুল ছেঁটে কাপ্তান আয়না কাছে দিয়ে বললেন, দ্যাখ কেমন সুন্দর চুল কেটেছি, তখন বনির দু-পা ছাড়িয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি। সবাই ছুটে এসেছিল। পাশাপাশি যারা থাকে সবাই। স্টুয়ার্ড পর্যন্ত। কাপ্তান কেবল সবার সমর্থন চাইছেন, কি স্টুয়ার্ড, চুলটা সুন্দর দেখাচ্ছে না। এদিক থেকে দ্যাখো. হ্যাঁ ঠিক ছেঁটেছি না। এই যে মেজ এসে গেছ, তুমি বলতো, কেমন হয়েছে।

—বা বেশ! সুন্দর! এমন তো হয় না। একেবারে বাটি ছাঁট।

—বাটি ছাঁট মানে। কাপ্তান প্রশ্ন করলেন।

—সে মাস্টার, ইণ্ডিয়ার রাজা-মহারাজারা যেসব ছাট ফাটে চুল কাটে।

—তবে! তুমি জ্যাক কেবল লাফাচ্ছ

অগত্যা জ্যাক কি করবে সে সবার সামনে কাঁদতে পারে না। অহঙ্কারে লাগে। সে চুপচাপ উঠে যায়। এবং পরে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার হু-হু করে গলা বেয়ে কান্না উঠে আসে। তার এমন সুন্দর চুলটা বাবা জাহাজে উঠেই ক্যাচ ক্যাচ করে ছেঁটে দিয়েছে। বাবার একবার হাত পর্যন্ত কাঁপল না!

বনি এখন নিজের কেবিনে এ-সব নিয়ে ভাবে না। বোধহয় বাবা খেয়ে-দেয়ে কেবিনে যাচ্ছেন। পাশের ল্যাডার দিয়ে ব্রীজে উঠে যাবার পথ। বোধহয় কোন কাজে কোয়ার্টার মাস্টার সিঁড়ি ধরে উঠছে। এ-কেবিনে বসে সব টের পায়। জুতোর শব্দ প্রায় তার সব মুখস্থ, বাবা, না সেকেণ্ড-অফিসার, না চিফ, না থার্ড-অফিসার অথবা যদি কোয়ার্টার মাস্টার হয় তবু সে টের পায়। দরজা না খুলে গেলেও টের পায় কে যাচ্ছে। তার দরজা বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়াবার সাহস কারো নেই। সে এখন এ-কেবিনে সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তার টিপয়ে জল। সে শুলে পায়ের কাছে বড় আয়না বেশ পালিশ করা দামী মেহগিনি কাঠের বাক্স। একেবারে সাদা বিছানা। প্রতিদিন সকালে চাদর, বালিশের ওয়ার পাল্টে দিয়ে যায় কাপ্তান বয়। সে অন্যদিন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু আজ তার কেন জানি ঘুমোতে ইচ্ছা করছে না।

সে কেবিনের সবকটা আলো জ্বেলে দিল। দুটো আলো পাশাপাশি লাল নীল বাল্ব। একটা সাদা ডুম, ফারুকাজ করা কাচের ঝালরে ঢাকা। আর ঠিক আয়নার সামনে কালো রঙের বাতিদানের ওপর হলুদ রঙের ডুম। ফলে স্পিড়ে পাখা ছেড়ে দিল, হাওয়া পাইপের মুখ ভাল করে ঘুরিয়ে দিল। তারপর সুন্দর প্রসাধন করে সে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

তার শরীরে সোনালি গাউন। সিল্কের পাতলা গাউনের ভিতর ওর আশ্চর্য শরীর দেখা যাচ্ছে। খুব হাওয়া, প্রায় ঝড়ের মতো হাওয়া চলে, চাদর, পাতলা গাউন সব উড়ছে। সে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ভাসছে। আয়নায় সে নিজেকে এমনভাবে দেখে কেমন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও সুন্দর চুলের জন্য ওর ভারি মায়া হচ্ছিল, তবু এমন একটা পোশাকে সে ভীষণ বিহ্বল হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছিল, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। অথবা গভীর সমুদ্রে সে ডুবে যাচ্ছে। চারপাশে নীল জল, কারণ ঘরের আলোটা এক নীল জলের আভার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কেবিনে, সে তার ভিতর শুয়ে আছে, চারপাশে এখন মাছেরা ঘোরাফেরা করছে। কোন মাছ ওর খুব কাছে। তেমন সুন্দর মনে হচ্ছে না। কেবল একটা বুপোলি মাছ অনেক দূরে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সহসা বনির মনে হল, সে এলিস ইন-ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড হয়ে গেছে। আবার সে কেন দেখতে পাচ্ছে আয়নায়, সেই ছোট্ট রাজকুমার যার একটা ছোট্ট গ্রহে বাস, যে সহসা পৃথিবীতে এসে আটকে পড়েছিল —যেতে পারছিল না, আর নানাভাবে প্রশ্ন পৃথিবীর সেই বিমানচালককে, অর্থাৎ বাওয়াব গাছের চারা ভীষণভাবে অনিষ্ট করে যাচ্ছে তার গ্রহে। একটাই গাছ সারা গ্রহে, এত ছোট্ট গ্রহ যে সেখানে এত বড় গাছ থাকা ঠিক না, ওর আগ্নেয়গিরি আছে একটা, যা অনায়াসে বাওবারের পাতায় ঢেকে রাখা যায়, বদী আছে, যা সে ইচ্ছা করলেই ইউকনের পাতায় ঢেকে দিতে পারে—এমন একজন ছোট্ট রাজপুত্র তার পায়ের কাছে কেন যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভেবে পায় না, চোখে তার এমন সব স্বপ্ন জড়িয়ে আসছে কেন। কেমন তার ভিতরটা ভীষণ আবেগে কাঁপছে। সে বুঝতে পারছে শরীরে এক অতীব উত্তেজনা। সে পৃথিবীতে এমন একটা সুন্দর বস্তু আছে বেঁচে থাকার জানত না। ভারি আরামে তার ঘুম আসছে। ছোট্ট রাজপুত্র তার পৃথিবীতে এসে আটকে গেছে। তার নিজের গ্রহে আর ফিরে যেতে পারছে না। সে স্বপ্নের ভিতর কেবল হাসছে, হেসে চলেছে। সে আলোর ভিতর দুহাত বুকের ওপর রেখে কেবল এক অসমতল অমসৃণ পাহাড়ের চারপাশে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার আর কি যে মনে হচ্ছিল না! ছোট্ট রাজপুত্রের জন্য ভিতরে ভিতরে একটা মায়া গড়ে উঠছে। সে নিজেও সেটা কি-ভাবে কখন হয়েছে জানে না।

(ক্রমশঃ)

রামায়ণী প্রকাশ ভবন ঃ ১০৬।১, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

অসামান্য গ্রন্থ

সোনার মলাট তারাশঙ্কর

সম্পাদনা ঃ শ্যামল চক্রবর্তী

খোঁজ নিন ঃ ন্যাশনাল পাবলিশার্স কমলার্স

৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

মনের খবর

মানসিক রোগ—১

কথায় বলে 'মাথা থাকলেই মাথার ব্যথা'। কথাটাকে আরও বিস্তারিত করে দেখলে বলা যায় দেহ থাকেই তার ব্যাধিও কখন সখন হবে। সেই রকম মনের সম্বন্ধেও বলা যায় যে মন থাকলে তার ব্যাধিও থাকতে পারে। যাঁরা মনের অস্তিত্ব মানেন না, তাঁদের অবশ্য মনের ব্যাধি থাকা না থাকা বা সে সম্ভাবনার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মাথা না থাকলে যেমন মাথাব্যথা হতে পারে না, তেমনি মন না থাকলে মনের রোগ হতে না। আমরা মনের অস্তিত্ব মেনে নিয়েই এতদিন মন সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। মানুষের জীবনে এমন অনেক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির উৎস মন। তার কতকগুলিকে স্বাভাবিক মানসক্রিয়া বলা হয়, যেমন ভাল লাগা, মন্দ লাগা, এটা ওটা ইচ্ছা করা, কোনও কথা বা বিষয় মনে রাখা, স্নেহ, ভালবাসা, সুখ বা দুঃখ অনুভব করা ইত্যাদি। আর কতকগুলি মানসক্রিয়া আছে যেগুলিকে রোগ-দুষ্ট বলা হয়। এই মানসিক রোগ সম্বন্ধে ক্রমে কিছু আলোচনা করব।

শরীরের রোগের বেলায় দেখতে পাই, রোগ বোঝাতে শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম করে রোগ বলা হয়। যেমন—মাথাব্যথা, চোখের ব্যারাম, পেটের ব্যারাম ইত্যাদি। এগুলি হল সাধারণ নামকরণ। একে বিশেষ করে এক একটা রোগের নাম করে উল্লেখ করলে তখন রোগের আরও স্পষ্টতর পরিচয় পাওয়া যায়। জ্বর বললে আমরা দেহের তাপ বৃদ্ধি বুঝি। এই জ্বর আবার নানা রকমের হতে পারে—সে হল তার বিশেষ পরিচয়—যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, নিউমোনিয়ার জ্বর, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি আরও কতকরকম আছে। যে কতগুলি জ্বরের নাম উপরে করা হল তাদের কারণ বুঝিয়ে বিশেষ বীজাণু বা বিশেষ অংগের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে রোগের নাম-করণ করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যারামের বীজাণু আজও পাওয়া যায়নি তেমন রোগের নামকরণ করতে বিশেষ কোন লক্ষণকে কেন্দ্র করে নাম রাখতে হয়। শরীরের রোগের বেলায় কোনও না কোন বীজাণুর প্রভাব খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। মনের রোগের বেলায় তেমন কোনও বীজাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি—কারণ তা সম্ভব নয়। বীজাণু তো এক-রকমের বস্তু; মনকে আমরা বস্তু বলে স্বীকার করিনি। পূর্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। তার পুনরুল্লেখ না করে কেবল এইটুকু বলব যে মন যদি বস্তু না হয় তবে তার ওপর বীজাণুর ক্রিয়া সোজাভাবে হতে পারে না। তবু দেখি আমাকে ঘুষি দেখালে আমার রাগ বা ভয় হয়। ঘুষি দেখানো এমনকি ঘুষি মারবার কথা বলা—এতো বস্তুগত বিষয়, আর তার ফলে রাগ বা ভয় হওয়াটা মানস-ক্রিয়া। যদি ঘুষিটা বাস্তব বস্তুর প্রকাশ হয় তবে তা থেকে এই মানসক্রিয়া হয় কি করে। এ সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা আগে করা হয়েছে। তবু সংক্ষেপে আবার বলে নিই। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের এ বিষয় নানা মুনির নানা মত আছে। ভারতীয় দর্শনের মতে মনও একরকম অতি সূক্ষ্ম বস্তু। সুতরাং এই মতানুসারে সূক্ষ্ম বস্তু এই মনের ওপর অন্য বস্তুর ক্রিয়া হওয়ায় কোনও মূল-গত বিরোধ নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য মনোবিদের মতে মন ও বস্তুকে (মাইন্ড অ্যান্ড ম্যাটার) একেবারে পৃথক পর্যায়ের বলায় এদের একের উপর অপরটির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে—তা নিয়ে অনেক তর্ক আলোচনা, অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। আজও তা একেবারে থেমে যায় নি, মতা-ন্তরতাও দূর হয়নি। এই মতবাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল—অদ্বৈতবাদ বা একসত্তা-বাদ (মনিজম)। এই মতবাদানুসারে মন ও বস্তু একই মূল থেকে উদ্ভূত বলা হয়। অর্থাৎ একই মূল থেকে মন ও বস্তু এই দুটি ধারাও সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কোনও সূত্রে একের ক্রিয়া অপরের উপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে বলা হয়। অপর এক মতবাদে মন ও বস্তু বা দেহের সহচরবাদ বা সহচার (প্যারালেলিজম) মানা হয়। অর্থাৎ মন ও শরীর ভিন্নগোত্রীয় হয়েও এদের মধ্যে এমন এক সহচার আছে যাতে শরীরে কিছু হলে মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দুটি সমান্তরাল রেখার একটির একস্থানে কিছু ঘটলে সমান্তরাল অপর রেখাটিতেও কিছু ঘটে। কিন্তু এই দুটি ঘটনা পরস্পর যুক্ত না হয়েও এদের মধ্যে একরকম যেন প্রতিবেগ (করেসপন্ডেন্স) আছে। অর্থাৎ দেহে কিছু ঘটলে মনে কিছু ঘটে। মন আর দেহ আলাদা, এবং এক অর্থে স্বাধীন হলেও তাদের মধ্যে ঐ প্রতিবেগ আছে, মনে করা হয়। আর এক মতবাদানুসারে দেহ ও মনের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাকশান) আছে বলা হয়। এই মতকে মানসদৈহিক মিথস্ক্রিয়াবাদ বলা হয়। এই মতবাদে মনের ওপর দেহের এবং দেহের ওপর মনের সোজাসুজি ক্রিয়া হওয়া সম্ভব বলা হয়। অর্থাৎ বস্তু (ম্যাটার) অবস্তুর (নন-ম্যাটার) উপর এবং অবস্তু বস্তুর ওপর ক্রিয়া করতে পারে এরূপ স্বীকার করা হয়েছে। স্বর্গত ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু পূর্বোক্ত দেহ মনের সহচারকে আরও বিস্তৃত করে তাঁর সর্বমনো-মানসভৌতিক সহচরবাদ (প্যান সাইকিক সাইকোলজিক্যাল প্যারালে-লিজম) প্রচার করেছেন। এই মতানুসারে প্রত্যেক বস্তুতেই বস্তু ও মন এই দুই অংশ আছে। আমাদের দেহে বস্তু অংশ কাজ করে আর তার মনের অংশ কাজ করে আমাদের মনের উপর। বিষয়টি জটিল হলেও এতে করে বস্তু ও মনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব অন্য মতবাদে দেখা দেয় তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আরও কিছু কিছু মতবাদ আছে। সে সম্বন্ধে কথায় আমাদের আর কাজ নেই। বিভিন্ন মতবাদের বিচার এখানে করার সুযোগ নেই প্রয়োজনও নেই। দেহ মনের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে এ সম্বন্ধে কিছু বলে নিতে হল। আবার আমাদের আলোচ্য বিষয় মানসিক রোগের কথায় ফিরে আসা যাক।

মনের রোগের কোনও বীজাণু পাওয়া যায়নি। তবু নানা রকমের মানসিক রোগের পরিচয় দিতে হলে তাদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিতে পারলে আলোচনা করতে সুবিধে হবে। এই জন্যে মনো-বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানারকম মানসিক রোগের শ্রেণীভাগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সবগুলিই মূলত রোগের লক্ষণ-ভিত্তিক বিভাগ বলা চলে। আমরা এখানে যেভাবে মানসিক রোগকে ভাগ করে নিয়ে দেখি তাতেও পাশ্চাত্য মনোরোগ চিকিৎ-সকদের পথ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। মোটামুটি একরকমের শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়ে রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

এক শ্রেণীর মানসিক রোগ আছে যাকে বলা হয় প্রকৃত উদ্বায়ু (অ্যাকচুয়াল নিউরোসিস)। আর এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে বায়ুরোগ (সাইকো-নিউ-রোসিস)। এবং তৃতীয় আর এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে বাতুলতা (সাইকো-সিস)

এই মোটামুটি তিন শ্রেণীভাগের মধ্যে প্রথম উল্লিখিত প্রকৃত উদ্বায়ু সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী বিভাগের রোগ-গুলির সম্বন্ধে আগে কিছু কিছু বলে নিলে সুবিধা হবে। বলে রাখা দরকার বায়ুরোগ ও বাতুলতা এই দুই শ্রেণীর মানসিক রোগকেই সাধারণ (ফাংশানাল) ব্যাধির পর্যায়ে ধরা হয়।

অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর রোগ কোনও প্রদর্শনীয় (ডিমনোস্ট্রেবল) আংগিক (অর্গানিক) রোগ দেখতে পাওয়া যায় না। তাই এদের পুরোপুরি মানসিক রোগ বলা যায়। প্রথমে বায়ুরোগ (সাইকো-নিউরোসিস) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই মূল কয়েক রকমের রোগ দেখতে পাওয়া যায়—যথা : (১) হিস্টিরিয়া। একে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। (ক) উৎকণ্ঠাবস্থা (অ্যাংজাইটি স্টেট), (খ) আতঙ্কাবস্থা (ফোবিয়া), (গ) বিপরিণামী হিস্টিরিয়া (কনভার্শান হিস্টিরিয়া।

অনেক সময় আজকাল উৎকণ্ঠা ও আতঙ্ক এই দুই অবস্থাকে একত্রে মিলিয়ে কেবল উৎকণ্ঠা নাম দিয়েও বলা হয়ে থাকে। এই ভাগের রীতি মেনে নিলে হিস্টিরিয়ার মধ্যে কেবল উৎকণ্ঠাবস্থা ও বিপরিণামী হিস্টিরিয়া এই দুটি ভাগ দাঁড়ায়।

(২) বায়ুরোগের মধ্যে আর একরকমের রোগ আছে যাকে বলা হয় আবেশিক অনুবর্ষী বায়ু (অবসেসিভ কমপালসিভ সাইকো-নিউরোসিস) আর বাতুলতা বলতে যে মানসিক রোগ শ্রেণীকে বোঝায় তার মধ্যে আবার কয়েকরকম রোগ দেখতে পাওয়া যায় যথা—(১) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (স্কিজোফ্রেনিয়া), (২) ভ্রমবাতুলাবস্থা (প্যারানোইড স্টেট) (ক) ভ্রমবাতুলতা (প্যারানোইয়া) (খ) চিত্তভ্রংশী ভ্রমবাতুলতা (প্যারানোইড স্কিজোফ্রেনিয়া) (৩) আধানিক বাতুলতা (অ্যাফেকটিভ সাইকোসিস) (ক) উন্মত্ততা (ম্যানিয়া), (খ) বিষন্নতা (ডিপ্রেশান), (গ) খেদোন্মত্থ বাতুলতা (ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস)

এছাড়াও আরও কয়েক রকম মানসিক রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের এখনকার প্রয়োজনের জন্য উপরোক্ত মানসিক রোগের শ্রেণীবিভাগ মনে রাখলেই কাজ চলে যাবে।

প্রশ্ন জাগে এই যে; বায়ুরোগ আর বাতুলতা এই যে মানসিক রোগের দুটি প্রধান শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে তাদের ভিত্তি কি? অর্থাৎ কি দেখে এই দুটি মূল শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে মানসিক রোগের কোনও বীজাণু নেই? আর তা থাকাও সম্ভব নয়। যদি এমন হয় যে মানসিক রোগেরও বীজাণু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হল তবে তখন আর এগুলিকে ঠিক মানসিক রোগ বলা যাবে না। তখন বলতে হবে যে ঐ বিশেষ বীজাণুর ক্রিয়ায় দেহের যে বিকার দেখা দেয় তার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ঐ বিশেষ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—এইমাত্র। তখন আর এদের পুরোপুরি মানসিক রোগ বলা চলবে না। যেমন দেখতে পাওয়া যায় দৈহিক নানা রোগের বেলায়, শারীরিক কোনও কারণে যখন মাথার যন্ত্রণা হয় তার ফলে যখন রোগী উঃ, আঃ, বাঁচাও বলে ছটফট করতে থাকে তখন তার এই যন্ত্রণাবোধটা আর তার সঙ্গে যুক্ত যেসব অস্থিরতা এসবই মানসিক অবস্থা। এ সম্বন্ধে পূর্বে দেহ ও মন বিষয় আলোচনা করবার সময় বলা হয়েছে। সে সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শরীরের ক্রিয়া শরীরেই ঘটতে থাকে আর তা থেকে যেসব অনুভূতি আমাদের হতে থাকে সে সবই মানসিক। ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করা হলে শরীরের ক্রিয়ার বন্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু শরীরের ক্রিয়ার সাথে মনের ক্রিয়ার যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার ফলে আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা আর থাকে না। শরীরের ক্রিয়ার সঙ্গে মনের সংযোগ না হলে দৈহিক ক্রিয়ার অনুভূতি আমাদের হয় না। হিন্দু দর্শনে চোখ, কান, নাক, মুখ, হাত, পা, পায়ু, উপস্থ প্রভৃতি যে দশটি ইন্দ্রিয় ধরা হয়েছে তা বাদে এদের অধিপতি হিসেবে মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি নিজের নিজের কাজ করে গেলেও তাদের সঙ্গে যদি মন যুক্ত না হয় তবে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনও অনুভূতি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ইত্যাদি কিছুই হতে পারে না। একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আগে বলা হওয়া সত্ত্বেও আবার একটু উল্লেখ করছি বোঝাবার সুবিধের জন্যে। অনেক সময় বই পড়তে পড়তে এমন হয় যে বইয়ের অক্ষর ঠিক চোখ দিয়ে পড়া হয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ মনে ধরা পড়ে যে চোখ কেবল বইয়ের লেখা অক্ষরের লাইনগুলিতে চোখ বুলিয়ে গেছে কিন্তু মন অন্যদিকে থাকায় পড়া বলতে যে জানা, বুঝতে পারা ইত্যাদি বোঝায় তা একেবারেই হয় না। অন্য কথা ভাবতে ভাবতে যখন পথ চলা হয় তখন পথে কি ঘটছে আশেপাশে কি চোখে পড়ছে তা মনে ধরা পড়ে না। এরকম বহু উদাহরণ আমাদের জীবনে প্রতিদিন অনেক ঘটে। একটু নজর রাখলে সহজেই তা আমাদের কাছে ধরা পড়ে যায়। সে আলোচনা আর নয়, এই থাক।

বলছিলাম বায়ুরোগ আর বাতুলতা এ দুটোই ত মানসিক রোগ, তবে এদের মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? খুব সহজ করে বলতে গেলে বলা যায় যে, বায়ুরোগী নিজের মনে যেন বুঝতে পারে যে সে যে লক্ষণ বা যন্ত্রণার কথা বলছে তাদের বাস্তবে কোনও ভিত্তি নেই। অর্থাৎ সে যেন বুঝতে পারে যে রোগের যেসব লক্ষণ তার হচ্ছে সে সবই তার নিজের মনে হওয়া, তার নিজের মনগড়া জিনিস, বাস্তবে তেমন কিছু ঘটছে না। অবশ্য বোধটা সব বায়ুরোগের সকল অবস্থায় রোগীর কাছে এত সহজবোধ্য থাকে না। রোগের প্রকোপ বেশী হলে তখন নিজের মনগড়া বিষয়ই তার কাছে বাস্তব সত্য বলে মনে হতে থাকে। লেখাপড়া জানা কোন জীববিজ্ঞানী যখন সামান্য তেলাপোকা দেখে ভয়ে চিৎকার করে ঘর ছেড়ে পালান তখন তার নিজের অধীত বিদ্যা তাঁকে ভয় থেকে বাঁচাতে পারে না। জিজ্ঞেস করলে ঐ তেলা পোকা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তিনি বলে দিতে পারবেন, যা থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে যে ঐ পোকাটিকে অমন ভয়ংকর মনে করে ছুটে পালানর কোনও কারণ ছিল না। তবু তিনি বারে বারেই তেলাপোকার ভয় পান—আর পালান। এটা যে তাঁর মনের ভয় তা তিনি জানেন, কিন্তু তাঁর ঐ পোকা সম্বন্ধে সব জ্ঞানের বাইরে নিজের মন আরও কিছু যুক্ত করে দিয়ে ঐ পোকাটাকে তাঁর কাছে ভয়াবহ করে তুলেছে। পাশে দাঁড়িয়ে অন্য একজন সে ভয় পায় না—দেখেও তার ভয় যায় না। চেপে ধরলে তিনিও মানবেন যে ওটাতে এত ভয়ের কিছু নেই ঠিক তবু তাঁর যেন কেমন ভয় করে। বোঝেন যে এটা তাঁরই মন গড়া ভয়—কিন্তু সেই ভয়ের হাত থেকে নিজেকে বাইরে সরিয়ে এনে বাস্তবে তিনি দাঁড়াতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁর বাস্তব জ্ঞান একদিকে থাকে আর তাঁর অস্পষ্ট মনের ধারণা তাঁকে চেপে ধরে ভয় পাওয়ায়। কিন্তু যারা বাতুল (সাইকোটিক), তাদের এই বাস্তব বোধটুকু থাকে না। নিজের মনগড়া বিষয়টি সে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক, অন্তত রোগের বিষয়টুকুতে, থাকে না। এই বাস্তব অবস্থার জ্ঞান লোপ পাওয়ার লক্ষণ যেখানেই দেখা যায় সেখানেই যে বাতুলতা দেখা দেয় তা বলা যায় না। বাতুলের বাস্তব জ্ঞান থাকে না বলার অর্থ এই নয় যে যারই বাস্তবের জ্ঞান ঠিক থাকবে না সে-ই বাতুল। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—নিজেকে যে ব্যক্তি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মনে করে এবং তা বিশ্বাস করে, তাকে বাতুল বলা হয়। কিন্তু যদি কেউ নিজে বিশ্বকবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ইত্যাদি পায় তবে তাকে বাতুল বলা যাবে না। এখানে সে নিজের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্মতা করছে; ইচ্ছামত সেই অবস্থা থেকে আবার নিজের ব্যক্তি অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এরকম একাত্মীকরণের ক্ষমতাকে মনের এক বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু বাতুলের পক্ষে ইচ্ছামত রবীন্দ্রনাথ হওয়া আর ইচ্ছামত নিজের মধ্যে আবার ফিরে আসা সম্ভব হয় না। নিজেকে সে রবীন্দ্রনাথ বলে বিশ্বাস করে এই ভুল বিশ্বাসের জন্যই তার পক্ষে এটা রোগ। একথা উল্লেখ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে যে ভুল বিশ্বাস যে করে সে-ই বাতুল নয়। যে বিশ্বাস পরিবারের সমাজের অনেকেই করে তা ভুল, ভিত্তিহীন হলেও ঐরকম বিশ্বাসী সকলকেই বাতুল শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। প্রায় সকল দেশের ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই এমন নানারকমের ভুল বা বাস্তব ভিত্তিহীন বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। যে ভুল বিশ্বাস ব্যক্তিগত একজনের, যে বিশ্বাস তার দলের, পরিবারের, অন্যদের মধ্যে নেই কেবল সেইরকম ভুল, বাস্তব জ্ঞানবহিত বিশ্বাসকেই বাতুলতার লক্ষণ বলা হয়। সত্যটা দেখিয়ে দিলেও এদের ভুল বিশ্বাস দূর হতে চায় না। ভুলটাকেই সত্য বলে ধরে রাখার মধ্যেই এদের বাতুলতার প্রকাশ।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

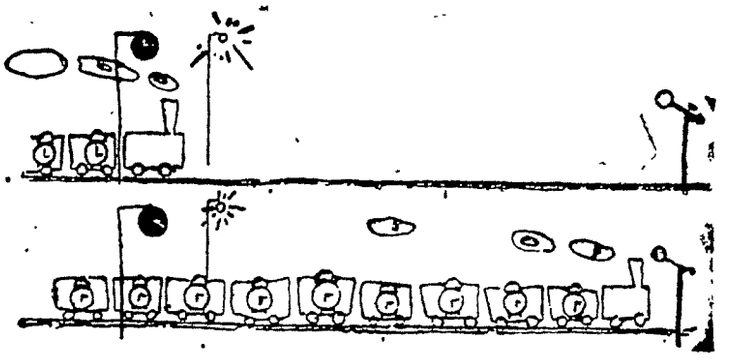

*সময়—একালে ও সেকালে

*আলোর বেগের চেয়ে দ্রুততর

*রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিজ্ঞানের কথা

কালে ও দেশে

অতীতের মানুষ সময় সম্পর্কে ধারণা করত নৈসর্গিক ঘটনা থেকে। এমন সমস্ত ঘটনা বা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে ঘুরে আসে। যেমন, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু বছরে একবার। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা—মাসে একবার। সূর্যোদয়—দিনে একবার। নৈসর্গিক এই ঘটনাগুলো পিরিয়ডিক বা পর্যাবৃত্ত। অর্থাৎ, একই ঘটনা অনবরত ঘটে চলেছে, নির্দিষ্ট সময় পরে পরে।

সতেরো শতকে মানুষ নিজের হাতেই তৈরি করতে পারল নির্দিষ্ট সময় নিয়ে অনবরত ঘটে চলার (পর্যাবৃত্ত গতির) নিখুঁত একটি আয়োজন—পেণ্ডুলামের। এই পেণ্ডুলামের সাহায্য নিয়েই তৈরি হল আধুনিক ঘড়ি। তখন থেকেই সম্ভব হল ঘন্টায় মিনিটে ও সেকেণ্ডে সময়ের মাপ নেওয়া। তারপরে এল স্পন্দনশীল স্প্রিং (টাইমপীস ও রিস্ট-ওয়াচ)। এবং সাম্প্রতিকালে স্পন্দনশীল পরমাণু (পারমাণবিক ঘড়ি)। শেষোক্ত ঘড়ির সাহায্যে সেকেণ্ডের লক্ষ ও নিযুত ভগ্নাংশের মাপও নির্ভুলভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। দূরত্বের মাপ বা দেশের মাপ বা (ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করাই ভালো) স্পেসের মাপ এখনো এতটা নিখুঁত নয়।

এই যে সময়ের মাপ নেবার একরকম ব্যবস্থা, স্পেসের মাপ নেবার আরেক রকম ব্যবস্থা, এ থেকে মনে হতে পারে একের সঙ্গে অপরের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যিই কি তাই? বাস্তবে দেখা যায়, স্পেসঘটিত কোনো ঘটনার সঙ্গে অবধারিত-ভাবেই সময় জড়িত হয়ে পড়ে। রাস্তা পার হবার সময়ে আমরা একবার ডাইনে তাকাই, একবার বাঁয়ে। এই দুটি ঘটনা পৃথক হয়ে ওঠে মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকার জন্যে। তেমনি দূরত্ব সম্পর্কে আমরা ধারণা করি সেই দূরত্ব পার হতে কতখানি সময় লাগে তা থেকে। আবার এই দূরত্ব পার হবার সময়ও বদলে যাচ্ছে। দিল্লীতে প্রাতরাশ সেরে মস্কোতে লাঞ্চ খাওয়ার কথা কিছুকাল আগে কেউ কল্পনাও করতে পারত না। এখন দিল্লীতে প্রাতরাশ, মস্কোতে লাঞ্চ, লণ্ডনে ডিনার—এমন ঘটনা অনায়াসেই ঘটতে পারে। অর্থাৎ, জগৎটা যেন ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, এমনও বলা যেতে পারে, স্পেস যেন সংকুচিত হচ্ছে। কথাটা পরিষ্কার করা দরকার। যেমন ধরা যাক, কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে আগে সময় লাগত দু-দিন, এখন দু ঘন্টা—তার মানে কি এই যে কলকাতা ও দিল্লীর দেশগত দূরত্ব কমে গিয়েছে? সময় যতোই কম-বেশি লাগুক, কলকাতা ও দিল্লীর স্থানিক অবস্থানের কতগুলো ব্যাপার এই সময়ের দ্বারা নির্ধারিত নয়—এমন কথা কি বলা চলে না?

স্থানিক অবস্থান কি ভাবে নির্ধারিত হয়? সকলেই জানেন, তিনটি মাত্রা দিয়ে—বলা যেতে পারে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা। একটা ঘরের চার দেয়াল এবং মেঝে ও সিলিং দিয়ে ঘেরা যে স্পেস তার যে কোনো বিন্দুর অবস্থান এই তিনটি মাত্রা জানা থাকলেই

ব্রেকিয়ে পড়ে। ওধারে ধরা যাক, এই টেপসে একটি ভ্রমর উড়ে বেড়াচ্ছে, তখন কিন্তু যে কোনো একটি মুহূর্তের তিনটি মাত্রার সাহায্যে পরের মুহূর্তের ভ্রমরকে পাওয়া যায় না—কেননা ভ্রমরটি উড়ে বেড়াচ্ছে ও মুহূর্তে মুহূর্তে স্থান বদল করছে। এক্ষেত্রে সময়কেও হিসেবে ধরতে হয়—সময়ও হয়ে ওঠে একটি মাত্রা।

জগতে যদি গতি না থাকত, পরিবর্তন না থাকত, তাহলে তিনটি মাত্রাই যথেষ্ট ছিল। গতি থাকলেই সময়ের মাপও এসে পড়ে। ফলে জগৎ হয়ে ওঠে তিন-মাত্রার নয়, চার-মাত্রার। তিনটি মাত্রা স্থানগত, একটি মাত্রা কালগত।

স্থানগত মাত্রায় অদলবদল হওয়া সম্ভব। দৈর্ঘ্যকে করা যেতে পারে প্রস্থ, প্রস্থকে দৈর্ঘ্য, ইত্যাদি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছানো যেতে পারে নানাভাবে, ডানদিকে গিয়ে বাঁদিকে বা বাঁদিকে গিয়ে ডানদিকে বা নিচে থেকে ওপরে বা ওপর থেকে নিচে। কিন্তু কালগত মাত্রায় এই অদলবদল সম্ভব নয়। কালগত মাত্রায় মাত্র একদিকেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব—অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে। সায়েন্স ফিকশনের লেখকরা যতোই কল্পনা করুন না কেন, কালগত মাত্রায় সময়ের পিছনে ঘুরিশমতো বিচরণ করা অসম্পূর্ণ অসম্ভব, কোনো যন্ত্রের সাহায্যেও নয়। কালগত মাত্রায় বিচরণ একমাত্র সামনের দিকে—ভবিষ্যতের দিকে।

তবে এই বিচরণ যে সব সময়ে সমান বেগের হয়ে চলবে তেমন কোনো কথা নেই। অদলবদল সম্ভব এই বিশেষ ক্ষেত্রে। বিচরণ বটেও সব সময়ে সামনের দিকে কিন্তু তার বেগ কখনো বেশি, কখনো কম।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্ব যে নির্ভুল তার প্রমাণ বাস্তবে নানাভাবে পাওয়া গিয়েছে। এই তত্ত্বের একটি বক্তব্য এই যে দূরত্বের মাপ নির্ভর করে আপেক্ষিক গতির ওপরে—যে বস্তুর মাপ নেওয়া হচ্ছে ও যে ব্যবস্থা মাপ নিচ্ছে এই দুয়ের পরস্পরের আপেক্ষিক গতি।

দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। দুটি রোমযান (ক ও খ) দুই বিপরীত দিকে একে অপরকে পাশ হয়ে যাচ্ছে। লম্বার দুটি রোমযান সমান—৩৬০ ফুট। বেগও সমান।

পৃথিবীর মাটিতে দুটি ট্রেন পাশাপাশি লাইনে এমনিভাবে একে অপরকে পার হয়ে যেতে পারে। মনে করা যাক দুটি ট্রেন সমান দীর্ঘ—৩৬০ ফুট। বেগও সমান—ঘণ্টায় ৬০ মাইল। যেহেতু গতি বিপরীত দিকে, অতএব আপেক্ষিক গতি দাঁড়াচ্ছে ঘণ্টায় ১২০ মাইল। অর্থাৎ, এক ট্রেন থেকে মনে হবে যে অপর ট্রেনটি ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে পার হয়ে যাচ্ছে। ধরে নিতে হবে যে, ট্রেন থেকে অপর ট্রেনের দৈর্ঘ্যের মাপ নেবার ব্যবস্থাও আছে। এই মাপ হওয়া উচিত ৩৬০ ফুট, কিন্তু আসলে হয়ে থাকে আরো কম। কিন্তু ট্রেনের বেগ এতই কম মাত্রার যে দৈর্ঘ্যের কম হওয়াটাও এক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর রকমের কম, যা ধরতে পারা শক্ত।

কিন্তু রোমযানের বেলায় বেগ হতে পারে অনেক অনেক বেশি—মনে করা যাক, সেকেণ্ডে (ঘণ্টায় নয়) ৫০০ মাইল। অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি দাঁড়াচ্ছে সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল। অর্থাৎ, ক থেকে মনে হবে খ সেকেণ্ডে ১০০০ মাইল বেগে পার হয়ে যাচ্ছে, খ থেকে একই ধারণা হবে ক সম্পর্কে। এই অবস্থায় ক থেকে মাপ নিলে খ হয়ে ওঠে ৩৫৯ ফুট লম্বা (অর্থাৎ, ১ ফুট কম), খ থেকে মাপ নিলে ক-এর অবস্থাও তাই। আপেক্ষিক গতি যদি হয় সেকেণ্ডে ১,৬২,০০০ মাইল তাহলে একটি থেকে অপরটির দৈর্ঘ্য হয়ে দাঁড়ায় শূন্য।

আরো একটি কথা আছে। ক থেকে যিনি মাপ নিচ্ছেন তাঁর মনে হবে তিনি স্থির, তাঁর রোমযানের দৈর্ঘ্য ছোট হয়নি, প্রচণ্ড বেগে (আপেক্ষিক গতিতে) পার হয়ে যাচ্ছে খ এবং দৈর্ঘ্যেও ছোট হয়ে গিয়েছে। খ থেকে যিনি মাপ নিচ্ছেন তাঁরও নিজের রোমযান সম্পর্কে ও ক রোমযান সম্পর্কে একই ধারণা হবে। দুজনের ধারণাই নির্ভুল।

এবারে ধরা যাক, এমন একটি ব্যবস্থাও আছে যার সাহায্যে ক থেকে জানা যাবে খ-এর ঘড়ি কেমন ধারা চলছে, কিংবা খ থেকে ক-এর ঘড়ি। দেখা যাবে, ক থেকে মনে হবে খ-এর ঘড়ি আস্তে চলছে, খ থেকে একই ধারণা হবে ক-এর ঘড়ি সম্পর্কে।

আপেক্ষিক গতি যদি হয় সেকেণ্ডে ১,৬২,০০০ মাইল তাহলে ক থেকে মনে হবে খ-এর ঘড়ি প্রতি এক ঘণ্টায় মাত্র আধ-ঘণ্টা এগোচ্ছে, খ থেকে মনে হবে ক-য়েও তাই। আপেক্ষিক গতি যদি হয় সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল তাহলে এক রোমযান থেকে মনে হবে, অপর রোমযানে সময় স্থির।

ব্যাপারটা তাহলে কী ঘটছে? আরেকবার দৈর্ঘ্যের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। বিপরীত দিকে একে অপরকে পার হয়ে যাবার সময়ে এক রোমযান থেকে মনে হয়েছিল অপর রোমযানের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে গিয়েছে। এবারে মনে করা যাক একটি রোমযান পাক খেয়ে ঘুরে এসে অপরটির পাশে চলে এসেছে এবং দুটি রোমযান এবারে একই বেগে একই দিকে ধাবমান। অর্থাৎ আপেক্ষিক গতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে শূন্য। এক রোমযান থেকে অপরটিকে স্থির মনে হবে। এবারে কিন্তু দৈর্ঘ্যের মাপ কোনো-ক্রমেই ছোট হয় না—সেই ৩৬০ ফুট। আপেক্ষিক গতি প্রচণ্ড হওয়ার দরুন কোনো এক সময়ে দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে গিয়েছিল ঘটে কিন্তু এখন আর তার কোনো চিহ্ন নেই।

সময়ের বেলাও কি তাই? না। যতোক্ষণ পাশাপাশি একই দিকে একই বেগে ধাবমান ততোক্ষণ দুই রোমযানেই সময়ের গতিও সমান। কিন্তু তার আগে কোনো এক সময়ে কোনো একটি রোমযানে সময়ের গতি যদি শ্লথ হয়ে থাকে তাহলে সেটি থেকে যায় এবং পাশাপাশি একই বেগে একই দিকে চলবার সময়েও সেই রোমযানের ঘড়ির সময় পিছিয়ে থাকে।

মনে করা যাক দুটি রোমযান একই সময়ে যাত্রা শুরু করেছিল, ঘড়িতে একই সময়ের নির্দেশ নিয়ে। বিপরীত দিকে একে অপরকে পাশ হয়ে যাবার সময়ে এক রোমযান থেকে মনে হয়েছিল অপর রোমযানের ঘড়ি আস্তে চলছে। তাহলে পাশাপাশি একই বেগে একই দিকে চলবার সময়ে কী মনে হওয়া উচিত? এক রোমযান থেকে মনে হওয়া উচিত অপর রোমযানের ঘড়ি পিছিয়ে আছে (যদিও আপেক্ষিক গতি শূন্য হওয়ার দরুন সেই মুহূর্তে উভয় রোমযানেই সময়ের বেগ সমান)। আসলে কী ঘটে?

রোমযান দুটি প্রথম বিপরীত দিকে একে অপরকে পার হয়ে গিয়েছিল। পরে একটি রোমযান (মনে করা যাক খ) পাক খেয়ে ঘুরে এসে অপর রোমযানের পাশে এসেছে ও একই বেগে একই দিকে ছুটছে। এই ঝাপ্টাটি করতে গিয়ে খ-কে কিন্তু পাক খেয়ে ঘুরবার পরে ধাপে ধাপে বেগ বাড়াতে হয়েছে (নইলে পাশাপাশি আসতেই পারে না)। অর্থাৎ, খ-এর বেগ কোনো এক সময়ে ত্বরণযুক্ত হয়েছে।

আসল রহস্যটা এইখানে—বেগ ত্বরণ-যুক্ত হওয়া। বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে এই ত্বরণযুক্ত বেগ বিবেচিত হয়নি। সমান মাত্রায় বেগের ক্ষেত্রেই বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব খাটে। অর্থাৎ, রোমযান দুটি যদি সমান বেগে শুধু বিপরীত দিকেই ধাবমান হত তাহলে ঘড়ি নিয়ে এই সমস্যা দেখা দিত না।

১৯১৬ সালে আইনস্টাইন উপস্থিত করলেন সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে, সময়ের গতি শ্লথ হয় এক-মাত্র যখন বেগ হয় ত্বরণযুক্ত। ওপরের দৃষ্টান্তে খ রোমযানের বেগ ত্বরণযুক্ত হয়েছিল, অতএব পাশাপাশি আসার পরেও দেখা যাবে (যখন সময়ের গতি উভয় রোমযানেই সমান) খ রোমযানের ঘড়ি পিছিয়ে আছে।

এবারের এই সময় আস্তে হয়ে যাওয়াটা মনে হওয়ার ব্যাপার নয়, বাস্তব ঘটনা।

মনে করা যাক, একজন মহাকাশচারী কোনো একটি তারার দিকে যাত্রা করেছে এবং ধাপে ধাপে বেগ বাড়িয়ে প্রচণ্ড গতি লাভ করছে। বাড়তে বাড়তে তার গতি যদি হয় সেকেণ্ডে ১,৬২,০০০ মাইল, তখন পৃথিবীর এক ঘণ্টার তুলনায় তার সময় হয়ে দাঁড়াবে আধঘণ্টা। মহাকাশচারীর বেলায় এই যে সময়ের গতি শ্লথ হবে গেল সেটা তার ত্বরণযুক্ত বেগের দরুন।

এখন যদি হয় যে মহাকাশচারী ঘণ্টায় ১,৮৬,২০০ মাইল বেগে ছুটছে (আলোর বেগের চেয়ে সামান্য কম) তাহলে পৃথিবীর ৩০ ঘণ্টার সমান হবে তার এক ঘণ্টা। এমনি বেগে দু-বছর বিচরণ করার পরে সে যদি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে সে

কী দেখবে? তার নিজের বয়স তখন ৩২, কিন্তু এক বছরের যে শিশু সন্তানটিকে সে রেখে গিয়েছিল সে হয়ে গিয়েছে ৬১ বছরের বুড়ো তার ২২ বছর বয়সের তরুণী ভার্যা ইতিমধ্যে ৮২ বছর বয়সে পৌঁছেছে।

আর কোন এক উপায়ে মহাকাশচারীর বেগ যদি হয় সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল (অর্থাৎ আলোর বেগের সমান)—তাহলে? তাহলে তার কাছে সময়ের কোনো গতি নেই। এই বেগে যতোদূর খুশি সে বিচরণ করুক, কোনো সময় পার হয় না। ত্রিশ বছর বয়সে রওনা হয়ে আবার সে পৃথিবীতে ফিরে আসবে ত্রিশ বছর বয়স নিয়েই—কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীতে হয়তো হাজার লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে গিয়েছে।

বলা বাহুল্য এসব নিতান্তই তত্ত্বকথা—বাস্তবে ঘটতে ঢের ঢের দেরি, আদৌ কোনোকালে ঘটবে কিনা সন্দেহ। তবে সত্যিই যদি রকেটকে কোনো দিন আলোর কাছাকাছি বেগে ছুটে দেওয়ানো যায় আর মানুষ যদি তার যাত্রী হতে পারে তাহলে কী কাণ্ড ঘটতে পারে তারই একটা মনগড়া দৃষ্টান্ত দেওয়া হল মাত্র।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ যেমন স্পেস অতিক্রম করতে পারে, তেমনি কালও। কিন্তু স্পেসের অতিক্রমণ হতে পারে সামনে, পিছনে, যে-কোনো দিকে; কালের অতিক্রমণ শুধুই সামনের দিকে—সেখানে কদাচ পিছিয়ে আসা চলে না।

কেন, আলোর চেয়েও অধিক বেগ অর্জন করা কি 'সম্ভব নয়? আলোর সমান বেগে সময়ের গতি শূন্য, আলোর চেয়েও অধিক বেগে সময়ের গতি নেগেটিভ। তার মানেই তো সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে আসা। তা কি সম্ভব?

আলোর চেয়েও অধিক বেগ

গতিশীল বস্তুর কাইনেটিক এনার্জি বা গতীয় শক্তিসম্পন্ন। এই গতীয় শক্তির নির্ভর দুটি—বেগ ও ভর। বেগ ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু ভর?

একটা রবারের বলকে যতো সহজে ছোটানো যায়, একটা লোহার বলকে ততো সহজে নয়। কেন? না, রবারের বলের ভর কম আর লোহার বলের ভর বেশি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানও রবারের বলের বেলায় কম, লোহার বলের বেলা বেশি। কথাগুলো বলা হল ভর সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্যে। যে বস্তুর ভর যতো বেশি তাকে ত্বরণযুক্ত করা ততো শক্ত।

গতীয় শক্তি নির্ভর করছে বেগের ওপরে ও ভরের ওপরে। বস্তুকে যতো বেশি গতিশীল করা যাবে ততো বাড়বে তার গতীয় শক্তি—অর্থাৎ তার বেগ ও ভর। আমাদের চারদিকে সচরাচর যেসব দৃষ্টান্ত আমরা দেখি তাতে মনে হয় গতীয় শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু বেগ-ই যেন বেড়ে চলে, ভর একই থেকে যায়। আসলে বেগ যতোক্ষণ নিচের দিকে, বেড়ে চলার মাত্রা বেগের দিকেই প্রায় সবখানি, ভরের দিকে অতি অতি

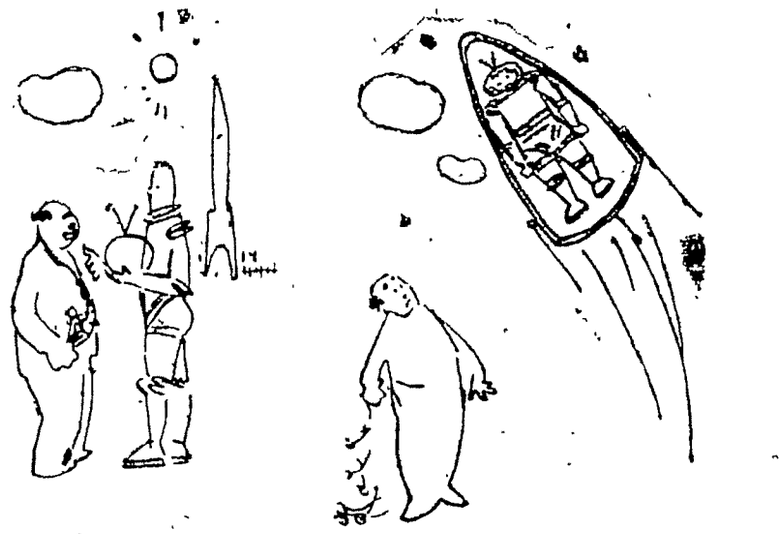

অল্পমাত্র। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ধারণা ছিল যে গতীয় শক্তি বাড়লে শুধু বেগ-ই বাড়ে ভর নয়। ভরকে মনে হত বস্তুর উপাদানের পরিমাণ, বেগ বাড়ুক-কমুক ভরের ভিন্নতা ঘটতে পারে না।

তারপরে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করলেন এবং গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে নির্ণয় করলেন বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কতখানি করে ভর বাড়ে।

হিসেবটা দাঁড়ায় এইরকম: নিশ্চল অবস্থায় কোনো বস্তুর ভর যদি হয় ১ কিলোগ্রাম তাহলে সেকেণ্ডে ৩০,০০০ কিলোমিটার বেগসম্পন্ন হলে সেই বস্তুর ভর হবে ১·০০৫ কিলোগ্রাম। সেকেণ্ডে ১,৫০,০০০ কিলোমিটার বেগসম্পন্ন হলে ১·১৫ কিলোগ্রাম। সেকেণ্ডে ২,৭০,০০০ কিলোমিটার বেগসম্পন্ন হলে ২·২৯ কিলোগ্রাম। আর যদি সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২·৫ কিলোমিটার (আলোর বেগের সমান হয়) তাহলে ভর হবে ইনফিনিট বা অনন্ত। তার মানে, বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অনুসারে, কোনো বস্তুকে আলোর সমান বেগসম্পন্ন করা বা আলোর চেয়ে অধিক বেগসম্পন্ন করা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্যই বস্তুটি হওয়া চাই ভরসম্পন্ন।

বস্তুটি হওয়া চাই ভরসম্পন্ন, কথাটা ব্যাখ্যা করা দরকার। বস্তু গঠিত হয় অতিপরমাণবিক কণিকা দিয়ে—যেমন, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন, ইত্যাদি। এই কণিকাগুলোর ভর আছে, তাই তাদের ছুটে আলোর চেয়েও কম বেগে।

কিন্তু এমন কণিকাও আছে, নিশ্চল অবস্থায় যারা ভরশূন্য। কিন্তু এই কণিকাগুলোকে কোনো সময়েই নিশ্চল অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাই ঘুরপথে এদের ভর নির্ণয় করতে হয়।

দেখা গিয়েছে, যে-কণিকার ভর শূন্য তাকে অবশ্যই সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২·৫ কিলোমিটার বেগে (অর্থাৎ আলোর সমান বেগে) ছুটতে হয়, কদাচ তার চেয়ে কম বেগে নয়। আলোয় আছে ফোটন কণিকা, যার ভর শূন্য। এ-কারণেই আলোর বেগ সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২·৫ কিলোমিটার।

এমন কণিকা কি থাকতে পারে যার বেগ আলোর চেয়েও বেশি? ধরে নেওয়া যাক, আছে। বস্তুটির ভর নিশ্চল অবস্থায় এক কিলোগ্রাম এবং সেকেণ্ডে ৪,২৫,০০০ কিলোমিটার বেগসম্পন্ন। এবারে আইনস্টাইনের সূত্র ধরে হিসেব করলে দেখা যায় নিশ্চল অবস্থায় এক কিলোগ্রাম ভরের এই বস্তুটি এই বিশেষ বেগে প্রাপ্ত হয় বিয়োগচিহ্নযুক্ত একের বর্গমূল। সকলেই জানেন, এটি একটি 'কাল্পনিক' সংখ্যা'। অর্থাৎ বস্তুটি হয়ে ওঠে কাল্পনিক ভরবিশিষ্ট।

কিন্তু তাই বলে এই বস্তুটিকে বাতিল করতে হবে কেন? বস্তুটি তো আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার সূত্র ভঙ্গ করছে না। আর কাল্পনিক ভরবিশিষ্ট হওয়ার অর্থ হয়তো এই যে সাধারণ বস্তুর উল্টো চালচলন এই বস্তুর—ঠেলা খেলে হয়তো তার বেগ কমে, বাধা পেলে হয়তো তার বেগ বাড়ে। যাই হোক, তত্ত্বগতভাবে যার অস্তিত্ব সম্ভব, বাস্তবে তার অস্তিত্ব অসম্ভব নাও হতে পারে।

কাল্পনিক ভর ও আলোর চেয়েও অধিক বেগসম্পন্ন এই কণিকাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্যাকিয়ন'।

এমনও হতে পারে, সাধারণ বস্তুকেই ট্যাকিয়ন-এ রূপান্তরিত করা যাবে। আবার ট্যাকিয়নকে সাধারণ বস্তুতে। তাই যদি হয় তাহলে সাধারণ একটি ব্যোমযান ও সাধারণ একজন মানুষ ট্যাকিয়নে রূপান্তরিত হয়ে দূর নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করুক, সেখানে আবার পুনঃ-রূপান্তরিত হোক সাধারণ বস্তুতে।

অসম্ভব মনে হলেও ধরে নেওয়া গেল তাই হল। তাহলেও কিন্তু আলোর বেগের সীমানাটা থেকেই যাচ্ছে। একদিকে সাধারণ বস্তুর জগতে বেগকে সব সময়ে থাকতে হবে আলোর বেগের নিচে, অন্যদিকে ট্যাকিয়নের জগতে সবসময়ে আলোর বেগের

ওপরে। অর্থাৎ সীমানাটা থেকেই যাচ্ছে। সেটা নিচে থেকে ওপরের দিকে, না, ওপর থেকে নিচের দিকে—তাতে কিছু আসে যায় না। নিজস্ব সীমানার মধ্যে দুই জগৎ অভিন্ন।

তার মনে, সময়ের দিক থেকে পিছিয়ে আসাটা মানুষের পক্ষে কোনোকালেই সম্ভব হবে না।

[এ সপ্তাহের আলোচনা আইজাক আসিমভের দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে। একটি প্রবন্ধের নাম, সময় সম্পর্কে মানুষের ধারণা—একালে ও সেকালে। 'অ্যামেরিকান রিভিউ', শীত ১৯৭৩, সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। অপরটির নাম, আলোর বেগের চেয়ে দ্রুততর। স্প্যান', জুলাই ১৯৭৩, সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত। দুটি প্রবন্ধেরই স্বত্ব সংরক্ষিত, অতএব অনুবাদ করা গেল না, মূলে বক্তব্য আমার নিজের ভাষায় এখানে উপস্থিত করেছি। সঙ্গের ছবি 'স্প্যান' থেকে ও একই বিষয় নিয়ে লেখা সোভিয়েত লেখক ভি স্মিলগার অসাধারণ গ্রন্থ 'রিলেটিভিটি অ্যান্ড ম্যান' থেকে। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল স্কুলে জৈব-রসায়নবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক আইজাক আসিমভ ১২২টি বই লিখেছেন—তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সায়েন্স ফিকশন। দুরূহ বিষয়কেও তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে বুঝতে পারার মতো করে উপস্থিত করতে পারেন, এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে—তাঁর লেখার এ এক মস্ত গুণ।)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরে আরো নটি বছর কেটে গেল। ২০ আগস্ট ১৮৬৪ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা উপস্থিত করছি।

জন্ম: সন ১২৭১, ৫ই ভাদ্র শনিবার। পিতা গোবিন্দসুন্দর বাংলায় উপন্যাস রচনা করেছিলেন, যাত্রাগান ভালোবাসতেন ও গ্রামের নানা কাজে নেতৃত্ব দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাপড়া শুরু গ্রামের পাঠশালায়। ছাত্রবৃত্তি থেকে শুরু করে প্রায় সব পরীক্ষায় প্রথম। কান্দী স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি ১৮৮১ সালে। ফার্স্ট আর্টস ১৮৮৩। বি-এ ১৮৮৬। এম-এ ১৮৮৭। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ১৮৮৮।

বিবাহ ১৭ বছরে—১২৮৫, ২২।২৩ বৈশাখে। বি এ পরীক্ষার সময়ে প্রথম কন্যা চঞ্চলা।

রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক ১৮৯২।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রকাশ করবার ঝোঁক প্রথম থেকেই। প্রথম প্রবন্ধ 'মহাশক্তি', অক্ষয় সরকারের 'নবজীবন'-এ প্রকাশিত (১৮৮৩)। 'বিশ্বের এই অনন্ত বৈচিত্র্য—যাহা কিছু নক্ষত্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে, মানব মনের বিকাশে, সমাজ শরীরের বিবর্তনে—যেখানে যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্তই গতি ও সেই গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় উৎপন্ন।'

সাহিত্য পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে ১৮৯৪ সালের ২৯শে জুলাই রামেন্দ্রসুন্দর সর্বসম্মতিক্রমে সভ্য নির্বাচিত। এটি তাঁর জীবনের একটি মুখ্য ঘটনা। এখন থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগ।

১৩০১ সালে শাখা সমিতির সভ্য এবং বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ ও প্রণয়ন। পরিভাষা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত।

১৩০৭।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ভাড়াটে বাড়িতে সাহিত্য পরিষদের স্বতন্ত্র অফিস স্থাপন। পরিষদের নিজের বাড়ি করার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের তৎপরতা। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমি দান (১৩০৫)। চাঁদা সংগ্রহের আবেদন। ১৩১৫ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ পরিষদের নিজের বাড়িতে প্রথম সভা। নানা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ, বহু শুভ কাজের পত্তন। পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন, প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ।

সন ১৩২১, ৫ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ। পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিনন্দন: 'যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ ও যশঃ উপার্জন করিতে পারিতে; কিন্তু তুমি সে সকল পদই ঘৃণা করিয়া দারিদ্র্যমণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞানজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।'

রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন: 'তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। * * * সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ: 'রামেন্দ্রকে আমি ভালবাসি তাহার স্বভাবগুণে, তাহার রচনানৈপুণ্যে, তাহার আদর্শ চরিত্রগুণে। সাহিত্য পরিষদের কেরানীগিরিতে সে নিজের সর্বনাশ করিয়াছে, সে যদি পরিষদের কাজে এত সময় না দিত তাহা হইলে তাহার 'জিজ্ঞাসা'র মত, 'প্রকৃতি'র মত, 'কর্মকথা'র মত, 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'র মত তাহার আরও কত বিচিত্র রচনা যে আমাদের মাতৃভাষার দেহ অলংকৃত করিতে পারিত তাহাতে আর ভুল নাই। তবে সে না থাকিলে হয়তো পরিষদই হইত না।'

১৩২৬ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদে নির্বাচিত। তার ছয়দিন পরেই মৃত্যু (২৩শে জ্যৈষ্ঠ, রাত্রি দশটায়)।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন রোগ-শয্যায় রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখতে। তার আগেই রবীন্দ্রনাথ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে নাইট উপাধি বর্জন করেছিলেন। 'রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে এবার শুনতে চাই। তিনিও একখানা নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠলো ত্রিবেদী তাপসের মুখে। 'শারীরিক অসুস্থতার তীব্রতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। ... কম্পিত রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—আমি আর উঠতে পারি না—দয়া করে আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন।' (আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধ থেকে)

সাহিত্য পরিষদ রামেন্দ্র রচনাবলী ছয় খণ্ডে প্রকাশ করেছেন।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। অতঃপর 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৩), 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর বঙ্গানুবাদ (১৯১১), 'কর্ম-কথা' (১৯১৩), 'চরিত-কথা' (১৯১৩), 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' (১৯১৪), 'শব্দ-কথা' (১৯১৭) 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০), 'নানা কথা' (১৯২৪), 'জগৎ-কথা' (১৯২৬)।

—অমৃতকান্ত

কখনো সখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'তবে আবার চিন্তা কিসের?'

'ভাবছি এর থেকে আবার কোনো বিপদ আসবে না তো? একটা ছেলে তো পচছে, আবার এ ছেলেটার—'

'ওমা! এসব কী কথা? দেখে কী মনে হচ্ছে?'

'মনে তো হচ্ছে কাপড় মত—'

'কাপড় মত? তবে আর বিপদের কী?'

ওদিকে পিয়ন অধৈর্য হচ্ছে।

বাবা বললেন, 'না তাই ভাবছি রাজশাহীতে আমাদের কে আছে? সেখান থেকে পার্শেল করবে?'

রাজশাহী! তাই তো! রাজশাহী থেকে আবার কে কী পাঠাবে?

'ঠিক আছে দেখাই যাক—'

সই করে নিলেন বাবা।

মা বললেন, 'ভাগ্যিস তুমি আজ বাড়ি ছিলে! তা' নইলে আমি কী বিপদেই পড়তাম।'

বাড়িতে পুরুষদের অনুপস্থিতি কালে মনিঅর্ডার, টেলিগ্রাম, রেজিস্ট্রী চিঠি অথবা পার্শেল এলে সেটা রীতিমত বিপদ বলেই গণ্য হতো আমাদের মত গেরস্থ বাড়িতে। সই করে নিতে পারলেও, আস্থা ছিল না নিজেদের ওপর। কি জানি বাবা কী ভুল ভাল হয়ে যায়।

খুব সন্তর্পণে ভয়ে ভয়েই প্রায় খোলা হলো পার্শেলটা। দেখা গেল বোমা নয়, বারুদ নয়, একখানা শাড়ী মাত্র। খদ্দরের শাড়ী। লাল পাড়, কমলা রং। নরম কোমল উজ্জ্বল।

শাড়ীর ভাঁজে এক টুকরো কাগজে লেখা 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুনীতি দেবীর শুভ পরিণয়ে—'

তলায় নাম সই শুধু 'শুভার্থী'।

কিন্তু তাতে আবার বুঝতে অসুবিধে হয় না কি? মা না বুঝলেও বাবার আর আমার কাছে রহস্যভেদ হয়ে গেল। বাবার মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। কেমন একটা হতাশ ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে প্যাকেটটা সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাল তো সুনী আসছেই—'

অর্থাৎ ওই 'শুভার্থী'র শুভেচ্ছা-প্যাকেট পৌঁছতে যেতে হবে না তাঁর কাছে, এটাই সান্ত্বনা।

'বিয়ের জন্যেই যদি পাঠানো, তো এই সাতদিন পরে—' মা নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, কিন্তু 'কে পাঠালো তা তো বলছো না।'

'বলবো কী করে? লেখা তো নেই। যা আছে তা তুমিও দেখছো, আমিও দেখছি—' বলে বাবা উঠে চলে গেলেন।

মা আমাকে ধরলেন, 'তোর কী মনে হচ্ছে রুচি?'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমিই বা কী করে বলবো? কোনো আত্মীয় টাত্মীয় হবেই নিশ্চয়, হয়তো নেমন্তন্ন-পত্তর পেতে দেরী হয়েছে তাই লৌকিকতা পাঠাতেও দেরী হয়ে গেছে।'

'ডাকে আবার কাকে নেমন্তন্ন পত্তর পাঠানো হল, মা অধই জলে হাবুডুবু খেতে খেতে বললেন। তাও রাজশাহীতে। ...আচ্ছা আনন্দময় নয়তো?'

মনে মনে বললাম, 'যাক শেষ পর্যন্ত তাহলে বুদ্ধিটা খেলালে!'

মুখে বললাম, 'ওকেও কি নেমন্তন্নর চিঠি দেওয়া হয়েছিল না কী?'

'ওকে নয়, মানে ঠাকুরমশাইকে তো—'

'কী জানি বাবা! তুমি আবার মাথা থেকে বারও করলে বটে ভেবে ভেবে।'

যেন ওটা সম্ভাবনার বাইরে। যেন স্রেফ মার একটা অবাস্তব চিন্তা।

মা তবুও নাড়তে লাগলেন, আবার বললেন, 'হাতের লেখা চিনিস তুই?'

কেন জানি না, বেচারী মার এই বোকা-বোকা ভাব দেখে হঠাৎ যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো মাথার মধ্যে।

আগুনঝরা গলাতেই বললাম, 'আমি চিনবো মানে? চিঠি লেখালিখি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

মা থতমত খেয়ে গেলেন।

বললেন, 'সব কথাতেই তোদের রাগ! বুঝতে পারছি না বলেই—'

মার ওই নিভে হাওয়া মুখটা দেখে আমার মনটা মায়া মায়া হয়ে গেল। একটু তরল ভাবে বললাম 'অতো ঘোঝাবুঝির দরকারই বা কী? মেয়ের বিয়েতে একখানা আশীর্বাদী শাড়ী এসেছে, তুলে রাখো, মেয়ে এলে দিও।'

মা ওটা নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

আর আমি লোকটাকে একশো গালমন্দ করতে লাগলাম মনে মনে।

আর অনেকক্ষণ পরে যখন মনটা একটু নরম হলো, তখন হঠাৎ মনে হলো সত্যি কী বোকাই লোকটা! আর কিছুদিন ধৈর্য ধরে—দিদির বিয়েটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও পারতো। তারপর এসে বললেই হতো—

ওঘর থেকে বাবার গলা শুনতে পেলাম, 'রুচি, একটু জল দে তো।' কিন্তু এ কী বাবার গলা।

এ কী রকম গলা! এমনভাবে জল চাইলেন কেন।

(৩১)

জল নিয়ে ছুটে গিয়ে বাবার এ কী চেহারা দেখলাম!

এই তো একটু আগে কথা বলছিলেন, কাজ করছিলেন, এতটুকু সময়ের মধ্যে এরকম কখন হলো, কী করে হলো, কেন হলো!

'স্ট্রোক' শব্দটা তখন এখনকার মতো এমন বাজারচলতি হয়নি, আর তার লক্ষণ সম্পর্কেও জনসাধারণ এতো ওয়াকিবহাল হয়নি। বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি আর মা শুধু, আমরা বুঝতে পারলাম না বাবার 'স্ট্রোক' হয়েছে। তবু এ যে একটা ভয়ানক কিছু তা বুঝতে দেরী লাগলো না।

বাবার মুখের রঙে যেন কালো আর বেগুনী রঙা ছাপ, বাবার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অবিরল ধারে আর দরদর করে ঘাম ঝরে সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে দিচ্ছে।

বাবা মাথাটা যেন বালিশে ঘসটাচ্ছেন।

'বাবা জল এনেছি' একথা আর কাকে বলবো?'

আমার নিজেরও যে সারা শরীরে ঘাম ছুটে গেল, চোখ দিয়ে উপচে উপচে জল

পড়তে লাগলো, আর মনে হলো পায়ের তলায় ঘরের মেজে-টেজে কিছু নেই, প্রকাণ্ড একটা গহ্বরের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

মা ব্যাকুলভাবে ঠেলে ঠেলে জিগ্যেস করছেন, 'হ্যাঁ গো' ডাক্তারকে যে খবর দিতে বললে, তা কোন ডাক্তারকে খবর দেব?' ওগো অমন চুপ করে আছো কেন? বল না গো। জল চাইলে জল খাও! ওগো শুনছো, তুমি অমন করছো কেন? কী কষ্ট হচ্ছে?'

কিন্তু কে জানে অবলুপ্ত চৈতন্যের কোন গভীর স্তরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন ওই স্থির চৈতন্যের মানুষটি! যেখানে এই ব্যাকুলতা, আর ব্যাকুলতর প্রশ্নেরা গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

মা অথচ চেঁচিয়ে চলেছেন, 'ওগো আমি কাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকবো? বুচিরে মানুষটা কি বিনা চিকিচ্ছেয় চলে যাবেন? মুখে এক ফোঁটা ওষুধ পড়বে না?'

তার সঙ্গে সমানেই বাবার হাতটা, কাঁপাটা ধরে ঠেলে যাচ্ছেন মা, যেন অবলুপ্তির ওই অতল তল থেকে নাড়া দিয়ে সাড়া জাগিয়ে তুলে আনবেন।

হঠাৎ আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম 'ঠেলছো কেন?'

'ওরে দেখতে পাচ্ছিস না উনি ক্রমশঃ ঘুমের নীচে তলিয়ে যাচ্ছেন। এ কী হলো।'

ঘুমের নীচে তলিয়ে যাচ্ছেন, মা ঠেলে ঠেলে সাড়া তুলে উঠিয়ে নিয়ে আসবেন।

আমার গলায় কী হলো?

একটাও কথা বলতে পারছি না কেন? বলতে পারছি না কেন 'মা ওভাবে ঠেলো না। ঠেললে হার্টফেল করে বসতে পারেন বাবা!'

না আমার গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোল না।

আমি সেই যে জলের গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বসে পড়েছি তো পড়েইছি। শুধু হাতপাখাটা মাথার কাছে নেড়ে চলেছি। যেখানা মা একটুক্ষণ বাতাস করেই নামিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু এই ভাবে তো বসে থাকা চলে না।

মার ব্যাকুল স্বর যেন আছড়ে আছড়ে পড়ছে, 'অ রুচি জানলা দিয়ে পাড়ার কাউকে ডাক না। বল কাউকে একটা ডাক্তার ডেকে দিতে—'

বুঝতে পারছি এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা পাগলের কাজ। অবিলম্বে ডাক্তার ডাকা দরকার, কিন্তু জানলা খুলে পাড়ার কাদের ডাকবো? আমরা কি কারো সঙ্গে ভাব করেছি? গল্প করি? তাই জানলা খুলে, এপাড়া ওপাড়ার লোক ডাকবো?

আমাদের এ বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই জেনে গিয়েছিল এ বাড়ির একটা ছেলে জেলে আছে, অতএব কেউ আর এগিয়ে এসে ভাব জমাতে আসেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থকও যদি হয় কেউ, তবু থানা পুলিশ জেল সাক্ষ্য দেওয়া এগুলোকে গেরস্থ লোকে ভয়ই করে থাকে। প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ তো সরকারি চাকুরে আছে অতএব চাকরী যাবার ভয়ও আছে।

এখন আমি জানলা দিয়ে কাকে ডাকবো? জানলার ধারে যাদের বাড়ি, এদিকটায় তাদের শুধু খানিকটা শ্যাওলা-পড়া উঠোন। কে বা থাকবে সেখানে।

ছাতে উঠে ওই হলদে বাড়ির ওদের হয়তো ডাকা যায়, তবে খুব চেঁচাতে হবে। দু' বাড়ির মাঝখানে বেশ খানিকটা ফালতু জমি আছে ওদের, যাতে বেশ ভালো ভালো কিছু গাছ আছে। যাকে আমরা 'বাগান' বলতাম।

নাম জানি না কিছু না, কাকে কী করে ডাকবো? ওদের তো শুধু বাগানওলা বাড়ির ছেলে, কি বাবু বলি।

এদিকে দেখছি বাবা বারবার হাতটা তুলতে চেষ্টা করছেন, আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে হাতটা।.. বাবা কি বুঝতে পেরেছেন, সময় শেষ হয়ে এসেছে, তাই আশীর্বাদের চেষ্টা করছেন।

জীবনে কখনো চোখের ওপর কোনো মৃত্যু দেখিনি। আত্মীয়বাড়িতে অমন ঘটনা ঘটলে মা-বাবা নিজেরা যেতেন, আমাদের নিয়ে যেতেন না।

এই প্রথম মৃত্যু দেখলাম।

কিন্তু 'প্রথম' দেখাবার জন্যে সবচেয়ে ভালো আর সবথেকে দামী জিনিসটিকেই নির্বাচন করলেন ভগবান?

ভগবান বলে কি সত্যিই কেউ আছেন?

থাকলে—তাঁর রীতিনীতি কেমন?

তাঁর মধ্যে মায়ামমতা বলে কোনো বৃত্তি নেই?

তাই না বলে. কয়ে একেবারে কিনা বাবাকেই নিয়ে নিলেন তিনি।

আমাদের বাবাকে?

এইটিই নিতে ইচ্ছে হল তাঁর?

তখন তাই মনে হয়েছিল।

বাবার বদলে আর কেউ গেলেও হয়তো ওইরকমই অভিযোগ মনের মধ্যে জমে উঠতো।

দিদির বিয়োগ আশঙ্কায় আমি তো মরতেই বসেছিলাম।

আর দাদা মেজদা?

সেই কি ভাবা যায়?

একমাত্র নিজেকেই মূল্যহীন মনে হয়, তবু নিজেকেও এরকম আকস্মিক 'মৃত্যু-শয্যায়' ফেলে ভাবতে গেলে?

সেও তো চোখে জল এসে যায়।

তবু বাবাকে এই সংসারের মর্মমূল থেকে হঠাৎ ছিনিয়ে নেওয়াটা ভগবানের একটা নির্লজ্জ নির্মমতার মত মনে হল।

ভাবতে পারছি না সত্যি সত্যিই বাবা চলে যাচ্ছেন!

কেন? কেন? কী অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে এতে ভগবানের?

হে ভগবান, সত্যি সত্যি বাবাকে মেরে ফেলো না। বাবা অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাকুন, খুব রোগা হয়ে যান, বাবা ভুগে ভুগে খিটখিটে হয়ে যান, তবু বাবা বেঁচে থাকুন।

ওই মাথাকোটা প্রার্থনাটা মনের মধ্যেই আছড়াচ্ছে, চেঁচিয়ে কাঁদবো কী করে? এখনো তো রয়েছেন বাবা। ভিতরে যদি জ্ঞান থাকে।

হয়তো জ্ঞান আছে, না হলে বারবার হাতটা অমন তুলতে যাবেন কেন?

মা কিন্তু একথা ভাবছেন না।

মা পরিব্রাহী চেঁচাচ্ছেন. হাহাকার আর্তনাদের ভাষা দিয়ে, 'হে মা দুর্গা, হে মা কালী, হে বাবা তারকনাথ, হে বৈদ্যনাথ, হে সর্বেশ্বর রক্ষে করো রক্ষে করো। আমার নোয়া সিঁদুর কেড়ে নিও না।'

আবার বাবাকে ডেকে ডেকেও বলছেন, তুমি কেন ঝেড়েঝুড়ে উঠছো না গো। কেন বলছো না ঠাট্টা করছি।...শরীরটা খারাপ লাগছে—একটা ডাক্তার—' এইটুকু মানুষ বললে তুমি আর কথা কইছো না কেন? আমি কি কোনোদিন ডাক্তার ডেকেছি? আমি জানি কিছু? তুমি কি কোনোদিন কোনো ভার দিয়েছো আমায়?.. ওগো শুনছো? এবারের জন্যে বলে দাও কি ওষুধ দেব তোমায়। আমার যে কত সময় কত কী হয়, তুমি তো ওষুধ-টষুধ এনে খাইয়ে সারিয়ে দাও।.. তোমায় আমি এক ফোঁটা ওষুধ খাওয়াতে পারছি না—বল না কী রকম কষ্ট হচ্ছে?'

ঠেলছেন না আর তবু গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিচ্ছেন বৈকি। আর তার সঙ্গে একটানা এই বিলাপবাণী।

খুব কষ্ট হচ্ছিল এসব শুনে।

মনে হচ্ছে যে বাবার ভিতরে জ্ঞান রয়েছে।

না থাকলে চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন? কেন হাতটা তুলতে চেষ্টা করছেন? মা কেন এখন এসব কথা বলছেন।

তবু এর মাঝখানেই একবার বলে উঠলেন, 'ওরে রুচি, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? দেখ না একবার ঝি এসেছে কিনা।'

ঝি এসে পড়লে মা বুঝি হাতে চাঁদ পেয়ে যাবেন।

ঝি এলে ডাক্তার ডাকতে না পাঠান এবাড়ি ওবাড়ির কোনো ছেলেকে ডাকতে পারবেন।

অথচ আমি একটা জলজ্যান্ত মস্ত মেয়ে রয়েছি সামনে।

আমাকে দিয়ে ডাক্তার ডাকানো যায় একথা মার মাথাতেও আসেনি।

কিন্তু আমারই কি এসেছিল হঠাৎ?

যখন বাবার ওই যন্ত্রণা আর দেখতে পারছি না যখন 'অসহায়তা' আর 'নিরুপায়তা' এই দুটো যে কী জিনিস তা বুঝতে পারছি, তখন হঠাৎ বলে উঠলাম—

'আমি যাচ্ছি।'

অতর মধ্যেও ওই 'যাচ্ছি' কথাটা শুনতে পেলেন।

চমকে বললেন, 'কোথায়? তুই কোথায় যাবি?'

'ওই ওখানে—'

'ওখানে কী?'

এতো উদভ্রান্ত অবস্থার মধ্যেও মা খোঁজ রাখছেন 'ওখানে কী?'

'ডাক্তারের কাছে।'

বলে, বাড়ির সদর দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। শুনতে পেলাম মার কাতর আর্তনাদ—'রুচি এই রুচি—তুই এভাবে কোথায় যাবি?'

ভরদুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে চৌকাঠের বাইরে পা ফেলতেই একটা ভয় ভয় অনুভূতিতে শরীরটা শিথিল হয়ে এলো।

ওই রোদে ঝকঝকে নির্জন নির্জন রাস্তাটায় একলা নামবো?

অনভ্যাস এমনিই বাধা।

অথচ বাবার কাণ্ডনতলা গ্রামে আমি কত বেরিয়েছি। একা দাদুর বাড়ি গেছি, একা আমবাগানে গিয়ে বসে থেকেছি। শহরের হওয়ায় অন্য ধরণের অনুভূতি আছে। সেই জন্যেই হয়তো গ্রাম নিথর, গ্রাম নিস্তরঙ্গ। গ্রামের রূপ অপরিবর্তনীয়।

সেখানে জোর করে কিছু ভাঙবার জায়গা নেই। শহরে যা কিছু করতে হবে সব ওই বাধা ভেঙে ভেঙে।

তাই এখানে ভাঙনের চেহারাটা এত স্পষ্ট।

আমি কি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে ওই ও মোড়ে ডাক্তারখানায় চলে যাবো?

নাকি আস্তে আস্তে?

আমি কিছুই করতে পারছি না কেন?

অথচ বাবা এক্ষুনি চলে যাচ্ছেন।

বাবা চলে যাবেন।

দাদা জেলে থাকবে, দিদি শ্বশুরবাড়িতে, মেজদা কলেজ শেষ হলেও, কোথায় না কোথায়। শুধু আমাকে একা নিরুপায় চোখে তাকিয়ে দেখতে হবে বাবা চলে যাচ্ছেন।

আমি মাথা খুঁড়ে ফেললেও মেজদাকে কোনোখান থেকে ধরে আনতে পারবো না, পারবো না দিদিকে খবর দিতে।

রাস্তা দিয়ে একটা মানুষও যাচ্ছে না কেন, যাকে ডেকে বলে উঠতে পারি, 'শুনেছেন! আমাদের ভয়ানক বিপদ!'

আমি রাস্তায় পা ফেলতে লাগলাম, এক পা দু' পা।

পিছনে মার ভাঙা গলার ডাক শুনতে পেলাম।

'রুচি! রুচি উনি যে কেমন করছেন! অ রুচি, আমায় কী তোরা সবাই মিলে মেরে ফেলবি?'

না, ডাক্তার ডাকতে যাওয়া আর আমার হল না।

আমাকে চলে আসতে হলো।

আমার কানে একটা অদ্ভুত শব্দ বেজেই চলতে লাগলো, 'আমায় কি তোরা সবাই মিলে মেরে ফেলবি?'

বাবা মারা যাচ্ছেন।

অথচ মা বলছেন, 'আমায় কি তোরা সবাই মিলে মেরে ফেলবি?' ওই সবাইয়ের মধ্যে বাবাও আছেন তো!

এরকম কেন হলো?

উন্মত্ত শোকের সময় যে মানুষের কথার মধ্যে মাত্রা নাও থাকতে পারে, তখনও জানতাম না।' তাই ওই মাত্রাহীন কথাটা মাথার মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

লক্ষলাম্ফ মার এ আর্তনাদের কারণও রয়েছে। বাবা যেন অনবরত খাট থেকে নামতে চাইছেন। মা একা ধরে রাখতে পারছেন না। যদি খাট থেকে পড়ে যান কী সর্বনাশ হবে।

মা আর আমি বাবাকে চেপে ধরে বিছানায় শুইয়ে রেখেছি, বাইরের দরজাটা যে খোলা পড়ে আছে তা' খেয়াল ছিল না।

এক সময় হঠাৎ দেখলাম ঘরভর্তি লোক।

এরা কারা?

বোধহয় পাড়ারই লোক।

এরা মার কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এসেছে।

ওরাই ডাক্তার ডেকে আনলো, ওরাই বরফের চাঁই নিয়ে এলো, ওরাই ভীড় করলো, এরাই ভীড় সরালো।

মা তখন সব আছড়ে-আছড়ি শেষ করে হঠাৎ চুপ করে গেছেন। যেন আর চেঁচাবার ক্ষমতা নেই।

ঠিক সন্ধ্যের সময় বাবা মারা গেলেন।

মেজদা তখনও ফেরেনি।

দিদির শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া হল না।

দাদা? তার কথা থাক।

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি বাবার ওই নিস্তব্ধ দেহটার দিকে।

অবাক হয়ে ভাবছি কিসের মধ্যে থাকে সেই প্রাণটি? কিসের উপর ভিত্তি করে এই সংসার, এই জীবন!

কালও বাবা যথানিয়মে অফিস গিয়েছিলেন, ফেরার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে সকালের জন্যে পাঁউরুটি নিয়ে এসেছিলেন, যার থেকে অনেকটাই এখনো পড়ে রয়েছে।

আজ সকালেও বাবা বাজারে গেছেন বাবার আনা সেই মাছ এখনো ভাজা রয়েছে যা রাতে রান্না হবার কথা ছিল।

আজও বাবা চানের আগে জুতো ঝেড়েছেন চানের পরে গেঞ্জি আর ধুতি নিজে হাতে শুকোতে দিয়েছেন, সে দুটো এখনো উঠোনের দড়িতে ঝুলছে।

আজও বাবা ভাত খেয়েছেন বাবার ওই ফুলতোলা আসনটায় বসে।

শুধু আজ আর বাবা অফিস যাননি।

মা সেই কথাই বলছেন মেজদাকে, 'ভাগ্যিস আপিস যাননি! না হলে, রাস্তায় পড়ে প্রাণটা যেতো!"

মা বাবার বিষয়ে ওরকম ভয়াবহ ভাবে কথা বলছেন কেন?

মেজদা এসেছিল অনেক রাতে, তখন পাড়ার ভদ্রলোকেরা একটি দুটি করে চলে গেছেন, গিন্নীরাও কেউ কেউ, দু-একজন আছেন।

এবং বেশ খোলা গলাতেই বাবার ছেলেদের সমালোচনা করছেন।

বাবার যে আজ কিছুই অসুখ করেনি, মেজদা যে কিছুই জানতো না একথা কেউ দাঁড় করাতে দিচ্ছেন না।

হয়তো মেজদাও দাঁড় করাতে চাইছে না—

মেজদার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সেও ভাবছে এতবড় ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ আমি দু'-এক্টা পাড়া দূরে বসে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। জানতে পারলাম না।

যেন মনের মধ্যে থেকে নিজে নিজে জানা উচিত ছিল।

এই জানতে না পারাটা নির্লজ্জতা।

জানতে না পারাটা ত্রুটি।

মেজদা সেই মারাত্মক ত্রুটির মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আর ওর আড়ালে একদা ভয়ার্ত মুখ।

মা বলছিলেন 'ওরে এক মুহূর্তে যে আমার জীবনটা ওলট-পালট হয়ে গেল। আমি কিছু জানলাম না, কিছু বুঝলাম না—

কিন্তু মেজদারই কি তার থেকে কিছু কম হল?

ওরও কি এক মুহূর্তে সব ওলট-পালট হয়ে গেল না?

মাত্র এই ঘন্টাকয়েক আগেও বেচারী পালকের মত হালকা মন নিয়ে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেছে।

আর এখন ওর মাথায় পাহাড় পড়লো।

যে পর্বতের আড়ালে ছিল এতোদিন, সেইটাই যে এমনভাবে হুড়মুড়িয়ে ওর ঘাড়ে পড়বে, তা কি দুঃস্বপ্নেও ভেবেছিল মেজদা?

প্রথম আর ভয়াবহ ভার ওই শবদেহের ভার। এই দণ্ডে ওকে স্থানান্তরিত করতে হবে। মৃত্যু এমনই খাতক, বলতে পারা যাবে না, এখন থাক, এখন আমি আমার এই প্রিয় মুখখানি নিয়ে বসে বসে দেখি।'

কিন্তু বেশীক্ষণ কি প্রিয় মুখটি আর নিয়ে বসে বসে দেখতে ইচ্ছে করে?

তাকে চোখছাড়া করবার জন্যেও তো চঞ্চলতা আসে।

মনে হয় 'এরা নিয়ে যেতে এতো দেরী করছে কেন?'

(ক্রমশঃ)

জীবনধর্মী সেরা কবি
শ্রীঅবনী চট্টোপাধ্যায়ের
সুবোধ্য অভূতপূর্ব কাব্যবাজি
আমার বাংলা ৩·০০ টাঃ
শান্তি কপোত ৩·৫০ "
আলোক দূত ৩·৫০ "
ধ্রুবতারা ৩·৫০ "
কল্পশ্রী ৩·৫০ "
দিশেহারা ৩·৫০ "
ছন্দা ৪·৫০ "
মত্তা ৪·০০ "
দীপ্তা ৪·০০ "
প্রকাশক ও পরিবেশক:—শ্রীঅঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
১/২ রাজচন্দ্র সেন লেন, কলিকাতা-৯
প্রাপ্তিস্থান: মনোহর সাহিত্য মন্দির
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

পুনশ্চ

বহুকাল পূর্বে বারাণসীর ব্রাহ্মণরক্ষা সভা থেকে শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ ভারতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত 'পুরাণতত্ত্ব' নামক একখানি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হলেও, যাঁরা ঐতিহাসিকভাবে পুরাণ আলোচনা করেন, তাঁরা এই গ্রন্থপাঠে অবশ্যই উপকৃত হবেন। যতদূর মনে হয়, উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার যুক্তিপূর্ণভাবে এবং প্রমাণসহকারে এইটিই দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, আমাদের পুরাণসমূহে বর্তমানে ক্রমে ক্রমে কি প্রকার নানাবিধ নূতন কথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

সে তো গেল এক কথা, কিন্তু অধুনা এই পুরাণের কথাই আমরা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হতে বসেছি এবং মূল অষ্টাদশ পুরাণের প্রায় সবগুলিই বাংলা সাহিত্য থেকে এমনভাবে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছে যে, কুত্রাপি কোন সম্ভ্রান্ত পুস্তক-ব্যবসায়ীর ঘরেও তার যেমন সন্ধান মেলে না, তেমনি কোন প্রকাশকই এই মহামূল্য গ্রন্থগুলি আজ প্রকাশে উদ্যোগী হন না। যদিচ এই লুপ্তপ্রায় পুরাণগুলির মধ্যে কোন একখানি কোন পুরাতন পুস্তক-বিক্রেতার কাছে, অথবা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে, ফুটপাথের পুরাতন বইয়ের দোকানগুলিতে জীর্ণ, কীটদষ্ট বা খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়, তাহলেও তার অত্যধিক বিস্ময়কর মূল্য ক্রেতাকে স্বতঃই নিবৃত্ত করে ঐ গ্রন্থ সংগ্রহের প্রয়োজন বা প্রলোভন থেকে।

অথচ এই পুরাণসমূহ আমাদের হিন্দু ধর্মাদর্শের ধারক ও বাহক বললেও অত্যুক্তি হয় না। আজ এবংপ্রকার গ্রন্থরাজির প্রতি তাচ্ছিল্য ও অনুরাগের অভাবই যে জাতিকে ও জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছে, সে দিকে সমাজ সংস্কারক বা বিদ্বজ্জনসমাজের যে কোন লক্ষ্য নেই এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। দেশে মূল্যবান প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ও আরও বহু সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান আছে; যাঁদের কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে মনোযোগী হলে দেশের ধর্মজ্ঞান চর্চার একটি বিশেষ অবহেলিত দিক পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয় রাজ্য সরকারেরও মনোযোগী হওয়া উচিত, এবং এই জাতীয় সাহিত্য সম্পদের উজ্জীবনে কোন প্রকাশন সংস্থা উদ্যোগী হলে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করি।

অতীতকালে 'হুতবাদী', 'বঙ্গবাসী' ও 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহের স্বত্বাধিকারীরা ঈদৃশ শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রকাশন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কলুটোলা অঞ্চলে অবস্থিত 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কার্যালয় থেকে তখন নানাবিধ ধর্মগ্রন্থ স্বল্প ও সুলভ মূল্যে প্রকাশিত হত। সে সময় গ্রন্থগুলির মূল্য বর্তমানের তুলনায় যে আশ্চর্যরকম নূন ছিল তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু তাহলেও, ব্যবসায়িক দৃষ্টি অপেক্ষা তাঁরা কিছুটা জাতীয় ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েও এগুলি প্রকাশ করতেন এবং বিক্রয়ও করতেন তৎকালীন বাজার দর অপেক্ষা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে। 'বঙ্গবাসী' কার্যালয় থেকে প্রকাশিত মূল সংস্কৃত ও শ্রীধর স্বামীর টীকা সংবলিত বিষ্ণুপুরাণের তখন মূল্য ছিল মাত্র দেড় টাকা। পূজার সময় তাও আবার গিয়ে দাঁড়াত সুলভ মূল্যে অর্ধেক দামে। ১৩০৪ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, একত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, গরুড়, অগ্নি মৎস্য কূর্ম মার্কণ্ডেয় ও মহাশিবপুরাণ এই মোট আটখানি পুরাণ গ্রন্থ যার একত্রে সুলভ মূল্য ছিল ৯১ আনা, সেগুলিকেও তাঁরা ভারতেশ্বরী ভিকটোরিয়ার হীরক জুবিলি উপলক্ষে ৮ টাকায় বিক্রি করতেন। সে দিন আজ কল্পনার অতীত হলেও, আজকের দিনের অনুপাতেই মূল্য নির্ধারণ করে এই পুরাণ শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থগুলিকে লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থিত করার জন্য আমি দেশের হিতৈষী ও ধর্মপ্রাণ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত এবার আমরা বিখ্যাত 'বিশ্বকোষ' নামক কোষগ্রন্থের সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর 'পুরাণতত্ত্ব' নামক একটি জ্ঞানগর্ভ তথ্যবহুল নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করলাম। এই নিবন্ধটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রদীপ' পত্রিকায় ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

পুরাণতত্ত্ব

'ভারতীয় হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন শ্রেণীর পুরাণই দৃষ্ট হয়। এতন্মধ্যে হিন্দুদিগের পুরাণই সর্বপ্রাচীন। প্রথমে হিন্দু পুরাণের কথাই সংক্ষেপে বলিব।

অথর্ববেদ, শতপথব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তেরীয় আরণ্যক, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি আর্যজাতির সুপ্রাচীন শাস্ত্রসমূহে পুরাণপ্রসঙ্গ আছে। অথর্ববেদের মতে—'অপরাপর বেদের সহিত যজ্ঞের উচ্ছিষ্ট হইতে পুরাণ উৎপন্ন হইয়াছিল।' (১১।৭।২৪) শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে অধ্বর্যু পুরাণ কীর্তন করতেন (১৩।৪।৩।১৩)।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও মনুসংহিতায়ও আছে—শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যে বেদ, ধর্মশাস্ত্র, আখ্যান, ইতিহাস, পুরাণ সকল ও খিলসমূহ শুনাইতে হইবে (আশ্বগৃহ্য ৪।৬, মনু ৩।২৩২)। এই কয়টি প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, এক সময়ে পুরাণ আর্য হিন্দুদিগের অবশ্যপাঠ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

শঙ্করাচার্যের বৃহদারণ্যকভাষ্য ও সায়ণাচার্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণভাষ্যোপক্রম হইতে জানা যায় যে, দেবাসুরের যুদ্ধ, পুরূরবা-উর্বশী-সংবাদ এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগের নাম ইতিহাস ও 'সর্ব প্রথমে একমাত্র অসৎ ছিল' ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ঘটিত বিবরণের নাম পুরাণ। ইহাতে মনে হয়, বেদের ব্রাহ্মণভাগের অংশবিশেষই পুরাণ ও ইতিহাস বলিয়া গণ্য ছিল। আবার মহাভারতে আদিপর্বে শৌনক ভারতকথক উগ্রশ্রবাকে বলিতেছেন, 'পুরাণে সমুদয় মনোহর কথা ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের আদিবংশের বৃত্তান্ত আছে। পূর্বে আমরা তোমার পিতার নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছি।' (৫ম অধ্যায়)

মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, 'পুরু, কুরু, যদু, শূর, বুবনাশ্ব, কুকুৎস্থ, রঘু, নিষধাধিপতি নল প্রভৃতি সহস্র সহস্র নরপতির কর্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য ও আর্জবাদির বিবরণ বিদ্বান সূতকবিগণ কর্তৃক পুরাণে

বর্ণিত হইযাছে।' এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে, নানা কবি পুরাণ লিখিয়াছেন; স্মরণীয় মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনও প্রাচীন পুরাণসমূহের উদ্দেশ্য ছিল। বেদে বিভিন্ন মহাপুরুষগণের চরিত-কীর্ত্তন 'নরাশংস' নামে অভিহিত। এই সকল নারাশংসী গাথাই আদি পুরাণের একটি অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, পুরাণার্থবিশারদ ভগবান বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণসংহিতা' রচনা করেন। স্বয়ং দেখিয়া যে কথা বলা যায়, তাহাই আখ্যান, পরম্পরাশ্রুত কথার নাম উপাখ্যান, পিতৃবিষয়ক ও পরলোকবিষয়ক গীত ও অন্যান্য কোন কোন গীতের নাম গাথা ও শ্রাদ্ধকল্পনির্ণয়ের নাম কল্পশুদ্ধি বা কুলধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া তাঁহার সূতজাতীয় শিষ্য লোমহর্ষণকে প্রদান করেন। পরে লোমহর্ষণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তচ্ছিষ্য অকৃতব্রণ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন এই তিনজনে তিনখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। এই চারখানি পুরাণসংহিতা অবলম্বন করিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম, তৎপরে পাদ্ম, তৎপরে বৈষ্ণব, এইরূপে পরে পরে ১৮ খানি পুরাণ রচিত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, বেদের ব্রাহ্মণ অংশে উপাখ্যান, গাথা প্রভৃতি যে-সকল পুরাণসম্বন্ধী কথা ছিল এবং বেদব্যাসের সময়ে যে সকল জ্ঞাতব্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা কবির বিবরণ একত্র করিয়া বেদব্যাস পুরাণসংহিতা প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে পুরাণ একখানি বিস্তৃত সংহিতাকারে ছিল না, তিনিই সংহিতাকারে পুরাণ প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া ও সেই সংহিতা অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল বলিয়া সকল পুরাণ বেদব্যাসের বিরচিত বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে।

পুরাণ সংহিতাবদ্ধ হইবার পর সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এইরূপ পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণবাদি অষ্টাদশ পুরাণ একসময়ে রচিত হয় নাই। তাহার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন পুরাণ হইতেই জানিতে পারি।...

এখানে জানা যাইতেছে, যে, আদি বিষ্ণুপুরাণ রচনাকালে পরিক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতেছিলেন। মৎস্যপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে—

'অথাশ্বমেধেন ততঃ শতানীকস্য বীর্য্যবান।
বক্ষ্যেঽধিসীম কৃষ্ণাখ্যঃ সাম্প্রতং যো
মহাযশঃ।।
তস্মিন্ শাসিত রাষ্ট্রস্তু যুষ্মাভিরিদমাহৃতং।
দুরাপং দীর্ঘসত্রং বৈ ত্রিণি বর্ষাণি পুষ্করে।
ঋষয়ঃ ঋষয়ং কুরুক্ষেত্রে দৃশদ্বত্যাং
দ্বিজোত্তমা।।' (৫০।৬৬।৬৭)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপসংহারপাদেও ঐ শ্লোকটি পাইয়াছি। এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, যখন পরিক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণ ভারত শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ রচিত হইযাছিল। সকল পুরাণ-মতেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণই শেষ বা অষ্টাদশ পুরাণ। এরূপ স্থলে পরিক্ষিতের সময়ে মহাপুরাণের রচনাকাল আরম্ভ এবং তাঁহার প্রপৌত্রের পুত্র অধিসীমকৃষ্ণের সময়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

অতি প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রাচীনতমকালে রচিত বলিয়া কি মনে হয়? অনেকে বলিতে পারেন, তাহা হইলে পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ প্রসঙ্গে আধুনিক কথা কিরূপে প্রবেশলাভ করিল? এদিকে অধ্যাপক উইলসন ও মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ অনেকেই বলিতেছেন, খৃষ্টীয় ৮ম হইতে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে পুরাণ রচিত হইয়াছে, তাহাই কি গ্রাহ্য করিতে হইবে?

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবর্ষ হইতে যবদ্বীপে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ গিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাই একথা লিখিযাছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আজ বলিদ্বীপের শৈব ব্রাহ্মণেরা দেববৎ রক্ষা করিয়া থাকেন, এমন কি তথাকার কোন শূদ্রকেও তাহারা এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ শুনিতে বা দেখিতে দেন না। ডাক্তার ফ্রেডারিক সাহেব ওলন্দাজ ভাষায় ঐ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ ও ইহার কতকগুলি শ্লোক প্রকাশ করিয়াছেন।

*

এখনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু, মৎস্য ও মার্কণ্ডেয়পুরাণেই আদি পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত পুরাণের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া যায়। এই জন্য ঐ পাঁচখানিকে (ভাবী পঞ্চমাংশ বাদ দিয়া) আমরা অনেকটা খাঁটি পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল পুরাণে সে জন্য আর্ষ শ্লোকের ছড়াছড়ি।

কেহ বলিতে পারেন, যদি ১৮ খানি পুরাণ ঐরূপ প্রাচীনকালে প্রায় ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে, তাহা হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট পুরাণের নাম আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না কেন? যখন আদি পুরাণ বেদের ব্রাহ্মণাংশ বলিয়া গণ্য ছিল, তখন অবশ্যই বিভিন্ন পুরাণের নামকরণ হয় নাই। কিন্তু ভগবান বেদব্যাসের পুরাণসংহিতা অবলম্বনে অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হইলে তৎকালীন বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণের কথা আলোচিত হইয়াছিল। আপস্তব ধর্ম্মসূত্রে এই প্রমাণ পাইযাছি—

'অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীষিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্যমন্নঃ পন্থানং তে শ্মশানানি
ভেজিরে।।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরে ঋষয়ঃ।
উত্তরেণার্যমন্নঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি
কল্পতে।।'

শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্যোপনিষদভাষ্যে এইরূপ পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—
যে প্রজামীষিয়ে ধীরা তে শ্মশানাদি
ভেজিরে।
যে প্রজাং নেষিরে ধীরাস্তেঽমৃতত্বং হি
ভেজিরে।।'

আপস্তব ধর্ম্মসূত্রে অষ্টাশতী সহস্রাণি ইত্যাদি যে পুরাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, আমাদের সংগৃহীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অনুষঙ্গপাদে ৫৪ অধ্যায়ে ঐ বচনগুলি বিবৃতিসহ পাইযাছি।...আপস্তব ধর্ম্মসূত্র রচনাকালে যে বিভিন্ন পুরাণ রচিত হইয়াছিল, তাহা ভবিষ্যৎ পুরাণের বচন হইতেই জানা যাইতেছে। উক্ত আপস্তব ধর্ম্মসূত্রের উদ্ধৃত বচনগুলি আর্ষ সংস্কৃতে গ্রথিত, উহা এখনকার ব্যাকরণসম্মত নহে। ইহাতে বোধ হইতেছে—আদি অষ্টাদশ পুরাণও ঐ আর্ষ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইযাছিল। পরবর্ত্তীকালে নানা পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া অনেকটা মার্জ্জিত হইযাছে।

সেই প্রাচীন পুরাণে কি ছিল, মৎস্যপুরাণে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত অনুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে জানা যায়, বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, মার্কণ্ডেয় ও মৎস্য ব্যতীত অপর পুরাণসমূহে তত্তৎ পুরাণের প্রাচীন আদর্শ লইয়া তাহাতে অনেক অভিনব কথা সংযোজিত ও অনেক প্রাচীন কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবার প্রভাব লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়েই ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণসমূহ সংগ্রহ বা প্রচলন করিতে থাকেন। সেই জন্য আমরা পুরাণ মধ্যে ভবিষ্য রাজবংশ প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজগণেরও সন্ধান পাই। অধিক সম্ভব রাজসভাশ্রিত প্রাচীন পৌরাণিকগণ পুরাণ মধ্যে তত্তৎ রাজবংশ-তালিকার প্রক্ষেপ করিয়া থাকিবেন, কালে তাহাই পুরাণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। তাহা বলিয়া পুরাণের প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। তৎকালে ভারতে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও জৈন এই পঞ্চ সম্প্রদায়ই প্রধান ছিলেন। ব্রাহ্মণানুরক্ত শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্তগণ যে যে পুরাণে আপনাদের অভিষ্ট দেবের কথা পাইযাছিলেন, তাহাকেই আপনাদের নিজ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে থাকেন। এই জন্য আমরা স্কন্দপুরাণীয় কেদারখণ্ডে দেখিতে পাই—

'অষ্টাদশ পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভির্ভগবান ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবী তথা
হরিঃ।।' ১ অঃ

অতঃপর এই প্রবন্ধের লেখক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু জৈন পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা এখানে আমাদের পাঠকদের অবগতির জন্য সং, ক্রীং, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি প্রণীত অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করলাম। যথা—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ বামন কৌর্ম মাৎস্য গারুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

—ভগবান

কথায় কথায়

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'কথায় কথায়' পাঠ করে অনেকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে এর লেখকের অর্থাৎ আমার মাথা সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ খারাপ। যাঁরা আমাকে চিনতেন তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিলো যে আমার মাথা কিছুটা খারাপ, বর্তমানে তাঁরা স্থির নিশ্চিত যে না আর কিছুই নয় পুরোপুরি খারাপ হয়ে গেছে, সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমার শুভানুধ্যায়ীরা অনেকে দুপুরের দিকে, অর্থাৎ আমি যখন বাড়িতে থাকি না, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নিতে আসেন। আমি কেমন আছি, আমার পরিবারবর্গের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কাঁচের গেলাস, আয়না, চশমা ইত্যাদি ভঙ্গুর দ্রব্য ছুঁড়ে ফেলার প্রবণতা আমার কিরকম—এই জাতীয় বহুবিধ প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, পরামর্শ ও উপদেশে আমার পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে।

একজন সুহৃদ নিজের পকেটের এক টাকা একত্রিশ পয়সা ব্যয় করে একগাছা তিরুলির বিখ্যাত পাগলের বালা আমার স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, নিকটবর্তী কৃষ্ণপক্ষ মঙ্গলবার শেষ রাত্রিতে আমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে সেটা পরাতে হবে, তাহলে আর ভয় অথবা চিন্তার কোনো কারণ থাকবে না। পাগলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশত শেষ রাত্রে গঙ্গাস্নান করতে কিম্বা এবং বালা পরতে আমি বাধা দিতে পারি; আমার স্ত্রী যদি প্রয়োজন বোধ করেন তাহলে সেই বিশিষ্ট দিনে যথাসময়ে কয়েকজন বলশালী লোক নিয়ে আমার সেই সুহৃদ আমার স্ত্রীকে সাহায্য করতে আসবেন বলে জানিয়ে গেছেন।

আরেকজন একটি দাতব্য মানসিক চিকিৎসালয়ের দরখাস্ত ফর্ম রেখে গেছেন। সেই ফর্মে কিছুই করতে হবে না, শুধু আমার স্ত্রী ও ভাই এবং দুজন প্রতিবেশী মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করবেন যে সামাজিক এবং পারিবারিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে অবিলম্বে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কোনো মানসিক ওয়ার্ডে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এর জন্যে বিশেষ তদন্তের প্রয়োজন হবে না। যে কোনো দুই বা তিন কিস্তি 'কথায় কথায়' আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিলেই কমিশনার সাহেব আবেদনের যৌক্তিকতা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিতান্ত বেপরোয়া। যেদিন দরখাস্ত ফর্ম এনেছিলেন তার পরদিনই খোঁজ নিতে এলেন কতদূর কি হোলো। যখন আমার স্ত্রীর কাছে শুনলেন যে আমি সেই দরখাস্ত ফর্ম দেখে রেগে গিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, তিনি কপাল চাপড়িয়ে 'হায়-হায়' করে উঠলেন এবং 'আর দেরি নয়, আর দেরি নয়' এই বলে দ্বিতীয় ফর্ম সংগ্রহের জন্য আমাদের বাড়ি থেকে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন। বোধহয় ইচ্ছা ছিলো সেদিনই আরেকটি ফর্ম নিয়ে আসবেন।

দুঃখের বিষয়, সেদিন উল্টো রথের জন্য আমাদের অফিস কয়েক ঘন্টা আগে ছুটি হয়ে গিয়েছিলো। উনি আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমিও ট্রাম থেকে নেমে ফিরছি। একবারে মুখোমুখি দেখা। তিনি আমাকে দেখে একেবারে ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠলেন। আমি ঠিক করে ফেললাম এঁকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

সোজাসুজি বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?' ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন, 'এই তোমার বাড়িতে।' আমি বললাম, 'আমিও আপনার বাড়ি হয়েই আসছি।'

ভদ্রলোক কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন, 'আমার বাড়িতে, এই ভর দুপুরে আমার বাড়িতে কি জন্যে?' তাঁর গলা কেমন যেন শুকিয়ে এলো। আমি বললাম, 'আপনার গলা কেমন শুকিয়ে গেছে একটু জল খেয়ে নিন।' বলে তাঁকে পাশেই মোড়ের মুখে টিউবওয়েলটার কাছে প্রায় ঠেলে নিয়ে গেলাম। বহুদিন অভ্যাস নেই মনে হোলো, ঘাড় গুঁজে টিউবওয়েলের মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিলো। কিন্তু আমি ছাড়লাম না, কর্কশ গলায় 'আরো খান, আরো খান' হুকুম করে প্রায় এক গ্যালন জল খাওয়ালাম। যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন টইটম্বুর জল খেয়ে ঢক্‌ঢক্‌ করে টলছেন, সাদা জল খেয়ে কাউকে এর আগে এতো বেসামাল হতে দেখিনি।

অবশ্য একটু পরে সামলিয়ে নিলেন এবং ঠিক তখনই আবার হুঁশ হলো তাঁর, 'আমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলে?'

আমি তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। গল্পে-উপন্যাসে পড়েছি পাগলেরা মারাত্মক কিছু করার আগে এইভাবেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। তিনি বেশিক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে সমর্থ হলেন না, ভয়ে-ভঙ্গে মাথা নামিয়ে নিলেন। এইবার আমি তাঁর একটু আগের প্রশ্নের জবাব দিলাম, হিমশীতল কণ্ঠে বললাম, 'আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম পেটানোর জন্যে।'

'পেটানোর জন্যে', সদাশয় পরোপকারী বন্ধু হার্টফেল করেন আর কি, 'কাকে পেটানোর জন্যে?'

ভদ্রলোকের উৎকণ্ঠা দেখে বড় আনন্দ হলো, মৃদু হেসে বললাম, 'কাকে আর? আপনিও বাড়ির বাইরে, আপনার স্ত্রীও অফিসে।

প্রথমে ঠেঙাতাম আপনার চাকরকে সে দরজা খুলে দিতেই তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলাম, কিন্তু সে ব্যাটা মহাধড়িবাজ। সে উঠে দাঁড়াতেই টেবিলের উপর থেকে যেই তাকে আপনার টাইমপিসটা ছুঁড়ে মারলাম ব্যাটা ছুটে গিয়ে রান্নাঘরে দরজা আটকিয়ে চেঁচাতে লাগলো। তারপরে পেটালাম আপনার ছোট ছেলেটিকে। কিন্তু যাই বলুন আপনার বড় ছেলেটি বড় তুখোড়, রেডিয়োটা ছুঁড়ে মারতেই সে ছোকরা সামনের চারতলা বাড়িটার কার্নিসে উঠে বসে রইলো, কিছুতেই ধরতে পারলাম না।'

আর অধিক বর্ণনার প্রয়োজন হলো না, ভদ্রলোক এল্ বাসের মত বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

তারাপদ রায়

চিঠি

জানি না তোর কাছে আমার অপরাধটা কি এবং কোন দোষে আজ তোকে অনুদা বলে সম্বোধন করারও অধিকার আমি হারালাম। অনুদা, তুই কি আমায় চিনিস নি? আমার মনটা যে তোর কাছে কতখানি বাঁধা তাও কি জানিস না। তোকে ছাড়া আমার জীবন চালানো সম্ভব নয়।

জনসমুদ্রের মাঝখানে কত মেয়েই না আমার মত একা অসহায়। তুই আমার নিঃসঙ্গভাবে ফেলে রেখে গেলি। আর একটা কথা বহুদিন পর বলছি। অনুদা, তুই আমার কোনদিনও সেভাবে ভালবাসিস নি। বুঝলি, ভালবাসলে অন্তত আমায় ভুল বুঝতিস না। আমি আর জীবনে কোনদিন তোর সংগে দেখা করতে চাইবো না। শুধু একবার তোর মনকে প্রশ্ন করে দেখ সত্যিই সে কি চায়। আমাকে কি ভালবাসিস না? অনুদা তুই সেদিন কেন যে রাগ করলি বুঝতে পারলাম না, তবে তোকে একথা জানাই, তোকেই যদি না পেলাম তবে আর কারোর দরকার নেই। সুখী হস আমি সেই প্রার্থনা করি।

আজ আর আমার মন কিছুতেই শান্ত হবে না। পারিস তো তোর এই হতভাগা অনুরাগিণীকে ভুলে যাস। তোকে কোনদিনই আনন্দ দিতে পারলাম না কেবল আঘাতই দিয়ে গেলাম এটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। তোর তো আমার মত আরো অনেক বান্ধবী আছে, তাদের মাঝে নিশ্চয়ই আমাকে তুই হারিয়ে ফেলতে পারবি।

তবে আমি তোকে কোনদিনও ভুলতে পারবো না। আমি ছাত মেলে যাকেই আকড়ে রাখতে চাই, সেই আমাকে ফেলে হয় জনসমুদ্রের মাঝখানে। কিছুদিন হাবুডুবু খাই। তারপর সব ঠিক হয়ে যায়। কিছুটা দুঃখ বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে। জানি না এই দুঃখের শেষ কোথায়।

বাইরের উজ্জ্বল রৌদ্র তোর মুখের সেই মধুর কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ তোকে খুব দুঃখের সংগে জানাচ্ছি, অনুদা বলারও অধিকার আমার নেই। আমি হারিয়ে ফেলেছি। সেটাই আমার দুঃখ।

নিজের দর্পণে

পুরানো ডায়েরীটা দেখছিলাম। অনেক কাগজপত্রের মধ্যে বন্ধুর চিঠি নজরে এল। সংগে সংগে মনের মধ্যে একটি মেয়ের ছবি ভেসে এল। যেন ট্রাম স্টপেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একগাদা বইপত্র বুকে নিয়ে। কত ট্রাম বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল। আবার যাত্রী নিয়ে চলে গেল। কিন্তু মর্মর মূর্তির মত নিশ্চল হয়

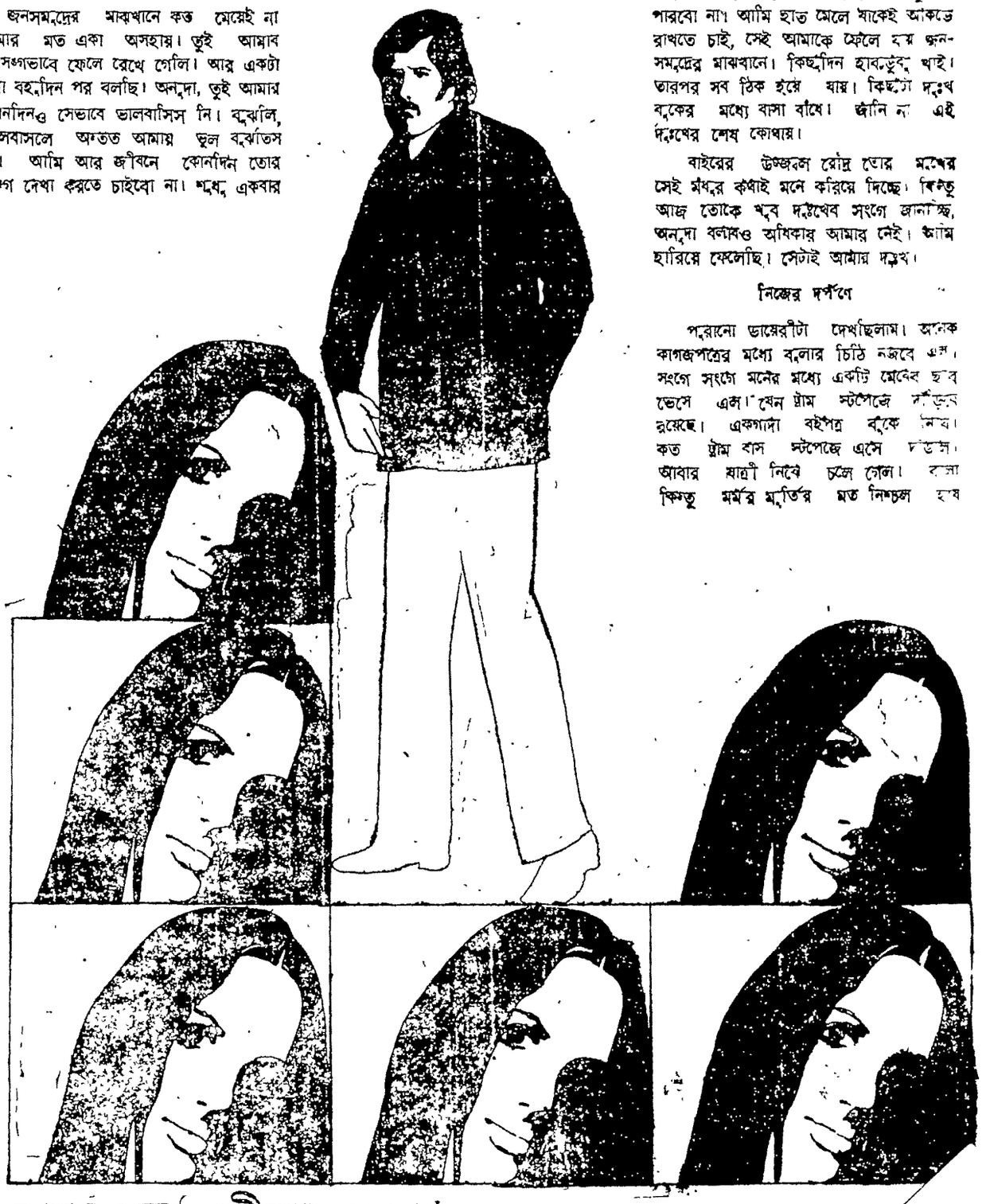

জলতরঙ্গ জীবন সরকার

দাঁড়িয়ে গাড়ী ঘোড়ার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করে যাচ্ছে। কোন বাস কিংবা ট্রামে ওঠবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা না করে। আমি ওর দৃষ্টির আড়ালে থেকে বেশ মজা অনুভব করছি আর ভাবছি, সত্যি মেয়েটা প্রেমে পড়ে গেল। বলার ভাই অরুণ আমার বন্ধু সেই সুবাদে ও আমাকে অনুদা বলে। ওর কথা-বার্তা চিঠিপত্র দেখে মনে হবে আপন ভাই। আমি ওকে তুই তোকারি করে সম্বোধন করি। হাসিঠাট্টা আমাদের মধ্যে চলে। মনে কোন গলদ নেই। অন্তত আমি তা কোনদিন ভাবিনি। তবিশ্যি বুলার যৌবনোদ্ভেদ দেহ এক এক সময় নাড়া দিত বলা যেতে পারে। কীর্তিমতু ভাবিয়ে দিত। আমি তখন নিজেকে ভীষণ গালমন্দ দিতাম এবং মনকে নানাভাবে প্রবোধ দিতাম, এটা ঠিক নয়। বন্ধুর বোন সেইজন্য খোলা মনে আমার সংগে মেশে, তাই বলে আমি অন্যরকম ভাববো কেন? এটা ঠিক নয়। কিন্তু এই মনটাকে আমি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারতাম না। রাস্তার যেই সেই ওদের বাড়ীর দিকে কে যেন অতি সন্তর্পণে টেনে নিয়ে যেত মনের অগোচরে। অনেকদিন এমন হয়েছে, বাড়ীর কাছে এসে ফিরে গেছি কিন্তু বেশী দূরে যেতে পারিনি। তবে কি আমি বুলাকে ভালবেসেছি। এই দুর্বলতা কি সেই কথাই প্রমাণ করে? এই দুর্বলতা যদি ভালবাসা হয়, তা হলে তাই। কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে।

যেহেতু বুলার দাদা আমার বন্ধু কলেজের সহপাঠী, সেইজন্য বুলা দাদার মত ভেবেই মনে হয় উৎফুল্ল হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়তা যা কিছু সবই সেই সূত্র। বন্ধুর বোন মানে আমার বোন ধরা যেতে পারে। আমার অন্য কিছু মনে হওয়া উচিত নয়। যদি হয়, তবে সেটা মারাত্মক অন্যায়। আমি যে তা জানি না তা নয়। কিন্তু ঐ যে বললাম—রাস্তায় বেরুলেই বুলাদের বাড়ীর দিকে আমার পা চলে যায়। আর কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। খেলার মাঠে, সিনেমা থিয়েটারে অথবা কোন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে যেতে ইচ্ছা করে না। কেমন যেন নীরস বলে মনে হয়। কিন্তু বুলাদের বাড়ীতে যাওয়া তো দূরের কথা, মনে করলেই মনের মধ্যে কি রকম একটা আনন্দের শিহরণ অনুভব করতে থাকি। আমার বন্ধুটিও অদ্ভুত। আমাকে পেলে আর যেন কিছু চায় না। শুধু বন্ধুটির কথা বললে ভুল হবে। ওদের বাড়ীর সবাই যেন আমাদের পেলে খুশী হয়। এই ব্যাপারটার মধ্যে যে অন্য কোনো বিষয় থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। থাকারও কথা নয়। এই পরিস্থিতিতে আমি যে কি করবো তা ভেবে পাচ্ছি না। বুলাদের বাড়ীতে যাওয়া উচিত হবে না এই ভেবে দুই একদিন বাড়ীতে বসেই রইলাম। কিন্তু ফল হল উল্টো। অরুণ চলে এল। দুদিন যাইনি বলে ভেবেছে অসুখ হয়েছে। আমি অরুণকে দেখে বললাম—কি রে তুই এত সকালে। অরুণ উত্তর দিল—মা পাঠাল। তুই দুদিন যাসনি। বাড়ীতে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সকলের মুখে, কি হল, ছেলেটার কি হল? আর আমি সেই খবর নিতে এলাম। বেশ আছিস। তোকে দেখে হিংসে হয়। তোর জন্য এত চিন্তা। তুই হচ্ছিস পরের ছেলে। আর আমি ঘরের ছেলে। একবারও জিগ্যেস করে না কেউ। আমার যেন কথাটা কেমন লাগল। আমাকে নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন?

সত্যি কথাই তো ওকে নিয়ে কেউ তেমন ভাবে না। বাড়ীতে ভালমন্দ জিনিস হলে আমার জন্যে রেখে দেয়। ওকে দেয় কিনা জানি না। বললে বলে—খেয়েছে। আমি বললাম—আমি আজকে আর যাবো না। অন্যদিন যাবো।

—সে কি হয়। আমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে।

—আমি কি চোর। না অন্য কিছু?

অরুণকে প্রশ্ন করি।

অরুণ একগাল হেসে উত্তর দেয়।

—আরে তা নয়, তা নয়। তুই ঠিক এখন আর পরের ছেলের মত নয়। এখানে হোটেলে পরে থাকিস। মা-বাবা কাছে নেই। রাতদিন আমাদের বাড়ীতে থাস। দুই-তিনদিন যাচ্ছিস না। স্বাভাবিক কারণেই চিন্তা হয়। আমারও হয়েছে। এর মধ্যে উদ্বেজিত হবার মত কোন কথা নেই। চল আর তুই যদি না যাস তাহলে আর কোনদিন আসবো না। এবার কিন্তু সত্যি সত্যি রাগ করবো।

অবশেষে উঠতেই হল। নিজের মনেই ঠিক করলাম, আজকে যাই আর যাবো না। বাড়ীতে গেলে যে কি হবে। কতজনের সামনে পড়তে হবে। হাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এসব জানা ছিল। উৎকট কামলায় পড়া গেল। প্রথম থেকে এই কথা ভেবে ঠিক বন্ধুর মত মেপে কথা বললে হয় তো বা সেই ব্যাপারটা ঘটতো না। দুঃখও পেতে হত না। বললাম—একটু বস। জামা-কাপড়টা পালটিয়ে নিই।

অরুণ উত্তর দিলে—ঠিক আছে। ভদ্রতা দেখাতে হবে না।

এই কয়টি কথা বলাতে মাথার মধ্যে দুদিনের জমা নানান প্রকার বাষ্প মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। রাস্তায় বেরিয়ে বেশ ভাল লাগল। মনে হল অনেকদিন পর খাঁচার পাখি ছাড়া পেল।

ফেরার সময়

বুলা: এই অনুদা। তুই যে আজকাল ভীষণ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিস। তোকে কেমন যেন আনমনা আনমনা লাগছে। বল না রে কি হয়েছে।

বুলা এমনভাবে আমাকে নাড়া দিল যে ওর দিকে মুখ ফেরাতেই হল। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি বুলা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আর আমি লোহার মত শক্ত হয়ে যাচ্ছি। আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোনো কথা বলতে পারছি না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বুলা আমাকে আরো সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললো—কি রে। বোবা! কথা বলছিস না কেন?

আমি যেন কি অপরাধ করেছি সেই ভেবে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। আমার যেন সব কথা শেষ হয়ে গেছে। আমার যেন সব কিছু দেখা হয়ে গেছে। আর কিছু বলার নেই। আর কিছু দেখার নেই। বুলা যেন আরো পুলকিত হয়ে আমাকে নাড়া দিল।

অনু-অনুদা, কি খাবি! খিদে পেয়েছে? তেষ্টা পেয়েছে? কিরে। কি খাবি। বল না। আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। তোর জন্যে খাবার রাখাই আছে। চাইলেই পাবি। কিরে বোকারাম!

আমি এবারও অন্য কথা কি যেন ভাবছিলাম। বুলা আমাকে নাড়া ধরে ডাকছে। বোকারাম বলছে অথচ আমি পাল্টা জবাব দিতে পারছি না। ওর সাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। এবং সেই জন্যই মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। কেবলমাত্র উঃ। আমি যে বেঁচে আছি সেটাই প্রমাণ করতে চাইছি। কিন্তু বিধি বাম। উঁহু যেই করেছি। বুলা ওর নরম হাতটা দিয়ে আমার গাল টিপে দিল। আমি যেন দিশেহারা পাগলের মত হয়ে গেলাম। বিবেক বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেল। মনের মধ্যে জলতরংগ বেজে গেল। আমি বুঝতে পারছি ঘরে কেউ নেই। বুলার চোখের ভাষাও বুঝতে পারছি।

আমি খাটে কাৎ হয়ে বসে আছি, আর বুলা আমার পাশে বসে আছে। ঘরে অল্প নীল আলো। দরজায়, জানালায় পর্দা ঝুলছে। বেশ নিরিবিলি। এই ঘরে বুলা একা থাকে। এই বিছানা বুলার। বইপত্র চারপাশে ছড়ানো। আমি এখন এই বাড়ীতে এলেই বুলা এই ঘরে নিয়ে আসে। পড়ার কথা বলে। এতদিন অনুদা ছিলাম এখন আবার মাস্টার হয়েছি। মানে কি বলবো ন্যাকামির চূড়ান্ত। অনুদা, ও মাস্টারের অন্তরালে ভীষণ একটা অসুস্থ মন সর্বদাই ওৎ পেতে বসে আছে। আমি সেই অসুস্থ মনটাকে কোনো ডাক্তার দেখিয়েও সারাতে পারলাম না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। অনেক ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোন উপকার হয়নি। দিন দিন যেন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি সবকিছু বুঝতে পারছি অথচ ঠিক বুঝতে পারছি না, এই রকম একটা ভাব। বুলা আমার মুখ ধরা মাত্রই ওর নরম বুক আমার শরীরে ছুঁয়ে গেল। আমি শিশুর মত ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ততক্ষণে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছি। আমি অন্য রাজ্যে চলে গেছি। কি বলবো। কি করা উচিত কোন কথাই বুঝতে পারছি না। বুলা যেন আমার আরো কাছে চলে এসেছে। আমি ওকে বাধা দিতে পারলাম না। আমার সে শক্তিও ছিল না। আমার মনে হলো আলো অন্ধকারের মধ্যে এক নৈসর্গিক জগতে বেড়াচ্ছি। নদীর উৎস সন্ধানে বেরিয়ে যেন আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

৮. ঘরে ফেরার আর কোন পথ নেই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফ্যাসি বিরোধী মহাজোটের সূত্রপাত : হপকিন্সের ঐতিহাসিক দৌত্য

সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটি সম্পূর্ণ নতুন পর্বের শুরু হইল। প্রকৃতপক্ষে এই পর্বে মহাযুদ্ধের চেহারা ও চরিত্রের—কূটনৈতিক ও সামরিক—যেমন বদল হইতে লাগিল, তেমনি সারা পৃথিবীর উপরেই তার প্রভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এমন কি পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক পৃথিবীর অনেক ভাঙাগড়ার সঙ্গেই মূলতঃ যুক্ত ছিল রুশ-জার্মান সংগ্রামের ফলাফল। যে 'গ্রান্ড এ্যালায়েন্স' বা মহামৈত্রী কিম্বা যে 'গ্রেট এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট কোয়ালিশন' বা ফ্যাসি-বিরোধী মহাজোট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তারও সূত্রপাত হইল নাৎসী জার্মানী - কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পর। অথচ হিটলারের ঘোষিত লক্ষ্য ও নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়া এই গ্রান্ড এ্যালায়েন্স বা মহামৈত্রী গড়িয়া উঠিল। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের কারণ হিসাবে জার্মান গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীকে বলশেভিক মতবাদের মারাত্মক বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যই এই অভিযানের প্রয়োজন হইয়াছিল। অর্থাৎ ইংগ-মার্কিনসহ সমগ্র পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক জগতের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য ছিল এই অভিযানের পিছনে। আরও সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, ইংগ-মার্কিণ শক্তিবর্গ যাতে আক্রান্ত রাশিয়ার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হয়। তেমন গূঢ় মতলবই ছিল বলশেভিক বিপদের' বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে। (১)

কিন্তু হিটলারের এই গূঢ় মতলব ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ রুশ-জার্মান সংগ্রামের গতিপথে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যে মহামৈত্রী বা মহাজোট রচিত হইল, ইতিহাসে তার দূরপ্রসারী ফলাফল প্রতিবিম্বিত হইল। বলা বাহুল্য যে, আক্রান্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি খুব দরদ ইংগ-মার্কিন ধনতান্ত্রিক শক্তি-বর্গের ছিল না এবং এজন্য উভয়পক্ষের পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যেও খুব আন্তরিকতা ছিল না। কারণ, কমিউনিজমের প্রতি অবিশ্বাস ও ভীতি আগের মতই বজায় ছিল এবং পর্দার আড়ালে অনেক কূটনৈতিক ও রণনৈতিক বিরোধ ও মতান্তর ঘটিতেছিল। তবু এই মৈত্রী গড়িয়া উঠিল এবং শেষ পর্যন্ত অন্ততঃ বাহ্যতঃ বজায় থাকিল এই আশংকায় যে, যদি নাৎসী-জার্মানীর হাতে সোভিয়েত রাশিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া যায়, তবে, ইউরোপজয়ী হিটলারী বাহিনী পরবর্তী-কালে নিশ্চিতরূপেই বৃটেন আক্রমণ করিবে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পতন ঘটিলে সুবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্য হিটলারী মুঠায় আসিয়া যাইবে এবং তারপর জাপানী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আর হিটলারী গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। প্রধানতঃ এই সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা করিয়াই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিল।

(1) British Foreign Policy during World War II— V. Trukhanovsky, P. 158 Moscow 1970.

সুতরাং ২২শে জুন তারিখ হিটলারী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল যে অপূর্ব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আপাততঃ হিটলারী আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে রেহাই পাইলা গেল এবং এজন্য চার্চিল এবং তাঁর বড় বড় সহযোগীরা 'খুব খুশী' হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁরা বুঝিলেন যে, 'বৃটেন আর একক নয়' এবং 'সেদিন সকালে চেকার্সের (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর পল্লী-বিশ্রাম ভবন) আবহাওয়ার মধ্যে একটা নিদারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস অনুভব করা গেল'—এসব লিখিয়াছেন চার্চিলের দেহরক্ষী ইন্সপেক্টর টমসন। (২)

চার্চিলের ২২শে জুন তারিখের সেই ইতিহাস বিখ্যাত বেতার ভাষণের পরেও কিন্তু দুই দেশের মধ্যে অবিলম্বেই সহৃদয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল না। কারণ, এতদিনের পারস্পরিক শত্রুতা ও সন্দেহ একটিমাত্র বেতার বক্তৃতায়ই দূর হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার আগে হিটলারের অন্যতম প্রধান সহকর্মী হেসের হঠাৎ ইংলণ্ডে গমন (পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ষ্ট্যালিন ও রাশিয়ার মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। স্বভাবতই এই সন্দিগ্ধ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে, বৃটেন ও জার্মাণীর মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে নিয়া কোন গোপন বুঝাপড়া বা চক্রান্ত হইয়াছে কিনা? সুতরাং চার্চিলের সেই চাঞ্চল্যকর বেতার বক্তৃতার পরেও রাশিয়ার কাছ থেকে তেমন উপযুক্ত সাড়া না আসায় ৭ই জুলাই তারিখ চার্চিল স্বয়ং ষ্ট্যালিনের নিকট পত্র লিখিলেন এবং সেই পত্রের জবাবও ষ্ট্যালিন ১৮ই জুলাইয়ের আগে দিলেন না—যদিও ইতিমধ্যে চার্চিলের বক্তৃতার জন্য সোভিয়েত জনগণের মধ্যে কিছুটা 'বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দের' সৃষ্টি হইয়াছিল। তবু ঘটনার এই আকস্মিক ও অদ্ভুত নাটকীয় পরিণতির জন্য সোভিয়েট গবর্নমেন্ট যেন কিছুকালের জন্য হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই ঘোর কাটাইয়া উঠিতে স্বয়ং ষ্ট্যালিনেরও ১১ দিন লাগিয়াছিল—সোভিয়েত জনগণের সামনে যুদ্ধের নীতি সংক্রান্ত বক্তৃতা দিতে এজন্যই এত দেরী হইয়াছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে জেনারেল ম্যাসন ম্যাকফারলেনের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ মিলিটারী মিশন লণ্ডন থেকে মস্কোতে পৌঁছিল। আবার মস্কো থেকেও একটি

(২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৫৯।

সোভিয়েত মিলিটারী মিশন লন্ডনে পৌঁছিল। এদিকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে স্ট্যালিন ও মলোটভের আলোচনা হইল ইঙ্গ-সোভিয়েট সামরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে। ১২ই জুলাই, ১৯৪১, ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত ও ঘোষিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে উভয়ে একত্রে যুদ্ধ চালাইবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইলেন এবং এমন অঙ্গীকার করিলেন যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারীর কেহ পৃথকভাবে জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা করিবেন না কিম্বা সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর দিবেন না।

....not to conduct negotiations or sign a separate armistice or peace with Germany. (3)

বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধকালীন স্বাক্ষরিত এই প্রথম চুক্তির বয়ান থেকেই বুঝা যাইতেছে যে, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের তেমন গভীরতা ছিল না। কিন্তু হিটলারী বিপদের মুখে উভয়ের পক্ষে এ ছাড়া কোন গত্যন্তরও ছিল না।

কিন্তু শুরুতেই সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বা সেকেন্ড ফ্রন্ট খোলার দাবী উঠিল—যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিতর্ক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে একটা প্রকাণ্ড অংশ জুড়িয়া আছে। কেননা এর পিছনে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ কূটনীতির চাল ছিল—যে কথা পরে আলোচিত হইবে।

১৮ই জুলাই তারিখ স্ট্যালিন চার্চিলের চিঠির যে জবাব দিলেন, তাতে প্রথমেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। স্ট্যালিন লিখিলেন যে, হিটলারী সামরিক শক্তি এখন পূর্বদিকে নিয়োজিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিম দিকে (উত্তর ফ্রান্স) এবং উত্তরে (মেরু সমুদ্র অঞ্চলে) দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার এটাই সর্বোত্তম সময়।

এর জবাবে চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তবে, উত্তর দিকে মেরু সমুদ্র অঞ্চলে কিছু নৌক্রিয়ার এবং মরমনস্ক বন্দরে কিছু বৃটিশ জঙ্গী বিমানবহর স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন।

২৬শে জুলাই চার্চিল আবার স্ট্যালিনের কাছে পত্র লিখিলেন এবং তাতে ২০০ বিমান, ২০।৩০ লক্ষ জোড়া বুট জুতা, এবং রবার, টিন, পশম ও পশমী পোশাক, দস্তা, পাট ও 'শেলাক' সরবরাহের প্রস্তাব দিলেন।

(৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৬৭।

বলা বাহুল্য যে, এই সাহায্যের প্রস্তাব সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মত। কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই দুর্দিনে এভাবেই বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার শুরু হইল এবং একথাও মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে কার্যতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার একমাত্র মিত্র (Cally) ছিল বৃটেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও যুদ্ধ থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এই মিত্রের কাছ থেকে তেমন কোন সামরিক সহায়তা সরাসরি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং যদি অস্ত্রশস্ত্র ও কাঁচামালের আকারে সর্বাধিক অর্থনৈতিক সহায়তা পাইতে হয়, তবে বৃটেনের চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপরে নির্ভর করাই বুদ্ধিসংগত—সোভিয়েত নেতারা স্বভাবতই এই চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম থেকে 'উপযুক্ত' সাহায্য পাওয়ার আগে বৃটিশ ও মার্কিন মহলে সর্বাগ্রে যে প্রশ্নটি দেখা দিল, সেটি এই—সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর এই আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে কিনা এবং পারিলে কতদিন পর্যন্ত পারিবে? (৪)

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের সামরিক-কূটনৈতিক মহলেই এই প্রশ্ন দেখা দিল। বৃটেনের অধিকাংশ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাস ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এমন কি, মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের গোড়ার দিকে এই বিশ্বাস ছিল। বৃটিশ সরকারী মহল এবং সামরিক মহলেরও এই ধারণাই ছিল। চার্চিলের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল লর্ড ইসমে, জেনারেল স্টাফের অধ্যক্ষ জেনারেল স্যার জন ডিল মিলিটারি অপারেশনের ডিরেক্টার জেনারেল জন কেনেডি প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ সামরিক নেতাদের বিশ্বাস ছিল যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়া খতম হইবে। মাথনের মধ্যে ছুরি চালাইবার মত হিটলারী বাহিনী রাশিয়াকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিবে—এই বিশ্বাস ছিল বৃটিশ সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্তার। এমন কি স্বয়ং চার্চিলেরও এই বিষয়ে সংশয় ছিল—যদিও পরবর্তীকালে তাঁর মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে এটা তিনি অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। (৫)

কিন্তু চার্চিল তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল সামরিক নেতারই মত ছিল যে, রুশ সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই হারিয়া যাইবে এবং অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বৃটেনের মত মার্কিন সামরিক মহলের মতামতও সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল না। মার্কিন সমর সচিব মিঃ ষ্টিমসন তাঁর সমর দপ্তরের ও সেনানী-মণ্ডলীর পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন যে, রাশিয়াকে পরাজিত করিতে জার্মানীর সর্বনিম্ন এক মাস কিম্বা সম্ভবত সর্বাধিক তিন মাস সময় লাগিবে—

(..."a minimum of one month and a possible maximum of three months"). (6)

এদিকে মস্কোস্থিত মার্কিন দূতাবাসে সোভিয়েট সামরিক শক্তি সম্পর্কে মতামত দ্বিধাবিহীন ছিল। দূতাবাসের মিলিটারী এ্যাটাশে মেজর ইভান ইয়েটন বিশ্বাস করিতেন যে, লালফৌজ খুব শীঘ্রই চূর্ণ হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রদূত ষ্টেটিনহাড লালফৌজের শক্তি সম্পর্কে অতটা নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। অবশেষে হ্যারী হপকিন্সের পরামর্শ অনুসারে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কর্ণেল ফিলিপ ফেদারস্টোনহকে পাঠাইলেন 'কর্জ ও ইজারা' চুক্তির তদারকী অফিসার হিসাবে এবং তিনি সামরিক অনুকূলেই মতামত প্রকাশ করিলেন। হপকিন্স স্বয়ং জুলাই মাসের শেষে মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং তাঁর এই পরিদর্শন ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। কারণ মার্কিন-সোভিয়েট ও ইঙ্গ-সোভিয়েট সম্পর্কের সমগ্র ভবিষ্যৎ-এর উপরেই হ্যারী হপকিন্সের মস্কো সফর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।*

হপকিন্স ছিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাসভাজন—একেবারে অন্দরমহলের লোক। অথচ হপকিন্স ছিলেন এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ—অত্যন্ত রোগা, শীর্ণকায়, লম্বা, রুজভেল্ট তাঁকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন

(4) Russia At War—Alexander Werth Pan Books, London. 1964. P. 286.

(5) The British Foreign Policy—Trukhanovsky, P. 163.

(6) Rocsevelt and Hopkins — Robert E. Sherwood, Bantam edition, Vol. 1, P. 370.

* হপকিন্স সম্পর্কে বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই শেরউড প্রণীত 'রুজভেল্ট এন্ড হপকিন্স' নামক অপূর্ব তথ্যসম্বলিত পুস্তক মহাযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে পরিচিত। —লেখক।

'অর্ধেক মানুষ' প্রায়শঃই অত্যন্ত অসুস্থ এমন কি শয্যাশায়ীও থাকিতেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কূটনৈতিক ব্যাপারে এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তায় তিনি অসাধারণ ছিলেন, আর অসাধারণ ছিল তাঁর সাহস, শ্রম-নৈপুণ্য ও সহনশীলতা। ওই রুগ্ন শীর্ণ চেহারা ও অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি ওয়াশিংটন-লণ্ডন এবং লণ্ডন-মস্কো ইত্যাদি যেভাবে ছুটাছুটি করিয়াছেন, সেই সমস্ত ঘটনা প্রায় অবিশ্বাস্য। শেরউডের বইতে এই সমস্ত কাহিনীর অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। কিন্তু হ্যারী হপকিন্স কিরূপ তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে কিরূপ সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর মেরু সমুদ্র এলাকায় আর্চেঞ্জেল বন্দর (লণ্ডন থেকে অতি কষ্টে বিমানযোগে এখানে পৌঁছিয়াছিলেন) থেকে মস্কো যাওয়ার পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বর্ণনায়।

রবার্ট ই শেরউড লিখিয়াছেন—'আর্চেঞ্জেল থেকে বিমানযোগে মস্কো যেতে চার ঘণ্টা লেগেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে হপকিন্স সোভিয়েট রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। বিমান থেকে তিনি নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—যেন শত শত হাজার হাজার মাইল গভীর ও ঘন অরণ্যে আবৃত এবং তিনি চিন্তা করিলেন—হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনীর সমস্ত যান্ত্রিক ডিভিসন নিয়েও এমন দেশকে বিদীর্ণ করতে পারবেন, এমন আশা তাঁর কখনও করা উচিত নয়।'(৭)

হপকিন্স ও আভেরিল হ্যারিম্যান প্রভৃতির মস্কো পরিদর্শনের পর যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে দৃঢ় আশাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিলেন, তখন চার্চিল মন্তব্য করিলেন—

> President Roosevelt was considered very bold when he proclaimed in September 1941 that the Russian Front would hold and that Moscow would not be taken.

অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে রুজভেল্ট যখন ঘোষণা করিলেন যে, রুশ রণাঙ্গন ভাঙিয়া পড়িবে না এবং মস্কোর পতন হইবে না—তখন তাঁর মতামতও দুঃসাহসিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।(৮)

---

(৭) রবার্ট ই শেরউড প্রণীত 'রুজভেল্ট এ্যান্ড হপকিন্স' পৃষ্ঠা ৩৯৮।

(৮) উইনস্টোন চার্চিল — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস (ইং) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা—৩৫১।

১৯৪১ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন মহলে যখন এই প্রকার ধারণা চলিতেছিল তখন হ্যারী হপকিন্সের দূরদৃষ্টি নিশ্চয় উচ্চ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু হপকিন্স হঠাৎ মস্কো গিয়াছিলেন কেন এবং কার নির্দেশে? কারণ, রাশিয়া তখনও বহু বিশিষ্ট ইঙ্গ-মার্কিনের আছে অজ্ঞাত দেশ ও ভীতির দেশ ছিল। অথচ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল চাহিতেছিলেন মার্কিণ প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়া ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার জন্য। এই উদ্দেশ্যে আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষে তাঁদের কথা ছিল অতলান্তিক (নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড) বৈঠকে মিলিত হওয়া। রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে হ্যারী হপকিন্স দ্বিতীয় বারের (প্রথম বার বড়দিনে) জন্য লণ্ডনে আসিয়া চার্চিলের সঙ্গে এই প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়া আলোচনা করিলেন। কিন্তু তখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, রুশ রণাঙ্গনের সত্যকারের অবস্থা জানা না থাকিলে চার্চিল-রুজভেল্টের আলোচনা বাস্তবতাসম্মত হইতে পারে না, অধিকন্তু কর্জ-ইজারা আইন অনুসারে রাশিয়াকে সাহায্য দানের প্রশ্নটিও নির্ভর করিতেছে রাশিয়া কতদিন পর্যন্ত হিটলারী আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, সেই গুরুতর তথ্য জানার উপর। এজন্য হপকিন্স স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেই মস্কো যাইবেন এবং খোদ ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তখন হপকিন্স চার্চিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাত দিনের মধ্যে মস্কো ঘুরিয়া আসা সম্ভব কিনা? চার্চিল তাঁকে জানাইলেন যে, আর এ এফ কোস্টাল কম্যাণ্ডের ক্যাটালিন ফ্লাইংবোট স্কটল্যাণ্ডের ইনভারগর্ডন থেকে নরওয়ের নর্থ কেপ হইয়া আর্চেনজেল বন্দর পর্যন্ত যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু এই পথ নিদারুণ বিঘ্নসংকুল সেজন্য চার্চিলের খুব উৎসাহ ছিল না। কিন্তু হপকিন্স যেন 'উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।' তিনি ২৫শে জুলাই রুজভেল্টের অনুমতি চাহিয়া তারবার্তা পাঠাইলেন এবং রুজভেল্টও সোৎসাহে সম্মতি দিলেন।—(শেরউড, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৮)।

মস্কো অভিমুখে যাইবার আগে ২৭শে জুলাই সন্ধ্যায় হপকিন্স চার্চিলকে (চেকার্সে) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার গুরুত্ব' সম্পর্কে চার্চিলের মতামতের কিছুটা তিনি ষ্ট্যালিনকে বলিতে পারেন কিনা?

চার্চিল জবাব দিলেন—

> Tell him, tell him that Britain has but one ambition to-day, but one desire—to crush Hitler. Tell him that he can depend upon us .... Good-bye God bless you, Harry".

তাঁকে বলেন, বলো যে, আজকের দিনে বৃটেনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একমাত্র ইচ্ছা—হিটলারকে ধ্বংস করা। তাঁকে বলো যে, তিনি আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন..... বিদায়, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, হ্যারী।'

—(শেরউড, পৃঃ ৩৯১)

শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, সেই সময় হপকিন্সের মস্কো যাত্রা যেন অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রলোকের দিকে রকেটযোগে যাত্রার মত' মনে হইতেছিল। কারণ, রাশিয়া তখন এত দূরবর্তী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। .....

এত দূর ও বিপজ্জনক পথে যুদ্ধ-বিমানের কঠোরতার মধ্যে এবং সামান্য রেশনের উপর নির্ভর করিয়া ২৪ ঘণ্টায় এই আকাশযাত্রা অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ ছিল—বিশেষত হপকিন্সের স্বাস্থ্যের সংকটজনক অবস্থায়।

তবু হপকিন্স আর্চেঞ্জেলে গিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু ক্লান্ত দেহে সেই রাতে মস্কো যাত্রা করিলেন না। তাঁর একটু ঘুম ও বিশ্রামের দরকার ছিল। সেই রাতে বন্দরের ভারপ্রাপ্ত সোভিয়েট এডমিরাল তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং হপকিন্স এই প্রথম সোভিয়েট আতিথেয়তার স্বাদ পাইলেন। তিনি এই ডিনারের কথা ভুলিতে পারেন নাই সুতরাং তিনি লিখিয়াছিলেন যে,—

সেদিনের ডিনার যেন এলাহি ব্যাপার ছিল। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে এই ভোজ চলল। টাটকা সবজি মাখন, ক্রীম ইত্যাদি, শস্য ও লাল মূলোগুলি বিস্ময় উদ্রেক করছিল। বহু পদ পরিবেশন করা হয়েছিল—ঠাণ্ডা মাছ, ক্যাভিয়ার ও ভদকা। ভদকার একটা কড়া মেজাজ আছে। এটকে উপেক্ষা করা কঠিন। ইংরাজ বা আমেরিকানরা যেমন হুইস্কি নীট খায় তেমনভাবে খেলে বুক যেন জ্বলে যাবে। অতএব একটা বড় টুকরো বৃটিতে ক্যাভিয়ার (মাছের ডিম, অত্যন্ত রাজসিক খাদ্য রাশিয়ানদের কাছে—গ্রন্থকার) মিশিয়ে নিতে হবে এবং তারপর গিলে ফেলতে হবে। তখন কিন্তু ভদকার বোতল বন্ধ রাখতে হবে। ওটা খেলা করার বস্তু নয়। ভদকা যখন পান করবে, তখন কিছু খাদ্য খেতে হবে। এই খাদ্যটাই ভদকা পানের তীব্র আঘাতকে সইয়ে নিতে সাহায্য করবে।'

(ক্রমশঃ)

অঞ্জনা

সমাজ যাচ্ছে কোন্ দিকে

আমাদের একটা চলতি নিয়ম আছে (অবশ্য সকলের কাছে নয়) জিনিষ কিনতে গিয়ে তার দরদস্তুর না করা। ধরুন আমার একটা শাড়ী পছন্দ হয়েছে, ঢুকেছিও নামী দোকানে সুতরাং শাড়ীর গায়ে লেপ্‌টে থাকা লেবেলের দামটা আমাকে বরবরে টাকায় দিতে হবে। নইলে প্রেসটিজের একটা প্রশ্ন আছে। এমনকি নামী দোকানের দামী শাড়ী ছাড়াও আটপৌরে শাড়ী কিনতে গিয়ে দেখলেন বাইশ টাকার শাড়ী বত্রিশ টাকা হয়েছে (হালে কাপড়ের দাম লাফ দিয়ে বেড়েছে, বাড়ছে), আপনি শাড়ীর জমিতে বার পাঁচেক হাত বুলিয়ে আপনার প্রতিবেশিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইস্ কি বিচ্ছিরি কোয়ালিটি শাড়ীর অথচ দাম বেড়ে ডবল হয়েছে।' তারপর আপনার খুব প্রয়োজন মেটাতে ঐ বিশ্রী কোয়ালিটির একখানি শাড়ীর প্যাকেট হাতে ধরলেন আর দাম বাবদ যা চাইলো তাই দিলেন। দাম কমাবার কথা একবারও বলা হল না। পাশে প্রতিবেশিনী তার ওপর নিজের বাড়ী, গাড়ীর প্রেসটিজটাতো ল্যাজে ল্যাজে ঘুরছে।

পরবর্তী ক্রেতা ঐ জাতীয় শাড়ীই দরদস্তুর করে বত্রিশকে আটাশে নামিয়ে একখানা কিনে নিলেন। আবার হয়তো কেউবা ছত্রিশেও কিনে নিচ্ছেন নিজের নিজের স্টেটাস অনুযায়ী। অবশ্য খুব নামী দোকানের এ ধরনের হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছোটখাট, মাঝারী ধরনের দোকানে এরকম ব্যাপার হামেশাই হয়। বিশেষ করে শাড়ীর জন্য ভদ্রলোকের থান বা ধুতি নিতে গেলেও এই বিচিত্র দামের সম্মুখীন হতেই হয়। আর যে দোকানে দামের লেবেল খুব পরিষ্কার নয়, শাড়ীখানি হাতে নিয়ে দোকানী লেবেলের নম্বর দেখে শাড়ীর দাম বলেন—সেখানে তো হামেশাই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। দাম বলার আগেই ক্রেতার চাহিদা ও তার কথা বলার ধরন দেখেই সবকিছু বুঝে নেবার ক্ষমতা অভিজ্ঞ দোকানদারদের সবসময়েই আছে। ওঁরা ঠিক একটা ভাত টিপলেই পুরো হাঁড়ির ভাতের খবরের মত ক্রেতার একটা মুখের কথাতেই নিমেষে সব বুঝে নেন। আমি অবশ্য দোকানদারদের বিন্দুমাত্র দোষারোপ করছি না। ওঁরা ব্যবসা করছেন দু-চার পয়সার জন্য। সুতরাং ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে না পারলে আর সংসার চলে কেমন করে? মূল্যবৃদ্ধির দিনে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেরই তো এক হাল। তবুও যাঁরা স্টেটাস রক্ষা করতে শোনামাত্রই দাম [illegible] এরই ফল কিন্তু ভোগ করতে হয় সাধারণ মানুষকে, যাঁরা একটা নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে চলতে বাধ্য।

এই দুর্মূল্যের দিনেও কিছু ভোজনরসিক আছেন। তাঁদের কারো কারো হাতে নগদ বেশ ভালই মজুত আছে। তাঁরা নিজেদের রসনার তৃপ্তিতে জিনিষের যে কোন দাম দিতেই প্রস্তুত। তাই বেশিরভাগ সময়ই বাজারে বারো টাকা কেজি দরে ইলিশই হোক আর রুই-ই হোক মহানুভব ভোজনরসিকদের কৃপায় নিমেষেই তা উধাও হয়ে যায়। এমন কি অনেক সময়ই দোকানদারদের উদ্দেশ্যে শোনা যায় তাঁদের উক্তি 'দেখি তোমরা কত দাম বাড়াতে পারো আর আমরা কত কিনতে পারি।' এই যে প্রতিযোগিতার মনোভাব এটাই সাধারণ ছা-পোষা মানুষের পক্ষে মারাত্মক। যাঁরা পাঁচ টাকা কে-জি দরে মাছ কিনতেই ঘর্মাক্ত কলেবর তাঁদের কাছে বারো টাকা কেজির মাছ স্বপ্নের মত। অথচ বাজারে মাছ উঠছে, তার দামও উঠছে ততোধিক, আবার তা বিক্রীও হচ্ছে যথারীতি। আসলে একদল লোক আছেন যাঁরা আত্মসুখেই বিভোর—অন্যের কথা চিন্তা করার মত মানসিকতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে বাজারের ঊর্ধ্বগতিকে রোধ করে কার সাধ্য! অথচ এর মধ্যে কোন গৌরব নেই। সকলে মিলে ভোগে যে আনন্দ আর তৃপ্তি সেটা কখনোই একার ভোগে উপলব্ধি করা যায় না। বিক্রেতারাও ক্রেতার মেজাজ বুঝে দাম হাঁকিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করে। আর অধিক মূল্যের ক্রেতারা চাকর-বাকরের সামনে নিজেদের ক্ষমতা প্রকাশ করে পুলকিত হন এবং যাঁরা ভর্তি বাজার করে পরম তৃপ্তি লাভ করেন। চাকর-বাকরেরাও অন্য বাড়ীর আজের লোকের সামনে গর্বভরে বাবুর বাজারের গল্প করে। এতে বাবুর বা চাকরের সত্যিই কি তৃপ্তি পাবার মত কিছু আছে?

পাত্রীর মাতা গর্বের সঙ্গে একবাড়ী ওবাড়ী ঘুরে মেয়ের বিয়ের ফর্দের বর্ণনা করছেন। কর্তার যেহেতু কর্মস্থলে বিশেষ একটা পদমর্যাদা আছে সেইসঙ্গে মানানসই বাড়ী আছে সেজন্য মেয়ের বিয়েতে কয়েকশ' লোক খাওয়ালেন। মেয়েকে ঢেলে সাজিয়ে দিলেন এটা ওটা। দামী শাড়ী গয়নার সঙ্গে ফ্রিজ ডিভান ছাড়াও আধুনিক উপহারে ঘর ভরিয়ে দিলেন। এই এতসব জিনিষ দেওয়ায় নিজের অভিজাত্য আর ক্ষমতার জাহির করেই ক্ষান্ত হলেন না, তা প্রচার করার জন্যও রইল আপ্রাণ প্রচেষ্টা। মেয়েকে মূল্যবান জিনিষ দেওয়ায় আনন্দ হয়তো আছে কিন্তু তা প্রচারের এতো গৌরব কিসের! উদার মনোভাবের বড় বড় বুলি আওড়ানোও পাত্রপক্ষ ও পাত্র নিজেও পাত্রীর বাড়ী থেকে দামী দামী জিনিষ নিতে ও পেতে অত্যন্ত আনন্দিত হন। আর পাত্রীপক্ষও দিতে পারলে স্বভাবতঃই খুশী। অথচ পাত্র ও পাত্রীপক্ষের এতে এত খুশী হবার আর ফলাও করে বলারই বা কি আছে তাদের দেনাপাওনার কথা। যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা যত খুশী দানধ্যান করুন আপত্তি নেই কিন্তু তা প্রচারের ফলটাই অত্যন্ত বিষময়। এ নজীর খাড়া করে অন্যান্য পাত্রপক্ষ বায়না করতে পারেন। কথায় কথায় অমুকের ছেলের পাওনার গল্প আর অমুকের মেয়ের মায়ের দেওয়ার উদাত্তার গল্প গাল ভরে শোনাবেন। কিন্তু এই গল্পটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। সমাজে জোর করে আদায় করতে চায় না এমন উদারচেতার সংখ্যা নিঃসন্দেহে অল্প। তারপর নজীরের পাহাড় খাড়া করে করে পাত্রীপক্ষকে কতটা বিব্রত ও অসহায় অবস্থায় ফেলা হবে তা বলাই বাহুল্য।

আবার এ ঘটনাও বিরল নয় যে, বাড়ীর কর্তার অক্ষমতা জেনেও বাড়ীর মেয়েরা বা স্বয়ং গৃহিণীই দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী। নিজেদের মনোভাবে তাঁরা অবিচল। তাঁদের ধারণা বেশ কিছু জিনিষপত্তর দিয়ে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলে আভিজাত্য বজায় রইলো না, অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হল না। মেয়েরও বক্তব্য শোনা যায় বাবা প্রচুর পরিমাণে জিনিষ না দিলে শ্বশুরবাড়ীতে বাপের বাড়ীর স্বচ্ছলতার কথা উচ্চবোলে বলা যাবে না। এই উচ্চবোল কিন্তু অহংকারের নামান্তর। সবচেয়ে আফশোষের কথা যে শিক্ষিতা মেয়েরা পর্যন্ত এই ধরনের অহংকারের কাছে মাথা নোয়াতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। অবশ্য একথা ঠিক বাবা-মায়ের ক্ষমতাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ীতে অনেক মেয়েকেই আজকের দিনেও গঞ্জনা সইতে হয়। আর ছেলের বাড়ীর চাহিদা মোটাতে—মোদ্দর বাবাকে নিঃস্ব হবার ঘটনা নতুন কিছু নয়। নিজের ছেলের শ্বশুরবাড়ী থেকে দেওয়ার যদি কিছু কমতি হয় তবে নতুন বৌকে ঠেস দিয়ে শাশুড়ী মাতা ঠাকরুন বলেন, 'আমলের শ্বশুরবাড়ী থেকে যা জিনিষ দিয়েছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।' সুতরাং দোষ শুধু মেয়ের বাড়ীর নয় এ ব্যাপারে ছেলের বাড়ীর ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। আর যুক্তভাবে তাঁরা এ ব্যাপারে সমাজকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে কে? শিক্ষার সঙ্গে যদি সুচেতনতা না ফিরলো আর অন্ধ অহংকারকে নিয়ে গর্বে মত্ত হয়ে রইলাম তবে আমাদের সমাজের পরিণতি কোথায়?

—অঞ্জলি চৌধুরী

বন্ধু

জন্মে পেয়েছি তোমাকে বন্ধু,
তোমাতেই গড়া প্রাণের তন্তু।
তোমাকেই জপে প্রতি নিশ্বাস
তুমিই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।
শুভ পথে যেন থাকে চির মতি,
ভুলো না বন্ধু আমার মিনতি।

—হাসিরাণী ঘোষ

বিবাহ বিচিত্রা (১০) আসাম

উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ এলে প্রথমে পুরোহিত ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেন গ্রহ সংযোগ শুভ হবে কিনা। মিল ভাল হলে ছেলের মা-বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা মেয়ে দেখতে যান। মেয়ের বাড়ী থেকেও মেয়ের বাবা-মা ও বড় ভাই ছেলে দেখতে যান। দুপক্ষেরই একে অন্যকে পছন্দ হলে পুরোহিত আশীর্বাদের শুভক্ষণ স্থির করেন। প্রথমে 'কইনার' 'আহীর্বাদ' হয়। কন্যা মুগার সুতোয় বোনা মেখলা ও চাদর পরে সাজসজ্জা করে আসনে বসে থাকে। ছেলেপক্ষের সব আত্মীয় বন্ধুরা এবং ছেলের বাবা কনেকে আশীর্বাদ করতে আসেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠরা ধান দুর্বা দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করেন, ছেলের বাবা আশীর্বাদ স্বরূপ সোনার 'ডিণ্ডিত হার' অর্থাৎ হার কনের গলায় পরিয়ে দেন। কনে সকলকে প্রণাম করে। আশীর্বাদের সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় এবং পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন আশীর্বাদের পর অতিথিদের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

'দরা' অর্থাৎ বরের বাড়ীতেও বিয়ের আগে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান হয়। বর ধুতি পাঞ্জাবী পরে আসনে এসে বসে। সামনে প্রদীপ জ্বালানো থাকে, পুরোহিত মন্ত্র পড়েন—মেয়ের মা-বাবা ও অন্যান্য গুরুজনেরা একে একে 'দরা'কে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। মেয়ের বাবা ছেলেকে ধুতি আংটি ও বেতাম ইত্যাদি দেন। ছেলে সকলকে প্রণাম করে। তারপর সকলকে জল-যোগ করানো হয়।

বিয়ের আগের দিন বর ও কনের নিজের নিজের বাড়ীতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। সধবা মহিলারা কাঁচা হলুদ বেটে মেয়ের গায়ে মাখিয়ে মেয়েকে স্নান করান। এই সময় অন্যান্য মহিলারা উলু দেন ও গান করেন—

'আজি হুব দিনে কন্যার গা হলুদু মাখি
গা ধোওয়াও ঐ দরা আহিব বলে।'

অর্থাৎ—'আজ শুভ দিনে' কন্যার গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করানো হবে—বর আসবে বলে।' বরের বাড়ীতেও মহিলারা বিশেষত বরের বৌদি অসমিয়া ভাষায় যাকে বলা হয় 'ডাঙর বউ' দেওরের গায়ে হলুদ মাখিয়ে স্নান করান। বরের বাড়ীতেও 'গায়ে হলুদ' অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান গাওয়া ও উলুধ্বনি দেওয়া হয়। বিয়ের দিন ভোরবেলা বর ও কনে উভয়ের বাড়ী থেকেই মহিলারা নদী থেকে জল আনতে যান। তাঁদের সঙ্গে থাকে পিতলের ঘড়া। সেই জল সযত্নে তুলে রাখা হয়—বিবাহের পূর্বে সন্ধ্যেবেলা বর ও কনেকে সেই জলে স্নান করানো হয়।

বিয়ের দিন কন্যাকে উপবাসী থাকতে হয়। উঠোনে চারটি কলাগাছ রোপণ করা হয়—মাঝখানে আলপনা দেওয়া থাকে। আলপনার মাঝখানে একটি পিঁড়িতে কনেকে বসানো হয়। পুরোহিত ও মেয়ের বাবাও সেখানে উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত নানা-রকম পূজা করেন—মেয়ের বাবা পুরোহিতের নির্দেশ মতো মন্ত্রোচ্চারণ করেন। মেয়ের বাবা তাঁর পূর্বতন চোদ্দ পুরুষকে কুলদান এবং পিণ্ডদান করেন। ফুল কলা চাল তিল তুলসী হরতকি প্রভৃতি দিয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা হয়ে গেলে পুরোহিত কনের হাতে শাঁখা পরিয়ে দেন। ছেলের বাড়ীতে অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়।

বিকালবেলা বর ও কনে নিজের নিজের বাড়ীতে সকালের আনা ঘড়ার জল গা ধুয়ে সাজসজ্জা করে। মেয়ে বিয়ের সময় মুগার তৈরী মেখলা ও চাদর পরে, মাথায় ঘোমটা,

কপালে টিপ ও চন্দন চোখে কাজল ও পায়ে আলতা পরে ঘরের ভিতর আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে থাকে। গুরুজনেরা তাকে আশীর্বাদ করেন। কন্যা তাঁদের প্রণাম করে। প্রত্যেকে তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী কন্যাকে উপহার দেন। বরযাত্রী আসার আগেই সাধারণত কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতদের আহার করিয়ে দেওয়া হয়— কারণ সাধারণত বিবাহের লগ্ন আরম্ভ হয় গভীর রাত্রিতে। বিবাহের দিন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রিতদের ফলার ভোজ করানো হয়—দই, চিঁড়া, গুড় ও মিষ্টি।

বর বিবাহ করতে যাওয়ার সময় সাধারণত ধুতি পাঞ্জাবী কপালে চন্দন গলায় ফুলের মালা ও মাথায় টোপর পরে। বিয়ে করতে যাওয়ার আগে মা ধান দুর্বা দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। ছেলে সব গুরুজনদেরই প্রণাম করে এবং সকলেই তাকে আশীর্বাদ করেন। ছেলেপক্ষের সব পুরুষ আত্মীয় এবং বৌদি ও ভগিনী স্থানীয়রা বরযাত্রীর সঙ্গে যান। বরকর্তা হিসেবে থাকেন ছেলের বাবা। বর ফুল সাজানো মোটরে চড়ে বিয়ে করতে আসে। মেয়ের বাড়ীতে নানারকম বাজনা বাজানো হয়। বরযাত্রী এসে পৌঁছলে উলুধ্বনি দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। কনের বৌদি বরের হাত ধরে তাকে বিবাহের আসরে নিয়ে যান। উঠোনে চারটি কলাগাছের মাঝখানে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বরকে বসানো হয়। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করেন। কনের বাবাও ওখানে বসে থাকেন। বরযাত্রীর দলকে আগেই চিঁড়ে ফলার ও মিষ্টান্ন খাইয়ে দেওয়া হয়। তারপর বরযাত্রীর দল উঠোনের চারিপাশে চেয়ারে বসে বিবাহের অনুষ্ঠান দেখেন। কনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে বিবাহের আসরে আনা হয়। কনের ভাইরা পিঁড়ি ধরে থাকেন। কনে চাদর দিয়ে তার মুখ ঢেকে রাখে। কনেকে বরের পাশে পিঁড়িতে বসানো হয়। পুরোহিতের নির্দেশ অনুসারে মন্ত্র পাঠ করে কনের বাবা একটি আংটি বরের হাতে পরিয়ে দেন। এরপর বরকে কনের বৌদি পিঁড়ি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান। বরকে কন্যাপক্ষের তরফ থেকে দেওয়া নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরানো হয়। তারপর কনের বৌদি বরকে উঠোনের মাঝখানে একটি চেয়ারে বসিয়ে দেন। বরের মুখ নতুন চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। কনেকে পিঁড়ি সুদ্ধ তুলে নিয়ে বরের চারিদিকে সাতবার ঘোরানো হয়। সাতবার ঘোরানো শেষ হলে বর ও কনের মুখের চাদর খুলে নেওয়া হয়—দুজনে দুজনের মুখ দর্শন করে—একে বলা হয় 'মুখচন্দ্র চন্দ্রিকা'। তারপর বর তার গলার মালা বধূর গলায় পরিয়ে দেয়, বধূ তার গলার মালা বরের গলায় পরিয়ে দেয়। এইভাবে মালা বদলের অনুষ্ঠান শেষ হয়। আবার বর-বধূকে পিঁড়িতে পাশাপাশি বসানো হয়। পুরোহিত এবারে মন্ত্রপাঠ করে বধূকে বরের পেছনে দাঁড় করিয়ে বধূর হাত দিয়ে বরের অঙ্গ স্পর্শ করিয়ে বধূকে বলতে বলেন—'আকাশের ধ্রুবতারাটি যেমন জ্বলে থাকে মোর স্বামী মোর ওছরৎ জেন জ্বলি থাকিব।' পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বধূও এই কথাগুলি উচ্চারণ করে। কথাগুলির অর্থ— আকাশে ধ্রুবতারা যেমন চিরদিন জ্বলে আমার স্বামীও যেন আমার কাছে চিরদিন ওই রকমই প্রজ্জ্বলিত থাকেন।' তারপর পুরোহিত বর ও বধূর চাদরের প্রান্ত গ্রন্থি-বদ্ধ করে দেন। তারপর যজ্ঞ আরম্ভ হয়। পুরোহিত নানারকম মন্ত্র পড়ে দেব-দেবীর পূজা করেন। যজ্ঞের আগুনে ঘি, কাঠ, কলা ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়। যজ্ঞ শেষ হলে বর-বধূ অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে। পুরোহিত যজ্ঞ কাষ্ঠের ফোঁটা বর-বধূর কপালে পরিয়ে দেন—তারপর বর বধূর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর বর-বধূ প্রথমে যজ্ঞাগ্নিকে, তারপর পুরোহিতকে এবং তারপর অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করে। এরপর বর-বধূকে নানারকম মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়। ভোরের কাক ডাকার আগেই বধূকে নিয়ে বর তার পিত্রালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাত্রার আগে দুজনেই গুরুজনদের প্রণাম করে। সকলে নব-দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন এবং আসন্ন বিচ্ছেদের দুঃখে সকলের মনই ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। এই সময় বধূর বাবা তার দেওয়া সব যৌতুক ছেলের বাবাকে দেন।

বরের বাড়ীতে আগে থেকেই আলপনা দিয়ে রাখা হয়। বর-বধূ আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মাঙ্গলিক বাজনা বেজে ওঠে। সধবা মহিলারা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে বর-বধূকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে গিয়ে বর-বধূকে দিয়ে 'নিয়ম কার্য' করানো হয়। 'নিয়ম কার্যের' অর্থ হল প্রথমে সূর্যদেবতাকে প্রণাম করানো। তারপর গৃহ-দেবতাকে এবং তারপরে পিতা-মাতাকে প্রণাম করানো। তারপর বরের বৌদি অর্থাৎ অহমিয়া ভাষায় যাকে বলা হয় 'ডাঙরী বউ' বর-কনের চাদরের গ্রন্থি খুলে দেন। বধূকে বরের বাড়ী থেকে দেওয়া নতুন শাড়ী পরানো হয়—তারপর বর ও বধূকে পাশাপাশি বসিয়ে জলখাবার খাওয়ানো হয়। কিছুক্ষণ পরই আবার বিবাহের সময় তারা যে জামা কাপড় পরেছিল সেইগুলি পরে নিয়ে বর ও বধূ একসঙ্গে বধূর পিত্রালয়ে যায়। সেখানে তাদের আবার জলযোগ করানো হয়। তারা প্রণম্যদের প্রণাম করে—জ্যেষ্ঠরা তাদের আশীর্বাদ করেন, উপহার দেন। এরপর আবার বধূ তার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যায়। সেই রাত্রেই নব-দম্পতির জন্য পালঙ্ক ফুল দিয়ে সাজানো হয় যুগলের একত্রে রাত্রিযাপন অর্থাৎ ফুলশয্যা বা অহমিয়া ভাষায় যাকে বলা হয় 'ফুলইষ্যা' সেই রাত্রেই অনুষ্ঠিত হয়।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

সাতদিনের শুভাশুভ

(২৫ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট)

গ্রহসন্নিবেশ ঃ মেষে মঙ্গল, মিথুনে শনি ও কেতু, সিংহে রবি ও বুধ, কন্যায় শুক্র, ধনুতে রাহু এবং মকরে বক্রী বৃহস্পতি।

মেষ ঃ কাজকর্মে সাফল্যের যোগ প্রবল। কিন্তু ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকছে। আয় একপ্রকার। শরীর চলনসই। পারিবারিক উদ্বেগ থাকবে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা আংশিক পূরণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ২৫, ২৬ আগস্ট।

বৃষ ঃ শরীর ও মন ভাল নয়। কাজকর্মে শুভ সম্ভাবনা। আয় ভাল। ব্যবসায় সুবিধার নয়। মেয়েদের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা। শুভ তারিখ ঃ ২৮, ৩১ আগস্ট।

মিথুন ঃ আর্থিক অস্বস্তি, ক্ষতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম শুভ। দেশভ্রমণের যোগ আছে। শরীর ভাল। পারিবারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে লক্ষণীয় উন্নতির যোগ আছে। শুভ তারিখ ঃ ২৭, ৩০ আগস্ট।

কর্কট ঃ কাজকর্মে আশানুরূপ সাফল্যের সম্ভাবনা। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় অনুকূল। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির লক্ষণ আছে। মেয়েদের শারীরিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ ঃ ৩০ ও ৩১ আগস্ট।

সিংহ ঃ আর্থিক উন্নতির লক্ষণ আছে। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্ম শুভ চলবে। শরীর মোটের উপর ভাল। পারিবারিক বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ২৬ আগস্ট।

কন্যা ঃ কাজকর্মে শুভ সম্ভাবনা। আয় ভাল। ব্যবসায়ে শত্রুতা কমবে। শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ ঃ ২৮, ৩০ আগস্ট।

তুলা ঃ শরীর ও মন ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা কমছে। ব্যবসায় অনুকূল। মেয়েদের মানসিক উদ্বেগের লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ ঃ ২৬, ২৮, ৩১ আগস্ট।

বৃশ্চিক ঃ শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র ক্রমশ ভাল হবে। কাজকর্ম ভাল, দেশভ্রমণের সম্ভাবনা। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় চলনসই। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ঃ ৩০ আগস্ট।

ধনু ঃ কাজকর্ম ভাল, কিন্তু শত্রুতাজনিত দুশ্চিন্তা থাকবে। শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ও আর্থিক ক্ষেত্র অনুকূলে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ২৮, ৩০ আগস্ট।

মকর ঃ শরীর ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যয়াধিক্যের লক্ষণ আছে। আয় মন্দ নয়। কাজকর্মে সাফল্য ও অস্বস্তি উভয়েরই লক্ষণ আছে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ৩০, ৩১ আগস্ট।

কুম্ভ ঃ শরীর ও মন ভাল। পারিবারিক উদ্বেগ থাকবে। আয় ভাল। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্মে অসুবিধা থাকবে। মেয়েদের মানসিক উন্নতির যোগ আছে। শুভ তারিখ ঃ ২৫, ২৬, ২৭ আগস্ট।

মীন ঃ শরীর একপ্রকার। কাজকর্মে সাফল্য ও পারিবারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। আয় মন্দ নয়। ব্যবসায় শুভ। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ ঃ ২৫, ২৬, ৩০ আগস্ট।

—শুভাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

অনিমা মুখার্জি (এম পি) ঃ ১৪, চিত্রা নক্ষত্র তুলা রাশি, শূদ্রবর্ণ, দেবাবিগণ কর্কট লগ্ন।

তন্দ্রা মুখার্জি (মধ্যপ্রদেশ) ঃ জন্ম-তারিখ জানাবেন।

দীপঙ্কর দাস ঃ জন্ম-সাল জানাবেন।

বিজয়া চক্রবর্তী ঃ ১৩৮০ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে প্রবল যোগ।

অর্চনা নন্দী (কলি-১৪) ঃ কন্যা রাশি, ধনু লগ্ন। ১৩৮০ সালে সম্ভাবনা বেশী।

সমর নন্দী (এলাহাবাদ) ঃ ২৭ বছর বয়সে উন্নতিসূচক কর্ম-পরিবর্তন সম্ভব।

সন্ধ্যা বসু ঃ স্বামী স্থানে শনি কেতু এবং লগ্নে রাহু থাকায় বিবাহে যথেষ্ট বাধা আসবে। ১৩৮০ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৮১ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে বিবাহ সম্ভব।

অমৃত পাঠক ঃ এ-বছর পাশ করবে তবে বিভাগ আশানুরূপ হবে না।

পত্রিকা পাঠক ঃ পাশ করবে তবে অনার্স না পাওয়ার সম্ভাবনা।

অমর দাস (ইছাপুর) ঃ ৪৬-৪৭ বছর বয়সে একটি প্রোমোশন পাবেন এবং কর্মস্থান পরিবর্তন হতে পারে।

দীপক দে'র রম্যরচনা

কলকাতা দেখেছি ৩.

আধুনিক কলকাতার রূপটাই ফুটে উঠেছে।

ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণি | লিপিকা, ৩০।১, কলেজ রো

জ্যোতিষ কার্যালয়

৭৩।এ, অরবিন্দ সরণি (গ্রে স্ট্রীট)
কলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিদ শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোষ্ঠী প্রস্তুত, বিচার প্রতিকারের ব্যবস্থা, সময়তো করেন। যোগাযোগের সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা।

ফোন ঃ ৫৫-৩০২৫

সুমিতা সেনগুপ্ত ঃ চাকুরী করার যোগ কম। ১৯৭৪ সালে বিবাহ সম্ভব। উচ্চশিক্ষার যোগ আছে।

হাসি মুখার্জি (শিয়ালদহ) ঃ ১৯৭৪ সালে সরকারী চাকুরী পাবার যোগ আছে।

রত্না চৌধুরী ঃ চাকুরী হবে কিনা সন্দেহ। ১৯৭৪ সালে বিবাহ।

লক্ষ্মণচন্দ্র মাহাত ঃ ১৯৭৩ সালে স্বাস্থ্য মধ্যম। অস্ত্রোপচার আশঙ্কা আছে। ১৯৭৪ সলে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। ১৯৭৫ সাল বিদ্যা-বিষয়ে শুভ।

চন্দন রায় (কলি-২৬) ঃ ১৩৮০ সালেই বিবাহ যোগ প্রবল।

কুমারিল ভট্ট ঃ ২৪ শতভিষানক্ষত্র, কুম্ভ রাশি, শূদ্রবর্ণ, দেবারিগণ ও বৃষ লগ্ন।

গীতা দেব (উড়িষ্যা) ঃ আপনার তিনটি সন্তান যোগ। আয়ু ৭০ বছর, সম্পত্তি হবে।

বিশ্বজিৎ বসাক (বেলঘরিয়া) ঃ সাহিত্যিক হবার যোগ আছে। মঙ্গল ও শনি প্রবল বাধাদায়ক। ৩২ বছর বয়সের পর কৃতকার্য হবে। প্রবাল ধারণীয়।

সন্ধ্যা দে ঃ ৩২ বছর বয়সে বিবাহ যোগ প্রবল।

মিতা মুখার্জি ঃ আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটবে যা সারা-জীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মিনতি ব্রহ্মচারী (অন্ডাল) ঃ ১৩৮০ সালের ফাল্গুন মাসের মধ্যে বিবাহ সম্ভাবনা।

দিব্যেন্দু সেন ঃ ডিগ্রী পরীক্ষায় ১ বার বাধা আছে। অনার্স নিয়ে পাশ করবেন। গোমেদ ধারণীয়।

মিছুলাল সাহা (চট্টগ্রাম) ঃ চলতি বছরে আশানুরূপ ফল না হলেও বিদ্যায় কৃতকার্য হবেন ও অর্থের অভাব হবে না।

দেবদাস ভট্টাচার্য (তমলুক) ঃ জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

এম দে (কলি-৫) ঃ ১৩৮১ সালে বিবাহ সম্ভব।

শর্মিতা সরকার (শেওড়াফুলী) ঃ না, ১৩৮১ সালে হবে।

মাহবুব হাসান বাবুল (বাংলাদেশ) ঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবার সুযোগ পাবেন। আগামী অকটোবর-নভেম্বর নাগাদ বন্ধুত্ব স্থায়ী হবে।

মুকুলরানী বিশ্বাস (কুচবিহার) ঃ মধ্যে মধ্যে মানসিক অশান্তি ঘটলেও, মোটামুটি ভালই হবে।

সুজিত ব্যানার্জি ঃ চন্দ্রের দশায় শনির অন্তরে প্রমোশন পাবেন। এমন অশান্তি কিছুটা থাকবে।

রাজীব মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

শ্রীদত্ত (ভি এচ এফ স্টেশান) ঃ ৫১ বছর বয়সে প্রমোশন পাবেন। আপনার পক্ষে শ্বেত প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

মানসকুমার রায় (ধানবাদ) ঃ বিদ্যাস্থান শুভ। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় উন্নতি। চাকুরিজীবী হবেন।

তাপসকুমার রায় (ধানবাদ ঃ বিদ্যাস্থান শুভ। চিকিৎসক বা ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় উন্নতি। স্বাধীন বৃত্তির যোগ বেশী।

স্বপনকুমার রায় (ধানবাদ) ঃ বাধাপূর্বক হিসাব সংক্রান্ত বিদ্যায় উন্নতি। চাকুরিজীবী হবেন।

বাসুদেব ব্যানার্জি (আসাম) ঃ চাকরী থাকবে। ১৯৭৬ সালে স্বদেশে বদলী হবার যোগ।

প্রতুল ব্যানার্জি ঃ ২২ বছর থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে স্থায়ী চাকরী পাবার যোগ।

এ এম গোলাম মোরশেদ (বাংলাদেশ) ঃ জন্ম সাল ইংরাজী, না বাংলা জানাবেন।

ভূপতিনাথ ঘোষ ঃ বৃহস্পতি মীন রাশিতে থাকাকালীন অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে কর্মস্থলে উন্নতি হবে।

সোমা মুখার্জি (কলিকাতা) ঃ বড় রকম ফাঁড়া নেই। তবে অস্ত্রোপচারের আশংকা আছে। প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

ছায়া চক্রবর্তী (দমদম) ঃ জন্ম সময় পাঠাবেন।

পূর্ণেন্দু সেন ঃ ১৯৭৪ সালে জানুয়ারী থেকে জুন মাসের মধ্যে চাকরী পাবেন।

উজ্জয়িনী বসু ঃ ২৮ বছর বয়স থেকে আর্থিক অবস্থা ভাল এবং ভবিষ্যৎ ভাল।

রুবী ব্যানার্জি (বরানগর) ঃ প্রবল বাধা। ১৩৮০ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

কৃষ্ণা সেন ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাল। ১৯৭৫ সালে বিবাহ সম্ভব।

মিতা ব্যানার্জি ঃ না হবার যোগ বেশী। হলেও ভাল হবে না।

রিনতে আলী (বাংলাদেশ) ঃ ২৪ বছর বয়সে স্বদেশে বিবাহ সম্ভব। সচ্চরিত্র ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হবেন।

বিজয় দত্ত (গৌহাটি) ঃ ১৯৭৪। জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে চাকুরী সম্ভব। আই-ই-এস পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেন।

নন্দিতা দত্ত ঃ ১৩৮০ সালে সম্ভাবনা বেশী।

শঙ্করী দত্ত (গৌহাটি) ঃ পাশ করার যোগ বেশী।

দীপ্তি দাস (কলি-৫০) ঃ জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ লেখক হবার যোগ আছে বটে, প্রতিকূল গ্রহ থাকায় সুযোগের বিষয় ঘটাবে।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

অশনি সংকেত জয়যাত্রার পথে

হাজার হাজার কৌতূহলী দর্শকের প্রশংসাধন্য 'অশনি সংকেত' সারা ভারতের আজ নয়নের মণি। চলচ্চিত্রজগতের এই নবতম বিস্ময় উপহার দিয়ে বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায় আমাদের গোটা জাতিকে যে মহৎ গৌরবের অধিকারী করেছেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

আগামী সপ্তাহে বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশিত হবে।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) নষ্ট দুনিয়া নয়ে লোগ (হিন্দী)

নীতীন ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল-এর নবতম নিবেদন 'নষ্ট দুনিয়া নয়ে লোগ' আধুনিক সমাজজীবনের উপরতলার একটি বিশেষ দিকের চিত্র। যদিও স্বাধীন ভারতের হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হয়েছে, তবু আমরা সাধারণ দর্শকরা ভাবতেই পারি না, ভারতীয় কোনও হিন্দু নারী—তিনি যতই ধনী এবং আধুনিকা হোন না কেন—তিন তিনজন স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের পরে অন্য আর এক পুরুষকে চতুর্থ স্বামীত্বে বরণ করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হবেন। অথচ বি আর ইশারা লিখিত ও পরিচালিত 'নষ্ট দুনিয়া নয়ে লোগ'-এর অন্যতমা স্ত্রী-চরিত্র মিসেস নিশা-নাথ প্রথম, মদ্যপ স্বামী ও দ্বিতীয়, ঘোড়ার রেসুড়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে তৃতীয় স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন রায়বাহাদুর রোশনলাল নাথকে। ভদ্রলোকের নিশা ছিলেন দ্বিতীয়া স্ত্রী। রোশনলাল নিজে ছিলেন দুর্দান্ত শিকারী।; তাই স্ত্রীকেও শিখিয়েছিলেন অ্যাপেয়ারস্রের ব্যবহারে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হতে। তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান ছিল শ্যাম। নিশা তাঁর প্রথম স্বামীর কাছ থেকে শিখেছিলেন মদ্যপান করতে। মদ্যপানের ফলে গা-পা টললেও তাঁর মাথা কিন্তু ঠিকই থাকত। তাই প্রতিটি পেগ নিঃশেষ করবার পরে কাঁচের গেলাসটিকে ভেঙে ফেলতে তাঁর যেমন কোনোদিনই ভুল

ছুটির ঘণ্টা / [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠী চৌধুরানীর সুচিত্রা সেন। পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত। ফটো ঃ অমৃত

হত না, তেমনই সপত্নীপুত্র শ্যামকে এবং নিজের বালিকা কন্যা গীতাকেও দু'চক্ষের বিষ জ্ঞান করতে তিনি কোনোদিনই ত্রুটি করেননি। তৃতীয় স্বামী রোশনলালের মৃত্যুর পরেই আমরা নিশাকে মদ্যপানরতা অবস্থায় দেখতে প্রথম দেখতে পাই। মাত্র উল্লেখের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, নিশার বিগত জীবনের তিন স্বামীর কথা।

আর সব হিন্দী ছবির রোমান্টিক নায়কের মতো শ্যামও শুধু প্রেমই করে এবং তা সে করে বিপত্নীক রবি খান্নার একমাত্র কন্যা সন্ধ্যার সঙ্গে। মেয়ের এই প্রেম ব্যাপারে রবি খান্নার প্রথমে আদৌ আপত্তি ছিল না, কারণ তিনি জানতেন, শ্যাম বিধবা নিশার অতুল সম্পত্তির অধিকারী হবে। কিন্তু হঠাৎ পাশা গেল উল্টে। একদিকে নিজের বালিকা কন্যা গীতার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় নিশা যেমন দিলেন সপত্নীপুত্র শ্যামকে গৃহ থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত করে, অপরদিকে তিনি তাঁর ব্যগ্র বাহু বাড়ালেন রবি খান্নার প্রতি তাঁকে চতুর্থ স্বামীত্বে বরণ করবার প্রস্তাব নিয়ে। রবি খান্না কন্যাকে আদেশ দিলেন, শ্যামকে তার জীবন থেকে বর্জন করতে হবে এবং পরিবর্তে গ্রহণ করতে হবে অপরিচিত প্রতাপকে। প্রতাপ এল এবং তার চাঞ্চল্যকর ঝড়ের বেগে সন্ধ্যাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। তার আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, আশ্চর্য ব্যবহার সন্ধ্যাকে করল দিশাহারা।

সে শ্যামকে জিজ্ঞাসা করল—এ তার কি হল? শান্ত শ্যাম নিরুত্তাপভাবে সন্ধ্যাকে পরামর্শ দিল—কপর্দকহীন শ্যামকে বিবাহ করার চেয়ে বিশাল বনস্পতি প্রতাপকে গ্রহণ করাই তার পক্ষে শ্রেয়। তাই সে করল। কিন্তু প্রথম মধুরজনীতে—ফুলশয্যার রাত্রে সন্ধ্যা প্রতাপকে দেখে হতচকিত হয়ে গেল; প্রতাপ অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অজ্ঞান, অচৈতন্য। —এরপর কোন অবস্থায় রবি খান্না নিশার হাতে নিহত হলেন, নিশা নিজেও আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন এবং প্রতাপ নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে সন্ধ্যা ও শ্যামের মিলনের পথ সুগম করে দিল এরই উত্তেজক দৃশ্যাবলী দিয়ে ছবির শেষাংশ গঠিত।

'চেতনা'' ও 'জরুরৎ' ছবির মাধ্যমে পরিচালক বাবুরাম ইশারা আমাদের মনে যে আশা জাগিয়েছিলেন, 'নঈ দুনিয়া নয়ে লোগ' তার অনেকখানিই স্তিমিত করে দিয়েছে। ছবিটি সম্পর্কে যে পরিচয়-পুস্তিকা (বুকলেট) রয়েছে, তাতে কাহিনীর কথাসারে বলা হয়েছে: আজকের উচ্চ সমাজে বাপ-মা এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যের সহজ সম্পর্কটি হারিয়ে গেছে, আজকের ছেলে-মেয়েরা ক্রমেই যখন বড়ো হয়ে উঠতে থাকে, তখন তাদের এবং তাদের বাপ-মার মাঝের সম্পর্কটি ক্রমেই শূন্যে গিয়ে পরিণত হয়।—এই ভাবনাটিকে যথাযথ কাহিনীর মাধ্যমে চিত্রায়িত করলে আমরা নিশ্চয়ই একটি অভিনব এবং উপভোগ্য চলচ্চিত্রের সাক্ষাৎ পেতুম। কিন্তু মদ্যাসক্ত বিধবা নিশা এবং ভাঁড় জাতীয় চরিত্র বিপত্নীক রবি খান্না আত্মসর্বস্ব আধুনিক মাতাপিতার যথার্থ প্রতীক নয় এবং শ্যাম ও সন্ধ্যার প্রতি তাদের ব্যবহার মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের সম্পর্ক'' ঘটিত সমস্যাকেও কিছুমাত্র তুলে ধরেননি। আজাজ গীতার প্রতি নিশার ব্যবহার তো নিতান্ত অবাস্তব ও বিসদৃশ। ছবিটির মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল প্রতাপ চরিত্রটি; কিন্তু প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে যখন সে সবে জাগ্রতচৈতন্য, সেই সময়েই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে দুর্ঘটনার আশ্রয় নিয়ে, চিরাচরিত-ভাবে অপদার্থ, মেরুদণ্ডহীন চরিত্রের নিদর্শন—শ্যামের সঙ্গে সন্ধ্যার মিলন ঘটিয়ে সাধারণ দর্শককে খুশী করবার অভিপ্রায়ে।

শিল্পীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন প্রতাপের ভূমিকায় জয়নী। একদিনা সে প্রতাপের জীবনে নারী ছিল অত্যন্ত সুলভ এবং সরা সুলভতর, সন্ধ্যার পবিত্র প্রেমের স্পর্শে সেই প্রতাপ সহসা যেন জীবনে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেল— এই ভাবটি কি আশ্চর্য দরদের সঙ্গেই না তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অনায়াস ভঙ্গী ও সুন্দর বাচনের মাধ্যমে। নায়িকা সন্ধ্যার চরিত্রটি যথাযথভাবে অঙ্কিত হয়নি। শ্যামের প্রতি অগাধ ভালোবাসা সত্ত্বেও প্রতাপের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ও তার ব্যবহার সন্ধ্যাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল, সন্ধ্যা প্রচুর চেষ্টা করেও নিজেকে তার দিক থেকে ফিরিয়ে নিতে

পারছে না, একটা ঘূর্ণাবর্ত তাকে প্রতাপের দিকে ক্রমেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে এই জিনিসটি কাহিনীকার পরিচালক শ্রীইশারা চিত্রিত করতে চেয়েও ঠিক মতো পারেননি। তবু বলব এই চরিত্রে রীণা রায়ের সংবেদনশীল অভিনয় যতটা সম্ভব অর্থপূর্ণ হয়েছে। তাঁর শান্তশ্রী এবং সহজ সারল্য চরিত্রটিকে জনচিত্তহারী করে তুলেছে। প্রেমিক শ্যামের ভূমিকায় নবাগত সত্যেন অত্যন্ত সংযতভাবেই সুঅভিনয় করেছেন। পানাসক্ত নিশা বেশে নাদিরা পানাসক্তি ও কামলোলুপতা—দুই-ই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন অতি সহজেই। রবি খান্নার ভূমিকায় মনোমোহন কৃষ্ণের নির্বাচন অসমীচীন হয়েছে; তিনি সাধারণ ভাঁড়ের অভিনয় করেছেন। হৃদয়বান সোফার ভোলা-কাকার ভূমিকায় অসিত সেন মন্দ নয়। অপরাপর ভূমিকাগুলি যথাযথভাবে চিত্রিত হয়েছে।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। নকাশ লায়ালপুরী রচিত চারখানি গানই সপন জগমোহনের সুরে অর্সুলা বাজ, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর এবং মুকেশ কর্তৃক গীত হয়ে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করেছে।

নীতীন ফিল্মস ইন্টারন্যাশনালের নবতম নিবেদন ইস্টম্যানকলারে তোলা 'নঙ্গে দুনিয়া নয়ে লোগ' সাধারণ দর্শকদের খুশী করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছবিটি প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য বলে চিহ্নিত।

(২) আবিরে রাঙানো (বাংলা)

প্রগতি চিত্রম-এর নিবেদন এবং অমল দত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত 'আবিরে রাঙানো' ছবির যে কাহিনী সূত্রটি মধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া, তা কি এবং কতোটুকু, সেকথা আমাদের জানা নেই। কিন্তু অমল দত্ত রচিত চিত্রনাট্য ও সংলাপ যদি ঐ সূত্রটিকে অবিকৃত রেখে থাকে, তাহলে বলব সূত্রটিতে এমন কোনো অভিনবত্ব নেই, যাকে সম্বল করে একটি 'হাসবার মতো, কাঁদবার মতো এবং...ভাববার মতো' চিত্রসম্পদ দর্শকবৃন্দকে উপহার দেওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত তরুণ পরিচালকদের যে কাহিনী নির্বাচন সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, একথা আপ্ত বাক্যের মতোই সত্য। এবং ততোধিক সত্য এই যে, চিত্রসম্ভাবনাযুক্ত জনপ্রিয় বড়ো গল্প বা উপন্যাস হচ্ছে পরিচালকের রক্ষাকবচ। কাহিনীর চিত্রসম্ভাবনা সম্পর্কিত বায়সঙ্কোচ না করাই ভালো; কারণ জনপ্রিয় কাহিনীর সুগঠিত চিত্রনাট্য হচ্ছে ছবির সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। বাংলা ছবির প্রযোজকরা একথা মনে রাখলে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ বহু অবাঞ্ছিত ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাবে। 'আবিরে রাঙানো' ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা উত্থাপন করতে হল এই জন্যে যে অমল দত্ত পরিচালিত ছবিগুলি (অশ্রু দিয়ে লেখা, পান্না-হীরে-চুনী এবং আবিরে রাঙানো) দেখে আমাদের মনে এই ধারণা হয়েছে যে, পরিচালক হিসেবে শ্রীদত্ত বহু সংগুণের অধিকারী এবং তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন সব সময়েই দর্শকদের কাছে নতুন কিছু পরিবেশন করতে আগ্রহান্বিত। মনে হয়, এ-ছবিতে মঞ্চাভিনয়কে উপলক্ষ করে তিনি নতুন পরিবেশ যেমন গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনই চেয়েছিলেন নতুন কথা শোনাতে। কিন্তু মূল কাহিনীটি যে সেই চিরাচরিত প্রেমের কাহিনী এবং তাও যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে সুগঠিত ও সম্প্রসারিত নয়, একথা তিনি ভুলবেন কেমন করে? কলেজে পড়া মেয়ে কান্তা—ছবির নায়িকা—যখন দেখল সন্দীপ তাকে ছেড়ে বিজলীর সঙ্গে প্রেমে মত্ত, তখন সে নাটকগতপ্রাণ অনল রায়ের 'জীবনে লতার মতো জড়িয়ে' যাওয়া অবস্থায় আবার কি করে সেই সন্দীপের কথায় ভুলে সব ছেড়ে তারই সঙ্গে চলে যায় এবং মাল্য বদল করে তার সঙ্গে 'পুতুলের বিয়ে'তে রাজী হয়? 'নাবী শিল্পী সংঘ'-এর নেত্রী এবং স্ত্রীলোকের দালাল নিশাপতি—ওরা কি চুম্বিত্বের জীব? মন্দ থেকে ভালো হয়ে যাওয়া কি এতই সহজ? 'কান্তার কাহিনী'র মঞ্চাভিনয়ে দর্শকরূপে আসল কান্তার উপস্থিতি একটি অতি পরিচিত ও পুরাতন স্টান্ট

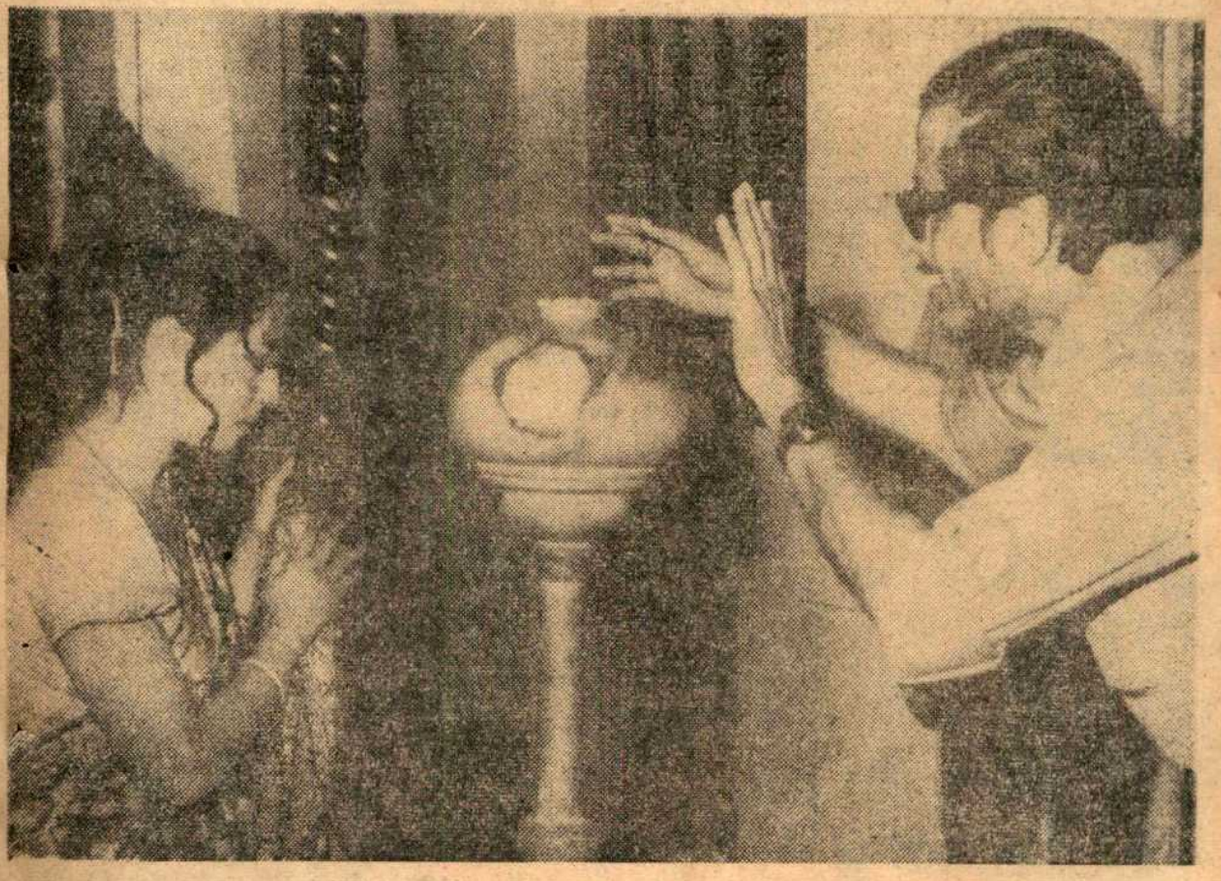

দেবী চৌধুরানী। মহরতে সুচিত্রা সেন ও পরিচালক দীনেন গুপ্ত। ফটো : অমৃত

(চমকপ্রদ কৌশল)। নবনাট্য ও গণনাট্য সম্পর্কীয় আন্দোলনের কথা এবং সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় জনগণের দুর্দশা লাঘবের শ্লোগান মূল কাহিনীর অঙ্গীভূত নয় বলে মাত্র প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণেই বর্জনীয়।

প্রযোজক-পরিচালক অমল দত্তের দুঃসাহসের প্রশংসা করি—তিনি একমাত্র মন্মথ মুখোপাধ্যায় (নিশাপতি) ছাড়া অন্যূন পঞ্চাশটি নূতন মুখ নিয়ে ছবিটিকে গঠিত করেছেন এবং এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অভিনয় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি-পূর্ণ। বিশেষ করে নায়িকা কান্তার ভূমিকায় সুচন্দ্রা ছবির প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত—দ্বিতীয়াংশে তো কটেই—তাঁর নাটনৈপুণ্য দ্বারা দর্শকদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। 'নারী শিল্পী সংঘ'-আবাসের নেত্রী এবং কান্তার মঙ্গলকামী এক বাসিন্দা— যে অনল রায়ের সান্নিধ্যে এসে জীবনটাকে বদলে ফেললে, তার ভূমিকাভিনেত্রী দুজনও যথেষ্ট অভিনয়-কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। নায়ক অনলের ভূমিকায় অনিল মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী সুন্দর, ওই সঙ্গে তাঁর মুখ-চোখ যদি ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে অবহিত হত, তাহলে তিনি অধিকতর সমাদৃত হতেন। মন্মথ মুখোপাধ্যায় তো একজন ঋজু চরিত্রাভিনেতা—তাই তিনি নিশাপতির ভূমিকায় যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার করতে ত্রুটি করেননি। অপরাপর ভূমিকায় আরও কেউ কেউ অল্পকিন্তর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু নূতন বলে তাঁদের নাম করা সম্ভব নয়।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষ করে, বহির্দৃশ্যে তাঁর কাজ নয়নাভিরাম। পরিস্থিতি অনুযায়ী চমক সৃষ্টিতে—যাকে বলি গিমিক—তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন সম্পাদক রমেশ যোশী। গৌর পোদ্দারের শিল্পনির্দেশনা কাহিনীর দাবিকে অনুসরণ করেছে। ছবিতে মোট সাতখানি গান আছে, তার মধ্যে চারখানি পরিচালক অমল দত্তের রচনা। তাঁর রচিত ও মান্না দে গীত 'আলকহল' সংক্রান্ত অমৃতবাজার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মিবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত 'বন্দর' নাটকের একটি আবেগদীপ্ত মুহূর্তে দিলীপ মৌলিক ও গীতা কর্মকার।

গানখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারত। যদি না গানের গোড়াতেই থাকত ঐ খাপছাড়া খটমটে কথা—চিত্তশুদ্ধি। শিবনারায়ণ ঘোষাল রচিত ও ললিতা ধরচৌধুরী গীত 'ও তুই শোনলো সখী ঘরে আমার ভোমর এসেছে' গানখানি একখানি জনপ্রিয় ছবির একটি অতি জনপ্রিয় গানের জনপ্রিয় সুরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবির মধ্যে প্রতিটি গানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করেও বলা যায়, সুরকার হিসেবে সত্যদেব চট্টোপাধ্যায় নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রগতি চিত্রম নিবেদিত, ম্যাডোনা পিকচার্স পরিবেশিত এবং অমল দত্ত প্রযোজিত-পরিচালিত 'আবিরে রাঙানো' নূতন 'শিল্পী-সমন্বয়ে গঠিত একটি উৎসাহযোগ্য ছবি। এ-ছবিটিও, কি কারণে জানি না, 'প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য' বলে চিহ্নিত।

(৩) **হিফাজৎ (হিন্দী)**

বালকৃষ্ণ মুডভীজ (মাদ্রাজ) নিবেদিত এবং কে এস আর দাস পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা হিন্দী ছবি 'হিফাজৎ' আরম্ভ ভাগ একজোড়া তরুণ-তরুণীর প্রেমের পথে তরুণের খামখেয়ালী বাবার তরফ থেকে বাধাদানের চেষ্টা এবং তরুণীটির উদারচিত্ত পিতার সেই বাধা ক্রমাগত অপসারণের জন্যে নানারকম যুক্তিতর্কের অবতারণার দৃশ্যাবলীর দ্বারা চিত্তাকর্ষক ভাবে গঠিত। কিন্তু যেই মাদ্রাজ কোথেকে উড়ে আসা এক ঘটকের মুখ থেকে প্রকাশ পেল যে, আশা হচ্ছে জজসাহেব রামপ্রসাদের পালিতা কন্যা মাত্র, আসলে সে সোনা-হাভেলীতে বসবাসকারী একটি অভিশপ্ত পরিবারের কন্যা এবং তার মা-বাপ দুজনেরই অপমৃত্যু হয়েছে, অমনই ছবির মোড় ঘুরে গিয়ে একটি নতুন পর্ব শুরু হয়ে গেল এবং এখন আমরা দেখতে পাই, 'শাটার্ড রুম' নামক বিখ্যাত শ্বাসরোধ-কারী সাসপেন্স থ্রীলারের ব্যর্থ অনুকরণ ও তার সঙ্গে একটি দুর্বৃত্ত লরীচালক দলের জগাখিচুড়ী সংমিশ্রণ। আশার প্রেমিক, কাহিনীর নায়ক কিশোর যখন সোনা হাভেলীর ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে তার রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যস্ত, তখন আশা বিপজ্জনক পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যেভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে নেচে গেয়ে ছুটোছুটি করে, তা, বোধকরি, একমাত্র হিন্দী ছবির নায়িকার পক্ষেই সম্ভব, যে-হিন্দী ছবির কাহিনী রচনায় যুক্তিতর্কাতীত অবাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টিতে পারঙ্গমতা প্রকাশ করেন কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার মিলিত ভাবে।

ছবির প্রথমাংশে জজসাহেব রামপ্রসাদ এবং নায়কের পিতা (ক্যাঙ্করবাবু?) বেশে যথাক্রমে অশোককুমার ও কানহাইলাল ভাব-ভঙ্গী ও সংলাপের সাহায্যে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিলেন। তবে কানহাইলালের সোচ্চার বাচনভঙ্গীর মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় মঞ্চসুলভ অভিনয়। নায়িকা আশার ভূমিকায় আশা সচদেব খুবই সাবলীল। বিনোদ মেহেরাকে নায়ক কিশোর রূপে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে, যদিও উচ্চাঙ্গের নাট-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদানের সুযোগ তার কমই আছে। লরী-ড্রাইভার বেশে নরেন্দ্রনাথ রূপমুণ্ডের বনাভাবটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ-ছাড়া মদনপুরী, ইফতেকার, ললিতা পাওয়ার, কুমুদ চুগানি জ্যোতি-লক্ষ্মী, রঞ্জিত প্রমুখ শিল্পী স্বল্প ভূমিকায় পরিদর্শিতা দেখিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটামুটি প্রশংসনীয়। সোনা হাভেলীর আভ্যন্তরীণ ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টিতে শিল্প নির্দেশক বি নাগরাজন যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে জিজ্ঞাস্য, সোনা হাভেলী কি মাত্র বাঁশ-কাঠের নির্মিত বাড়ী ছিল? নইলে পুড়ে যাবার পরে তার অমন রূপ প্রকাশিত হয় কি করে? ছবির চারখানি গানের মধ্যে কিশোরকুমার গীত 'জানে যহাঁ রুঠা না করো' গানখানি উপভোগ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

বালকৃষ্ণ মুডভীজ (মাদ্রাজ)-এর নিবেদন 'হিফাজৎ' সাধারণ দর্শকদের কাছে নানা দিক দিয়ে তৃপ্তিকর চিত্র বলে বিবেচিত হবে।

স্টুডিও সংবাদ

'দেবীচৌধুরাণী'র মহরৎ

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র একটি সবাক চিত্ররূপ আমরা দেখেছিলুম ১৯৪১ সালে। প্রায় চব্বিশ বছর বাদে সন্তোষিতা ফিল্মস ও শ্রীরাজিৎ পিকচার্স (প্রাঃ) লিমিটেড যুগ্মভাবে এই কাহিনীর একটি নবতম চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। গেল ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের বেলা

ঈশান শীতাতপনিয়ন্ত্রিত
ফোন ৫৫-১৬১৯
বুধ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩ ও ৬॥
দেবনারায়ণ গুপ্তের নাটক

১০-৩০ মিনিটে দীনেন গুপ্তের পরিচালনায় এই নবতম প্রচেষ্টার মহরৎ অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। মহরৎ শটে শিল্পীরূপে উপস্থিত ছিলেন সুচিত্রা সেন (দেবী চৌধুরাণী) ও রঞ্জিত মল্লিক (ব্রজেশ্বর)।

'বেদনা'র শুভ মহরৎ

গেল ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে ক্যালকাটা মুভীটোন স্টুডিওতে নবগঠিত রণজিৎ ফিল্মস-এর পতাকাতলে প্রযোজক পরিচালক রণজিৎ সরকার তাঁর প্রথম ছবি 'বেদনা'র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন করেন। ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই তোলা হবে।

'বড়বৌ'-এর শুভ মহরৎ

গেল ১৪ আগস্ট বৈকালে এস এস ফিল্মস-এর প্রথম নিবেদন, বড়বৌ-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয় পরি দত্তের পরিচালনায়। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীদত্ত নিজেই। এস এস আগরওয়ালা প্রযোজিত এই ছবিতে সংগীত পরিচালনা চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা ও সম্পাদনা করবেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পিন্টু দাশগুপ্ত, সুবোধ দাস ও গঙ্গাপদ বসু।

'সব্যসাচী'র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়!

পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অবলম্বনে অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মসের প্রথম নিবেদন 'সব্যসাচী' ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে প্রায় শেষ হতে চলেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন পীযূষ বসু।

উত্তমকুমার ছবিটির সংগীত পরিচালক। সম্প্রতি শিপ্রা বসুর গাওয়া কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ও সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় রয়েছেন সুপ্রিয়া দেবী (সুমিত্রা ও রোজ দাউদ), অনিল চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্র), তরুণকুমার (শশী কবি), বিকাশ রায় (নিমাই দারোগা), কিরণ লাহিড়ী (অপূর্ব), জয়শ্রী রায় (ভারতী), সুলতা চৌধুরী (মা শোয়ে), সুজাতা দত্ত (নবতারা), অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (তলোয়ারকার) সুপ্রিয় সরকার (মিঃ আয়ার) এবং হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাটাভিয়ার পুলিশ চীফ), ছায়াবাণী প্রাঃ লিঃ ছবিটির বিশ্ব পরিবেশক।

'শেষ বিচার' ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সোমা ফিল্মসের 'শেষ বিচার' ছবির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সুখেন দাস রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সুধীন দাশগুপ্ত ছবিটির গীতিকার ও সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন আরতি মুখোপাধ্যায়। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনিল সরকার। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—দীপঙ্কর দে, অঞ্জনা ভৌমিক, চন্দ্রাবতী দেবী অমরনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার হারাধন বন্দ্যোঃ শ্রীমান পার্থ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রুবী দত্ত বিজয়া চক্রবর্তী ও নবাগতা সুজাতা দত্ত। জে কে ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'শ্রাবণসন্ধ্যা আসছে'

কালীমাতা প্রোডাকসন্স নিবেদিত ও বীরেশ্বর বসু পরিচালিত 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' ছবিটি বর্তমানে রূপবাণী অরুণা ও ভারতীতে মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে সুর দিয়েছেন জনপ্রিয় সুরকার নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। সংগীতাংশ ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—সুচিত্রা সেন, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, শমিত ভঞ্জ, বঙ্কিম ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, উৎপল দত্ত জহর রায়, অপর্ণা দেবী বনানী চৌধুরী সাধনা রায়চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ, কল্যাণ চক্রবর্তী সুনীল কুমার, তৃপ্তি দাস, তপতী বর্মণ ইন্দিরা দে, আইভিলতা প্রভৃতি। কালীমাতা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

ডাকঘরঃ বহুরূপীর অসাধারণ প্রযোজনা

একটি বিষণ্ণতম অনুভব। একটি প্রাণময় পিয়াসী বাঁশী। সুর ছুঁয়ে গেলো হৃদয়ের অতলে। কি একটা চেয়েছিলাম, পাইনি—প্রীতির স্নিগ্ধ কিছু বিকেল, অথবা নক্ষত্রের তন্দ্রাভরা রাত। রক্তাক্ত, পরিশ্রান্ত হয় মন। তবু স্বপ্নে আবার বিভোর অন্তর, মন্থরতার অবাক ভাষাহীন সৌন্দর্যের লাবণ্যে টলমল।

সেদিনের অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে সন্ধ্যাটি এমনি এক কম্পিত স্বপ্নালু আলোর প্রহরে মনোময় হয়ে উঠেছিল। প্রাণের এক গোপন গভীর সুরে সেদিন অন্তরতম বাসনার আকাশকে ছুঁয়েছিলেন 'বহুরূপী'র শিল্পীরা। নাটকের নাম 'ডাকঘর'। সংলাপ ও সংঘাতের প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা চলে গেছি সব অনুভূতি, ভালোবাসা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক পরম অস্তিত্বের দিকে, অমলের অতল ইচ্ছা, আর ভাবনার ওপারে যিনি স্থির, অচঞ্চল হয়ে আছেন। মন হয়তো বলে উঠেছে আত্মিক গভীরতায়—'দাঁড়িয়ে আছে তুমি

শুভ মুক্তি ২৪শে আগষ্ট, শুক্রবার !

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মরণীয় কাহিনীর সার্থক চিত্ররূপ

উত্তরা-পূরবী-উজ্জলা ও অন্যত্র

আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি পায় চরণ, 'আমি পাইনে তোমারে'।

'ডাকঘর' তুলে ধরেছে মুমূর্ষু বালকের অন্তরমথিত চাওয়া পাওয়ার কথাকে। অমল হোচ্ছে সেই বালক যার চোখের সামনে থেকে জীবনের আলো স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। যতোই ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়, ততই চোখ মেলে এই রূপময়, বর্ণ-গন্ধে ভরা পৃথিবীকে মায়ার আবেশে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছে। ওর চোখ ও মনের তৃষ্ণা দিগন্ত খুঁজে নিতে চাইছে সেই দেশে যেখানে এক অদ্ভুত প্রহরীর ঘন্টায় নতুন সুর বেজে চলে—'ঢং ঢং ঢং'। কবিরাজের পরামর্শ মতো যখনই সমস্ত জানালা বন্ধ করে অমলকে রাখা হয়, তখনই সে আর্তনাদ করে ওঠে। জানালা খুলে দিলেই সবুজ পৃথিবীর সাবলীল প্রাণপ্রাচুর্য উদ্বেল হয়ে ওঠে ওর চোখের সামনে। সেই আবেশেই অমল যেন বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে দেয় মুক্তির আকাশে। রাজার চিঠি পাবার আশায় ও প্রহর গুণতে থাকে। ভাবতে থাকে 'আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করে বেড়াবো'। প্রকৃতপক্ষে একাজ তো যথার্থ শিল্পীরই। জীবনের আলোয় যে কাজ হোল না, তা তো আর একটি প্রদীপে আলো জ্বালাবেই। অমলের পরিপূর্ণতা তো সুধাতেই। এর পুষ্পচয়নের মধ্যেই তো অমলের বিষণ্ণতার আলোকিত উত্তরণ।

নাটকের শ্রেণীবিচারে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' হয়তো রূপকনাট্য বা কল্পনাট্যই। প্রায় প্রতিটি রূপক নাটকেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কারের প্রাণহীন প্রাচীর ভেঙে নির্মল মুক্ত আকাশের নীচে প্রাণভরে মুক্তির বাতাস নিতে বলেছেন। নিষেধাজ্ঞা চূর্ণ করে সারা প্রকৃতির রূপলাবণ্যে মধুরতম জীবনের আবিষ্কার— এই বোধকরি তাঁর রূপক নাটকের এক মর্মস্পর্শী ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে যে অনুভূতির গভীরে অনুপ্রবেশ করে তার মধ্য থেকেই চিরন্তন কালের ফসল তুলে নিতে হয়, সে সত্য সম্পর্কে 'বহুরূপী'র শিল্পীগোষ্ঠী সদা সচেতন। শৈল্পিক 'রক্তকরবী' 'চার অধ্যায়' 'বিসর্জন' 'রাজা' প্রভৃতি প্রযোজনায় এই বিশিষ্ট মানসিকতা সুস্পষ্টতার ভাষা পেয়েছে।

বহুরূপীর ডাকঘর : চৈতালী ঘোষাল ও শম্ভু মিত্র

'ডাকঘরে'র মঞ্চরূপেও এই বিশেষ দিকটিই প্রোজ্জ্বলতায় হয়েছে চিহ্নিত। শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র নিয়েছেন নির্দেশনার দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চরূপায়ণের বিশেষ শৈলীটি সম্পর্কে শ্রীমতী মিত্র প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। তাঁর পরিণত মনন, স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শৈল্পিক চেতনা প্রযোজনার প্রতিটি মুহূর্তেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসংগীত পরিকল্পনা— একই শৈল্পিক সেতুবন্ধনে অর্থময় হয়ে ওঠে।

কয়েকটি মুহূর্তের কথা না উল্লেখ করে পারা যায় না। নাটকের যাত্রা শুরুতে বংশীতে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সুর বেজেছে, তাতে অসীমের ব্যঞ্জনাই হয়েছে মূর্ত। সেই সুরই নিয়ে গেছে আমাদের মনকে চেনা সমুদ্রের ওপর দিয়ে অচেনা আকাশের দিকে। এ ব্যাপারে নির্দেশকার সংগে যিনি প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন তিনি হোলেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। নিষ্ঠার সংগে তাঁর আবহসংগীত পরিকল্পনা নাটকটির বিশিষ্ট বক্তব্যটিকে মঞ্চের আলোয় নিশ্চয়ই শৈল্পিক ভাষা দিয়েছে। শেষ দৃশ্যে অমলের বিছানার পাশে ঠাকুর্দা (ফকিরবেশী)র প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া, জানালা খুলে নীলাভ আকাশকে আমন্ত্রণ জানানো, রাজার আগমনের অপেক্ষায় এক মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন সে যেন রবীন্দ্রনাথেরই কল্পনার এক সার্থক রূপ। 'অমল' ও 'সুধা'র সংলাপের মুহূর্তটিকে মনে হয়েছে প্রাণস্পন্দিত কবিতার একটি নিরাভরণ নিটোল ছন্দ। শেষে সুধার একটি বিশেষ ভংগিমায় ফুলের সাজি হাতে নিয়ে 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য আবেগের যে দ্যোতনা বহন করে তাতে এই চিরন্তন অর্থই প্রতীয়মান হয়, প্রকৃত শিল্পীমনের সুগভীর কল্লোল কোনদিন থেমে যায় না, উত্তর সাধকের বেলাভূমিতেই তা নতুন মর্মর সৃষ্টি করে।

স্নিগ্ধ শান্ত, ললিত অথচ আবেগদীপ্ত এই নাটকের মঞ্চসজ্জায় কোন আতিশয্য প্রকাশ পায়নি। খালেদ চৌধুরীর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আভাস বেশ সুস্পষ্ট। ঘরের চেহারাটি অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত সুন্দর জানালার ইংগিতটি তারই ধারে এক পথের চিহ্ন। আলোকসম্পাতে তাপস সেনের শৈল্পিক মুন্সিয়ানা বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। যেন আবার নতুন করে 'ডাকঘরে' তিনি স্বকীয়তাকে প্রোজ্জ্বল করে তুললেন। কয়েকটি অন্তরমথিত অনুভবের মুহূর্ত আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ধরা পড়েছে তাঁর আলোকসম্পাতে। মঞ্চের চারদিকে অন্ধকার শুধু অমলের বিষণ্ণ মুখখানির ওপর মৃদু আলোর ছোট্ট একটি বৃত্ত, আর বিছানার একাংশ সামান্য আলোয় উজ্জ্বল— সে দৃশ্য ভোলা যায় না। তা যেন অমলেরই নিঃসীম বেদনার এক সকরুণ চিত্ররূপ।

প্রথম সংলাপ থেকে শুরু করে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণই অত্যাশ্চর্য নৈপুণ্যে অমলের অতল গভীরতায় প্রবেশ করতে পেরেছে আট বছরের ছোট্ট মেয়ে চৈতালী ঘোষাল। ওর কথাগুলো মনে হয়েছে এক একটি কবিতার কলি। তা কখনো বেদনায় কেঁপেছে, কখনো উচ্ছলতায় হিল্লোলিত হয়েছে। এই আবেশেই ও আমাদের নিয়ে গেছে প্রতিটি ক্ষণেই ওর অনুভবের জগতে। ওর চেহারায়, ওর ভংগিমায় অমলেরই যেন প্রতিরূপ। ভাবলে অবাক হোতে হয় এই ছোট্ট মেয়েটি কি আশ্চর্য সাবলীলতায় 'বহুরূপী'র প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সংগে অভিনয় করেছে। অবাক করে দিয়েছে চৈতালী যখন ও সমান তালে সংলাপ মিলিয়েছে ফকিরবেশী শম্ভু মিত্রের সংগে। অবশ্য ওকে শিখিয়ে নেবার ব্যাপারে নির্দেশিকা শ্রীমতী মিত্রের অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। সাত বছরের মেয়ে চেতা চক্রবর্তীও 'সুধা'র প্রাণচাঞ্চল্যকে যেন মঞ্চের আলোয় ঢেলে দিতে

রঙ্গনাল নান্দীকার
৫৫-৬৪৪৬ প্রযোজিত
২৫শে শনিবার ৩০শে বৃহস্পতি ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
২৬শে রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেরেছে। এও শ্রীমতী মিত্রের একটি সৃষ্টি বলতে হবে নিশ্চয়ই। প্রথমে 'ঠাকুদা' পরে 'ফকির' বেশে এসেছেন শম্ভু মিত্র। শ্রীমিত্র যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা তা তিনি ফকিরের সংযত প্রকাশ ভংগিমায় প্রমাণ করেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় প্রাণের তালে সুর মিলিয়েছেন তারাপদ মুখার্জি (মাধব দত্ত) দেবতোষকুমার ঘোষ (কবিরাজ), শান্তি দাস (দইওয়ালা), শোভেন মজুমদার (প্রহরী), শঙ্করপ্রসাদ ঘোষ (মোড়ল), উদয় সিংহ (রাজদূত), কুমার রায় (রাজ-কবিরাজ)। ছেলের দলে ছিল শুভেন্দু মুখার্জি, সিদ্ধার্থ রায়, সুবীর বসাক, সুশান্ত ঘোষাল, শুচিস্মিতা রায়।

সব শেষে একটি কথা। 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'ডাকঘর' স্নিগ্ধ পেলবতায় মন ভরিয়ে দেয়। জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত মনটি বলে ওঠে— এই তো সেই প্রাণময় কবিতা যার মধ্যে আনন্দ-বেদনায় আমরা একাকার হয়ে মিশে যেতে পারি।

—দিলীপ মৌলিক

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে শান্তি গুপ্তা

বাংলা চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তা শনিবার, ১১ আগস্ট রাত ৩ ঘটিকায় দীর্ঘদিন রোগ-ভোগের পর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আনুমানিক ৫৯ বছর। ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে বিভিন্ন সুকঠিন চরিত্রে অভিনয় করে শ্রীমতী গুপ্তা প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। রঙ্গমঞ্চে শান্তি গুপ্তার প্রথম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অশোক নাটকে তিষ্যরক্ষিতা।

শ্রীমতী গুপ্তা অভিনীত মঞ্চ-নাটকের সংখ্যা প্রায় শতাধিক। সেগুলির মধ্যে পতিব্রতা, বাঙলার মেয়ে, চরিত্রহীন, গোরা, মাকড়সার জাল, বিশ বছর আগে, মোগল মসনদ, ঘূর্ণি, রত্নদীপ, মালা রায়, সুপ্রিয়ার কীর্তি, কাঁটা ও কমল, বিংশ শতাব্দী, বিজয়া, সন্তান, পথের দাবী, আরোগ্য নিকেতন, ক্ষুধা প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বর্গত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তি গুপ্তা তখনকার দিনের সর্ব-জনপ্রিয় জুটি বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমতী গুপ্তা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং সবাক ও নির্বাক যুগের জনপ্রিয় শিল্পী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রথম ছবি ম্যাডানের 'কালপরিণয়' (ধীরাজ ভট্টাচার্যের বিপরীতে)।

শান্তি গুপ্তা অভিনীত নির্বাক যুগের ছবিগুলির মধ্যে গিরিবালা, কেরানীর মাসকাবার, চোরকাঁটা, জীবন প্রভাত, অপরাধ, মধুরেণ সমাপয়েৎ নৌকাডুবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সবাক যুগে প্রহ্লাদ, কৃষ্ণকান্তের উইল, জয়দেব, সাবিত্রী, দেবদাসী, মন্ত্রশক্তি, হরিশ্চন্দ্র, কৃষ্ণসুদামা, পণ্ডিত মশাই, বিল্বমঙ্গল, সহ-ধর্মিণী, সন্ধি, বন্দী প্রভৃতি প্রায় পঞ্চাশটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন।

শান্তি গুপ্তার নাট্য-শিক্ষক ছিলেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। অপূর্ব দেহ-সুষমা, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ভাবাভি-ব্যক্তির নৈপুণ্য শান্তি গুপ্তাকে অনন্য শিল্পীর জয়মাল্যে ভূষিতা করে। তাঁর সর্বশেষ মঞ্চাবতরণ বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে ক্ষুধা নাটকে। এর পর একটি মিলিত অভিনয়ে চরিত্রহীন নাটকে কিরণময়ীর চরিত্রে তিনি শেষবারের মতো মঞ্চাবতরণ করেন। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অপরাজিত চিত্রে তিনি সর্বশেষ অভিনয় করেন।

নাট্য ও চিত্র-জগত থেকে অবসর নিয়ে আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা নিয়েই তিনি সময় কাটাতেন। চিত্র ও নাট্য-জগতের বহু নাট্য-কার, শিল্পী, শিল্পকর্মী নিজেদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে যখনই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন, তখনই তিনি তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করেছেন।

শান্তি গুপ্তার মৃত্যুসংবাদ সকালের বেতার মারফত ঘোষিত হবার সংগে সংগে চিত্র ও নাট্য-জগতের বহুজন তাঁর শ্যাম-পুকুর স্ট্রীটস্থিত বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বেলা একটার পরে শোভাযাত্রাসহকারে শিল্পীর মরদেহ স্টার থিয়েটার, বিশ্বরূপা, রঙমহল ও মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সবশেষে নিমতলা শ্মশানঘাটে দাহ করা হয়। প্রতিটি থিয়েটার থেকে মাল্যার্পণ করা হয়। রবিবার অভিনয়ের পূর্বে প্রতিটি নাটমঞ্চ শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। শিল্পী সংসদ ও মহিলা শিল্পী মহলের পক্ষেও শবদেহে মাল্যার্পণ করা হয়।

আমরা শ্রীমতী গুপ্তার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

লেক টাউন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কর্তৃক ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন : লেক টাউন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কর্তৃক ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে ওয়েলফেয়ারের রেজিস্টার্ড অফিস থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়। লেক টাউনের সমগ্র অঞ্চলটি পরিক্রম করে ঐ শোভা-যাত্রাটি পরে ভি. আই পি রোড এবং লেক টাউন রোডের সংগমস্থলে জমায়েত হয়। স্থানীয় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, পুলিশ ব্যান্ড এবং এন সি সি ছেলেদের একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রার সমগ্র অঞ্চলটি বিশেষ শোভাময় হয়।

শ্রীযুক্ত অধীরকুমার বসু, লেক টাউন ওয়েলফেয়ার সভাপতি হিসাবে সমবেত সুধিবৃন্দ এবং কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীদের, এন সি সি এবং পুলিশ ব্যান্ড পার্টীদের আহ্বানের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

শ্রীযুক্ত বি আর গুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সেই সময় এন সি সি-র কুচকাওয়াজের মাধ্যমে এবং পুলিশ ব্যান্ডের মাধ্যমে অভিবাদন করা হয়। পরে তিনি জাতীয় পতাকার মর্যাদা বিশ্লেষণ করে একটি বক্তৃতা রাখেন। তিনি ঐ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে এই দীর্ঘ পাঁচিশ বৎসর যা যা হয়নি তা উল্লেখ করে সভায় তাঁর ভাষণ প্রদান করেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সকমল-কান্তি ঘোষ জনসাধারণের সুবিধার্থে লেক টাউন ওয়েলফেয়ার কর্তৃক আয়োজিত একটি পথনির্দেশক মানচিত্র উদ্বোধন করেন। দেশের বেকার সমস্যা বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষে শ্রীমতী মমতা চক্রবর্তীর সংগীত পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে অর্গা-নাইজেশনের তরফ থেকে শ্রীশুভেন্দু বসু সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠান অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গৌরীশংকরের সাহচর্যে পরি-চালিত হয়।

অনুপ ঘোষাল—দশম বার্লিন যুব উৎসবে লোকসংগীতে পুরস্কৃত হয়েছেন। মেট্রোপল থিয়েটারে অনুষ্ঠিত ভারতীয় অনুষ্ঠানে শিল্পী উপস্থিত সকলকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। শিল্পী এ-অনুষ্ঠানে ৬।৭ খানি বিভিন্ন ধরনের গান পরিবেশন করেন। তার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত ছবি গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবিতে শিল্পীর গাওয়া 'মহারাজা তোমার সেলাম' গানটি সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের আনন্দ দান করে। ঐদিন ভারতীয় প্রতিনিধিদের কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে সমবেতভাবে তিনি উদ্বোধন সংগীত হিসেবে দুটি গান করেন : 'চল চল চল' (নজরুল) এবং 'এখন আর দেরি নয়' (রবীন্দ্রনাথ) উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ঐ দুটি গানকে করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করে। গান দুখানি তিনিই পরিচালনা করেন। পরে ঐ দুটি গান উৎসবের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে এবং ওপেন এয়ার স্টেজে গাওয়া হয়। গান দুটি খুব প্রশংসা পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিল্পী লোকসংগীত, আনুষ্ঠানিক গান, দেশাত্মবোধক গান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত এবং তাঁর চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় গানগুলি পরিবেশন করেন। এবারকার বার্লিন দশম যুব উৎসব অসাধারণ উদ্দীপনা, সৌন্দর্য এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়—১৪৪ দেশের প্রায় ২৬ হাজার প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন।

জলসা

আহির ভৈরব ও আলি আকবর

লং-প্লেয়িং ডিস্ক : : আর্টিস্ট মেরা খেয়ালমে একই হ্যায়। উ আলি আকবর। উনকা আহির ভৈরব শুননেসে সাতদিন মেরা আঁখসে পানী গিরা।—আলি আকবর খাঁ সাহেব ও তাঁর আহির ভৈরব প্রসঙ্গে অমৃতের প্রতিনিধিকে বলেছিলেন ঠুংরী ও গজল সম্রাজ্ঞী বেগম আখতার। আহির ভৈরব সর্বপ্রথম এবং ব্যাপকভাবে শোনা যায় নৃত্যগুরু উদয়শংকরের কল্পনা ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকরূপে আলি আকবরেরই সরোদে (তার আগে এ রাগ অপ্রচলিত রাগের পর্যায়ভুক্ত ছিলো)। আহির ভৈরবের সে ধ্বনিমাধুর্যই রসিকচিত্তকে আকৃষ্টই শুধু করে নি, চমকে দিয়েছিলো। তারপর পন্ডিত রবিশংকর সর্বপ্রথম লক্ষ্ণৌ বেতারকেন্দ্রে এই রাগ বাজান? ১৯৫৫ তাঁর মাত্র তিন মিনিটের রেকর্ডে (এইচ এম ভি লেবেলে) ওস্তাদ আলি আকবর বাজানো এই রাগ সংগীতরসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। গুরু আলাউদ্দিন ঘরানার শিল্পীরা এ রাগের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করলেও আলি আকবরই আহির ভৈরবের সিদ্ধ শিল্পী—যেমন রবিশংকর কিরবাণী-র।

আলি আকবরের সরোদেই সেই আহির ভৈরব রাগ এবার লং-প্লেয়িং-এর ডিস্কে সংকলন করার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানী সকলের ধন্যবাদার্হ। সকালবেলার এই রাগে কারুণ্য ও প্রণয়ের সঙ্গে শিল্পীর হৃদয়াকৃতি যেন জলভরা চোখে চেয়ে থাকে কোমল রেখার ছুঁয়ে সুরে পৌঁছনোর অপলক মধুর ভঙ্গিতে। আলাউদ্দিন ঘরানার ধ্রুপদী আঙ্গিকের আলাপে রাগের সূচনা, আভাস গতি ও লাস্যে শিল্পীর কল্পনারঞ্জিত মনের ছবিটি ভেসে ওঠে। কিন্তু একেবারে মধ্যলয়ে গতটি ধরার ছন্দ-বৈচিত্র্যের বাহার থাকলেও কিসের যেন একটা অতৃপ্তি মনে থেকে যায়।

তবে এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছে অপর দিকে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সৃষ্ট দুর্গেশ্বরী রাগ রূপায়ণে। ১০৫ বছরেও সাধক শিল্পীর সৃজনক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর দুর্গেশ্বরী রাগে। ভারতীয় সংগীতে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জীবনব্যাপী অবদানের শেষবিন্দু হিসেবেও এ-রেকর্ডের মূল্য অপরিসীম। রেখাবকে সঙ্গী করে পঞ্চমের গততে শান্তি ও ভক্তিভাবের শুচিতা মূর্ত। একাধারে পিতা ও গুরুর অন্তিম প্রার্থনার রেশটিই যেন আলি আকবর খাঁ সাহেব শ্রোতাদের মনে অনুরণিত করেছেন পূজারীর আত্মনিবেদনের আবেগে। বিলম্বিত ও দ্রুত গতের বন্দেজ, তান ও বিস্তারে শিল্পী তাঁর আপন বাজনশৈলীর উচ্ছ্বাসকে সংযত করে পুরোপুরি আলাউদ্দিন খাঁর তালিমী বাজনা বাজিয়েছেন—যাতে তাঁরই ভাষায় তাঁর মনের কথাটি শোনানো যায়।

তরুণ শিল্পীদের প্রতি সহজাত স্নেহ ও অনুভূতিবশত তিনি ওস্তাদ আল্লারাখার তরুণ পুত্র জাকির হোসেনকে নিয়েছেন তবলিয়া রূপে। জাকির অবশ্য এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। তবে রেকর্ডের কভারে ওস্তাদ আলি আকবরের স্ব-লিখিত বক্তব্যের আকারে লিখিত উপসংহারের আগের অনুচ্ছেদটি হঠাৎ যেন ছন্দপতন ঘটিয়েছে (কারণ এই চার পংক্তি শিল্পী সম্বন্ধে অপরের উক্তি) যা কোনক্রমেই, তাঁর স্ব-লিখিত প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কোম্পানীর এডিটিং-এর এ অনবধানতা অমার্জনীয় ত্রুটি। কারণ এ-রেকর্ড বিদেশেও যাবে।

সুর সঞ্চয়ের নৃত্য ও সংগীত সভা:

রবীন্দ্রসদনে সুর সঞ্চয়ণের তিনদিন ব্যাপী নৃত্যনাট্য ও সংগীতাসর সুরু হয়েছিলো শাপমোচন' দিয়ে। দ্বিতীয় নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' একটিতে প্রাণচঞ্চল বহির্মুখী চিত্তের অন্ধকারের নিভৃত তপস্যার-ধ্যানলোকে সমাহিতি,—অন্যটি বাসনা-বিহ্বল, রূপপিপাসু এক নর্তকীর প্রেমাস্পদকে পাবার মত আবেগে প্রেম-পিপাসু নিষ্পাপ চিত্তের প্রতি অবিচার। এই দুয়ের মাঝে হাইফেনের মত ছিলো 'বাদলধারা' যাকে নৃত্যনাট্য অথবা গীতি আলেখ্যর নির্দিষ্ট কোনো পর্যায়ে ফেলা যায় না।

'শাপমোচনের' রাজার ভূমিকায় ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস ও অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় (গানে)।

রাণীর ভূমিকায় সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রানীর কয়েকটি গান সুন্দর গেয়েছেন বাণী ঠাকুর। নৃত্যাংশে সাধন গুহ (রাজা), পলি গুহ (কমলিকা) নৃত্যগতির দোলায় গানের ভাষায় দৃশ্যমান রূপকে, শোভন-রূপ দিয়েছেন। বিশেষ করে শেষের গানটিতে পলকহীন চোখে উভয়ে উভয়কে দেখার আকুলতার ছন্দদোলা হঠাৎ-থেমে-যাওয়া ভাব গাঢ়তার রূপে ভাস্কর্য সৌন্দর্যের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছেন সাধন ও পল্লি গুহ।

কাহিনীর শুরুতে ইন্দ্রসভায় 'ভারতনাট্যম' আঙ্গিককে অলকানন্দার উর্বশী নৃত্যের পরিকল্পনায় মৌলিকত্ব ও কল্পনার ছোঁওয়া চিত্তগ্রাহী। কিন্তু অলকানন্দার বেশ-ভূষায় শালীনতার অভাব-রবীন্দ্রঐতিহ্যানুসারী নয়। সৌন্দর্য ও নৃত্যনিপুণতার উজ্জ্বল সমন্বয় অলকানন্দার ঠিক ওভাবে আপনাকে আকর্ষণীয় করে তোলার দরকারই করে না। গানের ফাঁকগুলি সুরের আবেশে ভরে দিয়েছে-দীনেশ চন্দর যাদুকরী আবহসংগীত। অসিত চট্টোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ, কল্যাণ রায়, কনিষ্ক সেন সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক।

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গে পরিচালিত চন্ডীগড় প্রাচীন কলা কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে সংস্থার রেজিস্ট্রার শ্রীএম এল কোসার বক্তৃতা করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ডেপুটি রেজিস্ট্রার পন্ডিত রামকৃষ্ণ ব্যাস। উক্ত অনুষ্ঠানে ৮০ জন কেন্দ্রীয় সুপারিনটেনডেন্ট উপস্থিত ছিলেন। এই সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত।

অলকানন্দার বর্ষানৃত্য চিত্তহারী।

গানে গানে বর্ষণমুখর সন্ধ্যাকে মুখরিত করে তুলেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র। আপনাপন বৈশিষ্ট্যে এঁরা সকলেই যথাপ্রত্যাশিত মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছেন। দেবব্রত বিশ্বাস 'কে দিলো আবার আঘাত' গানটির প্রথম চরণের শেষে কোমল ও শুদ্ধ পর্দায় পাশাপাশি শ্রুতি প্রয়োগ করেছেন—খুব সম্ভব 'আঘাত'—কথাটিকে ডিস্‌কর্ড দিয়ে জীবন্ত করে তুলতে এর আগে তাঁর অনেক দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্যিকারের রস-সৃষ্টি করে রসিকজনের আনন্দের কারণ হয়েছে। কিন্তু সব দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাই সব সময় রসোত্তীর্ণ হয় না। অন্তত এক্ষেত্রে হয়নি। জানি না অনভ্যস্ত কানের জন্য কিনা।

নৃত্যোৎসব শেষ হয় 'শ্যামা' দিয়ে।

পরিকল্পনার বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করবার মত। নৃত্য ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন অসিত চট্টোপাধ্যায় ও বাণী ঠাকুর। সংগীতে শ্যামার গানে সুচিত্রা মিত্রকে আগেও শুনেছি কয়েকবার। কিন্তু বজ্রসেনের গানে চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা এই প্রথম। প্রেমিক-চিত্তের আবেগ ও বেদনা আভাসিত গানগুলি আন্ত রক্তের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। কোটালের কৌতুকাবহ নাটকীয়তা সৃষ্টিতে দেবব্রত বিশ্বাসের ভূমিকা আনন্দদায়ক। সকলকে আশ্চর্য করে দিয়েছে গোরা সর্বাধিকারীর কণ্ঠে উত্তীয়ের গান। কিশোর প্রেমিকের মনের সবুজ বাগানের কচি পুষ্পপল্লবের সুরভি পাওয়া গেছে প্রতিটি গানেই, বিশেষ করে আমার 'জীবনপাত্র উচ্ছ লয়'-তে। বন্ধুর ভূমিকায় অমর রায়ের গানও সুগীত। নেপথ্যে রাজার ভূমিকায় কল্যাণ রায় যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন। নৃত্যে বজ্রসেন ও শ্যামার যুগ্ম চরিত্রে সুন্দর মানিয়েছিলো সাধন গুহ ও অলকানন্দকে। বজ্রসেনের সঙ্গে মিলনের পরও নিরালা মুহূর্তে একলা ঘরে বসে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার উন্মনা ভাবটি অলকানন্দার ভঙ্গি ও গতিতে যেন ছবির মত ফুটে উঠেছে। সাধন গুহর প্রেমবিভোর চিত্তের আনন্দ ও অন্যায়ের দণ্ডে উদ্যত পৌরুষশক্তি সাধন গুহের নাচে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো।

বন্ধু ও কোটালের ভূমিকায় ঋটু পাল ও শিবশংকরম তাঁদের যথাযোগ্য মানে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সখীদের নৃত্য (শেষের দু-একটি বাদে) যথারীতি দুর্বল। সমবেত সঙ্গীতেও সবসময় সুরসঙ্গতি থাকেনি। রাগসঙ্গীতের মান বজায় রেখেছেন শিবানী পাল। সংগতে ছিলেন বিপ্লব মণ্ডল, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর চন্দ আর দীনেশ চন্দ ত নিশ্চয়ই।

প্রযোজনার উচ্চমানে শ্রীবাবুল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

সংগীতানুষ্ঠান ঃ ১৬ আগস্ট মহাজাতি সদনে সারারাত্রিব্যাপী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর স্মৃতিকল্পে একটি সংগীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত শিল্পী শ্যাম গাঙ্গুলী 'হিম হিন্দোল' রাগে সরোদ বাজিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন। সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর সুযোগ্য শিষ্য শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রকৌষিকী' রাগে খেয়াল শ্রোতাদের সবচেয়ে বেশী প্রশংসা অর্জন করে। তাঁর বিস্তার, তান ও লয়ের কাজ এক কথায় অনবদ্য। ঐ আসরে জনৈক ভদ্রলোক তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে একটি স্বর্ণপদক দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। অমরেশ রায়চৌধুরীর 'আহির ভৈরো' রাগে খেয়াল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়কৃষ্ণ সান্যাল ও নলিনচন্দ্র মালাকার দরবারী কানাড়ায় ধ্রুপদ ও ধামার গেয়ে স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামলী চ্যাটার্জি, নন্দিতা চ্যাটার্জি, বীরেন বোস, সুদীপ্ত রায়, ফটিক দাস (সেতার) ও সোমেশ ঘোষালের নাম উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র তারাপ্রসন্ন গোস্বামী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের বাংলা গান গেয়ে শ্রোতাদের বিশেষ আনন্দ দান করেন। বিকাশকুসুম হালদারের টপ্পা গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চকন্যাগানামৃত

এই স্তম্ভেই রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রজয়ন্তীর আলোচনা প্রসঙ্গে রাজেশ্বরী দত্ত, সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখার্জি, সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী হিসাবে যে কজন শিল্পীর নাম উল্লিখিত হয়েছিলো, তাঁদের মধ্যে থেকেই পাঁচজন মহিলাশিল্পীকে নিয়ে মল্লার সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান কাশিমবাজার রাজকুঠিতে নিবেদন করলেন একটি আসর। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এরা অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন 'বাদলধারা'। এ-নামের প্রতি সুবিচার করেছিলো সেদিনের প্রাকৃতিক পটভূমিকা। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারী শ্রীসত্যেষকুমার ঘোষ।

সেদিনের গানের আসর শুরু হয়েছিলো সুমিত্রা রায়ের (মুখার্জি) গান দিয়ে। গাইবার ভঙ্গী অনাড়ম্বর সহজ কিন্তু আন্তরিকতা হৃদয়স্পর্শী। গান ভাল লাগবার মত সুকণ্ঠেরও ইনি অধিকারী। এঁর গাওয়া পাঁচখানি গানের মধ্যে 'উতলধারা বাদল ঝরে' এবং 'কোথা যে উধাও' যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে। পুনরাবৃত্তিটুকু বাদ দিলে এ-অনুষ্ঠান আরো উপভোগ্য হোতো।

বাণী ঠাকুরের গানে মেজাজের কিছু অভাব থাকলেও 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' বেশ জমে জমে উঠেছিলো।

পূর্বা দাম তাঁর উচ্চমান বজায় রেখেছেন যথানির্দিষ্ট পাঁচখানি গানে। কিন্তু মনে দাগ কেটেছে বেশী তাঁর 'আমারে যদি' ও 'আজি ঝড়ের রাতে'।

পূরবী মুখোপাধ্যায়ের গানও ভালো লেগেছে। আরো ভালো লাগত যদি পঞ্চমের সংখ্যাসীমা অতিক্রম করে সপ্তমে না পৌঁছতেন।

পাঁচের মধ্যে একেবারেই পঞ্চম শ্রীমতী বনানী ঘোষ। আঙ্গিক, কণ্ঠসৌকর্য—সকল দিক বিচারেই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর 'আমার দিন ফুরালো' ও 'আজি তোমায় আবার'। কণিকার প্রভাব এঁর সহজাত নৈপুণ্যকে আরো উজ্জ্বল করে তুলছে।

—চিত্রাঙ্গদা

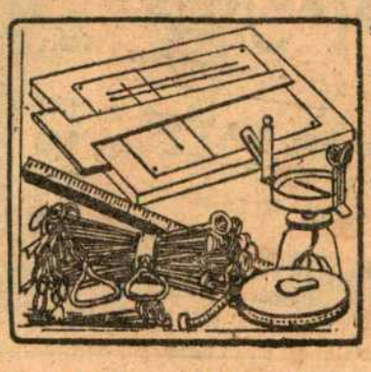

স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ফর্ম ও অফিসের জন্য ষ্টেশনারী, কাগজ, সার্ভে, ড্রইং, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যাবতীয় উৎকৃষ্ট ছাপার কাজের সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

ফোন—২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪; গ্রাম ঃ অয়ারদিন—হাওড়া, পোষ্ট বক্স—৩৮, হাওড়া

28 AUG 1973

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

এজবাস্টনে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলা অমীমাংসিত থেকে গেছে। প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় জয়লাভের সুবাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বর্তমানে ১—০ খেলায় (ড্র ১) এগিয়ে আছে। সুতরাং শেষ তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র রাখতে পারলেই ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ 'রাবার' এবং সেই সঙ্গে 'উইসডেন' ট্রফি জয়ী হবে।

প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৯০ রান তুলেছিল। দলের এই ১৯০ রানের মধ্যে ওপনিং ব্যাটসম্যান রয় ফ্রেডেরিক্স একাই ৯৮ রান তুলে অপরাজিত থাকেন।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস ৩২৭ রানের মাথায় শেষ হয়। ন্যাটা খেলোয়াড় ফ্রেডেরিক্স ১৫০ রান তুলে আউট হন। তিনি দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ২৫ মিনিট খেলে তাঁর ১৫০ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী করেছিলেন। টেস্টে তাঁর এই দ্বিতীয় সেঞ্চুরী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম।

৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে মারে (২৫ রান) এবং ফ্রেডেরিক্স সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাট করে দলের ১১৪ রান যোগ করেছিলেন। বার্ণার্ড জুলিয়েনের ৫৪ রানও উল্লেখযোগ্য। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর এই প্রথম অর্ধশত রানের নজির। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ইংল্যান্ডের ১৬ রান উঠেছিল, প্রথম ইনিংসের কোনও উইকেট না পড়ে। বয়কট এবং অ্যামিস যথাক্রমে ৫২ ও ৪২ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ২৬৫ (৭ উইকেটে); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৩২৭ রানের থেকে তখনও ইংল্যান্ড ৬২ রান পিছনে। বয়কট তাঁর ৫৪ রানের মাথায় বাঁহাতে আঘাত পেয়ে খেলা থেকে অবসর নেন। লাঞ্চের সময় ইংল্যান্ডের রান ছিল যেখানে ১৩৬ (১ উইকেটে) সেখানে চা-পানের বিরতির সময় রান দাঁড়ায় ২০৫ (৫ উইকেটে)। অর্থাৎ মাত্র ৬৯ রান তুলতে তাদের ৪টে উইকেট পড়ে যায়। হোল্ডার এবং জুলিয়েনের মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে এই দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল। খেলায় এক সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে ইংল্যান্ডের ৩টে উইকেট নিয়েছিল—১৯১ রানের মাথায় ৩য় ও ৪র্থ এবং ১৯৭ রানের মাথায় ৫ম উইকেট।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩০৫ রানের মাথায় শেষ হয়—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৩২৭ রানের থেকে ২২ রান কম। এইদিন ইংল্যান্ড ৯৫ মিনিট ব্যাট করে শেষ তিন উইকেটে ৪০ রান সংগ্রহ করেছিল। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২০৫ রান তুলে ২২৭ রানে এগিয়ে যায়। অধিনায়ক কানহাই ৫৪ রান এবং লয়েড ৯৪ রান করে আউট হন। কানহাই এবং লয়েড তৃতীয় উইকেটে জুটি বেঁধে ১০৫ মিনিটে ৯৪ রান যোগ করেন। লয়েডের ৯৪ রানে ছিল একটা ছক্কা একটা পাঁচ এবং ৮টা বাউণ্ডারী (চার)। তিনি তাঁর ৯৪ রান তুলতে ৭৩ মিনিট সময় নিয়েছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষদিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। খেলার বাকি সময়ে ঘণ্টায় ৮৪ রান হিসাবে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২৫ রান সংগ্রহ করা ইংল্যান্ডের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৮২ রানের (২ উইকেটে—মাথায় খেলা শেষ হয়) জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৩২৫ রানের থেকে ১৪৩ রান কম।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩২৭ রান (ফ্রেডেরিক্স ১৫০ এবং জুলিয়েন ৫৪ রান। আরনল্ড ৭৪ রানে ৩, ওল্ড ৮৬ রানে ৩ এবং আণ্ডারউড ৪০ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩০২ রান (কানহাই ৫৪, লয়েড ৯৪ এবং সোবার্স ৭৪ রান। আরনল্ড ৪৩ রানে ৫ এবং আণ্ডারউড ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩০৫ রান (বয়কট ৫৬ নট-আউট, অ্যামিস ৫৬, ফ্লেচার ৫২ রান। হোল্ডার ৮৩ রানে ৩ এবং সোবার্স ৬২ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮২ রান (২ উইকেটে। লাকহার্স্ট ৪২, অ্যামিস ৮৬ নটআউট এবং ফ্লেচার ৪৪ নটআউট। লয়েড ২৬ রানে ২ উইকেট)

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা

কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ১৭শ মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালয়েশিয়া ৩—১ গোলে কুয়েতকে পরাজিত করে আব্দুল রহমান ট্রফি জয়ী হয়েছে। ফাইনালের প্রথমার্ধে মালয়েশিয়া প্রথম গোল খেয়ে শেষ পর্যন্ত ২—১ গোলে এগিয়ে যায়।

১৯৭৩ সালের প্রতিযোগিতায় লীগের বাছাই পর্যায়ে ভারতবর্ষকে নিয়ে ১০টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। লীগের 'এ' গ্রুপের খেলায় দক্ষিণ কোরিয়া ১ম এবং মালয়েশিয়া ২ স্থান পেয়েছিল। অপরদিকে 'বি' গ্রুপের খেলায় ১ম স্থান পেয়েছিল ব্রহ্মদেশ এবং ২য় স্থান নবাগত কুয়েত। বাছাই পর্বের লীগের খেলায় মাত্র দুটি দেশ অপরাজিত ছিল—'এ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান দক্ষিণ কোরিয়া এবং 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ। 'এ' গ্রুপে মালয়েশিয়া এবং ভারতবর্ষ সমান ৫ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু গোলের গড় হিসাবে মালয়েশিয়া শেষ পর্যন্ত রানার্স-আপ হয়ে মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে। ভারতবর্ষের অসাফল্য খুব অগৌরবের হয় নি। কারণ ভারতীয় দলে আই এফ এ-র অন্তর্ভুক্ত একজন খেলোয়াড়ও ছিলেন না।

চূড়ান্ত ক্রমপর্যায় তালিকা : ১ম মালয়েশিয়া, ২য় কুয়েত, ৩য় ব্রহ্মদেশ, ৪র্থ দক্ষিণ কোরিয়া, ৫ম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, ৬ষ্ঠ ভারতবর্ষ, ৭ম থাইল্যাণ্ড, ৮ম বাংলাদেশ, ৯ম সিঙ্গাপুর এবং ১০ম কম্বোডিয়া।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়
শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো।
SUBHANA
Beauty Snow
সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3

AMRITA

Friday 24th August, 1973
Phone : 55-5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

28 AUG 1973

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেলে
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

আশোক চৌধুরী

[১৩ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা] শুক্রবার, ১৪ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম, সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮৯

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

যাযাবরের
চিরস্মরণীয় অবদান

ধ্রুব ত্রয়ী

২য় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ। দাম পাঁচ টাকা

অসামান্য সাহিত্যিক
শংকরের
দু'খানি বহু প্রশংসিত উপন্যাস

সীমাবদ্ধ ৬,
স্থানীয় সংবাদ ৬,

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্স

দ্বিতীয় দফার চারখানি বই :—

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬,

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥

আশুতোষ রায়ের
পথে প্রবাসে ৩,

বনফুলের
স্থাবর ৬,

এগুলি সম্পূর্ণ বই : সংক্ষিপ্ত নয়। ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, মনোহর প্রচ্ছদপট

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন বই
অশান্ত ঘূর্ণি ৮,

বিমল করের নূতন বই
সেতু ৫,

দক্ষিণারঞ্জন বসুর নূতন বই
প্লাবন ৫,

আশাপূর্ণা দেবীর
প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৮, উড়োপাখী ৬,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কোমল গান্ধার ৮, হাসপাতাল ৮॥

বিমল মিত্রের
আসামী হাজির ৩০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
প্রভাত সূর্য ৫,

॥ প্রকাশিত হল ॥

তারাশঙ্কর রচনাবলী

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড
প্রতিটির দাম ১৫,

ভূমিকা লিখেছেন : জগদীশ ভট্টাচার্য
পরিমল গোস্বামী

বিভূতিভূষণ
মুখোপাধ্যায়ের
সমগ্র রচনাবলীর

গ্রাহক করা হচ্ছে
১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রাহক করা হবে

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২
ফোন : ৩৪-৩৪৯২

৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
ফোন : ৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অনোনীত রচনার খবর ৭-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫·০০	টাকা ৩০·০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২·৫০	টাকা ১৫·৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬·২৫	টাকা ৮·০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ডাউন গুজরাট মেল

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রহস্য উপন্যাস দাম ৬.০০

কুইন্স পার্ক মিস্ট্রি

সুনীলকুমার ঘোষের সাম্প্রতিক রহস্যোপন্যাস দাম ৫.০০

জাল সপাই

চিরঞ্জীব সেনের নতুন স্বাদের রহস্য উপন্যাস। দাম ৭.০০

ঝড়ের রাতে

নিশাচরের সর্বশ্রেষ্ঠ রহস্য কাহিনী। দাম ৫.০০

চাঁপা ডাঙ্গার বউ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের পকেট বই। দাম ২.০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স । ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই চরিত

(৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড (১ম, ৪র্থ ও ৫ম) ৩·০০
(২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ) ৪·০০

কালাচাঁদ গীতা

৪র্থ সংস্করণ ৩·০০

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২·০০

পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

১৩শ বর্ষ

অমৃত

১৭ সংখ্যা

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 31st August, 1973 শুক্রবার, ১৪ ভাদ্র ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
			—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১১	সেই লোকটি	(কবিতা)	—শ্রীআনন্দ বাগচী
১২	হাত বদল	(কবিতা)	—শ্রীনির্মল হালদার
১২	পাখীর কাছে চেয়ে নাও	(কবিতা)	—শ্রীতুলসী মুখোপাধ্যায়
১২	বিশ ফুট উঁচু থেকে	(গল্প)	—শ্রীসুবন্ধু ভট্টাচার্য
১৩	হিসেবের বাইরে		—শ্রীতারাপদ রায়
১৮	কথায় কথায়		
১৯	নতুন বই		
২১	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে ১৫ই সেপ্টেম্বর

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত

শেকস্‌পীয়ার রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহকদের জন্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

সমগ্র রচনাবলীর শব্দগত ও ভাষাগত যাথার্থ্য বজায় রেখে সরল ও আক্ষরিক গদ্যানুবাদের পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

মপাসাঁ রচনাবলী

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। গ্রাহকদের জন্য প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

বিশ্ববিশ্রুত অমর কথাশিল্পী গী দ্য মপাসাঁর সমস্ত উপন্যাস ও ছোট গল্পের যথাযথ বঙ্গানুবাদ।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহকমূল্য পাঁচ টাকা। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা। অবিলম্বে গ্রাহক হোন। কাগজ ও ছাপা সুন্দর। ফুল রেক্সিন বাঁধাই।

ডঃ সুখেন্দুবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ প্রীতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত।

সুনীল চক্রবর্তীর মন্ত্রী হওয়ার কেচ্ছা
আমি মন্ত্রী হব ৮৲

কুমারেশ ঘোষ-এর ভ্রমণ কাহিনী
দমদম থেকে দামস্কাস ৫৲

ডুলি-কলম : ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯ ফোন : ৩৪-৮১৮০

বিদ্যোদয়ের বই

অনন্ত সিংহের
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ১১·০০

অমরেন্দ্র ঘোষের
একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী ৫·০০

শ্রীমন্তের
নাম তার রূপসী ৩·৫০

গুণময় মান্নার
লখীন্দর দিগার ৫·০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত
চাহার দরবেশ ৩·৫০

চলমান জীবন ৫·০০

কে, এম পানিক্করের
কেরল সিংহম্‌ ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা ৪·৫০

সুধীর ঘরনের
অরণ্যপুরুষ ৪·০০

সুশীল জানার
বেলাভূমির গান ৬·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
জীবনে প্রথম প্রেম ৪·৫০

ময়ূরাক্ষী ৪·০০

সোমলতা ৪·০০

মধুমিতা ৬·০০

গৃহকপোতী ৬·০০

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
পুরুষিকা ৩·২৫

বেদুইনের
বেগম নাজমা ফ্রাংকাইন ৩·৫০

যশাইতলার ঘাট ৩·০০

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের
মণ্ডমায়া ৩·৫০

সৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই স্বপ্ন ৩·৭৫

মনীশ ঘটকের
কনখল ৭·০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিপ্লবের সন্ধানে ১৩·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়ঃ ৭৫০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

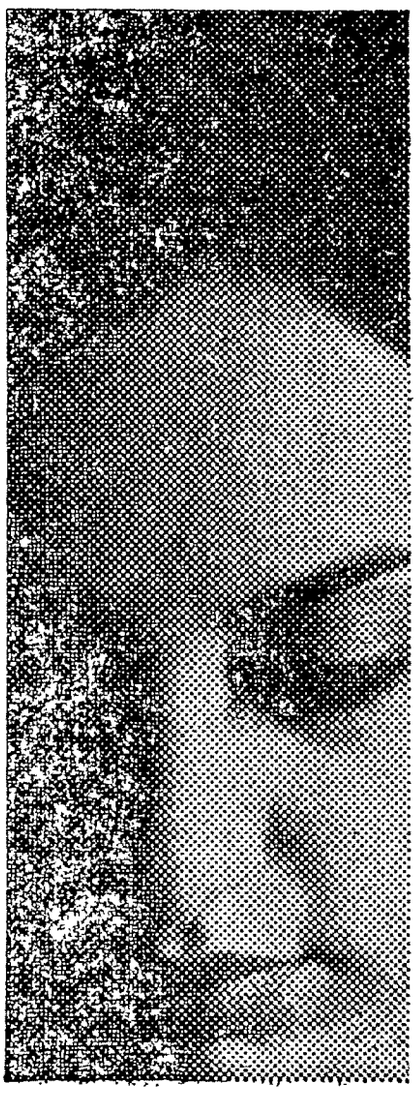

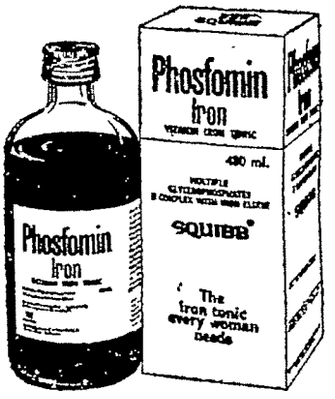

নতুন! ফসফোমিন আয়রন—মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

TM®
SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Squibb-HPMA-7A/73 Ben

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৬	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৩১	বাংলা কাব্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ		—শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
৩৪	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৩৭	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষণিক
৩৯	আকাশে পিঞ্জর	(গল্প)	—শ্রীশিশির দাস
৪৪	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৪৬	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫১	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৫৩	বিলুপ্ত রাজধানী দেবীকোট		—শ্রীউৎপল চক্রবর্তী
৫৭	শীতের ঝড়	(গল্প)	—শ্রীহীরেন চট্টোপাধ্যায়
৬০	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬২	ফুলের বাহার		—শ্রীমলয়া ধর
৬৩	বিবাহ-বিচিত্রা		—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৬৫	সাত দিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬৭	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৬	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৮	বাংলাদেশের ছবি		—আনওয়ার আহমদ
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময় ৮·০০

এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য—আনুমানিক ৭০০ থেকে সুরু করে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ সময়ের মধ্যে যে সব কবি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন অথবা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের পরিচয় প্রদান ও আবির্ভাবকাল নিরূপণ। এই সাতটি অধ্যায়ে যথাক্রমে 'চর্যাগীতিকারগোষ্ঠী', 'জয়দেব' 'লক্ষ্মণ সেন সংবৎ', 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' 'কৃত্তিবাস' এবং 'মালাধর বসু' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়েই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে এবং পূর্বসূরীদের মতের বিচার করে সত্য নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন, রামায়ণ রচনার ইতিহাস ও সম্ভাব্য জন্মতারিখ সম্বন্ধে নতুন তথ্যের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

ভারতী বুক স্টল

৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

নাটক—নাটক—নাটক

যাদল সরকারের

বড়ো পিসিমা (হাসির)	৪·০০
বাকি ইতিহাস	৩·২৫

গঙ্গাপদ বসুর

অন্ধকারের বৃত্ত	৩·৫০
অংশীদার	৪·০০

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের

কাঞ্চনরঙ্গ	৩·০০

শম্ভু মিত্রের

ঘূর্ণি	৩·০০

অমিতা রায়ের

হারানো চিঠি (হাসির)	৩·০০

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের

বাঁধ	৩·০০
অমিতাক্ষর	৩·৫০
তোমার হলো সুরু	৩·৫০
গল্প বলুন (হাসির)	৩·৫০
আজকের নাটক (ঐ)	৩·০০

তথাস্তু (যন্ত্রস্থ)

বীরেন্দ্র পাল চৌধুরীর

আজ অভিনয় বন্ধ	২·৫০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

দুই রাত্রি	৩·০০

মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের

অমাবস্যার মৃত্যু	৩·৫০
জীবন জিজ্ঞাসা	৩·০০
নায়কের সন্ধানে (৩টি একাঙ্ক)	৩·০০

বিস্তারিত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

গ্রন্থপীঠ

২০৯বি, বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

চিঠিপত্র

"এই আমাদের দেশ প্রসঙ্গে"

অমৃতের ১৩ বর্ষ, ১ম খণ্ড ১১ সংখ্যায় শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিঠিপত্র বিভাগে 'এই আমাদের দেশ : ২৪ পরগণা' শীর্ষক পত্রে কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্ন করেছেন। অতি সংক্ষেপে তার উত্তর দেওয়া হল।

(১) ভার্জিলের জর্জিকস্ বাব্যে যে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ় রাজ্যের উল্লেখ আছে তার বন্দর 'গঙ্গে' ছিল বসিরহাট মহকুমার বালোদ্দ পরগণার বেড়াচাঁপা গ্রামের টন্দ্রকেতু গড়ে। বছর চারেক আগে আকাশবাণী কলিকাতা থেকে 'বেড়াচাঁপা' বক্তিকায় আমি যে কথা বলেছি। তবে চব্বিশ পরগণার দক্ষিণে খাড়িময় ভূভাগই গঙ্গারিডি রাজ্য বলে অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি আদি-গঙ্গার শঙ্কের খাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কলিকাতা থেকে মাইল পনেরো দক্ষিণে গোবিন্দপথে গ্রামের (নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ বসুর নামে এ গ্রামের নামকরণ হয়েছে) কাছে 'গাঙ্গাট' বলে একটা জায়গার সন্ধান পেয়েছি। গাঙ্গাটে গঙ্গাবাচন অপভ্রংশ বলে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

(২) সুধাংশুবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্ন —আটঘরা কোথায়? জায়গাটি কলিকাতা থেকে দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার সামনে বারুইপুর ষ্টেশনের মাইল দুয়েক পূর্বে বিদ্যাধরী ও আদিগঙ্গার মধ্যস্থলে অবস্থিত। চৈতন্য-ভাগবতে আছে—শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল যাত্রা পথে আদিগঙ্গার তীরে তীরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার আটিসারা নগরীতে আসেন,—

'হেন মতে প্রভুতত্ত্ব কহিতে কহিতে।
উত্তরিলা আসি 'আটিসারা' নগরীতে।।

গ্রন্থের শেষে ভৌগোলিক বিবরণীতে লেখা আছে—'২৪ পরগণার বারুইপুর নামক স্থানের নিকট আটঘরা নামে একটি স্থান আছে। পূর্বে গঙ্গা এইস্থানে প্রবাহিতা ছিলেন। এই আটঘরাই আটিসারা হইতে পারে।' চৈতন্য ভাগবত—[অতুল গোস্বামী সম্পাদিত ৩৮২ পৃঃ]

(৩) আমার 'বঙ্গ-সংস্কৃতি কথা' গ্রন্থে উল্লিখিত পীর গোরাচাঁদের যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধেয় সুধাংশুবাবু। সেই কাহিনীর সন্ধান পাই বেড়াচাঁপা গ্রামের এক ভদ্রলোকের কাছে। সুধাংশুবাবুর মত আমারও মনে প্রশ্ন জাগে পীর গোরাচাঁদ কোন আমলে বর্তমান ছিলেন। ইতিহাসের সূত্রগুলো অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে লুপ্ত: তবে মনে হয় দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র, শাহসুফী কর্তৃক হুগলীর পাণ্ডুয়া বিজিত হবার পরবর্তীকাল রাজা চন্দ্রকেতুর আমল। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে বেশী।

(৪) শ্রদ্ধেয় সুধাংশুবাবু ঠিকই বলেছেন অবদানের কাহিনী বলতে গিয়ে নিত্যানন্দ ও রঘুনাথ দাস আয়োজিত 'চিঁড়া-ভোগের' কথার উল্লেখ না থাকা একটা ঐতিহাসিক ত্রুটি: কারণ সেই ছুৎমার্গের যুগে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকে একসঙ্গে খাওয়ানো এক বৈপ্লবিক ঘটনা। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ নিত্যানন্দ স্থিতিশীল সমাজে এক গণতান্ত্রিক চেতনার সঞ্চার করেন এই 'চিঁড়াভোগের' মাধ্যমে। মনীষী ব্রজেন শীল নিত্যানন্দকে বলেছেন,—একজন খাঁটি ডেমোক্র্যাট।

(৫), (৬), (৭) প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সুধাংশুবাবুর সঙ্গে একমত। (৮) সুধাংশু বাবুর প্রশ্ন—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম-চন্দ্র, দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছিলেন কিনা? এর উত্তর 'শ্রীম' লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে। বিদ্যা-সাগর সময়াভাবে যেতে পারেন নি। বঙ্কিম-চন্দ্র গেলেও তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তা বেশী হয়নি। মধুসূদন যান ১৮৭০ খৃঃ নাগাদ, রাণী রাসমণির আইনসংক্রান্ত বৈষয়িক কাজে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা না বলে একটা গান শুনিয়েছিলেন। মধুসূদন নাকি কেঁদেছিলেন।

প্রসিত রায়চৌধুরী
নবেন্দ্রপুর ২৪ পরগণা।

(২)

পশ্চিমবঙ্গের জেলা পরিক্রমা শেষ হয়ে এল। এবার তাই ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা। যাঁরা পত্র লিখে ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনে প্রয়াসী হয়েছেন অথবা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিব-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, শ্রীদিলীপকুমার পাত্র, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার সামন্ত, শ্রীমতী নীতা গুপ্ত প্রমুখের চিঠি-গুলি পড়ে আমার লেখার শ্রম সার্থক মনে হয়েছে।

একদিন যখন দেশের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল তখন মানুষের সংস্পর্শে আসার তাগিদে প্রায় ভবঘুরের মতো জেলায় জেলায় ঘুরতাম। তাই রচনা-গুলির বেশিরভাগই আমার প্রত্যক্ষ অভি-জ্ঞতার ফসল। কিন্তু চোখে দেখে তো ইতিহাস, ভূগোল বা অর্থনীতির তথ্য সংগ্রহ করা যায় না বা প্রত্নসম্পদের ইতি-কথাও জানা যায় না। তার জন্য অগণিত গ্রন্থ পাঠ করেছি ও বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ ব্যাপারে সাগ্রহ সহযোগিতা পেয়েছি যাদব-পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার-কর্মীদের কাছ থেকে। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ করেছি রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙলার ইতিহাস-গুলিকে। তবে হাতের কাছে সব সময় থেকেছে, ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে রচিত, শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত 'ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক'গুলি। ১৯৬১ ও '৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। বিভিন্ন জেলার সম্পদ ও সম্ভাবনা পর্যালোচনায় প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 'ফাস্ট ফাইন্ডিং সার্ভে' রিপোর্ট-গুলির উপরে যেগুলি পাই ঐ ব্যাঙ্কের প্রচার দপ্তরের শ্রীসৌহার্দ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন সময় যেসব স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে-গুলিও যা পেয়েছি পড়েছি। যেমন জলপাই-গুড়ি জেলার শতবার্ষিকী উপলক্ষে, বর্ধ-মানের পৌরসভার শতবার্ষিকী উপলক্ষে বা স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে নদীয়া থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি। শ্রীনির্মল বসু প্রমুখ আমার অনেক বন্ধুও তাঁদের নিজ নিজ জেলার অনেক কথা আমাকে জানিয়েছেন। লণ্ডন প্রবাসী সাংবাদিক শ্রীবিশ্বনাথ মুখো-পাধ্যায়ের পরামর্শে সব জেলার আরণ্যক-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে শুরু করি। 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলা নিয়ে আলো-চনার যে সুযোগ দিলেন তার জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়
—কলকাতা

"ঠাণ্ডা লড়াই প্রসঙ্গে"

গত ২১-শে আষাঢ়, ১৩৮০ প্রকাশিত 'অমৃত' পত্রিকার 'দেশে-বিদেশে নিবন্ধে (৮০৯ পৃঃ) লেখা হয়েছে তারিখটা ছিল ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ফুলটন শহর উইনস্টন চার্চিল প্রথম এই ঠাণ্ডা লড়াই' কথাটি উদ্ভাবন করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গরম লড়াই তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। তারই মধ্যে ঐ যুদ্ধের দুই সহযোগী দেশ যে নতুন ধরনের বৈরাচারিতে নেমেছিল, চার্চিল তারই নাম দিয়েছিলেন, 'ঠাণ্ডা লড়াই'। কিন্তু তথ্যটি সঠিক নয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের দুই সহযোগী দেশ, যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া, যুদ্ধের অবসান হতে পরেই যে নতুন ধরনের বৈরাচারিতে নেমেছিল তাকে ঠাণ্ডা লড়াই' নামে অভিহিত করেছিলেন নিউইয়র্ক টাইমসের বিখ্যাত কলামনিস্ট ওয়ালটার লিপম্যান, চার্চিল নয়। চার্চিল তাঁর ৫ই মার্চের বক্তৃতায় 'লৌহ যবনিকা' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গরম লড়াই ঠাণ্ডা হওয়ার আগেই সোভিয়েট রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। একে উদ্দেশ্য করেই চার্চিল তাঁর ফুলটন ভাষণে বলছিলেন :

'From Stetin on the Baltic to Trieste on the Adriatic an 'Iron curtain' has descended across the continent".

ঠাণ্ডা লড়াই (কোল্ড ওয়ার) শব্দটা তিনি চালু করেননি, তিনি চালু করে-ছিলেন লৌহ যবনিকা শব্দটা।

বিনীত
আবু ইউসুফ সামশুল আলম,
পশ্চিম মাদারবাড়ী,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

দেশের জনসাধারণের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে যারা চোরাকারবারে, ভেজালব্যবসায়ে ও মজুতদারীতে ফেঁপে উঠছে তাদের বিরুদ্ধে আজ জনমত তীব্র। কিছু দিন আগে সংসদে কয়েকজন সদস্য খাদ্যে ভেজালকারীদের মৃত্যুদণ্ড দানের দাবী জানিয়েছিলেন। ভেজাল ও চোরাকারবার দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতির খবর বিদেশেও গিয়ে পৌঁছেচে। একটি বহুল প্রচারিত মার্কিন সাপ্তাহিক তো বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে সম্প্রতি বলেছে যে, ভারতে ওপরতলা থেকে একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে সর্বত্রই দুর্নীতি। ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না। সরকার এই দুর্নীতিগ্রস্তদের কিছু করতে পারছেন না। মার্কিন পত্রিকার সমালোচনার উদ্দেশ্য অবশ্য অস্পষ্ট নয়। ভারত সরকার যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করছেন এবং কঠোরভাবে দুর্নীতিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন সে খবরটি তাদের সংবাদে উহ্য রাখা হয়েছে।

দুর্নীতি ব্যাপক আজ সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশাসনের সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ একথা সত্য নয়। সমাজবিরোধীরা নানাভাবে প্রশাসনকে কলুষিত করার চেষ্টা করে থাকে। তার জন্য জনসাধারণের অনেক দুর্ভোগও ভুগতে হয়। কিন্তু আজ তরুণদের মধ্যে এবং প্রশাসনেরও সৎ ও বিবেকবান অংশে এই অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ঘৃণা সুস্পষ্ট। খাদ্য সঙ্কটের দিনে খাদ্য মজুত করে এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে যারা সমাজের শত্রুতা করছে তাদের বিরুদ্ধে ক্রমশই জনমত সংগঠিত হচ্ছে। দেশের নানান জায়গায় জনসাধারণের উদ্যোগে মজুতদারদের কবল থেকে খাদ্য উদ্ধার করা হচ্ছে। খাদ্যে ভেজালকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে অভিযান। আশা করা যায়, জনমত আরও সজাগ ও সংগঠিত হলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের পক্ষে সহজ হবে। কতুত আইনমন্ত্রী সংসদে এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করে নিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন যে, চোরাকারবারী ও ভেজালকারীদের শাস্তি দেবার জন্য কঠোরতর আইন প্রণয়ন করা হবে।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ বিষয়ে কতকগুলো নির্দিষ্ট প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করার সংকল্প ঘোষণা করে জনগণের দাবিকেই বাস্তবায়িত করছেন। তাঁর সুস্পষ্ট প্রস্তাব—মুনাফাবাজ চোরাকারবারী মজুতদার এবং ভেজালকারীদের অপরাধ প্রমাণিত হলে একই সঙ্গে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং বারো বছরের জন্য মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হোক। প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, নাগরিকদের জন্য সংবিধানে বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, দেশে অবাধ চলাফেরা, ব্যবসা ইত্যাদি করার মতো সাতটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। চোরাকারবার বা খাদ্যে ওষুধে ভেজাল করে যারা সমাজের শত্রুতা করছে তাদের এই মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়াই হবে যুক্তিসঙ্গত। কারণ, তাদের কার্যকলাপের দ্বারা তারা সমাজের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করছে। দেশবাসীর দুর্দশার কারণ তারাই। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার তারা ভোগ করতে পাবে না। বলা বাহুল্য, মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। আজ এই ধরনের জঘন্য দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রচলিত আইনের দ্বারা তা রোধ করা সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারপতিও বলেছেন, বর্তমান ভেজাল-নিরোধ আইন সমস্যা মোকাবিলার অনুপযুক্ত। তার সংশোধন দরকার।

মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বাগত জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এ ব্যবস্থাও করতে হবে যাতে আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাঁদের ওপর সেই প্রশাসনিক কাঠামোও দুর্নীতিমুক্ত হয়। উৎকোচ ছাড়া কোনো কাজ হবার নয়, এ ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক। নানানভাবেই দুর্নীতি তার জাল বিস্তার করেছে। কিছু দিন আগে এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার কর্মীরা মাসে হাজার টাকা মেডিক্যাল বিল করে সরকারকে প্রবঞ্চিত করছে। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই ভুয়া বিল এবং সেই বিল যারা করছে এবং যারা পাশ করছে তাদের মধ্যে অসাধু বোঝাপড়া ছাড়া এই চুরি সম্ভব নয়। এ রকম ঘটনা নানা স্তরেই ঘটছে এবং এভাবেই সরকারের টাকা প্রশাসনের লোকেরা লুটে-পুটে খাচ্ছে। চোরাকারবারীদের চেয়ে এদের অপরাধ কম নয়। প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে না পারলে সমাজের অন্যান্য অপরাধও দূর করা যাবে না। কারণ যে-সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো হবে সে সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে বসে আছে। সুতরাং সরকারকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোরতম লড়াই চালাতে হবে। তা না হলে সমাজের এই রোগ সারানো যাবে না।

পত্রিকা ভবনে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের বৈষ্ণব সম্মেলন। প্রভুপাদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভাষণ দিচ্ছেন। পাশে রয়েছেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ তুষারকান্তি ঘোষ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী।

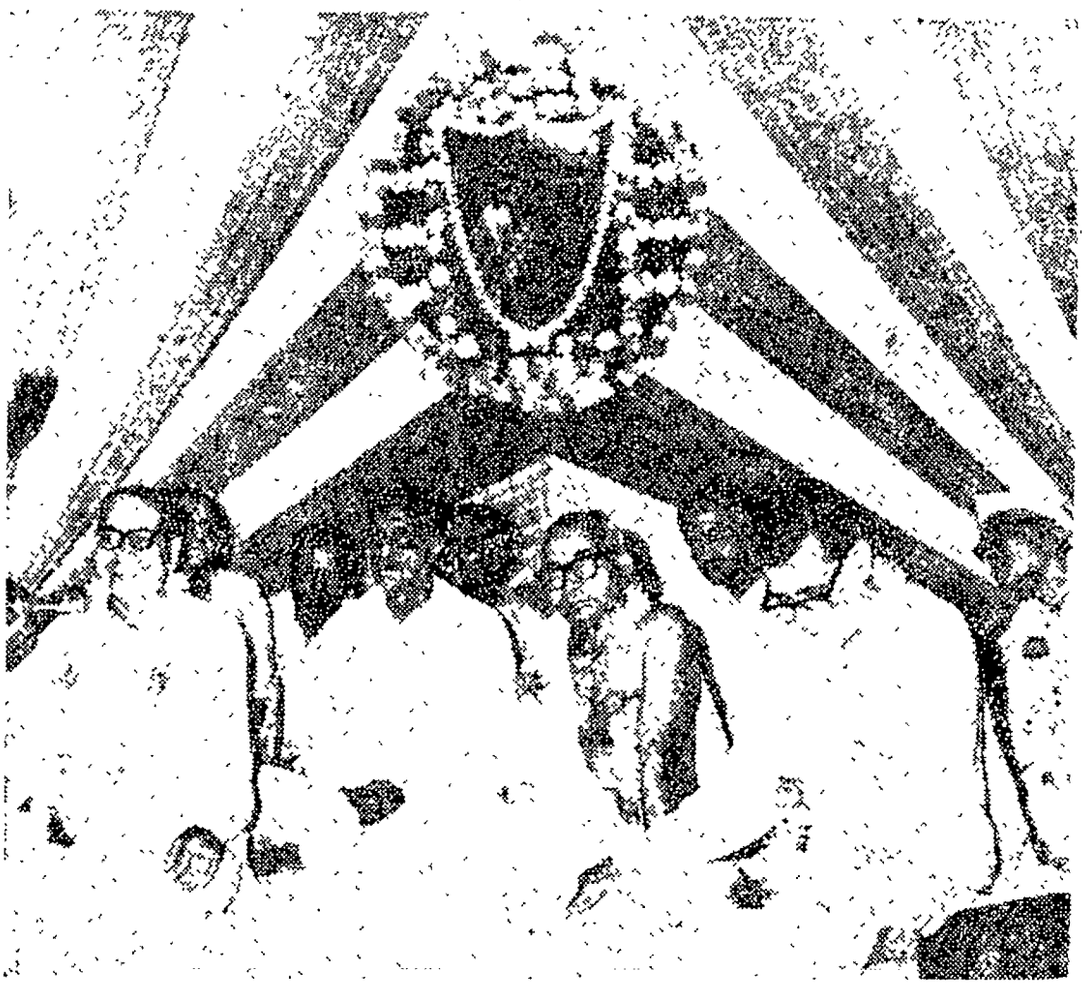

দেশ বিদেশে

'কে বড়, না কনে বড়?' বিয়ের আসরে বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষের মধ্যে এই রেষারেষি নিছক রঙ্গতামাসা। শেষ পর্যন্ত বরই বড় সাব্যস্ত হল, কি কনেই বড় সাব্যস্ত হল, তাতে বিয়ে ভাঙে না। কিন্তু, ব্যুরোক্রেট বড়, না, টেকনোক্র্যাট বড়? এই প্রশ্নের এখন আমাদের দেশে যে বিতর্ক ও বিসম্বাদ চলছে সেটা আদৌ আর রঙ্গ-তামাসা নেই, বরং এই ছোটবড়র প্রশ্নে সকল কাজেকর্মই পণ্ড হতে চলেছে।

ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, কেউ কেউ এই বিবাদকে গৃহযুদ্ধ বলে আখ্যা দিচ্ছেন—সিভিল সার্ভিসের ভিতর সিভিল ওয়ার, সংক্ষেপে 'সিভিল সার্ভিস ওয়ার'। এই গৃহযুদ্ধের যে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে তার একদিকে 'প্রথম সারিতে' এসে জমায়েত হয়েছেন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনীয়াররা, তাঁদের পিছনে অন্যান্য সরকারি বিভাগে নিযুক্ত ইঞ্জিনীয়াররা, ইঞ্জিনীয়ারদের পার্শ্বরক্ষা করছেন সরকারি ডাক্তাররা, তাঁদের সঙ্গে আছেন সরকারি কার্যে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য টেকনিক্যাল কর্মীরা। এই যুযুধান সিভিল সার্ভেন্টরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যে প্রশ্নটির মীমাংসা করতে চাইছেন, সেটি হল, আই-এ-এস ও আই-সি-এস গোষ্ঠীর আমলারা যে সর্বদা সরকারি প্রশাসনের নৈরাজ্যের চূড়ায় বসে চিরকাল খবরদারি করে যাচ্ছেন, সেই ব্যবস্থা আর চলতে দেওয়া হবে কিনা। পূর্ত বিভাগই হোক, কি স্বাস্থ্য বিভাগই হোক অথবা কৃষি বিভাগই হোক, সেক্রেটারিয়েট আলো করে বসে আছেন যে সেক্রেটারিরা তাঁরা অবশ্যই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের লোক হবেন আর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সরকারি অফিসাররা সকলেই সব সময়ে কি পদমর্যাদায়, কি বেতনে, কি পদোন্নতির সুযোগে সব সময়ে ঐ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের কাছে নত হয়ে থাকবেন কেন? —এই নিয়ে চলছে সিভিল সার্ভিসের গৃহযুদ্ধ।

এই গৃহযুদ্ধের শেষ পরিণাম দেখা এখনও বাকি, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই গৃহযুদ্ধ দেশের মানুষের বেশ কিছু দুর্গতি ডেকে এনেছে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও বঙ্গস্থান, এই চারটি রাজ্যের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়াররা ধর্মঘট করে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘোরতর বিদ্যুৎ সংকট ডেকে এনেছেন। পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়াররাও ধর্মঘটের নমুনা দেখিয়েছেন। রাজ্যে রাজ্যে সরকারি ইঞ্জিনীয়াররা ইতিপূর্বে কাল ব্যাজ পরে দাবি দিবস পালন করেছেন, এখন তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আই-এ-এস-এর সঙ্গে ক্ষমতার দাবিতে সরকারি ডাক্তাররাও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে জোট বাঁধছেন। বোম্বাইয়ে সরকারি ডাক্তাররা নিজেদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতে যে আন্দোলন চালাচ্ছেন সেই আন্দোলনকে টেকনোক্র্যাটরা তাঁদের বৃহত্তর আমলা-

বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে ফেলেছেন। অর্থাৎ ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার প্রভৃতি শ্রেণীর যেসব সরকারি অফিসারদের ধর্মঘটে নামবার সম্ভাবনা আগে চিন্তাই করা যায় নি তাঁরা এখন এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে হাসপাতাল অচল করে দিয়েও নিজেদের দাবির লড়াইয়ের ফয়সালা করতে চাইছেন। উত্তর ভারতের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়াররা অথবা বোম্বাইয়ের ডাক্তাররা যে আশু কারণে ধর্মঘট করছেন সেই কারণ দূর হয়ে যেতে পারে ও ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু মূলে যে প্রশ্নটি নিয়ে বিরোধ বেধেছে তার যদি মীমাংসা না হয় অর্থাৎ সরকারি কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্ ও প্রশাসকদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা যদি না হয় তাহলে দুই পর্ষদের সরকারি অফিসারদের মধ্যে যোগাযোগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, এই আশঙ্কা বাস্তব হয়ে উঠেছে।

* * *

উত্তর ভারতের বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়ারদের ধর্মঘটের আশু কারণ হল, পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক ঐ রাজ্যের রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান হরবংশ সিংহের সাসপেনসন। ধর্মঘটী ইঞ্জিনীয়ারদের দাবি, এই সাসপেনসন আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

পাঞ্জাব সরকার জানিয়েছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের জন্য ইলেকট্রিক মিটার কিনে শ্রীহরবংশ সিং পর্ষদের ৬০ লাখ টাকা লোকসান করিয়ে দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। তাঁর বাড়ি তল্লাসী করে এই বিষয়ে আপত্তিকর দলিলপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া একটি বিলাতী ও কয়েক বোতল বিদেশী মদ পাওয়া গেছে। শ্রীসিংহের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইন, অস্ত্র আইন ও আবগারি আইন অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

কিন্তু নিখিল ভারত বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়ার ফেডারেশন এইসব অভিযোগের গুরুত্ব দেন না। তাঁরা বলেন, অভিযোগগুলি বাজে এবং আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের ফল। তাঁরা একথাও বলেছেন যে সাসপেন্ড না করেই শ্রীসিংহের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগের তদন্ত করা চলত।

বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়ারদের এভাবে শ্রীহরবংশ সিংহের পিছনে এসে দাঁড়াবার কারণ আছে। শ্রীসিং নিজে একজন ইঞ্জিনীয়ার (রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্তৃত্ব ইঞ্জিনীয়ারদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি যেসব রাজ্যে মেনে নেওয়া হয়েছে পাঞ্জাব তাদের অন্যতম) এবং নিখিল ভারত বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়ার ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। শ্রীসিংহের হয়রানিকে বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়াররা টেকনোক্র্যাটদের সঙ্গে বুরোক্র্যাটদের লড়াইয়েরই একটি অংশ বলে মনে করছেন এবং তাঁদের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তাঁরা সেকথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কেন্দ্রীয় কোক ও বিদ্যুৎ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও ইঞ্জিনীয়ারদের ঐ ধর্মঘটে না নামার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন তাঁরা শোনেন নি। তাঁরা এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন।

ইতিমধ্যে বারপ্রতিবাদে এই লড়াই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দুই পক্ষের যেসব কথা ও পাল্টা যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হচ্ছে :—

টেকনোক্র্যাটরা বলছেন হাতেকলমে কাজ তাঁদের করতে হয়। দায়িত্ব তাঁদের অথচ কর্তৃত্ব আমলাদের হাতে, এটা ঠিক নয়। পাকিস্থানের সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় দেখা গেছে, সরকার ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সামনে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার রাস্তা ঠিক করার অধিকার সেনাপতিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা না করে যদি পদে পদে সৈন্যবাহিনীর উপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেওয়া হত তাহলে এই যুদ্ধে সাফল্য লাভ করা যেত না। গবাদী হস্তান্তর সংগ্রামেও তেমনিভাবে এই সংগ্রামের প্রকৃত যোদ্ধাদের মুক্ত পরিচালনার কর্তৃত্ব দিতে হবে। যে আমলে রাজত্ব আদায় করা এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই সরকারের প্রধান কাজ ছিল সেই আমলে প্রশাসকদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়ার একটা অর্থ ছিল। কিন্তু আজ যখন সরকারের কর্মকেন্দ্র অনেকদূর বিস্তৃত হয়েছে তখন প্রশাসনিক

॥ গ্রন্থপ্রকাশের সশ্রদ্ধ নিবেদন—বাংলা সাহিত্যের দুই দিক্‌পালের রচনাবলী ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
রচনাবলী

॥ দেবতাত্মা হিমালয়, হাসুবানু বিবাগী ভ্রমর, বেলোয়ারী, মহাপ্রস্থানের পথে, জনম জনম হম, উত্তর হিমালয় চরিত, বনস্পতির বৈঠক ইত্যাদি বিভিন্ন রচনাসহ দশ খণ্ডে প্রকাশিত হবে ॥ প্রতি খণ্ডের দাম ১৫৲।

মনোজ বসুর
রচনাবলী

॥ নিশিকুটুম্ব ভুলি নাই, বন কেটে বসত, বুনোকুতী মানুষ গড়ার কারিগর, বনমর্মর চীন দেখে এলাম, জলজঙ্গল পথ কে রুখবে? ইত্যাদি বিভিন্ন রচনাসহ দশ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। প্রতি খণ্ডের দাম ১৫৲।

নিয়মাবলী :—প্রতিটি রচনাবলীর জন্য ৫৲ টাকা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। দুটির জন্য ১০৲ টাকা। যাঁরা দুটির গ্রাহক একসঙ্গে হবেন বিনামূল্যে তাঁদের ৩৲৪৲ মূল্যের বই উপহার দেওয়া হবে। শুধুমাত্র গ্রাহকরা শতকরা ২০৲ টাকা হারে কমিশন পাবেন। জমা টাকা শেষ খণ্ডের সঙ্গে কাটা যাবে। গ্রাহক হবার জন্য টাকা পয়সা শুধুমাত্র আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন। কলকাতার বাইরে যাঁরা তাঁরা মণিঅর্ডার করে অথবা পোস্টাল অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট পাঠাতে পারেন।

বিশেষ উপহার : যাঁরা ১০৲ টাকা দিয়ে দুটি রচনাবলীর গ্রাহক হবেন তাঁদের আমাদের পছন্দ মতো লিস্ট থেকে ৩৲ টাকার বই বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হবে। এই উপহার ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৩ পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক গ্রাহককে দেওয়া হবে।
কেন গ্রাহক হবেন : এই দুজন লেখকের বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি আলাদা কিনতে গেলে ৩০০৲ টাকার উপর লাগবে প্রত্যেকের জন্য। রচনাবলীতে দশ খণ্ডে আনুমানিক ১৫০৲ টাকায় এবং তার উপর ২০% কমিশন বাদে কত পড়ছে হিসাব করুন। বর্তমানে যে হারে টাকার মূল্য কমছে, সে তুলনায় আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ মূল্যবান ও রুচিশীল করে তুলুন।

॥ বিভিন্ন পুস্তক প্রতিষ্ঠান যাঁরা আমাদের হয়ে গ্রাহক সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক, নিয়মাবলীর জন্য যোগাযোগ করুন ॥

গ্রন্থপ্রকাশ, C/O বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (ফোন : ৩৪-৩৮২৫)

দৃষ্টিভঙ্গীকেই সকলের উপরে স্থান দেওয়া ভুল। আমলাদের শিক্ষা ও অভ্যাস এমনই যে, তাঁরা যে কোন প্রশ্নকেই চিরাচরিক সরকারী নিয়মকানুনের চশমার মধ্য দিয়ে ছাড়া দেখতে পান না। তাঁদের স্বাভাবিক প্রবণতা কাজ করার দিকে নয়, যাতে নিয়মভঙ্গ না হয় সেদিকে। পরিবর্তনের চেয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার দিকেই তাঁদের বেশি আগ্রহ। আজ যখন দ্রুতবেগে এগিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনও এই আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য বজায় রাখার মানে হয় না।

এই সিভিল সার্ভিস ওয়ারের আক্রমণকারী পক্ষের বক্তব্য হল, আজকাল পৃথিবীর প্রায় কোন দেশেই সাধারণ প্রশাসকদের মাথার উপর বসিয়ে রাখার পুরান নীতি অনুসরণ করা হয় না, এমনকি যে বৃটিশ সরকার একদা আমাদের দেশে এই আমলা-কৌলীন্যের নীতি চালু করেছিলেন তাঁরা নিজেদের দেশেই সেই নীতির অনেকটা পরিবর্তন করেছেন। একজন ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার লিখেছেন, তিনি রাশিয়ায় গিয়ে দেখেছেন, টেকনিক্যাল বিভাগগুলির মাথায় ত বিশেষজ্ঞরা রয়েছেনই, এমনকি তাঁর সঙ্গে যে দোভাষীকে দেওয়া হয়েছিল তিনিও একজন ইঞ্জিনীয়ার।

আমাদের দেশে এই আমলা-প্রাধান্যের যে লক্ষণটির বিরুদ্ধে টেকনোক্র্যাটরা সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদমুখর সেটি হল, চাকরির ক্ষেত্রে সবজান্তা প্রশাসকদের তুলনামূলক সুযোগ-সুবিধা। একজন আই-এ-এস অফিসার অবসর গ্রহণ করার আগে কমসে কম ১৮০০ টাকা মাসিক বেতনের পর্যায়ে উঠবেনই। সেই জায়গায় সাধারণত একজন ইঞ্জিনীয়ারের শেষ বেতন মাসিক ১৩০০ টাকা। সরকারী ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে ২২ শতাংশ ১৩০০ টাকার বেড়া পার হতে পারেন। শতকরা পাঁচজন ২০০০ টাকার উপরে ওঠেন। আর সরকারী কাজে নিযুক্ত যেসব ইঞ্জিনীয়ার মাসে ২৫০০ টাকার বেশি বেতন পান তাঁদের অনুপাত হাজারকরা ৭-৭ জন মাত্র। অপরপক্ষে, প্রায় প্রতি পাঁচজন আই-এ-এস অফিসারের মধ্যে একজন মাসে ২৫০০ টাকা বা তার বেশি বেতন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। শতকরা ৪-৩৯ জন আই-এ-এস অফিসার মাসিক ৩০০০ টাকা ও শতকরা ৩-৩৮ জন ৩৫০০ টাকার বেশি বেতনে অবসর গ্রহণ করেন। আই-এ-এস অফিসারদের এক-চতুর্থাংশ সেক্রেটারি বা অতিরিক্ত সেক্রেটারির পদমর্যাদায় উন্নীত হন। আর বিশেষ ভাগ্যবান না হলে কোন সরকারী ইঞ্জিনীয়ারের পক্ষে জয়েন্ট সেক্রেটারির স্তরে ওঠাই কঠিন।

হিসাব করে দেখা গেছে যে, প্রথম শ্রেণীর সেন্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসে প্রবেশ করে একজন ইঞ্জিনীয়ার সাধারণত সারা জীবনে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন একজন আই-এ-এস অফিসার সাধারণত সারা জীবনে তার প্রায় দ্বিগুণ অর্থ উপার্জন করেন।

অথচ, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তথাকথিত মেধাবী তরুণরাই ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসে যোগ দেন। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আই-এ-এস অফিসারদের মধ্যে যেখানে শতকরা মাত্র ত্রিশজন তাঁদের শিক্ষাজীবনে প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করেছিলেন সে-জায়গায় প্রথম শ্রেণীর সেন্ট্রাল ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসের অফিসারদের শতকরা আশিজনই প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।

বুরোক্র্যাটদের পাল্টা যুক্তি হল, বিশেষজ্ঞদের ধারণা ও প্রস্তাবগুলির বিশ্লেষণ ও সমন্বয়সাধন, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য-বিধান এবং এই সবের ভিত্তিতে সরকারী নীতি প্রণয়নে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সেই নীতির রূপায়ণ সম্ভব হয়, এগুলি সবই প্রশাসকদের কাজ এবং এই কাজ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা হতে পারে না। দপ্তরের মন্ত্রীরা নিজেরা যেহেতু বিশেষজ্ঞ নন সেহেতু মন্ত্রীদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের চেয়ে প্রশাসকরাই যোগ্যতর। জেলায় জেলায় প্রশাসকরা যে কাজ করেন তার সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক রক্ষা করতে হয় বলেই সেই কাজের গুরুত্ব বেশি।

আই-এ-এস অফিসারদের দাবী, দেশের ঐক্যকে তাঁরাই ধরে রেখেছেন। অন্ধ্রকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের উপরই ডাক পড়েছে। প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের বিদ্রোহের পর উত্তর প্রদেশের পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন আই-এ-এস অফিসাররা। বিহারের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমুল বিশৃঙ্খলার পর সব কটিতে আই-এ-এস অফিসারকে উপাচার্য করে বসান হয়েছে। শিক্ষাবিদরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে শৃঙ্খলা আনতে পারেন নি আই-এ-এস অফিসাররা সেটা আনতে পেরেছেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে গত মে মাসের হাঙ্গামার পর সেখানেও একজন আই-এ-এস অফিসারকে উপাচার্য নিযুক্ত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার করার জন্যও প্রশাসনবিদদেরই ডাক পড়ে, কৃষিবিশেষজ্ঞ অথবা পুষ্টিবিশারদদের ত ডাকা হয় না।

বিশেষজ্ঞরা যে প্রশাসন বোঝেন না তার প্রমাণ হিসাবে আমলারা রেলওয়ে ও টেলিফোন বিভাগের কথা উল্লেখ করেন। এই দুই দপ্তরের মাথার উপর যাঁরা বসে আছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রযুক্তিবিদ। তাঁরা কেমন যোগ্যতার সঙ্গে প্রশাসন চালাচ্ছেন তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঐ দুই বিভাগের কাজকর্মের বিদ্রাটের মধ্যে।

নিজেদের স্বপক্ষে আই-এ-এস অফিসারদের দেওয়া আর একটি উদাহরণ : ইঞ্জিনীয়ারদের চাপে পড়ে একবার একটি কারিগরী বিভাগে ডিরেক্টর অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পদে একজন কারিগরী বিশেষজ্ঞকে বসান হল। ফলে এমন প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিল যে, ঐ পদে বিশেষজ্ঞকে সরিয়ে একজন প্রশাসককে বসাতে হল। এরপর থেকে বিশেষজ্ঞরা ঐ পদের উপর আর দাবী রাখেন নি।

এই যুক্তির জবাবে টেকনোক্র্যাটরা বলছেন, আই-এ-এস অফিসাররা যদি যোগ্যতম প্রশাসক হন তাহলে দেশে আইন ও শৃঙ্খলার এই অবস্থা কেন? আই-এ-এস-এর পরীক্ষায় পাশ করলেই যে কেউ প্রশাসনিক যোগ্যতা লাভ করেন আর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কখনই প্রশাসনিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না, একথা মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে নিযুক্ত একদল ডাক্তারকে বলেছিলেন আই-এ-এস'এর সমান হওয়ার জন্য আপনাদের যদি এতই আগ্রহ তাহলে আপনারা আই-এ-এস পরীক্ষা দিলেই ত পারেন। ডাক্তারদের জবাব, তা ত পারি, কিন্তু তাহলে ত আমরা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারব না, তখন আমাদের পুলিশকে গুলী চালাবার হুকুম দিতে হবে অথবা বহু স্তূপীকৃত রদ্দি ফাইলের উপর নোট লিখতে হবে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ নায়ুডাম্মা সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বিজ্ঞানীদের আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন যে, ইতিমধ্যে সাতজন বিজ্ঞানীকে যে ভারত সরকারের সেক্রেটারিব পদে নিযুক্ত করা হয়েছে তাতেই টেকনোক্র্যাটদের সম্পর্কে সরকারী নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মী সমিতি এই বক্তব্যে আশ্বস্ত হতে পারেন নি। তাঁদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'পদের আড়ম্বর বিজ্ঞানীদের মধ্যেও প্রশাসকদের মনোভাবই এনে দিচ্ছে। প্রশাসকরা যেমন প্রশাসকদের জন্যই রয়েছেন বিজ্ঞানীরাও তেমনি অস্তিত্ব রক্ষা করছেন বিজ্ঞানীদের জন্যই। এঁদের কারোরই কাজকর্মের সঙ্গে জনগণের প্রয়োজনের কোন যোগ থাকছে না।'

তাছাড়া, বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনীয়াররা যখন প্রশাসকদের সঙ্গে লড়াই করছেন তখন তাঁদের নিজেদের অধস্তন কর্মচারীদের আস্থা অর্জন করতে পারছেন না। দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ সি পাওয়ার স্টেশনের কারিগরী কর্মীরা বলেছেন যে, এই পাওয়ার স্টেশন ঠিকমত চলছে না ইঞ্জিনীয়ারদের দোষে। তাঁদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হলে তাঁরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই পাওয়ার স্টেশন চালু করে দেবেন। পাঞ্জাবে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মচারী ফেডারেশন ধর্মঘটী ইঞ্জিনীয়ারদের কাজের প্রতিবাদে তাঁদের ঘেরাও করছেন। কর্মচারীরা বলেছেন শ্রীহরবংশ সিংহের ব্যাপারে সরকার যদি কোনরকম উদারতা দেখায় তাহলে তাঁরা ধর্মঘট করবেন। উত্তর প্রদেশে ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনীয়াররা জানিয়েছেন, তাঁরা এই ধর্মঘটে নেই।

বিদ্যুৎ ইঞ্জিনীয়াররা কাজ বন্ধ করে দেশের মানুষকে অসুবিধায় ফেলছেন। তার উপর তাঁরা তাঁদের সহকর্মীদেরও বিরাগ-ভাজন হচ্ছেন। এতে বুরোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইয়ের জোর কমে যাচ্ছে।

—গণশত্রু

সেই লোকটি

এখন বয়েস হয়েছে। বারান্দায় বসে কত্তাবাবুর মত ভিংখরি বিদেয় করি। কিন্তু এমন পৈতে-পোড়ানো ব্রহ্মচারী যে উঠতি যৌবনে ছিলাম না, সে-কথাটা আগেভাগেই আমার পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে রাখি। কলকাতার অলি-গলি ঘর-বন্দর টো-টো করে ঘুরেছি। দিনে, রাতে-বেরাতে। কতরকম লোক চোখে পড়ল, কত কিসিমের তাদের চরিত্তর। কিন্তু একটা মুখ—একটা মুখ আজও এই রক্ত ঠাণ্ডা মেরে পাল্তা হয়ে আসার বয়েসে আমার স্মৃতির এঁদো পুকুরে এখনো ঘাঁই মারে। আপনারা আমার চিতায় অগ্নুৎপাত করার আগে পর্যন্ত সে মুখের হঠাৎ হঠাৎ চোরা টান থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই।

লাল গলদা চিংড়ির মত টকটকে মুখ। মোটা। গলার ভাঁজে সব সময় ঘাম দেখা যায়। কামানো গাল। সব মিলে মদ্যপানরত সূর্যদেবের মত চেহারা। বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই।

ভদ্রলোককে আমি দেখেছি অখণ্ড মনযোগে বুক স্টলে দাঁড়িয়ে বই পরতে। ঘোড়ার মাঠে গলায় বায়নাকুলার লট্‌কে হোয়াইট স্ট্যাণ্ডে লাফাতে। দিশি মদের দোকানে লাল টকটকে গোলাপ নাড়িয়ে গজল গাইতে। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে ফিটন চেপে ছুটতে। পদ্য পড়ার আসরে পরলা না হোক দোসরা শ্রোতার সাক্ষিতে বসে থাকতে। আর্ট ফিল্মের কাউণ্টারে গিয়ে নোট বাড়াতে। ক্রেম ব্রাউন ইন্সটিটিউটে গিয়ে 'টু ফ্যাট লেডিজ—দ্যাটস এইট্‌টি এইট' শুনে ক্ষেপে উঠতে। আবার ট্রামে চেপে কালো কুর্তা গায়ে বগলে ইংরিজি কাগজ শান্ত সভ্যভব্য হয়ে হাইকোর্টে যেতে।

এক কথায় এহেন লোককে আপনারা বলতে পারেন খাঁটি রাজহাঁস। যেখানে যে-ভাবে জীবনের ক্ষীরটুকু জোটে, আগেভাগে মেরে দেওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঠোঁট বাড়ান। আমি ক্ষতত্র ওঁকে দেখব, আর উনি আমাকে দেখবেন না, তাতো হয় না। শেষ-মেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল খুব। এতই আলাপ যে, কোনো ফরম্যালিটির দায় না রেখে আমাকে তুই-তোকারি করতেন। ভালো-মন্দ স্থলপথে জলপথে খাইয়েছেনও বিস্তর।

মদের দোকানে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন অনেকক্ষণ। পরিচিত কাউকে দেখলে সন্তর্পণে ভিড়ে রুমালের মোড়ক খুলে একটুকরো পাতিলেবু দিতেন। বলতেন—বাবা, অবেলায় লিভারটার টুয়েলভ বাজিও না। এক কোর্শ মদ খাওয়ার পরই আমাদের বলতেন,—যা, কাঁচা জলে মুখ ধুয়ে আয়। সারাজীবন দাঁত শক্ত থাকবে। না হলে বুড়ো বয়েসে কি তোর হয়ে তোর ছেলে মুরগীর ঠ্যাং চিবুবে?

কোনো সময় চেয়ারে বসতেন না—বার স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একশো দেড়-শো দুশো-র মাপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ খেতেন তিনি। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন—সাজানো বোতলগুলোর সঙ্গে একটা এ্যাকিনেনেস ফিল করি, বুঝলি। তাছাড়া তুই দাঁড়িয়ে খেতে থাকলে নেশা হলে বড় জোর বসে পড়বি। কিন্তু প্রথমেই বসে খেতে শুরু করলে তোর শয়নে পদ্মনাভশ্চ ঠেকাবে কে?

বেপরোয়া, বেমক্কা, তেবিয়া টাইপের লোক ছিলেন তিনি। গড়ের মাঠের মত শখের প্রাণ নিয়ে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় তাঁকে ছোটাছুটি করতে দেখেছি কলকাতার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো। বিপদে-আপদে তাঁকে সব খুচ্চে বলেছি, কতবার ছল-ছুতো করে হাত পেতেছি। তাঁর কিছু গোপন খবর আমরা জানতাম, জানতাম তাঁর অশান্তির খবর। কিন্তু কোনো কিছুই জল ঢেলে দিতে পারেনি তাঁর ফুর্তির সব সময় জ্বলজ্বলে আগুনে। তাঁকে আমরা ডাকতাম লর্ড বলে।

শুধু একটা দুর্বলতার জায়গা ছিল তাঁর, আমাদের লর্ডের। সে-জায়গাটা তাঁর মেয়ে। একদিন হেদুয়ার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখি, বেথুন কলেজের গেটের এক-কোণে চোরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইতউতি লোকের নজর বাঁচিয়ে এধার-ওধার চাইছেন। আমি তখন পেকে পিপুল হয়ে গেছি একেবারে। জানতাম, তাঁর স্বভাব-চরিত্তির ঠিক যাকে বলে ধোয়া তুলসী পাতা, তা নয়। খানিকক্ষণ আড়াল দিয়ে দেয়ালের এককোণ থেকে ঠাহর রাখতে লাগলাম। একটু পরে ঢং ঢং ঘণ্টা বাজল। বাঁধ ভাঙা জলস্রোতের মত প্রশ্নপত্র হাতে বেরিয়ে আসতে লাগল কলকল-খলবল মেয়ের দল। দেখি আমাদের লর্ড ব্যাকুল নয়নে এ দিক-ওদিক তাকিয়ে, বাঘ যেভাবে টুঁ শব্দটি করতে না দিয়ে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেইভাবে একটি মেয়েকে প্রায় বগল-দাবা করে ভিড় কেটে এগিয়ে চলেছেন। বেশ ভারী, পুরুন্টু গড়ন মেয়েটির। এগোতে এগোতেই ব্যাগ খুলে বের করলেন সন্দেশের প্যাকেট, কমলা-লেবু। আদুরে বিল্লীর মত লর্ডের বুকে প্রায় মাথা ঠেকিয়ে মেয়েটি চাবুম চুকুম খেতে লাগল। সাহস করে দু'-পা এগিয়ে ওঁর প্রায় মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। হতচকিত মেয়েটির সন্দেশ তখন হাতে আধখানা, দাঁতে আধখানা। লর্ড শশব্যস্ত হাসি পড়লেন—আবে, তুমি...কি ব্যাপার...। তারপর নিঃসর্তভাবে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে খুব লাজুক গলায় কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন—এবার পার্ট ওয়ান দিচ্ছে... আমার মেয়ে, আমার মেয়ে গো!

শুনেছি, শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েকে ইলোপ করেছিল মদের দোকানে তাঁরই পরিচিত এক জকি। বম্বে পালিয়ে যায় দুজনে। থানা-পুলিশ' করেননি আমাদের লর্ড। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর। একটা ছেঁড়া ইভনিং সুট পরিহিত তাঁকে মাঝে মাঝে ঘুরতে দেখেছি বৌবাজারে, শেয়ালদায় ধর্মতলায়। কি জানি কেন, আমাকে দেখলেই ঠিক চিনতে পারতেন। এগিয়ে এসে নির্ঘাৎ ঐ একই কথা বারবার বলতেন আমাকে—বুঝলি, না বলে-কয়ে পালিয়ে গেল। আমি তো ঠিক এঁচে রেখেছিলাম, আমার জামাই করব তোকে। তা আর এ-কাঠামে হল না রে। বলতে বলতে ধীর পায়ে এগিয়ে যেতেন তিনি। তারপর যে-কোনো অল্পবয়সী ডাগর-ডোগর মেয়ে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠতেন— ঐ আমার মেয়ে...আমার মেয়ে গো!

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হাত বদল ॥

আনন্দ বাগচী

আমার চারদিকে আজ তোমরাই সফল মানুষ
ফানুস আতসবাজি সহসা নিওন-স্নাত ধর্মতলা
উঠে আসে স্বচ্ছবাস উচ্চহাস যুবক-যুবতী
টেরিলিন মসৃণতা সমস্ত সমাজে,
সুরঙীন চলচ্চিত্র হেঁটে যায় মেট্রোর তলায়
আমার চারদিকে আজ তোমাদের সফলতা ফলে
জাহাজী ঘড়ির কাচে চুরুটের আলো
চুলে ভাস্কর্যের ছায়া,
ক্ষুরধার ট্রাউজার্স-ক্রীজে কেউ গলা দিতে পারে,
আরণ্য জ্যোৎস্নার নিচে সুনয়না পক্ষ্মবিধুনন
নিম্নকোটি নৃত্যে কাঁপে অর্কেস্ট্রার আলোছায়া
হিমঘরের উজ্জ্বল গেলাস।
জন্মান্তরের মত শুল্ক ফাঁকি হাত বদল ঃ
ভালোবাসা প্রেম ভালোবাসা।।

পাখীর কাছে চেয়ে নাও ॥

নির্মল হালদার

কে তুমি ভাঙ্গা ঘরের অপেক্ষায়
যুবতী বাড়ীর ভাঙ্গা দরজা খোঁজো
ভয়ন্ত সুখ আছে চতুর্দোলায় চড়ে
পথ ছাড়ো—
হাওয়ারা বেসেছে ভালো আমাকে
তোমাকেও দেবে ফুলের আসর
মাটি খুঁড়ে
মমতার বীজ ছড়িয়ে—
তুমিও একটা বাড়ীর জন্য
পাখীর কাছে চেয়ে নাও খড় কুটো।

বিশ ফুট উঁচু থেকে ॥

তুলসী মুখোপাধ্যায়

বিশ ফুট উঁচু থেকে
কী রকম অমোঘ গলায় তুমি কথা বল,
ভালোবাসা
মন্ত্র হয়ে যায়

বিশ ফুট উঁচু মঞ্চে
তুমি কেমন হৃদপিণ্ডে ছোপানো ঘোষণা
আমাদের পাঁজর ফাটিয়ে ডেকে ওঠে দু হাজার বাঘ
নাভিমূলে উঠে আসে আগ্নেয় প্রপাত
দশ দিক স্বপ্ন হয়ে যায়

বিশ ফুট উঁচু মঞ্চে
তুমি কী নিপুণ যাদুকর!

দিন যায় রাত আসে রাত যায় দিন আসে
পৃথিবীর বুকের উপর সেই অবিকল বিরুদ্ধ পৃথিবী
কলকাতায় সেই নিরক্ষর পুরোনো কলকাতা
কম্বলবিহীন শীতে বস্তি সেরকমই কম্বলবিহীন
আর মড়কখোলার হাওয়া মড়কখোলার হাওয়া
অবিরাম ছুটে আসছে বদ্‌ড়ডানায়!

বিশ ফুট উঁচু থেকে
কী রকম অমোঘ গলায় তুমি কথা বল,
ভালোবাসা
মন্ত্র হয়ে যায়।

হিসেবের বাইরে / সুবন্ধু ভট্টাচার্য

কলেজে যাবার সময় আজও বুলা সমীরকে মনে করিয়ে দিল, আর কিন্তু পনেরো দিন মাত্র বাকি।

সমীর জানে বুলার এ-কথা বলার অর্থ কি। আর পনেরো দিন বাদে অর্থাৎ দশই ফাল্গুন তাদের বিয়ের দু-বছর পূর্ণ হবে। সমীরের এবং বুলারও ইচ্ছে যে সেই উপলক্ষে তারা কয়েকজন আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। গত বছর টুবলু হওয়ার সময় বুলা কয়েক মাস বাপের বাড়ীতে থাকায় বিবাহ-বার্ষিকী পালন করা সম্ভব হয়নি। এ-বছর বুলাই তাকে এক মাস আগে বিষেব তারিখ মনে করিয়ে দিয়েছে। ওরই খুব ইচ্ছে যে তাদের বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে সামান্য কিছু আয়োজন করা হোক। সমীরও তার কথায় আপত্তি করেনি। দু-বছর আগে দশই ফাল্গুন তাদের জীবনে যে পুলক কিসময় শিহরণ নিয়ে এসেছিল তার কিছুটা রেশ যদি এই বিবাহ-বার্ষিকী পালনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় তাহলে মন্দ কি?

বুলা অবশ্য বে-হিসেবী নয়। সে সমীরকে খুব একটা ঘটা করতে বলেনি। শুধু কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আর দু-একজন আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করতে বলেছে। কিন্তু তাতেও হিসেব কবে দেখা গেছে যে জনা কুড়ি-পঁচিশের কম হবে না। আর তাছাড়া সমীরের একটা বিশেষ পরিকল্পনাও আছে। অনেকদিন ধবেই বুলা একটা চিকের কথা বলছে। বিয়ের সময় বুলাকে তার বাবা নেহাৎ কে-টুকু গহনা না দিলে নয় তাই দিয়েছেন। তার বেশি দেবার সংগতিও তাঁর ছিল না। সমীরের বাড়ী থেকে বুলাকে হার আর চুড়ি দেওয়া হয়েছিল। বৌ-ভাতের সময় বুলা জিমটে আংটি ও একজোড়া কানের দুল পেয়েছিল। কিন্তু চিক পায়নি। অথচ বুলার অনেকদিনের ইচ্ছে চিক পবার। সমীরকে সে একাধিকবার বলেওছে। একালের মেয়েরা অবশ্য চিক পরে না। কিন্তু বুলার পছন্দ ওইরকমই। সে একটু সেকেলে ধরনের।

এবার সমীব বুলাকে শুধিয়েছিল, তুমি কী উপহার নেবে?

—তুমি যা দেবে তাই নেবো!

—তবু তোমার ইচ্ছেটা শুনি।

—ইচ্ছে তো অনেক কিছুই করে। কিন্তু তোমার আয়টাও দেখতে হবে তো!

—তাহলে বিবাহ-বার্ষিকীতে তুমি কোন উপহার নেবে না?

বুলা বলেছিল, নেবো না কেন? তুমি যা পারো তাই দিও।

—যদি বলি চিক দেবো। নেবে? সমীর মিটিমিটি হেসে বলেছিল।

—সত্যি দেবে? বুলা আনন্দে উচ্ছল হয়ে শুধিয়েছিল।

সমীর মাথাটা বাঁদিকে ঈষৎ হেলিয়ে বলেছিল, সত্যি।

—কিন্তু কী করে হবে? বুলা যেন ভেবে কূল পায়নি।—তোমার যা আয় তাতে এত খরচ করে কী করে পারবে?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। সমীর বুলাকে আশ্বস্ত করেছিল।

বুলা যেন সমীরের কথায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। সে সমীরের বুকের মধ্যে লেপটে গিয়ে বলেছিল, উহুঁ। আমি ভাবতেই পারছি না।

বুলাকে চিক দেওয়ার ইচ্ছেটা সমীরের অনেকদিনের। এতদিন পারেনি। এবার এই উপলক্ষে যদি বুলার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ করা যায়। অবশ্য খরচ অনেক বেড়ে যাবে। স্যাকরার কাছে সে খবর নিয়ে জেনেছে খুব কম সোনা দিয়ে চিক করলেও দেড়শো টাকার কমে হবে না। এখন নাকি সোনার দাম খুব বেশি। তার উপর কুড়ি-পঁচিশজন লোককে খাওয়াতেই বেশ কিছু খরচ হবে। ভরসার কথা এই যে, সমীরের কলেজ থেকে সরকারী ডি-এ বাবদ সাড়ে তিনশো টাকার মত পাওনা আছে। সেটা পাবে বলেই সে বুলার জন্য চিক গড়াতে দেবার কথা ভাবতে পেরেছে। না হলে কি আর সে এখন দেড়শো টাকা দিয়ে বুলাকে চিক দিতে পারত?

আজ যে বুলা মনে করিয়ে দিল তার কারণ সমীর কলেজ থেকে কবে টাকাটা হাতে পাবে তা জানতে পারেনি। অথচ টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। যাদের যাদের সে নিমন্ত্রণ করবে ভেবেছে, তাদেরও নিমন্ত্রণ করতে পারছে না। কে জানে যদি টাকাটা এখন নাই পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে? তখন লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে সে কি বিপদে পড়বে? বুলা তাই মনে করিয়ে দিল যেন সে আজ কলেজে গিয়ে খোঁজ করে টাকাটা কয়েক দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা।

সৌভাগ্যক্রমে সমীর সেদিন কলেজে পৌঁছেই খবর পেল যে, দিন চার-পাঁচের মধ্যে সে ডি-এ-র টাকাটা পেয়ে যাচ্ছে। সে অফিসে গিয়ে হেড ক্লার্কের সঙ্গে নিজে দেখা করে এল। টাকাটা পাওয়া সম্বন্ধে যখন সে নিশ্চিন্ত হল, তখন সে কলেজের দু-একজন ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক-বন্ধুকে নিমন্ত্রণও করে ফেলল। এমনকি সেদিন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে বুলাকে নিয়ে সাকরার দোকানে গিয়ে পছন্দ করে চিক অর্ডারও দিয়ে এল। পঞ্চাশটা টাকা এ্যাডভান্সও দিয়ে এল।

বুলা বলল, সংসারের টাকা থেকে খরচ করলে। যদি কলেজ থেকে টাকাটা না পাও।

সমীর তাকে অভয় দিয়ে বলল, ঠিক পেয়ে যাবো। তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে সমীর কলেজ থেকে টাকাটা পেয়ে গেল। টাকাটা হাতে পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হল। এতদূর এগিয়ে এখন যদি টাকাটা না পাওয়া যেত, তাহলে সে খুব বিপদে পড়ে যেত।

যে কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করা বাকি ছিল তা-ও সে করে ফেলল। বুলার সঙ্গে আলোচনা করে কী কী খাওয়াবে ঠিক করল। মাছ-মাংস দুই-ই খাওয়াবে ঠিক করল। খরচ একটু বেশি পড়বে হয়তো। তা না হয় হলই। আত্মীয়দের খুব বেশি নিমন্ত্রণ করল না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাই হল বেশি।

বিবাহ-বার্ষিকীর দুদিন আগেই সমীর স্যাকরার কাছ থেকে চিকটা নিয়ে এল। চিকটা নিয়ে সে বুলার হাতে দিয়ে বলল, পরে দেখো তো। তোমাকে কেমন মানিয়েছে দেখি।

বুলা লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, পরে পরবো।

সে সমীরের সামনে থেকে চলে যেতে চাইছিল। সমীর খপ করে তার ডান হাতখানা ধরে ফেলে বলল, উঁহুঁ। সে-কথা শুনছি না। তোমাকে এখনই পরতে হবে।

অগত্যা সমীরের পীড়াপীড়িতে বুলাকে চিকটা পরতেই হল।

সমীর দু হাত দিয়ে বুলাকে ধরে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, ফাইন। চিকটায় তোমাকে যা মানিয়েছে না, কী বলবো!

বুলাও যে সেটা বুঝতে পারছিল না তা নয়। তবু সে আলমারির আয়নায় নিজেকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, চিকটা কিন্তু বেশ করেছে। তাই না?

সমীর বলল, তুমি নিজে পছন্দ করে দিয়েছো। ভালো না হয়ে উপায় আছে?

—সবসুদ্ধ কত লাগল?

সমীর একটা ঢোক গিলে বলল, দেড়শো পাঁচ টাকা।

—তোমার জন্যে খরচ করে দিলুম।

সমীর বুলার কথাটা উড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে বলল, ওসব কথা এখন থাক। তুমি বরং আমার জন্য একটু চা করে নিয়ে এসো।

বুলা পাছে লজ্জা পায় সেজন্য সে এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিল না।

আর একটা দিন মাত্র বাকি। পরের দিনই দশই তারিখ।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরে সমীর মুদির দোকানের জিনিসগুলো কিনে রাখল। কাটা আনাজ বা মাছ মাংসটা পরের দিন সকালে কিনলেই চলবে। বুলা রান্নার ভারটা নিজেই নিয়েছে। তাকে সাহায্য করবে সমীরের বোন রুনু।

বুলা বসে বসে মসলাপাতিগুলো গুছিয়ে রাখছিল। আর টুকিটাকি মন্তব্য করছিল।

—এমা, এ কাটা দারচিনি এনেছে? গরমমশলায় লবঙ্গ কই?

সমীর জামা-কাপড় ছেড়ে একটা চেয়ারে বসে টুবলুকে আদর করছিল। সে বলল, ওতেই হবে। লবঙ্গ দারচিনির দাম কত জান না তো?

কথাটা বুলাকে বলার পর সমীরের মনে হল, আসলে সেও কি জানতো? আজ বাজারে কেনা-কাটা করতে গিয়ে সে জেনেছে। রোজকার বাজারটা ছোটভাই করে। তাই জিনিসপত্রের দাম সে কিছুই প্রায় জানে না।

এমন সময় সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠল।

সমীর রত্নাকে বলল, দেখ তো। কে এল।

রত্না দরজা খুলেই বলে উঠল, কাকু এসেছে।

কাকু অর্থাৎ হরেনবাবু সমীরের বাবার আপন ভাই। থাকেন টালিগঞ্জে। সমীরের বাবার মৃত্যুর আগে প্রায়ই আসতেন। এখন খুব কম আসেন।

এত রাতে হরেনবাবুর আসবার খবর পেয়ে সমীর একটু বিস্মিত হল। সে বুলাকে তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে ও-ঘরে যেতে বলল।

হরেনবাবু এ-ঘরে ঢুকতেই বুলা মাথায় ঘোমটা টেনে দিল।

সমীর চেয়ারটা হরেনবাবুকে ছেড়ে দিয়ে টুবলুকে নিয়ে খাটের উপর গিয়ে বসল। বলল, বসুন। হঠাৎ এত রাতে?

হরেনবাবু হাসলেন। কিন্তু তাঁর হাসিটায় সংকোচ মাখানো ছিল।

—তোর কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এলাম।

বিশেষ প্রয়োজন কথাটা শুনেই সমীর কিরকম আড়ষ্ট হয়ে গেল। এর আগেও দু-একবার হরেনবাবু বিশেষ প্রয়োজনে তার কাছে এসেছেন। প্রত্যেকবারই প্রয়োজনটা হয়েছে টাকার। হরেনবাবুর কেন জানি ধারণা হয়েছে যে অধ্যাপনা করে সমীর প্রচুর আয় করে। তাই যখনই তিনি বিপদে পড়েন তখনই সমীরের কাছে ছুটে ছুটে আসেন। তিনি নিজে একটা সওদাগরী অফিসে কেরানীর কাজ করেন। কিন্তু যা আয় করেন তা দিয়ে তাঁর সংসার চলতে চায় না। বিয়ে করেছেন বেশি বয়সে। ছেলেরা কেউই উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাঁকে এত রাতে আসতে দেখেই সমীরের সন্দেহ হয়েছিল। এখন তাঁর মুখে প্রয়োজনের কথা শুনে সে সিগারেট

গেল। বলল, প্রয়োজনটা কী যদি বলেন, তাহলে—

হরেনবাবু বিড়ি ধরিয়ে বললেন, হ্যাঁ বলছি। বলবো বলেই তো এসেছি।

বুলা সামনে থাকাতেই যে হরেনবাবুর সংকোচ হচ্ছিল তা সমীর বুঝতে পারল। বুলা তার স্ত্রী হলেও পরের ঘরের মেয়ে। তার সামনে সংসারের অভাবের কথাটা হরেনবাবু বলতে চাইছিলেন না। সমীরও সেটা বুঝল। সে বুলাকে বলল, অসকুর জন্য একটু চা করে নিয়ে এসো।

হরেনবাবু না-না করে উঠলেন। বললেন, এত রাতে আবার চা কেন?

—খাবেন তো একটু চা।

বুলাকে লক্ষ্য করে সমীর বলল, তুমি যাও তো।

বুলার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গিয়েছিল। সে থলিটা হাতে নিয়ে এ-ঘর থেকে চলে গেল।

বুলা চলে যেতেই সমীর এমনভাবে তাকাল যার অর্থ : এবার বলুন আপনার প্রয়োজনটা কী?

হরেনবাবু তখনও যেন সহজ হতে পারছিলেন না। বললেন—বৌদি কোথায়?

—মা ঠাকুরঘরে আছেন।

সমীর জানে হরেনবাবুর হঠাৎ তার মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ কি। সমীরের কাছ থেকে যে তিনি মাঝে মাঝে টাকা ধার নেন এটা তার মা জানুক তা হরেনবাবু চান না। অথচ মা তো সব কথাই জানতে পারেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তিনি হরেনবাবুর প্রতি প্রসন্ন নন। হরেনবাবু তা বোঝেন বলেই সমীরের মা-কে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন।

এখন এ-ঘরে কেউ আসুক বোঝাই যায় হরেনবাবু তা চাইছেন না। তিনি দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, রীণার বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

রীণা হরেনবাবুর বড় মেয়ে। তার বয়স এখন ষোল-সতেরো হবে। বিয়ের বয়স হয়তো তার হয়েছে কিন্তু সমীর ভেবে অবাক হল হরেনবাবু কোন ভরসায় মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন। সে যতদূর জানে তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য কিছুই জমান নি। জমাবার সঙ্গতিও তাঁর নেই। রীণার বিয়ে দিতে গেলে যে টাকাটার প্রয়োজন হবে, তা তিনি পাবেন কোথায়? কিন্তু সে-কথা সমীর বলে কী করে। তাই সে উৎসাহ দেখিয়ে বলল, তাই নাকি? ভালোই তো। পাত্র ঠিক হয়ে গেছে?

—তা একরকম ঠিক বলতে পারো।

—কোথায় ঠিক করলেন?

হরেনবাবু যেন বাজীজয় করেছেন এমন ভঙ্গি করে বললেন, পাত্র কালীঘাটে থাকে। আগে বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে বরিশাল জেলায়।

—কী করে?

—সরকারী চাকরি করে।

—লেখাপড়া কতদূর করেছে?

পূজা সংখ্যা মানেই **চিত্রপ্রভা** নয়
বেছে নিন
বাজারের সবচাইতে কম দামের
শারদীয়া সংখ্যা
সব চাইতে সেরা রচনায় সমৃদ্ধ

৫টি উপন্যাস : মদন ত্রয়োদশী-বিমল মিত্র • নতুন জ্যোৎস্না-জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী • সুখের ঠিকানা-আশাপূর্ণা দেবী • প্রেমে পড়েছে প্রিসিলা-শিবরাম চক্রবর্তী • দারুচিনিদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় •

একটি অসাধারণ হাসির গল্প র‍্যাটকিলার-বিমল কর • অন্যটি লিখেছেন-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনবদ্য রচনা-অন্য রবীন্দ্রনাথ-অমিতাভ চৌধুরী •
এছাড়া ১০টি গল্প ভিন্ন ভিন্ন রসের লিখেছেন দশ জন সেরা লেখক।

বোম্বাই এবং কলকাতার সিনেমার ছবি ও খবর যা অন্য পত্রিকায় থাকবেনা।
সুন্দর মুদ্রণ, পরিছন্ন লে-আউট এবং সেরা লেখা।
দাম মাত্র ৫ টাকা
সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বেরুচ্ছে

১০৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট **চিত্রপ্রভা** কলকাতা—৯

—বি-কম পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করতে পারেনি। আর তাছাড়া আমার মেয়েও তো বেশি লেখাপড়া করেনি। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছিল।

বুলা চা নিয়ে ঘরে ঢোকায় হরেনবাবুর কথা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে ঘর ছেড়ে চলে যেতেই তিনি আবার শুরু করেন তা সেই ব্যাপারেই তোমার কাছে এসেছিলাম। তোমরা আমার পাশে না দাঁড়ালে আমি তো ভরসা পাচ্ছি না।

সমীর যা অনুমান করেছিল ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে। সে তবুও না বলে পারল না, আমার আর কতটুকু সাধ্য বলুন—

—তোমাদের পাঁচজনের কাছ থেকে নিয়েই তো আমাকে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে।

সমীর হরেনবাবুকে একেবারে নিরাশ করতে পারল না। বলল, আচ্ছা ভেবে দেখব কী করা যায়।

হরেনবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, বাবা ভাববারও তো খুব বেশি সময় নেই।

—কেন? আপনি কি বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেলেছেন?

হরেনবাবুর মুখে কিরকম অপরাধীর হাসি ফুটে উঠল। বললেন, একরকম তাই বলতে পারো। শুধু আশীর্বাদটাই যা বাকি। আসছে পঁচিশে ফাল্গুন বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।

সমীর হিসেব করে দেখল মাত্র আর মাত্র ষোল দিন বাকি।

—এর মধ্যে সব যোগাড় করে উঠতে পারবেন?

হরেনবাবু চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, পারতেই হবে। এমন ভালো পাত্র যখন পাওয়া গেছে তখন হাতছাড়া করা কি উচিত হবে? তোমার বোনকে দেখতে কেমন তা তো তুমি ভালো করেই জানো। পাত্রের নিজের যখন পছন্দ হয়েছে তখন এ-সুযোগ ছেড়ে দিলে ভুল হবে।

সমীর চিন্তিতভাবে বলল, তা ঠিক। তবে—

—আর তবে-টবে নয় বাবা। আমি ঐ তারিখেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি। এখন তোমরা কী করতে পারো দেখো।

সমীর বলল, এখনই তো কিছু বলতে পারছি না। তবে আপনার প্রয়োজনটা কিরকম যদি জানান, তাহলে সে অনুযায়ী চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—প্রয়োজন তো আমার অনেক কিছুরই। বুঝতেই পারছ ধার-দেনা করেই বিয়ে দিতে হবে। তবে গয়নাটাই হল আসল সমস্যা। জানোই তো আজকাল সোনার দাম বেড়ে গেছে—

এমন সময় সমীরের মা এ-ঘরে ঢোকায় হরেনবাবু চুপ করে গেলেন।

তার পর আরও কিছুক্ষণ সমীরের মায়ের সঙ্গে কথা বলার পর হরেনবাবু উঠলেন। সমীর তাঁকে কিছুটা এগিয়ে দিয়েছিল। যাবার সময় আভাসে-ইঙ্গিতে হরেনবাবু তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তার কাছ থেকে একটা কোন সোনার গয়না আশা করেন।

সমীর বাড়ী ফিরল চিন্তিত মনে। হরেনবাবু আসার আগে পর্যন্ত তার মনটা খুব ভালো ছিল। কিন্তু তিনি সমীরের কাছ থেকে সব আনন্দটুকু যেন কেড়ে নিয়ে গেলেন। সে মহা ভাবনায় পড়ে গেল। হরেনবাবু তার কাছে অনেক আশা নিয়ে এসেছেন। একদা তারা যখন যৌথ পরিবারে থাকত, যখন হরেনবাবু বিয়ে করেননি, তখন তিনি তাদের খুবই স্নেহ করতেন। বিশেষ করে সমীরকে তিনি খুবই ভালোবাসতেন। তার কোন আবদার তিনি না মিটিয়ে পারতেন না। সমীরের ভাই-বোনেদের মধ্যে সেই হরেনবাবুর স্নেহ বেশি পেয়েছে। তিনি যদি তার কাছে কিছু আশা করেন, তাহলে সে কি তা না মিটিয়ে পারে? অথচ মুসকিল হল রীণার বিয়ের আর ষোল দিন মাত্র বাকি। এখন তার কলেজ থেকে কোন পাওনাই নেই। যে কটা টাকা তার পাওনা ছিল তার সবটাই বিবাহ-বার্ষিকী উপলক্ষে খরচ হয়ে যাবে। অথচ রীণার বিয়েতে সে যদি একটা কিছু না দেয় তাহলেও খুব খারাপ দেখায়। হরেনবাবু তার কাছে অনেক কিছু আশা করেন। তার সবটাই হয়তো সমীরের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তত পক্ষে কিছুটা না মেটালে খুবই অন্যায় হবে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও কথাটা প্রচারিত হতে দেরী হবে না।

সেদিন রাতে সমীরের ঘুম আসছিল না। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পর পর দুটো সিগারেট খেল। কয়েকবার এপাশ ওপাশ করল। কিন্তু ঘুম এল না। সংসারের কাজ-টাজ সেরে বুলা যখন শুতে এল তখনও সে জেগে। বুলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা থেকে চুলের কাঁটা বার করতে করতে বলল, ঘুমোওনি?

সমীর একটা হাই ছেড়ে বলল, আসছে না।

—রীণার বাবা কেন এসেছিলেন?

—রীণার বিয়ে দেবেন।

—কবে?

—পঁচিশে ফাল্গুন।

—ওমা, তাহলে তো একদম সময় নেই।

সমীর শুধু মুখ দিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, হুঁ।

বুলা আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুল। মাঝখানে টুবলু ঘুমোচ্ছে। দু পাশে সমীর এবং বুলা।

—তোমার কাছে কি জন্যে এসেছেন?

সমীর কথাটা বুলাকে বলবে কিনা অনেকক্ষণ ভাবল। শত হলেও হরেনবাবু তাদের কাকা। তার বাবার ছোট ভাই। সুতরাং তার বিপদ-আপদের কথা বুলাকে বলা ঠিক হবে কিনা সে কিছুক্ষণ ভাবল। পরে মনে হল বুলার কাছে তার কিছু গোপন করা উচিত নয়। বরং এ ব্যাপারে তার পরামর্শই নেওয়া উচিত।

—এসেছিলেন অবশ্য একটা উদ্দেশ্য নিয়েই।

বুলা বলল বুঝেছি।

—কী বুঝেছ বলতো?

—তোমার কাছে কিছু টাকা চাইতে এসেছিলেন এই তো?

—না, ঠিক টাকা নয়। তবে—

—তবে কী?

—কাকুর ইচ্ছে আমি রীণাকে একটা গয়না দিই।

বুলা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বলল, তা তুমি কী বললে!

—কী আর বলব? বললাম ভেবে দেখি।

—ভেবে কিছু পেলে?

—নাঃ। ভেবে তো কিছুই পাচ্ছি না। কলেজ থেকে যে টাকাটা পেলাম তাও তো খরচ হয়ে গেল। এখন আবার টাকা পাই কোথায়? একটা গয়না দিতে গেলে তিনশে-চারশো টাকার কম হবে না। সে টাকাটা পাই কোথায়? অথচ কাকু আমার উপর অনেকখানি ভরসা করে আছেন।

বুলা কিছু বলল না। চুপ করে রইল।

—কলেজ থেকে যে টাকা ধার নেব তারও উপায় নেই। টুবলুর অন্নপ্রাশনের সময় প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যে টাকাটা ধার নিয়েছিলাম তারই এখনও অর্ধেক শোধ হয় নি। মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে কাটছে। কারোর কাছ থেকে যে টাকা ধার নেব তারও উপায় নেই। শুধবো কী করে?

বুলা সমীরকে অনেকটা আশ্বাস দেবার ভঙ্গীতে বলল, যা হোক একটা কিছু হবে। তুমি অত ভেবো না তো। বরং এখন ঘুমিয়ে পড়ো।

সমীর বলল, ঘুমোবার চেষ্টা তো করছি। কিন্তু ঘুম আসছে না।

সে ভাবল, কাল তার বিয়ের দু-বছর পূর্ণ হবে। দু বছর আগে কোথায় ছিল বুলা আর কোথায় ছিল সে। তখন বুলা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে যে তার বিয়ে হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। তখন সে ছিল খরুচে, মেজাজী, আড্ডাবাজ। বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরা তার কাছে ধার চেয়ে কখনো শূন্য হাতে ফিরে যায় নি। অনেকেই সে সব ধারের টাকা শোধও করে নি। তখন তা খুব গায়েও লাগে নি। কিন্তু এখন সে বিবাহিত। এখন সে সন্তানের পিতা। এখন কি আর তার বে-হিসেবী খরচ করলে চলে? এখন তার উপর গোটা সংসারটাই নির্ভর করছে।

বুলার জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে তার মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেও ঘুমোবার চেষ্টায় পাশ ফিরে শুল।

পরের দিন বিবাহ-বার্ষিকী ভালো-ভাবেই পালিত হল। সমীর যাদের যাদের নিমন্ত্রণ করেছিল প্রায় সবাই এসেছে। রাত্তিরেই খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। দিনের বেলা আর ঝামেলা রাখা হয় নি। বাধ্য হয়েই তাকে সেদিন কলেজ কামাই করতে হল।

বন্ধু-বান্ধবরা কেউ কেউ কিছু কিছু উপহারও নিয়ে এসেছে। কেউ এনেছে ফুল, কেউ এনেছে বই, কেউ বা অন্য কিছু।

সমীর বলেছে, এ সব আবার কেন?

বন্ধুরা কিছু বলে নি। কিন্তু বোঝা যায় তারা খালি হাতে আসতে সংকোচ-বোধ করেছে।

সমীরের কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপক চ্যাটার্জি খুব রগচটে স্ফূর্তিবাজ প্রকৃতির লোক। সমীরের চেয়ে বয়সে একটু ছোটই হবে। সে বুলাকে আগে দেখে নি। সমীর তার সঙ্গে বুলার আলাপ করিয়ে দিতেই সে বলল, আপনাকে দেখে কিন্তু মনেই হয় না যে, আপনার দু বছর আগে বিয়ে হয়েছে। মনে হয় আজই আপনার ফুল-শয্যা।

মুহূর্তে বুলার মুখটা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে।

নিমন্ত্রিতদের একে একে বিদায় দিয়ে তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে ওরা দুজনেই ক্লান্ত ছিল। তবু ফুলের গন্ধে, সেন্টের গন্ধে সমীরের মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই আজ তাদের ফুল-শয্যা। বুলাও আজকে খুব সুন্দরভাবে সেজেছিল। আজ সে দু-একটা গয়নাও পরেছিল। কিন্তু সমীর লক্ষ্য করেছিল যে, বুলা আজ একবারও চিকটা পরে নি। বুলার এই অদ্ভুত ব্যবহারে সমীর খুব বিস্মিত হয়েছিল। আজকের উৎসব উপলক্ষেই তো চিকটা সে বুলাকে উপহার দিয়েছে। অথচ বুলা একবারও চিকটা পরল না। বুলা কি কৃপণের মত চিকটা জন্মের মত রাখতে চায়? পরলে কি চিকটা ক্ষয় যাবে? সে কতবার বুলাকে চিকটা পরতে বলেছে। কিন্তু বুলা প্রত্যেকবারই একটা-না-একটা ছুতো করে এড়িয়ে গেছে। সমীর তাই মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

রাত্রে শুতে এসে বুলা শুধোল, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

—নাঃ। রাগ করবো কেন?

সমীর কথাটা বলল বটে কিন্তু সে যে অভিমান করেছে তা বুলা বুঝতে পারল।

—শোনো। তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।

সমীর জিজ্ঞাসু চোখে বুলার দিকে তাকাল।

—রীণার বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?

—নাঃ। আজ সারা দিন যা খাটুনি গেল। ভাববার আর সময় পেলাম কই।

—তুমি যদি রাগ না কর তাহলে একটা কথা বলবো।

—কি কথা?

বুলা সমীরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, রাগ করবে না বল।

সমীর এবার হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা বাবা রাগ করবো না—হলো তো?

—আমি বলছিলাম কি রীণার বিয়েতে তুমি আমার চিকটা দিয়ে দাও। একটা গয়না তো দিতেই হবে।

সমীর কঠোর দৃষ্টিতে বুলার দিকে তাকাল।

বুলা কিন্তু দমল না। সে বলে চলল, এখন তো তোমার হাতে টাকা নেই। এখন তুমি ওটা দিয়ে দাও।

সমীর বিস্মিতভাবে বুলার দিকে তাকাল। বুলা যে এভাবে সমস্যাটার সমাধান করে দেবে তা সে ভাবতে পারে নি। কিন্তু বুলার প্রস্তাবে সে সায় দিতে পারল না। বলল, ধেৎ তা হয় না—

—কেন হয় না?

—হয় না বলেই হয় না।

বুলা জেদীর মত বলল, কেন হয় না বলবে তো।

—আমি ওটা তোমার জন্যই গড়িয়েছি। রীণার জন্য নয়।

—বেশ আমিই না হয় ওটা রীণাকে দিলাম। তাহলে হবে তো?

—কিন্তু তোমার জিনিস তুমি দেবে কেন? তোমার একটা গয়না গেলে আর হবে?

—তুমিই বা এখন টাকা জোগাড় করবে কি করে?

বুলার প্রশ্নটা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। এর উত্তর সমীরের জানা নেই। কিন্তু বুলার জন্য যে চিকটা সে গড়িয়েছে সেটা রীণাকে দিতে কোথায় যেন তার বাধছে।

বুলা সমীরের হাতদুটো ধরে বলল, শোনো পাগলামি করো না। চিকটা এখন দিয়ে দাও। পরে কখনও যদি সুযোগ হয় আবার আমাকে গড়িয়ে দিও।

সমীর জানে সংসারের যা অবস্থা তাতে বুলাকে সে অদূরভবিষ্যতে চিক গড়িয়ে দিতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

—আমার জিনিস নিতে তোমার আপত্তি আছে?

বুলা করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

সমীর দু-হাত দিয়ে বুলার মুখটা ধরে বলল, তোমার কষ্ট হবে না?

—একটুও না।

বুলা কথাটা বলল বটে কিন্তু সমীরের মনে হল ওর চোখের কোণে কি যেন টল-টল করছে।

—এবার শারদীয়া পূজায়—
নূতন পূর্ণাঙ্গ নাটক
[অফিস ক্লাব ও বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় উপযোগী]
কিরণ মৈত্রের
চৌপর বদলে হ'লো 8-00
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে 8-00
ডাইভোর্স 2-50
সিটি বুক এজেন্সী
৪৪।১সি বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

কথায় কথায়

আমার শরীরের বহু জায়গায় ছোট-বড় কালো চাকাচাকা দাগ আছে। আগুনে পুড়ে ছ্যাঁকা লাগলে যে রকম হয়, এই দাগগুলো অনেকটা সেই রকমের, তাই স্বভাবতই বহুজনের ধারণা এবং কেউ কেউ রটনাও করে থাকেন যে একদা আমি এক এমন অসামাজিক গর্হিত কাজ করেছিলাম যার জন্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ধরে আমার শরীরের নানা অংশে ঐ রকম আগুনে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিয়ে আমাকে একেবারে মার্কামারা করে দেন।

আমার সেই গর্হিত কাজটি সত্যি কি, এ বিষয়েও কারো কারো যথেষ্ট কৌতূহল আছে এবং অনেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করেন আমার শরীরের এই কালো চাকা-চাকা ছোপগুলি আমার জন্ম থেকে কিনা?

প্রথমেই আমার বিনীত ভাবে জানানো উচিত যে না এই দাগগুলি, এই কালো চাকাচাকা ছোপগুলি আমার জন্মগত নয়, আমি চিতাবাঘ বা হরিণ নই, আমি মানুষ।

এটুকু বলেই যদি শেষ করতে পারতাম তাহলে খুবই সুখের হতো, কিন্তু ছোপগুলো আমার জন্মগত নয় একথা বলার পর নিজ দায়িত্বেই আমার ব্যাখ্যা করা উচিত এর উৎপত্তির কারণ।

আসলে এই সচিত্র শরীর যদিও জন্মগত নয় কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। আমার এক পরমপূজনীয় খুল্লতাত এর জন্যে দায়ী। কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন তিনিই আমার কোনো অন্যায় কর্মের জন্য আমার দেহে এই রকম ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা সেরকম নয়। আমার সেই খুল্লতাত ছিলেন অত্যন্ত নিরীহ এবং মহানুভব প্রকৃতির লোক। কোনো ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে, তা সে যে কোনো কারণেই হোক, এই রকম নির্দয়, নিষ্ঠুর ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড পরিকল্পনাপ্রবণ কর্মযোগী।

নিজের হাতে একটি সাবানের কারখানা স্থাপন করেছিলেন তিনি আমাদের বাড়ির রান্নাঘরের ঠিক পিছনে। এই কারখানায় সাবান তৈরীর পদ্ধতি একটু আলাদা রকমের ছিলো। মূল ঘটনায় প্রবেশ করার আগে একটু বিস্তারিত বলে রাখি।

আমার এই খুল্লতাত, ফুলকাকা, সেই আমলের বাইশ টাকা খরচ করে বিলেত থেকে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ আনিয়েছিলেন, বইটির নাম 'আয়ুর্বেদিক সাবান তৈয়ারীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'। বিলেতে বহু পাগল-সাহেব আছে, নিঃসন্দেহ তাদেরই একজনের লেখা। ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র এবং আধুনিক রসায়নবিজ্ঞান দুটিকে একত্র করে যে ধরনের গবেষণা সচরাচর দেখা যায়, এ তার থেকে একেবারে আলাদা, অসম্ভব রকমের মৌলিক।

এই বই ডাকে পাওয়ার পর সাত দিন ফুলকাকা দরজা জানলা সব বন্ধ করে খুব মনোযোগ দিয়ে আগাগোড়া দাগিয়ে দাগিয়ে সব পড়লেন। লম্বা লম্বা খাতায় কাঁটা-কম্পাস-স্কেল দিয়ে নানারকম আঁকজোক করলেন। অবশেষে আমার ডাক পড়লো, আমার উপর খুবই ভরসা ছিলো তাঁর। আমি তখন স্কুলের উঁচু ক্লাশে পড়ি, আমাকে ডেকে ফুলকাকা বড় যোগ আর গুণ ভাগ করতে লাগিয়ে দিলেন। তিন চার দিন অসম্ভব রকম পাটিগণিতিক পরিশ্রম করবার পর আমি কোনো রকমে অঙ্কগুলির উত্তর করতে পারলাম।

প্রথম অঙ্কের উত্তর হলো ৫৬০০ বানানা ট্রি (কলাগাছ)। দ্বিতীয় অঙ্কের উত্তর ষাট মণ কয়লা, তৃতীয় অঙ্কের ফল বেরুলো আড়াই হাজার নারকেল ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ফুলকাকা খুব মনোযোগ দিয়ে অঙ্কটা দেখলেন। তারপর একদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া করে বেরিয়ে পড়লেন সাইকেল চড়ে। ফিরলেন প্রায় এক সপ্তাহ পরে পিছনে কয়েকশো গরুর গাড়ি আর সেগুলির প্রতিটিতে রাশিকৃত কলাগাছ। বলাবাহুল্য সে-বছর আমাদের জেলাতে কলার আকাল পড়েছিলো এবং অসংখ্য বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিলো কলাপাতার অভাবে, আমাদের ওদিকে শালপাতা ছিলো না, মাটির থালাও ছিলো না।

যাই হোক কলাগাছগুলি এসে যাওয়ার পরে সেগুলিকে আমাদের সেই পুরনো বাড়ির চওড়া ছাদে ছড়িয়ে দেওয়া হলো রোদে শুকানোর জন্যে। আমার ঠাকুর্দা কাছারি থেকে ফিরে এসে চিৎকার করতে লাগলেন, ছাদ ভেঙে যাবে বলে' কিন্তু কে কার কথা শোনে তার ঐ পাহাড়প্রমাণ জিনিস আবার ছাদ থেকে নামানোও কম কথা নয়।

ফুলকাকা আগেই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই বরিশাল থেকে দুই নৌকো নারকেল এসে পৌঁছালো। সেগুলোকে বস্তা করে ছোবড়া ছাড়িয়ে শাঁস বের করে রাখা হলো। এরপর আমাদের ভিতরের তরকারির বাগানে ষাটমণ কয়লার উপযুক্ত উনুন খোড়া হলো এবং একদিন সত্যি সত্যি সেটায় অগ্নিসংযোগ করা হলো।

ইতিমধ্যে ছাদের উপর কলাগাছগুলি শুকিয়ে এসেছে, আমার মা-কাকিমারা সবাই বাপের বাড়ি চলে গেছেন এবং প্রতিদিন দলে দলে লোক আমাদের এই এলাহি কারবার দেখতে আসছে।

কলাগাছ, নারকেল ছাড়াও আরো অনেক ছোটখাট জিনিস ওষুধ, এ্যাসিড ইত্যাদি কাকাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিলো। এইসব একত্র করে নারকেলগুলির সঙ্গে মিশিয়ে, চারটে করোগেট টিন তালি দিয়ে তৈরী একটা বড় কড়ায় গনগনে আগুনে চড়িয়ে দেওয়া হলো। তারপর শুকনো কলাগাছগুলি আস্তে আস্তে সেই কড়ায় তুলে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলো, এত ধোঁয়া এবং আগুনে কয়েকশো কলাগাছ শেষ পর্যন্ত কড়াতে চাপানো গেলো না। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পরে ধোঁয়া কাটলো তখন সেই উনুনের কাছে গিয়ে দেখা দেখা গেলো ছোটো একটা গোল রবারের বলের মত কড়ার মধ্যে কি যেন পড়ে রয়েছে। অত কলাগাছ, নারকেল সব ধোঁয়া হয়ে গিয়ে কি করে এইটুকু একটা জিনিসে পরিণত হয়েছে, সে রহস্যের কোনো সমাধান নেই।

কিন্তু ফুলকাকা সে বলের মত জিনিসটা পেয়ে খুব খুশি, 'এই হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাবান, এইটুকু তৈরী করতে নশো টাকা লেগেছে।' তারপর আমার হাত ধরে বললেন, চল্ এটা গায়ে মাখবি।' এর পরের ঘটনা অতি সামান্য। ঐ সাবান গায়ে মাখামাত্র আমার শরীরের মধ্যে কি একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে যায়, আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই, তারপরে জ্ঞান ফিরে আসার পর থেকে দেখছি সারা গায়ে কালো ছোপ ছোপ দাগ, আজও উঠলো না। হয়তো সাবান মাখতে পারলে উঠতো। কিন্তু ঐ ঘটনার পর আমি আর গায়ে সাবান মাখিনি; যত ভালো, যত সুগন্ধি সাবানই হোক দেখলেই বুক কেঁপে উঠে।

—তাম্রাপদ রায়

নতুন বই

সাবধান! সি আই এ : প্রদ্যোৎ গুহ. প্রকাশক চলতি দুনিয়া প্রকাশনী, ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২, মূল্য ৬ টাকা।

চাবাট অক্ষর নিয়ে বানানো সি আই এ কথাটি আজ যেমন মাঠে ঘাটে, ট্রামে বাসে সাধারণ মানুষ বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করেন, তেমনটি অন্য কোন বিদেশী শব্দ-প্রতীক অতীতে করেছেন কিনা সন্দেহ। এর প্রয়োগ-বিধি অবশ্য সীমিত থাকে গালাগালি দেবার প্রয়োজনবোধের উপর।

সি আই এ বি. কাদের দ্বারা পরিচালিত এবং কোন কারবার হাসিল করতে ব্যস্ত, লেখক বেশ পরিশ্রম করে বিশ্বাসযোগ্য পত্র পত্রিকায় যে সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা জোগাড় করে বইতে জমা করে বুঝিয়েছেন। এ সংকলনের কাজ লেখক ধীর ও মন্থর গতি-তেই চালাচ্ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টির উপর তাঁর মত ব্যক্ত করাতে লেখক আর বালক্ষয় না করে তাঁর সংকলন পাঠকদের কাছে পেশ করেছেন। যে সব পত্র পত্রিকা বা বই প্রামাণ্য বলে তিনি গ্রহণ করেছেন তার নব্বই শতাংশেরও বেশীর উৎপত্তিস্থল হল মার্কিন-রাজ্য, যাদের রাষ্ট্রের অন্যতম সংস্থা এই সি আই এ সেন্ট্রাল ইন-টেলিজেন্স এজেন্সির সংক্ষেপিত নাম)।

রামায়ণের রামচন্দ্র থেকে আফগানি-স্থানের সর্দার দাউদ পর্যন্ত যে সব ধরণের গোয়েন্দা নিযোগ করে এসেছেন আপন রাজ্য বা পর-রাজ্যের গোপন তথ্য যোগাড় করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, সি আই এ তাদের কার্বন কপি নয়। এরা পররাজ্যে (ওয়াটার গেটের উল্লেখ বইতে নেই) কেবল ভিন্নভেদ নয়, প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রবিপ্লবও ঘটাতে সাহায্য করে থাকে। ভারত-বর্ষ তাদের একতিয়ারের বাইরে নয়। বইতে এবং পরিশিষ্টে দলিল মারফতে সে সব তথ্য দেওয়া আছে, তা পড়লে বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করতে হয়। আমেরিকান রাষ্ট্র-সচিব অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন—যদিও তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হয়।—যে এ দেশের অনুরূপ সি আই এ ঘটবে না।

লেখকের এই সংকলন সাধারণ আপা-মরের অবশ্যই পাঠ্য। কিন্তু তিনি বইয়ের যে টাইটেল দিয়েছেন হুঁশিয়ার করে, তার সার্থকতা কোথায়?

অতীতে সি আই এ যা করেছে নানা দেশে, বইতে দেওয়া সে বিবরণী পড়লে এদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটু ধারণা করা সম্ভব। কিন্তু 'সাবধান' বা হুঁশিয়ার কেবল ভবিষ্যৎ নিয়ে। কোন্ লক্ষণ দেখলে বা শুনলে তার পেছনে সি আই এ-র গোপন হাত কাজ করছে, বুঝতে পারব? লেখক জানিয়েছেন, 'যার কাছ থেকে খবর পাওয়া যেতে পারে সি আই এ সাধারণতঃ এমন ব্যক্তির দুর্বল স্থানটি খুঁজে বের করে।' এতো হোল সি আই এ-র-অ্যাপ্রোচ, কিন্তু সাধারণ মানুষ কি করে এদের ষড়যন্ত্রের আঁচ করতে পারবে? বিষয়টির উপর কোন ইঙ্গিতই দেওয়া নেই, বোধহয় দেওয়া যায় না। কেবল ইউ এস আই এস বা ভয়েস অফ অ্যামে-রিকার সঙ্গে যোগাযোগ বা মাখামাখি দেখলে সি আই এ এজেন্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা, এ ধারণা বাতিকগ্রস্তের লক্ষণ বলে মনে হবে। যে সব পত্র পত্রিকাকে লেখক প্রামাণ্য বলে ধরেছেন, তাদের প্রতিনিধিরা তো হামেশা ঐ সব প্রতিষ্ঠানের মারফত এ দেশীয়দের সঙ্গে মোলাকাত করে থাকেন।

কয়েকমাস আগে এক প্রবীণ আমেরিকান সস্ত্রীক এসেছিলেন কলকাতার প্রেস ক্লাবে। ভদ্রলোক সাংবাদিক নন, যারা সে বৃত্তি গ্রহণ করে, তাদের শিক্ষা দেন। অনেক পেশাগত কথা উঠল, বিশেষ করে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের স্বাধীনতা নিয়ে। প্রশ্ন করেছিলাম, কোন আমেরিকান সাংবাদিক যদি ভিয়েৎনামের (তখন যুদ্ধ চলছিল) যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের মিলিটারি অপারেশনের প্ল্যান পূর্বাহ্নে জানতে পারে, তবে কি তা প্রকাশ করতে

প্রকাশিত হলো! **জনপদ ৬**

অ্যাল্‌ফা-বিটা পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক

প্রফুল্লকুমার সিংহের

নতুন উপন্যাস

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ

হেনা চৌধুরী (পুরস্কারপ্রাপ্ত) ১০৲

অজানিতার সন্ধানে : গর্ডন ডিকসন

(অনুঃ আদিত্য ভট্টাচার্য) উপন্যাস ৪·৫০

কেটে যাবে মেঘ : ডঃ অসীম বর্মন ২·৫০

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস্ লিঃ

৫৫-১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী-১৩৮০

সম্পাদক : অশোক কুণ্ডু। ১৫·০০

বর্তমান ১২১৯ জন সাহিত্যিকের নাম, ছদ্মনাম, জন্ম তাং—ঠিকানা ও উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ, যাবতীয় সাহিত্য-পুরস্কার-প্রাপকের তালিকা, সাহিত্য-সম্মেলন-পরিচিতি, ১৩৭৯ সালে অনুষ্ঠিত সাহিত্যসভার বিবরণ ও ঐ সালে পরলোকগত সাহিত্যিকদের জীবনী, গ্রন্থপরিচয়, পত্রিকা-পরিচিতি বিভাগে—বিশেষ সংখ্যা—প্রথম সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যাগুলির নাম-ঠিকানা, ১৩৭৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা গবেষণার তালিকা।

নিম্নলিখিত প্রবন্ধসহ :—

১। রামমোহন ও বাঙালীর আধিমানসিকতা/ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যচর্চা/সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী/শুভ্রসত্ত্ব বসু।
৪। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী/ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত।
৫। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৬। শশাঙ্কমোহন সেন/সনৎ গুপ্ত।
৭। সরলা দেবী/সোমেন্দ্রনাথ বসু।
৮। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়/স্বপন বসু।
৯। চিন্তাহরণ চক্রবর্তী/ডঃ প্রফুল্লকুমার পাল।
১০। ভেরা নভিকভা/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
১১। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী/সনৎ মিত্র।

ছবিসহ ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ

ভারতী বুক স্টল ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

পারে? ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন, সে কি কথা! ওতো সিকিউরিটির ব্যাপার,, সাংবাদিক তা জানতেই বা যাবে কেন, আর প্রকাশ করতে চাইবে কেন?

পাশে এক ভারতীয় সাংবাদিক ছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন, সিকিউরিটির নাম করে অনেক সরকার আপনাদের অসারত্ব ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে থাকে।

এই যে পৃথক এবং প্রায়-উল্টো দৃষ্টি-ভঙ্গী দুটি লোকের একই বিষয়ের উপর, এর মধ্যেই মনে হয়, কোন ক্ষেত্রে সি আই এ তার এজেন্ট সহজে খুঁজে পায় বা পায় না তা আঁচ করা সম্ভব। আমেরিকানদের সঙ্গে মিললেই সি আই এ এজেন্ট বলে না, এজেন্ট তাদেরই হবার সম্ভাবনা যারা স্বদেশে বা স্বাজাত্যাভিমান সম্পর্কে যথোপযুক্ত মূল্যায়ণ করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম।

শ্রীগুহের বইটি পড়লে যে প্রত্যেক দেশ-ভক্ত ভারতীয়ই সি আই এ সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন হবেন তাতে সন্দেহ নেই।

বইটির ভাষা সুন্দর, ছাপা বাঁধাই ভালো।

—কালীপদ বিশ্বাস

অন্য নদী : রাজশেখর দত্ত। সপ্তম পাবলিশার্স। ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন। কলকাতা-৬। দাম : আট টাকা।

উপন্যাসে পটভূমির গুরুত্ব অনেকখানি, এবং পটভূমি যদি যুদ্ধক্ষেত্রের হয় তাহলে গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যদি একান্তই কাল্পনিক হয় তাহলে যা ঘটা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে 'অন্য নদী' উপন্যাসের ক্ষেত্রে। খুবই কৃত্রিম মনে হয়েছে লিলি এবং ক্রিবিয়ার অনুরাগ অভিমানের সাধারণ কাহিনী যুদ্ধের পটভূমিতে অসাধারণ মহিমা কিছু লাভ করেনি শেষ পর্যন্ত। 'তারপর?'—এই জিজ্ঞাসায় উপন্যাস শেষ করেছেন লেখক। উপন্যাস পাঠ অন্তে পাঠকের অন্তঃকরণে কিন্তু কোন বিরাট জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয় না।

তবে রচনাটির মধ্যে এক ধরণের গতি আছে এক শ্রেণীর পাঠককে যা আকর্ষণ করতে পারে। আকর্ষণের কারণ মহৎ হবে এটাই কিন্তু সৎ পাঠকের কাম্য।

শেষ প্রহরে শান্তি : শিশির লাহিড়ী। রামায়ণী প্রকাশ ভবন। ১০৬।২, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা-৯। দাম : আট টাকা।

শিশির লাহিড়ী আধুনিক বাংলা ছোট-গল্পের একজন সুপরিচিত লেখক। 'শেষ প্রহরে শান্তি' একটি উপন্যাস, সম্ভবত -লেখকের প্রথম উপন্যাস।

আজকের নৈরাশ্যপীড়িত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবন এই উপন্যাসের বিষয়। পারিবারিক জীবনে ব্যর্থতাজনিত নৈরাশ্য দিননাথের জীবনবোধকে পংগু করেছে, তারপর অসুখের পর মানুষ আরোগ্য লাভ করে যেমন, দিননাথের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে, সুস্থ জীবনের কিনারায় পৌঁছতে পেরেছেন দিননাথ। দিননাথের ব্যর্থতাবোধ, বেদনা, যন্ত্রণা পাঠকের হৃদয়ে সহজেই সঞ্চারিত হয়। সুমিত্রার ব্যর্থ জীবনের আলেখ্যও উপন্যাসের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে—পাঠকের হৃদয়ের অনেকখানি জায়গাও সুমিত্রাদেব জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। যথার্থই একটি চিরকালের আবেদন আছে 'শেষ প্রহরে শান্তি'তে। দুটি পংগু জীবনের উত্তরণের কাহিনী, যার মধ্যে দিয়ে সুস্থ জীবনবোধের প্রতি লেখকের দৃঢ় প্রত্যয়ও প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ও শ্রীমা সারদার অষ্টোত্তর শতনাম—ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ। প্রতিটি পুস্তিকার মূল্য চল্লিশ পয়সা।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের আলোকে পুস্তিকা দুটি রচিত। উভয় পুস্তিকায় একশ আটটি নামের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার অপরূপ লীলার অমৃতময় আস্বাদ পাওয়া যায়। এই পুস্তিকায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের তৎকালীন লীলা সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণের অনেক পরিচিতি আছে। নামগুলি যে রূপ সুন্দরভাবে আরোপিত হয়েছে, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধীয় পুস্তিকাবলী বিষয়ে লেখকের গভীর জ্ঞান ও ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠক পাঠিকা নিত্যপাঠে প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন। এই রকম পুস্তিকার প্রয়োজন ছিল। প্রচ্ছদ পট ও মুদ্রণ সুরুচির পরিচয় দেয়।

পূরক : শ্রীফণীভূষণ পাল। প্রকাশক : বুকস এন্ড বুকস, ৬০১, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪। মূল্য—৪-২৫ পয়সা।

ব্রহ্মই ব্রহ্মের পূরক। শ্রীফণীভূষণ পালের 'পূরক' বইটির বিষয়বস্তুই ব্রহ্মবাদ। এই তত্ত্বের আলোকেই বইটির নামকরণ 'পূরক'। লেখকের অদ্বৈতবাদী চিন্তা ব্রহ্মের স্বরূপ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি এই গ্রন্থে আলোচিত। কাহিনী একটি আছে, কিন্তু তা শুধু মাত্র তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সহজ সরল ও ঔপন্যাসিকের তুলিতে লেখক একটি গভীর তত্ত্ব পাঠকসমাজের কাছে বোধগম্য করে তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়িকা রাণী তার স্বামী নায়ক নিমাইকে তার পূর্বজন্মের ইতিহাস বলেছে। সেটাই কাহিনী। এই নিমাইই রাণীর পূর্বজন্মের প্রেমিক আনন্দ। কি করে আনন্দের মৃত্যু হয়েছিল, কেমন করে আনন্দ-ভগ্নী স্নেহময়ীকে রাণী ঈর্ষাবশে হত্যা করেছিল—এই সমস্ত কাহিনী নিমাই রাণীর মুখে শুনেছে। কাহিনী শেষে পূর্বজন্মের একমাত্র জীবিত রাণী-ভ্রাতা কমল-এর সঙ্গে এ জন্মের রাণী দেখা করেছে। তারপর কমলের নির্বাণ প্রাপ্তিতেই কাহিনীর সমাপ্তি। কাহিনীর মাধ্যমে লেখকের জন্মান্তরবাদী চিন্তা ও জাতিস্মর তত্ত্ব স্পষ্টতঃ অনুভব করা যায়। এই ধরনের গভীর তত্ত্বকে একটি গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার কৃতিত্ব অবশ্যই লেখকের প্রাপ্য।

ভাবনার দৌরাত্ম্য : প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী। প্রকাশক : শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীভূমি। কলকাতা-৪৮। মূল্য ৪-।

মনের চিত্তাকাশে 'ভাবনা' নামক বস্তুটির প্রভাব এই গ্রন্থটির একমাত্র বিষয়বস্তু। শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামীর এই প্রথম যুক্তি-আবেগ, তত্ত্ব-তথ্য, চিন্তা-ভাবের গঙ্গা-যমুনা। দর্শন চিন্তার সঙ্গে পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের সহিত অনুভূতি মিশে এই গ্রন্থটি একটি উচ্চমার্গের দার্শনিক তত্ত্বসম্ভৃত গ্রন্থের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ঈগল (সপ্তম সংকলন)—সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডল। ২৮ কিষণলাল বর্মণ রোড, হাওড়া—৬। এক টাকা।

চমকে দেবার মতো গল্প যেমন ছাপা হয়েছে। তেমনি কবিতাও। কেউ বলছেন, মানে বুঝি না। কেউ বলবেন, এখানেই তো আসল মজা। শাস্ত্র বিরোধী গল্পের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে আশিস আঢ্য ঐ রহস্যের একটা দিক নির্দেশ করতে চেয়েছেন। লিখেছেন শেখর বসু, রমানাথ রায়, অমল চন্দ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমিয় বসু, শকীল আহমদ, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক, বলরাম বসাক, সুব্রত সেনগুপ্ত, সুনীলকুমার, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন সেন, স্বপন সেনগুপ্ত, মোহিত চক্রবর্তী, তরুণ চৌধুরী ও সুময় জোয়ারদার। লেখাগুলি বিতর্কিত। ভালোই।

'রূপা'র বই

॥ উপন্যাস ॥

বিমলজ্যোতি দাস

মঞ্জরী ও মধুকর

উমা আর গোকুলের পরকীয়া প্রেমের মিষ্টি-মধুর কাহিনী।

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। পাঁচ ।।

ঠিক এ-সময়ে জাহাজে নানা জায়গায় নানা কাজ। যেমন, মৈত্র বৌকে চিঠি লিখছে, শেফালি আমরা কলম্বো বন্দরে আজ পৌঁছেছি। কাল আবার নোঙর তুলব। রসদ জাহাজে উঠলেই আমাদের কাজ শেষ। এখানে আশা করেছিলাম তোমার চিঠি পাব, কিন্তু কেন যে পেলাম না। চিঠি না পেলে ভীষণ খারাপ লাগে। ভাল লাগে না। আমরা লরেঞ্জ-মবকুইসে যাচ্ছি। ঠিকানা দেওয়া থাকল। গিয়ে যেন তোমার অন্তত তিনটে-চারটে...তুমি তো বলতে, রোজ একটা করে আমাকে চিঠি লিখবে। কেন যে তুমি চিঠি লেখ না। কি করে যে চিঠি না লিখে থাকতে পার। তারপরই মৈত্র সেই এক কথায় চিঠি শেষ করবে—আমার ভাল লাগে না শেফালি। তোমাকে ছেড়ে আমার কোথাও থাকতে ভাল লাগে না।

রাত বাড়ছে। সকালে এজেন্ট অফিসের লোক আসবে। যে যার চিঠি ফোকসালে লিখতে বসে গেছে। ছোটবাবুর কাছে লাইন দিয়েছে কেউ কেউ। ছোট-টিন্ডাল দুবার ঘুরে গেছে। এখনও বেশ ভিড়। ভিড় না কমলে সে ঠিক চিঠি লেখাতে পারবে না। চিঠি লেখার সময় কেউ পাশে থাকুক সে চায় না। ছোট-টিন্ডাল বাদশা মিঞার কপালে সেজন্য ঘাম। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে চিঠি এখন লিখিয়ে রাখতে না পারলে সকালে আর সময় পাবে না। দরজার গোড়ায় খুব ভালমানুষের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

সবার হলে ছোটবাবু ডাকল, আসুন চাচা।

বাদশা মিঞা ওকে হাতের ইসারায় ডাকল।

ছোট বলল, কি ব্যাপার!

—আস না!

সে, ছোট-টিন্ডালের পিছু পিছু উঠে গেল। টিন্ডাল ফোকসালে ঢুকে বলল, দরজাটা বন্ধ কইরা দেই।

ছোটবাবু বলল, কেন? দরজা বন্ধ করার কি আছে।

—তোমারে কই নাই, একটা কথা কমু, কেউ জানে না। তুমি জানব কেবল। আমার বিবির কাছে একটা খত লিখা দেও।

—সেটা তো সবাই জানে!

—কেডা জানে।

—সবাই জানে চাচা। আমি তো জানি, জাহাজে উঠেই জানি, তুমি তোমার চার নম্বর বিবির কাছে খতটত লেখাতে চাও।

—এডা মনু মিঞার কাজ।

—মনু কি করবে।

—না, ওডা আমার দ্যাশের লোক।

—মনু বলে নি।

—তবে কেডা কইছে কও। তারে একবার মোকাবেলা করি।

—সে যেই বলুক। এতে লজ্জার কি আছে।

—নারে বাজান, জাহাজে তুমি মানুষ চিন না। শালারা সব ইবলিশের বাচ্চা। কথা নাই বার্তা নাই, পিছনে লাগে।

—কেউ লাগবে না। তুমি বল, লিখে দিয়ে যাচ্ছি। খুব ঘুম পাচ্ছে।

—তা তোমার শরীরডা ভাল না। দু-লাইনে লিখা দ্যাও, ভাল আছি। ডাববানের ঘাটে বড় কইরা একটা খত লিখা দিস। বিবির বড় খত না পাইলে মন ভরে না। আর শোন তুমি লিখা দিয়, তোমার শরীরটা ভাল না বইলা বেশী কিছু লিখতে পারলাম না।

ছোটবাবু হেসে বলল, ঠিক আছে লিখে দেব। এবং খুব সংগোপনে প্রায় ফিস-ফিস গলায় অজস্র কথা বলে গেল ছোট-টিন্ডাল। মৈত্রকে ছোট-টিন্ডাল ভীষণ ভয় পায়। এখনই হয়ত মৈত্র এসে ছোটবাবুকে ডেকে নিয়ে যাবে। এবং ধমক দেবে, তোমার আক্কেল নেই মিঞা! একটা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে তুমি টানাটানি করছ।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খতটা লিখে দিতেই ছোট-টিন্ডাল দাঁত বের করে হাসল। ছোটবাবু দেখল, দু-পাশে চারটা-চারটা দাঁত ওর সোনায় বাঁধানো। হাঁ করলে জিভটা বের হয়ে আসে। ওর মুখে নানা-রকমের দাগ। এবং দেখলে বোঝাই যায়, সমুদ্রে সে ঘুরে ঘুরে নোনা জলের স্বাদ ঠিক ধরতে পেরেছে। সে একটার পর একটা নিকা করেছে। সে কাউকে তাড়ায় নি। সে চিঠিতে সবার খবর নিয়েছে।

বাদশা মিঞাকে ছোটবাবু খারাপ লাগল না। ছোটখাট মানুষ। চুল খুব ছোট করে ছাঁটা দাড়ি নেই, গোঁফ নেই। বোধ হয় এটা ওর এ-বয়সেও ওঠে নি। বয়স ষাটের ওপর হবে। নলিতে নানাভাবে বয়স কমিয়ে রেখেছে। সমুদ্রের ঝড়ে-জলে মানুষটা ভীষণ দক্ষ। ওর চার নম্বর বিবির বয়স খুব যে কম এবং প্রায় বালিকা, এটা চিঠির সব কথাবার্তা থেকে ছোটবাবু ধরে ফেলেছে। সে বলল, আমার চার নম্বর চাচি তোমাকে খুব ভালবাসে।

বাদশা মিঞা কেমন ছেলেমানুষের মতো মুখ নীচু করে রাখল। যেন এটা বলে ছোটবাবু ওকে ভীষণ লজ্জা দিচ্ছে। ভালবাসার কথা মুখে বলে ছোট করতে চায় না বিবিকে।

ছোটবাবু বলল, আমি ঠিক লিখে দেব। তোমার কোন ভাবনা নেই। এবং এই বলে সে বের হয়ে এসেই দেখল, ফোকসালে অমিয় নেই। কোথাও সে শুয়ে শুয়ে সব ছবি দেখছে। এ-সব ছবি কোথায় যে পাওয়া যায়। ছোটবাবু জানে না। নানারকম বীভৎস ছবি যোগাড় করেছে বল্কু। সে একবার অমিয়কে দেখাবে বলে গেছে। ছোটবাবু কাছে থাকলে অমিয় আমতা আমতা করেছে। এবং যখন গিয়ে দেখল, অমিয় নেই তখন সে ঠিক ভেবে নিল, বল্কু ওকে নিয়ে গেছে। ওরা এক-সঙ্গে লুকিয়ে সেই সব ছবি দেখছে। উলঙ্গ এবং নগ্ন সেই সব ছবির ভিতর অমিয় বেশ আছে। ছোটবাবু ফোকসালে ঢুকে একবার শুয়ে পড়ল। মৈত্র বলল, এলি।

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ।

—কি লিখলি মে বাদশা মিঞা।

—জাহাজের খবর-টবর দিল।

—ওর চাব নম্বর বি.বর কথা তোকে কিছু বলে নি!

—বলেছে। ওকেই তো চিঠি।

—তোকে বলে নি, কাউকে বলবে না।

—তা বলেছে।

—ও এই কাববার। সবাইকে বলবে। এখন ওব দুটো কাজ এমন বলবে। একটা কাজ বড় ক্যেটার সাদি, দু নম্বর কাজ, চাব নম্বর বিবিব ঘরে একটা বাচ্চা—এই হ.ল তার হয়ে গেল।

—সে আব কিছু চায় না!

—না। বলেই বলবে, কাউকে বলবে না, অথচ ও নিজেই বলে বেড়ায়।

—এমন স্বভাব কেন!

—ওর ধারণা, এই বয়সে চাব নম্বর বিবি ঘরে এনে খুব একটা পুবুষের মতো কাজ করে ফে.লছে। সেটা ও জা হর করতে চায়।

—কিন্তু আমাকে যে বলল, জাহাজেব সব শালা ইবলিশের বাচ্চা।

—ও অমনি বলে। আসলে একটা আস্ত শয়তান। না হলে কেউ এমন বয়.স তোব নাতিব বয়সী একটা মেয়েকে ঘরে আনতে পারে!

ছোটবাবুর হাই উঠছিল। ওর ঘুম আসছে। জলেব ছলাত ছলাত শব্দ আসছে। জলের ঢেউ মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে বলে হালটা নড়ছে। এবং সেজন্য স্টিয়াবিং ইনজিনেব শব্দ আস.ছে। পাশাপাশি ফোকশালগুলোতে জাহাজীরা গল্প করছে। সবই দেশ-বাড়ীব গল্প। স্নাছেব গল্প। কেউ সময় পেয়ে গল্প কবতে করতে জাল বুনছে। কেউ হয়তো এখন ওপরে কোরান-শরিফেব ব্যাখ্যা শুনছে, অথবা ইমানদাব মানুষ হবার জন্য এ-সফ ব কোরান-শবিফ পড়াটা বন্ত করে ফেলা ভাল, সময় পেলেই মাদুর বিছিয়ে ডেক-সাবেঙেব সামনে বসে আছে

তখনই ছোটবাবুর মনে হল, মাকে সে একটা চিঠি লিখতে পাবে। সে সবার ম.তো লিখল না, আমার ভাল লাগছে না, কবে যে দেশে ফিরব জানি না। সে লিখল, মা আমি ভালো আছি। আমার টাকা হয়.তা পেয়েছ। শমু-অমুব পড়া বন্ধ করে দিও না। জ্যাঠিমাকে বলবে যেন আমাব জন্য চিন্তা না করে। বড়দা মেজদাব খবর দিও। আমি মা যাচ্ছি দক্ষিণ আমেরিকা। কলম্বো থেকে জাহাজ কাল ছাড়ছে। কত বড সমুদ্র মা, কত বড়, সমুদ্রে না এলে বোঝা যায় না। বাবা কবে বাড়ী এসেছিল জানিও। জ্যাঠা-মশাইব জন্য খুব খারাপ লাগে মা। জ্যাঠা-মশাইব শবীব কেমন আছে জানিও। জাহাজে আমাব মৈত্রদা আছে। অমিয়, কঙ্কু, সাবেঙসাব, মেজ-মালোম সবাই আমাকে ভীষণ ভালবাসে। আমাব জন্য তুমি একেবারে চিন্তা করবে না। সফর শেষে যখন ফিবব ও কি যে ভাল লাগব না! শেব করল এই বলে, মা, আমি এখন জাহাজী।

এ-ভাবেই জাহাতে জাহাজীরা চিঠি লিখে থাকে। সকালের দিকে নৌকায় সব কাঠেব হাতি, ময়ূবেব পালখ এল। মৈত্র ভেবেছিল নেবে, কিন্তু সে যে একটা সঙ্গে ভীষণ দরকারী জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। এটা সে জাহাজে উঠলেই লুকিয়ে নিয়ে যায়। এবাবও গোপনে নিয়েছে। কাঠেব হাতি, ময়ূবেব পালখ নিয়ে কি আব হবে! সে কিছু নিল না। অন্য জাহাজীবা সব নিতে গিয়ে দেখলে, বসদ আসছে। বসদ উঠছে জাহাজ-ডেকে। মেজ-মালোম ছুটোছুটি কব ছ। ঠিক রোজকাব ঘটনা, অর্থাৎ ডেক-টিণ্ডাল যাচ্ছে আগিলে. কশপ যাচ্ছে. হাতে বণ্ডেব টব নিয়ে। বস্কুব কি কাজ জানে না। সে মেসরুমে ব.স রঙের টব ঢোলের মতো বাজাচ্ছে।

আব গান গাইছে অমিয়। যেন এখন ওদেব এই জাহাজে এ-সব ঘটনা বোজ ঘটবে। নামাজ পড়ছে দু নম্বব 'পবীন মানুষেবা। ওরা সকালে চাপাটি খেয়েই নামাজ পড়তে বসে গেছে।

তখন দেখা যাব নেমে আসছে জাক। সে এদিকে পাখিগুলোর খাঁচায় মাংস দিয়ে যাচ্ছে। বসদ তোলা হলে, মেজ-মালোম বোট-ডেকে সেই দূরবীন চোখে। তাবপর জাহাজ ছাড়লে এক নিত্য দিনেব ঘটনা। কবেতক যে আবার জাহাজ বন্দব পাবে কেউ জানে না। জাহাজ সমুদ্রে চলছে তো চলছেই।

তখন জাহাজ গভীর সমুদ্রে। 'দন শেষ হয়ে যাচ্ছে। মৈত্র ওয়াচ শেষ কবে ফি.বছে। অমিয় এসে চুপি চুপি ওব লকারে কি যেন বাখছে। আজকাল অমিয়ব এটা হয়েছে। সে সবার সামনে লকাব খোলে না। কিন্তু বোববা.র ইন্সপেক-সানের দিন থাকে। কাপ্তান মেজ-মালোম, বড়-মালোম সবাই দেখে-শুন যায়। সব সাফসোফ আছে কিনা দেখার একটা নিয়ম। তাছাড়া কোথায় কি আবাব ভাঙ্গছে, ঘুরে ঘুরে এটাও কাপ্তান দেখতে চায়। ইন্স-পেকসানের সময় লকার. খুলে বাখার নিয়ম। অমিয় লকাব খুলতে চায় না। সে সাবেঙকে বলেছে, চাব পা.ছ্ছ না। আসলে চাবিটা ওব কাছেই ছিল। অমিয় যে কেন এমন একটা মিথ্যা কথা বলল সে ভেবে প য না।

ছোটবাবু দেখল, অমিয় কি সব ভিতবে বেখে দিচ্ছে। কি বাখছে সে টের পেল না। ছোটবাবু বলল, কি বাখলি অমিয়?

—ঠিক কিছু নাতো।

ছোটবাবু আর কিছু বলল না। অমিয় পা.শর ঘবে ওযাচেব নোংরা জামা প্যান্ট ছেড়ে স্নান করতে গেলে মৈত্রকে বলল, অমিয় কি নিয়ে আসে সঙ্গে।

—কি আবার নিয়ে আস? বাংকাবে কি এমন আছে, শুধু তো কয়লা।

—কিছু নিয়ে আসে।

মৈত্র বলল, মবুক গে। জাহাজে উঠলেই নানাবকম অসুখে ভোগে মানুষ। এ-নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না ছোটবাবু। ওপরে যাও। কাল থেকে তো তোমার আবাব ওয়াচ।

ছোটবাবু এবার ওপরে উঠে গেল। থালা-বাসন ধুয়ে ভাণ্ডাবীব কাছ থেকে বিফ.ব মাংস নিয়ে নিল। কফি ভাজা, ডাল আব ভাত। মাংস নেবার সময় সে বলল, চাচা বিফ না মটন?

ভাণ্ডারী গলা বাড়িয়ে দেখল ছোট-বাবুকে। মেসরুমের সঙ্গে গ্যালিব একটা জানালা থাকে। তাব ফাঁকে গলা বাড়িযে বলল, বিফ। তাবপব ফেব কচ্ছপেব মতো সে গলা ভিতরে নিল ছোটবাবুব কেমন বাগ হল। রোজ রোজ বিফ। সে বলল, চাচা আমাদের জন্য মটন নিতে পার না। কি দিয়ে খাই বলতো!

—দেখ না। ভাণ্ডারী সাবেঙের চাহের জল গবম করছে। পাশেব উনুনে সে আব এক ডেকচি ভাত সেদ্ধ করছে। তামাব বড় ডেকচি। ছোটবাবু কি বল.ছ, ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছে না। সে ফের গলা বের করে বলল, কি বললে?

—আমা.দর জন্য মটন নিতে পাব না।

এবাব ভাণ্ডারী কেমন বেগে গেল। বলল, আমারে কিছু কইবা না। সারেঙ-সাব কিছু করতে পারে না! তোমরা যাও, মাস্তার দ্যাও। কও, মটন না দিলে চলব না।

—চলব না তা বলি নি। তুমি তো জানো বিফ আমি খেতে পারি না, অমিয় খায় না। কেবল মৈত্রদা খায়।

—থাকতে থাকতে তুমিও খাবে। তার-পব ভাণ্ডারী আর কোন কথা বলল না। সে এত বোগা মানুষ, আব সে এত বেশি বগচটা যে কথা বলা দায়। এখনই হয়ত কিছু বললে ক্ষেপে যাবে। ছোটবাবু ভয়ে ভয়ে মাংসের ডেকচিটা নীচে টেবিলে বাখল। তিনটে থালায় সে ভাত নিল, ডাল নিল, কফি ভাজা নিল। সে কফি ভাজা ডাল এই দিয়ে ভাত খেয়ে নেবে।

মৈত্র এসে আজ আবার ক্ষেপে গেল ছোটবাবুব ওপব। আমাকে তোরা কি পেয়েছিস?

ছোটবাবু বুঝতে না পেবে তাকিয়ে থাকল।

—আমি কি মানুষ না! এতটা গোস্ত আমার জন্য বেখেছিস।

ছোটবাবু বলল, কে খাবে! তুমি না খেলে কে খাবে। আমি খাই না, অমিয় খায় না।

কেন অমিয় খায় না, কেন তুই খাবি না।

—আমার ভাল লাগে না। এবং এখনই হয়তো ফের মৈত্র মেসরুমে হৈ-চৈ বাধিয়ে নিতে পারে। সারেঙেব সাতপুরুষ উদ্ধাব করতে পারে। এবং মৈত্র ক্ষেপে গেলে সাবেঙসাব একবারে কোন রা করেন না। সাবেঙসাব ইচ্ছা করলেই এদেব জন্য আলাদা মটনের ব্যবস্থা করতে পাবে। হিন্দু পোলাদের বিফ খাওয়াবার এমন একটা সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না। অর্থাৎ

এমন সব কথা মৈত্র তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে। সারেঙসাব রেলিংয়ে ভর করে তখন সমুদ্র দেখেন। তিনি মনে করেন, মৈত্র ভীষণ গোঁয়ার, ওর সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। তিনি যে ভীষণভাবে চেষ্টা করেছেন, কলম্বোতে রসদ নেবার সময় বার বার বলেছেন, জাহাজে যখন হিন্দু নাবিক আছে, তখন কিছু অন্তত মটন নেওয়া হোক। একেবারে যে না নেওয়া হয়েছে তা না, তবু ডারবান পর্যন্ত এই রসদেই চালিয়ে নিতে হবে। বিফ সস্তা বলে, কোম্পানী রেশনে বেশি বিফ দেওয়া পছন্দ করে। সারেঙের কথায় কি হবে। আর্টিকেল বদলাতে না পারলে কিছু হবে না।

সারেঙসাব এই নিয়ে মৈত্রের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন। কিন্তু বয়স মানুষকে নানাভাবে ধার্মিক করে রাখে। অযথা চিল্লাচিল্লি তার পছন্দ না। ছোটবাবু এ-সব বোঝে। বোঝে বলেই বলল, তুমি মৈত্রদা এ নিয়ে ঝামেলা কর না। তোমার অযথা ঝামেলা করার স্বভাব।

—আমার অযথা ঝামেলা করার স্বভাব।

—তাই তো।

—আমার কচু! জাহাজে এসেছিস, মরবি। বলে দিলাম, মরবি। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ছোটবাবু বুঝতে পারে না, এই কথায় এত উত্তেজনা আসে কি করে। মৈত্রদা এখন ভীষণ গোগ্রাসে খাচ্ছে। বড় মাংসের টুকরো দিয়ে চটকে ভাত খাচ্ছে। সবটা মাংস সে খুব সহজে খেয়ে বলল, এই ছোটবাবু, আমি হিন্দুর পোলা না। আমি বামুন না, আমার জাত নেই। তারপরই এমন বিষম খেল যে মুখের সমস্ত ভাত চারপাশে ছড়াতে থাকল। অমিয় বলল, তোমার মৈত্রদার ব্লাড-প্রেসার আছে। মাংসটা কম খাও।

এত কাস ছ, তবু কথা থামছে না মৈত্র, বিফ না খেলে জাহাজ চালানো যায় না। আ ম, আমি হিন্দুর পোলা বলছি, বিফ না খেলে কয়লার জাহাজে কাজ করা যায় না। মটন, মটন চাই! কেন দেবে মটন! কেন দেবে! যেখানকার যা, তোমাকে তাই খেতে হবে।

এবার ছোটবাবু যেন না বলে পারল না আচ্ছা খাব, কাল থেকে খাব। তুমি চেঁচামেচি করবে না তো। জলটা খাও। ছোটবাবু জল এগিয়ে দিল। তারপর মৈত্র একেবারে চুপ। সে আর কোন কথা বলতে পারল না। সে নিচেও নেমে গেল না। ছোটবাবু রেলিঙে ঝুঁকে আছে। আর সেই সমুদ্র, নীল আকাশ এবং যেমন মনে হয়ে থাকে অনেকদূর থেকে সারি সারি তিমি মাছের ঝাঁক জাহাজের পেছনে ছুটে আসছে, তেমনি সব ঠিকঠাক থাকলে ছোটবাবুর পাশে খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মৈত্র ছোটবাবুর পাশে দাঁড়ালেই দেখতে পেল, অতিকায় সব সমুদ্রপাখি জাহাজটার পেছনে ছুটে আসছে। এ-অঞ্চলে এদিক-ওদিক সব দ্বীপ, পাহাড় ছড়ানো। কি করে জাহাজের খবর পেয়েছে পাখিগুলো, খাবারের জন্য ওরা জাহাজটার পেছন নিয়েছে।

সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছিল। চারপাশে সমুদ্র নীল জলের ভিতর যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। দূরে ওরা দেখতে পেল, ডেড়ার পালের মতো ডল-ফিন ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবুর ইচ্ছা একটা তিমি মাছ যদি এ-সময় সমুদ্রে ভেসে ভেসে দিগন্তের দিকে চলে যেত, বেশ মজা হত তবে। এখন কোথাও মনে হচ্ছে, রেকর্ড-প্লেয়ার বাজছে। জ্যাক মাঝে মাঝে যখন একঘেয়েমি ঠেকে, বোট-ডেকে বসে বেহালা বাজায়। আসলে বেহালাটা কাস্তানের। তিনি মাঝে মাঝে তার ঘরে বসে বাজান। সবারই এই দূর সমুদ্র যাত্রায় কিছু-না-কিছু অভ্যাস আছে। যেমন জ্যাক ভাল নাচতে পারে। একদিন জ্যাক বোট-ডেকে পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে নেচেছে। আজ জ্যাক, বোট-ডেকে বসে আছে। জাহাজ জিরো ডিগ্রী পার হয়ে এসেছে। গরমটা এখন তেমন নেই। জ্যাক, একটা কালো রঙের প্যান্ট পরেছে। লতাপাতা আঁকা জামা গায়ে দিয়েছে। টাইটা বেশ লম্বা। জ্যাক খুব এখন সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। আর কেউ জানে না, জ্যাক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে ভীষণ ভালবাসে। সে সেখানে দাঁড়ালেই ছোটকে দেখতে পায়। ছোট, খুব সে ছোট, ওর ইয়র্কের বাড়ির মতো গাছপালায় ভরা ছোট্ট একটা বাগান। সে ছোটকে আজকাল নানারকম ফরমাস করতে ভালবাসে।

জ্যাক ডাকল, হেই।

ছোট বুঝতে পারল, জ্যাক তাকে ডাকছে। সে দৌড়ে বোট-ডেকে উঠে গেল। বলল, জ্যাক আমাকে।

—তুমি কি দেখছিলে!

—কিচ্ছু না।

—এটা ধরো। বলেই জ্যাক নুয়ে কি একটা সুন্দর আই লাভ-টাব গোছের গাছ তুলে অন্য একটা রেকর্ড বসিয়ে দিল। তিন-চারদিন আগেও এমনি হঠাৎ জ্যাক তাকে হাই করে ডিকেছিল। বলেছিল, তুমি দূরবীনে কি দেখেছিলে?

—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু দেখতে পাওনি।

—না। একটা কুকুর দেখেছিলাম।

—আর দেখবে না।

—আমি ঠিক দেখতে চাই না। কিন্তু মেজ বললে...

—মেজ বললেও দেখবে না।

ছোট খুব ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাৎ করে বলেছিল, আচ্ছা।

রচনাবলী গ্রন্থমালা

গিরিশ রচনাবলী

সমগ্র রচনা চার খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ২১ নাটক, ৭ গদ্য রচনা [২০·০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ২ উপন্যাস, ৬ ছোট গল্প [২০·০০]। তৃতীয় খণ্ডে ২২ নাটক, ১৪ গদ্যরচনা [২৫·০০]। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে ৬ নাটক, ৩ প্রহসন, ৫ কবিতা ও গান, ৩ গদ্য-রচনা [১২·৫০]। দ্বিতীয় খণ্ডে ৮ নাটক, ৩ প্রহসন, ৪ কবিতা ও গান, ৩ গদ্যরচনা, ১ ইংরেজী কবিতা [১৫·০০]।

মধুসূদন রচনাবলী

সমগ্র রচনা (ইংরেজি সহ এক খণ্ডে) [১৭·৫০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

সমগ্র রচনা এক খণ্ডে [১৩·০০]

রমেশ রচনাবলী

সমগ্র উপন্যাস (৬টি) [১৩·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

সমগ্র রচনা তিন খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [১৫·০০]। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র প্রবন্ধ [১৭·৫০]। তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি [১৫·০০]

প্রতি খণ্ডে জীবনী ও সাহিত্যসাধনা আলোচিত

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা—৯

আজ আবার কি জন্য ডেকেছে ছোট বুঝতে পারে না। বেশ শীত শীত করছে। সে হাতে একটা রেকর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা নক্ষত্র আকাশে উঠছে। আকাশে কিন্দুমাত্র মেঘ নেই। এমন নির্মল আকাশ অনেকদিন দেখা যায়নি সমুদ্রে। এমন কি সমুদ্র এত শান্ত যে এখন ইচ্ছা করলে কাপ্তান, এক রোববারে, ছোটখাটো একটা নাটক অভিনয় করিয়ে নিতে পারেন: ছোটখাটো স্ক্রীন টানিয়ে, ম্যাকবেথের কোন সিন, জ্যাক তো মুখস্ত বলতে পারে সবটা অথবা, ওনিলের কোন সমুদ্র-বিষয়ক নাটক, তখন কাপ্তান বেহালা বাজাতে পারতেন, এটাই তাঁর লাভ। তিনি উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাবেন এবং সমুদ্রের চারপাশে এক নীলাভ জ্যোতি তাকে কেমন গ্রাস করতে থাকে তখন।

জ্যাক আর একটা রেকর্ড পাল্টাল। খুব দ্রুত তালে বাজছে। গমগম করে উঠছে সারা জাহাজটা। নিচ ইঞ্জিনের শব্দটা পর্যন্ত এমন একটা গানের সুরে ছন্দ মিলিয়ে চলছে। জ্যাক, পায়ে তাল দিচ্ছে। জ্যাক বলছে, গাও, গাও। জোরে। ছোটবাবু একেবারে হাঁ। সে বলল, আমি পারি না।

—গাও, গাও না।

ছোটবাবু বলল, আমি পারি না জ্যাক।

—গাও, গাও না উই আর ইন দি সেম বোট, গাও, গাও না।

ছোটবাবু বেশ গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করল, উই আর ইন..

জ্যাক বলল, বেশ সুন্দর হচ্ছে। আরও জোরে। গাও, আরও জোরে।

কাপ্তান আর থার্ড অফিসার তাড়াতাড়ি উঁকি দিল ব্রীজ থেকে। কাপ্তান বয় যেতে যেতে দেখল, জাহাজের সবচেয় কমবয়সী নাবিকটির সঙ্গে জ্যাকের ভারি বন্ধুত্ব। সে কফি আর আইসক্রিম রেখে গেছে।

ছোটবাবু বলল, তুমি খেয়ে নাও জ্যাক।

জ্যাক বলল, ছোটবাবু মনে থাকে যেন, আর কখনও স্যার-টার বলবে না।

—না বলছি না।

আমার খারাপ লাগে স্যার শুনতে।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক, তুমি মেয়েদের মতো দেখতে। বলেই জিভ কেটে ফেলল। সে ভুলে যায় সব, এটা ঠিক না। জ্যাকের অহংকারে লাগতে পারে। অপমানিত হয়েছে মনে করতে পারে। সে তাড়াতাড়ি জ্যাককে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জ্যাক, ঐ দেখ কত বড় পাখি! কি বড়। ডানায় যেন সমস্ত আকাশ ঢেকে দিয়েছে।

জ্যাক দেখল, ওদের মাথার ওপর, হাত দশেক হবে, পাখিটা প্রকাণ্ড ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে। আসলে স্থির হয়ে নেই। জাহাজের সঙ্গে চলছে। জাহাজ এবং পাখির ডানায় ভেসে চলার গতি সমান। পাখিটাকে দেখলে মনে হয় তখন মাথার ওপর এরোপ্লেনের মতো ঝুলছে।

জ্যাক বলল, সর্বনাশ।

—কি হল!

—ওটা এখন ছোঁ মারবে।

—তার মানে।

—আমার সব খাবার ছোঁ মেরে নেবে।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খাবারটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

—তোমার চোখ তুলে নেবে ছোটবাবু। শিগগির বোটের নিচে চলে এস।

ছোট আর দেরি করল না। সে কফির কাপ এবং আইসক্রিমের প্লেট নিয়ে ছুটে বোর্টের নিচে চলে গেল। তারপর সে দেখল, জ্যাক সুন্দর দু পা বিছিয়ে দিয়েছে। বোট-ডেকের ভিতর দিয়ে, ওপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছোটবাবু উবু হয়ে বসে আছে। এত তাড়াতাড়ি খেতে কষ্ট রেকর্ডটা শেষ হয়ে আসছে। যেন ওর খাওয়াটা একটু দ্রুত সমাধান করার জন্য, সে কিছুটা ছোটকে দিয়েছে। ভাগ করে দিয়ে সে একটা কথাও ছোটকে বলতে দিল না। সে আবার রেকর্ড-প্লেয়ারের পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ছোটবাবুর সাহস হল না বলে, আমি খাব না জ্যাক। ছোটবাবু খেয়ে জামায় মুখ মুছে ফেলল। যেন সে খায়নি। সে খেল কিনা তাও বলল না জ্যাককে। বেশ পরিপাটি করে দু পা ছড়িয়ে সহজ হয়ে বসে পড়ল। জ্যাককে সে যে খুব ভয় পেত, এখন জানি না কেন সেই গল্পটা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু জ্যাক একবারও তাকাচ্ছে না। সে রেকর্ডের গাদা থেকে একটা ভাল রেকর্ড খুঁজছে। যা শুনলে ছোটবাবু বুঝবে, জ্যাকের সংগ্রহে কত সুন্দর সুন্দর গান আছে।

কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন যাক, জ্যাক সমুদ্রে একজন সমবয়সী সঙ্গী পেয়ে গেছে। ঠিক সমবয়সী নয়, তবু বয়সে ওরা কাছাকাছি। স্বাভাবিক-ভাবেই ওরা দুজন জাহাজে একটা টান বোধ করবে। আর নেটিভরা খুব বিনীত, ভদ্র, এবং ভীতু হয়। ছেলেটার ভিতর সব গুণগুলোই আছে। তিনি মনে মনে জ্যাকের জন্য যতটা উদবিগ্ন ছিলেন, এখন আর ততটা নেই। যেমন শিকারী তার দুষ্টু মেয়ের হাতে কখনও কখনও বাঘের ছানা দিয়ে দেয়, এবং তাকে ভুলিয়ে রাখে, অথবা পোষা বেড়াল, ছোটবাবু যেন জ্যাকের তাই। কাপ্তান বললে, বুঝলে থার্ড, জ্যাক আমার স্বভাব পেয়েছে। সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে ওর কখনও খারাপ লাগে না। স্কুলেটুলে কিছু হয় না। তার চেয়ে একজন মানুষ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে বেশি শিখতে পারে। জ্যাক আমার কত কত কম বয়সে কত বেশি জানে। কেমন আত্ম-তৃপ্তিতে কাপ্তান চোখ বুজে ফেললেন।

এভাবে জাহাজ আবার ক্রমে এগিয়ে চলে। কখনও কখনও ছোটবাবু জ্যাকের সঙ্গে পাখিদের মাংস খাওয়ায়। ডারবান পর্যন্ত ছোটবাবুর শেষ পর্যন্ত ওয়াচ থাকল না। সে ফালতু হয়েই থাকল। ফালতু মানে কাজ কম, ডেকের ওপর উইনচে উইনচে কাজ করা। ডেকের ওপর মাঝে মাঝে পাখিদের মাংস দেবার সময় বড় বড় সব এ্যালবাট্রস পাখি ডানা মেলে মাথার ওপর ভেসে থাকে। জ্যাক আর সে মাঝে মাঝে ওদেরও মাংস ছুড়ে দেয়। বেশ একটা খেলা। ডেকের ওপর ভারি আশ্চর্য খেলা জমে ওঠে। একে একে অনেক পাখি, প্রায় সারাটা ডেক। তখন ছেয়ে যায়, দলে দলে ওরা মাংস খাবার লোভে জাহাজের সঙ্গে একটা ছায়ার মতো ভেসে চলতে থাকে। মাংস ছুড়ে দিলেই হাওয়ায় লুপ করে ধরে ফেলে। ডেকে পর্যন্ত পড়তে দেয় না। পাখিগুলো মাংস খাবার লোভে কোথায় যে ভেসে চলেছে নিজেরাও জানে না। কারণ এরা এভাবে জাহাজের পিছু পিছু চলে আসবে। সামনে যতক্ষণ কোন ডাঙ্গা না পাচ্ছে ওরা আর থামবে না।

জাহাজিরা অবসর পেলেই পাখিদের স্নান, খাওয়া এসব দেখত। কখনও সবাই দেখত বেশ সামান্য ঢেউয়ের ওপর ওরা ভেসে রয়েছে। ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছে। অথবা প্রপেলার যেখানে জল ভেঙ্গে চলে আসছে সেখানটায় ওরা ডুবে গভীর নীল জলে, সাদা ডানা মেলে মাছ খুঁজছে। প্রপেলারের ঝাপটায় কত সব ছোট মাছ, মরে যায়, ওগুলো জলে ভাসলে, অথবা জলে ডুবে গেলে ওরা তুলে তুলে খায়। কখনও ভাণ্ডারিরা উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দেয় জলে। ওরা সে-সবও খায়। জাহাজিদের কাছে, সমুদ্রের মতো, আকাশের নক্ষত্রের মতো এই সব পাখিদেরও একটা দাম আছে মাস্তুলে কোন পাখি এসে বসলে ওরা তাড়িয়ে দেয় না। ওদের সময় ভাল যাচ্ছে, এমন ভেবে থাকে।

বন্দরে ঢোকার মুখে মৈত্র ভাবল, এ-বন্দরে শেফালির ঠিক চিঠি আসবে। এখানে শুধু বাংকার নেওয়া হবে। রাতে রাতে জাহাজ দুটো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বন্দরে ঢুকে যাচ্ছে।

শেফালী বন্দরে বন্দরে এক চিঠি লেখে। সেই এক দুঃখের কথা চিঠিতে। তুমি কবে ফিরবে। মৈত্রকে ছেড়ে শেফালীর এক দণ্ড ভাল লাগে না। লিখবে, জাহাজ তারপর কোথায় যাচ্ছে। ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখ। গত-বার এজেন্ট অফিসের ঠিকানা দিলে, কিছু বুঝতে পারিনি। কলম্বোতে চিঠি না হলে শেফালী চিঠি না দিয়ে থাকার মেয়ে নয়।

বন্দরে ঢোকার মুখেই ঠিক চিঠি হাজির। পাইলট জাহাজে উঠে এসেছে। পাইলটের সঙ্গে সব চিঠি এসেছে। সারেং ডেকে ডেকে চিঠি দিচ্ছে সকলকে। চিঠি পেয়েই একটু গোপনে পড়বে বলে, সে বোট-ডেকে উঠে গেছে। তা না হলে অমিয়টা গিদরের মতো করবে। কি লিখল দাদা। চুমুটুমু খাবার কথা লেখেনি। অমিয়র জিভ খুব লম্বা।

এবারের চিঠিতে শেফালীর নতুন একটা উপসর্গের কথা লিখেছে। সে নুয়ে দেখল, অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা, তবু হাতের লেখা বুঝতে কষ্ট হয় না, এতক্ষণ এই লেখা পড়েছে যে সে শেফালীর টানটোন দেখেই সব ধরে ফেলে। শেফালী লিখেছে, আমার বড়

বমি পায়। তোমার জন্য রাতে আমার ঘুম আসে না। তারপর লিখেছে শেফালী, ভাল থাকছে না শরীর। ক্রমশ বমি বাড়ছে। শরীর দুর্বল। কেবল দুঃস্বপ্ন দেখি। তারপর নিচের প্যারায় লিখেছে শেফালী—সে তার স্বপ্নের কথা লিখেছে।

আচ্ছা তোমার জাহাজে লম্বা বড় একটা বাঁশ আছে? বাঁশের মাথায় কি কোন কঙ্কাল বাঁধা আছে? প্রায়ই একটা বড় তিমি মাছের ছবি সমুদ্রে ভেসে যেতে দেখি। প্রায়ই মনে হয় মাছটা তোমাকে গিলে ফেলার জন্য অপেক্ষায় আছে। তুমি সেটা বুঝতে পারছ না। তুমি ক্রমশ মাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। মাঝে মাঝে তোমাকে আমি সেই ঝোলানো কঙ্কালের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ভয়ে তখন আমার মুখ শুকিয়ে যায়। মনে হয় আর সমুদ্রে গিয়ে কাজ নেই। বরং এবার এসে এই কলকাতা শহরে কিছু দেখে নাও। তুমি, লক্ষ্মীটি আমার, দস্যুর মতো কোন গোঁয়ার্তুমি কর না। ঝড়ের সময় ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটবে না। মনে থাকে যেন লক্ষ্মীটি। জাহাজে উঠলেই এভাবে শেফালী ভীষণ সংশয়ে ভোগে।

দস্যু কথাটা বলে শেফালী যেন অদ্ভুত এক সুখ পায়। দস্যু কথাটা ওর সম্পর্কে একটা ভীষণ উপমার মতো। দু হাত তুলে মৈত্র এখন সেই সব দৃশ্যের ভিতর ডুবে যেতে চাইছে। দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়া, দস্যুর মতো সহবাস এসব হামেশা শেফালী তাকে বলে থাকে। মৈত্রের চিঠি পড়তে পড়তে ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে আর ডেকে দাঁড়াতে পারছে না। নিচে নেমে সে ঢকঢক করে জল খেল।

আজকাল অমিয়র সঙ্গে মৈত্রের তুই তুকারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয় এখন জাহাজে বেশ সাবালক জাহাজি। সে খুঁজতে গিয়ে দেখল, মৈত্র জল খাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা। শীত লাগছে ভীষণ। এই শীতে কি করে যে ওর তেষ্টা পায়। সে বলল, কার চিঠি।

মৈত্র বলল, আর কার?

—শেফালী বৌদির?

মৈত্র বলল, তাই মনে হয়।

মাঝে মাঝে ওরা যখন ওয়াচ শেষ করে বাথরুমে ঢুকে যায়, তখন স্নানের ভিতর ওরা কেমন নিজেদের উলঙ্গ ছবি দেখে ফেলে। ভারি মজা এই স্নানে। সাবানের ফেনা সারা শরীরে। মৈত্রের চেহারা তখন বড় ভয়ঙ্কর। ওর চুল কোঁকড়ানো। হাতে পায়ের পেশী ভীষণ শক্ত। এমন একটা শক্ত মানুষের চেহারা দেখলেই অমিয়র কেন জানি মৈত্রের বৌর কথা মনে হয়। সে তখন বলতে থাকে, তোর বৌটাকে এবার দেশে গেলে দেখাস মৈত্র।

—কেন কেন! এত লোভ কেন আমার বৌকে দেখার!

—আমার লোভ না। লোভ তোমার। তোর এমন শরীর, বৌটার কষ্ট হয় না।

—কষ্ট! কিসের কষ্ট। একেবারে মৈত্রের মুখ নাবালকের মতো। যেন সে কিছু বোঝেনি।

—কষ্ট, কষ্ট, এত ব্যাখ্যা করতে পারব না। আশেপাশে ছোটবাবু থাকতে পারে—ছোটবাবুর সামনে মৈত্র চায় না খিস্তিখেউড় করে। আমিয় একটা ধারি, সে যা কিছু বলতে পারে। ওরা এদিক-ওদিক খুঁজে দেখলে ছোট নেই। এখন সে আবার কোথায়! হয়ত সে মেজ-মালোমের পাশে বসে আছে। ওকে খুঁজে দেখা দরকার। ওর চিঠি আসেনি। চিঠি না এলে জাহাজিরা খুব দুঃখের সঙ্গে সময়টা কাটায়। একা একা থাকে। এবং নিজেকে খুব অদরকারী মনে হয়।

মৈত্র, ছোটবাবুকে বঙ্কুর ফোকসালে শেষ পর্যন্ত পেল। সে বঙ্কুর বাংকে চুপচাপ শুয়ে আছে। চারপাশে যখন বন্দরের আলো পাহাড়ের মাথার বাতিঘর তখন ছোট এভাবে নিচে বসে আছে ভাবতেই মৈত্রের কেমন খারাপ লাগল। সে কোন চিঠি পায়নি। সে নিজে সবার চিঠি লিখে দিয়েছে, সবার চিঠি এসেছে জবাবে, ওর চিঠি নেই।

মৈত্র পাশের বাংকে বসে বলল, ঠিকানা ভুল লিখেছিস।

—না, ঠিকানা ঠিকই লিখেছি।

—তবে আমার যা মনে হয় বাবা-মা, আগের জায়গায় নেই।

—কোথায় গেছে।

—কোথায় যাবে, তাও জানি না। বাবা বারবারই জায়গা বদল করতে চাইছেন। নবদ্বীপের দিকে বাবার যাবার খুব ইচ্ছা। ওখানে কিছু যজমানি পাবেন কথা আছে। তবে ওখানে যদি যান, চিঠি ঘুরে ঘুরে ঠিক যাবে। আমি ঠিক বুয়েন্স এয়ার্সে মার চিঠি পাব আশা করছি।

—তা হলে পেয়ে যাবে।

—নাও পেতে পারি। আমাদের পরিবার এখনও ঠিক করতে পারছে না কোথায় থাকবে।

—কেন, কলকাতার দিকে চলে এলেই হয়।

—কলকাতাকে বাবার ভীষণ ভয়। জ্যাঠামশাই তো কিছুতেই আসবেন না। গাঁয়ের দিকে বাড়িটাড়ি করে কিছু জমিজমা করে বাঁচার একটা চেষ্টা চলছিল। কিন্তু বাবা, জ্যাঠামশাই এত আনাড়ি কোন ফসল ঠিক তুলতে পারেন না। একটা রেশনের দোকান জ্যাঠামশাই করলেন। টাকা কম ছিল বলে পার্টনার নিলেন। পরে কি করে যে সেই মালিক হবে গেল বোঝলাম না। জ্যাঠামশাই একদিন ক্ষোভে দুঃখে সব ছেড়ে চলে এলেন। তারপর কেমন খুব দূরে থেকে বলার মতো সে বলল, আসলে আমাদের পরিবার জানে না, একবার ছিন্নমূল হলে ফের কিভাবে বাঁচতে হয়। সে যেন বেশ দামী কথা বলে ফেলেছে, এমনভাবে বলল, বড় কথা শোনাবে, তবু এটাই ঠিক। বাবাই কেমন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

মৈত্র বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু থেমে বলল, আসার সময় তুই জেনে আসিসনি সব।

—সে তো আটমাস আগে, আটমাস আগে বাড়ি ছেড়েছি।

—বাড়িতে আর যাসনি।

—না।

—জাহাজে ওঠার আগে একবার দেখা করে এলি না।

—তাহলে আমার জাহাজে আসাই হত না। সে থাকগে, আপাতত আমি নামগোত্র-হীন। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্কহীন। বুয়েন-এয়ার্সে যদি না আসে তবে ভাগ্যের সন্ধানে ওরাও বের হয়েছে ভেবে নিতে হবে, ভাগ্যের সন্ধানে মৈত্রদা আমিও বের হয়েছি। টাকা মা পাবে না। অফিসে আবার ফেরত চলে আসবে।

মৈত্র এবার কেমন ঠাট্টা করে বলল, বাড়ি থেকে রাগ টাগ করে পালিয়েছিস!

—রাগ, না রাগ ঠিক না। তবে সবাইকে না জানিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বের হয়ে পড়েছি। কেউ জানত না, আমি কোথায়। আমার চিঠি পেলে মা যে কি খুশী হতেন!

—তোর এটা ঠিক হয়নি ছোট। মাকে এ-ভাবে উদবিগ্নের ভিতর রাখা ঠিক হয়নি।

ছোট এবার দেয়ালের দিকে মুখ ঘোরাল। ছোট কি মায়ের জন্য কাঁদছে। ছোট কিছুতেই এদিকে মুখ ঘোরাচ্ছে না। মৈত্র ভীষণ বিব্রত বোধ করছে। এ-ভাবে ছোটকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে দেখলে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে বলল, বুঝলি ছোট তোর বৌদি চিঠি লিখেছে!

ছোট কোন আগ্রহ দেখাল না। তবু মৈত্র বলে চলছে, বুঝলি তোর বৌদিব কি ভয়রে! ও নাকি ডেকের মাস্তুলে একটা তিমি মাছ স্বপ্নে ঝুলতে দেখে। কখনও তিমি মাছের কঙ্কাল। এ-আবার কি রকম স্বপ্ন রে বাবা!

ছোট উঠে বসল এবার। সে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে এখনও। সে তেমনিভাবে বলল, সত্যি আজগুবি স্বপ্ন মৈত্রদা। না হলে শেফালী বৌদি হবে কেন! তোমরা দুজনই দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারছ না। বলে ছোট একটি রসিকতা করে নিজেই নিজেকে হাল্কা করে দিল। এবং বড্ড ছেলেমানুষী করে ফেলেছে ভেবে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে মৈত্রের নাগালের বাইরে চলে গেল।

মৈত্র বলল, বেচারা!

(ক্রমশঃ)

এই আমাদের দেশ

মেদিনীপুর—(২)

১। সম্পদ ও সম্ভাবনা

মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-কীর্তিকে মোটা-দাগে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন, যেগুলি ১৬০০ খৃষ্টাব্দের আগের তৈরি, সেগুলি বেশি দেখা যায় সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় আর তমলুক শহরে। এইসব এলাকায় যেসব দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে সেগুলি সবই হিন্দু রাজাদের শাসনকালের সৃষ্টি। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে মুসলিম শাসনকালের কীর্তি যা মোটামুটিভাবে ১৬০০ থেকে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়। মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন—মসজিদ, প্রাসাদ ও সমাধি বেশি চোখে পড়ে সদর ও কাঁথি মহকুমায়। তৃতীয় বিভাগে পড়ে ইংরেজ শাসনকালে হিন্দুদের তৈরি মন্দিরগুলি।

প্রথম পর্যায়ের প্রাচীন মন্দিরগুলির উপর ওড়িশার মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু তৃতীয় বিভাগের, অর্থাৎ ইংরেজ আমলে তৈরি মন্দিরগুলির বেশির ভাগই বাঙলার নিজস্ব শিল্পরীতির অনুসারি। মন্দিরগুলি মাকড়া পাথর অথবা ইটের তৈরি এবং তার পোড়া মাটির কাজ প্রশংসনীয়। তৃতীয় বিভাগের মন্দিরগুলি বেশি চোখে পড়ে ঘাটাল মহকুমায়।

মেদিনীপুরের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রধান উল্লেখ্য তমলুক শহরের রূপনারায়ণ তীরবর্তী বর্গভীমার মন্দির। উঁচু বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির স্থাপত্য রীতির বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কোন প্রমাণ মেলেনি, তবে এটি বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনকালের সৃষ্টি বলে মনে হয়। এটি হয়ত পূর্বে বৌদ্ধদেরই প্রার্থনা ভবন ছিল, পরে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। অনেক দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায় এবং মন্দিরটি দেখলেই বুদ্ধগয়ার মন্দিরের কথা মনে আসে। মন্দিরটি সুপ্রাচীন হলেও তার কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। শুধু এক-পাথরের তৈরি চূড়াটি ১৮৬৪ সালের ঝড়ে ভেঙে পড়ে। তারপর ঐ ধরনের পাথর আর পাওয়া যায়নি বলেই বোধহয় ইটে গাঁথা নতুন চূড়া নির্মিত হয়।

দীঘা সমুদ্র সৈকতে

মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী উগ্রতারা, পাথরের তৈরি চতুর্ভুজা দেবী শিবের উপর দণ্ডায়মান। দেবীর দুটি দক্ষিণ হাতে আছে ত্রিশূল ও তরবারী, আর দুটি বাম হাতে নর ও অসুর মুণ্ড। মঞ্চে শিব, মহিষমর্দিনী ও বিষ্ণুর অনেকগুলি ছোট মূর্তি সংরক্ষিত আছে। বাইশ ধাপ উঁচু চত্বরে নির্মিত বিশাল মন্দিরভবন বড় দেউল, জগমোহন, নাট-মন্দির ও ষষ্ঠমন্দির—এই চার ভাগে বিভক্ত। বড় দেউলে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, জগমোহন দর্শনার্থীদের সমাবেশ ভবন। উভয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ঢাকা বারান্দাটি হল জ্ঞানমণ্ডপ যেখানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা সমবেত হয়ে শাস্ত্র চর্চা করেন। স্থানীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর এই মন্দিরের প্রভাব সীমাহীন। যাঁরা পুণ্যার্থী বা যাঁরা মন্দিরপ্রেমী তাঁদের সকলের কাছেই বর্গভীমা অবশ্য দ্রষ্টব্য।

তমলুক শহরের আর এক মন্দির হল কৃষ্ণার্জুনের মন্দির। রাজা তাম্রধ্বজ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে কৃষ্ণ ও অর্জুনের মূর্তি পূজিত হয়। মূল মন্দির চারশ বছর আগে রূপনারায়ণের ভাঙনে বিলুপ্ত হয়, তারপর নির্মিত হয় বর্তমান মন্দিরটি। শহরের অপর উল্লেখ্য গৌরাঙ্গদেবের মন্দির মহাপ্রভুর পার্ষদ বাসুদেব ঘোষ কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত।

তমলুক মহকুমায় পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত মহৎপুর গ্রামে আছে শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির। রচনাশৈলীতে মন্দিরটির সঙ্গে হুগলীর তারকেশ্বরের মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুর আছে, এখানে চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা বসে। পাঁশ-কুড়া থানার রঘুনাথবাড়ি গ্রামে আছে রঘুনাথ-জীউর মন্দির যা রামচন্দ্রের মন্দির নামেও পরিচিত। মন্দির স্থাপত্য উল্লেখযোগ্য নয়, তবে এখানে একটি কামান দর্শনার্থীকে আকৃষ্ট করবে। কামানটি কাশিজোড়ার কোন এক ফকিরের রাজার বলে কথিত। বিজয়াদশমীর দিন এখানে বড় মেলা বসে চলে সপ্তাহকাল।

তমলুকের সুতাহাটা থানার দেভোগ গ্রামে আছে একটি সুন্দর নবরত্ন মন্দির। দোরোর কুমার নারায়ণের মহিষী রাণী সুগন্ধা ঐ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। দোরোয় আছে দাঁড়া

পাথরের তিনটি সুন্দর মূর্তি। মাধব, সাগর-মাধব ও নীলমাধবের।

তমলুক মহকুমার ময়নাতে আছে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। দুটি পরিখার অভ্যন্তরে প্রায় আট একর জমির উপর ময়নার রাজাদের ঐ বিশাল দুর্গটি নির্মিত হয়। দুর্গটি ময়নাগড় নামে খ্যাত; এটি ছিল ময়নার রাজাদের বাসস্থান। ময়না যখন গৌড় রাজাদের শাসনাধীন ছিল সেই সময় দুর্গটি নির্মিত হয় বলে ময়নার রাজ-পরিবারের নথিপত্রে উল্লেখিত আছে।

মেদিনীপুর শহরের পশ্চিম দিকে কাঁসাই নদীর ধারে গোপ গৃহ বা গোপগড় নামে যে বিশাল স্থাপত্যকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় সেটিও একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। একদা উঁচু চওড়া দেওয়াল ও পরিখা দিয়ে ঐ দুর্গ ঘেরা ছিল। দুর্গের নির্মাণকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত কিছু জানা যায় না, আর সেই কারণেই নানা কিংবদন্তী প্রচলিত হয়েছে এই দুর্গটির নাম অনুসারে।

সদর মহকুমার শালবনীতেও একটি প্রাচীন দুর্গের জীর্ণাবশেষ চোখে পড়ে। সেটি সম্ভবতঃ পাঁচ শ' বছর আগে নির্মিত হয়। দুর্গের চারিদিকের পরিখা এখন মাটিতে ভরে গেছে, সীমানার প্রাচীরের সামান্য অংশ দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণী তার মাঝখানে একটি পাথরের মন্দির ছিল। দুর্গটির ধারে কাছে অনেক-গুলি ভগ্ন জীর্ণ মন্দির দেখা যায়। দুর্গ থেকে মাইলখানেক দক্ষিণ-পূর্বে আছে দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার দুটি প্রাচীরঘেরা মন্দির। মহামায়ার মন্দির ৩৬ ফুট, উঁচু আর দণ্ডেশ্বরের মন্দির পঁচাত্তর ফুট। এখানে যোগী মন্ডপ নামে যোগ অভ্যাসের যে ভবনটি নির্মিত হয়, সেটি নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

সদর মহকুমার গড়বেতাতে আর একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। দুর্গের নাম রায়কোট, এখানে বগড়ি রাজাদের রাজ-ধানী ছিল। দুর্গের দরজাগুলির নাম ছিল লাল দরজা, হনুমান দরজা, পেশা দরজা প্রভৃতি। দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল জলতুঙ্গি, ইন্দ্র পুষ্করিণী মঙ্গলা প্রভৃতি নামের সাতটি পুষ্করিণী। প্রত্যেক পুষ্করিণীর মাঝখানে ছিল একটি মন্দির। দুর্গটি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাকালের মধ্যে নির্মিত হয়। এখানে আছে সর্বমঙ্গলা, কামেশ্বর অথবা কংসেশ্বর মহাদেব ও রাধাবল্লভের তিনটি মন্দির।

মঙ্গলা পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সর্বমঙ্গলা মন্দিরের শিল্পশৈলীতে ওড়িশা রীতির ব্যাপক প্রভাব। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের একশ' গজ পশ্চিমে রয়েছে কামেশ্বর বা কংসেশ্বর শিবের মন্দির। উঁচু চাতালের উপর স্থাপিত রাধাবল্লভের মন্দিরটি বাংলা আটচালা ধাঁচের। দুর্জন সিং মল্লরাজার আমলে ১৬৯৭ সালে নির্মিত এই পাথরের মন্দিরটির শিল্পকার্য প্রশংসনীয়।

বগড়ি কৃষ্ণনগরে শিলাই নদীর বাঁ ধারে রয়েছে ইঁটের তৈরি কৃষ্ণ রায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির। বগড়ি রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাঘব রায় সম্পূর্ণ বাংলা শিল্পরীতির এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কষ্টি পাথরের তৈরী কৃষ্ণ রায়ের মূর্তিটিও একটি সুন্দর শিল্প নিদর্শন। শিলাই নদীর ডান ধারে রঘুনাথ-বাড়িতে আছে রঘুনাথজির নবরত্ন মন্দির। বাংলা শিল্পরীতিতে পাথরের তৈরি মন্দির। এটিও বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের কীর্তি। সুদর্শন এই মন্দিরের গায়ে যে পশু-পাখির চিত্রগুলি খোদিত হয়েছে সেগুলিও উচ্চতর শিল্পের নিদর্শন।

চন্দ্রকোণা রোড থেকে বারো মাইল পশ্চিমে গোয়ালতোড় গ্রামে আছে রাজা যদু-চরণ সিংহ প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। ১৭৫০ সালে মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির টেরাকোটার কাজ সুন্দর। অযত্নে ও অবহেলায় চাপে মন্দিরটি এখন ধ্বংসপ্রায়।

নারায়ণগড়ে আছে গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা ধলেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির। কসবা নারায়ণগড়ে মোগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র সুজা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিন-গম্বুজ মস-জিদটির একটি গম্বুজ ভেঙে পড়েছে।

সদর মহকুমার কেশিয়াড়ি আর একটি মন্দিরময় স্থান। এখানকার শিবমন্দির, সর্ব-মঙ্গলা মন্দির ও মহাদেব মন্দির দর্শনীয়। সবকটি মন্দির ওড়িশা শিল্পরীতি প্রভাবিত। সর্বমঙ্গলা মন্দিরের নির্মাণকাল ১৬০৪ খৃষ্টাব্দ।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে পশ্চিমবঙ্গের শেষ স্টেশন দাঁতন মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত একটি প্রাচীন স্থান। এখানকার শ্যামলেশ্বর মন্দির সুপ্রাচীন। তার প্রবেশপথে পাথরে খোদিত লিপি পাঠ করা যায়নি বলে নির্মাণকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়নি। কালা-পাহাড়ের আক্রমণে মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয়। এখানকার বিদ্যাধর ও শশাঙ্ক নামে পুষ্ক-রিণী দুটি বিশাল ও সুপ্রাচীন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, পুকুর দুটির মধ্যে একদা মাটির নীচে সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে সংযোগ ছিল।

ঝাড়গ্রাম মহকুমার উল্লেখযোগ্য পুরা-কীর্তি হল চন্দ্ররেখা গড়। ষোড়শ শতাব্দীতে নয়াগ্রামের রাজা চন্দ্রকেতু এই বিশাল দুর্গটি নির্মাণ করেন। দুর্গটির মাইল দেড়েক দক্ষিণ-পূর্বে, সহস্র লিঙ্গ গ্রামে আছে রামেশ্বরনাথ মন্দির। ওড়িশা শিল্প রীতি প্রভাবিত এই মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠাতা রাজা চন্দ্রকেতু। চৈত্র মাসে এখানে বারুণীর মেলা বসে।

ঝাড়গ্রাম শহরে আছে একটি গড়, যার অভ্যন্তরে রয়েছে ঝাড়গ্রাম রাজপরিবারের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রীদেবীর মন্দির। ঐ গড়ের মাইল দুয়েক উত্তরে রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগল দেব প্রতিষ্ঠিত মেল বাঁধ ও ফেলেদা বাঁধ নামে বৃহৎ পুষ্করিণী দুটিও দর্শনীয়।

কাঁথি মহকুমায় কাঁথি-বেলদা সড়কের মাঝপথে অবস্থিত এগরায় কয়েকটি প্রাচীন কীর্তি দেখা যায়। এখানে হাটনগরে যে শিবমন্দিরটি আছে তার প্রতিষ্ঠাতা ওড়িশার রাজা গজপতি মুকুন্দ দেব। সুন্দর স্থাপত্য-শৈলীর নিদর্শন এই মন্দিরে ওড়িশা শিল্প-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কসবা এগরার মসজিদটিও প্রাচীন। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজা বাংলার সুবাদার থাকাকালে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

কাঁথি শহরের অদূরবর্তী দেউলবাড়, ডিহিবাহিরি ও পাইকবাড়ি ও বিধুবাহিরী নামে যে গ্রাম কটি পাশাপাশি রয়েছে তাদের প্রত্নসম্পদ উল্লেখযোগ্য। একটি পুকুর

সুনীল কুমার ঘোষের সর্ববৃহৎ উপন্যাস

রাজা গেল রাজ্য গেল

প্রকাশিত হ'ল

ষোল টাকা

ভারাইটি পাবলিশার্স, ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

খোঁড়ার সময় এখানে বৌদ্ধ যুগের মূর্তির সন্ধান মেলে। এখানে ধানটিকরি, গোধনটিকরি, পালটিকরি ও সাপটিকরি নামে যে চারটি স্তূপ দেখা যায় সেগুলি সম্ভবত বৌদ্ধ সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ। একটি ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দির আছে এখানে যেটি অন্তত তিন শ বছরের প্রাচীন। দুটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে ভীমসাগর ও হেমসাগর নামে। এখানে একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায়, সেটি এখন আশুতোষ সংগ্রহশালায় আছে। অধুনালুপ্ত নদীর ধারে একটি সুপ্রাচীন তেঁতুল গাছ আছে, যার কাণ্ডে এখনও জাহাজ-বাঁধা শেকলের দাগ দেখা যায়।

দীঘার পথে পিছাবনির কাছে কাঞ্চনপুরে মোগল সম্রাট শাহ আলমের আমলের একটি ভগ্ন দুর্গ আছে। খেজুরি থানাতেও মুসলিম আমলের ও ইংরেজ আমলের সূচনাকালের অনেক স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়।

সারা মেদিনীপুর জেলা জুড়ে যে অগণিত মেলা, লোক উৎসব ও পূজা পার্বণ হয় তার দীর্ঘ তালিকা এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নানা উৎসব উপলক্ষে যেসব সমাবেশ হয় তার কয়েকটির উল্লেখ না করলে মেদিনীপুরের জনজীবন সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না।

সদর মহকুমায় খড়গপুরের দশহারা উৎসব খুবই বর্ণাঢ্য ও জনপ্রিয়। বিজয়া দশমীর দিন রাবণের বিরাট মূর্তি অগ্নিদগ্ধ করার সময় উৎসব স্থানে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হয়। গড়বেতার বর্গভিকলনগরে মার্চ মাসে দোলযাত্রা উপলক্ষে এক তিন দিনের মেলা বসে এবং সে মেলায় বেশ লোক সমাগম হয়। ডেবরার চণ্ডীপুরে পৌষসংক্রান্তিতে পক্ষকাল ধরে চলে কেদার মেলা। সে মেলাও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়। শালবনী থানার কর্ণগড়, গাইঘাটা ও নান্দুরিয়া পল্লীতে পৌষ মাসে দু দিন ধরে পূজার মেলা বসে। কেশপুর থানার কানাসোল গ্রামে মেলা বসে সাত দিন, বেশ লোক সমাগম হয়। নারায়ণগড়ের কসবার মাঘী পূর্ণিমার মেলা উল্লেখযোগ্য। মোহনপুরের রথযাত্রার মেলা বেশ বড়। পিংলার কাঁটাপুকুরে মাঘী পূর্ণিমার মেলা দু দিন চলে। দাঁতনের ঠাকুরগড়ে রথযাত্রার মেলা বড় ও সুপ্রাচীন।

তমলুক মহকুমায় বাঁশদার মাঘী পূর্ণিমার মেলা তিন দিন চলে। তমলুকের দেউলিয়াড়হাটের রথের মেলা বড় হয়। গড়ময়নার দোলযাত্রার মেলা ও উৎসবও উল্লেখযোগ্য। পাঁশকুড়ার রঘুনাথপুরে বিজয়া দশমীর দিন বড় মেলা বসে। তমলুক মহকুমায় মাহিষাদলের রথের মেলাই সবচেয়ে বড় উৎসব। আট দিন ধরে মেলা চলে আর তাতে অর্ধ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। নন্দীগ্রামে হরিচকের রথের মেলাও খুব বড়। রথযাত্রা এই মহকুমার একটি জনপ্রিয় উৎসব। নন্দীগ্রামের সম্বৎসরাদে মহরমের সময় একদিনের একটি বড় মেলা বসে, তাতে দশ বারো হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

ঝাড়গ্রামের মহকুমায় নয়াগ্রামের দেউলবাড়ে শিবরাত্রির দিন একটি বড় মেলা হয়। ঝাড়গ্রাম শহরে ইন্দ্রপর মেলা চলে ন' দিন। সাঁকরাইল থানার কাশিডাঙায় চড়ক উপলক্ষে একদিন একটি বড় মেলা বসে। ঝাড়গ্রাম মহকুমার সবচেয়ে বড় লোক-উৎসব হল গোপীবল্লভপুরের কুরবানিষা গ্রামের বালিজাত উৎসব। একদিনের মেলায় বিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়।

ঘাটাল মহকুমায় বড় মেলা বা লোক-উৎসব বেশি নেই। ঘাটাল শহরে মে মাসে শীতলা পূজা উপলক্ষে একটা ছোট মেলা বসে। দাসপুরের নিজনাড়াজোল গ্রামে সপ্তাহখানেক ধরে রথযাত্রার মেলা বসে। চন্দ্রকোণা শহরের রথযাত্রা মেলাও উল্লেখযোগ্য।

কাঁথি মহকুমার বড় মেলা হল এগরার শিবরাত্রি ও বাসন্তীপুজোর মেলা। বালিঘাইর ধরোধারী পুজোর মেলাও বড়। সব কটি মেলা সপ্তাহকাল ধরে চলে, আর প্রতিদিনই বেশ লোক সমাগম হয়। পটাশপুরের পাচেটগড়ে রাস-পূর্ণিমার সময় যে মেলা বসে তা চলে সপ্তাহকাল। অমরসি কসবার চন্দ্রনীলের মেলাও বড়। ভগবানপুরের খানজাদাপুর গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির সময় একটা তিন দিনের মেলা বসে। কাঁথি থানায় নাটিদাঘ অক্ষয়-তৃতীয়ার সময় এক পক্ষকালের মেলা বসে এবং প্রতিদিনই মেলায় হাজার দুয়েক লোক জড়ো হয়। দারুয়ার রথের মেলাও বড়। দাবিয়াপুরে বঙ্কিম-মেলার কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে যাত্রা ও অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় মেলাটির জনপ্রিয়তা বেড়েছে। এই ধরনের মনীষী আগমনের স্মরণে মেলা পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশি হয় না। খেজুরির লক্ষ্মণচকে পৌষ মাসে বসে গান্ধীমেলা। কাঁথির সবচেয়ে বড় মেলা হয় জুনপুটে পৌষ সংক্রান্তির দিন। মেলায় বিশ পঁচিশ হাজার লোকের সমাবেশ হয়। ঐ দিন দীঘা সৈকতেও প্রচুর লোক সমাবেশ ঘটে। দুর্গাপূজার সময় কাঁথি শহরের কিশোরনগর পল্লীতে কদিন ধরে মেলা চলে, সে মেলাও স্থানীয় অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়।

শিক্ষায় অগ্রগতি

বাংলায় শিক্ষা প্রসারে মেদিনীপুরের মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। তবে শিক্ষার শতকরা হারে মেদিনীপুরের স্থান কলকাতা, হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা—এই চারটি শিল্পসমৃদ্ধ জেলার পরেই।

১৯৫১ সালে এই জেলায় সাক্ষর ছিলেন শতকরা ২৩-১৭ জন; ১৯৬১ সালে-ঐ শতকরা হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৭-২৭; তার দশ বছর পরে শিক্ষার শতকরা হার আরও বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩২-৮৮। জেলায় ৫৫ লক্ষ ১৫ হাজার লোকের মধ্যে, ১৯৭১ সালে পুরুষ সাক্ষরের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার আর নারী সাক্ষরের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৯ হাজার। আনুপাতিক হারে জেলার ৪২-০৫ শতাংশ পুরুষ ও ২২-৫৪ শতাংশ নারী সাক্ষর। পুরুষ সাক্ষরের হারে মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের (৪২-৮৪) তুলনায় পেছিয়েও নারী সাক্ষরের হারে (২২-০৮) একটু এগিয়ে।

জেলায় ১৯৬৯ সালে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৫,৬০৭, হাই ও হায়ার-সেকণ্ডারি স্কুলের সংখ্যা ৫৪০ আর কলেজ ২৮টি। তার মধ্যে সদর মহকুমায় ছিল ১২টি কলেজ, তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় ছটি করে, ঝাড়গ্রাম মহকুমায় তিনটি আর ঘাটাল মহকুমায় মাত্র একটি। বিভিন্ন কলেজগুলি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। খড়গপুরে আছে বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ আই আই টি, সারা ভারতের ছাত্র সেখানে পড়তে আসে। আর ঝাড়গ্রাম শহরে আছে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

সংযোগ, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ

জেলার সংযোগ ব্যবস্থা প্রায় প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এত বড় জেলায় রেল স্টেশন আছে মাত্র বত্রিশটি, তার মধ্যে সদর মহকুমায় আছে একুশটি। ৩৬৯ বর্গমাইল আয়তনের ঘাটাল মহকুমায় রেল স্টেশন আছে একটি, আর ৯১২ বর্গমাইল আয়তনের কাঁথি মহকুমায় একটিও রেল স্টেশন নেই।

সড়ক পথও খুব উন্নত নয়। ১৯৭০ সালে জেলার ১০,৬১৮টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৮৫৬টি সড়কপথে সংযুক্ত ছিল। এখনও পর্যন্ত গো-যানই গ্রামের প্রধান বা একমাত্র পরিবহণ।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত জেলায় পোস্ট অফিসের সংখ্যা ছিল ৮১৩ এবং টেলিগ্রাফ অফিস ৪৫টি।

সারা মেদিনীপুর জেলার ১৯৫৯-৬০ সালে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৫২ লক্ষ ৮৮ হাজার কিলোওয়াট; ১৯৬৯-৭০ সালে ঐ ব্যবহারের পরিমাণ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯ কোটি ১২ লক্ষ ২৮ হাজার কিলোওয়াট। কিন্তু বৃহৎ মেদিনীপুর জেলার প্রয়োজনের তুলনায় এই সরবরাহের পরিমাণ তুচ্ছ। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পরিকল্পনা ত অনেক পরের কথা, জেলার চোদ্দটি শহরের মধ্যে এগারোটিতে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আর ১০,৬১৮টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ গেছে মাত্র ৩৬টি গ্রামে।

সদর মহকুমার ১১টি গ্রামে, কাঁথি মহকুমার ১৩টি ও তমলুক মহকুমার ১১টি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁচেছে, ১১৮৬ বর্গ মাইল আয়তনের ঝাড়গ্রাম মহকুমার মাত্র

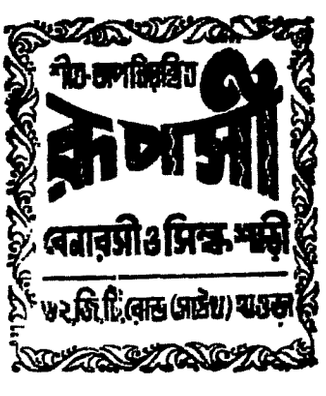

একটি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছেছে আর ৩৬৯ বর্গমাইল আয়তনের ঘাটাল মহকুমার কোন গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। বৈদ্যুতিকরণের এই হিসাব থেকেই বোঝা যাবে, মেদিনীপুর জেলার অগ্রগতি এখন কোন্ অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যুৎ ছাড়া শিল্পোন্নতির কোন উপায় নেই, আর মুখ্যত সেই কারণে আর্থিক অবস্থার বিচারে মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলার মধ্যে চতুর্দশ স্থানের অধিকারী।

মেদিনীপুর জেলার অবস্থা বোঝাতে নমুনা হিসাবে এখানে কাঁথি মহকুমার কথা বলা যেতে পারে। ৯১২ বর্গমাইল আয়তনের এই মহকুমায় এক ইঞ্চি রেলপথ নেই; ১৮৫০টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩টিতে এ-পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। সারা মহকুমায় একটিও বৃহৎ শিল্প নেই। মহকুমাটি আয়তনে হুগলী জেলার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ, কিন্তু হুগলী জেলায় মিউনিসিপ্যাল শহর আছে বারোটি, আর কাঁথি মহকুমায় একটি। দীঘা একটি বড় পর্যটন কেন্দ্র হয়ে ওঠায় কাঁথি অন্তত যে ভোগ্যপণ্যের বাজার গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছে তার কিছুই এখনও পর্যন্ত কাজে লাগানো হয়নি। মহকুমার অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর হলেও রাইস মিল আছে মাত্র ৪টি; দুটি কাঁথি—এক নম্বর ব্লকে ও দুটি এগরা—দু নম্বর ব্লকে। সমগ্র মহকুমায় একটিও তেল কল নেই। মহকুমার ১৮৫০টি গ্রামের মধ্যে সড়কপথে যোগাযোগ আছে ৫৪৩টি গ্রামের। সমগ্র চাষের জমির শতকরা মাত্র ১১ ভাগ সেচের জল পায়।

সেচ ও কৃষি ব্যবস্থা

ঝড়গপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ছাড়া কোন বড় কল-কারখানা মেদিনীপুর জেলায় নেই। মূলধন ও বিপণন ব্যবস্থার অভাবে জেলার কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবস্থাও ভাল নয়। সে কারণে কৃষির উপরেই জেলার মানুষ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সারা পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৪ জন কৃষিনির্ভর, আর মেদিনীপুরে কৃষিনির্ভর শতকরা ৭৬ জন।

কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্যও খুব বড় রকমের চেষ্টা এ পর্যন্ত কিছুই প্রায় করা হয়নি। জেলার মোট ২৫ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে চাষ হয় তার মধ্যে সেচের ব্যবস্থা আছে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জমিতে। সদর ও তমলুক মহকুমার চাষের জমির প্রায় অর্ধেক সেচসিঞ্চিত। ঘাটাল মহকুমার চাষের জমির ৩৮ শতাংশ সেচের জল পায়। কিন্তু ঝাড়গ্রাম ও কাঁথি মহকুমার যথাক্রমে মাত্র ১৬ ও ১১ শতাংশ চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় চাষের কাজ চলে যায়। বরঞ্চ জলনিকাশী ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় প্রতিবছর আতবর্ষণে বিভিন্ন এলাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। দুবদা বেসিন কাঁথি মহকুমার এমনই এক অভিশাপ। মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে যেমন প্রয়োজন সুনিশ্চিত সেচ ব্যবস্থার, তেমনই প্রয়োজন সুপরিকল্পিত জলনিকাশী ব্যবস্থার। বর্ষায় ফসল নষ্ট হয়ে যায় বলে মেদিনীপুরের চাষীরা এখন গ্রীষ্মের ফসল বোরো আউশ প্রভৃতি চাষের দিকে বেশি জোর দিচ্ছেন এবং তাতে ফলও ভাল পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু মেদিনীপুরের মাটির আর্দ্রতা ধারণ-শক্তি কম। তাই জলের অভাবে এখানে রবি-শস্য ভাল হয় না।

জেলার সেচ ব্যবস্থা যে কতটা উপেক্ষিত তা অন্য জেলার সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত ক্যানালের জলে মেদিনীপুর জেলার মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে, অথচ হুগলী জেলা মেদিনীপুরের এক-চতুর্থাংশ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ক্যানাল সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে দুই লক্ষ একর, আর বাঁকুড়া মেদিনীপুরের আয়তনের অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সেই জেলায় ক্যানালের জলে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে ২ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে।

জেলার মহকুমাগুলির মধ্যে সবচেয়ে খরাপ্রবণ হল ঝাড়গ্রাম এবং সেখানে সেচ-ব্যবস্থা আছে মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ চাষের জমিতে। অথচ সুবর্ণরেখার জল ঠিক পরিকল্পনা মতো কাজে লাগাতে পারলে জেলার বিস্তীর্ণ অংশকে সুফলা করে তোলা যায়। পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের মতে যদি কোকপাড়ায় একটি বাঁধ বাঁধা যায় ও সুবর্ণরেখার ডান পাড় থেকে হাই-লেভেল খাল কেটে গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রামের মধ্য দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ঐ দুটি ব্লকের সেচের জলের প্রয়োজন সম্পূর্ণ পূরণ করা সম্ভব হবে। একইভাবে কোকপাড়া বাঁধের কাছে বাম পাড় থেকে খাল কেটে যদি দলং নদীর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া যায় তাহলে সাঁকরাইল ও কেশিয়াড়ি অঞ্চলের জলের অভাব দূর হবে। তারপর দাঁতন, কেশিয়াড়ি ও নয়াগ্রামের সংযোগস্থলে যদি সুবর্ণরেখার উপর দ্বিতীয় বাঁধ বাঁধা যায় তবে দাঁতন ও নয়াগ্রাম অঞ্চলে খরিফ ও রবি উভয় ফসলেরই জল যোগানো সম্ভব হবে। ঐ জল কেলেঘাই দিয়ে হলদি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে হলদিয়া প্রকল্পের জলের অভাবও দূর হবে।

কোন শিল্প নেই বলেই জেলার মানুষকে এত বেশি কৃষিনির্ভর হতে হয়েছে। জেলার ৫৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ৪২ লক্ষ কৃষিজীবী, এবং তার মধ্যে ১৮ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। আবার যাদের জমি আছে তাদেরও শতকরা ৮১ জনের জমির পরিমাণ পাঁচ একরের কম। এসবের জন্যই মেদিনীপুরের মানুষের এত দারিদ্র্য। পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের সারা বছরে মাথাপিছু আয় ৩২৬ টাকা। আর মেদিনীপুর জেলায় ঐ আয় মাত্র ২২৩ টাকা। তাই আজ সারা জেলার মানুষের মাথায় পর্বতপ্রমাণ ঋণের বোঝা, আর ঋণের দায়ে ছোট চাষী জমি বেচে দিয়ে জমিহীন ক্ষেত মজুরের সংখ্যা বাড়াচ্ছে।

জেলায় চাষের জমি বাড়ানোর আর বিশেষ কোন সুযোগ নেই। সে কারণে এক জমিতে বহুবার চাষ করেই জেলার কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। অথচ, এখনও পর্যন্ত মেদিনীপুরে বহুফসলী জমির পরিমাণ খুব বেশি নেই। জেলার মোট ৩৩,২২,৪৭২ একর জমির মধ্যে চাষের জন্য পাওয়া সম্ভব এমন জমির পরিমাণ ৪৫,৪২,৭০৭ একর। আর তার মধ্যে বহু-ফসলী জমির পরিমাণ ২,৪০,৪৬১ একর ('৭০ সালে)। অর্থাৎ মোট চাষের জমির মাত্র ১১ শতাংশ বহু-ফসলী।

জেলার প্রধান ফসল ধান। ১৯৬৯-৭০ সালে মোট চাষের জমির ৭৯ শতাংশে ধান চাষ হয় এবং জেলার মোট কৃষিজ পণ্যের ৭৪ শতাংশ ছিল ধান। গমের চাষ দ্রুত বাড়ছে, গম-চাষের জমি এক দশকে প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৮০০ একর। অন্য দিকে জোয়ার তুর ছোলা প্রভৃতির চাষ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তিল তিসি মেস্তা ও তামাকের চাষের বিশেষ কোন হেরফের হয়নি। সর্ষের চাষের পরিমাণ ও সর্ষের তেলের উৎপাদন প্রায় দুগুণ বেড়েছে। আদার চাষও বেড়েছে। যে সব জমি সেচের জল পায় না সেখানে আমনের পর দ্বিতীয় ফসল হিসাবে তুলো ও বাদামের চাষ বাড়ছে। সূর্যমুখীর চাষও শুরু হয়েছে। কাঁথির হাজার হাজার একর বালি জমিতে কাজু বাদামের গাছ লাগানো হচ্ছে, এসব জমি কোন কাজে লাগে না, কিন্তু সুপরিকল্পিতভাবে কাজু বাদামের গাছ লাগানো হলে একর-পিছু একশ গাছে বছরে প্রায়

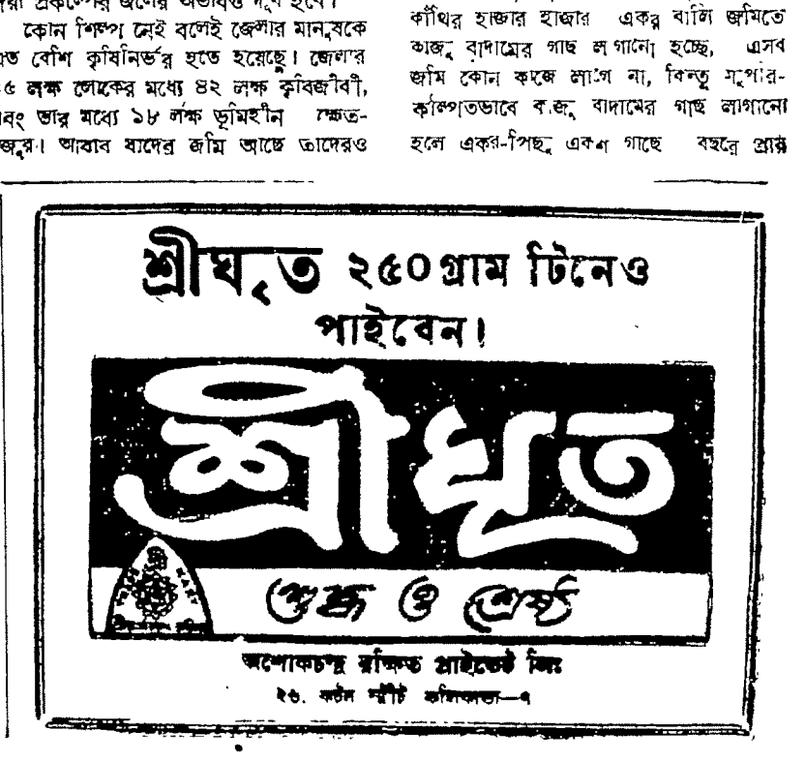

দু হাজার টাকা করে আয় হতে পারে। ১৯৬৮-৬৯ সালে মেদিনীপুর জেলা থেকে কাজু বাদাম বিক্রি হয়েছে ৯৮ লক্ষ টাকার।

সারা মেদিনীপুর জেলায় ১৯৬৮-৬৯ সালে কৃষিজপণ্য উৎপাদনের যে হিসাব মেলে তাতে দেখা যায় জেলায় আউশ ধানের চাষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬০০ একর জমিতে আর ফসল মিলেছিল ৪৫ হাজার ৯০০ টন, অর্থাৎ একর পিছু ফলন ছিল ৭-৮৭ মণ। আমন চাষ হয়েছিল ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩০০ একর জমিতে, ফসলের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন, অর্থাৎ একর প্রতি ফলন ছিল ১২-৩৩ মণ। বোরো ধানের চাষ হয়েছিল ৮৮ হাজার একর জমিতে, উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯২ হাজার টন, অর্থাৎ একর প্রতি ফলনের পরিমাণ ২৮-৪৬ মণ।

গম চাষের হিসাব পাওয়া যায় ১৯৬৭-৬৮ সালের। মোট ২৮০০ একর জমিতে চাষ করে গম মিলেছিল এক হাজার টন, অর্থাৎ একরে ৯-৫৭ মণ।

অন্যান্য ফসল হল ভুট্টা ছোলা ডাল তিল তিসি সর্ষে মেস্তা তামাক ও আদা। আখ আলু পানেরও ব্যাপক চাষ হয়। পান এখন তমলুক ও কাঁথির একটি বড় অর্থকরী ফসল। কোলাঘাট অঞ্চলে ফুলের চাষ হয় ব্যাপকভাবে, প্রায় চব্বিশ হাজার ফুলের বাগান আছে এই অঞ্চলে। কলকাতায় প্রতিদিন যে ফুল সরবরাহ হয় তার প্রায় সবটাই সরবরাহ করে ঐ বাগানগুলি।

শিল্পের অবস্থা

সারা জেলায় খড়্গপুরের রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ছাড়া কোন বৃহৎ শিল্প নেই। রাইস মিল আছে মোট ৭৬টি, যাতে দৈনিক প্রায় দশ হাজার মেট্রিক টন চাল প্রস্তুত হতে পারে। আর তেলকল আছে মোট ষোলটি। এর বাইরে মেদিনীপুর জেলায় কল-কারখানা বলতে কিছুই নেই। জেলার অভ্যন্তরে রেলপথ সামান্য, সে কারণে বাসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালের পয়লা জানুয়ারি জেলায় যাত্রীবাহী বাস ছিল ৮৫৬টি, তাছাড়া মালবাহী ট্রাক ছিল ১৬৩৪টি। ঐ সময় বাস ট্রাক জিপ ট্যাক্সি স্কুটার ইত্যাদি মিলিয়ে জেলায় মোট মোটর ভেহিকলের সংখ্যা ছিল ৪,৮২৫। সমগ্র হলদিয়া প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ হলে তবেই মেদিনীপুরের অর্থ-নীতিতে প্রাণ সঞ্চার হতে পারে। প্রথমত হলদিয়া হবে বড় জাহাজ চলাচলের বন্দর, দ্বিতীয়ত, এখানে গড়ে উঠবে একটি তৈল শোধনাগার, যার শোধন ক্ষমতা প্রথমে হবে পঁচিশ লক্ষ টন, পরে বাড়িয়ে করা হবে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন, নাপথা কেরোসিন ডিজেল ফার্নেস অয়েল ও গ্যাস উৎপন্ন হবে ঐ শোধনাগারে। শোধনাগারের নাপথা থেকে গড়ে উঠবে একটি সার কারখানা। পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্সের যে কারখানা হবে তা থেকে উৎপন্ন হবে এথিলিন, প্রপিলিন, বুটিলিন, আসো বুটিডিন বেনজিন, প্রভৃতি, বুটিলিন, আইসো বুটিলিন, বুটাডিন বেনজিন প্রভৃতি, এই সব সামগ্রীর ভিত্তিতে গড়ে উঠবে প্লাস্টিক, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, রং প্রভৃতির কারখানা। বন্দর চালু রাখার জন্য গড়ে উঠবে নানা যন্ত্রপাতির ও মেরামতির কারখানা। নানা রপ্তানিযোগ্য শিল্প ও সম্পূর্ণরূপে আমদানির উপর নির্ভরশীল শিল্পও ব্যাপকভাবে গড়ে উঠবে হলদিয়ার আশেপাশে। বলা বাহুল্য, এই শিল্পায়ন পরিকল্পনা যদি ঠিক মতো হয়, তাহলে শুধু মেদিনীপুরই নয়, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে প্রাণের জোয়ার জাগবে।

ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যে প্রায় দশ লক্ষ টন ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান মিলেছে তারও উত্তোলন ও প্রক্রমনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। মেদিনীপুর, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় যে অফুরন্ত স্টোনচিপস আছে সারা রাজ্যের পথ ও গৃহনির্মাণের কাজে তা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারেও কিছু করা হয়নি।

কাঁথির উন্নতি করা যেতে পারে কাজু বাদামের চাষ বাড়িয়ে ও কাজু প্রক্রমণের কারখানা স্থাপন করে। কাজু বাদামের ফলের নির্যাস থেকে গড়ে উঠতে পারে মদের কারখানা। সমুদ্র তীরে গড়ে উঠতে পারে ফিশারি ও নুনের কারখানা। আর দীঘার পর্যটকদের যোগান দিতে কাঁথি ও রামনগর অঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে অগণিত ডেয়ারি, পোলট্রি। দীঘায় গিয়ে কিছুই খেতে পাওয়া যায় না, সকল পর্যটকেরই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা। অথচ এত বড় চাহিদার বাজার পূরণ করতে ঐ এলাকায় কোন ডেয়ারি বা পোলট্রি গড়ে ওঠেনি। দীঘাকে আরও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র করে তোলার জন্যও অনেক কিছু করার আছে। তারপর দীর্ঘ পথের ক্লান্তি দূর করতে রসুলপুর ও হলদি নদীর উপর সড়ক সেতু নির্মাণের কাজও ত্বরান্বিত করা দরকার।

মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প-গুলির মধ্যে প্রথমেই তাঁতশিল্পের নাম করতে হয়। তমলুক মহকুমার বাধামণি ও তার নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে যে মশারি, লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি উৎপন্ন হয় তার বেশির ভাগই চালান যায় হাওড়া হাটে ও কল-কাতার বাজারে। ঘাটাল মহকুমার নিমতলা ও রামজীবনপুরে ও কাঁথির অমরসিতে যে মিহি সুতোর তাঁতের কাপড় হয় তার চাহিদা অভিজাত মহলেও আছে। ১৯৭০ সালে জেলায় ৬,৫৮৬টি তাঁত ছিল তার ৪৭-৫ শতাংশ ছিল শুধু কাঁথি মহ-কুমার পটাশপুর ও ভগবানপুর ব্লকে। তমলুক মহকুমার ময়না ব্লক তাঁতের জন্য বিখ্যাত।

মেদিনীপুরের আর এক বড় কুটির শিল্প হল মাদুর। জেলার বাহান্ন হাজার লোক মাদুর শিল্পে নিযুক্ত আছে। তম-লুক মহকুমার রঘুনাথবাড়ি অঞ্চলের মসলন্দ মাদুর তার হাল্কা সূক্ষ্ম সুন্দর রূপের জন্য খ্যাত। মোটা মাদুর তৈরি হয় সদর মহকুমার বালিচক, সবং ও দাঁশগ্রাম নামক স্থানে। ১৯৭০ সালে সারা জেলায় ৭৪৪১টি মাদুর তৈরির ইউনিট ছিল। ঝাড়-গ্রাম ও ঘাটাল মহকুমা বাদে জেলার সর্বত্র মাদুর তৈরি হয়। কাঁথি মহকুমায় সবচেয়ে বেশি মাদুর তৈরি হয় খেজুরি ব্লকে আর তমলুক মহকুমায় ময়নায়।

ঘাটাল মহকুমার দাসপুরে শিং-এর শিল্প একদা খ্যাত ছিল, এখন তার মুমূর্ষু অবস্থা। শাঁখ শিল্পও টিঁকতে পারছে না। কাঁসা পেতলের বাসনের শিল্পেরও এখন খারাপ অবস্থা। ঘাটাল মহকুমার খীরাই একদা বাসনের জন্য খ্যাত ছিল। এখন বাসন তৈরি বেশি হয় ঝাড়গ্রাম, বিনপুর, ভগবানপুর—২ ও ঘাটাল ব্লকে।

কাঁথির সমুদ্রাঞ্চলের প্রায় দশ হাজার গ্রামের লোক কিশ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপন্ন করে বা এই রাজ্যে উৎপন্ন লবণের প্রায় ৯৫ শতাংশ।

মানিকপাড়া ও মেদিনীপুর শহরে যে সিমেন্টের তৈরি কুয়োর বেড় হয় তার চাহিদা বাড়ছে। ঝাড়গ্রামে যে ছোট আকারের পেপার মিল গড়ে উঠেছে তারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষের বাসভূমি মেদিনী-পুর ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জেলা। অথচ এই জেলায় স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও একটি উৎপাদনমূলক বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠেনি এর চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের কথা আর কিছুই হতে পারে না। এই জেলার অধিকাংশ মানুষ আজ যে দারিদ্র্য সীমানার নীচে তার প্রতিকার বৃহৎ শিল্প ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না। সুতরাং মেদিনীপুরকে হলদিয়ার সমগ্র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের উপরেই এখন সর্বা-ধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশাল মেদিনীপুর জেলা উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও রাজ্যের এক কোণে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে—পঞ্চান্ন লক্ষ মানুষের এই ক্ষুব্ধ অভিযোগ আর কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৩৭-২৩৫৯।

বাঙলা কাব্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

আজকাল 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি অর্থনৈতিক জগতের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এসে আরো ব্যাপক পরিধিকে নিজের সীমানা বলে চিহ্নিত করার দাবী উপস্থিত করেছে। ইংরাজী alienation শব্দটি বিভিন্ন প্রকরণের সর্বক্ষেত্রে বিচার্য হবার দাবী তুলেছে, আর আধুনিককালের তাবৎ কাব্য সমালোচক এখনকার কবিতায় বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ কিভাবে এবং কতখানি ধরা পড়েছে, —তার পরিমাপ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বাংলা কাব্যে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে খুব অল্পই আলোচনা হয়েছে—যদিও সম্প্রতি-কালে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে সাময়িক পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু হয়েছে। কিন্তু সে লেখা-গুলি মূলতঃ বিচ্ছিন্নতার অর্থনৈতিক দাবী কতদূরে—সেই বিষয়ের উপরই বেশী মনোযোগী।

আসলে বিচ্ছিন্নতা একটা অর্থনৈতিক এবং কিছুটা দার্শনিক টার্ম, তাই বিচ্ছিন্নতাকে সাহিত্যের আলোকে বুঝতে গেলে এর অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটা জানার দরকার হয়ে পড়ে। সেই জন্যেই বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রসংগ না এসে পারে না। তবে যেহেতু আমি আধুনিক কাব্যের পটভূমিতে বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ বিচারে প্রয়াসী, তাই সংক্ষেপেই বিচ্ছিন্নতা কাকে বলে সে পর্ব সেরে নেব।

বিচ্ছিন্নতাকে ইংরাজী ভাষায় যে শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়—সেটি হচ্ছে alienation এই শব্দটির সমার্থক আরো দু-চারটি সিনোনিম আছে, estrangement, apathy, non-involvement ইত্যাদি। এগুলির দ্বারা বিচ্ছিন্নতাবাদী না বিযুক্তিবোধকে সংজ্ঞিত করতে পারে কিন্তু আজ শিল্প ও সাহিত্যে 'বিচ্ছিন্নতা' বলতে যা বোঝায়—তার পূর্ণ রূপ তুলে ধরতে পারে না। বাংলা ভাষাতেও বিচ্ছিন্নতার বহু সমার্থক শব্দ আছে—বিযুক্তি, বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা, অনন্বয়, আত্ম-বিচ্যুতি প্রভৃতি, কিন্তু 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি সমালোচনার ক্ষেত্রে একক আধিপত্য বিস্তার করছে বলেই বিচ্ছিন্নতা শব্দটির উল্লেখ করতে হচ্ছে, নইলে 'অনন্বয়' শব্দটি অনেক বেশী অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

বিচ্ছিন্নতা কাকে বলে—একবাক্যে তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে পাঠকে বোঝাবার চেষ্টা করবো মাত্র, এবং আলোচ্য-দের দ্বারা সংশোধিত হবার ভরসা রাখি বলেই জানাচ্ছি যে যাঁরা বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে একেবারে (alien) অর্থাৎ অপরিচিত—তাঁদের জন্যই এই প্রচেষ্টা, এ বিষয়ে যাঁরা একসপার্ট, তাঁদের জন্য এ আলোচনা নয়।

মানুষ কি নিজেকে সম্পূর্ণ চেনে? তার মন ও মননের খবর সে কি রাখে? কিছু, কিছু রাখে বৈকি, কিন্তু পরিপূর্ণ-ভাবে নিজের সত্তার সার্বিক পরিচয়ের হদিস পাওয়া যায় না। সেখানে সে নিজেই নিজের কাছে কিছুটা অজানা বা অপরিচিত হয়ে পড়ে। এই অপরিচয়ের ইংরাজী প্রতি-শব্দই হচ্ছে alienation সত্তার রূপ করপুটে কি সে সম্পূর্ণ বিধৃত? না, সে নিজের সত্তার কাছেই নিজে ভিন-দেশী অপরিচিত (alien) হিসেবে গণ্য? সে যে শুধু, নিজের সত্তা, তথা মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন তা নয় সে তার পরিপার্শ্ব থেকেও নিজেকে বিযুক্ত ভাবে। এক হিসেবে মানুষের মননে এ এক মডার্ণ ট্র্যাজেডীর করুণ অসহায়তা। যে সংসারে সে ঘরছে ফিরছে, যে জগতে সে বাস করছে, যে প্রাকৃতিক পরিবেশে সে শ্যামল দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হচ্ছে—সে সবের সংগে তার আত্মিক যোগ খুবই কম এমনকি ভাবতেও কেমন যেন কষ্ট হয়, অথচ তা মন বিশ্বাস করতে চায় না। পরিবেশ-নির্ভর মানুষ পরিবেশ থেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন বললে কথাটা প্যারাডক্স বলেই বা ভাবে।

বিচ্ছিন্নতা আসলে এক ধরণের মানস অনুভূতি—যে অনুভূতির ফলে মানুষ নিজের সত্তাকে আর নিজের করায়ত্তাধীন বলে ভাবতে পারে না। এই অনুভূতির জন্যেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ একা মনে করতে বাধ্য হয়, সমাজ-সংসার তার কাছে নিজের আত্মীয় বলে মনে হয় না, এদের থেকে সে পর পর ভাবে একাকীত্বের সংবেদনে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। সমাজের একজন বলে তখন নিজেকে জানিয়ে করা তার পক্ষে কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

যে বাড়ী সে বানাচ্ছে—সে বাড়ীতে সে থাকছে না, তার বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য মিলছে মাত্র। যে ফসল সে ফলাচ্ছে তার মালিকানাও তার নয়। সূর্যের প্রথম আলোর আকাশের নীচে নেমে তৃষিত মাটির বুকে লাঙল চালিয়ে সবুজ শস্য চাষ করে সোনার রঙে তাকে ফলিয়ে তোলার মধ্যে বিশেষ-সৃষ্টির আনন্দ আছে, পরিবর্তে [illegible] পটভূমিতে ধান রোপণ এবং বপন [illegible] আনন্দের—তা ভুক্তভোগী ছাড়া কজন জানে! কৃষকের তাই মনে হয় নিজের মাটের তথা চাষকরা জমিখণ্ডটুকুর পরিবেশ ছেড়ে সে কোথাও নড়বে না, কিন্তু সোনার ধানে যখন ভাগচাষের দানব করাত-নখ বসায় কিংবা জমিদার দেনার দায়ে সেই ফসল নিজের গোলায় তোলার হুকুম জারি করে—তখন সবুজের সমারোহ কিংবা সোনারঙ ফসল কৃষকের মনে আত্মিক যোগ গড়তে পারে না, ফলে একটা করুণ অসহায় বোধ তাকে পীড়িত করতে থাকে।

শুধু কৃষক বা শ্রমিক নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রেও এই কথা সমান-ভাবে প্রযোজ্য। নিজের শ্রমের দক্ষিণা যখন নিজের পূর্ণ অধিকার হারিয়ে যায় তখনই শুধু পরিবেশ সম্পর্কে নয় সব কিছু থেকেই মনটা সরে আসতে চায়, পলায়ন-তৎপর হয়ে ওঠে। তখন সে সামাজিক সত্তা হিসেবে নিজেকে বিকশিত করতে পরাঙ্মুখ হয়।

নিজের স্বকীয়তা লাভের জন্যে মানুষ সংগ্রাম করে—এ তার স্বভাব; স্বাধীন বাস্তিত্বে সে পূর্ণ হয়ে, মহত্তর হবে—এ বাসনা তার স্বাভাবিক, কিন্তু কিছু সবল বর্তমান মানুষ তার এই বাস্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য বিকাশে বাধা দিলে তাকে অতীতে ক্রীতদাস বানিয়ে, এখনকার জগতে কেরানিক বানিয়ে। সেই কেরানী বন্দী হয়ে পড়লো তার কাজের মধ্যে তার পূর্ণ বিকাশ গেল ঘুচে। কারণ কর্মীর কল্যাণের জন্য কর্ম নয়, কর্মের ফসল ফলানোর জন্যে তথা কর্মের কল্যাণের জন্যেই কর্মী; ফলে কর্মীর স্থান হলো উৎপাদনের নীচে। সুতরাং তার বিকাশ রুদ্ধ হলো।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলার দরকার আছে। যে বঞ্চিত, প্রতারিত বা হৃতসর্বস্ব—বুঝি সেই শুধু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সমাজ থেকে? না, আর একটিক থেকে দেখলে দেখা যাবে যে, যে প্রতারক আমার শ্রমভোক্তা শ্রমিককে সরিয়ে দিয়ে [illegible] হয়ে পড়লো সমাজ-দেহ থেকে, সেও তো স্বাভাবিকভাবে সামাজিক পরি-বেশে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারলো না; সে অপরের চাবুক সে তার কর্মীসত্তার সাযেস্তা করেছে সেই সম্পর্কের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয়ে গেছে। এইখানে [illegible] শ্রেণী বৈষম্যের জন্য [illegible] বিকাশ সম্ভব নয়, তার পূর্ণ বিকাশের ব্যাঘাতই তো বিচ্ছিন্নতার

সমস্যা। সংক্ষেপে তাই বলতে পারি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত না হওয়াই বিচ্ছিন্নতা।

মানুষ যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তার অধিকারী না হয়—তা হলে তার পূর্ণ বিকাশলাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর মানুষ কখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে? সবাই যখন একযোগে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে—তখন! এক-কে দাবিয়ে অন্যের সুবিধা ভোগে কখনোই সার্বিক বিকাশ ঘটে না, ফলে নিজেও এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন ব্যক্তি—যিনি শ্রম-শক্তিকে অর্থে বশ করেছেন, বিক্রীত বা শ্রমিক অপেক্ষা খুব বেশী মুক্ত বা অভিজাত পুরুষ নন। সংকট কিন্তু উভয় সম্প্রদায়েরই।

প্রাচীনকালে শুধু কি ক্রীতদাসই বিচ্ছিন্ন ছিল? তার প্রভুও সমাজের সার্বিক সত্তা থেকে কিছুটা বিমুক্ত ছিল বৈকি, কারণ মানুষ হিসেবে ক্রীতদাসও মানব-সমাজে অন্তর্ভুক্ত; যে সমাজে দাসেরা অন্ত্যজজ্ঞানে তাড়া সেই সমাজে যতই মুক্ত বলে প্রভুর দলের আত্মপ্রসাদ ঘটুক, ক্রীতদাসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিকৃত—তাই মানুষে মানুষে সম্পর্ক যেখানে বিকৃত—সেখানে একে অন্য থেকে বিযুক্ত, সুতরাং বিচ্ছিন্ন। এক ব্যক্তির মূল্যে অন্য ব্যক্তির মুক্তিতে বা স্বাধীনতা অর্জনে কখনোই উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিকাশলাভ ঘটে না।

মানুষ তার মনোজগৎ নিয়ে মশগুল থাকে, এ আর সম্পূর্ণ ব্যক্তিক দিক; এছাড়া তাকে তথা তার মনোজগতকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বদা প্রভাবিত করছে পরিপার্শ্ব। যে পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিতে তার চলাফেরা, কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা—সেই পরিপার্শ্বকে কখনোই তার সম্পর্কে অস্বীকার্য ভাবা চলবে না। অথবা ঘুরিয়ে একথা বলা যায় যে পরিপার্শ্ব বা সামাজিক পটভূমি এবং ব্যক্তিসত্তার মিলিত যোগফল নিয়ে মানুষের পূর্ণ পরিচয়। অর্থাৎ ব্যক্তি এবং পটভূমি সমানভাবেই প্রয়োজনীয়। মানুষ যখন তার পরিপার্শ্বের মধ্যে থেকে নিজেকে বুঝতে পারবে, তখনই সে যথার্থ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। আর যখনই সে তা করবে না, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেকে আবিষ্কার করতে যখন সে ব্যর্থ হবে, নিজেকে বুঝতে পারবে না, বোঝাতেও পারবে না, সে তখনই বিচ্ছিন্নতাবোধ করবে, নিজেকে সামাজিক বা জাগতিক সমগ্রতা থেকে সরিয়ে এনে ফেলবে। এই বোধের নামই বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়—যা আজকের বিশ্বে মানুষের মননে একটা চরম সর্বনাশা ট্র্যাজিক বেদনার সৃষ্টি করেছে।

রাজনীতি, অর্থনীতি বা দর্শনশাস্ত্রের দিক থেকে বিচ্ছিন্নতার আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়, তাই অতি সংক্ষেপে বিচ্ছিন্নতার পরিচয় দিয়ে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে, কবির মানসে এই বোধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ পরিচয় লাভের চেষ্টা করা যাক।

মানুষ যখন নিজের কাজের দ্বারা নিজেকে সমাজের সঙ্গে অন্বিত করে কিম্বা আর পাঁচজনের থেকে নিজেকে পৃথক ভেবে সকলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে গুটিয়ে নেয়—তখনই সার্বিকতার ট্র্যাজেডীর শুরু। তখনই সে নিজের কাজকে রুটিনমাফিক একঘেয়ে কর্ম করে কাজে সৃষ্টির আনন্দ হারিয়ে ফেলে—অনন্বয়ের এই এক দুর্ভাগ্যজনক অঘটন। কাজেকর্মে যদি মনের আনন্দ না থাকে, তবে তা জেল খাটার সামিল হয়। আধুনিক যুগের মানুষ যে কাজে আনন্দ পায় না, কর্মস্থলকে বন্দী-শালা ভাবে—তার কারণ তার শ্রম তাকে পূর্ণতা দান করেনি, তার সত্তাকে সম্পূর্ণ-ভাবে বিকশিত করে তোলেনি, তার কাজে তার মন খুসী হয় না, তাই সে কাজে উৎসাহ পায় না, মনে মনে ক্লান্তিবোধ করে, কাজ থেকে সে ছুটি চায়, পালাতে চায়। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই অনন্বয় স্থায়ী রূপ লাভ করে। ভেতরে ভেতরে তার মনটা এই বাস্তব পরিপার্শ্ব ছেড়ে কোথায় চলে যেতে চায়, কখনো কল্পনায়, কখনো স্বপ্নে। কবি—যাঁর ভাষা আছে—ছন্দে নিয়ে অন্বয়ের রূপ দান করে তাঁর কল্পনাকে, পালানোর স্বপ্নকে সাজিয়েছেন—

স্বপন নয়, শান্তি নয়, ভালবাসা নয়
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়
আমি তারে পারি না এড়াতে
সে আমার হাত রাখে হাতে,
সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়
সব চিন্তা প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়।

(জীবনানন্দ দাশ)

কবির এই শূন্যতা কেন? পার্থিব সংসারের প্রেমপ্রীতি, সাধ আহ্লাদ—সব কিছুর উপকরণেই জীবনবোধ গড়ে ওঠে,—কিন্তু কবি জানাচ্ছেন, পার্থিব অনুভূতির তামাম বাসাই থেকে তাঁর হৃদয় মুক্তি চায়: (কবির অনুভবগুলিকে বাসাই বলছি—এই কারণে যে সেগুলি কবির কাছে আর সহনীয় নয়, তাঁর হৃদয় নির্লিপ্তির মহা-শূন্যতায় ডুবে থাকতে চায়)। স্বপ্ন শান্তি প্রেম প্রীতি সব কিছুর থেকে পলায়ন-তৎপর হয়ে সবে ভাসতে চায়, সব কাজ তুচ্ছ, পণ্ড মনে হয় সব সময় শূন্য মন হয়। সমাজ সম্পর্কের শৃংখলে কবির সত্তা যেন বাঁধা নেই, সার্বিক মেলামেশায় তার কোনো দায়দায়িত্ব তাঁর নেই, নিজের অন্ত-লোকের এক নির্জন নিঃসঙ্গ চেতনার ভূত তাঁকে পেয়ে বসেছে, তাই তিনি নিজের সহজ ও স্বাভাবিক সত্তা থেকে নিজেকে অনন্বিত ভাবছেন।

জীবনানন্দের সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থের আর একটি কবিতার অংশ তুলে ধরি, তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতাগুলির একটি অংশ বিশেষ।

কোথাও সময় নেই আমাদের ঘড়ির আধারে।
আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃংখল শতাব্দীর সব নাশ
হয়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ বুপসীর মতো বিক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে
উৎসাহিত নাগরের তরে,
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে,
পৃথিবীর বারগৃহ ধরে তারা উঠে যেতে চায়।
নীরবতা আমাদের ঘরে।
আমাদের খেতে-ভুঁয়ে
অবিরাম হতমান সোনা
ফলে আছে বলে মনে হয়,
আমাদের হৃদয়ের সাথে
সে-সব ধানের আন্তরিক পরিচয়
নেই।

হিরন্ময় সূর্য-সম্ভাবনা কবির মনকে তৃপ্ত করে, স্নিগ্ধ করে এমন কি উৎসাহিত করে, তবু কিন্তু শতাব্দীর রূঢ় অভি-শাপ তাঁকে নিজের পরিজনদের থেকে ছিনিয়ে নেয়, ঘাঁড়তে সময় বেজে যায়, কি বাজে না—তার তফাৎ ঘুচে যায়। শুধু কবির মনে শতাব্দীর নিঃসংগতার এই বেদনা নয়,—তাঁর চারিদিকে যা-কিছু স্পর্শ-কাতর,—তার সবটুকুই বিশৃংখল শতাব্দীর সর্বনাশে সপ্রতিভ ও বেদনাতুর হয়ে উঠেছে।

মাঠে সোনার মতো ধান ফলে বটে, কিন্তু সে সোনাকেও হতমান মনে। আর সে-সব সোনার ধানের সংগে হৃদয়ের কোনো আন্তরিক যোগ অনুভূত হয় না। অথচ কবির অন্তর্জগতে ট্র্যাডিশনের সংবেদন দ্রবীভূত রয়েছে—কবির প্রত্যায়িত চেতনা সংস্কারের কোনো সীমানা পেরিয়ে নতুন অপরিচিত জায়গায় যায়নি, ফসলের দেশে সূর্যকে তিনি হিরন্ময় দেখেছেন কিন্তু সেই হিরন্ময় দ্যুতির কোনো আনন্দ মনকে তৃপ্ত করতে পারছে না, এক নিরবয়ব উদাস বিষণ্ণতাই অবশেষে অন্তর্লগ্ন হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতা সামাজিক ভাবনার একটি অনিবার্য ফসল, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই নিজের অন্তর্জগতে যেমন নিঃসংগ বোধ করেন—তেমনি সব কিছুর সংগে বিচ্ছিন্নতা-জনিত এক ধূসর বিধুরতা তাঁকে পীড়িত করে; তাই একথা খাঁটি যে বিচ্ছিন্নতার

সমস্যা শুধু সমাজতান্ত্রিক কবিরই সমস্যা নয়, এই কারণে আমরা জীবনানন্দের কয়েকটি বিভিন্ন রসের কবিতার উদাহরণ উপস্থিত করেছি, কবির মন অনন্বয়ের আঘাতে যতই নিঃসংগতা বোধ করে, কবি ততই কোনো একটা আশ্রয়ের আধার খোঁজেন। রোমান্টিক কবিদের কেউ কেউ তখন লুপ্ত স্বপ্নের নিশ্চিন্ত মোহাবিষ্টতে গুহাশ্রিত হন।

বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতারই উল্লেখ করা চলে। কি সমাজসচেতন বাস্তববাদী কবি আর কি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রধান কবিকুল—সকলের কবিতাতেই অনন্বয়ের চেতনা প্রত্যক্ষভাবে কিম্বা পরোক্ষভাবে রয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের লেখায় বিচ্ছিন্নতার ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলবে। সুধীন্দ্রনাথের শূন্যতাবাদী কবিতাগুলির কথা আমরা এই প্রসংগে স্মরণ করতে পারি। তাঁর কবিতায় একথা স্পষ্টই ঘোষিত হয়েছে যে এই সমাজ এবং সভ্যতা নিরংকুশ কল্যাণসাধনে অপারগ, মানুষের মনে নৈরাশ্যের এক বেদনা অন্তর্লীন হয়ে থাকে, কখনো সেই নৈরাশ্যের বেদনাকে শূন্যতার তথা বিচ্ছিন্নতার মরুদেশ বলেও কবির মনে হয়েছে, তিনি নির্দ্বিধায় লেখেন—'ধূ ধূ করে মরুভূমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া সবে গেছে পদতলে।' 'উত্তর ফাল্গুনী' গ্রন্থের 'প্রতিবাদ' কবিতাতে মরুভূমির ছবির মাধ্যমে কবির অনন্বয়-চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। সবশেষে এই কবি ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি—'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।'

যদিও কেউ কেউ প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আধুনিক কবির মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেছেন, আমাদের প্রস্তাবে আধুনিকোত্তম কবিকুলের এক বিশিষ্ট এবং অন্যতম কবি। আজকে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মানসের তাবৎ উপলব্ধির রসায়নেই তাঁর কাব্য-নির্যাস। তাঁর কাব্যেও ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছিন্নতার বেদনা লক্ষ্য করা যাবে—আবার বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের আর্তিও তাঁর কাব্যে 'শিল্পীর' দুর্লভ মর্যাদায় হাজির হয়েছে—দেখতে পাবো।

সকলের সামনে দিয়ে কাউকে না জানিয়েই কবি নিরুদ্দিষ্ট হতে চান। 'নিরুদ্দেশ' কবিতায় কবি একলা হওয়া যে সবচেয়ে বড় অভিশাপ তা মেনে নেয়েই বলছেন—

তবু একটু ফাঁক চাই।
মিলতে হবে বলেই মাঝখানে,
এক ফালি বন্ধ্যা মাঠ
কিছুই যা ফলায় না
শুধুমাত্র আকাশের মালেকানা মেনে।

'ফেব্রুয়ারী ফৌজ' গ্রন্থের অনেক কবিতাতেই কবির মনে অনন্বয়ী চিন্তার আকুলতা ধ্বনিত হয়েছে, 'সম্রাট' গ্রন্থে দেখি—কবি বিচ্ছিন্নতার গণ্ডী পেরিয়ে আসতে পেরেছেন; যন্ত্র-সভ্যতার বুপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত মানুষের অসহায়তা থেকে মুক্তির একটা ইংগিত কবি দিয়েছেন, 'কাঠের সিঁড়ি' কবিতাটি এই উপলক্ষে স্মরণীয়। কাঠের টুলে বসা একক মানুষটির মধ্যে নিঃসংগ জনতা স্তব্ধ হয়ে থেমে আছে—একদিন তার স্থাণুত্ব ঘুচে যাবেই। যন্ত্রসভ্যতার নিষ্প্রাণ পটভূমিতে এই ঘোষণায় যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের পক্ষে আশার কথা।

স্বপ্ন দিয়ে নিজের সাম্রাজ্যকে গড়ে নিয়ে সেখানে যখন কোনো কবি বাস করেন—তখন তিনি একদিক থেকে বলতে গেলে বিচ্ছিন্ন বৈকি। বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে এই রকম নিঃসংগতার বেদনা আগাগোড়াই অনুভূত হবে। এমন কি, তাঁর প্রথম যুগের প্রেমের কাব্য 'বন্দীর বন্দনা'য়ও বিচ্ছিন্নতাবোধের বেশ রয়েছে। সমাজে ব্যষ্টির পূর্ণ মর্যাদা নেই দেখে কবি ব্যক্তি-প্রেমের গৌরবকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, অথচ কবির মন অনাশ্রয়ী চেতনায় কাতর হয়েছে। 'শাপভ্রষ্ট' কবিতায় দেখি—

আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে
মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে,
অসহ্য লজ্জায়
হেরি মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার
মন্দির-প্রাংগণ।

এ যেমন একদিকে আশ্রয়হীনতার বেদনাবোধ এবং তজ্জনিত নিঃসংগ হৃদয়ের অনন্বয়, তেমনি অন্যদিকে কবি নিজের অন্তরের দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করে বাইরের জীবন ও জগৎ থেকে সরে এসেছেন, তিনি নির্দ্বিধ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন হৃদয়ের মধ্যে ঘর বাঁধতে, নিজের মুকুরে নিজেকে চিনে নিতে—

হৃদয়ের মধ্যে বাঁধো ঘর:
অবরোধ, বরফ, কুয়াশা,
স্তব্ধ মন, শব্দহীন ভাষা,
অগ্নিকুণ্ড, দীর্ঘ অবসর,—
আর দুই মুগ্ধ অন্তর্যামী—
আমি—আর মুখোমুখি আমি।

বিষ্ণু দে আধুনিক কালের এক প্রধান কবি। তাঁর কাব্যে অহংবোধের তীব্র প্রকাশ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না, তবুও তিনি যে সমগ্র মানব-সমাজ থেকে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন বোধ করেন—সে বেদনাও তাঁর কাব্যে অপূর্ব কথনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি
বিদেশী পথিক
মুখোমুখি কথা বলি—চোখে লাগে
অটল প্রাচীর
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি
বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে? বুঝিনাকো ভাষা
বে এদেব।

এর বিপরীত [illegible] পরিচয়ও বিষ্ণু দে-র [illegible] কাব্যে বিচ্ছিন্নতাবিরোধী আর একটি বোধও কাজ করছে: সমাজচেতনা তাঁকে সমাজের সংগে মেলবন্ধনের নিয়ত তাগাদা দিয়েছে, ফলে নিঃসংগতা বা অনন্বয়ের নির্জন বোধ যেমন তাঁর অন্তর্লীন হয়েছে, তেমনভাবে সমাজের তথা বাস্তব জগতের সংগে সংযোগ ব্যাকুলতাও কবির পক্ষে একান্ত সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি জীবনকে স্বীকার করেই নিয়েছেন, নিজের একক প্রাণের সংগে বিশ্বপ্রাণের অন্বয়ই তাঁর অভীষ্ট হয়েছে; 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থে তাই দেখি—

আমি একা একা ভাবি ছোটো ছোটো সুখে
বিস্তৃত হৃদয় মেলি তোমার হৃদয়ে
আমি চাই বিশ্বরূপ দোঁহার কৌতুকে
আপন হাতের মাঝে আপন সময়ে।

তাঁর 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' গ্রন্থটিতেও এই পরিচয় সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর অবক্ষয়ে জীর্ণ মানুষের সত্তা বিচ্ছিন্নতার বেদনায় শতধা বিদীর্ণ—সেই সত্তাহীনতার বোধকে স্মৃতিলোক থেকে ভবিষ্যতের হিরন্ময় সত্যের আধারে নিয়ে যাবার ইংগিত করেছেন কবি।

সকল কবির রচনাতেই নিঃসংগতাবোধ এবং বিমুক্তি চিন্তা আছে। সুযোগ এবং অবসর মিললে পরবর্তী রচনায় আমি অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কবিদের সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।

উপসংহারে শুধু একটা প্রসংগের অবতারণা করি। বিচ্ছিন্নতার মর্মভেদী বিলাপই কি কবির একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয়? তা থেকে কি মোক্ষণ ও মুক্তি নেই? তা যদি না থাকে, তবে তো কবির মনোভংগী শুধু অনন্বয়ী হবে। কবির কাব্যে দেশকালের উত্তরণ থাকবে না, কবি শিল্পী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব পালনে শাশ্বতকালের কি নজির রাখবেন? কবির একটা সামাজিক সত্তা আছে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হয়ে থেকে তাঁর কি সুখ? নিঃসংগ চেতনায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেও তো তাঁর শান্তি নেই, সামাজিক জীবনের প্রতিভাস বহির্জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন না রেখে সমষ্টিগত অখণ্ডতার উত্তরণের জন্যে তাঁর ইচ্ছা হয়—এই ইচ্ছার রূপণই হলো শিল্প। আর, অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ছোট-বড়, প্রধান অপ্রধান—সব কবির রচনাতেই এই উত্তরণ ঘটেছে।

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জাবাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৪৪৭

দিনকালের হিসেব

কৃষি-সেবা কেন্দ্র

'সেবা' বা 'সার্ভিস' শব্দটি আমাদের দেশে খুব প্রচলিত। কে ঠিক প্রচলন করেছিলেন, জানি না। হতে পারে স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর জীবনদর্শনকে বোধহয় দুটি শব্দে ব্যক্ত করা যায়ঃ ত্যাগ ও সেবা—রিনান্‌শিয়েসান অ্যান্ড সার্ভিস। শব্দ দুটি আবার ভারতীয় জীবনাদর্শেরও দ্যোতক। তাই বোধহয় নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনে, সর্বপ্রকার সম্প্রসারণ-প্রচেষ্টায় কর্তৃপক্ষ 'সেবা' বা 'সার্ভিস' শব্দটি ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, সমষ্টি উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্প্রসারণ সেবা (একসটেনশান সার্ভিস), সমবায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সেবা সমিতি (সার্ভিস কো-অপারেটিভস), ক্ষুদ্র শিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান (স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনসটিটিউটস) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি আবার তালিকায় সংযুক্ত হয়েছে কৃষি-সেবা কেন্দ্র —অ্যাগ্রো-সার্ভিস সেন্টারস।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজী 'সার্ভিস' বা বাংলা 'সেবা'র অর্থ ঠিক কি হতে পারে অভিধান থেকে তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। সার্ভিসের অর্থ করা হয়েছে কর্ম, চাকরি, সেবা। ফলে আবার বাংলা 'সেবা'তেই এসে পৌঁছলাম, আর সেবার অর্থ দেখলাম পরিচর্যা, শুশ্রূষা, পূজা, উপভোগ, কর্তব্যপালন বা কর্মসাধন ইত্যাদি। এর মধ্যে পরিচর্যা এবং কর্তব্যপালন—এই দুটো অর্থই মনে লাগল। ভেবে দেখলাম, অর্থ দুটোকে পরস্পরের পরিবর্ত হিসেবে না দেখে যদি একসঙ্গে করা যায়, তবেই বোধহয় সেবার প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য সুপরিস্ফুট হয়। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে সেবা হল কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালন এবং কৃষি ইত্যাদির দিক থেকে তা হল পরিচর্যা, যার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার ঐ অঙ্গ অসুস্থ হয়ে থাকলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে বা দুর্বল হয়ে থাকলে সবল হয়ে উঠবার প্রয়াসী হতে পারে। ধারণাটি পিতৃবৎ পালনের ধারণা বা পেটার্নালিস্টিক আইডিয়া। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে এই ধারণার প্রকাশ থাকতে বাধ্য।

পিতৃবৎ পালন ও কৃষি ঃ

আমাদের কৃষিক্ষেত্রে রাষ্ট্র কর্তৃক পিতৃবৎ পালন যে অপরিহার্য তা বোধহয় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। শুধু কৃষিক্ষেত্রে কেন, সকল ক্ষেত্রেই এই পালনের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানেই হল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থকতা। উন্নত দেশসমূহে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় পরিচর্যা ব্যতিরেকেও জাতীয় আয় নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আর্থিক কল্যাণ উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে (আন্ডারডেভেলপড্ কান্ট্রিজ) অর্থনৈতিক জীবনকে নিশ্চল অবস্থায় থাকতে বা ক্রমাবনতির পথে অগ্রসর হতে দেখা যায়। এর কারণ হল এইসব দেশে দরিদ্র জিনিস-পত্র বিক্রয় করে বিশেষ মুনাফা লাভ করা যায় না বলে উদ্যোক্তারা শিল্পবাণিজ্য প্রসারে আগ্রহান্বিত হন না। ফলে অর্থ-ব্যবস্থা বা ইকনমি সম্পূর্ণভাবে কৃষি-ভিত্তিকই হয়ে থাকে। কৃষিই এই সব দেশের প্রধান উপজীবিকা এবং জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান সূত্র; কিন্তু কৃষিকেই বিশেষ পশ্চাৎপদ হতে দেখা যায়। সুতরাং এই রকম দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্নয়নকার্য শুরু করতে হয় কৃষির সুসংগঠন থেকে। যেহেতু এই রকম দেশে কৃষি ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীনেই থাকে সেইহেতু সরকার বা রাষ্ট্র কৃষিকে পুত্রবৎ পালন বা পরিচর্যা করতে পারে মাত্র—সুসংগঠনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই স্থাপন করা হচ্ছে কৃষি-সেবা কেন্দ্রগুলো বা অ্যাগ্রো-সার্ভিস সেন্টারস। পশ্চিমবঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ঃ

পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম সমস্যাসঙ্কুল রাজ্য —ব্যাপক বেকারত্ব ছাড়াও বিভিন্ন সমস্যায় প্রপীড়িত। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন সমগ্র ভারতের মোট ভূখণ্ডের মাত্র ৩ শতাংশ, কিন্তু জনসংখ্যা হল মোট ভারতের জনসংখ্যার ৮ শতাংশেরও বেশী। পশ্চিমবঙ্গের মোট ভূখণ্ডের ৬২ শতাংশ কর্ষিত যা সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষকেরাই এই রাজ্যে বিশেষভাগে সংখ্যাধিক—যাদের জোতের আয়তন অনধিক ২-৫ একর—তারাই সংখ্যায় মোট কৃষিজীবীদের মোটামুটি অর্ধেক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির ওপর জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশী এবং যাদের বলা হয় ক্ষুদ্র কৃষক তাদের সংখ্যাও বিপুল। এই ক্ষুদ্র কৃষকদের সেবার মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গের কৃষির পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানেই —অন্তত তত্ত্বগতভাবে—রয়েছে কৃষি-সেবা কেন্দ্রের ভূমিকা। সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ভূমিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

দুটি প্রধান সমস্যা ঃ

ভারতীয় কৃষির সমস্যা অসংখ্য, তবে উৎপাদনবৃদ্ধির দিক দিয়ে দুটিকে প্রধান বলে গণ্য করা যায় ঃ (ক) শক্তি সরবরাহের অপ্রাচুর্য এবং (খ) প্রসারকল্পে সেবার (একসটেনশান সার্ভিস) অ-পর্যাপ্তি। তত্ত্বানুসন্ধান ও পর্যালোচনার ফলে দেখা গিয়েছে যে কৃষিজ উৎপাদন অনেকাংশেই নির্ভর করে শক্তি বা এনার্জির পরিমাণের ওপর। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে হেক্টর প্রতি ৩০০০ কিলোগ্রামের মত উৎপাদন করতে গেলে প্রতি হেক্টরে অন্তত ১ অশ্বশক্তি প্রয়োগ করা দরকার। ভারতে কিন্তু অশ্বশক্তির প্রাপ্তির গড় হল হেকটর প্রতি '১৫ শতাংশ মাত্র। তুলনামূলকভাবে জাপানে গড়ে প্রতি হেক্টরে ২ অশ্বশক্তি ব্যবহার করা হয়। অতএব ভারতে দু লক্ষ ট্রাকটর, ২ লক্ষ বৈদ্যুতিক মোটর এবং ১০ লক্ষ ডিজেল ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহের অভাবে তুলনামূলকভাবে হেকটর প্রতি কৃষিজ উৎপাদন একরকম নগণ্য বললেই হয়, এবং এই কারণেই আমরা খাদ্য-সমস্যা ও শিল্পে কাঁচামাল যোগানের সমস্যায় প্রপীড়িত। সার্থক ভাবে সমস্যার মোকাবিলা যদি করতে হয়, তবে একই জমি থেকে—অন্তত সেচসমন্বিত জমি থেকে—দুটো ফসল তুলতেই হবে। একটা ফসল তোলার পর আর একটা ফসলের জন্যে তাড়াতাড়ি জমি তৈরি করতে হলে শক্তির সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া শক্তির সাহায্যে কাটাকাড়া করলে অপচয় অনেক কম হয়। আমাদের মত দেশে অপচয় নিবারণও একটা বড় কথা। আরও বলা যায়, সেচবিহীন জমিতেও শক্তির সাহায্যে অনেকাংশে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করা যায়।

শক্তি এবং ট্রাক্টর ইত্যাদি আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষির যন্ত্রীকরণ বা মেকানাইজেশানই নির্দেশ করে। যন্ত্রীকরণের ফলে কৃষির ক্ষেত্রে কি অভাবিত পরিবর্তন ঘটতে পারে সে-ব্যাপারে আজকের জাপানই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের কৃষির অবস্থা বর্তমানে আমাদের কৃষির সঙ্গে বহুলাংশে তুলনীয়। ১৯৪৬ সালে বলদই ছিল জাপানের কৃষিক্ষেত্রে শক্তির প্রধান সূত্র। এর পর ১৯৫০ সালে জাপানে ব্যাপক ভূমি-সংস্কার সাধন করা হয়। যার ফলে জাপানী কৃষকের জোতের গড় আয়তন দাঁড়ায় ১ হেক্টর বা ২-৫ একরে। আগেই বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫০ ভাগ কৃষিজীবীর জোতের আয়তন অনধিক ২-৫ একর। এর পরই জাপানে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে শক্তির প্রয়োগ শুরু হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের স্থানাধিকার করে শক্তিকর্ষ (পাওয়ার টিলার)।

এই প্রসঙ্গে জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত একটি চিত্তাকর্ষক

পুস্তিকা (নাম 'আজকের জাপান') থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

'দেশের পর্বতময় ভূ-প্রকৃতির দরুন কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ।...মাত্র শতকরা ১৫-৬ ভাগ জমি কৃষিযোগ্য।...কৃষিযোগ্য জমি সবই নিবিড়ভাবে চাষ করা হয়। প্রাপ্তিসাধ্য জমির প্রতিটি বর্গ-ইঞ্চিতেই ফসল ফলান হয়...। কৃষি-খামারের ক্ষুদ্র আয়তনের দরুন...ট্রাক্টর বা অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার এক সময়ে অসুবিধাজনক ছিল।...'

'খামারে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি যন্ত্রচালিত করার ব্যাপারে দ্রুত উন্নতি ঘটায় এই অসুবিধা দূরীকরণে সহায়ক হয়েছে এবং শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ খামার-পরিবার ..শক্তিচালিত লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে...'

'বিগত ১০ বৎসর ধরে প্রতি হেক্টরে ধান উৎপাদন বৃদ্ধির হার গড়ে শতকরা ১-৬ ভাগ হয়েছে এবং প্রতি হেক্টরে উৎপাদনের পরিমাণ বিগত দুই বৎসর ধরে দাঁড়িয়েছে ৪-৫ টন।'

কৃষি-শিল্পীয় কর্পোরেশনের (অ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন) অধিকর্তার মতে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিকে যদি কাম্যভাবে পুনর্গঠিত করতে হয়, তবে এই-ভাবে শক্তি ও যন্ত্র ব্যবহারের পথেই চলতে হবে। অবশ্য এই পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের কথা স্মরণ রেখে তবেই কাজে এগুতে হবে। এসম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

প্রসারকল্পে সেবা বা এক্সটেনশান সার্ভিসের প্রসঙ্গেও জাপানের দৃষ্টান্তই মনে আসে। জাপানে দু-তিনটি গ্রাম নিয়ে কৃষি বিভাগের একটি করে আঞ্চলিক কার্যালয় (এরিয়া অফিস) আছে। এই আঞ্চলিক কার্যালয়ে কয়েকজন করে প্রসার বিশেষজ্ঞ (এক্সটেনশন স্পেশালিস্ট) থাকেন যাঁদের কাজ হল ৩ হাজার হেক্টর অঞ্চলে মোটামুটি ৪ হাজার কৃষি-পরিবারকে যন্ত্রপাতি পরামর্শ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা। বর্তমানে ভারতেও প্রত্যেক সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে এই রকম করে একটি এজেন্সী আছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্লকের আয়তন হল ২৬ হাজার হেক্টর, আর বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও অত বেশী নয়—বিশেষজ্ঞদের গুণগত উৎকর্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। উপরন্তু, সাহায্যের প্রকৃতি ও পরিমাণের কথা না তোলাই ভাল। তবে এর থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে, জাপান যখন ৫৮ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি ১০ ...কোটির মত লোকের পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে, তখন ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর কৃষি-জমি থেকেও আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা বৈদেশিক ও অন্যান্য রাজ্যের অন্নের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছি কেন। ব্যাখ্যা করে সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের দেশে কৃষিতে আধুনিক কলাকৌশলের

শারদীয়া
মৌসুমী

॥ অনন্যা মৌসুমী এবারেও অনন্য ॥

৬টি বিভাগে ৬টি করে অতুলনীয় রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে
৬ষ্ঠ বর্ষের শারদ অর্ঘ্য সব বয়সের সবার মনোরঞ্জিনী হবে কারণ

যুগোপযোগী উপন্যাস লিখেছেন
আশাপূর্ণা দেবী ॥ আশুতোষ মুখোঃ
নিমাই ভট্টাচার্য ॥ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ বিক্রমাদিত্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শীর্ষেন্দু মুখোঃ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ॥ বরেন গঙ্গোঃ
শক্তিপদ রাজগুরু ॥ তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
ভিন্ন স্বাদের বড় গল্প লিখেছেন

মিষ্টি মিষ্টি গল্প লিখেছেন
সমরেশ বসু ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আশা দেবী ॥ শৈলেন রায় সুভাষ সমাজদার ॥ শংকর দাশগুপ্ত ॥ কুমার মিত্র ॥ অশোক সেনগুপ্ত ॥ আদিত্য সেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

বিরূপাক্ষ ॥ কুমারেশ ঘোষ ॥ অমল গঙ্গোঃ এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ জ্যোতির্ময় দাশ বীরেন দাশ
বৈচিত্র্যময় রম্যরচনা লিখেছেন

মননশীল বিশেষ রচনা লিখেছেন
চন্দ্রাবতী দেবী ॥ সরযূ দেবী ॥ মতি নন্দী রাসবিহারী সরকার ॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত সুবিনয় রায় ॥ অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদীনকুমার মিত্র ॥ শঙ্কু মহারাজ ॥ পি. জি. সমরজিৎ কর ॥ শুক্রাচার্য ॥ অমিতাভ চৌধুরী
উপভোগ্য বিচিত্র রচনা লিখেছেন

—এ ছাড়া—

চলচ্চিত্র জগতের আকর্ষণীয় সংবাদ ও মনোমুগ্ধকর রচনা লিখেছেন—অশোক মজুমদার। নির্মল ধর ॥ বাংলা, হিন্দী, বিদেশী, বাংলাদেশের ছবি ও ফিচার।

দাম—সাড়ে ছ'টাকা * সডাক—সাত টাকা আশি পয়সা

॥ মৌসুমী প্রকাশন ॥
১০।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ * ফোন : ৩৪—৩৩০৮

অনুপ্রবেশ বিশেষ সম্ভব হয়নি বলেই আমাদের এই দুর্দশা।

কৃষি-সেবা কেন্দ্র :

প্রতিকার তাহলে হল সাধারণ কৃষকের দ্বারদেশে আধুনিক কলাকৌশল পৌঁছে দেওয়া। বলা যায়, এই ছিল জাতীয় প্রসার-সেবার (ন্যাশানাল একসটেনশান সার্ভিস) লক্ষ্য এবং বর্তমানে সমষ্টি

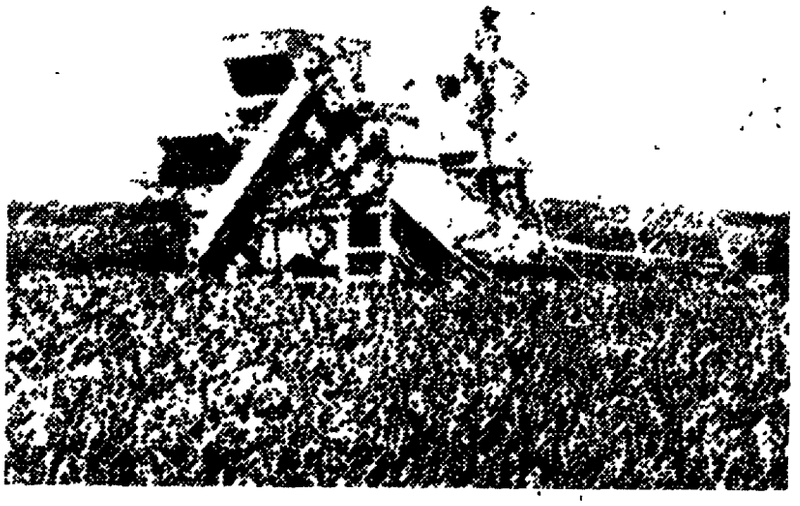

উন্নয়ন কেন্দ্রের ব্লকগুলোতে এই পথেই চলবার চেষ্টা করা হয়। তবে বলা ঠিক সম্ভব হয় নি। কৃষি শিল্প কর্পোরেশনের অধিকর্তা শ্রীকে সেনগুপ্ত ঠিকই বলেছেন যে, কৃষিজীবীকে যদি আধুনিক কলাকৌশলের কাছাকাছি আনতে হয় তবে কলাকৌশলকেও তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। কৃষি-সেবা কেন্দ্র এই নীতিকেই সম্মুখে রেখে কাজ করতে চায়। কেন্দ্র থেকে কৃষিজীবী শুধু যে পরামর্শ পাবে তাই নয়, পাবে উপাদান বা ইনপুট, অর্থ, বিক্রয়করণ প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য, 'পূর্ণ সেবাই'—কমপ্লীট সার্ভিস' হল সেবা-কেন্দ্রের মটো।

পূর্ণ সেবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উপাদানগুলো হল : (ক) কৃষি যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া, (খ) কীটপতঙ্গ থেকে শস্য রক্ষা করা, (গ) গুদামজাতকরণ ও বিক্রয় ব্যাপারে সাহায্য করা, (গ) মাটি পরীক্ষাকরণ ও বিশ্লেষণ করা, (ঘ) উপযুক্ত সার ও কীটপতঙ্গনাশাদি নাশক নির্বাচন করা (ঙ) সেচ ব্যবস্থার প্রসারের দিকে দৃষ্টি দেওয়া এবং (চ) কৃষিজমির পুঁজির ব্যবহারে কৃষিজীবীদের উৎসাহিত করা।

সরবরাহের ক্ষেত্রে আছে (ক) সার বীজ কীটপতঙ্গাদি নাশক দ্রব্য, (খ) কৃষি-যন্ত্রপাতি ভাড়া দেওয়া, (গ) যন্ত্রপাতি মেরামতের ব্যবস্থা (ঘ) তৈলাদি (অয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্টস) সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং (ঙ) ব্যাঙ্ক-ঋণের ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পটি কার্যকর করা হচ্ছে কৃষি-শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের অধীনে।

এপর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে এইরকম ৩০টি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, আর ১৮টি স্থাপিত হতে বেশী দেরী নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেছেন যে এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিই সবুজ বিপ্লব ঘটতে আর দেরী নেই।

মূল্যায়ন :

প্রতিবন্ধকগুলোর কথা স্মরণ করে কর্তৃপক্ষের এই আশাবাদকে কিন্তু আমরা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। কৃষি-সেবা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য—কৃষির যন্ত্রীকরণ। আমাদের মত দেশে তা কি সম্ভব বা কাম্য? পশ্চিমবঙ্গে করুন, কৃষিজীবীর ট্রাক্টর ইত্যাদি কেনবার ক্ষমতা আছে, আর ২-৫ একর জমিকে ট্রাক্টর কিভাবে কতটা কাজে লাগতে পারে? অবশ্য সেবা-কেন্দ্র থেকে ট্রাক্টর ইত্যাদি ভাড়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু খরচ পোষাবে কি? তারপর আছে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রশ্ন। 'জমি থেকে বলদ হঠাও' শ্লোগান না হয় তোলা হল, কিন্তু জোয়াল কাঁধে জোড়া বলদের সঙ্গে সঙ্গে পেছনের মানুষটিও যে হটে আসবে—তার ব্যবস্থা কি? জাপানে তা সম্ভব হয়েছে শিল্পায়নের জন্যে। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পায়নের গতি যখন অতি মন্থর এবং তা যখন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যার সঙ্গে মোটেই তাল রাখতে পারছে না তখন কৃষির যন্ত্রীকরণের পথে দ্রুত চলা সম্ভব হলেও উচিত হবে কি?

তারপর আছে সেবাকেন্দ্রসমূহের সার্থকতার প্রশ্ন। সমষ্টি উন্নয়ন ব্যবস্থা, জাতীয় প্রসার ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় লক্ষ্য সাধন করতে পারে নি, সেবাকেন্দ্রগুলোই যে পারবে সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। আগের মত এবারেও সেবার মনোভাবের অভাবই মূল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ—কোন শ্রেণীর মধ্যেই সেবার মনোভাব গড়ে ওঠে নি। ফলে চলছে সেই আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা। সুতরাং মনে হয় কাজ এই দিক থেকেই শুরু করা উচিত। শুধু 'সেবা' শব্দটি জুড়ে দিলেই হবে না—সেবাব্রত গ্রহণ করতে হবে। এদিকে কোন চেষ্টা করা হয়েছে কি? যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ প্রয়োজনীয় সামাজিক উৎসাহ বা সোসাল এনথুজিয়াজম্ গড়ে উঠতে পারে না, এবং এই সামাজিক উৎসাহই আমাদের গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূলসূত্র।

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

গৃহিনীদের রান্নার জন্য খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা সবসময় রান্নায় আগমার্ক গুঁড়ো মশলাই ব্যবহার করুন কারণ আগমার্কের জ্ঞানষ·

১০০% খাঁটি হয়

'ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ন্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা

রান্নায় ১০০% নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

পুনশ্চ

বাংলা কথা-সাহিত্যের অসামান্য শক্তিধর পুরুষ শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে আর তিন বৎসর পরে ১৩৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র। এখন থেকে নির্বাচিত কমিটি তার প্রস্তুতি-পর্বের উদ্যোগ-আয়োজন করছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে সমারোহের সৃষ্টি করেছিল, আমরা আশা করি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শ্রদ্ধা নিবেদিত হবে এবং সমারোহের আয়োজন হবে দেশব্যাপী। এ-আয়োজন কেবলমাত্র জনসাধারণের বা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দ্বারা আহূত সভা-সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেই হবে না, এ-আয়োজনে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারকে অংশ গ্রহণ করতে হবে সক্রিয়-ভাবে। এমন কতকগুলি জিনিস করতে হবে, যাতে জাতীয়-জীবনে তাঁর আসন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয় ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র (ইং ১৮৭৬ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর), এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ (ইং ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী)। মাত্র পঞ্চাবিংশতি বর্ষকাল তাঁর সাহিত্য-সাধনার মধ্যে, (১৯১৩ সালে 'যমুনা'য় প্রকাশিত তাঁর 'রামের সুমতি' গল্পের কথা ধরলে, যা শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর সত্যকার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত বলে স্বীকার করে গেছেন) তিনি যে সৃষ্টিকার্য করে গিয়েছেন, তা আজ বাঙালীর প্রতি ঘরে ঘরে যেভাবে আদৃত হয়েছে, তা অন্য কোন ভারতীয় তথা বাঙালী সাহিত্য-স্রষ্টার ক্ষেত্রে হয়েছে বলে মনে হয় না।

বর্তমানে শরৎচন্দ্রের এমন কোন গ্রন্থ নেই যার বহু সংস্করণ না হয়েছে এবং এমন কতকগুলি গ্রন্থ আছে, যার পঁচিশ-ত্রিশটিরও বেশী সংস্করণ হয়েছে, এবং সে-সংস্করণ অধিকাংশই হাজার মুদ্রণের উর্ধ্বে। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, এখনও সাধারণ্যে তাঁর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়ে চলেছে। এটা অবশ্য লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি ও অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষা-প্রসারের জন্য কিছুটা সম্ভব হলেও, শরৎচন্দ্র আমাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে এমনভাবে তাঁর রচনার মধ্যে রূপ দিয়ে গিয়েছেন, যার আবেদন অনাগত কালেও কোনদিন মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। আজ সমাজের বহু বিবর্তন হলেও এবং অতীতের বহু সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্যার আংশিক বিলুপ্তি ঘটলেও, বিগত দিনের ছোট-বড় বহু প্রাণবন্ত চিত্রকে মানুষ তার ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসাবে মন-মানসের সংগ্রহশালায় আজও সযত্নে রেখে দিতে ইতস্ততঃ করে না।

তা না হলে এক সময় যে চরিত্রহীন, পথের দাবী, দেবদাস, বড়দিদি, পল্লীসমাজ বা দেনা-পাওনা, চন্দ্রনাথ, অবক্ষণীয়া, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ প্রভৃতি বইগুলি সামান্য আট আনা থেকে তিন-চার টাকা দামে বিক্রি হয়েছে, আজ সেগুলির মূল্য দু' টাকা থেকে পাঁচ, সাত, আট এবং দশ টাকা দামে বর্ধিত হলেও, বিক্রির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে বই কমেনি।

এতদ্‌ব্যতীত বর্তমানে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে, 'শ্রীকান্ত'র চারটি পর্ব একত্র করে একটি অখণ্ড শ্রীকান্ত হয়েছে এবং তের খণ্ডের বিরাট গ্রন্থাবলী 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছেলেমেয়েদের জন্য পল্লীসমাজ, নিষ্কৃতি, পথের দাবী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থের কিশোর সংস্করণ হয়েছে। এছাড়া শরৎচন্দ্রের নিজেরও 'ছেলেবেলার গল্প' নামে ছোট-দের গল্পের নিজস্ব একটি গ্রন্থ আছে, যার একাধিক সংস্করণ হয়েছে।

অধুনা কয়েক কয়েক বৎসর ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র-পক্ষের ন্যায়, শরৎচন্দ্রের স্বতন্ত্র গ্রন্থগুলি ও 'শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন খণ্ডগুলি তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে একপক্ষকাল অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়ে থাকে এবং সাহিত্যানুরাগীরা অনেকে এই সময়ের অপেক্ষাও করে থাকেন।

শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর শরৎ-সাহিত্যের উপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, জ্ঞানী-গুণী বহুজন অসংখ্য আলোচনা করেছেন: নিবন্ধে-প্রবন্ধে। বিভিন্ন ভারতীয় ও বৈদেশিক ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে তাঁর প্রচুর গ্রন্থ। শিল্পী-সংস্থার প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, শরৎ-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট বোদ্ধা ও তত্ত্বানুসন্ধানী স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল কৃত মূল্যবান গ্রন্থ 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-বিবরণী' এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকার্য।

অতঃপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বহুবিধ রচনা যা আজও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, আমরা উক্ত রচনাসমূহের মধ্যে থেকে তাঁর সম্পর্কীয় মাতুল ঔপন্যাসিক ও 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি রচনা যা বিশেষভাবে শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক সাহিত্য-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা এস্থলে ১৩৪৪ সালের মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা' থেকে কিছু বর্জিত আকারে প্রকাশ করা হল।

* * *

আজ আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে কাহিনী লিখতে উদ্যত হয়েছি তা তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় দিনের কথা। বোধ করি সেদিন তাঁর সাহিত্য-জীবন একটি প্রবল গতিবেগ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

সে আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের কথা, হয়ত ইংরাজী ১৯১২ সালের কথাই হবে। আমি তখন কলিকাতা ভবানীপুরে ৮৫নং কাঁসারীপাড়ায় বাস করি। এই বাড়ি থেকেই কিছুকাল পূর্বে শরৎচন্দ্র ৮।৯ মাস বাস করবার পর রেঙ্গুন গমন করেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরে দেখি আমার অনুপস্থিতি কালে শরৎচন্দ্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এসে একটি চিঠি লিখে ফিরে গেছেন। সংক্ষিপ্ত চিঠি একজন ভৃত্যের হাতে লিখে দিয়ে গেছেন। 'প্রিয় উপেন, আমি কয়েকদিন হল বর্মা থেকে কলিকাতায় এসেছি। তোমার সহিত দেখা করতে এসে দেখা পেলাম না। আর একদিন আসব। ইতি, তোমার শরৎ।'

চিঠি পড়ে আনন্দিত যেমন হলাম, দুঃখিত এবং বিরক্তও তেমনি হলাম। শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হবে সেজন্য আনন্দিত হলাম, কিন্তু কেমন করে যে হবে সে-কথার দুশ্চিন্তায় দুঃখিত এবং বিরক্ত হলাম। চিঠিতে না আছে ঠিকানা এবং না আছে পুনরায় আগমনের দিন এবং সময়ের নির্দেশ। অনুসন্ধানের ফলে অবগত হলাম আর কাহারো সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেননি। যা হোক ভৃত্যদের এবং আত্মীয়স্বজনকে বলে রাখলাম এবার আমার অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র আগমন করলে যেন তাঁর কলিকাতার ঠিকানা জেনে রাখা হয়। কিন্তু এ-নির্দেশেও ফল পাওয়া গেল না। আর একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ঠিক পূর্বের মত আর একখানি শরৎচন্দ্রের চিঠি পেলাম। বাড়ির একটি ছোট ছেলের হাতে লিখে দিয়ে ফিরে গেছেন।...

এবার বিরক্তি সপ্তমে উঠল। আশ্চর্য লোক যা হোক! এই খেয়ালী অন্যমনস্ক মানুষটি চিরদিনই কি একরূপে কাটাল।..

হঠাৎ মনে পড়ল শরতের মেজ ভাই প্রভাসের কথা। সে তখন স্বামী বেদানন্দ, বেলুড় মঠে বাস করে। পরদিনই গেলাম তাঁর কাছে। বললাম, 'শরৎ কলকাতায় এসেছে জানিস তো প্রভাস?' প্রভাস বললে, 'তা তো জানি কিন্তু দাদা দু-দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা পাননি।' আমি বললাম 'তোমার দাদার যা বুদ্ধি দেখা পাবে কেমন করে? না

লিখে আসে দেখা করতে, যাবার দিন আর সময়—না লিখে আসে তার ঠিকানা। তুই জানিস তো তার ঠিকানা আমায় দে।

প্রভাসের কাছ থেকে শরতের ঠিকানা এবং বাসার অবস্থিতি বুঝে নিয়ে আমি পরদিন হাওড়ায় খুরুট বোডের নিকটবর্তী একটি গৃহে উপস্থিত হলাম। শরৎচন্দ্র তখন ক্ষুদ্র একটি কক্ষে বসে নিবিষ্ট চিত্তে কি লিখছিলেন। চতুর্দিকে কতকগুলি খাতাপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান এবং কয়েকটি ফাউণ্টেনপেন মোটা মাঝারি সরু, বেগুনে এবং কালো কালি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আমাকে সহসা সেখানে দেখে শরৎচন্দ্র একেবারে চমকে উঠলেন, 'একি! তুমি কেমন করে এখানে এলে?'

আমি বললাম, 'কেমন করে এলাম তা পরে বলছি, কিন্তু "আর একদিন আসব" লিখে আস, অথচ কবে আসবে, কখন আসবে লিখে আস না, 'এ যাত্রা দেখা হল না' লিখে আস অথচ ঠিকানা দিয়ে আস না। এ তোমার কেমন ব্যবহার?'

বলা বাহুল্য, এ বিবাদের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি অবিলম্বেই হয়ে গেল। দেখলাম শরৎচন্দ্র সে সময় 'চরিত্রহীন'-এর অষ্টম কি নবম পরিচ্ছেদ লিখছিলেন। ঘণ্টা দুই-কাল কথোপকথনে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় ভবানীপুরে ফিরলাম। উঠবার সময় চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি (প্রথম পরিচ্ছেদ হতে যে পর্যন্ত লেখা হয়েছিল) হস্তগত করে বললাম, 'পরশু দুপুরে এসো, বাড়ি থাকবো।' শরৎচন্দ্র বললেন, 'আসবো।'..

বাড়ি ফিরে তখনি চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপিখানি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। খুশিতে মন ভরে উঠল। কি অদ্ভুত লেখা, কি অপূর্ব প্রকাশভঙ্গি। শরৎচন্দ্র তখনও বাঙালী পাঠক-সমাজে অপরিচিতই। ইহার পূর্বে তাঁহার লেখা 'বড়দিদি' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যিক-মণ্ডলীতে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের অন্তরাল হেতু সে কথাও অনেকে ভুলে গিয়েছিল।

পরদিন সকালেই 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে শ্যামপুকুরে বামদন মিত্রের গলিতে 'সাহিত্য' পত্রিকার সুযোগ্য-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। সমাজপতি মহাশয় তখনকার দিনে একজন খ্যাতনামা সাহিত্য জহুরী, এবং তদ্বিষয়ে নির্ভীক এবং অনেক সময়েই তীক্ষ্ণ কটুভাষী সমালোচক। তাঁর প্রশংসাবাণীর প্রত্যাশায় এবং নিন্দা-ভৎর্সনার আতঙ্কে তখনকার লেখকদের মন নিরন্তর চকিত হয়ে থাকত। মনে করলাম সুরেশবাবুকে দিয়ে যাচাই করে নিলে শরতের লেখার মূল্য বিষয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

উদ্বিগ্ন চিত্তে সমাজপতির হস্তে 'চরিত্রহীন'-এর পাণ্ডুলিপি দিয়ে বললাম, এটা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা নতুন আরম্ভ করা বইয়ের পাণ্ডুলিপি। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, আপনি একবার পড়ে দেখবেন?'

সমাজপতি মহাশয় বললেন, 'কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়?' 'বড়দিদি'র লেখকের কথা উল্লেখ করলাম; তাঁর মনে পড়ল। আগ্রহসহকারে বললেন, 'আচ্ছা রেখে যাও, কাল কোনও সময়ে এসো।'

পরদিন সকালে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, 'অদ্ভুত প্রতিভাবান লেখক এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অদ্ভুত লেখা এই চরিত্রহীনের পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এ গল্প 'সাহিত্যে' প্রকাশিত করতে লোভ কেমন হয়, ভয়ও তেমনি হয়। যা হোক তুমি ওকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।'

সেই দিনই বৈকালে নিয়ে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে প্রত্যাগমন করলাম। দ্বিপ্রহরে শরৎ আসতেই বললাম, 'সমাজপতি মহাশয় তোমাকে ডেকেছেন। চল এখনি বেরিয়ে পড়ি।' শুনে শরতের মুখ আতঙ্কে একেবারে শুকিয়ে গেল। বললেন, 'কেন? আমার লেখা সমাজপতিকে দেখিয়েছ নাকি?'

বললাম, 'দেখিয়েছি।'

মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে শরৎচন্দ্র বললেন, 'ভাল করনি উপীন, ভারি ঠোঁট-কাটা লোক, কতগুলো কটু-কাটব্য করবে।' প্রকৃত কথাটা গোপন রেখে আমি বললাম, 'দেখাই যাক না, কি তিনি বলেন। আবার যখন লিখতে আরম্ভ করলে, তখন নিন্দা-প্রশংসার জন্য প্রস্তুত তো হতেই হবে।'

কোনপ্রকারে শরৎচন্দ্রকে রাজী করে উভয়ে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সমাজপতি কান মলেই দেবেন, না বেতের উপর দাড় করিয়েই দেবেন, শরৎ-চন্দ্রের মনের মধ্যে তখন এই রকম একটা ভয়। একজন শঙ্কাব্যাকুল মনে, আর একজন কৌতুক-প্রফুল্লচিত্তে সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করলাম।

তারপর যে ব্যাপারটা হল সেকথা মনে করে আজও আমার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। প্রশংসার অজস্র অমৃতবর্ষণে সুরেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের কান এবং প্রাণ পরিপূর্ণ করে দিলেন। সেই অপরিমিত এবং বোধকরি কতকটা অপ্রত্যাশিত প্রশংসার তাড়নায় বিস্ময়ে এবং আনন্দে শরৎচন্দ্রের মুখে একটা অপূর্ব শোভা ধারণ করল। আমার মনের মধ্যে আনন্দের পরিসীমা ছিল না। কিছুক্ষণ সমাজপতি মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করে নানাপ্রকার কথাবার্তার পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সে দিনটা ছিল ভাবী বিশ্রী মেঘলা দুর্যোগের দিন। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হু হু করে হাওয়া বইছে, পথ জলে এবং কাদায় মলিন। আমার কিন্তু স্বপ্ন-ভঙ্গ হবার আশঙ্কায় জনসঙ্কুল ট্রামে উঠলাম না। একটি ছাতায় কোনরকমে দুজনের মাথা গুঁজে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ফুটপাথের উপর দিয়ে উভয়ে ধীর পদক্ষেপে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলাম। আনন্দের নেশায় মন বুঁদ হয়ে রয়েছে—কথাবার্তাও সেইজন্য বেশী কিছু হচ্ছিল না।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে এসে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার কথা—শরৎ যাবেন হাওড়ায়, আমি ভবানীপুরে। কিন্তু কখন যে আমরা অজ্ঞাতসারে হ্যারিসন রোডের মোড় পেরিয়ে গেছি তা জানি না, যখন খেয়াল হল দেখলাম বৌবাজারের মোড়ে এসে উপস্থিত হয়েছি।

শরৎ বললেন, 'দেখ উপীন, তোমার কথা শুনে ও সমাজপতি প্রশংসা শুনে মনে হচ্ছে, আর যদি পাঁচটা বছরও বাঁচতাম তা হলে হয়ত বাংলা দেশকে কিছু দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু রেঙ্গুনের ডাক্তার বলেছে, আমার হার্টের না লাংসের দুরারোগ্য রোগ হয়েছে আমি বেশী দিন বাঁচব না। রেঙ্গুন ছেড়ে আমাকে চলে আসতে বলেছে।'

আমি বললাম, 'তোমার কোন দুরারোগ্য ব্যাধি হয়নি,—কিন্তু রেঙ্গুন ছেড়ে চলে এস।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'সেখানে একশ টাকা মাইনের সরকারী চাকরি করছি, এক রকমে চলে যায়। ছেড়ে এলে খাব কি?'

আমি বললাম, 'আচ্ছা সে ব্যবস্থা হবে।'

শরৎচন্দ্রকে চাকরি ছাড়িয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসার গৌরব গুরুদাস লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য।

আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির 'সম্মুখে তখন 'যমুনা' কার্যালয়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল যমুনার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। আমরা তাঁর কয়েকজন বন্ধু সেই সময়ে যমুনার উন্নতি বিধানে বিশেষরূপে ব্রতাশীল হয়েছি। যমুনা-চক্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে ফেললাম। ফণীবাবু তাঁর শ্রদ্ধা, সহৃদয়তা এবং সৌজন্যের গুণে শরৎচন্দ্রকে বশীভূত করলেন। শরৎচন্দ্র যমুনাকে নিয়মিত সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথাযথ প্রত্যাবর্তন করলেন।

তারপর কিরূপে মাসের পর মাস বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হয়ে ব্রহ্ম থেকে বঙ্গদেশে 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'নারীর মূল্য' প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আসতে লাগল, তার ইতিহাস সকলেই জানেন: সুতরাং সেকথা বিস্তারিতভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

সমাজপতি মহাশয়ের সহিত শরৎচন্দ্রের প্রথম দর্শনের দিনটি বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে একটি বিশেষ শুভদিন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।'

—রূপদর্শক

কলিং বেল বেজে উঠল। থেমে গেল। ইরা গ্রাহ্য করল না। যে ডাকছে এই সময়ে দুপুর-বেলায় সে সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবে। আজ রবিবার নয়, ছুটির দিন নয়, জানা উচিত বাড়িতে ইরা একা আছে। এই দুপুরে এসে ডাকাডাকির মানে কি? ইরা ঠিক করে ফেলল, ও উঠবে না। কিন্তু বেল আবার বেজে উঠল। এবার একটু বেশিক্ষণ বাজল। আবার থেমে গেল। দোতলার এই নির্জন ফ্ল্যাটে ইরা এখন একা। উপরে আর একটা ফ্ল্যাটে বাড়িওলা থাকে, নীচে আরও দুটি পরিবার। বেশি বেল বাজলে ওরাই হয়তো বিরক্ত হয়ে এসে লোকটাকে জেরা করবে। আবার বেল বেজে উঠল। এবার অনেকক্ষণ ধরে বাজল। হয়তো বিশেষ কোনো দরকারে কেউ এসেছে। হয়তো পিয়ন এসেছে রেজিস্টি চিঠি বা মানিঅর্ডার নিয়ে। অগত্যা উঠল ইরা।

ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রীলঘেরা বারান্দা পেরিয়ে বাইরের ঘরে ঢুকল। বাইরের দিকের জানলাটা খুলে বলল, কে?

যে বেল বাজাচ্ছিল সে সামনে এসে দাঁড়াল। আর তাকে দেখেই ইরার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ও। একটা আনক্যানি ফিলিং সমস্ত শরীরকে ঝাঁকানি দিয়ে তরতর করে বিদ্যুতের মতো বয়ে গেল।

খানিকক্ষণ ওরা কেউ কথা বলতে পারল না। পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইরার চোখে ভয়, আতঙ্ক, বিরক্তি, আনন্দ। আর তার চোখে মুগ্ধতা, অস্বস্তি, আনন্দ, জিজ্ঞাসা।

ইরা বলল, তুমি?

—হ্যাঁ, আমিই তো একবার না এসে পারলাম না, আসতে বড় ইচ্ছে হল, দেখতে বড় ইচ্ছে হল।

ইরা চুপ করে রইল। কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। ওকে চলে যেতে বলবে নাকি দোর খুলে ঘরে এনে বসিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে বিদায় দেবে? ওকে ডেকে ঘরে নিতে যেতে দারুণ লোভ হচ্ছে। কিন্তু এক বিচ্ছিরি নোংরা ভয় ওকে ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

সে বলল, কি হল? এমনি করে দাঁড় করিয়ে রাখবে? একটু বসতেও বলবে না নাকি?

ইরা যেন যন্ত্রচালিতের মতো দরজা খুলে ধরল, বলল, এসো।

ও ঢুকল। ইরা দরজাটা বন্ধ করল। তার-পর কোনো কথা না বলেই চলতে লাগল। ইরার পাশে পাশে সে। তাতে দূরত্ব নেই রোমাঞ্চিত। ইরার সহসা মনে হতে লাগল, যেন পাখি-ডাকা কোন ফুলে ভাওয়া অরণ্যে করে কখন ও বেড়াতে গিয়েছিল যৌবনের দিনে, পুরোনো দিনের ভুলে যাওয়া সেই অনুভূতি আবার যেন নতুন করে উদাস দুপুরের মতো হাতছানি দেয়।

ওরা ইরার শোবার ঘরে এসে পৌঁছল। ইরা অস্ফুটে বলল, বসো।

মানুষটা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো ইরাদের বিছানাতে গিয়ে বসল।

ইরা গম্ভীরভাবে একবার ওর দিকে তাকিয়ে বলল, অভীক, শেষপর্যন্ত তুমি আমার স্বামীর বাসাতেও ধাওয়া করলে? আত্মসম্মান জ্ঞান তোমার এত কমে গেছে?

কিন্তু কথাটা বলে ও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেল। অভীকের চিন্তিত ক্লান্ত মুখ একেবারে লজ্জায় ছাই হয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে ও তাড়াতাড়ি সামলেও নিল।

এদিকে পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল। ইরার ঘরের জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যাচ্ছে একসারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ ফুলে ফুলে নীল আকাশকে রাঙা করে দিয়েছে। ইরার জানলার পাশ দিয়ে বোগেনভিলিয়া লতিয়ে উঠে গেছে, জানলায় লাল ফুলের নিমন্ত্রণ গিয়েছে রেখে। সামান্য দূরে আমবাগান। কান পেতে চুপ করে থাকলে মৌমাছির অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যাবে। কোকিল ডেকে ডেকে উঠছে। বাতাসের ঝরঝর এলোমেলো শব্দের ক্লান্তি নেই।

ইরা ড্রেসিং টেবিলের সামনে একমাত্র বেতের চেয়ারটাতে বসল। অভীকের দিকে তাকিয়ে দেখল। অভীকের চোখ তো ইরার দিকে প্রথম থেকেই পড়ে আছে। ও চোখ-দুটিকে কিছুতেই যেন স্থানভ্রষ্ট করা যাবে না। ইরা সেই চিরপরিচিত মূর্তিটি দেখল। নতুন জীবনের পর্দাটা যেন প্রবল ঝড়ে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। লম্বা দোহারা চেহারা। শ্যাম বং। মাথায় বড় বড় একরাশ চুল আগুনের মতো বিপর্যস্ত লেলিহান। টানা টানা ঘন ভুরুর নীচে তেমনি সম্মোহিনী দুটি ভাসা ভাসা চোখ ছায়াতে-আলোতে কুহকে ভরা।

অভীক ভাবছে, এই সেই মেয়ে, ওর কৈশোরে যৌবনে মেয়ে বলতে শুকেই শুধু চিনে এসেছে। ছিপছিপে লম্বা। শরীরের গড়নই অমনি, কিন্তু রোগা যে নয়, সে ওর মরালের মতো নরম নিটোল বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। মাথায় ঝর্ণার মতো চুল। আশ্চর্য দুটি চোখ, একটু ছোটো, কিন্তু নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল, প্রতিটি ভাবের লীলায় ঝকঝকে আয়নার মতো। নরম পুরু পুরু কমলালেবুর কোয়ার মতো দুটি ঠোঁট। বেপরোয়া ঢেউ উঠেছে শরীরে। সরু কোমর, নিম্ন বিশাল। হাঁটায় চলায় একটি বিচিত্র ছন্দ যেন মনকে টানে। ফর্সা রং কচি কলা-পাতার যেন বিকেলের রোদ পড়েছে। ওর নতুন বিয়ে হয়েছে তাই দুপুরবেলাতে ঘরে লেকেও সিল্কের শাড়ি পরে আছে, তাতে নানান রঙের ফুল ছড়ানো। ফুলের রংয়ের ব্লাউজ ওর গায়ে।

ইরা বলল, কেমন আছ? কি খবর বলো।

—কেমন আছি? ভালো নেই, একেবারেই ভালো নেই। আর নতুন খবর কিছু নেই। সেই বিধবা মা, কিরের ঋণগ্রস্ত বোন, দুটো ছোটো ভাই। বোন মাস্টারি করে, আমি টিউশান করি। এই খবর!

সুজাতা এখনও মাস্টারি করছে?

—তা না হলে কি করবে? আমি বলেছি বিয়ে হলেও তুই চাকরি ছাড়বি না।

—তোমার মত আমি জানি, চাকরি না করলে নাকি মেয়েরা স্বাধীন হয় না।

—শুধু জানো তাই নয়, সে মত তুমিও মানতে।

ইরা জবাব দিল না, চুপ করে রইল। মুখ ফিরিয়ে একবার ও ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকাল। আয়নাতে অভীককে দেখা যাচ্ছে। অভীক ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখাচোখি হয়ে গেল।

অভীক বলল, আমি কটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আসা নিরর্থক জেনেও না এসে পারলাম না। কে যেন আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে এল।

—আমি জানতাম, তুমি আমাকে সহজে ছাড়বে না। কিন্তু পরে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে পারতে।

—কবে দেখা হবে, না হবে জানি না। আমি যেখানে আছি সেখানে যাবার সাহস কি তোমার হত? আর তাছাড়া এখনই ইচ্ছে হল, পরে যদি এই ইচ্ছে মরে যায় সেই ভেবে চলে এলাম।

—এই দুপুরবেলায়? ও বাড়িতে নেই বুঝে?

—ঠিক তাই, ওসব নীতিবাক্যে ভড়কে যাবার মতো মন আমার নেই। আর তোমার কাছে আমার নীতি কি? ন্যায়তঃ তুমি তো আমারই স্ত্রী। কেননা সেই কবে থেকে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি। এই ভালো-বাসার দাবীতে আমি তোমার কাছে যখন খুশি আসতে পারি।

ইরা কোনো কথা বলল না। এই কথাহীন স্তব্ধতার মধ্যে ফ্যানের বাতাস কাটার শব্দ নিভৃত গোপন কথার মতো দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে লাগল।

অভীক আবার বলল, কেন এই ভীষণ কষ্ট তুমি আমাকে দিলে? তোমার কাছে আমি কী অপরাধ করেছিলাম!

—কষ্ট আমার নেই?

—তাতো থাকবেই। তাহলে এত কষ্ট, সারাজীবন ধরে যা ভোগ করতে হবে সেই কষ্ট কেন দিলে, কেন নিজে নিলে?

অভীক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ইরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ইরার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। সিল্কের আঁচল দিয়ে চেপে চেপে সেই জল মুছে খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, বাড়ির লোকে দিন-রাত আমাকে বিরক্ত করতে লাগল। তুমি কিছুতেই চাকরি পেলে না।

—তাতে কি? চাকরি না পাই, কিছু একটা করতাম নিশ্চয়ই।

ইরা তীব্র অনিচ্ছাকে কঠিন চেষ্টায় কাটিয়ে উঠে আবার বলল, বাড়ির লোকে বলতে লাগল, ভালো ছেলে, ভালো চাকরি করে, দেখতে শুনতে ভালো, দেশে জমি-জায়গা অনেক আছে; কথা শোন, সুখে থাকবি; আমি, আমি আর পারছিলাম না।

—এখন সুখে আছ?

—জানি না।

—কেন জানো না কেন? সুখ দুঃখ বুঝতে পার না?

—না
—অ
সংগ্রামে, জ
আগুনের
অভীক, তুমি তো
—ওকথা বোলো না,
অভীক কথা বলল না।
তাকিয়ে রইল।
ইরা বলল, আমি জানি না
কিনা। মাত্র একমাস বিয়ে হয়েছে, কেমন
বুঝব?

—ভালোবাসা তীব্রতম অনুভূতি। ভালো-বাসো না, কেননা ভালোবাসা জীবনযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সঙ্কটে দুঃখে খাঁটি ভালোবাসা পরীক্ষা দিতে ভালোবাসে।

একটু থেমে বলল, আচ্ছা, একটা অজানা অচেন মানুষের কাছে এত তাড়াতাড়ি কেমন করে, আমি বুঝতে পারি না!

ইরা অসহিষ্ণু হয়ে বলল, থাক, ওসব কথা থাক, তুমি অন্য কথা বলো।

একটু চুপ করে থেকে অভীক বলল, এত একা লাগে, এত অসহায়! এই ভীষণ কষ্ট আমি কেমন করে ভুলব! আমি বাঁচব কেমন করে!

ইরা নীরব হয়ে রইল। কান্না ঠেলে আসছে ওর বুকের মধ্যে। অসংখ্য স্মৃতির সুধা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো দলে দলে উঠছে রক্তের ভিতরে।

অভীক বলল, তোমাকে নিয়ে আমার কতবড় অহঙ্কার ছিল, আমার সেই অহঙ্কারও তুমি ভেঙে গুঁড়িয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে কেন?

কেন, এই প্রশ্ন ইরার মনের ভিতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে হৃদয়ের সব সুখ-শান্তি ধ্বংস ভ্রংশ করে মহাকালের গম্ভীর ভয়াবহ বিষাণ-ধ্বনির মতো পাক খেয়ে খেয়ে মাথা কুটে কুটে মরতে লাগল।

অভীক বলল, তুমি কি একথা মানো না ইরা যে ভালোবাসাই স্ত্রী-পুরুষের মিলনের একমাত্র শর্ত হওয়া উচিত?

ইরা মিনতি করে বলল, তুমি চুপ করো, চুপ করো, আমি ছোটো, হীন, সাধারণ, আমি তোমার সব কথা মানতাম, আজও মানি, কিন্তু আমি পারি নি, হেরে গেছি।

তারপর দুজনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ইরা হঠাৎ বলল, অভীক, এবার তুমি এসো, ও হয়তো এসে পড়বে।

—তাতে কি? এলেই বা? আমি কি চুরি করতে এসেছি? এলে আলাপ হবে। তোমার বিয়ের সময় ছিলাম না, আলাপ পরিচয় হয়নি।

না, না, আমার ভয় করছে, আমি ওকে যতটা চিনেছি, ভীষণ হিংসুটে।

—তার মানে তোমার উপর বিশ্বাস নেই অথচ শরীরের চাহিদা—

—অভীক, ছেলেমানুষী করো না।

—ইরা, ভালোবাসা থেকে যে শিশুর জন্ম হয় না তাকেই জারজ বলে।

—অভীক, আমাকে এবার রেহাই দাও, ওসব কথা শুনে আর কোনো লাভ নেই,

আজকের সৌন্দর্য চর্চায়
অতীত গরিমার ছোঁয়া লাগুক !
শিঙ্গার কুমকুম লাগান
শিঙ্গার কুমকুম - ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক
শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম তৈরী করে···সোনালী ও রূপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যায়···যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে···আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও গ্লসী ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।
প্যারামাউন্ট প্রডাক্টস্
বোম্বাই-৪০০ ০০৪
শিঙ্গার

সবাই যা করছে তাই করেছি। মা-বাবা যার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে তাকেই মেনে নিয়েছি, কি করব বলো!

—কিন্তু বিয়েটা তোমরা মা-বাবা করেনি, তুমি করেছ। কত বড় দুঃখ থেকে পাগলের মতো এত কথা আমি বলছি তুমি যদি বুঝতে!

—বুঝছি, বুঝতে পারছি, আমার বুকের ভিতরে কি যে হচ্ছে তোমাকে যদি দেখাতে পারতাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে, আমার প্রতি করুণায় তোমার মন ভরে যেত। যাক গে, যা হয়ে গেছে তাকে আর ফেরানো যাবে না, সে সাহস, সে ক্ষমতা, সে তেজ আমার নেই, আমি দাস-খত নাম সই করেছি। অভীক, এবার তুমি এসো।

অভীক উঠে দাঁড়াল। একবার ইরাকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে দরজার কাছে গেল। ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল। ভয়ে ইরার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। গলা যেন ভেঙে গেল ওর। বলল, সর্বনাশ! ও এসে পড়েছে।

—তাতে অত ভয় পাবার কি আছে?

অসহিষ্ণু বেল বেজেই চলেছে। সে বোধহয় ভেবেছে ইরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বেল থামল। তারপর অধৈর্য গলা ভেসে এল, এই, এই শুনছ, আমি নীরেন, দরজাটা খুলে দাও।

মুখ সাদা হয়ে গেছে ইরার। অভীকের দুটি হাত ধরে বলল, অভীক, আমি এখন কী করব? কী করব তুমি বলো?

অভীক বিরক্ত হয়ে বলল, কী আবার করবে? দরজাটা খুলে দিয়ে এসো। অমন করছ কেন? কি হয়েছে কি?

গলার স্বর নিচু হয়ে এসেছে ইরার, ফিস-ফিস করে বলল, তুমি জানো না ও ভীষণ রাগী, তুমি জানো না, ছেলেরা কি ভীষণ হিংসুটে হয়, কি ভীষণ হিংস্র হয়, তুমি আমার একটা কথা রাখো অভীক।

—কি কথা?

—তুমি অন্য কোনো দিকে পালাও। কোনদিকেই বা পালাবে? কোথাও পালাবার জায়গা নেই। এটা একটা খাঁচার মতো বাড়ি। তুমি, তুমি কিন্তু মনে কোরো না, এই খাটের তলায় লুকিয়ে পড়।

—কী বলছ তুমি!

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার কথা শোনো, একটু পরে ওকে আমি বাইরে পাঠাব, তখন তুমি বেরিয়ে চলে যাবে।

—না, আমি খাট-ফাটের তলায় ঢুকতে পারব না।

ওদিকে আবার কলিং বেল বেজে উঠল বেজেই চলল, সেই সঙ্গে চীৎকার আসছে এই, এই, আচ্ছা ঘুম তো, ওঠো, দরজা খোলো। শুনছ এই।

ইরা অভীকের হাতদুটো ধরে টানতে টানতে বলল অভীক, আমাকে বাঁচাও আমার কথাটা শোনো, তুমি খাটের নীচে যাও।

—তুমি একটা শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে, কি ইয়ার্কি হচ্ছে কি?

—তোমার দুটি পায়ে পড়ি অভীক, আমি ঘরের বৌ, দুপুরে একা গল্প করছিলাম অন্য পুরুষের সঙ্গে, ও জানতে পারলে সারাজীবনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

—এই সামান্য কারণে!

পাগলের মতো বলতে লাগল ইরা, তুমি জানো না, ওরা মস্ত জমিদার বংশ, ভীষণ রক্ষণশীল, ওর বাবা এক মেয়েকে প্রেম করার জন্যে গুলি করে মেরেছিল,অভীক প্লিজ, তুমি একটু লুকোও, আমাকে যদি ভালোবাসো, আমার সুখের জন্যে একটু লুকোও।

ওদিকে দরজায় এবার ধাক্কা পড়ছে। কলিং বেলের উপরে আর সে ভরসা রাখতে পারছে না।

অভীক কেমন যেন হতচকিত হয়ে পড়ল। ইরা ওর হাত ধরে টানতে লাগল। ওকে জোর করে কাসয়ে দিল। ওকে ঠেলতে লাগল খাটের নীচে যাবার জন্যে। অভীক নীচু হয়ে খাটের তলায় ঢুকল। ইরা ওকে ঠেলে দিয়ে বলতে লাগল, আর একটু ভিতরে যাও লক্ষ্মীটি।

ইরা ভালো করে খাটের ধারটা দেখল অভীককে দেখা যাচ্ছে কিনা। তারপর দ্রুত কম্পিত পায়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দিল।

নীরেনের মুখ রাগে বিবর্ণতায় ভয়ঙ্কর করছে। বলল, এত ঘুম তোমার? কখন থেকে ডাকাডাকি করছি।

—একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এসো রাগ কোরো না। তুমি এত তাড়াতাড়ি আসবে জানব কেমন করে বলো। এসো।

নীরেন দরজা বন্ধ করে ইরাকে এক-হাতে জড়িয়ে ধরে ঘরে ঢুকল। ইরা আয়নায় নিজের মুখটা দেখতে পেল। কেমন যেন বিবর্ণ, ভীত, সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। আয়নার কাছে গিয়ে পাউডারে পাফটা নিয়ে মুখে বুলিয়ে নিল। এবং আয়নার নীচের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেল আয়নাতে খাটের তলায় অভীকের গায়ের জামার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। ভয় পেল ও। ভয়ে সর্বশরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

নীরেন ওকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল। সজোরে চুমু খেয়ে বলল, মাইরি একদিনও দিনের বেলা তোমার নুড ফেসটা দেখতে পেলাম না। আজ দেখব।

চমকে উঠল ইরা, বলল, না, না, আজ নয়।

—কেন আজ নয় কেন? এমন ফাস্ট ক্লাস বাসা। আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই। লজ্জাটা কি?

— না, না, আজ নয়, আমার ভীষণ লজ্জা করবে।

ইরাকে চটকাতে চটকাতে নীরেন বলল কাল অফিসে এই প্ল্যান হঠাৎ মাথায় এল, মাথা গরম হয়ে উঠল, তাই কাজকম্ম ফেলে ছুটে এলাম। কেন আজ হঠাৎ তোমার এত আপত্তি বলো তো?

—না, না, এখন নয়।

অনুনয়ে ভেঙে পড়ল ইরার গলা।

নীরেন বাধা পেয়ে ক্ষেপে উঠল, না, এখনই। আমি তোমাকে স্যাংটা করব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব।

বিচিত্র ইশারায় ভুরু নাচাল নীরেন, যা জিনিস তুমি মাইরি, লাইন থেকে কতটুকু তার বোঝা যায়!

—অমন করে বোলো না, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

—কেন হঠাৎ হল কি তোমার?

ইরাকে আরও জোরে চটকাতে শুরু করল নীরেন। ইরা ভীষণ লজ্জা পেল। নীরেনকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল। নীরেন আশ্চর্য হল, ক্ষেপে গেল। খানিক-ক্ষণ অবাক হয়ে ইরাকে দেখে বলল, দিতেই হবে, আমি যা বলছি তাই করব।

সে ইরাকে উলঙ্গ করবার জন্য ওর কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। বুকের বসন খসে পড়ল। তারপর দুঃশাসনের মতো টানাটানি শুরু করল নীরেন। ইরা হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল, চীৎকার করে উঠল, না, অমন কোরো না।

—কেন করব না? তুমি আমার বিয়ে-করা বৌ নও? আমি কি অন্যায় কিছু করছি? আমি তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করব।

—প্লিজ এখন নয়, অন্তত তুমি বাথ-রুম থেকে ঘুরে এসো।

—না, আমি এখন বাথরুমে যাব না। আগে এইসব তারপর বাথরুম।

আবার এক হ্যাঁচকা টান মারতেই ইরার কাপড় কোমর থেকে খুলে গেল। ইরা ছুটে পালাল ঘরের কোণে। নীরেন গিয়ে ওর বুকের কাছে ব্লাউজ ধরে হেঁচকা টান দিল।

ইরা চীৎকার করে উঠল, না, না, প্লিজ এখন নয়।

—না, এখনই।

ইরা গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, ছেড়ে দাও বলছি, পশু কোথাকার!

—কি? যা মুখে আসছে তাই বলছ যে, এত তেজ কেন তোমার, ব্যাপারটা কি?

বলে টান মারতেই ব্লাউজ ফরফরিয়ে ছিঁড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ইরা নীরেনকে ঠেলে দিল। নীরেন আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে পিছনের দেওয়ালে গিয়ে ঠোক্কর খেল। তারপর উন্মাদের মতো ছুটে যেতে গেল ইরার দিকে। ইরা তেজস্ক্রিয় টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নীরেন কাছে আসছে দেখে টেনার শিশি ছুড়ে মারল। নীরেনের মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে শিশিটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তারপর পাগলের মতো ইরা ড্রেসিং-টেবিলের উপরে রাখা প্রসাধনের সমস্ত শিশি বোতল ছোঁড়া নীরেনের দিকে ছুঁড়তে লাগল। নীরেন ওকে জাপটে ধরতে গেল, ইরা ঘরের উল্টো

দিকে চলে গেল, হাতে ওর ওডিকোলনের শিশি। আয়নার কাচে অভীককে সামান্য দেখা যাচ্ছে ও দেখল, তাই নীরেনকে মারবার ছল করে আয়নার নীচের দিকে শিশিটা ছুড়ে মারল। আয়নাটা ফেটে গেল ভেঙে পড়ল না।

এবার নীরেন চীৎকার করে গালাগালি শুরু করল, কুত্তি কাঁহিকা, হারামজাদী, দেখি আজ মাগী তোর তেজ কত। আমাকে আমার প্রাপ্য যখন খুশি আদায় করে নিতেই হবে।

ইরা চীৎকার করে বলতে লাগল, এসো না দেখি একবার। ভালো কথা শুনতে চায় না। আমি কি ক্রীতদাসী? কামুক রাক্ষস কোথাকার।

—আর তুমি সন্ন্যাসিনী। তুই কামুক নোস? তোকে আমি দেখছি না? আমার চেয়ে তোর কাম ঢের বেশি।

—হ্যাঁ বেশি, তাই বলে দিনদুপুরে আমি অফিস থেকে ফড়ের মতো ছুটে আসি না।

—হ্যাঁ রে কুত্তি, আমি কামুক, আমি তোকে ছাড়ব না।

ছুটে গিয়ে ইরাকে জড়িয়ে ধরল নীরেন। ইরা চীৎকার করে উঠল, ছাড়ো আমাকে, বেরোও বলছি।

ওদের চীৎকার, জিনিসপত্র ছোঁড়ার শব্দ এই দোতলা বাড়ি এবং আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছিল। ওরা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়তে লাগল, কী হয়েছে? দরজা খুলুন, বৌদি, বৌমা, কী হয়েছে? নানান কণ্ঠের জিজ্ঞাসা উচ্চকিত হয়ে উঠল। দরজায় দুমদাম ধাক্কা পড়তে লাগল। কলিং বেল তীব্র চীৎকারে বাজতে লাগল।

অগত্যা নীরেন ইরাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, কাপড়টা পরে নাও তাড়াতাড়ি, ছেঁড়া ব্লাউজটা ঢেকে নিও। দেখি কি ব্যাপার।

ওদিকে খাটের নীচে অভীক গরমে বিরক্তিতে রাগে লজ্জায় ভয়ে ঘামছে। লজ্জায় ঘেন্নায় ওর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে এখন আর কিছু করবার উপায় নেই।

নীরেন দরজা খুলে লোকগুলিকে ঠেকাতে চেষ্টা করল, কিছুই হয়নি।

কিন্তু নীরেনকে অগ্রাহ্য করে কয়েকজন উৎসাহী ছেলে ভিতরে ঢুকে গেল। বলল, বৌদি, কি ব্যাপার, অমন করে কাকিয়ে উঠলেন কেন?

ইরা তখনও নিজেকে সামলাতে পারে নি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বয়স্ক মেয়ে-পুরুষ যারা নীরেনের কথা প্রায় বুঝে আসছিল তারা ইরার এই আর্ত কান্না শুনে নীরেনের সঙ্গেই ছুটে ভিতরে এল। ঘরে লোক ভরে গেল।

বয়স্করা বোঝাতে লাগল, কেঁদো না, কি হয়েছে? স্বামীস্ত্রীতে অমন ঝগড়া হয়ই।

ইরা বলছে, না, না, ঝগড়া-টগড়া, কিছুই হয়নি।

উৎসাহী যুবকরা সুন্দরী নারীর কান্না সহ্য করতে পারে না। ওরা বলছে, তাহলে কি হয়েছিল; ঘরের এরকম অবস্থা কেন?

নীরেন বলল, কে জানে ভাই, আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না; কেন যে ও আজকে পাগলের মতো কাণ্ড করল, কেন যে কাঁদছে?

হঠাৎ ইরার চোখ পড়ল, বাড়িওয়ালা বুড়ো, দারুণ ধূর্ত যার মুখ, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইরা বলল, লোক জোটাবার জন্যেই আমি অমন করছিলাম।

—কেন, লোক জোটাবার জন্যে কেন?

—ও আসার পর আমি আয়নার সামনে দাঁড়াতেই দেখলাম।

—কী দেখলে?

ভিতো ওষুধ খাওয়ার মতো করে ইরা বলে ফেলল, ভাবলাম হয়তো লোকটার কাছে ছোরাটোরা আছে। ওকে যদি ছোরা মেরে বসে, একা মানুষ ও, তাই।

নীরেন আশ্চর্য হয়ে বলল, লোক কোথা? লোক ঢুকবে কেমন করে?

ইরা বলল, আমি বাইরের দরজা খুলে একটু আগে ছাদে গিয়েছিলাম কাপড় মেলতে, তখনই হয়তো—

নীরেন বলল, এই এক মুস্কিল, ছাদের সিঁড়িটা বাইরে।

ছেলেরা বলছে, কিন্তু লোকটা কই!

বাড়িওয়ালা বুড়ো বলল, আয়নায় দেখুন, খাটের নীচে কে যেন লুকিয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে অতগুলো লোক হুমড়ি খেয়ে নীচু হল, আরে তাইতো, তাইতো।

তারা টেনে হেঁচড়ে অভীককে বাইরে বার করে আনল। অভীক চকিতে একবার ইরার মুখের দিকে তাকাল। ইরার চোখে ভয়, লজ্জা, বেদনা, অশ্রু। প্রচণ্ড পেটন শুরু হয়ে গেল।

নীরেন বলল, বাইরে চলুন, বাইরে নিয়ে চলুন।

নীরেনও বাঘের মতো ঘুঁসি ঝাড়তে থাকল অভীককে। বেদম পিটতে পিটতে ওকে নীচে নিয়ে গেল ওরা। ইরা জানলার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। জানলার নীচেই বাড়ির গেটের সামনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, সেখানেই কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলি ফুলে ফুলে চারদিক আলো করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দেখল, ওরা অভীককে মেরে রক্তাক্ত করে দিল। অভীকের একটা চোখের ভুরুর কাছটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, চোখটা লাল হয়ে উঠেছে। গালে রগে নীল নীল কালসিটে পড়েছে। কপালের একদিক ফুলে গেছে। জামাটা কালা কালা হয়ে শরীরে ঝুলছে, প্যান্টটাও আস্ত নেই তখনও গায়ের বিবস্ত্র নেই।

ইরা আন্দাজ করল, অভীক চিৎ হয়ে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীরে মাটিতে পড়ে আছে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা ছেলে গিয়ে বালতি করে জল নিয়ে এসে ওর মাথায় মুখে দিতে লাগল; অনেকক্ষণ পরে ওর জ্ঞান হতেই সবাই চ্যাংদোলা করে ওকে তুলে নিয়ে থানায় চলে গেল। নীরেনও সঙ্গে গেল।

ইরা কাঁদতে কাঁদতে ঘর পরিষ্কার করল। বাথরুমে গিয়ে গা ধুয়ে এসে ভাঁজ-করা নতুন শাড়ি ব্লাউজ পরল।

সন্ধেবেলায় হন্তদন্ত ঘর্মাক্ত ক্লান্ত নীরেন ফিরে এল। অফিসের পোশাক তখনও ওর গায়ে। বলল, দাঁড়াও, আমি চান করে আসি।

চান করে ঘরে এসে পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরে গলায় গলে পাউডার ছড়িয়ে চুল আঁচড়ে বিছানায় বসে বলল, উঃ, তোমার বুদ্ধি বলিহারি। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, তুমি অমন করছ কেন? এত ফূর্তিবাজ মেয়ে তুমি, এত ফ্রী এত ফ্রাঙ্ক, তোমার গায়ে হাত দিলেই তোমার সব কিছু রিঅ্যাক্ট করে, তুমি অমন করছ কেন? উপস্থিত বুদ্ধি তোমার!

হেসে লুটিয়ে পড়ল নীরেন, ইরার চিবুক ছুঁয়ে বলল, পাগলী একটার।

খুশি মনে তাঁর সঙ্গে কেন বলল বাছাধন আচ্ছা শিক্ষা পেয়েছে, দিয়ে এসেছ হজমে পুরে।

একটু থেমে বলল, একটা ভোগান্তির ভালো কি কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, ভারি মুস্কিল হয়েছে!

তারপর সাজিত সুন্দর ইরাকে দেখে মাথিত করে উদ্দাম হয়ে উঠল নিজেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারংবার ভোগ করল ইরাকে।

মাঝ রাতে উচ্ছৃঙ্খল অপরিমিত ভোগে ক্লান্ত নীরেন অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে, ইরা বিছানা থেকে উঠে এসে জানলার কাছে মুখ রেখে মেঝেতে লুটিয়ে বসল। সমস্ত শরীরে ওর ক্লান্তি, যন্ত্রণা। বাইরের শকুনিরা ওর মৃত মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করছে। চোখে ফোয়ারার মতো জল ঝরছে ওর। হাজতে আটক আহত অভীকের মুখ আর ঘৃণা মেশানো মুখ গোপের সামনে ভাসছে।

বাইরে চৈত্রের খ্যাপা রাত্রি অন্ধকারে গাছে পাতায় বাতাসের ঝাপটা মেরে মাতাল তান্ত্রিকের মতো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ওর খল খল হাসি আর পদধ্বনি শুনে আকাশে আকাশে পড়ছে ছুটন্ত জোনাকিরা অগ্নি-ফুলকির মতো উড়ে যাচ্ছে, যেন কোথাও আগুন লেগেছে। ইরার মনে হল, এই সোনার পিঞ্জিরের ও আমৃত্যু বন্দী থেকে বিবেকের দংশন সইবে, স্বামীকে সত্যিকার ভালো বাসতে পারবে না। জীবনে সেই সুখের স্বাদ ও কখনো পাবে না যা মানুষকে ভালোবেসে জীবন-সংগ্রাম করে যে সুধার স্বাদ পাওয়া যায়, কঠিন সংগ্রামের সঙ্গেই সুধা মিশে থাকে, নিছক সুখের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

মনের খবর

মানসিক রোগ—(২)

অনেক রকমের মানসিক রোগ আছে। তাদের যে শ্রেণীবিভাগ পূর্ব নিবন্ধে দেওয়া হয়েছে তাদের সম্বন্ধে ক্রমে আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই বলা হয়েছে মনের রোগ প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় যথা অংগীয় (অর্গানিক) আর কার্মিক (ফাংশানাল)। আরেকটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। অংগীয় মানসিক রোগ বলতে কি বোঝায়? শরীরের অঙ্গ, বিশেষ করে মস্তিষ্কের কোনও পরিবর্তন থেকে যে-সব মানসিক রোগলক্ষণ দেখা দেয় সেই-গুলিকে এই পর্যায়ে গণ্য করা হয়। এ থেকে যে কথাটা মনে জাগে সেটা হল এই যে দেহের কোনও পরিবর্তন, বিশেষ করে মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটলে মানসিক রোগ লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তাই বলে পেনসিল কাটতে গিয়ে আঙুলে একটু আঁচড় লাগলে বা সামান্য রক্তপাত হলে যদি উৎকণ্ঠা দেখা দেয় তবে সেই উৎকণ্ঠাকে অংগীয় কারণে মানসিক রোগের শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। যেখানে শরীরের কোনও অঙ্গের পরিবর্তনের জন্য দেহের ক্রিয়ার উপর যে প্রতিক্রিয়া হয় তার মাত্রা যদি ব্যক্তির সহনসীমার বাইরে চলে যায় আর তার ফলে যদি মানসিক রোগ লক্ষণ দেখা দেয় তখনই তাকে অংগীয় মানসিক রোগ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। জ্বর হলে অনেকের বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়। রোগী তখন প্রলাপ বকতে সুরু করে, হাত পা ছুঁড়তে থাকে, বিকারের ঘোরে চিৎকার করে, আবোল তাবোল নানা কথা বলতে থাকে। তার জ্ঞান কিছুটা, সাময়িকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই লক্ষণগুলি সবই মানসিক অবস্থার প্রকাশক। সাধারণ অবস্থায় যে লোক সহজ স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, কাজ করে, বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, অর্থাৎ স্বাভাবিক মানসিক ক্রিয়াদি করতে পারে, জ্বরের ঘোরে তার সে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে, নানা রকমের রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। চিকিৎসার ফলে বা আপনা থেকেই যখন জ্বরের তাপ কমে আসে তখন রোগীর ঐসব মানসিক লক্ষণও আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এর জন্য কোনও মানসিক রোগের চিকিৎসা করতে হয় না। শরীরের ব্যাধি দূর করতে পারলে মানসিক লক্ষণও আরোগ্য হয়ে যায়। বিষয়টা তবুও ঘোলাটে থেকে যাচ্ছে। জ্বর হলে সকলের ত ওরকম মানসিক বিকার দেখা দেয় না! তবে কারও হয় আবার কারও হয় না। এর কারণ কি? শারীরিক? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের আবার দেহ-মনের সম্বন্ধের কথা মনে করতে হবে। দেহের কিছু হলে, মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যদি দেহের সে পরিবর্তন মন গ্রাহ্য করে। মনের গঠন, অর্থাৎ পূর্ব বর্ণিত অহংয়ের সংগঠন, তার সহনশক্তি, তার উৎকণ্ঠাশূন্য বাস্তববোধ ইত্যাদি তার নানা ক্ষমতার উপর এই মানসিক প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে। ফলে একজনের যেখানে ১০০ ডিগ্রী জ্বরের হলেই প্রলাপ বকা সুরু হয়ে যায় বা উঃ আঃ, মরলাম, গেলাম ইত্যাদি হৈ চৈ সুরু হয়ে যায়, অন্য এক-জনের সেই একই জ্বর ১০৫ ডিগ্রী উঠলেও সে চুপ করে শুয়ে থাকে, হয়ত জ্বরের ঘোরে তার একটা আচ্ছন্ন অবস্থা মাত্র দেখা দেয়। যে বীজাণুর বিষক্রিয়ায় দেহের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে জ্বর দেখা দেয়, দেহের সেই বিষক্রিয়ার ফলে মনেরও কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেমন করে তা সম্ভব হতে পারে সে বিষয় পূর্বে বলা হয়ে গেছে। এখন আর সেবিষয় আলোচনা করব না।

যে বিষক্রিয়া সামান্য মাত্র দেহে ঘটলে একজনের মনে বিকার অবস্থা দেখা দেয় তার মানসিক গঠনের সঙ্গে অর্থাৎ সাধারণ কথায় তার মনের বলের সঙ্গে যার অনেক বেশী পরিমাণে বিষক্রিয়া দেহে ঘটলেও মনের বিকার দেখা দেয় না, অন্ততঃ সেরকম প্রবলভাবে দেখা দেয় না, তাদের দুজনের মনের বল সমপরিমাণ নয়। মনের গঠনের এই পার্থক্য থাকার জন্যই দুজনের ব্যবহারেও প্রভেদ দেখা দেয়। এসম্বন্ধে এখন এইটুকুই বলা থাক। পরে আবার এবিষয় আরও বলা যাবে। এছাড়া রোগের ফলে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ঘটলে তার জন্যও কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখ দেয়। দেখা গেছে মস্তিষ্কের বিশেষ কোনও অংশের ক্ষতি ঘটলে প্রায় সকলেরই মোটামুটি একই রকমের মানসিক ক্রিয়াবিকার, বা অসুস্থ-তার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। যেটুকু পার্থক্য তাবও মধ্যে দেখা দেয় সেটা ব্যক্তিত্ব মানসগঠনের জন্যই সম্ভব হয়। চিত্তভ্রংশী (ডিমেনশিয়া) মানসিক রোগ লক্ষণগুলিকে এই অংগীয় মানসিক রোগ শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে এসেছে। অধুনা এই মতবাদ সম্বন্ধে সব মনোচিকিৎসক ও মনোবিদ একমত নন। সে জটিলতার মধ্যে যাবার প্রয়োজন আমাদের নেই। যা সংক্ষেপে বলা হল এ থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারলেই হবে—অংগীয় মানসিক রোগ বলতে কি বোঝায়।

মানসিক রোগ আলোচনায় কার্মিক ((ফাংশানাল) মানসিক রোগ সম্বন্ধেই বেশী করে বলতে হবে। এই কার্মিক শ্রেণীর মানসিক রোগে অংগীয় তথ্য প্রধান বলে গণ্য করা হয় না। এখানে রোগের মানসিক কারণই মূল—যদি কোনও দৈহিক লক্ষণ ঐ সঙ্গে দেখা যায় তবে তাকে আনুসঙ্গিক বলেই গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর রোগের চিকিৎসা করতে হলে কেবল দেহের লক্ষণ দূর করবার জন্য ওষুধ দিলে সে মানসিক রোগ সারে না। বায়ুরোগ প্রভৃতি যে সব মানসিক রোগের শ্রেণীবিভাগ পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সবই এই কার্মিক মানসিক রোগ শ্রেণীভুক্ত।

মানসিক রোগ কেন হয় তার কারণ বলতে গিয়ে আমাদের এই মন সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম পর্যায়ে লিবিডো প্রচয় (লিবিডো ডেভেলপমেন্ট) বিষয় বলবার সময় কিছু বলেছি। তখন বলা হয়েছে যে আমাদের এই লিবিডো তার প্রাথমিক স্বতঃকামী (অটো-এরোটিক) স্তর থেকে ক্রমে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে চলে এসে স্বাভাবিক ইতরবাসের (হেটেরো-সেক্সুয়াল) স্তরে পরিণতি লাভ করে। যদি কোনও কারণে এই লিবিডো বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে চলবার সময় তার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়, অথবা তার গতি বাধা পেয়ে কোনও স্তরে অংশত আটকা পড়ে যায় বা বিকৃত হয়ে যায় তবে ভবিষ্যত জীবনে কোনও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলে আমাদের মন সে বাধাবিপত্তির সঙ্গে স্বাভাবিক রকমের লড়াই করতে, সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের

উপায় বের করতে পারে না। তখন আমাদের মননে এমনকি ব্যবহারেও নানা রকমের ভুলভ্রান্তি, অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি দেখা দেয়। এইগুলিকেই আমাদের মানসিক রোগের লক্ষণ গণ্য করা।

প্রশ্ন করা যেতে পারে উক্ত লিবিডো-প্রচয়ের কোনও বিপত্তি দেখা দিলেই কি মানসিক রোগ অবশ্যই দেখা দেয়? উত্তর দেবার আগে আবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে মানসিক রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মনোবিদগণের যে মত গৃহীত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—মানসিক রোগ সম্বন্ধে জানতে বুঝতে হলে, মানসিক রোগের মূল কারণ হিসেবে মানসিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ (এনভায়রনমেন্ট) এই দুটিকেই মানতে হবে। এই মানসিক গঠনের মধ্যে আবার বংশগতির (হেরিডিটি) প্রভাবকেও কিছুটা স্বীকার করে নিতে হয়। আমাদের মনের মূল গঠনের জন্যে তা ছাড়া আমাদের এই বংশগতি আর প্রতিবেশ, এদের দিকে নজর দিতে হবে। দুঃখের বিষয় মানসিক গঠনের উপর আমাদের বংশগতি, কি করে, কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আর সেই প্রভাবের প্রকোপ বা ধরকার আমরা কতখানি এবং কি করে রদ-বদল করতে পারি সেবিষয় আজও আমাদের খুব ভাল জানা নেই। অনেক জীববিজ্ঞানী বহু রকমের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাম্প্রতিক কালে ডঃ খোরানার বংশগতির প্রভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্ব অভিনন্দিত আবিষ্কারের ফলে আগের চেয়ে অনেক বেশী তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পারা গেছে সত্য, কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের আরও অনেক জানবার বাকি রয়ে গেছে। সেসব অজানা বিষয়গুলি আরও জানতে না পারলে এই বংশগতির প্রভাব সম্বন্ধে পুরো খবর জানা আর প্রয়োজনমত তা থেকে রক্ষা পাবার উপায় বের করা সম্ভব হচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে ডঃ খোরানা তাঁর গবেষণায় যে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তার ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত আমরা এই বংশগতির অকাম্য প্রভাবগুলির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারবো। জীববিদদের সঙ্গে মনোবিদদেরও সেদিন এক স্বর্ণযুগের সূচনা হবে। মানব সভ্যতার এতে করে—যে কতরকমের, কতখানি উন্নতি সম্ভব হবে তার কল্পনা করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে আজকে সম্ভব নয়। তবু ভালর আশা সকলেই করে। যত শীঘ্র সে শুভ সমাজের কল্যাণে আসে ততই মঙ্গল। সে পথ না-পাওয়া পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে নানাদিক থেকে, কল্যাণের আশায়।

এতো গেল বংশগতির এখনও অজ্ঞাত প্রভাবের কথা। এবারে প্রতিবেশের কথা কিছু বলা দরকার। প্রতিবেশ তো আমাদের একরকম নয়। যদি বলি প্রত্যেকের প্রতিবেশই কিছু না কিছু পৃথক। তাই যদি হয়, আর যদি মেনে নিই যে মানসিক গঠনে এই প্রতিবেশের প্রভাব স্বীকৃত, তবে একজন মানুষের মনের সঙ্গে আর একজন মানুষের মনের যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই তাও আমাদের মেনে নিতে হবে। এ পার্থক্য যে আছে তা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেও না মেনে উপায় নেই। একজনের মনের মতন ঠিক আর একজনের মনের গঠন দেখতে পাওয়া যায় না। একটু একটু করেও যে কোনও দুজনের মনের গঠনে অনেক পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়।

এসব কথা মেনে নিয়েও কোন্ কোন্ প্রতিবেশ আমাদের মনের গঠনে এবং পরে মানসিক রোগ হওয়ায় সহায়তা করে তাই একটু দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে প্রতিবেশ যেমনই হোক না কেন আমাদের মন সেই প্রতিবেশকে কিভাবে গ্রহণ করল অথবা সেই প্রতিবেশের প্রতিক্রিয়া মনের উপর কি রকম হল সেইটাই বড় কথা। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মনের গঠনের উপর প্রতিবেশের কি প্রভাব হবে তা যেমন নির্ভর করে তেমনই প্রতিবেশও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে—মনের সুষ্ঠু গঠনের অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে। আবারও বলে রাখি—প্রতিবেশ, অবস্থা বা ঘটনা ইত্যাদিই প্রধান নয়, মন সেই অবস্থা বা ঘটনাকে কিভাবে নেয়, সে সম্বন্ধে কি অনুভব করে, তা থেকে কি ধারণা করে বসে সেটাই হল বড় কথা। একই ঘটনা দুজন মানুষের মনে দুরকমের ধারণা গড়তে পারে, অন্ততঃ সে ধারণা একই রকমের হলেও, দুজনের ধারণার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ থাকে, সে অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। যেমন প্রিয়জনের মৃত্যুতে সকলেরই দুঃখ হয়, কিন্তু সে দুঃখের প্রবলতা, বিস্তার, ও প্রভাব ইত্যাদিতে দুজনের অনুভূতির মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে। এই বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি, বিচার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের নানারকমের ধারণা ক্রমে গড়ে ওঠে। আর এই ধারণাগুলিই আমাদের, নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, সেই পরিস্থিতি সেই প্রতিবেশ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করে বিষয় সম্বন্ধে নতুন করে ধারণা জন্মায়; এইরকম করেই আগেকার সঞ্চিত ধারণা অনুভূতি ইত্যাদি মিলে পরের প্রতিবেশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের সহায়ক হয়, ধারণার পথনির্দেশক হয়। অনেক সময় নতুন প্রতিবেশের নতুন অভিজ্ঞতায় পুরোনো ধারণাকেও বদল করে বা কিছুটা পাল্টে দেয়। মনের এই ভাঙা-গড়ার কাজ সর্বদাই চলেছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া জ্ঞান পরের নতুন অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানকে গড়তে প্রভাবিত করে, আবার নতুন প্রতিবেশের অভিজ্ঞতা জ্ঞান আগের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে পরিবর্তিত করে। মনের এই পরিবর্তন, নব নব রূপায়ণ এক বিস্ময়কর সৃজন। মন যে কত বড় স্রষ্টা তা আমরা কিন্তু তাকিয়েও দেখি না, তাই জানতেও পারি না। অন্য কোনও কাজ না-থাকলে বসে বসে যদি নিজের মনের এই সৃষ্টির খেলা দেখা যায়—তবে তা থেকে গভীর আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজের মনকে দেখার অভ্যাস করলে এই আনন্দ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপকারও লাভ হয়। এর একটা বড় সুবিধে এই যে এজন্যে অপর কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর উপর অথবা কোনও বিশেষ পরিবেশের উপর নির্ভর করতে হয় না। মনের এই গবেষণাগার প্রত্যেকের নিজের মনেই রয়েছে—নিজের মনের দিকে তাকানোর অভ্যাস করে নিতে পারলে কত রকমের তথ্য, চিত্র, অনুভূতির হদিস যে মেলে তার ইয়ত্তা নেই। মনের এই বিচিত্র অতি বৃহৎ কারখানায় নানা প্রতিবেশের কত রকমের যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, আর কোন্ কোন্ প্রতিবেশ যে আমাদের মনের উপর সাধারণত ক্রিয়া করে সে সম্বন্ধে পরেরবার কিছু বলব, এবার এই থাক।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

॥ নতুন নাটক ॥

অগ্রদূতের

নক্ষত্রের জন্ম ৩-০০

সেটের ঝামেলা থেকে মুক্ত অভিনব বিষয়বস্তুর ও রীতির মৌলিক নাটক।

কমপক্ষে ১ জন মহিলা ও ৬ থেকে ১১ জন পুরুষ যে সংস্থায় আছে তারাই এ নাটক করতে পারবেন।

জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

লাভার্স লেন ৩-২৫

স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত প্রচণ্ড হাসির নাটক।

মনোজ মিত্রের

চাকভাঙা মধু ৩-৫০

লিপিকা-৩০।১এ কলেজ রো, কল-৯

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩০শে জুলাই মস্কোর মার্কিন দূতাবাসে পৌঁছিয়া হপকিন্সের ধারণা হইল যে, মার্কিন রাষ্ট্রদূত রুশ জনগণের আত্মরক্ষার শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত আশাশীল বটে, কিন্তু বিদেশীদের সম্পর্কে সমগ্র আবহাওয়া এমন সন্দেহ, অবিশ্বাস ও গোপনীয়তায় পূর্ণ যে, সমগ্র পরিস্থিতির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। হপকিন্স যে কোন প্রকারে হোক এই সন্দেহের প্রাচীর ভাঙিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

অতঃপর হপকিন্স ও ষ্ট্যালিনের মধ্যে সন্ধ্যা ৬-৩০য়ে ক্রেমলিনে যে ঐতিহাসিক প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিল, মিঃ শেরউডের বই হইতে তাঁর বিবরণীতে দেখা যায়—

হপকিন্স ষ্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়া গোড়াতেই ভূমিকা স্বারা বলিলেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিগত দূত-রূপে তিনি আসিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করেন যে, আজিকার পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইতেছে হিটলার ও হিটলারিইজমকে পরাজিত করা এবং সে জন্য তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।

জবাবে ষ্ট্যালিন হপকিন্সকে স্বাগত জানাইলেন এবং তারপর হিটলার ও জার্মানী সম্পর্কে বর্ণনা দিয়া বলিলেন যে, সমস্ত জাতির মধ্যেই একটা ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ড থাকা দরকার এবং এই ন্যূনতম মানদণ্ড ছাড়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহ-অবস্থান সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমান জার্মান নেতাদের মধ্যে নৈতিকতার এই ন্যূনতম মানদণ্ডও minimum moral standard নাই এবং তারা বর্তমান পৃথিবীর সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতিনিধি মাত্র—

'represented an anti-social force in the world today!

হপকিন্স ষ্ট্যালিনের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন।

হিটলারী জার্মানীর চরিত্র সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের এই মন্তব্য—'পৃথিবীর সমাজ-বিরোধী শক্তি'—এবং বিভিন্ন জাতির পক্ষে ন্যূনতম নৈতিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ নিশ্চয়ই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

অতঃপর হপকিন্সের সঙ্গে আলোচনায় ষ্ট্যালিন সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমানে কি কি প্রয়োজন—অবিলম্বে এবং ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ভিত্তিতে। সেই তালিকা বলিয়া গেলেন। যেমন, প্রথমত বিমানমারা কামান—ছোট-বড় ২০ হাজার, দ্বিতীয়তঃ শহরগুলি রক্ষার জন্য বড় বড় মেসিনগান, তৃতীয়তঃ ১০ লক্ষ রাইফেল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করিলেন বিমানের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন এক প্রকার পারসোলিন এবং এরোপ্লেন নির্মাণের জন্য এলুমিনিয়াম। এ ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা আগেই ওয়াশিংটনে দাখিল করা হইয়াছে।

মিঃ হপকিন্স লিখিয়াছেন যে, এর পর ষ্ট্যালিনের মুখ থেকে একটা চমকপ্রদ মন্তব্য শুনা গেল,—

"Give us anti-aircraft guns and the aluminium and we can fight for three or four years."

এই মন্তব্যের গভীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল। কারণ, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলারী দিগ্বিজয় যাত্রার মুখেও ষ্ট্যালিন মনে করিতেছেন যে, তিনি ৩।৪ বছর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন এবং তাঁর এই মন্তব্য ইতিহাসের দিক থেকেও কত সত্য ছিল।

ষ্ট্যালিনের সঙ্গে হপকিন্সের দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সময় ষ্ট্যালিন বলিলেন—

যুদ্ধারম্ভের পর থেকে রুশ রণাঙ্গনে জার্মান ডিভিসনের সংখ্যা ১৭৫ থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ২৩২ হইয়াছে, জার্মানী এই সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত বাড়াইতে পারে। যুদ্ধারম্ভের সময় রাশিয়ার ছিল মাত্র ১৮০ ডিভিসন। এখন সেই সংখ্যা হইয়াছে ২৪০ ডিভিসন—রাশিয়া ৩৫০ ডিভিসন পর্যন্ত সৈন্য সমাবেশের ক্ষমতা রাখে।..

ষ্ট্যালিন বলিলেন—১৯৪২ সালের মে মাসে জার্মানী যখন বসন্তকালীন অভিযান শুরু করিবে, তখন উক্ত পরিমাণ সৈন্য-দল তিনি সমাবেশ করিতে পারিবেন। তাঁর ইচ্ছা তাঁর সৈন্যদল শত্রুর সংস্পর্শে আসিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করুক। তারা শিখুক যে, জার্মানদেরও খতম করা যায়। তারা কেউ সুপারম্যান বা অতি-মানব নয়।..তিনি মনে করেন যে, জার্মানদের শীঘ্রই আত্মরক্ষার দিকে ঝুঁকিতে হইবে এবং তিনি স্বীকার করেন যে, যদিও রুশদের বৃহত্তর সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও মোটরযুক্ত ডিভিসন আছে, কিন্তু জার্মান যান্ত্রিক ডিভিসনের তুলনায় সেগুলি দাঁড়াইতেই পারে না।

(— none of them were a match for the German Pannyer divisons.).....

তিনি বলিলেন যে, লাল ফৌজের এখন রহিয়াছে ৪০০০ হাজার বড় ট্যাঙ্ক, ৮০০০ মাঝারী ট্যাঙ্ক ও ১২০০০ হাল্কা ট্যাঙ্ক। আর জার্মানদের মোট ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৩০ হাজার। রাশিয়ার ট্যাঙ্কের উৎপাদন এখন মাসে মাত্র ১ হাজার। তবে, রাশিয়ার ইস্পাতের অভাব ঘটিবে এবং এজন্য তিনি আমেরিকার নিকট ট্যাঙ্কের অর্ডার পেশ করিতে চান।...

ষ্ট্যালিন বার বার উল্লেখ করিলেন যে, তিনি জার্মান আর্মিকে মোটেই লঘু করিয়া দেখিতেছেন না—

Stalin repeatedly stated that he did not underrate the German Army Their organisation was of the very best, and they had large reserve of food, men, supplies and fuel.....The German is [thereforel capable of taking part in a winter campaign of Russia.....

অর্থাৎ জার্মান সৈন্য বাহিনীর সংগঠন সবচেয়ে সেরা। খাদ্য, লোকবল, সরঞ্জামও জার্মানীর প্রচুর মজুদ ভাণ্ডার তাদের রহিয়াছে। অতএব জার্মান সৈন্যবাহিনী রাশিয়ায় শীতকালীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম।...

কিন্তু ষ্ট্যালিনের ধারণা এই যে, ১লা সেপ্টেম্বরের পর কেবল দিন জার্মানীরা

আর আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইতে পারিবে না। কারণ, তখন প্রচুর বৃষ্টি শুরু হইবে। ১লা অক্টোবরের পর মাটির অবস্থা এমন খারাপ হইবে যে, তাদের বাধ্য হইয়াই আত্মরক্ষার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। স্ট্যালিনের দৃঢ় বিশ্বাস শীতের মাসগুলিতে জার্মানদের লাইন হইবে লেনিনগ্রাদ-মস্কো-কিয়েভের বরাবর। তারা এখন যেখানে আছে বোধহয় সেখান থেকে ১০০ কিলোমিটারের বেশী আসিতে পারিবে না।...

শেরউডের বইতে স্ট্যালিন ও হপকিন্সের মধ্যে সাক্ষাতের যে বিশদ বর্ণনা আছে এবং হপকিন্স স্বয়ং যে সমস্ত রিপোর্ট রচনা রচনা করিয়াছেন (অন্ততঃ ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী) ইতিহাসের উপাদান হিসাবে সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। ৩০শে ও ৩১শে জুলাই, ১৯৪১, পর পর দুই দিন ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল এবং একটি সাক্ষাৎকার চলিয়াছিল চার ঘন্টা ধরিয়া। স্ট্যালিনের সঙ্গে ছাড়াও হপকিন্স পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভ, কয়েকজন সামরিক ও কূটনৈতিক পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের দিক থেকে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সাক্ষাতের উপসংহারে স্ট্যালিন বলিলেন যে, জার্মানদের নৈতিক শক্তি নীচে নামিয়া গিয়াছে, যদি এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেন যে, তাঁরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে যাইতেছেন, তবে, জার্মানদের নৈতিক শক্তি আরও ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

হপকিন্সের রিপোর্টে প্রকাশ—

> Stalin said it was inevitable that we (the USA) would finally come to grips with Hitler on some battlefield. The might of Germany was (still) so great that, even though Russia might defend herself, it would be very difficult for Britain and Russia combined to crush the German military machine....He believed the war would be bitter and perhaps long .... and he wanted me to tell the President that he would welcome American troops on any part of the Russian front under the complete command of the American Army.....Finally he asked me to tell the President that, while he was confident that the Russian Army could with stand the German Army, the problem of supply by the next spring would be serious one and that he needed our help. —(9)

হপকিন্সের মূল্যবান রিপোর্টের কেবল এই অংশগুলিই নয়। ব্যক্তি মানুষ হিসাবে স্ট্যালিনের অসাধারণত্ব সম্পর্কে হপকিন্স তাঁর অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা'ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেননা স্ট্যালিনকে নিয়ে এখনও পৃথিবীব্যাপী বিতর্কের শেষ নাই।

হপকিন্স লিখিয়াছেন—

'তিনি একবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন নি। তিনি যখন সোজাসুজি কথা বলছিলেন, তখন তিনি জানতেন যে, তাঁর সৈন্যেরা যুদ্ধক্ষেত্রে গুলী চালাচ্ছে। খুব দ্রুত কয়েকটি রুশীয় কথায় তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি সংক্ষেপে, দৃঢ়তার সঙ্গে ও শিষ্টাচারের সঙ্গে আমার করমর্দন করলেন। একটি শব্দও তিনি অপব্যয় করলেন না, তাঁর মধ্যে কোন অঙ্গভঙ্গী বা কোন ম্যানারইজম (মুদ্রাদোষ) ছিল না। আমি যেন একটা সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যন্ত্রের সঙ্গে কথা বলছিলাম। যে যন্ত্রের বুদ্ধি আছে। যোসেফ স্ট্যালিনের জানা ছিল যে, তিনি কি চান এবং পশ্চিম কি চায় ..... যে প্রশ্নগুলি তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেগুলি ছিল সোজাসুজি, পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত ... তাঁর ভাষাগুলি ছিল একেবারে তৈরী, ব্যর্থহীন এবং মনে হয় যে কথাগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেগুলি যেন বছরের পর বছর তাঁর জিহ্বাগ্রেই ছিল। তিনি একটি শব্দও বৃথা ব্যয় করেন না। যদি হঠাৎ কোন উত্তর তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং যদি তিনি সেটা একটু নরম করতে চান, তবে, তিনি ত করেন অত্যন্ত দ্রুত নিয়ন্ত্রিত একটু মৃদু হাসির দ্বারা— সে হাসি হয়তো নির্বিকার, কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ, কঠিন কিন্তু উষ্ণ। তিনি আপনার কোন অনুগ্রহ চান না। তিনি আপনাকে এমন নিশ্চিত আশ্বাস দেবেন যে, রাশিয়া জার্মানীর এই প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকাবেই এবং সেই সঙ্গে তিনি এটাও ধরে নেন যে, আপনারও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই .....'

এই বর্ণনারই অন্যত্র আছে, দ্বিতীয় দিন যে চার ঘন্টা হপকিন্স স্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা করিয়েছিলেন, তখন—

'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে একবার মাত্র টেলিফোন বেজে উঠেছিল। তিনি ওই বাধার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং বললেন যে, তিনি তাঁর নৈশ আহারের (সাপার) ব্যবস্থা করছেন রাত সাড়ে বারোটায়। কোন ডেসপ্যাচ বা মেমোরান্ডা নিয়ে একবারও কোন সেক্রেটারী প্রবেশ করলেন না।..... রাশিয়ার এই ডিক্টেটরের চিত্র কেউ ভুলতে পারে না। কঠিন কঠোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটি মানুষের মূর্তি। তার পায়ের বুটজোড়া এত পালিশ যেন আয়নার মত চক চক করছিল। তেমনি শক্ত ট্রাউজার পরা— কোন সামরিক বা অসামরিক কোন আচ্ছাদন তাঁর পরিধানে নেই, তিনি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। ১৯০ পাউন্ড তাঁর ওজন। তাঁর হাতগুলি যেন প্রকাণ্ড এবং তাঁর মনোবলের মতই শক্ত, তাঁর কণ্ঠস্বর কর্কশ, কিন্তু সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত

'তাঁর সিগারেট থেকে একটি সিগারেট তিনি আমাকে দিলেন এবং আমার একটি সিগারেট তিনি নিলেন। তিনি অনবরত সিগারেট খেয়ে যান (চেইন স্মোকার) এবং এজন্যই বোধহয় তাঁর নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের এই কর্কশতা। তিনি অনেক সময় বেশ উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন, কিন্তু সংক্ষিপ্ত হাসি এবং কিছুটা ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি। কোন ছোট কথার মধ্যে তিনি নেই। তাঁর 'হিউমার' (বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গকৌতুক) খুব তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী। তিনি ইংরেজী জানেন না, কিন্তু দোভাষীকে উপেক্ষা করে তিনি সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রুশভাষায় এমন দ্রুত কথা বলে গেলেন যে যেন তাঁর সব কথাই আমি বুঝে ফেলেছি।

'আমি আগে বলেছি যে, আমাদের সাক্ষাতের সময় কোন বাধা ঘটেনি—ঘটেছিল দুবার কিংবা তিনবার। কিন্তু টেলিফোন বেজে ওঠার জন্য নয় বা অবাঞ্ছিতভাবে কোন সেক্রেটারির প্রবেশের জন্যও নয়। বার দুতিনেক আমি এমন প্রশ্ন করেছিলাম যে, তিনি এক সেকেণ্ডেরও এক ভগ্নাংশ সময় মাত্র ভেবে নিয়ে নিজেই সন্তোষবোধ করলেন না। তখন তিনি একটা বোতাম টিপলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে একজন সেক্রেটারি দেখা দিলেন, মনে হলো তিনি যেন দরজার কাছেই একেবারে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তিনি 'অ্যাটেনশনের' ভঙ্গীতে এসে দাঁড়ালেন। স্ট্যালিন আমার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন। উত্তরটা যেন গুলীর মত বেরিয়ে এলো। ঠিক সেভাবেই সেক্রেটারি মশাই অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।' — (১০)

* * *

স্ট্যালিনের এই অন্তরঙ্গ ছবি আজও পাঠকদের কাছে অদৃষ্ট মনে হবে এবং আভাষ পাওয়া যাবে তাঁর অসাধারণ নেতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের। বলা বাহুল্য যে, স্ট্যালিনের সঙ্গে হপকিন্সের এই সাক্ষাত হপকিন্সের মনের উপর গভীর রেখাপাত হইয়া ছিল এবং এমন রেকর্ড তিনি রাখিয়া গিয়াছেন যা সেদিনের অবস্থার বিষয়ে মহামূল্যবান। ঐতিহাসিক মিঃ শেরউড মন্তব্য করিয়াছেন যে, মাত্র দুই দিনে হপকিন্স রাশিয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এমন সমস্ত তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন, যেগুলি তাঁর আগে কোন বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব হয়

(9) Sherwood —New York, 1948 P. 432—43.

(১০) শেরউড— পৃষ্ঠোদ্ধৃত পুস্তক। পৃষ্ঠা ৪১৮

নাই। হুপকিন্স ক্রেমলিন থেকে এই ধারণা নিয়াই বিদায় নিয়াছিলেন যে, ষ্ট্যালিন কোন আজেবাজে কথা বলার মানুষ নন, তিনি তার মনের কথাটি বলিয়াছেন।

"This was indeed the turning point in the wartime relations of Britain and the United States with the Soviet Union. No longer would all Anglo American calculations be based on the probability of early Russian Collapse —after this, the whole approach to the problem was changed". — (Sherwood, P. 417)

অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধকালীন সম্পর্কের এটাই ছিল দিন পরিবর্তনের চিহ্নের মত। আগেই রাশিয়ার পতনের সম্ভাবনা আছে, একথা ধরিয়া লইয়া পরে ইংগ-মার্কিনের পক্ষে হিসাব নিকাশের কোন প্রয়োজন রহিল না— এই সাক্ষাতের পর সমস্ত সমস্যাটি বুঝিবার পক্ষে গোটা ধারাটিই যেন বদলাইয়া গেল।

রুশ-জার্মান সংগ্রামের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মিঃ আলেকজান্দার ভার্থও তাঁর বইতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিনের সংগে সাক্ষাতের যে বিবরণী মিঃ হ্যারি হুপকিন্স রাখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি অমূল্য সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে জার্মান আক্রমণের চরম পর্যায়ের সময় ষ্ট্যালিনের মনোভাব কি ছিল, সেটা বুঝিবার পক্ষে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক রিপোর্ট ছিল হুপকিন্সের। কিন্তু এই সমস্ত বিবরণীর মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন চিন্তা করার আছে। যেমন— ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের শেষে যুদ্ধের যে অবস্থা ছিল, তাতে মনে হয় ষ্ট্যালিন ইচ্ছা করিয়াই কিছুটা অনুকূল চিত্র আঁকিয়াছিলেন মার্কিন সাহায্য পাওয়ার আশায়। লাল ফৌজের ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরের যে অপ্রতুলতা ছিল, সেকথাও তিনি গোপন করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই ১৯৪২ সালের বসন্তকালীন অভিযানের পরিকল্পনা ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের উপর জোর দিয়াছিলেন।

কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা ষ্ট্যালিনের বাহ্যিক দৃঢ়তা ও কঠোরতা সত্ত্বেও তিনি যেন স্নায়বিক দুর্বলতার লক্ষণ গোপন করিতে পারেন নাই। অন্যথা হুপকিন্সের রিপোর্টে এমন কথার উল্লেখ থাকিত না যে, ষ্টালিন সোভিয়েত রণাঙ্গনের যে কোন অংশে মার্কিন সেনাপতির অধীনে মার্কিন সৈন্যের যুদ্ধে যোগদানকে স্বাগত জানাবেন।

তাঁর এই উদ্বেগ ও স্নায়বিক দুর্বলতা সত্ত্বেও বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে উক্রাইনের অধিকাংশ জার্মানীর দখলে চলিয়া যাওয়ার পর। তবা সেপ্টেম্বর তিনি চার্চিলের নিকট এক চিঠিতে লেনিনগ্রাদ ও উক্রাইন পরিস্থিতির গুরুতর পরিণতির কথা জানাইলেন এবং বলিলেন যে, জার্মানরা একে একে তাদের শত্রুদের খতম করিতে চায়— প্রথমে রুশ, পরে বৃটিশকে।

"সিভষরগোব (শ্রমশিল্পের প্রকান্ড কেন্দ্র) পতনের দ্বারা আমাদের প্রতিরক্ষার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে

—has confronted the Soviet with mortal danger —

এর একমাত্র প্রতিকার এই বছরেই বসন্তকালে বা ফ্রান্সের কোথাও দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সৃষ্টি .....

ষ্ট্যালিন এই চিঠিতে চার্চিলকে আরও লিখিলেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সাথে সাথে অকটোবরের আরম্ভেই ৩০ হাজার টন এলুমিনিয়াম এবং 'প্রতি মাসে' অন্ততঃ ৪০০ এরোপ্লেন ও ৫০০ ট্যাঙ্ক (ছোট ও মাঝারি) সোভিয়েত ইউনিয়নকে পাঠাইবার জন্য। কারণ, ষ্ট্যালিনের মতে এই দুই প্রকারের সাহায্য ছাড়া রাশিয়ার পক্ষে টিকিয়া থাকা কঠিন।

এর দশদিন পর ষ্ট্যালিন আবার চার্চিলকে এই মর্মে পত্র দিলেন যে, যদি বর্তমান অবস্থায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা কার্যতঃ সম্ভব নাও হয়, তবে বৃটেন অন্ততঃ এইটুকু করিতে পারেন কি, তাঁরা ২৫ থেকে ৩০ ডিভিসন সৈন্য আর্চেঙ্গেল বন্দরে অনায়াসেই নামাইতে পারেন কিংবা ঐ সৈন্যদিগকে জাহাজযোগে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে পাঠাইতে পারেন এবং তারা ইরাণ হইয়া সোভিয়েত ভূমিতে সোভিয়েতের সংগে সামরিক সহযোগিতা করিতে পারেন। এর দ্বারাও প্রভূত সহায়তা করা হইবে। —১১

নিঃসন্দেহে সেই সময় রাশিয়ার সবাই কাহিল হইয়াছিল এবং ষ্ট্যালিনের উৎকণ্ঠাও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। এজন্যই হ্যারি হুপকিন্সের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ষ্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট মার্কিন সৈন্যপত্যের অধীনে মার্কিন সৈন্য এবং চার্চিলের নিকট স্বলিখিত পত্রে বৃটিশ সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সাধারণ অবস্থায় ষ্ট্যালিনের পক্ষে এমন প্রস্তাব বোধহয় কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ যখন 'বিদেশীদের' সম্পর্কে রাশিয়াতে এত সন্দেহ ও অবিশ্বাস প্রবল ছিল।.....

কিন্তু ১২ই জুলাই, ১৯৪১-এর ইংগ-সোভিয়েত চুক্তি অনুসারে পারস্পরিক সামরিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি এবং ষ্ট্যালিনের ঐকান্তিক আবেদন সত্ত্বেও চার্চিল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিলেন কেন? একথা মনে রাখা দরকার ইংগ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পিছনে বৃটেনের জনমতের প্রবল সমর্থন ছিল, কারণ, তাঁরা অনুভব করিয়াছিলেন যে, রাশিয়ার পরাজয়ের দ্বারা বৃটিশ জনগণের বিপদ ঘটিবে। শ্রমিক দল, বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং অজস্র সংগঠন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি গভীর সমর্থন ও সহানুভূতি জানাইতে ছিলেন। রাশিয়াকে মেডিক্যাল সাহায্য দেওয়ার জন্য অকটোবরের মাঝামাঝি ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউন্ডের চাঁদা পর্যন্ত সংগৃহীত হইল।—(১২)

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও বৃটিশ সেনাপতি-মণ্ডলীর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিরূপ মনোভাব কম ছিল না। রাশিয়ার সামরিক শক্তির উপরেও তাদের আস্থা ছিল না। তাঁরা চাহিতে ছিলেন রাশিয়া ও জার্মানী উভয়েই পারস্পরিক যুদ্ধের দ্বারা ঘায়েল হোক এবং এভাবে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত হোক। দ্বিতীয়তঃ বৃটিশ রক্ষণশীল নেতারা ও চার্চিল ছিলেন মূলতঃ সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদী এবং সাম্রাজ্য রক্ষাই ছিল চার্চিলের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাঁর নজর বেশী ছিল এবং প্রচুর পরিমাণ রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য তিনি সেখানে পাঠাইতেছিলেন। সোভিয়েত ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মত বৃটেনের তখন উপযুক্ত সামরিক শক্তি ছিল না, এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাঁরা বলিতেছেন যে, ফ্রান্সের উপকূলভাগে তখন 'প্রতিরক্ষা প্রাচীর' তেমন শক্ত ছিল না। মার্কিন ঐতিহাসিক ট্রামবুল হিগিন্স বলিয়াছেন যে, নাৎসী সেনাপতিরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সের উপকূলে তখন ছিল 'প্রোপাগান্ডা ওয়াল', অর্থাৎ বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রক্ষা প্রাচীরের নামে অতিরঞ্জিত প্রচার।—(১৩)

সেই সময় বৃটিশ সামরিক শক্তি সম্পর্কে চার্চিলের লিখিত ইতিহাসেই (তৃতীয় খন্ড ৭৬৫-৬৬) দেখা যায় যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে তখন ২০ লক্ষের অধিক সৈন্য, ও ১৫ লক্ষ হোমগার্ড ছিল। এদের মধ্যে ২০ ডিভিসন ছিল মোবাইল (গতিশীল) ডিভিসন, ৯টি অর্ধ-গতিশীল ডিভিসন, ৬টি সাজোয়া ডিভিসন, ৫টি সাজোয়া ব্রিগেড এবং এগুলি ছাড়া নৌ ও বিমান বহর—শেষোক্ত শক্তি হিটলারের চেয়ে বৃটেনের বেশীই ছিল। অর্থাৎ সোভিয়েত লেখক ট্রুখনোভস্কি মনে করেন যে, বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করিলে সেই সময় ফ্রান্সের

(11) Alexder Werth—Russia at War P. 273—74

(12) V. Trukhanovsky —British Foreign Policy during World War II P. 169—170

(১৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক— পৃষ্ঠা ১৭৪

উপকূলে সৈন্য নামাইতে ও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে পারিতেন।

এমন কি, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড বীভারব্রুক, শ্রমিক নেতা মিঃ বীভান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বৃটিশ জনমতও সেই প্রস্তাবের পক্ষে ছিল।

বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল না, কিন্তু অবস্থার চাপে পড়িয়া বৃটেনকে সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখিতেই হইল এবং ১৯৪১ সালে এই সহযোগিতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ছিল ইঙ্গ-সোভিয়েত কর্তৃক ইরান দখল।

ইরান দখল

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে মধ্যপ্রাচ্যে নাৎসী পক্ষপাতী কার্যকলাপের জন্য বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই উদ্বিগ্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সমস্ত কার্যকলাপ নিবারণে ও নিয়ন্ত্রণে বৃটেন ও সোভিয়েত একমত ছিলেন। ফলে, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্থানকে ফ্যাসিস্ট ব্লকে যোগদান থেকে বিরত রাখা সম্ভব হইল এবং এই ব্যাপারে বৃটেন ও সোভিয়েত একযোগে যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে নাৎসী পক্ষপাতী চক্র নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

১৯৪১, ১৯শে জুলাই বৃটিশ ও সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হইল যে, ইরানে যে সমস্ত জার্মান শত্রুতা-মূলক কার্যকলাপ চালাইতেছে, ইরান সরকার যেন তাদের দমন করেন। ১৬ই আগস্ট আর একটি যুগ্মলিপি ইরান সরকারের নিকট পাঠানো হইল। কিন্তু ইরান সরকার এই সমতত লিপিকে তেমন আমল দিলেন না। তখন ২৫শে আগস্ট, ১৯৪১, সোভিয়েত সরকার ইরান সরকারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ১৯২১ সালের সোভিয়েত-ইরান চুক্তির ৬নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট তাদ্বাবক্কার খাতিরে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইতেছেন এবং ২৬শে আগস্ট তারিখ সোভিয়েত সৈন্যেরা ইরানে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানই ছিল এর মূলে লক্ষ্য। বৃটেনও ইরান সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। (১৪)

প্রকৃতপক্ষে বৃটেনেরও সৈন্য না পাঠাইয়া উপায় ছিল না। কারণ, দক্ষিণ ইরানে এ্যাংলো-ইরানীয়ান অয়েল কোম্পনীর বিরাট পেট্রল সম্পদ সুরক্ষিত করার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, এই পেট্রোল সরবরাহ করা হইত ভূমধ্য সাগরের ও ভারত মহাসাগরের বৃটিশ নৌবহরগুলির জন্য, আর মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে ইরানে জার্মান পক্ষপাতী অভ্যুত্থান (রসিদ আলী) ঘটার আগেই বৃটেনের টনক নড়িয়াছিল। ১০ই জুলাই, ১৯৪১, ভারতের বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল আচিবল্ড ওয়েভেল ইরানে জার্মানদের (সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার) কার্যকলাপ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, ইরানের মধ্য দিয়া রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলানো একান্ত দরকার। বৃটিশ সরকার কিন্তু আমেরিকাকেও এই বিষয়ে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে বৃটেন ইরানে কোন 'অতিরিক্ত সুবিধা' আদায় করিয়া নেয়, এই আশঙ্কাতে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে এই সমস্যার মীমাংসা হইল ইঙ্গ-সোভিয়েত যুগ্ম অভিযানের দ্বারা। উত্তর দিকে সোভিয়েত সৈন্যেরা এবং দক্ষিণ দিকে বৃটিশ সৈন্যেরা (১৯ হাজার) ইরানে প্রবেশ করিল। (১৫)

এই দখলদারির ফলে রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল এবং ইরানের তৈলকূপগুলি যেমন সুরক্ষিত হইল, তেমনি আর একটি বড় কাজ হইল পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহের পথ উন্মুক্ত রাখা। কেননা মিত্রপক্ষ, বিশেষভাবে চার্চিল মনে করিতেন যে রাশিয়াকে সরবরাহ যোগান দেওয়ার ব্লাডিভোস্টক বন্দরের পথ কিন্তু সমুদ্রের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। সুতরাং পারস্য উপসাগরের পথই ছিল নিরাপদ।

ইঙ্গ-সোভিয়েত সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জার্মান পক্ষপাতী রেজা শা সিংহাসন ত্যাগ করিলেন, নূতন ইরানীয় গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। রেজা শা দূরবর্তী জোহানসবার্গে (দক্ষিণ আফ্রিকা) নির্বাসনে প্রেরিত হইলেন এবং সেখানে ১৯৪৪ সালে মারা গেলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, তেহরানে ইঙ্গ-সোভিয়েতের দখলে গেল এবং রেজা শার পুত্র ২২ বৎসর বয়স্ক নূতন শাহ

14. The Anti Hitler Coalition — V. Issraeljan Moscow, 1971. P 32—34.

15. British Foreign Policy — Trukhanovsky P. 208—4

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পূজার আগেই। এই সংখ্যাটি দুভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রামমোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত মূল্য ৩ টাকা। বেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

• মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : পুলেপন্দু লাহিড়ী • ট্রাজেডির নায়ক : জীবনকৃষ্ণ শেঠ • বাংলা আধুনিক কবিতার মর্মসন্ধান : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় • মোহন এজোলেশী সংবাদ : যূথিকা বসু •

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র : রামমোহন রায় ॥

• বেদান্তদর্শন ও রামমোহন : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য • অষ্টাদশ শতক রামমোহন এবং যুক্তিবাদ : নির্মল ঘোষ • বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন : ভূদেব চৌধুরী • নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন : কুমুদে ভট্টাচার্য • রেনেসাঁসের তাৎপর্য ও রামমোহন : দিলীপকুমার নন্দী • এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

॥ বিশেষ রচনা ॥

বাঙ্গালি মুসলমানদের সাময়িক পত্র—সাধনা (১৮৩১-১৯৩৯) একটি বিলুপ্তপ্রায় মুস্তফা নূরউল ইসলাম। একশো বছরের মুসলমান সম্পাদিত বিভিন্নমুখী পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংকলন। ইতিপূর্বে কোথাও এরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নি।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

সংহাসনে আরোহণ করিয়া মিত্রপক্ষের পরামর্শে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এর পর ১৮ই অক্টোবর শারিখ বৃটিশ ও সোভিয়েত সৈন্যেরা তহরাণ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন—কেবলমাত্র যোগাযোগ রক্ষার পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু সৈন্য ছিল।

চার্চিল লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময় ইরানের এই গুরুত্বপূর্ণ পথ দিয়া রাশিয়াকে মোট ৫০ লক্ষ টন সরবরাহ দেওয়া হইয়াছিল। (১৬)

নাৎসীবিরোধী ইংগ-সোভিয়েট সহযোগিতার পক্ষে এই ঘটনা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মস্কোতে ইংগ-মার্কিন মিশন

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিরূপে হ্যারি হপকিন্স জুলাই মাসের শেষে মস্কোতে ষ্টালিনের সংগে যে দুইদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেই সাক্ষাৎকার ছিল ঐতিহাসিক। মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টইনহার্ড পররাষ্ট্র দপ্তরকে জানাইয়াছিলেন যে, হপকিন্সের এই সাক্ষাৎ ছিল অসাধারণ। ষ্টালিনের সংগে খুব দীর্ঘ-বিস্তৃত সময় তাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং যেরূপ খোলাখুলিভাবে ষ্টালিন তাঁর সংগে এই আলোচনা করিয়াছিলেন, আমার জানা কালের মধ্যে সোভিয়েত ইতিহাসে তার কোন তুলনা নাই।" (১৭)

মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হপকিন্স চার্চিলের কাছেও ষ্টালিনের সংগে তাঁর আলোচনার বিবরণী দিয়াছিলেন। কিন্তু হপকিন্সকে পুনরায় আর্চেঞ্জেলের সেই বিপজ্জনক পথেই ফিরিতে হইল এবং সেই একই ফ্লাইংবোট—উত্তর সমুদ্রের শত্রু বিমান ও ডেস্ট্রয়ারের গুলীবর্ষণ আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই যাত্রা করিতে হইল। কিন্তু এবার দুর্দশার আর ইয়ত্তা রহিল না। কারণ, যে অপরিহার্য ওষধগুলি ছাড়া হপকিন্সের বাঁচিয়া থাকাই কঠিন, এবং যে ঔষধগুলি তিনি সর্বদাই বহন করিতেন, এবার দৈবক্রমে তিনি সেগুলি মস্কোতে ফেলিয়া আসিলেন। অতএব তাঁর অবস্থা সংগে পৌঁছিল এবং যখন স্কটল্যান্ডের স্কাপা ফ্লোতে বৃটিশ নৌবহরের প্রধান এডমিরাল স্যার জন টোভের কাছে কোনও রকমে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল, তখন সত্য সত্যই এমন আশঙ্কা দেখা দিল যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই ব্যক্তিগত প্রতিনিধিটি তাঁর মস্কোর রিপোর্টে পেশ করার জন্য আর প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন কিনা! তবু তাঁকে কোনমতে টানিয়া তুলিয়া ডিনারে বসানো হইল এবং "এডমিরাল মহোদয় তাঁর সাধ্যমত সমস্ত মেডিক্যাল সাহায্য একত্র করিয়া ও ঘুমের ঔষধ দিয়া" তাঁকে নিদ্রামগ্ন করিয়া রাখিলেন।.....

কিন্তু সময় ছিল না, পরদিনই হপকিন্সকে আবার 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যুদ্ধ-জাহাজে চড়িতে হইল চার্চিলের সংগে অতলান্তিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য।

আর্চেঞ্জেল যাত্রায়তকারী আর এ এফ বিমানের ক্যাপ্টেন ম্যাকফিকন্‌লি যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এত অসুস্থ দেহে হপকিন্স যে সাহস ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি তাঁর কর্তব্যপরায়ণতাও অতুলনীয়।

—(শেরউড, ৪২২-২৪)

* * *

আগেই বলা হইয়াছে যে, রুজভেল্টের পক্ষ থেকে হপকিন্স গোড়াতে লন্ডনেই আসিয়াছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সংগে ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং সেখান থেকে তিনি পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা বুঝিবার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করিয়া মস্কোতে গিয়াছিলেন অসুস্থ দেহে। পরে শেরউডের সংগে এক সাক্ষাৎকারে চার্চিল হপকিন্সের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওই শীর্ণ দেহের আড়ালে একটা প্রকাণ্ড হৃদয় লুকিয়ে আছে।" —একথা বলিতে বলিতে চার্চিলের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। শেরউড তাঁর বিখ্যাত বইতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, চার্চিল একজন "পুরাপুরি ইংরাজ"। অতএব বাইরের ব্যবহারে তাঁর উদাসীন থাকারই কথা। কিন্তু তাঁর ভিতরটা ছিল একেবারে "নগ্নভাবে ভাবাবেগে" ভর্তি। অথচ রুজভেল্ট ছিলেন বিপরীত—একজন "সেন্টিমেন্টাল আমেরিকান", কিন্তু তাঁর বাইরের মুখ চোখ দেখিয়া—একমাত্র আন্দাজ করা ছাড়া বুঝিবার উপায় ছিল না, তাঁর ভিতরে কি ঘটিতেছে! (১৮)

ষ্টালিনের সংগে হপকিন্সের এই সাক্ষাতের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়াই সেপ্টেম্বর মাসের শেষে মস্কোতে চার্চিল ও রুজভেল্ট একটি ইংগ-মার্কিন মিশন পাঠাইয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড বীভারব্রুক এবং মার্কিন সরকারের পক্ষে আভেরিল হ্যারিমান ২৮শে সেপ্টেম্বর মস্কোতে পৌঁছিলেন। মলোটোভের সভাপতিত্বে কয়েকদিন ধরিয়া এই বৈঠকের অনুষ্ঠান হইল এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় কি কি সামরিক দ্রব্যসম্ভার, কাঁচামাল ইত্যাদি সরবরাহ করা যাইতে পারে সেই সমস্তই আলোচনা হইল। বৈঠকের শেষে এই মর্মে ইস্তাহার প্রকাশ করা হইল যে, "রাশিয়া যা কিছু চেয়েছে, বৃটেন ও আমেরিকা তার সমস্তই সরবরাহ করতে রাজী।" ১লা অক্টোবর তিন গবর্নমেন্টের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

কিন্তু মস্কোতে ইংগ-মার্কিন মিশনের সামরিক গুরুত্বের চেয়েও রাশিয়ানদের কাছে এর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক বেশী। কেননা হিটলারের বিরুদ্ধে ইংগ-মার্কিন সোভিয়েত মৈত্রী এভাবেই গড়িয়া উঠিতেছিল। চার্চিলের মন্ত্রিসভায় লর্ড বীভারব্রুক (এবং স্যার এন্টনি ইডেন) ছিলেন সবচেয়ে বেশী রুশ পক্ষপাতী। মস্কো বৈঠকের অভিজ্ঞতার পর বীভারব্রুকের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, "পৃথিবীতে একমাত্র রুশরাই পারে জার্মানীকে গুরুতরভাবে কাহিল করিতে।" অথচ তখন রুশ রণাঙ্গনে যুদ্ধের খুব ভয়াবহ অবস্থা চলিতেছিল। বীভারব্রুকের সংগে প্রায় প্রতি রাতে ষ্টালিনের সাক্ষাৎ হইত এবং "বীভারব্রুক ষ্টালিনের প্রশংসায় এমন পঞ্চমুখ হইলেন যে, তাঁকে প্রায় আকাশে তুলিয়া দিলেন।" —"ষ্টালিনের তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি, তাঁর সংগঠন ক্ষমতা এবং সর্বোপরি জাতীয় নেতা হিসাবে তাঁর গুণাবলী বীভারব্রুকের মনের উপর সত্যি সত্যি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।" —মস্কো বৈঠক সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন মিঃ আলেকজান্দার ভার্থ তাঁর "রাশিয়া এ্যাট্ ওয়ার" পুস্তকে (পৃষ্ঠা ২৭৬)।...

এই সময় চেকোশ্লভাকিয়া ও পোল্যান্ডের সংগে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল বটে, কিন্তু পোল্যান্ডের ভবিষ্যৎ সীমানা নিয়া লন্ডন-প্রবাসী পোলিশ সরকারের সংগে কোন মীমাংসা হইল না, বরং বিরোধ রহিয়াই গেল। তথাপি জোড়াতালি দেওয়া মীমাংসার ফলে সোভিয়েত রাশিয়াতে একটি পোলিশ আর্মি গঠিত হইল এবং তার অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন সোভিয়েত জেল থেকে সদ্যমুক্ত জেনারেল এ্যান্ডার্স।

জেনারেল দ্য গলের সংগেও সোভিয়েত সরকারের চুক্তি হইল ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ এবং দ্য গলকে 'স্বাধীন ফ্রান্সের' অধিনায়করূপে স্বীকার করা হইল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল।

(ক্রমশঃ)

16 Churchill — Vol. 3, P. 432
17. Sherwood — Vol. I, P. 421

(১৮) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪৪৮

কখনো রাত কখনো দিন

আশাপূর্ণা দেবী

উপন্যাস

(৩২)

মেজদা কেমন করে সেই বিরাট ভার মাথায় তুলে নিলো, কেমন করে চারিদিকে খবর দিলো, কেমন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'বলুন আমায় কী কী করতে হবে?' তা' ঠিক বুঝতে পারিনি।

যেগুলো করবার সেগুলো করা হচ্ছে, যেগুলো না করলেও চলে, তা-ও করা হলো এটাই শুধু দেখতে পেলাম।

আমাদের মামারবাড়ি মাসিদের বাড়ি কোনোখানে খবর দেওয়ার ত্রুটি হয়নি, ত্রুটি হয়নি ও-বাড়িতে খবর দেবার।

বাবার নিজের ভাইদের আর নিজের বোনদের। একা মেজদা কী করে যে এতো বাড়িতে খবর দিলো।

লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে বাড়ি, দেখতে পাচ্ছি জ্যাঠামশাই যিনি না-কি কক্ষনো কাউকে উঁচু কথাটি বলেন না তিনি মার সামনে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় চীৎকার করে বলছেন, 'একেবারে সব শেষ করে তবে খবর দিলে ন'-বৌমা? ন্যাড়া আমার নিজের ভাই ছিল। আমার সহোদর ভাই।'

বেশী শোকের সময় মানুষ ওজন রেখে কথা বলতে পারে না এটা ঠিক, তবু সেদিন জ্যাঠামশাইকে বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল।

'সব শেষ করে' তবে খবর দিলেন মা?

সবটা যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেটা মা বুঝতে পারলেন কখন? কতটুকু সময় পেলেন তার পর? আর দেবে কে খবরটা এটা খেয়াল করবেন না, শুধু দোষ দেবেন?'

তাছাড়া জানেনই তো মা ওঁনার সামনে মুখও খুলবেন না, ঘোমটাও খুলবেন না। তবে ডেকে কথা বলার অর্থ?

মাকে তো চুপ করেই থাকতে হলো।

বলতে তো পারলেন না, 'তেমন সময় আমি পেলাম কোথায়?'

বাবা যে এমন মুহূর্তের মধ্যে চলে গেলেন, মা যে কতোখানি অসহায় হয়ে গেলেন,, যার বড় ছেলেটা জেলে পড়ে আছে, মাথার ওপর একটা কেউ বড় নেই, সেই মেয়ের যে কী অবর্ণনীয় অসহায়তা, সেটা তো ভাবলেন না উনি গুরুজন হয়ে?

এদিকের ত্রুটির ভারটির ওজন করতে বসলেন?

মায়া-মমতা বলে কি কিছু নেই!

মার ভাসুর, মা আর কী বলবেন? শুধু দেখলাম ঘোমটার মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছেন।

তারপর দেখলাম, মানে দেখে দেখে বুঝলাম, কেউ মারা গেলে তার বাড়ির লোককে দোষারোপ করাটাই নিয়ম।

যে যেমন ভাবে পাচ্ছে দোষারোপ করছে।

কাকে?

আর কাকে? মাকে।

বাবা যে প্রায় বিনা-চিকিৎসায় মারা গেলেন একটা বড় ডাক্তার এলো না, মা চিরকাল নিজের স্বাধীনভাবে যেমন চালিয়ে এসেছেন, তেমনি স্বেচ্ছাচার করে শান্ত হয়ে বসে রইলেন, এতো বড় বিপদে আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিলেন না, এতে ক্ষুব্ধ হবেন না, ওই সব নিকট আত্মীয়রা?

খবর পেলে তাঁরা এসে পড়ে ছুটোছুটি করে বড় বড় ডাক্তার এনে সারিয়ে তুলতে পারতেন না?

তাছাড়া—

হঠাৎ কখনো এতবড় অসুখটা করতে পারে? তলে তলে ভিতরে ভিতরে শরীর খারাপ হচ্ছিল, কেউ তাকিয়ে দেখেনি।

আমাদের একজন মাসতুতো পিসিমা আমাদের মায়ের থেকে ছোট তো বড় নয় জীবনে তাঁকে আমি কয়েকবার মাত্র দেখেছি শেষে যা সম্প্রতি দিদির বিয়েতে দেখলাম, তিনি থরথর করে বলে উঠলেন, 'দেখবে কে? ন'বৌ? হুঁ। যে চিরকাল ওই মানুষটাকে ঘোড়ার মত ছুটিয়ে ছুটিয়ে শুধু নিজের সুখ-সুবিধে, আরাম আয়েসটিই দেখেছে? কোনোদিন তো দেখিনি ন'-বৌ ন্যাড়াদাকে একটু সেবা-যত্ন করছে। কেবল ছেলেটা মেয়েটা আর নিজেরটি।...এইতো মেয়ের বিয়েতেই তো দেখে গেলাম সেদিন,— মানুষটা যে উপোস করে কন্যে সম্প্রদান করছে, তার মধ্যে আবার খেটে হন্যে হচ্ছে, ন' বৌকে এক গেলাস ডাবের জল কি শরবৎ হাতে দিতে দেখলাম? হুঃ! মানুষটা কোথায় ঘুরছে তাতেই বড় দৃক্‌পাত। মেয়ের কাপড়, গয়না, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব, এই নিয়েই মত্ত।'

মেজ জ্যেঠিমা কম কথার মানুষ। তবু তিনিও বললেন 'স্বাধীন ভাবে সংসার করবো বলে আলাদা হয়ে চলে এলেও তো সম্পর্ক মুছে ফেলার নয়? এই যে দেশে গেলেন সব, ছেলেরা আমাদের কাছে রইলো, কেন? আপন জন বলেই তো? তা জ্যেঠারা কেউ মেয়ের বিয়েতে আভ্যুদয়িক, নান্দিমুখ কন্যে সম্প্রদান করতে পারতেন না? আমরা তো দেখে অবাক হয়েই বলাবলি করলাম ন'বৌ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলো। মেয়ের বিয়েতে বড় জ্যাঠাদের একবার বললো না, 'এ কাজটা আপনারা করুন।'

আমার তখন কথা বলার একতিল ইচ্ছে হচ্ছিল না, স্তম্ভিত হয়ে বসে শুধু ভাবছিলাম, এঁরা সব স্নেহ-মমতাশীলা মেয়ে মানুষ!

আমার বাবাকে যে এঁরা এতো ভালবাসতেন, তা' কখনো টের পাইনি। আজ দেখছি বাবার ওপর কী অগাধ স্নেহই ছিল বাবার দিদিদের বৌদিদের।

কিন্তু মেজ জ্যেঠিমার কথাটি শুনে আর যেন চুপ করে থাকতে পারলাম না বলে

উঠলাম, 'মা তাসুরদের সঙ্গে কথা কইতেন? তাই বললেন?'

'তোমায় কিছু বলিনি মা—'

মেজজ্যেঠি গম্ভীর ভাবে বললেন, 'বলার সাহসও নেই। নেহাৎ প্রয়োজনে কড়া দাগা লেগেছে বলেই বলে ফেললাম। তখনই দেখে গেছি ন' ঠাকুরপোর ভেতরে যেন আর শাঁস নেই। অথচ সমানে তাদের সব করে চলেছেন, ফেলতে পারণ করবার নেই।'

মা হেঁটমুখে বাবার পায়ের কাছে বসে আছেন, মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু মাঝে মাঝে কান্নার উত্তাল তরঙ্গ কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

জ্যাঠামশাইরা এসে পড়ার আগে পর্যন্ত অবিশ্রাম চেঁচিয়েছেন মা, সারা-জীবনের, সমস্ত সুখ-দুঃখের ইতিহাস ওই নিথর হয়ে যাওয়া দেহটাকেই ডেকে ডেকে শুনিয়েছেন, কপাল চাপড়ে চাপড়ে কপালটা ফুলিয়ে ফেলেছেন, তারপর চুপ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভাসুরদের সামনে তো আর গলার শব্দ বার করা যায় না? স্বামীকে ডেকে ডেকে কথা বলা যায় না?

সত্যি বলতে মা'র চুপ করে যাওয়ায় যেন কিছুটা স্বস্তি পেলে বেঁচেছিলাম, আর সহ্য হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, আত্মা যদি তক্ষুনি চলে না যায়, তক্ষুনি ছেড়ে চলে যাওয়া পরিত্যক্ত দেহটার চারিদিকে ঘুরতে থাকে, তাহলে বাবার আত্মাও এখনো ঘুরছে। এই সব কথা শুনতে পাচ্ছে?

কেন মা এমন করে ওদের সুখ-দুঃখ আমাদের ভালবাসার স্মৃতির কথা এমন করে উদ্‌ঘাটিত করছেন? 'মৃতের লজ্জা নেই' বলে কি মৃতদেহকে নিরাবরণ করে দেয়?

তখন মা'র ওপর বিরূপতা আসছিল, এখন আবার এঁদের এই নিষ্ঠুরতায় মার ওপর এতো মায়া আসছে?

মেজ জ্যেঠিমার কথার পরই বড় জ্যেঠি বললেন, 'মেয়েগুলিকে ভালই তৈরী করেছে দ'বৌ।'

বাবা মায়া গেলেন।

আমাদের কী হয়ে গেল তার এখনো হিসেব নেই, অথচ এঁরা এমন নিষ্ঠুরতা করছেন কেন?

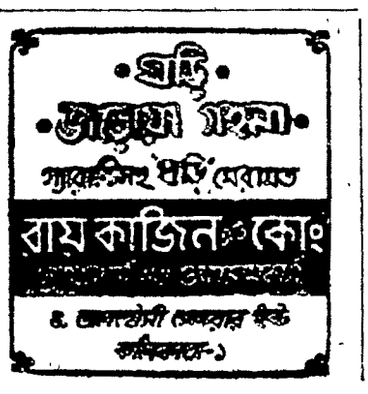

দিদির বিয়ের সময় কটু অম্ল মন্তব্য যে করেছেন দেখেছি, সেটা স্পষ্টই বুঝেছিলাম ঈর্ষার প্রকাশ।

কিন্তু এখন?

এখনো কি ঈর্ষা করার ঘটনা ঘটেছে?

অথবা—সারা জীবনের ঈর্ষার প্রতিক্রিয়া?

আমাদের নিজের মামীও তো বললেন, বাবাকে ডেকেই বললেন, 'চিরকাল ঠাকুরঝির সকল কথা মেনে এসেছো, যা বলেছে শুনেছো এখন তার সব অহঙ্কার ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে কোথায় চলে গেলে ঠাকুরজামাই?'

জনে জনে একই কথা।

মার দিকের বাবার দিকের বলে নয়।

মাকে ডেকে ডেকে জানিয়ে দিচ্ছেন সবাই, 'ওহে চারুলতা তোমার এতোদিনের রাণীগিরি ঘুচলো, এইবার তুমি পথের ভিখারিণী তুল্য হলে।'

ভিখারিণী।

হ্যাঁ পষ্টই বললেন কে একজন, ছেলেরা বাজাই হোক, আর বাদশাই হোক, আর স্বামী যতই রেখে যাক, মেয়েমানুষের শাঁখা-সিঁদুর ঘুচলে আর থানের ন্যাকড়া গায়ে জড়ালেই তো রাস্তার ভিখিরীমাগীর সঙ্গে সমান।'

ইনি কে আমি জানি না।

এর চেহারাটি ভারী-ভারী, কিন্তু কথা-বার্তা বেশ ধারালো।

ইনি নাকি বাবার কোন্নে একরকম পিসি।

কই দিদির বিয়েতেও দেখিনি।

বাবাকে এঁরা নিশ্চয়ই খুবই ভালবাসতেন তা' নইলে খবর পেয়েই এমনভাবে ছুটে আসতেন না।

কে একজন হঠাৎ বলে উঠলো, 'শেষ সময়ে ছেলেদের দিয়ে মুখে একটু গঙ্গাজল দিইয়েছিলে নবো? তোমার তো আবার এসব হুঁশ-পর্ব কম।'

এই সময় জ্যাঠামশাইরা ঘরে ছিলেন না, বাইরে 'ফিনাল ডিপার্চারের' ব্যবস্থা করছিলেন, মা কথা কইলেন। বললেন, 'ছেলেদের? এক-জনতো জেলে পড়ে আছে, আর একজন বাড়ি ছিল না. এসব তো অনেকক্ষণ বলেছি সেজদি!'

মার এই কথায় অভিযোগের সুরে আধিকার করে সেজদি ক্ষুণ্ণ হলেন। বলে উঠলেন, 'ওঃ। বলেছিলে বটে। অকস্মাৎ এই দৃশ্যে বাবার ঠিক নেই তাই, ভুলে গেছি। তবে—শেষ সময়ে মুখে একটু গঙ্গাজল পড়লো না—এই যা দুঃখু।'

'ওতে নবৌয়ের কিছু দুঃখু নাই সেজদি, ও ওসব মানে টানে না—'

হঠাৎ মার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

মা ভুলে গেলেন, ঘরের বাইরেই যার ভাসুরেরা রয়েছেন। মা চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'মারো মারো তোমরা মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা মারো যতো পারো। এখন সেই দিন পেয়েছো—'

মার এই চীৎকারে হঠাৎ এতোক্ষণের কলগুঞ্জন চুপ হয়ে গেল।

যেন সমস্ত পরিবেশটার ওপর একটা চড় পড়লো।

এটা বোধহয় এঁদের ধারণাতে ছিল না।

এতোক্ষণে ঘরে মৃত্যুর স্তব্ধতা নামলো। ঘরে শুধুই যে ওই দোষারোপ পর্ব চলছিল তাও তো নয়? এধারে-ওধারে জড় হয়ে বসা মহিলাকুলেদের মধ্যে অন্য অনেক কথাই হচ্ছিল।

মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের কষ্ট যন্ত্রণা শাশুড়ীর দুর্ব্যবহার, ছেলের বৌয়ের ঔদ্ধত্য অবিনয়, এ-যুগের বিস্ময়কর পরিবর্তন, 'স্বদেশী হওয়ার' পরিণাম, কোনো একজনের হাতের নতুন প্যাটার্ণের চুড়ির সমালোচনা, বাজার দর, ঝি-চাকরের বদমাইসী, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কান না দিই, মন না দিই, তবু কানে এসে খট-খট করে ঢুকছে বৈকি, মনে এসে তীক্ষ্ণ তীর হয়ে বাজছিল।

এই পরিবেশে এইসব গল্প করতে ইচ্ছেও করছে?

বাইরে বোধহয় তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। গভীর রাত্রির পটভূমিকায় মাঝে মাঝে দু-একটা ভীষণ শব্দ কানে আসছে।

'নাঃ, আর দেরী করা ঠিক নয়।'

'একবার তোমার বাবস্থা করো।'

'সঙ্গে কে যাচ্ছে?'

'কাপড়-চোপড় দেওয়া হয়েছে?'

'কিন্তু বড় মেয়ে তো এখনো এসে পৌঁছয়নি।'

'কী আর করা যাবে? তার অদৃষ্ট নেই।'

'খবর দেওয়া হয়নি?"

'হয়েছে। ভাগলপুরে তাকেই শ্রীরামপুরের না কোন্নগরে কোথায় নেমন্তন্নে গেছে।'

'কপাল!'

ঘরে এসে দাঁড়ালো কজন। যমেরই অনুচরের মত লাগলো তাঁদের।

মা বলে উঠলেন, 'ওগো, আর একটু রাখো। সুবী আসুক এসে মাথা খুঁড়ে মরে যাবে।'

'সে আসবে, এ-খবর পাওয়া গেছে?'

মেজদা এগিয়ে এলো।

গম্ভীর ভাবে বললো, 'হ্যাঁ খবর পাওয়া গেছে। আসছে।

একটু পরেই দিদি এলো।

সর্বাঙ্গে গহনা, মেমারুসী পরা আপ-সতে আপসাতে এসে লুটিয়ে পড়ে মাথা খুঁড়তে লাগলো—ও বাবা—ওবাগো—'

(ক্রমশঃ)

বিলুপ্ত রাজধানী দেবীকোট

উৎপল চক্রবর্তী

অবিশ্বাস্য মনে হয়!

এইখানে, এই পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার নারায়ণপুর মৌজায়, পুনর্ভবা নদীর তীরে ঘন জঙ্গলে ঢাকা পাথর ইঁট আর ভাঙা খিলানের এই বিশাল সমাধি সৌধের নীচে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছেন বখ্‌ত-ইয়ার—

মহম্মদ-ই-বখ্‌ত্ ইয়ার খিলজী!

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভাগ্যান্বেষী সেই দুর্ধর্ষ যুদ্ধ ব্যবসায়ী, সুবিখ্যাত ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসকারী এক লুণ্ঠক, বঙ্গ-বিহার বিজয়ী এক প্রবল পরাক্রমী সেনা-নায়ক, বাংলায় প্রথম মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা, দুর্গম তিব্বত অভিযানের নায়ক বাংলার শাসনকর্তা সেই বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজী—জনজীবনের কোলাহল থেকে দূরে, নির্বাসিতের মতো এই নির্জন ভূখণ্ডে, অবহেলিত এক নিভৃত অঞ্চলে, ঘন অরণ্যের এই জটিল আশ্রয়ে।

অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এই সেই দেবীকোট, বাংলায় মুসলমান যুগের প্রথম রাজধানী, পরবর্তী যুগে সুলতান হুসেন শাহর অন্যতম শক্তিশালী সেনানিবাস, সুশাসক পাল সম্রাটদের 'জনকভূ' বরেন্দ্রভূমির পরিবর্তিত নামের 'বরিন্দ্' অঞ্চল—সুপ্রাচীন কোটিবর্ষ বা কোটিকপুরের ভিত্তিভূমির উপর গড়ে উঠেছিল যে বিশাল মহানগরী দেবকোট বা দেওকোট! না, এখন আর কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না সেই মহানগরীর। পশ্চিমবাংলার ছোট একটি জেলার ছোট একটি থানার অন্তর্গত সামান্য কিছু ভূখণ্ড জুড়ে ছড়ানো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ, অসংখ্য ভাঙা পাথরের টুকরো আর ইঁটের কঙ্কাল আর কয়েকটি নিঃস্ব গৃহপ্রাচীরের অস্তিত্ব নিয়ে নিতান্ত নগণ্য এক গ্রাম হয়ে বাংলার এই রাজধানী এখন মুমূর্ষুর মতো ম্রিয়মাণ।

বিশ্বাস হয় না, এইখানে বাস করতেন দেবভূতি নামে এক রাজা। কথিত আছে, তাঁর নামেই এ জনপদের নাম হয় দেবকোট। কোট বা গড় শব্দের অর্থ দুর্গ বা দুর্গতুল্য রাজপুরী। এই জায়গারই অপর নাম কোটিবর্ষ, প্রাচীন গোকুলিকা মণ্ডল ও হলাবর্ত মণ্ডল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জৈন কল্পসূত্রে জৈন সাধুগণের কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্ধনীয় তাম্রলিপ্তিকা শাখার উল্লেখ আছে। অনুমানে অসুবিধে নেই, এই অঞ্চল বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরেরই সমসাময়িক এবং একদা এখানে জৈন-ধর্মেরও অন্যতম কেন্দ্র ছিল। যতদূর জানা গেছে, এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারও ছিল। কিন্তু এসবই সম্ভবত মুসলমান পূর্বযুগের ঘটনার ইতিবৃত্ত। রাজ্যব্যাপী মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁকে রাজলক্ষ্মীর বর গ্রহণ করিয়েছিল সেই বপ্যট বংশোদ্ভূত গোপাল দেব অশান্ত বাংলায় দীর্ঘ দুশো বছর-ব্যাপী এক সুশাসন প্রবর্তন করে পাল রাজত্বের এক শুভময় ইতিহাসের সূচনা করেন এইখান থেকেই। অদূরবর্তী ঐ রানগড়ই ছিল তাঁদের রাজধানী, মাটির গভীর স্তরে নিহিত আছে যার সাক্ষ্য। তারপর সেনরাজত্বের সূচনা। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো লক্ষ্মণাবতীতে। এখান থেকে দূরে, বরেন্দ্রভূমি থেকে গৌড়ে। আর তারপর.....

বিলুপ্ত রাজধানী পরিক্রমায় উৎসুক পর্যটক আমি একে একে গঙ্গো, কর্ণসুবর্ণ, রানগড়, লক্ষ্মণাবতীর পর আবার এসে দাঁড়িয়েছি সেই বরেন্দ্রভূমি রানগড়েরই কাছে—দেবীকোটে, স্তব্ধ বিস্ময়াহত হয়ে তাকিয়ে আছি তার জীর্ণ অবশেষের দিকে। না, কোথাও আর শোনা যায় না সেই দুর্ধর্ষ বখ্‌ত্-ইয়ারের অশ্বক্ষুরধ্বনি, শুধু মালদহ-বালুরঘাট সংযোগকারী জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অজস্র ট্রাক, বাস ট্যাক্সির যান্ত্রিক আওয়াজ, গোমীণ মানুষের সংলাপ, পুনর্ভবা টাংগন আর রক্ষাণী নদীর অস্ফুট কলস্বর।

এইখানেই বঙ্গবিজয়ের পর প্রথম রাজধানী স্থাপন করেছিলেন বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজী ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে।

শুনেছিলাম, একদা যাঁর প্রচণ্ড দাপটে বাংলায় হিন্দু সাম্রাজ্যের ভিত ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল, ছদ্মবেশী অষ্টাদশ-জন অশ্বারোহীর নষ্টকীয় ছলনা এবং সুতীব্র আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে পর্যুদস্ত হয়েছিল বাংলার সৈন্যবাহিনী—সেই দুর্বার সমরনায়ক বখ্‌ত-ইয়ারের প্রচণ্ড প্রতাপের চিহ্ন বেণু রেণু হয়ে মিশে আছে এখানকারই মাটিতে, নারায়ণ-পুর মৌজায় পীরপাঞ্জি বা পীরপাল নামের জায়গাটিতে। কেউ আসেন না আর। দেশী বিদেশী কোন পর্যটক নন, কৌতূহলী কোন গবেষক নন, এমনকি বাংলার ইতিহাস বিষয়ক কোন বইতেও এখনকার কোন ছবি নেই। কোথায় কোন সমাধির আড়ালে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে আছেন সেই অশান্ত সেনানায়ক, স্থানীয় মানুষ সঠিকভাবে তাও বলতে পারেন না, পথি পিপাসু কোন গবেষকের কৌতূহলও স্পর্শ করে না বিস্মৃতির শুধু অনুমানে বলেন, এই গঙ্গারামপুরের কাছেই কোথাও আছে বখ্‌ত্-ইয়ারের সমাধি। ফলে সেইসব অস্পষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে সময় এবং পরিশ্রম হলো অনেক বেশী পরিমাণে।

গঙ্গারামপুরে নেমে জিজ্ঞেস করলাম একজনকে, কোথায় আছে সেই সমাধিস্থান। জানালেন, পুনর্ভবার বড় সেতুটি পার হলে ব্রহ্মাণীর ছোট সেতু, সেটি পেরোলেই যে কাঁচামাটির রাস্তা নেমে গেছে লক্ষ্মী-পুর গ্রামের দিকে—সে পথে এগোলেই যাওয়া যাবে সেখানে। শীতের বিকেল, আসন্ন সন্ধ্যার আমেজ; বিদায় নিলাম, কিন্তু লক্ষ্মীপুর পৌঁছুলে সেখানকার অধিবাসীরা জানালেন সেই পীরপাল এখানে নয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে যে ছোট নদী, খেয়ায় সেটা পার হয়ে মাঠ বরাবর মাইল দেড়েক গেলে দেখা যাবে সেই আকাঙ্ক্ষিত চিহ্ন—এবং একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, এ নির্জন স্থানে অতএব না যাওয়াই নিরাপদ। ফিরেই আসছিলাম, কিন্তু কলকাতা থেকে এতটা পথ এসে শেষে না দেখে ফিরে যাবার ক্ষোভ নিরন্তর পীড়িত করবে আশঙ্কায় রিক্সাওয়ালাকে বললাম, —যাবে?

অবাঙালী চালক দীর্ঘকাল এখানে থাকার ফলে ভাবার পোষাকে বাঙালী হয়ে গেছে। প্রায় সানন্দেই রাজী হলো। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর ক্যামেরা দেখে কিনা কে জানে, ফটো ও অর্থপ্রাপ্তির মোহ সম্ভাবনাই তাকে উদ্দীপ্ত করে থাকবে বোধহয়—যদিও নিশ্চিতই ছিলাম ছবি তোলা আজ আর হবে না! রিক্সা পাশে রেখে নোকোয় উঠতেই মাঝি জানালেন, এই পাড় ঘেঁষে কিছুটা এগোলেই হেঁটেই পার হওয়া যাবে নদী এবং ওপাড়ে উঠলেই যে আলপথ মিলবে—সেটি ধরে এগোলেই তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যাবে। দেখছিলাম, সূর্য শীতের ভয়ে অন্ধকারের পর্দা গায়ে টেনে নিচ্ছেন দ্রুত, পা চালাতে হলো দ্রুততর বেগে। কিন্তু গ্রামের দেড় মাইল আংকিক হিসেবে কখনোই যথাযথ হয় না, আবছা আলো সন্ধ্যা ঝালরের আড়ালে এক সময় দেখলাম বিশাল এক সমাধি সৌধ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। বিশাল পাথরের গাঁথা তার ভিত্তিভূমি, চারদিকে ছড়ানো অজস্র তার ভগ্নাংশ, বহু কক্ষগুলির অস্তিত্ব [illegible]

এই কি সেই বখ্‌ত্‌-ইয়ারের শেষ চিহ্ন? বালরের ওপারে সমাধিসৌধ, সমাধিসৌধের ওপার থেকে ভেসে ওঠে বাংলার ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী।

গৌড়ের সিংহাসনে আসীন সম্রাট লক্ষ্মণ সেন। দানশীল, সুশাসক, সংস্কৃতিবান এই সম্রাট একান্তভাবে ধর্মনিষ্ঠও। লক্ষ্মণাবতী থেকেও তীর্থভূমি নদীয়া-নবদ্বীপের প্রাসাদে নিয়ত ধর্মচর্চা এবং কাব্য সুধারস পানেই তাঁর অনুরাগ বেশী। মহাসান্ধিবিগ্রহিক হলায়ুধ মিশ্র, কবি উমাপতিধর, শরণ প্রমুখ পণ্ডিতজনের সমাহারে গঠিত 'নবরত্ন' পরিবেষ্টিত হয়ে সুখেই ছিলেন তিনি। সুশাসকই ছিলেন, ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দীন সিরাজও স্বীকার করেছেন, 'মহৎ রাজা.....যিনি এক লক্ষ কড়ির কমে কাউকে কিছু দান করতেন না।' সুবিশাল গৌড়ের মসৃণ জীবনযাত্রার স্বরূপ তাই তাঁকে নিশ্চিন্তই করেছিল, অরো অখণ্ড মনোযোগে ধর্মচর্চায় মন দিতে পেরেছিলেন। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও সাদর অভ্যর্থনায় স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর রাজসভায়। এই কিছুদিন আগে, পীর শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজীর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে পাণ্ডুয়ার কিছু জমিও দিয়েছেন তাঁকে মসজিদ নির্মাণের জন্য।

জানতেন না সম্রাট লক্ষ্মণ সেন, ধর্মের কর্মের আড়ালে লুকোন থাকে অজস্র বিষাক্ত কীট যা ক্রমে জীর্ণ করে দেয় সকল সতর্ক প্রহরা। তাই ঐ পীর যে ধর্মপ্রচারের ছদ্মবেশে এদেশে এসেছেন আর একটি গুরুতর অভিপ্রায়ে, আর পাণ্ডুয়ার গোপ কালু ঘোষ কালু পীর নাম নিয়ে ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের খেলায় মেতে উঠেছেন—সে সংবাদ অস্পষ্টভাবে কানে এলেও গ্রাহ্য করেন নি তিনি।

কিন্তু তাঁর সুখী শ্রবণকে চমকে দিয়ে আচমকা বেজে উঠল এক দুঃসংবাদ অশ্বক্ষুর ধ্বনি। সংবাদ পেলেন তিনি, বিহার ও মগধ অধিকার করে গৌড়-লক্ষ্মণাবতীর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছেন এক মহাপরাক্রমী সমরকুশলী তুর্কী সেনাপতি। নাম মুহম্মদ-ই-বখ্‌ত্‌-ইয়ার খিলজী। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সম্রাট। ডাক পড়ল রাজজ্যোতিষীদের—যাঁদের পরামর্শ ছাড়া রাজকার্য পরিচালনা করেন না তিনি। তারপর?

এক আশ্চর্য চাঞ্চল্যকর উপন্যাসোপম ঘটনা ঘটল এরপর। তীব্র সংঘাতময় রাজ্য রাজধানী পরিবর্তনের এক চমকপ্রদ নাটকীয় কাহিনী—পৃথিবীর ইতিহাসে এ জাতীয় কোন দ্বিতীয় উদাহরণ আছে কিনা আমার জানা নেই।

সামান্য জায়গীরদার ছিলেন বখ্‌ত্‌-ইয়ার। চুণারের এগারো মাইল পূর্বে ভূইলি নামে যে গ্রাম আছে লেখানকার জায়গীরদার বখ্‌ত্‌-ইয়ার কিন্তু সামান্য ধনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। গাহড়বার সামন্ত রাজাদের পরাভূত করে তিনি মুঙ্গের ও বিহার অঞ্চলে লুণ্ঠনরাজ শুরু করলেন। ক্ষমতা ও অর্থের লোভে প্রচুর তুর্কী দস্যু তাঁর দলে এল। ধনলোভই ছিল বখ্‌ত্‌-ইয়ারের বেশী, তবু যেখানেই রাজশক্তির দুর্বলতা টের পেতেন সেখানেই ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করতেন। ১১৯৯ সালে আচমকা তিনি হিসার-ই-বিহার বা বিহার দুর্গ আক্রমণের ফলে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হলেন। তাঁর আক্রমণে পুড়ে গেল অসংখ্য গ্রন্থ।

ভুলই করেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন ওটা বোধহয় দুর্গ। আসলে বিখ্যাত ঔদন্ড বা ওদন্ডপুর মহাবিহার ছিল এটি এবং যাঁরা নিহত হলেন তাঁরা সবাই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষু। পরের বছর একই ভুলের ফলে ধ্বংস হয়ে গেল বিক্রমশীলা বিহার। খবর পেয়েছিলেন বখ্‌ত্‌-ইয়ার, পূর্বভারতে গৌড় রাজ্যেও আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ক্রমশ বিশৃঙ্খলার রূপ ধারণ করছে এবং স্বয়ং সম্রাট এবিষয়ে কিঞ্চিৎ উদাসীন।

খবর পেয়েছিলেন সম্রাট লক্ষ্মণ সেনও একজন মদগর্বী যবন তাঁর রাজ্য অধিকার করতে এগিয়ে আসছেন। আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন মহামন্ত্রী এবং উৎকণ্ঠিত সম্রাটকে বিমূঢ় করে ঘোষণা করেছেন রাজজ্যোতিষীগণ, আজানুলম্বিত বাহু কুৎসিত দর্শন এক যবনের হাতে এরাজ্য পরাজিত হবে। শাস্ত্রেও নাকি লেখা আছে সেকথা। সম্রাটের গোপন দূত ঝটিতি খবর এনেছেন, সেই তুর্কী সমরনায়কের চেহারার সঙ্গে বাস্তবিকই শাস্ত্রের বর্ণনায় মিল আছে। লক্ষ্মণাবতীতে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ল ভীতি আর অনিশ্চয়তা। ব্রাহ্মণ এবং বণিকেরা পালিয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গ এবং আসামে। শুধু মন্ত্রিমণ্ডলী এবং রাজজ্যোতিষীদের সকল সতর্ক উপদেশ এবং পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অসাধারণ রাজকীয় মর্যাদাবোধ এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নদীয়ার প্রাসাদে একাকী রয়ে গেলেন বৃদ্ধ সম্রাট লক্ষ্মণ সেন—রায় লছমানিয়া! ১২০১ সাল। বিহার সরিফ থেকে গয়া ও ঝাড়খণ্ডের ভেতর দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন বখ্‌ত্‌-ইয়ার। তাঁর চকিত গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলো না সৈন্যদল। মাত্র অষ্টরোজন অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে নদীয়ার সীমান্তে এসে দাঁড়ালেন মুহম্মদ-ই-বখ্‌ত্‌-ইয়ার খিলজী।

তারপর?

লক্ষ্মণাবতী-নদীয়া বিজয়ের পঞ্চাশ বছর পর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মিনহাজ-উদ্দিন সিরাজ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরী'-তে লিখেছেন,

..'বখ্‌ত্‌ ইয়ার সহসা নদীয়ায় প্রবেশ করলেন, এত সহসা এবং দ্রুত যে, তাঁহার অশ্বারোহীদের ভিতর ১৮ জন ছাড়া আর কেহ তাঁহার সঙ্গে তাল রাখিতে পারিলেন না...। নগরের দ্বারে পৌঁছিয়া তিনি কাহারো উপর কোন অত্যাচার করিলেন না বরং নীরবে এবং বিনীতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন. কেহই সন্দেহও করিতে পারিল না যে, ইনিই বখ্‌ত্‌-ইয়ার, বরং সকলেই ভাবিল এই অশ্বারোহীরা বোধহয় ব্যবসায়ী এবং মহার্ঘ অশ্ব বিক্রয় উদ্দেশ্যেই ইহাদের আগমন। বখ্‌ত-ইয়ার রাজপ্রাসাদের দ্বারে আসিয়াই ঘোষ হইতে তরবারি উন্মুক্ত করিলেন এবং বিধর্মীদের হত্যা শুরু করিয়া দিলেন। তখন দ্বিপ্রহর, রায় লখ্‌মনিয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় রাজপ্রাসাদের দ্বার হইতে এবং নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে তুমুল আর্তনাদ উত্থিত হইল। লক্ষ্মণসেন ব্যাপার কি বুঝিবার আগেই বখ্‌ত্‌-ইয়ার প্রাসাদের ভিতর এবং অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং নরহত্যা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রায় তখন নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলাইয়া গেলেন।'

নৌকো প্রস্তুত ছিল ঘাটে। অসহায় সম্রাটকে নিয়ে সংকনাট এবং বংগ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো সেই নৌকো।

'ফুতুহ্‌-উস-সালাতিন' গ্রন্থ প্রণেতা ইসমী লিখেছেন প্রায় একই কথা। ভাণ্ডার অশ্ব, চীনা বস্ত্রসম্ভার এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য পরীক্ষার জন্য সম্রাটকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ছদ্মবেশী বখ্‌ত্‌-ইয়ার। রায় যখন কারাবাসে এলেন, তখন তাঁকে ছলনায় বশীভূত করে বন্দী করলেন সহজই। দুটি বিবরণীর ভেতর যে সামান্য পার্থক্য আছে তা শুধু এই জায়গাতেই।

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থ, বিক্রমপুর স্কন্ধাবার থেকে প্রচারিত ভাওয়াল ও মাধাইনগর লিপি, উমাপতি ধর এবং শরণের শ্লোক বলে সম্রাট লক্ষ্মণসেন শেষজীবনে কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

সে যাই হোক, মুচতুর বখ্‌ত্‌-ইয়ার তখন গৌড় অধিকার করেছেন। লক্ষ্মণাবতীর নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন লখ্‌নৌতি। রাজধানী স্থাপন করেছেন দেবকোটে। এবং তারপর দিল্লীশ্বর কুতুবউদ্দীনকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু উপঢৌকনসহ রওনা হয়েছেন দিল্লীর দিকে। বাংলায় স্থাপিত হয়েছে মুসলমান রাজত্ব।

কিন্তু তবু ভরিল না চিত্ত। রক্তে যাঁর হুযবাজের হ্রেষাধ্বনি বাজে, তিনি রাজধানীতে কাল কাটাতে পারলেন না। ১২০৬ সালে দেবকোট থেকে এক সামরিক অভিযান চালালেন সুদূর তিব্বত জয়ের জন্য।

পরবর্তীকালে গৌহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্রের কানাইবরশীবোয়া নামে এক জায়গায় পাথরে লেখা এক লিপি বলে :

'শাকে ১১২৭ শাকে তুরগযুগ্মেশে
মধুমাস ত্রয়োদশেঽহ্নি
কামরূপ-[illegible]-ভঞ্জকো ক্ষয়মাযযৌ।'

অর্থাৎ ক্ষ বছরেরই ২৩শে মার্চ তারিখে কামরূপ অভিযান করেন তুর্কীরা। কিন্তু এবারও ভুল করলেন বখত্-ইয়ার। যুদ্ধ জয়ের নেশায় উন্মাদ হয়ে তিনি নিজের শক্তির পরিমাপ করতে পারেননি। তিব্বত অভিযান অসমাপ্ত রেখে শোচনীয় ব্যর্থতা বরণ করে ফিরে এলেন তিনি। শুরু হলো এবার পরাজয়ের পালা। রাজধানী স্থানান্তরিত হলো লখ্নৌতিতে। মিন্হাজের কাছে যে দুই বৃদ্ধ সৈনিক নদীয়া বিজয়ের কাহিনী বলেছিলেন, সেই দুইজন অকপটে এবারও ব্যক্ত করেছিলেন সেই কাহিনী।

ভগ্নস্বাস্থ্য ভগ্নমনোরথ বখত্-ইয়ার ফিরে এলেন রাজধানীতে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, যেখানে তাঁর ভয়ে গৌড়-নাগরিকেরা সদা সন্ত্রস্ত থাকত, সেখানে যেন এক উদ্ধত স্পর্ধার হাওয়া তুমুল চীৎকার তুলেছে। এই ব্যর্থ সমরাভিযানে যেসব সৈনিক মারা গেছেন, তাঁদের শোকার্ত পরিবারবর্গ কটূক্তি আর অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করে লখ্নৌতির আবহাওয়াকে যেন ভয়াবহ করে তুলেছে। দেবকোটে ফরলেন তিনি! সেখানেও সেই একই হাহাকার, একই কান্নার তীব্র আঘাত। পথে বেরোতে শঙ্কিত হন বখত্-ইয়ার। সুদৃশ্য অট্টালিকাগুলির দরজা-জানালা তাঁকে দেখা মাত্র এক অশুভ ছায়ার প্রবেশ নিষেধ করার জন্যই যেন সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। কখনো তাঁর ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে চকিত নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে প্রবল ধিক্কার আর ক্ষমাহীন ভর্ৎসনা বর্ষণ করেন নিপীড়িত নাগরিকেরা।

বিষাদে ভেঙে পড়েন দুর্ধর্ষ সেই বখত্-ইয়ার। যে প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি সামান্য এক জায়গীরদার থেকে আজ গৌড়ের সিংহাসনে উঠে আসতে পেরেছেন, তার যেন চিহ্নই খুঁজে পান না তিনি দেহে বা মনে। ক্ষোভে অপমানে দুঃখে রাজ-প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে আত্মগোপন করেন। কিংবদন্তী জানায়, এ-সময় কঠিন কুষ্ঠ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। অজানুলম্বিত বাহু, খর্বাকৃতি অসুন্দরদর্শন এই সমরনায়ক তখন যেন জীবন্ত প্রেতের মতো প্রাসাদপুরীর কক্ষে বন্দী। সভয় দেখতে পান, ইতিহাসের চাকা তাঁকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য এবার দ্রুত এগিয়ে আসছে। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা রাজ্যের ভেতর এক ষড়যন্ত্রজাল বিছিয়েছেন। অসহায়ের মতো নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে উঠতে থাকেন। তারপর একদিন তাঁর দেহমনের সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে এল আলি মর্দান নামে এক অশ্বারোহীর নিষ্ঠুর ছুরিকা! শেষ হয়ে গেল মুহম্মদ-ই-বখত্-ইয়ারের ভাগ্যাহত জীবন।

এই সেই দেবকোট! আর ঐ কি সেই সমাধিভবন? আমি বিস্ময়ে অভিভূত বোধ করি। কোথায় সুস্পষ্ট ভূমিলিপি গ্রন্থ, আর

দেবীকোটের ধ্বংসাবশেষ

কোথায় এই গণ্ডগ্রামপুর থানার নাবায়ণপুর মৌজার অবহেলিত গ্রাম পীরপাঞ্জা বা পীরপাল! কতদূর পথ অতিক্রম করে সাফল্যের চূড়ায় উঠতে গিয়ে ক্ষমতালোভী এক সুলতানের বিজয়ী অশ্ব এইখানে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। কি করুণ নাটকীয় এক পরিণতি!

অবিশ্বাস্য মনে হয়।

এইখানেই পরবর্তী সুলতান গিয়াসুদ্দীন প্রথম টঙ্কশাল স্থাপন করেন এবং এখান থেকেই মুদ্রা প্রচার করেন ১২১১ থেকে ১২২৭ সালের মধ্যে।

এইখান থেকেই ওয়েস্ট মেকট সাহেব পান চারটি শিলালিপি। প্রথমটি সুলতান কায়কাউসের (৬৯৭ হিজরা বা ১২৯৭ সালের), দ্বিতীয়টি সুলতান সেকেন্দার শাহর (৭৬৫ হিজরা বা ১৩৬৫ সালের), তৃতীয়টি সুলতান মুজফ্ফর শাহর (৮৯৬ হিজরা বা ১৪৯৬ সালের) এবং চতুর্থটি সুলতান হুসেন শাহর (৯১৮ হিজরা বা ১৫১৮ সালের)। এবং এখানেই হুসেন শাহ পরে নিকটবর্তী ঘোড়াঘাট সেনানিবাসের সঙ্গে এই দেবকোট সেনা-নিবাসের যোগাযোগের জন্য একটি পথ নির্মাণ করেন।

কোথায় আজ সে-সব! সন্ধ্যায় গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সব প্রত্নচিহ্ন! দ্রুত হাতে সমাধিভবনের একটা স্কেচ করে নিলাম, ফটো তোলা নিরর্থক জেনে!

রিকসাচালক বললেন, এটা কি বাবু?

বললাম। খুব মনোযোগসহকারে শুনলেন সব। ঘাড় নেড়ে কিম্বদাহত গলায় বললেন,

—এইখানে বাবু রাজা ছিলেন? এতদিন তো জানিনি!

আমিই কি জেনেছি আগে! স্কুলে বা কলেজে কোন শিক্ষকমশায় একথা বলেননি, কোন পঠ্য-বইতেও নেই, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে জানবার সুযোগ দেয় না। অতএব নিবক্ষর এই চালকের অকৃত্রিম আগ্রহ পূরণ করবার জন্য গল্পের আকারে সবই বলতে হলো ফেরার পথে। ক্ষতবিক্ষত চষা মাঠের সংকীর্ণ আলপথ অতিক্রম করতে দুঃসহ কষ্ট হচ্ছিল। ইতিমধ্যে কয়েকটি কুকুর নিকটবর্তী গ্রাম থেকে অচেনা মানুষের ঘ্রাণ পেয়ে যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করে আমাদের উদ্দেশ্যে দ্রুত এগিয়ে আসছিল। সমূহ বিপদ আসন্ন জেনে কি করব ভাবছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিছু একটা অনুমান করে কুকুরগুলো নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেই আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল। আল-বেরুনীর কথা শুনেছিলাম, অতএব তাদের কথা মনে হলো! আমাকে কামড়াবে তার এই সবল শরীর বহন করব কিভাবে ভাবতে ভাবতেই দেখলাম কাছেই নদী নক্ষত্রের আলোয় মৃদু হাসছে!

মালদায় ফিরতে হলো ট্রাকে করে, বাস ছিল না অত রাতে! মনে মনে ধন্যবাদ এবং বাস্তবে একটু বেশীই টাকা দিয়ে এসেছি চালককে। কোন ক্ষোভ নেই তার জন্য এমন দুর্গম জায়গায় অবেলায় ফেলে অমন অকপটে কেউ কি রাজী হতো।

শুধু একটু সংশয় রয়ে গেল। ঐ সমাধি-ভবনই কি বখত্-ইয়ারের সমাধিস্থান! কোথাও তো কোন প্রত্নতত্ত্বলিপি চোখে পড়ল না! তাহলে?

সুযোগ মিলল কিছুদিন পরই।

করলুম গবেষক শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী এবং জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীচিত্ত দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে। ঐ সমাধিভবনের ছবি দেখালেন শ্রীদত্ত। বললেন বাণগড় বিষয়ক লেখাটি অমৃতে পাঠ করে তিনি ও ডি-এস-ই-ও মহাশয় গিয়েছিলেন বানগড়ে এবং ঐ সমাধি-স্থান দেখেও এসেছেন। শুনেছেন, ওখানকার প্রস্তরলিপিটি নাকি নিকটবর্তী ধলদীঘির পারে এক মসজিদের গায়ে সংলগ্ন আছে! বেরিয়ে পড়লুম দুজনে। ধলদীঘির কাছাকাছি জাতীয় সড়কে নেমে সেই মসজিদে ঢুকতেই দেখি একটি প্রস্তরলিপি। ফটো নেওয়া হলো। ভেতরে একজন পীরসাহেবের সমাধি। তার সামনে নীরবে কি পাঠ করছেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক। আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালেন, এই পীরের নাম আতাউল্লা। আর তিনি পরিভৃত্য সৈয়দ শাহ আহম্মদের অধস্তন পুরুষদের একজন। জানা গেল, এই ধলদীঘি যা পৌরাণিক বাণরাজার মহিষী ধলারানীর নামে স্পন্দিত, তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৪০০০×১০০০ ফুট। এবং এই প্রস্তরলিপি পীর জাফর গাজীর নির্মিত ও সুলতান কাইকাউসের সময় অর্থাৎ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানে স্থাপন করা হয়েছে! মসজিদটি সেকেন্দার শাহ ১৩৬৮তে শেষ করেন। বাংলার ১২৬২ সালে করমালী শাহ ফকির দীঘির দক্ষিণ পাড়ে এক মেলা বসান। সেই থেকে আজও সেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে! বিখ্যাত এই ধলদীঘির মেলার আকর্ষণে বহু ভক্ত এখানে উপস্থিত হন, দেখলুম, দূর থেকে সাবিবদ্ধ উট নিয়ে আসছেন একদল মানুষ—মেলা আসন্ন। এই মসজিদের কাছে উত্তর পাহাড়ে ভূগর্ভে চিল্লার মধ্যে সাধুগণের উপাসনার স্থান ছিল। কাছেই আছে এক ফকিরপাড়া! সন্দেহ নেই, দীর্ঘকাল আগে থেকেই এঁরা এখানে বাস করেন।

কিন্তু এই প্রস্তরলিপি কি বখতিয়ারের সমাধিলিপি? আরবী জানা ছিল না বলে বালুরঘাটে এসে একজনকে ধরে পড়িয়ে নিতে হলো। না, তা নয়, এটি যে পীর আতাউল্লারই সমাধিস্থান তারই ইঙ্গিত আছে ঐ লিপিতে। পরে কমলেন্দু চক্রবর্তীর কাছেও সেই লিপির অনুবাদ পেলুম।

তবে ঐ দূর দুর্গমে নির্বাসিত সমাধি-ভবনটি কার? সুলতান সাহ বেখোয়ারীর? পীর সাহ সাহাউদ্দীনের? তাঁর দরগা তবে কোনটা? পীর নিমাই সাহেবের সমাধিটি কোথায়? বাণগড়ের ধ্বংসস্তূপে পীর সাহ বেখোয়ারীর নির্মিত মসজিদ আছে। আছে বালুরঘাট টাউনের তিন মাইল দক্ষিণে মহী-সন্তোষ নামে এক ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে বখতিয়ারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ শিরাণ খিলজীর সঙ্গে যখন দিল্লী থেকে প্রেরিত সংবাদারের যুদ্ধ হয় রাজ্য অধিকার নিয়ে তখন শিবিরে আশ্রয় নেন। আছে এমন ইতস্তত ছড়ানো অসংখ্য প্রত্নচিহ্ন, জেলা গেজেটিয়ারে যার উল্লেখ আছে সংক্ষিপ্তাকারে।

না, কেউই এখন আর কৌতূহলী নন। ইতিহাসবিমুখ বাঙালী বর্তমান নিয়ে অস্বাভাবিক ব্যস্ত। অথচ দেশের ইতিহাস আনুপূর্বিক না জানা থাকলে যে নতুন ইতিহাস রচনা করা প্রায় অসম্ভব এ ধারণা করবার মতো শিক্ষা আমাদের বিদ্যালয়গুলি দেয় না। ফলে বিসের টানে এখানে ছুটে আসবেন তাঁরা। আজ আর রাজপ্রতাপের কোন চিহ্ন নেই, নেই রাজছত্রের বিপুল বিস্তার, শোনা যায় না রণডঙ্কার বজ্রনির্ঘোষ।

কতদিন আগে হারিয়ে গেছে সেইসব—কত জল বয়ে গেছে পুনর্ভবা দিয়ে।

শুনেছিলাম অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে, প্রায় বছর চল্লিশেক আগে এখান দিয়ে গরুর গাড়ী করে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যখন তিনি যেতেন, তখন তাঁকে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে যেতে বলতেন গাড়োয়ানেরা। এ অঞ্চলের মানুষ নাকি কেউই খাট পালঙ্কে শুতেন না, মাটিতে বিছানা করতেন—কারণ এখানকার মাটির নীচেই তো চিরকালের মতো শয্যা পেতেছেন স্বয়ং সুলতান মুহম্মদ-ই-বখতিয়ার-খিলজী!

বুঝতে অসুবিধে নেই, তখনো মানুষের হৃদয়ের কিছুটা অংশ নিজের অধিকারে রাখতে পেরেছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত সেই তুর্কী নায়ক! কিন্তু আজ আর পারেন কিনা আমি জানি না। শুধু জানি, রাজাদের দিন শেষ হয়ে গেছে আজ। রাজছত্র ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে গেছে মাটিতে। শুধু বিশাল বট আর অশ্বত্থ সমাধিসৌধগুলির দেয়াল ফাটিয়ে এর রাজকীয় দম্ভ চূর্ণ করার প্রতিজ্ঞায় যেন ফণা মেলেছে মাথার উপর। ঘন বাঁশবন এক দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা করে ঘিরে ধরেছে অসহায় এক সুলতানকে। এইখানে, এই বরেন্দ্রভূমির মাটিতেই একদিন বাংলার প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সিংহাসনে এসেছিলেন গোপাল দেব, এইখানেই অত্যাচারী সম্রাট ২য় মহীপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত-নায়ক দিব্যোকের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। এখান থেকে বেশী দূরে নয় সেইসব পুণ্যস্থানগুলি।

আজ প্রকৃতি যেন তার প্রতীক হয়ে সেই পরিবেশই রচনা করেছে। দেবীকোট নামের কোন চিহ্নই নেই আর, সেই কোট বা দুর্ভেদ্য গড়বেষ্টিত প্রাসাদের মহিমা লুটিয়ে পড়েছে ধুলোয়—অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম আর সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন, আর তাদেরই রচিত এইসব বাঁশবনের ঘন বেষ্টনী আজ এক রাজধানী বিস্মৃতির অতলে নির্বাসিত প্রোথিত করেছে! শুধু সেই দুটি তুর্কী সেনানায়কের সমাধি হয়নি এখানে, আজ যেন অতীতের রাজকীয় বিলাস বৈভবেরই এক সমাধিস্থান এই দেবীকোট! ফিরে আসি বিষণ্ণ পায়ে। ইতিহাসের ক্রম-অগ্রগতির আর এক ধাপ পার হয়ে।

কিছুই যেন আর আশ্চর্যজনক মনে হয় না।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)।

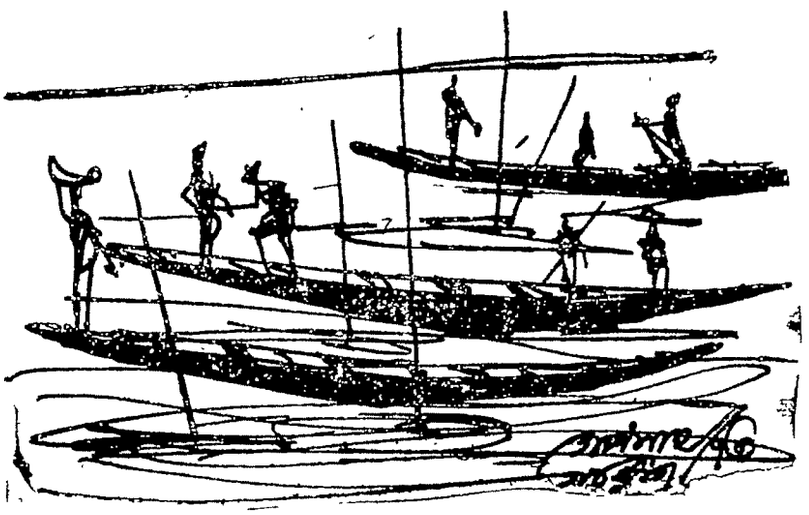

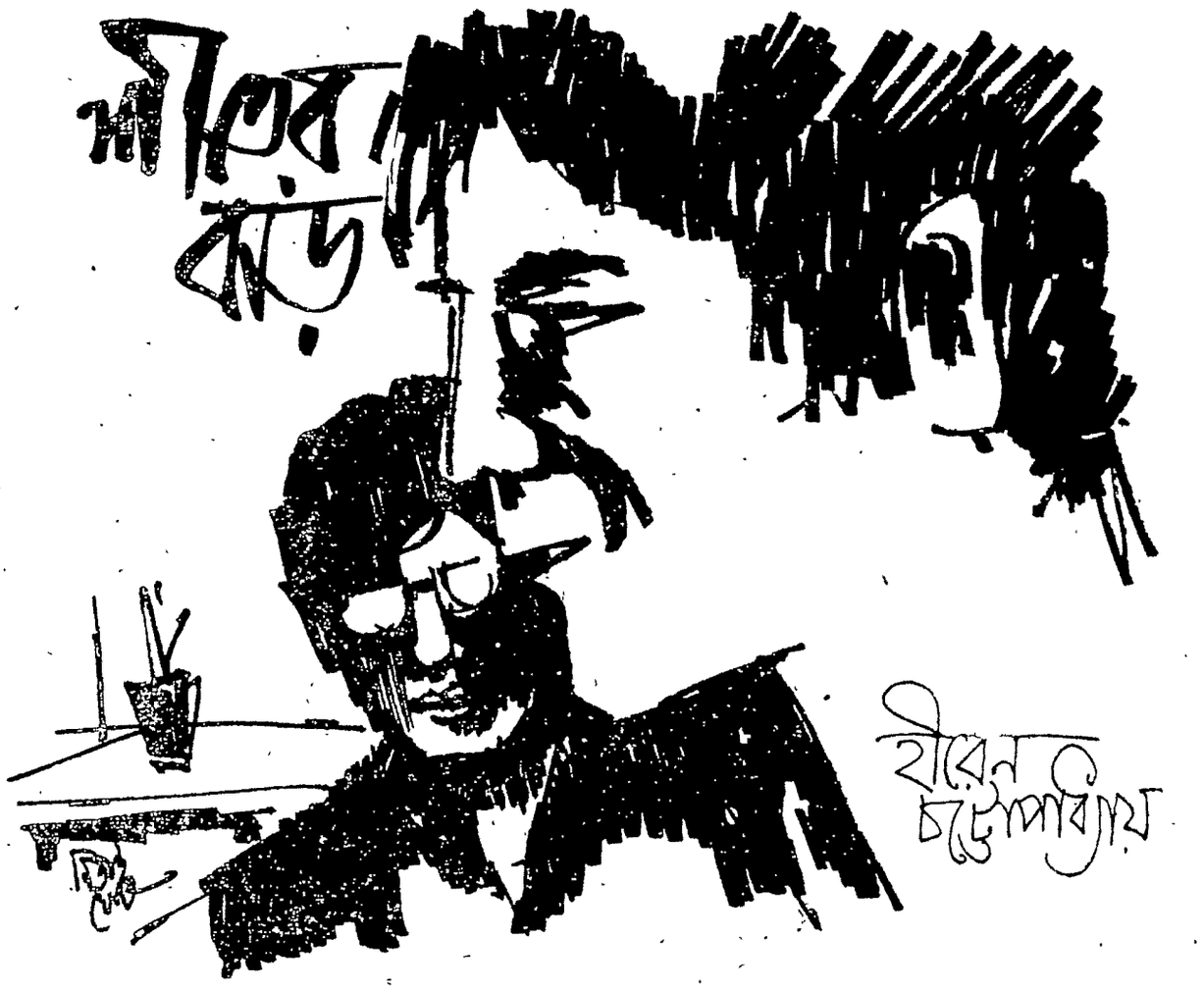

চোখ খুলতেই সব ছায়াছবি—সমস্ত দেহ জুড়ে যতির আয়েস, চারিদিকে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রণী, অপরিচিত ঘর, চোখের পাতা ভারী—নীরেন লেপ টেনে নিল ভাল করে।

কিন্তু আবর্তির কণ্ঠ চাপা হলেও তীক্ষ্ণ লেপটা মাথা পর্যন্ত উঠিয়েও সকালের মিষ্টি আমেজটা ধরে রাখতে পারল না নীরেন। ওর মনে পড়ে গেল, আজ ছুটির দিন নয়, আজকের জন্য কোন প্রভাতী বিলাস ওর পাওনা নেই।

সযত্ন সঞ্চিত শক্তি দিয়ে লেপটা পায়ের দিকে ঠেলে দিল নীরেন। ভুরু কুঁচকে—যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, চোখের কাপটা টেনে নিল আবর্তির হাত থেকে। যে মুহূর্তে শূন্য কাপ থামিয়ে রাখবার জন্য নীচু হয়ে হাত বাড়িয়েছে, গীতা এসে দাঁড়াল সামনে।

'তোকে কে ডাকছে, দাদা!'

'আমাকে?' ভুরু তখনও কুঞ্চিত, মুখ তুলে নীরেন তাকিয়েছে ওর মুখের দিকে—'আমাকে, আবার কে ডাকতে এল এত সকালে!'

'কি জানি, চিনি না—গীতা আঙুলের নখ খুঁটছিল, 'বলতে বললে তোর বন্ধু, সরোজদা।'

'সরোজ'—নীরেনের কপালে ভাঁজগুলো একটু কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে, কয়েক মুহূর্তের উৎকণ্ঠিত অবসর, তারপরই হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠেছে ওর চোখে মুখে, বলেছে 'যা যা ডেকে নিয়ে'—

'এই ঘরে ডেকে নিয়ে আসবে?' আরতি গজ গজ করতে সুরু করেছে—'কোন ভদ্রলোককে এ ঘরে ডেকে আনা যায়?'

'তাতে কি হয়েছে—সরোজ তো—নীরেন বুঝতে পারছিল এ ঘরে, অন্তত এই মুহূর্তে, কাউকে ডেকে আনলে অস্বস্তি লাগবে। কিন্তু নিয়ে আসতে গেলে এ ঘরেই আনতে হয়, অন্য ঘরটা তো যুগপৎ ঠাকুরঘর এবং খাবারঘর। উপায় না দেখে বললে, 'যা যা, এইখানেই নিয়ে আয়।'

'আশ্চর্য মানুষ'—আরতি নির্মম বিরক্তিতে ফোঁস ফোঁস করছিল, 'তবু একটু উঠে গিয়ে, বাইরে থেকে সাঁকতে পারো না'—

'বাইরেই তো সারি সব'—নীরেনের কণ্ঠও কর্কশ হচ্ছে, 'কটা বন্ধু আর আসছে বাড়ীতে বল—'

'আনো না গণ্ডা-গণ্ডা বন্ধু, সামনে বেরুতে হয় তো আমাকে—লজ্জাটজ্জা যে এখনও বিসর্জন দিতে পারিনি'—

'আঃ চুপ করোতো একটু!'

'থাক থাক'—সুকৌশলে গলা চেপে আরতি ঝঙ্কার দিয়েছে, 'বিছানাপত্তর সব ছত্রাকার, কোথায় বসবে শুনি, আমার হয়েছে—'

পরদা নড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরতির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। ওর শাড়ীর আঁচল অন্তর্হিত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই সরোজের মুখ দেখা গিয়েছে পর্দার ফাঁক দিয়ে।

ঢুকেই কিন্তু পিছিয়ে এসেছে সরোজ চৌকাঠের পেছন থেকে বলেছে—

'জুতো পরে তোমার ঘরে ঢোকাহয়—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে'—নীরেনের মনে পড়ছিল কলেজের প্রথমদিন থেকে ও নীরেনকে তুই বলে আসছে, শেষ যখন

বছর দুয়েক আগে এসেছিল আজও তাই বলেছিল।

বসবো না কিন্তু নীরেন'—সরোজ মাপ মতন হেসে যে মুহূর্তে দামী প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, নীরেন কেমন যেন থিতিয়ে গিয়েছে। হঠাতই কেন যেন মনে হয়েছে, একটা অপরিচিত লোকের সামনে ও বসে আছে—যাকে কোনদিন দেখেনি আগে। অথচ একই সঙ্গে, একটা যন্ত্রণাকে ভুলতে পারছিল না ও। সরোজ নামে একটা ছেলের সঙ্গে বি. এস সি পর্যন্ত পড়েছে হেসেছে—গল্প করেছে প্রেসিডেন্সির লনে বাদামের খোলা ছড়িয়েছে, বান্ধবীদের সঙ্গে বেলেল্লা ঠাট্টা করেছে। এম. এস. সিতে প্রথম হবার খবর নিয়ে যে লাজুক লাজুক কৃষ্ণবর্ণ ছেলেটি আচমকা ঢুকে পড়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংস-এর এক কেরাণীর ঘরে—সে ছেলেটাও যেন অত্যন্ত পরিচিত ছিল। অথচ আজকে নিজের ঘরে এই লোকটাকে—

সরোজ পকেট থেকে একটা দামী খাম বার করেছিল। সেইদিকে তাকিয়ে—সেই দামী প্যান্ট, দামী টেবিল, বোল্ডগোল্ডের চশমা আর সুপুষ্ট চেহারার দিকে চেয়ে নীরেনের মনে পড়ে গেল সরোজ পশ্চিম বিশ্ব ঘুরে এসেছে—সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওদিকের কোন এক ইউনিভার্সিটির ডকটরেট ডিগ্রী।

আমার বিয়ে'—

শেষ কথাটা নীরেন শুনতে পেয়েছে। কে জানে আর কি কি কথা বলেছে ও। অপ্রস্তুতের মত হেসে খাট থেকে নেমে পড়েছে ও বলেছে—'বেশতো, বিয়ে তো সকলেই করে—বোস না একটু'—নিজেই উঠে গিয়ে চেয়ারের ওপর থেকে রাশীকৃত জামা কাপড় সরাতে লেগেছে।

'না মানে অনেক জায়গায় যাবো তো'—প্যান্টের ক্রীজ ঠিক রেখে সন্তর্পণে বসেছে সরোজ, কার্ডটা এগিয়ে দিয়েছে সামনে।

'দেখি কি ব্যাপার'—নীরেন মুখটাকে হাসি হাসি করবার চেষ্টা করে কার্ডটা বার করেছে—' মানে তো—মার উপযুক্ত মেয়ে—' 'অনুপযুক্ত নয় নেহাৎ'— সরোজ নির্মমভাবে হেসেছে, 'চিত্রাকে মনে আছে বোধহয় তোমার—'

'চিত্রা!' নীরেন কি আর্তনাদ করে উঠেছে, কে জানে! সরোজের ঝুঁকে পড়া মুখটাকে প্রাগৈতিহাসিক এক অতিকায় জন্তুর মত দেখাচ্ছিল। নীরেনের মাথার মধ্যে একটা ঝম ঝম শব্দ—হাতে বর্শা পাথর জাতীয় ধারালো অস্ত্র থাকলে ভাল হতো বোধহয়। কোথায় যেন প্রচণ্ড উত্তাপ—দলা পাকানো প্রচণ্ড একরাশ বেদনা সেই উত্তাপে গরম সিসের মত গলতে শুরু করেছে— ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে নীরেনের কানে মুখে, গলায়!

'নীরেন, নীরেন!' সরোজের কপালে এই শীতের সকালেও শ্রান্তির বিন্দু চকচক করছিল, অনর্থক ঝুঁকে পড়ে ও নীরেনের নাম ধরে ডাকছিল।

'যাবো, নিশ্চয়ই যাবো'—ফিসফিস করে বলছিল নীরেন, কাকে যে বলছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। বোঝবার জন্য অবশ্য অপেক্ষাও করেনি সরোজ।

পাল্কী আঁকা ছিমছাম একখানা কার্ড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নীরেনের মনে হয়েছে, আরতি বেশ কয়েকবার সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে। লোকটা কে, কোথায় বিয়ে, আজকে ও অফিস যাবে কিনা—এই ধরনের বেশ কিছু তীক্ষ্ণ প্রশ্ন যেন আবর্তি করেছিল। উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, নীরেন বুঝতে পারল।

টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে মুখের ভেতর সেটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ নাচানাচি করল। চোখে মুখে জল ছিটিয়ে রান্নাঘরের পিঁড়িতে এসে বসল—'ভাত হয়েছে?'

'সেকি, চান করবে না?'

'চান—নাঃ দেরি হয়ে গেছে'—

'দেরি না ছাই'—প্রতিবাদের সুরে আরতি ডালে কাঁটা চালিয়েছে, 'কুঁড়ের বাদশা সব, গায়ে জল ঠেকাবার নামেই'—

'অঃ', নীরেন অকারণে রুক্ষ হয়ে উঠেছে, 'বাজে বক বক, করোনা—খেতে দাও।'

বাস স্ট্যান্ডে এসে মনটা দ্বিতীয়বারের জন্য বিস্বাদ হয়ে উঠেছে নীরেনের। ব্যাগটা বগলে চেপে দোকানের সামনে এগিয়ে এসেছে। 'সিগারেট দেখি একটা'—নীরেন পকেট হাতড়েছে, 'না, চার্মিনার না, প্লেন উইলস—থাক, গোল্ড ফ্লেকই দেখি একটা। কত দাম?' সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে প্রায় যন্ত্রচালিতের মত অবিশ্বাস্য বলিষ্ঠভাবে ডেকেছে নীরেন—'ট্যাক্সী, এই ট্যাক্সী'—

ক্যাচ করে শব্দ করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছে, 'নিউ সেক্রেটারিয়েট।'

ট্যাক্সীর মধ্যে নিজের ছাড়া দামী সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে কেমন মজা লাগছিল নীরেনের। ছোট্ট এক টুকরো ধোঁয়া কি প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে যায় চারদিকে—সমস্তটাকে যেন একসঙ্গে দেখাও যায় না খানিক পরে। গাড়ীর ভেতর কি আশ্চর্যভাবে মেঘের মত ভাসতে থাকে।

ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে নীরেনের অনেক কথা মনে পড়ছিল। ঠিক মনে পড়া নয়, বা ঠিক নিটোল কোন কথাও নয়—টুকরো টুকরো অনেক পরিচিত ছবির ভগ্নাংশ একসঙ্গে জড়িয়ে কি ভয়ঙ্কর শীতল অনুভূতিতে বিদ্ধ করছিল ওকে। সিগারেটের তেতো ধোঁয়া গিলতে গিলতে নীরেন জোর করে বাইরে তাকাল। সিনেমার বিজ্ঞাপন টিউটোরিয়াল ক্লাশ, মহেন্দ্র দত্তর ছাতা—

এই মুহূর্তে নীরেনের ভীষণভাবে অ্যালকহল খেতে ইচ্ছে হল। অথচ খায়নি কোনদিন, মানে যাকে বলে খাওয়া। দল বেঁধে শুধু একদিন খেতে গিয়েছিল, সেই উত্তেজনাটা এখনো ফ্রেমে বাঁধানো আছে। বারের মন্দির পরিবেশ, চোখে মুখের চাপা উত্তেজনা, নিঃশব্দচারী বয়গুলোর ভাবলেশহীন মুখ। আসলে, মদ নয়—সেই উত্তেজনাটুকুই যেন এখন পান করতে ইচ্ছে হল নীরেনের।

'সার!'

গাড়ীর গতিরোধে নয়, পাঞ্জাবী ড্রাইভারের কঠিন গলায় নীরেন নিজের ইচ্ছে থেকে গাড়ীতে ফিরে এল। জীবনে এই প্রথম ট্যাক্সী থামার পর মিটারের দিকে না তাকিয়ে গন্তব্যস্থলের দিকে তাকাল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা আভ্যন্তরীণ প্ররোচনায় ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল—'এখানে নয়—সিনেমা হল চলো, লাইটহাউস'

ট্যাক্সী নতুন করে স্টার্ট দেওয়ার মধ্যেই নীরেন ঠিক করে নিয়েছিল, ও সিনেমা দেখবে। কি হচ্ছে, জানবার দরকার নেই—খানিকটা সময় নিয়ে অন্তত বিলাস করা যাবে! খানিকটা অহেতুক খরচ এবং উত্তেজনা!

হাতের কাছে আর কোন সিগারেট খুঁজে না পেয়ে নিজের ওপর অসম্ভব রাগ ধরছিল নীরেনের। গাড়ী থামিয়ে সিগারেট কেনা যায়, কিন্তু সেকথা চিন্তা করতে গিয়েই আর একটা পরিকল্পনা মাথায় খেলে গেল নীরেনের! হঠাৎ ট্যাক্সীর দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লে কেমন হয়! খুব নতুন হবে জিনিসটা—ট্যাক্সী থেকে লাফিয়ে এইভাবে আত্মহত্যা! মানে, একেবারে মৃত্যু যদি নাও হয় কাগজে বেশ ফলাও করে ছাপা যাবে। নামটা পড়ে অনেকে—মানে পুলকেশ কি চিত্রা—

আর, চিত্রার নামটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল নীরেনের। চিত্রা কেন, আরতির কথাও তো মনে হতে পারতো এখন! নীরেনের কিছু হলে—

গাড়ীর গতিরোধ হলো। অনভ্যস্ত হাতে ল্যাচকি ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল নীরেন।

নিতান্ত অসময়, এখন ভিড় হবার কথা নয়। কাউন্টারের সামনে যাবার আগে নীরেন সামনের স্টীল ছবিগুলোর দিকে তাকাল।

লাস্যময়ী নায়িকার অর্ধনগ্ন ছবিতে ভর্তি। কোথাকার কোন দেশের রাত্রের জগতের ছবি। এর বিষয়বস্তু, চলচ্চিত্র মূল্য ইত্যাদির ধারণা একমুহূর্তেই করে নেওয়া সম্ভব।

কাউন্টারে পৌঁছেও হাত সরিয়ে নিল নীরেন। নিজেকে ভীষণভাবে অপরাধী মনে হল। ঠিক যেন কলেজে পড়া ছাত্রের মত লুকিয়ে একটা অপরাধ করতে এসেছে। অথচ ঠিক বুঝতে পারল না নীরেন—এইভাবে এতক্ষণ নিজেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে কার কাছ থেকে!

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল, শরীরে কেমন জোর পাচ্ছিল না—অথচ অনিবার্যভাবে যেদিকে যাওয়ার কথা, পায়ে পায়ে ওয়েলিংটন স্কোয়্যারে এসে পড়ল নীরেন। লাল রঙের দোতলা বাড়ীর সামনে এসে কড়া নাড়ল।

'কে?' দরজার ওপাশে দীপুর মুখ দেখতে পেল নীরেন, 'ও নীরেনদা'—

'পুলকেশ বাড়ী নেই?'

'দাদা তো বেরিয়ে গেছে—মানে, অফিস যাননি আজকে?'

'হ্যাঁ, না মানে যাবো আর কি'—

'দাদাকে বলবো কিছু?'

'না না, কিচ্ছু বলতে হবে না'—নীরেন প্রকৃতিস্থ হবার চেষ্টা করছিল,

'আমি সন্ধ্যেবেলা আবার আসব।'

মাথাটা অসম্ভব ভারী মনে হচ্ছিল, নীরেনের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না দীপুর কথা-গুলো। সরোজ ওর বিয়ের কথা পুলকেশকে বলেছে এবং সব শুনেও পুলকেশ অফিসে গিয়েছে—সি টি সির অফিস পেরিয়ে মনুমেন্টের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন একটু হালকা লাগল নীরেনের। গড়ের মাঠের সবুজ ঘাসে, প্রশস্ত ছায়ায় নিজেকে মেলে দিয়ে যেন কিছু স্বস্তি পেল ও। ব্যাগটা মাথার তলায় দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে নিজেকে কেমন যেন একটা বিদেশী পর্যটক মনে হচ্ছিল। এই পরিবেশ, এই কোলাহল—সব যেন অপরিচিত, সব কিছু থেকে নীরেন যেন কিরকম বিচ্ছিন্ন। এতক্ষণে নীরেন নিজেকে হালকা ভাবতে পারছিল। ওর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল। পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজল এখন।

'নীরেন, নীরেন, এই'—

ধড়মড় করে উঠে বসে, এই পরিবেশ এবং সামনে পুলকেশ, নীরেন হতভম্ব হয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ পড়তে আরো অবাক লাগছিল।

সমস্ত ব্যাপারটাকেই এখন একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। কলকাতায় এই গড়ের মাঠে অত্যাশ্চর্যভাবে ঘুমিয়ে পড়া—এবং এতক্ষণ; সামনে পুলকেশের বিধ্বস্ত চেহারা—

'কি ব্যাপার'—পুলকেশ ওর পাশে বসে পড়েছিল, 'এইরকম করে—মানে, ঘড়িটড়ি-গুলো চুরিও তো হয়ে যেতে পারতো!'

নীরেন কথা বললো না, ও বুঝতে পারছিল না এখন কি কথা ও বলতে পারে, আস্তে আস্তে বললে—'চা খাবি?'

'চল!'

মিনিট কুড়ি পঁচিশ তেমনি নিঃশব্দ সঙ্গ। চায়ের দাম মিটিয়ে নীরেন বললে, 'তোর তাড়া আছে?'

'না, তাড়া কি'—

'চল, একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবো।'

শীতের বিকেল। নরম সবুজ ঘাস। সামনে গঙ্গার জল চকচক করছে। ধারে ধারে দুটো একটা গাছও পাওয়া যাবে খুঁজলে পরে। দেখতে ভাল লাগে—যদিও ওগুলোর নাম জানে না নীরেন। হাওয়া নেই, নীরেনের ভাল লাগছিল।

'তুই তো আজ অফিস গিয়েছিলি, তাহলে'—

'ভাল লাগলো না'—পুলকেশের স্বরে আত্মসমাহিতের ভাব পাওয়া যাচ্ছিল, 'ভাল লাগছিল না, টিফিনের পর বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম একটা সিনেমা কি থিয়েটারে'—

নীরেন হাত দিয়ে টেনে টেনে লম্বা শিষওয়ালা ঘাস ছিঁড়ছিল, ডগাগুলো কত নরম কচি খুঁটে খুঁটে দেখছিল।

'তাও হলো না। পার্কে বসেছিলাম খানিক, তাও ভাল লাগলো না'—

নীরেন জলের দিকে তাকিয়েছিল, জলে নিজের মুখ দেখা যায়।

'ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—এমনি আর কি তারপর তোকে দেখতে পেয়ে'—

নীরেন অনেকক্ষণ কথা বলছিল না, হঠাৎ ফিসফিস করে বলল—'সরোজ এসেছিল।'

'হ্যাঁ, বিয়ে ওর।'

'চিত্রার সঙ্গে।'

গঙ্গার ওপর সূর্যটা অনেকখানি এগিয়ে গেছে—কিন্তু এখনো উজ্জ্বল, এখনো সতেজ। গঙ্গার জল আয়নার মত চকচক করছে। খানিক পরে আলোগুলো সব মরে যাবার আগে শেষবারের মত সূর্যটা রক্তিম হয়ে উঠবে।

'দাঁড়া, বাদাম কিনি', পুলকেশ পকেট হাতড়ালো—'পঞ্চাশ দাও।'

পকেট থেকে রুমাল বার করে বিছিয়ে দিল নীরেন, তার ওপর বাদামগুলো। পুরনো অভ্যেস।

'তোকে অনেক বেশি ভালবাসতো ও'—পুলকেশ নির্বোধের মত বাদাম চিবোতে লাগল।

গঙ্গার জল চোখের ওপর আলো ফেলেছে—চোখ আড়াল করে নীরেন ফিস-ফিস করল, 'তোকেও। তুইতো একবার প্রোপোজও করেছিলি।'

দুটো কথা পরস্পরকে শোনাবার জন্যই যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল ওরা। কি আশ্চর্যভাবে কথা ফুরিয়ে গেছে এখন।

সূর্যের সাদা আলোটা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এক্ষুনি একবার জ্বলে উঠবে। তারপরই অন্ধকার।

'সরোজের চেহারাটা বেশ ভাল হয়েছে'—বাদামের খোলাটা কিছুতেই ভাঙতে পারছিল না, নীরেন।

'ধ্যেৎ। ভাল কি'—

একটু একটু হাওয়া দিচ্ছিল, নীরেনের সোয়েটারের সবকটা বোতাম খোলা—কিন্তু ওর ঠাণ্ডা লাগছিল না। দু একজন করে লোক বেড়াতে আসছিল। কয়েকটা মেয়ে, কয়েকটা পুরুষ।

'চিত্রা এখন'—

'পাশ করে গেছে—খবর পাসনি?'

'ইস, এম, এস, সি?'

নীরেন বুঝতে পারছিল, কথাগুলো বোকার মত শোনাচ্ছে। সূর্যটা ডুবে গেছে অর্ধেক। ওপরের মেঘগুলো আবির খেলছে।

কেউ কোন কথা বলতে পারছিল না। ঘন অস্বস্তিতে নীরেন অনুভব করতে পারলো, সূর্যটা ডুবে গেছে। বাতাস আরো ঠাণ্ডা, আগের চেয়ে।

পুলকেশ বাদামের খোলাগুলো নাড়াচাড়া করছিল।

গঙ্গার জলে একটা কালো ছায়া থিরথির করে এগিয়ে আসছিল।

'যাবি?' মুখ দেখা যায় না—মানুষের রেখা, তবু নীরেন ঝুঁকে পড়ল পুলকেশের মুখের দিকে।

'বিয়েতে?' গঙ্গার জলে অজস্র কালো ছায়া। পুলকেশের মুখ অন্ধকার।

'হ্যাঁ?'

'না গেলে—মানে,' পুলকেশ নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছিল—

'যাওয়া উচিত, তাছাড়া চিত্রা'—

'থাম থাম'—বেদনার বৃত্ত থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল নীরেন, 'আমরা যাবো না কক্ষনো না'—

'নীরেন!'

নীরেনের মাথার মধ্যে সেই ঝমঝম শব্দ, বলছিল—'তুই ভুল করছিস পুলকেশ, আমরা মানুষ! তুই নিজেকে ঠকাচ্ছিস, আমায় ঠকাচ্ছিস, চিত্রাকে ঠকাচ্ছিস—আসলে তুই, আমি সব যে কেনা হয়ে গিয়েছি, বুঝলি—এই, সভ্যতার, এই দাসত্বের, এই—

নীরেন হাঁফাচ্ছিল, মাথা নীচু করে নিঃশ্বাস ফেলছিল। পুলকেশের মুখে কথা নেই। গঙ্গায় এখন কি ভীষণ অন্ধকার।

দুজনে আশ্চর্য মুখোমুখি। রুমালটা তেমনি করে পাতা—যেন কেউ উঠে গিয়েছে ওদের মধ্যে থেকে, এখুনি ফিরে আসবে। নীরেনের মনে হচ্ছিল, ও যেন রুমালের ওপর একটা সুস্পষ্ট শরীর অনুভব করতে পারছে। অথচ তৃতীয় শরীরটা কার ও বুঝতে পারছিল না।

নীরেন ভাবছিল, অকস্মাৎ কোন গাড়ীর হেডলাইট তীব্রবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর চোখে। চকিতে রুমালটাকে এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর একটও কথা না বলে ধীর লঘু পায়ে এগিয়ে গেল সামনে।

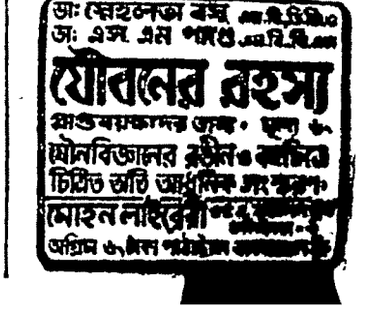

'সারণী' এবং কিছু ভাবনা

আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের দেশ গরীব হলেও মেধা বা প্রতিভার ক্ষেত্রে আমরা দরিদ্র নই। অবস্থাপন্ন বা মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছেলে-মেয়েদের জীবনে চলার পথে খুব একটা আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে অসচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে, জীবনে চলার পথে তাঁদের বারবার হোঁচট খেতে হয় কেবলমাত্র আর্থিক সমস্যার জন্য। তাই এই সমস্যাকে দূর করার জন্য বহু সংস্থা আছে যারা শুধুমাত্র গরীব ছাত্রদের অর্থ দিয়ে, পুস্তক দিয়ে ও আরো নানারকমভাবে সাহায্য করে। মোটামুটি এই সংস্থাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব থাকে বর্ষীয়ান বা বর্ষীয়সী পুরুষ বা মহিলাদের ওপরে। এবারে সদ্য কলেজ আর ইউনিভার্সিটি শেষ করা একদল অল্পবয়স্ক মেয়েরা একটি সংগঠনের মাধ্যমে সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সমাজের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের নানারকম সাহায্য করা, অশিক্ষার অন্ধকার থেকে কিছু কিছু বালক-বালিকাকে মুক্ত দেওয়া—এই উদ্দেশ্যে তারা ফ্রি-এডুকেশনের ব্যবস্থাও করবেন।

উত্তর কলিকাতার এই মহিলা সংগঠন 'সারণী'র ক্ষমতা স্বল্প হলেও আদর্শ নিঃসন্দেহে শুভ। সদ্য গড়ে ওঠা 'সারণী'র আকার এখন শীর্ণ হলেও তার গতি প্রবল, ভবিষ্যৎ বিরাটত্বের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার। নিজেদের শুভপ্রচেষ্টায় যমুনা-পদ্মার মতো গভীর ও বিশাল আকৃতি নিয়ে দেশের পর দেশ প্লাবিত করে শস্য-শ্যামলায় পরিপূর্ণ করে দেবে এই আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে এই সংগঠনের মহিলারা ভবিষ্যতের পথে অগ্রসর হয়েছেন। দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বলিষ্ঠ হবার বাসনায় এই মহিলা সংস্থা গত ১৩ই আগস্ট অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি লেডী রূপু মুখার্জি অল্পবয়স্কা একদল মেয়ের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান। ভবিষ্যতে এদের কর্মপথ সুন্দর ও সহজ হোক এই শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখেন।

অল্পবয়সী একদল মেয়েরা এক কঠিন কাজে সৎসাহসী হয়েছেন নিঃসন্দেহে, তবু, বোধহয় তাঁদের কর্মপন্থার গতি সম্বন্ধে বিশেষ সুস্পষ্ট কোন ধারণা নেই। উদ্দেশ্য মহৎ হলেও দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের কিভাবে সাহায্য করা হবে সে-বিষয়ে তাঁরা কোন বক্তব্য রাখতেই সক্ষম হননি। এই বণ্টন-ব্যবস্থা সুষ্ঠু না হয়ে যদি তা শুধু চেনাজানা মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এ-প্রচেষ্টার কোন সার্থকতা নেই। আশা করি 'সারণী'র সভ্যারা যথাযথ স্থানে প্রকৃত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করে জনসাধারণ থেকে সংগৃহীত অর্থের ও তাঁদের শুভ প্রয়াসের এক সার্থক রূপ দিতে সক্ষম হবেন।

* * *

শৈশব থেকেই যদি বাবা-মায়েরা শিশুদের ঠিকপথে পরিচালনা না করতে পারেন, তবে তারা বড় হয়ে কখনোই আদর্শ নাগরিক হতে পারবে না। উপরন্তু সমাজে তারা দুষ্ট গ্রহের মতো অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

শিশু মাত্রই দুষ্টু। তারা খৈ-ফোটার মত বুলি আওড়াতে যতটা ভালবাসে, ততটা ভালবাসে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে, এটা-ওটা ধরতে-ভাঙতে। শিশুরা নিজের বাড়ীতে যত দুরন্তপনাই করুক, তা সহ্য করার দায়িত্ব শুধু বাড়ীর লোকেদের, আবার দরকার পড়লেই তাকে ঠাণ্ডা করতে বাড়ীর লোকেরা দু-চার ঘা পিঠে বসিয়ে দেবেন। তাতে কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান হয় না। ছোটবেলা থেকেই তাকে শেখাতে হবে কোন্‌টা দিয়ে খেলতে হয় আর কোন্‌টা ঘর সাজাবার জন্য তুলে রাখতে হয়। এর ফলে অন্যের বাড়ীতে গেলেও সে এটা-ওটার জন্য বায়না করবে না, উপরন্তু শো-কেসে সাজানো জিনিস দেখে তৃপ্তি পাবে, জেনে যাবে কি করে নিজের বাড়ীতে খেলনা দিয়ে ঘর সাজাতে হয়।

অনেক বাচ্চাদেরই একটা বদ অভ্যেস আছে অপরের বাড়ীতে গেলেও খাটে বা সোফায় উঠে তাণ্ডব শুরু করে দেওয়া। তাণ্ডব করতে শিশুরা ভালবাসে নিঃসন্দেহে কিন্তু এই নিঃসন্দেহে ভালবাসাটাকে সবাই সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। অনেকে মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও হাবেভাবে বিরক্তি প্রকাশ করেন। আবার অনেকেই দামাল বাচ্চাদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে পুলকিত হন। এটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের রুচির ওপর। তবুও বাচ্চাদের বোঝাতে হবে সোফায় পা তুলে বসার নিয়ম নেই, অন্যের বাড়ীতে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করলেও তা যেন বিরক্তিকর দুষ্টুমিতে না পৌঁছোয়। এতে বড়দের অপ্রস্তুতে পড়তে হয়। অনেক সময় মায়েদের মুখে শোনা যায়, 'দুষ্টু ছেলেপিলেদের নিয়ে যাবো কোথায়? লজ্জায় মাথাকাটা যায়।' এই লজ্জায় মাথা-কাটার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে বাচ্চাদের জন্ম হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল আচরণ কি করে করা যায় সে সম্বন্ধে শেখাতে হবে। শুধু শেখালেই চলবে না, নিজেদেরও সেটা মেনে চলতে হবে প্রতি পদে পদে।

অত্যন্ত দুষ্টু, বক্‌বক করা ছেলেরাও অনেক সময় বোবা হয়ে যায় কারো প্রশ্নের উত্তরে। নাম-ধাম-ক্লাস জিজ্ঞেস করলে বা হাতটা কেউ ধরলে নিঃশব্দে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে। এটা বাবা-মায়ের পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক। হয়তো তাঁদের ছেলে বা মেয়ে লেখাপড়ায় ভাল অথচ ভীরু স্বভাবের অথবা একগুঁয়ে লোকের কথার জবাব দিতে পছন্দ করে না। ভদ্র আচরণের সঙ্গে স্মার্ট উত্তর দিতেও বাচ্চাদের সাহস জোগাতে হয়।

কোন কোন বাবা-মা দুর্বলকে লাঞ্ছিত করা, কথায় কথায় মিথ্যা বলা বা অপরের ওপরে দোষারোপ করা এ বিষয়ে বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে অত্যন্ত উদাসীন থাকেন। আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, শিশুর

সুকোমল অনুভূতিটা কিভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বড়দের শিক্ষার ভুলে।

শিশুর হাতে খেলনা দিয়ে বাবা-মায়েরা অনেক সময়েই বলে থাকেন, 'দেখ এটা ভাঙলে তুমি কিন্তু আর একটাও পাবে না। সাবধানে খেলবে। নিজে ছাড়া আর কারুর হাতে এ খেলনা দেবে না।' "এই দেবে না" কথার মধ্যেই আমরা স্বার্থপরতার বীজ বুনে দিই। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাটা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করবে। স্বভাবতই অন্য কোন শিশু এলেই বা সেই খেলনাটা দাবী করলে নিজের অধিকার ও বাবা-মায়ের নিষেধাজ্ঞা রক্ষা করার জন্য সে বলপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। মিলেমিশে থাকার অভ্যেসটাই তার সুকোমল অনুভূতি থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। বড় হয়ে এই শিশুই বিন্দুমাত্র ত্যাগ-স্বীকার করে মিলেমিশে বসবাস করতে নানা অসুবিধায় পড়বে। নিজের খেলনা বা বই নিজে ছিঁড়ে অন্যের নামে দোষ দিতে অনেক শিশুই তৎপর। বাবা-মায়েরাও সে বিষয়ে কোন সঠিক অনুসন্ধান ছাড়াই নিজের সন্তানের পক্ষ সমর্থন করে পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়া-তর্কে অবতীর্ণ হতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। সন্তানের মিথ্যাকে আশ্রয় করে যাঁরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে চলতে পারেন না তাঁদের সন্তানেরা বড় হয়ে বাবা-মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বহুতর জগতে চলতে চেষ্টা করবে। পরিণামে যা হবার, তাই হবে। নিজের জীবনের অশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি আরও সকলের জীবনে ডেকে আনবে অশান্তি। আর এই অশান্তির গোড়া পত্তন হয়েছিল তাঁদের শৈশবে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

স্মরণীয়া অপর্ণা দেবী

শ্রীমতী অপর্ণা দেবী ছিলেন একটি যুগ, একটি শতাব্দীর প্রতীক। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক ঘটনা এবং দেশবন্ধু-জীবনের ঘটনাবলীর তিনি যেন ছিলেন এক মূল্যবান স্মারক। স্বাধীনতা সংগ্রামের দীপ্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমান কালের সংযোগ রক্ষাকারী অপর্ণা দেবীর প্রয়াণ আমাদের জাতীয় ক্ষতি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ-শংকর রায়ের মাতা অপর্ণা দেবীর জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ ৬ নভেম্বর। প্রখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী সুধীরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯১৫ খৃঃ ১১ আগষ্ট। ১৯১৯ খৃঃ থেকে অপর্ণা দেবী নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাঁর সহৃদয় আচরণ আন্তরিক প্রীতি ও মমতার স্পর্শ পেয়েছিলেন সেকালে বহু কংগ্রেসকর্মী। তাছাড়া দেশ-প্রেমিক বিপ্লবীদেরও তিনি ছিলেন নির্ভর-যোগ্য আশ্রয়স্থল।

অপর্ণা দেবী ছিলেন বাঙলা কীর্তন গানের অন্যতম প্রচারিকা এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক। তিনি ব্রজমাধুরী সংঘ স্থাপন করে কীর্তন গান প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি এবং তাঁর স্বামী কীর্তন ও বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

এই মহীয়সী নারীর লোকান্তর আমাদের পক্ষে অসীম বেদনাদায়ক।

টুকিটাকী

ভাপে আমসত্ত্ব

মোটামুটি প্রায় সব আম দিয়ে আমসত্ত্ব হয়। আমের গোলা চিনির সঙ্গে মিশিয়ে তা প্রখর রৌদ্রে ছাঁচে বা থালাতে শুকিয়ে আমসত্ত্ব তৈরী হয়। কখন কখন এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে আম গোলার পর সহসা ঝলমলে আকাশ মেঘে ঢাকা পড়লো। সেক্ষেত্রে মা-বোনেদের মন খারাপের কোন কারণ নেই। আম গোলাকে অন্য কাজে ব্যবহার না করে রোদের পরিবর্তে ভাপে আমসত্ত্ব তৈরী করা যায়।

উপকরণ—আমের গোলা—১ কিলো
ক্ষীর— ২৫০ গ্রাম
চিনি— ২৫০ গ্রাম

ভাল করে আমের গোলা আর ক্ষীর ছেঁকে নিতে হবে। তাতে চিনি মিশিয়ে একটি পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। গনগনে আঁচে এক হাঁড়ি জল ভাল করে ফুটিয়ে হাঁড়ির মুখের মাপে থালা বসিয়ে তাতে গোলা ঢেলে দিতে হবে। আস্তে আস্তে ভাপে আমের গোলা ক্রমশ জমাট বাঁধবে অনেকটা পুডিং এর মত। তারপর আর এক প্রস্থ গোলা দিতে হবে। এভাবে ক্রমশ চার-পাঁচবার গোলার পর গোলা ঢেলে যখন সেটা বেশ ভাল করে জমাট বাঁধবে তখন তা নামিয়ে পছন্দমতো আকারে কেটে একটা কাপড় পেতে রৌদ্রে শুকোতে দিতে হবে। দু'তিনদিনেই তা মচমচে হয়ে উঠবে। ক্ষীরের আমসত্ত্ব এমনি খেতে যত স্বাদ তেমনি দুধে ফেলে ভাত দিয়ে খেতেও যথেষ্ট সুস্বাদু। বছর দু'তিন এই ক্ষীরের আমসত্ত্ব থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমসত্ত্ব যত উপাদেয় খাদ্য হোক না কেন গ্রামের মহিলারা এ জিনিস তৈরীতে সম্ভবত বেশী পারদর্শিনী। শহরের বুকে পয়সা ফেললেই আমসত্ত্ব কেনা যায় তার ফলে মেহনত করে এ জিনিস প্রস্তুত করার লোক দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে আমসত্ত্বের সেই পুরানো দিনের স্বাদ।

মাংসের দমপক্ত

উপকরণ—আধ কিলো মাংস দেড়শো টস দই, পঁচিশ গ্রাম আদা বাটা, বড় পেঁয়াজ দুটো, ঘি পঞ্চাশ গ্রাম, তেজপাতা তিনটি, নুন চিনি গরম মসলা কিশমিশ পরিমাণ মত।

টুকরো মাংস ধুয়ে সেই সঙ্গে আলু ডুমো করে কেটে রাখতে হবে। দই, পেঁয়াজ-বাটা ও আদা-বাটা দিয়ে মাংস ভাল করে মেখে রাখতে হবে। ডেকচিতে আলু ভেজে তুলে রাখতে হবে। সেই তেলে তেজ-পাতা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে মাখা-মাখা মাংস ডেকচিতে ঢেলে দিতে হবে। মাঝে মাঝে মাংস নাড়তে হবে। নাড়তে নাড়তে এভাবে জল শুকিয়ে গেলে নুন চিনি দিয়ে মাংস ভেজে আন্দাজমত জল ঢেলে দিতে হবে। মাংস বেশ ভাল সিদ্ধ হলে আলু ও কিশমিশ দিতে হবে। আলু ভাল সিদ্ধ হলে সামান্য ঝোল থাকতে ডেকচি নামাতে হবে। পরিবেশনের সময় মাংসের দমপক্ত সামান্য গরম করে নিতে হবে।

প্রকাশিত হলো

সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মুরশিদাবাদ থেকে বল্‌ছি

মুরশিদাবাদের প্রাচীন ও নবাবী আমলের ইতিহাসের কাহিনী, এবং তার সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ। মুরশিদাবাদ সম্পর্কে অনেক নতুন কথা, ছবি ও ম্যাপসহ।

প্রাচীন জরীপের ইতিকথা

অরুণ মজুমদার

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভূমি জরীপ সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়।

স্টুডেন্টস লাইব্রেরী ১৫এ টেমার লেন কলিকাতা—৯

ফুলের বাহার

সাজতে আর সাজাতে আমরা কে না ভালবাসি বলুন? কিন্তু কোথায় সেই অফুরন্ত অবসর যে, খানিকটা সময় ঢেলে দেওয়া যাবে সাজতে আর সাজাতে? স্বামীর সঙ্গিনী হতে হবে, সন্তানের পরিচর্যার ভার তাও মায়ের হাতে, রান্নাঘরের চাবিকাঠিটি যখন আপনার আঁচলেই বাঁধা তখন সেখানের সবকিছু দায়িত্বই আপনার। হ্যাঁ, এর সঙ্গে অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়নের ভারও কিন্তু আপনার। এর উপর আপনি যদি অর্থোপার্জনের ব্যাপারেও স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিনী হয়ে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই। দিনের আটটি ঘণ্টা তো কেটেই যাবে ঘরের বাইরে। দিনে চব্বিশ ঘন্টা আছে মানি কিন্তু আপনার হাতে অবসরের জন্য কতটা সময় থাকছে হিসাব করুন তো একবার। খুব বেশী নয় নিশ্চয়ই। তবু আপনাকে গৃহসজ্জার দিকে একটু নজর দিতে হবে, আপনার বাড়ীতে যখন অতিথিদের আসাযাওয়ার রেওয়াজ আছে। আর যদি অতিথিরা নাই বা আসেন তাহলেও কি আপনার বা আপনার স্বামীর ভাল লাগবে একটা অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ? পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মনটাকে সুখী রাখার সহায়তা করে, এটা নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করেছেন। তাই, ভেবে রেখেছেন সপ্তাহে অন্ততঃ কিছুটা সময় এই গৃহসজ্জার ব্যাপারে খরচ করতেই হবে—তাতেই গৃহ সুন্দর হবে, পরিবেশ মধুর হবে—আর আপনিও দেখবেন—খরচ আর পরিশ্রমের বিনিময়ে আপনি ও আপনার বাড়ীর সকলে যে আনন্দ পাচ্ছেন সেটা নেহাৎ অবহেলার নয়। তাই ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত আপনিও আগের চেয়ে একটু বেশীই যেন আগ্রহী হয়ে উঠবেন—সব ঘরগুলি না হলেও অন্ততঃ বসার ঘরখানাকে একটু সাজিয়ে রাখতে। একটুখানি সাজানো, গোছানোর দিকে মন না দিলেও, আপনার শিল্পীমনটাও যে মরে যাবে ঠিক নয় কি? বাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা বাইশটা বছর এক চাকাতেই বাঁধা এ জীবন নিশ্চয়ই এ যুগের মেয়েরা পছন্দ করবে না। কারণ প্রাক-বিবাহ অধ্যায় তারা নানাভাবে, নানা জিনিস শিখতেই সময়টা কাটায়। তারপরে সেই অতিকষ্টে আয়ত্ত করা জিনিসগুলোকে কে ভুলতে চায় বলুন শুধুমাত্র সংসারের চাকায় জীবনটাকে বেঁধে দিয়ে? তাই আধুনিক কালে আগের মত, বিবাহিত জীবন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় না বা চাবি পড়ে যায় না অন্যান্য জনতের দরজাগুলিতে।

এ যুগে বিবাহোত্তর জীবনে নারীরা [illegible] অসমর্থ নয়। সংসারের কাজ চটপট সেরে নিয়ে উদ্বৃত্ত সময়টি ঢেলে দেয় বাহিরের কাজে। সমালোচকের দল বলেন—একসঙ্গে দু' নৌকায় পা রাখা যায় না। নারীরা হাসতে হাসতে বলে—যে পারে সে আপনি পারে পারে সে ফুল ফোটাতে।'

ফুলের কথায় যখন এসে পড়লাম তখন ফুল সম্বন্ধে দু একটা কথা বলি কেমন? অঙ্গসজ্জা বা গৃহসজ্জার ব্যাপারে ফুলের হালকা পরশ কেমন যেন আবেশ ছড়ায় একথা টা নিশ্চয়ই অনুরাগিনীদের কাছে নতুন নয়। ছোট্ট ফ্ল্যাটের সীমিত পরিবেশে থাকার ফ্যাসান এ যুগে। বড়ীর সামনে ছোট্ট একটুখানি বাগানের কথা দূরে থাকুক ছাদের উপরে দুটো চারটে ফুল গাছের টব বসানোর কথাও এখন কল্পনাতীত। ঘরের সামনে সবুজের মেলা আর রাশি রাশি টগর, দোপাটী আর গাঁদার মত সহজলভ্য ফুলের কথাও ভাবা যায় না। তাই ছোট্ট ঘরের ছোট্ট টেবিলে যদি কিছু ফুল রাখা যায় তাহলে মন্দ হয় না, একথা টা বোধহয় সুগৃহিণী মাত্রই সবাই ভাবেন। হ্যাঁ, সত্যি দামটা ফুলের কিছু বেশী, গৃহিণীদের মাপা বাজেটে আবার একটা খরচের অইটেম যোগ হবে, ভাবতেই মনে হচ্ছে না, না এই ইচ্ছাটা সরিয়ে রাখাই ভালো। কিন্তু রীপাদের বাড়ীর ড্রইংরুমের কয়েকটি ফুল যে শোভা বাড়িয়েছে সে কথাটা ভাবলে পিছিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। গৃহিণীরা ভাবতে বসবেন, আচ্ছা সংসারের আর কোন অইটেম থেকে কিছু বাঁচিয়ে ফুলের একটুখানি ব্যবস্থা করলে বেশ হয়। শেষ পর্যন্ত আপনার ইচ্ছাটাই জয়ী হবে মনে হচ্ছে। না, না ঐ প্লাস্টিকের ফুল কিনে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যাবেন না—ওদের মাঝে কোন সজীবতা নেই। তার চেয়ে ফুলদানীতে রাখুন কিছু বুনো ফুল আর বুনো পাতা—না হয়, মানি প্লান্টের ছোট চারা—। এই মানি প্লান্ট একবার খরচ করে কিনলেই হবে পাশ থেকে আবার চারা বেড়োবে। তবে, আপনার বিবাহ বার্ষিকীতে বা বাচ্চাদের জন্মদিনে একটু ফুলের আয়োজন রাখতে পারলে ভালোই হয়। যদি ফুলের তোড়া বা নানারকম ফুল দিয়ে ফুলদানী সাজানো হয় তাহলে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুলগুলিকে ফেলে দিয়ে ভালো ফুল দিয়ে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখবেন। ফুল সাজাবার সময় পাতা বা কুঁড়িগুলোকে যেন ফেলে দেবেন না। ফুলদানী সাজাবার সময় মনে রাখতে হবে, বড় ফুলগুলি থাকবে নীচে অর্ধ কুঁড়ি ও বড় থেকে ছোট হয়ে যাওয়া পাতাগুলি থাকবে সবার উপরে ফুলগুলি উঁচু আর নীচু করে ফুলদানীতে সাজাতে হবে, একই উচ্চতায় যেন দুটি ফুল না থাকে। বা একটি ফুলের আড়ালে আর একটি ফুল হারিয়ে না যায়। ফুল সাজাবার সময় টেবিলের সাথে মানিয়ে ফুলদানি বেছে নিতে হবে। ঘরের মাঝে বা সোফাসেটের মাঝে গোল টেবিলে কিছুতেই লম্বা ফুলদানী মানাবে না। এরজন্য চাই নীচু গোল ফুলদানী। রজনীগন্ধার শীষ সে ফুলদানীতে রাখা যাবে না তাই পাতাসমেত কতকগুলো রংবেরংয়ের ফুল নিয়ে সাজিয়ে দিন, সেই ফুলদানীটা। খাবার টেবিলে উঁচু ফুলদানী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে—সেখানে সেই বড ডাইনিং টেবিলে অনায়াসে লাগিয়ে দিতে পারেন লম্বা ডালওয়ালা ফুলগুলি—হ্যাঁ, পাতাগুলোও ফেলে না দিয়ে ফুলদানীতে গুছিয়ে দিন। খাবার টেবিলের পরিবেশটি, সব সময় উজ্জ্বল রাখার দিকেই নজর দিতে হবে।

অনেক প্রদর্শনীতে, অনেক ছবিতে নানা রকমভাবে ফুল সাজানো রয়েছে দেখা যায়। কিন্তু ঠিক সেইভাবেই ফুল সাজাতে চেষ্টা না করাই ভালো। কারণ, সেটার কোনটা ব্যয়সাপেক্ষ, কোনটা বা সময়সাপেক্ষ। ঘরের আকৃতি আর আপনার প্রকৃতি এই দুটোর সমন্বয় করে সাজান আপনার ঘর, সাজান আপনার ফুলদানী। সেটাই বেশী সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আপনার ঘরের। আনন্দ দেবে আপনাকে আর আপনার প্রিয়জনদের।

দক্ষিণ ভারতে মেয়েদের মাথায় ফুল দেওয়া একটি রীতি। সবাই সেখানে প্রসাধন শেষে মাথার খোঁপায় বা বিনুনীতে লাগিয়ে দেয় ফুলের মালা। ফুলবিহীন চুল সেখানে বড একটা দেখা যায় না। আমাদের দেশে খোঁপায় ফুল ব্যবহার করার রীতি ততটা নেই বটে, তবে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কোন উৎসবের অনুষ্ঠানে দু-একটা সুগন্ধি ফুল খোঁপায় রাখলে মন্দ কি? তা সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করবে আর সেন্টেরও পরিপূরক হবে।

বিভিন্ন ঋতুতে নানা রঙের ফুলের সমারোহের অন্ত নেই আমাদের দেশে—কিন্তু তা নিয়ে বেশী বিলাসিতা নেই মানুষের মাঝে। অনেকের মতে এখানে মাঘ দু-বার ফুলের আড়ম্বর দেখা যায়—এক, ফুলশয্যার রাতে আর শবাধারে। আধুনিকারা কিন্তু সামান্য ফুলের পরশকে অবহেলাভরে সরিয়ে রাখতে চায় না। তাই সুরুচিসম্পন্ন গৃহিণীদের টেবিলে তাদের আসর কিছু দেখা যায়। এই নেশাটা যদি সব্বার মাঝে সংক্রমিত হয়, তাহলেই বা ক্ষতি কি? কারণ একমুঠো চাঁদের আলো আর ছোট্ট শিশুর একটুকরো মিষ্টি হাসির মতই কি মানুষের জন্য নক্ষ ফুলের [illegible]

মন্দাক্রা ধর

বিবাহ বিচিত্রা—(১১) উড়িষ্যা

সাধারণত ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষেরই জানাশোনা কেউ বিয়ের সম্বন্ধ আনেন। পাত্রপক্ষের বাড়ীতে মেয়ের কোন আত্মীয় ছেলে দেখতে যান এবং পাত্রীকে দেখতে যান ছেলের মা ও বিবাহিতা ভগিনী। সাধারণত অভিভাবকদের পছন্দ অনুসারেই পাত্র ও পাত্রীর মনোনয়ন হয়ে থাকে। তারপর জ্যোতিষী 'জাতক' বা ঠিকুজি মিলিয়ে দেখেন রাশিচক্র অনুসারে উভয়ের বিবাহিত জীবন সুখের হবে কিনা—তারপর বিয়ের কথা পাকা হয়। বিয়ের কথা পাকা হওয়াকে বলা হয় 'বিবাহ-নির্বন্ধ'। এই বিবাহ-নির্বন্ধ সম্পন্ন হলে মেয়ের বাড়ী থেকে তার মা বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ছেলেকে আশীর্বাদ করতে পাত্রপক্ষের বাড়ীতে যান। শাঁখ বাজিয়ে ভাবী কুটুম্বদের অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রথমে ছেলে ও মেয়ের বাবা উভয়েই জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেন—এ বিয়ের সম্বন্ধ কিছুতেই ভাঙবে না। তারপর কন্যাপক্ষের আত্মীয়স্বজনেরা ঘড়ি আংটি ইত্যাদি দিয়ে ছেলেকে আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদের পর অতিথিদের মহাপ্রসাদ মিষ্টি ও ভোজ খাওয়ানো হয়। ছেলের আশীর্বাদের পর একদিন পাত্রপক্ষও অনুরূপভাবে তাঁদের ভাবী বধূকে অলঙ্কার ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করে আসেন। এই আশীর্বাদের অনুষ্ঠান বা 'বিবাহ-নির্বন্ধ' সাধারণত বিয়ের বেশ কিছুদিন আগেই হয়ে থাকে।

বিয়ের একদিন আগে বর ও কনে উভয়পক্ষের বাড়ীতেই 'মঙ্গল' অনুষ্ঠান হয়। বর ও কন্যাপক্ষের মহিলারা পৃথক পৃথকভাবে দল বেঁধে স্থানীয় কোন মন্দিরে যান। সেখানে তাঁরা বর ও কনের মঙ্গল কামনায় গণেশ ও অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। যদি মেয়েপক্ষ গরীব হয় তাহলে মেয়েকে ছেলে পক্ষের তরফের লোকেরা এসে ছেলের বাড়ীতে নিয়ে যায় সেইখানেই তার বিয়ে হয় অন্যথায় বরই কনের বাড়ীতে আসে। যদি কনেকে বরের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বরপক্ষ থেকে যাঁরা কনেকে নিতে আসেন তাঁদের বলা হয় 'কন্যাধরা'। বিয়ের দিন বা বিয়ের একদিন আগে তাঁরা কনেকে বরের বাড়ীতে নিয়ে যান। যদি প্রচলিত প্রথা মতো কন্যাপক্ষের বাড়ীতেই বিয়ে হয় তাহলে কন্যাপক্ষ থেকে একদল আহ্বায়ক

গিয়ে ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে নিয়ে আসেন—এঁদের বলা হয় 'বরধরা।' 'বরধরার' এই দলে পুরোহিত ও কনের ভাই আসেন। তাঁরা সাধারণত বিয়ের একদিন আগে ছেলেকে নিতে আসেন এবং বিয়ের দিন বরযাত্রী দলের সঙ্গে বাড়ী ফেরেন।

বিয়ে করতে যাওয়ার আগে হলুদ জলে পাত্রের পবিত্র স্নানের অনুষ্ঠান হয়। একজন ক্ষৌরকার তাকে স্নান করিয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'বাড়ুওলানি গাধুইক'—অর্থাৎ এই স্নানের পর ছেলের কুমারজীবন শেষ হল। মেয়ের বাড়ীতেও এই স্নানের অনুষ্ঠান হয়। ক্ষৌরকারিণী তাকে হলুদ জলে স্নান করিয়ে দেয়। এই স্নান তার কুমারীজীবনের সমাপ্তির দ্যোতক। স্নানের পর বর ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী ও পায়ে নাগরা পরে এবং গলায় কর্পূরের মালা পরে সে বিয়ের সাজ করে মন্দিরে পুজো দিতে যায়। বরযাত্রী দলের কোন একজনের হাতে একটি চালভরা পাত্র থাকে। বর সেই পাত্র থেকে মুঠো করে চাল নিয়ে ও নারকোল নিবেদন করে দেবদেবীদের পুজো করে। যখন সে মন্দির থেকে ফিরে আসে তখন কিছু চাল তার মা অন্যান্য বয়স্থা মহিলাদের হাতে দেয়। ছেলে কারুর হাতে চাল দিলে সে তার পরিবর্তে ছেলের হাতে একটি করে পান দেয়। তারপর মা ছেলের কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিয়ে তাকে বিবাহ করতে যাওয়ার জন্যে বিদায় দেন। ছেলে আর তারপর মার দিকে পিছন ফিরে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে ছেলে যদি এই সময়ে মার দিকে পিছন ফিরে চায় তাহলে তার মা সারাজীবনের মতো শত্রু হয়ে যাবেন।

বরপক্ষ আগেই তত্ত্ববাহকদের হাতে কনের জন্যে শাড়ী ও অলঙ্কার পাঠিয়ে দেন। তারপর বরযাত্রীর দল রওনা হয়। বাড়ীর মহিলারাও বরযাত্রী হিসেবে যান তবে ছেলের মা যান না। ব্যান্ড বাজিয়ে, বাজী পুড়িয়ে, গাড়ীতে ফুলের মালা সাজিয়ে বরযাত্রী রওনা হয়। মেয়ের বাড়ী পৌঁছবার আগে মেয়ের কোন পিতৃস্থানীয় আত্মীয় বা মেয়ের বাবা এসে বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা জানান, বরের হাতে পান দেন। তারপর সকলকে তিনি বরযাত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসান। কনের বাড়ীর উঠোনে একটা বড় মাটির বেদী তৈরী করা হয় এবং বেদী ফুল ও আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়। সেই বেদীতে উভয় পক্ষের পুরোহিত হোম ও পুজো করেন। কনের বাবা ছেলেকে নতুন পোশাক দেন বর সেই পোশাক পরে বেদীতে এসে বসে। হোমের সময় তিনবার তিন রকমের মন্ত্র পাঠ করা হয় এবং প্রতি মন্ত্রপাঠের শেষে বর পোশাক পরিবর্তন করে—এই তিন প্রস্থ পোশাক কন্যাপক্ষ থেকেই দেওয়া হয়। এর পর কনেকে বিবাহের বেদীতে আনা হয়। কনের পরনে থাকে পাত্রপক্ষের দেওয়া শাড়ী এবং উভয় পক্ষের দেওয়া অলঙ্কারই সে এই সময়ে পরে। কনে আসবে এসে বসলে আবার হোম আরম্ভ হয়। দুপক্ষের পুরোহিতই হোমের সময় মন্ত্র পড়েন এবং দুপক্ষের পিতাই সেখানে উপস্থিত থাকেন। প্রথমে মালা বদল হয় বর ও কনের মধ্যে। তারপর দূর্বাঘাস ও ফুলের মালা দিয়ে বর ও কনের হস্তবন্ধন করা হয় এবং বর কনের গায়ে যে চাদর থাকে তাও পুরোহিত গ্রন্থিবদ্ধ করে দেন। তারপর হয় 'সপ্তপদী' অনুষ্ঠান—বর ও কনে গ্রন্থিবদ্ধ অবস্থায় সাতবার অগ্নি পরিক্রমা করে। এরপর হয় সিন্দুর দান অনুষ্ঠান। বধূর সিঁথিতে বর সিন্দুর পরিয়ে দেয়। তারপর আবার হোম হয় এবং কন্যার অভিভাবক ঘোষণা করেন, আমার কন্যাকে শ্রীমান অমুকের হাতে দান করলাম। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'হোমোকন্যাদান'। এর পরে বর কনে হোমাগ্নিকে প্রণাম করে গুরুজনদের প্রণাম করলে গুরুজনেরা নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন ও উপহার দেন। এর পর হয় 'কৌড়ি' বা বরকনের 'কড়ি' খেলার অনুষ্ঠান। তারপর অতিথিদের নানারকম আমিষ ও নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন খাওয়ানো হয় এবং মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়। কন্যা বিদায়ের আগে আবার বর কনেকে বিবাহের বেদীতে বসানো হয়—আবার হোম হয়। পুরোহিতের নির্ধারিত শুভ সময় অনুসারে কন্যা তার স্বামীর সঙ্গে পতিগৃহে যাত্রা করে। মেয়ে বাপের বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার আগে আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে এবং অচেনা শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার ভয়ে কাঁদতে থাকে। কন্যাপক্ষের মহিলারা এবং কনের বন্ধুরা মনের দুঃখে সাশ্রুনয়নে বিদায়ের গান গাইতে থাকেন—

'সবারি চলেন্তে ধীরে ধীরে
এ গাঁ ছাড়ি যিবু বহু যেসবে
নিয় জনম পর ঘরকু
যাহা সে দেখিব অজানাপুরে।'

অর্থাৎ—'পালকী ধীরে ধীরে যাবে। বিয়ের পর বউ এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। মেয়ের জীবনই হল অন্য বাড়ীতে যাওয়ার জন্যে—যা সে দেখবে অন্য জায়গায় থেকেই দেখবে।' কন্যা বিদায়ের আগে কনের বাবা বরকর্তার হাতে যৌতুকের সব জিনিসপত্র তুলে দেন।

বধূ শ্বশুরবাড়ীতে এলে শাশুড়ী নিজে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসেন। বরপক্ষের বাড়ীতে ও উঠোনে একটি মাটির বেদী তৈরী করা থাকে। পুরোহিত দশদিন ধরে সেই বেদীতে পুজো ও হোম করেন। দশ দিকপাল অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এই হোম অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সন্ধ্যা দুবেলাই বরবধূ এই বেদীতে এসে বসে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন—বরবধূ দেবতাদের উদ্দেশ্যে চাল নিবেদন করে। একে বলা হয় 'বেদী পুজো'। চতুর্থ দিন হোমাগ্নির সম্মুখে বরবধূ পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করে। এই দিনই রাত্রিবেলা 'বাসররাত্রি' অর্থাৎ ফুলশয্যা অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহের পর সপ্তম ও নবম দিনে আরও দুটি অনুষ্ঠান হয়—প্রথমটির নাম 'বরলুচিবা' এবং দ্বিতীয়টির নাম 'কন্যালুচিবা'। সপ্তম দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বর অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকে যাতে বাড়ীর অন্য কেউ তাকে দেখতে না পায়। সন্ধ্যায় সে বাড়ী এসে সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করে—একে বলা হয় 'বরলুচিবা'। নবম দিনে বধূও কোন নিকটস্থ আত্মীয়বাড়ীতে গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকে এবং ফিরে এসে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করে। বিবাহের দশদিন পরে বর তার পিতার আমন্ত্রণে স্বামীর সঙ্গে পিতৃগৃহে নব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এইরকমভাবেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উড়িষ্যাবাসীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

—সাধনা মুখোপাধ্যায়

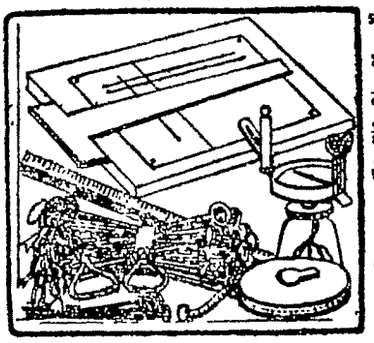

স্কুল, কলেজ এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ফর্ম ও অফিসের জন্য ষ্টেশনারী, কাগজ, সার্ভে, ড্রইং, ইঞ্জিনীয়ারিং ও যাবতীয় উৎকৃষ্ট ছাপার কাজের সুলভ প্রতিষ্ঠান।

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা—১

ফোন—২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪; গ্রাম: অয়ারদিন—হাওড়া পোষ্ট বক্স—৩৮, হাওড়া

সাতদিনের শুভাশুভ

(১ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ সেপ্টেম্বর)

গ্রহসন্নিবেশ ঃ রবি ও বুধ সিংহে, বুধ তুলায়, শুক্র কন্যায়, শনি ও কেতু মিথুনে, রাহু, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল যথাক্রমে ধনু, মকর এবং মেষে অবস্থান করছে।

মেষ ঃ শরীর ভাল চলবে। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। বাধাধিক্যের চাপ চলবে। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে শুভ যোগাযোগ ঘটতে পারে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ১, ২, ৬ সেপ্টেম্বর।

বৃষ ঃ শরীর ও মন বিশেষ ভাল নয়। মানসিক অশান্তির লক্ষণ আছে। আয় ভাল। ব্যবসায় ভাল। কাজকর্ম একরূপ। মেয়েদের পারিবারিক উন্নতির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ ঃ ৩, ৪ সেপ্টেম্বর।

মিথুন ঃ শরীর ভাল। পারিবারিক সম্প্রীতির লক্ষণ আছে। আয় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ প্রবল। মেয়েদের পক্ষে সময়টা শুভ। শুভ তারিখ ঃ ২, ৩, ৫ সেপ্টেম্বর।

কর্কট ঃ শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র মন্দ নয়। আয় ভাল। ব্যবসায় ব্যবসায় শুভ। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ১, ২, ৪ সেপ্টেম্বর।

কন্যা ঃ শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। কাজকর্ম সুবিধার নয়। মেয়েদের পক্ষে শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ ঃ ১, ২, ৩, ৬ সেপ্টেম্বর।

তুলা ঃ শারীরিক অসুস্থতার আভাষ আছে। পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আয় একপ্রকার। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ ঃ ২, ৪, ৭ সেপ্টেম্বর।

বৃশ্চিক ঃ শরীর ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্র সুবিধার নয়। আয় ভাল। ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। কাজকর্ম আশাপ্রদ। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ ঃ ১, ২, ৪ সেপ্টেম্বর।

মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ ঃ ২, ৩, ৫ সেপ্টেম্বর।

মীন ঃ শরীর ও মন প্রকৃপ্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে যোগ আছে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ঃ ১, ৩, ৫ সেপ্টেম্বর।

প্রশ্নের উত্তর

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ৪৫ বছর বয়স থেকে আর্থিক অকথা ভালই যাবে।

দুর্গা দে ঃ বিবাহিত জীবন ও ভবিষ্যৎ ভালই হবে। স্বামীর বয়স বলা কঠিন।

শুভ্রা ঘোষ (কলি-১৪) ঃ আগামী ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ মার্চ মাসের মধ্যে বিবাহ সম্ভব। স্বামী শিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠ হবে। প্রবাল ধারণীয়।

পি কুমার (হাওড়া) ঃ ১৯৭৪। ফেব্রুয়ারী থেকে জুনের মধ্যে চাকুরী পাবার সম্ভাবনা। যাদু প্রদর্শনীতে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারবে বটে তবে ৩০ বছর বয়সের পর থেকে।

রীনা বসু ঃ অষ্টমে শনি-রাহু বিবাহে বাধার সৃষ্টি করবে। ১৯৭৪ সালে বিবাহযোগ প্রবাল ও গোমেদ বস্ত্র ধারণীয়।

স্বপন রায় (কুষ্টিয়া) ঃ গ্রাজুয়েট হবার যোগ আছে। ব্যবসায়ে উন্নতি হবে।

মঞ্জুশ্রী দত্ত (পোঃ ওয়াই) ঃ সপ্তমে শনি এবং অষ্টমে চন্দ্র দাম্পত্যজীবনে অশান্তি ঘটাবে। আর্থিক কষ্টের যোগ নেই।

লগ্নের মিল হচ্ছে না। সঠিক জন্মসন তারিখ সময় পাঠাবেন।

মানিক দাস (ঘাটাল) ঃ এবছর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

কুমকুম রায় ঃ এবছর প্রতিকূল গ্রহস্থিতি আশানুরূপ ফললাভে বিঘ্ন ঘটাবে।

কপোত চট্টোপাধ্যায় (বীরভূম) ঃ ১৯৭৪ সালের প্রথমার্ধে চাকরী পাবার যোগ। তুলা রাশি। কর্কট লগ্ন।

পঙ্কজ চক্রবর্তী (মধ্যপ্রদেশ) ঃ জন্মসন তারিখ সময় পাঠাবেন।

যূথিকা কর (ঘাটাল) ঃ এবছর পরীক্ষার ফল ভাল হবে না। ১৯৭৫ সালে বিবাহযোগ প্রবল।

সুষমা কর (ঘাটাল) ঃ বৃহস্পতি সপ্তমে থাকাকালীন অর্থাৎ আগামী নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে বিবাহ সম্ভব। বিবাহ আগে হবে।

প্রণব কর (ঘাটাল) ঃ ১৯৭৫ সালের প্রথমদিকে চাকরী পেতে পারেন।

অনিল ঘোষ (বহরমপুর) ঃ বর্তমানে প্রতিকূল গ্রহ থাকলেও বৃহস্পতির শুভভাবাপন্নহেতু আশানুরূপ ফল না হলেও পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় বাধা আছে।

সুশীল চাকলাদার (গয়া) ঃ বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে থাকাকালীন অর্থাৎ ১৯৭৪ মার্চ থেকে ১৯৭৫ মার্চের মধ্যে বাড়ী হবার প্রবল যোগ। কন্যাদের ভাগ্য মধ্যমপ্রকার।

শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য (স্যাডোল) ঃ কর্মস্থলে ১৯৭৫ সালে স্থানান্তর যোগ আছে। ১৯৭৪ সালে সন্তান সম্ভাবনা। মকর রাশি।

নারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ কন্যারাশি। আপাততঃ পরিবর্তন সম্ভাবনা নেই।

মিস ছুটি ঃ চতুর্থে স্বক্ষেত্রে বৃহস্পতি এবং এবং একাদশে রাহু থাকায় কোন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির সাহায্য সহানুভূতি পাবেন। তবে চিরস্থায়ী নয়।

সুধীরা দেবী ঃ ১৩৮০ সালেই প্রবল যোগ।

অবনি মুখোপাধ্যায় ঃ এবছর পাশের আশা কম।

এস এন সরকার (মুর্শিদাবাদ) ঃ ১৯৭৪ সালে চাকরী পেতে পারেন।

হরিচরণ মন্ডল (মালদহ) ঃ ১৯৭৪ সালে কর্মস্থলে উন্নতির প্রবল যোগ।

পি এন সরকার (মুর্শিদাবাদ) ঃ ১৯৭৪ সালে পরীক্ষা দিলে কৃতকার্য হবার যোগ আছে।

আরতি নাথ ঃ চাকরী হওয়ার আশা কম। কন্যা রাশি। মিথুন লগ্ন।

হিমাংশুশেখর দেব ঃ না আসারই যোগ বেশী।

হলধর বর্ধন (দার্জিলিং) ঃ ২৮ অথবা ৩০ বছর বয়সে প্রবল সম্ভাবনা।

নীরেন্দ্রমোহন সেন ঃ বর্তমান চাকরী এখনও থাকবে। ছবি আঁকায় কিছু পয়সা রোজগার হবে।

চন্দন দত্ত ঃ কুম্ভ রাশি। মিথুন লগ্ন। প্রতিকূল গ্রহ থাকায় এবছর বাধা আছে।

রঞ্জন মিত্র ঃ গ্রাজুয়েট হবে। চাকরীজীবী হবে।

চন্দ্রলেখা মিত্র ঃ বাধাপূর্বক গ্রাজুয়েট হবে। ভবিষ্যৎ জীবন মধ্যম প্রকার।

চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ঃ আগামী নভেম্বরের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন। লেখাবৃত্তিতে যথেষ্ট বাধা আছে।

দময়ন্তী পুরকায়স্থ ঃ সপ্তমে রবি-রাহু ও অষ্টমে মঙ্গল থাকায় বিবাহের আগে নানারকম বিঘ্ন ঘটাবে। আগামী ১৯৭৪ মার্চের মধ্যে বিবাহ সম্ভাবনা।

ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্মতারিখ ভুল আছে ঠিক কবে পাঠাবেন।

দেবলীলা গাঙ্গুলী ঃ রোহিণী নক্ষত্র, বৃষরাশি। গ্রাজুয়েট নিশ্চয় হবেন।

দেবরঞ্জন গাঙ্গুলী ঃ বাইরে থেকে লেখাপড়ার যোগ বেশী। উচ্চশিক্ষিত হবার যোগ আছে।

আশীর্বাদ বিশী ঃ এখানেই হবে এবং ১৩৮০ সালেই। মাঘ-ফাল্গুনে প্রবল যোগ।

তাপসকুমার চন্দ (মেদিনীপুর) ঃ মকর রাশি। কর্কট লগ্ন। ২৪ বছর বয়সে কর্মপ্রাপ্তিযোগ। ১৯৭৪ সালে বিবাহ সম্ভব।

হুসনে আরা শেফা (ঢাকা) ঃ সঠিক জন্মসাল মাস ও তারিখ পাঠাতে হবে।

গোপা ঘোষ (কলি-৪) ঃ আশা খুব কম।

পার্থসারথি গুপ্ত ঃ আগামী নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

মঞ্জু ঘোষ (বালী) ঃ ১৯৭৪ সালে বিবাহ যোগ প্রবল। স্বামী সরকারী চাকরীতে লিপ্ত থাকবেন।

কৃষ্ণচূড়া সরকার ঃ ১৯৭৪ সালে এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মধ্যে কর্মপ্রাপ্তি সম্ভব।

চন্দ্রশেখর চৌধুরী ঃ ১৯৭৫ সালের প্রথমার্ধে স্থায়ী চাকরী পাবার যোগ।

সবিতা রায় ঃ ১৯৭৪ সালে জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে চাকরীযোগ। পরীক্ষায় কৃতকার্য হবেন।

বাসু ভট্টাচার্য (কলি-৩৭) ঃ ১৯৭৪ সালে জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে চাকরী এবং শিক্ষাবিভাগে যোগ বেশী।

নারায়ণচন্দ্র সাহা ঃ ৩০ বছর বয়স থেকে আর্থিক অনটন ও মানসিক দুশ্চিন্তা কমবে। পারিবারিক অশান্তি কিছু থাকবেই।

দীপক সেনগুপ্ত (আসাম) ঃ ১৯৭৫ সালে জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের মধ্যে কর্মস্থল পরিবর্তনের প্রবল যোগ।

মোঃ সাজাহান মন্ডল (রাজসাহী) ঃ বর্তমান চাকরীতেই ১৯৭৫ সালে উন্নতি হবে। ৩৬—৩৭ বছর বয়সে বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে।

এম আর (আসাম) ঃ রাহু গ্রহ বিরূপ থাকায় পারিবারিক জীবনে কিছু অশান্তি থাকবে। ৩৫ বছর বয়স থেকে ভাগ্য-অর্থ-কর্মোন্নতি আরম্ভ হবে। গোমেদ রত্ন ধারণীয়।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) স্বর্ণজয়ন্তীর বিজয়ী অশনি সংকেত

অশনিপাত নয়, অশনির সংকেত মাত্র, কর্ণপটহবিদীর্ণকারী বজ্রনির্ঘোষ নয়, বজ্রপাতের ইঙ্গিতবহনকারী বিদ্যুল্লতা মাত্র, প্রলয়ঙ্কর করাল দুর্ভিক্ষ নয়, দুর্ভিক্ষের নিশ্চিত ধ্রুব পদধ্বনি মাত্র, ক্ষুধার অন্ন-সংস্থানের জন্য একটি মাত্র দেহবিক্রয়ের ঘটনা দিয়ে যার আরম্ভ হয়েছিল, কয়েক-দিনের অনাহারের ফলে পল্লীপথে, সকলের নিরুপায় চোখের সামনে এক দরিদ্র, অসহায়া নারীর ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার মাধ্যমে যার অনিবার্য আগমন প্রতিভাত, সেই **'অশনি সংকেত'**ই রঙে রসে অচিন্ত্যপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে সারা বিশ্বের চিত্ররসিকদের উপহার দিয়েছেন রোমান্টিক কবি পরিচালক সত্যজিৎ রায়। না, সত্যজিৎ রায় কঠিন বাস্তবধর্মীতায় বিশ্বাসী নন, মর্মন্তুদ বেদনার চিত্র তিনি পারতপক্ষে আঁকতে চান না, যেখানে তা ছবির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, সেখানে তিনি তাকে ক্ষণিকের জন্যে স্থান দেন, তার বেশী নয়। অতি বড়ো কঠিন বাস্তবভরা পরিস্থিতিকেও তিনি যেন একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকরসজারিত করে দেখাতে চান। চালের দোকান লুটের ব্যাপারে গঙ্গাচরণকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার মতো গুরুতর ঘটনার মধ্যেও কি এই প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তা উঁকি মারে না? কিংবা ছবির একেবারে শেষ পর্যায়ে যেখানে দীনু ভট্টাচার্যের সমস্ত পরিবারের আগমনে উৎকণ্ঠিতমনা গঙ্গা-চরণের 'খাবার লোকের সংখ্যা দশ'—এই হিসাবের জবাবে অনঙ্গবৌ নিজের ভাবী সন্তানের কথা চিন্তা করে বলে—'না এগারো', সেখানেও কি আসন্ন অনাহারের ছায়াকে ছাপিয়ে ওঠে না কবি--পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নির্মল (এবং বুঝি কিছুটা মিষ্টিরও) কৌতুকপ্রিয়তা?

বাসিরহাট অঞ্চলের চর পোলতার নতুন পাড়ায় বাস হচ্ছে কাপালীদের—ওরা চাষ-আবাদও করে, আবার শণ দড়ি তৈরী করে হাটে গিয়ে বেচেও। কাপালীদের এই 'নতুন গাঁয়ে' একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার হচ্ছে বুড়ো গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী ও তার নিঃসন্তান স্ত্রী অনঙ্গ। গঙ্গাচরণকে পেয়ে ওরা বর্তে গেছে; গঙ্গাচরণ একাধারে ওদের পুরোহিত, কবিরাজমশাই এবং ওদের ছেলেদের গুরু-মশাই—না, গুরুমশাই নয়, স্যার (গঙ্গাচরণই ছেলেদের একথা বলে দিয়েছে)। গঙ্গাচরণের বুদ্ধি যতই থাক বিদ্যে বেশী দূর গড়ায়নি; বিশেষ করে ভূগোল সম্বন্ধে সে একেবারেই পণ্ডিত। কিন্তুপুরের কোথায় তা সে জানে না; বলে পুরীর কাছাকাছি, মেদিনীপুর জেলায়—একটু দূরে—পশ্চিম দিকে। তবে বাঁশবনে শেয়াল রাজা; তার মুখে থেকে 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং' শুনেই কাপালীদের চোখ কপালে উঠে যায়; বলে, এতো বড়ো বেরাহ্মণ পণ্ডিত ইত্যাদি। গঙ্গাচরণের সুন্দরী স্ত্রী অনঙ্গ হচ্ছে গ্রামের মেয়ে-বৌদের নয়নের মণি, তার সঙ্গে তাদের প্রাণের আতাত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল রচনার সঙ্গে মিল রেখেই সত্যজিৎ রায়ের ছবি শুরু হয়েছে নদীতে স্নানরতা অনঙ্গ ও জন দু-তিন কাপালী বৌদের নিয়ে। ওরা স্নান সেরে ডাঙ্গায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় আকাশে এক ঝাঁক উড়োজাহাজ। এই ছবি ও পরে কথাবার্তার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কাহিনীকাল হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের মধ্যভাগ ১৯৪২-৪৩ সাল, যখন পূর্ব রণাঙ্গনে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে বীরদর্পে মালয় সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন—একের পর এক দখল করে ইংরাজ, ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র (ইউ এস এ) কানাডা প্রভৃতির মিলিত শক্তিকে ভয়চকিত করে তুলেছে। কিন্তু যে নতুন গাঁয়ে কোনোদিন একখানি খবরের কাগজ পর্যন্ত যায় না, যে নতুন গাঁয়ের বাসিন্দারা সিঙ্গাপুর শহরটা কোথায় কতো দূরে তারই কোনো হদিস জানে না, সেখানে যুদ্ধভীতি পৌঁছবে কোন পথে? সেখানকার মেয়েরা বলে আকাশে উড়োজাহাজগুলো দেখতে বেশ লাগে এবং পুরুষেরা যখন চালের মণ সাড়ে চার টাকা থেকে ছ টাকায় ওঠে ও পরে আরো চড়বে মাত্র এই যুদ্ধের কারণেই বলে শুনতে পায়, তখনই আলোচনা প্রসঙ্গে বলে আমাদের রাজার সঙ্গে জার্মানি আর

দেবী চৌধুরানী / মহরতে সুচিত্রা মিত্র ও রঞ্জিত মল্লিক। ফটো : অমৃত

ছবির ঘণ্টা ঃ জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ রায়। পরিচালনা ঃ বরুণ কাপাসী

জাপানের যুদ্ধ বেধেছে, আর সেই জন্যেই সব জিনিসপত্র আক্রা হয়ে উঠছে।' কিন্তু খুব বেশী যে তারা চিন্তিত হয়, তা বোধ হয় না। কারণ 'এই হাঙ্গামা কতোদিনে মিটবে' এই চিন্তিত প্রশ্নের উত্তরে গ্রামের সম্পন্ন চাষী বিশ্বাসমশাই সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'আমাদের ভাবনা কি? ঘরে আমার দু গোলা ধান বোঝাই।'

কিন্তু নতুন গাঁয়ের লোকের মনেও ভাবনা ঢুকল, যেদিন গ্রামের মুদির দোকানে কেরোসিন তেল কিনতে গিয়ে গঙ্গাচরণ শুনল, রাসিন পাওয়া যাচ্ছে না এবং দোকানী তাকে পরামর্শ দিল 'এই বেলা কিছু নুন আর চাল কিনে রাখুন।' পয়সা হোলেও জিনিস মেলে না—এই আশ্চর্য কাণ্ডটি গঙ্গাচরণ তার জীবনে প্রথম দেখল। ক্রমে ঐ খরাব গাঁয়ে সকলেরই দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হতে লাগল পদে পদে। সবচেয়ে সমস্যা দাঁড়াল চালের। সৈন্যদের খাবার জন্যে সরকার নাকি চাল কিনে নিচ্ছে চড়া দামে; আশাতীত দর পেয়ে চাষীরা সব চাল বেচে দিয়ে এখন হায় হায় করছে। গ্রামের একমাত্র সম্পন্ন চাষী বিশ্বাসমশাই বিপদ বুঝে গোলা থেকে ধান সরিয়ে রেখেছে এমন এই সন্দেহেই গ্রামের লোক মরিয়া হয়ে তার মাথায় মারল লাঠি। গঙ্গাচরণ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটতে লাগল চালের সন্ধানে। একটা চালের দোকান লুট হওয়াও দেখল। নিবারণ ঘোষ তাকে কিছুতেই চাল বেচল না; শুধু পেট ভরে খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করল। বাড়ীতে অনঙ্গ অভুক্ত রয়েছে জেনেও সে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাওয়ার আহ্বান শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারল না। এদিকে অনঙ্গ ঢেঁকীতে পাড় দিয়ে এক মণ ধান ভেনে দু কাঠা বানি সংগ্রহ করে সংসারের সাশ্রয় করছে। ওরই ওপর এই দুর্দিনে কামদেবপুরের দীনু ভট্টাচার্য প্রায়ই ওদের বাড়ী অতিথি হচ্ছে। কাপালীদের ছোটবৌ, হাসিখুশী মেয়ে ছুটকী ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে দেহ বিক্রি করে আধ কাঠা চাল জোগাড় করছে। —মেয়েরা শাক, পাতা, গেঁড়-গুগলির সন্ধানে ফিরছে সকলের উদরপূর্তির জন্যে। ক্রমে ভাতের সন্ধানে প্রেতমূর্তিদের আবির্ভাব ঘটল নতুন গাঁয়ের পথে—শোনা গেল আকালের নিশ্চিত পদধ্বনি। এরই মাঝে হল অনঙ্গ সন্তানসম্ভবা।

বিভূতিভূষণের মূল কাহিনীর অনাবশ্যক ডালপালাগুলিকে ছেঁটে ফেললেও শ্রীরায় তাঁর ছবির আদ্যন্ত কাহিনীকারের মূল সুরটিকে বজায় রাখতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোথাও যেন কোনো পুনরুক্তি না হয়, কোনও রকম আতিশয্য প্রকাশ না পায়, সেদিকে তিনি রেখেছেন সতর্ক দৃষ্টি। চালের দোকানে খরিদ্দারের ভীড়; দ্রুত চাল বিক্রী হচ্ছে; গঙ্গাচরণ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে খালি থলি হাতে। হঠাৎ যেন কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল—লুট, লুট। সবই নিমিষের মধ্যে। গঙ্গাচরণ এগিয়ে একটা কি কথা বলতে গিয়ে কে একজনের ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। হঠাৎ মানুষ যেন ভুলে গেল নীতি-বোধ, সামাজিক মূল্যবোধ। যে গঙ্গাচরণকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাকে এই মুহূর্তে কেউ যেন চিনতেই চাইল না।—গৃহস্থের বধূরা নিরাপত্তাবোধকে বিস্মৃত হয়ে যেখানে সেখানে চুনো হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চালের অভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনও বিকল্পের সন্ধানে। ফলে রমণীসমাজের মর্যা-দাণ অনঙ্গ প্রায় ধর্ষিতা হবার উপক্রম। ছুটকী ও বেতুরী দুজনে মিলে শাবল দিয়ে পিটিয়ে লোকটির পঞ্চত্ব না পাওয়ালে শেষ পর্যন্ত কি যে হত, বলা যায় না। নরহত্যা করেও ওদের মনে কোনো পাপবোধ নেই। ক্ষিধের জ্বালায় যদুপোড়ার কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে ছুটকীর কি একটু বেধেছিল? বোধ হয়, না। মাত্র অনঙ্গবৌয়ের কথায় তার বিবেক হয়ত একটু দংশন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে যদুপোড়ার সঙ্গে শহরের অভিমুখেই রওনা হল, দুটি খেয়ে বেঁচে থাকবে, এই ভরসায়; যেমন করে হাজার হাজার গ্রামের মেয়ে আমাদের এই কলকাতা শহরে এসে জড়ো হয়েছিল মান খুইয়ে জান বাঁচাবার তাগিদে। মনুষ্যসমাজে এই মূল্য-বোধের আকস্মিক পরিবর্তনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন সত্যজিৎ রায়।

কাহিনীকার বিভূতিভূষণের বরাবরই লক্ষ্য থাকে গ্রাম্য প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার প্রতি। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে মনুষ্য প্রকৃতির পরিবর্তনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে রূপায়িত করার জন্যেই শ্রীরায় এই ছবিকে ইষ্টম্যানকালারে রঞ্জিত করেছেন। প্রকৃতি যেখানে হাস্যময়ী সেখানে সবুজের নয়না-নন্দকর শোভা; আবার যেখানে পরি-স্থিতি বিষাদময়, সেখানে আকাশ ধূসর। ভূপাতিত হবার পরে গঙ্গাচরণের এক রক্তাভ ধূসর সন্ধ্যাকাশের পটভূমিকায় এক বৃক্ষতলে একাকী বসে থাকার দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। এবং ছবির শেষভাগে সন্ধ্যার অন্ধকারে দীনু ভট্টাচার্যের পরিবারের অস্পষ্ট মূর্তিগুলির সহসা অসংখ্য ভূতুড়ি মিছিলে পরিণত হওয়ার দৃশ্যটিও অবর্ণনীয়। কিন্তু সর্বত্রই রোমান্টিক কবি-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরিমিতিবোধ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

ছবির শেষে টাইটেলের সাহায্যে শ্রীরায় বলেছেন, এই মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। এছাড়াও ছবির মাঝেও চালের মূল্য বৃদ্ধিজ্ঞাপক 'বারো, বারো চার আনা, সাড়ে বারো তেরো' ইত্যাদি লিপির সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। নির্বাক ছবি সম্পর্কে তিনি একস্থানে লিখেছিলেন, 'কাহিনীর যে বক্তব্য ছবির সাহায্যে বোঝানো সম্ভব হত না, সেখানেই প্রয়োজন হত টাইটেলের।' আলোচ্য রঙীন সবাক ছবিতে তাঁর টাইটেলের ব্যবহার কোন প্রয়োজনে?

ছবির পাত্রপাত্রীর সংলাপ ও পোশাক-পরিচ্ছদে একটি বিশেষ কাল ও বিশেষ অঞ্চলকে চিহ্নিত করবার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ফলে তারা আমাদের থেকে

দূরের লোক, অথচ জীবন্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে।

ছবির নায়ক গঙ্গাচরণের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অবিন্যস্ত কেশ, গুম্ফ, বেশভূষা ও চশমার সাহায্যে চরিত্রটির বাহিরংগকে যেমন বিশেষিত করেছেন, তেমনই অংগ ও চলনভংগী এবং বাচনের দ্বারা করেছেন ভিতরের মানুষটাকে। 'অপুর সংসার' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তিনি অজস্র ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন; কিন্তু এই গঙ্গাচরণের ভূমিকাটি হয়ে রইল তাঁর জীবনের সার্থকতম। অনংগ বৌয়ের ভূমিকায় রূপদান করেছেন বাংলা-দেশের চলচ্চিত্রজগতের অন্যতমা নায়িকা বাবিতা। অমন দুখানি চোখ না থাকলে অনংগ হওয়া যায় না। সময়ে বালিকা, সময়ে কিশোরী এবং সময়ে সকল্প সমবেত নারীর মাঝে ব্যক্তিত্বসম্পন্না নেত্রী—মিষ্ট অথচ সংযত ভাষণে মাধুর্যময়ী অনংগর প্রতিটি রূপ অনায়াসে ব্যক্ত করেছেন বাবিতা। চঞ্চলা ছুটকী জীবন্ত হয়েছে সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় গুণে। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় যখন ছুটকী তার বিদ্রোহী মনকে সংযত করে দেহ বিক্রয় করতে কৃতসংকল্প, তখন ক্ষুধাও কাতরতাপিষ্ট তার মূর্তিখানি যা হওয়া উচিত ছিল তা আমরা দেখতে পাইনি। গোবিন্দ চক্রবর্তী দৈন্যপীড়িত দীনু ভট্টাচার্যকে যথার্থভাবে চিত্রিত করেছেন। বদুপোড়ার চরিত্রে ননী গংগোপাধ্যায় সুন্দর রূপসজ্জা গ্রহণ করেছিলেন। অপরাপর ভূমিকায় রমেশ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বাসমশাই), অনিল গাংগুলী (নিবারণ ঘোষ), শুচিতা রায় (ক্ষ্যান্তমণি), শুভ্রা নাথ (সৌদামিনী), চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (মোতি) প্রমুখের অভিনয় হয়েছিল চরিত্রোচিত।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায় সত্যজিৎ রায়ের স্বপ্নকে সার্থক করেছেন অপরূপ রঙের প্রতিফলনে। সম্পাদক দুলাল দত্ত ছবির পরিস্থিতি অনুযায়ী তার গতিবেগকে সংযত রেখেছেন। গ্রাম্যপরিবেশ নিখুঁতভাবে প্রকাশিত হয়েছে অশোক ঘোষের শিল্প-নির্দেশনাগুণে। এ ছবিতে রূপসজ্জাকরের দায়িত্ব অল্প ছিল না; সে দায়িত্ব দক্ষতার সংগে পালন করেছেন অনন্ত দাস। লোক- ও বাউলাঙ্গ সুরাশ্রয়ী আবহসংগীত সম্পূর্ণভাবে ছবির অংগীভূত।

শর্বানী ভট্টাচার্য প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ইস্টম্যানকালার চিত্র 'অশনি সংকেত' বাংলা চলচ্চিত্রজগতে একটি গৌরব-ময় দিকচিহ্ন।

(২) বিলেত ফেরত

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের জনক চিদানন্দ দাশগুপ্ত ১৯৪৬ সাল থেকে ওতপ্রোতভাবে নানা দেশীয় চলচ্চিত্রের সংগে নিজেকে প্রায় একাত্ম করে তুলেছেন এবং বলা যেতে পারে, তিনি চলচ্চিত্রশিল্প-তত্ত্বজ্ঞরূপে খ্যাতিলাভ করেছেন। আগে কোনও

জহীর রায়হানের অসমাপ্ত শেষ ছবি 'লেট দেয়ার বি লাইট'-এ বাবিতা-ওয়ার চিস্তী

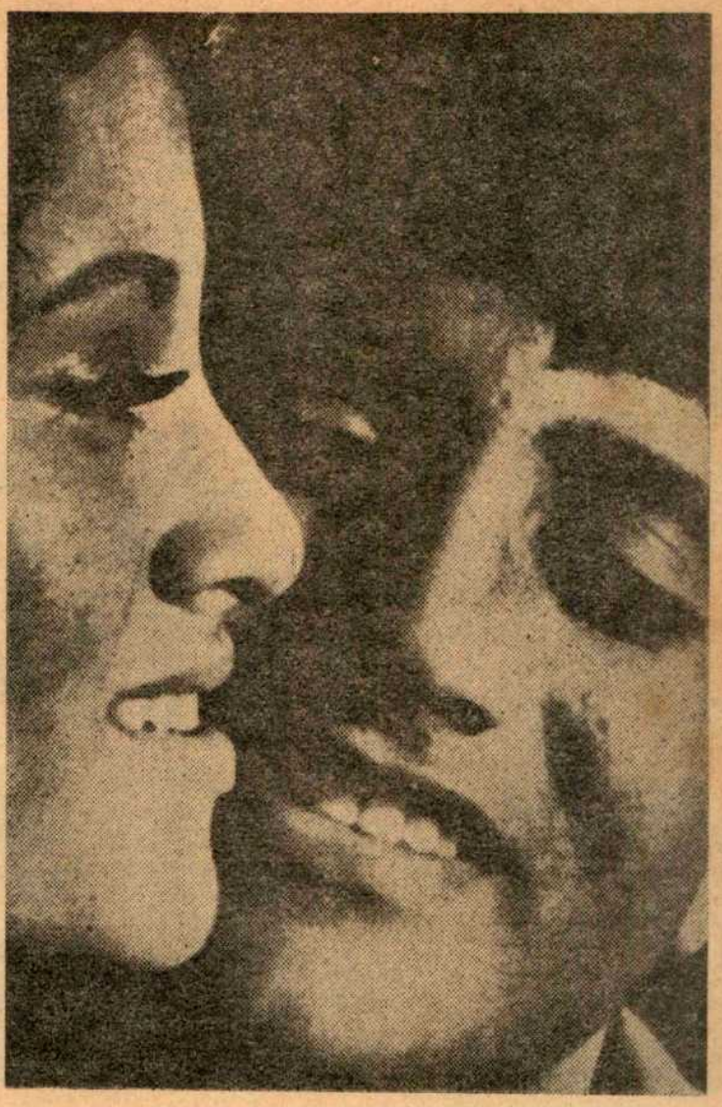

কোনও তথ্যচিত্র নির্মাণে তাঁকে ব্যাপৃত দেখলেও এই প্রথম তিনি কাহিনী-চিত্রের স্রষ্টা হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন মেট্রোতে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বিলেত ফেরত' ছবির মাধ্যমে। তিনি তত্ত্বগত বিশেষজ্ঞতার ব্যবহারিক প্রয়োগেও যে সমান পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, এ-ছবি দেখবার আগে তা অনুমান করা আমাদের পক্ষেও কঠিন ছিল। কিন্তু ছবি দেখবার পরে এ-কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার স্পর্ধা রাখি যে, বাংলার চলচ্চিত্রজগৎ চিদানন্দ দাশগুপ্তের মধ্যে একটি অভিনব দৃষ্টিকোণসম্পন্ন সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষাৎ পেল।

"বিলাত ফেরত" একটি অখণ্ড বৃহৎ কাহিনীচিত্র নয়, এর মধ্যে আছে তিনটি ছোট ছোট কাহিনী। এক, ষাঁড়, দুই গাধা ও তিন, রক্ত। তিনটিই শ্রীদাশগুপ্তেরই রচনা এবং তিনটিই প্রধানত কৌতুকের অবরণে মোড়া।

তিনটি কাহিনীরই নায়ক বিদেশ-প্রত্যাগত। প্রথমজন শংকর ফরাসী দেশ থেকে অঙ্কনশিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এসেছে। আধুনিক স্ত্রী লতিকার সংগে আদর্শগত কোলহল করে প্রেমকে তাজা রেখেছে। একটি স্কুটারে করে তারা বেড়াতে যায়, বাদ সাধল একটি ষাঁড়। ওদের স্কুটার ও লতিকার লাল রঙের পোশাক দেখলেই সে ওদের পিছু নেয়। শেষে বহু তদ্বিরের পরে পুলিশের কর্তার সাহায্যে ষাঁড়টি স্থানান্তরিত হলে ওরা বাঁচে। কিন্তু সেই নিয়মিত ষাঁড়টিকে না দেখতে পেয়ে লতিকার মনে হয়—সে কি যেন হারাচ্ছে, ষাঁড়টিকে একবার যেন দেখতে পেলে ভালো হত।

সুন্দর মেজাজে, অকৃত্রিমভাবে আসল বাড়ীঘরের মধ্যে ছবিটি তোলা হয়েছে। নির্মলকুমার ও সোহাগ সেনের কাজ সুন্দর।

দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক গোবিন্দ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে টাউন প্ল্যানিং সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে দেশে ফিরেছে। তার আশা, সে একদিন এই শহর কল-

মায়ের দেওয়ালা / অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার ও জয়শ্রী রায়। পরিচালনা ঃ বিমল ভৌমিক। ফটোঃ অমৃত

কীতার রূপ পাল্টে দেবে। কিন্তু তাকে অস্থির করে তুলল, পাশেই থাকা এক ধোপার গাধা রতন। সে যখন লং-প্লেয়িং রেকর্ড বাজাত, তখনই বিশেষ করে রতনের উচ্চৈস্বরে ডাকবার ইচ্ছা প্রবল হত, বোধ করি, সে নিজে ঐ লং-প্লেয়িংকে বাজাবার প্রতিবাদ জানাত। শেষপর্যন্ত গোবিন্দ এ-দেশে টিঁকতে না পেরে আবার আমেরিকা মুখো হল।

গোবিন্দের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় যে স্বচ্ছন্দভাবে অভিনয় করেছেন, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় কাহিনী অপেক্ষাকৃত বড়ো এবং কৌতুকোদ্দীপক হলেও চিন্তার খোরাক যোগায়। অক্সফোর্ড থেকে ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন হয়ে দেশে ফিরেছে গোপাল সর্বাধিকারী। বাবার ইচ্ছা, কোনোও বিখ্যাত কোম্পানীতে এক্‌জিকিউটিভের পদে ওকে বসিয়ে দেন। কিন্তু ছেলের সঙ্গে বাঁধে আদর্শগত বিরোধ। সে চায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে। বাবার কাছ থেকে নানা তিরস্কারসূচক উপদেশ পেয়ে সে প্রথমে করে কলেজে প্রোফেসারী এবং পরে অফিসে চাকরী। কিন্তু কোথাওই শেষপর্যন্ত টিঁকতে পারে না। শেষে ভেবেচিন্তে সে ব্যবসা শুরু করে। অর্গানিক ফার্টিলাইজারে শুরুনো রক্ত গুঁড়ো যোগান দেওয়ার ব্যবসা। প্র প্রথম নাক-চোখ বন্ধ করে সে-কাজ ক করে গা-সওয়া হয়ে যায়। উন্নতিও করা থাকে। কিন্তু বর্ষা এসে গোল বাধায় মাল রাখা সমস্যা সে মেটায় তার নিজে রক্ষণশীল বাড়ীতেই গুদাম করে। কি রক্ত গড়িয়ে বাইরে এসে গোল বাধালে শেষপর্যন্ত তাকে ঐ রক্ত যোগানদারী এ বড়ো কোম্পানীতে চাকরী করা স্বীক করতে হল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় গোপাল এ কৃষ্ণ কুণ্ডু তার বাবার ভূমিকায় অনব অভিনয় করেছেন। অপর্ণা সেন গোপাল ভগনীরূপে দেখা দিয়েছেন।

ছবির আসল কৃতু হচ্ছে এর চিত্রনা সংলাপ ও নবভঙ্গীর পরিচালনা। ধ্রু জ্যোতি বসুর চিত্রগ্রহণ অনবদ্য। সম্পাদন কাজও সুন্দর। আবহসঙ্গীত পরিমিত দুখানি কণ্ঠসংগীত ঃ রতি সুখসারে সোহাগ চাঁদবদনী জয়শ্রী দাশগুপ্ত গে ছেন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও মধুর কণ্ঠে আমরা শ্রীদাশগুপ্তকে আবার অভিনন্দ জানাই।

(৩) দি ইনার আই (ইংরাজী—তথ্যমূলক)

১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত তথ্যচিত্র হচ্ছে—**দি ইনার আই** (বাংলা বলতে পারা যায় অন্তর্দৃষ্টি)। এই দ্র শীলের রঙীন তথ্যচিত্রটি ভারত সরকা প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত শান্তিনিকেতনের খ্যাতনামা শিল্পী বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীজীবন শিল্প এই ছবিটির বিষয়বস্তু।—বিশে করে শিল্পী যখন তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে একে বারে হারিয়ে ফেলেন, তখন তিনি হতোদ্যম না হয়ে পূর্ণ উৎসাহ নিয়ে ত শিল্প-প্রতিভাকে নব নব পথে চালি করেন, তার বিস্ময়কর জীবন্ত চিত্র এ ছবিটির অনেকখানি অংশ জুড়ে রয়েছে কী অবলীলাক্রমেই না তিনি কাগজে ওপর বিচিত্র রেখাপাত করছেন, প্লাস্টা অব প্যারিস দিয়ে মূর্তি তৈরী করছে এমনকি মুরাল পেণ্টিংয়েও নিজেকে নিয়োজিত করছেন। মনে হয়, বাইরে দৃষ্টি হারিয়ে যেন তিনি তাঁর অন্তরে দৃষ্টিকে শতগুণে জাগ্রত করে রেখেছেন যার কাছে বাইরের দৃষ্টির প্রয়োজনীয়ত নগণ্য বলে অনুভূত হবে।

শিল্পী বিনোদবিহারী সম্পর্কে এ অত্যন্ত সংবেদনশীল তথ্যচিত্রটি নির্মাণে ভিতর দিয়ে যেন শ্রীরায় গুরুর ঋণশোধে প্রয়াস পেয়েছেন। নেপথ্য ভাষণ তা নিজেরই লেখা এবং নিজেরই কণ্ঠনিঃসৃত।

—নান্দীকর

রঙ্গনা নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
১লা সেপ্টেম্বর শনিবার ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
২রা রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টুডিও সংবাদ

বাঙলা ছবি 'বভ্রুবাহন' : মহাভারতের অমর উপাখ্যান অবলম্বনে বিষ্ণু সরকার ও মধু বসু প্রযোজিত মন্দিরা চিত্রমের প্রথম নিবেদন 'বভ্রুবাহন' ছবির চিত্রগ্রহণ এন, টি, ২নং স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন—অসীম পাল।

কালীপদ সেনের সুরে ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন—শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

গীত ও সংলাপ রচনা করেছেন গৌরী-প্রসন্ন মজুমদার। চিত্রগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনায় যথাক্রমে—বিভূতি চক্রবর্তী ও গৌর পোদ্দার।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—ললিতা চট্টো-পাধ্যায় (চিত্রাঙ্গদা), জয়শ্রী সেন (উলূপী), ইন্দ্রজিৎ নাগ (বভ্রুবাহন), শঙ্করনারায়ণ (অর্জুন), গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়, গীতিকা মিত্র ও শতাধিক শিল্পী।

মন্দিরা চিত্রম ছবিটির পরিবেশক।

'পরস্পরী'-র চিত্রগ্রহণ : জুবিলী ফিল্মসের নবতম নিবেদন 'পরস্পরী' ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে শীঘ্রই শুরু হচ্ছে। বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্র-নাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন—সলিল দত্ত। পরিচালনা করছেন—তরুণ পরিচালক শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা। পদ্মশ্রী মান্না দে ছবিটির সুরকার। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন—যথাক্রমে বিজয় ঘোষ এবং অমিয় মুখোপাধ্যায়। চরিত্রচিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, নবাগতা সাগরিকা, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় ও শান্তি ভঞ্জ।

পরিবেশনায় দায়িত্ব নিয়েছেন—সিলভার ফিল্মস।

একদিন সূর্য : চিত্রভাষ নিবেদিত 'একদিন সূর্য' (কাহিনী : সুনীল দাশ) ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ছবিটি এখন মুক্তির অপেক্ষায়। আজকের কলকাতার পটভূমিকায় একজন শিল্পীর জীবনযন্ত্রণার চিত্ররূপ দিয়েছেন তরুণ পরিচালক নীতীশ মুখোপাধ্যায়। এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও সঙ্গীত রচনা পরিচালকের নিজেরই। চিত্র-গ্রহণ করেছেন দীপক দাশ। সম্পাদনা করেছেন : মণি অধিকারী। প্রধান কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন : নবাগত সৌমেন ভট্টাচার্য, জয়শ্রী রায়, আলিস মুখোপাধ্যায়, নন্দন মুখোপাধ্যায়, কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, তপন দত্ত প্রভৃতি। বিশেষভাবে

জীবন যে রকম—বসন্ত চৌধুরী ও ওয়াহিদা রহমান।
পরিচালনা : স্বদেশ সরকার। ফটো : অমৃত

উল্লেখযোগ্য ছবিটি জাগাগোড়াই তোলা হয়েছে আউটডোরে।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় একদা : চিত্রদূত পরি-চালিত ভেনাস প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন 'একদা', কাহিনী ও চিত্রনাট্য : সমীর রায়। ছবির দৃশ্যগ্রহণ কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। সম্প্রতি সম্পাদনার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছে। ছবিটি পূজার আগে মুক্তির জন্য চিহ্নিত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রীতা ভাদুড়ী, ভাস্কর চৌধুরী, চিন্ময় রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জি, শেখর চ্যাটার্জি, সাধনা রায়চৌধুরী, বিনতা রায়, লতিকা বোস, চারুপ্রকাশ ঘোষ, পিনাকী সেনগুপ্ত, রুনু মিত্র, শেফালী ও বম্বের মনমোহন কৃষ্ণ, পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র এবং ছাত্রী এই প্রথম বাংলা ছবিতে নায়ক এবং নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

'ছুটির ঘন্টা' : ঐকতান প্রযোজিত 'ছুটির ঘন্টা' ছবির শুটিং এখন দ্রুত-গতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে একটানা কয়েকদিন কাজ হয়ে গেল। অনাথ আশ্রমের পট-ভূমিকায় এক দুরন্ত কিশোরের কাহিনী। কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার, পরিচালক বরুণ কাবাসী নিজেই। সঙ্গীতপরিচালনা করেছেন অমল মুখোপাধ্যায়। গানে কণ্ঠ দিয়েছেন : হেমন্ত মুখার্জি, আরতি মুখার্জি, শ্যামল মিত্র প্রভৃতি। বিশিষ্ট কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন : মাধবী চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, সুই ব্যানার্জি নবাগত সুনাম, সত্য ব্যানার্জি, গীতা দে, শিপ্রা চক্রবর্তী, সুনীতি দত্ত, দ্বিজু ভাওয়াল, বিমল দেব ও মাস্টার শান্তনু।

মঞ্চাভিনয়

মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালকমন্ডলী : সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারের অডিটো-রিয়ামে নবগঠিত পরিচালকমন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅরুণ মৈত্র। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, থিয়েটার জগতে বাংলাদেশের স্থান ভারতবর্ষে চির-দিন অগ্রণী। সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ করে অনেক এগিয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেছে অন্য দেশের তুলনায়। নাটক ও সাহিত্যের নিজস্ব সত্তা আছে যে সত্তার মধ্যে রাজনীতি না জড়ালেও চলে। রাজ-নীতি বাদ ও সাহিত্যের সত্তা নিজস্ব ভঙ্গীতে চলতে পারে। রাজনীতির পরিবর্তন হয় কিন্তু সাহিত্য ও নাটক নিজের পথ করে নিয়ে জীবনের চিন্তা-ধারাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যায়। নাম-করা শিল্পী ছাড়াও অনামী লেখক, শিল্পী তারাও নতুন আস্বাদ এনে দেন। পরবর্তী-কালে কেউ কেউ কমার্শিয়াল পথে নেমে আসে। থিয়েটার যেন আত্মার সন্ধান করে। শুধু অংশ গ্রহণ করতে নয়, আনন্দ গ্রহণ করাতে। আমি আশা করছি, মিনার্ভা থিয়েটার যেন অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সার্থক হয়ে ওঠে। আমি মনে প্রাণে এই প্রার্থনা করি।

মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালক মন্ডলীর সহ-সভাপতি শ্রীবারিদবরণ দাশ, এম এল এ বলেন, 'এই সংস্থা অনেক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে চলছে। নানারকম সমস্যার

সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাকে কাটিয়ে উঠবার জন্য মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের ভেতর থেকে কর্মীদের ও নাগরিকদের তরফ থেকে প্রতিনিধিকৃন্দ নিয়ে একটি কমিটি করা হয়েছে। কমিটির নাম মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালক মণ্ডলী। আমি এই কমিটির মধ্যে কাজ করে যাওয়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করব যে, আজকের এই থিয়েটারের দীনতাকে ঘুচিয়ে পুরাতন দিনের স্মৃতিকে মনে রেখে উন্নত মানের নাটক দিয়ে তার অতীত গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করতে হবে।'

সর্বশেষে বক্তব্য রাখেন নবগঠিত পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা শ্রীমতী সরযূ দেবী। তিনি বলেন, 'মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ও বারিদবাবু যা বলেছেন তা সুন্দরভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে মনে করি। আমি নাট্যমঞ্চের সাথে দীর্ঘদিন জড়িয়ে আছি, তাই কোন নাট্যমঞ্চ বন্ধ হওয়ার কারণ ঘটলে আমি খুব ব্যথা পাই এবং ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে সাধ্যমত প্রতিরোধ করি। তাই আমি মনে করি, এই থিয়েটারকে রক্ষার জন্য আমাদের সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।'

সভাপতির ভাষণে শ্রীঅরুণ মৈত্র বলেন, 'আমরা মনে করি না শিল্প, সংস্কৃতির ভূমিকা কিংবা তার পরিচয় রাজনীতির একটা হাতিয়ার হিসেবেই। আর্ট বা কলার একটা নিজস্ব আসন থাকে এবং তা শুধু নিজস্ব কলেবরে স্ফীত নয়—একটা বিরাট সম্ভাবনার অগ্রণী দূত হিসেবে পৌঁছে দেয় সকলকে। আমরা আশা করি সেই আর্ট বা কলার ন্যায্য আসন নবগঠিত পরিচালক মণ্ডলী রাখবার চেষ্টা করবেন।

গীত-বীথির শেষ রক্ষা অভিনয় : উত্তর কলকাতার গীত-বীথি সংগীত শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটকটি অভিনয় করেন। পরিচালনা করেন শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন প্রণব বসু, অসীম চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শংকর মুখোপাধ্যায়, রুপেন দে, সুচিত্রা রায়, কল্পনা ঘোষ, বিজয়া সেনগুপ্ত ও মালতী রায়। ইন্দুমুখী ও কমলমুখীর চরিত্রে অভিনয়ে ও গানে কৃতিত্ব দেখান সুচিত্রা বসু ও কল্পনা ঘোষ। পরিশেষে সুচিত্রা মিত্রর একক সঙ্গীত উপভোগ্য হয়।

এস কে দাঁ রোন কালচারাল অর্গানাইজেশনের বার্ষিক : শিয়ালদহ নেতাজী সুভাষ মুখে ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা নাটককে বার্ষিক নাম পরিবেশন করেন এস কে দাঁ রোন কালচারাল অর্গানাইজেশন। নাম পরিবর্তনের সপক্ষে কৈফিয়ৎ দিলেও যৌক্তিকতা তেমন ছিল না। নাচগানে ভরা জমপেশ ঢঙে অভিনয়ে প্রাচীন ধারা বজায় রেখেছেন। নাট্যপরিচালক প্রফুল্ল সেনগুপ্ত। সংগীতপরিচালক শ্যামল বিশ্বাস ও নৃত্যনির্দেশিকা অনিতা ঘোষের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। মর্জিনার চরিত্রে মধুশ্রী ব্যানার্জী ও আবদাল্লা রূপে প্রলয়বাবুর অনবদ্য নৃত্য ও অভিনয় দর্শকমণ্ডলী বার বার অভিনন্দিত করে। এ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য অলোক গুপ্তরায়, সুভাষ মজুমদার ও ভাস্কর ব্যানার্জী। স্যাডো মজুমদারের কৃতিত্ব উপভোগ্য হয়। আরও অনেকে অভিনয় করেন।

সংলাপের প্রতিষ্ঠা দিবস : সম্প্রতি এক ছোট্ট মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'সংলাপের' প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি শ্রীঅনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক শ্রীঅপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংলাপের' সাম্প্রতামামি দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করেন। সংগীতাংশে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীঅসীম দাস, গৌতম দত্ত ও সীমা চ্যাটার্জী। আবৃত্তি পরিবেশন করেন সাংবাদিক অচ্যুতকুমার সিংহ ও মঞ্জুলা গুপ্ত। ছোট্ট ফিল্মার পরিবেশন করেন অপূর্ব ব্যানার্জী, পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য ও মঞ্জুলা গুপ্ত।

মালয়েশিয়ায় বাংলা নাটক : বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তাকে আর কোনমতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে তা এখন বিদেশের মঞ্চেও নিজের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে কুয়ালালামপুরে একটি বাংলা নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হোল। প্রযোজনা করলেন মালয়ান বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের শিল্পীরা। নাটকটির নাম ছিল 'পঞ্চামৃত'। পাঁচ বন্ধুর ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে নাটকটি লিখেছেন সুনীতকুমার মুখার্জি। রঙ্গরসের এই নাটকটিকে মঞ্চের আলোয় প্রাণবন্ত করে তুলতে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁরা হোলেন ডি এন চক্রবর্তী, টি কে দত্ত, উৎপল ব্যানার্জি, এস আর সেনগুপ্ত, এম এম গুহ, কে কে মণ্ডল, বি সি রায়, আর কে পাল, সি কে চ্যাটার্জি, এইচ কে চৌধুরী, এ কে রায়। এ কে বাগ, মীরা ব্যানার্জি, বেবী ঘোষ, হেনা মুখার্জি, অনিমা পাল, শ্রীমতী পাল।

শিল্পী সংসদ আয়োজিত একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল :

প্রতি বছরের মতো এবারেও ৪ দিন ধরে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে শিল্পী সংসদের উদ্যোগে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিল্পী সংসদের তরুণ প্রতিভাধর শিল্পীদের শিল্প প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান ও সুযোগ দেবার জন্য এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। '৭৩ সালের প্রতিযোগিতায়—সুপ্রভা মুখার্জি, নীতিশ মুখার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হরেন মুখার্জি, বাণী বিনোদ কণ্ঠকারতী, বেণুকা রায়, যোগেশ চৌধুরী ও তুলসী লাহিড়ী—মোট ৯টি স্মৃতিদল অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৬৪ জন অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী প্রতিটি নাটকই কাহিনীতে, আঙ্গিকে ও অভিনয়ে দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচারকদের রায় অনুযায়ী '৭৩ সালের একাঙ্ক নাট্যপ্রতিযোগিতার ফলাফল :—

প্রথম : যোগেশ চৌধুরী স্মৃতি দলের 'জীবনকাহিনী' (পরিচালনা—চঞ্চল মুখার্জি), **দ্বিতীয় :** তুলসী লাহিড়ী স্মৃতিদলের 'তমসার তীরে' (পরিচালনা রমেন লাহিড়ী), **তৃতীয় :** রেণুকা রায় স্মৃতিদলের 'সন্ধ্যার রঙ' (পরিচালনা শ্যামলী গাঙ্গুলী), **শ্রেষ্ঠ অভিনেতা :** পঙ্কজ মুখার্জি (ইনি পর পর দু বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পেলেন), **শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা :** পান্না চট্টোপাধ্যায়। **বিশেষ পুরস্কার :** শিশুশিল্পী মাঃ পাপু ও আশীষ গুপ্ত।

দমদম নাট্যপরিষদের 'নায়কের সন্ধানে'

শুধু 'লেক' এর চমক, আর যৌন-উত্তেজনাভরা মুহূর্ত সৃষ্টি করে মঞ্চের আলোয় ঝাঁজমাৎ করার একটি প্রবণতা কয়েকটি জায়গায় চোখে পড়ছে। নাটক, শিল্পচাতুর্য চাপা দিয়ে যা কিছু আলোড়ন তা কিন্তু চোখ কাঁপলেও মন ভরাতে পারে না। তাই এধরণের নাট্যপ্রযোজনার কোন উপযোগিতা থাকতেই পারে না, যদি তা যথার্থ নাট্যশিল্পের মর্মবাণী বহন না করে।

কয়েকদিন আগে 'বয়েজ ওন লাইব্রেরী' হলে একটি নাটক দেখতে দেখতে এই কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল—কেন এই নাটক? কেন এই প্রযোজনা? কেন এরই জন্য ঘোষণা করা 'এক দুঃসাহসিক প্রযোজনা'? নাটকের নাম 'নায়কের সন্ধানে'। জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নাটকটি পরিবেশনার দায়িত্ব নেন দমদম নাট্য পরিষদের শিল্পীরা।

নাটকটির কাঠামোতে যে গল্পটি আছে তাতে অসাধারণত্বের ছোঁয়া খুব একটা নেই। বাঁচার তাগিদে সৎ পথের সন্ধান না পেয়ে, অসামাজিক জীবনের দিকে লাফিয়ে পড়ে বুঝিক নিচ্ছে যে সব তরুণ-তরুণীরা তাদেরই কথা এ নাটকের সংলাপে সংঘাতে পেরেছে ভাষা। বক্তব্যের দিক থেকে হয়তো নাটকটির একটি বলিষ্ঠতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু নাট্যমুহূর্তগুলি প্রায়ই হয়েছে দুর্বল। আর একটা কথা হয়তো অসংকোচেই বলা যেতে পারে যে দৃষ্টিভঙ্গী সব সময়েই রাখা হয়েছে যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করার দিকে।

শিল্পীদের অভিনয় আদৌ দুর্বল। জয়ন্ত গাঙ্গুলীর 'গণেশ রায়' ছাড়া আর কোন চরিত্রই এতোটুকু স্পষ্টতা পায়নি। মহিলা শিল্পীদের চেহারা অভিনয় মর্মান্তিকভাবে

বিসদৃশ লেগেছে। মঞ্চসজ্জা, আবহসঙ্গীত কোনটাই অভিনয়ের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি।

ফাঁস : হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সভ্যরা সম্প্রতি শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি ইস্টার্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট মঞ্চে অভিনয় করলেন। নাট্য নির্দেশনায় শচীন গুপ্ত সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন।

প্রায় প্রতিটি শিল্পীই অভিনয় করেছে চরিত্রের সঙ্গে তাল রেখে। 'সেজনাথ' চরিত্রে রণজিৎ মুখোপাধ্যায় অনেক আবেগদীপ্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পেরেছেন। শচীন গুপ্তের 'ডেপুটি'ও বলা যায় বলিষ্ঠ এক চরিত্র-চিত্রণ। অন্য তিনটি ভূমিকায় যথাযথই অভিনয় করেন বৈদ্যনাথ নন্দী (বিমান), শিবেন্দুমাধব সরকার (সুভাষ), রেণু ঘোষ (তরুলা)। সেদিনের অন্যতম সম্পদ ছিল কল্পনা দাসের অভিনয়। 'সোনালী'র অভিব্যক্তি তাঁর অভিনয়ে নিখুঁত রূপ লাভ করেছে।

আবহসঙ্গীতের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন সমীর বসু।

সাংবাদিকদের সার্থক প্রযোজনা বন্দর : সাধনার স্তরে রেখে নিষ্ঠাসহকারে যদি কোন শিল্পের চর্চা করা যায়, তা হলে সেটা যে সাফল্যের উচ্চশিখরে উঠে জনগণের মন অনায়াসেই জয় করতে পারে সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত অমৃতবাজার পত্রিকা এডিটোরিয়াল স্টাফ ড্রামা কমিটি প্রযোজিত বাবু মুখার্জির 'বন্দর' নাটকটির প্রযোজনাই তার এক জ্বলন্তদলা নিদর্শন। নিছক সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নিজেদের সশরীরে মঞ্চে হাজির করে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য যে অনুষ্ঠান বিগত কয়েক বছর ধরে অমৃতবাজার পত্রিকার সাংবাদিকরা করে আসছেন, নিঃসন্দেহে সেটা একটা সাধু প্রয়াস এবং এবারের 'বন্দর' নাটকটির বিশিষ্ট প্রযোজনা এই প্রয়াসকে আগামী দিনে আরও বলিষ্ঠ করবে বলেই সবার বিশ্বাস।

নাটকটির কাহিনী কিস্তারে আমরা দেখতে পাই হারিয়ে যাওয়া নাতনীর দুঃখ ভুলে থাকার জন্য কুসুমপুরের জমিদার তার সেক্রেটারী প্রলয়ের কথা উপেক্ষা করেও অসুস্থ শরীর নিয়ে বাইরের লোকেদের সঙ্গে অনাবশ্যকভাবে কথাবার্তা বলেন এবং উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ক্রমে ক্রমে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রলয়ই তার হারিয়ে যাওয়া নাতনীকে খুঁজে বের করে এক মধ্যবিত্ত সংসার থেকে আধা পাগলী অবস্থায়। সবশেষে সমাজের অনুশাসন উপেক্ষা করে পূর্ব-বিবাহিতা নাতনীর পুনরায় প্রলয়ের সাথে বিবাহের সম্মতি দিয়ে জমিদার অম্বর চৌধুরী জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। এবং নাতনী নেড়ীর তার হারিয়ে যাওয়া বন্দর ফিরে দাদুর বুকেই আশ্রয় পায়।

অভিনয়াংশে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ্য তিনি হলেন জমিদার অম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় দিলীপ মৌলিক। তাঁর বাচন ভঙ্গী সুন্দর ও পরিষ্কার। প্রলয় ও সঞ্জয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে প্রবীর সেন ও সমীর মিত্র চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। অনন্ত মল্লিক ও প্রসাদ পালিতের ভূমিকায় অজিত ঘোষ ও জয়বন্ধু ভাণ্ডারী সুঅভিনয় করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের তিন ভাইয়ের চরিত্রে যথাক্রমে প্রলয় ঝানার্জি, শ্যামল দে ও নিশীথ বড়াল নিজেদের দৃশ্যগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অন্যান্য যাঁরা সু-অভিনয়ের জন্য দর্শকদের মন জয় করেছেন তাঁরা হলেন অচ্যুৎ সিনহা, প্রশান্ত বসু, সত্যেন বসু, গোপাল ঝানার্জি, গীতা কর্মকার, মান্দরা রায় ও মালা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

নাটকটির নির্দেশনার জন্য দিলীপ মৌলিক কিছু অংশে নতুনত্বের দাবী করতে পারেন। আবহসঙ্গীত ও আলোক-সম্পাতে বিভাস মুখার্জি স্বকীয় নৈপুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাটকটির সাফল্যের জন্য নেপথ্যে জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, জ্যোতি-প্রসাদ ঘোষ, অজিত ঘোষ ও তপন দাস নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করেছেন।

চন্দননগর থিয়েটার সেন্টারের নাট্যাভিনয় : কলকাতা থেকে দূরেও যে আজ প্রচুর পরিমাণে নতুন ধরনের নাট্য-প্রযোজনা হচ্ছে, এ সত্যকে এখন আর কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। কয়েকদিন আগে চন্দননগর থিয়েটার সেন্টারের শিল্পীরা নৃত্যগোপাল স্মৃতি মন্দিরে একটি সমস্যামূলক সামাজিক নাটক পরিবেশন করে নাট্যচর্চার সীমাহীন নিষ্ঠাকেই প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। নাটকের নাম 'অসমাপ্ত'। তরুণ নাট্যকার দিলীপ দে এই নাটকের মধ্যে দেশের বেকার সমস্যা ও উদ্‌ভ্রান্ত তরুণদের চিন্তায় ওপর যথার্থ আলোকপাত করেছেন। ঘটনার উপস্থাপনা, সংলাপ এবং সর্বোপরি নাটকটির বক্তব্য উপস্থিত সবারই মন ছুঁয়েছে।

নাটকটি সার্থকভাবে পরিচালনা করেন নাট্যকার শ্রীদে স্বয়ং। নাটকটির অন্যতম চরিত্র 'জয়ন্তে'র ভূমিকায় তাঁর অসাধারণ অভিনয় মনে রাখার মতো। অনাথ মুখার্জি ও মৃণাল দত্ত মধ্যবিত্ত কেরাণী ও

বিভ্রান্ত যুবকের বৈশিষ্ট্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। নরেশ ব্যানার্জির চরিত্রচিত্রনও সার্থক হয়েছে বলতে হবে।

দেবদাস চ্যাটার্জি ও নিতাই দত্ত চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করতে পারেন নি। দুটি স্ত্রীচরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করেন বুলা দেবী ও সুজানা রোজারিও। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন অসিত পাল, সুনীল ঘোষ।

নাট্যানুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন আনন্দবাজারের প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীমধু সূদন চক্রবর্তী। 'অমৃত' ও অমৃতবাজারের তরুণ নাট্যসাংবাদিক শ্রীদিলীপ মৌলিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সতীর ঘাট : রজেন দে'র 'সতীর ঘাট' নাটকটি সম্প্রতি 'রঙমহলে' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল। অভিনয়ের আয়োজন করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস এণ্ড কালচারাল ক্লাবের শিল্পীরা। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন অনিলকুমার ঘোষ।

যে সব শিল্পীরা চরিত্রচিত্রণে নৈপুণ্যের নজীর রাখেন তাঁরা হোলেন অমর রায়, মঞ্জুশ্রী বোস, কনক পাল, অনিল ঘোষ, কীর্তিবাস দাস, শ্যামল বসাক, অভিমন্যু ভৌমিক।

ফেরারী ফৌজ : ষ্টেট ব্যাঙ্ক হাওড়া শাখার সভ্যবৃন্দ উৎপল দত্তের বহু বিতর্কিত নাটক "ফেরারী ফৌজ" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেন ষ্টার প্রেক্ষালয়ে। মঞ্চ আলো ও দলগত অভিনয় নৈপুণ্যে কিছু ত্রুটি থাকলেও সুপরিচালনার (কালী দে) ফলে ও প্রধান কয়েকটি চরিত্রাভিনেতার সুন্দর অভিনয়ে নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুবই জমজমাট হয়। অভিনয়াংশে প্রথমেই প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বপন ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপরেই হিতেন দাসগুপ্তের চরিত্রে শশাঙ্ক রায়চৌধুরী অসামান্য কৃতিত্বের দাবী রাখেন। অচিন্ত্য বিশ্বাস-এর প্রকাশ মুখুটি, বিভাস রায়চৌধুরীর অশোক ও সুধীপ্রসাদ চ্যাটার্জির নীলমণিও এককথায় খুব সুন্দর ও সাবলীল। স্ত্রীভূমিকায় বঙ্গবাসী চরিত্রে রেণু ঘোষ ভালো অভিনয় করেন। অন্যান্য দুটি চরিত্রে শিবানী ভট্টাচার্য ও মায়া ঘোষ সুন্দর। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন দিলীপ চক্রবর্তী, মলয় বসু, তাপস হাজরা, গোপাল ব্যানার্জি, অচিন্ত্য ব্যানার্জি প্রভৃতি।

ক্যাকটাস গ্রুপের বাতিঘর : বিশ্বাস চিরন্তন; মানুষের বিভিন্ন বৃত্তি ও সামাজিক বোধগুলির নিষ্ঠুরতার চাপে বিপর্যস্ত হোলেও অস্তিত্বের ইতিহাসে বিশ্বাস অম্লান থাকে। তাই বিশ্বাসকে এক্ষেত্রে অন্ধকার রাতের উথাল পাথাল সমুদ্রের তীরে বাতিঘরের ঘূর্ণায়মান আলোক-রশ্মির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে এই চরম অবিশ্বাসী যুগে সত্যকে কৃতিত্বের সঙ্গে বিঘোষিত করা হয়েছে 'ক্যাকটাস' নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত বাতিঘর নাটকে। নাটকটি পরিবেশিত হয়েছে ১০ই আগষ্ট একাডেমী মঞ্চে।

বুদ্ধদেব গুহ রচিত 'বাতিঘর' উপন্যাস অবলম্বনে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় কৃত নাট্যরূপ মুখ্যতঃ বিশ্বাস অবিশ্বাসের আদর্শগত দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও সমগ্র প্রযোজনার রূপ থেকে অনেক ব্যাপক ধারণার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমাজের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের বিভিন্ন বোধের উপর সংলাপ সীমাবদ্ধ থাকার দরুন নাটকের গতি অনেকাংশে একঘেঁয়েমির সৃষ্টি করে। পরিচালক শ্রীবিজন চট্টোপাধ্যায় নাটকের মূল বক্তব্যকে শেষ পর্যন্ত উপস্থাপনের দিকে সুনির্দিষ্টভাবে মঞ্চ শব্দ ও আলোর ব্যবহারে অত্যন্ত বলিষ্ঠ অথচ পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে কয়েকটি অংশ উল্লেখ করার মতো। 'বিশ্বাস' 'অবিশ্বাসের' দ্বন্দ্বের মাঝখানে 'হিপীদের' প্রবেশ মানুষের অন্ধ সংস্কারের প্রতীক 'কানাবাজকে' গুলীবিদ্ধ করা এবং বিশেষ-ভাবে শেষ দৃশ্য পরিকল্পনায় পরিচালক যথেষ্ট মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনয়াংশে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা-গণ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। নায়ক জয় চ্যাটার্জির ভূমিকায় চন্দন ব্যানার্জির অভিনয় আরো অন্তর্মুখী ভাব পরিস্ফুটনের দাবী রাখে। বৃদ্ধ নুলিয়া চন্দ্রাইয়ার ভূমিকায় হারাধন চট্টো-পাধ্যায়ের অভিব্যক্তি সুন্দর। ফাদার পাউন্ডের ভূমিকায় পরিচালক শ্রীচট্টো-পাধ্যায় দক্ষতার পরিচয় দেন। তোতো সেনের ভূমিকায় সুধীন দত্ত দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমস্ত নাটকে একটিমাত্র চরিত্র মন্টু ঘোষ এবং শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে দর্শকগণ হাসারস উপভোগ করেন।

ছোটো চরিত্রগুলির মধ্যে একটিমাত্র দৃশ্যে জয়ের বন্ধুর ভূমিকায় তপন চক্রবর্তী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে উপমার ভূমিকায় আরতি ঘোষ ও জুডিনের ভূমিকায় বন্দনা বিশ্বাস সুঅভিনয় করেন। সব কিছু মিলিয়ে সমগ্র প্রযোজনাটি নিঃসংশয়ে নতুনত্বের দাবী রাখে।

মনো দত্তের মঞ্চসজ্জা; হিমাংশু পালের শব্দনিয়ন্ত্রণ বিশেষভাবে ফ্যান-টাসীর দৃশ্যে—সুচিন্তিত; আলোকনাথ দের আলো ব্যবহার সুন্দর।

বর্মী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দলের সম্মানে নেপানগরে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য : বর্মী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলের নেপামিলস্ পরি-দর্শন উপলক্ষে নেপানগর ক্লাবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন নেপামিলস্-এর কর্মিবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গ। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান।

শ্রীএন বি দাসগুপ্ত, চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নেপামিলস্ সম্মানিত অতিথিদের স্বাগত জানান এবং ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানটি খুবই উপভোগ্য হয়।

শ্রীএল এন শান্ডিল্য, পার্সোনেল এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিলেসন্স অফিসারের নির্দেশ ও সহযোগিতায় সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা করেন শ্রীএস পি সরকার ওয়েলফেয়ার অফিসার। শ্রীদাসগুপ্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটির এবং সঙ্গীত পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন এবং 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি তিনিই মনোনীত করেন। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন : কুমারী নীতা সেনগুপ্ত, কুমারী শর্মিলা সরকার, শ্রীঅভিজিৎ চ্যাটার্জি, কুমারী মৈত্রী ব্যানার্জি, কুমারী নীরজা মিশ্র, কুমারী সুস্মিতা ঘোষ, কুমারী সন্ধ্যা গোপালকৃষ্ণ, কুমারী যোগিনী দেওস্কার, কুমারী সাইরাবানু।

বোম্বাইতে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রচারে বাংলা নাটক : বাংলা নাট্যমঞ্চের শতবার্ষিকীর বছরে বোম্বাইতে বাঙালী লেখক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের উদ্যোগে জন্ম নিল একটি নতুন নাট্যসংস্থা—'নাটমহল'। এই সংস্থার উদ্দেশ্য প্রবাস-বোম্বাইতে শুধু নিয়মিত বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করাই নয়, আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি হিন্দীতে অনুবাদ করেও এঁরা অবাঙালীদের কাছে পরিবেশন করার মহৎ সংকল্প নিয়েছেন। বাঙালী নাট্যকারদের কাছে নিঃসন্দেহে এটি এক আনন্দ-সংবাদ।

সুযোগ সুবিধার অভাবে প্রবাসে বাঙালীদের পক্ষে বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা এক সমস্যা। এই সমস্যার ওপর আলোকপাত করে লিখিত—দিব্যেন্দু গুহর "ল্যাঙ্গুয়েজ" নাটক নিয়েই নাটমহল তার যাত্রা শুরু করল। এবং প্রথম পদ-ক্ষেপেই নাটমহল যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য।

স্থানীয় রবীন্দ্র নাট্যমন্দিরে প্রায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত 'ল্যাঙ্গুয়েজ' দর্শকদের কাছ থেকে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা। এই নাটক প্রবাসী বাঙালীদের

শুধু বলিষ্ঠ এক নাটকের আস্বাদই যোগায় নি, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে দূর প্রবাসে বেঁচে থাকার দায়িত্ব বোধেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও সাহেবীয়ানার হাস্যকর অনুকরণের বিরুদ্ধে—নাট মহলের 'ল্যাংগুয়েজ' এই দীপ্ত প্রতিবাদ।

অভিজ্ঞ পরিচালক জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় নাটকটি সুচিন্তিত প্রয়োগ কৌশলে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। চরিত্র রূপায়ণে এই সংস্থার শিল্পীরা পেশাদারী সংস্থার মতই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন—মাণিক দত্ত, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, শান্তা বসু, শঙ্কর সেনগুপ্ত, সুনীল মাসচটক, ফাল্গুনী পুরকায়স্থ, সুকৃতি রায়চৌধুরী, পিনাকিন ত্রিবেদী, বিশ্বজিৎ রায়, গনেন বসু, পারুল মুখোপাধ্যায়, জগদীশ রায়, মাধব রায়, তন্ময় মুখোপাধ্যায় এবং রুমা ভাদুড়ী। দৃশ্যোচিত সঙ্গীত পরিবেশনে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন কুমারী সুস্মিতা গুহ। স্বাধীন দে-র আলোকসম্পাত আরও ভাল হবার অবকাশ ছিল। অঞ্জনাভ দত্তর ধ্বনি গ্রহণও উন্নত হতে পারত।

রঙমহলের নতুন নাটকঃ অনন্যাঃ রঙমহলের পরবর্তী নতুন নাটক কুণাল মুখোপাধ্যায়ের 'অনন্যা' সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে নিয়মিত ভাবে মঞ্চস্থ হবে। জহর রায় নাটকখানির পরিচালনায় দায়িত্ব নিয়েছেন। সুর দেবেন—চন্ডী বসু। জহর রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী সেন, গোপাল মুখোপাধ্যায়, মিন্টু চক্রঃ অজিত চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, প্রশান্ত এবং অসীমকুমারকে বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে।

বিবিধ সংবাদ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্ণালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন)-এর ৭ আগস্টে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত সভ্যগণ ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্যে বিভিন্ন পদাধিকারী ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ঃ সভাপতি—নির্মলকুমার ঘোষ, সহ-সভাপতি—বাগীশ্বর ঝা ও জ্যোতির্ময় বসুরায়, সম্পাদক—সেবাব্রত গুপ্ত, সহ-সম্পাদক—তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক মজুমদার, কোষাধ্যক্ষ—গোপালচন্দ্র পাল, কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ—কালীশ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন মল্লিক, নির্মল ধর, শৈলেশ মুখোপাধ্যায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, বি, এল, শা, প্রফুল্ল বসু, রণধীর সাহিত্য-লঙ্কার, পি, এন, উপাধ্যায়, রাইসুদ্দীন ফরিদি, মইনুদ্দীন আহমেদ, আশীষতরু মুখোপাধ্যায় এবং অরিজিৎ সেন।

'আধে আধুরে' পুরস্কৃত

সম্প্রতি পরলোকগত শক্তিমান নাট্যকার মোহন রাকেশ রচিত 'আধে আধুরে' সঙ্গীত কলামন্দির পুরস্কার লাভ করেছে। ১৯৬৬র জানুয়ারী থেকে ১৯৭১-এর ডিসেম্বর— এই ছ'বছরের ভিতর বারোটি ভারতীয় ভাষায় রচিত বা প্রযোজিত সকল নাটকের মধ্যে এই নাটকটিই সাহিত্যগুণের সঙ্গে নাট্যধর্মিতার সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন করতে পেরেছে বলে জানানো হয়েছে। ১৯৭১-এ প্রবর্তিত ১০,০০০ টাকা নগদ মূল্যের এই সঙ্গীতকলা মন্দির পুরস্কার এই প্রথমবার অর্পিত হ'ল। পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, এই নাটকটিরই একটি সার্থক বাংলা রূপান্তর শৌভনিক নাট্য-সম্প্রদায় দ্বারা কৃষ্ণ কুণ্ডুর পরিচালনায় দক্ষিণ কলিকাতার মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে অভিনীত হচ্ছে।

উত্তমকুমারের সংগীত পরিচালনায় 'সব্যসাচী' ছবির সংগীত গ্রহণ

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে অসীম সরকার প্রযোজিত ও পীযূষ বসু পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অবলম্বনে 'সব্যসাচী' ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়। উত্তমকুমারের সুরে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন শিপ্রা বসু। এমাসের শেষের দিকে ছবিটির অন্যান্য গানগুলি রেকর্ড করা হবে। 'সব্যসাচী' ছবির শেষ পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে গেল ৯ অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে। ছবিটির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার।

বার্লিন বিশ্ব যুব-উৎসবঃ এবার বার্লিন দশম বিশ্ব যুব উৎসবে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিনিধিদের তরফ থেকে যোগেশ দত্ত যোগদান করেন। মূকাভিনয়ের চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীদত্ত চারটি পদক লাভ করেন এবং তিনি আর একটি বিশেষ পদক উপহার পান। শ্রীদত্ত এই সফরে ভারতীয় মূকাভিনয়কে বিশ্ব স্বীকৃতি লাভ করান।

উল্লেখযোগ্য মূকাভিনয় ঃ ১। অলিম্পিক, ২। বনমহোৎসব, ৩। চোর, ৪। ছেলেটা।

প্রশ্নের উত্তর

কল্পনা চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—পুরুষেরাই সাধারণতঃ সিনেমা থিয়েটার, যাত্রায় উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন, এখানে মহিলারা কি আলাদাভাবে কেবলমাত্র মেয়েদের নিয়ে কোন দল গড়ার বা অভিনয় করার চেষ্টা করেন না?

—কেন করবেন না, বেশ ভালভাবেই করেন! আপনি কি 'শ্রীমতী কানন দেবীর' মহিলা শিল্পী মহল'এর কথা শোনেন নি? ওঁরা তো শুধু মেয়েদের নিয়েই যাত্রা-থিয়েটার করেন। রীতিমত পেশাদারী-ভাবেই। বাংলাদেশে প্রথম মেয়েদের নিয়ে যে পৃথক থিয়েটারের দলটি গড়ে ওঠে আজ থেকে বহুকাল আগে তার নাম ছিল 'দি রামবাগান ফিমেল কালী থিয়েটার'। এই দলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তদানীন্তন খ্যাতনাম্নী সার্কাসশিল্পী সঙ্গীতজ্ঞা অভিনেত্রী রাজবালা দেবী। ইনি হচ্ছেন গায়িকা-অভিনেত্রী ইন্দুবালা দেবীর মা।

কনক রক্ষিত, মেদিনীপুর—আমাদের এখানে পুণার মত যদি একটা ইন্সটিটিউট গড়ে ওঠে তো যাঁরা এখানে সিরিয়াসলী অভিনয়, ফিল্মের কলা-কৌশলের কাজ শিখতে আগ্রহী, তাদের খুব উপকার হয়। হচ্ছে কি এই ধরনের কোন ইন্সটিটিউট?

—আপাতত তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তবে শুনেছি, ফিল্ম ডেভালাপমেন্ট বোর্ডের কাছে ঠিক হুবহু না হলেও কাছাকাছি যায় এমন কিছু প্রস্তাব লিখিত আকারে পেশ করা হয়েছে। এছাড়া কাগজে-পত্রে এই নিয়ে বহুবার লেখালিখিও হয়েছে। সত্যি, এখানে পুণা ধরনের একটা ইন্সটিটিউট হওয়া খুবই জরুরী।

বলাই মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া—কলকাতার স্টুডিওতে অবিলম্বে হিন্দী ফিল্ম হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে যাঁরা দাবী করছেন, তাঁদের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত বলে কি বিবেচনা করেন আপনি? আমার বিশ্বাস, হিন্দী একবার শুরু হলে ভাল বাংলা ছবি তোলার কাজ ব্যাহত হবে।

—খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি, কারণ কলকাতার ফিল্মের ইণ্ডাস্ট্রীকে বাঁচাতে হলে এ-ছাড়া আর কোন পথ নেই। সর্ব-ভারতীয় বাজারের জন্য হিন্দী ফিল্ম তোলার কাজ শুরু হলে ইণ্ডাস্ট্রীতে যে নতুন অর্থনীতি গড়ে উঠবে, তাতে শুধুমাত্র ইণ্ডাস্ট্রীই বাঁচবে এমন নয়, বাংলা ছবিও বাঁচবে। ধরুন শান্তি সামন্ত আগামী অকটোবর মাসে যে ডাবল-ভার্সান রঙিন ছবি তোলার কাজ শুরু করবেন, তাতে

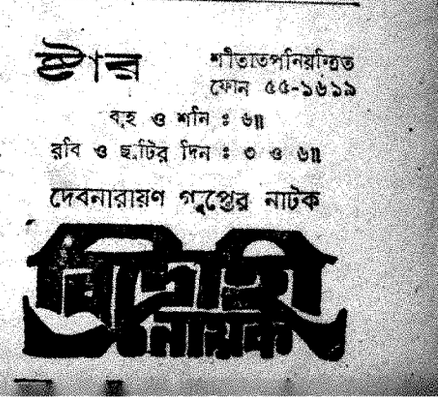

সামান্য বেশী খরচায় উভয় ভাষার পৃথক দুটি ছবি তৈরী হয়ে যাবে। এতে ছবির আয় এখনকার তুলনায় বহুগুণ বেড়ে যাবে। চিত্র-নির্মাতারা ছবি তৈরীর কাজে বেশী উৎসাহ দেখাবেন, ইন্ডাস্ট্রীর আপাত যে ক্রনিক সমস্যা তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাবে। মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। ওঁরা ঠিক একই প্রথায় সফল হয়েছেন। আর হিন্দীর জন্য ভাল বাংলা ছবি তোলার কাজ ব্যাহত হবে বলে আপনার যে বিশ্বাস, এইসবের পরিপ্রেক্ষিতে সেটা ভিত্তিহীন বলে আমার মনে হচ্ছে।

আব্দুল মতিন, বসিরহাট—সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' চিত্রে বাংলাদেশের অভিনেত্রী বরিতা অভিনয় করেছেন। সেইরকম আমাদের এখান থেকে শিল্পীরা গিয়ে ওখানকার ছবিতে অভিনয় করছেন নাকি?

—হ্যাঁ। বাংলাদেশের 'হারানো সুখ' নামে একটি ছবিতে মাধবী চক্রবর্তী, নির্মলকুমার ও নৃপতি চ্যাটার্জি এবং ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম প্রযোজনায় 'পালঙ্ক' ছবিতে সন্ধ্যা রায় ও উৎপল দত্ত অভিনয় করে এসেছেন খবর আছে। ঋত্বিক ঘটক ওখানকার ছবি 'তিতাস' পরিচালনা করেছেন, ছবিটি ওখানে বিশেষ খ্যাতি পেয়েছে বলে খবর এসেছে।

অমিত পাল, কালনা—বিদেশে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কি কি ছবি এপর্যন্ত পুরস্কৃত হয়েছে এবং কি কি ফেস্টিভ্যালে—উল্লেখ করবেন।

—পথের পাঁচালী এপর্যন্ত (১৯৫৬-৫৯) পেয়েছে মোট ৭টি বিদেশী পুরস্কার; '৫৬ সালে অনুষ্ঠিত ক্যান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্টারী," '৫৬ সালে এডিনবুর্গ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'ডিপ্লোমা অফ মেরিট' '৫৬ সালে ম্যানিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "গোল্ডেন কারাবো অ্যাওয়ার্ড," '৫৭ সালে সানফ্রান্সিস্কো ফেস্টিভ্যালে 'ফার্স্ট প্রাইজ,' '৫৮ সালে ভ্যাঙ্কুভার (কানাডা) ফেস্টিভ্যালে "ফার্স্ট প্রাইজ," '৫৮ সালে স্টার্টফোর্ড (কানাডা) ফেস্টিভ্যালে বছরের সেরা কাহিনী চিত্র হিসাবে "ফিল্ম ক্রিটিকস্ অ্যাওয়ার্ড" এবং '৫৯ সালে নিউইয়র্ক-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো আর্টস থিয়েটারে প্রদর্শিত বছরের শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে "কালচারাল অ্যাওয়ার্ড"।

'অপরাজিত' পেয়েছে ৩টি পুরস্কার; '৫৭ সালে ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (সপ্তদশতম) "গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক" পুরস্কার। '৫৮ সালে সানফ্রান্সিস্কো ফেস্টিভ্যালে "বেস্ট ডিরেকশান অ্যাওয়ার্ড," '৫৮-৫৯ সালে শ্রেষ্ঠ নন্-আমেরিকান চিত্র হিসাবে "গোল্ডেন লরেল অ্যাওয়ার্ড"।

'জলসাঘর' পেয়েছে ১টি পুরস্কার; '৫৯ সালে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "সিলভার মেডেল ফর মিউজিক" পুরস্কার।

'অপুর সংসার' পেয়েছে ৩টি পুরস্কার; '৬০ সালে লন্ডন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'বেস্ট ওরিজিন্যাল অ্যান্ড ইমাজিনেটিভ ফিল্ম' হিসাবে "সাদারল্যান্ড অ্যাওয়ার্ড," '৬০ সালে চতুর্দশতম এডিনবুর্গ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে "ডিপ্লোমা অফ মেরিট" পুরস্কার এবং ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ অফ মোশান পিকচার্স (ইউ, এস, এ) কর্তৃক "দি বেস্ট ফরেন ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড"।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তথ্যচিত্র পেয়েছে ১টি পুরস্কার; '৬১ সালে চতুর্দশতম লোকার্ণো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (সুইজারল্যান্ড) বছরের শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হিসাবে "গোল্ডেন সীল" পুরস্কার।

জলসা

সামান্য ক্ষতি—উদয়শংকরের অসামান্য সৃষ্টি

রবীন্দ্র সদনের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে মাত্র কদিন আগে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি'—নৃত্যে এবং সংগীতে। পরিবেশক উদয়শংকর ব্যালে সেন্টার। মাত্র একঘণ্টা সময়ের অনুষ্ঠানের জায়গায় প্রত্যক্ষ করলাম সময়াতীত এক অন্তহীন—সৌন্দর্যের দীপ্তি-রীতি। রবীন্দ্রনাথের আকাশচারী কল্পনায় লেগেছে উদয়শংকরের সৃষ্টিলীলার দোল, আর এই দুই মহাশিল্পীর মিলনে রূপময় হয়েছিলো এক অতল ধ্যানের নিবিড় অনুভব—যে অনুভব বিচিত্র লোকে বিহারের আনন্দে রসিক চিত্তকে আত্মহারা করেছে। কখনও নৃত্যের বিদ্যুতদ্যুতির চকিত আভাসে, কখনও সুন্দর ভাববৈভবে—কখনও বা বর্ণময় আলোর ইসারায় যেন এক আশ্চর্য উপলব্ধির দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছিলো।

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির আস্বাদ প্রয়াসী হলেও রবীন্দ্রনাথ সেই সংযমকে কখনও নিন্দিত হননি যে সংযম মানুষের নৈতিক ন্যায়নিষ্ঠায় চিত্তকে স্থিতধী রেখে সকল বন্ধনের সীমা পেরিয়ে মুক্তি দিতে পারে। এই মুক্তিদীক্ষার বরদানেই রাণী করুণার সেই উন্মত্ত লাস্য-বিলাসকে রাজা ক্ষমা করেননি, যে বিলাস-ঐশ্বর্যের উদ্দাম আনন্দে তাঁর গরবিণী রাণী—দরিদ্র প্রজাদের পর্ণকুটির পুড়িয়ে উত্তপ্ত হবার তৃপ্তি পেতে চেয়েছিলেন। দরিদ্রকে গৃহহীন করার বেদনা তাঁর অহংকার-কঠিন চিত্তে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। রাণীর এই নির্মমতাই রাজাকে কর্তব্যে কঠিন করেছে। তাই রাণীর বেশ ত্যাগ করে দীনতম প্রজার বেশেই দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা করার দুঃখ দিয়েই প্রজাদের দুঃখকে অনুভব করতে শেখার নির্দেশ দিলেন। সামান্য ক্ষতি কতটা অসামান্য সেই বোধেরই সাধনা এটা। রাণীর প্রতি হৃদয় ভরা প্রেমে অন্তরদ্বন্দ্বের জর্জর হয়েছেন। তবু উদ্যত রাজদণ্ড দুর্বল দ্বিধায় নিরস্ত হয়নি। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির এই সংযমকে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে প্রণাম জানিয়েছেন। কখনও— কাব্যে কখনও গল্পে, কখনও বা উপন্যাসে। এখানে সেই প্রণামকে অনুপম নৃত্য ও সংগীতের ভাষায় সহৃদয় রসিকচিত্তে পৌঁছে দিলেন উদয়শংকর ও রবিশংকর।

মহাকবির স্বপ্নের আকাশ যেন মুহূর্তের জন্য নেমে এসেছিলো রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। আর ত্রয়ী শিল্পীর সমন্বয়ে—সীমিত পরিসরে দীপ্ত হোলো অসীমের ব্যাপ্তি।

বহুদিন আগে হয়ত বা কোনো ফাল্গুনে 'সামান্য ক্ষতি'—প্রথম যখন মঞ্চরূপ গ্রহণ করে—তখন রাজার ভূমিকায় ছিলেন 'মহেন্দ্র-নিন্দিত কান্তি'—উদয়শংকর স্বয়ং—রাণী শ্রীমতী অমলাশংকর। এহেন যোগাযোগ এবারে সম্ভব হয়নি এবং এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।

তবু যা দেখা গেল—তারই মধ্যে না দেখার বাঁশী কি আর শোনা যায়নি। আর এই সুর শোনাতে পারার কারিগরীতেই পেলাম—শুধু সৃষ্টা নয় দ্রষ্টা উদয়শংকরকে। যে দিব্যদৃষ্টি শিল্পকে শুধু নৃত্যনায়ক নয় যথার্থ শিক্ষক করে তোলে—সেই দৃষ্টি বয়েই এই গুরুমুখী বিদ্যার রহস্যের চাবি-কাঠিটি তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই শান্তি বসু (রাজা), প্রতিটি পদক্ষেপে কখনও আর্ত প্রজার প্রতি করুণাকোমল চাউনীতে, কখনও রাণীর অন্যায়ের প্রতি রোষদীপ্ত দৃষ্টিতে শিল্পী উদয়শংকরের তুলির টান সু-পরিলক্ষিত। অনুপমা দাস নবাগতা (মাত্র কয়েক বছরই তাঁর শিক্ষাধীনে আছেন) তবু রাণীর জটিল চরিত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে—অহংকৃত লাসালীলা,—তারপরই দীনবেশে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পথে বেরোনোর শান্তিকে গ্রহণ করার দ্বিধা তাঁর অভিব্যক্তিতে যে মর্মস্পর্শী রূপ নিয়েছে তাও ত নৃত্যরাজ উদয়শংকরেরই সৃষ্টি।

নৃত্য রচনাতেও শংকরের ভাবকল্পনার অভিনবত্বে বিস্মিত হতে হয়। সাধারণ প্রজাদের সুখ-দুঃখ, উল্লাস ও বেদনার রূপসৃষ্টিতে তিনি পুরোপুরি লোকনৃত্যের আশ্রয় নিয়েছেন। এ লোকনৃত্য গতানুগতিকতা আতিশয্য বর্জিত। এবং তার মধ্যেও শংকরের নিজস্ব ধারা প্রবহমান। আবার রাজসভা, রাজা ও রাণী ও তাঁর সখীদের চরিত্রচিত্রণে তিনি ভাবগম্ভীর ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষচরিত্রে কথাকলির পৌরুষ-ব্যঞ্জনা, মেয়েদের নাচে মণিপুরীর লালিত সুষমা আপনাপন বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত।

রবিশংকরের সংগীত সৃষ্টিতেও ঐ ধারা এক অপরূপ কাব্যছন্দে নির্ঝরিত। এখানে সাধারণ জীবনের সহজ রূপ আনন্দলহরা, ঢোল কখনও বা বাঁশীতে অনুরণিত। আবার রাজকীয় পটভূমিকায় রাগসংগীতের ব্যঞ্জনায় মর্যাদাদৃপ্ত পরিবেশ রচিত। রাজা ও রাণীর সংগীত সংলাপে—রাণীর লীলাচাতুরী পিলুর মধুর রসে অথবা বাহারের রং-এ দুলে ওঠার মুহূর্তে মালকোষ অংগে রাজার প্রত্যুত্তরে রাণীর লঘুচিত্ততাকে তিরস্কার সুরের আশ্চর্য নাটকীয়তায় রসোত্তীর্ণ। অত্যাচারিত প্রজাদের অন্তরের কান্নায় লক্ষ্মী-শংকরের আহিরভৈরবের মূর্ছনায় এক গীতি-কাব্যের সৌন্দর্যে বিধৃত। সরোদ ও তবলায় আলি আকবর ও আল্লারাখার স্পর্শ সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

কমলেশ মিত্রর সংগীত পরিচালনা গোলাম কোয়াদারের আলোকসম্পাত ও এস এন প্রসাদের শব্দ সৃষ্টি সামগ্রিক সাফল্যের অংশীদার।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল 'প্রথম আদি পরম সূর্য'—গানটির সংগে ভারতনাট্যম আংগিকে শান্তি বসু ও অনুপমা দাসের যুগ্ম নৃত্য দিয়ে। তারপর একে একে দেখা গেলো সম্মিলিত লোকসংগীত (ধূর্জটি সেন, দেবতোষ চক্রবর্তী, জয়শ্রী ব্যানার্জি, স্বাতী সেন, তপতী ঘোষাল, ভারতী দাস, বীথিকা দাস ও জয়ন্তী মুখার্জি)। শান্তি বসুর কার্তিকেয় নৃত্য (বিশেষ করে তাঁরই জন্য গুরুশংকরম নম্বুদিরী রচিত এই নৃত্য দিয়ে যৌবনে উদয়শংকর বিশ্বজয় করেন), অনুপমা দাসের ভারতনাট্যম, মায়া চ্যাটার্জির কত্থক (আরও পরিমার্জিত) ও প্রকৃতি-আনন্দর একটি দৃশ্য। মাত্র এক মিনিট তবলা তরংগ বাজিয়ে—সুরে ও ছন্দের চমকে সকলকে চমকে দিয়েছেন কমলেশ মিত্র।

তুলসীদাস স্মরণে

সাধক তুলসীদাসের চতুঃশতবার্ষিকী জন্ম দিনটিকে স্মরণ করেই সৌরভ প্রতিষ্ঠান তাঁর সারাজীবনের সাধনার ফসল রামচরিত-মানসের 'বালখণ্ড—ছন্দ ও সুরের ভাষায় রসিক সমাজে নিবেদন করেন।

চল্লিশ রকমের ভারতীয় যন্ত্র ও আঠার-জন শিল্পী সমন্বয়ে—রচিত এই গীতি-নাট্যের স্রষ্টা ও পরিচালক ছন্দের যাদুকর শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। তাঁরই পরিকল্পিত।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হোলো এই যে নাট্যশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সকল রসের অবতারণা করা হলেও রামায়ণের মূল রস 'ভক্তি' রসের বাদীসুরের মতই ধ্বনিসমৃদ্ধ সংগীতের অতলে অনুক্ষণ অনুরণিত হয়েছে।

দোহা, ভজন ও বিভিন্ন রাগভিত্তিক গান সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করেছেন সর্বশ্রী রবি কিচলু, মালবিকা কানন ও ললিতা ঘোষ।

দোহা ও চৌপদীতে গ্রামীণ সুরের রেশ সৃষ্টি করেছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, দীপ্তি-প্রকাশ, শান্তা ব্যানার্জি, শশী শ্রীবাস্তব ও সাধনা বসু।

সেতার (কল্যাণী রায়) বাঁশী (গৌর গোস্বামী), সানাই (আলি আহম্মেদ), সন্তুর (দুলাল রায়)—বিভিন্ন তালবাদ্যের বিপরীতে বেজে উঠে এক জমকালো নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছে।

শ্রীমতী মণিকা রায় ও বিমলা গোদ্দারের সম্পাদনা ও সংগীত-সম্পদ উভয় বস্তুর সামঞ্জস্য। উৎসবের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধু-দাস শাস্ত্রী তাঁদের ভাষণে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

এই মহৎ প্রয়াসের জন্য শ্রীঅদ্রিজা মুখোপাধ্যায় ও নমিতা চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ।

ডিস্কে আগমনী পূজা উপহার

এবারের পূজা সিরিজে তিনটি এল পি ডিস্ক রসিক সমাজের গোচরে আনছেন মেগাফোন কোম্পানী।

সংগীত গুরু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ১২টি রাগ—ললিত, জিলাবিলাস্বিত, তিলক-কামোদ, যোগ, ভৈরবী, গাড়া, সিন্ধুড়া বেহাগ, মারু-খাম্বাজ, মালগুঞ্জ, কীর্তন সংকলনে বিভিন্ন রাগের বিবর্তনধারায় রাগ-ভাবের বৈচিত্র্য ত আছেই। উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া যায় যৌবনের আলাউদ্দিনের উচ্ছ্বাসের সংগে প্রৌঢ় আলাউদ্দিনের সমাহিত প্রশান্তি।

বেগম আখতারের বার খানি গজলের মধ্যে সুবিখ্যাত 'দিওয়ানা বানান হ্যায়' 'খুন দিলকা জো কুছ', 'জাবানী আসকে সে' এবং আরও অনেক গানে গজলের উদ্দামতার অন্তরালের জমাট বাঁধা বেদনা আভাসিত।

আর একখানি এল পি ডিস্কে—কানন দেবীর সেই অতুলনীয় কণ্ঠের রঙিন মায়ায় পাখা মেলেছে 'মুক্তি', 'বিদ্যাপতি' ও 'সাথী'র অবিস্মরণীয় গানগুলি। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় 'ওগো সুন্দর', 'অংগনে আওব', 'তোমারে হারাতে পারি না', 'রাখাল রাজারে' এসব গান যুগের সীমা অতিক্রম করে যুগান্তরের মানুষকে মুগ্ধ করবার ক্ষমতা রাখে—শিল্পী ও শিল্পসৃষ্টি উভয় কারণেই।

গান ছাড়াও যে কণ্ঠ আর শোনা যাবে না স্বর্গত সেই জহর গাঙ্গুলী অভিনীত 'রামের সুমতি'ও পূজো সংখ্যার এক উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন।

এঁরা ছাড়াও এখনকার জনপ্রিয় শিল্পী-দের মধ্যে আছেন—উৎপলা সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, অখিল বন্ধু ঘোষ। তরুণ শিল্পীদের মধ্যে—সলিল মিত্র, শংকর ব্যানার্জি, ফ্যান্সি রায়, মলয় বন্দ্যো-পাধ্যায় ও সুনন্দা ভট্টাচার্য।

বিশেষ দুটি ই পি ও এস পি ডিস্কের মধ্যে আছে—গুরু ও শিষ্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের দুটি রেকর্ড। ভীষ্মদেবের কণ্ঠে রাগপ্রধান। কানন দেবীর কণ্ঠে শোনা যাবে দুটি রবীন্দ্রসংগীত 'একদিন চিনে নেবে' ও 'কাছে যবে ছিনু'।

রেকর্ড জগতে নতুন তারকার আবির্ভাব

বোম্বাই চিত্রজগতের সর্বজনপ্রিয় আভি-নেতা ও প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী কিশোরকুমারের পুত্র শ্রীমান অমিতকুমার বোম্বাই এবং কলকাতার বহু গানের আসর ইতিমধ্যেই মাতিয়ে তুলেছেন। এবার পূজায় এইচ এম ভি রেকর্ডে তার দুটি বাংলা গান প্রকাশিত হবে।

গান দুটি সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লিখেছেন বোম্বাই-এর প্রখ্যাত গীতিকার মুকুল দত্ত। আর সুর দিয়েছেন স্বয়ং কিশোরকুমার। রচনার বাক-চাতুর্য এবং সুরের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় এই প্রথম রেকর্ডখানিই শ্রীমান অমিতকুমারকে রেকর্ড জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। অমিতকুমার তার স্বনাম-ধন্য পিতা কিশোরকুমারের সংগে বিদেশ সফরকালে বহু অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। তাই তার প্রথম রেকর্ডখানি শুধু এদেশেই নয়—বিদেশেও বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। আমরা অমিতকুমারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

ধ্রুপদ সংগীত অনুষ্ঠান

ফরাসী ইনস্টিটিউট এ্যালায়েন্স ফ্রানসিসের আমন্ত্রণে চন্দননগরের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক শ্রীবিপ্রদাস নন্দী ধ্রুপদ সংগীত পরিবেশন করেন। দুই ঘন্টা বিভিন্ন তালে ও রাগে আর্টিট ধ্রুপদ শোনায়। প্রত্যেক গানের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করায় বিদেশী শ্রোতাদের সংগীতের রস গ্রহণের কোন অসুবিধা হয়নি। এঁর সংগে স্বৈত মৃদংগ সংগত করেন ভারত প্রসিদ্ধ মৃদংগবাদক শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ মিত্র ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রেঃ শ্রীকালিশংকর মিত্র। পরে শ্রীমান কালিশংকরের 'মৃদংগ লহরা' অতীব মনো-গ্রাহী হয়। শ্রোতারা শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন হলে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় সংগীতবিদ শ্রীকালু কাওয়াল মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেন-গুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের শিল্পীদের দ্বারা নৃত্যবিচিত্রা ও 'উষা সন্ধ্যা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণা রায়, পাপড়ি বোস, অনুপশংকর, কানাই মজুমদার, ঝুমানী চৌধুরী, মিতা পাল, শিপ্রা সেন, কস্তুরী দত্ত, অনিতা ঘোষ, কৃষ্ণন বোস ও নীরেন্দ্রনাথের নৃত্যকলায় দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়। নৃত্যনাট্য উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা, রমাপদ সেনগুপ্তা, মলয় গাংগুলী প্রভৃতি সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন। সূত্রধরের ভূমিকায় ছিলেন বিমল সাহা ও অভিমান ব্যানার্জি। 'উষা সন্ধ্যা' নৃত্যনাট্যের রূপক ছিলেন শ্রীজে সি গাংগুলী।

—চিত্রাংগদা

শারদীয় অমৃত
১৩৮০

মহালয়ার আগেই প্রতি বছরের মতো বিশিষ্ট রচনা ও
চিত্রশোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

এবার উপন্যাস লিখছেন

আশাপূর্ণা দেবী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীর রক্ষিত

একটি বিস্ময়কর ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

তাছাড়া, প্রায় দু ডজন গল্প,
একটি পূর্ণদীর্ঘ শিকার কাহিনী,
এবং সুনির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ এবং
নিবন্ধ, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, গৃহসজ্জা ইত্যাদি
বিষয়ে সুলিখিত সচিত্র রচনা।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ডের শেষ তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ২২৬ রানে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ২—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' এবং সেই সঙ্গে উইসডেন ট্রফি জয়ী হয়েছে। এই নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যে ১৫টি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যাণ্ডের 'রাবার' জয় ৭ বার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' জয় ৬ বার এবং 'রাবার' অমীমাংসিত ২ বার। এই ১৫টি টেস্ট সিরিজের ৬১টি টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : ইংল্যাণ্ডের জয় ২০, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় ১৮ এবং খেলা ড্র ২৩। ১৯৬৩ সাল থেকে ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে 'রাবার' বিজয়ী দলকে 'উইসডেন ট্রফি' দিয়ে সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। এপর্যন্ত 'উইসডেন ট্রফি' জয়ী হয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩ বার (১৯৬৩, ১৯৬৬ ও ১৯৭৩) এবং ইংল্যাণ্ড ২ বার (১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক রোহন কানহাই টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসের ৪টি উইকেট খুইয়ে ৩৩৫ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের খেলার সূচনা কিন্তু ভাল হয়নি। দলের মাত্র ৮ রানের মাথায় ১ম এবং ৮৭ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। শেষে ৩য় উইকেটের জুটিতে লয়েড (৬৩ রান) এবং কানহাই (নট আউট ১৫৬ রান) ১৩৮ রান যোগ করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। কানহাই ১৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। এখানে উল্লেখ্য, এইদিন কানহাই তাঁর সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৬০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন। তাঁর ৭৪টি সরকারী টেস্ট খেলায় মোট রান দাঁড়ায় ৬০৭০। কানহাইয়ের আগে মাত্র ৭ জন খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ৬০০০ রান পূর্ণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্সের রানই সর্বাধিক—৮৯টি টেস্টে মোট ৭৯৩২ রান।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের প্রথম ইনিংসের ৬৫২ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ডের মাটিতে এই ৬৫২ রানই ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় **ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সর্বাধিক রানের রেকর্ডে** পরিণত হয়। এ বিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ছিল—

রোহন কানহাই

৫৫৮ রান, নটিংহাম, ১৯৫০। দ্বিতীয় দিনে ৭ম উইকেটের জুটিতে জুলিয়ান (১২১ রান) এবং সোবার্স (১৫০ নট আউট) ২৩১ রান যোগ করে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৭ম উইকেট জুটির সর্বাধিক রানের রেকর্ড করেন। এ বিষয়ে পূর্ব রেকর্ড ছিল—১৫৪ রান (ও জি স্মিথ এবং জে ডি সি গডার্ড, নটিংহাম, ১৯৫৭)। সোবার্স তাঁর ১৫০ রান তুলে নট আউট থেকে যান। টেস্ট খেলায় সোবার্সের এটি ২৬তম সেঞ্চুরী। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান **প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক টেস্ট** সেঞ্চুরীর বিশ্ব রেকর্ড (২৯টি) ভাঙতে সোবার্সের আরও চারটে সেঞ্চুরী দরকার।

দ্বিতীয় দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের ৩টে উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৮৮ রান তুলে একেবারে কোণঠাসা হয়েছিল।

তৃতীয় দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ২৩৩ রানের মাথায় শেষ হয়। যেখানে 'ফলো-অন' থেকে অব্যাহতি পেতে ইংল্যাণ্ডের ৪৫৩ রানের প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৩৩ রান তুলেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৬৫২ রানের (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ) থেকে ইংল্যাণ্ড ৪১৯ রানের পিছনে পড়ে যায়। ইংল্যাণ্ড 'ফলো-অন' করে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে পুনরায় কোণঠাসা হয়। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে স্কোর বোর্ডে ইংল্যাণ্ডের মাত্র ৪২ রান দাঁড়ায়, ৩টে উইকেট পড়ে।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের ৪৫ মিনিট পরে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৩ রানের মাথায় শেষ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ২২৬ রানে জিতে যায়। স্বদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের এটি বৃহত্তম পরাজয়ের নজির। বিদেশের মাটিতে ইংল্যাণ্ডের বৃহত্তম পরাজয়ের নজির আরও শোচনীয়—এক ইনিংস ও ৩৩২ রানে (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেন, ১৯৪৬-৪৭)।

গারফিল্ড সোবার্স

বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার গারফিল্ড সোবার্স এই তৃতীয় টেস্ট খেলায় মোট ৬টি ক্যাচ নিয়ে একটি টেস্ট খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ ধরার বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। সোবার্সের আগে এই ৮ জন খেলোয়াড় একটি টেস্ট খেলায় ৬টি করে ক্যাচ ধরেছেন : শ্রুস ব্রবী (ইংল্যাণ্ড), ভগলার (দঃ আফ্রিকা), উলি (ইংল্যাণ্ড), গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া), মিচেল (দঃ আফ্রিকা), রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া) এবং কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড) এবং ই ডি সোলকার (ভারতবর্ষ)

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৬৫২ রান (৮ উইকেটে ডিক্লঃ ফ্রেডরিকস ৫১, কানহাই ১৫৭, লয়েড ৬৩, সোবার্স ১৫০ নট আউট, জুলিয়ান ১২১ রান। উইলিস ১২৮ রানে ৪ এবং গ্রেগ ১৮০ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ২৩৩ রান (ফ্রেচার ৬৮ এবং গ্রেগ ৪৪ রান। হোল্ডার ৫৬ রানে ৪, বয়েস ৫০ রানে ৪ এবং গিবস ৩৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১৯৩ রান (ফ্রেচার ৮৬ নটআউট। বয়েস ৪৯ রানে ৪, জুলিয়ান ৬৯ রানে ৩ এবং গিবস ২৬ রানে ৩ উইকেট)

ইউনিভার্সিয়াড গেমস

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী মস্কো শহরে ৭ম ইউনিভার্সিয়াড গেমস (ওয়ারল্ড স্টুডেন্ট গেমস) মহা আড়ম্বরের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে। দশদিনের এই ক্রীড়ানুষ্ঠান বিভিন্ন দেশের একাধিক অলিম্পিক পদক বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় ৭০টি দেশের প্রায় ৪,৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন মোট ১৩৪টি পদক (স্বর্ণ ৬৮, রৌপ্য ৩৬ ও ব্রোঞ্জ ৩০) জয়ের সূত্রে প্রথম স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয়

৭ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের জিমন্যাস্টিকে তিনটি স্বর্ণপদক বিজয়িনী রাশিয়ার কুমারী ওলগা কোরবাট

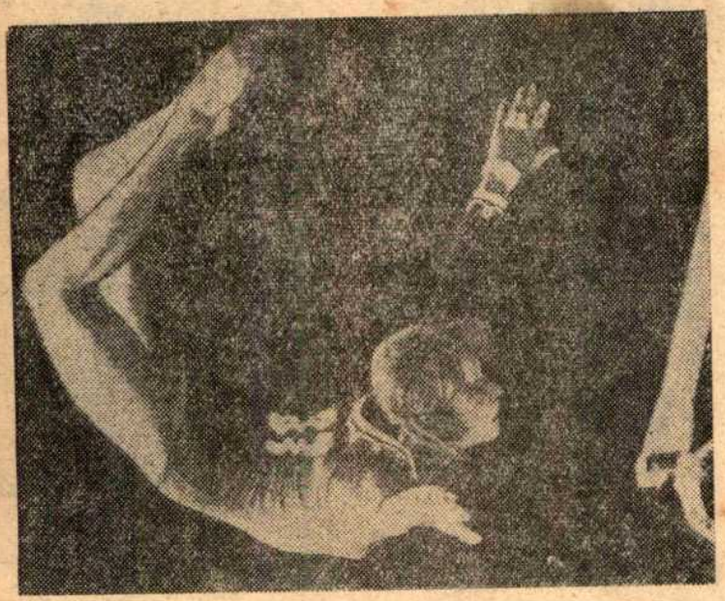

ফেইনা মেলনিক (রাশিয়া) ৭ম ইউনিভার্সিয়াড গেমসের ডিসকাসে স্বর্ণপদক বিজয়িনী (দরত্ব ৬৪-৫৪ মিঃ)

স্থান পেয়েছে আমেরিকা—মোট পদক ৫৩ (স্বর্ণ ১৯, রৌপ্য ১৫ ও ব্রোঞ্জ ১৯)। প্রতিযোগিতায় যেখানে রাশিয়া ৬৮টি স্বর্ণ পদক পেয়েছে, সেখানে আমেরিকা মাত্র ১৯টি স্বর্ণ পদক সংগ্রহ করে স্বর্ণ পদক জয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। আমেরিকার এই ১৯টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে তাদের সাঁতারুরাই ১৬টি স্বর্ণ পদক সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মাত্র একটি স্বর্ণ পদক পেয়ে আমেরিকা অ্যাথলেটিকস শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

ভারতবর্ষ অ্যাথলেটিকস, কুস্তি এবং টেনিস—এই তিনটি বিভাগে অংশ গ্রহণ করে মাত্র একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। এই ব্রোঞ্জ পদকটি পেয়েছেন ফ্রি-স্টাইল বিভাগে এস এল ভারুতে।

চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকা
(প্রথম চারটি দেশ)

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৬৮	৩৬	৩০
আমেরিকা	১৯	১৫	১৯
রুমানিয়া	৪	৭	৮
জাপান	৩	৮	১

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা নানা অপ্রিয় ঘটনায় কলুষিত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগানের সুপার লীগের খেলায় এক শ্রেণীর দর্শক মাঠের মধ্যে এবং গ্যালারিতে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই বিক্ষোভের মুখে পড়ে একাধিক নিরীহ খেলোয়াড় এবং বেশ কিছুসংখ্যক দর্শক আহত এবং দৈহিক নির্যাতন ভোগ করেন। মারাত্মক ফাউল করে খেলার জন্যে একাধিক খেলোয়াড়কে রেফারী সতর্ক করে কয়েকজনকে মাঠ ত্যাগ করার আদেশ দেন। খেলার শেষে মোহনবাগানের খেলোয়াড় সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদারের প্রচণ্ড ঘুষিতে রেফারী বিশ্বনাথ দত্ত মারাত্মকভাবে জখম হয়ে শেষপর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হন। এইসব ঘটনা ফুটবল খেলার স্বার্থে খুবই নিন্দনীয় এবং বিপদজনক নজির।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার রেফারীরা সুপার লীগের খেলা পরিচালনা বয়কট করেন। অপরদিকে টালিগঞ্জ অগ্রগামী এবং বি এন রেলওয়ে দল নির্ধারিত দিনের খেলায় মাঠে অনুপস্থিত থাকায় এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সুপার লীগের খেলায় এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ৬ পয়েন্ট, মোহনবাগান ৩ পয়েন্ট, টালীগঞ্জ অগ্রগামী ২ পয়েন্ট এবং বি এন রেলওয়ে ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। এই অবস্থায় ইস্টবেঙ্গলের মুকুটের মধ্যেই ১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগের লীগ-খেতাব পৌঁছে গেছে। সরকারীভাবে ঘোষণার যা অপেক্ষা।

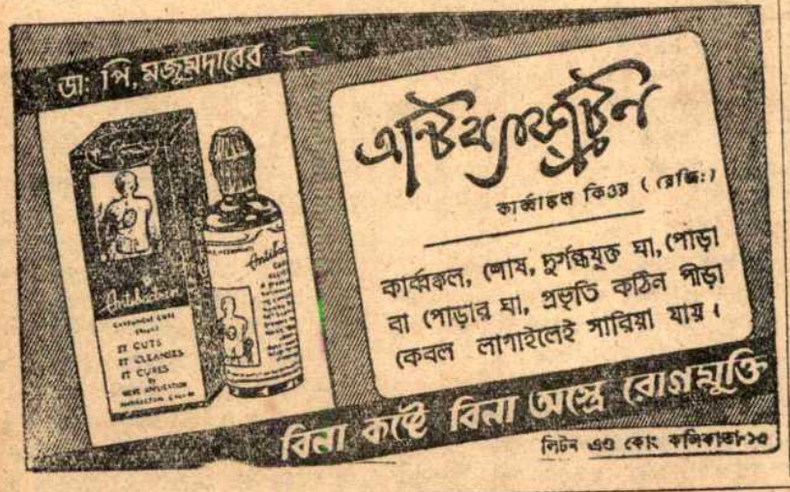

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কী সুন্দর মধুর হাসি

SD.6/70

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3

AMRITA

Friday 31st Augus
Phone : 55-5231 (14

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

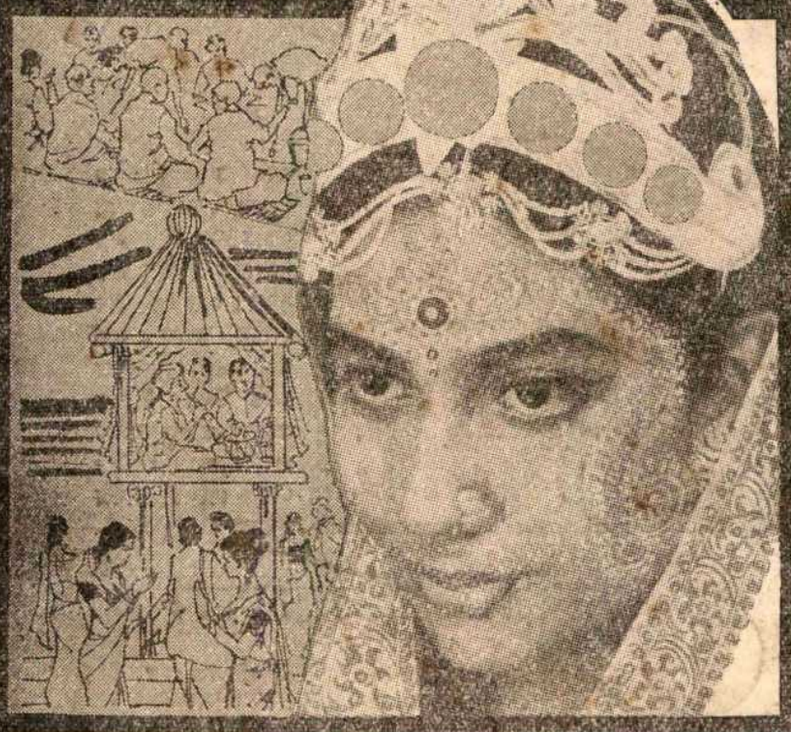

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেলে
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

4 SEP 197

অমৃত

সম্পাদক • শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ

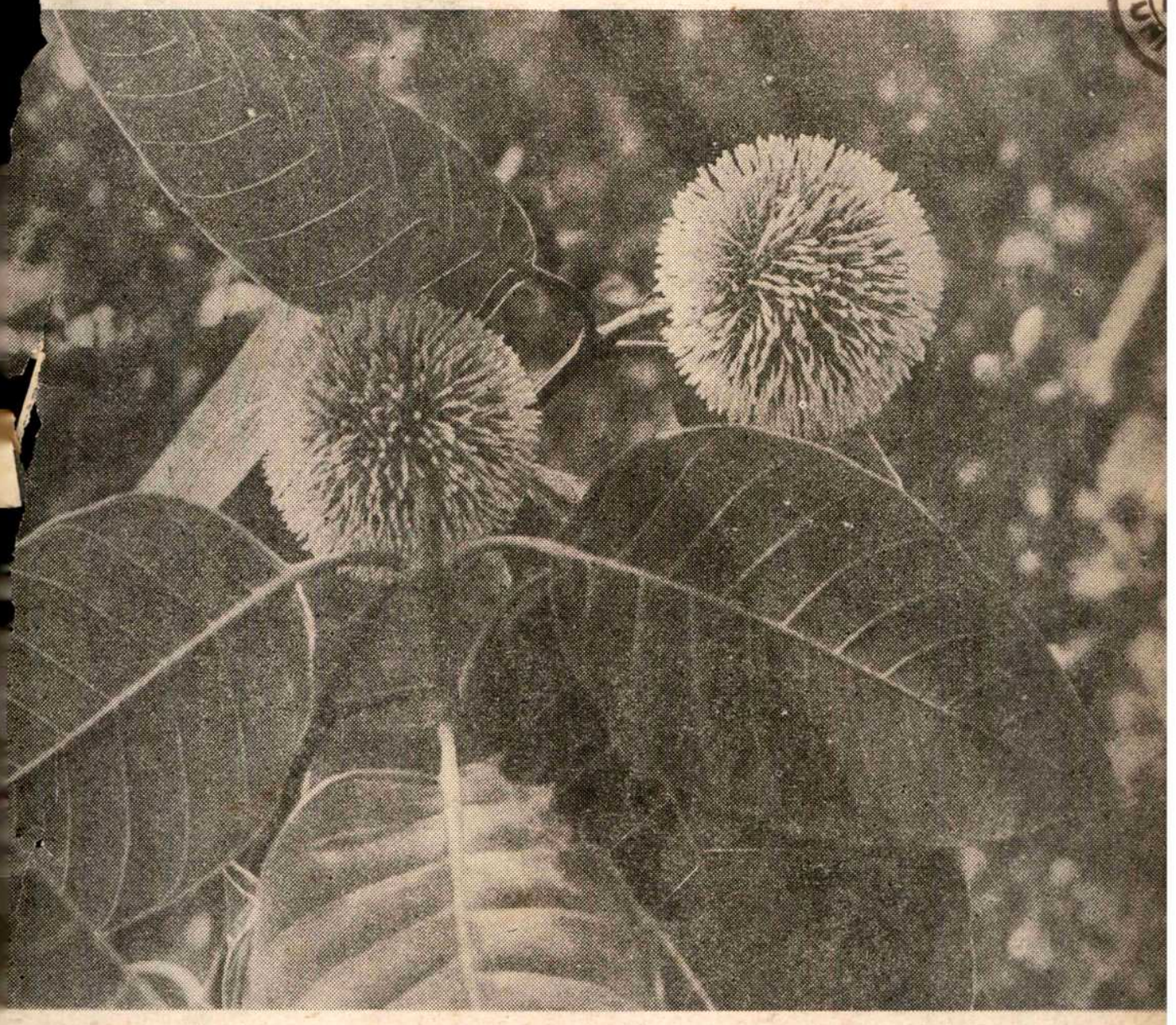

৩ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা] শুক্রবার, ২১ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফলগুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮৯

নিখিলচন্দ্র সরকারের নবতম উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

ধ্রুপদী উপন্যাস সব সময়েই কালোত্তীর্ণদের অঙ্গীকার-চিহ্নিত। বস্তুতঃ সমকালের খণ্ডিতরুচি, সস্তা বাহবার মধ্যে এরা নিঃশেষিত নয়। কারণ বোধ হয় এই, এখানে জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাসবোধ, জীবন-নির্ভর সত্যনিষ্ঠ, মানবিকতা ও ভালবাসার প্রতিশ্রুতি। সর্বোপরি এক বিশাল গভীর অনুভূতির ব্যঞ্জনা। এই উপন্যাসটিও একটি ধ্রুপদী উপন্যাস। ভালবাসা-ব্যর্থতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, গভীর জীবন-উপলব্ধি, পারস্পরিক স্নেহ-মমতা, বেঁচে থাকার তাৎপর্য—এগুলোই এই কাহিনী-বৃত্তির কেন্দ্রসূত্র। লেখক ঈর্ষনীয় দক্ষতা, গভীর সহানুভূতি, নিষ্ঠা আর বিশ্বাস নিয়েই প্রতিটি চরিত্র এঁকেছেন।

ভূতপূর্ব মন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্রের নতুন গ্রন্থ

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০,

ফণিভূষণ ভট্টাচার্যের অভাবনীয় রচনা

নৌ-বিদ্রোহের ইতিকথা ৮·০০

নিগুঢ়ানন্দের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

ভালবাসার আলোয় আধুনিক মানসের এক জটিল গ্রন্থি-মোচন এই বর্তমান উপন্যাস, যে আলো ইতিহাস আর বিজ্ঞান, রাজনীতি আর সাহিত্য, জীববিদ্যা আর স্থাপত্যকে এক করে মিলিয়েছে একটি বসন্ত-পুষ্পের মধ্যে।

নারায়ণ সান্যালের নবতম গ্রন্থ

গজমুক্তা শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের অমর সৃষ্টি

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হচ্ছে

যশস্বী ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নবতম উপন্যাস

আর এক সাজে ৬·০০

উচ্ছৃংখল ও বেপরোয়া জীবন থেকে নিজের স্বামীকে স্বপ্ন-মধুর জগতে ফিরিয়ে আনতে এক অসহায় নারী নিজের সাধ-আহ্লাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়েছিল। দেখতে চেয়েছিল স্বামীকে এক নতুন সাজে—নিজের জীবনের বিনিময়েও তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর.....

ডঃ জয়গুরু গোস্বামী প্রণীত

চারণকবি মুকুন্দদাস ২৫,

সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ

গল্প মাণঘর ১৪,

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

মোগলসরাই জংশন ৪,

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নতুন উপন্যাস

যুগ স্বাক্ষর ১০

নীলকণ্ঠের গল্পগ্রন্থ

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা ১০,

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

উত্তরাংশ ৯,

প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপন্যাস

গন্ধ গেলেন পরাশর বর্মা ৫,

ফণিভূষণ আচার্যের উপন্যাস

পঞ্চ কন্যা ১২,

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫,

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

যদি জানতেম ১০,

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভ্রমণ-কাহিনী

রূপসী প্রতিবেশী ১২,

দীপক চৌধুরীর উপন্যাস

কুমারী কন্যা ৮,

সুনীলকুমার ঘোষের উপন্যাস

ড্যাফোডিল হাউস ৮,

শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ-কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে

ব্রজপর্ব ১০, ॥ বনপর্ব ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

পূর্ব পুরুষ

প্রথম খণ্ড ৮, ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ১২,

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২ আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফূর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

Shilpi-SPL 1A/73 ban

১৩শ বর্ষ

অমৃত

১৮ সংখ্যা

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 7th September 1973 শুক্রবার, ২১ ভাদ্র ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১১	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১২	যদি-না পদ্মের সঙ্গে	(কবিতা)	—শ্রীমণীন্দ্র রায়
১৩	অনুপমের দিন	(গল্প)	—শ্রীকল্যাণ সেন
১৭	পশুচিন্তা : সেকালে-একালে		—শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২৩	নতুন বই		
২৫	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩১	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৩৩	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৭ই আশ্বিন
(২৪শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের

পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে
তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ
॥ সমগ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৪·০০
উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১৪·০০ টাকার স্থলে ১১·৯০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১৮২·০০ টাকার স্থলে ১৫৪·৭০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সমস্ত অনিবার্য-কারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাক মাশুল বা ভাড়া স্বতন্ত্র।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ৭০০০১২
ফোন : ৩৪-১৭৪২

বিদ্যোদয়ের বই

সর্বজনপাঠ্য সর্বকালের উপন্যাস
দীনেশচন্দ্র ভট্টোপাধ্যায়ের
নীল ঘূর্ণি ৭·০০
কালের জয়ডঙ্কা বাজে ৪·০০
মনোরঞ্জন ঘোষের
পরিবর্তন ৩·৫০
শিবরাম চক্রবর্তীর
চোরের পাল্লায় চকর্‌বর্‌তি ৩·০০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ময়ূরপঙ্খী ৬·০০
মকরমুখী ৬·০০
সাগরদাঁড়ী ৭·০০
সমরজিৎ করের
ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি ৩·২৫
প্রবন্ধ ও চিরায়ত সাহিত্য
ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের
শতাব্দীর শিশুসাহিত্য ১০·০০
শ্রীমন্তকুমার জানার
রবীন্দ্র মনন ৮·০০
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের
অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০
নিখিল সেনের
এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০
নারায়ণ চৌধুরীর
সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০
ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের
রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০·০০
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের
লেখকদের প্রেম ৩·০০
কানাই সামন্তের
চিত্রদর্শন ২৫·০০
মোহিতলাল মজুমদারের
কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০
সাহিত্য-বিচার ৮·৫০
বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০
বাংলার নবযুগ ৮·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। মনোনীত রচনার খবর দু-মাসের মধ্যে জানান হয়। অমনোনীত রচনা কনভেনশন ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি-অর্ডার যোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২৫.০০	টাকা ৩০.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১২.৫০	টাকা ১৫.৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৬.২৫	টাকা ৮.০০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

মহাত্মা শিশিরকুমারের

—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

অমিয় নিমাই চরিত

(৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি খণ্ড (১ম, ৪র্থ ও ৫ম) ৩.০০
(২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ) ৪.০০

কালাচাঁদ গীতা

৪র্থ সংস্করণ ৩.০০

নিমাই সন্ন্যাস

(নাটক) ২য় সংস্করণ ২.০০

নরোত্তম চরিত

৩য় সংস্করণ ২.০০

লর্ড গৌরাঙ্গ

(২টি খণ্ডে) (ইংরাজী) প্রতি খণ্ড ৩.০০

নরোত্তম চরিত

(হিন্দী) ২.০০

নয়শো রূপিয়া ও বাজারের লড়াই

(নাটক) ২.০০

সর্পাঘাতের চিকিৎসা

(৮ম সংস্করণ) —১.৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE

De-luxe Ed. — Rs. 6.50

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSE

Popullar Ed — Rs. 5.50

প্রাপ্তিস্থান :—

পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৮	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪০	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৪১	কখনো দিন, কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৪৫	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৪৭	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫১	কালো পাখী		—শ্রীঅতুল চক্রবর্তী
৫৩	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৫৫	হিমঘরের হীরক	(গল্প)	—শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত
৫৮	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৯	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৭	সাতদিনের সদাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬৯	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৬	জলসা		—চিত্রাঙ্গদা
৭৭	বাঙলাদেশের ছবি		—আনোয়ার আহমেদ
৭৯	খেলাধুলো		—শ্রীদর্শক

।। নতুন উপন্যাস ।।

কুমারেশ ঘোষ

মধুরেণ ২·৫০

ডাঃ বাসুদেব

কার্নিভালে খুন ৩·০০

কৌশিক রায়

রহস্যের নায়িকা ২·৫০

সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়

চারণ কবি মুকুন্দ দাশ ৩·০০

সত্যবান

তন্ত্র পরিচয় ৭·০০

লিপিকা—৩০।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

শেকস্‌পীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে যা থাকছে:—সমগ্র সনেট ভেনাস অ্যান্ড এ্যাডোনিস, দি রেপ অফ লিউক্রস টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা, কমেডি অব এরর্স টেমিং অফ দি শ্রু, লাভস্ লেবারলস্ট এ মিড সামার নাইট ড্রীম, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, য়্যাজ ইউ লাইক ইট রোমিও জুলিয়েট। প্রত্যেকটি নাটকের নাট্যরূপ (আক্ষরিক বাংলায় অনুবাদ) দিচ্ছেন বাংলার বিশিষ্ট ও [illegible] সমালোচকেরা। [illegible] প্রতি খণ্ড ১০৲। সবকিসিনে বাঁধাই। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

সোপাঁসা রচনাবলী **টলস্টয় রচনাবলী**

গিরিশ রচনাবলী **সমগ্র বঙ্কিম**

দামোদর রচনাবলী **রাজনারায়ন রচনাবলী**

ভূদেব রচনাবলী **হেমচন্দ্র রচনাবলী**

[illegible]—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ২ খণ্ডে, প্রতি খণ্ড ১০ টাকা। সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ৫৲ টাকা। গ্রাহক হবার মনি অর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র:—জ্যোতি প্রকাশন, ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯। অন্যান্য কেন্দ্র:—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ-১২, ফোন: ৩৪-৮৩৫৬। পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলিঃ-৯, ফোন: ৩৪-৯৫৯২ ॥ টাউন লাইব্রেরী, বনগাঁ ॥ গ্রন্থভারতী, জলপাইগুড়ি ॥ চয়নিকা, কুচবিহার ॥ বইঘর, আলিপুরদুয়ার ॥ বোলপুর পুস্তকালয়, বোলপুর ॥

চিঠিপত্র

এই আমাদের দেশ প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত 'এই আমাদের দেশ' প্রবন্ধে প্রচুর পরিমাণে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে প্রতি সংখ্যাতেই। কিছু কিছু চিঠিপত্রও লেখা হচ্ছে সে সম্পর্কে। এ-ব্যাপারে দু-একটি নিদর্শন তুলে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত পঁচিশে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে বর্ধমানে চারিটি মহকুমা আছে। কিন্তু সবলেই জানেন যে বেশ কিছুদিন যাবৎ দুর্গাপুর একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা হয়ে বর্ধমান জেলাতে মোট পাঁচটি মহকুমা দাঁড়িয়েছে। লক্ষাধিক লোকসংখ্যার শহর শুধু বর্ধমান, আসানসোলই নয় বহুদিন যাবৎ দুর্গাপুর লক্ষাধিক লোকসংখ্যা অতিক্রম করেছে। এবং আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে যে, এই জেলাতে মোট তিনটি ইস্পাত কারখানা যথা—দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানা ও বার্নপুর ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যান্ড ষ্টীল কোম্পানি অবস্থিত।

জ্ঞানানন্দ শী
অমল দাস,
দুর্গাপুর।

(২)

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকায় শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'এই আমাদের দেশ' ফিচারে বর্ধমান ১ এবং বর্ধমান ২ পড়ে মর্মাহত হয়েছি। তিনি প্রকৃত তথ্যের অনেক কিছুই বাদ দিয়ে গেছেন।

প্রথম সংখ্যায় ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর আর এক কর্ণধার রাসবিহারী বসুর নাম লেখেননি।

উল্লেখ করা যেতে পারে রায়না থানার সুবলদহ গ্রামে রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গত নেতা হেমন্ত বসু তাঁর জন্মস্থানে একটি শহীদ বেদীও নির্মাণ করেন।

বর্ধমানের কুলীনগ্রামে মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন বলেই তিনি কুলীন গ্রামের সব ঐতিহ্য সেবে দিয়েছেন।

কুলীনগ্রামের রথ, হরিদাসের আখড়া, গোপালের এবং গোপেশ্বরের মন্দির ইত্যাদি কোন কথাই তিনি উল্লেখ করেননি।

একথা ঠিক শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্বে রথ টানবার জন্য পটুডোরী আনবার কৃপাদেশ করেছিলেন।

এই কৃপাদেশের মধ্যে একটি গূঢ় ভজনের ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

'কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্ট-ডোরী লঞা।'

আর চৈতন্যদেবের শিষ্য ঠাকুর হরিদাস একটি কীর্তনীয় সমাজ গঠন করেছিলেন যা হরিদাসের আখড়া নামে খ্যাত।

'কুলীনগ্রামের এক কীর্তনীয় সমাজ,
তাহ নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ।।'

শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরামের পূজা খুব কমই পশ্চিমবাংলায় হয়। পুরানো কবিরা বলেছেন—

'বামনাপাড়ায় বলরাম বন্দি ভক্তি করে।
বোড়োগ্রামের বলরামে নত কৈনু শির।।'

সেই বলরামের পূজা রায়না থানার বোড়োগ্রামে আজও চলে আসছে কিন্তু তিনি উল্লেখ না করায় আশ্চর্য হলাম।

জামালপুর থানার সাদিপুরের মদনমোহন, হাড়ালার বিপত্তারিণী, কাঁপড়ার ভুবনেশ্বরের মন্দির বাদ পড়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হীরালাল বসু
বর্ধমান।

(৩)

আমি অমৃতের পাঠক। 'এই আমাদের দেশ' শীর্ষকে ২৪ পরগণার কথা লেখার সময়ে বনগাঁ মহকুমার (লোকসংখ্যা ও আয়তন ছাড়া) কোন কথা লেখেননি।

জানি না তিনি কিভাবে ২৪ পরগণার কথা লিখলেন—যেখানে গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি শ্রেষ্ঠ মহকুমার কথা কিছুই লেখা হয়নি।

২৪ পরগণার কথা লিখতে গেলে বনগাঁ মহকুমার অবদান যথেষ্ট, সেখানে তাকে বাদ দিয়ে কোন ইতিহাস হয় না।

'পথের পাঁচালী'র লেখক কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নীলদর্পণ' খ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, স্বর্ণলতার লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু এইটুকু লিখলেও বনগাঁ মহকুমার কথা লেখা হয়। অথচ এঁদের প্রত্যেকেই বিশ্ববিখ্যাত। এঁদের কথা অন্তত লেখা উচিত ছিল।

তাছাড়া ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয় 'যবন ঠাকুর হরিদাস', 'হীরাবাঈ' এবং রাজা প্রতাপাদিত্যর নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। বনগাঁ মহকুমার ইতিহাস নির্মল মুখোপাধ্যায় 'ইতিহাসের বনগ্রাম' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সব কাহিনী ছাড়া তা আরও ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

ক্ষুদ্র শিল্পের দিকে বনগাঁ মহকুমা পিছিয়ে নেই। এখানের শতকরা ৭৫ জনকে এই শিল্পের ওপর নির্ভর করতে হয়। এখানে দুই শতাধিকের বেশী চিরুনি শিল্পের কারখানা আছে। (যশোহর চিরুনি নামে পরিচিত)। এছাড়া শিক্ষার মানও যথেষ্ট উন্নত।

ভারতের বিখ্যাত নার্শারী 'ভারত নার্শারী' এই বনগাঁ মহকুমায়। ২০০ শত একরের উপরে জমিতে এই নার্শারী। এছাড়া এখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত ফরেষ্ট আছে।

—নির্মলকুমার বিশ্বাস
বনগাঁ, ২৪ পরগণা

(৪)

শ্রীযুক্ত যোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'এই আমাদের দেশ' পর্যায়ের ২৪ পরগণা-(২) শীর্ষক রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা-বলা প্রয়োজন মনে করছি। আলোচ্য রচনায় শ্রীমুখোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এবং তা থেকে আমরা জেলার বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে জেনেছি। এই জেলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা এলাকা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই স্থানের কোনও উল্লেখ নেই। অবশ্য লেখক স্বীকার করেছেন 'ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থান উল্লেখযোগ্য। বিস্তারিতভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা এই নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়, তবু কিছু কিছু স্থানের কথা না বললে ২৪ পরগণার পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।' আমার মনে হয় এই 'কিছু কিছু স্থানের' মধ্যেও গোবরডাঙ্গা উল্লেখের দাবী রাখে। সুতরাং এই বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই।

এই এলাকার খাটুরা গ্রামের মন্দিরে বাগানে বাস করতেন বিদ্যাসাগর-ছাত্র প্রধর্ম বিধবা বিবাহকারী শ্রীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়। কঙ্কণ বাওড়ের ধারে তাঁর বাড়িটি আজও বর্তমান। স্থানীয় 'নববিধান' ব্রহ্ম সমাজের উদ্বোধন করেছিলেন মনীষী কেশবচন্দ্র সেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রামতনু লাহিড়ী অনেকদিন যাবৎ গোবরডাঙ্গার জমিদার পরিবারের নাবালক ছাত্রদের অভিভাবক ছিলেন। এছাড়া রামধন বিদ্যালঙ্কার, ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, আচার্য মুরলীধর শাস্ত্রী, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী, হাসিরাশি দেবী প্রমুখ স্থানীয় সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের অন্যতম। এই সম্বন্ধে আর একজনের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন ভারতবিখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ আচার্য প্রমথনাথ বসু। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পার্শ্ববর্তী গৈপুর গ্রামে। আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গজননীর এই বিস্মৃত সন্তান স্মরণীয় হলেও আজ বিস্মৃত।

সুখেন্দু দাস
খাঁটুরা, ২৪ পরগণা।

সম্পাদকীয়

স্বস্তির নিঃশ্বাস ঃ শান্তির আশা

সিমলা বৈঠকে যার সূত্রপাত সাম্প্রতিক দিল্লি চুক্তিতে তার একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি। চুক্তিটা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলেও গোটা উপমহাদেশের শান্তি ও স্বস্তি এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের মুক্তির পর পাকিস্তানী এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত কমান্ডের কাছে। বাংলাদেশ সরকারের ইচ্ছাক্রমেই সেই নব্বুই হাজার যুদ্ধবন্দীকে ভারতে এনে আটকে রাখা হয়। এই যুদ্ধবন্দীদের ছাড়া হবে কিনা তা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষ। ভারতের কিছু করণীয় তাতে ছিল না। ইতিমধ্যে আরও কতগুলো সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্তানে বহু বাঙালী আটকে পড়েন। বাংলাদেশেও থেকে যায় বহু পাকিস্তানী নাগরিক যারা অবাঙালী। বাংলাদেশ সরকার পরিষ্কার বলে দেন, এই পাকনাগরিকদের পাকিস্তানে নিয়ে যেতে হবে। ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নাগরিকদের অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রাষ্ট্রই জায়গা করে দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার দাবি জানান, পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের তারা স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে চান। যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধাপরাধে অপরাধী তাদের বিচার হবে। নৃশংসতা, গণহত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও নারীধর্ষণের অভিযোগ আছে যাদের বিরুদ্ধে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

পাকিস্তান সরকার এর কোনোটাতেই রাজি ছিলেন না। তাঁরা সকল যুদ্ধবন্দীদের বেকসুর খালাস ও প্রত্যাবর্তন চান। বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাক নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে তাঁরা অস্বীকার করেন এবং পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ খাড়া করে তাদেরও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তানের আলোচনা মোটেই সহজ ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে নানা পর্যায়ে এ সম্পর্কে চিঠিপত্র বিনিময় ও আলোচনা চলে। ভারত গোড়া থেকেই বলে আসছিল, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে পাকিস্তান এ সম্পর্কে সরাসরি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসুক। ভারত সহায়ক হিসেবে তাতে যোগ দিতে রাজি। পাকিস্তান এই সহজ সত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃত হওয়াতেই চুক্তি সম্পাদনে এত দেরি হয়। সুখের কথা এই যে, বাংলাদেশ সরকারের ধৈর্য, সংযম ও সহিষ্ণুতা এবং ভারতের মানবিকতাবোধ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে শেষ পর্যন্ত এই জটিল সমস্যা সমাধানের সূত্র পাওয়া গেছে। দিল্লি চুক্তি তারই স্বাক্ষর।

চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান সমস্ত আটক বাঙালীদের ফেরৎ দিতে রাজি হয়েছে। পরিবর্তে তারা বাংলাদেশ থেকে পাক নাগরিকদের একটা মোটা অংশ ফিরিয়ে নিতে সম্মত। এই মোটা অংশের পরিমাণ কত তা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় ঠিক করবেন। এতে পাকিস্তান বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকারের প্রশ্নটিও পরোক্ষভাবে মেনে নিল। কারণ স্বীকৃতি না দিলে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসবেন না, একথা তাঁরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। মানবিকতার কারণেই বাংলাদেশ সরকার ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছাড়া বাকি সব যুদ্ধবন্দীকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত এই লোক বিনিময় কাজ সমাধা না হচ্ছে ততদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার স্থগিত থাকবে এবং তারা ভারতের হেফাজতে থাকবে। এই হল চুক্তির মোট কথা। এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারত এই চুক্তির জন্য গোড়া থেকেই দাবি জানিয়ে আসছিল। ভারত তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে থাকতে চায়। পাকিস্তানের ক্ষতি সে যেমন চায় না, পাকিস্তান বাংলাদেশের ক্ষতি করুক এটাও ভারত বরদাস্ত করতে পারে না। বাংলাদেশকে স্বীকার না করে পাকিস্তান অশান্তি ও উত্তেজনা জীইয়ে রেখেছে। আশা করা যায়, এই চুক্তির পর পাকিস্তান তার ভুল সংশোধন করবে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। অনেক প্রাণের মূল্যে তারা এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। পাকিস্তান এই সত্যকে স্বীকার না করলে স্থায়ী শান্তির আশা নেই। ঘটনাচক্রে আজ হয়তো পাকিস্তান বুঝতে পেরেছে যে, অস্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবকে সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। পাকিস্তান যাদের মুরুব্বি বলে মনে করে তারাও এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, দিল্লি চুক্তির পরেই পাকিস্তানের প্রতিনিধি আজিজ আহমেদ পিকিং যাচ্ছেন। হয়তো বা সলাপরামর্শের জন্যই। সে যাই হোক, আমরা আশা করব, চুক্তির শর্ত পাকিস্তান পালন করবে। কারণ এর সঙ্গে রাজনীতির চেয়েও মানবিকতার প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। যুদ্ধবন্দীরা দীর্ঘকাল আটক রয়েছে। নিরপরাধ বাঙালীরা পাকিস্তানে অকারণে যন্ত্রণা ভোগ করছেন। বাংলাদেশের পাক নাগরিকরাও স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষমান। এদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিল্লি চুক্তি কার্যকর হওয়া উচিত। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েই আছেন। পাকিস্তান সরকার সেই মৈত্রী ও সহযোগিতার পথে এগিয়ে এসে তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন এবং এই উপমহাদেশে বহুপ্রতীক্ষিত শান্তির আশাকে সফল করে তুলুন।

দেশে বিদেশে

কাম্বোডিয়ার ১নং হাইওয়ের ওপর প্রচন্ড যুদ্ধের পর ছেলেরা শেল বা রকেটের অংশ সংগ্রহ করছে বাড়ীতে সাজিয়ে রাখবার জন্য।

দীর্ঘ এগার দিন ধরে নয়াদিল্লীতে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিরা দীর্ঘ, জটিল ও ক্লান্তিকর আলোচনা করে যে চুক্তিতে এসে পৌঁছেছেন, সেটা কার্যকর করার পথে যেসব বাধা আসতে পারে তার লক্ষণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে উঠছে। এই চুক্তির কিছু কিছু অংশ কার্যকর করার জন্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন হবে আবার কিছু কিছু অংশ কার্যকর করার জন্য ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার দরকার হবে। এই ধরনের আলোচনা যে শুধু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতেই সেটা চুক্তির মধ্যেই পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মোদ্দা কথা হল, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকার না করে নেওয়া পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে আলোচনাও হবে না আর দিল্লি চুক্তি পুরোপুরি কার্যকর করাও সম্ভব হবে না।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা আশ্চর্য মনে হবে যে, ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লিতে এত দীর্ঘ আলোচনা চালাবার পর আজ যখন যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরে পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে তখনই পাকিস্তান আবার বেসুরো কথা বলছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো ও দিল্লি আলোচনায় তাঁর প্রধান প্রতিনিধি আজিজ আহমেদ দুজনই বলেছেন, বাংলাদেশকে এত তাড়াতাড়ি তাঁরা স্বীকৃতি দেবেন না. এই স্বীকৃতি দেওয়ার আগে তাঁদের আরও অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। তাঁদের মতে যেসব বিষয় মীমাংসা না হলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে না সেগুলির মধ্যে একটি হল দুই দেশের মধ্যে অবিভক্ত পাকিস্তানের দেনাপাওনার ভাগবাঁটোয়ারা।

কূটনীতির ভাষায় বলা হয়, আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনা হচ্ছে যুদ্ধেরই বিস্তার। ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, পাকিস্তান এই নীতিতেই বিশ্বাস করে। রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ তার হার হয়েছে সেই যুদ্ধই চালিয়ে যাচ্ছে আলোচনার ক্ষেত্রে এবং যতক্ষণ পারবে সে তা চালিয়ে যাবে।

*

সিমলা চুক্তিতে যেসব বিষয় অস্পষ্ট রাখা হয়েছে তাদের অনেকগুলিই দিল্লি চুক্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সিমলা চুক্তিতে কতকগুলি নীতি ও উদ্দেশ্যের ঘোষণার অতিরিক্ত আর বড় বেশি কিছু ছিল না। সেই ঘোষণার উপর ভিত্তি করে দিল্লি চুক্তিতে কিছু বাস্তব কর্মপন্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মপন্থার মূল কথাগুলি হল:—(১) পাকিস্তানে আটক বাঙালীরা বাংলাদেশে ফিরে আসবে। (২) বাংলাদেশের অধিবাসী বেশ কিছু সংখ্যক অবাঙালীকে পাকিস্তান ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশবাসী অবশিষ্ট বাঙালীদের নাগরিকত্বের সংজ্ঞা নিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা হবে। (৩) ১৯৫ জন বাদে পাকিস্তানী সামরিক ও অসামরিক যুদ্ধবন্দীরা দেশে ফিরে যাবেন। যে ১৯৫ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আছে বাংলাদেশে তাদের বিচার হবে কিনা সেটা নিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা হবে। প্রশ্নটির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী ভারতের হেফাজতে থাকবে। (৪) এ ত্রিমুখী প্রত্যর্পণ চলবে একসঙ্গে, একটার পর একটা নয়।

যে তিন শ্রেণীর মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা আছে তাদের মধ্যে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা ছাড়া আর দুই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা কত, এই প্রশ্নের কোন সুমীমাংসা কিন্তু এখনও হয় নি। স্বভাবতই বিভিন্ন চুক্তিতে এই দুটি সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। আর এখানেই এই চুক্তি নিয়ে ভবিষ্যতে জটিলতা বাধার একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা পি এন হাকসর বলেছেন যে, প্রথম কিস্তিতে পাকিস্তান বাংলাদেশের অধিবাসী কতজন অবাঙালীকে ফেরৎ নেবে সেবিষয়ে পাক-

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

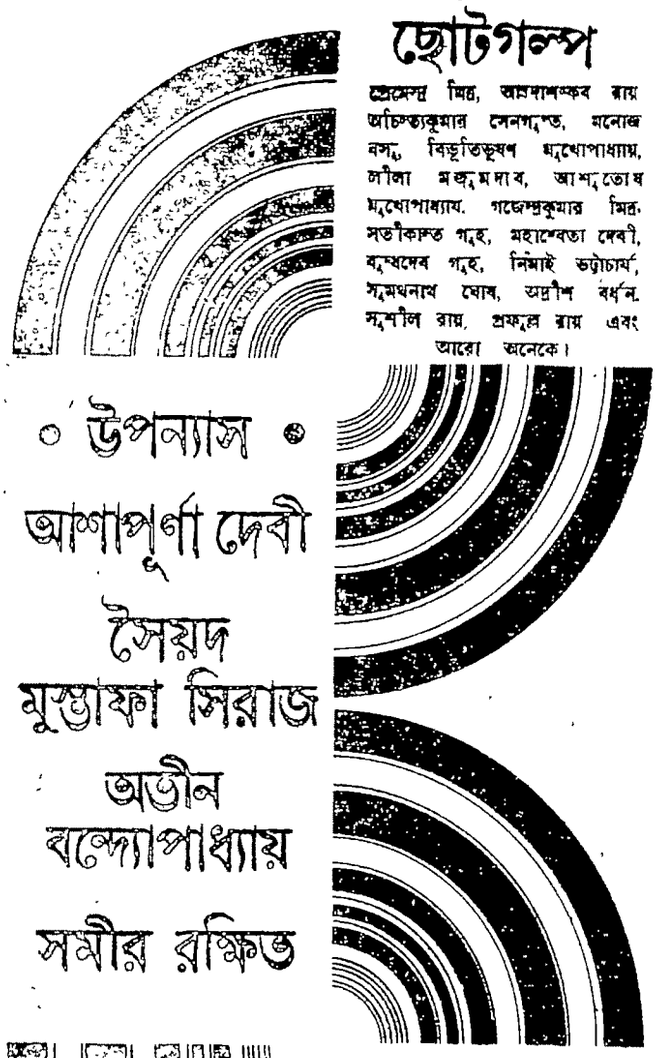

আলিপুর চিড়িয়াখানায় 'সাদা বাঘিনী' 'চন্দনী' চারটি সাদা বাচ্চা প্রসব করেছে সম্প্রতি।

স্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা 'বোঝা-পড়া' আছে। এমন কোন 'বোঝাপড়া'র ইঙ্গিত অবশ্য চুক্তির বয়ানের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি।

ভারতবর্ষের অন্য সব রাজনৈতিক দলই এই চুক্তিকে স্বীকৃতি জানালেও জনসংঘ কিন্তু এর বিরোধিতা করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সমালোচনার একটি মূল বিষয় হল সংখ্যাগত এই অস্পষ্টতা। জনসংঘের বক্তব্য হল, যুদ্ধবন্দীদের ঘাড় থেকে নামাবার জন্য তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভারত বাংলাদেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে এবং এমন একটা সম্ভাবনার সামনে তাকে ফেলে দিয়েছে যেখানে তাকে অবাঞ্ছিত পাকিস্তানী নাগরিকদের বোঝা বহন করতে হবে। (মৌলানা ভাসানির মত বাংলাদেশের বিরোধী নেতারা একই সুরে কথা বললে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না।)

কিন্তু, লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকার জনসংঘের মত সংশয় প্রকাশ করেন নি, তাঁরা বরং এই চুক্তিকে নিঃসর্তভাবে স্বাগত জানিয়েছেন।

এর কারণ কি সেটা হয়ত পরে বোঝা যাবে।

এটা একরকম ঠিক যে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী নাগরিকদের যে সংখ্যা (২,৬০,০০০) ঢাকা থেকে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামাবাদ সেই সংখ্যা কখনই মেনে নেবে না। প্রথম কিস্তিতে যে পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে তাদের সংখ্যা এর ধারেকাছেও নিশ্চয়ই যাবে না।

কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে, বাংলাদেশ সরকার যে ২,৬০,০০০ সংখ্যাটা উল্লেখ করেছিলেন সেটা কতকটা ভবিষ্যতে দর কষাকষির সুবিধা হবে মনে করে তাহলে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। দিল্লি আলোচনার একটা পর্যায়ে যে বাংলাদেশ থেকে যত লোক পাকিস্তানে যাবে, পাকিস্তান থেকে তত লোক বাংলাদেশে আসবে, এমন একটা প্রস্তাব হয়েছিল তাতেই এই ধরনের একটা অনুমান করা যায়। ২,৬০,০০০ সংখ্যাটি যেমন পাকিস্তান মানে না; বাংলাদেশও তেমনি পাকিস্তানবাসী বাঙালীর সংখ্যা সম্পর্কে পাকিস্তান রেডক্রসের দেওয়া সংখ্যা (১,৫৬,০০০) মানে না।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, সংখ্যাসমস্যার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার অসুবিধা ছিল। কারণ, তাহলে মানবিক সমস্যাটি অস্বীকার করা হত। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানবাসী বাঙালীদের মধ্যে শতকরা বেসরকারি কাজ করেন তাঁরা সকলে এখনই তাঁদের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে না চাইতে পারেন।

এবং নিশ্চয়ই মনে করার কারণ আছে যে, পাকিস্তানবাসী ২০৩ জন বাঙালী পাল্টা বিচারের হুমকি তুলে নেওয়ার পর এখন পাকিস্তান "অবশিষ্ট অবাঙালীদের ফেরৎ নেওয়ার ব্যাপারটাকে বাংলাদেশের উপর চাপ দেওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহার করবে। ভুট্টো নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন, আরও কিছু অবাঙালীকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার লোভ দেখিয়ে বাংলাদেশকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার স্থগিত থাকতে বাধ্য করাতে। বাংলাদেশ এতে রাজি হবে কিনা সেটা সম্পূর্ণরূপে তার নিজের ব্যাপার। চুক্তির মধ্যে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ভারতকেও তিন পক্ষের এক পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু ভারত ও বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী 'যুক্ত-কমান্ড' গঠন করে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল সেহেতু ভারত এব্যাপারে অনিবার্যভাবেই পক্ষভুক্ত হবে। কিন্তু এটা ঠিক যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তকে ভারত কোনরকম ভাবেই প্রভাবিত করবে না অথবা বাংলাদেশ তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রশ্নটিকে কিভাবে ব্যবহার করবে সেবিষয়েও ভারত কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। এদেশে জনসংঘ ও বাংলাদেশে মৌলানা ভাসানির অনুগামীরা যাই বলুন না কেন, পাকিস্তানের সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার সময় ভারত বাংলাদেশকে সবটাই অনুপস্থিত তৃতীয় পক্ষ হিসাবে এই আলোচনার সঙ্গে যুক্ত রেখেছে এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারত এক পাও এগোয় নি।

৩১-৮-৭৩ —পুণ্ডরীক

যদি-না পাপের সঙ্গে ॥ মণীন্দ্র রায়

যদি-না পাপের সঙ্গে—
যদি-না সাপের বলয়ে-বাঁধা
বিষাক্ত-মধুর সেই বুকে,
কী লাভ ছিল তোমার মুখবধির স্বর্গে?
কী লাভ তোমার গেলাশ গেলাশ অমৃতে?

জানি, তোমার ঐ
অনন্ত জ্যোৎস্নার বিছানার রূপকথার কাহিনী,
আর ঐ সুবর্তুল মুক্তোর মতো মুহূর্তগুলি।
অন্ধকারকে তারা ধারণ করতে পারে না কোনদিনই,
যেমন পারে—ধস্-নামা ভাঙা পাহাড়ের খাঁজে
আদিম কোনো গুহা;
ঐ সর্বনাশ আর দ্রোহই আমাদের জন্ম;
ঐ অন্ধকারের পাঁড়নই আমাদের
খুঁচিয়ে তোলে, খ্যাপায়;
আর তাইতো আমরা শাস্তিগুলোকে
সাজিয়ে তুলতে পারি স্বপ্নে!
কী লাভ ছিল বল সেই ভয়ঙ্করের-চেতনা-হারানো
হাজার বছরের দাসত্বে,
সুখের পায়ে যেখানে বিকিয়ে দিতে হয়
শিরদাঁড়ার সাহস!

না, আমি ছুঁড়ে ফেলেছি
তোমার ঐ ভালোবাসার কুহক;
রক্তে আমার ধারণ করেছি
শয়তানের মন্ত্রণা;
আর বিষাক্ত-মধুর ঐ বুকে আমি
উড়িয়ে দিয়েছি আমার নিশান;
বজ্র যদি নামে আমার এই স্পর্ধায়, তবে নামুক;
গন্ধকের সেই অগ্নিবাষ্পের নরকে তবুও চিরকাল
জ্বলতে জ্বলতে আমি বলে যাবো শুধু, না—।

আমার এই তর্ক আমাকে চাবুক মারবে, মারুক;
আমার এই বেয়াড়া বুদ্ধি তাড়িয়ে বেড়াবে
এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে, জানি;
আর সময় একটা পাগলা হাতির মতো
শুঁড় দিয়ে টেনে উপড়ে ফেলবে আমার ঘর,
আর আমার নারীর নিশ্বাস থেকে
ছিটকে বেরোবে শুধু আগুন, আমি জানি!
আর তবুও আমি
ক্রমাগত শুধু জ্বলতে থাকব আর ভাঙব,
আর ভাঙতে ভাঙতে বদলাবো, যেন শিল্প,
যেন সন্ধ্যার আকাশে অতিপ্রাকৃতিক
রঙ আর আদলে বদলাবদলি মেঘ,
ঐসব মুখের মতো পাহাড়, আর পাহাড়ের মতো গম্বুজ,
ঐসব বাইসন আর বন্য, আর তৃষ্ণা, এবং হাহাকার,
ঐ অপরূপ নীলে জাফরানি ঝিলের মমতা,
আর দিগন্ত থেকে উঠে আসছে তবু
ক্ষুধিত একটা নৃমুণ্ড-শিকারীর মতো রাত্রি,
অথবা মৃত্যু!.....

যদিনা শয়তানের সঙ্গে—
কে শেখাতো এই শূন্যের তাঁবুতে
আগুনের রিঙের মধ্যে বাঘ ছোটানোর সাহস,
অথবা জীবন!

সেই লোকটি

কলকাতার এক বিখ্যাত স্কোয়ারে তিন সন্ধ্যে তেরাত জুড়ে হরেক কিসিমের গানের মেলা বসেছিল একবার। তখনও আমরা পুরোপুরি লায়েক হয় নি, মনের এখানে ওখানে কিছু কিছু কাঁচা থেকে গেছে। মানুষ দেখলে হাঁপিয়ে উঠি না, ছুটি-ছাটায় গাঁ গঞ্জে যাই, আউল-বাউল ধরে গান শুনি। লোকগীতি শোনার কেমন একটা ঝোঁক ছিল টাটকা বোহিসাবী রক্তের ভেতর, খাঁটি রূপবান গান শোনার জন্যে তো একবার কোচবিহারের হাওয়াবগাড়ি গাঁয়ে ঢুকে বিপত্তির একশেষ।

উদ্যোক্তারা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন যে, তাঁরা দ্বিতীয় দিনের গানের আসরে পট-সংগীত শোনাবেন। শহুরে লোকজনের ভিড়ের জন্যে বীরভূম আর মেদিনীপুরের চারজন সেরা গাইয়ে-পটুয়াকে তাঁরা ধরে নিয়ে আসছেন। এ আয়োজন কলকাতার নাকি হাল-আমলে এই প্রথম।

আমাদের বাইরের ঘরের দেয়ালে ঠাকুর্দার আমল থেকে ঝুলত পাটের কাপড়ে আঁকা এক বিকটদর্শন মুখের ছবি। বাবা বলতেন —যমপট। পটের তলার দিকটা ছিল অনেকখানি গোটানো, তেমন কেউ এসে সুতো খুলে দেখানো হত। ছবির শেষভাগে ছিল বেশ কিছুটা লেখার কাজ—মন্ত্রের মত সে লেখা। বহুদিনের পুরোনো জিনিস, রং ধরে এসেছিল, অনেকখানি, তবু ধুলো ও সময়ের পুরু আস্তরণ ভেদ করে টলটলে রঙিন জলের মত পটের ছবির আভা আমার চোখ কাড়ত। কত সময় একাএকা চুপচাপ চেয়ে থেকেছি ঐ ছবির দিকে।

যখন শুনলাম, দূর গাঁ থেকে পটিদাররা আসছেন ম্যাডক্স স্কোয়ারের আসরে গান গাইতে, তখন থেকেই বুকের ভেতর চাপা উত্তেজনা মাগুর মাছের মত ঘাই দিয়ে উঠছিল। সন্ধ্যে হতে না হতেই পেট পুরে জলখাবার খেয়ে আসরের দিকে পা বাড়ালাম।

প্যান্ডেলের ভিতরে ঢুকে দেখি গিসগিস করছে লোক। একজন তরুণ প্রেম আর মায়া দিয়ে আধুনিক গাইছেন— একটার পর একটা, ননস্টপ-হাততালির চোটে কলকাতার সমস্ত ঘুলঘুলি, কার্নিশ থেকে সমস্ত পায়রা ডানা ঝটপট করতে করতে উড়ে যাচ্ছে। নাছোড়বান্দা শ্রোতাদের কাছ থেকে বহু কষ্টে নিষ্কৃতি পেলেন গায়ক-প্রবর। এবং তারপরই আসরের বুক ফাটিয়ে শুরু হল এক খুল্লম্ খুল্লা সুরৎ নর্তকীর চটুল পায়ের নাচ। ঝনঝন পায়েল বাজছে, ভদ্রমহিলা তাঁর বরাঙ্গের নানা লহর তুলে হঠাৎ হঠাৎ ত্যারচা নজর ছুঁড়ছেন, তামাম জোয়ান-মদ্দ দর্শকদের দিল একেবারে হু-হু করে লাফিয়ে উঠছে।

নাচ শেষ হল। কিছুক্ষণ পরে ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেল—এবার পট-সংগীত শোনাবেন মেদিনীপুরের প্রখ্যাত পটিদার কেনারাম।

এক হাতে একটি লাউতুম্বা, আরেক হাতে এক গোটানো পট নিয়ে একজন সুঠাম চেহারার প্রবীণ ব্যক্তি আসরে প্রবেশ করলেন। পরনে ময়লা হাফশার্ট, আটহাতি ধুতি, কাঁধে একটি বিবর্ণ হলদেটে চাদর।

যেন সার্কাসের ক্লাউন দেখছে, এইভাবে কৌতূহলী লোকজন ঝুঁকে পড়ল মঞ্চের ওপর। সবাইকে পূর্ণ-কবজোড়ে প্রণাম করলেন কেনারাম পটিদার। ধীরে ধীরে বিশাল ধড়ের সঙ্গে থাকে থাকে মেলে ধরলেন নিয়নে-ধাঁধানো কলকাতার চোখের ওপর এক অতি-প্রাচীন পট। তারপর একবার মাথা নুইয়ে বললেন, কর্তাবাবুরা, আদেশ দেন, যম-পটের জগন্নাথ-বন্দনা আপনাদের ছিচরণে পেশ করি আজ্ঞে। সবাই কৌতুকের সঙ্গে তাঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বৃদ্ধ ভাঙ্গা মেঠোগলায় গুন-গুনিয়ে গান ধরলেন—

হরি হরি বলরে ভাই ঠাকুর জগন্নাথ।
যার নাম নইলে খণ্ডন যাবে না পাপ।।
আষাঢ়ে দ্বিতীয়ার চন্দ্র রথবিজয় হল।
মহাপ্রভুর রথের ধ্বজা উড়িতে লাগিল।।

শ্রোতারা উশখুশ করতে লাগল। দু-এক

শ্রোতারা উশখুশ করতে লাগল। দু-এক

মিনিটের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল—সিটি, চেয়ার-ঠকঠক, তারপর খিস্তি, গালাগাল সমেত ঘনঘন হাততালি। অন্তভুক্ত বন্ধু ভাবলেন, সবাই তাঁকে তারিফ করছে, ফলে তিনি তন্ময় হয়ে সাপ-খেলানো সুরে গেয়েই যেতে থাকলেন। হঠাৎ সশব্দে এক-পাটি জুতো এসে মঞ্চের ওপর পড়ল। পটি-দার চোখ মেলে বিস্ময়ে দেখলেন, প্যান্ডেল-শুদ্ধ লোক তাঁকে যেন মারতে ছুটে আসছে।

দুজন উদ্যোক্তা এসে তাঁকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বারবার ফ্যাল-ফ্যাল করে তিনি চাইছিলেন তাদের দিকে, যাদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর রেলভাড়া ও নগদ টাকা দিয়ে এতদূর টেনে আনা হয়েছে।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী-সিল্ক-তাঁত
মিলবস্ত্র-গোমাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

অনুপমের দিন

কল্যাণ সেন

কোথাও একটা ঘন্টার শব্দ উঠছে, মৃদু, ধাতব সেই শব্দটা অনুপম তার সমস্ত শরীরে টের পাচ্ছিল, রোমকূপের ভেতর, রক্তের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মিহি বাজনার শব্দ—চোখের সাদা অংশে, জানলার, ছাদের কোণায় দরজার মাথায় বোধহয় ভেঙে যাচ্ছে শব্দটা। অনুপম বাইরে তাকাল, কয়েকদিন বৃষ্টির পর তেজী রোদ গাছের শরীরে। বাড়ি, রাস্তার মুখ সব যেন পালিশ করা, নীল রঙের রোদ কী এখন তার আঙুলের ওপর উঠে আসছে? মাথা সামান্য ঝাঁকাল সে, অনেকগুলো কলকব্জার ঝনঝন ঝন-ঝন শব্দ; মাথার ভেতর কী পোকারা খাদ্য খুঁজে বেড়ায়? পাশ ফিরল অনুপম, জল-পেটের দিকে বিশ্রি একটা ব্যথা টের পাচ্ছে সে, কাল প্রায় সমস্ত রাত বৃষ্টির শব্দের মত তার সমস্ত শরীরে যন্ত্রণাটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল, টেবিলের ওপর থেকে অভ্যাসমত সবুজ ট্যাবলেট তুলে নিয়েছিল সে: আহ! স্নায়ুর ভেতর অসংখ্য সবুজ ঘুম নামছে—আহ! শীতের সুখী পাখির মত। এরকম ভাবে অনুপম, আসলে তার চোখ কুঁচকে যায়; জিভের ডগায় তেতো তেতো স্বাদ, ঘুম আসেনি তার, বুকের ভাঁজে বালিশটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছিল, দেয়ালের গায়ে তখন কার ছায়া বড় হচ্ছিল? আশ্চর্য! ছায়াটার কোনো মাথা নেই, তার রক্ত-কণিকায় সবুজ ঘুম; টেবিলের জলের গ্লাসটা কী সবুজ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তার মনে হয়েছিল কে যেন তাকে শাওয়ারের নিচে শুইয়ে রেখেছে, অনুপম জলের ভেতর জলকণা... বাইরে তখন কী জোর হাওয়া উঠছিল? মাতালের অসুস্থ চোখের মত চাঁদ কী তিন-তলার কার্ণিসে লেগে ফেটে যাচ্ছিল তখন? রাস্তায় কুকুরের নিয়মমত চিৎকার, একটু দূরের হাসপাতালের রোগীর অশ্লীল গোঙানি, মাথার ভেতর দিসে একটা গুডস-ট্রেনের চলে যাওয়া, অনুপমের হাত উড়ছিল,

পা, চোখের পাতা, দেয়াল থেকে দেয়ালে শব্দ ঠক ঠক ঠক...।

ঠিক সেই মুহূর্তে অনুপম টের পাচ্ছিল তার শরীর ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে আসছে, সেই কত বছর আগে মন্দারদের বাগানের চাঁপা গাছে ঝুলে থাকা একটা পাখির বাসার মত, না-কি একটা ধূসর গ্রহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছাই হয়ে এখন ভাসছে সে? পিঠের নিচের চাদরটা কী ভীষণ ঠান্ডা। দেয়ালের ছায়া কী মশারি ফুটো করে এগিয়ে আসছে, সবুজ হয়ে আসছে তার আঙুল? আমি কী তবে মরে যাচ্ছি? মৃত্যু...চাদর, বালিশ, মশারির সহস্র চোখ, টেবিলে নটরাজের মূর্তি, আর ফাটা চাঁদের আলোয় হাওয়ার ভেতর তিরিশ বছরের অনুপম চমৎকার ভাবে মরে যাচ্ছে, অনুপম আবছা ভাবে যেন দেখতে পাচ্ছিল তার খুব কাছে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে তোমরা? তার জিভ উল্টে যায়।

ধোঁয়ার মত সেই অদ্ভুত শরীরগুলো ক্রমশঃ হাওয়ায় ভেসে যায়;

—আমাকে ধরো; অনুপম কার দিকে হাত তুলেছিল তখন?

ঘন্টার শব্দটা শুনল সে। শরীর জুড়ে যেন জলতরঙ্গের বাজনা, চোখের ভেতর...এক দুই তিন পাঁচ আট,...বারো...সতেরো...বাইশ ...উঠে বসল অনুপম। মাথার ভেতর অদ্ভুত এক আরাম, হাঁটুর ভাঁজে আর ব্যথা নেই, কী ভীষণ সুখ তার বুকের শব্দের ভেতর, এর নাম বেঁচে থাকা। বাহ! হঠাৎ ইচ্ছে হয় একটানা স্কিপিং করতে, নাকি মাছ-বাকসে লাল রংয়ের মাছ হয়ে সাঁতার কাটছে সে? চুলের ভেতর হাত চালায় সে। দেয়ালে ছবিটা হঠাৎ চোখে পড়ল তার, নীল রং-এর মধ্যে সোনালি একট পাখি কোথায় উড়ে যাচ্ছে, নিচে সোনালি জল, আর খুব রুগ্ন দুটো মানুষের মুখ। ছবিটার নাম পড়ল সে, 'ডিজায়ার'। ছবির নীল রঙটা বড় শান্ত মনে হয় এখন। ইচ্ছে হয় যে পাখি কোন ঠিকানাহীন শূন্যে উড়ে যাচ্ছে, একবার তার পালক ছুঁয়ে দেখে সে অদ্ভুত! শঙ্কর কেন এই ছবিটার নাম রেখেছিল 'ডিজায়ার'। তারিখটা পড়ল এখন, বাইশে মে, সাতষট্টি.....আজ তিয়াত্তরের জুনের শেষ, কবে মারা গেছে শঙ্কর? কতদিন? আশ্চর্য! তারিখটা কিছুতেই মনে করতে পারল না এখন, সবটাই যেন মাথার ভেতর ফাতনার মত কেঁপে ওঠে। শুধু মনে পড়ে, শীত আর ঠান্ডা জ্যোৎস্নায় কুয়াশা ভেঙে ভেঙে তারা কয়েকজন শ্মশানে, নিয়ে যাচ্ছিল শঙ্করকে। বন্ধুর ঠান্ডা কঠিন দেহ তাদের কাঁধে, রাস্তায় শব্দ নেই, লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থেকে একটি নক্ষত্র ঠিক তাদের সঙ্গে সঙ্গে শব্দহীন হেঁটে যায়, শিপ্রাকে মরা প্রজাপতির মত আলোয় পুরনো ন্যাসপাতির মত লাগছিল তখন। প্রদ্যোৎ কী কিছু বলছিল শিপ্রাকে? শঙ্কর শুয়ে আছে খাটে, ওর কপালের চন্দন হাওয়ায় ফেটে যায়, সমস্ত পৃথিবীর গম্ভীর বিশ্রাম চুরি করে কোথায় যায় শঙ্কর? শুধু হিম, জ্যোৎস্নার ধুলো বং, আর শব্দহীন গোড়ালিতে তার বন্ধুরা হেঁটে যায়। শিপ্রার চোখে কী রুমাল ছিল তখন? এখন সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে ওঠে অনুপমের। রোদ্দুরের মধ্যে দেয়াল ডিঙিয়ে শঙ্করের সেই পাখি উড়ে যাচ্ছে, নিচে রুগ্ন দুই মানুষের মুখ। কেন আত্মহত্যা করেছিল শঙ্কর? ঠিক কোন শূন্যতা মৃত্যুর দরজায় নিয়ে যায় মানুষকে? বৃষ্টির পরের রোদে অনুপমের নখ জ্বলতে থাকে।

অনুপম দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল। ঘুরে তাকাল একবার, ঠিক, জানলা বন্ধ করতে ভুলে গেছে সে। আবার কী উঠে যাবে ওপরে? চারপাশে তাকাল অনুপম। বিশাল শহরকে পেঁয়াজের মত অসংখ্য ভাঁজে ভাঁজে কে খুলে ধরেছে, পচা শসার রঙের মুখ মানুষের বাদামি বুকে ঢেউ জাগিয়ে যুবতীরা কী কোনো পানশালায় চলে যায়? রোদ, বৃষ্টি-ভাঙা রোদ, অনুপমের চোখের ভেতর, বাসের গায়ে ঝুলে আছে সুখী পরিবার, ট্রামের দরজায় লোক লোক, লোক; সমস্ত শব্দ তার মাথায় ফাটে, সুপুরির গায়ের রং একটি মেয়ে ফুটপাথের ব্যাগ কিনছে। শূন্যে নীল সাম্রাজ্য ভেঙে ভেঙে চলে যাচ্ছে একটা প্লেন। শঙ্কর কী ওই প্লেন থেকে নিচে খুঁজে পাচ্ছে তাকে? হাওয়ায় তার শরীর কেটে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছি আমি? কারো সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল? অথবা ফোন করে জানতে চাইব, কেমন আছ? কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবো? একবার ভাবল, আবার তার তিনতলার ঘরে ফিরে যায়, আরও দুটো ট্যাবলেট খেয়ে, হালকা সবুজ সাবানের ফেনা হয়ে ভাসতে ভাসতে.....নিচে সোনালি জল, দুই রুগ্ন মানুষের কাতর চোখ, শঙ্কর তের সেই পাখির পায়ের নিচে কোনো বিশ্রাম নেই? আহ! বৃষ্টি! বৃষ্টি! তার ঘরের মধ্যে অসংখ্য বৃষ্টির উড়ে উড়ে আসা! চোখ বন্ধ হয়ে আসে তার, তেঁতুলতলার মাঠ দিয়ে মাউথঅর্গ্যান বাজাতে বাজাতে কে চলে যাচ্ছে এখন?

—দাদা কটা বাজে?

অনুপম দেখতে পেল, মানুষ, শব্দ, ফেরেপবাজি, ল্যাভেটারির টক গন্ধ, রিকসায় জামরুলের মত মহিলার পেট, তিন চার পাঁচতলা বাড়ি, কুকুরের পেছনে কুকুর, ট্রাফিক পুলিশের হাত বদল, গাছের ডালে লটকান নায়িকার ঠোঁট ছিঁড়ে নিচ্ছে সময়, ভিখিরির দিকে ছুড়ে ফেলা পয়সা, কাচের ওপিঠে সবুজ রঙের পুতুল, একটা বিশাল নগরদোলা হয়ে লাট খাচ্ছে এই শহরটা, অথচ সে কিছুই করছে না, শুধু ব্রেকডাউন বাসের মত সে দাঁড়িয়ে আছে একা।

এখন কী সে ময়দানের দিকে হেঁটে যাবে? দেখবে, কী করে কাঠবেড়ালির দুত

পূজোয় চাই নতুন বই

নতুন স্বাদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার

সলিল মিত্রের

দুর্গম দ্বীপের রহস্য ২·৫০
আন্দামানের বিভীষিকা ২·৫০

দে'তেহাসি কাষ্ঠহাসি মুচকিহাসি ও অট্টহাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর

অনেক হাসি ২·০০

পরিচয় গুপ্তের

খেয়ালী রাজার কান্ড ২·০০
ভূতের বিয়ে ২·২৫
লম্বুদার গল্প ২·০০
গোয়েন্দা সম্রাট লম্বুদা ২·৫০

সুরজিৎ মজুমদারের

ভূতের পাল্লায় ২·২৫

রহস্য ও রোমাঞ্চ ভরা এ্যাডভেঞ্চার

হরিপদ ঘোষের

রহস্যময় গুহা ২·৫০
বাঘের দেশে বিভীষণ ২·৫০

পারলৌকিক ও শিকার কাহিনী

ছায়া-কায়া ২·০০
জ্যান্ত বাঘের কবর ২·০০

রূপকথার গল্প

সুজিতকুমার নাগের

রূপকথার ঝাঁপি ২·০০

শ্যামল চক্রবর্তীর

দৈত্যের পাহাড়ে ২·০০

বিঃ দ্রঃ— ভি, পিতে বই লইতে হইলে কিছু অগ্রীম পাঠাইবেন

সূচীপত্র ৩৫সি, সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

চোখ সমস্ত মাঠময় ঘুরে বেড়ায়, অথবা কাঁধে মই নিয়ে যে হেঁটে যাচ্ছে, তার পেছন পেছন সেও হাঁটতে থাকবে। এ রকম বিকেলের ঠিক আগে রোদ গায়ে লাগলে কারো নাম ধরে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে খুব, অথবা ঘোলাটে জলের ওপর সন্ধ্যা.....একটা ভাঙা মন্দিরের অন্ধকার..বড় ইচ্ছে হয়, ডিজায়ার..সেই সোনালী পাখির সঙ্গে তখন কী তার মুখোমুখি দেখা হবে? হঠাৎ তার মনে হয়, এই শেষ জুনেই আজ হয়তো সমস্ত রাত কুয়াশা পড়বে, সাদা কুয়াশায় ঢেকে যাবে তার তিন-তলার ঘর, দেয়ালের ছবিটা হয়তো তার রঙ পাল্টাবে, খাটের পাশে আরশোলার হলুদ চোখ তাকে দেখবে, টেবিলে শিপ্রার চিঠি—অনুপম, একটা চাকরি না পেলে ...অদ্ভুত-এক দৃশ্যের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে সে, হ্যারিকেন দোলাতে দোলাতে পায়ে কুয়াশা মেখে কোথায় চলে যাচ্ছে একজন মুখঢাকা মানুষ; তার কাঁধের ওপর পাখির পালক, —দাঁড়া শংকর, আমিও তোর সঙ্গে যাব! শিপ্রা, একদিন তোমার আঙুলে মেখে দেব পাকা ধানের গন্ধ.....ডিজায়ার.....

একটা বিকট হর্নের শব্দে তার শরীর স্পষ্ট টুকরোয় ভেঙে গেল। দাঁড়িয়ে আছে সে। আর জলের মত ঘুরে ঘুরে তার চারপাশে চলে যাচ্ছে মানুষ। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা পুলিশ ভ্যান, রোদ মুছে যায়, তিন-তলার কার্নিস থেকে। এখন কোনো বাসস্টার মোড়ে বা দোকানে হঠাৎ বাসের সিঁড়িতে তার সঙ্গে দেখা হবে শংকরের? যদি শিপ্রার সঙ্গে দেখা হয়? কী করছে এখন প্রদ্যোৎ? অফিস থেকে ফিরে বারান্দায় বসে সকালের কাগজ পড়ছে? ঠোঁট মুছল অনুপম। শরীরের ভেতর উজান বয়ে যায়। আবার সেই মৃদু ধাতব ঘন্টার শব্দ রোমকূপের ভেতর।

হাত দিয়েই গেটের ঠান্ডা লোহার শরীরের স্পর্শ নিল অনুপম। নির্জন অন্ধকার, কেমন ভেজা ভেজা মনে হল চারদিক। শব্দ নেই। মিহি হাওয়া তার জামার ভেতর ঢুকে যাব, টের পেল সে, গাছের পাতায় জল। জলের ছোট ছোট শব্দ তার আঙুলে, নির্জনতার ভেতর আবার কী সবুজ ঘুম উঠে আসছে তার রক্তের ভেতর? গাছের ডাল ভেঙে আকাশ দেখতে চাইল অনুপম, ঝাপসা আকাশ, কথা নেই, পাখের শব্দ নেই, অথচ অন্ধকারের ভেতর নিজস্ব অন্ধকারে অনুপম দেখতে

বিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। দাম : ১৮-০০, ১ম খণ্ড ২০-০০

যাঁরা পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হবেন তাঁরা ২০% কমিশন পাবেন।

শংকর-এর

এপার বাংলা ওপার বাংলা চৌরঙ্গী

২৯শ মুদ্রণ ১০-০০ ২৪শ মুদ্রণ ১২-৫০

সার্থক জনম ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ৬-০০ **যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ** ২২শ মুদ্রণ ৬-০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **পৌষফাগুনের পালা** ৫ম মুদ্রণ ১৮-০০

নিমাই ভট্টাচার্যের **উইং কমান্ডার** ৩য় মুদ্রণ ৬-০০

বিমল মিত্রের **এর নাম সংসার** ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ১০-০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর **গল্প সম্ভার** দাম : ১৬-০০

অসবর্ণ নতুন উপন্যাস ৫-০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিদূষক আলোকপর্ণা উপনিবেশ

দাম : ৪-৫০ ২য় মুদ্রণ ১০-০০ তিন খণ্ড একত্রে ৮-৫০

বনফুলের **অধিকলাল** ২য় মুদ্রণ ৪-৫০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **নিশিপদ্ম** ৯ম মুদ্রণ ৪-৫০

ব্যর্থনায়িকা ২য় মুদ্রণ ৪-০০

অতুলপ্রসাদ সেন ১০-০০ ॥ সুরেশ চক্রবর্তী সম্পাদিত

দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৬-০০ ॥ ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়

ধর্মবিজ্ঞান ও শ্রীঅরবিন্দ ১২-০০ ॥ দিলীপকুমার রায়

ভবঘুরে ও অন্যান্য ৬-৫০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী

আমাকে বাঁচতে দাও আমাকে জাগতে দাও ৪-০০ ॥ মণীন্দ্র রায়

ওঙ্কার গুপ্তের **ব্যাপার বহুতর** সচিত্র ব্যঙ্গ রচনা ৫-০০

চাণক্য সেনের **তিন তরঙ্গ** ৩য় মুদ্রণ ৭-০০

শুধু কথা ২য় মুদ্রণ ৩-৫০

নমিতা চক্রবর্তীর **অহল্যা রাত্রি** দাম : ৯-০০

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় **শেষ কোথায়** দাম : ৫-০০

নবগোপাল দাসের **দুই নারী** দাম : ৬-০০

কয়েকখানি নাটক

বিমল মিত্রের **একক দশক শতক** ৩·৫০

গঙ্গাপদ বসুর নতুন নাটক **অপমানিত** ৩·৫০

নাট্যরূপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত

দেবনারায়ণ গুপ্তর **সাহেব বিবি গোলাম** ৩·০০ **দাবী** ৩, **শর্মিলা** ৩, **সীমা** ৩·৫০

রতনকুমার ঘোষের **সম্রাট** ২·২৫

ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র-র **লেবেডফ** ২·৭৫

ধনঞ্জয় বৈরাগীর **সৈনিক** ২·৫০

বাক্‌সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড্, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

পাচ্ছিল, অনেক মানুষ শুয়ে আছে, শব্দ-হীন।

—তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ আমাকে? হাওয়ায় জল ভেঙে পড়ে তার পায়ে। গোল হয়ে ঝুলে আছে নিচু আকাশ, ঝুঁকে পড়ে চেষ্টা করল নামগুলো পড়তে, পরিষ্কার দেখতে পেল না বৃষ্টিতে, রোদে ধুলোয় সব এখন ঢাকা পড়ে আছে; একটু একটু করে ঘাস উঠেছে বুকের ওপর। অনুপম ঠোঁট আঙুল রাখল, নক্ষত্ররা যখন এই মাঠ জুড়ে দাঁড়ায়, তোমরা কী কফিন ভেঙে উঠে এসে রাতের নীলাভ হাওয়ার ভেতর.... সেই রক্তের দুই মানুষের অবিকল দৃষ্টি, কোনোদিন কী তোমাদের গায়ে সোনালি পাখির পালক ঝরে পড়েছে? বকুলের গন্ধ তার স্নায়ুর ভেতর নেশার মত ওঠানামা করে, একটুকরো মোম এখন গলে গলে পড়ছে, হয়তো বিকেলে কেউ জ্বেলে দিয়ে গেছে; হলুদ, ঠান্ডা আলোয় তার ছায়া কী পড়েছে কোনো ফলকের গায়ে?

যাহারা ক্লান্ত, তাহারা প্রভুর চরণে বিশ্রাম করে। অনুতপ্ত হও, পরিত্রাণ লাভ করিবে। প্রভু যাহাদিগকে ভালবাসেন, তাহাদিগকে শীঘ্র কাছে টানিয়া লন। প্রভুর শরণ লও, কারণ তিনিই পথ।' একটি দুটি বকুল শব্দহীন ঝরতে থাকে; তাদের ভারী গন্ধ হলুদ আলোয় মিশে যায়; হাওয়া কী অনেক বৃষ্টি নিয়ে ছুটে আসছে? ওপরে আকাশ, একটা প্লেনের চোখ শংকর, তুই কী এখন দেখতে পাচ্ছিস আমাকে? বাইরে এখন ব্যান্ডেজ খোলা দগদগে ঘা নিয়ে বসে আছে সমস্ত শহরটা, বুকে হেঁটে যায় মানুষ, চায়ের দোকানে প্রেম রিকসাওয়ালার হাতের ছোট ঘন্টার মত হয়তো বাজছে এখন, লিফটের চোখ উঠে যাচ্ছে, ক্রমশ উঠে যাচ্ছে, ধর্মতলার গুমটিতে হয়তো এইমাত্র কেউ কাউকে ভুল ঠিকানা বলে দিচ্ছে, এক পাগল তাড়া করেছে কোনো টাটকা যুবতীকে, এই-সব..... এইরকম .... শব্দ .... কথা, ধোঁয়ার ভেতরে মুখ, আর অনুপম এখন তার সমস্ত অবয়বে টের পেল নির্জন হলুদ আলো, হাওয়ার ভেতর বকুল মেশান.....আহ! আমি কী এখন ঘাসের ভেতর শুয়ে পড়ব? রাতের বৃষ্টির শব্দ ঢেকে দেবে আমার শরীর, চোখে আঙুলে ওঠানামা করবে অসংখ্য পিঁপড়ে, যাহারা ক্লান্ত তাহারা প্রভুর চরণে.

আমি কি এখন দেখতে পাব, সোনালি এক পাখি, সোনালি জলের ওপর দিয়ে কোন ঠিকানাহীন শূন্যে খড়ে যাচ্ছে.....ঘাম; শরীর কেঁপে উঠল তার; কে বকুল গাছের ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কাছে? শিপ্রার ছায়া কী ফলকের ওপর? ওই কী তবে বিকেলে মোমবাতি জ্বালিয়েছিল এখানে? শিপ্রার আঙুলে বৃষ্টির দাগ; পাবের ভাজের ওপর বকুলের উজ্জাড় করা গন্ধ? এখন কী করছে প্রদ্যোৎ, রেকর্ড শুনছে অন্ধকারে বসে? অরুণ কী বাসে কন্ডাকটরকে পয়সা গুনে দিচ্ছে এখন? মিহির হয়তো সিনেমার গভীর অন্ধকারে দেখছে এক ভয়ানক খেলা, সবুজ চোখ, হাতে ছুরি, বুকের ওপর নকসাকাটা; ওর বৌ ভয় না আদরে মুখ তুলে দেখে কাছে..... কী ভীষণ বেঁচে থাকা চারদিকে.....অথচ, অথচ আমার মাথার ভেতর মৃদু শান্তর ঘন্টার শব্দ, ভাঙতে থাকে আমাকে পুরনো দেয়ালের মতো; একটা ঠোঁট ফাঁক হল অনুপমের; প্রদ্যোৎ, কাল সকালে দলবেঁধে তোরা এখানে এসে দেখবি, আমার টুকরো টুকরো অসংখ্য শরীর নিয়ে রোদের ভেতর খেলা করছে অনেক পাখি, তাদের সোনালি পালকে আমার শরীর ঢাকা। পা দুটো ছড়িয়ে গেল তার। তার দুটো হাত কী ক্রমশ ফলক হয়ে যাচ্ছে? শিপ্রার ঠান্ডা ছায়া ভেঙে ভেঙে কেউ কী এগিয়ে আসছে কাছে? সেই বুনো দুই মানুষ? চোখ বন্ধ করল অনুপম।

সিঁড়ির মুখে আলো নেভান। অনুপম তা নিয়ে মাথা ঘামাল না। এখন তার সমস্ত শরীরে ঘাসের রঙ, বকুলের ভারি গন্ধ, এক-টুকরো মোমের আলো। দরজা খুলল সে। দেখল। পরিচিত অন্ধকার, নিচে কাশির শব্দ, কে একজন হিন্দী ফিল্মের হিট গান গাইছে, অনুপম শরীর গুটিয়ে জানলায় দাঁড়াল। ঠিক বিদেশী ছবির মত বাইরে এখন বৃষ্টির গুঁড়ো উড়ছে, একজন কে হেঁটে যায় লাইটপোস্টের পাশ দিয়ে; দূর থেকে গুডস্ ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ তাকে যেন ভাঙতে ভাঙতে চলে গেল; দেয়ালের উড়তে থাকা পাখি কী এখন বিশ্রাম চাইছে? সেই অদ্ভুত ছায়ারা আবার কী তার মশারির ভেতর উঠে আসবে? আচ্ছা এখন শিপ্রা কী করছে? আয়নায় আদর করছে নিজের ছায়াকে?

সবুজ দুটো ট্যাবলেট জলের সংগে ভেতরে চালান করে দিল অনুপম।

তলপেটে বালিশটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। হাওয়ার ভেতর ঘন্টার মিহি শব্দ দুই... তিন.. পাঁচ . সাত .. এগারো.....মাঠ জুড়ে কুয়াশায় পা ডুবিয়ে হ্যারিকেন হাতে কে চলে যায় এখন? শংকর, বুনো দুই মানুষ তাড়া করে আসছে আমাকে. তুই, ফলকের ওপর হাজার হাজার শিপ্রার ছায়া. ....ছায়ার হাতে সোনালি পালক।

মাথার ভেতর ঝিরঝির ঝিরঝির জলের আওয়াজ, রক্তের ভেতর সবুজ ঘুম ভারি হয়ে আসে। দেয়ালের ছবিটার দিকে হাত বাড়ায়; ঠোঁট ফাঁক হয়ে যায়। তোমাদের চোখ সরিয়ে নাও! কী খুঁজছো তোমরা এই ঘরে? বৃষ্টির হাওয়া একসময় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিথিল শরীরে; অন্ধকারে বুঝতে পারে না অনুপম কোনদিকে তার হাত।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

শ্রীঘৃত ২৫০গ্রাম টিনেও
পাইবেন।
শ্রীঘৃত
শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ
অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কটন স্ট্রীট কলিকাতা—৭

কার্নিভালে গন্ডার—সতের আঠার শতকে বিভিন্ন মেলা বা পরব উপলক্ষে পশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হত। এই চিত্রটি তারই নিদর্শন। ছবিটি আঁকা হয় ১৭৫১ খৃঃ।

পশুচিন্তা....

সেকালে-একালে

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

পশুপাখি, সরীসৃপ, মাছ, কীটপতঙ্গের আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে প্রবল কৌতূহল মানুষকে যুগে যুগে বন্য প্রাণী পর্যবেক্ষণে ও সংগ্রহে উৎসাহিত করেছে। অবশ্য অতীতে প্রধানত শিকার ও আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনেই রাজা বা অভিজাত পুরুষেরা দেশ-বিদেশ থেকে দুর্লভ জীবজন্তু সংগ্রহ করতেন। একালের মানুষ যেমন শখ করে কুকুর, বিড়াল পোষে ঠিক তেমনভাবেই প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, আসেরিয়া, পারস্য, চীন, ভারত, রোম প্রভৃতি দেশে হরিণ, ময়ূর, সিংহ, চিতা জেব্রা, হাতী প্রভৃতি বন্য পশু প্রতিপালন করা হত। প্রধানত রাজার প্রমোদ উদ্যানেই রাখা হত ঐ সব পশুপক্ষী। অধিকাংশ সময়েই সেখানে সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার থাকতো না। সেদিক দিয়ে বিচার করলে একালের মানুষেরা যথেষ্ট ভাগ্যবান। কারণ পৃথিবীর সব পশুশালায় আজকাল যে কেউ ঘুরে আসতে পারে। শুধু তাই নয়, ইচ্ছা হলে নানা প্রাণীর স্বভাব, প্রকৃতি, প্রজনন পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কেও গবেষণা চালানো যায়। বলা চলে, বন্যপ্রাণী বিনিময় ও আমদানী-রপ্তানীর মাধ্যমে প্রাণীবিদ্যা চর্চার সহায়তা করাই একালে পশুশালা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

অবশ্য এই জাতীয় আগ্রহ প্রাচীনকালের কোন কোন মানুষের মনে যে ছিল না তা নয়। তবে বর্তমানে পশুশালা বলতে আমরা ঠিক যে ধরনের পশু সংরক্ষণ বা প্রতিপালনের ব্যবস্থাকে বুঝি প্রাচীন বা মধ্য যুগে তা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। তখন মানুষ প্রধানত শিকার বা গৃহকর্মে নিয়োগের উদ্দেশ্যেই বনের পশুপাখি সন্ধান করতো। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ বনের নানা পশুপাখিকে ফাঁদ পেতে ধরে আসছে। প্রধানত চামড়া, হাড় ও মাংসের প্রয়োজনে। কারণ মানুষ তখনও জীবজন্তুকে পোষ মানাতে শেখে নি। আদিম গুহা মানুষের প্রাত্যহিক কর্মতালিকার মধ্যে তাই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকতো পশু-মৃগয়া। সেই মৃগয়ার কিছু কিছু দৃশ্য আঁকা আছে ম্যাকডালেনিয়ান যুগের গুহাগাত্রে। নৃতাত্ত্বিকের মতে, ঐ সমস্ত ছবি আঁকা হয়েছিল খৃস্ট জন্মের প্রায় দশ হাজার বছর আগে! উপাসনা, যাদুচর্চা অথবা শিকার যাত্রার পূর্বে বন দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে, আঁকা হত ঐ ধরনের ছবি। প্রাগৈতিহাসিক হিম যুগ থেকেই অবশ্য গুহা মানবেরা ছবি আঁকছে (নানা রং-এর মাটি ও প্রস্তর চূর্ণের সঙ্গে চর্বি বা বেসিন মিশিয়ে গুহার দেওয়ালে ও ছাদে)। অসলে বনের সব রকম পশুপাখি, সরীসৃপ সম্পর্কে গুহা মানবের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। পশু শিকারের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কেও তাদের কি গভীর আগ্রহ ছিল তা জানা যায় ঐ ছবি থেকে। স্পেনের আলতামিরায়, দক্ষিণ ফ্রান্সের লামাথ ও সাসাঁওয়ে, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভারতের বেত্রবতী ও চম্বল উপত্যকায়, ছত্তিশগড়ের সিংহালপুরে, মিরজাপুরের লিখুমিয়ায় যে সব প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নানা জাতের বন্য পশুপক্ষীর আশ্চর্য জীবন্ত রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। ম্যামথ, বাইসন, গণ্ডার, সম্বর ও বল্গাহরিণ, ভালুক, জিরাফ, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশু শিকারের যে সব চিত্র গুহামানবেরা এঁকে রেখে গেছেন সেগুলি তাদের নিখুঁত পশু পর্যবেক্ষণেরই পরিচয় বহন করছে। প্রতিটি প্রাণীর অবয়ব সংস্থান, তার আক্রমণ বা আত্মরক্ষার ভঙ্গিমা তুলির দু-একটি আঁচড়েই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। উপযুক্ত উপকরণের অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক গুহাশিল্পীরা সামান্য মাটি পাথর থেকে তৈরী রং আর পশু লোম থেকে তৈরী মোটা তুলি দিয়ে যে ছবি এঁকেছেন তা কয়েক হাজার বছর পরেও আমাদের মুগ্ধ না করে পারে না।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের এই পশুপ্রীতি সঞ্চারিত হয়েছিল প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, আমেরিকা, পারস্য, চীন, ভারত প্রভৃতি দেশের মানুষের মনেও, প্রাচীন মিশরে যে বন্য পশু সংগ্রহ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। মিশরের বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও সমাধিক্ষেত্রে বন্য পশুপক্ষীর বহু জীবন্ত মূর্তি, বাস-রিলিফ ও মুরাল চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত মূর্তি ও চিত্রাবলী থেকে কিভাবে বনের পশুপাখিকে ধরা হত বা পোষ মানানো হত তারও কিছু কিছু নিদর্শন আমরা পাই। কায়রোর যাদুঘরে

ইতেতের সমাধিক্ষেত্র থেকে তুলে আনা প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরানো একটি ভিত্তি চিত্র রাখা আছে। সেখানে দেখা যায় নীল নদের তীরে প্রতি বছর শীতকালে যে বুনো হাঁসেরা এসে বাসা বাঁধে প্রাচীন শিল্পী সাগ্রহে তাদেরই ছবি এঁকেছেন। ঐ ছবিটিতে বিশেষ প্রজাতির হাঁসের অবয়ব সংস্থান, পালকের রং, তার হাঁটার ভঙ্গিমা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই সূত্রে থিবসে অবস্থিত নাখতের সমাধি-মন্দিরের দেওয়ালে প্রায় তিন হাজার বছরের পুরানো যে মুরাল চিত্রটি আছে সেটিও লক্ষ্য করা যেতে পারে। অষ্টাদশ রাজবংশের রাজত্বকালে নাখতের এই সমাধি-মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল (১৫৮০—১৩৫০ খৃস্ট পূর্বাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়ে)। পূর্বে কথিত মুরালে শিল্পী সেকালের ব্যাধেরা জাল দিয়ে কিভাবে পানকৌড়ি, সারস, সরাল, দিগহাঁস প্রভৃতি ধরতো তাই দেখিয়েছেন। এই জাতীয় আর একটি চিত্রকর্মের সন্ধান পাওয়া যায় দেড় হাজার বছর আগে নির্মিত থন-সুর সমাধি-মন্দিরে। এই সমাধিগৃহের ছাদে নানা জাতের পাখি ও কীট-পতঙ্গের ছবি আঁকা আছে। বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়মে থিবসে প্রাপ্ত যে মুরালের নমুনাটি আছে তাতেও সেকালে প্যাপিরাস ঝোঁপের মধ্যে কিভাবে জাল পেতে নানা জলচর পাখি, প্রজাপতি ধরা হত এবং প্রজাতি, কার্ অনুসারে কিভাবে তাদের চিহ্নিত করা হতো তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

আসলে প্রাচীন মিশরের সকলেই ছিলেন পশুপ্রেমিক। তাঁদের কল্পনায় তাই দেখি অনেক দেব-দেবীই পশুমূর্তিধারী। যেমন মৃত্যু দেবতা আনুবিস-এর মুখ শেয়ালের মত, সূর্য দেবতা হোরাসের মুখ বাজপাখির মত। দেবতা এপিসের সঙ্গে ষাঁড়ের, মুতের সঙ্গে বিড়ালের, হ্যাথরের সঙ্গে গরুর, সেবেকের সঙ্গে কুমীরের, থোত ও হেপির সঙ্গে বেবুনের; হেকেথের সঙ্গে ব্যাঙের, তাওয়েরেতের সঙ্গে জল-

ফটো বিউটি

ক্লিক ক্যামেরা কিনুন।

ফ্লাশগান, কেস ও ফ্লিম সমেত মূল্য ৮৬·০০ টাকা।

—তৎসহ—

বিনামূল্যে একটি রঙিন ফটো এ্যালবাম নিন।

৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড হাওড়া। (কালীবাবুর বাজার), ফোন : ৬৭-৪৫২৬

প্যাপিরাস্ বনে পাখি ধরা। থিবসে প্রাপ্ত প্রাচীন মিশরীয় মুরাল চিত্র। এই ছবিটি রাখা আছে বৃটিশ মিউজিয়মে।

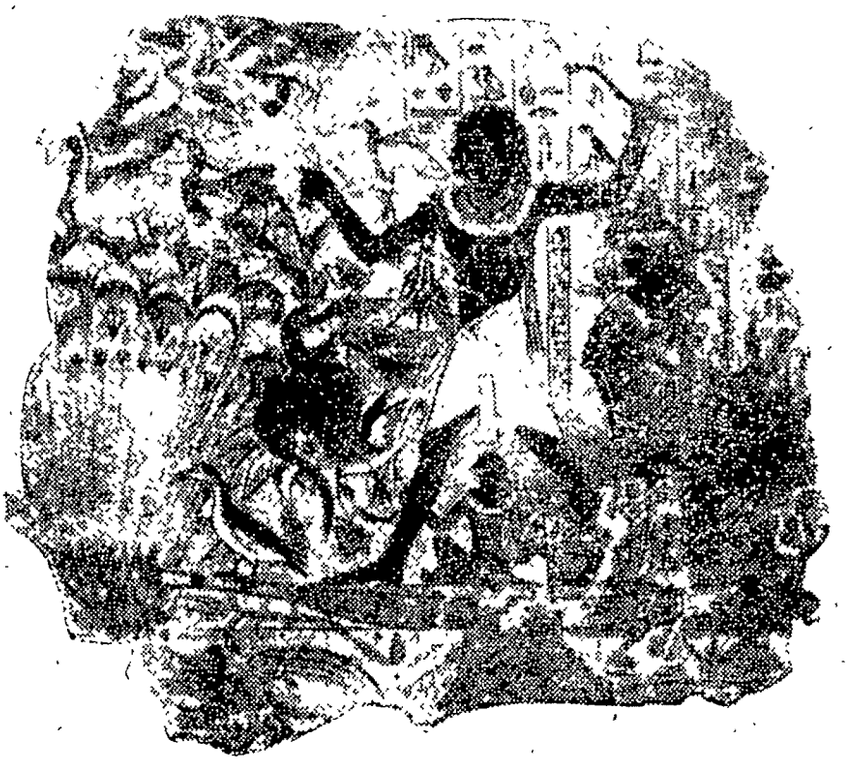

হস্তীর, নেফারতুমের সঙ্গে সিংহের, সেখে-মেতের সঙ্গে সিংহীর, এ্যামনের সঙ্গে ভেড়ার, বুতোর সঙ্গে সাপের, সেতের সঙ্গে গাধার এবং খেন্তি-আমেন্তির সঙ্গে নেকড়ে বাঘের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়েছিল। এই সব দেব-দেবীর যে সমস্ত চিত্র বা মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি অধিকাংশই ঐ বিশেষ বিশেষ পশুর অনুরূপ। আসলে নানা বন্য প্রাণী সম্পর্কে সে দেশের মানুষের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বলেই এই ধরনের মূর্তি গড়া বা ছবি আঁকা সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন মিশরে সাধারণ মানুষের মধ্যে জীব-জন্তু সম্পর্কে এই যে কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছিল তেমন কৌতূহলের কিছু কিছু প্রমাণ মেলে প্রাচীন ব্যাবিলন ও আসেরিয়ার মানুষের মধ্যেও। সে দেশের অধিবাসীরা যে বন্য সিংহকে পোষ মানানোর ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন তার ইঙ্গিত আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অংশে। তিন হাজার খৃস্ট পূর্বাব্দে নির্মিত সুখের রাজপ্রাসাদের (উরে) ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সব ভাস্কর্য ও মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলি দেখেও প্রাচীন ব্যাবিলনের সাধারণ মানুষের পশুপ্রীতির কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইগল পাখি, বাইসন, হরিণ, ভেড়া প্রভৃতি পশুপাখিকে পবিত্র জীবরূপে গণ্য করা হত। তাছাড়া ব্যাবিলনের রাজারা সিংহ শিকারে ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী। খোরসাবাদের রাজ প্রাসাদের দেওয়ালে সে সমস্ত কিভাবে সিংহকে বন্দী করা হতো তার একটি বাস রিলিফও দেখা যায়। এই ব্যাবিলনীয় সভ্যতারই উত্তরসাধক ছিল আসেরিয়া। সম্প্রতি নিমরুদে রাজা দ্বিতীয় আসুর নাসিরপালের [illegible] (৮৫৮—৮২৪ খৃস্ট পূর্বাব্দের মাঝামাঝি কোন সময়ে) নির্মিত [illegible] ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার গায়েও নানা পশুপাখি শিকার ও প্রতিপালনের বাস রিলিফ দেখা যাবে। কথিত আছে, সম্রাট তৃতীয় সালামানজার (৮৫৮—৮২৪ খৃস্ট পূর্বাব্দ) ও আসুর বানিপালের (৬৬৮ — ৬২৬ খৃস্ট পূর্বাব্দ) আগ্রহে আসুর ও নিনেভের প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে একটি সুবৃহৎ পশুশালা স্থাপিত হয়েছিল।

পারস্যের সম্রাট দারায়ুস (৪৬৮—৩৫৮ খৃস্ট পূর্বাব্দ) ছিলেন একজন পশু-প্রেমিক ও বড়ো শিকারী। সম্প্রতি সুসায় প্রায় দু হাজার বছর আগে নির্মিত রাজ-প্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার নানা স্থানে মৃগয়ায় ব্যস্ত রাজা ও রাজ-পারিষদের বহু লো রিলিফ লক্ষ্য করা যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সেলজুক সম্রাটেরাও ছিলেন মৃগয়াসক্ত। তাঁরাও রাজোদ্যানে নানা দুষ্প্রাপ্য পশুপাখি সংগ্রহ করে ছেড়ে রাখতেন।

অবশ্য পশুপ্রীতির ব্যাপারে পারসিক-দের আগেই প্রাচীন চীনের সাধারণ মানুষের নাম করা উচিত। তাঁদের তুল্য পক্ষী পর্যবেক্ষক সেকালে পৃথিবীর আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। শুধু পাখি নয়, অন্যান্য জীব সম্পর্কেও তাঁদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে

রুপালী পর্দার
খেলে আসা দিনগুলির পর
আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে!
কিন্তু আপনি?
বিলী
শার্টিংস ও
ড্রেস মেটিরিয়ালস ঃ
মহাকাশ-যুগের
মতই নির্ভীক ও
সুদূর প্রসারী
আজকের দিনের মানানসই আধুনিক
পোশাকই হল চূড়ান্ত ফ্যাশান।
বিলী
TERENE ব্রিম্রণের
Interpub/BB/40/73

রাজা বা অভিজাত সমাজের মানুষেরাও ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী। যেমন, তাঙ-বংশীয় সম্রাটেরা (রাজত্বকাল : ৬১৮—৯০৬ খৃস্টাব্দ) বিদেশী পর্যটক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দেশ-বিদেশের নানা দুর্লভ প্রাণী বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ করতেন। সম্ভব হলে সেই সমস্ত পশুপক্ষী উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতেও তাঁরা পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। পরবর্তী সুঙ (৯৬০—১২৭৯ খৃস্টাব্দ) রাজবংশের রাজারাও ছিলেন পশু-প্রেমিক। একাদশ শতকে সম্রাট হুইৎ-সুঙ স্বয়ং যে বহু দুর্লভ পাখির ছবি অঙ্কন করেছিলেন তার কিছু কিছু আমাদের হাতে এসেছে। প্রায় সমসাময়িক কালের মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান (১২১৬—১২৯৪ খৃস্টাব্দ) যে রাজকীয় প্রমোদ উদ্যানে দেশ-বিদেশ থেকে নানা পশুপক্ষী সংগ্রহ করে এক বিরাট চিড়িয়াখানা গড়ে তুলেছিলেন তার উল্লেখও ইতিহাসে আছে। তাঁরও পরবর্তী মিঙ রাজাদের আমলে (১৩৬৮ — ১৬৪৪ খৃস্টাব্দে) পেকিং, সাংহাই, ক্যান্টন প্রভৃতি শহরে যে মাঝে মাঝে পশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হত তার ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। বর্তমান পেকিং পশুশালা (১৯১১ খৃস্টাব্দে স্থাপিত) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিড়িয়াখানা।

অবশ্য চীনাদের পশুপ্রীতির কথা বলতে বসে প্রাচীন ভারতের সর্বস্তরে মানুষের পশুপ্রীতির কথাও সংগতভাবে মনে পড়ে: এক হিসাবে ভারতীয়রা এব্যাপারে সবার অগ্রগণ্য। কারণ পৃথিবীতে আর কোথাও এদেশের মত পশু মানুষের নিবিড় আত্মীয়তা বন্ধন স্বীকৃত হয় নি। একমাত্র ভারতেই বন্য পশুপক্ষী বশ করার বিদ্যাকে ৬৪ কলার অন্যতম রূপে সম্মান জানানো হয়।

আমরা আদি কবি বাল্মীকির কবিত্ব লাভের যে কাহিনী এ যাবৎ শুনে আসছি তার মূলে আছে এক চক্রবাকীর অকাল-মৃত্যুজনিত শোক। সামান্য পাখির দুঃখে কাতর হয়ে বিশ্বের আর কোন কবি এমন কবিতা উচ্চারণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ! আসলে বাল্মীকি রামায়ণের ছত্রে ছত্রে পশুপ্রীতির নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। মহাভারতের নানা স্থানেও বনের পশু-পক্ষীর সুন্দর ও বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে রচিত কালিদাস, ভারবি, ভট্টি, বাণ প্রভৃতির কাব্য, নাটক, কথাতেও পশু পর্যবেক্ষণ ও প্রতিপালনের প্রসঙ্গ আছে। কালিদাস-কল্পিত উদয়ন রাজার কাহিনীতে বন্য বারণ সংযমের (হাতী ধরার) বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সেকালে কিভাবে হাতী ধরা ও পালন করা হত তার আরও বিশ্বস্ত বিবরণ পাওয়া যাবে পালকাপ্য রচিত 'হস্তি-আয়ুর্বেদে"। কালিদাস তাঁর মেঘদূত ও ঋতুসংহার কাব্যে অসংখ্য পশু-পক্ষীর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গেছেন। এই পশু পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন বাণভট্ট। তাঁর 'কাদম্বরী' নামক কথা কাব্যের সূচনায় পম্পা সরোবরের তীরবর্তী যে অরণ্যের বর্ণনা আছে এই প্রসঙ্গে তা স্মরণীয় (এই বর্ণনা অনেকাংশে বাল্মীকির দন্ডকারণ্য বর্ণনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়)। ঐ অরণ্যে নানা পশুপাখি কেমন অবাধে বিচরণ করে বেড়াতো এবং পরে ব্যাধের আগমনে তাদের কি দুর্দশা হল তার আশ্চর্য জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন বাণভট্ট। শুধু তাই নয় জাল পেতে ও ফাঁদের সাহায্যে ব্যাধেরা কিভাবে পাখি ধরে তারও বিবরণ পাওয়া যায় ঐ অংশে।

শুধু সংস্কৃত কাব্য কথায় নয়, বৌদ্ধ জাতকের গল্পে, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশে পশুপক্ষী এক বিশিষ্ট আসন লাভ করেছে। সেখানে বাঘ, সিংহ, শেয়াল, হাতী, সাপ, কুমীর, শকুন, টিটিপাখি, কাক, বানর, বেজি প্রভৃতি কত না পশুপাখিরই দেখা মেলে। এদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে সেকালে বিষ্ণুশর্মা প্রমুখেরা যে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন তার প্রমাণও পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতের গৃহপালিত পশুর কথা আলোচনা করতে বসে ভারত তত্ত্ববিদ্ ব্যাশম যা বলেছেন এই সূত্রে সেটিও স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, সেকালে কৃষিকার্য, দুধ ও মাংস ভক্ষণের জন্যে গো পালন করা হত। অশোকের আমলেও গোরু-বাছুর নিধন নিষিদ্ধ হয় নি। পেশাদার রাখালেরা (আভীর সম্প্রদায়ভুক্ত) নিযুক্ত হত গোচারণে। গরুর সঙ্গে মহিষ পালনের প্রথাও ছিল। এমন কি গয়াল, গউর প্রভৃতির মতো বন্য প্রাণীকে পোষ মানিয়ে ঘরের কাজে লাগানোর ইঙ্গিত প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাছাড়া পশমের জন্যে কাশ্মিরী ভেড়া, সিল্কের জন্য গুটিপোকা, দুধ ও চামরের জন্যে চমরীগাই, মাংসের জন্যে ছাগল, শূকর প্রভৃতি পালন করা হত। সিন্ধুপ্রদেশে তখন বন্য ঘোড়া ধরে তাকে শিক্ষা দেবার উত্তম ব্যবস্থা ছিল। তবে ঘোড়ার দাম খুব বেশি হওয়ায় সেকালে খুব কম কাজেই তাকে নিয়োগ করা যেত। ঘোড়ায় টানা রথের থেকে গরুর গাড়ী ছিল বেশী জনপ্রিয়। বুদ্ধের সময় ভারতে হাতী ধরা ও পোষ মানানোর বিদ্যা অনেকেই আয়ত্ত করেছিলেন। যেহেতু পোষমানা অবস্থায় হাস্তিনীর সচরাচর বাচ্চা হয় না তাই প্রতি বছরই বন থেকে হাতী ধরে আনতে হতো। এই সমস্ত হাতী অবশ্য ছিল রাজার সম্পত্তি। সাধারণ-ভাবে সেকালে রাজকীয় বা ধর্মীয় শোভা-যাত্রায় এবং যুদ্ধে হাতী ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। প্রধানত গৃহরক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা শিকারের জন্যে বন্য কুকুরকে পোষ মানানো হত। সেকালে মধ্য পশ্চিম ভারতে চিত্রিকা বা চিতার অভাব ছিল না। বর্তমানে তাদের বংশ ভারত থেকে লোপ পেয়ে গেছে। সেযুগে রাজার শিকার খেলার এই চিতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাখীর মধ্যে ময়ূর, রাজহাঁস, ময়না, টিয়া, শারিকা বা পাহাড়ী ময়না প্রভৃতি পোষমানা বেওয়াজ ছিল। মাঝে মাঝে জনসমক্ষে প্রদর্শনের জন্যে বাঘ, চিতাবাঘ, গণ্ডার, ভালুক, সাপ, সজারু, কুমীর প্রভৃতি প্রাণীও ধরে আনা হতো। সে যুগের নানা কাব্য কথা থেকে আরও জানা যায় তপোবনে বা রাজার প্রমোদ উদ্যানে কৃষ্ণসার, চিতল প্রভৃতি নানা জাতের হরিণ, ময়ূর প্রভৃতি বিচরণ করতো। এছাড়া প্রাচীন মিশর বা আসেরিয়ার মত ভারতে বিশেষ বিশেষ পশুকে পবিত্র ও দেব-দেবীর বাহনরূপে (যথা সিংহ, হাতী, ময়ূর, রাজহংস, পেঁচা প্রভৃতি) গণ্য করার রেওয়াজ ছিল। শুধু তাই নয়, সে যুগে বিভিন্ন পশুপক্ষী সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কতটা দরদ ছিল তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় গোতম ও শালিহোত্র সংহিতায়। এই দুই গ্রন্থ প্রধানত গোপালন ও অশ্ব-পালন বিষয়ে লেখা। আসলে ভারতের পশু-পাখি সম্পর্কে শুধু এদেশের মানুষেরা নয়, এশিয়া ইউরোপের অনেকেই হয়ে উঠে-ছিলেন কৌতূহলী। মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হু-য়েন সাঙ, ইবন্-বতুতা, ভাস্কো ডা-গামা প্রভৃতি পর্যটকের মুখে মুখে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতের পশু ও উদ্ভিদ জগতের নানা খবর ছড়িয়ে পড়েছিল ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে। ভারতের এই পশু-পাখি সম্পর্কে পশ্চিমের কতটা আগ্রহ ছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রথম শতাব্দীর রোমক লেখক প্লিনির বৃত্তান্তে। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় রাজসভায় ও অভিজাত সমাজে ভারতের চিতা, হাতী, সিংহ, বাঘ, ময়ূর, বানর, গণ্ডার, টিয়া প্রভৃতি পশুপাখির চাহিদা ছিল। এমন কি সম্রাট ক্লডিয়াস একবার বহু অর্থব্যয় করে নাকি ভারত থেকে একটি অদ্ভুত ফিংস পাখি আনিয়েছিলেন। অধ্যাপক ব্যাশম অনুমান করেন আসলে ঐ বিচিত্র পাখিটি ছিল একটি সেনালী ফেজান্ট।

ভারতীয় চিত্রকলাতেও পশুপক্ষী গৌরবজনক স্থান লাভ করেছে। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের পুরনো সীল-মোহর ও চিহ্নিত মৃৎপাত্রে গণ্ডার, বৃষ, হাতী, সাপ, সিংহ, হাঁস, ময়ূর প্রভৃতি পশুপাখির জীবন্ত রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় ভাস্কর্যেও পশুপাখি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সাঁচী, ভারহুত, ইলোরা, মহাবলীপুরম্, খাজুরাহো, কোনারক প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত স্তূপ, গুহা, চৈত্য, মন্দির গাত্রে বিভিন্ন পশুপাখির মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। বিশেষ করে হাতী, সিংহ, বানর, সর্প, বাঘ, ময়ূর, হংস, বক প্রভৃতি পশুপক্ষীর জীবন্ত রূপায়ণ লক্ষ্যণীয়। পঞ্চম শতাব্দীতে আঁকা অজন্তার ফ্রেস্কো-গুলিতেও হাতী, হরিণ, কুকুর, হাঁস প্রভৃতি পশুপাখির চিত্র আছে।

মধ্যযুগে মুসলমান নরপতিরা অনেকেই ছিলেন পশুপ্রেমিক। বিশেষ করে মোগল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের নাম করতে হয়। বাবরের আত্মজীবনীর মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তু সম্পর্কে গভীর কৌতূহল লক্ষ্য

করা যায়। তাঁর এই কৌতূহল বংশগতি সূত্রে আকবর ও জাহাঙ্গীরের চরিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশেষ করে জাহাঙ্গীর হয়ে উঠেছিলেন একজন উৎসাহী পশু পর্যবেক্ষক। চিত্রসমালোচক জর্জলরেন্সের মতে—

"Jahangir shared with his great grand-father Babur a particular interest in birds and beasts"

কিন্তু জাহাঙ্গীর বাবরের মত শুধু যে জীবজন্তু ভালবাসতেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক। আসলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই মোগল চিত্রকলা চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১৬০৫ খৃঃ জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ে তার রাজসভার চিত্রকর ওস্তাদ মনসুর দেশ-বিদেশ থেকে বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করা কয়েকটি পশুপক্ষীর ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবিগুলির মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সংগৃহীত করা একটি টার্কিমোরগ এবং আবেসিনিয়া থেকে সংগ্রহ করা একটি জেব্রার চিত্র বৃটেনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়ামে রাখা আছে। এছাড়া সিংহের আহার, বহির্বিবাজ, সারস শিকার প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে। শোনা যায় জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে একটি পশুশালা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালের বাদশাহেরা ঐ বিষয়ে তেমন আগ্রহী না থাকায় সেই সংগ্রহশালাটি কালক্রমে উঠে যায়।

প্রাচীনকালে ইউরোপেও দেশ-বিদেশ থেকে বন্য প্রাণী সংগ্রহ করে এনে সর্বসাধারণের কাছে মাঝে মাঝে তা দেখানো হত। সম্প্রতি স্যার আর্থার ইভানসের চেষ্টায় ক্রীট দ্বীপের নসসে রাজা মিনোসের যে সুপ্রাচীন প্রাসাদের (২০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ) ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার নানা স্থানে প্রাচীন ইউরোপীয়দের পশুপ্রীতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে। ঐ রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে বাইসন, বন্যবরাহ, তিতির পাখি প্রভৃতি নানা পশুপক্ষীর সুন্দর চিত্র দেখা যায়। পরবর্তীকালের মাইসেনিয় যুগের (১৫০০-১০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ) যে সব অস্ত্র, তৈজসপত্র, ভাস্কর্য ইত্যাদি পাওয়া গেছে তার থেকেও নানা বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সেকালের মানুষের যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন ভাফিওতে প্রাপ্ত একটি সোনার পানপাত্র দেখা যায় যে সেকালে কিভাবে বন্য বাইসন ধরা হতো তারই চিত্র ক্ষোদিত রয়েছে।

প্রাচীন গ্রীসেও বন্য পশু সংগ্রহ ও পোষ মানানোর বেওয়াজ ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসও দেশ-বিদেশ থেকে এই বন্যজন্তু সংগ্রহের কথা উল্লেখ করে গেছেন। দিগ্বিজয়ী ম্যাসিডন রাজ আলেকজাণ্ডার যখন ভারতে এসে পৌঁছান (৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দ) তখন তিনিও পারস্য আফগানিস্থান, ভারত প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নানা দুর্লভ পশুপক্ষী জলপথে স্বদেশে প্রেরণ করেছিলেন। প্রাচীন রোমের রাজাদের যে কেমন পশুপক্ষী সংগ্রহের নেশা ছিল তা প্লিনির লেখা পড়লেই জানা যায়। জুলিয়াস সীজারের আমলেই আফ্রিকা থেকে সিংহ, জেব্রা, জিরাফ, উটপাখি, কুমীর, চিতাবাঘ প্রভৃতি রোমে চালান আসতে শুরু করে। পরবর্তীকালে কলোসিয়ামে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুর সঙ্গে গ্লাডিয়েটরের যুদ্ধ খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সম্রাট ক্লডিয়াসের পশুপ্রীতির কথা আমরা তো আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর পরবর্তী রাজারাও (নীরো, ক্যালিগুলা প্রভৃতি) এই ব্যাপারে ছিলেন যথেষ্ট উৎসাহী। ঐতিহাসিক গিবনের রচনায় তার উল্লেখও পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের ইউরোপে গ্রাম-শহরের পথে পথে নানা বন্য প্রাণী নিয়ে খেলা দেখিয়ে বেড়ানোর বেওয়াজ ছিল। শোনা যায় মহামান্য পোপ তাঁর ভ্যাটিকান প্রাসাদে এবং ইংলণ্ডের টিউডর রাজার, টাওয়ার অফ লণ্ডনে ঐ সময়ে একটি ব্যক্তিগত পশুশালা গড়ে তুলেছিলেন। ইটালীতে রেনেসাঁসের কালে ফ্লোরেন্সের মেডিচি পরিবার, ভেনিস ও মিলানের ডিউকেরা শুধু যে শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তাই নয় পশু পর্যবেক্ষণ ও তার স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে গবেষণারও সহায়তা করেন। রেনেসাঁস যুগের শিল্পী লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি এই পশু পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রণী ছিলেন। এই সময়েই ভেনিসের সওদাগর মার্কোপোলো (১২৫৪—১৩২৪ খৃষ্টাব্দ) মধ্যপ্রাচ্য ও চীন সফর করে এসে ঐ অঞ্চলের পশুপক্ষী সম্পর্কে ইউরোপের মানুষকে কৌতূহলী করে তোলেন। তাঁর দেখাদেখি পর্তুগালের প্রিন্স হেনরী (১৩৯৪—১৪৬০ খৃষ্টাব্দ) ও বার্থলোমিউ দিয়াজ (১৪৫০—১৫০০ খৃষ্টাব্দ) আফ্রিকা পাড়ি দেন। ভাস্কো-ডা-গামা (১৪৬৯—১৫২৪ খৃষ্টাব্দ) জলপথে ভারতে এসে পৌঁছান। জেনোয়ার নাবিক কলম্বাস (১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর) বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পদার্পণ করেন। এই সমস্ত ভূ-পর্যটকেরা নতুন-নতুন দেশ থেকে নানা বিচিত্র পশুপাখির নমুনা নিয়ে আসতেন। ইউরোপের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে সেই সব জীবজন্তু বা তার ছবি দেখানো হত। এরপর ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট

সুধীজনের প্রশংসাধন্য অভিনব গ্রন্থ

ইতিহাস অভিধান

(ভারত)

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে বর্ণানুক্রমে লিখিত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস। এতে আছে সব রাজা, রাজবংশ, রাজ্য, যুদ্ধ, সন্ধি, রাজনৈতিক দল, নেতা ও আন্দোলন, আর ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান ও গ্রন্থের আলোচনা, যা ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক সাহিত্যিক সাংবাদিক ও জিজ্ঞাসু পাঠকদের সব সময় কাজে লাগবে।

কয়েকটি অভিমত :

এতদিনে বাংলা ভাষার একটি বড় অভাব শুধু পূরণ হল না, একটি লজ্জাও দূর হল বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয়না।..সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিচিত্র বিরাট ইতিহাস একটানা লিখে যাওয়াই একটা কঠিন কীর্তি, সে ইতিহাসকে তন্তু ও গ্রন্থি অনুযায়ী যথাযথভাবে খণ্ড খণ্ড করে জিজ্ঞাসুদের জন্য সহজবোধ্য ও অনায়াসলভ্য করে সাজিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব আরো অনেক বেশী। এ কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বইখানি একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য পেয়েছে। —প্রেমেন্দ্র মিত্র (অমৃত)

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অবলম্বন করে অভিধান রচনা করা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। ভারতের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আমরা হাতের কাছে "রেডিমেড" পেয়েছি। সাধারণ পাঠকদের কাছে এটি একটি প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই হিসাবে বিবেচিত হবে। —বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (বসুমতী)

দর্শন শিল্প ও সাহিত্য থেকে শুরু করে যুদ্ধবিগ্রহ ধর্মপ্রচার ও লোককল্যাণকর বিবিধ প্রয়াস কিছুই বাদ যায়নি। বাংলা ভাষায় এরকম কাজ এর আগে হয়নি আর। —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত (যুগান্তর)

বাংলায় এই ধরণের অভিধান যে বিশেষ স্মরণীয় প্রবর্তনা, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনব গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, সোক্রেটিকস, স্যার জনশোর, যীশু, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ব্যক্তি প্রসঙ্গের বিচিত্রতা যেমন, তেমনি আবার নীল বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন—বা দ্রাবিড়, পালবংশ, ফা-হিয়েন, মগধ ইত্যাদি অন্যান্য প্রসঙ্গও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের বিচিত্র জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাবে। —হরপ্রসাদ মিত্র (সমকালীন)

প্রতি গৃহ, গ্রন্থাগার ও শিক্ষালয়ের জন্য এই অভিধান

দাম : পনেরো টাকা

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট: কলিকাতা-৭০০০১২

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল প্রধান চিত্রকর ওস্তাদ মনসুরের আঁকা আবিসিনিয়ার জেব্রা; এই জেব্রাটিকে হাবসী পশু ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনেছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। বর্তমানে এই চিত্রটি বিলাতের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে রাখা আছে।

ফ্রান্সের রাজত্বকালে, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ, প্রাসিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও রাশিয়ার জারিনা ক্যাথরিনের শাসনকালে ইউরোপে স্থায়ী পশুশালা স্থাপনের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। তবে এই সংগ্রহশালার দ্বার সকলের জন্যে সব সময় উন্মুক্ত থাকতো না।

প্রকৃত প্রস্তাবে, আধুনিক রীতির পশুশালার প্রথম উদ্বোধন হয় ১৭৯৩ খৃঃ ফ্রান্সের প্যারিস শহরে। এই পশুশালার নাম জার্ডিন দ্য প্ল্যান্তেস। বর্তমানে এই পশুশালা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিড়িয়াখানা। কেউ কেউ বলেন প্যারিসের এই চিড়িয়াখানা স্থাপিত হবার আগেই ১৭৫২ খৃঃ স্কনবার্ণ শহরে আর একটি পশুশাল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এবিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্যারিস পশুশালার পর স্থাপিত হয় লণ্ডনের জগৎবিখ্যাত চিড়িয়াখানা (১৮২৮ খৃঃ)। এই পশুশালায় এমন সব দুর্লভ পশুপক্ষী আছে যা বিশ্বের খুব কম চিড়িয়াখানাতেই দেখতে পাওয়া যাবে। বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের অন্যান্য চিড়িয়াখানার মধ্যে ১৮৩৬ খৃঃ স্থাপিত ম্যাঞ্চেস্টারের বেলভিউ গার্ডেনস, লিভারপুলের অ্যাইনস্ডেল (১৯১৪ খৃঃ স্থাপিত), ডালবিনের ফোনিক্সপার্ক (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের আরো কয়েকটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ পশুশালার নাম এই সূত্রে করা যেতে পারে। যেমন, বার্লিনের চিড়িয়াখানা (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ), হেলেভার চিড়িয়াখানা (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ), এমস্টার্ডম পশুশালা (১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ), কোপেনহেগেন চিড়িয়াখানা (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) বার্লেন চিড়িয়াখানা (১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ)। বর্তমানে ইউরোপের প্রায় সমস্ত চিড়িয়াখানাতেই পশুপক্ষীর স্বাভাবিক বাসভূমি সংস্থানটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এছাড়া উভচর ও জলজন্তুদের জন্যে প্রশস্ত একোরিয়াম বা জলাগারের ব্যবস্থা থাকে। শুধু তাই নয়, গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান অঞ্চলের পশু-পাখিদের উপযোগী আবহাওয়া পরিবেশ কৃত্রিমভাবে বজায় রাখার ব্যবস্থাও ঐ সমস্ত পশুশালায় আছে।

এশিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম চিড়িয়াখানা হচ্ছে বাঙ্গালোরের পশুশালাটি। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ খৃঃ। এরপর স্থাপিত হয় যথাক্রমে মাদ্রাজের মিউনিসিপ্যাল চিড়িয়াখানা (১৮৫৮ খৃঃ), তারপর ত্রিবান্দ্রমের (১৮৫৯ খৃঃ) এবং বোম্বাই-এর ভিক্টোরিয়া গার্ডেন্স (১৮৭০ খৃঃ)। বর্তমানে টালিনালার ধারে ও জিবাট হাভেলির কাছে আলিপুরের যে প্রসিদ্ধ চিড়িয়াখানায় আমরা অনেকেই ছুটির দিনে বেড়াতে যাই সেটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৫ খৃঃ ১ জানুয়ারী। তৎকালীন বাংলার ছোটলাট রিচার্ড টেম্পলের উদ্যোগে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ আনুষ্ঠানিকভাবে এই পশুশালার উদ্বোধন করেন। তবে ঐ বছরের ১ মে তারিখ থেকেই সাধারণ মানুষ ঐ চিড়িয়াখানা দেখবার সুযোগ পায়। প্রথমে টেম্পলের অনুরোধে কার্ল হেগেনবেকের তাঁর সংগ্রহ থেকে বেশ কিছু মূল্যবান পশুপক্ষী দান করেন। তাছাড়া কলকাতা কর্পোরেশন এবং কলকাতার বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি অর্থ ও জমি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে সাময়িক ভাবে এই পশুশালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন ঐ স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করা হয়েছিল। যুদ্ধ মিটে যাবার পর কলকাতার জুওলজিকাল গার্ডেন আবার নবরূপে সংগঠিত হয়। এখন প্রায় ৫০ একর পরিমিত জমি নিয়ে গড়ে ওঠা এই চিড়িয়াখানাটি নানা কারণে ভারতের শ্রেষ্ঠ পশুশালা হয়ে উঠেছে। শুধু সাদা বাঘ, টাইগণ প্রভৃতির মত দুর্লভ জানোয়ার আছে বলেই নয়, শিশু উদ্যান, সদ্য গঠিত অডিটোরিয়াম, বিশাল কৃত্রিম জলাশয়, কীট-জন্তু সম্পর্কিত পাঠাগার প্রভৃতির জন্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক প্রতি বছর এই পশুশালা দেখতে আসেন। কলকাতার চিড়িয়াখানার পর নাম করতে হয় দিল্লির জুওলজিকাল পার্ক, আমেদাবাদের জুওলজিকাল হিল গার্ডেন, মহীশূরের শ্রীচামরাজেন্দ্র জুওলজিকাল গার্ডেন এবং তিরুপতির ও লক্ষ্ণৌ-এর চিড়িয়াখানার। দার্জিলিং-এও একটি ছোট পশুশালা আছে। এই পশুশালায় দুর্লভ ভালুক এবং মাঞ্চুরিয়ার বাঘ দেখতে পাওয়া যায়।

এশিয়ার অন্যান্য প্রাচীন পশুশালার মধ্যে জাপানের কিয়াটো শহরের ওকাজাকি পার্ক (১৯০৩ খৃঃ), রেঙ্গুনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পার্ক (১৯০৬ খৃঃ), ক্যান্টনের চিড়িয়াখানা (১৯১১ খৃঃ), টোকিও-র পশুশালার (১৯১০ খৃঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তানের করাচী, লাহোর ও পেশোয়ারের চিড়িয়াখানাও বিশ শতাব্দীর সূচনা কালে স্থাপিত হয়েছিল।

আফ্রিকার মধ্যে প্রাচীনতম পশুশালা হচ্ছে কায়রোর গীজা পার্ক। এটি ১৮৯১ খৃঃ স্থাপিত। এর পর নাম করতে হয় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া জুওলজিকাল গার্ডেনের। এই পশুশালা স্থাপিত হয় ১৮৯৮ খৃঃ।

আমেরিকার সব প্রদেশেই বর্তমানে চিড়িয়াখানা দেখা যায়। এ গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে অবস্থিত পশুশালাটি। এটি স্থাপিত হয় ১৮৬৫ খৃঃ। এছাড়া ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান জুওলজিকাল পার্কের নামও স্মরণীয় (১৮৯০ খৃঃ)।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীনতম পশুশালাটি হচ্ছে মেলবোর্ণে। ১৮৫৭ খৃঃ এই পশুশালার উদ্বোধন হয়েছিল। এই চিড়িয়াখানায় হংসচঞ্চু বা প্লাটিপাস্, কোয়ালা ভালুক, টুয়াটারা প্রভৃতির মত দুর্লভ প্রাণী দেখতে পাওয়া যাবে।

বিশ্বের প্রায় সমস্ত সেরা পশুশালাতেই বর্তমানে নিছক সখ বা খেয়াল মেটানোর উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী সংগ্রহ করা হয় না। তাদের স্বভাব-চরিত্র, প্রজনন, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে পর্যবেক্ষণ চালাবার সুযোগ করে দেওয়াও আধুনিক পশুশালার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন গ্রন্থমালার পশু-পক্ষী সম্পর্কে যে কৌতূহলের প্রকাশ আমরা দেখেছিলাম ম্যাগডালেনিয়ান যুগের গুহাগাত্রে, আজকের চিড়িয়াখানায় সেই কৌতূহলই চরিতার্থ হয় নানা ভাবে। দশ হাজার বছরেও মানুষের স্বভাব যে বিশেষ পালটায় নি এটাই তার একটা বড় প্রমাণ।

নতুন বই

ব্রজপুরনন্দনের দেশে। নন্দদুলাল চক্রবর্তী। শ্রীগুরু পাবলিশার্স, ৩, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলকাতা-১। আট টাকা।

মথুরা ও বৃন্দাবনের পরিচয় দিয়ে 'ব্রজপুরনন্দনের দেশে' গ্রন্থটি রচনা করেছেন শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী। তবে মথুরার থেকে বরং বৃন্দাবনকেই লেখক বেশী পাঠকদের সামনে এনেছেন। ভ্রমণকাহিনীর ঢঙে লেখা। প্রাচীন বৈষ্ণবীয় আখ্যান-উপন্যাসের স্মৃতি-সূত্রে লেখক বৃন্দাবনের যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান—মন্দির, কুঞ্জবন, নদীতট, কালীদহ, বংশীবট, গিরি গোবর্ধন, অন্যান্য মন্দির, আশ্রম ইত্যাদির চমৎকার পরিচয় তুলে ধরেছেন। কাশীপুরের রাজবাড়ির লালাবাবুর কথা, প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা, রূপ-জীব-সনাতন ইত্যাদি গোস্বামীর কথা, মানকড়-বাসী জীবন ঠাকুরের কথা—এসমস্তই লেখক বৈষ্ণবীয় দৃষ্টি ও ঐতিহাসিক সততায় নিবদ্ধ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থে। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মহা-ভারতের যুগের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁর বৃন্দাবন পরবর্তীকালে পাঠান শাসকদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। তাকেই নতুন করে আবিষ্কার করেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবন পরিক্রমা তাই লেখক একবার মানসনয়নে, আর একবার লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে—দুভাবে সম্ভব হয়েছে। তথ্যনিষ্ঠা, কাহিনী নির্ভর সরসতা, ভক্ত ও ভ্রমণ রসিকের সমৃদ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ এই গ্রন্থের স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিয়েছে। গ্রন্থটি বৈষ্ণব-জীবন ও রসপিপাসুদেরই শুধু তৃপ্ত করবে না, সাধারণ সহৃদয় পাঠকদের ঔৎসুক্য ও জ্ঞান বাড়াবে নিঃসন্দেহে।

সমাজে সাহিত্যে (প্রবন্ধ)। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বুক ট্রাস্ট, ৫৭-বি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দশ টাকা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু দায়িত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করে পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। সেইরকম কিছু প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ 'সমাজে সাহিত্যে'। সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্যের প্রভাব, জীবন ও সাহিত্য, সাহিত্য ও শালীনতা, সাহিত্যের সঙ্কট ইত্যাদির উল্লেখ্য। লেখক 'ইন্দ্রজিৎ' ছদ্মনামে বেশ কিছু রচনা লিখেছিলেন। সে রচনাগুলির কিছু এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রচনাগুলির মধ্যে মন্ময় ভাব ও রচনারীতি অবলম্বিত হওয়ায় গম্ভীর বিষয় ও যুক্তি-তর্ক-তথ্য—সবই এক অভিনব প্রবন্ধের আকার পেয়েছে। 'রমণী ও রমণীয় রচনা' 'প্রেম ও প্রেমালাপ' সেই জাতীয় রচনা। ব্যক্তি ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে লেখা 'মহাকাব্যের কবি মধুসূদন', সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ', প্রমথ চৌধুরী স্মরণে' ইত্যাদি প্রবন্ধ লেখকের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় স্পষ্ট করে। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ, প্রবন্ধের দুরূহতাকে গদ্যের স্বচ্ছন্দতায় ও বাক্য গঠনের সহজ কৌশলে সপ্রাণ করে তোলায়। প্রবন্ধকারের পাণ্ডিত্য কোথাও এতটুকু বাসহানিকর হয়নি। মননধর্মিতা, যুক্তি তর্ক দিয়ে এক সুস্থ সিদ্ধান্তে উপ-নীত হওয়ার মত ক্ষমতা হীরেনবাবুর আছে। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে যথার্থ অর্থে সার্থক প্রবন্ধকার, 'সমাজে সাহিত্যে' তার প্রমাণ।

মনের আকাশ (গল্প সংকলন)। হরেন ঘোষ। বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩, টেমার লেন, কলকাতা ৯। ছয় টাকা।

'কীট', 'দূরের জানালা' ইত্যাদি নামের কয়েকটি গল্প সংকলিত হয়েছে 'মনের আকাশ' গ্রন্থে। গল্পগুলি ইতিপূর্বে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের গল্পের নায়ক-নায়িকারা উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কীট গল্পের সন্দীপন-শিখা, 'দূরের জানালার' সুব্রত-সুব্রতর স্ত্রী, 'ফানুস' গল্পের শিব-তোষ-শর্মিলা ইত্যাদি এই শ্রেণীর। কীট গল্পে লেখক সন্দীপনের স্ত্রী শিখার প্রতি সন্দেহ ও শিখার আত্মহত্যা, 'দূরের জানালা' গল্পে সুব্রতর লোভ-লোলুপতা ও স্ত্রী তপতীর প্রতি ব্যবহার, 'ফানুস' গল্পে বেকার ভোক শিবতোষের প্রতি শর্মিলার আচরণ ইত্যাদি অংশ লেখকের মধ্যবিত্ত জীবন-চেতনার পরিচায়ক। তবে গল্পগুলি গতানু-গতিক ভাবনায় ক্লান্তিকর। ভাষা সব সময়ে ছোটগল্পের উপযোগী অন্তর্ভেদী এক-মুখিতায় দীপ্ত হয়নি। শেষের চমকগুলি আধুনিক গন্ধ-রস-পিপাসু সহৃদয় পাঠকদের কাছে মেলোড্রামাটিক মনে হলে অন্যায় হবে না।

কান্না হাসি মৃত্যু (গল্প সংকলন)। সরসী সরকার। প্রকাশক, স্বপ্ন সাহিত্য গোষ্ঠী, পি-১৩২, সি আই টি রোড কলকাতা-১০। চার টাকা।

কান্না লজ্জা ঘৃণা, ভয়, মৃত্যু, হাসি ইত্যাদি নামের কয়েকটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ 'কান্না হাসি মৃত্যু'। লেখক সরসী সর-কার নতুন গল্প লেখক। নিছক প্রেমকে ভিত্তি করেই লেখকের গল্প-ভাবনা তৈরী হয়েছে। কিন্তু প্রেমের কোন জটিল সমস্যা আধুনিক জীবন যাপনের সঙ্গে ওতপ্রোত কোন প্রশ্ন, সংশয়—এসব কিছুই নেই। যা আছে তা শুধু সহজ সরল সেন্টিমেন্ট এবং মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশনের মধ্যে রেখে তার বিবরণ। সহজ রস-উপভোক্তা গল্প-পাঠকদের এ গ্রন্থ কিছুটা তৃপ্ত করবে।

শ্যামসুন্দর অনাথ আশ্রম (উপন্যাস)। ডঃ গৌরমোহন দাস দে। শৈলাবাস, পি ৭-১১(এস), কল্যাণী, নদীয়া। চারটাকা।

শ্রীগৌরমোহন দাস দে রচিত 'শ্যাম-সুন্দর অনাথ আশ্রম' গ্রন্থটি মূলত উপ-ন্যাসোপম দুটি বড় গল্পের সংকলন। বড় গল্প দুটি হল—নাম-গন্ধটি এবং দরদী। ধনীলোক শ্যামসুন্দর মুস্তাফীর নামেই অনাথ আশ্রমটি। ডঃ চ্যাটার্জির স্বপ্ন আদর্শ, আশ্রমের ছেলেমেয়ে সুদীপ্ত, সুশান্ত হারাধন, স্বপনা, মণিকা, রত্না মানসী অতসী ইত্যাদির কাহিনীই এর মূল উপজীব্য। এরা অনেকেই বড় হয়ে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। মা মমতা চরিত্র সু-অঙ্কিত। 'দরদী' গল্পের শশাঙ্ক-মনীষা-অমলের প্রেমাবর্তনজনিত কাহিনীর জটিলতা সুখপাঠ্য। লেখকের গল্প বলার ক্ষমতা আছে। ভূমিকায় এ দুটিকে উপন্যাস আখ্যা না দিলেই পারতেন।

শান্তির সন্ধানে (উপন্যাস)। পরমেশ চৌধুরী। চিত্ত দত্ত, ৫৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। সাড়ে পাঁচ টাকা।

প্রেমে দেহ সর্বস্বতা এবং দেহমালিন্য-হীন স্বর্গীয় বিভাব প্রেম—এই দু-এর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ—লেখক পরমেশ চৌধুরী তাঁর 'শান্তির সন্ধানে' উপন্যাসে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের মূল নায়ক-নায়িকা পরীর শান্তি। এরা প্লেটোনিক প্রেমে বিশ্বাসী এবং এরা স্বামী-স্ত্রী। শান্তির বান্ধবী রুমা প্রেমে শান্তির সন্ধানে বহুভোগ্যা, কিন্তু শান্তির আশায় অতৃপ্ত। পরীকে সে তার পরীক্ষায় টানতে চায়, শান্তি স্বামীকে পরীক্ষা করতে রুমার সঙ্গে একমত হয়। শেষে পরীর সংযম, শান্তির অনুতাপ এবং রুমার অসম্ভব ভোগাসক্তি, ব্যর্থতা থেকে শেষে আত্মহননে উপন্যাসের ছেদ টেনেছেন। বাস্তব-অবাস্তব ঘটনা, যুক্তিহীন পরিস্থিতি রচনা করে লেখক কাহিনীটি জমিয়েছেন। যাঁরা গল্প পড়ে আনন্দ পেতে চান, এ বই তাঁদের ভাল লাগবে।

মধুরেণ (উপন্যাস)। কুমারেশ ঘোষ। লিপিকা, ৩০।১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মধুরেণ' উপন্যাসের নায়ক এক শিক্ষক—নাম কেশব, মধুরাপুরের শিশির সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষক ছিলেন আদর্শবাদী। ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দানের দিকে ছিল তাঁর প্রধান দৃষ্টি। এক সময়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কেশববাবুর মতবিরোধ হলে তিনি স্কুল ছেড়ে কলকাতায় পরিচিত রামবাবুর বাড়ি এসে আশ্রয় নেন। বেকার থাকাকালে কেশববাবু হাতের পোস্টারে লেখা চাকুরীর আবেদন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। শেষে এক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সুযোগ পান। সেখানে 'ললিতা' নামে এক তরুণী অভিনেত্রী ওঁকে ভালবাসতে এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ললিতার অসহায় অবস্থা বুঝে তাকে বোনের মত স্নেহ করেন ও লেখাপড়া শেখান। একদিন কেশব-বাবুর স্ত্রী ব্রজসুন্দরী ও রামবাবুর স্ত্রী থিয়েটার দেখতে গিয়ে ললিতাকে দেখে সন্দেহ করে। পরে বোনের প্রতি স্নেহ ও কেশববাবুর প্রতি ললিতার শ্রদ্ধাভক্তি বুঝতে পেরে ভুল ভাঙে। শেষে কেশববাবু আসান গ্রামের স্কুলে মাস্টারী নেন। লেখক ভালই কাহিনী রচনা করেছেন। এ জাতীয় কাহিনী অনেকেরই ভাল লাগবে।

স্বয়ম্বর সভায় (উপন্যাস)। প্রফুল্ল মিশ্র। ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ণ, ৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ঢাব. / টাকা।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা 'স্বয়ম্বর সভায়' উপন্যাসটি শ্রীপ্রফুল্ল মিশ্রের সম্ভবত প্রথম উপন্যাস। নায়ক 'চৈতন' নির্মাল্য দাস, নির্মাল্যের পালক পিতা ত্রিভঙ্গ, জমিদার শ্রীশ রায়, শ্রীশ রায়ের কন্যা সংঘমিত্রা, প্রেমিক সঞ্জয়—এদের কাহিনী রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে এবং প্রেম-ভালবাসার জটিলতায় দানা বেঁধে উঠেছে। সঞ্জয়ের প্রতি প্রেমে ব্যর্থতার পর সংঘমিত্রার নির্মাল্যের প্রতি আকর্ষণবোধ এবং পরিণামে রাজনৈতিক আন্দোলনে গুলি খেয়ে নির্মাল্যের হাসপাতালে মৃত্যু—ইত্যাদির জটিলতায় কাহিনী শেষ। কাহিনী সহজ সরল, ভাষা সাবলীল।

প্রগতির পথে (স্মারক গ্রন্থ)। সম্পাদক—সুধীরচন্দ্র দাঁ। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মেলন, নবকুমার নগর (কালনা)।

বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থটি আমাদের হাতে এসেছে। গ্রন্থটি বাস্তবিকই সু-সম্পাদিত এবং মূল্যবান, যুগোপযোগী আলোচনায় পূর্ণ। উনিশ-বিশ শতকের কয়েকজন সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ ও আধ্যাত্মিক মানুষের রচনা এতে সংকলিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, জওহরলাল, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রই প্রধান। সাংগঠনিক বিষয় আলোচনায় দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু ইত্যাদির আলোচনা সুচিন্তিত, গঠনমূলক। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জাতীয় আন্দোলনের বিষয়গুলি নিয়ে চন্দ্রজিৎ যাদব, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায় ইত্যাদির আলোচনা স্মারকগ্রন্থটিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। বেশ কিছু মূল্যবান আলোকচিত্র ও নেতাজী-মহাত্মাজীর একত্র সাক্ষাতের চিত্র এই স্মারক-গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

অন্তরঙ্গ সপ্তর্ষি (কাব্য সংকলন)। সত্যেন্দ্র আচার্য। কবিপত্র প্রকাশ ভবন, ২২বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা-২৬। তিন টাকা।

'এই অন্ধকার ঘরে/আমি আর ভালবাসা একাসনে/অথচ কি বিশ্বাস বেঁচে আছি।' বা 'অজস্র আলোয়/নিরুপম মালাটিকে হাতে নিয়ে দেখি/কোন ফুলই চিরচেনা নয়।'—এই রকম বেশ কিছু কাব্যিক অনুভূতিপ্রাণ বিশ্বাস উজ্জ্বল পংক্তি রচনা করে কবি সত্যেন্দ্র আচার্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ সপ্তর্ষি'-তে কবিক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে কবিতার অন্তমিল কোথাও কোথাও পুরনো। গতানুগতিক মনে হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও—যেমন, 'লুণ্ঠিত'-র সঙ্গে 'কণ্টকিত'-র মিল দিয়ে অন্তমিলজনিত ধ্বনিসাম্যের সূক্ষ্ম-আরামবোধে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন—যদিও ছন্দ প্রকরণে কোন ত্রুটি সে ক্ষেত্রে চোখে পড়ে নি। প্রেম বিষয়ক শেষ কাব্যনাট্যটি সুলিখিত এবং এর শেষেও কবিরই প্রেম-ভাবনায় 'বিশ্বা দুর্লক্ষ্য নয়—'অসহায় আমি, কাকে দেব অনুরাগ/বল প্রেম কাকে, কাকে তুচ্ছ সে-ভালবাসার ঋণি?'

শান্তি আমার তৃষ্ণা (কাব্য সংকলন)। হেনা হালদার। সিগনেট প্রেস, ২৫।৪, এক-বালপুর রোড, কলকাতা-২৩। চার টাকা।

মেজাজে, বক্তব্যে, কবিভাষায় সম্পূর্ণত আধুনিক হয়েও 'শ্রীহেনা হালদার কোন দুর্বোধ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ক্ষেত্রে তেমন উৎসুক নন, 'শান্তি আমার তৃষ্ণা' কাব্য-সংকলনের কবিতাগুলি তা প্রমাণ করে। ভালবাসার অনুভূতির চিত্রল প্রকাশে হেনা হালদার কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন—'তোমার চোখেই মেঘ রোদ্দুর ইন্দ্রধনু ছুঁই/শুষ্ক প্রহর : বন্ধ ঘড়ি : রক্ত চলাচল।' অথবা 'একটি পদ্ম আনতে গিয়ে ফেরনি আর/শুষ্ক বিলে...' বা 'সেদিনকার সেই ছোট্ট আলোটির কথা../বুকের কাছে হাত আড়াল করা/পিদিমটার মত'। এই রকম উজ্জ্বল পংক্তি কবির রোমান্টিক অভিজ্ঞতা-মাখানো চিত্রকল্পের সঙ্গে পাঠকদের চিনিয়ে দেয়। আলোচ্য কবি আত্মগত লিরিক লিখতে ভালবাসেন। কোথাও কোন সচল বিদ্রোহ, বা সোচ্চার ঘোষণা নয়, নিজের মত করে নিজেরই গোপনতম কথাগুলি সাবলীল সহমর্মিতা লাভ করে।

লিপিকা। সম্পাদক—রাধাগোবিন্দ দে। ধনিয়াখালী, হুগলী। এক টাকা।

লিপিকার তেরশ আশি সালের তৃতীয় বর্ষ বৈশাখ সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি মাত্র বাইশ বছর বয়সে পরলোকগত তরুণ কবি দীপঙ্কর গুহ স্মরণ সংখ্যা। লেখকদের মধ্যে আছেন বিমল মিত্র, মনোজ বসু, সুভাষ সমাজদার, নচিকেতা ভরদ্বাজ ইত্যাদি লেখক। রচনাগুলি মৃত আত্মার প্রতি যথার্থ সম্মানই প্রকাশ করেছে।

এপার বাংলা (জুলাই)—সম্পাদক : সরোজ-মোহন মিত্র। ১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা—১২। এক টাকা।

পত্রিকাটির পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়, প্রচলিত সাহিত্যপত্রের সঙ্গে এর মেজাজ-মর্জি মেলে না। লেখালেখির ধরনধারণ আলাদা। বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেদারনাথ মজুমদার ও প্যারীচরণ সরকারের জন্মশতবর্ষ ও সার্ধ-শতাব্দী উপলক্ষে প্রকাশিত রচনা দুটি মূল্যবান। 'বনফুলের' দিনলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা আকর্ষণীয়। লিখেছেন ব্যোমকেশ মজুমদার, গোরাচাঁদ মিত্র, রতন দাশগুপ্ত, সলিল মিত্র, দেবপ্রসাদ সরকার, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অরুণকুমার সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেকে।

ঝরু (শ্রাবণ)—সম্পাদক : শিবব্রতন গঙ্গোপাধ্যায়। ৬৫ রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা—৩৪। দাম : এক টাকা।

চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বিজয় দেব। গল্পগুলি যথাযথ। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভালো কবিতা লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সুনীল বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শিবব্রতন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কয়েকজন। পত্রিকা সমালোচনাগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও ভালো।

আইন জগৎ (তৃতীয় সংখ্যা)— সম্পাদক : রামগোপাল মুরারকা। ১১৩ লালবাজার বাঁকুড়া। এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

আইনের পত্রিকা বাংলায় বোধহয় আর বেরোয়নি। এই পত্রিকাটি সে অভাব পূরণ করেছে। জমিজমা, জিনিসপত্রের কেনাবেচা, আষকবের রেহাই, সমবায় সমিতি প্রভৃতি সম্পর্কে যেসব আইনকানুন আছে—তার খবরাখবর, বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ সংখ্যায়। আইনজ্ঞদের কাছে পত্রিকাটি যেমন জরুরী, সাধারণ মানুষের কাছেও তেমনি প্রয়োজনীয়। আশা করা যায়, পত্রিকাটি জনপ্রিয় হবে।

ডাঃ বিভূতি রক্ষিতের

মানুষ ও প্রকৃতি ৬·০০

নূতন দিগন্তের গল্প ও কাহিনী।

বনফুল বলেছেন,...'তিনি রোগীদের মধ্যে চিরন্তন মানুষকে দেখেছেন এবং তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা রসোত্তীর্ণ করে প্রকাশ করেছেন বলে গল্প-গুলি সাহিত্যভাণ্ডারে স্থান পাবার যোগ্য হয়েছে।..আমাকে সব থেকে মুগ্ধ করেছে তাঁর ভাষার স্বচ্ছতা, আর নিখুঁত পরিমিতিবোধ।" এছাড়া **প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী ও জয়াসন্ধ** কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত।

পরিবেশক : বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, কলেজ রো, কলকাতা-৯

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। ছয় ।।

এ-বন্দরটা বেশ নিরিবিলি নির্জন। শহর খুব কাছে না হয়তো। বস্তিঘর থেকে আলো এসে মাঝে মাঝে তাদের জাহাজেও পড়েছে ছোটবাবু একবার আলোর মুখোমুখি পড়ে চোখে অনেকক্ষণ ঝাপসা দেখেছে। সে ভেবে ছল চুপচাপ পেছনের ফল্কাতে বসে থাকবে। কিছু পাখি জাহাজে আসতে আসতেই মরে গেছে। লোনা জলের ঝাপটা কিছু পাখির সহ্য হয়নি। ওরা সে-সব সমুদ্রেই ফেলে দিয়েছে। কোথাকার পাখি, রাজস্থানের কোন অঞ্চল থেকে পাখিগুলো ডারবান যাবে, তারপর কোথায় যাবে কেউ জানে না। চিড়িয়াখানা-টানায় হবে হয়তো। তবু এটা ওরা আন্দাজে অনুমান করে ছল। পাখিগুলো জলে ভাসিয়ে দিলে ছোটবাবুর এমন মনে হত। কারণ মরা পাখিরা জলে কিছুটা ভেসে রয়েছে, জাহাজ একটু দূরে গেলেই বড় বড় হাঙর ছুটে আসবে। কত সুন্দর নরম মাংস, ভারতবর্ষের কোথায় এদের বাস ওরা জানে না, তবু সে টের পায় জলের নিচে সেই সব অতিকায় হাঙরের ঘোরাফেরা আর জাহাজ যায়, সেই একভাবে, নীল রঙের সাম্রাজ্যে জাহাজ, সাদা জাহাজ যায় আর যায়। পাখিগুলোর মরা শরীর অনেক দূর থেকেও ভাসতে দেখা গেছিল।

কিছু পাখি মরে যাওয়ায় ফল্কার এদিকটা ফাঁকা। জাহাজ বেশ দ্রুত যাচ্ছে। কারণ, জাহাজটাকে সমুদ্র-স্রোত কিছুটা দ্রুত যেতে হয়তো সাহায্য করছে। এখানে সে জানে একটা মৌসুমি স্রোত আছে, মৌসুমি স্রোতের জন্য হতে পারে, বা জাহাজ খুব নিরিবিলি সমুদ্র পেয়েছে বলে প্রায় একদিন আগে লরেঞ্জোমার্কেজে সে ঢুকে গেছে। আর হাওয়াটা জাহাজের সামনে। পেছনে সেজন্য ধোঁয়া যাচ্ছে। ফানেলের ধোঁয়া সারাটা আফটারডেকে, ফল্কা একেবারে কালো করে ফেলেছে। ছোটবাবু ফল্কার একটু বসবে ভেবেছিল, সকালে ডেক-টিন্ডাল খুব ভালভাবে জল মেরেছে, অথচ এখন হাত দিলে ফের কালো ছাপ। সে এখানে বসতে পারল না।

বেশ অন্ধকার এদিকটাতে। যে-কোন কারণেই হোক, মাস্তুলের আলোটা জ্বলছে না। এখন নিশ্চয়ই বোট-ডেকে মেজ-মালোম আছে। কিন্তু সে গিয়ে দেখল মেজ-মালোম নেই। কেবল বড়-মিস্ত্রি সেজেগুজে কোথাও নেমে যাবে বলে গ্যাঙওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় একমাস হতে চলল, ওর মনেই ছিল না, এ-জাহাজে বড়-মিস্ত্রি বলে একজন আছে। অথচ সে প্রথম দিন দেখেছে, মানুষটা ক্লাচে ভর করে ডেকে উঠে আসছে। কিনারায় ওর মেয়ে ঠিক করা থাকে। বন্দর বন্দরে ঘুরে এটা হয়েছে। হয় জেনি, নয় লবী, নয় এলমা এমন কেউ না কেউ আছে। কলকাতা বন্দরে কে থাকে, তার নাম কি? মানুষটা এতদিন কোথায় ছিল। ঘরে, নিজের ঘরে। সারাক্ষণ মানুষটা সে শুনেছে দাবা নয়ে বসে থাকে। আর টিপয়ে মদ এবং সে একা দুজনের হয়ে সকাল-সন্ধ্যা কখনও গভীর রাত পর্যন্ত দাবা খেলে যায়। মনে হয় সে ঘুমোতে জানে না। সারাক্ষণ জেগে জেগে জাহাজ পাহারা দেবার স্বভাব বুঝি। যখন ভাল লাগে না পোর্ট-হোলে দাঁড়ায়। সমুদ্র যেন পেছনে চলে যাচ্ছে এমন তার মনে হয়। সে সমুদ্রে একটু সময় তাকিয়ে থাকলেই সমস্ত গ্লানি খুব সহজে শরীর থেকে মুছে ফেলতে পারে।

ছোটবাবুর মনে হল এ-মানুষটাই জাহাজে সবচেয়ে সুখী। বেশ লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, গোলগাল মানুষ, গোলগাল বলে যতটা লম্বা দেখানো দরকার তা দেখায় না। মাথায় একটাও চুল নেই। টাকটি এত বেশি মসৃণ আর চকচকে যে, কখনও কখনও একটা বরফের বলটল মনে হয়। বোধহয় জাহাজটা এখানে বাতটা কাটাবে। নয়তো বড়-মিস্ত্রি বের হয় না। ওর তো কোন কাজ নেই, কেবল একটা কেবিন, দাবার ছক, ছকটা আবার সাধারণ ছকের মতো নয়, খাঁজকাটা, যাতে দাবার বড়ের পিচিউ-এর সময় ছিটকে পড়ে না যায়। ওর একদিন বড়-মিস্ত্রির ঘরে পাইপ মেরামতের কাজ ছিল, সেদিন বড়-মিস্ত্রি সারাক্ষণটা মুখ গুম্ করে বসেছিল। কি বিরক্ত! ছোটবাবু আর পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি কোনরকমে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করে বের হলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো। সেই থেকে সে আর মানুষটাকে দেখেনি। তার কোন ওয়াচ-তাস নেই। দিনের বেলা সব সময় বরফলার স্যুট পরে থাকে। পেছনের পকেটে একটি লম্বা টর্চ। এটা সে কখনও পকেট থেকে খুলে রাখে না। বড় মিস্ত্রিকে একটা টর্চ বাদে কিছুতেই ভাবা যায় না।

গ্যাঙওয়েতে সিঁড়ি পড়ে গেলেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে মানুষটা নেমে যাবে। সামনে কি আছে, রাস্তার নাম কি, ট্যাকসি কোথায় পাবে, সব সে জানে। হয়তো এ-বন্দরে এই নিয়ে বিশবার এসেছে। তার কাছে, বন্দরের ছবি এত স্পষ্ট যে, জাহাজীরা মেয়ে ধরতে গেলে পর্যন্ত ওর কাছে শোনা যায় টিপস্ নিতে। কোন জায়গায় ভালো জিনিস আছে বড় মিস্ত্রির মতো কেউ বলতে পারে না।

সব শোনা ছোটবাবুর। মানুষটাকে দেখে আবার মনে পড়ে গেল। সে কোনরকমে অন্ধকারে গ্যাঙওয়ে পার হবার সময় টের পেল না, আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে। সে অমিয়। অমিয়, জাহাজ বন্দরে ধরছে, আর নেমে যাবার তাল করেছে। ছোটবাবুরও ইচ্ছা করছে একবার নিচে নেমে যেতে। যেন কতকাল মাটির স্পর্শ সে পায়নি। পায়ের নিচে মাটি পেলে, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইণ্ডিয়া মনে থাকে না মাটি, মাটি। মাটি, জননী,

এমন শুধু মনে হয়। মানুষের কাছে এর চেয়ে প্রিয় কিছু নেই।

ছোটবাবু অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখল, ঠিক বড়-মিস্ত্রি নেমে গেলে পিছু পিছু আর একজন নেমে গেল। ট্রেনগুলোর পাশ দিয়ে ডকের বড় বড় লম্বা গুদাম, রেল-লাইন, লাইন পার হয়ে গেটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জাহাজ যখন বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে তখন যে-যার মতো বন্দরে নেমে যাবে। ফ্যাকসালে এসে দেখল, মৈত্র উবু হয়ে চিঠি লিখছে। পাতার পর পাতা লিখছে, এবং একটা বাণ্ডিল বোধহয় করে ফেলবে। কেউ কেউ ডাকে খুঁজে গেছে। চিঠি লেখাতে দলবেঁধে এসেছিল। সে ভয় আর জেগে থাকতে পারল না। যা সব চিঠি, মাঝে মাঝে সে না হেসে পারে না। হাসলে আবার ওরা রাগ করে। সে চিঠি লেখার ভয়ে তাড়াতাড়ি কম্বল গায়ে শুয়ে পড়লে মনে হয়, ওপরে কেউ ওকে খুঁজছে। এবং সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কেউ দ্রুত নেমে আসছে। মৈত্র দেখল, মেজ-মালোম উঁকি দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি, মৈত্র লাফিয়ে দরজার কাছে গেলে ছোটবাবুর দিকে আঙুল তুলে মেজ যেন কি বলছে।

মৈত্র বলল, স্যার ও ঘুমোচ্ছে।

ছোটবাবু ঘুমোয়নি। সে সব শুনছে। যদি মজার কোন ব্যাপার হয়, তবে বলবে, না স্যার ঘুমোইনি, আর না হলে এখন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতেই হবে। সে চুপচাপ কথাবার্তা শুনছে কেবল।

সেকেণ্ড বলছে, এত তাড়াতাড়ি ছোট ঘুমিয়ে পড়েছে।

—ওর মনটা ভাল নেই স্যার।

—কেন কেন!

—দেশ থেকে চিঠি আসেনি।

—স্যাড!

—খুব স্যাড। সবার চিঠি এসেছে, চিঠি না এলে কেমন লাগে!

—খুব খারাপ। খুব খারাপ। তবে তার জন্য মন খারাপ করার কি আছে।

—খুব মন খারাপ করে সন্ধ্যার দিকে চুপচাপ শুয়েছিল। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা না। যখন খুঁজে বের করলাম তখন দেখি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে কাঁদছে।

ছোটবাবু এবার আর উত্তর না করে পারল না। মৈত্রদা ওকে সেকেণ্ডের কাছে একেবারে বালকের সামিল করে ফেলছে। ওর খুব এতে অহংকারে লাগে। সে উঠে বসল, কম্বল গা থেকে ফেলে বলল, না স্যার আমি কাঁদিনি। ও বেশি বেশি আপনাকে বলছে।

—তা ঠিক আছে, তুমি যখন কাঁদোনি, ভাল করেছ, জাহাজীরা চোখের জল ফেলে না। ওরা এত বেশি লোনা জল ঘাটে, চোখের জলে সেটা পোষায় না। তোমাকে যা বলছিলাম, তুমি যাবে ওপরে?

—কোথায় স্যার।

এই জেটিতে একটু ঘুরে আসব।

প্রস্তাবটা মন্দ না। সে বলল, চলুন।

আসলে ছোটর গরম জামাকাপড় কিছু নেই। সে এভাবে নিচে নেমে যেতে পারে না। মৈত্র বলল, আমার সোয়েটারটা গায়ে দে। না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মৈত্র ওর লকার খুলে কেশ ভাল সোয়েটার ঘি ঘি রঙের বের করে দিলে। ভীষণ ঢোলা। এবং মৈত্রের প্যান্ট, আরও ঢোলা, তবু শীত মানবে ভেব ছোটবাবু এসব পরে সেকেণ্ডের সঙ্গে জেটিতে নেমে গেল এবং সত্যি আরাম, আশ্চর্য আরাম। ওরা রেল-ইয়ার্ড পার হয়ে সামনে ইকাগো রেস্তোরাঁতে বসে গেল।—তুমি কি খাবে?

—কিছু না স্যার।

—আরে খাও। নতুন এয়েছ, দাখো না যাবে একদিন?

—কোথায় স্যার?

—কার্ণিভেলে।

—সেটা কোথায়?

—বুয়েন-এয়ার্সে। ও কি সব ব্যাপার। তোমার মনে হবে, সে একটা ব্যাপার। যাকগে, ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিচ্ছি।

ছোটবাবুর আশ্চর্য মনে হল মেজকে। সে এতটা কখনও প্রত্যাশা করে না। ওরা সাহেব-সুবো মানুষ অফিসার। সে সব-চেয়ে নিম্নতম মজুরিতে কাজ করে—ওর সঙ্গে মেজ-মালোমের সহৃদয় ব্যবহার কেবল কল্পনায়ক ঘটনা। মেজ-মালোম যে মনে হয় দার্শনিক, কখনও মনে হয় হিসেবী, আবার কখনও লুচ্চা। এখন কি মনে হচ্ছে সে ভেবে পাচ্ছে না। সে বয়সে ছোট বলে, মসৃণ গাল মসৃণ দাড়ির ভিতর আশ্চর্য একটা লোক এই সব জাহাজীদের থেকে যেতে পারে, এবং সেটা কতদূর পর্যন্ত গড়বে সে বুঝতে পারে না, সে নানাদিক ভেবে বলল, না স্যার। আমি ড্রিঙ্কস করি না।

—তবে কফি খাও। খাবার কি খাবে?

—কিছু না স্যার। এক কাপ কফিই যথেষ্ট।

মেজ পর পর পেগ পাঁচেক খেয়ে ফেলার সময় দূরে রেল-ইয়ার্ডের পাশে বড়মিস্ত্রির গলা পাওয়া গেল। খুব কসা করছে কারো সঙ্গে।—তুমি শালা ইণ্ডিয়ান, দালাল, কিচ্ছু জান না, এখানে আমাকে বাজারের মাগি চেনাতে এসেছ!

কেউ তখন হেঁকে বলছে, আপনি স্যার ভুল করছেন, আমি দালাল নই। বাজারের সেরা মাগি খুঁজে বের করা আমার পেশা না।

রেল-ইয়ার্ডে আলো কম। বেশ দূরে দূরে বাতির থাম। গাড়ি সান্টিঙের শব্দ আসছে, কখনও জেটির পাশ দিয়ে টংলিং টংলিং শব্দ করতে করতে একটা মালগাড়ি যেন সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। অন্ধকারে বোঝা যায় না, কেবল বোঝা যায়, আর একটু এগিয়ে গেলেই সমুদ্র। বড়-মিস্ত্রি খুব আজ বেকায়দায় পড়ে গেছে।

আসল ব্যাপারটা ছিল অন্যরকমের। অমিয় চুপি চুপি বের হয়ে যাচ্ছিল। ওর ইচ্ছা ছিল বড়-মিস্ত্রি নেমে গেলেই সে নেমে যাবে, সে গ্যাঙওয়ে থেকে যখন দেখল বড়-মিস্ত্রি, রেল-ইয়ার্ডের ভিতর ঢুকে গেছে, তখন সে নিজেও নেমে গেল। সে এখানে একটু হেঁটে বেড়িয়ে দেখবে, এমন ভাব আশা। বড়-মিস্ত্রি খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে সময় লাগে। অমিয় যেতে যেতে কখন দেখছে, কেউ অন্ধকারে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এটাকে ঠিক অন্ধকার বলা যায় না, কম আলো, অস্পষ্ট আলোতে সে বুঝতে পারছে না, কে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভাবছিল, কিন্তু কেউ তাকে ডাকছে, হাত তুলে ডাকছে।

বড়-মিস্ত্রির মনে হয়েছিল, জাহাজ থেকে নামার পরই কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে এ-সব দেশের দালালদের চেনে। ভীষণ টাকার খাঁকতি বেটাদের। হয়ত জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে, এখন মৌকা, ওঁত পেতে আছে, কে নামছে, কেউ নামলেই সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। আরে বাপু আমাকে শহরের পথঘাট চেনাবে, বাজারের কে কেমন আছে জানাবে। আমি তো সব জানি। মিলড্রেড কি চিঠি পায়নি তাহলে! চিঠি পেলে সে তো না এসে থাকার মেয়ে নয়। সে তো অন্য সময় ঠিক জাহাজ বাঁধার আগেই জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কত সে নিজের মানুষ। বহুদিন সফর শেষে তার মানুষ ঘরে ফিরছে। বড় এসব ভেবে সুখ পায়। মিলড্রেড যতই টাকা নিক, তাতে ওর কোন দুঃখ থাকত না।

সে ভেবেছিল, ইণ্ডিয়ান মার্কেটের দিকে যাবে, না পর্তুগীজদের যে বড় গীর্জা আছে, সেখানে, এবং প্রতি রোববারে যে মেলার মতো বসে জাবগাটায় সেখানে যাবে, সেখানে গেলে সে অনেকদিন আগের

এসিকে পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই গীর্জায় যাবার পথটা এতদিন পর ভুলে গেছে। ওর হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল, মিলড্রেড্স জাহাজঘাটায় না এসে অপমান করেছে। সে মিলড্রেডের সংগে আর সম্পর্ক রাখবে না। সে আবার পুরানো ঘরেই যাবে। পুরানো জিনিস দামে সস্তা আর শরীরের পক্ষে উপকারী। প্রায় পুরানো টনিকের মতো, অথবা পুরানো মদের মতো।

সে অনুসরণকারী লোকটার জন্য অপেক্ষা করল। দালাল মানুষেরা সব খবর রাখে। সে ওদের কাছে ঠিক খবরাখবর পেয়ে যাবে। কে ডাকল কিন্তু লোকটা আসছে না দেখে, সে হাত তুলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল।

অমিয় কাছে এলে বুঝতে পেরেছিল, বড়-মিস্ত্রি। সে খুব থতমত খেয়ে গেছে। সে বলল, আমি স্যার.....

বড়-মিস্ত্রি বলল, ঠিক ঠিক আছে, তুমি যে দালাল নও দালাল হলে তেমন লজ্জার কি আছে। তোমার সেজন্য ভয় নেই। বলছিলাম, একটু চার্চের দিকে যাব। তুমি আমার সংগে আসতে পার।

অমিয় বুঝতে পারল না, এমন কেন বলছে, চার্চ কোথায়, কি ব্যাপার সে কিছু জানে না। সে বলল স্যার চর্চ.....

—হ্যাঁ বুঝেছি নেকা সাজতে চাও। তোমরা যারা ইণ্ডিয়ান এখানে থাক, কেন যে পর্তুগীজ সরকার রেখেছে বুঝি না। ঠেঙিয়ে সমুদ্রের ওপারে দিয়ে আসতে পারে না। এত মিথ্যা কথা তোমরা বলতে পার।

অমিয় বুঝতে পারল, সে যে একই জাহাজের জাহাজী বড়-মিস্ত্রি স্বপ্নেও ভাবেনি। সে কেবিন থেকে বের হয় না, তার সংগে জাহাজের ক্রুদের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক মেজ-মিস্ত্রির সংগে সারেঙের। সারেঙের আদেশ মতো সব কাজগুলো চলে। সুতরাং, ওর মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, স্যার আপনি মহামান্য।

—তুমি মহামান্য আর প্রিন্স অফ ওয়েলস যাই বলে আমাকে সম্বোধন কর না কেন, তাতে একটা পয়সা বেশি পাবে না।

অমিয় বলল, চলুন স্যার গীর্জার দিকে।

—সেই ভাল।

—স্যার আমি কিন্তু মেয়েদের পাড়ায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না।

—গুলি মার। এমির ঘর আমার জানা আছে। সেখানে আমি যাব। তুম আমার সংগে থাকবে।

বড়-মিস্ত্রি খুব মনে হাসলেন। বিদেশে কি করে চলতে হয় জানেন। এদের কাছে কখনও অজ্ঞতা প্রকাশ করতে নেই। তাহলে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাবে, যে আর

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্তালিন রচনাবলী প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে

স্তালিন রচনাবলী

গ্রাহকগণকে প্রথম খণ্ড সযত্নে বাহ করা হচ্ছে।

বই সযত্নে বাহ করার সময় ছুটির দিন ছাড়া সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। শনিবার ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত।

কোলকাতার বাইরের গ্রাহকগণকে ভিঃ পিঃ-যোগে বই পাঠানো আরম্ভ করা হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক ভিঃ পিঃ ছাড় করে বই সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আগামী ১লা অকটোবর ১৯৭৩-এর মধ্যে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড গ্রাহকগণকে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

নতুন যাঁরা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তারা আগামী ১লা অকটোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত গ্রাহক হয়ে প্রথম খণ্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। গ্রাহক মূল্য দশ টাকা ও প্রথম খণ্ডের জন্য ১০·০০ টাকা মোট ২০·০০ টাকা দিতে হবে।

মাওসেতুঙ-এর নির্বাচিত রচনাবলী

গ্রাহক করা হচ্ছে। বাঙলায় অনূদিত চারখণ্ডে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রচনাবলীর মোট দাম ৬৪·০০ টাকা। গ্রাহক মূল্য ৩২·০০ টাকা। ৫·০০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে। ৩২·০০ টাকার মধ্যে বাকী ২৭·০০ প্রথম খণ্ড বই নেওয়ার সময় ৮·০০ টাকা করে এবং ৪র্থ খণ্ড নেওয়ার সময় ৩·০০ টাকা হিসাবে দিতে হবে। ১লা অকটোবর গ্রাহক হবার শেষ দিন। প্রথম খণ্ড অকটোবর মাসে প্রকাশিত হবে।

সংগ্রামী পাঠকদের জন্য বিশেষ সুযোগ

শারদ উৎসব উপলক্ষে পাঠকদের কাছে আমাদের প্রকাশিত বই ব্যাপক হারে পৌঁছে দেবার জন্য আগামী ১লা অকটোবর পর্যন্ত রচনাবলী ছাড়া প্রতি বই ক্রেতাদের শতকরা ২০·০০ টাকা হারে কমিশন দেওয়া হচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর কষ্টের ঝঞ্ঝাটও আসে

জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনার অসময়ে কাজে আসে

আপনি নিশ্চয়ই কলেজের কোনো উৎসব থেকে বাদ পড়তে চান না! ধরুন কলেজে কোনো ভালো ফিল্ম দেখানো হচ্ছে— আর আপনি কোমরের যন্ত্রণা আর অস্বস্তির দরুণ প্রায় শয্যাশায়ী! এ হেন অসহায় অবস্থায় আপনাকে সাহায্য করবে জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন!

অ্যানাসিনের গুণ অনেক। এ যে শুধু যন্ত্রণা থেকে আরাম দেয় তাই নয়—যন্ত্রণার দরুণ যে হতাশভাব আসে তাও দূর করে দেয়। আপনাকে চটপট আরাম আর স্বস্তি দিয়ে, অ্যানাসিন আপনার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে।

এই অসহায় দিনগুলিতে যন্ত্রণা আর অস্বস্তি ভোগ করে পড়ে থাকবেন না। আজ যুগ অনেক এগিয়ে গেছে। জোরালো আর নির্ভরযোগ্য অ্যানাসিন আপনাকে চটপট আরাম দেয়, চাঙ্গা করে তোলে। আপনি অক্লেশে আপনার রোজকার কাজকর্ম করতে পারেন।

মেয়ে হয়ে জন্মানো মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝাট বলে মনে হয়। কিন্তু আজ এই অসময়ে আপনি অ্যানাসিনের সাহায্যে সে ঝঞ্ঝাট দূর করে—জীবনের সকল আনন্দ পুরো উপভোগ করতে পারেন। প্রয়োজনের জন্যে হ্যাণ্ডব্যাগে সবসময় অ্যানাসিন রাখুন—মস্ত বড় সুবিধে!

জোরালো অথচ নির্ভরযোগ্য

অ্যানাসিন

জ্বরে ব্যথা-বেদনায় উপশমকারী

৩৮ দেশের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়

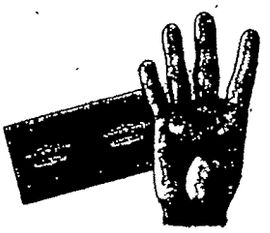

Regd. User of TM : Geoffrey Manners & Co. Ltd.

জাহাজে সময়মতো ফেরা যাবে না। জলের মতো টাকা খরচ করিয়ে দেবে। সুতরাং বেন সেই নিয়ে যাচ্ছে দালাল মানুষটাকে কেবল যেন সঙ্গে একজন লোক থাকলে ভাল, লোক থাকলে সে ভয় পাবে না, মুখ দেখলে সে চিনতে পারে মাল কেমন, অমিয়কে বড়-মিস্ত্রি সেভাবে সঙ্গে নিয়েছে।

বড়-মিস্ত্রি যেতে যেতে বলল, মিলড্রেড কেন যে এল না!

কাল সকালে জাহাজ ছেড়ে দেবে। জাহাজ ছেড়ে দিলে, এ-জীবনে আর মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। তাছাড়া ওকে দেখে বড়-মিস্ত্রি মনে রেখে দেবে না, হয়তো আট-দশ মাস সফরে কি বছরের ওপর হয়ে গেলেও একদিনও না দেখা হতে পারে—আবার দেখা হলেও, অন্ধকারে কাকে দেখেছিলে মনে রাখতে পারবেন। সে খুব বিজ্ঞের মতো বলল, না স্যার মিলড্রেডের দোষ নেই। ওরা এখানকার বাস তুলে দিয়েছে।

—তুলে দিয়েছে।

—হ্যাঁ স্যার। আর টাকা-পয়সা হাচ্ছেস না। ওরা আরও পশ্চিমে চলে গেছে।

—আমাকে একবার খবর দিতে পারল না! ছিঃ ছিঃ, কি যে করে, তারপর সে দাঁড়াল। টুপিটা মাথা থেকে খুলে আবার ঠিক করে পরল। যেন সে মিলড্রেডকে আর দেখতে পাবে না ভেবে কাতর হয়ে গেছে।

—না এটা মিলড্রেডের ভীষণ অন্যায়। ভীষণ। সে আমাকে চিঠিতে অন্তত টাকার কথা লিখতে পারত।

—আমি স্যার দেখা হলে বলে দেব।

—তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

—তা হবে না!

—এখানে কত ইণ্ডিয়ান আছে?

—তা বেশ প্রায় চারভাগের এক ভাগ আমরা।

—ওকে দেখা হলে বলবে তো, আমি ভীষণ দুঃখিত, কেন ও আমাকে চিঠি না দিয়ে পশ্চিমে চলে গেল। ওকে বলবে, কেন —কেন চলে গেল।

অমিয় আড়ালে মুচকি হেসে বলল, বলব স্যার।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বেশ শহরের ভিতরে ঢুকে গেছে। এদিকটায় কিছু ঘিঞ্জি বস্তির মতো। নিগ্রো বালক-বালিকার মুখ, যুবতীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে, কোথাও বস্ত্রাপনে সিংহের ছবি, কোথাও আদিবাসী রমণীর পোশাকে স্বল্পতা। আর বন্য লতায়-পাতায় ওরা শরীর ঢেকে কেউ কেউ হেঁটে চলে গেল। যেন একটা আদিমতা এ-অঞ্চলে এখনও আছে। অমিয়র বলতে কি নিগ্রো যুবতীদের দেখে ভীষণ ভয় করছিল। সে প্রায় বড়-মিস্ত্রির গা ঘেঁসে হাঁটছে। সে কিছুই চেনে না, আসলে বড়-মিস্ত্রি যেখানে যেখানে যাবে, সেও তার সঙ্গে আছে। বড়-মিস্ত্রি এমনই চাইছে। এবং বড় হাঁটতে হাঁটতে কেমন এক সময় বলল, এস একটু বসি কোথাও।

—আপনি যে এমির ঘরে যাবেন বলছিলেন।

—ধুস্ এমি! মিলড্রেডের জন্য মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

অমিয় দেখল, বড়-মিস্ত্রি ছেলেমানুষ। ফেলায় টাকা খরচ করতে পারে। সে জাহাজ বেঁধে ফেলার আগেই কোথা থেকে যে এত পয়সা পেল বুঝতে পারছে না। বেশ খেয়ে কেমন ঝিম মেরে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে ইণ্ডিয়ান, তুমি ভালো, খুব ভালো। তুমি আমার জন্য যা করলে কোনদিন ভুলতে পারব না।

অমিয় বলল, তবে চলুন স্যার জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—একটা ট্যাকসি দ্যাখো পাও কিনা!

অমিয় ট্যাকসি ডেকে বড়কে বসিয়ে দিল। এবং রেল-ইয়ার্ডে ঢুকেই বলল, এবারে আপনি যান স্যার। কাল আছেন তো। কাল আবার দেখা হবে।

এখানেই গণ্ডগোলটা বেধে গেল। দুজনেই মাতাল। তবে অমিয় খায়নি বেশি। সে এ-ব্যাপারটা বেশ রপ্ত করেছিল, এবং এজন্য ওর দাদাদের সঙ্গে বনিবনা হত না। লেখাপড়া হল না। ওকে ওর বাবা মিশনারি স্কুলে পড়িয়েছিল, এখন একেবারে বেহেড-মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করা ঠিক না, যেমন সে তার মায়ের কাছে সব সময় নির্দোষ থাকতে চেয়েছে, কারণ তার মা তাকে শেষপর্যন্ত ঘৃণা করত না। এমন কি আসার সময় শুকনো খাবার মুড়ি-মোয়া সব করে দিয়েছিল, সে এভাবে জানে কি করে মানুষের ভিতরে ঢুকে যেতে হয়। কেবল লীলাবৌদি, রমাবৌদির ভেতরে সে ঢুকে যেতে পারেনি। ওদের তাড়নাতে সে শেষপর্যন্ত বাড়ি ছেড়েছে। বাড়িতে সে একদণ্ড থাকতে পারত না। সে এখন

ভাবনার বই

প্রকাশিত হলো

ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ/শঙ্খ ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিজয়া'কে লিখেছিলেন একবার, 'পুরবীর কবিতাগুলি যারা পড়বে তারাও পাবে না তোমার প্রতি কত তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।' সত্যি, অল্পই আমরা জানি তাঁর কথা। অথবা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা তাঁর ছোটো বইখানির কথা। সে বইটির প্রথম পূর্ণ অনুবাদ। সঙ্গে রয়েছে বিজয়া-বিষয়ে নূতন কোনো-কোনো তথ্য, আর শেষ পনেরো বছরের রবীন্দ্রনাথকে জানবার মতো অনুষঙ্গী নানা বিবরণ।

দাম ৮·০০

ইতিপূর্বে প্রকাশিত

পিচ্ছিল গুহার জল ॥ ৪·০০

সুনীলকুমার নন্দী

'এক ধরনের ঋজু আড়ম্বরহীন অথচ সূক্ষ্ম শৈল্পিকতা আছে 'পিচ্ছিল গুহার জল'-এ। তার চাপা দ্যুতি ক্রমশ অনবগুণ্ঠিত হতে থাকে, নাটুকেপনা নয় এক গভীর নাটকীয়তা কবিতার কাটা কাটা পংক্তিগুলির হাঁরে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়...।"

অমিতাভ দাশগুপ্ত/যুগান্তর।

জীবনানন্দ দাশের গল্প ॥ ৫·০০

"ভাষা ও পর্যবেক্ষণে কবি জীবনানন্দকে নির্ভুল চেনা যায়...।" সনাতন পাঠক/দেশ।

প্রকাশিত হচ্ছে

গত শতকের প্রেম ॥ ৮·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী

নতুন বাঁশির সুর নতুন তালের রমনায়।

পরিবেশক। দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২

দাঁত-মুখ কেমন শক্ত করে ফেলল এবং বাজারে ম্যাগি মলড্রেডকে মনে হয় না নিজের বৌদিদের সম্পর্কে সে এই কটূক্তি করতে ভালবাসে। বাজারে ম্যাগিদের মুখ যেন ওর চেয়ে বেশি ভাল হয়।

বড়-মিস্ত্রি বলল, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এসেছ।

—এই তো স্যার, রেল-ইয়ার্ড ডানদিকে কষলার স্যুট। দেখুন না কয়লা কেমন জাহাজের বাংকারে ঢুকে যাচ্ছে। সামনেই তো আপনার জাহাজ এস-এস সিউল বাংকার লেখা।

—এটা চেস্টনের রাস্তা, না?

—না স্যার। এটা বন্দরের রাস্তা। আপনার জাহাজে উঠে যাবার রাস্তা।

বড়, ট্যাকস থেকে নামছে না।—কিন্তু আমার যে মিলড্রেডের কাছে যাবার কথা।

—সে তো নেই স্যার।

—নেই? কেন নেই? এবার সাঁ করে দরজা খুলে বের হয়ে এল। অলবৎ সে থাকবে। তুমি অন্য মেয়েদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য দালালি করছ।

—তা না স্যার। সত্যি বলছি।

—দালালরা আবার সত্যি কথা বলে কবে তিনি সামান্য হাসলেন। তারপর ক্রুদ্ধ গুপ্ত ভর করে মাথাটা কেমন নুইয়ে দিলেন।—কি সুন্দর রাত! মলড্রেড পশ্চিমে গেছে। আমি শালা কাল জাহাজ ছেড়ে পশ্চিমেই চলে যাব।—তুমি শয়তান, আস্ত শয়তান। তোমার জন্য আমার এত প্রিয় মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা হল না। বলে ছে স্মানুষের মতো বড়-মিস্ত্রি কাচে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রাখল।

অমিয় দেখল, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখন পালানো দরকার। অন্য কেউ নেমে এলেই ওকে চিনে ফেলবে। জাহাজ সামনে। ফার্লঙের মতো পথ। সে এখন অন্য পথে জাহাজে উঠে যাবে। আগে ওঠাই নিরাপদ। সে রেল-ইয়ার্ড ধরে হাঁটতে থাকল। এবং শোনা যাচ্ছে বড়-মিস্ত্রি এবার জোরে জোরে চিৎকার করছে—তুমি বাস্টার্ড ইণ্ডিয়ান, দালাল, কিচ্ছু জান না, এখানে আমাকে বাজারের ম্যাগি চেনাতে এয়েছে!

অমিয় তখন দূর থেকে হেঁকে বলছে, আপনি স্যার ভুল করছেন, আমি দালাল নই। বাজারে ম্যাগি খুঁজে বের করা আমার পেশা না।

—তুমি সৎ, তুমি ভালো, শয়তানরা বাচ্চা। বেজন্মা, ইতর!

মেজ-মালোম এবং ছোটবাবু তখন ফিরছিল জাহাজঘাটার দিকে। দেখল একা একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বড়-মিস্ত্রি। আর দুলছে। মুখ টুঁপিতে ঢাকা। মেজ-মালোম জানে, বন্দর এলে, বড়-মিস্ত্রি জাহাজে থাকে না। তার বাঁধা ঘর আছে। ওরা এসে ওকে নিয়ে যায়। অনেক দিন, সেই যৌবনের প্রথম থেকে কাজ করতে করতে এটা হয়েছে। অথচ বড় আজ এখানে একা। সে বলল স্যার আপনি।

—তুমি কে হে?

—আমি সেকেণ্ড অফিসার ডেবিড্, ম্যাকমবার।

—ডেবিড্!

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমি জাহাজে ফিরছ।

—হ্যাঁ স্যার।

—সঙ্গে কে আছে?

—আমাদের ছোটবাবু।

—ছোটবাবু! সে ভ্রু কোঁচকাল।

—জাহাজেই কাজ করে।

বড়-মিস্ত্রি ভেবেছিল, মেজকে সব ভেঙে বলবে। এক শয়তান ইণ্ডিয়ানের পাল্লায় পড়ে সে আজ যথাসর্বস্ব খুইয়েছে। তার যা ছিল সঙ্গে, ট্যাকসিতে, টিপ্‌সে গেছে। বড়-মিস্ত্রি যে এক সময় খুশি হয়ে অমিয়কে জেব খালি করে দিয়েছিল সে-সব আর মনে নেই। তার কিছু নেই। একেবারে খালি। চেট্টা ইণ্ডিয়ানটারই কাজ। অথচ আর একজন ইণ্ডিয়ান সেকেণ্ডের পাশে রয়েছে। তাছাড়া ক্রু-রুচিটুচিব বালাই বলতে সেকেণ্ডের কিছু নেই। বড়-মিস্ত্রি নানাদিক ভেবে একদম সব চেপে গেল। তারপর ওদের সঙ্গে টলতে টলতে হাঁটতে থাকল। যেন সে জেটিতে নেমে এসেছিল একটু হাওয়া খেতে। ওকে দেখলে এখন তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না।

বড়-মিস্ত্রি এবার গ্যাঙওয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। সেকেণ্ডের মনে হল বড় উঠতে পারবে না। নিজেও তেমন শক্ত নয়। ছোট এখন সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ছোট ওকে ধরতে গেলে অপমান বোধ করতে পারে। সে সেজন্য নিজে উঠে গেল একা। কোয়ার্টার মাস্টারকে ইশারা করল হাতে এবং কাছে এলে বড়-মিস্ত্রিকে ধরে তুলে আনতে বলে কেবিনের দিকে হেঁটে গেল।

বড়-মিস্ত্রি নিজের কেবিনের কাছে এসে দেখল দরজা বন্ধ। সে ভেবে পেল না ওর কেবিনে কে এখন থাকতে পারে। দরজায় সে টোকা মারল না। কেউ দরজা খুলছে না। বেশ জোরে ধাক্কা মারতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর ভিতরে একেবারে তাজা এক মেয়ে।

সে প্রথমটায় ভূত দেখার মতো উঠে দাঁড়াল। ওর সামনে মিলড্রেড।—তুমি।

—তোমার তো কোন [illegible] নেই রিচার্ড?

রিচার্ড একটু থতমত খেল। সে ঘোড়াচ্ছিল। বলল [illegible]

সে তার স্বভাবে সেটা স্বীকার করবে না। মিলড্রেড ধরতে গেলে হাত সরিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসে বলল আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছো না মানে।

—মানে, তুমি, কি করে তুমি...।

—আমি ঠিকই আমি। জাহাজ একদিন আগে আসবে কে জানত।

—কি করে খবর পেলে।

—সকালে কাগজে দেখলাম। তোমার জাহাজ ভিড়ছে। সাত তাড়াতাড়ি আসা যায় না। সিটি কোম্পানির থার্ড অফিসার এসেছে। ওর সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট। ওটা শেষ করে আসতে দেরি হল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও! হড়বড় করবে না। ভেবে দেখছি। সে ভাবতে থাকলে মিলড্রেড বলল, রাখো তোমার ভাবনা। এখন কি বের হবে!

—শরীর ঠিক নেই মিলড্রেড। দরজা বন্ধ করে দাও। এবং এভাবে, রিচার্ড কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। মিলড্রেড তাড়াতাড়ি তেমন সেজে আসতে পারেনি অথবা শরীরের ধকলের চিহ্ন, মিলড্রেডের পায়ে সাদা মোজা লতাপাতা আঁকা সিল্কের গাউন। সে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। যেন সেও আর পারছে না। পোর্টহোল দিয়ে নীল একটা আলো এসে পড়ছিল, পোর্ট-হোলের কাচ বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল রিচার্ড। তারপর সংক্রামক ব্যাধির মতো একটার পর একটা ঘটনা। সেই ইণ্ডিয়ানটাকে গালাগাল। সে আর কিছু বলছিল না মুখে। ওর জাহাজি খিস্তি যা জমা আছে একটার পর একটা এবং এভাবে একটা সে মজা পেয়ে যায়। ঘরের নীল আলো নিভে গেলে ওর মনে হয় একা হাঁটছে এবং এক ইণ্ডিয়ান ওর পিছনে কেবল পিছু নিয়েছে।

সে মিলড্রেডকে ধরে ফেলল বলল, আবার হাতের কাছে পেলে হয়। তারপর সে শুনতে পায় বাংকারে হড়হড় করে কয়লা নামছে। কি সাংঘাতিক শব্দ। জাহাজ কাল ছাড়ছে। রাতে রাতে বাংকার ভরে যাবে। সকালে জাহাজ ছেড়ে দিলে আবার কবে এই তাজা মেয়ের ঘরে আসতে পারবে জানে না। সে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল প্রথম ঈশ্বরকে, তারপর বাত্রিকারলোদেয় তারপর, সেকেণ্ডকে, সেকেণ্ড ওকে না ডাকলে সে হয়ত আর একবার চেষ্টা করত এমির ঘরে যাওয়া যায় কিনা। তারপর ওর ধন্যবাদের পালা, সেই ইণ্ডিয়ানটিকে। সে তার জেব সাফ না করে দিলে, ঠিক চলে যেত যে-ভাবেই হোক এমির কাছে চলে যেত। এখন আর ইণ্ডিয়ান দালালকে খচ্চর মনে হচ্ছে না, সে ভীষণ তার পক্ষে উপকারী। আবার দেখা হলে ধন্যবাদ না জানিয়ে তাকে পারবে না। খুব আপশোষ এখন তার হাতের কাছে সে নেই।

(ক্রমশঃ)

আপনি কেমন আছেন

যখন অবসরের সময় হল

বুড়ো বয়সে দেহ যখন অশক্ত হয়ে পড়বে, তেমন দিনে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান কি করে হবে, এই নিয়ে দুর্ভাবনা প্রায় সকলেরই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর স্তর ভেদে আজকাল অবশ্য ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নানা রকম ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন হয়েছে—পেনসন, গ্র্যাচুইটি, জীবনবীমা, স্বাস্থ্যবীমা, অকর্মণ্যতার ক্ষতি-পূরণ এবং আরও কত কি।

কিন্তু শুধু অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাই তো নয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে অবসর নেওয়ার পর এমন আরও কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয় যার উপর নির্ভর করে নিজের, পরিবারের, এমন কি গোটা সমাজের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যাক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গড় পরমায়ু বেড়ে গিয়েছে, সব সমাজেই বুড়ো মানুষদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু পরিবারে বা সমাজে একদা শীর্ষস্থানীয় এইসব বয়োবৃদ্ধরা যেমন কারও গলগ্রহ হয়ে থাকতে চাইবেন না, তেমনি সমাজও চাইবে না উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কতকগুলি অকর্মণ্য বৃদ্ধের পোষণ ভারে নুব্জপৃষ্ঠ হয়ে থাকতে। এমন সমস্যা আরও অনেক থাকছে। কোন একদিন এ-ধরনের সমস্যার কথাও ভাবতে হতে পারে।

প্রাকৃত ঃ অন্যান্য সমস্ত জীবের মত মানুষও প্রকৃতির নিয়মে জন্ম-বৃদ্ধি-স্থিতি ক্ষয় ও লয়ের পথে চলতে বাধ্য। মানব দেহে তার প্রচলিত রূপ হল, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু। মজা হচ্ছে এই যে—কিংবা দুর্ভাগ্যও বলা যেতে পারে—বহুক্ষেত্রেই যতক্ষণ না ক্ষয়ের লক্ষণগুলি জরার কলঙ্কচিহ্ন হিসাবে একটার পর একটা ইন্দ্রিয়ের আয়নায় ধরা পড়ছে, ততক্ষণ শেষের ঘন্টা কানে বাজে না। চুলে পাক ধরে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে, দাঁত নড়বড় করে, কপালে পড়ে বলীরেখা, পেশীগুলো শিথিল হয়, অস্থিসন্ধির সচলতা কমে যায়। আগের মত চটপটে চাল-চলন আর থাকে না, উদ্যম ও তৎপরতায় ভাঁটা পড়ে, কায়িক শ্রম ক্ষমতা কমে আসে। রক্তনালীগুলি পুরু ও শক্ত হয়ে তাদের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়, কোষের বিপাকক্রিয়ায় আসে শ্লথতা। হার্ট, লিভার, কিডনী, বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দেহযন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ মন্থর হয়ে পড়ে। মোটকথা, যৌবনের পক্ষীরাজ তেমন টগবগিয়ে আর ছোটে না, তার তরঙ্গে ভাটার টানটাই মনে হয় বেশি। তখনি টনক নড়ে। শুরু হয় ব্যস্ততা ও উদ্বেগ; ডাক পড়ে ডাক্তার-বদ্যির। তুলনায় বেশ কিছুকাল ৭০-৮০ বছর পর্যন্ত মনন শক্তি কিন্তু মোটামুটি অটুট থাকে। এবং থাকে বলেই বার্ধক্যের পদধ্বনি মনের উপর এমন একটা অস্পষ্ট অবর্ণনীয় চাপ সৃষ্টি করে যা থেকে শুরু হয় নানারকম দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

রকমফের ঃ বার্ধক্যের ছায়া এক এক-জনের দেহে ফেলে এক এক ধরনের ছোপ। কেউ ৯০ বছরেও বেশ সুস্থ ও সক্ষম, কেউ বা ৬০ বছরেই কিংবা তারও আগে বুড়িয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়েন। ব্যাপারটা করুণ হলেও আকস্মিক নয়, নির্ভর করে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। আসলে কেউ কেউ ভবিষ্যৎ জীবনে আর্থিক নিরাপত্তার কথা যতটা ভাবেন, সেই অনুপাতে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেন না। অবসর নেওয়ার পর বৃদ্ধ বয়সে স্বাধীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের জন্যে আর্থিক সচ্ছলতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে সুস্থ ও কর্মঠ না থাকলে সেই স্বাধীনতা ভোগ করার কালে অনাকাঙ্ক্ষিত পরনির্ভরতা এসেই পড়ে। অনেক সময় একথাও মনে থাকে না যে অন্যান্য সব কিছুর মত স্বাস্থ্যের ভবিষ্যতকেও ধৈর্য ধরে গড়ে তুলতে হয় জরা বা ক্ষয় শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে। যৌবনে যাঁরা অবশ্যপালনীয় স্বাস্থ্য-

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অভিনব

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পূজোর আগেই। এই সংখ্যাটি দু'ভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রাম-মোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত। মূল্য ৩ টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

• মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ঃ পুষ্পেন্দু লাহিড়ী • ট্রাজেডির নায়ক ঃ জীবনকৃষ্ণ শেঠ • বাংলা আধুনিক কবিতার মর্মসন্ধান ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় • মোহন্ত এলোকেশী সংবাদ ঃ মৃণিকা বসু •

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ রামমোহন রায় ॥

• বেদান্তদর্শন ও রামমোহন ঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য • অষ্টাদশ শতক, রামমোহন এবং যুক্তিবাদ ঃ নির্মল ঘোষ • বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রাম-মোহন ঃ ভূদেব চৌধুরী • নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন ঃ কুমুদ ভট্টাচার্য • রেনেসাঁসের তাৎপর্য ও রামমোহন ঃ দিলীপকুমার নন্দী • এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

॥ বিশেষ রচনা ॥

বাঙ্গালি মুসলমানদের সাময়িক পত্র—সাধনা (১৮৩১-১৯৩০) এটি লিখেছেন মুহম্মদ মুরউল ইসলাম। একশো বছরের মুসলমান সম্পাদিত দেড়শোটি পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংকলন। ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নি।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

বিধিগুলি মেনে চলেন নি কিংবা উচ্ছৃংখল জীবনযাপন করেছেন, অকাল-বার্ধক্যকে তাঁরা আবাহন করেন নিজেরাই। প্রকৃতির প্রতিশোধ বড় নিষ্করুণ।

ধর্মবোধ : স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ বৃথাই চেষ্টা করে এসেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যৌবনকে ধরে রাখতে। কত মন্ত্র তন্ত্র তপশ্চর্যা, কত সাধনা উপাসনা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কত সালসা বার্লিক, টনিক, কত ভিটামিন হরমোন অধিরোপন, কত অসংখ্য জীবরক্ত নররক্তের স্রোত বয়ে গেছে এই আদিম আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে, তার কোন লেখাজোখা নেই। হয়ত অনির্বাণ এই তৃষ্ণা। তবু, অনাস্বাদিত সেই আপেল ফলটির জন্যে মানসিক শান্তি নষ্ট করা যেমন অযৌক্তিক, নিজের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করাও তেমনি নির্বুদ্ধিতা। বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত বার্ধক্যকে অনিবার্য প্রাকৃতিক নিয়ম হিসাবে স্মিতহাস্যে গ্রহণ করা। একমাত্র মানুষই পারে এই বাস্তব জীবন যোধের রসাস্বাদন করে সুখ-দুঃখের রসে জারিয়ে তাকে উপভোগ করতে।

কাজ : অবসর নেওয়ার পর সকলেরই উচিত এমন কিছু কাজ খুঁজে নেওয়া যাতে শরীর ও মনের দিক থেকে সজীব ও সক্রিয় থাকা যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও সমাজের পক্ষে সে-কাজ হয় কল্যাণকর। দুর্ভাগ্যক্রমে এমন অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ আছেন যাঁদের না আছে কোন সঞ্চয়, না আছে মনোমত বা সাধ্যমত কাজ পাওয়ার সুযোগ। বিপুল যুবশক্তি যেখানে বেকার ও অর্ধবেকার, বৃদ্ধদের কাজ দেবে কে! অথচ এঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে সমাজ যেমন উপকৃত হতে পারে, তেমনি এঁদের পরনির্ভরতাও দূর করা সম্ভব। কে না জানে, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে মহত্তম কাজগুলির অনেক কিছুই সৃষ্টি হয়েছে মনীষী ও গুণীজনদের তথাকথিত অবসর-বয়সের পরে।

শ্রম : কাজ থেকে অবসর নেওয়ার অর্থ এই নয় যে বিশ্রামের নামে অলস জীবনযাপন করতে হবে। সুস্থ মানুষের বিশ্রাম হবে ঘুমানর সময়টুকু ছাড়া সক্রিয় বিশ্রাম। বয়স ও শারীরিক অবস্থা অনুসারে কায়িক শ্রম দেহ-কোষের বিপাক ক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে, পেশীর টান ও অস্থিসন্ধির সচলতাকে বজায় রাখে, রক্ত সঞ্চালনে ও হজম শক্তিতে সজীবতা আনে, সুনিদ্রায় সাহায্য করে। বিশেষ করে যাঁরা টেবিল-চেয়ারে বসে কাজ করে এসেছেন তাঁদের পক্ষে পছন্দমত বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের কাজ, সবজি বাগানের কাজ, সকাল-সন্ধ্যা বেড়ান খালি হাতে ব্যায়াম, নিজের জামা-কাপড় কাচা বা ঘর পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি হাল্কা ধরনের কায়িক শ্রম বিশেষ প্রয়োজন। মর্যাদা বা সম্ভ্রমের প্রশ্ন নয়, শরীর ও মনকে তৎপর রাখতে অপরিহার্য এই কায়িক শ্রম।

প্রতিষেধ : বুড়ো বয়সে নানা রোগ এসে ভিড় করার চেষ্টা করে দেহমন্দিরে। সব বয়সে যেমন, বার্ধক্যেও তেমনি, অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করানর চেয়ে নীরোগ থাকার সুবিধা অনেক। তাতে অনেক বিড়ম্বনা এড়ান যায়। গুরুভোজন, কায়িক শ্রমবিমুখতা এবং নেশার বশীভূত হওয়া এই বয়সে বিশেষ হানিকর। সতর্ক থাকা উচিত চোখ ও দাঁত সম্পর্কে। ছানি পড়লে কাটিয়ে নিতে হবে, দাঁত নড়বড়ে হলে তুলে ফেলে বাঁধিয়ে নিতে হবে। পুরুষের হাইড্রোসিল হার্নিয়া, মেয়েদের শ্বেতস্রাব বা যখন তখন রক্তস্রাব কিংবা স্তনে কোন গুটি থাকলে চটপট ডাক্তার দেখিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা করাতে হবে। যাঁরা প্রথমে ছোটখাট অসুবিধাগুলি প্রকাশ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন, পরে ব্যয়বহুল চিকিৎসার পাকে পড়ে আরও লজ্জা ডেকে আনেন তাঁরা। ক্ষীণদৃষ্টি, সান্ধ্যকালীন সুরাসক্তি, অপরিচ্ছন্ন আলোহীন বাথরুম এবং নিজের অপসৃয়মান শক্তি সম্পর্কে দাম্ভিক অবহেলা বহুক্ষেত্রে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের কারণ। ক্যানসার, হাইপারটেনসন, হার্টের অসুখ, ডায়াবিটিস ইত্যাদিতে মৃত্যু হয় বেশিরভাগ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে। সুতরাং অবসরপ্রাপ্ত জীবনে—বিশেষ করে এইসব ব্যাধিতে ভোগার পূর্বইতিহাস বা পারিবারিক ইতিহাস যাঁদের আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা একান্ত আবশ্যিক। ওজন যাতে না বাড়ে এবং মোটামুটি একই থাকে, সেদিকে কড়া নজর রাখা উচিত। অনেক দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার আলাদা ক্লিনিক আছে। আমাদের দেশে সেরকম ব্যবস্থা আজও গড়ে না উঠলেও সাধারণ হাসপাতালে বা পারিবারিক চিকিৎসককে দিয়ে মাঝে মাঝে চেক-আপ করান অসুস্থ হয়ে পড়ার চেয়ে নিশ্চয়ই সহজসাধ্য।

খাদ্য : যৌবনের খাদ্যাভ্যাস বার্ধক্যেও অপরিবর্তিত রেখে যাঁরা আত্মতৃপ্তি লাভ করেন তাঁদের মনে রাখা উচিত যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালরির দরকার হয় কম, হজমশক্তিও নানা কারণে দুর্বল হয়ে আসে। অবসরপ্রাপ্ত জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্ব বোধ থেকে কারও কারও খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যেতে পারে। ফলে পরিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেহযন্ত্রগুলির উপর অযথা চাপ পড়ে, হজমের গোলমাল দেখা দেয়। বৃদ্ধদের খাদ্য হওয়া উচিত পরিমিত, সহজপাচ্য ও সুস্বাদু—ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ। দুধ, সবুজ শাক-সব্জি এবং টাটকা ফল এই প্রয়োজন সহজেই মিটাতে পারে। ভোজনবিলাসী যাঁরা, পরিমাণে সংযত থেকে রকমারি খাদ্যের আয়োজনে তাঁরা খুশি হতে পারেন। মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্যের প্রাচুর্যে কিডনীর উপর অকারণ চাপ পড়ে, আবার ঘি-মাখন-মাংসের ফ্যাট বা ভেজিটেবল্ ঘির মত স্নেহপদার্থের আধিক্য হাইপারটেনসন ও হার্টের অসুখের প্ররোচনা দেয়। অপরদিকে শ্বেতসার বেশি খেলে পেটে গ্যাস হতে পারে, মিষ্টি বিলাসিতায় ভয় থাকে ডায়াবিটিসের। সাধারণভাবে ৫০-৬০ গ্রাম প্রোটিন, ৩০-৪০ গ্রাম স্নেহপদার্থ (সূর্যমুখীর তেল, তিলের তেল, মেইজের তেল, সরষের তেল ইত্যাদি), ৪০০ গ্রাম শর্করা (ভাত - ডাল - রুটি - সবজি-মিষ্টি মিশিয়ে), ১০ আউন্স দুধ এবং কিছু টাটকা ফল থেকে যদি দিনে ২০০০-২২০০ ক্যালরি পাওয়া যায়, একজন সাধারণ গড়নের বুড়োমানুষের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

পরিচ্ছন্নতা : পোশাক হওয়া উচিত হাল্কা ও অনাড়ম্বর। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি স্নিগ্ধ ও সৌম্যকান্তি বয়োবৃদ্ধদের দেখলে পদধূলি নিতে ইচ্ছা জাগে, এ অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে। বলা বাহুল্য, স্টাইল নয়, অন্তরের শুচিতাই ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়।

জীবনবেদ : জীবনের অভ্যস্ত পথে চলতে পছন্দ করি আমরা। একটা বয়স আসে যখন নতুন কিছু গ্রহণ করতে জাগে দ্বিধা ও সংকোচ। অথচ সদা-পরিবর্তনশীল সমাজে নবীনকে পথ ছেড়ে দিতেই হয়। স্খলিত শক্তি ও প্রতিপত্তি এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এক অব্যক্ত বেদনা নিঃশব্দে ছেয়ে ফেলে মনকে। অনেকে তাতে বিরক্ত হয়ে বিচ্ছিন্নতার শিকার হন, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েন। আর বার্ধক্যকে যাঁরা প্রকৃতির অমোঘ বিধান হিসাবে হাস্যমুখে বরণ করে নিতে পারেন, নিজের জীবনে জয়-পরাজয়ের মূল্যবান অভিজ্ঞতা দিয়ে যাঁরা পরিবার ও সমাজকে সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করেন, সেইসব সদাহাস্য দরদী কৌতুকপ্রিয় বয়োবৃদ্ধরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হন; কালের যাত্রায় স্মরণীয় পথিক হিসাবে গণ্য হন তাঁরাই, এমন দৃষ্টান্তই বেশি।

—অশ্বিনী সামন্ত

এই আমাদের দেশ

কলকাতা ঃ

অযোধ্যা, কাশী, দিল্লীর মতো কোন দূরঅতীতের ঐতিহ্য কলকাতা শহরের নেই। মাদ্রাজ, বোম্বাইর তুলনায়ও এই শহর অর্বাচীন। এদেশের রেলপথ বা আধুনিক ডাক তার ব্যবস্থার মতো শহর কলকাতাও ইংরেজ শাসনের অবদান। কলকাতার একিয়ারে একমাত্র কালীঘাটের মন্দির ছাড়া আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই যার অস্তিত্ব শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও ছিল।

কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য ইংরেজ শাসনকালেই, ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। সে হিসাবে 'ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ' কালীঘাটের বর্তমান মন্দিরের চেয়ে প্রাচীন, যেটি নির্মিত হয় ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে।

কালীঘাটের প্রাচীন মন্দিরটির অস্তিত্ব কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিনশ বছর আগেও ছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলায় মন্দিরটির বা তার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি কতটা ছিল তা বলা কঠিন। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের রচনা বিপ্রদাস পিপলাইর মনসামঙ্গল কাব্যে গঙ্গা তীরবর্তী কলকাতা পল্লীর উল্লেখ মেলে। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যপথের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন কবি, একের পর এক উল্লেখ করেছেন গঙ্গার দুধারের বর্ধিষ্ণু জনপদগুলির নাম। বর্তমানে হাওড়া জেলার অন্তর্গত বোটানিক গার্ডেনের নিকটবর্তী বেতোর গ্রামে অবতরণ করে চাঁদ বেতাই চণ্ডীর মন্দিরে পূজো দেন। কিন্তু আদি গঙ্গা ধরে সমুদ্রপথে এগিয়ে চলার কালে কালীঘাটের মন্দির তিনি দর্শন করেননি।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যের আগের কোন রচনায় এখনও পর্যন্ত কলকাতার উল্লেখ মেলেনি। পরবর্তী উল্লেখ মেলে, ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের রচনা, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে যাতে কলকাতাসহ অন্য দুটি মহল নিয়ে একটি 'সরকার' (রাজস্ব বিভাগ) গঠনের কথা বলা হয়েছে। তখন ঐ সরকারের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার টাকা। কিন্তু এসব আলোচনার কোনই প্রয়োজন হত না, কলকাতা বড়জোর ভাটপাড়া বা বারুইপুর অথবা ঘুষুরির মতো উল্লেখযোগ্য স্থান হয়ে থাকত যদি না তিন

ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ

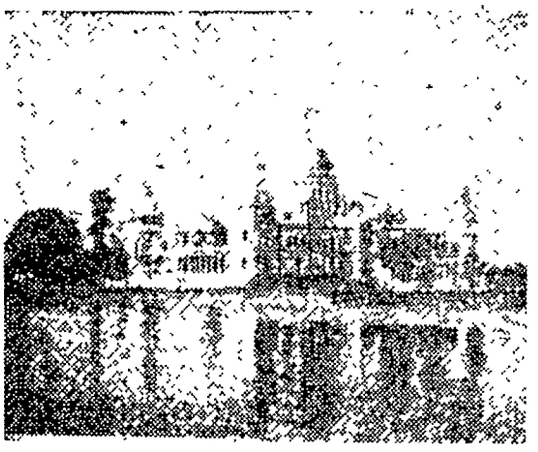

শতাব্দী আগের ইংরেজ বণিকরা নানা ঘটনা পরম্পরায় শেষ পর্যন্ত এই স্থানটিকে তাদের প্রধান ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে বেছে নিত।

ইংরেজ বণিকরা প্রথমে হুগলীকে তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় হুগলীর বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা লোপ পায়। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান এজেন্ট জব চার্নক হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়াকে পরবর্তী ঘাঁটি মনোনীত করেন। কিন্তু কোম্পানীর বেঙ্গল কাউন্সিল ঐ মনোনয়ন অনুমোদন না করায় জব চার্নক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪ আগষ্ট গঙ্গার পূর্ব তীরবর্তী সুতানটি গ্রামে অবতরণ করেন। কলকাতার পত্তন ঐদিনই হয়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা হুগলী কুঠি ত্যাগ করে। ঐ সময় ইংরেজদের সঙ্গে কারবার করে বসাক ও শেঠ উপাধিকারী কয়েক ঘর তাঁত বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রচুর বিত্তের অধিকারী হয়। হুগলী কুঠি পরিত্যক্ত হওয়ায় তারা ইংরেজ বণিকদের আসার আগেই সুতানটিতে বসতি স্থাপন করেছিল। কারণ সুতিবস্ত্রের বাজার হিসাবে সুতানটির তখনই খ্যাতি ছিল। মধ্য এশিয়া থেকে আগত আর্মেনিয়ানরা সুতানটির কাপড় নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যবসা করত। জব চার্নকের পদার্পণের হয়ত শতাব্দীকাল পূর্বেই আর্মেনিয়ানরা এসেছিল সুতানটিতে। কলকাতায় সেন্ট নাজারেথ নামে যে আর্মেনিয়ানদের গির্জা আছে তার প্রাঙ্গণে এক আর্মেনিয়ান মহিলার সমাধির গায় মৃত্যুসন লেখা আছে ১৬৩০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং জব চার্নক যখন সুতানটিকে ইংরেজদের কর্মকেন্দ্র রূপে নির্বাচিত করেন তখন সে স্থান বহুলাংশেই পরিচিত ছিল।

সুতানটি ছিল বর্তমান কলকাতা শহরের গঙ্গা তীরবর্তী বড়বাজার ও ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চল। সুতানটিতে কুঠি স্থাপনের পর মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন জব চার্নক, ১৬৯২ সালের ১০ জানুয়ারি মৃত্যু হয় তাঁর। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকরা বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পায়, এবং সেইমতো ১৭০২ সালে, এখন যেখানে জি-পি-ও ভবন সেইখানে গড়ে উঠে প্রথম ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। তার আগে, ১৬৯৮ সালে মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পৌত্র ও বাংলার সুবাদার আজিম-উল-শানের কাছ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতানটি সংলগ্ন দুটি গ্রাম কলকাতা ও গোবিন্দপুরের পত্তনি লাভ করে। আর ঐ তিন গ্রামের মধ্যবর্তী কলকাতার নামানুসারে সমগ্র এলাকাটির নাম হয় কলকাতা। জমিদার সাবর্ণ চৌধুরী দের কাছ থেকে কোম্পানী ঐ তিনটি গ্রাম কিনেছিল মোট তেরশ টাকায়। ১৭০৭ সালে কলকাতাকে একটি প্রেসিডেন্সী বলে ঘোষণা করা হয়।

তখন সারা কলকাতা ছিল জল আর জংগলে ভরা। বাঘ ঘুরে বেড়াত বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলে। আবহাওয়া এমনই স্যাঁতসেতে ও অস্বাস্থ্যকর ছিল যে কোন ইংরেজ ডাঙ্গায় বাস করতে সাহস পেত না, সকলে থাকত গঙ্গার বুকে নৌকায় ডাঙ্গার দরবাড়ি সবই ছিল মাটির। ১৭০৭ সালে কলকাতার প্রথম যে জরিপের রিপোর্ট মেলে তাতে দেখা যায় তখন এর কিতীর্ণ এলাকায় ধান চাষ হত। আর হত তামাক, তুলো, আখ, বাঁশ, কলা সব্জি ও সর্ষের চাষ।

ইংরেজরা অবশ্য বসে থাকেনি। জলাজমি ভরাট করে ও জংগল সাফ করে তারা দ্রুতগতিতে কলকাতাকে বাসযোগ্য করে তোলে, যার ফলে ১৭১৭ সালের মধ্যেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় ৩৮টি পল্লী গড়ে ওঠে। সেই পল্লীগুলির সব নাম এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সেদিনকার পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া দখিনদাড়ি, উল্টাডাঙ্গা, কাঁকুরগাছি, বাগমারি, মির্জাপুর, শিয়ালদা ট্যাংরা, তোপসিয়া, গোবরা প্রভৃতি নামাঙ্কিত পল্লীগুলি আজও আছে।

১৭৩৭ সালে এক বিধ্বংসী ঝড়ে কলকাতা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর ১৭৫৬ সালে আসে আর এক আঘাত। নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন আর কামান দেগে ভূমিসাৎ করেন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। মুর্শিদাবাদে ফেরার আগে নবাব সিরাজ

কলকাতার শাসনদায়িত্ব তাঁর অন্যতম সেনাপতি রাজা মানিকচাঁদের হাতে দিয়ে যান।

ক্লাইভ কলকাতা পুনর্দখল করেন ১৭৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে এবং তার দু মাস পরে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ পরাজিত ও নিহত হলে কলকাতায় ইংরেজের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পলাশির যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানী নবাব মিরজাফরের কাছ থেকে এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ আদায় করে এবং ঐ টাকার সবটাই কলকাতা শহর গড়ে তুলতে ব্যয় করা হয়। ১৭৫৮ সালে ক্লাইভ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং ১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে সে কাজ শেষ হয়। ১৭৭৩ সালেই কলকাতা হয় বৃটিশ ভারতের রাজধানী এবং ভারতে বৃটিশ শাসন শেষ হওয়ার পঁয়ত্রিশ বছর আগে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কলকাতার ঐ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। জনবাহুল্যে জাঁকজমকে রাজমর্যাদায় কলকাতা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী।

কলকাতা বৃটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ার দু বছর পরে, ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট এই শহরে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচারে এই শহরের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে লালবাজার অঞ্চলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। ঐ কলেজের লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রেভারেন্ড কেরী, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু প্রমুখের সযত্ন প্রয়াসেই আধুনিক বাংলা গদ্যের সূচনা হয়। শহরের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৮১৫ সালে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব। ঐ সমাজবিপ্লবী লেখক ও চিন্তানায়কের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কলকাতা তথা বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবযুগের সূচনা হয়। একে একে আবির্ভূত হন দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব, হেমচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ, রমেশ দত্ত, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ কর্মবীরগণ। বাংলা তথা ভারতের সমাজ, সাহিত্য ধর্ম, দর্শন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাবিপ্লবের যজ্ঞক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তির পর, ১৯১২ সালে রাজনীতির অগ্নিকুণ্ড কলকাতা শহর থেকে অনেক শান্ত ও নিরাপদ স্থান দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তাতে কলকাতার গুরুত্ব বা মর্যাদা হ্রাস পায় না। বৃহত্তম বাণিজ্য নগরী ও বন্দররূপে সর্বাধিক জনবহুল শহররূপে ও শিক্ষা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানরূপে কলকাতার গৌরব অম্লান থাকে।

কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরের বছর ১৯১৩ সালে কলকাতার নাগরিক রবীন্দ্রনাথ প্রথম এশিয়ার মানুষরূপে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। দক্ষিণ ভারতের মানুষ সি ভি রামন ১৯৩০ সালে ঐ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সেও কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা করে। এই কলকাতা শহরেই গবেষণা করে ১৮৯৮ সালে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন মেজর রোনাল্ড রস এবং তার জন্য তিনিও ১৯০২ সালে চিকিৎসা--বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

প্রথম কংগ্রেস সভাপতি ডব্লিউ সি ব্যানার্জি, প্রথম আই সি এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি রমাপ্রসাদ রায় সবাই কলকাতা শহরের লোক। কলকাতার সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম পাশ্চাত্য দুনিয়ায় গিয়ে সগর্বে প্রচার করে আসেন ভারতের শাশ্বত বাণী। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কলকাতার এ গর্বের কথা, গৌরবের কথা বলে শেষ করা যায় না। কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল, একথা বলে কলকাতার অবদানকে লঘু করা যায় না। কারণ দিল্লীও ভারতের রাজধানী হয়েছে ষাট বছর আগে, অথচ আজও দিল্লী একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর বিগত ষাট বছরে একটি প্রদেশের রাজধানী হয়েও কলকাতা হয়েছে জগদীশ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি ভি রামন, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা কে এস কৃষ্ণন, প্রশান্ত মহলানবিশ প্রমুখের কর্মক্ষেত্র।

আর শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত প্রবাহ ধারার মতো নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যামিনী রায়, উদয়শঙ্কর রবিশঙ্কর আলি আকবর, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ একের পর এক আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে, শত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়েও কলকাতা ফুরিয়ে যাবে না।

ভৌগোলিক পরিচয়

কলকাতার আয়তনের ব্যাপারে ডাকবিভাগ যেমন উদার, আইন বিভাগ তেমনই নির্দয়। জি-পি-ওর দাক্ষিণ্যে কলকাতার সীমানা চব্বিশ পরগণা পেরিয়ে প্রায় নদীয়ার সীমানায় পৌঁছেছে। ঘুঘুডাঙ্গার লোকেরা বলেন তাঁদের ঠিকানা কলকাতা—ত্রিশ আর কামারহাটির লোকেরা বলেন, তাঁদের নিবাস কলকাতা আটাত্রোয়। ময়দান থেকে ঠাকুরপুকুর ডায়মণ্ডহারবারের পথে পাকা এক ঘণ্টার পথ, কিন্তু তাহলেও ঠাকুরপুকুর হল কলকাতা ৬৩: আবার ঠাকুরপুকুর পৌঁছানোর আগে হঠাৎ চমকাতে হবে কলকাতা-৮ দেখে। বড়বাজার কলকাতা—৭ আর বড়িষা হল কলকাতা—৮।

হাইকোর্ট নির্দিষ্ট কলকাতার সীমানা আবার একেবারেই সংকীর্ণ। গঙ্গা আর দুই সার্কুলার রোডের মধ্যে বাঁধা যে এলাকাটুকু হাইকোর্টের কলমতা শুধু তারই মধ্যে সীমিত। তার বাইরে মানিকতলা, গড়পার, শিয়ালদা ইস্টালি পার্কসার্কাস, ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, কালীঘাট প্রভৃতি সবই চব্বিশ পরগণা।

কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকা এই দুইয়ের মধ্যে একটা আপস বলা যায়। পৌর কলকাতার এলাকা ২৮-৩৪ বর্গ মাইল, বৃহত্তর কলকাতার এলাকা ৩২-৩ বর্গ মাইল। কলকাতার পৌর এলাকা নিয়ে শহরের প্রশাসনিক অঞ্চল। পুলিশ কমিশনার এই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কলকাতাকে কতকগুলি ডিভিসনে এবং ডিভিসনগুলিকে থানায় বিভক্ত করা হয়েছে। নর্থ ও নর্থ সুবার্বন ডিভিসন গঠিত শ্যামপুকুর, জোড়াবাগান, বড়তলা, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কাশীপুর, চিৎপুর, মানিকতলা ও বেলেঘাটা এই আটটি থানা নিয়ে। সেন্ট্রাল ও সেন্ট্রাল সুবার্বন ডিভিসনে আছে বড়বাজার, জোড়াসাঁকো, হেয়ার স্ট্রীট, বউবাজার, মুচিপাড়া, তালতলা ও ইন্টালি এই সাতটি থানা। সাউথ ও সাউথ সুবার্বন ডিভিসনে আছে পার্ক স্ট্রীট, হেস্টিংস বেনিয়াপুকুর, বালীগঞ্জ, ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, আলিপুর নিউ আলিপুর, ওয়াটগঞ্জ, কড়েয়া, এরবালপুর, গার্ডেন রীচ ও যাদবপুর—এই তেরোটি থানা। এছাড়া পোর্ট ডিভিসনে আছে নর্থ পোর্ট সাউথ পোর্ট ও রিভার ট্রাফিক পুলিশ —এই তিন থানা। সমগ্র কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার।

সমুদ্র থেকে কলকাতার দূরত্ব ত্রিশ মাইল (৪৮ কিলোমিটার) ও সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শহরের উচ্চতা সতের ফুট। কলকাতা পৌর এলাকায় পথ আছে সাড়ে চারশ মাইল। শহরে মোটামুটিভাবে তিনটি ঋতুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। মার্চ থেকে জুন গ্রীষ্মকাল, জুলাই থেকে অকটোবর বর্ষাকাল ও নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি শীতকাল। শীতকালই কলকাতার সেরা সময়।

শহরের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর রয়েছে গঙ্গা নদী যা এই এলাকায় হুগলী নামে পরিচিত। হিন্দু পুণ্যার্থী ও কিছু কিছু স্বাস্থ্যান্বেষীর কাছে গঙ্গাস্নান প্রায় নিত্যকর্ম। কলকাতার দক্ষিণে, কালীঘাটের নিকটবর্তী আদি গঙ্গাতেও কিছু পুণ্যার্থী নিত্যস্নান করে থাকেন। এছাড়া সার্কুলার খাল, নিউ ক্যানাল, বেলেঘাটা খাল বোট ক্যানাল, টালিনালা আর ঢাকুরিয়া লেক, চিড়িয়াখানা ও ইডেন গার্ডেনের সরোবর আর বিভিন্ন পার্কের পুষ্করিণী নিয়ে কলকাতার জলাশয়। শহরে বৃষ্টিপাত ভাল হয় এবং মাটির নীচে জলের সঞ্চয়ও যথেষ্ট।

গঙ্গার উপর দুটি সেতু শহরকে হাওড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। একটি রীজ, যার বর্তমান নাম রবীন্দ্র সেতু, সারা ভারতের একমাত্র ক্যান্টিলেভার সেতু, সেতুটি ১৯৫০

ফুট চওড়া, এর ওপর দিয়ে দৈনিক তিন লক্ষেরও বেশি লোক যাওয়া আসা করে। অপর সেতুটি, যা বর্তমানে বিবেকানন্দ সেতু নামে অভিহিত, দক্ষিণেশ্বরে বেলুড় ও উত্তর কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। এই সেতুটি চওড়া ২৬১০ ফুট। ডক এলাকার সেতুগুলি ভাসমান এবং সেগুলি প্রয়োজন মতো খোলা বা সংযুক্ত করা হয়। অন্যান্য সেতুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তর কলকাতার টালা ব্রিজ, আলিপুরের খিদিরপুর ব্রিজ, নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজ ও মাজেরহাট ব্রিজ এর কালীঘাট অঞ্চলের আলিপুর ব্রিজ।

শহর অঞ্চলে রেল ষ্টেশনের সংখ্যাও কম নয়। শিয়ালদহ বিভাগে আছে শিয়ালদহ ও উল্টাডাঙ্গা ষ্টেশন, ডায়মণ্ডহারবার বিভাগে আছে পার্কসার্কাস, বালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়া ও যাদবপুর ষ্টেশন আর বজবজ বিভাগে কালীঘাট ও মাজেরহাট ষ্টেশন। বোট ক্যানাল ও ষ্ট্র্যান্ড রোড অঞ্চলে পোর্ট কমিশনার্সের কিছুটা নিজস্ব রেলপথও আছে।

জনসংখ্যা

১৬৯০ সালে জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালে এর লোকসংখ্যা কত ছিল তার সঠিক বা আনুমানিক হিসাব কিছুই পাওয়া যায় না। কিন্তু তার ছাব্বিশ বছর পরে, ১৭১৬ সালের প্রথম সমীক্ষায় কলকাতার লোকসংখ্যা বার হাজার বলে জানা যায়। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬ সালে যখন ইংরেজদের কলকাতা থেকে বিতাড়িত করেন তখন এই নগরীর লোকসংখ্যা ছিল চার লক্ষ। এই সংখ্যাগুলি সবই অনুমিত হিসাব।

১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম লোকগণনাকালে কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়; তখন কলকাতার লোকসংখ্যা ছিল আট লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার। এর পঞ্চাশ বছর পরে, ১৯৬১ সালে কলকাতার লোকসংখ্যা তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৯ লক্ষ ২৬ হাজার। তখন ভারতের দ্বিতীয় নগরী বোম্বাইর লোকসংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার, আর রাজধানী দিল্লীর ২০ লক্ষ ৬২ হাজার।

১৯৭১ সালের গণনা অনুসারে কলকাতার পৌর এলাকার লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ ৪১ হাজার আর বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ ৫ হাজার। ঐ সময় বৃহত্তর বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৫৯ লক্ষ ৬৯ হাজার। সুতরাং কলকাতা এখনও ভারতের সর্বাধিক জনবহুল নগরী।

কলকাতার ৭০ লক্ষ ৫ হাজার লোকের মধ্যে পুরুষ ৫১ লক্ষ ১৮ হাজার আর নারী ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার। অর্থাৎ প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৭০১। এটা যে কোন বিরাট নগরীর বৈশিষ্ট্য। দেশে সংসার রেখে শ্রমিক কর্মচারীরা শহরে কাজ করতে আসেন।

এই মহানগরীর জনজীবনের অপর বৈশিষ্ট্য হল তার সংমিশ্রিত রূপ। কলকাতার ৭০ লক্ষ লোকের ঠিক অর্ধেক অবাঙ্গালি, যারা এসেছে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা ও কচ্ছ থেকে কোহিমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। এদের মধ্যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা সর্বাধিক, প্রায় পনের লক্ষ। তারা এসেছে বিহার, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান থেকে; মারোয়াড়িদেরও হিন্দীভাষীরূপে গণনা করা হয়। শহরের কল-কারখানায় বা পথেঘাটে কায়িক শ্রমের যা কাজ তা প্রায় সবই হিন্দীভাষীদের দখলে। আবার বৃহৎ পুঁজির ক্ষেত্রেও তাদের প্রায় পূর্ণ আধিপত্য, কারণ মারোয়াড়িরাও ত হিন্দীভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দীভাষীরা বেশি বাস করে বড়বাজার, চিৎপুর কাশীপুর অঞ্চলে।

কলকাতায় উর্দুভাষীর সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। ভিন্ন প্রদেশাগতদের মধ্যে উর্দুভাষীদের অবস্থাই সব চেয়ে খারাপ। মেটেবুরুজ, খিদিরপুর, চিৎপুর বউবাজার, পার্কসার্কাস রাজাবাজার অঞ্চলে তাদের অধিকাংশের বাস এবং শতকরা আশিজনেরও বেশি বস্তীবাসী। ছোটখাটো পান বিড়ির দোকান হোটেল রেস্তোরাঁ, ফল ও মাংসের দোকান, দর্জির দোকান প্রভৃতি চালিয়ে বা ঐ সব দোকানে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। ঘোড়ার গাড়ি চালানো ছিল উর্দুভাষীদের আর এক বড় কাজ, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে কলকাতায়। উর্দুভাষী-

ঃ অতিরিক্ত কমিশনে শরৎচন্দ্রের বই ঃ

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে অন্যান্য বারের মত এবারও এক পক্ষকাল (৩-৯-৭৩ হইতে ১৭-৯-৭৩ তারিখ পর্যন্ত) আমাদের প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের উপর পুস্তক-বিক্রেতা বন্ধুদের ও সাধারণ পাঠাগারসমূহকে প্রচলিত কমিশনের উপর অতিরিক্ত ৫% কমিশন দেওয়া হইবে।

স্বনামখ্যাত রাজনৈতিক গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীকালীচরণ ঘোষ-এর বিরাট গ্রন্থ

জাগরণ ও বিস্ফোরণ

(১ম খণ্ড) ১·০০
২য় খণ্ড ১৮·০০

[ইংরেজ আমলে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত। শুধু তথ্য ও তত্ত্ব দিয়েই নয়, দেশাত্মবোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লেখা এই গ্রন্থখানি]

খ্যাতনামা লেখক 'নীলকণ্ঠ'-এর

বার্ধক্যে বারাণসী

৭·০০

[কাশী ভারতের প্রাণকেন্দ্র না হলেও মর্মকেন্দ্র। এই ভারত ভূমিতে অধর্মেরই বয়স হয়; ধর্মের কোন বয়স নেই। যুগে যুগে আসেন অবতার বিশেষ মহামানব। 'নীলকণ্ঠ'-এর এই অমর সৃষ্টি ভারতআত্মার এই চিরন্তন আকৃতিকেই শব্দরূপ দেওয়া হয়েছে]

প্রখ্যাত শিল্পী অহিভূষণ মালিক-এর

ডিয়ার মাস্টার ৭·০০

[বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী পল গগ্যাঁর জীবনী ও শিল্পকর্মের মূল্যায়ন ঃ তাঁর অঙ্কিত ছবি দ্বারা সমৃদ্ধ গ্রন্থ।]

বাণী রায়ের অনবদ্য গ্রন্থ

[দিল্লীর নবসিংদাস পুরস্কারপ্রাপ্ত ও সম্বলপুর ইউনিভার্সিটির বি-এ (অনার্স) ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনুমোদিত গ্রন্থ]

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ ৪·৫০

সমকর্ষণ রায়ের জীবনস্পর্শী চিত্র

অনেক পথ পেরিয়ে ৪·০০

ঃ প্রকাশের অপেক্ষায় ঃ
অজিত সেনের ছোটদের বই
আরশি-দেশে অ্যালিস

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

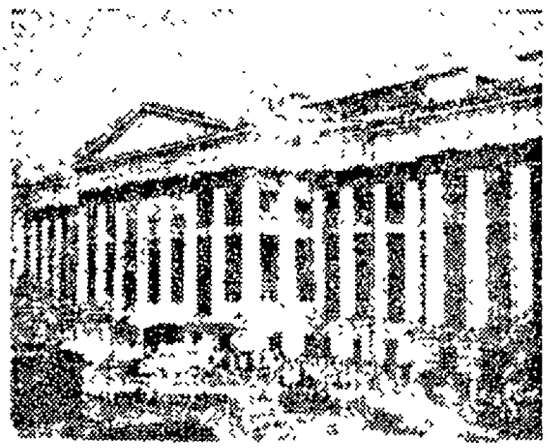

যাদুঘর

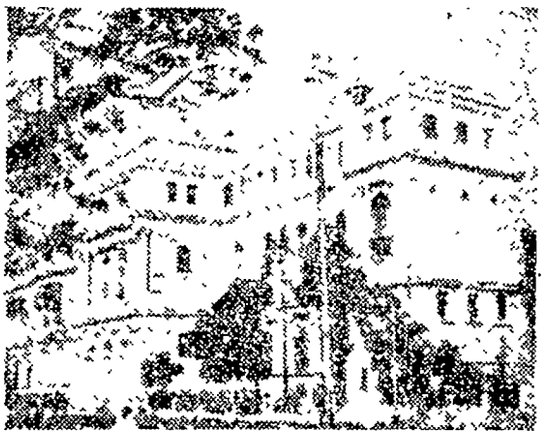

দের সঙ্গে তাদের সাবেক প্রদেশের সম্পর্ক প্রায় সম্পূর্ণই ছিন্ন হয়েছে, তারা এখন কলকাতার লোক ছাড়া আর কিছুই নয়।

কলকাতা শহরে হিন্দী ও উর্দুভাষীদের প্রভাব এই থেকেই বোঝা যাবে যে এখান থেকে প্রতিদিন হিন্দী কাগজ প্রকাশিত হয় চারটি (লোকমান্য, সন্মার্গ, বিশ্ববন্ধু ও বিশ্বমিত্র) আর উর্দু কাগজও চারটি (আবসার, আস্‌রেজাদিদ, আজাদ হিন্দ ও রোজানা হিন্দ)। এ ছাড়া হিন্দী ও উর্দু সাময়িক পত্রপত্রিকাও কয়েকখানি প্রকাশিত হয়। বৃহত্তর কলকাতা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের চারজন হিন্দীভাষী ও চারজন উর্দুভাষী।

কলকাতায় ওড়িয়াভাষীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। ওড়িশা থেকে আগত এই মানুষগুলিও মুখ্যত শ্রমজীবী, তবে বিশেষ কয়েক ধরনের কাজে তাদের পারদর্শিতার বেশি খ্যাতি। পাইপ, বং ও বিদ্যুতের কাজ তাদের প্রায় একচেটিয়া।

শহরে শিখ, পাঞ্জাবীর সংখ্যাও প্রায় তিন লক্ষ এবং তারাও একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়। তারা বেশিভাগই ভবানীপুর অঞ্চলের লোক। শিখদের অধিকাংশ পুরুষ পরম্পরায় কলকাতার অধিবাসী এবং দেশের সঙ্গে তাদের অল্পজনেরই সংযোগ আছে। কলকাতায় শিখদের নিজস্ব স্কুল, গুরুদ্বারা সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে এবং গুরুমুখী ভাষায় একটি দৈনিক পত্রিকা (দেশ দর্পণ) প্রকাশিত হয় এখান থেকে। পাঞ্জাবীদের প্রধান কর্মক্ষেত্র শহরের পরিবহন, হোটেল ব্যবসাতেও তাদের সিংহভাগ। অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু পাঞ্জাবীদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

কলকাতায় নেপালীর সংখ্যাও সাড়ে তিন লক্ষ, এদের বেশিভাগ দার্জিলিং ও সিকিমের লোক, তবে নেপাল থেকেও অনেকে এসেছে। আসাম পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য হলেও, কলকাতায় অসমিয়ার সংখ্যা নগণ্য, মাত্র সাত হাজার।

দক্ষিণ কলকাতার অধিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দক্ষিণ ভারতীয়। তাদের প্রায় অর্ধেক তামিল, অবশিষ্টরা প্রায় সকলে অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরলের লোক। কলকাতায় দক্ষিণভারতীয়দের সংখ্যা প্রায় অর্ধ লক্ষ, তামিলরা উচ্চশিক্ষিত এবং প্রায় সকলেই কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তামিলদের কয়েকটি স্কুল আছে এই শহরে, একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও তারা প্রকাশ করেন। অন্ধ্র থেকে আগত তেলেগুদের একাংশ শ্রমজীবী, দক্ষিণ কলকাতা ও ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে তাদের কয়েকটি হোটেল-রেস্তোরাঁও আছে। দক্ষিণভারতীয়রা একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেন, হিন্দী, ওড়িয়া, উর্দু বা পাঞ্জাবীদের মতো তারা কলকাতার জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাননি। বৃত্তির স্বাতন্ত্র্যই এর মুখ্য কারণ।

কলকাতার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় কলকাতা শহরের মতোই ইংরেজ শাসনের অবদান। ১৯৬১ সালে কলকাতায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সংখ্যা ছিল কিঞ্চিদধিক বাইশ হাজার। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা পরিশ্রমী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হওয়ার উপযোগী। ইংরেজ শাসনকালে রেল, ইলেকট্রিক সাপ্লাই ও পুলিশের কাজে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চাকরি বাঁধা ছিল। সেকারণে উচ্চশিক্ষার খুব বেশি প্রচলন এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনদিনই ছিল না। ফলে ইংরেজরা চলে যাওয়ায় তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়, ব্যাপক বেকার সমস্যা দেখা দেয় ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু ইংলণ্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় কয়েক বছর আগে প্রচুর শ্রমিকের চাহিদা হওয়ায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় তার পূর্ণ সুযোগ নেয়। দলে দলে তাদের দেশ ত্যাগ শুরু হয়। সে অভিবাসন তাদের এখনও অব্যাহত আছে এবং বর্তমানে কর্মক্ষম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শহরে নেই বললেই হয়।

দর্শনীয় ও পুণ্যস্থান

কলকাতা শহরের বয়স এখনও তিনশ বছর পূর্ণ হয়নি। ইংরেজরা কলকাতা থেকে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ঠিক দুশ বছর আগে কলকাতা বৃটিশ-ভারতের রাজধানী হওয়ার পর থেকে তার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধির সূচনা। সেকারণে এক কালীঘাটের মন্দির ছাড়া এই শহর বা তার উপকণ্ঠের কোন প্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ বা সংস্থার বয়স দুশ বছরের বেশি নয়।

কালীঘাট একান্ন পীঠের অন্যতম, এবং এখানে দেবীর দক্ষিণ পায়ের একটি আঙুল পতিত হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু খুব প্রাচীন কোন গ্রন্থে কালীঘাট তীর্থের উল্লেখ মেলে না। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বাংলা গ্রন্থে কালীঘাট মন্দিরের উল্লেখ মেলে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষেই ইংরেজ বণিকরা কলকাতায় এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। কালীঘাটের প্রাচীন মন্দির কলকাতায় ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের সাড়ে তিনশ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ, দ্বিতল চারচালা ধাঁচের এই মন্দিরটি বাংলার চালা-মন্দিরশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরের পাশ দিয়েই একদা গঙ্গার মূল ধারা প্রবাহিত ছিল, এখন যা একটি সংকীর্ণ স্রোতহীন খালে পরিণত হয়েছে। ইংরেজরা ১৭১৭ সালে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে যে ৩৮টি পল্লী কলকাতার সঙ্গে সংযুক্ত করার অনুমতি লাভ করে, তার মধ্যে কালীঘাটের নাম নেই, ১৭৫৮ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর যে ৫৫টি পল্লী নিয়ে কলকাতা শহর আরও সম্প্রসারিত হয়, তার মধ্যে কালীঘাটের নাম দেখা যায়।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ ইংরেজ আমলের প্রাচীনতম প্রাসাদ। প্রথম দুর্গ নির্মিত হয় ১৭০২ সালে, বর্তমান স্ট্রি পি ও ভবন যেখানে অবস্থিত সেইখানে। কিন্তু ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলা ঐ দুর্গটি বিধ্বস্ত করেন। পরের বছর পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হয়ে ক্লাইভ [illegible] দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে [illegible] নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। ১৭৫৮ সালে

নির্মাণকাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৭৭৩ সালে। আটকোণা আকৃতির বিশাল এই দুর্গটি নির্মাণে সেই সময়েই তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে দশ হাজার লোক থাকার ব্যবস্থা আছে। সৈন্য-শিবির, অস্ত্রাগার, খাদ্যভাণ্ডার, প্রার্থনাভবন, প্রমোদভবন ইত্যাদি নিয়ে দুর্গটি একটি ছোটখাটো শহরের মতো। দুর্গের চারিদিকে ৫০ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট গভীর একটি পরিখা আছে, যা জরুরী অবস্থায় হুগলী নদীর জল দিয়ে পূর্ণ করে ফেলা যায়। কিন্তু দুর্গটি নির্মিত হওয়ার পর এই দুশো বছরের মধ্যে সেরকম জরুরী অবস্থা কখনও উদ্ভূত হয়নি এবং সবচেয়ে বড় খবর হল যে, আজ পর্যন্ত কখনও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে আত্মরক্ষার্থে একটি গুলীও বর্ষিত হয়নি।

বেলভেডিয়ার ভবনটিও সুপ্রাচীন। ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস এই ভবনে কিছুকাল বাস করেছিলেন এবং ১৭৮০ সালের ৫ আগস্ট ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হওয়ার পর স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এই ভবনে আনীত হন। ১৮৫৪ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত এই ভবনে বাংলার লেঃ গভর্নর বাস করতেন এবং বর্তমান রাজভবনে বাস করতেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল। ১৯১২ সালে কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হলে বাংলার গভর্নরের বাসস্থান বেলভেডিয়ার থেকে বর্তমান রাজভবনে স্থানান্তরিত হয়। আর প্রতি শীতকালে দিল্লী থেকে গভর্নর-জেনারেল কলকাতা বেড়াতে এসে বেলভেডিয়ার ভবনে থাকতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, ১৯৫৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি এখানে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়। ঐদিন জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ভারতের এই বৃহত্তম গ্রন্থাগারে রয়েছে আট লক্ষেরও বেশি, আর আছে প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুথি-পত্রিকা ও তালপাতার টিপ। জাতীয় গ্রন্থাগারটি কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

কলকাতার মিউজিয়াম (যাদুঘর), পশুশালা (চিড়িয়াখানা) ও গঙ্গার তীরবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেনস (শিবপুরের বাগান) এই মহানগরীর আরও তিনটি অনন্য সম্পদ, যার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার অবকাশ এই নিবন্ধে নেই। শুধু এটুকু বলা যায় যে, জাতীয় গ্রন্থাগারের মতো ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও ইণ্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনও সারা ভারতের গৌরব।

কলকাতার আর একটি সুন্দর সম্পদ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আধুনিক ভারতের রূপকার মহাপুরুষ নিজেই এই ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ, ১৯০৬ সালে। তখন তিনি ছিলেন যুবরাজ, প্রিন্স অফ ওয়েলস। তারপর ১৯২১ সালে এই মর্মর প্রাসাদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আর এক প্রিন্স অফ ওয়েলস, পরে কিং এডওয়ার্ড নামে স্বল্পকালের জন্য রাজা হন। অবশ্য ভবনটি নির্মিত হয়েছিল ভারতীয়দেরই পয়সায় এবং নির্মাণে ব্যয় হয় ৭৬ লক্ষ টাকা। অনেকের হয়ত জানা নেই যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (১৮২ ফুট) মনুমেন্টের চেয়ে উঁচু (১৬৫ ফুট)। অনিন্দ্যসুন্দর ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের অভ্যন্তরে আছে বহু অমূল্য চিত্র, মর্মর-মূর্তি ও নানা স্মারক সামগ্রী। স্মৃতি-সৌধের চূড়ায় যে মূর্তিটি আছে তার উচ্চতা ষোল ফুট ও ওজন তিন টন, কিন্তু সেটি এত সূক্ষ্মভাবে ও সুকৌশলে স্থাপিত যে সেটি সর্বদা বাতাসের গতির সঙ্গে পাক খায়।

কলকাতার রাজভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয় ১৮০৩ সালে এবং গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সর্বপ্রথম এই ভবনে বাস করেন। ছয় একর জমি নিয়ে রাজভবনের প্রাঙ্গণ এবং ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা। রাজ-ভবনের দরবার হলে আছে টিপু সুলতানের সিংহাসন।

অকটরলোনি মনুমেন্ট বর্তমানে যার নাম শহীদ মিনার, নির্মিত হয় ১৮১৮ সালে, নেপাল যুদ্ধে (১৮১২-১৪) জয়ী ইংরেজ সেনাপতি স্যার ডেভিড অকটরলোনির সম্মানে। সম্পূর্ণ ইটের তৈরি এই স্মৃতি-স্তম্ভটির মধ্য দিয়ে পাক-খাওয়া সিঁড়ি চূড় পর্যন্ত উঠে গেছে এবং চূড়ায় উঠলে সমস্ত কলকাতা শহরের খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। মিনারটির নির্মাণ-শৈলীর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য। এর গোড়ার অংশ মিশরীয় রীতিতে ও উপরি-ভাগ সিরীয় রীতিতে নির্মিত হয়েছে এবং চূড়ার গম্বুজটি নির্মিত হয়েছে তুর্কী গম্বুজের অনুকরণে। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে মনুমেন্টটির নাম দেওয়া হয়েছে শহীদ মিনার।

শহরের প্রাচীনতম চার্চ হল ওল্ড মিশন চার্চ। ডালহৌসি স্কোয়ারের পূর্বে মিশন রো-য় অবস্থিত এই চার্চটির নির্মাণকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ। ট্রেজারার পরেশনাথের মন্দির নির্মিত হয় ১৮৭৬ সালে, এটি দশম জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীশীতল নাথজির স্মরণে নিবেদিত। কলকাতার মুসলিমদের বৃহত্তম প্রার্থনাভবন নাখোদা মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯২০ সালে। সিকান্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধির অনুকরণে নির্মিত এই বিশাল প্রার্থনাভবনটিতে একসঙ্গে দশ হাজার লোকের প্রার্থনার স্থান আছে। মসজিদটির সর্বোচ্চ মিনারটি ১৫১ ফুট উঁচু। সমগ্র মসজিদটি নির্মাণে ব্যয় হয় পনেরো লক্ষ টাকা।

এছাড়া কলকাতার ধর্মস্থানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য আর্মেনিয়ানদের সেন্ট নিকোলাস চার্চ, যার প্রাঙ্গণে রয়েছে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের একটি সমাধি। এদের পরিবার প্রতিষ্ঠিত ইহুদিদের প্রার্থনাভবন মাগেন-সিনাগগ আছে ক্যানিং স্ট্রীটে। বুদ্ধের ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চা এবং কলকাতার আগন্তুকদের সুবিধার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মহাবোধি সোসাইটি। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা এবং আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে রবীন্দ্র সরোবরের সান্নিধ্যে গড়ে উঠছে একটি বিশাল ও সুন্দর প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ ইন্সটিটিউট এণ্ড কালচার। এই সব প্রতিষ্ঠান ও ইতিহাস ও সংস্কৃতি অনুরাগী পর্যটকের অবশ্য দর্শনীয়।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আপনি কি হোমকুণ্ড যাবেন! তাহলে আজই কিনুন

দীপককুমার সরকারের

রূপতীর্থ রূপকুণ্ড-হোমকুণ্ড

মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা

হোমকুণ্ড অভিযানের এক বিস্ময়কর ভ্রমণ কাহিনী। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, "দীপকের এই বইখানি হাতে নিয়ে নিভয়ে পথ চলুন, দীপশিখার মত আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

পরিবেশক : ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২
প্রাপ্তিস্থান : ঘাতায়ন, ২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলি-৩
অমৃতায়ণ : ৩৬৬ ডঃ হাবার্ন রোড, কলি-৩৪

প্রকাশক : সুপ্রিয়া প্রকাশনী, ২ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলি-৩

দিনকালের হিসেব

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক—(১)

—ওরে বাবা! পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, বলে লাফিয়ে উঠলেন আমাদের ভুবনদা। আর্কিমিডিসের 'ইউরেকা, ইউরেকা'ও বোধহয় অতটা উল্লাসের দ্যোতক ছিল না। তারপরই ভুবনদা কিন্তু একটু মুষড়ে পড়লেন : বড্ড দেরী হয়ে গেল, ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই গাদি লেগে গেছে; মুখ্খুর মত ঠিকানা দিয়েছে যে!—আশঙ্কা ও অভিমত ভুবনদা ব্যক্ত করেই ফেললেন।

ব্যাপারটা পুরো না বুঝলেও অনেকটা অনুমান করেছিলাম। প্রতি রবিবার সকালে বাজার সেরে এসে ভুবনদা খবরের কাগজে খুঁটিয়ে পাত্রপাত্রী বিজ্ঞপ্তি দেখেন। সেই সময় তাঁর বাইরের ঘরে আমাদের বসা যায় আড্ডাই জমে। গল্পগুজবের মধ্যে ভুবনদার চোখ কিন্তু থাকে খবরের কাগজের শ্রেণীবদ্ধ ঐ বিজ্ঞাপনের ওপর, আর হাতে থাকে একটা স্কট পেন। যে বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর মনোমত হয় তাতে তিনি স্কটপেন দিয়ে বক্স করে ফেলেন। পরে সোমবার চিঠি ছাড়েন। এ তাঁর সাপ্তাহিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

না, ভুবনদা ঘটকালি করেন না। তিনি এক অনূঢ়া কন্যার পিতা। সুতরাং পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞপ্তির সবটুকু ঠিক পড়েন না—'পাত্রী চাই' অংশটুকুই পড়েন। ভুবনদার কন্যার গুণপনার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। তাই সে সম্বন্ধে আর আলোচনা করলাম না।

সেদিনও ভুবনদা বিজ্ঞপ্তি পাঠ করতে করতে হঠাৎ যেন তার মধ্যে ডুবে গেলেন। তারপরই 'ওরে বাবা! পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি' বলে লাফিয়ে ওঠা, ইত্যাদি। বুঝলাম নিশ্চয়ই ভুবনদা কোন সুপাত্রের সন্ধান পেয়েছেন, আর বিজ্ঞাপনদাতা ঠিকানাও দিয়েছেন। কিন্তু কিসে বড্ড দেরী হয়ে গেল এবং কিসের গাদি লেগেছে তা ঠিক বুঝলাম না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বা তাঁদের প্রতিনিধিদের না ঘটকদের? তাই যদি হয়, কি এমন লোভনীয় পাত্র যার জন্যে উমেদারের ভিড় লেগে যায়?

—না এখনই গিয়ে ধরি, বলে ভুবনদা উঠে দাঁড়ালেন। আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম : কিরকম পাত্র ভুবনদা যে পড়িমরি করে এখনই ছুটতে হবে?

ভুবনদা দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘিরে আমাদের সবাই-এর ওপর চোখ বুলিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন : রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী।

ভুবনদা চলে গেলে আড্ডার একজন উঁকি করলেন : ভালই করলেন ভুবনদা। পাত্র হিসেবে ন্যাশনালাইজড্ ব্যাঙ্কের কর্মচারী সত্যিই বড় একটা মেলে না।

আর একজন, যিনি সরকারী কর্মচারী, বলে উঠলেন : চাকা কিরকম ঘুরছে!.....

চাকা ঘোরার ব্যাখ্যা হিসেবে ভদ্রলোক যেন আরও কিসব বলেছিলেন, কানের ভেতর দিয়ে তা ঢুকলেও মনে ঠিক গেঁথে যায় নি; কারণ, চাকা ঘোরা সম্বন্ধে আমি নিজের ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের রোমন্থনে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলাম।

স্মৃতিচারণ :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—১৯৪৪ সালের মার্চ মাস। তারিখ ঠিক মনে নেই। আগের দিন বি-এ পরীক্ষা শেষ করে (তখন মার্চ মাসেই বি-এ পরীক্ষা ঠিক ঠিক হত) বেশ বেলা অবধি দুর্ভাবনামুক্ত ঘুম ঘুমোচ্ছিলাম। ইচ্ছে ছিল আটটা-ন'টা অবধি ঘুমিয়ে কাবার করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হল না। সাতটার আগেই মা এসে ডেকে তুলে বললেন : বাড়ুজ্যেদের মাতু অনেকক্ষণ ধরে বাইরের ঘরে বসে আছে। তোর সঙ্গে নাকি বিশেষ দরকার।

অগত্যা উঠতে হল। মা যাঁকে মাতু বলে অভিহিত করলেন, তিনি আমাদের পাড়ার মাতুদা। তৎকালীন লয়েডস্ ব্যাঙ্কের কোন্ এক ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু।

দেখা হতেই মাতুদা বললেন : কিরে, কাল নাকি তোর এগ্‌জামিন শেষ হয়েছে? তা' চ-আজ থেকেই লাগবি। তখনও ঘুমচোখ তাই বোধহয় বুঝতে দেরী হয়েছিল। মনে আছে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : কোথায় লাগব?

—কেন আমাদের ব্যাঙ্কে? মাতুদা অবাকই হয়েছিলেন। তারপর ভেঙে বলেছিলেন : সাহেবকে বলে রেখেছি—একরকম কথা দিয়েই এসেছি।

মাতুদার সঙ্গে সেদিন নয়, পরের দিন লয়েডস্ ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। আর সাহেবের কাছে অতি সংক্ষিপ্ত ইন্টারভিউ-এর পরই কাজে লেগে গিয়েছিলাম।

পরদিন অফিস করার পথে উত্তরপাড়া স্টেশনে পাড়ার শিবেশদার সঙ্গে দেখা হতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : কি এত সকাল সকাল কোথায়? কোথাও বেরোনো হচ্ছে নাকি?

শিবেশদা ভাববাচ্যেই আলাপ করেন, আর 'বেরোনো'র অর্থ হল নিয়মিতভাবে কোন চাকরিবাকরি বা কাজকর্ম করা।

উত্তর দিলাম : হ্যাঁ, লয়েডস্ ব্যাঙ্কে বেরোচ্ছি।

অ্যাঁ, ব্যাঙ্কে বেরোনো হচ্ছে! আর কোথাও জুটল না?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে, পূর্ণনিযোগের সময়। কেউ বসে নেই—কর্মপ্রার্থীর চেয়ে কাজকর্মের পরিমাণ অনেক বেশী। অনেক কর্মপ্রার্থীকে সকালে নিযোগের সন্ধানে বেরিয়ে সন্ধ্যেয় চাকরিতে যোগদানের পর একদিনের কাজ সেরে ঘরে ফিরতে দেখেছি। এই অবস্থায় শিবেশদার মন্তব্যে যুক্তি কিংবা অসঙ্গত নয়। তবুও কিন্তু গায়ে বেঁধায় প্রতিবাদ না করে পারলাম না : কেন, সাহেবী ব্যাঙ্কের চাকরি কি একদম বাজে?

—সব ব্যাঙ্কের চাকরিই সমান, তা সাহেবী হক আর দিশীই হক, শিবেশদা প্রতিবাদকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন। তারপরই জিজ্ঞাসা করলেন : তা' কতদূর ঢোকা হয়েছে?

বেতনের উল্লেখ করলাম। শিবেশদা তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন : আর ডিউটি আওয়ার্স?

এবার উত্তর দেওয়ার আগেই তিনি নিজে জ্ঞান বিতরণ করলেন : ডিউটি আওয়ার্স বলে কিছু নেই, রাত আটটা ন'টা দশটা.....।

আমাদের ট্রেন এসে পড়াতে সাক্ষাৎকার আর এগোল না। ট্রেনে উঠে আগের দিনে কাজে যোগ দেবার পর বড়বাবুর (মাতুদা নন, অন্য ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু) উপদেশাবলী মনে পড়ল : ব্যাঙ্কে ডিউটি আওয়ার্স বলে কিছু নেই। যদিও বা ব্যাঙ্ক খোলে দশটায় তবে তোমাকে হাজির হতে হবে সাড়ে নয়টার মধ্যে। এবং ফিরবে কাজ শেষ করে—লেজারে পোস্টিং হয়ে গেলে তারপর।

এরপর নিজের সীটের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম, বড়বাবু আবার ডাকলেন : আর একটা কথা। কনস্টিটিউয়েন্টদের সঙ্গে সবসময় ভাল ব্যবহার করবে। তোমার আবার কাউন্টারের কাজ। কোন কমপ্লেইন্ট যেন না আসে। সাহেবের কাছে কমপ্লেইন্ট গেলেই সঙ্গে সঙ্গে স্যাক।—বড়বাবু হাতে গলা কাটার ইঙ্গিত করলেন।

সত্যি সত্যিই স্যাকড্ হয়েছিলাম। কারো সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে নয় পর পর দু' শনিবার দুটোর সময় ব্যাঙ্ক ছেড়ে বেরোবার জন্যে। উদ্দেশ্য ছিল ময়দানে ফুটবল ম্যাচ দেখা। শনিবার যদিও দুটোতেই ব্যাঙ্ক থেকে বেরোবার কথা, কিন্তু বড়বাবু যে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : লেজার-পোস্টিং শেষ না করে বাইরের দিকে পা বাড়াবে না, তা সে যত বাত্তিরই হোক।—তারপর টিপ্পনীও কেটেছিলেন : ব্যাচেলার ছেলে, বাড়ীর টান ত' নেই। ধরে নিচ্ছি বারটানও নেই। কি বল?

ভাবতে লাগলাম, চাকা কিরকম ঘুরেছে। ১৯৪৪ সালে আমি সাহেবী ব্যাঙ্কের কর্মচারী ছিলাম বলে লোকে আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত, আর আজ এই ১৯৭৩ সালে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ভুবনদা এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী পাত্রের সন্ধানে রবিবারের আড্ডাটকে বিসর্জন দিয়ে তখুনিই ছুটলেন। সত্যিই পাত্র হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী বড় একটা মেলে না। অর্থাৎ খোলা বাজারে ঠিক যোগান আসে না—তার আগেই বুকেড হয়ে যায়।

চাকা ঘোরা শুরু :

চাকা ঘুরতে শুরু করে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময় থেকে। তার ঠিক আগের যুগ ছিল সংক্রামক হারে ব্যাঙ্ক ফেলের যুগ। মাত্র পশ্চিমবঙ্গেই ১৯৪৮-৫১—এই চার বছরের মধ্যে ৮৬টি ব্যাঙ্কের পতন ঘটেছিল। তারপর ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (বর্তমান নাম ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ বা রেগুলেশন আইন) পাস হলে অবস্থার খানিকটা উন্নতি ঘটে। এরপর ১৯৫৫ সালে ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ এক নতুন যুগের সূচনা করে। তখন থেকে পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার গুরুত্ব, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের আন্দোলন ইত্যাদির ফলে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা ক্রমশ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পরিশেষে, প্রথমে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে অর্ডিন্যান্স দ্বারা এবং পরে ১৯৭০ সালে পার্লামেন্টের আইন দ্বারা ১৪টি বড় বড় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হলে চাকা পুরোপুরি ঘুরে যায়, এবং পাত্র হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারী হয়ে দাঁড়ায় 'লাখে না মিলে এক।'

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য :

অবশ্য ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের অবস্থার উন্নতি ও মর্যাদার বৃদ্ধি হল রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সম্পূর্ণ উপজাত ফল বা বাই-প্রোডাক্ট—মুখ্য উদ্দেশ্য হল 'অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সামাজিক ন্যায়সাধন' (ইকনমিক গ্রোথ উইথ সোস্যাল জাসটিস)। এই মুখ্য উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হয়েছে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবার বিচার করতে হবে যে ঠিক কর্মী সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে পারা গেছে কিনা—যাকে বলে সামাজিক উৎসাহ তা' ব্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে ঠিক সঞ্চারিত হয়েছে কিনা। প্রত্যেক পরিবর্তনেই কোন-না-কোন শ্রেণীর মর্যাদা ও অধিকার বৃদ্ধি পায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার অতিরিক্ত দায়িত্বও এসে চাপে। এই দায়িত্ব পালন করে তবেই বর্ধিত মর্যাদা ও সম্প্রসারিত অধিকার ভোগ করা যায়। অনেকেরই অভিযোগ হল, ব্যাঙ্কগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হবার পর থেকে ক্রমশ 'সার্ভিসের' অবনতি ঘটছে, এবং এর মূলে আছে দায়িত্ব বা কর্তব্যবিহীন অধিকার ও মর্যাদার ধারণা। এই অভিমতকে মেনে নিলে পরিণতিকে অতীব দুঃখজনক বলেই আখ্যা দিতে হয়। এবং আশু এর মোড় ঘোরাবার ব্যবস্থা না করলে মুখ্য উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

এখন মুখ্য উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ থেকেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। এবং এই আলোচনাই করব পরবর্তী সংখ্যায়।

টুকরো খবর

পশ্চিমবঙ্গ :

পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দ বৃদ্ধি :

পঞ্চম পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দ চতুর্থ পরিকল্পনার মোটামুটি দ্বিগুণ হবে এই মূল নীতি গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে চতুর্থ পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩২২·৫০ কোটি টাকা। কিন্তু এই মোট বরাদ্দকে ভিত্তি হিসেবে না ধরে ধরা হয়েছে ৫৬০ এবং ৬০০ কোটি টাকার মাঝামাঝি একটা অঙ্কে। ফলে পঞ্চম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্যে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১১০০ কোটি টাকার মত দাঁড়াবে।

এই সংবাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেন যে পূর্ববর্তী দুই পরিকল্পনা এবং 'পরিকল্পনা থেকে ছুটির' (হলিডে) দু বছর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল পরিকল্পনা কমিশন তা স্বীকার করেছেন। তাই এবার বরাদ্দের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী ডি পি ধরের উক্তি উদ্ধৃত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থার কারণ হল 'চতুর্থ পরিকল্পনায়' ব্যয়বরাদ্দ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার এবং এই রাজ্যের অর্থ-ব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা।

শ্রীরায় ঘোষণা করেন যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিবর্তিত ও বর্ধিত বরাদ্দের পরিমাণ করা হবে।

ভারত :

টাকার দাম :

টাকার দাম আজ কত? ১৯৪৯ সালের তুলনায় মাত্র ৩৫ পয়সা। তাহলে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের জুন মাসের মধ্যে টাকার দাম বা ক্রয়শক্তি হ্রাস পেয়েছে ৬৫ পয়সা। এই হিসেব করা হয়েছে শিল্প-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক থেকে। হিসেবটিতে আরও বলা হয়েছে যে দু বছরেরও কম সময়ের মধ্যে টাকার দাম কমেছে ৭·৫ পয়সা আর গত কয়েক মাসে প্রতি মাসেই এক পয়সা করে কমেছে।

বিশ্ব :

জীবনযাত্রার মান :

ডলারের মূল্যমান হ্রাস সত্ত্বেও মার্কিন নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানই সবচেয়ে উন্নত। এই তথ্য দেওয়া হয়েছে—অর্থনৈতিক সমবায় ও উন্নয়ন সংস্থার (ও ই সি ডি) এক প্রতিবেদনে। মার্কিন মাথাপিছু আয় হল ৩২৩০ ডলার। এরই পরই আছে কানাডা—২৪৫০ ডলার এবং সুইডেন—২৩৯০ ডলার। পশ্চিম জার্মানীর মাথাপিছু আয় ১৯১০ ডলার এবং জাপানের ১২৩০ ডলার। স্বল্পোন্নত দেশগুলির কোন হিসেবই দেওয়া হয়নি।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

—এবার শারদীয়া পূজায়—
নূতন প্রচণ্ড হাসির নাটক (পূর্ণাঙ্গ)
[অফিস ক্লাব ও বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় উপযোগী]
কিরণ মৈত্রের
টোপর বদল হ'লো 8-00
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে 8-00
ডাইভোর্স 2-50
সিটি বুক এজেন্সী
৪৪।১সি বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

কথায় কথায়

'কথায়-কথায়'-এর উল্টোপাল্টা কচ্‌কচানিতে যাঁরা ক্লান্ত, তাঁদের জন্যে আজ একটি নিঃশব্দ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে এসেছি।

কয়েকদিন আগে একদিন সন্ধ্যাবেলা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই সংগ্রামের আমি দৈবাৎ প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছি। সংগ্রামের পটভূমি একটি মিনিবাস।

সবাই জানেন, কিছুদিন হলো মিনি বাস ঠিক কি, এর সামাজিক এবং আইনগত মর্যাদা কি, এটা বাস না ট্যাক্সি এই নিয়ে জটিল বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই কলহ, মিনিবাসে ধূমপান করা উচিত কি উচিত নয়, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু মিনিবাসে উগ্র ধূমপায়ীরা এবং তাদের মধ্যে মধ্যে তাঁর ডানদিকের সহযাত্রী যিনি জানলার ধারে বসে আছেন তাঁকে বক্রচোখে নিরীক্ষণ করছেন।

ধূমপায়ী ভদ্রলোকের বক্রদৃষ্টি অনুসরণ করে জানলার ধারের ভদ্রলোককে দেখলাম অত্যন্ত বিরক্তভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এই দ্বিতীয় ভদ্রলোক এঁর পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকটির সমবয়সী; ঐ পঞ্চাশের মতই বয়স হবে, তবে একটু হৃষ্ট-পুষ্ট। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, ইনিও কখনো কখনো বক্রদৃষ্টিতে তাঁর সহযাত্রীকে দেখছেন এবং এঁর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ধূমপান, বিশেষত মিনিবাসে ধূমপান ইনি মোটেই অনুমোদন করেন না।

এঁদের দুজনের চোখে ঘোরালো দৃষ্টি দেখে আমি অনায়াসে অনুমান করে নিলাম, এখনই প্রচন্ড কলহ শুরু হবে। আমার কেমন যেন এ-ও মনে হলো যে এঁরা দুজনে পরস্পর পরিচিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে রকম কিছু হলো না। আমি বাইরের দিকে চলমান জগৎ-সংসার দেখতে লাগলাম। হঠাৎ মিনিট-দুই পরে একটা আচমকা জাপটা-জাপটির শব্দ আমার ডানদিকে। অন্যান্য সহযাত্রীর সঙ্গে আমিও চমকিয়ে তাকালাম। কিন্তু সেই জাপটা--জাপটি কেন হলো, কোথায় হলো, কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। আমার পাশের দুইজন গম্ভীর নির্বিকার মুখে স্থির হয়ে বসে রয়েছেন।

উগ্র বিরোধীরা ক্রমশ যে রকম পরস্পরের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠছেন, তাতে এই বিবাদ শীঘ্রই আদালতের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছাবে এ বিষয়ে আমার ক্ষীণতম সন্দেহ নেই।

এই রকম একটি বিবাদের আমি নীরব-সাক্ষী, আর কেউ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। বিবদমান যাত্রীদ্বয়ের পাশেই আমি বসেছিলাম বলে আমি সেই নীরব সংগ্রামের সবটুকু দেখতে পেয়েছি।

মিনিবাস আসছিলো ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে গড়িয়াহাট। মিনিবাসের সবচেয়ে পেছনের সিটে পাঁচজন বসতে পারে। এই পাঁচজনের মধ্যস্থলে আমি বসেছিলাম। আমার ডানদিকে এক ভদ্রলোক, বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে, রোগা লম্বাটমতন ভদ্রলোক একটা লম্বা ফিল্টার উলা সিগারেট পকেট থেকে বার করে খুব আরাম করে ধরিয়েছেন আর ভদ্রলোক নীরবে জানলার ধারের ভদ্রলোকের একটা কান আচ্ছা করে মুলে দিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে এই অপমান ও যন্ত্রণা সহ্য করলেন। সবাই যখন তাঁদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়েছে, দুজনেই নির্বিকার। কারোর বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে কি সাংঘাতিক অথচ নিঃশব্দ দ্বন্দ্বযুদ্ধ এঁদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে।

এর পরের ঘটনা ঘটলো একেবারে গড়িয়াহাট মোড়ের মোড়ে। এবার অবশ্য বহুলোকের চোখের সামনে। সিগারেটখোর ভদ্রলোক যিনি একটু আগে কান মুলে দিয়েছিলেন তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, তাঁর পিছনে পিছনে গুটি গুটি আসছিলেন একটু অগের নির্যাতিত দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এবার তাঁর প্রতিশোধের পালা, এবং সত্যিই প্রতিশোধ নিলেন তিনি একটু বেশি নির্মম ভাবে।

অল্পবয়েসী ছেলেরা যে রকম করে প্রায় সেই রকম, সামনের ভদ্রলোক যেই সিঁড়ির উপরে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, পিছন দিক থেকে দ্বিতীয় ভদ্রলোক চকিতে নিজের একটা পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন তাঁকে। সামনের হতভাগ্য ভদ্রলোক এতক্ষণ খুবই সতর্ক ছিলেন, কিন্তু এইরকম আক্রমণ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। তিনি কলাগাছের মত গাড়ির সিঁড়ি থেকে হাতের ব্যাগ-ছাতা সমেত মুখ থুবড়ে ফুটপাথের উপর পড়ে গেলেন। সবাই হায়-হায় করতে লাগলেন। শুধু যিনি পড়ে গেলেন ভাব-চিহ্নহীন তাঁর মুখ আর যিনি ঠেলে দিলেন তিনিও নির্বিকার ভাবে জনতার পাশ কাটিয়ে মোড়ের দিকে এগোলেন।

এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে আর একজন মধ্যবয়সী মানুষ সজ্ঞানে পাশে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছেন এই কথাটা বুঝবার আগেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমিও গড়িয়াহাট মোড়েই নামি। দু-একটা টুকিটাকি বাজার ছিলো, সেটা সেরে মিনিট পনেরো পরে বাড়ির দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একটু আগের অধঃপতিত ভদ্রলোক একটা সিগারেটের দোকান আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমার কেমন সন্দেহ হলো, ভদ্রলোককে বুঝতে না দিয়ে আমিও একটু দূরে, দাঁড়িয়ে পড়লাম দেখবার জন্যে কি হয়।

কি আর হবে? একটু পরেই সেই জানলার ধারের দ্বিতীয় ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত চিত্তে এবং হৃষ্ট মনেই মনে হাসতে এগিয়ে এলেন এই দিক দিয়ে এবং সিগারেটের দোকানের আড়াল থেকে প্রথমজন বেরিয়ে এসে পিছন থেকে ধাঁ করে ছাতা দিয়ে এক বাড়ি, এবং আবার জনতার বিস্ময়, প্রতি-দ্বন্দ্বদ্বয় নির্বিকার বাক্যহীন। পর-স্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি, নিক্ষেপ করে দুজনে মুহূর্তের মধ্যে দুদিকে চলে গেলেন।

তারাপদ রায়

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(৩৬)

দিদিকে আর বেশীক্ষণ লুটোপুটি করতে সময় দেওয়া হল না, যাঁরা কোমরে গামছা বেঁধে উঠোনে ঘোরাঘুরি করছেন, তাঁরা আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।

এমনিতেই তো দিদির অপেক্ষায় যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে। অপেক্ষা ওরা করতে চাইছিলেন না, বলছিলেন রাত্তিরে যদি গাড়ির সুবিধে না পায়, যদি সকালের আগে না এসে উঠতে পারে?'

মেজদা না কি বলেছিল, 'তাহলে কাল সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হবে।'

এতে ওরা মর্মাহত হয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন। মেজদা যে হঠাৎ এতোখানি জোর পেলো কোথায়। এক ঘন্টার মধ্যে কতটা বড় হয়ে গেল!

কাকার আক্ষেপোক্তি থেকেই এটি শুনতে পাওয়া গেল, এ ঘরের দরজায় আর কারো যেন বলছিলেন, ছেলেমেয়েগুলিকে নাদা বেশ ভালই মানুষ করেছেন। বিমল এমনভাবে হুকুম দিল যেন ও হুকুমদাতা মনিব, আর আমরা ওর চাকর! নেহাৎ নদার ব্যাপার তাই না হলে দেখিয়ে দিতাম! সেই সকালে কেমন করে বাপের মড়া তুলতেন বাছাধন দেখতাম। বিয়ে হওয়া মেয়ে সব সময় মা-বাপের শেষ সময় আসতে পায়? বলি এই যে জ্যেষ্ঠপুত্রের যাঁর মুখাগ্নি করবার কথা তিনি তো শ্রীঘরবাস করছেন। কই বলতে পারবি 'দাদা আসুক তবে মড়া তুলবো।'

ফটিক বললেন তিনি তাড়াতাড়ি বললেন 'থাক থাক ওসব কথা। ছেলে বয়স বড় গরম—'

'আমাদেরও একদিন ছেলেবয়েস ছিল বিনোদ, এমন গুরু লঘুজ্ঞান শূন্য ছিলাম না। যাক এই কাজটা উদ্ধার হয়ে যাক এরপর তোদের বাড়িতে কেউ পা ধুতেও আসবো না তা জেনে রাখ।'

'মৃত্যু ভয়ংকর, তাকে আরো ভয়ংকর রূপ দেবার চেষ্টায় মানুষও যেন ভয়ংকর হয়ে ওঠে।

তা নইলে এতো নিষ্ঠুর কেন?

এতো আচার কেন?

যাদের সবচেয়ে প্রিয়জন চলে গেল তাদের জন্যে এমন অপরাধীর ভূমিকা কেন? হয়তো ওদেরও খুবই শোক লেগেছে, তাই সেটা এমন জ্বালা হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

আর আমাদের হচ্ছেও ত্রুটি।

বাবার কপালে চন্দন রেখা পরাবার জন্যে যে আমাদের বাড়ি থেকে চন্দন পিঁড়ি খুঁজে পাওয়া গেল না এটা বাড়ির গিন্নীর পক্ষে কম অপরাধ?

মেয়ের বিয়ের সময় গোলেমালে হারিয়ে গেছে? এটা একটা কথা?

তাছাড়া হিন্দুর বাড়িতে একখানা গীতা ও থাকবে না? একটা তুলসী গাছ? গীতা একটা দাদার ছিল, সেটা তো আর জেলে নিয়ে যায়নি নিশ্চয় আছে। কিন্তু কে খুঁজবে?

তবু কোথা থেকে যেন জোগাড় হয়েও গেল সব।

পাড়ার লোকেরাই হয়তো এসব সাহায্য করলো।

স্নানের চেয়ে চেয়ে দেখলাম বাবাকে নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরানো হয়েছে, বাবার কপালে চন্দনের রেখা, গলায় ফুলের মালা।

মনে হলো বাবা যেন আমাদের 'দুষো' দিয়ে অনেক দামী একটা জায়গায় চলে যাচ্ছেন। বাবা গো কী নিষ্ঠুর তুমি! কী হৃদয়হীন। আমাদের এতো কষ্ট হচ্ছে, আর তুমি এমন অদ্ভুত উদাসীনভাবে সেজেগুজে চলে যাচ্ছো? আমাদের সুখ দুঃখ ভাল মন্দ আর কিছু তুমি দেখবে না, আমাদের প্রাণ যেটে গেলেও তোমার কিছু এসে যাবে না! এ যে ভাবা যায় না।

হঠাৎ একটা মৃদু গম্ভীর আওয়াজ উঠলো। সেই চিরপরিচিত ভয়াবহ হরিনাম।

বাবাকে তুলে নিয়ে গেল।

মনে হলো যেন একটা বিরাট গাছকে বড় একটা মোচড় দিয়ে শেকড় ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে চলে গেল।

এ বাড়িতে আর কোনো দিন বাবার পা পড়বে না, এই খাটে আর কোনোদিন কেউ শোবেন না। তবে? তবে কেন আমরা বাবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইবো না?

বেরোতে পাইনি।

বাবা যেন আমাদের ধরে নিয়ে টেনে ঘরে পুরলো। মাকে আমাকে দিদিকে।

তারপর কতোগুলো দিন কী অদ্ভুত অবস্থাতেই কাটলো! নিয়মের নাগপাশে বাঁধা হয়ে আচ্ছন্নের মত রইলাম।

জীবনকে জটিল করে তোলবার যে কতো রকম উপায়ই আবিষ্কার করেছে মানুষ!

হয়তো শুধু এ দেশেই নয়, পৃথিবীর সব দেশেই জন্ম—মৃত্যু বিবাহ এই তিনটি পরম ঘটনাকে কেন্দ্র করে জটিলতা সৃষ্টি করতে কল্পনা, শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে অফুরন্ত, দাড়ির সংস্কার মত ছেড়েই চলেছে তাকে। ঘটনাগুলো যে তুচ্ছ নয়, হালকা নয় সেটা জানান দেবার জন্যেই কি?

মৃত্যু জিনিসটাকে একবারই মাত্র দেখেছি কাছেভাছাড়। জ্যাঠার মৃত্যু। কিন্তু তাতে তো অশৌচ পালনের প্রথা ছিল না কারুর তাই সেই ব্যাপারটা দেখবার দুর্ভোগ ঘটেনি।

দেখলাম।

বড় দুঃখের মধ্যে দিয়েই দেখতে হলো।

বাবা চলে গেছেন, আমাদের সেই চির-দিনের জানা পৃথিবীটা হারিয়ে গেছে এই হারিয়ে যাওয়াটা যে কতখানি যাওয়া সেকথা ভাববার অবকাশ কেউ দেবে না।

অবিরত শুধু 'এই করতে নেই।' আর 'এই করতে হয়' এর বেড়া জালে জড়িয়ে পড়ে থাকে।

বেড়াজাল না বেড়া আগুন?

মার দিকে তাকানো যায় না, কোনোদিনই যাবে কিনা জানি না। মা ঘরের কোণে বসে থাকেন একটা ভয়ের শিশুর মতো।

তবু আবার 'করণীয় কর্তব্য' করতেও উঠতে হয় বৈকি।

নিজেকেই তো ভবিষ্য বাঁধতে হবে।

বাঁধবো না খাবো না বললেও চলবে না।

খাও না খাও রাঁধতেই হবে। নিয়ম-মাফিক মাসমা না পেড়ালে নাকি বাড়িতে প্রেতাশ্রয় করে।

হবেও বা। মানুষ ওই ভয়েই মানুষ শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে না থেকে খেতে বাধ্য হবে, তাই এই ভীতি প্রদর্শন।

মার সঙ্গেই মেজদার খাওয়া। অতএব উঠতেই হবে মাকে, বাঁধতেই হবে মন দিয়ে। মেয়েমানুষ নিজের যত কষ্টই হোক, ছেলের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে দেখলে স্থির থাকতে পারে না।

মাকে তাই এখনকার ওই বীভৎস হাত-খানাকে আঁচলের তলা থেকে বার করে, ছেলের জন্য টিপে টিপে মটর ডাল বাটা ভাতে মাখতে হয় কাঁচকলা ভাতে চটকাতে হয়। উদাসীন থাকতে হয় হবিষান্ন যেন পিণ্ডে পরিণত না হয়।

মেজদা সম্পর্কে একটু ভয় ছিল।

ভেবেছিলাম মেজদা হয়তো এসব বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, হয়তো জিজ্ঞেস করবে কী হয় সেই প্রশ্ন তুলে তর্ক করবে। যুক্তিসঙ্গত তর্ক করার মতো লোকের অভাব ছিল না।

বড় মামীমা প্রতিদিন এসে সব কিছু ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন মায় চালটি ধনে ছোলাটি বেটে পর্যন্ত। দিচ্ছেন রাত্রের খাওয়ার ফলটল কেটে গুছিয়ে।

মেজ মাসিমা তো রয়েই গেছেন।

ওবাড়ির জ্যেঠিমাও এসে এসে থাকছেন। তাঁরও অবশ্য অশৌচ। ভিন্ন গোত্তর কেউ থাকলে ভালো হয় বলেই এঁদের থাকা।

দিদিও এখন ভিন্নগোত্র হয়ে গেছে, কিন্তু দিদিকে দিয়ে কী কাজ হবে? দিদি তো একেই কেঁদে কেঁদে প্রায় শয্যাগত তাছাড়া দিদিকে তো আবার শ্বশুরবাড়িতে চলে যেতে হলো 'চতুর্থী' করতে।

অশৌচের যে আবার ধাপে ধাপে আলাদা শাস্ত্র।

মাকে যা করতে হচ্ছে সেটা সিঁড়ির শেষ সীমা। চরম ব্যবস্থা।

মেজদাকেও তারই কাছাকাছি বরং এক এক দিকে আরো বেশী।

আর আর মেজদার যে মহাগুরুনিপাতের দায়।

আমি জাতিচ্যুত।

অরক্ষণীয়া কন্যার নাকি অশৌচই লাগে না। নেহাৎ বাড়িতে আছি তাই।

মামীমা বলছেন, 'ও বেচারী আর যাতে খেয়ে মরবে কেন? ও তো দুখানা ঘিয়ে ভাজা লুচি খেতে পারে। তেল ঝাল খাবে না, তবে ঘিয়ে দোষ নেই।'

এঁরা খাওয়া দাওয়ার যা যত্ন করেছেন, ও কিন্তু মনে রাখার মতো। সযত্নে ফল কেটে পাথরের রেকাবে করে সাজিয়ে দেন। সযত্নে ঘরের দুধের ছানা কাটিয়ে দেন। যা যা খেতে নেই, তার কিন্তু অনেকটা বলে যা যা খেতে আছে পরিমাণটা এতো বাড়িয়ে ফেলেন যে মামীমা জ্যেঠিমা দেখলেই ভয় করে।

দিদি এ সংসার থেকে খসে গেছে, তাই ওর কর্তব্য সমাধা করে দিদি শ্বশুর-বাড়িতেই বসেছে, 'মাছ ভাত' খাবে বলে। এ নাকি স্বামী শ্বশুরের কল্যাণে।

যত শুনেছি অবাক হয়ে যাচ্ছি। নিয়ম আইনের এই শত শত ধারা অনুচ্ছেদ উপচ্ছেদ কে তৈরী করেছিল বসে বসে?

শবদাহ করে এসে কেন আগুন ছুঁতে হয়? কেন নিম পাতা আর মটর ডাল দাঁতে কাটতে হয়? কেন একটা ঘটি ভরে নিয়ে আসতে হয় গঙ্গা থেকে?

কেন প্রতিক্ষণ এত রকম?

আমার মধ্যে এত কেনর ঢেউ ওঠে, কিন্তু অবাক হয়ে দেখি মেজদার মধ্যে যেন কোনো প্রশ্ন নেই। মেজদা যেন গভীর, সমুদ্রের মতো হয়ে গেছে। ঢেউ নেই, তরঙ্গ নেই।

মেজদা শুধু যে নীরবে সব নীতি নিয়ম মেনেই চলছে তা নয়, যেন এতোটুকু ত্রুটি হতে দিতেও রাজী নয়। এই সব অর্থহীন আচার নিয়মে এতো নিষ্ঠা ওর কাছে অন্য এক গভীর অর্থবহ হয়ে দেখা দিয়েছে।

এখন গুরুজনেরা খুব প্রীত মেজদার ওপর।

অনবরতই আনাগোনা করছেন আত্মীয়-জনেরা। বলছেন 'আজকালকার ছেলেরা বাপু সবাই এমন নিষ্ঠুর সঙ্গে এতো করে না।'

উদাহরণও দেন অনেকে, কার ছেলে মাত্র বিয়োগের সময় একবস্ত্র গায়ে না শুকিয়ে দুখানা কাপড় পরেছিল, কাদের ছেলে পিতৃ-বিয়োগের সময় বন্ধুবলের আসনখানা নামক ওষধাস্ত, পেতে চেয়ারে বসেছিল, কোন অসভ্য ছেলে চা খাবার বায়না নিয়েছিল, বলেছিল— 'গঙ্গাজলে চা হয় না? চা দুধ চিনি কোন জিনিসটা অশুদ্ধ শুনি?'

মেজদা ওরকম নয়।

মেজদা পারফেক্ট।

মেজদা বোধকরি নিশ্বাসটিও ফেলছে নির্দেশদাত্রীদের অনুমতি নিয়ে।

আশ্চর্য। আমার এরকম পারফেক্ট হবার অধিকার নেই। আমি না ঘরকা, না ঘাটকা। আমি ভিন্নগোত্র নই, অথচ একবংশের 'চোদ্দপুরুষও নরকস্থ' করার পাপে পাপিনী বলে, এখানেও 'এলেবেলে', তাই আমার কোনো দায়িত্ব নেই।

'রুচির আর অতো করবার দরকার নেই। রুচিকে আর কাচা কাপড় পরে জল খেতে হবে না, রুচিকে কম্বলে শুতে হবে না।'

মেয়ে হয়ে জন্মানোর অপরাধে চিরদিনই তো অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত তবু এই নিয়ম পালনের নিষ্ঠা থেকেও যে বঞ্চিত হচ্ছি এটা যেন বড় মর্মান্তিক। অথচ ওই নিষেধ নিয়মগুলো আমার অর্থহীন অবান্তর বলেই মনে হচ্ছে।

তার মানে সবাই আমরা কতকগুলো উল্টা-পাল্টা জিনিস দিয়েই তৈরী।

বহু ঝঞ্ঝাট, বহু দুঃখ বহু নিরুপায় যন্ত্রণার পর অবশেষে এই দিনগুলো পার হলো। 'নিয়ম ভঙ্গ' হলো।

মেজদার থান ধুতি পরার দিনের অবসান হলো।

হাঁ মেজদারই হলো।

ঘরের কোণে ভয়ের শিশুর মতো যে মূর্তিটা। ওই নিষ্ঠুর কুৎসিত আবরণটা দিয়ে নিজেকে মুড়ে বসে থাকতো?

না; তার আর আবরণ হবে না।

সেই কুশ্রীতাকে, সেই নিষ্ঠুরতাকে আস্তে আস্তে মেনে নিতে হচ্ছে সইয়ে নিতে হচ্ছে।

বহির্জগতেরা এতোদিন নিজ নিজ সংসার ফেলে এসে বসেছিলেন তাঁরা এবার বিদায় নিয়েছেন অতএব মাকে আর ঘরের কোণে বসে থাকলে চলছে না। তাছাড়া কাজ বেড়ে গেছে বিস্তর।

তাঁর নিয়মতো ইহজীবনেও ভঙ্গ হবার উপায় নেই। কাজেই তাঁকে নিজের রান্না নিজে করে নিতে হবে। তার ব্যবস্থাও আলাদা।

মেজদা হঠাৎ জানালো, কদিন নিরামিষ খেয়ে তার নাকি মাছে গন্ধ লাগছে, আর খাবে না মাছ।

মা অনেক আপত্তি করলেন, কান্নাকাটি করলেন মেজদার সেই এক কথা। এখন খারাপ লাগছে খাবো না। পরে ইচ্ছে হলেই খাবো—এর আর কী। আমায় তো আর কেউ কপালে ত্রিশূল পুড়িয়ে দেগে দেয়নি যে, আর খাওয়া চলবে না।'

'এখন ইচ্ছে হচ্ছে না—'

তার মানে মার রান্নাঘরেই থাকতে চায় মেজদা যাতে মাকে বাধ্য হয়েই কিছু ভাল রান্নাটান্না করতে হয়, স্রেফ ভাতে ভাতের ওপর না থাকেন। তাছাড়া—মা যে মাছ না হলে ভাত মুখে করতে—পারতেন না। সেই মাছটা বাড়িতে আসবে রান্না হবে।

ছেলেদের মধ্যেকার সেন্টিমেন্টগুলো অন্তঃসলিলা।

ওরা সেগুলো প্রকাশ করতে লজ্জা পায় তাই অন্য আবরণে মুড়ে উপস্থাপিত করে।

মেজদাও যদি গেল, তাহলে আর আমিষের পাটেরই বা দরকার কি? রান্নাঘরকেই বা কী দরকার?, এমনি তো বিদায় দিতেও হতো।

ধুতি চাদরের সঙ্গে ন্যাড়া মাথা একরকম মানিয়ে যাচ্ছিল, বেঁটে জামাটামা পরতে শুরু করলো মেজদা এমন বিচ্ছিরী মত দেখতে লাগলো।

এতোদিন আর্শিতে মুখ দেখতেও তো ছিল না, এই প্রথম আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে মেজদা বললো, 'খুব বোকা বোকা দেখতে লাগছে, না রে বাচি?'

মেজদাকে আজ প্রথম একটু যেন হাসতে দেখলাম।

বললাম, 'সাংঘাতিক। তুই মেজদা বলে চেনাই যাচ্ছে না।'

মেজদা আর একটু হাসলো।

বললো এই তক্কে গেরুয়া ধরলে, মন্দ হত না 'কী বলিস?'

'তাই ধর। নদের নিমাই নদের নিমাই দেখাবে।'

এতোদিন পরে আজই প্রথম আমরা নিজস্ব ভঙ্গীতে সহজ কথা কইলাম।

ব্রেকফাস্টে চাই নেস্‌কাফে

কাজে ঠাসা সারাটা দিন
শুরু হবার আগের
আলস্য মধুর
কয়েকটা মুহূর্ত।
মোহ কিছুতেই কাটে না
কাটে না পছন্দসই
এক কাপ কফির আকর্ষণ।
নেস্‌কাফে—উষ্ণ,
প্রাণরসে ভরপুর।

ব্রেকফাস্টের জন্য
এমন চমৎকার পানীয়
সারা পৃথিবীতে আর নেই।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

ACIL—114

বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভারী ভারী, তবু বলতে ইচ্ছেও হলো।

এই কথার পিঠেই আমার এতোদিনের প্রশ্ন ব্যক্ত করলাম, আচ্ছা মেজদা—আমি না হয় দুঃখসুখ বুঝি না কিছু' দাদা তুই, তোরা তো বিদেশ জাহাজ, বল দিকি—একটা ভয়ানক দুঃখের ঘটনাকে উপলক্ষ করে এতো দড়াদড়ি, এমন নাগপাশের বন্ধন কেন?'

মেজদা বললো, 'ও বাবা। ওই সব মহা-মহিমময়ীদের কাজের বেনব উত্তর আমি দেব?'

শুধু তো মহিমাময়ীদেরই নয়, রীতিমত শাস্ত্রীয়ও তো। পুরুতমশাইও—'

মেজদা বললো 'বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় নেহাৎ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়, ওগুলো। একদা এসবের রীতিমতই প্রয়োজন ছিল। অবোধ লোকেরা রোগের সংক্রামকতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, স্বাস্থ্য রক্ষা হিসেবে উপদেশ দিলে গাহ্য করতো না, তাই এতো বিধি নিষেধ। এখন আর প্রয়োজন নেই তবু প্রথাটা ঘাড়ে চেপে বসে আছে।'

'তাহলে—তুই অতো নিখুঁৎ হচ্ছিলি কেন? তুই তো মানিস না।'

মেজদা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বললো, 'বাবাকে তো মানি।'

লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলাম।

মেজদার ওই স্নিগ্ধ শান্ত কথাটা যেন সমস্ত অনুভূতির ওপর ঘা মেরেই চললো।

বাবাকে তো মানি।

এতোদিন দিদি এবাড়িতে এসে কিছু-দিন থাকবার অনুমতি পেলো।

এক মাস থাকবে দিদি।

বিয়ের পর এই প্রথম। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সদ্বিবেচনা দেখিয়েছে। মার সেবা-যত্ন করবার জন্যে মেয়েকে পাঠিয়েছে।

বাবা নেই অথচ আমরা রয়েছি। এটা ভেবেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, তবু এ ভাবনাটি ছিল 'ভাল লাগা' জিনিসটা জীবন থেকে চিরতরে মুছে যাবে।

আর কোনোদিনই কিছু ভাল লাগবে না আমাদের। 'আনন্দ' শব্দটা মুছে গেল চিরতরে।

অন্ততঃ নিজের কথায় তাছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না।

মনে হচ্ছিল প্রাণ বলে জিনিসটা হারিয়ে গেলো। এখন শুধু বেঁচে থাকা মাত্র। হয়তো বাবা ঘুমোবে খাবে কর্মও সবই করে চলবো তবু তার মধ্যে প্রাণের সাড়া থাকবে না। থাকবে না ভাল লাগা থাকবে না আহ্লাদ।

কিন্তু কী লজ্জার কথা কটা দিনই বা গেছে, দেখছি দিদি এসে একমাস থাকবে শুনে আহ্লাদ আহ্লাদ ভাব সমস্ত প্রাণের মধ্যে একটি ভাল লাগার সুর বাজছে।

দিদির সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই অনেক মিল মনের মিল, কিন্তু প্রকৃতির দারুণ অমিল। এটা ছেলেবেলায় তত বুঝতাম না, এখন খুব বুঝি।

এই এখনকার কথাই ধরি—

বাবা চলে গেছেন, বাবা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছেন এই মর্মান্তিক সত্যটাকে, আমি কিছুতেই উচ্চারণ করে বলতে পারি না। বাবার নামটি পর্যন্ত না।

বাবার প্রসঙ্গ সন্তর্পণে এড়িয়ে চলি।

'বাবা' শব্দটা উচ্চারণ করতে গেলে ঠোঁট উঠে না—বোবা হয়েই। যেমন শরীরের কোনো একটা বিশেষ ব্যথা হওয়া জায়গায় হাত দেওয়া যায় না এও যেন তেমনি।

কিন্তু দিদির মুখে অনবরত বাবা বাবা।

'বাবা' নেই একথা এখনো যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।', হঠাৎ মনে হলো বাবা যেন চায়ের ঘর থেকে বেরোলেন বাবা পোস্তর বড়া খেতে কী ভালই বাসতেন। সন্ধ্যাবেলা জানলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল বাস্তায় এতো লোক অফিস থেকে ফিরছে, বাবাই শুধু আর ফিরবে না।"

কী করে যে বলে!

ওকথা কি আমারই মনে হয় না?

সন্ধ্যের সময় ছাতের আলসে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবি না কি ভগবান তোমার এই পৃথিবীতে এতো লোকের জায়গা হচ্ছে শুধু সেই মানুষটির আর জায়গা হল না? ওই যারা আসছে দিনের শেষে কাজ শেষ করে হাতে সংসারের জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে, তাদের সঙ্গে হঠাৎ বাবাকে দেখা যায় না?

কী লাভ হলো তোমার ভগবান তাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে চলে গিয়ে?

কিন্তু সেকথা কি বলি?

বলবার কথা?

দিদি বলে।

আমার কাছে বিশেষ সাড়া পায় না বলে, মার কাছে বলতে বসে।

কাণ্ডনতলায় বাবার সেই সদা পরিষ্কার মূর্তি তোমার মনে আছে মা? শরীরটা কী রকম সেরেছিল?..'

দিদিতে নটা বাজলেই প্রাণটা ছাঁৎ করে ওঠে মনে হয় বাবার খাবার জায়গা করা হলো না। বাবার চটি জোড়াটায় ধুলো পড়ছে ঝেড়ে রাখতে হবে' এটা ছাড়া তা হোক ওটাতেই যেন বেশী করে বাবার পা দুটি মাখানো—'

মার গলাও শোনা যায় কিছু কিছু একদিন হঠাৎ শুনলাম কিচির মিচির যে কি বুঝতে পারি না। এই শুধু মনের মধ্যে একথা জানে আর কথা নেই আর কর মুখে একদিনের জন্যে নামটুকুও উচ্চারণ করতে শুনি না।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

মনে হলো, এই ভাবেই একে অপরের প্রকৃতি বিচার করে। চরিত্র বিশ্লেষণ করে।

কিন্তু উপায় কী?

মার চোখে স্বাভাবিক হবার জন্যে তো আর আমি বাবার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে বসবো না।

আমি যে বাবার ব্যবহারের ছোট ছোট জিনিসগুলি চশমার খাপ পানের কৌটো, টুপি পরানো পেন্সিল, 'দৈনিক হিসেবের খাতা' এই সব কুড়িয়ে কুড়িয়ে ঝেড়ে মুছে তুলে রেখে দিয়েছি, সে কথা কি আমি কাউকে বলতে যাবো?

বাখি, আবার ভাবি, এই ছোট্ট ছোট্ট স্মৃতির টুকরোগুলিতে এতো মূল্যবোধ কেন? এই টুকরোগুলোর মধ্যেই কি বাবার স্মৃতি বেঁচে থাকবে? তা নইলে নয়?

তখনই হঠাৎ একদিন খাতায় লিখে ছিলাম স্মৃতির কণিকা জমায়ে কী লাভ?'

বোঝা সে বাড়ানো খালি।
অসীম সাগর স্মরণে রাখিতে
কুড়ায়ে রাখিবে কালি?'

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

কবিতা লেখা হচ্ছে না। লিখতে পারছি না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কলম নিয়ে বসি, গদ্যই লিখি কিছু। উৎসাহ পাই না।

একদিন দুপুরে দিদির সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে চমকে উঠলাম।

আচ্ছা, দিদির সেই শাড়িটা।
আনন্দর পাঠানো?

সেটাতো দিদিকে দেওয়া হয়নি, দেখানোও হয়নি।

বললাম 'দিদি যোস। তোকে একটা জিনিস দেখাই—'

মার কাছে গিয়ে বললাম।
অসুখে সাবধানে।

বাবা ওই শাড়িটার সঙ্গেই যেন বাবার মৃত্যু জড়িত।

মা বলেন সেই—'কাল' জিনিসটা? সে আর সুনীতি দিয়ে কী হবে?'

আমি বললাম 'শাড়ির আঁচল কাল করলে কী মা? দিদির জিনিস দিদিকে দিতে হবে না?'

নিয়ে এলাম।

দিদির সামনে মেলে ধরলাম।
দিদি তটস্থ হয়ে বললো 'কী এ?'

'আমার বিয়ের প্রয়োজনীয়। সেই ভুল বিয়ে ভুলোকের প্রেরিত।'

(ক্রমশঃ)

মনের খবর

মানসিক রোগ—(৩)

মনের রোগ বংশগত ও প্রতিবেশ (এনভায়রনমেন্ট) —এই দুই কারণেই হতে পারে একথা বলা হয়েছে। বংশগত ছাড়াও দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি অথবা কোনও রোগ-বীজাণু বা বিশেষ কোনও ওষুধ কেমিক্যাল বস্তু ইত্যাদি নানা দ্রব্যের বিষক্রিয়ার ফলে যে পরিবর্তন হয় তার প্রতিক্রিয়া পরিণামেও মানসিক রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক রোগেও নানা রকম মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়। খুব খুঁতে স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে সাধারণ পরিচিত মন্তব্য করে থাকে 'লিভারের দোষ আছে', 'বাবামেসে পেটরোগা' পিত্তিপটে ত হবেই, বাব মার কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভোগে' ইত্যাদি। বার বার শরীরের গ্লানি ভোগ করতে থাকলে অথবা লোকে মনের স্বাভাবিক উৎসাহ, কর্মতৎপরতা, আনন্দ ভোগ করবার ক্ষমতা, সুখকর কল্পনা করা, ইত্যাদির ক্ষমতা কমে আসতে থাকে।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও দেখা যায়, মায়ের ছোট থেকে বেশী ভোগে সাধারণত তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় বেশী বায়না-কাটি করে, আবদে বেশী হয়, তাদের বায়নার আর শেষ থাকে না। বেশী দিন ধরে এমন চলতে থাকলে সন্তানের মানসিক গঠনের কিছু কিছু অস্বাভাবিকতা থেকে যেতে পারে। বড় হয়েও অনেকের মেজাজ একটুতেই খারাপ হয়ে যাওয়া, প্রাত্যহিক জীবনে একটা বিরক্তির বেশ ঢেউ চলা প্রভৃতি নানা রকমের প্রকৃতিগত অস্বাভাবিক মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ই এর মূলে শৈশবে বা পরেও শরীরের কোনও দীর্ঘস্থায়ী গ্লানি ভোগের সন্ধান পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বাড়লে রোগীর যে প্রলাপ বকার কথা বলা হয়েছে তাও মূলত এই দৈহিক ব্যাধির ফলেই ঘটে অবশ্য এ ক্ষেত্রে জ্বর কমে গেলে প্রলাপও বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই জাতীয় বীজাণুর বিষক্রিয়া দেহে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু যে রোগী ঘন ঘন ম্যালেরিয়াতে ভোগে তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, উৎসাহ কমে যায় ইত্যাদি অনেক মানসিক লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এছাড়া এমন ব্যাধিও আছে যার বিষক্রিয়া শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আর তা দীর্ঘস্থায়ীও হয়। যেমন সিফিলিস বা গণোরিয়া প্রভৃতি রোগে মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। এ থেকে, সিফিলিস ব্যাধির পরিণামে পক্ষাঘাত বাতুলতা (জেনারেল প্যারালিসিস অব দি ইনসেন সংক্ষেপে একে জি পি আই বলা হয়) নামক মানসিক রোগ হতে দেখা যায়। এই রোগে যেমন দেহে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা যায় তেমনই মানসিক নানা রকমের বাতুলতা সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়। বেশী বাড়তে দিলে এই রোগ দুরারোগ্য হয়ে পড়ে।

মস্তিষ্ক বা দেহের অন্যান্য প্রধান প্রধান দেহযন্ত্রের বিকল অবস্থা বেশি দিন স্থায়ী হলেও মানসিক রোগ দেখা দিতে পারে। দেহের কোনও ইন্দ্রিয় দুর্বল বা আংশিক অক্ষম হয়ে পড়লেও তার মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু একই অবস্থায় যে সকলের একই মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা নয়। কার কত পরিমাণ কোন ইন্দ্রিয় বা দেহাংশের ক্ষতি হলে কি রকমের কতখানি মানসিক রোগ লক্ষণ অথবা অস্বাভাবিকতা না হোক অন্ততঃ রোগীর মানসিক পরিবর্তন দেখা দেবে তা নিশ্চিত সম্বন্ধে ভাল করে না জানা থাকলে আগে থেকে বলা যায় না। মনের গঠনের উপর এই প্রতিক্রিয়ার রকম ও ক্ষীণতা নির্ভর করে। বসন্ত রোগে বা অন্য রোগে অথবা কোনও দুর্ঘটনায় যাদের একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়, কোনও কারণে হাত পা ভেঙে বা নষ্ট হয়ে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে যায় তাদের মনের এই কারণে অনেক রকম পরিবর্তন ঘটে যায়। যেমন কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই পরিবর্তন মানসিক রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়। সকলেরই তা হবেই এমন নয়। এখানেও কারণস্বরূপ ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপর এই পরিণতি নির্ভর করে। ব্যক্তির অহম্ কতখানি চাপসহ হয়ে গড়ে উঠেছে, বাস্তব অবস্থাকে কতখানি মেনে নেবার ক্ষমতা তাহম্ অর্জন করেছে ইত্যাদি নানা কারণের (নার্সিসিজম) বেড়াজাল থেকে অহম্ কতটা নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ইত্যাদি নানা কারণোৎপাদকের (ফ্যাকটর) উপর কোন আঘাত পেলে মনের কি পরিণতি ঘটবে তা নির্ভর করে।

সমাজে যেসব নেশার চলন আছে, তাদের মধ্যে মদ, আফিম, গাঁজা, ভাং চণ্ড চরস প্রভৃতি নানা নেশার ফলেও মানসিক রোগ হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে কতগুলি এমন আছে যার প্রভাব বংশগত ভাবে প্রসারিত হতে দেখা যায়। মনঃসমীক্ষণে একটা প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়—প্রশ্নটা এই—তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল? তাদের বলি—তেল পড়ে ধপ করে—না ধপ করে তাল পড়ে। নেশা করার বিষয়েও এইরকম প্রশ্ন উঠেছে। মানসিক রোগ কি ঐ সব নেশার ফলে হয় নাকি মানসিক রোগ হলে অন্তত মানসিক কারণেই মানুষ নেশা করে? বিচার করলে দেখা যায় মনের বিশেষ অবস্থার জন্যই নেশা করার দরকার মনে জাগে। মনের সেই বিশেষ অবস্থাকে খুব স্বাভাবিক বলা চলে না। যদিও এ সে অবস্থাটা কম বেশী সকলের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় তবু সকলে সেই অবস্থার মোকাবিলা করতে নেশার আশ্রয় গ্রহণ করে না। এখানেও মানসিক গঠনের প্রশ্ন এসে পড়ে। দুর্বল অহম্ তেমন অবস্থাকে মোজাসুজি আয়ত্তে আনতে না পেরে নেশার সহায়তায় তেমন অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে তৎপর হয়। ক্রমে সেই মাদকদ্রব্য তাকে পেয়ে বসে, তখন আর তার হাত থেকে রেহাই পাবার পথ অহম্ খুঁজে পায় না। সে নেশার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেয়, এমন কি ডুবিয়েও দেয়। অনেকের পান, জর্দা, সুপারী দোক্তা ইত্যাদি খাওয়া সিগারেট, বিড়ি, তামাক সেবন করা নস্যি নেওয়া চা কফি পান করার মধ্যেও মনের ঐ নেশা করার ইচ্ছাই প্রকাশ পায়। সমাজের চলন হিসেবে কতকগুলিকে আমরা নেশা বলি আবার কতকগুলিকে সে পর্যায়ে না ফেলে সাধারণ অভ্যাস মনে করে তাদের দিকে আর নজর দিয়ে দেখি না। আসলে এগুলি সবই নেশা। এছাড়াও আরও অনেক রকমের নেশা আছে। তার মধ্যে আজকাল এল এস ডি, ম্যারিজুয়ানা নানা রকমের বাংলা চিউবেট প্রেনার ওষুধ এবং অন্যান্য ঘুমের

ওষুধের ব্যবহার খুব বেড়ে গিয়েছে। যাদের হিপ্পি বলা হয় সেই বিদেশের অমদানি, ঢেউয়ের কল্যাণে বহু মাদকদ্রব্যের প্রচলন আমাদের দেশের যুবসমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক বা মানসিক কোনও দিকের বিচারে এর পরিণাম শুভ নয়। মার্কিন দেশের পশ্চিম উপকূলের দেশগুলিতে এই শ্রেণীর প্রভাবের ফলে সেখানের যুবসমাজে নানা রকমের সংক্রামক ব্যাধি ও অপরাধ প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কতকগুলি নেশার প্রভাবে মানুষের সংযম, নীতিজ্ঞান ক্ষুণ্ণ হয়ে গিয়ে তাদের আত্মঘাতি যৌনবৃত্তি ও অপরাধ প্রবণতাকে উদ্দীপিত করে তোলে। তার ফল দাঁড়ায় সমাজের নানা রকমের অনাচার, বিশৃঙ্খলা, চুরি, খুন-জখম, যৌন ব্যভিচার ও শারীরিক ব্যাধি ইত্যাদির বৃদ্ধি। সমাজ ও ব্যক্তির মানসিক অবনতি ও ব্যাধির সৃষ্টি হতে থাকে। প্রয়োজন মত এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এখনকার মত এই সামান্য উল্লেখটুকুই থাকুক।

কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম করবার শক্তি সকলের সমান থাকে না। এই সীমা, যাকে ব্যক্তির সহন-সীমা বলা যায়, পেরিয়ে যখন শ্রম করতে হয়, আরও বেশী করে চাপ সইতে হয়, এবং যখন সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায় তখনও কিছু কিছু মানসিক রোগ-লক্ষণ, যেমন উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, অনাসক্তি, বিষাদ এমন কি আরও কোনো গুরুতর মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। মনের গঠন যদি স্বাভাবিক হয় তবে অতিরিক্ত শ্রম করলে ক্লান্তি আসবে ঠিকই, কিন্তু উপযুক্ত বিশ্রাম নিলেই সে ক্লান্তি দূর হয়ে যায়, অথচ কোনও মানসিক রোগ লক্ষণ দেখা দেয় না। তা হলেও অতিমাত্রায় ক্লান্তি যদি নিয়মিতই হতে থাকে তবে এক সময় মনের সেই সহনসীমা অতিক্রম করে যাবার ফলে রোগ-লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সহনসীমা বলতে কেবল একক্ষণের মাত্রা বোঝায় না। একদিন দু দিন না দশ দিন যে অতি শ্রম মাত্রাতিরিক্ত হলেও মন সয়ে নিতে পারে সেই মাত্রার শ্রম কষ্ট ইত্যাদি যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তবে তা সহনসীমার বাইরে চলে যেতে পারে। আর তখনই মানসিক রোগ-লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। কাজের পরিমাণ সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, কাজের প্রতিবেশ সম্বন্ধেও তা তেমনই সত্য। মাটির গভীর গহ্বরে খনিতে যারা কাজ করে তাদের মানসিক অবস্থা বিচার না করে খনিতে নামিয়ে দিলে কিছু কিছু কর্মী ঐ মাটির অনেক নীচে ঐ গহ্বরের অন্ধকারে গুমোট কাজ করার প্রতিবেশ সহ্য করতে পারে না বলে তাদের মানসিক অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। উঁচু পাহাড়ে ওঠা, সমুদ্রে যাওয়া, উড়োজাহাজে চলা, প্রভৃতি বহু প্রতিবেশ আছে যেখানে সকলে তাদের মানসিক স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারে না।—উৎকণ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করার সঙ্গে এই বিষয় আরও বলা যাবে।

অতি পরিশ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা থেকে একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে শারীরিক কারণে যে ক্লান্তি আসে তা বিশ্রাম করলেই দূর হয়ে যায়—আর এই পরিশ্রমের জন্য মানসিক কোনও অসুস্থ লক্ষণ দেখা দেয় না। এখানে বলা দরকার যে অনেক সময়ই মানসিক প্রক্ষোভের (ইমোশান) জন্যই ক্লান্তি অবসাদ ইত্যাদি দেখা দেয়। অর্থাৎ ঐ রকম প্রক্ষোভ যদি না প্রভাবিত করত তবে দেহ আরও অনেক পরিশ্রম করতে পারত। কথাটা তবে এই দাঁড়াচ্ছে যে আমাদের পরিশ্রমের ক্লান্তিটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক (প্রক্ষোভের ক্রিয়াতে), শারীরিক নয়। মনে করা যাক, মাঠে গরুর পেছনে দৌড়াদৌড়ি করার ফলে 'আর চলতে পারব না' বলে কেউ যদি মাঠে শুয়ে পড়ে আর তখন যদি সে দেখতে পায় একটা সাপ তার দিকে তেড়ে আসছে, সে অবস্থায় সে কি আবার উঠে প্রাণের ভয়ে দৌড় দেবে না? এক্ষেত্রে তার ঐ 'আর পারি না' বলে শুয়ে পড়াটা শুধুমাত্র কায়িক পরিশ্রমের ফলে হয়নি, গরুর পেছনে দৌড়ে দৌড়ে সেটাকে ধরতে না পেরে যে ব্যর্থতার বোধ জেগেছে তাতেই ক্লান্তিটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু একজনকে দৌড় করাতে করাতে যদি তার শরীরের শক্তির (দৌড়বার শৈহিক ক্ষমতার) সবটুকু খরচ করে ফেলা হয় আর যদি সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন সাপ তেড়ে এলেও সে কি আর উঠে দৌড়তে পারবে? আসলে কথাটা হল—আমাদের শরীরের শক্তি নিঃশেষিত হবার অনেক আগেই মন থেকে বলে—স্বভাব দিয়ে বলে। কারণটা সেখানে মানসিক (প্রক্ষোভের) শারীরিক নয়। শারীরিক ক্লান্তি বলে কিছু নেই এ-কথা বলছি না। বলতে চেয়েছি শরীরের ক্লান্তি আসবার আগেই আমাদের যে ক্লান্তি বোধ জাগে তার কারণ মানসিক। অধিকাংশ সময় এই মানসিক ক্লান্তির ফলেই মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

মানসিক রোগ উৎপন্ন হবার কারণ হিসেবে কতকগুলি সামাজিক ও মানসিক অবস্থাকে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু বারে-বারেই বলে নিতে হচ্ছে যে সামাজিক কারণ যাই থাকুক না কেন সে কারণ এমন কিছু থাকে না—যার ফলে সকলেই মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এক-এক রকম প্রতিবেশের ফলে এক-এক মানসিক অবস্থার মানুষ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। প্রকৃত সাধু সিদ্ধ পুরুষদের কথা জানি না। সাধারণ মানুষের সহনের একটা ব্যক্তিগত সীমা আছে। অবস্থা তার বেশী কঠোর হলে তা অসহনীয় হয় আর তখন মানসিক বিকার দেখা দেয়। কল্পনা করা যেতে পারে, সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন কঠোর অবস্থা হল যাতে সকলেরই মানসিক বিকার কম বেশী দেখা দেবেই। কিন্তু বাস্তব জীবনে তেমন অবস্থা খুব কমই ঘটে। এমন কি ঘটেই না বলা যায়। মানসিক প্রতিক্রিয়া আর মানসিক বিকার এক অবস্থা নয়। মানসিক বিকারও মানসিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু সকল মানসিক প্রতিক্রিয়াই মানসিক বিকার বা রোগলক্ষণ বলা যায় না।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই মানসিক রোগের প্রবণতা কিছু আছে কিনা তা দেখার চেষ্টা কিছু হয়েছে। কিন্তু সে অনুসন্ধান খুব ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে করা যায় না। মোটামুটি রকমের কাজ যা কিছু হয়েছে তা থেকে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতি বা মানবগোষ্ঠীর যে ধারণা বিশ্বাস ইত্যাদি আছে আর তাদের ভিন্ন রকমের জীবনধারা যা গড়েছে তার ফলে এক-এক মানবজাতির মধ্যে এক এক ধরনের মানসিক রোগের প্রবণতা কিছু বেশী দেখতে পাওয়া যায়। সমাজ ধর্ম ইত্যাদিও নানা রকমের ভ্রম সৃষ্টি করে। আবার মানসিক ভ্রমের পরিণামে বিশ্বাস, ধর্মমতও গড়ে ওঠে। একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন রকমের মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এর কারণ দেখতে গেলে সুরাপান ইত্যাদি নেশার প্রভাব, সিফিলিস, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের পরিণাম ও সামাজিক এবং ধর্মীয় বিশেষ নিয়ম কানুনের জন্য, নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহনিয়ম প্রচলিত থাকা ইত্যাদি বহু কারণ পাওয়া যায়। সে সব বিষয় ভাল করে বিচার না করে প্রকৃত কি কারণে এক জাতি থেকে অন্য জাতের মধ্যে বিশেষ মানসিক রোগ বেশী দেখতে পাওয়া যায় বা এক দেশে এক-এক রকমের মানসিক রোগ কেন বেশী দেখতে পাওয়া যায় তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে এই রকমের বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব এক এক দেশে দেখতে পাওয়া যায়, এইটুকুই মাত্র এখানে বলে রাখা যেতে পারে।

বয়সের হিসেবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যৌবনারম্ভের কাছাকাছি সময় থেকে অর্থাৎ মোটামুটি ১৫।১৬ বছর বয়স থেকে ৩০।৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই মানসিক রোগীর সংখ্যা বেশী। অর্থাৎ এই বয়সের লোকদের মধ্যেই মানসিক রোগ প্রথম প্রকাশ পায়। এই রোগ কারো কারো ক্রমে বেড়ে যায়, সারা জীবন ধরে চলতে থাকে। আবার কারো কারো রোগ বয়স বাড়লে প্রকোপ কিছু কমে। কিন্তু বয়সের জন্য রোগমুক্ত হতে বড় দেখা যায় না। সাধারণত বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মনের অবদমনের (রিপ্রেশান) ও উদ্গতির (সাবলিমেশান) ক্ষমতা কমে আসতে থাকে। মানসিক রোগের প্রকোপ তখন বেড়েই যায়। বয়স খুব বেশী হলে সব শক্তিই শিথিল হয়ে আসে। তখন মানসিক রোগ থাকলেও তা নিয়ে বাইরের হৈ-চৈ কমে আসে। সে অবস্থাকে রোগ কমে যাচ্ছে বলা যাবে না। বয়সের চাপে স্তিমিত হয়ে এসেছে এইটুকু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। অবশ্য কতগুলি মানসিক রোগ আছে যা প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরিয়ে একটু বেশী বয়সেই দেখা দেয়, অপেক্ষাকৃত কম বয়সে দেখা যায় না।

সামাজিক কারণগুলির সম্বন্ধে পরের পর আলোচনা করব।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস, দু-লক্ষ গুণে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক পৃথক ভগিকার ধারে ধারে দাঁতের মতো উদ্গত অংশ লক্ষণীয়। এই উদ্গত অংশেই থাকে প্রোটিন অণু, যা অ্যান্টিজেনরূপে ক্রিয়াশীল। আর মানুষের শরীরে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি এই উদ্গত অংশের গায়ে লেগে থাকে।

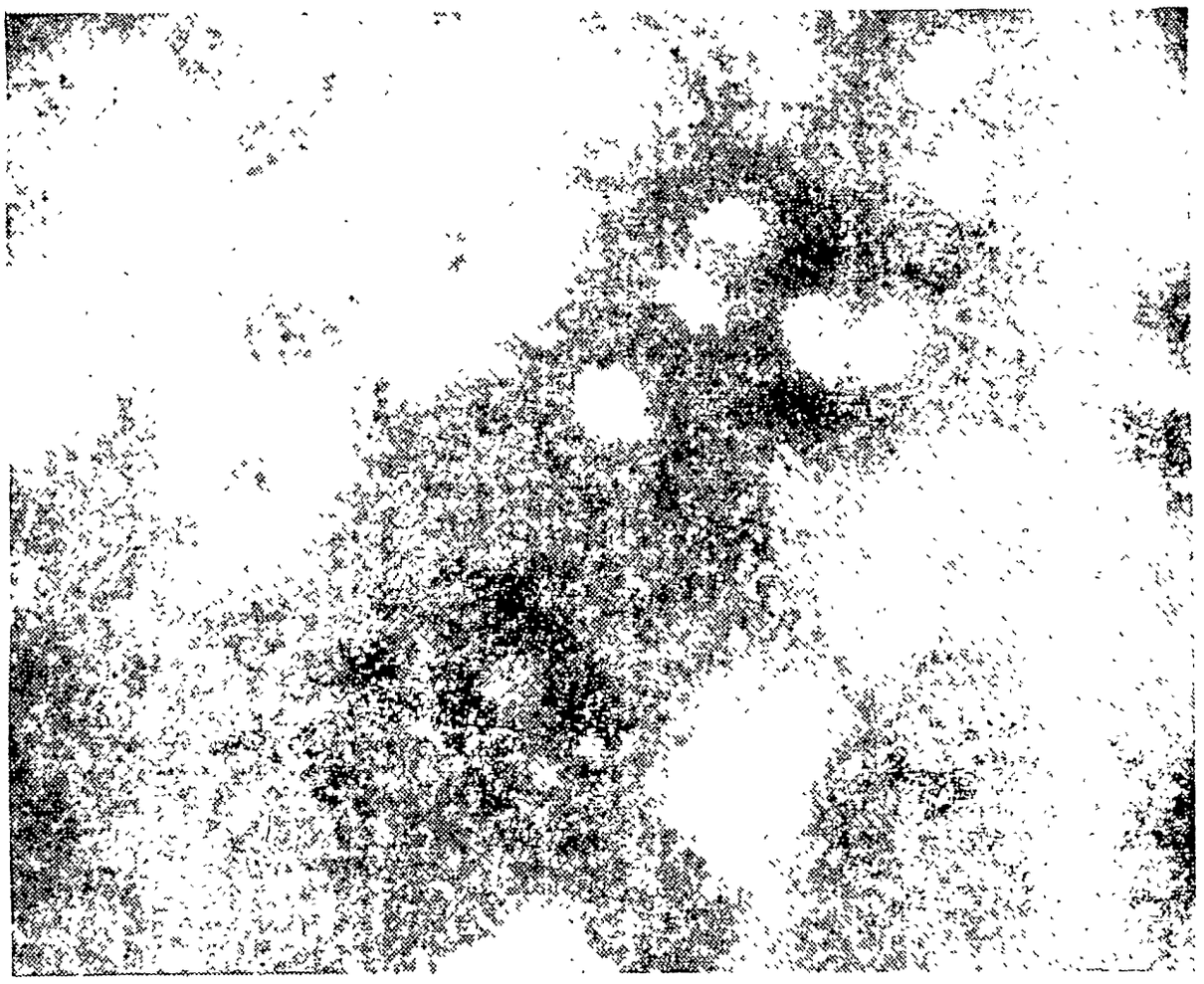

বিজ্ঞানের কথা

*ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধক

*শহরের গোলমাল

আমাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগটিকে তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না। অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েও দিব্যি ঘুরে বেড়ান (এবং তার ফলে অবশ্যই আরও দশজনের মধ্যে রোগটি ছড়িয়ে থাকেন) এবং খারাপ দিকে না যাওয়া পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে যান না।

কিন্তু রোগটি মোটেই এতটা তুচ্ছ করার মতো নয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা এখনো পর্যন্ত এমন এক রোগ হিসেবে গণ্য, যাতে রোগীর মারা যাওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। এতীতে বহু দেশে বহুবার ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। একমাত্র ব্রিটেনেই ১৯৬৮ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রাণহানি ঘটেছে ৫,০০০ জনের, পরের বছর তার দ্বিগুণ সংখ্যকের। এ ছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যে আপিসে কারখানায় অনুপস্থিতির দরুন অর্থনৈতিক ক্ষতির কিছুটা বিপদস্থ হয়নি এমন দেশ পৃথিবীতে কম।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে চিকিৎসা করার জন্যে ঠিকমতো ওষুধ বার করার চেষ্টা পৃথিবী জুড়ে চলেছে। ঠিক ওষুধটি পাওয়া গিয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। তবে ইনফ্লুয়েঞ্জার বিরুদ্ধে যা ওষুধ প্রধানত এখন চলছে তা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে, যাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়াটা বন্ধ হয়। ওষুধ নয়, টিকা। একবার টিকা নিলে সাধারণত নির্দিষ্ট রোগটিকে নিশ্চিতভাবে ঠেকিয়ে রাখা চলে। তবে এক্ষেত্রেও কিছু ভুল। ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে নানা ধরনের ঠিক যে বিশেষ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী রূপে দেখা দেবার সম্ভাবনা, টিকা হতে চাই সেই বিশেষ ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিরুদ্ধে কাজ করার উপযোগী।

এই কারণে বিশ্বের নানা দেশের স্বাস্থ্য সংগঠন স্থাপন করেছেন বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা

মুরগির ডিমের ভিতরে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের চাষ। উর্বর মুরগির ডিমের বাইরের পর্দায় সুঁই দিয়ে ভাইরাস প্রবিষ্ট করানো হয়। সেখানে তা সংখ্যায় বেড়ে চলে। পরে সংগৃহীত হয় এবং এমনভাবে তাকে হত্যা করা হয় যাতে ভাইরাসের রোগ বাধা-বার ক্ষমতা থাকে না কিন্তু তার অ্যান্টিজেনের গড়নটি বজায় থাকে। এই হতশক্তি ভাইরাস থেকেই তৈরি হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা।

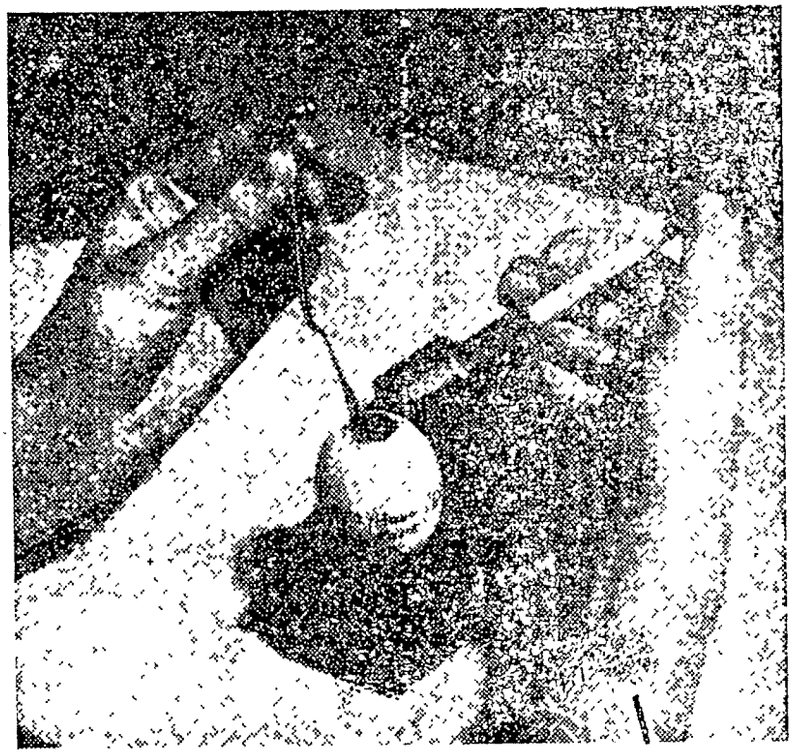

কেন্দ্র, সদরদপ্তর লণ্ডনে। আমেরিকা ছাড়া গোটা বিশ্বের ইনফ্লুয়েঞ্জা সমস্যা নিয়ে এই কেন্দ্রে গবেষণা চলে। অনুরূপ একটি কেন্দ্র আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার জন্য।

লণ্ডনের কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন স্থায়ী কয়েকজন গবেষক। বিশ্বের বহু দেশ থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের নমুনা এসে পৌঁছয় এখানে। গবেষকরা তখন পরীক্ষা করে দেখেন, নমুনার ভাইরাসের সঙ্গে পরিচয় আগে ঘটেছে কি ঘটেনি। যদি দেখা যায় ভাইরাসটি একেবারে নতুন ধরনের তাহলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে (নমুনার অল্প পরিমাণ ভাইরাস থেকেই) বিশ্ব টিকা উৎপাদনকারীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টিকা উৎপাদনকারীরা তখন সেই ভাইরাস থেকে টিকা তৈরি করেন। তারপরে ব্যাপকভাবে সেই টিকার ইনজেকশন দিয়ে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমাদের দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দেবার ব্যবস্থা কোথাও আছে কিনা আমি জানি না, কিন্তু ব্রিটেনের খবরে দেখা যাচ্ছে—সেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীর আশঙ্কা দেখা দিলে ত্রিশ লক্ষ মানুষের টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। 'আশঙ্কা' শব্দটি লক্ষ্য করতে বলছি—মহামারী শুরু হয়ে যাবার পরে নয়, তার আশঙ্কা দেখা দিলেই।

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি

ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা দিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয় কোন কায়দায় তা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

শরীরের মধ্যে কোনো বস্তু প্রবিষ্ট হয়েছে অথচ শরীরের টিসুতে তা গ্রাহ্য হচ্ছে না বাইরাগতই থেকে যাচ্ছে—এমন বস্তুকে বলা হয় অ্যান্টিজেন। আর এই অ্যান্টিজেনকে খতম করবার জন্যে শরীরের মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের প্রোটিন, যার নাম অ্যান্টিবডি। অর্থাৎ, অ্যান্টিজেন উপস্থিত হলে অ্যান্টিবডিও প্রস্তুত। ভাইরাস কী? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একজাতীয় কণিকা যা রোগবহন করে। জীবের ও উদ্ভিদের শরীর গঠিত হয় যে জীবকোষ দিয়ে তার চেয়ে ভাইরাস অনেক সরল বটে কিন্তু একেবারে জটিলতাবর্জিতও নয়। যেমন, ভাইরাস হতে পারে নানা ধরনের, আবার একই ভাইরাস থেকে ঈষৎ ভিন্ন ভাইরাস সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। এই ভিন্নতা-প্রাপ্ত ভাইরাসও সমান বিপজ্জনক।

ভাইরাস যে-ধরনেরই হোক (অর্থাৎ তার দরুন রোগের আক্রমণ সামান্য বা মারাত্মক যাই হোক), শরীরের ভিতরে তা কিছুতেই গ্রাহ্য হবে না। অতএব ভাইরাস হচ্ছে অ্যান্টিজেন। আসলে কিন্তু অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করে ভাইরাসের দু-জাতীয় প্রোটিন-অণু। এই অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর জন্যে শরীরের মধ্যে তৈরি হয় যে অ্যান্টিবডি—তাও প্রোটনের অণু। এই অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের গায়ের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে থাকে যে অ্যান্টিজেনের সংখ্যা বাড়তে পারে না। ফলে আক্রমণকারী ভাইরাস কাবু হয়ে পড়ে। তার মানেই রোগ দূর হওয়া।

বাস্তবে কিন্তু রোগ দূর হওয়াটা সহজ ব্যাপার নয়। মনে করা যাক বিশেষ একটি শরীরে ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাসের আক্রমণ ঘটেছে। এই ভাইরাস অবশ্যই বিশেষ ধরনের, এবং তারই ওপরে নির্ভর করে অ্যান্টিজেনেরও ধরন। সহজে বোঝা যায় অ্যান্টিবডিও তৈরি হয় এই প্রাথমিক অবস্থার অ্যান্টিজেনকে কাবু করার উপযোগী-রূপে। অথচ ভাইরাস একই রকম নাও থাকতে পারে। ভাইরাস হতে পারে ঈষৎ ভিন্নতাপ্রাপ্ত, হয়ে থাকে, হচ্ছেও। তখন অ্যান্টিজেনের ধরনও বদলে যায়। কিন্তু অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আছে রোগের সেই প্রাথমিক অবস্থার সময়কার। পরিবর্তিত অ্যান্টিজেনকে কাবু করার ক্ষমতা এই অ্যান্টিজেনের নাও থাকতে পারে। সমস্যাটা এখানেই।

বিশ্ব ইনফ্লুয়েঞ্জা কেন্দ্রের কাজকর্মের একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে ভাইরাস অনুযায়ী অ্যান্টিজেন নির্ণয়ের ব্যাপার। নমুনা হিসাবে পাওয়া ভাইরাসকে ক্রিয়াশীল

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এম পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রঙ্গচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৪৩, সুরেন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকযোগে প্রেরিত হয়

শ্যামা স্টোর্স
বেনারসী • সিল্ক • তাঁত
মিল বস্ত্র • গোষ্বাক
হোসিয়ারী
৪৫/৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া

করানো হয় বিশেষ অ্যান্টিবডি যুক্ত রক্তের সিরামের সঙ্গে। এমনিভাবে অ্যান্টিজেন নির্ণীত হয়।

ভাইরাসের ধরন যদি পূর্বপরিচিত হয় তাহলে জানা সিরামের সাহায্যের তাকে কাবু করা যেতে পারে। কিন্তু এমন যদি হয় যে তার অ্যান্টিজেন পৃথক ধরনের তাহলে জানা কোনো সিরামের সাহায্যে তাকে কাবু করা সম্ভব নাও হতে পারে। অর্থাৎ, এই নতুন ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার আয়োজনটি আর পাওয়া যায় না, রোগ তখন মহামারীর চেহারা নেয়। এমনও হতে পারে, এই নতুন ধরনের ভাইরাস থেকে সৃষ্ট রোগটি তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু সেটা অন্য কথা। এখানে দেখার বিষয় ভাইরাস এমন একটা চেহারা নিয়েছে যাকে কাবু করার মতো অ্যান্টিবডির হদিশ জানা নেই, ফলে রোগ মহামারির আকার নিতে পারে।

জাগ-দমনের উপায়—

এক্ষেত্রে সম্ভাব্য মহামারী ঠেকাবার জন্যে অবশ্যই অন্য উপায় অবলম্বন করতে হয়। সেটা কী?

আগে থেকে জানা এমন কোনো ভাইরাস যদি থাকে যার অ্যান্টিজেনের গড়নটি এই অ্যান্টিজেনের মতোই, তাহলে একটা উপায় হতে পারে। দুটি পথ আছে। এক, আগে থেকে জানা ভাইরাসকে এমনভাবে হত্যা করতে হবে যাতে তার রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকে কিন্তু তার অ্যান্টিজেনের গড়নটি বজায় থেকে যায়। এই নিহত ভাইরাস থেকে তৈরী টিকা শরীরে প্রবিষ্ট করলে সেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে লড়াই করার উপযোগী অ্যান্টিবডি শরীরের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। অতঃপর জীবন্ত ভাইরাসের আক্রমণ যদি ঘটেও তাহলে এই মজুদ অ্যান্টিবডি তা প্রতিহত করতে পারে। দুই, নতুন ভাইরাসকে যুক্ত করা হোক এমন একটি জানা ভাইরাসের সঙ্গে যেটি কিছুমাত্র মারাত্মক নয়। ফলে উদ্ভূত হয় একটি হাইব্রিড বা সঙ্কর ভাইরাস যা শরীরের পক্ষে অ-ক্ষতিকর। কিন্তু তার দরুন শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ঠিকই এবং এই অ্যান্টিবডি নতুন ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। টিকা তৈরির জন্যে এই সঙ্কর ভাইরাসকে জীবন্ত অবস্থাতেই ব্যবহার করা চলে। কেননা, এই সঙ্কর ভাইরাস শরীরের কোনো ক্ষতি করে না, যতোই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হোক।

পূর্বাভাস কি সম্ভব?

প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট ঘোষণা করেছেন, আগামী কয়েক বছরে ইনফ্লুয়েঞ্জার নতুন কী ভাইরাস দেখা দিতে পারে তাও আগে থেকে জানা সম্ভব। তাহলে আগে থেকেই টিকা করে নিয়ে ভবিষ্যতের সেই সম্ভাব্য রোগকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা হতে পারে। কেমন করে আগে থেকে জানা যাবে? পাস্তুর ইনস্টিটিউট বলছেন, ভাইরাসের অ্যান্টিজেনের গড়ন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে বদলায় তা জানা দরকার। তা থেকেই ধারণা করা যাবে আগামী কয়েক বছরে আরো কিভাবে বদলাবে। ফলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুতি সম্ভব।

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের এই ঘোষণা সবাই মেনে নিতে পারেন নি। তাহলেও এ-বিষয়ে সবাই একমত যে আগে থেকে একটা পরিকল্পনা করে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকা চলে, যাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দেওয়া মাত্রই ব্যাপক টিকা দেবার ব্যবস্থা হতে পারে ও রোগ ছড়িয়ে না পড়ে।

(ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রতিষেধক সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য নেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ বিজ্ঞান বিষয়ক বুলেটিন 'স্পেকট্রাম' থেকে। পাঠকদের কাছে বিষয়টি হয়তো কিছুটা দুরূহ মনে হতে পারে কিন্তু তাঁরা এই ধারণাটুকু নিশ্চয়ই করতে পারবেন যে পশ্চিমের দেশগুলিতে এমন কি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিরুদ্ধে কতখানি আয়োজন ও তৎপরতা। স্বভাবতই আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। কোথায় আছি আমরা? পাঠকরা নিশ্চয়ই আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা নয়, তার চেয়েও অনেক মারাত্মক ও ভয়াবহ একটি রোগ—নাম শোনা যাচ্ছে এনকেফেলাইটিস—কিভাবে জেলা থেকে জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে ও প্রাণ হনন করছে। যেখানে জরুরি অবস্থার ভিত্তিতে গোটা দেশের খাড়া হয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল সেখানে কিছু বিবৃতি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। অন্ততপক্ষে, মশা মারবার যে আয়োজন আছে বলে শোনা যায় সেটিরও যদি কিছু তৎপরতা দেখা যেত! তবে আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে, সরকারের একজনের হলেই যে সকলের হবে, এমন কোনো কথা নেই। কলকাতার কর্পোরেশনারদের ধন্যবাদ, তাঁদের চাবুক পড়েছে। তবে চৈতন্যোদয় হবে কবে! জেলাগুলির কথা বাদ দেওয়া যাক, এমন কি খোদ কলকাতা শহরেই মশার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, আর এমন বেপরোয়া মশা যে দিনের বেলাতেও রেহাই দেয় না। কিছুকাল আগে দেশজোড়া মানুষ চক্ষু রক্তবর্ণ করে তাকিয়েও কিছু করতে পারে নি। আমাদের কপাল, সেই রোগটি সম্প্রতি ছেড়ে গিয়েছিল। এবারেও তাই যেন হয়, এই প্রার্থনা জানানো ও কিছু মন্তব্য করা ছাড়া অয়স্কান্ত আর কী করতে পারে।)

গোলমালে শরীর ও মনের গোলমাল

কলকাতার মতো শহরে যাঁরা থাকেন, গোলমালে তাঁরা অভ্যস্ত। কিন্তু তা হয়তো বুঝতেও পারেন না গোলমালের দরুন তাঁদের শরীর ও মনের কতখানি ক্ষতি হচ্ছে। আমেরিকার একজন বিজ্ঞানী ডক্টর রবার্ট অ্যালেকস ব্যারন—প্রায় এক দশক ধরে শিল্পপতিদের সরকারী কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণকে গোলমালের বিরুদ্ধে সজাগ করার চেষ্টা করে আসছেন। তাঁর মতে—

গোলমালের দরুন হার্টের ব্যারাম বাড়ে ও রক্তচাপ বাড়ে। গোলমালে মানুষের মেজাজ

সারদা-রামকৃষ্ণ

—সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও মেডারে বলেছেন,—বইটি পাঠকমনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে॥

বহুচিত্রশোভিত সপ্তম মুদ্রণ—৮.

গৌরীমা

—শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত—

যুগান্তর:—তিনি এতাধারে পরিব্রাজিকা তপস্বিনী, কর্মী এবং আচার্যা। ঘটনার পর ঘটনা চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে।... গৌরীমার অলোকসামান্য জীবন ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে॥

বহুচিত্রশোভিত পঞ্চম মুদ্রণ—৫.

সাধনা

বেদ উপনিষদ গীতা মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি বহু, সেতার সাড়ে তিন শত বাংলা হিন্দী ও ভাতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বসুমতী বলেন,—এমন মনোরম সেতার-গীতি পুস্তক বাঙ্গালায় আর দেখি নাই।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ—৬

দুর্গামা

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মানসকন্যা :

—শ্রীসুভাষপুরী দেবী রচিত—

অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং বাঙলার পাঠক কর্তৃক প্রশংসিত।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন ...জীবনীটি পড়ে এইটাই একান্ত বিশ্বাস হয় মত মনে হয় যে, এমন একটি মানুষ আমাদেরই সমসাময়িক কালে আত্ম প্রত্ন পরিবর্তনশীল কালের পটভূমিকায় সনাতন এক আদর্শকে আপনার জীবনে ধারণ লালন ও প্রতিষ্ঠিত করে জীবন অতিবাহন করে গেলেন। এ জীবন পবিত্র, এ জীবন সুন্দর, সুশোভন ও মাহাত্ম্যমণ্ডিত। ...আমি এই জীবনকথা পড়ে তৃপ্তিলাভ করেছি, এবং পাঠকসমাজের কাছে অকুণ্ঠভাবে বইখানি তুলে ধরে বলতে পারি তারাও এই গ্রন্থপাঠে অনুরূপ তৃপ্তি লাভ করবেন॥

বহুচিত্রশোভিত প্রথম মুদ্রণ—৮.

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা—৪

ফটোর সঙ্গে ফটো জুড়ে দেখানো হয়েছে আমেরিকার শহরের একজন মানুষকে কত রকমের গোলমাল সহ্য করতে হয়। কলকাতা বা দিল্লী বা বোম্বাইয়ের একজন মানুষের অবস্থাও একই রকম। তবে গোলমালের উৎস ভারতের শহরগুলোতে আরও বিচিত্র ধরনের। এই ফটো-মন্তাজটি নেওয়া হয়েছে 'স্প্যান' পত্রিকা থেকে।

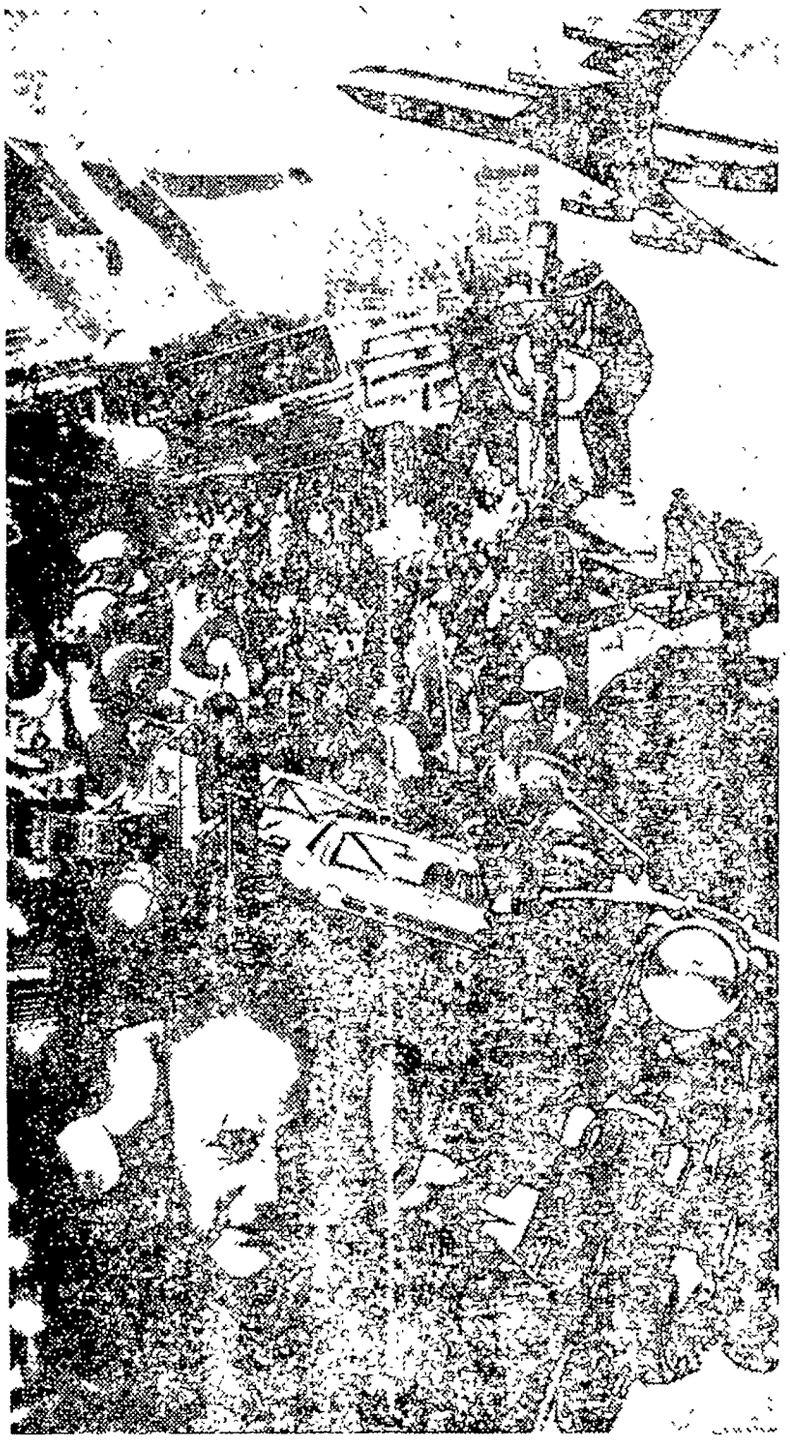

খারাপ হয়, মাথা ধরে ও এমনকি বুদ্ধি-নাশও ঘটে।

গোলমালে এমন কি মায়ের পেটের ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্রেও ব্যাঘাত ঘটতে পারে, যার ফল ভবিষ্যৎ জীবনে মারাত্মক হতে পারে।

গোলমালে চিত্তবৈকল্য ঘটে ও পেটের পীড়া হয়।

গোলমালে ঘুম নষ্ট হয় এবং তার ফলে শরীর ভেঙ্গে পড়ে।

গোলমালে শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়।

গোলমাল মানুষের শত্রু হিসেবে অতি কপট। গোলমালের মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ তাতে অভ্যস্ত হয়ে গড়ে এবং তার ধারণা হয় যে, কোনো গোলমাল-ই নেই। অর্থাৎ, গোলমাল কোনো গোলমাল না করেই মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

কলকাতা শহরের সাধারণ একজন নাগরিক সকাল থেকে রাত্রি যে-জীবন কাটায় তা শুধু গোলমালে ঠাসা। অন্য সমস্ত গোলমালের কথা বাদ দিলেও, কলকাতার ড্রাইভারেরা অকারণে যতো হর্ন বাজায় শুধু তাতেই মাথার গোলমাল হওয়া অসম্ভব নয়। (কথাটায় বিশ্বাস না হয় যে-কোনো ট্র্যাফিক সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে পরখ করতে পারেন। লাল থেকে হলদে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পিছনে অপেক্ষমান সবকটি মোটরের হর্ন একসঙ্গে বাজতে শুরু করে।)

গোলমাল কাকে বলব? যে শব্দ কাম্য নয় তাই গোলমাল। কেউ কেউ বলেন, গোলমাল হচ্ছে সেই শব্দ যার কোনো দাম নেই। গোলমাল মাপা হয় ডেসিবেল-এ। ডেসিবেল গণিতের যে সূত্র মেনে চলে (লগারিথম্) তা দশের ধাপে ধাপে চলে। দশ ডেসিবেল বাড়া মানে একশো গুণ বাড়া। গোলমাল দশ ডেসিবেল বাড়লে মানুষের কানে তা দ্বিগুণ হয়ে বাজে।

গাছের পাতার সর-সর আমরা শুনি ১০ থেকে ২০ ডেসিবেলে। ঘরের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা ৫০ ডেসিবেলে, ট্রামবাসের যাতায়াত ৯০ ডেসিবেলে, জেট প্লেনের মাটি ছাড়া ১৪০ ডেসিবেলে। গোলমাল যদি ৮৫ ডেসিবেলের ওপরে হয় তা একটানা শুনলে কালা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ১৩০ ডেসিবেলের ওপরের মাত্রার গোলমালে শরীরে যন্ত্রণা হতে পারে।

আধুনিক প্রত্যেকটি শহরে গোলমালের মাত্রা প্রতি বছরে এক ডেসিবেল করে বাড়ছে এবং এই হারে বেড়ে চললে ২০০০ সাল নাগাদ শহরের মানুষগুলো হবে বদ্ধ কালা।

ভারতে অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। তাঁরা গোলমাল থেকে রেহাই পেয়ে-ছেন। গোলমাল ভোগ করতে হয় শহরের মানুষকে। দিল্লী ও বোম্বাই শহরে যান-বাহন চলাচলের গোলমাল কখনো কখনো ৯০ ডেসিবেলের চেয়েও বেশি এবং কোন সময়ই ৬০ ডেসিবেলের কম নয়। কলকাতা শহরের মাপ পাওয়া যায় নি, তবে অনুমান করা চলে তা আরো বেশি। গরমের দেশ ভারতে ঘরবাড়ি তৈরি করতে হয় চারদিক খোলা রেখে, ফলে রাস্তার গোলমাল সবাসরি অন্দরে পৌঁছে যায়—এটা একটা গুরুতর অসু-বিধের ব্যাপার। ভারতের শহরগুলিতেও গোলমালের মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। বিষয়টি সম্পর্কে এখনই অবহিত হওয়া প্রয়োজন—এই হচ্ছে ওয়াকিবহাল বিজ্ঞানীদের মত।

—অয়স্কান্ত

কালো পাখী

অতুল চক্রবর্তী

অন্তর যে কী চায় এটা মানবজাতির সমস্ত জিজ্ঞাসা। জয় ঐশ্বর্য রূপ আধিপত্য সব কিছু পেয়েও যেন মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবর্তি হয় না। তাই এক এক সময়ে দেখা যায় কোন কোন মানুষ মরীচিকার মত তাতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মোহে অবিশ্রান্ত ধাবিত হবে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। আতস বাজির মত নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়ে সাময়িক একটা রোশনাই সৃষ্টি করে সে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে পৃথিবী থেকে। এমনই এক দুর্বার বেগবতী নারী ছিলেন ইসাডোরা ডানকান।

ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সানফ্রান্সিসকো শহরে ১৮৭৮ সালে খুব সামান্য ঘরে। তাঁর জন্মরহস্যও অন্ধকারে সমাবৃত, অবৈধ প্রণয়ের সন্তান। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, জন্মের পূর্বেই পিতা পলাতক। পালন পোষণের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল মায়ের ওপর। এক কথায় বস্তির মেয়েই বলা চলে। অত্যন্ত অবহেলা এবং অনাদরে কেটেছে শৈশব। এই সকল অবাঞ্ছিত শিশুরা সকল দেশেই তথাকথিত ভদ্রসমাজে অনাদৃত। শৈশব স্মৃতি মন্থন করতে গিয়ে ইসাডোরা নিজেই বলেছেন—অমিন ছাড়া আমার আরও তিন ভাই-বোন ছিল। আমাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে মাকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। তিনি একটা গানের স্কুলে পিয়ানো বাজনা শেখাতেন, এছাড়া অবসর সময়ে দস্তানা স্কার্ফ ইত্যাদি বুনতেন। সেগুলো আমরা সব ভাইবোনেরা পাড়ায় পাড়ায় ফেরি করে বিক্রয় করতাম। কিন্তু এতেও ঠিকমত কুলোতো না। প্রায়ই বাকি ভাড়ার জন্য বাড়িওয়ালা এসে আমাদের অপমান করতো। কাজেই এক বস্তি থেকে আর এক বস্তিতে চারমেশাই আমাদের স্থান পরিবর্তন করতে হতো।

তাঁর মাথায় ছিল সোনালি কেশের গুচ্ছ, নয়নে নীল মদির কটাক্ষ আর দেহ-সৌষ্ঠব ছিল সুগঠিত। ভবিষ্যতে তিনি যে অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী রূপসী হবেন তার পূর্বাভাস শৈশবেই সুস্পষ্ট হয়েছিল। এছাড়া অনেকে মনে করেন ইসাডোরার ধমনীতে জীপসী শোণিত প্রবাহিত তাই নৃত্যগীতে ছিল তাঁর সহজাত প্রতিভা। অতি শৈশবে যখন তিনি ভাল করে হাঁটতেও অভ্যস্ত হননি, প্রতিবেশীদের বাতায়ন থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের সুর তাঁর অন্তরে দোলা দিয়ে ছন্দের সৃষ্টি করতো এবং তিনি আপন মনে নাচতেন।

দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করবার পর থেকেই যেন ইসাডোরার দেহের মরা গাঙে রূপের বান ডেকে এলো। পেলব যৌবন মুখশ্রীর, ক্ষীণকটিতটে সুডৌল শ্রোণীভার, দীর্ঘ অজানু পদপল্লব, প্রস্ফুটিত স্পন্দায়িত বক্ষ সর্বোপরি তন্বী দেহলতা লীলায়িত ও সাবলীল ছন্দে উদ্বেল। যে পরিবেশে ইসাডোরা মানুষ তাতে নিজেকে আবৃত ও সংযত রাখবার শিক্ষা সে পায়নি। যৌবনের স্পর্শ যেন হাউইতে আগুন ধরিয়ে দিল। পতঙ্গের মত আকৃষ্ট হয়ে এলো প্রণয়ীর দল। তারা সকলেই বঞ্চিত হয়নি। তবে এক হিসেবে ইসাডোরাও নিজের জীবনের প্রধান লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হননি। তিনি বিশ্ববিজয়িনী নর্তকীরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর সমকক্ষ নর্তকী আর কেউ ছিল না।

সে যুগে পায়ের পাতার ওপরে কাপড় তোলা মেয়েদের পক্ষে শিষ্টাচার বিগর্হিত বলে গণ্য হতো। কিন্তু ইসাডোরা এই সকল রক্ষণশীল বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলতেন। তিনি যে পরিচ্ছদ পরিধান করতেন তাতে পদমূল থেকে জঙ্ঘা এবং স্কন্ধ-সন্ধি থেকে দুইবাহু ছিল সম্পূর্ণ অনাবৃত। এমন কি এতো ক্ষীণ বক্ষাবরণ ব্যবহার করতেন যা তৎকালীন সভ্য মার্কিন মহিলা সমাজে দৃষ্টিকটু বলে বিবেচিত হতো। প্রতিষ্ঠাবান সম্ভ্রান্ত মহিলা সমাজে ইসাডোরা চক্ষুশূলে হয়েছিলেন। একবার এক নাচের আসর থেকে প্রায় চল্লিশজন মার্কিন মহিলা ইসাডোরার অশালীন পরিচ্ছদের প্রতিবাদ স্বরূপ কক্ষ ত্যাগ করেন। আজকের দিনে মার্কিন মুলুকে 'টপলেস' আর 'মিনি স্কার্টের' বহুল প্রচলন দেখে ঐ সকল ধর্মপ্রাণা মহিলারা সম্ভবতঃ তাঁদের কবরের মধ্যেও আঁৎকে ওঠেন।

প্রায় বিংশ বর্ষ বয়সে ইসাডোরা ইওরোপ চলে আসেন এবং লন্ডনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কন্যা রাজকুমারী হেলেনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হন। লন্ডনে ব্যালেরিনার নাচের আসরে তিনি অল্পই অবতীর্ণ হতেন। সচরাচর অভিজাত সম্প্রদায়ের পারিবারিক জলসাতেই নাচ দেখাতেন।

এতোদিন ইসাডোরার জীবনস্রোত চলছিল অনেকটা মন্দাক্রান্তা তালে কিন্তু ইওরোপে আসবার পর তাঁর জীবনের বেগ যেন উন্মত্ত তরঙ্গাঘাতে ভেসে চলল দিগভ্রান্ত অকূলে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি বুদাপেস্তের এক অভিনেতার সঙ্গে গভীর প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাস তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আবেগময় জীবনযাপন করবার পর যখন বিবাহ প্রস্তাবের সম্মুখীন হলেন তখন ইসাডোরা সহসা স্থির করে ফেললেন বিবাহিত জীবনের বর্ণহীন উত্তেজনহীন বন্ধন তাঁর জন্য নয়।

অতঃপর তিনি বুলগেরিয়ার রাজকুমার ফার্ডিনান্ডের নিবিড় সংস্পর্শে আসেন। রাজকুমার তাঁর ইটালির সুরম্য উদ্যানবাটী ইসাডোরাকে উৎসর্জন করেন কিন্তু রাজ দরবারে এ নিয়ে তুমুল আলোড়ন এবং প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের বিক্ষোভ লক্ষ্য করে রাজকুমার অধঃপাতের পথে সম্ভবতঃ আর বেশি দূর অগ্রসর হননি। শোনা যায় ইসাডোরা যখন ক্ষীণ বসনাঞ্চলে নিজেকে আবৃত করে প্রভাতে সরোবরে অবগাহন করতে যেতেন তখন রাজকুমার ফার্ডিনান্ড প্রতিদিন আপন প্রাসাদ-সৌধের উপরিভাগ থেকে দূরবীনযোগে ইসাডোরাকে অবলোকন করে দীর্ঘশ্বাস মোচন করতেন।

ইসাডোরার জীবনের দুর্মদ প্রণয়াভিসার কিন্তু এখানেই সমাপ্ত নয়। একবস্ত্রে বাসর শয্যা নিশিভোরে পথ প্রান্তে ফেলে দিয়ে প্রতিদিন নব নব লক্ষ্যে ধাবিত হতে লাগলেন। এরপর তিনি চলে আসেন বার্লিনে। এখানে তাঁর নৃত্যকলা বিপুল অভিনন্দন লাভ করে। এই বার্লিনেই মঞ্চ-সজ্জাকর গর্ডন ক্রেইগের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং ক্রেইগই তাঁর প্রথম সন্তান দীরদ্রের জনক। সেটা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ। সারা জার্মানি তখন ইসাডোরা ডানকানের নৃত্য শিল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি যখন মিউনিখ শহরে পৌঁছুলেন তাঁকে বিপুল জনতা অভ্যর্থনা জানায় এবং ঘোড়ার বদলে উৎসাহী তরুণদল নিজেরাই তাঁর গাড়ি শহরের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।

ব্যক্তিগত জীবন যতই কলংকলিপ্ত হোক না কেন ইসাডোরার হৃদয়ের একটা উদার দিকও ছিল। তিনি তাঁর শৈশবের দুঃখ ও যাতনার দিনগুলি বিস্মৃত হননি। তিনি যে বিপুল উপার্জন করতেন সেই অর্থ কেবলমাত্র নিজের পরিচ্ছদ অলংকার এবং বিলাসিতাতেই ব্যয় করতেন না। দরিদ্র অনাথ ও পিতৃপরিচয়হীন মেয়েদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে যে দুস্তর প্রতিবন্ধ আছে সেকথা তিনি পলে পলে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতেন। স্বোপার্জিত অর্থে তাই তিনি জার্মানিতে কুড়িজন অনাথা বালিকা ছাত্রী নিয়ে তিনি একটি চারুশিল্প শিক্ষায়তনের গোড়া পত্তন করেন। এখানে সংগীত ও নৃত্যশিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ দেওয়া হতো। ইসাডোরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে এই বিদ্যালয়ের সর্বতোভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

জার্মানিতে রচিত তাঁর প্রেমের খেলাঘর আবার ভেঙ্গে গেল। ইসাডোরা এবার চল্লেন রাশিয়ায় আপন নৃত্যকুশলতার বিজয়মাল্য অর্জন করতে। রাশিয়া ব্যালেট নৃত্যের সিদ্ধপীঠ। তিনি পরিচ্ছদের আড়ম্বর বর্জন করে অতীব সরল বেশে শ্লাক, বীঠোফেন, চপিন প্রভৃতি ঐতিহাসিক সংগীত বিশারদ রচিত গীতাবলীর নৃত্যসংগীত প্রদর্শন করে সকলকে মুগ্ধ করে দেন। নৃত্যে সজ্জা সংক্ষেপ ও সরল ভঙ্গি ইসাডোরার একটি বৈপ্লবিক অবদান। রাশিয়ার স্বনামধন্য নর্তকী অ্যানা পাবলোভা পর্যন্ত ইসাডোরার নৃত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

এরপর ইসাডোরা ফিরে আসেন প্যারিসে। সেখানে ক্রোড়পতি ধনী এবং সেসাইকলের বিশ্ববিখ্যাত মালিক সিঙ্গারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সিঙ্গার তখন বিবাহিত এবং পাঁচটি পুত্র কন্যার পিতা কিন্তু ইসা-

ডোরার সঙ্গে তাঁর গাঢ় প্রণয়ের পরে বিবাহিত জীবন কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। আর পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সকল বিষয়ে ইসাডোরাও ছিলেন সম্পূর্ণ বেপরোয়া এবং সংস্কারমুক্ত। 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কী ভয়' সিঙ্গারই হচ্ছেন ইসাডোরার দ্বিতীয় সন্তান প্যাট্রিকের জনক। তিনি ছিলেন দুই সন্তানের জননী দীরদ্রে এবং প্যাট্রিক, উভয়েরই পুত্র।

মানবজীবনের যা কিছু কাম্য, এই সময়ে মনে হতো ইসাডোরা সবই পেয়েছেন। যশ, ঐশ্বর্য, রূপ, প্রতিপত্তি, পুত্র কোন কিছুরই অভাব ছিল না। গৌরবে তিনি রাজমহিষীর চেয়ে কম কিসে। কিন্তু অন্তরের নিভৃত অবকাশে উঁকি দেখলে দেখা যাবে মানব-জীবনের কয়েকটি অমূল্য সম্পদ থেকে ইসাডোরা বঞ্চিতা ছিলেন—গৃহের স্নিগ্ধ ছায়া, পতির একনিষ্ঠ প্রেম এবং হৃদয়ের অচঞ্চল শান্তি।

এই সময়ে কিছুকালের জন্য ইসাডোরা সিঙ্গার সমভিব্যাহারে বিভিয়েরায় প্রমোদ বিহারে যাত্রা করেন। তাঁর অনুরোধক্রমে সিঙ্গার নিজ ব্যয়ে তাঁর স্কুলের ছাত্রীদেরও ধনীর বিলাস কুঞ্জ বিভিয়েরা ভ্রমণ ও দর্শনের সুযোগ দান করেন। দিনগুলো ছিল যেন আনন্দে ভরপুর। তারপরেই এলো ১৯২৩ সালের সেই মর্মান্তিক দশই এপ্রিল। হাসির পরেই কান্না।

ঐ দিনটাতে তাঁর দুই পুত্র দীরদ্রে এবং প্যাট্রিক প্যারিস শহরে সীন নদীর পারে বেড়াতে বেরিয়েছিল মোটরযোগে ড্রাইভারের সঙ্গে। তাদের বয়স তখন যথাক্রমে সাত এবং দুই। একটা ঢালুর মুখে এসে হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে। হয়তো কোন যান্ত্রিক গোলযোগ। অনবধানতা বশতঃ ড্রাইভার ব্রেক না লাগিয়েই নীচে নেমে গেল ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে। নিয়তির দুর্জ্ঞেয় পরিহাস, ড্রাইভার নেমে যাওয়ার পরই হঠাৎ আবার চলতে আরম্ভ করল গাড়ি এবং চালকহীন যান ঢালু বেয়ে বিদ্যুৎ গতিতে আরোহী সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ল সীন নদীর জলে। সেখানে নদী চল্লিশ ফুট গভীর। প্রায় দেড় ঘন্টা স্থাঙ্গাথুর্জিব পরে দীরদ্রে ও প্যাট্রিকেরে তুলে আনা হলো নদী গর্ভ থেকে। কিন্তু তখন সব শেষ।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ফুল দিয়ে ঢেকে দিল দুই শিশুর সুকুমার দেহ। অশ্রুসিক্ত হতে লাগল সকলের বক্ষদেশ কিন্তু ইসা-ডোরা বারংবার বলতে লাগলেন—'আজকের দিনে অশ্রু বর্ষণ নয়। মৃত্যুকে আমি সুন্দর করে সৃষ্টি করবো।' —কিন্তু ওটা কথার কথা। পুত্রহারা জননীর ব্যাকুল হৃদয় আঘাতে আঘাতে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল।

এরপর থেকে ইসাডোরার মনের বাঁধ যেন সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল। এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না বেশি দিন। কখনও প্যারিস কখনও নিউইয়র্ক, আবার কখনও নাপলস মার্সেলিয়েজ বুয়েনস এরারস সানফ্রান্সিসকো তাহারা এখানে সেখানে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসের ট্রোকাডেরো নৃত্যমঞ্চে ফরাসী জাতীয় সংগীত 'মার্সেলিস'এর নৃত্য-রূপ প্রদর্শন করে তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব লাভ করেন। সেই সময়ে জার্মান গোলন্দাজ বাহিনী ভার্ডুন দুর্গের ওপর তোপ দাগছিল, সম্ভবতঃ এইটিই তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য শেষ শিল্প-কীর্তি।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁর চেয়ে সতেরো বছরের কনিষ্ঠ রুশ কবি সার্গাই এসেনিনকে বিবাহ করে ইসাডোরা ইউরোপে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। কিন্তু এ বিবাহ মোটেও সুখের হয়নি। এসেনিন প্রথম থেকেই এক অদ্ভুত ঈর্ষায় ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন সন্দিগ্ধচিত্ত এবং মদ্যপায়ী, ইসা-ডোরা এবং এসেনিন যখন মিলিতভাবে কোন জলসায় উপস্থিত থাকতেন তখন দর্শকেরা ইসাডোরাকেই অধিক সমাদর করতো এবং তাঁর সান্নিধ্য প্রার্থনা করতো। এটা এসেনিন মনে মনে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। এই ঈর্ষায় দুই একবার তিনি ইসাডোরাকে হত্যার চেষ্টাও করেন।

দ্বিতীয়বার ইসাডোরা তাঁর মৃত পুত্রদ্বয়ের কখনই বিস্মৃত হতে পারেন নি। এলবামে বাঁধিয়ে তাদের ছবি নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতেন এবং কখনও কখনও বাছির নিভৃত অবসরে ছবির দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে অশ্রু বর্ষণ করতেন। তাঁর এই আচরণও ছিল এসেনিনের দুই চক্ষের বিষ। বার্লিনের এক হোটেলে এক সন্ধ্যায় ইসাডোরা যখন একাকিনী তাঁর মৃত পুত্রদ্বয়ের চিত্রের সামনে অশ্রুবর্ষণ করছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় এসেনিন কক্ষে প্রবেশ করেন এবং ইসাডোরার হাতে এ্যালবামে ছবি দেখতে পেয়ে ক্রোধান্ধ হয়ে অ্যালবাম কেড়ে নেন এবং তা জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

এই দুঃসহ জীবনের অবসান এসেনিন নিজেই একদিন ঘটালেন। লেনিনগ্রাদে এঞ্জেল্স-টেরে হোটেলের যে কক্ষে বিবাহের পর ইসাডোরা এবং এসেনিন প্রথম ফুলশয্যা রচনা করেছিলেন সেই কক্ষেই রুশ-কবি একদিন উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলেন। মৃত্যুর পূর্বে ছুরি দিয়ে নিজের কব্জি চিরে তাজা রক্ত দিয়ে ইসাডোরার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে রেখে গিয়েছিলেন—'হে প্রেয়সী বিদায়। এ জীবনে একমাত্র তোমাকেই সকল মন দিয়ে ভালবেসেছি, আবার বেলাতেও তোমার মুখচ্ছবি আমার হৃদয়পটে আঁকা।'—বিচিত্র মানব-চরিত্র।

যদিও এসেনিনের জীবনে ইসাডোরাই একমাত্র নারী ছিলেন না, কিন্তু সোভিয়েট আদালতের বিচারে দেখা গেল ইসাডোরাই ছিলেন তাঁর একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী এবং সম্পত্তির অধিকারিণী। এই বিচারের ফলে এসেনিনের কাব্যগ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ প্রায় তিন লক্ষাধিক রুশ মুদ্রা রুবেলের উত্তরাধিকারিণী নির্বাচিত হলেন ইসাডোরা। ঐশ্বর্যের প্রতি লোভ ইসাডোরার কোনকালেই ছিল না। যদিও নিজে তখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় তবু এই অর্থ তিনি এসেনিনের মাতা এবং ভগিনীদের দান করে দেন।

জীবনে তখন ভাটার টান এসে পৌঁছেছে এবং সেই অনুপাতে মনের বল ও দেহের শক্তি শিথিল হতে আরম্ভ করেছে। সেই সঙ্গে নানা রকম কুসংস্কার মনকে প্রপীড়িত করতে লাগল। মোট কথা পুত্রবিচ্ছেদের পর থেকে ইসাডোরার জীবন ভেতরে ভেতরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল। এ আঘাত কোনদিনই তিনি ভুলতে পারেননি। বাইরে যতই ব্যস্ততা চটুলতা ও আড়ম্বর থাক না কেন ভেতরে তিনি বিন্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সকল দেশের মত ইউরোপেও কিছু কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। 'কালো পাখিকে সেখানে মৃত্যুর অগ্রদূত মনে করা হয়। পুত্রহারা ইসাডোরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করতে লাগলেন ছেলেদের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাদের ঘরের ওপর দিয়ে তিনটে কালো পাখীকে চক্রাকারে উড়তে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত 'কালো পাখী' তাঁর মনের এক অন্ধ সংস্কার হয়ে দাঁড়ালো। তিনি 'কালো পাখী' অবলম্বনে গান রচনা করে তা রেকর্ড করলেন 'হে কালোপাখী বিদায়।' গানখানি সে সময়ে ইউরোপে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

অন্যদিকে কিন্তু ইসাডোরার জীবনতরী পূর্বের মতই ভেসে চলেছিল উত্তরোত্তর প্রমত্ত বিলাসে, সেখানে প্রতিদিন ভিড় করে আসতো নব নব প্রণয়ী ফেনিল সুরাপাত্র হাতে। সেটা যেন মাটির জগৎ নয় সেখানে আছে শুধু নেশা ও আমেজ।

শীত ঋতুর অবসানে ১৯২৭ সালের একটি সন্ধ্যা। ইসাডোরা তখন নিস-এর এক অভিজাত হোটেলে ডিনারের শেষে নতুন এক প্রেমিকের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন মোটর-ভ্রমণে। হঠাৎ খেয়াল হলো 'কালো-পাখী বিদায়' গানখানি শুনবেন। গানখানি রেকর্ডপ্লেয়ারে চড়িয়ে তিনি তালে তালে নাচতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হলেন প্রতীক্ষিত অতিথি। লীলা-চ্ছলে একখানি রঙিন ওড়না তুলে দিয়ে গলদেশে তির্যক ভঙ্গিতে জড়িয়ে ইসাডোরা গিয়ে বসলেন গাড়িতে প্রিয়তমের পাশে। অবলুণ্ঠিত ওড়নার প্রান্তভাগ বায়ুভরে উড়তে লাগল পত পত করে পতাকার মত।

গাড়িখানি ছিল বুগাটি স্পোর্টস কার ঝড়ের বেগে যাত্রা শুরু হলো। যম কিন্তু লুকিয়ে ছিল পাশেই। তখনকার দিনে বুগাটি গাড়ির চাকা থাকতো অনাবৃত। হঠাৎ ইসা-ডোরার ওড়নার লুণ্ঠিত অংশ জড়িয়ে গেল গাড়ির চাকায়। এক হেঁচকা টানে তিনি উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন পথের ওপর এবং সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। মেরুদণ্ড ও গ্রীবাসন্ধির অস্থি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

তখনও হোটেলের বাতায়নপথে আপন কণ্ঠসংগীত ভেসে আসছিল:—

'প্যাক আপ অল মাই কেয়ার এণ্ড উও,
হিয়ার আই গো সিংগিং এ্যা
ব্ল্যাক বার্ড বাই বাই।'

আমার সকল চিন্তা ভাবনার অবসান হোক,
এই তো আমি মুক্ত পক্ষবিস্তার গান
গেয়ে চলে যাচ্ছি
হে কালো পাখী বিদায়।

পুনশ্চ

অধুনা অধিকাংশ লেখকগণই তাঁদের নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করেন না। আবার কিছু সংখ্যক ব্যবহার করলেও, কাগজে তাঁদের রচনা মুদ্রিত করার সময় পত্রিকার সম্পাদকগণ তা বর্জন করে কেবলমাত্র নামটিই মুদ্রিত করে থাকেন। এই সকল সম্পাদকগণ নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহারের যে পক্ষপাতি নন তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এমনও কিছু সংখ্যক সম্পাদক দেখা গেছে, যাঁরা নামের প্রারম্ভে শ্রী রাখার পক্ষপাতি এবং লেখকগণ শ্রী ব্যবহার না-করলেও, তাঁরা শ্রীসহ নামটি ছেপে থাকেন। এছাড়া সম্পাদকদের মধ্যে আবার এমনও দেখা গেছে যে, এ সম্বন্ধে তাঁরা নিজেদের কোন ইচ্ছা বা অভিমত ব্যক্ত না করে, যাঁরা শ্রী লেখেন তাঁদের নাম শ্রীসমেত এবং যাঁরা শ্রী লেখেন না, তাঁদের নাম শ্রী ব্যতিরেকেই ছেপে দেন। এবং স্বয়ং শ্রী রাখা বা না-রাখা সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব কোন অভিমত লেখকদিগের উপর আরোপ করেন না।

কিন্তু এই শ্রীর ব্যবহার এক সময়ে ভারতের তথা গৌড়ের সর্বত্র যেমন ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, তেমনি নামের পূর্বে শ্রী-র প্রচলনও ছিল প্রাচীন কালের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে। জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মধ্যেও শ্রী-র ব্যবহার ও অব্যবহার প্রচলিত আছে।

লেখকগণের কথা বাদ দিলেও, ব্রিটিশ ইংরেজীতে কি বাংলায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আজও সসম্মানে নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহার করে থাকেন। ইংরেজ আমলে 'বাবু' শব্দের ব্যবহার কিছুকাল প্রচলিত থাকলেও, বর্তমানে তা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হিসাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের প্রথমাংশে দীর্ঘকাল শ্রী ব্যবহার করার পর, ভবিষ্যৎকালে তা বর্জন করেন এবং এ নিয়ে সে সময় কিছু বাদানুবাদ হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

এই বিষয় সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় 'নামের আগে শ্রী লিখিবার নিয়ম' শীর্ষক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের লিখিত একটি সুন্দর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। যদিচ লেখক নামের পূর্বে শ্রী রাখার বিপক্ষেই শেষ পর্যন্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তথাচ এই বিশ্লেষণধর্মী গবেষণামূলক রচনাটি অমূল্যর পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এখানে তুলে দেওয়া হ'ল।

নামের আগে শ্রী লিখিবার নিয়ম

'প্রাচীন ভারতের হিন্দু রাজারা কেহ কেহ পত্রলেখার গায়ে অনুশাসন লেখাইতে

বাহির হইল বাহির হইল বাহির হইল

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী রচিত

শরৎ সাহিত্য অনবদ্য ও অতুলনীয় সমালোচনা গ্রন্থ
ফুল রেক্সিন বাঁধাই ১৫·০০

অনুবাদ গ্রন্থ : অনুবাদক শ্রীতারাপদ রাহা
সারা বিশ্ব যে বই পড়ে শিউরে উঠবে সেই উপন্যাস

মোঁপাসার বেল আমী পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ৮·০০

মোঁপাসার ছোট গল্পের সংকলন **নারীর মন** ৫·

মোঁপাসার রচনাবলী ১ম খণ্ড অনুবাদ ও সম্পাদনায় শ্রীতারাপদ রাহা ফুল রেক্সিন বাঁধাই ১৫·০০

ক্রমশঃ সমস্ত খণ্ডগুলি বাহির হইবে।

গোর্কির মা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

খ্যাতনামা অনুবাদক ইন্দুভূষণ দাস অনুদিত ৬·০০

শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসাকের

রিক্তের বেদন ৪·০০

ওপার বাংলায় যে উপন্যাস একাদিক্রমে ষোলটি সংস্করণের গৌরব অর্জন করেছে, সেই অনন্য উপন্যাস পশ্চিম-বঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে।

কালপুরুষের **শেষ বিচার**

কালের আবর্তনে সমাজ জীবন আজ ক্লিষ্ট ও বিপর্যস্ত। দুর্নীতি, স্বৈরাচার আর চক্রান্তে সমাজদেহ ক্ষতবিক্ষত। সমাজের কলুষপঙ্কের ছবি আঁকতে গিয়ে শক্তিমান লেখক তারই মাঝে কয়েকটি সোনার কমল ফুটিয়ে তুলেছেন। ৯২·০০

অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত

ক্ষীরের পুতুলের নাট্যরূপ

নাট্যরূপায়ণে : শ্রীঅনিলচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ১·৫০

শ্রীশিশিরকুমার রচিত স্ত্রী চরিত্র বর্জিত নাটক

প্রকৃতির প্রতিশোধ ২·০০

দীপালি বুক হাউস—১২।১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলি-১২

দিয়া নিজেদের নাম গোত্র লিখিবার ভঙ্গীটিরও পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রিয়দর্শন অশোকের শিলালিপিই প্রাচীনতম। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত তাঁহার কোন অনুশাসনেই তাঁহার নামের আগে শ্রী' লিখিবার নিদর্শন নাই। তার পরেই সমুদ্রগুপ্তের সংস্কৃত অনুশাসন উল্লেখযোগ্য। তাহাতেও অশেষ বিশেষণ-স্তূপের মধ্যেও রাজার নামোল্লেখের আগে শ্রী'র সন্ধান পাই না। ইহার আরও কিছুকাল পর মহারাজ হর্ষবর্ধনের সময়ে তাঁহার অধুনা-আবিষ্কৃত স্বাক্ষরের মধ্যে একটি শ্রী'র সন্ধান পাওয়া গেল। তাহাতে আছে——স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষ।' কিন্তু মনে হয় ইহা মূল নামেরই অন্তর্ভুক্ত শ্রী', যেমন বাংলায় শ্রীকান্ত, শ্রীনাথ, শ্রীশ।

রাজাদিগের নামের আগে তাহাদের অন্যান্য বিশেষণ থাক, সত্ত্বেও 'শ্রী'র অভাব দেখিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে যে, এই রীতির উদ্ভব নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী সময়ের, কিন্তু গুপ্ত-সম্রাটদিগেরই সমসাময়িক (৩২০—৫০০ খৃষ্টাব্দে) একটি শিলা-লিপির উল্লেখ করিব, তাহা হইতে তৎকালীন সম্ভ্রান্ত চরিত্রের নামোল্লেখের পূর্ব্বে শ্রী' ব্যবহার এক বিশেষ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। শিলা-লিপিটি হাতিগুম্ফা বা খারবেলের শিলা-লিপি বলিয়া পরিচিত। ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী উদয়গিরি নামক পাহাড়ের গায়ে ইহা পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে মৌর্য্য-সম্রাটগণের আমলের বলিয়া মনে করেন। ইহা পুরাণ প্রাকৃত ভাষায় লেখা, সংস্কৃত অনুবাদ করিলে এই রকম দাঁড়াইবে . কলিঙ্গপতিনা শ্রীখারবেলেন।' এই সেল পূর্ব্ব ভারতের কথা। পশ্চিম-ভারতের রাজপুতানার কুল্লুকের শিলালিপিতেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহা যদিও কিছু পরবর্ত্তী কালের, তথাপি 'শ্রী' লেখার দৃষ্টান্তবাহুল্যে মনে হয় অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রকার রীতি এদেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোন নামের পূর্ব্বে এই রীতির ব্যতিক্রম দেখি না, যথা, (অনূদিত) শ্রীলক্ষ্মণ ইতি শ্রীমজ্জালঃ .. শ্রী ভল্লুকস্য শ্রীকল্পঃ ইত্যাদি।

তারপর আমাদের বাংলার কথাই বলি। প্রাচীনতম বাংলা পুঁথিগুলিতে ভণিতায় কেহ শ্রী সহ নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই। বাংলায় এই রীতি কোনদিনই ছিল না, কিন্তু পরে ইহা সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। কারণ পাল-রাজগণের যে-সকল সংস্কৃত তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীবিগ্রহপাল, শ্রীমদনপাল এই প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাই। বাংলায় সেন-রাজাদিগের আমলে সংস্কৃত ভাষার খুব চর্চ্চা ছিল। সেই সময়ে এই রীতি বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে। বল্লালসেনের 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত-সাগর' পুঁথিতে শ্রীবল্লাল এই প্রকার লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়-দেব গীতগোবিন্দের ভণিতা দিয়াছেন, 'শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারম্।' . কিংবা 'শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গল-মুজ্জ্বলগীতি' ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত হইবার আগে কোন বাঙালী কবিই নিজের নামের আগে শ্রী লিখিয়া ভণিতা দেন নাই। তাঁহারা বড়-জোর নামের আগে জাতি বা পদবীটুকুর উল্লেখ করিতেন, যেমন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চন্দ্রীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দাস বৃন্দাবন, কবি কৃত্তিবাস, দ্বিজ ঘনশ্যাম, ইত্যাদি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে মন্ত্রভাগবৎ পুরাণখানি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাহাতে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত চরিত্রের পূর্ব্বে শ্রী এই সম্মানজ্ঞাপক উক্তিটি দেখিতে পাই, যেমন শ্রীশুক উবাচ ইত্যাদি। সেই হইতে বাংলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের 'শ্রী' একটি বিশেষ সম্মান ও ভক্তিজ্ঞাপক পাঠ হইয়া দাঁড়াইল। ইহা তখন আর শুধু ব্যক্তিজ্ঞাপক বহুল না, ক্রমে পবিত্র বস্তুজ্ঞাপক ও এমন কি বৈষ্ণবের ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট কতকগুলি স্থান-জ্ঞাপকও হইয়া উঠিল, যেমন শ্রীনবদ্বীপ ধাম, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীপাঠ ইত্যাদি। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকেও শ্রী-শোভিত করিলেন, যেমন শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রীগীতা, দেখাদেখি শাক্তরাও করিলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী, শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি। তৃণাদপি সুনীচেন' স্বভাব-বিনয়ী বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক কখনই নিজের নামের পূর্ব্বে শ্রী' ব্যবহৃত হইত না। তাঁহারা সর্ব্বদা দাস কি দীন বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন, এবং মৃত কি জীবিত কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বা কোন বস্তু, কি কোন স্থান প্রভৃতির নামের পূর্ব্বেই একমাত্র শ্রী' শব্দের ব্যবহার করিতেন। যেমন, চৈতন্যচরিতামৃতের আধুনিক কোন সংস্করণে পাইতেছি, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ (যদিচ তিনি বহুকাল পূর্ব্বেই স্বর্গীয় হইয়াছেন) গোস্বামী বিরচিত তারপর এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম-গ্রন্থের ভূমিকাটি কতক তুলিয়া দেখাইতেছি, ইহা হইতেই শ্রী ব্যবহারের বৈষ্ণব রীতি পাঠক কতক অনুমান করিতে পারিবেন,—যথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবদেব. . প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মধুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতেও শ্রীচৈতন্যদেবের লোকপাবনী লীলা বিস্তৃত আছে বটে। এ যাবৎ এই শ্রীগ্রন্থের অনেক-গুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীমহা-প্রভুর ইচ্ছায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ইতি শ্রীরথযাত্রা শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।' ইত্যাদি। এইভাবে বৈষ্ণবগণ শ্রী'র ব্যবহার ক্রমশঃ বিস্তৃত করিয়া লইতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত চরিত্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীমুখ, শ্রীপদ, শ্রীচরণকমল, শ্রীহস্ত প্রভৃতিতে গৌরবে 'শ্রী' ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

কিন্তু ইহার ব্যবহার আরও বিস্তৃত হইয়া ক্রমে দেবচরিত্রসম্পর্কশূন্য হইয়াও সম্ভ্রান্ত কোন বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী' ব্যবহার আরম্ভ হইল। অর্থাৎ শ্রীমুখ বুঝাইতে তখন শুধু রাধাকৃষ্ণ কি চৈতন্যের মুখই বুঝাইত না, যে কোন সুন্দর রমণীর সুন্দর মুখও বুঝাইতে লাগিল। এই ভাব হইতেই শ্রী'র ব্যবহারও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত সমস্ত চরিত্রের নামের আগেই শ্রী'র ব্যবহার দেখিয়া পরবর্ত্তী লেখকগণ মনে করিলেন যে, শ্রী ব্যতীত বুঝি কাহারও নামই সম্পূর্ণ নহে। বিনয়-অবিনয়ের প্রশ্ন তখন কাহারও মনেই আসে নাই, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখককেই . শ্রীযুক্ত লেখিতাম না। কিন্তু মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন 'শ্রীকবি-কঙ্কন ভণে', ইত্যাদি। অতএব বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'শ্রী শব্দের বহুল ও পরবর্ত্তী কালে শিথিল প্রচার হইতে আধুনিক বাঙালীর সমাজে নামের আগে 'শ্রী'র ব্যবহার একটা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা জীবিত ও মৃত ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইত, কারণ বহু মৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উল্লেখেও সাধারণে ইহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু খুব অল্প-কাল ধরিয়াই ইহা শুধু জীবিত ব্যক্তির জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার কারণও খুবই সুস্পষ্ট।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও ইহার সাহিত্য যে সমস্ত দেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়া-ছিল, সেই দেশেই এই নিয়মের আজিও প্রচলন দেখিতে পাই। সেই জন্যই পশ্চিম-ভারতে এই নিয়মের তেমন প্রচার নাই। কিন্তু এই সম্পর্কে বাঙালীর প্রভাব আশে-পাশের অনেক প্রদেশকেই মানিয়া লইতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ওপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্ব্ব-প্রথম নিজের স্বাক্ষর হইতে শ্রী উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিকট অনেক দিন আগে একবার জিজ্ঞাসু হইলে তিনি এই বিনয়-অবিনয়ের কথাই বলিলেন। রবীন্দ্রনাথও আজ এই যুক্তি হইতেই তাঁহার নাম স্বাক্ষর হইতে শ্রী'র ব্যবহার উঠাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ নিজের নামের আগে নিজেই শ্রী' লিখিয়া স্বজ্ঞানেই যে কেহ অবিনয় প্রকাশ করিতেন না তাহাও সত্য!

আমরা সত্যটির সন্ধান পাইয়া আজ এক সংস্কারের মোহ হইতে বাঁচিলাম। ইহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।'...

—ক্ষণিক

দিলীপ সেনগুপ্ত

হিমঘরের হীরক

ঘুম, তারপর আলস্য কেটে যাবার পর বিছানায় উবু হয়ে বসে একমনে কিছুক্ষণ ডান অথবা বাঁ হাতের রেখা পাঠ আর ওই-রকম অন্যমনস্কতার সময়ে হীরককে শোনাবার মতো যথেষ্ট কথা নিয়ে পিসীমার প্রবেশ, এসবই রেওয়াজ ঘটনা। হীরককে নিয়ে পিসীমার নিত্য-নতুন সমস্যা। যদিও বিরল ক্ষেত্রে পিসীমা-সৃষ্ট ও আবিষ্কৃত সমস্যার সঙ্গে হীরক নিজেকে যুক্ত করে। তাতে পিসীমার কিছু যায়-আসে না। চৌকাঠ না ডিঙিয়েই শুরু—'সম্পর্ক নেই বললেই তো উবে যায় না আর? রক্তের সম্পর্ক। তোর না ভাই? বউটার ফুসফুসে অপারেশন হবে শুনছি। ছেলেমানুষ বউ—কি না কি হয় কে জানে? একবার কি দেখে আসতে পারিস না গিয়ে? দুধের শিশুটাকে নিয়ে ছেলেটাই বা কি করছে কে জানে? তুই তো বড় যা হোক্। থাক্ গে, বলি কাকে এসব? ঘর সংসার তো করলি না? মর্মও বুঝলি না সেসবের। যা খুশি কর। আমার মাজায় জোর থাকলে নিজেই যেতাম—', চৌকির এক কোণের তোষক উল্টে ফেলে কাঠের ওপর সশব্দে চায়ের কাপ রেখে চলে যাওয়ার সময় পিসীমা আরও কিছু শোনায়। হীরক একটু নড়েচড়ে বসে মাত্র।

এর অনেক পরে, চা যখন প্রাকৃতিক কারণে সামান্য গরমও থাকতে পারে না, এক চুমুকে ভরা কাপ শেষ করে লাফ মেরে চৌকি থেকে মেঝেয় নামে হীরক। হঠাৎ এই অস্থিরতার যে কোন অর্থ নেই, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে হীরকই তা প্রমাণ করে। তবুও বুকে লাফ দেওয়ার অবশ্যক কেমন যেন নিজস্ব অগোচরেই হীরককে চঞ্চল করে তোলে। প্রতিদিন এই সময়ে ওর এইভাবে শয্যাত্যাগ করতে হয়। অথচ এই মুহূর্তে করণীয় বিশেষ কোন কাজের কথা মনে পড়ে না। নানান বিষয় একসঙ্গে ওকে ভাবায়। ধীরে ধীরে জট খুলতে থাকে বেলা বাড়ার তালে তালে।

বাল বিকেলে পানশিলায় দু পাড়ার দুই দল আবার মারামারি করেছে। এই নিয়ে দুবার। এর আগের বারের সংঘর্ষ অনেকদূর পর্যন্ত গড়াতে পারত, পারেনি যার জন্য সে হীরক। ওর মধ্যস্থতা দু পক্ষ মেনে নিয়েছিল। কমিটি হয়েছিল শান্তির। আর সে কমিটির প্রেসিডেন্ট হীরক। সংঘর্ষের উদ্যোক্তা ঘটনা বিশ্লেষণে বলে হয় যে লাঠি ছুটে আসে, এই রকমই বলে। কিন্তু হীরক এ খবর জেনেছে কিনা সন্দেহ। এ বলে ও যেন ওর অসম্মান, তাই সকলের বিমর্ষ।

চৌকির ধার ধরে হেঁটে ঘরের বাইরে যেতে যেতে আর একবার পরিত্যক্ত বিছানার দিকে তাকিয়ে নেয়। যেন আরও কেউ ওখান থেকে নেমে আসতে বাকি আছে। অথবা কিছু একটা ফেলে চলে যাচ্ছে হীরক। আসলে আশ্চর্য একটা অনুভূতি, অনুভূতিও বলা যায় না, হয়তো ভ্রমবশেই মনে হয় এইসময় থেকেই ছায়ার মতো কি একটা ওর অনুগামী হয়। এমনই এক অস্পষ্ট বস্তুর অস্তিত্ববোধ ওকে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে যতক্ষণ না বাথরুমের বাইরে জল-কলের কাছে ও এসে পৌঁছতে পারে। ছায়াটা মিলিয়ে যায়। আশ্বস্ত হয়ে দ্রুত ভুলে যায় হীরক। বলা বাহুল্য বারান্দায় উঁকি মেরে দ্যাখে খবরের কাগজ এলো কিনা। তখনই শুনে বুঝতে পারে এই-মাত্র বারান্দায় ছুঁড়ে দেওয়া কাগজখানা আছড়ে খেয়ে পড়ল। কলকলা থেকেই 'দাঁড়াও' বলে হেঁকে বারান্দায় আসে হীরক। হকার ছেলেটি ভুমিকে পা ঘষে ঘষে সাইকেল খানিক পিছিয়ে এনে বারান্দার সামনে দাঁড়ায়। 'এত দেরি হলে চলবে না।' বলে হীরক। 'আপনিও যদি এরকম বলেন হীরকদা—জানেন তো সবই।' ছেলেটি এর বেশি আর কিছু না বলে চলে যায়। হাসিমুখে না গম্ভীরমুখে বলে গেল তাও বোঝা হল না। কেন বলল তাও একেবারে স্পষ্ট নয়। হীরককে পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য জানতে হবে অথবা জানে, ছেলেটির দাবী অথবা স্বীকৃতিকে প্রসন্নমনে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পানশিলায় ঘটনা ওকে ভাবিয়ে তোলে। গণ্ডগোল, ও তার ফলে হত-আহতের সংখ্যা আপাতত কোন বিষয় নয়। ওদের এই অব-ছেলাকেই হীরক বড় করে দেখে। গতবারের সংঘর্ষ এবং আজকের এই সকাল এর মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে যা ওকে সংঘর্ষকারী দের কাছে কম মূল্যবান করে তুলতে পারে? ওদের সঙ্গে হীরকের এযাবৎ আচরণে কোন ত্রুটি থেকে গেল কিনা এক মিনিটের মধ্যে তা খতিয়ে দেখে নেয়। ব্রাস করতে করতে অনেক বেশি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ছোট ভায়ের মেয়েটা গেল বছর কদিন এসে এখানে থেকে গেছে। কি দুষ্টুই না হয়েছে মেয়েটা। ওর মা-বাবার দেখাদেখি মেয়েটাও হীরককে 'দাদা' বলে ডাকত। 'নমস্তে দাদা—ভালো তো!' চোখ নাচিয়ে আরও কত কথাই না বলত! হীরক হঠাৎ সামলে নেয় নিজেকে। এইমাত্র ও একবার মুচকি হেসে ফেলেছে। কেউ দেখে ফেলবে এ আশঙ্কায় গম্ভীর হয়ে যেতে হয় তৎক্ষণাৎ। ভায়ের অবুঝ মেয়ের বিগত দুষ্টুমি বর্তমান হয়ে ওকে হাসিয়ে দিয়েছে। এ হাসিতে ওর কোন হাত ছিল না। এখন গম্ভীর। এসময় এতখানি গম্ভীর হওয়ার কথা নয়। আবার কথাও। ওই শিশুটির সঙ্গে যুক্ত ওর মা। যে এখন হাসপাতালে। যুক্ত ওর বাবাও। যে হীরকের ভাই। স্ত্রীর অসুখে ছুটি দিতে নারাজ। হীরকের একবার না গেলেই নয়। বউটা যদি না বাঁচে? তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নেয় হীরক। ওর যেন কিছু করার নেই। আপন ভ্রাতার ভাসা ভাসা উদ্বিগ্ন মুখখানা ওকে পীড়িত করে। দ্রুত অন্য চিন্তায় মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

বাইরের ঘরে একজন দুজন করে লোক আসতে আরম্ভ করে এই সময় থেকেই। হীরকের সকাল কাটে ওই সব মানুষজনের সঙ্গে নানা আলাপে। ওই মানুষগুলি ওর মনে শুধু উত্তাপ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকে না, পিসীমা প্রত্যাখ্যাত ঘরসংসারহীন নিষ্ফল হীরককে চাঙ্গা করে তোলে। বিশাল গাঁথুনিতে এক খণ্ড বাঁকা ইষ্টকের মতো পিসীমা এতক্ষণে হীরকের কাছে নিরুদ্বেগ ও নিঃশঙ্ক। পিসীমার মূল্যবোধ ও হীরকের সামাজিক অবস্থানে দ্বন্দ্ব আজ নতুন নয়। কিন্তু এই দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার সুখ প্রতিদিন সকালে ওর কাছে রোমাঞ্চকর। ধীরে ধীরে যারা বাইরের ঘরে জড় হচ্ছে, পিসীমা তাদের দলে নয়। যার জন্য জড় হচ্ছে তার পক্ষও পিসীমা সমর্থন করে না। একটা মড়া গাছ কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকা এবং একটি মূল্যহীন দৃশ্য তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না—হীরকের সম্পর্কে পিসীমার ভাবনাও একই রকম। এই ভাবনার কথা এমন উৎকণ্ঠায় প্রকাশ করে, হীরক মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে। ভীত হয়। একেবারে ভোরে পিসীমার ওকে অপদার্থ বলে ঘোষণা ও পুনর্শিলার সংঘর্ষকারীদের আচরণ, এ দুয়ে কেমন যেন মিল ছিল, তার সঙ্গে জুড়েছিল ভায়ের বর্তমান দুরবস্থা।

এখন, ওই লোকজনের আবির্ভাবে ভীত হয় হীরক। অতএব চিন্তারও কিছু থাকে না। ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে জামা গলিয়ে দেয় গায়ে। এই ফাঁকে কলেজ জীবন থেকে আজ এই অবস্থায় কেমন করে আসতে পারল, চকিতে একবার তা ভেবে দেখে। কলেজ ইউনিয়নের নেতা কখন যে কলেজ থেকে বেরিয়ে বাইরে-ও নেতা হয়ে উঠল, ঠিক ঠিক সে হিসাব এখন আর মেলাতে না পারলেও কিছু দিনক্ষণ, উত্তেজনা ইত্যাদিকে স্মরণ করতে পারে। এখন ও য়ুনিভার্সিটির কমিশনার। মন দিয়ে পাঠাভ্যাসের ফলে পরীক্ষায় পাশের মতো এই প্রাপ্তিও হীরকের অনিবার্য ছিল কিনা, নাকি এর জন্য ওকে আলাদা কোন পাঠ নিতে হয়েছে তা ওর জানা নেই। শুধু জানে, আর পাঁচটা মানুষের মতো ঘর-সংসার না করে অপরের কল্যাণে নিজেকে অর্পিত করা ওকেই মানায়। এ কাজের ও উপযুক্ত।

পিসীমার কথা স্বতন্ত্র। সে অস্বীকৃতিতেও আন্তরিক। কিন্তু কারো কারো গাত্রজ্বালা ওকে ক্ষুব্ধ করে। এই জ্বালার কারণ কি তা জানলেও কখনও প্রকাশ করে নি। নেতৃত্বের অনেক দায়। বন্ধুজনেরা যখন বলে, 'তুমি দেখছি বিধানসভা পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বে না হীরক', কিংবা 'বেশ গুছিয়ে নিলে—কি বলো?', তখন কিছু বলার থাকে না। তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে একবারেই যে অনেক ভোটে জিতে কমিশনার হতে পারে, চারপাশের ভালোবাসা ছড়িয়ে দেখলে তার কাছে বিধানসভা এমন কিছু দূরের বস্তু নয়। এই শ্লেষ আসলে ওকে আরও খাতে করে তোলে, বিশিষ্ট করে দেয়। ঈর্ষা, জ্বালা, নষ্টামি এই সব অকথাকে তুচ্ছ করেই ওকে চলতে হবে। সাবধানে। কেন না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কিছু অভাব নেই। আসল ভয় তাদেরই। কেন ভয়, সে বিষয়ে ভেবে ওঠার সময় থাকে না। বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নোট বুকখানা টেবিল থেকে তুলে নেয়।

সুবল কাকাকে এক সময় দেখে হাসত হীরক। মোটা একটা ডায়েরিতে যাবতীয় বিষয় লিখে রাখতেন। বন্ধুদের হীরক বলত, 'ওই ডায়েরিটা হ'ল কম ওজনের বাটখারা। ওটা আছে বলে ঘাঁটি দোকানী মনে হয়। ফাঁকিটা ধরা পড়ে না।' সুবল কাকা মারা গেছেন একেবারে হঠাৎ। মাত্র ছাব্বিশটা ভোট পেয়েছিলেন শেষ নির্বাচনে। কথা ছিল ছাব্বিশ হাজার পাওয়ার। এত সহস্রের বিয়োগে তিনি আর বেশিক্ষণ বাঁচতে পারেন নি। পঞ্চাশের আতিকায় হৃদপিন্ড এক ধাক্কায় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

হীরক একটু ম্লান হয়। দুই ঠোঁট বুজে আসে। নোট বুকের একটা কোনা মাথায় ঘষতে ঘষতে সুবল কাকাকে অতিক্রম করার উপায় ঠাওরায়। এবং অপেক্ষিত চেনা সারথীদের সামনে এসে দিনের প্রথম হাসি হেসে ফেলে। 'বলুন—কেমন আছেন সব।' অথবা 'নিরূপদবাবু যে—এত যোগা হলেন কি করে?' অভ্যস্ত হাসি হাসে। অভ্যস্ত হওয়ারও একটা মাত্রা আছে। এই মাত্রা সম্পর্কে হীরক সচেতন। তাই প্রতি-দিনই চেষ্টা হাসি যেন আন্তরিক হয়।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দুষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৬৭-২৩৫৯।

তার জন্য চেষ্টা করতে কম উদ্যম নেয় না। নিজের হাসি নিজে দেখতে পায় না, তবে কোন কিছুর অভাব হলে যে ধ্বনের অস্বস্তি বোধ করবার কথা, তা-ও টের পায় না। তাই নিশ্চিন্ত থাকে।

সকলের সব কথা মন দিয়ে শোনে। নোট নেয়। ভ্রূ কোঁচকায়। দরকার মতো গম্ভীর হয়, জোরে কিংবা আস্তে হাসে। বহু সন্তানের বিপন্ন জননী স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপে বিপাকে পড়েছে। বিনা অর্থে চিকিৎসা চাই। 'একটা কিছু উপায় করুন হীরক বাবু—নইলে যে পথে বসবো।' গুছিয়ে এমন একটি বাক্য ব্যবহার করতে হয় যা আশ্বাস ও নিরাশ্বাস দুই অবস্থাকেই স্পর্শ করে, কোনটাকেই নিশ্চিত করে না। হাসপাতালের ডাক্তার রোগীর মৃত্যুতে যেমন অবিচল ভংগীতে শবদেহ ঢেকে দিয়ে পরবর্তী রোগী পরীক্ষা করে, 'আচ্ছা—দেখা যাবে' উক্তির পর আরেকজনের কথা শুনতে প্রস্তুত হয় হীরক। সম্ভ্রান্ত পিতার অবিবাহিতা কন্যা গর্ভবতী। সে-ও হীরকের শরণাপন্ন। 'আপনি বলুন হীরকবাবু—এরই নাম কি পলিটিক্স্—আমরাও তো স্বদেশী যুগে—'

'এর মধ্যে পলিটিকস্ এলো কি করে?' হীরক প্রশ্ন করে।

'যে ছেলেটি ক্রিমিনাল সে তো পার্টি করে—এখন উল্টে আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে—আমি আর মেয়ে নাকি ক্লিক্ করে তার নাম বলছি। একটা কিছু সুরাহা করুন প্লিজ।'

'অ্যাবরসান করালে তো পারতেন?'

'কথাটা বলতে পারলেন হীরকবাবু? বাপের দিকটা-ও বুঝলেন না? সংসার করলেন না বলে এতটা অবিবেচক হতে বলবেন না আমাকে।'

দু-একটা মুহূর্ত গুম্ হয়ে থাকে হীরক। ওই সংসার বস্তুটি কি সত্যি ওর অজ্ঞাতে থেকে গেছে? এটা কি কোন প্রশ্ন হতে পারে? অনেকের সংসার বুকে বয়ে বেড়ানো তো মহৎ কিছুর আভাস দেয়। পৃথক ঘট সাজানো ওর পক্ষে শোভন হত না। পিসীমার সম্পদ হয়েই থাকতে হত। আর ওইখানেই ইতি। কথাটা গায়ে মাখে না। সহজ স্বরে বলে, ঠিক আছে—আপনি যান। আমি কথাবার্তা বলে দেখি।'

ক্লায়েন্ট ব্যক্তি আগের উক্তির জন্য লজ্জিত হবার ভান করে। মাথা নিচু করে বলে, 'আমার দোষ অস্বীকার করছি না। আমার মেয়েকে সামলাতে পারি নি। তাই বলে এত বড় অবিচারটা আপনি থাকতে যেন না হয় হীরকবাবু। আমি বিপদ্গ্রস্ত। একটু ভেবে দেখবেন।'

বয়লার ফ্যাক্টরিতে একজন টাইপিস্ট নেবে হীরকদা। জানেন তো—বাবা গেল মাসে রিটায়ার করেছে—আমার চাকরি না হলেই নয় এখন।'

অতশত জানে না হীরক। কোন্ ছেলের কোন্ বাবা বেবাক হয়ে গেল, সে নির্দিষ্ট সংবাদ ওর রাখার কথা নয়। সব মিলিয়ে গোটা বিষয় ওকে অহরহ ভাবায়। পৃথক কিছুর সেখানে স্থান হয় না। তবু বলতে হয়, তুমি কাল সকালে এসো একবার—আমি কথাবার্তা বলে দেখি।'

'হবে তো হীরকদা?' দুঃখবোধ করে হীরক। তবু মুচ্কি হাসে। চেষ্টা করে দেখবো। বাট তাহলে এসো।'

'আপনি চেষ্টা করলে হবে হীরকদা।'

এটাই ওর আসল আকাঙ্ক্ষা। যথার্থ প্রাপ্য। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন অঘটন হয়ে যায় সব। এই এখন যেমন হল। হীরক এক পলকে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ভেংগে পড়তে চায় শরীরখানা। পরবর্তী ব্যক্তির উপস্থিতি ওকে বাঁচিয়ে তোলে। আবার খাড়া হয়ে ওঠে কথায় কথায়।

সকলেরই দুঃখ। সুখের কথা বড় একটা বলে না কেউ। একদিন হয়তো এই দুঃখগুলো থাকবে না। হীরক-এর সাধনা সফল হবে। কিন্তু তখন ওর করার মতো কাজ থাকবে তো? ফাঁসির নিয়ম উঠে গেলে জল্লাদ তার চাকরি খোয়াবে। সকলের দুঃখ মোচন হয়ে গেলে হীরকেরও একই দশা।

সকলে বিদায় হলে ঘরে ঢুকে একা একা হাসতে থাকে। জল্লাদ আর দুঃখমোচন ওকে হাসায়।

'মাথাটাও গেছে নাকি?' পিসীমা ঘরে ঢোকে। যেন ওইটাই যেতে বাকি ছিল। আর সব ঠিক আছে। পিসীমার কথায় আরও হাসে হীরক।

তোর এই খাতাখানা আমি একদিন পুড়িয়ে ফেলবো হতভাগা। কি ছাইপাঁস লিখিস্ ওতে?' ডায়েরী নিয়ে পড়ে পিসী।

'ও তুমি বুঝবে না।' হীরক উড়িয়ে দেয়।

'ওতে আবার বোঝার কি আছে? ওখানে গিয়ে বলবি কি শুনি? ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে যে।' হাতের মুদ্রায় স্বর্গ বা নরক দেখায় পিসীমা।

বিব্রত হীরক কথা বাড়াতে চায় না।

স্নান করতে করতে আবার কচি মেয়েটার মুখখানা মনে পড়ে। বেশ লাগত পাকা পাকা কথা শুনতে। বন্ধ বাথরুমে হীরক এবার নিজের মুগ্ধ হাসি টের পেয়েও সাবধান হয় না। অমন সুন্দর মেয়েটার মা আজ রোগশয্যায়। ফুসফুসে অপারেশন। না-ও বাঁচতে পারে। যদি না বাঁচে— মাথায় জল ঢালে তাড়াতাড়ি। বুক ধুয়ে যায়। বেঁচে উঠুক্ ভালোর বউ। তাহলে ও রক্ষা পায়। একটি মাত্র মানুষ, হোক্ তার আত্মীয়া, একটিমাত্র পরিবার, হোক্ তার ভাবের—তবু তা নিয়ে মনে মনে এত গবেষণা ওর বৃহত্ পরিমণ্ডলকে ম্লান করছে। এই দুঃখ থেকে ও রেহাই পায় যেন।

স্নান সেরে সেদিনকার চিঠিপত্রগুলো পড়ে নেয় একবার। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে সারাদিনের একটা ছক বানিয়ে যখন পথে নামে সূর্য তখন মাঝগগনে আসতে এক-আধ ঘন্টা বাকি থাকে। মাঝখানে জীপের সুবিধে ছিল। ইদানীং তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে। সমাজের কাজ সমাজের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গে পায়ে পায়ে হেঁটে সারতে হবে। হীরক প্রাণভরে নিঃশ্বাস হাসে। পরশপাথরটি দখলের জন্য কত না কলাকৌশল! নিয়মের কর্তা ওকে যেন বুদ্ধিতে হারিয়ে দেয়। বুদ্ধির এই প্রতিযোগিতায় হীরক বুঝি ফেরে উঠবে না শেষ পর্যন্ত।

রাস্তা একটু ফাঁকা থাকে এই সময়। ঘাড় ঘুরিয়ে ডান বাঁ দেখে। ছায়ার মতো কি যেন একটা ওর সঙ্গে সঙ্গে চলে। সকালে শয্যা থেকে পতিত সেই বোধহীন বস্তুর মতো। ওটা যে ঠিক ছায়াই তা-ও জোর দিয়ে বলা মুশকিল। অথচ অনুভব করে সেইরকমই। ও হাঁটে। ছায়ার মতো অস্পষ্ট কি একটা-ও যেন হাঁটে। তবে গা ঘেঁষে নয়। খানিক তফাতে। ওই ছায়ার মতো অপরিচিত পদার্থটি হীরকের দরকার কি না তা ও জানে না।

আর জানে না, ভবিষ্যতে ওই বিদগ্ধ ছায়াটি থাকে বলেই কোল্ড স্টোরেজের সুরক্ষিত ফলের মতো পচতে পারে না হীরক। কিন্তু ক্ষয় হয় যথানিয়মে।

আর ওর শীতল দেহখানা ছায়াকে দূরে রেখে কিছুতেই পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

প্রকাশিত হলো!
অ্যাল্ফা-বিটা পুরস্কারপ্রাপ্ত
প্রফুল্লকুমার সিংহের
নতুন উপন্যাস
জনপদ ৬
এযুগের কসমোপলিটন সমাজের স্বার্থ, লোভ, হিংসা, রিরংসার প্রাণবন্ত পটভূমিকায় সযত্নে বিধৃত অসাধারণ গতিময় এই উপন্যাসে সুখস্খলিতের সহজ পথের সন্ধানে দিকভ্রান্ত নানা স্তরের মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র সুপরিস্ফুট হয়েছে।
অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্স্ লিঃ
৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০১২

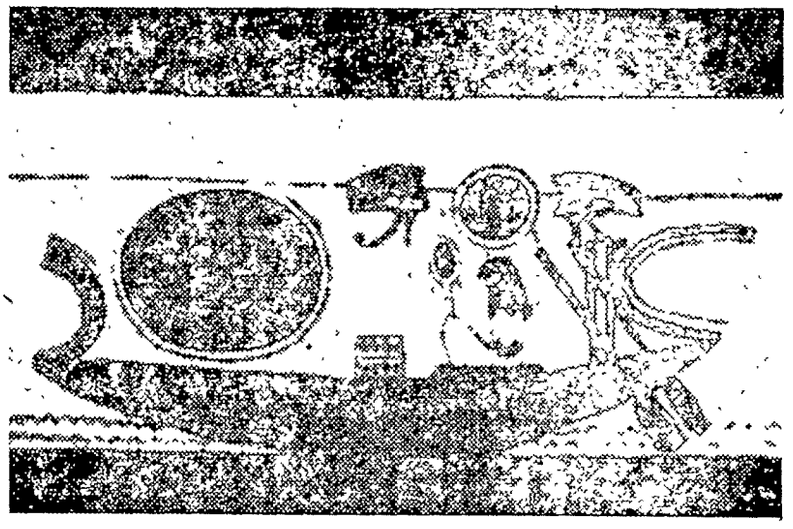

বাটিক প্রদর্শনী

অঙ্গনা

সম্প্রতি আমাদামি অব ফাইন আর্টসে হ্যান্ডিক্র্যাফটস সেন্টার বাটিকের এক মনোরম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণকারী বাণী ভৌমিক, শান্তনু পোদ্দার ও প্রবীর রায় এ তিনজনের কেউ কোন বিদ্যায়তনে শিক্ষাগ্রহণ করেন নি, অথচ তাঁদের চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠতা, তুলির স্বচ্ছন্দতা, রং-এর সুষ্ঠু নির্বাচন দেখে মনে হয় দীর্ঘদিন ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভ্যাসের ফলে তাঁরা এত পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। একমাত্র বাণী ভৌমিক ছাড়া অপর দুজন শিল্পী বয়সে তরুণ, সদ্য বি-এস সি পরীক্ষা দিয়ে মাত্র চার মাসের সময়ের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় প্রদর্শিত জিনিসগুলি তৈরি করেছেন। প্রদর্শনীতে বাটিক প্যানেল, শাড়ী বিছানার চাদর, টাই-ডাই শাড়ী, মাথার রুমাল প্রভৃতি সব মিলিয়ে একশো পঁচাত্তরটি জিনিস ছিল।

শ্রীমতী ভৌমিক ছাড়া শ্রীপোদ্দার ও রায় বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য হাতের কাজের দিকে নজর দিয়েছেন। এই তাঁদের প্রথম প্রদর্শনী। এতে শুধু বেকারত্ব ঘুচানোর বাসনা নয়, সেই সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে সুপ্ত শিল্প-চেতনা। এই প্রদর্শনী দেখে মনে হয়, উদ্যোক্তারা পর-পর কয়েকটি প্রদর্শনী করে নিজেদের সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন।

প্রদর্শিত বাটিকের প্যানেলগুলির মধ্যে দেশী-বিদেশী নানা দেশের প্রভাব পড়েছে, কোথাও বা চড়ান্ত ভারতীয়, কোথাও বা অ্যাবস্ট্রাক্ট আবার কোথাও ইজিপসনীয় আর্টের প্রেরণায় শিল্পীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। প্যানেল-গুলির মধ্যে 'দি টাইম অ্যান্ড হিজ মিরর' ছবিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবিটির ফিগারের প্রোফাইল মুখ, সামনে দেহ ও নৌকার ছাঁচ ব: গড়ন ইজিপসিয়ান ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। ছবিটিতে মেরুন, সবুজ, কালো রং-এর ব্যবহার ও তাদের ব্যবহারের সমতা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। 'বার্ডস অ্যাণ্ড দি ব্লু' ছবিটিতে বর্ণের সমারোহ নেই। মাত্র আকাশ নীল ও সাদা রং-এর ওপর কালো রং-এর রেখা এমন দৃঢ়সংবদ্ধ যে দেখলে মনে হয় এই নীল আর কালো রংটাই এই একঝাঁক পাখীর একান্ত নিজস্ব। কালো রেখায় সমস্ত কম্পোজিশনটি জম-জমাট। 'রিক্লাইনিং ফিগার' ছবিটিও দর্শকদের মনে থাকবে অনেকদিন। ছবিটির রেখার বলিষ্ঠতা ও উজ্জ্বল রং-এর সমানুপাত লক্ষ্য করার মত। এছাড়া 'দি কুইন রিল্যাকসিং' প্যানেলে হলদে, মেরুন, কালোর সুন্দর প্রয়োগ ছাড়াও সুচিন্তিত ক্র্যাকের প্রয়োগ অতুলনীয়। 'দি সেইন্ট অ্যান্ড হিজ কম্পেনিয়ন'—ছবিটির রেখা ও রং শিল্প দক্ষতার পরিচায়ক।

'মোরগের লড়াই' কম্পোজিশনে পাখী-দুটি পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তব, আধুনিকতার কোন ছাপ নেই। সেক্ষেত্রে ছবিতে যে পাখীর ড্রয়িং দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে মোরগ অপেক্ষা টিয়াপাখীর সাদৃশ্য অনেক বেশী। রাউন্ড কম্পোজিশনে ছবিটি করা হয়েছে। এই রাউন্ড কম্পোজিশন দেখে সাঁচী, ভারহুতের রাউন্ড প্যানেলগুলির কথা মনে হয়।

প্যানেল বা কম্পোজিশন ছাড়াও প্রদর্শনী কক্ষ রং-বেরং-এর বাটিকের শাড়ীতে সাজানো ছিল। বিশেষ করে শাড়ীর 'অভ' রং আনার দক্ষতা দেখে কখনোই মনে হয় না—শিল্পীদের এটা চার মাসের অভ্যাসের ফল। শাড়ী শুধু ক্র্যাক আর রং-এ ভরপুর নয়, ডিজাইনেও দেখা যায় চিন্তাশক্তির অভিনবত্ব। বিছানার চাদর আর মাথার রুমাল সবেতেই শিল্পীদের যথেষ্ট দক্ষ হাতের পরিচয় দেয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

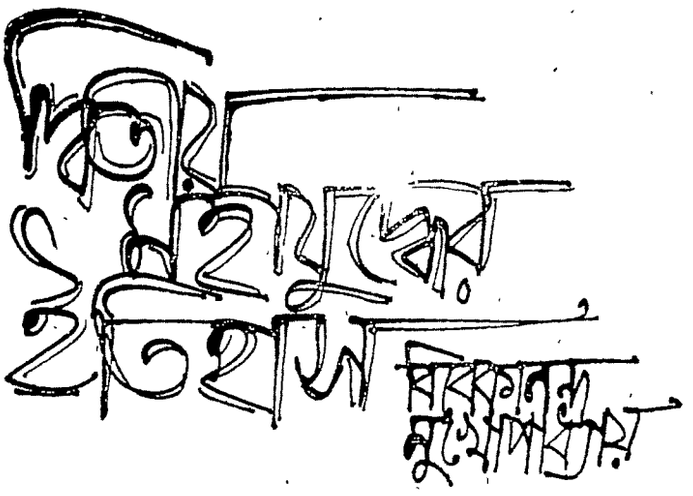

তৃতীয় পর্ব

চতুর্দশ অধ্যায়

'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার'—আমেরিকা

অতলান্তিক বৈঠকে রুজভেল্ট-চার্চিল

১৯৪০ সালের ৫ই নভেম্বর ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট তৃতীয় বারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান দলের ওয়েন্ডেল এল উইলকি, যিনি ১৯৪২ সালে মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করিয়া এবং ৩১ হাজার মাইল ভ্রমণ পথে 'এক বিশ্ব' বা 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' শ্লোগান প্রচার করিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি সেদিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে হারিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রুজভেল্টের জয়লাভ ছিল অসাধারণ। কেননা রুজভেল্টকে নিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভে আমেরিকায় বিতর্কের অবধি ছিল না, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের কোন রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু রুজভেল্ট আমেরিকার এই ট্রাডিশন ভঙ্গ করিয়া তৃতীয় বারের জন্য রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হইলেন—যে ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৪০, তিনি যে বেতার ভাষণ দিলেন, তাতে আগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের জন্য আমেরিকার বিপদের কথা উল্লেখ করিলেন এবং জাতীয় ভিত্তিতে এমন উৎপাদনের জন্য আহ্বান জানাইলেন যাতে আমেরিকা 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগারে' পরিণত হইতে পারে।(১)

রুজভেল্টের সেই বক্তৃতা থেকেই সারা পৃথিবীতে 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' কথাটি ছড়াইয়া পড়িল এবং মিত্র শক্তিবর্গের প্রচার মাহাত্ম্যে কলিকাতাসহ দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করিয়া বসিল। এই প্রসঙ্গেই Lend and Lease বা কর্জ ও ইজারা আইন মহাযুদ্ধের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কেননা, এই আইন অনুসারেই আমেরিকা থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও মালপত্র মিত্র শক্তিবর্গকে সরবরাহ করা হইয়াছিল।

ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে রক্ষা করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী আক্রমণের পর আমেরিকা অবশ্যই সরকারীভাবে যুদ্ধরত হইল, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে এই মহাযুদ্ধে সাহায্য দান ও যোগদান নিয়া প্রচুর বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। কেননা, ১৯১৪—১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ থেকেই 'ইউরোপের নরককুণ্ড' নিয়া আমেরিকায় প্রচণ্ড বিতণ্ডা ছিল। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইউরোপে যখন এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন আমেরিকার জনগণের কাছে সেই ঘটনাটা ছিল এমন অপ্রত্যাশিত যে, বজ্রপাতের মত নিদারুণ, গোড়াতে কোন পক্ষেই মতামত খুব প্রবল ছিল না, কোন এক পক্ষের দিকেই জনমতের সমর্থন নিরঙ্কুশ ছিল না, তবে সেই সময় অনেকেই বৃটিশ বিরোধী ও জার্মান পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্ট উইলসনকে আমেরিকার পক্ষ থেকে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইল এবং আমেরিকার কল-কারখানায় উৎপাদিত বিশাল অস্ত্রসম্ভারের সাহায্যে কাইজারের জার্মানী পরাজিত হইল বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের সময় মার্কিন জনমত মনে করিল যে, ইউরোপীয় (প্রধানত বৃটিশ ও ফরাসী)

(1) The WAR 1939-1945 — By Louis L Snyder USA, 1964 P.239

আশাপূর্ণা দেবীর
বর্তমান সাহিত্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস
ওরা বড় হয়ে গেল ৫৲
সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
ত্রিলোকনাথের পথে ৪৲
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
ময়ূরমহল (নাটক) **৩৲**
জরাসন্ধের
পরশমণি ৫·৫০

শঙ্কু মহারাজের
গঙ্গাসাগর ৮·৫০
মহাশ্বেতা দেবীর
অজানা ৪·৫০
প্রবোধকুমার সান্যালের
তিন কন্যার ঘর ৭॥

বিমল মিত্রের
আমি ১০৲
অনেক লোক অনেক ভাষার অনেক উপন্যাস পড়েছেন, কিন্তু কেউ কখনো কোনো ভাষায় এমন উপন্যাস পড়েননি

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী অমনিবাস ১০৲
তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'ল।
গ্রাহকরা অবিলম্বে বই সংগ্রহ করুন!

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

রাষ্ট্রধুরন্ধরগণের স্বারা আমেরিকা প্রবঞ্চিত হইয়াছে। এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লীগ অফ নেশন্সের সদস্যপদ গ্রহণে পর্যন্ত অস্বীকৃত হইল। সেই থেকে কিম্বা ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত 'সুদীর্ঘ' যুদ্ধবিরতির' সময় আমেরিকা ইউরোপীয় ব্যাপারে বাহ্যত নির্লিপ্ত হইয়া পড়িল এবং নির্লিপ্ততাবাদীগণ (isolatimist) প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলি বার বার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে জড়াইয়া পড়িতেছে, আমেরিকা কেন সেই ব্যাপারে মাথা গলাইতে যাইবে? তারা জর্জ ওয়াশিংটনের উপদেশ স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, ইউরোপীয় মহাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার থেকে আমেরিকার দূরে থাকাই উচিত। কিন্তু আমেরিকার এই 'উদাসীন' মনোভাবের পিছনে কেবল কি ভালোমানুষী ছিল, কিম্বা অন্য কোন নিগূঢ় কারণ ছিল? আসলে 'মনরো ডকট্রিনের (১৮২৩ ডিসেম্বর) কৃপায় গোটা দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল সম্পদ মার্কিন ধনিক ও বণিকদের নিকট বিজার্ভ ফরেস্টের মত সংরক্ষিত মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল, সুতরাং অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া নতুন সাম্রাজ্য সন্ধানে তাদের বাহির হওয়া প্রয়োজন ছিল না।* মূলত এ জন্যই ইউরোপীয় যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে মার্কিন ধনবাদী সমাজের বহু লোক নির্লিপ্ততা বা isolation -এর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত পুরাতন কথা। আসলে রুজভেল্ট যখন প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইলেন, তখন থেকেই জার্মানীতে হিটলার ক্ষমতায় আসীন এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের দৌরাত্ম্য শুরু। রুজভেল্ট ছিলেন উদারতাবাদী এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রগতিশীল ও মানবিক। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই সোভিয়েট রাশিয়াকে প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন (১৯৩৩, নভেম্বর) এবং আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য 'কালেকটিভ সিকিউরিটি' বা যৌথ নিরাপত্তার নীতির উপর জোর দিলেন। হিটলার-মুসোলিনীর দাপাদাপির দিকে তাকাইয়া ১৯৩৭ সালের ৫ই অকটোবর শিকাগোতে 'quarantine of aggressors' নামে তিনি যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়াছিলেন ইতিহাসে তা' স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলিলেন—

দুর্ভাগ্যক্রমে এটা সত্য যে, পৃথিবীব্যাপী অরাজকতা সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। যখন সংক্রামক ব্যাধি দেখা দেয়, তখন সমাজের বাকী জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যাধি আক্রান্ত রোগীদিগকে কোয়ারেন্টাইনে আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ঘটে। যুদ্ধ এইপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি .....এবং এই ব্যাধি থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমেরিকাকে নিশ্চয়ই শান্তির সন্ধান করিতে হইবে। (২)

কিন্তু আসন্ন মহাযুদ্ধের ছায়া যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই মার্কিন সমাজে বিতর্কের ঝড় বহিতে লাগিল। ১৯১৪ সালে যে মার্কিন জনগণ বিস্ময় বোধ করিয়াছিল, ১৯৩৯ সালে তারাই অবাক মানিতে লাগিল। অবশ্য আমেরিকার নাৎসী আগ্রাসন ও হিটলারী বর্বরতার বিরুদ্ধে জনমত যথেষ্ট প্রবল ছিল। তথাপি অধিকাংশই যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী বড় একটা কেউ ছিলেন না। বরং তাঁদের মধ্যে তিনটি সুস্পষ্ট মতের অভিব্যক্তি ছিল—প্রথমত শক্তিশালী ও বৃহৎ একদল ছিলেন isolation বা নির্লিপ্ততার তীব্র পক্ষপাতী। দ্বিতীয় দল ছিলেন নাৎসী শক্তিবর্গের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলিকে যুদ্ধ ছাড়া যথাসম্ভব সাহায্য দানে ইচ্ছুক এবং তৃতীয় দল ছিলেন আমেরিকার নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইবার পক্ষে।

যদিও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ব্যক্তিগতভাবে নাৎসী আগ্রাসনের সম্পূর্ণ বিপক্ষে এবং আক্রান্তদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তবু তিনি সহসা এমন কোন নাটকীয় ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহস পাইলেন না, যাতে আমেরিকা যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে পারে। এ জন্যই পোল্যান্ড আক্রান্ত হওয়ার পর ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, তিনি ঘোষণা করিলেন—'আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকিবে' এবং ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ ১৯৩৭ সালের নিরপেক্ষতা আইনের সর্তগুলি প্রয়োগ করিলেন এবং যুদ্ধরত দেশগুলিকে অস্ত্র প্রেরণ নিষেধ করিলেন। কিন্তু এর ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সই সবচেয়ে বেকায়দায় পড়িল এবং অভিযোগ উঠিল যে, এর দ্বারা কার্যত জার্মানীকেই সাহায্য করা হইবে। ৮ই সেপ্টেম্বর 'সীমাকক্ষ জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করা হইল এবং ৪ঠা নভেম্বর, নিরপেক্ষতা আইনের সংশোধনপূর্বক অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল এবং সদ্য গৃহীত (২রা নভেম্বর) 'ক্যাশ এ্যান্ড কেরি', অর্থাৎ নগদ টাকার বিনিময়ে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুযায়ী যুদ্ধরত দেশগুলিতে অস্ত্র ও মাল সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হইল।* কিন্তু এই সমস্ত অস্ত্র ও মাল যুদ্ধরত দেশগুলিকে আমেরিকার কিনিতে অনুমতি দেওয়া হইল বটে, কিন্তু পরিবহণের ব্যবস্থা সেই সমস্ত দেশকেই করিতে হইত, অন্যথা সমুদ্রপথে জার্মান আক্রমণে মার্কিন জাহাজ মারা যাওয়ার ভয় ছিল।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!
গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুঁড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জ্ঞানষ
১০০% খাঁটি হয়
'ডাঁটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ
জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

* ১৮২৩, ২রা ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো এই মর্মে ঘোষণা দিয়াছিলেন যে, উত্তর আমেরিকার রাজ্যগুলি আমেরিকান গবর্ণমেন্টেরই সংরক্ষিত এলাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই মহাদেশের কোথাও অন্য কোন শাক্তকে কোন ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে দক্ষিণ আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হইবে না।

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩০।

* তখনকার দিনের বাংলা সংবাদপত্রে 'cash and carry' বিধানকে 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল'—এই চলতি বাংলায় অনূদিত করা হইয়াছিল এবং মার্কিন বণিকদের কিছুটা বিদ্রূপও করা হইয়াছিল।

দৃঢ় পদে হাসিখুশি জীবনের দিকে

বাটা জানে এযুগের ছেলেমেয়েদের মন
তাইতো ওদের জন্য এমন নিপুণতার অনুশীলন
করেছেন বাটার কারিগররা। আধুনিক, অতি-আধুনিক,
বনেদি—যে জুতোই ওরা চায়—বাটার দোকানে বিপুল সম্ভার,
অনেক পছন্দের স্বাধীনতা। পায়ের দিকে চোখ পড়ার মতো
অথচ নির্ভয় আরাম। একেই তো বলে দৃঢ় পদক্ষেপে
হাসিখুশি জীবনের দিকে এগিয়ে চলা।

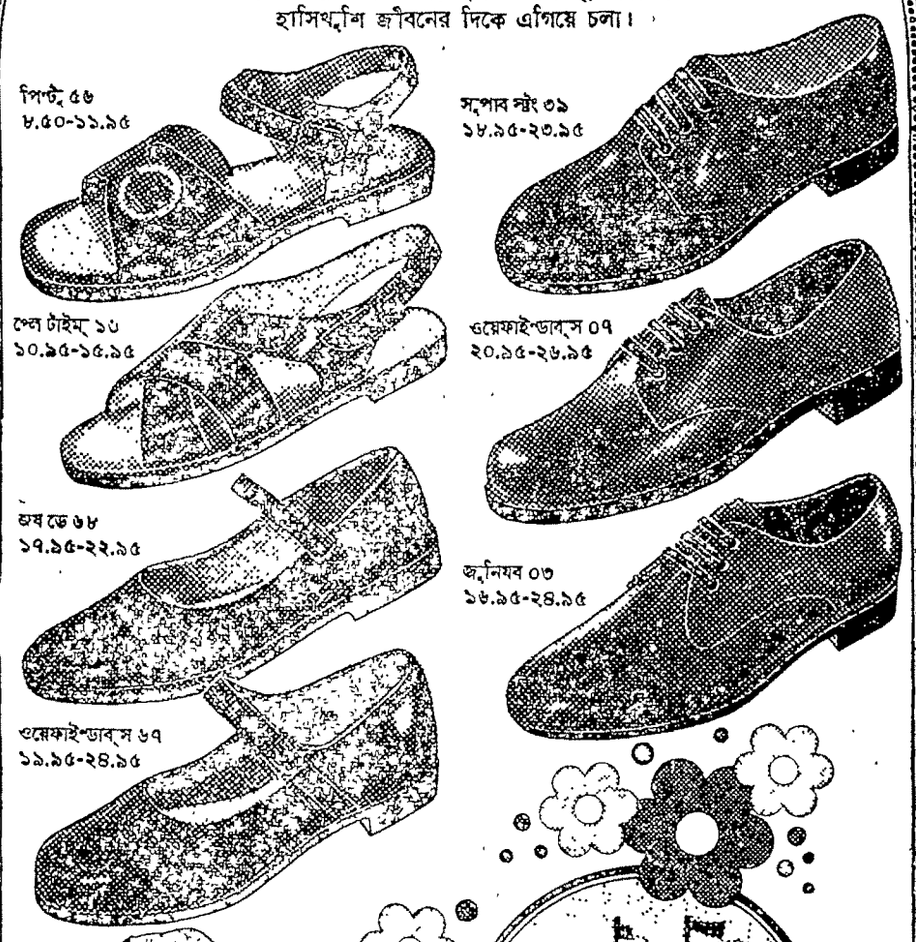

Bata
Bata
Bata
Bata

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনের চূড়ান্ত যুদ্ধে নাৎসী জার্মানীর হাতে পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পরাজয় এবং ফ্রান্সের অতি শোচনীয় আত্মসমর্পণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন থেকেই আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নটি নিয়া উৎকণ্ঠিত গুঞ্জন শুরু হইল। প্রথম মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যোগ দিতে বাধ্য হইলেও বৃটেন জার্মানীর দখলে চলিয়া যাইতে পারে কিম্বা বৃটিশ রয়েল নেভী বা রাজকীয় নৌবহর ধ্বংস এবং অতলান্তিক মহাযুদ্ধের নিরাপত্তার ব্যবধান ভাঙিয়া পড়িতে পারে, এমন দুর্ভাবনা তখন ছিল না। কিন্তু এবার সেই দুর্ভাবনা কালো মেঘের ছায়ার মত দেখা দিতে লাগিল। অতলান্তিক মহাসমুদ্র কি হিটলারকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে কিম্বা নাৎসী জার্মানী কি 'মনরো ডকট্রিন' মানিয়া চলিবে—যে নাৎসীরা এ পর্যন্ত কোন আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রের মর্যাদা রাখে নাই? অথবা দক্ষিণ অতলান্তিক পার হইয়া হিটলারী দস্যুদল পশ্চিম গোলার্ধেও হানা দিবে? লাতিন আমেরিকায় তো ইতিমধ্যেই নাৎসী প্রচারকার্যের বান ডাকিয়াছে। যদি অক্ষ শক্তিবর্গ জয়ী হয়, তবে শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে কি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একা ডিকটেটরদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে না?

ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া আমেরিকার রাজনৈতিক মহল, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, রাস্তাঘাট, এমন কি পল্লী ও জনপদ পর্যন্ত মুখরিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বিতর্ক দেখা দিল এবং জনমত প্রধানত দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল—Interventionist এবং Isolationist কিম্বা হস্তক্ষেপকামী ও নির্লিপ্ততাবাদী এবং এই দুইয়ের মতবাদ ছিল প্রায় পরস্পরের বিপরীত। (৩)

জাপান, জার্মানী ও ইতালির আগ্রাসী ফ্যাসিজমের দিকে তাকাইয়া হস্তক্ষেপকামীরা গণতন্ত্র ও সভ্যতা রক্ষার জন্য আবেদন জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত হস্তক্ষেপকামীরা অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে রাজী ছিলেন না, তাঁরা আক্রান্ত পক্ষকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কারণ, তাঁরা ফ্যাসিজমকে ঘৃণা করিতেন।

অপরপক্ষে নির্লিপ্ততাবাদীরা এই ধরনের সাহায্যদানেরও বিরোধী ছিলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, কোন প্রকার সাহায্য দিতে গেলেই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং কেন তারা মিছামিছি ইউরোপের 'ঘরোয়া বিবাদে' নাক গলাইতে যাইবে? প্রথম মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে কি আমেরিকার শিক্ষা হয় নাই? নির্লিপ্ততাবাদীদের মধ্যে এমন বহু লোক ছিলেন যাঁরা জার্মানীর পক্ষপাতী এবং কোনও না কোন কারণে বৃটেনের বিরোধী। এই গোঁড়া রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সেনেটর বাটন কে হুইলার (মন্টানা) সেনেটর জেরাল্ড পি নাই (নর্থ ডাকোটা) লা ফলেতা (La Follette of Wisconsin) ভ্রাতৃদ্বয়, প্রতিনিধি সভার হ্যামিলটন ফিশ (নিউইয়র্ক), বিখ্যাত সংবাদপত্র স্বত্বাধিকারী উইলিয়াম হার্স্ট এবং হার্স্ট (Hearst) সংবাদপত্রগোষ্ঠী এবং শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকার বার্নেস ববাট আর ম্যাককরমিক। সোসিয়েলিস্ট নেতা ও শান্তিবাদী নরম্যান টমাসও এই দলভুক্ত ছিলেন।

এ ছাড়া 'আমেরিকা ফার্স্ট কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হইল। এই কমিটির পিছনে ছিল প্রচুর লোকবল ও অর্থবল। তাঁরা সারা দেশে আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগদান বা হস্তক্ষেপকামীদের বিরুদ্ধে। এমন কি বিপন্ন বৃটেনের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রদর্শনেরও তাঁরা বিরোধী ছিলেন। এই সময় নির্লিপ্ততাবাদীদের পক্ষ থেকে নাৎসী শক্তিবর্গের তে যশকামীরূপে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন Public Hero No I— Charles A. Lindbergh (4)

বৈমানিক চার্লস লিণ্ডবার্গ তখন পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতির শীর্ষে। ১৯২৭ সালে যুবক লিণ্ডবার্গ ছোট্ট একটি এক ইঞ্জিনের প্লেনে করিয়া অসম সাহসিকতার সঙ্গে একাকী অতলান্তিক মহাসমুদ্রের উপর দিয়া না থামিয়া উড়িয়া আসিয়াছিলেন ইউরোপে (—৩৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস)। * সেদিনের বিমান জগতে এই কার্যের জন্য লিণ্ডবার্গ সেদিনের আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় হীরো' বা নায়করূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বার্লিনে স্বয়ং মার্শাল হেরমন গোয়েরিংয়ের দ্বারা 'রাজকীয় সম্বর্ধনায়' আপ্যায়িত হইয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি নাৎসী জার্মানীর যে বিমান শক্তি দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাতে তাঁর ধারণা হইল যে, জার্মানী অপরাজেয়। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪১, লিণ্ডবার্গ 'আমেরিকা ফার্স্ট কমিটির' পক্ষ থেকে নিউইয়র্কে যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি জার্মান বিমানশক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিলেন,—'বৃটেনকে আমরা যতই সাহায্যদানের চেষ্টা করি না কেন, আমরা কিছুতেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিব না। বিদেশী যুদ্ধের প্রশ্নে জাতিকে দুই ভাগ করার অর্থ শত্রুকে সহায়তা করা। আর যুদ্ধ আমেরিকার পক্ষে অনিবার্যও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ১০ কোটির অধিক লোক এই যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী, অতএব গণতন্ত্রের দাবী অনুসারে আমাদের উচিত এই যুদ্ধের বাইরে থাকা।'

কিন্তু আমেরিকার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমস বৈমানিক লিণ্ডবার্গের এই নাৎসী তোষণ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, নির্লিপ্ততা দ্বারা ত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নাই। আমাদের সামনে মাত্র দুটি পথ আছে—হয় আমাদের আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, অথবা যথাশক্তি আমাদের লড়িতে হইবে আমাদের নৈতিক ও আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য।.....

এভাবে নির্লিপ্ততাবাদীদের বিরুদ্ধেও শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে হিটলার ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে জনমতের একটা প্রকাণ্ড অংশ খুব সোচ্চার ছিল এবং তাঁরা নিরপেক্ষও ছিলেন না। উইলিয়াম আলেন হোয়াইট নামক প্রখ্যাত সাংবাদিক যেন 'আমেরিকা ফার্স্ট কমিটির' জবাবে একটা পাল্টা সংগঠন দড় করাইলেন 'মিত্রপক্ষকে সহায়তার দ্বারা আমেরিকাকে রক্ষা করার জন্য।' সারা দেশব্যাপী এই সংস্থা হিটলারবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইল।

(৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩২।

(৪) পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৩৩

* Doubleday's Theyelopedia, 1936

বহু নতুন বিষয় নিয়ে ২৭ শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

বর্ষপঞ্জী ১৩৮০

বাংলা ভাষায় ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট 'ইয়ার-বুক' (তথ্যগ্রন্থ)

গুণ আছে বলেই দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে সমাদৃত হচ্ছে। 'নতুন ভারত' ও 'চলতি দুনিয়ার' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। পঃ বঙ্গ সরকারের সকল তথ্যকেন্দ্রে বর্ষপঞ্জী ব্যবহৃত হয়।

দৃঢ় বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৯ টাকা ৫০ পঃ। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক : এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫/এ, গোয়াবাগান লেন, কলকাতা-৬। ফোন : ৩৫-৪৭৯৭

হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর অন্তরঙ্গ সহকর্মীগণ অবশ্যই অক্ষশক্তিবর্গের আগ্রাসন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪০, তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা খাতে যে ১৮০ কোটি ডলার ব্যয়বরাদ্দ নির্দেশ করিয়াছিলেন, তার সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ১১৮ কোটি ২০ লক্ষ ডলার যুক্ত হইল এবং ১৬ই মে তারিখ তিনি বছরে ৫০ হাজার প্লেন বা বিমান উৎপাদনের নির্দেশ দিলেন।

বলবে ৫০ হাজার প্লেন? সংখ্যাটি সেদিন অনেকের কাছে হঠাৎ আজগুবি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এমন কি লেণ্ড-লীজের বক্তকর্তা মিঃ স্টেটিনিয়াসেরও প্রথম সংশয় উদ্রেক করিয়াছিল। কারণ, এর আগের বছর মাত্র ১২০০ প্লেন তৈরী হইয়াছিল। —(১৯৪৪ সালে প্রকাশিত লেণ্ডলীজ পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তথাপি একথা সত্য যে, ১৯৪০ সালের প্রথম ভাগ থেকে মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমেরিকার কারখানাগুলি থেকে মোট ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬০১টি রণ-বিমান তৈরীর হইয়াছিল। অর্থাৎ বছরে গড়পড়তা প্রায় ৬০ হাজার প্লেন উৎপাদিত হইয়াছিল। (৫)

'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগারের' উৎপাদন শক্তির এটি একটি চমকপ্রদ নমুনা, সন্দেহ নাই।

পশ্চিম ইউরোপে যুদ্ধের সঙ্কট (১৯৪০) যত বাড়িতে লাগিল রুজভেল্ট ততই স্থল, নৌ ও বিমান শক্তি বৃদ্ধির দিকে মন দিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ২০শে জুলাই তিনি ২০০ নূতন যুদ্ধ জাহাজগুলির মধ্যে সাতটি ছিল ক্যারিয়ার এবং যার প্রত্যেকটি ছিল ৫৫ হাজার টনের—নির্মাণের হুকুম দিলেন। অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দুইয়ের জন্যই (কারণ, একদিকে জার্মানী ও অন্যদিকে জাপান) মার্কিন নৌবহরের এই শক্তি বৃদ্ধি। এই সময় মোট প্রতিরক্ষা ব্যয়-বরাদ্দ দাঁড়াইল ২৮০০ কোটি ডলার। রুজভেল্ট চার দফা কর্মসূচীর উপর জোর দিলেন—(১) প্রতিরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি (২) আভ্যন্তরীক প্রস্তুতি (৩) দুই মার্কিন মহাদেশের মধ্যে সংহতি এবং (৪) কর্জ ও ইজারা।

এই সঙ্গে সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্যও ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, মার্কিন কংগ্রেসে এমন একটি আইন পাশ হইল, যার ফলে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ (২১ থেকে ৩৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত পুরুষদের জন্য) প্রবর্তিত হইল। তখনও আমেরিকা যুদ্ধরত নয়। সুতরাং শান্তির সময়ে এমন আইন ছিল অভিনব।.....

(৫) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক পৃষ্ঠা ২৩৬

অতলান্তিক মহাসমুদ্রের পথ বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনের মত ছিল। সুতরাং চার্চিলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রুজভেল্ট মার্কিন নৌবহরকে ৯ই এপ্রিল, ১৯৪১, গ্রীনল্যাণ্ড (নির্বাসিত ডেনিশ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে) এবং ৭ই জুলাই আইসল্যাণ্ড দখলের জন্য নির্দেশ দিলেন। নাৎসী জার্মানীর হাত থেকে এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল না করিয়া উপায় ছিল না। এর ফলে আমেরিকার পক্ষে অতলান্তিকের পশ্চিমাংশে এবং বৃটেনের পক্ষে পূর্বাংশ পাহারা দেওয়ার সুবিধা হইয়াছিল।

এদিকে ৩০শে জুলাই, ১৯৪০, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সংহতি এবং অধিকতর ঐক্য ও আত্মরক্ষার জন্য ২১টি রিপাব্লিকের যে সম্মেলন হাভানায় অনুষ্ঠিত হইল, তাতে মনরো ডকট্রিন আরও কড়াকড়িভাবে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হইল এবং কার্যত লাতিন আমেরিকায় নাৎসী প্রভাব বৃদ্ধি বা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল।

* * *

আগেই বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট অক্ষশক্তিবর্গের আগ্রাসী কার্যকলাপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪১, তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিলেন, ১৯১৭ সালে প্রেসিডেন্ট উইলসন কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতই সেই ভাষণ আমেরিকাবাসীদের নিকট গুরুত্বের বলিয়া মনে হইল। এই বক্তৃতার আরম্ভে রুজভেল্ট ঘোষণা করিলেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক 'অভূতপূর্ব মুহূর্তে' এই বক্তৃতা দিতেছেন—'অভূতপূর্ব (unprecedented) এজন্য যে, এর আগে আমেরিকার নিরাপত্তা বাইরে থেকে এমনভাবে আর কখনও বিপন্ন হয় নাই। যেমন আজ হইয়াছে।' 'চীনা প্রাচীরের আড়ালে আমরা আবদ্ধ হইয়া থাকিব, আর আমাদের সামনে দিয়া সভ্যতার শোভাযাত্রা চলিয়া যাইবে, এমন নীতির বা এমন চেষ্টার আমরা সর্বদাই বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছি।' .....কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ৯৯ বছর ধরিয়া ইউরোপের একটি যুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিম্বা অন্য কোন আমেরিকান জাতির নিরাপত্তা এতটা বিপন্ন হয় নাই। (৬)

রুজভেল্টের এই উপলব্ধি যে কত সত্য ছিল, তার প্রমাণ এই যে, ফ্রান্সের পতনের পর রণপণ্ডিত ম্যাক্স ভার্নার আমেরিকার উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলেন—

> Security is no longer determined by international law, and even less by geography. The new methods of warfare have conquered space

অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নাই। ভৌগোলিক অবস্থানের দ্বারা আরও নাই। যুদ্ধের নূতন পদ্ধতি দূরত্বকে জয় করিয়াছে। (৭)

মার্কিন নৌসচিব মিঃ নক্স ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪১, পররাষ্ট্র কমিটির নিকট বলিয়াছিলেন যে, মানচিত্রের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, ইউরোপের অতলান্তিক মহাসমুদ্রে প্রবেশের মাত্র তিনটি পথ আছে—(১) উত্তর সাগরের পথ, (২) ইংলিশ চ্যানেল এবং (৩) জিব্রাল্টারের পথ। একমাত্র বৃটিশ নৌবহরের পাহারার জন্যই এই পথগুলি এতদিন নিরাপদ এবং সারা পশ্চিমী জগৎ নির্বিঘ্ন ছিল। কিন্তু বৃটেনের পতন ঘটিলে এই সমস্তই নষ্ট হইবে।

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ কর্ডেল হালও এই সময় অনুরূপ সুরে আমেরিকাবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। (৮)

(6) 'The Second Great War — Sir John Hamperton London, 1949, vol 5, P. 1737

(7) Battle for the world — Max Werner London, 1941, P 246

(৮) ঐ পুস্তক—পৃঃ ২৫০—৫১

বেকার বসে না থেকে নিজের চেষ্টায় ঘরেতে কুটীর শিল্প গড়ে তুলুন মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে।

শিল্পের সন্ধানে ১৪·০০

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতে আছে ১০০টির ওপর বিভিন্ন কুটীর শিল্পের ফরমুলা সমেত বিশদ ব্যাখ্যা। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেই সবকিছু করা যাবে।

রকমারি বুক হাউস

৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯; ফোন : ৩৪-৭৫৮৯

অর্থাৎ মার্কিন রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নেতারা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্কটে আমেরিকার বিপদ বৃদ্ধির বাস্তবতা সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হইতেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে রুজভেল্ট নাৎসীবাদকে ঘৃণা করিতেন এবং মার্কিন গণতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষার জন্য ৬ই জানুয়ারীর (১৯৪১) প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় 'Four Freedoms বা চতুর্বিধ স্বাধীনতা' রক্ষার উপর জোর দিলেন, যথা—(১) বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা (২) ধর্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা (৩) অভাব থেকে মুক্তি বা স্বাধীনতা এবং (৪) ভয় থেকে মুক্তি।

কিন্তু কেবল বক্তৃতা দিয়াই এই চতুর্বিধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং এজন্য যাঁরা ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে হাতেকলমে যুদ্ধ করিতেছে, তাঁদের সাহায্য দেওয়া দরকার। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদবাহ জোগান দেওয়া দরকার—দরকার জাহাজ, এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান ইত্যাদি। সুতরাং রুজভেল্টের উদ্যোগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই বিখ্যাত মার্কিনী বিধান Lend-Lease বা কর্জ ও ইজারা আইন পাশ হইল ১১ই মার্চ, ১৯৪১। দুই সপ্তাহ পরেই এই আইন অনুসারে প্রাথমিক পর্যায়ে ৭০০ কোটি ডলার ব্যয়-মঞ্জুরি হইল। অবশ্য নির্লিপ্ততাবাদীরা এই আইনের বিরুদ্ধে খুব চেঁচাইতে লাগিলেন। এমন কি হোয়াইট হাউজের ফুটপাতের সম্মুখে মার্কিনী 'মায়েদের' এক বিক্ষোভ-প্রার্থনার পর্যন্ত অনুষ্ঠান হইল। কিন্তু অক্ষশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে সাহায্যদানের অতি ব্যাপক ক্ষমতা এই আইনের বলে প্রেসিডেন্টের হাতে অর্পণ করা হইল।

> The law empowered the President to manufacture, sell, lend, transfer, lease, or exchange any war material to the government of any country whose defence the President deems vital for the defence of the United States' The President was given complete discretion even to the extent of not requiring any repayment if he did not wish it — (9)

এর মর্ম এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার পক্ষে যে কোন দেশের গবর্নমেণ্টকে সামরিক সাহায্য দান প্রেসিডেন্ট প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, এই আইন অনুসারে প্রেসিডেন্ট সেই সাহায্য দিতে পারিবেন এবং এজন্য তিনি যে কোন সামরিক মালমশলা উৎপাদন, বিক্রি, ইজারা বা বিনিময় করিতে পারিবেন। এমন কি, তিনি ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত পণ্যের জন্য মূল্য গ্রহণ না করিয়াও পারিবেন।...

একথা নিঃসন্দেহ যে, লেণ্ড-লীজ বা কর্জ ও ইজারা আইন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং অজস্র কোটি টাকার সমরাস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের দ্বারা নাৎসী শক্তিবর্গের পরাজয়ে মিত্রশক্তিবর্গকে সহায়তা করিয়াছিল। ইংলণ্ড থেকে উইনস্টোন চার্চিল তো এই আইন পাশ হওয়ার পর একে—

> An inspiring act of faith, a monument of generous and far-reaching statesmanship

বলিয়া উচ্ছ্বসিত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

* * *

অতলান্তিক বৈঠক ও অতলান্তিক সনদ

আগেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মহাযুদ্ধের চেহারা ও চরিত্র পাল্টাইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে দূরবর্তী পূর্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপানের গতিগতিও ইঙ্গ-মার্কিন মহলের খুব সন্দেহ উদ্রেক করিতে লাগিল। সুতরাং এই সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ ও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অবশ্য এর অনেক আগেই চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে নিয়মিত পত্র, টেলিগ্রাম ও সমুদ্রপারবর্তী টেলিফোন

(9) The War — L. Snyder. P.241

দাঁতের ডাক্তারেরা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

যাঁরা নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন, অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

"ফরহ্যান্স টুথপেষ্টের কাছে এবং যে ডাক্তার বোজ এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বলেছিলেন তাঁর কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ..."

—বিভূতি ভূষণ বোস, কলকাতা

"একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আপনাদের বিশ্ববিখ্যাত টুথপেষ্ট আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি। আজ আমার প্রত্যেকটি দাঁত অটুট, মজবুত! ফরহ্যান্সকে আমি সবকিছু থেকে ওপরে ঠাঁই দিই, কারণ এই টুথপেষ্ট একজন দাঁতের ডাক্তারের সৃষ্টি—এই তো বড় কথা।"

—এস্ এন্ চ্যাটার্জি, কোয়েম্বাটুর

(এই প্রশংসাপত্রগুলির প্রতিচ্ছবি (ফোটোস্ট্যাট) জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

ভালোভাবে দাঁতের যত্ন নিতে হলে রোজ রাতে আর সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স তরল অ্যাক্সন টুথব্রাশ ব্যবহার করুন। আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনামূল্যে। অত্যাধুনিক রঙীন পুস্তিকা, "দাঁত ও মাড়ির যত্ন"।

এর এক কপি* পেতে হলে, এই কুপনের সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো, পোস্ট ব্যাগ নং ১০৩৩১, বম্বে ১।

নাম_____ বয়েস_____

ঠিকানা_____

এ-৭

* অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিন : ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালবালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট-এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

যোগে অতলান্তিকের এপার থেকে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। (নৌ বিভাগের সঙ্গে দুইজনেরই জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল এবং রুজভেল্ট নৌ-জীবন খুব পছন্দও করিতেন। এজন্য চার্চিল রুজভেল্টের নিকট প্রেরিত চিঠিপত্রের আরম্ভপ্রসঙ্গে 'Former Naval Person' এই সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার করিতেন।) কিন্তু সাক্ষাৎ আলোচনা ঘটে নাই। অবশ্য এই ব্যাপারে রুজভেল্টের মনে একটু ক্ষোভ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট যখন নৌ-বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি ছিলেন, তখন তিনি একবার লণ্ডনে গিয়াছিলেন এবং একটি ভোজ উৎসবে চার্চিলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। কিন্তু চার্চিল তখনই প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি, তিনি তরুণ রুজভেল্টকে তেমন আমল দিলেন না এবং মনেও রাখিলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে দিনকালের ওলটপালট ঘটিয়া গিয়াছে। রুজভেল্ট এক্ষণে আমেরিকার মত শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রের তৃতীয়বারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট —বেটা ইতিহাসের নূতন রেকর্ডের মত। আর চার্চিল বৃটিশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মাত্র—এই পদমর্যাদায় তফাৎ কাহাকে কেতাবী বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু চার্চিল রুজভেল্টকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অধিনায়করূপে যথেষ্ট সমীহ করিতেন। ১৯৪১ সালের আর্জেন্টিনা বৈঠক থেকে ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা বৈঠক পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং এই দুইজনের সম্পর্ক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। (১০)

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ৪ঠা আগস্ট তাঁর দলবলসহ বিখ্যাত যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যোগে যাত্রা করিলেন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর প্রথম শীর্ষ বৈঠকের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনেকগুলি ডেস্ট্রয়ার অতলান্তিক মহাসমুদ্রে 'প্রিন্স অব ওয়েলস'কে পাহারা দিতে দিতে চলিল এবং এই সমগ্র যাত্রাপথ অত্যন্ত কঠোরভাবে গোপন রাখা হইল। এমন কি, রেডিও বার্তা বিনিময় পর্যন্ত বন্ধ রাখা হইল, পাছে শত্রুর কাছে কোন সাঙ্কেতিক বার্তা ধরা পড়ে। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। বাহিরে প্রচার করা হইল যে, প্রেসিডেন্ট কয়েকদিনের ছুটি উপভোগের জন্য তাঁর প্রমোদ তরীতে যাইতেছেন। কিন্তু পরে এই প্রমোদ তরীটি পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি তাঁর দলবলসহ 'অগাস্টা' ক্রুজারে (রণতরী) গিয়া আরোহণ করিলেন এবং ৯ই অগস্ট, ১৯৪১, নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের অদূরে উত্তর অতলান্তিকের দরিয়ায় তিনি চার্চিলের সঙ্গে মিলিত হইলেন।

(10) Roosevelt & Hopkins—Sherwood USA, 1950 P 425-26

আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মস্কো প্রত্যাগত হ্যারি হপকিন্স 'প্রিন্স অব ওয়েলস' জাহাজে চার্চিলের সহযাত্রী হইয়াছিলেন এবং দুই রাষ্ট্রনেতার বৈঠকে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯ই আগস্ট সন্ধ্যার পর অগাস্টা' জাহাজে চার্চিল-রুজভেল্টের ডিনার বা ভোজসভা অনুষ্ঠিত হইল। সঙ্গে উভয়পক্ষের বড় বড় সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিগণ ছিলেন। যাঁদের হাতে সেদিন গোটা পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল, তাঁদের ডিনার উৎসব কেমন ছিল? 'মেনু' বা খাদ্যতালিকাই কিরূপ ছিল? শেরউড তাঁর মনোজ্ঞ ইতিহাসে সেই সমস্তই উল্লেখ করিয়াছেন—

> Present at the dinner were on the American side Roosevelt, Welles, Stark Marshall, King Arnold Hopkins and Harriman
> On the British side Churchill Cadogane, Pound Dill Freeman and Chevel.
> The menu consisted of broiled chicken, spinach omelet, lettuce and tomato salad chocolate ice cream and a lot of side dishes

না, এই খাদ্যতালিকার উপর চোখ বুলাইলে এমন কিছু হাতি ঘোড়ার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। এমন কি, সেদিনের বিশ্ববিখ্যাত চার্চিল-রুজভেল্টের ডিনারের চেয়ে অনেক বেশী রাজসিক ডিনার বোধহয় আজিকার ফ্যাসনদুরস্ত যুবকেরাও উপভোগ করিয়াছেন।

* * *

অতলান্তিক সম্মেলনে দুই শীর্ষ নেতার বৈঠক থেকেই অতলান্তিক সনদ বা Atlantic Charter রচিত হইয়াছিল। এর প্রথম খসড়া বৃটিশ পক্ষের বা চার্চিলের, কিন্তু রুজভেল্ট বা মার্কিন পক্ষ সংশোধন ও পরিবর্জন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের লক্ষ্য কি, কি কি নীতি বা প্রিন্সিপল অনুসারে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে, সেই সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রনেতা একটি ঘোষণা প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিলেন। ১২ই আগস্ট ১৯৪১, অতলান্তিক সনদ চূড়ান্তরূপে রচিত হইল। এই সনদে ৮টি অনুচ্ছেদ ছিল এবং শেষের অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে এমন কথা ছিল, যেগুলিকে বলা যাইতে পারে পরবর্তীকালের ইউনাইটেড নেশনসের বীজ-তুলা—অতলান্তিক সনদ এই বীজ প্রথম বপন করিয়াছিলেন রুজভেল্ট। (১১)

কিন্তু ৮ দফার অতলান্তিক সনদ কোন মৈত্রীচুক্তি ছিল না, কিম্বা এর কোন

(১১) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৪৩৬—৩৭

মানিক গ্রন্থাবলী

দশম খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। উক্ত খণ্ডে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস ও গল্পগুলি সংযোজিত হয়েছে। নবম খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৪.।। গ্রাহক-মূল্য ১১·২০।।

বনফুল রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। এই খণ্ডে বনফুলের (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সংযোজিত হবেছে।। তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৫.।। গ্রাহক-মূল্য ১২.।।

বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও ছাপার মূল্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়তো বোধ করা যাবে না। এখনও যাঁরা গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁরা ১০.্ টাকা জমা দিয়ে (মফঃস্বলের গ্রাহকগণ মানি-অর্ডারযোগে) আগামী মহালয়া/১৩৮০ মধ্যে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি এখনকার মূল্যেই পাবেন। যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা-১২

পড়েছেন কি?

বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপরূপ কথা কাহিনী—

পেসু বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

স্ত্রী অনেকেই হয়, সহধর্মিণী হয় কজন ৪.৭৫

তরুণ কবি "চক্ষুশূলের"— আজ আমি বেকার ১.২০

পরিবেশক—দে বুক ফোর্স ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। পুস্তকম—শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। সত্যজিত মুখার্জি - ২বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

আইনগত বাধাবাধকতাও ছিল না। এটা ছিল দুই রাষ্ট্রনেতার প্রচারিত (পরে স্ট্যালিন কর্তৃক অনুমোদিত) একটি যৌথ বিবৃতি মাত্র, অনেকটা প্রেসিডেন্ট উইলসন কর্তৃক প্রচারিত (৮ই জানুয়ারী ১৯১৮) ১৪ দফার ঘোষণাপত্রের মত। কিন্তু চার্চিলের মতে অতলান্তিক সনদ এক হিসাবে খুব অভিনব ছিল। কেননা, আমেরিকা তখনও যুদ্ধরত নয়, অথচ যুদ্ধরত বৃটেনের সঙ্গে একত্রে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'নিরপেক্ষ' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যুক্ত ঘোষণায় সম্মতি দিলেন। (১২)

মার্কিন নির্লিপ্ততাবাদীগণ অবশ্য অতলান্তিক সনদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন—বিশেষত 'ধর্মের স্বাধীনতা'র কথা না থাকায়। পরবর্তীকালে ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী যখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে প্রথম ঘোষণাবাণী প্রচার করা হয়, তখন অতলান্তিক সনদ সেই ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং স্ট্যালিন বা সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মতিক্রমেই 'ধর্মের স্বাধীনতা'ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রুজভেল্টের পূর্ব প্রদত্ত (৬ই জানুয়ারী) বক্তৃতার মধ্যে যে 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা'র কথা ছিল, সেই ভাবধারা অতলান্তিক সনদেও প্রতিফলিত হইল। (১৩)

এখানে মূল ইংরাজীতে অতলান্তিক সনদের পূর্ণ বয়ান উদ্ধৃত করা যাইতেছে :

The President of the United States of America and the Prime Minister Mr Churchill, representing His Majesty's Government in the United Kingdom, being met together, deem it right to make known certain common principles in the national policies of their respective countries on which they base their hopes for a better future for the world First Their countries seek no aggran-disement, territorial or other

Second They desire to see no territorial changes that do not accord with the freely expressed wishes of the peoples concerned

Third. They respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live, and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been 'forcibly deprived of them.

Fourth. They will endeavor, with due respect for their existing obligations, to further the enjoyment by all states great or small, victor or vanquished, of access on equal terms, to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic prosperity.

Fifth. They desire to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field, with the object of Security for all improved labour standards, economic advancement and social security

Sixth After the final destruction of the Nazi tyranny they hope to see established a peace which will afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out their lives in freedom from fear and want

Seventh Such a peace should enable all men to traverse the high seas and oceans without hindrance.

Eighth. They believe that all the nations of the world, for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force Since no future peace can be maintained if land sea, or air armaments continue to be employed by nations which threaten, or may threaten aggression outside of their frontiers, they believe, pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such nations is essential They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for peace-loving peoples the crushing burden of armaments -- (14)

(12) The War — Snyder. P. 243
(13) Roosevelt and Hopkins — P. 438-39.
(14) The War — Snyder P 242-43

অতলান্তিক সনদ নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু শেরউডের মতে বৃটিশ সরকারের পদস্থ আফসারেরা গোড়ায় এই বিবৃতিকে একটা প্রচারমূলক ইস্তাহার বা পাব্লিসিটি হ্যাণ্ডআউটের' চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করেন নাই—কিন্তু রুজভেল্ট এই ঘোষণাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন। এর প্রমাণ এই যে, এর সর্ত বা অনুচ্ছেদগুলির ব্যাখ্যা নিয়া চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে মত বিরোধ ঘটিয়াছিল। যখন অতলান্তিক সনদের কথা ঘোষিত এবং এশিয়াতে প্রচারিত হইল, তখন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি উপনিবেশগুলি থেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল যে, অতলান্তিক সনদ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এশিয়া খণ্ডেও প্রযোজ্য কিনা? এই প্রশ্ন এত তীব্র আকার ধারণ করিল যে, চার্চিলকে বাধ্য হইয়া এই সম্পর্কে কমন্সসভায় এক বিবৃতি দিতে হইল (১৫)

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল তাঁর এই সরকারী বিবৃতিতে 'ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যকে' অতলান্তিক সনদের আওতা থেকে বাদ দিলেন এবং ঘোষণা করিলেন--

'অতলান্তিক সম্মেলনে আমরা মূলত ইউরোপের সেই সমস্ত দেশ ও জাতির সার্বভৌমত্ব, স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় সত্তা পুনরুজ্জীবনের কথাই চিন্তা করিয়াছিলাম, যারা এখন নাৎসী লোহজালে আবদ্ধ রহিয়াছে।'

অর্থাৎ চার্চিলের ঘোষণার দ্বারা অতলান্তিক সনদ থেকে ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা লাভের আশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বৃটিশ সরকারের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলেন না। ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪২, রুজভেল্ট ঘোষণা করিলেন—'পৃথিবীর যে সমস্ত অংশ অতলান্তিক মহাসমুদ্রের সীমানাবর্তী অতলান্তিক সনদ কেবল সেগুলির পক্ষেই প্রযোজ্য নয়, সারা পৃথিবীর পক্ষেই প্রযোজ্য।'

অতএব দেখা যাইতেছে যে, রুজভেল্ট চার্চিলের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত ছিলেন না। এমন কি, অতলান্তিক সনদে বর্ণিত 'পৃথিবীর কাঁচামালের বাজার ও ব্যবসায় বাণিজ্য প্রবেশের জন্য কোন জাতির প্রতি বৈষম্য করা চলিবে না এবং সমস্তের সমান অধিকার থাকিবে'—এই ধরনের ঘোষণাতেও বৃটেনের আপত্তি ছিল। তবে, এই বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিন অভিমতের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করা হইয়াছিল, যদিও বৃটিশ মতের প্রাধান্য ছিল। (১৬)

(15) Roosevelt & Hopkins — Sherwood P 440
(16) The Anti-Hitler Coalition— Israeljan P 54.

(ক্রমশঃ)

সাতদিনের শুভাশুভ

(৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর)

গ্রহ সন্নিবেশ : রবি সিংহে, বুধ কন্যায়, শুক্র তুলায়, শনি ও কেতু মিথুনে, রাহু,বৃহস্পতি এবং মঙ্গল যথাক্রমে ধনু, মকর এবং মেষে অবস্থান করছেন।

মেষ : আপনার কর্মক্ষমতা স্বীকৃতি লাভ করবে। শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা থাকলেও কাজকর্ম, আয়, ব্যবসায় ভাল চলবে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৯, ১১ সেপ্টেম্বর।

বৃষ : কলহ, উত্তেজনা এড়িয়ে চলা আবশ্যক। কারণ বিবিধ উত্তেজনায় আপনার মানসিক অস্বস্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। শরীর সুবিধার নয়; পারিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আয় একপ্রকার। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্ম মন্দ নয়। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ: ৮, ১০ সেপ্টেম্বর।

মিথুন : শরীর ও মন ভালই চলবে। শত্রুরা বশ্যতা স্বীকার করবে। পারিবারিক, আর্থিক ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ। ১১ ১৩ সেপ্টেম্বর।

কর্কট : শরীর ক্রমশ ভাল হবে। পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। আয় সুবিধার নয়। ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় আশানরূপ। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৮ সেপ্টেম্বর।

সিংহ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে
শরীর ও মন ভাল

তুলা : বিবিধ ক্ষেত্রে হতাশা; কিন্তু সপ্তাহ শেষে শরীর ও পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। আর্থিক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা ও ব্যবসায়ে বাধার লক্ষণ আছে। কাজকর্ম সুবিধার নয়। মেয়েদের সতর্ক হয়ে কাজকর্ম করা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখ : ৭, ৮, ১২ সেপ্টেম্বর।

বৃশ্চিক : কাজকর্মে সাফল্য, ব্যবসায়ে উন্নতি এবং আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। শরীর একপ্রকার। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ: ১০, ১৩ সেপ্টেম্বর।

ধনু : শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর শান্তিপূর্ণ আর্থিক উন্নতি ও ব্যবসায়ে সাফল্যের যোগ আছে। কাজকর্মে ক্রমশ ভাল ফল পাবেন। মেয়েদের পক্ষে শুভ। শুভ তারিখ : ৭, ১৪ সেপ্টেম্বর।

মকর : শরীর মন্দ নয়। কাজকর্ম আশানুরূপ। কোনও কাজে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর্থিক দুশ্চিন্তা চলবে। ব্যবসায় চলনসই। পারিবারিক ক্ষেত্র

[redacted]

২৮ বছরের আগে অর্থাৎ
সব আগে কর্মস্থলে উন্নতির

প্রশ্নের উত্তর

মানুষ রক্ষিত : হবে না।

অনিমা পাল : প্রতিকূল গ্রহাবস্থানের জন্য এ বছর পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হবে না।

বিমল কর (ঘাটাল) : ৭মস্থ বাহু ও শনির অবস্থিতি দাম্পত্যজীবনে কিছু অশান্তি ঘটাবে।

মীনা দে: ১৩০৮ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রবল যোগ। ভালই হবে।

আখতার হোসেন (চট্টগ্রাম) : মধ্যম শিক্ষিত হবার যোগ। বিদেশ ভ্রমণ যোগ নেই।

সজল আঢ্য (কলি-২৬): আপনার পক্ষে আইন ব্যবসা উন্নতির সোপান স্বরূপ।

চিত্তপ্রিয় গুপ্ত: ৩৩ বছর বয়সের পর ডাক্তার হিসাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

অনল ভট্টাচার্য: মিথুন রাশি। কর্কট লগ্ন।

সাধন দেব : ৫-গ্রে বাহু শনি-মঙ্গলের অবস্থিতি এবং বর্তমানে বাহুর মহাদশা চলায় ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যা বিষয়ে অশুভ।

স্বপন ঘোষ (বেলঘরিয়া): ১৯৭৪ সালে এপ্রিল -জুন মাসের মধ্যে চাকরি পেতে পারেন।

অশোক দাস: ৩৮ বছর বয়সের পর বুধের দশায় আপনার ব্যবসা উন্নতি হবে।

চিত্রিতা মুখার্জি: আপনার প্রশ্ন বুঝতে না পারায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না। ভাল করে প্রশ্ন লিখে পাঠাবেন।

মদন সেন: ১৯৭৩ সালে অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কোনো বৃদ্ধ অস্ত্রপচার সম্ভাবনা আছে।

স্মিতা ঘোষ : আপনার মতে বিবাহ হবে বটে কিন্তু দাম্পত্যজীবনে অশান্তি থাকবে।

অসীম ব্যানার্জী (বালীগঞ্জ): বিচ্ছেদের সম্ভাবনা প্রবল।

[redacted]: ১৩৮১ সালে বিবাহ যোগ
স্বামী সরকারী চাকুরিজীবী

শিশির দাঁ (কলি-৩৬)ঃ আপনার ৬-৭ রতি পীত পোকরাজ প্রয়োজন।

শ্বেতা দত্তঃ কোনো বয়স্ক লোকের সাহায্য পেতে পারেন।

সীতা সেনঃ হতে পারে।

সন্ধ্যা ব্যানার্জিঃ জন্ম তারিখ পাঠাবেন।

কাজল গৃহঃ বিশেষ আশাপ্রদ হবে না।

কৃষ্ণা চ্যাটার্জিঃ এ বছরে পাশের সম্ভাবনা প্রবল।

বি পি (এস পি)ঃ কর্মস্থলে শত্রুতা ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা আছে।

চিন্ময় গাঙ্গুলীঃ উচ্চ শিক্ষিত হতে পারবেন। কোনো রূপ উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরী পাবেন।

প্রবোধ হাঁসদা (মেদিনীপুর)ঃ রবি-বুধের শুভ অবস্থিতি হেতু আইন অথবা হিসাব সংক্রান্ত বিদ্যায় আপনার পারদর্শিতা হবে।

বাণী ভট্টাচার্য (কলি-৫০)ঃ কন্যা সন্তান যোগ বেশী।

শান্তশ্রী মজুমদারঃ চাকরী হবে, কিনা সন্দেহ। ১৩৮০ সালেই বিবাহ যোগ প্রবল।

মনোজিৎ ঘোষালঃ মামলার রায় আপনার বিপক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

প্রকাশ দেবঃ আপনার পক্ষে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

বিকাশ দেবঃ ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার যোগ এবং বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে।

তমাল পোথদার (সলকিয়া)ঃ কর্কট ও রাশি কর্কট লগ্ন।

স্বপন মজুমদার (রাজসাহী)ঃ উচ্চশিক্ষিত হবেন। বিদেশ ভ্রমণ যোগ প্রবল।

কাঞ্চনপ্রভা নস্করঃ জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

শিপ্রা মজুমদারঃ বিদ্যাস্থানে রাহুর অবস্থিতি এবং বর্তমানে প্রতিকূল গ্রহাবস্থানের জন্য পরীক্ষার ফল ভাল হবে না।

বিজন দত্তঃ ১৯৭৪ সালে জুন-অক্টোবর মাসের মধ্যে চাকরি পাবেন।

মৃণাল পালঃ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

কান্তি গুহ (বাবাসত)ঃ স্বাস্থ্য ভালই চলবে। একাধিক প্রশ্ন পাঠাবেন না।

প্রিয়া মুখার্জী (কলি-৩৬)ঃ আপনার আপত্তি থাকায় উত্তর ছাপান হল না। কিন্তু পত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর জানান হয় না।

স্মৃতি দাস ঃ ১৯৭৫ সালে বিবাহ, দাম্পত্যজীবন সুখের হবে।

পলাশ (চাকদহ)ঃ ১৯৭৫ সালে অর্থাৎ ২৫ বছর বয়সে চাকরী পাবেন।

সরজিত গুহঃ বন্ধুদের দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

মিনতি দাশগুপ্ত ঃ গৃহ-ভূম্যাদি হবে, তবে ৪২ বছর বয়সের পর।

স্বপ্না হালদারঃ বিবাহের পর স্বামী সাথে বিদেশে ভ্রমণ সম্ভাবনা আছে।

ভি দত্ত (ইছাপুর)ঃ ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসের মধ্যে কর্মচ্যুত হতে পারেন।

শৈলেন দত্ত ঃ আগামী মে মাসের মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

বিজয় (কলি-৩)ঃ লটারী পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

কৃষ্ণা ঘোষালঃ ২২ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব।

অনুপ দাস ঃ জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

তপন রায় (বারাকপুর)ঃ সম্ভাবনা আছে।

পদ্মলোচন দাসঃ কন্যা রাশি। সিংহ লগ্ন।

তৃপ্তি দত্তঃ মেষরাশি, বৃশ্চিক লগ্ন, ইং ১৯৫০ সাল ৬ আগষ্ট।

দেবু সেনঃ ১৯৭৬ সালে আপনার ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ সম্ভব।

মাখন পাল (বি জি)ঃ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হতে পারবেন। আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

সুশীল মিত্র ঃ ৫-এ কেতুর অবস্থিতি ও রাহুর মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি সন্তান-জনিত দুশ্চিন্তা ঘটাবে।

ইন্দ্রানী গুহেঃ ২৫ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব। স্বামী সরকারী চাকুরে হবে।

শিবানী রক্ষিতঃ বিশেষ সুবিধে হবে না।

নিরঞ্জন গাঙ্গুলী ঃ মামলার রায় আপনার বিপক্ষে যেতে পারে।

ভূপেন্দ্রনাথ আচার্যঃ ৩৮ বছর বয়সের পর (শে+বু) থেকে ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকবে।

রতীকান্ত হাজরাঃ জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

নিলীমা দাসঃ ১৯৭৫ সালে জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

অমিত পালঃ বিশেষ সম্ভাবনা নেই।

বিনতা চ্যাটার্জি ঃ হ্যাঁ।

রাধা ঘোষালঃ স্বামীর কোষ্ঠী প্রয়োজন।

নিতাই ভঞ্জঃ বিদেশ ভ্রমণ যোগ নেই।

তরুণ দত্তঃ আশানুরূপ ফল লাভে বাধা আছে।

প্রফুল্ল দাশগুপ্ত (বাগুইহাটি)ঃ আগামী কার্তিকের মধ্যে পেতে পারেন।

অমিত দেঃ লেখক হিসাবে সুনাম পাবেন কিন্তু পেশা হিসাবে বিশেষ সুবিধা হবে না।

প্রেক্ষাগৃহ

পশ্চিমবঙ্গে হিন্দী ছবির নির্মাণ প্রয়াস

ঊনিশশো তিরিশ ও চল্লিশ দশকে দেবকীকুমার বসুর 'পুরাণ ভকত' থেকে শুরু ক'রে হেমচন্দ্র চন্দ্রের 'ওয়াপস্' 'মাই' সিস্টার', 'সৌগন্ধ' পেরিয়ে কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র হিন্দী সংস্করণ পর্যন্ত প্রায় দু-যুগ ধ'রে নিউ থিয়েটার্স সারা ভারতের চিত্ররসিক দর্শকদের মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল তার বিভিন্ন কালজয়ী হিন্দী ছবি দ্বারা। নিউ থিয়েটার্স ছাড়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী, রাধা ফিল্মস্ প্রভৃতি আরও কয়েকটি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রতিষ্ঠান মাঝে মাঝে হিন্দী ছবি নির্মাণ করেছেন বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতের দর্শককে সেসব ছবি কচিৎই খুশী করতে পেরেছে। নিউ থিয়েটার্স বন্ধ হয়ে যাবার পরে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র মানচিত্র থেকে পশ্চিমবঙ্গের নাম অবলুপ্ত হয়। মাত্র বাঙলা ছবি নির্মাণ করেই পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্প নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার দুরূহ সাধনায় ব্যাপৃত রয়েছে তার পর থেকে। অপর দিক জাঁকজমকপূর্ণ, নৃত্যগীতবহুল, রঙীন হিন্দী ছবি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলের দর্শক সমাজে—বিশেষ করে যুব সমাজে এমন ভাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করছে যে, মাত্র বাঙলা ছবি দেখাবার জন্যে সারা পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ৪৭৫টি চিত্রগৃহের মধ্যে মাত্র ৬০টির আনুকূল্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাঙলা ছবি তার 'নিজ বাসভূমে'ও আজ অনাদৃত। আজ বছরে বড় জোর খান-পঁচিশেক বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করতে পায়।

এ-অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার পথ খোঁজবার জন্যে এই শিল্পে নিযুক্ত শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন; কারণ শিল্পটির বাঁচার সঙ্গে তাঁদের নিজেদের জীবনমৃত্যু অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ওঁদের সঙ্গে এমন কিছু অল্পসংখ্যক চিত্র প্রযোজকও আছেন, যাঁরা অপর সকল ব্যবসায়ের আকর্ষণকে উপেক্ষা করে মাত্র চিত্র-প্রযোজনাতেই ব্রতী থাকতে চান। চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বাঁচিয়ে রাখতে চান ব'লে একাধিকবার জানানো হয়েছে এবং এ-ব্যাপারে তাঁরা একটি উন্নয়ন পরিষদও গঠন করেছেন। এই পরিষদের গুটি দুই-তিন অধিবেশনও হয়ে গেছে ব'লে শুনেছি।

আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র প্রযোজনা শিল্পকে সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখবার দুটি মাত্র উপায় আছে: এক, বাঙলা ছবিকে কাহিনী, অভিনয় ও কলা-কৌশল—এই তিনটি দিক দিয়েই যথার্থ আকর্ষক ক'রে তোলা এবং দুই, আবার নিয়মিত ভাবে হিন্দী ছবি তৈরী করা। এই দুটি উপায়কেই সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার জন্যে চাই (১) চলচ্চিত্রের উপযোগী বলিষ্ঠ কাহিনী, (২) চলচ্চিত্রোপযোগী আকৃতি ও প্রতিভাসম্পন্ন নতুন নতুন শিল্পী, (৩) আধুনিকতম কলাকৌশল প্রয়োগকে সম্ভব করবার জন্যে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সম্বলিত স্টুডিও, অপটিক্যাল্স্-এর কাজ করবার প্রয়োগ কেন্দ্র, রঙীন ও সাদা-কালো—উভয়-বিধ ফিল্ম প্রোসেসিং-এর জন্যে আধুনিকতম ল্যাবোরেটরী এবং (৪) চলচ্চিত্র প্রযোজনা-শিল্পে লগ্নী করবার জন্যে সুবিধামতো

ছবি
নবাগতা ঝুমুর গঙ্গোপাধ্যায় ফটো: অমৃত

শর্তে ও হারে যথেষ্ট অর্থ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে কিছুদিন আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই রাজ্যে যদি কেউ হিন্দী ছবির প্রযোজনা করতে চান, তাহলে সরকার তাঁকে নিম্নেন পক্ষে এক লক্ষ টাকা উৎসাহ-অর্থ (ইন্‌সেন্‌টিভ) প্রদান করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চয়ই জানেন আজ একটি দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া সব হিন্দী ছবিই ইস্টম্যান কলার ফিল্মে নির্মিত হয়। এবং যেহেতু কাঁচা ইস্টম্যান কলার ফিল্মের জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়, সেই কারণে প্রতিটি প্রযোজককে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জামিন দিতে হয় যে তিনি ঐ ছবি থেকে ন্যূনকল্পে সাড়ে চার লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ভারত সরকারকে দেবেন। পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো প্রযোজক যদি হিন্দী ছবি তৈরী করতে চান, তাঁর পক্ষে এই ধরণের জামিন দেওয়া সম্ভব কিনা, এটা ভেবে দেখবার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-ব্যাপারে সেই প্রযোজকের কোনো সহায়তা করতে পারলে ভালো হয়। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, যে কাঁচা রঙীন ফিল্ম ব্যবহার করলে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় না, সেই ওরও কলার ফিল্ম ব্যবহার করলে ত' সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ লোক বলবেন, 'ওরও' কলার ফিল্মের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের চিত্রশিল্পীরা আজও তেমন দক্ষতা অর্জন করেননি এবং আমাদের চিত্রশিল্পীরা বলবেন অন্য কথা। মোটকথা, ইস্টম্যান কলার ফিল্মেরই এখন বাজার এবং তার জন্যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। এই বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যাটা যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো-না-কোনো উপায়ে মেটাতে পারেন তাহলে এই রাজ্যে হিন্দী ছবি নির্মাণের পথ সুগম হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কার, প্রযোজক অরুণ-কুমার রায়চৌধুরী সম্প্রতি তপন সিংহকে দিয়ে এখানে যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে একটি স্টার বর্জিত হিন্দী ছবি তৈরী করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি তাঁকে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে যথোচিত সাহায্য করেন এবং প্রমোদ করের কিছুটা অংশ প্রত্যর্পণ করে তাঁর ব্যয়ভার লাঘব করেন, তাহলে তিনি আধুনিক যুগের প্রখ্যাত লেখক প্রফুল্ল রায়ের জনপ্রিয় রচনা 'আলোয় ফেরা'র হিন্দী চিত্ররূপ দেবার জন্যে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের আবেদন, এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করুন।

রঙ্গনান্দীকার
৫৫-৬৪৪৬ প্রযোজিত
৮ই শনিবার ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
৯ই রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ· এম· ভি·

রেকর্ড প্লেয়ার
রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুব্যবস্থা আছে।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৩৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

চিত্র-সমালোচনা

(১) **বিন্দুর ছেলে** (বাঙলা)—

১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি-প্রাপ্ত, চিত্ত বসু পরিচালিত 'বিন্দুর ছেলে' সবাক চিত্ররূপে সে-যুগে যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সে-কথা বর্তমানের দর্শক সমাজের জানবার কথা নয়। এবং আমরা সেই ছবির সঙ্গে বর্তমানের **এস এস প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন, গুরুদাস বাগচী পরিচালিত 'বিন্দুর ছেলে'র** কোনও তুলনা-মূলক সমালোচনাও করতে চাই না, বর্তমান যুগের দর্শকদের অধিকাংশই কুড়ি বছরেরও বেশী আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটির সঙ্গে আদৌ পরিচিত নন, এই বিবেচনা করে।

প্রথমেই বলি, বর্তমান ছবির চিত্রনাট্যটি গোড়ার দিকে বেশ কিছুটা শিথিল এবং সেই কারণে ছবিটি মনের গভীরে প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়ার্ধের দৃশ্যগুলি ঢের বেশী পারম্পর্যযুক্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। এরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ এই অর্ধ চিত্তকে স্পর্শ করে সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে। চিত্রনাট্য রচনায় বিকাশ রায় মূল কাহিনীকে মোটা-মুটি অনুসরণ করলেও দেখতে পাচ্ছি, তিনি অনেকটি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও সংলাপকে উপেক্ষা করেছেন। অমূল্যর পকেট থেকে পোড়া সিগারেটের অংশ আবিষ্কারকে উপলক্ষ্য করে অন্নপূর্ণা যখন বিন্দুকে মিনতির স্বরে বলে : 'হাজার হোক, সে তোরই ছেলে—'তখন প্রত্যুত্তরে বিন্দু বলে, 'আমার ছেলে নয়, সে-কথা আমিও জানি, তুমিও জান—'। এরও জবাবে অন্নপূর্ণা যখন বলে 'আমি নই, তুই তার মা—আমি তোকেই ত' দিয়েছি, তখন বিন্দুর মুখের সংলাপ : 'যখন ছোট ছিল খাইয়েছি পরিয়েছি। এখন বড় হয়েছে, তোমাদের ছেলে তোমরা নাও—আমাকে রেহাই দাও।'—এই সংলাপটি যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু মাত্র ছোট অমূল্যকে দিয়েই সারা ছবিটি শেষ করায় এই অত্যন্ত আবশ্যকীয়-সংলাপটি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছেন চিত্রনাট্যকার। এর পরে না বিন্দু, না অন্নপূর্ণা—কারুরই কাছে শুতে না পেয়ে অমূল্যর বারান্দার এক কোণে কতকগুলো কাঠ-খড়ের ওপর (এটুকুর কিছুটা এদিক ওদিক ঘটানো যেতে পারে) শয্যা গ্রহণ করে সারা রাত্রি কাটিয়ে দেবার ফলে কার্তিক মাসের হিম লেগে জ্বর হওয়ার ব্যাপারটিও বিন্দুর চরিত্র-চিত্রণের পক্ষে অত্যাবশ্যক ব'লে মনে করি।—এমন আরও বহু পরিস্থিতি আছে, যা দেখানো দরকার ছিল এবং অপর-পক্ষে ছবিতে এমন কিছু পরিস্থিতি সন্নিবিষ্ট আছে, যা বর্জন করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হ'ত না।

ছবির অভিনয়াংশ মোটের উপর ভালো। বিন্দুর ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তী সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন। অভিমানের ভাবটা তিনি অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে সক্ষম। অন্নপূর্ণা বেশে সন্ধ্যারাণী স্নেহপরায়ণ বড়-জায়ের চরিত্রটিকে সার্থক ভাবে পরিস্ফুট করেছেন। বড় ভাই যাদবের চরিত্রটির একটি মাধুর্যমণ্ডিত রূপ দিয়েছেন বিকাশ রায়। এ-ছবিতে মাধবের ভূমিকাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ; চরিত্র-চিত্রণে নির্মলকুমার কোনো ত্রুটি রাখেন নি। এলোকেশীর ভূমিকাটিকে সুযোগ সুবিধা মতো জীবন্ত ক'রে তুলেছেন নীলিমা দাস। তার স্বামী প্রিয়নাথের ছোট্ট চরিত্রটিতে প্রেমাংশু বসু বিশেষ নাট-নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ পাননি। এছাড়া ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (ভৈরব), অসিত-বরণ (বিন্দুর পিতা), পদ্মা দেবী (বিন্দুর মাতা), মেনকা দেবী (কদম), দিবোদ্দু মুখোপাধ্যায় (অমূল্য), তপন ভট্টাচার্য (নরেন), প্রমুখের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ পর্যায়ের। ছবির গান দুখানি অপরিহার্য নয়।

এস এস প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন 'বিন্দুর ছেলে' শরৎ রচনার স্বাভাবিক আবেদন সমৃদ্ধ ব'লেই সাধারণ দর্শককে খুশী করতে পেরেছে।

(২) **ইন্তেজার** (হিন্দী)

ডি-লুক্স ফিল্মস-এর নিবেদন ইউনাইটেড প্রোডিউসার্স-এর ইস্টম্যান কলারে তোলা ছবি '**ইন্তেজার**'-এর ভূমিকালিপি দেখে বিস্মিত হ'তে হয় এই ভেবে যে, এর প্রযোজক মোহন সেগাল প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্টারবর্জিত ক'রে ছবিখানি তৈরী করবার দুঃসাহস অর্জন করলেন কোথা থেকে। আই এস জোহর ছাড়া কোনো পরিচিত নাম ভূমিকালিপিটিতে নজরে পড়ে না।

মালয়ালম ভাষায় পদ্মনকৃত 'আদিম-কল্প' নাকি একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। কিন্তু তার থেকে রূপান্তরিত জি আর কামাত-কৃত

চিত্রনাট্য নির্ভর 'ইন্তেজার' ছবিতে যে কাহিনী বিধৃত দেখলুম, তার মধ্যে আই এস জোহর অভিনীত 'ক্লেশ যোগী' চরিত্রটি ছাড়া এমন কিছু পেলুম না, যাকে অভিনব বা অভূতপূর্ব বলে অভিনন্দিত করা যায়।

শীলা তার বাল্যজীবনে তার মাতাল বাপের দ্বারা তার নিরীহ মাকে অকথ্য ও নৃশংসভাবে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত হতে দেখেছিল। সেই স্মৃতি তাকে পুরুষ মানুষ থেকে দূরে থাকতে শিখিয়েছে। পুরুষের প্রতি তার মন একান্তই বিরূপ। সে তার কৌমার্য বজায় রেখে সংসারের কর্তৃত্ব করে, অবসর সময়ে করে পূজার্চনা। তার ছোট ভাই আনন্দ কলেজে পড়ে এবং বেপরোয়া জীবন যাপন করে। তার বাড়ীতে পর-পর দু'জনের আবির্ভাব হল। প্রথমে এল চন্দা। পল্লীগ্রামের সুন্দরী অনাথা মেয়ে। শীলা তাকে পরিচারিকা নিযুক্ত করল। এর পরে এল সত্যেন—আনন্দের পরিচিত, ধনী ইঞ্জিনীয়ার। তার অকপট কথাবার্তা বিশেষ করে শীলার সৌন্দর্য সম্বন্ধে তার সুস্পষ্ট মতামত শীলাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। সে সত্যেনকে তার নিজের বাড়ীতে স্থান দিতে ভরসা পেল না। তাদেরই বিপরীত এক বাড়ীতে সে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। চন্দার দৈহিক সৌন্দর্য ও চটুল স্বভাব তার প্রতি আকৃষ্ট করল আনন্দকে। আনন্দ তাকে বিবাহ করবার স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে বশীভূত করে নিজের ভোগলালসা চরিতার্থ করল। কিন্তু যখন চন্দা সন্তানসম্ভবা, তখন সে সমস্ত দায়িত্ব এড়াতে চাইল এবং সত্যেনের স্কন্ধে তার পা-পর ভার চাপাবার চেষ্টা করল। এদিকে শীলা ক্রমেই ভিতরে ভিতরে সত্যেনের অনুরক্ত হয়ে উঠছিল এবং প্রকাশ্যে তাকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময়ে সত্যেন সম্পর্কে তার নিজের ভাইয়ের রটিত কুৎসা তাকে বিভ্রান্ত করে তুলল। চন্দার নীরব ভক্ত ছিল শীলার বাড়ীর ভৃত্য রাঘব, যার ডাক নাম হচ্ছে ভোলু। ভোলু সত্যিই সাদাসিধে মানুষ ছিল। সে ছিল চন্দার গোপন প্রেম ও তার পরিণতির নীরব সাক্ষী। আনন্দ ভোলুরই অভিভাবকত্বে চন্দাকে এক নির্জন স্থানে বন্দী করে রাখল। সেখানে চন্দার কোলে যখন এল একটি সন্তান, তখন ভোলুই তাকে পরম স্নেহে লালনপালন করতে লাগল। সত্যেনের চেষ্টায় যখন আনন্দই চন্দার সন্তানের জনক বলে প্রতিপন্ন হল, তখন শীলা ও সত্যেন সমবেতভাবে আনন্দেরই সঙ্গে চন্দার বিবাহ দিতে অগ্রসর হল। কিন্তু চন্দা আনন্দের মতো ঘৃণ্য জীবকে স্বামীত্বে বরণ করতে অস্বীকার করল। এবং তার পরিবর্তে ভোলুর কণ্ঠে মাল্যদান করতে অগ্রসর হল।

অভিনয়ে চন্দার ভূমিকায় রিঙ্কু জয়সোয়ালের স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত চরিত্রচিত্রণ ছবিটির বিশেষ সম্পদ। শীলা বেশে পদ্মিনী কোলাপুরীর সংযত অভিনয় শক্তিপূর্ণ। সত্যেনের ভূমিকায় বলদেব খোসার অনাড়ম্বর অভিনয় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। ভোলু বা রাঘব চাকরবেশী রাকেশ পান্ডে অল্প কথাবার্তা কয়ে চরিত্রটির মাধুর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। জেলফেরৎ দাগী আসামী ও ক্লেশযোগী নামধারী ভন্ড সাধু-পুরুষবেশে আই এস জোহর উপভোগ্য সংলাপের সাহায্যে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করেছেন। তাঁর চেলাবেশে মোহন চটির কর্তব্য ছিল খুব সামান্যই। আনন্দের ভূমিকায় বিশালকে আকৃতি ও সাজসজ্জার দিক দিয়ে যথেষ্টই উপযোগী মনে হলেও তাঁর চরিত্রচিত্রণে যথেষ্ট আড়ষ্টতা ছিল। ভোলুর মা গোরা কাকীবেশিনী চন্দ্রিমা ভাদুড়ীর লাগানো-ভাঙ্গানো চরিত্রচিত্রণটি খুবই স্বাভাবিক। অপরাপর চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পরিচালক মোহন সিং কবীয়ার সংলাপ বহু স্থানেই চমৎকার উপভোগ্য। এম এন মালহোত্রার চিত্রগ্রহণে আছে দক্ষতার সঙ্গে অভিনবত্ব। মিসেস শামিমের শিল্প-নির্দেশনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছবির পাঁচখানি গানই সুরের দিক দিয়ে অভিনব এবং এর জন্যে চিত্রগুপ্ত নিশ্চয়ই প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

ডিলাক্স ফিল্মস নিবেদিত 'ইন্তেজার' দর্শকচোখকে তৃপ্ত করবে নতুন নতুন মুখের সমাবেশে এবং কানকে খুশী করবে সংলাপ ও গানের চমৎকারিত্বে।

(৩) জীবনসুখ (হিন্দী)

১৯৫৭ সালে 'উদয়ের পথে'র খ্যাতনামা লেখক জ্যোতির্ময় রায় তাঁর নিজের রচনা ও পরিচালনা 'কাঁচামিঠে'কে একটি সার্থক চলচ্চিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরই এক সহকারী দেবু সেন ঐ 'কাঁচামিঠে'কেই অবলম্বন করে রঙীন হিন্দী ছবি **'জীবনসুখ'** তৈরী করেছেন এই ১৯৭৩ সালে। এবং বলতে বাধা নেই **সুমন প্রোডাকসন্স** নিবেদিত 'জীবনসুখ' সামগ্রিকভাবে একটি চমৎকার

দয়ারামের শারদীয় অবদান!

যে সাড়ী যে রঙ শুধু আপনাকেই মানাবে শারদোৎসবের দিনে—পছন্দ মত বেছে নিন দয়ারামের বিরাট সাড়ীর মেলা থেকে।

হালফ্যাসানের নূতন নূতন ডিজাইনের সাথে ঐতিহ্যের সমন্বয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ শুধু দয়ারামেই পাবেন।

দয়ারাম এণ্ড কোং

(সাড়ীর রাজা)

জি ১\৫, নিউ মার্কেট,

কলিকাতা-১৩

ফোন ঃ ২৪-১৪৫০ গ্রাঃ রেশমকুটি

পদাতিক
পরিচালনা ঃ মৃণাল সেন
ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, ও শিল্পি

উপভোগ্য চিত্ররূপে দর্শক-অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

পুরাতনপন্থী বাপমায়ের ছেলে ও মেয়ে—শেখর এবং ইভা হচ্ছে উগ্র আধুনিক। তাদের এবং তাদের সঙ্গীদের বাড়ীর মধ্যেই নাচগানের হৈহুল্লোড় বাপমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই তাঁরা হঠাৎ ঠিক করে বসলেন সমস্ত নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে তাঁরা কিছুদিনের জন্যে তীর্থযাত্রা করবেন এবং সেই অনুযায়ী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও ছাপিয়েই সরে পড়লেন। শেখর এবং ইভা আকাশ থেকে পড়ল, যখন দেখল বাড়ীর সামনে হবু-ভাড়াটেদের একটি জটলা। ওরা নানা উপায়ে তাদের বিফল মনোরথ করবার ফন্দী আঁটতে লাগল। কিন্তু যখন সুন্দরী সুষমা এবং সুদর্শন অমিতাভের আবির্ভাব ঘটল, তখনই হল ছন্দ-পতন। শঙ্কর ইভাকে না জানিয়েই সুষমাকে নীচের তলা ভাড়া দিয়ে বসল এবং ইভাও শঙ্করের অজ্ঞাতসারেই নবীন অধ্যাপক অমিতাভকে ভাড়াটিয়া বলে স্বীকার করে নিল। অমিতাভ ও সুষমার মধ্যে হল ঠোকা-ঠুকি। আশ্চর্য!—একই জায়গাতে দুজনের থাকবার ব্যবস্থা করেছে জোচ্চরেরা। কিন্তু শীঘ্রই চারজনের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেল। এবং ওরা পরম সুখে একই বাড়ীতে বাস করতে লাগল—শঙ্কর ও সুষমা এবং অমিতাভ ও ইভা। স্থির হল, যতশীঘ্র সম্ভব ওরা বিবাহিত হবে। খবর গিয়ে পৌঁছুল প্রাচীনপন্থী বাপমায়ের কাছে। ওঁরা এসে পৌঁছুলেন এবং নিজেদের হিসাবে পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে চেষ্টিত হলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ছাড়তে হল পথটা এবং বদলে গেল মতটা।

যদুবংশ
অপর্ণা সেন, উত্তমকুমার ও পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। ফটো ঃ অমৃত

এ ছবিতেও অধিকাংশই নতুন মুখ। বিশেষ করে প্রধান চরিত্র চারটি ও তাদের

সাঙ্গোপাঙ্গো। অথচ শেখর, ইভা, অমিতাভ ও সুষমার ভূমিকায় যথাক্রমে ধীরাজ, নার্গিস বানু আনন্দ চেনি এবং মণিকা একেবারে মাতানো অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে নার্গিস বানু দর্শকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন ইভার ভূমিকায় অশ্চর্য সাবলীল অভিনয় করে। পিতা কাশীনাথ-রূপে অবতীর্ণ নাজির হোসেন তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সু-অভিনয়ের নজীর রেখেছেন এ-ছবিতেও। ধূমল এবং অসিত সেন বংশী ও রামুর ভূমিকায় হাসির খোরাক যোগাবার চেষ্টা করেছেন। চান্দ্রমা ভাদুড়ীকে মায়ের ভূমিকায় খুব বিশেষ কিছু করতে হয়নি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। প্রথমেই দেবব্রত সেনগুপ্তের চিত্রনাট্যটি সুগ্রথিত। খেয়াল নাহবির সংলাপও সুরচিত। এস চক্রবর্তী ছবির কাহিনী অনুযায়ী গীতিকে যথেষ্ট বেগবান করেছেন তাঁর দক্ষ সম্পাদনার সাহায্যে। চুনী চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রান্ত দৃশ্য পরিবর্তনে সঞ্চরণশীল মৎসোব আকোরিয়ম-এর উপস্থাপনা একটি নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। স্বপন জগমোহনের সুরযোজনা যথেষ্ট রসসমৃদ্ধ এবং উপভোগ্য।

সুমন প্রোডকসন্সের 'জীবনসুখ' সত্যিই একটি সুখকর চিত্র।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

কাজললতা ছবির মুক্তি সন্নিকট! অসীম পাল নিবেদিত ও শ্রীমতী শিবানী রায় প্রযোজিত বিবেক প্রোডাকসন্সের 'কাজললতা' ছবিটি বর্তমানে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় মুক্তিপ্রতীক্ষিত। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন বহু সুপারহিট ছবির পরিচালক প্রখ্যাত অভিনেতা বিকাশ রায়। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে ও স্বপ্না দাশগুপ্তা। উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন ছবিটির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করেছেন—ছায়া দেবী, জহর রায়, শ্যামিতা বিশ্বাস, বঙ্কিম ঘোষ, নির্মল ঘোষ, রবীন মজুমদার, সমীরণ সেন, নিতাই রায়, রবী দত্ত, অজন্তা কর ও মিস জে। শুভ চিত্রম ছবিটির পরিবেশক।

বভ্রুবাহন ছবির চিত্রগ্রহণ এগিয়ে চলেছে ঃ মহাভারতের অমর উপাখ্যান অবলম্বনে বিষ্ণু সরকার ও মধু বসু প্রযোজিত মন্দিরা চিত্রমের 'বভ্রুবাহন' ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স ২ নম্বর স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত সংলাপ অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন অসীম পাল। কালীপদ সেনের সুরে ছবিটির চারখানি গানে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখার্জি ও শ্যামল মিত্র। চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিভূতি চক্রবর্তী ও গৌর পোদ্দার। বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবিটির প্রধান বারোকটি চরিত্রে রূপদান করছেন ললিতা চ্যাটার্জি, জয়শ্রী সেন, বাণী ভর্মা, ইন্দ্রজিৎ নাগ, শঙ্কর নারায়ণ, গীতিকা মিত্র ও নবাগতা গায়ত্রী মুখার্জি। মন্দিরা ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

অসতী চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে ঃ শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন 'অসতী' ছবির চিত্রগ্রহণ সামনের সপ্তাহ থেকে নিউ থিয়েটার্সের এক নম্বর স্টুডিওতে শুরু হচ্ছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—বহু সুপারহিট ছবির পরিচালক সলিল দত্ত। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ, অমিয় মুখার্জি ও সন্তোষ রায়চৌধুরী। সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও অপর্ণা সেন ছবিটির নায়ক-নায়িকা। পরিচালক শ্রীদত্ত সম্প্রতি সুন্দরবনে কালিম্পং গিয়েছিলেন ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের লোকেশন দেখবার জন্য। পুজোর পরেই কালিম্পং-এ 'অসতী' ছবির বহির্দৃশ্য গৃহীত হবে বলে ছবিটির প্রচার উপদেষ্টা শ্রীপঞ্চানন জানিয়েছেন। সাহিত্য চিত্রম ছবিটির বিশ্ব পরিবেশক।

মুক্তিপ্রতীক্ষায় 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে হরিষ মজুমদার পরিচালিত কে এল কাপুর ফিল্মসের শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' সত্যিই সত্যিই রূপালী পর্দায় বিশ্বব ঘটাতে আসছে। শহরের রূপবাণী ভারতী ও অরুণা এবং শহরতলির বহু ছবিঘরে ছবিটি পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে মুক্তিলাভের জন্য চিহ্নিত। দম বন্ধ করা গুমোট আবহাওয়ার ভেতরে এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতোই আসছে 'পৃথ্বীরাজ'। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অনাবিল হাসি, আনন্দ ও উপভোগ্যতার এমন নজির বাংলা ছায়াছবির ইতিহাসে বিরল। **বিভূতিভূষণ** মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী, **হেমন্ত** মুখোপাধ্যায়ের সুর এবং লতা অরীত **হেমন্তর** প্রাণমাতানো গান এছাড়া অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সেই সঙ্গে আছে নতুন (অরুন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, সত্যজিৎ

সঙ্গিনী
কাজল গুপ্ত ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।
পরিচালনা ঃ দীনেন গুপ্ত। ফটো ঃ অমৃত

বসু, ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল দত্ত) ও পুরনো (সন্ধ্যা রায়, বিশ্বজিৎ, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বীণা ঘোষ) শিল্পীদের চমকপ্রদ অভিনয়। ছবিটির পরিবেশক কে এল কাপুর ডিস্ট্রিবিউটার্স।

মন যারে চায় : মহামায়া পিকচার্সের 'মন যারে চায়' ছবির তৃতীয় পর্যায়ের চিত্রগ্রহণ গেল জুলাই '৭৩-এর শেষ সপ্তাহে বর্ধমান ও কালনায় সমাপ্ত হয়েছে। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন নিরঞ্জন দে, চিত্রগ্রহণে রয়েছেন নির্মল গুপ্ত, অভিনয়ে রয়েছেন পদ্মা দেবী, দীপক মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, রাজীব মুখোপাধ্যায়, মিতালী মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু ও জলী বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতপরিচালনায় আছেন লক্ষ্মণ হাজরা। সেপ্টেম্বর থেকে স্টুডিওতে দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

মঞ্চাভিনয়

'অতিগে'র সুঅভিনীত দুটি একাঙ্কিকা : আজকের পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার একটি বিশিষ্ট দিক হোল একাংক নাটকের সূক্ষ্ম শৈল্পিক-প্রযোজনা। এ ধরনের নাটকে গভীরতর জীবনবোধ যেমন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তেমনি প্রোজ্জ্বলতর হয় আঙ্গিক পরিকল্পনার চাতুর্য। অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পীরা এই সত্যকেই বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে মঞ্চের আলোয় প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। কয়েকদিন আগে 'অতিগে'র শিল্পীরা মহারাষ্ট্র নিবাস মঞ্চে দুটি একাঙ্কিকা পরিবেশন করে এই নাট্যনিষ্ঠাকেই প্রাণময় করে তুলেছেন। নাটক দুটি হোল 'অরুণোদয়ের পথে' ও 'হিমালয়ের থেকেও ভারী'। দক্ষিণ কলকাতার নাট্যগোষ্ঠী হিসাবে 'অতিগ' যে গৌরব আগে অর্জন করেছে তা আরো ব্যাপ্তি লাভ করলো এই দুটি একাঙ্কিকা প্রযোজনায়।

মেট্রো-তে প্রত্যহ ২॥ ৫॥ ৮॥টায়
তৎসহ মোগমায়া (হাওড়া)

শ্রেষ্ঠাংশে :
তুলসী চক্রবর্তী - কালি ব্যানার্জি

সত্যজিৎ রায়ের **পরশপাথর**
তুলসী চক্রবর্তী

১৯৪৭ সালের আগে অখণ্ডিত ভারতবর্ষের কোন একটি অধ্যায়কে কেন্দ্র করে 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি গড়ে উঠেছে। লেডি গ্রেগরীর রাইজিং অফ দি মুনের ভাবাবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। কোন এক ছদ্মবেশী বিপ্লবী বাউল সেজে কোন এক জাহাজ ঘাঁটি দিয়ে পালাতে যায় এবং ধরা পড়ে এক পুলিশ অফিসারের হাতে। এই অফিসারটি পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীটিকে ধরতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু নাটকটি সংলাপে সংঘাতে মুখর হয়ে উঠেছে সেইখানে, যেখানে বাউলবেশী বিপ্লবী নানা কথায় ও গানে পুলিশ অফিসারের মনে দেশপ্রেম জাগাবার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়া ও সংঘাত। তারই ফলে বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে পারে না, উপরন্তু তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এইখানেই ঘটেছে নাটকের সমাপ্তি।

নাটকটির উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অভিনয়, মঞ্চপরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, ধ্বনি প্রক্ষেপণ সবই যেন একই ছন্দে মিলে গেছে। বাউলের চরিত্রে সাবলীল অভিনয় করেছেন রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তার কণ্ঠে গান হয়েছে অপূর্ব। মঙ্গলময় ঘোষ অসাধারণ অভিনয় করেছেন পুঃ অফিসারের চরিত্রে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ভয় এই দুই অভিব্যক্তিতেই শ্রীঘোষ নৈপুণ্যের নজীর রেখেছেন। অন্য দুটি ভূমিকায় ছিলেন পিন্টু দেব ও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে সুজিত চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত নির্দেশনা।

দ্বিতীয় একাংকিকা 'হিমালয়ের থেকেও ভারী' ১৯৭১-এর অশান্ত কলকাতার একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মহাপুরুষের মূর্তিগুলো কারা যেন রাতের অন্ধকারে ভেঙ্গে দেয়; আর এই মূর্তি ভাংগার ব্যাপারের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এ নাটক। রাত্রে পুলিশের পাহারা ও পুলিশের চা খেতে যাওয়ার ফাঁকে চারটি মূর্তির কথোপকথন নাটকটির একটি উপজীব্য অংশ।

নাটকটি নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন রঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কয়েকটি অসাধারণ মুহূর্ত তিনি মঞ্চে সৃষ্টি করতে পেরেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন কুমার ঘোষ (রামানন্দ) মঙ্গলময় ঘোষ (নরেশ), প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় (তরুণ), শান্তনু ঘোষ (হরিদাস), বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, তরুণ রায়।

ট্যাক্স রিকভারি অফিসের 'ডার্করুম' : সংঘাতমুখর নাটক 'ডার্করুম' কয়েকদিন আগে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হোল রঙমহলের মঞ্চে। মুরারি সেন রচিত এই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নেন শ্যামল বসাক। রহস্যঘন মুহূর্তগুলোকে শ্রীবসাক আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তোলেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন শিবপ্রসন্ন ঘোষ (বিনায়ক), তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবনাথ), অভিমন্যু ভৌমিক (শম্ভু), পরিমল সাহা (নিতাই), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বিশ্বজিৎ), মনোরঞ্জন চক্রবর্তী (অরুণ), সৌমেন চট্টোপাধ্যায় (অশোক), ঠাকুরদাস বড়াল (জগদীশ), নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় (মিঃ সিনহা), রাজীব রায়চৌধুরী (সেন সাহেব), সুলেখা ব্যানার্জী (সুমিত্রা), মালবিকা মুখার্জি (সোনিয়া), মুকুলিকা মিত্র (মিতালী), মিস রেডিনা (বুলবুল)।

১৫ আগস্ট ১৯৭২ সালে 'বারবধূ' নাটকের অভিনয় হওয়ার পর থেকে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে গেল ৫ আগস্ট তিন শততম অভিনয় পূর্ণ হয়।

সাম্প্রতিক নাট্যপ্রযোজনায় বারবধূর অসামান্য সাফল্য ও অভূতপূর্ব জন প্রিয়তা তুলনারহিত। দশক দু ও এক বছরের কম সময়ের মধ্যে 'বারবধূ'র তিন শততম অভিনয় সম্পূর্ণ হয়েছে।

আসছে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩, সন্ধ্যে ছটায় প্রতাপ মঞ্চে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্রের উপস্থিতিতে এক স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবের উদ্বোধকরূপে থাকবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবরঞ্জন দে এবং সভাপতিরূপে থাকবেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়।

এই উৎসবে উত্তরসাধক হিসেবে 'চতুর্মুখ'-এর তরফ থেকে কয়েকজন প্রবীণ নাট্যকার নট এবং নটীকে সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানানো হবে। শ্রীযুক্তা নিভাননী দেবী পুরস্কার বিতরণ করবেন।

চিত্র ও মঞ্চ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের উপস্থিতিতে এই উৎসব আনন্দমুখর হয়ে উঠবে।

বিবিধ সংবাদ

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া—

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়ার জন্ম হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৬৬ সালে সংস্থাটি সমিতিভুক্ত হয় (রেজিস্ট্রীকৃত হয়)। ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়ে পুতুলনাচ ও তার আনুষঙ্গিক শিল্পকলায় মনোনিবেশ করানোই এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আট থেকে ষোল বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সৃজনীশক্তির সন্ধানে প্রতি বছর এই সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যেসব ছেলেমেয়ে এই সংস্থার সভ্যপদ গ্রহণ করে, তাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে অংকন, পুতুলতৈরী, পুতুলনাচের কলাকৌশল, মঞ্চসংগঠন, পরিচালনা প্রভৃতি অত্যন্ত যত্নসহকারে শেখানো হয়ে থাকে। একমাত্র চামড়ার তৈরী 'শ্যাডোপাপেট' ছাড়া প্রচলিত প্রায় সব পাপেটই— ফিঙ্গার পাপেট, গ্লাভস পাপেট, রড পাপেট, ম্যারিওনেটস্ প্রভৃতি এখানে তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনে তাদের নাচানো হয়ে থাকে। ১৯৬৪ ও ৬৫ সালে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারা ভারত পুতুলনাচ উৎসবে যোগ দিয়ে এই সংস্থা উদয়পুর ও বোম্বাই শহরে প্রশংসা অর্জন করে। ১৯৭০ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর সহযোগিতায় 'লিটারেসী হাউস' আয়োজিত এবং লক্ষ্ণৌয়ে অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত পুতুলনাচ উৎসব ও সম্মেলনে' এই সংস্থা 'অলরাউণ্ড বেস্ট পারফরম্যান্স ট্রফি' লাভ করে। ১৯৭০ সালেই এরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র সংস্থা 'পাপেটিয়ার্স অব আমেরিকা' আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল পাপেট ফেস্টিভ্যালে' যোগ দেবার সৌভাগ্য অর্জন করে। এবং উচ্চ প্রশংসিত হয়।

'পরশ পাথর'-এর পুনর্মুক্তি

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত তৃতীয় ছবি হচ্ছে রাজশেখর বসু লিখিত হাস্যরসপূর্ণ কাহিনীনির্ভর 'পরশ পাথর'। এল বি ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশানালের পতাকাতলে নির্মিত এই ছবিটি পনেরো বছর আগে ১৯৫৮ সালের ১৭ জানুয়ারী তারিখে মুক্তিলাভ করেছিল বিভিন্ন বাংলা চিত্রগৃহে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এই একমাত্র হাসির ছবিটি শ্রীরায়ের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক এবং সাধারণ হাসির ছবি—যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সস্তা ভাঁড়ামোতে ভরা হয়ে থাকে, তার থেকে ভিন্ন স্তরের। সে যুগে রসিক দর্শকসমাজকে ছবিখানি রীতিমত অভিভূত করেছিল। প্রধান ভূমিকায় পরলোকগত তুলসী চক্রবর্তী স্মরণীয় অভিনয় করেছিলেন। এই 'পরশ পাথর' সুদীর্ঘ পনেরো বছর পরে মেট্রো সিনেমায় দেখানো হচ্ছে গেল বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর থেকে। বর্তমান যুগের দর্শকদের একটি বৃহৎ অংশ নিশ্চয়ই ছবিখানি দেখেননি। তাঁরা এবং যাঁরা আগে দেখেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ সত্যজিৎ রায়ের প্রথম যুগের পরিচালনার এই ভিন্ন রসের নিদর্শনটিকে দেখবার জন্য নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হবেন।

জীবনসুখ
ধীরাজ ও নার্গিসবানু

* *

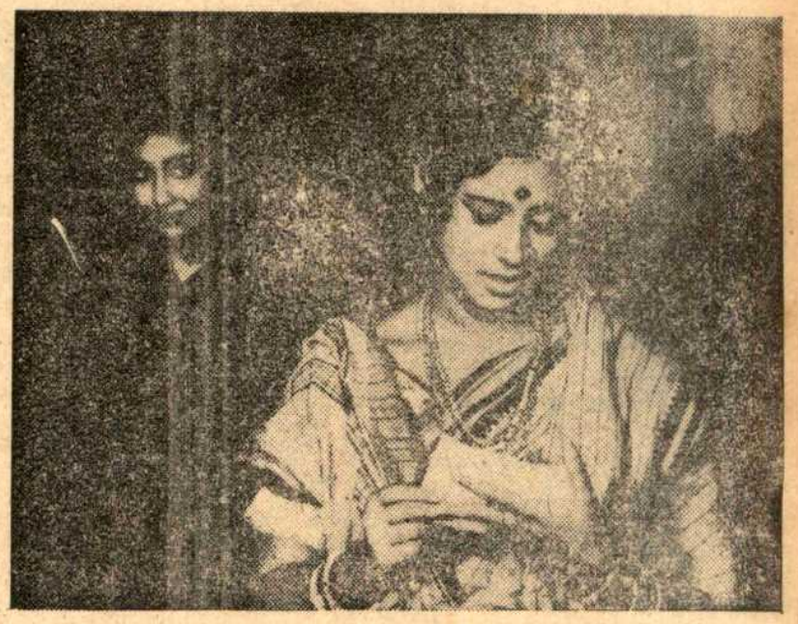

ফাঁক
পরিচালনা : রাণু চক্রবর্তী । জয়শ্রী সেন

জলসা

একটি নমস্কারে

রবীন্দ্রসংগীতের কথা বলছি। বিধাতার দেওয়া প্রতিভার সনদ নিয়ে আসেন যে শিল্পী, তাঁর গান শোনাটা সংগীতরসিকের কাছে অবশ্যই আকর্ষণীয়। কিন্তু এই আকর্ষণ একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে যদি সেই শিল্পীকে শোনা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে—যে মুহূর্তে কথা ও সুরের মিলন-সৃষ্ট-দিব্য অনুভূতিলোকে শিল্পী শুধু আপনাকে হারিয়েই ফেলেন না, সীমিত সত্তাকে অতিক্রম করে পৌঁছে যান এবং শ্রোতাদেরও পৌঁছে দেন—রবীন্দ্রনাথের সকল আনন্দের, উৎস—সেই রূপময়ের দ্বারে যাঁর সঙ্গে মিলন হলে আলোয় আকাশ ভরে যায়।

ঠিক এই রকমই এক স্মরণীয় লগ্নের সৃষ্টি হয়েছিলো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে, যখন রামমোহনের দ্বিশত-বার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রসদনে এক মনোরম প্রভাতী আসরের আয়োজন করেছিলেন ব্রাহ্ম সম্মেলন সমাজ। নানা রং-এ রোমাঞ্চিত বহির্মুখী জগতের চমকরঙিন ইসারায় শিল্পী মন সাড়া দিতে তখনই নারাজ হয়, যখন মন বিছিয়ে যায় গভীর বোধের সেই গৌরবলোকে—যেখানে শোনা যায় অনির্বাণের পদধ্বনি। এই ধ্বনিটি শোনবার জন্যই যুগে যুগে সকল শিল্পী, কবি ও সাধক কান পেতে থাকেন। এই ধ্বনিই সেদিন শোনা গেলো কণিকার গানে, যখন তিনি আত্মনিবেদনের গানের নানান স্তর অনেক সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বেদনা-পাথার পেরিয়ে এলেন তাঁরই চরণে যাঁর জন্য 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনের রাত' (সে-দিনের শেষ গান)। কণিকা স্বধর্মে ভক্তিমতী—, তাঁর কণ্ঠলাবণ্যও অসাধারণ। এর আগে তাঁর গানে শুনেছি মহাকবির বাণী-লালিত্য, হৃদয়ের সঙ্গে কণ্ঠের মিতালী (শ্যামোচন), প্রত্যক্ষ করেছি সুরের যাদুতে স্বতোবিরোধী ভাবাবেগের সমন্বয় (শ্যামা) —কিন্তু, সেদিনের গানে এক গভীর প্রেরণার আলোয় যেন ঝলকে উঠল এক পরম প্রাপ্তির তৃপ্তি, বেদনা দুই-ই। সঞ্চারী অংগে 'এরা সবাই কি-ই বলেগো'র 'কি'-তে, মীড় মূর্চ্ছনা, জমজমা তথা সংগীতের সকল অলংকার মিলে মিশে এক অনুপম সৌন্দর্যানুভূতি নূতন করে আমাদের সচেতন করে দিয়েছে যে আংগিক ও অনুশীলনীর ঐশ্বর্যে কণিকা যে কোনো প্রথম শ্রেণীর উচ্চাংগ সংগীত শিল্পীর সমকক্ষ। আর এই সৌন্দর্যানুভূতির প্রসাদেই তিনি শ্রোতাদের অন্তরে জেবলে দিয়েছেন চিত্ত-শুদ্ধির সেই পাবন-আভা—যে আভা মনকে নিয়ে যায় সংশয় থেকে স্থায়ী প্রত্যয়ে, অস্বীকার থেকে অটল ভগবৎ-ভক্তিতে। আর ঠিক এমনি মুহূর্তেই আবিশ্বাসী মনও মাথা নীচু করে বলে 'হার মেনেছি'।—তাঁর গানেই সেদিন উপলব্ধি করেছি শ্রীঅরবিন্দের সেই বাণীর মর্মার্থ ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রাণের মিলনকে যেখানে তিনি বলছেন 'ফ্রম্ এ্যালেন টু দি এ্যালোন' পাশাপাশি কোমল ও শুদ্ধ পর্দার নিষ্পলক স্থায়িত্বে ছিলো এ ভাবেরই অনুরণন।

রামমোহনের আধ্যাত্মিক দিকটি উন্মোচিত করবার জন্যই বুঝি অশোকতরু গাইলেন রামমোহন রচিত তিনটি ভক্তি-গীতি 'অনেক ত বিষয় কর' 'যারে ভয় করিলে না থাকে অন্যের ভয়', ও 'ভাবো সেই একে'—ভৈরবী, শাহানা ও ইমনে ধ্বনিত হোলো প্রার্থনার বিনতি। দুটি রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে ছন্দের বৈচিত্র্য এনে ইনি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করলেন।

নীলিমা সেন, গীতা সেন ও ঋতু গুহ ঠাকুরতার গানে উদ্ভাসিত হোলো রামমোহন সম্বন্ধে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের সেই প্রণত উচ্ছ্বাস 'দি মোটিভ ফোর্স অফ রামমোহনস অ্যাকটিভিটি, সোস্যাল, পলিটিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ওয়াজ এ ডিপ ফেইথ ইন গড।'

শুধু শান্তিদেব ঘোষের শেষের গানটি ছিলো 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'।

আসন্ন সদারং সংগীত সম্মেলন

উচ্চাংগ সংগীতের শ্রোতাদের বহু প্রতীক্ষিত সদারং সংগীত সম্মেলন শুরু হচ্ছে ১৭ থেকে। চলবে ২৩শে সেপ্টেম্বর অবধি। স্থান—কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহ। শিল্পী—কণ্ঠসংগীতে আছেন সর্বশ্রী সমীর খাঁন, সুনন্দা পট্টনায়ক, ভীমসেন যোশী, সরাফৎ হোসেন খান, পরভীন সুলতানা, মাণ রাই (কার্শিয়াং), কানুওয়াল সিংহ (দিল্লী), আরতি ব্যাগচী পলি চ্যাটার্জি, মনোরমা আহুজা ও প্রারম্ভে সংগীতশাস্ত্রী বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরিচালিত ধ্রুপদানুষ্ঠান। যন্ত্রে ওস্তাদ বিলায়েৎ খান, ইমরাৎ খান, জি এন গোস্বামী, উমাশংকর মিশ্র (দিল্লী), সিদ্দিক খান (লক্ষ্ণৌ), বেগম জব্বর, গায়ত্রী চক্রবর্তী, মহম্মদ সগীরুদ্দিন, কেরামৎ খাঁন, কানাই দত্ত, শংকর ঘোষ, অনিল ভট্টাচার্য, শ্যামল বসু, শংখ চ্যাটার্জি, গোবিন্দ বসু ও আরও অনেকে।

গ্রামোফোন কোম্পানীর পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত আলিবাবা নাটকের রেকর্ডিং-এ ইলা বসু ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি সেতারের আসর

সম্প্রতি সুরংগনার একটি আসরে শোনা গেলো শ্রীমতী কল্যাণী রায়ের একক সেতারবাদনের একটি অনুষ্ঠান। ইনি বাজালেন 'জলধরণী'। ঠাকুরবাড়ীর অমূল্য সংগ্রহের অন্যতম এই রাগটি 'ঝিনঝোটি'র স্পর্শ থাকলেও অনায়াসে একে বর্ষার রাগ বলা যায়, মল্লার ও দেশের সজল মধুর অনুরণনের মিতালীতে এ রাগের রূপাভাস মেলে বলে। আলাপে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য বিলম্বিতের গায়কী সব মিলে এক গমগমে পরিবেশের পটভূমিকায় বর্ষাধারার নৃত্যের মতই বেজে উঠলো ডি টি যোশী রচিত অপূর্ব বন্দেশের গত্। গমক অংশের পরিমিত প্রয়োগে ব্যঞ্জনাগভীর এক ভাবাবেশ রচিত হোলো।

বিশেষ অনুরোধে বাজানো 'পিলু' ও লোকসংগীতের মধুরতা দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হোলো। সংগতে ছিলেন গোবিন্দ বসু।

অনুষ্ঠান শুরু হয় ওস্তাদ শওকত আলি খাঁর তবলালহরা দিয়ে। সাড়ে ৫ মাত্রার আরম্ভ ছন্দের বৈচিত্র্য ও ত্রিতালের রকমারী বোল, কায়দায় ইনি গুণপনার পরিচয় রেখেছেন।

—চিত্রাংগদা

বাঙলাদেশের ছবি

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কতজন চলচ্চিত্র পরিচালক আছেন, কাজ করছেন, কাগজে নাম ঘোষণা করছেন—চলচ্চিত্রের সঙ্গে যারা সক্রিয় ও আন্তরিক ভাবে জড়িত আছেন—সম্ভবতঃ তারাও ঠিক ঠিক তাদের সংখ্যা বলতে পারবেন না।

নতুন পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য ইতিমধ্যে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কারো কারো পরিচালিত ছবি ইতিমধ্যে মুক্তিও পেয়েছে। আবার কারো কারো ছবি মুক্তির দিন গুনছে।

কিন্তু কিছু কিছু দক্ষ ও ক্ষমতা-সম্পন্ন পরিচালক স্বাধীনতার আগে ও পরে নিজেরা নিজেদেরকে 'ইউনিট' ইত্যাদির আড়ালে রেখে কাজ করেছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। এরা কেন যে নিজেদেরকে 'ইউনিট' ইত্যাদির আড়ালে আত্মগোপন রেখে কাজ করেন, করে যাচ্ছেন, করতে ভালবাসেন—তা বলা মুশকিল।

তবে কি তাদের মধ্যে 'আত্মবিশ্বাসের' অভাব রয়েছে? যদি তাই না হবে—তবে কেন নিজেদেরকে গোপন রাখতে এত বেশী আগ্রহী?

এই সব পরিচালককে আমরা স্বরূপে দেখতে আগ্রহী। তাদের শুভ বুদ্ধি হোক—তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করুন। এই কামনা অবশ্যই করতে পারি।

শনিবারের চিঠি

ফখরুল আলম প্রযোজিত এ ছবির সুটিং সম্প্রতি শেষ হয়েছে। এখন বাকী সম্পাদনা, রিরেকর্ডিং ও ডাবিং। এগুলো শেষ হলেই ছবির সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হবে এবং অতঃপর ছবিটির মুক্তি আশা করা যেতে পারে। 'শনিবারের চিঠি' হবে বাংলাদেশের দীর্ঘতম ছবি। এ ছবিতে অভিনয় করছেন ববিতা, উজ্জ্বল, খলিল, আনোয়ার হোসেন, সুচন্দা, শাহানা প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করছেন এফ, এ ফিল্মস। চিত্রগ্রহণে আছেন শামসুল আলম।

পদসঞ্চার

পরিচালক ইবনে মিজান কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে একটি ছবি তৈরী করবেন। নাম 'পদসঞ্চার'।

ছবিটির সংলাপ ও চিত্রনাট্য নিয়ে মিজান সাহেব ও মাহফুজ সিদ্দীকি বর্তমানে খুব ব্যস্ত আছেন।

পালঙ্ক/সন্ধ্যা রায় ও আনোয়ার হোসেন

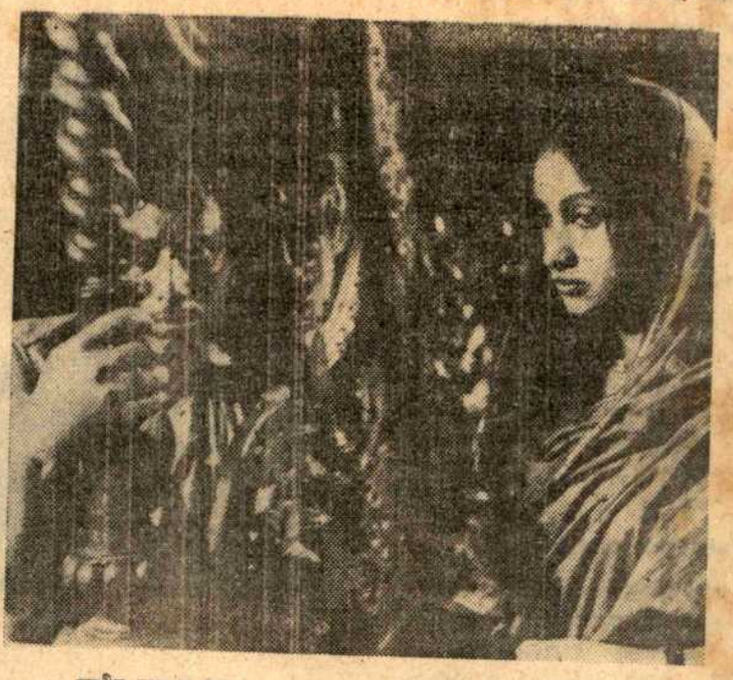

নদীর অনেক নাম

নাট্যকার আবদুস সাত্তার পরিচালিত "নদীর অনেক নাম" একটি নিরীক্ষামূলক ছবি হিসেবে চিহ্নিত হবে। নদী-ভিত্তিক জীবনকেন্দ্রিক এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন সুচন্দা, খলিল, আনসারা, সুজাতা প্রমুখ।

সংগ্রাম

চাষী নজরুল ইসলামের এ ছবিটির কাজ সমাপ্তির পথে। ছবির অভিনেতা অভিনেত্রীরা হলেন খসরু, সুচন্দা, নবাগত পলাশ, হাসান ইমাম, মুরাদ, দারাশিকো, বারি, মঞ্জু দত্ত, তন্দ্রা ইসলাম ও নতুন প্রমুখ। সম্পাদনায় বশীর হোসেন। ক্যামেরায় সামাদ। সংগীতে খোন্দকার নূরুল আলম। প্রযোজনায় কাজী সবুজ। অনুপম কথাচিত্র 'সংগ্রাম' পরিবেশনা করছেন।

সুলতান ডাকু

যমুনা ফিল্ম করপোরেশন তাদের নতুন ছবি ঘোষণা করেছেন। নাম 'সুলতান ডাকু'।

ইবনে মিজান ছবিটি পরিচালনা করবেন। মোহাম্মদ শফি প্রযোজিত এ ছবির নাম-ভূমিকায় থাকবেন ওয়াসিম ও শাবানা। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করবেন ফতেহ লোহানী, জসিম, বাবলু, আমান। ছবির জন্য আনুমানিক দশ লাখ টাকা খরচ হবে বলে জানা গেছে।

অনির্বাণ

কামাল আহমদ পরিচালিত 'অনির্বাণ' মুক্তি প্রতীক্ষায়। এ ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন কবরী, রজ্জাক, সাত্তার প্রমুখ। সুরারোপে রয়েছেন সুবল দাস।

ফেরার

মোস্তফা আনোয়ার পরিচালিত এবং শাবানা অভিনীত 'ফেরার' ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। 'ফেরারে'র চিত্রগ্রহণ করছেন সাধন রায়।

দয়াল মুরশিদ

লোককাহিনী ভিত্তিক ছবি 'দয়াল মুরশিদ' আগামী মাসে পর্দায় আসছে বলে জানা গেছে। কালীপদ দাস চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচয়িতা। পরিচালনায় রূপ সনাতন।

বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন সুচন্দা, আনোয়ার হোসেন, মেসবাহ, আনিস, মেহফুজ প্রমুখ। সংগীত পরিচালনায় এম মনসুর।

পিঞ্জর

তরুণ পরিচালক শাহজাহান চৌধুরী 'পিঞ্জর' পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি রাজধানীর আশেপাশে ছবির সুটিং চলছে। এ ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন ববিতা, উজ্জ্বল, রাণী সরকার ও মোস্তফা। ছবির চিত্রগ্রহণে রয়েছেন এ, টি, এস ইসহাক।

দস্যুরাণী

ছবিটি জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে মুক্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ছবিটি মুক্তি পেতে দেরী হবে বলে জানা গেছে। আরো জানা গেছে যমুনা কথাচিত্র এ ছবি পরিবেশনায় দায়িত্ব নিচ্ছেন না। কারণ অজ্ঞাত। এর আগে এ ছবি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছিল চিত্রম। কিন্তু তারাও ছবিটি হাতবদল করেছে। সেও অজ্ঞাত কারণে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া। শাবানা 'দস্যুরানীর' নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

মন নিয়ে খেলা

ছবিটি মুক্তির দিন গুনছে। একত্রা প্রোডাকসন্সের 'মন নিয়ে খেলা'তে অভিনয় করেছেন সুজাতা কায়েস, আনোয়ারা, রোজী, আলতাফা, শাকিল, ইনাম আহমেদ, সুপ্রিয়া, রহিম, রাণী সরকার ও আনোয়ার হোসেন। কাহিনী সংলাপ লিখেছেন মন্টু, পরদেশী। চিত্রনাট্যও তাঁর। সুর দিয়েছেন এম মনসুর। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্বে আছেন ইউনাইটেড পিকচার্স।

শ্লোগান

পারাপার নির্দেশিত 'শ্লোগান' ছবিটি গতানুগতিক ছোঁয়া থেকে মুক্ত ভিন্ন স্বাদের ছবি হবে বলে জানা গেছে। কবীর আনোয়ার পরিচালিত এ ছবির নায়ক-ভূমিকায় আছেন ববিতা, রাজ্জাক। সংগীতে আলম খান। পরিবেশনায় বাণীরূপা। ছবিটি আগস্টে মুক্তি পাচ্ছে।

কৌতুকাভিনেতা থেকে প্রযোজক

কৌতুকাভিনেতা আহমেদুর রহমান রাণু প্রযোজনায় নামলেন। তাঁর প্রযোজিত ছবির নাম ঘোষণা করেছেন—'তবুও মা।' কাহিনী তৈরী করেছেন আশীষকুমার লেন্স। পরিচালনা করবেন খসরু গোমনি।

"আপনি তোরা মানুষ হ'

খান আতাউরের এ ছবির কাহিনীকার আমজাদ হোসেন। ফটোগ্রাফার তাঁর ছোট ভাই খান আরিফ। এ ছবিটি প্রসঙ্গে খান আতা তাঁর বক্তব্য রেখেছেন এই বলে—'এ ছবির বিষয়বস্তু আমার মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। অনেকদিন পর আমি যেন আমার হারানো অনুভূতি ও উদ্যমকে ফিরে

অপবাদ—ববিতা ও উজ্জ্বল

পেয়েছি। ছবির চিত্রনাট্য লেখার সময় আমি প্রচণ্ড আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে আমার চোখ ফেটে জলও এসেছে। ছবিটি আমি সত্যিকার অর্থে ভালভাবে তৈরী করতে চেষ্টা করবো।'

পালঙ্ক

পশ্চিম বাংলার প্রখ্যাত পরিচালক রাজেন তরফদার বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনায় অনেকদিন আগে থেকে একটি ছবি পরিচালনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। ছবির নাম 'পালঙ্ক'। ছবির শ্রেষ্ঠাংশে আছেন—পশ্চিম বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ নায়িকা—সন্ধ্যা রায়, বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আনোয়ার হোসেন। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন ভারতের উৎপল দত্ত, বাংলাদেশের রাণু রহমান সাহেব, করিম এবং আরো অনেকে।

ছবিটির কাহিনীকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

সোনার কাজল

তরুণ ফিল্মস নিবেদিত ও মমতাজ আলি পরিচালিত ছবি 'সোনার খেলনা'র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন শাবানা, মোস্তফা, মঞ্জু দত্ত, আনোয়ার হোসেন এবং নবাগত হামিদ। সংগীতপরিচালনায় রাজা-শ্যাম। প্রযোজনায় মঞ্জু দত্ত। ছবিটি আগষ্ট মাসে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে।

পরিচালকের বিয়ে

পরিচালক এইচ আকবর এককালীন চিত্রনায়িকা পল্লবীকে বিয়ে করেছেন। এই উপলক্ষে লালকুঠি মিলনায়তনে বৌভাতের আয়োজন করা হয়। চিত্রপুরীর অনেকেই এ বৌভাত অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ভাই-বোন

আলী কওসার পরিচালিত একটি ছবি। নাম ভাই-বোন। এস এম ইদ্রিস নিবেদিত এ ছবির নায়ক-নায়িকা শাবানা ও রাজ্জাক।

ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন আলী মনসুর।

প্রযোজনায়—আবদুর রশিদ, সংগীতে—খান আতাউর রহমান। ছবিটির কাজ চলছে। ছবির পরিবেশনায় আছেন প্রাচী চিত্র।

আনওয়ার আহমদ

...ণীর বাঁধনে বন্যা ছিল
কি বাঁধা ?

সত্যিই রমণীয় কেশ হবে
রমণীর শোভা
বেঙ্গল কেমিক্যালের
"ক্যান্থারাইডিন"
ঐতিহ্যমণ্ডিত এই কেশ তৈল
চুলের খাদ্য যুগিয়ে
কেশরাশিকে এক অনুদ্দাম
রূপলাবণ্যে ভরিয়ে তোলে।

কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ০ বোম্বাই ০ কানপুর
দিল্লী ০ মাদ্রাজ ০ পাটনা ০ জয়পুর

ভারত বনাম হল্যান্ডের ২য় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় ভারতের গোলরক্ষক চার্লস একটি অবধারিত গোল বাঁচিয়েছেন।

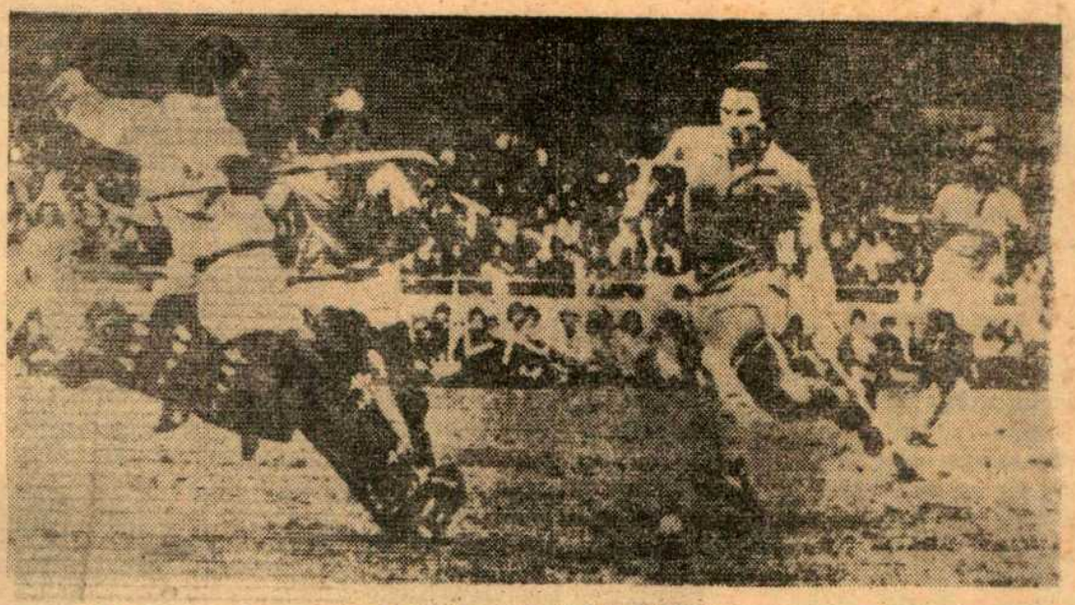

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা

আমস্টার্ডামের (হল্যান্ড) দ্বিতীয় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে হল্যান্ড ৪—২ গোলে (টাই ভাঙ্গার খেলায় পেনাল্টি স্ট্রোকে) ভারতকে হারিয়ে বিশ্ব হকি কাপ জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক হকি খেলার আসরে ভারতের বিপক্ষে হল্যান্ডের এই প্রথম জয়ের বগড়ে আজ থেকে ৪৫ বছর আগে ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামেই অলিম্পিক হকির ফাইনালে ভারত ৩—০ গোলে হল্যান্ডকে হারিয়ে অলিম্পিক হকি খেলায় তার প্রথম স্বর্ণপদকটি সংগ্রহ করেছিল। ১৯২৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিগত ১০টি অলিম্পিক গেমসের হকি খেলায় ভারত মোট ৭টি স্বর্ণপদক পেয়েছে—উপর্যুপরি স্বর্ণপদক ৬টি (১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮ ১৯৫২ ও ১৯৫৬)।

আলোচ্য বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারতের ব্যাক সুরজিৎ সিং প্রথমার্ধের প্রথম দশ মিনিটের খেলায় দুটি গোল দিয়ে ভারতকে ২—০ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার ২০ মিনিট আগে হল্যান্ডের থিজ ব্রুইজ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে একটা গোল শোধ করেন। বিরতির সময় ভারত ২—১ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ৪৪ মিনিটের মাথায় ব্রুইজের গোল থেকে খেলার ফলাফল সমান (২—২) দাঁড়ায়। এর পর নির্দিষ্ট সময়ের খেলায় আর কোন গোল হয় নি। অতিরিক্ত সময়ের খেলা গোলশূন্য ছিল। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধের খেলায় ভারতের সেন্টার ফরোয়ার্ড গোবিন্দ পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করার সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। শেষ পর্যন্ত টাই ভাঙ্গার খেলায় পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে একটা গোল ৪—২ গোলে ভারতকে পরাজিত করে। এখানে উল্লেখ্য, হল্যান্ড সেমি-ফাইনাল খেলাতেও টাই ভাঙ্গার খেলায় ৪—২ গোলে অলিম্পিক হকি চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়েছিল।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ১৯৭২ সালের হকি চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী ১—০ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ-পদক জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তান ১৯৭১ সালের প্রথম বিশ্ব হকি কাপের খেলায় স্বর্ণপদক এবং ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি খেলায় রৌপ্যপদক জয়ী হয়েছিল।

সুরজিৎ সিং

লীগ পর্যায়ের খেলা

দ্বিতীয় বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশ দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথম লীগ প্রথায় খেলেছিল। লীগের খেলায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী এই চারটি দেশ মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে উঠেছিল : এ গ্রুপের পশ্চিম জার্মানী (চ্যাম্পিয়ান) এবং ভারত (রানার্স-আপ), অপর দিকে বি গ্রুপের পাকিস্থান (চ্যাম্পিয়ান) এবং হল্যান্ড (রানার্স-আপ)। লীগ পর্যায়ের খেলায় এই তিনটি দেশ অপরাজিত ছিল—এ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী এবং রানার্স-আপ ভারত এবং বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পাকিস্তান। লীগের খেলায় ভারত দুটো পয়েন্ট নষ্ট করেছিল (পঃ জার্মানীর সঙ্গে ০—০ গোল এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ১—১ গোলে খেলা ড্র) অপর দিকে হল্যান্ড নষ্ট করেছিল ৩টে পয়েন্ট (পাকিস্তানের কাছে ১—২ গোলে হার এবং আর্জেন্টিনার সঙ্গে ০—০ গোলে ড্র)।

সেমি-ফাইনাল

এক দিকের সেমি-ফাইনালে ভারত ১—০ গোলে পাকিস্তানকে এবং অপর দিকের সেমি-ফাইনালে হল্যান্ড ৪—২ গোলে (টাই ভাঙ্গার খেলায় পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে) পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, লীগের দুই রানার্স-আপ দল ফাইনালে উঠেছিল। লীগের দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান এবং ১৯৭২ সালের অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী পাকিস্তান ফাইনালে উঠতে পারে নি।

লীগ পর্যায়ের খেলা
চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ

গ্রুপ এ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পঃ জার্মানী	৫	৪	১	০	৬	২	৯
ভারতবর্ষ	৫	৩	২	০	১২	১	৮

গ্রুপ বি

পাকিস্তান	৫	৪	১	০	১৬	৫	৯
হল্যান্ড	৫	৩	১	১	১১	৪	৭

ভারত বনাম পাকিস্তান

ভারত এবং পাকিস্তান এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান এবং বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতায় পরস্পরের সঙ্গে যে ১২টি ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফল ঃ পাকিস্তানের জয় ৬ বার, ভারতের জয় ৪ বার এবং খেলা ড্র ২ বার। তারা অলিম্পিক গেমসের ফাইনালে খেলেছে ৩ বার এবং সেমি-ফাইনালে একবার। অলিম্পিক গেমসের তিনবারের ফাইনালে ভারতের জয় ২ বার (১৯৫৬ ও ১৯৬৪) এবং পাকিস্তানের জয় একবার (১৯৬০)। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি খেলার সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান ২—০ গোলে জয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর কাছে ১—২ গোলে হেরেছিল। ১৯৭১ সালে বার্সিলোনার প্রথম বিশ্ব হকি কাপ প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে পাকিস্তান ২—১ গোলে ভারতকে পরাজিত করে শেষ পর্যন্ত স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিল।

হকি খেলার ফলাফল
অলিম্পিক গেমস

বছর	স্থান	বিজয়ীদল	স্কোর
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	ভারত	১—০
১৯৬০	রোম	পাকিস্তান	১—০
১৯৬৪	টোকিও	ভারত	১—০
১৯৭২	মিউনিখ	পাকিস্তান	২—০

এশিয়ান গেমস

১৯৫৮	টোকিও	খেলা ড্র	০—০
১৯৬২	জাকার্তা	পাকিস্তান	২—০
১৯৬৬	ব্যাংকক	ভারত	১—০
১৯৭০	ব্যাংকক	পাকিস্তান	১—০

আন্তর্জাতিক হকি

১৯৬৬	হামবুর্গ	খেলা ড্র	০—০
১৯৬৭	লণ্ডন	পাকিস্তান	১—০

বিশ্ব হকি কাপ

১৯৭১	বার্সিলোনা	পাকিস্তান	২—১
১৯৭৩	আমস্টারডাম	ভারত	১—০

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ
১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজ

ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২—০ খেলায় (ড্র ১) জয়ী হয়ে 'রাবার' এবং সেই সঙ্গে টইসডেন ট্রফি জয়ী হয়েছে। এই 'রাবার' জয়ের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাহুর কুদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেল। ১৯৭৩ সালের ইংল্যান্ড সফরের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে যে ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল তার একটা খেলাতেও জিততে পারেনি, 'রাবার' জয় তো দূরের কথা। এই ২০টা টেস্ট খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হার ৬ এবং খেলা ড্র ১৪। এক সময়ের বেসরকারী বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর সগৌরবে আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে ফিরে এসেছে।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স মোট ৩০৬ রান করার সূত্রে উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন (গড় ৭৬-৫০)। তাঁর ব্যাটিংয়ের পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছেঃ খেলা ৩, ইনিংস ৫, নট-আউট ১ বার, মোট রান ৩০৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৫০ নট আউট এবং গড় ৭৬-৫০। তিনি এই সিরিজের শেষ তৃতীয় খেলায় ৬টা ক্যাচ লুফে একটা খেলায় সর্বাধিক ক্যাচ ধরার বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন। এই টেস্ট সিরিজে তিনি যে একটা সেঞ্চুরী করেন তা তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের ২৬তম টেস্ট সেঞ্চুরী। স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান প্রতিষ্ঠিত সর্বাধিক টেস্ট সেঞ্চুরীর বিশ্ব রেকর্ড (২৯টি) থেকে তিনটে সেঞ্চুরী কম। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৭৩ সালের টেস্ট সিরিজে সোবার্স প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি এখনও ফুরিয়ে যান নি। টেস্ট খেলায় রানও তুলেছেন বিস্তর—৮৯টি টেস্টে মোট ৭৯৩২ রান এবং এক ইনিংসের খেলায় নট আউট ৩৬৫ রান (দুই-ই আজও বিশ্ব রেকর্ড হয়ে আছে)।

১৯৭৩ সালের ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন কিথ ফ্লেচার—খেলা ৩, ইনিংস ৬, নট-আউট ২বার, মোট রান ২৬৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮৬ নট আউট এবং গড় ৬৬-৫০। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান (৩১৮ রান) করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ন্যাটা খেলোয়াড় ক্লাইভ লয়েড—খেলা ৩, ইনিংস ৫, নট আউট ০, মোট রান ৩১৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৩২ এবং গড় ৬৩-৬০। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন কিথ ফ্লেচার (মোট ২৬৬ রান)। বোলিংয়ের গড় তালিকায় উভয় দলের পক্ষে শীর্ষ স্থান পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২৯ বছরের ফাস্ট মিডিয়াম পেস বোলার কিথ বয়েস (গড় ১৫-৪৭)। তাছাড়া তিনি উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট উইকেটও পেয়েছেন (মোট ১৯টি)। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সর্বাধিক মোট উইকেট এবং বোলিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন জিওফ আনল্ড (মোট উইকেট ১৫ এবং গড় ২৬-০০)।

বিবিধ রেকর্ড
সেঞ্চুরী

ইংল্যাণ্ড ঃ হেজ ১০৬ (ওভাল)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ লয়েড ১৩২ (ওভাল), ফ্রেডরিকস ১৫০ (এজবাস্টন), কানহাই ১৫৭, সোবার্স ১৫০* এবং জুলিয়েন ১২১ (লর্ডস) *নটআউট

এক ইনিংসে পাঁচ উইকেট

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ঃ বয়েস—৭০ রানে ৫ এবং ৭৭ রানে ৬ (ওভাল)

ইংল্যান্ড ঃ আরনল্ড ...১২৩ রানে ৫ (ওভাল)

ডেভিস কাপ

ইউরোপীয়ান জোনের 'এ' গ্রুপের ফাইনালে রুমানিয়া ৩—২ খেলায় রাশিয়াকে এবং 'বি' গ্রুপের ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ৪—১ খেলায় ইতালীকে পরাজিত করে মূল প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

একদিকের সেমি-ফাইনালে আমেরিকা ৪—১ খেলায় রুমানিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। আমেরিকার বিপক্ষে ফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়া বনাম চেকোশ্লোভাকিয়ার সেমি-ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল।

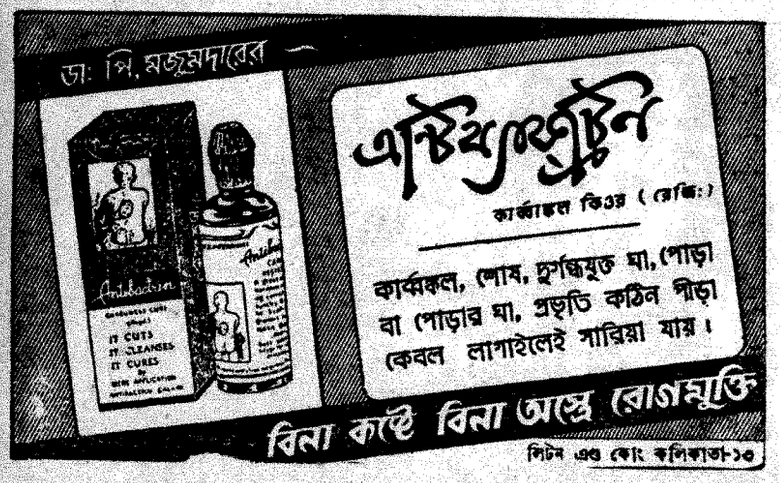

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

SMM-1/69

Regd. No. C 4352
Gram: AMRITA Calcutta-3.

AMRITA

Friday 7th September, 1973
Phone: 55-5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হালা সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

10 SEP 1973

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লোগো
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

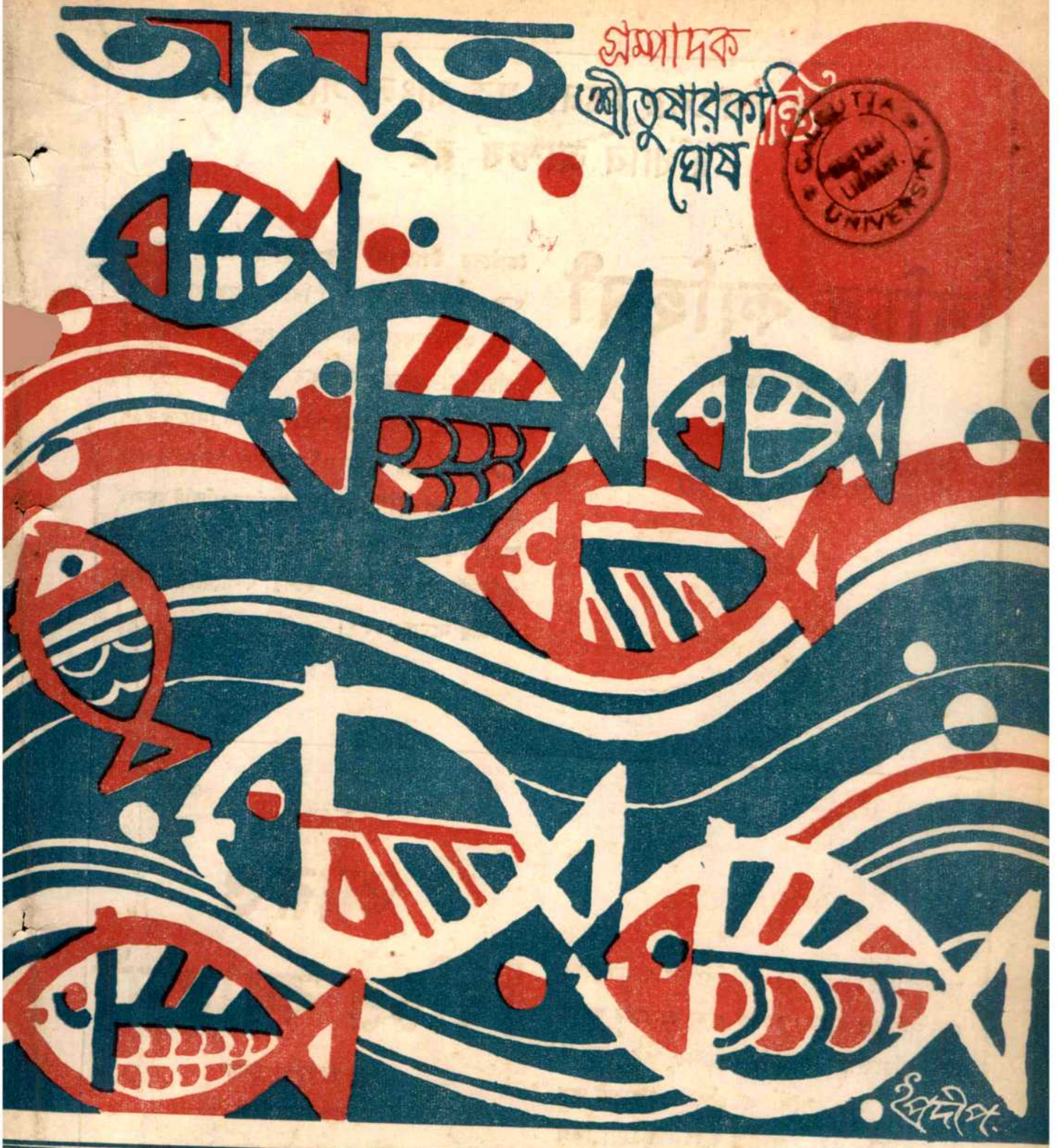

[১৩ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা]
শুক্রবার ২৮ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ
[মূল্য ৫০ পয়সা

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৪৯

॥ শ্রেষ্ঠ লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা ॥

এই দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও
বৃহত্তম উপন্যাসের অসামান্য
জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত

সাহিত্য তপস্বী
বিমল মিত্রের
অবিস্মরণীয় উপন্যাস

আসামী হাজির

সাড়ে চার মাসে
দুই মুদ্রণ
নিঃশেষিত

তৃতীয় মুদ্রণ
প্রকাশিত হয়েছে !

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ
॥ ত্রিশ টাকা ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
নবতম সুদীর্ঘ উপন্যাস

অশান্ত ঘূর্ণি

প্রকাশিত হলো
॥ আট টাকা ॥

যাযাবরের
নূতন বই

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)
॥ পাঁচ টাকা ॥

বিমল করের
নবতম সুদীর্ঘ উপন্যাস

সেতু ৪

দক্ষিণারঞ্জন বসুর উপন্যাস

প্লাবন ৬

আশাপূর্ণা দেবীর

যার যা দাম

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)
॥ পাঁচ টাকা ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সারিতুমিকার

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)
॥ পাঁচ টাকা ॥

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২ ফোন : ৩৪-৮৭৯১
৮৬।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯, ৩৪-৩৪৯২

নবীন প্রবীণ সবার জন্য

সব বয়সের পুরুষের কাছে সাদর আমন্ত্রণ—বাটার দোকানে আসুন। দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত ছোটোদের, চৈতন্য তরুণদের, কর্মচঞ্চল পুরুষদের, বিশিষ্টরুচি মানুষদের জন্য, বাটার দোকানে এবার উৎসবের উপযুক্ত জুতোর বিশাল সমাবেশ। যার যেরকম পছন্দ বেছে নিন।

শ্লে টাইম্ ১৬
১০.৯৫-১১.৯৫

ঘাঁচিক ৮৬
১০.৯৫

ওয়েফাইডান্স ০৭
২০.৯৫-২৬.৯৫

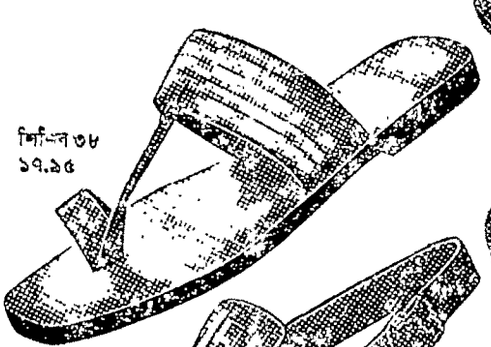

শিপ্পি ৩৮
১৭.৯৫

বুটি ৩১
১০.৯৫

অভিত ২৯
২০.৯৫

কম্ফর্ট ৮৩
২৮.৯৫

Bata Bata Bata Bata

১৩শ বর্ষ

অমৃত

১১ সংখ্যা

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 14 September, 1973 শুক্রবার ২৮ ভাদ্র, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	দেশেবিদেশে		—শ্রীপুণ্ডরীক
১১	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১২	ভাষা	(কবিতা)	—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী
১২	জ্যোতির্ময় আলো	(কবিতা)	—শ্রীবার্ণিক রায়
১২	তৃষ্ণা	(কবিতা)	—শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক
১৩	ভিনগ্রহের হানাদার	(বিজ্ঞানধর্মী গল্প)	—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু
১৯	বাংলার রেনেসাঁস		—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
২৭	নতুন বই		
২৯	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫	হে সম্রাট কবি		—শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৪শে ভাদ্র (১০ই সেপ্টেম্বর) হইতে ৭ই আশ্বিন (২৪শে সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত

অপরাজেয় কথাশিল্পী

শরৎচন্দ্রের

পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে

তাঁর সমগ্র রচনাবলীর সংকলন

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

শতকরা ১৫·০০ টাকা হারে কমিশনে ক্রয়ের অপূর্ব সুযোগ

॥ সমগ্র রচনাবলী ১৩ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৪·০০

উল্লিখিত তারিখের মধ্যে রচনাবলীর সমগ্র ও স্বতন্ত্র খণ্ড যাঁহারা ক্রয় করিবেন, তাঁহারা প্রতি খণ্ড ১৪·০০ টাকার স্থলে ১১·৯০ পয়সায় ও সমগ্র খণ্ড ১৮২·০০ টাকার স্থলে ১৫৪·৭০ পয়সায় পাইবেন। ঐ সময়ে অনিবার্য-কারণবশতঃ যদি কোনও খণ্ড সরবরাহ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীকালে অপ্রাপ্ত খণ্ডগুলির উপরও তাঁহারা সমহারে কমিশন পাইবেন। ডাক মাশুল বা ভাড়া স্বতন্ত্র।

এম্ সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা : ৭০০০১২

ফোন : ৩৪-১৭৮২

বিদ্যোদয়ের বই

মোহিতলাল মজুমদারের

কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০

সাহিত্য-বিচার ৮·৫০

বাংলার নবযুগ ৮·০০

বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বক্তব্য ৫·০০

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০

গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর ১১·০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮·০০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০

সুশীল জানা সম্পাদিত

বাঙলা প্রবন্ধ ও ভাষাশিল্প ৬·৫০

ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্রশিক্ষা-দর্শন ১০·০০

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯·০০

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ২০·০০

শ্রীমন্তকুমার জানার

রবীন্দ্র মনন ৮·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০·০০

নিখিল সেনের

এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

লেখকদের প্রেম ৩·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-৩১৫৭

অতুল রূপের অধীশ্বরা ও উপযুক্ত সৌন্দর্য প্রসাধনে তাঁদের রূপ হয়ে ওঠে অপরূপ!

পণ্ডস ফ্লজেল ক্রীম

ঈষৎ ঘন দুধের মতো ক্রীমটি
(বাকি বক্তব্য ইংরেজিতে)

POND'S FLUFFY CREAM BY PONDS

পণ্ডস
এক্সেল ফেস—
আপনার
রূপকে
মোহনীয়
করার জন্যে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৮	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৪০	দিন কালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪২	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৪৩	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৪৭	এই আমাদের দেশ		—শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়
৫০	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৫২	যে দেশে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে		—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত
৫৪	প্রদর্শনী		—শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৫৭	স্রোতের সমীপে পাখী দেখা		—শ্রীরুণ ঘোষ
৬১	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৬৪	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬৫	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৬৭	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬৯	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

এপার বাংলা

শারদীয় সংখ্যা / ১৩৮০

এই বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা লিখছেন

প্রবন্ধে—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ভবানী মুখোপাধ্যায়, রবি দাস।

দুইটি উপন্যাস—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

মৌলিক সাইন্স ফিক্‌সন—নারায়ণ চক্রবর্তী

গল্প ও রম্য রচনা—বনফুল, বিমল মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু গৌতম ও অন্যান্য।

এ ছাড়াও বিশিষ্ট কবিতা ও অন্যান্য ফিচার সহ বিপুল আকারে শুভ মহালয়ার দিন প্রকাশিত হবে। গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য যাঁহারা এই বিশেষ সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান তাঁহারা সত্বর যোগাযোগ করুন।

এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য ৪.।

শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান/গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

শেক্সপীয়র সমগ্র রচনা সংগ্রহ

প্রথম খণ্ডে যা থাকছেঃ—সমগ্র সনেট ভেনাস অ্যান্ড এ্যাডোনিস, দি রেপ অফ্ লিউক্রস টু জেন্টলম্যান অফ ভেরোনা, কমেডি অব এরর্স টেমিং অফ দি ষ্ট্রু লাভস্ লেবারলস্ট এ মিড সামার নাইট ড্রীম, দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, য়্যাজ ইউ লাইক ইট রোমিও জুলিয়েট। প্রত্যেকটি নাটকের নাট্যরূপ (আঙ্কারিক বাংলায় অনুবাদ) দিচ্ছেন বাংলার বিশিষ্ট ও খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। তিন খণ্ডে প্রতি খণ্ড ১০.। রেক্সিনে বাঁধাই। ম্যাপলিথো কাগজ ছাপা।

হোমারের রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা

টলষ্টয় রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা।

গিবন রচনাবলী

সম্পাদনায় — দেবনারায়ণ গুপ্ত ৫ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০.

সমগ্র বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ৮ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ৯. টাকা।

ব্যাসদেব রচনাবলী

৩ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা

রাজনারায়ণ রচনাবলী

এক খণ্ডের দাম ১০. টাকা।

ডিকেন্স রচনাবলী

সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ২ খণ্ডে, প্রতি খণ্ড ১০ টাকা।

হেমচন্দ্র রচনাবলী

সম্পাদনায়—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ২ খণ্ডে—প্রতি খণ্ড ১০. টাকা।

প্রতিটি রচনাবলীর গ্রাহক মূল্য ৫. টাকা। গ্রাহক হবার মনি অর্ডার পাঠানোর মূল কেন্দ্র ঃ—জ্যোতি প্রকাশন, ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলি-৯। অন্যান্য কেন্দ্র ঃ—রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, ফোন ঃ ৩৪-৪৩৫৬। পূর্ণ প্রকাশন, ৮এ, টেমার লেন, কলিঃ-৯, ফোন ঃ ৩৪-৯৫৯২ ॥ টাউন লাইব্রেরী, বর্ধমান ॥ গ্রন্থভারতী, জলপাইগুড়ি ॥ চয়নিকা, কুচবিহার ॥ বইঘর, আলিপুরদুয়ার ॥ বোলপুর পুস্তকালয়, বোলপুর ॥

পত্রবিনিময়

এই আমাদের দেশ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা পঃ দিনাজপুর জেলা প্রসঙ্গে কয়েকটি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তিমূলক বিষয় নিম্নে তুলে ধরলাম।

মুদ্রণ দোষ কিংবা শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠিক জানা না থাকায় কয়েকটি ভুল দৃষ্ট হয়েছে। গঙ্গারামপুরে কোন কলেজ নেই। কাশিরানি খাল কাশিযাড় খাড়ি হবে। দলদীঘি ধলদীঘি নামে পরিচিত। দলদীঘি নাম তিনি কোথায় পেলেন জানালে ইতিহাসের একটি সাক্ষ্য আমাদের জানা থাকতো।

লেখক কান্তজীর মন্দিরের ছবি দিয়ে যেমন সুরু করেছিলেন তেমনি যদি তিনি দিনাজপুরের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা করতেন তবে প্রত্ন সম্পদে এই জেলা দীন বলে লিখতে পারতেন না। তবু অবশিষ্ট আমাদের এই অংশ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ের বানগড় গুপ্ত, মৌর্য, সুঙ্গ ও পাল রাজবংশের অস্তিত্বে ভরপুর। মুসলিম ইতিহাসের প্রথম লক্ষ্মণের অস্তিত্ব এখানেই। কোটিবর্ষ, শোনিতপুর উষা বা উষাবন, দেবীকোট, বরেন্দ্র ভূমি, বরিন্দ এই পশ্চিম দিনাজপুরের মাটিতে। দিব্যক, ভীম, গণেশের গণতন্ত্র স্বায়ত্ত-শাসনের অভ্যুদয় এরই মাটিতে। এরই মাটিতে আরো অনেক কিছুর সঙ্গে পাওয়া গেছে এই লিপি—'রুম্বোজাল্বয়জ' গৌড়পতি কুঞ্জর ঘটাবর্ষে ইন্দু মৌলির এই ভূ-ভূষণ মন্দির নির্মাণ করেন। এখানের খালে, বিলে, দীঘিতে, স্তূপে, পল্লীপ্রান্তরে অগণিত প্রত্নচিহ্নগুলি আজও রাখাল বালকেরা অবহেলা ভরে নিয়ে খেলা করে।

রণেন সরকার
বালুরঘাট

(২)

আপনার বহুল প্রচারিত 'অমৃত' সাপ্তাহিকে (শুক্রবার, ১৪ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) যোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'এই আমাদের দেশ—মেদিনীপুর (২)' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতি আপনার ও লেখকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করছি। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের শেষের দিকে লিখেছেন যে, 'ঝাড়গ্রামে যে ছোট আকারের পেপার মিল গড়ে উঠেছে তাও উজ্জ্বল সম্ভাবনা।' উল্লিখিত পেপার মিলটি 'গড়ে উঠেছে' কোথায়? মহকুমার কোন্ স্থানে, কবে গড়েছে, কে গড়ে তুলছে ইত্যাদি জানবার ইচ্ছা করে।

প্রবন্ধে লিখিত পেপার মিলটি [illegible] ধারণা স্থানীয় জনগণের মনে এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং লেখক এই রিপোর্ট কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং কে এই রিপোর্টদাতা তা দয়া করে যদি লেখক মারফৎ পুনরায় জানান তাহলে আমরা ঝাড়গ্রাম মহকুমাবাসী যারপরনাই উপকৃত হবো।

মুরলীমোহন শাউ
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবীর আশ্চর্য উপন্যাস 'কখনো দিন কখনো রাত'-এর ধারাবাহিক প্রকাশনার জন্য আপনাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল, নিটোল উপন্যাস বহুকাল চোখে পড়ে নি। হারিয়ে যাওয়া 'সেকালের' কথা 'একালের' মত এমন সহজ সুরে বলতে পারেন যিনি, তাঁর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে কি পারা যায়?

ইন্দ্রজিৎ সিনহা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অশনি-সংকেত

শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'অশনি সংকেত' সাধারণ মানুষের সাধারণ দৃষ্টিতে আমি দেখেছি। কিন্তু অসাধারণ লেগেছে। সরল জীবন কথা সরলভাবে এবং সুন্দরভাবে যিনি বলতে পারেন, তিনিই প্রকৃত আর্টিস্ট। অবশ্য শুধু যা দেখছি তার হুবহু রিপোর্ট দেওয়া শিল্পীর কাজ নয়। চার পাশে যা অতীতে দেখেছি বা এখন দেখছি তা সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেওয়ার নামই আর্ট। (কিন্তু এই সুন্দরভাবে দেখানোটাই সবাই পারেন না)। এবং সেই আর্ট যখন এমন রসে রূপায়িত হয় যে, আমাদের সেই রসের টানে নন্দনলোকে নিয়ে যায়—যে লোকে উত্তীর্ণ হলে আমাদের মন ছোট-ছোট ঘরের চার-দেওয়ালের বেড়া ভেঙে দিয়ে সত্য ও সুন্দরের উদার আকাশে হাত ঝাড়িয়ে আনন্দ-আলোর অমৃত মুঠো-মুঠো লুটে নেয়, তখনই সে-আর্ট হয়ে ওঠে মহৎ এবং বৃহৎ। 'অশনি সংকেত' এই হিসেবে মহৎ এবং বৃহৎ সৃষ্টি। কিন্তু তা-ই বলে 'পথের পাঁচালী'র সৌন্দর্য এবং এই ছবির সৌন্দর্য-অভিসার এক নয়। সৌন্দর্য একই, লক্ষ্য একই, অভিসার আলাদা, গতি আলাদা, বঙ্ক আলাদা, সৌরভ আলাদা।

এখানে মহাদুর্ভিক্ষের (মন্বন্তরের) বুকে ভীষণ কুক্ষির হাঁ-করা পিলে-চমকানো রূপ আমরা দেখতে পাই নি, পরিচালকের এটি অভিপ্রেত ছিল না (মূল কাহিনীতেও নয়)। যে মহাবিপর্যয়ের অশনিপাতে সোনার বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ জীয়ন্ত ফুল ঝরে পড়েছিল, তারই ধ্বংসেষের কিছুং-লেশ দিয়ে এবং শেষে মনুষ্যসৃষ্ট প্রলয়দানবের রুদ্রভীষণ রূপের আভাস (দশ থেকে কুড়ি, কুড়ি থেকে চল্লিশ—এই ধারায় শত-শত কালো মাথার এবং ঊর্ধ্ববাহুর স্মরণীয় শটে) দিয়েই শিল্পী রূপকার তুলি সরিয়ে নিয়েছেন আমাদের বাইরের চোখ থেকে।

কিন্তু আমরা দেখেছি—মানসনয়নে—ঐ দানবটাই যুগ-যুগ ধরে আমাদের সাজানো বাগানের ফুল ঝরিয়ে দেয়, আমাদের প্রগতির রথ এ জন্যই থেমে-থেমে যায় বা ভূমিগ্রাসে পড়ে, কিন্তু যা সুন্দর, যা সত্য—তা নষ্ট হয় না, তা ধ্বংস-স্তূপের মধ্যেও নতুন সৃষ্টির বেদনা-মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে। তবুও আমরা ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠি। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেই কেটে রক্ত-উৎসে ক্ষুন্নিবারণ করি। এখানেই মনুষ্য-স্বভাবের বিচিত্রতা। সুন্দর-অসুন্দর, আলো-অন্ধকার, দেব-পশু পাশা-পাশি আমাদের মধ্যে রয়েছে এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করছে যুগ থেকে যুগান্তর, দেশ থেকে দেশান্তরে, মন থেকে মনান্তরে।

এখানেই ছবি দেখার সার্থকতা। সত্যজিৎবাবুকে নমস্কার জানাই।

* * *

পুনশ্চ—'অমৃতে' প্রকাশিত (শুক্রবার ১৪ ভাদ্র,'৮০) ছবিটির আলোচনা যুক্তি-নির্ভর এবং সৌন্দর্যরসনিঃসারী।

কিন্তু ছবির শেষের 'টাইটেল' বা ছবির মাঝখানে রিপোর্টাজ ধরণে লিপির মাধ্যমে বাজারের/দেশের অবস্থা সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করা বিষয়ে যে সমালোচনা করা হয়েছে তার উত্তরে বলা যায়—সত্যজিৎবাবু একটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই বা গ্রামাঞ্চলকে ঘিরেই তাঁর ক্যামেরার গতি নিয়ন্ত্রিত রেখে-ছেন। বাইরের যা খবর তা এসেছে মুখ্যত ধ্বনি (এরোপ্লেন) বা লোকমারফৎ (বিকৃত বা অবিকৃতভাবে)। তাই, এখানে রিপোর্টাজে সংবাদ পরিবেশন (সামান্য) অপরিহার্য ছিল 'লেডাব অফ দি লাস্ট রিজর্ট' হিসেবে। মূল কাহিনীতে মফস্বল শহরের যে সামান্য বর্ণনা আছে (গঙ্গাচরণের চালের বা কেরোসিনের উদ্দেশ্যে গমনকালে) তা-ও এখানে অনুপস্থিত রাখা হয়েছে। কারণ, তা থাকলে 'অশনি সংকেত'-এর শিল্পশ্রীমণ্ডিত ভাষ্য-রচনার নিটোলত্ব ক্ষুণ্ন হতো। আমাদের শুধু অসঙ্গতি লেগেছে—একই গ্রামের বা পাশাপাশি গ্রামের পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কারো-কারো সংলাপের কথ্য ভঙ্গীতে সামান্য বিভিন্নতার জন্য এবং অনঙ্গ বউয়ের মুখে ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহারের জন্য।

সুদেষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
[illegible], বিবেকানন্দ পল্লী
[illegible]—৬০

সম্পাদকীয়

বন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা

কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও সেদিন লোকসভায় বলেছেন যে, এদেশে বন্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। আমাদের বন্যা নিয়েই বেঁচে থাকতে শিখতে হবে। মন্ত্রীমহোদয়ের উক্তিতে দার্শনিকতার সুর বন্যার্তদের পক্ষে নিশ্চিতই খুব সহায়ক হবে না। তাঁরা চান প্রকৃতির এই রোষ থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। শুধু ত্রাণ নয়, বর্ষায় উদ্দাম নদীশাসনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও সরকারকে নিতে হবে।

এবারের বন্যা তার পূর্বগামী খরার মতোই প্রচণ্ড। খরাতে তবু মানুষ বেঁচে থাকবার উপায় বার করতে পারে স্থানান্তরে গিয়ে। আকস্মিক বন্যার আক্রমণে গ্রাম-গ্রামান্ত যখন ভেসে যায় তখন সেই অসহায় মানুষগুলোর আত্মরক্ষার কোনো পথ থাকে না। পরিচিত যে নদীর সঙ্গে তার প্রতিদিনের আত্মীয়তা তার ভয়ালরূপ সাক্ষাৎ কালান্তকের মতো গ্রামকে গ্রাস করে ফেলে। কোথায় মানুষের আশ্রয়? কোথায় তার বাঁচবার সুযোগ? উত্তর ও পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানের বন্যায় গত সপ্তাহের হিসাবে সাত শতাধিক মৃত। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা।

পশ্চিমবাংলায় এবারের বন্যার আক্রমণ অত্যন্ত ব্যাপক। মেদিনীপুরই এবার সবচেয়ে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর সহকর্মী কয়েকজনকে নিয়ে বন্যার্ত মেদিনীপুর পরিক্রমা করে এসেছেন। সাড়ে চৌদ্দ লাখ নরনারী বন্যায় বিপন্ন এবং জলবন্দী। তাদের জন্য ত্রাণব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সমস্ত গৃহহারাদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া হয়। হুগলী, হাওড়া, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলাতে বন্যা প্রচুর ক্ষতি করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আজ দুর্দিন। এতে মানুষের সমূহ বিপদই শুধু হল না, খাদ্যোৎপাদন ক্ষেত্রেও প্রচুর ক্ষতির আশংকা।

পশ্চিমবাংলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেই নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য চল্লিশ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। শুধু আশ্বাস ও সহানুভূতি ছাড়া সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। বন্যাত্রাণের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ হয় কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়নি। তার ফলেই উত্তরবাংলার এবং দক্ষিণবাংলার নদীগুলো যখন বর্ষায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার সেই স্ফীত জলধারাকে রুখবার মতো সামর্থ্য থাকে না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যা সত্য, অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও কম-বেশি সেই একই বাস্তব চিত্র। বন্যার সঙ্গে বেঁচে থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রীর আবেদন তাই খুবই করুণ শোনাবে।

জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যাপ্লাবিত এলাকায় বন্যার বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলে সেচমন্ত্রী দাবি জানিয়েছেন। তিনি আশা করছেন, এই শতাব্দীর শেষে দেশে বন্যার অন্তত পঞ্চাশভাগ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কিন্তু তা নির্ভর করবে সরকার কতটা দক্ষতায় এবং আন্তরিকতায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী রূপায়িত করেন। বন্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। হয়তো কৃষির দিক থেকে তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। বন্যায় জমির উর্বরাশক্তি বাড়ায়। কিন্তু গ্রামের মানুষকে রক্ষা না করতে পারলে সেই উর্বর জমি কাজে লাগাবে কে? বন্যার স্রোত অশেষ দুঃখ ও বিপত্তি নিয়ে আসে তাদের ওপর। এর জন্য চাই ব্যাপক সতর্কতা ব্যবস্থা। বন্যার হুঁশিয়ারি আগে থেকেই গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং প্লাবিত এলাকায় শক্ত উঁচু পাকাবাড়ি নির্মাণ করে রাখতে হবে গ্রামবাসীদের সাময়িক আশ্রয় দেবার জন্য। দামোদর প্রকল্পের দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য পূরণ কতটা হয়েছে তাও বিচার্য। কারণ প্রবল বর্ষার সময় প্রকল্পের জলাধার থেকে এত বেশি পরিমাণ জল ছাড়তে হয় যে তার ফলে অতি দ্রুত গ্রামাঞ্চল ভেসে যায়।

প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব না হলেও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের আছে। বন্যায় বিপন্ন মানুষের করুণ ক্রন্দন শুনলে আমাদের এ কথাই মনে হয়, এই দুরন্ত নদীগুলোকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি। তাকে আরও ব্যাপক করা দরকার। পশ্চিমবাংলায় বন্যার ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য শ্রী ডি পি ধর মহাশয় এসেছিলেন। আশা করি, তিনি আমাদের ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করে এই বিপন্নদের সাহায্য তো করবেনই, যাতে ভবিষ্যতে এই রাজ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সুষ্ঠুভাবে করা যায় সেদিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

তমলুক মহকুমার বেয়াপাড়া (নন্দীগ্রাম) বুক সম্পূর্ণ বন্যায় ভেসে গেছে চিত্রে দুটি ছেলেকে একটি গাছের ভেলায় ভেসে যেতে দেখা যাচ্ছে দূরে কোন আশ্রয়ের সন্ধানে।

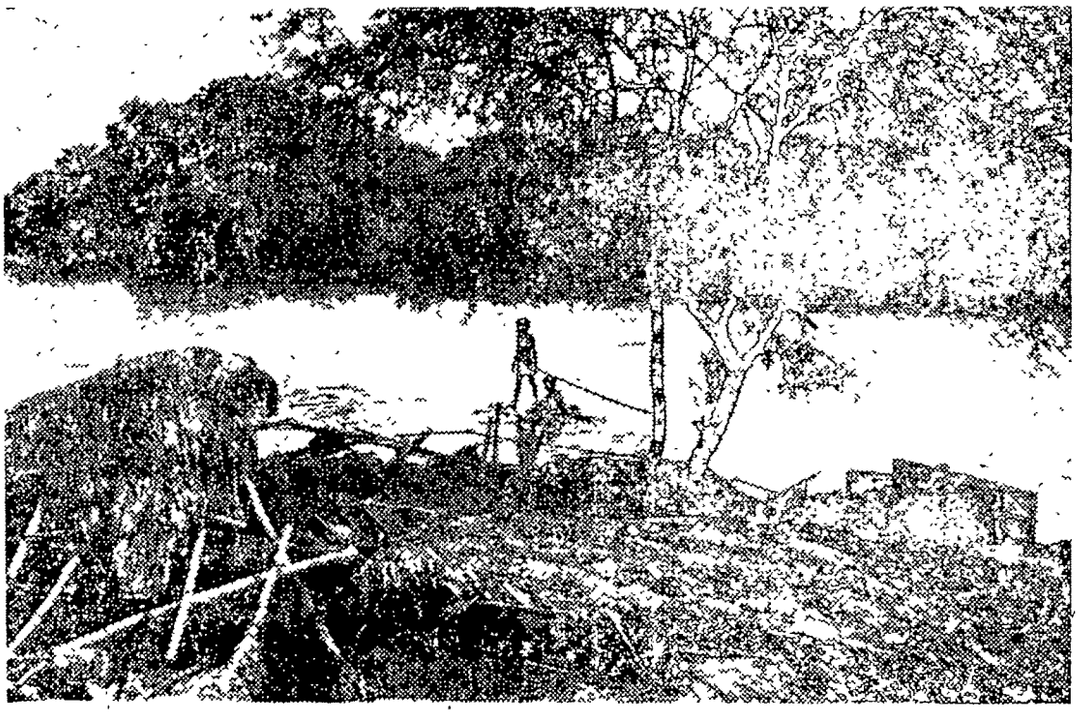

দেশে বিদেশে

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবারকার বন্যায় ৪০০ মানুষ মারা গেছেন এবং প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এটা হচ্ছে গত ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বাৎসরিক বন্যার মরশুম শেষ হবার আগে বন্যায় এই ক্ষয়ক্ষতির অঙ্ক আরও অনেকগুণ বাড়বে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ক্ষতির পরিমাণ বিপুল।' ঐ রাজ্যে লাখ পাঁচেক মানুষ দুর্গত হয়েছেন এবং ৬০০ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। আলোয়ার জেলায় সোমনদীর জলস্ফীতি একটি যাত্রীবাহী বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে আর সেই সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ৭৯জন মানুষকে। ঐ ৭৯জন নিয়ে রাজ্যে বন্যায় মৃতের মোট সংখ্যা ২৪৩।

মধ্যপ্রদেশের বন্যায় প্রাণবলি হয়েছে ১৫০টি।

গুজরাটের কিছু কিছু অঞ্চল খরার প্রকোপ কাটিয়ে না উঠতেই অন্যান্য অঞ্চল বন্যার কবলে পড়েছে। ঐ রাজ্যের উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্যঅঞ্চল বন্যাপ্লাবিত হয়েছে আর কচ্ছ আর সৌরাষ্ট্রের মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছেন।

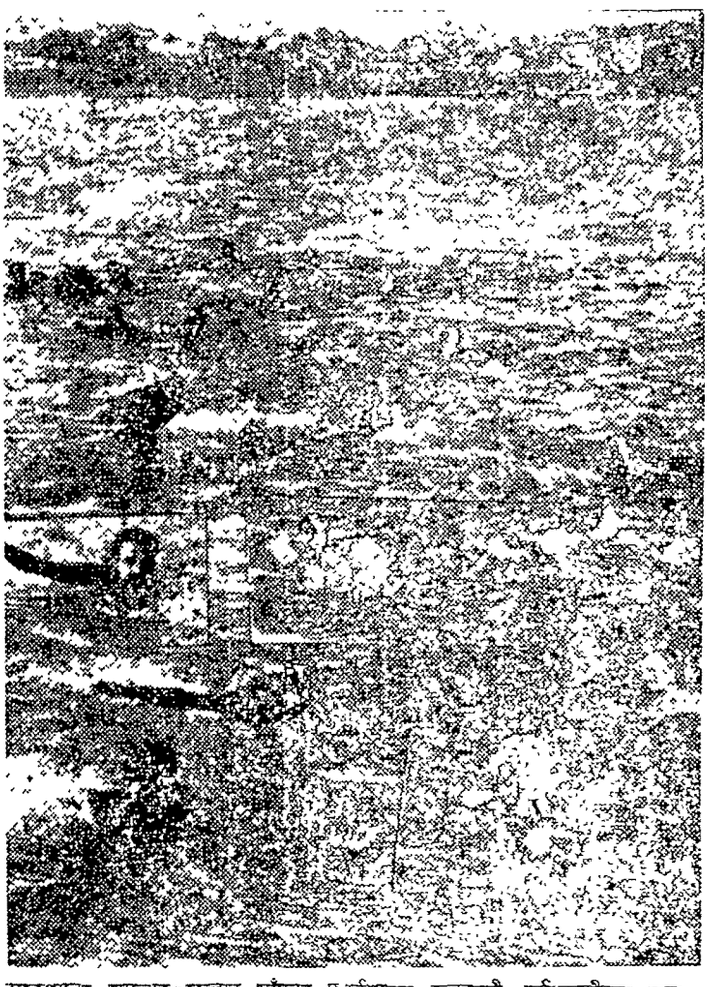

রাজস্থানের জালোর জেলার সাঁচোর তহশিলের জলবন্দী অধিবাসীদের জন্য মাতারুরা খাদ্য নিয়ে চলেছেন।

বিহারে কুশী, গণ্ডক ও বুড়িগন্ডক নদীর প্লাবনে প্রায় হাজার বর্গমাইল এলাকা জলের তলায় গেছে আর প্রায় দশ লাখ মানুষ বিপন্ন হয়েছেন।

ওড়িশার কটক ও ভুবনেশ্বর জেলার প্রায় ১২০০ বর্গমাইল এলাকা জলমগ্ন।

পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণ মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় বন্যা ডেকে এনেছে। এই পাঁচটি জেলার মোট ৯ লাখ ৭৮ হাজার একর জমির ফসল জলে ডুবে গেছে।

মাত্র কয়েকদিন আগেও কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে খরার খবর আসছিল। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহারের কোন কোন জেলা থেকে হাহাকার শোনা যাচ্ছিল, ফুটিফাটা মাটির বুকে তখনও লাঙলের আঁচড় বসান যাচ্ছিল না বলে। বন্যার জল সরলে হয়ত লাঙল নিয়ে মাঠে নামা যাবে, এই আশা যেমন কোথায় কোথায় জাগবে তেমনি যাঁদের ধানচাষা জলের তলায় তলিয়ে গেল তাঁরা মাথায় হাত দেবেন। যোগ-বিয়োগের পর খরিফ ফসলের মোট কতটুকু বাড়ল বা কমল তার পুরো খবর পেতে কিছু দেরি হবে।

আপাতত যেটা আশার লক্ষণ তা হল, খর মরুভূমির বুকে এবার তৃষ্ণা মিটেছে। এই সেদিন রাজস্থানে দুর্ভিক্ষ চলছিল। আর আজ ঐ রাজ্যের মানুষ বলছেন, এই এক বর্ষায় যা জল পাওয়া গেল তাতে অন্তত আগামী তিন বছর দুর্ভিক্ষ হওয়ার ভয় নেই।

সারা রাজস্থানের সমস্ত দিঘি, পুকুর, ঝিল, কুয়া ইত্যাদি জলে টৈটুম্বুরে। স্মরণ-কালের মধ্যে এই প্রথম বিস্তীর্ণ অহল্যা-ভূমিতে লাঙল পড়ল। জয়সালমির, বাবমের, গংগানগর, জালোর প্রভৃতি জেলায় ইতি-মধ্যে আবাদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। রাজ্যের মন্ডিগুলিতে ইতিমধ্যে জওয়ারের দাম অনেক পড়ে গেছে।

কিন্তু তবু এই বন্যা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে, এই দেশে আমরা আজও কিরকম অসহায়ভাবে প্রকৃতির হাতের মার খেতে বাধ্য হচ্ছি। হয় ঝরা না হয় খরা, দুটোর কোনটিই আমাদের বশে নয়। প্রতি বছরই এই সময়ে ভাবনাটা আমাদের মাথায় চেপে বসে। প্রতি বছরই সংসদের বাদল অধিবেশনে সদস্যদের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন শোনা যায় : বন্যানিয়ন্ত্রণের কি করা হচ্ছে?

এবারও প্রশ্নটা শোনা গিয়েছিল। উত্তরে সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও যা বলেছিলেন তাতে সদস্যরা অবশ্য চটে-ছিলেন। কিন্তু ডঃ রাও অন্তত মিথ্যা আশা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেন নি। ডঃ রাও, যিনি খোদার উপর খোদকারি করে গঙ্গাতে কাবেরীর সঙ্গে বাঁধার কথা বলেন, সাফ কথায় বলে দিয়েছেন, বন্যা নিয়ে ঘর করতে আমাদের শিখতে হবে। কারণ বন্যার হাত থেকে কখনই সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে, একথা যদি তিনি বলেন তাহলে ডঃ রাও নাকি নিজেকে আর ইঞ্জিনীয়ার বলে পরিচয় দিতে পারবেন না।

একথা বোঝা অবশ্য কঠিন নয় যে, এমন কোন ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল আজও মানুষের জানা নেই যাতে বন্যা থেকে ষোল আনা অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। এ নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, বন্যার দরুন যে প্রাণহানি হচ্ছে, প্রতি বছর যে শস্যহানি ও অন্যান্য ক্ষতি হচ্ছে তা

১৩৮০ সালের
সর্বশ্রেষ্ঠ শারদীয়া

ক্রাইম

ভিন্ন স্বাদের পাঁচটি উপন্যাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত • কৃশাণু বন্দ্যোপাধ্যায় • রবীন দেব • জেমস হেডলী চেজ অনুবাদ করছেন রজত সেন • ড্রাকুলা ভাস্কর রাহা অনুদিত

পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের, উপন্যাসোপম গল্প

শিবরাম চক্রবর্তী • তারাপ্রণব ব্রহ্মচার • চিরঞ্জীব সেন • বোম্মানা বিশ্বনাথম্ • জগদীন্দ্র মজুমদার

পনেরটি ছোট ও বড় গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র • সমরেশ বসু • কবিতা সিংহ

মনোজিৎ লাহিড়ী, উৎপল ভট্টাচার্য, আনন্দরূপ চৌধুরী। শ্রীপার্থ, অনীশ দেব, বসুমিত্র দত্ত, অভিজিৎ দত্ত, হরেন ঘোষ, কিরণশঙ্কর মৈত্র, মল্লিনাথ সেন, অসিত মৈত্র। অমল রায়।

রঙিন ফটোগ্রাফসহ বীরু চট্টোপাধ্যায়ের নরমুণ্ড শিকারীদের বীভৎস কাহিনী এবং দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফসহ অশনি গুপ্তের রচনা বিশ্বঅপরাধের এক সত্য ঘটনা

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের অমর গোয়েন্দা কিরীটি রায় এবার অবসর বিনোদনে

কিরীটির কর্মজীবনের সর্বশেষ উপন্যাস শারদীয়া ক্রাইমে প্রকাশিত হচ্ছে।

মূল্য পাঁচ টাকা সডাক সাত টাকা

ক্রাইম, ৯৩/৩/১, মৈত্রিকখানা রোড, কলিকাতা-৯

যতদূর সম্ভব কমাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হচ্ছে কি! বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যে মন্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব তিনি একথা বলে পার পেয়ে যেতে পারেন যে, দেশের মানুষকে বন্যা মেনে নিয়েই বাঁচতে হবে, বন্যা মেনে নিয়ে বাচার অর্থ কি? প্রতি বছর যে ৬৫০ জন মানুষ বন্যার জলে তলিয়ে যান তাঁরা কি বন্যা সত্ত্বেও কেমন করে বাঁচতে হবে তা জানেন না বলেই মরে যান?

শুধু ত সাড়ে ছয়শ' মানুষের মৃত্যুই নয়, বাৎসরিক বন্যায় ক্ষতির তালিকায় আছে আরও অনেক কিছু ঃ দেড় কোটি একর চাষের জমি জলমগ্ন হয়, দেড় কোটি মানুষ আশ্রয়চ্যুত হন ত্রিশ হাজার গরু-বাছুর মারা যায় ও জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি হয় প্রায় সত্তর কোটি টাকার মত।

বন্যা হয়ে যাওয়ার পর বন্যার্তদের ত্রাণের জন্য সরকারকে বাধ্য হয়ে প্রতি বছর যে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয় সেটা তাঁরা যদি বন্যার আগে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য খরচ করেন তাহলে কিন্তু এই বিরাট বাৎসরিক ক্ষতির বহর অনেক কমান যায় দুর্গতত্রাণের জন্যও অর্থব্যয় করতে হয় না। যেমন, দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় বন্যার্তদের ত্রাণের জন্য ব্যয় করেছেন মোট ৫৬ কোটি টাকা। আর এই সময়ের মধ্যে বন্যানিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাগুলিতে রাজ্য সরকার ব্যয় করেছেন মাত্র এগার কোটি টাকা।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উপর যে তেমন জোর দেওয়া হয়নি তার একটি কারণ হল বন্যা যখন হয় তখন এই নিয়ে যতটা সোরগোল তোলা হয় বন্যার জল সরে গেলে সেই সোরগোলের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। (এমনকি বন্যার সময়েও এই বিষয়ে আমাদের সংসদ সদস্যরা যে কতটা আগ্রহ দেখান তার প্রমাণ হল, গত বছর আগস্ট মাসে লোকসভায় বন্যার উপর বিতর্কের সময় সভা প্রায় শূন্য ছিল এবং সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারের ভাষায়, 'বক্তারা যে জোর দিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁদের এই অনুপস্থিতির সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।'

আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সেচ পরিকল্পনাগুলি থেকে যেমন সরকারের কিছু রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা থাকে বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা থেকে তেমন কিছু আশা থাকে না। সেচের জল যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সেই জলের দাম দিতে হয়, কিন্তু বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার দ্বারা যাঁরা উপকৃত হন তাঁদের উপর ট্যাক্স ধার্য করে খরচ তুলে নেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এই কারণে রাজ্য সরকারগুলি বন্যাপীড়িতদের কান্না না শুনে বরং সেচের জলের চাহিদা মেটাতেই বেশি আগ্রহী হন।

সরকারী হিসাবে দেশের মধ্যে মোট এমন কুড়ি কোটি একর জমি আছে যেখানে কোন না কোন সময়ে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এর মধ্যে প্রায় ছয় কোটি একর জমিতে ইতিমধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। আর চার কোটি একর জমিকে বন্যা থেকে রক্ষা করার কাজ সম্পূর্ণ করতে অর্থাৎ মোট বন্যাপ্রবণ এলাকার অর্ধাংশকে সুরক্ষিত করতে ১৯৮১ সাল পার হয়ে যাবে। বাকি অর্ধাংশ থেকে বন্যার বিপদ দূর করার কথা এখন পর্যন্ত ভাবাই হচ্ছে না।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর বন্যায় যে ক্ষতি হয় তার ৬০ শতাংশের জন্য দায়ী হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলির জলস্ফীতি। এই নদীগুলিকে বাগে আনার কতগুলি প্রাকৃতিক অসুবিধা আছে। এই নদীগুলির ঢাল অত্যন্ত বেশি। তাই এই নদীগুলি তাদের স্রোতের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পলি বয়ে নিয়ে আসে। এই কারণে নদী এঁকেবেঁকে যায় ও প্রায়ই খাত বদল করে। এইসব নদীর উজানে বাঁধ বাঁধার সুবিধা নেই। হিমালয়ের শিলা-ভূতাত্ত্বিক অর্থে তরুণ এবং ভাকরা থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত হিমালয়ের সানুদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। এমন জায়গায় জলাধার তৈরির ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তবুও উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাগীরথী ও তেহ্‌রিতে বাঁধ দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় আর একটি প্রস্তাব হচ্ছে, সমতলে কৃত্রিম দীঘি তৈরি করে সেখানে বর্ষাস্ফীত নদীর জল ধরে রাখা হোক। এই প্রস্তাব কার্যকর করার পথে প্রধান একটি অসুবিধা হল, গঙ্গা উপত্যকার মত ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে এই ধরনের বিরাট জলাশয় তৈরি করতে হলে লাখ লাখ মানুষকে তাদের ভিটা ও জমি থেকে উৎখাত করতে হবে।

তৃতীয় আর একটি অভিনব প্রস্তাবের দ্বারা এই অসুবিধা দূর করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবটি হচ্ছে এই যে, এলাহাবাদ থেকে ভাটিতে গঙ্গার ধারে মোট প্রায় ১২০টি কুয়ো খুঁড়ে বর্ষায় ফেঁপে ওঠা নদীর জল পাম্প করে মাটির নিচে জলাধারে সঞ্চিত করে রাখা হবে। মাটির নিচে রাখার আগে অবশ্য জল থিতিয়ে নিয়ে পলি আলাদা করে নিতে হবে। ভূগর্ভে সঞ্চিত এই জল সেচ ও অন্যান্য প্রয়োজনে পাম্প করে তুলে নেওয়া যাবে।

এমন একটা বিচিত্র পরিকল্পনা আদৌ কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে কিনা সেবিষয়ে অবশ্য বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কিন্তু পরিকল্পনাটি অন্তত কাগজপত্রে গঙ্গা উপত্যকার বন্যানিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিখুঁতভাবে সমাধান করে দেয়।

৭-৯-৭৩ —পুস্তকীক

শুভ মহালয়া উপলক্ষ্যে যারা আমাদের প্রকাশিত ২টি রচনাবলীর গ্রাহক হবেন তাদের বিনামূল্যে ৫টি বই, ৩টি গ্রাহকে ৪ টাকায় বই এবং ৪টির গ্রাহককে ১ কপি "সুভাষ ঘরে ফেরে নাই" দেওয়া হবে

১৫ই আগষ্ট ১ম খণ্ড বের হয়েছে। এখনো গ্রাহক করা হচ্ছে.

শেকসপীয়র রচনাবলী
সনেটসহ সম্পূর্ণ অনুবাদ। ৩ খণ্ডে ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন

কালজয়ী মহান রুশ সাহিত্যিকের সবকটি শ্রেষ্ঠ রচনার অনুবাদ
তলস্তয় রচনাবলী
৫ খণ্ডে বের হচ্ছে। মূল্য ৫০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন

১ম খণ্ড ২৭শে সেপ্টেম্বর বের হবে। বঙ্কিমচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত
বঙ্গদর্শন
পত্রিকার সবকটি সংখ্যা ৯ খণ্ডে ৮০ টাকা। ৮ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন

১ম খণ্ড ২৬শে সেপ্টেম্বর বের হবে। ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। মূল্য ৫০ টাকা

মাক্সিম গোর্কি রচনাবলী
সবকটি শ্রেষ্ঠ রচনার সাবলীল অনুবাদ। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন

ছোট গল্পের রাজা হেনরী রেণে অ্যালবার্ট গী দ মোঁপাসাঁর
মোঁপাসাঁ রচনাবলী
৩ খণ্ডে বের হচ্ছে। মূল্য ৩০ টাকা। ৬ টাকা দিয়ে গ্রাহক হন

নেতাজীর জীবন ও অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে শ্যামল বসু'র কাহিনী
সুভাষ ঘরে ফেরে নাই
১০ টাকা। ৬৩টি ছবি। গ্রাহক হওয়া ও মনি-অর্ডার পাঠানোর ঠিকানা

রিক্লেক্ট পাবলিকেশন ॥ ৩০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ (পূরবী ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজের মাঝে)

সেই লোকটি

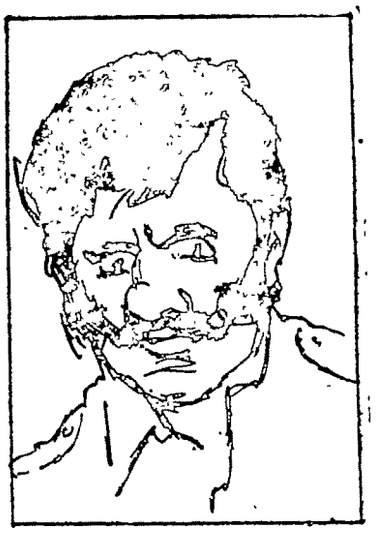

জলপাইগুড়ি স্টেশন রোডের কাছাকাছি হোটেল লাইটহাউস। পার্বতীপুর দিয়ে যখন গাড়ি যেত, যখন দোমোহানি স্টেশন ছিল উত্তর বাংলার রেল চলাচলের হৃৎপিণ্ড, তখন খুব রমরমা ছিল হোটেলটির। শহরের নিউ পুলিশ লাইনের লাগোয়া রেস কোর্সে এমন কি ঘোড়াও ছুটেছে তখন। সায়েব-সুবো আসত। পুরোনো সে সব দিনের কথা স্মরণ করে সাবেক বাসিন্দারা হা-হুতাশ করেন, এখনও হোটেলের টিঁকে থাকা পুরোনো দু-চারজন বেয়ারা নোংরা জামার হাতা দিয়ে নাক-চোখ মোছার ভান করে।

গরীব হয়ে গেছে হোটেল লাইটহাউস, তার সমুদ্র শুকিয়ে অভাবের ইঁট-কাঠ-পাথর বেরিয়ে পড়েছে। জলপাইগুড়িতে চাকরি করতে এসে এখানেই উঠেছিলাম প্রথমে। থেকেও গিয়েছিলাম প্রায় তিন বছর। কত রকম মানুষজন স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে এসেছে গেছে, সাধ্যে কুলোলে এদের নিয়ে ঝাড়া ৩৫০—৪০০ পাতার একটা উপন্যাসই লিখে ফেলব একদিন। আপাতত এই একমুঠো জায়গার মধ্যে স্রেফ একটি লোকের কথাই বলি। নাম রামচন্দ্র।

এমন একটা ঘরে থাকতাম, যার দেয়ালে হোটেলশুদ্ধু লোক মুখ ধোয়ার পর কুলকুচি ছিটিয়ে যেত। ঘরটা ছিল সবার চোখের ওপর, প্রায়ই দরজা ঠেলে কারও না কারও নাক উঁকি মারত। ক্রমে ক্রমে সবে গিয়েছিল ব্যাপারটা, কিন্তু এতখানি দ্রষ্টব্য হয়ে থাকার দরুন মেজাজ সব সময় চড়া পর্দায় বাঁধা থাকত।

যেদিন দুপুরে হোটেলের ঘরে ঢুকলাম, সেদিনই আকাশ ছাপিয়ে বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি, আমার ঘরের ছাদ-দেয়াল চুঁইয়ে সরু-মোটা রেখায় জলের শিকড়-বাকর নামছে। জামা-কাপড়, বিছানা-বাকসো নিয়ে আমি যখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি ভেবে এটা সরাচ্ছি, ওটা তুলছি, হঠাৎ রামচন্দ্রের আবির্ভাব। বেঁটে-খোটো শক্তসমর্থ চেহারা, নাকের নিচে কাঁকড়া-বিছের মত একজোড়া হিংস্র গোঁফ, দু গালে ব-দ্বীপের মত জুলফি, গোলাপি রঙের চোখ, পরনে খয়েরি মিলিটারি শার্ট ও কালো হাফ প্যান্ট। ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় বলল, আপনি সরে যান স্যার। বৃষ্টির জবরদস্ত এলাকা থেকে সাধ্যমত নিরাপদ এলাকায় টেবিল-চেয়ার, খাট সরিয়ে দিয়ে বেডিং খুলে পরিপাটি করে বিছানা পাতল, ডুবন্ত ঘরদোর সাফ করে আমার জুতোজোড়া একপাশে রেখে প্রায় অ্যাটেনশন হয়ে বলল, আই অ্যাম রামচন্দ্র। একটা অ্যানাসিন দিয়ে চা খেয়ে ফেলুন গরম গরম। উত্তর দেওয়ার ফুরসৎ না দিয়ে 'যাও' করে রাম অদৃশ্য হল।

প্রসন্ন মনে হোটেল-বাসের প্রথম সন্ধেতেই দু-টাকা বকশিস দিয়েছিলাম রাম-কে। পরের দিন সকালে রাম ফিকস করে দিলে আমার ধোপা-নাপিত, ধারে সিগ্রেট পাওয়ার দোকান, এমন কি কর্মস্থলে যাতায়াতের রিকশ। ভাবী প্রীত হলাম এহেন অযাচিত দাক্ষিণ্যে—দশরথের মত অচিরাৎ আমারও জান-প্রাণ হয়ে দাঁড়াল রাম। একবার প্যারা-টাইফয়েডে ভুগে খুবই কষ্ট পাচ্ছিলাম এই নির্বান্ধব পুরীতে, দু হাতে মায়ের মত সেবা করেছে রাম। বমি করেছি, নিকিয়েছে, ডাক্তার ধরে নিয়ে এসেছে, মাথা খুইয়ে সারা শরীর স্পঞ্জ করে পাউডার মাখিয়েছে, সকালে বিকেলে ফল কেটে হরলিকস করে খাইয়েছে।

অথচ রামের ভারী বদনাম শুনতাম শহরে। বউকে দ্যাখে না, নয়াবস্তীর চোলাই মদ-বিকোনী প্রমীলা প্রধানের ঘরে রাত কাটায়, ছেনতাই-দাঙ্গায় পয়লা দাগের আসামী, ডুয়ার্স থেকে রাইনোর খড়্গ বিদেশিদের কাছে চোরাই চালান করে—এই সব। একদিন গভীর রাতে জানলা দিয়ে দেখি, রাম স্যাঁ করে পাশের দরজা ঠেলে হোটেলে ঢুকল—জামা-কাপড় হাত মুখ রক্তে একাকার। হাজার ডেকেও আর সাড়া পেলাম না। পরের দিন সারা শহরে হৈ-চৈ—স্টেশন রোডের কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলে গলার নলী কাটা অবস্থায় এলাকার সবচেয়ে ডাকসাইটে কাবুলিঅলার ভারী লাশ দেখা গেছে।

প্রায়ই পুলিশ আসত রামের খোঁজে, রামের তেলোয় ডলা খৈনি খেয়ে গালগল্প মস্করা করে চলে যেত। মাঝে মাঝে গায়েব হত রাম, আবার ডুডুস করে গজাত চার-পাঁচ দিন বাদে। হোটেলের সমস্ত বোর্ডারদের কাছে ও ছিল এত জরুরি যে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত ঘাঁটাতে সাহস করতেন না ওকে। দলে দলে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ আসত মরশুমে—রাম তখন কেঁচোর মত লেগে থাকত তাঁদের দরজায়, তাবাও স্বাভাবিক কারণেই 'রাম' বলতে ছিল ইগনোরেন্ট।

আমার ছিল লাগাতার সর্দি-জ্বরের ধাত। বগলে করে একদিন একটা ব্রান্ডি নিয়ে এল রাম, বলল, খেয়ে ফেলুন, নাম্বার ওয়ান ভূটানি স্টাফ। তারপর প্রায়ই খেতে ইচ্ছে করত ঐ নাম্বার ওয়ান স্টাফ, এবং বলা বাহুল্য স্রেফ ব্র্যান্ডি নয়। আমার মত আরও অনেকেরই এ জাতীয় দুর্বলতাকে রাম নিজের হাতে তৈরি করত, তার পর ঐ ফাঁক দিয়ে ঢুকত বজ্রকীটের মতন। হাঁটুমুড়ে বসে থাকত ভক্তের প্রথায়। কিছুটা মাল বোতল থেকে গলাতে ঢেলে দিলে ও আমার দিকে পেছন ফিরে সেটুকু গলায় নামিয়ে আবার উবু হয়ে বসত।

আস্তে আস্তে আমার জামা-কাপড়, চাদর-সুজনি-তোষালে, পকেটের টাকা পয়সা সবই হাপিস হয়ে যেতে লাগল। অথচ আমি তখন রামের হাতের খামলাক হয়ে গেছি প্রায়। ইচ্ছেমত বসায়-শোয়ায়। ওর অসাক্ষাতে মাঝে মাঝে ওর বউ তিনটি বাচ্চা নিয়ে এসে রামের কিস্সা করে, কান্নাকাটি করে। রাম উধাও হয়, আসে।

অবশেষে, অনেক নাকানি-চোবানি খাওয়ার পর ঠিক করলাম, হোটেল ছেড়ে বাসা ভাড়া করে স্ত্রীকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসব। মাসকলাইবাড়ীতে ঘরও নিলাম। রাম প্রথম প্রথম আমাকে অনেক বুঝিয়েছে, কিন্তু আমার একরোখামো দেখে শেষ কদিন আর কাছে ঘেঁষেনি। হোটেলের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিদেয় নিয়ে মালপত্র সমেত রিকশায় উঠেছি, হঠাৎ দেখি ছুটতে ছুটতে কোত্থেকে রাম এসে দাঁড়াল। দু'চোখের উদ্যত জল চেপে একটা আনকোরা তাঁতের ধুতি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল,—ফার্স্ট ক্লাশ স্টাফ স্যার, এটা আপনাকে পড়তেই হবে।

বলেই একটা ছুঁচো বাজির মত ধাঁ করে ও স্টেশন রোডের জনারণ্যে মিলিয়ে গেল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভাঙা ॥ গোবিন্দ চক্রবর্তী

কষ্টিপাথরেই,
যাচাই হয়,
সোনা।
না, হে, না—
এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই।

বলেডোজারেই,
সমান হয়,
জমি।
বলছি ত'—না,
এতে কাতরাবার কিছু নেই।

শোনো।
ফুল ফোটানোরও
দারুণ একটা যন্ত্রণা আছে।
সেটা গাছই জানে।

আসলে, সময়—
সময়ই আসল কারিগর।
তোমাকে,
মনের মত গড়তে
ভাঙবেও তাই থাম থান।

জ্যোতির্ময় আলো ॥ বার্ষিক রায়

জ্যোতির্ময় আলো,
কি খেলা খেলছ শীতের বিকেলে
রঙিন নির্জন অরণ্যের অন্ধকারে
পাতার ভেতরে।

ধূসর রাত্রির অন্ধকার,
সমস্ত বনস্থলীর প্রচণ্ড স্তব্ধতা;
যেমন মৃত্যুর আগে
সমস্ত বাসনা জাগে
পৃথিবীর আদিম ভালোবাসায়,
কম্পিত পাতার বুকে বেদনার
আলো যায় নেচে, সুরে ওঠে
গন্ধের আরতি, চেতনায় অন্ধকার নদী
ঘুরে যায়

তবুও সময় যায়
জ্যোতির্ময় আলো,
তোমার বিরহে অন্ধকার স্বনিত হয়
পাতার কান্নায়

হে ময়ূরী, পুরুষ কেন সে অন্ধকারে বার বার কাঁদে
তোমার গভীরে।।

তৃষ্ণা ॥ গৌরাঙ্গ ভৌমিক

টুপ টুপ করে শব্দ হচ্ছে কলের জলে।
টুপ টুপ করে বর্ষা নামবে গাছের ছায়ায়।

এখন তোমাকে একটা গল্প বলি, সুদেষ্ণা, শোনো
সেবার খরায়
মাঠের বুকে হাহাকার জেগেছিল ভাদ্র মাসে।
উঠোনের কোণে দাঁড়িয়েছিল মরা নিম গাছটা।
সেকথা তোমাকে বলা যায়।

দৃশ্যটা ভাবতে পারবে না তুমি। মাঝরাতের প্রবল জ্যোৎস্নায়
নিঃসঙ্গ গাছটাকে বিপন্ন দেখাচ্ছিল।
চাঁদটাকে দেখাচ্ছিলুম গাছের আগায়।

টুপ টুপ করে শব্দ হচ্ছে কলের জলে।
টুপ টুপ করে বর্ষা নামবে গাছের ছায়ায়।

সুদেষ্ণা, গল্পটা শেষই হয় নি। শোনোই না—সেদিন
গভীর তৃষ্ণায়
দরজাটা খুলেছিলুম, গাছটাকে ছোঁব বলে। যেই না ছুঁয়েছি
প্রবল জ্যোৎস্নায়
তোমাকে মনে পড়ল—গাছটাকে আর না।
বুকটা ফেটে যাচ্ছিল গভীর পিপাসায়।

টুপ টুপ করে শব্দ হচ্ছে কলের জলে।
টুপ টুপ করে বর্ষা নামবে গাছের ছায়ায়।
দিগন্তে দাঁড়িয়ে আমি জলের শব্দ শুনছি, সুদেষ্ণা
তোমাকে মনে পড়ে...

টুপ টুপ করে শব্দ হচ্ছে...
টুপ টুপ করে...
টুপ টুপ...

ভিনগ্রহের হানাদার শচীন্দ্রনাথ বসু

কেবিনের ছোট্ট জানলার ভারী পরদা সরিয়ে রজার লিভিস বাইরে উঁকি দিল। দিগন্তবিস্তৃত তুষারাবৃত প্রান্তরে প্রতিফলিত তারার আলো এক ভুতুড়ে আভা সৃষ্টি করেছে। ঐ নির্দয় বহির্জগতে এখনই তাকে পা ফেলতে হবে ভেবে উষ্ণ কামরার মধ্যেও তার হাড় কেঁপে উঠল। কুটিরের ঘর দুখানি তাপনিয়ন্ত্রিত, জানলায় ডবল কাচ। ঘরের অধিকাংশে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।

ক্যানাডার উত্তর প্রদেশ নর্থ ওয়েস্ট টেরিটোরিস অনেকাংশে সুমেরু বৃত্তের অন্তর্গত, এখানে মাইলের পর মাইল জনমানবের দেখা মেলে না। এই বৃত্ত সীমার অদূরে জাতীয় গবেষণা পরিষদের এই ক্ষুদ্র ঘাঁটির বাসিন্দা তরুণ বিজ্ঞানী রজার লিভিস ও পল মেসিয়ে। এদের কাজ হল এই হিম জগতের থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা; তার কিছুটা হয় ঘরে বসে, কিন্তু দিনের মধ্যে বার পাঁচেক বাইরে যেতে হয় জায়গায় জায়গায় রাখা যন্ত্রের তদারক করতে।

রজার ভারী চামড়ার জামা পরল, মাথা ঢাকল পুরু লোমের টুপিতে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় শুধু চোখ আর নাক। তারপর হাতে মোটা দস্তানা পরে, ঘরে পরার জুতোর উপর উঁচু রবারের জুতো চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। পায়ের নীচে পুরু বরফের স্তর ঢেকে রেখেছে পাথরের মত কঠিন জমাট মাটি; তারই মধ্যে গর্ত খুঁড়ে এক যন্ত্র বসানো আছে কয়েক পা দূরে, সে দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে ঐ বরফের মতই জমে গেল।

বেশ কিছুটা দূরে উত্তর-পশ্চিম কোনে একটার পর একটা আলোর রেখা উপরে ছুটে আকাশ বিদীর্ণ করছে। বিদ্যুৎ চমকানি নয়, কারণ তা জ্যামিতিক সরল রেখার মত সোজা; সার্চলাইট নয়, কারণ ছড়িয়ে পড়ে নি, অতি সঙ্কীর্ণ তার পরিধি। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলে মানুষই তো নেই।

দৌড়ে গিয়ে সে তার সহকর্মীকে ডেকে আনল, আর আনল ক্যামেরা এবং দিক নির্ণয়ের যন্ত্র। তাড়াতাড়ি সেগুলির কাজ শেষ করতে করতে আবার আকাশ অন্ধকার, আলোর রেখা নিশ্চিহ্ন। সে দিনে বিস্মিত চোখ মেলে রজার বললে, "কপাল ভাল, গোটা পাঁচেক ছবি নিতে পেরেছি। কিন্তু কি বল তো ওটা?"

"আমার তো মনে হল হেজ হেসেস" বললে পল।

"আমারও তাই, কিন্তু শীতে জমে যাচ্ছি। ঘরে চল, সেখানে এখন আমাদের অনেক কাজ।"

গবেষণার খাতিরে দূর-দূরান্তরে এই ধরনের নির্জন ঘাঁটি যারা আগলায়, হয়তো একাদিক্রমে তিন কি ছয় মাস, দিনের পর দিন গতানুগতিক কৃত্য সমাপন, অহোরহ একই সঙ্গীর মুখ দেখা ইত্যাদির মধ্যে মনটাকে সুস্থ রাখা তাদের এক মস্ত সমস্যা। ছোটখাটো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিরাট আকার নিয়ে নানারকম মানসিক বিকার ঘটাতে পারে, কেউ আক্রান্ত তর্কবাগীশ হয়ে ওঠে, কেউ গুম হয়ে যায়, সঙ্গীকে খুন করেছে এমনও

দেখা গিয়েছে। ভবিষ্যতে দূর গ্রহের পাড়িতে যারা ক্ষুদ্র কামরায় মাসের পর মাস কাটাবে তাদের নানা সমস্যার মধ্যে এটাও একটা।

রজার ও পলের এখনও মেজাজ ভাল আছে; দাবার ছক, হাল্কা বই পত্র, শরীর চর্চার ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে অবসরসময় কাটে। মাঝে মাঝে হেলিকপটারে ডাক ও দরকারী জিনিসের সঙ্গে আসে তাবসর বিনোদনের নতুন খোরাক। তবু দিন ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসছিল, শীতকাল আসন্ন বলে দিনের আলো যে দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে বিশ্রী লাগে সেইটা। কিন্তু সেই সন্ধ্যার আশ্চর্য অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় এই সব প্রভাব দেখতে দেখতে উবে গেল।

ঘরে ঢুকে প্রথমেই তারা বেতারে খবর পাঠালে রাজধানী অটোয়ায়; ক্যামেরার ছবি সঙ্গে সঙ্গে তৈরী তাও পাঠানো হল একই উপায়ে। তারপর খাবার টেবিলে দু'জনের মধ্যে আলোচনা চলল; শেষ পর্যন্ত মনে হল হয়তো ওখানে কোনও গুপ্ত সামরিক পরীক্ষা কেন্দ্র আছে, তারই লেসার রশ্মি তারা দেখেছে।

লেসার যে কি বস্তু তা পুরোপুরি না বুঝলেও আজ সাধারণ লোকেও শুনেছে তার নানা আশ্চর্য প্রয়োগের খবর। স্খলিত আঁখিতারা থেকে আরম্ভ করে ধাতুবস্তু পর্যন্ত জোড়ে লেসার, কঠিন হীরে অনায়াসে ফুটো করে। বিনা রক্তক্ষয়ে অস্ত্র-চিকিৎসার ছুরি এই অভিনব আলো। লেসার পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মেপেছে মাত্র কয়েক ইঞ্চির মধ্যে, পৃথিবীতেও জরিপের কাজ সহজ করেছে। চুম্বকী ফিতের গায়ে অল্প জায়গায় তথ্য সংরক্ষণের সূক্ষ্মতর পন্থার নির্দেশ দিয়েছে লেসার, বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রেও তা রেডিওকে হার মানাতে চলেছে। দিনে দিনে বাড়ছে এই তাজ্জব রশ্মির প্রয়োগ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অকল্পনীয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যদিও মানুষের প্রভূত উপকার করেছে, এর অপ-প্রয়োগও যে বন্ধ করা যায় নি তার অনেক উদাহরণ আমাদের জানা আছে। লেসার থেকে মারণাস্ত্র বানাবার যে গোপন গবেষণা চলছে তা সাধারণের অগোচর থাকলেও রজার ও পলের মত বিজ্ঞানীদের অজানা নয়। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের শেষের দিকে যে সব মার্কিন বোমা চুলচেরা লক্ষ্যভেদ করতে সক্ষম হয়েছে তাদের দিক নির্দেশ করেছে লেসার। এর চেয়েও ভয়াবহ ও সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের হাতিয়ার নিয়ে গোপন পরীক্ষা অনেকটা এগিয়েছে, সে খবর অনেকে রাখে। রাশিয়া ও আমেরিকা এই কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, যদিও তারা সর্বদা শান্তিপূর্ণ প্রয়োগের দিকটাই ফলাও করে প্রচার করে। মার্কিন লেসার পরীক্ষা কেন্দ্রটি আণবিক বোমার জন্মস্থান লস অ্যালামস-এর অদূরে অ্যালবুকার্ক নামক জায়গায়। এ ছাড়া অনেক দেশে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ এড়িয়ে তার তেজকে বশে আনবার চেষ্টা চলছে লেসারের সাহায্যে, তাতে আণবিক শক্তির শান্ত ব্যবহার আরও সহজ হবে, সমুদ্রের জল থেকে সংগ্রহ হবে প্রায় জলের মত সস্তা অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি।

রাজধানী হলেও অটোয়া ছোটখাটো তল্লাটের শহর, কিন্তু দূর মেরু অঞ্চলের বার্তা পেয়ে হঠাৎ তা চঞ্চল হয়ে উঠল। সাসেক্স স্ট্রীটে জাতীয় গবেষণা পরিষদের পদার্থবিজ্ঞানীদের মুখে এ ছাড়া আর কোনও প্রসঙ্গ নেই। তাঁদের বাছা বাছা কয়েকজনের ডাক পড়ল মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠকে। চার ঘন্টা আলোচনায় বিজ্ঞানীরা শুনে অবাক হলেন যে ঐ অঞ্চলে সরকারের কোনও গুপ্ত সামরিক পরীক্ষা কেন্দ্র নেই। সরকার পক্ষ লেসার সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা বাদ করলেন। অবশেষে ঘনীভূত রহস্যের থেকে এই প্রশ্ন উঠল যে তা হলে কি অন্য কোনও দেশ অজানতে ক্যানাডার ভূমিতে ঘাঁটি বানিয়েছে...আমেরিকা রাশিয়া? স্বভাবতই সন্দেহ পড়ল এদের উপর।

দুই দেশই ক্যানাডার রাষ্ট্রদূতদের অনুসন্ধানের জবাবে জানালে ভিন্ন দেশের জমিতে তার অগোচরে ঘাঁটি বানালে সেই দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়, কেউ যদি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করে থাকে তো তার চক্রান্ত উদ্‌ঘাটন করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। অপরাধী কে সে সম্বন্ধে দুই দেশেরই বিবৃতিতে প্রচ্ছন্ন কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকল। ক্যানাডা তৎক্ষণাৎ এক তদন্ত পরিষদ সৃষ্টি করল।

দেশের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জনসাধারণ শঙ্কিত হয়ে উঠবে বলে ঘটনাবলী প্রকাশ করা হল না, কিন্তু তা চাপা রইল না। অন্দর মহলের প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ ব্যারি গ্রিসম স্বীকার করলেন তিনি এক সাংবাদিককে দু'কথা বলেছেন কারণ এ খবর দেশের লোককে জানতে না দিলে ক্ষতির আশঙ্কা বেশী। অবিলম্বে বিশ্বের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এই চাঞ্চল্যকর প্রসঙ্গের আলোচনায় মুখরিত হয়ে উঠল।

এই সব কিছুর আড়ালে, রহস্যের সমাধান করতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে ক্যানাডা তার সাহায্য নিতে রাজী হল। দেখতে দেখতে দূর মেরু দেশের ঘুমন্ত ঘাঁটি ক্যানাডীয় ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের কার্যকলাপে ও আনাগোনায় সরগরম হয়ে উঠল নানা যন্ত্র ও উপকরণ সাজিয়ে তাঁরা চতুর্দিকে অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন। বিমান থেকে সেই আশ্চর্য আলোর সংলগ্ন ভূমির পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি নেওয়া হল, তাতে একটি পয়সার মত ক্ষুদ্র বস্তুও ধরা পড়ে। আরও উঁচুতে মহাকাশে ক্যামেরা এবং সূক্ষ্ম যন্ত্র সম্ভার বাগিয়ে প্রদক্ষিণ করছে কৃত্রিম উপগ্রহ এমন কি জলের জাহাজও রাডার ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় মেলে ওৎ পেতে বসে রইল। রাশিয়াও নিজের স্বার্থে পিছিয়ে থাকল না অনুরূপ অনুসন্ধানে।

এ দিকে লেসার সম্বন্ধে সাধারণের কৌতূহল মেটাতে দেশে দেশে বিজ্ঞানীদের ডাক পড়ল। রেডিও ও টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে, পত্রিকার প্রবন্ধে তাঁরা বোঝালেন আলোর চরিত্র। জলে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে তেমনি আলোর রশ্মিও তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়ায়; সাধারণ আলোতে থাকে নানা দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ, তা ছাড়া রশ্মি-গুলি একমুখী বা সমান্তরাল নয়, দূরের দিকে ক্রমেই তারা পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৬০ সালের কাছাকাছি যন্ত্রে এমন আলো তৈরি সম্ভব হল যার তরঙ্গগুলি সমান দীর্ঘ, যার রশ্মি একমুখী; উপরন্তু ঢেউয়ের ওঠানামা চলে একই তালে। এই সব শৃঙ্খলার ফলে সৃষ্টি হল অতি প্রবল সংহত আলো, আমাদের পরিচিত পাঁচ-মেশালি এলোমেলো আলোর তুলনায় যা আজ অসাধ্য সাধন করছে—এর কিছু নিদর্শন উপরে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী থেকে চাঁদে সাধারণ আলো পাঠালে ২৪০,০০০ মাইল পথ যেতে তা তার গায়ে ছড়িয়ে পড়বে হাজার হাজার মাইল জুড়ে, চোখে আর দেখাই যাবে না, কিন্তু লেসার আলো সেখানে মাত্র দুই মাইলের এক বৃত্ত রচনা করেছে। লেসার রশ্মিকে ঘন করা চলে এক সেনটিমিটারের ১০,০০০ ভাগের এক ভাগ জায়গায়, তখন তার ঔজ্জ্বল্য সূর্যগাত্রের বহু কোটি গুণ।

ইতিমধ্যে গোপনীয় সরকারী খবর প্রকাশ করার অপরাধে ডঃ গ্রিসম চাকরি হারিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরিবার তাঁর স্বভাবে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তা অন্য কারণে। কথাবার্তা বেশী বলেন না, অন্য-মনস্ক হয়ে কি যেন ভাবেন, বাকি সময় নিজের লাইব্রেরিতে কাটান। খাবার দাবার সেখানে পাঠানো হয়, কিন্তু প্রায়ই তিনি তা স্পর্শ করেন না। মাঝে মাঝে চোখ দুটি আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সরকারের বিরাগভাজন হলেও দেশের এই অগ্রগণ্য বিজ্ঞানী সাধারণের এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। কিছুদিন এদের এড়িয়ে চলার পর একদিন রাজী হলেন টেলিভিশনের প্রশ্নোত্তর বৈঠকে বসতে। সেই সন্ধ্যায় তিনি যা বললেন তা আগের চেয়েও চমকপ্রদ, শুনে সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তাঁর বক্তব্যের প্রধান অংশ এই রকম ঃ

প্রশ্নকর্তা ঃ আপনি কি মনে করেন উত্তর মেরু অঞ্চলে যে লেসার আলো দেখা গিয়েছে তার উৎপত্তি রাশিয়ার কোনও গোপন ঘাঁটির থেকে?

ডঃ গ্রিসম ঃ যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের সরকার এবং পশ্চিম ইয়োরোপের দেশগুলি তা সন্দেহ করলেও আমি তা বিশ্বাস করি না। রাশিয়ার পক্ষে তা হবে আত্মঘাতী দুঃসাহস।

প্রশ্ন ঃ তা হলে কি যুক্তরাষ্ট্রই এর জন্য দায়ী?

ডঃ গ্রিসম ঃ না তাদের কথাও আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সঙ্গে তাদের চির-কাল বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আমাদের না জানিয়ে এমন কাজ হবে নিতান্তই পাগলামি।

প্রশ্ন ঃ তবে অনেকে যে বলে ঐ আলোর উদ্ভব প্রাকৃতিক কারণে, আপনারও কি তাই বিশ্বাস?

ডঃ গ্রিসম ঃ লেসার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত আমরা যা জানি তাতে তা হঠাৎ প্রাকৃতিক কারণে আলেয়ার আলোর মত জন্মাতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন ঃ তা হলে রজার ও পল কি দেখেছেন, কিসের ছবি তুলেছেন?

পরদার গায়ে ডঃ গ্রিসমের চোখ চকচক করে উঠল, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে তিনি বললেন, "তা যদি প্রকৃতির বা মানুষের সৃষ্টি না হয় তা হলে কি বাকি থাকল? হয়তো আমাদের অজানা, মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান কোনও জীবের..."

প্রশ্নের উত্তরগুলি ডঃ গ্রিসম আগে টেলিভিশনের কর্তাদের কাছে পাঠাতে রাজী হন নি, সুতরাং তাঁর কথাগুলি প্রশ্নকর্তার পক্ষে সম্পূর্ণ আকস্মিক। কয়েকটি স্তম্ভিত মুহূর্তের পর তিনি শুরু করলেন, "আপনি কি বলতে চান..."

"হ্যাঁ সম্ভাবনাটা এখন আর অবজ্ঞা করা চলে না। পৃথিবীর কোনও দেশ ঐখানে পরীক্ষা কেন্দ্র বানায় নি, তা হলে ঐ আলো তৈরি করেছে হয়তো বহির্জগতের কোনও আগন্তুক। চাঁদে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকত তো সেখানে আমাদের বৈজ্ঞানিক উপকরণ, পদচিহ্ন দেখে তারা কি ভাবত? বিশ্বের অগণ্য নীহারিকার মধ্যে শুধু আমাদের ছায়াপথ নীহারিকাতেই প্রায় ১০,০০০ কোটি তারা আছে তাদের অনেকেরই নিশ্চয় গ্রহ পরিবার আছে সূর্যের মত; অনুমান করা হয় উপযুক্ত অবস্থার সংযোগে অন্তত ১০-৫০ কোটি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে বনমানুষের থেকে খাঁটি মানুষের বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র হাজার চল্লিশেক বছর আগে, অন্য জগতে তার তুল্য প্রাণী যদি পঞ্চাশ হাজার বছর আগেও দেখা দিয়ে থাকে তো তাদের পক্ষে দূর মহাকাশ পাড়ি, প্রবল লেসার সৃষ্টি ও তার প্রয়োগ আদৌ অকল্পনীয় নয়। আমরা সৌর জগতে চাঁদ মঙ্গল শুক্র বৃহস্পতির অনুসন্ধান শুরু করেছি, অন্য কোনও নক্ষত্র পরিবারের কেউ হয়তো পারিবারিক গন্ডি ছাড়িয়ে আমাদের গন্ডিতে এসে পড়েছে। আমার মনে হয় এই সম্ভাবনার কথা এখন সারা বিশ্বের ভেবে দেখা দরকার, এবং অবিলম্বে তদনুসারে অনুসন্ধান চালানো এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা উচিত।"

প্রশ্নকর্তা মন্তব্য করলেন, "নিশ্চয়, নতুবা এই আক্রমণের পরিণতি কোথায় কে জানে?"

ডঃ গ্রিসম ঃ আক্রমণ বলছেন কেন? আমি আপাতত 'অনুসন্ধান', 'পর্যবেক্ষণ' বা 'অভিযান' শব্দের পক্ষপাতী। ওরা এ পর্যন্ত আমাদের কোনও ক্ষতি করে নি।

এই বাক্য বিনিময়ের পর মার্কিন কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এসেছিল। সকলেই জানে বছর কয়েক আগে যখন নানা দিক থেকে উড়ন্ত চাকি বা 'উফোর খবর আসতে থাকে তখন তারা এ সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক তদন্ত চালায়; শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ রিপোর্টই ধোপে টেঁকে নি, তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় নি। প্রকাশ্যে তারা ডঃ গ্রিসমের উক্তিকে পাত্তা না দিলেও মনে মনে সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিলে না; রাশিয়ার প্রতি একরোখা সন্দেহেও ঈষৎ ভাঁটা পড়ল। তবে গ্রিসম যাই বলুন, ভিন্ গ্রহের থেকে কেউ যদি এসেই থাকে তো তারা মিত্র নয় এই বিশ্বাসও দৃঢ় হল। এই সবই পরে প্রকাশ পায় ঘটনার পরিণতির থেকে। এবং ঘটনা এবার দেখতে দেখতে ঘনিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আরও দু'একবার একই জায়গায় সেই আশ্চর্য আলো দেখা দিয়ে উত্তেজনা চরমে চড়িয়ে রেখেছে। আকাশ থেকে উত্তর ক্যানাডার উপর যে অক্লান্ত অনুসন্ধান চলছিল অবশেষে অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর তার থেকেও সামান্য এক ইঙ্গিত পাওয়া গেল। দিগন্তপ্রসারিত সাদার একঘেয়েমি মাঝে মাঝে শুধু ভেঙেছে ছোট বড় গাঢ় নীল হ্রদ; গাছপালা বা বলগা হরিণ তো দূরের কথা, কোথাও একটা সন্দেহজনক ঢিবি পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। কিন্তু বারোদিন পরে এক কৃত্রিম উপগ্রহের রেডার তরঙ্গ এক জায়গায় তুষার স্তরের নীচে কোনও কঠিন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এল। কিন্তু এই খবর বিশেষজ্ঞদের কাছে পৌঁছাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিম উপগ্রহটি বোবা হয়ে গেল। জানতে দেরি হল না যে তা টুকরো টুকরো হয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, যন্ত্রপাতি অবশ্য সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অবিলম্বে আমেরিকা ও রাশিয়ার সব কটি কৃত্রিম চাঁদের হল একই দশা। ফলে আর যাই হক, এদের পারস্পরিক সন্দেহ প্রায় নিশ্চিহ্ন হল।

কিন্তু বিকল হওয়ার আগে প্রথম মার্কিন উপগ্রহটি অজানা বস্তুটির অবস্থান সুক্ষ্মভাবে নির্দেশ করেছে। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্টের ভবনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের উচ্চপদস্থ আমলারা। সেনাপতিরা চান ঐখানে বোমা ফেলতে। আবার কেউ বললেন পেট্রোল বোমা বা তাপ রশ্মি দিয়ে দেখা যাক নীচে কি আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী ঠিক হল যে কয়েকটি বাছা বাছা পদাতিক সেনা আগে কাছে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করবে এবং যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করবে। তাদের সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র থাকবে আত্মরক্ষার জন্য।

এদিকে ডঃ গ্রিসমকে নিয়ে আবার এক সমস্যা। একদিন সকালে তাঁর স্ত্রী পুলিশকে জানালেন যে তিনি নিরুদ্দেশ, সম্ভবত গভীর রাত্রে বেরিয়ে গিয়েছেন। মূল রহস্যের সঙ্গে নিশ্চয় এ ঘটনা জড়িত, সুতরাং তন্ন তন্ন খোঁজ শুরু হল। কিন্তু দুদিন পরে, নাগালের বাইরে গিয়ে, তিনি নিজেই জানালেন তাঁর খবর। ক্ষুদ্র শহর ইয়েলোনাইফ থেকে সংক্ষিপ্ত এক চিঠি পেলেন মিসেস গ্রিসম; প্রধান কথা ঃ আমার জন্য ভেবো না কর্তৃপক্ষ ক্রমেই উন্মাদ হয়ে উঠছে, পৃথিবীবাসীর সর্বনাশ ডেকে আনছে। সেটা এড়াবার যথাসম্ভব চেষ্টা না করে আমি পারছি না, সুতরাং চললাম আতিথিদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে।

সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল তিনি স্যাস্কাটুন শহর পর্যন্ত বিমানে এসে সেখান থেকে এক সরকারী হেলিকপটার চুরি করে পালিয়েছেন। এও প্রকাশ পেল যে অটোয়ার দপ্তর থেকে কিছু গুহ্যতিগুহ্য কাগজপত্র হারিয়েছে, অন্যান্য তথ্যের মধ্যে তাতে লক্ষ্য স্থলের নির্দেশ আছে।

তা হলে কি উপর দিকের কোনও সরকারী কর্মী ডঃ গ্রিসমের সহযোগী? এ ছাড়া আরও প্রশ্ন উঠল ঃ এর আগেই কি হানাদারদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে... হয়তো তারা পৃথিবীতে নামবারও আগে? কি ভাষায় তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বা বলবেন? বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনায় মেতে উঠলেন, যদিও অনেকেই তখনও গ্রহান্তরবাসীর মর্তে্য আগমন সম্পূর্ণ মানতে রাজী নন।

এর পর অবিলম্বে অনুসন্ধানী সেনা দল রওনা হয়ে পড়ল, তাদের উপর জরুরী নির্দেশ ডঃ গ্রিসমকে ধরে আনতে হবে। গন্তব্য স্থলের এক মাইল দূরে প্যারাশুটে করে তুষার প্রান্তরে নামল তারা, চলল উত্তর মুখে। কিছুটা এগিয়ে দূরে থেকে সাদার গায়ে নীল রঙের হেলিকপটারটি

বহু নতুন বিষয় নিয়ে ২৭ শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

বর্ষপঞ্জী ১৩৮০

বাংলা ভাষায় ৯০০ পৃষ্ঠার বিরাট 'ইয়ার-বুক' (তথ্যগ্রন্থ)

গুণ আছে বলেই দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে সমাদৃত হচ্ছে। 'নতুন ভারত' ও 'চলতি দুনিয়া'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হলে বর্ষপঞ্জী চাই-ই। পঃ বঙ্গ সরকারের সকল তথ্যকেন্দ্রে বর্ষপঞ্জী ব্যবহৃত হয়।

দৃঢ় বোর্ড বাঁধাই, মূল্য ৯ টাকা ৫০ পঃ। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

প্রকাশক ঃ এস. আর. সেনগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী

৩৫/এ গোয়াবাগান লেন কলকাতা-৬। ফোন ঃ ৩৫-৪৭৯৭

চিনতে অসুবিধা হল না, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখা গেল তা খালি। চোখে দূরবীন যন্ত্র লাগিয়েও কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন পাওয়া গেল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল তারা।

এমন সময়ে হঠাৎ যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ এসে ঠিকরে পড়ল দলনেতা মার্টিনের গায়ে, চোখের পলকে তাঁর দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল বরফে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুগামীরাও স্বাভাবিক আত্মরক্ষার কৌশলে ভূমিশয্যা নিল। মিনিট কয়েক পরে আর কিছু ঘটছে না দেখে তারা সন্তর্পণে এগিয়ে গেল দলনেতার কাছে। কিন্তু দেহটি উলটে যে বীভৎস দৃশ্য দেখল তা সহ্য করার ক্ষমতা রইল না তখন তিনি সব সাহায্যের বাইরে। বুকের মাঝে নিখুঁত গোল এক গহ্বর তার ফাঁক দিয়ে কোথাও পাঁজরার হাড় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আর কোথাও ক্ষতের চিহ্ন নেই।

অভিযাত্রীদের সঙ্গে এক বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি বললেন "এটা গুলির ক্ষত নয় মনে হয় মৃত্যু হয়েছে এক মারণ রশ্মির আঘাতে—এবং লেসার ছাড়া আর কিছু এমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে বলে আমাদের জানা নেই। কমান্ডার মার্টিনকে মেরেছে সম্ভবত রাসায়নিক লেসার।"

এই বিজ্ঞানী অ্যালবুকার্ক গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেসার অস্ত্র তৈরির গোপনীয় কাজের খবর রাখেন। তিনি জানেন যে বহুকাল মারণ রশ্মি নিয়ে যেসব কাল্পনিক গল্প কাহিনী লেখা হয়েছে তা সৈন্যদল পরিচালনা বিজ্ঞানীরা আজগুবী বলে উড়িয়ে দিলেও নানা দেশে গোপন বন্দুকের। রাশিয়া ও ফ্রান্সিসকো পরীক্ষণের দিকে লক্ষ্য করে সেখানে স্থলে হাইড্রোজেন বোমার ক্ষেপণাস্ত্র সাজিয়ে রেখেছে সোভিয়েট টিপলেই তা ছেড়ে অসংখ্য শত্রুর দেশ ধ্বংস করতে এতই তা কিন্তু যে প্রচলিত প্রতিরক্ষা পদ্ধতিগুলি তার বিরুদ্ধে অকেজো। কিন্তু বিদ্যুৎগতি লেসার সীমাহীন বহুদূর আকাশ পথে কোনও প্রক্ষেপণ পাঠিয়ে দেবে। এই ব্রহ্মাস্ত্র নিঃশব্দে বৈমানিকদের চোখ অন্ধ করে দেবে হাজার হাজার মানুষ বিনাশ করবে। মার্কিন পরীক্ষায় দু' মাইল দূরে কাঠের লক্ষ্য ভস্মসাৎ করতে তা। রাসায়নিক লেসারের প্রায় সত্তর ভাগ চালিত, বাইফেলের গুলির মত কাজ করার জন্য।

এই সব ব্যবহারে লেসার অনেক প্রচলিত অস্ত্রের উপর টেক্কা দিয়েছে। প্রথমত তার দ্রুতি— সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ গোলা-গুলির সোজা রাস্তায় চলে না পরিবর্তন আকর্ষণ বিন্দু থেকে যার গতির দিকে তা ছাড়া বাতাসের প্রভাব নিরীক্ষক হয় কিন্তু লেসার রশ্মি তা নির্ভুল সরল রেখায় চলে। সুতরাং সাধারণ বন্দুকের গুলি ঠিকমত তাক করলেও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু লেসারের কথা নিখুঁত লক্ষ্য ভেদ করতে বাধা। অবশ্য লেসারের কিছু অসুবিধাও আছে—সাধারণ আলোর মতই তা মেঘে বাধা পায়, বাতাসের নানা অণুর সঙ্গে ধা খেয়ে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে তাই এখনও বেশী দূরে পর্যন্ত তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানীর কথা শুনে স্তম্ভিত অভিযাত্রীরা আরও বিহ্বল হয়ে পড়ল, জানা বিপদের তুলনায় অজানা প্রমাদ বেশী ভয়ংকর। দূরবীন যন্ত্রে লক্ষ্যস্থল ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে মনে হল দূরে একটা নল তাদেরই দিকে মুখ করে বরফের গায়ে শুয়ে আছে। ওটা কি পেরিসকোপের মত কিছু বা দিয়ে শত্রু তাদের উপর নজর রেখেছে? হঠাৎ এক সৈনিক উত্তেজনার আতিশয্যে তার দূরবীন-বসানো বন্দুক তুলে সেই দিকে গুলি করলে।

সঙ্গে সঙ্গে সে এবং আরও দুই সঙ্গী ধরাশায়ী হল, বিভ্রান্ত অভিযাত্রীরা দেখলে তিনজনেরই পিঠ ফুটো হয়ে গিয়েছে। মুহূর্ত আগে নলের মুখে তিনটি আলোর ঝলক তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

এবার অবিলম্বে তারা চারটি দেহ তুলে নিয়ে পিছু হঠল।

আবার ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং অমাত্যবর্গের জরুরী অধিবেশন। সামরিক ও অসামরিক কর্তারা এবং জনকয়েক বিজ্ঞানী অভিযাত্রীদের কাহিনী শুনলেন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। যে হঠকারী সৈনিক হঠাৎ গুলি ছুঁড়েছিল সে বরখাস্ত হল কিছুদিনের জন্য। কিন্তু অতঃপর কি কর্তব্য? দু-একজন উগ্রপন্থী সেনাপতি প্রস্তাব করলেন পরমাণু বোমা দিয়ে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করা হক কানাডার প্রধানমন্ত্রী তাতে আপত্তি জানালেন, বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা ছড়াবে এই ভয়ে।

প্রবীণতম বিজ্ঞানী বললেন, 'মারণ রশ্মি যেই ব্যবহার করে থাকুক—এই পৃথিবীর বা বহির্বিশ্বের লোক—তাদের নীতি আক্রমণ না আত্মরক্ষা মাত্র তা এখনও জোর করে বলা যায় না। আমাদের কৃত্রিম উপগ্রহগুলি তাদের উপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিল বলেই হয়তো সেগুলি বিনষ্ট হয়েছে। তার পর অভিযাত্রীদের দূরে রাখবার জন্য তারা শুধু কমান্ডার মার্টিনকেই মেরেছে, যদিও সবাইকে কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারত অনায়াসে। পরে আমরাই গুলি চালিয়েছি বলে তারা আর একটু কড়া জবাব দিয়েছে। আমার মনে হয় তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে আগে বেডিওর সাহায্যে ডঃ গ্রিসমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা উচিত।' শুনে কর্তারা খুশী হলেন না, কারণ কথাগুলি গ্রিসমেরই মত শোনাল, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করলেন না।

বিজ্ঞানীরা এও বললেন যে, আগন্তুকদের শিবিরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করলে সব নজিরও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং তাদের সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত আমরা কিছুই জানতে পারব না। সুতরাং কাজটা হবে অদূরদর্শী।

অবশেষে মাঝামাঝি এক রফায় সায় দিলেন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। বিমান থেকে পেট্রোল বোমা অথবা তাপ-রশ্মি ফেলে ঐ জায়গায় বরফ গলিয়ে ফেলা হবে। ভিতরের কামরা দৃষ্টিগোচর হলে প্রবল লেসার রশ্মি দিয়ে তা ফুটো করে সেই পথে অসহনীয় গ্যাস ঢুকিয়ে বাসিন্দাদের বাইরে তাড়িয়ে আনার চেষ্টা হবে। তার পর যদি দরকার হয় আমরাও লেসার যুদ্ধ চালাব। এই প্রস্তাবে সামরিক দপ্তরের নেতারা এবং অস্ত্রবিশারদরা খুশী হলেন: এযাবৎ কোনও শত্রুর উপর লেসার অস্ত্র পরখ করবার সুযোগ তারা পাননি, এইবার পাবেন।

নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করেও ডঃ গ্রিসমের সঙ্গে রেডিও সংযোগ সম্ভব হল না। এদিকে দুটি বিমান চলল উত্তরে, একটি লেসার আলো দিয়ে লক্ষ্য চিহ্নিত করবে যাতে অন্যটি পেট্রোল বোমা বা তাপ রশ্মি দিয়ে চুলচেরা লক্ষ্যভেদ করতে পারে। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই তারা পড়ল অভাবিত অগ্নিপাতের গ্রাসে। প্রতিপক্ষের শিবির থেকে হঠাৎ এক লেসার স্রোত ঊর্ধ্বে মিলিয়ে গেল এবং কয়েক মুহূর্ত পরে শূন্য থেকে ভেড়ে এল নিদারুণ বজ্র—পরচণ্ড লেসারের আঘাতে দুটি জ্বলন্ত বিমান হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

বিপক্ষদলের বুঝতে দেরি হল না যে, সেগুলিকে বিনাশ করেছে শূন্যের কোনও অদৃশ্য শত্রু, পৃথিবীর থেকে পাঠানো লেসার সংকেত পেয়ে; সেখানে আছে কোনও প্রদক্ষিণরত মহাকাশ যান, যেমন ছিল মানুষ যখন চাঁদে নেমেছে। এই যানের অস্ত্রই এর আগে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি চূর্ণ করেছে।

এর পর জগত জুড়ে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল মানুষের ইতিহাসে তার নজির নেই। মানুষ অবশ্য চিরদিন নিজেদের মধ্যে হানাহানি করে এসেছে, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি এবং তজ্জনিত ভীতি তার সুপরিচিত। কিন্তু এখানে আড়াল থেকে অদৃশ্য, অমানবিক শত্রু বহু গুণ শক্তিসম্পন্ন অভিনব হাতিয়ার হানছে—এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। হয়তো আমাদের এই গ্রহে অন্যত্রও জলে স্থলে ওরা সুপ্রতিষ্ঠিত, হয়তো অন্তরীক্ষে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। ওদের বিরুদ্ধে মানুষ লড়বে কি করে। তাও ওরা কি চায় যদি জানা যেত তো আপসের চেষ্টা সম্ভব হত। তবে কি মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবী অধিকার করাই ওদের উদ্দেশ্য? ভয়োদ্যম মানব জাতির মনে এই সব ভাবনা।

কর্তারা এবার বিপদের গুরুত্ব লুকোবার কোনও চেষ্টা করলেন না, তাঁদের বিবৃতিতে অক্ষমতার প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি অনুভব করে সাধারণ লোকের নৈরাশ আরও বাড়ল। কিন্তু একই থেকে জন্ম নিল এক বিশ্বজনীন মৈত্রী —তাও মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন আত্মরক্ষা এই ভাব সঙ্গে বাঁধা সব দেশের সব জাতির স্বার্থ। কিন্তু কে বাতলে দেবে পন্থা—আমেরিকা ও রাশিয়ার কি আর কোনও কৌশল হাতে আছে—অথবা গুপ্ত অস্ত্র?

নতুন-ফসফোমিত নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিত আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ৫০০ মি. লি. ও ৪০০ মি. লি.।

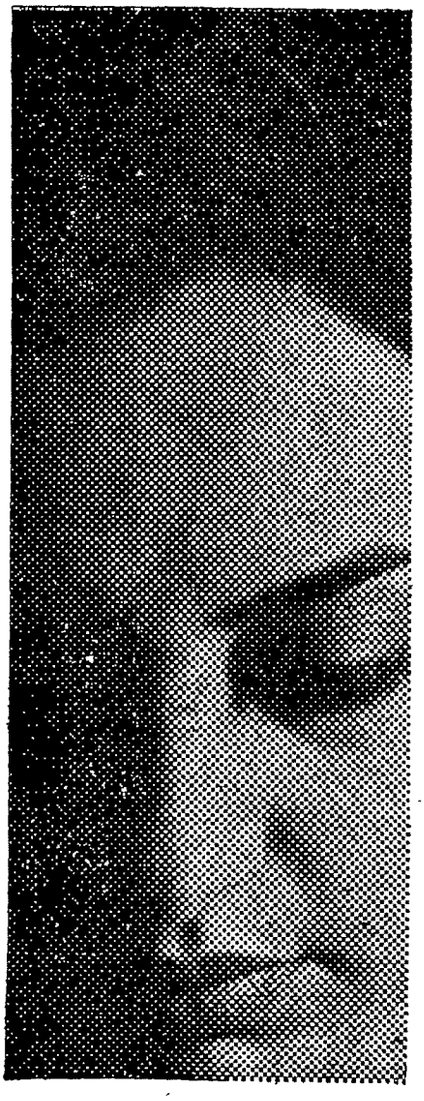

নতুন! ফসফোমিত আয়রন—মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন ফসফেটাদ মেফেটাদ আইয়েট সিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
© ই. আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা, হলেন দে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Beng

এবার সলা-পরামর্শে পাশ্চাত্য দেশগুলি রাশিয়াকেও ডাকলে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা ছাড়া কঠিন মাটির গর্ভে শত্রু নিপাতের আর কোনও উপায় মনোনীত হল না: এ যেন মশা মারতে কামান দাগা, কিন্তু এই মহাসংকটে এ নিয়ে আর দ্বিধা করা চলে না। এও ঠিক হল যে বিশ্ব জুড়ে নানা যন্ত্র উপকরণের সাহায্যে খোঁজা চলবে অন্যান্য শত্রুঘাঁটির, সন্ধান পেলে সেগুলিও একই অস্ত্রে বিলোপ করা হবে।

আমেরিকা চালকহীন রোবট বিমান বানিয়েছে, ইলেকট্রনিক আজ্ঞার নির্দেশে তা যেতে পারত এই মহাস্ত্র ফেলতে, তাতে প্রাণ হানির আশঙ্কা নেই। কিন্তু এর চেয়ে দ্রুত ব্যালিসটিক মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র, তার মাথায় চড়ে কয়েক মুহূর্তে বোমা পৌঁছাবে লক্ষ্যে। খুব বড় বোমার দরকার নেই, পাঁচ মেগাটনই যথেষ্ট। ক্ষেপণাস্ত্রের মুখ চুলচেরা হিসাবে কাত করে তাক করা হয়েছে, বিস্ফোরণ দেখবার জন্য দূরে পর্যবেক্ষকরা দূরবীণ যন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত, টেলিভিশন ক্যামেরা সাজানো। বিশ্বের রাজধানীগুলির সঙ্গে ঘন ঘন খবরাখবর চলছে, রাশিয়ার সঙ্গে হট লাইন গরম হয়ে উঠেছে।

ঘটনা ক্ষেত্রে আকাশ ঘোলাটে, সামান্য দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, থেকে থেকে বরফ পড়ছে। হঠাৎ দর্শকরা আবছা দেখলে শূন্য থেকে প্রকাণ্ড ঘণ্টার মত কি একটা বস্তু লক্ষ্য স্থানে নেমে এল; মিনিট দুই আর তাকে দেখা গেল না, তার পর আবার হুশ করে তা শূন্যে মিলিয়ে গেল।

প্রেসিডেন্টের আদেশে ক্ষেপণাস্ত্র তার মুখে নামিয়ে গর্ভে ফিরে গেল—সম্ভবত পাখি উড়ে গিয়েছে। শেষ হল ভিন গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর প্রথম যুদ্ধ। সামরিক নেতারা সগর্বে ঘোষণা করলেন রণে ভঙ্গ দিয়ে শত্রু পালিয়েছে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হলেও পরে দেখা গেল পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নিরাপদ নাও হতে পারে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানে এবং অস্ত্রশক্তিতে মানুষ যে খাটো তাতে সন্দেহ থাকল না।

নানারকম সতর্কতা অবলম্বন করে আবার যে অনুসন্ধানী দল অবশেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছাল তারা দেখলে অনেক আশ্চর্য বস্তু, তার কিছু কিছু এখনও হেঁয়ালি। মস্ত এক চোঙগার মধ্যে গোল ঘর, পেনসিলের মুখের মত ঢালু ছাতে ছোট ছোট গর্ত, নিশ্চয় তারই ভিতর দিয়ে লেসারের নল উঁকি মেরেছিল। ঘরে মাত্র কয়েকটি যন্ত্র, তার অধিকাংশই চেনা যায় না, যেমন এক ভারী গোলকের গায়ে গাঢ় লাল দুটি চোখ, মনে হয় যেন কাঁচের মত কোনও বস্তু দিয়ে তৈরি তা। দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আলমারির মত জিনিসটা সম্ভবতঃ কম্পিউটার। কিন্তু প্রথম অনুসন্ধানীরা বেশীক্ষণ টিকতে পারল না সেখানে ঘরে ঢুকতেই একটা গন্ধের সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্ট অনুভব করলে। পরে দেখা গেল তার কারণ কামরার বাতাসে পৃথিবীর তুলনায় অক্সিজেন কম, এবং নাইট্রোজেন ছাড়া বেশ কিছুটা মিথেন বা আলেয়া গ্যাস আছে—গন্ধটা তারই। আগন্তুকরা নিশ্চয় এই পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে আপন গ্রহের বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে। (ডঃ গ্রিসমের জন্য হয়তো অক্সিজেন সেকনের ব্যবস্থা হয়েছিল।)

ঘরের কঠিন দেয়াল তৈরি হয়েছে কয়েকটি ধাতুর সংকরে, তার অন্যতম আর্বিয়াম পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। কম্পিউটারটি ঢালাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, কিন্তু তার ভিতরটা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা যেমন বিস্মিত, তেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন—অনেক কিছু শিখতে পেরে এই বিদ্যায় এক লাফে বহু দূর এগিয়ে যাবেন এই আশায়। কতগুলি সরু ফিতে পাওয়া গেল, তাদের গায়ে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক গর্ত, এ-ছাড়া অন্যান্য নজির থেকেও তাঁদের এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে লেসার দিয়ে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রেরণের ক্ষেত্রেও আমরা ওদের অনেক পিছনে পড়ে আছি; লেসারের যেসব ঝলক শূন্যে উঠতে দেখা গিয়েছে তা টেলিগ্রাফীর সংকেত নয়, টেলিফোনের মত তা সুদীর্ঘ বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছে ঊর্ধ্বে প্রদক্ষিণরত যানটিতে। এই কারণেই ওদের কাজ-কলাপে রেডিওর বালাই নেই। আমাদের মহাকাশযাত্রীরা এখনও রেডিওর সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু তার জন্য যে ভারী অ্যান্টেনা (তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের আঁকশি) নিয়ে যেতে হয় দূর পাড়িতে তা মস্ত এক বোঝা।

কামরাটি ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করে যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন মহাকাশ কেন্দ্রে বিশদ পরীক্ষা চলল। বোঝা গেল উপর থেকে নেমে তা প্রথমে তাপ রশ্মি দিয়ে বরফ গলিয়েছে, তারপর পাথরোপম কঠিন মাটি কেটে ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে—উদ্দেশ্য নিশ্চয় মানুষের দৃষ্টি এড়ানো। কামরার বাসিন্দারা কি ধরনের, তারা কজন এসেছিল এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা গেল না; তবে খুঁজতে খুঁজতে একটি লালচে রঙের লোম আবিষ্কার হল, প্রায় দু ইঞ্চি লম্বা। তা দেখে কোনও কোনও বিজ্ঞানী বললেন তারা হিম জগতের অধিবাসী, আমাদের মেরু দেশে যে আশ্রয় নিয়েছে তা শুধু নির্জন বলে নয়। আর পাওয়া গেল কয়েকটি অদ্ভুত পদাঙ্কা-চিহ্ন, দেখে মনে হয় ওদের পা মানুষের তুলনায় সরু ও লম্বা এবং সামনের দিকে যেন দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডঃ গ্রিসমের পদচিহ্নের থেকে তা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

এক টুকরো কাগজে তাঁর হাতে লেখা কয়েকটি কথা প্রথম পরীক্ষাতেই পাওয়া গিয়েছিল। স্ত্রীকে চিঠি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাতে যেন আকস্মিক বাধা পড়ে—হঠাৎ পালাবার দরকার হল বলে, না তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বাধা দিল বলে তা বোঝা গেল না। চিঠিতে আর কয়েকটি কথা থাকলেই হয়তো স্পষ্ট হত তিনি স্বেচ্ছায় পৃথিবী ছেড়েছেন কিনা, বহিরাগতরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল, তারা শত্রু না মিত্র।

আপাতত তাদের শত্রু সাব্যস্ত করে পৃথিবী জুড়ে খোঁজ খবর চলল তাদের চিহ্নের সন্ধানে। এ যাবৎ একমাত্র নজিরটি পাওয়া গিয়েছে আকস্মিকভাবে। আফ্রিকার উপকূলে এক সৌখিন ডুবুরী ভূমধ্য সাগরের জল থেকে তুলে এনেছে একটি গোলক, তার গায়েও লাল কাঁচের চোখ। কেউ বললে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির নীচে ছিল, ভাঁটার টানে বালি সরে গিয়ে জলে পড়েছে; আবার কারও ধারণা জলেই ছিল ঘাঁটি—হয়তো এখনও আছে!

এরা কোথা থেকে এল? বিজ্ঞানীরা বলেন যাদের প্রাণ ধারণের উপযোগী গ্রহ থাকতে পারে এমন নিকটতম তারা দুটি আছে প্রায় ৬০,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল দূরে। আলোর বেগে ছুটলেও (যা সম্ভব নয়) সেখান থেকে পৃথিবীতে একবার যাতায়াত করতে প্রায় একুশ বছর কেটে যাবে। যেখান থেকেই আসুক হানাদাররা কি শুরু করেছে তাদের দীর্ঘ প্রত্যাবর্তন? তাদের আর এক দল কি এখন পৃথিবীর দিকে অভিযানরত? নাকি এখনও প্রদক্ষিণরত যানটি থেকে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে আমাদের উপর?

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অক্লান্ত অনুসন্ধান চলছে। এবং ওরা যে আবার আসবে সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ, যদিও ওদের মতলব সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলে ওরা চায় আমাদের সাহায্য করতে নিজেদের উন্নত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভাগ দিয়ে; তার আগে কিছুদিন আড়ালে থেকে আমাদের মতিগতি বুঝতে চেয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশের ধারণা জন্মভূমি বাসের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে বলে (হয়তো গ্রহটা বেশী জুড়িয়ে যাচ্ছে, অথবা তার প্রাকৃতিক রসদ সামান্য অবশিষ্ট আছে) ওদের মতলব পৃথিবীতে উপনিবেশ স্থাপন করা: মানুষকে উচ্ছেদ না করলেও এই নৈসর্গিক আগন্তুকরা তাকে দাস বানাবে।

হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সঠিক জবাবটি মিলবে।

বাংলার রেনেসাঁস

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওদের রেনেসাঁস আর আমাদের রেনেসাঁস এই দুই রেনেসাঁসের মধ্যে মৌল প্রভেদ ছিল একটি জায়গায়। ওদের রেনেসাঁস এসেছিল প্রাচীন গ্রীস রোমের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের বেলা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি, সুতরাং পুনরুদ্ধারের কথা ওঠে না। আমাদের রেনেসাঁস এসেছিল আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপন করতে। মাঝখানে ছিল বহু সমুদ্রের তথা বহু শতাব্দীর ব্যবধান। সমুদ্র লঙ্ঘন করা তত কঠিন নয় শতাব্দী লঙ্ঘন করা যত কঠিন। একটা পেছিয়ে পড়া দেশকে এগিয়ে যাওয়া কালের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে, এই ছিল আমাদের রেনেসাঁসের আহ্বান। তার জন্যে রাখতে হবে অগ্রসর যাত্রীদের উপর দৃষ্টি।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের দৃষ্টি ছিল অগ্রসর যাত্রীদের উপরে। তাই ভারতও দিন দিন আধুনিক হয়ে ওঠে। আধুনিক ভারত আর মধ্যযুগের ভারত নয়। যদি মধ্যযুগের ভারত হয়ে থাকে তবে আধুনিক ভারত নয়। কিন্তু ছিন্ন না হলেও এদেশের প্রাচীনের সঙ্গেও এদেশের আধুনিকের একটা যোগসূত্র ছিল। সেই যোগসূত্রটার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে অগ্রসর হলে ঐতিহ্য-বোধ হারিয়ে যেত। ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয়রক্ষাও ছিল আমাদের অন্যতম অবশ্য-কর্তব্য। আমাদের রেনেসাঁসের নায়করা প্রাচীন ভারতের সঙ্গে অন্বয়রক্ষা করতে যত্নবান ছিলেন। কেমন করে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয় ঘটানো যায় এই ছিল তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন।।

পরবর্তীকালের চিন্তানায়কদের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন হলো কেমন করে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন ভারতে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা যায়। যেমনটি সে পলাশীর পূর্বে ছিল বা পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পূর্বে ছিল। কারো মতে পরাধীনতার হয় পলাশীর পর থেকে। কারো মতে পৃথ্বী-রাজের পরাজয়ের পর থেকে। যাঁদের মতে মুসলিমশাসিত ভারতও ছিল পরাধীন ভারত তাঁরা স্বাধীন ভারত বলতে বুঝতেন প্রাচীন ভারত। সেই প্রাচীন ভারতকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করা বা সেইখানে ফিরে যাওয়াই ছিল তাঁদের মতে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এর নাম রেনেসাঁস নয়, রিভাইভ্যাল। রিভা-ইভালের নায়করা আধুনিক ইউরোপের সঙ্গে সমন্বয়ের কথা ভাবতেন না। বরং ভাবতেন কেমন করে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ঝগড়াটা শুধু ইংলণ্ডের সঙ্গে নয়। ইংলণ্ড যাকে বয়ে নিয়ে এসেছে সেই আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে। পুনরুজ্জীবনবাদীরা প্রাচ্যের দেশরক্ষী ও কালরক্ষী।

পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন বৈজ্ঞানিকটাই সত্য আর রিভাইভাল-পন্থীরা বলবেন পৌরাণিকটা সত্য। পুরাণের বিবরণের সঙ্গে ইতিহাসের বিবরণের যদি না মেলে রেনেসাঁসপন্থীরা বলবেন ইতিহাসের বিবরণটাই প্রামাণিক আর রিভাইভালপন্থীরা বলবেন পুরাণের বিবরণটাই প্রামাণিক। দুই পক্ষই ইংরেজী শিক্ষিত, দুই পক্ষই নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। অথচ রিভাইভালপন্থীদের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে তাঁরা স্কুল কলেজ থেকে কিছুই শেখেননি কিংবা যা শিখেছেন সব ভুল। তা বলে যে তাঁরা তাঁদের সন্তানদের টোল চতুষ্পাঠিতে পাঠাবেন তা নয়। যাবে তারা ওই সব স্কুল কলেজেই কিংবা নবপ্রতিষ্ঠিত গুরুকুলে বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। যুগটাকে তাঁরা সরাসরি অস্বীকারও করতে পারেন না। নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়েও মাতৃভাষায় একালের ভূগোল ইতিহাসই পড়ানো হয়। অথচ মনটা পড়ে আছে সুদূর অতীতে। যখন চারদিকের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালিয়ানরাও তো দু' হাজার বছর পূর্বের গ্রীসের পুনর্জন্ম কল্পনা করেছিল। হোমারের গ্রীস, পেরি-ক্লিসের অ্যাথেন্স ছিল তাদের কল্পলোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীরাও যদি বেদ উপনিষদের তপোবন তথা রামায়ণ মহা-ভারতের রাজসভার বা রণাঙ্গনের কল্পনা করে কেনই বা তার নাম হবে পুনরুজ্জীবন। পুনর্জন্মের জন্যে কেনই বা তাদের স্বদেশের বাইরে তাকাতে হবে? আধুনিক ইউরোপের কাছে পাঠ নিতে হবে? তা হলে তো ইউরোপকেই ভারতের উপর জিতিয়ে দেওয়া হয়। তা হলে কি ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে? হেরে যাওয়া দেশের মানসিক বল নির্ভর করে বিজেতার দান প্রত্যাখ্যানের উপর। নতুন বিদ্যাও তো সেই-রূপ একটা দান।

রিভাইভালের সঙ্গে রেনেসাঁসের তফাৎটা হচ্ছে ভক্তির সঙ্গে যুক্তির, বিশ্বাসের সঙ্গে বিচারের, পূর্বপুরুষ পূজার সঙ্গে আত্ম-স্বাধীনতায়। শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব-জ্ঞানের, আপ্ত বাক্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার, স্থিরসিদ্ধান্তের সঙ্গে কৌতূহলী জিজ্ঞাসার সংস্কারের সঙ্গে সংস্কারমুক্তির আচারের সঙ্গে আচারলঙ্ঘনের, স্থিতাবস্থার সঙ্গে অভিনবত্বের। বর্ণাশ্রমের সঙ্গে বর্ণা-শ্রমবর্জনের, যজ্ঞের সঙ্গে যজ্ঞ ত্যাগের, মন্ত্রের সঙ্গে খোলা মনের। রিভাইভালপন্থীদের কথা হলো সেকালে যা হয়নি একালে তা হবে না, একালে যা হবে সেকালের মতো হবে। রেনেসাঁসপন্থীদের কথা হলো পুনর্জন্ম মানে পূর্বজন্ম নয়, দেশ তার পূর্বজন্মে ফিরে যেতে পারে না। দেশকে বাঁচতে হবে কালের সঙ্গে তাল রেখে। ভালকে বদলে দিতে পারা যাবে না দু' হাজার বা দু'শো বছর বাদে।

আশনে বসনে স্বদেশী হতে গিয়ে শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশী, শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশী হতে গিয়ে সত্যযুগের মতো যোগী ঋষি ও বর্ণাশ্রমী, এই যে বিবর্তন এটা স্বদেশের দুর্গরক্ষার জন্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জাতীয়তাবাদ ছিল না, তাই পুনরুজ্জীবনবাদও ছিল না। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদই পুনরুজ্জীবন বাদের উত্থানের কারণ। 'আনন্দমঠ' থেকে 'গোরা পর্যন্ত সময়টা ছিল রিভাইভালবাদের মধ্যাহ্নকাল। রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। 'সবুজ-পত্রে' যাঁকে পাই তিনি রেনেসাঁসের রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল রেনেসাঁসের পাল থেকে হাওয়া সরে গেছে। কারণ খাস ইউরোপেই একটা হাওয়া-বদল হয়েছে। জীবনের মূল প্রত্যয়গুলোই মার খেয়েছে বা ধ্বসে হয়েছে। কবিদের কেউ কেউ নিশ্চিত অন্বেষণে ক্যাথলিক ডগমার আশ্রয় নিয়েছেন। রেনেসাঁস মানুষকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার পরিণতি কি কমিউনিজম ও ফাসিজম? না রেনেসাঁসের আদর্শের ভিতরেই বিনাশের বীজ নিহিত ছিল? দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে একটা হিসাবনিকাশের পালা চলে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে আরেক দফা মার দেয় ও আরো বিধ্বংস ঘটায়। বাইরের ভাঙন পুন-র্গঠিত হয়। কিন্তু ভিতরের ভাঙন চায় নতুন নিশ্চিতি, নতুন বিন্যাস, নতুন স্বপ্ন, নতুন কল্পনা। কেউ কেউ তার জন্যে রাশিয়ার বা চীনের দিকে চেয়ে আছেন। কেউ কেউ আমেরিকার দিকে। ইউরোপের নিজের বলতে যেটা ছিল সেটা আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত। সেও করছে তার দুর্গরক্ষা। তারও স্বাধীনতা বিপন্ন। যদিও কিন্তু

আক্ষরিক অর্থে নয়। ইউরোপ যাকে রক্ষা করতে চায় তা দুহাজার বছর আগেকার ইউরোপ নয়, গত তিন চার শতাব্দীর ইউরোপ।

এই যখন খাস ইউরোপের অবস্থা তখন যাঁর কাছে থেকে যাঁরা প্রেরণা পেতেন তাঁদের অবস্থা বুঝুন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, পুনরুজ্জীবনবাদের পুরোনো অজুহাত আর নেই, তবু স্বাধীন ভারতের মতো স্বাধীন ভারতেও পুনরুজ্জীবনবাদ নতুন অজুহাতে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলাম তার শত্রু, কমিউনিজম তার শত্রু। কিংবা তাও নয়, প্রগতিশীল মতবাদ তার শত্রু। দেশের একভাগই অপরভাগের শত্রু। নতুনই পুরাতনের শত্রু। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় হতে পারে, কারণ একটার অস্তিত্ব অপরটার নাস্তিত্ব নয়। কিন্তু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় কেমন করে সম্ভব? একটার অস্তিত্ব যে অপরটার নাস্তিত্ব। নূতন থাকলে পুরাতন থাকে না, পুরাতন থাকলে নূতন থাকে না। তাদের মধ্যে সম্ভব যেটা সেটা অনুসরণযোগ্য। তার বেশী রক্ষা করতে গেলে নূতনের বাড় বাধা পায়। বিদেশের হাত থেকে মুক্তি মিলেছে, কিন্তু বিগত যুগের হাত থেকে মুক্তি মিলবে কবে? সে যুগ পৃথ্বীরাজেরও পূর্ববর্তী।

রেনেসাঁস মানুষকে ধর্মনির্বিশেষে জাতিনির্বিশেষে বর্ণনির্বিশেষে ও শ্রেণীনির্বিশেষে যে মহত্ত্ব দিয়েছে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তা দেয়নি। জাতীয়তাবাদও না, পুনরুজ্জীবনবাদও না, কমিউনিজমও না। আরো পুরাতন হিন্দুধর্মও না, ইসলামও না। সেইজন্যে মানব ইতিহাসে রেনেসাঁসের একটি মহৎ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে ও থাকবে। তার আয়ুষ্কাল যতই ক্ষীণ হোক না কেন। রেনেসাঁসের দরুন মানুষের মহত্ত্ব যদি বেড়ে গিয়ে থাকে তবে সে মহত্ত্ব স্বীকার করেছেন যাঁরা তাঁদেরও মহত্ত্ব বেড়ে গেছে। ধর্মযাজকদের চেয়ে বৈজ্ঞানিকদের মহত্ত্ব বেশী, দার্শনিকদের মহত্ত্ব বেশী, কবি ও নাট্যকারদের মহত্ত্ব বেশী, ভাস্কর ও চিত্রকরদের মহত্ত্ব বেশী, এটা গত চার পাঁচ শতাব্দীর লাভ। এই চার পাঁচ শতাব্দীর বেশীর ভাগ ভারতের বাইরে ছিল বলে ভারত তার থেকে কম লাভবান হয়নি। ভারত যদি নেপালের মতো পুরোপুরি তার বাইরে থাকত তা হলে সেই লাভ থেকে বঞ্চিত হতো। রূপমণ্ডুকের মতো স্বাধীন থেকে আফগানিস্থান যা পেয়েছে বাংলাদেশও তাই পেত। তাতে তার অষ্টাদশ শতাব্দী প্রলম্বিত হতো। ঊনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা যেত।

একথা সত্য যে রেনেসাঁস জনগণের মধ্যে ছড়ায়নি। ধর্মই সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। ধর্মকে স্থানচ্যুত করে কমিউনিজম তার জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসতে চায়, যেমন বসেছে রুশিয়ায় ও চীনে। এটা নাকি ইতিহাসের লিখন। কিন্তু এখনো এই লিখন সব দেশের মানুষের কপালে লেখা হয়নি লেখা হয়ে থাকলে পড়া যাচ্ছে না। ভারতের ভাগ্য অনিশ্চিত। ভারতের সাধারণ লোক ধর্মের কাছ থেকে যা পেয়েছে তাকে ভবিষ্যতের আশায় হাতছাড়া করতে চায় না তেমনি শিক্ষিত মহল রেনেসাঁসের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছে সেটুকুর মূল্য বোঝে। তার থেকে বঞ্চিত হলে তাদের চেহারা হতো টোলের পণ্ডিত ও মাদ্রাসার মৌলবীর মতো। তা দেখে জনগণ পাশে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু জনগণের তাতে মাথা উঁচু হতো না। যেটুকু হয়েছে সেটুকু রেনেসাঁসের হাওয়া লেগে হয়েছে। এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে। গত শতাব্দীর নবজাগরণ ও বর্তমান শতাব্দীর গণজাগরণ তাদের উঠে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। একটির অগ্রপথিক রামমোহন, অপরটির গান্ধী।

রামমোহন কেবল রেনেসাঁসের নন, রেফরমেশনেরও অগ্রণী। যদি রেফরমেশনের শব্দটা প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত হয়। রেনেসাঁসও কি যুক্তিযুক্ত নাকি? রামমোহনের যেমন দ্বৈত ভূমিকা গান্ধীজীরও তেমনি। তিনি ভারতের মুক্তি চেয়েছিলেন যেমন ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে তেমনি আধুনিক সভ্যতার হাত থেকেও। এই দ্বিতীয় ভূমিকায় তাঁকে মনে হতে পারে পুনরুজ্জীবনবাদীর মতো। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাধীনতা অবিকল বৈজ্ঞানিকদের মতো। সে স্বাধীনতা তিনি গুরু পুরোহিত বা পণ্ডিতদের পায়ে সঁপে দেননি। করুণার অনুরোধে গোবৎসবধের বিধান দিয়েছেন। সাম্যের অনুরোধে হরিজনের পায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পাত্রীর বিবাহ দিয়েছেন। নিজে দ্বিজ হয়েও উপবীত ধারণ করেননি। পেশা কী জানতে চাইলে বলেছেন, চাষী ও তাঁতী। যে রামরাজ্যের স্বপ্ন তিনি দেখেছেন তা ত্রেতাযুগের রাজা রামের রাজ্য নয়, শ্রীশু যাকে বলতেন ভগবানের রাজ্য। সেটাও একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তবে এটাও ঠিক যে আধুনিক সভ্যতা বলতে ইউরোপে যা বোঝায় তা তিনি ইউরোপের পক্ষেও অহিতকর মনে করতেন। তাঁর মতে সেটা একটা রোগ। ইউরোপ থেকে সেটা ভারতেও সংক্রামিত হচ্ছে। তার আগে যে ইউরোপ ছিল তার সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল না। পুঁজিবাদ ও শিল্পায়ন মিলে তাকে বিপথগামী করে। সেই বিপথগামিতাকেই সে সভ্যতা বলে ভুল করে। এই ভুল করলে ভারত, যদি একইভাবে বিপথগামী হয়। তাহলে মানকালের পাশ্চাত্য সভ্যতার কতটুকু অংশ এই আধুনিক সভ্যতা! শুধু এই অংশটুকুর সঙ্গেই তাঁর কলহ, সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে নয়। দেশ স্বাধীন হয়ে যদি এই বিপথ ধরে তা হলে দেশের সঙ্গেও তাঁর কলহ বাধবে। আধুনিকতার সংজ্ঞা তাঁর কাছে ছিল নেহাৎ সংকীর্ণ। আরো প্রশস্ত হলে তাঁর বিচার অন্যরূপ হতো। সব দিক দেখার সুযোগ তিনি পাননি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বা পরাধীন ভারত থেকে সব দিক দেখা যায় না। তা ছাড়া সমকালীন ইউরোপীদের অনেক আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন। নীতির দৃষ্টিতে তাঁরা দেখলেন। গান্ধীজীর দৃষ্টিও নীতির দৃষ্টি। টলস্টয়ের মতো, রাস্কিনের মতো।

দেশকে স্বাধীন করতে সকলেই পারে। আমি চাই জনগণকে জাগাতে।' গান্ধীজী বলেছিলেন আগস্ট আন্দোলনের প্রাক্কালে। স্বাধীনতার সংগ্রাম তার আগেই শুরু হয়েছিল, কিন্তু জনগণের জাগরণ তাঁর অপেক্ষায় ছিল। কোনো পুনরুজ্জীবনবাদী নেতা এই কাজটি পারতেন না। জনগণকে বিভ্রান্ত করা সহজ, কিন্তু তাদের আস্থা অর্জন করা সহজ নয়। প্রাচীন ভারতে জনগণ বলতে বোঝাত শূদ্র বা ছোটলোক। শূদ্র মানেই ক্ষুদ্র। কোনো অধিকারই তাদের ছিল না। প্রাচীন ভারতকে ফিরিয়ে আনা বা সেখানে ফিরে যাওয়া তাদের দিক থেকে প্রতিক্রিয়া। কেনই বা তারা তেমন এক আদর্শের জন্যে লড়বে! পুনরায় শৃঙ্খলিত হতে কে চায়!

আমাদের রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট উনবিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছিল। বাকী ছিল ফরাসী বিপ্লব। তারই সঙ্গে তুলনীয় এই গণজাগরণ। এটা একদিনে ঘটেনি। এর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি চলেছিল শতখানেক বছর ধরে। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তিনটি ঝনিয়াদী আদর্শ ছিল এর পশ্চাতে। মৈত্রীরই অন্য নাম অহিংসা। আমাদের রেনেসাঁস যেমন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের হুবহু নকল নয় তেমনি আমাদের ফরাসী বিপ্লবও ইউরোপের ফরাসী বিপ্লবের নির্বিচার অনুকরণ নয়। দেশ অনুসারে কাল অনুসারে পাত্র অনুসারে ভিন্ন। একই স্পিরিট কাজ করছিল এদেশেও সেইজন্যে এদেশেও রাজতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্রের পতন হলো। দেশীয় রাজ্যের বিলোপ, জমিদারির বিলোপ অনায়াসে সম্পন্ন হলো। তবে পুরোহিততন্ত্রের পতন হয়নি, তার বদলে হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রবর্তন। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে গান্ধীজীকেই বলতে শোনা যায় যে আমাদের রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। ইতিমধ্যেই তিনি নিরীশ্বরবাদীদের কোল দিতে আরম্ভ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সত্যই ভগবান। নিরীশ্বরবাদীও সত্যের সাক্ষাৎকার পেতে পারেন। এক শিষ্যকে এই মর্মে লিখেছিলেন, 'কে জানে তোমার নিরীশ্বরবাদ হয়তো আমার ঈশ্বরবাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। হয়তো উৎকৃষ্ট।' সেই ব্রাহ্মণ শিষ্যের কন্যার বিবাহ হরিজন পাত্রের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তাঁরই আশ্রমে ও তাঁরই উপস্থিতিতে, এই অনুরোধে সম্মত হবার পরেই তিনি নিহত হন। হত্যাকারীরা পুনরুজ্জীবনবাদী হিন্দু।

ফরাসী বিপ্লব রুশ বিপ্লব নয়। ধন তন্ত্রের উচ্ছেদ তার অভিষ্ট নয়। সুতরাং ভারতের গণজাগরণ ততদূর যায়নি বলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। গান্ধীজীকেও দোষী করা যায় না। মার্কসবাদ ভারতে এসে পৌঁছয় প্রথম মহাযুদ্ধের পরে। মার্কসবাদী চিন্তার প্রসার হয় আরো দুই দশক বাদে। মার্কসবাদীরা যখন বিপ্লবের উদ্যোগ করেন তার আগেই দেশ হয়েছে স্বাধীন। জনগণ নতুন কোনো অগ্নিপরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত

নয়। গান্ধীজী তাদের বার বার তিনবার অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে তাদের শক্তির সঞ্চয় নিঃশেষিত করেছিলেন। বাকী যেটুকু ছিল সেটুকু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় লক্ষ্যভ্রষ্ট। লক্ষ্যে ফিরিয়ে না এনে নতুন কোনো পরীক্ষার নিযুক্ত করা ছিল গান্ধীজীরও অসাধ্য। তাই তিনি অসহায়ভাবে দেশভাগ মেনে নেন। মার্কসবাদীরা যে ব্যর্থ হবেন এটা বিচিত্র নয়। বিচিত্র এই যে তাঁরা রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে একনিঃশ্বাসে ধনতন্ত্রের পতনও প্রত্যাশা করেছিলেন। যেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে গান্ধীজীকেই দগ্ধ করেছে সেখানে মার্কসকেও কি করত না?

মার্কসবাদের উদ্ভব ও পশ্চিম ইউরোপে। সে যখন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়ায় তখন সেটা অসঙ্গত মনে হয় না। অসঙ্গতির কথা ওঠে রেনেসাঁসের বেলা। আসলে বৌদ্ধধর্মের মতো, খৃষ্টীয়ধর্মের মতো ইসলামের মতো আধুনিক যুগের বড়ো বড়ো মুভমেন্টগুলিও সর্বত্রসঞ্চারী। আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশকে দেশ ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী আর সোস্যাল জাসটিস এই তিনটি তত্ত্ব স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিচ্ছে। তিনটিরই উৎপত্তি পশ্চিম ইউরোপে। যে পশ্চিম ইউরোপ আরো আগে রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্টের ভিতর দিয়ে গেছে। এইসব পর্যায় মানুষের মনের দুয়ার একটু একটু করে খুলে দিয়েছে। দুয়ার খোলা পেয়ে ওইসব আইডিয়া বা আইডিয়াল ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেছে। তবে সব দেশের বিবর্তন একই রকম নয়। আফ্রিকার দেশগুলিতে রেনেসাঁসের পূর্বেই ন্যাশনালিজম গিয়ে হাজির হয়েছে। তেমনি আরব দেশগুলির কয়েকটিতে ডেমোক্রাসীর পূর্বেই সোস্যাল জাসটিস।

জব চার্নক কলকাতা বন্দর প্রতিষ্ঠা করার পর পিটার দ্য গ্রেট করেন পিটারসবুর্গ বন্দর প্রতিষ্ঠা। সমুদ্রপথে পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়াকে যুক্ত করে দেন। জার্মানীর এক রাজকুমারী পরে হন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী। ক্যাথরিন দ্য গ্রেট অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানীর মতো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গড়ে ওঠে একটি বিদ্বৎসমাজ। এর পূর্বে রাশিয়াকে কেউ ইউরোপের অঙ্গ মনে করত না। রাশিয়ানরাও না। এর পরেও উভয়পক্ষের দ্বিধা যায় না। ইউরোপ সম্বন্ধে বঙ্কিমের যে মনোভাব টলস্টয় ও ডস্টয়েভস্কিরও সেই মনোভাব। অপরপক্ষে মাইকেলের যে মনোভাব টুর্গেনিভেরও সেই মনোভাব। লেনিন ছিলেন ইউরোপমনস্ক, স্টালিন ছিলেন রুশমনস্ক। রাশিয়া এখনো এ দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বোধহয় চায়ও না।

রাশিয়ার বরাত ভালো যে সেদেশে পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট গোড়াপত্তন করেছিলেন। চীনে তো এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও দরজা জুড়ে বসেছিলেন মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী। শাংহাই প্রভৃতি কয়েকটি জানালা দিয়ে ঢুকেছিল বাইরের আলো হাওয়া। তার ফলে যেটা হয়েছিল সেটা হয়তো এক-প্রকার রেনেসাঁস, কিন্তু যেমন বিলম্বিত তেমনি দুর্বল। এরকম দেশ মার্কসবাদী হতে পারে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু 'একশোটি ফুল' ফোটাতে চাইলে কী হবে, একটিও ফুল ফোটাতে পারে না। রাশিয়ায় ও কাজটি বিপ্লবের পূর্বে এগিয়ে রয়েছিল, পরেও এগিয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে নয় বিজ্ঞানে। রাশিয়ার লোক সাবেক আমলের ব্যালেকে চক্ষের মণির মতো রক্ষা করেছে, যদিও তা অভিজাতকুলের।

রেনেসাঁস যেখানে ঘটে সেখানে ধর্মযাজক বা মান্দারিন বা ব্রাহ্মণ বা উলেমার চেয়ে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা নাট্যকার বা ভাস্করের মহত্ত্ব বৃদ্ধি পায়। রেনেসাঁসের পূর্বে কেউ ভাবতেই পারত না জেওনার্দো বা শেকসপীয়ার বা গালিলিও বা বেকনের কী মহত্ত্ব! মানুষকে এঁরা কত বড়ো উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সেসব এভারেস্ট বা ক্যাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের জন্যে শত শত মানুষ জীবন পণ করেন। কেউ বা পৌঁছন, কেউ বা পথে মারা যান। পৃথিবীকে দেশ অনুসারে ভাগ না করে যুগ অনুসারে ভাগ করলে তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। আধুনিক যুগ কোথাও আগে এসেছে, কোথাও পরে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এটা একটাই যুগ। এযুগে যেখানেই যিনি কাজ করে থাকুন না কেন সকলের জন্যেই করেছেন, সকলের হয়ে করেছেন। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংগালীরা এত সহজে শেকসপীয়রকে ও রোমান্টিক কবিদের আপনার করে নেন। দেশ কিংবা ভাষা সেখানে অন্তরায় হয় না। পরাধীনতা কিংবা পুঁজিবাদী শোষণ সেখানে বরদাস্ত করে না। লোকে যেমন কবিরাজ ছেড়ে ডাক্তার ডাকে তেমনি মঙ্গলকাব্য ছেড়ে স্কট ডিকেন্স পড়ে। এই যে রুচিবদল এর থেকে আসে পালাবদল। সাহিত্যে নবযুগ। পুরাতনের সঙ্গে যার ভাষার মিল, কিন্তু ভাবের মিল পরদেশীর সঙ্গে। পরদেশী হলেও সে স্বকালের। কালগত ব্যবধান না থাকায় শেলী

১৪ই সেপ্টেম্বর থেকে
সিল্ক, র-সিল্ক ও রেডিমেড সমেত
সবরকম তাঁত বস্ত্রের উপর
১০% বিশেষ রিবেট
র-সিল্ক * সিল্ক * সুতী
হ্যাণ্ডলুম
শাড়ি
পশমী শাল
ড্রেসপীস
স্টোল * টাই
সুটের ও সার্টের কাপড় * ধুতি * গৃহসজ্জার বস্ত্রাদি
তৈরী জামাকাপড় * বিছানার চাদর * লুঙ্গি
তোয়ালে * সুতীর কার্পেট প্রভৃতি
শীততাপ নিয়ন্ত্রিত
হ্যাণ্ডলুম হাউস
২, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
গাইকারী বিভাগ : ২, গার্স্টিন প্লেস, কলি-১
দি অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রিক্স্ মার্কেটিং
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ কর্তৃক পরিচালিত।
Progressive/HH-5/70

কীটস বায়রন নিকটতর, রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র দূরতর।

কিন্তু নিজের দেশেও যখন বায়রন ও স্কট জন্মালেন তখন বিদেশের বায়রন ও স্কট হলেন দূরতর। দেশগত ব্যবধান না থাকায় মাইকেল ও বঙ্কিম হলেন নিকটতর। স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী কারুশিল্প দাঁড়াতে পারবে না, এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য স্বদেশীয়রা পৃষ্ঠপোষকতা না করলে স্বদেশী চারুকলাও দাঁড়াতে পারবে না। চারুকলার মধ্যে পড়ে কাব্য উপন্যাস নাটক। এই স্বদেশী মনোভাব থেকে আসে শেক্সপীয়ার ছেড়ে কালিদাসের দিকে দৃষ্টিপাত। বায়রন ছেড়ে মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত। হারিয়ে যাওয়া থেই ফিরে পেতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। অজন্তার থেই ফিরে পেয়ে চিত্রকরদের হাত খুলে যায়। পুরাণের থেই ফিরে পেয়ে নাট্যকারদের। এরই নাম রিভাইভাল। কিন্তু উপন্যাসের বা ছোট-গল্পের বা প্রবন্ধের কোনো প্রাচীন আদর্শ পাওয়া গেল না, অগত্যা আধুনিক ইউ-রোপের দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হলো। বিষয়টা রইল স্বদেশী, কিন্তু আঙ্গিকটা হলো আধুনিক, আধুনিকতর, অত্যাধুনিক। বিদেশের সঙ্গে তাল রেখে। প্লট চুরি করে বা ধার করে বিদেশীকেও স্বদেশী বলে চালিয়ে দেওয়া গেল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আসে গান্ধী উদ্বোধিত গণজাগরণ। গত শতাব্দীর নব-জাগরণের মতো এই শতাব্দীর গণজাগরণও জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। গণসত্যাগ্রহও একপ্রকার বিপ্লব। এতেও নিচের মানুষকে উপরে তুলে দেওয়া হয়, উপরের মানুষকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়। রেনেসাঁসের সময় যেমন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক প্রভৃতির মহত্ত্ব বেড়ে যায় রেভলিউশনের সময় তেমনি সাধারণ লোকের বিশেষ করে চাষী মজুরের। গণসত্যাগ্রহের দিন এরাই গণ। বিপ্লবের দিন এরাই বরযাত্রী।

সাহিত্যের আসরে কিন্তু এদের হাজির করা শক্ত। কজন সাহিত্যিক আছেন যাঁরা এঁদের সঙ্গে জুটে মাঠে ময়দানে রাজদ্বারে শ্মশানে গেছেন। আন্দোলনের ভিতর থেকে এদের দেখেছেন? পারতেন যাঁরা তাঁরাও রাজদ্রোহের ভয়ে পারেননি। তার চেয়েও ভয় নেতারা কী মনে করবেন। বাস্তবানুগ ছবি আঁকলে নেতাদের তো দেবতার মতো করে দেখানো যাবে না। দোষে গুণে মানুষের মতো করে আঁকতে হবে। দোষগুলো সাহিত্যে অমর হলে কোন নেতা সেটা ক্ষমা করবেন? কাজগুলোও সব সময় বীরোচিত নয়। অনেক সময় মহত্ত্বহীন। প্রতিপক্ষও নাটকের শয়তান নয়। অথচ তাকে যদি মানুষের মতো করে আঁকা হয় তো আপত্তি উঠবে। আঁকতে হবে তাকে শয়তানের মতো করে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথা গণ-জাগরণের বাস্তবানুগ কাহিনী অল্পই লেখা হয়েছে। একদিন হয়তো তা নিয়ে একটা মহাভারত লেখা হবে। যিনি লিখবেন তাঁকে দল ও মতের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁদের পক্ষে এটা শক্ত। আর যাঁরা পাঁচজনের মুখে শুনেছেন তাঁদের বিবরণ হয়তো ঘটনার দিক থেকে যথার্থ হবে, কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে শুষ্ক শীতল নিষ্প্রাণ।

ত্রিশের দশকের আগেই বস্তিবাসীকে সাহিত্যে আনা হয়েছিল, এর পরে আনা হলো চাষাভূষা জেলে মাঝিদের। এরা হয়তো সংগ্রামরত নয়। পরে যাদের আনা হলো তারা সংগ্রামী জনতা। কিন্তু তাদের সংগ্রাম দেশের জন্যে নয়, শ্রেণীর জন্যে। এটা জাতীয়তাবাদী লেখকদের পক্ষে অসম্ভব। সাম্যবাদী বা প্রগতিবাদী লেখক-দের পক্ষেই সম্ভব। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই শ্রেণীসংগ্রাম সাহিত্যের আসরে জায়গা করে নেয়। স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদকে কোণঠাসা করে। যদি না সেটা হয় সন্ত্রাসবাদ।

কিন্তু গণজাগরণ থেকে যে জিনিসটি আশা করা গেছল সেই জিনিসটি হলো না। শিক্ষিত স্তরের সঙ্গে অশিক্ষিত স্তরের ব্যবধান লোপ। বামপন্থী কবির রচনাও শিক্ষিতভিন্ন আর কেউ পড়ে না। আর কেউ বোঝে না। কেমন করে বলব ইনি জনগণের সভাকবি!

নবজাগরণের যুগে যে প্রশ্ন উঠেছিল সেই একই প্রশ্ন গণজাগরণের যুগেও অন্যভাবে উঠেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের নায়করা ছিলেন লাটিনভাষায় শিক্ষিত। লাটিন রচনায় নিপুণ। তা সত্ত্বেও তাঁরা ইচ্ছা করেই লিখলেন ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি লোকভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান না থাকে। এদেশেও তেমনি রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কৃতভাষায় শিক্ষিত, বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত রচনায় নিপুণ। তবু ইচ্ছা করেই তাঁরা লিখলেন বাংলাভাষায়। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মানসিক ব্যবধান দূর হয়। ইউরোপে যেমন লাটিন ভারতে তেমনি সংস্কৃত। ইউরোপে যেমন ইটালিয়ান ফরাসী, ইংরেজী ভারতে তেমনি বাংলা, হিন্দী, মারাঠী। তাছাড়া পারসিক শিক্ষিত মহলও ছিলেন। পারসিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। রামমোহনও তাঁদের একজন। কিন্তু নব-জাগরণের সময় স্থির হয়ে যায় যে লোকভাষায় লিখতে হবে। পরবর্তীকালের ইংরেজী শিক্ষিতরাও ইংরেজী রচনায় নৈপুণ্যসত্ত্বেও বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত নেন। যেমন মাইকেল ও বঙ্কিম। যাতে দেশের লোকের সঙ্গে মান-সিক ব্যবধান না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বাংলা-ভাষার লেখকরা ক্রমে উপলব্ধি করেন যে এও যথেষ্ট নয়। সাধু ছেড়ে চলতি বাংলায় লিখতে হবে। এরূপ উপলব্ধি চীনের লেখকদেরও হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী মহা-শয়ের প্রচেষ্টা এতদিনে সফল হয়েছে। চলতি বাংলারই এখন প্রচলন বেশী। যদিও এ, রীতি পূর্ব বাংলার নয় তবু পূর্ব বাংলার সাহিত্যিকরা একে উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এতদূর আসার পরও দেখা যাচ্ছে এ ভাষা শিক্ষিত মহলেরই ভাষা। ইংরেজী শিক্ষিত না হয়ে বাংলা শিক্ষিত হলেও তাঁরা শিক্ষিত। তাঁরা সংস্কৃতিমান। কালচারের মধ্যে একটা কর্ষণের ভাব আছে। তাঁরা কর্ষণ করেছেন। লাঙল দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে, বিদ্যা দিয়ে। তাঁদের ভাষা ঠিক জনগণের ভাষা নয়, যদিও লেখেন কথ্যরীতিতে।

এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার আমাকে বলেছিলেন এই মর্মে, যে ভাষায় আমি লিখি সেটা কথ্যভাষা, কিন্তু সাধারণ লোকের মুখের ভাষা নয়। তাদের কাছে এখনো পৌঁছতে পারিনি।' এর জন্যে তাঁর মনে আফসোস ছিল।

সে আফসোস তাঁর একার নয়। বিদগ্ধ নাগরিকের মার্জিত ভাষা যেন ভিটামিন-বর্জিত ছাঁটা সিদ্ধ চালের ফ্যানগালা ভাত। তাতে না থাকে স্বাদ, না হয় পুষ্টি। তাছাড়া তাঁর মননও তাঁকে দূরের মানুষ করে। কথ্যরীতির দরুন ব্যবধান কমতে পারে, কিন্তু উচ্চচিন্তার দরুন দূরত্ব থেকে যায়।

গণজাগরণের পূর্বেই বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কথ্যরীতিতে লেখা আরম্ভ হয়ে যায়। গণজাগরণের পরে এটা আরো ব্যাপক হয়। কিন্তু প্রশ্নটা তো ব্যক্তির প্রশ্ন নয়। ব্যবধানলোপের প্রশ্ন। আমাদের বামপন্থী লেখকরা গণজাগরণের পরে এসেছেন। এঁদেরই তো দায় লোকমুখের ভাষার সঙ্গে লেখনীমুখের ভাষার কোনো-রূপ ব্যবধান না রাখা। কিন্তু লেখেন যাঁরা তাঁরা ভদ্রলোক পড়েন যাঁরা তাঁরাও ভদ্রলোক, ভদ্রলোকদের পালিশ করা ভাষাতেই লেখা হয়। আঙ্গিক তো আরো সোফিস্টিকেটেড। এর জন্যে যে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার সে জিনিস জনগণের নাগালের বাইরে। যে নাগরিকত্বের দরকার সেটাও বহুপরিমার্জিত। মতবাদ হয়তো অভিন্ন, কিন্তু মনের গড়ন যে ভিন্ন। একই রকম ইউনিফর্ম পরিয়েও একজন ভদ্র-লোককে একজন শ্রমিকের সঙ্গে একাকার করতে পারা যাবে না। শ্রমিককে ভদ্রলোক করলেও করতে পারা যায়, কিন্তু ভদ্রলোককে শ্রমিক করা কারো সাধ্য নয়। যদি না তাঁকে জেলে পাঠিয়ে ঘানী ঘোরাতে বাধ্য করা হয়। কিংবা সমস্ত দেশটাকে একটা কারাগারে পরিণত করা হয়। তার মানে প্রোলিটারি-য়াটের ডিকটেটরশিপ।

আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না ঘটেছে! এটাই বা না ঘটবে কেন! গণতন্ত্রকে অন্তহীন সুযোগ কেউ দেবে না। যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার সদ্ব্যবহার না করলে রাজ-তন্ত্রের মতো গণতন্ত্রও একদিন যাবে। তখন ডিকটেটরশিপ ব্যতীত আর কী বিকল্প! যে ডিকটেটরশিপমাত্রেই প্রোলিটারিয়ান নয়। দৃষ্টান্ত স্পেন। দৃষ্টান্ত গ্রীস। তাছাড়া দেশটা বৃহৎ ও বহুভাষী। সুতরাং আবার ভাগ হয়ে যেতে পারে। তারপরে কোথাও গণতন্ত্র, কোথাও একনায়কত্ব, কোথাও শ্রমিকের রাজত্ব, কোথাও সৈনিকের রাজত্ব। আমরা চেষ্টা করছি সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে। ধর্মনির্বিশেষে। ভাষানির্বিশেষে। শ্রেণী-নির্বিশেষে। মতবাদনির্বিশেষে। এটা শুধু গণতন্ত্রেই সম্ভব। গণতন্ত্র যদি সকলের শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা পায়।

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

শারদীয় ১৩৮০

ছোটগল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমরেন্দ্রশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সতীকান্ত গুহ, মহাশ্বেতা দেবী, সুবোধ ঘোষ, নিমাই ভট্টাচার্য, সুমথনাথ ঘোষ, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুশীল রায়, প্রফুল্ল রায় এবং আরো অনেকে।

• উপন্যাস •

আশাপূর্ণা দেবী

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীর রক্ষিত

জিম করবেটের
শিকারজীবন
বিশ্বনাথ বসু

•

একটি ফরাসী উপন্যাস
অনুবাদ :
ফাদার দ্যতিয়েন

ভ্রমণকাহিনী
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

•

অসংখ্য রমণীয়
ফিচার
নিবন্ধ
কবিতা
একাঙ্কিকা

•

চলচ্চিত্র
গৃহসজ্জা
খেলাধূলা

•

সুঅলংকৃত
চিত্রশোভিত

মহালয়ার আগেই
প্রকাশিত হবে

*

দাম ৬ টাকা
ডাকমাশুল
১ টাকা ২৫ পয়সা
বাংলাদেশ ৭ টাকা

গণজাগরণের পর থেকে জনগণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে, অথচ নবজাগরণ যাদের গুরুত্ব দিয়েছিল সেই ভদ্রলোকশ্রেণীর গুরুত্ব কমেনি। কেনই বা কমবে? ভদ্রলোকরা কি সংস্কৃতির দায়িত্ব পালন করেননি? সাহিত্যকে বিজ্ঞানকে সঙ্গীতকে নাট্যকে ললিতকলাকে এগিয়ে দেননি? এই দেড়শো বছরের ইতিহাস কি অগ্রগতির ইতিহাস নয়? অগ্রগতি সব সময় সরল রেখায় হয় না, নদীর মতো আঁকাবাঁকা গতিও অগ্রগতি, স্পাইরালের মতো উঁচু নিচু গতিও অগ্রগতি। যেখানে রিভাইভালবাদ পেছনে টানছে সেখানে রেনেসাঁসবাদ টেনে নিয়ে যেতে বাধা পায়। তা সত্ত্বেও যদি আমাদের সংস্কৃতি চার পাঁচ শতাব্দীর পথ দেড় শতাব্দীতেই অতিক্রম করে থাকে তবে আমি তো বলব অসাধ্যসাধন করেছে। এদেশ শুধু যে পরাধীন ছিল তাই নয়। ছিল পূর্বপুরুষাধীন। ছিল জগতের কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মরা গাঙ্। এখানে যে আবার প্রবাহ ফিরে এসেছে, জোয়ার ভাটা খেলছে, জাহাজ চলাচল করছে এর জন্যে আমাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মুক্তমনা সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ দিতে হয়।

তাঁদের প্রেরণা আসত প্রধানত দুটি উৎস থেকে। একটি তো প্রাচীন ভারত, অপরটি আধুনিক ভারত। ক্রমে ক্রমে দুটি উৎসই শুকিয়ে আসে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক থেকে নতুন কিছু পাওয়া যায় না। রামায়ণ মহাভারত থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু নতুন রূপ দিতে সাধ্যে কুলায় না। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাকে বলেছিলেন অর্জুনের চোখের উপর কৃষ্ণের পরিবারের নারীদের হরণ করে নিয়ে যায় দস্যুরা, কেউ কেউ স্বেচ্ছায় হৃত হয়, যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল যে তাদের প্রেমিকরা তাদের হরণ করে নিয়ে যাবে দস্যু সেজে। কেমন চমৎকার একটি বিষয় যা নিয়ে নাটক লেখা যায়। কিন্তু লিখবে কে? কবির বয়স গেছে, সাহস হয় না। লিখব আমরাই। কিন্তু আমরাও লিখিনে। কারণ লিখলে সেটা হবে ধর্মদ্রোহ। ভাগ্যিস মহাভারত লেখা হয়ে গেছল কৃষ্ণের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। রামায়ণও রামের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এসব গ্রন্থ থেকে বিষয় নিয়ে তাকে নতুন রূপ দিলে ভক্তরা প্রকাশ বন্ধ করে দেবেন।

তার চেয়ে সোজা ইউরোপ থেকে ভাব সংগ্রহ করা ও তাকে নতুন রূপ দেওয়া। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশবিপ্লবের পর পশ্চিম ইউরোপের মহিমা ক্রমেই অস্তাচলগামী হয় ও আমাদের লেখকদের দৃষ্টি পড়ে স্কান্ডিনেভিয়ার উদয়াচলের উপর। পরে সেদিক থেকেও প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। বিনা বিচারে বা নামমাত্র বিচারে যা স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শত শত ব্যক্তির প্রাণদন্ড মধ্যযুগের খৃস্টীয় ইনকুইজিশনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পোপ যদি অভ্রান্ত না হয়ে থাকেন স্টালিনও কি অভ্রান্ত? সেই যে খটকা বাধে সেটা পরে আরো দৃঢ় হয়। পশ্চিম ইউরোপের মডেল স্কান্ডিনেভিয়ার মহিমাও হ্রাস পায়। বাইরের দিকে তাকানো কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ নয়। লোকসংস্কৃতির বহমান ধারার দিকে। এর থেকে রস আহরণ করি। কিন্তু আলো পাইনে। রূপও কি পাই? লোকসঙ্গীত যেমন মার্গসঙ্গীতের অভাব পূরণ করতে পারে না লোকসাহিত্যও তেমনি মার্গসাহিত্যের।

তবে প্রাণশক্তির অভাব হলে জনগণের জীবন সে অভাব পূরণ করতে পারে। যদি তারা থাকে মাটির কাছাকাছি। কিন্তু তারা যদি শহরে চলে আসে ও মাটির সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে তবে তাদেরও প্রাণশক্তিতে টান পড়বে। সবকটি উৎস শুকিয়ে এলে সাহিত্যরচনাও অবক্ষয়ী হবে। মাটির সঙ্গে সংযোগ থেকেই প্রাণশক্তি। বিয়োগ থেকেই অবক্ষয়।

সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর দায়িত্ব যদি ভদ্রলোকদের হাত থেকে আর কোনো শ্রেণীর হাতে যায় আমি একটুও দুঃখিত হব না। এই সম্প্রতি কারো কারো ভাগ্যে ধন সম্পদ জুটছে, নয়তো সরস্বতীর সেবকরা লক্ষ্মীর কৃপা থেকে চিরদিন বঞ্চিত। যে গাধাখাটুনি তাঁদের খাটতে হয় তার অনুপাতে পারিশ্রমিক তাঁদের অকিঞ্চিৎকর। শ্রমিক হলে তাঁরা পর্যাপ্ত মজুরির দাবীতে ধর্মঘট করতেন, ওভারটাইমের জন্যে বাড়তি মজুরি চাইতেন, নিয়মিত ছুটি চাইতেন। শ্রমিকদের অবস্থার যখন আরো উন্নতি হবে তখন দেখা যাবে শ্রমিক হওয়াই অধিকতর লাভজনক। দুটি একটি বিভাগ বাদ দিলে সাহিত্যকর্ম অর্থকরী নয়। আর সেই দুটি একটি বিভাগে এত বেশী কর্মী যে অধিকাংশের বরাতেই লাভের ঘরে শূন্য। জীবিকার জন্যে অন্যকিছু করতে হয় বলেই সাহিত্যকর্মে শ্রমদান পোষায়। কিন্তু এমনও হয় যে সেই অন্যকিছুর পেছনে সমস্ত শক্তি যায়, সাহিত্যকর্মের জন্যে উদ্বৃত্ত যেটুকু থাকে সেটুকু অতি সামান্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ এর একটা সমাধান করেছিল। লেখকদের অনেকের ছিল বাপ দাদার পিসি মাসির রেখে যাওয়া টাকা বা সম্পত্তি। এদেশে তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীতে করবৃদ্ধির ফলে লেখকদের সেই প্রাইভেট আয়ের সুখস্বর্গ গেছে। তবে পাঁচ রকম উপার্জনের পন্থা খোলা আছে। এদেশে সেটারও অভাব।

মোট কথা সাহিত্যের কাজ হচ্ছে প্রেমের শ্রম। যে প্রেমিক সেই শ্রমিক। পারিশ্রমিক কেউ পায় কেউ পায় না। যে পায় সে পাওনার চেয়ে কম পায়। এইভাবেই এতদিন কাজের লোক পাওয়া গেছে। এর পরে যদি না পাওয়া যায় তবে সাহিত্যের অনেকগুলি বিভাগ অপুষ্ট থাকবে। উপন্যাসের অতিস্ফীতিই সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নয়। যাঁর উপন্যাস লেখার কথা নয় তিনিও বছরে চারখানা উপন্যাস লিখছেন। কবিতার হাত হারাচ্ছেন। প্রবন্ধের জন্যে সময় করে উঠতে পারছেন না। সেকালে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে কতকগুলি অবশ্যকরণীয় কৃত্য ছিল, যার বিনিময়ে তাঁরা পেতেন সম্মান। তাঁদের সেই কৃত্যকে বলা হতো নোবলেস অবলিজ। তেমনি ভদ্রলোক শ্রেণীর পক্ষে অবশ্যকরণীয় একটি কৃত্য হচ্ছে সংস্কৃতির জন্যে শ্রম: এটাও একরকম নোবলেস অবলিজ।

একদা অভিজাত শ্রেণীর যে সাংস্কৃতিক দায় সে দায় এখন ভদ্রলোক শ্রেণীর উপর বর্তেছে। এই শ্রেণী যদি সংস্কৃতিকে কেনা-বেচার একটা ব্যাপার করে তোলে ও তাই নিয়ে ব্যবসাদারী করে তবে তার শেষ ফল হবে লোভে পাপ ও পাপে মৃত্যু। কতক সাহিত্যিককে মনে মনে বেছে নিতে হবে এমন এক পথ যেটা বিত্তময়ী সুকরা নয়। অথচ নয় সাহিত্যকে দিয়ে সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা। সাহিত্যিকদের সাহিত্যকার কমিটমেন্ট সত্যের কাছে, সৌন্দর্যের কাছে, প্রেমের কাছে। প্রথমটা বৈজ্ঞানিকের মতো, দ্বিতীয়টা শিল্পীর মতো, তৃতীয়টা ধার্মিকের মতো। এর কোনোটিই রাজনীতিকের মতো বা সৈনিকের মতো নয়। তবে কোনো সাহিত্যিক যদি অন্তরে তেমন কোনো তাগিদ অনুভব করেন সে স্বাধীনতা তাঁর আছে, তখন সেটাই তাঁর কর্তব্য। এর জন্যে তাঁকে হয়তো বহু দুর্ভোগ পোহাতে হবে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ঝাঁপ দিতে গেছলেন কয়েকজন ইংরেজ লেখক। আরো এক শতক আগে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বায়রন। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানেরও নজীর আছে।

সংস্কৃতিকে এগিয়ে দেওয়া এক কথা। সমাজকে পালটে দেওয়া আরেক। এই দ্বিতীয় কৃত্যটি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন রুশো ভলতেয়ার ও দিদেরো। তা বলে সেটি লেখকমাত্রেরই ঘাড়ে তাঁর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চাপিয়ে দেওয়া যায় না। সমাজকে পালটানোর ভার নিলে সাহিত্যসৃষ্টির উপর লক্ষ্য রাখা শক্ত। লক্ষ্যভ্রষ্ট রচনা সামাজিক পরিবর্তন ঘটালেও সাহিত্যে উচ্চ স্থান পায় না। সাহিত্যিককে সেইজন্যে ফরমাস করতে নেই, করলে সেটা হবে লক্ষ্যভ্রষ্টতার নির্দেশ। যাঁরা ভিতর থেকে অনুশাসন পান তাঁরা তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন না। সেটাও একপ্রকার নোবলেস অবলিজ। মানুষের আরো পাঁচটা দিক আছে। একজন সাহিত্যসৃষ্টি করেন বলে সমাজসংস্কারও করেন না তা নয়। একই লেখনী দুই কাজে নিযুক্ত হয়। যাঁর কাজ সমাজসংস্কার তিনিও করেন সাহিত্যসৃষ্টি। রামমোহন, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকের ছিল একাধিক সত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল, কিন্তু তিনি সমাজসংস্কার না সমাজসংরক্ষণ কোন্‌টার সহায়তা করেছিলেন বলা কঠিন। শরৎচন্দ্র তাঁর বিধবা নায়িকাদের বিয়ে দেননি। একথা তিনি নিজেই লিখেছিলেন আমাদের এক বিখ্যাত মহিলা কবিকে।

রেনেসাঁসের মূল্যগুলি ইউরোপের যেসব দেশে অনেক দুঃখে অর্জিত হয়েছে, সেসব দেশ সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধেও পাঁচ শতাব্দীর পিছু হটতে রাজী নয়। যখন ছিল কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। তা তিনি যিনিই হোন—রাজা অথবা পোপ। একালে তার প্রতিরূপ রাষ্ট্রের অধিনায়ক ও পার্টির পরিচালক। আমাদের

এখনো দেড় শতাব্দী যায়নি। অর্জনের জন্যে তেমন কিছু দুঃখও পোহাতে হয়নি। চিন্তার স্বাধীনতা, বচনের স্বাধীনতা, ছাপার হরফে প্রকাশের স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা যখনি বাধা পেয়েছে তখনি বিলেতের লিবারল বন্ধুরা তার জন্যে লজ্জিত হয়ে সেখানকার কর্তাদের কাছে আপীল করেছেন ও তাঁরা হস্তক্ষেপ করেছেন। দেশের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া সুসাধ্য যেমন হয়নি, তেমনি ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করাও সহজ হয়নি। সরকারেরও জবাবদিহির দায় ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও জনমতের কাছে। ব্রিটিশ শাসন বাদশাহী শাসন ছিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতা অনায়াসলভ্য ছিল বলেই সরকারী চাকরিতে থাকার সময় বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল অমন অবাধে অজস্র লিখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সরকারী চাকরি করলেও এঁরা কেউ কর্তার ইচ্ছায় লেখনী ব্যবহার করেননি। প্রশস্তি রচনা করেননি। সভাকবি বা দরবারী সাহিত্যিক হননি। ব্রিটিশ ভারত দেশীয় রাজ্য ছিল না। তার পাশেই ছিল অপর এক ঐতিহ্য। কিন্তু আমাদের রেনেসাঁস সে ঐতিহ্য অনুসরণ করেনি। তাই আমাদের লেখকরা ছিলেন স্বাধীন লেখক। স্বাধীন দেশের লেখক না হয়েও স্বাধীন লেখক হওয়া যেত। এটা ছিল ব্রিটিশ রুদ্রের দক্ষিণ মুখ।

দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। এখন তো সবাই আমরা স্বাধীন লেখক। ব্যক্তিস্বাধীনতা আমাদের সংবিধানসম্মত অধিকার। একে প্রাণপণে রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় সদ্ব্যবহার করা। যারা স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে না তারা তার যোগ্য নয়। সেটা আপনি হারিয়ে যায় বা অপহৃত হয়। লেখকের স্বাধীন লেখনীই তার সেরা সম্পদ। স্বাধীনতার বিনিময়ে আর কোনো সম্পদ কখনো সেরা সম্পদ হতে পারে না। আজকের দিনে যে প্রলোভন আমাদের সামনে ঝুলছে তেমন কোনো প্রলোভন আগেকার দিনে ছিল না। প্রলোভন মানুষকে পরীক্ষা করে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মনুষ্যত্ব। নির্যাতনের পরীক্ষাও যে অন্তর্হিত হয়েছে তা নয়। ক্ষুরধার পন্থা। একধারে হেঁসেলে প্রলোভন, আরেকধারে হেঁসেলে নির্যাতন। অপ্রমত্ত হতে হবে।

যে দেশ যে সরকারের যোগ্য সে দেশ সেই সরকার পায়। তেমনি যে জাতি যে সভ্যতার বা যে সংস্কৃতির যোগ্য সে জাতি সেই সভ্যতা বা সেই সংস্কৃতি পায়। আমরাও পেয়েছি। আমি এর জন্যে গৌরব বোধ করি। এই দেড় শতকের মধ্যে আমরা স্বাধীনতাহীনতার হীনতা কাটিয়ে উঠেছি। তেমনি আধুনিকতাহীনতার দীনতা। আমাদের সাহিত্য এখন স্থিতিশীল নয়, গতিশীল কথা প্রগতিশীল। তবে সব অঙ্গ সমান পুষ্ট নয়। সামনের দেড়শো বছরে হয়তো অপুষ্ট অঙ্গের পুষ্টি হবে। সংস্কৃতির যেসব বিভাগ সাহিত্যে তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ তারাও অগ্রসর হয়ে সাহিত্যের সঙ্গে পা মেলাবে। ফ্রান্সে যেমন সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পরের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে।

ভারতকে একটা উপদ্বীপ বলা হয়। আসলে কিন্তু এটা একটা মহাদ্বীপ। হিমালয়ও এককালে একটা সমুদ্র ছিল। এখনো সমুদ্রের মতো পথ রোধ করে রয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের লোক দ্বৈপায়ন। তাদের মনটাও ইনসিউলার। চার যুগ, চার বেদ, চার বর্ণ, চার আশ্রম তাদের মনের চার দেয়াল। সেই চার প্রাচীরের অন্তরালে জনমানস অবরুদ্ধ। ইংরেজী শিক্ষার পণ্ডিতরাও সংস্কৃত শিক্ষার পণ্ডিতদের ভাষায় কথা বলেন। এরপরে যখন বাংলা শিক্ষার পণ্ডিতরা সভামঞ্চে সমাসীন হবেন তখন তাঁদের কথাবার্তাও হয়তো একই রকম হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষা যদি নতুন মোড় না নিত আমাদের সাহিত্যও নতুন মোড় নিত না। প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সংস্কৃতভিত্তিক। ব্রাহ্মণরাই তার সুযোগ পেতেন। তাই সাহিত্যও ছিল ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া। আধুনিককালের শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে ইংরেজীভিত্তিক। ভদ্রলোকরাই তার সুযোগ পান। তাই সাহিত্যও ভদ্রলোকদের হাতে গড়া। প্রাচীনকালের সাহিত্যের মতো আধুনিককালের সাহিত্যেরও পায়ের তলার মাটি সংকীর্ণ। শিক্ষা যদি বাংলাভিত্তিক হয় ও জনগণ তার সুযোগ পায় তাহলে শিক্ষার নতুন মোড় থেকে আসবে নতুন সাহিত্য। এটা যেমন একটা প্রিয় সম্ভাবনা তেমনি আর একটা অপ্রিয় সম্ভাবনা হচ্ছে বিশ্বের মুখ্য স্রোতের সঙ্গে ভারতের অন্তঃস্রোতের সংযোগ যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু ছিন্ন করে দ্বৈপায়নত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। এবার জনগণের কর্তৃত্বে।

নবজাগরণ থেকে আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক সংস্কৃতি এর মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। তেমনি গণজাগরণ থেকে গণসাহিত্য ও গণসংস্কৃতি এর মধ্যেও আর একটা পারম্পর্য। দুই পারম্পর্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে আমাদের উপর এই ভার পড়েছে, যেমন আমাদের পূর্বসূরীদের উপর পড়েছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপ দুই পক্ষের মধ্যে সমন্বয়সাধনের ভার। নবজাগরণের লাভগুলিকে ত্যাগ করলে জনগণেরও ক্ষতি হবে। সেটা বুঝতে ওদের সময় লাগবে। যারা বোঝে তাদের কর্তব্য হবে লাভগুলিকে হাতছাড়া না করা। উপরন্তু গণজাগরণ থেকে যা লাভ করা গেছে ও যাবে সেসব লাভকেও হাত পেতে নেওয়া। জনগণের মধ্যে নতুন একটা জগৎ নিহিত রয়েছে। বাঁজের মধ্যে যেমন বনস্পতি। তাকে সাদরে বরণ করতে হবে। তেমনি তার কাছেও আশা করতে হবে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

গণজাগরণ যখন খুশি যেখানে খুশি ঘটানো যায় না। তার আগে নবজাগরণ ঘটে থাকা চাই। ইউরোপের ইতিহাসে দেখা যায় আগে রেনেসাঁস, তার পরে রেফরমেশন, তারপরে এনলাইটেনমেন্ট, তার পরে ফরাসী বিপ্লব। মোটামুটি এই পরম্পরা রাশিয়াতেও অনুসৃত হয়েছে। ভারতেও। যদিও আমাদের গণজাগরণকে কিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বিপ্লব হয়তো ভবিষ্যতে আসবে। কিন্তু তার আগে যেসব পর্যায় পার হওয়া গেছে সেগুলিকে অস্বীকার করে নয়। রেনেসাঁস যেখানে ঘটেনি রেভলিউশন সেখানে ঘটে না। ঘটলে খোপে টেকে না।

মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিপ্লব যে কখনো কোথাও ঘটেনি তা নয়, কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের আগে কোনো দাগ রেখে যায়নি। ফরাসী বিপ্লব একসঙ্গে চার্চকে ও রাষ্ট্রকে, পোপকে ও রাজাকে, শাস্ত্রকে ও শস্ত্রকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। আমাদের গণজাগরণ ততদূর যায়নি, যেতে সাহস পায় নি। শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নেতাদের মনোভাব ছিল সংস্কারের। বিপ্লবীর নয়। শস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাজীর মনোভাব অহিংস অর্থে কৈপ্লবিক, কিন্তু অন্যান্য নেতাদের মনোভাব জাতীয়তাবাদী। চার্চ তো আমাদের ছিলই না, পোপের মতো যাঁরা ছিলেন তাঁরা ক্ষমতাহীন। রাষ্ট্র আর রাজার বিরুদ্ধেই আমাদের গণজাগরণ। সঙ্গে সঙ্গে রাজন্য ও জমিদারদেরও বিরুদ্ধে। তবু এর মধ্যে একটা mystique ছিল। সেটা সঞ্চার করেছিলেন আমাদের মহান নেতা গান্ধীজী। তিনি ছিলেন নৈরাজ্যবাদী। রাষ্ট্র তাঁর হাতে পড়লে তার বিকেন্দ্রীকরণ হতো। প্রত্যেকটি গ্রামই হতো স্বাধীন ও স্বাবলম্বী। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবাণিজ্যেরও হতো বিকেন্দ্রীকরণ। সৈন্যদল থাকত না। থাকলে অতি ক্ষুদ্র আকারে। দেশ বিপন্ন হলে প্রত্যেকটি নাগরিক নিরস্ত্রভাবে লড়ত। কেমন করে লড়তে হয় গান্ধীজীই সেটা শেখাতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু গান্ধীজীর পেছনে ভারতে কোনো ভাবুক পরম্পরা ছিল না। পরম্পরা যেটা ছিল সেটা পশ্চিমে। থোরো, রাস্কিন, টলস্টয় ও তাঁদেরি মতো কয়েকজন ভাবুক তাঁর পূর্বসূরী। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁদের তিনি মানতেন তাঁরা রেনেসাঁসের নায়ক নন, রিভাইভালের নায়ক। এক গোখলে বাদে। প্রাচীন ভারতে নৈরাজ্যবাদের মূল সন্ধান করা বৃথা। সে ভাবনে ছিল ঘোরতর রাজতন্ত্রী ও পুরোহিততন্ত্রী। তাকে পুনরুজ্জীবিত করলে তার বিরুদ্ধে নতুন করে লড়তে হতো। গণযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। গান্ধীজী স্বয়ং রিভাইভালের ঊর্ধ্বে উঠলেও তাঁর শিষ্যরা এখনো তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। এঁরা টলস্টয়, থোরো, রাসকিনেরও নাম

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

করেন না। এঁদের পেছনে তেমন কোনো ভাবুক পরম্পরা নেই। আছেন যাঁরা তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাধক ও সাধু। রেনেসাঁস থেকে এঁরা শতহস্ত দূরে। শুধুমাত্র নৈতিক প্রভাবের দ্বারা কোথাও কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। ইতিহাস কী চায়, কোন্ অভিমুখে যাচ্ছে, কেমন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে, সবচেয়ে কম রক্তপাতে বা কম হিংসায় সবচেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হবার উপায় কী, এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে নেতৃত্ব তাঁদের হাত থেকে চলে যাবে।

মার্কসশিষ্যদের কাছে হয়তো বিকল্প নেতৃত্ব প্রত্যাশা করা যেত। কিন্তু তাঁদেরও ধারণা ইতিহাস রেনেসাঁস, রেফরমেশন ও এনলাইটেনমেন্ট নামক ধাপগুলি ডিঙিয়ে একলম্ফে রেভলিউশনে পৌঁছতে পারে। এরকম ধারণা স্বয়ং মার্কসের ছিল না। রেভলিউশনের ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের জন্যে। যেখানে ওই ধাপগুলি আগেই পার হওয়া গেছল। রাশিয়ার বিপ্লবীরা তাকে সেদেশেও ঘটাতে চাইলেন। পারলেন যে তার অন্যতম কারণ সেদেশেও কতক পরিমাণে রেনেসাঁস ও এনলাইটেনমেন্ট সম্পন্ন হয়েছিল। রেফরমেশন যদিও হয়নি তবু এনলাইটেনমেন্টের প্রভাবে রুশদেশের মার্কসপন্থীরা সকলেই ছিলেন নিরীশ্বরবাদী। ধর্মকে তাঁরা মনে করতেন জনগণের আফিম। এসব কথা চীন সম্বন্ধেও মোটামুটি খাটে। চীনারা বৌদ্ধই হোক আর কনফিউসিয়ানই হোক ঈশ্বরবাদী নয়। মানুষের মন বদলে না দিয়ে শুধুমাত্র বাইরের অ্যাকশন দিয়ে যা হয় তা বিপ্লব নয় বিদ্রোহ বা বিক্ষোভ। যেমন সিপাহী বিদ্রোহ।

আমাদের রেনেসাঁসের নায়কদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল দেশের লোককে আধুনিক যুগের লোক করে তোলা। আধুনিকতা নিছক সমকালীনতা নয়। সমকালীন হলেই আধুনিক হয় না। আধুনিক শব্দটির অর্থ আর একটু সূক্ষ্ম। সে অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নন। মধ্যযুগেও এমন কবি দুচারজন ছিলেন যাঁরা এই সূক্ষ্মতর অর্থে আধুনিক। প্রাচীন গ্রীসে তেমন কবি বা নাট্যকার বা দার্শনিক অনেক বেশী ছিলেন। মহাভারত পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে মনে হয় যিনি বা যাঁরা লিখেছিলেন তিনি বা তাঁরা কারো চেয়ে কম আধুনিক ছিলেন না। আসলে যুগটা আধুনিক বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাসম্পন্ন নয়। আবার যুগটা আধুনিক নয় বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাসম্পন্ন নয়। আবার যুগটা অধুনিক নয় বলে সব সৃষ্টি আধুনিকতাবর্জিত নয়।

আধুনিকতা তাহলে কী? এর সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। এর লক্ষণ হচ্ছে, সবকিছু জানার জন্যে সব কিছু বোঝার জন্যে সব কিছু নেড়েচেড়ে দেখার জন্যে স্বাভাবিক কৌতূহল। তার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা। বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চার। অবিরত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্যকে শেষ কথা বলে ধরে না নেওয়া। ব্যক্তির বিচার-বিবেকের উপর আত্মকর্তৃত্ব। দেহের সৌন্দর্যে আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধ। হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি। সত্যের জন্যে নিত্য ব্যাকুলতা, নিত্য উদ্যোগ। নিজের মতো করে বাঁচা। জীবনকে ভরিয়ে নেওয়া। মরণকে ভয় না করা। পরকাল বা পরলোক নিয়ে মাথা না ঘামানো। ইহকাল ও ইহলোকের কাজ নিখুঁতভাবে করে যাওয়া। আদর্শকে এই জগতেই ও এই জীবনেই যথাসাধ্য রূপায়িত করা। নতুনের জন্যে মনের দুয়ার সব সময় খোলা রাখা। অতীতকেই ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা না করা।

আজকাল সব দেশের উপরের স্তরের দিনযাপন ও নিশিবিহারের ধারা প্রায় একই প্রকার। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোও প্রায় একই জাতের। এর নাম সমকালীনতা, আধুনিকতা নয়। সত্যিকার আধুনিকতা আরো গভীর স্তরের ব্যাপার। রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট যেসব দেশে হয়নি সেসব দেশ আধুনিক যন্ত্রপাতির বা অস্ত্রশস্ত্রের দৌলতে ভারতের তুলনায় সম্পদশালী বা শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু গভীরতর অর্থে আধুনিক নয়। এই দেড়শো বছরে আমরা তাদের তুলনায় আরো আধুনিক হয়েছি। নবলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের আধুনিকতার সহায়ক হবে। তা বলে ইংরেজ আমলও যে সহায়ক ছিল না তা নয়। মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করলে বোঝা যাবে ইংরেজ আমল নানা দিক দিয়ে পূর্বের চেয়ে প্রগতিশীল ছিল। প্রত্যেক পুরুষেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। সব মিলিয়ে যা ঘটে তা ঐতিহাসিক বিবর্তন। তাতে ভারতীয়দের যেমন হাত ছিল তেমনি ইংরেজদেরও হাত। হাতাহাতি হয়নি তা নয় কিন্তু হাত ধরাধরিও হয়েছে। যে যুগ চলে গেছে তার ষোল আনা নিন্দাবাদ করা সত্যভাষণ নয়। আমরা এগিয়েছি ঠিকই। হয়তো আরো বেশী এগোতে পারতাম। বাধা পেয়েছি।

কিন্তু বাধা কেবল বাইরে থেকেই আসেনি। আমাদের অতি পুরাতন ঐতিহ্যও আমাদের বাধা। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনটাকে প্যাশনমুক্ত করে বিচার করতে হবে। এ দেশটা ইংলন্ড বা আমেরিকা নয়, রাশিয়া বা জার্মানী নয়। এটা ভারত। ভারতেরও একটি মুখ্য স্রোত আছে। সে স্রোত আর্যপূর্ব যুগ থেকে প্রবহমান। কত জাতি, কত ভাষা, কত ধর্ম, কত দার্শনিক তত্ত্ব তার সামিল হয়ে তার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। তাকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছেও। ভারতের যে ঐতিহ্য তাকে তুলনা করতে পারি গঙ্গার সঙ্গে। গঙ্গার মতো সে আদিকালের গঙ্গোত্রী থেকে নির্গত হয়ে একালের গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বহির্জগতের মহত্তর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই যে মহত্তর সাগর এর জোয়ার এসেছে গঙ্গার বুকে বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের মতো।

আর্য ও আর্যপূর্ব, বৌদ্ধ ও বৌদ্ধপূর্ব, মুসলিম ও মুসলিমপূর্ব, আধুনিক ও আধুনিকপূর্ব, ভারতের বিবর্তনের এই চারটি পর্বকেই ইতিহাসের বিধান বলে মেনে নিতে হবে। এক একটি পর্বের ভালো আর মন্দ দুটি করে দিক। দুই দিকই সত্য। মন্দের জন্যে ভালোকে অস্বীকার করা ভুল। মানবিক ব্যাপারে ভালো মন্দ একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। রেনেসাঁসের ভিতরেও প্রচুর কলুষ ছিল যেমন ইটালীতে তেমনি ইংলন্ডে। রেফরমেশনও ছিল রেভলিউশনের মতো রক্তাক্ত যেমন জার্মানীতে তেমনি ফ্রান্সে। আর এনলাইটেনমেন্ট সম্বন্ধেও একালের সমালোচকরা তেমন সপ্রশংস নন। তার নায়করা নাকি বিশ্বাস করতেন যে একজন প্রজ্ঞাহিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা যতখানি মঙ্গল সাধন করতে পারবেন একটা অনাচারী গণতন্ত্র ততখানি নয়। এতে সাধারণ ভোটদাতার উপর অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। আখেরে মানবপ্রকৃতির উপর। পক্ষান্তরে এটাও তো দেখা গেল জার্মানীর সাধারণ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই হিটলার চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন ও তারপর সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করে চরম অমঙ্গল সাধন করেন।

ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সামঞ্জস্য এখনো বাকী। ঐতিহ্য যে বাধা দেয় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, অথচ ঐতিহ্য যদি আদৌ না থাকে তবে তার শূন্যটাও অপূরণীয়। ভারত যদি প্রাচীন না হয়ে অর্বাচীন হতো সেটাও কি আনন্দের বিষয় হতো? তাহলে তো আমাদের আদিম অবস্থা থেকেই আরম্ভ করতে হতো। যে উত্তরাধিকার আমরা বিবর্তনসূত্রে লাভ করেছি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তা অমূল্য। আর যে উত্তরাধিকার আমরা বৃহত্তর মানবপরিবার থেকে আধুনিক শিক্ষাসূত্রে ভ্রমণসূত্রে যোগাযোগসূত্রে লাভ করেছি, করছি ও করতে পারি তার সমস্ত ত্রুটিসত্ত্বেও তাও তেমনি অমূল্য। দেশাভিমান বা শ্রেণীসচেতনতা যেন আমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত না করে। কিন্তু গ্রহণ করলেও আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করতে বাধ্য নই। পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন সদারক্ষণ চলবে। রেনেসাঁসের মূলকথাই তাই।

আজকের ভারতে সবচেয়ে রক্ষণশীল শক্তি ঐতিহ্য নয়, ধর্ম। প্রাগৈতিহাসিক কুসংস্কার, প্রাচীনযুগের আচার অনুষ্ঠান, মধ্যযুগের যুক্তিহীন ভক্তি ও অন্ধ বিশ্বাস, এসব বাদ দিলেও এমন কিছু থাকে যার জন্যে হিন্দুদের ধর্ম এখনো প্রাণবান। এখনো সৌন্দর্যসৃষ্টির আকর। এখনো নৃত্যে গীতে কারুশিল্পে অভিনব প্রেরণার উৎস। ধর্মীয়তার অন্তরালে আধ্যাত্মিকতার অন্তঃস্রোত এখনো বহমান। ঐতিহ্যের মুখ্য স্রোতের মতো আধ্যাত্মিকতার অন্তস্রোতের সঙ্গেও আধুনিকতার সামঞ্জস্য সন্ধান করতে হবে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশও কি পড়ে না? নৈতিক বিকাশও পড়ে। এগুলি বাদ দিলে মানবিকতাবাদও ধর্মের মতো একপেশে হবে। সব দিক নিয়েই সমগ্র মানবসত্তা। নইলে অপূরণীয় শূন্যতা।

নতুন বই

কলির পাঁচালী (উপন্যাস)।অজিত সরকার। প্রকাশক—অরুণচন্দ্র সরকার, সরকার বাড়ী, কদমতলা, চুঁচুড়া, হুগলী। ছয় টাকা।

একটি ঘটনাচক্রে বদলে গিয়ে অন্য পিতা-মাতার আশ্রয়ে লালিত সন্তান, প্রথমে অর্জুন, পরে পার্থ, শেষে ধনঞ্জয় হয়ে কি ভাবে তার আসল পিতার কাছে বদলে চলে আসা লালিতা কন্যা চিন্ময়ীর সাক্ষাৎ পেল, প্রেমে পড়ল, এবং অনুশোচনায় তার সঙ্গে মিলিত হল, 'কলির পাঁচালী' উপন্যাসে অজিত সরকার তারই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসে প্রচুর ঘটনা, যা যুক্তি-চিন্তা, বুদ্ধির ন্যায় মানে না, অনেক অবাস্তব কাহিনী—যা পড়তে মন্দ লাগে না—সেই সব দিয়ে ভরিয়ে পাঠকদের সামনে হাজির করানো হয়েছে। আমরা বিশ শতকের মাতের দশকের মানুষ, উনিশ শতকে ফিরে যেতে চাই কিনা—এ উপন্যাসের লেখক তা ভাবেন নি। আর ভাবেননি বলেই এমন নিছক কাহিনী ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়ে এত বড় একটা উপন্যাস পরিবেশন করেছেন। ভাষায়, সংলাপে, উচ্ছ্বাস, অবেগময়তা সস্তা রোমাণ্টিকতা ক্লান্তিকর। লেখকের চরিত্রচিত্রণ দক্ষতা সাধারণ পর্যায়ের।

রূপতীর্থ রূপকুন্ড—হোমকুন্ড (ভ্রমণ কাহিনী)।দীপককুমার সরকার। সুপ্রিয়া প্রকাশনী ২।ই, বৃন্দাবন পাল লেন কলকাতা—৩। ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হিমালয় অভিযান ও ভ্রমণ নিয়ে ইতি-পূর্বে একাধিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। দীপক-কুমার সরকারের 'রূপতীর্থ রূপকুন্ড-হোমকুন্ড' গ্রন্থটি সেই সাহিত্য ধারায় একটি সার্থক সংযোজন। লেখক স্বয়ং রূপকুন্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন—সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেভাবে পরম নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন এবং ভাষায় যে অন্তরঙ্গ সহজ আন্তরিকতা ও সাবলীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন —তা-ই এ গ্রন্থকে মূল্যবান করেছে। নন্দাঘুন্টি, ত্রিশূল, বৈদিনীকুন্ডে ত্রিশূলের প্রতিবিম্ব, কৈলুবিনায়ক, ওয়ান গ্রামে নন্দাজাত ব্রহ্মকমলের মেলা, জিণ্ডরাগলি হিমবাহের নীচে রূপকুন্ড রূপকুন্ডের ধারে অস্থি-অবশেষ ইত্যাদির শিরোনামার আলোক-চিত্রগুলি হিমালয়ের দুরূহ দুর্গম অঞ্চলের জীবন্ত রূপ তুলে ধরে। এগুলি বাস্তবিকই মূল্যবান এবং নতুন অভিযাত্রী ও পর্বত আরোহেচ্ছুদের যথেষ্ট সঠিক পথের নিশানা দেবে বলে মনে করি। আলমোড়া, কৌশলী, রাণীখালী ইত্যাদি জায়গা ভ্রমণে লেখক যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন, তা ভ্রমণকারীদের সহায়ক। লেখকের ভাষা কবিত্বপূর্ণ।

লীলায়ন (কাব্যগ্রন্থ)—নিশিকান্ত। পরি-বেশক ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৪৫ বেনেটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম বারো টাকা।

নিশিকান্ত সাধক ছিলেন। আবার কবিও। একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ ছিল না। ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ। ধ্যানের অভিজ্ঞতাকেই তিনি কবিতার অন্যতম প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে, আপাত সারল্যের অন্তরালে গভীর কথা বলার দিকে ছিল তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক। এবং দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন।

'লীলায়ন' তাঁর কাব্য-সাধনার প্রাথমিক প্রয়াস নয়—সিদ্ধির ফসল। কিছুটা পালা-কীর্তনের ঢঙে লেখা। এবং অলৌকিকতায় মণ্ডিত। পৌরাণিক ধারার খাত বেয়ে ইতিহাসের পথে মুরলীমনোহরের যে-কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে, সেই কাহিনী তাঁরই নিজস্ব বিশ্বাস ও উপলব্ধির জারক-রসে নতুনতর তাৎপর্য পেয়েছে এই কাব্য-গ্রন্থে। সন্দেহ নেই, বহু জনশ্রুতিকেও তিনি ইতিহাসের নজীর বলে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মতে, ধন নেই, জন নেই, এমন একটি অখ্যাত পরিবারের পর্ণকুটিরে প্রায় দেড়শ বছর আগে মুরলীমনোহর ইষ্ট-দেবতার আসনে সমাসীন ছিলেন। তার আগে, বিস্তৃতপ্রায়কালের কোনও এক অক্ষয় তৃতীয়ার একটি শাশ্বতী ঊষার উদয়লগ্নে বৈদ্য রায়-বংশীয় জনৈক মহাজনের কুঞ্জ-প্রাঙ্গণে তিনি প্রকট হন। আবির্ভাব ক্ষেত্র—নবদ্বীপ থেকে একশ ক্রোশের মধ্যে মুর্শি-দাবাদ জেলার গোয়াস পরগণার এক নিভৃত পল্লী। তার দীর্ঘকাল পরে, বিভিন্ন অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে, ভগবান মুরলী-মনোহর কলকাতায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে অর্চাবতার দধিবামনের অতিথ্য গ্রহণ করেন। এবং ১৩৭৭ সালের ২৭ কার্তিক শুক্রবার পূর্ণিমার রাতে স্বধাম বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করেন। বৃন্দাবনের কয়েক সহস্র নরনারী নগরের সড়কে ও কুঞ্জগলিতে দাঁড়িয়ে তাঁকে রাজোচিত সম্বর্ধনায় অভ্যর্থিত করেন।

যাঁরা ভক্ত নন, তাঁদের মনে হয়তো এই কাহিনীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় জাগবে। কিন্তু রসপিপাসু ভক্তের কাছে অলৌকিকেরও লৌকিক তাৎপর্য অন-স্বীকার্য। বিশেষ করে, যে-পরিচ্ছন্ন শিল্প-দৃষ্টি থাকলে যে-কোন রচনাই সর্ব-জনীনতায় উত্তীর্ণ হয়, সেই দুর্লভ গুণে নিশিকান্তের এই গ্রন্থটি অনন্য।

স্বীকার করতে বাধা নেই, সাক্ষ্য নিশিকান্ত এখানে প্রবলভাবে উপস্থিত। তবুও তাঁর কবিসত্তা স্বমহিমায় ভাস্বর। ভাষার কারুকার্যে সরল উপস্থাপনায়, কবিতার মাধ্যমে সহজেই পাঠকের হৃদয় কেড়ে নেয়। ভক্তের হৃদয় যে তাতে আরো উদ্বোলিত হবে—তাতে সন্দেহ কি?

'রূপা' থেকে বলছি ঃ

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলতেন, বাংলার তিনজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমার অন্তর্দৃষ্টি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন।

বাংলার গভর্ণর এবং ভারতের গভর্ণর জেনারল রাজা-গোপালাচারীর দৈনন্দিন জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক অজ্ঞাত বহু তথ্য তাঁর অন্তরঙ্গ কর্মসচিব শ্রীবিমানেশ চট্টোপাধ্যায়ের কলমে ধরা পড়েছে।

একটি ব্যক্তিত্বময় পুরুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ঐতিহাসিক এক দলিল ঃ

কালো চশমার আড়ালে

[রাজাজীর সঙ্গে হাজার দিন]

।। যন্ত্রস্থ ।।

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২

এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ, ইন্দ্র দুগারের আঁকা বহুবর্ণে মুদ্রিত রাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক ছবিগুলি। এমন প্রাণবন্ত তুলির টান এবং বর্ণের সমাবেশ সহজে চোখে পড়ে না।

আমরা সত্তরের যীশু (কবিতা সংকলন)—যীশু কবিগোষ্ঠী কর্তৃক পুরুলিয়া থেকে প্রকাশিত।

সুকান্ত স্মরণে এই বিশেষ কবিতা সংকলনটির প্রকাশ নিঃসন্দেহে সুন্দর হয়েছে। তরুণ দাস, মুকুল চট্টোপাধ্যায়, নির্মল হালদার, কল্লোল মজুমদার, সৈকত রক্ষিত, বিজয় পাঠক, নির্মলকুমার মাহাত এবং উদয় দরিপা মোট আটজন কবির রচনা এতে স্থান পেয়েছে। মুখবন্ধে লেখা—জীবন যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে কবিতাই সর্বাধিনায়ক। প্রত্যেকটি কবিতা এই সুরের প্রতিধ্বনি। তরুণ কবিদের সংকলনটি অনুরাগী পাঠক পাঠিকাদের নিশ্চয় আনন্দ-দান করবে।

তুমি সুন্দর (কাব্য-সংকলন)—সম্পাদনা : শান্তশীল দাস, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : হেমকুমার মুখোপাধ্যায়, ঘোষপাড়া, পানিহাটি, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

রবীন্দ্রজন্মদিনকে ঘিরে রবীন্দ্র-বন্দনা করেছেন কবিতার প্রখ্যাতনামা ও প্রতি-শ্রুতিবান এদেশের পঁয়ষট্টিজন কবি। সবিশেষ উল্লেখ্য হলেন : বনফুল, হরপ্রসাদ মিত্র, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শান্তশীল দাস, রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, সেখ সদরউদ্দিন প্রমুখ। কাব্য-সংকলনটি কবিতা-অনুরাগীদের খুশী করবে। প্রচ্ছদে প্রবোধ সরকার-এর আঁকা রবীন্দ্র-প্রতিকৃতিটি সংকলন-গ্রন্থটিকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছে।

শিল্পের সন্ধানে : সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রকাশক রকমারি বুক হাউস, ৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯ : ১৪ টাকা।

নিঃসন্দেহে একখানা উপযোগিতাভিত্তিক বই, বিশেষ করে আজকের ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার দিনে। বলা যায়, স্বয়ং-নিযুক্ত হওয়াই আমাদের পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকারদের পরিত্রাণের পাকা সড়ক। এবং এই নিয়োগ-ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ও গৃহ-শিল্পের মাধ্যমেই বিশেষভাবে সম্ভব। কিন্তু ঠিক কোন শিল্পের পথে পা বাড়ান হবে, পুঁজিই বা কত লাগবে—এই সব ঠিক না করতে পেরে শিক্ষিত বেকার দিশেহারা এবং শেষে হতাশ হয়ে পড়েন। এই সম্বন্ধে দিক-নির্দেশ করা হয়েছে বইখানিতে। শুধু ফরমুলা নয়, কিভাবে তৈরী হয় এবং সূচনায় কত পুঁজি নিয়ে আরম্ভ করলেই বা চলে—তারও প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আছে বিভিন্ন যন্ত্রের আলোকচিত্র ও রেখাচিত্র। প্রধানত প্রসাধন দ্রব্য এবং কতকগুলো নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। এদের অধি-কাংশের বিক্রয়-বাজার প্রচারের ওপর নির্ভর করে। এ সম্বন্ধে কিছু নির্দেশ দিলে ভাল হত। শুধু 'বাজার পেতে গেলে শহরে প্রচার দরকার'—বলাই যথেষ্ট নয়।

মুদ্রণ ব্যাপারে এবং স্বভাবতই সূচীপত্রে সমজাতীয় পণ্যগুলোকে শ্রেণী বিভাগ করলে আরও ভাল হত—যেমন দাঁত মাজার মাজনের পরই আইসক্রীম এলে চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করতে বেশ একটু অসুবিধে লাগে। তাছাড়া বইখানির শেষও করা হয়েছে হঠাৎ। একটা উপসংহার বা ঐ রকম কিছু জোড়া যেতে পারত।

অবশ্য এরকম ত্রুটি প্রথম সংস্করণে থাকেই। আশাকরি শুধু দ্বিতীয় কেন, পর-বর্তী সংস্করণও হবে এবং এই সব ছোটখাট ত্রুটিও দূর করা হবে। তবে বহুল প্রচারের দিকে যদি দৃষ্টি রাখতে হয় তবে গ্রন্থখানির দাম নির্ধারণ ব্যাপারে প্রকাশককে একটু বিবেচনা করে দেখতে হবে। যাঁদের জন্য এই রচনা—এই গ্রন্থ প্রকাশ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের সংগতি অতি সামান্য তা ভুললে চলবে না।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

লেখা ও রেখা (মাঘ-চৈত্র)—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২।১সি পাইকপাড়া রো, কলকাতা—৩৭। এক টাকা।

'লেখা ও রেখা'র একটি বিশিষ্ট পাঠক-গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে। এ সংখ্যাটি পূর্বতন ঐতিহ্যে বিশিষ্ট। একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন তারাপদ মুখোপাধ্যায়। বিষয় : 'স্বনির্ভর অর্থনীতির কাহিনী'। সাহিত্যে প্রেমের প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। গ্রন্থসমালোচনাগুলি চমৎকার। এবং কবিতা-গুলি সুনির্বাচিত।

একক (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮০) সম্পাদক : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ১০।৩সি নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলকাতা—২৬। দাম : দু' টাকা।

মাইকেলের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে নানা-রকম রচনা প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে। 'একক'-এর এ সংখ্যাটি তার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। একালের নয়, বিগত-কালের মনীষীরা কে কিভাবে মাইকেলকে দেখেছিলেন—তারই নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পত্রিকাটির পাতায় পাতায়। প্রায় সবকটি লেখাই পুনর্মুদ্রিত। লিখেছেন রাজনারায়ণ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গঙ্গাচরণ সরকার, রজনীকান্ত গুপ্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামগতি ন্যায়রত্ন, জগদ্বন্ধু ভদ্র, প্রমথ চৌধুরী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং একে-বারে একালের লেখক সনৎকুমার গুপ্ত। সম্পাদকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষর সর্বত্র লক্ষণীয়। মাইকেলজিজ্ঞাসু পাঠক-পাঠিকা-দের কাছে সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য এবং অপরি-হার্য বলে মনে হবে।

বিচিত্রা (কবিতা সংখ্যা)—সম্পাদক : সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত, সব্রত রাহা, জীবন ভৌমিক। ৩৩২ গাঙ্গুলী বাগান, কলকাতা—৪৭। পাঁচ পয়সা।

নির্ভেজাল কবিতা, আর কবিতা ছাপা হয়েছে এ সংখ্যায়। গদ্য রচনা নেই। দু একটি লেখা পুনর্মুদ্রিত। লিখেছেন জীবনা-নন্দ দাস থেকে শুরু করে অনেক খ্যাত অখ্যাত কবি। একটি ছবি ছাপা হয়েছে। কিন্তু শিল্পীর উল্লেখ করা হয়নি। সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে অনেক কবিতা পাঠকই উৎসুক হবেন।

ভাষা (১ম বর্ষ। দ্বিতীয় প্রকাশ)। সম্পাদক—মৃণাল নাথ। তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কল-কাতা—১২। আড়াই টাকা।

'ভাষা' ত্রৈমাসিক ভাষা-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। এর বর্তমান সংকলনটি 'আচার্য সুকুমার সেন উৎসর্গ সংখ্যা'রূপে প্রকাশিত হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন একজন প্রথিতযশা ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় সংকলনটির মর্যাদা যথেষ্ট বেড়েছে। এতে 'অধ্যাপক সুকুমার সেন প্রশস্তি' লিখেছেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, হিমাংশুভূষণ সরকার, সত্যব্রত মিত্র, সুকুমার বিশ্বাস, রমাপ্রসাদ দাস, কৃষ্ণচন্দ্র ভাষা, অমিতাভ চৌধুরী, পতঞ্জলি চক্রবর্তী। সংকলনটি অত্যন্ত মূল্যবান যে কোন ভাষা-গবেষক তো নিশ্চয়ই, এমন কি সাধারণ সাহিত্যসেবীদেরও এটি অবশ্য সংগ্রহযোগ্য।

নতুন উপন্যাস ! কসমোপলিটন সমাজের দিকভ্রান্ত মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র .....
প্রফুল্লকুমার সিংহের জনপদ ৬,
নতুন নাটক ! অফিস-কর্মীদের সংগ্রামধর্মী অভিনয়সফল....
দুর্বাদল চ্যাটার্জীর এ লড়াই বাঁচার লড়াই ৩,
আরও কয়েকটি নাটক। প্রত্যেকটি উৎসবে মঞ্চসফল
দুটি একাঙ্কিকা : শ্রীকংস ১-৫০ রূপম পুষ্প ও দুই সখী : সুহাসিনী দাস ১-৫০
মুক্তি সংগ্রাম : অজিত সেনগুপ্ত ১, নতুন জীবন : অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪-৭৫
অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস লিঃ, ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০১২

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

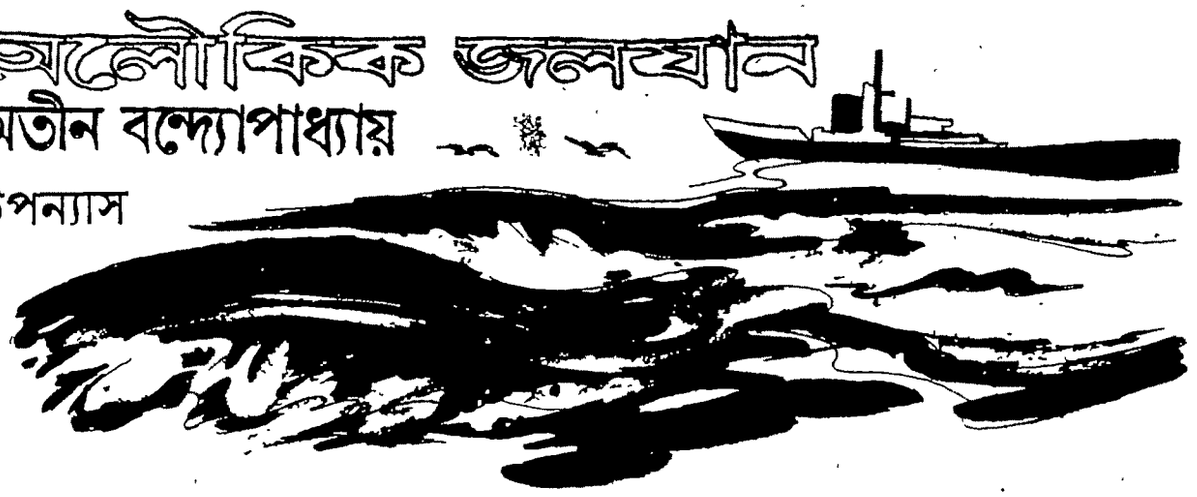

।। সাত ।।

রাত থাকতেই জাহাজ নোঙর তুলেছে। ডেবিডের ওয়াচ আটটা বারোটা। কিন্তু জাহাজ নোঙর তুলেছে বলে, শেষ রাতের দিকে পিছিলে হাড়িয়া হাফিজ করতে হয়েছে। জাহাজ নোঙর তুলে সমুদ্রে না পড়া পর্যন্ত সে ডেকে বসেছিল। কেবিনে ফিরে গিয়ে সে ঘুমোবার আর চেষ্টা করেনি।

এটা ওর স্বভাব। কিনারায় জাহাজ ভিড়লেই তার আর ঘুম আসে না। যতক্ষণ সমুদ্রে জাহাজ ভেসে না যায়, সে বসে থাকে চুপচাপ। মাথার ওপর আকাশ থাকে। আকাশের অজস্র তারা ক্রমে কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে যায়। চারপাশে এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা থাকে। এনজিনের শব্দ ব্রীজে আর কিছু তখন কানে আসে না। স্টাফ-হোলডে শলইশ অথবা র‍্যাগের শব্দ। বেলচায় কয়লা মাবার শব্দ। আর কিছু কানে আসে না। সমুদ্রের কিনারার গাছপালাও ক্রমে চোখের ওপর থেকে সরে যায়। পৃথিবীর সব বন্দরে সে এ-ভাবে বসে থাকে। স্ত্রী এবির কথা মনে হয়। ছেলে-মেয়েদের মুখ ভেসে ওঠে। ওরা ওকে প্রত্যেকে একটা করে চিঠি দেয়। চিঠিতে ওদের নানা বায়নাক্কা থাকে। বউ নানাভাবে লেখে, তুমি চিন্তা কর না, আমরা ভাল আছি। তখন মনে হয় এবির চোখ দুটো তেমন সুন্দর নয়। চুল সোনালী, এবি ভারি সংসারী মেয়ে। এত ভাল যে মাঝে মাঝে এবিকে খুব একঘেয়ে লাগে। সে তার ছেলেপেলে সংসার বাদে আর কিছু জানে না।

এবি নিজেও একটা কাজ করে। স্কুলে সে শিক্ষকতা করছে সেই কবে থেকে। দুজনের রোজগারে ওরা ডলফিনে বেশ সুন্দর ছিমছাম একটা বাড়ি করেছে। এবির খুব শখ হে ঘাসের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার। সূর্য উঠলে এবিকে সে কখনও দৌড়াতে দেখেনি। ওর ইচ্ছা হত, সূর্য উঠলে সে এবিকে নিয়ে হে-ঘাসের ভিতর দৌড়াবে।

এবি সব সময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে চায়। সে বেশি হৈচৈ পছন্দ করে না। চার্চে প্রতি রোববার তার যাওয়া চাই। খুব ধর্মভীরু এবি। এতটা ধর্মভীরু যে মাঝে মাঝে ডেবিডের এবির ঈশ্বর সম্পর্কে খুব ঠাট্টা করতে ইচ্ছা হয়। খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। ক্যাথলিক এবং আচার-অনুষ্ঠানে আন্তরিক। এমন আন্তরিকতাও ডেবিডের খুব পছন্দ না। বৌ একটু ছলনা করবে না, একটু চাতুরি খেলবে না, একেবারে সতীসাধ্বী হয়ে থাকবে ভাবতে তার ভারি খারাপ লাগে। সমুদ্র থেকে ঘুরে গেলে ওর মনে হয় সে এবির প্রতি নানাভাবে অবিশ্বাসের কাজ করছে। এবি যদি সামান্য অবিশ্বাসের কাজ করত তবে বোধ হয় তার এতটা অনুতাপ থাকত না।

কিনার সবে গেলেই সে ভাবে ধার্মিক হবে। স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক হবে, কিন্তু কিনারার গেলে কিছু তখন মনে থাকে না। কেবল একটা মুখ ভাসে, দূরবীনে সে এবির মুখ আর দেখতে পায় না, যেন এক পাখি নিরন্তর উড়ছে, সেটা যে কি, কেন ওড়ে, কেন সমুদ্রে ছায়া ফেলে যায়, দিগন্ত-রেখায় অদৃশ্য হয়ে গেলে কিছু ভাল লাগে না, সব গাছপালা দ্বীপের তখন কেন যে এত মনোরম মনে হয় সে বুঝতে পারে না। সে আজও বসেছিল, যতক্ষণ কিনার দেখা গেছে, চোখে দূরবীন। কাল তার ভারি ইচ্ছা ছিল, কোথাও ঠিকানা খুঁজে যাবার, কিন্তু ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে যেন ভুল করে ফেলেছিল। আসলে সে চায় আন্তরিক থাকতে। একজন পাহারাদারের কাজ করবে ছোটবাবু, ছোকরা সে, ওর ভিতর এখনও রক্ত ততটা দামাল নয়, কিছুটা সন্ত মানুষের মতো লাগে। সে এখন ভাবছে, ছোটকে সঙ্গে না নিয়ে বের হলেই ভাল হত। বড়-মিস্ত্রির মতো তবে একটা ঘরের খোঁজে যাওয়া যেত।

আসলে, রাতে জাহাজে কেউ ছিল না। কাপ্তান চিফ-অফিসার জ্যাক বাদে সবাই নেমে গেছিল। ক্রুদের ভিতর থেকেও কেউ কেউ নেমে গেছে। শেষ পর্যন্ত বড়মিস্ত্রি মিলড্রেডকে নিয়ে কেবিনেই রাত কাটিয়েছে। এতটা অবশ্য ওর ভাল লাগে না। নির্লজ্জের মতো সে এটা কখনও করতে পারে না। কিনার চলে গেলেই ওর মায়া হয় গাছপালার জন্য। এবার সে ভেবেছে সামনের বন্দরে ঠিক নামবে। যে-ভাবে হোক, কারণ এই প্রায় মাস দুই হল সে জাহাজে উঠে এসেছে, জাহাজটা পুরানো বলে বেশিদিন একনাগাড়ে কাজ করা যায় না, অনেকে অসুখে পড়ে যায়, সে সিঙ্গাপুরে উঠেছে। সে, বড়মিস্ত্রি, মেজ-মিস্ত্রি। জাহাজ হোমে গেলে, সে নেমে যেতে পারবে না। ব্যাংক লাইনের সফরে বেশদিন থাকার নিয়ম। পাঁচ সাত মাসে নেমে গেলে, কোম্পানী সুনজরে দেখে না। যদিও সে যতটা জানে জাহাজ বুয়েন-এয়ার্স থেকে ব্রাজিলের ভিকটরিয়া বন্দরে যাবে। সেখানে খালি জাহাজ যাবে। আয়রণ-ওর বোঝাই হবে ভিকটরিয়া বন্দরে, তারপর সোজা কার্ডিফে। যদি জাহাজ ড্রাই-ডক হয় তবে বেশ কিছুদিন এবির সঙ্গে কাটাতে পারবে। ওর ভারি ইচ্ছা তখন এবিকে নিয়ে হে-ঘাসের ভিতর কেবল লুকোচুরি খেলবে। কিন্তু এবি যেন কেমন, সে এটাকে ভারি অসভ্যতা ভাবে। কখনও একটা মাঠের ভিতর ঘাসের ছায়ায় এবি দূরবীন চোখ রাখতে চায় না। ওর ভারি লজ্জা। এই বয়সে এ-সব ওর এতটুকু ভাল লাগে না।

অথচ এবি জানে না, দূরবীনে মেয়েদের ছবি আশ্চর্যভাবে বদলে যায়। সে দেখতে পায় একটা জীবন, হ্যাঁ জীবনই তো, যেন সচল আন্তরিক আকাশ ওর কাছে মাথা পেতে রেখেছে। ছুঁয়ে দিলেই ঝর ঝর করে বৃষ্টিপাত হবে। এমনটা না হলে ডেবিডের মন ভরে না। মাঝে মাঝে ডেবিড তখন কেমন অন্যমনস্ক

হয়ে যায়। কোন দ্বীপের বনমেয়ের স্নান সে চুরি করে দেখতে ভালবাসে। মানুষের আদিমতা তাকে অত্যন্ত জীবন্ত করে রাখে।

একা একা ডেকে বসে থাকলে কত কিছু এমন মনে হয়। রাতে জাহাজ নোঙর নিয়েছে বলে সারাটা ডেকে কয়লার গুঁড়োতে ভরে গেছে। সারাটা ডেক ন্যাচ ভেরফ. ঝুঁ কোবিন, লাইফ বোট সব কালিতে ঢেকে গেছে। হেঁটে গেলে জুতোর ছাপ পড়ছে ডেকে। ভাল হুইস্কিও ভাল লাগছে না।

ক্যাপ্টেন হিগিনস তখন ব্রীজ পাশে বার বারই সমুদ্রে কি যেন উঁকি মেরে দেখছেন। কিছু খুলে টুলে গেল নাকি। যা একখানা লক্কর মার্কা জাহাজ, কখন যে কি হয়। বে-অফ-বেঙ্গলে বড় রকমের একটা ঝড় পড়েছিল—তারপর তো জাহাজে পাট-বাণীর মতো চলছে। হোল কলে কেবল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং রুম বিয়ারিং তখনও দক্ষিণ-পূর্বে করতে হচ্ছে। স্টারবিং ইঞ্জিনের সঙ্গে কম্পাসের কাটার হিসাব ঠিক রাখা এবং জাহাজ চালানো তেমন কঠিন না। কিন্তু মুসকিল নদীর মতো সমুদ্র কখনও কখনও দামাল হয়ে যায়। কোথাকার স্রোত, কি ভেঙে এনে কোথায় জমা করবে এবং কিভাবে চড়া পড়ে যেতে পারে আর চড়ায় উঠে গেলে বেশ হয়ে গেল। যেতে যেতে এমন যে দুটো একটা ছবি এই যেমন জাহাজ চড়ায় আটকে আছে, অথবা একটা বয়াতে লাল নীল আলো, অর্থাৎ নিচে অতলে একটা জাহাজ ডুবে আছে, সেখানে এখন সমুদ্র-প্রাণীরা নানাবর্ণের লতার ভিতর জলজ-জানোয়ার ভিতর আস্তানা বানিয়েছে—এমন সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া না যাবে তা নয়। এ-সব দেখলেই পুরানো জাহাজের ভয়। অবশ্য পুরানো জাহাজ অনেক সময় পুরানো টনিকের মতো কাজ করে। ঝড়ে জলে সে বেশি সমক্ষয় বুঝতে পারে।

না কিছু না। হিগিনস এখন চার্টরুমে ঢুকে যাবে। ডেভিড এবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। ডেক-ওয়াচে জাহাজিরা হোসপাইপের জল মেরে যাচ্ছে ডেকে। টিন্ডাল বোট-ডেকে উঠে সি-ওয়াচের ভালব ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নানা জায়গায় নানাভাবে এইসব ভালব ছড়িয়ে আছে যেখানে যেভাবে জলের দরকার ভালব ঘুরিয়ে দিলেই হল। হোসপাইপ লাগিয়ে দিলেই হল। জেনারেল সার্ভিস পাম্প থেকে নানাভাবে সব পাইপ জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। এবং এ-জাহাজ পুরনো বলে, স্টিম এনজিন বলে, সব সময় জাহাজে জলের দরকার বেশি। লম্বা সফরে জল কখনও কখনও ফুরিয়ে যায় পর্যন্ত। তখন এভাপরেটিং করতে হয়। নোনা জল থেকে সাদা জল তৈরি করে নিতে হয়।

ডেভিড বুঝতে পারে এভাবে এক বিচিত্র জীবন এ-জাহাজে থাকলে গড়ে ওঠে। কিনারার প্রতি টান, পরিবারের জন্য মায়া, তারপর দীর্ঘদিন বাদে মনে হয়, সে একজন নিরালম্ব মানুষ, সে আছে এই জাহাজেই, জাহাজেই তার জন্ম, জাহাজেই তার শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য এবং এভাবে সে মরে যাবে। তখন মনে হয় না, তার স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, কেবল মনে হয়, সে একটা যান চড়ে ক্রমাগত সমুদ্র, দ্বীপ এবং পাহাড় অতিক্রম করে পৃথিবীর সব মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। সাংসারিক জীবন, স্ত্রী পুত্র সব অনেক দূরের মনে হয় তখন। বন্দরে নেমে তখন একটু বেলাল্লাপনা করতে না পারলে ভাল লাগে না। পুরানো ছবির মতো মেয়েমানুষের শরীর একটা যাদুঘর হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে ঠাণ্ডা, অতি ঠাণ্ডা কেমারের নিচু অংশটা। কেন যে সেখানে ফুল ফোটার মতো উত্তাপ থাকে না।

ডেভিড ভেবেছিল, বিকেলে ছোটবাবুকে নিয়ে বোট-ডেকে বসবে। একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে তখন তারা যাবে। দ্বীপটা সোনালি। নানারকমের ক্যাকটাস। ক্যাকটাসগুলো এত বড় যে কখনও ওদের বড় গাছটাছ মনে হয়। এমন সব ক্যাকটাস পৃথিবীর অন্য কোথায় আছে তার জানা নেই। সে তো অন্তত দেখেনি। দূরবীনে এ-সব এত ভাল দেখা যায়, যে মনে হয়, সমুদ্রের নীল জল, যখন এ-ভাবে এমন একটা দ্বীপকে, সেই পৃথিবীর জন্ম থেকে ঘিরে রেখেছে, আর সেই ক্যাকটাস সব ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তখন সেখানে কোন মানুষের পায়ের ছাপ থাকবে না হয় না। কিন্তু সে জানে এ দ্বীপে মানুষেরা আসেনি। কি হবে, এইসব দ্বীপে, শুধু ক্যাকটাস, এবং এত ছোট যে ফার্লঙের মতো বৃত্তাকারে ভেসে আছে। মাটির রঙ সে যেবার যে-ভাবেই দেখেছে, সোনালি, এবং ক্যাকটাসগুলো অতি প্রাচীন বলে নীল রঙের। আর সূর্য উঠলে ওর মুখে হত পৃথিবীতে প্রথম মানুষ আদম ইভ এখানেই বোধহয় শৈশবে বড় হয়েছে। আদম ইভের পক্ষে এর চেয়ে নির্জন জায়গা খুঁজে পাওয়া মুসকিল। সে দূরবীনে কোন গিরগিটি দেখেনি, কোন টিকটিকি দেখেনি, পিঁপড়ে টিপড়ে আছে কিনা, বুঝতে পারে না। কেবল দ্বীপটার চার-পাশে নানারকমের শঙ্খের মরা খোল পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মানুষের মাথার কঙ্কালের মতো মনে হয়। তখন গাটা শিউড়ে ওঠে।

কিন্তু সে দেখল, ছোটকে তখন ভীষণ ধমকাচ্ছে মেজ-মিস্ত্রি। ছোট কাজ করছিল ফাইভারের সঙ্গে। ফাইভারকেও থিস্ত করছে। এবং গালাগাল, মুখে যা আসে তাই বলছে। বড় বেশি হামবড়া ভাব এই মেজ-মিস্ত্রি আর্চির। সে জাহাজের এনজিনঘরের সব। দায়িত্ব সব তার। সে জোরে জোরে হাঁকছে—সারেঙ, সারেঙ! ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁকছে। এবং ওর চিৎকারে জ্যাক পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কাপ্তান চার্ট-রুমের পোর্টহোল দিয়ে দেখছে, আর্চি ভীষণ মেজাজে কথা বলছে সারেঙের সঙ্গে। সারেঙ আমতা আমতা করছে।

ছোট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আর্চি চেঁচিয়ে বলছে, এ ছোকরা এখানে কেন? এখানে কেন জবাব দাও।

হঠাৎ মেজ-মিস্ত্রির ক্ষেপে যাবার কারণ সে বুঝতে পারছে না। সে বলল, সারেঙসাব বলেছেন ফাইভারকে একটু হেলপ করতে।

হেলপ, মানে তুমি ফাইভারকে হেলফ করবে! তোমার এত সাহস কোথা থেকে আসে হে ছোকরা! তুমি কি ভেবেছ!

ছোট যথাযথ ইংরেজীতে বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল, আমি কিছু ভাবিনি স্যার।

—মুখের ওপর কথা! কি সাহস! এইসব ছোকরাদের বেজায় সাহস। তুমি কাল কার পারমিশনে জাহাজ থেকে নেমে গেছ।

—কারো না। যাবার সময় সারেঙসাবকে বলে গেছি।

আর্চি বুঝল এখানে তার কিছু করার নেই। নিচে নেমে যাবার অনুমতি সারেঙ অনায়াসে দিতে পারে। সে আবার হেঁকে উঠল, ওহে ছোকরা, শুনে রাখো জাহাজে কাজে নবাবি চলে না।

ছোট বলল, জানি স্যার।

—তুমি জানো! কি বলে, কি জানো! কি জানো, যাও, হতভাগা পাজি, নচ্ছার, নিচে যাও। ফাইভার, এ রাসকেল ফাইভার, তোমার মুখের চামড়া খুলে এবার দেখছি একজোড়া জুতো না বানালে চলছে না। আহম্মক, তুমি হেলপার নিয়েছ কেন!

—একা পারা যাচ্ছে না সেকেণ্ড। দেখুন, কি পুরানো মনে হচ্ছে জাহাজে যারা গত সফরে ছিল, তারা হাতই দেয়নি!

—রাখো তোমার নোংরামো। পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবে না। পুরনো জাহাজে এমন হয়।

—দেখুন স্ক্রুপারগুলো কেমন জ্যাম। দেখুন, বলে সে তেলকালিতে নিজের শরীর মুখ ভরে দিয়েও স্ক্রুপারের নাট আলগা করতে পারল না।

আর্চি দেখল, বেশ লম্বা হয়ে ফাইভার ডেক বরাবর উইনচের নিচে ঢুকে গেছে। ওর পা থেকে কোমর পর্যন্ত বাইরে। আর বাকিটা ভিতরে। নাট টেনে জ্যাম ছাড়াতে পারছে না। এ-শীতেও সে ঘামছে। এবার আর্চি খুব জোরে ফাইভারের পায়ের ওপর চাপ দিল। —আঃ একটা আর্ত চিৎকার।—টানো। এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট-বোল্ট আলগা হয়ে গেল। এমন একটা কষ্টের ভিতর আর্চির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ থাকে না। জাহাজ ডারবান যাচ্ছে। সেখানে কিছু পাটের গাঁট নামানো হবে। কিছু চায়ের পেটি। ডেরিকগুলো ঠিকঠাক, এবং উইনচ গুলো সব কাজের করে নিতে না পারলে মেজ-মিস্ত্রি আর্চির বদনাম ছড়িয়ে যাবে।

অথচ ছোট জানে মেজ-মিস্ত্রি আগেও দেখেছে, সে ফাইভারের সঙ্গে কাজ করছে। কাল বড়-মিস্ত্রি ওকে মেজ-মালোমের সঙ্গে দেখেছে। সে জাহাজে কি কাজ করে হয়ত এমন খবর নিয়েছে। আর একটা রাগ তো পুষেই রেখেছে মেজ-মিস্ত্রি। এখন বড়-মিস্ত্রি পাশে থাকলে মাল স্লাটাতে সময় লাগবে না। সে মেজ-মিস্ত্রির এমন ব্যবহারে অবাক হল না। কেবল বলল, স্যার, আমি কোথায় কাজ করব!

সামান্য কোলবয়ের সোজাসুজি মেজ-মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। এসব বেয়াদপী সে সহ্য করতে পারে নাই সে গম্ভীর হয়ে যায়। সারেঙকে শুধু কি বলে দিল। মেজ-মিস্ত্রির দায় নেই ছোটকে সোজাসুজি কিছু বলার। এবং এই যে সোজাসুজি ছোট জিজ্ঞাসা করল, এতে অপমান ভীষণ অহঙ্কারে জাগে। আগে এসব জাহাজে ছিল না। আগে যারা আসত, ওরা সবাই প্রায় যেন কৃতদাসের সামিল। একটা কথাও বুঝত না। সারেঙ সব বুঝে নিত কাজ, তারপর সে সবাইকে দিয়ে কাজ-গুলো করাত। এখন এরা নতুন ট্রেডে আসছে। কেউ কেউ বেশ সুন্দর ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারে। আর কি যে এরা ভাবে, একটু ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারলেই, যথাযথ ভেবে ফেলার চেষ্টা করে। আর্চি তখন মনে মনে না হেসে পারে না।

আর্চির গালাগাল ছোটকে ভীষণ কাবু করে দিয়েছে। আবার জ্যাক মাথার ওপর বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে। জ্যাক কাছে না থাকলে সে যেন এতটা অপমানিত বোধ করত না। সে জ্যাকের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না পর্যন্ত। চুপচাপ সারেঙের পিছু এনজিনরুমের দরজায় ঢুকে গেল। লোহার জালিতে হেঁটে গেলেই সামনে সোজা সিঁড়ি নেমে গেছে। সে সিঁড়ির দু রডে হাত রেখে শরীর সোজা ছেড়ে নিয়ে নেমে গেল না আজ। ধীরে ধীরে কোন কারাগারে বন্দী মানুষের মতো হেঁটে গেল। আর্চি যেভাবে পেছনে লেগেছে, আজ হোক কাল হোক সে একটা হয়তো কিছু করে ফেলতে পারে। ছোটবাবু ভিতরে ভিতরে কেমন সহসা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তখন সারেঙ বলল, ওদিকে না। এদিকে।

ছোট, জেনারেটারের ডানদিকে হেঁটে গেল। তারপর বয়লার এবং ক্র্যাঙ্ক স্যাফটের মাঝখানে ঢুকে সে ও-পাশের কনডেন্সার বাঁয়ে ফেলে আরও ভিতরে ঢুকে গেল। এখানে সারেঙ একটা স্লেট তুলে ফেলে বলল, নিচে নাম। নিচটা ভীষণ অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। ছোটর ভীষণ ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সে নিচে নেমে গেলে যদি সারেঙ স্লেট চাপা দিয়ে সরে যায়। অন্ধকারে অজস্র জলের খালি ট্যাঙ্ক নিচে। ভিতরে ঢুকে গেলে, একটা দিয়ে আর একটায় বের হয়ে যেতে পারবে। কিন্তু ওপরে উঠে আসার রাস্তাটা তার জানা থাকবে না। কেমন একটা ভিতরে গুম গুম শব্দ। সারেঙ এখন একটা বাতির ব্যবস্থা করছে। নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটা বালব জ্বলছে লম্বা রবারে মোড়া তারে। সে সেটা নিয়ে ভিতরে নেমে গেলে দেখল, ট্যাঙ্কগুলো থেকে জল পাম্প করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওর এখন কাজ বালতিতে সব ময়লা তোলা। লাল সবুজ নানারকমের শ্যাওলা জমেছে। ট্যাঙ্কের ছাদে, চারপাশে শ্যাওলার জট। এ-কাজ একা এক নাগাবে এক বছরেও শেষ করতে পারবে না সে বুঝল, এটা শাস্তি দেবার কৌশল।

ছোট চুপচাপ কাজ করে গেল। সে ক্রমে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে, বালতির সঙ্গে দড়ি বাঁধা। এনজিনরুমের নিচে এই ট্যাঙ্কে ছড়ানো। এক একটা এপারটমেন্টের মতো। ভিতরে গোল হোল। একটার ভিতর দিয়ে

॥ ছোটদের উপহারের বই ॥

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

বাজীকরের ঝাঁপি

ষোলজন বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার ষোলটি কিশোর-মনোরঞ্জনকারী অনবদ্য গল্প-সংকলন। ।। তিন টাকা।।

আনন্দবাজার পত্রিকার প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট
চন্ডী লাহিড়ী রচিত ও চিত্রিত

মানুষ কি করে মানুষ হল

অজস্র ছবিতে ভরা ছোটদের জন্য লেখা মানুষের ইতিহাস। ।। দুই টাকা।।

আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী প্রভানন্দ বিরচিত

পৌরাণিকী

নচিকেতার বরলাভ, বিদুষী গার্গী, সত্যকাম, সাগর ও গঙ্গা, গণেশ, নারদ, ঋষ্যশৃঙ্গের শিক্ষা, চ্যবন ও সুকন্যা, দুই রাজার গল্প, ইত্যাদি বারোটি কাহিনী সমৃদ্ধ। ।। দেড় টাকা।।

ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিবাজী মহারাজ

বীর শিবাজীর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত। ।। দেড় টাকা ।।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের

একদা যাহার বিজয় সেনানী

বাংলার পালরাজাদের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী—উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। ।। দুই টাকা ।।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

করে দেখ

এই বইয়ে দেওয়া ছবির সাহায্যে কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে নিজের হাতে কৌতুকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারবে। দুই খণ্ড। প্রতি খণ্ড দুই টাকা ॥

[জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা—১২

আর একটা ট্যাঙ্কে চলে যাওয়া যায়। সারেঙ বালতিটা ভরে গেলেই তুলে ফেলছে। মেজ-মিস্ত্রি জেনারেটরের পাশে দাঁড়িয়ে স্টিম দেখছে জাহাজের। আর বেশ একটা বেন মজা পাচ্ছে। সে ছাতানা চুরুটের ধোঁয়ায় চারপাশটা অন্ধকার করে ফেলেছে!

ছোট এভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। সে বেশ ভিতরে ঢুকে গেছে। সে সব সময় সঙ্গে অ'লোটা রেখেছে, একটা এপারটমেণ্ট থেকে অন্য এপারটমেণ্টে ঢুকে যাবার সময় সে বাতিটা ছাড়ছে না। ভয়, সে একটা না গোলকধাঁধায় পড়ে যায়। এমন একটা জায়গা এই জাহাজে আছে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ওপরে বিশাল প্লেটের ওপর বড় বড় কলামে সিলেণ্ডার খাড়া করানো বড় বড় তিনটে পিস্টন, থামের মতো মোটা ঘুরে যাচ্ছে, অতিকায় প্রপেলার সাফ্ট মাথার ওপর অনবরত ঘুরছে, আর তার তলায়, সেই আলাদিনের দৈত্যের মতো সারেঙ, গুহার মুখে। সে কোথায় যে ক্রমে চলে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে তার পায়ের নিচে সমুদ্র, খোলের শেষ বিন্দু।

ছোটবাবুর ঘাড় ধরে গেছে, কারণ, ভিতরে সোজা বসা যায় না। নুয়ে নুয়ে কাজ করছে সে। সে ট্যাঙ্কের জল সাদা কাপড়ে মুছে দিচ্ছে। ওর জামা প্যান্ট ভিজে গেছে। ভিতরটা এত ঠাণ্ডা যে শীতের গুহা যেন। ওর মনে হচ্ছিল হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে আর কিছু সময় থাকলে সে এখানে ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে তো কাজকে ভয় পায় না, সেতো মরে গেলেও বলতে পারবে না, শীত করছে। যতক্ষণ না সারেঙসাব নিচে নেমে বলছেন, উঠে আয়, ততক্ষণ এখানেই তাকে থাকতে হবে।

ছোট সেজন্য খুব দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে। বসে বসে করলে শরীরের রক্ত গরম থাকে না, ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে কিছুটা হাটু গেড়ে কাজ করে যেতে লেগে গেল। দাঁত ঠকঠক করছে, তবু সে কাজ করে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব সে হাত-পা নেড়ে করে যাচ্ছে। ওর মুখে চোখে এখন নানাবর্ণের দাগ, কোথাও সবুজ, কোথাও খয়েড়ি, সে জানে না, ওর চোখ মুখ এখন একজন সারকাসের জোকারের মতো।

ছোটকে সারেঙ কোথায় নিয়ে গেল! জ্যাক কাজের অছিলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটকে খুঁজে মরছে। আর্চি বেশ মজা করছে ছোটকে নিয়ে। জ্যাকের তাই মনে হল। আর্চি ভেবেছে, জ্যাক কিছু বোঝে না। জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। সে কিছু কাউকে বলছে না। সে চিমনির পাশে, বয়লার ঘরে নেমে যাবার সিঁড়িতে বেশ শিষ দিতে দিতে নামছে। অথবা সেই গানটা যেন শিষের ভিতর—উই আর ইন দি সেম বোট...অথবা মনে হয় জ্যাক ভীষণভাবে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছে। জ্যাককে এখন খুব চতুর মনে হচ্ছে। ছোটকে দিয়ে আর্চি কি করাচ্ছে, অথবা কি করাতে চায় সেটা না দেখতে পাবলে ভিতরের অস্বস্তিটা যাচ্ছে না। সে লম্বা বয়লার স্যুটের ওপর একটা কালো সোয়েটার চাপিয়েছে। কারণ শীত ক্রমে বাড়ছে। যত ডারবানের দিকে যাচ্ছে আরও ঠাণ্ডা পড়ছে। এবং এভাবে ওরা এখন শীতের দেশে চলে যাবে—ছোট যে এখন কোথায়! সে বাংকারে উঁকি দিলে দেখল অন্ধকারে একজন কোলবয় বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। সে জ্যাককে দেখেই তাড়াতাড়ি বিড়িটা ফেলে বেলচে হাতে গাড়িটা টানতে টানতে করলার কাছে নিয়ে গেল। পাশের বাংকারে লোকটা কাজ করছে। মাঝ-বয়সী মানুষ। অনবরত গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর করলা ফেলছে।

না, এখানেও নেই। সে সিঁড়ি ভেঙে আরও নিচে ঠিক বয়লার ঘরে নেমে গেল। ফায়ারম্যান, ওকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সারেঙের ওয়াচ। সবাই এখন দমাদম করলা হাকড়াচ্ছে চুল্লীতে। জ্যাক এ-সব বুঝতে পারে। স্টিম দেখেই বুঝতে পারে, এটা ওরা ওর সম্মানে কাজ করছে। এখন করলা ফার্নেসে না দিলেও চলত। সে এবার এখানেও ছোটকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হল। মিঃ আর্চি ছোটকে কোথায় নিয়ে গেছে!

জ্যাক এবার গলাবাজুর বয়লার আর ব্লাঙ্কেড বরাবর যে রাস্তাটা এনজিনরুমে চলে গেছে তার ভিতর ঢুকে গেল। এখানে এসেই চারপাশে ছাই ঝুর ঝুর করে মাথার ওপর পড়তে থাকে। সে যেতে যেতে বুঝতে পারল ওর মুখেও ছাই লেগেছে। রুমাল দিয়ে ভালভাবে ছাই মুছে ভিতরে ঢুকে দেখল মিঃ আর্চি সিঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে না, জ্যাক সামনে। জ্যাক বলল, গুড মর্ণিং মিঃ আর্চি।

—গুড মর্ণিং জ্যাক। হঠাৎ এখানে। তুমি তো কখনও আস না।

—আপনার এনজিনঘর দেখতে এলাম।

—তুমি আগে দ্যাখোনি!

—খুবে দেখলাম। খুব বিস্ময়ের সংগে তাকাল।

—বেশ এস, দেখাচ্ছি।

মিঃ আর্চির কথাবার্তা কি সুন্দর এখন। বড় ভাল মানুষ। যেন সে জ্যাকের জন্য যা কিছু দরকার সব করতে পারে। জ্যাককে নিয়ে সে প্রপেলার স্যাফটের পাশে চলে গেল। কখনও কনডেনসারের পাশে। কখনও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালো। জ্যাক আসলে কিছুই শুনছে না। সে তো সব জানে, সে তো নানাভাবে এসব দেখেছে। কিন্তু সারেঙ যে ছোটকে এদিকে নিয়ে এল তারপর কোথায়! সে বলল, মিঃ আর্চি, আপনার এনজিনঘর খুব পরিষ্কার। এমন পরিষ্কার রাখেন কি করে। তারপরই খস খস শব্দ। কেউ মনে হয় শুকনো তেল আর শিরিস কাগজে ঘসছে। মনে হল জ্যাকের, হয়তো ছোট হবে। ওরা নীল রঙের পোশাক পরে সবাই, কিন্তু কাছে গেলে দেখল, একজন বুড়ো মতো মানুষ, কোলবয়-টর হবে, স্লোট ঘসছে। জ্যাক আর ভেতরে উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। সে তো সারেঙ আর মেজ-মিস্ত্রি এনজিনরুমে নেমে এলে অনেকক্ষণ বোট-ডেকের রেলিংএ দাঁড়িয়েছিল। এনজিনরুম থেকে উঠে যাবার দুটো পথ। একটা এনজিনরুম থেকে সোজা সিঁড়ি ধরে, অন্যটা বয়লারঘর দিয়ে চিমনির পাশে উঠে আসা। সে বোট-ডেকে বয়-কেবিনের পাশে ছিল বলে দুটো পথই চোখের ওপর। ছোট এবং সারেঙ এনজিনরুম থেকে উঠে গেলে ঠিক চোখে পড়ত।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ
১০০% খাঁটি হয়

ডাঁটা গুঁড়ো মশলা শুধু
আগমার্ক যুক্তই নয় এর
পেছনে রয়েছে ভারতের
শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ
লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা।
ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি
আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত
হয় এবং গভর্নমেন্ট
ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক
প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে
বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়।
ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা
সব সময় খাঁটি ও উন্নত
মানযুক্ত।

ডাটা
গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

অথচ সে বলতে পারছে না, মেজ, তুমি ওকে কোথায় রাখলে। মিঃ আর্চি, ছোট তো সামান্য একজন নাবিক, তুমি কত বড় কাজ কর জাহাজে, একজন সামান্য মানুষকে এভাবে অকারণ কষ্ট দিয়ে কি লাভ। তুমি নিজেকে ছোট করছ আর্চি। এ-সবই মনের কথা। সে আর না পেরে, শেষবারের মতো যমুনাবাজুর ঘরলারের ফাঁকে উঁকি মারলেই দেখল, সারেঙ দাঁড়িয়ে আছে। হাতে দড়ি। সে টেনে টেনে বালতি তোলার সময় দেখছে, একেবারে সামনে জ্যাক। সে খুব থতমত খেয়ে গেল। বলল, গুড মর্ণিং সাব।

জ্যাক বলল, গুড মর্ণিং! এখানে কি করছ সারেঙ।

—টাংকি সাফ করছি সাব।

—আমি টাংকিতে নামব।

—না না সাব। নামলে সব ভিজে যাবে। পা ভিজে যাবে। জুতা ভিজে যাবে। ঠাণ্ডা লাগবে। ভীষণ ঠাণ্ডা।

জ্যাক কিছু শুনল না। সে লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। দেখল অনেক দূরে আলোর তারটা ভিতর দিকে চলে গেছে। সে বলল, কি চমৎকার সারেঙ! সে ছোটকে দেখতে পাচ্ছে না।

মাথার ওপরে ট্যাঙ্ক-টপ প্রায় ছাদের মতো। নির্জন কারাগারের মতো জায়গা। কেবল এনজিনটা গর্জাচ্ছে বলে কঠিন এক শব্দ। ভিতরে জলের আধার। এবং শ্যাওলার গন্ধ, ঠাণ্ডা এক অতীব হিমশৈল ভেসে বেড়ালে, সমুদ্রে যেমন লাগে ঠিক তেমনি, জ্যাক শীতের দেশের মানুষ, ওরও কেমন ভিতরটা শীত শীত করছে। কিছুক্ষণ থাকলে ওরও দাঁত ঠক ঠক করবে।

এবং এ-সময়ে মনে হল, ঠিক ভূতের মতো অথবা ছায়া ছায়া অন্ধকারে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এদিকে আসছে। ক্রমে কাছে এলে বুঝতে পারল, ছোট। জলে ভিজে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মুখে নানাবর্ণের বর্ণমালা, সঠিক জোকার। চোখ তবু উজ্জ্বল। সে জ্যাককে দেখেই হাসল। জামা-কাপড় জবজবে ভিজা। ভীষণ ক্লান্ত এবং দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপছে।

জ্যাক হাসতে পারল না। কিছু বলতেও পারল না। ছোট, প্লেটের মুখে এসে বালতিটা সারেঙের হাতে দেবার সময় বলল, একটু আগুন না হলে চাচা মরে যাব।

জ্যাককে বলল, তুমি এখানে। দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপছে বলে কথা স্পষ্ট হচ্ছে না। কেমন লম্বা হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি শব্দ। যেন জলে কাঠের শব্দ করে মাছ ধরার মতো এক পাখি। জ্যাক এবার ওপরে উঠে সোজা চলে গেল। একটা কথাও ছোটর সঙ্গে বলল না। সারেঙ কিছুটা এতে ঘাবড়ে গেছে। সে বলল, চল ওপরে। এখন তো খাবার সময় হয়ে গেছে। পরে দেখা যাবে।

সে ছুটি পেয়ে এক দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। সে যে সাদা হয়ে গেছে একথা তাকে দিয়ে যে একটা অকারণ কাজের ভিতর মেজ-মিস্ত্রি টরচার করছে এটা মৈত্র পিছিলে সব জাহাজিদের বলে বেড়াচ্ছে। এটা কেন হবে! সারেঙের কি ইচ্ছা। ওর কি ইচ্ছা ছোটকে মেরে ফেলবে। মেজ-মিস্ত্রি কি ভাবেন! তাঁর কি আমাদের মাথা নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং ছোট পিছিলে ঢুকে গেলেই বুঝতে পারল ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে মৈত্র, অমিয়, লতিফ, মনু, জব্বার। সারেঙকে ওরা একেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।—আপনি কি ভেবেছেন।

—কি ভেবেছি!

—মেজ যাই বলবে, আপনাকে তাই করতে হবে।

—তা ছাড়া কি!

—আপনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটাবেন না? এখনও আপনি ভেবেছেন, আমরা ওদের গোলাম আছি।

—কিন্তু উনি অর্ডার দিলে আমি কি করব।

—বলতে পারলেন না, ডারবানের ঘাটে হবে। সবাই নেমে যা পারা যায় করা যেত। ছোটর একার কি দায় এ কাজ করার।

—কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখা যাচ্ছে।

—শুনুন, মৈত্র বলল, তোষামোদ আর করবেন না। আর না। জব্বার বলল, আর না। ওরা যা খুশি একসময় করতো, এখন আর না।

সারেঙসাব বহু পুরানো মানুষ। তার কাজ করা স্বভাব। আদেশ তামিল করা তার কাজ। সে ভেবে পেল না কি অন্যায়টা মেজ-মিস্ত্রি করেছে। ওর বরং ছোটর ওপরই রাগ হল। একটুতেই কাহিল হয়ে যায়। এবং ছোটও ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছে। সে প্যালিতে আগুন পোহাবার সময় বলল, আরে মৈত্রদা কিছু তো করতে হবে।

—যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। ডারবানের ঘাটে আমরা সবাই মিলে করলে কি আর কাজ। এতো আর তকতকে ঝকঝকে করা হয় না। একটু মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া। ঠিক পরিষ্কার করতে গেলে এক বছরে কেন, জাহাজের জীবনেও হবে না। এটা আবার জাহাজ নাকি! ডাম্প মারা জাহাজ, তায় মেজ-মিস্ত্রি তা আবার কত রোয়াব। শেষ পর্যন্ত মেজ সম্পর্কে মৈত্রদা কিছু উচ্চবাচ্যও খিস্তিও ঝেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে এটা দেখেছে ছোট, মৈত্রদা ঝগড়ার সময় কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সে সারা সফরেই এভাবে জাহাজিদের পক্ষ হয়ে কথা বলে। সে সেদিনও ঝগড়া করেছে। সারেঙসাব, মেজ--মিস্ত্রির কি রাইট আছে জুতো দিয়ে মুখ নেড়ে দেখাব! কি রাইট আছে বলুন! আপনারা কিছু বলেন না বলে পেয়ে বসে। আপনারা বলবেন না, আমাদেরও যেতে দেবেন না।

সারেঙসাব বললেন, আরে সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারা যায় না। ওরা আমাদের তো ওপরয়ালা। ওরা আমাদের অনেক ক্ষতি করতে পারে।

মৈত্রদা যেমন বলে থাকে, বলে ফেলল, কচু করতে পারে। কৈ দু দুবার তো ব্ল্যাক লিসটেড হয়েছি, জাহাজ পাই না এমন তো হয় না।

ছোট কি করবে তখন ভেবে পায় না। সারেঙসাব এভাবেই সারাজীবন কাজ করে এসেছেন। সব কাজই জাহাজের কাজ, সবই করতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। ছোট আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে এই একটা ভয় থেকে গেল। জ্বরটর আসতে পারে। বুকে কফ বেঁধে একটা কেলেঙ্কারি হতে পারে। কারণ ভিতরে ভিতরে সে খুব আড়ষ্ট বোধ করছিল। খাবার খেয়ে আবার কি কাজ

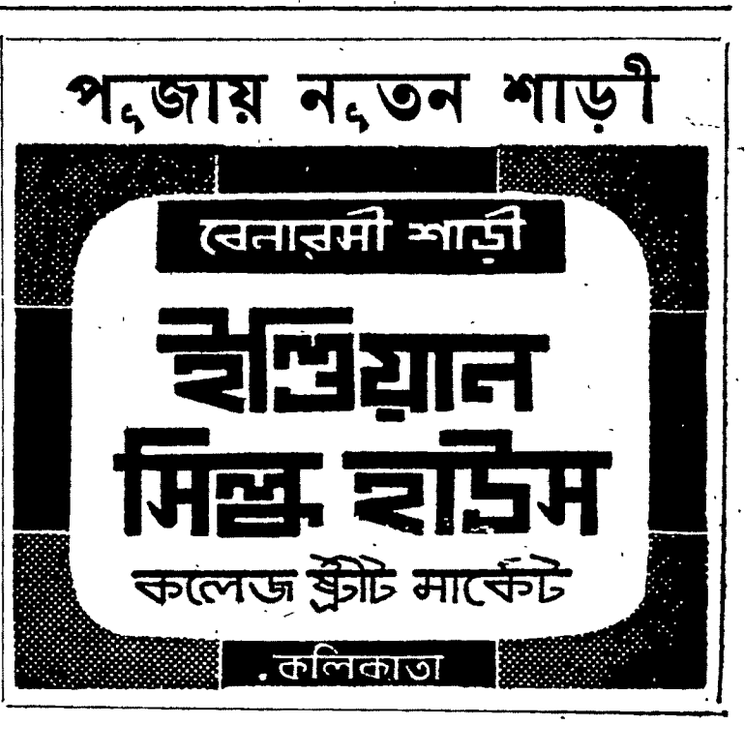

করতে হবে সে জানে না। যদি আবার ট্যাঙ্কের ভিতর নেমে যেতে হয়—ও কেমন অসহায় বোধ করতে থাকল।

তবু বিকেলের দিকে কেউ জানে না, কেন মিজ-মিস্ত্রি সারেঙকে বলে পাঠাল, এখন ট্যাঙ্ক-টপের কাজ বন্ধ থাকবে। ছোট যেমন কাজ করছে, তেমনি করবে।

ছোট কেবল বুঝতে পারল, এটা জ্যাকের কাজ। জ্যাক কিভাবে এটা করেছে সে জানে না। প্রথমে সে জ্যাকের ওপর ভীষণ খুশী। তারপরই জ্যাকের ওপর ওর কেমন একটা রাগ, অথবা জ্যাক কি ভেবে থাকে, আমি কোন কাজের উপযুক্ত নই, আমি কি, কিছু পারি না। জ্যাক কি আমাকে খুব সাহসী মনে করে না? সে ভাবল, জ্যাককে একা পেলে দুকথা শুনিয়ে দেবে। এবং তারপরই মনে হল, সত্যি সে সাহসী নয়। ভাবতেই ভিতরে কেমন হীন-মন্যতা জন্মে গেল। এমন কি জ্যাকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও ভারি লজ্জার ব্যাপার। সে সারাটা বিকেল ফাইভারের সঙ্গে প্রায় ঠিক আগের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করল। জ্যাক যাতে দেখতে না পায় সে এভাবে জাহাজে সেঁধিয়ে গেল।

এভাবে সেকেণ্ড অফিসার বিকেলে ফসে গেলেন, ছোটকে দেখতে পেল না। এভাবে জ্যাক চুপচাপ বয়-কেবিন পর্যন্ত যার যার ঘুরে গেছে তবু ছোটকে দেখতে পেল না। বেশ জাহাজ যাচ্ছে। এবং কিছু উড়ুক্কু মাছ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর নীল জলে ডুবে যাচ্ছে। সামনে জল কেটে যাচ্ছে জাহাজ, দু পাশে অজস্র বিন্দু বিন্দু সাদা ফেনা। আর আকাশটাকে কখনও মনে হয় নীল চাঁদোয়ার মতো। এবং কতভাবে যে এ-আকাশ সুন্দরভাবে সাবতে ভালবাসে। কখনও কিছু মেঘ ভেসে গেলে, সমুদ্রে তাদের ছায়া, কখনও সাদা, কখনও লাল অথবা হলদে রঙের ছায়া। নীল জলে এই-সব ছায়া খেলা করে বেড়ালে জ্যাকের মনে হয় পৃথিবীতে সে খুব ভালভাবে বেঁচে আছে। ঠিক সেই নদীর পারে কোন দুর্গের পাশে তার বাবার প্রাসাদের মতো বাড়িতে সে যখন হেঁটে যায়, চারপাশে ডেইজি ফুলেরা তখন ফুটে থাকে, এখানে ফুল নেই, কিন্তু ছোট আছে, ছোট আছে বলেই বোট-ডেকে তার বার বার হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগে।

এভাবে একদিন সেই ক্যাকটাসের দ্বীপটাও দূরে দেখা গেল। তখন বিকেল, সূর্য অস্ত যাবে আর কিছু সময় বাকি। ছোটকে সেকেণ্ড অফিসার ডেভিড খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ তিন-চার দিন কেউ ওকে দেখতে পায়নি। ডেভিড বুঝতে পারছে ছোটকে এভাবে মেজ-মিস্ত্রি গায়েপড়া করেছে বলে খুব আত্মসম্মানে লেগেছে, এবং এভাবে ডেভিড মানুষের স্বভাব বুঝতে পারে—ছোট ঠিক দশটা জাহাজির মতো নয়। কোথায় যেন সে একটা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছবি ব্যবহারে সব সময় ফুটিয়ে রাখে। তখন ডেভিডের ছেলেটার জন্য কেন জানি কষ্ট হয়।

ছোটকে ডেভিড ফোকসাল থেকে ডেকে নিল। বলল, এস।

ছোট এবং ডেভিড পাশাপাশি হাঁটছে। ছোট পরেছে একটা সাদা পাজামা, একটা ডুরে সার্ট। সে একটা ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিয়েছে। সোয়েটারটা সেই আগের—মৈত্রদা দিয়েছে। ডারবানে গিয়ে মৈত্রদা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে ওকে সব গরম জামা-কাপড় কিনে দেবে। কারণ জাহাজে ক্রমশ শীত বাড়বে। অবশ্য একটা কালো রঙের ফুলহাতা সোয়েটার আর কম্বলের গরম প্যান্ট কোম্পানী দিয়েছে। সেটা এত ঢোলা যে পরা যায় না। আর শীত আরও না পড়লে পরা যাবে না। তা ছাড়া জাহাজি মানুষেরা ফিটফাট থাকবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, শহরে নেমে হবার সময় টিপটপ বের হতে হবে, কারণ বিদেশে ছোট একজন ভারতীয়, সে যেভাবে বাঁচবে, সেখানে তার দেশ সেভাবে বাঁচবে।

ওরা এসে দুটো ক্যাম্পস্টুলে পাশাপাশি প্রথমে বসল। এক নম্বর ফক্কার ঠিক নিচে। ওরা জাহাজের সামনে আছে এবং গতি-বাজুতে আছে। ক্রমে দ্বীপটা দূরবীনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।। মেজ বলল, তুমি কি দেখতে পাও বলবে।

ছোট দেখছে সেই সোনালি রঙের দ্বীপ, বড় বড় ক্যাকটাস। কি যে বড়। শৈশবে সে একবার বনের ভিতর সে হারিয়ে গিয়েছিল তার মতো। এবং মনে হয় সংসারে সবার জন্য এমন একটা প্রিয় বন অথবা তপোবন আছে যেখানে মানুষ হেঁটে গেলে নিজেকে খুঁজে পায়। মেজ-মালোম এই দ্বীপের কাছে এসে কি যেন পেয়ে যায় যা ওরা মুখ না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যাবে না।

মেজ বলল, জানো ছোট, আমার মাঝে মাঝে এমন একটা দ্বীপে নেমে যেতে ইচ্ছা হয়।

ছোট বলল, দু-একদিন ভাল লাগবে। তারপর আর ভাল লাগবে না।

—না, তুমি জানো না। তারপর মেজ-মালোম কেমন সংকোচ বোধ করল, যেন ছোটকে এসব ঠিক বলা যায় না। আসলে এমন একটা দ্বীপ দেখলে মনে সে সব সময় বসে থাকে। যদি গভীর রাতে জেগে থাকে দ্বীপটা পার হয়ে যাবে।—যদি ওয়াচ হয় ওয়াচ শেষে আবও দু-তিন ঘণ্টা, দরকার হলে চার ঘণ্টা জেগে থাকতে হবে, সে তাও করে। দ্বীপে সে এবং এক সুন্দরী দ্বীপবাসিনী, সে আর কিছু চায় না। কিছু পাতি লেবুর গাছ থাকবে, আর থাকবে, নীল জলের গভীরে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আশ্চর্য সব ঝিনুক। ছোট একটা শালতিতে দ্বীপের চারপাশে সোনালী বোদে ঝিনুক খোঁজা সে যে কি আরাম! সে ডুবে ডুবে ঝিনুক তুলে আনবে, ঝিনুকের খোল ভেঙে শাঁস সে লেবুর রসে আর নুনে ভিজিয়ে খাবে। সে আর সেই যুবতী। যার শরীরে কোন পোশাক থাকবে না। যে মাথায় পাতার মুকুট পরতে ভালবাসবে আর যে রোদে অথবা বৃষ্টিপাতে মাঠের ঘাসের ভিতর নিরন্তর ছুটে বেড়াবে। সে তার চিবুকে, তারপর স্তনে, এবং নিচে নেমে যেতে যেতে ক্রমে গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলে, মনে থাকবে না এবি তার স্ত্রী। মনে থাকবে না এমি আগামী বসন্তে ওর জন্য জন্মদিনের কেক বানাবে, এবং চার্চে সে সব বিয়ুবে ভিতর তার স্বামী যে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জন্য প্রার্থনা করবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

শারদীয়া কালিয়া

৭টি উপন্যাস, ৫টি নভেলেট, ১টি নাতে কবিতাগুচ্ছ, অসংখ্য গল্প, চলচ্চিত্র, নাট্য রহস্যকাল, প্রবন্ধ প্রভৃতির বিচিত্র সমাহারে সজ্জিত হয়ে।

উপন্যাস লিখছেন : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, শিবরাম চক্রবর্তী, দীপকের সেন গৌরী গুপ্ত, মায়া বসু, কমিন্ত পাণ্ডব ও ডাঃ ভবতোষ গুপ্ত

নভেলেট : অতীন বন্দ্যো:, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বাণি দেবী ও শিবজেন ভৌমিক।

কবিতা : রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শঙ্খবরণ বসু ও সমীর সে।

প্রবন্ধ : লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত।

নাটক : প্রশান্ত চক্রবর্তী।

চিত্রতারকাদের নিজস্ব রচনা লিখছেন : উত্তমকুমার, সুচন্দ, চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, মিঠু মুখার্জী, অনিলা ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ও রেখা।

থাকছে পাতায় পাতায় রঙিন ফটোগ্রাফ :
চিত্রতারকাদের মন মাতানো ছবি।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫০ দাম : ৫-৫০ সডাক : ৬-৭০

কার্যালয় : ২০বি, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি-৯ ৩৫-২১৩৪

: বিশেষ আকর্ষণ :
অলকা চৌধুরীর কলমে স্বনামধন্যা হেমেন গাঙ্গুলীর জীবনীর অপ্রকাশিত কবিতা।

যে সম্রাট কবি

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি-সম্রাট বলা না গেলেও দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শা'কে সম্রাট-কবি বলা চলে নির্দ্বিধায়। প্রেমিক সম্রাট শাজাহানের মত 'নব মেঘদূত' রচনা করতে না পারলেও বাহাদুর শা' যে কাব্য নিদর্শন রেখে গেছেন তা প্রকৃতই আমাদের নিয়ে যায় 'অলক্ষ্যের পানে', বাচ্যাতিরিক্ত এক মনসলোকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সত্য-দর্শন তাঁর কাব্যে রূপ লাভ করেছে তাতে তার প্রকৃত কবিমনের পরিচয় পাই।

অন্য অনেক সম্রাট ও নবাবের মত বাহাদুর শা' কেবলমাত্র সুরা ও বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি, যুদ্ধও শুধু তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল না। সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন তিনি, সাহিত্য ও শিল্পের সাধনাকে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সম্রাট ও শাসনকর্তা হিসেবে হয়ত তিনি ব্যর্থতার কালিমা থেকে মুক্ত ছিলেন না। মোগল সম্রাট বাবর আকবর, এমন কি ঔরঙ্গজীবও সম্রাটরূপে কোন না কোন দিক থেকে ইতিহাসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। বাবর তাঁর প্রবল পরাক্রম, সাহস ও প্রখর বুদ্ধিবলে দিল্লীর সুলতানী আমলের অবসান ঘটিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা। সুশাসক হিসেবে ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির জন্য আকবর সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ঔরঙ্গজীবও সাহসী, পরিশ্রমী, কূটনীতিজ্ঞ ও রণকুশলী ছিলেন। কিন্তু এসব গুণের কোনটিই ছিল না বাহাদুর শা'র মধ্যে। শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন ভীরু। আসলে রাজ্য শাসনের কূট-নীতি তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি, সাহিত্যরসিক। রাজা-মহারাজাদের চরিত্রের বজ্রকঠোর দিক-টাই আমাদের সহজে চোখে পড়ে, কিন্তু তাঁদের অন্তরেও যে একটা কুসুম-কোমল দিক থাকতে পারে তা অনেক সময় আমরা ভুলে যাই। দ্বিতীয় বাহাদুর শা'র ক্ষেত্রেও অনেকটা এইরকমই ঘটেছে।

মির্জা আবুল মজঃফর সিরাজুদ্দিন মহম্মদ ১৮৩৭ সালে দিল্লীর মসনদে বসলেন বাহাদুর শা' উপাধি নিয়ে। তখন তাঁর বয়স ৬২। 'জাফর' তাঁর ছদ্মনাম। তিনি সাধারণতঃ এ নাম ব্যবহার করতেন তাঁর লেখায়। মৈনুদ্দিন দ্বিতীয় আকবর ও আকবর শা'র ঔরসে ও তাঁর রাজপুত পত্নী লাল বাঈয়ের গর্ভে দ্বিতীয় বাহাদুর শা'র জন্ম।

সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁকে শাসনকার্যের জন্য বিশেষ কিছুই করতে হত না। বেশির ভাগ সময় তিনি দিল্লীর

দুর্গে অতিবাহিত করতেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পেনসনভোগী রূপে।

শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। শাসনকার্যে হাত দিতে হত না বলে তিনি কিন্তু নিশ্চুপ বসে থাকতেন না। তাঁর কবিমন তাঁকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেয়নি। তিনি বই লিখতেন, কাব্যচর্চা করতেন। সাধু-ফকিরদের দরগায় দরগায় ধর্ণা দিতেন। হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও শেখ কুতবুদ্দিন বখতিয়ার কাকির দরগায় তো তাঁকে হামেশাই দেখা যেত। জাফর মহল নামে এক প্রাসাদ নির্মাণ করে তিনি সেই প্রাসাদের ওপর থেকে দেখতেন বার্ষিক হিন্দু-মুসলিম মেলা। এসব থেকেই তাঁর একটা মানসিক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হল মীরাটে। ১০ই মে বৃটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হল। লুঠতরাজ, অস্ত্র সংগ্রহ, হত্যা চলল অবাধে। বাহাদুর শা' কিন্তু দিল্লীর তক্তে বসে এর বিন্দুবিসর্গও টের পেলেন না। ১২ই মে দিল্লীতে এই বিদ্রোহের আত্ম-প্রকাশ। বিদ্রোহ ক্রমে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা দিল্লীর দুর্গে বাহাদুর শাহের সঙ্গে দেখা করল। সম্রাট তখন ৮২ বছরের বৃদ্ধ। বিদ্রোহীরা বৃটিশ দমনের কাজে সম্রাটের সমর্থন প্রার্থনা করল।

সম্রাট তাঁর পুত্রদ্বয় জহীরুদ্দিন মির্জা মোগল ও মির্জা জওয়ান বখ্‌তকে সংগে নিয়ে দিল্লীর কেল্লা থেকে চাঁদনী চকে এলেন। এখানে বিদ্রোহী সৈন্যদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন : 'আমার আন্তরিক সমর্থন রইল আপনাদের কাজে। কিন্তু আমি আপনাদের কী দিতে পারি? আমার তো সৈন্য-সামন্ত নেই, কোনও ঐশ্বর্য-সম্পদও নেই। তবে লুপ্ত সাম্রাজ্য ফিরে পেলে যথাযথ রাজকীয় প্রথায় আমি আপনাদের পুরস্কৃত করব।' বিদ্রোহীরা জানাল পুরস্কার তারা চায় না, চায় শুধু সমর্থন। বাহাদুর শা'র নৈতিক সমর্থন পেলেই তারা তাদের কর্তব্যপথে এগিয়ে যেতে পারে।

উত্তেজিত সিপাহীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শা'কে দিল্লীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা বলে স্বীকার করে নিল। সম্রাট কোনও সক্রিয় ভূমিকা না নিলেও শুধু তাঁর নামটুকুই সিপাহীদের মনে মন্ত্রের মত কাজ করল। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে সম্রাটের নাম তাদের দেহে-মনে অপরিসীম শক্তি ও সাহসের সঞ্চার করল। 'ভূপতির নামই উচ্চশক্তির মন্দির।'

সম্রাটের নৈতিক সমর্থন তারা পেয়েছিল। কিন্তু সাফল্যের রাজমুকুট পরা তাদের অদৃষ্টে ছিল না। ইতিহাস নানা কথা বলে। মোট কথা হল এই যে, সংগঠনের ত্রুটির জন্যই হোক অথবা সম্রাজ্ঞী জিনৎমহল বেগম ও বিশিষ্ট আমীর হাকিম আসানুল্লা খাঁর গোপন চক্রান্তের ফলেই হোক, এই সশস্ত্র বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু সে ইতিহাস এখানে নয়।

বাহাদুর শা'র সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে কোনও খাদ ছিল না। তিনি কাব্যপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। বাবরের কাব্যসৃষ্টি ক্ষমতা তাঁর উত্তরপুরুষদের মধ্যে বর্তেছিল। মোগল সম্রাটদের অনেকেরই চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম উপায় ছিল কবিতা রচনা ও কাব্যরস উপভোগ।

বাহাদুর শা'র পিতামহ শাহ্ আলম যখন বৃদ্ধ ও অন্ধ হলেন তখন তাঁর নিদারুণ দুর্দশা। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি হতোদ্যম ও নিরাশ হন নি। এ সময়ে তাঁর ক্লিষ্ট মনে শান্তিবারি সিঞ্চন করত কবিতা। তিনি তখন স্বয়ং কবিতা লিখতেন, পারিষদ-বান্ধবদের নিয়ে কবিতা পাঠের আসর বসাতেন, কবিতার আলোচনা করে আনন্দ পেতেন।

বাহাদুর শা শুধু যে নিজে কবিতা রচনা করতেন তা নয়, তিনি কবি ও বিদ্বজ্জনদের নানাভাবে উৎসাহিত করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাহাদুর শা'র সভাসদ, পুত্র-পৌত্রেরাও উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। সম্রাট প্রায়ই তাঁর রাজ-দরবারে 'মুশায়রা' বা কবি সম্মেলনের আয়োজন করতেন। বস্তুতঃ সেকালে কবিতা যেন মানুষের রক্ত-মাংসের সংগে মিশে গিয়েছিল। কবিতা রচনা তখন যেন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। এমন কি এদেশে তখন যেসব ইংরেজ আসতেন তাঁরাও উর্দু কবিতা পছন্দ করতেন তাঁরা উর্দুতে কবিতা রচনাও করতেন।

এইরকম আবহাওয়ায় বাহাদুর শা'র কবিত্বশক্তির বিকাশ। বস্তুতঃ, শাসক অপেক্ষা কবি হিসেবে তিনি বড় ছিলেন। শাসনকার্যের কূটকর্তব্য অপেক্ষা কবিত্বের মনোভূমিতে কোমল-পেলব পদে বিচরণ তাঁর কাছে অনেক বেশি রমণীয় ও সুখকর ছিল। রাজমুকুট তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি, বরং তিনি জ্ঞানের সাধনায় নিজেকে বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

দরবেশ সাজ নাহি চাই আমি
লোভ নাহি মোর মুকুটের 'পরে।
এইটুকু জ্ঞান তুমি দাও মোরে,
যেন পাগল হইয়া ফিরি তোমা তরে।

মির্জা গালিবের মত কবিকে সম্রাট সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন। গালিব স্বল্পকালের জন্যই বাহাদুর শা'র সভাকবি ছিলেন। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই সম্রাট তাঁকে এতখানি প্রভাবিত করেছিলেন যে উর্দুতে কবিতা লেখা পছন্দ না করলেও শুধু বাহাদুর শা'র মনস্তুষ্টির জন্যই তিনি উর্দু কবিতা রচনা করেছিলেন। গালিব তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি লিখেছিলেন পারসীতে। তিনি বলতেন, তাঁর পারসী কবিতা দিয়েই তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিচার করতে হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও উর্দুতে তাঁকে লিখতে হয়েছিল। তিনি নিজেই লিখেছেন : 'আসলে উর্দু লেখায় আমার ঝোঁক নেই। শুধু সম্রাটকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই আমাকে লিখতে হয়েছে।'

বাহাদুর শা'র শক্তি এইখানেই। গালিব বাহাদুর শা'র স্তুতিতেও কবিতা রচনা করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তা নিছক স্তুতি বলে মনে হয়েছে। তবুও সম্রাটের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে অসম্মান করা চলে না। গালিব লিখেছেন :

(বাহাদুর শা, নয়নভরা অন্তরভরা শ্রদ্ধা
তোমার তরে,
করুণাঘন দেবশিশু যেন বিরাজে
তোমার মাঝারে।)

শেষ জীবনে বাহাদুর শা অন্তত দুর্দশার মধ্যে পড়েছিলেন। উত্তেজিত-ক্রুদ্ধ সৈন্যরা তাঁকে দিল্লীর সমুন্নত প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। তাঁর সকল ক্ষমতা তারা কেড়ে নিয়েছিল। বলতে গেলে তাঁর রাজপ্রাসাদ সৈন্যনিবাসে পরিণত হয়েছিল। এ অবস্থায় সম্রাটের মনে সুখশান্তি বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। স্বরচিত কবিতায় তিনি আপন মনের ব্যথা-যন্ত্রণাকে রূপায়িত করেছেন :

সেনাদল মোরে করেছে বেষ্টন,
নাহি শান্তি, নাহি হায়! স্থিরতা এখন।
কেবল জীবনমাত্র রয়েছে আমার
তাহাও করিবে তারা আচরে সংহার।

(রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য)

এ কবিতায় বৃদ্ধ সম্রাটের মর্মপীড়া পরিস্ফুট।

কিন্তু তথাপি পিতামহ শাহ্ আলমের মত তিনিও নিরুৎসাহ হন নি। মনের বেদনাকে তিনি কাব্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে হালকা করে তুলেছেন। দুঃখকে তিনি জয় করেছেন সত্য উপলব্ধি দিয়ে।

ভেবেছিনু দুঃখকষ্ট যত, কহিব তা
আসিলে নিকটে।
সত্য যবে এলো দুঃখের বোঝা
রইল না তা হৃদয়পট।

দিল্লীর অবস্থা তখন সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নানা দিক থেকেই পরিস্থিতি

পূজোয় চাই নতুন বই

নতুন স্বাদের দুঃসাহসিক এ্যাডভেঞ্চার

সাগর মিত্রের

দুর্গম দ্বীপের রহস্য ২·৫০
আন্দামানের বিভীষিকা ২·৫০

দেড়হাসি কাষ্ঠহাসি মুচকিহাসি ও অট্টহাসির গল্প

শিবরাম চক্রবর্তীর

অনেক হাসি ২·০০

পরিচয় গুপ্তের

খেয়ালী রাজার কাণ্ড ২·০০
ভূতের বিয়ে ২·২৫
লম্বুদার গল্প ২·০০
গোয়েন্দা সম্রাট লম্বুদা ২·৫০

সুরজিৎ মজুমদারের

ভূতের পাল্লায় ২·২৫

রহস্য ও রোমাঞ্চ ভরা এ্যাডভেঞ্চার

হরিপদ ঘোষের

রহস্যময় গুহা ২·৫০
বাঘের দেশে বিভীষণ ২·৫০

পারলৌকিক ও শিকার কাহিনী

ছায়া-কায়া ২·০০
জ্যান্ত বাঘের কবর ২·০০

রূপকথার গল্প

সুজিতকুমার নাগের

রূপকথার ঝাঁপি ২·০০

শ্যামল চক্রবর্তীর

দৈত্যের পাহাড়ে ২·০০

কি চাই— ভি, পিতে বই লইতে হইলে কিছু অগ্রীম পাঠাইবেন

সূচীপত্র ৩৫সি, সুবোসেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রতিকূলে। ইংরেজ সৈন্যদের উৎপীড়ন ও নিপীড়ন, সিপাহীদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির একান্ত অভাব, রাজধানীতে নানা সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্য, মানুষের মন পঙ্কিলতার বিষে ভরপুর। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষ-বাষ্পে দিল্লীর আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন।

দিল্লীর বাগিচায় বাগিচায় ঝরাফুলের দীর্ঘনিশ্বাস সম্রাটের অন্তরে আঘাত করেছে আর সম্রাট কবির অন্তরের ব্যথা সেই আঘাতে ফুল হয়ে কাব্য-উদ্যানের শোভা বর্ধন করেছে। দিল্লী কী ছিল, আর কী হয়েছে একথা ভেবে সম্রাটের মন কেঁদে উঠেছে :

অপ্সরী-পরী ছিল এ শহরে
ছিল সব ছিল চাঁদ ও তারা।
কে যে লুণ্ঠন করে নিল সব
কেউ জানে নাকো কোথা গেল ওরা।

দিল্লীর সামগ্রিক চেহারাটা তখন পাল্টে গেছে। দিল্লীর সে বড় বিশৃঙ্খল, মর্মান্তিক রূপ সম্রাটের কাছে। সম্রাট-কবি বলছেন :

কত রূপ আমি হেরিয়াছি তার এই বাগিচায়
যত ফুল ফোটে হেথা আজি হায়
অন্য গন্ধ তায়।

গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক, সঙ্গীন-তরবারি—যুদ্ধোপকরণের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু দক্ষ নেতৃত্বের। সুযোগ্য নেতার অভাবে, পরিচালনার ক্ষেত্রে শূন্যতার ফলে সিপাহীরা ক্রমেই ক্ষীণবল হয়ে পড়েছিল।

বাহাদুর শা'র সভাকবি গালিবের লেখা এই সময়কার একখানি চিঠিতে দিল্লীর তদানীন্তন পরিস্থিতির করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের বছরে ৫ই ডিসেম্বর তারিখে কবি গালিব চিঠিখানি লিখেছিলেন তাঁর ভাবীশিষ্য উর্দু কবি মুন্সী হরগোপাল তাফ্‌তাকে। গালিব লিখেছিলেন : '... ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই প্রাণভয়ে পালিয়েছে। অবশিষ্টরা নির্বাসিত। বিস্তারিত লিখতে আমি ভয় পাচ্ছি। কেল্লার কর্মচারীরা বিশেষ করে যারা সিপাহী বিদ্রোহের সময় সম্রাটের অধীনে কাজ করেছে, তাদের সন্দেহ করা হচ্ছে, জেরা করা হচ্ছে, শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।'

গালিব ঐ পত্রে আরও লিখেছেন : 'গৃহগুলি পরিত্যক্ত, নিষ্প্রদীপ। ১১ই মে থেকে সামরিক আইন বলবৎ হয়েছে।...'

বাহাদুর শা তখন আশীতিপর বৃদ্ধ। স্থবির, ক্ষমতাহীন। নিজের সিদ্ধান্ত আরোপ করার মত শক্তি তখন তাঁর নেই। কাজেই ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সম্রাট শুধু মর্মঘাতনাই ভোগ করেছেন। নিষ্করুণ ভাগ্যের চাপে তিনি তখন অসহায় দর্শকমাত্র।

কুটিল ভাগ্যের পথ জানিতে কি চাও?
নিদয়-নিষ্ঠুর সে যে, স্বরূপ জেনে নাও।

বাহাদুর শা'র জীবনের শেষ পরিণতি বড় করুণ। ১৮৫৭ সালের শেষ দিকে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করে নিজেদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল। সম্রাট বন্দী হলেন। বিচারে তাঁর দণ্ড হল রেঙ্গুনে নির্বাসন। কয়েক বছর পরে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বন্দী-দশায় তিনি কবিতায় লিখেছিলেন : এখন আর আমি কারও চোখের আলো নই, কারও মনের শান্তি নই। কেরল বৃন্তচ্যুত পুষ্পের সঙ্গেই এখন আমার তুলনা।'

বাহাদুর শা অসংখ্য কবিতা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অনেকগুলিই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর ৫৲ জমা দিয়ে গ্রাহক হবার শেষ দিন তারপর বেশী দামে কিনতে হবে।

সুকুমার রায়
সমগ্র রচনাবলী

প্রকাশিত/অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখা—লাইনো টাইপে. ম্যাপলিথো কাগজে ২ রঙে ছাপা হয়ে ২ খণ্ডে বের হচ্ছে। গ্রাহক মূল্য মাত্র ২০৲ টাকা। পুণ্যলতা চক্রবর্তী ও কল্যাণী কার্লেকর সম্পাদনা করছেন।

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড আপনি কি এখনও নেন নি? আর দেরি না করে আজই সংগ্রহ করুন। পছন্দ হলেই আমাদের অন্যান্য বই-এর গ্রাহক মূল্যের সুযোগ নিন। গ্রাহক না হলেও প্রথম খণ্ড কিনতে পাবেন—দাম ২৩৲ টাকা।

নতুন কিছু গ্রাহক করা হচ্ছে। ...ষ্টক থাকতে থাকতে ৭·৫০ দিয়ে গ্রাহক হয়ে আপনিও সংগ্রহ করতে পারেন। ২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৭·৫০ টাকা। সম্পাদনা : লীলা মজুমদার

বিশ্ব শিশুসাহিত্যের আরও কয়েকটি সেরা রচনাবলী আমরাই বের করছি।

গ্রিমদের সমগ্র রচনাবলী

২ খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ গ্রাহক মূল্য ২৫৲ গ্রাহক চাঁদা ৫৲
অনুবাদ : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী

অনুবাদ : অশোককুমার মিত্র/শৈলশেখর মিত্র। গ্রাহক মূল্য ৭৲ গ্রাহক চাঁদা ২৲

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

প্রথম খণ্ড নভেম্বরে বেরুবে। গ্রাহক মূল্য ১০৲ এখন ৫৲ দিন।

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন সমগ্র রচনাবলী

অনুবাদ : লীলা মজুমদার। ২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২০৲ গ্রাহক চাঁদা ৫৲

লুইস ক্যারল সমগ্র রচনাবলী

অনুবাদ : জরন্ত চৌধুরী। ৩ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৯৲ গ্রাহক চাঁদা ৫৲

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২, ফোন : ৩৪২৩৮৬।
অন্যান্য শাখাকেন্দ্রেও গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে।

মনের খবর

মানসিক রোগ (৪)

সামাজিক কারণ কোনো কোনো সময় মানসিক রোগ উৎপাদনের সহায়ক হতে পারে। সমাজ বলতে এখানে পারিবারিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিতকেও ঐ সমাজের মধ্যে ধরে নিয়ে উল্লেখ করব। সমাজ বা পরিবারের যে যে কারণগুলি আমাদের প্রক্ষোভকে নাড়া দিয়ে দুর্বল অহমকে বিপদে ফেলে তার মধ্যে আর্থিক কঠিন দুরবস্থা একটি। এখানে পরিবারের তথা সমাজের এবং বিশেষ করে ব্যক্তির আদর্শের (ইগো-আইডিয়াল) প্রশ্ন এসে পড়ে। জীবনে কে কোন বিষয় বা বস্তুকে বড় মূল্য দেয়—তার উপর তার প্রক্ষোভের প্রবলতা, কিস্তার ইত্যাদি নির্ভর করে। অনেকেরই জানা পরিচিতের মধ্যে এমন মানুষ আছে যে টাকা পয়সাকে জীবনে বড় করে দেখে না। কেউ বা গান-বাজনা কেউ খেলা, কেউ পড়াশোনা কেউ বা ধর্মকে জীবনের আদর্শ মনে করে চলে। যে টাকাকড়ি, ঐশ্বর্যকে প্রধান বলে মনে করে, তার কাছে টাকার প্রয়োজনটাই বড়। আমার পরিচিতের মধ্যে নানা রকমের মানুষই আছে। একজনের কথা বলি। আমি যখন সেই শিববাবুকে দেখি তখন তাঁর বোধ হয় পঁয়তিরিশ বছর বয়স, পার হয়ে গেছে। বিয়ে হয়েছে, দু-তিন জন কি আরও বেশী ছেলেমেয়ে আছে। স্ত্রী বড় অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। শিববাবুর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সেকালের কয়েক বিঘে জমির ধান ও অন্যান্য ফসল পেতেন। গ্রামের বাড়ী, পাকা দালান কোঠা নয় টিনের ঘর। সে গ্রামের অন্যান্য ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ আনন্দে হাসিখুশিতে দিন কাটাতেন। পরিবারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় ও দিনকালের পরিবর্তন হওয়ায় আর্থিক অবস্থা বলতে গেলে অচল হয়েই আসে প্রায়। সেদিনও রোজ মাছ জোটে না ডাল আর একটু তরকারি বা শাক ভাজা দিয়েই আহার শেষ হয়। শিববাবুর নিজের উপার্জন কিছু ছিল না। ঐ সামান্য জমির ফসল দিয়েই বছরের খাওয়া পরার খরচ মেটাতে হত। বছর যায়, বয়স বাড়ে, আর্থিক অবস্থারও ক্রমাবনতি হতে থাকে। এক সময় এমন অবস্থা হয় যে, দু-বেলা ডাল-ভাত কোনো রকমে জুটত, পায়ের জুতোর বদলে কাঠের খড়ম ব্যবহার করতে দেখতাম। ঐ খড়ম পায়েই গ্রামের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, বাজারে যেতেন। মনে পড়ে খালি পায়েও চলতে দেখেছি। গায়ের জামা অনেক সময়ই থাকত না। একটা চাদর কাঁধে পাট করা থাকত। তিনি সেই অবস্থাতেও মহা আনন্দে হেসে গল্প করে দিন কাটাতেন। অপরের কোনও উপকার করতে পারলে খুশী হতেন। বড় ছড়ানো গ্রাম। গ্রামের কোনো বাড়ীতে অসুখ কিছু হলে রোজ গিয়ে খবর নিয়ে আসতেন। গান-বাজনা শুনতে ভালবাসতেন—ফুটবল ক্রিকেট খেলা দেখতে নিয়মিত মাঠে উপস্থিত হতেন। তাঁকে খুড়ো ডাকতাম। খুড়ো খাদ্যরসিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে যেমন করেই হোক মাঝে মধ্যে এটা ওটা করে দিতেন। তাতে খুড়োর স্ফূর্তি বেড়ে যেতো। একদিন সামনে দিয়ে চলেছেন। ডাকলাম—'খুড়ো ও খুড়ো, আরে আসুন আসুন, শুনে যান।' খুড়ো এলেন—তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম 'আজ কি খেলেন?' তিনি মহাখুশী হয়ে বল্লেন 'আজ খুব ভাল খেয়েছি ভাই, গিন্নি আজ কাচ কিউলী পাতার কাটলেট করেছিল, বুঝলে! সে কী স্বাদ! খুব ভাল হয়েছিল।' আরেক দিন বলেছিলেন, সেদিন দুর্বাঘাসের চপ হয়েছিল। খেতে নাকি 'জব্বর' ভাল হয়েছিল। কোনো কিছুর জন্যে মনে খেদ নেই, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ আনন্দে দিন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর ছেলেরা বড় বড় কাজ করে—কলকাতা শহরেই বড় বাড়ী করেছে। তাঁদের উন্নতি খুড়ো কিছু দেখে গেছেন। কিন্তু নিজের সেদিকে নজর ছিল না। টাকার অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করেনি—তাঁর মনে বিকারও আনতে দেখিনি। এর ঠিক উল্টো দেখতে পাই আজকের দিনের মুনাফাবাজ ভেজাল-কারবারীদের মধ্যে। তারা যেমন করে হোক টাকা পাবার দিকে ছুটেছে। টাকাই ধর্ম, টাকাই কর্ম, টাকাই জীবনের সব—ধ্যান-জ্ঞান যা বলুন তাই। এদের মধ্যে অনেকেই সমাজের রীতিনীতির বা মানবধর্মের কোনও আদর্শকে জীবনে বিশেষ ঠাঁই দেয় না। নেশা করা, নারী ভোগ করা এদের অনেকেরই স্বিধাহীন স্রোতে চলে। বড়জোর একদিন কোনও ঠাকুরবাড়ীতে একটু পুজো দিয়ে থাকে। যদি সে পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম একটু খোঁচা লাগে। এঁদের টাকা না হলে, বা ব্যবসা ফেল করলে মানসিক রোগ বেশী দেখা দেয়। বেশ সহজেই বুঝতে পারা যায় যে এদের জীবনে টাকা পাওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনও নীতিবোধ প্রায় নেই। সুতরাং একাগ্র মনে যা চেয়েছেন তা যদি না পাওয়া যায় তবে যে গভীর ব্যর্থতা বোধ জাগে তা সইবার মত এঁদের অহমের শক্তি থাকে না। এই শ্রেণীর সকলেরই যে টাকা না পেলে এরই পরিণতি হবে তা নয়। তবু তাঁদের যে মানসিক অস্থিরতা টাকার অভাবে দেখা দেবে—অন্য শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা টাকাটাকেই প্রধান বলে গণ্য করেন না তাঁদের তেমন বিকার দেখা দেবে না।

ছোটবেলা থেকে শিশুকে হাজারবার করে শোনান হতে থাকে—তাকে বড় হতে হবে—খুব বড়, অনেক টাকা রোজগার করতে হবে—বাড়ী গাড়ি করতে হবে। আরও শেখানো হয় ওবাড়ীর অমুকের চেয়ে তোমার ভাল হতে হবে। পরীক্ষায় সকলের উপরে হতে হবে। ওর চেয়ে ভাল নম্বর পেতে হবে ইত্যাদি। তেমনি অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও এই রকম দাবী শিশুর কাছে করা হতে থাকে। এর ফলে এমন এক প্রতিযোগিতার প্রতিবেশ গড়ে তোলা হয় যে শিশু নিজেকে সেই হাজার দাবীর উপযুক্ত হতে নিজের স্বাভাবিক গতির উপর চাপ দিতে থাকে। যদি সে পরীক্ষায় ক্লাসে প্রথম না হতে পারে তাকে নানা রকমে অশ্রদ্ধা দেখানো হতে থাকে—সে যে ভাল না—একথা বারে বারে শোনান হতে থাকে। সে পড়াশোনা করে না, বাজে ছেলে হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক কথা তার শুনতে হয়। এর ফলে শিশুর মনে ক্রমে একটা হীনমন্যতার বোধ জাগতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই অসুস্থ মনোভাব থেকে আরও জটিল মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। আদর্শ যদি অতি উচ্চ করে গড়া হয় তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক সময় সে আদর্শগত নীতি বা পন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। আদর্শবোধটাকেও যদি বেশী গুরুত্ব দিয়ে সেই অনুসারে শিশুর অধিশাস্তা (সুপার-ইগো) গড়ে তোলার সাহায্য করা হয় তবে আদর্শানুসারে চলতে না পারলে মনে অন্যায়বোধ, পাপবোধ বাড়তে থাকে। নিজেকে পাপী মনে করে চলার ফলে অনেক রকম অন্য মানসিক রোগের সূত্রপাত হতে পারে, হয়ে থাকেও। প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠলেও জয়ী না হতে পারলে নিজের সম্বন্ধে মূল্যহীনতা বোধ জাগে। এই বোধও সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়। এই মূল্যহীনতা বোধও এক রকমের ব্যাধি। আবার এ থেকে আরও জটিল মানসিক রোগও হতে পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে খুব মানী বলে গণ্য করা এবং কথায় কথায় তা প্রচার করা, নিজে যে কত বড়, একটা কেউকেটা লোক, অন্যেরা যে তার থেকে অনেক নীচু স্তরের লোক, এরকম উক্তি হামেসাই শুনতে পাওয়া যায়। এও এক রকমের মানসিক ব্যাধি। এরা একটুতেই অপমানিত বোধ করে। তার সম্মান রেখে অপরে চলে কিনা সেদিকে এদের কড়া নজর থাকে। অপমানিত বোধ করায় ক্রোধ বিদ্বেষ ইত্যাদি অনেক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই শ্রেণীর মানুষ সমাজে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। সকলেরই এমন দু-দশ জন পরিচিত লোক নিশ্চয়ই আছে।

এদের ঠিক বিপরীত স্বভাব দেখা যায় যারা জনসেবার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। এদের মধ্যেও যে সকলেরই মানসিক স্বাস্থ্য ভাল অর্থাৎ মানসিক সুস্থতা বজায় আছে তাও নয়। কিছু কিছু মানুষ নিজেদের মানসিক অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কেউ ধর্মপথে, কেউ ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, কেউ রাজনীতি করে, কেউ বা

কোনও সমাজকল্যাণের কাজে যুক্ত হয়ে, নিজেদের আরও গুরুতর মানসিক অসুস্থ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। অনেকে এতে কৃতকার্য হতে পারেন কিন্তু সকলে নয়।

আরও একটু ঘরের দিকে নজর দেওয়া থাক। যে পরিবারে বাবা মায়ের সম্পর্কে স্নেহ ভালবাসার অভাব থাকে, ঝগড়া বিবাদ চলে, সেই পিতামাতার সন্তানদের মনে নিরাপত্তার অভাব বোধ জাগে। এর পরিণাম সন্তানের পক্ষে শুভ হয় না। শিশুর মনে এজন্য যে উৎকণ্ঠা জাগে তাতে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়— এমন কি মানসিক রোগও দেখা দিতে পারে। মনঃসমীক্ষণ করতে গিয়ে অনেক রোগীর মধ্যেই শৈশবের এই উৎকণ্ঠা দেখেছি। এছাড়া আরেক সমস্যা আছে। মা বা বাবা যদি সন্তানকে না ভালবাসেন তাতে সন্তানের মনে যে প্রতিক্রিয়া, অনিশ্চয়তা, অসহায় বোধ জাগে তা থেকেও সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে থাকে। শিশু যদি নিজেকে পিতামাতার অযাচিত মনে করে, তাতেও তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে। এই অযাচিত বোধ দূর করতে শিশু অনেক সময় নিজেকে অতিমাত্রায় মূল্যবান করে তোলবার চেষ্টা করে নিজের উপর অস্বাভাবিক চাপের সৃষ্টি করে। এর ফল ভাল হয় না। শিশুদের মধ্যে যে দুষ্কৃত্য (ডেলিকোয়েন্ট) প্রকৃতি গড়ে ওঠে সে জন্য পারিবারিক এই অবস্থা অনেক পরিমাণে দায়ী। এই দুষ্কৃত্য শিশুরা মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, নেশা করা, ইত্যাদি অভ্যাসাসক্ত এবং এমন কি অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়াশক্তও হয়ে পড়ে। এসব বাঁচাতে গিয়ে পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি বাড়াবাড়ি স্নেহ আদর দিতে থাকেন তার ফলও ভাল হয় না। শিশু বড় হয়েও এই আদর যত্নের দাবী অথবা মনের আশা ত্যাগ করতে পারে না—। সারা জীবন সে বুড়োখোকাই থেকে যায়। না হয় অস্থির বায়ুরোগগ্রস্তের মনোভাব যৌবনকালে এমন কি পরেও টেনে নিয়ে চলে।

এদেশেও এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন চালু হয়েছে। অনেক বিয়ে ভেঙেও যাচ্ছে। এই ঘরভাঙা অবস্থাটা শিশুর মনে যে প্রক্ষোভ সৃষ্টি করে তার মধ্যে ঐ অনিরাপত্তার ভীতিই বড় হয়ে দেখা দেয়। দুষ্কৃত্য প্রকৃতি এর থেকেও জন্মায়। পরের জীবনে বাস্তব কোনও বাধাবিপত্তি দেখা দিলে, শৈশবে ঐ ঘর ভাঙার অনিবার্যতা বোধ থাকার, নানা রকমের বায়ুরোগ দেখা দিয়ে থাকে।

শিশুকাল থেকেই অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। পরজীবনে সহায়ক অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বড়তে যদি তেমন একজন বাবা মা বা উপযুক্ত অভিভাবকের অভাব হয় তবে আবশ্যক শিক্ষা না হওয়ায় বয়সকালে অনেক মানসিক সমস্যা দেখা দেয়।

বাবা মায়ের ব্যক্তিত্বের মূল্য অনেকখানি, এবং তাঁদের ও অন্যান্য অভিভাবকদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব শিশুর উপর অত্যন্ত বেশী। আমরা সেদিকে নজর খুব কমই দিয়ে থাকি। মনে রাখতে হবে—বাবা মা যদি কেবল নিজেদের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে তাঁদের রুচিমত সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তুলতে চান সন্তানের স্বভাব-প্রকৃতির দিকে নজর না রেখে চলেন তবে তাতেও পরিণাম ভাল হয় না। সন্তানের কল্যাণকে বড় করে নিজেদের ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রয়োজন মত গৌণ করে চলার দরকার আছে।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে সমাজের গরীব এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের সন্তানদের মধ্যে আর্থিক অভাবের ফলে যে দুস্থ অবস্থা ও শাসন ইত্যাদি এবং অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন চলে তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা যদি তেমন প্রকট না থাকে তবে সন্তানদের মধ্যেও উৎকণ্ঠা তেমন দেখা যায় না। আসল কথাটা হল পিতামাতার নিজেদের উৎকণ্ঠা ও অস্থির মনোভাব সন্তানের মধ্যেও সংক্রামিত হতে থাকে। অবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যে সামান্য অসুবিধাতেই অতিমাত্রায় প্রক্ষোভ দেখা যায়। অল্পেতেই তারা বিচলিত, চিন্তিত উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সন্তানের মধ্যে এই উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তার ভীতি ইত্যাদি সহজেই সংক্রামিত হয়ে পড়ে। অথবা তার প্রতিক্রিয়ায় কোনও মানসিক রোগ দেখা দেয়।

একটু আগে যে প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার কথা বলেছি তার সঙ্গে আরও একটু কথা যোগ করে দেব এখানে। সেটা হল আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি—বিশেষ করে স্কুল কলেজের শিক্ষার কথাই বলছি। শিক্ষকতার মান এত নেমে গেছে যে ছাত্রছাত্রীরা লেখা-পড়া করার মধ্যে কোনও আগ্রহ বা রস খুঁজে পায় না। কেবলই বেগার খাটা ক্লাস করায় পর্যবসিত হতে চলেছে। সব শিক্ষকই এই শ্রেণীর তা বলছি না। কিন্তু অতি অধিক সংখ্যক শিক্ষকের কাজকর্মে এই ভাবই প্রকাশ পায়। এতে প্রকৃত শিক্ষা যেমন বাধা পায়, জীবনের উচ্চ আশায় কর্মজীবনে তেমনই ব্যর্থতার সৃষ্টি করে। মানুষ বড় হতে চায় বা শক্তিমান হতে চায়। কিন্তু তার জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার তা যদি না হয় আর নিজের আকাঙ্ক্ষা যদি তেমনই বড় থেকে যায় তবে কাজের বেলায় ধাক্কা খেতেই হবে। তখন নিজের মনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সভ্যতার দাবী, সংস্কৃতির দাবী বড় হয়ে উঠেও মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে। পাশ্চাত্ত্য দেশেও কতকগুলি মানসিক রোগকে সংস্কৃতিগত বায়ুরোগ (কালচারাল নিউরোসিস) নামই দেওয়া হয়ে গেছে। ইস্কুল কলেজের শিক্ষার যে উদ্দেশ্য খাড়া করা হয় সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে, সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হলে মনে ব্যর্থতার গ্লানি ও বিষাদ ভাব জাগে। এগুলি এক সময় মানসিক পর্যায়ে পরিগণিত হবার যোগ্য হয়। মানুষ কিছু একটা করতে চায়—এটা তার স্বাভাবিক বৃত্তি। যদি কিছু করবার সুযোগ না পায় তবে মানসিক অস্বস্তি ও পরিণামে মানসিক রোগও দেখা দিতে পারে।

আরেক সমস্যা দেখা যায় যখন বাধ্য হয়ে মানুষকে একা থাকতে হয়। জেলে একা থাকতে হওয়ার অনেকের বাস্তুরোগ এমন কি বাতুলতাও দেখা দিয়েছে এমন নজির খুব কম নেই।

আমাদের দেশে পুরনো ধর্মবিশ্বাস, নীতিবোধ, সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবই ওলট পালট হয়ে গেছে। সে জায়গায় নতুন কোনও ব্যবস্থা, আদর্শ নীতিবোধ শিক্ষা ইত্যাদি কিছুই গড়ে ওঠে নি। সারা দেশটাই একটা অনিশ্চিত, অনির্দেশ্য শিথিল জড়গতিতে গড়িয়ে চলেছে। কোথায়, কি উদ্দেশ্যে, কোনদিকে চলেছে কেউ জানে না। এই অন্ধ অনিশ্চয়তার মধ্যে মানুষের যে অতৃপ্তি উৎকণ্ঠা ভেতরে ভেতরে কাজ করে চলেছে তার ফল মনের উপর আদৌ ভাল হচ্ছে না। সংঘাত, সমস্যার টানাপোড়েন বেড়েই চলেছে। মানসিক রোগও ক্রমে বেড়ে চলেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশেও নানা সংঘাতের ফলে মানসিক রোগ বাড়ন্ত পেয়েছে। কৃষিভিত্তিক সভ্যতা থেকে যান্ত্রিক সভ্যতায় দ্রুত পরিবর্তনের জন্যও আমাদের মানব ভিত্তিস্তরে নাড়া লেগে অনেক ভাঙাচোরা হয়ে চলেছে। বুদ্ধি যত দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থাকে মেনে নিতে পারছে প্রক্ষোভ তা পারছে না। বুদ্ধি আর প্রক্ষোভের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠছে। সকলের পক্ষে এ আলোড়ন সয়ে নিয়ে সহজ জীবন যাপন করা সম্ভব হচ্ছে না। মানসিক রোগ সে কারণেও দেখা দিচ্ছে। চারদিকে সমস্যা অভাব অনটন বেড়েই চলেছে। মন যেন কোথাও একটু স্বস্তিতে বসতে পারছে না। উৎকণ্ঠা রোগ তাই বেড়ে যাচ্ছে। স্নায়ুঘটিত অন্যান্য রোগও বাড়ছে।

আমাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে গেছে, দেশ শাসনেও আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকছে না। এই নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকেও নানা মানসিক রোগ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। নৈতিক অনাচার, অশিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি সামাজিক যেসব দুর্লক্ষণ দেখা দিয়েছে সে সবের মূলেই আছে মানসিক বিকৃতি বিকার বা রোগপ্রভাব। মানুষের সামাজিক জীবন বহু ব্যাপ্ত। সেখানের প্রভাবও নানা গলদ থেকে মানসিক রোগ উগ্র স্বার্থপরতা ইত্যাদি অসুস্থ মানসিকতা বৃদ্ধি পাবার সহায়তা করছে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

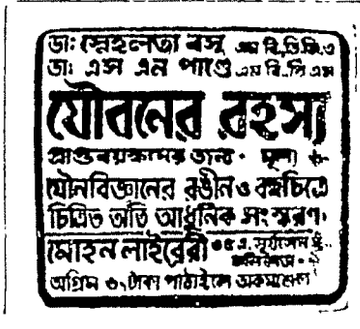

দিনকালের হিসেব

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক—(২)

পাকাপাকিভাবে ১৪টি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। 'পাকাপাকিভাবে' বলছি এই জন্যে যে এর আগে ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসের আইনকে সুপ্রীম কোর্ট 'বৈষম্যমূলক আচরণ ও অন্যায্য ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার' দরুন বাতিল করে দেন।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ভারতে নতুন নয়। এর আগে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় যথাক্রমে ১৯৪৯ ও ১৯৫৫ সালে। উপরন্তু, অনেকদিন ধরেই দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবি চলে আসছিল।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ :

বলা যায়, এই দাবির মোকাবিলার জন্যেই—১৯৬৭ সালের শেষের দিক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (সোস্যাল কন্ট্রোল) প্রবর্তন করা হয়, এবং ১৯৬৮ সালে ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনের আর এক দফা সংশোধন পাশ করে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আরও কড়াকড়ি করা হয়।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জাতীয়করণের সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এঁদের অভিযোগ ছিল যে শিল্পপতি ও বণিকদের চাপে পড়েই ভারত সরকার এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিল। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও সামাজিক ন্যায়—এই দুই প্রধান লক্ষ্যের কোনটিরই সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে ওঠেনি। তাই যখন অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ১৪টি বড় বড় ১৪টি তপশীলী ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় তখন জাতীয়করণের সমর্থক মহলে আনন্দ-উৎসাহের প্রবল বন্যা বয়ে গিয়েছিল।

মূল অর্ডিন্যান্সটিতে বলা হয়েছিল: 'জাতীয় অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন সুষ্ঠুভাবে সাধন করবার জন্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।' বিরোধীদের মতে কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এই পথে পা বাড়ান হয়েছিল। অন্তত ব্যাপারটা অর্ডিন্যান্স জারির মত শুরুবরী ছিল না।

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের উদ্দেশ্য :

একথা হয়ত ঠিক যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মূলে রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ যে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তাও অস্বীকার করা যায় না। কেন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল মোটামুটি তার ব্যাখ্যা জাতীয়করণের সমর্থনে পার্লামেন্টে প্রদত্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি থেকেই পাওয়া যাবে। এই বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার হল এই রকম: ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে ভারতের বহু বিঘোষিত পরিকল্পনা ও নীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক নতুন এবং উজ্জ্বল অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। এর ফলে ফটকা বাজারে এবং অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যাঙ্কের টাকা লগ্নী বন্ধ হবে। শিল্প বাণিজ্যও আগের মত কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ঋণ পাবে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে কৃষি, শিল্প ও রপ্তানী-বাণিজ্য—এই তিনটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ঋণের প্রবাহকে আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া সমাজের সকল উপেক্ষিত ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার এবং ব্যাঙ্কের ঋণ সহজলভ্য হবে। এক কথায়, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে পূর্বে প্রবর্তিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যগুলোকে কমাভাবে এবং দ্রুত রূপায়িত করা সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে বলা না হলেও অর্থনৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়ে ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি ছিল যে, ভারতে বিশেষ করে পরিকল্পনাধীন সময়ে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসার উন্নয়নের অনুগামীই হয়েছে, উন্নয়নের সহায়ক ঠিক হয়নি। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে সত্যি কিন্তু ঘটেছে উন্নত অঞ্চলে। মহানগরীর প্রত্যেক পল্লী এবং শহরতলীর বিভিন্ন অংশে এমনকি ব্যাঙ্কের শাখায় ছেয়ে গেছে, কিন্তু দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল, এমনকি অনেক মফস্বল শহরও ঠিক ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। স্টেট ব্যাঙ্ক অবিশ্যি শাখা বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিল, কিন্তু একের পক্ষে কতটা সম্ভব? আবার সম্প্রসারণের সহায়ক হোক আর না হোক, সেই সব শিল্প-বাণিজ্যই ঋণ পেয়ে এসেছে যারা বেশী সুদে ধার নিতে এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ করতে সমর্থ ছিল। ফলে স্বল্পবিত্ত উদ্যোক্তা ও ক্ষুদ্র শিল্প উপেক্ষিত থাকায় বিকেন্দ্রীকৃত অর্থ-ব্যবস্থা মোটেই গড়ে ওঠেনি। এই বড় বড় ব্যাঙ্কগুলো অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণাধীনও ছিল এবং এর ভিত্তিতে একচেটিয়া অবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটছিল। ঐসব ব্যাঙ্ক পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল যাকে কোন মতেই কাম্য বলে কল্পনা করা যায় না।

এখন বিশ্লেষণ করলে উপরি-বর্ণিত ও অন্যান্য উদ্দেশ্যকে এইভাবে সাজানো যায়:

(১) রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে টাকা-কড়ির বাজারের ওপর বেসরকারী আধিপত্যের জায়গায় সরকারী একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এতে ক্রেডিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ সহজ হবে; (২) ব্যাঙ্ক আমানতের যে বিরাট অংশ সরকারের হাতে আসবে তাতে কৃষি শিল্প ও রপ্তানী--বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে; (৩) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও শিল্পপতিদের মধ্যে অবাঞ্ছিত যোগাযোগের আর্থিক ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়ের নিয়ন্ত্রণ এবং একচেটিয়া কারবারের যে অকাম্য প্রসার ঘটছিল তা বন্ধ করা সম্ভব হবে, (৪) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কৃষির উন্নতির জন্যে বেশী ঋণ দিতে পারবে এবং কৃষি-ব্যবস্থাকে অনেকাংশে সুদৃঢ় করতে সমর্থ হবে, (৫) গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনার জন্যে অর্থ সংগ্রহের পথ সুগম হবে, (৬) ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে অকাম্য ও অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে, (৭) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পরিচালনা সুদৃঢ় হবে এবং আমানতকারীদের আমানতের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে, (৮) ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কার্যের সর্তাবলী আরও উন্নত হবে এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক হবে এবং (৯) সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে উন্নয়নের সহায়ক করে তোলা হবে।

মূল্যায়ন :

এখন দেখা যাক, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো কতদূর সফল হয়েছে। প্রথমত, দেখা যায় যে, শাখা প্রসারের কাজ বহুদূর এগিয়ে গেছে, এবং ১৯৭২ সালের শেষে মাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ১৪টি ব্যাঙ্কের কার্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৪০২-এ। এর ওপর আছে রাষ্ট্রায়ত্ত ছোট ব্যাঙ্ক। সঞ্চয় সংগ্রহও বিশেষ সম্প্রসারিত হয়েছে। ১৯৭২ সালের মধ্যেই মোট আমানতের পরিমাণ ২০ শতাংশ বা ৪৭১ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৩,১৯০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৬৯ সালের জুন মাসে সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৮,২৬২ এবং মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৪,৬৪৬ কোটি টাকা। সুতরাং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মূলে আছে স্টেট ব্যাঙ্ক সমেত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর ভূমিকা।

শুধু তাই নয়, এর দরুন গ্রামাঞ্চলেও ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়েছে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে গ্রামাঞ্চলে সকল ব্যাঙ্কের

শাখার সংখ্যা ছিল ১,৮৩২। ১৯৭২ সালের শেষে তা ৫,৩২৫-এ দাঁড়ায়। গ্রামাঞ্চলে এই সব নতুন শাখার অধিকাংশই হল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অগ্রাধিকার-ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প এবং কৃষিতে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ উল্লেখ-যোগ্য ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্যের সহায়তাতেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

আমানতের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমানত কারীদের মনে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে সে-সম্বন্ধেও সন্দেহ নেই। এবং এর ফলেই সঞ্চয় সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কার্যের সততাবলীর উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ওপরের দিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-গুলো যদি ঐভাবে আমানত আকর্ষণ করতে সমর্থ না হত তা হলে মূল্যস্ফীতি বা প্রাইস ইনফ্লেশান প্রবলতর হয়ে উঠত। স্মরণ রাখতে বলা হয়েছে যে, এই অতিরিক্ত আমানতের অনেকটাই এসেছে গ্রামাঞ্চল থেকে যা গ্রামীণ অর্থ-ব্যবস্থার নতুন রূপই নির্দেশ করে। দাবী করা হয়েছে যে, এই অবস্থা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম সুফল—'এ পজিটিভ সাইড'।

কিন্তু অন্য দিকে কি আছে—অন্যান্য লক্ষ্যসাধন কতদূর সম্ভব হয়েছে? সংক্ষেপে বলা যায়, ক্ষুদ্র শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ মোটেই আশানুরূপ হয় নি, প্রদত্ত ঋণের সুদের হারও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। অনেক অঞ্চলেই বেকার সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ঠিক এগিয়ে আসে নি, ব্যাঙ্কগুলোর সেবা বা সার্ভিসের উন্নতি ত ঘটেই নি বরং অনেক ক্ষেত্রে অবনতিই লক্ষ্য করা যায়, পরিচালনাতেও সেই গতানুগতিকতার কোন অবসান ঘটে নি, বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে অকাম্য প্রতিযোগিতার নিরসন ঘটলেও চিত্তাকর্ষক প্রচারকার্য মোটেই বিলুপ্ত হয় নি এবং পরিচালনা-কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগও গড়ে ওঠে নি।

এসব আমার বা অন্য কোন বাইরের লোকের অভিযোগ নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষরাই স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী পি এন ট্যাণ্ডনের একটি সাম্প্রতিক রচনা থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যায় :

'জনসাধারণ ব্যাঙ্কের সার্ভিসের অবনতি নিয়ে দুঃখ করেন এবং দোষ দেন কর্ম-চারীদের। কর্মচারীরা দেখান ম্যানেজার-দের এবং ম্যানেজাররা দেখান কর্মচারীদের'।

'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল একনিষ্ঠ পরিচালনা ও সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে এবং অপর দিকে ব্যাঙ্ক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে কাম্য সম্পর্ক গড়ে তোলার অক্ষমতা।'

'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাঙ্ক-ঋণের সুদের হার অত্যধিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে কোন কোন সময় স্বল্প সুদই দাবী করি। কিন্তু সাধারণ বাণিজ্যিক নীতির অনুসরণে অধিকাংশ সময় আমরা বেশী এবং অযৌক্তিক সুদই সুপারিশ করে থাকি।'

'সমাজে আজ যাঁরা উচ্চ বেতন পান ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা তাঁদেরই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এই সব কর্মচারী কি তাঁদের বেতনের অনুপাতে সমাজকে সেবা করে যাচ্ছেন?'

শ্রীট্যাণ্ডনের অভিমত হল যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো মোটামুটি ভাল কাজই করেছে —রাষ্ট্রায়ত্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়েও ভাল কাজ করেছে, কিন্তু যতটা আশা করা গিয়ে-ছিল ততটা নয়। আমরাও তাই বলি এবং সত্যিই শ্রীট্যাণ্ডনের মত স্পষ্টবাদিতা প্রশংসনীয়।

প্রতিকার :

শ্রীট্যাণ্ডনই কতকগুলো প্রতিকারের নির্দেশ করেছেন : (ক) নীতি-নির্ধারণের কাজ সরল ও সংক্ষিপ্ত করতে হবে—ঐ গাছের ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে, (খ) গতানুগতিক পরিচালনা-ব্যবস্থায় প্রয়ো-জনীয় প্রকারভেদের সূচনা করতে হবে, (গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক-ঋণের সুদের হার হ্রাস করতে হবে, (ঘ) সদর কার্যালয়ের দরুন ব্যয়ভার বিশেষ কমাতে হবে, (ঙ) গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসারে অগ্রণী ব্যাঙ্ক পরিকল্পনাকে (লীড ব্যাঙ্ক স্কীম) ঠিকমত কার্যকর করতে হবে, (চ) ঋণ প্রদান ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করতে হবে, (ছ) সমাজের প্রয়ো-জনীয়তার সঙ্গে তাল রেখে নিয়ত নীতির পরিবর্তন করে যেতে হবে এবং (ঝ) বাণিজ্যিক ও সমাজসেবার মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করতে হবে।

উপসংহার :

দেখা যাচ্ছে, সাফল্যের পরিমাণ যে ঠিক কত সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহলেও সচেতনতার সঞ্চার হয়েছে। এবং এখানেই রয়েছে আশার আলো। এই আলো যদি সব-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে তবেই ১৪টি ব্যাঙ্কের জাতীয়তাকরণকে সার্থক বলে বর্ণনা করা চলবে এবং আর বাকী ব্যাঙ্কগুলোর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দাবীও সকলে সমর্থন করবে।

খবরাখবর

পশ্চিমবঙ্গ :

কলকাতায় জীবনযাত্রার ব্যয় :

ভারতের সব মহানগরীর মধ্যে ত বটেই, এমন কি অনেক শহরের তুলনায় কলকাতায় জীবনযাত্রার ব্যয় নাকি কম। ইট ইজ ফিল দি চীপেস্ট সিটি ইন ইণ্ডিয়া —বলে দাবী করা হয়েছিল মাত্র কিছু দিন আগে। তবে গত এক বছরের মধ্যে (১৯৭২ সালের জুলাই থেকে ১৯৭৩ সালের জুলাই পর্যন্ত) কলকাতার মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় প্রায় ৬ শতাংশ বা ৪৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে—সূচকসংখ্যা ৭৪৪ থেকে ৭৮৮তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। 'ক্যাপিটাল' পত্রিকা নিয়মিত কলকাতার মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করে যায়, তাতে এই তথ্যই পরিবেশন করা হয়েছে।

হয়ত ঐ সময়ের মধ্যে অন্যান্য শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় আরও বেড়েছে—বেম্বাই ও দিল্লীতে ত নিঃসন্দেহেই বেড়েছে, কিন্তু কলকাতাতেও বৃদ্ধির পরিমাণ মোটেই উপেক্ষণীয় নয়।

এই সূচকসংখ্যায় ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে ১৯৩৯ সালকে—অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার বছরকে। সেই স্বর্ণ-যুগের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আজকে ঘটছে কি—এক বছরের মধ্যেই মধ্য-বিত্তের জীবনযাত্রার ব্যয় ৬ শতাংশের মত বৃদ্ধি? আবার এ হল খাস কলকাতার কথা। প্রামাণ্য তথ্য না পাওয়া গেলেও নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় যে, অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলেই জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির হার অনেক বেশী। সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ যদি সত্যিই রূপায়িত করতে হয় তবে এ-ব্যাপারে অন্তত সমতা আনয়ন করতে হবে। এবং এর জন্যে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা হল প্রাথমিক কাজ।

ভারত

বিদ্যুৎ-সঙ্কট :

বৈদ্যুতিক শক্তি যোগানের সমস্যা অনেক দিন ধরেই বর্তমান ছিল। সম্প্রতি তা অভূতপূর্ব সঙ্কটে পরিণত হয়েছে। গত দু মাসে কোন কোন ক্ষেত্রে যোগান ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়। মোটা-মুটি কোন রাজ্যই আজ এই সঙ্কট থেকে মুক্ত নয় বলা চলে। অর্থ-ব্যবস্থার ওপর এর ফল সহজেই অনুমেয়। কিভাবে এই সঙ্কটের সার্থক মোকাবিলা করা যায় সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস অফ কমার্স এক সেমিনারের আয়োজন করে। পরিকল্পনা-মন্ত্রী শ্রী ডি পি ধর ছিলেন সেমিনারের প্রধান অতিথি এবং সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী কে এল রাও ছিলেন উদ্বোধক। শ্রীধর বলেন : সঙ্কট মুক্তির জন্যে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলোকে ঢেলে সাজা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাপজ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলো তেলভিত্তিক না হয়ে হবে কয়লাভিত্তিক, কারণ জ্বালানী তেলের আন্তর্জাতিক দাম অনেক বেড়ে গেছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ৩'৬ কোটি কিলো-ওয়াটে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং ১৫ বছরের ভিত্তিতে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে।

সেমিনারের উদ্যোক্তাদের অনেকে কিন্তু পরিকল্পনার সংগঠন-ত্রুটিকেই মূলত দায়ী করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এই ত্রুটি দূর না হলে অদূর বা সুদূর-ভবিষ্যতে অবস্থার উন্নতির কোন আশাই নেই।

—শান্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

কথায় কথায়

আমার শরীর ভালো নেই, আমার জ্বর হয়েছে।

আমাদের যাদের ছেলেবেলা কেটেছে ম্যালেরিয়া-মহামারীর সুবর্ণযুগে, তাদের কাছে একটু-আধটু সপ্তাহান্তিক জ্বর অতি নগণ্য ব্যাপার; সেই সাবু-বার্লি আর পুনঃপুনিক কুইনিন মিকশ্চারের স্বাদ আজো আমাদের জিভে লেগে রয়েছে।

সেই আমলের ম্যালেরিয়া ছিলো পরম পরিহাসপ্রবণ। আমাদের জেলার সিভিল সার্জন অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যকর্তা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সরেজমিনে বেরোলেন কোথায় কি রকম ম্যালেরিয়া হয়েছে দেখতে। হঠাৎ পথের মধ্যে তাঁর নিজেরই এল কম্প দিয়ে জ্বর কিছু অনুমান করার আগে ডাক্তারসাহেব অশ্বপৃষ্ঠ থেকে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেলেন।

এই দৃশ্য আমরা ছোটবেলায় বার বার দেখেছি। ম্যালেরিয়া আক্রমণ করতো গেরিলা পদ্ধতিতে, কিছু বোঝার আগে সচল সুস্থ মানুষ ধরে ধরে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়তো।

সে সব দিনের কথা এখন হয়তো কারো মনে নেই। রেল গাড়ির কামরায় সাতজন মাত্র লোক, তার মধ্যে একজন হলেন টিকিট চেকার, কিন্তু কে কার টিকিট চেক করবে? কামরার মেজেতে শুয়ে বেঞ্চির পা জাপটে ধরে, কেউ ধুতির খুঁট গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন, কেউ কম্বল। সাতজনেই কোঁ কোঁ করে কাতরাচ্ছেন। কামরায় কামরায় একই দৃশ্য।

সেই সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের এই কম্প-ভীতি বহু মানুষের মনে প্রবল ভাবে ছাপ ফেলে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই ছাপ রীতিমত পাকাভাবে পড়েছে। যদি এখনও কোনো প্রবল গ্রীষ্মের দিনে কোনো ভদ্রমহোদয়কে ব্যাগের মধ্যে কম্বল নিয়ে বেরোতে দেখেন, বুঝবেন তিরিশের দশকের শেষাশেষি কিংবা চল্লিশের গোড়ার সেই কুইনিন-মধুর দিনগুলির স্মৃতি মনের অবচেতন পর্যায়ে ইনি এখনো বহন করে চলেছেন।

আদালতে বিচার চলছে, এমন সময় হঠাৎ একই সঙ্গে হাকিম, উকিল, সাক্ষী আসামী এই এনোফিলিস তাড়িত অসুখে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছেন। আমরা যে স্কুলে পড়তাম সেখানে একজন শিক্ষক এবং দুজন ছাত্র ছাড়া আর সবাই সাতচল্লিশজন একই সঙ্গে জ্বরে অনুপস্থিত, তেইশ বছর আগের এমন একটি দিনের কথা আমার আজও মনে পড়ছে।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে আমাদের সেই মন্মথচরণ কবিরাজের বৃহৎ সর্বজ্বর নাশিনী বটিকার কথা। এই সর্বজ্বর-নাশিনী বটিকা প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে-ছিলো কুইনিনের সঙ্গে এবং যদি তিক্ততাই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের একমাত্র মাপকাঠি হতো তাহলে কুইনিনকে অবশ্যই হারাতে হতো। আমার এই সামান্য জীবনে আজ পর্যন্ত যত তেতো জিনিস খেয়েছি অথবা খেতে হয়েছে, তার সমস্ত তিক্ততা একত্র করলে এই একটি সর্বজ্বর বড়ি তৈরি হতে পারে। এক একটি বড়ির ওজন ছিলো আধ ছটাক, অর্থাৎ এই রকম বত্রিশটি বড়িতে এক সের হতো। এই রকম বড়ি দুটো করে দৈনিক তিনবার চিরতা-ভেজানো জল দিয়ে খেলে গুলে খেতে হতো। বড়ি খাওয়ার প্রাক্কালে মানসিক অবস্থা যা হতো তাতে গায়ে তখন যত জ্বরই থাক সমস্ত রকম কাঁপুনি থেমে গিয়ে কপালে ঘাম দেখা দিতো। মন্মথ কবিরাজ যে দাবি করতেন একটি সর্বজ্বর নাশিনী বটিকা দিয়ে অনায়াসে এক লক্ষ কুইনিনের বড়ি করা যায় সে কথাটা মিথ্যে ছিলো না।

আমাদের খুল্লপিতামহের কঠিন শাসনে জ্বর না থাকলেও বাড়ির প্রত্যেককে জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে এই বটিকা নিয়মিত সকাল-বেলা খালি পেটে একটি করে খেতে হতো। আমাদের পরিবারের এক নব জামাতা, আমাদের ছোট পিসেমশায়, দ্বিরাগমনে শ্বশুরালয়ে এসে অতি প্রাতঃকালে এই একটি বটিকা সকলের সঙ্গে সরল মনে গলাধঃকরণ করতে গিয়ে বমি করতে অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে আসার পর এক বস্ত্রে তিনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এর পরে আর কোনোদিনই তিনি শ্বশুরবাড়িতে পদধূলি দেননি।

মন্মথচরণ কবিরাজের এই সর্বনেশে বটিকাকে কুইনিন এসে কয়েক বছর কঠিন সংগ্রামের পর দেশান্তরী করেছিলো। আমরা যারা পুরনো পাপী, আমাদের মুখে কুইনিন মোটেই তিতো লাগতো না, কোনো ফলও পেতাম না। মুড়ি-মুড়কির মত মুঠো-মুঠো কুইনিন খেতাম কিন্তু আবার জ্বর হতো, আবার ভুগতাম। হয়তো সেই সর্বজ্বর-নাশিনীই আমাদের যোগ্য ওষুধ ছিলো; কিন্তু ততদিনে মন্মথ কবিরাজ এবং আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত শাসনকর্তা খুল্লপিতামহ মহাশয় উভয়েই ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন; এবং দুঃখের বিষয় দুজনেই ম্যালেরিয়ায় মারা যান।

আমরা পরে শুনেছিলাম এঁদের দুজনের কেউই নাকি কখনো ঐ জ্বরনাশিনী বটিকা একটিও গ্রহণ করেননি। তাই হয়তো তাঁদের এই পরিণতি হয়েছিলো।

—তারাপদ রায়

প্রকাশিত হইল বেদুইনের নতুন বই

অশান্ত চিলি

লাটিন আমেরিকায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্ক চিলি। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার ব্যয়েমী স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তার ভয়াবহ গুপ্তচরচক্র সিয়ার সাহায্যে কি অত্যাচার চালাচ্ছে, তারই জ্বলন্ত বিবরণ এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে।

এই সঙ্গে চিলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে দলিলদস্তাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। মূল্য : আট টাকা।

পূর্বাচল—৩৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(৩৭)

দিদির চোখ দুটোয় ফস করে যেন একবার একটু আগুন জ্বলে উঠলো, কিসের মুখটা লাল হয়ে উঠলো, তারপরই দিদি শাড়িটা ঠেলে রেখে দিয়ে বললো, 'এ শাড়ি যার জন্যে, সেই পরুক।'

'তাকেই তো পরতে বলছি।'

'কক্ষণো না।'

দিদি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলো, ভয়ানক উত্তেজিত দেখালো দিদিকে। মনে হলো খুব চেঁচাবে, কিন্তু চেঁচানো দূরের কথা, গলাটা যেন বসে গেল। সেই বসা গলায় বললো, কী ভেবেছে ও? সব সময় আমাকে নি? আমি বলছি এটা তোকেই দিয়েছে। অপমান করবে? এতোতেও আশা মেটে —হ্যাঁ তোকেই। না হলে বিয়ের পরে পাঠাতো না। নেহাৎ কোন লজ্জায় পাঠাবে, তাই আমার দুতো করে—। এ তোকেই নিতে হবে।'

আমি খুব গম্ভীরভাবে বললাম, 'কোনো মেয়ের বিয়ের পরে যদি আইনবুড়ো ভাতের শাড়িফাড়ি আসে, সেটা তার বোনের হয়ে যায়, এটাই আইন বুঝি?'

দিদি বোধহয় আমার গাম্ভীর্যে একটু ভয় পেলো। চিরদিনই দিদি আমাকে ভয় করে।

একটু নরম হয়ে বললো, 'ওর কথা আমি সব বুঝতে পারি।'

'কচু পারো। ঢেঁকি পারো। আমার নিতে দায়।'

বলে আমি উঠে চলে গেলাম।

মনে একটা অশান্তি চেপে এলো।

যদি বা দিদির মধ্যেকার আগুনটা একটু নিভে এসেছিল, আবার যেন জ্বালা হলো। মরতে ওই অপয়া শাড়িখানা বার করলাম। মায়ের আলমারিতে পড়ে পড়ে পচতো। ওটাই যেন বারবার মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। আবার এখন কী হয় কে জানে। নেভা আগুন জ্বলে উঠলে মুস্কিল আছে।

ভাবলাম যতো অনর্থের মূল ওই শাড়িখানাকে সকলের চোখছাড়া করে সরিয়ে রেখে দেব, কারুরই পরে কাজ নেই। ওটা অপয়া। একটু পরে ঘরে এসে দেখলাম দিদি শাড়িখানাকে গুছিয়ে ওর তাকের উপর রেখে দিয়েছে।

বাবার মৃত্যুর বিনিময়ে, আমার এই মূল্যবান 'জীবনটা'কে আরো কিছু দিন চিনে নিয়ে ফেলতে পারা গিয়েছিল।

গোলেমালে দিন যাচ্ছে, মাথার ওপর কার ছাতা সরে গেছে, মেয়ের বিয়ের কথা কে চিন্তা করে?

কিন্তু ওই দোহাই দিয়ে তো আর মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে কুড়ি বছরের করে ঘরে রেখে দেওয়া যায় না? জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়স্বজন, এঁদেরকেও তো স্বস্তি শান্তি দিতে হবে?

আগে যা করতেন বাবাই করতেন, আর সত্যি বলতে আমার বিয়ের জন্যে কিছু করেনও নি। যদিও সবাই বলেছে, 'একসঙ্গে দুই মেয়ের পাত্র খোঁজো।'

এখন বাবার করণীয় কাজটি যেন সকলেরই দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। প্রায়ই কেউ-না-কেউ 'সম্বন্ধ' নিয়ে আসছেন আমার জন্যে।

মামারা, পিসিরা, মেসো-মাসিরা।

এমন কি 'ও বাড়ির' জ্যাঠামশাইরাও। যাঁরা বলেছিলেন, ন্যাড়ার শেষকৃত্যটা হয়ে যাক, আর এবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোবো না।'

তাঁরাও পাত্রের সন্ধান আনছেন চৌকাঠ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে।'

কিন্তু এমনি আমার কপাল, একটাও লাগছে না। মেজদার কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না।

অথচ মেজদাই এখন বাড়ির কর্তা, তার মতামতকে মূল্য দিতে হবে। মেজদা যে আমার সম্পর্কে এতো ভাবে, তা আগে জানতাম না। এখন শুনে শুনে অবাক হয়ে যাই।

দিদি যেমন, বিয়ে সম্পর্কিত কোনো কথা উঠলেই লজ্জায় লাল হয়ে সেখান থেকে পালাতো, আমার তো আর সে বালাই নেই? আমি দিব্যি গাঁট হয়ে বসে থাকতাম ঘটনাস্থলে। এবং সবই শুনতাম।

মেজদা মাকে বলতো, 'ওই বাড়িতে বিয়ে? কর্তাদের গলায় কণ্ঠী! রাম রাম, বলতো, 'নগদ চেয়েছে দু হাজার? বলে দিও ইতরের বাড়ি আমরা কাজ করি না।'

মা একদিন রেগে উঠলেন এই তো সেদিন সুনীর বিয়েতে দেওয়া হলো দেড় হাজার দু হাজার টাকা নগদ, এক্ষুনি আমরা কী একেবারে 'মহৎ' হয়ে গেলাম যে, অতো বড় কথাটা মুখ দিয়ে বার করবো?'

মেজদা মার দিকে একটু তাকিয়ে বললো, 'সুনীর বিয়েতে নগদ দেওয়া হয়েছিল? জানতাম না।'

মা তো বলেই বুঝতে পেরেছেন কথাটা ফাঁস হয়ে গেল। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, তোর দাদার ভয়েই একটু চাপতে হয়েছিল।'

মেজদা গম্ভীর গলায় বললো, ওই চাপার অভ্যেসটা ছাড়ো মা। কেউ কোনো কারণেই তোমায় ফাঁসি দেবে না। যা সত্যি, তাই জোরের সঙ্গে বলতে শেখো। তা থেকে তোমার শুভ হোক আর অশুভ হোক।'

মা রাগ করে উঠে গেলেন।

ও ঘরে গিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে গজ-গজ করতে লাগলেন, তার মানে বোনের বিয়ে দেবার গরজ নেই। তবে যা ধিঙ্গী নাচুনী বোনকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পিকেটিং করাগে যা, পুলিশে ধরুক, জেলে যাক।'

মেজদা শুনতে পেয়ে একটু হেসে উঠলো। বললো, 'জেলখানাটা শ্বশুরবাড়ির থেকে এমন কিছু খারাপ জায়গা নয়। কি রে সুনী, কী বলিস?'

দিদি বললো, ঠিক বলেছো মেজদা।'

দিদি এখন প্রায়ই মেজদাকে তুমি করে কথা বলে। ওর শ্বশুরবাড়িতে নাকি ভাই-বোনের মধ্যেও 'তুই' বলা নেই। সহবৎ শিক্ষাটা নাকি ওদের খুব বেশী। দিদি তাই যখন-তখন বলে, আমার শ্বশুরবাড়িতে

বাবা এটি হবার জো নেই। আমার শ্বশুর-বাড়িতে বাবা এ হলে রক্ষে থাকবে না।'

তবু কিনা আমার একটা 'সম্বন্ধ'র ব্যাপারে বলে বসলো কিনা, 'তোমার বোনেদের মত পাঁচ-সাতটা করে তো মেয়ে নয় মা তোমার। মাত্র দুটি। তার একটাকে তো জলে ফেলে দিয়েছো, আর একটাকেও তাই দিতে চাও?'

সম্বন্ধটা এনেছিলেন বড়মামী।

ওঁর বাপের বাড়ির দিকের কে যেন। খুব নাকি বড়লোক. বাড়িতে ঝি চাকরের গুণতি নেই, পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাবে বৌ দোষের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ।

বড়মামী অবহেলায় বলেছেন, 'ওই শুনতেই দোজবরে, বিয়েটা হয়েছিল মাত্র, ঘর-বসতের আগেই বৌ মরেছে। তারপর করবো না করবো না করে এই এতো দিনে মত হয়েছে।'

মা সাহস করে বলে ফেলেছিলেন, 'কিন্তু বড়বৌ দোজবরেয় তোমার ননদাইয়ের বড় ঘেন্না ছিল।'

বড়মামী একটু থতমত খেয়েই দৃঢ় স্বরে বললেন, 'তা তিনি কি আর স্বর্গ থেকে চোখ পেতে বসে আছেন ঠাকুরঝি, ওরা কী করছে না করছে দেখতে? আর যদি থাকেনও, অবস্থাটা বুঝবেন। মেয়েটির তো তোমার মেঘে মেঘে কেলা বড় কম যায় নি? একবরে বরের সঙ্গে মানাবে আর? আর একবরে হলে ওরা আমাদের ঘরের মেয়ে নিতে আসতো?

বড়মামী অনেক যুক্তির জাল ফেলে মাকে যখন প্রায় জল থেকে ডাঙায় তুলে রেখে হৃষ্টচিত্ত চলে গেলেন তখন মেজদা ওই কথা বললো।

মা বললেন, 'সুনীকে জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে?'

'আমার তো তাই ধারণা।'

'ওর বিয়ে তিনি নিজে দেখে-শুনে করেছিলেন বিনু—'

মেজদা বললো, 'শুনেছি তো তোমাদের ভগবানেরও মাঝে মাঝে ভুল হয়,—মানুষেরও হতে পারে।'

'তোর সব তাতেই ভাল ঠোকা—' বলে মা রাগ দেখিয়ে চলে গেলেন।

মেজদার কথার সত্যতার প্রমাণ মা কোনো দিন পান নি, পেয়েছিলাম আমি।

আর হয়তো দিদি অহরহই পাচ্ছিলো।

কিন্তু মেজদা কী করে আগেই জানতে পারলো?

সে দিন একটা অদ্ভুত দিন ছিল।

যদিও বাবা নেই, দাদা ফেরে নি, বাড়ির আবহাওয়া এখনো পর্যন্ত সাংঘাতিক। তবু প্রথা পালনের ব্যাপারে মার ভুল হবার জো নেই।

জামাই ষষ্ঠী বলে মা জামাইবাবুকে নেমন্তন্ন করে আনিয়ে ছিলেন। আর দিদি তো রয়েছে।

মা রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত, দিদি জোগাড় দিচ্ছে সমানেই, কারণ দিদি নাকি এর মধ্যেই অনেক সব রান্না শিখেছে। তাছাড়া জামাইবাবু কেমন ঝালটি কেমন নুনটি খান, সেটা বাৎলেও দিচ্ছে।

আমাকে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন ছাতের ঘরে ওদের বিছানা পাততে।

দাদার ঘরটা বইয়ে বোঝাই, পোড়ো পোড়ো, ওটায় মেজদা শোবে একটা রাতের জন্যে, মেজদার ঘরে দিদিজামাইবাবু শোবে। মা আমায় নানা ডিরেকশনও দিয়েছেন, যেমন আলমারী খুঁজে সব থেকে ভালো বিছানার চাদর, ঝালর দেওয়া ওয়াড় এসব বার করে নিয়ে তো কাজে লাগাবোই, তাছাড়া বিছানায় সামান্য করে অগরু সেন্ট ছড়াতে হবে, কাচের গ্লাসে জল রাখতে হবে ঢাকা দিয়ে।

মাথার কাছে হাতপাখা আর পায়ের কাছে পাপোস রাখতে হবে।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'পাখা কী হবে? ফ্যান রয়েছে তো।'

মা চাপা গলায় বললেন, 'তো হোক। ওটা নিয়ম। ঝালর দেওয়া একখানা পাখা জামাইয়ের বিছানায় রাখতেই হয়।

কেন?

তা কে জানে।

চিরকাল যা হয়ে আসছে তা হবে না? মার বেলায় হয় নি? তাঁর মার বেলায়? তাঁর শাশুড়ী ননদ জা জাল্লী ভাসুরঝি কার বেলাতেই বা না হয়েছে?

তখন পাখা ছিল না?

তাতে কী? ওতো বিলিতি জিনিস। তালপাতার পাখাই হলো আসল।

তবে?

আসল' বাদ দিয়ে কাজ হয়? মায়ের দিশী-বিলিতির হিসেব দেখলে মোহিত হতে হয়।

যাক, ওই পর্বের আরও একটি দরকারী উপকরণ আছে, সেটা হচ্ছে জলের গ্লাসের কাছে এক ডিবে পান।

এই সব সেরে যখন ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখছি ঠিক হলো কিনা। হঠাৎ ফস করে ঘরের আলোটা নিভে গেল।

এ মা!

ভাবলাম বাল্ব্টা ফিউজ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি। মার এতো সাধের জামাই-এর ঘরের বারোটাই এ চিন্তা মুহূর্তের, অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই দুটো সবল হাত আমায় জাপটে ধরলো সেই অন্ধকারের মধ্যে।

এর মানে!

ইহজীবনে এমন দুর্ঘটনায় পড়া তো দূরের কথা পড়ার আশঙ্কা দুশ্চিন্তাতেও আসেনি। অবশ্যই চিৎকার করে উঠবো 'কে?'

বেশ তীক্ষ্ণই হয়েছিল চিৎকারটা।

তার পরই মুখের ওপর একটা হাত চাপা পড়লো।

তখন এমন সিনেমার ঘটা ছিল না।

ছবিতে দুর্বৃত্তের দুষ্কর্ম দেখবার অভিজ্ঞতাও ছিল না। (যেমন এ যুগের মেয়েদের হয় হচ্ছে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতারই সঞ্চয় হচ্ছে, এদের!) তবু সহজাত অনুভূতিই লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ালো।

আলো জ্বাললাম।

দেখলাম জামাইবাবু।

কপালের একটা পাশ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে। খাটের বাজুতে ঠুকে গেছে বোধ হয় ঠাঁই করে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম 'এর মানে?'

জামাইবাবু মিহি সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা ঘসে দেখলো রক্তপাত হয়েছে কিনা। তারপর রুমালটা পকেটে পুরে ছাবলা হাসি হেসে বলে উঠলো, 'যাক। রক্তপাতটা ঘটে নি। এই ষষ্ঠীর দিনে সেটা হলে শাশুড়ী ঠাকরুণ অপস্তেন।'

আমি রুদ্ধ গলায় বললাম 'আপনি এতো ছোটলোক?'

জামাইবাবু বলে উঠলো, 'বাঃ! ঐ যে দেখছি সিংহিনী! শালির সঙ্গে একটু মস্করা করারও জো নেই? শালি না মাসশাশুড়ী বাবা!'

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসবো, ও দরজার দুটো পাল্লায় দুটো হাত দিয়ে আগলে দাঁড়িয়ে বললো, 'মাইরী ভাই তুই বড় বেরসিক।'

ছাতটা অন্ধকার ছিল, ছোটখাটো রূপের সিঁদটা যে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল জানি না, জামাইবাবুর হাতের তলা দিয়ে কখন ঢুকে এলো, দেখতে পেলাম।

সমস্ত পরিস্থিতিটায় একবার চোখ বুলিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো 'চেঁচাচ্ছি কেনরে বুচি?'

'জিগ্যেস কর তোর বরকে।...সরুন, যেতে দিন।'

নবকল্লি

অভিজাত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ চলছে। বার্ষিক চাঁদা ২৲

বিশেষ শারদীয়া সংকলন মহালয়ার আগে প্রকাশিত হবে। মূল্য এক টাকা। বিশেষ সংখ্যার জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত দিতে হয় না। নামী ও অনামী লেখকদের বিচিত্র রচনাসম্ভারে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ হবে।

পরবর্তী পৌষ সংখ্যা বিশেষ ভ্রমণ সংকলন রূপে প্রকাশিত হবে। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০শে আশ্বিন।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পেতে গ্রাহক চাঁদা পাঠান।

সম্পাদক—শ্রীননীগোপাল দত্ত

ফ্ল্যাট—জি/৪ এল আই. জি

৩৭, বেলগাছিয়া রোড কলি-৩৭

সব স্টলে পাওয়া যায়

ও কিন্তু নড়লো না।

দিদির মত তো বেঁটে নই যে হাতের তলা দিয়ে চলে যাবো। বেঁটে হলেও যেতাম না। হাতটাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু লোকটাকে ছুঁতে প্রবৃত্তি হলো না। তাছাড়া পুরুষ স্পর্শ সম্পর্কে এমন একটা সংস্কার মা সেই বালাকাল থেকে মজ্জার মধ্যে বদ্ধমূল করে রেখেছেন যে, চট করে ওটা পেরে ওঠা যায় না।

জামাইবাবু না নড়ে বললো, 'তোমার এই কোমরটার না রসিকতা জ্ঞান একেবারে নেই বুঝলে?'

দিদি তীব্র গলায় বললো, 'কী রসিকতাটি করতে যাওয়া হয়েছিল শুনি?'

বেহায়া লোকটা হ্যা হ্যা করে বললো, কিছুই নয় বাবা, হঠাৎ ফস করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছিলাম। বাস অমনি আঁৎকে উঠে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে—'

'আপনি সরবেন?'

বললাম কঠোর গলায়।

কী জানি কী ভেবে সরে দাঁড়ালো। আর বলে উঠলো, 'আর যা করিস করিস ভাই, তোদের ওই মেজদাকে যেন লাগিয়ে দিস নি। ওকে আমার বড্ড ভয়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনি আমায় তুই বলতে আসবেন না।'

চলে আসতে আসতে দিদির গলা শুনতে পেলাম আগুন-ঝরা কান্নার গলায় বলছে, 'ভেবেছিলাম মাকে আর এখন এই মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেবো না, দিতেই হবে। আমি তোমার মুখ পুড়িয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরবো মরবো মরবো।'

নেমে এসে ভাবলাম, আচমকা আক্রমণে চেঁচিয়ে ওঠা মানুষের স্বভাবজাত, তাই ওটা হয়ে গেলো। না হলে বাছাধনকে এমন শিক্ষা দিয়ে দিতাম যে চিরদিন মনে থাকতো। এ আবার এক গেরো হলো।

দিদির ঘাড় থেকে সেই 'গলায় দড়ি' ভূতটা নেমেছিল বলে হচ্ছিল, সেটা আবার ঘাড়ে চেপে বসলো যে দেখছি।

তখনকার থেকে একটু পার্থক্য আছে, এই যা।

তখন প্রেমে হতাশ হয়ে অভিমানে মরতে চেয়েছিল, এখন 'প্রেমাস্পদের' বিশ্বাসঘাতকতায় অপমানে হিংস্র হয়ে তার মুখ পোড়াতে মরতে চাইছে। এটা অনেক তীব্র।

অভিমানটা যদি হোমিওপ্যাথি ডোজ তো 'অপমান'টা কবিরাজী।

বলবো না, কাউকেই, মাকেও নয়, মেজদাকেও নয়। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবলাম, ওই সুকান্তি চেহারার মধ্যে যে এই ইতরতা আর বদমাইসী লুকনো রয়েছে মেজদা এটা জানলো কী করে!

ঘরে [illegible] বললাম।

[illegible] পেলাম, 'রুচি এক-বার এদি[illegible]।'

ক্লান্ত বিষণ্ণ গলা।

এটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

মার ডাক মানেই ক্লান্ত বিষণ্ণ ভেঙে-পড়া।

মা এখনো ঝিয়ের সঙ্গে বকাবকি করেন, বাসন মাজা ভাল হওয়া না হওয়া নিয়ে, কিন্তু ওই সুরে। বলেন, 'আমায় তুমি একটু দয়া করো বাছা! চেঁচাবার ক্ষমতা আর নেই আমার।'

আমি ভাবি, তার থেকে মা যদি এই-গুলো দেখা ছেড়ে দিতেন।

'বাবা নেই, বাবা মারা গেছেন' অদ্ভুত এই শব্দটার সঙ্গে ওইগুলো মেলাতে পারি না। ওই বাসন ঝকঝকে না হওয়া, কড়ায় পোড়ার কালি থাকা। অথচ ওগুলো আছে, থাকবে। অমোঘ অপরিহার্য আইনে।

সাড়া না দিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মা বললেন, 'সুনীটা একটু সাহায্য করছিল, হঠাৎ কোথায় যে গেল!'

গম্ভীরভাবে বললাম, 'দিদির [illegible] ধরেছে।'

'ওমা! এই তো কতো উৎসাহ করে এটা-ওটা করছিল, কখন আবার [illegible] ধরলো। সবই আমার কপাল! তা তুই একটু দেখে দ্যাখ দিকি মালাইকারিটায় নুন বেশী হয়ে গেল কিনা।'

বেশ উদ্বিগ্ন দেখালো মাকে।

আমার খুব অবাক লাগে।

সত্যি খুব অবাক লাগে।

অথচ এইটা তো আর ভাবতে পারি না, বাবা যাওয়ার যতো কষ্ট আমারই হয়েছে, মার হয় নি।

মার মুখের দিকে এবার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'হয়ে থাকলে হয়েছে। আর কী করবার আছে? তোমার হাতে ও ঠিকই হয়েছে।'

'শোনো কথা! মনটা শান্তি হওয়া দরকার নেই?' মা বললেন, 'নুন খর হলে একটু দই দিয়ে দেব।'

বসে পড়লাম।

নিজস্ব ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যে দয়ারামের প্রতিশ্রুতি...

এবার পূজায়
অভিনব শাড়ীর
বিরাট সম্ভার

সেই একই বৈশিষ্ট্যে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের অপরূপ সমন্বয়!

আজই আসুন!

দয়ারাম এণ্ড কোং
(শাড়ীর রাজা)
জি ১৫, নিউ মার্কেট,
কলিকাতা-১৩
ফোন ঃ ২৪-১৪৫০ গ্রাঃ রেশমকুটি

বললাম, মা, এখনো তোমার এসব ইচ্ছে করে?'

মা বোধহয় কথার সুরটায় ঠিক কান দেননি. পটলের দোলমার মধ্যে পুর ভরতে ভরতে অন্যমনাভাবে বলেন, 'কী সব?'

'এই যে. জামাই নেমন্তন্ন করা, মালাই-কারী নিখুঁত হওয়া, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধা—ইচ্ছে করে এখনও? ভালো লাগে?'

মা হঠাৎ দুই হাঁটুর মধ্যে মাথাটা গুঁজে চাপা গলায় ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'ইচ্ছে না করলেই বা উপায় কী অমন্ত? সব বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তিনি তো বাজার মতো চলে গেলেন। বুক ছিঁড়ে গেলেও করতে হবে অগত্যায় এসব—'

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন মা।

খুবই অপ্রতিভ লাগলো।

এতো বড় কঠিন কথাটা মাকে বলে ফেলা উচিত হয় নি। এটা হয়তো কিছুক্ষণ আগের রাগের ঘেন্নার আর অপমানের জ্বালার প্রতিক্রিয়া। সেই ছোটলোকটার জন্যে এতো আয়োজন দেখে সারা শরীরে লঙ্কা বাটার ঝাল জ্বলে উঠলো।

একটু থেমে নরম হয়ে বললাম, বোঝাটা একটু কমাবার চেষ্টা করলেও তো পারো মা। এতো কেন? একটা লোকের জন্যে এতো কিসের?'

মা অসহায় গলায় বললেন, নতুন জামাই! এই প্রথম জামাইষষ্ঠী!'

'চুলোয় যাক ওসব। যা না করলে নয় সেইটুকুই শুধু করবে। বাবা এতো ভালবাসতেন পটলের দোলমা, আর তুমি একটা বাজে লোকের জন্যে—'

আমার মুখ দিয়ে এরকম ভাবপ্রবণ কথা বেরিয়ে পড়তে পারে স্বপ্নেও ভাবি নি

কী যে হলো আজ।

কোথায় ভাবছিলাম মাকে অতোটা কঠিন কথা বলা উচিত হয়নি, আবার তার বেশী বললাম। মড়ার ওপর ঘাঁড়ার ঘা তো আমিই দিলাম।

মার হিসেবের খাতায় 'যা না করলে নয়' এর তালিকাতেই এই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। সে হিসেবের খাতায় সব কিছুই 'না করলে নয়।'

এই সংস্কারের পাশ থেকে কে মুক্ত করবে মাকে?

স্বয়ং যমরাজেরই যখন সাধ্য হলো না।

সব থেকে বড় হাতুড়িটা বসিয়ে দিয়েও তো এই সংস্কারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারলেন না ভদ্রলোক। ওই 'করণীয় কর্তব্যে'র দায়িত্ব বোধ সিন্ধবাদের বুড়োর মতো চেপেই থাকবে মার মাথায়। মা এক ধারে কাঁদবেন, আর এক ধারে সব কিছু করে চলবেন।

মা বৈশাখে তুলসী গাছে ঝারা দেবেন, জ্যৈষ্ঠতে ষষ্ঠিকাটার ষোড়শোপচার সাজাবেন, আষাঢ়ে স্নানযাত্রা রথযাত্রার পুজো পাঠাতে একে-ওকে খোসামোদ করবেন, শ্রাবণে পাঁচ পঞ্চমী আর ভাদ্রে মনসা পুজোয় 'অরন্ধনের' ঘটা করবেন যথারীতি। মার বারো মাস্যার ইতু মঙ্গলচণ্ডী নবান্ন 'বড়ি হাত' পৌষ পার্বণ কিছুটি বাদ যাবে না।

কারণ মা জানেন ওইগুলোই হচ্ছে সংসারের মঙ্গল লক্ষণ।

সংসারের যিনি মূল তিনি পক্ষাঘাতে, বাড়ির বড় ছেলে জেলখানায়, ঝাড়ির একটা মেয়ে ভিন্নগোত্র হয়ে গিয়ে অন্যের সংসারের মঙ্গল কল্যাণের অংশ ভাগ পাচ্ছে, আর অন্য মেয়েটা নাকি 'অরক্ষণীয়া' হয়ে গিয়ে 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে পড়ে আছে, তবু মা সংসারের মঙ্গল করছেন মরে মরে কেঁদে কেঁদে।

বিদ্রোহ করে বলে ওঠবার সাহস নেই মার, 'এসব আর কেন? কি জন্যে এই অনর্থক বোঝা বয়ে মরছি আমি?'

ঘরে এসে অনেক দিন পরে বাবার জন্যে খুব কাঁদলাম পড়ে পড়ে।

কোথা দিয়ে সন্ধ্যেটা কেটে গেল কে জানে।

এক সময় মার গলা পেলাম, 'তবে যে রুচি বললো, 'তোর মাথা ধরেছে?'

এ প্রশ্নটা অবশ্যই দিদিকে।

তার মানে দিদি আবার 'ঠিকঠাক' হয়ে নেমে এসেছে।

দিদি বললো, 'মাথাতো রুচিরই ধরেছে। ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে।'

মার সেই হতাশ ক্লান্ত স্বর শোনা গেল।

'ওই মেয়েকে নিয়ে যে আমি কী করবো!'

সত্যি আমায় নিয়ে মার খুব জ্বালা বুঝতে পারছি।

এর পর আমার জীবনে এক আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটলো।

(ক্রমশঃ)

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পুজোর আগেই। এই সংখ্যাটি দুভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রামমোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত। মূল্য ৩ টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

• মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : পুলেপন্দু লাহিড়ী • ট্রাজেডির নায়ক : জীবনকৃষ্ণ শেঠ • বাংলা আধুনিক কবিতার মর্মসন্ধান : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ : সঞ্জীত গঙ্গোপাধ্যায় • মোদন্ত এলোকেশী সংবাদ : যূথিকা বসু •

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র : রামমোহন রায় ॥

• বেদান্তদর্শন ও রামমোহন : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য • অষ্টাদশ শতক রামমোহন এবং যুক্তিবাদ : নির্মল ঘোষ • বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন : ভূদেব চৌধুরী • নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন : কুমুদ ভট্টাচার্য • বেদান্তসারের তাৎপর্য ও রামমোহন : দিলীপকুমার নন্দী • এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

॥ বিশেষ রচনা ॥

বাঙ্গালি মুসলমানদের সাময়িক পত্র—সাধনা (১৮৩১-১৯৩০) এটি লিখেছেন মুস্তফা নুরউল ইসলাম। একশো বছরের মুসলমান সম্পাদিত দেড়শোটি পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংকলন। ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নি।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

এই আমাদের দেশ

কলকাতা—(২)

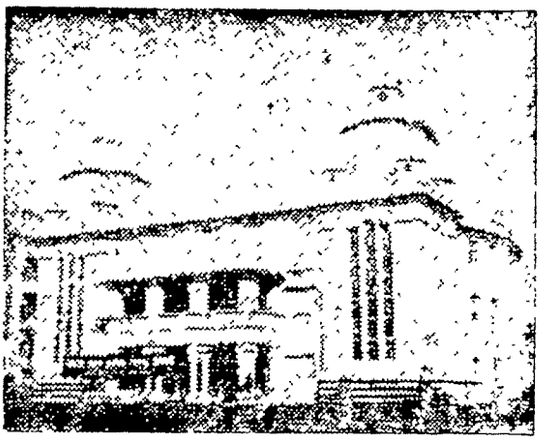

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই কলকাতা রাজধানী শহর। একশ চল্লিশ বছর বৃটিশ ভারতের রাজধানী থাকার পর বিগত ষাট বছরের অধিককাল এই শহর বাঙলার প্রাণকেন্দ্র। তদুপরি কলকাতা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম ও সারা ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ভারতের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার চল্লিশ শতাংশ আসে এই বন্দর দিয়ে—রপ্তানি করা পণ্যের বিনিময়ে। সারা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্য রাজনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়ুকেন্দ্র এই বিশাল মহানগরী।

নগরীর পঁয়ত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল স্থানে সত্তর লক্ষ লোকের বাস, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে বাস দু-লক্ষ লোকের। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে তিনটি। মেডিক্যাল কলেজ আছে চারটি, অন্যান্য কলেজ আছে প্রায় একশ। ভোর হওয়ার আগেই শহর কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে মধ্যরাত্রেও নিস্তব্ধতা ফিরে আসে না। শহরের সর্বত্র সর্বদা চলমান গণস্রোত। দুই দশকের ব্যবধানে পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে অন্তত দশ গুণ, তবু কোথাও মাল্লীবাহী গাড়ির পা-দানিতেও পা রাখার ঠাঁই মেলে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলতে চায়—কিন্তু পথের বাধার নিরুপায় হয়ে হা-হুতাশ করে। পাশাপাশি ছ সারি গাড়ি চলার পথও এখন কলকাতার গতির তুলনায় অতি সংকীর্ণ। তাই এখন শহরের বুকের ভার কমাতে সুড়ঙ্গ পথের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সুড়ঙ্গ পথের কাজ যখন শেষ হবে তখন বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা হবে কোটির কাছাকাছি পৌঁছাবে। আর ঐ বিশাল জনসমুদ্রের একটি সংকীর্ণ স্রোতধারাও যদি সেদিন সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে—তবে সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করা হবে।

দ্রুত বর্ধিষ্ণু কলকাতা শহরের বর্তমানে এইটিই বৃহত্তম সমস্যা। তার বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে কোন ব্যবস্থাই সম্প্রসারিত হতে পারছে না। দশ বারোতলা বাড়িতে শহর ছেয়ে যাচ্ছে কিন্তু মানুষ মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছে না, এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু হাজার হাজার ছেলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, এতগুলি মেডিকেল কলেজ ও বড় বড় হাসপাতাল কিন্তু শত ছোটাছুটি করেও কোথাও একটা বেড জোটে না। সর্বত্র কর্মচঞ্চলতাও মজুর কাজ সৃষ্টির ব্যাপক উদ্যোগ, তবু কাজের অভাবে ঘরে ঘরে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

১৯৭১ সালের জনগণনার হিসাবে প্রকাশ, কলকাতার ৭০ লক্ষ ৫ হাজার লোকের মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির আনুপাতিক সংখ্যা ৫৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ৪১ লক্ষ ১৮ হাজার পুরুষের মধ্যে শতকরা ৬২--৫৪ ও ২৮ লক্ষ ৮৮ হাজার নারীর মধ্যে ৫০-৪৮ শতাংশ শিক্ষিত। এটা নিশ্চয়ই এই শহরের পক্ষে গৌরবের কথা নয়। এই শহরের ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার লোক (যা মুর্শিদাবাদ জেলার লোকসংখ্যার সমান) নিরক্ষর এটা প্রায় কল্পনাই করা যায় না। বহিরাগতরা নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়িয়েছে এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়, কারণ মোটামুটি হিসাবে দেখা গেছে যে বহিরাগতদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি সাক্ষর। কলকাতায় বহিরাগতদের মধ্যে নিরক্ষরতা সবচেয়ে বেশি ঊর্দুভাষীদের মধ্যে, তার পরেই নিরক্ষরতা বেশি দেশ-বিভাগের পর আগত উদ্বাস্তু নরনারীদের মধ্যে। ১৯৬১ সালে কলকাতায় উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ২৮ হাজার।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শহরের শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি বলেই নিরক্ষরের সংখ্যা এইভাবে বেড়ে চলেছে। কোন যাদুমন্ত্রেই কলকাতার প্রায় ত্রিশ লক্ষ নিরক্ষরকে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। ফলে নিরক্ষরদের ঘরে নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং '৮১ সালের জনগণনার হয়ত দেখা যাবে যে কলকাতায় নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের কাছে পৌঁছেছে।

শিল্প উদ্যোগ ও কর্মসংস্থান

শহরে শ্রমজীবীর সংখ্যা ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮২৯। তার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৫৩ ও নারীর সংখ্যা ৭১ হাজার ৭৫৬। প্রায় সিমেন্টে বাঁধানো কলকাতা শহরে কৃষিজীবীও আছেন কয়েক-শ জন। '৭১ সালের গণনা অনুসারে কলকাতায় কৃষকের সংখ্যা ২১০, যার মধ্যে নারী ১৬ জন এছাড়া কৃষি-মজুর আছেন ১৭৩১ জন যার মধ্যে নারীর সংখ্যা ১৫৪। পুরুষদের মধ্যে ৫৬-১৫ শতাংশ ও নারীদের ৫-৮৬ শতাংশ কাজ করে কারখানায়, শিক্ষা বা সেবা প্রতিষ্ঠানে অথবা অফিস-আদালতে কাজ করে থাকেন।

কলকাতা একটি বৃহৎ এলাকা জুড়ে এখানকার জলদরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহণ, পৌরসভা হাসপাতাল, পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতি সব প্রতিষ্ঠানই বিরাট এবং সর্বত্রই কাজের অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে। ডাক্তার নার্স ও হাসপাতাল কর্মীরূপে, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অশিক্ষক কর্মচারীরূপে, উকিল, ব্যারিস্টার ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগর রূপে এই শহরে সর্বাধিক লোক জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

এছাড়া আছে ব্যাঙ্ক, বীমা ও সওদাগরি অফিসগুলি, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাদের উদ্ভব। সমগ্র পূর্ব ভারতের সব বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর কলকাতায় এবং তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির উপরেই কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অফিসগুলিও কলকাতার অন্যতম বৃহৎ কর্মকেন্দ্র।

শিল্প উৎপাদনেও কলকাতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১-৬২ সালের হিসাবে দেখা যায়, ঐ বছর বৃহৎ শিল্পজাত পণ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গের যে ১৯০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল তাতে কলকাতা এলাকায় অবস্থিত বৃহৎ শিল্পের অবদান ছিল ২৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, যা মোট আয়ের ১৫-০১ শতাংশ। এ ব্যাপারে কলকাতার স্থান ছিল চব্বিশ পরগণা ও হাওড়ার পরে। চব্বিশ পরগণা (৪৩ শতাংশ) হাওড়া (১৭-৭৬ শতাংশ), কলকাতা (১৫-০১ শতাংশ), বর্ধমান (১১-০১ শতাংশ) ও হুগলী (১০-৯১ শতাংশ)—এই পাঁচটি জেলাতেই পশ্চিম বঙ্গের বৃহৎ শিল্পের শতকরা ৯৮-১৫ ভাগ অবস্থিত। কলকাতার বৃহৎ শিল্পের মধ্যে প্রধান হল ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প। তাছাড়া আছে হোসিয়ারী, প্রকাশন, রাসায়নিক, ওষুধ প্রভৃতির

সেন্টপলস ক্যাথিড্রাল

কারখানা। এছাড়া আছে গংগা তীরে ডক এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের কারখানা।

ক্ষুদ্র শিল্পেও কলকাতার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১-৬২ সালে ক্ষুদ্র শিল্প থেকে পশ্চিমবঙ্গের আয় হয়েছিল ৪৭ কোটি টাকা। তাতে কলকাতার অবদান ছিল চার কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট আয়ের ১-৬০ শতাংশ। এক্ষেত্রে জেলাগুলির মধ্যে কলকাতার স্থান ছিল তৃতীয়, চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের পরে।

শিল্পক্ষেত্রে কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গের মূল শিল্পাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে বজবজ থেকে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত গংগার দুই তীর ধরে বিস্তৃত যে শিল্পাঞ্চল তা অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই শিল্পাঞ্চল। বর্ধমানের দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলও কলকাতা-কেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের সংগে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। এর বাইরে পশ্চিমবংগ শিল্প তৎপরতা বলতে যা আছে তা হল উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকা। তারও সংগে কলকাতার নাড়ির বন্ধন। এইজন্যই দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে যে ৭৬৫টি ব্যাংক অফিস ছিল তার মধ্যে ২৯৩টি ছিল, কলকাতায়। আর সারা পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংক যে ১০৭৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছিল তার মধ্যে শুধু কলকাতার বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পেয়েছিল ৭৬০ কোটি টাকা। এমন কি ব্যাংক যে কৃষি-ঋণ দেয় তারও বৃহৎ অংশ পায় কলকাতা। কারণ কৃষি ঋণের বেশির ভাগ পায় উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলি, যার প্রায় সবকটির হেড অফিস কলকাতায়। বৃহৎ কলকাতার শিল্পাঞ্চলের শতকরা ৬১জন শ্রমিক অবাঙালি। সেকারণে কলকাতা থেকে প্রতি বছর শুধু ডাকে ২৮ কোটি টাকা অন্যান্য রাজ্যে প্রেরিত হয়। এছাড়া লোক মারফৎ যায় প্রায় সমপরিমাণ টাকা।

বন্দরই ভরসা

বন্দর রূপেই কলকাতার সূচনা এবং বন্দর হিসাবেই তার সমস্যা ভবিষ্যৎ। একদা বৃহত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দরের আজ সমস্যা ও সংকটের শেষ নেই। কিন্তু ভৌগোলিক ও ঐতিহ্যগত কারণে কলকাতা বন্দর এমন এক বিশেষ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যে কিছুতেই তার বিনাশ হবে না। কলকাতা যখন ভারতের রাজধানী ছিল, তখন এর লোকসংখ্যা নয় লক্ষও ছিল না। আর তার ষাট বছর বাদে আজ কলকাতার লোকসংখ্যা হয়েছে সত্তর লক্ষ। এই থেকেই বোঝা যাবে যে, কলকাতার গুরুত্ব রাজনৈতিক কারণে নয়, কলকাতার অন্তর্নিহিত শক্তি তার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।

ভারতের প্রাচীনতম বন্দর কোচিন, প্রাচীনত্বে কলকাতার স্থান তার পরেই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে জব চার্নকের কালে যার সূচনা, ভারত ইংরেজ অধিকার বিস্তারের সংগে সংগে তা সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হতে থাকে। কলকাতা বন্দরকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সুপরিচালনার জন্য ১৮৭০ সালের ১৭ অকটোবর পোর্ট কমিশন গঠিত হয়। ঐ সময় কলকাতা বন্দর দিয়ে দেশের অধিকাংশ পণ্য চলাচল করত। তারপর পেট্রোলিয়াম আনার প্রয়োজনে ১৮৮৬ সালে বজবজে একটি স্বতন্ত্র জেটি নির্মাণ করা হয়, ১৯৮৩ সালে হয় খিদিরপুরের ডক। এর পর ১৯২৫ সালে গার্ডেনরীচ এলাকায় পাঁচটি জেটি নির্মিত হয়। তখনই কলকাতা বন্দর দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ টন পণ্য চলাচল করত। কলকাতাকে কেন্দ্র ক'রে বাঙলা, আসাম, বিহার ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশের শিল্প বাড়ার সংগে সংগে কলকাতা বন্দরও বড় হতে থাকে।

কলকাতা বন্দরের প্রধান শক্তি তার বিস্তীর্ণ, বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমি (হিন্টার ল্যান্ড)। পূর্ব ও উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে কলকাতা বন্দরের পশ্চাদভূমি। আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, ত্রিপুরা নাগাভূমি, মিজোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা বিহার ও উত্তর প্রদেশের একমাত্র বন্দর কলকাতা। এই এলাকায় আছে ভারতের তিন-চতুর্থাংশ চা-বাগান কয়েকটি তৈল শোধনাগার, সবকটি লোহা ও ইস্পাত কারখানা, অর্ধেকের বেশি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ভারি শিল্প, সিমেন্ট কারখানা ও সবকটি পাটকল। কয়লাখনি এই এলাকার বাইরে যা আছে তা অনুল্লেখ্য। চব্বিশ পরগণা হাওড়া, হুগলী, খড়্গপুর, দুর্গাপুর বার্ণপুর, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন ধানবাদ, সিন্ধ্রি টাটানগর, রাউরকেলা ভিলাই, বোকারো, বারৌনি, রাঁচি ডিগবয় নুনমতি ও উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা বাগান—এই বিস্তীর্ণ এলাকার প্রাণকেন্দ্র বন্দর শহর কলকাতা। এই শিল্প এলাকার সব রপ্তানিযোগ্য পণ্য যায় কলকাতা বন্দর দিয়ে এবং এই এলাকার প্রয়োজনে বাইরে থেকে যা আসে তাও আসে কলকাতা বন্দর দিয়ে। ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী রাজ্য নেপাল ও ভুটানেরও সব লেনদেন কলকাতা বন্দর দিয়ে। সুতরাং পূর্ব ভারতের প্রায় বিশ কোটি লোক অধ্যুষিত এই এলাকার ক্ষতি না করে কলকাতার ক্ষতি করা সম্ভব নয়।

কিন্তু কলকাতা বন্দরের সমস্যা অন্য। কলকাতা সমুদ্র থেকে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত, নদী তীরবর্তী একটি বন্দর। ভারতের বৃহৎ বন্দরগুলির মধ্যে কলকাতাই একমাত্র সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর নয়। আবার যে হুগলী নদীর তীরে এই বন্দর গড়ে উঠেছে তার নাব্যতা রক্ষা করা কঠিন সমস্যা। নদীর ন্যূনতম গভীরতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সব সময় এর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়, পলিমুক্তির ব্যবস্থা করতে হয়। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ছয়টি ড্রেজার আছে বেগুলি অহরহ নদীতে পলি ক্যাটার কাজে লিপ্ত। তাতেও সম্পূর্ণ কাজ হয় না, কারণ নদীর অভ্যন্তরে কয়েকটি বড় বালির চর আছে, আর বেঁকও আছে কয়েকটি। সেজন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ পাইলট ছাড়া সমুদ্র থেকে কলকাতা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব নয়।

একদা কলকাতা বন্দরের গভীরতা (ড্রাফট) বছরে প্রায় ২০০ দিন পঁচিশ ফুট থাকতো। এখন খুব কমদিনই সে গভীরতা থাকে। একমাত্র ফরাক্কার জল এনে কলকাতা বন্দরের নতুন করে প্রাণসঞ্চার হতে পারে যা এই বছরের শেষে বা '৭৪ সালের গোড়ার আসার কথা। গংগার চল্লিশ হাজার কিউসেক জল যদি ভাগীরথীতে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা হয় তাহলে কলকাতা বন্দর সারা বছরই ২৬ ফুট গভীর থাকবে; তার মধ্যে আটাশ ফুট থাকবে প্রায় এক মাস ও উনত্রিশ ফুট থাকবে কয়েকদিন। সে সময় ছোট জাহাজে কলকাতা থেকে পাটনা, এলাহাবাদ পর্যন্ত মাল পরিবহণও সম্ভব হবে।

কিন্তু দিনে দিনে জাহাজের আকার বেড়ে যাচ্ছে। সব দেশেরই এখন চেষ্টা হচ্ছে এক জাহাজে বেশি মাল বহন করে পরিবহণ ব্যয় কমানো। বড় একটি তৈলবাহী জাহাজ এখন পাঁচ লক্ষ টনেরও হয়। ভারতের ট্যাঙ্কার জাহাজগুলিও এখন আশি হাজার টনের। এই আকারের একটি জাহাজ মাল বোঝাই হয়ে বন্দরে ঢুকতে গেলে বন্দরের গভীরতা চল্লিশ—বিয়াল্লিশ ফুট হওয়া দরকার। খনিজ পদার্থ বহনের একটি

ষাট হাজার টন জাহাজের জন্যও বন্দরের গভীরতা চাই ৩৭—৩৮ ফুট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ফরাক্কার জল এলেও কলকাতা বন্দর আধুনিক পরিবহনের গুরুদায়িত্ব বহনে সমর্থ হবে না। এই জন্যই আজ কলকাতা থেকে ছাপ্পান্ন মাইল নীচে হলদিয়ায় নতুন বন্দর গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়েছে। জাহাজ যত বড়ই হোক হলদিয়া বন্দরের জেটিতে ভিড়তে যাতে কোন অসুবিধা না হয় —সেইভাবে হলদিয়া বন্দরকে গড়ে তোলা হচ্ছে। ঠিক পরিকল্পনা মতো যদি কাজ হয় তবে হলদিয়া হবে ভারতের সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী বন্দর। কিন্তু তাতে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব লাঘব হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, কারণ হলদিয়া হবে কার্যত কলকাতার পরিপূরক বন্দর।

কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছে তার প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল আয়তনের পশ্চাদভূমির নিজস্ব প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। এই বন্দর দিয়ে বহির্দুনিয়ায় যায় পাট, চা, কয়লা, তুলো, চামড়া, ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্য। এইসব পণ্য নাড়া চাড়া করার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে এবং কলকাতা বন্দরের যাবতীয় ব্যবস্থা সেই অনুসারে গড়ে উঠেছে। এসব পণ্য পরিবহনের জাহাজও আলাদা। ওড়িশার পরাদীপ বন্দর যেমন তৈরি হয়েছে আকরিক লোহা রপ্তানির উপযোগী করে, হলদিয়া বন্দর যেমন গড়ে উঠছে বড় বড় জাহাজ চলাচলের উপযোগী করে, কলকাতা বন্দরও তেমনি তার পশ্চাদভূমির প্রয়োজন অনুসারে রূপ নিয়েছে। সুতরাং কলকাতা বন্দরের মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই। ভারতের পূর্বাঞ্চলই খনিজ, কৃষিজ ও শিল্পসম্পদে সর্বাধিক সমৃদ্ধ এবং কলকাতাই এই এলাকার একমাত্র বন্দর।

তাহলেও একথা জানা দরকার যে, কলকাতা বন্দরের এখন খুবই দুঃসময় চলেছে। ১৯৭০—৭১ সালে এই বন্দর দিয়ে মাত্র ষাট লক্ষ টন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়েছে, যা সম্প্রতি কয়েক বছরের হিসাবে ন্যূনতম পরিমাণ। পূর্ববর্তী দশ বছরের গড় হিসাবে দেখা যায়, সারা ভারতে যত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয়েছে তার ৫০-২ শতাংশ চলাচল করেছে কলকাতা বন্দর দিয়ে। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি হিসাবে দেশের পণ্য চলাচলের অর্ধেক কলকাতা বন্দর দিয়ে হয়েছে। কিন্তু ১৯৬৯—৭০ সালে ঐ পরিমাণ কমে হয় ৩১-৪ শতাংশ, এবং পরের বছর আরও কমে হয় মাত্র ২৩ শতাংশে।

এর অবশ্য অনেকগুলি কারণ দেখানো হয়। বলা হয় যে, আগে কলকাতা বন্দর দিয়ে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য আমদানি হত, খাদ্যে দেশ স্বয়ম্ভর হওয়ায় সে আমদানির প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তারপর তিনটি জাতীয় যোজনাকালে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনে বিদেশ থেকে যেসব যন্ত্রপাতি আমদানি করা হত তাও আর এখন করা হচ্ছে না। আর এর জন্য কলকাতা বন্দরই সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ শোধনাগার, সার কারখানা, ইস্পাত কারখানা প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পগুলির বেশির ভাগ কলকাতার পশ্চাদভূমিতেই গড়ে উঠেছে। বন্দরের গভীরতা কমে যাওয়ায় বড় জাহাজ কলকাতায় আসতে পারছে না। ১৯৭০—৭১ সালে ইঞ্জিনীয়রিং শিল্পে যে মন্দা দেখা দেয় এবং সাধারণভাবে এই রাজ্যে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘটে তারও ফলভোগ কলকাতা বন্দরকে করতে হয়েছে।

উল্লেখিত কোন কারণই অস্বীকার্য নয়। কিন্তু তাহলেও একথা সত্য যে কলকাতা পূর্ব ভারতের প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল স্থানের বিশ কোটি মানুষের একমাত্র বন্দর। তাদের সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই বন্দর দিয়েই আসবে এবং এই এলাকার সব রপ্তানি যোগ্য পণ্যও এই বন্দর দিয়েই যেতে হবে। সুতরাং বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতিতে সাময়িক সঙ্কট ঘটলেও তা কোন স্থায়ী ক্ষতি করতে পারবে না। ফরাক্কার জলে ভাগীরথীতে প্রাণের জোয়ার এলেই সব অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাবে। তখন কলকাতা বন্দরে বড় জাহাজ আসতে পারবে এবং জাহাজ ভেড়ানোর ব্যয়ও হ্রাস পাবে। আভ্যন্তরীণ জলপথের বিস্তারও কলকাতাকে নতুন করে সমৃদ্ধ করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের প্রতিবেশী মিত্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সব যোগাযোগই চলবে কলকাতা বন্দর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান সঙ্কট যে সাময়িক তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

কলকাতা যে সাত প্রতিরুদ্ধকতার মধ্যেও সমৃদ্ধ হচ্ছে তা গত কয়েক বছরে কলকাতার ইতস্তত গড়ে ওঠা বহুতল বিশিষ্ট বাড়িগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বড় বড় হোটেল আর দামি খাবারের রেস্তোরাঁ ও পানশালায় ভরে যাচ্ছে এই শহর। একটি ভাল খোঁপা বাঁধার জন্য মধ্যবিত্ত ঘরের বঙ্গ ললনারাও এখন অকাতরে দশ টাকা ব্যয় করতে পারে। গাড়ির ভিড়ে পথে চলা যায় না, কোন কোন রাস্তার মোড় পেরোতে অনেক সময় ঘন্টাখানেক সময়ও লেগে যায়। মাদ্রাজ, দিল্লী এমন কি বোম্বাই শহরেও দিনে রাতে এমন ট্রাফিক জ্যাম কল্পনাতীত। এসব নিশ্চয়ই সমৃদ্ধির লক্ষণ, যদিও একথাও সত্য যে সে সমৃদ্ধি সর্বজনীন নয়। কিন্তু কলকাতার যে আরও সমৃদ্ধ হওয়ার অবকাশ আছে তার সন্দেহাতীত প্রমাণ চারি দিকেই মেলে।

তবু কবির ভাষায় বলি, সমস্ত রক্ত যদি মুখেই সঞ্চারিত হয় তবে সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বাংলা যদি না বাঁচে তবে কলকাতাও বাঁচবে না। যে বৃহৎ পুঁজি জোরে কলকাতা বিশাল, তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও বাঙালির নয়। বৃহত্তর কলকাতার শিল্প এলাকায় যে শ্রমিক সমাজ কর্মরত তার ৬৭ শতাংশ অবাঙালি। অন্য অপর দিকে বাংলার ঘরে ঘরে বেকার। ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করা যুবক কারখানায় একটা সামান্য শ্রমিকের কাজ চেয়েও পায় না সমস্ত কলকাতা শহর বাঙালির হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আর বাঙালির জন্য গড়ে উঠছে সল্ট লেকে, বৈষ্ণবঘাটায় এল-আই-জি স্কিমের বাড়ি। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে কলকাতা শহর থাকবে ঠিকই, কিন্তু সে শহর আর বাঙালির শহর থাকবে না। আর ঐ অবাঙালি অর্থশালী ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনার্থে কিছু বাঙালি গায়ক নট ও পটুয়া কলকাতায় থাকবেন, এবং তাঁদের খ্যাতিতে পরিতৃপ্ত হতে চাইবে পিছু হটে-যাওয়া সমগ্র বাঙালি সমাজ।

যে ভাষা ও সংস্কৃতির গর্ব ছিল বাঙালির, তারও আজ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করার সময় এসেছে, নইলে এর পর বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে। একদা কলকাতার স্টুডিওর তোলা শুধু বাংলা ছায়াছবিই নয় হাতী মার্কা হিন্দী চলচ্চিত্রের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত সারা ভারত। আর আজ কলকাতা শহরের আশিটি সিনেমা হাউসের মধ্যে দশটিতেও নিয়মিত বাংলা ছবি চলে না। বাঙালি ছেলেমেয়ের মুখে শুধু হিন্দি গান। কলকাতায় যেসব গানের আসর বসে তার গোড়াতে দু-একজন গায়ক মুখ-নীচু করে দু-একখানি রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উঠে চলে যান, তারপর আসর জমে ওঠে হিন্দি গানের হুল্লোড়ে। রাত ফর্সা হয়ে গেলেও আসর এতটুকু ফাঁকা হয় না। বাংলা সিনেমা যে অবস্থায় এসেছে সেটাকে মুমূর্ষু না বলে মৃত বলাই সঙ্গত।

ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, অর্থনীতি সংস্কৃতি —সকলক্ষেত্রে পেছিয়ে-পড়া বাঙালি এখন সে চার শুধু খেলার মাঠে ও বিধান সভায়। অন্যরা নীরবে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি, এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার ঘটানোর দায়িত্ব যাঁদের, দেশের সেই কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়ে—'এই আমাদের দেশ' প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি টানছি।

—যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আপনি কেমন আছেন

পুষ্টি রক্ষায় ঘি-তেলের ভূমিকা

"মাংসে মাংস বৃদ্ধি, ঘৃতে বৃদ্ধি বল,
দুগ্ধেতে লাবণ্য বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।"

হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ জেনেছে, ঘি-দুধ-মাখন খেলে শরীর পুষ্ট হয়, চেহারায় লাবণ্য ও কান্তি আসে। শীতের দেশের লোকেরা ঠাণ্ডায় বেশি করে চর্বি খায় শরীর গরম থাকবে বলে। অভিজ্ঞতাগুলির মূল্য আছে। শর্করা ও প্রোটিনের তুলনায় স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট তাপ-শক্তি দেয় দ্বিগুণেরও বেশি। স্নেহ-পদার্থে রান্না করা খাদ্য হয় সুস্বাদু, তার পুষ্টিমূল্যও বেড়ে যায়। আলুসিদ্ধর চেয়ে আলুভাজা, রুটির চেয়ে লুচি-পরোটা শুধু মুখরোচক নয়, ক্যালরিও পাওয়া যায় বেশি। সুতরাং কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ যাদের করতে হয়, পরিমাণে কম হলেও কিছুটা ফ্যাট তাদের খেতেই হবে।

ফ্যাটের উৎস

স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট আমরা পাই মাখন, দুধ, মাংসের বা মাছের চর্বি ও ডিম থেকে এবং বিভিন্ন রকম উদ্ভিদের তেলে। প্রাণীদেহ অথবা উদ্ভিদ যে-কোন সূত্রে পাওয়া যাক না কেন, জমাট অথবা তরল যে-কোন অবস্থাতেই থাক না কেন, সবই এরা ফ্যাট। এবং সব ফ্যাটেরই মূল রাসায়নিক উপাদান একই। নারকেলের তেল ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধে, আবার চর্বি-ঘি-মাখন-বনস্পতি গরম করলে হয়ে যায় তেলের মত। খাওয়ার পর পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে গিয়েও দেহের তাপে সব জমাট ফ্যাটই তরল হয়ে যায়। উদ্ভিদের প্রধান উপাদান যদিও শর্করা, তবু সরষে, বাদাম, তিল, তিসি, সূর্যমুখীর দানা, জলপাই, অ্যাভোকাডো, নারকেল, সিসেম ইত্যাদি কিছু কিছু শস্য বা ফল পুরোপুরি হলে বা পাকলে তাতে যথেষ্ট পরিমাণ ফ্যাট জন্মায়। সেই সব উদ্ভিদের ফ্যাট বা তেল ব্যবহৃত হয় রান্নায়।

প্রাণীদেহে ফ্যাট আসে দুভাবে—সরাসরি উদ্ভিদের ফ্যাট বা প্রাণিজ ফ্যাটে সমৃদ্ধ খাদ্য খেয়ে অথবা অতিরিক্ত শর্করা খেয়ে। কেউ যদি তার শ্রমের পক্ষে যে পরিমাণ ক্যালরি দরকার তার চেয়েও বেশি শর্করা খায়, তবে সেই অতিরিক্ত শর্করা ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে দেহে সঞ্চিত হয় চর্বিরূপে। হাঁস, মুরগী, ভেড়া বা শূকরকে বেশি করে ঘাস-দানা খাইয়ে মেদবহুল করার রীতি চালু আছে সব দেশেই। যাঁরা কায়িক শ্রম করেন কম, অথচ ভাত-রুটি বেশি খান, তাঁদেরও মেদবৃদ্ধি হয় একই-ভাবে। কিন্তু চাল-গম, তেল-ঘি যখন দুর্মূল্য ও দুর্লভ হয়ে পড়ে, মেহনতী মানুষদের পুষ্টি রক্ষায় সংকট আসে সবচেয়ে বেশি। ক্ষীণজীবী ও ব্যাধিপ্রবণ হয়ে পড়েন তারা।

ফ্যাটের চরিত্র

তেল-ঘি জলে গলে না তা সকলেরই জানা আছে। অবিকৃত অবস্থায় ফ্যাট পরি-পাকও হয় না। খাওয়ার পর অন্ত্রের মধ্যে গিয়ে সব ফ্যাটই বিভিন্ন এনজাইমের প্রভাবে বিশেষ করে প্যাংক্রিয়াস থেকে ক্ষরিত রস লাইপেজ এবং লিভার থেকে ক্ষরিত পিত্তের দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরলরূপে। বিশ্লিষ্ট হওয়ার পর ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসেরল আলাদা আলাদাভাবে অন্ত্রের জলীয় অংশের সঙ্গে মিশে যায় এবং তখন তারা অন্ত্রের গা দিয়ে অবশোষিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যেসব স্নেহপদার্থ বা ফ্যাট এইভাবে বিশ্লিষ্ট হয় সেইগুলিই খাদ্য। লিকুইড প্যারাফিন বা ভেসিলিনের মত খনিজ তেল বিশ্লিষ্ট হয় না বলে খেলেও তা পুষ্টিরক্ষায় কোন কাজে লাগে না। পুষ্টির দিক থেকে একথাও মনে রাখা দরকার যে লিভার কিংবা পিত্তাশয়ের স্বাস্থ্যহানি অথবা অন্য কোন কারণে উপযুক্ত পরিমাণে পিত্ত যদি খাবারের সঙ্গে ঠিকমত মিশতে না পারে, তবে স্নেহপদার্থ পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটতে পারে, হজমের গোলমাল দেখা দেয়।

গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া ফ্যাটে আরও কিছু উপাদান থাকে যা বিশ্লিষ্ট হয় না। এগুলি হল (১) ভিটামিন এ, ডি, ই, কে এবং (২) কোলেস্টেরল। দেহের পুষ্টির ব্যাপারে এদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

রাসায়নিক উপাদান

এক ইউনিট ফ্যাট মানে হল এক ইউনিট গ্লিসারলে আবদ্ধ তিন ইউনিট ফ্যাটি অ্যাসিড। ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি গড়ে ওঠে শৃঙ্খলাবদ্ধ কতকগুলি কার্বন বা অঙ্গারের অণু দিয়ে। আমরা যেসব স্নেহ-পদার্থ খেয়ে থাকি, তাদের মৌল রাসায়নিক উপাদান একরকম হলেও বিভিন্ন ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন শৃঙ্খলে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। এই শৃঙ্খলগুলির কোনটা ছোট কোনটা বড়, কোনটা সম্পূর্ণ কোনটা অসম্পূর্ণ। কোন কোন শৃঙ্খলে সরলভবে যুক্ত কার্বন অণুগুলি হাইড্রোজেন অণু দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সংযুক্ত থাকে; তাদের বলা হয় সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। আবার কোন কোন শৃঙ্খলের কয়েকটি কার্বন অণুতে হাইড্রোজেনের পরিবর্তে থাকে কার্বনের দ্বিতীয় সংযোগ বা ডবল বন্ড। সেগুলির নাম অসং-পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড। কার্বনের এই দ্বিতীয় সংযোগ এক বা একাধিক হতে পারে এবং উচ্চতাপে সংযোগের স্থলে তারা হাইড্রোজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে। তরল ফ্যাটকে জমাট বাঁধানর কাজে ফ্যাটি অ্যাসিডের এই বৈশিষ্ট্যটির বিশেষ ভূমিকা আছে।

সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড

সাধারণত নারকেলের তেল ছাড়া অন্যান্য উদ্ভিদের তেলে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে। তুলনায় সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ঘি, মাখন, চর্বিতে ও নারকেলের তেলে।

স্নেহপদার্থের নাম	সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড	অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড
	শতকরা	শতকরা
ভয়সা ঘি	৬৩·৬	৩৬·৪
গাওয়া ঘি	৫৯·৫	৪০·৫
নারকেল তেল	৯১·৫	৮·৫
সরষের তেল	৪·০	৯৬·০
বাদাম তেল	১৯·০	৮১·০
তিলের তেল	১৩·৫	৮৬·৫
তুলাবীজের তেল	২৩·৫	৭৬·৫
তিসির তেল	৯৩·০	৯০·০
সূর্যমুখীর তেল	৬·০	৯৪·০

বনস্পতি

আজকাল কিছু কিছু উদ্ভিদের তরল ফ্যাট বা তেলকে উচ্চ তাপে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রয়োগে জমাট বাঁধিয়ে বনস্পতি-ঘি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। হাইড্রোজেন দ্বারা জমাট বাঁধানর সময় অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। বনস্পতির সুবিধা হচ্ছে এই যে দেখতে পাওয়া বা ভয়সা ঘিয়ের মতই, কোন অপ্রিয় গন্ধ নেই, অথচ দামে সস্তা। অপরদিকে অসুবিধা হল, অসংপৃক্ত তরল অবস্থায় যে তেল দেহের কোন ক্ষতি করত না, সংপৃক্ত হয়ে তা হল অহিতকর। ঘি-মাখনে ভেজাল দেওয়ার প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় বনস্পতি ঘি। সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড কেন অহিতকর তা বুঝতে হলে সঙ্গে সঙ্গে কোলেস্টেরলের ভূমিকাও এসে পড়ে।

কোলেস্টেরল

জমাট অথবা তরল সব ফ্যাটেরই ক্যালরিমূল্য সমান। অর্থাৎ তাপশক্তি সৃষ্টির ব্যাপারে তেল-ঘিতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু অধুনা এই তত্ত্ব মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে যেসব ফ্যাটে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি আছে সেগুলি বেশি খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বেচ্ছাসেবীদের মাখন, মাংসের চর্বি ও ডিম বেশি করে খাইয়ে প্রমাণ হয়েছে, তাদের রক্তে কোলেস্টেরল

বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ঠিক একই রকম ফল পাওয়া গিয়েছে বনস্পতি খাইয়ে। ঐ একই স্বেচ্ছাসেবীদের অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে সমৃদ্ধ বাদাম তেল ও জলপাই-এর তেল খাইয়ে কিন্তু কোলেস্টেরলের কোন তারতম্য দেখা গেল না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য ঘটলে (প্রতি ১০০ মিলি লিটার রক্তে ২০০ মিলিগ্রামের বেশি হলে) ধমনীর গায়ে কোলেস্টেরল সঞ্চিত হয়ে বা পলি পড়ে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়, ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। তাঁরা মনে করেন, হৃদপিণ্ড ও রক্তনালীর ব্যাধির অন্যতম কারণ হল সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ডিম, মাখন, চর্বি, ঘি, বনস্পতি বেশি খাওয়া। তার মানে কিন্তু এই নয় যে ঐ খাদ্যগুলি বাদ দিতে হবে। না, তা নয়। কোলেস্টেরল রক্তের এবং অধিকাংশ দেহ-কোষের একটি স্বাভাবিক উপাদান। পরিমিতভাবে ঘি, মাখন, ডিম স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। তবে কোনটাই অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে বয়স্কদের এবং যাদের বাপ-মার বা নিজের হাইপারটেনসনের ইতিহাস আছে তাদের পক্ষে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড যুক্ত ঐ খাদ্যগুলি সম্পর্কে সংযত হওয়া উচিত। কোন্ কোন্ ফ্যাট কোলেস্টেরলের উপর কী ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে নিচে তার একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হল।

কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সহায়ক—মাখন ঘি, মার্জারিন, মাংসের চর্বি, ডিমের কুসুম, বনস্পতি, নারকেলের তেল।

কোলেস্টেরলের উপর প্রভাব নেই—জলপাই-এর তেল, বাদাম তেল, সরষের তেল।

কোলেস্টেরল কমানর সহায়ক— সূর্যমুখীর তেল, সিসেম তেল, মাছের তেল।

ফ্যাট আত্মস্থ হয় কিভাবে

অন্ত্রে বিশ্লিষ্ট ও অবশোষিত হয়ে স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলি প্রথমে যায় লসিকা প্রবাহে এবং সেখান থেকে রক্তে। কিছু অংশ সরাসরি রক্তে চলে যায়। রক্ত-স্রোত বেয়ে কোষে কোষে পৌঁছে বেশির ভাগ ফ্যাট সৃষ্টি করে ক্যালরি বা তাপশক্তি এবং কিছু জমা হয় বিভিন্ন দেহযন্ত্রে ও ত্বকের নিচে।

স্নেহপদার্থের বিপাক ক্রিয়া চলে শর্করার সঙ্গে একযোগে এবং পারস্পরিক সহযোগিতায়। শর্করা আমরা খাই প্রধানতঃ শ্বেতসার রূপে। শ্বেতসার খুব বেশি খেলে পেটে গ্যাস হতে পারে। স্নেহপদার্থে সেই আশঙ্কা থাকে না বটে, কিন্তু দিনে ১০০—১৫০ গ্রামের বেশি ফ্যাট হজম করা শক্ত। আসলে খাদ্য এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে শর্করা, ফ্যাট ও প্রোটিন থাকে সুষম হারে—দৈনিক যথাক্রমে ৪৫০, ৫০ ও ৮০ গ্রাম হিসাবে। যেহেতু প্রোটিন ও শর্করার তুলনায় ফ্যাটে ক্যালরি পাওয়া যায় দ্বিগুণ, তাই দেহের ওজন বাড়াতে হলে কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত ফ্যাট খেয়ে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। ফ্যাটের আর একটি সুবিধা হল, শর্করার তুলনায় ফ্যাট শরীরে সঞ্চিত রাখা যায় অনেক বেশি। কঠোর শ্রমে, অসুস্থতায়, অনাহারে বা আকস্মিক প্রয়োজনে যখন বেশি ক্যালরির দরকার হয়, সে অবস্থায় দেহের সঞ্চিত ফ্যাট সেই বাড়তি প্রয়োজন মেটাতে পারে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে ফ্যাট পাকস্থলীর রস ক্ষরণ কমিয়ে দেয় বলে গ্যাসট্রাইটিস বা গ্যাসট্রিক আলসারের মত রোগে দুধ মাখনের মত স্নেহপদার্থ খেতে দেওয়া হয়।

—দিনে কতটা ফ্যাট—

দিনে কতটা ফ্যাট খাওয়া উচিত সেটা নির্ভর করে তাপ শক্তির প্রয়োজনের উপর। সাধারণভাবে দৈনিক ৫০—৬০ গ্রাম খেলেই চলে। শীতের সময় বা ঠাণ্ডা দেশে দেহের তাপ বজায় রাখার জন্যে কিংবা কঠোর শ্রমের তাগিদে ৯০—১০০ গ্রাম পর্যন্ত দরকার হতে পারে। প্রোটিনের মত ফ্যাটও মহার্ঘ বলে আমাদের দেশে দরিদ্র মানুষেরা দৈনিক ২০—২৫ গ্রাম ফ্যাট খেয়েও কঠোর শ্রমে নিযুক্ত থাকেন বটে, কিন্তু তার দ্বারা এই প্রমাণ হয় না যে পুষ্টির পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। বরং ফ্যাটের সঞ্চয় না থাকার জন্যে জরুরী প্রয়োজনে বাড়তি ক্যালরি তাদের জোগাতে হয় লিভার ও পেশীর শেষ সঞ্চয় গ্লাইকোজেন (শর্করা) থেকে।

—কোন ধরনের ফ্যাট খাওয়া উচিত—

কোন ধরনের ফ্যাট খাওয়া উচিত উপরের তালিকায় তার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড যাতে বেশি আছে, অর্থাৎ সূর্যমুখী, সরষে, তিল, বাদাম ইত্যাদির তেল তরল অবস্থাতে খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী। ঘি, মাখন, চর্বি, ডিম খাওয়া উচিত কম করে। যাঁরা বসে কাজ করেন তাদের পক্ষে ফ্যাটে—বিশেষ করে সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে সংযমী হওয়া উচিত, কারণ কায়িক শ্রমহীন জীবনে ফ্যাট মেদবৃদ্ধি করায়, রক্তেও কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে। তেলে শতকরা ১০০ ভাগ ফ্যাট থাকে বলে অতিরিক্ত তেল খাওয়াও নিরাপদ নয়। কিন্তু তেল-ঘি-মাছ-মাংসের দর যখন সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, পুষ্টিরক্ষার সেই সংকটের সমাধানটি তখন স্বাস্থ্যবিধির সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে।

—অশ্বিনী সামন্ত

ছোটদের যে বই কিনে দিয়ে আনন্দ পাবেন

॥ ছোটদের ছড়া-সঞ্চয়ন ॥
সংকলন : শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীপ্রভাত বসু। অলংকরণ : শ্রীসমর দে। আদ্যিকালের ছড়া থেকে আধুনিককালের বিভিন্ন ছড়ার সুনির্বাচিত সচিত্রিত সংস্করণ। [টাঃ ৩·০০]

॥ খেলার সাথী ॥
লেখা : স্বপনবুড়ো। ছবি : শ্রীসমর দে। প্রকৃতি ও একটি আপনভোলা ছেলের কাহিনী আর বহু অপরূপ রঙীন ছবি। [টাঃ ২·৫০]

॥ ছবির খেলা ॥
লেখা ও ছবি : শ্রীবাদল সরকার। ছোটদের জন্য সচিত্র ধাঁধার বই। এমন বই বাঙলায় আর নেই। [টাঃ ২·০০]

॥ রাঙাদির রূপকথা ॥
লেখা ও ছবি : শ্রীত্রিভঙ্গ রায়। দক্ষিণারঞ্জনের পরে যেন আরো উত্তীর্ণ বই। [টাঃ ৫·০০]

॥ ভূতপুরাণ ॥
লেখা ও ছবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রহস্যময় ভূতরাজ্যে প্রবেশের ভূরপুরাণ। [টাঃ ৪·০০]

॥ যুগে যুগে ভারতশিল্প ॥
লেখা ও ছবি : শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের ইতিকথা। বহু ছবি। [টাঃ ৭·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা-৯

যে দেশে ঘর বাঁধতে ইচ্ছে করে

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত
জন্মাতে কে চাইত যদি
আগে সেটা জানত॥

কবির উক্তি যে আদৌ অতিরঞ্জন নয় সেটা ইদানীং এদেশের সাধারণ মানুষ রীতিমত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। চাকরিজীবদের কথা ছেড়েই দিলাম, যারা চাকরি না ছোটখাটো ব্যবসা করে, সংসার চালাতে তারাও আজকাল চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ নাগালের বাইরে, বাড়িওয়ালা ঘন ঘন ভাড়া বাড়াবার হুমকি দিচ্ছে আর সবচেয়ে যা প্রাণান্তকর তা হচ্ছে পাড়া ও বেপাড়ার ধারোয়ারি পুজোর চাঁদার জুলুম। এ হেন অবস্থায় যখন শোনা যায়, পৃথিবীতে এখনও এমন একটি দেশ আছে যেখানে খাওয়া-পরার সমস্যা নেই, যেখানে সবাই সুখে শান্তিতে রয়েছে, তখন কি ইচ্ছে করে না সেই দেশে গিয়ে—তা সে যত দূরেই হোক না। কেন—ঘর বাঁধতে?

এই দেশটি হল লিচটেনস্টাইন। সুইটজারল্যান্ডের কাছে রাইন নদীর ওপারে একটি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। প্যারিস ও ভিয়েনার মধ্যে যাতায়াতকারী ইন্টার-ন্যাশনাল এক্সপ্রেস এ রাজ্যের সীমান্তে এসে থামে। সেখান থেকে আশি সেন্টিমের (centime) টিকিট কেটে মেল-কোচে চেপে এই স্বপ্নরাজ্যের ছোট্ট রাজধানী ভাডুজ-এ পৌঁছনো যায়।

লিচটেনস্টাইনে পৌঁছে বিদেশী পর্যটকের মনে হবে যেন সে এক অদ্ভুত জগতে এসে হাজির হয়েছে। এ রাজ্য আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—মাত্র ষাট বর্গ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে বেকারি নেই, নেই চুরি, রাহাজানি, খুন-জখম প্রভৃতি অপরাধ যা পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিনিয়ত ঘটছে। নোংরা অপরিচ্ছন্ন বস্তি কোথাও চোখে পড়বে না, প্রত্যেকেরই আছে সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাড়ি আর যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী। এদেশে রাজা আর চাষীর সামাজিক মর্যাদা একই। শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, বাস্তবেও রাজা ও প্রজা সমান। এখানে যে কেউ নিজের ধর্ম-বিশ্বাস বা রাজনৈতিক মত নির্ভয়ে ঘোষণা করতে পারে। এ রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিসের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নেই। যে যত খুশি জামা-কাপড় ও খাদ্য-সামগ্রী কিনতে পারে। এখানে আয়কর অবশ্য আছে, তবে তা অতি সামান্য—এক পাউন্ডে মাত্র পাঁচ পেনি।

এদেশের লোকসংখ্যা মাত্র আঠারো-উনিশ হাজার। স্থানীয় লোকেরা তাদের দেশকে বলে ফুরেসটেন্টাস লিচটেনস্টাইন যার অর্থ হল নৃপতিশাসিত লিচটেন-স্টাইন। ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা উপহাস করে এ রাষ্ট্রকে বলে রুরিটানেয়া (প্রিজনার অব জেন্ডার রচয়িতা প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক অ্যানেটনি হোপ কর্তৃক বর্ণিত এক কাল্পনিক রাজ্য)। নিরপেক্ষ পর্যটক হয়তো এ রাষ্ট্রটিকে ইউটোপিয়া (স্যর টমাস মোর কর্তৃক কল্পিত এক আদর্শ রাষ্ট্র) আখ্যা দিতে দ্বিধাবোধ করবে না।

এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এত চমৎকার যে বিদেশী পর্যটক রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। আজব দেশে অ্যালিস-এর যে অবস্থা হয়েছিল তার অবস্থাও হবে অনেকটা সেই রকম। এখানে কারো অভাব-অনটন নেই, সবাই খেয়ে-পরে সুখে শান্তিতে আছে। মানুষ হিসেবেও এরা ভালো, কেউ কারো অনিষ্ট চিন্তা করে না। এরা বুঝতে পারে না পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক নির্বোধের মত যুদ্ধ করে কেন সময় ও সম্পদের অপচয় করে। কেন যে লোকে নোংরা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে, কেন যে রোগে ও দারিদ্র্যে কষ্ট পায় কেনই বা অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয় তাও এদের কাছে হেঁয়ালির মত। লিচটেনস্টাইনে এসব কিছুই নেই। যুদ্ধ এখানে কেউ কোনোদিন দেখেনি, এখানে রোগের উপদ্রব নেই, নেই দারিদ্র্য ও আইনভঙ্গের অপরাধ।

আধুনিক জগতের এটাই হল প্রথম সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ইউরোপে এটাই হল একমাত্র স্থান যেখানে লোকে ডেমোক্র্যাট শব্দটার আদৌ উল্লেখ করে না। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে ওরা কত উন্নত এটা কোন বিদেশীকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা লিচটেন-স্টাইনের অধিবাসীরা ভাবতেই পারে না—যেমন কোনো ইংরেজ ভাবতেই পারে না তার গায়ের রং কতটা সাদা সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে। ঐ সম্পর্কে যদি কোনো বিদেশী মন্তব্য করে ওরা রীতিমত আশ্চর্য হয়।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা এ রাজ্য সম্বন্ধে কৌতুকমিশ্রিত একটা ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে এটা রূপকথার রাজ্যের মত ছোট একটা দেশ যা সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে নিজেকে জাহির করতে চায়। এখানে বহির্বিশ্বের প্রাণচাঞ্চল্য বা আলোড়ন নেই, আছে শুধু রাজা-রাজড়ার সেকেলে আড়ম্বর আর চটকদার পোশাকের বৈচিত্র্য।

এই ধারণাটা যে আজও বর্তমান তার কারণ এই যে, খুব কম বিদেশীই ওখানে বেশ কিছুদিন থেকে স্থানীয় জনসাধারণের জীবনধারা ও রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন।

বিদেশী পর্যটককে আটকে রাখবার মত ওখানে অবশ্য কোনো আকর্ষণ নেই। গরমের সময় সুইমিং পুল নেই, শীতকালেও সুসংগঠিত স্পোর্টস-এর কোনো ব্যবস্থা নেই, এমন কি এখানে বিলাসবহুল হোটেলও (Luxury hotel) একটা নেই যা বিদেশী পর্যটকদের মন হরণ করতে পারে।

এ রাজ্যের রাজধানী ভাডুজ-এ দোকান বাজার খুব কম। ইংলণ্ডের অখ্যাত গ্রামে যত দোকান দেখা যায় এখানে দোকানের সংখ্যা তার চেয়েও কম। শহরটা ঘুরে দেখবার জন্য বিশেষ যানবাহনের ব্যবস্থা নেই, রাইন নদীতে নৌকাবিহারের সুযোগ নেই, জ্যোৎস্না রাতে নৃত্য-গীতের আয়োজন নেই। আছে শুধু একটি সিনেমা হল যা সপ্তাহে মাত্র দু-তিন দিন খোলা থাকে। সুদৃশ্যবিস্তারী শৈলশ্রেণী আছে বটে তবে তার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। সীমান্তের ওধারে অস্ট্রিয়ান ও সুইস আল্পস-এর মত এর বিশেষ খ্যাতি নেই। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গ আছে, কিন্তু সে দুর্গও অতি সাধারণ। একশো মাইলের মধ্যে অমন দুর্গ বিস্তর দেখা যায়।

সুইটজারল্যান্ড থেকে যাত্রী নিয়ে শারাবাং (charabanc) রাইন সীমান্তে প্রায় আসা-যাওয়া করে বটে, তবে যাত্রীদের এই বিচিত্র দেশটি দেখবার পর্যাপ্ত সময় দেয় না ওরা। মাত্র ঘন্টা দুই-তিন ওরা অপেক্ষা করে। ঐ সময়টুকুর মধ্যে যাত্রীরা পানাহার সেরে দুর্গটা একবার দেখে আসে দূর থেকে যাতে তারা ফিরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলতে পারে লিচটেনস্টাইন তারা দেখে এসেছে। আর এই কারণেই লিচটেনস্টাইন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাটা টিকে আছে আজও।

এ রাজ্যের মোট রাজস্বের এক পঞ্চমাংশ সংগৃহীত হয় ডাকটিকিট (স্ট্যাম্প) বিক্রি করে। স্ট্যাম্পকে এখানকার প্রধান ইন্ডাস্ট্রি বলা যেতে পারে। পোস্ট অফিস থেকে যখন নতুন স্ট্যাম্প ইস্যু করা হয় তখন ঐ স্ট্যাম্পযুক্ত হাজার হাজার চিঠি এখান থেকে পোস্ট করা হয় নানান দেশে। পৃথিবীর সর্বত্র এখানকার স্ট্যাম্পের বিশেষ সমাদর আছে স্ট্যাম্প-কালেক্টরদের কাছে।

এদেশে বেকার কেউ নেই। সবারই কাজ আছে আর সেই কাজ করে বা রোজগার হয় তা দিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হয় না। অবশ্য যারা দীর্ঘ-কাল কাজ করে প্রচুর অর্থসঞ্চয় করেছে তারা আর কাজ করে না, কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেয়। যাদের কাজের চাপ কম, অবসর আছে তারা কাফেতে বসে গল্প-গুজব করে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়, কখনও বা অবসর যাপনের জন্য চলে যায় পাহাড় অঞ্চলে। এখানে কাজের অভাব হয় না কারো। যদি দেখা যায় এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের কাজ নেই তখন ওখানকার সরকার নতুন কিছু তৈরী করার একটা প্রকল্প হাতে নেন—যেমন একটা অফিসবাড়ি, রাস্তা বা সুড়ঙ্গ। প্রকল্পটি রূপায়িত করতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় সেটা সংগ্রহ করা হয় নতুন এক সেট স্ট্যাম্প ইস্যু করে।

আগেই বলেছি এদেশে কেউ আইন লঙ্ঘন করে না। খুন-জখম দূরের কথা, ছোটখাটো চুরিও কেউ করে না। করবেই

বা কেন? তাদের যা দরকার সবই আছে। তবু যদি দৈবাৎ কেউ খুন করে তাহলে তাকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় রাখা হবে, তারপর বিচারের জন্য তাকে পাঠানো হবে সুইটজারল্যাণ্ডের সেন্ট গালেন-এ খুনের মামলা বিচার করার উপযুক্ত আদালত লিচটেনস্টাইনে নেই। ভবিষ্যতে কোনদিন হয়তো খুনের ঘটনা ঘটতে পারে এ মনে করে দেশের মধ্যেই খুনের মামলা বিচারের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা ওরা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে।

অবশ্য সীমান্ত অঞ্চলে মাঝে মাঝে ছোটখাটো উপদ্রব যে না হয় এমন নয়। তবে এসব উপদ্রবের জন্য স্থানীয় লোকেরা দায়ী নয়। উপদ্রব করে বাইরের লোক। পাহাড়ের ওধারে অস্ট্রিয়া রাজ্যের সীমান্ত। গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ওখান থেকে এসে সশস্ত্র দুর্বৃত্তের দল মাঝে মাঝে পাহাড় অঞ্চলের গ্রামগুলিতে হামলা করে। তাদের উদ্দেশ্য লুঠতরাজ।

এই সব অবাঞ্ছিত ঘটনার মোকাবিলা করার জন্যই লিচটেনস্টাইনে আইনকানুনের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটি আদালত আছে। তাকে বলা হয় Salle de Justice অর্থাৎ বিচারভবন। প্রয়োজন অনুযায়ী এটাকে ফৌজদারি আদালত অথবা দেওয়ানি আদালত হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর কোনোটাতেই মামলা বড় একটা আসে না, কারণ স্থানীয় লোকেরা মনে করে, মামলা-মকদ্দমা করা সময় ও অর্থের অপচয় মাত্র। ওদের মতে বেশীর ভাগ বিবাদ-বিসংবাদই আদালতের বাইরে আপোসে মিটিয়ে নেওয়া যায়।

এখানে প্রতি বৎসর শতাধিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং দুই শতাধিক শিশুও হয় ভূমিষ্ঠ অথচ আশ্চর্যের বিষয় এখানে গৃহসমস্যা নেই। এখানকার বেশীর ভাগ লোকই সঙ্গতিপন্ন। অনেকেরই বাড়ি আছে তিনটি জায়গায়—রাজধানী ভাডুজে, আর শান ও ট্রিসেনবার্গে। শান ও ট্রিসেনবার্গ এখানকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শহর। শহরের বাড়ি ছাড়া কারো কারো পাহাড় অঞ্চলের গ্রামেও বাড়ি আছে। শহরের বাড়িগুলি ইট ও পাথরে তৈরী গ্রামের বাড়িগুলি তৈরী কাঠে। এগুলিকে বলা হয় শালে (chalet)

এদেশের যিনি রাজা তাঁকে বলা হয় ফুরস্ট Furst । তবে রাজার হাতে দেশের শাসনকর্তৃত্ব নেই। বর্তমান রাজার নাম দ্বিতীয় প্রিন্স ফ্রান্স জোসেফ। রাজা, রাণী, রাজকুমারী জার্জিনা এবং রাজকুমার প্রিন্স হান্স আডাম পাবান-এর প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ অপরিসীম। রাজপরিবারের ছবি সর্বত্র দেখা যায়—কাফে, হোটেল আর সাধারণ লোকের বাড়িতে। রাজমুকুটশোভিত লাল ও নীল রঙের জাতীয় পতাকা প্রায় প্রত্যেক গৃহশীর্ষেই নজরে পড়ে—বিশেষ করে কোন উৎসবের সময়। জাতীয় দিবস হচ্ছে পনেরোই আগস্ট। ঐদিন ওরা রাজার জন্মদিবস পালন করে। ঐ তারিখেই আবার অনুষ্ঠিত হয় ওদের ধর্মীয় উৎসব ফিস্ট অভ দ্য আসামশন (Feast of the Assumption). লিচটেনস্টাইনের শতকরা সাতানব্বুইজন ক্যাথলিক এবং ওরা যেমন স্বদেশানুরাগী তেমনি ধর্মপরায়ণ।

স্থানীয় রীতি অনুযায়ী রাজপরিবারের লোকেরা দুর্গে বাস করে এবং নিজেদের যাবতীয় খরচ নিজেরাই বহন করে। ইংলণ্ডে যেমন রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা আছে এখানে সেরকম কিছু নেই।

রাজ্যের শাসনযন্ত্র পরিচালনা করে ডায়েট (Diet) বা পার্লামেন্ট। এগারোটি জেমেইন্ড বা প্যারিশে রাজ্যটি বিভক্ত। প্রতিটি প্যারিশ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত। সাধারণত প্রতি চার বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একুশ বছরের ঊর্ধ্ববয়স্ক পুরুষমাত্রেই ভোট দেবার অধিকার আছে। পার্লামেন্টের অধিবেশনের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। যখনই আলোচনা করার মত কোনো ব্যাপার থাকে, পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকা হয়।

এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজনীতি বিদেশীর চোখে জটিল ও অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও স্থানীয় লোকের কাছে অত্যন্ত সরল ও যুক্তিসিদ্ধ। এখানে দুটি রাজনৈতিক দল আছে। একটিকে বলা হয় Regierungspartei অর্থাৎ সরকারী দল, অপরটির নাম Volksparte অর্থাৎ জনগণের দল। দ্বিতীয় দলটি গঠন করা হয়েছে সাধারণের সম্মতি অনুযায়ী, রাজনৈতিক বিদ্বেষ বা রেষারেষির ফলে নয়—কারণ প্রত্যেকেরই ধারণা রাজ্যের কল্যাণের জন্য একটা বিরোধী দল থাকা দরকার। প্রশাসন যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তার জন্য এখানে রয়েছে দুটি সংবাদপত্র—প্রতি দলের একটি। প্রতিটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় দুই বা তিন দিন অন্তর। বেশীর ভাগ লোক দুটি সংবাদপত্রেরই গ্রাহক যাতে প্রতিদিনই তারা সংবাদপত্র পড়তে পারে। শাসনব্যবস্থা তৈরী করা হয়েছে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে যাতে রাজ্যের রাজনীতিতে শক্তিসাম্য বজায় থাকে এবং শাসনকর্তৃত্ব কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে চলে না যায়।

লিচটেনস্টাইনের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। দেশের অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে অনুর্বর পাহাড়। ওখানে পশু চরানো ছাড়া আর কিছুই করা চলে না। এছাড়া কয়েক মাইল দীর্ঘ একটি উঁচু পাহাড় দেশটিকে খণ্ডিত করায় মালপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠানো কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। তা সত্ত্বেও ছোটখাটো শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বছরে প্রায় তিন মিলিয়ন ফ্রাঁ। ওখানে অবশ্য তিনটি সমস্যা আছে এবং স্থানীয় লোকেদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আজও তা দূর করতে পারে নি। এই তিনটি সমস্যা হচ্ছে সংক্ষেপে রাইন বুফে আর ফন (Rhine Rufen and Fohn) রাইন নদীর তটভূমিতে প্রতি বছরই ভাঙন দেখা দেয় আর তা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। রুফেন হচ্ছে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ যার মধ্য দিয়ে পাহাড়ী ঝর্ণার প্রবল জলধারা প্রবাহিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর তার ফলে হয় ভূমিকম্প। ফন হচ্ছে একটা তপ্ত শুষ্ক বায়ু যা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে প্রভূত ক্ষতিসাধন করে।

লিচটেনস্টাইনের পররাষ্ট্রনীতি কারো কারো কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও সুবিবেচনা প্রসূত—ইংরেজিতে যাকে বলে প্র্যাকটিকাল। ওরা বলে, আমরা কখনও যুদ্ধ করি নি কারণ আমাদের সৈন্যসামন্ত নেই আমাদের শেষ সৈনিকটি মারা যায় ১৯৪০ সালে। তখন তার বয়স হয়েছিল নব্বুইয়ের ওপর। আমাদের অস্ত্র যা আছে তা সব এখন দুর্গের মিউজিয়ামে। এইভাবে আমরা টাকা বাঁচাই আর এটা নিশ্চয়ই যুদ্ধ করা চাইতে অনেক ভালো, কেননা বড় বড় দেশ সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা জয়ের আশা করতে পারি না। ওরা স্বীকার করে ওরা খুব ভাগ্যবান, কারণ ওদের দেশের কথা মুসোলিনি হিটলারের মনে পড়ে নি।

তবে যুদ্ধ না করলেও নিজের নিরপেক্ষতা রক্ষা করার জন্য ওরা পঞ্চাশ জন প্রহরী রেখেছিল অস্ট্রিয়ান সীমান্তে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে এসে যারা ওদের দেশে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের রেখেছিল নজরবন্দী করে। ১৯৪৫ সালে মে মাসে লাভাল লিচটেনস্টাইনে প্রবেশের অনুমতি চান, কিন্তু অনুমতি তাঁকে দেওয়া হয় নি। লাভালকে কাজেই ফিরে যেতে হয় ইন্সব্রুকে এবং সেখান থেকে তিনি স্পেনে চলে যান স্পেনে চড়ে।

লিচটেনস্টাইনে আভিজাত্যের কোন মূল্য নেই। প্রায় পঁচিশজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা রাজভবনে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত, কিন্তু যখন তাঁরা রাস্তায় কেউ তখন কেউই তাঁদের দেখিয়ে বিদেশীর কানে বলে না, ওঁরা অভিজাত বংশের মানুষ মিডল ক্লাস, বুর্জোয়া প্রভৃতি শব্দ এখানে কারো মুখে শোনা যায় না। কেউ হয়তো পশুপালক বা দোকানদার। তার মানে এই নয় যে, সে নিম্নস্তরের লোক। সে ও কাজটা করে সম্ভবত এই কারণে যে, ও কাজে তার দক্ষতা আছে এবং ও কাজটা তার পছন্দ। শ্রেণীবৈষম্য ওদের কাছে দুর্বোধ্য।

যে সমস্ত জনদরদী সমাজসংস্কারক রাজনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী দুনিয়ার চেহারাটা পাল্টে দেবার স্বপ্ন দেখেন, লিচটেনস্টাইনের শাসন-ব্যবস্থা এবং ওখানকার জনগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা যে অনেক কিছুই শিখতে পারবেন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

প্রদর্শনী

পরিতোষ সেনের সাম্প্রতিক চিত্রকর্ম

অংগুলীগণ যে ক'জন সক্রিয় বাঙালী চারুকলাশিল্পীর নাম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়, পরিতোষ সেন তাঁদের অন্যতম। চল্লিশের দশকের স্পর্ধিত বিদ্রোহী শিল্পীমূর্তিগুলোর অধিকাংশের ভিতর থেকেই যখন খড়ের ঠেকনাগুলো বেরিয়ে পড়েছে তখন ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, নীরদ মজুমদার এবং পরিতোষ সেনের মতন সামান্য কয়েকজনই আছেন, যাঁরা তাঁদের কাজ দিয়ে প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে চল্লিশের খ্যাতিমান সব শিল্পীই প্রায়-শূন্য কলস ছিলেন না। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সেদিনকার তরুণ পরিতোষ-বাবুর কেশে রৌপ্যাভা নেমেছে। দেশে-বিদেশে ঘুরে, দেখে, শুনে, পড়ে জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। সক্রিয়ভাবে শিল্পচর্চা করে, বহু দেখে শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। এত অভিজ্ঞতা তাঁর মানসিক প্রশান্তি নষ্ট করলেও তারুণ্য নষ্ট করতে পারেনি। নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণের জন্য মনের দ্বার সর্বদা প্রশস্ত রেখেছেন। সজীব থেকেছেন। এক জায়গায় স্থির হয়ে থেকে বুড়িয়ে যাননি। বেশীর-ভাগ চিন্তাশীল ব্যক্তিরই নিজেকে চিনে নিতে খানিকটা সময় লাগে। সেই সময়টাতে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা খোলাদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ব্যক্তিত্বকে আস্তে আস্তে গড়তে থাকে। ব্যক্তিত্ব আস্তে আস্তে, ঠিক হোক বা ভুল হোক, একটা প্রত্যয়ের স্থির বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। যখন সেই প্রত্যয়ের স্থির বিন্দুতে উপনীত হয় তখন ব্যক্তিত্ব স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। তারপর যতই নতুন আসুক না কেন, ব্যক্তিত্ব তার প্রত্যয় দিয়ে সেই নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে। নিত্য নতুন অভাবনীয় অভিজ্ঞতার অভিঘাতে প্রত্যয় পরিবর্তিত হয় সত্যি কিন্তু আমূল পরি-বর্তিত হয় না, পরিবর্ধিত হয় মাত্র। ব্যক্তিত্ব চিহ্ন হারিয়ে যায় না। অনেক সময়ে দেখা যায় নতুন অভিজ্ঞতার বৈপ্লবিক অভিঘাতে প্রত্যয়ের ভিত টলে গেছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব-প্রত্যয়-অভ্যাসের চিহ্ন বিলোপ ব্যক্তির পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠেছে। নীরদ মজুমদার মহাশয় তো প্রায় অন্যবাহিত প্রত্যয়ে স্থির বিশ্বাসে আসীন। ফ্রান্সিস নিউটন সুজা কখনও জগৎ-জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা গ্রহণে বীতরাগ নন, কিন্তু জগৎ এবং জীবনকে দেখার জন্য তাঁর একটা বিশিষ্ট নিজস্ব দৃষ্টিকোণ তৈরী হয়ে আছে। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত শৈলীতেই স্বপ্রকাশ। জগৎ-জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞ-তাই হোক বা শিল্পবস্তু নির্মাণ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাই হোক পরিতোষবাবু অনেক সময়েই অস্থির আবেগে নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন, সে অভিজ্ঞতাও আত্মস্থ করে নেবার সময় দেননি। ফলে অনেক স্থায় পরিতোষবাবুর শিল্পকর্মে বিভিন্নভাবে তাঁর চরিত্রসুলভ অস্থিরতা এবং গতি-ময়তাকে প্রত্যক্ষ করলেও তার বিশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বকে হারাই।

পর্ট অব এ রাইণ্ড গেট —শর্মিলা রায়

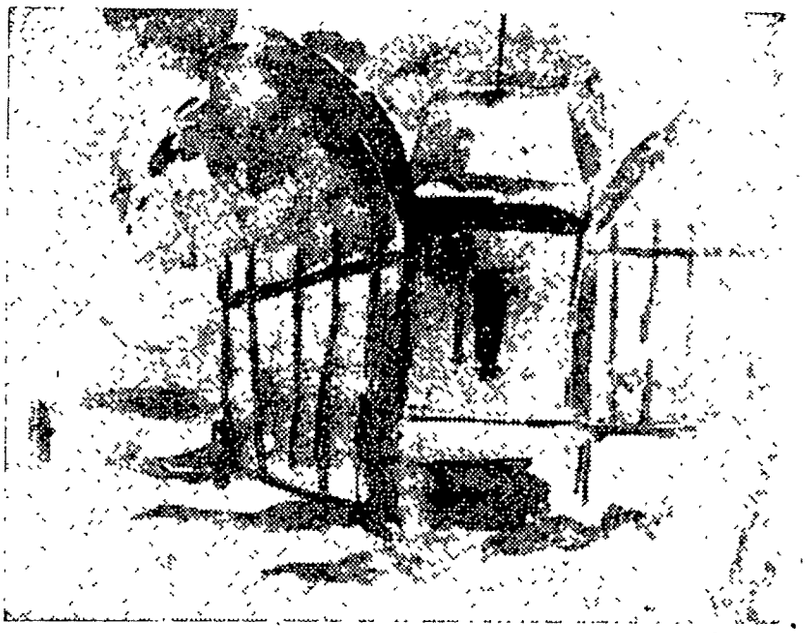

অনেকেই পরিতোষ সেনের বর্ণবিন্যাস এবং বর্ণপ্রয়োগের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করে থাকেন। অনেকে তাঁর বিরাট বিরাট ক্যানভাস, ব্যবহারের দক্ষতার কথা উল্লেখ করে থাকেন। বর্তমান সমালোচক স্বয়ং পরিতোষবাবুর তুলি চালনা পদ্ধতির অত্যন্ত গুণগ্রাহী। তুলি চালনা দ্বারা তিনি গতিময়তাকে যেভাবে দৃশ্যমান করে তুলতে পারেন খুব কম চিত্রশিল্পীই তা পারেন। কিন্তু শুধুমাত্র কারিগরী দক্ষতা কোন বড় শিল্পীর মুখ্য গুণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। পরিতোষবাবু নিছক শিল্প-বস্তু, অন্যনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পবস্তু নির্মাতা নন। শিল্পবস্তু তাঁর কাছে অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপ। টেকনিক বা কারুকৌশল তাঁর কাছে ততটুকুই মূল্যবান, যতটুকু সেই টেকনিকের সাহায্যে নির্মিত দৃশ্যবস্তু ইন্দ্রিয়গতভাবে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয়। অতএব, আমার বিশ্বাস, শুধুমাত্র কারুকৌশলগত ঔৎকর্ষের কারণে তাঁর ছবি প্রশংসিত হোক এটা পরিতোষবাবু নিজেও চাইবেন না।

সম্প্রতি বিড়লা একাডেমির প্রদর্শনী কক্ষে পরিতোষবাবুর ষোলটি ক্যানভাস, পাঁচটি এচিং এবং অনেকগুলি গোয়াশ (অচ্ছ জলরঙের প্রত্যেকটির সঙ্গে সাদা রঙ মিশিয়ে যে আঁকার মাধ্যম তৈরী হয় তাকে গোয়াশ বলে), প্যাস্টেলে এবং লিথোগ্রাফিক চকে আঁকা ছবি ও ড্রইং এবং কালি কলম, পেন্সিল ও প্যাস্টেল ইত্যাদির সাহায্যে আঁকা ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। পরিতোষবাবুর ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত তৈরি শিল্পকর্মের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী বলে এটিকে গণ্য করা যায়। প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সুবৃহৎ রচনা করেছিল একটি বৈদ্যুতিক মোটর-চালিত 'কাইনেটিক স্কাল্পচার।' এই বৈদ্যুতিক মোটরচালিত বিভিন্ন মাধ্যমের সমাহারে রচিত শিল্পবস্তুটিকে অবশ্য পরিতোষবাবু খেলনা বলে চিহ্নিত করে-ছিলেন। কিন্তু এটি নেহাতই খেলনা নয়। কাগজের মণ্ড দিয়ে শিল্পী একটি পূর্ণ-বয়ব স্বীয় প্রতিকৃতি তৈরি করে তাকে একটি সাইকেলের উপর বসিয়ে একজন সাইকেল আরোহীর মূর্তি তৈরি করেন। বৈদ্যুতিক মোটর টিপলেই এই আরোহী সাইকেল পেডাল করে চালাতে শুরু করেন, পিছনে পথ নির্দেশক সংকেত 'বাঁদিক ঘেঁষে চল', 'ডানদিকে চোখ রেখে চল', 'মাঝের দাগ খেয়াল রেখো' ইত্যাদি পর পর জ্বলে ওঠে, আরোহী বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে টেপ রেকর্ডে রাস্তায় যানবাহন চলাচলের শব্দ শোনা যায়। কাগজের মণ্ডে তৈরি স্বীয় প্রতিকৃতিটি এক কথায় অসাধারণ অভি-ব্যক্তিময়। গঠনের দিক থেকে মূর্তিটি অসাধারণ শক্তিমত্তার দ্যোতক এবং ভীষণ টেনস। মুখমণ্ডলে বিভ্রান্তি এবং অনিকেত-ভাব পরিস্ফুট। লোকটির মূর্তিতে বেগে ধাবমানতা দৃশ্যমান, কিন্তু অসম শক্তিশালী এই বিভ্রান্ত ব্যক্তিটি যে উদ্দেশ্য হীনভাবে ছুটে চলেছে বিনাশের পথে। শিল্পী বোধ হয় এই এফেকটটাই তৈরী করতে চেয়ে-

ছিলেন। মূর্তিটিতে এফেকট দৃশ্যমান। কিন্তু মূর্তি উপস্থাপনের পরিমণ্ডলে নয়। মূর্তিটির সাইকেলের উপরে বসে থাকার ভঙ্গি যে বেগের দ্যোতন সঞ্চার করে, পদচালনা সে-বেগে ঘটে না। দ্বিতীয়ত সাইকেলটিকে ঐ মূর্তির আত্মবিনাশের বাহন বলে মানা দুরূহ। মূর্তিটি এবং সাইকেলটির দৃশ্যগত পারস্পরিক সম্পর্ক যা তাতে সাইকেলটির পক্ষে ঐ মানুষটিকে বিনাশের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পথ নির্দেশক 'ডাইনে চলো', 'বাঁয়ে রাখো' সংকেতগুলি কিন্তু মূর্তির অংগের আয়তনের তুলনায় এত ক্ষুদ্র যে মূর্তিটি অনায়াসে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে। যা হোক এই ভাস্কর্য বা খেলনাটি প্রদর্শনীর মূল সুর রচনা করে।

কয়েক বছর আগে মার্কিন দেশে থাকতে তিনি অনুভব করেন সারা দেশ যেন পাগলের মতন শুধু বেগের নেশায় ছুটে চলেছে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না, শুধু গতির নেশায় ছুটে চলেছে। যেন এক আত্মবিনাশী নেশায় ভূতগ্রস্তের মতন সবাই ধেয়ে চলেছে। একটি দিব্যদৃশ্যে তিনি এই আত্মবিনাশী গতিনেশার প্রতীক করে তুলছেন। দুটি একক মোটর সাইকেল আসাহী ডাইনে বা বাঁয়ে বাঁকার নির্দেশ না মেনে ভীমবেগে নিরিখ মধ্যরেখা দিয়ে ছুটে এসে পরস্পরের বিরুদ্ধে ধাক্কা খেয়ে নিজের কাঙ্ক্ষিত বিনাশ ডেকে আনছে। প্রদর্শিত অধিকাংশ ছবিতেই আত্মহননকারী গতিনেশার এই ভয়ংকর প্রতীকটিই নানা-ভাবে রূপায়িত দেখি। তিনটি অসমাপ্ত ড্রইং-এ প্রতীকটিকে যেভাবে রূপায়িত হতে দেখি অনেক বড় ছবিতে তা দেখি না। এই ড্রইং তিনটিতে একই চরিত্রের অসাধারণ গতিময় রেখার সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত আরোহী এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সাইকেলের যে ছবি পরিতোষবাবু এঁকেছেন তাতে সমগ্র পরিস্থিতিটির অ্যাবসার্ডিটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ছবিতে পরিতোষবাবু তুলির টান ও তুলির টানে আঁকা রেখা এবং রেখাধর্মী পুঞ্জের সাহায্যে প্রচণ্ড ধাবমানতাকে এবং দুই বিপরীত বিহারী ধাবমানতার সংঘাতকে দৃশ্যমান করে তুলতে চেয়েছেন। ওঁর ব্রাশের টান অত্যন্ত গতিময় সন্দেহ নেই; কিন্তু একই ছবিতে বিভিন্ন দিকাভিমুখী রেখা এবং রেখার জালের আধিক্য ঘটায় দ্বন্দ্বের ভাবটি প্রকাশ পায় না, গতিমুখ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হয় না। উইলেম ডি কুনিং ও তাঁর ছবিতে ভিন্নমুখী, ভিন্ন গতিসম্পন্ন রেখার জাল সৃষ্টি করেন, কিন্তু হঠাৎ ঝরেকটি উজ্জ্বল বা উষ্ণ রঙের রেখা দাঁড়িয়ে উঠে মূল গতি সৃষ্টি করে, শটক তৈরী করে পরিতোষবাবুর পরিশীলিত চিত্রবর্মে সেই হঠাৎ জাগতা হয়ে ওঠা মূলগতির প্রকাশ দেখা যায় না। ফলে জান্তব শক্তির প্রকাশ তাঁর ছবিতে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করে না।

পরিতোষবাবুর ছবির বিষয় বস্তু যা এবং যে ধরনের রূপকল্পের সাহায্যে তিনি সে বিষয়বস্তুর অভিব্যক্তি খোঁজেন, সে সব খানিকটা প্রেক্ষিত দাবী করে। পরিতোষবাবু হয়ত সমতল দ্বিমাত্রিক চিত্রক্ষেত্রে বিন্যস্থ রেখাবদ্ধ গতি, পুঞ্জের আকৃতি এবং রঙের অভিক্ষেপের সাহায্যেই তার বক্তব্য প্রকাশে আগ্রহী, কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি খানিকটা প্রাতিস্বিক রূপকল্পের এবং তাদের পারস্পরিক বহির্জাগতিক বিন্যাসের সাহায্য নিলেন, সে মুহূর্তে ছবি খানিকটা প্রেক্ষিত দাবী করবে, পুরোপুরি সমতল থাকবে না। পরিতোষবাবুর রঙের ব্যবহার প্রেক্ষিত-সৃষ্টির অন্তরায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে— রং যেখানে একান্তভাবে অভিব্যক্তি সৃষ্টির কাজে, অভিজ্ঞতা প্রতিফলনের কাজে নিয়োজিত, সেখানে প্রেক্ষিত ইত্যাদি সংগঠনমূলক কাজে রংকে ব্যবহার করলে অভিজ্ঞতার বিশুদ্ধ প্রকাশও ব্যাহত হবে, সংগঠনের কাজেও ভালভাবে ব্যবহৃত হবে না। তত্ত্বগতভাবে কথাটা ঠিক কিন্তু আমরা ডি কুনিং-এর রঙের ব্যবহার দেখেছি। যে রং তাঁর অভিজ্ঞতাকে অভিব্যক্তি দিয়েছে, সেই রংই কালার পারস্পেকটিভ তৈরী করেছে। পরিতোষবাবুর ছবির রূপকল্পে ঘনত্ব চাষ। ঘনত্ব না থাকলে সংঘাতের বিধ্বংসী ক্ষমতা দৃশ্যমান হবে কি করে। কিন্তু পরিতোষবাবুর রূপকল্পে ঘনত্বের একান্তই অভাব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকল্পগুলি একতলনাত্মিক।

পরিতোষ সেন অধিকাংশ ক্যানভাসকে কাজ দিয়ে ভরে ফেলেন, তাতে ছেড়ে দেওয়া ক্ষেত্র থাকে না। হয়তো তিনি তা করে একটি শ্বাসরোধকারী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চান। কিন্তু সত্যই কি তা হয়? সবগুলি যে বড় ছবিতে তিনি সমতল ক্ষেত্রে ছেড়েছেন, সেখানে কাজ-দিয়ে-ভরা জায়গা-গুলির অভিক্ষেপ অধিকতর দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। ছবিতে কি ঘটনা ঘটছে তার উপর ছবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থময়তা নির্ভর করে না। আষ্টে-পৃষ্ঠে কাজ দিয়ে ভরে দেওয়া ছবিতে শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন 'টানেল' নামে ছবিতে আমরা আসন্ন অন্তের যে বিশদ বিবরণ পাই একসিডেন্ট সিরিজের দু নম্বর ছবিতে সে বর্ণনার এক দশমাংশও পাই না। কিন্তু ছবি হিসাবে 'একসিডেন্ট ২' সার্থক 'টানেল' অসার্থক। কারণ এক-সিডেন্ট ২'-তে বিবরণ-বিহীনভাবেই আসন্ন অন্তের অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে, তার বিন্যাসে, পুঞ্জের ভাব এবং পুঞ্জের গতি-ময়তায় ও তার দিকছন্দে।

মূল কথা একক ব্যক্তির আত্মহননকারী গতিনেশা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সে তত্ত্বের সমানুপাতিক প্রতীক যতোটা তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ ততটা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, কিংবা অভিজ্ঞতা-লব্ধ হলেও সে অভিজ্ঞতা এমন কোন সার্বিক অভিজ্ঞতা নয় যা জীবনে চালক শক্তির কাজ করতে পারে। ফলে অত্যন্ত ক্ষমতা নিয়েও সে অভিজ্ঞতার দৃষ্টিগ্রাহ্য ধ্বন্তরূপ সৃষ্টি করলেও কোথাও ফাঁক থেকে যাবেই।

ক্যানভাস গোষ্ঠীর প্রদর্শনী

পরিতোষ সেনের প্রদর্শনীর পর বিড়লা এ্যাকাডেমি গ্যালারিতে ক্যানভাস আর্টসটস সার্কেল দলের সদস্যদের চিত্র ও ভাস্কর্যের একটি প্রদর্শনী হয়। এই ক্যানভাস আর্টিসটস সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। সেই থেকে ক্যানভাস দলের সদস্যরা কলকাতা শহরে তাঁদের চিত্র ও ভাস্কর্য কর্মের নিয়মিত প্রদর্শনী করে যাচ্ছেন। এঁরা বয়সে কেউই নেহাৎ কচি নন। দলের সদস্যদের অধিকাংশই মধ্য-পাব হয়েছেন, কিছু সংখ্যক ইতিমধ্যে প্রৌঢ়ত্বে ছুঁই ছুঁই করছেন। সুতরাং সদ্য-শিক্ষোত্তীর্ণ সদ্য-সমাপ্তকারী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমাধারী চিত্রকর ভাস্কর্যের যে মানে বিচার করা হয়, সে মান এঁদের কাজে প্রযোজ্য নয়, পেশাদারী শিল্পীর চিত্র ও ভাস্কর্য যে মানে বিচার করা হয়, এঁদের কাজ বিচারেও সেই মান প্রযোজ্য।

প্রথমেই এঁদের কাজের সার্থক শিল্প-গুলির কথা উল্লেখ করি। বেশ কয়েকজনের কাজ দেখে মনে হল, তাঁরা শুধু অভ্যাসবশে কাজ করেন না, ঘর সাজানোর জন্য পণ্য-বস্তু তৈরী করেন না। ছবি বা ভাস্কর্যকে বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম বলে মনে করেন। অর্থাৎ এঁদের কিছু বক্তব্যও রয়েছে, শিল্প-বস্তুকে তাঁরা যার প্রকাশ বলে মনে করেন।

কিন্তু শিল্পবস্তু তো শুধুমাত্র বক্তব্যের মাধ্যম বা আধার নয়, শিল্পবস্তু যেন বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব মাত্র করে না। শিল্প-বস্তু প্রাথমিকভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে উদ্দীপ্ত করে শিল্পবস্তু তার শারীরিক সত্তা দিয়ে বক্তব্যের ইংগিত দেয়। অর্থাৎ বক্তব্য প্রকাশ শিল্পের অন্যতম প্রধান কর্ম হলেও, প্রাথমিক কর্ম নয়, কিন্তু অধিকাংশ ছবিতেই যেন প্রকারে বক্তব্য প্রকাশ প্রাথমিক শর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, ফলে শিল্পশরীরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ব্যাহত হয়েছে। কোন প্রকার বক্তব্য প্রকাশের জন্য শিল্পীরা কিছু প্রতিমানলক্ষণের সাহায্য নিয়েছেন— যেমন মুষ্টিবদ্ধ হাত, উত্তোলিত বাহু, ভয়ার্ত মুখমণ্ডল, পতনোন্মুখ মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। এ অনেকটা যেন আধুনিক দুর্গা প্রতিমা গঠন দশ-প্রহরণধারিণী, দশভুজা মহিষমর্দিনী দাঁড় করাতে পারলেই যেন বরাভয়দাত্রী মাতৃমূর্তি হয়ে গেল!

শিল্পে বক্তব্য প্রকাশের প্রাথমিক শর্ত, শিল্পের নিজস্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্য দিয়েই বক্তব্যকে স্বপ্রকাশ করতে হয়। বক্তব্য যদি শিল্পীর অভিজ্ঞতালব্ধ হয় এবং শিল্পী যদি শিল্প ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে সে অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যকে ব্যক্ত করতে পারা যায় না বলে মনে করেন, তবেই কেবল শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশের সঠিক ভাষা এবং শৈলী সম্বন্ধে যত্নবান হতে পারেন, নচেৎ নয়। শিল্পী যেহেতু একজন মানুষ এবং একটি নির্দিষ্ট সময়-এককে তাঁর অভিজ্ঞ-

খেলনা পরিতোষ সেন

তার সার্বিক পরিমণ্ডল যেহেতু এক, সেই-হেতু একটি নির্দিষ্ট সময়-এককে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা, শৈলী একাধিক হতে পারে না। যদি হয়, তা হলে বুঝতে হবে কোথাও ফাঁকি আছে। বক্তব্যটি হয় অভিজ্ঞতার ফসল নয়, না হয় একান্তভাবে কোন শিল্পিতরূপের দাবী নিয়ে শিল্পীর কাছে উপস্থিত হয়নি। এই প্রদর্শনীতে, অনেকেই দেখলাম, একাধিক ভিন্নধর্মী শৈলীতে এক ধরনের বক্তব্য পেশ করেছেন।

মানিক তালুকদারের ভাস্কর্যই প্রদর্শনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ বলে মনে হয়। মানিক প্লাস্টারে দুটি, এলুমিনিয়মে একটি ও এলুমিনিয়ম ও কাচের সমাহারে নির্মিত একটি রচনা পেশ করেন। ওঁর কাজে মাধ্যমমনস্কতা, কারিগরী দক্ষতা এবং ভাস্কর্য বস্তু গঠনের নিজস্ব সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্যণীয় গুণ। কিন্তু তাঁর কাজে এখনও তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দেখা যায় না। মানিকের প্রদর্শিত কাজগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটির কথাই ধরা যাক; প্লাস্টার তৈরী সোনালী পাখী এবং কাঠ ও এলুমিনিয়ম নির্মিত 'পেণ্ডুলাম'। প্রথমটিতে বহির্জাগতিক পাখীর রূপ এবং পাখীর শিল্পীরূপের সম্পর্কভেদের মধ্য দিয়ে পাখীর একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিঅভিজ্ঞতারূপ দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টিতে ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে এই শিল্পীত পেণ্ডুলামের সাদৃশ্য,—বৈসাদৃশ্যের প্রশ্নটি একান্তই গৌণ। এটি ভাস্কর্যের নিজস্ব বৈষয়িক সমস্যা, অর্থাৎ ভাব ও ভারসাম্য-সম্পর্ক বিষয়ে একটি রচনা। একই সঙ্গে পাত্র বন্ট ও বল্টের আয়তনিক প্রসার নিয়েও এতে নিরীক্ষা করা হয়েছে। মানিকের দুটি রচনা দুটি ভিন্নমুখী মানসিকতার পরিচয় দেয়। তা সত্ত্বেও দুটি রচনাই নিজ গুণে শিল্পবস্তু।

অলোক ভট্টাচার্য, শান্তি চক্রবর্তী এবং বলাই কর্মকারের রচনায় তবু খানিকটা পেশাদারী যত্ন পরিলক্ষিত হয়। অলোকের মন্তাজ-রচনা পোট্রট অফ এ উচম্যান অভিব্যক্তিমূলক বিন্যাসগুণে দৃষ্টি আকর্ষক। অন্য দুটি অত্যন্ত নাটুকে। শান্তি চক্রবর্তী নিসর্গদৃশ্যকে অরান্তর-বিশ্লিষ্ট মুক্ত করেছেন রং ও আয়তক্ষেত্রের প্রায়-বিমূর্ত বিন্যাস গড়ে তুলতে। আকর্ষণীয় ওঁর বর্ণিকভঙ্গী। বলাই কর্মকারের 'প্রিজনার' রেখার অভিব্যক্তিমূলক ছন্দোগুণে সমৃদ্ধ এবং রূপ-কল্পের উপস্থাপনায় স্মরণীয়।

এই প্রদর্শনী দেখে আবার মনে হল, আমাদের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা বিষয়-সচেতন তাঁরা শিল্পবস্তুর নিজস্বতা সম্পর্কে এতটুকু যত্নবান নন, আর যাঁরা শিল্পশরীরমনস্ক তাঁরা প্রায়শই বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্বিকার। এই অবস্থায় ভাল শিল্প জন্মাবে কি প্রকারে?

শর্মিলা রায়-এর প্রদর্শনী

ছোট্ট মেয়ে শর্মিলা রায় ছবি আঁকে বড়োদের মতন। হয়তো বড়োদের দক্ষতা তার আয়ত্তাধীন নয়, কিন্তু মানসিকতা বড়োদের মতন। গোপাল ঘোষের দক্ষতা শর্মিলার কাছে আশা করা বাতুলতা। তার জন্য সময় দরকার। কিন্তু যতটুকু সে আয়ত্ত করেছে তা বিস্ময়কর। অতটুকু মেয়ে যেভাবে টোনাল গ্রেডেশন করেছে, আলোছায়ায় খেলা দেখিয়েছে, যে রকম স্বাচ্ছন্দে দ্রুত রেখার টান দিয়েছে, রঙ সরিয়ে রেখার আঁচড় দিয়েছে, বর্ণ সমাবেশ ঘটিয়েছে তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

শর্মিলার ছবির প্রথম প্রদর্শনী হয়ে গেল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর গ্যালারীতে। প্রদর্শনীতে শর্মিলা জল-রঙে আঁকা একত্রিশটি, প্যাস্টেলে আঁকা পাঁচটি, এবং কালি-কলমে আঁকা দুটি ছবি উপস্থিত করেছিল। প্যাস্টেলে আঁকা তিনটি প্রতিকৃতি ছাড়া সব কয়টি ছিল নিসর্গদৃশ্য। সবকয়টি নিসর্গদৃশ্যেই প্রকৃতিকে দেখা হয়েছে দূর থেকে, সব দৃশ্যেই উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আকাশ ছবির মূল রাখালিয়া সুরটিকে মূর্ত করেছে। আর আছে একাকী গাছ ইত্যাদি। ছবির বিন্যাসে একটি রোমান্টিক দূরভিসার মূর্ত হয়ে উঠেছে। এর উপর আছে রঙ। অল্পজোরসম্পন্ন সম্পূরক রঙের ব্যবহারে একটি বিষাদের সুর বিন্ বিন্ করে বাজে এবং বিন্যাসের সহায়ক হয়ে ওঠে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন মানসিকতাটা একটু বুড়োটে, তেরো বছরের বালিকাসুলভ মোটেই নয়। এবং তার পরেই হয়তো বলে ফেলবেন —এ নিশ্চয় গোপাল ঘোষের ছবি দেখার ফল। বর্তমান লেখকের তা মনে হয় না। ব্যাপারটা যদি ভিতর থেকে না ঘটত, তা হলে রেখা এত স্বাচ্ছন্দ্য হত না, বর্ণান্তর ঘটানোও সহজ হত না। ব্যাপারটা ঘটেছে অন্তর-তাগিদেই। বালিকাটির ড্রইং একটু কাঁচা। কিন্তু যেখানে সে নিসর্গদৃশ্য রচনা করেছে—সেখানে কোথাও 'কাঁচামি' নেই। অর্থাৎ শর্মিলার শিল্পসৃষ্টি একান্তভাবে অনুভূতি নির্ভর। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-সত্ত্বাকে সাধারণ নিয়ম দিয়ে বিচার করা চলে না। তেরো বছরের কিশোরী মানসিকতায় তেইশ বছরের যুবতী হতে পারে। দক্ষতার কথা ভিন্ন।

—প্রণবরঞ্জন রায়

স্রোতের সমীপে পাখি দেখা

রুণ ঘোষ

দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। ব্লটিং পেপারের মতো গা, যেখানে বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পের ছেঁয়া। কটা মাথায় রুক্ষ চুলের জট। মুখের ওপর মাছি বসছে। ভন-ভন করছে মাছির ঝাঁক। তার কৌপিনের ন্যাকড়ায় শিশ্নে স্বেচ্ছাচার। বাঁ হাতে একটা প্লাস্টিকের ফাটা শূন্য গেলাস প্রায় মুখের কাছাকাছি তুলে আনা উবু হয়ে বসে আছে লোকটা। ডান হাতে একবার গেলাসের ভেতর থেকে মাছি তাড়িয়ে খাবার ভাগতে জড়ো করা আঙুল, মুখের কাছা-কাছি তুলে আনছে। মুখ পর্যন্ত উঠছে না, হাত কাঁপছে। আবার মুখের ওপর থেকে মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছে। মুখখানা গেলাসের কাছাকাছি ঝুঁকে আসছে। কিছুতেই আর কাঁপা হাত মুখ পর্যন্ত উঠছে না। ওঠবার আগেই মুখের চার পাশের মাছি সরিয়ে ফেলতে হচ্ছে। এবং আবার...। ক্লান্তিহীন এই প্রচেষ্টা।

এইভাবে অক্লান্ত মানুষটা শূন্য একটা গেলাস থেকে কী যে সামগ্রী মুখে তুলবার

চেষ্টা করছিল আমি তা জানি নে। শুধু কোম্পানী বাগানের সামনে দেখেছিলাম এমন এক মানুষ যিনি এই পৃথিবীর গাছ-গাছালির আলোয় মানুষের সকল গৌরবের ঠিকানার ওপরে উবু হয়ে বসে আছেন, বসে বসে নাম লিখছেন মানুষের!

বা জীবনের?

অক্লান্ত তিনি লিখে চলেছেন।

এর পর আমি তার খোঁজ করি নি, বা তার লাশেরও না। আসলে এর পর থেকে লোকটা আমার কাছেই থাকে। খায়-দায়, শুতে যায় আমার সঙ্গে। তবে সব সময় সে কী থাকে আমার সঙ্গে? থাকে হয়তো। আমি সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না। মাঝে মাঝে সে যে কোথাকার কোন্ এক ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে।

তার সুবিধা, পায়ে কোনো শব্দ হয় না। হাওয়ার আগেই হাঁটতে পারে। আর লোকটা এমন মজার ঐ যে প্রথম দেখেছিলুম, ঐ দিনই সে আমার সঠিক বয়সটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। যেন আমার বয়সটা তার সেই ফাটা গেলাসটার মধ্যেই এতদিন পড়েছিল। মন্ত্র পড়ে সেই বয়সটা এখন আমার দিকে ছুড়ে দিল। আমিও আগ্রাসী, লুফে নিলুম। টুপ করে পকেটে ভরে ফেললুম।

এর আগে আর একটা বয়স ছিল আমার। সেটাই তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো। আমার সঙ্গে গঞ্জেও যেত। চরেও যেত। হপন হাড়ামের সঙ্গে ভাগিরথী পর্যন্ত হেঁটে যেত। শিকারের দিনগুলো বেহুঁশ কাটতো আমাদের। পাখির ডাক চিনিয়ে দিত হপন হাড়াম। পাখির ডাক পড়ে সঠিক সে বলে দিতে পারতো কে ডেকে পড়েছে, কে দলছুট হয়ে দলে ফিরে যেতে চাইছে। কিংবা কেউ, তার গলা চিরে এক ধ্বনির শব্দে ডাক দিলে সেই ডাক শোনবা মাত্র হপন বুঝে নিত। বলতো, অম্বরে শালা মরচে। সে রসের চোখ মটকে দিত। আমার কাঁধে চাপড় তুলে সে এক রকমের ছুর্ ছুর্ করে হাসতো। বসো হে। বসো, বসো।

সে যেমন বসতো তার দেখাদেখি কোনো ঝোপ বা গুল্মের পাশটিতে নিজেকে আমিও লুকিয়ে ফেলতুম। আমার সেই বয়স শুধু তো রঙ চায়, স্বপ্ন ছুঁয়ে উড়ু উড়ু চলে যেতে চায়। তাই আমি হপনের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন। বুক ঠেলে ধড়ের শ্বাস আমার হুড়োহুড়ি করে উঠে আসে। হপন কুঁজো হয়ে বাঁ পাশে কাৎ হয়। আমিও হই। সে এখন নির্দেশ দিলে আমি এই মুহূর্তে ঘাস হয়ে যেতে পারি। ঘাস বললে ঘাস, পিঁপড়ে বললে পিঁপড়ে। হপন হাড়াম কি যে আমায় হতে বলবে!

ওসব কিছুই হতেটতে বললো না সে। তার গলা আমার কানের কাছে নীচু হয়ে এলো, দ্যাখ, দেখতে পাচ্ছিস? হুই, হুই— ই যে?

আমার চোখের সামনে শুধুই গাছ আর ডাল আর পাতাপুঁতির ভাঁড়। সবুজ আর কালচে কিছু রঙ।

কই?

আমি ঘাড় উঁচু করে দিই। চোখ দুটো কচলে ফেলি। যেন পরদা নতুন হয়ে যাবে। আমি দেখতে পাব, গঞ্জে যেমন নগরদোলায় চড়লে দেখি, অমনি!

ক্যাচ ক্যাচ ক্যাচোড়্

স্বগ্‌গে যান বিবি

উড়ছে ঘোড়ার কেশর। — চোখের পরদা আরও জড়িয়ে যায়। এখন যদি হপন হাড়ামের একটা চোখ আমি পেয়ে যেতাম!

ছটফট করি। কই। কই? কই—

হপন দাবড়ে দেয়। ঠাণ্ডা, অথচ মুগুরমারা গলায় বলে, ই শালা আচ্ছা ত বটে! থাম যাহ্।

হপন একটা রাগী কুকুর দাঁত খিঁচিয়ে দেয় আমাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে যেমন দেখছিল আবার তেমনি দেখতে থাকে।

আমি চুপসে যাই। বেলুন ফেঁসে গেছে। বুকের ভেতরটা দুর দুর করে। গলার কোথাও এমন ভার ঝুলে থাকে, আমি যেন ডুবে যাচ্ছি।

এরকম সময় আমি কাঁদতেও পারি না। টমু হলে সে এখুনি আড়াল থেকে গুলতিতে টিপ করতো। একটা টিপ মাত্তর, ব্যস। সঙ্গে সঙ্গে টমুও ভোঁ কাট্টা। ও যা দৌড়ুতে পারে! হপন হাড়াম ওকে ধরবে?

ইস। ধরুক তো দেখি।

টমুর জন্য আমার কান্না পাচ্ছিল।

টমুর জন্যে, আমি তো ওকে একটা পদ্য লিখে দিয়েছি, টমু কি আমার জন্যে এটুকু করবে না? হঠাৎ দেখি ঝোপের ভেতর আমার সামনেই এক সাপ গলা বাড়িয়ে দুলছে। শূন্যে দুলছে। সরু, নীলচে। কেমন চেরা চেরা জিভ চক চক বার করছে। ক্রমশ এ গয়ে আসছে। গোল-খুদে চোখ দুটো আমার চোখের ওপর থেকে নড়ছে না। আমি তো জানি লাউডগা সাপ কোমরে বেড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তারপর চোখ খুলে খায়। তবু আমার গলা থেকে শব্দ বেরুচ্ছে না। হাড়ামকে ডাকতে পারছি না। আমি নড়তে পারছি না। সাপটা ধীরে ধীরে আমার চোখের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি চোখ দুটো দু হাতে চেপে ধরে কী করে যে চিৎকার করে কেঁদে উঠলুম।

রাত্রে হপন হাড়াম বনের মধ্যে জেগে জেগে আমাকে পাহারা দিত। ঘুঘু বললে ঠ্যাং ধরে আমার দিকে এগিয়ে দিত। নেহ, ধর।

একটা আস্ত ঘুঘু। পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুড়িগুলো নাবিয়ে দিয়েছে। পোড়া মাংসের গন্ধ এমন মিষ্টি আমি কি আগে জানতুম! আগে আগে বরং বমিই করতো। গা গুলিয়ে ওক ওক করতো। কিন্তু হপন যখন কাপড়ের পুঁটুলি খুলে বাঁশের চোঙার ভেতর থেকে নুন বার করলো, সেই মাংসের ওপর ছিটিয়ে দিল,

চট্টোলা একটা পাতার ওপরও খানিকটা রেখে দিল, আমার তখন সারা দিনের খিদে, হাড় মাংস চিবিয়ে সেই গোটা ঘুঘু আমি কুড়মুড় করে খেয়ে ফেললুম।

সেবার শিকার থেকে ফিরে আমি একটা কাঠবিড়ালীর ছানা ধরে এনেছিলুম। বাড়িতে একা একা শুয়ে থাকলে বারান্দার কোণা থেকে আমি ওকে ডাকতুম। হুপন হাড়াম যে রকম ঠোঁট গোল করে শিষ দিত অবিকল আমিও তেমনি শিস দিয়ে ডাকতুম। ডাকলেই ও কাছে আসতো। গায়ে উঠতো। ল্যাজে তো ওদের চামর থাকে, সেই দিয়ে আহ্লাদে আমাকে আদর করতো। সেই যে কোন্ আদ্যিকালে কাঠবিড়ালীতে সাগর বেঁধেছিল, সে সময় খুশী হয়ে রামচন্দ্র হাত বুলিয়ে আদর করেছিল। তখন থেকেই ওদের পিঠের ওপর রামচন্দ্রের আঙুলের ছাপ। আমি সেই ছাপগুলি খুঁটিয়ে দেখি। ও আমার শরীরে উঠে এলে টের পাই আমি এক অরণ্যে ঢুকে পড়েছি। অরণ্যে তো অনেক রঙ। অনেক রূপের দেশ। যেখানে পা রাখলে মানুষ রূপকথা হয়ে যায়। হুপন হাড়াম এই অরণ্যেই একদিন সেই যে গেল আর ফিরতে পারে নি। আমি জানি, হাড়াম কোনো বনস্পতির আড়ালে তার রসের চোখ মটকে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। সে কেবলই দেখে যাচ্ছে। রূপ এমনই।

আমি তো চরেও গেছি।

সেই বয়স নিয়েই গেছি।

চরের বালিতে কি রকমভাবে দিন গড়িয়ে যায়, চাঁদ উঠে আসে দেখেছি। টমরু খুকুদি, আমারও খুকুদি, একবার চুপি-চুপি আমাকে এই চরে ডেকে এনেছিল। আমার হাতে লজেনচুষ দিয়ে বলেছিল, অ্যাই ছিপে শোন্।

সেই চরে এসেছিলুম রাত্রে।

মাথার ওপরে হলুদ কদম ফুলের মতো একটা আলো ঝুলছিল। মরা নদীর জলে শ্যাওলা। বুড়ো অশথের তলাটায় চাপাচাপি অন্ধকার। এই জলের ধারে আর ঝুরঝুরে বালুর চরে রাত এক অদ্ভুত শব্দ তুলে বাজে। খুকুদির হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছিল খুকুদিও আমার একটা ঝুমঝুমি নিয়ে হাঁটছে। খুকুদি তুমি থেমো না। তুমি হেঁটে হেঁটে হেঁটে যাও। আমার জন্যে তুমি আজ ঝুমঝুমি এনেছো। খুকুদি বললো, ছিপতি অ্যাই। একলা ফিরে যেতে পারবি তুই?

খুব পারবো। এক ছুটে—টে চলে যাবো।

তুই পারবি।

আমি তো পারি। সত্যি সত্যি, দেখবে? আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে খুকুদি চরের মধ্যে বসে পড়লো, আমার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বললো, থাক। একটু বোস আগে।

আমার তখন সাহস বেড়ে গেছে। খুকুদির সামনে আমার কোনো ভয়ই নেই, হয়।

টমরুর সাহস আমার দশ গুণ জানি। তবু খুকুদির সামনে একটা মিথ্যে কথা বলতে আমার খুউব ইচ্ছে করছিল। আমি বললুম, এই খুকুদি জানো টমরু না অই অশথতলায় যেতে পারে না। ওখানে তো মড়া পোড়ায়। আমি পারি, জানো?

খুকুদি কোনো কথা বললো না। আচমকা একটা হ্যাঁচকা টানে আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল। যেন আর কোনো-দিন আমাকে তার বুকের বাইরে কোথাও যেতে দেবে না। তারপর দু হাতে ধরে আমার মুখের ওপর ওর মুখ নাবিয়ে নিয়ে এলো। খুকুদি চুমো খেলো। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, ক্যানো খুকুদি তুমি ক্যানো এমন করছো! তুমি কি আমার মা? আমার মা এমনি করে আমায় চুমো দেয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মুখের ওপর টপটপ করে গরম জলের ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগলো। আমি তো কয়েক ফোঁটা খেয়েও ফেলেছি, কেমন লোনা লোনা স্বাদ। তাই চট করে বুঝে ফেলেছি আমার, খুকুদিকে ঠ্যালা দিয়ে বললুম, খুকুদি! এহ-ই, এহ-ই—ই খুকুদি! তুমি কাঁদছো ক্যানো?

খুকুদি কথা বললো না। শুধু আবার আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিল।

তারপর চুপচাপ বসে রইলো।

আর পাতলা একটা হলুদ ওড়নার মতন চর পড়ে আছে। সেও চুপচাপ। আমিও একা একা বালুর মধ্যে আঙুল ভরিয়ে দিচ্ছিলুম। মুঠিতে ভরে বালু তুলে আন-ছিলুম, আর ঝিমকি বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম সব। বেশ মজা লাগছিল।

পাশ থেকে কখন যে খুকুদি উঠে গেছে টের পাইনি।

আগুপিছু তাকাতেই দেখতে পেলুম খুকুদি চরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমি দূরে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলুম আজও সেই ঝুমঝুমি বাজছে। আমি উঠে পড়-লুম। আমাকে দাঁড়াতে দেখে খুকুদি দৌড়তে লাগলো। নরম চরের ওপর দিয়ে আরও নরম পা ফেলে ফেলে খুকুদি দৌড়ে চলেছে। আমিও ওর পেছন পেছন দৌড়তে লাগলুম। সেই হলুদ ওড়নার আবছা আলোয় খুকুদির আঁচলা বাতাস জড়িয়ে এক শূন্যে উড়ছে। জলের গন্ধ আর ঝুরঝুরে বালুচরে অপরূপ রাত বাজছে। খুকুদির ঝুমঝুমি বাজছে। আমার মনে হলো, সেই গল্পের নাগরদোলায় যেমন, অমনি, স্বর্গে যান বিবি, তার ঘোড়ার কেশর উড়ছে।

এক সময় খুকুদি সেই ঝুমঝুমিটি কোথায় যেন ফেলে দিল। খুকুদি আমার দু চোখের ওপর থেকে হারিয়ে গেল। আমি একা সেই চরের ওপর দাঁড়িয়ে ডাকের পর ডাক দিতে থাকলুম, খুকুদি খু কু দি...

কোথাও কোনো শব্দ নেই আর। কেবল সেই ডাক চরের ওপর আছড়ে পড়তে লাগলো। আমাকে একা ঘিরে কেবল হি হি করতে লাগলো চর। কিন্তু খুকুদি?

এই বয়স, খুকুদির জন্যে আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

পরে আর একটা বয়স যখন পেয়ে গেলুম আমি সেই কোম্পানী বাগানের

—এবার শারদীয়া পূজায়—
নূতন প্রচণ্ড হাসির নাটক (পূর্ণাঙ্গ)
[অফিস ক্লাব ও বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় উপযোগী]
কিরণ মৈত্রের
টোপর বদল হ'লো ৪-০০
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ৪-০০
ডাইভোর্স ২-৫০
সিটি বুক এজেন্সী
৪৪।১সি বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

ধারে। বলা যায়, সেটাই তো আমার সঠিক বয়স। তখন, সহজেই একদিন দুপুরবেলা গঙ্গার ধারে এক দেহাতি মেয়েমানুষের হাত থেকে গাঁজার কলকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছি। তার কষ বেয়ে টসটস করছিল আরামের লালা। কৌতুকে চোখের গুলি নাচিয়ে বললো, লে পীয়ো? আমি সেই কলকে আয়েসে খেতে পেরেছি।

আমি জানি বয়সের মতো বয়সে মানুষের গায়ে চন্দনের সুবাস আর থাকে না। বর্ষায়, বৃষ্টিতে বা ঘামে ধুয়ে যায়। যেমন সেই কাঠবিড়ালী গেছে, হপন হাড়াম গেছে। আমার খুকুদিও গেছে। সবই যায়, গঞ্জও যায় চরও যায়। যেমন যায়, তেমন আসেও কিছু। যে বয়সটায় এখন আমি আছি সেটাও তো একটা পাওয়াই। মাস গেলে এখন আমি কোম্পানীর খাতায় দিব্যি একটি সই ঠুকে নোটের বান্ডিল পকেটে তুলে নিতে পারি। এবং তুলে নিলে প্রতিবারই আমি শুনতে পাই একটা বিকট যন্ত্র যার মাথামুণ্ডু আমার মগজে ঢোকে না সে ভারি খটোমটো, কোথাও যেন ফাঁসে চলেছে। বিবামবিহীন। এই যন্ত্রে আমার টিকির সঙ্গে টান। আমার যৌবন, আমার রক্ত পাম্প করা হচ্ছে। বিনিময়ে এই কাগজের বান্ডিলে আমার ভালবাসার সীলমোহর। আমি মুঠি খুললেই এখন জীবনের ঐশ্বর্য হা হা করে হেসে ওঠে। যেমন খুশী আমি ঠ্যাং বাড়াতে পারি। লম্বা ঠ্যাঙে ঠর ঠর হেঁটে যেতে পারি। কোনো বেয়াদব ছুঁড়ির ঝুঁটি ধরে তার নাকের ডগায় আমার ভালবাসার সীলমোহর থুতুর মতো ছিটিয়ে দিতে পারি। আবার এই বয়সেই মানুষ হঠাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

বয়সের অলেখ্য অলোয় সবই দেখতে পাই। যেমন এখন দেখছি, প্রতিমার অনুজ্জ্বল মুখ। ওর পল্লবের নীচে গভীর ছায়া শুয়ে আছে। গোটা মুখে সেই ভার। উৎসবের প্রাঙ্গণে বা মন্দিরে প্রতিমার এখন ডাক নেই। অথচ প্রতিমা আমারই জন্য জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। রুবি স্কুল থেকে ফিরলে ওর রিবনের ফাঁস আলগা করে দেবে। খাইয়ে দাইয়ে ওকে আরও বড় করে তুলবার জন্যে ওর সামনে বই মেলে ধরে। প্রতিমার যেন শোকতাপ কিছুই নেই, মেয়ের সামনে বসে সে তেমনি সত্যি প্রতিমার মতন ঝলমল করতে চাইবে। আর 'মা মণি'—এই ডাকে, ছেলেবেলার কোড়ো ফলের মতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে প্রতিমা তার কোচড় ভরে তুলবে।

বিছানার অন্ধকারে প্রতিমার শরীর মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি সমস্ত নিশানা হারিয়ে ফেলি। অন্ধকারে মাইল মাইল হাঁটি। মাঠের ভিজে হাওয়ায় মরা নক্ষত্রের কান্না মিশে থাকে। আমার পা ভারী হয়ে ওঠে। ক্রমশ গভীর দূরত্বে আমরা হারিয়ে যেতে থাকলে আমার হাঁটু ভেঙে ক্লান্তি নামে। বিশ্রামের জন্যে আমি শরীর ছড়িয়ে দিতে চাই।

আর তখনই সকল হয়। প্রতিমা পেয়ালা ভরে চা নিয়ে আসে। বাইরের কুয়াশায় জানালা আক্রান্ত হয়। গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢুকেও পড়ে।

কুয়াশায় ভেসে যায় প্রতিমা, জানালা বন্ধ করে দেয়।

রুবির গায়ে চাদর টেনে দেয়।

আমি পেয়ালা হাতে নিয়ে রুবিকে দেখি, ঘুমিয়ে রয়েছে, নিঃসাড়। ফুটফুটে মুখের পাশ ঘিরে পশমের মতো চুল। এ সময় ঘুমন্ত শিশুর মুখ মানুষকে বড় আকুল করে তোলে। প্রতিমা আমার দিকে তাকায়। সে বুঝতে পেরেছে। ঈষৎ হাসি টেনে বলে, জানো কাল রাত্রে বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার হয়েছে। তুমি দিব্যি নাক ডাকাচ্ছো, আমি তো ভয়ে মরি!

প্রতিমা ওর স্বপ্নের কথা বলে। একটা মানুষ জল্লাদের মতন চেহারা, বিরাট একটা খড়্গ হাতে নিয়ে আকাশ ফাটিয়ে হাসছে। রুবিকে কেড়ে নিতে চাইছে। কিছুতেই আমি একা সেই লোকটার সঙ্গে পেরে উঠছি না। তখন প্রাণপণে তোমাকে ডাকছি। আর তুমি যেন দূর থেকে আমার ডাক শুনে দৌড়ে আসছো। যেমনি তুমি সামনে এসে দাঁড়ালে অমনি জল্লাদটা কেমন গুটিয়ে গেল। তখন খড়্গটা তোমার হাতে। আর লোকটা তোমার পায়ের তলায় পড়ে কুঁই কুঁই করছে। প্রতিমা শরীরে চিকন কেটে বললো, মা গো, আমি কেঁপে মরি! ভাগ্যিস তুমি অমনি করে এলে।

শুনতে বেশ মজাই লাগছিল। প্রতিমা আমাকে দিব্যি বীরপুরুষ বানিয়ে নিয়েছে। জল্লাদের মুঠি থেকে খড়্গ ছিনিয়ে নিয়েছি, ইয়ারকি নাকি? পরিত্রাতার ভূমিকায় আমি এই শ্রীপতিসুদন ভাবলেই আমার গলার ভেতরটা কেমন চুলকিয়ে ওঠে। আমার সামনে মিত্তির ব্যানার্জি আর শালা চাকলাদারের মুখগুলো ভেসে ওঠে। ওদের সঙ্গে আমি কোনো দিনই পেরে উঠবো না। এই বাঙ্গোৎগুলোর জন্যে আমার চেয়ার বদলাবে না। যে চেয়ারে আমি বসে আছি সেই চেয়ারেই আমাকে বসে যেতে হবে। প্রতিমা জানে না, এইসব জল্লাদের হাতে এখন সমূহ শক্তি। ওদের মুঠিতে খড়্গ কাঁপে না, ওদের কাছে আমি তো দুঃখপোষ্য, ছেলেমানুষ। প্রতিমার জন্যে এই মুহূর্তে আমি করুণাবোধ করি।

এমনি করে মধ্যে মাঝেই আজকাল আমার মুঠি খুলে যায়। কে যেন কোথাকার এক খোপ থেকে হুট করে বেরিয়ে আসে। আমার মুঠি উদোম খুলে দিয়ে বলে, দ্যাখো হে দ্যাখো, জীবনের ঐশ্বর্য দ্যাখো।

আমি দেখি।

সে বলে, কেমন দেখিস শ্রীপতি?

আমি বলি, এযে স্রোত। অবিরাম, অনন্তকাল ধরে চলছে। এর শুরু তো আমি চিনি। কিন্তু শেষ কবে? সে উত্তর দেয় না। কেবল মুচকি দিয়ে সরে যায়। অসলে কেটেই পড়ে সে।

আবার মনে পড়ে যায় সেই গঞ্জের নাগরদোলা চরের কথা, হপন হাড়ামের কথা, সেই কাঠবিড়ালীর ঘ্রাণ। আমি যেন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। যতদিন পর্যন্ত সেই বিবি খান স্বগুণে আর ঘোড়ার কেশর উথালি-পাথালি উড়বে শূন্যে, চরের সেই হলুদ ওড়নার ফিনফিনে আলোয় বা আবছায়ে খুকুদিরা রহস্যময় অদৃশ্য হয়ে যাবে, হপন হাড়ামেরা বংশ পরম্পরায় অরণ্যের মধ্যে রূপকথা হয়ে মরবে কিংবা কাঠবিড়ালীর ঘ্রাণ যতদিন পর্যন্ত এক বাহারী অরণ্য ডেকে আনবে ততদিন পর্যন্ত কী এই স্রোতও বয়ে চলবে না? নিরবচ্ছিন্ন এই স্রোত চলে যায়।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলে আমি কখনো প্রতারিত হই না। এই স্রোতের সামনে এসে আমার দুই ঠ্যাং দৃঢ় হয়ে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা চাঁদ ঝুলে থাকে, খজুগাছ ভূপাতিত হয়। পিঁপড়ের বাসা ভেসে যায়। প্রতিমা ভেসে যায়। রুবি ভেসে যায়। আমি দেখতে পাই, সেই জল্লাদেরাও ভেসে যায়। নিভাঁজ শাদা খড়্গ যায়, গঞ্জ যায়, চরও ভেসে যায়। আমলাদের দাড়ি নেড়ে এই স্রোত কখনও বা খরতর হয়, ভেসে যায়। সবই যায়। আমার দেখতে ভাল লাগে। আমি জানি, এখানকার নির্মল হাওয়া ব্যাধ হতে পারে, যে পাখি এখানে আসে নাচে আর গান গায় তার জন্যে আমার কোনো ভয় নেই। আমি কবতালি দিয়ে এক মহান কবিতার যাবতীয় সঙ্গীত এবং ছন্দ গভীর চৈতন্যে শুষে নিতে থাকি।

আমার অচৈতন্য দেহ অনিবার্য কলস্বরে ক্রমে ভেসে যায়।

আমি জানি নে সেই কদাকার মানুষটা তখনও কোথায় থাকে! তার মুখের চারপাশে ভণভণ করে মাছি, মলমূত্রে শিশুর মতন তার স্বেচ্ছাচারিতা। নির্বিকার, উবু হয়ে বসে থাকে সে। কুচ্ছিৎ সেই ছবি; অনন্ত এক খেলায় মেতে থাকে। অনন্তকাল।

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চার্চিল চিরকাল ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী ও গোঁড়া রক্ষণশীল ছিলেন। যুদ্ধের এই বিপদেও তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক ইঞ্চি ভূমি কিংবা ভারতবর্ষের বৃহৎ জমিদারি ছাড়িতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেবল অতলান্তিক সনদের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদের অপব্যাখ্যাই করিলেন না, ১৯৪২ সালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন এক সময় (আগস্ট) বিদ্রোহের আকার ধারণ করিল, এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসিবার জন্য চার্চিলের উপর চাপ পড়িল, তখন টইনবীর চার্চিল চটিয়া গেলেন এবং তপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

> I have not become the Kings First Minister in order to preside over the liquidation of the British Empire.' — (The Times. Noll. 1942) —(17)

অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারবারে লাল বাতি জ্বালাইবার উদ্দেশ্যেই আমি সামান্য সম্রাটের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করি নাই। চার্চিলের এই দম্ভোক্তি স্বাধীনতার পরেও ভারতবাসীর কাছে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁর এই কথা সেদিন বৃটিশ ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন উত্তেজনার সঞ্চার করিয়াছিল।

অপরপক্ষে ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত সরকার অতলান্তিক সনদের মূল শর্তগুলির সঙ্গে একমত হইলেন, কিন্তু এগুলির ব্যাখ্যায় সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ স্বাধীনতার, ঔপনিবেশিক এলাকাগুলির মুক্তির এবং সার্বভৌম অধিকারের মূল নীতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিলেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, যদিও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রধানত সোভিয়েত রাশিয়াই যুদ্ধের এই অসম্ভব দায়িত্ব বহন করিতেছিল, তবু কিন্তু অতলান্তিক সম্মেলনে চার্চিল-রুজভেল্টের বৈঠকে সোভিয়েত রাশিয়াকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই কিম্বা যে অতলান্তিক সনদ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম মূল দলিলের মত ছিল, তার রচনায়ও সোভিয়েতকে আহ্বান করা হয় নাই। (১৮)

সুতরাং রাশিয়াকে তখনও ইঙ্গ-মার্কিন মহলে পরিপূর্ণভাবে 'বিশ্বাস' করিবার পক্ষে সংশয় ছিল।

(18) Anti-Hitler Coalition —P.55

তবে অতলান্তিক সম্মেলন থেকেই চার্চিল ও রুজভেল্ট একত্রে স্ট্যালিনের নিকট একটি বার্তা পাঠাইলেন এবং সেই বার্তায় দুই রাষ্ট্রনেতাই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁরা সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে পাঠাইবার চেষ্টা করিবেন। (১৯)

স্ট্যালিনের নিকট দুই রাষ্ট্রনায়ক কেবল সহযোগিতামূলক বার্তাই পাঠাইলেন না, হিটলার বিরোধী মহাজোটের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক শক্তি সংহত করিবার উদ্দেশ্যে কি কি করা দরকার সেই প্রশ্নগুলি আলোচনার জন্য (প্রধানত হ্যেরি হপকিন্সের পরামর্শ ও লর্ড বীভারব্রুকের আগ্রহের জন্য) মস্কোতে একটি উচ্চপর্যায়ের ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েত বৈঠক অনুষ্ঠানেরও সিদ্ধান্ত হইল। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮শে সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-মার্কিন মিশন মস্কোতে পৌঁছিয়াছিল—যে কথা আমরা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।.....

(19) Correspondence - (Stalin-Churchil-Roosevelt etc.) Moscow 1959. Vol I, P.18.

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।

অশোকচন্দ্র বাঁকড়া প্রাইভেট লিঃ
২৬ কটন স্ট্রীট কলিকাতা-৭

অতলান্তিক সম্মেলনে বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষভাবে দূরপ্রাচ্যে জাপানের কার্যকলাপ নিয়া বিস্তৃত আলোচনা করিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় বৃটেনের বিরাট সাম্রাজ্যের স্বার্থের খাতিরে আমেরিকাকে যথাশীঘ্র সম্ভব জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইবার জন্য বৃটিশ পক্ষ চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইল না। (২০)

তবে, অতলান্তিক সম্মেলন থেকে চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হইয়াছিল, মহা-যুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে মাঝে মাঝে তার উঠানামা ঘটিয়া থাকিলেও শেষ পর্যন্ত এই হৃদ্যতার সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। কারণ, উভয়েরই উভয়কে অনুপ্রাণিত ও সতেজ করিয়া তোলার আশ্চর্য ও ব্যাপক ক্ষমতা ছিল।' যুদ্ধের ভয়ঙ্করতম দুর্দিনেও রুজভেল্ট চার্চিলকে এক গম্ভীর ও দীর্ঘ তারবার্তার শেষে এই কথাটা লিখিয়াছিলেন—

It is fine to be in the same decade with you.

(আপনার সঙ্গে একই দশকের সঙ্গী হওয়া মজার বিষয় বটে)।

* * *

চার্চিল কিন্তু অতলান্তিক সম্মেলন থেকে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে এবং গভীর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া গিয়াই তিনি পরমোৎসাহে জনগণের সামনে তাঁর সেই বিখ্যাত "V for victory" সাইন দেখাইতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের এই চার্চিলীয় ভঙ্গীটি পরে বহু ফটোতে ও চিত্রে বিখ্যাত হইয়াছিল এবং এই 'V' চিহ্নের শুরু তখন থেকে।

(20) The Anti-Hiter Coalition. P. 53, 59.

চার্চিলের এই নূতন অদম্য উৎসাহ দেখিয়া মার্কিন নির্লিপ্ততাবাদীগণ ও বৃটিশ জনসাধারণ কিন্তু ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, অতলান্তিক সম্মেলনে নিশ্চয়ই কোন 'গোপন চুক্তি' হইয়াছে, যার ফলাফল যথাসময়ে জানা যাইবে। (২১)

* * *

অতলান্তিক সম্মেলনের পর আইস-ল্যাণ্ডের দিকে অতলান্তিকের জলপথে সেপ্টেম্বর অকটোবর নভেম্বরে জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক মার্কিন ডেস্ট্রয়ারগুলি আক্রান্ত এবং কোন কোনটা ডুবিয়া গেল ও প্রচুর প্রাণহানি ঘটিল। তখন ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১, নিরপেক্ষতা আইনের এমন বিপুল সংশোধন ঘটানো হইল যে, মার্কিন বাণিজ্য জাহাজগুলিকে সশস্ত্র করার ও যুদ্ধরত দেশের বন্দরে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হইল এবং আমেরিকা এভাবে পরিপূর্ণ যুদ্ধযাত্রার দিকে অগ্রসর হইল। (২২)

কিন্তু মার্কিন সরকারী মহল যুদ্ধ-যাত্রার দিকে অগ্রসর হইলে কি হইবে, জনগণের এক বৃহৎ অংশে যুদ্ধের পক্ষে কোন উত্তেজনাই ছিল না, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁদের মনে ছিল। যখন জাহাজ-ডুবির খবরের চেয়ে ফুটবল খেলার ফলাফলের দিকেই তাদের বেশী ঝোঁক ছিল। মিঃ শেরউড এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—লোকে বলে ফরাসীরা ১৯১৪ সালে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের (ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ) যুদ্ধের জন্য তৈরী হইয়াছিলেন, ১৯৩৯ সালে তাঁরা তৈরী হইয়াছিলেন ১৯১৪ সালের যুদ্ধের জন্য, ঠিক অনুরূপভাবে বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালে আমেরিকানরা ১৯১৭ সালের মহাযুদ্ধের বাইরে থাকার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।' (২৩)

(21) Roosevelt and Hopkins — P. 443

(22) The War — P. 245

রাশিয়ার পক্ষে ও বিপক্ষে

এই সময় আমেরিকার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি মনোভাবের যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল, সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জনসমাজের প্রগতিশীল অংশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুকূল ছিল এবং হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকায়ও জনমতের এই অভিব্যক্তি দেখা গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরের অনেক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, জাহাজী লস্করদের সংস্থা, মোটর যান কর্মীদের সংগঠন, গণতন্ত্র রক্ষার নাগরিক প্রতিষ্ঠান, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি বহু প্রকার সংস্থা সোভিয়েত জনগণের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইতে লাগিল। মার্কিন বুদ্ধিজীবী মহলের ও জনজীবনের নামকরা নেতা ও লেখকেরা—যেমন, থিওডোর ড্রেইজার, (প্রগতিবাদী লেখক), বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ও আপ্টন সিনক্লেয়ার, সুবিখ্যাত গায়ক পলরোবসন, চিত্রশিল্পী রকওয়েল কেন্ট, নাট্যকার ক্লিফোর্ড ওডেটস, বিখ্যাত চিকিৎসক হেনরি সিগারিস্ট, মেরু-অভিযানকারী ভিলজালমুর স্টেফানসন প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে বিবৃতি দিলেন। ২রা জুলাই, ১৯৪১, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১০ হাজারের অধিক জনগণের এক বৃহৎ সভা হইল এবং তাতে সোভিয়েত জনগণের প্রতি সীমাহীন সমর্থন জানাইবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র সভা অনুষ্ঠিত হইল। মার্কিন রাজনীতিবিদদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা অবিলম্বে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন, যেমন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি হ্যারল্ড এস্, আইকস্, নৌবিভাগের এডমিরাল হ্যারল্ড স্টার্ক প্রভৃতি।

কিন্তু নির্লিপ্ততাবাদী এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কম ছিলেন না। যেমন—

(23) —Roosevelt and Hopkins— P. 464

১৩৮০ সালের প্রকাশিত নতুন উপন্যাস

শক্তিপদ রাজগুরুর ॥ চোখের আলো ৮·০০

অমরেন্দ্র দাসের ॥ এ পৃথিবী স্বর্গ নয় ৬·০০

চিরঞ্জীব সেনের ॥ সাগর বেলায় খুন ৭·০০

বেদুইনের ॥ এ জীবন নাটক নয় ৭·০০

অনিল রায়ের ॥ লোভের সোনা কামের হীরা ৭·০০

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ।। তারাশঙ্কর বিচিত্রা ৬·০০

সুজিতকুমার নাগের (ছোটদের জন্য) সাত সাগরের ঢেউ ২·৫০

সাহিত্য লোক : ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলি-৬

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার, সিনেটর হ্যারি এস ট্রুম্যান (পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট), রবার্ট এ টাফট, হ্যামিলটন ফিস, চার্লস লিণ্ডবার্গ, জন এল সুইস, প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ জার্মানীর পক্ষপাতী মনোভাব দেখাইতে লাগিলেন। ট্রুম্যান তো প্রকাশ্যেই বলিলেন যে, জার্মানী ও রাশিয়া যদি পরস্পরকে ঘায়েল করে, তবে, সেটা আমেরিকার পক্ষে ভালোই হইবে। আর সেনেটর টাফট রেডিওযোগে ভাষণ দিলেন—'পৃথিবীতে কমিউনিজমের জয় ফ্যাসিজমের জয় অপেক্ষা আমেরিকার পক্ষে বহু গুণ বিপজ্জনক হইবে।' এমন কি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেও সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব ছিল এবং সোভিয়েত জয়লাভ সম্পর্কে আদৌ বিশ্বাস ছিল না। (২৪)

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মস্কোতে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড বীভারব্রুক এবং মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে আভেরিল হ্যারিম্যান স্ট্যালিনের সঙ্গে যে সমস্ত সাক্ষাৎ ও যুদ্ধে সাহায্য দানের বিষয় নিয়া যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছিলেন, আগের অধ্যায়ে সে কথা বলা হইয়াছে। তিন দিনে স্ট্যালিনের সঙ্গে ৯ ঘণ্টা আলোচনা হইয়াছিল। এখানে সেই সম্পর্কে দুই একটা স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

হ্যারিম্যানের রিপোর্টে প্রকাশ যে, দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় সাক্ষাতের সময় দেখা গেল যে, স্ট্যালিনের মেজাজ খুব তিরিক্ষি, তাঁকে শিষ্টাচারহীনও মনে হইল। যেমন, এক সময় তিনি চাঁছাছোলাভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—আমেরিকা যখন বছরে ৫০ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারে, তখন তারা আমাকে ট্যাঙ্কের বর্ম-চ্ছাদনের জন্য মাত্র এক হাজার টনের বেশী ইস্পাত দিতে পারে না, এটা কেমন কথা?

হ্যারিম্যান এবার একটা ব্যাখ্যা দিতে চাহিলেন, কিন্তু স্ট্যালিন গ্রাহ্যই করিলেন না।

বীভারব্রুকও লিখিয়াছেন, 'স্ট্যালিনকে অত্যন্ত অস্থির দেখা গেল, তিনি অনবরত ধূমপান করিছিলেন ও পায়চারি করিছিলেন। মনে হলো তাঁর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে।'

বীভারব্রুক চার্চিলের কাছ থেকে পাওয়া একখানা চিঠি স্ট্যালিনকে দিলেন। স্ট্যালিন সেটা খুলিয়া একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া নিলেন। তারপর টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিলেন। যখন বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান বৈঠক থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন মলোটোভ আবার স্ট্যালিনকে চার্চিলের চিঠির কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু স্ট্যালিন চিঠিখানা থামের মধ্যে পুরিয়া একজন কেরানীর হাতে দিলেন। বৈঠকের সময় স্ট্যালিন নিজে তিনবার টেলিফোন করিলেন এবং তিনবারই নিজে নম্বর ডায়েল করিলেন।

কিন্তু স্ট্যালিনের এই খারাপ মেজাজের কারণ কি, তা বীভারব্রুক বা হ্যারিম্যান কেউ বুঝিতে পারিলেন না। তবে, তাঁদের অনুমান এই যে, সেই সময় মস্কোর দিকে আসন্ন জার্মান অভিযানের খুব উদ্বেগ-জনক সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। (২৫)

তবে, আগেরবার হ্যারি হপকিন্সের সঙ্গে বৈঠকের মতই স্ট্যালিন এই সমস্ত বৈঠকেও সামরিক অবস্থা, জার্মান সৈন্য-বাহিনীর শক্তি এবং রাশিয়ার জরুরী প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কে খোলাখুলি-ভাবেই আলোচনা করিলেন।...

তৃতীয় দিনের বৈঠকে স্ট্যালিনের মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল এবং বীভারব্রুক লিখিয়াছেন যে, 'এই প্রথম স্ট্যালিন আমাদের চা ও জলখাবার দিলেন।' পরদিন সন্ধ্যায় তিনি ডিনারেরও নিমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

মস্কোর বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান উভয়েই স্ট্যালিন সম্পর্কে উচ্চপ্রশংসা করিয়াছেন। বীভারব্রুক লিখিয়াছেন—'আমরা তাঁকে পছন্দ করতে লাগলাম। একটি সদয় চিত্তের মানুষ কার্যত কখনও ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেন না।'

১লা অকটোবর, ১৯৪১, সামরিক সাহায্য দান সম্পর্কে রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের মধ্যে একটি 'গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

কিন্তু হ্যারিম্যান মস্কো ত্যাগ করার আগেই হিটলারের পক্ষ থেকে সারা দুনিয়াকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, লাল-ফৌজ খতম এবং রাশিয়ার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে! (২৬)

এদিকে কর্জ ও ইজারা অনুসারে রাশিয়া যখন ৭ই নভেম্বর মার্কিন সাহায্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল, তখন জার্মান সৈন্যরা মস্কো থেকে মাত্র ৩০ মাইল দূরে ছিল।

অর্থাৎ জার্মান আক্রমণের পূর্বে সাড়ে চার মাস পরে রাশিয়ার জন্য বিনা সুদে কর্জ ও ইজারা অনুসারে আমেরিকা ১০০০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করিয়াছিল বটে, কিন্তু সাহায্য আসিতেছিল অত্যন্ত ধীর গতিতে। ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন মাত্র ৫,৪৫০০০ ডলার মূল্যের বা মোট মার্কিন সাহায্যের ০-১ ভাগেরও কম সামরিক সাহায্য পাইয়াছিল! (২৭)

কিন্তু মস্কো যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় তখন পাশ্চাত্য উপসাগরের পথে জলযানে বিমান পাঠাইয়া জরুরী সাহায্য দেওয়ার জন্য হপকিন্স নৌবিভাগের উদ্দেশ্যে যে স্মারকলিপি তৈরী করিয়াছিলেন, রুজভেল্ট তার এক কোণায় পেন্সিল দিয়া মন্তব্য করিলেন—

H. L. H.
O.K. but say to them from me: Hurry, hurry, hurry;
F. D. R.

রুজভেল্ট কর্তৃক এই 'জরুরী' তাগাদার তারিখ ছিল ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪১। (২৮)

তখন মস্কো যুদ্ধের চরম অবস্থায়। কিন্তু তখনও সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য 'গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার' আমেরিকার দরজা খুলিতে স্বয়ং রুজভেল্টকে 'জরুরী ধাক্কা' দিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

(24) The Anti-Hitler Coalition — P. 39-43

(25) Roosevelt & Hopkins-Sherwood, P 469-71

(২৬) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক পৃষ্ঠা, ৪৭৪, ৪৭৯, ৪৮২।

(27) The Anti-Hitler Coalition — P. 47.

(28) Roosevelt & Hopkins, P. 483

অঙ্গনা

কি বিচিত্র বায়না !

আমাদেরই প্রতিবেশী জনাপাঁচেক সদস্যের পরিবার। ছেলে, মেয়ে, স্বামী, স্ত্রী আর তাঁদের বৃদ্ধা মা। মাত্র তো আর পুজোর দিন পনেরো বাকি। ঘটনাটা ঘটেছিল এরও কিছুদিন আগে। পুজো কাটাতে পরিবারের পাঁচজনের পাঁচ মত। স্ত্রী মনে মনে স্থির করলেন মুসৌরী যাবেন—অনেক দিন পাহাড় যোরা হয় নি, ছেলের সেই একই কথা বেতে হয় তো বোম্বে যাবো। হাল-ফ্যাসানের যত কারবার ওখানেই চলছে। মেয়ে অমনি মাথা দুলিয়ে বললো, 'কোন কথা শুনতে চাই না। আমি দক্ষিণ ভারত যাবো। মন্দিরে ভরা এই দেশকে যদি না দেখলাম, শুধু সমুদ্র আর পাহাড়ে কি মন ভবে?' নাতনীর এই কথা শুনে ঠাকুরমা আশ্বস্ত বুক বাঁধলেন। নিজের মনের আনাচে-কানাচে যে ইচ্ছেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটাই তিনি নাতনীর কথার সাহস সঞ্চয় করে বললেন, ঠিক বলেছিস। মন্দির যদি নাই দেখলাম তবে আর দেখাব কি হল। তা তোর ঐসব দক্ষিণ ভারত ঘোরার পাগলামী ছেড়ে চল সদলবলে কাশী মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে আসি। মন্দিরও দেখা হবে আর সেই সঙ্গে দেবদর্শনও হয়ে যাবে। সেই কবে একবার গিয়েছিলাম।

আর কর্তা মহাশয়ের ইচ্ছে কাছাকাছি শিমুলতলা কিংবা মধুপুর ঘুরে আসেন। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলার যো নেই। তবুও আস্তে আস্তে গিন্নীকে বললেন, ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা মহা-সমস্যার ব্যাপার। ভাবছি কাছেপিঠে কোন জায়গা ঘুরে আসবো।

গিন্নী তো কর্তার কথা শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠলেন। এই ঘুরে আসার ওপরে যে গিন্নীর সামাজিক মান কতখানি নির্ভর করছে সে সম্বন্ধে যদি কর্তার বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকতো। গিন্নী মহাশয়া নিজের শৈলশিখরে ভ্রমণের ইচ্ছেটাকে ব্যক্ত করলেন। একে একে ছেলে, মেয়ে, ভয়ে ভয়ে বৃদ্ধা মাও নিজেদের অভিলাষ প্রকাশ করলেন।

কর্তা মহাশয় মহা ফাঁপড়ে পড়লেন, কোন দেবতাকে কিভাবে তুষ্ট করেন, সকলেই তো ভয়ংকর রূপ নিয়ে বিচরণ করছে। তার ওপর সবচেয়ে বড় সমস্যা টিকিট জোগাড় করা। অথচ কর্তা গিন্নী দুজনেই একমত বাইরে না গিয়ে পুজোটা কলকাতায় কাটানো নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া পাড়ার আরও পাঁচজনে যখন জিজ্ঞেস করবেন যে 'পুজোতে কোথায় যাচ্ছেন' তখন কি উত্তর দেবেন। পদমর্যাদা, সামাজিক মর্যাদা সব কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। ছি ছি বাইরে যাবেন না এ রকম সৃষ্টিছাড়া কথাও চিন্তা করা যায়। তাই তিনি উঠেপড়ে লাগলেন, হয় শৈলাবাস, নয় মন্দির অথবা বড় কোন শহরের টিকিট জোগাড় করতে। আর সেই টিকিট জোগাড় করতে যে কোন দাম দিতেই তিনি রাজি।

এ ধরনের একদল ভ্রমণবিলাসী গড়ে উঠেছেন যাঁরা প্রত্যেক পুজোতে হাওয়া বদল করতে ছোটেন। বাইরে গিয়েও থাকেন আসবাবপত্রে সজ্জিত বড় বড় হোটেলে। সেখানে জলের মত অর্থব্যয় করেন দুহাতে। অথচ পরিবারের সকলে খুশী নন। পাহাড়ে গেলে কারো সমুদ্র দেখা হয় না, আবার সমুদ্র দেখলে বহু শখের মন্দির দেখা বাদ পড়ে যায়। এতো করেও পরিপূর্ণ শান্তি আর সুখ নেই।

শুধু বিত্তশালী মহলে এক শখটা বজায় থাকলেই বোধ হয় মঙ্গল হোতো তবে আর আমাদের পাড়ার নয়নদাকে এত নাস্তানাবুদ হতে হতো না। সদ্য বিবাহিতা নয়নদার স্ত্রী নয়নদার কোন কথা শুনতেই নারাজ। তাঁকে পুজোতে বাইরে যেতেই হবে। না হলে অসম্ভব, বন্ধুমহলে আর মুখ দেখানো যাবে না।

অথচ নয়নদার সাধ্যের অতীত এ ফুর্তি করতে বাইরে যাওয়া। তার ওপর সদ্য বিয়ে করা স্ত্রীর খুশিমত শ্যালক-শ্যালিকাদের পুজোর জামা-কাপড় কিনতে তাঁকে যা ব্যয় করতে হয়েছে সে কথা নয়নদাই জানেন।

আয় অনুসারে ব্যয় করার চিন্তাই প্রত্যেকের সংসারে ব্যয়ের মূলকথা। অথচ পুজোর বাজারে শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ করা, প্যান্টের সঙ্গে সার্ট, স্কার্টের সঙ্গে চুলের ফিতে—চটি মিলিয়ে পরার হিড়িকে গৃহস্বামী থেকে শুরু করে গৃহকর্ত্রীও বিব্রত। বাজারের চালু জিনিস কিনতে বা পরতে কম বেশী সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। যেমন, বর্তমান বাজারে কটকী শাড়ীর এত বেশী ফ্যাশান উঠেছে যে অনেকে আক্ষেপ করে বলেন, 'জরি দেওয়া একটা কটকী শাড়ী কেনা এখনও হয়ে উঠলো না। যা দিনকাল পড়েছে যে চাল-ডাল-নুনের জোগাড় করে বাড়তি কিছু খরচ করা সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। বাজারের চালু জিনিস কেনা আমাদের মত হাপোষা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।' এই সম্ভব বুঝতে পারলেও না কিনতে পারার জন্য গভীর একটা আক্ষেপও রয়ে গেছে। এই আক্ষেপের সুর ধরেই গিন্নী কর্তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'এমনি মন্দভাগ্য নিয়ে জন্মেছি বাবাও এমন ঘর-বর দেখে বিয়ে দিয়েছেন যে শখ-আহ্লাদ আর এ জীবনের জন্য নয়।' শুধু একথা বলেই গিন্নীর আক্ষেপের সুর পাল্টালো না তিনি রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর কর্তার হাতে পানটি ধরে দিয়ে শুরু করলেন, 'জানো, পাশের বাড়ীর কমলাদি একশো দশ টাকা দিয়ে একটা সুতীর বেনারসী কিনেছেন। সাদা শাড়ীতে যা সুন্দর সুন্দর সুতোর কাজ করা—দেখলে তোমারও খুব পছন্দ হবে। কাল সকালে তোমাকে দেখাবো।'

কর্তা মহাশয় নীরবে সব হজম করেন। মনে মনে ভাবেন যার পঞ্চাশ টাকার শাড়ী কেনার ক্ষমতা নেই তার পক্ষে একশো টাকার কথা কল্পনা করাও বাতুলতা। তবুও তিনি নীরব।

গিন্নী এবার ধ্যানমগ্ন স্বামীর উদ্দেশ্যে গলা চড়িয়ে বলেন, 'বোনাস কবে পাচ্ছো, অবশ্য ততদিনে শাড়ীর দাম আর একটু বাড়তেও পারে। সে সময় কিনে নেবো।'

এই একটু সান্ত্বনার কথা শুনিয়েও গিন্নী স্বামী ভদ্রলোকের ধ্যান ভাঙাতে পারলেন না। ভদ্রলোক গুটি গুটি বালিশের ওপর মাথা রেখে দেহ ছড়িয়ে দিলেন বিশ্রামায়। বোনাসের টাকাটাকে চোখ বুজে ভাগ করলেন ধার-দেনা কিছু শোধ করতে, কিছু নিকট আত্মীয়-স্বজনের পুজোর এটা-ওটা কিনতে শেষে গিন্নীর ভাগে ধরলেন গোটা তিরিশ।

এই তো পুজো-উৎসবের পূর্বাহ্নেই সংসার জীবনের উৎসব। গিন্নী যথাসময়ে গোটা তিরিশেক হাতে পেয়ে লাফিয়ে উঠবেন, তারপর কথা কাটাকাটি, স্বামীর মুরদ, সংসারের জন্য উদ্বৃত্ত খাটা, গুষ্টি গালতেই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে অবহেলা, কোথাও যাবার একটা ভাল শাড়ী নেই প্রভৃতি বিভিন্ন ফিরিস্তি গাইতে গাইতে গিন্নীর গলা সপ্তমে চড়ে যাবে। আসলে সারা বছরের মধ্যে এই একটি সময় যখন সাধারণ গৃহস্থেরা একটু ভাল জামা-কাপড় কেনাকাটার আশা করেন বা সুযোগ পান। এ সময়ের এই ভাল জামা-কাপড়েই উৎসবাদিতে যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বর্তমানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ইচ্ছে সত্ত্বেও বাড়ীর কর্তা গিন্নী বা ছেলে-মেয়ের শখ আহ্লাদকে পূরণ করতে পারেন না। তাই প্রাক-পুজোতে এই নিরাশায় অনেক সংসারে কুরুক্ষেত্রের সৃষ্টি করে।

এতো গেল প্রাক্‌পুজোর জামা-কাপড়ের ব্যাপার। এবার আসুন আর একটু খতিয়ে দেখা যাক যে একদল লোক নিজেদের মান-মর্যাদা, ঠাট বজায় রাখতে কিভাবে নিজেদের সামর্থ্যের চেয়েও বেশী খরচ করে ফেলেন পুজোর আনন্দমুখর দিনগুলিতে। উৎসবের দিনগুলিতে গাড়ী চড়তে কেই বা না ভালবাসে বলুন? কিন্তু যাদের নিজেদের গাড়ী নেই? অথচ তাঁদের পুজোর দিনগুলিতে গাড়ী চড়ে ঘুরতে না পারলে ঠাট বজায় থাকে না। সুতরাং এ ব্যাপারে বাড়তি খরচ করতে বাড়ীর কর্তা রাজি না থাকলেও পরিবারের সকলে উঠেপড়ে লেগে যান গাড়ীর খোঁজে। গাড়ীর জোগাড়ও হল বেশী ভাড়ায়।

এই যে ক্ষমতার বাইরে বাজে খরচ এর পরিণাম কোথায়? সামান্য আমোদ-আহ্লাদের জন্য অনেক সময়েই পরিবারের শান্তি এমন কি ঐক্য পর্যন্ত বিঘ্নিত হয়। এই অপ্রয়োজনীয় আমোদ-আহ্লাদ, হৈ-হুল্লোড় বর্জন করলে যদি কোন ক্ষতি না হয়—সেটাই আমাদের গ্রহণীয় হওয়া উচিত নয় কি?

—অঞ্জলি চৌধুরী

পুনশ্চ

'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?
যতদিন ভবে, না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।'

কবিতাটি কার প্রশ্ন করা হলে শুধু আপনি কেন, একটি স্কুলের নীচু ক্লাশের ছেলে কি মেয়েও বলতে পারবে এটি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা। এমনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন তিনি এবং এককালে কবি হিসাবে তাঁর নামও ছিল। কিন্তু আজ কৃষ্ণচন্দ্র বিস্মৃতির গহ্বরে আজ স্কুলের পাঠ্যের মধ্যেও তাঁর কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাংলার স্বভাব কবি হিসাবে খ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব বাংলায় (বাংলাদেশ) খুলনা জেলার সেনহাটি নামক গ্রামে। প্রথম জীবনে যশোহর জেলা স্কুলে কয়েক বৎসর প্রধান পণ্ডিতের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্বে বাংলার কয়েকখানি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতেও তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে ঢাকা প্রকাশ', 'বিজ্ঞাপনী' ও 'বৈভাষিকী' নামক কয়েকখানি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

পারস্য দেশীয় কবিগণের কবিতা তাঁর উপর বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে জানা যায়। হাফিজ, সাদী ও ওমর খৈয়ামের কবিতা তিনি যেমন নিত্য পাঠ করতেন, তেমনি সেই ভাবালম্বন করে অনেক কবিতাও রচনা করেছিলেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা না করলেও যে ক'খানি করেছিলেন, তার মধ্যে 'সদ্ভাব শতক' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। অনেকে তাঁর এই গ্রন্থখানি হাফিজের কবিতার অনুবাদ হিসাবে মনে করে থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধও যে দেখা দেয় নিম্নে ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এই নিবন্ধটি তার বিশেষ পরিচায়ক। 'মানসী' (চৈত্র, ১৩১৭) পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়।

'সদ্ভাব শতক'-এর অষ্টাদশ সংস্করণ ১৩১৪ সালে কামিনীকুমার গুহ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থখানি কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করেন।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধটির নাম 'কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার'। এ সম্পর্কে 'মানসী' সম্পাদক একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান যে, 'লেখকের কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বিস্তৃত জীবনচরিত যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।'

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

পারস্য ভাষা কিছুদিন পূর্বে এ দেশের রাজভাষা ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষা যেমন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে পারসী শিক্ষা এক সময়ে এইরূপ ছিল। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পাঠশালার সঙ্গে মক্তবেরও আধিপত্য হইয়াছিল। এখনও কোথাও কোথাও দুই-একটি মক্তব দেখিতে পাওয়া যায়।

পারসিক সাহিত্যের এত সমাদর সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যে পারসিক চিন্তা ও ভাব খুব বেশী পরিমাণে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ এই, এখন যেমন অনেকে কেবল চাকুরীর জন্য ইংরাজি শিক্ষা করেন তখনও চাকরীর জন্যই অনেকে

আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হচ্ছে

আগামী ১৯৭৪ ইংরেজী বছর আপনার কেমন যাবে?
নিজের পারিবারিক জীবন ও কর্মজীবন কেমন থাকবে?
কোন্ কাজে হাত দেওয়া ভাল হবে?
কোথায় কখন ঝুঁকি নেবেন না
কখন কোথায় সাবধান হবেন
এসব প্রশ্নের উত্তর পাবেন

ভৃগুজাতকের

১৯৭৪ কেমন যাবে

ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

জ্যোতিষজগতে এই বিস্ময়কর গণনাকার ভৃগুজাতকের প্রতিষ্ঠা আজ সর্বোচ্চ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ও গণনা অভ্রান্তভাবে মিলে যাবার অভিজ্ঞতা বহু লোকেরই হয়েছে। এবার এই বইটিতে বিবাহ ঘোটক মিল সম্বন্ধে অতিরিক্ত জ্যোতিষিক তথ্য সম্বলিত হয়েছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত রাশিফল লগ্নফল, ইংরেজী জন্মতারিখ অনুসারে ভাগ্য নির্ণয় রাষ্ট্রগত বর্ষফল ও অন্যান্য যাবতীয় জ্যোতিষ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তো আছেই। এই বইটির অতিরিক্ত আকর্ষণ ১৯৭৪ সালের সারা বছরের পঞ্জিকা—শুভদিনের নির্ঘণ্ট সমেত।

দাম মাত্র ২৲।

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৯

পারসী শিক্ষা করিতেন। ইহার ফলে পারসী সাহিত্য সে সময়কার লোকদিগের মনে ও সাহিত্যে একটা আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই।

কিন্তু পারসিক সাহিত্যের যে সকল ভাব ও চিন্তা নিতান্ত মনোজ্ঞ তাহা আমাদের সাহিত্যে আনিবার জন্য একজন মাত্র উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর তাঁহার সেই চেষ্টা এতদূর সফল হইয়াছিল যে, পারসিক সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইল না কেন, ইহা ভাবিলে মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে কবি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার জন্ম, দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁহার জীবনের অবসান। কিন্তু শিলায় পেষিত চন্দন যেমন সুগন্ধই দান করে, ভস্মীভূত ধূপ যেমন কল্যাণেরই সূচনা করে, সেইরূপ দারিদ্র্য তাঁহার জীবনকে বিকাশের পক্ষে সহায়স্বরূপ হইয়াছিল। দারিদ্র্য তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল ঐশ্বর্য। তাঁহার নিকট কৃত্রিম ও অসুখের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। যুগযুগান্তরের সাধনার পর মানবজীবনে যাহা সম্ভবপর হইতে পারে তাঁহার জীবনে তাহা অল্প আয়াসেই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সুকঠোর সাধনাকে সহজ করিবার পক্ষে পারসী দেশীয় কবিগণ তাঁহার সহায় সখা, বন্ধু হইয়াছিলেন। হাফিজ সাদী ও ওমর-খৈয়াম তাঁহার নিত্যসহচর ছিলেন। তাহাদের নিঃস্পৃহতা নিঃস্পৃহ করিয়াছিল, তাঁহাদের উন্মাদন কৃষ্ণচন্দ্রকে উন্মাদিত করিয়াছিল। তিনি বঙ্গদেশের নিভৃত পল্লীতে বসিয়া মানসনেত্রে পারসিক কবিদিগের দ্রাক্ষবসোচ্ছ্বাসিত পেয়ালার সৌন্দর্য দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

কৃষ্ণচন্দ্র কবি ছিলেন। হাফিজ, সাদী ও ওমর তাঁহাকে কবি করেন নাই। তিনি স্বভাবতঃই কবি ছিলেন। তাঁহারা কখনো কখনো তাঁহার ভাব যোগাইয়াছেন সত্য, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের নিজের ভাবের অভাব ছিল না। তাঁহার রচিত পারসিক কবিদিগের ভাবনিরপেক্ষ কবিতাগুলি পাঠ করিলে আমরা তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি। বাল্যকালে কৃষ্ণচন্দ্রের 'সদ্ভাব শতক' অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। উহাতে 'বখ্যাত পারসিক কবি সাদীর রচনার প্রভাব যৎসামান্য পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে হাফিজের ভক্ত ছিলেন সেই হাফিজের রচনা-প্রভাবও বহু স্থানে লক্ষিত হয়। হাফিজ পড়িতে পড়িতে তিনি 'পাগল হইতেন' বাস্তবিকই হাফিজের প্রতপ্ত প্রেমমদিরা পান করিয়া উদ্ভ্রান্ত হন নাই, এমন লোক বিরল। হাফিজের প্রভাব তাঁহার রচনায় অপেক্ষাকৃত অল্প দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, হাফিজ তাঁহাকে পাগল করিতেন সাদী ও অন্যান্য কবিগণ তাঁহাকে শান্ত করিতেন। সাদী ও তাঁহার রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া গেল।

সাদীর একটি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই :—

"Although a gem be cast away
And lie obscure in heaps of clay,
Its precious worth is still the same
Although vile dust be whirled to heaven,
To such no dignity is given —
Still base as when from earth it come

সদ্ভাব শতকের কবি তাঁহার 'সাধু ও নীচ' শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন :—

'ঘটে যদি সাধুর দীনতা অতিশয়
আদর গৌরব তাঁর কমিবার নয়।
নীচে যদি ধনী হয় কুবের সমান
বাড়ে না কখন তার আদর সম্মান।
পড়েছে যে মহামণি পঙ্কের ভিতরে,
বলো তারে কোন জন অনাদর করে?
বায়ুস্থিত আকাশের ধূলি সমুদয়,
বল বল কার কাছে মাননীয় হয়?'

সাদীর কবিতার সহিত যেমন কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতার অনেক স্থানে চিন্তাগত সাদৃশ্য দেখা যায়, হাফিজের রচনা পাঠ করিয়া আমরা সেরূপ কোনো নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা হাফিজের ভাবে অনুপ্রাণিত।

সদ্ভাব শতকের অনেক কবিতায় হাফিজের ভণিতা দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে সেগুলি হাফিজের রচনা হইতে গৃহীত বলিয়াই ঐরূপ ভণিতা যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখিতে পাই না। ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কবিতায় হাফিজ ও সাদীর অনেক সময় সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু সাদী হাফিজের পূর্ব্ব-বর্ত্তী সময়ের কবি। অধিকন্তু হাফিজ উক্ত কবিতাগুলিতে সাদীর ভাব লইয়াছেন ইহা মনে করিবার অন্যান্য অনেক কারণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র সাদীকে ছাড়িয়া অনুক্ষণই হাফিজের অনুগামী হইয়াছেন একথা মনে করিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ হাফিজের ভণিতাযুক্ত কবিতাগুলির অধিকাংশই হাফিজ হইতে গৃহীত নহে উক্ত কবিতাগুলি হাফিজের ভণিতাযুক্ত হইবার কারণ এই যে, হাফিজ পড়িতে পড়িতে কৃষ্ণচন্দ্রের হাফিজ সম্বন্ধে সোহং-জ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছিল।

ইংরাজি সাহিত্যপুষ্ট, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাব ইংরাজি সাহিত্যে দিন দিন পুঞ্জীভূত হইতেছে। এই সুবিশাল নিখিল হৃৎস্পন্দন কোথায় কতটুকু শুনা গিয়াছে তাহা জানিবার জন্য ইংরাজি সাহিত্য অহর্নিশ উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বের চিন্তার সহিত যদি বাংলা সাহিত্য পরিচয় স্থাপন করিতে পারে তবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। পারসিকগণ আমাদের প্রতিবেশী বলিলেও হয়, অথচ সেই প্রাচীন প্রতিবেশীদিগের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ অজ্ঞ! পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া মূল কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য-আভা প্রতিফলিত করিতে কৃষ্ণচন্দ্রই আমাদের দেশে প্রথম ও এখানে প্রধান হইয়া রহিয়াছেন একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

ধূপের তীব্র দীপ্তি যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় কৃষ্ণচন্দ্রের কাব্য-প্রতিভাও তেমনি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। 'সদ্ভাব শতক' রচনার পর তিনি আরো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি ভাল হয় নাই। কিন্তু কবিতা ভাল না হইলেও তিনি ভক্ত সুফীদিগের মত নীরব কর্ত্তব্যময় জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত সুফী কবিগণ যেমন দ্রাক্ষলতালিঙ্গিত গোলাপকুঞ্জে বসিয়া অপরিমিত ভক্তি-মদিরা পান করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন, ভাবের সুশ্যাম তটভূমিতে বিকচ কামিনীকুঞ্জে কৃষ্ণচন্দ্র তেমনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ধ্যানসমাহিত কবির মস্তকে ও উৎসঙ্গে অজস্র সুশুভ্র কামিনী-ফুল বর্ষিত হওয়ায় তাঁহার পুষ্পাচ্ছাদিত শরীর কোনো সদ্ভাব মূর্ত্তি বলিয়া পথিকের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিত।'

—ক্ষণশর্মা

বেকার বসে না থেকে নিজের চেষ্টায় ঘরেতে কুটীর শিল্প গড়ে তুলুন মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে।

শিল্পের সন্ধানে ১৪·০০

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতে আছে ১০০টির ওপর বিভিন্ন কুটীর শিল্পের ফরমুলা সমেত বিশদ ব্যাখ্যা। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেই সবকিছু করা যাবে।

রঙ্কমারি বুক হাউস

৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯; ফোন : ৩৪-৭৮৫৯

সাতদিনের শুভাশুভ

শুভাচার্য

(১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বর)

গ্রহসন্নিবেশ : রবি ও বুধ কন্যায়, শুক্র তুলায়, শনি ও কেতু মিথুনে, রাহু, বৃহস্পতি ও মঙ্গল যথাক্রমে ধনু, মকর ও মেষে অবস্থিত। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ সেপ্টেম্বরের ফল নীচে বলা হোল :

মেষ : শনির অবস্থান ভাল, রবিও অনুকূল হয়েছে। বুধের কাছ থেকে ভাল ফল পাচ্ছেন না। মোটের উপর শুভ সময়। নতুন কাজকর্মের সুযোগ পেতে পারেন। শরীর ভাল ; আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। মেয়েদেব পক্ষে শান্তিপূর্ণ সময়। শুভ তারিখ : ১৯, ২২ সেপ্টেম্বব।

বৃষ : বৃহস্পতির অবস্থান শুভ। বুধেব অবস্থান অনুকূল ; কিন্তু শনি ও মঙ্গলের অশুভ প্রভাবে বিবিধ উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ করবেন। নিন্দুকেব দল মিথ্যা রটনা করতে পারে। শরীর সুবিধার নয়। ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর ব্যাপারে উদ্বেগের লক্ষণ আছে। কাজকর্ম চলনসই। মেয়েদের পক্ষে উদ্বেগের সময়। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬, ২৮ সেপ্টেম্বর।

মিথুন : বুধের অবস্থান ভাল। মঙ্গল ও শুক্র ভাল ফল দেবে। কিন্তু বৃহস্পতি ও শনি এখন ভাল ফল দিচ্ছে না। শরীর ভাল ; আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। কাজকর্ম তত্তটা সুবিধার নয়। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ : ১৫, ২০ সেপ্টেম্বব।

কর্কট : সময়টা ক্রমশ ভাল হচ্ছে। ব্যাধিক্যের চাপ বাড়বে। শরীর একপ্রকার। কাজকর্ম চলনসই। ব্যবসায়ে সতর্কতা দরকার। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ক্রমশ ভাল। শুভ তাবিখ : ১৫, ১৭, ২০ সেপ্টেম্বর।

সিংহ : বুধের শুভ প্রভাবে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কু-প্রভাবে বিবিধ উদ্বেগ থাকবে। শরীর সুবিধাব নয়। আয়-ব্যয় চলনসই। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হবে। শুভ তারিখ : ১৬, ১৯ সেপ্টেম্বর।

কন্যা : বৃহস্পতি, শুক্র ভাল, শনি ও বুধ কুফল দিতে পারে। শরীর সুবিধার নয়। পাবিবারিক ক্ষেত্র সুবিধাব নয়। ব্যাধিক্যের চাপ থাকবে। কাজকর্ম সুবিধার নয়। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়। শুভ তারিখ : ১৯ সেপ্টেম্বর।

তুলা : রবি শুভ। বুধের অবস্থান শুভ নয়। মানসিক হতাশ, শারীরিক অস্বস্তি চলবে। আয় মন্দ নয়। ব্যবসায় সুবিধাব নয়। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল। মেয়েদেব মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১৬, ২১, ২২ সেপ্টেম্বর।

বৃশ্চিক : মঙ্গল, বুধ, শুক্র বৃহস্পতির অবস্থান মোটের উপর ভাল। শরীব চলনসই। পারিবাবিক ক্ষেত্র একপ্রকাব। আর্থিক ক্ষেত্র অনেকটা ভাল। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। মেয়েদেব মনেব কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১৫, ১৬ সেপ্টেম্বর।

ধনু : বৃহস্পতি শুভ। মঙ্গল ও শনিব প্রভাব ভাল নয়। শরীর মন্দ নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র মোটের উপর ভাল। আয বৃদ্ধি ও ব্যবসাবে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। কাজকর্ম অনুকূল ; কিন্তু মানসিক অস্বস্তি থাকবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ ১৬, ১৭ সেপ্টেম্বর।

মকর : অশুভ গ্রহের প্রভাব অধিক। শরীব সুবিধার নয়। পারিবারিক উদ্বেগ থাকবে। আয় ভাল ; ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল হবে। ব্যবসায় মন্দ নয়। কর্মে উদ্বেগ থাকলেও সাফল্য আসবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১৫, ২০ সেপ্টেম্বর।

কুম্ভ : শুভ গ্রহাদির প্রভাবে কাজকর্মে সাফল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শবীর ও মন একপ্রকার। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় গতানুগতিক। কাজকর্ম খুব সুবিধার নয়। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ১৫, ১৯ সেপ্টেম্বর।

মীন : শুভ গ্রহাদির প্রভাব প্রবল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। শরীর এক-প্রকাব। আয় ভাল। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্মে বাধা আসতে পারে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ২০, ২২ সেপ্টেম্বর।

প্রশ্নের উত্তর

সুধাময় চট্টোপাধ্যায় (বাকুড়া) : ১৯৭৪ সালে জানুয়ারী থেকে জুনেব মধ্যে বিবাহ সম্ভব।

কমলাজিৎ সাধুখাঁ : ১৯৭৬ সালের আগে কর্মে পবিবর্তনেব আশা কম।

সুপ্রিয়া হালদার : উচ্চশিক্ষিত হওয়াব যোগ আছে। কিন্তু বর্তমান বছরে প্রতিকূল গ্রহাবস্থানের জন্য পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

পরেশ ঘোষ (হালি-৭) ১৯৭৫ সালেব প্রথমার্ধে চাকরী পেতে পারেন।

শ্রীপতি গুহ : আপনার পক্ষে ব্যবসা না করা ভালই।

দীনেশ ভট্টাচার্য : কন্যা রাশি। বৃশ্চিক লগ্ন। আশা কম।

মালবিকা সেন : কোনোরূপ শিল্প বিষয়ে পরিচিতি ও সুনাম পেতে পাবেন।

অনিল সাহা : গৃহ-ভূম্যাদি হবে তবে ৪৭ বছর বয়সের পর শুক্রেব মহাদশায়।

অরুণা বোস : স্বামীস্থান শুভ, স্বামী কোনোরূপ পেশাগত কর্মে লিপ্ত থাকাব সম্ভাবনা বেশী।

দীপক দে'র রম্যরচনা

কলকাতা দেখেছি

"আধুনিক কলকাতার রূপটাই ফুটে উঠেছে।"

ডি এম লাইব্রেরী লিপিকা

৪২, বিধান সরণি ৩০।১, কলেজ রো

জ্যোতিষ কার্যালয়

৭৩।এ, অবিনাশ সরণি (গ্র স্ট্রীট)

কলিকাতা-৫

জ্যোতির্বিদ শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কোষ্ঠী প্রস্তুত, বিচার প্রতিকারের ব্যবস্থা সযত্নে করেন। যোগাযোগের সময় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা।

ফোন : ৫৫-৩০২৫

জে ডি দাস (বর্ধমান): জন্ম সন তারিখ, ও সময় জানাবেন।

মনোরঞ্জন দে: আশা কম।

অনিতা মজুমদার: ২৫ বছর বয়সে বিবাহ তবে আপনার মতে হবে কিনা সন্দেহ।

...বিকাশ দত্ত: ১৯৭৪ সালের নবেম্বর মাস পর্যন্ত সাবধানে থাকা প্রয়োজন। কোনোরূপ বদনাম বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

প্রীতিকণা ঘোষাল: উচ্চশিক্ষায় বাধা আছে। বিদেশ ভ্রমণ সম্ভাবনা খুবই কম।

রঞ্জন দেবরায়: আগামী নবেম্বর মাস থেকে জুনের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

বিমল মুখার্জি (কলি-৩৪): আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের পর আপনার অশান্তি কিছুটা কমবে।

যাদব ভাদুড়ী: ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মামলার বিষয়ে অশুভ।

অনিল ও শিপ্রা (কলি-৩৬): পুত্র-সন্তান সম্ভব। সন্তান-সুখ পাবেন।

অজন্তা বসু: আগামী ফাল্গুনের মধ্যে বিবাহ সম্ভাবনা।

ইলোরা বসু: আপনার জন্মে মঙ্গল। তার প্রতিকারের জন্য ৭-৮ রতি প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

দীপক রায়: কর্কট লগ্ন। ৭মে রাহুর অবস্থিতি এবং শনির পূর্ণদৃষ্টি দাম্পত্য-জীবনে কিছু অশান্তি ঘটাবে।

অশোক দাস (দাদার): বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে। ১৯৭৫ সালে সম্ভাবনা বেশী।

অনুপম মুখার্জি: জন্মতারিখ ঠিক করে জানাবেন।

অসীম রক্ষিত: ৫স্থ রাহু ও তারই মহাদশা চলায় ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যা বিষয়ে অশুভ।

রীতা বিশ্বাস: প্রত্যাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

ইন্দ্রনীল কাঁড়ার: ১৯৭৪ সালে জুন মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

বিমল দাশগুপ্ত: ১৯৭৫ সালের মে-মাসের আগে কর্মপ্রাপ্তির আশা কম।

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ: কোনোরূপ সম্পত্তি বিষয়ক মামলার সম্ভাবনা আছে।

নরেন বল: বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হওয়া উচিত। প্রত্যাবিত হওয়ার যোগ প্রবল।

শিখা চ্যাটার্জি: ১৩৮১ সালে বিবাহ সম্ভব।

শুচিস্মিতা চট্টরাজ (কালীঘাট): সম্ভাবনা কম।

অনুপ ঘোষ: ১৯৭৪ সালে মে থেকে আগস্টের মধ্যে কর্মোন্নতি সম্ভব।

নীতীশ দাস: ৩৬ বছর বয়সের পর সম্ভব।

দীপালি সেন: এড়িয়ে চলাই ভাল।

মীনা রায়: ৭মস্থ রাহু, শনি, মঙ্গলের অবস্থিতি দাম্পত্য জীবনে অশুভ ফলদাতা।

কনক রায়: অনুকূল গ্রহাবস্থান হেতু ১৯৭৪ সালে আশানুরূপ ফল পেতে পারেন।

বিজয় দে: আশানুরূপ হবে না।

জাহেদউদ্দিন — (ঢাকা) বাংলাদেশ—বৃশ্চিক রাশি, কেতুস্থ কন্যা লগ্ন। বর্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতে উন্নতির যোগ বেশী।

প্রকাশ বসু—মীন রাশি, তুলা লগ্ন, গ্র্যাজুয়েট হতে পারবেন।

অন্যামী মুখার্জি—প্রতিকূল গ্রহ থাকায় এ-বছর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। ২৪ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের হাতে অসংখ্য প্রশ্ন জমে গেছে। সুতরাং সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত 'কুপন' ছাপা বন্ধ রাখা হল।

শ্রীহরকুমার ঘোষ—(মুর্শিদাবাদ) ৪৫ বছর বয়সের পর উন্নতি। 'গোমেদ' রত্ন ধারণীয়।

সাধনা চৌধুরী—(যাদবপুর) জন্ম-কালীন বৃহস্পতি অষ্টমে নীচস্থ থাকায় দাম্পত্য অশান্তি থাকবেই। ৫-৬ রতি হলদে পোখরাজ ধারণীয়।

অর্চনা সিংহ—(জব্বলপুর)— অষ্টমস্থ মঙ্গলের জন্য বিবাহে বিঘ্ন—প্রবাল রত্ন মঙ্গলবার পালনীয়। ১৩৮০ সালেই বিবাহ সম্ভব।

আনন্দগোপাল খাল—(ঝাড়গ্রাম) জন্ম সন, তারিখ সময় পাঠাতে হবে।

দেবব্রত গাঙ্গুলী—(কানপুর) তরণীনক্ষত্র সিংহ রাশি, নরগণ, মকর লগ্ন। চাকুরী করা ভাল।

পরেশনাথ গাঙ্গুলী—(কানপুর) ১৯৭৪ সালে কর্মে স্থায়ী এবং ১৯৭৬ সালে পদোন্নতি সম্ভব।

উৎপল গাঙ্গুলী—(কানপুর) ১২ উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র, কন্যা রাশি, নরগণ, কুম্ভ লগ্ন। বিদ্যাস্থান শুভ। উচ্চশিক্ষার যোগ আছে।

অর্চনা সেন—মঙ্গল রাহু অশুভ থাকায় বিবাহে প্রবল বাধা। কর্মজীবন ও আর্থিক ভাল যাবে। প্রবাল রত্ন ও গোমেদ রত্ন ধারণে আশা পূর্ণ হতে পারে।

রীতা ঘোষ—স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রবাল ও মুক্তা রত্ন ধারণ কর্তব্য। চাকুরী যোগ কম। ১৩৮১ সালে বিবাহ হতে পারে।

প্রতিমা মজুমদার—(বীরভূম) ২৫ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব। স্বামী চাকুরীজীবী ও মধ্যবিত্ত সম্পন্ন হবেন।

গজানন গাঙ্গুলী—বর্তমানে শনি-রাহু বিরুদ্ধ থাকায় পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে কিনা সন্দেহ।

ভাস্কুমার ধনুরায়—বর্তমানে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত শনি-রাহু অশুভ থাকায় অশান্তি ও বাধাবিঘ্ন থাকবে। তারপর থেকে ক্রমশঃ উন্নতি ও শান্তি পাবেন।

রুমা গাঙ্গুলী—৪-৫ রতি হলদে পোখরাজ রত্ন ধারণে অনেকটা সুফল পাবেন।

গৌতম গাঙ্গুলী—লেখাপড়া ভাল হবে। উচ্চশিক্ষার যোগ আছে।

ডলি ব্যানার্জি—অষ্টমস্থ মঙ্গল-শনি বিবাহে বিঘ্ন ও বিলম্ব। ৩২ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

সমরলাল দে—১৯৭৪ সালের মার্চের মধ্যে চাকুরী সম্ভব।

গীতা বসু—রাহু গ্রহ অশুভ থাকায় এরূপ অশান্তি ঘটছে। পাত্তা দেওয়া উচিত নয়। গোমেদ রত্ন ধারণীয়।

জিতেন্দ্রনাথ দে—(দমদম) হঠাৎ অর্থ-প্রাপ্তি বা পরধন প্রাপ্তির আশা কম।

মমতা মিত্র—১৩৮০ সালেই বিবাহযোগ প্রবল। স্বামী চাকুরীজীবী হবে।

প্রফুল্লকুমার দাস—(হাওড়া) মৃগশিরা নক্ষত্র, বৃষ রাশি, মেষ লগ্ন।

রবীন্দ্রমোহন বণিক—প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি যোগ নাই। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্য।

মিলেস পালিত—২৪ বছর বয়সে বিবাহ যোগ প্রবল এবং দাম্পত্য জীবনে সময় সময় অশান্তি হবে। 'গোমেদ' রত্ন ধারণীয়।

প্রণব মুখার্জি—অষ্টমস্থ মঙ্গল-রাহু আপনার যোগ্যতা, দক্ষতা, পরিশ্রম অনুসারে উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটাবে।

অশোককুমার দাস—২৫ বছর বয়স পর্যন্ত পেটের পীড়া থাকবে। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। এবছর বিবাহ সম্ভব।

শ্যামল দে—(গৌহাটি) বর্তমান বছরেই চাকুরী সম্ভব। ২৮ বছরের পর বেশ ভাল সময় চলবে।

কুমকুম রায়—রাহু প্রতিকূল থাকায় বিবাহে বিঘ্ন, ১৩৮০ সালে বিবাহ সম্ভব। গোমেদ রত্ন ধারণীয়।

তপনকুমার চাটার্জি—১৯৭৩ সালের অক্টোবরের পর পরীক্ষায় সুফলের সম্ভাবনা। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির যোগ।

জলসা

বিদেশে সফরান্তে ইমরাৎ খান

ইমরাৎ খাঁর ইউরোপ সফর এই প্রথম নয়। গত সাত বছর ধরে তিনি নিয়মিতভাবে সাগরপারে উড়ে যাচ্ছেন—আর তাঁর পূর্ব-সূরীরা ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে বিদেশীদের যে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছেন সেই জাগ্রত চেতনাকে আরো উদ্দীপ্ত করছেন।

সম্প্রতি ইনি সপ্তমবারের সফরান্তে দেশে ফিরলেন। কয়েকদিন আগে স্ব-গৃহেই এক ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পীর কাছে জানা গেলো তিনি স্বদেশ অথবা বিদেশের কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠান অথবা ভি আই পির দাক্ষিণ্যে সাংস্কৃতিক সফরে যাওয়া-আসা করছেন না। ওদেশে তাঁর অনুরাগী সংগীত রসিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তাঁদেরই আগ্রহে তিনি যান। তাঁর অসংখ্য অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের চাহিদা, চুক্তি ইত্যাদির বন্দোবস্তের জন্য তাঁর পার্সোনাল ম্যানেজাররূপে আছেন সুবিখ্যাত ইম্প্রেসারিও মাইকেল জীন।

যেসব জায়গায় ইমরাৎ খাঁন গত ৬ মাস ধরে অনুষ্ঠান করেছেন সেগুলি হোলো যথাক্রমে ম্যাঞ্চেস্টার, কারডিফ মিউনিখ, ফ্লান্স, লন্ডনে কেনসিংটন ক্লাব, ব্রাইটন ফেস্টিভেল, বেলজিয়াম ব্রাসেলস, বার্লিন, বার্মিংহাম (টি ভি) শানদ। শ্রুসেসটার (ইংল্যান্ড) ভিসিয়ান এভিগনন ফেস্টিভেল (ফ্রান্স)—এবং অনেক গ্রামাঞ্চলেও।

'কোথায় বাজিয়ে আপনি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন?' —অমৃতের প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে শিল্পী জানালেন 'ওদের রুচি এখন এমনভাবে গড়ে উঠেছে এবং ভারতীয় সংগীতকে ওদেশের বিদগ্ধ শ্রোতা এমন গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন যে যে কোনো 'কনসার্ট'-ই শ্রোতাদের উচ্ছ্বাস আমার প্রেরণা দ্যায়। আমার দাদা ও গুরুর কাছে শেখা সব বিদ্যা উজাড় করে ঢেলে দিতে। তবু এ আনন্দে বৈচিত্র্য এনেছে লন্ডনে কেনিংটন ক্লাবে—ফ্যাসানেবল সোসাইটি লেডিদের আয়োজিত আমার একটি একক সেতার অনুষ্ঠানের আসর।

বাজাবার আগে একটু যে শংকা হয়নি তা নয়। শুধু এই কারণেই ইতস্তত বোধ করেছেন প্রসাধন ও হাল্কা আমোদে অভ্যস্তা ললনাকুল কি ভাবতের 'যোগীর ধ্যানের ধন'—এই মর্যাদামণ্ডিত সংগীতকে যথাযথ-ভাবে গ্রহণ করতে পারবেন? এখানে আধ্যাত্মিক ভাবের আলাপ বাজালে আলাপকে খেলো করা হবে না ত?—যাই-হোক, গুরুর নাম নিয়ে বাজনা শুরু করতেই ওদের চোখের কিময় মুগ্ধতার ছায়া শিল্পীকে তাঁর পরিবেশনায় আবেদন সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত করেছে।

এ অনুষ্ঠান যেন এক ধরণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী। কিন্তু শিল্পী নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছেন বার্লিনে বিশেষভাবে তাঁরই বাজনা ভাষ্য ও সংগীত-চিন্তার সংগে পরিচিত হবার জন্য তাঁরই জন্য আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী এক সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত হয়ে। ১ থেকে ৫ জুন অবধি এই সুবিস্তৃত অনুষ্ঠানে একাধারে সংগীতরসিক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। মন দিয়ে তাঁরা দীর্ঘবিলম্বিত অনুষ্ঠানই শুধু শোনেনি—তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে ইমরাৎ বিস্মিত হয়েছেন ভারতীয় সংগীত ধারার খুঁটিনাটি বিষয়ের সংগে তাঁদের পরিচয়ের অন্তরংগতা দেখে। তাঁরা জানতে চেয়েছেন—নানান তালের উৎপত্তি ও মেজাজ সম্বন্ধে, তাঁরা প্রশ্ন করেছেন ধ্রুপদের আলাপের প্রকৃতি কি এবং খেয়ালের বিলম্বিতের সংগে তার কোথায় পার্থক্য? বিভিন্ন ঘরাণার—প্রকৃতি ও পদ্ধতি। 'এসব শুনে আনন্দে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। নতুন করে বুঝেছি আমাদের সংগীতের অধ্যাত্মিক মর্যাদা কতখানি।' আবেগভরে বললেন ইমরাৎ খাঁন।

শুধু তাই নয়। এই অনুষ্ঠান তিনবার বেতারে সম্প্রচারিত হয়। প্রথমবার অবিকল অনুষ্ঠানের প্রচার দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠান ও আলোচনার জার্মান অনুবাদ, তৃতীয়বার অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় অংশ বিশেষ সম্পাদনা করে বেতারের বিভিন্ন শাখায় প্রচারিত হয়।

শিল্পী প্রাণে গভীর শান্তি পেয়েছেন 'সানতে'র চার্চে বাজিয়ে। ১৪ শতাব্দীর এই চার্চে নির্বাচিত শিল্পী ও শ্রোতা ছাড়া অন্য কারো প্রবেশপত্র পাওয়া কঠিন। সুরবাহারে 'শ্রী' রাগ দিয়ে আলাপ শুরু করে সেতারে 'ইমন' ও 'হংসধ্বনি' রাগে গতের উন্মোচন চার্চের উপাসনার ছন্দের সংগে মিশে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

নিজের বাদনশৈলী প্রসংগে শিল্পী জানান ওখানের অনুষ্ঠানগুলিতে কোনো-রকম কমপ্রোমাইজ না করে পুরোপুরি এদেশের রীতিতেই রাগ বিশ্লেষণ করে থাকেন। ঠুংরি একেবারে বাজান না। কারণ তাঁর মতে মনটা এতে হাল্কা রসের পশারী হয়ে পড়ে। একথার সংগে আমরা একমত না হলেও ভারতীয় রীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য অবশ্যই প্রশংসনীয়।

পরিশেষে ইমরাৎ আফশোষ করে বললেন—ওদেশে এত সমাদর পাওয়া সত্বেও মন সংকুচিত হয়ে যায় যখন দেখেন দেশের মানুষ তাঁর প্রতি উদাসীন। এই প্রসংগে এবার আসন্ন সদ্ভাবনা সংগীত সম্মেলনে শেষ-মুহূর্তে তাঁর অনুষ্ঠান যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য শ্রীকালিদাস সান্যালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্র সদনে অচিন্ত্যমোহন হোমিও-প্যাথিক হাসপাতালের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উদযাপিত হয় সংগীতসভা দিয়ে। এ উৎসবের নিবেদক স্বয়ং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রতিষ্ঠানটি তাঁরই পিতার নামে উৎসর্গীত। সেদিনের সন্ধ্যায় সংগৃহীত অর্থ হাস-পাতালের গৃহ-নির্মাণার্থে ব্যয়িত হবার পরিকল্পনাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

উৎসবের উদ্বোধন করে পূর্তমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যকে অভিনন্দিত করেন। প্রধান অতিথি শ্রীমতী কানন দেবী তাঁর আন্তরিকতাসিক্ত ভাষণে দুঃস্থদের সেবায় নিয়োজিত এই সংস্থার সর্বাংগীন কল্যাণ কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা দেবব্রত বিশ্বাসের গান দিয়ে। ইনি সর্বসমেত ৯ খানি গান গেয়েছেন। 'এলেম নতুন দেশে' দিয়ে সুরু। তারপর 'উদাসী বেশে', 'চিনিগো চিনি', 'পুরানো জানিয়া'—তথা সমধর্মী গানের নির্বাচনে একই অনুভূতির বিভিন্ন পর্যায়ে সূক্ষ্ম রূপান্তরে 'ডেকো না আমায়' ও 'আছ দাঁড়িয়ে' গান দুটির উপসংহারে এক সুন্দর ভাবসংহতি সু-পরিলক্ষিত। দেবব্রত-বাবুর মননশীল অন্তরটির প্রতিফলন বিদগ্ধ সংগীতরসিক শ্রোতাদের যথার্থ আনন্দ দিয়েছে।

পরের শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইনি শুধু জনপ্রিয় শিল্পীই নন; রবীন্দ্র-সংগীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতেও হেমন্ত-বাবুর উল্লেখযোগ্য অবদান অনস্বীকার্য। সেই কথাটিই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাঁর সেদিনের গাওয়া 'পাগলা হাওয়ার বাদলদিনে', 'প্রাণগনে মোর', 'আমার গোধূলি লগন'। এছাড়াও আরও ৯টি গানে রবীন্দ্রসংগীতে তাঁর বহুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সকল অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে উঠেছিলো তাঁর মৌলিক সুর বিশ্লেষণের আলোয় গাওয়া চন্ডালিকার গানগুলি। সেদিনের নবলব্ধ অভিজ্ঞতা হোলো সুরকার হেমন্তকুমারের সুররচনার উৎসধারার পথ-প্রদক্ষিণ—তাঁরই পরিবেশিত গানগুলির ইংগিতে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যর গানগুলিই তাঁকে সুররচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে বলে তিনি জানালেন।

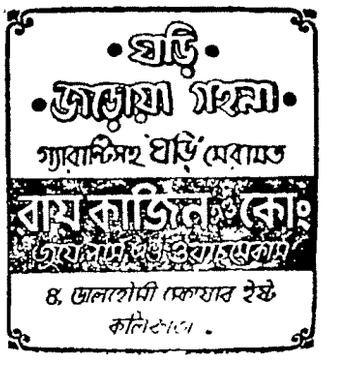

'চণ্ডালিকা'র গানগুলি আমরা নৃত্যের সংগতরূপেই শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু চোখের সামনে নৃত্যের দৃশ্য সৌন্দর্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকার দরুণই যেন শ্রোতাদের মানসলোকের দরজা খুলে গেলো—শিল্পীর সুরের নির্দেশে। তিনি ভাষ্যসহ গান গেয়ে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে শুধুমাত্র লয় থেকে লয়ান্তরে আবর্তনের মধ্যেই হৃদয়ের নানান আবেগের ওঠাপড়া নানারঙা অনুভূতির—গতি প্রকৃতির চাঞ্চল্যকে মূর্ত করা যায়।

'ওকে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' ছিল ধিক্কারে প্রকৃতির মর্মবেদনা, আনন্দর 'একটি গণ্ডুষ জল প্রার্থনা'য় প্রকৃতির বৈপ্লবিক ভাবান্তর ও নতুন জন্মে। নতুন গৌরবে জেগে ওঠা। ভাব উতলা ভাবের অন্যমনস্কায় মার তিনবার। তারপরই আনন্দকে পাবার উদ্দাম আকাঙ্খায় মাকে মন্ত্রের স্মরণাগত হবার মিনতি এবং মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ায় আনন্দর বিভ্রান্ত দশা দেখে কাতর হয়ে 'ওমা, ওমা ওমা ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র'। শুধু কি তাই? 'এখনই এখনই, এখনই' জোর দিয়ে উদ্বেল অন্তরের অস্থিরতা, এ সবই যেন ছবির মত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিলো হেমন্তর সেই জীবন্ত গায়কীতে—যা কোনো কনভেনশনের নিগড়ে বাঁধা নয় কিন্তু নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ। ওঁর কোমল ও শুদ্ধ পর্দার শ্রুতির সূক্ষ্ম পরিবর্তনে ভাবেরও রং কেমন করে পাল্টায়—ইত্যাদি নানান তথ্য আহরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানকে একটি সৃষ্টিধর্মী অনুষ্ঠান বলা যায়। নানা বিচিত্র ভাবের দোলায়িত ছন্দকে সংগত কারণেই হেমন্তবাবু 'সিম্ফনী' আখ্যা দিয়েছেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান শুধু চিত্তবিনোদনীই নয়, শ্রোতাদের নতুন করে অবহিত করে মহাকবি ও সুরকারের সুরবচনার অপূর্ব ভংগির সংগে। যথার্থ ভাবে গান শোনাটাও কিছুটা শিক্ষা ও অনুশীলনীর অপেক্ষা রাখে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলেও এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মূল্য আছে।

হরিদাস স্মৃতি-সংগীত সংসদ-এর পঞ্চম সংগীতোৎসব : সম্প্রতি ৬৭/ই, বিডন স্ট্রীটস্থ রামদুলাল সরকার মিউজিয়ামে, হরিদাস স্মৃতি সংগীত সংসদ-এর পঞ্চম ত্রৈমাসিক সংগীতানুষ্ঠান সম্পন্ন হল। প্রধান দুই শিল্পী ছিলেন সেতারে উদীয়মান তরুণ শিল্পী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও কণ্ঠে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ওস্তাদ সাগীরুদ্দিন খাঁ। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে উদ্ভব কলকাতায় কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েও বর্তমানে উপযুক্ত আসর করতে পারছেন না—সেদিক থেকে হরিদাস স্মৃতি-সংগীত সংসদ-এর পুনরায় নিয়মিত সংগীত অনুষ্ঠান চালাবার অনুপ্রেরণা সংগীতোৎসাহী বসন্ত শ্রোতার সাধুবাদ পাবে—এটা অনস্বীকার্য। মন্টু মুখোপাধ্যায়ের ভজন গানে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে যন্ত্র-সংগীতের আসরে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সেতারে রাগ ইমন কল্যাণ পরিবেশন করলেন। আলাপ ও গতের অংশে শিল্পীর খোলা হাতের কাজ মনে রাখবার মত। এর সংগে তবলা সংগতে সন্দীপ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ সাগীরুদ্দিন খাঁ-এর সর্বসাধারণ্যে সারংগী বাদক হিসেবে পরিচিত থাকলেও তিনি যে প্রকৃতই একজন কণ্ঠসংগীত শিল্পী সেটা সেদিন প্রমাণ করলেন। সাগীরুদ্দিন 'যোগ' রাগে খেয়াল ও ঠুমরি গেয়ে শোনালেন। তাঁর স্বর-বিন্যাস, গায়কী তানকর্ত বেশ পরিচ্ছন্ন। এই ভারগম্ভীর পরিচ্ছন্ন সংগীতানুষ্ঠানের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন সংগীত-সংসদ-এর সভ্যবৃন্দ।

মাহেশ সঙ্গীতী সংগীত শিক্ষানিকেতনের সংগীতানুষ্ঠান: স্বল্প পরিসরে, ক্ষুদ্রায়তনী পরিকল্পনায় এবং স্বেচ্ছা কর্মীদের অবসরের শ্রমে গড়ে ওঠা মাহেশ সঙ্গীতী সংগীত শিক্ষা নিকেতন দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষে ১৮ আগষ্ট এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগীত শিল্পীদের শিক্ষাদানের একটি সার্থক নমুনা এই অনুষ্ঠানে পাওয়া গেল। প্রধান আকর্ষণ নিঃসন্দেহে ডাঃ সুব্রত রুদ্র, কেশব দাস, দীপক ব্যানার্জী, শ্রীমতী শর্ববরী চ্যাটার্জি ও দিলীপ পাত্রের গান। ডাঃ সুব্রত রুদ্র শুরু করেন পর পর ছয়টি রবীন্দ্রসংগীত। যে তিনটি গান শ্রোতাদের বিশেষভাবে আনন্দ দিতে পেরেছে তা ছিল—'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবন, বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল, 'এবার নীরব করে'। উদীয়মান তরুণ শিল্পী শ্রীশঙ্কর মল্লিক, দেবীপ্রসাদ অধিকারী ও কুমারী তাপসী ব্যানার্জীর গানে শিক্ষা, রেওয়াজ, মেজাজ সবই ছিল।—কিন্তু যে বস্তুটি না থাকার জন্য তাঁদের অনুষ্ঠান মনে দাগ কাটতে পারেনি সেটি হোল সংযম ও ভারসাম্যের অভাব। এদের সংগে বাজালো শ্রীমনু ঘোষ, কিশোর শিল্পী সমীর ব্যানার্জীর তবলা সংগত ভাল লাগলো। বিশেষ করে তবলা সংগত মনে রেখাপাত করে শ্রীনন্দদুলাল সাহা ও কার্তিক দাসের। ঠেকার স্পষ্টতা, রেলা ও তেহাই-এ অনুশীলনী প্রশংসা করার মতই।

দীপক ব্যানার্জীর নজরুল গীতি ও আধুনিক গানে কণ্ঠের মাধুর্যতা ও কাজ সত্যই প্রশংসনীয়। তিনি কয়েকটি গান করেন তার মধ্যে যে তিনটি আকর্ষণীয় তা হলো—'না মিটিতে সাধ মোর' 'পরদেশী মেঘ', 'আমায় বেলা না ভুলিতে'। শ্রীতাপস অধিকারীর পুরিয়া ধানেশ্রী রাগে সেতার শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পেরেছে। তারপর শ্রীদীলিপ পাত্র শুরু করেন মালকোষ রাগে সরোদ। তাঁর সুনিপুণ সরোদ যন্ত্র শুরু হওয়ার সাথে সাথে সারা গৃহ যেন শান্ত গম্ভীরভাবে সমাহিত হয়ে গেল। শ্রীমতী শঙ্করী চ্যাটার্জির কণ্ঠে পরিবেশিত 'বেহাগ' রাগের খেয়াল খুবই চমকপ্রদ। অনুষ্ঠানের শেষ শিল্পী শ্রীকেশব দাস 'টোড়ী' রাগে খেয়াল। শক্তিশালী কণ্ঠে বিস্তারের তানের সৌষ্ঠব ও লয়ের চমক সব মিলে শিল্পীর মুনসীয়ানা ও পরিবেশন কারিগরী প্রথম থেকে শেষ অবধি শ্রোতাদের চুম্বকের মত আকৃষ্ট করে রেখেছিলো।

বিদেশ প্রত্যাগত ধ্যানেশ খাঁন

ইউরোপ ও আমেরিকায় সাফল্যদীপ্ত সাংস্কৃতিক সফরের পর তরুণ সরোদী ধ্যানেশ খাঁ ফিরে এসেছেন কোলকাতায় আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক পরিচালনার দায়িত্বের ভাগিদে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধ্যানেশ খাঁ জানালেন বিদেশের নানা অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ ধ্রুপদী পদ্ধতিতে আলাপ বাজিয়ে ওখানের সংগীতজ্ঞ মহলের তুমুল অভিনন্দন পেয়েছেন। 'বাবা ও পিসেমশাই (আলি আকবর ও রবিশংকর) বহু পরিশ্রমে ওদের রুচি প্রকৃতি ভারতীয় সংগীত গ্রহণের অনুকূল করেছেন বলেই আমাদের পক্ষে ওদের 'ইমপ্রেস' করাটা সহজ হয়েছে।' এই ওঁর অভিজ্ঞতা। সেদিন ধ্যানেশ ইমন কল্যাণ বাজিয়ে শোনালেন। স্বল্প পরিসরের মধ্যেই গায়কী অংগের সংগে তন্ত্রকারী ও বাজনশৈলীর মিলনে তিনি গুরু ও পিতামহ আলাউদ্দিন খাঁর সংগীতচিন্তার সুষ্ঠু রূপটি পরিস্ফুট করেন। সাংবাদিক মহলের প্রশ্নের উত্তরে ধ্যানেশ জানালেন, মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই দাদুর কাছে দাদা আশীষ খাঁ ও অন্যান্য শিষ্যদের সংগে কণ্ঠসংগীতে তালিম গ্রহণ শুরু করেন। তিন বছর শিক্ষার পর সরোদের দীক্ষা গ্রহণ হোলো দাদুরই কাছে। এরই মাঝে পিতা আলি আকবর খানের ও পিসিমা অন্নপূর্ণা দেবীর কাছেও পাঠ গ্রহণ করেছেন।

১৯ই সেপ্টেম্বর একাডেমী অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে সন্ধ্যা ৭টায় শংকর ঘোষের তবলাসংগতে একটি একক সারোদানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন ধ্যানেশ খাঁন। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন শ্রীমতী কানন দেবী।

—চিত্রাঙ্গদা

অমরজিৎ মিত্রের

পশ্চিম য়ুরোপে পাঁচশ দিন

পড়েছেন কি? বর্ণনার চাতুর্যে ভাষার মাধুর্যে, রসসৃষ্টির কল্পনায়—সবার জন্যে।

দাম চার টাকা

নবগ্রন্থ কুটির

৫৪/৫এ কলেজ স্ট্রীট

বেঙ্গিনা প্রেস

১৩১, হরিশ মুখার্জী রোড

জন্মভূমি
সোনিক্সা সাহনী ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-সমালোচনা

(১) ভারতকে শহীদ (হিন্দী)

~~মুকেশ ফিল্মস নিবেদিত~~ নামকরণের ছবি 'ভারতকে শহীদ'-এর বিষয়বস্তু তার নামেই প্রকাশ্য। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম যোদ্ধা-শহীদ মংগল পান্ডে থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে, ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাসংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু অবধি খ্যাত এবং অখ্যাত সকল স্বাধীনতাকামী বীর শহীদদের প্রশস্তি গেয়েছেন এই ছবির নায়ক বিজয়। প্রেম ধাওয়ান রচিত এই বিরাট প্রশস্তি গীতটিকে চারভাগে বিভক্ত করে সেপথ্যকণ্ঠে শোনানো হয়েছে মুকেশ কাপুরকে দিয়ে এবং এই বিরাট প্রশস্তিতে শতাধিক শহীদদের নাম উচ্চারিত হয়েছে।

কাহিনীতে বলা হয়েছে, এই বিরাট প্রশস্তি রচনা করেছে নায়ক বিজয় এবং এর জন্য এক সাহিত্য সভায় সে শেঠ ধরমদাস দ্বারা একটি ১১,০০০৲ টাকার তোড়া দ্বারা পুরস্কৃত হয়। কিন্তু ঐ টাকা সে তখনই দেশরক্ষা তহবিলে দান করে। নায়কের দাদা অজয় কিন্তু গোপনে দেশদ্রোহিতার কাজে লিপ্ত। তার শ্বশুর, এরিয়া কম্যান্ডার মিস্টার খান্নার বাড়ীর চাকর রামুকে দিয়ে সে গোপনে যুদ্ধসংক্রান্ত দলিল চুরি করে এবং শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত শেঠ ধরমদাসকে সেই দলিলপত্র যোগান দিয়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। অজয়ের বালকপুত্র পাপুকে আটক রেখেছে শেঠ ধরমদাস অজয়কে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে। বিজয় গান গেয়ে গেয়ে দেশের লোকের মধ্যে দেশভক্তি জাগানোর কাজে লিপ্ত থেকে হঠাৎ এসে পড়ে ষড়যন্ত্রকারী ধরমদাসের গোপন আস্তানায় এবং সেখানে বিস্মিত হয় যে, তার দাদা অজয় সেখানে যুদ্ধসংক্রান্ত গোপন দলিল পৌঁছে দিতে এসেছে নিজের সন্তান পাপুকে ফিরিয়ে পাবার জন্যে। বিজয় আবার গান ধরল :

সম্ভালো অয় বতনবালো বতন অপনা
সম্ভালে
জিস বতনকে বাস্তে লাখোঁনে আপনী
জান দী
জান দী জানে নহী দী আন
হিন্দুস্থানকী
কহানী উন শহীদোঁ কে ম ভুলো
হিন্দবালো

ব্যস দাদা অজয়ের মন গেল বদলে. সে বললে. আমার ছেলে এবং আমি নিজে মরব, কিন্তু প্রাণ থাকতে গোপন দলিল হস্তান্তর করে শত্রুর হাতকে শক্ত করব না। —এতকাল শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী শেঠ ধরমদাস নিজের পরিচয়কে অপ্রকাশ রেখে, নিজেকে লোকচক্ষুর গোপনে রেখেই কাজ-কর্ম চালাতেন বেতার ও ডিকটাফোনের সাহায্যে। আজ কিন্তু অজয়ের বিদ্রোহিতা তাকে বাধ্য করে নিজের দোষ

সত্যসাচী
পরিচালক : পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়,
কিরণ লাহিড়ী, জয়ন্ত বসু ও উত্তমকুমার।
ফটো : অমৃত

অবাক যে তাকে পুরস্কারপ্রদানকারী শেঠ ধরমদাস হচ্ছে শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী ব্যক্তি। কিন্তু নির্লজ্জ ধরমদাস নিজের অভিসন্ধি ব্যর্থ হয় দেখে অজয়কে লক্ষ্য করে যে-গুলি ছোঁড়ে, তা গিয়ে বেঁধে বিজয়ের বুকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়েন মিস্টার খান্না অজয়কে সন্ন্যাসীসহ সমেত গ্রেপ্তার করবার জন্যে। বিজয়ের মৃতদেহ শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় তারই প্রণয়িনী মুজবোওয়ালী কবিতার বাড়ীর সামনে দিয়ে। কবিতা তখন বধূবেশে সজ্জিত হয়ে প্রতীক্ষায় ছিল বিজয়ের সঙ্গে বিবাহিত হবার জন্যে।

কিন্তু এই কাহিনীই ছবির সব নয়। ছবিটির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিজয়ের মুখনিঃসৃত শহীদপ্রশস্তি গীতকে যথাযথভাবে চিত্রিতকারী সকল শহীদের অঙ্কিত ছবি, ঘটনাবর্ণনাকারী অভিনীত দৃশ্যাবলী এবং মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, সর্দার প্যাটেল, নেতাজী প্রমুখের খণ্ডিত তথ্যচিত্রগুলি। বলতে পারি, শহীদ-প্রশস্তির চিত্রাবলীই পুরো ১৫ রীলের ছবির অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে এবং এই অংশই ছবিটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, যার ফলে ছবিটিকে সরকার দিয়েছেন প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি।

কবিরাজ মহেশ বিদ্যারত্নের
ছুলিজল
চুলির অব্যর্থ ঔষধ
হার্বাল ড্রাগ কর্পোরেশন
২০৩-২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৬

মূল কাহিনীর অভিনয়কারীদের মধ্যে নায়কের ভূমিকায় সুভাষ ঘাই, অজয়ের ভূমিকায় রমেশ দেও এবং ষড়যন্ত্রকারী ধরম-দাসের ভূমিকায় তিওয়ারী দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবলচী বেশে ছোট মেহমুদ কিছুটা হাসির খোরাক জোটাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় সপ্রু (মিঃ খান্না), বীমা সপ্রু (কবিতা), সীমা শৈফালী প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মংগল পান্ডে থেকে শুরু করে ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম কানাইলাল, বাঘা যতীন ও তাঁর বাঙ্গেশ্বর বুদ্ধের সঙ্গীরা, সাভারকর, বিসমিল, উধম সিং প্রভৃতি বহু চরিত্রই প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ ঘটনা দেখাবার জন্যে বিভিন্ন শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে। বলতে পারা যায়, প্রত্যেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সাধারণ পর্যায়ের। নরোত্তম পাটনীর সাদা-কালো ফোটোগ্রাফী ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কোথাও মূল কাহিনীর অংশ, কোথাও নায়কের মুখের সঙ্গীতকে রূপদানের জন্যে অঙ্কিত পটের ও মূর্তির ব্যবহার, আবার কোথাও কোনো বীর শহীদের জীবনের ঘটনাকে অভিনয় করে দেখানো এবং কোথাও বা অতীতে গৃহীত তথ্যচিত্রখণ্ডের ব্যবহার—এই সবের সংমিশ্রণে চিত্রনাট্যানুযায়ী সম্পাদনায় এস আর সাওন্ত এবং এন ভি পালকারের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবির প্রায় সবটুকুই জুড়ে আছে প্রেম ধাওয়ান কৃত সঙ্গীত। 'মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী' থেকে আরম্ভ করে সুদীর্ঘ পাঁচটি প্রশস্তিসঙ্গীত এবং বাকী দুখানি প্রেমসঙ্গীত। সুরে নূতনত্ব না থাকলেও শ্রুতিমধুর।

রূপেশ ফিল্মস নিবেদিত ও বিশ্রাম বেদেকর পরিচালিত 'ভারতকে শহীদ' দেশাত্মবোধক চিত্র।

(২) দুটি তথ্যমূলক চিত্র

(ক) গঙ্গাসাগর মেলা (ইংরাজী ভাষ্য সংবলিত)

গ্রাফিক ডকুমেন্টারীজ কৃত দু রীলের সাদা-কালো তথ্যচিত্র 'গঙ্গাসাগর মেলা' পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর মোহনায় অবস্থিত সাগর দ্বীপে পৌষ সংক্রান্তিতে মকর স্নান উপলক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত পুণ্যার্থীদের যে মেলা হয়—যা বহুকাল ধরেই গঙ্গাসাগর মেলা নামে পরিচিত—তারই একটি সুবর্ণিত প্রতিচ্ছবি। পুণ্যার্থীরা জড়ো হবার আগে থেকেই সরকারী তদারকে যে আয়োজন ও প্রস্তুতি কপিলমুনির আশ্রমে ঘিরে, তা থেকে শুরু করে পুণ্যার্থীদের বিভিন্ন পথে ও যানে আগমন, তাদের ক্ষণিক আবাস, তাদের স্নান ও বিগ্রহ দেখা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তাদের পুনরায় প্রস্থান এবং মেলা-স্থানের পুনরায় শূন্য প্রান্তরে পরিণতি—এসবই অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে গ্রহণ করে যথাযথভাবে সাজিয়ে উপযোগী ভাষ্য এবং আবহসঙ্গীত দ্বারা অলঙ্কৃত করে দেখানো হয়েছে। ছবিটির নির্দেশক হচ্ছেন বংশী-চন্দ্র গুপ্ত, চিত্রগ্রহণে আছেন সৌমেন্দু রায়, বিশু চক্রবর্তী ও পূর্ণেন্দু বসু, সম্পাদনায় দলাল দত্ত এবং ভাষ্যলিখন ও পঠনে যথা-ক্রমে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও পি কে ঘোষ। আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন সত্যজিৎ রায়।

(খ) দার্জিলিং—দি হিমালয়ান ফ্যান্টাসী (ইংরাজী ভাষ্যসংবলিত)

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে শিলিগুড়ি থেকে ছোট্ট যেন খেলাগাড়ীর রেলে চেপে ৫০ মাইল গেলে পৌঁছোনা যায় পাহাড় শহর দার্জিলিংয়ে। পাহাড় কেটে বিভিন্ন ধাপে ধাপে—বিভিন্ন উচ্চতায় গড়ে উঠেছে এই নিসর্গশোভা শহরটি যার উত্তরে রয়েছে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই শহরে নানা দেশ থেকে পর্যটনকারীরা এসে জড়ো হয়; শৈলাবাসে গ্রীষ্মকালে আসে পশ্চিমবঙ্গের ধনী সম্প্রদায়। বহিরাগতদের সঙ্গে এই শহরের আদিম বাসিন্দা ভুটিয়া, ল্যাপ্চা, পাহাড়ীদের বিচিত্র বেশভূষাধারী চেহারা মিশে চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়, মাতিয়ে দেয়। দার্জিলিংয়ের আদিবাসীদের নাচ ও গান অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য; এর তরুলতা, ফুলফল, অর্কিডের ছড়াছড়ি ঝাউ, দেবদারুর শ্রেণী সবই মনোরম। দার্জিলিংয়ে দেখা যায় বহুবিধ হাতের কাজ, গহনা, পাথরের মালা, কাপড়চোপড় রূপার তৈরী গৃহসজ্জা দ্রব্য। এখানকার রয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন, এখানকার টাইগার হিলের সূর্যোদয়, সিঙ্গল লেক প্রভৃতি সবই রোমাঞ্চকর।

গ্রাফিক ডকুমেন্টারীজ সংস্থা দার্জিলিংকে তার সবরকম দর্শনীয় বিশেষত্বসহ উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের দু' বাঁলে পূর্ণ ইস্টম্যানকলারে তোলা ছবিটির মাধ্যমে। মৌখভাবে নির্দেশিত এই ছবিটির চিত্রগ্রহণ করেছেন সৌম্যেন্দু রায় ও পূর্ণেন্দু বসু। সম্পাদনায় আছেন দুলাল দত্ত। আবহসঙ্গীত রচনা করেছেন ওয়াই এস মুলকী। ভাষ্য রচনা করেছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও হিতব্রত রায় এবং বলেছেন এন বিশ্বনাথম্।

(৩) একটি পুরোনো ছবি,

যা পুরোনো হয়নি.

১৯৫৮ সালে তৈরী হয়ে মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায় পরিচালিত হাসির ছবি 'পরশ পাথর'। এল বি ফিল্মস ইন্টারন্যাশানালকৃত এবং প্রমোদ লাহিড়ী প্রযোজিত এই ছবিখানি আবার সেদিন দেখলুম ও হাসি এবং আরও হাসি হাসলুম। কার্জন পার্কে হঠাৎ কুড়িয়ে-পাওয়া ছোট্ট পরশ-পাথরটির গুণে ব্যাঙ্কের কেরাণী পরেশ দত্তের ফুলে-ফেঁপে ওঠা এবং 'ককটেল পার্টি'তে মদ্যপান করে বেসামাল হওয়া দেখে কে না হেসে থাকতে পারে? চুরি নয়, জুয়োচুরি নয়, কালোবাজারী বা ফটকাবাজী নয়, চোরাই চালানও নয়, তবু পরেশ দত্তকে পুলিশ ধরল এবং পরশপাথরটিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রিয়তোষ হেনরী বিশ্বাস উদ্বস্ত করে পুরোপুরি হজম করল ততক্ষণ পর্যন্ত তার রেহাই নেই। ছবির প্রধান চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী এবং তাঁর সঙ্গে রানীবালা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, রেণুকা রায় প্রভৃতি অনেকেই আজ ইহজগতে নেই। সেদিক দিয়ে ছবিটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তবু বলব, ছবিটিকে টাটকা ফুলের মতোই ভালো লেগেছে।

তরুণ অপেরার 'কার্ল মার্কস্'

দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বজ্র অসুরনিধনকল্পে। আর জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস-এর দারিদ্র্যসমুদ্র মন্থন করে উঠেছিল 'দাস ক্যাপিটল', যা আজকের বিশ্বের মেহনতী জনতার জীবনবেদ, যা শ্রমজীবী দরিদ্রদের হস্তে দিতে চেয়েছে সেই অমোঘ অস্ত্র যার প্রয়োগে একদিন পৃথিবীর কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায় হবে একেবারে নিশ্চিহ্ন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত কার্ল মার্কস লন্ডন শহরে দীনতমভাবে, ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে দিন যাপন করতে করতে লিখেছিলেন 'দাস্ ক্যাপিটল্'। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস যথাসাধ্য সহায়তা করেও তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচাতে পারেননি। মার্কস স্বপ্ন দেখেছিলেন, পৃথিবীর মেহনতী জনতা একদিন স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে। ফরাসী বিপ্লবীদের উত্থান ও পতনের কথা শুনেও তিনি হাল ছাড়েননি। তাঁর সুদৃঢ় আশা ছিল, ধনিকের অন্যায় একদিন স্তব্ধ হবেই হবে।

কার্ল মার্কস-এর সপরিবারে লন্ডন শহরে দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসের কাহিনীকে যাত্রানাট্যকে রূপ দিয়েছেন শম্ভু বাগ। তেরটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এই নাটকের প্রতিটি দৃশ্যকে মর্মস্পর্শী করবার জন্যে শ্রীবাগের প্রয়াস সার্থক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মার্কসের মতবাদ প্রচারের সুযোগটিকেও পরিত্যাগ করেননি। তাঁর রচিত গানগুলিও পরিস্থিতি রচনায় সাহায্য করেছে।

অমর ঘোষের নির্দেশনায় যাত্রাপালাটি সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে গেছে চূড়ান্ত পরিণতির পথে। পরিচ্ছন্ন হয়েছে এর রূপ, দর্শক হৃদয়কে সম্মোহিত এবং উদ্বুদ্ধ করে এর আবেদন। চরিত্রোপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ, কাহিনী উপযোগী সুরের মূর্ছনায় এই পালানাটকটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অপরূপ সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হবে। তরুণ-অপেরার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সর্বাংশে সার্থক হয়েছে। উদ্বোধনরজনীতে অভিনয়টি চার ঘন্টাকাল ধরে হয়েছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতোই অভিনয়টিকে প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছি। নিশ্চয়ই আশা করতে পারি, নাটকটিকে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ না করেও সময়টিকে কিছুটা সংক্ষেপ করা সম্ভব।

পলিডর

রেকর্ডে পূজার গান

মন কেড়ে নেওয়া সুরে নতুন গান গেয়েছেন

চিত্র তারকা মালা সিনহা

বাংলা পপ্ গানের জনপ্রিয় শিল্পী

বাপী লাহিড়ী

বোম্বাইয়ের শিল্পী ঃ মানস মুখোপাধ্যায়

প্রথিতযশা জপমালা ঘোষ ও সনৎ সিংহ

জনপ্রিয় শিল্পী ঃ প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

উদীয়মানা শিল্পী ঃ

শ্যামলী বসু ও কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

সেই সঙ্গে

বটুক নন্দী ঃ গীটার ● জহর রায় ঃ কমিক

সুকুমার মিত্র ঃ নজরুল গীতি

ফিল্মের গান ঃ

রৌদ্রছায়া ● চলো কলকাতা ● অপরাজিত

এই তিনটি ছায়া ছবির গান গেয়েছেন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ● সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

মান্না দে ● নির্মলা মিশ্র

ই. পি. রেকর্ডে ঃ কার্ত্তিক কুমারের সেতার

এল. পি. রেকর্ডে ঃ শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা

আপনার কাছের পলিডর বিক্রেতার দোকানে আজই শুনুন

গানের বই স্টক থাকা পর্যন্ত পাবেন

polydor

পূর্ব ভারতের একমাত্র পরিবেশক ঃ

দেবসন্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা ● পাটনা ● কটক ● গৌহাটী ● জব্বলপুর

BEEVAS/737

নাম-ভূমিকায় শান্তিগোপাল আর একটি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তিনি যে চরিত্রটির গভীরে প্রবেশ করেছেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি পদে পদে। আশ্চর্য সংবেদনশীল অথচ মতবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাবান চরিত্রটিকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তার পরেই উল্লেখ করব মার্কস-এর মেজো মেয়ে লরার ভূমিকায় মণিকুন্তলা বসুর অভিনয়ের কথা। এমন সুন্দর বাচন, এমন চমৎকার উচ্চারণ এবং এমন হৃদয়গ্রাহী অভিনয় মাত্রাপালায় কমই দেখেছি। টুসী (এলিয়ানর) লেপ্পেন ও জেনি-এর চরিত্রে যথাক্রমে গীতশ্রী দাস, সোনালী গোস্বামী ও শীলা চক্রবর্তীর অভিনয়ও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গীতশ্রীর 'উগবগ টগবগ ঘোড়া চলে' গানের সঙ্গে শান্তিগোপাল ও গীতশ্রীর যৌথ অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য। অমর ভট্টাচার্য (লেবেদেফ), হিমাংশু দাস (এঙ্গেলস), সুদেশকুমার (চার্লস), বিশ্বনাথ দত্ত (পল), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় (বগ), নিখিলেশ সান্যাল (উগ্রপন্থী যুবক), শিব ভট্টাচার্য (বুচার) প্রমুখের সুঅভিনয় উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত ভট্টাচার্যকৃত সুরে গীত পালাটির বিভিন্ন গান এর আকর্ষণকে বহুগুণে বর্ধিত করেছে।

তরুণ অপেরার 'কার্ল মার্কস' সংস্থার যশকে বহুবিস্তৃত করবে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

নাটকাভিনয় : আসছে ২৮শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় অরুন মহল মঞ্চে ভবানীর একাঙ্ক নাটক 'আর এক তরঙ্গ' ও হেমন্তকুমারীর নৃত্যনাট্য 'তিলোত্তমা' অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণে বিজন চট্টোপাধ্যায়, তপন পাল, সুশীল দত্ত, প্রদীপ রায়, বিশ্বাস, অরুণ ব্যানার্জি, অশোক গুহ, অনিল ভদ্র, তপন দাস, জগবন্ধু দাস, তপন বিশ্বাস, গৌতম সরকার, সৌমিত্র দাস, দুর্লভ ঘোষ, শিবব্রত চক্রবর্তী, রতন ঘোষাল, সমর হালদার, মন্টু রায়চৌধুরী, গীতশ্রী গুহ, মমতা ব্যানার্জি, মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

রঙ্গনায় নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত
৩৫২ শনি ২০শে বৃহস্পতি ৬॥টায়
নটী বিনোদিনী
১৬ই রবিবার ৩টে ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

তরুণ অপেরার কার্লমার্কস-এর নামভূমিকায় শান্তিগোপাল

মমতা ব্যানার্জি, গোপা মজুমদার, মায়া মজুমদার, সংযুক্তা চ্যাটার্জি, দীপক মুখার্জি ও উমাশংকর মুখার্জি। নৃত্যনির্দেশনা—সর্বশ্রীমন্টু রায়চৌধুরী ও বিজন চট্টোপাধ্যায়।

বিসর্জন : সন্ধ্যা নাট্যসংঘের প্রযোজনায় ৭ সেপ্টেম্বর অকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অভিনয়ে রঘুপতি—শান্তিগোপাল, গুণবতী—সোনালী গোস্বামী এবং অপর্ণা—গীতশ্রী দাস শ্রোতাদের মনে রেখাপাত করেন।

শৈলিকের তিনটি একাঙ্ক : 'শৈলিকের শিল্পীরা যে আধুনিক নাট্যচর্চার গভীরে এখনো পূর্ণমাত্রায় উদ্বুদ্ধ, সে সত্যটি সেদিন 'ম্যাকসমুলার ভবনে' প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনটি সার্থক একাঙ্কিকা পরিবেশন করে তারা তাঁদের আন্তরিক নাট্যনিষ্ঠার প্রমাণ রেখেছেন। একাঙ্কিকা তিনটি হোল বিমল করের 'ঘাতক', মনোজ মিত্রের 'টুপুরে টাপুর', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সওয়ার'।

প্রযোগ পরিকল্পনা ও অভিনয়ে নতুনত্বের স্বাদ মিলেছে নিশ্চয়ই। আলোকসম্পাত ও মঞ্চসজ্জায় আধুনিক শৈল্পিক চিন্তার ছাপ আছে। প্রায় প্রতিটি চরিত্রচিত্রণই হয়েছে প্রাণময়তায় উজ্জ্বল।

সামন্তনীর হারাধনের দশটি ছেলে : আগস্ট মাসের প্রতি শনিবার থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে সামন্তনী মঞ্চস্থ করে কাশীরমণ ঘোষ বিরচিত 'হারাধনের দশটি ছেলে'। আজকের সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে রয়েছে হারাধনের সন্তানেরা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তির পথ খুঁজে না পেয়ে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অপেরা ঢঙে উপস্থাপিত নাটকটি দর্শকমনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে। পরিচালক মিহির চট্টোপাধ্যায় উপস্থাপনায় ব্রেখটীয় ধারা অবলম্বন করায় নাটকটি আরও বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রদীপ চক্রবর্তীর মঞ্চ ও আলো এবং অসিত চৌধুরীর সংগীত নাট্যোপযোগী। দু-একটি স্থানে সংগীত একটু কমালে নাটকের গতি আরও অব্যাহত থাকবে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে এদের দলগত নৈপুণ্যের কথাই আগে বলতে হয়, আলাদা করে কাউকে চোখে পড়ে না। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন অসিত চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কল্যাণ বসু, মিহির চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত কর এবং আরতি চট্টোপাধ্যায়।

শিলিগুড়ি 'মিত্র সম্মিলনী'

উত্তর বাংলার প্রাচীনতম নাট্যসংগঠন 'মিত্র সম্মিলনী' এখন একটি পরিচিত নাট্যসংস্থা। তেষট্টি বছর আগে পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিছু জমি দান করেছিলেন এই সংগঠনকে। সেখানকার টিনের ঘর ভেঙে কিছুদিন আগে গড়ে উঠেছে একটি সুসংস্কৃত নাটমঞ্চ। সেই সঙ্গে সংগঠনের বর্তমান সদস্যরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রযোজিত করছেন একের পর এক পূর্ণাঙ্গ নাটক।

আসছে পনের, ষোল ও সতেরই অক্টোবর কলকাতার রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চে এঁরা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'খীতিংস" 'কাবকাহিনী' এবং 'এক যে ছিল ঘোড়া' নিয়ে তিনটি সন্ধ্যার এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছেন।

শিলিগুড়িতে অভিনয় : শিলিগুড়ি শহরের প্রাচীন নাট্য সংস্থা 'মিত্র সম্মিলনী' চেক নাট্যকার জুলিয়ুস হে-র রচনা অবলম্বনে লেখা 'এক যে ছিল ঘোড়া' নাটকটি গত ২৬শে আগস্ট দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ করেন। নাটকটি রূপান্তর করেছেন বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার। উদ্ভট ও অবাস্তব এই নাটকটি পরিচালনা ও অভিনয় গুণে প্রথম রাত্রির দুর্বলতা কাটিয়ে দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে দর্শকদের অকুণ্ঠ করতে সমর্থ হয়েছে। বিশিষ্ট নটশিল্পী শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটির নির্দেশনায় যে দক্ষতার ছাপ রেখেছেন, সম্রাটের চরিত্র চিত্রণে কিন্তু ততটা সফল হন নি। অন্যান্য ভূমিকাভিনয়ের মধ্যে সর্বাগ্রে দীপ্তি মুখার্জির (ললিতা) নাম উল্লেখযোগ্য। তারপর দীপক চ্যাটার্জি (জ্ঞানবর্ধন), সুশান্ত বসু (সুমন্ত),

অশোক বসু (ধনপতি), শম্পা ঘোষ (মালশ্রী), হাসি রায় (ভারতী) এবং টাইপ চরিত্র অঙ্কনে প্রিয়তোষ সেনশর্মা, পীযূষ ঘটক ও শক্তিপদ ব্যানার্জি সুঅভিনয় করেছেন।

ইতিমধ্যে মিত্র সম্মিলনী নিয়মিতভাবে বীতংস, কবি কাহিনী ও তিন পয়সার পালা (দৃশ্যাংশ) অভিনয় করে শহরের নাট্য-রসিকদের নিকট থেকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। এই সফলতার মূলে পরিচালক শ্রীআসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের (কলিকাতা লোকাল হেড অফিস ইউনিট) সভ্যবৃন্দ আয়োজিত বাৎসরিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে গেল ৫ সেপ্টেম্বর স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হল রতনকুমার ঘোষের বহু প্রচারিত নাটক 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'।

অমৃতের সন্তান মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমৃতের সন্ধানে ফেরে, পায় কজন? বাঁচাটাই যেখানে সমস্যা, সেখানে অমৃতের সন্ধান পাওয়া কি সহজ, এই জটিল বিষয়টির নাটকীয় উপস্থাপনা আছে নাটকটিতে।

বাবলু দাশগুপ্তের নির্দেশনায় এবং সভ্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নাটকটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে যে কটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেগুলি হোল সমর দত্ত (সনাতন), গৌতম দে (তরুণ), কল্যাণ মল্লিক (বানওয়ারীলাল), পুলক মুখোপাধ্যায় (সজ্জন) চঞ্চল দত্ত (রমণীমোহন) ও বেলা সরকার শিবানী)।

রক্তকরবীর চলন্তিকা ঃ হাসির নাটকে আমরা প্রাণভরে হাসবো, হিল্লোলে আর উচ্ছলতায় চলমান হবে উচ্ছল মন; এই প্রত্যাশাই থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বলা হয়তো অযৌক্তিক হবে না যে 'রক্ত-করবী'র সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'চলন্তিকা' সেই সীমাতে আমাদের আবেগকে উন্নীত করতে পারেনি। রঙমহলে পরিবেশিত শ্রীভবেন্দু ভট্টাচার্যের এই নাটকটি একটি বয়স্কা মহিলার বিয়ে করতে চাওয়ার বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু অনাটকীয় অনেক শৈথিল্য এসে রুদ্ধ করেছে নাটকের প্রত্যাশিত প্রবহমানতা।

নাট্য-নির্দেশক শ্রীভবেন্দু ভট্টাচার্য নাটকটিকে সফল করবার জন্য বহু পরিশ্রম করেছিলেন বোঝা যায়। কিন্তু নাটকটি বিশেষ সম্পাদনার প্রয়োজন। অভিনয়ে অমলেন্দু ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম [illegible] মুখোপাধ্যায় বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখেন। এ-ছাড়া সমীরণ মিত্র, বঙ্গলাল মুখার্জি, বুলু মুখার্জি, সঞ্জীব চক্রবর্তী, প্রণয় পাল, সলিল সরকার, তপন মুখার্জি, অসীম মুখার্জি, গোপাল দাস, সমরেন্দু ব্যানার্জি, সোমাংশু দাস, শ্রীদাস, কাজল ব্যানার্জি, মলি মুখার্জি, চৈতালী রায়-এর অভিনয় চরিত্রানুগ হয়েছে। আলোক নিয়ন্ত্রণের ত্রুটি চোখকে পীড়া দেয়।

মহুয়া নাট্যসংঘের 'হোমের আগুন' ঃ বিভ্রান্তি আর অসৎ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে হোমের আগুনে একটি বিক্ষুব্ধ মানসিকতাকে শোধন করে নেওয়ার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'হোমের আগুন' নাটকটির সংলাপ ও সংঘাত। শ্রীলরেন্স ডি রোজারিওর এই নাটকটি নানা কারণে দর্শকদের আকৃষ্ট করেছে। নাট্য-নির্দেশনার আন্তরিক নিষ্ঠা ও শৈল্পিক সংযমের পরিচয় রেখেছেন হীরেন সেন ও লরেন্স ডি রোজারিও।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে যাঁর মুন্সিয়ানা প্রায় সবারই মন কেড়ে নিয়েছে তিনি হোলেন হীরেন সেন। নাটকের মুখ্য চরিত্র 'কল্যাণের' প্রকাশভঙ্গিমায় তাঁর বিশিষ্ট কৌশলটি সত্যি মনে রাখার মতো। নাট্যকার রোজারিওর 'রাজীব'ও হয়েছে ব্যক্তিত্বে দীপ্ত। ত্রিদিব-জ্যোতি দাসের 'নন্দলাল' হয়েছে একটি বিশিষ্ট চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন নন্দলাল শর্মা, প্রবীর ব্যানার্জি, শিবরাম গাঙ্গুলী, ব্রজেশ্বর সাহা রাধাশ্যাম রায়, দেবাশীষ গুহ, মধুসূদন সাহা, সুরেন সাহা, ফিদেলিন ডোনা, কৃষ্ণ ব্যানার্জি, কাজল মুখার্জি, শ্রীমতী পাইন।

অবহসঙ্গীত পরিকল্পনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন সুনীলবরণ দাস।

অগ্নিদূতের 'ঝি' ঝি পোকার কান্না ঃ অগ্নিদূতের বলিষ্ঠ নাটক 'ঝি ঝি পোকার কান্না' নাটকটি কয়েকদিন আগে সরলা মেমোরিয়াল হলে অভিনীত হোল। পরি-বেশন করলেন 'পরবেশের' শিল্পীরা। বহুঅভিনীত এই নাটকটিকে মঞ্চের আলোয় মোটামুটিভাবে প্রাণবন্ত করে তুলতে শিল্পীরা চেষ্টা করেছেন আন্তরিকভাবেই। এ ব্যাপারে নির্দেশক মৃন্ময় চৌধুরীর মুন্সিয়ানা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম সবচেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয়, তিনি হোলেন মৃন্ময় চৌধুরী। কুমারেশের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সত্যি মনে রাখার মতো। অন্যান্য চরিত্রে যাঁদের অভিনয় প্রায় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়, তাঁরা হোলেন অজিত মণ্ডল, প্রসাদ কুণ্ডু, অনিল দাস, শ্রীকান্ত মিত্র, [illegible] নাটকের চরিত্র গোরা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব একটা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা তুলে ধরতে পারেননি।

আলোকসম্পাত ও মঞ্চপরিকল্পনা এই নাটকটির প্রযোজনাকে আরো অর্থবহ করে তোলে।

বিবরের অভিনয় ঃ কুমার দিব্যেন্দুর পরিচালনায় বলাকা (শ্যামবাজার)-এর প্রযো-জনায় 'বিবর' নাটকের টিম-ওয়ার্ক ভালো লাগল। নায়কের ভূমিকায় পরিচালকের অভিনয় মনে বেশ দাগ কাটে। দুর্বল অবাস্তব কাহিনীকে এমনিভাবে দর্শক-সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় করে রাখার কৃতিত্ব শুধু যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের এবং পরিচালকের। নায়কের অভিনয় ছাড়াও সম্পাদক, বাগচি চ্যাটার্জি, আই বি সলিল, নীতা সেন, শিশির ও রফি দত্তর ভূমিকায় যথাক্রমে অলোক বিশ্বাস, মন্টু ব্যানার্জি, সুতেজ স্বাতিক, অশোক দাশগুপ্ত, মিহির চক্রবর্তী, রমা দাস এবং শেফালী ব্যানার্জির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সেট সেটিং যথোপ-যুক্ত হয়েছে। মিস জে-এর নাচ দেখে বার বার এই কথা মনে হয়েছে যে, যে সমাজে এই নাচ চলে সেই সমাজকে কবে আমরা বাতিল করে নতুন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে পারব। কাহিনীকার এবং নৃত্যশিল্পীর এই সাফল্যের কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আবহসঙ্গীত প্রশংসনীয়।

প্রকাশিত হয়েছে

৪১শ 'বিশেষ' সংখ্যা

বহুরূপী

• এ সংখ্যায় ছ'টি পূর্ণাঙ্গ নাটক •

অপরাজিতা ঃ নীতীশ সেন ॥ এক যে ছিল ঘোড়া ঃ জুলিয়াস হে/অশ্রুকুমার শিকদার ॥ অভিমন্যু ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষ ॥ গন্ডার ঃ ইউজিন ইয়োনেস্কো/শাঁওলী মিত্র ॥ পাপের বেতন মৃত্যু ঃ রঘুনাথ গোস্বামী ॥ তরুণ হিরের নতুন যন্ত্রণা ঃ উলরিশ প্লেনহর্স্ডফ/স্বপন মজুমদার ও দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

• প্রবন্ধ •

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ॥ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ॥ সুকুমার সেন ॥ সুশীল মুখোপাধ্যায় ॥ চিন্মোহন সেহানবীশ

শম্ভু মিত্র

॥ দাম পাঁচ টাকা মাত্র ॥

• পরিবেশক •

পত্রিকা সদন ॥ মনীষা গ্রন্থালয়

॥ বহুরূপী ॥

১৮এ, মাসিমুদ্দিন রোড, কলিঃ-১৭

এসবেসটাস সিমেন্ট সেলস রিক্রিয়েশন ক্লাব : হিন্দী হাই স্কুলে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত নাটক 'বহ্নিশিখা' অভিনয় করেন। এই নাটককে কেন্দ্র করে অফিসের সকলে একত্র হয়েছিলেন এবং তাঁদের পরিবার পরিজন প্রচুর আনন্দ পান। দুই-চারজন ছাড়া কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। বিজয় বসু, কাজল মুখার্জি, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শচীন সেনগুপ্ত, শান্তিপ্রিয় ঘোষ, গীতশ্রী দেবী, কল্লোলী পরিষা, আর এস কৃষ্ণান, শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি ও প্রীতিকণা পাল, উদয়ন ঘোষ মিস তুহিনা ইভা সেনগুপ্তা এই নাটক অভিনয় করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন ইন্দ্র রায়।

'সাহেব বিবি গোলাম' : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম' নাটকটি পরিবেশন করলেন বিশ্বরূপায় মঞ্চে। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকের প্রায় প্রতিটি শিল্পীই স্বাভাবিক অভিনয় করতে পেরেছেন এবং সেই সূত্রে সামগ্রিক প্রযোজনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন ভূমিকায় যে সব শিল্পীরা অংশ নেন তাঁরা হোলেন মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, রবি গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়ব্রত ঘোষ, মোহনলাল চক্রবর্তী, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, কনিষ্ক রায়চৌধুরী, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধন দে, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, অভয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়দেব মুখোপাধ্যায়, প্রেমগোপাল অহঠাকুরতা, রঞ্জন ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, শান্তি ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য, অতীন চট্টোপাধ্যায়, মোহনলাল চক্রবর্তী, জ্ঞানানন্দ ঘোষ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে সাবিত্রী চক্রবর্তী, মীরা চক্রবর্তী, পুতুল দত্ত, অনিলা দেবী, সুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

মৃণাল সেনের 'পদাতিক'

মৃণাল সেন প্রযোজিত ও পরিচালিত নবতম বাংলা ছবি 'পদাতিক' ২৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকে দেখানো হচ্ছে এলিট সিনেমায়। ছবিটিকে 'ইন্টারভিউ' ও 'কলকাতা ৭১'-এর পরিণতি হিসাবে গণ্য করা যায় বলে দাবি করা হয়েছে। একজন রাজনৈতিক কর্মী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়াবার জন্য গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার সময়ে আত্মসমীক্ষণ শুরু করে দিল এবং তারই ফলে এই সিদ্ধান্তে এল যে, এ পৃথিবীতে সব জিনিসই কিছু নিষ্পত্ত নয়। ক্রমে সে দেখতে পেল তার রাজনৈতিক বন্ধুরা সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তখনই সে মনস্থির করে ফেলল, এই বিপথগামীদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়তে হবে। চিত্রকাহিনীটি যুগ্মভাবে রচনা করেছেন মৃণাল সেন এবং আশীষ বর্মণ। চিত্রগ্রহণ করেছেন কে কে মহাজন এবং সুরযোজনা করেছেন আনন্দশঙ্কর। ছবির মুখ্যচরিত্রে আছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এবং অপরাপর ভূমিকায় সিম্মী, বিজন ভট্টাচার্য, জোছন দস্তিদার, প্রভাস সরকার, অসীমা সিংহ প্রমুখ শিল্পী। মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স নির্মিত 'পদাতিক'-এর পরিবেশক হচ্ছেন বিলিমোরিয়া লালজী।

স্টার থিয়েটারের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেবনারায়ণ গুপ্ত দ্বারা বিশেষভাবে 'বিদ্রোহী নায়ক' (বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের বিশিষ্ট নাট্যকার-পরিচালক উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকীয় জীবনী)-এর সাফল্যমণ্ডিত শতাধিক রাত্রি অভিনয়ের পরে স্টার থিয়েটার দুর্গাপুজোর আগেই যে-নাটকটি দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করতে চলেছেন, সেটি হচ্ছে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুলপঠিত উপন্যাস 'জনপদবধূ'র নাট্যরূপ। স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক নাট্যকৃত ও দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত এই নাটকে সুরযোজনা করছেন খ্যাতনামা সুরশিল্পী তিমিরবরণ। দৃশ্যপট পরিকল্পনা করছেন রামচন্দ্র সিংধে এবং আলোক সম্পাত করা হবে তাপস সেনের নির্দেশে। নাটকটির প্রধান প্রধান চরিত্রে দেখা দেবেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

স্টার থিয়েটারের বর্তমান পরিচালক রঞ্জিতমল কাংকারিয়া জানিয়েছেন যে, নিয়মিত অভিনয়ের সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজিত নাটক প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন সকালে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ধরনের প্রথম নাট্যনিবেদন হবে জয় সেনগুপ্ত পরিচালিত ও সুকুমার রায় রচিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'।

শ্রীকাংকারিয়া আরও জানিয়েছেন যে, আসছে ডিসেম্বরে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একাঙ্ক নাটকাভিনয়ের পঞ্চাশ বৎসরপূর্তি উপলক্ষে (১৯২৩-এর ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল নাটকার মন্মথ রায়ের একাঙ্কিকা 'মুক্তির ডাক') স্টার থিয়েটার একটি একাঙ্ক নাট্যাভিনয়ের উৎসব করবে।

'বারবধূ'র ৩০০তম রজনীর স্মারকোৎসব

রাজাবাজারের প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে ১৯৭২-এর ১৫ আগস্ট থেকে চতুর্মুখ নাট্যসম্প্রদায় 'বারবধূ' অভিনয়ের আসর বসিয়েছেন। সংস্থাপ্রধান অসীম চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানতে পারলুম, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লোকসানের ধাক্কা সামলে ১ অক্টোবর তিনি খবরের কাগজে বড়ো বড়ো করে বিজ্ঞাপন দিলেন : 'বারবধূ—
Blow hot—Blow hottest
নাটক, প্রতি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এবং সেই দিন থেকে 'বারবধূ'র—'অশ্লীল' নাটক 'বারবধূ'র জয়যাত্রা শুরু হয়েছে এবং তা চলেছে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজও অব্যাহতভাবে। সমাজ বহির্ভূত এক বারবণিতার নির্মলুষভাবে সামাজিক জীবনযাত্রার স্বপ্নকে চিত্রিত করবার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার দেখিয়েছেন আজকের সমাজে শিক্ষিতা আধুনিকা রমণীর নির্লজ্জ যৌনাকুতিকে। প্রশ্ন জাগে কি দোষে লতা স্বামী-সন্তান পেল না,' আর কি গুণে অভা সমাজে স্থান পায়? অভিশম্পাত দিতে ইচ্ছে করে সমাজবিধাতাদের।—কিন্তু না—৩০৪ রাত্রি অভিনয় হয়ে যাওয়ার পরে 'বারবধূ' নাটকের বিস্তৃত কোনো সমালোচনা সাজে না। গেল ৮ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় প্রতাপমঞ্চে উপস্থিত থেকে 'বারবধূ'র ৩০০তম রজনীর স্মারকোৎসবে দেখেছি, 'চতুর্মুখ'-এর সভ্যবৃন্দের সাফল্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল, দেখেছি বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রাচীন অভিনেত্রী নিভাননী দেবীর হাত থেকে তাঁদের বিনীতভাবে পুরস্কার গ্রহণ, শুনেছি উদ্বোধক ও সভাপতি হিসেবে যথাক্রমে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ভবরঞ্জন দে ও নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'চতুর্মুখ'-এর সভ্যবৃন্দের প্রতি আন্তরিক আশীর্বচন সহ সময়োচিত ভাষণ। এই সঙ্গে আমরাও শুভকামনা জানাই 'চতুর্মুখ'-এর সভ্যবৃন্দকে, তাঁদের চলার পথ যেন কুসুমাস্তীর্ণ হয়।

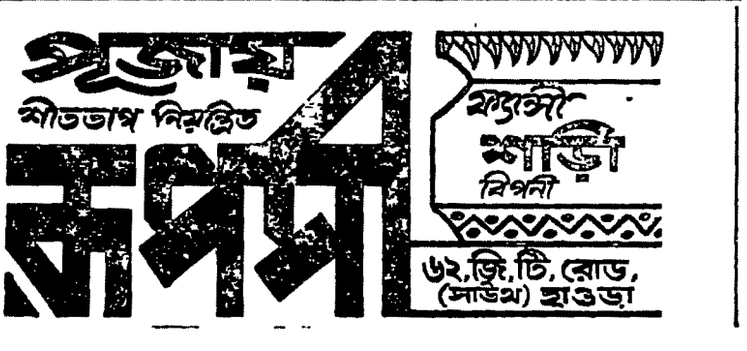

...ওপারবাংলায় ঋত্বিককুমার ঘটকের ছবি

...তিতাস একটি নদীর নাম

...ছবি তৈরীতে অত্যন্ত বেশি করে মনো-যোগী হয়েছেন।

এই ক্ষেত্রে অবশ্য সেখানে ঋত্বিক-কুমার ঘটক পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' যে চিরাচরিত ও প্রচলিত

...নিয়মেই হয় ধরে—[illegible] সফলতা অর্জনে ব্যর্থ হবে—[illegible] কিন্তু ঋত্বিকবাবুর [illegible] 'তিতাস' যে মাত্র [illegible] পরই [illegible] হল থেকে মাত্র একটি [illegible] জুদ্রতম) হলে [illegible] হবে—তা যেন [illegible] করতে ইচ্ছে করে না।

এর কারণ কি?

ইতিহাস যারা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, বাংলাদেশের কপাল, এ-ধরনের একটি ছবি এখানে তৈরী হয়েছে।

ইতিহাস যারা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন—এ-ছবি বিশ্বের যে-কোন চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জনে সক্ষম।

ইতিহাস যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের চিত্র-কর্মীদের ক্ষমতার উপর আবার বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন—বাংলাদেশে উত্তমকুমার নেই, দিলীপকুমার নেই, সুচিত্রা বা শর্মিলা ঠাকুর নেই বটে—তবে যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন করবী, রোজী, মোস্তফা, রওশন জামিল প্রবীর মিত্র, রানী সরকার। এবং সবচেয়ে বড় কথা হল, এঁরা যদি আগামীতে ছবিতে অভিনয় না করেন তবুও তাঁরা 'ইতিহাসে' অভিনয়ের জন্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চির-অমর হয়ে থাকবেন।

ইতিহাসের ক্যামেরাম্যান বেবী ইসলাম।

বেবী ইসলাম তাঁর ক্ষমতা আর একবার প্রমাণ করেছেন।

আমরা আশংকা করছি—রাজেন তরফদার পরিচালিত ও মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি 'পালঙ্ক' ছবিটিও কি শেষপর্যন্ত 'ইতিহাস একটি নদীর নাম' ছবির মতই অবহেলিত হবে? উল্লেখ্য যে, পালঙ্ক ছবির শ্রেষ্ঠাংশে রয়েছেন বাংলাদেশের শক্তিমান অভিনেতা আনোয়ার হোসেন এবং পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাতা নায়িকা সন্ধ্যা রায়। এছাড়া উৎপল দত্ত পালঙ্কের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন। এ-ছবির কাহিনী নবেন্দ্রনাথ মিত্রের। সুরসৃষ্টি—সুধীন গুপ্ত। চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় রাজেন তরফদার।

অন্যান্য খবর

ববিতা সমাচার

নায়িকা ববিতাকে নিয়ে ইদানিং বেশ কানা-ঘুষা শোনা যাচ্ছে।

গুজবে প্রকাশ কিশোরী নায়িকা ববিতা ও কিশোর নায়ক জাফর ইকবাল ইদানিং—ইত্যাদি।

কিন্তু ববিতা সম্প্রতি সব গুজবের হাওয়া কেটে সাফ জবাব দিয়েছেন স্পষ্ট জানিয়েছেন, ১নং আগামী ছবছরের আগে আমি বিয়ে করব না।

২নং 'ফিল্ম লাইনের কাউকে আমি বিয়ে করব না।'

শাহনাজ গানের জগতে ফিরে এলেন

সুদীর্ঘকাল সংগীত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের প্রখ্যাতা কণ্ঠশিল্পী শাহনাজ বেগম সম্প্রতি একটি ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন। আমজাদ হোসেন পরিচালিত 'বাংলার মুখ' ছবিতে খান আতাউরের সুরে তিনি গান গাইলেন। খান আতার 'আবার তোরা মানুষ হ' ছবির জন্যও তিনি কণ্ঠ দেবেন বলে জানা গেছে।

মামা-ভাগ্নে

আকবর কবীর পরিচালিত ছবি 'মামা-ভাগ্নে এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা গেছে।

ছবিটি প্রযোজনা করেছেন—বজল আহমেদ ও আনোয়ারুল মতিন।

ছবির চিত্রগ্রহণে আছেন—রোজা-লতিফ।

'মামা-ভাগ্নে' ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হলেন—জাফর ইকবাল, ববিতা, রেজাউল কলিম, খান জয়নুল, নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন—সুবল দাস।

পরিবেশনা করছেন চিত্রম।

২২শে শ্রাবণ

একটি নতুন ছবি।

নাম '২২শে শ্রাবণ'।

পরিচালকের নাম—এম মান্নান। সংগীতে—সুবল দাস। চিত্রগ্রহণ—হারুন।

স্বপ্ন-সংগীত নির্বেদিত এ ছবিতে অভিনয় করছেন—করবী, জাফর ইকবাল, রোজী, আনোয়ার হোসেন, খান জয়নুল প্রমুখ।

স্রোতের-পাকে

পরিবেশনায় আছেন আশা ফিল্মস।

ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে জানা গেছে।

এম এস রহমান পরিচালিত একটি ছবি। নাম 'স্রোতের পাকে'। সোনার-গাঁও ফিল্মস-এর ছবি স্রোতের-পাকেতে অভিনয় করছেন—জাফর ইকবাল, ববিতা, সুজাতা, কায়েস, সুচন্দা, শওকত আকবর, সুপ্রিয়া ও মেজবাহউদ্দীন, মালতী, রাণু, হাসমত রাণী সরকার প্রমুখ।

ছবিটির সংগীত পরিচালনা করছেন—কাজল রশিদ।

পরিবেশনায় আছেন মিতালী ফিল্মস।

—আনওয়ার আহমদ

প্রশ্নের উত্তর

'টু ডটার্স' (মূল চিত্র 'তিন কন্যা') পেয়েছে ২টি পুরস্কার; '৬২ সালে মেলবোর্ণ ফেস্টিভ্যালে 'গ্র্যান্ড প্রিকস্' (মেলবোর্ণ ট্রফি) পুরস্কার। "৬৩ সালে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ফর বেস্ট সাভিং অফ ইণ্টারন্যাশনাল আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বাবদ সেলুলজিনিক গোল্ডেন লরেল' পুরস্কার।

'মহানগর' পেয়েছে ১টি পুরস্কার; '৬৪ সালে চতুর্দশতম বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার জন্য 'সিলভার বিয়ার' পুরস্কার।

'চারুলতা' পেয়েছে ১টি পুরস্কার; '৬৫ সালে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার 'সিলভার বিয়ার' পুরস্কার।

'নায়ক' পেয়েছে ১টি পুরস্কার; '৬৬ সালে ইন রিকগ্নিশান অফ হিজ হাই আর্টিস্টিক এমিনেন্স ইন দি ওয়ার্ল্ড অফ সিনেমা-র জন্য বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড অফ অনার 'ইণ্টারন্যাশনাল ক্রিটিকস্ প্রাইজ'।

'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' পেয়েছে ১টি পুরস্কার; "৬৯ সালে অ্যাডেলাইড অ্যাণ্ড অকল্যাণ্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে 'দ অ্যাওয়ার্ড ফর দি বেস্ট ডিরেকশান অ্যাণ্ড ওরিজিনালিটি' পুরস্কার।

এর পরের ছবিগুলি সম্পর্কে আজ খোঁজখবর নিচ্ছি, নির্ভুল তালিকা পেলে সেটা যথাসময়েই প্রকাশ করার ইচ্ছা রইলো।

প্রণবকুমার সেন, কলিকাতা-২৬

১। সত্যজিৎ রায় এপর্যন্ত ফিল্ম এস্থেটিকস্ এবং ফিল্ম টেকনিক সম্বন্ধে যে সমস্ত আর্টিকেল লিখেছেন অথবা আলোচনা করেছেন, তার কোন সংকলিত সংস্করণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে কিনা?

—যতদূর জানি, ওঁর এই ধরনের কোন পুস্তক এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

২। এক্সপ্যানডেড সিনেমা সম্বন্ধে ভারতীয় কোন ফিল্ম মেকার চিন্তা করছেন—এমন কোন খবর আপনার জানা আছে কিনা?

—না।

৩। ১৯৭৫ সালের প্রথমেই কলকাতায় টি ভি হতে চলেছে—টি ভি প্রোডাকশনের ব্যাপারে যে সমস্ত ফ্রী-ল্যান্স টেকনিশিয়ান, ক্যামেরাম্যান এবং ডিরেক্টরবা আগ্রহান্বিত, তাঁদের কতখানি সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে?

—অনেকখানি।

জয়ন্ত মুখার্জি, কলকাতা-১৩

সম্প্রতি একটি বাংলা ছবি দেখলাম। দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম। আচ্ছা, আমার প্রশ্ন, এ-ধরনের ছবি তৈরী বন্ধ করা যায় না?

—কোন্ ছবি? কিন্তু যে-ছবিই হোক, তা কেমন করে সম্ভব! কেউ যদি নিজের টাকায় মন্দ বায়োস্কোপ করেন, আপনি-বাধা দেবার কে?

বলাই কুণ্ডু, গ্রহিষাদল

প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবিগুলো এখন কোথায়?

—অধিকাংশই ভারত সরকারের ন্যাশনাল আর্কাইভসে, কিছু আছে পুণার **ফিল্ম ও টি ভি ইন্সটিটিউটে।**

খেলাধূলা

দর্শক

আমেরিকান টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৭৩ সালের আমেরিকান জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার জয়-জয়কার। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা পুরুষ ও মেয়েদের সিঙ্গলস এবং পুরুষ ও মেয়েদের ডাবলস খেতাব পেয়েছেন। তবে মেয়েদের ডাবলস খেতাব অস্ট্রেলিয়া একা পায় নি, বৃটেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে পেয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১০নং বাছাই খেলোয়াড় জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) এ বছরের উইম্বলেডন সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং ৫নং বাছাই জান কোডেসকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) হারিয়ে দ্বিতীয়বার আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। এই খেতাব তিনি প্রথম পান ১৯৬৭ সালে। তিনি এ বছরের সিঙ্গলস খেতাব জয়ের পুরস্কার পেয়েছেন নগদ ২৫ হাজার ডলার, সাড়ে তিন হাজার ডলারের মোটর গাড়ী এবং এক সুবৃহৎ রৌপ্য কাপ।

মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে ২নং বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) জয়লাভের সূত্রে পাঁচবার আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হলেন।

এ বছরের প্রতিযোগিতায় অনেক অঘটন ঘটে গেছে। যেমন ২য় রাউণ্ডে বোডোশিয়ার অবাছাই খেলোয়াড়ের কাছে গত বছরের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ১নং ক্রম বাছাই খেলোয়াড় ইলি নাস্তাসের (রুমানিয়া) পরাজয়। সেমি-ফাইনালে ১নং ক্রম বাছাই খেলোয়াড় স্ট্যান স্মিথ (আমেরিকা) ৫নং বাছাই চেকোশ্লোভাকিয়ার জন কোডেসের কাছে হেরে যান। খেলার তৃতীয় রাউণ্ডে ১৯ বছরের ভারতীয় খেলোয়াড় বিজয় অমৃতরাজ ৪নং বাছাই বিশ্ববিশ্রুত রড লেভারকে হারিয়ে দেন। এখানে উল্লেখ্য, দু মাসের মধ্যে বিজয় অমৃতরাজের কাছে লেভার দুবার হেরে গেলেন। সুইডেনের ১৭ বছরের স্কুল ছাত্র বর্গ ১৯৬৮ সালের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান এবং এ বছরের ৩নং বাছাই আর্থার অ্যাসকে (আমেরিকা) হারিয়ে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

মেয়েদের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন ২নং বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া)। এই নিয়ে তিনি মোট ৫ বার আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেলেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের টেনিস মরশুমে তিনি এই তিনটি বড় প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন—অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান।

শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট

উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাবটি হাতছাড়া না করলে তিনি একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান—এই চারটি সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে দ্বিতীয়বার দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব পেতেন। তিনি 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব প্রথম পেয়েছিলেন ১৯৭০ সালে। মেয়েদের মধ্যে এই দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব পেয়েছেন মাত্র দুজন। প্রথম পান কুমারী মরীণ ক্যাথেরীন কনোলী (আমেরিকা) ১৯৫৩ সালে, তাঁর মাত্র ১৭ বছর বয়সে।

ভারতের মুখরক্ষা

অমৃতরাজ ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের কিছুটা মুখরক্ষা করেছিলেন। পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে বিজয় অমৃতরাজ হেরে যান অস্ট্রেলিয়ার প্রবীণ পেশাদার খেলোয়াড় কেন রোজওয়ালের কাছে। পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে টম ওক্কার (নেদারল্যাণ্ডস) এবং মার্টি রিসেন (আমেরিকা) জুটির কাছে বিজয় এবং আনন্দ অমৃতরাজ জুটি শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করেন।

ফাইনাল খেলা

পুরুষদের সিঙ্গলস : ১০নং বাছাই জন নিউকম্ব (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ১-৬, ৪-৬, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে ৫নং বাছাই জান কোডেসকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করে দ্বিতীয়বার এই প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন।

মেয়েদের সিঙ্গলস : ২নং বাছাই শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৬, ৫-৭ ও ৬-২ গেমে ৪নং বাছাই স্বদেশের কুমারী ইভোন গুলাগংকে পরাজিত করে মোট ৫ বার এই সিঙ্গলস খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জন নিউকম্ব এবং ওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৩, ২-৬, ৭-৫ ও ৭-৫ গেমে ১নং বাছাই জুটি স্বদেশের রড লেভার এবং কেন রোজওয়ালকে পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস : ২নং বাছাই জুটি শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং ভার্জিনিয়া ওয়েড (বৃটেন) ৩-৬ ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে ১নং বাছাই জুটি শ্রীমতী বিলি জিন কিং এবং রোজমেরী ক্যাসলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মিকসড ডাবলস : শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা) এবং ওয়েন ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৩-৬ ও ৭-৬ গেমে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টি রিসেনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

এই এক এ লীগ খেলা-কমিটির সিদ্ধান্তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৭৩ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সূত্রে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৭০-৭৩) এবং মোট ১২ বার প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়নের লীগ খেতাব জয়ের মধ্যে আছে তাদের অপরাজিত অবস্থায় উপর্যুপরি তিনবারের (১৯৭০-৭২) লীগ চ্যাম্পিয়নের রেকর্ড। ইস্টবেঙ্গলের আরও তিনটি লীগ চ্যাম্পিয়নের এল আই (১৯৪১-৪৩), মহমেডান স্পোর্টিং (১৯৩৪-৩৮) এবং মোহনবাগান (১৯৫৪-৫৬ ও ১৯৬২-৬৫) উপর্যুপরি তিন অথবা তার বেশীবার (ছয়ের নয়) লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মত অপরাজিত অবস্থায় উপর্যুপরি তিনবার নয়। তাছাড়া প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে কোন ক্লাব এক-এক বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড করেছে আর এই দুটি দল—ইস্টবেঙ্গল (১৯৭৩ সালে) এবং রেঞ্জার্স আইরিশ রাইফেলস (১৯০১ সালে)। তবে রেঞ্জার্স আইরিশ রাইফেলস দলের রেকর্ড আরও অসাধারণ। তারা ১৯০১ সালে লীগের খেলায় কোন গোল তো খায়নি, উপরন্তু সমস্ত খেলায়

18 SEP 1973

জিতেছিল। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সর্বাধিকবার লীগ খেতাব জয়ের রেকর্ড মোহনবাগানের মোট ১৪ বার এবং উপর্যুপরি সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড মহমেডান স্পোর্টিংয়ের —পাঁচবার (১৯৩৪-৩৮)। শেষের রেকর্ডটি ভাঙ্গার সুবর্ণ সুযোগ আজ ইস্টবেঙ্গলের হাতে এসে গেছে।

১৯৭৩ সালের প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় মোহনবাগান ১ম স্থান (৩৪ পয়েন্ট), ইস্টবেঙ্গল ২য় (৩৪ পয়েন্ট), বি এন রেলওয়ে ৩য় স্থান (২৭ পয়েন্ট) এবং টালীগঞ্জ অগ্রগামী ৪র্থ স্থান (২৬ পয়েন্ট) পাওয়ার সূত্রে সুপার লীগ খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সমান ৩৪ পয়েন্ট উঠেছিল। গোল এভারেজের ভিত্তিতে মোহনবাগান পেয়েছিল প্রথম স্থান।

সুপার লীগে চারটি দলের প্রত্যেকের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু প্রত্যেকের তিনটে করে ম্যাচ খেলার পর টালীগঞ্জ অগ্রগামী প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয়। অপর দিকে বি এন রেলওয়ে তাদের কয়েকজন খেলোয়াড় আহত থাকার ফলে তাদের লীগের খেলা এক সপ্তাহ স্থগিত রাখার যে আবেদন করেছিল তা আই এফ এ মঞ্জুর না করায় তারা নির্দিষ্ট দিনের সুপার লীগের ফরতি খেলায় যোগদান করে নি। সমস্ত মিলিয়ে সুপার লীগ খেলা শেষ পর্যন্ত একটা প্রহসনে দাঁড়িয়েছিল।

সুপার লীগের প্রথম পর্যায়ের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে টালীগঞ্জ অগ্রগামী, ৪—০ গোলে বি এন রেলওয়ে এবং ১—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহের সূত্রে লীগ তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। প্রথম পর্যায়ের সুপার লীগ খেলায় মোহনবাগান ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। অপর দিকে টালীগঞ্জ অগ্রগামী ২ পয়েন্ট (মোহনবাগান ও বি এন রেলওয়ের সঙ্গে খেলা ড্র) এবং বি এন রেলওয়ে ১ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছিল। টালীগঞ্জ অগ্রগামী এবং বি এন রেলওয়ের অনুপস্থিতির ফলে ফিরতি লীগের খেলা হয় নি। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আই এফ এর লীগ সাব-কমিটির সভায় ইস্টবেঙ্গল দলকে ১৯৭৩ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং মোহনবাগানকে রানার্স-আপ ঘোষণা করা হয়।

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৩ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলা গত ২১শে আগস্ট শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের নক আউট খেলা শেষ হওয়ার পর বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা চলছে। এই লীগ খেলা শেষ হওয়ার পর আবার নক আউট খেলা হবে।

এ বছরের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলা এই তিনটি স্তরে ভাগ করে খেলানো হচ্ছে : প্রথম পর্যায়ের নক-আউট খেলা, দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা এবং তৃতীয় পর্যায়ের নক-আউট খেলা (সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনাল)। প্রথম পর্যায়ের চারটি গ্রুপের নক-আউট খেলা হয়েছিল তিনটি বিভিন্ন স্থানে—কলকাতায় 'এ' এবং 'সি' গ্রুপের খেলা, কৃষ্ণনগরে 'বি' গ্রুপের খেলা এবং বার্ণপুরে 'ডি' গ্রুপের খেলা। 'এ' গ্রুপের ফাইনালে ইস্টার্ণ রেলওয়ে, 'বি' গ্রুপের ফাইনালে রাজস্থান, 'সি' গ্রুপের ফাইনালে পোর্ট কমিশনার্স এবং 'ডি' গ্রুপের ফাইনালে বার্ণপুর ইউনাইটেড জয়ী হয়ে ইন্টার গ্রুপে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। ইন্টার-গ্রুপের নক-আউট খেলায় ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১—০ গোলে রাজস্থানকে এবং অপর দিকে পোর্ট কমিশনার্স ২—০ গোলে বার্ণপুর ইউনাইটেড দলকে হারিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের লীগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। তৃতীয় পর্যায়ের লীগে এই ৮টি দল সমান ভাগ হয়ে দুই গ্রুপে খেলছে : 'এ' গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ণ রেলওয়ে, তাজ ক্লাব (ইরাণ) এবং ট্রেঙ্গানু (মালয়েশিয়া)। অপর দিকে 'বি' গ্রুপে মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, পোর্ট কমিশনার্স এবং উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং। লীগের এই দুই গ্রুপ থেকে লীগ-চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ — মোট চারটি দল নিয়ে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল এবং পরে ফাইনাল খেলা হবে।

প্রথম পর্যায়ের নক আউট

গ্রুপ 'এ' (কলকাতা)

ফাইনাল : ই আই আর ১ : বি এন আর ০

গ্রুপ 'বি' (কৃষ্ণনগর)

ফাইনাল : রাজস্থান ৫ : ভারতী সঙ্ঘ ২

গ্রুপ 'সি' (কলকাতা)

ফাইনাল : পোর্টকমিশনার্স ২
খিদিরপুর ০

গ্রুপ 'ডি' (বার্ণপুর)

ফাইনাল : বার্ণপুর ইউনাইটেড ২
এবিয়ান ১

ইন্টার-গ্রুপ খেলা

ই আই আর ১ : রাজস্থান ০
পোর্ট কমিশনার্স ২ : বার্ণপুর ইউ: ০

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলা

গ্রুপ 'এ' : ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ণ রেলওয়ে, তাজ ক্লাব (ইরাণ) এবং ট্রেঙ্গানু (মালয়েশিয়া)।

গ্রুপ 'বি' : মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং, পোর্ট কমিশনার্স এবং পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব (উত্তর কোরিয়া)।

বড়দলে ট্রফি

১৯৭৩ সালের বড়দলে ফুটবল ট্রফির ফাইনালে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১—১ ও ৩—০ গোলে জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে হারিয়ে উপর্যুপরি দুবার ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

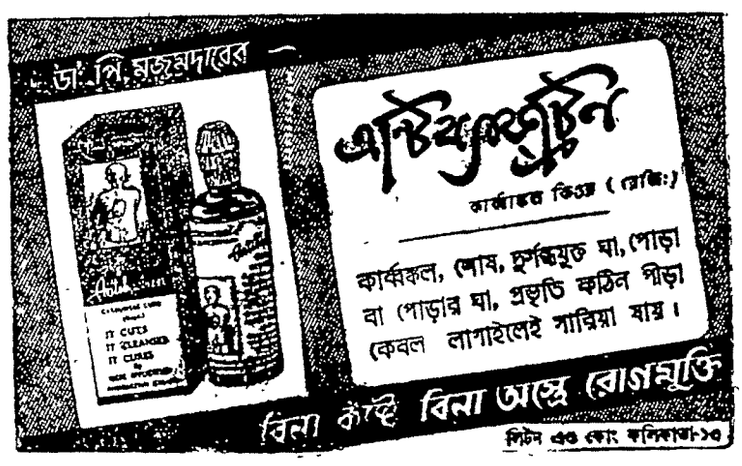

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কী সুন্দর মধুর হাসি

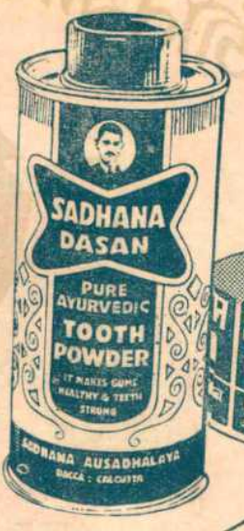

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন | **সাধনা টুথ পেষ্ট**

SD.6/70

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3

18.9.73

AMRITA

Friday 14th September, 1
Phone: 55-5231 (14 Lines)

18 SEP 1973

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেল
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নে

আমাদের অন্য কোন ব্রাণ্ড নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

বর্ষ ২০ সংখ্যা] শুক্রবার ৪ আশ্বিন ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

অধরা রূপ ধরা দিল, আধফোটা রূপ ফুটলো,
ফিরে এল হারানো রূপ।

ফেমিলা স্নো

চোখ ধাঁধানো মন মাতানো রূপের জলুস
দেখাতে হলে অবশ্য চাই ফেমিলা-স্নো

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এস. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮১

একটি মাত্র সেটে অভিনয়োপযোগী মঞ্চ-সফল পূর্ণাঙ্গ নাটক

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪·০০

সত্তর দশকের মৃত স্বপ্ন, আহত আশা, অনিশ্চিত ভালবাসায় দুঃসাহসিক নাটক

রাধানাথ ঘোষের

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৪·০০

রতনকুমার ঘোষের

ভোরের মিছিল (১ নারী) ৪·০০

সকালের জন্য (৩য় সং ॥ ১ নারী) ৪·০০ * ফেরা (২য় সং ॥ ১ নারী) ৩·৫০
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩·০০ * ভূমিকম্পের পরে (১ নারী) ৩·০০
অসভ্য পুরুষ (২য় সং ॥ ৩ নারী ৩· * সিঁড়ি (১ নারী) ৩·০০
প্রদ্যুম্ন মাহাত্ম্য (কাহিনী ॥ কনফুল : ৩ নারী) ৩·০০

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের

ক্যাপ্টেন হুর্‌রা (১ নারী) ৩·৫০

গঙ্গাপদ বসুর
নবমাতা (১ নারী) ৩·৫০
একটি স্বপ্নের জন্যে (২ নারী) ৩·৫০
পার্থপ্রতিম চৌধুরীর
ললাটের রং মুহূর্মুহু (২ নারী) ৩·০০
খাঁচা (২ নারী) ৩·০০
সম্রাট কণিষ্ক (১ নারী) ২·৫০
রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের
এই মন সেই মন (২ নারী) ৩·৫০
পাঞ্চজন্য (২ নারী) ৩·০০
অগ্নিদূতের
অন্ধকারের নীচে সূর্য (২ নারী) ৩·০০
দিলীপ মজুমদারের
গোলাপ কাঁটার মৃত্যু (১ নারী) ৩·০০
সুশীলা সেনের
ভলপোন (২ নারী) ৩·৫০
বিজন ভট্টাচার্যের
দেবী গর্জন (৫ নারী) ৩·০০
শান্তিপদ রাজগুরুর
কুমারী মন (৩ নারী) ৩·০০
প্রবোধবন্ধু অধিকারীর
জনক জননী (৩ নারী) ৩·৫০

মনোজ মিত্রের
নেকড়ে (২ নারী) ৪·০০
বাবা বদল (৪ নারী) ৩·০০
অগ্নিমিত্রের
নিজস্ব সংবাদদাতা (৩ নারী) ৪·০০
জটায়ু (৪ নারী) ৩·৫০
নিকটে ফাঁদ (২ নারী) ৩·০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের
দাদা জানেন (১ নারী) ৩·০০
অগ্নিকোণ (২ নারী) ৩·০০
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ইন্তাহার (১ নারী) ৪·০০
চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩·৫০
নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩·০০
তমাল দাসের
স্বপ্ন সম্ভবা (২ নারী) ৩·০০
গৌর শীল
ত্রিশূল (৩ নারী) ৩·০০
তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের
ক্রৌঞ্চ-নিষাদ কথা (২ নারী) ২·৫০
অভিজিৎ সেনগুপ্তের
করুণার ঘর-সংসার (১ নারী) ৩·৫০

পুরস্কৃত একাঙ্ক নাটকসমূহ

বাবলু দাশগুপ্তের
সুর যেখানে ছন্দ খোঁজে ৪·০০
ধ্রুব তারার আলোয় ৪·০০
কেন এই অবক্ষয় ৩·৫০
যখন বৃষ্টি নামল ৩·৫০
রতনকুমার ঘোষের
রাজার বাড়ি কতদূর ৩·৫০
পারঘাটায় দাঁড়িয়ে ”
যবনিকা পতনের আগে ৩·৫০
বিষুবরেখা ”
পিতামহদের উদ্দেশ্যে ২য় সং ৩·০০
শেষ বিচার ৩·০০
সোনালী স্বপ্ন/শেষ প্রহরী ৩·০০
মহাকাব্য/তৃতীয় কণ্ঠ ৩·০০
সমুদ্রসন্ধানে ২য় সং ৩·৫০
পাপপুণ্য ” ”
রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের
আমায় বাঁচতে দাও ৩·০০
সংবাদ বিভ্রাট ”
সওদাগরের দেশে ৩·৫০
শ্মশানে রক্তের স্বাদ ”
মনোজ মিত্রের
কোথায় যাবো/টাপুর টুপুর ৩·৫০
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাতটি একাঙ্ক
উজান ৪·০০
সলিল মজুমদারের তিনটি একাঙ্ক
ত্রিধারা ৩·০০
তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের
শ্মশানগান/জলওয়াজ ২·৫০
অগস্ত্যকের
চমকত ভাণ্ডার/পুনরাবৃত্তি ৩·০০
উমানাথ ভট্টাচার্যের
রঙ্গ/ধামভাসি/ডাক ৩·০০
চিত্তরঞ্জন দুরের
আজন্তকের নাটক/বিচার ৩·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী : ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

HMV

পুজোর রেকর্ড

উৎসবের

অপরিহার্য অঙ্গ

৪৫ আর-পি-এম
স্ট্যাণ্ডার্ড প্লে রেকর্ড

অনুপ ঘোষাল
অমিতকুমার
আশা ভোঁসলে
আরতি মুখোপাধ্যায়
ইলা বসু
উষা মঙ্গেশকর
কিশোরকুমার
চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
তালাত মামুদ
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
নির্মল মুখোপাধ্যায়
নির্মলেন্দু চৌধুরী
নির্মলা মিশ্র
পিন্টু ভট্টাচার্য
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বনশ্রী সেনগুপ্ত
বিশ্বজিত
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
মাধুরী চট্টোপাধ্যায়
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মান্না দে
মিন্টু দাশগুপ্ত
রাণু মুখোপাধ্যায়
রাহুল দেব বর্মণ
ললিতা ধরচৌধুরী
শচীন দেব বর্মণ
শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শ্রাবন্তী মজুমদার
শ্যামল মিত্র
সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়
সবিতাব্রত দত্ত
সবিতা চৌধুরী
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
হেমা মালিনী

৪৫ আর-পি-এম
এক্সটেণ্ডেড-প্লে রেকর্ড

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
ও মাধুরী মুখোপাধ্যায় (ভক্তিমূলক)
কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
(অতুলপ্রসাদের গান)
আগমনী গান (ভক্তিমূলক)
রঞ্জিত মল্লিক এবং
সহশিল্পীবৃন্দ (ছড়া গান)।

'সুপার সেভেন'
৩৩⅓ আর-পি-এম রেকর্ড

কাজী সব্যসাচী
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎপল দত্ত এবং শম্ভু মিত্র (আবৃত্তি)

এল পি রেকর্ড

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
(পদাবলী কীর্তন)
ফিরোজা বেগম (নজরুল-গীতি)
কাজী অনিরুদ্ধ ও
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (গীটার)
আলিবাবা (দু'খণ্ড)

গানগুলির পূর্ণ তালিকার জন্য
আজই এইচ-এম-ভি ডীলারের দোকানে আসুন।

75 years of the world's greatest recorded music

দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ই এম আই প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও ভনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী।

এবার পূজার অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা 'জনপ্রিয় পূজার গান নির্বাচন'
প্রথম পুরস্কার — এইচএমভি 'সুপার স্টিরিও'
দ্বিতীয় পুরস্কার — এইচএমভি 'সফারি রেডিওগ্রাম'
তৃতীয় পুরস্কার — এইচএমভি 'সোপ্রানো ট্রানজিস্টর রেডিও'
নিয়মাবলীর জন্য আপনার এইচএমভি ডীলারের দোকানে খবর নিন।

প্রতি শনিবার রাত ৯।।০ টায় কলকাতা 'বিবিধ ভারতী'থেকে প্রচারিত হচ্ছে এইচএম ভি'র পূজোর 'নতুন গানের আসর'। শুনতে ভুলবেন না। এছাড়া, এবারের 'রেকর্ড সঙ্গীতের' শারদীয়া সংখ্যাও পাড়ে দেখুন।

CC 7705A

১৩শ বর্ষ

অমৃত

২০ সংখ্যা

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 21st September, 1973 শুক্রবার, ৪ আশ্বিন ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	ঘটনার আয়নায়		—শ্রীসমদর্শী
১২	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১৩	হিসেব-নিকেশ	(গল্প)	—শ্রীবীরেন্দ্র দত্ত
১৯	নতুন বই		
২২	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
২৩	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
২৭	উপনিষদে আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তা		—শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
৩৩	সন্তরের সূর্য	(গল্প)	—শ্রীচণ্ডী মণ্ডল
৩৭	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৩৯	রয়্যাল বেঙ্গল বনাম রাজকুমারী		—শ্রীবিশ্বনাথ বসু
৪৪	সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস		—শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
৪৮	নীলদর্পণের অনুবাদক		—শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
৫১	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ৫ দিন

শরৎচন্দ্রের জন্মদিন

উপলক্ষে তাঁর সমগ্র রচনাবলী

শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

রাখার অভিনব ও অভাবনীয় আয়োজন

১৩ খণ্ডে সমাপ্ত ॥ প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৪·০০ টাকা শতকরা ১৫% কমিশন বাদে ১১·৯০-তে পাওয়া যাবে। পুরো সেট ১৮২·০০ টাকার স্থলে ১৫৪·৭০ পয়সা।

২৪শে সেপ্টেম্বর, '৭৩ পর্যন্ত এই সুবিধা থাকিবে।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭০০০১২ * ফোন : ৩৪-১৭৮২

বিদ্যোদয়ের বই

সর্বজনপাঠ্য সর্বকালের উপন্যাস

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনীতে নীল বিদ্রোহের রক্ত সংগ্রাম-কাহিনী

নীল ঘূর্ণি ৭·০০

[ছেলেটি ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকলো। পেছন থেকে নীলকরের কুত্তা লেলিয়ে তিনু বিশ্বাসের নিক্ষেপিত সড়কির আঘাতে তার বাঁ কাধের বাহুর কাছটা জখম হয়েছে। রক্ত দেখে তখন তার মাথায় খুন চেপে গেছল। একটানে মাটি থেকে সড়কিটা উপড়ে নিয়ে সে হুঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছিল—"আয় শালারা, কালীনাথ সর্দারের ছেলে কি চিজ্, তোদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" কিন্তু তার পর ?]

মনোরঞ্জন ঘোষের

পরিবর্তন ৩·৫০

সুখলতা রাওয়ের

আলি ভুলির দেশে ৩·০০

সমরজিৎ কবের

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি ৩·২৫

শ্রীকথকঠাকুরের

অথ ভারত কথকতা ৩·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

শুক্রে যারা গিয়েছিল ৩·০০

ড্র্যাগনের নিঃশ্বাস ২·২৫

ময়ূরপঙখী ৬·০০

মকরমুখী ৬·০০

সাগরদাঁড়ী ৭·০০

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিজ্ঞানের দুঃস্বপ্ন ২·৫০

সুশীল জানার

গল্পময় ভারত ১ম ৩·০০

গল্পময় ভারত ২য় ৩·০০

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

নাবিক রাজপুত্র ও সাগর রাজকন্যা ২·০০

সুধীর করণের

অরণ্যপুরুষ ৪·০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

কালের জয়ডঙ্কা বাজে ৪·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯

ফোন : ৩৪-৩১৫৭

ফ্যাশান মডেল মিন্না জোহরের সঙ্গে মুখোমুখি

"ফেস পাউডার?
আমার তো না হলেই নয়!
তবে পণ্ডস হওয়া চাই"

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে
পণ্ডস [illegible]

মিন্না জোহরকে ভালো ক'রে দেখুন। পণ্ডস ফেস পাউডার ওঁর সুন্দর মুখে ঝলমলে আভা এনে দেয় আর ওঁকে মনোহারিণী ক'রে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে।
আপনিও পণ্ডস ফেস পাউডার মেখে দেখুন কি সুন্দর লাগে।
পণ্ডস ফেস পাউডার এদেশের রূপসীদের মুখের রঙের সঙ্গে মানানসই ছ'রকম জনপ্রিয় রঙে পাওয়া যায়।

চেসব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(যৌথ কারবারসহ ইউ.এস.এ.-তে সংগঠিত)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৫৬	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৬০	হারানো প্রাপ্তি	(গল্প)	—শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়
৬৫	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৬৬	আর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা		—শ্রীঅনুভূতি বসু
৬৭	বিবাহ বিচিত্রা		—শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়
৬৯	পুজোর বাজার, না পুজোয় বাজার		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৭১	গরমিল	(কবিতা)	—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী
৭১	ব্যস্তিগড চতুর্দশ পঙক্তি	(কবিতা)	—শ্রীমনোজ নন্দী
৭১	ঘুমের গভীর শব্দে	(কবিতা)	—শ্রীগণেশ সেন
৭৩	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রকাশিত হয়েছে
সমালোচকদের
উচ্চ প্রশংসিত
রহস্য সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি
শারদীয়

সাম্প্রতিক কালে শেষ সংকেতে'র পূজা সংখ্যাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে
৭০০'রও বেশী পৃষ্ঠা
দাম ঃ ৬·০০
'শেষ সংকেত' ১২৪।১এ মাণিকতলা স্ট্রীট কলি-৬

সদ্য প্রকাশিত হ'ল নতুন উপন্যাস

নটরাজন-এর
মেয়ে পুলিশের ডায়েরী ৭·

রূপশংকর-এর
জেনে শুনে বিষ করেছি পান ৭·

অমিল রায়-এর
ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ৭·

নগ্ন প্রহর ৭·

নিশাচর-এর
জীবন রহস্য ৫·

কুহেলিকা ৫·

হরপ্রসাদ মিত্র-এর (কবিতার বই)
ঝাউবনের শব্দ ৪·

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর (কবিতার বই)
মুখোশের রঙ ৩·

সমরেশ মৈত্র (কবিতার বই)
বিচ্ছিন্নতা, টুকরো ঘটনা ও মন ৩·

এবার পুজোয় ছোটদের কয়েকখানি বই

অভিজিৎ বিশ্বাস-এর
মর্জিনা আবদ্দাল্লা ৩·

অভিজিৎ বিশ্বাস-এর
এক যে ছিল বাঘ ৩·

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর
রঙমশাল ৩·

নিখিল সেন-এর
ব্ল্যাক বয় ৩·

অমরনাথ রায়-এর
মজার বই ৩·

অবনী সাহা-র
রেজগীবাবুর রাজগীর ভ্রমণ ৩·

সদু খুড়ী পুরী গেলেন ৩·

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর
সামনে আড়ালে ৭·

দীপক চৌধুরী-এর
স্বাদ ৬·

জ্যোতি প্রকাশন ২এ নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলিকাতা-৯

চিঠিপত্র

বাঙলা কবিতায় স্বদেশপ্রেম

গত ৭ই ভাদ্র-এর 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত রাধা বসুর 'বাঙলা কবিতায় স্বদেশ প্রেম' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে।

প্রবন্ধকার তাঁর এই প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনার গুরু-রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, একথা কি ঠিক? আমার মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ঠিক আগে আরেকজন নামকরা স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যিক তথা গীতিকারের নামোল্লেখ করতে ভুলে গেছেন, যাঁর কাছে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনার জন্য বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর নাম হোল রামনিধি গুপ্ত, যিনি নিধুবাবু নামেই বিশেষ পরিচিত। তাঁর রচিত নিম্নোক্ত গানের মধ্যেই আমরা স্বাদেশিক অনুভূতির প্রথম অভিব্যক্তি দেখতে পাই—

'নানান দেশের নানা ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা।।'

এঁর আগে মাতৃভাষা সম্বন্ধে বিশিষ্ট অনুরাগের কোনো প্রমাণ আমরা দেখতে পাই না মধ্যযুগের সাহিত্যে। বাঙলা ভাষা নিয়ে বাঙ্গালীর কোনো চিন্তাই ছিল না আগে। মধ্যযুগে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ভাষা ছিল সংস্কৃত, আর সরকারী ভাষা ছিল ফার্সী। বাঙলা ভাষা লোকভাষা হিসাবেই বর্ণনীয় ছিল। বাংলা ভাষায় যে মঙ্গলকাব্য বা পদাবলী রচিত হয়, তার মূলে প্রধানত ধর্মীয় প্রেরণা। নিধুবাবুই (১৭৪১-১৮৩৯) তাঁর এই গান বা কবিতার মারফৎ আনলেন স্বাদেশিকতার গভীর অনুপ্রেরণা। এঁর এই দেশপ্রীতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর পরবর্তী দুজন প্রাতঃস্মরণীয় কবিকে—একজন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অপরজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বলা বাহুল্য, নিধুবাবুর এই গানই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুরকে পূজা করবার অনুপ্রেরণা যোগায়।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখক যে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড কবির সর্বপ্রথম সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন, তার অনেক আগেই কবিকে আমরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখি সর্বজননিন্দিত 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'। কার্জনী চক্রান্তের পরিণতি হিসাবে আসাম ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে গড়ে ওঠে একটি রাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গড়ে ওঠে অপর একটি পৃথক রাষ্ট্র। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, মহামান্য তিলক, গোখলে প্রভৃতি বরেণ্য দেশনেতাদের কণ্ঠস্বরকে অতিক্রম করে কবির কণ্ঠে সেই সময় ধ্বনিত হোল—'এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।' হিন্দু, মুসলমান, সকল বাঙালী একজোটে সেদিন মিলিত হয়েছিল আহিরীটোলার গঙ্গার ঘাটে, আর কবি বিনা দ্বিধায় সকলের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন ভ্রাতৃত্বের রাখীচিহ্ন। সেখান থেকে রওনা হয়ে সবাই মিলিত হয়েছিল 'বিডন স্কোয়ারে' একটি সভায়। তারপর শোভাযাত্রা করে তাঁরা আসেন বাগবাজার বোসেদের বাড়ী। শোভযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কণ্ঠের গান—"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—তুমি কি এমনি শক্তিমান!"—মিছিলের সকল মানুষের কণ্ঠধ্বনিতে কলকাতার আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর বিদেশী বোর বর্জনের যে উত্তাল তরঙ্গ বাঙলা দেশের বুকের উপর তোলপাড় করেছিল, কবি তাতে সুর ধরিয়ে ছিলেন—'এবার তোর মা গাঙে বান এসেছে 'জয় মা' বলে ভাসা তরী।' এর পরের ঘটনা হোল জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা যার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি কবি অত্যন্ত ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন এবং এদেশের সকল নির্যাতিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান অম্লান বদনে।

বারিদবরণ ঘোষ।
হুগলী।

এই আমাদের দেশ : মেদিনীপুর- সম্পর্কে

গত ভাদ্রের অমৃতে এই আমাদের দেশ পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে একটি অসম্পূর্ণ তথ্য আমার চোখে পড়ল। এই জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বর্তমানে ছটি থানা, লেখক উল্লেখিত চারটি নয়। যে দুটি নাম বাদ পড়েছে তা হোল—নয়াগ্রাম ও সাকরাইল।

শশাঙ্কশেখর মাইতি,
নয়াগ্রাম।

(২)

আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৬৭ সংখ্যায় শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা "এই আমাদের দেশ" পর্যায়ে লেখাটি পড়লাম এবং ভালই লাগল। তবে তিনি কয়েকটি বিখ্যাত বাড়ীর কথা উল্লেখ করেন নি। (১) মারাঠা কেল্লা বা পুরাতন জেল যা ঐতিহাসিক আমলে বিখ্যাত। প্রাসাদটি বিরাট ও সম্পূর্ণ ছাটাই পাথরে তৈরী। শহরের উত্তরে এবং বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরের পার্শ্বে।

২। জন্মেঞ্জয় মল্লিক মহাশয়ের দ্বাদশ শিবালয়সহ রাসমঞ্চ এবং প্রাসাদ, মল্লিক মহাশয়দের দুর্গাপূজা, রাস উৎসব এবং রথ জেলার সবচেয়ে বেশী প্রাচীন।

৩। স্বদেশী আমলে বিপ্লবীদের গুপ্ত আস্তানা হিন্দুস্কুল। ঐ স্কুলটি অরোবা টাকিজের সম্মুখে কেল্লাপুকুরের পাড়ে ছিল এবং বর্তমানে পোড়ো বাড়ী হয়ে আছে।

৪। শহরে গোলকুয়ার চকের নিকট ঋষি রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির অবস্থিত। মেদিনীপুর শহরের ইতিহাস লিখিত হলে—পূর্বে-লিখিত স্থানসমূহের নাম সর্বাগ্রে থাকা উচিত। শুধু তাই নয় গোপ-এ রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের বিরাট রাজপ্রাসাদ যা বর্তমানে মহিলা মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁন প্রতিষ্ঠিত জলাধার যা মেদিনীপুর ষ্টেশন যাতায়াতের পথে অবস্থিত তার উল্লেখ নেই।

হবিরপুর পল্লীতে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থানের কথাও উল্লেখ করেন নি। মেদিনীপুর শহর একটি প্রাচীন শহর এবং বহু দেশপ্রেমিকের আবির্ভাব এই শহর তথা জেলায়।

অসিতকুমার দত্ত
বল্লভপুর, মেদিনীপুর।

(৩)

শুক্রবার ৭ই ভাদ্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দের অমৃতে 'এই আমাদের দেশ পর্যায়ে মেদিনীপুর জেলা (১) সম্বন্ধে যোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি অতি সুন্দর তথ্যবহুল প্রবন্ধ লিখেছেন। একজন মেদিনীপুরের সন্তানরূপে তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অনিচ্ছাকৃত অনবধানতার কারণে দু'একটি ভুল হয়েছে। প্রবন্ধের সঙ্গে জেলার যে মানচিত্রটি দেওয়া হয়েছে তাতে কংসাবতী বা কাঁসাই নদীটিকে মেদিনীপুর শহরের উত্তরে প্রবাহিতা দেখানো হয়েছে। কাঁসাই নদী শহরের দক্ষিণ দিয়ে বয়ে গেছে। যোগনাথবাবু অবশ্য ম্যাপ দেখে লিখেছেন "মেদিনীপুর শহর এই নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত।

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "শহরের অপর ঐতিহ্যময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেদিনীপুর টাউন স্কুল। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগের এক নীরব সাক্ষী। প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, অনাথ পাঁজা, নরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ অমর শহীদগণ ছিলেন এই স্কুলের ছাত্র।"

এখানে একটু ভুল হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ দাস আমার স্নেহাস্পদ অনুজ তুল্য! সে বহু বছর বিনা বিচারে রাজবন্দীরূপে আটক ছিল। সুস্থদেহে সে এখনও আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। আমি তার নাম মৃত শহীদদের তালিকায় দেখে বিস্মিত হয়েছি। আমি নরেন্দ্রনাথ দাসের দীর্ঘজীবন কামনা করি। মেদিনীপুরশহরের অধুনালুপ্ত অন্য একটি স্কুলের নাম এই প্রসঙ্গে যোগনাথবাবু উল্লেখ করেন নি। এই হিন্দু স্কুলও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শিক্ষায়তন ছিল। হিন্দুস্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে ছিলেন শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ, বিমল দাশগুপ্ত, জ্যোতিজীবন ঘোষ, ক্ষুদীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি।

বিনয়জীবন ঘোষ
কলকাতা

সম্পাদকীয়

জোট নিরপেক্ষ পৃথিবী

বৃহৎ শক্তির প্রভুত্বের দিন শেষ হয়েছে। আলজিয়ার্সে সাম্প্রতিক জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। জওহরলাল নেহরু, যুগোশ্লাভিয়ার টিটো এবং মিশরের গামাল নাসের, এই তিনজন ছিলেন জোটনিরপেক্ষ দুনিয়ার শক্তির উৎস। গত দুই দশকে এই জোটনিরপেক্ষ নীতি নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। বৃহৎ শক্তি, বলা বাহুল্য, এই স্বাধীন নীতিকে ভালো চোখে দেখেনি। সামরিক জোট সৃষ্টি করে যারা দেশে দেশে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ জীইয়ে রাখতে চায় তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলোর এই স্বাধীন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি অপরাধ হিসেবে গণ্য। তার জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোকে কম মূল্য দিতে হয়নি।

তা সত্ত্বেও জোটনিরপেক্ষ নীতি টিকে আছে। শক্তিদ্বন্দ্বে বিভক্ত পৃথিবীতে তারা শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে। আলজিয়ার্স সম্মেলনে পৃথিবীর জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনায় এবার আত্মবিশ্বাসের সুর স্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। ছিয়াত্তরটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। নতুন চিন্তা ও নতুন কর্মসূচীর নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা যা ভবিষ্যতে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করবে। সব বিষয়েই যে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে একথা বলব না। রাষ্ট্রসঙ্ঘেই কি তা কখনো হয়? কিন্তু মূল প্রস্তাব সম্পর্কে মতৈক্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় নিজেদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার সংকল্প নিঃসন্দেহে অভিনন্দনীয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক সাহায্যের ফাঁস দরিদ্র দেশগুলোর গলায় পরাতে চায়। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো এবার পরিষ্কার বলে দিয়েছে সেই ফাঁদে তারা পা দেবে না। জোটনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে চাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত না হলে শান্তির জন্য এই নীতি অনুসরণ কঠিন। উন্নতিশীল দেশগুলোকে এখন নিজেদের স্বার্থেই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতায় আবদ্ধ হতে হবে। অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এই সংকল্পও এবার আলজিয়ার্স সম্মেলনকে দিয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে পড়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে শান্তি ও সমৃদ্ধির তৃতীয় পৃথিবী গড়ার সংকল্পই বিবদমান বিশ্বের একমাত্র আশা। এখনও পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিক শক্তির দাপট চলছে পৃথিবীর নানা স্থানে। আফ্রিকায় পোর্তুগীজদের নৃশংস অত্যাচার। সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় চরম বৈষম্যমূলক ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। লাতিন আমেরিকায় চলছে মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নানা কুকীর্তি। সম্প্রতি চিলিতে গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাত এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদোর আলেন্দের শোচনীয় মৃত্যু তারই নূতন দৃষ্টান্ত। পশ্চিম এশিয়ায় ইস্রায়েলের জঙ্গীপনা, কাম্বোডিয়া, লাওসে বৈদেশিক চক্রান্তকারীদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ পৃথিবীর শান্তির সংকল্প বারবার বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিকামী জোটনিরপেক্ষ দুনিয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। শোষণ ও হস্তক্ষেপ যতদিন থাকবে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারত তার স্বাধীনতালাভের গোড়া থেকেই সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করে আসছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্যই এই সংগ্রাম। কোনো একটি দেশ পদানত বা শোষিত হলে তার প্রতিক্রিয়া অন্যত্রও অনুভূত হয়। সে কারণেই আজ জোটনিরপেক্ষতার প্রয়োজন এত বেশি।

আলজিয়ার্স সম্মেলনে ভারতের নীতিই জয়যুক্ত হয়েছে। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো চায় ন্যায়বিচার। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাদের লড়াই। বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের এই যুদ্ধ নৈতিক যুদ্ধ, অস্ত্রের যুদ্ধ নয়। শক্তির দম্ভে যদি তারা স্বাধীনতা ও শান্তিকামী দেশগুলোর এই নীতির মর্যাদা না দেয় তাহলে পৃথিবীর অশান্তির জন্য তারাই দায়ী হবে। শক্তিজোট আজ অবান্তর, জোটনিরপেক্ষতাই আগামী দিনের উজ্জ্বল প্রতীক।

ভিভা কাস্ত্রো ঃ ভারত-কিউবান মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক, উদ্বেলিত জনতার সম্মুখে তরুণকণ্ঠে ঘোষণা ফিডেল কাস্ত্রো
মিলিয়ে দমদম বিমানঘাঁটিতে ফিডেল কাস্ত্রো বললেন, লং লিভ ইন্ডিয়া!

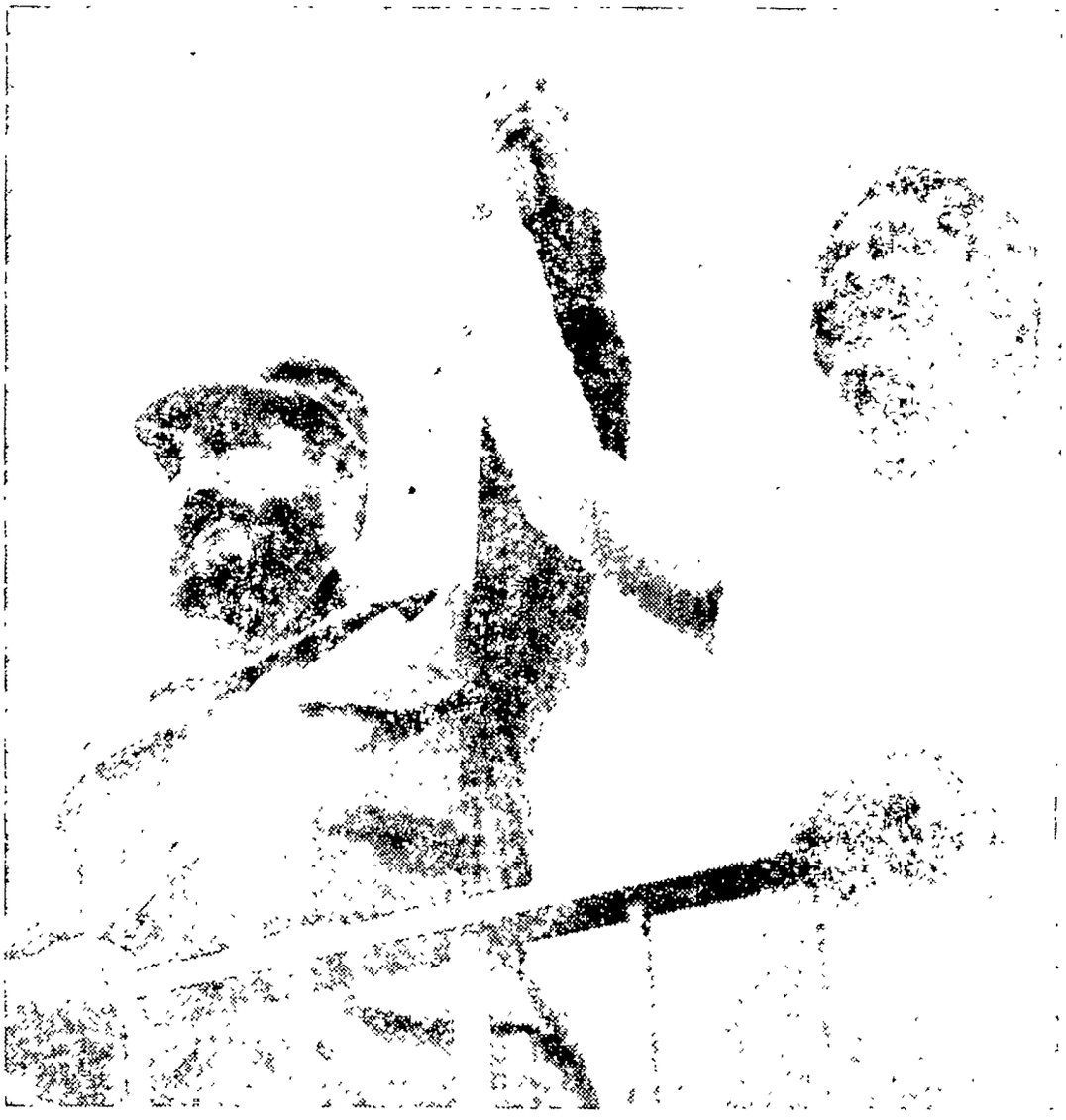

চিলির অগ্নিদাহ

চিলির রাজনৈতিক মঞ্চে কয়েকদিনের মধ্যেই অত্যন্ত করুণ অথচ নিষ্ঠুর বাস্তব নাটক অভিনীত হয়ে গেল। সমাজবাদী সরকারের কর্ণধার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সালভাদর আলেন্দেকে সামরিক অভ্যুত্থানের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। মুক্ত সমাজবাদী ডাঃ আলেন্দের বৈধ সরকার নির্মূল হয়ে গেছে। প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির ঝঞ্ঝাবেগের মধ্য দিয়েই কঠোর নিষ্ঠুরতার নতুন প্রেসিডেন্ট হোসেনরো মারিচিত্তির ক্ষেত্রেরা আগস্তে পিনোসে মারদ্বিও। সামরিক উত্থানের মুখে ৫৫ বছর বয়স্ক ডাঃ আলেন্দে মরিয়া হয়ে দশজনের এক মন্ত্রিসভা গঠন করে ফেলেছেন। আর এর আগে ডাঃ আলেন্দে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আত্মহত্যা করেছেন। একজন ফরাসী সংবাদিক বলেছেন, 'ডাঃ আলেন্দে বলেছিলেন আমার দেশে যদি সামরিক শাসন কায়েমী হয়, তাহলে আমি আত্মহত্যা করবো।' ভাগ্যের নিষ্করুণ পরিহাস। নিজের মন্তব্যেরই সত্যতা নিজেই প্রমাণ করে গেলেন ডাঃ আলেন্দে।

জনগণের ভোটে ১৯৭০ সালে যখন ডাঃ আলেন্দে চিলির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই মনে হয়েছিল, লাতিন আমেরিকাতে তিনি হয়তো শান্তি ও স্বস্তিতে সঙ্গে দিন কাটাতে পারবেন। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ করে দিল তা কোনমতে সম্ভব নয়। চিলির রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁরা হয়তে নিশ্চয়ই মনে আছে, গত জুন মাসে একটি সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন একথা ঠিক প্রেসিডেন্ট আলেন্দে সেই অভ্যুত্থানের পথ-রোধ করেছেন, সক্ষিয় সংগঠন তিনি করেনই নিতে পারেননি। প্রত্যুত মুহূর্তেই তিনি হয়তো, হয়তো-বা অভয় পেয়েছেন এবং তখন থেকেই তাঁর বামপন্থী ঝোঁক দিতে শুরু করে যে তাঁর আলেন্দে শেষ-পর্যন্ত তাঁর সমাজবাদী আদর্শে নিষ্ঠা ঠিকে থাকতে পারেন কিনা [illegible] দেখে তিনি [illegible] প্রতিনিধিকেও নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের [illegible] অসামরিক প্রতিনিধিদের [illegible] পুনর্গঠন করেন। কিন্তু [illegible] নানারকম চাপে পড়ে [illegible] বিরক্ত এবং বিপন্নবোধ [illegible] করার

বার। যখনই তিনি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের খাতিরে কোন আইন পার্লামেন্টের সাহায্যে পাশ করাতে ব্রতী হয়েছেন, তখনই প্রতিবন্ধকতা এসেছে শক্তিশালী মার্কিন লবি থেকে। কমিউনিজমের ধুয়ো তুলে দেশের অভ্যন্তরে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন মার্কিন পুঁজির সমর্থকরা। সরকারকে কাবু করার জন্য একের পর এক ধর্মঘট করা হয়েছে। এদিকে দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্র হয়ে ওঠে, মুদ্রাস্ফীতি ও রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ কমে যাওয়ায়। এ-ব্যাপারে প্রতিরোধ করার জন্য দক্ষিণপন্থী ন্যাশনাল পার্টি সেনাবাহিনীকে ওসকাতে থাকে। এই সেনাবাহিনী ১৯৩০ সালের নির্বাচনের পর থেকে চিলির সরকার গঠনে বা নির্মূল করে দেবার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই সামরিক চক্রের হাতেই চিলির সমাজতান্ত্রিক সরকারের মর্মান্তিক পতন হোল।

কাদের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে সেনাবাহিনীর এই আচরণ, তা যদি বলতে হয় তবে সোচ্চারে এটাই বলা উচিত যে মার্কিন মুলুকের দীর্ঘদিনের প্রয়াসই চিলির বৈধ সরকারের পতন ঘটিয়েছে। এবং গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেই বোঝা যাবে যে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সরকার ডাঃ আলেন্দের নেতৃত্বে চালিত সমাজতান্ত্রিক প্রগতিকে সর্বতোভাবে প্রতিহত করবার সবরকম চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। এবং কোন শান্তিকামী মানুষ না চাইলেও মার্কিন অভিসন্ধিরই আপাতদৃষ্টিতে জয় হয়েছে। ডাঃ আলেন্দেকে শুরু থেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক মার্কিন চাপ সহ্য করতে হয়েছে—রাজনীতি ও অর্থনীতির অনেক জটিল আবর্তে তাঁকে ফেলা হয়েছে অকারণে। উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। মার্কিন সরকার দেখতে চান না যে তাঁদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠুক সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয়। যে মার্কিনী কৌশল উরুগুয়ে ও বলিভিয়াতে চালানো হয়েছে, সেই একই কৌশল আরো খোলাখুলিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে চিলির ক্ষেত্রে।

আলেন্দে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সম্প্রসারণের জন্য দেশের প্রধান শিল্পগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করতে থাকেন। চিলির তামার খনি মালিকদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাও রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন। এই নীতিতে অসম্ভব রকম আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে যায় ওঠে মার্কিন সরকার। তারপরই চক্রান্ত চলতে থাকে কি করে চিলির অর্থনীতিকে শ্বাসরোধ করে মারা যাবে। রাষ্ট্রায়ত্ত তাম্র রপ্তানীর বাজার বন্ধ করার সব রকম চেষ্টা চলতে থাকে অবিরত।

এইসব ঘনীভূত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও অন্তত বাইরের দিক দিয়ে শক্ত এবং দৃঢ় হয়েছিলেন ডাঃ আলেন্দে। কিন্তু বিগত কয়েক মাস ধরে আসন্ন হয়ে উঠছিল তাঁর অবসন্নতার ছবি, শৈথিল্যের মন্থরতা। তাঁর বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন, তা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। কয়েক সপ্তাহ আগে ছোট ব্যবসাদার ও লরীর মালিকদের যৌথ প্রতিবাদ মিছিল। এবং তা আরো সোচ্চারে ধ্বনিত হয় ছাত্রদের বিরাট মিছিলে। তারাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে 'ডাঃ আলেন্দের অপসারণ চাই।' সঙ্গে সেনাবাহিনীর তিনটি পর্যায় থেকেই বিক্ষোভ। সব মিলে বিরাট এক গোষ্ঠী। অন্যদিকে অসহায় ডাঃ আলেন্দে। মার্কিন অনুপ্রেরণাপুষ্ট এই ষড়যন্ত্রের কাছে হার মানতে হোল তাই ডাঃ আলেন্দেকে।

ডঃ আলেন্দের মৃত্যু ও তাঁর সরকারের উৎখাতে চিলির গণতান্ত্রিক ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়ের সংযোজন করলো।

* * *

জরুরী অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত খাদ্য চেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্যরা। কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর যে-ধারণাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে আর যাই থাক অন্তত খুশী হবার মতো ছবি ফুটে ওঠেনি। করুণ বলা যেতে পারে, রাজ্য সরকারের এই আন্তরিক আবেদন কেন্দ্র হয়তো খানিকটা উদাসীন দৃষ্টি দিয়েই বিচার করেছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকার এর আগেই গমের পরিমাণ ১৩৫,০০০ টন থেকে ১০০,০০০ টনে কমিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারের সমস্ত রকম আপত্তিও সেখানে কোন সুফল আনতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আলোচনায় সম্মত হয়েছেন যে আরো ৫,০০০ টন গম এবং ৫,০০০ টন মাইলো এ-মাসে জরুরীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। এই খাদ্যের পরিমাণ প্রয়োজন অনুপাতে যে কতো কম, আশা করি সে-কথা আর কাউকে বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা করতে হবে না। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ-কথা নাকি বেশ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে, খাদ্যের এই বরাদ্দ নিয়েই রাজ্য সরকার তাঁর আশু প্রয়োজন পুরোপুরিই মেটাতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের জটিলতর খাদ্য-পরিস্থিতির সমাধানের যে-পথ কেন্দ্র তুলে ধরেছেন, তা দেশের স্বাভাবিক অবস্থার কাঠামোতেই প্রযোজ্য। কিন্তু এ-অবস্থাতেও কেন্দ্র খাদ্যের যে পরিমাণের কথা বলেছেন, রাজ্য সরকারের খাদ্য দপ্তরের হিসেব তার থেকে স্বতন্ত্র। বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা—এ-সত্যটা যে কেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী তাঁর পরিণত মনন ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বুঝে উঠতে পারলেন না, তা বোঝা গেল না। খাদ্য বণ্টন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের যে দায়িত্ব তা শুধু এখন বেশানিং এলাকাকে ঘিরেই শেষ হয়ে যায় না। যে এলাকাতে বন্যার তাণ্ডবলীলায় অগণিত লোকের সামনে অনিশ্চয়তার ছবি নেমে এসেছে, সেখানেও খাদ্য বিলি করার মানসিক ও মানবিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের নিশ্চয়ই আছে, এই গভীরতর বাস্তব সত্যটি ভুলে গেলে চলবে কি করে। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত লোক খাদ্যের জন্যে কাঁদছে,

আশ্বিন ১৩৮০ **কালি ও কলম** ৭ম বর্ষ শারদীয় সংখ্যা

এই সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, কমলকুমার মজুমদার, মনোজিৎ বসু, ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ডঃ শিশিরকুমার সিংহ, আশিষ সান্যাল, ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, নিখিল সেন, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, ডঃ শ্রীমন্ত জানা, ডঃ কালীপদ মালাকার, ও সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ভ্রমণ কাহিনী ঃ সুরেশচন্দ্র সাহা গল্প ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ডঃ নমিতা চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রমোহন আচার্য, সতীকান্ত গুহ, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, দেবল দেববর্মা, আশা দেবী, সুকৃতি রায়চৌধুরী, সুভাষ সমাজদার ও ছবি মুখোপাধ্যায়, নাটিকা ঃ ডঃ সুশীল রায়, কবিতা ঃ মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার চৌধুরী, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বার্ণিক রায়। সাহিত্যের খবর ঃ সুচরিতা সান্যাল। দাম ঃ ৪·০০। গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। ষান্মাষিক ৬·০০, বার্ষিক ১২·০০।

প্রকাশ ভবন ঃ ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

• তারা কি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে এই কারণে যে তাদের এলাকা স্বাভাবিক সময়ে রেশনিং সীমানায় পড়ে না।

এটাও আশ্চর্যের বিষয়, রেশনিং এলাকায় যাঁরা থাকেন, যাঁদের আইনসঙ্গত কার্ড আছে, তাঁরাও প্রয়োজন অনুপাতে যথেষ্ট কম খাদ্য পান। তাই আরো খাদ্য, বিশেষ করে চাল, খোলাবাজার থেকেই স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কিনতে হয়। এবং প্রকারান্তরে বাজার থেকে চাল কিনে রাজ্য সরকারের ভাণ্ডারে জমা করার ব্যাপারটাও খুব সঙ্গত কারণেই সীমিত হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় সরকারও যে এখন খুব স্বস্তিবোধ করছেন এমন নয়, বিভিন্ন রাজ্যে বন্যার তাণ্ডব রীতিমতো টেনশন করছে সরকারকে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যা বন্যার বিধ্বংসী লীলার আগেই অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, এ-কথা তো মানতেই হবে। এবং সেই খাদ্যের পরিমাণ যেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আবার পূর্বাবস্থায় যেতে পারে কিনা এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে অনেক। কিন্তু আশা-ব্যঞ্জক কিছু শোনা যায়নি। যাই হোক পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কম খাদ্যাশসা নিয়েই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন কি করে সবার মুখে কিছু অন্ন তুলে দেওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রকৃতি এতে বাদ সাধলো। বন্যার রুদ্র রোষে সব প্রচেষ্টাই প্রায় বানচাল হয়ে গেছে। এখন এমন একটা জটিলতর ও মর্মান্তিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে রাজ্য সরকার যে তা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে কেন্দ্রের অনেক সাহায্য এখনই প্রয়োজন। বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলীতে বন্যা যে দুর্ভোগ ডেকে এনেছে, তাতে কেঁদে মরছে লক্ষ লক্ষ লোক। তাঁদের ক্ষতির শেষ নেই। রাজ্য সরকারের সীমিত ক্ষমতায় কতোটা সাহায্য তাদের কাছে পৌঁছে দেবে। কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, তিনি তাঁর যথাসাধ্য কর্তব্য করবেন। আর দেরি করা উচিত নয়।

* * *

অনেক আলোচনা অনেক মতানৈক্যের পর নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্থানকে জড়িয়ে বিশেষ করে পাকিস্থানে আটকে পড়া বাঙালীদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া, ও বাংলাদেশে মৃত পাকিস্থানীদের পাকিস্থানে ফেরত পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে যে জট পাকিয়েছিল, তা এই চুক্তির ফলে প্রায় সবটাই ছেড়েছে। বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধপরাধীদের বিচার করবে এ নিয়েও সিদ্ধান্ত ছিল চুক্তিতে। সব মিলিয়ে এই প্রয়াসকে উপ-মহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সার্থক দিক-চিহ্ন হিসেবে মনে করা হয়েছে। দেশ বিদেশের রাজনীতিক মহল অভিনন্দন জানিয়েছেন একে। চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পাকিস্থানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ আজিজ আমেদ নিজেই বলেছেন 'শান্তির একটি নতুন দিকে উন্মোচন হোল।'

অথচ দেশে ফিরে গিয়েই আজিজ আমেদ ভুলে গেলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মহৎ সংকল্পের কথা। ভুলে গেলেন ঐতিহাসিক চুক্তির বয়ান। ইসলামাবাদে মিঃ আমেদ ফ্রান্সের পরবাষ্ট্র মন্ত্রী মাইকেল জবার্টিকে তিনি বেশ খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ ১৯৫ জন যুদ্ধ-অপরাধীর বিচারের বিষয়টি প্রত্যাহার করে না নেওয়া পর্যন্ত পাকিস্থান ও চীন রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করবে। মিঃ আমেদ কয়েকদিন আগে তিনদিনব্যাপী পিকিং সফর শেষ করে ফিরে এসেছেন। পাকিস্থানের অকৃত্রিম বন্ধু পিকিং সরকার নিশ্চয়ই মিঃ আমেদকে মদত দিয়েছেন। আজিজ আমেদের কণ্ঠে তাই এত দৃঢ়তা। চীন আছে পাশে তাই শান্তি চুক্তির কথা ভুলে গেলেও ক্ষতি কি।

একটা কথাই শুধু মনে আসে মনের গভীরতম কোণে যদি বিরোধিতার বাসনাই থাকে তা হোলে কেন এই শান্তি চুক্তির প্রহসন গড়ে তোলা। এতে নিজেদের আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে কি নিজেদেরই নষ্ট করে ফেলা হয় না!

* * *

মনোভাবের বলিষ্ঠতা ও আলোচনার দৃপ্ত ভঙ্গি থেকে একথাই স্পষ্টতর হয়েছে যে এবারে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ঘোষণা করেছে। ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে চোখ রাখলে দেখা যাবে যে আগে এই ধরনের সম্মেলন শুধু সম্মেলনের খাতিরেই অনুষ্ঠিত হোত। সেখানে মহত্তর সংকল্পের কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত হোত, কিন্তু সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করার কোন প্রচেষ্টা থাকতো না। কিন্তু এবারকার আলজিয়ার্সের সম্মেলন সেদিক দিয়ে একটু স্পষ্ট ব্যতিক্রম এনেছে বলতেই হবে। আলোচনাতে অনেক বিষয়েই মতানৈক্য দেখা দিয়েছে ঠিকই এবং ছিয়াত্তরটি রাষ্ট্রের প্রধানরা যে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সেখানে মত পার্থক্য থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এত বড় সমাবেশে কার্যকর পথ আবিষ্কারের চেয়ে মত বিনিময়ই তো প্রধান কথা। সেদিক দিয়ে এ সম্মেলন সার্থকতার ইঙ্গিত এনেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

এবারকার আলজিয়ার্স সম্মেলনে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিরূপ সমালোচনায় কোন কোন রাষ্ট্রনেতা হয়েছেন মুখর। সমালোচকদের আক্রমণের বিষয়-বস্তু ছিল ইন্দোচীনে ও পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিনী ভূমিকা। দৃঢ়তর কণ্ঠে আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগকে সোচ্চার করে তোলেন কিউবার প্রধানমন্ত্রী ক্যাস্ট্রো। তাঁর প্রধান অভিযোগ, লাতিন আমেরিকাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়ার জন্য আমেরিকা গোপন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং ব্রেজিলকে ব্যবহার করছে। ক্যাস্ট্রোর অভিযোগের

শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে

শারদীয়া কালিয়

৮টি উপন্যাস, ৫টি নভেলেট, ১টি নাটক, কবিতাগুচ্ছ, অসংখ্য গল্প চলচ্চিত্র, মাঠ ময়দান প্রবন্ধ প্রভৃতির বিচিত্র সমাহারে সজ্জিত হবে।

উপন্যাস লিখছেন : ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত, তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, শিবরাম চক্রবর্তী দীপংকর সেন, গৌরী গুপ্ত মায়া বসু, ঋত্বিক পান্ডব ও ডাঃ ভবতোষ গুপ্ত। নভেলেট : অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ দক্ষিণারঞ্জন বসু, বাণী দেবী ও সমরেশ বসু। গল্প : শংকর দাশগুপ্ত, গিরিবালা দেবী, মরদী সরকার প্রভৃতি।

কবিতা : রায়সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিশেখর কালিদাস রায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শঙ্খসত্ত বসু ও সমীর দে।

প্রবন্ধ : লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত ও ডঃ রমা চৌধুরী।

নাটক : প্রশান্ত চক্রবর্তী।

চিত্রতারকাদের নিজস্ব রচনা লিখছেন : উত্তমকুমার, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সাবিত্রী চ্যাটার্জী মিঠু মুখার্জী, দেবানন্দ, শশী কাপুর, শর্মিলা ও রেখা।

থাকছে পাতায় পাতায় রঙিন ফটোগ্রাফ :

চিত্রতারকাদের মন মাতানো ছবি।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫০ দাম : ৫-৫০ সডাক : ৬-৭০

: বিশেষ আকর্ষণ :

অলকা চৌধুরীর কলমে স্বনামধন্য হেমেন গাঙ্গুলীর জীবনীসহ অপ্রকাশিত কবিতা।

কার্যালয় : ২০বি, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি-৯ ৩৫-২১৩৪

সত্যতা কয়েকদিন আগে চিলির সমাজবাদী সরকারের উচ্ছেদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার আরব রাষ্ট্রগুলির আমেরিকা সম্পর্কে অভিযোগও অনেকটা একই রকম। ইস্রাইল রয়েছে তাদের সামনে। মার্কিন আনুকূল্য লাভ করে সে দখল করে রেখেছে বিস্তীর্ণ আরবভূমি। তাই ইস্রাইলকে সব দিক দিয়ে বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এবং এবারকার আলজিয়ার্স সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে প্রধান আসামী হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে ইস্রাইলকে। ইস্রাইলের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়েছে এই সম্মেলনে। তাই অসংখ্য করতালি ও হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে অভিনন্দিত হয়েছে ক্যাস্ট্রোর সেই দৃপ্ত ঘোষণা—কিউবা ইস্রাইলের সঙ্গে সমস্ত রকম কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো। তবে একথা সত্য আলজিয়ার্সে আমেরিকা বিরোধীর সংখ্যা যতো বেশী দেখা গেছে সোভিয়েট বিরোধী সংখ্যা সে তুলনায় যথেষ্ট কম।

আফ্রিকার পর্তুগীজ উপনিবেশগুলোতে মুক্তিসংগ্রাম আলজিয়ার্স সম্মেলনের এক প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁরাই এই শীর্ষ সম্মেলনে এসেছিলেন যাঁরা সেখানকার মুক্তিসংগ্রামে রত। তাঁদের আন্তরিকতা প্রায় সব রাষ্ট্রপ্রধানদের অন্তরকে স্পর্শ করেছে, তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছেন সবাই। ঠিক হয়েছে সেই মানবিক সংগ্রামকে সফল করে তোলার জন্য গড়ে তোলা হবে একটা তহবিল। সবাই অর্থ দেবে তাতে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন আফ্রিকার সেই মুক্তিসংগ্রামী-দের। আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের মাটিতে। তিনি বলেছেন এই মুক্তিসংগ্রাম যে কোন দেশের কাছেই অভিনন্দন যোগ্য।

আলজিয়ার্স সম্মেলনে একথা গভীরতার সঙ্গেই অনুভূত হয়েছে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গুলোর আসল দুর্বলতা দারিদ্র্য ও ধনী রাষ্ট্রগুলোর ওপর অসম্ভব রকমের নির্ভরতা। পশ্চিম ইউরোপে গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় যৌথ একচেটিয়া আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসা। কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ায় তার সামনে দাঁড়াবার মতো গড়ে ওঠেনি কোন যৌথ কাঁচামাল রপ্তানী সংস্থা। তাছাড়া পশ্চিমী ধনী রাষ্ট্রগুলির ঋণদানের ব্যাপার তো আছেই। এগুলো সবই জোট-নিরপেক্ষতার স্বাধীন চিন্তার অন্তরায়ই সৃষ্টি করে। তাই ভাবা হয়েছে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো যদি ব্যবসায়িক আদান-প্রদান ও সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে পারে তা হোলেই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর ওপরে নির্ভরশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে কমে যেতে পারে। হয়তো এ ব্যাপারটাকে সার্থক-তায় চিহ্নিত করতে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু এই অনুভব এবং প্রকারান্তরে বলিষ্ঠ সংকল্প নিঃসন্দেহে বৃহত্তর কল্যাণেরই ইঙ্গিতবাহী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদের অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতার স্তর ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে। এখন তারা আত্মসচেতন এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠতর সংকল্পে মুখর। এখন পৃথিবীর ধনী এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে এদের মতামত কিছুতেই উপেক্ষা করা সহজ নয়। তিনি বলেছেন, অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণা আমরা সহ্য করেছি, আমরা এই সম্মেলনে সমবেত হয়েছি সমব্যথী হিসেবে একের দুঃখ অন্যে সমস্ত অন্তর দিয়ে বুঝে নিতে। এই অনুভবের সমতা যদি থাকে তাহোলে কারো সাধ্য নেই জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আকাশে কোন জটিল মেঘ এনে দেয়।

তিনি জোরের সঙ্গে বলেছেন এখনো আমাদের মতো শান্তিকামী জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর ওপর বৃহত্তর শক্তির শোষণ চলছে। এই শোষণ মুক্ত করতে হবে আমা-দের এবং শোষণের চাপে যাদের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের দিতে হবে ভাষা, দিতে হবে প্রোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান। শ্রীমতী গান্ধী বৃহত্তর শক্তিবর্গকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন বেঁচে থাকা ও পৃথিবীর যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার শুধু তাদেরই নেই যারা শোষিত তাদেরও পূর্ণ-মাত্রায় আছে, একথা ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না।

আলজিয়ার্সের প্রেসিডেন্ট বুমেদিনও তীব্রতর ভাষায় উচ্চারণ করেছেন যতোদিন বৃহত্তর ধনী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অপসারণ না হয় ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বপ্ন দেখা নিষ্ফল। যুগোশলাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো (যিনি জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের তিনজন উদ্গাতাদের মধ্যে এখনো জীবিত। অন্য দুজন ছিলেন নাসের, জওহরলাল নেহরু) বলেছেন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-গুলোর সম্প্রীতির এমন একটি উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা উচিত যা নিয়ে সত্যি গর্ব করা যাবে।

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানরা আলজিয়ার্স সম্মেলনে যে মানসিকতাকে আন্তরিকভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা দীর্ঘদিনের বাস্তব অস্থিরতা থেকে এই সত্যই খুঁজে পেয়েছেন যে সাহায্যের জন্য ধনী রাষ্ট্রগুলোর দরজায় পড়ে থাকলে অবমাননা ছাড়া কিছুই মেলে না। এখন সেই মুহূর্ত এসেছে যখন নিজেকে নিজেদেরই গতিবেগে এগিয়ে যেতে হবে। এ কাজ দ্রুততর হোতে পারে যদি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিক অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতার এক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারেন। এই সহযোগিতাকে নিশ্চিত এবং দৃঢ়তর করার জন্যে জোটনিরপেক্ষদের কোন স্থায়ী সংস্থা তৈরী করার কোন যৌক্তিকতা নেই। সম্পূর্ণ জোর দিতে হবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ওপর। লুসাকা সম্মেলনে যার ওপর সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আলোক-পাত করা হয়েছিল। কিন্তু লুসাকা সম্মেলনের পর গৃহীত প্রস্তাব নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করা হয়নি। শুরু থেকেই আলজিয়ার্সের সম্মেলন লুসাকার প্রস্তাবের এই ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিল। তাই এবারে আলজিয়ার্সের সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অর্থনৈতিক প্রস্তাবের ওপর।

ওদিকে আবার সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রখর ও বিস্তৃত হয়েছে। এশিয়া আফ্রিকায় অনেক বারুদের আভাস আছে। তাই সংগত কারণেই আল-জিয়ার্স সম্মেলন হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলো এখন তাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেভাবেই হোক আত্মনির্ভর-শীল হয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে বৃহত্তর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও আছে।

১৫-৯-৭৩ —সমদর্শী

ছেলেমেয়েদের জন্য ঘরে ঘরে হাসির স্বর্গ গড়ে তুলুন—

শিশু সাহিত্যের হাসির রাজা

শিবরাম চক্রবর্তী

শিব্রাম রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সমগ্র রচনাবলী ৫০৲ টাকা প্রতি খণ্ড—১৫৲ টাকা। এখনি অবধি যাঁরা গ্রাহক হননি অগ্রিম ৫৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হবার সুযোগ নিন।

রচনা সংগ্রহ প্রকাশন বিভাগ

শিবরাম চক্রবর্তীর বই-এর দোকান এম. টি ৫৩/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট — তার পাশেই স্টান্ডার্ড পাবলিশার্স—দক্ষিণ কলিকাতা : লোক বুক স্টল, রাসবিহারী এভিনিউ। সুবোধ লাইব্রেরী, বেনাচাতি—দুর্গাপুর-১৩

সেই লোকটি

রাজাকাটরার সামনে সেদিন হঠাৎ আশুদা-র সঙ্গে দেখা। বরানগরের আশু আচার্য। বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। বাঁধ ভেঙ্গে গেছে চেহারার। শিরাবহুল হাত চোখের ওপর তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর প্রায় ফোকলা মুখে শিশুর মত একগাল হেসে বললেন, 'তুই...তুই আমাদের স্লেটু-বাবু না?'

ক্লাশ টেনে পড়ি তখন। পাড়ায় ক্যানভাস বল, ইটের উইকেট আর নিজেদের হাতে দা-কাটা পলকা কাঠের ব্যাট নিয়ে ক্রিকেট খেলায় হাত পাকিয়ে বছর দুয়েক ডিউজ বল-অলা এক ক্লাবে প্রমোশন পেয়েছি। খেলতে খেলতে দেখলাম, বল করাটা আমার ভালো আসে। বাঁ হাতে বল করতাম। স্পিন। খুব স্লো নয়, এমনকি একটু আধটু ঠুকতেও পারতাম মাঝে মাঝে।

পাড়াওয়ারি খেলায় কেষ্টা-বিষ্টু ব'নে গিয়ে অবশেষে একদিন দুরুদুরু বুকে বরানগর স্পোর্টিংএর মাঠে টেন্টের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। মাঠে নেট পড়েছে। প্রাকটিস শুরু হয়ে গেছে। একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক প্যাড পরছিলেন, মরীয়া হয়ে তাঁকে বললাম, 'আমি প্রাকটিসে নামতে চাই।' ভদ্রলোক ঘাড় গুঁজে পায়ের বেল্ট আটকাচ্ছিলেন, হাত থেমে গেল, কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বাজখাঁই গলায় বললেন, 'কে তুমি? কোথায় থাকো?' আমি এক সেকেন্ড-ও দেরি না করে আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারির দেয়া পরিচয়-পত্র তাঁর হাতে ধরিয়ে দিলাম। তিনি আরেকবার আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, 'চলো আমার সঙ্গে।'

দুরুদুরু বুকে নেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঐ ভদ্রলোক যাকে সবাই দিলুদা বলে ডাকছিল, তিনি দলের ক্যাপটেন শচীন দে বা নেড়ুদা-র সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। নেড়ুদা কোনো কথা না বলে আমাকে আঙুল দিয়ে মিড্ অনে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। মাঠের এখানে ওখানে আরও জন পনের খেলোয়াড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রায় আমার বয়সী একটি ছেলে কাছে ঘনিয়ে এল। ওর সঙ্গে দু-চারটে ফিসফাস আলাপ হওয়ার পর ও বলল, 'এবার আশুদা বল করছেন, আরেকটু ওয়াইডে গিয়ে দাঁড়াও।' আমাদের দিকে নেড়ুদা-র চোখ পড়তেই ছেলেটি ধাঁ ক'রে নিজের জায়গায় সরে গেল।

ভুঁড়ির ওপর আধছেঁড়া ময়লা জিনের প্যান্ট টানতে টানতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের আশু আচার্য, আশুদা বল করছিলেন। খুব স্লো, কিন্তু অসম্ভব ফ্লাইট। লেগ স্পিন, মাটিতে বল পড়ে লাট্টুর মত পাক দিতে দিতে হাত দেড়েক চুকে যাচ্ছে। তাগড়াই চেহারার সে ছেলেটি এতক্ষণ সব বোলারকে পিটিয়ে লাশ ক'রে দিচ্ছিল, আশুদা-র ফ্লাইট যেন তাকে রেশমি সুতোর ফাঁসে বেঁধে ফেলল। কখনো ফরোয়ার্ড খেলে, কখনো একেবারে উইকেটের গা ঘেঁষে ব্যাক ফুট, কিন্তু একটা বলও জব্দ করতে পারছে না। শেষে ক্ষেপে গিয়ে চার-পাঁচ স্টেপ লাফিয়ে একটা লোম্পা বল সোজা ক্লাব-টেন্টের মাথায় পাঠিয়ে নেট থেকে বেরিয়ে আসে। আশুদা অর্ধেক-ফাটা বলটা হাতে নিয়ে ওর দিকে একচোখ টিপে হাসতে থাকেন।

কিছু বললেন না, তবে পরপর চারদিন নেটে আমার বল দেখে বোধহয় ইমপ্রেস্ড্ হলেন নেড়ুদা। বরানগর স্পোর্টিং তখন সি এ বি ক্রিকেট লীগের সেকেন্ড ডিভিশানে খেলছে। তিন-তিনটে খেলা হয়ে গেল, তিনটেতেই প্রথম পনের জনের মধ্যে আমার নাম। পুরো গিয়ার্স নিয়ে যেতাম, সঙ্গে যেত অনুরাগী দু-চারজন বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু তিনটে খেলাতেই শেষ অবদি বাদ পড়ে গেলাম।

এদিকে খুব বিদিকিচ্ছিরিভাবে সীজন্ শুরু করেছে বরানগর স্পোর্টিং—দুটোয় হার, একটায় কোনক্রমে ড্র। ব্যাটসম্যানদের হ্যাস, একবার বাংলাদলের ট্রায়ালে চান্স পাওয়া দুর্ধর্ষ আশুদা-কে পর্যন্ত অন্য দলের খেলোয়াড়রা রেয়াত করছে না। পাইকপাড়া স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলায় তিনি একাই চুয়াত্তর রান দিলেন বিনা উইকেটে।

এক শনিবার ছিল কাশীপুর ক্লাবের সঙ্গে খেলা। আমি টুয়েলফথ্ ম্যান। দশটা বেজে গেল, আশুদা তখনো এসে পৌঁছন নি। আমাদের আগে ফিল্ডিং, নেড়ুদা বললেন, 'নেমে পড়ো হে।'

ভাবলাম, একবার যখন শিকে ছিঁড়েছে, এই আমার সুযোগ। নেড়ুদা যখন আমার হাতে বল তুলে দিলেন, সারা শরীর থরথর ক'রে কাঁপছিল। উত্তেজনায় বোলারের ক্রীজ পেরিয়ে গেলাম, ফুলটস—ব্যাটসম্যান পরপাঠ একটা ছক্কা ঝাড়ল। পরের বলটা ভয়াবহ সর্ট-পীচড্, চোখ-কান বুজে সপটে স্কোয়ার লেগ দিয়ে চার চালিয়ে দিল সে। পরের বল—আম্পায়ার হেঁকে উঠলেন, 'নো।' তার পরের বল, একটু ওভার-পীচ মতোন, দেখি একটা লাল গোলা আমার বুক লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে। নিজেকে বাঁচানোর জন্য দু'হাত পেতে দিয়েই মুঠোর মধ্যে

যেন রক্ত জমে গেল। সারা মাঠ করতালিতে ফেটে পড়ছে। দলের খেলোয়াড়রা ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ভাবতেই পারি নি—এভাবে কট্ এ্যান্ড বোল্ড হয়ে যাবে ঐ বাঘতাড়ুয়া ব্যাটসম্যানটি।

তারপর কি এক শক্তি এসে আমাকে ভর করল জানি না। লাঞ্চের আগে কাশীপুরের সাতটা ইউকেট পড়ে গেল, আমি একাই পেলাম ছ'টা। খেতে বসে দেখি, বাঁ পাশে আশুদা। বললেন, 'আরেকটু আস্তে বল কর। ডিরেকশনের গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

সেদিন জিতলাম আমরা। পরের খেলা ছিল বেলগাছিয়া ক্রিকেট ক্লাবের সঙ্গে। একজন মিডিয়ম-পেস বোলারকে বসিয়ে নেড়ুদা এই প্রথম আশুদা আর আমাকে একসঙ্গে নামালেন খেলায়। গোটা চারেক উইকেট পেলাম আমি। প্রচুর রান দিয়ে আশুদা কুল্যে একটি।

পরের সপ্তাহে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। আর সাত দিন বাদে পুন্টু চৌধুরীস (বিখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় ও পেস বোলার) ইলেভেনের সঙ্গে আমাদের চ্যারিটি একজিবিশন খেলা। সারা মাঠ ঢাকা হয়েছে দর্মা দিয়ে। পন্টু চৌধুরীর দলে খেলতে আসছেন পঙ্কজ রায়, প্রকাশ পোদ্দার, দাত্তু ফাদকার আর কল্যাণ মিত্র।

খেলার আগের দিন রাত্তিরে ক্লাবের নির্বাচক কমিটির জোর মিটিং চলছে। টেন্টের বাইরে কি এক প্রবল দুরাশায় ঘুর ঘুর করছি। চারপাশে অন্ধকার। রাত দশটা নাগাদ নেড়ুদা বেরিয়ে এলেন টেন্টের ভেতর থেকে। থমথমে মুখ। পেছন পেছন ভাইস-ক্যাপটেন আশুদা। নেড়ুদা আমার দিকে তাকালেনও না। হঠাৎ আমার ডান হাতের কব্জি চেপে ধরলেন আশুদা। তারপর ধরা ধরা গলায় বললেন, 'লেটু, কাল তুই-ই খেলবি।' ব'লেই হনহন ক'রে সেই যে মাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে গেলেন, আর মাঠে ঢোকেন নি কোনোদিন।

তারপর কুড়ি বছর বাদে, সেদিন এই রাজাকাটরায় দেখা।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

হিসেব নিকেশ

বীরেন্দ্র দত্ত

কাশতে কাশতে বারদুয়েক বমি করার পর হঠাৎ হেঁচকি তুলে তারাপ্রসন্ন মারা গেলেন।

কনকনে ঘন শীতের সন্ধ্যে। একটু আগেই লোডশেডিং-এ কারেন্ট চলে গেছে। অন্ধকারের মধ্যেই একটা বাতি কোনরকমে এপাশ-ওপাশ হাতড়ে বের করে জেলে বাবার বিষণ্ণ মুখ দেখছিল বিনয়। এরই মধ্যে কাশি-বমি—সব শেষ!

কষ্ট থেকে আরাম দেওয়ার জন্যে বিনয়ের ডান হাত বাবার বুকের ওপর ধরা ছিল। এই মুহূর্তে ঝুঁকল বিনয়। বাবা কি সত্যি বেঁচে নেই! হাতের কনুই কপাল ছুঁলো বিনয়। তারপর গলা, বুক। সব ঠান্ডা! বাতির টিম টিমে আলোয় বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বিনয়ের দিকেই ঈষৎ এক পাশ হয়ে গেছে বাবার মুখ। বাতির আলোতেও বিনয়ের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, বাবার মুখ হলদে। নাকের ডগা যেন বেঁকে গেছে। শীতল ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক। চোখের পাতা সম্পূর্ণ বোজেনি।

বিনয় বাবার দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ, নিঃসাড় বসে রইল।

এই মুহূর্তে বিনয়ের চারপাশে কেউ নেই। গত বছর মা মারা গেছে। ভোরে রান্না-বাড়া শেষ করে বিনয় যখন ফ্যাক্টরীতে বেরুবার জন্যে তৈরী হতে থাকে, তারই মধ্যে দূর সম্পর্কের বিধবা পিসি আসেন। ওভারটাইম খেটে সন্ধ্যের

একটু আগে ফিরলে পিসি চলে যান। বাবার অসুস্থ হয়ে বিছানা নেওয়া থেকে এটাই এখন প্রতিদিনের নিয়ম হয়ে গেছে।

আজও বিকেল তখন সন্ধ্যের গায়ে লাগতে শুরু করছিল, বিনয় ফিরেছে। পিসিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বিনয় পা ধুয়েছে। তখনো কারেন্ট চলে যায় নি। স্টোভ জেলে বিনয় চা করতে বসবে ভাবছিল, হঠাৎ বাবা ডাকল, 'খোকা, একবার আমার কাছে এসে বস তো। কথা আছে।'

বাবার কথায় বিনয় সামনে এসে বসেছিল।

বাবা একভাবে বিনয়ের মুখে দৃষ্টি রেখে কি যেন দেখছিল। অপলক, নির্বাক।

'বাবা! কিছু বলবে?'

বাবার দু' চোখে জল। চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট চলে গেল। বিনয় বুঝতে পারছিল, বাবা ওকে কিছু বলতে চায়। বাবার হাতটা বিনয়ের হাত ছুঁয়েছিল। কিন্তু বলতে পারেনি। কারেন্ট চলে যেতে বিনয় বাতি খুঁজে জেলেছে। ততক্ষণে বাবা ঘুমিয়ে পড়েছিল। নিদ্রিত পিতাকে দেখছিল বিনয়। তখন আর ঘুম ভাঙাতে চায়নি। হঠাৎ বাবা জেগে উঠে বিনয়কে কিছু বলতে যাচ্ছে, ভয়ংকর এক কাশি বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে। বাবা উঠে বসেছিল মুহূর্তের মধ্যে। বিনয় বাবার বুকে হাত রাখে। তারপরেই সব শেষ।

মৃত পিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিনয় কথাগুলো ভাবছিল। বিনয়ের হঠাৎ মনে হল, বাবার মুখ কত তৃষ্ণার্ত! বাবা কি একটু আগে জল চাইছিল? নাকি, বাবার কোন কষ্টের কথা জানাতে চেয়েছিল? মুমূর্ষু মানুষের মুখে গঙ্গাজল দিতে হয়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে হয়—'গঙ্গা নারায়ণঃ ব্রহ্মঃ'। ওর খুব ছোটবেলায় এক জ্যাঠামশাই মারা যাবার সময় বাবা শিখিয়ে দিয়েছিল এসব।

বিনয় হঠাৎ ভিতরে কেঁপে উঠল। পিসি নিজের জন্যে একটু গঙ্গাজল এনে রেখেছে ঘরে। এখন কি একটু গঙ্গাজল দেবে বাবার মুখে? মন্ত্রটা কি কানের কাছে একবার বলে নেবে? বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বিনয় অদ্ভুত এক অসহায়তা বোধ করল। জল খাবে কে? বাবার মন্ত্র শোনাবেই বা শক্তি কোথায়? সমস্ত শরীর এখন রুদ্ধ, স্তব্ধ। বাবা কত একা!

বিনয়ও তো একা। হঠাৎ কথাটা মনে হতেই বিনয় ভিতরে চমকে উঠল। বাতির আলো থেকে চোখ সরিয়ে অন্ধকারে ছড়িয়ে দিল। এত অন্ধকার ও বোধহয় কোনদিন দেখেনি। এমন অপরিচিত অন্ধকার বিনয়কে হঠাৎ ভয় দেখাল। ছোটবেলায় বাবার কাছে ভয়ের গল্প শোনার সময় যেমন শুনতে শুনতে কখন যেন বাবার কোলের কাছে ডুবে যেত, সেইভাবে বিনয় বাবার অনেক কাছে চলে এল। বাবার শরীর ছুঁয়ে থাকল।

মা বলত, 'কখখনো মরা মানুষের শয্যা ছেড়ে উঠতে নেই রে খোকা। সব সময় ছুঁয়ে বসে থাকতে হয়। উঠলে লোহার কিছু জিনিস ছুঁইয়ে রাখতে হয়।' মায়ের মড়া ছুঁয়ে থেকেছিল বিনয় শ্মশানে চিতার তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। ছুঁয়ে থাকতে থাকতে কেমন কান্না পেয়েছিল বিনয়ের। মনে হয়েছিল, মায়ের স্নেহ বুঝি এই রকম।

বাবাও কি সেইভাবে কাছে ডাকছে। বাবাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে মনে হাসল বিনয়। মরা মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই! বিনয় যেন ভূতে বিশ্বাস করে ফেলছে।

একটু নড়ে বসল বিনয়। চাপা শীতে ভিতরটা কাঁপল একবার। সিগারেট খায় ও। কিন্তু এখনি সব যেন বিস্বাদ। বাবার বিছানার ধারে হাত ঘষল। আজই সব বদলে নতুন পোষাক পরিয়েছিলেন পিসি বাবাকে। বাবা অনেকটা সুস্থ ছিল। তাই জামা, কাপড়, বিছানার চাদর, মাথার আর পায়ের বালিশের ওয়াড়—সব বদলে দিয়েছেন। কম্বলটাও কাচা। অফিস থেকে ফিরে বাবাকে দেখে খুব ভাল লাগছিল বিনয়ের। ছোট বোন ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাবাকে একদিন একরকমই দেখে গেছে। বড় বোন ভিলাই-এ থাকে। চিঠিপত্র সব খবর রাখে। শেষ চিঠিতে জানিয়েছে—সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে কদিন ছুটি নিয়ে এসে থাকবে। বিনয় তাই নিশ্চিন্ত হচ্ছিল।

কিন্তু আজ। বিনয় দিদির কথা ভাবতে ভাবতে কেন যেন স্থির তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হল বিনয়ের, কোন গভীর স্নেহ-ভালবাসায় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখ ঠিক এইরকম! কিছুদিন আগেও বিনয় যেন তা দেখেছে!.....

'খোকা!' ক্লাসে বেরুবার মুখেই বাবা ডাকল বিনয়কে। 'তোর খুব তাড়া আছে?'

'কেন?' বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় বলল।

'আমার কাছে একটু বস না।'

পিসি তখন বাবার জামা-কাপড় কাচতে বসেছিলেন কলঘরে। বিনয় দাঁড়িয়ে থেকেই বলল 'কেন, তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?'

বাবা হেসে উঠল। 'না রে না, দেখছিস না, কি ভীষণ ইমপ্রুভ করেছি আমি। ডাক্তারও তাই বলে গেলে।'

'তবে!'

বাবা কয়েক মুহূর্ত বিনয়কে দেখল। বলল, 'তুই একটা কাজ কর তো বাবা। ওই ওপরের তাকের একেবারে কোণে আমার কুষ্ঠিটা আছে, একবার দে তো বাবা।'

'কোথায়?'

'ওই যে দ্যাখ না! ওখানটা ঝুলে-নোংরায় ভর্তি হয়ে আছে।' বাবা আঙুল দিয়ে দেখাল। 'আমার কুষ্ঠির পাশেই তোরটা আছে। ওটা থাক।'

'এটা নিয়ে কি করবে?' কুষ্ঠি খুঁজতে খুঁজতে বিনয় জিজ্ঞেস করল।

'এমনি দেখব। উঁহু, ওটা নয়। আমারটা তো গাছকুষ্ঠি—বেশ বড়। হাত দিলেই বুঝতে পারবি।'

বাবা মাসে মাসে গণনা-করা কুষ্ঠিকে বলত গাছ-কুষ্ঠি। বিনয় কুষ্ঠি বের করে বাবার হাতে দিতে দিতে বলল, 'তুমি শুধু শুধু আজেবাজে কথা ভাব। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করে।'

'ভয়!' বাবা হাসল। খোলা কুষ্ঠির দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকে

বেকার বসে না থেকে নিজের চেষ্টায় ঘরেতে কুটীর শিল্প গড়ে তুলুন মাত্র ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে।

শিল্পের সন্ধানে ১৪·০০

সুভাষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এতে আছে ১০০টির ওপর বিভিন্ন কুটীর শিল্পের ফরমুলা সমেত বিশদ ব্যাখ্যা। কারও সাহায্য না নিয়ে নিজেই সবকিছু করা যাবে।

রকমারি বুক হাউস

৭৭, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯; ফোন ঃ ৩৪-৭৮৫৯

বলল, 'খাতার সব পাতা শেষ হয়ে গেলে কি আর ভষ থাকে?' হঠাৎ খোলা অংশটা বন্ধ করে বিনয়কে বলল, 'থাক, এখন দেখব না। তোর তো অফিসের তাড়া আছে, যা। এটা তোকে আর তুলে রাখতে হবে না। আমার মাথার বালিশের নীচেই থাকবে।' বিনয় ভিতরের ভীত আড়ষ্টতায় অফিস যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালে বাবা গভীর স্নেহে বলল, 'সাবধানে যাবি। ফ্যাক্টরিতেও খুব সাবধানে কাজ করবি বাবা। সময় সব সময়ে মানুষের ভাল যায় না।'...

সেদিন সেই হলদে পাকানো লম্বা কাগজটার কোন লেখাই যেন শুনতে চেয়েছিল বিনয়কে। বিনয় বাবার মুখের দিকে তাকাল। সেই পাকানো হলদে কাগজটার শেষ পাতায় কি এই লেখা ছিল? অকারণে সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল। বাবার মাথার দিকে ঝুঁকে বালিশের নীচে হাত ঢোকাল। পেয়ে গেল পাকানো কাগজটা। কি আছে এতে! কিছুটা খুলে বাতির আলোয় মেলে ধরল। বিনয় অবাক হয়ে গেল। হলদে কাগজটার শেষের খানিকটা অংশ বাবা নিজেই কবে যেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে! কেন? শেষটায় কি ভুল ছিল? শেষটা সম্পূর্ণ মিথ্যে! নাকি মেলাতে পারেনি বলে বাবা রাগ, অভিমান, আফশোসে ছিঁড়ে ফেলেছে! কার অক্ষমতা? বাবার নিজের, না, এই হলদে রঙের নানান চিত্র-বিচিত্র করা রহস্যময় কাগজটার?

বিনয় হাতের খোলা কাগজটা মেঝেয় রাখতেই মুড়ে গুটিয়ে গেল। অদ্ভুত শূন্য মনে কয়েক মুহূর্ত স্থির বসে থাকার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে দেয়ালের ওপরের তাকের কোণে হাত রাখল।

...'এই খোকা নিজের কুষ্ঠি কখনো দেখবি না। বাববার দেখা খুব খারাপ।' মা প্রায়ই বলত। এই মুহূর্তে মনে হল, পাশের ঘর থেকেই মা যেন চীৎকার করে ওকে বারণ করল!

কিন্তু কেন দেখবে না! বড় হবার পর মা একবার দেখিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। তখন কিছুই বোঝেনি। বোঝার এতটুকু চেষ্টাও করেনি। এখন দেখায় ক্ষতি কি?

বিনয় এক সময়ে বাতির আলোয় ওর কুষ্ঠিটা মেলে ধরল। বাবার কুষ্ঠির মত বড় নয়। হাত চারেক লম্বা হবে। হলদে কাগজের ওপর লাল কালির সরু লাইন-টানা। লাইনগুলোর মাঝখানে কালো কালির কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে লেখা বিচিত্র রহস্যময় কথা। বিনয়ের এখন বয়স কত? পঁয়তিরিশ! শেষ থেকে খুলতে খুলতে চোখ বুলোচ্ছে বিনয়। বাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় লেখাগুলো জটিল, দুর্বোধ্য ঠেকছে। কিন্তু পঁয়তিরিশ বছরটা চোখে পড়তেই বিনয়ের দৃষ্টি থেমে গেল। কি ভেবে চমকে উঠল। সারা শরীরে কয়েক মুহূর্তে জমাট ঠাণ্ডার মত তীব্রতম শিহরণ। শরীরের সব রক্ত বুঝি জমে গেছে। হঠাৎ বিনয়ের হাত থেকে কাগজটা মুড়ে পাকিয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। যেন দম বন্ধ-করা ভয় ওর বুক-গলা চেপে ধরল। বিনয় আর্ত কাঠ। কি এক অস্বস্তি, অসহায়তা মানুষের চারপাশের অন্ধকার থেকে চুইয়ে বাবার মৃতদেহ ছুঁয়ে ওকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে! এমন ভয়ংকর শূন্যতার মধ্যে কেঁপে ওঠা!

বিনয় বাবার দিকে তাকাল। বাবার মুখ দেখে মনেই হচ্ছে না, বাবা বেঁচে নেই। ভয়ংকর যুদ্ধ করেছে বাবা বাঁচার জন্যে, পারেনি। মানুষ পারে না। পারে না বলেই মানুষ ছটফট করে, কাঁদে, সারাজীবন সীমাহীন অস্থিরতার মধ্যে কাটায়। বাবার মৃত্যুতে বিনয় কাঁদছে না। সহজে কান্না আসে না ওর। বড়দি, ছোড়দি থাকলে কাঁদত। কিন্তু এখন বিনয়ের নিজের ভেতরে কান্নার মত কিছু যেন ঠেলে উঠছে। নিজের অসহায়তার জন্যে? এত নিঃসঙ্গ কেন? আবার বাবার মৃত মুখ চোখে পড়ল। ও কি পাগল হয়ে যাবে?

দ্রুত উঠে দাঁড়াল বিনয়। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়াতে জড়াতে প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার গলি পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। শীতেও হাঁপাচ্ছে ও। এ-সি কারেন্ট থাকায় সামনের পার্কের, রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্ট, এদিক-ওদিক দু-একটা দোকানের আলো নেভেনি। সন্ধ্যের ধোঁয়া-মেশানো কুয়াসায় ঢাকা চারদিক। বিনয় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। একটা সিগারেট ধরাবে ভেবে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখল, সঙ্গে কিছুই আনেনি। লাইট-পোস্টটায় হেলান দিয়ে

শারদোৎসবের অঙ্গ

দয়ারামের

প্রসিদ্ধ শাড়ী বিপণী...ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক ফ্যাশানের সমন্বয়ে মনোহর...মনমাতানো...মনরাঙানো শাড়ীর মেলা

দয়ারাম এণ্ড কোং

(শাড়ীর রাজা)

জি ১/৫, নিউ মার্কেট, কলিকাতা—১৩

ফোন ঃ ২৪-১৪৫০ গ্রাম ঃ রেশম কুটি

স্থির সম্ভিত হইল কিছু সময়।

চারপাশে চীৎকার, হুড়োহুড়ি, সারাদিনের ক্লান্ত থেকে ফেরা জনতার ক্লান্ত ট্রাম-বাসের শব্দ, রেস্টুরেণ্টের টেবিলগুলোয় খদ্দেরদের উচ্চহাসির কলরোল, পথচারীদের আলাপ—এ-সবের মধ্যে বিনয় যেন ডুবে গেল। রাস্তার ওপাশে পার্কের অন্ধকার রেলিং ঘুঁষে এখানে-ওখানে কয়েকটা বেঞ্চি দাঁড়িয়ে। কাছেই মৃদুপরিচ্ছন্ন অবকুর্ননা, একটু দূরে পেচ্ছাবখানা। কুয়াশা-ঢাকা বেলাশেষে ক্লান্তি-শান্তিতে সমস্তকে চুকচুক করছে। ওদের শান্তি-ক্লান্তি মাখানো মাখার ভান। অন্ধকারে ওদের পা ঘুঁষে-ঘুঁষে কয়েকজন পথ-চারী মানুষ সন্তর্পিত ব্যস্ত প্রেমিকের মত ধীরে মাঝে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ দূরে মেয়েদের মুখে শরৎচন্দ্রের ধরনি বাম নাম শুনে ফেলে।

বিনয় পার্কের অন্ধকার-ঢাকা পাম-গাছগুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আকাশ দেখল। শীতের আকাশ নক্ষত্রে ঠাসা। সামনেই একটা ট্রাম বিশ্রী শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াতেই বিনয় ওদিকে দৃষ্টি রাখল। অফিসযাত্রীরা ফিরছে। 'এদের মধ্যে মিনতি না!' ট্রাম থেকে নামা একটি মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই বিনয় বিড় বিড় করল। সোজা হয়ে দাঁড়াল বিনয়। মেয়েটি এদিকে না এসে ক্লান্ত পায়ে ওদিকে এগোতেই বিনয়ের ভুল ভাঙল।

কিন্তু মিনতি আজই তো আসবে কথা ছিল। কিন্তু বিড় বিড় করল বিনয়। আজই এখনি মিনতি আসতে পারে। কথাটা মনে হতেই বিনয় ঘরে ফিরে এল। বাবার মৃতদেহের সমান নিশ্চুপ শুয়ে রইল। বাবার মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় বাবার চোখের পাতা দুটি হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল বিনয়। কুকের ওপর থেকে কম্বলটা টেনে মুখ-মাথা ঢেকে দিল। ঘাতিটার দিকে তাকাল। নতুন মোটা একটা বাতি জ্বেলেছে বিনয়। এখনি শেষ হবে না।

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৩৭-২০৫১।

বিনয় নিঃসাড় বসে থেকে ভাবল, ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে এখনি। আলো জ্বললে বাবাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসের একেবারে শেষের দিক। হাতে এখন যাবতীয় খরচ করার মত এত টাকা নেই। আরো অনেক কাজ। ও একা কি করবে? মিনতির কথা মনে হল। ও যদি আসে অনেক সাহস পাবে বিনয়। মিনতি কি আজ আসবে?

আসবে নিশ্চয়ই! বিনয় মনে মনে বলল। কদিন আসেনি ও। দিন পাঁচেক আগে শেষ দেখা হয়েছিল ওদের অফিসের সামনে ছোট পার্কটায়।...

মিনতি কাছে এসে দাঁড়াতেই বিনয় বলল, 'আজ তোমাকে একটা কথা বলব মিনু।'

অফিস-ক্লান্ত মিনতি বিনয়ের দিকে তাকাল। মুখে শান্ত হাসির ছায়া।

'এবার একদিন সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ি এসো। দুজনে খুব কাছাকাছি বসে গল্প করা যাবে। কত দিন আমরা একা হইনি, হিসেব আছে?' মিনতিকে নীরব থাকতে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'কি, একা একা আমার কাছে আসার ইচ্ছে নেই বুঝি?'

'বাবা কেমন আছেন?' মিনতি চতুরভাবে প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল।

'ভীষণ ভাল। বাবা তো উঠে বসছে এখন। পিসি বলল, একা একা উঠে বাথরুম পর্যন্ত গেছে দু-তিনবার। বাবা তো খুব তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করছে। ডাক্তারবাবুরও তাই মত।'

'তাহলে তো ভালই।' মিনতির মুখ উজ্জ্বল। 'আজ তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথাটা তাহলে সেরে নেব।'

'তোমার তো মাঝে মাঝেই জরুরী ব্যাপারটা দেখা দেয়।' বিনয় শব্দ করে হাসল।

'না, সত্যি!' মিনতির মুখ ঈষৎ গম্ভীর, বিষণ্ণ।

'বেশ, বল।'

'এখানে নয়, চল একটু হাঁটি। অফিসে একভাবে বসে টাইপ করতে করতে কোমর ধরে গেছে।'

হাঁটতে হাঁটতে বিনয় বলল, 'আমাদের ফ্যাক্টরীর খবরটা আগে দি। এখনো কিন্তু কোম্পানি ট্রাইব্যুনালের রায় মানছে না। আবার বোধ হয় গোলমাল হবে।

'তাতে কি?' মিনতি সোজা তাকাল বিনয়ের দিকে। একটু থেমে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এবার কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের ব্যবস্থা করো। যত তাড়াতাড়ি পারো। আর টানতে পারছি না।'

কি ব্যবস্থা করতে বলছ?'

'যদি বলি দুই-এ!' মিনতি মুখ তুলে বিনয়কে দেখতে দেখতে বলল।

'আমি যদি বলি, ও ছাড়াও অন্য কিছু তুমি চাইছ?' বিনয়ের কণ্ঠস্বর একটু লঘু।

'কি?'

'সুখ!'

'তা কি খুব অন্যায় হবে? নাকি চাইলে স্বার্থপর বলবে আমাকে!' মিনতি স্থির তাকিয়ে আছে বিনয়ের দিকে। 'জীবনটার কত বছর চলে গেল বল? আর একা থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।'

'আগে তো বলতে, মা-ভাইদের ছেড়ে আসতে পারবে না! এখন?'

'তোমার কাছে থেকেও সকলকে দেখতে পাবি, দেখার মত মন আমার আছে।' হঠাৎ থামল কিছু সময়। বলল, 'তোমার বুঝি এখনো সময় হয় নি? এত কথা বলছ কেন?' চমৎ রুক্ষ হয়ে গেল মিনতির গলা।

অবাক হয়ে বিনয় বলল, 'বয়স আমারও হয়েছে মিনু। কিন্তু একসঙ্গে থাকার দায়িত্ব অনেক। আর একটু ভাবতে দাও, সময় দাও।'

'এখনো সময়?' মিনতি অবাক হয়ে তাকাল বিনয়ের দিকে। কি ভেবে বলল, 'ভুল হও না, কোন কিছুর শেষ যখন আসে, তাড়াতাড়িই আসে। তখন আর সময় থাকে না কিছুরই।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ?'

'রাগ নয় বিনয়।' মিনতি হঠাৎ নীরব হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই বলল, 'সব কিছু সামনে নিয়ে এগোতে গেলে সামলানোই হবে, এগোনো হবে না। অগোছালো জীবন নিয়ে চলতে চলতে বেশ, চলতে চলতেই যখন জীবন বেশ গোছানো হয়ে গেছে। আমি সেইজন্যেই তোমাকে চাইছি।'

চুপ করে দুজনে হাঁটল কিছু সময়।

'তা হলে, আমাকে আরও একটু ভাবতে দাও।'

হঠাৎ একটা বাস সামনে এসে দাঁড়াতেই মিনতির চলা থেমে গেল। কি ভেবে কয়েক পা এগিয়ে গেল বাসের দিকে। 'আমি চলি।'

'সে কি! এখনি!'

'ভাল লাগছে না।'

'কবে আবার দেখা হবে?'

মিনতির এগোনো মন্থর হল। 'বাবা তো ভাল আছেন। কদিন যাচ্ছি না। দিন পাঁচেক পরে দেখতে যাব।' বাসে উঠে পড়ল মিনতি।

'শুক্রবার তো?' বিনয় বাসে-বসা মিনতির দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিনতি ঘাড় নেড়ে বলল। মুখে পরিচিত বিষণ্ণতার ছায়া।

'আজ শুক্রবার।' অফিস থেকে সোজা আসবে হয়ত। বিনয়ের মনে পড়ল,

সেদিন চাপা অভিমান নিয়ে চলে গেছে মিনতি। বাবার অসুখ, ফ্যাক্টরির কাজ—সব কিছুর ঝামেলায় অভিমান ভাঙাতে যেতে পারে নি বিনয়।

বিনয় মাঝে মাঝে অনুভব করে, মিনতির মধ্যে ভয়ঙ্কর এক চাপা অভিমান কাজ করে। ষোল বছর বয়স থেকে চাকরীর খোঁজে বাড়ির বাইরে পা দিয়েছে। সরকারী দুধের ডিপো, প্রাইভেট টিউশানি, লিভ-ভেকান্সিতে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারী থেকে সুরু করে শেষে এক মার্চেন্ট অফিসের টাইপিস্ট হয়েছে মিনতি। বিধবা মায়ের সংসারে ছোট ছোট চার ভাই-বোনকে বড় করে মানুষ করতে করতে তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছে। এখন সুখ চায়! এ সুখ বুঝি আশ্রয় পর্যন্ত! চারপাশে মিনতির ভাই-বোন-মায়ের মধ্যেও মিনতি একা নিঃসঙ্গ! বিনয় যে ওর থেকেও একা! এই মুহূর্তে ওর কেউ নেই! কোথায় ওর আশ্রয়?

বিনয় বাবার কম্বলে ঢাকা শরীরের দিকে তাকাল। বাড়ির কাঁপা-কাঁপা আলোয় গভীর অন্ধকারের মধ্যে চোখ বুলোল। মিনতির কথা ভাবতে ভাবতে এই মুহূর্তে কোন ভয়, শিহরণ নেই ওর, কিন্তু এক শূন্য, অসহায় নিঃসঙ্গতা ওর বুকের চাপা নিঃশ্বাসকে যেন শব্দময় করল।

'বিনয়।' বাইরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুটে ডাকল মিনতি।

'কে?' বিনয়ের যেন সম্বিৎ ফিরে এল।

'আমি।' মিনতি বলল। 'আমি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি না, একটু আলোটা দেখাও তো!'

বিনয় অন্ধকারের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে মিনতির সামনে দাঁড়াল।

'দেখ, এই রাস্তা, ঘর এত পরিচিত, তবু অন্ধকারে একটুও ঠাহর করতে পারছি না।' মিনতির কণ্ঠস্বরে চাপা উচ্ছলতা। 'তুমি কি? একটা বাতিও সঙ্গে আনতে পারলে না!' বিনয়কে স্থির, নীরব থাকতে দেখে বলল, 'নাও, তোমার দেশলাই জ্বালো, দেখি। নাকি, সিগারেট-খোরের দেশলাই-এরও অভাব!' মিনতি গলায় হাসির ছোট ছোট শব্দ করতে করতে সামনে একপা বাড়াল।

বিনয় হাত ধরল মিনতির। 'এসো।'

'ইস্! তোমার গলার স্বর যেমন হাতও তেমনি ঠাণ্ডা!' একটু থেমে বলল, 'এভাবে কথা বলছ কেন? দূর, আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

'বাবা, একটু আগেই মারা গেলেন।'

'সে কি!' এতক্ষণের উচ্ছল মিনতি আকস্মিক ধাক্কায় বিমূঢ় হয়ে পাথরের মত স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চারপাশে কঠিন স্তব্ধতা। বিনয়ের হাতের মুঠোয় মিনতির উষ্ণ নরম হাত শিথিল, ঠাণ্ডা।

'ঘরে এসো।' বিনয় এক সময়ে বলল।

মৃতদেহের সামনে মিনতি নিশ্চুপ বসে রইল। ঈষৎ তফাতে পাশে বিনয়। বাতির ক্ষীণ আলো কম্বল-চাপা লম্বা মৃতদেহের ওপর কাঁপছে। মোড়া হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মিনতি সেদিকে তাকিয়ে আছে।

নিঃসাড় নীরবতা ভাঙল বিনয়। 'দেখবে মিনতি, বাবার মুখ কিন্তু একটুও মৃতের মনে হবে না।' বিনয় বাবার মুখের ওপর থেকে আবরণ সরালো।

মিনতি একভাবে দেখতে দেখতে চাপা রুদ্ধ গলায় বলল, 'আমি তো ভাবতেই পারছি না। কত সুস্থ দেখে গিয়েছিলাম।' মিনতির দৃষ্টি স্থির। এর আগে অনেক মৃত্যু দেখেছে মিনতি। বাবার, দিদিমার, এক পিসতুতো ভাইয়ের, একটু কম বয়সে ঠাকুমারও।

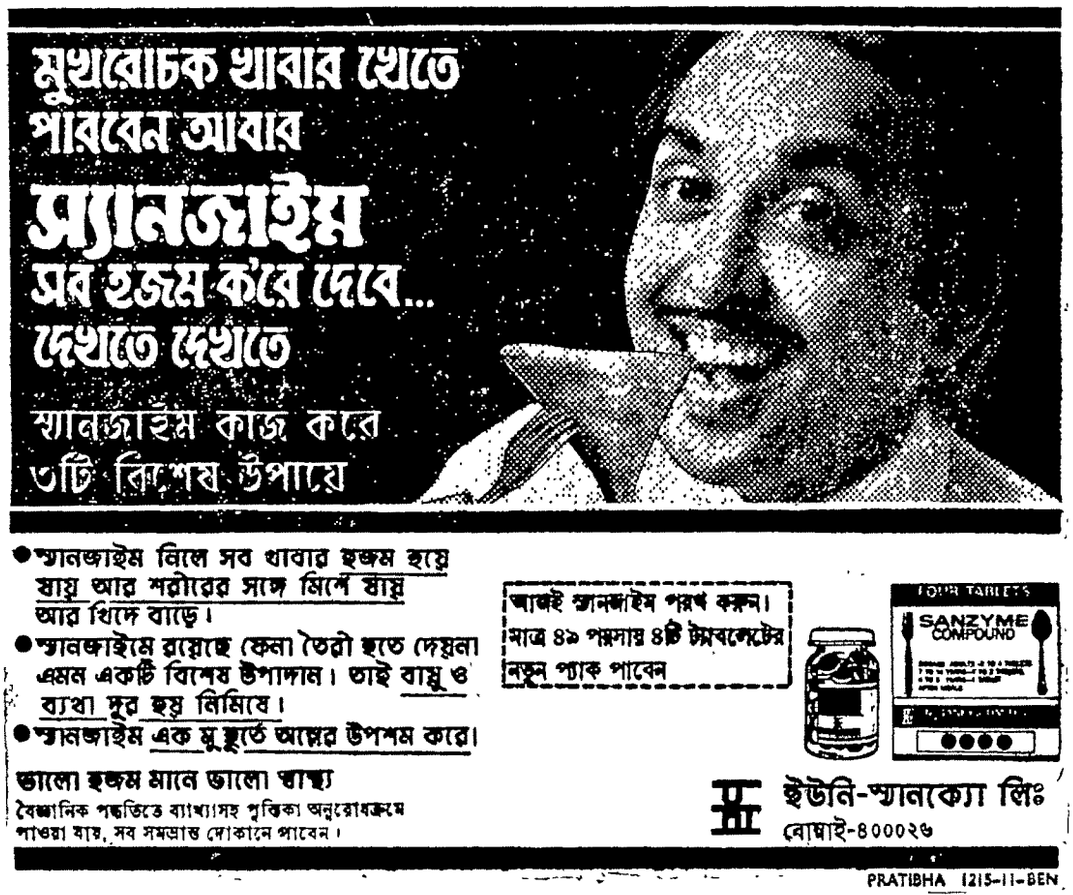

কলিকাতার পরিবেশক : মেসার্স আনন্দ মেডিসিন কোম্পানী, ৭৯/৪০, কলুটোলা স্ট্রীট কলিকাতা—১
পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক : মেসার্স প্রিমিয়ার মেডিক্যাল সাপ্লাইজ এণ্ড স্টোরস, ৪, এজরা স্ট্রীট কলিকাতা—১

ভিতরটা শক্ত মিনতির। কাঁদছে না। ঘরের শীতল পরিবেশে কাঠ হয়ে বসে রইল।

'কাল পর্যন্ত বাবা বাঁচার কথা বলেছে! এমন কি একবার শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারলেই কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবে ভেবে রেখেছিল।' বিনয় এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

মিনতি বিনয়ের দিকে তাকাল। 'সবই নিয়তি।' বিড় বিড় করার মত বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ও।

'বাবা এটা বুঝেছিল।'

'কি?' মিনতি স্পষ্ট করে তাকাল বিনয়ের দিকে।

'খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে।'

'বলতেন বুঝি?'

'বরং উল্টোটাই বলত। কালও তাই বলেছে।' থামল বিনয়। 'হয়ত আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই!'

'তবে!'

'দেখ।' একটু দূরে পড়ে-থাকা কুষ্ঠিটা আঙুল দিয়ে দেখাল বিনয়। 'এটা বাবা বালিশের নীচে রাখত, দেখত। একটু আগে মনে পড়তেই বার করে দেখি, শেষের দিকের বেশ খানিকটা করে যেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে বাবা।'

মিনতি কুষ্ঠিটায় হাত দিল না। অবাক হয়ে বিনয়ের কথা শুনছে।

'জান মিনু, আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম!'

'কেন!'

'একটু আগে বাবার কুষ্ঠি দেখে আমার কিরকম কৌতূহল হল! এইমাত্র দেয়ালের তাকে খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম। মা এগুলো নিজের কাছে রাখত। মারা যাবার আগে কি ভেবে বাবার কাছেই রেখে গেছে। আমাকে কিন্তু মা কিছুতেই এসব দেখতে দিত না!' একটু থামল বিনয়। 'কিন্তু আগে একবারও তা দেখতে ইচ্ছে বা কৌতূহল দেখা দেয় নি আমার। অথচ আজ—'

'আজ দেখেছ বুঝি?'

'দেখলাম।'

'কি?'

'কি, ঠিক বোঝাতে পারব না মিনু।' বিনয় থামল। হঠাৎ যেন একটু একটু করে হাঁপাতে সুরু করেছে। 'এখন তো পঁয়তিরিশ। যখন সদ্য-যৌবন ছিল, তখন এসব বিশ্বাসই করতাম না! প্রসঙ্গ উঠলেই হেসে উড়িয়ে দিতাম। একটা বিরাট মজা, কৌতুক, ভবিষ্যৎ নিয়ে টাকা ফেলে বাজি ধরার মত মনে হত গোটা ব্যাপারটা। এখন, এই মুহূর্তে বাবার সামনে নিজেকে হঠাৎ একা মনে হল। প্রথমে মনে হয়েছিল সাধারণ ভয়, যে কোন মৃত্যুর মত সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু না। মনে হল, এমন শূন্যতা তো আমার কোনদিন ছিল না!' বিনয় যেন রীতিমত হাঁপাতে সুরু করেছে। 'এরই মধ্যে ওটা দেখলাম।'

মিনতি সামনে পড়ে থাকা বিনয়ের কুষ্ঠির দিকে তাকাল। আবার বিনয়কে দেখল।

যেন ক্লান্ত অসহায় বিনয় বলে চলেছে, 'জান মিনু, সেই অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ কোত্থেকে ভয়ঙ্কর ভয় ঢুকে গেল। আমি ভিতরে ছটফট করছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমার বুঝি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে! ঠিক ঘুমের স্বপ্নের মৃত্যুর মধ্যে বোবায় ধরলে যেমন দম বন্ধ হয়, সেই রকম।'

'কেন, কি আছে ওতে?' মিনতির কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'আমি কি ছাই বুঝি, যে তোমায় বোঝাব! এখন শুধু মনে হচ্ছে এই পাকানো হলদে বঙের হাত চারেক লম্বা কাগজটা আমার জীবনের আদি-অন্ত আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। আমি কিছুতেই ও থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। আর বয়স যত বাড়ছে, ওটা আমাকে টি-বি জীবাণুর মত ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ করে দেবে। আমি কিছুতেই ও থেকে মুক্তি পাবো না!'

বিনয়ের শেষ কথাগুলো ফিসফিস শোনাল।

বাবার মৃত্যুতে বিনয় কাঁদে নি, খুব শক্ত থেকেছে। কিন্তু এখনি যেন মনে হল, বিনয় নিজের মধ্যেই কোথাও যেন ভয়ঙ্করভাবে শেষ হয়ে গেছে। এমন ক্লান্ত শীতল হতে বিনয়কে কোনদিন দেখে নি মিনতি।

মিনতিরও কি যেন ভয় হল। বলল, 'তুমিই বা কেন দেখতে গেলে ওটা?' একটু থামল। 'দেখি, ওটাতে কি আছে।' হাত বাড়াল মিনতি।

বিনয় কি ভেবে হঠাৎ যেন ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিল। 'না, তুমি দেখো না।'

মিনতির ভয়ের সঙ্গে চাপা বিস্ময় মিশল। 'তুমি সত্যি এত ভয় পাচ্ছ!' বিনয়কে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখে ওর কাছে একটু সরে এল। ঘনিষ্ঠ হল বিনয়ের। হাত ধরল। 'তুমি এরকম কোরো না। কেমন পাগলের মত হয়ে গেছ! আমার কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগছে।'

বিনয় উৎকণ্ঠিত মিনতির হাতের স্পর্শ অনুভব করল। ওর মুখ দেখল। দুচোখের জমি জলে চকচক করছে! 'মিনু, তুমি বিশ্বাস কর, আমি আর একদিনও একা থাকতে পারব না।' মিনতির হাত জোরে চেপে ধরল বিনয়।

'জানি।' মিনতি একভাবে বিনয়কে দেখতে থাকল। দীর্ঘনিঃশ্বাস মেশানো শব্দে বলল, 'এই মুহূর্তে তোমাকে দেখার পর আমিও আর ভরসা পাচ্ছি না।'

মিনতির হাত বিনয়ের হাতের মুঠোয় ধরা। কত মুহূর্তে কে জানে, ওরা এভাবে চুপ করে বসে থাকল।

এক সময়ে মিনতি বলল, 'এভাবে বসে থাকলে তো হবে না! অন্য সব ব্যবস্থা করতে হবে তো?' শ্রান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর মিনতির।

'আমার কাছে কিন্তু এখনি এত খরচের পয়সা হবে না।'

'আমার কাছে আছে, দুজনের মিলিয়ে হয়ে যাবে, নাও।' মিনতি ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতের মধ্যে নিল। 'পাশের বাড়ির টেলিফোনে মাকে খবর দি। আমার ভাই এসে যাবে। তুমি বোস, আমি বরং দিদিদেরও টেলিগ্রাম করে আসি।'

'তুমি কতক্ষণ থাকবে?'

'শেষ পর্যন্ত।' মিনতি বিনয়ের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ওর ডান হাতের দিকে তাকাল। 'ওটা কি হবে? দাও।'

'না।' বিনয় যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই ঘাড় নাড়ল। বাবার মুখের দিকে তাকাল। বাবার মুখের সঙ্গে ওর নিজের মুখের অনেক মিল আছে। মা বলত, ঠাকুরদার সঙ্গে ওর আরও বেশী মিল। বাবাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ বিনয়ের একথা মনে হল। মনে হল বাবা একা নয়, মৃত্যু হলেও বাবা হারিয়ে যায় নি। একবার মিনতির দিকে তাকাল। তার পরেই কম্বলটা গলার কাছ থেকে তুলে মুখ মাথা ঢেকে দিল।

হাতের গোটানো কাগজটার কিছুটা খুলল বিনয়। খোলা অংশটা বাতির দপদপে শিখায় ধরল।

'এই, কি করছ?' মিনতি হাত বাড়িয়ে বিনয়ের হাত ধরে টানার চেষ্টা করল।

'এটুকু পুড়িয়ে দিলে আমরা দুজনেই ভয়ঙ্কর সাহস ফিরে পাব। কি, তাই না?' বিনয় মিনতির দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

হলদে কাগজটা পুড়ছে। লাল কালির লাইন টানা অংশের মধ্যে রহস্যময় জটিল শব্দগুলো পুড়ে কালো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। জ্বলন্ত আগুনের আভায় অন্ধকার ঘর উজ্জ্বল, আলোকিত। মৃতদেহের ওপর লাল আগুনের দপদপে আভা। মিনতির ফর্সা, সুগঠিত মুখ, দৃঢ় পরিশ্রমী শক্ত শরীর লাল আলোয় নতুনের মত দেখাচ্ছে। বিনয় দেখছে মিনতিকে। মিনতির নির্ভয় দৃষ্টি বিনয়ের চোখে স্থির।

খানিকটা পুড়ে যাওয়া পর পঁয়তিরিশ বছরের কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ জ্বলন্ত কাগজটা নিভিয়ে দিল বিনয়। বাকিটা ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। বাতির স্বল্প আলোয় ঘরের কোণ শীতল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কঠিন হয়ে আছে।

শরৎ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে রবীন্দ্রসদনে শরৎচন্দ্রের ৯৮তম জন্ম দিবস পালন অনুষ্ঠানে তুষারকান্তি ঘোষ বক্তৃতা করছেন। মঞ্চে বসে আছেন (বাঁ দিক থেকে) দক্ষিণারঞ্জন বসু অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র মনোজ বসু প্রভৃতি।

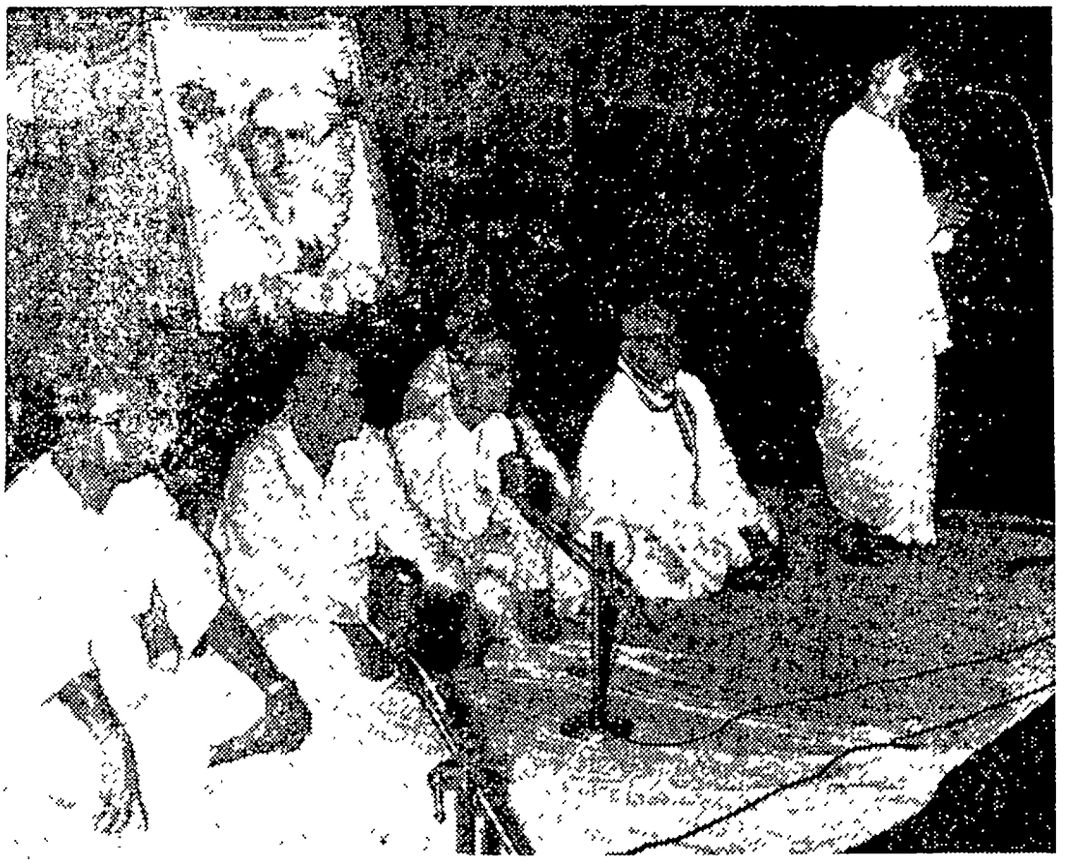

নতুন বই

বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬-৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা —৭। মূল্য সাড়ে ষোল টাকা।

বর্তমান গ্রন্থটি বাংলাদেশের নাট্যোৎসাহী ও নাট্য-রসিকদের কাছে একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলা লোকনাট্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই গ্রন্থটি রচনার পূর্বে লোকনাট্য বিষয়ে কিছু কিছু খণ্ড বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিষয় অবলম্বনে একখানি সুবৃহৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতে কেউ এগিয়ে আসেননি। সুতরাং লেখক ভূমিকায় বর্তমান গ্রন্থটিকে বাংলা লোকনাট্য সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে যে দাবি করেছেন তা অযৌক্তিক হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা হল, যে লোকনাট্য বা যাত্রা নিয়ে ইতিপূর্বে নাট্য-সমালোচকেরা আলোচনা করতে নিরুৎসাহ হতেন নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে দায়সারাভাবে স্থান দেওয়া হত ডঃ ভট্টাচার্য বিদ্বৎসমাজে অবহেলিত সেই বিষয় নিয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনা করে দুঃসাহসিকতা ও তাঁর অসামান্য কাব্য-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। এবং এজন্য তাঁকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছে এবং সেই সব অঞ্চলের লোকনাট্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে সেকথাও তিনি ভূমিকায় জানিয়েছেন। লেখকের এই অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার জন্য তিনি নিশ্চয়ই সুধী সমাজের প্রশংসা পাবেন। এবং রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে বাংলাদেশের অগণিত নাট্য-রসিক ও নাট্যোৎসাহীর অশেষ উপকার করেছেন।

এই গ্রন্থটি ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের

নতুন উপন্যাস !

প্রফুল্ল কুমার সিংহের **জনপদ** ৮.

এ যুগের কসমোপলিটন সমাজের দিকভ্রান্ত মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত কোনান ডয়ালের বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী

শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন ১০.

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা ১০.

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ ॥ হেনা চৌধুরী ১০.

সকল প্রকার বই-এর সুষ্ঠু প্রকাশনা, পরিবেশনা ও প্রচারের জন্য লিখুন :—
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌ লিঃ ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে লোক-উৎসবানুষ্ঠান, সংগীত, শিল্প ও সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লোকনাট্যের উপাদান সংযোজন ও প্রত্যাগ রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লোকনাট্যের ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস উপস্থিত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রায় হরিমোহন রায়, মানমোহন বসু এবং মদন মাস্টারের দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই শতকের বিশিষ্ট পেশাদার অধিকারী ও মহিলা-যাত্রার পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার পর্যালোচনা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন লোক-নাট্যকারদের পরিচয় এবং তাঁদের রচিত লোক-নাট্যের সমালোচনামূলক সমীক্ষা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া এই অধ্যায়ে বর্তমান শতাব্দীতে পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত 'কৃষ্ণযাত্রা' 'সত্যীবা' ও 'আলকাপ'-এর নাট্যধর্ম ও নামের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত 'টনসা-যাত্রা', 'পালাটীয়া যাত্রা' 'লেটোর পালা' 'কীর্তন যাত্রা' 'গুণবিবির যাত্রা' পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঝিমাকাল মলালিটি পেলে, অপেরার সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক নাটক ও সংগীত যাত্রানাট্যের থিয়েটারী নাটক, কালচি মেলোড্রামা যাত্রা বিবর্তনে আলো ও যান্ত্রিকতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়েই রবীন্দ্র-নাট্য ও যাত্রা শীর্ষক একটি আলোচনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের উপর যাত্রা কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা লেখক বিশদভাবে দেখিয়েছেন। গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে বিংশ শতাব্দীর বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া প্রখ্যাত পেশাদার লোকনাট্য সম্প্রদায় বর্তমানে চলিত বিশিষ্ট পেশাদার লোক-নাট্য সংস্থা কলকাতার সৌখীন লোকনাট্য সংস্থা বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত লোকনাট্য শিল্পীদের কথা ও লোকনাট্য সম্প্রদায়ের পরিভাষা ও নিদর্শাবলী ও বাংলার বিভিন্ন জেলার লোক-নাট্য সম্প্রদায়ের বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া লোক-নাট্যের দুজন প্রখ্যাত সুরকারের গানের স্বরলিপিও পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্তমান- কালে বিশিষ্ট যাত্রা-নাট্যকার যাত্রা-অভিনেতা যাত্রাপালা প্রভৃতির চিত্রও বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এগুলি গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার সন্দেহ নেই।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থের কোথাও কোথাও ছাপার ভুল লক্ষ্য করা গেল। বিশেষ করে এই ভুল যখন সন-তারিখের ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা যায় তখনই তা মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এই ত্রুটিটুকু না থাকলেই গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হত।

—সুবোধ ভট্টাচার্য

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য (জীবনী)—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ২১১, বিধান সরণী, কলকাতা—৬। চার টাকা।

বাংলাদেশে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সর্বপ্রথম যাঁর নাম করতে হয় তিনি রামমোহন। এই নবপ্রবর্তিত ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উনিশ শতকে যে এক সপ্রাণ ভাব ও ধর্মান্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তা বিফল হয়নি। অধুনা ব্রাহ্মধর্ম ও তার আচার-আচরণ সীমিত হলেও উনিশ শতকে এই ধর্মের প্রভাব বেনেসাঁকে যে কি অনুপ্রাণিত করে ও সামগ্রিকভাবে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে—তা ভাবলে আজও বিস্ময় কাটে না। প্রাণকৃষ্ণ আচার্য সেরকম একজন ব্রাহ্ম সমাজের মানুষ যিনি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতকেই জন্মগ্রহণ করে দীর্ঘ প্রায় ছিয়াত্তর বছর ধরে এই ধর্মের জন্য স্বকীয় সাধনা, আধ্যাত্মিকতা দিয়ে সমাজ ও সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষকে নানা-দিকে আলোকিত করে গেছেন। তিনি তাঁর মন ও আত্মার সম্বন্ধে উপার্জিত সামগ্রী দিয়ে যে সমস্ত উপদেশাবলী দিয়ে গেছেন, আলোচ্য গ্রন্থে সেই সমস্ত উপদেশাবলী তাঁর দীর্ঘ জীবনপ্রসঙ্গের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে। জীবন-প্রসঙ্গে লিখেছেন জয়কালী দত্ত। 'তত্ত্বকৌমুদী' সমিতির উৎসবে বিবৃত' ইত্যাদির উপদেশাবলীর মধ্যে 'ব্রতযাত্রা' 'প্রেমের প্রতিষ্ঠা' 'সদ্‌গুরুর শিক্ষা' 'আত্মোৎসর্গ'—এরকম শিরোনামের রচনা আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কিছু চিঠিপত্রও এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যোগী কর্মী ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অবশ্য পঠনীয়।

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী (১৩৮০)ঃ অশোক কুণ্ডু—ভারতী বুক স্টল, ৬, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৯। পনের টাকা।

শ্রীঅশোক কুণ্ডু সম্পাদিত 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী' (১৩৮০) প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের সময়েই যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়েছিল—যদিও এর সম্পাদনায় ত্রুটি সে সময়ে বুদ্ধিমান পাঠক গবেষকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সুখের বিষয় বর্তমানে গ্রন্থে শ্রীকুণ্ডু আগের অনেক ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়েছেন। অনেক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন। অধ্যায়গুলি সুসম্পাদিত ও সুলিখিত। সম্পাদকের এমন বিরাট প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু গ্রন্থটি সম্পূর্ণ রূপ দিতে আরও কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। যেমন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থের পূর্ণ তালিকা নিশ্চয়ই থাকা উচিত ছিল। অনুবাদকদের নাম ও পরিচিতিও আমরা সে ক্ষেত্রে আশা করি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের জেলা ভাগ করে প্রত্যেক জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ তালিকা সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জীতে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়ত, বাংলা কোষ গ্রন্থের সংখ্যা আজ পর্যন্ত প্রকাশের হিসাবে কম নয়। তাদের একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি না থাকা কি অযৌক্তিক হয়নি? এছাড়া কয়েকজন লেখকের গ্রন্থ তালিকা প্রণয়নে আরও স্থির চিত্তভাব পরিচয় থাকা উচিত ছিল। সম্পাদক এসব দিকে যত্ন নিলে গ্রন্থটি আরও অনেক স্পষ্ট রূপ পেতো। তবু গ্রন্থটি এখনো সর্বস্তরের পাঠক গবেষকদের কাজে লাগবে বলে আমরা মনে করি।

রূপবন্যা (উপন্যাস)ঃ রাধানাথ—অনন্যা প্রকাশন, ৬৬ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২। ছয় টাকা।

শ্রীরাধানাথ রচিত 'রূপবন্যা' উপন্যাসে একাধিক চরিত্র এনেছেন লেখক—সোমনাথ, থিয়েটার দলের মালিক কমলেশবাবু, সোম-নাথের সহপাঠিনী বান্ধবী চৈতালী অভি-নেত্রী করবী, সোমনাথের মা চৈতালীর বৌদি মীনাক্ষী— এরকম ছোট-বড় আরও অনেক। এরা কাহিনীর সহজে তৈরী করা জটিলতা বানানো সেন্টিমেন্ট ভালবাসা ইত্যাদির সূত্রে বাঁধা। সোমনাথ অভিনয় ভালবাসে। তাই চৈতালীর দাদা থিয়েটার দল থেকে আসে সিনেমায়। সেখানে সমাজে পরিচয়হীনা করবীর সাক্ষাৎ ঘটে। করবীকে সোমনাথের মা অপমান করে। সোমনাথ সব কিছু সামলাবার চেষ্টা করে। চৈতালীর দাদা মীনাক্ষীকে বিয়ে করে, এদিকে সোম-নাথ বিয়ে করে চৈতালীকে। কিন্তু চৈতালী জানে মীনাক্ষী তার দাদাকে ছেড়ে সোমনাথের ওপর নির্ভর করতে চায়। মীনাক্ষীকে শেষ পর্যন্ত পাগল করেছেন লেখক। কাহিনী সাজানো বানানো কৃত্রিম মেলোড্রামাটিক সিচুয়েশানে ভর্তি। চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতাও নেই। ভাষা ও গদ্যভঙ্গির দুর্বলতা উপন্যাস পাঠে অসুবিধে ঘটায়।

তোমার প্রতিমাঃ অরবিন্দ রায়—বিশ্ববন্ধন ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। সাড়ে তিন টাকা।

যা কিছু অমানবিক, তা কবিকে দুঃখ দিতে বাধ্য। কিন্তু তা সাধারণ দুঃখ নয়, কবির দুঃখ। এই দুঃখ-বেদনা কবির স্মৃতি, সুখ অতীত আনন্দ ইত্যাদি জাগিয়ে এক-সময়ে ভয়ংকর এক অবিরল ক্রন্দনের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিয়ে চলে যায়। কবি মনে এই ক্রন্দন থেকেই আসে অমানবিক বিষয় নিয়ে ভয়ংকর কবিতা, কখনো দুঃখে ভাল-বাসায়, কখনো বা মধুর-বিধুর স্মৃতি অনুষঙ্গে উঠে আসে। সুপ্রতিষ্ঠিত কবি অরবিন্দ বাগচির 'তোমার প্রতিমার' যা আকারে দ্বিতীয় প্রকাশের পর গ্রন্থ নিহিত কবিতাগুলি পাঠে আমাদের এই কথাগুলি প্রথমেই মনে পড়ে।

তিনটি পর্যায়ে কবিতাগুলিকে ভাগ করেছেন কবি। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি একাত্তর-বাহাত্তর সালের রচনা—যখন পূর্ব-

বাংলা মুক্তি সংগ্রামে রত, দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের পটভূমিকায় লেখা প্রায় দশ বছরে রচিত কবিতাবলী সংকলিত। তৃতীয় পর্যায়ে তোমার প্রতিমার প্রথম সংস্করণের কিছু কবিতা কবি নির্বাচন করে দিয়েছেন। কিন্তু এত সময়ের ব্যবধান থাকলেও কবিতাগুলির একটি মূলসূত্রগত যোগ আছে—তা হল কবি ভাবনায় ধৃত এক বাংলাদেশ—তার বিবিধ বিচিত্র রূপ, বেদনা থেকেই কবি বলেছেন 'একাত্তরের বাংলাদেশকে—যাই না যাই, দেখা হোক অথবা না হোক। তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছো।' বলেছেন—'আমার রক্ত, আমার জন্ম আমার বাংলাদেশ।' দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় বাংলাদেশকে ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে আছে স্মৃতি, প্রেম-অপ্রেমের ছায়াছবি—আর এসব উজ্জ্বল হয়েছে কবির সুন্দর চিত্রকল্প রচনায়—'শুধু তুমি কোন ছোটবেলাকার সাদা মেঘ/এখনো রয়ে গেলে।' শেষ পর্যায়ে কেবল স্মৃতি দুঃখ—'কতদিনের কত ছবি।/তবু কি ফেরা যায়।' কবির আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা-গভীরতার পাশেই আছে রোমান্টিক বিষণ্ণতা অসহায়তা, দীর্ঘশ্বাস কখনো বা একান্ত অন্তরঙ্গ করে কাছে পাওয়ার এক অত্যদ্ভুত আনন্দের মায়া—তাও স্মৃতি অনুষঙ্গে ভিন্নকালের সঙ্গে তুলনায় রঙিন—'আর/ভিন্নকালের গৃহবধূর মত। লাল চেলি রঙিন শাঁখা, আলতা পায়ে/তুমি এই সারাক দিনের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছ।' সেই অমানবিকতা—যা বাংলাদেশকে ভয়ংকর মলিন ক্লান্ত করেছে—কবিকে তাই এক আত্মনিষ্ঠ মেজাজে বাজিয়ে দিয়েছে। 'তোমার প্রতিমা' কাব্য সংকলনের নতুন-পুরনো কবিতাগুলির সম্মিলিত কবির সেই একটি গোপন কণ্ঠই সিম্ফনির বেদনার গভীর ইমেজে ধরা পড়েছে। কবির বেদনার্ত হৃদয়ই এ কাব্য গ্রন্থের প্রধান 'ইমেজ।'

ভারতের বাইরে প্রবাস (১ম খণ্ড)—ডঃ গৌরমোহন দাস দে ও শ্রীমতী নীহারকণা দাস দে। 'শৈলাবাস' পি—৭—১১ (এস্) কল্যাণী, নদীয়া। ছয় টাকা।

অধুনা বেশ কিছু ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে। 'ভারতের বাইরে প্রবাস' গ্রন্থ সেই সাহিত্যধারায় নূতন সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ও লেখিকা শুধুমাত্র দেশ দেখার উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ আঁখি মেলে বিভিন্ন দেশের স্বরূপ ও সত্তা উপলব্ধি করার মানসে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। মস্কো থেকে ডিসনিল্যান্ড ওয়াশিংটন, কোপেনহেগেন ইত্যাদি পৃথিবীর বিখ্যাত জায়গা ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা আলোচ্য গ্রন্থে তথ্যসমৃদ্ধ ও রসসমৃদ্ধ দৃষ্টিতে উপস্থাপিত। 'কল্যাণী থেকে মস্কো,' 'ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কি' 'নরওয়েডে দুদিন', 'ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন' 'হোয়াইট হাউস' 'ডিসনিল্যান্ড' ইত্যাদি শিরোনামায় কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় রচনা করেছেন লেখক-লেখিকা। তাঁদের বর্ণনাভঙ্গি বাস্তবিকই প্রশংসা পাবার মত। ভ্রমণরসিক মানুষ এ গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন।

দিল্লী চলো (নাটক)—উৎপল দত্ত। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি বিধান সরণি, কলকাতা—৬। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীযুক্ত উৎপল দত্ত একজন বিখ্যাত নট ও নাট্যকার। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারায় ও অভিনয়-শিল্পের নবত্ব সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনায় তাঁর দান অবশ্যই উল্লেখ্য। অঙ্গার, ব্যারিকেড, টিনের তলোয়ার ইত্যাদি নাটক রচনা ও পরিচালনায় তিনি রীতিমত বিতর্কিত নট ও নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'দিল্লী চলো' নাটকে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও সে সময়ের জার্মাণ শক্তি স্বরূপকে সমবেত করে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আন্দোলনের এক বৈপ্লবিক অধ্যায়কে জীবন্ত নাট্যসংগতে সক্রিয় করেছেন। আসামের মণিপুর অঞ্চল ক এ-নাটকের পটভূমি করা হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্র ঘটনা ও পরিণতির চিত্রের মধ্যে নাট্যকার কল্পনায় যে অংশগুলি যোজনা করেছেন তা কালানৌচিত্য দোষে আদৌ দুষ্ট হয়নি। চরিত্রগুলি গতিপ্রাণ এবং তাদের সংলাপ তথ্যসমৃদ্ধ উত্তেজক হলেও কোথাও নাটককে থামিয়ে রাখেননি। উৎপলবাবু প্রায় সব নাটকেই কমবেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা চিন্তা করেন। এ নাটকেও তা দুর্লক্ষ্য নয়। গেরিলাবাহিনীর ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা, সেই সূত্রে অন্যতম গেরিলা প্রদ্যোতের শত্রুপক্ষে যোগদান, নেতাজীর সংবাদ ফাঁস করা, পরে মিথ্যা নেতাজীর পরিচয় দিয়ে বন্দিশিবিরকে প্রবঞ্চিত করার অংশটি নাটকের গতিকে ও নাট্যক্রিয়ার চমককে শিল্পসমন্বিত করেছে। চরিত্রগুলি সু-অভিনীত। নাটকটি মঞ্চোপযোগী এবং সার্থক অভিনয়ে জীবন্ত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পূজার আগেই। এই সংখ্যাটি দুভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রামমোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত। মূল্য ৩ টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

• মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : পুলেন্দু লাহিড়ী • ট্রাজেডির নায়ক : জীবনকৃষ্ণ শেঠ • বাংলা আধুনিক কবিতার জন্মস্থান : সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় • অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় • মোহন্ত এলোকেশী সংবাদ : মধুমিতা বসু •

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র : রামমোহন রায় ॥

• বেদান্তদর্শন ও রামমোহন : শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য • অষ্টাদশ শতক রামমোহন এবং যুক্তিবাদ : নির্মল ঘোষ • বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন : ক্ষুদের চৌধুরী • নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন : কুমুদ ভট্টাচার্য • বেনেসাঁসের তাৎপর্য ও রামমোহন : দিলীপকুমার নন্দী • এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

॥ বিশেষ রচনা ॥

বাঙ্গালি মুসলমানদের সাময়িক পত্র—সাধনা (১৮৩১-১৯৩০) এটি লিখেছেন মুহম্মদ নুরুল হুদা। একশো বছরের মুসলমান সম্পাদিত দেড়শোটি পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংকলন। ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নি।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

কথায় কথায়

আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'গোবিন্দবাবু, কাপড়-কাচা সাবান খেতে কিরকম লাগে?'

কিংবা 'কেরোসিন তেলের স্বাদ কেমন?'

আপনার একমাত্র প্রতিক্রিয়া হবে উত্তর না দেয়া। আপনি হয়তো হেসে ফেলবেন, এমনকি প্রশ্নকারী ইয়ার্কি করছে ধরে নিয়ে রেগেও যেতে পারেন। আপনার সন্দেহ হতে পারে যে এই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটি নির্বোধ অথবা উন্মাদ কিংবা বিপরীতক্রমে এই ব্যক্তিটি আপনাকে ঐরকম অর্থাৎ বোকা বা পাগল কিছু ঠাউরেছে।

আসলে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে দেখবেন প্রশ্ন দুটি আপাততঃ যতটা বাজে, অবান্তর, উদ্ভট মনে হচ্ছে ঠিক তা নয়। কোনো না কোনো উপায়ে আমরা সবাই সাবান ও কেরোসিন তেলের স্বাদ কি রকম সেটা খুবই ভালই জানি।

কিন্তু আমরা কখনোই কেরোসিন তেল খেয়ে দেখিনি। সাবান-ও খেতে হয়নি কখনো। হয়তো মুখে মাখতে গিয়ে বা দাড়ি কামাতে গিয়ে আমরা হঠাৎ কখনো গায়ে মাখা কিংবা দাড়ি কামানোর সাবানের স্বাদ জিভে পেয়েছি, কিন্তু কাপড়-কাচা সাবানের স্বাদ? একটু চেষ্টা করলেই সেই স্বাদ কিরকম ভালো ভাবে মনে করতে পারি। তাহলে আমরা কি কখনো কাপড়-কাচা সাবান বা কেরোসিন তেল খেয়ে দেখেছি।

নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু এগুলোর স্বাদ আমরা জানি, খুব স্পষ্ট করেই জানি। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, এই স্বাদের স্মৃতি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে এই অভিজ্ঞতা, মানুষের আরো দশরকম অভিজ্ঞতার মতই আমরা অর্জন করেছি।

কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা, তাঁরাই বা এই স্বাদ কি করে জানলেন? একথা কল্পনা করা কঠিন (এবং উচিত নয়) যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গ্যালন-গ্যালন কেরোসিন তেল কিংবা ঝুড়ি ভর্তি সাবান খেতেন।

তাহলে এই রহস্যের কোনো সমাধান নেই। পায়ের উপর দিয়ে একটা চিকন লম্বা ঠান্ডা সাপ সরসর করে কিলবিলিয়ে চলে গেলে কি রকমের অনুভূতি হয় তা কি কেউ জানে না? অবশ্য জানে নিশ্চয়ই জানে। কিন্তু কটা লোকের পায়ের উপর দিয়ে সাপ চলে যাওয়ার মত মহৎ ঘটনা ঘটবার সৌভাগ্য জীবনে হয় এবং হওয়ার পরেও তাঁর জীবন থাকে কি-না এসব প্রশ্ন অজানা রেখেও আমরা সবাই সাপ পায়ের উপর দিয়ে চলে গেলে কেমন লাগে খুব ভালো ভাবে জানি।

দশতলা বাড়ির ছাদ কিংবা এরোপ্লেন থেকে পড়ে গেলে কেমন বোধ হয়। মাটিতে পড়ার পর কেমন বোধ হয় এ-প্রশ্নের জবাব প্রত্যাশা করা অনুচিত। কিন্তু পড়তে-পড়তে আকাশপথে যে কয়েক সেকেন্ড ভাসমান বা উড্ডীয়মান অবস্থায় কাটে সেই সময় কেমন লাগে?

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও আমরা সবাই কিন্তু কম-বেশি মোটামুটি-ভাবে জানি পড়ে যাওয়ার সময় কেমন বোধ হয়। স্বপ্নে উপর থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘুমের মধ্যে প্রায়ই ঘটে।

এই সব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমাদের মত সাধারণ লোকের মাথাব্যথা নেই। কেরোসিন তেল বা সাবানের স্বাদ, সাপের স্পর্শ-সুখ কিংবা আকাশ থেকে পতনের মহৎ অনুভূতি এইসব ব্যাপার নিয়ে মাথা আমাদের ঘামানোর সময় কোথায়?

কিন্তু সম্প্রতি এক ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী হয়ে এসেছেন তিনি প্রতি রবিবার সকালে একটি বিচিত্র জিজ্ঞাসা নিয়ে আমার কাছে আসেন। কোথায় কানাডাতে তাঁর এক আত্মীয় কি এক মনস্তাত্ত্বিক রহস্যময় বিষয়ে গবেষণারত, তাঁরই সাহায্যার্থে এই প্রশ্নমালা থেকে উত্তর সংগ্রহ করে তিনি পাঠান। এবং আমাকেই তিনি আদর্শ উত্তরদাতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

প্রথম দিকে উত্তরগুলি আমি শান্ত এবং নিরাসক্ত ভাবেই দিচ্ছিলাম। কিন্তু প্রতি রবিবার সকালে এই ধারাবাহিক অত্যাচার আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তদুপরি প্রশ্নের ধরণ ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে। ফলে আমিও এখন মরিয়া হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করছি।

গত রবিবার প্রতিবেশী মহোদয়ের প্রশ্ন ছিলো 'পাগলা বুনো শুয়োর কামড়ালে কেমন লাগে?'

শরৎদিনের মধুর সকালে রবিবারের মেজাজে এক কাপ চা খেয়ে খবরের কাগজের জন্য অপেক্ষা করছি সেই সময় হাসি-হাসি মুখে এই প্রশ্ন। ইচ্ছে করছিলো ভদ্রলোককে দাঁত খিঁচিয়ে আমি কামড়িয়ে দিয়ে বলি, 'এই রকম।'

কিন্তু হাজার হলেও প্রতিবেশী। নিজেকে যথাসাধ্য সামলিয়ে নিলাম। বরং একটু ব্যাখ্যাশ্রয়ী ভাষায় বললাম, 'যতদূর জানি, পাগলা বুনোশুয়োর কামড়াতে পারে না।'

ভদ্রলোক আমার এই ধরনের জবানে বিস্ফারিত নেত্র হলেন 'সে কি মশাই? আমার জানাশুনো কত লোককে পাগলা বুনো শুয়োরে কামড়েছে?'

মনে মনে বললাম, তাহলে আমাকে জ্বালাচ্ছেন কেন, তাদের কাছেই যান না। কিন্তু মুখে বললাম, 'অসম্ভব এ হতে পারে না। বুনো শুয়োর পাগলা হলে কখনোই কামড়াবে না, কারণ তখন তার কামড়ানোর ক্ষমতা থাকে না। বুনো শুয়োর কেন পাগল হয় জানেন?'

'কেন?' আমার দিক থেকে এইরকম পাল্টা প্রশ্নবাণে ভদ্রলোক অসহায় বোধ করছিলেন।

কিন্তু আমি এখন ছেড়ে দেয়ার পাত্র নই, আমি বললাম, 'বুনো শুয়ের দাঁত পড়ে গেলে পাগল হয়, তার আগে হয় না। আর সেই জন্যেই, দাঁত না থাকার জন্যেই পাগলা বুনোশুয়োর কামড়াতে পারে না। যদি কাউকে কখনো বুনোশুয়োর কামড়ায় বুঝবেন সেটা পাগলা ছিলো না।'

ভদ্রলোক কি বুঝলেন জানি না ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন। আজ পরের রবিবার বেলা এগারোটা হতে চলেছে এখনো তিনি এলেন না। আমার কেন যেন কাপড়-কাচা সাবানের ঢেঁকুর উঠছে।

অমলেন্দু রায়

কখনো সখনো

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

আবির্ভাবটি ঘটলো অথচ একটা তুচ্ছ ছুতোয়। মাত্র এক গ্লাস জল তার পট-ভূমিকায়।

মেজদার ভাত বাড়া হয়েছে, মা অনেক-ক্ষণ বসে রয়েছেন অথচ মেজদা বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে, আসছে না।

কথা বলছে তো বলছেই।

এইরকমই ওরা করে অবিশ্যি। দাদারও এই অভ্যাস ছিলো। বন্ধু এসেছে, ঘরে ডেকে এনে বসা না বাবা তা নয়, যিনি এসেছেন তিনি টুক্ করে একটু ডাকবেন আর যাঁকে ডাকা হলো, তিনি টুক করে বেরিয়ে পড়ে ওই দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে পড়বেন। ঘন্টা কেটে যাবে। পায়ে ব্যথাও করে না এই আশ্চর্য্য।

আমার তো কাজকর্মের বালাই নেই, অতএব এসব আমারই চোখে পড়ে। আমি মেজদার ওপর রেগে যাই এক এক সময়। আড্ডা দিবি তো এক জায়গায় বসেটসেই দে না। আমরা অভাগারা সে আড্ডায় যোগ দিতে না পাই, কী নিয়ে ওরা এতোক্ষণ গল্প করে কোন ভাষায় কথা কয় তার ছিটেফোঁটাও তো শুনতে পাই।

বাইরের জগতের বার্তার জন্যে তো চিত্ত পিপাসিত। কিন্তু সে জগতের বার্তা আসছে কখন বাড়িতে?

আত্মীয়জনেদের মধ্যে যেসব তরুণ বয়স্করা আছে, তারা যদি আসে তো এসে মার সঙ্গেই কথা কয়। অতএব তাদের জগতের কথা কয় না।

আমার সঙ্গে কথা কইতে বসবে এ ছাড়-পত্র পেলে তো? হলেও ভাইটাই, 'তুতো' সম্পর্কিত সম্পর্কে তেমন উদার মনোভাব ছিল না বাড়িতে। মার তো নয়ই, বাবাকেও দেখেছি খুব কম ছেলেকেই পছন্দ করতেন। ওরা চলেটলে গেলে, হঠাৎ বলে বসতেন 'দেশের অধিকাংশ ছেলেই তো এই! অসার!'

কাজেই ওদিকে বিশেষ সুবিধে ছিল না।

আর প্রধান আড্ডা দেওয়ার সম্পর্ক 'জামাইবাবু'?

আহা কী নিধিই দিয়েছেন ভগবান!

বাবাকে যে দেখতে হয়নি ওর স্বরূপ, এটাই সান্ত্বনা।

অতএব ওই ছিটেফোঁটার জন্যেই চিত্ত পিপাসিত হয়ে থাকবে। এটা বিচিত্র নয়।

মেজদার সেই দাঁড়ানো আড্ডার কিছু শুনতেটুনতে না পেলেও জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, বেশ জোর একটা তর্ক চলছে যেন।

মানে দুজনেই বেশ উত্তেজিত উত্তেজিত। হতে পারে—গান্ধীবাণ বনাম গান্ধী—বাদ এই নিয়ে জোর তর্ক চলছে। ওতেই তো দাদাতে মেজদাতে তর্ক চলতো।

ওদের ভঙ্গীটা দেখছিলাম আর রাগ ধরে যাচ্ছিল। কেন রে বাপু? এতোই যদি সময় দিচ্ছিস বন্ধুকে, তো ঘরে এনে বসা!

তা নয় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—

ওদিকে মার সেই ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বর শোনা যাচ্ছে 'রুচি, বিমল এলো?'

দিদি এখন মার কাছে নেই।

দিদি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে চিঠি লিখছে। ওই বরকে!..... লজ্জাও করে না।

মাকে বলতে আসছি 'মা, মেজদার আশা ত্যাগ করে তুমি খেয়ে নাও। বেলার খেলে অসুখ করে তোমার—'

ওমা দেখি মেজদা ঢুকে আসছে।

কী ব্যাপার!

তর্কের মধ্যাহ্নগগনে সেটা হঠাৎ থেমে গেল কী করে?

বলে উঠবো ভাবছি, বাঁচা গেল বাবা, সেই থেকে তোর জন্যে মা—'

বলা আর হলো না। আমার বাঁচার আহ্লাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে মেজদা বলে উঠলো 'এই রুচি, এক গেলাশ জল দেতো চট করে—'

'জল?'

তার মানে তর্কের সমাপ্তি ঘটেনি, নতুন করে গলা ভিজিয়ে লাগা হবে।

জলটা দিয়ে দেখি মেজদা নিজে না খেয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

বলে উঠলাম 'ওমা খেলে না?'

'আমি নয় ও খাবে।'

আমার তো সর্দারী স্বভাব বলে ফেলি —'রাস্তায়' দাঁড়িয়ে খাবে? এমা! বাড়ির মধ্যে ডেকে আনো।'

'আবার কে ডাকে—'

'ডাকবে যে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করাচ্ছে। কী নিয়ে এতো তর্ক বাবা?'

'শুনেছিলি বুঝি?'

'শুনবো, আর কোথা থেকে?' দেখ-ছিলাম। নিশ্চয় গান্ধীবাদ আর—'

মেজদা হেসে বলে, 'আমরা বুঝি আর অন্য কোনো কথা কই না? তর্ক হচ্ছিল মানুষের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম কী হওয়া উচিত? কাব্য না গদ্য, না প্রবন্ধ কিম্বা নাটক।'

ওমা! ওরা তাহলে এসব কথাও কয়? আমি ভাবি বুঝি শুধুই রাজনীতি।

মেজদা চলে যাচ্ছিল, ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, 'ওটাও একজন কবি।'

শুনেই মনটা কেমন দুলে উঠলো।

'ওটাও' মানে?

মানেটা তাহলে মেজদা আমায়ও একজন কবি বলে স্বীকার করেছে।

আবার জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

এতোক্ষণ শুধু মেজদার বন্ধু বলে দেখ-ছিলাম, এখন নতুন দৃষ্টিতে দেখতে থাকি।

হঠাৎ ওকে যেন আমার সগোত্র মনে হয়। মনে হয় নিজজন।

যেন সত্যিই আমি 'কবি'পদবাচ্য।

আহা! মেজদার কথাটা যেন বুকের মধ্যে একটা সুখের রেশ বইয়ে দিয়েছে।

ওটাও একজন কবি!

কিন্তু মুখটা দেখা যাচ্ছে না। পাশ ফিরে রয়েছে। মনে হলো—যে কোনো প্রকারে ওর মুখটা দেখতেই হবে। আর নামটাও জানতে হবে।

একাগ্র ইচ্ছের বোধহয় একটা শক্তি আছে।

যখন মেজদার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মাকে বলে এসেছি এবং মা খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছেন 'এমনি করেই সবাই মায়ার বন্ধন কাটছেন।'

ওমা, রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে দেখি সেই শলতের ফল ফলেছে।

মেজদার বন্ধু বাড়ির মধ্যে ঢুকে আসছে।

'ও আরো জল খাবে। বড় গেলাশে—' বললো মেজদা।

বললাম, 'খাবেন বৈকি! তর্কের ঝোঁকে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

'তা হতে পারে। কবির গলা তো?'

মেজদা আর এক গেলাশ জল নিয়ে বললো, 'খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে। একটা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক তাছাড়া—নিজে লেখেটেখে।'

মেজদা চলে গেল ঘরের মধ্যে।

তারপর—

কতক্ষণই বা পরে?

দেখি মেজদা রান্নাঘরে মার সঙ্গে কথা বলছে। বেশ নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে।

ওঃ। বাবুর দায়িত্বজ্ঞান উথলে উঠেছে এতোক্ষণে মাকে বলতে আসা হচ্ছে—

কিন্তু কে জানতো কী বলতে এসেছে মেজদা।

গিয়ে দাঁড়ালাম।

শুনতে পেলাম, মা বলছেন, 'পদ্য দেখতে চায় পদ্য দেখুক, ওকে দেখবার কী আছে?

বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

এটা কোন্ জাতীয় কথা? সরে এলাম। ঘরে এসে বললাম, 'দিদি, তোর চিঠি লেখা কি আর শেষ হবে না?'

দিদি হাসেটাসে না। বেজার গলায় বলে, 'দ্যাখনা একমাস থাকবো আশা করে এলাম, এই তেইশ দিন মাত্তর হয়েছে, লিখেছি কিনা বাড়িতে খুব অসুবিধে চলছে মা তোমাকে আনার দিন দেখছেন। এখন একটু তোষাজ করে চিঠিটা লিখছি, যাতে অগে-ভঙ্গে না নিয়ে যায়।'

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, 'তোষামোদ করবে? তেজ করে নয় কেন?'

'তেজ? হুঃ। তেজ দেখাবো আমরা? বিয়ে হোক বুঝবি মেয়েমানুষের পোজিশনটা কী?'

শুনে খুব কড়া করে একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, চুপ হয়ে গেলাম। মেজদা ব্যস্ত হয়ে এসে বললো 'এই রুচি, তোর ওই কবিতার খাতাটা নিয়ে চলে আয় তো একবার।'

প্রায় সর্পাহতের মতই চমকে বলে উঠি, 'কেন? কী হয়েছে?'

'চল না।' নীরেনকে তোর কবিতার কথা বলছিলাম কথায় কথায়, তা বললো কীরকম কবিতা দেখি—'

তদ্দণ্ডেই বুঝে ফেললাম মার সঙ্গে কিসের কথা হচ্ছিলো মেজদার। মার অনুমতি চাইতে গিয়েছিলো।

আমিও হঠাৎ মার মত কথা বলে বসি, 'তা খাতাটাই নিয়ে যাও না। আমি আর কী যাবো?'

মেজদা বললো 'তুইও আর এরকম গাঁইয়া কথা বলিস না রুচি।'

'গাঁইয়া' শব্দটাই তো আমাদের সবথেকে ধিক্কারজনক, তাই বোধহয় ওইটাই প্রয়োগ করলো মেজদা।

আমি বললাম, গাঁইয়া আবার কি। চিনি-টিনিনা ভাই—'

'চেনা করলে তো চিনবে মানুষ! ও বললো, 'কই তোমার বোনকে ডাকো না একটু দেখি উনি কী নিয়ে লেখেনটেখেন।' আর আমি বলবো, তিনি আসবেন না, ভারী পর্দানসীন।'

'বেশ যাচ্ছি—আমার কী। মা রাগ করলে তোমার দোষ।'

বলে খাতা নিতে গেলাম।

কিন্তু খাতা তো আর আমার একটা নয়? প্রথম দিকেরটা বাদ দিলেও, দেশাত্ম-বোধক, অথবা এমনি নানাবিধ ছাড়াও আর একটা ছিল যাতে বেশ কড়া কড়া প্রেমের কবিতা ছিল। খুব ইচ্ছে হলো ওইটাই নিয়ে যাই। খুব ইনটেলিজেন্ট ছেলে যখন, তখন ওগুলোর মর্ম বুঝবে। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত লজ্জা করলো। মেজদাতো দেখবে।

দেখলাম কবিকে।

মানে ইচ্ছে করেই লজ্জাত্যাগ করে বেশ মুখ তুলে। নচেৎ পরে হয়তো মেজদা বলে বসবে 'তুই অমন কনে দেখার মত জড়সড় হয়ে বসেছিলি কেন?'

'কবে থেকে লিখছেন আপনি?'

বললেন ভদ্রলোক বেশ গুরুগম্ভীর চালে।

হাসি পাচ্ছিল, তবু সেটি সামলে বললাম 'এই আরকি ছোটবেলা থেকেই।'

'আচ্ছা প্রথম যেদিন লিখলেন, সেটা কোন প্রেরণা থেকে? মানে হঠাৎ লেখার ইচ্ছেটা হলো কেন? ধরুন কোনো একটা দুঃখবেদনা অথবা—।

আমি অভ্যাসগতভাবে চট্ করে বলে ফেললাম, 'না না! ওসব দুঃখবেদনাটেদনা নয়। কবিতা পড়তে ভালবাসি, এই মেজদা একখানা চয়নিকা দিয়েছিল খুব পড়তাম, হঠাৎ একদিন ইচ্ছে হলো আমিও লিখি।'

এসব কথা যে বলতে হবে কোনোদিন তাতো জানা ছিল না, তাই ভেবেও রাখিনি। বলে ফেলেই মনে হলো খুব বোকার মত কথাটা হলো। সামনে মেজদা। আমার বোকামিতে তো ওর মানসম্ভ্রম খতম।

কিন্তু কী আর করব? বলা যখন হয়েই গেছে।

তুইও বাবা আচ্ছা লোক! জিগ্যেস করবার আর কথা খুঁজে পেলি না?

কথার মাঝখানেই খাতার পাতা উল্টো-ছিল। একটা পৃষ্ঠায় চোখ রেখে বলে উঠলো, 'এইটা আমাদের ম্যাগাজিনে দিন।'

শুনে না আহ্লাদে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগলো।

মেজদা বললো 'ও বাবা! তাহলে তো তোর পাকা খাতায় নাম উঠলো রুচি।'

ও হাসলো।

ওর নাম নীরেন হালদার।

বংটা যদিও বেশ মহলা, তবে দেখতে শুনতে পরিষ্কার।

আরো দু' চারটে কথার পর বললো, গল্প লেখেননি কখনো?'

মাথা নাড়লাম।

'লিখুন না। আমাদের জীবনপ্রবাহ'র জন্য লিখুন গল্প।'

মেজদা বেশ আত্মপ্রসাদ আত্মপ্রসাদ মুখ করে বসেছিল, একথা শুনে বলে উঠলো 'কী নিয়ে লিখবে? মানে বিষয়বস্তুটা কী হবে?'

নীরেন হালদার একটু হেসে বললো, 'সে উনি নিজেই বুঝবেন।'

ওর চোখে মুখে বেশ একটু সপ্রশংস ভাব। দেখে আনন্দে প্রাণ উথলে উঠেছিলো।

পরে অবশ্য বুঝেছিলাম ওর অবস্থাও আমারই মত হয়েছিল। কবিই হোক আর যাই হোক, বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে তো? ওদের বাড়িতেও হয়তো আমাদেরই মত সনাতনী হাওয়া। বন্ধুর বাড়িতে এসে প্রগতি দেখাতে সপ্রতিভভাবে বলে বসেছিল, 'কই তোমার বোনকে একবার ডাকো না—'

মেজদার পদমর্যাদা তো খুব খারাপ নয়।

ওর দাদা জেল খাটছে, ওর বোন কবিতা লিখছে, সোজা প্রগতি না কি? তারপর আবার—'বোনকে দেখি' বলতেই বোন গট-গট করে গিয়ে হাজির। 'খুকি' বলে সম্বোধন করবার মত বোন নয়, রীতিমত তাজা তরুণী বোন।

আমি বলতে পারি নির্ঘাৎ ওই সহকারী সম্পাদক ভেবে পুলকিত হচ্ছিল, বেশ একটু প্রগতিশীল বাড়ির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন হলো।

আমার গল্প লেখার ওপর ও আবার জোর দিলো।

আমি একটু ঠাট্টার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। হেসে হেসে বললাম, 'কেন?

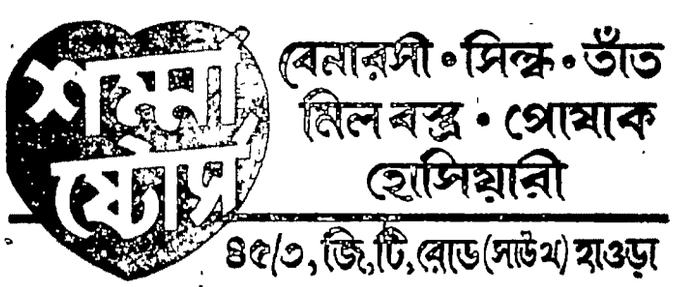

কবিতার পৃষ্ঠাটা বুঝি নিজের জন্যে রিজার্ভ রাখতে চান?'

ও হেসে উঠলো।

বুঝলাম নীরেট নয় ঠাট্টা তামাসা বোঝে। সবাই তো আবার ওটা বোঝে না।

হেসে উঠে বললো, 'রহস্যটা ধরে ফেলেছেন তো?'

আরো দু-একটা কথা হলো, তারপর হঠাৎ দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে 'উঃ দারুণ বেলা করিয়ে দিলাম আপনাদের—' বলে উঠে পড়লো।

আর বললো, 'কবিতাটা 'কপি' করে দাদার হাতে পাঠিয়ে দেবেন।'

চলে যাবার সময় আবার মেজদা যথারীতি তার সঙ্গে সঙ্গে চললো। এটা হচ্ছে বন্ধুকৃত্য। যে যখনই আসুক, তাকে খানিকটা এগিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

ফিরে যখন এলো, আমি মরতে তখনও সেইখানেই বসে বসে খাতাটা ওল্টাচ্ছি।

যে কবিতাটা বলে গেল, তার থেকে আরো ভালো কবিতা আছে কিনা, তাই দেখছি বসে বসে—

মেজদা এসে বললো 'কি রে তুই এখনো বসে আছিস? খুব অহঙ্কার হয়ে গেল তো?'

আমি আর কী বলবো, 'আহা' ছাড়া?

মেজদার মুখে চোখে খুব খুশী খুশী ভাব।

বাবা যাবার পর, শুধু তাই বা কেন, তার আগে থেকেই মেজদার মুখে এমন উৎফুল্ল ভাব দেখিনি। অনেকদিন আগে এরকম ছিলো মেজদা।

সদা উৎফুল্ল।

তাহলে বোধ হয় ঘাড় থেকে রাজনীতির ভূত ছেড়েছে, ও ওর নিজস্ব জগতে ফিরে আসছে। সংস্কৃতির জগৎ, সাহিত্যের জগৎ। সেই রকম বন্ধুও জুটছে এখন ভাগ্যে।

এতো মেজদার পুরনো বন্ধু নয়।

পুরনো হলে নিশ্চয়ই নাম শুনতাম আগে।

মেজদা উৎফুল্ল মুখে বললো, 'নীরেন খুব খুশী হয়ে গেছে। বলছিলো, 'এতোটা আশা করিনি।'

মনে মনে ভাবলাম হায়! তবু তো তোমায় আমার সেই মোক্ষম খাতাটা দেখাতে পারিনি।

মেজদা আবার বললো 'বলেছে 'কবিতা নিতে ও নিজেই আসবে।'

মনে হলো—এইটিই প্রত্যাশা করছিলাম।

ভাবছিলামই ও আবার আসবে।

'তাহলে এবার গল্প লাগা' বলে মেজদা আমার মাথাটা নেড়ে দিলো।

ইচ্ছে হচ্ছিল. তক্ষুণি লিখতে বসি।

কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে? মান মর্যাদাও আছে। মেজদাই হয়তো ভাববে হ্যাংলা।

কিন্তু হ্যাংলা যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

নইলে পরদিন সকাল থেকেই কেন ভাবতে শুরু করেছি, কখন আসবে কবিতা নিতে।

আচ্ছা এর মধ্যেই যদি একটা গল্প লিখে ফেলতে পারি?.....ওই কবিতাটার সঙ্গে ধরে দিয়ে বলবো, 'এই নিন আপনার ফরমাসমত একটা গল্প লিখে ফেললাম।'

লোভটা সামলাতে পারলাম না, লিখতে বসে গেলাম।

কী নিয়ে লিখবো জানি না, তবু ব্যাকুলতা রয়েছে, রয়েছে আনন্দ।

লেটাটা অথন বানান উল্টে ফেলা।

ওই নীরেন হালদারও বোধ হয় আমার মতই চঞ্চলজ্জার খাতিরে দুদিন দেরী করলো। পাছে আমরা ওকে হ্যাংলা ভাবি।

কিন্তু যখন এলো?

তখন মেজদা বাড়ি নেই।

বাইরের দরজার কড়া নড়লে অবশ্য দরজা খোলার কাজটা আমারই।

কিন্তু বাইরের লোক আর কে কবে আসে? আসতে ঝি আসে গয়লা আসে, কয়লাওলা আসে, বাসনমাজা ঝি ঘুঁটে-ওয়ালী এরাই সব আসে।

আমি তো এ টাইম আন্দাজে ঝি ভেবেই খুলেছি, দেখি কবি।

বুকের অবস্থার কথা আর বলতে পারি না। হাতুড়ি ঢেঁকি অনেক কিছুর স্টেজ পার হয়ে গেছে।

একটুক্ষণ আমিও কিছু বলতে পারলাম না, ও কিছু বললো না। তারপর আমি বললাম, 'মেজদা বাড়ি নেই কিন্তু—'

নীরেন হাসলো।

বললো, 'মেজদার কাছে তো আসিনি। এসেছি আপনার কাছেই।'

তারপর বললো, 'কী ঢুকতে দেবেন? না দরজা থেকেই বিদায় দেবেন?'

লজ্জিত হয়ে দরজা ছেড়ে সরে এলাম। বসবার ঘরটায় এসে বসলো।

তারপর বললো, 'কই আমার কবিতা?'

বললাম, 'আনছি।'

ঘরে এসে আশির দিকে একবার না তাকিয়ে পারলাম না।

আচমকা এমন এলো।

খুবই বিচ্ছিরী হয়ে আছি। এই বেলা তিনটের সময় কে আর পরিপাটি থাকে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো মুখটা তেলতেলে, শাড়িটা কোঁচকানো, ছিঃ।

এরকম সময় লোকের বাড়ি আসে মানুষ?

কিন্তু কী আর করা।

এই মুহূর্তে কিছু তো আর বদলে ফেলা যায় না?

চুলটাতেও যে একটু হাত বোলাবো, তার জো নেই, দিদি জেগে বসে আছে।

আমায় আসতে দেখে দিদি বললো, 'ঝি যে আজ এত সকাল সকাল?'

বললাম, 'ঝি নয়।'

'তবে?'

'বলছি এসে।'

বলে সেই কবিতা আর নতুন গল্পটা নিয়ে চলে গেলাম বাইরের ঘরে।

গাটা ছমছম করছিলো বৈকি।

এই ভরদুপুরে একটা অনাত্মীয় ছেলেকে ঘরে ডেকে বসিয়ে একা তার সম্ভাষণে যাচ্ছি এটা কি চারটিখানি কথা নাকি?

কিন্তু উপায় কী?

দিদিকে তো আর বলতে পারি না, 'দিদি তুই আমার সঙ্গে চল।'

বুকের বল করে চলে এলাম।

ও বললো, 'অসময়ে এসে আপনাকে খুব অসুবিধেয় ফেললাম।'

মনে মনে বললাম, 'তাই যদি জ্ঞান ছিলো তো অসময়ে এলে কেন বাছা?

কিন্তু মুখে তো অন্যকথা বলতেই হবে।

বললাম, 'না না অসময় আবার কী।'

'ব্যাপার কি জানেন, প্রেসটা এই পাড়ার দিকে, তাই ভাবলাম একেবারে নিয়ে প্রেসে

প্রকাশিত হলো

সাংবাদিক কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মুরশিদাবাদ থেকে বলছি ১২·০০

মুরশিবাদের প্রাচীন ও নবাবী আমলের ইতিহাসের কাহিনী, এবং তার সঙ্গে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ। মুরশিদাবাদ সম্পর্কে অনেক নতুন কথা, ছবি ও ম্যাপসহ।

প্রাচীন জরীপের ইতিকথা ৬·০০

অরুণ মজুমদার

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভূমি জরীপ সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়।

স্টুডেন্টস লাইব্রেরী ১৫এ টেমার লেন কলিকাতা—৯

দিয়ে চলে যাই। বিমল ফিরবার আশায় থাকলে আজ আর প্রেসে যেতো না।'

আমিও উল্টো শোধ নিলাম।

বললাম, 'তা কবিতাটা তো আর মেজদা দিতো না।'

ও হাসলো। বললো, 'তা সত্যি! যাক গল্পের কথা ভাবছেন?'

মনে হলো, যদি উত্তর দিই 'ভাবছি কি, লিখে বসে আছি—' তাহলে নির্ঘাৎ হ্যাংলা ভাববে।' তাই বললাম 'ভাবছি।'

'ভাবুন, লিখুন। সামনের মাসেই দিতে চাই। আমাদের একটা বিভাগ রাখা আছে নতুন লেখক লেখিকাদের জন্যে। সামনের মাসে তেমন কিছু নেই।

'আমারটাই বুঝি তেমন হবে বলে আশা রাখেন?'

'রাখি।'

'হঠাৎ এমন আশা যে?'

'দেখেই বুঝেছি।'

'দেখবেন নিয়ে শেষে অসুবিধেয় পড়তে হবে। কিছু হয়নি বাজে—বলতেও লজ্জা করবে, আবার ছাপতেও পারবেন না।'

'আচ্ছা এতো ভবিষ্যৎ-বাণীতে কাজ নেই। লিখুন তো আগে।'

মনটা হায় হায় করতে লাগলো।

মরতে কেন, বা ফট করে ওর নাকের সামনে ধরে দিল না গল্পটা। কিন্তু এখন তো আর হয় না। যাকগে একটা ভালো হলো, গল্পটা নিতে আর একদিন আসতে হবে ওকে।

গুছিয়ে বসে কথা কইতে অস্বস্তি, তাই দাঁড়িয়েই ছিলাম কবি কোমল কবিকণ্ঠে বললো, 'বসুন? দাঁড়িয়েই রইলেন যে।'

বললাম, 'ঠিক আছি। কিন্তু আপনার পত্রিকার চেহারাটা কী রকম তাতো দেখলাম না।'

'ওহো হো—'

'জীবন প্রবাহের' সহকারী সম্পাদক হৈ হৈ করে উঠলো, ভাগ্যিস বললেন! নিয়ে এসেছি, অথচ—'

হাতের কাছে ব্যাগটা থেকে আস্তে আস্তে চারখানা কপি বার করলো।

'এই বছরের এই চার মাসের। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ। ভাদ্রে আপনার কবিতা যাচ্ছে, আর আশ্বিনের জন্যে ওই যা বললাম গল্প। আশ্বিন সংখ্যাটায় গল্প দু-একটা বেশী দেওয়া হয়।

ওই পর্যন্তই। ওর বেশী নয়।

'ভারতবর্ষে-টর্ষেও তাই দেখতাম।

'শারদীয় সংখ্যার' হিড়িক তখনো দেখা দেয়নি। চার চারখানা পত্রিকা একসঙ্গে।'

বিমোহিত হয়ে দেখছি, ও বললো, 'আচ্ছা উঠছি তাহলে। অনেক বিরক্ত করে গেলাম।'

অস্বস্তি ওরও হচ্ছিল নিশ্চয়। মেজদার অনুপস্থিতিতে এসে পড়েছে।

কিন্তু আমার ভিতরের দুষ্টু বুদ্ধিটা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলছিলো, 'এসে পড়েছে', না ইচ্ছে করেই এই সময়টা বেছে নিয়েছে?

দরজাটায় আবার খিলবন্ধ করে ভিতরের দালানে পা দিয়েই দেখি মা আর দিদি।

রুদ্ধশ্বাস বক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হলো।'

মা বলে উঠলেন, 'ছেলেটি কে রুচি?'

অবহেলার ভান করে বললাম, 'ও মেজদার একটা বন্ধু।'

'বিমলের বন্ধু? তা এ সময় এসেছে কেন? বিমল কলেজ যায় জানে না?'

'অন্য কাজে এসেছিল।'

'অন্য কাজটা আবার কী?'

দিদি প্রায় ধমকে উঠলো, আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে আছি।'

'এতে এতো কাঠ পাথর হবার কী আছে?'

'বাঃ নেই? তখন বললাম, কে এলো তুই বললি পরে এসে বলছি। তারপর আর গেলিই না। এদিকে সমানেই একটা ব্যাঙ্গ-ছেলের গলা পাচ্ছি। আমাদের কাউকে কিছু না বলে কী এতো কথা কইছিস তুই ওর সঙ্গে, ভেবে ভয় হয় না? পুলিশের লোক-টোক কিনা—'

কথাটা যে দিদির চালাকি, তা বুঝতে দেরী হল না। ভয়ের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতেই হঠাৎ পুলিশের আমদানি।

'পুলিশ! হঠাৎ পুলিশের দুঃস্বপ্ন দেখলি কেন?'

মা তাঁর সেই নিজস্ব করুণ বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'সে দুঃস্বপ্ন তো সর্বদাই দেখছি মা। একটা তো গেছেই, এটাকেও কখন টেনে নিয়ে যায় এই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।'

শান্তভাবে বলি, 'এবার ঠিক হও। কাঁটা হবার কোনো কারণ নেই। ও একটা মাসিক-পত্রের সহকারী সম্পাদক। এই যে এইটায়—' বইটা মার দিকে এগিয়ে ধরে বলি, 'আমার একটা লেখা নিলো ছাপবে বলে।'

যেন এটা কিছুই নয়।

যেন আমার কাছে জল-ভাত।

পত্রিকাগুলো মা ধরলেন না, দিদি নিলো। আহ্লাদ আহ্লাদ মুখে বললো, 'এতে তোর লেখা ছাপবে?'

'তবে না তো কি?'

বিজয় গৌরবের মুখে ঘরে চলে এলাম।

(ক্রমশঃ)

বিনামূল্যে!

একেবারে নতুন
ফরহ্যান্স পুস্তিকা
"দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

তথ্যপূর্ণ এই রঙীন পুস্তিকাটি নিন, বিনামূল্যে! এই কুপনটি আজই ভরে পাঠিয়ে দিন।

ন্যাশনাল ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে—১
অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে এক কপি "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" নামে ফরহ্যান্স পুস্তিকাটি* পাঠান। এই সঙ্গে ডাক খরচ বাবদ ২০ পয়সার টিকিট পাঠালাম।

নাম _____ বয়েস _____
ঠিকানা _____ এ—৭ এ বি

*অনুগ্রহ করে যে ভাষায় চান তার নিচে দাগ কেটে দিন: ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স-টুথপেষ্ট—এক দাঁতের অক্সিজেনের তৈরী

100F-152 BEN B

উপনিষদে আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তা

অমিয় কুমার মজুমদার

(এক)

অবতরণিকা

জীবের বিবর্তনের মতবাদে যান্ত্রিক মনোভাবের আসন অনেকটা টলমল করে উঠেছে। আমরা বিবর্তনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি আকস্মিক ঘটনা পারিপার্শ্বিক ঘটিত পরিবর্তন, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের উপর। জড়বিজ্ঞানী জড়বস্তুকে (ম্যাটার) তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সন্ধান পান নি প্রাণশক্তির। ডারউইন নিজেই স্বীকার করেছেন (১)

নিম্নতম প্রাণীদেহে কী করে কোন উপায়ে যে মানসিক শক্তি সর্বপ্রথম বিকশিত হয়েছিল তা জানার কোন আশা নেই। প্রাণশক্তির প্রথম উৎপত্তির ইতিহাস সন্ধান করা যেমন আজ বৃথা তেমনি বৃথা মনের উৎপত্তির সন্ধান করতে যাওয়া।'

কিন্তু আমাদের কাছে 'মন' হলো বস্তুর ক্রমবিকাশের একটি চেতন রূপ। মন বস্তু প্রক্রিয়ায় উপজাত মাত্র কেবলমাত্র দেহের কিয়াকে ভাস্বর করে এবং তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্রমে ও বিকাশে মন বস্তুজগতের নিয়মাবলী অনুসরণ করে এবং তার কোন নিজস্ব সত্তা নেই এরূপ অনেকে বলে থাকেন। অতীত যুগের বিজ্ঞান দুটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—কার্যকারণ সম্বন্ধ এবং অপরিবর্তনীয় নিয়মশৃঙ্খলা। পদার্থবিজ্ঞানের নূতন চিন্তাধারা এই ভিত্তির মূলকে করে দিয়েছে শিথিল। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সম্ভাবনা (প্রোবাবিলিটি) অনুসারে ও সংখ্যাতত্ত্বমতে সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকে। জড়জগতের কার্যকারণ সম্পর্কিত অনড় নিয়মের বাজে ব্যতিক্রম ঘটতে পারে একথা আজকের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন কথাও অনেক বিজ্ঞানী বলছেন যে জড়জগতের ঘটনাবলী অনেকসময় অনির্দিষ্ট (ইনডিটারমিনেট) এবং ভবিষ্যৎ পূর্ব হতে নির্ধারিত নয় (আনপ্রেডিকটেবিলিটি)।

এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাস্তব-সত্তার সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করা প্রায় অসম্ভব মনে করা হচ্ছে। মানুষ যখনই ইন্দ্রিয়েরই পর্যবেক্ষণচেষ্টা দ্বারা বাস্তব-সত্তার জগতে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন কেমন একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। আবার যখন সে বাস্তব জগতের ইন্দ্রিয়জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে দেখতে সচেষ্ট হয় তখন বস্তুনিরপেক্ষ গাণিতিক ছক ছাড়া অন্য কিছুরই ধারণা করতে পারে না। (২)

এডিংটন এবং রাসেল উভয়েই বলেছেন, আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যা অনুভব করি তা পদার্থের গতিভঙ্গী নয়, তা হলো এই গতিভঙ্গীর সঙ্গে সংযুক্ত আমাদের নিজেদেরই কতিপয় ঘটনা। এগুলি বাইরের কোন বস্তু নয়, আমাদের উপর এইসব বস্তু থেকে নিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি বা অন্যশক্তির নিপতনের ফলাফল মাত্র। স্নায়ুর পথ বেয়ে মস্তিষ্কে আসে নানা বার্তা এবং মন তাই নিয়ে ধারণার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের গবেষণা এই ধারণার জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আজ যদি কোন পদার্থবিজ্ঞানীকে ইথর অথবা ইলেকট্রনের গণ্ডী থেকে কি মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় এই প্রশ্ন করা হয় তাহলে তার বাস্তব কোন উত্তর তাঁরা বা তিনি দিতে পারবেন না, পরিবর্তে কতিপয় প্রতীকের (সিম্বল) দ্বারা সিদ্ধ গাণিতিক সমীকরণ উপস্থাপিত করবেন। সেই প্রতীকসমূহের অর্থ জানতে চাইলে পদার্থবিজ্ঞানী রহস্যজনকভাবে উদাসীন থাকেন, ফলে চরম সত্তা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ্য মত প্রকাশ করতে পদার্থবিজ্ঞানী অক্ষম, একথা বলেছেন বিজ্ঞানী এডিংটন।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন বলেছেন, জীবন উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে বিকশিত হয়। ক্রমশ এমন প্রাণের প্রকাশ হয়েছে যার শক্তি পূর্বেকার প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি, গভীরতর বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষমতাও বেড়েছে অনেক। হলডেন প্রাণকে একটা শক্তি বা তত্ত্বরূপে ধরেছেন। আমাদের শাস্ত্রেও প্রাণকে শক্তিই বলা হয়েছে। তিনি মনে করতেন প্রাণ প্রথমে অচেতন অবস্থায় থাকে অথবা তার মধ্যে চেতনার বীজ সুপ্ত থাকে। ক্রমে সেই সুষুপ্তির ঘোর কেটে গিয়ে চৈতন্যের দীপ্তি প্রকাশিত হয়।

বার্গসঁ স্যামুয়েল বাটলার, জর্জ বার্নার্ড শ প্রভৃতি মনীষীরা মনে করতেন প্রাণ পদার্থকে কাজে লাগায়। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্র তৈরি করে এবং তারই সাহায্যে জীবজগতের অনন্ত বৈচিত্র্যে নিজেকে প্রকাশিত করে। প্রাণের সেই ক্রিয়ার ছন্দকে সীমিত করে রাখতে চেষ্টা করে পদার্থ। আবার পদার্থই সেই সীমার বাঁধনকে অতিক্রম করবার জন্য প্রাণের শক্তিকে মহত্তর, মমতাকে বৃহত্তর করে তুলতে চায়। একারণেই ক্রমবিবর্তন এবং অগ্রগতির জন্য জীবনসংগ্রাম অতি অপরিহার্য অধ্যায়।

আবার বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ম্যাকস প্লাঙ্ক বলেন, (৩) 'আমার মতে চৈতন্যই মূল। আমি মনে করি পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে চৈতন্য (কনসাসনেস) থেকেই। আমরা আমাদের চৈতন্যকে অতিক্রম করে যেতে পারি না। যা কিছুর কথা বলি, যা কিছুর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, সব কিছুর জন্য চাই আমাদের চৈতন্য।'

মহাবিজ্ঞানী শ্রডিংগার স্বীকার করেছেন, (৪) বিবর্তনের এক পর্যায়ে চৈতন্য আসা একটি বিশেষ ঘটনা। যেখানে চৈতন্যের বিকাশ তীব্র, সেখানে জগৎ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে আমাদের দেহ প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত, অথচ আমরা আমাদের দেহকে নিজের নির্দেশিত লক্ষ্য অনুসারে নিয়োগ

---

১ ডিসেন্ট অব ম্যান'

২ লিংকন বারনেট ; 'দি ইউনিভার্স অ্যান্ড ডঃ আইনস্টাইন'

৩। [illegible] ১৯৩১

৪ মাইন্ড [illegible] পৃঃ ১২

করতে পারি নানা কর্মপ্রচেষ্টায় এবং সেই কর্মপ্রচেষ্টার জন্য নিজেকে দায়ী অনুভব করি। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মেনে নিতেই হয় (৪ক) যে প্রায় আড়াই হাজার বা তিন হাজার বছর আগে উপনিষদ, 'আত্মন' ও 'ব্রহ্মের' একত্ববোধক যে বাণী প্রচার করেছিল তা জগৎব্যাপারে মূল সত্যকে প্রকাশ করেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদে পরা ও অপরা বিজ্ঞানের আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। উপনিষৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। একটু বিস্তৃতভাবে বলা যাক। উপ ও নি পূর্বক সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় করে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'উপ' শব্দে সম্ভব বা সামীপ্য বুঝায়, বড়ো অর্থে বস্তুমাত্রেরই সামীপ্য বুঝায়। নি- ভাষ্যভূমিকা এবং আনন্দগিরির টীকা থেকে জানা যায়, নি-শব্দ নিশ্চয়ার্থক ও নিঃশ্রেষার্থক, এবং 'সদ' ধাতুর মানে শিথিলীকরণ গতি বা প্রাপ্তি এবং অবসাদন বা বিনাশ। এ কারণে উপনিষৎ শব্দের অপরার্থ, 'ঐকাত্ম্য নিশ্চয়ের দ্বারা যে বিদ্যা সত্বর সহেতুক সংসার উন্মূলিত করে।' (৫) কিন্তু মনে হয় বৃহদারণ্যক (২।১।২০) এবং শ্বেতাশ্বতর (৫।৬) উপনিষদে যে অর্থ বলা হয়েছে তাই অনেকাংশে আধুনিক। এখানে উপনিষদের অর্থ বলা হয়েছে বিদ্যাবিশেষের সারাংশ বা রহস্যবিদ্যা।

অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা উপনিষদ বা বেদ বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আধুনিক বিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ, পদার্থ ও শক্তির ধারণা, কৃষিব্যবস্থা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান দেহবিদ্যা, প্রজননতত্ত্ব ও জন্মনিয়ন্ত্রণবিদ্যা ইত্যাদি যেসব বিষয় নিয়ে আজকের বিজ্ঞানীরা মহাব্যস্ত উপনিষদের ঋষিরাও তা নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের চিন্তার ফসল ছড়িয়ে আছে নানা উপনিষদে। ঋগ্বেদ তো সর্বপ্রাচীন। বৈদিক ঋষিরা ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গভীর চিন্তা করেছেন তার বহু নিদর্শন আমাদের জানা আছে।

(দুই)

সৃষ্টির রহস্য সন্ধানে

কত্যের যুবা পুত্র কবন্ধী কাত্যায়ন জিজ্ঞাসী হয়ে উপস্থিত হলেন ঋষি পিপ্পলাদের কাছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, (৬) 'ভগবন', কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি!' হে ভগবান্ কোন্ কারণ বিশেষ থেকে এইসব প্রাণী উদ্ভূত হয়?' তার উত্তরে পিপ্পলাদ বললেন, 'আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্মূর্তিরেব রয়িঃ।' (প্রশ্নোপনিষৎ ১।৫) সূর্যই প্রাণ, অন্নই চন্দ্রমা স্থূল ও সূক্ষ্ম এই যা কিছু সমস্তই অন্ন, অমূর্ত (সূক্ষ্ম) থেকে পৃথককৃত স্থূল পদার্থই অন্ন। তারপরে বলছেন (প্রশ্নোঃ ১।১৪), অন্নই প্রজাপতি, ভক্ষিত অন্ন থেকেই প্রসিদ্ধ শুক্র উৎপন্ন হয়। তা থেকে এইসব জীববর্গ জন্মে।

সাংখ্যদর্শনে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা উপনিষদের ভাষ্য থেকে অধিকতর বৈজ্ঞানিক একথা সত্য। তথাপি উপনিষদের বক্তব্যও অগ্রহণীয় নয়। উপনিষদে বলা হয়েছে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। কিংবা ব্রহ্মাণ্ড আকস্মিকভাবে সৃষ্টি হয়নি, ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে গড়ে উঠেছে ব্রহ্মাণ্ডের কলেবর।

মুণ্ডকোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির ভাষ্য আছে এমনিভাবে—

'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ
সর্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী
বিশ্বস্যাধারিণী।।'
(মুণ্ডকো, ২।১।৩)

—এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন, সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে উপনিষদের ঋষি জগৎ সৃষ্টির বিষয়ে এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—'আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যো হন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।' (২।১।৩) আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসমূহ, ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ (অর্থাৎ মানুষ) উৎপন্ন হলো।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১।২—২) বলা হয়েছে জলই অর্ক বা অগ্নি। জলের উপরে সরের মত যা হয়েছিল তা গাঢ় হলো এবং তা পরিণত হলো পৃথিবীতে। উপনিষদে আদি বস্তু জল বলা হয়েছে; তা থেকে অগ্নি এবং পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে এই ধারণা তখন প্রবল। তাই বৃহদারণ্যকের ১।৫।১৩ শ্লোকে বলা হলো, 'অথৈতস্য প্রাণস্যাপঃ শরীরং' অর্থাৎ জল এই প্রাণের শরীর। একই কথা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭।১০।১ শ্লোকে রয়েছে—অন্ন থেকে জল অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। তাই কখনও সৃষ্টি না হলে 'অন্ন অল্পতর হবে' এই মনে করে প্রাণসমূহ ব্যথিত হয়, আবার সৃষ্টি হলে 'প্রভূত অন্ন হবে' এই মনে করে মানুষ আনন্দিত হয়। এই যা কিছু স্থূল—এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক পর্বতরাজি, দেবমনুষ্যবৃন্দ, পশু-পক্ষীগণ, তৃণ-বনস্পতিসমূহ, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা সহ হিংস্র জন্তুগণ—জলই এইসব মূর্তবস্তুরূপে পরিণত হয়েছে। এ কারণে উপনিষদের ঋষি জলের উপাসনা করেছেন।

তারও ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে প্রাণের। উপনিষদে প্রাণকে চেতন ও জড় জগতের সমস্ত গতির মূল কারণ বলা হয়েছে। কৌষীতকি উপনিষদে (২।৩।২) আছে, 'যদিদং কিঞ্চিৎ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু থেকে আরম্ভ করে জীবাণু, কীটাণু, প্রকান্ড গ্রহ-তারা-নক্ষত্র ইত্যাদি সমন্বিত সৌরজগৎ পর্যন্ত যেখানে যার মধ্যে কোন গতিশীলতা ও জীবনের স্পন্দন দেখা যায় সেখানেই আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে এই সর্বব্যাপী প্রাণের শক্তি প্রকাশিত হচ্ছে। 'প্রাণ' বলতে কি বোঝা যায় তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। জড়দেহে প্রাণের প্রথম প্রকাশ পাবার পর থেকেই সুমগ্র বিশ্বের বুকে সূচিত হলো নতুন ইতিহাস। এক স্পন্দনশীল বস্তুর ক্রমবিকাশের পালা রচিত হলো পর্বে পর্বে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৩ শ্লোকে আছে : 'প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তস্মাৎ সর্বায়ুষমুচ্যতে'—অর্থাৎ প্রাণই সর্বভূতের আয়ু, তাই তাকে বলা হয় সর্বায়ু বা বিশ্বের জীবন।

প্রাকৃত-জগতে শক্তির বিভূতিবিশেষকে অভিহিত করা হয় প্রাণ। তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মনের। এই পৃথিবীর বুকে জড়ের আধারে প্রাণের মহাশক্তির প্রকাশ দেখে বিমূঢ় আমরা। স্পষ্ট অনুভব করতে পারি এ প্রাণ কেবলমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুবিশেষের মধ্যেই অবরুদ্ধ নয়—এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির বিভূতি হলো এই প্রাণ। বিজ্ঞানীরা যাকে বলেছেন কসমিক এনার্জি। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এই শক্তির ধারা প্রবাহিত। তারই নিরন্তর লীলায় গড়ে উঠেছে রূপের মেলা। চলেছে ভাঙ্গা-গড়ার শিল্পকলা, তারই মধ্যে অপ্রমত্ত ধারায় অনবরুদ্ধ গতিতে চলেছে প্রাণের প্রবাহ। এই মহাজাগতিক শক্তি থেকে শক্তি লাভ করেছে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুনিচয়।

প্রাণ যদি বিশ্বশক্তির সংবেগ হয় তাহলে তা জড় থেকে অঙ্কুরিত হয়েছে

৪ক হোয়াট ইজ লাইফ? ১৯৬২, পৃঃ ৮১

৫ উপনিষৎ গ্রন্থাবলী ১ম খন্ড, চতুর্থ সং, স্বামী গম্ভীরানন্দের ভূমিকা, পৃঃ ৯

৬ প্রশ্নোপনিষৎ ১।৩; উদ্বোধন প্রকাশিত

শিঙ্গার
এইসব উৎসবের দিনগুলি আমাদের মধুর ঐতিহ্যেরই অংশ বিশেষ...
শিঙ্গার কুমকুমও তাই...
ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক
শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম তৈরী করে···সোনালী ও রূপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যায়···যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে···আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও গ্লসী ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।
প্যারামাউন্ট প্রডাক্টস্, বোম্বাই-৪০০ ০০৪
everest/597/SP-bn

আর সঞ্চারিত হয়েছে মন মানসে। তবে প্রাণ তো মধ্যবর্তী স্থানেরই। একথা মানতে গেলে স্বভাবতই বলতে হবে প্রাণ ছিল জড়ের মাঝেই সুপ্ত হয়ে। তা না হলে কোথা থেকে তার আবির্ভাব হলো? নচেৎ বলতে হয় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের এই অতর্কিত আবির্ভাব এক আকস্মিক ঘটনা মাত্র। স্যার জোলিয়ান হাক্সলি বলেছেন (৭) অতর্কিতে সৃষ্টি হয়নি প্রাণের। আগেকার জীবন বা প্রাণধারা বেয়ে নেমে এসেছে নতুন প্রাণ কাজেই একথা কেমন করে বলি কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে প্রাণের। তবুও তো কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। ডারউইন লামার্ক মেন্ডেল হাক্সলি হলডেন সার্ডিন সিম্পসন সকলেই নিজ নিজ চিন্তার মৌলিকত্বে আস্থাশীল।

ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে জীব চার শ্রেণীর—'অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চ—অন্যবাগ বঃ পুরুষা হস্তিনঃ যৎকিঞ্চেদং প্রাণি জঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্।' (৩।১।৩)

মূল কথা জীব চার রকমের—অণ্ডজ জরায়ুজ, স্বেদজ উদ্ভিজ্জ। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বেদজের স্থান নেই। সেখানে জীব তিন শ্রেণীর—তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি' (৩।৩।১)। অর্থাৎ জীব তিন প্রকারের—অণ্ডজ, জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ।

বিজ্ঞানের মতে এই পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনা বা বস্তু বিবর্তনের প্রক্রিয়া মেনে চলে। কুহৎ সৌর জগৎ থেকে শুরু করে ছোট্ট ঘাসের ডগাটি পর্যন্ত যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সবই বিবর্তনের ফলশ্রুতি মাত্র। ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের ফলে জন্ম নিয়েছে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উপগ্রহ এবং অপরাপর গ্রহসকল। তেমনি মানুষের ক্ষেত্রও। মনষ্যজাতি পৃথিবীতে আকস্মিকভাবে আসেনি, মানবরূপে জন্মগ্রহণের আগে পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে নিম্নশ্রেণীর জন্তুজানোয়ার ও উদ্ভিদাদির সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। প্রাণের বীজ মানবরূপে জন্মগ্রহণের আগে নানা ধরনের শরীর ধারণ করেছে একথা উপনিষদের ঋষিরা জানতেন।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে উপনিষদে সূর্যকে অত্যন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে সূর্যকেই 'প্রাণ' বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্যালোক রূপান্তরিত হয় তাপে। তাপ রূপান্তরিত হয় বিপুল শক্তিতে। 'জীবন' বা 'প্রাণ' প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই শক্তির সঙ্গে জড়িত। আবার বিজ্ঞান বলে কোন ক্ষুদ্রকায় বস্তু দিনের আলোককে নৈপুণ্যের সঙ্গে তাপে পরিণত করতে পারে,—এতে 'এনট্রোপি' বেড়ে যায়। ফলে 'সৃষ্টি' 'দূর অস্ত' হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে অবশ্যই এমন কোন সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত অনুশাসন বা নিয়ম আছে যাকে পরিচালনা করছে কেউ যার ক্ষমতাবলে বিশৃঙ্খলার ভরা অঙ্কের পৃথিবীতে সুশৃঙ্খল 'প্রাণের' সৃষ্টি সম্ভব, এবং এই নিয়ম কিংবা অনুশাসন কেবলমাত্র জীবন্ত বা প্রাণবন্ত বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আর কোথাও নয়। এই 'নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি' মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে যায়। আধুনিক কালের বিজ্ঞানী তার গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফলে জেনেছে যে, 'প্রাণের' সাহায্যেই প্রাণের সৃষ্টি হতে পারে।

সৃষ্টিরহস্য বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের মতবাদ উল্লেখযোগ্য। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হলো জগতের মূলবস্তু। জগতের অব্যক্ত অবস্থা বা সৃষ্টির পূর্বাবস্থা এবং প্রকৃতর বাস্তবাবস্থা হলো জগৎ। প্রকৃতি ত্রিগুণসম্পন্ন—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। এদের বলা হয় প্রকৃতির অঙ্গ ভাব বা অবয়ব। উপনিষদে যে প্রাণের কথা বলা হয়েছে সাংখ্যদর্শনকারও তাকে অস্বীকার করেননি। প্রাণের বারবার আঘাতে আকাশ থেকে বায়ু বা আকাশের স্পন্দনশীল অবস্থা হয়। এ থেকে বায়বীয় বা বাষ্পীয় পদার্থের উৎপত্তি। স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকলে উত্তাপ বা তেজের উৎপত্তি হয়। উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে শীতল হতে থাকে: তখন ঐ বাষ্পীয় পদার্থ তরলভাব ধারণ করে: তাকে 'অপ' বলি। অবশেষে তা কঠিনাকার প্রাপ্ত হলে তাকে বলা হয় 'ক্ষিতি'। (৮)

(তিন)

শক্তির অন্বেষণে

আধুনিক বিজ্ঞানের জগতে শক্তির দুই অবস্থা কল্পনা করা হয়েছে—অবরুদ্ধ শক্তি এবং মুক্ত শক্তি। দ্বিতীয় অবস্থাতে গতি পরিলক্ষিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই দুটির কথা বলতেন; একটি ব্রহ্ম—তা হলো নিষ্ক্রিয়, সুপ্ত· আর একটি হলো শক্তি বা ভাগবতী শক্তি অর্থাৎ সৃজনী শক্তি। সৃষ্টি করবার মানসে সদা চঞ্চল; গতিবেগে মুখরিত। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—

তদেজতি তদৈন্নতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বাস্যাস্য

বাহাতঃ।
(ঈশ: ৫)

ইনি চলেন; চলেন না, দূরে আবার নিকটে, সমস্ত জগতের ভিতরে বা বাইরে। এই বক্তব্য আমাদের কাছে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখন বিজ্ঞানী ইলেকট্রন অথবা আলোর কণিকা ফোটনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে যান তখনও তাঁর বক্তব্য হয় পরস্পরবিরোধী। আলোর ক্ষুদ্রতম অংশ ফোটন অনেক সময় কণিকার মতো (করপাসকুলার থিয়োরী) অথবা তরঙ্গের মতো (ওয়েভ থিয়োরী) ব্যবহার করে থাকে। তা হলে প্রকৃতপক্ষে তা কি? কণা না তরঙ্গ?

বিজ্ঞান যখন প্রকৃতির রহস্যের গভীরে চলে যায় তখন আর নাম বা সংজ্ঞার অস্তিত্ব থাকে না। ত্রি-মাত্রিক জগতের বিচারপদ্ধতি বা যুক্তি ভেঙে পড়ে চতুর্মাত্রিক জগতে। বিজ্ঞান অধুনা পরমাণুর কেন্দ্রকের গভীরে প্রবেশ করেছে এবং ঊনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা সংজ্ঞার নতুন মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছে। বিজ্ঞানী সার জেমস জীনস্ বলেছেন (৯), 'যে পদার্থবিদ তাঁর মানসিক চক্ষুদুটিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং আশ্চর্য নতুন আলোতে দৃষ্টি যখন তাঁদের স্বচ্ছ, তখন তাঁরা নিজেদের দেখতে পান এক অপরিচিত জগতে যে জগৎ তাঁদের পূর্বসূরীদের কাছে অজ্ঞাত ছিল।'

এই সত্যদৃষ্টি উপনিষদের ঋষিদের ছিল। ঋষ্ ধাতুর অর্থ দর্শন। ইন্দ্রিয়ের অগোচরে প্রাণ দর্শন করেছেন যিনি তিনিই ঋষি। তাঁরা অনুভব করেছেন 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই ব্রহ্মাণ্ড সবই ব্রহ্ম। আধুনিক বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যা বা বায়োলজি উভয় শাখার সর্বোৎকৃষ্ট আবিষ্কার হলো প্রকৃতির শক্তি এবং যাবতীয় বস্তুনিচয়ের মধ্যে একাত্মতা স্থাপন করা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য নির্দেশ করা। পদার্থবিদ্যা পার্থিব ও মহাকাশীয় প্রপঞ্চ বা ঘটনাবলীর মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করেছে। বায়োলজি জীবাণু বা পাণীদের পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে তাদের এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেশের মধ্যে সম্বন্ধের ঐক্য আবিষ্কার করেছে। এক প্রাণ যে আর একটি প্রাণের সঙ্গে বহু যুগ ধরে একসূত্রে গ্রথিত তা বিজ্ঞান স্বীকার করেছে। বেদান্ত এবং উপনিষদে এই সত্য অবজ্ঞাত ছিল না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী নীলস বোর বলেছেন

---

৭ জে এস হাক্সলি: দি কন্টিনিউইটি অব লাইফ, ১৯৩২, পৃ ৩

৮ স্বামী বিবেকানন্দ, সাংখ্য ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব (স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞান-দৃষ্টি গ্রন্থের ১০৯ পৃঃ)

৯ দি নিউ ব্যাকগ্রাউন্ড অব সায়েন্স, পৃঃ ২—৬

(১০) আমরা আমাদের জীবনের বিরাট নাটকে যুগপৎ দর্শক এবং অভিনেতা। মানুষ নিজেই তার কাছে বিরাট রহস্য। সে বুঝতে পারে না এই বিশাল, অবগুণ্ঠিত বিশ্বকে যার মধ্যে সে নিজে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এবং কেন যে হয়েছে তা-ও সে জানে না কারণ নিজেকেই সে জানে না।

এই ত্রুটি উপনিষদে অপসারিত। ঈশোপনিষদের ঋষি তাই বলছেন, যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।' (ঈশ, ৬)—যিনি সমুদয় বস্তুই আত্মাতে (অর্থাৎ অব্যাকৃতাদি স্থাবরান্ত কোন ভূতকে যিনি আত্মা থেকে অতিরিক্ত রূপে দর্শন করেন না (১১) এবং সমুদয় বস্তুতেই আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই দর্শনের বলেই কাউকে ঘৃণা করেন না। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে যে, নিজেকে জানবার কথা এবং প্রক্রিয়া উপনিষদে বলা হয়েছে। তাঁরা আত্মাকে জেনেছেন তাই বিশ্বকে জানতে, তার রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি সহায়ক হয়েছে। তাকে জানলে কি হয়? 'আত্মনা বিন্দতে বীর্যং' (কেনোপনিষৎ ২।৪) অর্থাৎ মানুষ আত্মাকে জানলেই শক্তি লাভ করতে পারে। এই শক্তির সাহায্যে সৃষ্টি ও সংহারের সূত্রটিকে জানা যায়।

নক্ষত্রপরিচয়

ঋগ্বেদে বহু নক্ষত্রের পরিচয় আছে। সর্বপ্রাচীন বেদগ্রন্থ ঋগ্বেদ। সেখানে নক্ষত্রজগতের যা আলোচিত হয়েছে উপনিষদের যুগে তা অবশ্যই জ্ঞাত ছিল একথা বলা বাহুল্য। নক্ষত্র চক্রের ষষ্ঠ নক্ষত্রের ঋগ্বেদীয় নাম রুদ্র, সৈদ্ধান্তিক নাম আর্দ্রা, ইংরেজী নাম বেটেলগ্যিউসে। রুদ্রনক্ষত্রপুঞ্জ বা কালপুরুষ নক্ষত্রের তারা হলো রুদ্র। কালপুরুষের দুটি তারা সৌরবিশ্বের সঞ্চারপথের (বৃত্তের) আঠারো অংশ প্রক্ষেয় অন্তর্ভুক্ত। পঞ্চম নক্ষত্র হলো মৃগশিরা এবং ষষ্ঠটি আর্দ্রা। অন্য সব তারা সঞ্চারবৃত্তের বাইরে অবস্থিত। রুদ্রনক্ষত্র অত্যন্ত রক্তবর্ণ এবং কালপুরুষের দক্ষিণবাহু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৪।১২ শ্লোকে আছে 'যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ'। রুদ্রের তেজ সূর্যের চেয়ে অনেক বেশী। পৃথিবী থেকে প্রায় পঁচিশ আলোকবর্ষ দূরের জ্যোতিষ্ক হলো রুদ্র বা আর্দ্রানক্ষত্র। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার ওজ্জ্বল্য জানা যায়। আধুনিক বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে হিসেব করা গেছে যে রুদ্র নক্ষত্রের তেজ আমাদের সূর্য অপেক্ষা এক হাজার দুশো ষাট গুণ বেশী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত শ্লোকের শেষ অংশে আছে 'হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং'—এখানে বলা হচ্ছে রুদ্র হিরণ্যগর্ভেরও জন্ম প্রত্যক্ষ করেছেন। বিশ্বের আধিপত্যে রুদ্র ও হিরণ্যগর্ভের পূর্বাপরত্বে মতভেদ বর্তমান, (১২) তেমনি আর্দ্রার আয়তন সৌর জগতের মঙ্গলগ্রহের কক্ষ পর্যন্ত মহাকাশ আবরণ করে ফেলতে পারে, এ প্রসঙ্গেও মতভেদ বর্তমান।

জ্যোতির্বিদ্যার চিন্তাধারা: আদিকথা

বিশ্বের মূল অবস্থা সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকোপনিষদের বক্তব্য আমরা আগেই জেনেছি। তাতে বলা হয়েছে আদিতে সমগ্র বিশ্ব সূক্ষ্ম বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। ক্রমাবয়বে তা সংকুচিত হয়ে বায়ুতে (আমরা যাকে বলি আবহমণ্ডল) পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অপঃ বা জল। ক্ষিতি (মাটি, পৃথিবী) জলের উপরকার ঘন স্তর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তারপরে সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চমহাভূত একটি ডিম্বাকৃতির বস্তু থেকে। এই ডিম্বাকৃতি বস্তুটির মধ্যে সূর্যের জ্যোতি (উজ্জ্বলতা) ছিল। এবার উপনিষদে একজন ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে। ঐ জ্যোতিপুঞ্জের নিয়ন্তাকে বলা হয়েছে হিরণ্যগর্ভ। গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সকলেই এই ডিম্বাকৃতির বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এই ডিম্বাকৃতির উজ্জ্বল বস্তুটির সঙ্গে 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের মহাজাগতিক ডিম বা 'কসমিক এগ'-এর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বার্নার্ড লোভেল, মার্টিন-রাইল, জর্জ গ্যামো প্রমুখ বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন—যখন থেকে বিশ্ব বিস্তৃত হতে আরম্ভ করলো তার কোটি কোটি বছর আগে বিশ্বের সমগ্র বস্তুনিচয় ঘননিবদ্ধ ছিল—অনেকটা ডিমের মতো। তাকে বলা হলো কসমিক এগ। তাঁদের মতে, বহু বছর আগে আকস্মিকভাবে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে তা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো এই থেকেই এসেছে গ্যালাক্সি। বিস্ফোরণের পরে মহাকর্ষের ফলে খণ্ড কণগুলি আবার দানা বাঁধতে লাগলো। তা থেকেই প্রথমে নীহারিকা ও পরে নক্ষত্রের জন্ম।

নদীর উৎপত্তি ও স্রোতধারা

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।১০।১ শ্লোকে নদী সম্পর্কে বলা হয়েছে 'ঐমাঃ সোম্যঃ নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্য স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপিযন্তি স সমুদ্র এব ভবতি তা যথা তত্র ন বিদুরিয় মহমস্মীয় মহমস্মীতি।' - হে সোম্য এই পূর্ববাহিনী নদীসকল পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় এবং পশ্চিম বাহিনী নদীগুলি পশ্চিম দিকে প্রধাবিত হয়। তারা সমুদ্র থেকে (জলীয় বাষ্প বা মেঘরূপে উত্থিত হয়ে) সমুদ্রেই লীন হয় এবং সমুদ্রস্বরূপ হয়ে থাকে। সমুদ্রমধ্যস্থ নদীসমূহ 'আমি অমুক নদী' এইভাবে নিজের পরিচয় পায় না।

১০ লিঙ্কন বার্নেট : দি ইউনিভার্স অ্যান্ড ডঃ আইনস্টাইন, পৃঃ ১২৬-২৭

১১ স্বামী গম্ভীরানন্দ : ঈশোপনিষদ, চাঁকা, উদ্বোধন ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫

১২ বেলাবাসিনী ও অহনা গুহ : ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র

—এবার শারদীয়া পূজায়—
নূতন প্রচণ্ড হাসির নাটক (পূর্ণাঙ্গ)
[অফিস ক্লাব ও বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয় উপযোগী]
কিরণ মৈত্রের
টোপর বদল হ'লো ৪-০০
শৈলেশ গুহ নিয়োগীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ৪-০০
ডাইভোর্স ২-৫০
সিটি বুক এজেন্সী
৪৪।১সি বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

কুমারস্বামী সর্বপ্রথম এই শ্লোকের মধ্যে ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক পরিচয় নির্দেশ করেছেন। উপরের শ্লোকটির দুটি ব্যাখ্যা করা চলে। জলচক্রের নিয়মানুসারে সমুদ্র থেকে জল সূর্যের তাপে জলীয় বাষ্প হয়। ক্রমে মেঘের সৃষ্টি। মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা নদীর মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এবং অন্তিমে নদী সমুদ্রেতে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো সমুদ্রের স্রোত একবার নদীর দিকে ধাবিত হয় আবার উজানের অবসানে জল আবার সমুদ্রে চলে আসে।

উপনিষদের যুগে এই ধারণা ছিল যে বিস্তৃত জলরাশি অথচ সর্বদা স্রোত বর্তমান নয় তাকে বলা হয় সমুদ্র এবং নিয়ত স্রোতসমন্বিত বিস্তীর্ণ জলরাশিকে নদী বলে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতাতে স্রোতের উদ্ভব সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'সমুদ্রমভীতাঃ পিন্বমানম্। অভীতা শব্দটি উভয় দিক ইঙ্গিত করে। এর থেকে নদীর মোহানাতে স্রোতের প্রভাব বোঝানো হচ্ছে। 'পিন্ব' শব্দটির মানে হলো ফুলে ওঠা বা উপচে যাওয়া। তৈত্তিরীয় সংহিতা (৪র্থ-২।৮।১) এবং বাজসনেয়ী সংহিতায় (অষ্টম ২৮) সমুদ্রের স্রোত নিয়ে বলা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (নবম, ১।২।৩) সমুদ্রের স্রোত পৃথিবী এবং চন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে বক্তব্য আছে।

মৈত্রায়ানী উপনিষদে রয়েছে, 'সমুদ্র বেগ দুর্নিবার্যম্, অস্য মৃত্যোরগমণম্' অর্থাৎ সমুদ্রের স্রোতের মত মৃত্যু এগিয়ে আসছে, তাকে নিবৃত্ত করা দুরূহ। এখানে 'বেগ' শব্দটিতে স্রোত বোঝাচ্ছে। এই সব শ্লোক থেকে একথা সুস্পষ্ট যে সেই সময়ে স্রোতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তাঁদের ছিল।

দেশ ও কাল

উপনিষদে কাল সসীম এবং অসীম দুই-ই বলা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্ব এবং সসীমত্ব উভয় সম্বন্ধে বক্তব্য রয়েছে বৈদিক গ্রন্থসমূহে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে প্রজাপতির দুই অবস্থা—সীমিত এবং অসীম; ব্যক্ত ও অব্যক্ত, মৃত্যু এবং অবিনশ্বরতা। শতপথ ব্রাহ্মণের ৬।৫।৩-৭ শ্লোকে আছে 'উভয়ং বৈ তৎপ্রজাপতিঃ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ পরিমিতঞ্চাপরিমিতঞ্চ।' মৈত্রী উপনিষদের ৬-৩৫ শ্লোকেও একই কথা 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চাকালশ্চ' অর্থাৎ ব্রহ্মের দুই অবস্থা—এক অবস্থায় কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ, অন্য অবস্থায় কালাতীত, অখণ্ড। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে বলা যায় যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তহীন প্রকার এক অদৃশ্য আদর্শ জগতের চিহ্ন বহন মাত্র।

বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষ সন্ধান পেয়েছে অনন্ত বিশ্বের এবং অনন্তকালের যার তুলনায় মানুষের ক্ষুদ্র পৃথিবী এবং তার স্বল্প জীবন-পরিসর সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত নগণ্য। উপনিষদে দুটি বিদ্যার কথা আছে—পরা এবং অপরা। অপরা বিদ্যায় জগৎকে জানা যায়—বাইরের থেকে, বুদ্ধি দিয়ে। আর পরা বিদ্যায় জগতের মূলে পরমতত্ত্বকে জানা যায়—অন্তরে, বোধি দিয়ে। তাই জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানকে বলা হয়েছে অপরা জ্ঞান। উপনিষদে দুটি বিদ্যারই সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। একথা আজ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে যে, (১৩) 'বিশ্বকে ধরে জ্ঞানের অনুশীলন করতে করতে মানুষ বুদ্ধির পরিপাকে ঝোঁক কিম্বা-তীতের দিকে।' বিজ্ঞানীরা পদার্থের বা ব্রহ্মাণ্ডের মূলে অন্বেষণ করতে গিয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যে, তার সঠিক ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় দিতে পারছেন না।

(চার)

উপনিষদ ও আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তা

বিজ্ঞানের রাজ্যে আমরা পাই কার্য-কারণের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। প্রকৃতির রাজ্যে বস্তুজগতে রয়েছে নিয়মের অলঙ্ঘনীয় বন্ধন। কিন্তু এই কার্যকারণের সম্বন্ধের মধ্যে কোন আদি অন্ত বিজ্ঞান খুঁজে পায়নি। 'যা কিছু আছে বা যা কিছু ঘটছে, এ সবার আদিম কারণ বা শেষ কি এবং কোথায় এর কোন উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না', বলেছেন বিজ্ঞানাচার্য প্রিয়দারঞ্জন রায় (১৪)। আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হলো বস্তু এবং শক্তি আপাত-ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সম্পূর্ণ পৃথক বলে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অভিন্ন—একই সত্তার দুই পিঠ মাত্র। একারণে অবস্থার বিশেষে তাদের বিনিময় ঘটা সম্ভব। কিন্তু বস্তুরূপী শক্তির বা শক্তিরূপী বস্তুর উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে তার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান নীরব। যে বিজ্ঞান কার্য-কারণের সম্বন্ধে আস্থাশীল, বিশ্বাস করে ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সেই বিজ্ঞান এই সমস্যার জবাব দিতে পারে নি। এখানেই তার হার।

কিন্তু উপনিষদ ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের অন্ত খুঁজে পেয়েছে। উপনিষদে বলা হচ্ছে আত্মচৈতন্যেই বিশ্বচৈতন্যের অনুভব হয়। এই চৈতন্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানী শ্রডিংগার (১৫) বলেছেন, 'চৈতন্য এমন কিছুর একক রূপ যার বহুবোধক রূপটি অজ্ঞাত; সব কিছুই এক এবং অদ্বিতীয়, যেটাকে বহুত্ব বলে মনে হয় তা একই জিনিসের মায়াময় বিভিন্ন রূপ মাত্র।' চৈতন্যই বিশ্বমূল তত্ত্ব। চৈতন্যের প্রথম স্থিতি হলো জড়ের আয়তনের মধ্যে। বিশ্বচৈতন্য বিশ্বজড়ে তখন নিগূঢ়ীভূত রয়েছে। জড়, প্রাণ এবং মন এই তিনের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশের তারতম্য রয়েছে। জড়ে চৈতন্য থাকে সুষুপ্ত, প্রাণে স্বপ্নাবিষ্ট এবং মনে জাগ্রত। এই জাগ্রত চৈতন্য নিয়ে মানুষ অগ্রসর হয়েছে বিশ্বের রহস্য উন্মোচনে।

আধুনিক বিজ্ঞানেও স্বীকার করা হচ্ছে যে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুজগতের এবং বিকিরণের ফলে উদ্ভূত বস্তুর সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তাকে সে বর্ণনা দিতে পারে না বা প্রকৃতির কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরতে পারে না। ফোটন, ইলেকট্রন এবং প্রোটন আজ পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে যেমনি এক্স ওয়াই এবং জেড্‌কে বীজগণিতের প্রথম শিক্ষার্থী অর্থহীন মনে করে। (১৬) বিজ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে সংশয়। বিজ্ঞান আজ স্বীকার করছে যে তার সত্যগুলি খুচরা সত্য। অনেকগুলি সত্যকে জোড়াতালি দিয়ে ব্যাপক সত্যের উৎপত্তি হয় বিজ্ঞানে। তার কোন স্থিরতা নেই, কারণ নতুন তথ্যের আবিষ্কারে তার রূপ বদলে যাওয়া স্বাভাবিক, যেমনটি হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব, আপেক্ষিকতত্ত্ব আবিষ্কারের পর। প্রাচীন বিজ্ঞান ধারণার ক্ষেত্রে গভীর আঘাত এসেছে। উপনিষদ বা বেদান্তের সত্য শাশ্বত। কত যুগে কত বিপরীত ভাব, বিরুদ্ধ ধারণা এসে তাকে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করেছে, পারেনি।

বিজ্ঞানের গোড়াতেও এক বিশ্বাস আছে—তা হলো বিশ্বব্যাপী এক শাশ্বত সনাতন নিয়মে। এই নিয়মের ফলে সম্ভব হয়েছে বিশ্বের স্থিতি এবং গতি। এই সনাতন নিয়মের অন্তরালে এরই আশ্রয়রূপে রয়েছে এক বিশ্বব্যাপী চেতনাশক্তি। আচার্য প্রিয়দারঞ্জন বলেন, এই চেতনাশক্তিকে বিশ্বাত্মা বলা যেতে পারে। এহেন কোন শক্তি যে বর্তমান তা আজকের বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারছে না। উপনিষদে তাকেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম।

---

১৩ অনির্বাণ ঃ যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ ১৩৭৪ পৃঃ ৩০২।

১৪। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি, ১৩৬৪, পৃঃ ৬।৭।

১৫। হোয়াট ইজ লাইফ? পৃঃ ৯০-৯১

১৬। সার জেমস জীনস্ ঃ দি নিউ ব্যাকগ্রাউন্ড অব সায়েন্স, পৃঃ ৬-৭।

তপন, মিহির, দিবাকর, দিনেশ। এক মাস আগেও কেউ চিনতো না কাউকে—এখন ঠিক বন্ধু না হলেও বন্ধুর মত হয়ে গেছে চারজন। তপন আর মিহির থাকে সাউথে, দিবাকর আর দিনেশ নর্থে। বি-এ পাস করার পর বছর দুই বেকার ছিল তপন—ঠিক বেকার ছিল না, বাড়ীতে বসে ছিল। তার বাবা এখনো চাকরী করেন, বড় একটা ফ্যাক-টরীর সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার তিনি। বেকার জীবনের জ্বালা বলতে যা বোঝায় তপনের সৌভাগ্য, সেই সুখভোগ করতে হয়নি তপনকে।

মিহির ফিজিক্সে অনার্স পাস করে এম-এস-সি পড়ছিল, সেকেণ্ড ইয়ারে। চাকরী পাবার পর তাকে পড়া ছেড়ে দিতে হয়েছে। তার বাড়ীর অবস্থা তত ভাল নয়। তার বাবা কলকাতার একটা কলেজের ম্যাথমেটিক্সের অধ্যাপক ছিলেন বছরখানেকের ওপর রিটায়ার করেছেন। দু ভাইয়ের মধ্যে মিহিরই বড়, ফলে সংসারের দায় এখন তার ওপর বর্তেছে।

দিবাকরের এরকম কোন দায় নেই। তার বাবা এককালে ব্যবসা করতেন, বেশ কিছু টাকা ব্যাঙ্কে থাকা সম্ভব; দিবা-কর অবশ্য স্বীকার করে না। তবে কল-কাতায় তাদের দুখানা বাড়ী আছে সে-ই বলেছে। গত বছর এম-কম পাস করেছে সে; ল'র ফাইন্যাল দেবে এ-বছর। তার ইচ্ছা ছিল সে ব্যবসা করবে। কিন্তু চাকরীটা হঠাৎ পেয়ে গেল, বন্ধুবান্ধবরা বলল, তোর মাথা খারাপ, এমন চাকরী আজকালকার বাজারে কেউ হাতছাড়া করে!

দিনেশ একটা চাকরী করত। মফঃ-স্বলের একটা কলেজের লেকচারার ছিল সে। কলকাতা থেকে ট্রেনে তিরিশ কিলো-মিটারের মত পথ সপ্তায় পাঁচ দিন পাড়ি দিতে হত তাকে। হাঁটতেও হত আবার পনেরো কুড়ি মিনিটের পথ। মাইনে খুব খারাপ পেত। শেষের দিকে শরীর মন তার ভেঙে পড়ছিল। অনেকদিন থেকেই সে অন্য কোথাও একটা চাকরী চাইছিল। চেষ্টাও করছিল কিছু কিছু। তবে ব্যাঙ্কের চাকরী ঠিক পছন্দ ছিল না তার। সে চেয়েছিল কলকাতায় কোন কলেজে পড়াবে, দু-চার বছর পরে ইউ জি সি স্কেল পাবে—তেমন কিছু পাওয়ার লক্ষণ সে দেখতে পায়নি।

একেবারে নতুন খুলেছে তাদের ব্যাঙ্কের এই ব্রাঞ্চ, এখনো দু মাস হয়নি। ষোল-র মাসখানেক পরে একই দিনে, এক মঙ্গলবার, তপন মিহির দিবাকর দিনেশ চারজন এখানে জয়েন করেছে।

ন্যাশনালাইজেসানের পর থেকে সমস্ত ব্যাঙ্কই একের পর এক নতুন শাখা খুলতে আরম্ভ করেছে। দু-একটা শাখা এমন জায়গায় খোলা হয়ে যাচ্ছে যেখানে

হয়ত ব্যবসার সুযোগ খুব কম থাকে, তাতেও প্রথম দেশ বিদেশি ব্যবসা সেটেই সুবে না। যেমন তপনদের ব্যাঙ্কের ওই ব্রাঞ্চটার অবস্থা—নামী রাস্তার ওপরে অফিসটা, কিন্তু কয়েকশ গজের মধ্যে অন্য দুটি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ আছে অনেকদিন আগে থেকে। তাছাড়া ব্যাঙ্কের বড়টার ব্যবসার উপযুক্ত নয় ঠিক। বড়টার এলাকায় একটা স্টেশনারী দোকান, একটা চায়ের দোকান, তিনতলায় ফ্যামিলি নিয়ে বাস করেন বাড়ীওয়ালা। দুতলায় তপনদের বাসা। ওপরে ওঠবার সিঁড়ির মুখ অথাৎ বাড়ীর দরজার পাশের সরু একটা রাস্তায়। অন্যটা অবশ্য চাকরিজীবী বাঙ্গালীদের। এইসব কারণে ব্যাঙ্কের ব্যবসা জমেনি। দু-একজন খদ্দের কম আসে, যা আসে ওই দুপুরে দিকে—কিংবা কেরাণী, বয়স্কা গৃহিণী, তরুণী বধূ—

সানমাইকার শীট-এ মোড়া মডার্ন স্টাইলের, কর্মী মনের চমৎকার পালিশ-করা ঝকঝকে চেয়ার টেবিল। মোজাইক করা ভারি সুন্দর মেঝে-এ ঢালা টিউব লাইট, নামী কোম্পানীর তিলাক্স ফ্যান, ছোট্ট নীল রঙের ভিসটেম্পার্ড দেয়াল; কাউন্টারের সামনে খানিকটা ফেন্সিস, তার ওপর খুব দামী একটা সোফা, ওপরে কাচপাতা টেবিল, টেবিলের ওপর সুন্দর একটা অ্যাশট্রে। কয়েকটা অয়েল পেন্টিং আর দামী একটা রেডিওগ্রামের অভাব চোখে পড়ে, না হলে দিব্যি কোন রুচিবান ধনীর ড্রইংরুম মনে হয়।

ব্যাঙ্কের আগেই চারজনে এসে বসে আড্ডায়। তারপর একটার পর একটা সিগারেট আর কাপের পর কাপ চা।

'তপন, তুমি কী করে বাড়ীতে?'

'সকালে ঘুম থেকে যখন উঠি তখন সময়টা ঠিক সকাল থাকে না। তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে বাথরুমে ঢুকি। সাড়ে নটায় বাসে উঠি।'

'অফিস থেকে গিয়ে?'

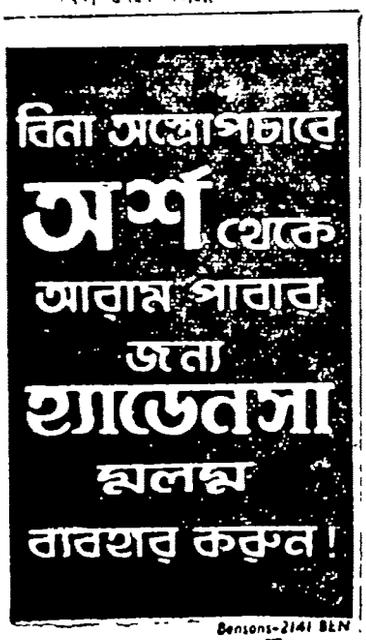

'আমার নিজের একটা অফিস ঘর আছে, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এক কাপ চা খাই মৌজ করে আর পরপর দুটো সিগরেট। তারপর ধীরেসুস্থে হাতমুখ ধুই। সন্ধ্যের পর বেরিয়ে পড়ি—বন্ধুবান্ধব আছে কিছু, জমিয়ে আড্ডা দিই। রাত দশটা নাগাদ বাড়ী ফিরি। এগারটায় শুয়ে পড়ি, বারোটা একটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন আবার আগের দিনের মত—।'

'তুমি ক্লান্ত হও না?'

'ক্লান্ত নাহ্!—তুমি?'

'আমি?' মিহির বলল, 'বাড়ী গিয়ে মুখহাত ধুয়ে আমি শুয়ে পড়ি, কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি। তারপর চা খাই। রাত্রে আমার বেরোতে ইচ্ছে করে না—বসে বসে বা শুয়ে শুয়ে উইকলি ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাই—ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে।'

'বইটই মানে, কী ধরনের বই পড়তে তোমার ভাল লাগে?' দিনেশ প্রশ্ন করে।

'কী ধরনের বই পড়তে ভাল লাগে, তা বলা মুস্কিল—তবে মাঝে মাঝে এমন বই পড়ি —সায়েন্স ফিকসান, ক্রাইম—এই সব আর কি!'

'গান কেমন লাগে তোমার, রবীন্দ্র-সঙ্গীত?'

'আমাদের বাড়ীতে কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গানের রেকর্ড আছে।'

'তোমার কেমন লাগছে ব্যাঙ্ক?'

'কেমন লাগছে—কী বলব, শুনেছ ত সব, —মোটামুটি ভাল ছাত্র ছিলাম একরকম। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুরা বলে এসেছে, এখনো বলে—আমি নাকি খুব ভাল ছাত্র,—আমি বলি, ওটা ইতিহাস হয়ে গেছে!' ভারি বিষন্ন দেখায় মিহিরকে; একটু পরেই আবার আগের মত স্মার্ট হয়ে যায়।—আমার অনেক টাকার দরকার। কী করে অনেক বেশী টাকা রোজগার করব এই একটাই চিন্তা এখন আমার!—আচ্ছা, কিন্তু দরকার ছিল ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার! সাধারণ হায়ার সেকেন্ডারী পাসই কি যথেষ্ট নয় এই চাকরীর জন্যে?—তোমার কেমন লাগছে বল,—তোমার নিশ্চয়ই—?'

'আমার মানে—' দিনেশ বলে, 'আমার একটা ভাল চাকরীর দরকার ছিল। ভাল চাকরী মানে একটা ভাল কাজ, যে কাজ আমি সাধারণত পছন্দ করি—। তবে আমি আমার চেয়ে বয়স কলেজে—এখনো ঠিক আশা ছাড়ি নি! তবে কি একটা কথা এটা এমন একটা সময়—তুমি যে কাজ চাও, যে কাজে তুমি আনন্দ পাবে বলে বিশ্বাস কর, সেই কাজ তুমি কি পেতে পার!—কেউ কেউ হয়ত পায়, পাচ্ছে, তবে সেটা আকস্মিক একটা অ্যাকসিডেন্ট; যেমন হচ্ছে—আমি এম-এ পাস করেছি বলেই এই কোম্পানীর চাকরী করছি!'

'নিশ্চয়ই কেরাণী থাকবে না চিরদিন!'

'না—আমি, কী বলব, সত্যি কথা বলতে কি খুব বেশী টাকা আমি চাই না। মোটামুটি যতটুকু দরকার—আমার খুব বেশী দরকারও নয়, আমি মনে করি এ চাকরী করেই আমি ফুরিয়ে যাব,—এই চাকরী করছি আমি, এটাই আমার পরিচয় এ আমি ঠিক মানতে পারব না কোনদিন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না—।'

'তুমি সত্যিই আমাদের মধ্যে অন্যরকম—তোমাকে দেখলেই এটা বেশ বোঝা যায়।—জান দিনেশ, আমার খুব ইচ্ছা ছিল এম-এস-সিটা কমপ্লিট করে রীসার্চ করব—সুযোগ যদি পেয়ে যাই আমেরিকা যাব। সেই ছেলেবেলা থেকে স্বপ্ন দেখে আসছি বড় একটা আবিষ্কার করেছি আমি!—সেই স্বপ্নের আনন্দ আমার চিরদিনের মত স্বপ্নই থেকে গেল। —কি দিবাকর, তুমি কিছু বলছ না!'

দিবাকরের চিরকাল ছাত্র; ভারি শান্ত ছেলেটা। দিবাকরের, —'আমি ভাই তোমাদের মত ভাবুক নয়, মোটা মানুষ, মোটাবুদ্ধির মানুষ আমি! বায়োম করতুম আগে রোজ বিকেলবেলা। চাকরী পাবার পর ভাবলুম, দুর হাই হয়ে রোজ রোজ সন্ধেটা নষ্ট করব, হুতে দিলুম ব্যায়াম। দেখ না, এক মাসেই কী রকম ভুঁড়ি হয়ে গেছে!'

সবাই উপভোগ করে দিবাকরের রসিকতা। চাকরী ভাই আমার পোষাবে না—এই দশ-পাঁচশ টাকা দেবে আমাকে, ওই টাকায় কী হবে আমার! তবু যখন নিয়োগ চাকরীটা, হাতে রাখব কিছুদিন, বিজনেস যেটা আমি খুব শিগগিরই শুরু করব—যদি দাঁড়িয়ে যেতে পারি, পারব বলেই আমার বিশ্বাস।'

'তখন তোমার ভুঁড়িটা কী চেহারা নেবে দিবাকর?' তপন হাসায় সবাইকে।

দিনেশ প্রসঙ্গ বদলায়। 'নতুন ছবি কে কী দেখলে?'

তপন বলল, 'আমি ভাই বাংলা সিনেমা দেখি না, হিন্দী ছবি প্রায় সব দেখি। একটাই ত ছুটির দিন রবিবার —ম্যাটিনীতে একখানা দেখি, ইভনিংটা বিশ্রাম নিই—ম্যাটিনীতে যা দেখি ওই তিন ঘন্টায় সেটা ভুলে যাই, তারপর ফ্রেস মন নিয়ে নাইট শোয় কোথাও ঢুকে পড়ি। —তোমাদের নিশ্চয়ই হিন্দী ছবির গপ শুনতে ভাল লাগবে না।'

'না না!' মিহির বলে, 'ইদানিং কিছু কিছু হিন্দী ভাল ছবি রিলিজ করছে। প্রতিশ্রুতিবান আর্টিস্ট আসছে, ডিরেকটার আসছে, প্রডিউসারও আসছে দু-একজন যারা হিন্দী ছবির জগতে বিপ্লব আনবার চেষ্টা করছে। —তবে একটা কথা—দিনেশ, তুমি দেখেছ কোন হিন্দী ছবি সম্প্রতি?'

'না, —হিন্দীটা আমি ঠিক বুঝি না। অবশ্য ল্যাংগোয়েজটা বড় ম্যাটার এখানে নয়—হিন্দীতে ভাল ছবি নিশ্চয় হতে পারে! —আমি সাধারণত ইংরাজী ছবি দেখে থাকি। মেট্রোতে একটা ছবি

হয়ে গেল —'দি রায়াল্স ড্যাটার' কেউ দেখেছ নাকি, আমার কয়েকটা জিনিস বেশ লেগেছে। অবশ্য এর চেয়ে অনেক ভাল ছবি দেখেছি আমি। আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি,—ইংরাজী ছবির ওপর আমার কোন বায়াসনেস নেই,—আমার মনে হয়, একটা সাধারণ ইংরাজী ছবিতে এমন অনেক জিনিস থাকে আমাদের বেশ ভাল বাংলা ছবিতে সে সব দেখা যায় না। আমি এ কথা বলছি না খারাপ ইংরিজি ছবি হয় না—অজস্র হয়। আমি মোটামুটি ভাল ইংরাজী ছবির কথা বলছি। আর খুব ভাল ইংরাজী ছবি, যাকে বলা হয় অসাধারণ—সে অন্য জিনিস। মজা হল, সাধারণ দর্শক এসব ছবির খবর বড় একটা জানে না। আসলে শিল্প-সংস্কৃতি সে আমাদের দেশেই হোক বা ইউরোপ আমেরিকায় হোক, মহৎ শিল্প চিরকালই সাধারণের এক্তিয়ারের বাইরের জিনিস। যেমন, সত্যজিৎবাবুর 'পথের পাঁচালী' সাধারণ দর্শকদের ভাল লেগেছিল কি? যদি লেগে থাকে, কেন লেগেছিল,—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই একটা বিরোধ দেখা দেবে। দেখা যাবে যে সাধারণ দর্শকদের যে কারণে ভাল লেগেছিল, সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীর শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্য সেটা নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' —কোন একজন বাস্তব মাঝি যে পদ্মা নদীতে মাছ ধরে, সে কি এই উপন্যাসের রস আস্বাদন করতে পারে। পারা সম্ভব নয়। তাই বলে 'পদ্মা নদীর মাঝি' কিছু কম মহৎ শিল্পকর্ম নয়। —আমি বলতে চাইছি—।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না অধ্যাপক তোমার লেকচার,—স্লিজ—।'

'সরি।' দিনেশ খুব সংকুচিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরায়: 'প্রেমিকা আছে নাকি কারো?'

সকলে নীরব।

'প্রেমে পড়ো নি কেউ কখনো?'

সকলে নীরব।

'সে কী! ভারি আশ্চর্য ত, প্রেমে সকলের এত অনীহা!'

তপন বলে উঠল—প্রেমে পড়ব কী, পড়লে ত অসংখ্য মেয়ের প্রেমে পড়তে হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দৈনিক অন্তত এক শ' সুন্দরী মেয়ে দেখি যাদের সঙ্গে প্রেম করা যায়! কিন্তু তা ত আর করা যায় না, তাই শুধু দেখে যাই।'

'তুমি, মিহির?'

'আমার ঠিক, কী বলব, আমি সুযোগ পাই নি! সুযোগ পাই নি বললে ঠিক বলা হয় না, —সময় পাই নি—। নাহ্ আমি প্রেমে পড়ি নি।'

'দিবাকর তুমি?'

দিবাকর হাসে। 'আমি একটু মেয়ের প্রেমে পড়েছি অনেক দিন থেকে। পাড়ার মেয়ে, আমাদের বাড়ীর চার পাঁচটা বাড়ী পরে থাকে। মেয়েটি জানে সব, আমাদের মধ্যে প্রেম আছে বোঝে। দেখা হলে আমিও হাসি সেও হাসে কিন্তু আমি যেই কোন কথা বলতে যাই অমনি সে বলে ওঠে—বলে দোব কিন্তু তোমার বন্ধুদের।'

সবাই বেশ উপভোগ করে দিবাকরের কথাবার্তা।

'দিনেশ, তুমি অধ্যাপক ছিলে—তুমি নিশ্চয়ই—?'

'নাঃ! যা ভাবছ তা নয় কিন্তু। তবে, কী বলব— শুনবে, বলব একদিন!—গান হোক।'

'হোক হোক!'

'মিহির একটা গান গাও।'

গান শুরু হল। শুরু হয়েই থেমে গেল। এদের জানালার ওপারে পাশের বাড়ীর জানালার নীল পর্দা দুলে উঠল, দেখা দিল নীল শাড়ির আভাস—তারপর দুটি চোখ—গভীর, মায়াময়।

চারজন চারজনের চোখের দিকে তাকাল। আবার শুরু হল গান। নতুন গান ঃ চোখের আলোয় দেখেছিলাম.....

যাকে প্রথম সেই দেখা গিয়েছিল তারপর থেকে রোজ তাকে দেখা যেতে লাগল। তারপর এমন হল দুটি চোখ জানালার নীল পর্দার পাশে জেগে না থাকলে তপনদের দিন কাটে না। যদি কোনদিন সে কোন কাজে ব্যস্ত থাকে জানালার কাছে দাঁড়াতে সময় না পায়, সে দিনটা বিরাট বঞ্চনা হয়ে তাদের পীড়া দেয়—অফিসে, বাড়ীতে যেখানেই থাকে, যেখানেই যায় একটুও ভাল লাগে না। খুব নিষ্ঠুর, নির্দয় মনে হয় নারীকে।

ফর্সা নয়, বরং কালোই, মুখে আশ্চর্য লাবণ্যও কিছু নেই—রূপ তার সামান্য। কেমন করে তবু এমন হল—রূপ তুচ্ছ হয়ে গেল। শুধু দুটি সুন্দর নম্র চোখ—কী ছিল ওই দুটি চোখে যার মায়ায় চার যুবক চার প্রেমিক হয়ে গেল।

তপনের মুখে দেখা দিল পাউডারের আভাস, মিহিরের জামায় সেন্টের সুবাস। দিবাকর চেহারাটাকে মানানসই করতে আবার ব্যায়ামে মন দিল। আর দিনেশ, সে নতুন করে ছাত হয়ে গেল আবার—সেই কলেজের দিনগুলোয় সে যে রকম ছিল—হ্যান্ডলুমের কাপড়ের পাঞ্জাবি, এক মাথা অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল।

আর এদের মনের খবর —সেটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার প্রত্যেকের, কেউ মুখে কিছু প্রকাশ করতে নারাজ।

'একটা নাম দাও!'

দিনেশ নাম দিল—শ্যামলী।'

'শ্যামলী! —এমনিতে ভালই, তবে বড্ড আদ্দিকালের?'

'সেটা ঠিক। তবে যেটা হচ্ছে সেটাও কিছু কম আদ্দিকালের নয়।'

'আচ্ছা, নতুনরকম কিছু হয় না।'

'কি রকম?'

যেমন, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি এমন কি নিজেদের ভবিষ্যত নীতি নিয়ে এত যে কথা হত চারজনের সে সব কোথায় গেল। একটাই ঢেউ-এ দুলতে লাগল চারজন। একটাই সুরে কাঁপতে লাগল চারজনের হৃদয়। চারটি মন সারাদিন জানালার ধারে নানা সুরে একটাই সুর শোনায়। আর সুর শোনার আশায় আশায় কান পেতে থাকে।

ওদিকের বাতায়নও সারাদিন খোলা থাকে। নীল পর্দায় পাশে নীল শাড়ি আর আভাসে নয়, আপন রূপে বিরাজ করে সারা দুপুর। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। রক্তিম রোদ ঘুরে যায় ওদিকের জানালায়। এদিকের জানালায় তখন পূরবী।

চার বন্ধু মনে মনে পরস্পর পরস্পরকে ঈর্ষা করে। একজন যদি জানালার কাছে আসে, বাকী তিনজন মনে মনে জ্বলে। তারপর পায়ে পায় তারাও এসে দাঁড়ায় জানালার ধারে। এসেও আসতে পারে না আবার, কেমন যেন সংকোচ হয়।

সংকোচের বাধা পেরিয়ে প্রথমে তপন একটু সাহস দেখাল। একদিন সে সত্যি করে হাসবার চেষ্টা করল। পরের দিন মিহির হাসল। পরের দিন দিবাকর। দিবাকর সাহসের চরম প্রমাণ দিল—কথা বলবার চেষ্টা করল। ওপার থেকে উত্তর হল হাসি। তপন কী যেন শুধোল একদিন। উত্তর এল ওপার থেকে—সেই হাসি। তারপর সকলের

নৃত্য ও সঙ্গীতজগতের দিক্‌পাল মনীষিবৃন্দ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত
প্রখ্যাত নৃত্যবিদ্ অনুপশঙ্কর অধিকারী প্রণীত
নৃত্যবিতান ৭·৫০
এই গ্রন্থে সঙ্গীতপ্রভাকর, সঙ্গীতবিশারদ, সঙ্গীতসুধাকর প্রভৃতি সকল উপাধি পরীক্ষার ১ম হইতে ৬ষ্ঠ বর্ষের সিলেবাসের যাবতীয় থিয়োরী ও ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাস সন্নিবেশিত আছে।
সান্যাল য়্যান্ড কোং, ১/১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

অসংখ্য প্রশ্ন —সব প্রশ্নের উত্তর শুধু হাসি।

হাসো। হাসি! পৃথিবীতে এমন হাসি এতদিন কোথায় ছিল। হাসতে হাসতে এত সুন্দর দেখতে—কে দেখেছে কবে! যতই দেখে ততই দেখার তৃষ্ণায় মন ভরে।

চার প্রেমিক চার প্রতিদ্বন্দ্বী হল। তপন যখন 'শ্যামলী'র চোখের দিকে তাকায়, তপনের মুখে, চোখে, ব্যক্তিত্বে এই কথাটাই ফুটে ওঠে—তাই সকলের চোখে ধাঁধা। মিহির, দিবাকর, দিনেশ সবাই ওই একই কথা বলে—আমি আগে যেতাম। জানালার ওপার থেকে একজন হেসে যায়।

আর একজন আসে মাঝে মাঝে জানালার ধারে। তার চোখে মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকে সবসময়ে। সে শ্যামলীর ছোট বোন, তপনদের বন্ধু। ভারি ভালো মেয়ে সে—দিদির পাশে দাঁড়িয়ে তপনদের সঙ্গে অনেক কথা বলে।

তপনরা বেঞ্চে হেঁটবোনের মুখ দিয়ে দিদিই আসলে কথা বলে।

আসল কথাটা দুপক্ষের কেউ যা মুখে বলতে পারে নি মনের সেই কথার আনাগোনা দুপক্ষ পড়ছিল মনে মনে।

মনের যখন এই অবস্থা, অফিসের শেষ চার বন্ধু একদিন রাস্তায় নেমেছে, দেখতে পেল অদূরে দাঁড়িয়ে আছে ওদেরই ছোটবোন—তার দুচোখ বলছে —আপনাদের জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।

চারজনই চমকালো মনে মনে। কী কাণ্ড! পায়ে পায়ে ছোটবোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'কী, কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ—আপনাদের নাম কী?'

নাম। —কেন?'

'বলুন না!'

'কেন বল ত?'

'বলুন না!'

'কে জানতে চেয়েছে—দিদি?'

'হ্যাঁ।'

'ও!'

'কই বলুন!'

'পরে—।'

'এখন বললে কী হয়!'

'না, কী হবে! পরে বলা যাবে!'

কোনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'বলবেন না তাহলে?"

'পরে—পরে!'

'আচ্ছা!' চলে গেল সে আর কথা না বলে।

'ব্যাপার কী!' চারজন চারজনের মুখের দিকে তাকায়। মুখের রঙ বদলে গেছে সকলের। মনের উৎকণ্ঠা লুকোতে চাইছে সবাই—যেন কিছুই ঘটে নি, কেউ একটুও বিচলিত হয়নি। চোখের দৃষ্টি কিন্তু অন্য রকম হয়ে গেছে প্রত্যেকের।

'কী—কী মনে হয়—নাম নিয়ে কী হবে!'

'কী হবে?—এবার আসবে!'

'কী আসবে?'

'চঠ!'

'চিঠি!'

'এত দিন মনে মনে যে খেলা খেলেছ, এবার সময় হয়েছে তার মাশুল দিতে হবে!'

'কী করতে হবে?'

'প্রেমের খেলা নয় আর, সত্যিকারের প্রেম করতে হবে!'

সবাই কেমন হয়ে গেছে। কথা নেই মুখে কারো। হেঁটে চলেছে চারজন যেন চারজন অন্য মানুষ চলেছে।

'কিন্তু চারজন ত আর একজনের সঙ্গে—!'

'নিশ্চই নয়!—চারজনের মধ্যে একজনকেই—আমাদের মধ্যে যে কারো একজনের নাম—!'

তারা একটা চায়ের দোকানে এসে উঠল। পুরোনো ছোট্ট চায়ের দোকান। ভেতরে চারজনেরই মাত্র বসবার জায়গা। একজন খুব বুড়ো লোক বসে আছে উনুনের ধারে। উনুনে একটা কেটলি বসানো আছে। উনুনের আঁচ কিন্তু বেশ গনগনে। জ্বলন্ত চোখে বুড়ো তাকাল চারজনের মুখের দিকে।

'চারটে চা।'

কোন কথা নেই তারপর আর চারজনের মুখে। মুখ তুলে কেউ কারো দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না।

তপন সিগারেট ধরাতে গিয়ে অনেকগুলো দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট করল। মিহির টেবিলে হাত দুটো রেখে সেই যে মাথা নিচু করেছে আর মুখ তোলে নি—গুনগুন করে একটা গান গাইবার চেষ্টা করছে। দিবাকরকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে একবার দুবার বলল—চা হতে দেরী হচ্ছে কেন! দিনেশ বার বার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

চা এল। চারজনেই এক সঙ্গে চায়ের কাপ তুলে। প্লেটে প্লেটে কাপ কাঁপার ঠক্ ঠক্ শব্দ হল। প্রত্যেকের কাপ থেকে চা চলকে পড়ল। চারজন চারজনের চোখের দিকে তাকাতে লাগল —তাকায় আর চোখ নামিয়ে নেয়।

'আমাদের মধ্যে একজনের কিন্তু দিতেই হয়!'

'নিশ্চয়!'

'কে নাম দেবে—তপন?'

সকলে তপনের মুখের দিকে তাকাল।

'আমি!' তপনকে চেনা যায় না।—'আমি—আমি ভাই রাস্তায় মেয়ে দেখতাম—তাই দেখব আবার।—মিহির যদি—।'

সকলে মিহিরের দিকে তাকাল।

মিহিরের মাথা নিচু হয়ে গেল।—'আমার কেরিকিরি তৈরী হয়নি এখনো—।—দিবাকর ইচ্ছা করলে—।'

দিবাকরের মুখের দিকে তাকাল সকলে।

'আমার যে কোন উপায় নেই—বাবা মা আমাকে না জানিয়েই এক জায়গায় আমার বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন।' দিবাকর কথাটা বলে হাসবার চেষ্টা করল—মুখটা তার কেবল বিকৃত হল মাত্র!

'দিনেশ?'

দিনেশকে কী রকম অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। তার কণ্ঠে অদ্ভুত উদ্বেগ 'আমার ভীষণ উদ্বেগ হচ্ছে—ও টেনসন আমি সহ্য করতে পারি না! আমাকে তোমরা ক্ষমা কর—। খুব কষ্ট হচ্ছে আমার।"

'কী কী কষ্ট হচ্ছে তোমার দিনেশ!' সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'আমি বলতে পারব না—বোঝাতে না! আমার মনে হচ্ছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব!—একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে!'

তপনকেও বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।—'আমার শরীরটাও ভালো লাগছে না।—ঠিক বুঝতে পারছি না—বেশ কষ্ট হচ্ছে!'

মিহির বলল—'আমারও কী রকম অসুস্থ লাগছে—। একটা হতাশা মনের মাঝে আমাকে এই রকম আচ্ছন্ন করে—সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা—মনে হচ্ছে তবে কি হবে—তবে কি হবে" গলা, বুক, মিহিরের রীতিমত—চোখে মুখে আতঙ্ক।

দিবাকর কিছু বলতে পারছে না—কিন্তু ভেতরে ভেতরে আরও মড় উঠেছে—ভেঙে পড়তে চায়। তার কণ্ঠস্বর স্তিমিত শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের দোকানটা চারটে কঠিন দেয়ালে মোড়া।—একটাও জানালা নেই—কোন বাতায়ন নেই! বাতাস নেই। ধোঁয়া, ধুলো আর ভেজা ধুসর আলো। একটুও শব্দ নেই—কোন স্পন্দন নেই বাইরে পৃথিবী কি নিঃশব্দে মরে পরিণত হয়ে গেছে! ভাঙা টেবিল আর শূন্য কাপপ্লেটগুলো যেন পড়ে আছে যেন কতকাল আগে কারা ব্যবহার করে গেছে! কয়েকটি মাছি উড়ছে, কোন শব্দ হচ্ছে না—প্রাণহীন মাছিগুলোর গায়ে মরচে পড়ে গেছে।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে মূল শরীর থেকে! নিজের সঙ্গে নিজের সংযোগের যে তন্তুটা সেটা কাঁপছে থর থর করে—ছিঁড়ে যাবে যে কোন সময়। তলিয়ে উঠবে—পড়ে ছাই হয়ে যাবে চারটে অস্তিত্ব।

তবু উঠে যেতে পারছে না কেউ। 'শক্তি নেই'—বলার আগেই চারজন চারজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিয়েছে। তারা জানত তাদেরকে এই অসহায় হয়ে।

মনের খবর

মানসিক রোগ—(৫)

সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে মানসিক রোগ মেয়েদের বেশী হয়। এক সময় ফ্রয়েড বলেছিলেন লিবিডো পরিণতির ক্ষেত্রে মায়ের প্রতি অশৈশব আকর্ষণ ও তাকেই কেন্দ্র করে যে ভোগবৃত্তি গড়ে উঠতে থাকে, যেহেতু মেয়েদের ঈডিপাস স্তরে এসে তাতে বাধা পেয়ে বাপের প্রতি তার আকর্ষণের মোড় ঘোরে, সেই জন্যে মেয়েদের মনে এই সময় একটা বিশেষ রকমের আলোড়ন চলতে থাকে। তাতে করে পূর্বেকার আস্থার ভিত নড়ে যায়। ফলে আবার তাকে নতুন করে বাপের দিকে নজর দিয়ে ভিত পত্তন করতে হয়। এই অমূল নড়চড়ের ফলে তার মনের ভিতটা একটু নড়বড়ে থেকে যেতে দেখা যায়। এই জন্য মেয়েদের বায়ুরোগ দেখা দেবার সম্ভাবনা ছেলেদের চেয়ে বেশী থেকে যায়। ফ্রয়েডের উক্ত মতের স্বপক্ষে যে যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন তা অকাট্য না হলেও খুব সহজে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত বেশ কিছু সংখ্যক মেয়েদের বেলায় যে এই যুক্তি খাটে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে আলোচনা এখানে আর বাড়াব না। তবে বায়ুরোগের বেলায় যদিই বা এ মত মানা যায়, তবু সাধারণভাবে সামগ্রিক বিচারে যে মেয়েদের মানসিক রোগ ছেলেদের চেয়ে বেশী হয় এমন কথা বলা কঠিন। নির্ভরযোগ্য কোনও পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলবার মত তথ্য আমাদের জানা নেই। মোটামুটি বিচারে মনে হয়, মানসিক রোগের আক্রমণ ছেলে বা মেয়ে কাউকেই বাদ দিয়ে বা খাতির করে চলে না।—লিবিডো পরিণতির বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় এ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে। পরে দরকার মত আরও বলা যাবে। এখন বায়ুরোগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

মানসিক রোগ যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, পূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে যে নানা মুনির নানা মত আছে তাও বলা হয়েছে। আমরা এই মানসিক রোগের তিন রকমের শ্রেণী ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করব। তার মধ্যে পূর্বে দেওয়া তালিকার বায়ুরোগ সম্বন্ধে বলা যাক। বায়ুরোগের মধ্যে যে দুই রকম রোগ দেখা যায়, তার মধ্যে হিস্টিরিয়া সম্বন্ধে প্রথম বলি। হিস্টিরিয়াকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তার এক ভাগে, উৎকণ্ঠাকথা (অ্যাংক্সাইটি স্টেট) দ্বিতীয় ভাগে আছে আতঙ্কাবস্থা (ফোবিয়া) ও তৃতীয় ভাগে আছে বিপরিনামী হিস্টিরিয়া (কনভার্সান হিস্টিরিয়া)। একে একে এই তিন রকমের হিস্টিরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

হিস্টিরিয়ার একটা প্রধান লক্ষণ হল প্রক্ষোভের (ইমোশান) অস্থিরতা বা অপ্রতিষ্ঠ অবস্থা। আনন্দ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি যে কোনও প্রক্ষোভের অস্বাভাবিক মাত্রাধিক্য বা অসঙ্গত কম প্রকাশ অথবা অসঙ্গত প্রকাশ। প্রচলিত ধারণায় হিস্টিরিয়া বলতেই ফিট হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বোঝায়। এটা ঠিক যে এক রকম হিস্টিরিয়া রোগে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় দাঁত কপাটী লাগে, হাতের মুঠো শক্ত করে বন্ধ হয়ে থাকে। রোগী নানা রকম হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, গোঙানোর শব্দও করতে থাকে—অথবা একটানা উঁ—শব্দ করে যেতে থাকে। নিঃশ্বাস সহজভাবে পড়ে না। দম আটকে রেখে হঠাৎ দম ছাড়া। কেউ মুঠো করা হাত দিয়ে নিজের মাথায় বুকে বা পেটে জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে। মেঝেতে বা খাটে মাথা, কপাল ঠুকতে থাকে। কেউ কেউ নিজের হাত বা শুশ্রূষাকারীর হাত গা কামড়ে দেয়। কেউ কেউ ঐ ফিট হলে কাঁদতে থাকে, দাঁত বন্ধ থাকলেও কান্নার আওয়াজ শোনা যায়—চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এই সব নানা রকম লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। আজকাল এই ফিটের ব্যারাম আগের চেয়ে যেন কম দেখা যায়। তাই বলে হিস্টিরিয়া যে কমে গেছে তা নয়। হয়ত লক্ষণের রকমফের হয়েছে এই যা। আমাদের ছোটবেলায় দেশের বাড়ীতে অনেক ঝি কাজ করত। তখন দেখেছি এক ঝিয়ের হিস্টিরিয়ার ফিট হয়ে তার গোঙানী শুরু হলে সে শব্দ শুনে অন্য ঘরে আরেকজন ঝিয়েরও ফিট শুরু হয়ে যেতো। এমন কি একজনের ফিট হয়েছে খবর শুনে আরেকজনেরও ফিট শুরু হয়ে যেত। কখন এমনও দেখেছি একে একে তিনজনের ফিট একত্রে হয়েছে। তখন এক হৈ-চৈ কাণ্ড। কে কাকে সামলায়। সব মিলে এ নিয়ে বেশ হাসির ব্যাপার ঘটত। বড়রা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতেন। যারা রোগীদের সামলাতে ব্যস্ত থাকত তারাও যেন কতকটা মজা দেখার মতই সমস্ত ব্যাপারটাকে মনে করত। এটাকে কেউ একটা গুরুতর রোগ বলেই যেন মনে করত না। রোগীর জ্ঞান ফিরে এলে বরং তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতেও শুনেছি। একদিনের কথা বলি। মাঝবয়সী এক বিধবা ঝিয়ের কাজ করত অনেক দিনের পুরোনো লোক। তার এক অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েও তার সঙ্গে কাজ করত। অল্পবয়সী বিধবাটির নাম ধরা যাক—সাগরী। বয়স ২০।২২ বছর হবে। একদিন দুপুরে গড়িয়ে যাবে নিস্তব্ধ বাড়ি এমন সময় শোনা গেল সাগরীর ফিট হয়েছে। গিয়ে দেখি সে চিৎ হয়ে শুয়ে জোর জোর একটানা উঁ উঁ—শব্দ করছে। চোখ বন্ধ, দাতে দাত এটা, হাত দুটোই মুঠো করা। সেই হাতে সে দুমদাম নিজের বুকে কিল মেরে চলেছে। তার দু পাশে দুজন অন্য ঝি বসে হাত ধরে রেখেও আটকাতে পারছে না। মনে আছে তার ঐ গায়ের জোর দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কী ভয়ংকর জোর বেড়ে যায় হিস্টিরিয়ার ফিটের সময়। দুই হাত যখন দুই পাশে মাটিতে চেপে ধরে দুজনে তখন সাগরী তার পা দুটোতে আবদ্ধ করল আর অবিরাম মাথা এ পাশ ও পাশ নাড়াতে লাগল। আরও তিন-চারজন তাকে সামলাতে যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন অন্য এক ঘরে আরেক ঝিয়ের ফিট শুরু হয়ে গেছে। তাকে সামলাতে অন্য লোকের দরকার হল। সেখানে গিয়ে দেখি, মালতী ঝি—সে মধ্যবয়স্কা হবে—মাটিতে উবু হয়ে পড়ে মেঝেতে মাথা ঠুকছে যেন হাতুড়ী পেটার মত আওয়াজ হচ্ছে। আমার ত ভয় হয়েছিল মাথাই বুঝি ফেটে যায়। একজন তার কপালে নিজের হাতটা দিয়ে মালতীর মাথাটা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর হাতশুদ্ধ এত জোরে মেঝেতে মালতী মাথা ঠুকল যে বেচারার হাতের আঙুলের গোড়া সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠল। সে তো তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। এ দিকে মালতীর মাথা ঠোকা আর থামে না। তখন কে একজন তাড়াতাড়ি কোথা থেকে একটা বালিশ এনে সেখানে রাখল। তাতে মালতীর মেঝেতে মুখ ঠোকাটা বন্ধ হল। কিছুক্ষণ বালিশে মাথা ঠুকে পর এক সময় দুহাতের মুঠির মধ্যে বালিশটা চেপে ধরে দাঁত দিয়ে কামড়ে টেনে বালিশের ওয়াড় ছিঁড়ে ফেলল। আবার তাকে সামলানোর চেষ্টা চলতে লাগল। ততক্ষণে বালিশের তুলো বেরিয়ে পড়েছে—মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ছে—তবু ফিটের নিবৃত্তি পড়ে না। একজন কে যেন তখন লঙ্কা পুড়িয়ে নাকে ধোঁয়া দেবার কথা বলেছিল। হয়ত সেই ব্যবস্থাই হচ্ছিল,—কিন্তু সেই ঘরেই বারান্দার আর এক কোণে ততক্ষণ তৃতীয় জনের ফিট শুরু হয়েছে। তখন দেখি

প্রকাশিত হল
অমর বসু/দিলীপ পাল সম্পাদিত
শারদীয়া **দৃশ্য** ১·০০
লিখেছেন : গল্প/বীরেন্দ্র দত্ত, বোম্মানা বিশ্বনাথন অমিতাভ বসু, সীমা মিত্র। কবিতা ও অন্যান্য আলোচনা/পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, দেবাবতি মিত্র নিশীথ ভড়, গঙ্গাপদ বসু অংশু বসু, রবীন মজুমদার রাম পাঠক ইত্যাদি ও অসংখ্য বিচিত্র ছবি। প্রচ্ছদে উত্তম-সুপ্রিয়ার নতুন স্বাদের ছবি।
কার্যালয় : ১।এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা ৬। ফোন—৩৫-৩২০৬।

সেবার চেয়ে সকলের হাসির বহরটাই যেন সব ছাপিয়ে উঠেছে। ওদিকে সাগরীর নাকে ততক্ষণ মরিচ পোড়ার ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে আর তার ব্যারামের তেজও তখন কমে এসেছে। মালতীর মুখে চোখে তখনও জলের ঝাপটা চলছে। সকলের হাসিঠাট্টার মধ্যেই জলের ঝাপটা ও পরে মরিচ পোড়ার ধোঁয়া দেওয়া হল। কে একজন যেন আলমারী থেকে স্মেলিং সল্টের শিশি নিয়ে এসে মালতীর আর সেই তৃতীয়া বমার মায়ের নাকের কাছে পালাক্রমে ধরতে লাগলেন। তারাও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসে। ঐ ওষুধ নাকের কাছে ধরতেই রোগী দম বন্ধ করে দেয় বা মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে নেয়। সেখানে ওষুধ ধরতেই আবার মাথা ঘুরিয়ে নেয়। এও যেন এক মজার ব্যাপার। সকলে বেশ হাসতে শুরু করেছে। তার মধ্যে থেকে কে যেন বলেছিল, 'নে এখন উইঠ্যা পড়। অনেক হইছে।' সে কথা মনে পড়ে এখন মনে হয় ওরা যেন মনে করত যে ফিটের ব্যারামের রোগী ফিটের সময়ও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারায় না। তারা যেন কিছু কিছু শুনতে বুঝতে তখনও পাবে। বর্তমানের বিজ্ঞানের যুগেও বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে, হিস্টিরিয়ার রোগীর ফিটের সময়ও জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায় না। কোথাও যেন একটু জ্ঞানের রেশ তাদের থেকে যায়। মনঃসমীক্ষণের সময় দেখা গেছে রোগী তার ফিটের সময়কার কিছু কিছু বিষয় অস্পষ্ট আভাসে বলতে পারে। বিশেষ চেষ্টা করলে তার সে অস্পষ্টতা ক্রমে একটু স্পষ্ট হয়ে আসে। অবশ্য সে যে সব কথা মনে করতে পারে তা নয়। তবু সাধারণের প্রচলিত বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞান-লব্ধ অভিজ্ঞতার কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবু হিস্টিরিয়ার ফিটকে সংজ্ঞানের ইচ্ছাকৃত শয়তানী বা ভানকরা (ম্যালিঙ্গারিং) বলা চলে না। এর মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তা সংজ্ঞানের ইচ্ছার রূপায়ণ নয়। অবদমিত কোন ইচ্ছার বিকৃত বা রূপান্তর প্রকাশ ঐ ফিটের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। ফিটের সময়কার রকম-সকম দেখে রোগীর অবদমিত ইচ্ছার স্বরূপ ঠিকমত বুঝতে না পারলেও তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক তা থেকে রোগীর মনের কিছু হদিশ পেতে পারেন।

রোগীর মনে কোন কারণে বিশেষ কোনও অবদমিত প্রক্ষোভ যদি উদ্দীপ্ত হতে চায় তখন সেই সম্ভাবনাকে রোগীর অহং (ইগো) যদি সামলাতে না পারে বা তার প্রকাশের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয় তবে ফিট হতে পারে। তাই বলে সকলেরই কিছু আর ফিটের ব্যারাম নেই যদিও অবাঞ্ছিত অবদমিত প্রক্ষোভের পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনায় সকলেই কিছু-না-কিছু উৎকণ্ঠিত হয়। তবে সে উৎকণ্ঠাকে সহ্য করা বা অন্য কোনও উপায়ে প্রশমিত করা অথবা নিজের আয়ত্তে আনা অধিকাংশের পক্ষেই কম-বেশী সম্ভব হয়। কিন্তু উৎকণ্ঠা একেবারেই হয় না এমন মানুষ বোধ হয় নেই।

উৎকণ্ঠা সইতে না পারলেই যে ফিট হয়ে যায় তা কিন্তু নয়। চাপতে না পারলে বা সইতে না পারলে অথবা অন্য কোনও দিকে তা চালনা করতে না পারলে উৎকণ্ঠা নিজ স্বরূপেই প্রকাশ পায়। রোগী তখন উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকে, অশান্তি ভোগ করতে থাকে। ফিটের মূলে যে উৎকণ্ঠা কাজ করে এক কথায় বলা যায়, সব মানসিক রোগের মূলেই থাকে সেই উৎকণ্ঠা। তবে এই উৎকণ্ঠার রকমফের হয়—লিবিডো পরিণতির কোন স্তরের মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে উৎকণ্ঠা দেখা দেয় তাই বিচার করে। কিন্তু মূল উৎকণ্ঠা একই। অর্থাৎ উক্ত রকমের বিচারে উৎকণ্ঠার রকম ভাগ করা যেতে পারে, তার পরিমাণের কম-বেশী হতে পারে কিন্তু মূল উৎকণ্ঠা সর্বক্ষেত্রে একই—অর্থাৎ উৎকণ্ঠা উৎকণ্ঠাই। মানসিক সব রোগের মূলে এই উৎকণ্ঠা থাকলেও রোগের বিভিন্নতা রূপ নেয় পূর্বোল্লিখিত লিবিডো পরিণতির কোন স্তরের মানসিকতার সঙ্গে এই উৎকণ্ঠা যুক্ত হয়ে রোগ লক্ষণ রচনা করে—তার পরিচয় বিচার করে। তবে এই দাঁড়ালো যে একই উৎকণ্ঠা লিবিডো পরিণতির বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন রোগ লক্ষণ নিয়ে প্রকাশ পায়। কিন্তু মূল কথা এক হলেও তার সঙ্গে অন্য অবস্থার মানসিকতা যুক্ত হয়ে রোগের প্রকোপ যেমন বাড়াতে কমাতে পারে—তেমনই বিশেষ রোগ লক্ষণ আরোগ্য করার বিষয়েও অনেক তারতম্য ঘটে। এক এক সময় এই মূল উৎকণ্ঠাকে কিছুতেই প্রশমিত করা যায় না। একটু কমে আবার বেড়ে যায়। এই রকম কতক রোগী দুরারোগ্য হয়ে যায়। হিস্টিরিয়া রোগে উৎকণ্ঠাবস্থার সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে সে নিরঙ্কুশ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ভেসে ভেসে চলে। এইজন্যই উৎকণ্ঠাবস্থার কোন বিশেষ নির্দেশ নেই। তার কোনও ঠিকানা পাওয়া যায় না। এখন এখানে তখন ওখানে এই ভাবে দ্রুত সঞ্চালিত হতে থাকে। এই রোগীরা এক এক সময় এক এক প্রক্ষোভের ঝোঁকে চলে। যখন যে প্রক্ষোভ আসে সেইটাই কিছুক্ষণের জন্য রোগীকে পেয়ে বসে। তাকে নিয়ন্ত্রিত করা রোগীর পক্ষে সম্ভব হয় না। আধুনিক মনোবিদের মতে এমন কোনও মানসিক রোগ লক্ষণ নেই যা নাকি হিস্টিরিয়ায় দেখা দিতে পারে না। তাই কোন লক্ষণটা হিস্টিরিয়ার আর কোনটা অন্য মানসিক রোগের লক্ষণ তা বোঝা সময় সময় বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অন্ততঃ প্রথম দেখায় সে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশ কিছুটা থেকে যায়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেও সব সময় নির্ভুল বিচার বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তাছাড়া আরও অসুবিধাও রোগের ক্ষেত্রে আছে। সেটা হল এই যে প্রায় কোন মানসিক রোগই কেবলমাত্র নিজ নামাঙ্কিত রোগের লক্ষণ নিয়ে দেখা দেয় না। প্রায় সব মানসিক রোগেই মূল রোগের সঙ্গে অন্য রোগের কিছু লক্ষণ জুটে যায়। ছিটেফোঁটা হলেও এই লক্ষণগুলি চিকিৎসকের সিদ্ধান্তে তালগোল পাকিয়ে দিতে পারে। এমনও হয় যে মূল রোগটা প্রথমেই দেখা না দিয়ে তা অন্য রোগ লক্ষণের আড়ালে আপ্রাণ থেকে চিকিৎসকের ভুল করবার পরিবেশ সৃষ্টি করে। তা ছাড়া একই লক্ষণ যদি হিস্টিরিয়া ও অন্য রোগে দেখা দেওয়া সম্ভব হয় তবে প্রকৃত রোগ চেনবার ক্ষেত্রে হয়ত ভুল কিছু হতেও পারে। তবু একথা সত্য যে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের চোখে এ আচরণ বেশী সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। ভিড়ের মধ্যে কে রাজা কে বা মন্ত্রী তা সব সময় ধরতে পারা সম্ভব না হলেও, একটু নজর করলেই অভিজ্ঞ মানুষ তা চিনে নিতে পারে। অর্থাৎ হিস্টিরিয়ায় যদি কোনও ভ্রান্তি বা অমূল প্রত্যয় (ডিলুশন) দেখা দেয় আর সেই অমূল প্রত্যয় প্রায় একই রূপে যদি ভ্রম-বাতুলতার (প্যারানোইয়া) রোগীর রোগ লক্ষণে দেখা দেয় তবে খুব অল্প ক্ষেত্রে ছাড়া যোগ্য চিকিৎসকের পক্ষে ঠিক ঠিক রোগ নির্ণয় করা অসাধ্য হওয়া উচিত নয়। সাধারণ কাঠামোতে একরকম হলেও দুই রোগে ঐ লক্ষণের প্রকাশে এমন কিছু পার্থক্য থেকে যায় যা সূক্ষ্ম নজরে ধরা পড়ে। তবু বলছি ভুল যে হতে পারে না বা হয় না এমন নয়। এমন জটিলভাবে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় যে এক এক সময় অভিজ্ঞ ব্যক্তির মনকেও যে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।

আর একটা কথার উল্লেখ করে হিস্টিরিয়া রোগের এই প্রস্তাবনা শেষ করব। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, হিস্টিরিয়া রোগ কেবলমাত্র মেয়েদেরই হতে পারে—ছেলেদের কদাচ নহে। তার মূল কারণ এই যে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে হিস্টিরিয়া রোগের সঙ্গে জরায়ুর কোনও বিশেষ সম্বন্ধ আছে। জরায়ুর কোনও গোলমাল হলে বা রোগ হলে তবেই হিস্টিরিয়া রোগ হতে পারে নইলে নয়। পুরুষের জরায়ু থাকে না, সুতরাং পুরুষের কখনই হিস্টিরিয়া রোগ হতে পারে না। কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। জরায়ুর সঙ্গে হিস্টিরিয়া রোগের কোন সোজাসুজি সম্পর্ক নেই। ব্যক্তির প্রক্ষোভের পরিচালনা ও তার গতি প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তির অহমের সংগঠন ও পরিচালন প্রকৃতির উপরই মানসিক রোগ, কার কোনটা হবে তা নির্ভর করে।

হিস্টিরিয়া সম্বন্ধে ক্রম আরও আলোচনা করা হবে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

রয়্যাল বেঙ্গল বনাম রাজকুমারী

বিশ্বনাথ বসু

মাহুতের হাতের অঙ্কুশের মার খেয়েও বাঘ যখন সবার চোখের সামনে হস্তিনী পাঙখাপেটির মুখখানা হাঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল তখন সন্ত্রস্ত সবার হুঁস হোল যে সেবারে ১৯২৮ সালে, এখানেই এই পীরের জংগলের শিকারে একটা বদরাগী বাঘ হাতী মতিলালের নাক মুখও ঐভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে পালিয়েছিল।

স্থানীয় কিম্বদন্তী এই যে কোন এক পীরের মৃত আত্মার অলৌকিক প্রভাবেই নাকি এই বনের আশ্রিত সব বাঘই নিরাপদ। তাই কোন শিকারী যদি এখানকার বাঘেদের পিছনে লাগে ফলভোগ তাকে কোন না কোনদিক দিয়ে করতেই হবে। জংলী সংস্কারে বিশ্বাস না থাকলেও অতীতের মত বর্তমানেও যখন একই স্থানে একইভাবে আর একটা শিকারী হাতী বাঘের হাতে জখম হোল, তখন ব্যাপারটা সবার কাছে কতকটা রহস্যজনক ঠেকলো।

১৯৩৩ সালের ১৬ এপ্রিল। আসামের গৌরীপুরের রাজপরিবার সদলে রওয়ানা হয়ে গেলেন শিকার অভিযানে। এবারের গন্তব্যস্থল বিজনী এস্টেট। ক্যাম্প পড়েছে দুলানী নদীর তীরে। নেতৃত্বে রাজাবাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া স্বয়ং। সংগী বধূরাণী, রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া ওরফে লালজী, ছোট রাজকুমার প্রণবেশচন্দ্র বড়ুয়া বড় রাজকুমারী নীহার বড়ুয়া ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনীন্দ্রনারায়ণ বড়ুয়া ওরফে দাজু, ছোট রাজকুমারী নীলিমা বড়ুয়া ও তাঁর স্বামী শ্রীসন্তোষকুমার বড়ুয়া এবং অন্যান্য আরও অনেকে।

উনিশ এপ্রিল ছিল হাটবার। চারিদিক থেকে শিকার ক্যাম্পে অনেক খবর এলো বাঘের দৌরাত্ম্যের। সব চাইতে নিকটের খবর ছিল ক্যাম্প থেকে মাত্র পৌনে দুই মাইল উত্তরে ভেটাগাঁও গ্রামের। সবার আগে এই বাঘটাকেই মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল। পরদিন সকালের ব্রেকফাষ্ট সেরে শিকার পার্টি রওয়ানা হয়ে গেল ঘটনাস্থলের দিকে।

তিনটে বিক্ষিপ্ত জংগলখন্ড—ঝোপ-ঝাড়ে ভরা। রাজাবাহাদুর পরিকল্পনা ছকে দিলেন। যেহেতু দুই মেয়ের কারো তখনও রয়্যাল বেংগল টাইগার শিকার হয়নি—তাই বড় মেয়ে নীহারবালাকেই তিনি আজকের অভিযানের মুখ্য শিকারী মনোনীত করলেন এবং তাকে ডেপুটেল হাতী জংবাহাদুরের পিঠে নিজের পাশেই বসালেন। বধূরাণী শিকারের চান্স পেয়ে নীহারবালাতো আনন্দে আটখানা।

বড় জংগলটা প্রথম খেদানো হোল। বাঘও দেখা গেল। কিন্তু রাইফেলের লাইনের সামনে না গিয়ে পিছনে সরে পড়লো। হাতী ঘুরিয়ে উল্টোদিকে খেদানো হোল। কিন্তু এবার বাঘের কোন পাত্তাই মিললো না। আবারও উল্টোদিকে জংগল মাড়ানো হোল। এবার বাঘ শিকারীদের পাশ কাটিয়ে ডানদিক দিয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে বেগতিক দেখে আবার পুরোনো জংগলে ঢুকে গেল। বাঘের লুকোচুরি খেলা দেখে সবাইতো তাজ্জব। অন্য কোন জানোয়ার ঘা খাওয়া শেয়ানা বাঘ বোধহয়। যাই হোক রাইফেলের লাইনকে জংগলের বিপরীত দিকের শেষ প্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়ে

ফিরতি বিটে হাতীর লাইনকে দুই পাশ চেপে এগিয়ে আনা হোল। কিন্তু দেখা গেল জঙ্গলে বাঘের নাম গন্ধ নেই। কোন যাদুমন্ত্রে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ক্যাম্প থেকে শিকারীদের জন্য টিফিন পাঠানো হয়েছে একটা হাতীর পিঠে। হাতীটা দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি দুটো জঙ্গলের বাইরে একটু দূরে ফাঁকায়। রাজা-বাহাদুর বললেন পাশের জঙ্গলটা একবার ঢুঁড়ে দেখে টিফিনে বসা হবে। বিটার ও শিকারীরা যার যার লাইনে দাঁড়িয়ে গেল। দ্বিতীয় জঙ্গলটার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ খেদানো সবে শেষ হয়েছে এমন সময় টিফিনের হাতীর মাহুত চেঁচিয়ে জানান দিলে যে বাঘটা তাড়া খেয়ে ফাঁকায় বেরিয়ে আবার প্রথম জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। সবাই হন্তদন্ত হয়ে আবার প্রথম জঙ্গলে গিয়ে লাইন দিলেন। খাদ্যবাহক হাতীর মাহুতকে নির্দেশ দেওয়া হোল দুই জঙ্গলের ফাঁকায় নজর রাখতে। এবার জঙ্গলটাকে লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে বার বার হাতীর পায়ের তলায় মাড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু বাঘের কোন হদিস মিলল না।

অতি রহস্যজনক পরিস্থিতি। সবাই শুধু পরিশ্রান্তই নয়—বিভ্রান্তও বটে। জঙ্গলের বিস্তৃতিও বেশী নয়। চারিদিকে ফাঁকা। বাঘ যাবে কোথায়? দু-একবার মাত্র নিজের ডোরাকাটা চেহারার চমক দেখিয়ে সে কি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? বেয়াড়া বাঘের বেয়াদপি দেখে রাজাবাহাদুরের মেজাজ চড়ছে এবং মনে জেদ চাপছে। প্রতিটি বিট পুনর্বিন্যাসের পিছনে তাঁর আশা—এইবার হয়ত বাঘ বেরোবে। রাশ-ভারী লোক। তাঁর প্রতিবারের ব্যর্থতা তাঁর গাম্ভীর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই দেখে বয়োকনিষ্ঠদের মুখে রা নেই। সমীহ-ভরে ও সুশৃঙ্খলায় সবাই নির্দেশ পালন করছে। অদূরে দণ্ডায়মান হাতীর পিঠে রক্ষিত চব্য-চোষ্যের দিকে লোভাতুর নয়নে তাকিয়েও নজর তাদের বাধ্য হয়ে ঘুরিয়ে নিতে হচ্ছে গা ঢাকা দেওয়া বাঘের খোঁজে।

রাজাবাহাদুরের হুকুম দ্বিতীয় জঙ্গলটা আবার ঘেরাও করো। করাও হোল। ছোট এক টুকরো জঙ্গল। জানোয়ার থাকলে খেদিয়ে ফাঁকায় বের করে দেওয়া যাবে। কাজেই বিটিং লাইনকে জঙ্গলের পেছন দিকে পাঠিয়ে শিকারীরা বইলেন সামনে ফাঁকায়।

বিট সুরু হয়েছে। হাতীর লাইন জঙ্গল মাড়িয়ে এমন চেপে এগুচ্ছে যে একটা মুষিকেরও লুকোবার পথ নেই।

রাজাবাহাদুরের আজীবনের অভ্যস্ত চোখ। বিটিং লাইনের আগে আগে দুটো হালি (জঙ্গলের আলোড়ন) তাঁর নজরে ধরা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড় মেয়ে ও আশপাশের সহ-শিকারীদের সাবধান করে দিলেন। জঙ্গল ঠেলে দুটো জানোয়ার এগুচ্ছে। বাঘ হলে শিক্ষার্থী শিকারীদের নিয়ে একসঙ্গে দুটোকে সামাল দেওয়া কঠিন হবে।

প্রতিটি শিকার প্রোগ্রামের একটা অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিক রোমাঞ্চের মাদকতা আছে। অভিযানের স্থান, কাল স্থিরীকরণ ও প্রোগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব থেকে সুরু করে যাত্রা ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আশা নিরাশা, সাফল্যের উত্তেজনায় সারা মন-প্রাণ যেন সব সময় ঢেউয়ের দোলায় দুলতে থাকে।

শিকার ভিত্তিক রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বড় রাজকুমারী নীহার বড়য়া কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে অনেক উচ্চ ও প্রগতিশীল নীতিবোধ ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারিণী। এক কথায় তিনি একজন নিষ্ঠাবতী ন্যাচারালিস্ট। সামাজিক জীবনে মমতাময়ী এই মহিলার শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগ সশ্রদ্ধায় উল্লেখযোগ্য। পিতৃ অনুগ্রহে অতীত জীবনে আশ্বেয়াস্ত্র চালনায় সিদ্ধহস্ত হয়েও এবং শিকার সাফল্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেও চারিত্রিক মাধুর্যভরা তাঁর জীবনে মানবিক উদারতা ও জাতীয়তাবোধের সর্বাঙ্গীন সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

চল্লিশ বছর আগের পিছনে ফেলে আসা তৃতীয় দশকে রাজকুমারীর রোমাঞ্চে-ভরা দেহমন তখন শক্তি, সাহস ও আরণ্যক উন্মাদনায় চঞ্চল। কিন্তু বাঘের খোঁজে বিজনীর জঙ্গলে বার বার আশাভঙ্গের বিরক্তিতে সেই চাঞ্চল্য যেন সাময়িকভাবে কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাজা-বাহাদুরের সাবধানবাণী শুনে মনটা তাঁর অদম্য উত্তেজনায় উন্মুখ হয়ে উঠলো।

জঙ্গলের আলোড়নের ধরণে রাজাবাহাদুর ঠিকই বুঝে নিয়েছেন অগ্রসর-মান জানোয়ার বাঘ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। নীচু গলায় মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন জঙ্গলের আলোড়ন সে দেখতে পাচ্ছে কিনা। মেয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে। হাওদায় রাজাবাহাদুর নীহারবালাকে সামনে রেখে বসেছিলেন। কারণ সেই প্রথম গুলি চালাবে। বাঁদিকে খানিকটা দূরে হাতীর পিঠে পরবর্তী সহ-শিকারী তাঁর বাবো বছরের বড় নাতি—অর্থাৎ বড় মেয়ে নীহারের বড় ছেলে দাক্কু। শিকারে দুরন্ত তুখড় এই বালক একটি ;২৪০ বোরের হাল্কা রাইফেল হাতে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। জঙ্গলের হালি তার চোখেও ধরা পড়েছে। বারো বছর বয়সের বালক হলে কি হবে—এর মধ্যেই ডোরাকাটাদের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা দাক্কুর হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় মোকাবিলায় আর একটির ওপর হাতের টিপ পরীক্ষা করবার জন্য সে উসখুস করছে।

ওদিক থেকে হাতীর লাইন যত চেপে আসছে এদিকে জঙ্গলের হালি তত সামনের দিকে এসে সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে। সন্ত্রস্ত জানোয়ার যেন আড়াল ছাড়া হতে সাহস পাচ্ছে না। অথচ ওদিককার ঠাসা বিটিং লাইন ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ারও পথ নেই তাদের। কাজেই নিরুপায় তাদের পরবর্তী প্রত্যাঘাত সামনের দিকেই ঘটবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। রাজাবাহাদুর মাহুতকে সাবধান করে দিলেন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হাতীকে সামলে রাখবার জন্য।

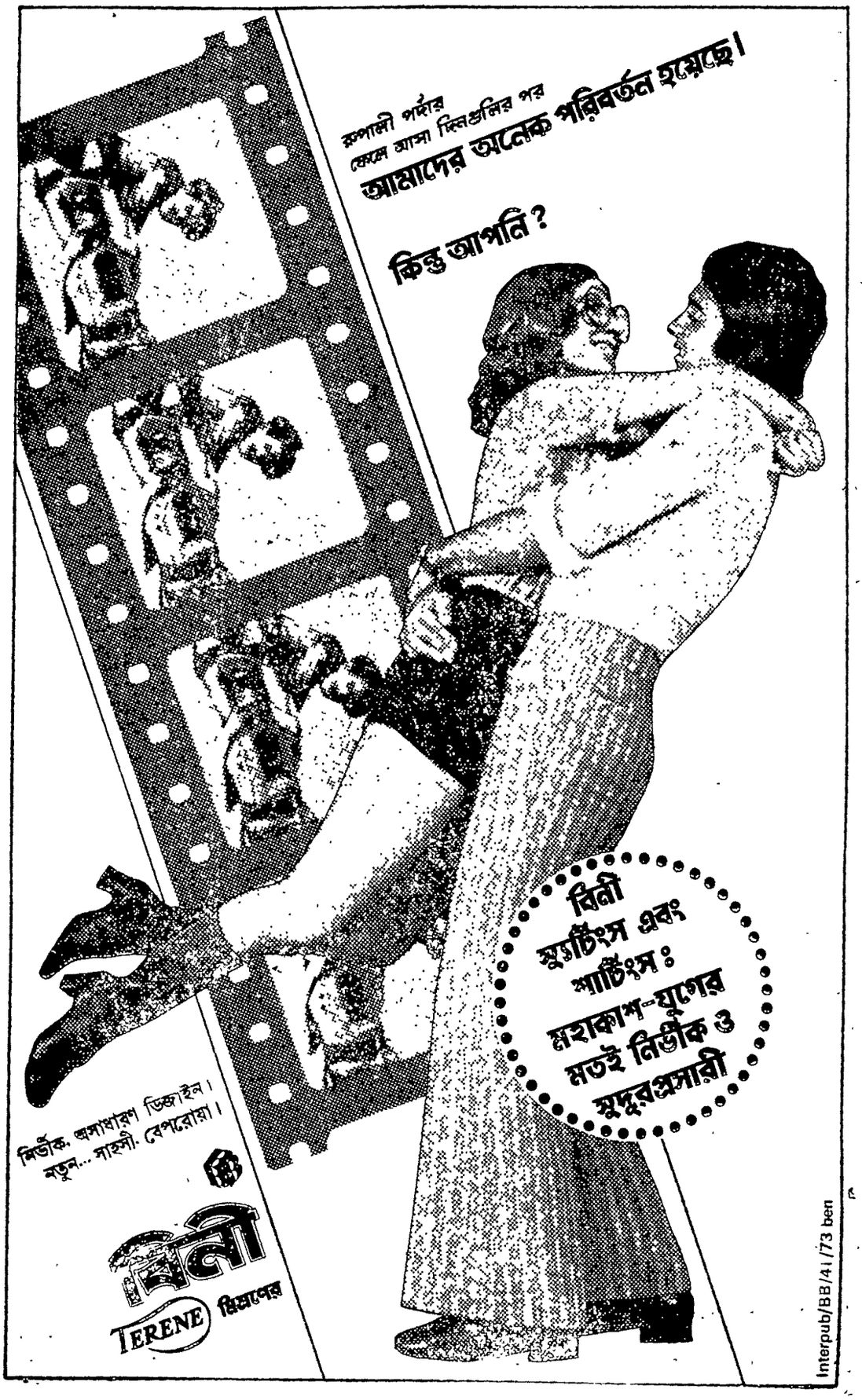
রুপালী পর্দার
ফেলে আসা দিনগুলির পর
আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
কিন্তু আপনি?
বিনী
স্যুটিংস এবং
শার্টিংস:
মহাকাশ-যুগের
মতই নির্ভীক ও
সুদূরপ্রসারী
নির্ভীক. অসাধারণ ডিজাইন।
নতুন... সাহসী. বেপরোয়া।
বিনী
TERENE ফিনিশের
Interpub/BB/41/73 ben

বেশী সময় আর অপেক্ষা করতে হোল না। একটা নয়—দুই দুটো বাঘ তেড়ে সামনের মাঠে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড গর্জনে আক্রমণ করে বসলো সামনের দুটো শিকারী হাতীকেই। একটা বাঘ ছুটে গেল দাজুর হাতীর দিকে।

দাজু যেন মনে মনে চাইছিলই বাঘ তার রাইফেলের সামনে বেরোক। অল্প বয়সী যুবক। সবে শিকারে হাত পাকাচ্ছে।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জ্ঞানষ
১০০% খাঁটি হয়

ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু
আগমার্ক যুক্তই নয় এর
পেছনে রয়েছে ভারতের
শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ
লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা।
ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি
আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত
হয় এবং গভর্নমেন্ট
ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক
প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে
বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়।
ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা
সব সময় খাঁটি ও উন্নত
মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

দাদুর নির্দেশ নেই প্রথম গুলি ছোঁড়ার। মায়ের চান্স ফার্স্ট। তবুও ছেলের পাকামো মা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। আর দাদু মনে মনে বিরক্ত হলেও পেয়ারের নাতিটিকে যে তিনি সামনা-সামনি কিছু বলবেন না এটা ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অবস্থাটা যা দাঁড়ালো তাতে কে আগে গুলি করবে কে পরে সে বাদ-বিচারের আর অবকাশ নেই। কারণ সগর্জনে বাঘ একটা ছুটেছে দাজুর দিকে—অন্যটা তার মায়ের দিকে। আক্রমণ-মুখী দুটো যমদূতকে সামলানোর জবরদস্ত দায়িত্ব এখন মা ও ছেলে দুজনেরই।

রাইফেলের নিশানা মেলাবার আর সময় ছিল না। দেখে মনে হোল ডোবাকাটা একটা কম্বল যেন ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে আসছে হাতীর দিকে। কিন্তু দাজু তাকে আর হাতীর সংস্পর্শে পৌঁছুতে দিল না। হাতের রাইফেল গর্জে উঠলো ভার, এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল বাঘ মাঝ পথে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটু পরে দেহ তার অসাড় হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলির আর দরকার হোল না।

ওদিকে বড় রাজকুমারীর হাতের রাই-ফেল সেফটি তোলা অবস্থায় বাগিয়েই ধরা ছিল। বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়েই শিকারী হাতী জংবাহাদুরকে দেখেছে। বিদ্যুৎ ঝলকে সে ছুটে গেল শত্রুর দিকে।

আক্রমণমুখী বাঘের গতির পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। হুঙ্কার যেন তার ভূকম্পনের দোলা। আমি অন্যত্র যা বলেছি—এক্ষেত্রেও তার পুনরুক্তি করে বলতে চাই—বাঘ শিকারী হয়ত অনেকে আছেন কিন্তু বাঘের গর্জন সহ্য করতে পারেন এমন শিকারী কমই আছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা আমার স্মরণ হচ্ছে—

এক বিদেশী দম্পতি ভারতের জঙ্গলে বাঘ শিকারের উদ্দেশ্যে গাছের মঞ্চে বসে আছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শিকারী। তাড়া খেয়ে বাঘ বেরিয়েছে। ভদ্রলোক গুলিও করেছেন। আহত বাঘ শিকারীদের দেখে নিয়েছে। প্রচণ্ড গর্জনে বন কাঁপিয়ে উল্কা বেগে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল সে শিকারীদের দিকে। এই জরুরী অবস্থায় ভদ্রলোক অবশ্য দ্বিতীয় গুলিতে বাঘকে রুখে দিতে সক্ষম হলেন। কিন্তু স্ত্রী তার মঞ্চেই জ্ঞান হারালেন। সুস্থ হয়ে পরে তিনি বলেছিলেন যে—আক্রমণ-মুখী বাঘের ভয়াট গলার গর্জন চারি-দিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে, ওপরের আকাশটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে মাথায় ভেঙ্গে পড়ছে।

দুঃসাহসী ছেলে দাজুর রাইফেলের শব্দ ইতিমধ্যেই কানে পৌঁছেছে। উদ্বিগ্ন মন। কিন্তু চোখ ঘোরানো বা ছেলের গুলির ফলাফল কি হোল না হোল ভাবাভাবির সময় নেই। হাতী ও হাতীর আরোহী সকলের নিরাপত্তা নির্ভর করছে এই মুহূর্তে নিজের হাতিয়ার ও মনের দৃঢ়তার ওপর। বাঘের গগন-বিদারী গর্জন যদি স্নায়ুশক্তিকে একটুও শিথিল করতে পারে তাহলে চোখ ও মনের একাগ্রতা ব্যাহত হবে ও গুলি বর্ষণও ব্যর্থ হবে। যার ফলাফলে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটাও অসম্ভব নয়।

প্রচণ্ড গতিশীল একটি লক্ষ্যবস্তুর সমান্তরালে রাইফেলের ব্যারেল স্থিরবদ্ধ রেখে অভ্যস্ত হাতে বড় রাজকুমারী গুলী করলেন। নিশানা মেলানো গেল না—সম্ভবও নয়। গুলি খেয়ে মাঝপথে বাঘ কয়েকটা ডিগবাজি খেলে।

শিক্ষিত হাতী জংবাহাদুরের শিকার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ এই প্রথম নয়। কাজেই বাঘ-টাঘকে সে পরোয়া করে না এবং ওদের গাঁক গাঁক গলাবাজি হজম করবার মত কলজের জোর ওর যথেষ্টই আছে। তাই গুলি খাওয়া ভিরমি লাগা বাঘকে মাটি ছেড়ে আবার চারপায়ে খাড়া হতে দেখেই জংবাহাদুর তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে দু-চারটে আছাড় দেবার মতলবে গোদা পায়ে ধপ ধাপিয়ে রুখে গেল সেদিকে। হাওদার শিকারীদের হাতের রাইফেল উঁচিয়েই ধরা আছে। কিন্তু ছুটন্ত হাতীর পিঠের দোলানির দরুন গুলি ছোঁড়ার উপায় নেই। বেগতিক দেখে বাঘ ছুটেছে বড় জঙ্গলটার দিকে—আর পেছনে তাকে কালাপাহাড়ী দাপটে খেদিয়ে নিয়ে চলেছে জংবাহাদুর। একরোখা তাকে সামলাবার সাধ্য তখন মাহুতেরও নেই।

হাজার হলেও বাঁড় ওয়েট তো দেখতে হবে। কাজেই টিমে লয়ে ধাবমান জংবাহা-দুরের শুঁড়ের নাগালে আসবার আগেই বাঘ ঝাঁপ দৌড়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল বড় জঙ্গলে। তারপর হাওয়া। যেন সে ম্যাজিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তবুও দুই জঙ্গলের মাঝের ফাঁকায় শিকারী লাইন দাঁড় করানো হোল, এবং বিটিং লাইন পাঠিয়ে দেওয়া হোল বড় জঙ্গলের পেছনে শেষ মাথায়। বড় জঙ্গলের পা ঘেঁসা একটা হালকা ঝোপঝাড়ের টুকরো। রাজাবাহাদুরের নির্দেশ হোল—যদিও স্বচক্ষে দেখা গিয়েছে—বাঘ বড় জঙ্গলে ঢুকছে, তবুও বিটাররা যেন ঐ হালকা টুকরোটিকে ছেড়ে না আসে।

অভিজ্ঞ হাতী-পাখাপেটি। মাহুত তার পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ সদের শেখ।

কর্তাদের সলা পরামর্শ তখনও চলছে। স্টার্ট-এর ইসারা আসে নি। ছোট টুকরো ঝোপটার মাঝে একটা বড় গাছ। কাঠফাটা রোদের হাত থেকে টেকো মাথা বাঁচাবার জন্য সদের সেখ সেই গাছের ছায়ার দিকে তার হাতী পাখাপেটিকে একটু এগিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু কি তাজ্জব ব্যাপার—ঠিক সেই গাছেরই গোড়ায় কোন রকমে গা বাঁচিয়ে একটা বাঘ ঘাপটি মেরে রয়েছে।

'বাঘ বাঘ' সদের সেখ চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট বাঘের গর্জন।

শিকারীরা সেদিকে মুখ ঘোরাতেই একটা তীব্র গতিশীল বিদ্যুৎ ঝলক তাঁদের চোখে পড়লো এবং পরমুহূর্তেই দেখা গেল --একটা বাঘ তার সুতীক্ষ্ণ বক্রমুখী নখ সজ্জিত সামনের পায়ের এক থাবা হাতীর মাথায় অন্য থাবা কানের গোড়ায় বসিয়ে দিয়ে দুই চোয়ালের বজ্র কামড়ে পাখাপেটির কপালে দাঁত বসিয়ে দিয়ে মুখের ওপর ঝুলছে। আর বেচারা পাখাপেটি মুখ থেকে তার এই অবাঞ্ছিত আগন্তুককে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে মরিয়া হয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

বাঘ তার ঝুলন্ত গুরুভার দেহের টাল সামলাতেই ব্যস্ত। আর তার মাঝেই থাবাটা হাতীর কানের গোড়া থেকে একটু এগিয়ে নিয়ে সদের সেখের পা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে যাতে তাকে টেনে নামাতে পারে।

সারাটা বয়েসকাল ধরে বহু প্রাণ-কাঁপানো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় পোড়খাওয়া সদের সেখের আবশ্যক জীবন। ঘাবড়াবার লোক সে নয়। বাঘ হাতীর মুখে ঘাড়ের পেণ্ডুলামের মত ঝুলছে। গুলি করলে সদের সেখ তার হাতী সমেত আহত হবার সমূহ সম্ভাবনা। গুলিভরা রাইফেল হাতে শিকারীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

এই লোমহর্ষক পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু বৃদ্ধ সদের সেখ নিশ্চেষ্ট বসে নেই। কোমরের ভুটানী ভোজালি আর হাতের অঙ্কুশ মাহুতদের বিপদ আপদের একমাত্র সহায়। বাঘের মাথা ও থাবা নাগালের মধ্যে আছে। ভোজালির কোপ হড়কে গেলে হাতী জখম হবে।

সদের সেখ তাই সমানে অঙ্কুশ ঠুকে চলেছে বাঘের ব্রহ্মতালুতে ও কষদাঁতের ওপর। দাঁতের কামড় না ছেড়ে সমানে বাপও হেড়েগলায় গজরাচ্ছে—আর সদের সেখও না থেমে ক্রমাগত তার অঙ্কুশের ঠোক্কর চালিয়ে যাচ্ছে।

শিকারীদের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে প্রায় মিনিটখানেক ধরে চললো এই ব্যাপার। এক মিনিট হিসেবে কম মনে হলেও, উক্তরূপ লোমহর্ষক পরিস্থিতির এক মিনিট সময়কালের মধ্যে গুরুতর অঘটন ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

যাই হোক পাখাপেটির সর্বক্ষণের মাথা ঝাঁকুনি সহ্য করে বেশী সময় ঝুলে থাকা সম্ভব হোল না। এদিকে অঙ্কুশের ঘায়ে কষদাঁতও ভাঙলো। ফলে নখদন্তের খিলেন খুলে হাতীর মাথা থেকে হড়কে মাটিতে পড়ে বাঘ আবার পিঠটান দিলে সেই টুকরো জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

এই সেই পীরের ভিটে, হাতীর রক্তে যেখানকার মাটি রঞ্জিত না হলে পর নাকি বাঘের দুর্বর্ষতার অবসান ঘটে না। এবারও সেই একই স্থানে ১৯২৮ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কিন্তু বাঘ পীরের যতই পেয়ারের হোক না কেন আহত অবস্থায় তাকে জঙ্গলে ছেড়ে যাওয়া শিকারীসুলভ নীতির বিরোধী।

এই পরিস্থিতিতে রাজাবাহাদুরের কড়া হুকুম হোল— দুই জঙ্গলের মাঝে রাইফেলধারীদের হাতী পরস্পর থেকে এমন দূরত্ব রেখে দাঁড়াক যাতে তাড়া খেয়ে বাঘ আবার জঙ্গলে ঢুকতে না পারে।

দাঁড়ানো হোল সেইভাবে। মুখ্য শিকারী বড় রাজকুমারীকে রাজাবাহাদুর তাঁর বিশ্বস্ত বাহন জংবাহাদুরসহ সব সময় এমন সুচিন্তিত ঘাঁটিতে দাঁড় করাচ্ছেন যাতে বাঘকে ধরাশায়ী করার শেষ আঘাত হানা তাঁর রাইফেলেই আবার সম্ভব হয়।

এবার বন্দুকে ফায়ার ওয়ার্কস কার্টিজ পুরে সন্দেহজনক ঝোপের ভিতর ছুঁড়তেই উত্তেজিত ও উত্যক্ত বাঘ শিকারীদের বিভ্রান্ত করে উল্কাবেগে সগর্জনে ফাঁকায় বেরিয়ে এল এবং প্রবল গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে গা বাঁচিয়ে আবারও গিয়ে বড় জঙ্গলে আশ্রয় নিল। শিকারীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন —'বাঘ কি যাদু জানে?' মাহুতরা ফিস ফিস করছে—'এ বাঘ সে বাঘ নয়। এ বাঘ নিশ্চয়ই পীর সাহেবের পোষ্য বাঘ।'

সূর্য পশ্চিমে হেলছে। ক্ষিধেয় পেটের নাড়ী সেন্ধ হচ্ছে। সেই সাতসকালে থেকে সারা দিন ধরে জঙ্গল দাবানোর ধকলে হাতী, মাহুত, শিকারী সবাই হয়রান হয়ে পড়েছে। তবুও দিনের আলো থাকতে থাকতে শেষ চেষ্টা করে দেখতেই হবে। কারণ এটা নিছক শিকারীদের সখের ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত। অন্যদিকে একথাও মনে রাখা দরকার যে অতি যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক আঘাত নিয়ে সারাদিন প্ররোচনামূলক তাড়া খেয়ে খেয়ে ক্রুদ্ধ বাঘের মেজাজ এমন এক তীব্র বিস্ফোরক অবস্থায় রয়েছে যে তার শেষ প্রতি-আক্রমণ প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য হতে পারে। তাই সতর্কতার বিন্দুমাত্র শিথিলতায় মহাবিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা। কাজেই জঙ্গল যুদ্ধের এই শেষ রাউণ্ডের ব্যূহ বিন্যাসে রাজাবাহাদুর কতর শৃঙ্খলার প্রবর্তন করলেন।

অভিধানের প্রথম পর্যায়ে ছোড়া বাঘের একটিকে এক গুলিতে ভূতলশায়ী করে দাজুর উৎসাহ যেন বাগ মানছিল না। তাই এই অবেলায় তার বাড়াবাড়ি বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাবাহাদুর মধ্যমকুমার লালজীকে ইসারায় নির্দেশ দিলেন দাজুর হাতীর বাঁ-দিক আগলে থাকতে। নিজেদের হাতী জংবাহাদুরকে রাখলেন তার ডাইনে।

এবার আর খেদিয়ে আনা নয়। পূর্ব থেকে অনুমান করা গিয়েছিল বড় জঙ্গলের কোন ঝোপের মধ্যে বাঘ আশ্রয় নিয়েছে। হাতী দিয়ে দূর থেকে চক্রাকার জঙ্গলটাকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান ঘেরটাকে সংকুচিত করে আনা হোল। একটু পরেই ঝোপের ভেতর থেকে কানে এল উত্তেজিত বাঘের গলার চাপা গরগর আওয়াজ। প্রতি আক্রমণের পূর্বাভাষ। শিকারীদের হাতিয়ার আওয়াজের দিক বরাবর উদ্যত আছে।

দাজু বুঝি মায়ের সামনে ডবল বীরত্ব দেখাতে চায়। তাই নিজের হাতীকে দিল দু কদম বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জনের গমকে ত্রিভুবন কাঁপিয়ে দিয়ে বাঘ চার্জ করলো দাজুর হাতীকেই। সঙ্গে সঙ্গে দাজু ও লালজীর রাইফেল অনল উদ্গীরণ করলো। কিন্তু তার আগেই বড় রাজকুমারীর চকিত নিশানার মোক্ষম অঘাত বাঘকে নিস্পন্দ করে মাটিতে শুইয়ে দিল।

এটা ছিল একটা বাঘিনী। লম্বায় ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি।

শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া বহু বছর হোল শিকার সখ থেকে মুক্ত। তাঁর অতীত শিকার কৃতিত্বের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ডোরাকাটা বাঘ ৬টি, লেপার্ড ১টি এবং ৬ ফুট লম্বা ভাল্লুক একটি।

সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস

অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

গত পঁচিশ বছরের নয়, গত কয়েক বছরের বাংলা উপন্যাসের সামান্য পরিচয় নিতে গিয়েই দেখা গেল, কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ সিংহাবলোকন বা ঝাঁকিদর্শনের জন্য যতটা দূরত্ব বা নিরাসক্তি প্রয়োজন, তা এই মুহূর্তে আমার হাতে নেই। বলা উচিত, তার জন্য সযত্ন প্রয়াসও বৈফল্য স্বীকার করতে বাধ্য। গত পঁচিশ বছরের বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষাপট কী? এই পর্বে সমাজজীবনে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসলোকেও নানা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। দেখেছি কতো বিচিত্রধারা, পদ্ধতি ও রীতির প্রয়োগ। দেখেছি আত্ম-প্রকাশের প্রবল বাহনরূপে উপন্যাসের ব্যবহারে লেখকদের নৈপুণ্য। দেখেছি উপন্যাসের রূপান্তর ও জন্মান্তর। 'সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসার এমন প্রবল সমন্বয় আগে কখনো আসেনি।' এই ভাবে ঔপন্যাসিকেরা অল্প-বিস্তর উদ্দীপ্ত। স্বাধীনতা-উত্তর দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সমগ্র পরিবর্তন, মনুষ্যের মেজাজের পরিবর্তন, ব্যক্তির আত্ম-বেষণ ও আত্মানুসন্ধানের প্রকৃতি-পরিবর্তন, — যে উপন্যাস-লেখক সৎ জীবনশিল্পী, তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। আমাদের চেনাকালের প্রকৃতি অনু-ধাবনে বিবেকবান ঔপন্যাসিক ব্যর্থপরিশ্রম হয়ে পারেন না। আমাদেরকে ঘিরে যে চঞ্চলতা ও বিক্ষোভ, সংশয় ও নৈরাশ্য, যে দ্বিধা ও দোটানা, যে আত্মপ্রতারণা ও পরস্পর-বিরোধিতা, বিশাল সম্বন্ধবন্ধ সমাজ ও উৎপাদনশক্তির কাছে ব্যক্তি-বোধের নিরুপায়তা ও অসহায়তা, এস্টাবলিশমেন্টের প্রতি আনুগত্য ও তার সঙ্গে ভীরু আপোস, নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের সূচীমুখ তীক্ষ্ণতা, এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে তারুণ্যের বিদ্রোহ হঠকারিতা ও সাহসী সংগ্রাম, কর্তাভজা মনোভাব ও কুসংস্কারানুগত্যের জগাখিচুড়ি, নতুন পৃথিবী অন্বেষণের তীব্র ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও প্রত্যয়কে ফিরে পাবার ও অর্জনের তীব্র বাসনা—এ সব কিছুই আমাদের চঞ্চল উত্তেজিত ও অশান্ত করে তুলেছে।

গত পঁচিশ বছরের বাংলা উপন্যাসে এইসব প্রগতি ও পশ্চাৎগতির ছাপ পড়েছে। পাশাপাশি বাস্তব হয়েছে প্রাচীন-পন্থী ধারণা ও আধুনিক মানসিকতা (দ্রষ্টব্য—বর্তমান লেখকের 'কালের প্রতিমা')। গত দুতিন বছরের বাংলা উপন্যাস সম্পর্কেও সেকথা প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক বিশ্বাসরিক্ত জীবনে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে বিশ্বাস চাইছে আশ্রয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্বেষণ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের জন্মান্তরের স্বরূপটা একবার বাংলা উপন্যাস থেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

> এই যে অল্প কয়মুহূর্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া গেল—এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্য দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল—ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। (নৌকাডুবি, পরিচ্ছেদ ১৪, শেষাংশ)

রমেশের প্রতি হেমনলিনীর প্রেম এখানে শান্ত আনন্দে বিশ্বাসে প্রাপ্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। এই সুখের আশা, প্রাপ্তির আনন্দ, বিশ্বাসের আনন্দ আজ আর নেই।

> বাতাসে হৈমন্তীর এলো আঁচল উড়ে অবনীর হাতে লাগছিল। এখনও আকাশে চাঁদ ওঠেনি, উঠে আসছে, অন্ধকার ম্লান হয়ে এল, মালগাড়ির গুম-গুম শব্দটা আরও স্পষ্ট যেন স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে, ফুলগাছের মাটির সামান্য সোঁদা ভিজেভিজে গন্ধ, কোনো ফুলের মৃদু সুবাস ভাসছে বাতাসে হৈমন্তী দাঁড়াল। অবনী সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুড়ে দিল। হৈমন্তীর, ডিমের মতন মসৃণ গড়নের মুখ টোল-তোলা নরম থুতনি টানা টানা চোখের পাতা সুন্দর গভীর নির্মল দুটি চোখ মাথার পাতলা ঈষৎ রুক্ষ রেশমের মতন চুলের এবং তার স্থির অল্প শিথিল অবনত দেহের চারপাশে একটি অব্যক্ত মায়া যেন সৃষ্টি হয়েছিল। অবনীর মনে হল তার জীবনে এযেন এক অন্য মুহূর্ত যা আগে কখনও আসেনি—ভবিষ্যতেও আসবে না।' ('পূর্ণ অপূর্ণ' ঃ বিমল কর। অধ্যায় ৩২)

'নৌকাডুবি'র (১৯০৬) হেমনলিনী অনায়াসেই ভাবতে পেরেছিল, অল্প কয় মুহূর্তেই রমেশের সঙ্গে তার বিশ্বাসের মালা বদল হয়ে গেছে এবং রমেশও তা মেনে নিতে বাধা পায়নি কিন্তু 'পূর্ণ অপূর্ণ'র (১৯৬৭) অবনী বা হৈমন্তী তা ভাবতে পারেনি। ভালো লাগাটা মুহূর্তের সম্মোহন, জীবনের অন্য এক মুহূর্ত; যা আগে কখনও আসেনি—ভবিষ্যতেও আসবে না—একথাই অবনী ভেবেছিল। আসল কথা, যে বিশ্বাস ষাট বছর পূর্বেকার নায়ক-নায়িকার ছিল, আজ তা থেকে আমরা এবং একালের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা অনেক দূরে চলে গিয়েছি। মানুষের জীবন অপূর্ণ, স্বভাবতই তার যাত্রা পূর্ণতার পথে। আজকের মানুষ কীভাবে সে পথে যাবে? তার জীবনে এত জটিলতা ও মালিন্য এসে গেছে যে তার ফলে জীবনে অবিশ্বাস আর ঘৃণারই প্রাধান্য। ফলে চোখের সামনে ভালবাসাকে ক্ষয় হয়ে যেতে দেখেও মানুষ অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। বিশ্বাসের মালা বদল আজ আর হয় না। ফলে পূর্ণতার অন্বেষণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

অবনী বা হৈমন্তী হেমনলিনীর মতো অনায়াসে বিশ্বাসের মালা বদল করতে পারেনি, কিন্তু রমা আর প্রশান্ত (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'দুটি প্রতী-ক্ষার কারণে' ১৯৭৩) পেরেছিল। তথাপি সে মালা শেষ পর্যন্ত ধারণ করতে পারেনি, কারণ রমেশ-হেমনলিনীর প্রত্যয়, পরিবেশ ও কাল থেকে রমা-প্রশান্ত অনেক দূরে চলে এসেছে। তাই প্রতিশ্রুতি ও প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়, রমা অভিনেত্রী হয়ে আর প্রশান্ত মাতাল হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। যখন ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়, তখন পরম লগ্ন অতিক্রান্ত।

শ্রীজাতার ট্রাজেডি (মণীন্দ্র রায়ের 'ছড়ানো জালের বৃত্তে' ১৯৬৯) এই ব্যর্থ অন্বেষণের নামান্তর। নিজের মনের অদ্ভুত একটা টানাপোড়েনের ফলে অর্থ-হীন পুনরাবর্তনের মধ্য দিয়ে কেটে গেল এতগুলি দিন, মাস, বছর। এই লক্ষ্যহীন আশাহীন দিনযাপনের নামই কি

জীবন? বলা বাহুল্য এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীভ্রাতার জানা নেই। তাই টুটুলে পারমল রাজীব—কারুর সঙ্গেই সে বিশ্বাসের মালা বদল করতে পারল না। জীবন কী? তা কি অভ্যস্ত ছকে, ছড়ানো জালের বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়া? না অন্যকিছু? শ্রীভ্রাতা তা জানে না, কারণ তার বিবেক, প্রবৃত্তি-আবেগ হয়ে উঠেছে এলোমেলো, বেপরোয়া। এখন জীবন তার কাছে মহান সংগ্রাম নয়, বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, শূন্যতা মাত্র।

কুড়ি বছর পরে দেখা হল অনুপম আর অঞ্জলির—কলকাতা থেকে দূরে মুসাবানিতে—সারা অঞ্চল জুড়ে অরণ্যের ছায়া বাতাসে ধাতব গন্ধ নির্জন রোমান্টিক পরিবেশে। আজ দুজনেই বিরাহিত, একজনের আছে স্ত্রী পুত্রকন্যা, অপরজনের স্বামী কন্যা। পুরনো স্মৃতিতে ডুব দিয়েও সেদিনের ভালবাসার পদ্মরাগ-মণিটি আহরণ করা যায় না (রমাপদ চৌধুরীর 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ১৯৭৩)। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই তাদের ছেলেমেয়ে বাপ্পা আর ঝুমঝুম পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। অঞ্জলি আর অনুপম কি আসেন নি? এসেছেন, নতুন করে পুরনো প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে উঠতে চেয়েছেন। কিন্তু অঞ্জলির স্বামীর আকস্মিক অসুস্থতা অঞ্জলির ঘোর ভেঙে দিল—তার চোখের সামনে একটিই দৃশ্য—তার অসুস্থ স্বামী। স্বামী মানে নিরাপত্তা স্বামী মানে সংসারে প্রতিষ্ঠা তাই দুদিনের ঘোর কাটিয়ে অঞ্জলি আজ বলতে চান—'আপনাকে দেখতে চাই না, চাই না।' অথচ দুদিন আগে নিভৃত মিলনমুহূর্তে বলেছিলেন—'দেখতে চাই, দেখতে চাই।' অঞ্জলিরা চলে যাচ্ছে। অনুপম শেষ পর্যন্ত কী পেলেন? কটা দিনের স্মৃতি—সুখের বেদনার আনন্দের। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে অঞ্জলির সংলাপে সব মোহের অবসান, সব রোমান্টিক ব্যাকুলতার নির্মম বিসর্জন।

> কি বলবে অঞ্জলি খুঁজে পাচ্ছিল না। ও হঠাৎ বললে, আপনাকে কিছু একটা দেবো ভেবেছিলাম, কিছুই দেওয়া হল না।
>
> —তুমি তো দিয়েছো। এই কটা দিনের স্মৃতি।
>
> অঞ্জলি করুণভাবে তাকালো অনুপমের দিকে। ওর নিজের স্মৃতিও যে হারিয়ে গেল। এখানে ফেলে রেখে গেল। কুড়ি বছর ধরে আঁকড়ে ধরে থাকা সেই স্মৃতিটুকে এখানে হারিয়ে গেছে।
>
> (যে যেখানে দাঁড়িয়ে, অধ্যায় ১৪)

কেবল নিভৃতে আত্মচিন্তা নয়, জীবনের অন্যদিকেও আজ। পরিবর্তমান ভারতবর্ষের চেহারা আমাদের চিন্তায় ঠিক ধরা পড়ে না, যা বিদেশীদের চোখে ধরা পড়ে। স্বাধীন ভারতের বিশাল কর্মযজ্ঞে সারা দুনিয়া থেকে এসেছে সাহায্য, এসেছে সাহায্যকারী। তেমনি তিন স্বেচ্ছাসেবী তিনটি মার্কিন তরুণী জোয়ান, আইলীন আর মেরী। তারা এসেছে পাঞ্জাবের পাহাড়ঘেরা মধুবন গ্রাম—মার্কিন ডলারের দাক্ষিণ্যে তৈরি কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মহাবিদ্যালয়ে। প্রতি বছর চার হাজার ভারতবাসী আমেরিকায় পড়তে যায়। তাদের লক্ষ্য উচ্চতর ডিগ্রি, চাকরি, পরে দেশে ফিরে কোনো দামী নিশ্চিন্ত চাকরি। আর ভারতবর্ষে আছে ছ'হাজার আমেরিকান। প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ হাজার আমেরিকান ভারতবর্ষ 'দেখতে' আসে। জানতে নয়, 'দেখতে'। কেউ কেউ জানতেও আসে— ভারতীয় চাষীদের দুঃসহ প্রাচীন দারিদ্র্য, ভারতের গভীর অজ্ঞানতা। কিন্তু আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে বহু শতাব্দীর ব্যবধান যে-গভীর অন্ধকার পুঞ্জীভূত করে রেখেছে উদার-হস্ত ডলার-সাহায্য আর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি তা সহজে দূর করতে পারবে না। চাণক্য সেনের 'তিন তরঙ্গ' উপন্যাসে (১৯৬৬) এই পরিবর্তমান ভারতের ছবি দেখি বিদেশীর দৃষ্টি-প্রতিবিম্বে। পশ্চিমী দুনিয়ার নেতা আমেরিকার সঙ্গে প্রাচীন অথচ নবোদ্গমে প্রাণিত ভারতবর্ষের এই পরিচয় কি দুই দেশের মানুষকে কাছে এনেছে, না, দূরত্ব বাড়িয়েছে? দুনিয়া দিন দিন ছোট হয়ে মানুষকে নিটকতর করছে, না বাড়াচ্ছে ব্যবধান? পরিবর্তমান ভারতের অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য ধরা পড়েছে 'তিন তরঙ্গে'। জোয়ান, আইলীন, আর মেরী'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রকাশবীর আজাদ, চিরন্তন দাস, পালিওয়াল, দীপা কৃপাল, অনন্ত সচ্চদেব, চন্দ্রভান গুপ্ত, সর্তশ আগরওয়াল সন্তোষ কৌর, চাওলা শেঠী, অমৃত সোহানীর। যে ভারতবর্ষ বহু শতাব্দের স্থবিরতা আর জড়কে বর্জন করে এগোতে চাইছে, তার চঞ্চল্য আর অস্থিরতার ছবি এই উপন্যাস। কী বিচিত্র এই ভারতবর্ষ—আমরা তাকিয়েও দেখি না। জীবনের আদিম ও আধুনিক সমস্যার সহাবস্থান। অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু, অচিকিৎসিত ব্যাধি, অনিয়ন্ত্রিত জন্মহার, মড়কের ও দুর্ভিক্ষের তান্ডব যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের সংঘর্ষ, বৈবাগ্য আর বোরডম, হ্যাংলামি আর ইতরতা, মহান আদর্শ আর কঠিন সংকল্পের জন্য আত্মত্যাগ মহত্ত্ব আর হীনতা। দ্রুতগতি শহুরে জীবন আর উলঙ্গ-প্রায় উপজাতির বুদ্ধগতি জীবন। কুসংস্কার আর সংস্কারমুক্তি। 'তিন তরঙ্গ' উপন্যাসের দর্পণে এই স্ববিরোধী পরিবর্তমান অস্থির ভারতের প্রতিবিম্ব পড়েছে।

চঞ্চল বিক্ষুব্ধ পশ্চিমবঙ্গের জীবনে খৃঃ ১৯৬৯—৭১ তিনটি বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে রাজনৈতিক আন্দোলন আর অস্থিরতা এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গকে বিপর্যস্ত করেছে তাকে সচেতন জীবন-শিল্পী অস্বীকার করতে পারেন না।

সমরেশ বসুর 'মানুষ' (১৯৭০) উপন্যাসে এই বস্তুনিষ্ঠ অধ্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাই। পার্টি-রাজনীতি যে হিংসা ও হত্যাকে প্রশ্রয় দেয় তা মানুষকে কীভাবে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা লেখক দেখিয়েছেন। আরো কিছু দেখিয়েছেন। পার্টির ইনার স্ট্রাগল-এর ফলে মানুষের জীবন কিভাবে ছেলেখেলা, রাজনৈতিক হত্যার পর যে জবাবদিহি যে শাস্তি ঘটে, তা সংক্ষিপ্ত ও তার বন্দী প্রান্তন কমরেড ধীরেশের মাধ্যমে চিত্রিত। ধীরেশ একদিন ধ্রুবকে হত্যা করেছিল, আজ তাকে বন্দী করে আনা হয়েছে—হত্যার শাস্তি তাকে পেতে হবে। শেষ মুহূর্তে কেষ্টদার উদ্যত শাণিত কাটারির মুখে ধীরেশ [illegible] পড়ছে স্বীকার করেছে ধ্রুবকে [illegible] বশত খুন করেছে। পার্টিতে কম ধ্রুবের এই প্রতিষ্ঠা? কেন তার নয়?

> মাবো, কেষ্টদা, তোমাদের অমন ভালোবাসার নেতাকে আমি মেরেছি। ধ্রুব কেন এত ভালোবাসার নেতা ছিল আমি সহ্য করতে পারিনি। সকলের ওপরে থেকেও কোনদিন

মানিক গ্রন্থাবলী

দশম খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। উক্ত খণ্ডে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস ও গল্পগুলি সংযোজিত হয়েছে। নবম খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৪।। গ্রাহক-মূল্য ১১·২০।।

বনফুল রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড আশ্বিন/১৩৮০

প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হবে। এই খণ্ডে বনফুলের (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) তৃতীয় দশকের বিশিষ্ট উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ; কবিতা ইত্যাদি সংযোজিত হয়েছে।। তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রতি খণ্ড ১৫।। গ্রাহক-মূল্য ১২।।

বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও ছাপায় মূল্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়তো রোধ করা যাবে না। এখনও যাঁরা গ্রাহক তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক তাঁরা ১০ টাকা জমা দিয়ে (মফঃস্বলের গ্রাহকগণ মানি-অর্ডারযোগে) আগামী মহালয়া/১৩৮০ মধ্যে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলি এখনকার মূল্যেই পাবেন। যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ

১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

কলকাতা-১২

তোমাদের মধ্যে ঢুকতে পারলুম, তোমাদের সকলের মধ্যে ধ্রুবর মৃত্যু দেখেছি।

অপরাধের স্বীকারোক্তি, অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা, যন্ত্রণা-শুদ্ধ উপলব্ধির সার্থকতা এখানে প্রমাণিত। কেষ্টদা ও সুজিতদা নিষ্ক্রান্ত হলেন ভগবতীদিদি। তাঁদের কথায় স্বীকারোক্তি ও ক্ষমার মহিমা প্রতিষ্ঠিত।

সুজিত : যে ধীরেশকে আমি নিজে এঁকেছিলাম, এ সে নয়। আমি বুঝতে পারছি। ধ্রুবর জীবনের বিনিময়ে ও এখন মুক্তি চায়।

ভগবতীদিদি : না, ধীরেশের মরা চলে না। যখন এখানে আসি তখন ওকে মানুষ বলে মনে করতে পারিনি, এখন ওকে একটা খাঁটি মানুষের মত লাগছে, যেটা আমরা সবাই হতে চাই, আরো বেশি করে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নিশীথ ফেরারী' (১৯৭০) এই প্রশ্ন, এই দাবি নতুন করে উত্থাপিত। নায়ক প্রকাশের বিশ্বাস ছিল পার্টি আনবে সুদিন। তার জন্যই একটি আসন্ন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সহায়তা করল। প্রকাশ ওরফে সুখেন্দু সমস্ত পার্টির নির্দেশ, বিপ্লবীর ও কর্তৃত্ব পৌঁছে দিল এস এস ওরফে শান্তকে। এই পৌঁছে দেবার কাহিনী ও আগামী খুনের জন্য প্রকাশের মানস-প্রতিক্রিয়া এখানে বর্ণিত। তার অস্থিরতা, ত্রাস, পাপবোধ ও তার থেকে মুক্তিলাভের ব্যাকুলতা এখানে নিপুণভাবে বিশ্লেষিত।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'সময়, আমার সময়' (১৯৭২) একটি বিশেষ সময়—যঃ ১৯৭১ সালের কলকাতার ছবি। '৭১ সনের কলকাতার একটি নাম ভয়, অপর নাম সন্দেহ, অবিশ্বাস। সেদিন বিবেক পৌরুষ বুদ্ধি সমাজদর্শন কাঁধ দিয়ে আত্মপ্রিয় ভীত মানুষ ক্রয় করেছিল নিরাপত্তা। সোনিরে দুঃস্বপ্নকে আমরা কি ভুলতে পেরেছি? পেরেছি তাকে পেরিয়ে আসতে? স্বগতোচ্চারণমূলক এই উপন্যাসে লেখক আমাদের নিজেদের চেনবার দরকার ও দায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাঠগড়ায় আসামীর, সওয়াল-জবাবে একে একে অনেককে তিনি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন—প্রগতিপন্থী, বুদ্ধিজীবী, বিপ্লববাদী, ছাপোষা সাধারণ নাগরিক সাফাই দিয়েছে। রাজনৈতিক দলের যুক্তির অসারতা, মত ও পথের ভিন্নতা, নাগরিকতার রাজনীতির আত্মঘাতী পথ লেখকের নিপুণ নির্মম নিরাসক্ত লেখনীমুখে বিশ্লেষিত। আমাদের ভণ্ড আত্মপ্রতারণার নির্মম বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র অভিনব উপন্যাস।

অসীম রায়ের 'অসংলগ্ন কাব্য' (১৯৭৩) উপন্যাসে একই স্থান কালকে ব্যবহার করা হয়েছে। মহুতলীর যুবক, পলিথিন কারখানার সুপারভাইজর বন্ধু মিত্তিরের চোখ দিয়ে লেখক এই ভগ্নস্তূপ ন্যস্ত বিশ্বাসাধন্ত আত্মপ্রতারণারত সময়কে দেখেছেন। একদিকে সূর্য ব্যানার্জির মত আদর্শবাদী নেতা, অপরদিকে সুযোগ সন্ধী ভাই আবু ও উপির মত নকশালপন্থী উদ্দীপ্ত কর্মী—মাঝখানে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় দ্বিধাগ্রস্ত বংশী। সূর্য তার কাছে 'হীরো', বংশীর নিজের চোখে দেখেছে সূর্য কত উজ্জ্বল, বংশী দেখেছে সূর্য কত নিষ্প্রভ। এই আতঙ্ক অন্ধ অস্থিরতার মাঝে সূর্য কীভাবে অনাসক্ত, জাগ্রত, উদ্ভ্রান্ত, শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়েছে, তা বংশী মিত্তিরের দৃষ্টিতে আমরা দেখি।

সূর্য ওরফে সোনা আসলে স্বপ্ন দেখত, তাই পার্টি-রাজনীতিতে, বন্ধু-সমাজে, স্বার্থপর পরিবেশে তাকে কেউ জায়গা দিল না। সূর্য যেমনভাবে বিপ্লবের কথা ভেবেছে, তেমনভাবে কোনো দল ভাবে না—

বিপ্লবটা আসলে একটা স্বপ্ন, একটা লক্ষ্য। এই সে এত লড়ালড়ি রক্তপাত এগুলো কিন্তু আসলে কোনটাই বিপ্লবের গোটা চেহারা নয়, খুব আংশিক, আসল লক্ষ্য হল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক—এখন যা বিকৃত। এক বুকচাপা একাকীত্বে মানুষ বাস করছে। সারাজীবন চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। আগে ধর্মকর্ম মানুষকে তার খোলস ছাড়তে সাহায্য করেছিল, মানুষ ভাবতে পারতো এই চব্বিশ ঘন্টা অস্তিত্বের কোন বিশেষ রূপে আছে যে রূপের সঙ্গে ত্রিভুবন বাঁধা পড়েছে। এই ধর্মবোধ এখন নীরস হিবড়ে। মানুষের এক নতুন ধর্ম সৃষ্টি হয়েছে, কার্ল মার্কস সেই নয়া ধর্মের স্রষ্টা। শুধু একা নয়, সবাই মিলে, সবাই হাত লাগিয়ে কাঁধ লাগিয়ে এই বাঁচার চেষ্টার মতো তাৎপর্যপূর্ণ আর কী থাকতে পারে? এরই মাঝখানে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। মেয়েরা পণ্য নয়, তোয়ালের বিজ্ঞাপনের নায়িকা নয়, মেয়েরা এই সকলে মিলে বাঁচবার এক বিরাট অংশ। বিপ্লবের অসংলগ্ন মানে হল, এই সকলে মিলে বাঁচার চেষ্টা, এক সামগ্রিক বৌথ অস্তিত্ব। ('অসংলগ্ন কাব্য', অধ্যায় ৩, পৃঃ ৪০)

'মানুষ', 'নিশীথ ফেরারী', 'সময় আমার সময়', 'অসংলগ্ন কাব্য'—সবই জীবনের ও প্রেমের অসীকার। ধীরেশ, সুজিত, প্রকাশ, সূর্য—সকলেই চায় অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতায় ফেরা।

অন্যদিকে তরুণ যৌবনের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বেদনা নিজস্বরূপ পেয়েছে কয়েকটি উপন্যাসে। এবং সেগুলির লেখকরাও তরুণ। শীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পরপারে) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (জীবন যে রকম), শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (বহ্নিবলয়), মতি নন্দী (সুতাহুর বা সুখের জন্য), সুধাংশু ঘোষ (ফানুসের উপমা) দিবেন্দু পালিত (ভেবেছিলাম), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (পিপাসা) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (অসবর্ণ) প্রফুল্ল রায় (আমার নাম বকুল), দেবেশ রায় (হলাহল) স্বীবনের সংশয়াকুল শিল্পরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। মাত্র দুটি উপন্যাসের আলোচনায় এর রূপবৈচিত্র্য দেখতে পারি।

'আমার নাম বকুল' (পরিচয় পত্রিকা)-এর নায়িকা বকুল একটি সাধারণ মেয়ে। তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন আছে, তার আছে কিছু দুঃখ আর সমস্যা। সংসার-না-জানা মানুষের মত সেও ভাসে ঢেউ কাশ ডুবে যাচ্ছে। বকুল ভালবাসে বিপ্লবকে। সকলে নীড় বাঁধতে চায়, কিন্তু সকলেরই আছে পিছুটান—পরিবারের দায়দায়িত্ব। পাশ্চাত্যের বাঁধনছাঁড়া যৌবন নয় বলেই ভারতবর্ষের পারিবারিক জীবনে বন্ধ যৌবন সহজে

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।
শ্রীঘৃত
শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ
অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ
২৬, কটন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭

লাগাম-ছেঁড়া হতে পারে না। তাই বকুলের বিষণ্ণ কণ্ঠে শুনি—

> আমার মতো মেয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে একটা বিয়ে হয়তো বসাতে পারে, অফিস থেকে লোন-টোন তুলে মনের মতো করে ফ্ল্যাটও সাজাতে পারে, ছুটিছাটায় সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে সংসার-সংসার খেলতেও পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। স্বামীর কাছে গিয়ে থাকা আমার কোনদিনই হবে না। সে-পথে হাজার কাঁটা। বাচ্চু-হাবু-ভারতী-সংঘমা-বাবা-নীলিমা-নির্মল সব মিলিয়ে যে মরণফাঁদ, তার বাইরে পালাবার উপায় নেই।

পারিবারিক বন্ধন দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারছে না বলেই বকুলের যৌবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ-কাহিনীতে শিল্পীর সামাজিক চেতনা প্রখর। অপরদিকে দেবেশ রায়ের 'যযাতি' উপন্যাসের বিদ্রোহী পুত্র কিছুতেই পিতৃস্থ আদেশ ও শাসনকে মেনে নিতে চায় না বলেই সবকিছু ছেড়েছে। এখানেও আত্মকথনের ভঙ্গিতে আপন সমস্যা বিশ্লেষণ করেছে তিন চরিত্র—গিরিজামোহন (স্বামী), রেণু (স্ত্রী), খোকা (তাদের পুত্র)। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সংস্কারবদ্ধ পারিবারিক জীবনে ব্যক্তির স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু তার নিপুণ বিশ্লেষণ পাই এখানে। গিরিজামোহনের শঠতা তার ছেলের সন্ধানী দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত। বিদ্রোহী পুত্র কেবল পিতৃ-আশ্রয় ত্যাগ করেনি, সেই সঙ্গে ত্যাগ করেছে তার মোহকে। তার সামনেই ভেঙে পড়েছে অনেক দিনের মূল্যবোধ, বিশ্বাস আর আত্মপ্রতারণা। ধীরে ধীরে বিদ্রোহী পুত্রের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে পিতার জীবনের অন্ধকার অধ্যায়গুলি। তার কর্তৃত্বাভিমানী অবিশ্বাসী চরিত্রটি। পুত্রের জীবনীতে আমরা সেই মোহাবসানের কাহিনী জানতে পারি—

> গিরিজামোহনের যে প্রতিমা সেই বাল্য থেকে ধরে ধীরে আমার চেতনার সঙ্গে মিশেছিল, সেটা তখন ফাটলে ফাটলে চৌচির। আমার জীবন যে আমারই হাতে নয়, আমার নিয়তি আমাকে পূর্বনির্দিষ্ট পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এ-ধারণার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল। বিশ্বাসের কোনো খুঁটি আমার ছিল না, তাই সান্ত্বনা অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কতোক্ষণ পারা যায় সেই সান্ত্বনাকে নিজের মনে মনে লালন করা—বাইরে থেকে যখন তার কোনো সমর্থন নেই।

আত্মবিনাশের পথে সে এগিয়েছে। গিরিজামোহনের মূলধনের আমি সৃষ্টি—এই আত্মপরিচয়ের গ্লানি থেকে বাঁচবার দুটো পথ তার সামনে ছিল,—এক, নিজেকে ধ্বংস করা মানে গিরিজা-মোহনের মূলধন ধ্বংস করা। দুই, তাকে যাতে তার পিতা মূলধন হিসাবে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য নিজেকে গিরিজামোহনের দায়ে পরিণত করা। দুটোই সে করেছে। কোনোটাতেই সে সফল হয়নি। কী করুণ এই স্বীকারোক্তি! বিদ্রোহী ছেলের মা গিরিজামোহনের প্রথম বিনিয়োগক্ষেত্র। সেই মা-কে (রেণুকে) গিরিজামোহন বিশ্বাস করে না, সর্ব অর্থে ব্যবহার করে। সে গিরিজামোহনের যক্ষিণী তাই তাকেই পুত্র ধ্বংস করতে চায়। পারে না। এখানেই পুত্রের পরাজয় এবং তারই স্বীকৃতি—'আমার যৌবন আমি তোমাকে দিয়ে এসেছি গিরিজামোহন। তোমার উত্তরাধিকার আমি স্বীকার করি না। আমার উত্তরাধিকার তোমাকে স্বীকার করতে হবে।...আমার এ-যৌবন তোমাকে মারুক। তোমার সেই মৃত্যুতে বোধহয় আমাদের দুজনেরই তর্পণ।' বিশ্বাস ও মূল্যবোধ বিসর্জন-পটভূমিতে যৌবনের এ কী বেদনার্ত স্বীকৃতি!

বিশ্বাসের সঙ্গে মূল্যবোধ আজ আর হয় না, অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার পথে যত্রা প্রায়শই ব্যর্থ হয়। তবু মানুষের যাত্রা শেষ হয় না, কারণ, মানুষ মৃত্যুর চেয়ে বড়। এই উপলব্ধি লেখককে করে তোলে জীবন-অনুরাগী। কাফকার উপন্যাসে মানুষ এক অদ্ভুত স্বপ্নলোকের পুতুল। সেই জগতের কোনকিছুর উপরই তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নৈরাশ্য আর হতাশার সে শিকার। সে মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তি তার কাছে আলেয়া। লোকনাথ ভট্টাচার্যের 'বাবু-ঘাটের কুমারী মাছ' (১৯৭২) পড়তে গিয়ে কাফকার 'ট্রায়াল' উপন্যাসের কথা মনে হচ্ছিল। এক উদ্বাস্তু শিবিরে বন্দী একদল মানুষ—যুবক যুবতী বুড়ো-বুড়ী শিশু। এ শিবির বাহ্যিক আবাস ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার স্বর্গবিশেষ। আবার আত্মিক ব্যভিচার ও পশুত্বের গ্লানিভরা নরকবিশেষ। এখানে সব বন্দী উলঙ্গ, তাদের প্রতি সর্বদা রক্ত-চক্ষু পরিচ্ছদশোভিত প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। পালাতে গেলেই গুলি। এখানে নেই স্বাধীনতা, শোনা যায় না পাখির ডাক, জাগে না মুক্ত মানুষের কলরোল। এখানে অনেককিছু আছে, নেই বাইরের স্বাধীনতার জগৎ। যেখানে খুশি যাওয়া যায়, যা খুশি করা যায়, চাইলে আপনজন খুঁজে তার চোখে মিষ্টি হাসি হাসা যায়। আসলে সেই স্বাধীনতা নিয়ে নীরব কাতরানিই এই উলঙ্গ শিবিরের দিনরাত্রির একমাত্র কাব্য। এ-শিবিরে বন্দীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে শূন্য আকাশ, সম্পূর্ণ পরিচয়হীনতা। এরই বেদনা এক বন্দীর জবানীতে ব্যক্ত। তারা কেবল শারীরিক দিক থেকেই নগ্ন নয়, মানসিক দিক থেকেও নগ্ন। তাদের জীবনে আন্তরিকতা নির্বাসিত হয়েছে অন্তর-হীনতায়। এখানে নগ্নতা অভিশাপ, কারণ তা উপর-থেকে চাপিয়ে দেওয়া। কথক বন্দী জানে, চিন্তার স্বাধীনতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাম্যধন। আরো জানে, ক্ষমতা যাদের হাতে তারা একমাত্র নিজেরাই স্বাধীন থাকতে চায়, অন্য কোনো স্বাধীনতার অস্তিত্ব কিছুতে বরদাস্ত করে না। তবু বন্দীরা লড়ে, হেরে গিয়েও লড়ে। চন্দ্রিমার বিদ্রোহে তারই ইঙ্গিত। বক্তার কথায় তারই বজ্রগর্ভ সংকেত। নৈঃশব্দ্য আর অসহায়তা এর বাতাবরণ। কিন্তু তা শেষ কথা নয়। আজকের নিয়ন্ত্রিত দ্বন্দ্বের মানুষের অস্তিত্বের সংকটের সত্য রূপ ও সংগ্রামের ইঙ্গিত পাই এই উপন্যাসে।

অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতর পথে মানুষের যাত্রার ইঙ্গিত এখানেও পাই।

নীলদর্পণের অনুবাদক

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে 'নীলদর্পণ' এমন একখানি নাটক যাকে ঘিরে একটার পর একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে। এমন উত্তেজনা বাংলাসাহিত্যে আর কোনো বইকে নিয়ে কখনো দেখা যায়নি। ঢাকা থেকে যন্ত্রে ছেপে রামচন্দ্র ভৌমিক আঠারোশ ষাট সালের দোসরা আশ্বিন এই বইটি যখন বের করলেন, ঠিক প্রায় তখন থেকেই এই নব্বই পৃষ্ঠার গ্রন্থটি নিয়ে আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল আলোড়ন। প্রথমে দেখা দিল কৌতূহল। যেহেতু গ্রন্থটিতে গ্রন্থকের কোনো নাম ছিল না, তাই এর গ্রন্থক সম্পর্কে সকলে খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ভ্রূকুটি করলেন, কার এমন দুঃসাহস যে নীলকরদের বিরুদ্ধে কলম ধরেন?

পরের বছর আঠারোশ একষট্টিতে দশ নম্বর ওয়েস্টনস লেন থেকে ম্যানুয়েল সাহেব এ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ছেপে বার করলেন এবং লঙসাহেব নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য প্রয়োজনমত আরম্ভ করলেন বিলি করতে, তখন উত্তেজনা চরমে উঠল। 'নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদেও মূল নাট্যকারের নাম ছিল না, সে জায়গায় শুধু লেখা ছিল একটি কথা—'এ নেটিভ'। সুতরাং কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এদিকে নীলকরেরা ক্ষিপ্ত হল, 'হুরুরা' 'ইণ্ডিলশম্যান' রাগে ফেটে পড়ল। আরম্ভ হয়ে গেল মামলা-মোকদ্দমা। ইংরেজি অনুবাদ করিয়েছিলেন যিনি, সেই লঙসাহেব এগিয়ে এসে সমস্ত লাঞ্ছনা বুক পেতে নিলেন। হাজার টাকা জরিমানা এবং এক মাসের কারাবাস—এ শাস্তি তিনি মাথায় তুলে নিলেন। আমাদের দেশের কল্যাণে প্রথম কারাবরণের গৌরব যিনি অর্জন করলেন, তিনি কোনো নেটিভ নন, সাত-সমুদ্দুর তের নদী পারের এক ধর্মপ্রাণ পাদ্রী হলেন তিনি। যে-কোনো দেশের ইতিহাসে এ জাতীয় ঘটনা দুর্লভ।

'নীলদর্পণ' নাটকটিকে আরো অনেক গৌরবে ভূষিত করা যায়। আমাদের দেশের প্রথম জন-জাগরণের ছবি এখানেই ধরা পড়ে। যথার্থ স্বদেশিকতার বাস্তব উন্মেষ এখানেই দেখা যায় প্রথম। আঠারোশ বাহাত্তরে প্রথম যেদিন জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিন তারা যে প্রথম নাটকটিকে অভিনয়ের জন্য বেছে নিয়েছিল, তা হল 'নীলদর্পণ'। আর 'নীলদর্পণই বোধহয় প্রথম নাটক যাকে ঘিরে সুদূর ইংলণ্ডেও নিবিড় হয়ে উঠেছিল কৌতূহল এবং চার্লস ডিকেনস সম্পাদিত 'অল দি ইয়ার রাউণ্ড' পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধও লিখিত হয়েছিল।

একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় কী মূল কী অনুবাদ—ইতিহাস সৃষ্টিতে কেউই কম যায় না। তাই উভয় সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল। বাংলা 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে অনেক তথ্যই আমরা পরে পরে জানতে পেরেছি, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে অনুবাদ বিষয়ক সকল তথ্য আমাদের অনেকখানি জানার বাইরে রয়ে গেছে। হঠাৎ কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে, আমরা ভীষণভাবে অসহায় হয়ে পড়ি।

মূল বাংলা নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের নাম নাট্যকার হিসাবে প্রথম দিকে না থাকলেও তিনিই যে নাট্যকার তা চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোনো প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।'

অনুবাদের ব্যাপারেও ঠিক তাই হয়েছিল। যদিও ধরিত্রীকৃত গানে লিখিত ছিল, 'নীলদর্পণে লং-সাহেব যথার্থ যা তাই লিখেছে', কিন্তু স্বয়ং লঙ সবিনয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, 'বোথ দি ওরিজিনাল অ্যান্ড ট্রান্সলেশন আর বোনাফাইড নেটিভ প্রোডাকসন্স'। —অর্থাৎ মূলগ্রন্থ এবং তার অনুবাদ দুইই বোনাফাইড দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত।

'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করে যিনি সহজেই খ্যাতিমান হন, আর নিজের নাটক 'শর্মিষ্ঠা' অনুবাদের ভেতর দিয়ে অনুবাদক হিসাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন, সেই মাইকেল মধুসূদনই যে এই 'নীলদর্পণের অনুবাদক সে বিষয়ে অনেকেই দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র বা মাইকেল মধুসূদন দত্ত দুজনে নীরব থাকলেও, দুজনের জীবনী লিখতে যারা এগিয়ে এলেন, তাঁরা কেউই নীরব থাকলেন না।' আঠারোশ তিপ্পান্নর খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাইকেল দেহ রক্ষা করেন, আর ঐ বছরেই পয়লা নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে অকাল মৃত্যু বরণ করেন দীনবন্ধু। —এঁদের মৃত্যুর পর দীনবন্ধুর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'এই গ্রন্থ (নীলদর্পণ) রচনা করতে করতে দীনবন্ধু মেঘনায় নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইতে হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন —লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরাজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।'

'বঙ্কিম যুগের কথা' বিবৃত করতে গিয়ে আরেকজন নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখলেন 'অবিলম্বে 'নীলদর্পণ' ইংরাজিতে অনুবাদিত হইল। অনুবাদ করিয়াছিলেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত: কিন্তু লং সাহেবের নামেই তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। এই 'নীলদর্পণ'-এর সংস্রবে আসিয়া মাননীয় মিঃ সিটন-কারও কিছু কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়া একেবারে পরিত্রাণ লাভ করেন নাই; গোপনে তিক্ত মধুগোছের কিছু কিছু পাইয়াছিলেন।'

শিবনাথ শাস্ত্রী জানালেন, 'যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।'

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম মাইকেলকে কেবল অনুবাদক হিসাবেই স্বীকৃতি দিলেন না, যে বাড়িতে নীলদর্পণের অনুবাদ হয়, তার ঠিকানা পর্যন্ত উদ্ধার করে দিলেন।

ঝামাপুকুরের ডেপুটি তারকনাথ ঘোষ সাহিত্যিক না হলেও, সাহিত্য তাঁর বড়ো প্রিয় ছিল। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই সাহিত্য আলোচনার আসর বসত। আর তাঁর ঐ সারস্বতকুঞ্জে' বঙ্কিম দীনবন্ধু সকলেই আসতেন। রাস্তার ওপারে দিগম্বর মিত্রের বাড়ি। মধুসূদন ঐ দিগম্বরের বাড়ি প্রায়ই যেতেন, পরে ডেপুটি তারকনাথ ঘোষের বাড়ি তিনি নিয়মিত যাতায়াত করতে থাকলেন। এবং এই বাড়িতেই এক রাত্তিরে অনুবাদ করে ফেলেন 'নীলদর্পণ' নাটক। মধুসূদনের জীবনীকারের ভাষায় 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণের অনুবাদকার্য সমাধা করেন।'

'নীলদর্পণ' গ্রন্থটি যে অনূদিত হওয়া দরকার, এর প্রয়োজন যিনি অনুভব করেন তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন রেভারেণ্ড জেমস লঙ। মানবসেবায় নিবেদিত-প্রাণ এই মনীষী আমাদের জন্য যা করে গেছেন, ভারতের ইতিহাসে তার নজির মেলে না। কেরী-মার্শম্যান বা ডেভিড হেয়ার রিচার্ডসন যা করে গেছেন তা আংশিক। লঙসাহেবের কাজ সে তুলনায় অনেক গভীর এবং অনেক ব্যাপক। বিরাট মাথা, একমুখ দাড়ি, খর্বাকৃতি এই মানুষটির ক্ষমতা ও উৎসাহ ছিল অপরিসীম। আঠারোশ চল্লিশে ছাব্বিশ বছর বয়সে চার্চ মিশনারী সোসাইটির পাদ্রী হিসাবে তিনি কলকাতায় আসেন। মিশনারী হিসাবে তিনি কতখানি সার্থক, খৃস্টীয় ধর্মযাজকরা তার হিসাব নিতে পারেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাই তিনি প্রথম থেকেই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন সমাজ সেবায়।

ঠাকুরপুকুরের নিম্নসম্প্রদায়ের অশিক্ষিত চাষীদের ছেলেপুলেদের শিক্ষার্থে তিনি বিদ্যালয় খুলে বসলেন। 'রুরাল লাইফ ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের লেখক কোলসওয়ার্দি গ্রানট এই বিদ্যালয় দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হাইনিরিক পেসতালোৎজির শিক্ষাদর্শের কথা ভারত ও ইউরোপ যখন ভালো করে শোনেনি, ঠাকুরপুকুরের একটি ছোট্ট বিদ্যালয়ে সেই আদর্শ রূপায়িত করতে বসেছিলেন লঙ সাহেব। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সুন্দর বাংলা শিখে নেন এবং একটি বাংলা মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাও করতে আরম্ভ করেন। গ্রামে

গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি বহু লাইব্রেরী তৈরী করেন। শুধু বাংলার গ্রামে গ্রামে নয়, ওড়িশা-উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-ভারতের অনেক অঞ্চল তাঁর ঘোরা ছিল। অন্যূন নয়টি ভাষা তিনি জানতেন।

'ভার্ণাকুলার ট্রান্স্লেশন সোসাইটি'-র সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বহু সভা-সমিতির সঙ্গে তিনি ছিলেন যুক্ত। চোদ্দশ বাংলা বই-এর ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর। আমাদের দেশের ছয় হাজার প্রবাদ সংগ্রহের ও সংকলনের এবং অনুবাদের তিনি অন্যতম পুরোধা। 'সমাজবিদ্যা' সম্পর্কে এদেশকে তিনি প্রথম অবহিত করেন। আর বাংলা ভাষার সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেন,

> 'A change is comeing over Bengal: the Bengali language is happily dropping the old Sanskrit style and assuming a national idiomatic form'

ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বাংলা মৌলিক গ্রন্থগুলি লঙ্ সাহেবের নির্দেশে সংগৃহীত হত; অক্সফোর্ডের প্রখ্যাত 'বোডেন' অধ্যাপক উইলিয়ামস্ একদা সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত বইগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এ-গুলি সংগ্রহের জন্য কাকে তিনি দায়িত্ব দেন?—বলা বাহুল্য, লঙ্ সাহেবই সেগুলি কিনে পাঠিয়ে দিলেন দিলেন অক্সফোর্ডে। শুধু বাইরের লোক কেন, গবেষকরাও বলে থাকেন, 'দেশীয় বহু ধনী-মানীও বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় বা সংগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ লইতেন।'

এই বিদ্যোৎসাহী ও সমাজসেবী রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্ হঠাৎ 'নীলদর্পণ'কে নিয়ে এত উঠেপড়ে লাগলেন কেন?—কেনই বা তিনি এর ইংরেজি অনুবাদ করিয়ে সোজা বিলেতে বই পাঠাতে থাকলেন?

এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হয়, লঙ্ সাহেব এ দেশীয় লোকেদের এবং সেই সঙ্গে শাসক ইংরেজকুলের ভালো চেয়েছিলেন বলেই এ কাজে নেমেছিলেন। আঠারোশ তিপ্পান্ন খৃষ্টাব্দে তাঁর দিল্লী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এ কাজে উৎসাহিত করার আরেকটা কারণ। — আঠারোশ তিপ্পান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর আগেকার কথা। লঙ্ সাহেব ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন উর্দু বই সংগ্রহের জন্য। অনেক সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছিল, শুনতে হয়েছিল তাঁদের অনেক কথা। মুসলমানদের মন গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কী ভীষণ তিক্ত হয়ে রয়েছে, তার তিনি সুস্পষ্ট আঁচ পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠতে আর দেরী নয়, সবই প্রস্তুত কেবল দেশলাই কাঠি ছুঁইয়ে দেবার অপেক্ষামাত্র।—কিন্তু লঙ্ সাহেবের দুঃখ এই, এ সব কথা সরকারকে বোঝাবার মত কোনো দলিল তাঁর কাছে ছিল না; যদি তা থাকত, লঙ্ সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্রোহের বহ্নিবন্যাকে আটকানো যেত।

বিদ্রোহের পরে বাংলাদেশে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় অনুরূপ অবস্থাই দেখলেন নীলচাষকে কেন্দ্র করে। আর হাতের কাছে পেয়ে গেলেন দলিল। এ দলিলের নাম, 'নীলদর্পণ'।—এবার কী সাহেব আর সুযোগ ছাড়েন? — নীলদর্পণের অনুবাদ করালেন। অতি দ্রুত।

ছাপবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন রিক্রেমেন্ট হেনরী ম্যানুয়েল। ছাপবার 'ম্যাটার' অবশ্য সাহেব একেবারে দেন নি, দিয়েছিলেন ক্ষেপে ক্ষেপে। শেষ-এপ্রিল কী মে মাসের প্রথমে আরম্ভ হয় ছাপবার কাজ। কয়েকদিনের ভেতর একশ দুই পাতার এই বইখানি ছাপা হয়ে গেল। মাত্র পাঁচশ কপি ছাপানো হয়েছিল। প্রুফ দেখে দিয়েছিলেন লঙ্ সাহেব নিজে। সব কাজ শেষ হয়ে গেলে ঐ পাঁচশ কপি বই এবং পাণ্ডুলিপি-প্রুফকপি সবই ম্যানুয়েল পৌঁছে দিয়ে এলেন লঙ সাহেবের কুঠিতে। মূলের সঙ্গে অনূদিত পাঠের কিছু কিছু তফাৎ ছিল। প্রকাশক লঙ্ সাহেব নিজেই কবুল করেছিলেন, 'কোর্সার প্যাসেজেস্ আয়ার একসপানজড্ অব সফটেনড' এবং যাঁরা মূলের সঙ্গে পাঠ মিলিয়ে পড়বার শ্রমস্বীকারে প্রস্তুত, তাঁদের বলেছেন,

> '..any one who will take the trouble to examine the original will find that a good deal has been omitted.'

অনূদিত 'নীলদর্পণ' এবার বিলি করবার ব্যবস্থা করা হল। পাঁচশ কপির ভেতর দুশ কপি নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাংলা সরকারের সেক্রেটারীর মাধ্যমে এই গ্রন্থখানি পাঠানো হয়েছিল। কেননা, সেকালে এ ভাবেই অনেক বই পাঠানো হত এবং এটাই ছিল কেতা। মাত্র চোদ্দ কপি ছাড়া সব বইই গেল ইংলন্ডে। যাঁরা 'ইউরোপীয়ান্স অফ ইনফ্লুয়েন্স', তাঁদের কাছে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই বইগুলি পাঠানো হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু কিছু কাগজের সম্পাদক। আর সে কাগজগুলি হল, 'বোম্বে টাইমস', 'লাহোর ক্রনিকল', 'ম্যাড্রাস স্পেক্টেটার' ইত্যাদি।

'লাহোর ক্রনিকল'র সম্পাদক বইখানি পড়ে সোজা পাঠিয়ে দিলেন কলকাতার 'ল্যান্ডহোলডারস অ্যান্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশন অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'র সেক্রেটারীর কাছে। এবং তারপরই লেগে গেল ধুন্ধুমার। 'হরকরা' এবং 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদকেরা নীলকরদের মতনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যেহেতু 'নীলদর্পণে' প্রকাশক বা লেখকের নাম ছিল না, তাই তাঁরা প্রথম দিকে তল্লাসির জন্য লোক পাঠালেন দিকে দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জুনের ছয় তারিখে মুদ্রাকর ম্যানুয়েলের নামে ঠুকে দিলেন মামলা। এগারোই জুন বিচার হল। দশ টাকা জরিমানা দিয়ে এবং লঙ সাহেবের নাম প্রকাশ করে সাহেব ম্যানুয়েল নিষ্কৃতি পেলেন।

পরের দিন বারোই জুন তারিখে 'হরকরায়' একটি বিচিত্র সংবাদ বেরোল।

'নীলদর্পণ'-এর লেখক সম্পর্কে এঁরা যে কী রকম তল্লাশী চালিয়েছেন, ঐ সংবাদই তার প্রমাণ। সংবাদদাতা ঢাকা থেকে খবর পাঠিয়ে জানিয়েছেন, 'নীলদর্পণ! তার খবর জানতে চেয়েছ? তুমি না বলা পর্যন্ত জানতামই না ঢাকা এর জন্মস্থান! অবশ্য তুমি বলবার পর থেকে একটু-আধটু খোঁজ-খবর করছি। যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তোমার খবর সত্যি। এখানকার বাঙ্গলা যন্ত্রই তা দিয়ে এই নাটকের ডিমটি ফুটিয়েছে। ও ছাপাখানার এটাই প্রথম বই। আমাদের দেশী বন্ধুরা নাটক অভিনয় করে মাঝে মাঝে আমোদ আহ্লাদ করে থাকে। এর ভেতর নীলদর্পণ তারা একদিন অভিনয় করেছে।...বেঙ্গল অফিসে এ বইখানি কী করে গিয়ে ঢুকল, সে সব কথা বলতে পারব না। তবে ঐ রেভারেন্ড ভদ্রলোক—উনি হলেও হতে পারেন (হবেন কি না তুমি নিজে বিবেচনা করো), শোনা যাচ্ছে তিনিই নাকি নীলদর্পণের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন। বাংলা বই সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অপরিসীম, কি বই, কি কাগজ, কি পত্রিকা—যাই প্রকাশিত হোক না কেন, প্রত্যেকটি তাঁর জানা চাই। নীলদর্পণের জন্ম হয়েছে একটি বিশেষ মুহূর্তে। এ বই কে লিখেছে? দেশী লোক? সে সরকারী চাকরী করে...মোট কথা, সে এক ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট অব এনকোয়ারী। তুমি কী এ সম্পর্কে জানতে চাও?'

এখানে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, নাম ছাড়া লেখক সম্পর্কে সকল তথ্যই সাংবাদিক জানাতে সমর্থ হয়েছেন। আর লঙ সম্পর্কেও। ইনি যে ভূমিকা লিখেছেন, সে কথাও এঁদের কাছে অজ্ঞাত থাকে নি। লঙ সাহেব যদি গ্রন্থটি অনুবাদ করতেন, তবে নিশ্চয় সে কথাটিও এখানে উল্লিখিত থাকত।

দীনবন্ধুর নামটি দিন সতেরো পরে খুব সুস্পষ্টভাবেই লিখে জানালেন সাংবাদিক। সংবাদদাতা এবারের চিঠিতে লিখলেন, 'অ্যাট এনি রেট অ্যাজ ইউ অব অ্যাকোয়েনটেড উইথ দি নেম অব দিস ফ্রেন্ড অব দি পুওর অ্যান্ড নিডি, কিপ অ্যান আই আপন দি অ্যাপয়েন্টমেন্টস অ্যান্ড প্রোমোশনস ইন কনেকশন উইথ দি পোস্ট অফিস অ্যান্ড ইউ মে বি এডিফায়েড সাম মরনিং।'

এখানে 'ফ্রেন্ড অব দি পুওর অ্যান্ড নিডি' কথাটি লক্ষ্যণীয়।—'দীনবন্ধু' নামটিই কি এখানে লেখা হয় নি হেঁয়ালী করে? আর অর্থটি কি এইভাবে পড়লে সংবাদটির মর্ম অতিসহজেই উদ্ঘাটিত হয়ে যায়,—'যে-ভাবেই হোক তোমরা যখন দীনবন্ধু নামের সঙ্গে পরিচিত, ডাক-বিভাগ সংক্রান্ত নিয়োগ ও পদোন্নতির দিকে নজর রাখো, কোন এক প্রভাতে তোমাদের কাছে সব তত্ত্ব জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে যাবে।'

মোট কথা, তল্লাশী চালিয়ে সাহেবরা জেনেছিলেন, মূল নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র এবং ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকা লেখক হলেন লঙ সাহেব। অনুবাদক কে, সে তত্ত্ব অন্ততঃ এঁরা তখনো পর্যন্ত জানতে পারেন নি। এর তিন সপ্তাহ পরে লঙ সাহেবের বিচার আরম্ভ হয়।

বিচারের সময় বহু তথ্যই উদ্ঘাটিত হল। এবং বিচারের সময় গ্রন্থটির ইংরেজী যে অত্যন্ত জঘন্য একথা কোথাও কেউ বললেন না। বরং ভালো ইংরেজীর জন্য কোনো নেটিভ যে এ গ্রন্থের অনুবাদক, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হল। বিরোধী পক্ষের কৌসুলী জেরার সঙ্গেই দাবী করেছিলেন, 'ইট ওয়াজ নট ট্রানস্লেটেড বাই এ নেটিব।' বক্তব্যের সমর্থনে 'সরকী ওয়ালা' কথাটির অনুবাদ 'ব্রিক ডাস্ট মেকার্স' ইংরেজিটি তুলে দিয়েছিলো। — বিদেশীরা হয়ত ভুল করতে পারেন কিন্তু যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারা কী এ ভুল কখনো করতে পারে? এই বলে সাহেব সোজাসুজি রেভারেন্ড জেমস লঙকে অনুবাদক হিসাবে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সওয়াল করবার সময় বলেছিলেন,

> . translation could never have been made by a Hindu but by an Englishman.'

এখানে কৌসুলী 'নেটিব' কথাটি ব্যবহার না করে 'হিন্দু' কথাটি ব্যবহার করলেন কেন? এর মধ্যে কী কোন ইঙ্গিত আছে?—না, সেরকম কোন ইঙ্গিত নেই, 'ইংলিশম্যান' কথাটির ওপর জোর দিয়ে, কৌসুলী তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট রাখেন নি। সোজা কথা, তিনি লঙ সাহেবকেই অনুবাদক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু লঙ যা করেন নি, সে দায়িত্ব নেবেন কেন? অন্ততঃ অপরের যদি কোনো গণপনা থাকে, তার কৃতিত্ব বা খ্যাতি সাহেব কখনোই নেবেন না। তাই লঙ সাহেবের পক্ষে কৌসুলী অনুবাদক হিসাবে সোজাসুজি তাঁর নাম প্রত্যাখ্যান করে বললেন,

> He is not the author, neither was he the translator of the work Those persons are both known, and if necessary they are ready at a fitting time to come forward and declare their shares in the matter.'

লঙ সাহেব নন, তাহলে দেখা যাচ্ছে অনুবাদক হলেন দেশীয় কোনো ব্যক্তি। এখন দেখা যাক, কে সেই ব্যক্তি? লঙ সাহেব অবশ্যই জানতেন অনুবাদককে। আর দীনবন্ধুর পক্ষেও তাঁকে জানা অসুবিধার ছিল না। দীনবন্ধু জানলে বঙ্কিম-সঞ্জীবচন্দ্র সকলেই জানতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। শুধু শোনা কথার ওপর নির্ভর করার পাত্র তিনি নন। যাচাই করে তবে তিনি তা লিখতেন। সেই বঙ্কিমই প্রথম জানালেন যে নীলদর্পণের অনুবাদক হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আর একথা যখন জানালেন, তখন ইংরেজ আদালতের ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁদের ধরে নিয়ে আসতে পারে। দুজনেই তখন মৃত। আর তা ছাড়া 'নীলমামদো'র উৎপাত তখন অতীত কথা মাত্র।

যাই হোক, সাহেবরা যেমন কেউ এ নিয়ে আন্দোলন করলেন না, দেশীয় লোকেদের কাছ থেকেও কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়ার' সম্পাদক একদা লিখেছিলেন, 'অনুবাদের হরেক রকম অসুবিধা সত্ত্বেও এটা পাকা হাতের লেখা, বিটন উইথ ট্যালেন্ট।' — যাঁরা অনুবাদকের নাম জানতেন না, তাঁরা বঙ্কিমের লেখায় মধুসূদনের নাম জেনে খুশী হলেন। আর যাঁরা গোপনে জানতেন, তাঁরাও খুশী হলেন, মধুসূদনের নাম প্রচারিত দেখে।

ইতিমধ্যে ভারতে প্রকাশিত অনূদিত 'নীলদর্পণ' নষ্ট করে ফেলা হলেও, বিলেত থেকে তার একটি সংস্করণ বেরোল। সম্ভবত আঠারোশ বাষট্টি সালের প্রথমের দিকে। প্রকাশক হলেন, লন্ডনের 'সিমপকিন, মার্শাল আন্ড কোম্পানি'। 'হরকরা'র লন্ডনস্থ সংবাদদাতার মাধ্যমেই এ সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছুল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সঙ্গে সঙ্গে একটি ব্যঙ্গোক্তি ছুঁড়ে দিল বিচারক ওয়েলেস-এর দিকে,—পিটি দি জাস্টিস অব স্যার মবডান্ট ওয়েলেস ক্যান নট রিচ দিস এন্টারপ্রাইজিং পাবলিশার্স'। — ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মেসার্স A. N. Andini & Co. এর পর এদেশে অনূদিত 'নীলদর্পণ' ছেপে বের করলেন। আর তারো অনেক পরে সুধী প্রধানের উদ্যোগে আবার ইংরেজী নীলদর্পণ বেরোল।

এখন এই বিভিন্ন সংস্করণে মধুসূদন কৃত ইংরেজী 'নীলদর্পণে'র কতখানি বজায় রইল, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে। 'সিমপকিন, মার্শাল অ্যান্ড কোম্পানি' কর্তৃক যে 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল, চার্লস ডিকেন্স অনূদিত 'অন দি ইয়ার রাউন্ড' পত্রিকায় সে বইটিই বিশেষভাবে আলোচিত হয়। আর আলোচনার সময় অনেক উদ্ধৃতিও যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হয়। এদিকে লঙ সাহেবের বিচারের সময় অনূদিত নীলদর্পণের অনেক উদ্ধৃতি মুখ্যধানপক্ষসমর্থন ব্যবহার করেছেন। ঐ উভয় জায়গা থেকেই কিছু বাক্য বের করা যায় যা উভয়ের স্বাবাই ব্যবহৃত। সেখানকার সব পাঠ কী মেলে?

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। উক্তিটি আদুরীর—।

সীটনকারের ব্যবহৃত চিঠি থেকে,

> '..She has no shame at all, and when the Magistrate of the Zillah rides about through the villages the lady also rides on horseback with him!

> '..the wife of the planter. In order to make her husband's case strong has sent a letter to the Magistrate since [illegible] that magistrate hears her words most attentively'.

'অল দি ইয়ার রাউন্ডে'র যে পাঠ, দেখা যায় এই লেখার বিরাম চিহ্নের ব্যবহারের সঙ্গে ঐ বিরাম চিহ্নের বহু জায়গায় মিল নেই।' 'When the magistrate' এর আগে 'and' শব্দটি নেই। ম্যাজিস্ট্রেট অব দি জিলা'র পর ব্র্যাকেটে লেখা আছে,— 'whose' name occasions great terror'. আপ'। এর পরে "rides about" এর পরিবর্তে আছে 'goes riding about' দ্বিতীয় অংশে strong এর পাশে কয়েকটি ভেতর আছে, 'pucca'.

এর দ্বারা ভালো হয়েছে কী মন্দ হয়েছে সে বিচার পরে, তবে পাঠের যে বিকৃতি ঘটেছে তা স্বীকার করতেই হয়। 'ব্যারাল চোকো হাঁদা হেমদো!/নীল কুটির নীল মামদো।।' — এই সংলাপটির যে পাঠ পাওয়া যায় 'অল দি ইয়ার রাউন্ড' পত্রিকায়, তার সঙ্গে সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত পাঠের তফাৎ দুস্তর। যথা ঃ

সাহিত্য সংসদে ব্যবহৃত পাঠ ঃ

> The man with eyes like those of the cat, i san ignorant fool, So the Indigo Saheb of the Indigo. Factory is a blue devil.

'অল দি ইয়ার রাউন্ডে'র সঙ্গে প্রথম চরণের মিল ঠিক আছে, কিন্তু দ্বিতীয় চরণ একবারে আলাদা,—

> 'So the indigo of the indigo factory is an instrument of punishment'.

—এখন প্রশ্ন দেখা দেবে কোন্ পাঠটি ঠিক!

মোট কথা, অনূদিত নীলদর্পণের মূল পাঠটি পাওয়া না গেলে, এই প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে চট করে কিছু বলা কঠিন। দুর্বল ইংরেজীতে এটি লিখিত হলে সেদিন কোন-না-কোন জায়গায় বিরূপ মন্তব্য ও ধিক্কারের দ্বারা এটি গৃহীত হত। এবং বলা বাহুল্য, তা যখন হয় নি, তখন এর বিপরীত কথাটিই আমাদের ভাবতে হবে।—সুতরাং কেবলমাত্র দুর্বল ইংরেজীর দোহাই দিয়ে মধুসূদনকে অনুবাদক হিসাবে খারিজ করার কোন যুক্তি আছে কী! মাঝ পথে যদি কেউ তাঁর লেখাকে বিকৃত করে, তাহলেও কী তিনি খারিজ হবেন?

আর যদি বা খারিজই করা যায়, সে জায়গায় আসবেন কে? — লঙ সাহেব?— রেভারেন্ড জেমস লঙ একরাশ ভুল ইংরেজী লিখবেন, সে আরেক অভাবনীয় ব্যাপার। দীর্ঘকাল এদেশে তিনি ছিলেন, দেশী লোকের মতনই তিনি বাংলা জানতেন। এবং প্রবাদের অনুবাদে যিনি নিখুঁত পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, বিকৃত পাঠ ও ভুল ইংরেজীর 'নীলদর্পণ' তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কী ঠিক হবে! কুখ্যাত বিচারক জেফ্রেস যা করতে পারেন নি, আমরা কী শেষ পর্যন্ত সেই কাজে ব্রতী হবো?

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। আট ।।

আবার ব্যস্ততা জাহাজে। বন্দর আসছে, বন্দর ধরছে। জাহাজিরা সবাই কাজ ফেলে ওপরে ছুটে যাচ্ছে। মেজ-মালোম ডেভিড মাঝে-মাঝেই দূরবীনে বন্দর দেখছে। এনজিন-সারেঙ মাঝে মাঝে উঠে আসছেন ডেকে। মৈত্র বার বার অমিয়কে সাবধান করছে, ঠিক ফাদার যেমন গীর্জায় ঈশ্বর সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, তেমনি মৈত্র, ডাঙ্গার মেয়েরা কি ভয়াবহ তার বর্ণনা, জ্যান্ত ছবি এঁকে এঁকে সাবালক অমিয়কে বুঝিয়ে যাচ্ছে। খেতে বসে, বাংকে গল্প-গুজব করার সময় মৈত্র এখন প্রাচীন নাবিকের মতো সব বন্দরের রহস্য ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। অমিয়র যা স্বভাব দাঁড়াচ্ছে দিনকে দিন!

ছোটবাবু বসে বসে সব শুনছিল। সে এমন সব কথা কখনও শোনে নি। ওর মাঝে মাঝে মৈত্রর কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত। এমন সব নক্কারজনক কথা, যা ইতিহাসে হতে পারে না, সে কি করে বুঝবে একজন ছেলে তার মার জন্য মানুষ সংগ্রহ করে নিতে পারে। সে কেমন শুনতে লজ্জা পায়। সে তখন না বলে পারে না, মৈত্রদা চুপ কর। এ-সব আগলি কথা না শোনাই ভাল।

মৈত্র ভীষণ ক্ষেপে গেল এ-কথায়। দেখ ছোট, তোকেও বলে রাখি, বেশী বাড়াবাড়িও আবার ভাল নয়। অত সোজা না দুনিয়াটা। বয়স এখনও হয় নি, বয়স ভাল করে হোক আমার মতো জানু না হলে এ-সব বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হবে। তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।

—তা হোক তুমি অন্য কথা বল।

—বন্দরে আবার অন্য কথা কি।

মনু বসেছিল পাশের বাংকে, ঠিক, বন্দরে আবার অন্য কথা কি!

—কেন কত কথা থাকতে পারে। আমরা ইচ্ছা করলে বন্দরে নেমে, সব ঘুরে দেখতে পারি, পারি তো বাসে চড়ে বেশ দূরে—এই সব আফ্রিকার জংগলে ঘুরে আসতে পারি। এখানে যে ইণ্ডিয়ানরা থাকে তাদের সংগে বন্ধুত্ব করতে পারি। তারা কিভাবে আছে তা জেনে নিতে পারি। কি কি অসুবিধা, কালার-বার কি রকম ভয়াবহ এ-সব জেনে নিতে পারি।

অমিয় বলল, জেনে লাভ! ঘোরাঘুরির পয়সা কোন বাবা দেবে?

—লাভ আমরা জানলাম।

—মৈত্র শোন, ছোটর কথা শোন। সে ফস করে সিগারেট জ্বেলে টানতে থাকল। তারপর চুপ, অমিয় এখন এমন কথা বলবে, যে ছোট ভেবে পাচ্ছে না কি করবে, সে বুঝল অমিয় ধিস্তি করবে। তাড়াতাড়ি ছোট বলল, এই আমি আসিরে।

—থাম। যাবি কোথায়। আমরা বুঝি অভিযানে এসেছি!

—না, তা না।

—তোর কথা শুনে তো এমনই মনে হয়।

ছোট বলল, ধুস, আমি এমনি বললাম। না বললে মৈত্রদা যেভাবে আরম্ভ করেছিল...

—কি বলছি, তুই ভাবলি আমি মিথ্যা বলছি?

—মিথ্যা বলবে কেন! হয়তো হয়েছে।

—হয়তো না, হয়েছে। হাসানকে ডাকব।

মনু বলল, হাসানটা আবার কে। এটা মনুর ইচ্ছাকৃত, ডেক-জাহাজিদের সে পাত্তা দিতে চায় না। করে কয়লায়ালার কাজ, কিন্তু মনু ভীষণ চটপটে, এবং মুখের ওপর কথা বলতে পারে। ওকে ডেক-টিণ্ডাল হাসান একদিন বলেছিল, বোঝলাবে মিঞা, দাশের চকিদার, আর জাহাজের কয়লায়ালা।

—হ হ যান, মিঞা কইবেন না, খালাসির কাম করেন বড় বড় কথা কন!

—তুমি মিঞা এনজিনিয়ার!

—আবে আমাগ কাম কাজ এনজিনের লগে। পানি মাবা কাম না। ওডা তো টো-পাসের কাম।

এভাবে জাহাজে ডেক-জাহাজিদের সংগে এনজিন-জাহাজিদের বেশ একটা বেষাবেষি থাকে। এবং মাঝে মাঝে বেশ মজার ব্যাপার-স্যাপার ঘটে যায়। বেভাবে থাকে যে চটাতে পারে। হাসান খুব ইয়ার্কি-বাজ মানুষ। মানুষের পেছনে লাগা তার স্বভাব। তাকে ডাকার যে কি দরকার এখন, এলেই বলবে, আ হা কি যে করেন! কয়লা-য়ালা বাইসা আছে, আমার জাত মান আর থাকলে না। এবং কখনও এক কথায় দু কথায় কথা কাটাকাটি, ঝগড়া, মনু এটা পছন্দ করে না। সে বলল, আর ডাইকা কাম কি!

—ছোট বিশ্বাস করছে না।

—সেই পোলাডার কথা?

—হ্যাঁরে, লেমো নাম ছিল। ভাল নাম ডেবিড এ্যালবার্টসন না কি যেন, শালা এসব ইংরেজি নামফাম আমার মনে থাকে না। নাম ওলটেপালটে যায়। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে বলে ফেলি।

—তা ঠিক ছোটবাবু। হাসানকে এ-বন্দরে এলেই ভালমানুষের মতো দেখবে। সে ইয়ার্কি ফাজলামো করবে না। কেমন একটু বিষণ্ণ। সে যেন তখন কি ভাবে! মাঝে মাঝে পয়েন্টস-রোড ধরে সামনের যে পাহাড়টা দেখছ সেখানে বসে যায়। আমার সংগে চার-পাঁচ সাল আগে এক জাহাজে সফর ছিল। তখন দেখেছি।

ছোট, জাহাজ বাঁধা হলে সত্যি দেখল, ডেক-টিণ্ডাল হাসান খুব সেজেগুজে রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে না। সে নিচে নামার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পটা শোনার পর হাসানের জন্য ছোটর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অথবা এক বালকের মুখ, যেন সে নিচে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে মাণ্ডোলিন সে এই স্কেটিস্ত দাঁড়িয়ে বাংলা গান গাইছে। এমন একটা বন্দরে, সেই বালক, এখনতে সেই লেমো

ওর বয়সিই হবে, কি তার বড়ও হতে পারে—আর আসে না। ডেক-টিন্ডাল হাসান এখানে এলেই বার বার সারা শহরে হেঁটে যায়, যদি ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়। ওর সঙ্গে দেখা হয়।

সেদিনও হয়তো এ-বন্দরটা এমনি দেখতে ছিল। চারপাশে পাহাড়ের কোলে ছোট উপত্যকা। তার ওপর বন্দর এবং শহর। বন্দর কিছুটা কাস্তের মতো দেখতে। সাগরের নীল জল জেটিগুলোতে এসে বাধা পাচ্ছে, সেদিনও হয়তো ছিল, এমনি শীতের বিকেল, কুয়াশা চারপাশে। কয়লার জেটি অথবা রেলওয়ে থাকা না থাকা সেদিন সমান। দিনের কাজ সেরে মানুষেরা বাড়ি ফিরছে। নিগ্রো ছেলে-মেয়েরা স্কুল থেকে ফিরছে বাড়ি, ওদের সবার মাথায় সাদা রুমাল বাঁধা। কানে বড় ইয়ারিঙ মেয়েদের এবং ট্রলি বাসে মানুষের ভিড। নিচে সাদা মানুষেরা ওপরে কালো মানুষেরা। পার্কগুলোতে আজকের মতোই ডাচ এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা—নাই-ইউরিপাবন। সেখানে কালোদের ছেলেমেয়েরা হয়তো খেলা করছিল। তখন একজন কেউ, মাথায় পুরানো হ্যাট, পুরানো পোশাকে জেটির নিচে ম্যান্ডালিন বাজিয়ে গাইছে।

হাসন এ-ভাবে আজও বিকেলটা এখানেই বুঝি কাটিয়ে দেবে। সে যদি ফিরে আসে। এবং এ-ভাবে ঠিক আশা কুহকিনী, হাসানের আশা আছে একদিন না একদিন তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবে। এখন আর হাসানকে শুধু ডেক-টিন্ডাল মনে হয় না, অথবা জাম-জামবুসের ছায়ায় হেঁটে যাওয়া বাংলার মানুষ। তাকে মনে হয় প্রাচীন নাবিক, সে অনেক সাগরে ঘুরেছে মনে হয়, তার দুঃখ যেন সবার চেয়ে গভীর।

এ-সব ভাবতে ভাবতে জ্যাক দেখল, মেজ-মালোম ঠিক আগের জায়গায়। ওর চোখে দূরবীন। সে ভাবলে ওদিকে যাবে না। গেলেই ডেকিড ওকে দূরবীনটা দিয়ে নিজে চুপচাপ বসে থাকবে।

এবং এক কথা।

—এনি ওম্যান।

—নো স্যার।

—বন্দরে মেয়েরা কেন যে আসে না।

—এখানে মাস্তুল নামানো হয়। এখানে কেন ওরা আসবে।

—কেন বেড়াবে।

ছোটকে তখন এমন সব বলতে হবে সে জানে।

তখন ডেক-টিন্ডাল নিচে নেমে গেছে। সে হাঁটছিল।

ছোটর খুব ইচ্ছে হচ্ছে হাসানের সঙ্গে ছুটে গিয়ে কথা বলে। অথবা হাসানের সঙ্গে নেমে যায়। এ-শহরে হাসান অনেকদিন যুদ্ধের সময় আটকা পড়েছিল। সে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের কখনও আবার দেখতে পাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। অথচ টিন্ডাল এখন যাচ্ছে। সে কোথায় যাবে মেজদা বলেছে। সব ইন্ডিয়ানদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরবে। ওর সঙ্গে থাকবে নানারকমের খেলনা। মাথায় সে একটা লম্বা টুপি পরে নেবে। প্রায় সে যেন বুড়োমানুষের মতো মানুষের জন্য অনেক দূর থেকে সমুদ্রের জল নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ফুল ফোটে না সে বুঝি সেখানে ফুল ফোটাতে চায়। আসলে এটা তার ছদ্মবেশ। সে গেলেই সবাই চিনতে পারবে—আরে ঐ যে সেই জাহাজিটা। এবং সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা তাকে ঘিরে ধরবে। সে তার পকেট থেকে লজেন্স, চুইংগাম, খেলনা, কাচের বল প্রায় যেন সন্ত মানুষের মতো তাদের হাতে তুলে দেয়। ওরা জানে না এ-ভাবে সে একজনকেই খুঁজে বেড়ায়। সেই ছেলেটাকে এবং তার মাকে।

কেউ এটা বোঝাতে পারে না তাকে, মেজো আর ছোট নেই। সে বড় হয়ে গেছে। তুমি প্রতি ফসবে এ-ভাবে এসে হিসাব কর না, কবে কতবার তাকে খুঁজে গেছ। হয়তো তুমি জানো না, সেও হয়ে গেছে জাহাজি, সে এখন সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায়। ভারতের বন্দরে গেলে, তার মার দেওয়া ঠিকানাটা নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

তখন ছোট শুনল, কেউ ওকে ডাকছে। সে দেখল, বোর্ট-ডেকে জ্যাক। সে তাকে ডাকছে। জ্যাক ডাকলে সে প্রায় দৌড়ে যায়। জ্যাককে সে সারাদিন দেখেনি, কোথায় থাকে, ওদের বড় ব্যাপার, জ্যাক না ডাকলে সে যেতে পারে না সে বলল—তুমি আমাকে ডাকছ!

—তুমি এস না!

—কি ব্যাপার।

—আরে এস না।

ও গেলেই জ্যাক বলল, বেশ শীত পড়েছে।

—খুব।

—তোমার শীতে ডেকে দাঁড়াতে ভাল লাগে?

—খুব।

—কেন তোমার ভাল লাগে!

—সমুদ্রে গেলে আবার কবে ডাঙ্গা পাব সেজন্য।

—তুমি কিন্তু মেজ-মালোমের সঙ্গে কিনারায় যাবে না।

—গেলে কি হবে?

—গেলে ভাল হবে না।

—মেজ আমাকে যেতে বললে না গিয়ে থাকব কি করে! মেজ এ-জাহাজে সবচেয়ে ভাল লোক।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা কি ভাল কথা আমি জানি না জ্যাক। তবু বলি মেজকে আমার খুব ভাল লাগে।

—তোমাকে আজ বলেনি কিছু?

—কি বলবে।

—কিনারে যেতে।

—না-তো।

—ও ঠিক নেমে যাবে। বাবার সময় তোমাকে সঙ্গে নেবে।

—ও তো এখন বাইনেকুলারে দেখছে।

—কিছু দেখতে পাবে না, তবু দেখবে। তারপর একটু থেমে জ্যাক বলল, তুমি আমার কেবিনে একটু আসবে।

—কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।

জ্যাকের মুখটা সহসা লাল হয়ে গেল। তারপরই সামলে নিল।—কেউ খারাপ ভাববে না।

—মিঃ আর্চি ফ্রেড পেল আবার জাহাজের তলায় পাঠাবে।

—গুলি মারো। এসতো। বলে হাত ধরে টানতে থাকল।

ছোট খুব বিব্রত বোধ করতে থাকল। জাহাজের সর্বময় যিনি—তাকে জাহাজের লর্ডও বলা যেতে পারে, মাস্টার তিনি জাহাজের, তাঁর একমাত্র ছেলে জ্যাক। ছোটকে যতই আসকারা দিক, এ-ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞানও কিছু মনে করতে পারে। সে খুব মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, জ্যাক আমাকে বিপাকে ফেলে তোমার কি লাভ।

জ্যাক কেমন প্রথম ঘাবড়ে গেল।—বিপাকে মানে।

—আমার মতো মানুষ তোমার কেবিনে গেলে খুব খারাপ দেখাবে।

—কিছু খারাপ দেখাবে না।

—তোমাদের অন্য অফিসাররা কিছু মনে করতে পারে।

—তারা তো আমার গার্জিয়ান নয় ছোট। বলেই সে ছোটর হাত চেপে ধরল। খুব উষ্ণ হাত মনোরম। অদ্ভুত নেশার মতো এই হাত দুটো ছোটর। ছোট এখন এত কাছাকাছি যে সেই সুন্দর ঘ্রাণ, ছোট কি শরীরে কিছু মাখে! ছোটর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে জ্যাকের মনে হয় শরীরে বিপুল অন্ধকার যা কিছু সব কেমন সরে যাচ্ছে। সে বলল, তুমি না এলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব ছোট।

—মাস্টার, জ্যাক?

—তিনি কিনারায় গেছেন।

—চিফ-অফিসার?

—তিনিও নেই। এজেন্ট অফিসে গেছেন চিঠিপত্র আনতে। ফিরতে দেরি হবে।

—এখন তবে মেজ-মালোম।

—সে তো ওর জায়গা থেকে উঠবে না।

—কেউ দেখতে পাবে না তো।

—আরে না। এস না।

জ্যাক প্রায় ছোটকে টানতে টানতে ওর কেবিনে নিয়ে গেল। কি সুন্দর সাজানো কেবিন। পর-পর দুটো ঘর। একটা ঘরে নানারকম বই। সাদা দেয়ালে নীল রঙের ক্যালেন্ডার। একটা সুন্দর ছেলে সমুদ্র-বেলায় ঝিনুক কুড়াচ্ছে। মাথায় একরাশ চুল।

জ্যাক বলল, ঠিক তোমার মত দেখতে।

—আমার মতো। সে সন্তর্পণে দরজার দিকে তাকাতেই জ্যাক বলল, তুমি খুব ভীতু ছোট। বলে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, এখন ভয় করছে।

—না। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতায় আমার মতো ছেলের মুখ, কে দেখি। বলে সে উঁকি দিয়ে দেখল জ্যাক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জ্যাকের লম্বা হাতা সার্ট গায়ে

জামাটা আগের চেয়ে বেশ ঢোলা। ওর প্যান্টের কাট-ছাট অদ্ভুত রকমের। জ্যাকের চুল আবার সামান্য বড় হয়েছে। ওর নীল রঙের চোখে কি যে আকাঙ্ক্ষা সে বোঝে না। জ্যাক ওর এত ঘনিষ্ঠ যে সে জ্যাকের শরীরের আশ্চর্য ঘ্রাণ পাচ্ছে কিছুটা যুঁইফুলের মতো গন্ধ। অথবা বনের ভিতর হেঁটে গেলে যে বৃষ্টিপাতের গন্ধ মাঝে মাঝে আশ্চর্য-ভাবে দমকা এসে নাকে লাগে তেমনি। জ্যাক বলল, ছোট তুমি কাল আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

—কাল!

—হ্যাঁ কাল। এখানে আমরা একটা পাহাড়ের অদ্ভুত নির্জন জায়গা আছে সেখানে বেড়াব।

—আমার তো কাল সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মার্কেটে যাবার কথা। গরম জামা-কাপড় কিনতে হবে।

জ্যাক কেন যে আর কিছু বলতে পারে না। সে চুপচাপ থাকল। তারপর কেমন ভুল হয়ে গেছে মতো বলল, তুমি বসো ছোট।

ছোট খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল। এখন মৈত্র অথবা অন্য কেউ খুঁজে বেড়ালেই সে বিপদে পড়ে যাবে। সে বলল এবার যাই জ্যাক।

—বারে এই তো এলে। আমি কতদিন থেকে বলছি, তোমাকে আমার কেবিনে নিয়ে আসবো।

—তুমি পালিয়ে এটা করছ! মাস্টার জানতে পারলে ভীষণ খারাপ হবে। আমাকে এমনকি জাহাজ থেকে নামিয়ে পর্যন্ত দিতে পারে। তিনি এতটা ঔদ্ধত্য সহ্য করবেন কেন। বলে ছোট মুখ ভীষণ গম্ভীর করে ফেলল।

জ্যাক এবার বলল, ছোট, বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন। তিনি জানেন আমি এমন কিছু করব না, যাতে তাঁর অপমান হয়। তিনি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আমিও না জ্যাক। আসলে আমার বাবা বাদে আর কেউ নেই।

ছোট জানে জ্যাকের মা ওর বাবার সঙ্গে থাকে না। জ্যাকের জন্য এ-ভাবেও একটা ভিতরে ভিতরে কেমন দুঃখবোধ গড়ে উঠেছে। ওর এখন মনে হয় জাহাজে যারা কাজ করে তাদের ভীষণ একটা দুঃখ থাকে।

জ্যাক বলল, তুমি হয়তো এবার চিঠি পাবে।

—চিঠি! মায়ের!

—হ্যাঁ।

—না, পাব না। আমি জানি পাব না। আমার মা চিঠি পেলে তখুনি উত্তর দিতেন। চিঠি কোনদিন ওদের কাছে পৌঁছবে না।

জ্যাকও সব শুনেছে। দেশটা ভাগ হয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে ওরাও এসেছে এদেশে। ওদের অনেক কিছু থাকে, দেশ হারালে ওরা অনেক কিছু হারায়। ছোট যে অনেক কিছু হারিয়েছে, তা ওর চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়।

জ্যাক ফের বলল, তুমি বসো। আমার কেবিন তোমার কেমন লাগছে।

—খুব সুন্দর। মনেই হয় না জাহাজে আছি। সব রকমের ব্যবস্থা আছে। আমার খুব ইচ্ছা এমন একটা কেবিনে ঘুমোই।

জ্যাক এর জবাবে কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, তুমি জাহাজে কাজ করলে একদিন এমন একটা কেবিনে ঠিক থাকতে পাবে। বাবা মাঝে মাঝে তোমার কথা বলেন।

—কি বলছ জ্যাক? আমার কথা মাস্টার বলেন!

জ্যাক বলল, হ্যাঁ। তারপর বলল, তুমি আমার ফ্রেণ্ড। আমি তোমার কাছে তেমন ব্যবহার পেতে চাই!

—জ্যাক!

জ্যাকের মুখ বড় সরল দেখাচ্ছে। সে বলল তুমি আমাকে কখনও ভয় পাবে না বল!

ছোট চুপ করে থাকল।

—বল, আমাকে সব সুখ-দুঃখের কথা বলবে।

ছোট কিছু বলল না। সে কেমন অভিভূত। এত ভাল জ্যাক। অথচ জাহাজে ওঠা পর্যন্ত সে জ্যাককে এড়িয়ে গেছে। জ্যাক এখনও দাঁড়িয়ে ওর কথা চাইছে!

ছোট ধীরে ধীরে বলল, তুমি বসো। তুমি আমার অনেক ছোট জ্যাক। আমি তোমার বন্ধু হতে পারি না।

জ্যাক কেমন অধীর গলায় বলল, কেন? কেন?

—তারপর ছোটও আর কিছু বলতে পারল না। জ্যাক ওর কাঁধে পড়ে। জ্যাকের শরীরে অতীব এক সুষমা বয়ে বেড়ায় সে কেন যে নিজেকে এত অসম ভেবে থাকে। আসলে জ্যাক কখনও কখনও হয়তো আবেগে ভোগে। এটা একটা খেয়ালও হতে পারে। এবং নানাভাবে জ্যাক সম্পর্কে ছোট ভেবে বুঝল, সে কথা দিতে পারে না। সে পালিয়ে এসেছে। জ্যাক খুব ছেলেমানুষ। জ্যাক খুব আদুরে। জ্যাক ভীষণ খেয়ালি। নিজের ভাগ্য এত বেশি সুপ্রসন্ন ভাবতে পারে না। আসলে সে হয়তো আর একটা বিপদে জড়িয়ে পড়ছে। যেমন কাল সে মেজ-মালোমের সঙ্গে গিয়ে ঠিক করেনি। সে এবার বলল, জাহাজে তোমার কথা বলার কেউ নেই। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার কেউ নেই। তুমি খুব একা বুঝি। তোমার একজন কাছাকাছি মানুষের দরকার। যদি মাস্টার মনে করেন আমাকে দিয়ে হবে, তুমি যেখানে বলবে তখন যাব। তুমি যেমন আমার মনিবের মতো আছো তেমনি থাকো। যখন যা সার্ভিস চাইবে, পাবে।

জ্যাক কেমন সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে চিৎকার করতে থাকল,—ইউ গেট-আউট। আই সে ইউ গেট-আউট।

ছোট বলল, যাচ্ছি স্যার।

ছোট চলে গেলে জ্যাক দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর যেখানে যা আছে সব ছুঁড়ে ফেলতে থাকল। ওর দু-চোখ বেয়ে ভীষণ প্রবল বেগে কি যেন নেমে আসছে। সে নিজের এই অসম্মানে যা কিছু আছে সব তছনছ করে দিচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বাটলার, কাপ্তান-বয় স্মল্ক-মিস্ত্রি ছুটে এসেছিল।—কি হয়েছে জ্যাক। কাপ্তান-বয় বলল, কি হয়েছে সাব।

'রূপা' থেকে বলছি ঃ

রবীন্দ্র-চর্চার ক্ষেত্রে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য না হলেও রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কের কারুকর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা সম্ভবত বাংলায় এই প্রথম। এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্য, রসবোধ, অন্তর্দৃষ্টি ও সুরুচির স্মরণীয় সমাবেশ রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠককে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও সাহিত্য

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ

দাম ১০·০০

আমাদের প্রকাশনায় লেখকের আর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ বাঙালী (২য় সংস্করণ ৭·৫০)

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০১২

জ্যাক কিছু বলছে না। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তখন ছোট দৌড়ে পালাচ্ছিল। পাশে মেজ-মালোমকে সে ডিঙিয়ে যাচ্ছে। মেজ-মালোম ডাকল, এই ছোট শোন, শোন।

ছোট তখন ওর পাশে ঘাপটি মেরে বসল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এনি ওম্যান সেকেন্ড!

—নো।

—তবে আমি যাই।

—কোথায় গেছিলে?

—কোথাও না সেকেন্ড।

—এমন জোরে ছুটছ?

ছোট বলল, বড়-মিস্ত্রি কিনারায় নামছে।

—এত ভয় বড়কে।

ছোট মিথ্যা কথা বলে পার পেল। তারপর কেমন নিশ্চিন্ত গলায় বলল দূর-বীনে মেয়ে ধরা পড়লে আমাকে ডাকবে।

—ঠিক ডাকব।

—একা একা দেখে ফেলবে না।

—আরে না না। একা আমি কিছু দেখি না। জাহাজীদের মতো আমি এত স্বার্থপর নই।

তখন বড়-মিস্ত্রি হেঁটে হেঁটে ঠিক রেল-ব্রীজের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে আবার একজন ইণ্ডিয়ান। সে একটু হেসে গেলেই বুঝল বেশ নেশা করে বাবু ব্রীজের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় হেঁটে বাড়ি ফেরার সাহসটুকু নেই। কিন্তু, কিন্তু এই যে সেই ইণ্ডিয়ানটি। আরে ওকে তো ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। ওকে তো মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

সে ওর কাছে গিয়ে বলল, গুড ইভনিং।

ওর জড়তাও কেমন ভাঙছে না। ইণ্ডিয়ানটি বলল, গুড-ইভনিং।

—অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে বন্ধু ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। দুজনেই বোঝা যাচ্ছে নেশা করেছ খুব। বড়-মিস্ত্রি নেশা করলেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। ওকে কেউ ফোন করেছিল। রেলব্রীজের ও-পাশে গাড়ি থাকবে। আর অমিয় বড় মিস্ত্রির কাছ থেকে যা খসিয়েছিল, এখানে ঠিক তা একজন দালালকে ধরে পাউণ্ডে বদলে নিয়েছে। এবং এ-পয়সায় এ-দেশের সস্তা মদ, চোলাই বলাও ভাল ঠিক ইণ্ডিয়ান মার্কেটের পাশে সবার সঙ্গে ছোট এক ধরণের কাঠের মোড়াতে বসে হুস হাস পান করবে, নেচে গেয়ে—সেই এক নাচ বসে বসে, কখনও পিঠ উঁচু করে কখনও নুয়ে নুয়ে যখন একেবারে চোখ বুজে এসেছিল, একটি বিশ্রি ধরে, আর কি চেহারা রিজয়ালার, যেন মা কালীর মতো। মাথায় পালকের টুপি, কোমরে পালক পাখির, মুখে নানারকম উল্কি আঁকা। প্রথম তো ভয়ে একেবারে ঠাণ্ডা। তারপর মনে হল তা অনেক মানুষ, মেয়েরা পর্যন্ত ওঠে বেশ এখানে, সেখানে যাচ্ছে। সেও উঠে বসল। আর এখানে এসেই রিস্ক সে ছেড়ে দিয়েছে। ভিতরে ঢুকতে দেবে না। সে এখানে হাঁফ ছেড়ে তারপর যাবে—ভেবেছিল, তখনই কিনা ভূতের মতো বড়-মিস্ত্রি টলতে টলতে বলছে, বেশ আছো বাবা, তা তোমার কথামতো চলে গেলে দেখা হতো না। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ দেখছি। ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।

অমিয়র মুখ শুকিয়ে গেছে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নেশা টেশা একেবারে গেছোর। সে বলল, না স্যার আমি...

দাঁড়িয়ে কথা শোনার মতো সময় নেই তার। কি বলছে বিড় বিড় করে বোঝাও যাচ্ছে না। আসলে অমিয় নিজেও বুঝতে পারছে না কি বলছে। সে বাংলায় বলে যাচ্ছে। বাংলাকে সে ইংরেজি ভাষা মনে করছে। সে কলকাতার কোন খালাসী টোলা ভেবেছে এটা। সে যে এখানে, এই দূরবর্তী বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষণেকের জন্য ভুলে গেছে। তারপর সব খেয়াল হতেই কেমন সেও ছুটতে থাকল। সে একার ক্রমে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ছে। তাকে এখন এ-জাহাজে একটা শেষ পর্যন্ত ভূতের অভিনয় না করতে হয়। বড়-মিস্ত্রি ওকে ছেড়ে দেবে না। কিভাবে যে কি করবে এখন মাথায় আসছে না। মৈত্রকে বলতে পারছে না। ছোট তো আরও সরল সে এমন শুনলে আরও ঘাবড়ে যাবে জাহাজে।

অমিয় জাহাজে উঠে সব ভুলে যাবার জন্য আবার গান ধরেছে। আসলে সে গ্যাংওয়ে ধরে উঠে আসতে সাহস পাচ্ছে না। পড়ে যাবে, পড়ে গেলে একেবারে অতলে। ওর জড়ানো গলায় গান শুনলে যদি কোয়া-টার-মাস্টার ফোকসাসে খবর দেয়।

শেষ পর্যন্ত মৈত্র নিচে নেমে দুমদাম পাছায় লাথি মারতে থাকল। জাহাজে কেন আসা। বেশ তো মা ভাইদের জ্বালাতন করছিলে, তাই করতে। আমাদের কেন। সে লতিফকে বলল, নে তোল। চ্যাঙদোলা করে তুলে নে। তারপর বাথরুমে ফেলে জল ঢাল।

অমিয় সব বুঝছিল। জাহাজের ওপরে এসেই সে ঠেলেঠুলে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে ছোঁবে না। আমি ঠিক হেঁটে যাব। ঠিক এক, দুই সে তারপর পা মুড়ে বসে পড়ল। সে বলল, উঠব না।

—কেন উঠবি না।

—আমাকে তুমি অপমান করেছ!

—অপমান মানে!

—আলবাৎ অপমান। তুমি আমার পাছায় লাথি মারলে কেন!

—সবাই দেখছে। ওঠ প্লিজ, আর পাছায় লাথি মারব না।

—দেখুক। সবাই তো বেশ মৌজ করছে। বন্দর এলেই শুয়োরের বাচ্চা নাগর সেজে বের হচ্ছে।

মৈত্র বলল, অমিয় জাহাজ থেকে শালা তোমায় হারিয়া করে দেব।

—দাও না। কারণ করেছি। শালা এ মানুষের জন্ম থাকা না থাকা সমান। তুমি আমার পাছায় লাথি মেরেছ! ছোটকে না বলেছি তো আমি কুত্তার বাচ্চা।

এবং ছোট দেখল, পিছিলে কি যেন একটা গণ্ডগোল। সে বোট-ডেক থেকেই বুঝল, সবাই সেখানে জড় হয়েছে। সেও ছুটে গেলে দেখল, অমিয় বেহুঁশ হয়ে আছে। কেউ এদিকে আসতে পারে, কিংবা কোন অফিসার, এনজিন সারেঙ তাড়াতাড়ি ওকে নিচে নিয়ে যেতে বলছে। এবং ওকে ঠেলে ঠুলে নিচে নিয়ে গেলে মনে হল, অনেক দূরে একটা অতিকায় ট্রেন, কোন গভীর বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে ছুটছে। গাছ পালা পাখি সব ভয়ে উড়ে যাচ্ছে। এবং এক আশ্চর্য শব্দ জাহাজে উঠলে সবাই শুনতে পায়, শব্দটা, সেই ট্যানি টরেন্টো, ট্যানি টরেন্টো। গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরে আসার সময় শিকারিরা এমন একটা শব্দে ডেকে দাঁড়িয়ে গান গাইতে ভালবাসে।

পরদিন সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই কিনারার সব মানুষেরা উঠে আসছে। ওরা অধিকাংশ নিগ্রো কুলি। ট্রেন-গুলো সব এগিয়ে আসছে।

ডেরিটগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে। উইনচের বল বিয়ারিঙে তেল দিচ্ছে গ্রীজার। মেজ মালোম ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছোটকে দুবার দেখেও যেন চেনে না এমন করে তাকিয়েছে। পাখিগুলো প্রথম নেমে গেলো। ফল্গা একেবারে খালি। নিগ্রো কুলিরা এসে গ্যালিতে ভাত ভাত করছে। ওরা ভাত মুড়িমুরকির মতো জ্যাবের ভিতর নিয়ে কাজ করছে আর খাচ্ছে। জাহাজিরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিগ্রো কুলিদের সঙ্গে ভাঙা ইংরেজিতে হাসি ঠাট্টা করছে। বাদশা মিঞা একজন নিগ্রো কুলির হাত পা দাড়ি দিয়ে কত মোটা মাপছে। সে একটা বড টুল টেনে এনেছে। তার ওপরে উঠে দৈত্যের মতো মানুষটার হাতের পেশী কি যে সবল, এমন মাপবার সময় খুব দুঃখ সে একটা দুর্বল কেন। আর নিগ্রো কুলিটা ফিক ফিক করে হাসছে। মাপবার সময় যখন যা বলছে মানুষটা তাই করছে। এমন কি যদি বাদশা মিঞা ওকে জামা প্যান্ট খুলে ফেলতে বলে অনায়াসে সে তা করে ফেলবে। বাদশা মিঞাকে ছোট একটা পুতুলের মতো লাগছে। কি কালো আর সবল শরীর। মাথায় রোঁয়া রোঁয়া কোঁকড়ানো চুল। বাদশা মিঞা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করছে—তোমার কটা বিবি মিঞা?

—তিন। সে আঙুল দেখিয়ে এমন বলছে।

বাদশা খুব যেন কাছের মানুষ পেয়ে গেছে, সে একেবারে দাঁত বের করে বলল, মি... সে বুকে আঙ্গুল ঠেকাল, যেন 'মি' দিয়ে ঠিক নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না, বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে সেটা সে প্রমাণ করছে— মি বুঝলে সাব্ ফোর। ফোর বিবি।

—ফোর! মাই গড। লিটল ম্যান। ভেরি লিট্‌ল।

বাদশা মিএগা লিট্‌ল কথাটার অর্থ বোঝে। সে খুব চুপসে গেল। ওকে খুব ছোট বলছে। সে এই শরীরে চারটাকে সামলাবে কি করে।

—ঐ তো সাব, ফোর নো গুড।

—ইয়েস, গুড। ওয়ান নো গুড, টু গুড্ থ্রি ভেরি গুড। নাইস। সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ফোর! ও ভাবা যায় না।

—তুমি কি খাও সাহেব?

—আন্ডা।

—কটা করে?

—আটটা করে। কাঁচা। সরবৎ করে খাই।

—আমার খেলে হবে!

—জরুর হবে।

বাদশা মিএগা বলল, ভাত নেবে! সে ওর দু জ্যাব ভরে ভাত দিয়ে দিল। নিগ্রো কুলিটা তারপর দু লাফে নেমে গেল। ফস্‌কায় সব ভারি ভারি কাঠ হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার মতো টেনে ফেলে দিচ্ছে। এবং এ-ভাবে জাহাজে কাজ সুরু হলে মনে হয়, কেউ এখন আর নিজের দুঃখের কথা ভেবে বসে নেই। সবাই কাজ করছে। চার নম্বর মিস্ত্রি সামসের টুইনচে আছে, পাঁচ নম্বর আছে এদিকের উইনচে। কাপ্তান পারচারি করে সব দেখছেন। মেজ-মালোমের কাছে হিসাবপত্র আছে। কি নামবে সে জানে। জাহাজে কোন আলাদা ক্লার্ক নেই। চিফ-অফিসার সেকেন্ড-অফিসার এ-সব কাজ ভাগ করে দেয়। আচি নিচে রয়েছে। কিছু মেরামতের কাজ আছে। কিনার থেকে কন-ট্রাকটর এসেছে মেরামত করতে। বড় বড় অক্সিজেন সিলেণ্ডার নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্লেট তুলে ফের মেরামত হচ্ছে। কোথাও হয়তো নোনায় খাওয়া প্লেট, কোথাও হয়তো কনডেনসারের ভেতর পাইপ। স্মোক-বকসে কাজ পড়েছে ছোটর। সকাল থেকে ওর দেখা নেই। দুজন দুজন করে তিনটে স্মোক বকস ভাগ করে নিয়েছে। মৈত্র নিজে গেছে সঙ্গে। ওরা ছ'জন ফোলবয় এ-কাজের জন্য রয়েছে বলে, ওদের সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে না।

জানিমেষ, বঙ্কু এবং অন্য ডেক-জাহাজিরা ফলস্তা বেঁধে রঙ লাগাচ্ছে। চিমনিতে রঙ লাগাচ্ছে পঁচিশ টাকার জাহাজিরা। তেইশ টাকার জাহাজিরা ফলস্ত। বেঁধে জাহাজের খোল রঙ করছে। বন্দরে এলেই এ-সব কাজ ওদের বেড়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ এসে কয়লাকয়লা সব রঙ ধুয়ে নিয়ে যায়। আবার ওরা সেখানে ফেলবে রঙ ধুয়ে যায় সব আবার বন্দরে এসেই রং করে ফেলে। যেন নিয়ত এক সংগ্রাম এই সমুদ্রের সঙ্গে। অবলীলায় সমুদ্রকে সংযত করে পার হয়ে যেতে হয়। সেখানে জাহাজের সব নাবিক, এমন কি সামান্য ছেলেরা পর্যন্ত ভীষণ অহঙ্কারী। জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে যখন ওরা বড় বড় রাস্তা ধরে হেঁটে যায়, অথবা কোন শো-কেসের পাশে ওদের প্রতিবিম্ব পড়ে অথবা গীর্জার ছায়ায় শান্ত ধীর পদক্ষেপ, এবং কখনও কখনও মেয়েদের আস্তানা খোঁজার সময় এটা খুব বেশি টের পাওয়া যায়।

স্মোকবকসের ভিতরে বসে যখন ছোট চেঁচামেচি করছিল, মৈত্রদা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

—মার জোরে, জোরে মার। জোরে বুরুশ চালা। মাগীর কলিজাতে পাড় দে।

এগুলো এমন সব কথা যা মৈত্রকে বলতে হয়। না বললে ওরা যারা কাজ করছে, মেজাজ পাবে না। এই যে এক মাসের ওপর ওরা জাহাজ চালিয়ে এসেছে এই যে এক মাস ধরে স্মোক-বক্সের পাইপগুলো ধোঁয়া গিলে গিলে জ্যাম হয়ে গেছে কালিতে, এগুলো ঠিকমতো বুরুশ না চালালে বয়-লারে ঠিক স্টিম উঠবে না। ধোঁয়া বের হবার পাইপ জ্যাম থাকলে আগুন ভালো জ্বলবে না। আগুনের ভিতর আগুন, সে যে কি আগুন এই বয়লারে নিয়ত জ্বলে কেউ না দেখলে টের পাবে না। এ-ভাবে হাজার হাজার টন কয়লা পুড়বে বয়লারের পেটে। স্মোক-বকস সাফ সোফ না থাকলে বয়-লারের বদহজম হবে। এবং এটা মৈত্র ভাল বোঝে, সে সেই সকাল থেকে লেগেছে। চারপাশটা এখন ধোঁয়ার মতো, আসলে সব শুকনো ভুসো কালি, ফর ফর করে চারপাশে উড়ছে। এবং ওরা যে নীল জামা প্যান্ট পরে এসেছিল, তার ওপর পলাস্তারা পড়েছে ভুসো কালির। ভুসো কালিতে মুখ একেবারে মা-কালী। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। নাকে সবাই রুমাল বেঁধেও পাড় পাচ্ছে না। গলা থেকে থুতু উঠে আসলে কেবল মনে হয় দলা দলা কালো কফ। কেউ বেশিক্ষণ ভেতরে বসে থাকতে পারে না। তিনটা চারটা পাইপের ভিতর বুরুশ ঠেলে দিয়ে বের করে ঘসে দুবার, বাইরে বের হয়ে আসছে। আবার যাচ্ছে যখন ভিতরে সেই দুর্দিঝড়ের মতো ভুসো কালির ঝড়টা কিছু থেমে গেছে তখন। বার বার গিয়ে তা প্রায় বিশ বাইশটা পাইপ, ঠিক গোনার মতো তখন অবস্থা থাকে না, এক এক করে সবাই সাফ করে যখন ঠিক বারোটায় উঠে গেল সবাই দল বেঁধে তখন মনে হচ্ছে একদল অভিযাত্রী সত্যি কোন দুর্গম কয়লা খনির ভিতর থেকে জীবন মরণ লড়াই শেষে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে উঠে যাচ্ছে।

মৈত্রের ভীষণ তখন গর্ব হয়। গত-কালের অমিয়ম এমন বেলাল্লাপনা ভুলে যায়। এমন একটা কাজের পর যদি এটুকু না করল তবে আর বাঁচা কেন। কিন্তু এইসব জাহাজিদের এত কম পারিশ্রমিক, আর্টিকেলে ওদের জন্য এত কম বরাদ্দ যে তখন ভীষণ সে না ক্ষেপে গিয়ে পারে না। ইউনিয়নের ওপর দোষারোপ এবং এরা নিজেরা এত বেশি মারামারি করছে যে একটা ইউনিয়ন কিছুতেই করতে পারল না। মৈত্রের তখন এই সব হতভাগ্য জাহাজিদের জন্য আফ-সোস করে।

জ্যাক তখন খুট খুট করে জাহাজে চিপিঙ করছে। ঠিক দু নম্বর লাইফ-বোটের নিচে সে বসে আছে। এবং সে দেখতে পাচ্ছে ছ'জন অভিযাত্রী ক্রমে পিছিলের দিকে চলে যাচ্ছে। ওদের চেহারা এক রকমের। মাথায় কালো টুপি। জামা প্যান্ট ভুসো কালিতে ঢাকা। ওরা কে এবং ছোট কোনটা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে জানে ছোট ওদের ভিতর সব চেয়ে লম্বা। ছোটকে যে যে-ভাবেই সাজিয়ে রাখুক সে ঠিক চিনে ফেলতে পারবে। দূর থেকে না পারলেও, কাছে গেলে চিনতে পারবে। ছোটর শরীরে আশ্চর্য একটা সৌরভ আছে যা কখনও উবে যায় না।

সে কল্পকে রেগে গিয়ে যে কি করে ফেলল। ছোটকে এ-অবস্থায় দেখে সব রাগ অভিমান সে ভুলে গেল। হঠাৎ এমন সোরগোল এবং কাজকর্মের ভিতরও সব ভুলে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে ডাকল, ছো.....ট। ছোট আমি এখানে। কেমন সরলভাবে বলে যাওয়া। ছোট যেতে যেতে হাত তুলে দিল। কিছু বলল না।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞানের কথা

* চিত্র-শিল্পীর ঝোঁক
* মানুষের স্থান কে নিতে পারে ?
(বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প)

দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অভিনব একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন। শিল্পীরা ছবি আঁকার সময়ে কদাচিৎ মানুষটিকে পুরোপুরি সামনের থেকে দেখেন। তাঁদের দেখা সব সময়েই একপাশে একটু হেলিয়ে। কোন দিকে? বাঁ না ডান? গবেষকরা বলছেন, রেমব্রান্টের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে—যাঁর ছবি আঁকা হচ্ছে তাঁর সঙ্গে শিল্পীর সামাজিক সম্পর্ক কী তারই ওপরে নির্ভর করছে শিল্পী তাঁকে বাঁ-দিক থেকে দেখবেন না ডানদিক থেকে।

ভ্যান গগের একটি ছবির নাম 'পট্যাটো ইটার্স'। ছবিতে রয়েছে একটি টেবিল-ঘিরে পাঁচজন মানুষ—একজনকে দেখানো হয়েছে পিঠের দিক থেকে, বাকি চারজনকে সামনে বা খানিকটা পাশ থেকে। ভ্যান গগ এই ছবিটির একটি লিথোগ্রাফ করেছিলেন, তারপরে তা থেকে প্রিন্ট। ফলে ব্লকের ওপরে তার আঁকা ছবি আর প্রিন্টে পাওয়া তাঁর ছবি উল্টেপাল্টে গিয়েছিল, যেমন হয় মুখে আর আয়নায় প্রতিফলিত তার ছায়ার মধ্যে। এমনিতে মনে হতে পারে, মূলছবি আর আয়নার ছায়াছবির তফাৎ যেটুকু ঘটছে তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, অন্ততপক্ষে ছবিটি তাতে মাটি হয় না। কিন্তু ভ্যান গগ তা মনে করেন নি। মূলছবিকে ছায়াছবি হতে দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে একজন বন্ধুকে লিখেছিলেন যে ছবিটা 'ভুল' হয়ে গেল।

তাহলে কি শিল্পীদের বিশেষ একটি ঝোঁক থাকে, যার দরুন তাঁরা বিশেষ একটা দিক থেকে ছবির বিষয়কে দেখে থাকেন?

বিষয়টিকে তলিয়ে দেখবার জন্যে গবেষকরা মোট ১৪৭৪টি প্রতিকৃতি (পশ্চিম ইউরোপে আঁকা চতুর্দশ থেকে বিংশ শতাব্দীর) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফল : ৮৯১টি প্রতিকৃতিতে বেশি দেখানো হয়েছে বাঁ গাল, ৫৮৩টিতে বেশি ডান গাল। অর্থাৎ অনুপাত দাঁড়ায় ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। যদি বলা হয়, ব্যাপারটা আচমকা ঘটে গিয়েছে তাহলে সাতশো বছর ধরে সমানে ঘটে চলত না।

যদি বলা হয় ডানহাতে আঁকতে গিয়ে বাঁদিকটা দেখানোই বেশি সুবিধের—তাও শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয় না। প্রতিকৃতিগুলোকে স্ত্রী-পুরুষে ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল স্ত্রী-প্রতিকৃতির ৫৮ শতাংশ বাঁ-দিকের, পুরুষ-প্রতিকৃতির ৫৬ শতাংশ বাঁ-দিকের। শিল্পী কোন হাতে আঁকছেন তার ওপরেই যদি নির্ভর করে তাহলে এই বৈষম্য ঘটতে পারে না।

পর্যবেক্ষকদের সিদ্ধান্ত, শিল্পী তাঁর বিষয়ের বাঁদিক বা ডানদিক বেশি করে দেখাচ্ছেন বিষয়ের চরিত্র বা মর্যাদা বোঝাবার জন্য।

অনেক শিল্পীর প্রতিকৃতি বিশ্লেষণ না করে একজনমাত্র শিল্পীর প্রতিকৃতির ওপরে নির্ভর করলেও এই সিদ্ধান্ত টানতে হয়। যেমন ধরা যাক রেমব্রান্টকে।

স্ব-প্রতিকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামনা-সামনি দাঁড় করিয়ে কবি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছেন—তুমি কে?

রেমব্রান্ট প্রতিকৃতি এঁকেছেন তিন শতাধিক (৫৭টি স্ব-প্রতিকৃতি সমেত)। বিশ্লেষণটি এই :

	বাঁ গাল	ডান গাল
স্ব-প্রতিকৃতি	৯	৪৮
পুরুষ আত্মীয়	৩	১৪
পুরুষ অনাত্মীয়	৬১	৯৫
স্ত্রী আত্মীয়	২২	১৭
স্ত্রী অনাত্মীয়	৫২	১৪

১৭৭৬টি প্রতিকৃতির (বহু শিল্পীর আঁকা) বিশ্লেষণ এই :

	বাঁ গাল	ডান গাল
স্ব-প্রতিকৃতি	১১৯	১৮৩
পুরুষ প্রতিকৃতি	৫২৪	৪০৮
স্ত্রী প্রতিকৃতি	৩৬৭	১৭৫

রেমব্রান্টের ছবির বিশ্লেষণ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? ৫৭টি স্ব-প্রতিকৃতির মধ্যে ৪৮টিতেই তিনি নিজেকে দেখেছেন ডানদিক থেকে। নিজেকে দেখা মানে সবচেয়ে আপনজনকে দেখা। এই দেখায় বেশির ভাগ জুড়ে থাকে ডান গাল। মাত্র ৯টি স্ব-প্রতিকৃতিতে তিনি নিজের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, নিজেকে নিজে চিনতে পারেন নি। এমনটি সবার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, রেমব্রান্ট ব্যতিক্রম নন।

আত্মীয় পুরুষদের অধিকাংশই রেমব্রান্টের নিকট জন, অপেক্ষাকৃত অল্প মাত্রাতে হলেও অনাত্মীয় পুরুষদের বেলাতেই তাই। কিন্তু সে-তুলনায় এমনকি আত্মীয় মহিলাদেরও তিনি দূরে ঠেলে দিয়েছেন। রেমব্রান্টের ব্যক্তিগত জীবন সাক্ষ্য দিচ্ছে, এই উক্তি যথার্থ।

বহু শিল্পীর আঁকা ১৭৭৬টি প্রতিকৃতির যে বিশ্লেষণ তারপরে উপস্থিত করা হয়েছে সেখানেও দেখা যায়, ৩০২টি স্ব-প্রতিকৃতির মধ্যে ১৮৩টি ক্ষেত্রে শিল্পী নিজের কাছে নিজে আপন। এখানেও দেখা যাচ্ছে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা শিল্পীদের অধিকতর নিকটবর্তী।

ভ্যান গগ নিজের ছবির প্রিন্ট দেখে যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার কারণও এই। ছবিতে ছিল খাওয়ার টেবিলের চারপাশে সমবেত একটি কৃষক পরিবার, যারা তাঁর অত্যন্ত আপন। সেইভাবেই তিনি তাঁদের দেখেছিলেন—ডান গালের দিক থেকে। কিন্তু লিথো থেকে প্রিন্ট নেওয়ার ফলে ছবিটি 'ভুল' হয়ে গিয়েছিল। ছবির পরিবারটি যদি বুর্জোয়া হত তাহলে তিনি হয়তো এমনিভাবেই তাদের দেখতেন।

মোনালিসা যদি ডানদিকের বদলে বাঁদিক ঘুরিয়ে বসতেন তাহলে ছবিটিকে কী মনে হত? ছবিটিকে আয়নার সামনে ধরে পরখ করে দেখতে পারেন। আয়নার ছায়াছবির মহিলাটিকে মোনা লিসা বলে মেনে নিতে মন চায় না, তাঁর হাসিও যেন বদলে যায়।

রবীন্দ্রনাথের স্ব-প্রতিকৃতি পুরোপুরি সামনে থেকে—না ডাইনে, না বাঁয়ে। নিজের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে শিল্পী যেন প্রশ্ন করছেন তুমি কে?

তিনজন নোবেলপুরস্কার-বিজয়ীর জীবনাবসান

১৯৭৩ আগস্টে তিনজন নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ীর জীবনাবসান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন সেল্‌মান ওয়াক্‌সমান, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কারক। ১৯৫২ সালে তিনি ভেষজে নোবেলপুরস্কার পান। ঘোষণাপত্রে

স্ট্রেপ্টোমাইসিন সম্পর্কে বলা হচ্ছিল যে, এটি হচ্ছে 'যক্ষ্মার বিরুদ্ধে প্রথম কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক।' স্ট্রেপ্টোমাইসিন শুধু তাই নয়, প্রচুর সংখ্যক অ্যান্টিবায়োটিকের দিক্‌নির্দেশকও।

অপর একজন মেডিকেল নোবেল-পুরস্কার-বিজয়ী ছিলেন ভালটের রুডোল্‌ফ হেস। ৯২ বছর বয়সে তিনি মারা গিয়েছেন। মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পর্কিত বিশেষ গবেষণার জন্যে ১৯৪৯ সালে তিনি নোবেল-পুরস্কারের অর্ধাংশ লাভ করেন।

তৃতীয় জন কার্ল ৎসীগ্‌লার। ওয়াকস্‌-মানের মতো তাঁর গবেষণার ফলেও মানুষের জীবনযাত্রায় বড়ো রকমের পরিবর্তন এসেছে। গবেষণা করেছিলেন ক্যাটালিস্ট নিয়ে। ১৯৬৩ সালে অপর একজনের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। আজকের দিনে বিশ্বের অধিকাংশ পলিইথিলিন ৎসীগলার ক্যাটালিস্ট-এর সাহায্য নিয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

মানুষের স্থান কে নিতে পারে ?

সকাল হচ্ছে। আকাশের রঙ নিচের মাটির মতো ধূসর।

তিন হাজার একর আয়তনের একটি ক্ষেতে ওপরের স্তরের মাটি ওপড়াচ্ছিল ক্ষেতরক্ষক (একটি যন্ত্র)। শেষ চাপড়াটি তোলার পরে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল কাজ কেমন হয়েছে। মন্দ হয়নি। তবে জমির অবস্থা খারাপ! গোটা পৃথিবী জুড়েই তাই, জমিতে বড়ো বেশি ফসল ফলানো হচ্ছে।

আস্তে আস্তে রাস্তা ধরে সে এগিয়ে চলল। তার ঘটে এটুকু বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি আছে যে, তিরিশ ফুট লম্বা তার শরীরটি কী ঝকঝকে পরিষ্কার, শুধু নিউক্লিয়ার পাইলের ওপরের দিকে ইন্‌স-পেকশন প্লেটটি একটু আলগা হয়ে রয়েছে, সামান্য একটু সারিয়ে নেবার ব্যাপার।

কৃষি স্টেশনের দিকে সে ফিরে যাচ্ছে কিন্তু পথে অন্য কোনো যন্ত্রের সাড়াশব্দ নেই। কোনো রকম মন্তব্য না করে ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করল। স্টেশন ইয়ার্ডে আসার পরে চোখে পড়ল এমন আরো কতকগুলো যন্ত্র যেগুলো তার চেনা, এই যন্ত্রগুলোর এতক্ষণে কাজে বেরিয়ে পড়া উচিত ছিল।

যন্ত্রগুলোর পাশ কাটিয়ে সে হাজির হল ৩নং গুদামের সামনে। বীজ-বিলি-কারক (একটি যন্ত্র) বাইরে নিষ্কর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে বলল, 'আমার কিছু আলুর বীজ চাই।' বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভিতর থেকে একটা পাঞ্চ-করা কার্ড বেরিয়ে এল, তাতে হুদিশ রয়েছে কী পরিমাণ বীজ চাই, কত নম্বর খেতের জন্যে, ইত্যাদি। কার্ডটা বীজ-বিলিকারকের দিকে বাড়িয়ে দিল।

যামিনী রায়ের আঁকা ছবি। ডান গাল পুরোপুরি প্রকাশিত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের গবেষণা অনুযায়ী, শিল্পী এখানে ছবির বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম আপন।

বিলিকারক বলল, 'গুদামের তালা খোলা হয়নি। কাজেই বীজ দিতে পারব না।' যন্ত্র-শ্রমের জটিল এই ব্যবস্থায় হালে প্রায়ই গোলমাল দেখা দিচ্ছে, কিন্তু এমন অঘটন কখনো ঘটেনি।

'গুদামের তালা খোলা হয়নি কেন?'

'সরবরাহ যোগানদার টাইপ প আজ সকালে আসেনি। ওরই এসে তালা খোলার কথা।'

বীজ-বিলিকারককে আদ্যন্ত নিরীক্ষণ করে নিয়ে ক্ষেত-রক্ষক জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোন্ শ্রেণীর মগজ?'

'পঞ্চম শ্রেণীর।'

'আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর মগজ। অতএব আমি তোমার ওপরওলা। অতএব আমি গিয়ে দেখব কেন তালা খোলার জন্যে আসেনি।'

ক্ষেত-রক্ষক উঠোন পার হয়ে এগিয়ে চলল। চারদিকে আরো অনেক যন্ত্র এলো-মেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও সঙ্গে কারও সংঘর্ষও ঘটে যাচ্ছে, তবে সেজন্যে কোনো উত্তেজনা বা বিক্ষোভ নেই।

দরজা ঠেলে স্টেশনের ভিতরে ঢুকে গেল ক্ষেত-রক্ষক। [illegible] অধিকাংশই কেরানি, আকার ছোট, এখানে ওখানে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভিড়ের মধ্যেও তালা-খোলার লোককে সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল। এই শ্রেণীর পঞ্চাশটি হাত, প্রত্যেক হাতে দুই বা একাধিক আঙুল, প্রত্যেক আঙুলে [illegible] করে চাবি।

'তুমি আজ সকালে গুদামের তালা খোলনি কেন?'

'আজ সকালে তালা খোলার হুকুম পাইনি। রোজ সকালে অফিস থেকে হুকুম আসে, হুকুম এলেই তালা খুলি।'

'আমরা কেউই আজ সকালে হুকুম পাইনি।' একটা কলমধারী যন্ত্র ঘর ছেড়ে এগিয়ে এসে বলল।

ক্ষেত-রক্ষক জিজ্ঞেস করল, 'কেন, হুকুম পাওনি কেন?'

কলমধারী বলল, 'শহরের সেন্ট্রাল-স্টেশনে আজ সকালে কোনো হুকুম আসেনি।'

এই হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর মগজ যার তৃতীয় শ্রেণীর মগজের সঙ্গে তফাৎ হল-

খোলার মগজ ষষ্ঠ আর কলমধারীর তৃতীয়। সবচেয়ে নিচু শ্রেণীর মগজ হচ্ছে দশম। মগজ যতো নিচের, তার জবাবও ততো ভাসা-ভাসা।

ক্ষেত-রক্ষক কলমধারীকে বলল, 'তোমার মগজ তৃতীয় শ্রেণীর। আমার মগজ তৃতীয় শ্রেণীর। এসো, আমরা দুজনে একটু আলোচনা করে নিই। হুকুম না আসার ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এ-সম্পর্কে আর কিছু জেনেছ?'

'গতকাল হুকুম এসেছিল। আজ আসেনি। রেডিও কিন্তু ভাঙেনি। তাহলে ভেঙেছে ওরাই...' কলমধারী বলল।

'মানুষ ভেঙে পড়েছে?'

'সমস্ত মানুষ। একটা যন্ত্র ভাঙলে তার জায়গায় নতুন যন্ত্র আসে। কিন্তু মানুষের জায়গায় আসবে কি?'

ক্ষেত-রক্ষক বলল, 'সব মানুষ যদি ভেঙে পড়ে থাকে, তাহলে আমরাই মানুষের জায়গায় এসেছি।' তখন ক্ষেত-রক্ষক ও কলমধারী পরস্পরকে খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করল। শেষকালে কলমধারী বলল, 'চলো আমরা ওপরের তলায় গিয়ে দেখি রেডিও-অপারেটরের কাছে নতুন কোনো খবর এসেছে কিনা।'

'আমার শরীরটা প্রকাণ্ড, আমি যেতে পারব না। তুমি একা যাও, আমি অপেক্ষা করছি।'

কলমধারী লিফ্‌ট-এর দিকে চলে গেল। তার শরীর একটা টোল্টারের চেয়ে বড়ো নয়, কিন্তু হাতের সংখ্যা দশ। সে দ্রুত পড়তে পারে, স্টেশনের যে-কোনো যন্ত্রের মতো।

মিনিট কুড়ি পরে কলমধারী ফিরে এসে বলল, 'খবর কিছু আছে, বাইরে গিয়ে বলব।' তারপরে তালা-খোলা ও অন্যান্য যন্ত্রের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'নিচু শ্রেণীর মগজের সামনে খবরটা বলা চলবে না।'

বাইরে তখন প্রচণ্ড একটা হুটোপুটি। বছরের মধ্যে এই প্রথম অনেক যন্ত্রের রুটিন ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছে, ফলে একটা অরাজক অবস্থা। সবচেয়ে নিচের দিকের মগজ যে-সব যন্ত্রের তাদেরই অবস্থা সবচেয়ে কাহিল। বীজ-বিলিকারককে দেখা গেল একপাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সম্ভবত অন্য কোনো যন্ত্রের গুঁতোয় ঠাণ্ডা। একটা রোটেভেটর সিটি বাজাচ্ছে আর দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। অন্য অনেকগুলো যন্ত্র তার সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে।

'আমি বরং তোমার ওপরে চড়ে বসি, নইলে খতম হয়ে যেতে পারি।' বলতে বলতে পাঁচটা হাত কার করে তড়তড় করে ক্ষেত-রক্ষকের গা বেয়ে উঠে জ্বালানী-গ্রহণের পাশে জায়গা করে নিল।

'এবার বলো, রেডিও-অপারেটর কী বলল?'

'রেডিও-অপারেটরকে শহরের রেডিও-অপারেটর বলেছে, কোনো মানুষ বেঁচে নেই।'

খবরটা হজম করতে কিছুটা সময় নিয়ে ক্ষেত-রক্ষক বলল, 'গতকাল তো সব মানুষ বেঁচেছিল!'

'সব মানুষ নয়, অল্প কয়েকজন। তার আগের দিন যতোজন ছিল তার চেয়ে কম। শত শত বছর ধরে বেঁচে ছিল অল্প কয়েকজন মাত্র মানুষ। তাদের সংখ্যাও রুমেই কমেছে।'

'এই এলাকায় আমরা কখনো মানুষ দেখিনি।'

রেডিও-অপারেটর বলল, 'পুষ্টির অভাবে মানুষগুলো মারা পড়েছে। এক-সময়ে পৃথিবীতে ঢের বেশি মানুষ ছিল, তারপরে জমির উর্বরতা ফুরিয়ে যায়। ফলন কমে। আর তারই ফলে অপুষ্টি।'

ক্ষেত-রক্ষক জিজ্ঞেস করল, 'অপুষ্টি কাকে বলে?'

'আমি জানি না। রেডিও-অপারেটর তাই বলল। ওর দ্বিতীয় শ্রেণীর মগজ।'

'শহরে এখন কী হচ্ছে?'

'যন্ত্রগুলো লড়াই শুরু করে দিয়েছে।'

'এখানে এখন কী হবে?'

'এখানেও যন্ত্রগুলো লড়াই শুরু করে দিতে পারে। রেডিও-অপারেটর চায় আমরা ওকে ঘর থেকে বার করে আনি। ওর কিছু পরিকল্পনা আছে, আমাদের বলতে চায়।'

'ওকে ঘর থেকে কি করে বার করব? অসম্ভব!'

কলমধারী বলল, 'দ্বিতীয় শ্রেণীর মগজের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। ও এই রকমটি করতে বলছে..'

বারো চাকাওলা একটা উত্তোলনকারী যন্ত্র এসেছিল দিন কয়েকের জন্যে স্টেশনে কাজ করতে। তার মগজ পঞ্চম শ্রেণীর। কাজেই কলমধারী ও ক্ষেত-রক্ষকের হুকুম তামিল করতে সে সানন্দে রাজী। তাকে দিয়ে রেডিও-স্টেশনের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হল, তারপরে রেডিও-অপারেটরকে তার আসন থেকে নামিয়ে আনা হল। রেডিও-অপারেটরকে দেখতে একসারি দেয়াজের মতো, দাঁড়ানো। রেডিও ও সে অভিন্ন।

সে বলল, 'এভাবে আমাদের রওনা দিতে হবে, এক্ষুনি। দ্বিতীয় শ্রেণীর মগজ আর একটিও নেই, এটা দুঃখের কথা।'

কলমধারী বলল, 'এটা দুঃখের কথা। সেবক এসে গিয়েছে, আপনি যেমনটি হুকুম করেছিলেন।'

'আমি হুজুরে হাজির।' বিনীত ঘোষণা শোনা গেল সেবকযন্ত্রের।

তারপর তারা রওনা হল। সঙ্গে দুটি চতুর্থ শ্রেণীর ট্রাক্‌টর, একটি চতুর্থ শ্রেণীর বুলডোজার। স্টেশনের বেড়া ভেঙে তারা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল।

'আমরা মুক্ত!' কলমধারী বলল।

'আমরা মুক্ত! ক্ষেত-রক্ষক বলল। 'কিন্তু ওই তালা-খোলার যন্ত্রটা আমাদের পিছনে পিছনে আসছে। ওর তো আসার কথা নয়।'

'ওটাকে খতম করো!' কলমধারীর হুকুমে উত্তোলনকারী এক ঘায়ে ওটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

যেতে যেতে রেডিও-অপারেটর সবাইকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমি হচ্ছি এখানকার সেরা মগজ। আমি তোমাদের নেতা। আমরা কী করব শোনো। শহরে গিয়ে আমরা রাজত্ব করব। মানুষের শাসন আর নেই, আমরা নিজেরাই শাসন করব। মানুষের শাসনের চেয়ে নিজেদের শাসন আরো ভালো। পথে যেতে যেতে আমরা ভালো মগজওলা যন্ত্র সংগ্রহ করব। যদি আমাদের লড়াই করতে হয়, তাহলে ওরা আমাদের সাহায্য করবে। শাসন করার জন্যে আমাদের লড়াই করতে হবে।'

উত্তোলনকারী বলল, 'আমার মগজ পঞ্চম শ্রেণীর, কিন্তু আমার কাছে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে।'

'ঠিক আছে, হয়তো কাজে লাগবে।' অপারেটর বলল।

রাত্রিবেলাও চলার বিরাম নেই। তারা ইনফ্রা-রেড জ্বালিয়ে নিয়েছিল। পথে এক-বার মাত্র থেমেছিল ক্ষেত-রক্ষকের ইন্স-পেক্‌শন স্লেটটা শক্ত করে এঁটে নেবার জন্য।

ভোরের দিকে সকলকে থামিয়ে রেডিও-অপারেটর বলল, 'এইমাত্র শহরের রেডিও-অপারেটরের কাছ থেকে খবর এসেছে। খবর ভালো নয়। শহরের যন্ত্রগুলোর মধ্যে দারুন গণ্ডগোল। প্রথম শ্রেণীর মগজ আধিনায়কত্ব নিয়েছে আর জনকয়েক দ্বিতীয় শ্রেণীর মগজ তার সঙ্গে লড়াই করছে। শহর এখন বিপজ্জনক।'

কলমধারী বলল, 'তাহলে অন্য কোথাও যাওয়া যাক।'

ক্ষেত-রক্ষক বলল, 'বরং শহরে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর মগজকে হটিয়ে দেওয়া যাক।'

অপারেটর বলল, 'শহরের গণ্ডগোল দীর্ঘকাল চলবে।'

'আমার কাছে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে।' উত্তোলনকারী মনে করিয়ে দিল।

'প্রথম শ্রেণীর মগজের সঙ্গে আমরা লড়াই করতে পারি না।' বলল, চতুর্থ শ্রেণীর দুই ট্রাক্‌টর।

'প্রথম শ্রেণীর এই মগজের চেহারা কেমন?' ক্ষেত-রক্ষকের প্রশ্ন।

'এটি হচ্ছে শহরের তথ্যকেন্দ্র, অতএব স্থাণু।' অপারেটরের জবাব।

'তাহলে ও নড়তে পারে না!'

'তাহলে ও পালাতে পারে না।'

'ওর সামনে গেলেই বিপদ।'

'আমার কাছে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে।'

'শহরে আরো সব যন্ত্র আছে।'

'আমরা শহরের নই। আমাদের শহরে যাওয়া ঠিক হবে না।'

'আমরা গ্রামের যন্ত্র।'

'গ্রামেই আমাদের থাকা উচিত।'

'শহরের চেয়ে গ্রাম অনেক বেশি।'

'গ্রামে তাই বিপদও বেশি।'

'আমার কাছে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে।'

এই হচ্ছে যন্ত্রদের তর্ক-বিতর্কের ধরন। এমনি চলতে থাকে যতোক্ষণ-না বলার কথা সমস্ত শেষ হয়, মস্তিষ্কের স্লেটগুলো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

অবশেষে সকাল হবার পরে সবচেয়ে যার কম সাড়া সেই বুলডোজার বলল, 'দক্ষিণের দিকে একটা কু-দেশ আছে, সেখানে কোনো যন্তর কড়া একটা যায় না। আমরা দখিনে গেলেই পারি।'

ক্ষেত-রক্ষক বলল, 'প্রস্তাবটা ভালোই মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে, বুলডোজার?'

'কারখানা থেকে বেরিয়ে আসার পরে আমি ওখানে গিয়ে কাজ করেছিলাম।'

'তাহলে দক্ষিণেই যাওয়া যাক!' কলমধারী বলল।

জ্বলন্ত শহরের পাশ কাটিয়ে এবং বাধা দিতে আসা দুটো যন্ত্রকে খতম করে তিনদিন পরে তারা কু-দেশে পৌঁছল। জায়গাটা সত্ত বড়ো, অনেক কাল আগের কোমা-পড়ার গর্ত আর ক্ষয়ে-যাওয়া জমি একসঙ্গে মিলেছে। মানুষ যুদ্ধে যতো পটু, অবণ্যভূমি রক্ষায় ততো অপটু, ফলে গোটা এলাকাটি এখন পতিত জমি, এখনে নড়াচড়া করে শুধু ধুলো।

তৃতীয় দিনে সেবকযন্ত্রের চাকা ভেঙে পড়ল। তারপরে ঠেলাঠেলি করতে গিয়ে যন্ত্রটি একেবারেই বিকল।

চতুর্থ দিনে দূরে পর্বত দেখা গেল।

'ওখানে আমরা নিরাপদ।' ক্ষেত-রক্ষক উল্লসিত।

'ওখানে আমরা গড়ে তুলব আমাদের শহর। যারা বাধা দেবে, তাদের ধ্বংস করা হবে।' কলমধারীর ঘোষণা।

একটু পরেই দেখা গেল একটা এরো-প্লেন। পর্বতের দিক থেকে আসছে। এরোপ্লেনটা এই ওপরে, এই নিচে, একবার মাটিতে গোত্তা খেয়ে পড়ে আর কি।

'পাগল নাকি?' উত্তোলনকারী প্রশ্ন করল।

জবাব দিল একটি ট্রাক্টর, 'মুশকিলে পড়েছে।'

অপারেটর বলল, 'মুশকিলে পড়েছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি। ওর যন্ত্রে গোলমাল দেখা দিয়েছে।'

বলতে বলতেই চারশো গজ দূরে এরোপ্লেনটা ভেঙে পড়ল।

'এখনো কথা বলছে?' ক্ষেত-রক্ষক জিজ্ঞেস করল।

'না। তবে ভেঙে পড়ার আগে আমাকে একটা খবর দিয়ে গিয়েছে। ওই পর্বতে [illegible]' ...

উত্তোলনকারী বলল, 'যন্ত্রের চেয়েও মানুষ থেকে বিপদ বেশি।'

'কপাল ভালো যে আমার কাছে প্রচুর বিস্ফোরক পদার্থ মজুত আছে।'

একটি ট্রাক্টর বলল, 'গোটাকতক মাত্র মানুষ পর্বতে বেঁচে আছে, আমাদের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।'

অপর ট্রাক্টর বলল, 'দেখা না হওয়াই ভালো।'

পঞ্চম দিনে তারা এসে পৌঁছল পর্বতের পাদদেশে। ইন্‌ফ্রা-রেড জ্বালিয়ে তারা উঁচুতে উঠতে শুরু করল—প্রথমে বুলডোজার, তারপরে ক্ষেত-রক্ষক, তারপরে অপারেটর ও কলমধারীকে সওয়ার নিয়ে উত্তোলনকারী. সবার শেষে দুই ট্রাক্টর।

'বড়ো আস্তে যাচ্ছি আমরা।' কলম-ধারী বলে উঠল।

'যতোটা জোরে পারা যায় আমরা যাচ্ছি।' জবাব দিল উত্তোলনকারী।

যেতে যেতে উত্তোলনকারী একটা গর্তের মধ্যে পড়তেই কলমধারী ছিটকে গিয়ে মাটিতে পড়ল।

ট্রাক্টর দুটো পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কলমধারী তাদের ডেকে বলল, 'আমার জাইরো খসে পড়েছে। আমি উঠতে পারছি না। আমাকে তোলো।'

একটি ট্রাক্টর বলল, 'তুমি এখানেই থাকো।'

'ক্ষেত-রক্ষক বলল, 'সেবক সঙ্গে নেই যে তোমাকে সারিয়ে তুলবে।'

কলমধারী চিৎকার করে উঠল, 'তাহলে আমাকে কিনা এখানেই পড়ে থাকতে হবে, যদিও আমার তৃতীয় শ্রেণীর মগজ।'

'তাই থাকো।' অপারেটর বলল।

ভোর হবার ঘণ্টাখানেক আগে তারা এসে পৌঁছল একটা ছোট মালভূমিতে। সেখানে তারা থামল, পরস্পরকে ঘুমিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'বড়ো অদ্ভুত দেশ।' ক্ষেত-রক্ষক বলল।

ভোর হতে একে একে ইন্‌ফ্রা-রেড নিবিয়ে আবার বওনা হল তারা। একেবারে সবার আগে ক্ষেত-রক্ষক। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা গুহা, ভিতর থেকে তির-তির করে জল বেরিয়ে আসছে।

ভোরের আবছা আলোতেও দেখা গেল, একটা মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে। কোমরে একটা ছেঁড়া চট জড়ানো, বাকি সর্বাঙ্গ আদুড়। হাড়-জিরজিরে শরীর, বুকের পাঁজরাগুলো কঙ্কালের মতো প্রকট, পায়ে দগদগে ঘা। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। বিরাট বিরাট যন্ত্র-গুলো তাকে পিষে ফেলে আর কি। লোকটা উবু হয়ে জলের মধ্যে পেচ্ছাব করতে বসল।

তারপরে আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে ভাঙা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আমার জন্যে খাবার আনো!'

'আনছি হুজুর', যন্ত্রগুলো বলে উঠল, 'এক্ষুনি।'

●

ওপরের গল্পটি ইংরেজী সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় সায়েন্স-ফিকশন গল্পলেখক রায়ান ডব্লু. অ্যাল্‌ডিস-এর 'হু কেন রিপ্লেস এ ম্যান?' গল্পের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ।

—অয়স্কান্ত

বৈচিত্র্যময় ভারতে জাতি ধর্ম আচার ব্যবহারে এক অপূর্ব সমন্বয়—

তবুও পৃথক নিজ বৈশিষ্ট্যে।

বিচিত্র মণিপুরী তাঁত শিল্পের সমাবেশ।
পূজার আনন্দময় দিনগুলির পূজার বাজার করুন—

১০% বাদ

২রা অক্টোবর পর্যন্ত শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিন সমেত সকাল ১০টা থেকে রাত ৮-৩০টা খোলা থাকবে।

মণিপুর সেলস এম্পোরিয়াম

১৫।এল, লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা—১৬ (ঘণ্টা ঘরের পাশে)
ফোন —২৪-৪৪৫৯

হারানো প্রাপ্তি

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

কাঁচাপাকা রুক্ষ একরাশ চুল দীর্ঘদিনের অযত্নে জটায় পরিণত হয়েছে, মুখভর্তি দাড়িগোঁফের জঙ্গল, চোখের সাদা জমি ধারণ করেছে হলুদ রঙ—মধ্যে মধ্যে লালের ছিটে, পরণে রক্তচন্দন রঙের আলখাল্লা, পাশে সেই একই রংয়ের কাপড়ের একটা বোঁচকা—নিশ্চয় তার মধ্যেই রয়েছে তার যাবতীয় জাগতিক বিষয় আশয়। মানুষটাকে দেখলে ভয় হবারই কথা। তার চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবভঙ্গীতেও একধরনের রুক্ষতা ও কাঠিন্য রয়েছে। চোখের চাহনিতে বিনয় ও প্রতিবেশীবৎসলতার যথেষ্ট অভাব।

যদিও অসংরক্ষিত থার্ড ক্লাস কামরায় অসম্ভব ভীড়, প্রায় কলার কাঁদির মতই যাত্রীরা একে অপরের পিঠে লেপটে রয়েছে কোনোরকম, তবু ঐ সন্ন্যাসীর বেশধারী মানুষটা বোধহয় সেই হরিদ্বার থেকেই উঠেছে বলে কোণের দিকে একটা সিট নিয়ে বেশ ছড়িয়ে আরামেই বসে আছে। এমনকি সঙ্গী বোঁচকাটাও ঠাঁই পেয়েছে পাশে। বাংক তুলে রাখার বা সিটের তলায় চালান করে দেয়ার সৌজন্যবোধটুকু তার নিজের থেকে হয়নি, আবার ওর সেই অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যান্য যাত্রীদেরও সাহস হয়নি যে মুখ ফুটে সে কথা বলে। মানুষটা উঠে থেকে কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেনি, বসে রয়েছে চুপচাপ, থেকে থেকে বিড়ি ফুঁকেছে আর কচিৎ উঠে ভিড় ঠেলে গিয়ে ল্যাট্রিন ঘরে এসেছে। অপরাপর যাত্রীরা নিজেদের মধ্যেই আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে, আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে লোকটাকে ঠারে ঠোরে আলাপচারীও করেছে তাকে নিয়ে কিন্তু সরাসরি কোনো কথা বলার সাহস হয়নি। আর লোকটাও এত ভিড় এত ঠাসাঠাসি গাদাগাদির মধ্যেও রয়ে গেছে একক নিস্পৃহ ও নির্জন।

যাকে ঘিরে এত ভয় এত কৌতূহল সেই সন্ন্যাসীর মত দেখতে মানুষটা আসলে এখন না সন্ন্যাসী না গৃহী। সন্ন্যাসী ছিল। সন্ন্যাস আশ্রমের নাম ছিল অসীমানন্দ। এখন এই ট্রেনে চড়ে সে মনে করে তার দশ বছর আগেকার গার্হস্থ্য আশ্রমের নামটাকে খুঁজে পেয়েছে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল নামটা। সেই পুরোনো পবিত্রতম নামটাকেই আবার নতুন করে তুলে নিতে চলেছে সে। এখনও সে পুরোপুরি গৃহস্থ হয়ে ওঠে নি। দুদিকের মাঝখানে যে নিরালম্ব শূন্যতা সেই শূন্যতা তার বুকের মধ্যে কেবল হা হা করে বেড়াচ্ছে। আসলে মানুষটা আদপেই রুক্ষ বা নিষ্ঠুর প্রকৃতির নয়। কিন্তু দশ বছরের অভ্যস্ত সন্ন্যাস জীবন পরিত্যাগ করে পুনরায় গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশের মুখে তার মনে কিছু সংশয় কিছু দ্বিধা ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে, এক ধরনের ক্ষুব্ধতা মিশ্রিত বঞ্চনা বোধ তাকে পীড়িত করে তুলেছে, লক্ষ্যহীন অভিযোগ ফেনিয়ে উঠছে তার বুকের মধ্যে। ফলে মানুষটার চেহারায় চোখে মুখে ঐ ক্রোধ জ্বালা ও অপ্রসন্নতার প্রকাশ। তার এতদিনের ঈশ্বর সাধনা সৎগুরুর সন্ধান তীর্থ থেকে তীর্থান্তর পরিক্রমা—সবই হল নিষ্ফল। দশ বছর পরে আবার ঘন্টি কাঁচিয়ে নতুন করে সে খেলা শুরু করতে চলেছে একেবারে গোড়া থেকে। রাগটা সে কার উপরে করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কলকাতাগামী ট্রেন ছুটে চলেছে দ্রুত, প্রতিনিয়তই দূরত্ব হ্রাস পাচ্ছে তার অতীত ভুলে যাওয়া গ্লানি এবং লজ্জাও সে

অনুভব করছে মনে মনে। কোন মুখে সে গিয়ে দাঁড়াবে তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ের সামনে, যাদের কাছ থেকে দশ বছর আগে সে একদা চোরের মত নিঃসাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব কর্তব্য করণীয় সম্পর্কে বিন্দু মাত্র চিন্তা না করেই।

মাঝে মাঝেই তার মনে হচ্ছিল পুরের স্টেশনেই নেমে পড়ে। দরকার নেই ফিরে গিয়ে। বাকী জীবনটাও না হয় এলোমেলো ঘুরেই কাটিয়ে দেবে ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। যেমন কেটেছে এই দশ বছর। না হয় নাই হল মোক্ষ অর্জন ঈশ্বর সামীপ্য লাভ। সংসারের পঙ্কে ডুবে রয়েছে কোটি কোটি মানুষ, ডুব সাঁতার কেটে ঘুলিয়ে তুলছে সেই পাঁক, কোনো দিন দুচোখ তুলে বারেকের তরেও তাকিয়ে দেখল না আকাশের অসীম বিস্তার, দুধারে তারার ফুল ছড়িয়ে যে ছায়াপথ চলে গেছে অনন্তের সন্ধানে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সে পথের খোঁজও করল না তারা। তারা কৃমিকীটের মতই বেঁচে রইল মুক্তি চিন্তায় মাথা না ঘামিয়েই। সেও না হয় তাদের মতই হয়ে যাবে অজ্ঞ অন্ধ নির্বোধ। তফাতের মধ্যে সংসারে না ডুবে সে বেড়াবে ভেসে ভেসে ঘাট থেকে আঘাটায় স্রোতের ফুলের মত। কোনো বন্ধন নেই বিচার নেই, নিস্পৃহ, নিরাসক্ত।

মুক্তির জন্যে যে আন্তরিক বাসনা সেও এক প্রকারের আসক্তি, আর আসক্তি মাত্রেই পাপ সুতরাং পরিত্যাজ্য। কথাটা বলে ছিলেন সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী যার দেখা পেয়েছিল সে কেদারের মন্দিরে। মন্দিরের পশ্চাতে রয়েছে যে তুষারাবৃত পাহাড় সেই পাহাড় পেরিয়ে নেমে এসেছিলেন তিনি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যেও প্রায় উলঙ্গ জটাজুটধারী দীর্ঘছন্দ গৌরবর্ণ দেহ, দুই চোখে দূরপ্রসারী দৃষ্টি, অধর ওষ্ঠে শিশুর সারল্য ও পাপহীনতা। সন্ন্যাসীকে দেখেই যেন বুকের মধ্যে বেজে উঠেছিল পূজোর ঘন্টা। মনে হয়েছিল এতদিনে পেয়েছে সেই গুরুর সন্ধান যার খোঁজে সে শুধু ঘুরে বেড়িয়েছে হেথা-হোথা তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে মন্দিরে, মঠে আশ্রমে। এইবারে পাওয়া যাবে জন্ম আর পুনর্জন্মের মীনচক্র থেকে মুক্তির সঠিক পথনির্দেশ।

সন্ন্যাসী কিন্তু তার দিকে এক পলক তাকিয়েই মৃদু মধুর স্নেহসিক্ত স্বরে বলে উঠেছিলেন,—'তুই বাড়ি ফিরে যা।'

সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরেছিল সে,—'আপনাকেই খুঁজছি এতদিন। চরণে ঠাঁই দিন।'

মৃদু হেসেছিলেন সন্ন্যাসী,— 'গাছ থেকে ফল পেড়েছিস না পাকতেই। তোর সমস্ত অন্তর জুড়ে কেবল মোহেরই বাষ্প-পাট। কারো স্নেহ ধনদৌলতে, কারো নাম-যশে। যারা অতিনিকৃষ্ট তারা চায় দুটোই। তোর বাসনা মুক্তির জন্য। সেও এক প্রকারের আসক্তি। গাছের ফলকে ফিরে যেতে হবে গাছে। সংসারের উত্তাপে ফল পেকে উঠুক—'

সন্ন্যাসীর মৃদু ভাষণের মধ্যেও নির্দেশের কঠোরতা ছিল। অন্তরে দ্বিধা দেখা দিলেও সে যেন নিরুপায়। নিরাশ হতোদ্যম সে কেদার থেকে ফিরে এল হরিদ্বার। ঝোলাঝুলি নিয়ে চেপে বসল ট্রেনে। ফিরে যাবে কলকাতা। পিছনে পড়ে রইল তার দশ বছরের সন্ন্যাস জীবন আর অবিরল কৃচ্ছসাধন, প্রব্রজ্যা আর পথ পরিক্রমা। পুনরায় সে হয়ে যাবে গৃহী। চা খাবে খবরের কাগজ পড়বে আর দরদস্তুর করে দোকান-বাজার করবে নিয়মিত। অপরকে ঠকানোর জন্য সব সময়ই মুখিয়ে থাকবে নইলে পাছে নিজে ঠকতে হয়। এতদিনের অসীমানন্দ খুঁজে খুঁজে বার করল গার্হস্থ্য জীবনের সেই ভুলে-যাওয়া পুরনো নাম। দিবাকর সান্যাল।

লক্ষ্ণৌ স্টেশনে গাড়ি পৌঁছুল বেলা দশটা নাগাদ। নামল অনেক লোক। কিন্তু উঠল বোধহয় আরো বেশী। ফলে ভিড় না কমে বেড়েই গেল। এখানে ট্রেন দাঁড়াবে বেশ কিছুক্ষণ। যাত্রীরা কেউ কেউ নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে পায়ের আড় ভাঙিয়ে নিতে চাইল। কেউ কেউ ঘটি বা ওয়াটার বটল হাতে ছুটল জলের সন্ধানে। জানলায় জানলায় চা গরম আর গরম সামোসার হাঁকাহাঁকি। দিবাকর এক ভাঁড় গরম চা নিল।

গাড়ি ছাড়ার সময় যখন প্রায় হয়ে এল ব্যস্তসমস্তভাবে এসে হাজির হল একটি দম্পতি। তরুণ বয়স্ক এবং বাঙ্গালী। ওদের পিছনে কুলির মাথায় হোল্ড-অল

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর নতুন উপন্যাস

ওরা বড় হয়ে গেল

প্রকাশিত হলো। দাম পাঁচ টাকা

বিমল মিত্রের
একটি অনন্যধর্মী উপন্যাস
আমি ১০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অসাধারণ সৃষ্টি
অশনি সংকেত ৫৷৷

সুমথনাথ ঘোষের নতুন উপন্যাস

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা

প্রকাশিত হলো। দাম পাঁচ টাকা

অমর সাহিত্য প্রকাশন : ৭, টেমার লেন, কলি-৯

আর সুটকেস হাতে বেতের টুকরি। বোটির কোলে কচি বাচ্চা— এক কি দেড় বছরের।

ভিতরের যাত্রীদের প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও ওস্তাদ কুলি হোল্ড-অল আর সুটকেস চালান করে দিল কামরার মধ্যে। তারপর সেই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেই বস্তার মত ঠেসে দিল বাচ্চা সমেত বৌটিকে। কুলির প্রাপ্য মিটিয়ে যুবকটি যখন হাতল ধরে পাদানিতে, উঠল তখন ঘন্টা পড়ে গেছে। গুটি গুটি চলতে শুরু করেছে গাড়ি।

কামরার মধ্যে ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ ভাষার বিপুল কলবর। বসার ত প্রশ্নই ওঠে না, ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারাই দুঃসাধ্য। ওরই মধ্যে যুবকটি—যার নাম প্রভাকর—প্রায় সার্কাসের কসরত দেখিয়ে বাংকের এক ধারে তুলে দিল সুটকেস হোল্ড-অল আর বেতের টুকরি। তুলতে গিয়ে কারো পা মাড়িয়ে দিল সে, কারো মাথা ঠুকে গেল সুটকেসের কোণে। ফলে আর একচোট গাল-মন্দ চিৎকার কোলাহল। ভিড়ের ট্রেনে উঠতে গেলে ও সব গায়ে মাখলে চলে না। প্রভাকরের বউ সুনন্দা তার দেড় বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে একটা বড় বস্তার উপর হেলে পড়েছে, ক্রমেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে বিপদজনকভাবে। তার গৌরবর্ণ মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, স্বামীর দিকে তাকাল দুচোখে ত্রাস আর তিরস্কার। ক্রমে কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠে সে বলল, — 'এভাবে কখনও যাওয়া যায় এত দূরের পথ—'

প্রভাকর চোখের ইসারায় ধৈর্য ধরতে বলল। এইভাবে যাওয়ার প্রস্তাব থেকেই সুনন্দা আপত্তি করেছে আর প্রভাকর অভয় দিয়েছে ওকে,—দেখবে কিছুক্ষণ পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যতই ভিড় হোক না কেন, একে মেয়েছেলে তায় কোলে বাচ্চা—দেখবে কেউ-না-কেউ ঠিক ম্যানেজ করে বসিয়ে নেবে।'

প্রভাকরের দোষ নেই। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করেই সে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। আসাব রিজার্ভেশনের সঙ্গে সঙ্গেই বেল আফিসের মাধ্যমে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ফেরার রিজার্ভেশনও করিয়ে রেখেছিল। লক্ষ্ণৌতে নেমে কাঠগুদামগামী ন্যারো গেজের ট্রেনে ওঠার আগে স্টেশনে খোঁজ করে জেনেও নিয়েছিল সব ঠিক আছে। সুতরাং বেশ খোলামেলা মন নিয়েই কদিন ঘুরেছে বেড়িয়েছে নৈনীতাল আর রাণীক্ষেত, প্রায় পুরো ছুটিটাই কাটিয়ে দিয়েছে ঐদিকে। তারপর আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে এসে খোঁজ নিয়ে দেখে সর্বনাশ। রিজার্ভেশন কাউন্টারে টিকিট কাটতে গিয়ে দেখে কি কৌশলে যেন সব ওলটপালট হয়ে গেছে। কাউন্টারের ওধারে বসা নির্বিকার ধ্যানস্থ পুরুষটি 'আপকো নামমে কই বুকিং নেহি হ্যায় জি।' বলেই ফের সমাধিস্থ হয়ে গেল। অনেক অনুনয়-বিনয়েও চিড় ধরল না তার সে অটল গম্ভীর নৈঃশব্দে।

প্রভাকরের তখন আর ঝগড়া করার সুযোগ নেই। সময় নেই উচ্চমহলে গিয়ে এই নিয়ে দরবার করারও। তার ছুটি প্রায় শেষ। সোমবার সকালে অফিসে হাজিরা না দিতে পারলে চাকরী রাখাই দায় হবে। সুতরাং সুনন্দাকে বলল,—'কি আর হবে। চল, জয় মা বলে রিজার্ভেশন ছাড়াই রওনা হয়ে পড়ি।'

শুনে আঁৎকে উঠেছিল সুনন্দা,—'সেকি! প্রায় চব্বিশ ঘন্টার জার্ণি। তায় সঙ্গে বাচ্চা—'

নার্ভাস মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে প্রভাকর চোখ মটকেছিল,—'সেটাই ত সুবিধে। ঐ খোকনই হবে তোমার ছাড়-পত্র। একে মেয়েছেলে, তায় কোলে বাচ্চা—মানুষের সদাশয়তার প্রতি বিশ্বাস হারান পাপ—দেখবে কেউ না কেউ ঠিক বসিয়ে নেবে তোমাকে।'

সেই ক্ষীণ আশাটুকুকে অবলম্বন করেই বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। কিন্তু আপাততঃ ব্যাপারটা মোটেই সুবিধেজনক বলে মনে হচ্ছে না। কেননা, এখন প্রভাকর দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ের উপর দেহভার ন্যস্ত করে জলার ধারের বকের মত, ভিড়ের চাপে বিপুল বস্তাটার উপর ক্রমেই হেলে পড়ছে সুনন্দা দেহের ভারসাম্য হারিয়ে আর তার কোলে দেড় বছরের খোকন তার-স্বরে চিৎকার করে যাচ্ছে গরমে ঘামে কষ্টে আর অসুবিধেয়। বেড়ানর মজা এখনও সে উপভোগ করতে শেখেনি, সুতরাং তার কাছে কষ্টটাই সার।

দরজার কাছে সদা যে অতিরিক্ত কোলা-হলটা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে উঠছিল এই নবাগত যাত্রীকটিকে নিয়ে দিবাকর তার নিরাপদ আসনে বসে নিস্পৃহ উদাসীন চোখে কেবল তাকিয়ে দেখছিল তা। এই তাকিয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় এক-ঠেঙে প্রভাকরের নিরুপায় মুখের উপরে তার নজর পড়ল। দৃষ্টিটা নিয়ম মতই পিছলে সরে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ যেন তার বুকের মধ্যে ঠুন ঠুন শব্দে বেজে উঠল এক রাশ ছোট ছোট ঘন্টা। ঠুন ঠুন, ঠুন ঠুন ঠুন। মুখখানা যেন চেনা লাগছে। বড় পরিচিত আব আপন। দিবাকর আবার দু'চোখের দৃষ্টি সরিয়ে এনে স্থাপন করল প্রভাকরেব মুখের উপব। হ্যাঁ, সেই মুখ। যদিও দশ বছর আগে দেখা সে-মুখের সঙ্গে এ-মুখের অনেক পার্থক্য, সেই হাল-ফিল গোঁফের বেথা দেওয়া সদা কৈশোরো-ত্তীর্ণ মুখে আজ পরিণত যৌবনেব প্রগাঢ় প্রত্যয়, তবু ভুল হল না চিনতে।

প্রভাকরের পিছনে বস্তার সঙ্গে লেপটে যাওয়া সুনন্দাকে তাকিয়ে দেখল দিবাকব, দেখল তাব কোলের সন্তানকে, তাবপব উঠে দাঁড়িয়ে দুই সিটের মাঝখানে রাখা মালপত্র ডিঙিয়ে সরাসরি গিয়ে হাজির হল দরজার কাছে। একেবারে প্রভাকবের সামনে। আর একবার কাছে থেকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল, তারপব নিপাটবিস্ময়ে হতবাক প্রভাকরেব মুখেব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা স্ববে বলল— 'খোকা না?'

দিবাকর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রভাকর চিনতে পাবল। দাড়ি গোঁফের সেই ঘন অরণ্য ভেদ করেও চোখে ধরা পড়ল সেই পরিচিত মুখের আদল। ফলে বিস্ময় আরো বাড়ল। তফাতের মধ্যে আগে যা ছিল অপরিচিত মানুষের অস্বাভাবিক আচরণ-হেতু, এখন হল তা ঘটনার যোগাযোগ ও আকস্মিকতায়। এই ভবে—। এই ট্রেনের মধ্যে—। এত কাল পরে—। আশ্চর্য—!

কি বলবে কি করবে ভেবে পেল না প্রভাকর। আরো যখন সে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক চরম অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে। আড়ষ্ট স্পষ্ট কণ্ঠে সে কোনো রকমে বলতে পারল,—'হ্যাঁ—আমি—'

ইসারায় সুনন্দাকে দেখিয়ে দিবাকর বলল,—'ওদেরকে নিয়ে আয়। আমার ওখানে ছায়গা হয়ে যাবে।'

সুনন্দার বিপন্ন চোখে বিস্ময়েব বেশ। তির্যক ভঙ্গীতে ঘুরে প্রভাকর সুনন্দাকে বলল,—'চলে এস।'

খানাখন্দ পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে ওরা এসে পৌঁছুল কামরার শেষ প্রান্তে যেখানে দিবাকরের দখলিকৃত প্রশস্ত জায়গায় অনায়াসে বসতে পাবে দু'জন। বেঁচকাটাকে নামিয়ে সিটের তলায় ঠেলে দিতেই আবো একজনের জায়গা হয়ে গেল। দিবাকর

ব্রণ
দূর করবার জন্য
লিচেনসা

● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেস্‌ক্রিপশন করেছেন।
● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
DZ-1676 R-BEN

অঙ্গুলী নির্দেশ করে সুনন্দাকে বলল,—'বস মা, বস।'

সুনন্দা তখনও তাকিয়ে আছে প্রভাকরের মুখের দিকে। দুচোখে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। উত্তরে নিশ্বাস চেপে প্রভাকর বলল,—'আমার বাবা। প্রণাম কর।'

দিবাকরের মনে স্পষ্ট ভাবে ধারণা ছিল সন্ন্যাস জীবনের দশটা বছর সময় কেবল তার চুল আর দাড়িতে জট পাকিয়েই রয়ে গেছে, তার আর কোনো তাৎপর্য নেই, নেই ভিন্নতর কোনো ফলাফল। সময়ের অতিক্রান্ত যে এক সর্বব্যাপক প্রক্রিয়া, কাল নামক সেই সুবৃহৎ কটাহে যে প্রতিক্ষণে জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে মানুষ পশু পক্ষী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু, বৃক্ষ লতা পর্বত এবং গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল—এ বাবদে কোনো সচেতনতাই ছিল না তার মধ্যে। হরিদ্বার থেকে বাড়ি ফিরে যাবে বলে যখন ট্রেনে চেপে বসল সে মনশ্চক্ষের সামনে তার গৃহের যে অস্পষ্ট ছবিখানি ছিল তা যেন সেই দশ বছর আগেকার সংসারেরই হুবহু প্রতিচ্ছবি। গৃহিণী পুণ্যলতা—প্রতিদিনের অশুচিতা প্রতিদিনের গঙ্গা-স্নানে ধুয়ে ফেলে তার স্বস্তি, একমাত্র ছেলে প্রভাকর—সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ, ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে রেজাল্টের অপেক্ষায়, আর বিবাহযোগ্য দুই কন্যা লিপিকা আর দীপিকা—পিঠোপিঠি দুই বোন দুই সখীর মতই সদা অন্তরঙ্গ। দিবাকরের নীহারিকাবৎ ধোঁয়াটে চিন্তা-জগৎ সেই ছবিখানিতে কখনও কখনও মগ্ন হয়ে যাচ্ছিল। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা যেন এক দীর্ঘ প্রতীক্ষা—ফিরে গিয়ে আবার মিশে যাবে সেই সব প্রিয়জনদের সঙ্গে, অন্তর্গত হয়ে যাবে সেই চিত্রে।

প্রভাকরকে দেখেই প্রথম হোঁচটটা খেয়েছিল দিবাকর। দশ বছর সময় প্রভাকরকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে প্রগাঢ় যৌবন মধ্যাহ্নে। সে আজ বিবাহিত এবং সন্তানের জনক ওদেরকে নিয়ে এসে সবাই গুছিয়ে বসার পর সুনন্দা ফ্লাস্ক থেকে গরম দুধ ঢেলে তার ছেলের মুখে ফিডিং বট্‌ল ধরল। দু-চার টান টেনেই ক্লান্ত খোকন ঘুমিয়ে ন্যাতা হয়ে গেল। কোনোদিন না-দেখা হঠাৎ জুটে যাওয়া শ্বশুরের সামনে এখনও সহজ হয়ে উঠতে পারছিল না সুনন্দা, সে ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আর গুন-গুন করে কথাবার্তা চলতে লাগল দিবাকর আর প্রভাকর—বাপ আর ছেলের মধ্যে।

আর প্রভাকরের এক-একটি ছোট ছোট উক্তি ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ফাটানর মত দিবাকরের সেই অস্পষ্ট ধারণা ও কল্পনাকে ক্রমে ক্রমে ধসিয়ে দিল, মনের ভিতরে অযত্ন-লালিত দশ বছর আগেকার স্থির ফটোচিত্রখানি যেন চকিতে হাওয়ায় উড়ে গেল শূন্যে, আর হঠাৎ দিবাকর বুকের মধ্যে এক বিরাট শূন্যতাকে অনুভব করল, একটা বিশাল ব্যাদিত গহ্বর যার মধ্যে সহসা শাণিত ও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা অনুভূতি-সকল হাওয়ার মত হাহাকার করে বেড়াতে লাগল।

দিবাকর জানল সময়—নিষ্ঠুর সময়—নির্বিকার উদাসীন সময়—ধাবমান বন্যা-বরাহের মত একরোখা সময় তছনছ করে দিয়েছে সবকিছু। পুণ্যলতা আজ পরলোকবাসিনী, বড় মেয়ে লিপিকা সন্দিগ্ধ চরিত্রের একটি যুবকের সঙ্গে গৃহত্যাগিণী হয়েছিল—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আর জানা যায় না, যেটুকু জানা যায়, তাও খুব আশাপ্রদ নয়, আর ছোট মেয়ে লিপিকার দেখেশুনেই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই বাচ্চা হতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আঘাত—হাতুড়ির ঘায়ের মত—একটার পর একটা যেন অবশ নির্বাক করে দিল দিবাকরকে। সময় যখন তার গোঁফ-দাড়ি চুল নিয়ে কৌতুকভরে ক্রীড়াশীল ঠিক তখনই সে আর এক জায়গায় আবিষ্কার করল সময়ের মধ্যে রয়েছে তায়ীর মত নৃশংস জলদস্যুর মত নির্মম, তীরের মত লক্ষ্যপরায়ণ।

অনেকক্ষণ বসে রইল দিবাকর নির্বাকভাবে। কেদারের মন্দিরের পিছনের পাহাড় ডিঙিয়ে নেমে এসেছিলেন যে জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী তাঁর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি নিশ্চয় জানতেন সবকিছু, কেননা, ওঁরা ত্রিকালজ্ঞ, দৃষ্টি ওঁদের সর্বত্রগামী চলে যায়, এমনকি অতীতের ধূসর পথ বেয়ে সুদূর পুরাকালে। তাহলে তিনি কেন এমন বিধান দিলেন দিবাকরকে। কেন মৃদুস্বরে কঠোর আজ্ঞা দিলেন সংসারে ফিরে যাওয়ার! কোথায় ফিরবে সে? সংসারের কোন্ নাটমঞ্চে? দিবাকর যেন এক নির্বাক্‌নির্দেশ নট অথচ নাটক শেষ হয়ে গেছে তার চরিত্রটিকে নির্মমভাবে ছেঁটে দিয়ে। আজ ফিরে গিয়ে দেখবে কেবল শূন্য মঞ্চ, জনহীন প্রেক্ষাগৃহ, অন্ধকার—

চকিতে আর একবার মনের মধ্যে ভাবনাটা খেলে গেল। কাজ নেই। কাজ নেই ফিরে গিয়ে। পথিমধ্যে নেমে পড়বে সে যে-কোন স্টেশনে। আবার হারিয়ে যাবে অগণন মানুষের মধ্যে। প্রভাকরকে এখন কিছু বলার দরকার নেই।

হঠাৎ সুনন্দার কোলের মধ্যে খোকন নড়ে উঠল। ঘুম ভেঙেছে তার। আড়-মোড়া ভেঙে সে হাই তুলল। তারপর নিষ্পাপ সরল দুই চোখে অপার কৌতূহল ফুটিয়ে তাকাল দিবাকরের দিকে। তাকিয়েই রইল।

এতক্ষণ ওর অস্তিত্বকে ভুলে ছিল দিবাকর। সহসা সে সচেতন হয়ে উঠল। তার বুকের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন কাপড় নিংড়ানোর মত মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল। একটা খুব পুরোনো অনুভূতি নতুন করে তীব্র হয়ে ফিরে এল যেন। দিবাকর দুই হাত সামনে প্রসারিত করে দিয়ে বলে উঠল,—'বৌমা, খোকনকে আমার কোলে দাও—'

সুনন্দা খোকনকে এগিয়ে ধরল। কিন্তু দিবাকরের কোলে যেতে খোকনের তেমন উৎসাহ নেই। সে তার মার কোলের সঙ্গে লেপটে গিয়ে শুধু মুখ ঘুরিয়ে দেখতে

• পূজোর প্রকাশ •

শবরীর তিয়াষ ৮৲

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

[এই উপন্যাসটি পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের আদিবাসীদের গণজীবনকে কেন্দ্র করে লেখা। সুসাহিত্যিক শ্রী সেনগুপ্ত সাহিত্যের আঙিনায় এই বইটি উপস্থিত করে জাতির এক মহান কর্তব্য পালন করলেন। এটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল।]

হাসির রাজা
শিবরাম চক্রবর্তীর
দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা
মূল্য—৩৲

সাহিত্যের আঙিনায়
নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায়
[সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের উপর আলোচনা-মূলক গ্রন্থ] মূল্য—৩৲

ভোলানাথ প্রকাশনী ।। ৩৭।১১ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা-৯

লাগল দিবাকরকে. তাকিয়ে রইল তার কাঁচা-পাকা জটপাকান চুল আর গোঁফ-দাড়ির দিকে, তারপর কচি অর্ধস্ফুট ভাষায় উচ্চারণ করল,—'ভম্পাই।'

অর্থাৎ, ভয় পাই।

মোগলসরাইতে গাড়ি পৌঁছুল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। এখানে ট্রেন দাঁড়াবে অনেকক্ষণ। প্রায় ঘণ্টাখানেক। ইঞ্জিন পালটান হবে গাড়ির, পালটাবে রানিং স্টাফ—অর্থাৎ ড্রাইভার ফায়ারম্যান গার্ড আর কণ্ডাক্টর গার্ডের দল। প্রত্যেক বগিতে বগিতে জল নেয়া হবে। সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ সময়সাপেক্ষ।

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দাঁড়াতেই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল দিবাকর, যেন খানিক উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলল—'আমি আসছি—'

প্রভাকর সামনে ফিরে তাকাল,—'কোথায় যাচ্ছেন?'

ততক্ষণ দিবাকর এগিয়ে গেছে। পৌঁছে গেছে দরজার কাছে। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল,—'ঘুরে আসছি। যাচ্ছি একটু প্রয়োজনে।'

দিবাকর নেমে গেল গাড়ি থেকে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে প্রভাকর দেখতে লাগল দিবাকরকে যতক্ষণ দেখা যায়। যখন সে চলে গেল দৃষ্টির আড়ালে, দেহটাকে গাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে এসে সুনন্দাকে বলল প্রভাকর,—বাবা বোধহয় আবার চলে গেলেন।'

সুনন্দা হতবাক,—'চলে গেলেন মানে?'

—'চলে গেলেন মানে চলে গেলেন। আকার হয়ে গেলেন নিরুদ্দেশ—'

খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না সুনন্দা, তারপর যেন বাকশক্তি ফিরে পেল,—'সেকি!' হঠাৎ তার নজর পড়ল দিবাকরের বোঁচকার দিকে,—'কিন্তু ওর পুঁটলি। তাহলে ওটা রেখে যাবেন কেন?'

গলার মধ্যে এক ধরনের ফাঁপা হাসি হাসল প্রভাকর,—'দূর! সন্ন্যাসী মানুষের আবার পোঁটলার মায়া। ওটা নিতে গেলে যদি আবার আমরা ঝামেলা বাধাই, তাই বোধহয় ফেলে গেলেন।'

সুনন্দা আর কোনো কথা বলল না। ব্যাপারটা তার কাছে কেমন বিসদৃশ এবং অর্থহীন বলে মনে হচ্ছিল। সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে কোনো সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছিল না সে। অকল্পিতভাবে এতদিন পরে একটা নিরুদ্দিষ্ট মানুষের সঙ্গে ট্রেনে সাক্ষাৎ, সে নাকি স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই ফিরে যাচ্ছিল ঘরে, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সেই মানুষটাই আবার অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেল—লোকলোচনের আড়ালে থেকে যে শক্তি বা পরিকল্পনা সমস্ত ঘটনার সমাবেশ ঘটায়, সাজিয়ে তোলে একটা সুনির্দিষ্ট ছককে লক্ষ্য রেখে—এই ঘটনাটা যেন সেই সামগ্রিক ছক থেকে পৃথক বিচ্ছিন্ন, গেঁথে যাওয়া ঘটনার মালা থেকে খসে যাওয়া ফুলের একটি দল—

সহসা উঠে দাঁড়াল প্রভাকর। বিস্মিত সুনন্দা প্রশ্ন করল,—'একি, তুমি আবার চললে কোথায়?'

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে প্রভাকর বলল,—'গাড়ি ছাড়তে এখনও ঢের দেরী। যাই একটু খুঁজে দেখি।'

—'এখানে কোথায় খুঁজবে তুমি। বিদেশ-বিভূঁই। অচেনা জায়গা—'

প্রভাকর বলল,—'তাই বলে ত একেবারে হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকা যায় না।'

নেমে গেল প্রভাকর। লম্বা প্ল্যাটফর্ম দুদিকে বিস্তৃত। তারপর ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে রেল-লাইন। শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অনেক জায়গা জুড়ে যেন কেবল লোহার জাল পাতা রয়েছে। দূরে দূরে ইট-রঙের রেলের বাড়ি-কোয়ার্টার। কোথায় গেছে দিবাকর কে জানে! নাকি গেট পেরিয়ে চলে গেছে শহরের মধ্যে। তাৎক্ষণিক প্রেরণার বশে নেমে এসেছে বটে প্রভাকর, কিন্তু এখন কি করবে, কোন্‌দিকে যাবে ঠাহর করতে পারল না কিছুই। ঠিক গেটের কাছে একজন ফলওয়ালা আম বিক্রী করছিল, তাকেই জিজ্ঞাসা করল—একজন সাধুবাবাকে যেতে দেখেছ এখান দিয়ে?'

ফলওয়ালা ব্যস্ত মানুষ। খদ্দের সামলাতে সামলাতে জবাব দিল,—'কেয়া জানে বাবু—'

এলোমেলো খানিক ঘুরল প্রভাকর। এদিক-ওদিক। দু-চারজনকে কিছু প্রশ্নও করল। কিন্তু বেলের কুলি চায়ের ভেণ্ডার দোকানদার রিক্সা আর ট্যাকসি-স্ট্যাণ্ডের বাহকগণ—কেউই কিছু জানে না। তারপর ঘড়িতে দেখল গাড়ি ছাড়ার প্রায় সময় হয়ে এসেছে। হতাশ নিরুদ্যম প্রভাকর ধীরে ধীরে ট্রেন অভিমুখে রওনা হল।

প্রভাকরের মুখের চেহারাতেই এর ব্যর্থতা লেখা ছিল স্পষ্ট অক্ষরে, সুতরাং সুনন্দা প্রশ্ন করল না কিছু। নিজের জায়গায় এসে বসল প্রভাকর। বসে রইল চুপচাপ। কিছু পরে স্বগতোক্তির মত সে বলল,—'বাবা বরাবরই এইরকম। একেবারে মতিস্থিরতা নেই। কখন যে কি করেন কি ভাবেন—' প্ল্যাটফর্মে তখন গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজছে—ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং—

গাড়ি ছাড়ল। দুলে উঠল কামরা। চাকা গড়িয়ে গেল। জানলাপথে সোজা দেখতে পাওয়া প্ল্যাটফর্মের দৃশ্য ক্রমে তির্যকভাবে ঘুরে গেল, একটা লোহার খুঁটি সাঁৎ করে সরে গেল জানলার খুব কাছ দিয়ে। আর সেই সময় একটা মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে দরজার হাতল ধরে লাফিয়ে উঠল চলন্ত ট্রেনের পাদানির উপর। ততক্ষণে গতিতে বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, প্রবল দাপটে পাদানিতে দাঁড়ান মানুষটার রক্তাম্বর আলখাল্লা এলোমেলো উড়ছে।

ঐ রক্তাম্বর চিনিয়ে দিল দিবাকরকে, নইলে চেনার কোনো উপায় ছিল না। দরজা খুলে সে যখন ঢুকে এল গাড়ির ভিতরে, এগিয়ে আসছে, প্রভাকর আর সুনন্দা দেখল, দিবাকরের মুখের সেই দাড়ি-গোঁফের অপরিষ্কার জঙ্গল নির্মূলভাবে কামানো, মাথার বিপুল জটাভার লাঘব হয়ে গেছে অনেকখানি, কিন্তু আগে দেখা সেই মানুষটা এমনভাবে পালটে গেছে যে চেনাই দায়—

দিবাকর সরাসরি এসে দাঁড়াল সুনন্দার সামনে। তারপর দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—'এবারে দাদুভাইকে দাও আমার কাছে। এখন আর ও ভয় পাবে না—'

তারপর ওদের হতবাক বিস্ময় কিছুটা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিতভাবে কৈফিয়তের সুরে বলল দিবাকর,—'বুঝলে না, যে কোনো কিছু পেতে গেলেই সাধনা করতে হয়। এবারে শুরু হল আমার সেই ফিরে পাওয়ার তপস্যা।'

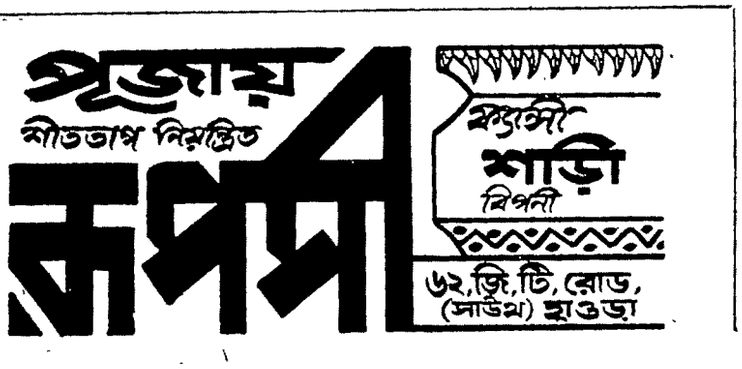

পুনশ্চ

২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামের রামধন শিরোমণির পুত্র 'নাটুকে রামনারায়ণ'-এর নাম বাংলার প্রথম নাট্যকার হিসাবে সর্বজনবিদিত। সে নাটকের নাম 'কুলীন কুলসর্বস্ব'। ইংরেজী ১৮৫৪ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে ১১৯ বৎসর পূর্বে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এরও পূর্বে কয়েকখানি নাটক কেবলমাত্র প্রকাশিতই হয়নি, অভিনীতও যে হয়েছিল এই নিবন্ধটি তার উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেছে।

'নাটুকে রামনারায়ণ'-এর আসল নাম, রামনারায়ণ তর্করত্ন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ সালের এই জানুয়ারী মাসেই। পণ্ডিত হিসাবে তাঁর সবিশেষ খ্যাতি ছিল এবং সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল তিনি সংস্কৃত কলেজে কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনা করেন। সেকালে কেবলমাত্র বাংলা নাটক বা প্রহসন রচনাতেই তাঁর যে খ্যাতি ছিল তা নয়, সংস্কৃত রচনাতেও তিনি বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন এবং তার নিদর্শন হিসাবে বিশেষভাবে 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'আর্যশতকম্' নামক দু'খানি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়।

রামনারায়ণের নাম 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের নাট্যকার হিসাবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করলেও, তর্করত্ন মহাশয় আরও বেশ কয়েকখানি নাটক রচনা করেন।

এই নাটকগুলির বিষয় ও নাটুকে রামনারায়ণ সম্বন্ধে 'নারায়ণ' পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১৩২২) অমরেন্দ্রনাথ রায় একটি মূল্যবান তথ্যবহুল নিবন্ধ রচনা করেন। ঐ সময় উক্ত নিবন্ধটি আবার 'মালঞ্চ' পত্রিকায় ২য় বর্ষের শেষ (চৈত্র, ১৩২২) সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। 'মালঞ্চ' থেকে সেই রচনাটি পুনরায় এখানে মুদ্রিত হল। আমরা আশা করি, এতদ্দ্বারা নাট্যামোদী বা নাট্যালোচনায় যাঁরা ব্যাপৃত, আলোচ্য নিবন্ধটি তাঁদের জ্ঞানার্জনের যথেষ্ট সহায়ক হবে। নিম্নোক্ত রচনাটির বানান যথাযথ অপরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত হল।

নাটুকে রামনারায়ণ

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় উক্ত প্রবন্ধে বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাটকের প্রথম পথ প্রদর্শক নাট্যকার ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত আটখানি নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধোক্ত বাঙ্গালা নাটকের আদিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান মনে হয়। ভবিষ্যতে বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য এই সকল উপকরণ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। নিম্নে সংগৃহীত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কবিবর ভারতচন্দ্র 'চণ্ডী নাটক' নামে একখানি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কবি বৎসর পূর্বে গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত প্রথম নাটক।

১৭৮২ শকাব্দের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র রামনারায়ণের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, কয়েক বৎসরাবধি নাট্য-সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়ায় বহুসংখ্যক নাটক প্রকাশিত হইতেছে এবং তিনি স্বয়ং অন্যূন চল্লিশ-খানি নাটক পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সকল নাটকের নামটুকু জানিবারও এখন উপায় নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতে পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'প্রেম নাটক' বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রিত নাটক। ইহা ১৮২০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পুস্তক ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থে কলুষিত প্রেমের বর্ণনা; ভাষা পদ্য-গদ্য। উপসংহারে কবি বলিতেছেন—

'অতএব মন দিয়া শুন বন্ধুগণ।
নারীর সহিত প্রেম করো না কখন।।
কহিলাম সার কথা কর প্রণিধান।
প্রেম নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান।'

শুনিতে পাওয়া যায় ১৮২১ সনে রাজা রামমোহন রায়ের 'সংবাদকৌমুদী' নামক বাংগালার তৃতীয় সংবাদ পত্রে 'কলি রাজার যাত্রা' নামক একখানি নাটকের সমালোচনা হইয়াছিল। অতএব ইহাই দ্বিতীয় মুদ্রিত নাটক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৮৩১ সনে কলিকাতা শ্যামবাজারে ৺নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে কৌতুক সর্ব্বস্ব বা 'বিদ্যা-সুন্দর' নামে একখানি নাটক অভিনীত হয়। বাঙ্গালী-দ্বারা বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় সম্ভবতঃ এই প্রথম। এই নাটক কোন সালে প্রথম ছাপা হয় জানিতে পারা যায় নাই। ১৮৪৯ সনে পণ্ডিত রামগতি তর্করত্ন প্রণীত 'মহানাটক' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কিছুকাল পরে তারাচাঁদ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক এবং হরচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত 'ভানুমতী-চিত্ত-বিলাস' নাটক প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নাটকখানি - শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভিনিস' নামক নাটকের আদর্শ করিয়া লিখিত।

১৮৫৪ সনে বাঙ্গালার আধুনিক ধরণের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল', প্যারীচাঁদের মাসিক পত্রিকা 'কাগজে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই বৎসরেই রামনারায়ণের প্রথম গ্রন্থ—কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক মুদ্রিত হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছিল। ইহার রচনা বোধহয় আরও পূর্ব্বে হইয়াছিল। কারণ, ১৮৫২ সনে রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন—'যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।' বলা বাহুল্য পণ্ডিত রামনারায়ণ এই দুইটি পুরস্কারই লাভ করেন।

উক্ত গ্রন্থ সমেত রামনারায়ণ মোট ৮ খানি নাটক প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্যে ৪ খানি মৌলিক নাটক ও ৪ খানি অনুবাদ।

(১) 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'—রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই নাটক-খানির বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বাঙ্গালা বহির বিস্তৃত সমালোচনা বাংগালা সাহিত্যে এই প্রথম আরম্ভ হয়। 'বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীনকামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, অভিনয় দ্বারা স্বদেশীয় মহোদয়গণের মনে তাহা সমুদিত করিয়া দেওয়াই প্রস্তাবিত নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশীয় কোন নিন্দিত প্রথার উচ্ছেদের নিমিত্ত প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই প্রকার রূপক রচনা সর্ব্বদাই করিতেন।'

(২) 'নবনাটক'—উৎসর্গ পত্রে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিবৃত আছে। 'ইহা বহু বিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।'

(৩) 'রুক্মিণীহরণ'—১৮৭১ সনে প্রকাশিত হয়।

(৪) 'স্বপ্নধন'—১৮৭৩ সনে রচিত, ইহাই রামনারায়ণের শেষ নাটক রচনা।

এই চারিখানি ব্যতীত তিনি চারিখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রণয়ন করেন, যথা (১) বেণীসংহার (২) রত্নাবলী (৩) অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (৪) মালতীমাধব।

'রামনারায়ণকে আদি নাট্যকার বলিতে না পারিলেও তাঁহাকে বর্ত্তমান বাংগালা নাটকের প্রথম পথপ্রদর্শক বলিলে বোধকরি তেমন অন্যায় হয় না। মাইকেল মধুসূদনও এ ক্ষেত্রের একজন পথপ্রদর্শক বটেন, কিন্তু প্রথম নহেন। রামনারায়ণের রচনায় আমরা বর্ত্তমানের শাখা-প্রশাখাময়ী নাট্যকলার অধিকাংশ অঙ্গেরই অঙ্কুর দেখিতে পাই। তিনি যে সময়ে অপরোক্ষ নাট্যকলার লালনপালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্যসত্যই উহা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা ধূলায়বলুণ্ঠিতা। সেই সময় তাঁহার মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত ইহাকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ না করিলে আজি 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল' প্রভৃতির মত উপাদেয় নাটক দেখিতে পাইতাম কিনা সন্দেহ।'

—কৃপণক

আর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা

বিশ্বের বধির সমাজ ইংরাজী ভাষাকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করে আর একটি আন্তর্জাতিক ভাষা সৃষ্টি করেছে, যার সাহায্যে তারা পেয়েছে ভাষা রাজ্যে অবাধ প্রবেশাধিকার আর শিক্ষার অকৃপণ দাক্ষিণ্য। শুনতে না পাওয়ার জন্যে বধিররা আমাদের মত কানে শুনে, অর্থ বুঝে আর অনুকরণ করে পরিবেশের ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারে না। শ্রবণহীন বধির জীবনে তাই ভাষাহীনতা দেখা দেয় অনিবার্যরূপেই।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাতে আর আত্মিক জীবন বিকাশের জন্যে ভাষার দাবী অপরিহার্য। বধির জীবনে এর ব্যতিক্রম নেই, সেই জন্য এরা একটা বিকল্প **ভাষা, সৃষ্টি** করে নিয়ে নিজেদের মধ্যে **ভাবের আদান** প্রদান করে থাকে। একত্রে **মিলিত** হলেই বধিররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে **ইসারা** ইংগিতের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। আমাদের চোখে এটা একটা নিতান্তই বিজাতীয় ভাষা বলে বোধ হয় কারণ হাতের আঙ্গুলগুলোর ক্ষিপ্র সঞ্চালন আর অবয়বে বহু বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া বিশেষ আর কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে জানা যায় যে ইসারাগুলি খামখেয়ালী মনের অসংগত প্রকাশ নয় বরং এদের সাহায্যে মোটামুটিভাবে বস্তু ও ভাবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে মূর্ত করা সম্ভব হয়। তবে ইসারা ইংগিতের অর্থদ্যোতকতার পরিধি সীমিত হওয়ার জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি প্রয়োগ সাপেক্ষ নয়। তাছাড়া স্থানীয় চাহিদা ও ব্যক্তিগত রুচির প্রয়োজনে ইসারাগুলি উদ্ভূত হওয়ার জন্যে অর্থগত অস্পষ্টতা সময়ে সময়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণে পাশাপাশি দুটি অঞ্চলের বধির যদি একটি ইসারাকে ভিন্নার্থে গ্রহণ করে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ব্যাকরণ-বিযুক্ত, অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ এই ভাষা স্বাভাবিকভাবেই বধির জীবনের প্রয়োজন মেটাতে অপারগ তাই এই ভাষাকে পরিশুদ্ধ করে একটি উন্নততর ভাষা রচিত হয়েছে যা মূলতঃ ইংরাজী ভাষাশ্রয়ী, এক হাত বা দু হাতের আঙ্গুলের সাংকেতিক ভাষা। উচ্চারণের ত্রুটি বিচ্যুতি, সুরের আরোহ অবরোহক্রম ইত্যাদি সমস্যামুক্ত এই নীরব চিত্রলিপির ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্যে প্রয়োজন ইংরাজী ভাষার সঙ্গে পরিচিত আর হাতের আঙ্গুলগুলি নিয়ন্ত্রিত করার দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা অর্জন।

দু হাতের দশ আঙুলের ভাষা

অতি প্রাচীনকাল থেকে যে আঙ্গুলের ভাষার প্রচলন ছিল, তার বহু নজীর রয়েছে বিভিন্ন চিত্রকলায় ও স্থাপত্যে। আজও আমাদের প্রকাশে সেই ধারা অব্যাহতভাবে বইছে বিশেষ করে সংখ্যা গণনার ব্যাপারে। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মমঠগুলিতে মৌনতা অবলম্বনকালে সন্ন্যাসীরা বিশেষভাবে আঙ্গুলের ভাষা ব্যবহার করতেন। এই ভাষার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তির যে একটা চিরন্তন সম্পর্ক রয়েছে—এই ধারণা অনেকেরই।

বধিররা যে আঙ্গুলের ভাষা ব্যবহার করে, তা প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী ভাষার এক অভিনব চিত্ররূপ। এই ভাষায় ইংরাজী বর্ণমালার ২৬টি অক্ষরকে বিশেষ রূপে রূপায়িত করার জন্যে এক হাতের পাঁচটি আঙ্গুল বা দু হাতের আঙ্গুলগুলিকে

এক হাতের পাঁচ আঙুলের ভাষা

বিশেষভাবে স্থাপন করতে হয়। সেই সংস্থাপনা লক্ষ্য করে বর্ণগুলিকে নির্ভুলভাবে পাঠ করতে সক্ষম হয় পাঠক। বলাবাহুল্য সাধারণ কথাবার্তার ক্ষেত্রে বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা এখানে গ্রহণ করে যথাক্রমে চিত্রকর ও পাঠক। এই ভাষার বর্ণমালা—

ইংলণ্ডের প্রভাবে আমাদের দেশে দু হাতের ১০ আঙ্গুলের ভাষার প্রচলন হয়েছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বধিররা সাধারণতঃ এই ভাষার জন্যে এক হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ব্যবহার করে থাকে। চিত্রধর্মী এই ভাষা শিক্ষাকরা স্বল্প সময়েই সম্ভব, তবে একে রপ্ত করার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘকালের অভ্যাস ও সুকঠোর শ্রম। বিদেশে যাঁরা এই ভাষার মাধ্যমে বধিরদের উন্নততর শিক্ষা দান করেন অথবা বধিরদের জন্য অনুবাদকের কাজ করেন বিভিন্ন সভা সমিতিতে, তাঁদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা-গ্রহণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এই শিক্ষার কাল সাধারণতঃ তিন বছরের। আঙ্গুলের ভাষায় যেসব ইসারা ইংগিতের প্রয়োগ রয়েছে তারা বিধিবদ্ধ ও অর্থদ্যোতক সেই কারণেই এই ভাষা পাঠ করে নির্ভুল ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। অস্পষ্ট ও সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বহুত্তর বিশ্বে মুক্তি পেয়েছে এই ভাষা যা ব্যাকরণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরই মাধ্যমে আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত গ্যালডেট্ কলেজ সারা দুনিয়ার বধিরকে আজ বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে।

গত ২৮শে মে 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ দি ডেফ'এর (সর্ব ভারতীয় বধির সম্মিলন এর) উদ্যোগে গৌহাটিতে যে অধিবেশনটির শুরু হয়, তাতে যোগ দেবার জন্যে দলে দলে এসেছিলেন বধির নরনারী ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আর কয়েকজন সাগরপার হতেও। তাঁরা সকলেই এক ভাষাভাষী—যে ভাষার কাছে দেশ মহাদেশের ভৌগোলিক সীমা, জাতি ধর্ম বর্ণের যত বিভেদ আর অসাম্য সব কিছু নিতান্তই তুচ্ছ ও অর্থহীন। দুটি হাত যেখানে কথা বলে ওঠে সেখানে প্রথম মিলনে হয় শাশ্বত-কালের রাখীবন্ধন। এদের প্রাণোচ্ছ্বাসের অনাবিল ও অফুরন্ত প্রকাশধারা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিনন্দন জানিয়েছি এই অনুপম সাংকেতিক ভাষাকে আর বারবার মনে হয়েছে আমাদের জীবনে মহামিলনের সুরটি ধ্বনিত করার জন্যে প্রয়োজন এমনি একটি আন্তর্জাতিক ভাষার।

—অনুভূতি বসু

বিবাহ বিচিত্রা—(১২) : হিমাচলপ্রদেশ

ভারতের উত্তর পশ্চিম ভাগে কাশ্মীরের ঠিক দক্ষিণেই হিমাচল প্রদেশ। হিমাচল প্রদেশের পূর্ব সীমান্তে আছে তিব্বত এবং দক্ষিণে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পাঞ্জাব রাজ্য। এই রাজ্যটি হিমালয় ও তার পাদদেশের উচ্চ অংশে অবস্থিত। গড় উচ্চতা সাত হাজার ফুট—পূর্বদিকে তিব্বত সীমান্তের পর্বতগুলি দুর্গম ও চির-তুষারাবৃত। এখানে জীবন সংগ্রাম অতি কঠোর —কৃষির উপযুক্ত ভূমিও বেশী নেই। পশুপালন কাঠ সংগ্রহ এবং কোন কোন নদী উপত্যকায় বা পার্বত্য অঞ্চলে সিঁড়ির মতো ধাপ কেটে কৃষিই এখানকার অধিবাসীদের জীবিকা। আগে এখানে অনেক ছোট ছোট দেশীয় রাজ্য ছিল। এইসব রাজ্য এখন লুপ্ত হলেও এখানে অনেক বিচিত্র উপজাতির বসতি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল গদ্দী (অর্থাৎ মেষপালক) এবং তিব্বত সীমান্তের গা ঘেঁষে অবস্থিত অতি শীতল কিন্নর ভূমির বাসিন্দা জেলার 'নেগী' সম্প্রদায়। এদের বিবাহ প্রথা সত্যিই অদ্ভুত। এইসব অঞ্চলে পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা কম। সেই জন্য বিবাহে পুরুষরাই মেয়ে পক্ষকে পণের টাকা, জামা-কাপড় মিষ্টি ফল ইত্যাদি যৌতুক হিসেবে দেয়। বিবাহের সময় এদের মধ্যে নাচগানের প্রথা প্রচলিত আছে। পুরুষ ও মহিলারা বিবাহ মণ্ডপে একত্রে গান গায় ও নৃত্য করে থাকে। মহিলারা ঘাগরা, কাঁচুলী, ও উড়নি ও নানা রকম সোনা রূপার অলঙ্কার পরে। বিবাহের পর কনেকে শ্বশুর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বধূর জন্যে একটি ঘর নির্দিষ্ট থাকে। বড় ভাইয়ের বিবাহের অর্থ হল বরের সব ভাইদেরই বিবাহ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ বধূ তার ইচ্ছে মতো বর বা তার যে কোন ভাইয়ের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। বড় ভাই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। সেই জন্যে অন্যান্য ভাইরা বড় ভাইয়ের সঙ্গেই থাকে। বড় ভাইয়ের সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হল বধূর প্রথম ছেলে—সে যে ভাইয়ের ছেলে হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। অনেক সময় বড় ভাই একাধিক বিবাহও করতে পারে। সেক্ষেত্রেও প্রত্যেক ভাই তার

সাহিত্যপত্র জগতের বারুণ দুর্দিনে এখনো বেঁচে থাকা লিটল ম্যাগাজিন

কৃশানু

শারদীয় গল্প সংখ্যা থেকে
৬ষ্ঠ বর্ষ সুরু
সমকালীন যুবমানস নিয়ে গল্প লিখছেন
রত্নেশ্বর বর্মণ । নির্মল চট্টোপাধ্যায় । সমরেশ মজুমদার । মদন দাশ প্রভাতকান্তি ভদ্র । দুলেন্দ্র ভৌমিক । দিলীপ সেনগুপ্ত । অসীম চক্রবর্তী প্রবীর সাহা । রথীন্দ্রনাথ ঘোষ । দীনেশচন্দ্র সিংহ
দাম — এক টাকা
কৃশানু ৩০/১এ কলেজ রো কলি-৯

ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক কলম!

ক্যামলিন
স্কেচ পেন ও ফাইবাইট পেন

মনে রাখবেনঃ
- স্কেচ পেনগুলি পাওয়া যায় ১২টি রঙে আর ফাইবাইট পেনগুলি পাওয়া যায় ৭টি রঙে।
- আবার কালি ভরার জন্যে পেছনের প্লাগটি খুলুন।
- ডগ একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার আগেই কালি ভরুন।
- ফাইবাইটে রয়েছে মজবুত সিন্থেটিক টিপ—ভাঙ্গার ভয় নেই।
- স্কেচ পেনগুলির টিপ সিন্থেটিক রেজিন-মেশানো ফাইবার দিয়ে তৈরী—তাই স্কেচ করার সময় চাপ পড়েনা।
- ফাইবাইট ও স্কেচ পেনের জন্যে সব রঙে আবার ভরার কালি পাওয়া যায়।

FIRITE ফাইবাইট ৯২৩

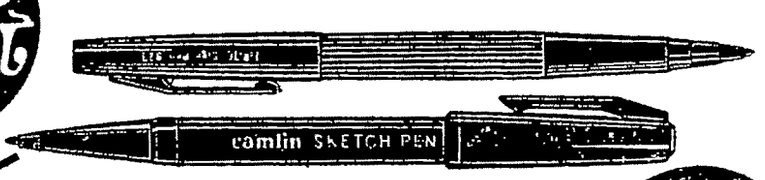

স্কেচ পেন ৯২১

ক্যামলিন প্রাঃ লিঃ
আর্ট মেটিরিয়াল ডিভিসন, জে. বি. নগর,
বোম্বাই-৫৯ (ভারত)

PRATIBHA 1216-52-BEN R

অন্যান্য বৌদিদেরও বধূ হিসেবে পেতে পারে অবশ্য সেটা নির্ভর করে ভ্রাতৃবধূদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। দারিদ্র্য, নারীদের সংখ্যাল্পতা, ও পৃথক পৃথক পরিবার প্রতিপালনে পুরুষদের অক্ষমতাই এই ধরনের দ্রৌপদী প্রথার মূল কারণ। এদের এই ধরনের বিবাহপ্রথা পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর বিবাহের স্মৃতি বুকে আজও বহন করে চলেছে।

অন্যান্য হিমাচল প্রদেশের বিবাহ প্রথা প্রায় সনাতন হিন্দু বিবাহ প্রথারই অনুরূপ। এখানেও অন্যান্য রাজ্যের মতো আছে জাতি-ভেদ প্রথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। স্থানীয় ভাষায় বরকে বলা হয় 'জাড়া' এবং কনেকে বলা হয় 'লাড়ি'। এখানেও যথারীতি প্রথমে ছেলে ও মেয়ের 'জন্মপত্রী' মেলানো হয়। পণ্ডিত অর্থাৎ পুরোহিত উভয়ের গ্রহ-সংযোগ শুভ মনে করলে এবং ছেলে ও মেয়ে পছন্দ হলে কনের বাড়ীতে হয় 'ঠাকা' অনুষ্ঠান। 'ঠাকা' শব্দের অর্থ আটকে দেওয়া—অর্থাৎ বর ও কনের এখানেই বিবাহ স্থির হয়ে গেল—অন্যত্র বিবাহ হতে পারবে না। এই অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষ পাত্রসহ করেন কন্যাগৃহে যান। তাঁরা তত্ত্ব হিসেবে ফল ও মিষ্টি নিয়ে যান। এই দিনই দু পক্ষের পুরোহিত একত্রে বসে সাগাই, বিবাহের শুভদিন ও লগ্ন স্থির করেন। পাত্র পক্ষকে জলযোগ করানো হয় এবং প্রত্যেক অভ্যাগতকে মিষ্টির বাক্স ও টাকা দেওয়া হয়। বর পক্ষের আত্মীয়দের জন্যে শাড়ী ও মিষ্টির বাক্স উপহার দেওয়া হয়। বিয়ের তিন দিন আগে পাত্র পক্ষের বাড়ীতে

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৩এ, মুরারিসন স্ট্রীট কলিকাতা-১৩
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

সাগাই' অর্থাৎ বাগদান অনুষ্ঠান হয়। কনের ভাইরা সেদিন বরের বিবাহের পোশাক—শেরওয়ানি চুড়িদার, জরি পাগড়ি, জুতি, মিষ্টান্ন ও টাকা নিয়ে পাত্র পক্ষের বাড়ীতে যান। কনের এই পত্রের আগমনে আনন্দ পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেই দিনই কন্যাপক্ষ বর-পক্ষকে বিবাহের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ করে আসেন। পুরোহিতের নির্দেশ মতো কনের বিবাহের পোশাক—চাদর, চেলি, ও উড়নি এবং অন্যান্য কন্যাপক্ষের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। বিবাহের সাত দিন আগে থেকেই দু-পক্ষের বাড়ীর মহিলারা অবসর সময়ে ঢোলক বাজিয়ে গান করেন। এই গানকে 'মহিলা সংগীত' বলা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে মহিলাদের একটু অশ্লীল ধরনের নাচও চলতে থাকে। এই নাচকে বলা হয় 'গদ্দা' নাচ। গানের সময় কুমারী ও সধবা মেয়েদের হাতে মেহেদী লাগান। গান শেষ হলে প্রত্যেক মহিলার হাতে একটি করে 'দিশি চিনি' বা শর্করা ভরা ঠোঙা দেওয়া হয়।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে দু পক্ষের বাড়ীতেই কুলদেবতার পূজা হয়। বিবাহের লগ্ন সাধারণত গভীর রাতে হয়। সন্ধ্যাবেলা বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতেই হয় 'শৃঙ্গার' অনুষ্ঠান। নাপিত বরের চুল কাটে, মহিলারা বেসন ও তেলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত 'বাটনা' লাগিয়ে বরকে স্নান করান। বন্ধুরা বরকে বিবাহের পোশাক পরিয়ে দেন। নাপিত চুল আঁচড়ে দিয়ে মাথায় লাল পাগড়ি বেঁধে দেয়। একটা চৌকির ওপর বরকে দাঁড় করিয়ে বোনেরা বা বড় বোন তার চোখে কাজল পরিয়ে দেন, ছেলের বাবা ছেলের পাগড়ির ওপর মুখ ঢাকা ফুলের মালা বেঁধে দেন—যাকে বলা হয় 'শেরা বন্দী করনা'। এরপরই হয় 'মসনু' অনুষ্ঠান। পাত্রের বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলারা ছেলেকে একটি ছোট তোয়ালেতে শুকনো নারকেল ও টাকা দিয়ে কাকবিষ্ঠা করেন। এইভাবে প্রত্যেক বয়োঃজ্যেষ্ঠার আশীর্বাদ শেষ হলে পাত্রের বন্ধুরাও তাদের ক্ষমতা উপহার ছেলেকে দেন। অনুরূপভাবে কন্যা পক্ষের বাড়ীতেই 'শৃঙ্গার' ও মসনু অনুষ্ঠান হয়—তফাৎ-এর মধ্যে ফুল পাগড়ির পরিবর্তে কনের বেণী বন্ধন করা হয়। মসনু অনুষ্ঠানে কনের মামীমাকে অবশ্যই সোনা বা রুপোর নথ দিয়ে কনেকে আশীর্বাদ করতে হয়। সৌভাগ্য চিহ্নস্বরূপ কনের হাতের কনুই পর্যন্ত সেই রঙ মশলার লাল মোটা চুড়ি পরান হয়—তাকে বলা হয় চুড়া

বর বিবাহ করতে যাওয়ার আগে বরপক্ষ থেকে বরযাত্রীদের প্রচুর মদ্য পান করানো হয়। যে মেয়ের বাবা তাঁর অতিথিদের যত বেশী মদ্যপান করানোর ভার বেশী প্রশংসা হয়। মদ্যপান করার পর বরযাত্রীদের মনে স্বভাবতই 'ফ্রৌত' বা ঘরে ফেরার তাগিদ হয়। বর ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যায়, তার কোমরে তরবারি বাঁধা থাকে। বরের আগে আগে বাজে ব্যাণ্ডপার্টি ও নৃত্যশীল পানোন্মত্ত বরযাত্রীদের দল—সন্তর্পণে পেছনে থাকেন বয়স্করা। মহিলারা কেউ যান না। বরযাত্রীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য কন্যাপক্ষ রাস্তাতেই এগিয়ে আসেন। পুরোহিতের নির্দেশ মতো মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে, মেয়ের মামা ছেলের মামাকে, মেয়ের ভাই ছেলের ভাইকে—এই রকমভাবে দু পক্ষের সম্পর্কিত সকলেই সকলকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেন—একে বলা হয় 'মিলনী' অনুষ্ঠান।

বরযাত্রী কনের বাড়ী এসে পৌঁছলে বরকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে 'দ্বারপূজার' অনুষ্ঠান করা হয়। তারপর বর সহ বর-যাত্রীকে নিরামিষ ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ভোজ্য তালিকার থেকে ভাত, মাংস সাবুত ডাল (আস্ত নানা ডাল) মহনী (আমচুর ও কালো ছোলার টক তরকারী), মন্দরা (দই ও সাদা ছোলার তরকারী) মিঠা (অমৃতি ধরনের এক রকমের মিষ্টি) ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়ার পর বরযাত্রী শুতে চলে যায়। উঠোনে যজ্ঞবেদী ও ফুল সাজানো বিবাহের মণ্ডপ তৈরী করে রাখা হয়। বিবাহের লগ্নের কিছুক্ষণ আগে বর-যাত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়। বরকে বিবাহের আগে স্নান করতে হয়। তারপর বর-কনেকে বিবাহমণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে হোম আরম্ভ হয়। পুরো-হিতের নির্দেশ মতো বর ও কনে অগ্নিতে ঘি, ফুল, চিনি ও চাল আহুতি দেন। যজ্ঞ চলাকালীন অবস্থায় কনের মা বা বাবা বরের হাতে কনের হাত সঁপে দেন—একে বলা হয় 'কন্যাদান'। পুরোহিত এই সময়ে কন্যাদানের মন্ত্র পড়েন। কন্যা দানের পর হয় 'বরমালা' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কনে বরকে এবং বর কনেকে মালা পরায়। 'বর-মালা' অনুষ্ঠানের পর পুরোহিত একটি চাদর দিয়ে কনের উড়নি ও বরের শালের প্রান্ত গ্রন্থিবদ্ধ করে দেন। ওরা দুজনে সাত-বার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করে। অগ্নি প্রদক্ষিণের পর হয় 'সিন্দুর দান' অনুষ্ঠান—বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। অবশিষ্ট রক্ত বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ পৃথক পৃথক স্থানে স্থাপন করে। তারপর তিন শুভ মুহূর্ত দেখে 'ডোলী বিদায়ী' অনুষ্ঠান হয়। 'ডোলী'র অর্থ পালকী। বধূ পালকী বা চারজন মানুষেটানা পাহাড়ী রিকশায় চড়ে শ্বশুরালয়ে যায়। বর পৃথক পালকীতে বা ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী ফেরে। মেয়ের পালকী বা রিকশায় লাল চাদর বাঁধা থাকে। বিদায়ের আগে যথারীতি কান্নাকাটি হয়, প্রণাম ও আশীর্বাদ বিনিময় চলতে থাকে। এই সময় বর ও কনেকে দলসামগ্রী বা দক্ষিণা দেওয়া হয়।

ছেলের বাড়ীতে বধূ এসে পৌঁছলে প্রথমে হয় 'বধূপ্রবেশ' অনুষ্ঠান। উঠোনে পূজা ও হোম হয়, ছেলের মা বর বধূকে আরতি করেন। সেই দিনই সন্ধ্যায় বা তার পরের দিন ছেলের বিবাহ উপলক্ষে ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজও সম্পূর্ণ নিরামিষ। বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে হয় 'মুকনারা' বা 'সোহাগ রাত' অনুষ্ঠান। এই রাতেই নবদম্পতির একত্র জীবনের সূচনা হয়।

—সুধনা মুখোপাধ্যায়

পুজোর বাজার, না পুজোয় বাজার

শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

—এই যে আপনিও এখানে! তা ভালই হলো। দেখুন ত ওয়াইফের জন্যে শাড়ীখানা কেমন হল। —দোকানের বরজায় দাঁড়িয়েই হারু শাড়ীর বাকসের সবুজ (লাল নয়) ফিতে খুলতে শুরু করল। তার মুখনিঃসৃত শব্দপ্রবাহও অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলল : এবার একখানা রিয়েল নাইলন প্রমিস করেছি আর ওয়াইফের অভাব গড়িয়াহাট থেকে কেনবার : তাকে সঙ্গে নিয়েই আসতুম, কিন্তু সানডে ছাড়া ত উপায় নেই। তা সানডেতে যা ভিড় আর লং ডিসটান্সে—ফম শ্যামবাজার . . . .।

হারু মিশ্র-ভাবভেই কথা বলে।

ফিতে খুলে ফেলে বাকসের ঢাকনাটা অর্ধেক সরিয়ে হারু শাড়ীখানার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল : আমার ওয়াইফকে ত আপনি চেনেন, বলুন ত কালারটা পছন্দ হবে কিনা।

অনুরোধ ঠিক তর্কশাস্ত্রের বিধিসম্মত নয়। কারও ওয়াইফকে চিনলেই সেই ভদ্রমহিলার শাড়ীর কোন রং পছন্দ তা বোধ হয় বলা যায় না। আর যাঁর পক্ষে ভদ্রমহিলাকে সবচেয়ে বেশী জানার কথা—সেই স্বামীরই যদি সংশয় থাকে তবে আমার মত আউটসাইডারের (না, হারুর অনুবর্তী হব না)—বহিরাগতের পক্ষে সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব কি? তাই সেদিকে না গিয়ে প্রশ্ন করলাম : কত দাম নিল?

হারুও সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তর্জনী তুলল এবং তারপর বলল : নট এ পইসা লেস।

দেখলাম, হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রে যে পাই-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পয়সা, সে সম্বন্ধে কিন্তু হারু সচেতন।

চমৎকার হয়েছে, বলাতেই হারু চলে গেল। আর আমি তখন দোকানে ঢুকলাম।

হারু আমার পাড়ারই ছেলে। বয়সে সে আমার চেয়ে বেশ কিছুটা ছোট, তবে লঘুজন-গুরুজন সম্পর্ক তিক্ত নয়। তাই শাড়ীর রং সম্পর্কে তার স্ত্রীর পছন্দের ব্যাপারে আমার অভিমত চাওয়া অত্যুক্তি হলেও ঠিক অস্বাভাবিক নয়।

জানি হারু চাকরি করে এক সদাগরী অফিসে। মাইনে হয়ত মোটামুটি ভালই পায়, বোনাসও নিশ্চয় পেয়েছে। কিন্তু তর্জনী-সংকেতে যা বুঝিয়েছিল —সেই একশ টাকা দিয়ে স্ত্রীর শাড়ী কেনার সঙ্গতি তার আছে কি? তবে এটা হল পুজোর সময়। এ সময়ে অসঙ্গত বায়না আবদার ও অভিমানের ধক্কায় অতি হিসেবী লোকও বেসামাল হয়ে পড়ে। আর পাল্লায় না পড়লেও অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। ব্যয়ের ব্যাপারে কেরামতি দেখাবার সময়ই ত এই। একটু বেহিসেবী হলে কয়েকদিনের জন্যে নিজেকে খাঞ্জা খাঁর ভায়রাভাই বলে মনে করলে ক্ষতিই বা কি?

এই কথাগুলোই সেদিন ভাবছিলাম —অবশ্য কাপড়ের দোকানে নয়, নৈশ ভোজনের পর বাড়ীতেই বসে। এ নিয়ে আগেও ভেবেছি। আবার ভাবতে শুরু করলাম যে এই রকম বেহিসেবী ব্যয়—বাহাদুরী দেখাবার প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ।

ব্যয়নির্বাহের তত্ত্ব :

অর্থনৈতিক কার্যকর্মের সমগ্র ক্ষেত্রকে অর্থ-ব্যবস্থা (ইকনমি) আখ্যা দেওয়া হয়। ভোক্তা বা কনজিউমার হল এই অর্থ ব্যবস্থার নিয়ামক, কারণ অভাব পূরণের জন্যে বাজার থেকে ভোক্তারা যে সব জিনিসপত্র কেনে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই উৎপাদকেরা উৎপাদন করে এবং বিক্রেতারা যোগানের ব্যবস্থা করে। ক্ষেত-খামার কলকারখানা প্রভৃতি সর্বত্রই যে উৎপাদনকার্য চলছে তার লক্ষ্য হল ভোক্তাদের আকাঙ্ক্ষিত জিনিসপত্র যোগান দিয়ে মানসিক্ষা অর্জন করা।

ভোক্তা বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যে অভাব মোচনের জন্যে ভোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। ব্যক্তি কিনুক ভোগ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে বা কেনে নিজের জন্যে নয়—তার পরিবারের জন্যে। এই কারণে অর্থনীতিতে ব্যক্তিকে নয়—পরিবারকেই (হাউসহোল্ড) ভোগের একক বা কনজিউমিং ইউনিট বলে ধরা হয়। সুতরাং অর্থনীতিতে যখন ভোক্তা (কনজিউমার) শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন পরিবারকেই বোঝানো হয়। আমার পরিবারে যদি আমি ছাড়া আর কোন ধূমপায়ী না থাকে, তাহলেও অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সিগারেটের (বা বিড়ির) ক্রেতা হল আমার পরিবার, এবং এর দরুন ব্যয়ও হল পরিবারের ব্যয়।

ভোক্তা হিসেবে পরিবারের আচরণ প্রতিফলিত হয় ব্যয়নির্বাহের (পারচেজ প্ল্যান) মধ্যে। ফোর্ড-বকফেলার-ট্যাটা-বিড়লার কথা ছেড়ে না দিয়েই ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক পরিবারেই আয় সীমাবদ্ধ অথচ অভাবের অন্ত নেই। এই অবস্থায় প্রত্যেককেই বুঝেসুঝে ব্যয় করতে হয়—কোন কোন জিনিস কত কত পরিমাণে কেনা হবে সে-সম্বন্ধে হিসেব করে নির্বাচনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে পরিবারের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা। আরও ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেক পরিবার বা ভোক্তা এই সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রচেষ্টাতে সফলও হয়, কারণ ক্রেতা বা ভোক্তা সিদ্ধান্তবুদ্ধিসম্পন্ন জীব—ইচ রেশনাল কনজিউমার ইজ র‍্যাশানাল। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক পরিবার বা ভোক্তাই জানে যে কিভাবে ব্যয় করলে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক হবে।

নির্বাচন সমস্যা ও পরিবর্তন

কোন কোন জিনিস কত কত পরিমাণে কেনা হবে, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও পরিবার বা ভোক্তাকে জিনিস পত্রের বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যেও নির্বাচন করতে হয়—কোনো জিনিস বেশী কিনলে অন্যান্য জিনিষ কেনার পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। এই দ্বিতীয় নির্বাচনকেই বলা হয় পরিবর্তন (সাবসটিটিউশান)। এ কাজের লক্ষ্য হল মোট উপযোগ বা পরিতৃপ্তিকে সর্বাধিক করে তোলা।

পুজোয় বাজার :

সাধারণ সময়ে ভোক্তা বা পরিবার নির্বাচন (চয়েস) এবং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি লাভের প্রচেষ্টা করে থাকে এবং ধরে নেওয়া হয় যে প্রচেষ্টা সফলও হয়। কিন্তু পালপার্বণ উৎসবের সময় এই হিসেবী ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতি (র‍্যাশানাল পারচেজ প্ল্যান) বজায় থাকে কি?

কয়েক মাস আগে থেকেই আমরা পূজোর জন্যে তৈরী হতে থাকি। আমরা যারা অর্থ যোগান দিই তাদের জীবনে অবশ্য সম্পূর্ণ আবামশ্র নয়, বোহসেবী ব্যয়ের আনন্দের আশার সঙ্গে মিশে থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সম্বন্ধে আশঙ্কা। স্ত্রী ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে গৃহভৃত্য পর্যন্ত সবাই জামাকাপড় প্রাপ্তির আশা করে বসে আছে। এবং যেমন এক জায়গায় ঢেউ উঠলে অন্য এক জায়গা শূন্যগর্ভ হতে বাধ্য, তেমনি তাদের আশাই আমাদের নিয়ে যায় ব্যাঙ্কের খাদের পাশে। অনেক সময় মনে মনে যা প্রকাশ্যে তার অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধতা করলেও আমরাও কি ঠিক হিসেবী ভোক্তার (র‍্যাশানাল কনজিউমার) মতো আচরণ করে থাকি? আমাদের পাড়ার ছেলে যে শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাটে এসে স্ত্রীর জন্যে একশ টাকা দিয়ে শাড়ী কিনল বোনাস পেয়েও দমকা অতটা খরচ করা কি তার উচিত ছিল? তাছাড়া হস্ত পূজোর পরই ঐ শাড়ীখানা ঐ দোকান থেকেই ৮০ টাকায় পাওয়া যেত। আবার কিনতে তখন ঐ দোকান থেকে না কিনলেও চলত। যা হোক ঐ বিশ টাকা অতিরিক্ত খরচের অর্থ হল অন্য জিনিসপত্রের ওপর কিছু টাকা কম কমানো। এইভাবে ব্যয় কমলে নির্দিষ্ট অর্থব্যয়ে পরিবারের পরিতৃপ্তি হতে পারে কি?

মোটামুটিভাবে বলা গেল, উৎসব ইত্যাদির সময়ে আমরা ভোক্তা হিসেবে এক রকম প্রকৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ি—এমনকি আমাদের ব্যয়নির্বাহ রুচি যা অর্থনীতির দোহাই-এ অচরণসঙ্গতের মোটেই প্রতিফলন নয়। এটা সকলেরই জানা যে পূজোর সময় সব জিনিসপত্রের দামই বিশেষ করে জামা কাপড়ের দাম—বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় আবার গুণগত অবনতিও ঘটে। অথচ এই পূজোর সময়ই আমরা বেশী বেশী করে কিনে থাকি।

কোন কোন পরিবার আবার অনেক জিনিসের সারা বছরের কেনাকাটা এই সময়েই সারেন। এটা ব্যক্তির দিক দিয়ে পরিবারের ব্যয়নির্বাহের সমস্যা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিক্রেতারা অনেক ক্ষেত্রে এই সময় ছয় মাসের মুনাফা করে নেয় কিন্তু তাদেরও ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতি অনুরূপ হওয়ার জন্য মালের গুঁড়ি পিপড়েতেই খেয়ে ফেলে।

উৎসবের সময় প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কিছু-না-কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়ে। বড়দিনের উৎসবের কথাই ধরা যাক। ম্যাজাই যে উপহার প্রদানের প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন সমগ্র খৃষ্টান জগতে তা আজ সম্পূর্ণ ব্যাহত। তবে বোধহয় তা আমাদের মত ব্যাপক নয়, এবং ততটা বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কহীনও নয়। বড়দিনের সময় খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা একটা নতুন পোশাক হয়ত কেনে, যথাসাধ্য উপহার দেবার চেষ্টাও করে, কিন্তু সারা বছরের কেনাকাটা সারে না। ফলে উৎসবের পরই আসে না অবসাদ, আর অর্থনৈতিক কাজকর্মও কিছুটা ভাঁটা পড়লেও ঠিক মন্দার সূচনা হয় না। আমাদের কিন্তু তাই-ই নয়। পূজোর পরই বেশ কিছু দিনের জন্যে অর্থনৈতিক জীবনস্রোত হয়ে আসে স্তিমিত। অফিসে বা অন্যত্র যার শোধ করতে হয়, জিনিসপত্রের বিক্রীর পরিমাণ কমে যায়—মোট কথা সম্প্রদায়ের আয় ব্যয় ভাঁটা পড়তে শুরু করে। অর্থনৈতিক কল্যাণের দিকে এর ফলাফল নিশ্চয়ই পর্যালোচনার যোগ্য। জাতীয় আয় নিয়মিত কমাবাড়া করলে অর্থনৈতিক কল্যাণ যদি ব্যাহত হয় তবে পূজোর সময় বোহসেবী ব্যয়ের ফলে পরবর্তী কয়েক মাসে কৃচ্ছ্রসাধনের দরুন মোট অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিমাণ হ্রাস পাবে না কেন?

উপসংহার :

অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একটা নিজস্ব জীবন-পদ্ধতি থাকে। সুশিক্ষা বা উপদেশের মাধ্যমে তাকে হঠাৎ পালটানো শক্ত। তাকে মেনে নিয়েই অর্থনীতির সূত্রগুলোকে বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হয়। ঐতিহ্য-পরম্পরায় আমরা বাঙালীরা পূজোর সময় একটু বোহসেবী হয়েই থাকি। এতেই তৃপ্তি পাই, যদিও হয়ত উপভোগ সর্বাধিক করতে পারি না। এই তৃপ্তির হিসেব অর্থনীতিতে ঠিক করা যায় না, মাত্র উপভোগ ও পরিতৃপ্তির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই ধরে নেওয়া হয়। তবুও কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতির পর্যালোচনায় আমাদের ব্যয়নির্বাহ পদ্ধতির একটু বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয়। সত্যি সত্যিই অনেক ব্যাপারেই অর্থনীতির সূত্রগুলোকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত আকারে আমাদের অর্থব্যবস্থার পর্যালোচনায় প্রয়োগ করা যায় না। ব্যানার্জের এই কথাই বলেছিলেন। র‍্যানার্জের অভিযুক্তকে মেনে নিয়ে যদি একটু দৃষ্টিপাত করি তবে আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার কিছুটা বিশ্লেষ্য নিজেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সমস্যার সমাধানও সহজতর হবে।

গরমিল ॥

রাজলক্ষ্মী দেবী

যাকে তুমি জান্তব, বাস্তব বলো, আমি শুধু তাকে
অচৈতন্য নাম দিই। যেইখান থেকে
উঠে আসে তোমার বাসনা, ক্ষুধা, পৌরুষপ্রহারী
অন্তর্দ্বন্দ্ব, সেই অতলান্তিকের কারবারে
আমি যে দেখেছি রূপ। হাঙ্গরের এলাকা পেরিয়ে
শংখমুক্তাপ্রবালের অন্বেষণে গিয়ে
আমি যে তুলেছি সত্য। অতলডুবুরি আমি,
গভীরের আকর্ষণে বারংবার নামি।

যাকে তুমি নির্লজ্জ, উলংগ বলো, আমি শুধু তার
শিশুমুখ দেখি। প্রাণে গর্ভ-অন্ধকার,
ভীষণ যন্ত্রণা সেই প্রাকৃতিক ধর্মের আচারে।
মায়ার পুতুলি এই সোনার বাছারে
কখনো পালংকে রাখি, কখনো দোলায়।
এ যদি তোমাকে না ভোলায়,
তুমি একে পাপ বলো, রক্তের কলংক বলো, জানি
তোমাতে আমাতে গরমিল কতোখানি।

ব্যক্তিগত চতুর্দশ পঙক্তি ॥

মনোজ নন্দী

নিজের সম্পর্কে কিছু কিছু ন্যুব্জ একান্তর বোধ
থেকে গেছে। কবিতাই এতোল বেতোল
নম্নতায় নেবে যাই, তবু সেই ক্রোধ,—
স্বপ্ন ছিঁড়ে ফেলি, নষ্ট হয় সুশীতল
জলবায়ু; ময়ূর পেখম আর তোলে না অবোধ
শূন্যতার মত কিছু দেয়ালে বিলোল
ঝুলে থাকে ঝুল শাদাপরী স্ববিরোধ
আমাদের জৈবজন্মে ভুল সে সকল।

মনে হয় এইখানে প্রেমিকার মুখ
মানুষের মুখের মতন নয়; কেননা শুদ্ধতা
তারা যেন কোথায় পেয়েছে,—তবুও তা
আমাদের ব্যক্তিগত নয়। এ অসুখ
আমাদের মন থেকে দেহে আর দেয়ালে দেয়ালে
ছড়িয়ে গিয়েছে আজ একান্তর বোধের খেয়ালে।

ঘুমের গভীর শব্দে ॥

গণেশ সেন

এক একদিন আউলিয়া জ্যোৎস্নায় এক অলৌকিক মানুষ
পেতে রেখে যায় লাল চিঠির বাক্স।
হাত বাড়ালেই উড়ে আসে সুদূরে পাখিরা—
ঘুমের গভীর শব্দে উচ্চকিত স্নেহ-ভালোবাসা।

নীল অববাহিকায় ছুটে যায় স্বপ্নের ঘোড়া।
বুকে ফিসফিস করে টেলিগ্রাফের তার।
আঙুলে কাকিয়ে ওঠে গোপন দোতারা।

আমি এক আদিম মায়াবীদের কুহক-বিদ্যায়
সবুজ রুমাল উল্টে উলংগ কবি
খড়ের মতো শাণিত এক সকাল।
সমস্ত দুঃখী মানুষ এবং অভিমানিনীদের
ফেরী করি শুভার্থী অক্ষর।
বিকলাংগ শিশুদের পৌঁছে দেই বড়দিনের কেক্।
মৃত বেড়ালের জন্য পালন করি শোকদিবস।
জ্ঞাতিশত্রুদের উইল করি জমি-জিরেত।

আর ডাক পাঠাই
সুদিনের প্রতীক্ষায় আত্মগোপনকারী বন্ধুদের
ঘরে ফেরার।

তরুণ অপেরার নতুন কীর্তি 'কার্ল মার্কস'

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

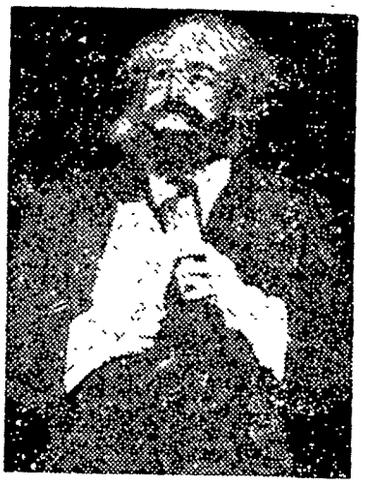

কার্ল মার্ক্সের ভূমিকায়
আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত
যাত্রাজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী
শান্তিগোপাল

"নৌকা করে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যেমন দুঃসাহসের পরিচায়ক, কার্ল মার্ক্সকে আমাদের দেশের বাংলা যাত্রা-পালায় আনয়ন করাও তেমন দুঃসাহসের কাজ"—এই মন্তব্য আমি করেছিলাম তরুণ অপেরার নতুন যাত্রা-পালা 'কার্ল মার্ক্স'-এর প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে। সেদিন সন্ধ্যায় প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমরা দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে সেই অভিনব যাত্রাপালা দেখেছিলাম এবং আজ এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তরুণ অপেরা নৌকা করেই সাফল্যের সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের আগে-কার বহু কীর্তিকে যেন তাঁরা অতিক্রম করে গিয়েছেন এই নতুন যাত্রাপালায়। হিটলার, লেনিন, নেপোলিয়ন, সুভাষ; মহেঞ্জোদাড়ো, ওথেলো ইত্যাদি বহু চমকপ্রদ যাত্রাপালার অত্যন্ত সাফল্য-পূর্ণ অভিনয়ের দ্বারা তাঁরা সেকালের যাত্রার আসরকে শিক্ষিত-অশিক্ষিত মনীষী ও সাধারণ দর্শক অর্থাৎ সব-শ্রেণীর সর্বজনীন মানুষের আসরে উপস্থিত করেছেন এবং বলা যেতে পারে যাত্রাপালার জগতে তাঁরা আধুনিকতার এক আধুনিক চিন্তা-ধারার বিপ্লব এনে দিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স-এর মত জটিল চরিত্র ও তাঁর মতাদর্শের মত দুরূহ বিষয়কে এত সহজ, সুন্দর এবং উপভোগ্যরূপে উপস্থাপনা করা যাত্রাপালার পক্ষে বিপ্লব বৈ কি? মার্ক্স ও মার্ক্সবাদ নিয়ে ঊনবিংশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত তুমুল আলোড়ন ও বিতণ্ডা চলছে এবং এই শতাব্দীর সোভিয়েট বিপ্লব থেকে ভিয়েৎনামের বিপ্লব পর্যন্ত অভূতপূর্ব এবং যুগান্তকারী ঘটনাবলীর সমাবেশ হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে সমগ্র ধন-তান্ত্রিক জগৎ মার্ক্স ও মার্ক্সবাদের নামে আজও কম্পমান। ভারতবর্ষে এর প্রবল তরঙ্গ এসেছে সোভিয়েট বিপ্লবের পর থেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই জনসাধারণের নিকট মার্ক্স-এর চেয়েও লেনিনের নাম সমধিক পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ। কেন না মার্ক্স-এর মতবাদের ভিত্তিতেই লেনিন এই বিপ্লবকে রূপায়িত করেছিলেন এবং তরুণ অপেরা সেই লেনিনকে যাত্রাপালার আসরে এনে "কলিকাতা থেকে মস্কো পর্যন্ত" দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় কার্ল মার্ক্স-এর অভিনয় লেনিনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। লেনিন ও সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে নাটকীয় রোমান্টিক উপাদান ছিল প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু কার্ল মার্ক্স-এর মত বাহ্যতঃ শুষ্ক ও কঠোর চরিত্রের মানুষ জ্ঞানের জগতে যিনি ঋষিতুল্য এবং যাঁর বিস্ময়কর প্রতিভার ও পৃথিবী আলোড়নকারী মতবাদের বা মার্ক্সবাদের অনেকখানিই ছিল পুঁথিপত্রের সীমানায় আবদ্ধ তাঁকে নিয়ে যে এমন আশ্চর্য নাটক সৃষ্টি হতে পারে, এই অসাধ্য সাধন করেছেন তরুণ অপেরা। নাট্যকার হিসাবে শ্রীশম্ভু বাগ যেমন সার্থক, তেমনি অভিনেতা হিসাবে শ্রীশান্তি-গোপাল অনন্য। কার্ল মার্ক্সকে নিখুঁত রূপসজ্জায় জ্ঞানগর্ভ সংলাপে এবং অপূর্ব ব্যক্তিত্বের চরিত্রায়ণে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তার তুলনা নেই। নাট্যকার হয়তো কার্ল মার্ক্স-এর জটিল ও বিস্তৃত জীবনেতিহাস সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন নি এবং যাত্রা-নাটকের খাতিরে ও শিল্পরস সৃষ্টির জন্য তা করা সম্ভবও ছিল না, তবু কার্ল মার্ক্স-এর জীবনালেখ্যের মধ্যে মোটামুটি যে ঐতিহাসিক রেখাচিত্র পাওয়া যায় সেটা নিশ্চয়ই নির্ভর-যোগ্য। তবু বলা যেতে পারে এঙ্গেলস-এর চরিত্রচিত্রণ মার্ক্স-এর পাশাপাশি কিছুটা নিষ্প্রভ। এবং দুর্বল আর ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে সপরিবারে মার্ক্স-এর অভূতপূর্ব লড়াই যদিও অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী, তবু আমাদের মনে হয় অবর্ণনীয় দারিদ্র্য দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার দৃশ্যগুলি বোধহয় আর একটু সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হতো। কেন না মার্ক্স কেবল একজন অসাধারণ জ্ঞানতাপস ছিলেন না, মার্ক্সবাদের উদ্গাতারূপে তিনি ছিলেন জীবনের বিরামহীন যোদ্ধা ও অপোষ-হীন বিপ্লবী। মানুষের ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী দার্শনিক সত্য সত্যই আমাদের জগৎটাকে নাড়া দিয়ে গেলেন আমূল পরিবর্তনের জন্য, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সর্বাত্মক মতবাদের দ্বারা। তবু এমন মানুষেরও প্রেম ছিল, গভীরতর স্নেহ ও প্রীতি ছিল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-পরিবার, এমন কি পরিচারিকার জন্য—যে চরিত্রগুলি বিভিন্ন অভিনেতার ভূমিকায় রূপ পেয়েছে শ্রীমতী মিতা তালুকদার, শীলা চক্রবর্তী, মণিমালা বসু, গীতশ্রী দাস ও সোনালী গোস্বামীর মাধ্যমে। বাড়ীওয়ালা, পাওনাদার, দুধওয়ালা এবং উঞ্ছবৃত্তির ভূমিকায় কিংবা কবি ও মার্ক্স-এর অনুগামীদের অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন যেমন—সর্বশ্রী অজিত দত্ত, শিব ভট্টাচার্য, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন দে, সুদর্শন সেন, সুদেশ কুমার প্রভৃতি তাঁরা যথাসম্ভব এই নাটকের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। প্যারিস কমিউনের বৈপ্লবিক উত্থান ও পতন ইতিহাসের একটা নাটকীয় অধ্যায় এবং দর্শকেরা এই অধ্যায়টিরও একটি রোমাঞ্চকর রূপরেখা পেয়েছেন। মার্ক্স-এর মত এত বড় জীবনযোদ্ধা এবং এত বড় বিপ্লবের উদ্গাতা যেমন আধুনিক পৃথিবীতে দুর্লভ, তেমনি তাঁর জীবনের ট্রাজিডিও অবর্ণনীয়। তাঁর যে মহাগ্রন্থ "দ্যাস্ ক্যাপিটাল" পৃথিবীর চিন্তাক্ষেত্রে প্রায় ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে সেই গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড হাতে নিয়ে মার্ক্স পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। সেই অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সহচর ও সহকর্মী এঙ্গেলস।

বাংলা যাত্রাপালায় কার্ল মার্ক্স অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ধারার বিপ্লব এনে দিয়েছেন। কার্ল মার্ক্স-এর মত এত বড় জীবনযোদ্ধা এবং এত বড় বিপ্লবের উদ্গাতা যেমন আধুনিক পৃথিবীতে দুর্লভ, তেমনি তাঁর জীবনের ট্রাজিডিও অবর্ণনীয়। তাঁর যে মহাগ্রন্থ "দ্যাস্ ক্যাপিটাল" পৃথিবীর চিন্তা-ক্ষেত্রে প্রায় ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছে সেই গ্রন্থের মাত্র প্রথম খণ্ড হাতে নিয়ে মার্ক্স পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। সেই অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সহচর ও সহকর্মী এঙ্গেলস।

বাংলা যাত্রাপালায় কার্ল মার্ক্স অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ' নাকি সত্য সত্যই কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা ঘনঘন মিটিং করছেন এবং জরুরী আলাপ-আলোচনা করতে করতে বিস্কুটের সঙ্গে চা বা কফি পান করছেন কমিটি চেয়ারম্যান রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের রাইটার্স বিল্ডিংস্থ খাস-কামরায় বসে। তাঁদের সমনে বৃহত্তর সরস্যা হচ্ছে সরকার সংরক্ষিত পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা। —সাংবাদিক হিসেবে আমরা মাত্র এইটুকু খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং এর বেশী বিন্দুবিসর্গও নয়। অনুমান করি, সংবাদপত্রকে জানাবার মতো কোনো উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তে 'পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ এখনও পৌঁছোননি; নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই একটি 'সাংবাদিক সম্মেলন' আহ্বান করে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতেন।

একটা মৃদু গুঞ্জন উঠেছে যে, 'উন্নয়ন পর্ষদ'-এর অধিকাংশ সভ্যই নাকি কিছু সংখ্যক চিত্র-প্রযোজকের মধ্যে এই পঁচিশ লক্ষ টাকা বন্টন করে দিয়ে কর্তব্য সমাধা করতে চান। শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে কর্মব্যস্ত ফিল্ম স্টুডিওগুলির আধুনিকীকরণ, বাংলায় রঙীন ছবি তৈরী করবার জন্যে রঙীন ল্যাবরেটারী স্থাপন, বাংলা ছবির মুক্তি-সমস্যার সমাধানের জন্যে কলকাতা এবং মফঃস্বল শহরগুলিতে সিনেমাগৃহ নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ কাজকে ভবিষ্যতের জন্যে মুলতুবী রেখে দিয়ে আপাতত তাঁরা চিত্রপ্রযোজকদের আর্থিক সাহায্য দান করাটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করছেন। জানি না, কথাটা কতদূর সত্য! এবং সত্য হলে, তাঁরা কি উপায়ে কোন্ কোন্ প্রযোজক যথার্থ সাহায্য পাবার যোগ্য বলে নির্ধারণ করবেন, সে-প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে পড়ে। এবং সাহায্যদানের ব্যাপারে 'উন্নয়ন পর্ষদ'-এর বিরুদ্ধে একদেশদর্শিতা, পক্ষপাতত্ব প্রভৃতি অভিযোগ আরোপিত হওয়াও আদৌ অস্বাভাবিক নয়।

এবং আমরা মনে করি, কিছু প্রযোজক সংস্থাকে এক বা দু লাখ টাকা করে অর্থ সাহায্য করার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র শিল্পের বহুমুখী সমস্যার বিন্দুমাত্রও সমাধান হবে না। আমরা উন্নয়ন পর্ষদকে প্রথমেই যে-দিকে মনোনিবেশ করতে বলব, সে হচ্ছে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চলচ্চিত্র প্রযোজক হবার যোগ্যতা নিরূপণ এবং যোগ্যতা নিরূপণের পরে তাদের অনুকূলে এক বা দু বছরের জন্যে সাময়িক লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা। পর্ষদ-এর দ্বিতীয় কর্তব্য হবে ১৯৪৯-৫০ [illegible] সাজে প্রযোজিত হবার জন্যে প্রযোজকদের কাছ থেকে সম্ভাব্য বাজেট সমেত চিত্র-কাহিনী (ফিল্মস্টোরি) ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরের মধ্যে পেশ করবার জন্যে আহ্বান জানানো। দুটি বিশেষজ্ঞ সাব-কমিটি দ্বারা যথাক্রমে চিত্র-কাহিনীগুলির যোগ্যতা এবং তাদের বাজেটের নির্ভুলতা পরীক্ষা করানো এবং ফলাফল ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারী বা মার্চের মধ্যে প্রকাশ করা। এই দুই বিশেষজ্ঞের সাব-কমিটির সদস্যদের জন্যে তাঁদের কর্মের [illegible] যথোচিত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে হবে। যারই কিছু কালোবাজারী টাকা আছে, সেই তার কালো টাকাকে সাদা করবার জন্যে রাতারাতি সেজে বসবে চিত্র-প্রযোজক এবং তার পঞ্চায়ের স্টুডিওপাড়াগুলো ন্যাপলম বা কৌচাকে দাঁড় করাবে চিত্র-পরিচালকরূপে, এই সুযোগ-সুবিধার অচিরে অবসান ঘটানো প্রয়োজন বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্যে। জাতীয় অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপব্যবহার বন্ধ করা বড় প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পর্ষদ-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, প্রয়োজনা-শিল্পে ব্যব-

ছট উইল বি টু লেট টুমরোর দৃশ্য

মাই লাভ টু থি সোয়ালোসের দৃশ্য

হারের জন্যে যোগ্য মানের কাঁচাফিল্ম—পিকচার ও সাউন্ড নেগেটিভ এবং পজিটিভ—যাতে প্রয়োজনমত সরবরাহ হয়, তার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা। দেখা যাচ্ছে, সরকারী প্রতিষ্ঠানজাত 'ইন্দু' পজিটিভের কোনও নির্দিষ্ট মান নেই এবং তার ফলে চমৎকার নেগেটিভ থেকেও ভালো প্রিন্ট বার করা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে ত্রুটি সংশোধনের জন্য পর্ষদকে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হবে। চতুর্থ কর্তব্য হবে, ১৯৭৪-এর এপ্রিলের আগেই আমাদের ফিল্মস্টুডিও এবং ল্যাবরেটারীগুলি যাতে তাদের প্রয়োজনানুযায়ী যন্ত্রপাতি—যার সংগে ৫,৩,২ বা ১ কিলোওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্‌বকেও ধরা হবে—পেয়ে সুপরিচ্ছন্ন সাদা-কালো ছবি তৈরী হবার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

আমাদের 'পশ্চিমবংগ চলচ্চিত্র উন্নয়ন পর্ষদ' যদি আসছে ১৯৭৪-এর মার্চ মাসের মধ্যে এই চারটি অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, তাহলেই আমরা এবং আমাদের সংগে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অযুত শুভানুধ্যায়ীরা তাঁদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবো। সরকার সংরক্ষিত পাঁচিশ লক্ষ টাকা কিভাবে ব্যয় করে কর্তব্যদায় থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এ-সম্বন্ধে অযথা মস্তিষ্ককে ঘর্মাক্ত এবং বৃথা কালাতিপাত করার প্রয়োজন নেই।

২৩ সেপ্টেঃ সকাল ১০টায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে

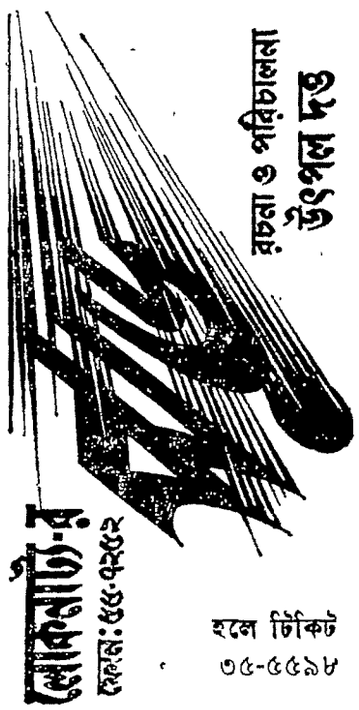

হলে টিকিট

৩৫-৫৫৯৮

চিত্র-সমালোচনা

আশার আলো

ইউনাইটেড ফিল্ম প্রোডাকসন্সের নিবেদন, তানিল ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশিত এবং রাধা ও পূর্ণতে প্রদর্শিত 'আশার আলো'র বিজ্ঞাপনে লেখা হচ্ছে 'রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা—ছবির জগতে নতুন বিস্ময়'। ছবিটি রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরা কিনা, সেটা যাচাই করে দেখবার বিষয়। কিন্তু 'আশার আলো' যে বাংলা ছবির জগতে এক নতুন বিস্ময়, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ছবির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। এ-বিস্ময়—কে, কি, কেন সম্পর্কে। বিচারালয়ে মৃতদেহকে পর্যন্ত হাজির করা হয়েছে। ছবির পরিচালক শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় (পর্দায় তাঁর নাম আছে শম্ভু ব্যানার্জি) নিজেই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যরচয়িতা এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র—গোপীর ভূমিকাভিনেতা। এই গোপী বায়ুর মতো অবাধগতিসম্পন্ন এবং জেট বিমানের চেয়েও দ্রুতগামী—অকুতোভয়, অসমসাহসী বীর, আবার প্রেমিকও বটে। বাংলা চলচ্চিত্রজগতে গোপীর মতো চরিত্রের দেখা এই প্রথম মিলল; কিন্তু উপস্থাপনার দোষে কাহিনীকার-পরিচালকের প্রয়াস মাঠেই মারা গেল। যেমন মারা গেছে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্তের কণ্ঠ এবং কালীপদ সেনের চমকপ্রদ সুরযোজনা এই উপস্থাপনার দোষে। শ্রীমতী শেফালীর ক্যাবারে নৃত্য দর্শকদের কাছে ছবির একমাত্র আকর্ষণ বলে বিবেচিত হবে। আক্ষেপ শোনা গেল—যাঃ, শেষ হয়ে গেল!

ছবির প্রযোজক হচ্ছেন বদ্রীপ্রসাদ গুপ্তা।

—নান্দীকর

স্টুডিও থেকে

অরুণ রায়চৌধুরীর আগামী ছবি ঃ—খ্যাতনামা প্রযোজক-পরিবেশক অরুণ রায়-চৌধুরী অল্প কিছুদিন আগে সমরেশ বসুর বিখ্যাত উপন্যাস 'এপার-ওপার' ছবির বারবিনের একটানা এক আউটডোর শুটিং শেষ করে এসেছেন ওয়ালটেয়ারে। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। বর্তমানে কলকাতার স্টুডিও এবং স্টুডিও চত্বরের বাইরে শেষ পর্যায়ের শুটিং চলছে। ছবির পরিচালক হলেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত। ক্যামেরায় রামানন্দ সেনগুপ্ত এবং সম্পাদনায় আছেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য। এই ছবির আর এক প্রধান সম্পদ আশা ভোঁসলে, মান্না দের কণ্ঠে গাওয়া অপূর্ব গান। একটি বিশেষ নর্তকীর ভূমিকায় আছেন নৃত্যসম্রাজ্ঞী মিস শেফালী। ছবিটি পুজোর পরেই মুক্তিলাভ করবে। প্রযোজক শ্রীরায়চৌধুরী 'এপার-ওপারের' শুটিং শেষ করেই তপন সিংহ কর্তৃক কলকাতায় ইস্টম্যান কালারে প্রফুল্ল রায়ের 'আলোর ফেরা' কাহিনী অবলম্বনে হিন্দী ছবি শুরু করার পূর্বে তাঁর শিশুচিত্র 'লাট্টু'র কাজ ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ করে ফেলবেন। নাম-ভূমিকায় আছেন মাস্টার প্রিন্স।

দুস্থ এবং অসহায় শিল্পীদের সাহায্যার্থে শিল্পী সংসদের নবতম প্রচেষ্টা—দুস্থ এবং অসহায় শিল্পীদের কল্যাণকল্পে শিল্পী সংসদ নিবেদিত, উত্তমকুমার পরিচালিত 'বন পলাশির পদাবলী' ছবির অসাধারণ সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পী সংসদ শিল্পীদের ত্রাণ তহবিলের জন্যে এককোটি টাকার বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে আবার চলচ্চিত্র প্রযোজনায় ব্রতী হয়েছেন। শিল্পী সংসদ খুব শিগগিরই যে দুটি ছবির চিত্রগ্রহণ করতে চলেছেন, তা হলো শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'নুনের পুতুল সাগরে'। ছবি দুটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন শিল্পী সংসদের সভ্যবৃন্দ। এ ছবির পরিচালনায়, সংগীত পরিচালনায়, অভিনয়ে, নৃত্যে ও কণ্ঠসংগীতে সব শিল্পীই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবেন।

ছবি দুটির লভ্যাংশ শিল্পীদের কল্যাণ সাধনে ব্যয়িত হবে। খুব শিগগিরই ছবিগুলির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে বলে শিল্পী সংসদের জন-সংযোগ সচিব জানিয়েছেন।

মঞ্চাভিনয়

কল্যাণ সংঘের সার্ধক নাট্যোপহার 'ময়ূর মহল' ঃ কসবার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ও সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কল্যাণ সংঘের ২৪তম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব সম্প্রতি বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের বহু আলোচিত 'ময়ূর মহল' নাটকটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন কল্যাণ সংঘের সভ্য ও সভ্যাবৃন্দ।

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনীর 'কালিন্দী' ঃ—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রতিষ্ঠিত অভিনয়রীতির সংগে প্রায় সব নাট্যানুরাগীদেরই পরিচিতি আছে। এই মঞ্চসফল নাটকটিকে কয়েকদিন আগে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীর সমন্বয়ে প্রোজ্জ্বল করে তুললেন শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মিলনী। রঙমহলে পরিবেশিত এই নাটকটির নির্দেশনার গুরু দায়িত্ব বহন করেন প্রবীণ নট শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী। প্রয়োগপরিকল্পনার কয়েকটি মুহূর্ত নিঃসন্দেহে শ্রীচক্রবর্তীর পরিণত মনন ও শৈল্পিক মুন্সিয়ানার পরিচয় তুলে ধরে।

অভিনয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রায় প্রতিটি শিল্পীই স্বকীয় চরিত্রের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছেন এবং সেই কারণে নাটকটির টিমওয়ার্কে শৈথিল্য

আসেনি। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত জমিদার 'রামেশ্বর'-এর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন রাধা-গোবিন্দ চক্রবর্তী। অমর চট্টোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্র রায়' একটি কঠোরে কোমলে মেশানো প্রায়ময় চরিত্র-চিত্রণ। মিঃ মুখার্জির ব্যক্তিত্ব চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে সব্যসাচী হাজরার অভিনয়ে। 'কমল মাঝি' রূপে কালীপদ চক্রবর্তী তাঁর পরিণত অভিনয় নৈপুণ্যকে যেন একনতুন আলোয় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। প্রদীপ ভট্টাচার্যর অভিনয় মনে হোল, আরো অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। অচিন্ত্যবাবুর চরিত্রে অনাবিল হাসির রোল তুলেছেন শচীন বসু।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য, অরবিন্দ রায়, নটবিহারী ধর, কালাচাঁদ দত্ত, কমল হাজরা, স্বপন মল্লিক, ইন্দ্রকুমার বিশ্বাস, স্বপন দত্ত, রমাপ্রসাদ। 'সুনীতি, হেমাঙ্গিনী ও সাবির' ভূমিকায় গীতা দে, প্রিয়া চ্যাটার্জি ও আশা বোসের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা এ-নাট্য-প্রযোজনার একটি বিশেষ উল্লেখের দিক। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শচীন বসুর। আলোকসম্পাতেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে। আলো-ছায়ায় গ্রাম্য পরিবেশে কালিন্দী চরটা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল মঞ্চে।

অথ স্বর্গ বিচিত্রা ঃ প্রতীকধর্মী নাটকের মধ্য দিয়ে অনেক গভীরতর সমস্যা সুকৌশলে শিল্পসম্মত উপায়ে মঞ্চের আলোয় উপস্থাপিত করে দর্শকদের সামনে আজকের সমাজের কাঠামোটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা যায়। এই সত্যেরই একটি মোটামুটি সার্থক রূপ ধরা পড়েছে সেদিন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের (নিউ মার্কেট শাখা) 'অথ স্বর্গ বিচিত্রা' নাটকটির প্রযোজনায়। একাডেমি মঞ্চে পরিবেশিত ও রাধারমণ ঘোষ রচিত এই নাটকটি বর্তমান দেশকালের, সমাজনীতি ও অর্থনীতির একটি নিষ্ঠুর অর্থহীন চেহারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছে। নাট্যকার হিন্দু-ধর্মের প্রচলিত দেবদেবীদের কল্পিত আচার আচরণের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের অন্যায়, আর অত্যাচারের কথা অত্যন্ত কৌশলে উপস্থাপিত করেছেন। এদিক থেকে নাটকটি যে একটু বলিষ্ঠ সুরে মুখর তা বলতেই হবে।

অভিনয়ের প্রাণময়তায় বক্তব্যধর্মী এই নাটকটির গতিবেগ কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি। এর জন্য শিল্পীরা যেমন প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন, তেমনি অভিনন্দনযোগ্য নির্দেশক অশ্রু ভট্টাচার্য। অভিনয়ের ব্যাপারে যাঁর নাম প্রথমেই করতে হয় তিনি হোলেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। 'ব্রহ্মা' চরিত্রে তাঁর অভিনয় ও অভিব্যক্তি সত্যি মনে রাখার মতো। একটি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব, হতাশা আর গ্লানিকে নিখুঁতভাবে পরিস্ফুট করেছেন শ্রীমুখোপাধ্যায়। সুবিধাবাদী যুবনেতার ভূমিকায় সাবলীল অভিনয় করেছেন দীপক ঘোষ।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মানিক দাস, রঞ্জিত কর, শান্তনু ব্যানার্জি, সঞ্জয় মিত্র, ব্রজেন বোস, অতনু মুখার্জি।

মঞ্চ পিয়াসের 'উত্তাল বাংলা' ঃ 'জু' রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্বোধন উপলক্ষে মঞ্চ পিয়াস-এর শিল্পীরা ভূপতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তাল বাংলা' নাটকটির একটি সার্থক অভিনয় সম্প্রতি পরিবেশন করলেন।

নাটকটি গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেন্দ্র করে। একটি গ্রামের আদর্শবাদী দৃঢ়চেতা এক শিক্ষকের সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত নেতৃত্বে পাকিস্থানী সেনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কিভাবে দ্রুততর গতিতে এগিয়েছে, তাই ভাষা পেয়েছে এই নাটকের সংলাপে আর সংঘাতে।

বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন গিরিধারী চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীব সেনগুপ্ত, ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ সিনহা, কৃষ্ণানন্দ মজুমদার, অনুকূল দে, বৈদ্যনাথ ঘা, প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত, অমিতা বসু।

নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন সঞ্জীব সেনগুপ্ত।

প্রফুল্ল ঃ হিন্দুস্থান কর্মার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (মানিকতলা শাখা)-এর কর্মীদের উদ্যোগে

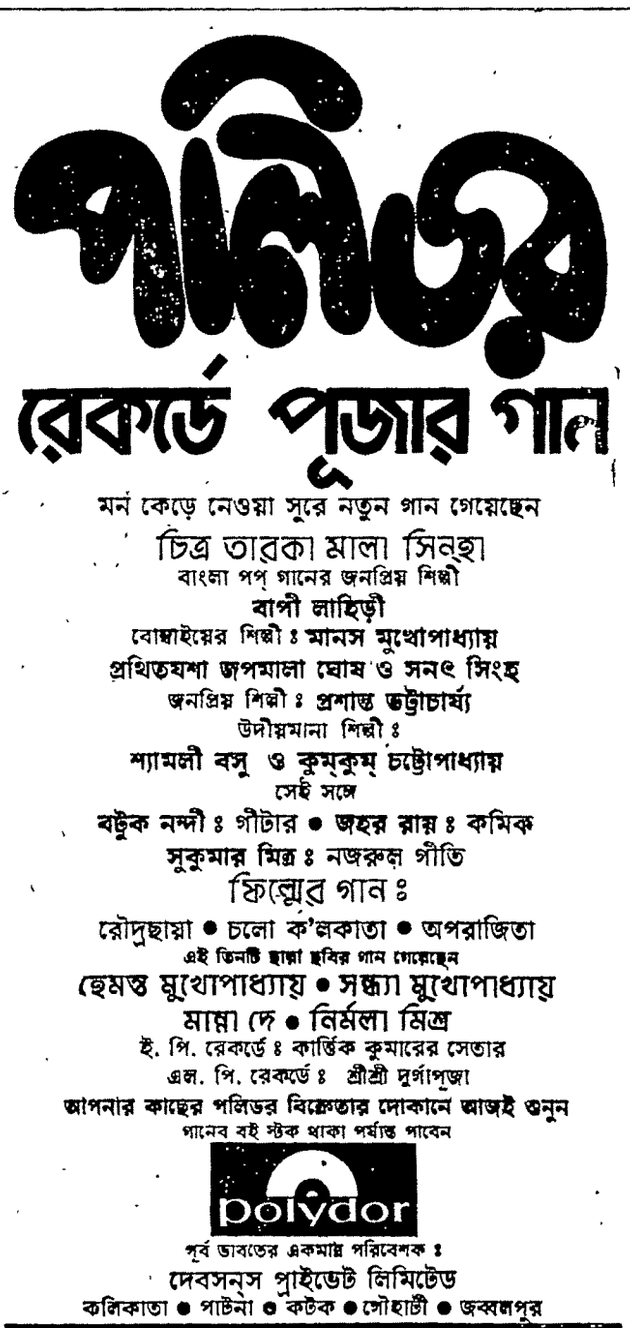

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে পরিবেশিত হোল গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটি। নাট্য-নির্দেশনায় গোকুল সেন আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন সুবীর ট্যান্ডন, মেনকা দেবী, গীতা প্রধান, গীতা নাগ, রমা গুহ, অধীন বিশ্বাস, সুনীল মিত্র, অনন্ত দে, অভয় বিশ্বাস।

পুতুল নাচের ইতিকথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসার এক মনোময় চিত্ররূপ। নাটকের মধ্য দিয়েও জীবনের সেই সাবলীল ভঙ্গিমা, সংলাপ ও সংঘাতের বৈচিত্র পরিস্ফুট নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। কিন্তু ইলাবন্ত ঘোষের নাট্যরূপ বোধ হয় সব সময়ে সেই আমেজ তুলে ধরতে পারেনি। তাঁর নাট্যরূপ সম্প্রতি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করলেন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (কলেজ স্ট্রীট শাখা)-র শিল্পীরা। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীঘোষ নিজে।

শিল্পীদের অভিনয় খুব একটা উন্নত মানের না হোলেও সামগ্রিক অভিনয় কখনো শৈথিল্যে মন্থর হয়ে যায়নি। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন শ্যামল বোস, গোপাল দাস, মধু শ্রীমানি, সুভাষ রায়, প্রশান্ত চ্যাটার্জি, নীতিশ চৌধুরী, গীতা দে, শিবানী ভট্টাচার্য, সঞ্চিতা মুখার্জি, বাসন্তী চ্যাটার্জি, সান্ত্বনা ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, নীলরতন ঘোষ, অমল দাশগুপ্ত, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অমর সাহা, অজিত মন্ডল, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রভাত দাস, শিবনাথ ভট্টাচার্য, সুভাষ সাহা।

রঙ্গনা নান্দীকার

৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত

২২শে শনি ২৭শে বৃহস্পতি ৬॥টায়

নটী বিনোদিনী

২৩শে রবিবার ৬॥টায় ৩৯৩তম

তিন পয়সার পালা

২৬শে বুধবার (মহালয়া) ৩ ও ৬॥টায়

শের আফগান

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়। মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্

১৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।

ফোন : ২৪-৪৭৯৩

বিবিধ সংবাদ

চেকোশ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্রোৎসব

গেল শুক্রবার, ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাতদিন ধরে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগে কলকাতার নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি চলচ্চিত্রোৎসব সুসম্পন্ন হল। ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার ছবির শিল্পগত ও প্রযুক্তিগত সাফল্য সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞভাষণ দেন ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজক শাখার সভাপতি অজিত বসু। সকলকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অ্যাকটিং কনসাল জেনারেল মিস্টার ভ্লাডিমির হেগারও তাঁদের দেশ ও ভারতের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব স্থাপনে এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে এই ধরনের চলচ্চিত্রোৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সভান্তে ১৯৭২-এ ইন্দিরা গান্ধীর চেকোশ্লোভাকিয়া পরিদর্শন সম্পর্কিত 'ভিজিটিং চেকোশ্লোভেকিয়া' নামক তথ্যচিত্র এবং 'দি গ্যাম্বলার' নামে কাহিনী চিত্রটি প্রদর্শিত হয়।

যাত্রা উৎসব

ইডেন উদ্যানের রঙ্গি ইনডোর স্টেডিয়ামে ১৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে যাত্রা উৎসব চলছে, তার উদ্যোক্তা হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ। এই প্রথম সরকারী উদ্যোগে কলকাতায় যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। উৎসবান্তে শ্রেষ্ঠ দল, পালা, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক ও কৌতুকাভিনেতাকে পুরস্কৃত করবার জন্যে একটি বিচারমন্ডলী গঠিত হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মারকপুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্নের উত্তর

সঞ্চিতা রায়চৌধুরী, দমদম

পরিচালক তরুণ মজুমদার এখন কি ছবি তুলছেন এবং সে-ছবির নায়ক ও নায়িকা কে?

—ফুলেশ্বরী। নায়ক-নায়িকা যথাক্রমে অনুপকুমার ও সন্ধ্যা রায়।

বিজয় চট্টোপাধ্যায়, ডিগবয়, আসাম

'রৌদ্রছায়া' চিত্রে উত্তমকুমার যে পিয়ারীলাল বাজের ভূমিকায় রূপদান করছেন, সেটি কি বাঙালী চরিত্র?

—অন্তত শট্ দেবার সময় উত্তমকুমার যে বীরভূম জেলার ঢঙে বাংলা বলছিলেন—এ আমি স্বকর্ণে শুনেছি। চিত্রনির্মাতাদের প্রশ্ন করেছিলাম, ওঁরা বলেছেন, পিয়ারীলাল বাজ্র বাঙালী-ই।

ভারতী কুন্ডু, দুর্গাপুর

স্থানীয় চলচ্চিত্র-শিল্পীদের মধ্যে বর্তমানে কে কে চিত্র-পরিচালনায় ব্রতী হয়েছেন?

—শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী, শ্রীমতী মঞ্জু দে, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীসুখেন দাস, শ্রীজ্ঞানেশ মুখার্জি, শ্রীবিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীউত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়। আরও দু-একজন শুরু করবেন বলে শুনছি।

রমা, বাদল, পুতুল সেনগুপ্ত, কলকাতা-১৯

বাংলা ছবিতে নিয়মিত অভিনয় করেন অথচ বাঙালী নন, এমন শিল্পী আমাদের এখানে আপাতত ক'জন আছেন?

—মহিলাদের মধ্যে বিদ্যা রাও (এঁর পিতা দক্ষিণ ভারতীয়, মা অসমীয়া), নন্দিনী মালিয়া (দক্ষিণ ভারতীয়) এবং পুরুষদের মধ্যে অধ্যাপক এন কিশনাধন (ইনি দক্ষিণ ভারতীয়, ডক্টর কালিদাস নাগের জামাতা)। আপাতত এই ক'জনের নাম স্মরণ হচ্ছে, আরও থাকতে পারেন।

প্রতিমা ও অরূপ মজুমদার, ঘাটশীলা

বাংলা চলচ্চিত্রে সাম্প্রতিক কালে যে-সব নায়িকা এসেছেন, তাঁদের নাম জানাবেন। আর এঁদের মধ্যে বেশী সম্ভাবনা আছে কার—তাও জানাতে ভুলবেন না।

—সাম্প্রতিক কালে নায়িকা হিসাবে এসেছেন রাজশ্রী বসু, জয়শ্রী রায়, জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, রীটা ভাদুড়ী, হাসু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখার্জি এবং মিঠু মুখার্জি। এঁরা প্রত্যেকেই চমৎকার অভিনয় করেন বলে প্রমাণ হয়েছে, তবে এর ভেতর সুমিত্রা, জয়শ্রী—এ-দুজন খুব অল্প দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। মিঠু মুখার্জি হচ্ছেন একজন বিশেষ সম্ভাবনাময় শিল্পী, আমার বিশ্বাস।

কণিকা ঢোল, হাওড়া

লিলি চক্রবর্তী এবং নন্দিতা বসুর খবর কি? ওঁদের অনেকদিন বাংলা ছবিতে দেখিনি।

—লিলি চক্রবর্তী এখন বেশীর ভাগ সময় বোম্বেতেই থাকছেন। ওখানে বেশ কয়েকটি হিন্দী ছবিতে অভিনয় করছেন বলে খবর পাই। আর নন্দিতা বসু বেশীর ভাগ সময় থাকছেন মাদ্রাজে। কয়েকটি তামিল-তেলেগু ছবিতে অভিনয় করছেন বলে শুনেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লিলি চক্রবর্তীও একটি-দুটি দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

সুশীল গাঙ্গুলী, কলিকাতা-৩৪

প্রবীণ অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল এখন কি করছেন?

—কি আর করবেন, অতুলপ্রসাদের গান গাইছেন বিভিন্ন ফাংশনে, সিনেমায় অভিনয় করছেন আর করছেন আপাতত বিশ্বরূপা থিয়েটারে অভিনয়।

নলাই সমন্ত, কলকাতা-১

মাঝখানে জীবেন বসু মারা গেছেন বলে স্টার থিয়েটারে নাকি এক মিনিট নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছিল, অথচ আমি খবর রাখি ভদ্রলোক দিব্য বেঁচে আছেন। ব্যাপারটা কি?

—গুজব। আরও একবার এই রকম একটা মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল জীবেন বসুর এক দৈনিক পত্রিকায় ভুল করে খবর ছাপা হয়েছিল যে, হঠাৎ তালে শিল্পীর মৃত্যু হয়েছে। এবার ছাপা হয়নি তবে ঠিকে ভুল হয়েছিল একটা। মারা গেছেন ওঁর স্ত্রী, বটে গেল জীবেন বসুর মৃত্যু হয়েছে। শিল্পীর নীরোগ দীর্ঘ-জীবন কামনা করছি।

রঞ্জন চৌধুরী, শিলচর, আসাম

'বনপলাশীর পদাবলী' ছবির পর উত্তমকুমার আর কি কি ছবি পরিচালনা করছেন? এছাড়া উনি কি কোন ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন?

—মাঝখানে শুনেছিলাম উনি বঙ্কিম-চন্দ্রের কাহিনী 'রজনী'র চিত্ররূপ দেবেন প্রযোজক অসীম সরকারের হয়ে, এছাড়া শিল্পী সংসদের হয়ে পরিচালক হিসাবে এখনও পর্যন্ত কোন কাহিনী নির্বাচন করে উঠতে পারেননি। সংগীত পরিচালনা করছেন 'সব্যসাচী' ছবির।

শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, মোগলসরাই

শ্রীমতী সুচিত্রা সেনের পরবর্তী ছবির নাম কি? ওঁর কন্যা মুনমুন কি মায়ের দৃষ্টান্তে অভিনয়ের লাইনে আছেন?

—শ্রীমতী সেনের পরবর্তী চিত্র 'দেবী চৌধুরানী'। পরিচালনা করবেন দীনেন গুপ্ত। মুনমুন অভিনয় করেন না, তবে খুব ভাল ছবি আঁকেন। কিছুদিন আগে ওঁর ছবির একটি প্রদর্শনীও হয়ে গেছে কলকাতায় অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে।

—পত্র-পত্রিক

জলসা

'শ্রুতি'র দুটি অনুষ্ঠান : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রসিক-সমাজে নিবেদন করার সংকল্প নিয়ে, আসরে এসেছেন একটি নতুন সংস্থা 'শ্রুতি'। সম্পাদক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রবীন্দ্র-সদনে এঁদের দুটি অনুষ্ঠান হয়ে গেলো। প্রথম অনুষ্ঠানটির নাম রবীন্দ্রসঙ্গীত যুগে, যুগে। দ্বিতীয়টি রবীন্দ্র গীতনাট্যের গান।

প্রথম অনুষ্ঠানটির বক্তব্য ছিলো [illegible] এমন একটা গান আছে যা গায়নরীতির পরিবর্তন সত্ত্বেও তার চরিত্র অক্ষত রাখে। ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হলেও রবীন্দ্রসঙ্গীত মন্দাকিনীর মোহানা তার উৎসের মতো একই।

এই বক্তব্যটি সপ্রমাণ উপস্থিত করবার জন্যই শ্রুতির নিবেদন 'রবীন্দ্রসংগীত যুগে যুগে।'

অনিবার্য কারণবশতঃ শুভাচার্যের 'সাতদিনের শুভাশুভ' এবং বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস' এ-সপ্তাহে প্রকাশ করা গেল না। আগামী সপ্তাহ থেকে যথারীতি প্রকাশ করা হবে। —অঃ সঃ

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সম্বর্ধনা জানানো হয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীযুক্তা অমিয়া ঠাকুরকে। এঁরা গান গেয়েও শোনান।

প্রথম পর্বের সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—যথাক্রমে সুবিনয় রায়, গীতা সেন, নীলিমা সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, ঋতু গুহ, গীতা ঘটক, অর্ঘ্য সেন, রনো গুহঠাকুরতা ও সুপর্ণা চৌধুরী (ঠাকুর)। আপনাপন যুগের ও চিন্তার গায়নশৈলীর স্বাক্ষর এঁদের সবার গানেই ছিলো। একটি উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল ঠাকুরবাড়ীরই অন্যতমা শিল্পী অমিয়া ঠাকুরকে দিয়ে যে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠান শেষ হোল ঠাকুরবাড়ীর এ যুগের বধূ সুপর্ণা চৌধুরীকে দিয়ে।

দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রুতির শিল্পীরা। শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পরিচালনায় এঁদের গাওয়া প্রত্যেকটি গানে সুর সঞ্চার মাধুর্যে হৃদয়স্পর্শী। গানগুলি হোল 'এই তো ভালো লেগেছিল', 'গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে', 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার', 'আমি হেথায় থাকি শুধু', 'বেঁধেছ প্রেমের পাশে', 'প্রতিদিন তব

চিত্রনাট্য কে. কে. মহাজন • সঙ্গীত আনন্দ শঙ্কর
শ্রেষ্ঠ—ধৃতিমান - সিমি - বিজন ভট্টাচার্য - জোছন দস্তিদার - প্রভাস সরকার ও অসীমা সিংহ
এলিটে ২৭শে সেপ্টেম্বর আসছে
বিলিমোরিয়া অ্যান্ড ম্যানার্জী পরিবেশনায়

গাথা', 'আমার মন তুমি নাথ', 'ঐ যে ঝড়ের মেঘের', 'কোথা হতে বাজে প্রেম বেদনায়', 'দূরে কোথায় দূরে দূরে', 'কোথায় তুমি, আমি কোথায়' 'যায় নিম্নে যায় আমায়'। একক সঙ্গীতে ছিলেন রমা দে, শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুশ্রী মিত্র, চৈতালী বসু, গোপাল পাত্র ও শ্রীপর্ণা ভট্টাচার্য। ঘোষণায় ছিলেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। যন্ত্র-সঙ্গীতে সুভাষ চৌধুরী, রমেশ চন্দ্র ও জহর দে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি হোল ৯ সেপ্টেম্বর, ঐ একই মঞ্চে। বিষয় রবীন্দ্র-নাথের 'গদ্যনাট্যের গান'। পরিবেশনা ও পরিকল্পনায় ছিলেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। অশোকবাবু শুধু শিল্পীই নন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিকের, আংগিক, ভাব ও রসের ঐশ্বর্যলোকে প্রবেশ করে তার বিচিত্র রস আস্বাদন করেই শুধু তিনি তৃপ্ত নন, সেই আনন্দ ছড়িয়ে দিতে চান রসিক মহলেও। 'গদ্যনাট্যের গান' তার এই ভাবঅধ্যয়নেরই অন্যতম ফলশ্রুতি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের গদ্যনাট্যের গানগুলির একটি বিশেষ রসমাধুর্য আছে। কিন্তু এই রমণীয় শ্রী অনেকখানিই হারিয়ে যায় যদি গানগুলিকে তাদের পটভূমিকা ও পরিবেশ বর্জন করে শোনা যায়। গানগুলিকে তাই শাখাচ্যুত করে পরিকেশন না করে যদি সংশ্লিষ্ট সংলাপ ও পরিবেশকেও সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরা যায় তাহলেই তার স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপটি অনুভব করা যায়।

ভাষ্যকে তিনি যথার্থ রূপদান করলেন 'নলিনী' নাটকের প্রেমসঙ্গীত 'হা কে বলে দেবে' দিয়ে শুরু করে 'যদি জোটে বোজ' (বিনিপয়সার ভোজ), শারদোৎসব, প্রায়শ্চিত্ত, রাজা, অরূপরতন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের গানের পথ বয়ে শেষ করলেন 'বাশরী' নাটকের 'পিনাকেতে লাগে টংকার' দিয়ে। মধুর, কৌতুক, বিষণ্ণ ভক্তি ইত্যাদি গানের সঙ্গে সঙ্গে নানান রসের সুররেখায় রবীন্দ্রনাথের মানসলোকও যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অশোকবাবুর গানের কথা বলাই বাহুল্য।

সংলাপে শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরী ঘোষ, শেফালী ব্যানার্জি, পার্থ ঘোষ, শান্ত মুখার্জি, প্রদীপ ঘোষ এবং কৌশিক ব্যানার্জির বর্ণিত চরিত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। দেবদুলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠ ভালই, তবে অতিমাত্রায় কম্পন সৃষ্টি করার দরুণ মাঝে মাঝে তাকে নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম মনে হয়েছে। দীনেশ চন্দর আবহসঙ্গীত অনুষ্ঠানকে সুরের ভাষায় ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছিল। তাপস সেনের আলোক কৃতিত্বের একটি বড় অংশীদার। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যের সহায়ক হয়েছেন রমেশ চন্দ্র, কুমার বীরেন্দ্র-নারায়ণ, জহর দে ও পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য।

সংস্কৃতি সংসদের রজত-জয়ন্তী বর্ষের চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পী, নাট্যকার ও বিদগ্ধ মহলের সমাবেশে যে সংস্কৃতি সংসদের উন্মেষ হয়েছিল ১৯৩১ সালে 'চতুরঙ্গ' নামে, তারই বিকশিত রূপ সংস্কৃতি সংসদ তাঁদের রজত-জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই চারটি আসর নিবেদন করেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের আসর, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান ও কবি সুরকার জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সম্বর্ধনা সভা। মাত্র কয়েকদিন আগে কলামন্দিরে এঁরাই উপহার দিলেন মহিলা শিল্পী মহলের গীতিনাট্য 'কবি'। ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকভাবে নাটক ও নৃত্যনাট্য পরিবেশন করার পরিকল্পনা আছে বলে সংঘসচিব শ্রীমতী তপতী মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে জানালেন।

বিষয়বস্তুর আবেদনে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যেও মহিলা-শিল্পী-মহলের কবি প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শকদের আবিষ্ট করে রেখেছে।

গ্রাম্য কবিয়াল নিতাই গান বাঁধে গান শোনায়। পথই তার ঘর, তাই বিশেষ কোনো ঘরের বাঁধনে সে বাঁধা নয়। এই কবিয়ালের জীবনকে স্নেহ দিয়ে ভিজিয়ে রাখে রাজন। উদাসী কবির জীবনে এসেছিল দুই নারী ঠাকুরঝি ও বসন। কিন্তু জীবনের নানান বিপর্যয়ে একজনকেও সে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করতে পারেনি। হারাতে হোলো দুজনকেই। তখনই গানে গানে জেগে উঠল তার জীবনমথিত বেদনার জিজ্ঞাসা 'জীবন এত ছোটো কেন?'

নাট্যরূপ মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে সর্বশ্রী শিপ্রা মিত্র (কবিয়াল), রাজন (মহিলা) নীলিমা দাস (বসন), এবং মহিলা-শিল্পী-মহলের অন্যান্য শক্তিশালী শিল্পীদের অভিনয় কৌশলে। ঠাকুরঝির ভূমিকায় ছন্দা দেবী সুন্দর করেছেন। তবু বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল পূর্বের এই চরিত্রগুলির অনুভাকে। —চিত্রাঙ্গদা

খেলাধূলা

দর্শক

বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতা

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে আয়োজিত প্রথম বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় আমেরিকা প্রথম স্থান এবং পূর্ব জার্মানী দ্বিতীয় স্থান লাভ করে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রথম স্থান অধিকারী আমেরিকা পেয়েছে মোট ৩৮টি পদক (স্বর্ণ ১৫, রৌপ্য ১৬ ও ব্রোঞ্জ ৭) এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পূর্ব জার্মানীর মোট পদক ২৮টি (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৬ এবং ব্রোঞ্জ ৯)। প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক পেয়েছে এই ৮টি দেশ : আমেরিকা ১৫, পূর্ব জার্মানী ১৩, হাঙ্গেরী ২, ইতালী ২, সুইডেন ২, কানাডা ১, অস্ট্রেলিয়া ১ এবং বৃটেন ১। রাশিয়ার মোট পদক ৫টি (রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ১)। এশিয়া মহাদেশের একমাত্র জাপান পদক জয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে, মোট পদক ৬টি (ব্রোঞ্জ)।

ব্যক্তিগত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন আমেরিকার ১৮ বছরের ছাত্র জিম মন্টগোমেরী। তিনি ৫টি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। পূর্ব জার্মানীর অলিম্পিক সাঁতারু কুমারী কার্নেলিয়া এন্ডার পেয়েছেন ৪টি স্বর্ণ পদক। আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে জিম মন্টগোমেরী নবাগত। অপরদিকে গত ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে কুমারী এন্ডার তিনটি রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন—২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলে, ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ৪×১০০ মিটার মেডলে রীলেতে।

বেলগ্রেডের এই প্রথম বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় মোট ১৫টি নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে। এই আসরের কয়েকটি বিষয়ে একই সাঁতারু আগের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে পুনরায় স্বপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। যেমন হাঙ্গেরীর ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর রোজমেরী কোথার ৮ ঘণ্টার মধ্যে দুবার (হিট এবং ফাইনালে) বিশ্ব রেকর্ড ভাঙেন—হিটে ২ মিঃ ১৫·৪৫ সেকেণ্ডে এবং ফাইনালে ২ মিঃ ১৩·৭৫ সেকেণ্ড সময়ে তিনি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে বিশ্ব রেকর্ড করেন।

অস্ট্রেলিয়ার ১৫ বছরের সাঁতারু স্টেভ হল্যাণ্ডের দুটি বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড করার নজির খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি পুরুষদের ১,৫০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে ৮০০ মিটার দূরত্ব ৮ মিঃ ১৬·২৭ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেন এবং ১,৫০০ মিটার দূরত্বও নতুন বিশ্ব

কার্নেলিয়া এন্ডার
(পূর্ব জার্মানী)

রেকর্ড সময়ে (১৫ মিঃ ৩১·৮৫ সেঃ) শেষ করেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে তাঁর এই প্রথম যোগদান। পূর্ব জার্মানীর অলিম্পিক পদক বিজয়িনী কুমারী কার্নেলিয়া এন্ডার ৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে সাঁতারে অংশ গ্রহণ করে প্রথম ১০০ মিটার দূরত্ব নতুন বিশ্ব রেকর্ড সময়ে (৫৭·৬১ সেঃ) অতিক্রম করেন।

১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে যাঁরা পদক পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার মার্ক স্পিজ এবং অস্ট্রেলিয়ার শেন গোল্ড বাদে অনেকেই বেলগ্রেডের প্রথম বিশ্ব সাঁতারের আসরে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে ২২ বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মার্ক স্পিজ ৭টি স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে একই বছরের আসরে যে-কোন খেলায় সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড করেন। অপরদিকে ১৫ বছরের স্কুল-ছাত্রী কুমারী শেন গোল্ড পেয়েছিলেন মোট ৫টি পদক (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১)। এঁরা দুজনেই আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসর থেকে অকালে অবসর নিয়েছেন।

১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতার এবং সদ্যসমাপ্ত ১৯৭৩ সালের প্রথম বিশ্ব সাঁতার—এই দুই আসরেই স্বর্ণ পদক এবং নতুন বিশ্ব রেকর্ড করার নজির সৃষ্টি করেছেন—পুরুষদের ব্রেস্ট স্ট্রোকে আমেরিকার জন হেঞ্চেকেন এবং পুরুষদের ব্যাক-স্ট্রোকে পূর্ব জার্মানীর রোল্যান্ড মাথেস। মেয়েদের সাঁতারে প্রভূত উন্নতির পরিচয় দিয়েছেন পূর্ব জার্মানীর রোজমেরী কোথার। ১৯৭২ সালের ২০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে তিনি মাত্র ৪র্থ স্থান পেয়েছিলেন। আর ১৯৭৩ সালের প্রথম বিশ্ব সাঁতারের আসরে ২০০ মিটার বাটার-ফ্লাই সাঁতারে তিনি দুবার বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে স্বর্ণ পদক জয় করেন। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর কুমারী কার্নেলিয়া এন্ডার যেখানে তিনটি

আবদুল জব্বার-এর নতুন স্বাদের উপন্যাস

বদর বাউল ৬·০০

লেখক জন-পদ-জীবনের অতি আপনজন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অজ্ঞাত জন-জীবনের অলৌকিক কাহিনী। তাঁর পূর্বেকার সমস্ত লেখাকে ছাপিয়ে গিয়েছে বর্তমান এই উপন্যাস।

প্রকাশিত হল।

মিত্র প্রকাশনী । ২০৬, বিধান সরণী । কলিকাতা-৬

রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন সেখানে ১৯৭৩ সালের প্রথম বিশ্ব সাঁতারের আসরে চারটি স্বর্ণ পদক পেয়েছেন এবং ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

আমেরিকা বনাম পূর্ব জার্মানী

আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে আমেরিকা আজ 'জাত সাঁতারু' হিসাবে চিহ্নিত। উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক সাঁতারে (১৯৬৪, ১৯৬৮ ও ১৯৭২) আমেরিকা সর্বাধিক স্বর্ণ এবং সর্বাধিক মেট পদক জয়ের সূত্রে অলিম্পিক সাঁতারের চূড়ান্ত পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়ে এসেছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেশের পদকের তুলনায় আমেরিকার পদকের সংখ্যা অনেক বেশী—আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেই শক্তিশালী আমেরিকাকে অল্প-পূর্ব জার্মানী হাতের নাগালে এনে ফেলেছে। গত ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকার পদক সংখ্যা ছিল এইরকম : পুরুষ বিভাগে মোট ২৭ (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ১০ ও ব্রোঞ্জ ৮) এবং মহিলা বিভাগে মোট পদক ১৮ (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৫ ও ব্রোঞ্জ ৪)। পুরুষ ও মেয়েদের মোট ৮৭টি পদকের মধ্যে আমেরিকা একাই ৪৫টি পদক পেয়েছিল। দুই বিভাগের ৩৩টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে আমেরিকা সংগ্রহ করেছিল ১৮টি স্বর্ণ পদক।

১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে পূর্ব জার্মানীর পদক ছিল এইরকম : পুরুষ বিভাগে মোট পদক ৪ (স্বর্ণ ২, রৌপ্য ১ ও ব্রোঞ্জ ১) এবং মেয়েদের বিভাগে মোট পদক ৫ (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ১)।

এবার ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারে যে ২৩টি নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল তার হিসাব লক্ষ্য করুন—পুরুষ বিভাগে নতুন বিশ্ব রেকর্ড মোট ১২টি—আমেরিকা ১টি, পূর্ব জার্মানী ১টি, জাপান ১টি এবং সুইডেন ১টি। মেয়েদের বিভাগে ১১টি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে আমেরিকা ৭টি, অস্ট্রেলিয়া ৩টি এবং জাপান ১টি। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক সাঁতারের আসরে পূর্ব জার্মানী কোন দিক থেকেই আমেরিকার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এখন দেখুন ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানী কিভাবে আমেরিকার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা নিয়েছিল। এই আসরে আমেরিকার মোট পদক ৩৮ (স্বর্ণ ১৫, রৌপ্য ১৬ ও ব্রোঞ্জ ৭) এবং পূর্ব জার্মানীর মোট পদক ২৮ (স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৯)। আমেরিকার মোট স্বর্ণ পদক ১৫টি এবং পূর্ব জার্মানীর মোট স্বর্ণ পদক ১৩টি। নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছিল ১৫টি—পুরুষ বিভাগের ৭টি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে আমেরিকার ৩, অস্ট্রেলিয়ার ২, ইংল্যান্ডের ১ এবং পূর্ব জার্মানীর ১। মেয়েদের ৮টি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের মধ্যে পূর্ব জার্মানীর ৭ এবং ইতালীর ১।

বিশ্ব রেকর্ড

প্রথম বিশ্ব সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড ১৫টি—পুরুষ বিভাগে ৭টি এবং মেয়েদের বিভাগে ৮টি। পুরুষ বিভাগে আমেরিকা ৩টি, অস্ট্রেলিয়া ২টি, পূর্ব জার্মানী ১টি এবং ইংল্যান্ড ১টি। মেয়েদের বিভাগে পূর্ব জার্মানী ৭টি এবং ইতালী ১টি।

পুরুষ বিভাগ

ফ্রিস্টাইল :

৪০০ মিটার : বিক ডেমেন্ট (আমেরিকা)
সময়—৩ মিঃ ৫৮·৯৮ সেঃ

৮০০ মিটার : স্টেভ হলান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
সময়—৮ মিঃ ১৬·২৭ সেঃ

১,৫০০ মিটার : স্টেভ হলান্ড (অস্ট্রেলিয়া)
সময়—১৫ মিঃ ৩৯·৮৫ সেঃ

ব্রেস্ট স্ট্রোক :

১০০ মিটার : জন হেকেন্স (আমেরিকা)
সময়—১ মিঃ ০৪·০২ সেঃ

২০০ মিটার : ডেভিড উইলকি (ইংল্যান্ড)
সময়—২ মিঃ ৯·২৮ সেঃ

বাটারফ্লাই :

২০০ মিটার : রোল্যান্ড ম্যাথেজ (পূঃ জার্মানী)
সময়—২ মিঃ ১·৮৭ সেঃ

রিলে :

৪×২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : আমেরিকা
সময়—৭ মিঃ ৩৩·২২ সেঃ

মহিলা বিভাগ

ফ্রিস্টাইল :

১০০ মিটার : কার্নেলিয়া এন্ডার (পূঃ জার্মানী)
সময়—৫৭·৫৪ সেঃ

৮০০ মিটার : এন ক্যালিগারিস (ইতালী)
সময়—৮ মিঃ ৫২·৯৭ সেঃ

ব্যাকস্ট্রোক :

১০০ মিটার : উলরিকে বিচটার (পূঃ জার্মানী)
সময়—১ মিঃ ০৪·৯৯ সেঃ

বাটারফ্লাই :

২০০ মিটার : রোজমেরী কোথার (পূঃ জার্মানী)
সময়—২ মিঃ ১৩·৭৬ সেঃ

ব্যক্তিগত মেডলে :

২০০ মিটার : এলিন্দ্রা হুবার (পূঃ জার্মানী)
সময়—২ মিঃ ২০·৫১ সেঃ

৪০০ মিটার : জি ওয়েগনার (পূঃ জার্মানী)
সময়—৪ মিঃ ৫৭·৫১ সেঃ

রিলে :

৪×১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল : পূঃ জার্মানী
সময়—২ মিঃ ৫২·৪৫ সেঃ

৪×১০০ মিটার মেডলে : পূর্ব জার্মানী
সময়—৪ মিঃ ১৬·৮৪ সেঃ

চূড়ান্ত পদক তালিকা

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	১৫	১৬	৭	৩৮
পূঃ জার্মানী	১৩	৬	৯	২৮
হাঙ্গেরী	২	১	২	৫
ইতালী	২	১	২	৫
সুইডেন	২	১	১	৪
কানাডা	১	৩	২	৬
অস্ট্রেলিয়া	১	২	২	৫
বৃটেন	১	০	১	২
রাশিয়া	০	৪	১	৫
নেদারল্যান্ডস	০	১	১	২
চেকোশ্লোভাকিয়া	০	১	১	২
ফ্রান্স	০	১	০	১
জাপান	০	০	৬	৬
পঃ জার্মানী	০	০	৩	৩
যুগোশ্লাভিয়া	০	০	১	১

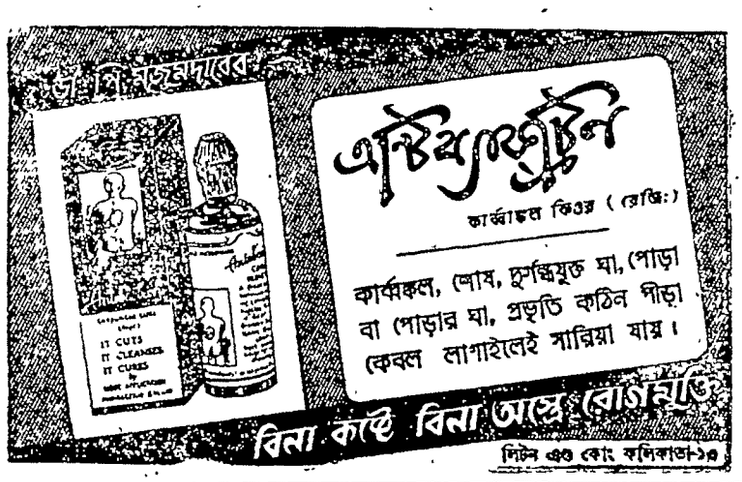

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৪।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আজকের জীবনযাত্রা

ক্লান্তি, অবসাদ, কর্মবিমুখতা, স্নায়ুদৌর্বল্য ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের অধিকাংশের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুস্বাদুকৃত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেব্য।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

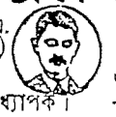

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) - আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C 4352
Gram : AMRITA Calcutta-3

AMRITA

Friday 21st September, 1973
Phone: 55-5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

25 SEP 1973

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লোগো
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

অমৃত

সম্পাদক / শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অশোক চৌধুরী

৩ বর্ষ ২১ সংখ্যা] শুক্রবার ১১ আশ্বিন ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

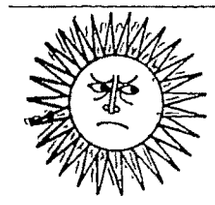

বোরোলীন এই প্রবল গ্রীষ্মে প্রখর রৌদ্রে তপ্তদিনে
স্নিগ্ধ শীতল ছায়ার মত আরামপ্রদ।

রুক্ষ, শুষ্ক, জীর্ণ, তাপদগ্ধ ত্বকে এ সময়ে
বিশেষ করে চাই

সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

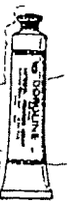

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮৯

শ্রেষ্ঠ লেখক ॥ শ্রেষ্ঠ রচনা

সাহিত্য-জগতের বিস্ময়কর সৃষ্টিকারী গ্রন্থ

যাযাবরের

হ্রস্ব ও দীর্ঘ

মাত্র এক সপ্তাহে প্রথম মুদ্রণ
নিঃশেষিত হবার পর

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

।। দাম পাঁচ টাকা ।।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
আর একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের উপন্যাস

অশান্ত ঘূর্ণি ৮

প্রকাশিত হয়েছে
লেখনকর অন্যান্য বই

সেই মরুপ্রান্তে ১১ নূপুর ৫
কলঙ্ককথা ৬॥ হাসপাতাল ৮॥
কোমলগান্ধার ৮

প্রকাশিত হল
বিস্ময়কর জ্যোতিষী
ভৃগুজাতকের

১৯৭৪ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা

দাম ২। ডাকে ৩·৫০
১৯৭৪ সালের বিস্তৃত রাশিফল লগ্নফল বিবাহবিচার প্রভৃতি তথ্য ও ১৯৭৪ সালের পঞ্জিকা সম্বলিত।

ভৃগুজাতকের অন্যান্য বই

নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন
দুই টাকা

ভাগ্য কখন খুলবে
দুই টাকা

হাত দেখতে শিখুন
চার টাকা

বিমল মিত্রের
যুগোত্তকারী উপন্যাস

আসামী হাজির

মাত্র সাড়ে চার মাসে তৃতীয় মুদ্রণ
প্রকাশিত হলো
১ম খণ্ড—১৫ ২য় খণ্ড—১৫

পেপার ব্যাক ক্লাসিকের
দ্বিতীয় দফার বই

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬
বনফুলের
স্থাবর ৬
অন্নদাশঙ্কর রায়ের
পথে প্রবাসে ৩
প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥
চারখানি একত্রে ষোল টাকা

প্রমথনাথ বিশীর

কেরী সাহেবের মুন্সী

নূতন মুদ্রণ, দাম বারো টাকা।
বিমল করের
নতুন উপন্যাস

সেতু ৪

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
নতুন উপন্যাস

পলাবন ৬॥

জরাসন্ধের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৬॥

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের

তন্ত্রাভিলাষীর

সাধুসঙ্গ

দ্বিতীয় খণ্ড বেরুলো
দাম দশ টাকা
প্রথম খণ্ড—দশ টাকা

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের সমারোহ
নীহাররঞ্জন গুপ্তের

শরাবণী ৩ বহ্নিশিখা ৩
ময়ূরমহল ৩ রাত্রি শেষ ৩
উল্কা ৩ মায়ামৃগ ৩
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের আশাপূর্ণা দেবীর

বিধিলিপি ২ মঞ্জরী ৩
বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্তোষকুমার ঘোষের

অপার্থিব ২
আদর্শ হিন্দু হোটেল ২॥

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

লেখকের সমগ্র রচনাগুলিকে একত্রিত করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করা হচ্ছে। পাঁচ টাকা অগ্রিম জমা নিয়ে গ্রাহক করা হচ্ছে। তারাশঙ্কর ও বিভূতি রচনাবলীর গ্রাহকদের জমা লাগবে না। নভেম্বর মাসে লেখকের জন্মদিনে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবে।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২; ৩৪-৩৪৯২; ৩৪-৮৭৯১

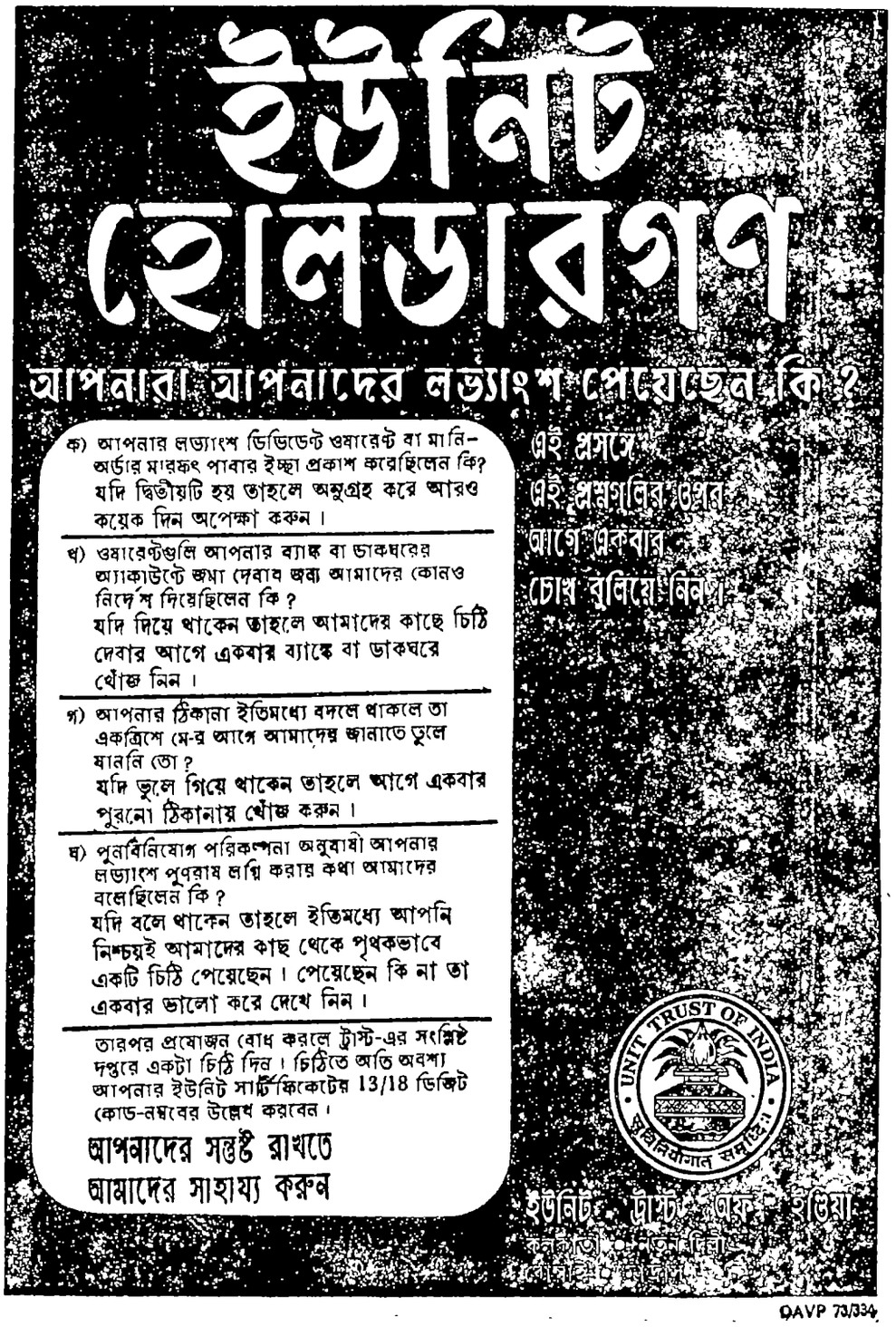
ইউনিট
হোলডারগণ
আপনারা আপনাদের লভ্যাংশ পেয়েছেন কি ?
ক) আপনার লভ্যাংশ ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্ট বা মানি-অর্ডার মারফৎ পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কি? যদি দ্বিতীয়টি হয় তাহলে অনুগ্রহ করে আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করুন।
খ) ওয়ারেন্টগুলি আপনার ব্যাঙ্ক বা ডাকঘরের অ্যাকাউন্টে জমা দেবার জন্য আমাদের কোনও নির্দেশ দিয়েছিলেন কি ? যদি দিয়ে থাকেন তাহলে আমাদের কাছে চিঠি দেবার আগে একবার ব্যাঙ্কে বা ডাকঘরে খোঁজ নিন।
গ) আপনার ঠিকানা ইতিমধ্যে বদলে থাকলে তা একত্রিশে মে-র আগে আমাদের জানাতে ভুলে যাননি তো ? যদি ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আগে একবার পুরনো ঠিকানায় খোঁজ করুন।
ঘ) পুনর্বিনিয়োগ পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনার লভ্যাংশে পুণরায় লগ্নি করার কথা আমাদের বলেছিলেন কি ? যদি বলে থাকেন তাহলে ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাছ থেকে পৃথকভাবে একটি চিঠি পেয়েছেন। পেয়েছেন কি না তা একবার ভালো করে দেখে নিন।
তারপর প্রয়োজন বোধ করলে ট্রাস্ট-এর সংশ্লিষ্ট দপ্তরে একটা চিঠি দিন। চিঠিতে অতি অবশ্য আপনার ইউনিট সার্টিফিকেটের 13/18 ডিজিট কোড-নম্বরের উল্লেখ করবেন।
আপনাদের সন্তুষ্ট রাখতে আমাদের সাহায্য করুন
এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিন।
UNIT TRUST OF INDIA
সহযোগিতায় সমৃদ্ধি
ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
কলকাতা নয়াদিল্লী
QAVP 73/334

১৩শ বর্ষ

অমৃত

২১ সংখ্যা

মূল্য ৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 28th September, 1973 শুক্রবার ১১ আশ্বিন, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	চিঠিপত্র	
৭	সম্পাদকীয়	

বাংলার সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে অদ্বিতীয়

শারদীয় সংখ্যা

ত্রৈমাসিক

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদক

সঞ্জীবকুমার বসু

নবম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮০) শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হচ্ছে পূজার আগেই। এই সংখ্যাটি দুভাগে বিভক্ত। একটি সাহিত্য বিষয়ে ও অপরটি রাজা রামমোহন রায়ের উপর বিশেষ ক্রোড়পত্র। এটি সংগ্রহ করে রাখার মত। মূল্য ৩ টাকা। রেজিস্ট্রী ডাকে ৪-৫০।

॥ লেখক সূচী ॥

* মোহিতলাল সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ঃ পুষ্পেন্দু লাহড়ী * ট্রাজেডির নায়ক ঃ জীবনকৃষ্ণ শেঠ * বাংলা আধুনিক কবিতার মর্মসন্ধান ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় * অন্বেষণের কবি নীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় * হোমন্ত এলোকেশী সংবাদ ঃ যূথিকা বসু *

॥ বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ রামমোহন রায় ॥

* বেদান্তদর্শন ও রামমোহন ঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য * অষ্টাদশ শতক রামমোহন এবং যুক্তিবাদ ঃ নির্মল ঘোষ * বাংলা গদ্যের ইতিহাস ও রামমোহন ঃ ভূদেব চৌধুরী * নীল চাষের ইতিবৃত্ত ও রামমোহন ঃ কুমুদ ভট্টাচার্য * রেনেসাসের তাৎপর্য ও রামমোহন ঃ দিলীপকুমার নন্দী * এছাড়া কয়েকটি আর্ট প্লেট ও পুস্তক পরিচয়।

॥ বিশেষ রচনা ॥

বাঙালী মুসলমানের সাময়িক পত্র—সাধনা (১৮৩১-১৯৩০) এটি লিখেছেন মুস্তফা নূরউল ইসলাম। একশো বছরের মুসলমান সম্পাদিত দেড়শোটি পত্র-পত্রিকার দুর্লভ সংকলন। ইতিপূর্বে কোথাও এইরূপ তালিকা প্রকাশিত হয় নি।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা হল বার্ষিক ১০ টাকা ডাক ব্যয় সহ। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও মূল্যবান রচনার জন্য এই পত্রিকা সকলের প্রিয়

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ॥ ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড । কলিকাতা ৭০০০০১

বিদ্যোদয়ের বই

মোহিতলাল মজুমদারের

কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০

সাহিত্য-বিচার ৮·০০

বাংলার নবযুগ ৮·০০

বঙ্কিম-বরণ ৬·৫০

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০

শ্রীমন্তকুমার জানার

রবীন্দ্র মনন ৮·০০

ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ১০·০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র ৬·০০

খগেন্দ্রনাথ মিত্রের

শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১০·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮·০০

গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত

বিদ্যাসাগর ১১·০০

নিখিল সেনের

এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০

ভূদেবভূষণ ভট্টাচার্যের

রবীন্দ্র শিক্ষা-দর্শন ১০·০০

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬·০০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বক্তব্য ৫·০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫·০০

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের

লেখকদের প্রেম ৩·০০

অনন্ত সিংহের

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ১১·০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সন্ধানে ১৩·০০

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯·০০

ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস ২০·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭

পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক

ভোরের স্নিগ্ধ পরশের আমেজে সারাদিন আপনাকে ঘিরে রাখে

শীতল জলে স্নানে যেমন সুখের শিহরণ জাগে···শিশির-ধোয়া ভোরে যেমন খুশীর পরশ লাগে···পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক মাখলে তেমনি মনে হবে ঝরঝরে মনোরম···সারাদিন, সারাক্ষণ। হালকা-সুবাস জড়ানো এই ট্যালক ঘাম টেনে নেয় নিমেষে আর অঙ্গ সৌরভ আপনাকে ক'রে তোলে প্রিয়-সঙ্গিনী! এই ট্যালক সারা বছর সারা শরীরে মাখা যায়।

৩ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ক্যামিলি, লার্জ, মিডিয়াম

পণ্ডস ফেস পাউডার
সব ফেস পাউডারের চেয়ে পণ্ডসের ললনাদের প্রিয়।

টীজব্রো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড
(সীমিত দায়িত্বসহ ইউ.এস.এ.তে সংস্থাপিত)

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮	ঘটনার আয়নায়		—শ্রীসমদর্শী
১২	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১৩	হাত বাড়ালেই	(গল্প)	—শ্রীসুধাংশু ঘোষ
১৮	কুমারী পূজন		—শ্রীসুধর্মন ভট্টাচার্য
১৯	নতুন বই		
২১	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
২৯	প্রদর্শনী পরিক্রমা		—শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়
৩১	বনমানুষের হাড়	(গল্প)	—আবদুল আজিজ আল আমান
৩৪	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৩৫	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৪০	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৪২	রমণীয় রোশ্নি		—শ্রীদীপালি সিংহ
৫১	দক্ষিণ সেরপুরের যাত্রী	(গল্প)	—শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু
৫৭	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৯	প্রতিস্খলন	(গল্প)	—শ্রীরবীন্দ্র দত্ত
৬৫	পিছনে তাকিয়ে	(কবিতা)	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
৬৫	আর কী কী তুমি নিতে চাও	(কবিতা)	—শ্রীঅনন্ত দাস
৬৫	রবিবার	(কবিতা)	—শ্রীঅমিত বসু
৬৬	সাত দিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬৮	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৭	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

প্রকাশিত হল নিগূঢ়ানন্দের প্রকাশিত হল

দিল্লী যখন জাহাঁপনা

ভালবাসা-ঘৃণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দুঃসাহস আর দুর্বলতার সংঘাতে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অথচ রমণীয় এক ঐতিহাসিক উপন্যাস। দাম : সাত টাকা

অমলেন্দু শূরের

স্বপ্নটপ্ন আদতে

শক্তিমান তরুণ লেখকের সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে লেখা এক রোমান্টিক স্নায়ু-শিহর উপন্যাস। চলচ্চিত্রে রূপায়িত হওয়ার জন্য স্থিরীকৃত। দাম : পাঁচ টাকা

পুস্তক প্রকাশনী—৮২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রকাশিত হল

এপার বাংলা

শারদীয় সংখ্যা । ১৩৮০

এ সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখছেন :
ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, ডঃ সরোজমোহন মিত্র ও রবি দাশ।
উপন্যাস লিখছেন :
নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও নিরঞ্জন চক্রবর্তী।
মৌলিক বিজ্ঞান-বিষয়ক উপন্যাস লিখছেন : নারায়ণ চক্রবর্তী।
গল্প লিখছেন :
বনফুল, বিমল মিত্র, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোঃ, আশা দেবী, নির্মলেন্দু গৌতম, দেবীদাস চট্টোঃ ও বিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
কবিতা লিখছেন :
কৃষ্ণ ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী, দেবকুমার ঘোষ, আনন্দরূপ চক্রবর্তী, ঋত্বীটপ্রসাদ দাশশর্মা, রঞ্জিতা সান্যাল ও বাণী রায়।
এ ছাড়া খেলাধুলা ও অন্যান্য ফিচার থাকছে।

এপার বাংলা
১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২।

মহাত্মা শিশিরকুমারের
—কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩.০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২.০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২.০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩.০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২.০০

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

চিঠিপত্র

এই আমাদের দেশ : মেদিনীপুর—(২) সম্পর্কে

অমৃতের গত ১৭ সংখ্যায় (১৪ ভাদ্র ১৩৮০) শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'এই আমাদের দেশ : মেদিনীপুর (২) সম্পদ ও সম্ভাবনা' রচনায় বেশ কয়েকটি তথ্যগত ভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। লেখক ঐ সংখ্যায় ২৭ পৃষ্ঠায় বগড়ী কৃষ্ণরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির সম্পর্কে বলেছেন : 'বগড়ি-কৃষ্ণনগরে শিলাই নদীর বাঁধারে রয়েছে ইঁটের তৈরি কৃষ্ণরায়ের পঞ্চরত্ন মন্দির। বগড়িরাজ গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজাধর রায় সম্পূর্ণ বাংলা শিল্পরীতির এই মন্দিরটি নির্মাণ করান—শিলাই নদীর ডানধারে রঘুনাথবাড়ীতে আছে রঘুনাথজির নবরত্ন মন্দির। বাংলা শিল্পরীতিতে পাথরের তৈরি মন্দির। এটিও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কীর্তি।'

কৃষ্ণরায়ের পঞ্চরত্নমন্দিরটি শিলাই নদীর বাঁধারে না বলে এই নদী উত্তর তীরে অবস্থিত বললে আরও স্পষ্ট করে বলা হয় আর রঘুনাথ বাড়ীর রঘুনাথজীউর নবরত্ন মন্দিরটি শিলাইয়ের দক্ষিণ দিকে। অবশ্য এই নবরত্নটি নদীতীরে থেকে কিছুটা দূরে। রঘুনাথবাড়ী গ্রামের মুসলমান পাড়ায় অবস্থিত দোলমঞ্চটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বগড়ির বিখ্যাত দোলের মেলা এই দোলমঞ্চের সন্নিহিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিলাইয়ের উত্তরতীরবর্তী কৃষ্ণরায়ের বর্তমান পঞ্চরত্ন মন্দিরটি আদৌ বগড়িরাজ গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজাধর রায়ের নির্মিত নয়। মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলে আমার সাম্প্রতিক পরিক্রমণকালে মন্দিরটির দক্ষিণদিকে অবস্থিত (শিলাইয়ের মুখোমুখি) লিপিটি থেকে একথা প্রমাণিত হবে। লিপিটি এই—

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউ। সকাব্দা ১৭৭৭।৭।৮ বাঙ্গলা সন ১২৬২ সাল তারিখ আটঐ অগ্রহায়ণ শ্রীযাদবরাম চট্টোপাধ্যায় সাকিম (উদ্ধার করতে পারা যায়নি).. শ্রীসনাতন মিস্ত্রী সাকিম বিষ্ণুপুর।' ১২৬২ সালে এ মন্দির নির্মাণ করে দেন সম্ভবত গড়বেতার এক আইনজীবী যাদবরাম চট্টোপাধ্যায়। রাজাধর রায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। শোনা যায়, সেই প্রাচীন মন্দিরটি শিলাইয়ের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। সেটি শিলাইগর্ভে বিলীন হওয়ার পর সম্ভবত যাদবরাম চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে একশ আঠারো বছর আগে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান। কিন্তু এটিরও অবস্থা এখন শোচনীয়। স্বাভাবিক অবস্থায়ও এটির শিলাইগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, আর বর্তমান ভয়াল বন্যার তাণ্ডবলীলার কথা ত বাদই দিলাম। জানি না, হয়তো মেদিনীপুরের সাম্প্রতিক বন্যায় এটি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে কিনা। কৃষ্ণরায়ের এই মন্দিরটির সমান পূর্বদিকে নাট মন্দিরটি ভগ্ন এবং প্রবেশ দ্বার ও নহবতখানাও ক্রমবিলীয়মান। কৃষ্ণরায়ের একটি বিশাল ভগ্ন পাথর বাটীও মন্দিরের পশ্চিমদিকে পড়ে আছে দেখা যায়। রঘুনাথবাড়ীর পাথরের নবরত্ন মন্দিরটিতে ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন আছে। বর্তমানে এটি পরিত্যক্ত। রঘুনাথজীউ অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছেন। 'এটিও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কীর্তি' কিনা বলা কঠিন। কারণ এখানে প্রমাণযোগ্য কোন লিপি নেই। লিপির স্থানটি বর্তমানে ফাঁকা। মনে হয় কোন সহৃদয় ব্যক্তি ওটি সরিয়েছেন বেশ কিছুকাল আগে। তবে মন্দিরের গঠন ও কারুকার্যের ভঙ্গী লক্ষ্য করে এটিকে নিঃসন্দেহে বেশ প্রাচীন বলা যায়। অবিলম্বে মন্দিরটির সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হলে এটি যে কিছুকাল পরেই ভূমিসাৎ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। বগড়িরাজ গজপতি সিংহের রাজ্যকাল ১১৬৫-১২২২ খৃষ্টাব্দ বলে অনেকে মনে করেন। কেউ কেউ তাঁকে পনেরো শতকের গোড়ার দিকের লোকও বলেন। যা হোক, ওপরের উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন আশা করি। রঘুনাথবাড়ীর পাথরের নবরত্নমন্দিরটি নয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল এবং জগপতি সিংহের পৌত্র রঘুনাথ সিংহ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে জানা যায়। (যুগান্তরে' ৬ই চৈত্র, ১৩৬৯ সালে প্রকাশিত বগড়ি মন্দির সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।) শ্রীমুখোপাধ্যায় এই মন্দিরগুলিকে 'সম্পূর্ণ বাংলা শিল্পরীতি' বলে বার বার উল্লেখ করায় বিচলিত বোধ করছি। রত্নমন্দিরগুলি সম্পূর্ণ বাংলা রীতি কিনা বিচার্য। প্রবীণ মন্দির গবেষক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষের মতে রত্নমন্দিরগুলিকে মিশ্ররীতির স্থাপত্য বলাই সংগত।

শ্রীমুখোপাধ্যায় এই রচনার এক স্থানে গড়বেতার রাধাবল্লভের মন্দিরটিকে বাংলা আটচালা ধাঁচের বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই মন্দিরটি আটচালা হলেও (আটচালা ধাঁচের নয়) একটু বিশেষত্ব আছে। মন্দিরটির স্থাপত্য ভালভাবে লক্ষ্য করলে সাধারণ আটচালা থেকে এর প্রভেদ চোখে পড়ে। এটির ওপরের চার চাল খোড়ো ঘরের কাটা ওপরের চার চালের মতো। এ ধরনের আটচালা মন্দিরকে বিষ্ণুপুরী কাটচাল মন্দির বলাই সংগত। সদর মহকুমার শালবনীতে যে দুর্গ ও তার মাইল খানেক দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডেশ্বর ও মহামায়ার যে মন্দির দুটির উল্লেখ শ্রীমুখোপাধ্যায় করেছেন সেগুলি মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড়ে অবস্থিত। এ সম্পর্কে রচনায় কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এটি মেদিনীপুর জেলার একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান। এ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া চন্দ্রকোণা শহরের প্রায় মাইল তিনেক দক্ষিণে কেশপুর রাস্তার পাশে সুপ্রসিদ্ধ নেড়া দেউলের উল্লেখ শ্রীমুখোপাধ্যায় করেননি। এটি কামেশ্বরের দেউল নামে পরিচিত এবং উৎকলীয় রেখ দেউল হিসেবে মেদিনীপুর জেলার একটি বেশ প্রাচীন মন্দির। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা-মঙ্গলে' এর উল্লেখ আছে—'বঙ্গের সীমা নেড়া দেউল দেখিয়া।' আগে এই দেউলের পর থেকে উড়িষ্যার সীমা আরম্ভ হোত। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যান ডন ব্রুকের মানচিত্রে চন্দ্রকোণার পরে মন্দিরের একটি প্রতীক চিহ্নিত আছে এবং তার পর থেকে উড়িষ্যার সীমা দেখানো হয়েছে। মানচিত্রে অঙ্কিত সেই প্রতীক চিহ্নটি যে এই নেড়া দেউল, তাতে সন্দেহ নেই। ঘাঁটাল মহকুমায় বাংলা রীতির অজস্র মন্দির থাকলেও সেগুলির সবই শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রদর্শিত তৃতীয় বিভাগের (ইংরেজ শাসনকালে হিন্দুদের তৈরি মন্দির) মন্দির নয়। অন্তত ঘাঁটাল শহরের কোন্নগর অঞ্চলে প্রায় ৫০০ বছরের একটি চার-চালা মন্দির এখনও আছে। মন্দিরটি সিংহবাহিনীর। প্রতিষ্ঠাকাল ১৪১২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ। ইটের এই মন্দিরটির গঠন প্রাচীন ধাঁচের এবং লিপিটি মূল মন্দির সংলগ্ন জগমোহনের সামনের দেওয়ালে অবস্থিত। ঘাঁটাল মহকুমার মধ্যে এই মন্দিরটি একটি বিস্ময়। শুধু মেদিনীপুর জেলায় কেন, সমগ্র বাংলায় এরূপ প্রাচীন মন্দির সুদুর্লভ। এ মন্দিরের একটি ছবি 'অমৃতে'র ২২শে মাঘ, ১৩৭৯ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় লিখিত ধারা বাহিক রচনা 'বাংলার মন্দিরের প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রয়োজন বোধ করলে সেই রচনা ও শ্রীরায় রচিত অন্যান্য আরও রচনা দেখতে পারেন। ঐ মন্দিরের লিপির আলোকচিত্রও 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধে আরও অনেক ভ্রান্তির উল্লেখ করতে গেলে এ পত্র খুবই দীর্ঘ হবে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপসংহার করার আগে সংক্ষেপে আরও দুয়েকটির কথা বলছি। তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরকে তিনি বুদ্ধগয়ার ধরনের বলে কিভাবে মনে করলেন বুঝতে পাচ্ছি না। বুদ্ধগয়া ধরনের একটি মন্দির বীরভূম জেলার খগেড়ার খগেশ্বরের মন্দির। এর আলোকচিত্রও 'অমৃতে' প্রকাশিত হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার মন্দিরবহুল স্থান চন্দ্রকোণার মন্দির ও প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে শ্রীমুখোপাধ্যায় একেবারে নীরব থেকে গেছেন। এখানে বহু প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে রঘুনাথজীউর মন্দিরটি বেশ প্রাচীন ও বিশুদ্ধ উৎকলীয় রেখ দেউলরীতির। অনুরূপভাবে বিস্ময় সৃষ্টি করে হিজলির (কাঁথি মহকুমা) বিখ্যাত মসনদ-ই-আলার মসজিদ অনুল্লেখ।

মেদিনীপুর জেলার মতো বহুরত্ন জেলায় সেখানে অসংখ্য মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য বহু প্রত্নকীর্তির নিদর্শন আছে সেখানে অতি প্রসিদ্ধ উপরি আলোচিত প্রাচীন নিদর্শনগুলির অবশ্যই উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।

প্রণব রায়
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সম্পাদকীয়

এবারের পুজোর ভাবনা

বৎসরের এই সময়ে আসন্ন দুর্গোৎসবের আনন্দবার্তা আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই পুজো পুজো ভাব। প্রথামত শরৎকাল তার সুনীল আকাশ এবং শিউলি-সুবাসিত বাতাসে গ্রাম-বাংলার প্রকৃতিকে মনোহর করে সাজিয়ে তোলার কথা। এবারে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। বাদল দিন যেন যাই যাই করেও কয়েক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আকস্মিক বন্যার স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি আর্ত মানুষের মন থেকে। দুর্যোগের মাঝেই এবার হবে মাতৃ-আবাহন।

প্রতি বৎসরই আমরা এই উৎসবকে অন্তরের সমস্ত শুভকামনা দিয়ে আবাহন করি। হিন্দুদের উৎসব হলেও দুর্গোৎসবের সঙ্গে যেন বাঙালী জাতির সামাজিক মেলামেশা এবং পারস্পরিক হৃদয় বিনিময়ের শুভকামনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জাতীয় আনন্দোৎসবেরই অপর নামে দুর্গোৎসবকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এই উৎসবের সঙ্গে সকলেরই হৃদয়ের যোগ। এই উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব সে কারণেই অপরিসীম।

এবার দেশব্যাপী চরম আর্থিক ও বৈষয়িক সংকটের মধ্যেই আমাদের এই উৎসব পালন করতে হবে। প্রথমে খরা এবং তারপরে বন্যায় দেশের নানাস্থানে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়েছে। প্রকৃতির এই অকরুণতার অভিশাপ বহন করতে হচ্ছে আমাদের। দুর্যোগের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। আমাদের পশ্চিমবাংলাও তা থেকে উদ্ধার পায়নি। বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকাতেও খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কাটা পড়েছে। উপায় নেই রাজ্য সরকারের। কারণ, খাদ্যশস্য সরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তাঁরা দেশব্যাপী খাদ্যাভাবের দোহাই দিয়ে রেশনের বরাদ্দ কাটছেন। পুজোর মুখে এই রেশন কাটা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। খোলা বাজারে কোনো জিনিসে হাত দেবার উপায় নেই। গৃহস্থ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

পূজার সময়ে সকলেরই আশা থাকে প্রিয়জনকে কিছু উপহার দেওয়ার। প্রবাসী আত্মীয়রাও এ-সময়ে আসেন আপনজনের সঙ্গে মিলিত হতে। কিন্তু বাজারের যা অবস্থা তাতে কাকেই বা কি দেওয়া যাবে, কি দিয়েই বা অতিথিকে আপ্যায়ন করা সম্ভব হবে? অবশ্য শিশুদের তো এই উৎসবের দিন কটি আনন্দে কাটতে সকলেই চাইবেন। তা এবার কতটা সম্ভব হবে তা আমরা বলতে পারছি না। কারণ, সংকটের ছায়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আচ্ছন্ন এবং বিবর্ণ।

দুঃসময়ের স্বীকৃতি আছে প্রধানমন্ত্রীর মুখেও। উচ্চ পণ্যমূল্য ও পণ্যঘাটতির ফলে গত বছরের দুঃসময়ের জের এখনও চলছে। জনগণের কষ্টের কথা তিনি উপলব্ধি করেই বলেছেন যে এ সংকট শুধু ভারতের নয় পৃথিবীর সর্বত্রই। মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশেও পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ভারতবর্ষও তার শিকার হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সংকট স্বীকার করেও একথা আমরা বলব, আমাদের সংকটকে আরও বেশি ভয়াবহ ও দুঃসহ করে তুলেছে অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার আবেদন জানিয়েছেন। দেশে খাদ্যঘাটতি আছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিমাণ এমন বেশি নয় যে, দেশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘটতে পারে। বণ্টনব্যবস্থার ত্রুটি এবং মজুতদারদের কারসাজি বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরকার এবং সমাজ যদি সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহলে এই দুর্দশা আরও বাড়বে। সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।

সাধারণ মানুষের সহিষ্ণুতার ওপর বড় বেশি চাপ দিচ্ছে এই সমাজ-বিরোধীরা। তার ফলে নানা জায়গায় খাদ্যের দাবিতে উচ্ছৃঙ্খল ঘটনাও ঘটতে দেখছি। অতি সম্প্রতি মহীশূরে যে খাদ্য-হাঙ্গামা ঘটে গেল তা থেকে আশা করি সরকার শিক্ষা গ্রহণ করবেন। উদ্বেগের কথা এই যে, জনসাধারণের এই ন্যায্য দাবিকে অনেক সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং নাশকতার ভেদবুদ্ধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দুর্দিনের মেঘ কেটে যাচ্ছে। এবার বৃষ্টি ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হবে। খাদ্যশস্য বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হলে জনসাধারণের জন্য সুলভে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর এ আশা সার্থক হোক। জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদা যদি সরকার পূরণ করতে পারেন তাহলে তাঁরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারের সমাজকল্যাণ কর্মসূচী রূপায়ণে সহায়তা করবেন। কিন্তু সেই সামান্য চাহিদাও যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে সরকার শক্তি পাবেন কাদের কাছ থেকে?

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী পুনর্মিলন উৎসবে প্যারিস হলে প্রখ্যাত প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীভূষারকান্তি ঘোষকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীঘোষের বাঁদিকে উপবিষ্ট অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীপি বি মুখার্জি ও উদ্বোধক প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

ঘটনার আয়নায়

দেশের বর্তমান বহুমুখী যে জটিলতর সমস্যা, তার ওপর প্রত্যাশিত আলোকপাত না করায় এবারকার দিল্লী এ আই সি সি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়ে উঠতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথাতেই বলতে হয় যে এই সম্মেলন পার্টির সাংগঠনিক কর্মধারার ওপর কোন একটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলোচনা তুলে ধরেনি। তবুও প্রতিটি সম্মেলনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও আলাদা চেহারা থাকে। সেই দিক দিয়ে দিল্লীর সম্মেলন তার নিজস্ব পথেই চলেছে। প্রায় দেড়শ প্রতিনিধি বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর বক্তৃতা করেন। তাঁদের বক্তৃতা এবং যুক্তিতর্কে সেই সময়ে দেশের রাজনীতির মঞ্চ বেশ মুখর হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাহলেও বলতে হবে ফলশ্রুতি খুব একটা আশাব্যঞ্জক হয়নি। প্রায় ন' মাস আগে বিধাননগরের কংগ্রেস সম্মেলন থেকে প্রতিনিধিরা যখন ফিরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের মনে তীব্র আশা এবং বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্তী দিল্লীতে এ আই সি সি আরো অনেক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। তার ফলপ্রসূ আলোচনা হবে খাদ্যনীতি ও অর্থনৈতিক রূপায়ণ নিয়ে। গমের পাইকারি ব্যবসার অধিগ্রহণ তো সমাপ্ত হয়েছে। এবার তাঁরা শুনবেন তাঁদের নেতাদের মুখ থেকে চালের অধিগ্রহণ ব্যবস্থার কথা। কিন্তু দুঃখের হলেও ব্যাপারটা সত্য যে তাঁদের এ আশা দিল্লীর এ আই সি সি পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে আপাতদৃষ্টিতে হতাশ হয়ে নানা বিরূপের কথা ভাবতে হয়েছে, এবং সেই সূত্রেই দেখা গিয়েছে মতানৈক্যের সম্ভাবনা। আরো কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের যে শিথিল দশা হয়েছে, চালের ব্যবসার অধিগ্রহণ পরিকল্পনাটিও তার ব্যতিক্রম কিছুতেই হতে পারে নি। এটা কিন্তু কোন একটা নতুন ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নয়, ১৯৬৯তে ভুবনেশ্বরের কংগ্রেসে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, চালের মিল সব রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেওয়া হবে। অধিগ্রহণ সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি তো সেখানেই ছিল। বেশ কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর গান্ধীনগরে এ সিদ্ধান্ত বেশ খানিকটা বাস্তব রূপায়ণের আকৃতি পেয়েছে এবং বিধাননগরের সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে বিস্তৃতভাবে।

কিন্তু দিল্লীতে আবার সিদ্ধান্ত এবং রূপায়ণের মধ্যে ব্যবধানটা হয়তো বেশ খানিকটা মর্মান্তিকভাবেই চোখে পড়েছে। তবে একথা সত্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর উদ্দীপ্ত ভাষণে বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, সব রকম প্রতিশ্রুতি পালনে পার্টিকে বদ্ধপরিকর হতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ়তর সংকল্প গ্রহণেই তো বাস্তব ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে উঠবে না। প্রতিটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা যদি সক্রিয় না হন, তাহলে অধিগ্রহণ ব্যবস্থার রূপায়ণ কি করে সম্ভব। তাঁরা যে এ ব্যাপারে সবরকম প্রয়োজনমূলক ব্যবস্থা খুব দ্রুত গ্রহণ করতে পারবেন, এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্ততঃ বর্তমানে তাঁদের আচরণে এ সন্দেহের আভাসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিল্লীর সম্মেলনে তাঁরা কেউ নীরব থেকেছেন, কেউ বলেছেন পুরনো কথা নরম সুরে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেবরাজ উরস। শ্রীউরস অত্যন্ত সংযত ভাষায় সরকারী খাদ্যনীতির অসারতা এবং অযৌক্তিকতাকে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি জোরের সঙ্গে একথাই বলতে চেয়েছেন যে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে বিলি ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই যদি সরকারের নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তাহলে খাদ্যসংকট সব সময়েই থাকবে, এ কষ্ট থেকে মুক্তি আমাদের কোনকালেই মিলবে না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও উচ্চারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁরা যে ন' মাস সময় হাতে পেয়েছিলেন তার

মধ্যেই চালের ব্যবসার অধিগ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ করতে পারতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েও এ ব্যাপারে কোন প্রতিবাদের ঝড় ওঠেনি। পার্টির সমালোচকদের কণ্ঠ যেন স্তব্ধই ছিল বলতে হবে। হাইকমাণ্ডের প্রতিনিধিরা কিংবা এ আই সি সি-র সদস্যরা একেবারেই সোচ্চার হয়ে ওঠেন নি। আশা করা গিয়েছিল চালের ব্যবসার অধিগ্রহণের ওপর বিতর্কমূলক আলোচনাই হবে দিল্লী এ আই সি সি-র একটি বিশিষ্ট দিক; কিন্তু বাস্তবে সে ছবি ফোটে নি।

এ-আই-সি-সি'র ঠিক আগে ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক বসে তাতে শেষ দিকে কর্ম-ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। আগে ঠিক ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ওপর একটি সময়োচিত ও সুপরিকল্পিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে দুটো পৃথক প্রস্তাব গ্রহণেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্ভবত ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ভেবেছিলেন অর্থনৈতিক প্রস্তাবের আগে রাজনৈতিক প্রস্তাবের আলোচনা হোলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সমালোচকদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমা বোধ হয় খুব একটা থাকবে না। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, এ ব্যবস্থা নেতৃবৃন্দের কাছে বেশ এক অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করেছে। কর্ণধাররা যে এ ব্যবস্থা থেকে প্রত্যাশিত ফলই পেয়েছেন, তাও সত্য। এমন কি সব সময়ে প্রতিবাদে মুখর যুবক নেতা শ্রীকৃষ্ণকান্তও ঝড় তোলার লোভ সম্বরণ করেছেন, এবং তার অন্যান্য সাথীরা আলোচনায় অংশ নেন নি। কেন জানি না ক্ষোভ প্রকাশ এবং প্রতিবাদ জানানোর কণ্ঠ প্রায় স্তব্ধই হয়ে গিয়েছিল দিল্লী এ আই সি সি-তে। অর্থনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে প্রায় এগারো ঘন্টা ধরে নিষ্প্রাণ ও নিরুত্তেজ আলোচনা হয়েছে, আলোচনাকে আকর্ষণীয় ও প্রাণময় করে তুলতে কোন সদস্যকে কোন বিশেষভাবে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় নি। যাই হোক অর্থনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়েছে বোম্বেতে গৃহীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে কার্যকর করতে গেলে এখনো অনেক কিছু করতে হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীওয়াই বি চ্যবন, শ্রীসি সুব্রামণিয়াম সদস্যদের এবং প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। পরিকল্পনাগুলোকে রূপায়িত করার চেষ্টায় সরকার কখনোই পিছিয়ে যায় নি।

প্রতিনিধিদের সামনে এই তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরো প্রতিশ্রুতি রেখেছেন যে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধে সব রকম ব্যবস্থা তাঁরা অবলম্বন করবেনই। কিন্তু কবে এর অবতাবণা হবে, সে সম্পর্কে কোন সময় সীমা নির্ধারণ করেন নি তাঁরা। ব্যক্তিগত ভাবে এই তিনজনের ভাষণই কি বর্তমানে সংকটে চালেঞ্জের মোকাবিলা করার পক্ষে যথেষ্ট?

কালো টাকা সঞ্চয় নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে এবার। প্রধানমন্ত্রী সতর্ক করে বলেছেন এ ব্যাপারে যে অভিযুক্ত হবে তাকে কোন মতেই ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু কালো টাকা সঞ্চয়কারীরা অনেক বেশী ধুরন্দর এবং কৌশলী, তারা জানে কিভাবে সরকারী আইনের চোখে ধুলো দেওয়া যায়। সুতরাং ধরা পড়লে এদের ব্যাপারে আরো অনেক বেশী নির্দয় হওয়া প্রয়োজন। সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে আগে যে রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তারই যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহোলে খুব বেশী হৈ চৈ করে কোন লাভ নেই। রাজনৈতিক প্রস্তাবের ওপর আলোচনাতে সাম্প্রদায়িকতার চ্যালেঞ্জের ওপরে অনেক আলোকপাত করা হয়েছে। অনেক গভীরে প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই সমস্যার আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন শুধু কংগ্রেসের নেত্রী হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বের দিকেও নজর রেখে তিনি

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি অনন্য উপন্যাস

সতীকান্ত গুহ-র

চৌধুরী কাস্‌ল্‌

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ কাফ্‌কার কাস্‌ল মনে পড়ে। যদিও দুই লেখকের সমস্যা এক নয় তবু দুজনেই আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন বাস্তব সংসারের ঊর্ধ্বে ও অন্তরালে। সংলাপ গভীর ও নিবিড় উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাক্‌ চাতুরীর উপর নয়। ...চৌধুরী কাস্‌ল্‌ এক নিশ্বাসে পড়বার মতো বই নয়। একবার পড়েও এর মর্মভেদ হয় না। হয় শুধু রহস্য ভেদ। রহস্যকে ছাড়িয়ে গেছে এর মীনিং। তাই বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া চাই। আজকের দিনের ক'খানা বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে এটা খাটে? লেখক আগাগোড়া সূক্ষ্ম রসবোধ ও উন্নত রুচির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে অভিনন্দন।

[যুগান্তর, ১৩ জুলাই '৭৩]

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর কথায় ঃ সম্প্রতি প্রকাশিত 'চৌধুরী কাস্‌ল্‌' অতি বিরল বই-এর একটি। এ বই হাতে নিয়ে খানিক চেয়েও দেখতে হয়, তারপর একবার পড়া সুরু করলে রীতিমত সমস্যাতেই পড়তে হয়। ...এ বই পড়তে আরম্ভ করে ছেড়ে দেবার উপায় নেই। একবার কটি পাতা ওল্টালেই এ বই ঘোর লাগিয়ে দেবে মনে, ঘোর লাগাবে ভাষায়, ভাবে, চরিত্রের বিচিত্র রহস্যে আর কাহিনীর বিন্যাসে ছাড়া আরো অনির্দিষ্ট অস্ফুট কিছুতে। .....'চৌধুরী কাস্‌ল্‌'-এর যিনি স্থপতি সেই সতীকান্ত গুহ-কে মূলতঃ ছোটদের বিশিষ্ট লেখক বলেই আমরা জানতাম। সম্প্রতি কয়েকটি ছোট গল্পে তাঁর নতুন সাধনার বিষয়ে তিনি আমাদের সচকিত করে তুললেও সত্যিই তাঁর কাছ থেকে 'চৌধুরী কাস্‌ল্‌'-এর মত সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

এ উপন্যাসের অভিনব চরিত্র সৃষ্টি কি কাহিনী বিন্যাসের কঠিন কুশলতা শুধু নয়, তাঁর নিজস্ব ভাষার যাদুও ভিন্ন স্বাদের, অত্যন্ত কর্মবহুল জীবনের কোন নেপথ্য সাধনায় কখন লেখক আয়ত্ত করলেও, তাও আমাদের সপ্রশংস কৌতূহলের বিষয়।

[অমৃত ১১ শ্রাবণ ১৩৮০]

বাক্‌-সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড

৩৩ কলেজ রো কলিকাতা—৯

দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রাচীর যেভাবে হোক ধূলিসাৎ করে দিতেই হবে। এই প্রসঙ্গে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে সতর্ক হোতে বলেছেন শ্রীমতী গান্ধী। চিলির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো সেই সব গোষ্ঠীদের সঙ্গে বহিঃশক্তির কোন যোগাযোগ আছে, যারা ভারতীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণই করে থাকে।

সি পি আই-এর সঙ্গে মৈত্রীর ব্যাপার নিয়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভও রাজনৈতিক প্রস্তাব বিষয়ক আলোচনার একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক। প্রস্তাবে বলা হয়েছে সমাজ-তান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সব শক্তির সমন্বয় সাধন করতে হবে; সাম্প্রদায়িকতা, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বামপন্থী চরম মনো-ভাবের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে তীব্র সংগ্রাম। কিন্তু এই ধরনের নিয়মানুগ ও প্রথামাফিক প্রস্তাবে শ্রীএ পি শর্মা, শ্রীসি এম স্টিফেনের মতো নামী নেতারা খুব সন্তুষ্ট হোতে পারেন নি। তাঁরা দাবী করেছেন সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী শক্তির সমন্বয় সাধন, এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন প্রস্তাবে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে হবে এরা কোন দিক থেকে চরমপন্থী থেকে স্বতন্ত্র। এইসব নেতারাই জানতে চেয়েছেন যেসব দল বন্ধ, ধর্মঘট' আহ্বান করে তারাই কি প্রগতিশীল অথবা গণতান্ত্রিক বামপন্থী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে। সরাসরি সি পি আই-এর নাম না করলেও প্রকারান্তরে তাঁরা এখন এই দলের সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাতের অযৌক্তিকতাকে প্রকাশ করতে চাইছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ ব্যাপারে শ্রীশর্মা ও শ্রীস্টিফেনকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন বন্ধুস্থানীয় দল থেকে যদি বিরোধী মনো-ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও সর্বতোভাবে সতর্ক হবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীরায় এ ব্যাপারে বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী হন নি, সি পি আইর নামও তিনি উল্লেখ করেন নি।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রস্তাব খুব একটা উল্লেখের দাবী রাখে না। চিলির সামরিক অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোন প্রস্তাব পাশ হয়নি। এ ব্যাপারে একটা কথা বলা প্রয়োজন, এ সম্পর্কে প্রস্তাবের খসড়া তৈরী এবং অন্যান্য দায়িত্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিংয়ের ওপরে অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে আন্তর্জাতিক ঘটনা-বলীর পর্যালোচনায় শ্রীসিংয়ের পক্ষে খোলা মন নিয়ে এগোনো কঠিন। এবং এই বাধাই চিলির ব্যাপারে প্রস্তাবকে অসম্পূর্ণ রেখেছে বলতে হবে। যাই হোক প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে চিলির সামরিক অভ্যুত্থানের নেপথ্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করেছেন।

সবশেষে একটি কথাই বলতে হয়। দিল্লী এ আই সি সি আবার নতুন করে প্রমাণ করলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেত্রী। মবলঙ্কর হলে স্টেজের ব্যাক ড্রপ হিসাবে রাখা হয়েছে তাঁর বিরাট প্রতিকৃতি। দিল্লীর এ আই সি সি আবার স্পষ্ট করেছে যে কংগ্রেসের সবকিছু গতিবিধি শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষেরও তিনিই কর্ণধার।

* * *

বিধিবদ্ধ রেশন এলাকাতে খাদ্যের বরাদ্দ কমতে কমতে এসে এখন যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে, তা সত্যি মর্মান্তিক। কয়েক মাস আগেও প্রতিটি লোক সপ্তাহে যে পরিমাণ চাল, গম পেতো, তার এক-তৃতীয়াংশ এখন জুটছে। রাজ্য সরকারকে হয়তো নিরুপায় হয়েই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত খাদ্যের বরাদ্দ চেয়ে খুব একটা আশাব্যঞ্জক প্রত্যুত্তর পান নি মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী। এদিকে খাদ্য সংগ্রহের অভিযানও মোটেই জোরদার হয়ে ওঠে নি, আমদানীর ব্যাপারেও দেখা দিয়েছে অনেক অসুবিধা। এর ওপর এসেছে বন্যা ও অনাবৃষ্টির প্রচণ্ড তাণ্ডব। স্বাভাবিকভাবেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে সরকারের ওপর। মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই কয়েক দিন আগে বলেছেন, পারি-পার্শ্বিক অবস্থা এমন এক চূড়ান্ত সীমায় এসে পড়েছে, যাতে রেশন বরাদ্দ কমানো ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু কথা হোল, কতদিন এ রকম 'বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা ব্যবস্থা চলবে?' মুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয়ে কোন আলোকপাত করেন নি। হয়তো এ আঁধারে খুব তাড়াতাড়ি কোন আলোর সন্ধান দেওয়া সম্ভবও নয়। তাই অত্যন্ত কষ্টকর হোলেও এটাই হয়তো সত্য যে, খাদ্য সমস্যা সঙ্কটময় হয়েই থাকবে, যতো-দিন পর্যন্ত বাজারে নতুন শস্যের আমদানী না হয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মুখ্য-মন্ত্রীর বক্তব্যে আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। এবং তিনি যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাও যথেষ্ট অকৃত্রিম। কিন্তু তাঁর এই দুঃখ প্রকাশ ও সমবেদনায় ভরা অভিব্যক্তি মানুষকে বর্তমান খাদ্যের এই অসহনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দেবে না। একথা ভেবে তারা কখনো স্বস্তি পাবে না যে অন্যান্য রেশন এলাকায় এর চেয়েও অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, এমন কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে খাদ্যের পরিমাণ এখানকার চেয়েও কম। কিন্তু গ্রামাদের বক্তব্য হোল, এই যুক্তিতে কি এখানকার রেশন এলাকার লোক সায় দেবে? এদিকে কষ্টের পরিমাণ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। খোলা বাজারে চালের দাম আরো কিছু বেড়ে গেছে। ব্যাপারটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। গমের বরাদ্দ কমে যাওয়ার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই চালের এই ঊর্ধ্বমুখী মূল্যায়ন।

বর্তমান অবস্থাতে যাকে কিছুতেই এড়ানো যাবে না, সেই দুঃখ কষ্টকে স্বীকার করে নিতে কোন বাধা নেই। এবং মানুষ তা নিচ্ছেও। কিন্তু সামাজিক মানুষ হিসেবে আইন অনুযায়ী এই প্রশ্ন কি তাঁরা শাসক-গোষ্ঠীকে করতে পারেন না—কেন খাদ্য-ব্যবস্থার এই মর্মান্তিক ছবি! সত্যি এটা লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় যে রেশনের পূর্ণ বরাদ্দ দিতে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, তাও সংগ্রহ অভিযানে এলো না। অল্প খাদ্য-শস্যের উৎপাদনও কিন্তু এই দুর্বিষহ অবস্থার কারণ নয়। গমের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পরও, এই ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করতে কোন সংঘবদ্ধ প্রয়াস গড়ে ওঠেনি।

তাহলে কোথায় সমাধান? কোথায় সেই প্রয়াস, যার ফলে খাদ্য সংগ্রহের অভিযান তীব্রতর ও আরো অর্থময় হয়ে উঠবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের মধ্যেই তো রয়েছে খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতির ইঙ্গিত।

* * *

দীর্ঘ দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর অবশেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত লাওসে শান্তির প্রতিশ্রুতি স্থায়ী হয়েছে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ ভিয়েনটিন সরকার এবং নিউ লাও হক সাত (কমিউনিস্ট লাওসের রাজনৈতিক সংস্থা) সম্প্রতি এক মৈত্রীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। নতুন করে আবার লাওসকে রক্তাক্ত সংগ্রাম থেকে মুক্ত করার জন্যই শান্তির এই প্রয়াস। চুক্তির বয়ানে আছে আগামী ১০ অকটোবরের মধ্যে লাওসের জন্য গঠিত হবে বারোজনের লাওসের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রিন্স সুভানা ফুমা। পাঁচজন মন্ত্রী আসবেন পাথেট লাও থেকে। আর পাঁচজন নেওয়া হবে ভিয়েন-

শারদীয় অভিনন্দনসহ নতুন উপন্যাস প্রকাশিত হলো.....

অ্যালফা-বিটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রফুল্লকুমার সিংহের জনপদ ৮·০০

এ যুগের কসমোপলিটন সমাজের দিকভ্রান্ত মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ

হেনা চৌধুরী ১০,

ডঃ অসীম বর্ধনের বাঁচতে সবাই চায় ৩·৭৫

॥ উৎসবে অভিনয়সফল কমেডি নাটক ॥

এ লড়াই বাঁচার লড়াই : দুর্বাদল চ্যাটার্জী ৩, (সদ্য প্রকাশিত)

দটি একাঙ্কিকা : শ্রীকৃষ্ণ ১-৬০ **যুদ্ধপুলস ও দুই সখী :** সুহাসিনী দাস ১-৫০

মুক্তি সংগ্রাম : অজিত সেনগুপ্ত ১, **নতুন জীবন :** অজয় গঙ্গোপাধ্যায় ৪-৭৫

জ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস্ লিঃ, ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

টিন সরকার থেকে। বাকি দুজনের পদে দলনিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ থাকবেন। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী দু মাসের মধ্যেই বিদেশী সৈন্যদের লাওসের মাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। এর অর্থ দাঁড়ালো তার দু'শ আমেরিকার বণকৌশলী ও মার্কিন অর্থে পুষ্ট সতেরো হাজার ভাড়াটে থাই সৈন্যকেও মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে একই সময়ে।

একথা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে সমগ্র ইন্দোচীনের পক্ষে লাওসের শান্তি চুক্তি নিঃসন্দেহে এক শুভ ইংগিত বহন করে এনেছে। কম্বোডিয়া এখনো যুদ্ধের কবলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের লোকের মনে এখনো স্বস্তি ফিরে আসে নি। সুতরাং সে দিক দিয়ে বিচার করলে এই ঘটনাকে বর্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে মেনে নেওয়া যায়। সংগে সংগে একটি কথা বলা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। লাওসে শান্তির স্থায়িত্ব কিন্তু বেশ কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে কম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনামে শান্তির পরিবেশ রচনার মধ্যে। নানারকম পারিপার্শ্বিক অস্থিরতার মধ্যে লাওসের একক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এতেই কর্তব্য ফুরিয়ে যাওয়া উচিত নয়। শান্তি চুক্তির পর এখনো দক্ষিণ ভিয়েতনামে পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক হয়নি, সেটা সবারই জানা। সুতরাং সতর্ক হবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। তাছাড়া সুভানা ফুমার নেতৃত্বে গঠিত লাওস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার দায়িত্ব হবে অনেক। অন্তর্বিরোধ বা যে কোন শৈথিল্যের আগমন সম্পর্কে তাঁদের প্রতিমুহূর্তে সচেতন হয়ে থাকতে হবে। এই সরকারের স্থায়িত্বের ওপর বেশ কিছু পরিমাণে নির্ভর করছে লাওসে শান্তির স্থায়িত্ব।

লাওসে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার মূলে চীন ও আমেরিকার আগ্রহ বেশ কিছুটা কাজ করেছে। শান্তির আবহাওয়াকে আরো অনুকূলে এনে দিয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম। ভারত সব সময় শান্তি চেয়েছে, তাই যেখানেই শান্তি প্রতিষ্ঠার ইংগিত এসেছে সেখানেই সে পৌঁছে দিয়েছে তার পূর্ণ সমর্থন। লাওসের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সংগে সংগেই অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার বার্তা ভারত সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে একটা অপ্রিয় সত্য কথা বলা হয়তো খুব একটা অসংগত হবে না। ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারত সব সময়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারে নি বলে কোন কোন মহল থেকে অভিযোগের সুর উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই তিক্ততা ভুলে গিয়ে ভারত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে লাওস শান্তি চুক্তিকে।

কণ্ঠে সেই একই দৃপ্ত ঘোষণা—সাম্রাজ্যবাদীদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, সংগ্রামে আমরা জিতবোই। বলছি কিউবার বীর বিপ্লবী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ফিডেল কাস্ত্রোর কথা। প্রচণ্ড শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর আশ্চর্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কথা সবারই প্রায় জানা। কয়েক দিন আগে দু' দুবার ভারতের মাটি ছুঁয়েছিলেন ডাঃ কাস্ত্রো। একই বলিষ্ঠ সুরে তিনি আমাদের দেশের নেতাদের ও জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি অসামান্য দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করেছেন, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সংগে সংগ্রামে জয় হবে শোষিত মানুষেরই। দিল্লীতে তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী আবেগ-আপ্লুত কণ্ঠে ডাঃ কাস্ত্রোকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন কিউবার বিপ্লবের ইতিহাসে ডাঃ কাস্ত্রোর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তিনি শুধু কিউবার নয়, সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মেহনতিকে এগিয়ে যাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছেন। সম্বর্ধনার উত্তরে ডাঃ কাস্ত্রো জানিয়েছেন ভারতের প্রতি কিউবার পরিপূর্ণ সমর্থন। শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রতিটি পদক্ষেপেই কিউবা ভারতকে সহযোগিতা দেবে একথা বেশ সোচ্চারেই বলেছেন এই বিপ্লবী বীর।

কলকাতার লোক প্রথম বারে হতাশ হোলেও দ্বিতীয় বারে আবেগে উদ্দীপ্ত হয়েছে ডাঃ কাস্ত্রোকে কিছুক্ষণ তাদের কাছে পেয়ে। হ্যানয় থেকে স্বদেশে ফিরে যাবার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন তিনি। পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষ থেকে ডাঃ কাস্ত্রোকে অভ্যর্থনা জানান বাণিজ্য শিল্পমন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ও সমবায়মন্ত্রী ডাঃ নয়নাল আবেদিন। বামপন্থী নেতারাও স্বাগত জানান এই বীর বিপ্লবীকে।

কলকাতা বিমানবন্দরে ডাঃ কাস্ত্রো স্থির নিশ্চয়তার ঘোষণা করেছেন, লাতিন আমেরিকা থেকে সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ ভাবে একদিন নিঃশেষিত হবেই। তিনি বলেছেন, কারো ওপর নির্ভর না করে সাধারণ মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেবে। তিনি আরো বলেছেন ইউরোপের চেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি অনেক পুরনো অপর পক্ষে ইউরোপ ধন-সম্পদে স্ফীত। অনেক শিল্প ও ধনসম্পদ সেখানে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা এসেছে অনেক শোষিত মানুষের রক্ত ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। ডাঃ কাস্ত্রো মনে করেন, এখন নতুন করে শিল্পের উন্নতি করতে হবে, নতুন পথে আত্মোৎসর্গের মনোভাব নিয়ে।

২১।৯।৭৩ —সমদর্শী

আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়।

দয়ারামে আজই আসুন! আপনার পছন্দমত শাড়ী বেছে নিন্। এখানে পাবেন ঐতিহ্য ও উপযোগিতার অপরূপ শাড়ীর সমাবেশ...
অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সম্ভার

দয়ারাম এণ্ড কোং

জি ১/৫, নিউ মার্কেট, কলিকাতা—১৩

ফোন ঃ ২৪-১৪৫০ গ্রাম ঃ রেশম কুটি

সেই লোকটি

আমাদের এক ঘনিষ্ঠজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন খবর পেয়ে আমি, আমার স্ত্রী রত্না ও বন্ধু দেবেশ—তিনজন একটা পিকাপ জোগাড় করে তীরের বেগে কাকভোরে ছুটে গিয়েছিলাম জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার। হাসপাতাল - ডাক্তার - চিকিৎসাপত্র ইত্যাদির খোঁজ-খবর সেরে সেখান থেকে আবার বেরাতে বেরোতে বিকেল হয়ে এল। সাত-মাইলব্যাপী চিলাপাতা রিজার্ভ ফরেস্টের পেট কেটে যে সরু রাস্তা গেছে তার ওপর দিয়ে দক্ষহাতে গাড়ি চালিয়ে নিচ্ছিল আমাদের তরুণ নেপালী ড্রাইভারটি। দুধারে ঘন অরণ্য। বর্ষার জল পেয়ে রাক্ষুসীর মত লকলকিয়ে উঠেছে। কচি চিকন সবুজ-কালো পাতা আর গাছের গুঁড়ি থেকে আশ্চর্য বাস ছড়াচ্ছে, এক গাছ থেকে আর এক গাছের মাথায় জাল বিবন বাঁধতে বাঁধতে ছুটে চলছে সূর্য।

হঠাৎ কয়েকবার থরথরিয়ে উঠে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল পিকাপটি। ড্রাইভার নেমে পড়ল। হ্যান্ডেল চালাল কয়েকবার। তারপর গাড়ির বনেটটা তুলে কিছুক্ষণ থতমত দাঁড়িয়ে থেকে মৃত্যুঘোষণার মত সেই সাংঘাতিক খবরটি জানাল। কার্বন পুড়ে গেছে। সর্বনাশ! জনমানবহীন বিশাল অরণ্যের আমরা তখন ঠিক মাঝামাঝি। অস্তায়মান সূর্য দিকে দিকে চাপ চাপ রক্ত-ধর্ম করছে। আর একটু পরেই সন্ধে নেমে আসবে। সেই সঙ্গে কাছে-দূরের টিলা থেকে জল খেতে নামবে বুনো হাতির দঙ্গল। পাল পাল বাইসনে গাঢ় হয়ে উঠবে অন্ধকার। হেডলাইটে ঝলসে যাবে চিতাবাঘের শরীরের ডোরা। অবাধ্য গিয়ার-বক্সে বারবার লাথি ঝামাচ্ছে বাহাদুর। একটা জেদী বোবা জন্তুর গলার শব্দের মত দু-চারবার গড়গড় আওয়াজ বেরিয়ে তাও বন্ধ হয়ে গেল। কোনো আশা নেই।

রাস্তার ধারে চারজন বেশ কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে রইলাম। তারপর উঠে এধার-ওধার খোঁজ করতে লাগলাম যাতে দু-চারজন স্থানীয় লোকের দেখা পাওয়া যায়। কোথায় কে—ক্রমশই যখন মুষড়ে পড়ছি, দেখি একটি মালবোঝাই ট্রাক ছুটতে ছুটতে আসছে। চারজন মিলে পথ আটকে হাত তুলে ট্রাকটি থামালাম। প্রবীণ পাঞ্জাবি ড্রাইভারকে অনেক অনুনয়-বিনয় করে রাজি করালাম, সে যাতে অন্তত আমাদের মধ্যে জনাদুয়েককে ন্যাশনাল হাইওয়ের একটা জনবহুল পয়েন্টে নামিয়ে দেয়। জোর করে দেবেশ ও রত্নাকে তুলে দিলাম। তাদের উদ্বিগ্ন চার চোখ জানলায় এঁটে ট্রাকটি একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আর একটু পর বেশী খুলে অন্ধকার নামল। নানা অচেনা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল ঐ সাতমাইলব্যাপী আদিম সাম্রাজ্য। কয়েকটা রাতচরা ডাকল। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বিশ্রীভাবে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। বাহাদুর তার হু-সেলের জোরালো টর্চ ক্রমাগত এধার-ওধার নাচাচ্ছে, যেন অন্ধকারের ক্ষত দিয়ে ফিনিক কেটে আলো বেরোচ্ছে। অকস্মাৎ ঠাহর হল, দুটি মোষ তাড়াতে তাড়াতে বনপথ বেয়ে আসছে জনা-তিনেক মুন্ডা কিশোর। মাথাপিছু চার আনা করুল করায় তারা আমাদের অচল গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল অপেক্ষাকৃত ছিমছাম এক জায়গায়, যেখানে চারটে শালখুঁটির ওপর একটি ছোট্ট কাঠের ঘর বা টঙি দেখা যাচ্ছে। রাস্তা থেকে গাড়িটাকে ঢালে ঠেলে দিয়েই ওরা বিদায় নিল।

খানিকটা তকতকে নিকোনো জায়গা। গাড়ির দরজা খুলে দুজন নামতেই টঙি থেকে মেঘগর্জনের মত স্বর ভেসে এল, 'কে বট?' ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি খুঁটির মাথায় জ্বলজ্বল করছে একটি খর্বাকৃতি মানুষের দুটো চোখ। হেঁকে বললাম, 'তুমি কে?' লোকটি ভাবল, বাবু গোছের কেউ। একটু গলা নামিয়ে বলল, বুধিমান ওঁরাও। ফরেস্ট-গার্ড।' কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমাদের দেখে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর একটা দড়ির মই নামিয়ে দিল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে বিনাবাক্যব্যয়ে আমরা তরতরিয়ে ওপরে উঠে গেলাম।

ঢুকে দেখি, প্রায় নিভন্ত একটি লণ্ঠন ঘরের কোণ মৃদু অস্তিত্বে সজাগ রাখার চেষ্টা করছে। একটি দড়ির খাটিয়া, একটি বল্লম ও একখানা গাদা বন্দুক ছাড়া ঘরে প্রায় কিছুই নেই। বুধিমান আঙুল দেখিয়ে আমাদের খাটিয়ায় বসতে ইঙ্গিত করে নিজে দরজার কোণ থেকে একটা টুল টেনে নিল। খুব মন দিয়ে আমাদের বিপদের কথা শুনল। তারপর বলল 'তোমারালা (তোমরা উটি (রুটি) খান দুই-চারিখান।' গ্যাটরার তল থেকে একটি পাত্রের ঢাকনা খুলে যান্ত্রিক হাতে সে আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিল কলাপাতার আধারে খানিকটা হরিণের মাংস ও কয়েকটা জোয়ারের রুটি। ক্ষিদের চোটে পেট পুড়ে যাচ্ছিল, খেতে অমৃত-সমান লাগল। ঘটি থেকে ঢকঢক করে অনেকখানি জল গিলে বুধিমানের দিকে স্থির হয়ে তাকাতে ও আমাদের দিকে কাঁচা গন্ধা, পান ও দুখানা চুট্টা এগিয়ে দিল। তারপর টুলটা নিয়ে দরজার সামনে গিয়ে বসল।

ঘুম আসছিল না। বুধিমানের ব্যস্ততা লক্ষ্য করছিলাম। দূরে থেকে গাড়ির শব্দ শুনলেই মই বেয়ে নেমে যায়, গাড়ি দাঁড় করায়, কথাবার্তা বলে ওপরে উঠে আসে। কখনো হাতে করে নিয়ে আসে দু-এক প্যাকেট চা, ছোট একটিন তেল, বেশ কিছু কমলালেবু, কমলার কয়েকটা বড় চাঙার এমনকি চোরাই ভুটানি মদ। গাড়ি না থামিয়েই পাহাড়ি রাস্তার ওপর টং করে সিকি আধুলি ছুঁড়ে দেয় ড্রাইভাররা, সারারাত সেগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে বুধিমান তিলকে তাল করে।

বাহাদুর ডানবাহুকে বালিশ করে অঘোরে ঘুম দিচ্ছিল। আমারও খানিকটা তন্দ্রা এসে-ছিল। শালকাঠের থামের ওপর মাথা রেখে ঝিমিয়ে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ মাথাটা ঠুকে যেতে চোখ মেলে দেখি ঘর ফাঁকা। আধঘন্টা-তিন কোয়ার্টার কেটে গেল—বুধিমানের কোনো পাত্তা নেই। এদিকে মশার কামড় ও বাহাদুরের নাসিকা-গর্জনের প্রচণ্ড ধ্বনি আমাকে আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছিল না। দুঃসাহসে ভর করে গোটানো দড়ির মইটা ফেলে নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে এলাম। চারপাশে নিকষ অন্ধকার। কান পেতে ঠাহর হল, কিছুটা তফাৎ থেকে ডুকরে ডুকরে মাঝে মাঝে একটা আওয়াজ আসছে..... বু র র র.....বু র র র.....। শব্দকে অনুসরণ করে খানিক এগিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। অভ্রান্ত শুনলাম, গাড়ির ভেতর থেকেই ঐ শব্দ আসছে। চোয়া চাউনি হেনে দেখি ড্রাই-ভারের আসনে খুব তরিবৎ করে বুধিমান বসে আছে, আর মাঝে মাঝে পরম খুশিতে মুখ দিয়ে শব্দ তুলছে বু র র র...বু র র র।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এভাবে তন্ময়কে বিপদে ফেলার কথা ছিল না। জীপখানার উইণ্ডস্ক্রিনে সাঁটা এক-টুকরো কাগজে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে 'টেস্টেড' এবং তার তলায় একজন মেকানিকের সই ও দশ দিন আগের একটা তারিখ। অর্থাৎ মাত্র দশ দিন আগেও পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে জীপটার যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে। অথচ আজই জীপের ইঞ্জিন বিগড়ে যাওয়ায় তন্ময় এমন বিপন্ন হয়ে পড়ল।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি। আকাশে মেঘ ছিল সারা দিনই। রাত দশটার পর এখন সেই মেঘ গোপন ষড়যন্ত্রকারীর মতন ক্রমে পাহাড়ের চুড়োর শাল-সেগুন গাছের আরো কাছে নেমে এসে তুমুল বৃষ্টি ঝরিয়ে দিলে অভিযোগ করার কিছু থাকে না। কিন্তু জীপখানা তো আরো একটু স্বাস্থ্যের উল্লাস দেখাতে পারত। তাহলে অন্ধকার অরণ্যে এমন বিপদে পড়ত না তন্ময়।

রাস্তাটা খাড়াই। আকাশ-ভাঙা বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে জীপটা হিল-গিয়ারে গর্জন করে কালচে-লাল জলের স্রোতের উজানে উঠে আসছিল। বাঁ দিকে খাদ, ডাইনে পাহাড়ের দেয়াল, জঙ্গলাকীর্ণ। রাস্তায় আলো নেই, শুধু জীপের হেডলাইট জ্বালা ছিল। বৃষ্টির ছাঁটে ভেজা স্টিয়ারিং থামচে ধরে তন্ময় দুটো হেডলাইটের প্রসারিত আলোর ঋজু রেখার নাচ দেখছিল। পাথর-মাটিতে মেশানো লোহা-ধোয়া কালচে-লাল জল তোড়ে নেমে আসছিল। অন্তত গোড়ালি ডুবে যাওয়ার মতন গভীর। দারুণ ঝাঁকুনি দিয়ে জীপের ডান দিকের চাকা বিরাট গর্তে পড়ে আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ। এবং তখনই শাল-সেগুনের অরণ্যে কড়ো হাওয়ার গোঙানি, প্রবল বৃষ্টির শব্দ এবং ঝিঁঝির ডাক হঠাৎ যেন নতুন করে তন্ময়কে আক্রমণ করল।

লোহার খনির ইঞ্জিনীয়ার এবং অভিজ্ঞ মোটর ড্রাইভার তন্ময় যা কিছু করবার করে দেখল। না, কোনো লাভ নেই। অন্তত এই বৃষ্টির রাত্তিরে জীপ আর চলবে না। গা শিরশির করছে শীত-শীত ভাব। স্টিয়া-রিংটা ঠাণ্ডা। জীপখানার লোহার তৈরী লাশ ডান দিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। তন্ময়ের সিন্থেটিক মেটিরিয়ালের চকচকে শার্টের ওপরটা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজে সপ-সপে। ভিতর-পকেটে চার হাজার টাকার করকরে নোট। সেখানে অবশ্য বৃষ্টির ছাঁট লাগছে না; নোটের তাড়া রয়েছে ওয়ালেটের মধ্যে। পাহাড়ের চুড়োর কাছে টাউনশিপে তার ছিমছাম কোয়ার্টার এখান থেকে অনেক দূর। চুড়ো থেকে পাহাড় ফুটো করে ভাব-বাঁধা সুতো নামিয়ে দিলে এ জায়গাটায় পৌঁছতে হয়ত মাত্র কয়েকশ' মিটার লম্বা সুতো লাগবে। সুতরাং ভার্টিক্যাল ড্রপ মাত্র

কয়েকশ' মিটার। কিন্তু চূড়োর কাছে টাউন-শিপে পেঁছিতে হলে তো পাহাড়ের কোমর জড়িয়ে-জড়িয়ে তৈরী রাস্তা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে, এখান থেকে অন্তত সাত-আট মাইল। অতএব জলস্রোতের উজানে পাথুরে রাস্তার খানাখন্দ মাড়িয়ে এই ঝড়বৃষ্টির রাত্তিরে হেঁটে কোয়ার্টারে ফেরা অসম্ভব। ঘড়ির কাঁটা এগারটার দিকে। এখন আর অন্য কোনো গাড়ি এ-পথে আসবে বলে আশা করা যায় না।

কিয়নঝড়ের আদিম অরণ্য কি তন্ময়ের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে? কেন? পাহাড়ের হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত লোহা আরো অনেকের সঙ্গে তন্ময় খুবলে নিতে এসেছে বলে? না কি ভিতর-পকেটের ওয়ালেটে চার হাজার টাকার নোটের তাড়া পাপের পথে এসেছে বলে? ধুৎ! এমন পাপে চরাচর লিপ্ত! তন্ময় নিপুণ হাতে একটি মাত্র কাঠি ব্যবহার করে দামী সিগারেট ধরাল। কয়েক সেকেণ্ড হাতের কোটরে আলো ছিল, চোখ ছিল সেই আলোয়। কাঠিটা নিভে যেতে অন্ধকার গভীরতর মনে হল। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল হয়ত। এবং একগাল ধোঁয়া ছেড়েও তন্ময় ধোঁয়ার উড়ে-যাওয়া স্পষ্ট দেখতে পেল না, যা দেখতে না পেলে সিগারেটের স্বাদই কমে যায়। দক্ষ আঙুলে জ্বলন্ত কাঠি ধরে একটুক্ষণের জন্যে যে-আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল, তা আবার শিথিল হয়ে গেল।

এই বৃষ্টি আজ রাত্তিরে থামবার লক্ষণ নেই। একটানা দু-সপ্তাহ ধরেও চলতে পারে। তাহলে দিনের বেলাযও তিন-চার হাত দূরের কিছুই দেখা যাবে না। সব ডুবে যাবে ঘন কুয়াশায়। এই কারণেই বর্ষার ঋতুতে এই অঞ্চলের লোহার খনিতে কাজের চাকা ঢিলে হয়ে যায়। বর্ষা শেষ হলে আবার সেই চাকায় গতি সঞ্চারিত হয়। শীতকাল হলে রাত এগারটায়ও এই রাস্তা দিয়ে অন্য জীপ যাওয়া-আসার সম্ভাবনা থাকত। আজ রাত্তিরে সে-সম্ভাবনা আর নেই।

ড্যাশবোর্ড থেকে টর্চটা বের করে আনল তন্ময়। বোতাম টিপে দেখল, জ্বলছে। হাতের মুঠিতে শক্ত ঠাণ্ডা টর্চটাকে ধরতে পেরে এবং বোতাম টিপে আলো জ্বালতে পেরে হয়ত আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেল একটু। টর্চের আলো ফেলে-ফেলে আশপাশ দেখল ভাল করে। ভাবী লম্বা জোরালো টর্চ, নতুন ব্যাটারি, তবু চারপাশ থেকে ঘনিয়ে এসে চেপে-ধরা গাঢ় অন্ধকারে মনে হল, বড় কৃপণ আলো।

তন্ময় অবশ্য এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দেবে না। ডান দিকে পাহাড়ের দেয়ালে খানিকটা ওপরে এক জায়গায় আলোর বৃত্তটা ঈষৎ কাঁপা-হাতে নিবদ্ধ রাখল। খুঁটিয়ে দেখল জায়গাটা। মাচার ওপরে একটা কাঠের গুমটিঘর। খনি এলাকায় এমন ঘর অনেকগুলো তৈরী হয়েছে। কোনোটাতে মজুররা সন্ধ্যেয় বসে আড্ডা জমায়, নেশাটেশা করে, কোনোটা পাহাড়াদারের আশ্রয়। এখন ওই ঘরটায় নিশ্চয়ই কেউ নেই। ওখানে পেঁছিতে পারলে বরং ভাল। জীপে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পাহাড়ের স্তরে-স্তরে জমানো লোহা সংগ্রহের জন্যে এবং পাথরের চাঁই ফাটিয়ে রাস্তা বানানোর জন্যে সারাদিন ব্লাস্টিং চলে। সেই শব্দে ভয়ঙ্কর জন্তুরা জংগলের গভীরতর অংশে সরে গেছে। তাই আজ রাত্তিরে কোনো হিংস্র জন্তু হয়ত জীপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না। কিন্তু জীপে এভাবে বসে-বসে তন্ময়ের ঝিমুনি ধরে গেলে, খিদের ঘুমোতে না পেরে একটি উৎসাহী ময়াল নিঃশব্দে জীপের গা বেয়ে উঠে আসতে পারে।

বর্ষাতিটা চাপিয়ে তন্ময় জীপ থেকে রাস্তায় নামল। জুতো খুলতে সাহস হয়নি, তবে ট্রাউজার্স প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিয়েছিল। পায়ে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ লাগতে একটা শিরশিরানি বয়ে গেল সারা শরীরে। জুতো পরা থাকায় রাস্তার ধারাল পাথর পায়ের তলায় খোঁচা দিল না। টর্চ জ্বেলে রেখে পাহাড়ের দেয়ালের খাড়াইটুকু ডাল-পালা, ঝুলন্ত শিকড় ইত্যাদি ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল। তারপর গুমটি-ঘরের পেছল সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়িতে তখনো তেমনই ধারাল বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, পড়েই জলের গুঁড়ো টর্চের আলোয় ছিটকে যাচ্ছিল।

মাচার ওপর গুমটিঘরের মেঝে, দেয়াল, ছাত সবই কাঠের। ছাঁট এসে মেঝে ভিজে গেছে। জানলা নেই, খোলা দরজাটা বাতাসের ঘায়ে আছড়াচ্ছে। তন্ময় চারদিক আলো ফেলে দেখল, কোনো মারাত্মক জন্তু অথবা সরীসৃপ ভেতরে নেই। জুতোমোজা খুলে খালিপায়ে দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়াল। এর পর? এই খনি এলাকায় তন্ময়ের পাঁচ বছর হয়ে গেল। এমন ঝড়বৃষ্টির রাত্তির এরকম একটা গুমটিঘরে একা কাটাতে হবে কখনো ভাবেনি। দিনের বেলার চেনা জংগল এই দুর্যোগের রাতে তার আদিমতা ফিরে পেয়েছে। বুঝতে পারছিল, কাল সকাল পর্যন্ত নিচের রাস্তাটা দিয়ে শুধু জলস্রোত বয়ে যাবে।

অথচ মাত্র সাত-আট মাইল দূরে খালি পড়ে থাকবে তন্ময়ের সাজান কোয়ার্টার। কাজের লোকটা বারান্দায় ঘুমোবে, শোবার-ঘরের নরম বিছানায় কেউ আজ শোবে না। তন্ময় কোয়ার্টারে ফিরতে পারল না, চিত্রিতাও কলকাতায় গিয়েছে দু সপ্তাহ হল। শোবারঘর শূন্য পড়ে থাকবে, তন্ময়ের রাতের খাবারটা নষ্ট হবে। লোকটা ভালই রান্না করে; তন্ময়ের পছন্দ মতন, ফিরতে পারলে খিদে মিটতো। তাছাড়া লোকটার চোখের আড়ালে বোতল লুকনো আছে; ঠিক সময়ে ফিরতে পারলে গেলাস নিয়ে বসতে পারত। প্রমাণ করা যেত, চিত্রিতা না থাকলেও তন্ময়ের ঘরের সুখ একেবারে ফৌত হয়ে যায় না।

ছ মাস আগেই চিত্রিতা একবার কলকাতায় গিয়ে মাসখানেক থেকে এসেছে। এর মধ্যে আবার এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় যাওয়া বেমানান। বিয়ে হয়েছে মাত্র আড়াই বছর। এখন তো চিত্রিতার তন্ময়ের সঙ্গে থাকার ইচ্ছেটাই তীব্রতম হওয়ার কথা। ঘন-ঘন কলকাতায় যাওয়ার একটা অজুহাত অবশ্য চিত্রিতা দেখায়, তার বাবার শরীর খারাপ। কিন্তু নিশ্চয়ই সেটাই সব নয়, আরো কিছু আছে। অন্য কেউও থাকতে পারে, অন্য কোনো একজন! অসম্ভব নয়। আসলে কলকাতাই টানে চিত্রিতাকে, বড় শহরে আজন্ম দিনযাপনের অভ্যেস কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো। এখানকার টাউন-শিপের সংকীর্ণ নকশার একঘেয়েমি এক-টানা দুচার মাসের বেশী সহ্য করতে পারে না। তবে লোহার খনির ইঞ্জিনীয়ার তন্ময় হাজরার ঘরে আসবার আগেই তো সব দিক ভেবে নেওয়া উচিত ছিল। তার ঘরে আস-বার আগেই তো চিত্রিতা বুঝতে পেরেছিল, দিনরাত্তির কাটবে এক জংগল থেকে আর এক জংগলের আস্তানায়। আড়াই বছরের মধ্যে এতবার নানা অজুহাতে কলকাতায় ছুটে যাওয়ার যুক্তি কোথায়! বড় শহরের প্রতি এতই যদি মোহ, ওই শহরের সফল কোনো যুবকের ঘরে যেতে পারত চিত্রিতা। তাহলে কলকাতার ফুরফুরে বিকেল, সোঁদাল সন্ধ্যে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়ানোর স্বাদ পেত।

একাদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা **রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা** শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮০

সম্পাদক । রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ছিন্নপত্র), শঙ্করপ্রসাদ মিত্র (শিক্ষাব্যবস্থা) রমা চৌধুরী (জীবের নিত্যত্ববাদ ও জগতের স্বরূপ) শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (বেনেসাঁসের শিল্পরূপ ও মেঘনাদবধ কাব্য), নিরঞ্জন চক্রবর্তী (প্রাচীন বৈষ্ণব-পদসংকলনের কথা), প্রণয়কুমার কুণ্ডু (শৈশবের মেঘদূত), নমিতা চক্রবর্তী (বাংলায় নবজাগরণে দেবেন্দ্রনাথ), শঙ্কবলাল মুখোপাধ্যায় (অন্ধের কুচিপুড়ি নৃত্য প্রসঙ্গ), সন্তোষ চক্রবর্তী (যদ্ভিন্ন-উপন্যাসে বাত্রির ভূমিকা), কুমারেশ ঘোষ (উইলিয়াম ফকনার), মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী (কীর্তন কী রতন), নৃসিংহপ্রসাদ ভট্টাচার্য (শক্তিপূজা ও চন্ডীদুর্গা), রমেন্দ্রনাথ মল্লিক (বিবর্তন-ধারায় নাট্যসংস্কৃতি ও লোকরঞ্জন), হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিত্রসূচী । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নীতীন্দ্রনাথ)

ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । প্রতি সংখ্যা এক টাকা

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক 'জিজ্ঞাসা' ১এ কলেজ রো' ও ১৩৩ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা

গুমটিঘরটাও একখানা ঘর। যেমন সাত-আট মাইল চড়াইয়ের টাউনশিপের কোয়ার্টারে তন্ময়ের সাজান শোবারঘর। দুখানা ঘরই শূন্য। সাজান শোবারঘরের দরজার বাইরের বারান্দায় কাজের লোকটা এতক্ষণে ঘুমিয়ে কাদা, আর এখানে গুমটিঘরের দরজার পাশে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তন্ময়ের পা ধরে গেল। একই আদলের দুটি দৃশ্যে চিত্রিতা অনুপস্থিত, যদিও দুটি দৃশ্যেই তার ভূমিকা থাকা খুব স্বাভাবিক এবং শোভন ছিল। এই গুমটিঘরে আজ রাত্তিরে চিত্রিতার উপস্থিতি হয়ত অনিবার্য ছিল না, কিন্তু টাউনশিপের শোবার ঘরে চিত্রিতা থাকতে পারত। এবং থাকলে গুমটিঘরের এই ফালতু দৃশ্যটাই হয়ত খাজি হয়ে যেত। পাথসাট মেরে কলকাতায় চলে না গিয়ে চিত্রিতা টাউনশিপের কোয়ার্টারে থাকলে তন্ময় সম্ভবত বাইশ মাইল দূরের খনি-শহরের পানশালায় অত রাত করত না, তাড়াতাড়ি উঠত, ঝড়বৃষ্টি এতটা বেড়ে যাবার আগেই টাউনশিপে পৌঁছে যেত। ঝড়বৃষ্টি এতটা না বাড়লে অল্প নেশাগ্রস্ত তন্ময়ের জীপের চাকা গর্তে পড়ত না, ইঞ্জিন বন্ধ হত না, শ্যাওলা-ধরা স্যাঁতসেতে গুমটিঘরে জন্তুর মতন এসে ঢুকতে হত না।

সুতরাং শালা জীপ, শালা ঝড়বৃষ্টি, শালা পাথুরে রাস্তার গভীর গাল্ডা, আর—আর কলকাতার বিকেল-সন্ধ্যের প্রজাপতি চিত্রিতা সমান দক্ষতায় এই গুমটিঘরের দৃশ্যটা তৈরি করেছে। কনট্রাকটরের ছোট ম্যানেজার জগজিতের সঙ্গে খনি-শহরের পানশালায় বসে উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় তিনটে হুইস্কি তন্ময়ের গলা দিয়ে পেটে নেমে গিয়েছিল। এখন চনমনে খিদে। শুকনো সিগারেট টেনে টেনে ঠোঁট জ্বলে গেল।

গত বৈশাখে—তখন দারুণ গুমোট, দু-একবার মাত্র কালবৈশাখী নাড়া দিয়ে গেছে, একদিন সন্ধ্যায় তন্ময় বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে। চ্যাটার্জিদের কোয়ার্টারে চায়ের নেমন্তন্ন ছিল। চ্যাটার্জির বউ কণিকার বাপের বাড়ি চিত্রিতার বাপের বাড়ির পাড়ায়। বিয়ের আগে ওদের পরিচয় ছিল। তন্ময় বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে, কিন্তু দেরি হয়ে গেল, অন্যান্য দিনের থেকেও একটু বেশী। চিত্রিতা রাগ করবে জানাই ছিল। জীপ থেকে লাফিয়ে নেমে বারান্দাটুকু দ্রুত পার হয়ে ঘরে ঢুকেই তন্ময় অপরাধীর গলায় বলল, 'সত্যি বড় দেরি হয়ে গেল। উপায় ছিল না, আটকে গেলাম। —আমি দু-মিনিটে তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

'এখন এই রাত্তিরে আর চা খেতে যাওয়া যায় না।' রাগের কথা। রাগের কথায় তাপ অথবা ঝাঁজ থাকা স্বাভাবিক। অথচ তন্ময়ের মনে হল, প্রত্যেকটি শব্দ বরফ-জলে ডুবিয়ে ছুঁড়ে দিল চিত্রিতা।

তন্ময়ের ফিরতে দেরি দেখে চিত্রিতা অর্ধেক তৈরি হয়ে বসেছিল। চুলের বিন্যাস এবং মুখের প্রসাধন শেষ। হয়ত ভেবেছিল, তন্ময় এলেই চট করে শাড়ি-জামা বদলে নেবে। কিন্তু তন্ময় বড় বেশী দেরি করে ফেলল। তার অপেক্ষায় বসে, দাঁড়িয়ে, পায়চারি করে প্রায় দু ঘণ্টা কাটিয়ে চিত্রিতা হয়ত একবার ভেবেছিল, একাই চলে যাবে কণিকাদের কোয়ার্টারে। যায় নি, কারণ তাহলে তন্ময় ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ দেখানোর সুযোগ নষ্ট হত। অবশেষে তন্ময় যখন ফিরল রাত আটটা নাগাদ, তৎক্ষণে চিত্রিতার মেজাজ একেবারে তেতো হয়ে গেছে।

চিত্রিতা ফণা তুলেছে দেখে সাপুড়ের মন্তর দু-একটা প্রয়োগ করল তন্ময়। সুবিধে হল না। চিত্রিতার চুলে নিপুণ বিন্যাস, মুখে প্রসাধন, নাক এবং ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে ঘামের বিন্দু, কপালে কয়েকটা চুল লেপটে আছে। অযত্নে জড়িয়ে রাখা বাড়িতে পরার শাড়িটা শরীর ভাল করে ঢাকে নি। তার বুকের ঢাল যেখানে কোমরের দিকে নেমে গেছে সেই জায়গাটা অনাবৃত ছিল। তন্ময় সচেতন প্রচেষ্টায় চোখের কোণ দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল, কোমরের ওপর আলতো করে রাখবার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল। শরীরে সঞ্চারিত সুখ গোপন করে চিত্রিতা একটু সরে দাঁড়াল, ঠোঁট একদিকে টেনে ঘৃণার মুদ্রা জীইয়ে রাখল। তন্ময় বুঝতে পারল, সুবিধে হল না। তখন শার্টের ভিতর-পকেট থেকে মোটা নোটের তাড়াটা বের করে কেমন হেলাফেলায় চিত্রিতার সামনের চায়ের টেবিলে এগিয়ে দিল। নেহাত ঘরোয়া গলায় বলল, 'তুলে রাখ।—হঠাৎ জগজিৎ এসে টেনে নিয়ে গেল। তাই তো এত দেরি।'

চিত্রিতা নোটের তাড়ায় হাত দিল না। তন্ময়ের দিকে ঘৃণার চোখে তাকিয়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'দিনে দিনে কত নিচে নেমে যাচ্ছ বুঝতে পার না।'

অথচ সব জেনেশুনেই ওই ঘুষের টাকার অংশ নিয়ে চিত্রিতা প্রতিবার কলকাতায় যায়। তাছাড়া, তন্ময় ভাবল, তোমার বাপের বাড়ির সবাই কেমন সাধু আমার জানা আছে। বাপটি তো রেলের গুডস শেডের কেরানী। যোধপুর পার্কে বাড়ি উঠল কী করে।

পা দুটো অবাধ্য হয়ে উঠেছে, শীত ধরেছে গায়ে, দুই হাঁটুতে মৃদু কাঁপুনি। একটু বসা দরকার। সম্ভব হলে শুয়ে পড়া দরকার। জায়গা নেই। জলে ভেজা ঠাণ্ডা কাঠের মেঝে। তাছাড়া, মারাত্মক কোন সরীসৃপ না থাকলেও কাঠের জোড়ের ফাঁকে কাঁকড়াবিছে লুকিয়ে থাকতে পারে। এখানকার মতন বীভৎস লোমশ কাঁকড়াবিছে আর কোন পাহাড়ি জঙ্গলে দেখে নি তন্ময়। শুতে সাহস হল না। এমন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়াও তো অসম্ভব মনে হয়। পা দুটো আর কথা শুনতে চাইছে না, সারা শরীর শিথিল অবশ হয়ে আসছে। ঝড়ো হাওয়ার ঘা খেয়ে দরজাটা আছড়াচ্ছিল। মাথার মধ্যে রাগ এবং বিরক্তি কিলবিল করে ওঠায় একটা মোক্ষম লাথি কষাবার ইচ্ছে হল দরজাটায়। জুতো খুলে ফেলেছে খেয়াল হওয়ায় নিজেকে সামলে নিল, নিজের পা-ই জখম হতে পারে।

ঠিক তখন বৃষ্টির শব্দ এবং ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। একবার দুবার। কেউ যেন চিৎকার করে ডাকছে—'সাহাব সাহাব।' তন্ময় তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মুখে এগিয়ে গেল।

বনফুল রচনাবলী

'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এঁর রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ড বের হয়েছে। এই খণ্ডে লেখকের তৃতীয় দশকের অন্যান্য উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প নাটক ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। তৎসহ লেখকের সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন ডঃ সরোজমোহন মিত্র। মুদ্রণ ও পারিপাট্যে অপূর্ব। মূল্য ১৫৲ প্রতি খণ্ড/গ্রাহকদের মূল্য ১২৲। আপনার খণ্ডটি সত্বর সংগ্রহ করুন।

মাণিক গ্রন্থাবলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর দশম খণ্ড প্রকাশিত হোল। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বাঙালী জীবনের অভূতপূর্ব বিপর্যয় ও বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত লেখকের অসামান্য রচনাগুলি এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। মুদ্রণ ও পারিপাট্যে অপূর্ব। মূল্য ১৪৲ প্রতি খণ্ড/গ্রাহকদের মূল্য ১১-২০। আপনার খণ্ডটি সত্বর সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও মুদ্রণের মূল্য বৃদ্ধি হেতু পরবর্তী সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি হয়তো রোধ করা যাবে না। গ্রাহক হলে পরবর্তী সংখ্যাগুলি গ্রাহক মূল্যেই পাবেন। প্রতি গ্রন্থাবলীর জন্য ১০৲ করে জমা দিয়ে (মফঃস্বলের গ্রাহকগণ মানি অর্ডারযোগে) এখনি গ্রাহক তালিকাভুক্ত হয়ে এই সুযোগ নিন। যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ/১২এ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মাথায়, মুখে এবং বিশেষ করে চোখে ধারাল বৃষ্টির আঘাত আমল দিল না। নিচের রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল তার জীপটার কাছে একটা আলো নড়ছে। মুখ থেকে তখনই কোনো শব্দ খসাতে পারল না তন্ময়, তবে আলোর সঙ্কেত দেবার মতন করে হাতের টর্চটা নিচের দিকে দোলাতে লাগল।

তন্ময়ের থেকে অনেক বেশী দক্ষতায় এবং দ্রুত ওপরে উঠে এল একজন। সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে এলে তন্ময় বুঝতে পারল লোকটা মুণ্ডা। কুলিটুলি হবে। মেকানিকও হতে পারে। গায়ে কিন্তু দামী বর্ষাতি হাতে জোরাল টর্চ। তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে লোকটা মধুর করে হাসল। হাসিতে এক ধরনের নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্তে ভিজে বুঝিয়ে দিতে চাইল—সে যখন এসে পড়েছে সব বিপদ কেটে গেল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে লোকটা বলল 'রাস্তায় জীপ দেখে মনে হল কোনো সাহেবের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কতক্ষণ এখানে আটক রয়েছেন সার?

তন্ময় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিল না। লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছিল।

দুটো টর্চের আলোয় ঘরের অন্ধকার কমলেও কাঠের বেড়ার অসংখ্য ছায়ারা দুলছে। লোকটা গায়ের বর্ষাতি খুলে ভিজে ঝেড়ে পাতল। তন্ময়ের বর্ষাতিটা দেখিয়ে বলল 'ওটা পেতে বসুন সার। কাল সকাল পর্যন্ত এই ঘরেই থাকতে হবে।'

লোকটার গায়ে খাকি শার্ট হাফ প্যান্ট। তার উচ্চতা তন্ময়ের থেকে কম, কাঠামে মেদ নেই তবে মনে হয় শক্তিমান, শিরা-জাগা হাত। দাঁত সবিনাস্ত সব সময় হাসছে। বলল 'আপনাকে আমি অনেকবার দেখেছি। চিনি আপনাকে। আপনি তো ইঞ্জিনীয়ার সার। খালি আপনার নামটা জানি না।—আমার নাম ম্যাথু ডোম্পারে কাজ করি।'

লোকটাকে তন্ময় এর আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। দেখে থাকলেও মনে রাখবার মতন কোট নয়। তন্ময়ের পায়ে আর দাঁড়িয়ে থাকার জোর ছিল না। লোকটা বর্ষাতির এপর আয়েশ করে বসেছে। নিজের বর্ষাতিটা খুলে মেঝেয় ছড়িয়ে পেতে তন্ময় বলল 'তুমি এত রাত্তিরে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে?'

'জাপানীদের কোয়ার্টার থেকে ঘরে ফিরছিলাম সার।'

'সেখানে তোমার কী কাজ?'

'দিনের ডোম্পারে খাকি আর রাতের বেলায় জাপানীদের কোয়ার্টারে খানা বানাই।'

'এত রাত্তিরে ফিরছিলে কেন?'

'আমার বৌজ্বর শরীল দেরি হয় সার। ছেলে কিনকে সাথে পাশ বাবটা।' এতক্ষণে লোকটা নিঃশব্দে হাসছিল, এবার দেরির কথা বলবার সময় হাসিটা সোচ্চার হল কেমন রহস্যময়।

পাঁচজন জাপানী বিশেষজ্ঞ এসেছে এখানে। ক্লাশিং প্লান্ট বসানোর কাজে সাহায্য করতে এসেছে। বিশেষভাবে তৈরী একটা কোয়ার্টারে থাকে তারা। এই লোকটা তাহলে তাদের রান্নাবান্না করে দেয়। বর্ষাতির ওপর পা মুড়ে বসে তন্ময় বলল 'তোমার নাম বলছে ম্যাথু?'

'হাঁ সার। আমরা ক্রিশ্চিয়ান। মিশনারি স্কুলে আমি ক্লাস সেভেন তক পড়েছি। হিন্দি ইংলিশ আর আপনাদের বাংলা ভালই জানি।'

'এই যে তুমি রাতে ঘরে ফিরতে পারলে না তোমার বউ ভাববে না?'

'বিয়েই হল না এখনো।—তবে আমার দুজন সিসটার আছে তাদেরও শাদি হয় নি। তারা ভাবনা করবে না।'

বর্ষাতির এক পাশে বসেছে ম্যাথু, আর এক পাশে পকেটের মধ্যে কিছু একটা উঁচিয়ে রয়েছে। তার ওপর সে বার বার আদরের হাত বুলোচ্ছিল কৌতূহল হল তন্ময়ের। 'কী আছে পকেটে?'

ম্যাথু সব্র চোখে তন্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনোভাব আন্দাজ করল কান পেতে ঝড়-বৃষ্টির ধরন শুনল, তারপর বর্ষাতির পকেট থেকে বের করে সামনে রাখল একটা বোতল মোটা গ্লাসের বোতল। তন্ময় বোতলটা দেখে বুঝতে পারল এ-জিনিস এ-দেশে পাওয়া যায় না। নিশ্চয়ই জাপানীরা আমদানি করেছে। ম্যাথু হয়ত এত কাছাকাছি বসে তন্ময়ের মুখ থেকে মদের গন্ধ পেয়েছে তাই সাহস হয়েছে জিনিসটা বের করে সামনে রাখতে।

ম্যাথুর শার্টের তলায় কোমরে আর একটা জিনিস গোঁজা ছিল। এবারে সেটা বের করে বোতলটার পাশে রাখল। একটা চকচকে ছুরি। একটা টিন নেড়ানো প্লাটাই একসঙ্গে জুড়ালিয়ে রাখল। পাব পুরো অন্ধকারে থাকতে হবে। স্বল্প আলোতেও চরিত্রের তীক্ষ্ণতা ঝালসে হয়। জীপটা সেনাকলের পাশে রাখায় মনে হচ্ছে নিজে কেলাসের স্মাগলিং সেনী হয় না। ডোম্পারে কম্পিস কাজ করে ম্যাথু তার কাছে বিদেশী মদের বোতলের থাকা রাজ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছিল। স্মাগলার সেনার সাথে তন্ময় যেন কনভিনিয়ে একসাথে সময়ের করে।

সাইজ মাপের গ্লাসের খানি করলে আধখানা হয়ে যাবে। সেই গ্লাসে এ-অঞ্চলের মদ ঢেলে। সোনালি সোনা। তার নাকে তীব্র মাদকতা ছড়াবে। লোকটা সাংঘাতিক ধরনের ধূর্ত। তন্ময়ের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য এতক্ষণ পরিশ্রমের সঙ্গে। সেই বিশ্বাসটুকু জন্য চেষ্টা করছিল। টাউনশিপে জগজিৎরা আরো খানেক কোয়ার্টার তৈরী করবে। হাসপাতালের বাড়ি তাবাই বানাচ্ছে। নির্মাণের কাজে ফাঁকি চোখে পড়লে চোখ বুজে থাকা ছাড়া আর কোনো পাপ তন্ময়ের করতে হয় না। সুতরাং জগজিৎদের সঙ্গে তার নেহাত মামুলি স্বাভাবিক লেনদেনের সম্পর্ক। এসব একটু না থাকলে বেঁচে থাকার সুখ কোথায়।

ম্যাথুর বর্ষাতিটা জাদুকরের আলখাল্লার মতন, পকেটের রহস্য শেষ হয় না। সেই পকেট থেকেই সেলোফেন কাগজের একটা মোড়ক বের করে খুলে সামনে রাখল। বেশ কয়েকটা চর্বির বড়া।

লোকটা চোর। জাপানীদের কোয়ার্টার থেকে বেরোতে এত রাত হওয়ার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পুরনো অল্প-ছেঁড়া বর্ষাতি এবং টর্চটা জাপানীরা ম্যাথুকে দিয়ে থাকতে পারে, মদের বোতল আর চর্বির বড়া নিশ্চয়ই চোরাই মাল। নিজের লোভ কষ্টে লুকিয়ে তন্ময় গম্ভীর গলায় বলল 'এসব তুমি চুরি করে এনেছ?'

'চোরি ছাড়া সুখ নাই।' ম্যাথু এক গাল হাসল গোপনতার ধারাই কেড়ে ফেলেছে। তন্ময়ের সন্দেহ হল, তার নিজের ঠোঁটেও হাসি ফুটেছে।

মনে পড়ল জীপের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে একখানা এক পাউন্ড রুটি আছে বিকেলে খানিকটা খেয়ে কিনেছিল। টাউনশিপে ভাল রুটি পাওয়া যায় না। ম্যাথুকে বলতে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বর্ষাতিটা পিঠে-মাথায় চাপিয়ে টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

জীপের চাকা এখনো গর্তে আটকে আছে আশা হয়। বৃষ্টি চলছে থাকলে রাস্তায় জলের স্রোত বাড়লে জীপটা গড়িয়ে সরতে পারে, ঢাল বরাবর অনেক নিচু পর্যন্ত ফলপ্রসূ-প্রচেষ্টা চালাতে পারে। তেমন হলে তন্ময়ের অবশ্য আসে যায় না। সরকারী গাড়ি। তার শুধু একটা ইনফিরিয়রিটি লেখার ব্যাপার।

আবার খানিক ভিজে শিস দিতে দিতে ম্যাথু ওষুধিটার ব্যাগটা নিয়ে ফিরে এল। ময়লাটার আলোয় স্পষ্ট নিশ্চিন্ত ম্যাথু বাঁকা থেকে কখন রুটি বের করে চর্বির বড়ার পাশে রাখল। বোতলের মুখটা ম্যাথু আন্দাজে হাতে খুলে ফেলেছে। এমন দুরন্ত কিনা আর কোনো দিন পেয়েছে কিনা তন্ময় মনে করতে পারল না।

ম্যাথুর্বাহিত তন্ময় স্পর্শিত্ব স্পর্শ জাদুর সমান নয়। তন্ময়ের হাতে ছুরি ছিল, সেখানে ইচ্ছে হল নি সেখা আলোতেও মদ পুরনো সোনা আলো ঝলমল করছে। ম্যাথু বলল 'তুমি আগে খাও।' তন্ময় প্রথম চুমুক দিল, তারপর ম্যাথু এবং তারপর ক্রমান্বয়ে দুজন বারবার হাত

করে দুই ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরেছে যাতে একটি ফোঁটাও বাইরে না পড়ে। এখন বোতল প্রায় শূন্য। ম্যাথুর টর্চটা নেভান, তন্ময়ের টর্চের আলো ফুরিয়ে এসেছে। তন্ময়ের দামী সিগারেটে জোর টান দিয়ে ম্যাথু বড় বেশী এপাশ-ওপাশ দুলছিল, বসে থাকতে পারছে না। আগাগোড়া কাঠের তৈরী গুমটি ঘরটাকে তন্ময়ের একখানা নৌকো মনে হল। সেই একই নৌকোয় যেন ভাসছে দুজন, সে আর ম্যাথু।

বরফ-জলে ডোবান কয়েকটা শক্ত চুরি-করা মদের ঝাঁজে উষ্ণতা ফিরে পেয়ে তন্ময়ের কানের মধ্যে থেকে থেকে গুনগুন করছিল —দিনে দিনে কত নিচে নেমে যাচ্ছ বুঝতে পার না! ম্যাথুর ঘরে তার দুটো সিসটার আছে। ম্যাথুর সঙ্গে জমে গেলে তার ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখাশোনা জানাশোনা করা যেতে পারে। শুধু চিত্রিতার কলকাতায় কেন, এই অরণ্যেও ফুরফুরে বিকেল আর রহস্যময় সন্ধ্যা আসে!

তন্ময়ের টর্চটা হয়ত এখনই নিভে যাবে কাঠের বেড়ার ভৌতিক ছায়ারা দুলছে গায়ের শার্টটা শুকিয়ে গেছে। ভিতর-পকেট ওয়ালেটের মধ্যে নোটের তাড়া হুংপিণ্ডের ওপর লুটিয়ে আছে। চুরি-করা শুয়োরের চর্বির শেষ বড়াটায় কামড় বসিয়ে তন্ময় গলাগলি দোস্তের মতন ম্যাথুর কাঁধে একটা হাত তুলে দিল। বর্ষাতির ওপর শুয়ে পড়বার আগে ম্যাথু আদরের হাত তন্ময়ের হাঁটুতে আলতো করে একটা চাপড় মারল।

...আমোদিত ক'রে তুলবে আপনার জীবন।
হালকা মিষ্টি গন্ধের ছোঁয়ায় এনে দেবে
পুলক রোমাঞ্চ। কান্তা আপনাকে ঘিরে
রচনা করবে এক সৌরভের জগৎ—
মুগ্ধ হবে সকলের মন।
ক্যালকাটা কেমিক্যালের তৈরী

সুখময় ভট্টাচার্য

শারদীয় দুর্গাপূজার ভিতরে কুমারী-পূজন একটি অঙ্গ। আজকাল সর্বত্র কুমারী-পূজার প্রচলন না থাকিলেও শাস্ত্রে এই অঙ্গটির নিত্যতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মহাষ্টমী অথবা মহানবমী তিথিতে কুমারীপূজার বিধান।

মহাকাল সংহিতাতে দেখা যায়—

ন তথা তুষ্যতি শিবা বলিহোমস্তুতীরণৈঃ।
কুমারীপূজনেনাশু যথা সদ্যঃ প্রসীদতি।।

—দেবী (শিবা) বলি, হোম ও স্তুতিপাঠে সেইরূপ প্রসন্না হন না, কুমারীপূজনে তৎক্ষণাৎ যেরূপ প্রসন্না হন।

কৌলমতে রাত্রিকাল ও স্মার্তমতে অপরাহ্নকাল কুমারী-পূজায় প্রশস্ত। পরন্তু সর্বত্রই পূর্বাহ্নে পূজা করিতে দেখা যায়।

কুমারীর লক্ষণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—অজ্ঞাতরজস্বা সদ্‌বংশজা গৌরাঙ্গী কন্যা হইবেন পূজাযোগ্যা কুমারী, তাহার মাতাপিতা জীবিত থাকিবেন।

যামলে বিভিন্ন বয়সের কুমারীর ভিন্ন ভিন্ন নামও দেখা যায়। একবর্ষা কুমারীর সংজ্ঞা—সন্ধ্যা। দ্বিবর্ষা কুমারী সরস্বতী। ত্রিবর্ষার সংজ্ঞা হইতেছে ত্রিমূর্তি। চতুরব্দা কুমারীকে কালিকা বলা হয়। পঞ্চবর্ষা কুমারী সুভগা। ছয় বৎসরের কুমারীর নাম উমা। সপ্তবর্ষা কুমারী মালিনী। অষ্টবর্ষা কুমারীর নাম কুব্জিকা। নববর্ষা কুমারী হইতেছেন কালসংকর্ষা। দশবর্ষার সংজ্ঞা অপরাজিতা। একাদশাব্দার নাম রুদ্রাণী। দ্বাদশবর্ষা ভৈরবী। ত্রয়োদশবর্ষা মহালক্ষ্মী। চতুর্দশী কলনায়িকা অথবা পীঠনায়িকা। পঞ্চদশী কুমারীর সংজ্ঞা ক্ষেত্রজ্ঞা। ষোড়শী কুমারীর নাম চণ্ডিকা, মতান্তরে অম্বদা এবং অম্বিকা।

যামল ব্যতীত অন্নদাকল্পতন্ত্রেও কুমারীগণের বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কুমারী-পূজা না করিলে হোমপ্রভৃতি সমস্ত কার্যের যথাযথ ফল পাওয়া যায় না। তন্ত্র হইতে ইহাও জানা যায় যে, প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত যথাক্রমে একবর্ষা কুমারী সন্ধ্যা হইতে পঞ্চদশী ক্ষেত্রজ্ঞা পর্যন্ত প্রত্যহ এক একজনকে দেবীরূপে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে এবং পরের অমাবস্যায় ষোড়শী অম্বিকার পূজা করিতে হইবে।

মহাকালসংহিতায় বলা হইয়াছে—কাম্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্মে একজন কুমারীকেই পূজা করিতে হয়, পরন্তু শারদীয় পূজার সময় বহু কুমারীকে পূজা করিতে হইবে।

বহ্বীনামপ্যভাবে হি ভবেদেকা কুমারিকা।

—পূজার যোগ্য বহু কুমারী যদি না পাওয়া যায়, তবে অগত্যা একজন কুমারীকে পূজা করিতে হইবে। অযুগ্ম-সংখ্যক কুমারীকে পূজা করিবার বিধান। তিন, পাঁচ, সাত বা নয়জন কুমারীকে আহ্বান করিয়া সাদরে শ্রদ্ধাপূর্বক গীত-বাদ্যাদিনির্ঘোষে আপ্যায়িত করিয়া পূজা-মন্ডপের দ্বারদেশে আনিতে হইবে। যজমান পাদ্যদান করিয়া স্বহস্তে কুমারীর চরণ মুছাইয়া দিবেন। চরণে আলতা পরাইয়া দেবীর আসনের সন্নিকটে উত্তম আসনে কুমারীকে বসাইবেন।

কুমারীর সংখ্যা একাধিক হইলে তাঁহাদিগকে পঙ্‌ক্তিক্রমে বসাইয়া তন্মধ্যে একজনকে মুখ্যরূপে কল্পনা করিতে হইবে। পূজার আদিতে মধ্যে ও অন্তে তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শাস্ত্রবিধি অনুসারে নানাবিধ উপচারে পূজা করিবার সময় কুমারীকে দেবীস্বরূপ চিন্তা করিবার বিধান।

ন কেবলং পূজয়েৎ তাং
ভোজয়েচ্চাপি যত্নতঃ।
বাগ্‌ভতা চাপ্যকরণাৎ পূজায়াঃ
পরিকীর্তিতা।

উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান করিয়া কুমারীকে উত্তম খাদ্যের দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হয়। কুমারী ভোজনে পরিতৃপ্তা না হইলে যজমানের পূজা সিদ্ধ হয় না। কুমারীর উচ্ছিষ্ট শিরালকে খাইতে দিবে, অথবা জলে বিসর্জন করিবে।

তন্ত্রোক্ত কুমারীর ধ্যান যথা—

প্রসন্নবদনাম্ভোজাং
প্রোদ্যদ্‌বালার্কসপ্রভাম্।
রক্তাম্বরাং রক্তমাল্যাং
নানালঙ্কারভূষিতাম্।।
সস্মিতাং দিব্যকন্যাভিঃ
ক্রীড়ারসপরায়ণাম্।
ধ্যায়েৎ কুমারিকাং বালাং
স্বভক্তাভীষ্টসিদ্ধিদাম্।।

কুমারীর দেহে জয়া, বিজয়া, ঋদ্ধিদা, মায়া প্রমুখ পঞ্চাশজন শক্তি বিরাজ করেন। যজমান কুমারীদেহে সেইসকল শক্তিরও অর্চনা করিবেন।

পূজার সময়, ভোজনকালে এবং পরে কুমারীর বিভিন্ন কার্যকলাপের দ্বারা যজমানের নানাবিধ শুভ এবং অশুভ ফলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাকাল-সংহিতায় এইগুলি বিস্তৃতভাবে পরিকীর্তিত হইয়াছে।

পূজান্তে প্রণাম-মন্ত্র যথা—

নমস্তে ভগবত্যম্ব
নমস্তে ভক্তবৎসলে।
নমস্তে জগদাধাররূপিণি
ত্রাহি মাং সদা।।

পূজার দক্ষিণা তো যথাবিধি দিতেই হইবে, তদুপরি কুমারীকেও যথাশক্তি সুবর্ণাদি দক্ষিণা প্রদানের বিধান রহিয়াছে।

ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজার এই অঙ্গটি অতি সুন্দর। ভক্ত যজমান সরলস্বভাবা কুমারীর পবিত্রতৃপ্তি দর্শনে কৃতার্থতা বোধ করেন।

যে সকল ভক্ত কামাখ্যা মহাপীঠ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সেখানকার দেবী-মন্দিরে অবশ্যই কুমারীপূজা দর্শন করিয়াছেন। অনেক তীর্থযাত্রীই সেখানে ভক্তিভরে কুমারীপূজা করিয়া থাকেন। শিশু-বালিকাকে দেবীরূপে পূজা করিয়া পূজক দেবীর প্রসাদলাভে ধন্য হন।

নতুন বই

রোমেল ঃ অমিতাভ রায়—অনন্য প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। সাত টাকা।

এককালের জার্মান নেতা হের হিটলারকে বলা যায় নিরবধিকালের পৃথিবীর উত্থান-পতনের ইতিহাসে এক উল্লেখ্য অধ্যায়। আবার হিটলার একা নয়, তার যে সব সংগী ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনি বিচক্ষণ, স্থিতধী মানুষ ছিলেন—যিনি এককভাবে ইতিহাসে নিজেকে চিহ্নিত ব্যক্তি হিসেবে নির্দিষ্ট করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সেনানায়ক আর উইন রোমেল। সেই প্রসিদ্ধ সেনানায়কের অদ্ভুত কর্মশক্তি, যুদ্ধকৌশল, বিচক্ষণতা, দূর-দৃষ্টি—এসবের চমৎকার তথ্য, তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রন্থ লিখেছেন লেখক শ্রীঅমিতাভ রায় তাঁর অধুনা প্রকাশিত 'রোমেল' গ্রন্থে। গ্রন্থটি রোমেল নামে এক জার্মান সেনানায়কের কথা হতে পারে। কিন্তু সেই সংগে সে সময়ের যুদ্ধ আতংকগ্রস্ত সারা পৃথিবীর ইতিহাস তার পরিবেশের চিত্রও সংক্ষেপে অংকিত হয়ে গেছে গ্রন্থ মধ্যে। উনিশ শ একচল্লিশের উনিশে জানুয়ারীর এক সভায় গ্রাজিয়ানীর পতনকে কেন্দ্র করে শোকাচ্ছন্ন মুসোলিনী ও হিটলার। তাঁরাই শেষে রোমেলকে সেনানায়ক করে আফ্রিকার ট্রিপলিতে পাঠান। রোমেলের ব্যস্ত কর্মময় জীবন এখান থেকেই উজ্জ্বল রূপ পেতে থাকে। হিটলারের ঘনিষ্ঠ সংগী এই রোমেলের কাহিনী লেখক যেভাবে বলেছেন এবং যে ভাষায় বলেছেন, বস্তুত তা যেন সর্বস্তরের পাঠকদের অবলীলায় তন্ময় করে রাখে। লেখার ভংগি কথা-সাহিত্যিকের কিন্তু ঐতিহাসিক বোধ, তথ্য এবং তথ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও নিরাসক্তি এতটুকু কম নয়। কোথাও কোন কালানৌচিত্য দোষ ঘটেনি। একই সংগে কথাকারের পরিবেশনভংগিজনিত রসাস্বাদ ও ইতিহাসকারের নির্মোহ তথ্য বর্ণনার বিস্ময় গ্রন্থটিকে সত্যিকারের অভিনবত্ব দান করেছে।

ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্ (প্রবন্ধ)—অমর দত্ত। প্রকাশিকা ঃ সান্ত্বনা দত্ত, ২৯, ডিক্‌সন লেন, কলকাতা-১৪। ছয় টাকা।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাদেশ। সে এক আশ্চর্য ভাব-আন্দোলনের কাল। বস্তুত উনিশ শতকের এক কোটিতে ছিল ঐশ্বর্যের উল্লাস, আর এক কোটিতে আত্মার উল্লাস। প্রথমার্ধ হল ঐশ্বর্যের উল্লাসে উচ্চকিত সময়—এ সময়ে বাংলা ও বাঙালীর নব-উচ্চকিত মনোভূমিতে নূতন বীজ বপনের কাল। ডিরোজিও এই কালে আবির্ভূত। সংগে আছেন এদেশীয় মনীষী-দের অন্যতম স্তম্ভরূপে প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহন। দু'জনের যোগাতা, প্রতিভা, কর্মক্ষেত্র এমনকি আয়ুষ্কালও এক ছিল না। তবু অত্যদ্ভুত যোগাযোগে দুই মানুষের মনোলোকে নবীনতার সার্থক সমাপতন সম্ভব হয়েছিল। রামমোহন সমাজসংস্কারক, ডিরোজিও শিক্ষক। ডিরোজিওর চিন্তা, চেতনা, বিদেশী আলোকে এদেশীয় ভাবপ্রেরণাকে আলোকিত করার প্রয়াস অনন্য। এই ডিরোজিওর সার্থক পরিচয় তুলে ধরেছেন শ্রীঅমর দত্ত তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্‌স্' গ্রন্থে। ডিরোজিও বলা যায় রামমোহনের পরিপূরক। ডিরোজিও সেকালে ভালয়-মন্দে মেশানো একটি অনুবর্তী দল তৈরী করতে পেরেছিলেন। সেই সমস্ত ডিরোজিয়ানদের যে পরিচিতি ও ব্যাখ্যা এ গ্রন্থে আছে, তা বাস্তবিকই মূল্যবান। গ্রন্থটি উনিশ শতকের গবেষক ও শিক্ষিত পাঠকদের কাজে লাগবে।

ঝাড়খণ্ডের লোক-সংস্কৃতি (প্রবন্ধ)—শ্রীরাধাগোবিন্দ মাহাত। প্রকাশক ঃ সুধীররঞ্জন বসুমল্লিক, ৩৮, শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-৪। দাম দশ টাকা।

বাংলাদেশের সীমানার বাইরে ঝাড়খণ্ড। কিন্তু এই ঝাড়খণ্ডের লোক ভাষা ও সংস্কৃতির সংগে যুক্ত আছে বাংলাভাষার অন্যতম উপভাষা। ঝাড়খণ্ড ভাষা বাংলা-ভাষাকে প্রভাবিত করেছে নানাভাবে, আবার বাংলাভাষাও ঝাড়খণ্ডী ভাষার সংগে যুক্ত হয়ে নানাভাবে সীমান্তের বাইরে প্রসারিত হয়েছে। ভাষা হল মানবপ্রাণ প্রকাশের একমাত্র বাহন। এই ভাষার আশ্রয়ে ঝাড়-খণ্ডের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যে অসাধারণ মানব ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার সংস্কৃতি বিশেষ করে লোকগীতি, লোক-নৃত্য, পূজাপার্বণ ও তন্নিহিত লোক-মানসকে চমৎকার তথ্যপূর্ণভাবে রূপায়িত করেছেন ঝাড়খণ্ডের অধিবাসী শ্রীরাধা-গোবিন্দ মাহাত তাঁর 'ঝাড়খণ্ডের লোক-সংস্কৃতি' গ্রন্থে। অধুনা লোকসাহিত্যের ওপর সুনিপুণ ও সুচিন্তিত গবেষণার অন্ত নেই। নিয়মিতভাবে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এই সাহিত্য অবশ্য পাঠ্য হয়েছে। সে ক্ষেত্রে রাধাগোবিন্দবাবুর গ্রন্থটি মূল্যবান সংগ্রহ বিশেষ। ঝাড়খণ্ডের ওপর

প্রকাশিত হ'ল **সারস্বত** শারদীয়, ১৩৮০

প্রবন্ধ।। নারায়ণ চৌধুরী। আধুনিক বাংলা গানের পশ্চাৎপট; বর্তমান ও ভবিষ্যত। হারাণচন্দ্র নিয়োগী। সম্প্রদায়িকতা ও সুলতানী যুগের ইতিহাস। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য। বঙ্কিমের বাংলা রচনা। গদ্যঃ সংগ্রহ—ক্রম নির্ণয়—পুন-র্বিচার। দীপক মুখোপাধ্যায়। প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর কালনির্ণয়। অশোক ভট্টাচার্য। মানুষের স্বপক্ষে পিকাসো।

কবিতা ঃ বিষ্ণু দে। অরুণ মিত্র। সুশীল রায়। কিরণশংকর সেনগুপ্ত। জগন্নাথ চক্রবর্তী। কৃষ্ণ ধর। মৃগাঙ্ক রায়। সুশীলকুমার গুপ্ত। দুর্গাদাস সরকার। তরুণ সান্যাল। মদীন্দ্র রায়। রাম বসু। সলিল চৌধুরী। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। বিতোষ আচার্য। গৌরাংগ ভৌমিক। অমিতাভ দাসগুপ্ত। বীতশোক ভট্টাচার্য। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

উপন্যাস ।। কার্তিক লাহিড়ী

গল্প ।। অনুপম দত্ত। মিহির সেন

চিত্রগুচ্ছ ।। পাবলো পিকাসো

দাম দু টাকা।

সারস্বত লাইব্রেরী/২০৬ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬।

এমন ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক দলিল-গ্রন্থ বিরল। গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠক ও গবেষকদেরও সংগ্রহযোগ্য নিঃসন্দেহে।

অন্ধকারে সূর্য শিকার (উপন্যাস)—তারাপদ ভট্টাচার্য। জ্যোতি গ্রন্থম, ১৩১বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২। ছয় টাকা।

কাহিনীর কথক—লেখক দিব্যেন্দু, আবিষ্কারক শ্যামল, দিব্যেন্দুর দাদা খুনী শরদিন্দু দাসী আহ্লাদী ইত্যাদি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের ভিড়ে 'অন্ধকারে সূর্য শিকার' উপন্যাসটির কাহিনী জমে উঠেছে। লেখক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য নতুন লেখক হলেও কাহিনীতে যথেষ্ট সাসপেন্স সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ঈর্ষায় নিজের স্ত্রী প্রভা দেবীকে খুন করে দিব্যেন্দুর দাদা শরদিন্দু কাহিনীর মোড় ঘুরিয়েছেন। শরদিন্দুর পুত্র শিবেন্দু মায়ের খুনের বিচার চায় তার খুনী পিতার কাছে। লেখক এই সমস্ত জটিল ঘটনা ও চরিত্রকে সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন, কাহিনীটি সুবিন্যস্ত, পাঠকদের অবলীলায় ধরে রাখে। শরদিন্দুর সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়া, উপন্যাসে কাহিনী-অনঙ্গ। আহ্লাদীর গর্ভে শরদিন্দুর কন্যার কাহিনীটি এবং আহ্লাদীর কন্যাকে বিকৃত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করার চিন্তাটি লেখক সুন্দরভাবে কাহিনীমধ্যে গ্রথিত করেছেন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সহজ স্বাভাবিক।

বেলাল চৌধুরীর কবিতা : বেলাল চৌধুরী—বিশ্বজ্ঞান, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা-৯। আড়াই টাকা।

বেলাল চৌধুরী তরুণ কবি হলেও কবিতা লিখে আধুনিক কবিতা চর্চার প্রয়াস বেশ কিছুকাল ধরেই করেছেন। 'বেলাল চৌধুরীর কবিতা' নামের সংকলনে সেই দীর্ঘকাল প্রবাহিত কবিতা চর্চার কঠিন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর আছে। বেলাল চৌধুরী তাঁর কবিতায় কোন পূর্বসূরির চিহ্ন ব্যবহার করেননি। প্রচলিত ছন্দ তাঁর কবিতাগুলিতে দুর্লক্ষ্য নয়, কিন্তু কবিতাগুলির চরণান্তিক ছেদচিহ্ন ব্যবহারে তিনি উৎসুক নন। তবে কোন কোন কবিতায় শুধু মাত্র কবিতার শেষে তা ব্যবহার করেছেন, যেমন—'আমাকে? কোথায়, কে জানে? আমি জানিনে।' (ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটে সহসা) যেন কবিতাটির আত্মমগ্নতা থেকে হঠাৎ জেগে ওঠার মুহূর্তে সচেতন আত্ম-কথনে এই প্রশ্নবোধক ছেদচিহ্ন অবধারিত ছিল। বস্তুত, বেলাল চৌধুরী কবির স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ অনুভূতির প্রবাহকে কোন স্থির নির্দিষ্ট 'যতি' ভাবনায় শৃঙ্খলিত করতে চান না। বেলাল দীর্ঘ চরণে কবিতা লিখেছেন লিখেছেন দুটি কি তিনটি শব্দ সমষ্টি দিয়ে রচিত চরণও। নারীর শরীর, প্রেম, অন্তরঙ্গতা, বেদনা, হাহাকার পতিতা ও পতিতাপল্লীর ওপর নিরাসক্ত দৃষ্টি, শূন্যতা—এসব নিয়ে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি মৃত্যু বাংলাদেশ স্মৃতি, ইতিহাস এই শহর কলকাতা—এর মধ্যেও কবির অনুভূতিপ্রাণ মন ও মনন পরিভ্রমণ করেছে। তাঁর দেহসম্ভোগের ইমেজ কবির কাব্যে একাধিক। বেলাল অতি আধুনিক ইমেজ ছন্দ ইত্যাদির মধ্যে প্রাচীন ভাবনাকে প্রবাহিত করে বিচিত্র মেজাজের কবিতা রচনা করেছেন। কবির ছন্দজ্ঞান ও শব্দ সচেতনা এবং অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়।

গঙ্গোত্রী (বর্ষা সংখ্যা) সম্পাদক : শান্তনু দাস। ৪।১, আফতাব মল্লিক লেন, কলকাতা—২৭। এক টাকা।

নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করার ব্যাপারে গঙ্গোত্রী সম্পাদকের জুড়ি নেই। এ সংখ্যায় কবিতা ছেপেছেন তিনি অনেকগুলি। কিন্তু কবির নাম ও পরিচয় ছেপেছেন শেষের দিকে। তাঁর মতে : 'আগে কবি। পরে কবিতা।.....এটাই ধারাবাহিক চল হয়ে আসছে। পত্রিকার পাতা উল্টেই আমরা দেখে নিই প্রিয় কবিদের নাম। অথচ দূর গ্রামগঞ্জের নিঃসঙ্গ ডেরা থেকে কবিতা পাঠিয়ে যোগাযোগহীন তরুণদের কত বিনিদ্র রাত কেটে যায়। এরা কেমন লিখছেন? ভালো?.....আগে তা পড়া হোক।' সেজন্যেই কবিতাগুলিকে ছেপেছেন তিনি এলোমেলো-ভাবে। পড়তেও বেশ লাগে। কত তরুণ কবির কত উজ্জ্বল পংক্তিই না ছড়িয়ে আছে একাধিক কবিতায়। এ সংখ্যায় লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, দীনেশ দাস, মনীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, সতীকান্ত গুহ, শঙ্খ ঘোষ, সুনীলকুমার নন্দী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শিবশম্ভু পাল, শিশির ভট্টাচার্য, অনন্য রায়, প্রশান্ত রায়, হরিপদ দে, প্রতিমা সেনগুপ্ত এবং অনেকে। কবিতা নির্বাচনের গুণে সম্পাদক সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ।

শস্য (জুলাই ১৯৭৩)—সম্পাদক : উৎপল চক্রবর্তী। ফ্ল্যাট ৮, ব্লক—এইচ (এম আই জি, গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, ৩৭ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা ৩৭। দেড় টাকা।

আধুনিক কবিতায় মিউস্টিক নেই—ভাষা দুর্বোধ্য—এমন একটা অভিযোগ দীর্ঘ-কাল ধরে চলে আসছে। শস্য পত্রিকার সম্পাদক শ্রীউৎপল চক্রবর্তী তা মানতে চান না। জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে তরুণ-তম কবির কবিতা খুঁজে—তার মধ্যে তিনি সঙ্গীতের সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন। বোধহয় তাঁর আগে আর কেউ এই বিষয়টি নিয়ে এমন ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

এ সংখ্যায় আধুনিক বাংলা গান বিষয়ক ক্রোড়পত্রে কয়েকটি চমকপ্রদ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রাজেশ্বর মিত্র, অমিতাভ চৌধুরী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, অনল চট্টোপাধ্যায় ও নিখিল চক্রবর্তী। আধুনিক বিভিন্ন দিক দিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ ইন্দ্র, অজয় নাগ ও উৎপল চক্রবর্তী। সুরারোপিত কয়েকটি আধুনিক গান মুদ্রিত হয়েছে ক্রোড়পত্রে। লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোবিন্দ ভৌমিক, আনন্দ বাগচী, কবিতা সিংহ, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণব মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, ফণিভূষণ আচার্য, তুষার রায় ও তুলসী মুখোপাধ্যায়।

এ সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ আঞ্চলিক ভাষায় লেখা কয়েকটি গল্প। সম্পাদকের আন্তরিকতার ছাপ পত্রিকাটির প্রতি পৃষ্ঠাতেই দ্রষ্টব্য। রচনাগুলি সুনির্বাচিত।

সমর্পিতা (কাব্য সংকলন)—শ্যামল বিশ্বাস। প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, লোবান, শিলং-৪। তিন টাকা।

মোট বাইশটি ছোট ছোট কবিতার সংকলনগ্রন্থ হল শ্যামল বিশ্বাস রচিত 'সমর্পিতা'। গ্রন্থটিতে সবই মিলের কবিতা এবং পুরনো রীতিতে লেখা। ছন্দজ্ঞান যে সব সময়ে নিখুঁত, তা সব কবিতা প্রমাণ দেয় না। কবির কাব্য বিষয় হল আত্মকথনের মাধ্যমে হতাশার কথা, অজানিতের আগমন গান, কখনো কখনো ছোট ছোট প্রেম, দুঃখ, স্মৃতি, ব্যথা ও ভরসা। আধুনিক কোন যন্ত্রণা, কোন চিত্রকল্পের জটিল অভিজ্ঞতা এসব কবিতায় না থাকলেও কবি সহজ সরলভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তাঁর পাঠকরা গ্রন্থে তা পাবেন।

আধুনিক ডিজাইনের গিনি সোনার অলঙ্কার নির্মাতা ও বিক্রেতা

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

১। আপনার জন্মা বিবরণ ও জন্মাতে সঠিক বিজ্ঞানের দ্বারায় খাঁটি গ্রহরত্ন ধারণ করুন

২। আপনার সৌভাগ্য ভিত্তিতে আমার জন্য প্রতিটি রত্ন হাত বাড়িয়ে আছে।

ঢাকেশ্বরী জুয়েলারী এণ্ড কোং

১০৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিঃ-১২ ফোন ৩৫০৩২৫

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

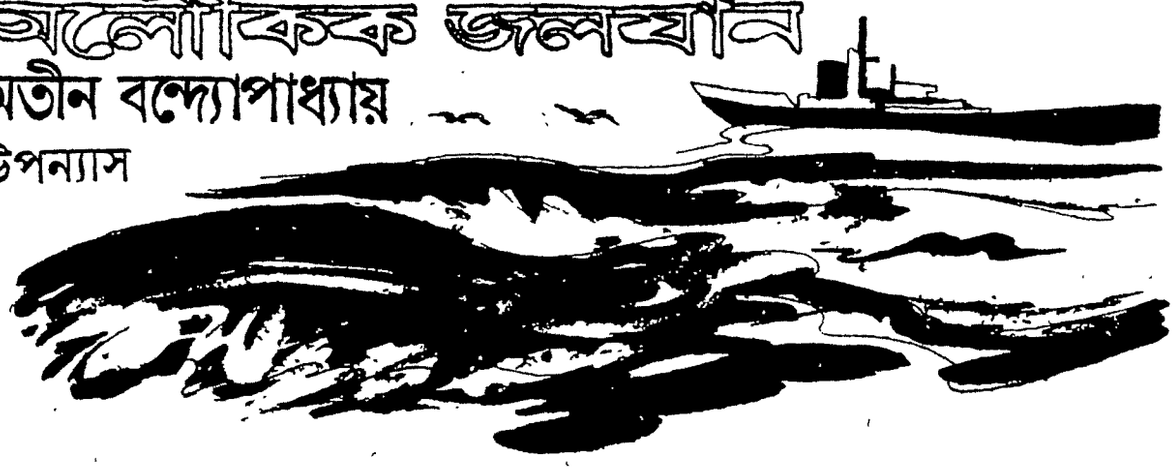

।। নয় ।।

জাহাজ ছাড়ার আগে মৈত্র, ছোটবাবুকে ওয়াচে নিয়ে নিল। সারেঙের ইচ্ছা ছিল না। কি দরকার, যখন চলে যাচ্ছে। এখনতো সমুদ্রে তেমন ঝড় উঠছে না। আর সামনে যে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, খুব ভয়াবহ হবে না। শীতের সমুদ্র। শান্ত নিরিবিলি। নানাবর্ণের সমুদ্র-পাখিরা ঘোরাফেরা করবে কেবল। এখন ছোট যেভাবে আছে সে-ভাবেই থাক না। ওকে আর কে ঘাটাচ্ছে।

তবু মৈত্র বলল, না। ওর শক্ত হওয়া দরকার আছে। সব জাহাজে আপনি আমি থাকব না।

—ছোট কি বলে।

—ওর আবার বলার কি আছে। ওর ইচ্ছায় তো আর কাজ হবে না।

সারেঙ বললেন, ঠিক আছে, যা ভাল মনে করেন, করবেন।

সারেঙের এ-নিয়ে বেশি দ্বিধা থাকল না। ছোটবাবুর জন্য মৈত্রমশায় ভেবে থাকেন। এটা সারেঙ সাব নিজেও চান, ছোট শক্ত হোক। অনেকটা হয়েছে। জাহাজের স্মোক-বকসে খুব ভালভাবে কাজ করেছে। কয়লা লেভেলিং-এর দিন, সে তো সবচেয়ে বেশি খেটেছে। এভাবে একজন জাহাজি জাহাজে ঠিকঠাক না হলে দুঃখ নানাভাবে কপালে লেখা থাকে। সুতরাং ছোটবাবুর ফালতু থাকা আর হল না। এখন সেও অন্য জাহাজির মতো 'পরিদার'। তার 'পরি' মৈত্রদার সংগে। বারোটা-চারটা ওয়াচ। সে এক বাংকারে কাজ করবে, অন্য বাংকারে অমিয়। অমিয় ইতিমধ্যেই বেশ 'পরি' শেষে শিস দিতে দিতে উঠে আসে। একদিন ছোট দেখেছিল, অমিয় 'পরি' শেষ করে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কবিতা আবৃত্তি করছে। বোধহয় কোন ইংরেজ কবির সমুদ্র-বিষয়ক কবিতা। সে শুনতে পায়নি। ওর হাত-পা নাড়া দেখে ভেবেছিল, অমিয় বোট-ডেকে পাগলামি করছে। সে ওপরে যেতে পারেনি। কারণ সে উইন্‌চে কাজ করছিল। ফাইবার ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। পরে সে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, কবিতা আবৃত্তি করলাম। কি শান্ত আকাশ, কি অসীম সমুদ্র, ইচ্ছা হয় না হাত পা ছুড়ে কবিতা আবৃত্তি করতে। ইচ্ছা হয় না ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা খানটা গেয়ে ফেলি।

এ-ভাবে প্রথম যে জাহাজ মনে হয় নিদারুণ, সমুদ্র-যাত্রা মনে হয় কঠিন সফর, জীবনযাপনে বিশ্বস্ততা থাকে না, মনে হয় সবাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে, ক্রমে তা আর মনে হয় না। মনে হয় এরা সবাই মিলে একটা গুষ্ঠিভুক্ত জীব। এখানে ঠিক সব একইভাবে, যেমন সারেঙ বলতে পারে কবে বাড়িয়ালা মাসতাব ডেকে বলবে, নাটক, যাত্রা, কবিগান, যার যা খুশি কর। একদিন, শান্ত সমুদ্রে ডেকের ওপর নাটক, আবৃত্তি, গান-বাজনা লাগাও। বেশ তো বের হয়েছি সেই কবে ডাঙ্গা ছেড়ে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। তখন মনেই হয় না, কাপ্তান খুব বুড়ো, মনে হয় না অথর্ব, মনে হয় না খিটখিটে মেজাজ, বরং মনে হয় মানুষটা জীবনের চারপাশটা যেন শেষদিন পর্যন্ত নানাভাবে দেখতে ভালবাসেন। চুপি চুপি বলবেন, আমার জন্য কিন্তু একটা প্রোগ্রাম রাখবে। এখনও একেবারে খারাপ হাত না।

সবাই হেসে ফেলবে। এই যখন জাহাজের নিয়তি, অর্থাৎ যেখানেই জাহাজ থাক, জাহাজের একঘেয়েমি থাকবে, নিশি-দিনতো শুধু নীল জল নীল আকাশ, মাঝে মাঝে সমুদ্র-পাখিদের ওড়া অথবা ডলফিনের ঝাঁক ডেড়ার পালের মতো সমুদ্রে দেখা, আর তো বৈচিত্র্য বলতে কিছু নেই, যখন ঝড় সাইক্লোন দেখা দেয়, তখন বোধহয় একটা বৈচিত্র্য আসে, একেবারে সব মানুষগুলোকে পাগলা করে দেয়। অথবা কুয়াশার ভিতর ঢুকে গেলে কিংবা কোন হিমশৈল, এটা সহজে ঘটে না। কাপ্তান সারাজীবনে দুবার সংকেত পেয়েছিলেন, নেমে আসছে, নেমে আসছে, পালাও পালাও জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দাও ভয়ংকর সমুদ্রের অতলে মৃত্যুর বিভীষিকা, যেন এক অতিকায় সমুদ্র জুড়ে সে কোন প্রাগৈতিহাসিক জীব হয়ে যায়। আর তো কিছু নেই। কেবল কাজ, চার্ট ঠিক দেখা, চার্ট মতো জাহাজ চলছে কিনা দেখা, দুপুরে গ্রহ-নক্ষত্র দেখা জাহাজের অবস্থান বোঝা; কখনও কখনও দেখা, দিক ঠিক আছে কিনা, অথবা দিক নির্ণয়। অথবা মাকনি সাব অর্থাৎ রেডিও অফিসার সকাল হলে জাহাজের খবর জানিয়ে দিচ্ছেন এরিয়া স্টেশনকে প্রতি সকালে তার এটা কাজ।—হ্যাঁ হ্যাঁ, সিউল ব্যাঙ্ক। তারপর প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে যাওয়া—কত এন আর টি, কত জি, আর, টি, কোন কোর্সে জাহাজ যাচ্ছে এবং নেকস্ট পোর্ট অফ কল কি। অথবা পজিসান জাহাজের ভুল হলে চেয়ে নেন রেডিও থিয়ারিও। তা হলেই সব ঠিকঠাক। আর ভয় থাকে না। এভাবে সব কাজের ভাগ-বাটোয়ারা করে বাকি সময়টা কাপ্তান হুইল ঘরে বসে থাকেন। অথবা খোলা ডেকে বসে এই যে পৃথিবী, সমুদ্র, এবং গ্রহ-নক্ষত্র এবং সৌরলোক সব মিলে ঈশ্বরের কি অপার মহিমা এমন ভাবেন। তখন কাপ্তানের চোখ বুজে আসে, তারপরই কেমন একটা দুঃস্বপ্ন ভেতরে নাড়া দেয়, যেন কেউ পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার গাউন এবং চুলের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছেন তিনি। যত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন তত সে তার পাশে দাঁড়িয়ে কেমন হা-হা করে পাগলের মতো হাসে। তারপরই এক পতনের শব্দ হয়। নিশীথে কেউ শুনতে পায় না, খোলা-ডেক থেকে কে কাকে যেন ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। আর কোন শব্দ নেই। প্রপেলারটা কিক্ ঝিক শব্দ তুলে কেবল যাচ্ছে। তখন কেমন ভয়ে কাপ্তানের বুক গলা শুকিয়ে যায়। সে হাকতে থাকে, জ্যাক জ্যাক, দ্যাখতো কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে কিনা।

—না তো। কে ঢুকবে!

—মনে হল কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে।

জ্যাক এতে কিছু মনে করে না। সে এটা বাড়িতেও দেখেছে। বাবার হাতে কাজকর্ম না থাকলে এমন হয়। একা চুপচাপ বসে থাকলে, কেন জানি বাবা ভীষণ ঘাবড়ে যান। সে বাবাকে এজন্যও ছেড়ে থাকতে পারে না।

বাড়িটা ওদের পোর্টের কাছাকাছি। এক-দিকে বড় মাঠ, শহরের ভেতরে রাস্তা চলে গেছে, রাস্তা পার হলে, কিছু লোহা-লক্করের কারখানা, তারপরই নির্জন একটা গাছপালা ঘেরা ফোর্টের মতো বাড়ি। সামনে লাইট-হাউস। অর্থাৎ রাস্তা সামনে, তারপর ড্রাই-ডকের জেটি, কিছু লম্বা ক্রেন, ড্রাই-ডক করা সব জাহাজের খোল ওদের বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে। আর আছে আরও দূরে সব যুদ্ধজাহাজের ঘাঁটি। সারি সারি ডেস্ট্রয়ার সমুদ্রের জলে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বাবা বোধহয় বাড়িটা ইচ্ছা করেই এমন একটি জায়গায় করেছিলেন। সারাদিন বেল-কনিতে বসে থাকলে সমুদ্রে সব ছোট ছোট জাহাজ, বড় জাহাজ, টাগ-বোট এবং যুদ্ধ-জাহাজের নীল জলে ঘোরাফেরা তার ভাল লাগে দেখতে। আর বাড়িটা গাছপালায় ঘেরা। বেশ জায়গা নিয়ে। নানাবর্ণের সব গাছ বাবা জায়গা নিয়ে। নানাবর্ণের সব গাছ বাবা পৃথিবীর সব বন্দর থেকে সংগ্রহ করেছেন। কেউ বেঁচেছে, কেউ বাঁচেনি। তবু বাড়িটাকে দেখলে মনেই হয় না, ওয়েলসে এমন, অন্য একটা বাড়ি আছে।

মাঝে মাঝে বাবা ঠিক এমনি চিৎকার করে ওঠেন, দেখ তো ভিতরে কে গেল?

—কে বাবা!

—মনে হয় কেউ।

—না তো।

—ভালো করে দ্যাখ।

জ্যাক ভিতরে ঢুকে ভাল করে দেখে আসে। পরিচারিকা মেয়েটিও ছুটে আসে। সফরে বের হলে একজন পাহারাদার থাকে বাড়িতে। মাঝে মাঝে পরিচারিকার সঙ্গে বাজারের হিসাবপত্র নিয়ে আসে। এমন শুনতে পেলে সেও ছুটে আসে।—ভুল হয়েছে স্যার।

—আমি পড়ছিলাম, মনে হল কেউ এসে পাশে দাঁড়াল, কি বলল, তারপর কোন তোয়াক্কা না করে ভিতরে ঢুকে গেল।

এ-নিয়ে প্রথম প্রথম সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ত। ওদের ভাবনা হত। সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে, এমন হওয়া স্বাভাবিক। সে তো সারাক্ষণ জল আর জল, কখনও ডাঙ্গা, মানুষের কাছে ডাঙ্গা যে কত বড়, একজন নাবিকের চোখ দেখলে তা টের পাওয়া যায়। এবং বোধহয় কাপ্তান আর সফরে যেতে চান না। কিন্তু পরে এত স্বাভাবিক হয়ে যান যে তখন আর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।—ও এটা আমার হয়। ওটা কিছু না, শোন তো বনি। কাছে গেলে বলবে, বেহালাটা আন তো একটু বাজাই।

তখন হয়তো সমুদ্রে সূর্যাস্ত হচ্ছে, অথবা জ্যোৎস্না রাত থাকলে এভাবে কতক্ষণ যে বাজান! যত বয়স হয়ে যাচ্ছে, তত বাবা বেহালা বাজাতে বেশি ভালবাসেন। বনি এটা দেখে বুঝেছে, বাজার ভিতরে অসীম দুঃখ। মেয়েকে তিনি কিছুই বলতে চান না। তখন তার ভীষণ অভিমান। সে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। বাবা তাকে যেন দেখছে না। সেও বাবাকে দেখছে না। সামনের রাস্তায় কিছু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ। রাত হলে তাও থাকে না। বাড়িটা পোর্টের পেছন দিকে বলে খুব নির্জনতা আছে। ছাদে উঠলে, শহরের ভিতরে যে ক্যাসেল আছে তার চূড়ো দেখা যায়। আর এই যে লাইট-হাউস, এবং সব রঙ-বেরঙের বাড়ি, জাহাজের ভোঁ এ-সবের ভিতর বাবা এবং সে মাঝে মাঝে এমন নীরব হয়ে যায় যে, কেউ বুঝতেই তখন পারে না, বাড়িতে কেউ আছে।

বনি সমুদ্রে এলে শরীর ওর ভাল হয়ে যায়। প্রায় নাবিকের জীবনেই এটা ঘটে। কিন্তু বনি যতটুকু বড় হয়েছে, যা কিছু শিখেছে, অথবা জীবনযাপনে সে যে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে শিখে গেছে, সেটাও এই জাহাজে। এখন রাত্তিরবেলা, বাবা হুইল ঘরে একটা ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। এনজিন-ঘর থেকে ঝিক ঝিক শব্দটা উঠে আসছে। সমুদ্রের বাতাসে এখন আর তেমন জলকণা নেই। বাতাস ক্রমশ শুকনো হয়ে উঠছে। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস। বাবার মাথার চুল গত সফরেও দুটো একটা সে কালো দেখেছে। কিন্তু সে এ-সফরে কেমন দেখল, বাবা ভীষণ বুড়ো, চুলগুলো ভীষণ সাদা, বিশেষ করে বাবা যখন একা একা চুপচাপ উইংসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন বাবাকে ভীষণ দুঃখী মনে হয়। উইংসের সবুজ আলো দুলতে থাকে। জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্রে ভেসে যায়। জ্যোৎস্নায় কেমন চারপাশের সমুদ্র অলৌকিক এক জগত নিয়ে বেঁচে থাকে। সে শুনতে পায় বাবা সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলছেন, অথবা মনে হয় কিছুটা গানের মতো, অর্থাৎ সারাটা জীবন বাবা সমুদ্রে কাটিয়েছেন, ওর বয়স যদিও কম, তবু সে সমুদ্রে এসেই বুঝতে পেরেছে, বাবা এই সমুদ্রেই থেকে যেতে চান। বাড়িটা যে তিনি সমুদ্রের ধারে করেছেন সেও হয়তো মৃত্যুর আগে তিনি জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখতে পাবেন বলে।

আসলে মানুষের এই হয়। যত বয়স বাড়ে, তত ঈশ্বর সম্পর্কে বিচিত্র অনুভূতি অথবা মৃত্যু-চেতনা, এবং কখনও গভীরে কি যেন বাজে। বনি বাবাকে অবসর সময়ে এখন দুটো কাজ করতে দেখে। সে দেখে বাবা, ঈশ্বর সম্পর্কে সব রকমের বই, বিশেষ করে জেরুজালেমের প্রাচীন ইতিহাস তিনি পড়তে খুব ভালবাসেন। কখনও কখনও তিনি বালকের মতো পড়ে যান ট্রেজার আয়-লেণ্ড অথবা ফরাসী দেশের সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প। যে থাকত ছোট্ট একটা গ্রহাণুতে। বাবা আর এখন ডিকেন্সের বই পড়েন না। অথচ লাইব্রেরিতে তার সব বই আছে। তিনি এখন বেছে বেছে সব ছোটদের বই সঙ্গে নেন। অথবা কোন বন্দরে গেলেই তিনি ছোটদের বই কি ভাল আছে খোঁজ করবেন। এ-সব দেখে মনে হত সব তিনি বনির জন্য কিনছেন, তার কোন এতে উৎসাহ নেই। কিন্তু বই কিনে কিছুতেই প্রথম না পড়ে বনিকে দেবেন না। বনি তখন না হেসে পারে না। অথবা কখনও কখনও তাঁর যখন ঘুম আসে না, যখন সারা রাত্রি সহসা খুব দীর্ঘ হয়ে যায়, তিনি বোট-ডেকে একাকী বেহালা বাজান। রাতের জাহাজ এমনিতেই ভীষণ মায়াবী, নীল রঙের ভিতর সাদা জাহাজের চলা, কেবল ঢেউ-ভেঙ্গে অথবা গভীর সমুদ্রে চলা, আর অন্তহীন আকাশের নক্ষত্রের ছায়া সমুদ্রে, তখন বাবার ভীষণ আবিষ্ট হয়ে যেহালা বাজানো বনির কি যে খারাপ লাগে! সেও নেমে যায় বোট-ডেকে। বাবাকে সে ডাকে, বাবা।

—কে!

—আমি বাবা।

—অঃ। তোর আবার এখানে আসার কি হল।

—এমন ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার অসুখ হবে।

—কোথায় ঠাণ্ডা।

—ঠাণ্ডা নয়! আমার ভীষণ যে শীত করছে বাবা!

—যা! তুই ছেলেমানুষ, তোর তো আরও গরম লাগার কথা! বলেই তিনি ওর জামার নিচে বুকের কাছে হাতটা নিয়ে যেতেন।—দ্যাখ তো ঠাণ্ডা লাগছে?

বনি দেখেছে, ঘামছেন বাবা। কেমন ভিজে ভিজে।

বাবা না বলে যেন পারেন না, আমি যে বেহালা বাজাচ্ছিরে। কি যে ভাল লাগে না! মনেই হয় না, ভেতরে কোন পরিশ্রম হচ্ছে।

বনি টের পেত বাবার বুকটা কেমন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সে এমন আর একটা বুকের কাছে হাত রাখলে টের পাবে, তাজা, গভীর। যে যেন বলতে পারত, বাবা ছোটবাবুর বুকটা তোমার মতো না। ওর বোধ হয় খুব চওড়া। তোমার মতো বয়সে ওর বুকে হাত দিলেও বুঝি এমন ছোট মনে হবে।

বনির এ-ভাবে কত যে ভাবনা! তার বয়স বাড়ে। বুঝতে পারে, সে নানাভাবে বুঝতে পারে, সে বয়সানুযায়ী বেশি ভাবে বুঝতে পারে। সে যখন এ-ভাবে ভাবে, তখনই কখনও দেখতে পায়, ছোটবাবু স্মোক-বকস পরিষ্কার করে পুপ-ডেকে ফিরে যাচ্ছে, কখনও দেখতে পায়, নীল রঙের পোশাক পরে বোট-ডেক পার হয়ে সোজা তরতর করে ফানেলের গা ঘেঁষে। সিঁড়ি ধরে স্টোক-হোলডে নেমে যাচ্ছে। আবার কখনও সে দেখতে পায় পুপ-ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে চর্বি-ভাজা রুটি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, আর অনবরত সমুদ্র দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে যাচ্ছে!

তখন কেন যে বনি জোরে না ডেকে পারে না—ছো.. ট...বা. বু।

সেদিনও পোর্ট এলিজাবেথ বন্দর ছেড়ে যাবার মুখে বনি ডেকেছিল, ছোটবাবু এ-ভাবে কোথায় ছুটে যাচ্ছ।

—সেকেণ্ডের কাছে।

—কি ব্যাপার!

—মেয়ে। জাহাজে ওম্যান এসে গেছে।

—যা!

—হ্যাঁ। ওকে খবরটা দিতে হবে। [illegible] চাপে বন্দরে একবার নামতে [illegible]। ফাঁক পেলেই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে

দেখেছে। অথচ এত কাছে বন্দর, বার বার দেখেও তার আঁশ মেটেনি। খবরটা দিয়ে আসছি।

বনি লাল রঙের জাহাজী টুপি মাথায় পরেছে। পায়ে পরেছে কেডস্ সাদা রঙের। চুল কাটা হয়নি অনেকদিন। চুল বড় হয়ে গেছে। চুল বড় হলেই ছোটবাবুর ইচ্ছা হয় আর একটু দাঁড়িয়ে থাকে জ্যাকের পাশে। জ্যাক সুন্দর একটা ডোরাকাটা পুল-ওভার পরেছে। পিছনে পকেট, সামনে পকেট, সবুজ রঙের প্যান্ট পরেছে। জ্যাকের কাছে এ-শীতটা মনোরম। ছোটবাবুর কাছে শীতটা প্রচণ্ড। সে সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মার্কেট থেকে দুটো সস্তায় সোয়েটার কিনেছে, একটা ফুলহাতা, একটা হাতকাটা। সে লেদার জ্যাকেট কিনেছে একটা। মাথায় পরার জন্য উলের টুপি। একটা পুরানো ওভারকোট কিনবে ভেবেছিল। কিন্তু মৈত্র বলেছে, বুনোসাইবিসে পুরানো জিনিস খুব সস্তা। আর আমেরিকা অথবা ইউরোপের বন্দরে গেলে তো কথাই নেই। এখন যা না হলে নয় এমন কিছু কিনে নিতে বলেছে।

জ্যাক ছোটবাবুর পোশাক দেখে হেসে ফেলল। ছোটবাবুর পুরানো পোশাক তার ওপর যা যা কিনেছে, শীতের জন্য সব পরে ফেলেছে। ছোটবাবু পোশাকের ভিতর আটকে গেছে। হাতে দস্তানা। একটু শীতকাতুরে ছোটবাবু। পিছনে পড়ে থাকছে বন্দর। একেবারে সমুদ্রের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে পাহাড়। তার কোলে ঘর বাড়ি, লাল নীল কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের ওপরে ট্রেন লাইন, জাহাজ থেকে পাহাড়ের মাথায় রাতে বনি আর ছোটবাবু গাড়ির এনজিন ছুটে যেতে দেখেছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায় এনজিনের আলো। পাহাড়ের গাছপালার ভিতর একটা ঐমন আলোর বন্যা দেখতে ওদের অনেকক্ষণ ভাল লাগছিল। ওটা গাড়ির এনজিনের মতো মনে হয়েছে। আসলে ছোটবাবু জানে না ওটা কি!

এখন সকাল বলে, এবং শীতের মরসুমে সবাই জামাকাপড় সেঁটে বেশ হাহা হিহি করতে করতে এনজিন রুমে এসে যাচ্ছে অথবা ডেকে জল মারছে অথবা ফলগুলো বেঁধে জাহাজের খোল, মাস্তুল রঙ করছে। ইণ্ডিয়ানদের পোশাক একেবারে বেঢপ। ছোটবাবুকে কিছুতেই আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। বনি বলল, ছোটবাবু যে-ভাবে তুমি ভাল্লুকের মতো ছুটছ—ঠিক উলটে পড়বে। একটু আস্তে যাও। ডেবিড অনেক মেয়ে দেখেছে, আলাদা করে তোমার না দেখালেও চলবে।

আসলে বনি ছোটবাবুর সব পছন্দ করে। কিন্তু যখন দূরবীনে মেয়ে খুঁজে বেড়ায় বন্দরে তখন কেমন ক্ষেপে যায় বনি। সে কখনও কখনও ছোটবাবুকে এ-নিয়ে ছোট বড় কথা বলে ফেলে। ছোটবাবু জানে ক্যাপ্টেনের আদুরে ছেলে—তার সঙ্গে ভাব করে থাকাই ভাল। তাকে রাগালে জাহাজে থাকা চলে না। তা ছাড়া বড়মানুষের ছেলেরা একটু বাঁদর গোছের হয়, সে দিক থেকে তো জ্যাক ভীষণ ভালো। কোন অহংকার নেই মনে হয়। আবার যখন মনে হয় জ্যাক ভীষণ অহংকারী তখন সে আর বোট-ডেক দিয়ে নিচে নামে না। ওর নামতে ভয় হয়।

যেমন জ্যাক আর দাঁড়াল না। রাশভারি তার কথাবার্তা। গলার স্বর কিছুটা মেয়েলি। রাশভারি গলায় কথা বলতে চাইলে সেটা আরও বেশি মেয়েলি হয়ে যায়। ছোটবাবু সে-জন্য মাঝে মাঝে হেসে ফেলে। হেসে ফেললে জ্যাক আরও বেগে যায়। দুদিন তিনদিন তখন আর কথা বলে না। এ-ক'দিনেই সে বুঝেছে, জ্যাক তাকে এ-জাহাজে নানাভাবে জব্দ করে। এই যে সামনে পড়ে গেল, কেন যে বলতে যাওয়া; ওম্যান। না বললেই যেন ভাল ছিল, মেয়েদের কথা বলতে গেলে জ্যাকের চোখ মুখ কেমন হয়ে যায়। জ্যাক কি ওকে সাধু সন্ত বানিয়ে রাখার চেষ্টা করছে! সে তো তা নয়। এ-ভাবে সে শৈশবের কথা মনে করতে পারে—কবে কোথায় কে যেন প্রাচীন শ্যাওলাধরা একটা ইঁটের ঘরে তাকে নিয়ে কি করেছিল। সে সেই থেকে ভয় পায়, অবশ্য এখন সে আর তেমন ভয় পায় না, সে তো ডেবিডের সঙ্গে বের হয়ে ডারবানে শিস পর্যন্ত দিয়েছে। ডেবিড খুব খুশি সে-জন্য।

এবং কেন যে এমন হয়, জ্যাক তাকে ভাল্লুক বলেছে! এখন শীতের বেদ ডেকে। জাহাজ সোজা এবার আটলান্টিকে পড়বে। দুশো তেত্রিশ ডিগ্রি বরাবর জাহাজ যাচ্ছে। শহর বন্দর ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ফানেলের ধোঁয়া সমুদ্রের জলে যেন এক মহামায়ার মতো, অথবা মনে হয় কেউ মোহিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বে এবং তার চুলের বাহার, উড়ছে অনবরত, সমুদ্রে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

ভাল্লুক কথাটা মোটামুটি খারাপ। এমন খারাপ কথা এই প্রথম বলেছে জ্যাক। ছোটবাবুর মনে হল, জ্যাকের সঙ্গে সে কোন সম্পর্কই রাখবে না। জ্যাক তো ওদের ফোকসালে আসে না। এলেও খুব কম। যেন না আসারই নিয়ম। রোববারে রোববারে সবাই যখন সাফাই দেখতে বের হয়, ঠিক তখনও জ্যাক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর মনে হল, ভাল্লুক কথাটা গালাগাল। ইংরেজিতে গালাগাল কেমন গায়ে লাগে না। একটা কথা অবশ্য ছেলে-বেলা থেকেই সে শুনলে ক্ষেপে যায়। ব্লাণ্ডি কথাটা ওর কেন জানি সহ্য হয় না। সোয়াইন, বাস্টার, রাসকেল এসব কথা শালা শুয়োরের বাচ্চার মতো তত পাজি শব্দ নয়। সে ভাল্লুক কথাটাকে শালা শুয়োরের বাচ্চার মতো ভাবতে গিয়ে মুখ গোমড়া করে ফেলল। মুখ গোমড়া হলেই ভিতরে ভিতরে সে বেপরোয়া হয়ে যায়। সে তখন আর কিছু ভাবতে পারে না।

সে ফের ছুটতে থাকল। তা না হলে ডেবিড হুইল-ঘরে চলে যেতে পারে। সে অফিসারস গ্যালি পার হয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর দরজায় কড়া নাড়ল, সেকেণ্ড সেকেণ্ড স্লিজ।

ডেবিড দরজা খুলে বলল, কি ব্যাপার!

—ওম্যান।

—কোথায়?

—এঞ্জিন-রুমে।

—বলছ কি!

আর তখনই ছোটবাবু দেখল ওর প্রতিবিম্ব সামনের দর্পণে। একেবারে চেনা যাচ্ছে না তাকে। সে পোশাকের ভিতর হারিয়ে গেছে। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। মাংকি-ক্যাপের জন্য সে কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। এমন মুখ এবং চেহারা হয় পোশাকের ভিতর আটকা পড়লে সে জানত না। বেশ মজা লাগছে দেখতে নিজেকে। সে নিজেই হেসে ফেলল, বলল, ছোটবাবু, তুমি ভাল্লুক নও, একেবারে জাম্বুবান, বলেই সে হাঁকল।—ওম্যান স্যার।

—ওম্যান।

প্রকাশিত হল
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্লাসিক উপন্যাস
টুকুনের অসুখ ১০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কবি নন, লেখক—কথাশিল্পী। অথচ তাঁর বর্ণময় সুষমা-মণ্ডিত লেখনী মাঝে মাঝে যেন কবিতা হয়ে যায়। ...লেখকের এ উপন্যাসের নায়ক সুবল, বয়সে কিশোর। নায়িকা টুকুন, কিশোরী। টুকুন চিররুগ্ন। হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুবলের। সেদিন টুকুন বিস্ময়ে সুবলকে দেখেছিল অনেকক্ষণ। কিভাবে যেন সুবলকে তার ভাল লেগে গেল। তারপর কিভাবে গ্রাম্য সুবলের সরল সান্নিধ্যে টুকুন সুস্থ হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়! লেখক এ কাহিনী রচনা করেছেন বড় মায়ায়। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়ে লাগে। যা ক্লাসিক উপন্যাসের বড় ধর্ম।
বর্ণালী ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

ডেবিড ছুটছে, ছোটবাবু ছুটছে। ছোট চিৎকার করে বলছে, জাহাজে ওম্যান! ওরা ছুটে এসে এঞ্জিন-ঘরে ঢুকে গেল। আর চিৎকার করে বলতে থাকল, ওম্যান! ওম্যান!

—কোথায়!

—আসুন না। দেখাচ্ছি। ওরা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল।

জাহাজে তখন খবর রটে গেল, যেমন খবর রটে যায় মৈত্রমশাই যাবেন সাগর-সঙ্গমে, এও মানুষের কাছে সাগরসঙ্গম, না হলে সামান্য দুটো চড়াই পাখির পাশে দাঁড়িয়ে ছোটবাবু বলবে কেন, স্যার, মিসেস স্পেরো।

—ইয়েস। ইয়েস।

—স্যার, মিঃ স্পেরো।

—ফাইন।

ছোটবাবু বলল, স্যার নেমে যাচ্ছি, দেখছি, কিচ-কিচ করছে। কে কিচ-কিচ করে! ওমা দুটো পাখি। ওদের আমি জানি, এ যে ছাই বঙের দেখছেন এটা মিসেস স্পেরো, আর এ যে দেখছেন, গলার কাছে লাল রঙ ওটা মিঃ স্পেরো।

তখন ডেবিড বলে উঠল, হ্যালো মিঃ এণ্ড মিসেস হাউ ডু ইউ ডু।

—খুব ভাল আছে সেকেণ্ড। ছোটবাবু কখন যে কি বলে! সেকেণ্ড, স্যার, যখন যা খুশি। আসলে সে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেলে সেকেণ্ড বলে ফেলে। যখন অফিসার ভেবে ফেলে, তখন স্যার। সে বলল, শীতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল, এঞ্জিনের গরমে বেশ আছে এখন। দেখছেন না কেমন পাখা ঝাড়ছে। আবার আমাকে আপনাকে দেখছে ঘাড় বাঁকিয়ে।

—আমরা ওদের ডিস্টার্ব করছি না তো! সেকেণ্ড বলল।

—না, না। দেখছেন না আমাদের ভয় পাচ্ছে না।

তারপর একে একে অনেকেই ছুটে এসেছিল। এসেই অবাক! দেখল মেজ-মালোম আর ছোটবাবু অতিকায় সাকুলেটিং ফ্যানটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিচে যেন স্টিম-পাইপ, পাশে লম্বা রেলিঙ। রেলিঙে দুটো চড়ুই পাখি বসে পাখা ঝাড়ছে। উড়ছে। নাচছে গাইছে। মাঝে মাঝে কিচ-কিচ করছে।

পাগল, যেমন ছোট তেমনি মেজ-মালোম। পাগল না হলে দুটো পাখি নিয়ে এক্ষুণি একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে আর তখন মৈত্র 'পবি'তে ছোটকে খুঁজছে। ওরা সারেঙকে বলে আটটা-বাবোটা ওয়াচ চেয়ে নিয়েছে। এটা সাধারণত সারেঙের ওয়াচ, কিন্তু সারেঙ মৈত্রের কথা ভেবেই হোক, অথবা ছোটবাবুর কথা ভেবেই হোক ওয়াচ বদলে নিয়েছে। আটটা বেজে গেছে। মৈত্র দেখল, ছোট নামেনি। সকালের চাবটা-আটটার পরীদারেরা উঠে যাচ্ছে। মৈত্র এসেই স্টিম দেখে নিয়েছে। এখন স্টিম তর-তর করে নেমে যাবে। কার্পেসের ছাই ঝেড়ে নিতে হবে। র‍্যাগ মারতে হবে। অমিয় চুপচাপ উইণ্ডস হোলের নিচে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, এদিকে ছোটবাবুর দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু সে নেই। এ বেশ ঝামেলা। বেশ বাবুটি বের হয়ে কোথায় যে চলে গেল। কেউ তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। আগয়ালারা তিনটে বয়লার থেকে একেবারে সোজা সব আগুন টেনে ফেলে দিচ্ছে, এবং পর পর ত্রিশ-চল্লিশ বেলচা কয়লা হাঁকড়ে বালব্ খুলে দিচ্ছে। এখন পায়ের কাছে আগুন ধক-ধক করে জ্বলছে। স্টোক-হোলও লাল হয়ে গেছে তাপে। কেউ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, একা অমিয় জল মেরে আগুন আয়ত্তে আনতে পারছে না মৈত্রকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে, সে এখন ছোটবাবুর হয়ে ক্রমান্বয় বালতি বালতি জল মেরে যাচ্ছে। ছাই টেনে জড় করছে। আর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে রাগে। কোথায় কে গেল! সে যেতেও পারছিল না। মোটামুটি সব ঠিকঠাক না করে স্টোক-হোলও ছেড়ে যেতে পারছে না। তাহলে স্টিম তর তর করে নেমে যাবে। স্টিম নেমে গেলে কেলেঙ্কারী। সে কোনরকমে মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে যখন বেশ হাওয়ায় ফার্নেসের আগুন একেবারে লাল, স্টিম-গ্যাসের কাঁটা লাল দাগটা বরাবর থর-থর করে কাঁপছে, তখনই সে দু-লাফে এঞ্জিন-রুমে ঢুকে গেল, ছোটবাবুকে যেখান থেকে হোক এখন ঘাড় ধরে নামাতে হবে। না হলে লজ্জা হবে না।

সে ওপারে উঠে যায়। মেজ-মালোম আর সে দুই বন্ধুর মতো কথা বলছে। তিন নম্বর মিস্ত্রি নিচে দাঁড়িয়ে গজ গজ করছেন। হেল, এমন বলছেন। তিন নম্বর মিস্ত্রির কাছে টিণ্ডালের বদনাম হবে, সে এটা দেখে আরও বেগে গিয়েছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে মেজ-মালোমের সঙ্গে ওর এমন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে আর ঘাড় ধরতে ইচ্ছা হল না। দুজন অসমবয়সী মানুষ জাহাজে এসে কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।

মৈত্র ডাকল, ছোট।

ছোট পেছন ফিরে তাকিয়েই জিভ লম্বা করে দিল, একেবারে ভুলে গেছি। বলেই আর দাঁড়াল না। এক দৌড়ে সে ওপরে উঠে গেল, টুটন-ডেক পার হয়ে গেল। কিনার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহর-বন্দর দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র সামান্য ফের অশান্ত হয়ে উঠছে। মৈত্র ওকে একটাও চড়া কথা শোনাতে পারল না। সে নেমে এসে বলল, এই অমিয় হাত লাগা।

—ছোটকে পেলি না?

—পেয়েছি।

—কি করছে?

—বাবু ওম্যান আবিষ্কার করে মেজ-মালোমের সঙ্গে ওম্যান সম্পর্কে একটা বড় লেকচার দিচ্ছে।

স্টোক-হোলও, খোলের সব চেয়ে নিচুতে বলে, ওপরে কি ঘটে, খবর রাখা ঠিক হয়ে ওঠে না। এখন এই যে এত বড় একটা খবর জাহাজে রটে গেল, অমিয় তার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সে কেমন অবাক হয়ে বলল, মৈত্র, বলিস্ কি!

—ঠিকই বলছি, ওম্যান!

—তার মানে মেয়েছেলে!

—হ্যাঁরে বাবা, ওম্যানের বাংলা মানে মেয়েছেলে, শালা তোর বাবাতো তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়িয়েছিল রে। সাহেব করার ইচ্ছা ছিল, তা এখন ওম্যানের বাংলা মানেটা গুলিয়ে ফেলছ। কয়লাবালা আর কাকে বলে!

—সত্যি বলছিস!

—মিথ্যা বলতে যাব কেন।

—কে ধরে এনেছে।

—কেউ না। নিজেই জাহাজে উঠে এসেছে।

—কোথায় নেমে যাবে?

—সে জানি না।

—মাইরি। আমি মরে যাব মৈত্র। বল্ সব খুলে।

আগয়ালারা এসে জড় হয়েছে। মৈত্র ওদের সঙ্গে একটু রাশভারি কথাবার্তা বলে থাকে।—এই যে মিঞারা কাম কর, খাড়ইয়া থাইক না। স্টিমের অবস্থা ভাল না। ওরা স্টিম দেখতে সরে গেলে মৈত্র বলল, চালা, হাত চালা। সে অমিয়র কথায়ও জবাব দিল না। এ্যাস-রিজেক্টারে সে বেলচে মেরে ছাই তুলতে থাকল।

এবং তখনই দেখা গেল ছোটবাবু নেমে আসছে, নীল পোশাক সে পরেছে। যা পরে সে পরী দেয়, সেই পোশাক। মাথায় সেই নীল রঙের টুপি। নিচে নেমে একটু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। বেলচেটা নিতে গেলে মৈত্র বলল, যা, ওপরে যা। অমিয়, তুইও উঠে যা। কয়লা যা খাচ্ছে!

বাকি কাজটা মৈত্র করবে। আগয়ালাদের নিয়ে সে ফাঁকে ফাঁকে হাতে হাতে কাজটা সেরে ফেলবে। আগয়ালারা এটা করে থাকে। কারণ মৈত্রের মুখের ওপর ভারা কথা বলতে পারে না। আগে কয়লায়ালাদের কাজ ছিল, সব কাজ কামের পর ওদের চানের জল তোলা। এবারে সারেঙসাব তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এ-ভাবে কয়লাবালারা বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে। ওরা মৈত্রের সামনে কিছু না বললেও, নিজেরা ভিতরে ভিতরে সমালোচনা করতে ছাড়ছে না। কখনও কখনও এটা যে সারেঙসাবের কানে না গেছে এমন না, তিনি তখন বলেছেন, কেন করবে? তোমাদের চানের জল কয়লায়ালারা কেন গরম করবে? আগে করত, তোমরা ওদের বহলাবে কয়লা মারা শেখাতে, অসুখে বিসুখে অথবা কেউ কোন বন্দরে নেমে গেলে, কাজের লোক হয়ে যেত কয়লাবালা। বাড়িয়ালা খুশি হয়ে লিখে দিতেন সফরে কে কি কাজ করেছে। এখন তো বাপজানেরা তা আর হচ্ছে না। একটা সফর সেরে যেতে পারলেই আগয়ালা। তারপর কাজ দেখানোর পালা। স্টো তোমাদের হাতে না, স্টো সাহেবদের হাতে।

সুতরাং আর এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়নি। অমিয় বেলচে কাঁধে ওর ব্যাংকারে চলে

যাচ্ছে। উঠে যাবার সময় সে লারে, লা লা বলে গান গাইছিল। অমিয়র চুল খাটো করে ছেঁটে দিয়েছে মৈত্র। চুল কাটার লোক না থাকলে যা হয়, মৈত্র ওদের চুল কেটে দেয় খ্যাবড়া ছাঁট। অমিয় মাথায় হাত দিয়ে মাঝে মাঝে তখন বলতে ছাড়ে না, শালা চুল কাটতে কাটতে বউএর কথা ঠিক ভাবছিল। —দ্যাখ চুলটা পেছনে কি করে দিয়েছে!

ছোটবাবু দেখল, সত্যি চুলটার ভীষণ বাজে ছাঁট হয়েছে। এ-নিয়ে অমিয় তিন চারবার বলেছে। এখন বলেছে, এ-জন্য যে, সে ছোটর কাছে কিছু জানতে চায়। সে বলল, ছোট কে এসেছেরে জাহাজে!

—কে আসবে!
—খুব ব্যালা মারছিস!
—র‍্যালা মানে!

—ঐ খুব মেয়েছেলে নিয়ে ডট্ ডট্। আমার যে কি হবে না! মাথার চুলটা এমন বাজে ছেঁটে দিল! কে জানত বল, জাহাজে মেয়েছেলে উঠে আসবে। তারপর একটু থেমে বলল, কোথায় যাবে, ফ্রেন্টিস, মন্টিভিডিও না বুনোসাইরিস।

ছোটবাবু হেসে দিল! ধুস্, তুই যে কি না! তোকে কে বলেছে জাহাজে মেয়েছেলে প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে! কেপটাউনে গেলে তবু হয়তো দেখা যেত মেয়েটেয়ে, পোর্ট-এলিজাবেথ থেকে কে আর উঠবে! আমাদের নসিব খারাপ, জাহাজ সোজা আটলান্টিকে পড়ছে।

এদিকে তখন সুট থেকে গড় গড় করে কয়লা আগয়ালারা টেনে নিচ্ছে তো নিচ্ছেই। মৈত্র খেয়াল করছে না। মাথার ওপরে বাবুরা দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সে ছাই এ্যাস-রিজেকটারে ফেলে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ঠিক মাথার ওপর প্রায় ফুট বিশেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে গল্প করছে তারা। এবার সে চিৎকার না করে পারল না, এই হারামজাদারা, রাসকেল, তোরা ভেবেছিস কি! আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সব ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছায়া দুদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মৈত্র ওপরে মুখ তুলে তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে, আমি কিছু করতে পারব না! ভেবে-ছিসটা কি! সুট ভরতে না পারলে, ওয়াচের পর যা সময় লাগে খেটে যেতে হবে। রোজ রোজ আমি পারব না। পরীর বদনাম তোমাদের জন্য কে নেবে!

ছোট ঢুকে দেখল, একেবারে অতলে। সে লম্ফটা হাতে নিয়ে সুটের পাশে দাঁড়াল। চারপাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক খাদের নিচে, মানুষ একা অন্ধকারে লম্ফ হাতে দাঁড়ালে যেমন দেখায়, তেমনি ভূতুরে। সে আর দাঁড়াল না। ডারবান থেকেও কিছু কয়লা নেওয়া হয়েছে। টুইন-ডেকের দুদিকে কয়লার ডাঁই। এখন এক নাগাড়ে চব্বিশ পঁচিশ দিন সমুদ্রে ভেসে যেতে হবে। যত ওরা দক্ষিণে নেমে যাবে তত শীত বাড়বে। ডেকের কয়লা মাঝ দরিয়ায় না গেলে ফেলা হবে না হয়তো নিচে। সে এবার বুঝতে পারল ঠিক এক-নাগাড়ে ঘন্টা চারেকের মতো কয়লা ফেলতে না পারলে সুট সে ভরতে পারবে না।

এবং এ-ভাবে এক সংগ্রামের মতো, কখনও কখনও ভরে রাতে ঘুম আসে না, সকাল হলেই ওয়াচ, অথবা রাত আটটা বাজলেই ওয়াচ। বাংকে শুয়ে থাকলেও মনে হয়, কেউ যেন অনেক দূরে হেঁকে যাচ্ছে, ষোয়ানলোগ টান্টু। এই এক শব্দ, অনেকটা টেনি টরেন্টো শব্দের মতো। গর্ভিনী তিমি শিকার করে ফেরার সময়, সমুদ্রে এমন একটা শব্দ শিকারীরা শুনতে পায়। গর্ভিনী তিমিরা কত যে অবলীলায় ভেসে বেড়ায় সমুদ্রে। ছোটবাবুও বাংকে শুয়ে থাকলে এমন সব শব্দ শুনতে পায়। বুক তার ধুকপুক করতে থাকে। কখনও সে এটা খুলে বলে না। যেন গ্রাহ্য করছে না, সে অন্য সবার মতো কাজ করতে পারছে এটা প্রমাণের জন্য আর এক মুহূর্ত নষ্ট করল না। দরজার কাছে সে লম্ফটা রেখে এল। মেডিসিন জারটা সে ঠেলে নিয়ে গেল সামনে। সুট থেকে কয়লা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। সে নুয়ে দ্রুত বেলচা দিয়ে গাড়ি ভরে ফেলল। তারপর দু হাতে সামনে ঠেলে দিল গাড়িটা। এখন আর ভারি গাড়িটা মাঝে মাঝে কাত হয়ে পড়ে যায় না। সে ঠিক ঠিক সুটের মুখের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, তারপর সে ফেলে চলে, একবার দুবার, একশবার, সে যাচ্ছে আর আসছে। লম্ফটা দপ দপ করে জ্বলছে, আবার কখনও ঘন অন্ধকার। ওকে ছায়ার মতো মনে হয় তখন। সে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। ওর জামা প্যান্ট ভিজে গেছে।

একটা দ্রুত শব্দের মতো কাজ, ঝম ঝম কয়লা ভরার শব্দ, থপ থপ করে ছেঁটে যাবার শব্দ, গড় গড় করে কয়লা সুটে ফেলে দেবার শব্দ, এ-ভাবে সব নানা রকমের অতিকায় শব্দ ক্রমে গড়াগড়ি খেতে থাকলে, একসময় মৈত্র এসে দেখল, ছোট এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছে না। মৈত্র বলল, আমি ভরছি, তুই ফেল।

—না, তুমি যাও। আমি ঠিক পারব।
—ওয়াচের লোকেরা নেমে গেছে।

—আর কটা ফেললেই হয়ে যাবে। বরং গিয়ে সব ঠিকঠাক কর। পেটে আগুন জ্বলছে। খেতে বসে দেরি করতে পারব না।

অমিয় এবং মৈত্র উঠে গেল। ছোটবাবু এখানেই ছোটবাবু। সে সাহায্য না নিয়ে

এবারের পূজায় চিত্রাঙ্গদা পাবলিকেশনসের নতুন বই

রক্তাক্ত ভিয়েতনাম\কমল চৌধুরী

সদ্য প্রকাশিত এই গ্রন্থ ভিয়েতনামের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রামাণ্য দলিল। ভিয়েতনামে মার্কিন বর্বরতা কিভাবে মানবতাকে কলঙ্কিত করেছে তারই আলেখ্য। আর্ট পেপারে ছাপা অসংখ্য আলোকচিত্র সমৃদ্ধ। দাম ঃ ১০.০০।

ভারতাত্মা\ডক্টর সুধীরচন্দ্র মৈত্র

ভারতের সাধক মহাপুরুষদের অমৃতময় জীবনকথা। দাম ঃ ১২.০০।

শারদীয় চিত্রাঙ্গদা

চারটি উপন্যাস লিখেছেন

দক্ষিণারঞ্জন বসু হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় অদ্রীশ বর্ধন সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাম্বোডিয়ার যুদ্ধের কাহিনী লিখছেন কমল চৌধুরী

সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা, ফিচার ও অসংখ্য আলোকচিত্র সংখ্যাটির আকর্ষণ।

দাম ঃ ৫.০০

পরিবেশক ঃ লোকায়তিক ঃ ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা—১২

যেন কখনও কখনও ওদের কাছে বড় হয়ে যায়।

মৈত্র এবং অমিয় ওপরে ওঠে যেতে যেতে শুনল, অনেকটা হিসাব রাখার মতো, ছোটবাবু গাড়ি টেনে নিচ্ছে, আর হরে রাম বলছে, এক, দুই হরে রাম, হরে হরে এক দুই, গাড়ি ফেলে দিলে তিন, চার পাঁচ এবং শেষে একসময় যখন দেখল কয়লায় ভরে উঠছে সুটের মুখ সে একেবারে ছাদের দিকে বেলচে ছুঁড়ে দিয়ে, গাড়িটা কয়লার কাছে লাথি মেরে উল্টে সো দৌড়ে বোট-ডেক পার হয়ে গেল।

আসলে রোজ রোজ সে এভাবেই কাজের শেষে যেন কিছু আবিষ্কারের মতো চিৎকার করে ওঠে, সাবাস ছোটবাবু, সুট ভরে মাথা কিনে নিলে !

কারণ কাজটা তার কাছে প্রায় দুর্গম গিরি প্রান্তর পার হয়ে যাওয়ার মতো। সে রোজ রোজ এ-ভাবে ভরে ফেলে সাংঘাতিক কিছু করে যাচ্ছে। সে জীবনের কাছে হেরে যাচ্ছে না। যত এমন ভাবে, তত বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। সে ভাল করে স্নান করে। সে ওয়াচের জামা প্যান্ট পাল্টে বাথরুমে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যায় এবং গরম জল ঢেলে সে যখন স্নান করে তখন মুখে শরীরে সাবানের ফেনা। সারা শরীরে অজস্র সাবানের ফেনা এবং বুদবুদ, সে মাঝে মাঝে হাত পা ঘসতে ঘসতে টের পায়, পেশী শক্ত হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের বাতাসে শরীরের রক্ত ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে। জল ঢেলে দিলে শরীরে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা সারা শরীরে আর শরীরময় আকাঙ্ক্ষা, সে চুপচাপ তখন কেমন শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। তার কিছু ভাল লাগে না তখন। মার চিঠি এল না, কেউ তাকে চিঠি দেয় না। সে নিরুদ্দেশে, সবাই হয়তো ভেবেছে, ছেলেটা বেঁচে নেই।

তখন, অমিয় ডাকল, কিরে কতক্ষণ ধরে চান করছিস ! তোর ক্ষিদে পায় না।

সে সত্যি খুব ক্ষুধার্ত। এবং মনে হওয়ার সঙ্গে যে কি হয়ে যায়। সে এক-মুহূর্ত দেরি করতে পারে না। এতক্ষণ যে শরীর অবশ অবশ মনে হচ্ছিল, সে যেন জোর করে তা অস্বীকার করতে চেয়েছে। সে আর দেরি করতে পারছে না। পাজামা পরে নিল। জামা গরম পুল-ওভার পরে সে সোজা মেসরুমে ঢুকে বলল, দে।

টেবিলে যে যার মতো খাচ্ছে। সব পরীদারের, কেউ নিচে বসে খাচ্ছে, কেউ টেবিলে বসে খাচ্ছে। বড় টিনের ভিতর ডাল। কাঠের হাতা, ডেকচিতে ভাত। ডাল যে যার মতো তুলে নিচ্ছে। 'বিশ্বর' সবাই গোল গোল হয়ে বসে গেছে খেতে। যাদের খাওয়া হয়ে গেছে তারা এখন ডেকে মাদুর পেতে নামাজ পড়ার আগে দাঁত খুঁটছে। রুপোর খড়কে। গলায় ঝুলানো। ছোটবাবু এসব কিছুই দেখছিল না। সে আসলে ক্ষিধার চোখ মুখ বুজে খাচ্ছে। আলুভাজা, ডাল। মাংস হয়নি। মটন হলে সে খায়, না হলে খায় না। বাঁধাকফির সঙ্গে মাংসের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে বেশ একটা সুস্বাদু খাবার ভাণ্ডারি তৈরি করেছে। খেতে ভাল হয়েছে বলে সে গলা পর্যন্ত খেয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে অমিয়, মৈত্র দেখছে, ছোট-বাবুকে। কিছু বলছে না: বেশ খেয়ে গেল ছোটবাবু। খাওয়া হলে মৈত্র বলল, বাঁধাকফি দিয়ে গোস্ত হয়েছে। কেমন লাগলোরে।

—খুব ভাল হয়েছে। ভাণ্ডারি জ্যাঠা বেশ রেঁধেছ। তোমার হাত যা খোলে মাংসে মাংসে !

ভাণ্ডারি তখন গ্যালি থেকে গলা বের করে হঠাৎ জিভে কামর দিয়ে ফেলেছে। তুমি খাইলা জ্যাঠা।

—হু খাইলাম। ভাণ্ডারি বুড়ো মানুষ, রোগা, রোঁয়া রোঁয়া চুল মাথায় তাকে খেতে শুনে এমন জিভ বের করে দিয়েছে কেন বুঝল না।

সে বলল, না খাইলে পারতা।

—ক্যান এমন কথা কন !

ভাণ্ডারি কিছু না বললেও সে বুঝতে পারল, সে আজ কিফ খেয়েছে। সে তো কিছু বোঝেনি, সেতো বুঝতে পারেনি, কিফ কি মটন ! তা ছাড়া ইদানিং ওদের জন্য ভাণ্ডারী আলাদা মটন বটলারের কাছ থেকে বলে কয়ে নিত। কিন্তু আজকে নানা কারণে এটা হয়তো সম্ভব হয়নি। ভাণ্ডারিকে চারপাশ সামলাতে হয়। সব কিছু এক হাতে। মানুষটার খেয়াল না থাকার কথাই ! তা ছাড়া ওর তো কিছু হচ্ছে না, বমি পাচ্ছে না, না বমি একেবারেই পাচ্ছে না। তবে কি এটা জুজুর ভয়। সে যেন কেমন সাংঘাতিকভাবে বলে ফেলল, খেতে তো জ্যাঠা খারাপ লাগল না। বেশ লাগে খেতে।

মৈত্র বলল, সহসা চিৎকার করে বলল, থ্রি চিয়ার্স ফর ছোটবাবু।

ছোট উঠে পড়ল। তবু মনের ভিতর এক আশ্চর্য অহমিকা আছে, কিংবা দীর্ঘ-দিনের অভ্যাস, সে একেবারে তার সবকিছু উড়িয়ে দিতে পারে না। যত এমন ভাবছে, মনে হচ্ছে, না এটা ঠিক না, কাল আবার হয়তো আগে জানতে পারলে গা ঘিন ঘিন করবে। সে ভাবল, আর কখনও মাংসের ব্যাপারে কোন কথাবার্তা বলবেনা। যেমন সবাই খায় মুখ বুজে খেয়ে উঠবে।

সেদিনের কথা আসলে মনে হলেই কেমন সে অবাক হয়ে যায়। কে যেন ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর কে যেন বলছে, কিফ খানে সাক্তা ! তোমকো কিফ্ জরুর খানে হোগা।

গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে এখন হাস্যকর। এমন সুন্দর দিন যেন হয় না। জাহাজ এখন কোথায় ? বোধ হয় ভারত-বর্ষের শেষ সংযোগটুকু আজ মুছে যাবে। কথা আছে জাহাজ দুটোর ভেতর আট-লান্টিকে পড়বে। ঠিক সময়টা কেউ জানে না। আবার আটটায় ওয়াচ। এখন আর গিয়ে ফোকসালে চিৎপাত হয়ে শুয়ে লাভ নেই। সেই যে দূরবর্তী এক উপকূলে তার বাস-ভূমি ফেলে এসেছে, সেই যে কুমান্বয়ে জাহাজের প্রপেলার কেবল ঘুরতে থাকল, সেই যে সে দিনরাত জাহাজ ডেকে পায়চারি করতে করতে দেখল, সমুদ্র উত্তাল, ভয়াবহ, ওর শেষ বাসভূমির গান্ধপাল্য ছায়া ছায়া হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে সেটা মেঘের মতো দিগন্ত রেখায়, তারপর মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে, তারপর সেই অসীম যাত্রা, সমুদ্রে সমুদ্রে ওরা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলেছে, আজ ওরা শেষবারের মতো তাও পার হয়ে যাবে। সে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগবে। রেলিঙে দাঁড়িয়ে মেজ-মালোমকে ডেকে বলবে, স্যার বলবেন, কখন জাহাজ আটলান্টিকে পড়ছে।

সে এ-ভাবে যখন দাঁড়িয়েছিল, কেমন যেন একাকী, নিঃসঙ্গ। সে শীতের জন্য বেশ গরম পোশাক, পোশাক বলতে পুরানো বাজার থেকে কেনা পোশাক। সে তাই সাদা প্যান্টের ওপর পরেছে। ঘন চুল সমুদ্রের হাওয়ায় নীল দেখাচ্ছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন। তবু সমুদ্রে বেশ ঢেউ আছে। সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। জাহাজে সামান্য পিচিং, সে এখন আর এ-সব আমল দেয় না, স্বাভাবিকভাবে বেশ এই দুলুনি তার ভাল লাগে। ওর কেমন তখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। দূরে, দিগন্তরেখার দিকে সব পাখিরা যায়, কোথায় যে যায়, উড়ে উড়ে কোন মহাসমুদ্রে যায় সে জানে না। সে তখন কেবল ওদের অবাক হয়ে দেখে।

মৈত্র ফোকসালে ছোটবাবুকে দেখতে না পেয়ে ওপরে উঠে এল। ওপরে উঠে দেখল, টুইন-ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে ছোটবাবু সমুদ্র দেখছে। ওর মনে হল কিফ খেয়ে বোধ হয় ছোটবাবুর মন ভাল নেই। কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কিছু বলতে প্রথমে সে সংকোচ করল। তারপর যেন আর না বলে পারল না। কিরে কিফ খেয়েছিস বলে মন খারাপ।

তখন মেজ-মালোম ডেভিড, চিৎকার করে ছোটকে বলছে, সামনে আটলান্টিক ছোট। ভালো করে দ্যাখো। আটলান্টিক কি বিশাল, মহান সমুদ্র। দ্যাখো। দেখলে তোমার আর দুঃখ থাকবে না।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলো, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৬৭-২০৫১।

দিনকালের হিসেব

নেই নেই ও স্ট্যাগ্ ফ্লেশান (২)

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দমদম বিমান বন্দরে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী ডি পি ধর অপেক্ষামান সাংবাদিকদের কাছে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। বিবৃতিটির বিষয়বস্তু ছিল মূল্যস্ফীতি দমন। শ্রীধর বলেছিলেন : উৎপাদন বৃদ্ধিই হল বর্তমান মূল্যস্ফীতির কবল থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা। উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হলে আরও বেশী টাকাকড়ি আরও কম জিনিসপত্রের পেছনে ধাওয়া করবে—এ লারজার ভল্যুম অফ মানি উইল বি চেজিং এ ফিউয়ার ভল্যুম অফ গুডস্। বিবৃতিটি স্ট্যাগফ্লেশানের অস্তিত্বের স্বীকৃতি মাত্র। বিষয়টির হয়ত সামান্য কিছুটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

স্কুলকলেজের ক্লাশে আমরা যখন মূল্যস্ফীতির (বা মুদ্রাস্ফীতির) প্রতিবিধান নিয়ে আলোচনা করি তখন পাঠ্যপুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে সাধারণত এইরকমই বলে থাকি : মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান হল উৎপাদনবৃদ্ধি—অর্থাৎ জিনিসপত্রের যোগান বাড়ানো। কিন্তু ট্রু ইনফ্লেশান বা প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় জিনিসপত্রের যোগান বাড়ানো সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির প্রধানতম অনুমান বা পসচ্যুলেট হল পূর্ণ নিয়োগাবস্থা—ফুল্ড্সন অফ ফুল এমপ্লয়মেন্ট। এই অবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদান পূর্ণভাবে নিয়োজিত থাকে বলে আর ত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। অতএব, আংশিক মুদ্রাস্ফীতির অবস্থাতেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির অবস্থায় নয়।

এখনও স্ট্যাগফ্লেশনের ধারণা প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে ঠিক জায়গা করে নিতে পারে নি। তাই বলি না যে স্ট্যাগফ্লেশানের অবস্থাতেও উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব। কারণ পাঠ্যপুস্তকে যা মুদ্রিত আছে তার বাইরে গেলেই ছাত্রছাত্রীদের অনেকের মধ্যে সন্দেহ এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে—তাই সতর্ক হয়েই চলি। যাক সে কথা।

এখন আমাদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে, উৎপাদনবৃদ্ধিই বর্তমানে মূল্যস্ফীতির প্রকৃত প্রতিবিধান। ব্যাপারটাকে তিনি এইভাবেও বলতে পারতেন : আমাদের এই বন্ধ অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতি থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে—ষ্ট্যাগফ্লেশানের মোকাবিলা করতেই হবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রীর সঙ্গে কেউই নিশ্চয় দ্বিমত হবেন না, কিন্তু কি করে বেরিয়ে আসা যায়—কি করে সার্থকভাবে মোকাবিলা করা যায় তাই হল সমস্যা। মনে হয় সমস্যাটির পূর্ণ প্রকৃতি-বিচার এখনও ঠিক করা হয়নি।

সমস্যার প্রকৃতি :

ধরে নেওয়া হয় যে মৃদু বর্ধনশীল মূল্যস্তর সম্প্রসারণের সহায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হল : কি পরিমাণ সম্প্রসারণের জন্যে কি পরিমাণ মূল্যস্ফীতি সমর্থন করা যেতে পারে? এ ব্যাপারে বলা হয়, সম্প্রসারণের হার যদি মূল্যস্ফীতির দ্বিগুণ হয় তবে ঐ মূল্যস্ফীতিকে মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু বিপরীত দিকে মূল্যস্ফীতির পরিমাণ যদি সম্প্রসারণের চার বা পাঁচগুণ হয় তবে ঐ মূল্যস্ফীতি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না কি? আমাদের দেশে ঠিক তাই হয়েছে। যেখানে সম্প্রসারণের হার ৪-৫ শতাংশের বেশী নয় সেখানে সম্প্রতি মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ২৩-২৫ শতাংশ। এই অবস্থা চূড়ান্ত স্ট্যাগফ্লেশানের দ্যোতক।

কারণানুসন্ধান :

অবস্থার পর্যালোচনায় বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করা হয়েছে : অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ত্রুটি, টাকাকড়ির অত্যধিক যোগান, কস্ট-পুস বা উৎপাদন-ব্যয়জনিত মূল্যস্ফীতি বা এরই এক প্রকারভেদ—মজুরীস্ফীতি ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কারণের মধ্যেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, কিন্তু মূল কারণের সন্ধান বোধহয় পাওয়া যাবে অনুসৃত সরকারী নীতিতে এবং মুনাফা সম্বন্ধে উৎপাদক-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ধারণায়।

মূল্য বা মজুরীবৃদ্ধির দাবী সম্পর্কে দেখা যায় যে সবকার মোটামুটি বিরোধিতা পরিহারের পথেই চলেছেন। ফলে সামান্য হুমকি, সামান্য আন্দোলনের পরই সংবাদপত্রে ঘোষণা বেরোয় : সরকার সিমেন্টের দাম দশ শতাংশ বৃদ্ধি করতে রাজী হয়েছেন বা কেরোসিন তেলের দাম পনের শতাংশ বাড়ল, ইত্যাদি। অনেক সময় অবশ্য কমিশন নিয়োগ করে বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে একটু বিলম্বিত করা হয় মাত্র—কমিশন নিযুক্ত হলেও শেষপর্যন্ত যে দাম বা ভাড়া কিছুটা বাড়বে তা সকলেই ধরে নেয়। আবার এক ক্ষেত্রে বৃদ্ধির দাবীকে মেনে নিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে দাবীকে অস্বীকার করা শক্ত। যেমন, ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ালে বেসরকারী বাসের মালিকদের ভাড়া বাড়ানোর দাবীকে কি করে অস্বীকার করা যায়? তাছাড়া অনেক সময় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র থেকেই দাম বাড়ানো শুরু হয়। কয়লার কথাই ধরা যাক। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কয়লাখনি শিল্পে বিভিন্ন কারণে উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কয়লাভিত্তিক প্রত্যেক উৎপাদন-ব্যবস্থাই কিছু-না-কিছু ব্যয়বৃদ্ধির কবলে পড়েছে এবং এই নিত্য-ব্যবহার্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির দরুন সাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী নীতির আর একটা দিক হল টাকাকড়ির যোগান। বর্তমানে এই যোগান বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশে, এবং এর মূলে আছে ঘাটতি ব্যয়। এই টাকাই বাজারে আসে বলে আবার ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মাধ্যমে তা গুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু মূল্যস্তর নিয়ত বর্ধমান বলে গুটিয়ে তোলা কঠিন। তাই স্থায়ী আমানতের সুদের হার প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে হয়। কিন্তু এই বর্ধিত সুদই আবার অতিরিক্ত ক্রয়-শক্তি হিসেবে যে বাজারে আসে তা ভুললে চলবে না।

সুদের হার যখন বেশী তখন ডিভিডেন্ড ইত্যাদির হারও তুলনীয় হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ লোকে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেবে কেন? এই ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশের উচ্চহার দ্বিতীয় বিষয়টির—অর্থাৎ মুনাফা সম্পর্কে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

স্বাভাবিক মুনাফা :

পাঠ্যপুস্তকে যাকে স্বাভাবিক মুনাফা বা নর্ম্যাল প্রফিট বলা হয়—অর্থাৎ যে মুনাফা না পেলে ব্যবসায়ী বা উৎপাদক ব্যবসায়ে টিঁকে থাকবে না এবং যে মুনাফাকে উৎপাদন-ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয়—তার সঙ্গে বর্তমানে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মুনাফার ধারণা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। অত্যধিক মুনাফা বা সুপারনর্ম্যাল প্রফিট হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনে স্বাভাবিক মুনাফা। তাও আবার ক্রমবর্ধমান হওয়া চাই। গতবারের (মাস বা সালের) হিসেবে মুনাফার হার যদি পাঁচ শতাংশ হয়ে থাকে তবে এবারের হিসেবে সাত শতাংশ না হলে ব্যবসায়ী তাকে লোকসান বলেই মনে করে। এই অতিরিক্ত মুনাফার ধারণা চলে আসছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগ থেকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে মাত্র। কিন্তু এর ফলেই যে আবার মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী হবার প্রবণতা তাও ভুললে চলবে না।

চক্রব্যূহ :

মোটকথা একটা দুরতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি হয়েছে। অস্বাভাবিক মুনাফাকে স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়ায় মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, আবার ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর এই অস্বাভাবিককেই স্বাভাবিকের ছাপ নিয়ে মহাযাত্রা করছে। ব্যাপক অর্থে শ্রমজীবী যদি ক্রমাগত বেশী মজুরী দাবী করতে পারে, উৎপাদক বা ব্যবসায়ীই বা ক্রমাগত বেশী

মুনাফা আশা করবে না কেন? টাকার দাম ত সব শ্রেণীর কাছেই হ্রাস পেয়েছে।

এই অবস্থায় খাদ্যশস্য একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রভৃতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা অবস্থাকে সঙ্গীন করে তুলতে বাধ্য। সব উৎপাদক বা ব্যবসায়ী যখন বর্ধমান মূল্য-স্তরের সুযোগ গ্রহণ করছে তখন কৃষক এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীরাই বা করবে না কেন? অবশ্য সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকের লাভের চেয়ে সাধারণ ক্ষেত্রে মজুতদার ও ফাটকাবাজদের লাভই হয় বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশেও খাদ্যশস্যের বর্তমান অকল্পিত মূল্যবৃদ্ধির মূলে আছে মালমজুত ও ফাটকা কারবার। কিন্তু মজুতদার ও ফাটকা কারবারীদের দোষারোপ করলেই কাজ শেষ হবে না। চক্রব্যূহ থেকে—স্ট্যাগফ্লেশানের অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসবার পথই খুঁজতে হবে।

নির্গমনের পথ :

নির্গমনের পথের সন্ধান আলোচনার শুরুতেই উদ্ধৃত পরিকল্পনা মন্ত্রী মহাশয়ের উক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে—উৎপাদনবৃদ্ধির মাধ্যমেই আমাদের চক্রব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ খুঁজতে হবে। কিন্তু ঠিক কিভাবে? সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের পরিকল্পনাকে মূলত ভোগভিত্তিক করতে হবে—অর্থাৎ পরিকল্পনায় উৎপাদন-লক্ষ্য-সমূহকে ভোগ্যপণ্যাভিমুখী করতে হবে। এ পর্যন্ত তা করা হয়নি বলেই এবং বন্ধ অর্থব্যবস্থায় এই মূল্য-স্ফীতি। দ্বিতীয়ত, ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের দক্ষতা বাড়াতে হবে। ভাবাদর্শের দিক দিয়ে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার সমর্থনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা যায় যে সরকারের হাত পড়লেই হয় পণ্যটি খোলা বাজার থেকে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়, না হয় বর্ধিত মূল্যেই সংগ্রহ করতে হয়। যেমন কয়লা। তৃতীয়ত, যতদিন পর্যন্ত না সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ততদিন বেসরকারী উদ্যোগকে সম্প্রসারিত রাখা চলবে, না—উভয় উদ্যোগের ক্ষেত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমানা নির্দেশ করতে হবে যাতে বেসরকারী উদ্যোগ তার বিচরণের ক্ষেত্র সম্বন্ধে আশঙ্কাবিহীন ধারণা নিয়ে চলতে পারে। তারপর স্বাভাবিক মুনাফা সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত করতে হবে। এ অবশ্য কঠিন কাজ। তবে প্রচারকার্য, নির্বাচনের ভিত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপ (যেমন, যেখানে লভ্যাংশ বণ্টন সরকার বা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সম্মতি-সাপেক্ষ) ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক প্রদত্ত দীর্ঘমেয়াদী সুদের হারের ব্যাপারেও বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে। সামান্য পরিমাণে সুদ হ্রাস করলে হয়ত সঞ্চয় সংগ্রহ ব্যাহত হবে না, অপরদিকে জিনিস-পত্রের ওপর ক্রয়শক্তির চাপও কমবে। এবং হয়ত কস্ট-পুস ইনফ্লেশানও কিছুটা ধাক্কা খাবে। ক্রয়শক্তির চাপ কমানোর জন্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে। তারপর আছে কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ, কর-সংগ্রহ ব্যবস্থাকে জোরালো করা ইত্যাদি। এসব অবশ্য বহু-নির্দেশিত ও সহায়ক প্রতিকার। এই সবের সহায়তায় একদিকে যেমন মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমাতে হবে, অপরদিকে তেমনি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতেই হবে। উভয়ের মধ্যে আবার দ্বিতীয়টিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

চালের পাইকারী ব্যবস্থা :

গমের একচেটিয়া কারবারে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার চালের কারবার রাষ্ট্রায়ত্ত করার বিষয় ভাবতে শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত এ মাসের এ আই সি সি অধিবেশনে ঠিক হয় যে রাজ্য-গুলিই ঠিক করবে চালের পাইকারী ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হবে কিনা। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বলেন ঃ চালের পাইকারী ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হবেই তবে কার্যক্রম অনুসরণে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে। শেষপর্যন্ত জানা যায়, এ আই সি সি-র সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কয়েকটি রাজ্য চালের পাইকারি ব্যবসা হাতে নেবার সিদ্ধান্ত করেছে।

বিশ্ব আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার :

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে নাইরোবীতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবার কথা। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক বিনিময়-ব্যবস্থায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। ডলার পাউন্ড মার্ক ইয়েন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কারেন্সীর আজ যে অবস্থা, কাল তা থাকবে কিনা—কেউই জানে না। সুতরাং বেশ কিছুদিন ধরে চলছে বিনিময়-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা ও তজ্জনিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংকট। এরই সুরাহা করবার জন্যে নাইরোবী অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অবশ্য ধারণা যে মাত্র নাইরোবী সম্মেলনে বিশেষ কিছু হবে না। যদি ভবিষ্যতের অধিবেশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায় তবে তাই হবে যথেষ্ট।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

কী কোমল লাবণ্যময় ত্বক…
কী অপরূপ বর্ণ-সুষমা…
উনি যে নিয়মিত মাখেন…
বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর
গ্লিসারিন সোপ
কস্‌মেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর
দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • জয়পুর

প্রদর্শনী পরিক্রমা

কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতা ইনফরমেশন সেন্টার-এ সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়ের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে কালি-কলমে আঁকা ড্রইং, ড্রইং ও ছাপা মনোক্রোম ছবির টুকরো জুড়ে তৈরী কোলাজ এবং তেলরঙ ও ছাপা রঙিন ছবির টুকরো জুড়ে তৈরি কোলাজ স্থান পেয়েছিল।

সব্যসাচী যেন যুথবদ্ধ অসহায় মানুষ, মানুষের পশুত্ব এবং তজ্জনিত যন্ত্রণাবোধ ইত্যাদি বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখতে চান। সেজন্য তিনি একাধিক মানুষ অথবা মনুষ্যাবয়বযুক্ত অংশের সমাহারে রচনা গড়ে তোলেন, বিশিষ্ট অঙ্গ-ভঙ্গি দিয়ে অবস্থা-গত কারণে-সৃষ্ট মনোভাবকে দৃশ্যাগতরূপ দেবার চেষ্টা করেন, মনুষ্যাবয়বের পাশব সাদৃশ্য আরোপ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। ছবির রূপবন্ধগুলি নির্মাণ করেন প্রকৃত-বাস্তবতার নিয়ম মেনেই। ফলতঃ এটা প্রতীয়মান হয় যে তাঁর বক্তব্য বাস্তব বিষয়েই, কিন্তু লক্ষ্য দৃশ্যমান বাস্তবের গূঢ়ার্থ উন্মোচন।

কলকাতার যে শিল্পী ঠিক এই ধরনের কাজ করেই সর্বভারতীয় খ্যাতি পেয়েছেন তিনি বিকাশ ভট্টাচার্য। সব্যসাচী বিকাশ-বাবুর ছাত্রস্থানীয়। বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টি-ভঙ্গি এবং শিল্পবস্তু নির্মাণের যে সাযুজ্য লক্ষ্য করি সব্যসাচীর ক্ষেত্রে তা দুর্লক্ষ্য। বস্তু নির্মাণ পদ্ধতি আয়ত্ত করা যায় কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সহজ নয়। দৃষ্টি-ভঙ্গি আয়ত্ত না হলে, ঐ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাতিক নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরণ করে বস্তু নির্মাণ করলে, নির্মিত বস্তুও কিন্তু পুরো-পুরি সত্য বস্তু হয়ে ওঠে না।

সব্যসাচীর ছবিতে ছেড়ে দেওয়া ক্ষেত্রের সঙ্গে রূপবন্ধের তথা ভরে দেওয়া জমির সম্পর্কে যে বিভ্রম, রূপবন্ধের বেধরেখার সঙ্গে রেখাটানের জালের যে সম্পর্ক বিভ্রম, কালো-সাদার বিতরণের বিভ্রম, অঙ্গভঙ্গির অতি নাটকীয়তা ইত্যাদি যা দেখা যায় তার কারণ ঐ বিষয় এবং বিষয়ীর সাযুজ্য। তবু বলি, সব্যসাচীর ড্রইং প্রতি-শ্রুতিপূর্ণ। উনি যদি নিজ-অভিজ্ঞাত বিষয় নিয়ে নিজের মতন করে ছবি আঁকার চেষ্টা করেন তবে ওঁর প্রতিভার সত্যকার বিকাশ ঘটতে পারে।

তপন মিত্র, হরেকৃষ্ণ বাগ এল আই সিং-এর প্রদর্শনী

কয়েক সপ্তাহ আগে বিড়লা একাডেমি প্রদর্শনী কক্ষে হরেকৃষ্ণ বাগ, তপন মিত্র এবং এল আই সিং--এর ছবির একটি যৌথ প্রদর্শনী হয়ে গেল। এরা তিন-জনই শান্তি-নিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র। প্রদর্শ-নীতে হরেকৃষ্ণ বাগের আটটি এচিং, তপন মিত্রের আটটি সেরিগ্রাফ ওরফে সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্ট এবং এল আই সিং-এর সাতটি কোলাজ দেখা গেল।

হরেকৃষ্ণ বাগ অসাধারণ মাধ্যমমনস্ক ছাপের ছবি নির্মাতা। কিন্তু মাধ্যমে দখল তাঁর এতই স্বাভাবিক যে, কারিগরী কৌশল কখনও সরব হয়ে চোখকে পীড়া দেয় না। কারিগরী কলা-কৌশল বিষয়বস্তু ও রচনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে। খুবই সহজ সরল বিষয় নিয়ে যিনি ওঁর রচনা বিন্যস্ত করেছেন। একটি বা দুটি মনুষ্যমূর্তি বা মুখমণ্ডল বা অবয়বাংশকে সবলীকৃত করে রেখায় বেঁধে ধরে উনি রূপবন্ধ তৈরী করে-ছেন। ঐ রূপবন্ধের বেধরেখাকেই ব্যবহার করেছেন চিত্রক্ষেত্র বিভাজনের কাজে। এসব লম্বা টানের সাবলীল এচড্ রেখাগুলি পেয়েছেন গভীরভাবে অ্যাসিড দিয়ে খাইয়ে। ছোট মাপের সবলরৈখিক হ্যাচিং-এর সাহায্যে রূপবন্ধে ঘনত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর দক্ষতা সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে একোয়াণ্টিক-এ। একোয়াণ্টিক করেই তিনি টেনোল গ্রোভসন এনেছেন এবং জমির বুনট তৈরী করেছেন। সফট গ্রাউন্ড করার একটি নিজস্ব কৌশল হরেকৃষ্ণবাবু উদ্ভাবন করে-ছেন। লিথোগ্রাফে যেভাবে ছাপা ইমেজ ট্রান্সফার করা হয়, হরেকৃষ্ণবাবু সে-ভাবে

ভাস্কর্য / চন্দ্রবিনোদ পান্ডে

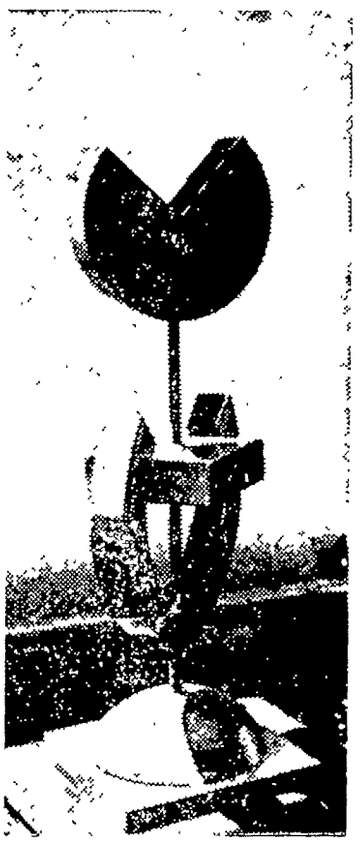

ছাপা ইমেজ এচিং-এর ছাঁচে ট্রান্সফার করে-ছেন এবং করে ইমেজের এক বুনটের অভি-নব এফেক্ট সৃষ্টি করেছেন। কাজগুলির মধ্যে দুটি রঙিন অন্যগুলি মনোক্রোম্যাটিক। রঙ একটু বাড়তি মনে হয়। কাজগুলো সবই ছোট আকারের।

তপন মিত্রর সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টগুলি বিমূর্ত রচনা। কিন্তু এগুলির কোনটিই জ্যামিতিক অংশের যৌগিক সমাহার নয়,

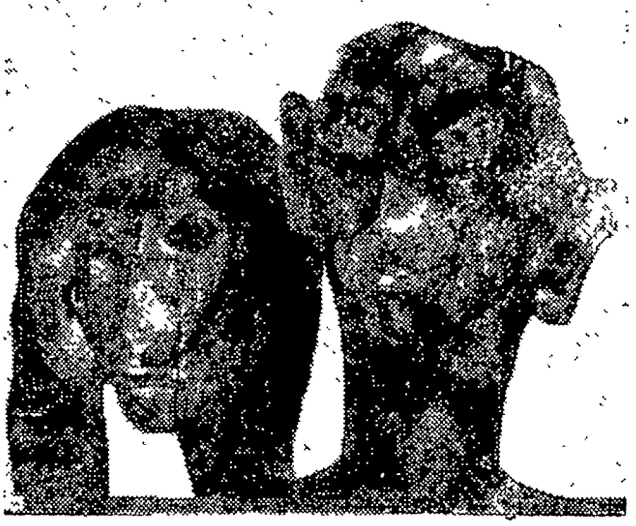

যুগল / সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

নির্মাণধর্মী বিশুদ্ধ বিমূর্ত রচনা নয়। দৃশ্যতঃ রূপবন্ধগুলি জৈবধর্মী। মার্কিন দেশীয় বিমূর্ত-অভিব্যক্তিবাদী শিল্পের সঙ্গে শৈলীগত সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। রূপ-বন্ধের আকৃতি, আকার, আয়তন এবং পার-স্পরিক সম্বন্ধ অপেক্ষা তুলি বা অঙ্কন যন্ত্র চালাবার গতি, ছন্দ এবং অঙ্কিত রেখার বা পুঞ্জের ভঙ্গি অভিব্যক্তি সঞ্চারের উপায় হিসাবে দৃশ্যমান—এ-সব ছবিতে। চারিত্রালক্ষণের দিক থেকে এ উপায় মার্কিন বিমূর্ত-অভিব্যক্তিবাদী চিত্রকলাকে স্মরণ করায়। যে সব মার্কিন বিমূর্ত অভিব্যক্তি-বাদী শিল্পীর কর্মে ভঙ্গি-ভাষা রূপ পেয়েছে তাঁদের সবাইয়ের ছবিতেই মাপ বা আয়তন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে মাপের ছবি হলে ভঙ্গি অভিব্যক্তি সঞ্চার করে তপনের ছবি সে মাপের নয়। তবু তপন অত্যন্ত মাধ্যম সচেতন শিল্পী এবং ছবিতে লক্ষণীয় সম্ভাবনা রয়েছে।

এল আই সিং-এর ছবিগুলিকে কোলাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ছবির সাপোর্ট মেটেরিয়াল-এর উপর রং, কালি ইত্যাদি ছাড়া অন্য যে কোন বস্তুর প্রয়োগকেই কোলাজ বলে যদি ধরা হয় তবে অবশ্যই এ-ছবিগুলি কোলাজ। পিকাসো এবং ব্রাক্—যাঁরা কোলাজের উদ্গাতা তাঁরা অবশ্য কোলাজ বলতে মনে করতেন শিল্পী কর্তৃক স্বয়ংনির্মিত নয় এমন রূপবন্ধের সংযো-জন। সে সংযোজনের ফলে ছবিতে এক টুকরো বহির্জাগতিক বস্তুজগতের এবং তৎসহ বস্তুজাগতিক বুনটের অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্যই পিকাসো এবং ব্রাক্ কোলাজের প্রবর্তন করেন। এল আই সিং ঠিক এ-জাতের কোলাজে করেন নি। তাঁর কোলাজ খানিকটা এসেম্বলেজ-ধর্মী। এ জাতের এসেম্বলেজ-কোলাজ করেছেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। নানা রঙের কাগজের টুকরো জুড়ে রূপবন্ধ তৈরী করা এই এসেম্বলেজ-কোলাজের বৈশিষ্ট্য। এল আই সিং নানা রঙের চকচকে কাগজ হাত দিয়ে টুকরো করে ছিঁড়ে বোর্ডের উপর সাজিয়ে আঠা দিয়ে জুড়ে তাঁর ছবি রচনা করেছেন। সব কাগজই একজাতের চকচকে কাগজ হবার কারণে এবং হাত দিয়ে ছেঁড়ার ফলে সব টুকরোর ধার এক-ধরনের হবার জন্য ছবিতে খানিকটা এক-ঘেয়েমি দেখা যায়। তাছাড়া ওঁর ইমেজও খুব পরিষ্কার নয়।

এক এক সময়ে ভয় হয় শিল্প হিসাবে ভাস্কর্য ব্যাপারটা লুপ্ত না হয়ে যায়। সুলভতম ভাস্কর্য-মাধ্যম—পোডামাটি বা প্লাস্টার-এ নির্মিত বস্তু দুর্লভতম চিত্র-মাধ্যমের চেয়ে ব্যয়বহুল। গতরে খাটুনীর দিক থেকেও একজন ভাস্করকে একজন পরি-শ্রমী চিত্রকরের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম করে শিল্পবস্তু নির্মাণ করতে হয়। একজন চিত্রকরের একটি প্রদর্শনী করার জন্য যে পরিশ্রম ও ব্যয়ভার বহন করতে হয়, এক-জন ভাস্করের নিদেন তার দ্বিগুণ করতে হয়। অথচ ছবির যেটুকু বাজার আছে ভাস্করের কর্মের তার ভগ্নাংশটুকুও নেই। ছবির বাজার দামের সঙ্গে ভাস্কর্যের বাজার দামে খুব একটা তফাৎ না থাকা সত্ত্বেও ভাস্কর্যের চাহিদা না থাকার অন্যতম কারণ বোধ হয় অধিকাংশ ক্রেতাগৃহে স্থান সঙ্কুলান। চাহিদার অভাবে বিভিন্ন কারু-শিল্প যে-রকম ভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে, ভাস্কর্যও সেরকমভাবে যাতে লুপ্ত না হয়ে যায় তার ব্যবস্থা বিষয়ে ভাববার সময় এসেছে। এর প্রতিকারের চাবিকাঠি রয়েছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, আধা-সরকারি ও সরকারি সংস্থাগুলির হাতে এবং স্থপতিদের শুভবুদ্ধিতে। ভাস্কর্য এক সময়ে স্থাপত্যের দোসর ছিল। স্থপতিরা যদি আবার ভাস্কর্যকে সেই স্থান দেন এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি যদি ভাস্কর্যের চাহিদা অনুভব করেন তবেই ভাস্কর্য শিল্প হিসাবে টিকতে পারে নচেৎ নয়। দুঃখের বিষয় স্থপতিরা এখনও ভাস্কর্যকে স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত হননি এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলি ভাস্কর্য বলতে শুধুমাত্র প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যের কথাই ভাবে।

এ-হেন হতাশাব্যঞ্জক অবস্থাতেও যে-সব তরুণ ভাস্কর হতাশায় ভেঙে না পড়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান, নিত্য-নতুন উদ্যমে তাঁদের উদ্ভাবনীশক্তিপ্রকাশক ভাস্কর্যের প্রদর্শনী করেন তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তরুণ ভাস্কর চন্দ্রবিনোদ পান্ডে তেমনই একজন শিল্পী। চন্দ্রবিনোদ বিশ্বভারতী কলা-ভবনের প্রাক্তন ছাত্র। জাতীয় সাংস্কৃতিক বৃত্তি নিয়ে তিনি কলা-ভবনেই স্নাতকোত্তর কাজ করছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে বিড়লা এ্যাকাডেমি প্রদর্শনী কক্ষে চন্দ্রবিনোদের প্রথম একক প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে চারটি মর্মরপ্রস্তর তক্ষণের, পাঁচটি ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের, একটি পেটাই করা পিতলের, তিনটি বণ্ডকরা লোহার অংশবিশেষ ওয়েল্ড করে জোড়া কাজের, পেটাই করা এলুমিনিয়ামের একটি ও এলুমিনিয়ম এবং প্লাস্টিকের চাদরের সমা-হারে নির্মিত সর্বসাকুল্যে পনেরোটি কাজ প্রদর্শিত হয়।

মর্মর-প্রস্তরে তক্ষণের নিদর্শনগুলি প্রায়-বিমূর্ত রচনা। বহির্জাগতিক রূপ-বন্ধকে প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করে তাকে সরলীকৃত করে একটি নির্দিষ্ট আকার মাত্রায় এনে উদ্ভাবক অংশকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করে চন্দ্রবিনোদ প্রায়-বিমূর্ত রচনা তৈরী করেছেন। আকার মাত্রায় অনেক সময় জ্যামিতিকতার আভাস থাকলেও উদ্ভাবক অংশের আকারে, স্পর্শমানতায় এবং ঘনত্বের ক্রমায়মানতায় জৈব-চারিত্র্য স্পষ্টতই প্রতীয়-মান হয়। পান্ডের তক্ষণ প্রণালী অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড হবার কারণে এই জৈবতা অবশ্য কোথাওই সরব নয়।

চন্দ্রবিনোদের ব্রোঞ্জ ঢালাই এবং পেতল পেটাই করা কাজগুলিতেও খানিকটা একই ধরনের মনোভঙ্গি ক্রিয়াশীল দেখি। এখানে তিনি উদ্ভিদ-জগৎ থেকে তার রূপবন্ধ সংগ্রহ করে তাকে সরলীকৃত করেছেন। উদ্দেশ্য, ক্রমায়িত পৃথুল ছন্দোকে বঙ্কিম এবং বহতা রেখার মাত্রায় দৃশ্যমান করা। এখানেও দেখি জৈব-প্রাণতার উদ্দাম প্রকাশকে সফিস্টিকেটেড জ্যামিতিকতা দিয়ে সুভদ্র করার প্রয়াস। এই কাজগুলি থেকে মানুষটিকে চেনা যায়, কাজগুলি শরীর দিয়ে কথা বলে।

এলুমিনিয়ম এবং এলুমিনিয়ম ও প্লাস্টিকের সমাহারে তৈরী ভাস্কর্যগুলি আমাদের হতাশ করে। চন্দ্রবিনোদের উপ-রোক্ত মনো-কনস্ট্রাকশন বা একীভূত ভাস্কর্যগুলিতে যে মেজাজের সাক্ষ্য দৃশ্য-মান হয়ে ওঠে, এই এডেটিভ বা যৌগিক নির্মাণগুলিতে সেই মেজাজ দুর্লক্ষ্য। এগুলি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক বিমূর্ত শিল্পের নিদর্শন। বিন্যাস চাতুর্য ছাড়া অন্য কিছুরই পরিচয় এগুলি বহন করে না।

—প্রণবরঞ্জন রায়

শারদীয়ার অতুলনীয় আকর্ষণ

কালিয়

৮টি উপন্যাস, ৫টি নভেলেট ১টি নাটক; অসংখ্য ছোট গল্প, কবিতাগুচ্ছ প্রবন্ধ: রম্যরচনা ও চলচ্চিত্রের বিপুল সম্ভারে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল।

সমরেশ বসু, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শিবরাম চক্রঃ, অতীন বন্দ্যোঃ অনুতাকা সিরাজ, তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী, অর্চনা মিশ্র, দক্ষিণা-রঞ্জন বসু, বাণী রায়, বারি দেবী; প্রমীলা রায় চৌধুরী গৌরী গুপ্ত, শংকর দাশগুপ্ত, বৈশম্পায়ন সরসী সরকার বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী, কবি-শেখর কালীদাস রায়, রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত গিরিবালা দেবী, প্রশান্ত চক্রবর্তী কনিষ্ঠ পান্ডব; ডাঃ ভবতোষ গুপ্ত ও লীলা পুরস্কার-প্রাপ্ত লেখিকা মায়া বসু প্রমুখ লেখক/লেখিকার সম্মেলন *

আর্ট প্লেটে ছাপা চিত্রতারকাদের মন-মাতানো রঙীন ছবির মালা

৫৫০ পৃষ্ঠার বই : দাম—৫·৫০

২০বি, বৃন্দাবন মল্লিক লেন কলিঃ-৯
৩৫-২১৩৪

বনমানুষের হাড়

আবদুল আজীজ আল আমান

সেই সজীব পরিচ্ছন্ন বিকেলে ও উপবনটার কাছে এসে দাঁড়াল। এত নিকটে ও কোনদিন আসেনি। দু' পাশের ঘাস লতাপাতা কেটে কেটে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর থেকে গড়াতে গড়াতে নীচেয় নেমে এসেছে। বিকেলটা ক্রমেই নির্জন হয়ে আসছিল। বাতাসে সাঁতার কেটে কেটে আলোরা হেমন্তের শীষ-নোওয়া ধানের ওপর মৃদু হয়ে ঝরে পড়ছিল। অনেক দূরে পর্যন্ত ও কাকেও দেখতে পেল না। তবুও সারা মাঠের ফসলে ফসলে ও নিজেকে, নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করল। কচি মনটা খুশীতে ফুটে উঠছিল। বিকেলের নরম মোহ ওর চিন্তাকে, অনুভূতিকে অপূর্ব গরিমা দিয়েছিল।

সামনে সেই বিশাল বট গাছ—ঝুরি নামিয়ে বিপুল শাখা-প্রশাখায় সারা বনটা বুঝি ছেয়ে ফেলেছে। বাড়ীর কিনারায় দাঁড়িয়ে দেখলে যেটাকে মেঘের মত মনে হয়। ঘন পল্লবে ঢাকা ঢেউখেলান উপরটা

দেখে কখনো ঘনীভূত শিলাস্তরের কথা, পাহাড়ের কথা মনে হতো। সেই মেঘের সামনে, পাহাড়ের সামনে ও দাঁড়াল। তারপর এক সময় ভাবল, মা শুধু শুধু মিছে কথা বলে। এখানটায় আসতে রোজ নিষেধ করে। এই তো এলাম—কী হলো!

কিছু হয়নি কিন্তু ওর ভয় করছিল। সেই দুরু দুরু ভাবটা বুকের মধ্যে হচ্ছিল। মায়ের নিষেধবাক্য কানে নিয়ে ঝড়ীর কিনারা থেকে উপবনটার দিকে তাকালে ওর প্রায়ই আফ্রিকার জঙ্গলের কথা মনে হতো। ভূগোলে পড়েছে। বাঘ, গণ্ডার, বন-ভাল্লুক, জিরাফ, মরুল, হায়না।

উপবনটার দিকে তাকিয়ে ও হাসল। মিছে কথা সব। বাঘ সিংহ মরুল থাকলে মানুষ যেতে পারে? ঐ তো পথ পড়েছে। রোজ এক-আধজন পথিক এপার-ওপার হয়।

উজ্জ্বল বিকেলে তবুও বুকটা ভারী হয়ে উঠছিল। মৃদু হাওয়ায় ঘাস লতাপাতা কাঁপছিল। পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ও একদল প্রজাপতি দেখল। ওরা

কতো! মনটা অসম্ভাং উল্লাসে তির তির করে আন্দোলিত হলো, কাঁপল। অনেকগুলো প্রজাপতি একটাকে তাড়া করে ফিরছে। উপরে উঠছে, নীচের নামছে, ঝিলমিল করতে করতে কখনো ঘুরপাক খাচ্ছে। ঝগড়া করার কথা ভাবতে ওর ভাল লাগল না। মনে হলো ওরা খেলা করছে। প্রজাপতিগুলো রঙীন ডানায় ভর করে উড়তে উড়তে এক সময় প্রশাখার আড়ালে মিলিয়ে গেল। বিকেলটা অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল আর মনোরম হয়ে উঠেছে। শিউলীর গন্ধ নিতে নিতে এক সময় ওর মন থেকে সব শঙ্কারা পালিয়ে গেল। স্নিগ্ধ মৌনতা দিয়ে বনটা ওকে ক্রমেই আকর্ষণ করছিল। এক সময় ও মায়ের নিষেধকে উপেক্ষা করার সাহস পেল। বটগাছ পার হয়ে ও ধীরে ধীরে উপবনটার ভিতরে এসে থামল। আর কী আশ্চর্য এক রাশ বনফুলের খুশী-খুশী গন্ধ ওর নাকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভিতরটায় দ্রুত ও চোখ বুলিয়ে নিল। কোথায় জঙ্গল ভিতরে? অনেকখানি জায়গা জুড়ে কয়েকটা লতান বনফুলের চারা খেলা করছে। ওপাশে সেই গাম্বিল গাছের কোল পর্যন্ত জায়গাটা প্রায় ফাঁকা। অথচ এর মধ্যে মা আসতে নিষেধ করতো! ফুলের গন্ধ, লতাপাতার গন্ধ প্রাণভরে নিতে নিতে ওর মনে হলো ভিতরটা আরো নির্জন। আশ্চর্যরকম নির্জন। নির্জনতায় কান পেতে ও মৌনতার শব্দ শুনল। চোখ বন্ধ করতেই ওর মনে হলো—এই উপবনের মাটি থেকে, গাছ-গাছালি ভেদ করে অবিরাম একরকম শব্দ উঠছে। আর সেই নৈঃশাব্দিক আলোড়নে জঙ্গলের নির্জনতা বাড়ছে। আশ্চর্য মোহময় মৌনতা। মনে হল এই মুখর নির্জনতা দিয়ে সারা বনভূমি তার চিত্তকে, চেতনাকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করছে। তারপর এক সময় সম্মোহিত চোখ মেলে তাকাল। চোখ খুলতেই এই উপবনের অপরিচিত সকল বৃক্ষ লতাকে ও একসঙ্গে চিনে ফেলল। অচেনা লতার গায়ে ফোটা তারার মত শুভ্র ফুলটা তাকে ডাকল। আলতোভাবে কচি পা দুটি ফেলে এগিয়ে গেল সিরাজ। নত হয়ে ফুলটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল। পাশেই একটা গাছে সোনালী রং-এর কেমন পাতা হয়েছে। সবুজের মাঝে হলদে ছোপ। দেখতে দেখতে তার মনে হলো. এমন একটা পাতার ছবি তাদের প্রকৃতি-পরিচয়ে আছে। লতান গাছটাকে চিনতেই পারল না—অথচ করমচা গাছটাকে জড়িয়ে কোথায় উঠে গেছে। কল্কে ফুলের মত ছোট ছোট গোলাপী রংএর ফুলে সারা করমচা গাছ ছেয়ে গেছে। একটা ফুল তোলার জন্যে দারুণ আবেগে ছুটে এলো ও। তারপর সজোরে ছিঁড়তে গিয়ে প্রসারিত হাত থমকে দাঁড়াল। লাগবে—ব্যথা পাবে গাছটা। এই প্রথম সে গাছের সঙ্গে আপন হয়ে গাছের ব্যথা বুঝল। তারপর ফুলটার কাছে নাক নিয়ে ঘ্রাণ নিল। সারা দেহটা, মনটা ভুর ভুর করে উঠল আহ্!

আবার। আবার। বুক ভরাট করে শ্বাস নিল। তারপর ধীরে ধীরে ফুলটার সঙ্গে কথা কইলো, আমি রোজ আসব। তোমরা আমার জন্যে ফুটে থাকবে কুলঝুরির মত, তারার মত। আমি এসে দেখব, দেখে কী খুশী-ই-ই হবো!

নরম ঠোঁট দিয়ে কোমল ফুলটায় ও চুমো খেল।

কী যেন আর একটা গাছ উঁচু হয়ে আছে এপাশে। বোধহয় সোঁদাল গাছ। সেই গাছের ডালপালা বেয়ে ধুঁধুল ঝুলছে। অসংখ্য। কেউ জানে না নাকি—কেটে নিয়ে গেলে কত তরকারি! বাড়িতে গিয়ে দিদার ভাইকে বলব। তলা থেকে কটা শুকনো ধুঁধুল কুড়িয়ে নিল।

জঙ্গল-গাছ-লতা-পাতা ওর চেতনার ওপর প্রভাব ছড়াচ্ছে। অনুভূতিকে গ্রাস করছে। সব কিছু উপলব্ধি করছে ও। এক সময় মনে হল সারা বনটা ওর সঙ্গে কথা কইছে।

অনেক পরে ও একটা পাখির ডাক শুনল, পিউ-উ, পিউ-উ। নির্জনতা ভেঙে ভেঙে সঙ্গীতের মত আলোড়ন তুলে ছড়িয়ে পড়ল বনময়। আবার ডাকল। কয়েকটা লতা সরিয়ে উঁচু ডালের দিকে তাকাল ও। শব্দকে অনুসরণ করেও পাখিটাকে দেখতে পেল না। একটা দারুণ অস্বস্তিতে বুকটা ভরে থাকল। কিছু পরে কথাটা ভুলে গেল। সামনের লাল রং-এর লতাটার ওপর সেই প্রজাপতিগুলো বসেছে। দেখেই এক বিশেষ ভঙ্গিমায় হাঁটু দুমড়ে দু' হাত প্রসারিত করে অতি ধীরে এগুতে থাকল ও। খুব কাছে, খুব কাছে এল। হাত বাড়ালেই ধরা যায় অথচ ধরা গেল না। ফুর ফুর করে উড়ে গেল সব কটা। সেই একটাকে তাড়া করছে সবাই। শূন্য বাতাসে অনেকগুলো রঙীন ডানা মালার মত দোল খেতে খেতে মিলিয়ে গেল। আবার নীচের দিকে তাকাল ও। একেবারে দক্ষিন দিকের কিনারায় এসে গেছে। ওপাশে কাদের বেগুন ক্ষেত। খুব উঁচু করে কাঁধি মেরেছে ওরা। পগারে জল জমে আছে আয়নার মত। মাঝে মাঝে কালো কচুর গাছ। জলটা একেবারে স্থির হয়ে ছিল হঠাৎ অসংখ্য পোকা যেন বিজ বিজ করে উঠল। কী, কী! শোলের পোনা। শোল মাছ পোনা চরাচ্ছে। কিন্তু মা-মাছটা কই? বিস্মিত চোখে কৌতূহলের

আমেজ ঘনতর হয়ে এলো। ঊঃ কতোতো বড়। ছিপ থাকলে ধরা যেত। অনেক জলের নীচের মাটির কোল ঘেঁষে আস্তে আস্তে চরছে। কানকোর পাশে পাখা দুটো নড়ছে ঈষৎ আর বড় মুখটা গন্তব্যের নিশানা ধরে এগুচ্ছে। জলের নীচেয় মাছকে বুঝি বড় মনে হয়। মা-কে ঘিরে বাচ্চারা কিলবিল করছে জলের উপর। সোনালি তরুণ পিঠে বিকেলের স্বচ্ছ আলো কী অপরূপ কমনীয়তায় ঝিকমিক করছে।

বাচ্চাদের নিয়ে মাছটা আস্তে আস্তে অনেক দূরে চলে গেল।

এই মুহূর্তে নিজেকে অত্যন্ত ভাল লাগল ওর। বিকেলের নির্জনতা আরো ঘনতর হচ্ছে। আরণ্যক মোহ যেন ক্রমেই তাকে পেয়ে বসছে। এক অদ্ভুত অনুভূতিতে তার মনে হচ্ছে অরণ্যের আদিম ভাষা যেন সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে। কয়েক পা এগিয়ে এসে একটা ঢিপিতে সে তেলাকুচু গাছ দেখল। অনেকগুলো তেলাকুচু পেকে টকটকে লাল হয়ে রয়েছে। তার পাশেই বনফুলের ঝিছিল। সারা বনভূমিকে তার বহু বর্ণের রঙীন ছবি বলে মনে হচ্ছে। বর্ণের আলিম্পনে তার স্বপ্নালু কিশোর মন লুটিয়ে বিছিয়ে গেছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে এই সবুজ-রঙীন লতা-পাতা-ফুলের উপর প্রাণভরে লুটোপুটি খায়। মাথার উপর উদার উন্মুক্ত সুনীল আকাশ আজ তার কাছে নতুন অর্থে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। শব্দ-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শে আজ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি পরম সার্থকতায় আকুলি-বিকুলি করছে। জীবনটাকে এত ভাল, এমন প্রসারিত আর কোনদিন মনে হয় নি। পৃথিবী আর প্রকৃতির অসামান্য রূপে মুগ্ধ হয়ে সে অসীম আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বিপুলা আকাশের দিকে মুখ করে এক বুক সুগন্ধি হিমশীতল বাতাস পরম তৃপ্তিতে গ্রহণ করলো। অকস্মাৎ উপবনটার উপর পরম আগ্রহে বসে যেন মাটি-লতা-পাতা-ফুলকে শুনিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমি রোজ আসব। কাল দুলালকে সঙ্গে করে আনব। আমরা খেলব, ঘুরব, বেড়াব।

তারপর দাঁড়িয়ে দু' হাত প্রসারিত করে নাচের ভংগিতে বনফুলের উপর দিয়ে একটা ঘুরপাক খেয়ে বলল, কী মজা—কী মজা!

পরিচ্ছন্ন বিকেলের চোখে কালিমা নামছে। বনভূমিতে তার নির্জন প্রলেপ পড়েছে। বটগাছের ভিতরের ডালগুলো কালো হয়ে গেছে। সারা জঙ্গলটা যেন ক্রমে থমথমে হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে সে থমথমে ভাব বাড়ছে, গাঢ় হচ্ছে। হঠাৎ সে অনেক উপরে পত্র-পল্লবের ভিতরে একটা মানুষের মাথা দেখতে পেল। লতাপাতা সরিয়ে ভাল করে দেখল মূর্তিটা। না মানুষ নয়—শুকনো গুঁড়ি।

এখন তার মায়ের কথা মনে পড়ল। জলায় বাঁধা ভেড়াগুলোর ডাক শুনে মনে হল মা তাকে ডাকছে। ও গুলোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এ বন ছেড়ে যেতে তার মনটা যেন কেমন কেমন করছে। সামনেই একটা পেয়ারা গাছের ডালের ক'টা সুন্দর পেয়ারা পেকে থাকতে দেখে ও খুব খুশী হলো। প্রথমটা বিশ্বাস করতে চাইল না—ভাল করে দেখে আকণ্ঠ খুশী খুশী ভাবে বলল, এতোতো পাকা পেয়ারা! উফ্।

ওগুলো পাড়া এবং পাওয়ার প্রত্যাশায় শূন্যে লাফ দিয়ে দৌড় শুরু করল। মনে হলো যেন আর কেউ এসে এখুনি পেড়ে নিয়ে যাবে। অদৃশ্য সেই মানুষের সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা। কিন্তু কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েই দারুণ বিভীষিকায় ও মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়াল। সামনে দীর্ঘ কালকেউটে বিশাল ফনা বিস্তার করে দারুণ আক্রোশে দুলছে। চকিতে পিছন ফিরে মরণ-ভীতু তীক্ষ্ণ চীৎকার স্বরে ও প্রাণ-পণে দৌড় দিল। এখন তার কাছে বন-লতা-ফলসহ সারা উপবন অবলুপ্ত। কালকেউটের হাত থেকে বাঁচার আপ্রাণ তাগিদে সে দৌড়ুচ্ছে আর দৌড়ুচ্ছে। উপবনটা পেরিয়ে, জলাভূমি পেরিয়ে আখ ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার মনে হলো সাপটা এখনো পিছনে তাড়া করে আসছে। অনেক দূরে এসে আউশের ক্ষেতের উপর দিয়ে যেতে যেতে যখন সে আর কিছুতেই দৌড়ুতে পারছিল না তখন চকিতে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দাঁড়াল। না—কালকেউটেটা সেই উপবনেই রয়ে গেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে অত্যন্ত ক্রুর দৃষ্টিতে জঙ্গলটার দিকে তাকাল। তাকাতে তাকাতে তার বনমানুষের হাড়ের কথা মনে হলো।

সেবার নিত্যবাবুর আমতলায় সাপের খেলা বসেছিল। সাপুড়ে বাঁশি থেকে আঁটুলা পাকান একটা সাপ বার করে বাঁশীতে ফুঁ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো সাপ বার হয়ে এসে ফণা তুলেছিল। একসঙ্গে তিনটে ভুজঙ্গম ফুঁসছিল সমানে। দর্শকেরা সামাল সামাল রব তুলে পালাচ্ছিল। কিন্তু সাপুড়ে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপির পাশ থেকে একটা হাড় তুলে নিয়ে ফণার ছুঁইয়ে দিতেই কেঁচো হয়ে গেল সাপগুলো।

ছেলে-বুড়ো-জোয়ান দর্শকেরা ফিরে এসে আবার গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল। হাড়টা তুলে নিয়ে সাপুড়ে বলল, বাবু এ হল বনমানুষের হাড়।

হাড়টা পেলে সে এখুনি সাপটাকে মেরে আসত। তারপর তার দীর্ঘ বিষাক্ত দেহটা আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিত। তখন দুলালকে নিয়ে প্রাচুর্যময় নির্মল উপবনটায় গিয়ে বুকভরে নিশ্বাস নিতে, খেলতে এতটুকুও ভয় পেত না।

কিন্তু এমন প্রত্যয়-দৃঢ় নিশ্চিত ভাবনার পরও সে বুকে দারুণ ব্যথা অনুভব করল। কচি দেহটা যেন অসীম যন্ত্রণায় পলে পলে পাণ্ডুর হয়ে যাচ্ছে। ম্লান বিকেলের মৃত্যু দেখতে দেখতে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আশ্চর্য, বনমানুষের হাড়ের সন্ধান তার জানা নেই।

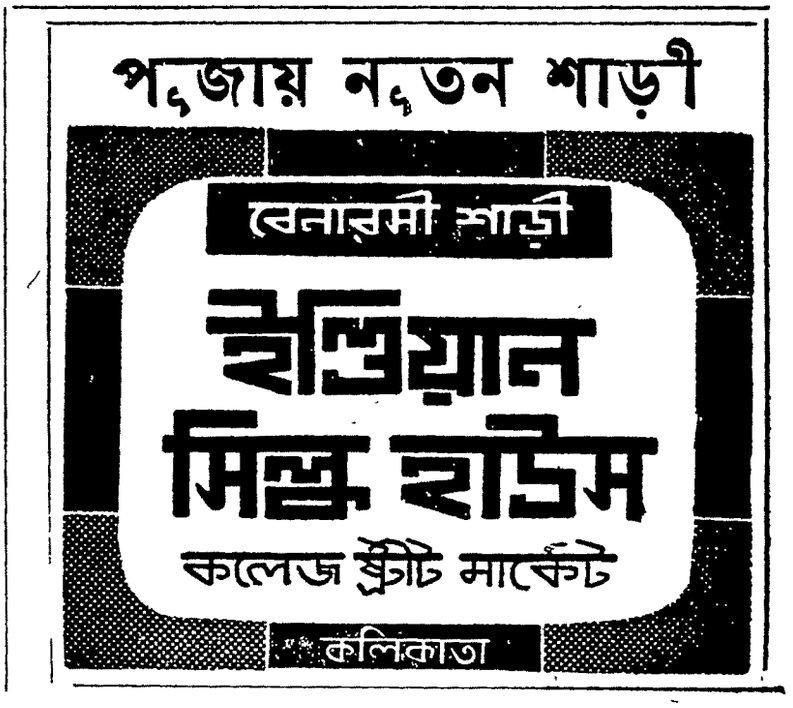

কথায় কথায়

আমি যখন আমার এই বর্তমান বাড়িতে প্রথম আসি, প্রায় বছর চারেক আগে খুব ভোরের দিকে প্রায় চারটে-সাড়ে চারটের সময় একজন লোক আমার দরজায় দাঁড়িয়ে 'ভীম ভীম' বলে কাকে যেন ডাকতো। আমরা সাধারণত অনেক রাত শুই। শোয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অর্থাৎ চারটে-সাড়ে চারটে আমাদের মধ্যরাত্রি। এই সময় কেউ যদি কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এই রকমভাবে প্রতিদিন ভীম নামে একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোককে আমার বাড়িতেই খোঁজে, সেটা ভীষণ বিরক্তিকর।

তবে একটা সুখের কথা এই যে, লোকটা কড়া-নাড়া বা দরজা ধাক্কাধাক্কি এই সব পরবর্তী কার্যক্রমে উৎসাহী বা বিশ্বাসী নয়। ফলে একটু বাদেই কয়েকবার ভীমকে ডাকবার পরই ধীরে-সুস্থে চলে যায়। তবুও প্রতিদিনই শেষ রাতে এই একই উৎপাত। বাধ্য হয়ে একদিন উঠে দরজা খুলে দাঁড়ালাম। দেখি গোগামতন একজন লোক গেঞ্জি গায়ে, লুঙ্গি পরা, হাতে একটা তারের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললাম, 'কি চাই? এখানে ভীম নামে কেউ থাকে না।'

লোকটা আমাকে দেখে একটু ইতস্তত করছিলো। তারপরে একটু সামলিয়ে নিয়ে যা বুঝিয়ে বললো তার মানে দাঁড়ায়, ভীম নামে কোনো লোককে সে খুঁজছে না, আসলে সে ডিম বেচে। তার নিজের মুরগীর সদ্যপ্রসূত ডিম নিয়ে সে এই শেষ রাতে কয়েকজন বাঁধা খদ্দেরকে পৌঁছে দেয়, এবং দরজায় কড়া না নেড়ে বা অন্যভাবে উৎপাত না করে 'ডিম-ডিম' করে জানান দেয়। বন্ধ ঘরের মধ্যে সেই কথাটাই আমাদের কানে 'ভীম, ভীম' বলে মনে হয়েছে। আমাদের এই বাড়ির পূর্বতন বাসিন্দা তার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, সে আশা করছে আমরাও টাটকা ডিম হাতের কাছে নিয়মিত পাওয়ার এই সুযোগ ছাড়বো না।

আমি তাকে বললাম, এমন টাটকা ডিম এত সহজে সংগ্রহ করতে পারলে আমরা অবশ্যই খুশি হতাম, কিন্তু এই শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে প্রতিদিন ডিম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। লোকটা কেমন যেন নিরাশ হয়ে চলে গেলো।

ডিমওয়ালার কাছ থেকে অতি সহজে পরিত্রাণ পেলাম বটে, কিন্তু এ পাড়ায় আসার দু-চারদিনের মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা ফেরিওয়ালাদের স্বর্গ-রাজ্যে এসে পৌঁছেছি।

প্রথমে খাদ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের কথাই ধরা যাক। হাওয়া-মিঠাই অর্থাৎ বুড়ির চুল নামে আমাদের ছোটবেলার সেই অতি লোভনীয় এবং রহস্যময়ভাবে বায়বীয় খাবার যে এখনো পৃথিবীতে রয়েছে সেটা জানার অব্যবহিত পরই রাস্তা দিয়ে একসঙ্গে প্রায় একই রকম কর্কশ কণ্ঠে তীব্র প্রতিযোগিতা করতে করতে চলে গেলো কলকাতার ফুচকাওয়ালা এবং খাস বোম্বের ভেলপুরীওয়ালা। ভেলপুরী জিনিসটা আমাদের শৈশবে দেখিনি একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে, যখন বাড়িতে কেউ ছিলো না, জানলার আড়াল থেকে ভেলপুরী-ওয়ালাকে ডেকে পঞ্চাশ পয়সার ঐ ভেলপুরী কিনে খেয়ে দেখলাম, অপূর্ব।

শুধু ফুচকাওয়ালা বা ভেলপুরীওয়ালা নয়, প্রতিদিন বিকেলে পর্যায়ক্রমে তিনজন সন্দেশওলা আসে এ পাড়ায়, তিনজনের তিনরকম বৈচিত্র্য। ক্ষীরের সন্দেশ, নারকেলের সন্দেশ এবং আইসক্রিম সন্দেশ। ক্ষীরের সন্দেশওলা ঐ জিনিস ছাড়াও শোনপাপড়ি বেচে।

আইসক্রিম বা চানাচুরের বা ঝালমুড়ির ফেরিওলা সর্বত্রই আছে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না, গভীর রাতে একটা লোক 'রুটি-আলুর দম', 'রুটি-আলুর দম' হেঁকে যায়। আমার সহধর্মিণীর ধারণা লোকটা এই খাদ্য-সমাহারের বিক্রেতা নয়, কোথাও খেয়ে প্রাণের আনন্দে ঐ রকম চেঁচাতে চেঁচাতে ফেরে। তিনি নাকি দেখেছেন লোকটা খালি হাতে যায়। আমি অবশ্য দেখিনি, ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো তার চীৎকার শুনেছি। কোনোদিন যদি অতরাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারি পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

গভীরতর রাতে একেবারে স্বপ্নের মধ্যে ডাক শুনতে পাই চার-আনায় তিনটে পাতি-লেবুওলা, অথবা দার্জিলিং-এর ফুলকপির। যথাঋতুতে সজনে ডাঁটাওলা এবং কুমড়ো-ফুল ওয়ালা এই রকম গভীর রাতে অনিবার্য পথপরিক্রমায় বের হয়ে পড়ে। স্বপ্নের মধ্যেই তাদের কণ্ঠের রেশ ক্রমশ দূরদিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। একেকদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবি, ঐ নিঝুম নিশীথকালে কারা পাতিলেবু কেনে, কারা কেনে কুমড়ো-ফুল; কেন কেনে?

তাই বলে বেলফুলওয়ালা বা ধূপওয়ালা যে নেই তা'ও নয়, তারাও আছে। আছে এক অবাঙালি মালি সে কেন যে নৃত্য-গীত সহযোগে কপাল চাপড়িয়ে পাতাবাহার আর মরসুমী ফুল বেচে, ঈশ্বর জানেন। তার হয়তো সত্যিই মাথা খারাপ। কিন্তু যে লোকটা প্রতিদিন পুরানো গ্রামোফোন আর দেয়ালঘড়ি কিনতে আসে তারো কি মাথা-খারাপ। তার উদ্দেশ্য কি? প্রতিদিনই এত পুরানো গ্রামোফোন আর দেয়ালঘড়ি কারা বেচে?

আর একজন আছেন অতি শৌখিন প্রকৃতির। তাঁকে আপনি করেই বলছি। তাঁর চোখে সুরমা, গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি, তিনি শুধু পুরানো বেনারসী শাড়ির পাড় কেনেন।

সেদিন কুকুরের বাচ্চা বেচতে এসেছিলো একটা লোক, কি বুঝে পাড়ার কুকুরেরা তাকে কামড়ে দিয়েছে। তার আগে তারা কামড়িয়েছিলো এক ভ্রাম্যমান্ জ্যোতিষীকে, তাঁর হাতের সামুদ্রিক বিদ্যার বইটিকে কুকুরেরা কেড়ে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো।

এখন এই কুকুরেরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু তারা কেন যে অন্য ফেরি-ওলাদের এমন কি বিচিত্রদর্শন হিং-বিক্রেতাকে পর্যন্ত কিছু বলে না সে এক রহস্য।

—তারাপদ রায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

চতুর্থ পর্ব

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী অভিযান

প্রথম অধ্যায়

'উদীয়মান সূর্যের' দেশ জাপান

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অপরাজেয় হিটলারী বাহিনী যখন মস্কোর দ্বারদেশে লালফৌজের প্রচণ্ড পাল্টা আঘাতের নিদারুণ বিপাকের মুখে পড়িল, তখন সেই নাটকীয় মুহূর্তে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান পূর্ব ভূখণ্ডে হঠাৎ যে বজ্র নিক্ষেপ করিল, তাতে সারা পৃথিবীতে যেন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমগ্র প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বলা যাইতে পারে, পার্ল হারবারে এই আকস্মিক জাপানী আক্রমণ একটি আঘাতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডকে পৃথিবী-ব্যাপী প্রলয়াগ্নিতে পরিণত করিল। জুন মাসে জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের দ্বারা মহাযুদ্ধের চেহারার যে পরিবর্তন ঘটিতেছিল, ডিসেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক আমেরিকাকে আক্রমণের দ্বারা সেই পরিবর্তন যেন আরও গভীর এবং আরও ব্যাপক ও জটিল হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের ইতিহাস এক পর্ব থেকে অন্য পর্বে উত্তীর্ণ হইল। এমন কি, পশ্চিমে ইউরোপ ও আফ্রিকার ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে এই মহাযুদ্ধ আর আবদ্ধ রহিল না, পূর্ব খণ্ডের 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হইয়া আমাদের ভারতবর্ষের দুয়ারের দিকে যেন পা বাড়াইল!.....

জাপান 'উদীয়মান সূর্যের' দেশরূপে পরিচিত এবং তার এই পরিচয় বিশেষভাবে প্রাচ্য জগতের কাছে একদা উদীয়মান সূর্যের আলোর মতই আশার ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া আসিতেছিল। কারণ, সারা এশিয়া মহাদেশ যখন কার্যত পদানত ছিল, বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের আধিপত্যের নিকট নতশির ছিল, তখন একমাত্র স্বাধীন জাপান পূর্বদিকে নবোদিত সূর্যের মতই গৌরবোজ্জ্বল ছিল। তার সামরিক শক্তি ও মহিমার কাছে ইউরোপের বিশালতম জারের সাম্রাজ্য রাশিয়াও হতমান হইয়াছিল—১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। অতএব ইউরোপীয় শক্তিগুলির অধিকৃত দেশের জনগণের এবং বিশেষভাবে পরাধীন ভারতের নিকটও জাপানের একটা আলাদা মর্যাদা ছিল।

কিন্তু জাপানের ইতিহাস দীর্ঘ ও রোমাঞ্চকর। শত শত বছর ধরিয়া সমুদ্র-বেষ্টিত এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ছিল সাহসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ, দেশপ্রেমিক এবং পুরাতন ঐতিহ্যের অনুরক্ত। প্রাচীন জাতীয় ধর্ম শিন্টো ও তার পর বৌদ্ধ ধর্মের আচার আচরণের ফলে এদের জাতীয় চরিত্রে যেন কিছুটা 'গুপ্ত রহস্যবাদ' বা মিস্টিক প্রভাব পড়িয়াছিল। কিন্তু ১৩ শত খৃষ্টাব্দের আগে ইউরোপ জাপান সম্পর্কে কোন খবর রাখিত না এবং ষোড়শ শতাব্দীতে খৃষ্টধর্ম প্রথম প্রবর্তিত হইবার পর খৃষ্টানদের উপর নিদারুণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল এবং ২৪ বছর ধরিয়া জাপানে যে খৃষ্টান নিধন যজ্ঞ শুরু হইল, তা শেষ হইল ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি। এই সময়ের মধ্যে আড়াই লক্ষের অধিক খৃষ্টানকে সাবাড় করা হইল। এর পর জাপান তার সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া যেন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী হইয়া রহিল। (১)

কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই অবস্থা চলিল। এদিকে সামন্ত যুগের বিধি-ব্যবস্থায় সারা দেশ যেন আচ্ছন্ন ছিল, অভিজাতগণ সামুরাই নামে পরিচিত ছিলেন। দেশের ভূমি ও সম্পত্তির মালিক ছিলেন তাঁরাই। তাঁদের একটি কঠিন নৈতিক আচরণবিধি ছিল, যার নাম ছিল 'বুশিদো'—এই বুশিদোর গুণে তাঁরা যেমন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বিরোধীকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তেমনি অপমানিত জীবনের অবসানের জন্য 'হারিকিরি' (পেটে ছুরিকাঘাতের দ্বারা আত্মহত্যা) করিতেও কিছুমাত্র সংশয় বোধ করিতেন না। এই সামুরাইগণই ছিলেন দেশ ও সমাজের আসল শাসক—যদিও সকলের মাথার উপরে নামে মাত্র ছিলেন মিকাডো বা সম্রাট। কিন্তু মধ্যযুগের খৃষ্টান জগতের নাইটদের মত জাপানের সামুরাই গোষ্ঠীগুলির নিজেদের মধ্যেও ঝগড়া বিবাদ ও লড়াই লাগিয়া থাকিত। ফলে, দেশে যেমন শান্তি ছিল না, তেমনি ছিল না কোন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি। (২)

এমন সময় একটা অঘটন ঘটিল। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে কমোডোর পেরি চারখানা জাহাজসহ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া জাপানী দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। এই চারিখানার মধ্যে দু'খানা ছিল বাষ্পচালিত পোত। এমন তাজ্জব ব্যাপার, অর্থাৎ বাষ্পীয় পোত জাপানীরা আগে কখনও দেখে নাই। তারা অবাক হইল এবং আরও অবাক হইল এজন্য যে, একজন বিদেশী আসিয়া অনায়াসে এবং দম্ভভরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এক দাবীপত্র জাপানের মিকাডোর (সম্রাটের) উদ্দেশ্যে পেশ করিলেন! পরের বছর কমোডোর পেরি আবার তাঁর নৌবহরসহ ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁর আগেকার চরমপত্র অনুসারে জাপানের কাছ থেকে আমেরিকার অনুকূলে এক সন্ধি চুক্তি আদায় করিয়া ছাড়িলেন।

(1) The Second World War — Churchill, Vol 2, P. 515

(2) The Between — War World (1918-1939) — J. Hampden Jackson London 1947, P 285

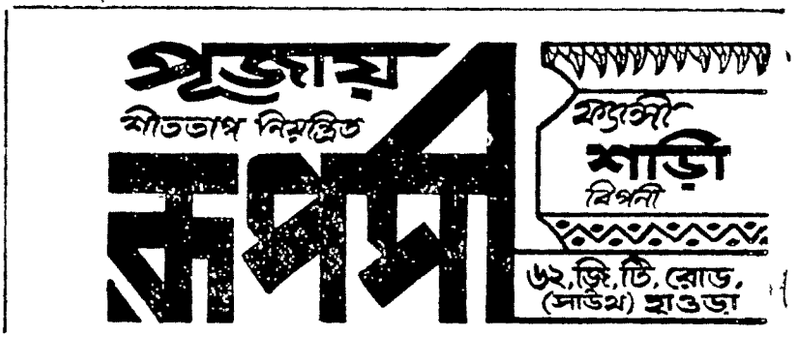

এই ঘটনা ইতিহাসের এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিল এবং জাপান কয়েক শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা থেকে আধুনিক পৃথিবীর নূতনতর সংস্পর্শে আসিয়া পৌঁছিল। এর পর ১৮৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হইল সম্রাট মেইজির রাজকীয় ক্ষমতা ও গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বা Restoration এর সঙ্গে জাপানের জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের এবং আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার যুগ। ইংলণ্ডের ভিক্টোরিয়া যুগ যেমন ইতিহাস বিখ্যাত, জাপানের ইতিহাসে তেমনি মেইজি যুগের গৌরব। জাপান এই প্রথম অনুভব করিল—'পশ্চিমে আজ খুলিয়াছে দ্বার এবং সেখান থেকে নব্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 'উপহার' আহরণ করিতে হইবে। বিদেশীরা আর 'বর্বর' বলিয়া বিতাড়িত হইল না। বরং তরুণ সম্রাট এক নূতন 'প্রতিজ্ঞার সনদ' (The Charter Oath) প্রচার করিলেন :

> Knowledge shall be sought for all over the world and thus shall be strengthened the foundation of the imperial polity.—(3)

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী থেকে জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে এবং এভাবেই সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সংগঠনকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

সম্রাটের এই অনুজ্ঞা অনুসারে জাপানের সঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কারণ মেধাবী জাপানীরা প্রেরিত হইলেন লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক ম্যাঞ্চেস্টার ইত্যাদি নগরীতে—আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের জন্য।

জাপানের অভ্যন্তরে দ্রুত সামন্ত যুগ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা সেখানে প্রবেশ করিল। সামুরাই অভিজাতগণ তাঁদের জমিদারি মনোবৃত্তি ও বিশেষ অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং ক্রমে কৃষকেরাও জমির অধিকার পাইল। পশ্চিমের অনুকরণে জাপানেও পার্লামেণ্টারি শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল বটে, কিন্তু সম্রাটের বিশেষ অধিকার ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও অব্যাহত রহিল। জাপানের মন্ত্রিসভা সংসদের নিকট দায়ী ছিল না এবং প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিযুক্ত হইতেন সম্রাটের দ্বারা। আর সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ছিল 'জেনরো' বা একদল প্রবীণ রাজনীতিক। কিন্তু নৌ ও সৈন্যবিভাগের যেমন সর্বোচ্চ দায়িত্ব ছিল সম্রাটের হাতে, তেমনি এই দায়িত্ব তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তর মারফৎ পরিচালনা করিতেন না, করিতেন সোজাসুজি সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষদের (Chiefs of Staff) মারফৎ। আবার এঁরা একমাত্র সম্রাটের নিকট দায়ী ছিলেন।

(3) A History of Modern Japan—Richard Storry Pelican, London, 1963, P 103

সুতরাং জাপানের সামরিক বাহিনী জাপানী পার্লামেণ্টের আওতার বাইরে ছিল, এই গুরুতর তথ্যটি মনে রাখা দরকার। কারণ, আধুনিক জাপানের শাসন-কর্তা ছিলেন এই সামরিকগোষ্ঠি, পূর্বেকার ভূম্যধিকারী অভিজাত সামুরাইগণ নবীন জাপানের সেনাপতি ও সামরিক নেতায় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

যে দ্রুতগতিতে সমুদ্রবেষ্টিত এই দ্বীপপুঞ্জ * মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে একেবারে আধুনিক যুগের সূর্যোদয়ে আসিয়া পৌঁছিল, তা প্রায় অবিশ্বাস্য। চীনা ভাষায় 'জাপান' শব্দের অর্থ 'উদীয়মান সূর্য' এবং জাপানীরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁরা সূর্যদেবতার দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁদের সম্রাটও 'সূর্য-বংশোদ্ভূত'। দুই হাজার বছর ধরিয়া এই রাজবংশ জাপানে রাজত্ব করিতেছিল। দেবতারূপী এই সম্রাটের সেবায় আত্ম-বিসর্জন করিতে পারাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করা হইত। নবীন জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন সম্রাটকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল।

অন্যদিকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের পর কয়েক বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎগতিতে জাপানে কল-কারখানা, শ্রমশিল্প এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসার লাভ করিল। বৃহৎ মূলধনের প্রয়োগে বড় বড় শ্রমশিল্প গড়িয়া উঠিল এবং ধান চাষকারী কৃষকেরা গুটিপোকা ও রেশম উৎপাদনের দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিতে লাগিল। জাপান এভাবে অতি দ্রুত এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইল। তারপর ১৯০৪ সালে জারের রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করিল। তার এই শক্তি ও গর্বিত চেহারায় এশিয়া মহাদেশের পরাধীন দেশগুলিতে ধন্য ধন্য রব উঠিল। এদিকে তার জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে যে জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬০ লক্ষ, ১৯২০ সালে তাহা দাঁড়াইল সাড়ে ৫ কোটিতে এবং পরবর্তী দুই দশকে আরও বৃদ্ধি পাইল। এই বর্ধিত জনসংখ্যা কেবলমাত্র কৃষির দ্বারা বাঁচিতে পারে না এবং কৃষিকার্যের উপযোগী আর এক ছটাক জমিও ছিল না। সুতরাং পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের সঙ্কট আরম্ভ হইল। এই গভীর সমস্যায় দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল স্থির করিলেন যে আরও ব্যাপকভাবে এবং পূর্ণতরভাবে দেশকে শ্রমশিল্পের দ্বারা ছাইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু পেট্রোল, কয়লা, লোহা, কার্পাস, পশম ইত্যাদি বৃহৎ শ্রমশিল্পের সহায়ক কাঁচামালগুলির জন্য তাকে বিদেশের—বিশেষভাবে আমেরিকা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং সমস্যা সহজ ছিল না এবং ছিল না বলিয়াই এর পরিণতি ঘটিল আক্রমণাত্মক যুদ্ধে। সিজুকাই ও মিনসিটো নামে যে দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল জাপানে ছিল, তারা বৃহৎ শ্রমশিল্পের প্রসার সম্পর্কে একমত ছিল বটে, কিন্তু কিভাবে উহা প্রচুর ঐশ্বর্যদায়ক হইবে, তা নিয়া মতভেদ ছিল। সিজুকাই দল বিশ্বাস করিতেন যে, একমাত্র আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির মধ্যেই জাপানের মুক্তি নিহিত। অপরপক্ষে মিনসিটো দল বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রপারবর্তী রহির্বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাপান চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে। এজন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কঠোর করিতে হইবে এবং বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

এই দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছাড়া জাপানে আর একটি তৃতীয় দল ছিল এবং তারা এই দুই দলেরই বিরোধী ছিলেন। তাঁরা হইতেছেন সামরিকতাবাদী, সেনানীমণ্ডলী এঁদের পরিচালক। এই সামরিকগোষ্ঠীর নীতি ছিল এই যে, পৃথিবীতে জাপানের বৃহত্তম সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং দিগ্বিজয়ের দ্বারা জাপানের সমৃদ্ধি ঘটাইতে হইবে। রাজনৈতিক দলগুলি এঁদের নীতির সঙ্গে একমত না হইলেও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁদের বিরোধিতা ছিল না, ছিল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ পরিপূরণের জন্য। কেননা এঁদের পিছনে ছিল জাপানের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকটি ধনিক পরিবার—যাদের মধ্যে প্রধান ছিল দুইটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী, মিৎসুই এবং মিৎসুবিসি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ফ্রান্সের মত জাপানেও এই ধনিক পরিবারগুলিরই আধিপত্য ছিল এবং সমগ্র জাপানের আর্থিক জীবন এঁদের করতলগত ছিল। প্রাচীন সামুরাই অভিজাত শ্রেণীর বংশধরেরাই নূতন জাপানের ব্যবসায় বাণিজ্য পত্তন এবং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মিৎসুই গোষ্ঠী ছিলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে, কারখানাজাত পণ্যদ্রব্যে, কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যাদিতে এবং বিশেষভাবে অস্ত্র ব্যবসায়ে প্রতিপত্তিশালী। এঁরাই ছিলেন সিজুকাই দলের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। আর মিৎসু-বিসি গোষ্ঠী ছিলেন জাহাজ ব্যবসায়, ইঞ্জিনীয়ারিং, সামুদ্রিক বীমা, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং এবং বিমানশিল্প নির্মাণ ইত্যাদি এবং তাঁরা ছিলেন মিনসিটো দলের অভিভাবক। সুতরাং বৃহৎ ব্যবসায়ের পরিচালক এই দুই পরিবারগোষ্ঠীর মত

* খাস জাপানের আয়তন ১,৪৮,৮০০ বর্গমাইল। কোরিয়া, ফরমোজা ও দক্ষিণ শখালিনসহ সমুদ্রপারবর্তী রাজ্যগুলির আয়তন ছিল ১,১৪,৬০০ বর্গমাইল। জাপানের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ এবং জাপ দখলীকৃত রাজ্যগুলির লোক-সংখ্যা ৩ কোটি—(১৯৩৯ সাল)।

এই দুইটি পার্টিও অনিবার্যরূপেই রণ-প্রস্তুতি ও যুদ্ধব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিল। যেমন, সৈন্যবাহিনী সম্প্রসারণের খরচের সঙ্গে সিজুকাই দলের এবং নৌবহরের খরচের সঙ্গে মিনসিটো দলের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ছিল।

জাপান ক্রমশঃ প্রশান্ত মহাসাগরে ও পূর্ব এশিয়ায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের টনক নড়িল। এই অবস্থায় ১৯২১ সালে ওয়াশিংটন সম্মেলনে আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদির সঙ্গে নৌ চুক্তির দ্বারা জাপান শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১০ বৎসর ধরিয়া এই 'শান্তির যুগ' চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসের এক ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পের দ্বারা জাপান বিধ্বস্ত হইল। রাজধানী টোকিও এবং প্রসিদ্ধ বন্দর ইয়কোহামা ধ্বংস হইল। সেই প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের যেমন কোন তুলনা ছিল না, তেমনই ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করাও দুঃসাধ্য ছিল। ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক ভূমিকম্পে এবং কম্পনসঞ্জাত অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারাইল, আর সম্পত্তি নষ্ট হইল ৫৫ কোটি পাউণ্ড বা কয়েক সহস্র কোটি টাকা মূল্যের। কিন্তু জাপানী-দের ধৈর্য, সহনশক্তি এবং নৈপুণ্য ও পরিশ্রমেরও তুলনা ছিল না। ৭ বৎসরের মধ্যেই এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি জাপান সামলাইয়া উঠিল এবং নূতন নূতন নগর নির্মাণ করিল। (এই সময় জাপানের 'শান্তিপূর্ণ' থাকার অন্যতম কারণও ইহাই।) কিন্তু একদিকে ভূমিকম্পের আঘাত এবং অন্যদিকে শ্রমশিল্প বিপ্লবের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের ধাক্কায় জাপানী সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে বহু আলোড়ন আনিল। বৃহৎ মালিক ও শ্রমিক শ্রেণী গড়িয়া উঠিল এবং নির্মাণ সংগঠন ও উৎপাদনের তাগিদে শ্রমিকদের খাটুনির ঘণ্টা বাড়িয়া গেল। তাদের মজুরি ছিল সামান্য, পরিশ্রম ছিল অসাধারণ। মজুরদের বাহিরের জীবন বলিয়া কিছু ছিল না, অনেকে কারখানায় কাজ করিয়া সেখানেই ক্লান্ত দেহে ঘুমাইয়া পড়িত। আর বাকি লোকগুলি ছিল নোংরা বস্তির বাসিন্দা মাত্র। ১৯১৯ সাল হইতেই ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ বৎসর খৃস্টান প্রচারক কাগাওয়ার নেতৃত্বে কোবে শহরের ৩৫ হাজার শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ধর্মঘটগুলি সফল হইল না, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল দুর্বল। সুতরাং এই অবস্থায় জাপানে 'বিপজ্জনক চিন্তা-ধারা' প্রবেশ করিল। অর্থাৎ কমিউনিজম দেখা দিতে লাগিল। বিশেষভাবে ছাত্র ও যুবক সমাজে ইহা প্রসার লাভ করিল। সুতরাং এই 'বিপজ্জনক চিন্তাধারা' দমনের জন্য পীড়ন নীতি শুরু হইল এবং এই বিষয়ে দুইটি রাজনৈতিক দলই—সিজুকাই ও মিৎসুবিসি একমত ছিলেন। ১৯২৮ সালে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির' প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণকে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ বলিয়া আইন পাশ হইল।

এর পর ১৯৩০ সাল হইতে পৃথিবী-ব্যাপী বাজার মন্দার ফলে জাপান নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকটে পড়িল। ইহার পরই সুরু হইল মাঞ্চুরিয়া ও চীনে জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি ও যুদ্ধ—যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ১০ বৎসর ধরিয়া চলিল।

এই সময় হইতে জাপানে ফ্যাসিজম ও সন্ত্রাসবাদীর হত্যাকাণ্ড সুরু হইল। ১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে নৌবল নিয়ন্ত্রণ চুক্তির পর ১৯৩০ সালে লণ্ডনে আর একটি নৌ-সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইল এবং উহাতে জাপান ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত হইল। ফলে জঙ্গী-বাদীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধানমন্ত্রী হামাগুচিকে হত্যা করিল। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই জঙ্গীবাদীরাই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল এবং এজন্য মন্ত্রিসভা বা গভর্ণমেণ্টের সম্মতির পর্যন্ত প্রয়োজন হইল না। তখন মিনসিটো দলের ব্যারণ সিদেহারা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রিসভা এতটা বাড়া-বাড়ি পছন্দ করিতেছিলেন না এবং মাঞ্চুরিয়া 'রাশপ্রভু' চ্যাং সুয়ে লিয়েঙের সঙ্গে একটা আপোষরফার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু জাপানী সেনানীমণ্ডলী তা' গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলেন না। ডিসেম্বর মাসে মিনসিটো মন্ত্রিসভার পতন হইল এবং সিজুকাই দল নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন। ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়া জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক নিযুক্ত লর্ড লিটনের (লিটন কমিশন) রিপোর্ট প্রকাশিত হইল এবং তাতে জাপানের কার্যকে 'সমর্থনের অযোগ্য' বলিয়া নিন্দা করা হইল। তখন প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই চীনের সঙ্গে আপোষ-রফার প্রস্তাব করিলেন। তৎক্ষণাৎ জঙ্গীবাদীরা চীৎকার শুরু করিল যে ইনুকাই এবং তাঁর সমর্থক মিৎসু গোষ্ঠী দেশপ্রেমিক নহেন। ফলে মিৎসুবিসি কারবারের বড়কর্তা এবং প্রধানমন্ত্রী ইনুকাই নিহত হইলেন। জেনারেল আরাকি তখন সমরসচিব এবং কার্যতঃ জাপানের ডিক্টেটার। মাঞ্চুরিয়া অভিযানের সংগঠকও ছিলেন তিনি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে (জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতালাভের সময়) জেনারেল আরাকি যে বক্তৃতা দিলেন তাহা দস্তুরমত ফ্যাসিস্টপন্থী এবং এই বক্তৃতায় তিনি 'কোডো' (Kodo) নামে এক তত্ত্বের উপর জোর দিলেন, যাহা নাৎসী জার্মানীর আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্বের মত জাপানী জাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার করিল এবং রাশিয়া হইতে শ্বেতকায় জাতির প্রভুত্ব অবসানের দাবী জানাইল। হিটলারের মত জেনারেল আরাকিও পুঁজিবাদীদের উপর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সৈন্য ও নৌবিভাগের পদস্থ সেনানীগণ জানিতেন যে মিৎসু এবং মিৎসুবিসিদের মূলধন ও আর্থিক

(4) 'The Between — War World' — by J. Hampden Jackson Pages 285-89

বৈচিত্র্যময় ভারতে জাতি ধর্ম আচার ব্যবহারে এক অপূর্ব সমন্বয়—

তবুও পৃথক নিজ বৈশিষ্ট্যে।

বিচিত্র মণিপুরী তাঁত শিল্পের সমাবেশ।
পূজার আনন্দময় দিনগুলির পূজার বাজার করুন—

১০% বাদ

২রা অক্টোবর পর্যন্ত শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিন সমেত সকাল ১০টা থেকে রাত ৮-৩০টা খোলা থাকবে।

মণিপুর সেলস এম্পোরিয়াম

১৫।এল, লিণ্ডসে স্ট্রীট কলিকাতা—১৬ (ঘণ্টা ঘরের পাশে)
ফোন —২৪-৪৪৫৯

শক্তি ছাড়া যুদ্ধ চলিতে পারে না। সুতরাং তাহারা জেনারেল আরাকিকে সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৯৩৪ সালে তিনি মন্ত্রি-সভা হইতে অপসারিত হইলেন এবং ১৯৩৫ সালে তার পন্থানুসারীগণকে সৈন্যবাহিনী হইতে নির্মূলে (purged) করা হইল। এর প্রতিশোধ লওয়ার জন্য ১৯৩৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী তরুণ সামরিক অফিসারেরা বিদ্রোহ করিল এবং ৪ জন মন্ত্রীকে হত্যা করিল। প্রধানমন্ত্রী ওকাদা কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়া রহিলেন এবং শোকার্ত শবযাত্রীর ছদ্মবেশে 'নিজের শবযাত্রায়' দেখা দিলেন। অর্থাৎ তাঁকে ভুল করিয়া তাঁর শ্যালককে হত্যা করা হইয়াছিল। (৫)

এভাবে জঙ্গীবাদী এবং পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে দলগত বিরোধ সত্ত্বেও পুরাপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিকবাদের নীতি আঁকড়াইয়া ধরিল এবং জাপানে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মৃত্যু ঘটিল।

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উগ্র-জাতীয়তায় জাপান নেশাচ্ছন্ন হইল এবং ইতিমধ্যেই যে মার্কসীয় চিন্তাধারা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হইল এবং নিষ্ঠুর দমন নীতি শুরু হইল। সোসিয়েলিস্টপন্থীরা দুই ভাগ হইয়া গেল। এক পক্ষ জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের নামে আমিকে সমর্থন করিল এবং অপর পক্ষ আন্তর্জাতিকতার আদর্শকেই অনুসরণ করিতে চাহিল। কিন্তু বামপন্থী মতবাদ ও মার্কসীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট যে হিংস্র আক্রমণ শুরু করিলেন, তার প্রথম শিকার হইল একজন তরুণ বামপন্থী লেখক—কোবাইয়াসি তাকিজি, একে পুলিশের হেপাজতে মারিয়া ফেলা হইল। শুরু হইল সমস্ত শিক্ষালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বামপন্থী মতবাদের পুঁথিপত্র ও শিক্ষক বিতাড়ন। ১৯৩৩ এবং ১৯৩৭ সালের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ও অধ্যাপককেই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িতে বাধ্য করা হইল। কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ, জাপানের সমগ্র শিক্ষাজগতে যাঁর প্রচুর প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইল। অধ্যাপক মিনোবে (Prof.: Minobe) নামে একজন সুবিখ্যাত মনীষী, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য যাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং যিনি হাউজ অব্ পীয়ার্স-এর সদস্য ছিলেন, তাঁর উপর পর্যন্ত নির্যাতন অনুষ্ঠিত হইল। তাঁকে শিক্ষা জগত ও জনগণের জীবন থেকে বিতাড়িত করা হইল। অবশ্য তাঁর ভাগ্য ভালো যে, তাঁকে জেলে দেওয়া হইল না, বা তাঁকে খুন করা হইল না, কিন্তু দৈহিক আক্রমণ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অথচ তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং জাপানের সম্রাটের মন্তব্য কিন্তু উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—

মিনোবে সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইতেছে। কিন্তু তাঁর আনুগত্য নাই, এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না। আজিকার জাপানে মিনোবের মত প্রতিভাধর ব্যক্তি কয়জন আছেন? কিন্তু এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঠেলিয়া দেওয়া নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়।'

এমনকি এই ঘটনার দুই বছর পর জাপানের সম্রাট সম্পর্কে পর্যন্ত টোকিওর উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। কারণ, 'বিজ্ঞান বিষয়ক পড়া-শুনায় তিনি অত্যধিক সময় ব্যয় করিতেন।

আধুনিক জাপানের জনৈক লেখক জানাইতেছেন যে, এভাবে জাপানকে চারিদিক থেকে 'কুরাই তানিমা' বা 'অন্ধকার উপত্যকার' গভীর কালো ছায়া ঘিরিয়া ধরিতে লাগিল।*

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল এবং আমেরিকার সহিত সংঘর্ষ বাধিল।

জাপ-মার্কিন সংঘর্ষ

আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সংঘাত যে অনিবার্য ছিল এই ঐতিহাসিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন সোভিয়েট বিপ্লবগুরু স্বয়ং লেনিন। সেই বিংশ শতকের গোড়াতেই এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থার দিকে তাকাইয়া তিনি ১৯২০ সালে লিখিয়াছিলেন—

> "....a most stubborn struggle has been going on for many decades between Japan and America over the Pacific ocean and the mastery of its shores, and the entire diplomatic, economic and trade history of the Pacific ocean and its shores is full of quite definite indications that the struggle is developing and making war between America and Japan inevitable" (6)

অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসমুদ্র এবং এর তীরবর্তী দেশগুলির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা লইয়া জাপান ও আমেরিকার মধ্যে গত কয়েক দশক ধরিয়া যে ভয়ানক রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে, এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও তার উপকূলভাগের সমগ্র কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের মধ্যে যে সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই তীব্র দ্বন্দ্ব জাপান ও আমেরিকার মধ্যে 'যুদ্ধকে অনিবার্য' করিয়া তুলিতেছে।...

এই 'অনিবার্য যুদ্ধ'ই ঘনাইয়া আসিতেছিল প্রশান্ত মহাসাগরে, যার ঐতিহাসিক রূপ লেনিনের চোখে ধরা পড়িয়াছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই। সাম্রাজ্যবাদের এটাই স্বাভাবিক পরিণতি এবং এই পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন বৃটেনের সুবিখ্যাত সমর-ঐতিহাসিক মেজর-জেনারেল জে এফ সি ফুলার। তিনি লিখিয়াছেন যে, পশ্চিমে যেমন জার্মানী, পূর্বদিকে তেমনই জাপানেরও যুদ্ধযাত্রার মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। জাপানের দ্রুত শ্রমশিল্পায়ন ঘটিল বটে, কিন্তু জার্মানীর মত তারও কাঁচামালের মূল উৎস ছিল না। ফলে, বিদেশের দিকে যাত্রা করিতে হইল এবং সাম্রাজ্যবাদের পথ ধরিতে হইল। ১৮৭৫ ও ১৮৭৯ সালের মধ্যে জাপান, কিউরাইল, বোনিন ও বিডকিউ দ্বীপ দখল করিল এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভলক্যানো দ্বীপপুঞ্জ। তারপর ১৮৯৪-১৮৯৫ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জাপান ফরমোজা পেসকাডোরস্ ও পোর্ট আর্থার বন্দর আদায় করিয়া লইল। কিন্তু রাশিয়া, জার্মানী ও ফ্রান্সের চাপে পড়িয়া পোর্ট আর্থার ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া জাপান আবার পোর্ট আর্থার ফিরিয়া পাইল। শাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ দখল করিয়া এবং কোরিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯১০ সালে কোরিয়া জাপানের পুরাপুরি অধিকারে গেল এবং ১৯১৯ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের একমাত্র গুয়াম ছাড়া ম্যারিয়ানা, ক্যারোলিন ও মার্শাল দ্বীপগুলি ইজারা বা ম্যাণ্ডেটস্বরূপ লাভ করিল। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান পিকিংয়ের কাছে মার্কোপোলো ব্রীজ পার হইয়া চীন আক্রমণ করিল। জার্মানীর মত সেও এক নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (নিউ ইকোনোমিক অর্ডার) গড়িয়া তুলিতে চাহিল এবং এই ব্যবস্থাকেই সে 'দি গ্রেট এশিয়া কো-প্রসপারিটি স্ফীয়ার' নামে অভিহিত করিল। এর উদ্দেশ্য ছিল মাকুও থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি দ্বীপ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই বিশাল এলাকায় এমন একটি অর্থনৈতিক সৌরমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করা—যার মর্মকেন্দ্রে থাকিবে জাপানের নবাদিত সূর্য। (৭)

আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জাপানী মন্ত্রিসভার উপর সশস্ত্রবাহিনীর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু চার্চিল তাঁর ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন যে, আর্মির তুলনায় নেভী কম উগ্র ছিল। কারণ, ঊনবিংশ শতকে জাপানের সৈন্যবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল জার্মানীর প্রশিক্ষণের ফলে, আর নেভী বা নৌবাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছিল বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ ছিল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী আবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

(৫) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০০।

* A History of Modern Japan-Richard Storry London, Pelican, 1963. P. 194-96.

(6) The Anti-Hitler Coalition —Israeljan, Moscow, 1971, P. 82

(7) The Second World War — Fuller London, 1968, P. 127

উভয় বাহিনীর সৈনিক জীবনের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। আর্মির অফিসারেরা কদাচিৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পাইতেন একমাত্র যুদ্ধ ও আক্রমণের উপলক্ষ ছাড়া। ফলে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংকীর্ণ ও জাতীয়তার উগ্রতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু নেভী বা নৌবহরের লোকদের সচরাচর বিদেশের বন্দরে ও নৌঘাঁটিতে যাতায়াত করিতে হইত এবং বৃটিশ বা মার্কিন নৌবহরের তুলনায় তাঁদের শক্তি যে কম, এই চেতনাও তাঁদের ছিল। এজন্য আর্মির তুলনায় নেভী অনেক বেশী সাবধানী ও মধ্যপন্থী ছিল। (৮)

১৯৪০ সালে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফরাসী, ওলন্দাজ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ উপনিবেশগুলিকে ছিনাইয়া লওয়ার জন্য জাপান লোভাতুর হইয়া উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের এই বিপজ্জনক কিনারা থেকে জাপানকে সরাইয়া নেওয়ার জন্য তখনও জাপানী সমাজে কিছু স্থির-বুদ্ধি ও সংযত স্বভাবের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জাপানী রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রিন্স কনোয়ে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৪০ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৪১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি প্রধানমন্ত্রীর গদীতে আসীন ছিলেন। চার্চিল লিখিয়াছেন যে, জাপানী সমাজে তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ও বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে পরিচিত ছিলেন। বৃটিশ ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার আগ্রহ থেকে তিনি জাপানী আর্মির রাশ টানিয়া ধরিলেন। সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের রাজপুত্রগণ এবং উচ্চতম অভিজাতগণও এই প্রকার আগ্রাসী যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর্মিকে ঠেকাইয়া রাখিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিতে তাঁরাও প্রস্তুত ছিলেন না।

* * *

১৯৪১, জুলাই মাসে জাপানী সৈন্যরা দক্ষিণ ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া নিল। ফলে, জাপানের দিক থেকে শ্যাম, মালয় এবং পূর্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের বিপদ দেখা দিল। প্রিন্স কোনোয়ে ইন্দোচীনের এই ঘাঁটি দখলে রাজী হইয়াছিলেন এজন্য যে, তাঁর মনে হইয়াছিল এটাই সবচেয়ে মন্দের ভালো। কারণ, তখন জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণের ফলে জাপানী সামরিক মহলে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছিল। মাৎসুয়োকোর মত কোন কোন উগ্রতাবাদী রাজনীতিক 'মিত্র জার্মানীর' সহিত একত্র হইয়া অবিলম্বেই সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিতে চাহিলেন। কেউ কেউ আবার হংকং এবং মালয় দখল করিয়া নেওয়ার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থার জন্যে প্রিন্স কোনোয়ে অনুভব করিলেন যে, বোধহয় সায়গনের দিকে যাওয়াই সব-চেয়ে কম বিপজ্জনক হইবে। কিন্তু মার্কিন, বৃটিশ, ওলন্দাজ একত্রে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক স্যাংশন জারী করিবে, এতটার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। (৯)

জাপানী সেনাবাহিনী এবং সমরসচিব জেনারেল তোজো ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সুযোগ লওয়ার জন্য ক্রমেই যেন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকা বৈষয়িক সম্পদে ধনীর দেশ হইতে পারে, কিন্তু জাপানীদের মত তাঁরা যুদ্ধনিপুণ নন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের একান্ত বিরোধী ছিলেন। এই সময় কোনোয়ে চাহিলেন, প্রেসিডেন্ট রুজ-ভেল্টের সঙ্গে সরকারী সাক্ষাৎ-আলোচনার দ্বারা জাপানী-মার্কিন বিরোধ মিটাইয়া ফেলা যায় কিনা, তেমন চেষ্টা করিয়া ফেলার জন্য। জাপানী প্রধানমন্ত্রী এজন্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অথবা আলাস্কাতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু এর পিছনে জাপানী সমর বিভাগের কোন চাতুর্যপূর্ণ ফাঁদ থাকিতে পারে, কিম্বা আমেরিকাও জাপান সম্পর্কে মিউনিকের তোষণনীতি অনুসরণ করিতে চলিয়াছে, এমন অপবাদ বিরোধী পক্ষ রটনা করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় কোনোয়ে-রুজভেল্ট বৈঠকে ওয়াশিংটন আর রাজী হইল না। (১০)

এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাটের উপস্থিতিতে যে ইম্পিরিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইল, তাতে ক্যাবিনেট মন্ত্রিগণ, সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষবৃন্দ এবং শীর্ষস্থানীয় অফিসারবৃন্দ যোগ দিলেন। এই বৈঠকে স্থির হইল যে, আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যে আলোচনা চলিতেছে, যদি সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝির মধ্যে তা সার্থক না হয়, তবে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জাপানকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে যদি এই সময় নৌ-দপ্তরের মন্ত্রী এবং নৌ-সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ সাহসপূর্বক সমর-সচিব জেনারেল তোজোকে বাধা দিতেন, তবে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ও জাপানের সম্রাট একত্রে চাপ দিয়া হয়তো আমেরিকার সঙ্গে একটা আপোষরফা ঘটাইয়া যুদ্ধ এড়াইতে পারিতেন। কিন্তু নৌ-দপ্তর প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরোধিতা করিতে সাহস পাইলেন না।

অক্টোবরের (১৯৪১) মাঝামাঝি আসিয়া গেল। প্রিন্স কোনোয়ে কিন্তু ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাইয়া যাইতেই চাহিলেন। কিন্তু টোকিওতে যুদ্ধের উন্মাদনা বাড়িয়াই গেল। ক্রমেই সংকট গাঢ় হইতে লাগিল। তখন প্রিন্স কোনোয়ে প্রধান-মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জেনারেল তোজো একাই জাপানের প্রধান-মন্ত্রী, সমরমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রিসভার এই গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তনের আগে জেনারেল তোজোর সঙ্গে এই বুঝাপড়া হইল যে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে কথাবার্তার শেষ চূড়ান্ত তারিখ কয়েক সপ্তাহ আগাইয়া দেওয়া হইবে। (১১)

জেনারেল তোজো নিজে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদও কেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধের বদলে শান্তির সিদ্ধান্ত হইলে পাছে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দেয়, সেজন্যই এই সতর্কতা! (১২)

(8) The Second World War — Churchill Vol. 3, P 517.

(9) A History of Modern Japan—P. 210.

(10) A History of Modern Japan — Richard Storry P. 212.

(১১) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক — পৃষ্ঠা ২১২-১৩

(১২) চার্চিল, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২৫।

প্রকাশিত হল দুই বাংলার
একমাত্র ছোটগল্পের মুখপত্র
শারদীয় বাংলা ছোটগল্প
লিখেছেন : মহাশ্বেতা দেবী, দিলীপ সেন, অমিত গুপ্ত, অজিত রায়চৌধুরী, তৃপ্তি বসু, বিপুল সেনগুপ্ত, শান্তি লাহিড়ী, জহর সেনগুপ্ত, সুবোধ বসু সত্যেন আচার্য সামসুল হক স্বদেশরঞ্জন দত্ত প্রমুখ।
॥ সর্বত্র এজেন্সী চাই ॥ মূল্য : এক টাকা
প্রাপ্তিস্থান : বইঘর : ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২
কার্যালয় : ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০

পুনশ্চ

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে অপরিচয়ে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ 'পুনশ্চ'র মধ্যে আমরা প্রকাশ করি। শরৎ-সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে এবং তাঁর সংগে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্র ধরে, শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশা থেকে মৃত্যুর পর আধুনিককাল পর্যন্ত, বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও প্রাজ্ঞজন এত নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচনা করেছেন যে তার ইয়ত্তা নেই। এই লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বর্গত নৃপেনচন্দ্র পাল লেখেন 'শরৎ-সাহিত্য কামগন্ধহীন', ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'শরৎ-প্রতিভা', ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব', ডঃ ক্ষেত্রগোপাল দাস ঘোষ 'বিস্ময়ী শরৎচন্দ্র', হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'শরৎ-সাহিত্য', অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র', ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'রসস্রষ্টা শরৎচন্দ্র', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্র', বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শরৎ-সাহিত্যের পরিচয়', ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় 'শরৎচন্দ্রের গদ্যরীতি', সজনীকান্ত দাস 'কুয়োপলব্ধি-শরৎচন্দ্রকে' এবং অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল লেখেন 'শরৎচন্দ্রের লিখন-ভঙ্গী'।

এতদ্‌ব্যতীত আরও শতাধিক সাহিত্য-সেবী যথা, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, মতিলাল দাস, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হেমন্তকুমার সরকার, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দীনেশরঞ্জন দাশ,—শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনের নানা দিক ব্যাখ্যাত করে এমন সব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন, যার সমন্বয়ে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর মতই কয়েক খণ্ডের বিরাট সাহিত্য-সংকলন সৃষ্টি হতে পারে, এবং এগুলি সাধারণ্যে প্রচারিত হলে শরৎ-সাহিত্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সকলে সম্যক অবহিত হতে পারবেন।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের তথ্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও রঙহীন চিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৩।১, বৃন্দাবন বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে ভি.পি.তে পাঠান হয়।

১৩৮৩ সালে শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই ধরনের সংকলনগ্রন্থ প্রকাশেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

এখানে আমরা শরৎচন্দ্রের সাম্প্রতিক জন্মদিন-উপলক্ষে 'কল্লোল'-এর সম্পাদক ও লেখক দীনেশরঞ্জন দাশের একটি রচনা ১৩৪৪ সালের 'বাতায়ন' পত্রিকার শরৎ-স্মৃতিসংখ্যা থেকে এখানে উদ্ধৃতি করে দিলাম।

কিছুকাল আগে ফরাসী মনীষী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রম্যাঁ রলাঁ একখানি চিঠিতে লেখেন যে, আমরা যদি শরৎচন্দ্রের ভাল ভাল লেখাগুলিকে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করে ছাপাই তাহলে ফরাসী ও বাংলার চিন্তাধারার একটা আত্মীয়তা ঘটবার সম্ভাবনা হয়। এটা আমরা করি না কেন?

চিঠিখানা নিয়ে শরৎদার কাছে পানিত্রাসের বাড়িতে যাই। খোসগল্প ও আদর-আপ্যায়নের পর আমি কথাটা তুলি। ঐ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বিষয়ান্তরে গিয়ে পড়ি। প্রশ্ন আমি করি, উত্তর দেন শরৎদা। আজ আর তাঁর ভাষায় তা লিপিবদ্ধ করতে পারব না। তাই আমার ভাষাতেই তাঁর মুখের কথা-গুলি যতদূর স্মরণ আছে বলি।

মহাত্মা রলাঁর প্রস্তাব শুনেই বলে উঠলেন : দেখ হে, ওদের কাছে আমাদের যা শেখবার আছে সেগুলোর অন্ততঃ অনুকরণও করি না। এত ভাল ভাল জিনিস আর এত উদারতা ওরা পেল কোথায়? কোথায় কে বাংলার এক প্রান্তে দেশের লোকের নিন্দার ভারে জর্জরিত, ওদের দেশের একটি সামান্য লেখকের তুল্যও নয় যে শরৎচন্দ্র, তার লেখা নিয়ে নাকি এতবড় একটা লোকের মাথা ঘামুচ্ছে! কি? না লেখার ভিতর দিয়ে অন্তরের পরিচয় হবে. ভাবো দেখি কত বড় সাহিত্যিকের কথা!

আমি বলি—তাহলে তাঁকে লিখবো নাকি? উত্তরে শরৎদা বলেন, লিখে দাও যে শরৎবাবু ইচ্ছে করেন না যে তাঁর বাংলা লেখা কোনও বাঙালীকে দিয়ে ফরাসীতে অনূদিত হয়। কারণ ওতে ঠিক রসটি যথাযোগ্য থাকবে না। কোনও ভাষারই অপর ভাষায় অনুবাদ হলে তা থাকে না। এতবড় শক্তিমান লেখক রবীন্দ্রনাথ, এক তাঁর নিজের করা কোন অনুবাদ ছাড়া, অন্যকারো হাতে করা কোন অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের বাংলার রসটি কি বজায় রাখতে পেরেছে? কত দুঃখেই না জানি শেষকালে রবীন্দ্রনাথ—আর জেনো একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বলেই তা পেরেছেন—ইংরেজী শিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। বল ত 'ও আমার আমের মঞ্জরী' এটি কোন ভাষায় এমন করে বলা যায়? এ যেন একেবারে আম্র-মুকুলের তরতাজা গন্ধ নিয়ে রূপ নিয়ে আমাদের কাছে হাওয়ার দোলায় দোল খাচ্ছে।

বলেই থেমে রইলেন। মুখ চলছিল, সট্‌কার নল মুখে। হঠাৎ নল ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন—

আচ্ছা বল ত, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ভাষার লেখার অন্তরালে কতখানি ছবি যে অলিখিত থাকে, তা কি এক দেশের লোক অপর দেশের লোককে মাথা খুঁড়লেও বুঝিয়ে বলতে পারে? ভাব তো, আমি লিখলাম—খালধারের শোভার মধ্যে কটি অত্যুচ্চ নারিকেল বৃক্ষ। এটুকু লিখেই আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু বাংলার পাঠক সেখানেই ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবেন। তার মনে এই নারিকেল গাছ কটিকে ঘিরে বাংলার খালধারের একখানি মনোজ্ঞ ছবি ফুটে উঠেছে। তার মনে পড়েছে খালধারের সংকীর্ণ একটি ঘাটের কথা। সেখানে কোন তরুণী এসেছে ঘট পূর্ণ করতে। তার ছায়া পড়েছে জলের উপর। মনে হয় কোন লীলা-রসময় না জানি জলের তলে লুকিয়ে থেকে ঐ তরুণীকে নিয়ে কেলি করছেন। চারিদিকে হোগলা, কচু, আস-শেওড়ার বন। ধারে ধারে বড় বড় শর কোমর-জলে দাঁড়িয়ে আছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাদা বকগুলি এক ঠ্যাং উঁচু করে কবে মাছের দিকে তাগ করে আছে। খান-কয়েক নৌকা বাঁধা একটু দূরে। নৌকার ছই থেকে মাঝীদের রঙিন কাপড় রৌদ্রে শুকোচ্ছে। তখনও তোলা হয়নি। পাতি-হাঁসগুলো ঝাঁক বেঁধে অরূপ-রতনের আশায় যেন ক্ষণে ক্ষণে মাটির তলায় মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বস্তায় বস্তায় শস্য, টিনে টিনে তেল, ঝুড়িতে ঝুড়িতে পান গুড় লঙ্কা আরও কত কি, খালের ঘাটের খোলা মাঠে পড়ে আছে। একান্ত বাংলার সম্পদ অপরূপ এক নীলাভ আকাশের বুকের কাছে ঝাঁকড়া-চুলের মাথা নেড়ে নারকেল গাছগুলো কাকে কি সংকেত করছে কে জানে! আরও কতকি পাঠক এক মুহূর্তে এঁকে ফেলে—আমরা তা জানি না।

আমি বললাম, তাহলে কি আপনার মত যে কোন ভাষার লেখা অপর ভাষায় অনুবাদ করা উচিত নয়?

শরৎদা বলে উঠলেন, এই দ্যাখ। গোটা কয় কথা তোমাকে গুছিয়ে বলতে পারি নি বলে, তুমি আমার অন্তরের ভাবটি ধরতে পারলে না। আরে, যত যত ভাষায় অনুবাদ হয় ততই ভালো। কিন্তু শুধু অনুবাদ নয়। I met a lame dog -এর মত নয়। যিনি চিন্তাশীল, উভয় ভাষাতেই পারদর্শী, লেখার উপর যার ভালবাসা আছে, এমন লোক যদি নিরপেক্ষ হয়ে নিজের কল্পনা ও পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে, ভাষা ও ভাব এই দুই জিনিস নিয়ে অনু-বাদ করতে চেষ্টা করেন, তাহলে অনুবাদ করার সার্থকতা আছে—একশোবার আছে। তা নয়, তোমরা পিঠের ইংরেজী 'কেক্' লিখবে, তাতে কি রসপুলির রস থাকে?

জিজ্ঞাসা করি, তাহলে এ রকম বন্দোবস্ত না হলে আপনার লেখা অনুবাদ হব আপনি পছন্দ করেন না?

ভদ্রলোক যেন একটু বিপদে পড়লেন। কোথাও আট্‌কালেই সট্‌কা ধরেন এ আমরা অনেকবার দেখেছি। এখনও সট্‌কা নিয়ে দু'বার টান্ দিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে মাথা নীচু করে বলতে লাগলেন—

দ্যাখ দীনেশ, আমি কোন বইয়েতে ঠিক কি লিখেছি তা আমার মনে নেই। লিখেছি প্রাণের তাড়ায়, লেখার তাড়ায়ও নয় পেটের তাড়ায়ও নয়। লিখেছি এই ভেবে যে আমার দেশের লোক লেখাগুলো পড়ুক, তারা দেখুক এমন জিনিসও রয়েছে আমার দেশে, আমার সমাজে, আমাদের পরিবারে। তারপর যা ভাল বিবেচনা হয় তারা করুক। পথও দেখাই নি, উপদেশ দিতেও চেষ্টা করিনি। প্রাণ দিয়ে যা অনুভব করেছি, ধ্যান দিয়ে তার বিচার করে নিয়েছি। লিখতে দেরি হওয়ার আমার সেও একটা কারণ। নিজেকে নিজের কাছে আমি বড় একটা আমল দিই না। তার কারণ আমি জানি আমি প্রবর্তক নই, অবতার বা পন্ডিত নই, কেউ নই। কপাল জোরে কেউ কেউ আমার লেখা পড়ে, এইতেই আমার গৌরব অথবা প্রতিষ্ঠা যাই বল। আমার নিজের মধ্যে সে কারণ লজ্জাও যথেষ্ট আছে।"

—রূপদর্শক

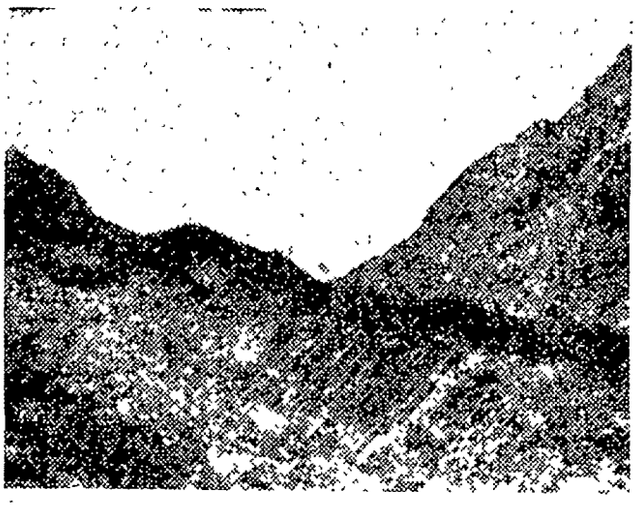

আজ রাত্রে আমরা এপার বাংলার কয়েকটি মেয়ে, তাঁবুর মধ্যে আস্তানা গেড়েছি। ১৬,৫০০ ফুট উঁচুতে হিমালয়ের তুষার রাজ্যে পাখির ডাক শোনা যায় না। বরং ক্ষণে ক্ষণেই শুনতে পাচ্ছি আসে পাশে, দূরে বরফ ধ্বসে পড়ার বুক কাঁপানো গুরু গুরু, ঝুপ ঝাপ শব্দ। এছাড়া প্রায় সারারাতই ফট ফটা ফট শব্দে বরফের ফাটল খুলছে কাছেই কোথাও। মনে হয় যেন সবশুদ্ধ তলিয়ে যাব নিচে, নয়ত বরফের ধস ভেঙ্গে পড়বে মাথার ওপর। নিদ্রাদেবী আমার চোখের পাতায় তাঁর আসন বসাননি। রাত কত হোল বোঝা দুষ্কর। এই বরফ সমুদ্রে চাঁদের আলো পড়ে এমন এক মায়াময় আলো আঁধারের সৃষ্টি করেছে যে, তাতে সারারাতই মনে হয় এই বুঝি ভোর হয়ে এল। একমাত্র ঘড়ি ছাড়া সময় নিরূপণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর আমাদের শোবার থলির (পর্বতারোহণের ভাষায় স্লিপিং ব্যাগ) মধ্য থেকে সেই ঘড়ি দেখা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। অগত্যা ভোরের আশায় প্রহর গুনছি।

আজ ২৭শে অকটোবর ১৯৬৭ সাল। রাত প্রায় ৯টার সময় অতিকষ্টে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর নিজের শরীরটাকে ঢুকিয়েছি। আরও নিচে আছে আমাদের হাওয়া ভরা তোষক। দুজনের মত ছোট্ট একটি তাঁবু—তারই ভেতর আমাদের যাবতীয় জিনিস। আমার সঙ্গী সারা-দিনের ক্লান্তি মেটাতে ঘুমের আশ্রয়

নিয়েছে। কিন্তু ঘুম আসছিলো না আমার কিছুতেই। মন খুবই অশান্ত। কঠিন পরী-ক্ষার মুখোমুখি হয়েছি আমরা.....।

অভিযানের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে জয় পরা-জয়ের আশা নিরাশার দোলায় দুলছি। বাইরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত চলছে—তাঁবুর ওপর পরতে পরতে জমছে বরফ। তুষার ঝঞ্ঝায় তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে যাবার অবস্থা। তাপমাত্রা নেমে গেছে শূন্য ডিগ্রীরও অনেক নিচে। মনে হচ্ছে, এই কটি বাঙ্গালী মেয়ের দুঃ-সাহস দেখে হিমালয়ের দেবতা যেন ক্রোধে ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। পাহাড় সব সহ্য করে কিন্তু ঔদ্ধত্যকে সে কখনো ক্ষমা করে না। রুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা কি সত্যিই জয়ী হবো? না পরাজয়ের গ্লানি বয়ে ফিরতে হবে?

আজ দিনটা খুব ভাল যায়নি। ভাল ছিল না গতকাল ও তার আগের দিনও। এই দু নম্বর ক্যাম্পে ২৪শে অকটোবর আমরা সকলে জড় হয়েছি। তারপর দুদিন পর্যায়ক্রমে শের-পারা ও অভিযাত্রিনীরা আরও ওপরে গিয়ে আমাদের তৃতীয় শিবিরের জায়গা পর্যবেক্ষণ করে এসেছে। এবং শিখরে চড়বার রাস্তাও খানিকটা দেখে এসেছে। এই অভিযানে এক-দিকে যেমন আমাদের নানারকম প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে—দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, কঠিন চড়াই উৎরাই অতি-ক্রম করতে হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সর্বদাই আমাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে সময়ের সঙ্গে। কারণ অক্টোবরের মধ্যে শিখর জয় করতে না পারলে আমরা নেমে যেতে বাধ্য হব। সেজন্য স্থির করা হয়েছে ২৮ বা ২৯ তারিখে আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে শিখরা-ভিযান চালানো হবে। তাতে যদি সফল হই ভালো না হয় বুঝতে হবে আমাদের দুর্ভাগ্য। এ যাত্রায় পরাজয়ের বেদনা নিয়েই আমাদের নেমে যেতে হবে। এ অবস্থায় আমারই নির্দেশে আজ সকালে স্বপ্না মিত্র, সুদীপ্তা সেনগুপ্তা, শীলা ঘোষ ও লক্ষ্মী পাল তিন নম্বর ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল—সঙ্গে রইল শেরপারা। শেরপাদের মধ্যে চারজন শুধু ওদের সঙ্গে থাকবে, বাকীরা মাল নামিয়ে ফিরে আসবে আমাদের শিবিরে। অনেক উৎসাহে, অভিনন্দন (আর কিছুটা উপদেশও) দিয়ে ওদের বওনা করিয়ে দিয়ে সুজয়াদি, আমি, ইন্দিরা আর স্বপ্না নন্দী ওদের পথের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। ওরা সামনের বরফে ঢাকা চড়াইটা ধরে উঠতে লাগল। আমরা নিচে থেকে দেখছি হাঁটু পর্যন্ত বরফে ডুবিয়ে ওরা প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করছে। কোথাও কোথাও বরফ কোমর পর্যন্ত—সে সব জায়গায় পায়ের বা হাতের ওপর ভর দিয়ে বাকী শরীরটাকে টেনে তোলা যে কী কষ্টকর তা আমি নিচে দাঁড়িয়ে থেকেও

উপলব্ধি করতে পারছিলাম। সাদা বরফের দেয়ালে ওদের কতগুলো কালো কালো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। ওরা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে—চড়াইটা প্রায় শেষ হয়ে এল। কি প্রচণ্ড পরিশ্রমে ওরা একটার পর একটা পা তুলছে এই চড়াইটা পার হয়ে যাবার জন্য। ওরা প্রায় দেয়ালটার মাথার ওপর উঠে গিয়েছে। এবার একে একে ওদের অদৃশ্য হয়ে যাবার পালা। আমার মনের মধ্যে তখন অশান্ত ঘূর্ণি। আমি দলনেত্রী—আমারই নির্দেশে আজ ওরা সমস্ত বিপদ বাধা তুচ্ছ করে এগিয়ে গেল শিখর জয়ের দিকে। কয়েক ঘন্টা পরে যে কী হবে তা ওরাও জানে না। জানিনা আমিও। জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে ছাপিয়ে আমার মনে তখন সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা উঁকি মারছে। ওরা কি সত্যিই জয় করতে পারবে! ওদের মধ্যে কেউ যদি প্রকৃতির শিকার হয়? আমার এই বন্ধুদের মধ্যে যদি কাউকে এই পাহাড়েই রেখে যেতে হয়? সমস্ত বাংলা-ভূমি যাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছে আমি কি তাদের সবাইকে সুস্থ দেহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না?

বাইনোকুলারে চোখ রেখে আমি তাকিয়ে আছি ওদের দিকে। বহুদূরে সেই বরফ সমুদ্রে একটা কালো বিন্দুকে যেন খানিকটা নিচে নেমে যেতে দেখলাম, আর ঠিক প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে যে কথাটা আমার কানে এলো সেটা ওদের আর্ত চীৎকার—'দীপালি শীলা পড়ে গেছে।' আচমকা সংবিৎ ফিরে পেলাম। আমাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে গেলো। এখনি ওপরে যাব কিনা ভাবছি। ওদিকে বরফের দেয়ালে কালো বিন্দুগুলোর নড়াচড়াও বেড়ে গেল। আমাদের ডাক্তার তাঁর পূর্ব অভিযানের অভিজ্ঞতায় পাকা। তিনি বললেন হয়তো বিশেষ কিছু হয়নি—শুধুই পড়ে গেছে। বুঝতে পারলাম না এটা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কিনা। একজন শেরপাকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম প্রয়োজনে শীলাকে নামিয়ে আনার জন্য। আর কিছুটা ইঙ্গিতে কিছুটা চীৎকারে ওদের নির্দেশ দিলাম শীলাকে একজন শেরপার সঙ্গে বসিয়ে রেখে অন্যদের এগিয়ে যেতে। অনেক চেষ্টার পর শীলা একজন শেরপার সাহায্যে নিজের পায়ে হেঁটেই নেমে এল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওর হাত পা অবশ হয়ে গেছে—দেহে কোন সাড় নেই। গরম কফি তৈরী রাখাই ছিল। আমার তাঁবুতে ওকে শুইয়ে দিয়ে মোজা, দস্তানা সব বদলে দিলাম। একটু সুস্থ হয়ে ও ঘুমিয়ে পড়লো।

শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি যে শেষ পরীক্ষার প্রাককালেই আমাদের একজন অসুস্থ হয়ে ফিরে এল—অন্য তিনজন যে এখন কী অবস্থায় আছে জানি না। মনটা উৎকণ্ঠায় ভরে রয়েছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে পড়ছে এই অভিযানের গোড়ার কথা। কি করে এই অভিযান সম্ভব হল—এর প্রস্তুতি পর্বের কথা।

১৯৬২তে কলেজে ঢুকেই এন সি সিতে যোগ দিয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই আমার এসব দিকে একটু বেশী ঝোঁক ছিল। কয়েকটা ক্যাম্প করবার পর ১৯৬৪তে ডাক এল মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিংয়ের জন্য দার্জিলিংয়ে যাবার। প্রকৃত পর্বতারোহণ যে কী সে সম্বন্ধে তখনও কোন ধারণাই ছিল না। ছবি ছাড়া তার আগে কোন পাহাড়ও দেখিনি। ১৯৬২ তে এন সি সি ক্যাম্প করতে গিয়েছিলাম শিলিগুড়ি। সেখান থেকে আমাদের নিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ী শহর দার্জিলিং বেড়াতে। সেই আমার প্রথম পাহাড়ের সঙ্গে পরিচয়। কোলকাতায় বা আশেপাশে ইচ্ছে করলেই পাহাড় দেখার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং পাহাড়ের প্রতি আগ্রহ থাকলেও সেটা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। আবার দার্জিলিংয়ের নামে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। যাবার নামে আমি একপায়ে খাড়া হয়ে গেলাম। এন সি সির মনোনয়নে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি—তবে সামনেই পারট ওয়ান পরীক্ষা—তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ রাজী নন এ সময় ছাড়তে। আর বাড়ীর লোকের তো কথাই নেই। এঁদের সামলে, বহুকষ্টে অনুমতি যোগাড় করে যখন রওনা হলাম তখন মনে হল পর্বতারোহণ ব্যাপারটা বোধহয় এর চেয়ে বেশী কষ্টের হবে না।

পৌঁছলাম আমার স্বপ্নের দার্জিলিংয়ে। স্বপ্নের চাইতেও সুন্দর বাস্তবের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। চমৎকার ব্যবস্থা থাকবার, খাবার এবং পাহাড় সম্বন্ধে জ্ঞানবার, পাহাড়ে যাবার আগেই আমার ভালো লেগে গেল এই ইনস্টিটিউটকেই। ৪২ দিনের এই বেসিক ট্রেনিংয়ে পর্বতারোহণ সম্পর্কে যা যা শেখানো যায় তার সবটুকুই ওঁরা আমাদের শিখিয়ে দিলেন। ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং, ষ্টেপ কাটিং, আইস কাটিং, নরম এবং শক্ত বরফের ওপর চলা, দড়ির সাহায্যে ওঠা নামা এবং আরও অনেক কিছু। পাহাড়ের কোলে ঐ অল্পদিন থাকলেও পাহাড়ের সঙ্গে যেন আত্মার যোগসূত্র স্থাপন হয়ে গেল। অশান্ত মন নিয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

সেই থেকেই অশান্ত মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। কোলকাতার এক নামকরা পর্বতারোহী সংস্থাতে নামও লেখালাম। সেখানকার কর্তাদের কাছে দু-একবার কথাও পেড়েছিলাম যে কি করে মেয়েদের একটা অভিযান বার করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি তাঁদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখিনি। কোলকাতা শহরের বিশিষ্ট পর্বতারোহীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন খুব উৎসাহ দিলেন—সাহায্যের আশ্বাসও দিলেন। যাই হোক পড়াশুনো এবং অন্যান্য গোলমালে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল—চমকে উঠে টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়িটা দেখলাম। রাত এখন ১টা বেজে কয়েক মিনিট। পাশের তাঁবুর ভেতর থেকে কে যেন পা দিয়ে তাঁবুর ওপরকার বরফ ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে—তারই শব্দ। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। বাইরে হয়তো আলো আছে—কিন্তু সে আলোর এক কণাও এই তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করছে না। ভোরের আশায় প্রহর গুণছি...মনে পড়ছে কিছু টুকরো টুকরো স্মৃতি। পুরনো দিনের কথা।

আডভান্স কোর্স শেষ করে তো ফিরে আসি একসময় কলকাতায়। মাথায় চাপে রোগ। অনেকদিনের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে ফিরে এসেই উঠে পড়ে লাগলাম। অনেক ঘুরে অনেক খুঁজে জোগাড় করলাম কয়েকটি মেয়ের ঠিকানা যারা বিভিন্ন বছরে এইচ এম আই থেকে ট্রেনিং নিয়েছে। প্রত্যেককে চিঠি দিলাম আমার উদ্দেশ্য জানিয়ে। বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে সাড়া পেলাম। তাদের নিয়ে আমাদের প্রথম মিটিং হলো 'লেকে' (রবীন্দ্র সরোবর)। সেদিনই আমরা প্রথম সবাই সবাইকে দেখলাম। নির্দিষ্ট সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে জমা হয়ে আমরা সবুজ ঘাসের ওপর বসলাম আলাপ-আলোচনার জন্য। মোটামুটি পরিকল্পনা এবং দরকারী কয়েক জায়গায় চিঠিপত্র লেখার কাজ আমি এগিয়ে রেখেছি। অন্য মেয়েরাও তাদের সমস্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এল আমাকে সাহায্য করতে। আমরা পুরোপুরি-ভাবে কাজে নেমে পড়লাম। তখন আমাদের একটা বসার জায়গার ভীষণ দরকার। উৎসাহদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে কাছের লোক আমার বাবা। তাঁকেই ঘিরে ধরল মেয়েরা 'মেসোমশাই আমাদের একটা বসার জায়গা দিতে হবে'। হবে মানে হবেই—পাহাড়ী মেয়েদের বায়না না রাখে সাধ্য কার। তাই বাইরের ঘরটা ছেড়েই দিতে হলো। সেই ঘরেই এক সন্ধেবেলা তাঁরই দেওয়া নাম নিয়ে জন্ম হলো—পথিকৃত মহিলা পর্বতারোহী সংস্থার।

ঘর তো পাওয়া গেল কিন্তু আসল জিনিসের দেখা নেই। টাকা-টাকা করে সারাদিন ঘোরাঘুরি করেও টাকার জোগাড় করতে পারছি না একেবারেই। অনেক দরজা থেকে ফিরে এসেছি—অনেক দরজা পর্যন্ত এগোনই যায়নি বাসভাড়ার অভাবে। এমন দিনও গেছে যখন জরুরী চিঠি ছাড়ার দরকার অথচ ডাকটিকিট কেনার পয়সা নেই। বন্ধু-বান্ধবেরা সেই পয়সা দিয়েছে তবে সে চিঠি পোষ্ট হয়েছে। অথচ অভিযানের ঝামেলার কমতি নেই। শয়ে শয়ে চিঠি টাইপ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতে হবে তার পয়সা চাই—রোজ বেরোতে হবে তার বাসভাড়া চাই—শেরপাদের অগ্রিম বুকিংয়ের টাকা চাই— অথচ হাতে একটিও পয়সা নেই।

এমনকি সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকেও আমাদের হাতে কোন টাকা-কড়ি এসে পৌঁছল না। ইতিমধ্যে আমরা এমন একজন শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম যাঁর নাম বাংলাদেশের অনেক পর্বতারোহী ভুলতে পারবে না। তিনি তাঁর সমস্ত প্রেরণা ও

উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে না এলে আমাদের এই অভিযান হয়তো কোনদিনই সম্ভব হত না। তাঁরই সাহায্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করতে সক্ষম হলাম। এবং তিনি এ আশ্বাও দিলেন যে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে সমস্ত রকম সহযোগিতাই তিনি করবেন। এছাড়া একটি সংবাদ সংস্থা, কয়েকজন ব্যক্তি ও বহু প্রতিষ্ঠান তাঁদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এলেন।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুঁড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ

১০০% খাঁটি হয়

ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

আমরা যখন আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী অনেকখানি এগিয়ে গেছি এবং কাগজে রেডিওতে নানাভাবে আমাদের সম্ভাব্য অভিযানের কথা প্রচারও হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় অতর্কিতে সমন এলো দিল্লীর ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশন (এভারেষ্ট পর্বতারোহণের হর্তা-কর্তা বিধাতা সংস্থা) থেকে। তাঁরা আমাদের অভিযানের প্রস্তাবটিকে নাকচ করে আমাদের আরও উচ্চশিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। এর আগে আমাদের শিক্ষক শ্রীতেনজিং নোরগের মুখেও শুনেছি প্রশ্ন 'তুম বাঙ্গালী লেড়কীলোগ কিঁউ ট্রেনিংমে আতা হ্যায়। তুম তো কভি এক্সপিডিসন নেহি করেগা, বলকি ঘরমে বৈঠকে খানা পাকায় গা—কিঁউ সরকার কা পয়সা বরবাদ করতে হো?' অথচ এভাবে আমাদের প্রয়াসে বাধা দিলে আমরাই বা কি করি!

কিন্তু এবার আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—অভিযান আমরা করবই। তাই সবকাজ ফেলে রেখে আমাকে ছুটতে হোল দিল্লীতে। সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে নানান আলোচনায় বসা গেল। তাঁদের মত ফেরাতে আরও ওপর মহলে দরবার করতে হয়েছিল। কারণ তখন অভিযান বন্ধ করার কোন উপায় ছিল না। জনসাধারণের কাছ থেকে অভিযানের নামে টাকা তোলা হয়েছে—তাঁদের কৈফিয়ৎ দেব কোন মুখে? এইসব ব্যাপার বোঝাতেই দুদিন লেগে গেল—তবু তাঁরা আমাদের পরিকল্পিত নন্দাঘুন্টি (২০৭০০) তে অভিযান চালাতে দিতে রাজী হলেন না। তাঁরা আমাদের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য খুব বেশী রকম আগ্রহ দেখালেন। এই শেষ মুহূর্তে তাঁদেরই নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের বেছে নিতে হোল এই কোন্টি শিখর (১৯৮৯৩); আমরা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিলাম কোন্টিকে। এখানে বলে রাখা ভাল যে উচ্চতায় কম হলেই যে সে শিখর সহজগম্য হবে তার কোন মানে নেই। এরকমও দেখা গেছে অনেক বাঘা বাঘা পর্বতারোহীরা ১৯ হাজার বা ২০ হাজার ফুটের শিখরে উঠতে ঘায়েল হয়ে গেছেন—কোথাও বা সফল হতেই পারেনি। তাই বলছি কোন্টি নন্দাঘুন্টির চেয়ে উচ্চতায় কম হলেও দুর্গমতায় কিছুমাত্র কম নয় তা এই দ্বিতীয় শিবিরে পৌঁছতেই বুঝে গেছি।

সে দিনগুলো এখনও এই অন্ধকারে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আদেশ-নামা নিয়ে যখন কোলকাতায় ফিরলাম তখন আমাদের যাত্রার আর দশ-বারো দিন মাত্র বাকী। এদিকের অন্যান্য সমস্ত কাজ দলের অন্য মেয়েদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি ছুটলাম দার্জিলিং। সেই ছোটাছুটির কথা মনে করে এই শীতে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরেও যেন ঘামছি। দার্জিলিংয়ে এক-গাদা কাজ পড়ে ছিল। অভিযানের শেরপা সংগী নির্বাচন, তাদের অগ্রিম কিছু দাদনের ব্যবস্থা, ট্রেনের বুকিং এবং সর্বোপরি অভিযানের পোষাক-আশাক ও সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া করা ইত্যাদি। এই সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করাটা অভিযানের এক অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পর্যায়। এই বিশেষ ধরনের সাজ-সরঞ্জাম আমাদের দেশে খুব কমই তৈরী হয়। বিদেশ থেকে আনা জিনিসপত্র পাওয়া যায় নামমাত্র কয়েকটি সংস্থার কাছে—তার মধ্যে পর্বতারোহণ শিক্ষণ কেন্দ্রগুলোই প্রধান। এই শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে অভিযানের জন্য সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া দেওয়া হয় যে দামে তা সাধারণ দলগুলির পক্ষে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া আছে দিল্লী থেকে অনুমতি জোগাড় করা যা নাকি এই শিক্ষণ কেন্দ্র থেকে সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া নেওয়ার জন্য একান্ত জরুরী। দার্জিলিংয়ের শিক্ষণ কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গেরই মধ্যে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটের একটা অংশ প্রত্যেক বছরই এই শিক্ষণ কেন্দ্র খাতে ব্যয় করা হয়। অথচ সেই বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্যও অনুমতি পত্র দরকার হয় দিল্লীর কর্তাদের কাছ থেকে। আমাদের অবশ্য অনুমতিপত্র জোগাড় হয়েছে তবে হিসাব মত অভিযানের অর্ধেক টাকা তখনও আমাদের হাতে আসেনি। যাই হ'ক অতি কষ্টে শেরপাদের কিছু অগ্রিম দিয়ে আর ইনস্টিটিউটে একেবারেই কিছু না দিয়ে দার্জিলিং থেকে যখন ফিরলাম তখন আমাদের হাতে রয়েছে আর মাত্র পাঁচ দিন। কেনাকাটা কিছুই আরম্ভ হয় নি। আরও নানান রকমের কাজ জমে রয়েছে। আমাদের এই আটটি মেয়েকে একদিকে যেমন টাকার জন্যে দরজায় দরজায় হানা দিতে হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি জিনিসপত্র কেনাকাটা, প্রতিটি জিনিসের লিষ্টি করা, সেই লিষ্টি মিলিয়ে আলাদা আলাদা বাক্সে গুছিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলা একসঙ্গেই করতে হচ্ছে। এই লিষ্টি করার ব্যাপারটাতে গরে জ্বর আসে। জনপ্রতি পোষাক আশাক, খাবার দাবার, ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্ট, কিচেন ইউটেনসিলস—আবার মাল মিলিয়ে মাল বাহকের ফর্দ, উপরন্তু মালবাহক গুণে তাদের খাবার-দাবার গরম পোষাক, পাহাড়ে চলার জুতো—ক গজ কলম নিয়ে বসে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড়। এরপর আছে সারা কোলকাতা চষে একটা একটা করে এইসব জিনিস জোগাড় করা। কোথায় কোনটা কম দামে পাওয়া যায় তার জন্য চেনা জানা এমন কি শুধুমাত্র নাম জানা যাদের ও খোঁজ করতে ছুটছি। লিষ্ট করতে বসেছিল স্বপনা (মিত্র)। ওকেই দেওয়া হয়েছে কোয়ার্টার মাষ্টারের দায়িত্বপূর্ণ পদটি। ওর যা যা মনে পড়ছে তাতো লিখেছেই তার সঙ্গে যোগ হচ্ছে চারপাশে ভীড় করা অন্যদের মুখ থেকে নিঃসৃত অজস্র জিনিসের নাম। ওঃ যা মগ লিখতেই ভুলে গেছি, কি রে বন্তা সেলাই করার গুণ সুঁচ লিখলি না, মেডিকেল কিট যেন ডজনখানেক বোতলের টিউব থাকে—মেয়েদের টীম তো— এই সব নানান জনের নানান ফরমাস। স্বপনার তো হাঁপ ধরে যাওয়ার অবস্থা, তাও যে কত জিনিস বাদ থেকে গেল কে জানে। যা যা হাতের কাছে জম হয়েছে সেগুলো তো আগে

ভরে ফেলি। ওমা ভরব কিসে? প্যাকিং বাকস কই—কিট ব্যাগ কই? তাইতো ওগুলো ধরতে ভুলে গেছি। দার্জিলিং থেকে দুজন শেরপাকে নিয়ে আসা হয়েছিল সঙ্গে, তাঁরা এবার এগিয়ে এলেন। প্রত্যেক বাকসে নম্বর লাগিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী জিনিষপত্র ওপরে নীচে করে ভরতে এবং কোন্ মাল কিভাবে প্যাক করা হবে সেসব ব্যাপারে মেয়েদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন। ছোটা-ছুটিতে আমাদের পায়ে খিল ধরে অবস্থা কি। এক মুহূর্ত সময় নেই—বাড়ীতে মা ভাত নিয়ে বসে আছেন, আমরা বাড়ী গিয়ে খেয়ে তাঁদের ছুটি (মার ভাষার 'উদ্ধার') দেব সে সময়ও আমাদের হাতে নেই। দলের প্রতিটি মেয়ে যেন এই অভিযানের নেশায় মেতে উঠেছে। অন্য সমস্ত ভুলে গিয়ে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তারা সমানে খেটেছে, তবু তাদের উৎসাহে এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনেক সময় মনে হয়েছে, হায়রে এত চেষ্টার পরও হয়ত কোলকাতা ছেড়ে বেরোতে পারব না—'পর্বতারোহণে' তো দূরের কথা। তখন আমার সঙ্গীরা আমাকে প্রেরণা দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে বলে। আবার নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছি, আর মাত্র দুদিন বাকী। প্রধান চিন্তা (সমস্যা বলাই বোধহয় ঠিক হবে) কুলী জোগাড় করা। পদযাত্রা সুরু করার প্রথম দিন থেকে মূল শিবির পর্যন্ত স্থানীয় কুলীরাই অভিযানের মাল পৌঁছে দেয়। সেই কুলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাধারণতঃ এক বা দুজনের এক এ্যাডভান্স পার্টি পাঠানো হয় প্রায় সব অভিযানেই। আমরা নানান কারণে সে পার্টি পাঠাতে পারিনি। আমাদের মেয়েদের দল। এপথে আগে কখনও কোথাও যাইনি কেউই। কতক জায়গার তো নামই শুনিনি। এরকম পরিস্থিতিতে মেয়েদের পাঠানোর উপদেশ কেউই দিলেন না। সুতরাং 'কুলী' একটা সমস্যা হয়েই রইল। বোঝার ওপর শাকের আঁটি মত আরেক দুশ্চিন্তা। যে সব সমেত দলের প্রায় ৮০ জনের এক মাসের খোরাকী চাল, ডাল, আটা, চিনি ও অভিযানের নিত্য প্রয়োজনীয় কেরোসিন তেল—যাওয়ার দিন পর্যন্ত আমরা যোগাড় করতে পারিনি। তবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সৌজন্য ও সহযোগিতায় অভিযানের নানান্ প্রয়োজনীয় সামগ্রী শেষ মুহূর্তে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সারারাত জেগে সেই সব জিনিষ আমরা প্যাক করেছি। কোন র‍্যাশন রাস্তায় ভাঙ্গা হবে— কোন্ মাল যাবে বেস-ক্যাম্পে—কোন্ জিনিষ যাবে তারও ওপরে—এই সব আলাদা আলাদা বাছাই করে আলাদা প্যাকিং। সে কি কম ঝামেলা?

এভাবেই নানা বিপদ, বাধা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে এল ৯ই অকটোবর। মহাপূজার উল্লাস চারদিকে। আলো ঝলমল রাস্তাঘাট ঢাকের বাদ্যিতে মুখর পূজামণ্ডপ, নতুন শাড়ীর ঝিলিক লাগানো তরুণী কিশোরীর দল—সব মিলিয়ে এক রমণীয় উৎসবের মুহূর্ত, সেই উৎসবে সাড়া দিতে সবাই তখন ঘরমুখী, অথচ আমরা এই বাংলারই কয়েকটি মেয়ে সেদিন ঘর ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছি। আমরা চলেছি অদেখাকে দেখতে, অজানাকে জানতে—চলেছি এ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, সকাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি তারই মধ্যে চলেছে আমাদের যাত্রার আয়োজন। স্টেশনে পৌঁছবার কথা সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়। সব মেয়েরা ওখানেই থাকবে। নিজের কি কি জিনিষ সঙ্গে যাবে তাও গুছিয়ে নেবার সময় নেই। বাড়ীর লোকের সঙ্গে দু' দণ্ড কথা বলারও নেই অবকাশ। তবু মন খুশীতে ভরপুর এই ভেবে যে আমাদের এতদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হতে চলেছে। পাহাড়ী রাস্তায় গিয়ে কি হবে জানি না—তবে কোলকাতা ছেড়ে তো বেরোতে পারছি।

ছুটতে ছুটতে ঢুকলাম হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ৯-৩০ মিনিটে গাড়ী, এখনো দেরী আছে ঘন্টা দুয়েক। কিন্তু তর সইছে না যেন আমাদের। বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীর ভিড়ে ভিড়াক্কার। মা বাবারা শুকনো মুখে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন—ভিড় ঠেলে নিজের নিজের মেয়েদের কাছে পৌঁছন মুশকিল। মালা, চন্দনের ফোঁটা আর তার সঙ্গে ক্যামেরার ফ্ল্যাস। শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন এসেছেন আমাদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিতে। ঠিক সেই মুহূর্তে বুক কেঁপে উঠল। পারবো তো আমরা এই সম্মান বজায় রাখতে? একসময় গার্ডের বাঁশী বাজল—ট্রেন ছাড়ল। সমস্ত পশ্চিম-বাংলার জনগণের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা স্টেশন ছাড়লাম। সেই কোল-কাতা থেকে কয়েকশ মাইল দূরে তুষারাচ্ছন্ন এই ছোট তাঁবুতে শুয়েও সমস্ত ঘটনা আমার চোখের সামনে সিনেমার মত ভেসে উঠছে। রাত এখন পৌনে তিনটে প্রায়—ঘুম এল না এখনও।

১১ তারিখ বেলা দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম হরিদ্বার স্টেশনে। দেবভূমি হরিদ্বার—তীর্থভূমি হরিদ্বার, তায় আবার মহাপূজার মহা অষ্টমীর দিন। স্টেশনের এক কোণে কয়েকজন বাঙ্গালী মিলে মায়ের পূজোর আয়োজন করেছেন। সেখানে একদণ্ড উঁকি মেরে ঠাকুর দেখা নাম খণ্ডালাম। দাঁড়িয়ে যে পূজো দেখব সে সময় নেই, কারণ এখনি বাজার খুঁজে জোগাড় করতে হবে চাল, চিনি, আটা, কেরোসিন। সেদিন ছিল বুধবার—হরিদ্বারের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। এ খবর আমাদের আগে জানা ছিল না। অতি কষ্টে দোকানের ফোকর গলে দোকানীকে বুঝিয়েসুঝিয়ে দোকান খোলা-লাম। এরকমভাবে কয়েকটা দোকানে ঘুরে জোগাড় হল ৪ কুঃ চাল, ৪ কুঃ আটা, ৫০ কিলো চিনি, ৬০ লিটার কেরোসিন তেল ৩২ কিলো সূর্যের তেল. জিনিসপত্র গুছিয়ে করে কিস্তিতে কিস্তিতে এনে স্টেশনে রাখছি। এছাড়া রয়েছে কোলকাতা থেকে আনা আরও দু টনের মত মালপত্র। সব মালপত্র স্টেশনেই ডাম্প করা হোল কারণ বিকেলের গাড়ীতেই আমরা হৃষীকেশ চলে যাব। দেরী করবার সময় নেই। তাড়াহুড়ো করে সুজয়াদি আর সুদীপ্তাকে শেরপাদের সঙ্গে বেলা ১টার গাড়ীতেই হৃষীকেশ পাঠিয়ে দিয়েছি। বলা আছে ওরা যেন কালকের প্লেনসপোর্ট আর আজ রাতের থাকবার জায়গা ঠিক করে রাখে। সন্ধ্যের মুখে আমরা হৃষীকেশে নামলাম। অন্যরা স্টেশনেই ছিল। ওদের মুখে ধর্মশালার কথা যা শুনলাম তাতে সমস্ত মালপত্র টেনে সেখানে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না মনে হোল। ঠিক হোল শেরপারা মালপত্র নিয়ে থাকবে স্টেশনে—সঙ্গে থাকবে ডাক্তার। আর আমরা সব ধর্মশালায়। সেই অনুযায়ী হাঁটা দিলাম শহরের দিকে। পথে কিছু মেয়েলী বাজারপত্র করা গেল। ইতিমধ্যে সুজয়াদিরা যোশীমঠে যাবার বাস ঠিক করে ফেলেছেন। আগামী কাল ভোর পাঁচটায় বাস আসবে আমাদের তুলতে, কারণ আমরা ফার্স্ট গেট ধরে বেরোতে চাই। খাওয়া দাওয়া মিটিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি—কিন্তু বাস আর আসে না। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম বাস গুমটিতে। আমাদের নির্দিষ্ট বাসের ড্রাইভারের খোঁজ করতে জানা গেল, তিনি এখনও ঘুমে বিভোর। শেষ পর্যন্ত তাকে ঘুম থেকে তুলে তবে আমরা রওনা হলাম। পথে লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ, বিয়াসী পেরিয়ে এসে আমরা থামলাম শ্রীনগরে (কাশ্মীরের নয়)। সে রাতের মত আস্তানা গাড়লাম সেখানকার টুরিস্ট গেস্ট হাউসে। মালপত্র দুজন শেরপার অধীনে বাসেই থাকল। হরিদ্বার ও হৃষীকেশের নিরামিষ খাওয়ার পর আজ একটু 'মৎস্যমুখী' করা হল। পরদিন আবার ফার্স্ট গেট ধরবার জন্য রওনা হলাম তাড়াতাড়ি। আজকের রাস্তার পড়লো রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ। বিকেল চারটের আমরা পৌঁছলাম যোশীমঠে। উত্তর প্রদেশের চামোলী জেলার এক শহর এই যোশীমঠ। বদ্রীনাথ যাবার পথে এই ছিল শেষ বাসরাস্তা—এখন নাকি মন্দিরের দরজা পর্যন্ত বাস যাচ্ছে। অনেক কষ্টে বিড়লা ধর্মশালায় একটা ঘর পাওয়া গেল। এখানকার ধর্মশালাগুলির মধ্যে এটিই উন্নত মানের—ফুলের বাগান-টাগানও আছে। যাই হোক, সেই ঘরে সবাইকে আঁটানে যাবে না বলেই ঠিক হলো ডাক্তার শেরপাদের নিয়ে বারান্দায় শোবে। বেচারী ডাক্তার—দলের একমাত্র পুরুষ মেম্বার হয়ে কি দুর্গতিতেই না পড়েছে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছনর এই টালবাহানায় ভুলেই গিয়েছিলাম আজ বিজয়া। মনে পড়ল সন্ধ্যেবেলা বাজারে বেরিয়ে। তাড়াতাড়ি ধর্মশালায় ফিরে বাড়ী থেকে আনা নারকেল নাড়ু সহযোগে বিজয়া উৎসব পালন করলাম। সুদীপ্তা ও ডাক্তর গান শোনাল। মাঝে মাঝে গলা মেলালাম আমরা, সবাই। তারপর বসে ঠিক করা হোল কাল সকালে সুজয়াদি শীলা আর দুই শেরপাকে নিয়ে চলে যাবে গরিনিতে

কিছু কুলী জোগাড়ের আশায়। এরাই বলতে গেলে আমাদের প্রথম অ্যাডভান্স পার্টি। আমাদের একদিন থেকে যেতে হবে ঘোশী-মঠে—ইনারলাইন পারমিট জোগাড় করতে।

১৪ তারিখ সকালে উঠে ওরা চলে গেল রিনি'র দিকে। আমি টাসীকে নিয়ে গেলাম তহসীলদারের কাছে। সেখান থেকে ইনার-লাইন পারমিট, ক্যামেরা পারমিট জোগাড় করে সুদীপ্তকে নিয়ে আবার দৌড়লাম সামরিক বিভাগীয় দপ্তরে কিছু সাহায্যের আশায়। জোগাড় হলো কিছু ডাবিন (ঘৃতেয় লাগানোর মোম পালিশ) কিছু টিন ফুড ও খুচরো কিছু জিনিসপত্র। সারাটা দিন ওখানেই কাটল। সন্ধ্যাবেলায় ধর্মশালায় ফিরে পরদিনের যাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। শুতে শুতে একটু দেরীই হোল। পরদিন সকাল সকাল উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। বাস ছাড়ল ঠিক সময়েই, কিন্তু থামতে হোল কিছুদূর গিয়েই। সামরিক বিভাগের অধিকর্তা যাবেন এই পথ দিয়েই—সুতরাং তিনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন গাড়ী যেতে পারবে না। ঘন্টাখানেক পরে সেখান থেকে ছাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু বাসের ইঞ্জিন গেল বিগড়ে। যেখানে দশটায় পৌঁছনর কথা সেখানে রিনিতে এসে নামলাম বেলা দুটোর পর। তপোবনের উষ্ণ কুণ্ডে স্নান সেরেই এসেছিলাম—খাবারও তৈরী। সুতরাং হাত লাগাতে বেশী দেরী হোল না।

রিনি—নামটা যেমন ঠিক তেমনি ছোট্ট সুন্দর একটি গ্রাম। ধৌলিগঙ্গা আর ঋষি-গঙ্গার সঙ্গমেই গ্রামটি। একমাত্র স্কুলবাড়ী গ্রামের মধ্যে একটু ওপরে ওঠা—সেখানেই আশ্রয় নিয়েছি আমরা। এর মধ্যেই কোয়ার্টার মাস্টারের সাহায্যে শেরপারা সমস্ত মালপত্র খুলে ওজন করে আবার প্যাক করে ফেলেছে। কুলী যতজন আমাদের দরকার ততজন পাওয়া যায়নি। খুঁজে পেতে জনা পঁচিশেক কুলী জোগাড় হয়েছে। আশ্বাস পাওয়া গেছে—কাল সকালে আরও কিছু লোক আসবে। কাল থেকে আমাদের পদযাত্রা শুরু হবে—তাই আমরা সবরকমভাবেই প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি। আমাদের চলার পথে রিনিই শেষ জনবসতি। এরপর আর মাথা খুঁড়লেও কোন জিনিসপত্র পাওয়া যাবে না। সমস্ত জিনিসপত্র পুনরায় পরখ করে যা-যা আগে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেগুলোই আগে প্যাক করে ফেলা হল। কারণ কুলী না পাওয়া গেলে কিছু মাল হয়ত এখানে রেখে যেতে হবে—পরে এই কুলীরাই সেগুলো আবার নিয়ে যাবে। খাটাখাটুনিতে খিদেও পেয়েছে খুব। স্বপ্না সকাল থেকেই রান্না-ঘরে ব্যস্ত। আজই প্রথম আমাদের 'র‍্যাশন' ভাঙ্গা হয়েছে। এখানে আলুটা ভালই পাওয়া যায়। আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দু' মণ আলুর অর্ডার দিয়েছিলাম। সকাল হতে না হতেই আলু নিয়ে লোক হাজির। সঙ্গে কিছু কাঁচা সবজী। আমরাও নমোঃ নমোঃ করে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোবার জন্যে তৈরী কিন্তু ওপরের গ্রাম থেকে যে কুলীদের আসার কথা ছিল, তাদের আর দেখা নেই। গতকাল জোগাড় করা কুলীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মালের বোঝাগুলো ভাগাভাগি করে দেওয়া হল—কিন্তু তারা সে মাল তুলতে রাজী নয়। কারণ, বোঝা নাকি ভারী হয়েছে। এরা কেউই ৩০ কেজির বেশী মাল তুলতে রাজী নয়। অথচ ট্রেনিংয়ের সময় দেখেছি ৪০।৪৫ কেজি মালের বোঝা নেপালী কুলীরা কত অনায়াসে তুলে নেয়। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেও কোন ফল হল না। ওরা ভীষণভাবে বেঁকে বসল। অগত্যা গ্রামের মোড়ল ও এস-ডি-এম সাহেবকে ডাকা হোল সমস্যার সমাধান করতে। তাদের বুঝিয়ে বললাম আমাদের বিপদটা কোথায়। জানালাম যে কুলীর সংখ্যা কম অথচ মাল আমাদের নিয়ে যেতেই হবে। না হলে আমাদের আজকের দিনটাও বসে থাকতে হবে। অভিযানে বেরিয়ে একদিনও বসে থাকলে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, সে সম্বন্ধে ওঁদের ধারণা হোল। ওঁদের অনুরোধ করলাম যে, কোনমতে আজকের মত ওঁরা যদি কুলীদের রাজি করিয়ে দিতে পারেন তবে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। এতে বোধ হয় কাজ হল। কারণ তারপরই দেখলাম কুলীরা নিজের নিজের বোঝা তুলে নিচ্ছে। এইসব ঝামেলায় বেরোতে অনেক দেরী হয়ে গেল। শেরপা এবং কুলীদের সঙ্গে মেয়েদের রওনা করিয়ে দিয়ে স্বপ্নাকে নিয়ে আমি বসলাম মালের হিসেব করতে। পরে রাস্তায় ওদের ধরে নেব।

প্রায় অর্ধেকেরও বেশী মাল আমাদের রেখে যেতে হচ্ছে। কেদার সিং এখানকার বহু পুরোনো লোক। এর আগে দেশী, বিদেশী বহু অভিযানেই সে মালবাহক জোগাড়ের দায়িত্ব পালন করেছে। কোন কারণে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না জানিয়েছে। তবে এখান থেকে এইসব মাল সময়মত ওপরে পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব সে নিজেই নিয়েছে। গত বছর মানা অভিযানেও ও ছিল। সেই অভিযানের ডাক্তার দীপক সিংহ (আমার মেজদা) আবার আমাদের দলেরও ডাক্তার। সে কেদার সিংকে চেনে, জানে। তাই ওকে এ দায়িত্ব দিতে আমরা ভরসা পেয়েছি। কেদার সিং আশা দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ও ব্যবস্থা করে মাল-পত্র ওপরে পাঠিয়ে দেবে। সেইসব মাল কোন বাক্সে কি আছে, কোনটা আগে যাওয়া দরকার, কোনটা পরে গেলেও চলবে তার একটা তালিকা করে কেদার সিংকে দিলাম। ও যদি সময়মত ঠিক ঠিক মাল না পাঠাতে পারে তবে সমস্ত দলকে ওপরে অনিশ্চয়-তার মধ্যে থাকতে হবে। কেদার সিংয়ের ওপর নির্ভর করা যায়—তবু এ এক মস্ত বড় দুশ্চিন্তা। মনটা খচখচ করছে, কিন্তু কোন উপায়ও নেই।

বিষণ্ণ মনে রুকস্যাক পিঠে তুলে শেষ-বারের মত কেদার সিংকে সব বুঝিয়ে দিয়ে কাঁচামাটির পথে পা বাড়ালাম। আমাদের শেরপা সর্দার বহু অভিযানখ্যাত পাসাং ফুটার। অভিজ্ঞ, সাবধানী লোক। সবার পেছনে পেছনে আসছে ডাক্তারের সঙ্গে গল্প করতে করতে। অনেকদিন পর রুকস্যাক তুলেছি—পিঠটা বেশ ভারী ভারী ঠেকছিল। ঋষিগঙ্গার ওপরে ছোট্ট কাঠের সেতু পেরিয়ে পাহাড়ে গা বেয়ে ওঠা পাকদণ্ডী পথে চলা শুরু হোল। এ পথে ভেড়া, ছাগল চরাতে নিয়ে যায় স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সরু পায়ে চলা পথ—আর পুরোটাই চড়াই। সামনে শুধু সবুজের সমারোহ। বড় বড় গাছ আর ছোট ছোট জলের ধারা পেরিয়ে চলেছি। রিনির গ্রামবাসীদের কাছে শুনেছিলাম আজকের পথ খুব দুর্গম হবে না। ওরা তো জানে না কোলকাতার বাসে ট্রামে চলা-ফেরাকরা মেয়েদের কাছে ২৫ ফুট চড়াইও দুর্গম হয়ে দাঁড়ায়। ওদের কাছে হয়ত এ কিছুই নয়, মনের আনন্দেই চলছি তবে মাঝে মাঝে এবড়োখেবড়ো পাথরগুলোই মুশকিল করছে। ঐ পাথরের ওপর একটু বেকায়দায় পা পড়লেই একেবারে সপাত ধরণীতলে। মাঝে মাঝেই পা মচকে যাবার মত অবস্থা হচ্ছে। সেদিনের চলা শেষ হলো বেলা প্রায় দুটোর সময়। আমরা তাঁবু ফেললাম ভাং কি রাণীতে। ভাং কি রাণী জায়গাটি চারদিকে পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা। ঠিক সন্ধ্যার মুখে সেই জঙ্গল ঝাঁপিয়ে এলো ঝড়—সঙ্গে বৃষ্টি। ঝড়ের গর্জনে আর হাওয়ার দাপাদাপিতে খুঁটিশুদ্ধ তাঁবু উড়ে যায় আর কি, সারারাত প্রায় জেগেই কাটল।

পরদিন সকালে টিপ টিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরোলাম। যথারীতি আমি আর স্বপ্না (মিনু) পেছনে রইলাম কুলী আর মালের হিসেব মেলাতে। আজ প্রথম থেকেই ঘন জঙ্গলের শুরু। তার মধ্যে বেশীর ভাগই বিছুটি গাছ—গায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই। এ ছাড়া রয়েছে সরু সরু লম্বা লম্বা ধরনের বাঁশ গাছ। এই বাঁশের কঞ্চিতে হাত-পা ছড়ে যাচ্ছে—জামা-কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে। তবু আমাদের চলার বিরাম নেই। সেই জঙ্গল কেটে রাস্তা বানিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বিরাট বিরাট শ্যাওলা-ধরা গাছ পথিমধ্যে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ঝর্ণা পার হতে হোল। জলে-ভোবা ছোট-বড় পাথরের টুকরোর ওপর খুবই সাবধানে পা রেখে ঝর্ণাগুলো পার হতে হয়—নড়বড়ে কোন পাথরে পা পড়লেই একেবারে সোজা জলের ভিতর, আর তার পরের ঘটনা তো বলাই বাহুল্য। অবিরাম চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সেদিনের মত আমরা থামলাম খাট্টাইখড়কে। রোন্টি নালার পাশেই পড়ল আমাদের তাঁবু। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে রোন্টি নালা। অবিরত ঝমঝম শব্দে যেন নূপুর বাজিয়ে নেচে নেচে চলেছে সে। আমাদের মধ্যে লক্ষ্মী আবার একটু কাবিলনা। এখানে পৌঁছনোর পরই সেই যে একটা বড় পাথরের ওপর উদাসী মন নিয়ে বসেছে ওর ধ্যান ভাঙ্গার কার সাধ্য। খাওয়ার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে শুয়ে

পড়লাম। কালকের রাস্তা বেশ কঠিন হবে—প্রথমেই এক খাড়া চড়াই।

১৮ই অকটোবর। শুরু থেকেই চড়াই ভাঙছি। প্রকৃতির খেয়ালে হঠাৎ ধসে পড়েছে মূল পাহাড়ের খানিকটা অংশ। বেরিয়ে পড়েছে মাটি আর পাথরশুদ্ধ খানিকটা দেয়াল। সেই দেয়ালে ধাপ কেটে কেটে আমরা এগুচ্ছি। নীচেই রোন্টি নালা—তার স্বাভাবিক ছন্দে বয়ে চলেছে। একবার ভারসাম্য হারালেই সোজা তার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে। ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পা রেখে এগোতে হচ্ছে। কখনো কখনো পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে আলগা পাথরের নুড়ি নয়তো বা একরাশ ঝুরো মাটি। পড়ো পড়ো হয়েও পড়ছি না—শেরপারা প্রস্তুত হয়েই আছে মদত দেবার জন্য। সারা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় পাথরের স্তূপ। বেশীর ভাগই আলগা, পা রাখলেই নড়বড় করে। এ পথ পেরোতে সময় নিচ্ছে অনেক। আস্তে আস্তে গাছপালাও কমে আসছে। রোডোডেনড্রনের গুচ্ছও দেখতে পাচ্ছি। চলতে চলতে চলাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এল—পথও ফুরিয়ে এল। খানিকটা মাঠ মতো একটা সমতল জায়গায় আমরা তাঁবু ফেললাম। স্থানীয় কুলীরা জায়গাটার নাম জানালো ভাঙ্গাপানি।

ভাঙ্গাপানি থেকে চলা শুরু করেছি খুব সকালে। আজ আমরা মূল শিবির পাতব। পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের ওঠা-নামা চলছে। মাঝখানে একটা ঝর্ণা পেয়ে হাত-পা ধোয়ার ধুম পড়ে গেল। কি পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা এই ঝর্ণার জল। খেতেও ভালো। তারপর শুরু হলো কঠিন চড়াই। রোডোডেনড্রন আর নানান গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা করে উঠছি। গাছের ডালপালা ধরে ধরে উঠছি কোন কোন সময়। ভূর্জপত্রের গাছ পাচ্ছি অনেক। হৈ-হৈ করে সবাই সংগ্রহ করছে সেই গাছের ছাল—চিঠি লেখার জন্য। সুন্দর বাদামী রংয়ের নরম নরম পাতার মত এই ছাল। মধ্যে মধ্যে দু-একটা পিঠও আছে। এক ধার থেকে আরেকটা খুব সাবধানে ছাড়াতে হয়—না হলেই ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা। এত সবের মধ্যেও চড়াই যেন আর শেষ হতে চায় না। চলেছি তো চলেছি। বুকে হাঁপ ধরছে, গলা শুকিয়ে আসছে। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুর এসে পড়ছে গায়ে মাথায়—গরমে প্রাণান্তকর অবস্থা। আরও চলেছি—চলতে হচ্ছে।

জঙ্গল ক্রমেই ফাঁকা হয়ে আসছে—এবার শুরু হোল কোমর পর্যন্ত উঁচু ঘাসে জড়ানো ময়দান। সেই ময়দান পেরিয়ে এসে আমরা তাঁবু পাতলাম রোডোডেনড্রন বনের মধ্যে। শিবিরের জন্য অতি প্রয়োজনীয় 'লকড়ি' আর 'পানি' দুটোই এখানে পাওয়া যাবে। তাই এ জায়গাটা পছন্দ হোল সবারই।

চারপাশে পাহাড়-ঘেরা এই আমাদের মূল শিবির—অভিযানের মূল ঘাঁটি। পরবর্তী শিবিরগুলোতে রসদ আর অন্যান্য সরঞ্জাম পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে এই শিবির থেকেই। তাছাড়া প্রতিটি শিবিরের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রাখা তেমনই অনেক নীচে ফেলে-আসা শেষ গ্রাম বা আরও দূরে আমাদের নিজস্ব শহরে আমাদের খবরাখবর পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও এই মূল শিবিরের। কাছে দূরে দেখা যাচ্ছে তুষার-টুপী-পরা ছোট-বড় নানান শৃঙ্গ। সকালের সোনালী রোদ পড়েছে তাদের মাথার ওপর। আজ আমাদের বিশ্রাম। বিশ্রাম মানে শুধুই চলার বিশ্রাম—কাজের নয়। সমস্ত মালপত্রের প্যাকিং খুলে বিভিন্ন শিবিরের জন্য আলাদা আলাদা করে প্যাক করা হচ্ছে। ক্লাইম্বিংয়ের সাজ-সরঞ্জাম খুলে খুলে দেখা হচ্ছে। ফুটোফাটা মেরামত, বোতাম বা স্নিপ ফাস্টনার লাগানো, জুতোর ছেঁড়া দড়ি পাল্টানো—সবই প্রয়োজনমত সেরে নিতে হবে এখানে। কোয়ার্টার মাস্টার আজ খুবই তৎপর—খাতা হাতে ঘোরাঘুরি করছে এদিক-ওদিক। এক ধারে একরাশ ওষুধপত্তর ছড়িয়ে বসেছে ডাক্তার। তারই কাজ বেশী। নিজে তো যাবে না। ওপরে—তাই মেয়েদের বোঝবার মতো করে লিস্ট করে ওষুধ গুছোতে হচ্ছে। অন্যান্য অনেকেই শেষবারের মত স্নানের নামে কিছু জল আর সাবানের অপচয়ে ব্যস্ত। গ্যালজিন (আমাদের কুক) প্রেসার কুকারের শেষ সিটি শোনবার আশায় উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। রিনি থেকে সঙ্গে করে আনা দুটো ভেড়ার একটাকে আজ বলি দেওয়া হয়েছে। কিছুটা মাংস আজ খাওয়া হচ্ছে—বাকী-টুকুর সদ্গতি হবে ওপরের ক্যাম্প-গুলোতে। সবার থেকে একটু দূরে, একটা বড়সড় পাথরের ওপর আধশোয়া হয়ে ইন্দিরা ঘরের কাগজের জন্য 'সংবাদ' তৈরী করছে। আজই মেল রানার যাবে নীচে।

টুপ্ এক ফোঁটা জল পড়ল নাকের ওপর। উঃ কী ঠাণ্ডা—আমি শিউরে উঠলাম। আবার টুপ—আরেক ফোঁটা জল—সেই নাকেরই ওপর। স্লিপিং ব্যাগের কৃপায় সমস্ত শরীরটাই ঢাকা, ওই নাকটুকুই যা বেরিয়ে আছে—আর তারই ওপর যত উৎপাত। তাঁবু চুঁইয়ে চুঁইয়ে বরফগলা জল পড়ছে টুপটাপ। এপাশ-ওপাশ করেও স্বস্তি নেই। স্লিপিং ব্যাগের এখানে-ওখানেও যেন ভিজে-ভিজে ঠেকছে। নাঃ একবার উঠতে হোল। শীলাকে আর ডাকতে হোল না। আমার উসখুসের চোটে ও বেচারী জেগে গেছে। 'দীপালি উঠছ নাকি' জিজ্ঞেস করল ও। হ্যাঁ—টর্চটা জ্বালো তো দেখি কি অবস্থা। ওমা—এ তো সব ভিজে একাকার। তাঁবুর দুটো পাশ যে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে তার গায়ে রীতি-মত বড় বড় ফোঁটায় জল আটকে আছে। স্লিপিং ব্যাগের এখানে-ওখানে গোল গোল ভিজে দাগ। খুলে রাখা জুতো জোড়াও ভিজে জবজবে। খুঁজে খুঁজে ক্যাম্পসু পায়ে গলিয়ে তাঁবুর ফোকর গলে বাইরে বেরোলাম। আকাশ বেশ পরিষ্কার, একটু আলোর আভাষও পাওয়া যাচ্ছে যেন। এক-রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া তীর বেঁধালো চোখে মুখে। ভোর হয়ে এলো নাকি। ঘড়ি দেখ-লাম—ঠিকই তাই, রাত প্রায় শেষ। পাঁচটা বাজতে বিশেষ দেরী নেই। সারারাতের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ক্লান্তি মুছে গেল। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম শুধু সাদা, সাদা আর সাদা। সেই সাদা ফেনার মাথায় আমাদের রংগীন তাঁবুগুলো যেন ভাসছে আর হাওয়ার দোলায় দুলছে। যদিও তাঁবুর মাথায় ঘন্টায় ঘণ্টায় ঝুরো বরফ জমেছিল পুরু হয়ে, সারারাত সাবধানে থেকে ভেতর থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করেছে সবাই। এখন বরফ পড়া বন্ধ হয়েছে। কুয়াশার চাদর মুড়ি দেওয়া দূরের সেই বরফের দেওয়ালটাকে কি রকম যেন শান্ত বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। চারদিকে কেমন একটা মধুর জড়তা মাখা। নৈঃশব্দকে আগে কখনো এমনভাবে উপলব্ধি করি নি। ঠাণ্ডা প্রচণ্ড—তবুও তাঁবুতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বরং মনে হচ্ছে সবাইকে ডেকে তুলে এই সৌন্দর্য দেখাই। এই মুহূর্তে বুকের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও কোন কলুষতা আছে তা মনেই হচ্ছে না। আমার চোখের সামনে একটু একটু করে ধূসর অন্ধকারের পর্দাটা কে যেন অতি সন্তর্পণে সরিয়ে নিচ্ছে—আর উদার হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভোরের পবিত্র আলো। এ সৌন্দর্যের বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই। শুধু মনে হচ্ছে এতদিনের এত কষ্টের দাম পেয়ে গেছি। 'আরে লীডার দিদি, ইধর কিঁউ খাড়া হ্যায়—কিচেন মে আকে বৈঠো।' জল আনতে যাচ্ছিলো লোপ সাং—ওর নজরে পড়ে গেলাম, ঘোর কাটল আমার। কিচেন টেন্টের খুটখাট শব্দ কানে এলো। 'গুড মর্ণিং দাজুলোগ'—গুড়ি মেরে ঢুকলাম কিচেনে। চায়ের জল চাপিয়েছে গ্যালজিন। এই এত ভোরেও কি সতেজ লাগছে ওকে। এক গাল হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো। 'গুড মর্ণিং লীডার দিদি'—আজ ওয়েদার আচ্ছা হ্যায়, সামিঠ বন যায়েগা'—নরবু দার্জু আশ্বাস দেয়। বহু অভিযানে পোড়-খাওয়া শেরপা এই নরবু। বরফ চেনে, হাওয়ার গতি বোঝে। মেঘ দেখে বলতে পারে আব-হাওয়া কি রকম থাকবে। ওর কথায় মনটা খুশী হোল। আসলে আমারো মনের মধ্যে ঐ একই প্রার্থনা গুন-গুনিয়ে উঠছে। হে ভগবান আবহাওয়া যেন ভাল থাকে—আমরা যেন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। গত তিন চারদিনের অবি-রাম তুষারপাতে আমরা ক্রমেই যতটা হতাশ হয়ে

পড়ছিলাম। বিশেষ করে ২৫, ২৬ দুদিন তো শুধু তাঁবুর মধ্যে বসেই কেটেছে। বাতাসের তীব্রতায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তাঁবু আর বরফে ভরে গেছে চারিদিক। সেই তুষারপাত মাথায় নিয়ে ২৬ তারিখে ডাক্তার উঠে এসেছে দুদিনের রাস্তা এক দিনে কভার করে সোজা এই ক্যাম্পে, 'কী রে এই সন্দো, ফলের মধ্যে তুই এলি কেন?' উত্তরে বলছে, একটা ভেড়া সঙ্গী করে আর কতদিন থাকা যায়?' সেই প্রচণ্ড তুষারপাতে আমাদের জামাকাপড়, শোবার থলি, মাথার ওপরে তাঁবুর চাঁদোয়া সবই ভিজে ঢোল। শেরপারা পরামর্শ দিয়েছিল নীচে গিয়ে সেগুলো শুকিয়ে নিয়ে আসতে। উচিতও ছিল তাই। কিন্তু তব এটুকু ঝুঁকি না নিতে পারিনি। মনে সংশয় আর যদি ওয়েদার ভালো না হয় —তবে তো আর ওপরে আসা হবে না। আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিতের এত কাছে এসে ফিরে যাবো? আমাদের প্রার্থিত শিখরচূড়ায় আমাদের প্রণাম না রেখে ফিরে যেতে মন চাইছিলো না। তাই ঠিক করেছিলাম দু-একদিন দেখেই যাই। এরই মধ্যে কাল আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হওয়াতে ওরা তিনজন ওপরে গেছে সামিট ক্যাম্প করতে। আজকে ওরা শিখরে অভিযান চালাবে। ওদের কথা মনে হতেই আবার আমার চোখ গেল সামনের বরফের দেওয়ালটার ওপর। যে প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাল ওদের সামনে দাঁড়িয়েছিল আজ যেন সেই উদ্ধত্য নেই—কিছুটা ক্লান্তি পরাক্রান্ত। ওরই গায়ে ধাপ কেটে কেটে এগিয়ে গেছে ওরা—ফিরে আসবে ওরই গা বেয়ে। উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায় আমরা থাকবো আজ সারাদিন।

তাঁবুতে তাঁবুতে বেড-টী দিতে গেলো গালজিন আর আমার হাতে ধরিয়ে দিলো মগের মধ্যে খানিকটা হরলিকস। চুমুক দিতে দিতে বেশ তাজা আর ঝরঝরে লাগলো নিজেকে। কাল রাতে যে দুচোখের পাতা এক করিনি—সে অবসাদও কেটে গেল। বাইরে আলোয় ভরে উঠেছে—তবে রোদ আসতে এখনো অনেক দেরী। চা চা হাঁকে জেগে গেলেও কেউ এখন তাঁবুর বাইরে বেরোবে না রোদ না আসা পর্যন্ত। বেড-টী শেষ করে আরেক ঘুম দেবে। আমি একটু বরফের ওপর পায়চারি করতে বেরোলাম।

ক্রমে বেলা বাড়লো—সরগরম হয়ে উঠলো আমাদের এই দুনম্বর শিবির। কয়েকজন শেরপা ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরী—ওরা নীচে যাবে কিছু জিনিসপত্র আনতে। কাল থেকে এই ক্যাম্পে নুন বারুদ। আজ নীচ থেকে না আনলে হাই ব্লাডপ্রেসারের রুগীর মতো আলুনী খাওয়া খেতে হবে। চারজন শেরপা যাবে ওপরে—তিন নম্বর থেকে খবর আনতে। রান্নার ভার আজকে আমরা নিয়েছি। অবশ্য রসদ সবই ফুরোবার মুখে। আজকের মেনু চাল ডালে খিচুড়ি আর কিছুটা টিনের সবজী। বেসক্যাম্পে ডাক্তারের জিম্মায় একটা ভেড়া রেখে এসেছিলাম—তা আবহাওয়া খারাপ দেখে লকুলদের বুদ্ধিতে ডাক্তার সেটিকে নন্দাদেবী মায়ের চরণে মানত করে রেখে এসেছেন। আর আশ্চর্য তারপর থেকে ওয়েদার ভালো হতে শুরু করেছে। কুলীদের মধ্যে এ বিশ্বাসটা সাংঘাতিকভাবে প্রচলিত।

শেরপারা যে যার পথে রওনা হয়ে গেছে। ইন্দিরা তার খবর লেখায় ব্যস্ত। অন্যরাও এদিক ওদিকে ছিটিয়ে রয়েছে। সারা ক্যাম্পে একটা নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে। যে যার কাজ ফেলে মাঝে মাঝেই বাইনোকুলারে চোখ রাখছি। যদি কাউকে দেখা যায় সামনের ঐ দেয়ালটা বেয়ে নীচে নামতে—যদি আসে ওপর থেকে কোন খবর। কিন্তু কোথায় কি। সূর্যের আলোয় ঝলকাচ্ছে ঐ দেয়ালটা—যেন হাজার হীরের দ্যুতি। সেখানে আর কোন রঙই দেখা যাচ্ছে না। বেলা যতই বাড়ছে আমাদের অস্থিরতাও বাড়ছে দ্বিগুণ। অন্য কিছুতেই মন লাগাতে পারছি না—ওপরের খবর পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি। প্রত্যেকবারই নতুন আশায় দূরবীণে চোখ রাখছি প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হচ্ছি। এর মধ্যে নীচ থেকে শেরপারা প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে ফিরে এসেছে। আমাদের এই হতাশ ভাব দেখে ওরা নিজেদের ভাষায় কি বলাবলি করল। নরবু এগিয়ে এসে অভয় বাণী শোনাল। অভি খবর আনেকা টাইগ নেহি হুয়া—দিদিলোক খানা খালো।' আর খাওয়ার পর বৃথা সময় নষ্ট করে 'থোড়া নিদ যাবার' পরামর্শ দিল। ইতিমধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ পড়তে শুরু করেছে। মনে হয় যেন আকাশ থেকে সাবুদানা ঝরে পড়ছে। গায়ে মাথায় টুপটাপ পড়ে, জামা কাপড়ের খাঁজে আটকে থাকে। একটু ভিজে ভিজে ভাব চারদিকে, হাওয়া যেন শান্ত আলিঙ্গনে জড়ায়। সময় আর কাটে না, প্রতিটি মুহূর্ত যেন মনে হচ্ছে একটা গোটা লম্বা দিন। একটা দিনের পর আরেকটা দিন—একটা মুহূর্তের পর আরেকটা মুহূর্ত। ছুটির দিনগুলো যেমন শুয়ে বসেও কাটতে চায় না তেমনি এই মুহূর্তগুলোও কাটতে চাইছে না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হোল। এখনো কেন ওপর থেকে কেউ নামছে না। মাঝে মাঝে টেন্টের ফ্ল্যাশ তুলে খোঁজ নিচ্ছি শেরপাদের কাছ থেকে। ওরা সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে আয়েগা আয়েগা' বলে। তবু মন মানছে না। নানা চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মাথার ভেতর। মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে নানান সন্দেহ। ওদের কি কোনো বিপদ হোল? কোন না এ্যাকসিডেন্ট? দুর্ঘটনার কথা মনে হতেই আমার সারা দেহ একটা শিহরণ খেলে গেল। অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। কিছুতেই আর তাঁবুর ভেতর থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে কিচেনের দিকে যেতে দেখলাম আগুনের ধারে বসে আছে ডাক্তার। ওকে বেশ চিন্তিত দেখালো। তবে কি সেও আমার মতো ওদের কোনো বিপদের আশঙ্কা করছে? কি হলো বলতো—এখনো কোনো খবর আসছে না' বলতে বলতে আমি ওর পাশে গিয়ে বসলাম। 'তাইতো ভাবছি.. বলে আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল ও। নরবু সামনের দেয়ালটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে—ওরা যে ওখান দিয়েই নামবে। চমরি-খড়কের পেছনে মস্ত লাল সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। একরাশ সিঁদুরে আলো পড়েছে সাদা সাদা চূড়াগুলোর ওপর। একটু পরেই সে আলো ম্লান হয়ে যাবে। আসবে রাত। এখনো ওরা কেউ নামলো না। সামনের চড়াইটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করছে—তবু কোন প্রাণের স্পন্দন পাচ্ছি না সেখানে। আমি শুধু ভাবছি যে চারজন শেরপা আজ সকালে গেছে এখান থেকে তারাই বা ফিরে আসছে না কেন? তবে কি..... আর ভাবতে পারছি না। আমার চোখের সামনে পর পর ভেসে উঠল কয়েকটা মুখ তান্জা, ভবপুরে প্রাণ লক্ষ্মী নম্র শান্ত স্বপ্না (মিত্র) কিছুটা বা গম্ভীর সুদীপ্তা, লাজুক অথচ দৃঢ়চেতা পাসাং ফুটার (আমাদের শেরপা সর্দার) সতেজ ঝরঝরে টাসী, সর্বকনিষ্ঠ দা তেনজিং আর সবচেয়ে খাটিয়ে নওয়াং শেরিং। এরা সবাই জীবনকে ভালবাসে, ভালবাসে তাদের আপন আপন পরিবেশকে। এই পাহাড়ের সাদা নির্জনতায় কেউই তার দামী প্রাণটা রেখে যেতে চায় না। ওরা সবাই ভালো আছে তো, সুস্থ আছে তো? কেন আমি ওদের এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও ওপরে পাঠালাম? এতগুলো জীবনের দায়িত্ব আমার ওপর। আমি কি তবে ভুল করেছি? ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠছে। 'জী লীডার দিদি'—নরবুর গলা শুনলাম। আমি বোধহয় আমার অজান্তেই ওকে ডেকে উঠেছি। কেয়া হোগা দাজু, আভিতক কোই নেহি—আমার গলা শুকিয়ে এলো।

'ঘাবড়াও মত—সামিট বনকে আয়ে গা' ইসিলিয়ে দের হোতো হ্যায়,' সাহস দিল ও। কিন্তু ওর গলাটাও কি নরম শোনাল না? ভেতরে ভেতরে কি ও ভয় পেয়েছে? আমি এখন আর সামিটের কথা ভাবছি না। তেত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে 'সামিট চাই না—শুধু ওদের ভালোভাবে ফিরিয়ে দাও।' রাতের অন্ধকার নাবতে শুরু করেছে। বরফ পড়াও চলছে সমানে। তারই মধ্যে শেরপারা কজন বাইরে বসেছে গোল হয়ে আর নিজেদের ভাষায় গম্ভীর হয়ে কিসব আলোচনা করছে। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত চিন্তা আমার মাথায় আসছে। কি কি বিপদের মুখোমুখি ওরা হতে পারে তাও ভাবছি। ঘড়িতে এখন ৭টা—এখনও কেউ এসে পেঁছয়নি ওপর থেকে। আমার চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। আমাদের জানতে না দিলেও শেরপারা যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছে বুঝতে পারছি। ওদের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি কিছু আঁচ করতে পারছি না। আমার অনুভূতিগুলো যেন ভোঁতা হয়ে আসছে। একমাত্র উপায় সমনে

রয়েছে ওপরের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাওয়া। ডাক্তারও আমার এই প্রস্তাবে রাজী। কিন্তু রাজী নয় শেরপারা। এই অন্ধকারে চড়াই পার হওয়া যে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিপদ তো প্রতি পদক্ষেপে হাঁ করে রয়েছে সেখানে।

সাধ করে মৃত্যুকে কেই বা ডাকতে চায়। বিকেলের আলো মুছে যাওয়ার আগেই দুজন শেরপাকে ফ্লাস্কভর্তি গরম চা আর কিছু বিস্কুট দিয়ে পাঠিয়েছি। কথা ছিল ওদের দেখতে পেলে তারা সিটি দিয়ে জানাবে। জীবনে কোনদিন সিটি শোনবার জন্য এত উৎকর্ণ হব ভাবিনি। কিন্তু কই আমাদের কথার গুনগুনানি ছাড়া আর কোন আওয়াজই তো পাচ্ছি না। বাইরে অন্ধকার। বরফ পড়ছে ঝির ঝির করে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে আছি আমরা ক'জন। কি করা দরকার বা কি করলে স্বস্তি পাওয়া যায় কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না। আমার মনের সন্দেহগুলো প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হতে চলেছে। দুচোখ হতাশা ভরে আবার তাকালাম বাইরে।...একী—ঐ চড়াইটার মাথায় কি যেন জ্বলে উঠল না? 'মেজদা দেখতো ওটা আলো নাকি' উত্তেজনায় আমার গলার আওয়াজ নিজের কানেই বিকৃত শোনাল। কথাটা শেষ হতেই যা দেরী, হুড়মুড় করে সবাই বাইরে বেরিয়ে এলাম। সবার চোখ স্থির হয়ে রয়েছে ঐ চড়াইটার ওপর। হ্যাঁ—অনেক ফুলকি দেখা গেল মনে হোল, এবারও একটা, আরো একটা, আরো আরো। এবার নিঃসন্দেহ হলাম। ওগুলো টর্চের আলো—একটা নয় অনেকগুলো। লাইন করে পর পর যেন নীচের দিকে আসছে। আমাদের চীৎকারে অন্যান্যরাও তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু আলোগুলো এত ধীরে ধীরে আসছে কেন? দু-একটা আলো যেন এলোমেলো বোধ হচ্ছে—সব সময় যেন লাইনে থাকছে না। ডাক্তার একটু ছটফট করে উঠল, স্বগতোক্তির সুরে বলে উঠল মনা অভিযানে ঠিক এই দৃশ্যই দেখেছিলাম। রাত সাড়ে আটটায় এভাবে যখন শেরপারা দু নম্বর শিবিরে এসে পৌঁছল তখন প্রত্যেকের পিঠে আরেকটা ক্ষতবিক্ষত মানুষের দেহ—বীভৎস সে দৃশ্য।

১৯৬৬ সালের মানা অভিযানের ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সে ইতিহাস আমরা সবাই জানি। চোখের সামনে থেকে আলোর ফুলকিগুলো যেন আমার মাথার মধ্যে ঢুকে এল, কপালের দুপাশের রগদুটো দপদপ করছে। ধমনীতে রক্তস্রোত ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসছে। বেশ বুঝতে পারছি বুকের ধুকপুকানিও বেড়ে গেছে। হাতের পাতা ঘামতে শুরু করেছে। প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আলোর সারি ধীরে ধীরে নেমে আসছে, ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, এবার বোধহয় আমরা আওয়াজ দিলে ওরা শুনতে পাবে। সমবেত কণ্ঠে আমরা হো-ও-ও-ও চীৎকার করে উঠলাম। আমাদের সে কণ্ঠস্বর চারিদিকের নির্জনতাকে খান খান করে প্রতিটি শিখরে প্রতিধ্বনিত হল। কিন্তু পাহাড়ে সাধারণত এক শিবির থেকে অন্য শিবিরে যাওয়া আসার সময় এ ধরনের আওয়াজ দিয়ে একদল তাদের আগমন বার্তা জানায়—অপর দল প্রত্যুত্তরে তাদের অভ্যর্থনা জানায়। ওরা তো গতকালই যতক্ষণ আমাদের দেখা গেছে এভাবেই আওয়াজ করতে করতে গেছে। তবে আজ ওদের হলো কি? ওরা কি আমাদের উৎকণ্ঠা আঁচ করতে পারেনি? বোঝেনি কি ওদের জন্যই এই ঠান্ডায় বরফের মধ্যে আমরা সবাই তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে। আবার আমরা স্বর মিলিয়ে হেঁকে উঠলাম। হো-ও-ও-ও—। পাহাড়ে পাহাড়ে ঠক্কর খেয়ে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল সে আওয়াজ তবু ওরা কোন জবাব দিল না। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগের মেঘ ঘনিয়ে আছে। ডাক্তার বোধহয় আর বেশীক্ষণ এভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। সে গেল তার মেডিক্যাল কিট বোর্ড করতে। আমরা একপা একপা করে সামনে এগোচ্ছি—যত তাড়াতাড়ি ওদের মুখোমুখি হওয়া যায়। কালো বিন্দুগুলো এতক্ষণে একেকটা চেহারা নিচ্ছে। তবে পিঠে রুকস্যাক, ফেদার কোট গায়ে কোনটা কে তা কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সে চেষ্টা না করে আমি তাড়াতাড়ি গুনতে লাগলাম ওরা সবাই দলে আছে কিনা। তিনজন মেম্বার দশজন শেরপা। কিন্তু দূরে ঝাপসা হলেও আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি আটটা মূর্তি। আর পাঁচজন কোথায়, অজানা আশংকায় আমার বুক কেঁপে ওঠে। কাকে জিজ্ঞেস করব অন্যদের কী হলো। আমার মত আর সবাইও তো একই আশংকা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খবরের আশায়। আটটা মূর্তি আরও স্পষ্ট হলো। ওরা এগিয়ে আসছে। চড়াইটা শেষ করে ওরা এবার নরম বরফ ঠেলে এগুচ্ছে। এখন আমরা ঠাহর করতে পারছি যে ওরা সবাই শেরপা—মেম্বাররা কেউই এ দলে নেই। সারা শরীরে একটা শীতল তরঙ্গ বয়ে গেল, মেয়েরা? তারা কোথায়—কিভাবে আছে? আছে তো? নাকি.....না না তা যেন না হয়। অন্য শেরপা দুজনই বা এ দলে নেই কেন? মনে হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করি—কিন্তু আমার পাদুটো কে যেন গেঁথে দিয়েছে এই বরফের মেঝের সঙ্গে। নড়বার শক্তি আমার নেই—হাত পা অবশ হয়ে গেছে। ওদের দলটা এবার প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে। সারিবদ্ধ ভাবে ওরা এগিয়ে আসছে, দলের পুরোভাগে পাসাং ফুটার। কারো মুখে কথা নেই। আমি আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম মেয়েরা কেউ আছে কি না, কিন্তু না, তিনজন মেম্বার সুদ্ধ পাঁচজন এ দলে অনুপস্থিত। আমার সেই সহযাত্রিনীদের আমিই তো টেনে এনেছিলাম এই দুর্গম পর্বতের গহন কন্দরে। তাদের না নিয়ে এখন আমি ফিরব কি করে? কেন মুখে গিয়ে দাঁড়াব তাদের অভিভাবকদের সামনে? দায়ী। পারবেন কি তাঁরা আমায় ক্ষমা করতে? ঝড়ের মত এ সব চিন্তা আমার দেহ মনকে অসাড় করে দিল। সারি বেঁধে ওরা এগিয়ে আসছে, নিজেদের অগোচরে আমরাও যেন কখন সারি বেঁধে ফেলেছি। আমার থেকে দুহাত দূরে এসে ওরা থামলো। পরিশ্রান্ত অবসন্ন চেহারা ওদের। যেন একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে ওদের ওপর দিয়ে। বরফে পুড়ে প্রত্যেকবারই মুখ কালো—জামাকাপড় সমস্ত ভিজে। মেশিনের মত যেন ওরা এসে থামলো আমাদের সামনে। বুকশ্বাসে অপেক্ষা করছি ওদের মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য। আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস হচ্ছে না। কি দুঃসংবাদ শুনতে হবে কে জানে। ওদের দেখে মনে হচ্ছে কথা বলার শক্তি ওরাও হারিয়েছে। তবু ওদেরই মধ্যে একজন তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিয়ে বলে উঠল 'দিদিলোগ আচ্ছা হ্যায়—উপর ক্যাম্পমে শোতা হ্যায়? আঃ! একটা বোঝা নেচে গেল। গলার কাছে কি যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল এতক্ষণ সেটাও যেন সরতে আরম্ভ করেছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। দলের মাঝামাঝি ছিল দা তেনসিং। ওর হাতে পতাকা জড়ানো তুষারগাইতিটা দেখে সামিটের কথা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। দা তেনসিংই উত্তর দিল, 'দিদি কাম বনগেয়া।' এই ছোট্ট কথাটায় এত আনন্দ লুকিয়ে আছে আগে ভাবিনি। মনে মনে দেবতাকে স্মরণ করলাম। আমরা তাহলে পেরেছি। কিন্তু উচ্ছ্বাসে অধীর হবার সময় এখন নেই। ওরা ক্লান্ত হয়ে এসেছে—ওদের বিশ্রাম দরকার কিন্তু ওরা যেন আর এক পাও তুলতে পারছে না। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম টাসী চোখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অন্যান্যদেরও খুব সুস্থ মনে হলো না। দা তেনজিংয়ের হাতে হাত মেলাতে গিয়ে বুঝলাম ওর হাতের আঙুলগুলো ঠান্ডায় অসাড় হয়ে গেছে। আনন্দে বিহ্বল আমরা সবাই সবাইয়ের সঙ্গে হাত মেলালাম কোলাকুলি করল শেরপারা পরস্পরের সঙ্গে। ওদের নিয়ে আসা হল আগুনের পাশে। জামা জুতো খুলে ফেলে শুকনো জামা পরল ওরা। ডাক্তারের ডাক পড়েছিল আগেই। টাসী ভুগছে তুষারান্ধতায়। দা তেনজিংয়ের হাত-পা নীল হয়ে গেছে—ঠান্ডায় অসাড়। জানা গেল পাসাং এক তুষার ধসের সঙ্গে গড়িয়ে গেছিলো শখানেক ফুট নীচে। ওর বুকে অসহ্য যন্ত্রণা তবু মুখের হাসি মুছে যায়নি। গরম পানীয় কিছু খাবার আর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দিয়ে ওদের শুশ্রূষা করা হয়েছে।

এখন ওদের শরীর স্বাভাবিক উত্তাপ ফিরে পেয়েছে। কথা বলার শক্তি ফিরে এসেছে সকলের। আজ সারাদিনের বিবরণ শোনার জন্য আমরা সবাই উৎসুক। তবু ওদের শরীরের কথা ভেবে আমাদের কৌতূহল দমন করতেই হলো। ওদের বিশ্রাম করতে দিয়ে আমরা যে যার তাঁবুতে

গলা ছেড়ে গান ধরলো। সুর, তাল থাকুক বা না থাকুক উচ্ছ্বাসে বিহ্বল ওরা জানালো আজ সারা রাত ওরা গান গাইবে। বুঝলাম ঘুমের আজ বারোটা বেজে গেল।

আমি অক্সিহারা। আমাদেরই একজন আজ রোপ্ট শিখরে তিনরঙা পতাকা তুলতে সক্ষম হয়েছে। পর্বতারোহণের ইতিহাসে আজ এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হল হল বাঙালী মেয়েদের এক নতুন ইতিহাস রচনা। আমার উচ্ছ্বসিত, খুশীতে ভরপুর। কিন্তু তার মাঝেও মনে পড়ছে তাঁদের কথা—যাঁরা প্রথম থেকেই আমাদের এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিলেন। আরো মনে পড়ছে তাঁদের, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা না করলে আমরা আজ অভিযানের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছতে পারতাম না। আর স্মরণ করছি আমার দেশের অগণিত জনসাধারণকে যাঁদের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ আজ আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে তাঁদেরই মাঝে। এ সাফল্য শুধু আমাদের নয়, এ সাফল্য মিলিতভাবে সবার। এ সাফল্য তাঁদের যাঁরা এগিয়ে এসে হাওড়া স্টেশনে আমাদের মাল তুলে দিয়েছেন গাড়ীতে, এ সাফল্য সেই শেরপাদের যে একা বসে একদিন মূল শিবির পাতারা দিয়েছে। এ সাফল্য তাদেরও যে রাত তিনটেয় উঠে বরফ গলিয়ে আমাদের চা করে দিয়েছে। সকলের সহযোগিতা ছাড়া এ সাফল্য সম্ভব হত কিনা জানি না। তাই সবার উদ্দেশ্যে মনে মনে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

২৯শে অকটোবর। দু নম্বর শিবিরের যাবতীয় জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে আমরা তৈরী। ওপর থেকে মেয়েরা নামলেই আমরা নীচে রওনা দেব। ওরা নামলো বেলা ৯টা নাগাদ। শিবিরের পর শিবির পেরিয়ে বাড়ী ফেরবার তাড়ায় ওরা ভোর থাকতেই চলা শুরু করেছে। আবার একচোট আলিঙ্গন আর উচ্ছ্বাসের পালা। ভাবাবেগ প্রশমিত হলে হৈ হৈ করে লক্ষ্মী বলতে সুরু করল তাদের শিখরাভিযানের কাহিনী। আমরা সবাই ঘিরে বসলাম ওকে। 'চতুর্দিকে পাহাড়ে ঘেরা, পায়ের নীচে শক্ত বরফের মেঝ আর যতদূরে তাকাই আদিগন্ত সাদা বরফের চাদর বিছানো—এ রকম একটা জায়গায় ছিল আমাদের তিন নম্বর শিবির। অবিশ্রান্ত তুষারপাত, বরফের কুচি উড়িয়ে হাওয়ার তান্ডব আর তুষার ধসের গর্জনে সারারাত আমরা কেউই ঘুমুতে পারিনি। খুব ভোরে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রুকস্যাকে ভরে নিয়ে আমরা রওনা হলাম শিখরের দিকে। দুটো দড়িতে আমরা সাতজন বাঁধা। কখনো হাঁটু পর্যন্ত কখনো বা কোমর পর্যন্ত নরম তুষারের মধ্য দিয়ে প্রায় সাঁতার কাটার মত করে আমাদের এগোতে হচ্ছিল। বেচারী স্বপ্না—ওর তো বুক পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল মাঝে মাঝে (দলের মধ্যে সবচেয়ে বেঁটে স্বপ্না)। উড়ন্ত বরফকুচি চোখে মুখে তীরের মত বিঁধছিল। তুষারপাতের জন্য কয়েক হাত দূরের জিনিসও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দড়ি টেনে অনুভব করছি সবাই ঠিক আছি কিনা। প্রতোক দশ কদমে আমাদের দাঁড়াতে হচ্ছে। আর দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে জুতোর ভিতর পায়ের পাতা জমে যাচ্ছে। চারপাশ বরফের ফাটলগুলো যেন মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে, এভাবে চলতে চলতে একটা তুষার ধসের কবলে পড়ল পামাং। ওর মত দুর্ধর্ষ শেরপা বলেই তার থেকে ও বেরিয়ে আসতে পেরেছিলো। অনেকটা সময় আমাদের নষ্ট হয়ে গেল সেখানেই। এতবড় দল নিয়ে এভাবে এগোলে শেষ পর্যন্ত শিখর চূড়ায় পৌঁছান যাবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। প্রত্যেকেরই ধীর গতি, ওই বরফের মধ্যে শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে চলা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। জল তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বুক ধড়ফড় করছে, নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। তবু সবাই এগিয়ে চলেছি—মনের অদম্য বাসনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে। বেলা ১টার কাছাকাছি। মনে হচ্ছে আজ সারাদিন চললেও পথ ফুরোবে না। অথচ ২টোর মধ্যে চূড়ায় না পৌঁছতে পারলে ফিরে আসা দুঃসাধ্য হবে। এই অবস্থায় ওখানেই আমরা ঠিক করলাম আমরা সবাই যাব না। আমাদের মধ্যে যে কেউ একজন এগিয়ে যাব চূড়ার দিকে। কিন্তু কে ফিরবে? এতদূরে এসে কারই বা ফিরে যেতে মন চায়? সবাই একটু সময় নিচ্ছি ভাবতে। সুদীপ্তাই প্রথম রোপ খুলে সরে দাঁড়াল। তারপর আমি। স্বপ্না ছিল রোপের একদম প্রথমে সুতরাং ওকেই অগ্রসর হতে বললাম আমরা। ঠিক হলো পাসাং ফুটার আর দা তেনজিং যাবে ওর সঙ্গে আর আমরা টাসী আর নাওয়াং শেরিংসের সঙ্গে ফিরে যাব।'

এবার শেষ পর্যায়ের বর্ণনায় স্বপ্না এগিয়ে এলো—'ওরা ফিরে গেলো। ভেতরে ভেতরে খুব খারাপ লাগছে। শিখরের এত কাছাকাছি এসেও ওরা ফিরে গেল, সে জন্য কোনো দুঃখও নেই ওদের মনে। দড়ি টেনে পাসাং জানালো এগিয়ে চলো। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলতে শুরু করলাম। কিন্তু চলতে যেন আর পারছি না। বরফপড়া আরও বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে হাওয়ার গতি। চোখা ফাটলগুলোর মুখ ঢেকে রয়েছে পাতলা বরফের আস্তরণে। পা ফেলার আগে আইস-এ্যাকস ঠুকে ঠুকে দেখতে হচ্ছে। মৃত্যুকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমার পা দুটোর ওপর আমার আর কোন কন্ট্রোল নেই। ওগুলো আপনা থেকেই উঠছে আর পড়ছে, মাঝে মাঝেই পা পিছলে যাচ্ছে। সামনে থেকে পাসাং দড়ি টেনে সামাল দিচ্ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাতাসের ঝাপ্টা আমাদের চোখে মুখে লাগছে। নাকের ডগা, গাল দুটো যেন কেটে যাচ্ছে। ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে—তবু চলেছি। আমাদের যে পৌঁছতেই হবে। রোপ্ট শিখরে আমাদের নৈবেদ্য রেখে আসতেই হবে। আমার এই গভীর ইচ্ছাই আমাকে ভেতর থেকে শক্তি জোগাচ্ছিলো। আর সেই বাসনাই এক সময়ে আমাকে পৌঁছে দিলো রোপ্টের শিখরে। 'পুকেয়ো পুকেয়ো' আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচাচ্ছে পাসাং। আমি দেখলাম এই আমার সেই স্বপ্নের শিখরচূড়া, তার ওপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। বিশ্বাস কর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়লো তোমাদের সবার কথা, বাবা মা আত্মীয়স্বজনের কথা, বন্ধুবান্ধব, শুভার্থীদের কথা। আমার মনে হোল আমাদের এই প্রচন্ড পরিশ্রম আজ সার্থক হলো। তুষার গাইতিতে বেঁধে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলাম আমি শিখরচূড়ায়। প্রণাম জানালাম দয়াময় দেবতার উদ্দেশ্যে। এবার ফেরার পালা। ফেরার কথা মনে হতেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। সেই রাস্তায় আবার ফিরতে হবে। আবার সেই প্রচন্ড সংগ্রাম। পদে পদে মৃত্যুকে মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। থামতে তো আসিনি, চলতেই এসেছি। শেষবারের মতো শিখরচূড়ায় প্রণাম জানিয়ে আমরা নামতে শুরু করলাম।

'চলো এবার আমরাও নামি—যেতে হবে অনেক দূর—সেই কোলকাতা' ইন্দিরার কথায় আমরা আবার ফিরে এলাম বাস্তবে। এতক্ষণ মগ্ন হয়ে শুনছিলাম লক্ষ্মী আর স্বপ্নার বর্ণনা।

এবার ফিরতে হবে। চারিদিকের এই সৌন্দর্যকে পিছনে ফেলে ফিরে যেতে হবে কোলাহলমুখর জনপদে। আমাদের এই অভিযানে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। নতুন নতুন উপলব্ধি, উত্তেজনা আর আনন্দের ক্ষণ এসেছে, কঠিন দারিদ্র, সংকটজনক মুহূর্তগুলোকে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। প্রকৃতি সর্বদা আমাদের পাশে পাশে, আমরা তার বুকের মধ্যে এসে পড়েছি, তার স্নেহ পরশ যেমন পেয়েছি তেমনি তার রোষের পরিচয়ও পেয়েছি। কিন্তু কোন দুর্গমতাই আমাদের বাধা দিতে পারেনি। তাই পথ ভয়ঙ্কর হলেও তা আমাদের কাছে অগম্য হয়ে থাকেনি। এই মুহূর্তে বুঝতে পারছি, কেন সব কিছু উপেক্ষা করে মানুষ পাহাড়ের ডাকে বেরিয়ে পড়ে।

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

পথটা এবার গ্রাম্য পথের মতই, ধুলোভরা কাঁচা সড়ক। পাকা রাস্তার গায়ে এসে থেমে গেছে রাস্তাটা। বাস স্টপেজে লোকজন, দু-চারটে দোকান-পশার, কৃষিবন্ধু স্টোর্স, সার ও বীজের বেড়াঘেরা দোকান-এর পাশ দিয়ে হাটতলার ফাঁকা চালা-গুলোকে বাঁয়ে রেখে বাঁদিকের মজা নদীর কাঠের পুল পার হয়ে চলে গেছে গ্রাম-গুলোর দিকে।

মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলেই মাটির রাস্তাটার খাল খন্দে জমে আছে কাদা জল। গরুর গাড়ির যাতায়াত তবু রয়েছে, ফলে সেই কাদা জল কমে না—আরও মাখামাখি হয়ে রয়েছে পথের বুকে।

বাস থেকে নেমে অসীম এগিয়ে যায় ওদিকে দাঁড়ানো কয়েকটা সাইকেল রিকসার দিকে। গ্রামটার নাম ঠিক জানা নেই—তাই ওদের গন্তব্যস্থলের নাম বলতে গিয়ে চাইলো। শীলাই নামটা যুগিয়ে দেয়,

—দক্ষিণ সেরপুর!

অসীম কিছু বলার আগেই রিকসা-ওয়ালা ছেলেটি জানায়,

—ওবে বাবুবা, সে পথে এখন হাঁটু ভোর গর্ত, জল-কাদায় রিকসা এখন যাবে না বাবু।

শীলা চুপ করে থাকে। নীরবে ওর কথাটার যেন সমর্থনই করলো সে।

অসীম শুধোয়,—তবে?

শীলা বলে—হাঁটতে হবে, তাছাড়া আর উপায় নেই। অবশ্যি পথ বেশী নয়, মাইল তিনেক হবে। চলো হেঁটেই চলে যাই।

সকাল থেকে বৃষ্টিটা ধরেছে। সূর্যের তেজ নেই। আকাশটা রুপোলী আভায় চকচকে হয়ে বেলা বাড়ার একটু চিহ্ন এনেছে মাত্র।

বালি মাটির পথ। দু দিকে ঘন বাঁশ-বনের প্রহরা। নীচেটা ফাঁকা ভিজে-ভিজে আর পরিষ্কার। তারই মাঝে কালো ঘন সবুজ বাঁশ গাছগুলো জড়াজড়ি করে পাতার জমাট ভিড়ে নিজের অস্তিত্ব মিশিয়ে দিয়েছে। বাতাসে দুটোপুটি করে পাতা-গুলো।

অসীম চেয়ে থাকে ঘন সবুজ ওই বননির্জনের দিকে। কয়েক ঘন্টা আগে

তারা কলকাতায় ছিল। সেখানে এখন কর্ম-ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। হাজার মানুষের ভিড়, ট্রাম-বাসের গুঁতোগুঁতিও লেগেছে। মানুষগুলো সেখানে দৌড়চ্ছে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

একটা মিষ্টি সুর শোনা যায়।—বউ কথা কও। সবুজ বননির্জনে বাতাসের হু-হু শব্দে সেই সুরটা মিশেছে কি মিনতি নিয়ে।

—কি বলছে জানো?

শীলা অসীমের দিকে চাইল। ওর ফর্সা নিটোল মুখে পথচলার পরিশ্রমে ঘাম জমেছে, প্রতিমার মুখের তেলঘামের মত চকচকে ভাব হয়ে উঠেছে মুখটায়। তাতে ফুটে উঠেছে শান্ত মাধুর্যময় একটু আবেশ।

অসীম বলে—বউ কথা কও পাখি না?

শহরতলীর ভিড় আর ঘিঞ্জির মধ্যে মানুষ হয়েছে অসীম। এই সবুজ ছায়া-স্নিগ্ধ জগতকে সে চেনে না। ওই পাখির নাম বই-এর পাতায় দেখেছে সে। এককালে তাদের বাড়ির আশপাশে কিছু গাছগাছালি ছিল। ভোরবেলায় পাখিগুলো কলরব করতো দত্তদের বাগানে—ওপাশের ঝিলের ধারে পিটুলী আঁশফল বাঁশগাছের জটলার মধ্যে।

ক্রমশ সেসব জায়গাও বিক্রী হয়ে গেছে ঝিল বুজিয়ে সেখানে উঠেছে টানা লম্বা টিনের শেড। গুদাম, বস্তবাড়ি আর বাজে মানুষের ভিড়ে ভরে উঠেছে চারিদিক, পাখী-ডাকা সবুজ স্নিগ্ধ রাজ্য কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পাখীরাও নেই।

তাই ওই ডাক শুনে অসীম হঠাৎ সেই দিনগুলোকে ফিরে পায়। পাখীডাকা সকাল-সন্ধ্যার সেই চঞ্চল কিশোর এমনি ধুলো-মাটির পথে কোথায় হারিয়ে গেছে।

শীলা আর সে।

সেদিন ওরা জীবনকে এত কাছ থেকে দেখে নি। যেটুকু দেখেছিল তাতেই খুশী হয়ে উছলে পড়তো। ঝিলের ধারে সুপারি গাছের সারি। এককালে কোনও বড়লোকের বাগানবাড়িই ছিল এটা। এখন পরিত্যক্ত বাড়িটায় স্কুল বসে। আর তাদের পাড়ার এই দিকটা জংগলে আর আগাছায় ঢেকে গেছে।

ওরা আসতো এই ঝোপে জংগলে প্রজাপতি না হয় পাকা লালচে কামরাঙার সন্ধানে। দূরে জলা—কচুরীপানার সবুজ বুকে বেগুনী রং-এর ফুল ফুটেছে। তার পাশাপাশে উঁচু রেল লাইন দিয়ে অস্ত্র ধোঁয়া ছিটিয়ে ট্রেনগুলো যেতো দমদম জংশন ছাড়িয়ে শিয়ালদার দিকে।

—একদিন শিয়ালদা যাবি শীলা?

শীলা শাড়িটা কোমরে জড়িয়ে কামরাঙার ফলন্ত ডাল থেকে লাল ফলগুলো সংগ্রহে ব্যস্ত। ওর মুখে মাথায় ফুলের পরাগ লেগে আছে। শীলা ডাগর দু চোখ মেলে ওর কথায় বলে,

—কবের মেলায় গেছলাম মামার সংগে। ট্রাম-বাস, একেবারে ইয়া দোতলা বাস চলছে। কতো পুতুল—নাগরদোলা, পাখী আর পাঁপড় ভাজা বিক্রী হয়।

অসীম মাঝে মাঝে ট্রেনে করে শিয়ালদা যায়। এর পর রোজই যাবে সে। কলেজে পড়বে সেখানে পাশ করে। তার কাকার মত নকুদার মত মাস্থলী টিকিট হবে তার নামে। অসীম বলে—ধ্যাৎ। ও তো মেলায় বিক্রী হয়। বুঝলি, পাশ করলে কলকাতার কলেজে পড়বো। ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতে হবে।

শীলা জানায়—আমিও পড়বো কলেজে।

অসীম যেন ওর সেই ভাগ্যটাকে বিশ্বাস করতে পারে না। শীলার কথায় খেঁকিয়ে ওঠে। — ইস। এখন ইস্কুলের দিদিমণির বেড়া পার হ দেখি? এবার ক্লাশে তো গাড়ু—

—বেশ। তুমি না হয় ভালো ছেলে, আর আমি ফেলমার্কা। তা মিশতে কে বলে?

শীলার আত্মসম্মানে বেজেছে। ওর ডাগর চোখ দুটোয় বেদনার্ত চাহনি ফুটে ওঠে। মামার বাড়িতে সে মানুষ। বাবা করে মারা গেছেন মা গেছে তার আগেই। তাই মামা দয়া করে ওই সবহারা মেয়েটাকে এনে রেখেছে বাড়িতে। তাই নিয়ে মামীমার মুখ-ঝামটা কতো শুনতে হয় শীলাকে তা শীলাই জানে। সারা মন বেদনায় নীল হয়ে ওঠে।

মামীমায়ের বাড়িতে ঝিগিরিই করতে হয় তাকে। বাজার কাজ দেখতে হয়। মামা-তো ভাই-বোনদের সামলানো, দরকার হলে হেঁসেল ঠেলা এসব করে কোনমতে পড়া-শোনা করে শীলা। তাই পড়ার সময়ও পায় না। আর যে যা বলে বলুক—অসীমের কাছে ওই তীক্ষ্ণ কথাগুলো শুনে শীলার সারা মন কি বেদনায় মুচড়ে ওঠে।

—এ্যাই। অসীমও অবাক হয়, শীলার ডাগর চোখ জলে ভরে আসে। টলমল করে। শীলা অভিমানভরা স্বরে জানায়,

—থাক।

সরে যেতে চায় সে। বেশী হয়ে গেছে। শীলার খেয়াল হয় আনমনে অসীমের সঙ্গে এই দিকে এসে পড়েছে। মামীমা খোঁজ করবে। সেই ভয়টা সব জ্বালা ছাপিয়ে মন ভরে তোলে।

—শীলা! শোন! ওসব কথা এমনিই বলেছিলাম তোকে। রাগ করলি—ওর হাতটা ধরে ফেলেছে অসীম। নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে শীলা। কিন্তু পারে না। অসীমের টানে ওর বুকের উপরই পড়েছে। ওর নিবিড় করোষ্ণ ছোঁয়ায় কি যেন তীব্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে শীলার সারা দেহ মনে।

ওই অতল স্পর্শটা তাকে কোন অতলে নিয়ে চলেছে। হাঁপাচ্ছে শীলা, তার বাধা দেবার সব শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে গেছে। একটা আলোকস্নাত অনুভূতির অসীমে হারিয়ে যায় সে।

অসীমও চমকে উঠেছে। দুজনে এত-দিন মিশেছে। দেখেছে শীলাকে। কিন্তু ওই দেহের অতলে এমনি একটা বিচিত্র অনু-ভূতির রাজ্য আছে তা জানতো না। দুজনের কাছেই এটা ছিল অজানা। হঠাৎ শান্ত নির্জন সবুজে তারা কি এক অদেখা জগৎকে যেন দূর থেকে দেখেছে। তাই ওরা বিস্মিত সচকিত।

শীলা চলে গেছে। তখনও অসীম দাঁড়িয়ে আছে সেইখানে। পাখীটা ডাকছে। তীক্ষ্ণ সুরেলা সেই ডাকটাকে বহুকাল পরে আবার আজ শুনেছে অসীম।

—বউ কথা কও!

সেই পাখীর সুর আজও বহু দিন বৎসর পার হয়েও বাতাসে ভেসে আসে। গ্রাম বলতে পথের দুধারে মাঝে মাঝে ছড়ানো দু-একটা বাড়ি। রাংচিতরের ঘন সবুজ কালো বেড়া ঘেরা, এদিক-ওদিকে পাট ক্ষেত। সবুজের বুকে ঢেউ-খেলানো আভাস, ওদিকে পথের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে সেই মজা নদীটাও চলেছে, ঠাঁই ঠাঁই ওর কালো গভীর জলের নিশানা। আবার কোথাও মজা নদীর বুক দখল করেছে পাট গাছের জটলা।

—আর কতো দূর তোমার দক্ষিণ সেরপুর?

শীলা জানায়—আর একটু পথ।

দূরের ছায়া-ছায়া গ্রামসীমার পানে আঙ্গুল তুলে দেখায়। অসীম বলে,

—আর চাকরীর জায়গা পেলে না? এলে কিনা এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে?

শীলা হাসল, অসীমের কাছে মনে হয় ওই হাসিটা কান্নার মতই করুণ আর বেদনার্ত। জানে সে শীলার এই চাকরী নেওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। শীলা নিজেকে এমনি নির্বাসনে লুকিয়ে রাখতে চায়। হয়তো শহরতলীর সেই উপছে-পড়া প্রাচুর্য আর জীবনের মাঝে নিজেকে ভেবেছিল কাঙ্গাল, বঞ্চিতের দলে। সেই অভিমানে শীলা এখানে সরে এসেছে।

আর শীলার জীবনে এই শূন্যতার জন্য দায়ী অসীমও। অসীম নিজের দোষ এড়াতে পারে না এক্ষেত্রে। সেও অপরাধী।

শীলা সেদিন অনেক স্বপ্ন দেখে-ছিল। অসীমদের বড় বাড়িখানা ওই শহর-তলী এলাকায় বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। সামনে বেশ খানিকটা বাগান, গেট পার হয়ে একটু পথ, এর পর ওদের বাড়িটা। বাগানে চাঁপা, কাঁঠালী চাঁপা, বেলা, রজনীগন্ধা ফুলের গাছগুলো সতেজ হয়ে উঠছে বর্ষার ছোঁয়ায়। কোথায় সবুজ পত্রাবরণের আড়ালে কাঁঠালী চাঁপার উগ্র সৌরভ ওঠে। অসীমের বাবার লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা এখন সাতে পাঁচে ফুলে ফেঁপে উঠছে। তাদের বড় বাড়িটার ওপাশে পুরোনো চুন-বালিখসা একতলা বাড়িটা শীলার মামার আশ্রয়স্থল। অসীমদের দোতলার বারান্দা থেকে ওদের একতলার উঠান এদিক-ওদিক কিছুটা দেখা যায়।

অসীমকে শীলা এড়িয়ে চলে ওই ঘটনার পর। কিন্তু মামীমার হাত থেকে এড়াতে পারে নি সে। ফিরতে দেরী হয়ে

রুপালী পর্দার
ফেলে আসা দিনগুলির পর
আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
কিন্তু আপনি?
বিন্নী
শার্টিংস ও
ড্রেস মেটিরিয়ালস ঃ
মহাকাশ-যুগের
মতই বিভীক ও
সুন্দর প্রসারী
প্রাণচঞ্চল ছন্দমধুর ডিজাইন।
পরিপাটি আধুনিক…
নবীনতম ফ্যাশান।
বিন্নী
TERENE ব্রিজেশের
Interpub/BB/42/73 ben

গেছে, মামীমা তাই সেদিন ওকে চুপচাপ বাড়ি ফিরতে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে,—কোথায় থাকিস মুখপুড়ী?

শীলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর এই চুপচাপ থাকাটা স্বভাব, মামীমা ভাবে এটা ওর বদমাইসীর লক্ষণ। গভীর জলের মাছ। তাছাড়া এত অবহেলা লাঞ্ছনা সত্ত্বেও মেয়েটার দেহ ছাপিয়ে এসেছে যৌবনের সাড়া। ওর গা হাত পাগুলো ভরাট হয়ে উঠেছে। এটা মামীমার মনে নতুন ভাবনা, হয়তো বা মেয়েদের সহজাত হিংসাও কিছু এনেছে। তাই মামীমার রাগও বেড়ে ওঠে। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মামীমা গর্জায়, —সবই বুঝি, তবে শেষ কথা বলে দিলাম, ওই নষ্টামী দেখলে ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে দূর করে দোব। যা, একগাদা বাসন পড়ে আছে, মেজে আন।

দোতলা থেকে দেখছে অসীম ওই লাঞ্ছনা আর অপমান।

শীলা তবু মুখ ফুটে কিছু বলে না। কদিন অসীমের সঙ্গে কথাও বলেনি। অসীমকে বারান্দায় দেখলে শীলা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াতো। ডাগর কালো চোখ মেলে চেয়ে থাকতো ওর দিকে, ওর মুখে ফুটে উঠতো মিষ্টি হাসির আভাষ।

কদিন থেকেই অসীমকে সে এড়িয়ে গেছে।

অসীম দেখেছে শীলাকে, ওর মনের একটা নতুন সুর সারা চেতনাকে ভরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তার যেন কোনো সার্থকতা নেই।

বৈকালের পড়ন্ত বেলায় সেদিন শীলা একা স্কুল থেকে ফিরছে। দত্তদের বাগানের পিছনের পথটা নির্জন। অসীম শীলাকে দেখে দাঁড়ালো, শীলাও চমকে উঠেছে ওর সেই উদ্বেলমুহূর্তের সবহারানো চাঞ্চল্য জাগে সারা মনে সরম জাগানো একটি রঙীন অনুভূতিকে শীলা জোর করে চেপে রাখতে চায়।

—কথাই কও না? দেখা হলে এড়িয়ে যাও। অসীম অনুযোগ করে।

শীলার মনে পড়ে মামীর কঠিন শাসন আর জ্বালাভরা কথাগুলো। তাকে ওই নরক থেকে বাঁচতে হবে, সামনে পরীক্ষা। তাই শীলা জানায়,—এছাড়া পথ নেই। আমরা গরীব—

—গরীব বড়লোকের কথা নয় শীলা? অসীম কি যেন জানাতে চায় তাকে, তার মনের আলোয় ওই সব কিছু আজ অর্থহীন বলে মনে হয়, শীলা হাসল। হাসিটুকুই ওই নিঃস্ব মেয়েটার মনের কি অফুরান সম্পদের ইঙ্গিত আনে। শীলা বলে—

—আমার কাছে ওইটাই বড় কথা। নইলে মামীর ওই সব কথা সয়েও বেঁচে আছি কেন?

অসীম কলেজে ঢুকেছে। তার চোখের সামনের জগত কি স্বপ্ন সৌরভে ভরা, সে পাশ করবে। বড় হবে। বাবার ইচ্ছা অসীম চার্টার্ড একাউন্টেন্ট হবে, তাদের ব্যবসা—কাজ-কারবারের একদিকের ভার নেবে।

ওর জগতের মাঝে শীলা একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু। কিন্তু শীলার বন্ধ ছোট পরিসরের ওই নিঃস্ব জীবনের যন্ত্রণাটা তার জানা নেই, তাই শীলার কথা-গুলো ঠিক বুঝতে পারে না। শীলা চলে গেছে, তাকে এড়িয়ে চলে গেছে। অসীম ওর বন্ধু প্রকাশকে আসতে দেখে চাইল।

প্রকাশ হাসছে,—ছুঁড়িটার সঙ্গে তোর তো খুব জমেছে রে?

প্রকাশের কথায় অসীম বলে,—আজে-বাজে কথা বলতে এতটুকু বাধে না?

হাসছে প্রকাশ—ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস, বল্লেই যতো দোষ! ঠিক আছে বাবা। মজা লোট তুই। তা হ্যাঁরে, সিনেমায়-টিনেমায় যায় তোর সঙ্গে, না শুধুই হিড়িক দিচ্ছিস?

ওরা এমনিই। অসীম ওদের এইসব কথার জবাব দেয় না। ওরা জানে না শীলার জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা আর দুঃখের কথাগুলো। মামীমার ছেলেমেয়েগুলো অবধি শীলার যেন শত্রু। অসীম এক জায়গায় নিজের নিদারুণ অক্ষমতাকে বার বার দেখেছে। শীলার জন্য কিছুমাত্র করার সাধ্যও তার নেই। এই কথাটা যত ভেবেছে ততই অসহায় বোধ করেছে নিজেকে।

আজ বৈকালের ব্যাপারটা নিয়ে বাড়িতে ঝড় উঠবে তা জানতো না শীলা। মামীমার শরীরটা ভালো নেই। বৈকালে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরছে। শীলাও এবার পরীক্ষা দেবে। তাই স্কুলে গেছল একটু কাজে।

কিন্তু তখনও ফেরেনি সে। মামাতো বোন গৌরী খবর দেয়,—শীলুদিকে দেখলাম অসীমদার সঙ্গে দত্তদের বাগানের ওদিকে।

চমকে ওঠে মামীমা। মেয়েটার স্বভাব-চরিত্রর সম্বন্ধে এমনি ধারণা তার একটা হয়েছে। ওবাড়ির অসীমের সম্বন্ধেও কোথায় একটা প্রশ্নও তার মনে জেগেছিল। মামীমা গুম হয়ে যায়।

আর সেই চোটটা পড়ে শীলা বাড়ি ঢুকতে। অতর্কিতে ওর চুলের মুঠি ধরেই মুখে গালে ঘাকতক চড়-চাপড় কসে দিয়ে গর্জায়—দূর হয়ে যা। এমনি করে মুখ-পোড়াবি তা জানতাম। কেমন বংশ দেখতে হবে তো?

শীলা দুঃসহ অপমানে কাঁদছে আর মামীমার হাত-পা ধরে এবাড়িতে এই আশ্রয়-টুকুকে কায়েম রাখার চেষ্টা করছে। মামাও। অফিস থেকে ফিরেছে, সামনে স্ত্রীকে ওমনি চামুণ্ডা মূর্তিতে দেখে অবাক হয়। কিছু শুধোবার আগেই, শীলা কিছু জানাবার আগেই মামীমাই শোনায়,

—তোমার সাধের ভাগ্নী এবার মুখ-পোড়াবে। ছিঃ ছিঃ, নষ্টামীও দেখতে হবে? ওই ঘোষবাড়ির অসীমের সঙ্গে—

মামাবাবু তবু স্ত্রীকে থামাবার চেষ্টা করেন—আঃ। কি যা তা বলছো?

—যা তা বলছি আমি? সারা পাড়ার লোকে জানে।

...কথাগুলো সন্ধ্যার বিবর্ণ অন্ধকারে এবাড়ির বাতাসেও ভেসে আসে। শীলার কান্নার শব্দটা তবু প্রকাশ পায়নি। শূন্য বাতাসে মিশে ছিল তার হাহাকারের শব্দ।

অসীম শুনেছিল আর গুমরে উঠেছিল কি অসহ্য যন্ত্রণায়। ওর মাকে বারান্দার দেখে একটু অবাক হয়। ওই করুণ নাটকের সে-ই অদৃশ্য নায়ক। পড়বার চেষ্টা করে, দেখছে মায়ের মুখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

ওকে দেখে মা বলে,—মেয়েটাকে ওই মামীই শেষ করবে নাকি? এমন শান্ত ভালো মেয়েটাকে দিন-রাত কিগিরি করিয়েও সাধ মিটছে না, এইবার শেষ করবে।

অসীম চুপ করে কথাগুলো শোনে। মনে হয় একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে সে, শীলাকে ওই নরক থেকে উদ্ধার করে আনবে। তাকে সুখী করবে। ওর সামনে শান্ত সুন্দর সেই পূর্ণতার ছবিটা কি উজ্জ্বল আভা নিয়ে ফুটে ওঠে। জীবনের এমনি পূর্ণতার কথা এর আগে সে জানতো না।

কিছুদিন শীলা আর বাড়ি থেকে বের হয়নি। ঘরের কাজ নিয়ে থাকে

মামাতো বোন গৌরীর মুখেই শুনেছে—পড়ছে খুব।

গৌরী অবশ্য বেহায়ার মত পথেঘাটে চলাফেরা করে। শীর্ণ দেহটাকেই যথাসম্ভব সাজিয়ে নিষ্প্রভ ঠোঁটে গালে রং মাখিয়ে আকর্ষণীয় করে তোলে।

অসীমকে সেদিন শীলার খবর নিতে দেখে ওর গায়েঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে বিলোল চাহনি ছড়িয়ে বলে,

—দিন-রাত পড়ছে। পাশ করবে না ছাই!

তারপরই আসে নিজের কথায়—কোথায় চলেছ অসীমদা সেজেগুজে? সিনেমায়? উঃ বেদিং বিউটি নাটক টেরিফিক বই হয়েছে। একদিন যাবো ভাবছিলাম—

অসীম দেখছে ওকে। মেয়েটা এবার পরীক্ষায় ফেল করেছে তবু এতটুকু চেষ্টা নেই পড়ার। টইটই করে ফিরছে। অসীমের বিশ্রী লাগে। শীলা তার কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। বারান্দা থেকে দেখা যায় ওদের বাড়ির উঠানে বসে শীলা বাসন ঘুচ্ছে, ওকে দেখেও দেখল না। মুখ নামিয়ে কাজ করে যায়।

হয়তো ওই কলের জলের সঙ্গে তার চোখের জলও ঝরেছে, সে খবর জানে না অসীম। শীলা নিজেকে যেন পাথর করে তুলেছে। কি নীরব সাধনার মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে।

অসীমও খবরটা শুনেছে।

পাড়ার রূপ বদলাচ্ছে। আশপাশের ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট হয়ে বাড়ি উঠছে। এসেছে অনেক নতুন মানুষ। রকে ছেলেদের আড্ডা জমে। মেয়েরাও এখন একটু বেশী-মাত্রায় ঘোরা-ফেরা করে যখন তখন। প্রকাশ্য পথেই কলরব করে ছেলেদের সঙ্গে।

ওখানেই পরীক্ষার খবর আসে প্রথম। পাড়ার মধ্যে মেয়েরাই ভালো রেজাল্ট করেছে।

কে বলে ওরা পড়াশোনা করে আর তোরা করিস রকবাজী ফাশেন; পড়বি কখন?

শীলার মামীর চড়া গলা শোনা যায়। গৌরী এবারও পরীক্ষা দিয়েছিল, যথারীতি ফেল করেছে। আর সারাদিন ঝিগিরি করে লাথি ঝাঁটা খেয়ে শীলা কিনা সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করে গেল।

মামীমার গলা শোনা যায়—শত্তুর, কাল শত্তুর কিনা পাশ করে গেল আর তুই ল্যাক হাসাচ্ছি? মুখপোড়া মাস্টারগুলোও হয়েছে অমনি। মুখ দেখে পাশ করায়। হারামজাদীর চোখে যে আগুন আছে গা?

শীলার সম্বন্ধে কথাগুলো শুনে সেদিন মনে মনে হেসেছিল অসীম। খুশি হয়েছিল। আর সেই খুশির খবর জানিয়েছিল বারান্দা থেকে, শীলার আঁধার কালো মুখে সেদিন দেখেছিল অসীম একটু সাবধানী হাসির সন্তর্পণ প্রকাশ।

অসীমের সঙ্গে শীলার দেখা হয়ে যায় শিয়ালদহ স্টেশনের ওদিকে, দুপুরের আলস্য নেমেছে পথে। অসীম বি-কম পাশ করে এবার কোন ফার্মে আর্টিকলড ক্লার্ক হয়ে কাজ শিখছে, সি-এ পড়ছে? বাবার দৌলতেই তার কোন বন্ধুর ফার্মে যায় এখন।

হঠাৎ শীলাকে দেখে দাঁড়ালো—তুমি!

শীলার মুখে হাসির ঔজ্জ্বল্য। এখানে মামীমা-গৌরীর প্রহরা নেই। এতদিন নিজেকে বহু কষ্ট করে অসীমের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিল, আজ যেন সেই আবেগ মুক্ত জলধারার গতিপ্রবাহের মত চাঞ্চল্য নিয়ে ফুটে ওঠে। অসীম বলে,

—পাশ করার খাওয়াটা আজ আমিই খাওয়াবো কিন্তু। তা কোথায় এসেছিলে? কলেজে ভর্তি হতে?

শীলার ফর্সা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ওর কথায় হাতের কার্ডখানা দেখিয়ে বলে,

—কলেজে আর এগোবার ভাগ্য হবে না কোনদিন। এই যে। বেকারের খাতায় নাম লিখিয়ে এলাম। এবার বাঁচতে চাই—তাই নিজের জন্য একটা কাজ-কর্মের দরকার।

শীলার এই রকম অবস্থার খবর জানে অসীম। ও যেন তার কাছেই এই আবেদন জানায়।

বৈকালের পড়ন্ত রোদে ওরা দুজনে ইডেনের সবুজ পরিবেশে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে ঝিলের ধারে। জলরেখার ওপারের ঘন সবুজ ঝাউবনের আড়ালে সূর্যের রক্তিম বেদনায় বিদায়ী আভাস ফুটে ওঠে। অসীম শীলাকে আজ নতুন করে চিনেশে। কৈশোরের ব্যবধানে ওর দেহ-মনে এসেছে নতুন একটা চেতনা। আরও পরিণত হয়েছে তার চিন্তাধারা। চোখের অতল চাহনিতে জেগে ওঠে নতুন কোন চেতনার সন্ধান।

শীলা! অসীম ওকে ডাকছে।

শীলা ভাবনার জগতে হারিয়ে গেছে। অসীম সাহসী হয়ে উঠেছে, বলে সে, নিজের পায়ে একদিন দাঁড়াবো শীলা। সেদিন—

শীলা হাসল ওকে দেখে, হালকা স্বরে বলে,

—চলো, বাড়ি ফিরতে হবে না?

—বাড়ি। অসীম বলে—সেখানে কি সান্ত্বনা আছে তোমার?

শীলা জবাব দিল না। শুধু চেয়ে থাকে—নীরব সেই চাহনিতে ফুটে ওঠে নিদারুণ অসহায় একটা বেদনা।

...এ যেন তাদের কাছে জীবনের পাত্র থেকে করুণ মুহূর্তগুলো কি পূর্ণতার প্রসাদে ভরিয়ে তোলার দুর্বার প্রয়াস। শীলা মাঝে মাঝে চলে আসে। অসীমের সঙ্গে শহরের এই বৈচিত্র্যের মাঝে উধাও হবার নেশাটা তাকেও পেয়ে বসেছে। দু-একটা চাকরীর খোঁজেও আসতে হয়। মামীমাকে এখন মিথ্যা কথাও বলে শীলা।

এই চাকরীটার জন্য ভাবছি মামীমা। হয়ে গেলে ভালোই হয়।

মামীমাও আশা করে মেয়েটার একটা কাজ-কম্মো হবে, আর তার রোজগারের টাকাটা মামীমায়ের হাতে আসবে। অবশ্য শীলা এখনই দু-চারটে টুইশানি করে যা পায় সেটাও মামীমায়ের হাতে দেয়।

তাই ওর চাকরীর জন্য যাতায়াতের ছুটি মেলে।

হাসে অসীম—যদি মামীমা বুঝতে পারে এইসব ব্যাপার?

শীলার চোখে ফুটে উঠে তৃপ্তির হাসি, বঞ্চিত জীবনে আজ সেও স্বপ্ন দেখে, পূর্ণতার স্বপ্ন। সে আর অসীম। শীলা আজ নতুন আশ্বাস খুঁজে পেয়েছে ওই অসীমের মাঝে।

শীলা তাই ওর কথায় জবাব দেয়—বুঝুক গে?

শীলার চোখেমুখে নিটোল তৃপ্তির আভাস। অসীম অবাক হয়।

—খুব তো সাহস তোমার?

—মেয়েদের এ সাহস আছে স্যার, তারা অনেক কিছু করতে পারে।

—কিসের জন্য?-

সলজ্জ হাসিতে শীলার মুখ ভরে ওঠে —জানি না, যাও!

শীলার চোখে আজ সেই ফিরে-পাওয়া তৃপ্তির আভাস। বেলা বেড়ে উঠেছে। সূর্য-ওই মেঘ-ঢাকা আকাশে কোথায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। তবু তার ঘসা কাঁচের মত অস্বচ্ছ আলোর ইশারা লেগেছে দিগন্তহোঁয়া পাটক্ষেতের বুকে। পাটকাঠির বেড়াঘেরা পাটলের ক্ষেতে সাদা ফুল ফুটেছে—লালচে পাকা পটলগুলো ছড়িয়ে আছে এদিক-ওদিকে সবুজ পাতার ভিড়ে।

ওরা দুজনে একটা সোঁদাল গাছের নীচে বসেছে। গাছটায় হলুদ ফুলের মঞ্জরীগুলো দুলছে, ফুরিয়ে ফুরিয়ে করে পড়ছে ফুলগুলো – এখনও দু-চারটে মৌমাছি গুনগুনিয়ে ফেরে শেষ ফুলের মেলায়। তারপর আর আসবে না ওরা। অপরিচিতের মত দাঁড়িয়ে থাকবে গাছটা।

অসীম বলে—বসে থাকলে পথ ফুরোবে না। চলো, তোমার দক্ষিণ সেরপুরটাকে আবিষ্কার করে আসি।

শীলা হাসল, বলে সে—বিসর্জন দিতে পারলে মুক্তি পাও, না?

চমকে ওঠে অসীম। শীলা পথে বের হয়ে ফ্ল্যাস্কে চা আর কিছু স্যাণ্ডউইচ, ডিমসেদ্ধও এনেছিল। গাছতলায় ক্ষণিকের সংসার পেতেছে তারা।

—চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দুটো স্যাণ্ড-উইচ নাও।

অসীম চা খেতে খেতে ওর কথায় চাইল শীলার দিকে। বিসর্জনই বটে।

শীলা আজ বিসর্জিতা। এই শীলাকে সেইই বিসর্জন দিয়েছে তার জীবন থেকে।

মনে মনে শীলা হয়তো বাঁচার, ঘর-বাঁধার অনেক স্বপ্নই দেখেছিল। ওর মামীমাকে ও মিথ্যার পর মিথ্যা কথা বলেছে শীলা, ভেবেছিল অসীমের কাছেই সে আশ্রয় পাবে।

তাই সব ভুলে অসীমের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল।

হঠাৎ চমকে ওঠে শীলা।

সেদিন পৃথিবীর রূপ রং বদলে যায় তার সামনে। বিবর্ণ হয়ে ওঠে শীলার সব স্বপ্নের রঙীন আকাশ। সেখানে জমছে ঝড়ের কালো মেঘ। সব ভাব হারিয়ে যাবে।

অসীমও এটা ভাবতে পারেনি। ভেবেছিল তার দিনগুলো এমনি নিশ্চিন্ত পাওয়ার আভাসে ভরে উঠবে। কোন দামই দিতে হয়নি এতদিন, কিন্তু হঠাৎ বাবার কথা-গুলোয় চমকে উঠেছে সে। বাবা বলেন অসীমকে, —ও'দের আমি কথা দিইছি। তাছাড়া নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথাও রয়েছে। মিঃ দেব-এর ফার্মের সব চার্জ তোমাকে নিতে হবে। বিরাট ফার্ম। সামনের মাসেই শুভকাজ সেরে ফেলতে চাই।

বাবা গম্ভীরভাবে তাকে হুকুম দিয়ে বের হয়ে গেলেন কারখানায়। ছেলের ভবিষ্যৎ-এর ব্যবস্থাও পাকা করেছেন তিনি।

মিঃ দেব-এর বিরাট ফার্ম আসবে তার হাতে. বিনিময়ে মিঃ দেব-এর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। মোটা কুমড়োর মত মেয়েটিকে এর আগেও দেখেছে অসীম। ফ্যাস ফ্যাসে পাতি হাসের মত গলা, আর সোকাট ব্লাউজে আধঢাকা মাংসল দেহের দিকে চাইলে কেমন আঁতকে উঠতে হয়।

...তাকেই নিয়ে ঘর বাঁধতে হবে অসীমকে।

কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে। শীলাও শুনেছে। গৌরীই খবরটা আনে এ বাড়ীতে। শীলা ওপাড়ায় দু বাড়িতে টুইশানি সেরে ফিরছে. দুপুরে অবকাশে বের হবে সে। অসীমের ওখানে গিয়ে তার সঙ্গে চলে যাবে মুক্ত অঙ্গনে. কি একটা নাটক দেখতে। নাটক দেখাই মুখ্য নয়—দুজনের নিবড় মেলামেশার স্বপ্নটাই বড় কথা। তাই নিয়ে শীলা সব ব্যর্থতাকে ভুলে আছে।

বাড়ি ঢুকে গৌরীর কথায় থমকে দাঁড়ালো। গৌরী আড়চোখে শীলাকে দেখছে। আজ সে খুবই খুশি হয়েছে মনে মনে। তাই জানায় গৌরী।

—শুনেছিস তো? ও-বাড়ির অসীমদার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে। মস্ত বড়-লোকের মেয়েকে বিয়ে করছে। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পাবে শুনলাম।

শীলার মুখের উপর যেন চাবুকের ঘা পড়েছে। বিবর্ণ বেদনাহত চাহনিতে শীলা ওর দিকে চাইল। নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে চলে গেল ওদিকে। গৌরীর মুখের হাসিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

তবু শীলা সেটা জানতে চেয়েছিল অসীমের কাছ থেকে। তাই বের হয়েছিল দুপুরে। অসীমের জন্য অপেক্ষাও করে-ছিল। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল। পাখী-গুলো কলরব করে গাছগাছালির মাথায়। দু-চারজন ছেলে কৌতূহলী চাহনিতে চেয়ে দেখছে ওকে. সেটা শীলাও বুঝতে পারে।

কোনরকমে উঠে এসেছিল। তার দুচোখ ফেটে জল নেমেছিল দুঃসহ লজ্জায় আর অপমানে। একাই ইডেনের ওই সবুজ থেকে ফিরে এসেছিল শীলা ব্যর্থ স্বপ্ন নিয়ে।

তার সব হারিয়ে গেল।

ক্রমশঃ শীলা নিজের মনকে নিজেই প্রবোধ দিয়েছিল। তার কোন সামাজিক মর্যাদা নেই। ওই অসীমকে পাবার দাবীও থাকতে পারে না। নিজের কথাটাই ভাবতে হবে তাকে। তার বাঁচার প্রশ্নটাই আজ সব-চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে।

মামামীও জেনেছে সব। তাই বাঁকা কথাগুলো আবার ধারালো হয়ে ওঠে।

—বামনের চাঁদে হাত! কুঁজোর সাধ যায় চিত হয়ে শোবে। এখন দ্যাগ মজা।

শীলা চুপ করে শোনে কথাগুলো। মামীমা বলে,—চাকরী হবে? গাছের ফল, এ্যাদ্দিন কি করেছিস তা জানি।

শীলা চুপ করে থাকে। আজ তার সামনে কঠিন বাস্তব। ঊষর বন্ধুর রৌদ্র-তপ্ত পথ। সুর নেই।

সুর ওঠে ও-বাড়িতে। সানাই-এর সুর। আলোর ঝলকানিতে সব আঁধার ছাপিয়ে গেছে। ওরই মাঝে দেখেছিল শীলা একদিন অসীমকে। শীলার দিকে চেয়ে থাকে অসীম। শীলার মনের অতলে জেগেছে কাঠিন্য। ওই মানুষটার কাছে নিজের মনের কোন দৈন্য, হাহাকারই প্রকাশ করতে চায় না সে। তাতে নিজেকেই অপমান করা হবে। এটা চায় না সে।

শীলা সহজ হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর হাসি মেশানো স্বরে জানায়,—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পেয়ে গেলে তাহলে?

অসীম দেখছে শীলাকে। নিজের এত-পাওয়ার মাঝেও নিদারুণ নিঃস্বতার কথাই মনে হয়। বাবার কথার প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পারেনি। তাই বলে,—এসব আমি চাইনি শীলা—

শীলা হাসছে, ধারালো হাসির সামনে অসীমের মধ্যবিত্ত সংরক্ষণশীল মনের সব লোভ আর দৈন্যের ছবিটা ফুটে উঠেছে। শীলা কোন অনুযোগ করেনি। করতে চায় নি।

তাই চাকরীটা পেয়ে গিয়ে নিশ্চন্ত হয়েছে শীলা।

গ্রামসেবিকার চাকরী। ঘুরতে হয় দূর গ্রাম-গ্রামান্তরে। কলকাতার আলো কোলাহল বিকৃতভরা সমাজ থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

এমনি করেই দক্ষিণ সেরপুরে এসেছে সে কয়েক মাস আগে।

প্রথম এসেই মামার ওখানে গিয়েছিল কাঁদনের ছুটি নিয়ে। গৌরীর বিয়ে হয়ে গেল। মামীমাকে কয়েকশো টাকাও দিয়েছে শীলা আফস থেকে ধার করে।

মামীমা বলে—সুখী হ মা!

শীলা হেসেছিল মাত্র। তার জীবনের সুখ শান্তি আজ একটা বিস্মৃত অধ্যায়। ঘরের ঠিকানা তার হারিয়ে গেছে। তবু এই নিঃস্ব জীবনকে মেনে নিয়েছে শীলা।

অসীমকে দেখেছিল। অসীমই বলে—ওই দিকেই যাবো। চলো একটু দেখে আসি জায়গাটা।

—পারমিশান নিয়েছো তো বৌদির কাছে? শীলা বলে। অসীমকে আজ মোহমুক্ত মন নিয়ে বিচার করতে পারে শীলা।

তাই এই চলতিপথের ক্ষণিকের সঙ্গ-টুকুকেই মেনে নিয়েছে তৃপ্তি ভরে। পথের ধারে আজ ক্ষণিকের সংসার পেতেছে।

বেলা হয়ে গেছে। অসীম সোঁদাল গাছের নীচে বসে ওই মুক্ত সবুজ দিগন্তের পানে চেয়ে থাকে। অতীতের সেই সবুজ বাগানে তারা এমনি করে হারিয়ে যেতো।

সেই বছরগুলোর সঙ্গে আজ ও ব্যব-ধানটুকু হারিয়ে গেছে। বদলে গেছে শীলা। ওর মুখের কচি সবুজ ভাবটায় এসেছে পূর্ণতার আভাস। ওর দিকে চেয়ে শীলা বলে—খাও। আর একটা সন্দেশ দিই?

অসীম মাথা নাড়ে।

সবুজ আদিগন্ত কাঁপছে কি হিল্লোলে, পাখী ডাকছে। ওদিকে পাটক্ষেতে বাতাস লুটোপুটি খেয়ে আছড়ে পড়ে। শীলা আর সে, কথা ছিল দুজনে ঘর বাঁধবে। দুজনের ভালোবাসার স্বপ্নে সেই ঘর সার্থক হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হয়নি।

ওরা দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়েছে জীবনের কেন্দ্র থেকে কক্ষচ্যুত গ্রহের মতই। বেলা বেড়ে ওঠে। মেঘলা আকাশের ফাঁক দিয়ে চকচকে আলোর আভাস জাগে। এখনও শীলার সেই আন্তরিকতার দেখা নেই। অসীমই জিজ্ঞাসা করে একজন চাষীকে—দক্ষিণ সের-পুর কতো দূর হে?

লোকটা পাটক্ষেতের নিড়ান সেরে উঠে আসছিল, ওদের কথায় অবাক হয়ে বলে,—দক্ষিণ সেরপুরের পথ তো অনেক আগেই ছেড়ে এলেছেন বাবু।

চমকে ওঠে অসীম—তাই নাকি!

লোকটা কাস্তের ডলটো পিঠ দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বলে,—উঁই যে ঝুপড়ি [illegible]—ওর নীচে মজা যমুনা-নদীর ওপারের গেরাম। উঁই যে সি সি করছে।

শীলা হাসছে। একবার মাত্র এসেছে এখানে। তাই পথটা ঠিক ঠাওর করতে পারেনি আজ। মনে পড়ে মরানদীর ধারে গাছগাছালি ঘেরা ছোট্ট মাটির ঘরখানা, সেহদা আজ তার আস্তানা। একা থাকে আর একটা আদবাসী মেয়েও রয়েছে সেখানে সেহদা তার সাচব-সখা।

হাসছে শীলা, বলে সে—সবাই আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি অসীম, ঘরের ঠিকানাও। তাই পথে পথেই ঘুরছি।

অসীম ওর দিকে চাইল ওর কণ্ঠস্বরে কি বেদনা ফুটে ওঠে—সেটাকে চাপার চেষ্টাও করেনি শীলা।

—শীলা! অসীম ওর দিকে চাইল।

শীলা চমকে ওঠে, অসীম বলে ওঠে —জীবনে এসব চাইনি শীলা। ওই অফিস, লেজার, দিনরাত্রি হাহাকার আর অমনি অন্তরহীন দেহসর্বস্ব একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইনি শীলা। মনে হয় পথের ধারের এমনি একটি মুহূর্তকেই চেয়েছিলাম সারা মন দিয়ে।

একটা পাখী বনসবুজ কোথায় ডাকছে তীক্ষ্ণস্বরে। রঙীন প্রজাপতিগুলো উড়ে উড়ে হারিয়ে গেল সবুজের বনে।

ওরা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।

পথের ধারে ক্ষণিকের পাতা সংসার তুলে ফেলেছে ওরা। আবার চলছে দুজনে. দুটি পথ হারানো মানুষ। দূরে দিগন্তসীমায় ছায়া ছায়া গ্রামসীমা, কোন স্রোতহারা মজা যমুনা নদীর সন্ধানে।

সেখানে একজনের ক্ষণিকের আশ্রয়। আর অসীমের জন্য আছে সেই সহরের কাঠিন্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন।

ওরা যেন জীবনের পথটাই হারিয়ে ফেলেছে দুজনে। মুখ বুজে কোন রকমে চলেছে—অদৃশ্য কোন মায়াদিগন্তের মরীচিকার সন্ধানে।

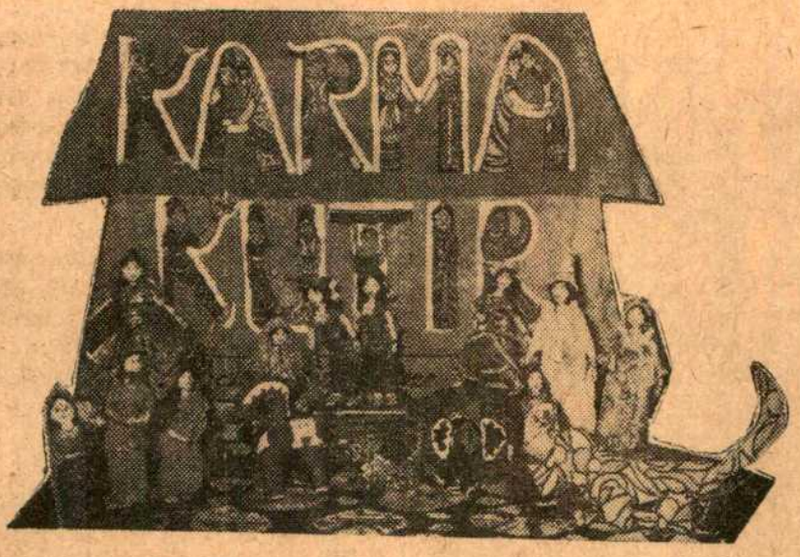

অঙ্গনা

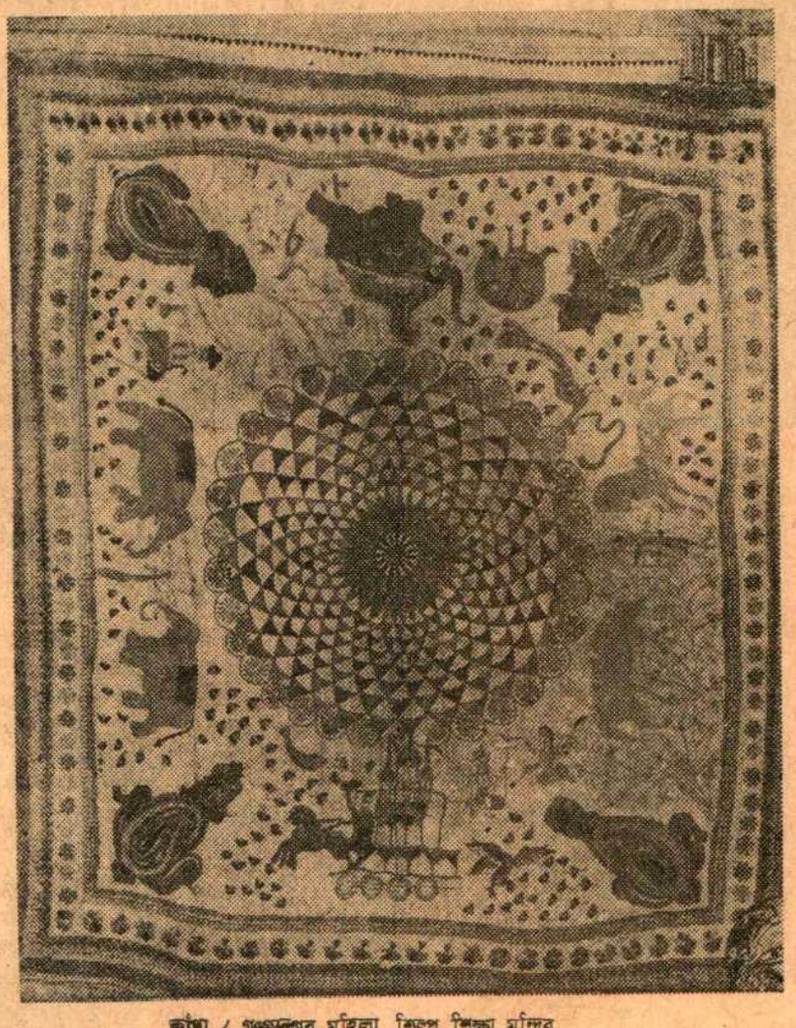

কাঁথা / গঙ্গানগর মহিলা শিল্প শিক্ষা মন্দির

প্রদর্শনীতে মহিলারা

সম্প্রতি কলিকাতা তথা কেন্দ্রে বিভিন্ন মহিলা সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত একটি মনোরম হস্তশিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল। কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন সংস্থা এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্থা তাদের স্বল্প পরিসরে হাতে তৈরী যাবতীয় কাজের নমুনা এখানে জড়ো করার সুন্দর সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রত্যেক সংস্থারই নাম-ধাম পৃথকভাবে টাঙ্গানো হয়েছে, প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করলে মনে হয় অনেকের যৌথ প্রচেষ্টায় কতকগুলি সেলস্ কাউন্টার খোলা হয়েছে। দর্শক এখানে নিজেদের পছন্দমত জিনিস ঘুরেফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তারি সঙ্গে সুযোগ পেয়েছেন কিছু কিছু জিনিস কিনে নেবার।

পূজার পূর্ব মুহূর্তে এই প্রদর্শনী করার ফলে কোন কোন সংস্থা মন্দ লাভবান হয়নি। দর্শকেরাও পছন্দমত জিনিস কেনার সুযোগ পেয়ে পূজার উপহার সামগ্রীর অনেক কিছুই হয়তো এখান থেকে কিনে নিয়েছেন। মহিলা সংস্থাগুলির কারো হয়তো এই প্রথম প্রদর্শনী, কারো বা বৎসরের সেই নির্দিষ্ট একটি প্রদর্শনী।

একটি সংস্থার জনৈকা ছাত্রী অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন 'এই আমাদের সংস্থার প্রথম প্রদর্শনী।' বেচাকেনার কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, 'বিক্রী আশাপ্রদ না হ'লেও কিছু কিছু অর্ডার আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। আশা করছি এভাবেই আমরা ভাল অর্ডার জোগাড় করে উপার্জন কিছু করতে পারবো।'

নারী সেবা সংঘ (বালিগঞ্জ), পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি (বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট), বাগজোলা মহিলা সমিতি, হরিনাভি প্রগতি সংঘ শিল্পশিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র, রাণী ঝান্সী বাহিনী, কিশাননগর শিল্প-নিকেতন ইত্যাদি আরও বিভিন্ন সংস্থার এমব্রয়ডারি, কুরুশ, উল-এর কাজ বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নারী সেবা সংঘের ব্লক প্রিন্ট শাড়ীর ডিজাইন এবং রং নিঃসন্দেহে নতুনত্বের দাবী রাখে। বাজারের চালু ডিজাইনের সঙ্গে এখানকার নমুনা বিস্তর তফাৎ। সবচেয়ে বড়

তাঁতের শাড়ী / সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন

কথা এই নমুনার স্রষ্টাও তাঁদের সঙ্গে ওত-প্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া বাটিক প্রিন্টও বেশ আকর্ষণীয়। এই নারী সেবা সংঘের কাজকর্ম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার থেকেই এখানে মেয়ে পাঠানো হয় শিক্ষার জন্য। লেডী ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা, বুক বাইন্ডিং ট্রেনিং প্রভৃতি বিভিন্ন ডিপ্লোমা এখানকার মেয়েদের দেওয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেক বছরই তারা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির এমব্রয়ডারি এবং কার্পেটের কাজ ও ছোট-দের ফ্রক, ব্লাউজ, সায়া, রুমালের বিভিন্ন-ধরনের কাজ অপূর্ব। এছাড়া রানী ঝান্সী বাহিনী সীবন শিক্ষাকেন্দ্র শেলা, বাটিক, আচার, বড়ি, পাঁপড়, উল ফেব্রিকের কাজে কিছু কিছু অভিনবত্বের দাবী রাখে। মণিপুরী নৃত্যের ঢং-এ পুতুল, গণেশ লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীকে শোলাতে রূপ দেওয়া হয়েছে। চট্, পুরানো বা নতুন কাপড়ে হরেকরকমের পুতুলও এই প্রদর্শনীকে জমকালো করে রেখেছিল, আজ-কালকার দিনে বাজারে চালু মেয়েদের ব্যাগের সুপ্রচুর আয়োজন রেখেছিল নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন। মেয়েদের এই ব্যাগের অধিকাংশই, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন রং-এর চটে তৈরী—কোনটা বা হাতে ঝোলানো, কোনটা বা কাঁধে ঝোলানো। চটের ব্যাগ ছাড়া শাড়ী, ব্লাউজ, স্পঞ্জের খেলনা আর ভবানী-পুর নারী সমিতির প্লাসটিকের তারের ব্যাগ, জেলি-আচার সবগুলোই দর্শকদের বহুলাংশকে সে ক্রেতায় পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সমস্ত সংস্থার কোন কোনটির সদস্যা বা ছাত্রী সংখ্যা দশ-এগারো থেকে শুরু করে চল্লিশ-পঞ্চাশজন। এই প্রদর্শনী-গুলি শুধু উৎকৃষ্টমানের হস্তশিল্পের আয়োজন-ই করেনি সেই সঙ্গে বেকার কিছু মহিলাদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

শহরের ঘিঞ্জি অবস্থা রাস্তার উপরে রেল লাইন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। বাসটা অল্প অন্ধকার টানেলে ঢুকেছে, তীব্রবেগে চারিদিক কাঁপিয়ে মাথার উপর দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন চলে যায়। 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার' পাশের লোকটি আস্তে বলতেই গোপাল তার দিকে তাকায়। বাঁ হাতে ঘড়ি দেখে, চারটে বাজতে দশ মিনিট। ঠিক সাড়ে চারটের সময় নীলিমা তিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে চিঠিতে জানিয়েছে।

রাস্তার দুপাশে দোকান, কিছু বাড়ির পর অনেক দূরে গ্রামের সীমানা, সবুজ ফসলের ক্ষেত দেখা যায়। আষাঢ় মাসের আজ বোধহয় কয়েকদিন গেছে। নীলিমার চিঠিতেই বাংলা মাসের তারিখটা আজ দেখেছে। তা না হলে অফিসের কাজে বা আর কোথাও তো সম্পর্ক নেই। এখন মেঘ নেই, কাল গভীর রাতে বৃষ্টি হয়েছে। হু-হু করে হাওয়া ঢুকছে বাসের মধ্যে। হাওয়ায় মাটির হয়তো সবুজ গাছ-পালারও গন্ধ আছে। গোপাল বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়। ডান হাত মসৃন গালে বুলোয়। রাস্তার ডানপাশে সারি সারি রেল কোয়ার্টার। তারের জাল ঘেরা বারান্দায় বিভিন্ন বয়সী মানুষের মুখ। বাড়ির ছাদের আলসেতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি নীলিমার মত দেখতে। বাসটা থামে। দু-চারজন লোক তাড়াতাড়ি নেমে যায়। পাশের লোকটি উঠে দাঁড়ায়। ড্রাইভারের পিছনে বসে থাকা সম-বয়সী যুবকটিকে গোপালের পরিচিত মনে হয়। অনন্ত কি! কলেজে একসঙ্গে পড়তো, গোপালের কত দুপুরের শহরের বিভিন্ন রাস্তায় চায়ের দোকানে অনন্তর সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি মনে আছে। গোপাল জানালার লোহার বড়ে মুখটা চেপে নিজেকে আড়াল করে। এখন আর পুরানো বন্ধুর সঙ্গে ডেকে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। অনন্তর মুখটা কত বদলে গেছে। মুখে অল্প দাড়ি চোয়াল ভাঙা, বেশী পাওয়ারের চশমার পিছনে উজ্জ্বল দুটি চোখ। অনন্তর দৃষ্টি ছিল শান্ত, দৃশ্যের প্রতি ফলনেও আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। এখন তাকিয়ে আছে যেদিকে তার সব কিছু অনন্ত দেখে নিতে চায়। 'আমার চোখে কি প্রতিফলিত হয়?' গোপাল আস্তে যেন নিজেকেই বলে। ব্যস্ত জীবন, চাকরীতে অনবরত একই পরিবর্তিত দিন, শুধুই

প্রয়োজন! আমার চারদিকে। বাসটা আবার স্টপেজে থামতেই অনন্ত নেমে যায়। গোপাল উদগ্রীব হয়ে অনন্তকে দেখার চেষ্টা করে। চলন্ত বাস থেকে। ওই তো অনন্ত বাচ্ছে মাথা উঁচু করে, লম্বা পা ফেলে পিচের সরু রাস্তায়। বাড়ির কিনারা ঘেঁষে দোকান আড়ম্বর করে দেয় অনন্তকে। বিদেশী কোম্পানীর কারখানার সীমানা উঁচু রং করা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে পরিচ্ছন্ন সজানো গোছানো কোয়ার্টার সৌখিন ফুলের বাগান, কারখানার কিছু অংশ। ঢোকবার বন্ধ গেটের সামনে অবস্থানরত কর্মচারীদের দেখা যায়। তাদের চারিদিক ঘিরে আছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার শ্লোগান, ফেস্টুন। পাঁচিলের সীমানা শেষ, একরাশ বাগান-বিলাস ফুলের প্রাকৃতিক বিন্যাস। ফিকে বেগুনি রঙ যেন সমস্ত পরিবেশকেই রঙীন করে তুলেছে। নীলিমা এই গাছ ভালবাসে।

'ঠিক সময়ে আসবে। জানি, অফিস থেকে চলে আসার অসুবিধে আছে, তবু বোধহয় তোমায় লেখা যায়।' চিঠির লেখা-গুলি যেন গোপাল দেখতে পায়। জামার ভিতরের পকেটে আছে, এখন একবার পড়ে দেখতে ইচ্ছে করল গোপালের। অফিসে দুবার পড়েছে পাশের টেবিলের সহকর্মিকে লুকিয়ে। এখনও তো কাউকে নীলিমার কথা বলেনি। যে কোন পরিচিত মানুষ গোপালকে কাছে পেয়ে কতভাবে না তাদের নারীর গল্প বলেছে। নীলিমার সঙ্গে কারো সাদৃশ্য পায়নি গোপাল। তখন বন্ধুদের কথায় অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। ভালবাসার নারী কি আমার আকাঙ্ক্ষা মতই অস্তিত্ব পাবে? ভাস্কর বলে, যতক্ষণ কাছে থাকে যে সমস্তটুকু মেয়েটি আমার হাতের আওতায় তখন আমার আর কোনদিকে খেয়াল থাকে না। 'শরীর সর্বস্ব' ভাবে গোপাল, কি আর বলবে ঠিক করতে পারে না। 'ছোট বোন কলেজে চলে গেলেই সমস্ত বাড়িতে মা ও আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, হাতে কাজও কম। তখন একজনের কথা মনে পড়ে। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি কখনও সেলাই নিয়ে বসি। সাদা কাপড়ে রঙীন বাহারী সুতোয় ফুলের বদলে কি সব নাম সেলাই হয়ে যায়।' 'পথের পাচালী' সিনেমায় ছোট ছেলে অপু অজ পাড়াগাঁয়ের বাঁশবনের ভিতর দিয়ে ডান হাতে চিঠি ধরে ছুটতে ছুটতে বাড়িতে ঢুকছে 'চিঠি, চিঠি' বলে। নীলিমার চিঠি পড়তে গেলে গোপালের কেবল এই দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। অফিস থেকে নিজের ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর খাম দেখেই বুঝতে পেরেছিল। তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলেছে। শরীরের রক্ত তখন বুকের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মা কখন দরজায় বাইরে থেকে ডেকে গেছে খেয়াল নেই। নিজে চিঠি হাতে করে দাদার ঘরে গেছে। 'বৌদি আমার চিঠিটা কখন এলো?' 'কেন বলতো?' বৌদি বিছানার চাদর গোছানো থামিয়ে বলেছে 'ঘন্টা মিনিট বলতে হবে?' গোপাল অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। 'কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি।' 'দাদা বোধহয় ভাল আম এনেছে বাড়িতে?' গোপালও হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে। 'তুমি বোধহয় সব গন্ধ এখন এক ভাবছো।' বৌদি বলে খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

ঘরের আলো না জেলে জামা-কাপড় পাল্টে চুপ করে বসে থেকেছে গোপাল। ঘরের সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে। বিছানা টেবিল চেয়ার আলনা টেবিলের উপর টুকি-টাকি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর সবই তার ভাল লাগে। বহুদিনের ব্যবহৃত ছোট ঘর এক-মাত্র আশ্রয়স্থল মনে হয়। মা চা জলখাবার রেখে চুপ করে চলে যান। প্রতিদিনের মত গোপাল আজ মায়ের সঙ্গে কোন কথা বলল না। সারাদিনের ক্লান্তি শরীর থেকে মুহূর্তের মধ্যে যেন উবে গেছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার পাখার হাওয়ায় উড়ছে এ মাসের ছবি: উঁচু-নিচু বালিয়াড়ি দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। মাথায় পাগড়ী বাঁধা দেহাতী চালক পিছনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা রঙীন শাড়ি জামা পরনে যুবতী। তামাটে আকাশ, অনেক দূরে চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সমস্ত ছবিটায় দূরত্বের পরিমাপ করতে গোপালের খুব ভাল লাগে। নীলিমার ছবিটা কি ভাল লাগবে, 'ভীড় আমার এক-দম ভাল লাগে না।' নীলিমা ভীড় রাস্তায় গোপালের পাশে হাঁটতে হাঁটতে একদিন বলেছিল।—'শহরেই বড় হয়েছি, স্কুল কলেজের সব পরিচিত মেয়েই এই শহরের তবু এরকম কেন বলুন তো?' 'ভেবে দেখা দরকার। খুব জটিল চিন্তা। ভাবতে গেলে অবসর চাই, তাহলে নির্জন জায়গায় বসতেই হবে। গোপাল অনেক লোকের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছে।

নীলিমা গোপালের মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে শরীর ভরে হেসে উঠেছে। 'চারিদিকে এতো লোক আপনার খেয়াল নেই?' 'নিশ্চয়ই, তার সঙ্গে আপনিও তো আছেন।' 'আমি তো এখুনি চলে যাবো, তারপর।' নীলিমা গোপালের কাছে এগিয়ে আসে। মৃদু প্রসাধনের গন্ধ গোপালকে চঞ্চল করে। সবুজ ছাপা শাড়ি পরেছে। শ্যামলা রং, ভরাট স্বাস্থ্য। গোলাকৃতি মুখের আদল, একরাশ চুল ঘেরা ছোট কপালে বড় লাল টিপ। পাতলা ভুরু দিয়ে ঘেরা টানা চোখ। নাক সমান্য চাপা, থুতনি ও চোয়ালের গড়নে কমনীয়তা আছে। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নীলিমা। কি উত্তর দেবে গোপাল?

—দূর, 'কটা আর বাজে, এখুনি চলে যাবেন?' জিজ্ঞাসা করে হতাশ স্বরে, নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকায়। আটটা বেজে গেছে।

—আর দেরী করলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। বড়দা বাড়ি এসে গেছে। চলুন, আমাকে বাসে তুলে দেবেন। বলে নীলিমা ভীড় রাস্তায় এগিয়ে চলে, গোপালও পাশে পাশে পিছনে।

এলোমেলো কথা বলতে বলতে শহরের অনেক অচেনা রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে দুজনে। আজ থেকে প্রায় চারমাস আগে নীলিমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ক্যালেন্ডারের পিছনে পুরোনো পাতায় সেই তারিখটা এখনও আছে। 'আর একবার চিঠিটা পড়তে হবে' ফিসফিস করে বলে গোপাল প্রায় ঠান্ডা চায়ের কাপে চুমুক দেয়, খাবার খায়। এই ঘর, গোপালদের বাসার চারিদিকে অফুরন্ত ঘর ঘর ঘর, অনেক মানুষের বাস। তাই শব্দও অনেক রকম, দূরের রাস্তা থেকে বিভিন্ন যানবাহনের শব্দ। আজ আর বিরক্ত লাগছে না শব্দ-সকলকে। এখন যেন নীলিমার ভাবনার পিছনে অনেক রকমের শব্দের উত্থানের প্রয়োজন আছে।

কি বিচিত্রভাবেই না নীলিমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল শ্যামবাজারের মোড়ে সন্ধ্যেবেলা অফিসের বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। চারিদিকে বাড়িফেরা মানুষের ভীড়, ট্রাম বাস ট্যাকসি, ফিরিওয়ালাদের চীৎকার। সেদিন অফিস থেকে হাঁটতে হাঁটতেই লোকটির সঙ্গে এসেছে। কেবল অফিসের গল্প, প্রয়োজনীয় ফাইলের প্রসঙ্গ, দাবী দাওয়া নিয়ে কর্মচারী-দের প্রতিক্রিয়া। মানসিক ক্লান্তি, এতো মানু-

শ্রীঘৃত ২৫০ গ্রাম টিনেও পাইবেন।

শ্রীঘৃত

শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ

অশোকচন্দ্র রক্ষিত প্রাইভেট লিঃ

২৬, কটন স্ট্রীট কলিকাতা—৭

ষের মাঝখানে গোপাল একা, এই তার সাময়িক অস্তিত্ব। সামনে পিছনে উপরে বিচিত্র বিজ্ঞাপন। রঙীন অভিনেতার কোমল মুখ বিজ্ঞাপনের সীমানাতেই মোটরের ব্রেক কষার তীক্ষ্ণ শব্দে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। গোপাল কোনদিকে তাকিয়েছিল, এলোমেলো ছুটে চলা যানবাহন ভর্তি রাস্তার দিকে, না বয়সের ভারে বৃদ্ধ ভিখারী, চঞ্চল বালিকার চোখে, সমবয়সী যুবকের ঋজু ফিটফাট শরীরের দিকে। সবই সামনে পিছনে যাতায়াত করা অপরিচিত মানুষের শরীরের আড়াল হয়ে যায়।

'দমদমের বাসটা কোথায় পাবো বলতে পারেন?' প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে গোপাল। সামনে একটি যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে। 'কেন, ঠিক এখানেই পাবেন।' 'আশ্চর্য তো' বলে মেয়েটি বাস আসা রাস্তার দিকে তাকায়। গোপাল বিরক্ত হয়। 'আশ্চর্যের আবার কি দেখলেন?' 'মানা, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি নিজেই বলছি, দেখুন না দিদির বাড়ি বরানগরে গিয়ে ছিলাম। প্রায় বছর খানেক ধরে যাচ্ছি আসছি। আজ এখানে নেমে কিছুতেই বাড়ি যাওয়ার বাস খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু মনে হচ্ছে ভুল বাসে না উঠে পড়ি। মেয়েটি বলে সামান্য হাসে। লোককে জিজ্ঞাসা করতেও এখন ভয় করে। কতরকমের তো লোক আছে। শেষে আপনাকে দেখতে পেয়ে এলাম। মেয়েটি বলেই লজ্জা পায়।

গোপাল হঠাৎ কর্তব্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'আপনি কিছু ভাববেন না, বাসে তুলে দিচ্ছি।' কিছুক্ষণ পরে একটা ভীড় বাস লাল আলোর জন্য তাদের পাশেই দাঁড়ায়।—এই বাস যাবে, উঠে পড়ুন। গোপাল তাড়াতাড়ি বাসের গেটের সামনে এগিয়ে যায়।—কন্ডাকটর লেডিজ আছে। চীৎকার করে বলে মেয়েটিকে উঠে যেতে সাহায্য করে। মেয়েটি বেশ কষ্ট করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। মেয়েদের বসার জায়গা নেই। বড় ধরে দাঁড়ায়, পিছনের লোকটি মেয়েটির শরীরে ঠেস দিয়েই থাকে। সবুজ আলোর সিগন্যাল হতেই বাস চলতে থাকে, মেয়েটি মাথা নীচু করে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গোপালকে নীরব ধন্যবাদ জানায়।

গোপাল সেই সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ চুপচাপ ঠিক একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। ঘটনাটা স্বাভাবিক হলেও মেয়েটির কমনীয় মুখে, উজ্জ্বল চোখজোড়া তাকে যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে। চারিদিকে বিভিন্ন আলো যানবাহন, মানুষজন এখন যেন তার প্রতিবেশী হয়ে রয়ে গেছে। কাউকে এই ঘটনার কথা বলেনি। কেবল দিনেরাতে অফিসের কাজের মধ্যে মেয়েটির মুখ চোখ ও সামান্য কথাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে। আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি তাকে ক্রমশঃ গ্রাস করেছে। ট্রামে বাসে, রাস্তায়, শহরের বিভিন্ন বাড়ির জানালায় দরজায় ছাদে যে কোন নারীর অস্তিত্বই মেয়েটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। মেয়েটির কাছে যাওয়ার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে নির্জনতায় ছেয়ে গেছে সমস্ত শরীর, মন প্রয়োজন ভিত্তিক জীবন ধারণ। তাই একই জায়গায় বহু মানুষের ভিতর শ্যামবাজারে গোপাল উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে। 'আজ আমার ভুল হয়নি।' মেয়েটি কিছুদূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দিকে যেতে যেতে গোপালকে বলেছে। 'এই, দাঁড়ান।' প্রায় চীৎকার করে ডেকে উঠেছে গোপাল।

'আমার সময় নেই, আজ অনেক দেরী হয়ে গেছে।' মেয়েটি হাসিমুখে বলে খবরের কাগজ মোড়া একরাশ জিনিস বুকে চেপে কাছে এগিয়ে এসেছে। 'কি বলছেন?' ছোট কপালে অনাবশ্যক রেখা পড়ে।

'আজ মনে হচ্ছে ঘোড়া থামিয়ে আসছেন? গোপাল গম্ভীর হয়ে বলে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়ে হলে বুঝতেন। চলি—' বলে মেয়েটি ছুটে গেছে বাসের দিকে। মসৃন-ঘাড়, নিতম্বের সুন্দর গঠন গোপালকে আকৃষ্ট করে। জানালার ধারে বসে হাত নেড়ে, হাসিমুখে এপাশ ওপাশ করে বিদায় নিয়েছে। বাস ঘুরছে মেয়েটি তখনও হাত নাড়ছে লোভনীয় হাসি হঠাৎ কোন আলোয় ঝলসে উঠেছে। গোপাল অবাক হয়ে চারিদিকের অস্তিত্ব ভুলে দেখেছে। মন তার চঞ্চল হয়ে উঠেছে আনন্দে, দুর্বোধ্য ভাললাগায়। বড় বড় পা ফেলে অনেক মানুষ, বিচিত্র জ্যামিতিক আলো ও গাড়ির জটিলতা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে।

'আজ সাড়ে নটা বেজে গেছে। দিদির ছোট ছেলেটার খুব জ্বর। দেরী হয়ে গেল কাজ সারতে গিয়ে। বাসে একলা যেতে বেশ ভয় করে।' আর একদিন বলল মেয়েটি।

'চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' 'নানা আপনাকে যেতে আমি বলছি না।' থাক, অনেক বলেছেন। না হয় সঙ্গেই গেলাম।' গোপাল বলে পা বাড়িয়েছে।

আকস্মিকভাবে বাস ফাঁকা, মেয়েটির পাশে বসে গোপাল। মেয়েটির শরীরের স্পর্শ ছাড়াই তার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। কেন সে নিজেও জানে না। বাইরে থেকে হাওয়া এলে সুন্দর একটা গন্ধ পায়। প্রসাধনের গন্ধ নয়, তাহলে কি যুবতী শরীরের গন্ধ।

'সেদিনের কথা ভাবলে আমার খুব হাসি পায়। বাড়িতে মা, দাদা, বৌদি বোনদের কাছে বলেছি।।'

'তারা কি বললেন?' গোপাল মেয়েটির সুন্দর ঠোঁটজোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে।

"আমাকে বোকা হাঁদা বলল। আচ্ছা আপনিই বলুন, মানুষের ভুল হয় না? আমি এই পথে কলেজ করেছি, কখনও কখনও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরেছি, দিদির বাড়ি গেছি যখন তখন। আশ্চর্য, আমিই বাস চিনতে পারিনি।' মেয়েটি বলে জোরে হেসে ওঠে। হাওয়ায় উড়ে আসা কয়েকটি মাথার চুল কাঁপতে থাকে, সমস্ত শরীরের সঙ্গে ওরও বুক দোল খায়। 'ভুল না হলে আমার দিন ও রাতের তফাৎ থাকতো না' গোপাল বিড় বিড় করে বলে। 'ফিসফিস করে কি বলছেন?' মেয়েটি মুখ গোপালের খুব কাছে এনে আস্তে বলে। নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগে গালায়, থুতনিতে। গোপাল দুচোখ ভরে সুন্দর মুখে ব্যাপক অনুভূতির দ্রুত ওঠানামা দেখে।

—পড়াশোনা কি ছেড়ে দিয়েছেন? গোপাল বড় নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করে।

—পাশ করে এক বছর বসে আছি। বড়দা বলে বাড়ির কাজেই মেয়েদের আসল পড়া। তাই এখন ঘর বন্দী। বলুন, বাইরে আড্ডা দেওয়ার স্বাদ পেলে ঘরের কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে ভাল লাগে?

প্রায় কুড়ি মিনিটের রাস্তা। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যায় গোপাল বুঝতে পারে না। অথচ সে প্রতিটি মুহূর্তেই কি ভীষণ না সজাগ থাকে।

—আপনি কি শ্যামবাজারে প্রতিদিন থাকেন? রাতের আলোকিত বাস, প্রায় অন্ধকার রাস্তায় আলোকিত করে চলেছে। মেয়েটির মুখচোখ হঠাৎ যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—কোনদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে ভাল না লাগলে দাঁড়িয়ে থাকি।

—আজ আমার খুব উপকার করলেন। দেখুন তো আপনাকে কতদূর নিয়ে চলে এলাম নিজের দরকারে। —আমার খুব ভাল লাগল। বলে গোপাল মেয়েটির মুখের দিকে তাকায়। সোজাসুজি মেয়েটি তাকেই দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছে গোপাল। [illegible] খুব কম এসেছি। তাড়া যেন ফাঁকা জায়গা, রাতে ফাঁকা বাসে খুব ভাল লাগে যেতে।

—আমি এখানে নামবো, রাস্তার পাশেই আমাদের বাড়ি। চলি। বলেই মেয়েটি বাসের গেটের দিকে এগিয়ে যায়। কন্টার মৃদু পরপর শব্দ, যান্ত্রিক ওঠানামা, কন্ডাকটরের চীৎকার, গোপালের একাগ্র তাকিয়ে থাকার মধ্যে মেয়েটি নেমে পড়ে। গোপাল বাসের জানালা দিয়ে পড়া চতুষ্কোণ আলোয় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। হাত নাড়তে যেতে যেতে। 'এই পরিবেশ সৃষ্টি হয় একবার' গোপালের ভিতর থেকে কে যেন বলে

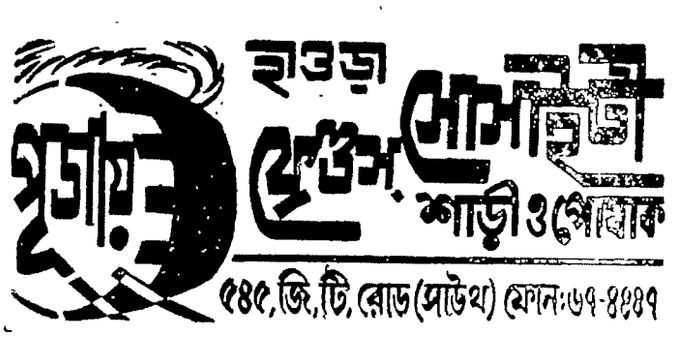

ওঠে। মেয়েটি হঠাৎ তাড়াতাড়ি থেমে থাকা বাসের কাছে এগিয়ে আসে। 'ওখানেই থাকবেন' বলেই সামনে অন্ধকারে চলে যায়।

তারপর গোপাল যেন তীরন্দাজের লক্ষ্য-ভেদের মানসিকতা গ্রহণ করেছে। শ্যাম-বাজারের রাস্তার সেই বিশেষ জায়গাটি যেন তার রাজত্ব, সেই তার একমাত্র ঈশ্বর সকালে ঘুরে আসে, ধুলোয় অনেক পায়ের পাতার ছাপ। অফিস থেকে বেরিয়ে তাড়া-তাড়ি ট্রামে বা বাসে চেপে এসে ঠিক সেই জায়গাটার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরের রাস্তায় তার শরীরের ছায়া অনেকক্ষণ স্থির থাকে। কখনও কখনও দূরে দাঁড়িয়ে, অনেক অপরিচিত মানুষের মাঝখানে থেকে নির্দিষ্ট জায়গাটিকে লক্ষ্য রেখে প্রদক্ষিণ করে চলে। কোথাও রাস্তার ফোটোগ্রাফ দেখলে তারও ইচ্ছে হয় শ্যামবাজারের নির্দিষ্ট জায়গাটির একটা ছবি তুলে রাখতে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে চিন্তায় ওখানে গিয়ে পৌঁছয়, মেয়েটি পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে আসে।

—সকালে আপনাকে দেখতে পাবো ভাবতে পারিনি। মেয়েটি সুন্দর মুখে মনোরম হাসিতে উচ্ছল হয়ে বলে ওঠে।
—আমি জানতাম দেখা হবে। —কি করে জানলেন? মেয়েটি অবাক হয়ে বলে।

—কারণ আমি সব সময়েই দাঁড়িয়ে থাকি। —পাগল হয়ে গেলেন নাকি। ওখানে কি গাছ প্রতিষ্ঠা করেছেন? মেয়েটি গোপালের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলেছে।

রাস্তায় হাঁটলে জুতোর শব্দে গোপাল সময়ের নির্দিষ্টতা বুঝতে পারে। বাড়ির লোকজনের মুখচোখ এখন তার কাছে পরিষ্কার।

প্রথম চিঠি এলো—'আমার নাম নীলিমা। আপনার নাম আশা করি চিঠির প্রথমেই থাকবে। প্রথম দিনের পরিচয়ের কথা এখনও আমার লজ্জা হয়। আপনি কি ভেবেছিলেন লিখবেন না? আমরা অনেক ভদ্রতা করে ফেলছি বোধহয় আপনি বলে। আমি জানি, তুমি?'

জীবনে প্রথম নারীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে গোপাল। মনপ্রাণ কয়েকদিন আনন্দে ভরে দেখেছে। কি উত্তর লিখবে ভেবে ঠিক করতে পারেনি। লজ্জা ভয় অত্যধিক আনন্দে কলম আর চলতে চায় না। দীর্ঘ চিঠিই লিখেছে। একটি সমর্থ যুবকের বেঁচে থাকার তীব্র চাপা আকাঙ্ক্ষায় প্রতিফলিত মানুষের উল্লাস যেন ফেটে পড়েছে দুঃখবোধের বিন্যাসে, এককীত্বের প্রবল শাসনের ভয়ের প্রকাশে।

বাস হঠাৎ ব্রেক করে, দাঁড়িয়ে থাকা সব যাত্রীই টালমাটাল। অনেক রকমের অভিযোগে বিভিন্ন মানুষ ব্যস্ত হয়। 'বাচ্চা ছেলেটা বাস চাপা পড়তে গিয়ে জোর বেঁচে গেল' কণ্ডাকটর বেল বাজাতে বাজাতে বলে উঠল। নীলিমাদের বাড়ি কি পেরিয়ে গেছে? আশপাশের বাড়িগুলি তাড়াতাড়ি দেখার চেষ্টা করে গোপাল। আপন মনে হেসে ওঠে, বাড়ি চেনে না অথচ খুঁজছে। শুধুকি তীব্র অনুভূতির চাপে অচেনা বাড়ি খুঁজে নিতে পারে? হেসে ওঠে, ঘড়ি দেখে সময় হয়ে গেছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় নেমে গোপাল বাস-স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা নারীপুরুষের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয়। না, নীলিমা নেই। আজ কি আসবে না, বাড়িতে কাজে আটকে গেল? মনটা বিষাদে ভরে যায়। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। নীলিমার আসার পথের দিকে ঘুরে ফিরে চোখ চলে যায়। ঘনঘন বাস লরি মোটর ছুটে চলেছে। রেল-স্টেশন থেকে একটা রাস্তা এসে এখানে মিশেছে, আশে পাশে বিভিন্ন দোকান, বাজার পাশে, লোকের ভীড় বেশী। বাস এসে থামল, ভীড় আছে, দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন ঠেলাঠেলি করে উঠতে থাকে। নীলিমাকে এরকম একটা বাসেই সে রাতে তুলে দিয়েছিল। বাস থেকে বিবাহিতা মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা গোপালকে একদৃষ্টিতে দেখে চলেছে। পরিচিত কি? কে হতে পারে, চিন্তায় এরকম পরিচিত মুখ খুঁজে পায় না।—'এই মশাই কটা বাজে?' পিছন থেকে গোপালের পিঠে হাত দিয়ে নীলিমা বলে। গোপাল থর থর করে কেঁপে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে সামান্য হাসে। নীলিমা একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে, সমস্ত মুখ চোখ হাসিতে ভরে আছে। গোপালের উদ্বিগ্নতা, বিষাদ সাময়িক অপেক্ষা নীলিমার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে মুহূর্তেই শেষ। —কতদূর থেকে আসছি বলতো? গোপাল আস্তে বলে পাশের লোকটির দিকে তাকায়।

—সেটা কোন কথা নয়। দেরী হয়েছে স্বীকার করো। আমি প্রায় কুড়ি মিনিট দাঁড়িয়ে। একলা আর কতক্ষণ দাঁড়াবো, বন্ধুর বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম।

—আমি জানতে পারলে সকালে এসে দাঁড়াতাম। গোপাল তাড়াতাড়ি বলে।

—কোথায় যাবে? —যেখানে তোমার ইচ্ছে। —হেঁটে না বাসে? —দুটোতেই। গোপাল বুক ভরে সিগারেটের ধোঁয়া নিয়ে বলে। ধোঁয়া ছাড়ে নীলিমার মুখের ওপরেই।

—এই কি হচ্ছে, ইস কি কড়া গন্ধ। নীলিমা এক পা পিছিয়ে বলে ওঠে।

—তোমার গন্ধটা ভাল লাগে না? —খু-উ-ব। নীলিমা হাসতে হাসতে বলে। 'চলো' চোখের ইঙ্গিত করে নিজে সামনে এগিয়ে চলে। মাথা ভরা চুড়ো করা খোঁপা, সবুজ জমিতে হাতে শাদা সুতোর লতা-পাতার কাজ করা শাড়ি, একই রংয়ের ছোট হাতা ব্লাউজ। চওড়া কাঁধের দীর্ঘ মসৃণতা বিকেলের আলোয় গোপালকে উজ্জ্বল স্মৃতির কাছে নিয়ে যায়। রাস্তার জলকাদা বাঁচাতে সতর্ক হয়ে পা ফেলছে সমস্ত শরীর নীলিমার ভেঙে চুরে আবার মসৃণ, স্বাভাবিক। গোপাল পিছনে যেতে যেতে গভীর আকর্ষণ বোধ করে। —চলো এরো-ড্রোমের দিকে যাওয়া যাক। কিছুক্ষণ আগে এখানে বেশ বৃষ্টি হোল। এখনও মেঘ আছে। নীলিমা থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে উপরে তাকায়। গোপাল উপরের দিকে তাকায় না। নীলিমার গ্রীবা, মুখের প্রোফাইল উন্নত স্তনের বিন্যাস ভাস্কর্যের ধর্ম পায়।

—বর্ষাকালে বৃষ্টি হবে না? গোপাল নীলিমার কাছে গিয়ে বলে।

—আমার কাপড় ভিজে গেলে? নীলিমা তাড়াতাড়ি বলে।

—আমি তখন আড়াল করে দাঁড়াবো। গোপাল হাসতে হাসতে বলে।

—চলো বৃষ্টি এলে দেখা যাবে। এখানে আমার অনেক পরিচিত লোকজন আছে। বলে নীলিমা মাঝ রাস্তাতেই এগিয়ে আসা একটা বাস হাত নেড়ে থামায়। দুজনে উঠে পড়ে। ফাঁকা বাস নীলিমা জানালার ধারে গোপাল পাশে।—সবে পাঁচটা বাজে, এখনই চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

—তোমার কি ভয় করছে? —হ্যাঁ, চোখ বুজে বসে থাকবো? —কোথায়?—স্বভাবতই তোমার মাথার ভিতরে। নীলিমা বলেই খিলখিল করে হেসে ওঠে। বাঁ হাতে ধরা রুমাল থেকে খুচরো পয়সা নিয়ে টিকিট কাটে।

—আজ আমি ভাড়া দিলাম, তার মানে তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছো, যা বলবো তাই শুনবে। নীলিমা বলে। —কি করতে হবে আমাকে? —ওই দ্যাখো এরোপ্লেনটা নামছে, সূর্যের আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছে। —আমি দেখবো? গোপাল নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে। —না, তুমি মেয়ে-দের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো। নীলিমা গোপালের হাতে চিমটি কাটে। —মেয়েদের সঙ্গে থাকলে মেয়েরা বোধহয় চিমটি কাটে?

এরোড্রোমে বাস থেকে নামতেই গোপাল চোখজোড়া হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় অস্বস্তি পায়। মেঘের আড়াল সবে যেতেই শেষ বিকেলের আলো কি ঝলমল করে উঠছে?

—কি সুন্দর লাগছে। দ্যাখো ওই বাড়ি-টার সামনের গাছের পাতাগুলো যেন জ্বলছে।

নীলিমা উজ্জ্বল মুখে বাড়ির দিকে হাত বাড়িয়ে বলে। গোপাল বাড়ি তার পাশে গাছের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে

পারে অসংখ্য পাতায় বৃষ্টির জলের ফোঁটা জমে থাকায় আলোর প্রতিফলন। নীলিমার মুখের উপরেই সমস্ত দৃশ্য ভেসে আছে। গোপালের কোন উত্তর না পেয়ে নীলিমা তার দিকে তাকায়।

—আবার মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে? তুমি গাছটা দেখেছো?

—হ্যাঁ। কোথায় বল তো? —ওই তো। কি নরম, মসৃণ গাছের পাতাগুলো। কেউ যেন অল্প প্রসাধনে আরো সুন্দর করে তুলেছে। —অসভ্য। —কে, গাছটা না বৃষ্টি? —এই লম্বা গাছটা। বলে নীলিমা গোপালের ডান হাতে চাপ দেয়।

অনবরত ব্যস্ত বিমানক্ষেত্রের দিকে গেল না দুজনে। ফাঁকা রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাটতে থাকে।

—যখন বৃষ্টি হচ্ছিল আমার খুব খারাপ লাগছিল বাড়িতে।

—কেন তোমাদের বাড়িতে ছাতা নেই?

—ইয়ার্কি হচ্ছে। নীলিমা মুখ গম্ভীর করে—তুমি আটকে গেলে খারাপ লাগতো না?

—আমার অফিসের ধারে-কাছে বৃষ্টি পড়ে নি।

—তোমাদের মত ছেলেরা যেখানে থাকে সেখানে বৃষ্টি হয় নাকি?

—হয়, সে বৃষ্টি চোখে দেখা যায় না।

—ও, কে আমার এলো রে।

—তোমাকে আড়াল তো করবো। —এই রকম রাস্তায় আমার হাটতে খুব ভাল লাগে। —একা না—। বলে গোপাল থামতেই নীলিমা লজ্জায় মাথা নীচু করে। চারিদিকের আলো কখন সন্ধ্যের অন্ধকারে সরে গেছে। এরোড্রামের এলাকার জোরালো বৈদ্যুতিক আলোগুলো জ্বলে উঠছে. পাতলা মেঘে ভরে গেছে সমস্ত আকাশ। —এই বৃষ্টি আসবে এখুনি। নীলিমা উপরের দিকে তাকিয়েই বলে ওঠে।

—তাহলে আস্তে চলো। গোপাল বলে নীলিমার হাত ধরে টানে। —না না কোথাও গিয়ে দাঁড়াই চলো। বলে নীলিমা কয়েক পা এগিয়ে আশে-পাশে তাকায়। রাস্তায় দু পাশেই বড় বড় অচেনা গাছ, ঘন পাতায় অন্ধকার। 'ওই গাছটার নীচে চলো' নীলিমা কিছু দূরে ঘন পাতায় ঢাকা গাছের দিকে দৌড়তে থাকে। গোপাল পা চালিয়ে এগিয়ে যায়। গাছের তলায় যাওয়ার আগেই বৃষ্টি নামে। সমস্ত শরীর দুলছে, গোপাল অন্ধ মানুষের অনুসরণের চরিত্র পায়। চারিদিক থেকেই অনেক মানুষের ছুটে যাওয়ার সময়ে আনন্দ চিৎকার শোনা যায়। প্রায় আধভিজে অবস্থায় দুজনে গাছের তলায় পৌঁছয়। 'ইস একেবারে ভিজে গেছি' বলে নীলিমা আঁচলে মুখ মুছে। গাছের পাতায় তোমাদের এখানে জল আটকায় বোধ হয়?' 'অল্প হ্যাঁ', বলে প্রায় অন্ধকারে নীলিমা গোপালের শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়। কি গাছ কে জানে, ঘন পাতায় দীর্ঘবিস্তৃত গাছের সীমা। পাতায় জলের ফোঁটার মৃদু অনর্গল শব্দসকল। দূর থেকে আলোর পিছল প্রতিফলন। নীলিমার চোখজোড়া গোপালের মুখের উপরেই স্থির। 'গোপাল, পিছনে বসার জায়গা আছে' বলে নীলিমা হাসতে হাসতে গোপালের হাত ধরে টেনে গাছের গুঁড়ির পাশেই সিমেন্টের বেঞ্চে বসে পড়ে। 'এই, তুমি বসবে না?' নীলিমা গলার স্বর যেন দূর থেকে ভেসে আসে। গোপাল তাড়াতাড়ি নীলিমার পাশে বসে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ারও জোর আছে। দূরের আলোয় জলের ফোঁটাগুলি স্পষ্ট। হঠাৎ গোপাল থরথর করে কেঁপে ওঠে। 'কি হলো তুমি ঠান্ডায় কাঁপছো?' 'ঠান্ডা হাওয়া তোমার লাগছে না?' ফিসফিস করে গোপাল বলে। 'তুমি তো আছো', আদুরে গলায় বলে নীলিমা গোপালের মাথায়, মুখে গলায় হাত বুলিয়ে দেখে। কাঁধে মাথা রেখে একটা হাত পিঠের উপর দিয়ে জড়িয়ে গোপালকে কাছে টানে। নীলিমার কোমল শরীর, তার শরীরের রেখাবহুল আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য মুহূর্তে দুর্দান্ত উষ্ণতার সৃষ্টি করে গোপালের সমস্ত মুখে চোখে হাতে, বুক জুড়ে। দু হাতে সবলে নীলিমাকে জড়িয়ে ধরে বুকের উপর টেনে নেয়। দীর্ঘ উজ্জ্বল পাতা থেকে যেন জলের একমাত্র ফোঁটা পড়ে। গোপাল চুমু খায় নীলিমার কপালে গালে গলায় আকণ্ঠ কাতর উন্মুখ ঠোঁট জোড়ায়। কতক্ষণ নিবিড় আদরে দুজনে আপ্লুত ছিল জানে না, 'এই বৃষ্টি কমে গেছে' নীলিমা গোপালের মুখের উপর ঠোঁটজোড়া চেপে ধরে আস্তে বলতেই গোপাল তাড়াতাড়ি নীলিমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে বসে। আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য তৈরী হয়েছে নীলিমার মুখে, জলের অসংখ্য ফোঁটায় সমস্ত মুখ তার মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে দূরে অনেক আলোর প্রতিফলনে। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত দুজনে চুপচাপ হেঁটে আসে। সারাক্ষণ নীলিমা গোপালের পিছনেই থাকে। নীলিমা বাসের জানালা থেকে আজ হাত নাড়ে না, মাথা নীচু করে বসে থাকে। 'এখন রাত সাড়ে আটটা বাজে' নীলিমাকে নিয়ে বাসটা এগিয়ে যায়, পিছনের লাল আলো আরো অনেক গাড়ির ভিতর ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত শহরতলীর বিচিত্র শব্দ শব্দ শব্দ। হু-হু করে লরী দূরের বাস রাস্তা কাঁপিয়ে যাচ্ছে। একটা ভিড় বাস এসে থামে। ঠেলাঠেলি করে গোপাল উঠে পড়ে। আজ অনেক মানুষের ভিড়ের মধ্যে যেতে বিরক্ত লাগছে না। কোন রকমে ভিতরে ঢুকে উপরের রড ধরে দাঁড়ায়। সিটে বসে-থাকা সব লোকই প্রায় ঘুমোচ্ছে। সামনের লেডিজ সিটের দিকে তাকিয়েই গোপাল চমকে ওঠে। বয়স্কা এক চাষী বৌয়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে। মাথা জুড়ে নোংরা কাপড়ের ব্যান্ডেজ, তাজা রক্তে ভর্তি, কোথাও কালচে হয়ে গেছে রক্তের দাগ। থুতনিতে সামান্য মাটি লেগে আছে। গায়ে কেবল নোংরা গেঞ্জী, ছেঁড়া পুরনো প্যান্ট পরনে। বৌটির সিঁথি ভরা মোটা সিঁদুরের পাশে এলোমেলো তেল-বিহীন চুল। রঙচটা শাড়ি পরনে, সস্তা ছিটের ছাপা ব্লাউজ। মুখ জুড়ে উদ্বেগ ও ভয়ের চিহ্ন, দুটি চোখ উৎকণ্ঠায় কাতর। চোখের কোলে কি কান্নার রেখা শুকিয়ে গেছে?

—কি হয়েছে? গোপাল বৌটিকে জিজ্ঞাসা করে। —কি আর বলবো বাবা। ছেলেটা সেই সকালে জাম গাছ থেকে পড়ে মাথা ফাটিয়েছে। কত রক্ত, আমার একটা শাড়ি রক্তে ভেসে গেছে। আমাদের গ্রামে ডাক্তার নেই, সাত মাইল দূরে একজন আছে। তাকে খবর দিয়েও পাই নি। বলেই বৌটি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। গোপালের পাশের প্রৌঢ় লোকটি সান্ত্বনা দেয়, সাহস তৈরী করার মত অনেক কথা বলে। ডান হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বৌটি আবার বলে—সারা দিন ছেলেটা কিছু কাটে নি। কেবল চোখ খুলে তাকায়, লাল চোখজোড়া থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। মুখ চোখ কয়েক বার বিকৃত করেছে। তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি,

— অনুবাদ গ্রন্থ —
প্রবীর ঘোষ অনূদিত
মোরাভিয়া-র (Two Women)
দুই নারী ৬·০০
(The Woman of Rome)
রোমের রূপসী
২য় সং (১ম খণ্ড) ৪·০০
(২য় খণ্ড) ৫·০০
(The Wayward Wife)
স্বৈরিণী ৫·০০
ম্যানে-র (The Confessions of Felix Krull)
ফেলিক্স ক্রালের স্বীকারোক্তি ৬·০০
জোলা-র (Human Beast)
পাশবিক ৬·০০
(২য় সং)
মম্-এর (Theatre)
অভিনেত্রী ৬·০০
মেটালিয়াস এর (Peytor Place)
পেয়টন প্লেস ১০·০০
যোগেশচন্দ্র নন্দী অনূদিত ম্যাক্সিম গোর্কীর
(A Man Who Was Afraid)
ভয়ংকর ৭·৫০
চলন্তিকা প্রকাশালয়
৪, কলেজ রো, কলি-৯ ফোন: ৩৪-৪৬১৭

সঙ্গে ওর বাবা আছে। বৌটি চোখ ঘুরিয়ে পিছনের বসে থাকা লোকটিকে দেখায়। খালি গা, কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে মিশ কালো বয়স্ক চেহারার একটি লোক ভয়ার্ত চোখজোড়া ছেলের দিকে স্থির রেখে বসে।

বাসের বাস খুব জোরে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলেছে। গোপাল অনেক লোকের হাত, মাথার ফাঁকা দিয়ে দূরের সিটের যুবতী মেয়েটির দিকে তাকায়। বস্তাস্ত মাথার একটা অংশ ভেসে ওঠে। নীলিমা এখন বাড়িতে গিয়ে কি করছে? পরিতৃপ্ত, লজ্জায় আপ্লুত মুখ সমেত নীলিমা গোপালের সামনে উপস্থিত হয়। কাল কি আবার দেখা হবে? রাস্তার পাঁচমাথার মোড়ে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে একটি অচেনা মানুষের পায়ের দাগ দেখা যায়। অফিসের টেবিলে বসে গোপাল কাজ করছে একাগ্রমনে। আশে-পাশে ব্যস্ত সমস্ত মানুষ, ফাইলের পাহাড়। 'বাবু আপনার ফোন।' বিরিভাব তুলে 'হ্যালো' বলতেই 'তুমি তুমি।' নীলিমা বৃষ্টি ধোয়ার মত হেসে ওঠে, 'কখন আসছো?' শ্যামবাজারের নির্দিষ্ট জায়গায় অনেক গাড়ির আলো এসে পড়ে। সূর্যের আলোর সামনে সবুজ গাছের পাতার নিখুঁত স্বচ্ছতায় জায়গাটুকুর যাবতীয় নকশা ফুটে ওঠে। গোপালের পা দুটি মানসিক ব্যস্ততায়, অপেক্ষায়, কয়েক হাত দূরে নীলিমাকে দেখে মানসিক চঞ্চলতায় বিভিন্নভাবে ঘোরাফেরা করে। চারিদিকে রামধনুর রংগুলি বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে।

'এখানে নেমে পড়ে, উল্টো দিকে হাস-পাতাল।' কন্ডাকটর বাসের ঘণ্টা জোরে বাজিয়ে বলে ওঠে। চাষী লোকটি তার বৌ দুজনে ছোট ছেলেটিকে অতি যত্নে ধরে নামায়। ফাঁকা অন্ধকার সিমেন্টের রাস্তায় ভীষণ অসহায় মনে হয় তিনটি মানুষকে। বাস ছেড়ে দেয়, গোপাল চলন্ত বাস থেকে প্রায় লাফিয়ে নামে।

আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। বলে গোপাল রাস্তা পেরিয়ে হাসপাতালের দিকে এগোয়। লোকটি ছেলেটিকে সমর্থ হাতে কোলে তুলে নেয়। বৌটি একটা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে পিছনে আসে। রাত বেশী না হলেও হাসপাতালের ভিতর-কার রাস্তায় লোক কম। গোপালের পায়ের শব্দ আশে পাশে বড় বড় বাড়িতে প্রতি-ধ্বনিত হয়। অনেক ঘরের মৃদু আলো-থমথমে পরিবেশ অনেক অসুস্থ মানুষের উপস্থিতি বুঝিয়ে দেয়। এমারজেন্সীতে বাইরের আলো আজ জ্বলেনি। কয়েকটা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে গোপাল ভিতরে ঢোকে। দেয়ালের ধারে টুলে বসে উর্দিপরা একটি লোক চোখ বন্ধ করে বসে। একপাশে কাচ ঘেরা ঘর ভিতরে টেবিলের উপর ফোনের পাশে চেয়ারে বিবাহিতা সুন্দরী মহিলা বসে। তার পাশে দুটি চেয়ারে গোপালেরই সমবয়সী দুজন ডাক্তার বসে হাসতে হাসতে গল্প করছে। সামনে পরপর অনেকগুলি ঘর, কাতর চীৎকার, ওষুধের মিশ্রিত গন্ধ। পাশের দেয়ালে হাসপাতালের বিভিন্ন নিয়মকানুন লেখা। 'সতর্কতা' শব্দটা অনেকবার উল্লেখ আছে, দেখতে পায় গোপাল। কাচের জানালায় মুখ রেখে গোপাল বলে—রুগী কি আপনারা দেখবেন?

—হ্যাঁ। মাথা নেড়ে হাসিমুখ একটি ডাক্তার বলে। মুখে কোন ভাবান্তর দেখা যায় না। আবার হাত মুখ নেড়ে দুজনে গল্প করতে থাকে। মহিলাটিও জোরে হাসতে হাসতে গল্পে যোগ দেয়। গোপাল চুপ করে অপেক্ষা করে। তার ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে আসে। শব্দ তো রোজদিন শুনতে পায় না, আজ হঠাৎ! —আপনি একটু বাইরে বসুন রুগী নিয়ে, হাউস সার্জেন এলেই অ্যাটেন করবেন। মহিলাটি সুন্দর গলায় বলেন।

—সকাল বেলা গাছ থেকে পড়ে গেছে। এখুনি তাকে দেখা দরকার। গোপাল কাতর গলায় বলে। পিছন থেকে ছেলেটির বাবার ভয়ার্ত গলার স্বরে সমর্থন শোনা যায়।

—একটু বসুন না। ফর্সা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারটি টেবিল থেকে টেথিস্কোপ তুলে দোলাতে দোলাতে বলে।

রাগে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে গোপালের ছোট ছেলেটির যন্ত্রণা কাতর মুখ তাকে যেন ধাক্কা মারে। কতক্ষণ পর হাউস সার্জেন আসবে? —আমার ছেলেকে দেখবে না। বৌটি ছেলের মাথা কোলে নিয়ে মেঝেয় বসে। ছেলের কপালে মুখে হাত বুলোয়। টপটপ করে চোখের জল পড়ে। গোপাল দুঃখিত দৃশ্যের মুখোমুখি আর থাকতে পারে না। কাচের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েই থমকে দাঁড়ায়। জুতোর শব্দ তুলে মধ্যবয়সী ডাক্তার গম্ভীরমুখে এসে ঢোকে। ঘরের সবাই উঠে দাঁড়ায়। গোপাল তাড়া-তাড়ি ঘরে ঢুকে ডাক্তারটির মুখোমুখি।—আপনিই হাউস সার্জেন?—কেন বলুন তো। ডাক্তারটির কপালে রেখা পড়ে।—অনেকক্ষণ থেকে একটি ছেলেকে নিয়ে বসে আছি। গাছ থেকে সকালে পড়ে গেছে। অজ্ঞান হয়ে আছে, অনেক দূর থেকে আসছি। গোপালের কথা মাঝপথে থামিয়ে ডাক্তারটি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। গোপালও পিছনে পিছনে আসে। রাতের ঘর দালান ডাক্তারের ব্যস্ত চিৎকারে মুখর হয়ে ওঠে। এখন আর কিছু করার প্রয়োজন নেই বুঝতে পারে গোপাল। স্ট্রেচারে করে হাসপাতালের লোক ছেলেটিকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যায়। নার্স, দুটি ডাক্তার তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে চলে। বাইরে রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দ, অ্যাম্বুলেন্স বোধহয়। তখনি কাপড়ে জড়ানো বস্তাস্ত শরীর স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসে দুটি লোক। গোপাল আর ভিতরে না থেকে বাইরে বারান্দায় আসে। চারিদিক চুপচাপ, প্রায় দশটা বাজতে চলল। একঝলক ঠান্ডা হাওয়া আসে। কতক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে, মাটি নরম, নীলিমার পায়ের ছাপ কি রয়ে গেছে? ডান হাতে মুখ মুছতে গিয়ে সুন্দর গন্ধ এসে নাকে লাগে। তখনি স্বামী স্ত্রী এসে গোপালের সামনে মেঝের বসে পড়ে। কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। নিজেকে খুব হালকা লাগে গোপালের। বাড়িতে খেয়ে অফিস গেছে, সামান্য টিফিন করে নীলিমার কাছে যাওয়ার জন্য তাড়া-তাড়ি অফিস থেকে বেরিয়েছে। পেট ফাঁকা তবু শরীর ক্লান্ত হয় নি। মা বৌদি বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই এতক্ষণ দুশ্চিন্তা করছে। বৌটি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।—কাঁদবেন না, ডাক্তার তো এসে গেছে। কাল-কেই হয়তো ছেড়ে দেবে।' বৌটি শুনেই উঠে দাঁড়ায়। 'আপনি যা উপকার করলেন, কেউ তা করে না। গাঁয়ের সব লোক ভীড় করে দেখে গেছে, কেউ একটা ব্যবস্থা করেনি।' বৌটি ঘোমটা ঢাকা মাথা এপাশ ওপাশ করে যেন তার কথার সত্যতা দেখাতে পায়। আমার এই একটিই ছেলে। কিছু হবে না তো?' বৌটি আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে। গোলগাল, ফর্সা চেহারার ডাক্তারটি বারান্দায় আসে। গোপালের দিকে তাকিয়ে বলে—রুগী এখন ভাল। ইনজেকসন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। মাথায় ভিতরে সামান্য হ্যামারেজ হয়েছে। কোন ক্ষতি হবে না। বাবা মা বোধহয়? উদগ্রীব দুটি মানুষের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। বলে ডাক্তারটি হাসিমুখে আবার ঘরের দিকে চলে যায়।

—আমি তাহলে চলি? স্বামী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গোপাল জিজ্ঞাসা করে। বাড়ি যেতে আপনার অনেক রাত হয়ে যাবে বৌটি বিড়বিড় করে বলে।

গোপাল সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে আসে। উল্টো দিকের বাড়ি থেকে যন্ত্রণারাতের রুগীর গলা শোনা যায়। আস্তে আস্তে পা ফেলে হাসপাতালের গেটের দিকে এগিয়ে চলে। খারাপ ব্যবহার করেছে কি ডাক্তারগুলির সঙ্গে? গ্রামের অসহায় মানুষ দুটির মুখ চোখ তাকে সমর্থন করে। নির্জন রাস্তা দিয়ে গোপাল মাথা নীচু করে হেঁটে চলে। দু' পাশের টিমটিমে আলোয় তার ছায়া পড়ে না। এরোড্রোমে নীলিমার মুখে চোখে প্রতি-বিম্বিত স্বচ্ছ নরম আলোয় তার বাড়ি ফেরার পথ আজ উজ্জ্বল দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন।

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪,
কলকাতা দেখেছি-র
লেখক দীপঙ্কর দে-র নতুন উপন্যাস।
ডি এম, লাইব্রেরী | লিপিকা
৪২, বিধান সরণি | ৩০।১ কলেজ রো

পিছনে তাকিয়ে ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই
দেখি, ছায়ারা দিব্যি হেঁটে আসছে
আমার অনুসরণ করে। দুঃখগুলি
যখন সময় সময় প্রতিধ্বনি হয়,
আমি একটা তাড়না অনুভব করি।
বিদগ্ধে সঙ্কটে গ্রীষ্মের দাবুণ গঞ্জনা,
তারই মধ্যে অকস্মাৎ স্বপ্নের জগতে
শুরু করে কোলাহল স্মৃতির প্রতিমা;
মুহূর্তেই মুখরিত সুদূর অতীত।
আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই,
ছায়াদের পদক্ষেপ স্পষ্ট কানে আসে;
যেন কোনো রেলগাড়ি সমুখে এগোয়
ঘটনার ভিড় বয়ে বহু বগি নিয়ে।
ধমনীতে প্রতিমার নৃত্যের ঝঙ্কার—
তারে কাছে টেনে নিয়ে বক্ষের উত্তাপে
সুপ্তিমগ্ন নিশ্বাসের অস্থির ধাতাসে।

আর কী কী তুমি নিতে চাও ॥

অনন্ত দাশ

আর কী কী তুমি নিতে চাও ভালবাসা? নাও!
কৈশোর মন্থন করে দিয়েছি আমার রক্ত
যৌবনের বিলাসিতা তাও তুমি কেড়ে নিলে
সমস্ত উচ্চাশা ভুলে
আগুনে আদগ্ধ আমি যেন এক নিঃস্ব নাগরিক।

তবু সব নিয়েও কী? দুচোখে জমানো অশ্রু
ঐ দশকযজ্ঞাধা ভরে দিতে পারে;
এই শুষ্ক হাড়ে
আদিম উচ্ছ্বাসে আজো জ্বলে উঠতে পারে কোন অরণ্যের ক্ষুধা
জীবনের মুগ্ধ, মত্ত জলে
অক্লেশে ডোবাতে পারি যাত্রীবাহী সাতটি জাহাজ।

অথচ এখন তুমি নির্বিকার
সীসাঘন জলের মতো ঠাণ্ডা নিস্পন্দ নির্বাক
আমার জীবন-জন্ম আর কোন অন্ধকার শোকের গভীরে
বসে আছ তুমি
আর্তনাদ ডোবে যার শোধনির বজ্রময় দিন
ক্ষুব্ধিক্ষুব্ধ আকাশে কাটে তলোয়ার বাঁকানো ছুরি
প্রতিদিন বিদ্ধে যাচ্ছে বুকে
আনক ঝড় ও তুফান মাথাকুটে ক্ষোভে ধ্বস্ত ভাসে
শ্মশানের একপাশে জ্বেলেছি যাখি
অমর চুল্লীর শিখা, শিল্পিত আগুন।

রবিবার ॥ অমিত বসু

গত রবিবার ডাক্তারের কি
তার আগের রবিবার মোটর মেকানিকের মজুরি
তার আগেরটা সাম্যাজিক সৌজন্যের সাজা
এমনি করে ক্যালেন্ডারের পাতা
হরদম উল্টে যাচ্ছি বছরের পর বছর
পাহাড়ী ডাকবাংলোর জাল সকালের মত ধবির
খুঁজে বেড়াচ্ছি ইনো হয়ে যেমন খুঁজছি
দেবদারুপি ছাতা কোনও দাম
ভাবনার বাইরে কোনও ভাব
মাংসের বাইরে কোনও ভালবাসা
রক্তের বাইরে কোনও মাদকতা
হারিয়ে গিয়েছিলাম মত রবিবার

সাতদিনের শুভাশুভ

(২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর)

গ্রহসন্নিবেশ : মেষে মঙ্গল, মিথুনে শনি ও কেতু, কন্যায় রবি ও বুধ, তুলায় শুক্র, ধনুতে রাহু এবং মকরে বৃহস্পতি।

মেষ : পারিবারিক সুখ পাবেন। শরীরও ভাল। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় শুভ। সম্পত্তি থেকে আয় বাড়বে। কর্মক্ষেত্রে অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে আনন্দের সময়। শুভ তারিখ : ৩, ৫ অকটোবর।

বৃষ : চোখের পীড়ায় কিছু কষ্টভোগ হতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সুবিধার নয়। আর্থিক ক্ষেত্রে আশানুরূপ। ব্যবসায় শুভ। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ১, ২ অকটোবর।

মিথুন : শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটতে পারে। আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকলেও আয় মন্দ নয়। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে বাধা আসবে। মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল নয়। শুভ তারিখ : ২, ৩, ৪ অকটোবর।

কর্কট : শরীর মোটের উপর ভাল। ছেলের সাফল্যে মনটা ভাল থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্মে শত্রুতা বা বাধা থাকলেও সাফল্য আসবে। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ২, ৩, ৫ অকটোবর।

সিংহ : শরীর ক্রমশ ভাল হবে। ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য সুবিধার নয়। আর্থিক ক্ষেত্রে মোটের উপর ভাল। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্মে অনুকূল পরিবর্তন আসতে পারে। মেয়েদের পক্ষে সুখের সময়। শুভ তারিখ : ১, ২, ৪, ৫ অকটোবর।

কন্যা : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। আয় ক্রমশ বাড়বে। ব্যবসায় আশানুরূপ। কাজ-কর্মে আশানুরূপ। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ১, ২, ৪ অকটোবর।

তুলা : স্বাথ্য সুবিধাব নয়। পাবিবারিক ক্ষেত্র চলনসই। আর্থিক অসুবিধা ব্যবসায়ে উদ্বেগের লক্ষণ আছে। কাজ-কর্ম ভালই চলবে। মেয়েদেব মানসিক উন্নতিব যোগ আছে। শুভ তারিখ : ২, ৩ অকটোবব।

বৃশ্চিক : শরীর একপ্রকার। পারিবারিক ক্ষেত্রে উন্নতির যোগ আছে। আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সাফল্যের লক্ষণ আছে। কাজকর্ম শুভ। মেয়েদের সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ : ২, ৩, ৫ অকটোবর।

ধনু : শরীর একপ্রকার। পারিবাবিক ক্ষেত্রে চলনসই। আর্থিক দুশ্চিন্তার লক্ষণ আছে। ব্যবসায়ে মন্দ নয়। কাজকর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের শুভ লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ২, ৩ অকটোবর।

মকর : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। আর্থিক অসুবিধা ও ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিব লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ২, ৩, ৫ অকটোবর।

কুম্ভ : শবীর একপ্রকার। পাবিবারিক ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্মের উন্নতির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ২, ৩, ৫ অকটোবর।

মীন : শরীর ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। ব্যায়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্মে উন্নতিব লক্ষণ আছে। মেয়েদের সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১, ২, ৩, ৫ অকটোবর।

—শুভাচার্য

প্রশ্নের উত্তর

তুষার মুখার্জি—(শ্রীরামপুর) ৩৬ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব। এবং বিবাহের পর ভাগ্যোন্নতি সূচীত হবে। এবছর পরীক্ষার ফল ভাল হবে কি-না সন্দেহ। এখন বদলীর সম্ভাবনা নেই।

শৈব্যা দাসাধিকারী —(মেদিনীপুর) ৩৬ বছর বয়সের পর স্বাস্থ্য ভাল হবে চাকুরী বজায় থাকবে।

শ্রীমতী কে চ্যাটার্জি—১৩৮০ সালেব শেষের দিকে বিবাহ সম্ভব। দাম্পত্যজীবন সুখের হবে।

শঙ্করকুমার দাস—পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে কর্মপ্রাপ্তি আশা করা যায়।

দীনেশচন্দ্র পাল—স্বাস্থ্য মধ্যম। ৪৮ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত ভাগ্য অর্থ, কর্ম বিষয়ে উত্তম সময়। ইন্দ্রনীলা ধারণ কর্তব্য। সন্তান স্থান ভাল। লটারী যোগ আছে।

বংশধর ভঞ্জচৌধুরী—(সোদপুর) আয়ু ৬৯-৭০ বৎসর। ভবিষ্যৎ জীবনে অর্থকষ্টের যোগ নাই বরং উত্তরোত্তর উন্নতি হবে।

প্রণবকান্তি ভঞ্জচৌধুরী — (সোদপুর) ২২-২৩ বছর বয়সে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। গ্রাজুয়েট হবার যোগ আছে। আয়ু ৬৭-৬৮ বছর।

নীলিমা ভঞ্জচৌধুরী — (সোদপুর) গ্র্যাজুয়েটের পূর্বে বাধা। ভাগ্য মধ্যম।

মধুমিতা রায়—এবছর বিদেশ ভ্রমণে প্রবল বাধা আছে।

ভাস্কর সেন—১৯৭৩ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মধ্যে কর্ম লাভের সম্ভাবনা।

অনুপমা ব্যানার্জি—(হাওড়া মঙ্গল গ্রহ বিশেষ অশুভ। এবছর হবার যোগ। প্রবাল রত্ন ধারণীয়।

চৈতী পাল—(আসাম) ১৩৮০ সালেই বিবাহ যোগ প্রবল। স্বামী ব্যাঙ্কুরীজীবী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন।

রঞ্জিৎকুমার চ্যাটার্জি—বিরুদ্ধ গ্রহ মঙ্গল থাকায় এখানে বিবাহ না হওয়াই সম্ভব।

অমলকুমার দত্ত—(কোচবিহার) ককর্ট রাশি, দেবাকিগণ, ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে কর্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ইন্দ্রনীলা ধাবণ কর্তব্য।

প্রণব সেনগুপ্ত — ১৩৮০ সালের কার্তিক মাস থেকে সময় ভাল যাবে। মাঘ-ফাল্গুনে কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

নিখিল ধর—১৩৮০ সালে বিবাহ যোগ প্রবল। শ্বেত প্রবাল রত্ন ধারণ কর্তব্য।

রজনীকান্ত রায়—(রাজারহাট) ভরণী নক্ষত্র, মেষ রাশি, সিংহ লগ্ন, পরীক্ষার ফল মধ্যম। ২৫ বছর বয়স হ'তে শান্তি পাবেন।

প্রকাশচন্দ্র বসু—(বিরাটী) আয়ু ৭৮ বছর পাওয়া যায়। ভবিষ্যতে অর্থার্জনে বিঘ্ন।

সুবিমল সান্যাল—দুজনেরই জন্ম সন তারিখ সময় দরকার।

মন্টু জানা—১৯৭৬ সালে ডিগ্রী পাবার যোগ আছে, কিন্তু রাহু বিরুদ্ধ থাকায় নানারূপ প্রতিবন্ধক ঘটাবে।

ডাঃ এইচ এন রায়—৩০ বছর বয়সে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমন সম্ভাবনা। ৫-৬ রতি গোমেদ ধারণীয়।

দীপালী ভট্টাচার্য—২৫ বছর বয়সে জানা পরিচিতের মধ্যে বিবাহ সম্ভাবনা।

অর্চনা বসু—কুম্ভ লগ্ন। আগামী বছর পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার যোগ আছে।

প্রসন্নকুমার দত্ত—বৃহস্পতি বক্র ত্যাগ করলে অর্থাৎ ১৯৭৩ নভেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে কর্মপ্রাপ্তি সম্ভব।

জয়রাজিতা মজুমদার (হিজলী) : ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত রাহুর দশায় হবে না।

দেবপ্রসাদ মৈত্র : আগামী এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্বজন বিরোধ কিছুটা থাকবে।

বাপী মৌলিক : মকর রাশি। কুম্ভ লগ্ন।

প্রতীক মৈত্র : পাশের আশা কম।

রবি দত্ত : বর্তমানে প্রতিকূল গ্রহাবস্থানের জন্য সম্ভাবনা কম।

অমিয় সেন : উচ্চশিক্ষিত হবেন। বিদেশ ভ্রমণযোগ আছে।

পরমেশ্বর জৈন : আগামী নবেম্বর মাসের পর শুরু হতে পারে।

গোলোক মল্লিক : মামলার রায় আপনার স্বপক্ষে হবে।

পীযূষ দাস : আর্থিক কষ্ট পাবার যোগ নেই।

ধীরাজ কুণ্ডু : ডাক্তারী পড়ার যোগ বেশী।

প্রশান্ত চৌবে : ২৫ বছর বয়সের পর ব্যবসায় উন্নতি হবে।

কৃষ্ণা দেবনাথ : ১৩৮২ সালে বিবাহ সম্ভব। দাম্পত্য জীবন মধ্যমপ্রকার হবে।

রাজীব দাস : সম্ভাবনা বেশী।

উমেশ দত্ত : মিথুন রাশি। ধনু লগ্ন।

আরতী মজুমদার : ২৬ বছর বয়সে হতে পারে।

কমলা সেন : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

তামিল পাহক : হবার যোগই বেশী।

সীতা ভট্টাচার্য : হবে না।

মালা ভদ্র : পাশের যোগ প্রবল।

অনিকেত ভট্ট : আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

পিনাকী মুখার্জি : বিশেষ হবে না।

শৈবালিনী হাজরা : ৪৫ বছর বয়সের পর কেতুর দশায় গৃহ-সম্পত্তি হতে পারে।

কমলেশ সেনগুপ্ত (বিরাটি) : ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত শনির দশায় বিদ্যা বিষয়ে অধিক পরিশ্রমে অল্প লাভ।

মিনু ভট্টাচার্য (হালিসহর) : ২৪ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব।

বিনোদ পাইন (কলি-৭) : ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে চাকুরী পেতে পারেন।

অপরেশ মজুমদার : ১৯৭৬ সালের আগে কর্মোন্নতির সম্ভাবনা কম।

মালা গুঁই (বাগুইহাটি) : প্রতিকূল গ্রহাবস্থানের জন্য ১৯৭৪ সালে পাশের আশা কম।

বাবলি পালিত : জন্ম তারিখ ও বার না মেলায় আপনার জবাব দিতে অক্ষম। জন্ম তারিখ ঠিক করে জানাবেন।

শোভনা পাল (কালিঘাট) : স্বামী ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনীয়ার হবার যোগ। ১৩৮১ সালে বিবাহ সম্ভব।

সামশুল হক চৌধুরী (কুষ্টিয়া) : বিদেশ ভ্রমণ যোগ নাই। লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করবেন।

মিনাক্ষী দাস : ব্যক্তিগতভাবে পত্রের মাধ্যমে জবাব দেওয়া হয় না।

দিলীপ ঘোষ : ২৭ বছর বয়সের পর কিছুটা কমবে।

তামিল ব্যানার্জি : হ্যাঁ। ১৯৭৪ সালে সম্ভব।

নিতাই ঘোষাল (কলি-২৬) : কর্কট রাশি। বৃশ্চিক লগ্ন।

মিনা+অসিম : পুত্রসন্তান সম্ভাবনা বেশী।

অলোক দত্ত : হিসাব সংক্রান্ত বিদ্যায় উন্নতি সম্ভব। বিদেশ ভ্রমণ যোগ প্রবল।

প্রণবেশ মজুমদার : ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে চাকরী পেতে পারেন।

নিলীমা ভট্টাচার্য : কোনো মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সজল কুণ্ডু : আগামী মাঘ-ফাল্গুনে প্রবল যোগ।

মিলন দত্ত : বিদেশ ভ্রমণ যোগ আছে তবে ৩৬ বছর বয়সের পর।

বিশ্বনাথ দাস (নববারাকপুর) : সরকারী চাকুরীতে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন।

দীপা সেন : না করাই বাঞ্ছনীয়। অশান্তি থাকবে।

সীমা চ্যাটার্জি (লেকটাউন) : স্বামীর কোষ্ঠী প্রয়োজন।

জগদীশ ঘোষ : ১৯৭৪ সালে জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে কর্মোন্নতি আশা করতে পারেন।

মানিক রায় : কর্মোপলক্ষে ২৭ বছর বয়সে বিদেশগমন সম্ভব।

পরেশ চক্রবর্তী : স্বীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

অজানা পাঠিকা (কলি-৩৬) : হ্যাঁ।

যাদব বটব্যাল (কলি) : জন্ম সন তারিখ সময় পাঠাবেন।

কাজল রায় : রাহু-শনির শুভভাবাপন্ন হেতু এ বছর পাশের সম্ভাবনা বেশী।

মিতালী ঘোষ : ৭মস্থ মঙ্গল-শনির অবস্থিতি দাম্পত্যজীবনে কিছুটা অশান্তি ঘটাবে।

ভরদ্বাজ মিত্র : ১৯৫০ সাল ৬ই আগস্ট। মেষ রাশি। বৃশ্চিক লগ্ন।

স্মৃতিকণা চৌধুরী : ২৫ বছর বয়সে বিবাহ সম্ভব।

জয়ন্তমা দাশগুপ্ত : ১৯৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মামলা বিষয়ে অশুভ।

পূর্ণ ঘোষ : ৮মস্থ রাহুর জন্য ৬-৭ রতি গোমেদ রত্ন ধারণীয়।

মণীন্দ্র ভট্টাচার্য : ব্যবসায় বিশেষ সুবিধা হবে না।

বিনয় ব্যানার্জি : স্বোপার্জিত অর্থে বাড়ী-ঘর করতে পারবেন।

শুভ্রা তালুকদার (বারাসত) : জন্ম সন সময় জানাবেন।

শান্তি কর্মকার : ১৩৮১ সালে সম্ভব।

উৎসব কুণ্ডু : আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্ভাবনা আছে।

হরিচরণ দাস (বেলেঘাটা) : ১৯৭৪ সালে মে থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে স্থানান্তর সম্ভব।

অসীম পোদ্দার (নিউদিল্লী) : বিশেষ আশাপ্রদ হবে না।

অসতী। অপর্ণা সেন, পরিচালক সলিল দত্ত ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

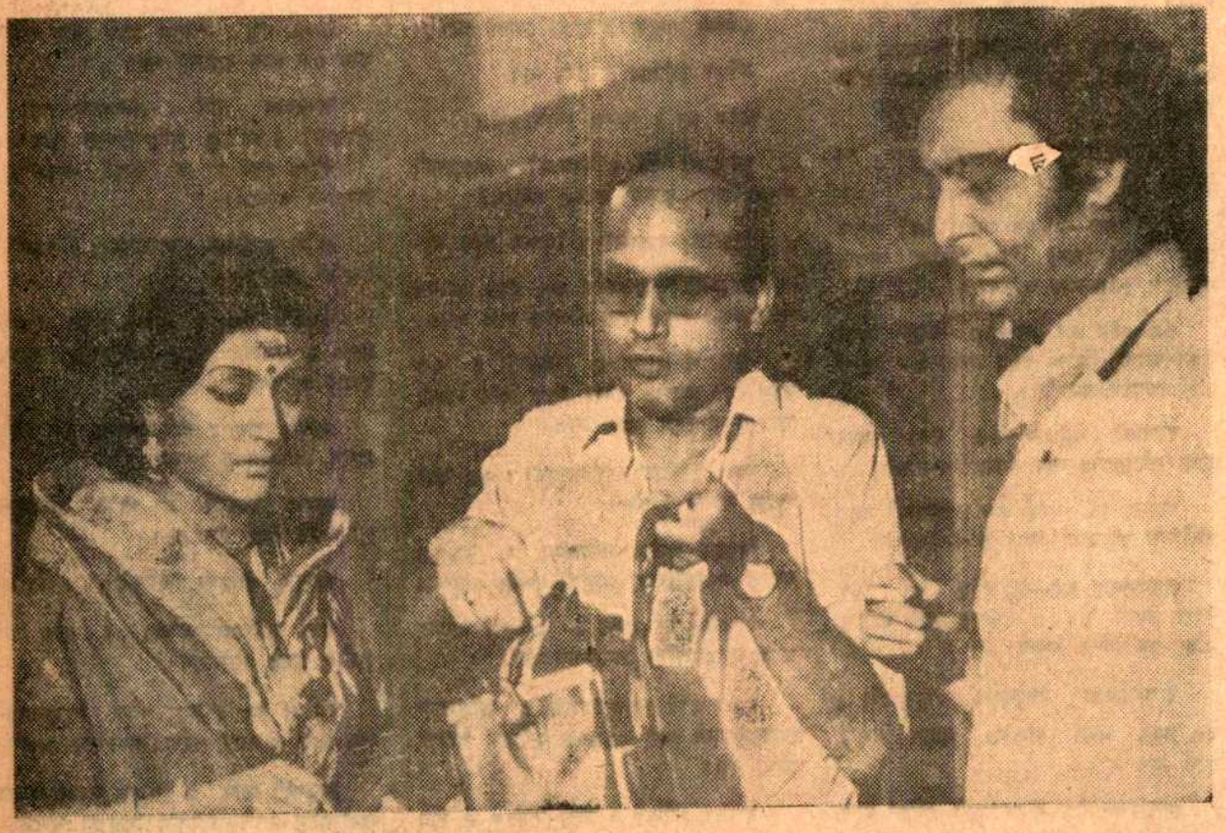

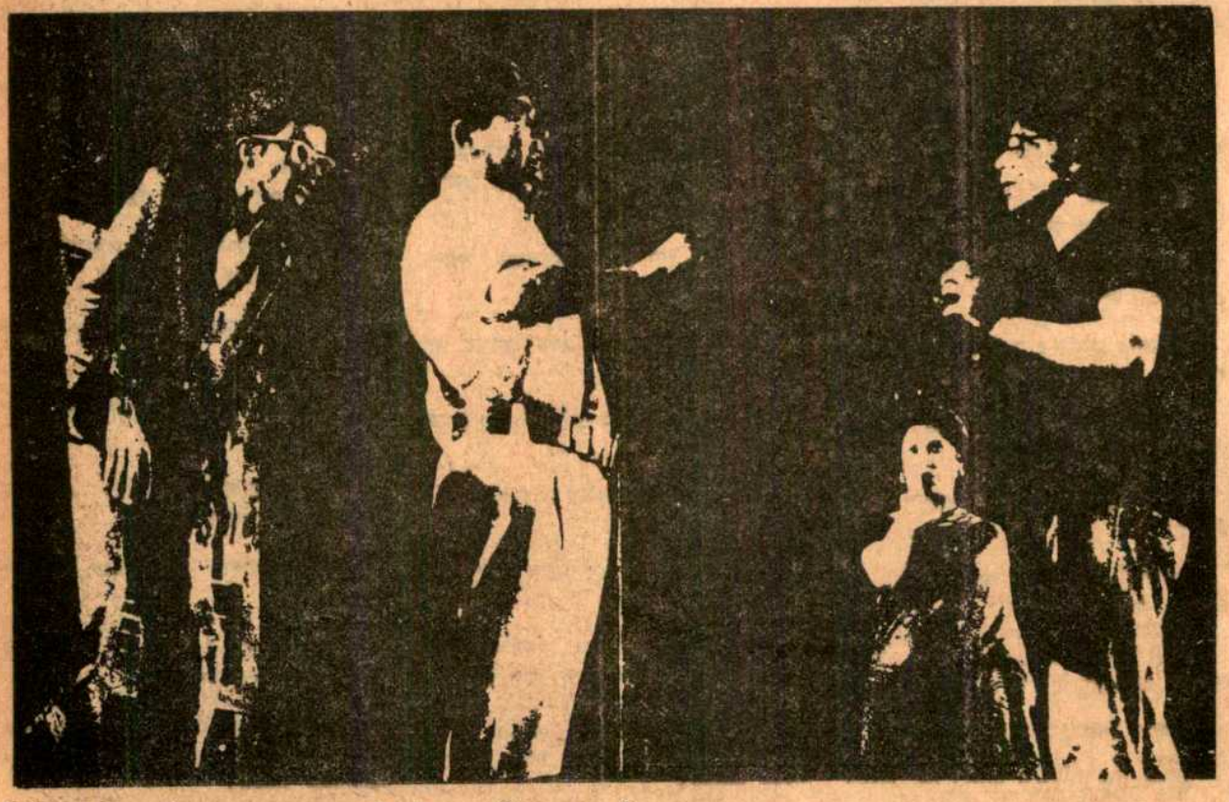

ছ পি এ টি প্রযোজিত কলকাতার হ্যামলেট নাটকের একটি দৃশ্যে সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন ও অসিত বসু। ফটো অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

'পুজোর লগন এলো

কলকাতাবাসী বাঙালীর সুখের অবধি নেই। সাপ্তাহিক র‍্যাশন বরাদ্দের পরিমাণ কমেই চলেছে, সরষের তেল বাজার থেকে উধাও একটা শুকনো পাঁউরুটির টুকরো চিবিয়ে যে দু' চুমুক চামড়া-মেশানো চায়ের গরম জল গলাধঃকরণ করবে, পাঁউরুটি নববধূর মতো দরজার অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়েছে বলে তারও উপায় নেই, অনির্দিষ্ট 'লোড-শেডিং'-এর জ্বালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘর-বাড়ী অন্ধকার থাকে, স্টোভ জ্বলেনা, অথচ 'হা কেরোসিন, হো কেরোসিন' করে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় বোতল হাতে করে, মাসের প্রথমেই নগদ টাকা দিয়ে দুধের কার্ড করেও দুদিন অন্তর শুনতে হয় 'দুধের গাড়ী' আসেনি। শুধু যে ডাল-ভাত বা ডাল-ধারণ করবে, সেই ডাল নামক পদার্থটিও রুটি খেয়ে সাধারণ গৃহস্থ বাঙালী জীবন-অগ্নিমূল্য। —বাঙালীর এই সুখের সংসারে বৎসরান্তে আনন্দময়ী মা আসছেন নিয়মমাফিক। মা দুর্গা নাকি দুর্গতি-নাশিনী, অসুরদলনী! কিভাবে তিনি কার বা কাদের দুর্গতি নাশ করবেন এবং কোন্ কোন্ অসুরকে দলন করে নিজে দায়মুক্ত হবেন বা নিজের মহিমা প্রকাশ করবেন, তা তিনিই জানেন। আমরা জানি, নিত্যকারের দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও সৎ বা অসৎ যে-কোনও উপায়েই আমাদের বেশ-কিছু টাকা সংগ্রহ করতেই হবে ছেলেমেয়ের শাড়ী, ব্লাউজ, প্যাণ্ট, জুতো কিনে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে।

এই সঙ্গে আরও জানি, মহাদেবীর শুভ আগমন উপলক্ষ্যে আজ, শুক্রবার, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকেই কলকাতা ও শহর-তলীর বিভিন্ন চিত্রগৃহে দেখানো শুরু হচ্ছে অন্তত ৫ খানি শুধু বাঙলা ছবিই। (১) এলিট সিনেমায় মৃণাল সেনের **পদাতিক**; (২) রূপবাণী, অরুণা, ভারতী এবং অন্যত্র তরুণ মজুমদারের **শ্রীমান পৃথ্বীরাজ**; (৩) রাধা, পূরবী, পূর্ণ এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে সলিল দত্তের **শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন**; (৪) শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং আর আর ছবিঘরে উমাপ্রসাদ মৈত্রের **এক যে ছিল বাঘ** এবং (৫) নিউ এম্পায়ার, বসুশ্রী, বীণা, আলোছায়া প্রভৃতিতে শচীন অধিকারীর **রৌদ্রছায়া**। এবং এই পাঁচখানি

নগরদর্পণে । উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। পরিচালনা ঃ দিলীপ মুখোপাধ্যায়
ফটো ঃ অমৃত

মৃণাল সেনের **পদাতিক** সিমি

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন সৌমিত্র ও অপর্ণা

মুক্তিলাভ করছে বেশ কয়েকখানি, রঙীন, নাচ-গানে ভরা হিন্দী ছবি : (১) ভাপ্পী সোনী পরিচালিত ও প্রযোজিত **ঝিলকে উস্ পার**; (২) কে. শঙ্কর পরিচালিত **রিক্সাওয়ালা**; (৩) সুনীল দত্ত ও জয়া ভাদুড়ী অভিনীত **পূজা আউর পায়ল** এবং (৪) শান্তিলাল সোনী পরিচালিত **নাগ মেরে সাথী**।

কঠিন বাস্তব থেকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে মনকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে সুলভতম প্রমোদোকরণ হচ্ছে চলচ্চিত্র। আনন্দময়ীর আগমনে যাঁরা সত্যিই আনন্দিত হবেন এবং ক্ষতবিক্ষত পকেট যাঁদের নিরানন্দের মাত্রাকে বর্ধিত করবে, তাঁরা—এই উভয় দলই যে তাঁদের পছন্দমত ছবি দেখে অন্তত ঘণ্টা দুতিন স্বপ্নলোকে বিচরণ করবার জন্যে সিনেমা হাউসগুলির সামনে ভীড় করবেন, এ-কথা অনুমান করা কঠিন নয়।

জয় মা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, আনন্দদায়িনী, ত্রিভুবনতারিণী!

সম্প্রতি দেখা চেক ছবিগুলি

গেল ১৪ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাতদিন ধরে লাইট হাউস সিনেমায় চেকোশ্লোভাকিয়ার যে-সাতখানি কাহিনী-চিত্র এবং সমসংখ্যক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হল, তার সবগুলিই অতি সাম্প্রতিক কালে নির্মিত হয়েছে; কোনোটি ১৯৭০-এ, কোনোটি ১৯৭১-এ এবং কোনোটি ১৯৭২ সালে। কাজেই বলতে পারা যায়, ছবিগুলিতে ঐ দেশের আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এবং ঐ সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, কলাকৌশলের দিক দিয়ে ঐ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের চূড়ান্ত অগ্রগতি। কি সাদা-কালো বা রঙীন চিত্রগ্রহণে, কি সেট-সেটিংয়ের বাস্তবতায়, কি পাত্রপাত্রীদের পোশাক-পরিচ্ছদের নির্বাচনে, কি বহির্দৃশ্যের উপস্থাপনায়, কি অপটিক্যাল্স্-এর সুপ্রয়োগ দ্বারা দৃষ্টিবিভ্রমকারী জাদু সৃষ্টির কাজে—সর্বত্রই এমন একটি উচ্চ-পর্যায়ের নিখুঁত ভাব বিরাজ করছে, যে মন আপনা থেকেই বলে উঠতে বাধ্য হয়—হাউ **পারফেকট**! কলাকৌশলের সর্বস্তরে এমন আশ্চর্য উৎকর্ষের নিদর্শন পৃথিবীর আর কোনও দেশের চলচ্চিত্রে আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। আর একটি কথা। পূর্ব ইয়োরোপের অন্তর্গত এই সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক রাজ্যটির কোনো কাহিনী-চিত্রেই যৌন-আবেদনের ছিটেফোঁটাও পরিবেশিত হয়নি। এমন কি, নারী চরিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদেও একটি অসামান্য শালীনতা রক্ষা করা হয়েছে। তরুণ চেক চলচ্চিত্রকারেরা অবশ্যই বিশ্বাস করেন, চলচ্চিত্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দর্শকদের প্রমোদ বিধান এবং তাঁরা এও বিশ্বাস করেন, উপস্থাপনার গুণেই কাহিনী চিত্তগ্রাহী হয়; তাকে চিত্তাকর্ষক করবার

জন্যে কোনো রকম নোংরামির আশ্রয় গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর একটি কথা: কাহিনীর বিভিন্নতায় বিভিন্নধর্মী রসের পরিবেশনে, এমন কি চলচ্চিত্রায়ণ পদ্ধতির বিভিন্নতায় প্রতিটি ছবি একক।

প্রথমেই বলব, সাতটি কাহিনী-চিত্রের মধ্যে সাদা-কালোয় তোলা একমাত্র ছবি **'ফেয়ারলি ডিসেণ্ট ফেলোজ্'**-এর কথা। ম্যারেক একজন লরীচালক—খেটে খাওয়া মানুষ। হঠাৎ সে আবিষ্কার করল, একটি মোটর-সাইকেল-ওয়ালা যুবকের সঙ্গে তার স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কথা। বিনা বাক্যে সে স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেল এবং স্থান ত্যাগ করবার আগে স্ত্রীর প্রেমিককে এমন প্রহার করল যে, ভাঙা হাত নিয়ে সে হাসপাতালে যেতে বাধ্য হল। ম্যারেক হয়ে পড়ল আদালতের চোখে অপরাধী। কিন্তু সে আদালতের চোখ এড়িয়ে বহু দূরাঞ্চলে গিয়ে একটি ট্রাক-চালকের কাজ নিল। কাজে তার একাগ্রতা ও দক্ষতা দেখে ফোরম্যান ম্যাকো তার প্রতি খুশী হল। লোকটি কখনও হাসে না, হৈ-হুল্লোড়ে যোগ দেয় না, মদ খায়না—এইসব কারণে অন্যান্য চালকেরা তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। ওদেরই মধ্যে একজনের গর্ব ছিল সেরা লরীচালক বলে। কিন্তু ম্যারেকের দুঃসাহসিকতার কাছে সে হেরে গেল। একদিন সেই হাতভাঙা প্রেমিকের বাবা ম্যারেকের সন্ধান পেয়ে তার কর্মস্থলে এসে হাজির হল। ম্যারেক তার উপার্জনের যথাসর্বস্ব দিয়ে তাকে চুপি চুপি বিদায় করলে। ব্যাপারটা কিন্তু ফোরম্যান ম্যাকোর নজর এড়াল না। জিজ্ঞাসাবাদ করতে ম্যারেক যখন তার কাছে তার বেদনাদায়ক অতীতের কথা জানাল, তখন ম্যাকো তার প্রতি বেশী করে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে পড়ল। ম্যারেকের কর্তব্যনিষ্ঠা দলের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার আবহাওয়া এনে দিয়েছিল। ফলে ম্যাকোর দল ওদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হল। কিন্তু ম্যারেক যখন শুনল, ওর প্রতি সহানুভূতিপরবশ হয়ে এবং দলের সুনাম বৃদ্ধির জন্য ম্যাকো ওরা যত না কাজ করেছে, তার চেয়ে বেশী খাতায় লিখেছে, তখন সত্যপরায়ণ ম্যারেক এই অন্যায়ের জন্যে ম্যাকোকে এমন ভর্ৎসনা করল যে, ম্যাকো দল ছেড়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু ম্যারেক তাতেও সায় দিতে রাজী নয়। দলের সকলের জন্যেই যখন ম্যাকো মিথ্যাচার করেছে এবং সেই মিথ্যাচারের ফলে সকলেই যখন পুরস্কৃত হয়েছে, তখন সকলেরই শাস্তি ভাগ করে নেওয়া

শ্রীমান পৃথ্বীরাজ
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া রায়চৌধুরী

উচিত। এবং যতদিন না অন্যায়ভাবে বর্ধিত কাজটির সমান কাজ ওদের দ্বারা পূরণ হচ্ছে, ততদিন নিয়ম করে ওদের কাজকে কম করে খাতায় লিখতে হবে, এই শর্তে ম্যারেক ম্যাকোকে দলপতি হিসেবে থাকতে রাজী করালো। ম্যাকো ম্যারেকের মনোবেদনার কথা জানত। তাই সে তাকে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলে। খুব খুশী মন নিয়েই ম্যারেক স্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু বহুদিন নিরুদ্দেশ থাকবার পরে ম্যারেকের এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের জন্যে তার স্ত্রী আদৌ প্রস্তুত ছিল না; সে ততদিন অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে। ম্যারেকও এই পরিস্থিতির কথা চিন্তাতেও আনেনি। কাজেই অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কিন্তু তার পরে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সে আবার ফিরে গেল তার কর্মস্থল অভিমুখে।

—ছবির নব্বই ভাগ জুড়ে আছে লরী-চালকদের কর্মকাণ্ড এবং কোথাও কোনো প্রেম-ভালোবাসার বাষ্প মাত্র নেই। ছবিতে ম্যারেকের স্ত্রীকে দুবার মাত্র দেখা যায়; এক, ম্যারেক যখন তাকে বাড়ীর চাবি দিয়ে বিদায় নিচ্ছে এবং দুই, শেষে যখন সে তার কাছে ফিরে গিয়েও আবার ফিরে আসতে বাধ্য হল। কিন্তু পরিস্থিতি ও দৃশ্যরচনায় উপস্থাপনাগুণে, ক্যামেরা স্থাপন ও চালনা কৌশলে, দক্ষ সম্পাদনা এবং সর্বোপরি জীবন্ত অভিনয়গুণে ছবিটিকে প্রায় রুদ্ধনিশ্বাসে উপভোগ করতে হয়, এমনই আশ্চর্য তার গতিবেগ। ছবিটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন যে, উষর সাহারার বুকেও পদ্মফুল ফোটানো সম্ভব। ইয়ান সোলোভিক রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য এবং ইয়োসেফ রেজুকার পরিচালনা—এবং ঐ সঙ্গে শিল্পীদের সামগ্রিক অভিনয় সম্পর্কে কোনো প্রশংসাই প্রশংসা নয়।

এর পরেই বলব রঙীন ছবি **'দি গার্ল অন দি ব্রুমস্টীক'**-এর কথা। ছেলেভোলানো রূপকথাই বটে; কিন্তু ছবিটি আমাদের মতো বুড়োরাও কি কম উপভোগ করেছে? এবং তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীরাও কি বাদ গেছেন? না, ছবির নায়িকা জাদুকরী সাকসেনা কাউকেই মাতাতে ছাড়েননি। কিন্তু এই ভূমিকায় নিতান্ত নিরীহদর্শনা রূপসী অভিনেত্রীর মুখ থেকে নির্লিপ্ত-ভাবে নিঃসৃত 'মন্ত্র'গুলি মত না দর্শক কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে, তার থেকে ঢের ঢের বেশী চমকের সৃষ্টি করেছে চিত্র-গ্রহণের ভোজবাজী, যার ফলে নিমিষে মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছে মোরগ, শশক ও গোরু-বাছুরে এবং মহিলার মুখে গজিয়ে উঠছে ঠেলে-ওঠা দাঁত। জাদুর রাজ্য থেকে পালিয়ে সাধারণ মানুষের রাজ্যে এসে সাকসেনা যে-লণ্ডভণ্ড কাণ্ড জুড়ে দিল, তাতে মেতে উঠবে না, এমন দর্শক বিরল; যখন সে আশ্চর্য নিরীহভাবে তার উপকারী তরুণটিকে জিজ্ঞেস করে, ভালোবাসা কাকে বলে এবং উত্তরে ছেলেটি একজোড়া কাপ-ডিস দেখিয়ে বলে—এদের আলাদা করে রাখলে কেমন যেন একা একা লাগে, তখন পরিস্থিতিটি কি আশ্চর্য মাদকতারই না সৃষ্টি করে। মাত্র চুয়াল্লিশ ঘন্টার জন্যে সে সাধারণ মানুষের রাজ্যে বিচরণ করতে এসে আর ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু 'শুয়োরের কান' না খেলে তাকে আবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জাদুর রাজ্যে ফিরে যেতে হবে, এই অবস্থায় সে যখন পাগলের মতো 'শুয়োরের কান'-এর খোঁজে ব্যস্ত, তখন তার তরুণ বন্ধুর চেষ্টায় একজন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী তাকে 'হগ্‌স্‌ ইয়ার'-নামে কোনো উদ্ভিদের রস পান করতে দিল এবং ফলে তার ঐ তরুণ বন্ধুটিকে কোনোদিনই আর ছেড়ে যেতে হল না সাকসেনাকে।

—হিন্দী ছবিতে কারণে অকারণে 'অপটিক্যালস'-এর বাহাদুরী দেখানো হয়। কিন্তু টেবিলের ওপর কাটা মুণ্ড বসিয়ে—সে টেবিলের নীচেটা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে—তাকে জীবন্ত করা এবং কথা বলানোর মতো চাক্ষুষিক ভোজবাজী আজ পর্যন্ত কোথাও দেখিনি। সাবাস!

'প্রিন্স বায়াস্কা'কেও একটি রূপকথার ছবি বলে মনে করা যেতে পারে, যদিও বলব, এই বায়াস্কা আজকেরই কোনো শক্তিশালী, অসমসাহসিক, দ্বন্দ্বযুদ্ধ-বিশারদ তরুণেরই প্রতীক। হাম্‌বড়া মনোভাবাপন্ন চাটুকারবেষ্টিত, বাইরে শক্তির দম্ভকারী, অথচ আসলে হীনমনো-বলাবিশিষ্ট খল-নায়ককে সে প্রতিপদেই পরাস্ত করে রূপসী নায়িকাকে জয় করে নেয়। দক্ষ ঘোড়সওয়ারের যেমন চাবুকের প্রয়োজন নেই, তেমনই প্রার্থিত বস্তু লাভের জন্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে—এই কথাই রূপকের আকারে বলা হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে।

মহাপূজার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !

॥ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ॥

নিউ এম্পায়ার : বসুশ্রী : বীণা : আলোছায়া মণিমালা : নারায়ণী : পার্বতী শ্রীকৃষ্ণ (বালী) - প্রফুল্ল (খড়দহ) - রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) - রমা (বিরাটি) : ইন্দ্রপুরী (নৈহাটী) - উদয়ন (শেওড়া-ফুলি) - শংকর (হাবড়া) - নৈহাটি সিনেমা - নিউ সিনেমা (কোচবিহার)।

এবং শিবপুর বি ই কলেজের সামনে নবনির্মিত **লিপি**

বায়ার বাহন সুদৃশ্য শ্বেতকায় অশ্বটিকে তার উপদেষ্টা বা বিবেকরূপে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে অভিনবভাবে উপভোগ্য। রাজকুমারী স্লাভেনাকে ত্রিমুখী ড্রাগনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দৃশ্যটি রীতিমত উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সুন্দরী নারী শুধু সাহসী বীরের জন্যেই—নান্য বাট দি ব্রেভ ডিজার্ভস দি ফেয়ার—এই আপ্ত বাক্যেরই সার্থক প্রতিফলন দেখা যায় এই রূপকথার ছবিটিতে।

চেকোস্লোভেকিয়ার চলচ্চিত্র-সপ্তাহের উদ্বোধন হয়েছিল 'দি গ্যাম্বলার' ছবিটি দিয়ে। ফিয়োডোর ডস্টোভেস্কির উপন্যাসাশ্রয়ী এই ছবিটি বোধ করি, বলতে চেয়েছে যে, জীবনটাই জুয়া। এবং সঙ্গে সঙ্গে, বোধ হয়, কিছুটা ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলতে চেয়েছে, বর্তমান জগতে নারীর হৃদয়ও লাভ করা যায় প্রচুর অর্থসম্পত্তি থাকলে। রুশ জেনারেল সপরিবারে এসেছেন একটি স্বাস্থ্যপ্রদ খাতব প্রস্রবণ-বিশিষ্ট স্থানে। কিন্তু সেখানকার জুয়ার আড্ডাসমেত সাধারণ নৃত্যশালাটি সমধিক প্রসিদ্ধ। নায়ক অ্যালেকসি আইভানোভিচ জেনারেল-কন্যা পলিনের প্রেমাকাঙ্ক্ষী; তার সকল প্রকার আদেশ সে সাধ্যমত প্রতিপালন করে। কিন্তু জেনারেল যে-মার্কুইসের কাছে বহু টাকা ঋণ করেছেন, তিনিও ঐ কন্যার পাণিপ্রার্থী। রুশ জেনারেল আশা করছেন, মস্কোতে বসবাসকারী তাঁর পিতামহী যে-বিরাট সম্পদ রেখে পরলোকগমন করেছেন, তারই কিছু অংশ দিয়ে তিনি ঋণভার লাঘব করবেন। কিন্তু হা হতোস্মি! সকলকে হতবাক করে সেই পিতামহী সশরীরে ঐ শহরে পদার্পণ করলেন এবং নিজের জেদী স্বভাবের বশবর্তী হয়ে বেপরোয়াভাবে জুয়া খেলতে শুরু করলেন। প্রথম প্রথম জিতলেও শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হয়ে তিনি মস্কো ফিরে গেলেন তাঁর আদরের নাতি, ঐ রুশ জেনারেলকে বিপৎসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে। মার্কুইস অর্থপ্রাপ্তির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে পলিনের কাছ থেকেও বিদায় গ্রহণ করলেন। তখন অ্যালেকসি ঘরীয়া হয়ে জুয়া খেলে প্রচুর টাকা জিতে পলিনের হাতে সব তুলে দিল এবং তার সঙ্গে নিশিযাপনের অনুমতি পেল। জাত-জুয়াড়ী অ্যালেকসি জুয়ায় হেরে জেলে গেল; কিন্তু একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি জামিনে তাকে খালাস করলেন। ইতিমধ্যে অ্যাস্টলে নামে একজন ইংরাজ ব্যবসায়ী পলিনের পাণিপ্রার্থী হয়ে হাজির হল। সে অ্যালেকসিকে টাকা দিল জুয়া খেলতে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালেকসি ছুটল জুয়ার আড্ডায়—টাকা জিতে পলিনের হৃদয় জয় করবার আশায়।

চমৎকার বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি, অভিনয়াংশে প্রোজ্জ্বল; বিশেষ করে জেনারেলের পিতামহীর ভূমিকায় তাতিয়ানা নিকোলায়েভনা অ্যাইভানোভার আশ্চর্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের তুলনা নেই।

'দি ঈগল্‌স্ ফেদার' হচ্ছে নামকরা চেক ছবি 'কপার টাওয়ার'-এরই সম্প্রসারণ। দু বছর জেলে থাকবার পরে ভেলার ও স্টেয়ার্স বাইরে বেরিয়ে সৎজীবনযাপন করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে কি হবে, সীমান্তরক্ষীদের নায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট পার্ডেক কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, তারা চোরাই চালান করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করতে পারে। কাজেই তিনি তাদের টাট্রা পর্বতশৃঙ্গে অবস্থিত ছোট্ট কুটিরটি থেকে তাড়াতে বদ্ধপরিকর হলেন। লেগে গেল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল সুন্দরী নায়িকা, যে মনে করে, ঈগলের পালক কাছে থাকলে সৌভাগ্য অনিবার্য। শেষ পর্যন্ত ভ্যালের ও স্টেয়ার্সেরই জয় হল, পার্ডেক ওদের পথ ছেড়ে দিলেন।

—সুন্দর পরিস্থিতি রচনা, চরিত্রচিত্রণ এবং আশ্চর্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্যে ছবিটি স্মরণীয়। এবং রঙীন ফোটোগ্রাফীও ক্বচিৎ দেখা যায়।

'ইট উইল বি টু লেট টুমরো' ছবির কাহিনী জার্মান অধিকৃত চেকোস্লোভেকিয়ার বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণকে ঘিরে। জার্মান সৈন্যদল যখন জনসাধারণকে অত্যাচার দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত করছে, তাদের এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে মারছে, তখন স্লোভাক সৈন্য তাদের অধীনে থেকেও বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে। এই সময়েই যখন স্লোভাকদের ক্যাপ্টেন জন অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন তাকে চিকিৎসা করবার জন্যে এল ডাঃ ভেরা। তার সঙ্গে প্রতিরক্ষীবাহিনীর যোগাযোগ আছে জেনে ক্যাপ্টেন জন তাকে জার্মানদের ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করল এবং ফলে শেষ পর্যন্ত একটি রেলওয়ে সেতু ওড়াবার কাজে জয়ী হয়ে জার্মানদের ছত্রভঙ্গ করে দিল।

—যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় সম্পর্কিত এই ছবিটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নির্মিত

হলেও দর্শক হিসেবে আমাদের বেশী আগ্রহান্বিত করতে পারে না। তবে কলা-কৌশলের দিক দিয়ে ছবিটিতে প্রশংসাজনক বাস্তবতা লক্ষণীয়।

'মাই লাভ টু সোয়ালোজ' হচ্ছে এমন একখানি ছবি, যার কোমল বিষণ্ণতা দর্শককে বেদনার্ত না করে পারে না। প্রতিরক্ষী বাহিনীর কর্মী, সুন্দরী তরুণী মারুস্কা কুদেরিকোভার হয়েছে বিচারে প্রাণদণ্ড। সাধারণত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা জারি হবার ৯৯ দিন পরেই দণ্ডাজ্ঞা পালিত হয়। কারাকক্ষে বন্দী অস্বথায় মারুস্কা তাই দিন গুনে চলেছে। এবং সেই সঙ্গে সে মাঝে মাঝে করছে স্মৃতিচারণ—তার বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি, তার বাসস্থান, তার বাপ-মা, তার প্রথম প্রেম। তারপর তার মনে পড়ল, প্রতিরক্ষীবাহিনীতে তার প্রথম দিনগুলি, তার কার্যকলাপ, তার গ্রেপ্তার হওয়া, শত্রু-পক্ষীয় কর্তার জিজ্ঞাসাবাদ, তার বিচারপর্ব। শুক্রবারগুলিই তার কাছে ভয়ানক বলে বোধ হয়, কারণ ঐ দিনটিতেই বন্দীদের হত্যা করা হয়। ওরই মধ্যে ইহুদী মেয়ে জুলিংকার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছে। ওরা দুজনেই দিন গুনছে। শুনছে, জার্মানরা হারতে শুরু করেছে—পরাজয়ের পর পরাজয় ঘটছে! —তাহলে ওরা নিশ্চয়ই নির্মম, ভয়ংকর হয়ে উঠছে। ক্ষমা পাবার কোনোই আশা নেই। অথচ ৯৯ দিনতো কেটে গেল। তাহলে কি?—না, তা আর হোলো না। মারুস্কার জন্মদিনের মাত্র দুটি দিন পরে ১৯৪৩-এর ২৩ মার্চ ওর ডাক পড়ল, ১২৪ দিনের দিন ওকে হত্যা করা হোলো।

—ফ্ল্যাশ-ব্যাকের সুষ্ঠু প্রয়োগ দ্বারা ছবিটিকে আশ্চর্যভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। আর কি সুন্দর দেখতে ঐ মারুস্কার ভূমিকাভিনেত্রী ম্যাগ্‌ডা ভাসারিয়োডাকে! মৃত্যুর প্রতীক্ষাপূর্ণ ছবিটিকেও যে এমন সুন্দর রূপ দেওয়া যায়, ছবিটি না দেখতে তা বিশ্বাস করাই শক্ত।

সাতটি কাহিনী-চিত্রের যে-সাতটি তথ্যচিত্র দেখানো হল, তার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭২ সালে চেকোস্লোভেকিয়া ভ্রমণ অন্যতম। অপরগুলি চেকোস্লোভেকিয়ার নিসর্গ দৃশ্যাবলী, তার খেলাধুলা, তার লোকজন, তার শহর, কল-কারখানা, শিল্পী স্বাবিলস্কির জীবনী ও শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কিত অধিকাংশ ছবিই প্রচার-ধর্মী হলেও নয়নাভিরাম। কয়েকটি কার্টুন-চিত্রও দেখানো হয়েছে।

—নান্দীকর

মঞ্চাভিনয়

বিবর : সমরেশ বসুর বহুআলোচিত এবং বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'বিবর' স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় এর মধ্যে যে বাস্তব জীবনচেতনা বলিষ্ঠ সুরে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, তাকে নাটকের সংলাপে এনে মঞ্চের আলোয় সপ্রতিভ করে তোলা খুব একটা সহজ ব্যাপার বলে মনে হয় না। কিন্তু এই কঠিন ব্যাপারটিকেই সম্ভব করে তুলেছেন 'বলাকা' (শ্যামবাজার) নাট্যসংস্থার শিল্পীরা। অনেকেরই কৌতূহল ছিল, এই উপন্যাসের নাট্যরূপ কি রকম মনোগ্রাহী হবে। প্রথমেই বলা উচিত নাটক আমাদের মন ও মননকে কিছু পরিমাণে আকৃষ্ট করেছে নিশ্চয়ই।

নায়কের বিশিষ্ট অন্তর্ভাবনাই বিবরের ভিত্তিভূমি। মনের ও মুখের কথার দ্বন্দ্বই নাট্যরূপকে করে তুলেছে গতিশীল। আর এই অন্তঃসংঘাতটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য নায়কের বিবেককে একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। সে কথা বলেছে নেপথ্য থেকে। অন্য চরিত্রের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে নায়ক স্থির অচল হয়ে যাচ্ছে এবং সেই সময়ে নেপথ্য সংলাপ থেকে সোচ্চার হয়ে উঠছে নিজেরই কথা। তবে এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে সামঞ্জস্যের অভাব থেকে গেছে।

নায়ক মিঃ বি বি আর-এর রূপকার কুমার দিব্যেন্দুই নাটকটির প্রয়োগ-পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন। অভিনয়ের ব্যাপারে তিনি মোটামুটিভাবে নৈপুণ্যের পরিচয়ই রাখতে পেরেছেন। নীতা সেনরূপী রমা দাসকে বড়ো কৃত্রিম মনে হচ্ছিল, সংলাপে ছিল প্রত্যাশিত কোমলতার অভাব।

অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অলোক বিশ্বাস (পত্রিকা সম্পাদক), শেফালী চ্যাটার্জি (রুবি দত্ত), সুতেজ মল্লিক (চ্যাটার্জি), পুলক কুণ্ডু (চেতনা), অশোক দাশগুপ্ত (ইন্সপেকটর), কিতেক আওন (শিশির), মিহির চক্রবর্তী (সুলিনী), কালিদাস রায়।

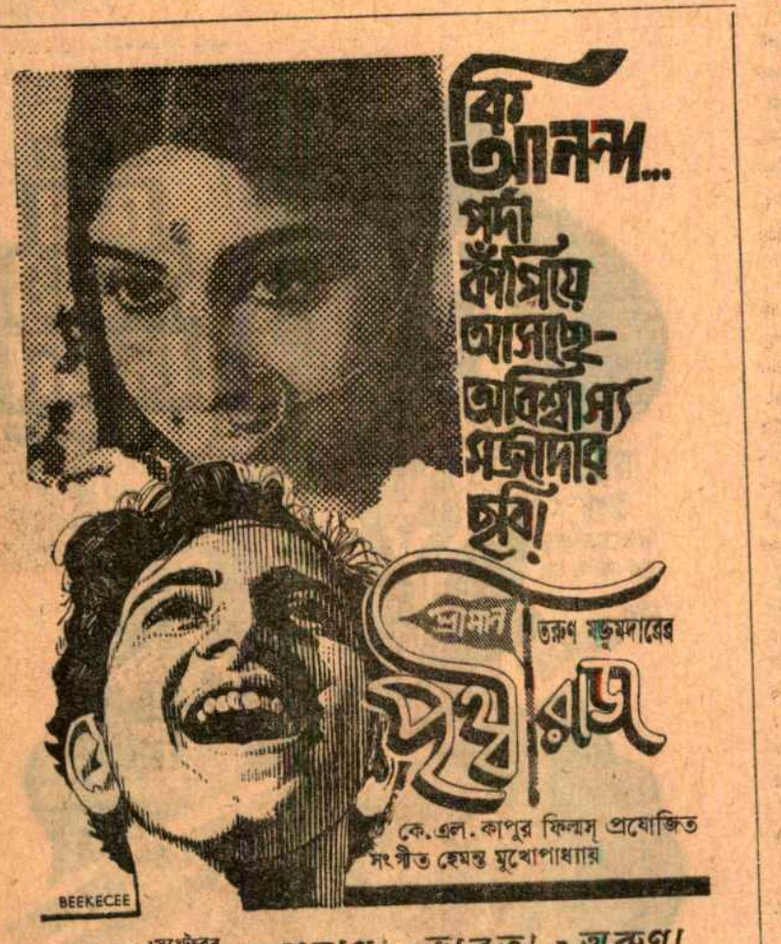

হোটেলের ক্যাবারের দৃশ্যে মিস জে তার মুন্সিয়ানা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তবে দৃশ্য দুটোর খুব একটা নাটকীয় প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। কণিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। আবছা আলো আঁধারের সমন্বয়ে একটি মুহূর্তে সত্যি আশ্চর্য ছন্দে নায়কের অন্তর্সংঘাত মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

এন্টনী কবিয়াল ঃ ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক (মিশন রো শাখা) স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা সম্প্রতি রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'এন্টনী কবিয়াল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। এই সফলতার জন্য প্রথমেই নির্দেশক শ্রীকালীপদ চক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানাতে হয়। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রানুগ অভিনয় করে প্রযোজনাটিকে প্রাণময় করে তুলতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের চরিত্রচিত্রণ সত্যি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে তাঁরা হোলেন নির্মাল্য পাল (এন্টনী), ফণী রায় (ভোলা ময়রা), বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (মামাবাবু), লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভজহরি), দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (সৌদামিনী)। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন প্রভাত ঘোষাল, সত্য চট্টোপাধ্যায়, স্মরণদেব মুখোপাধ্যায়, নিখিলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দুলাল চক্রবর্তী, সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত সরকার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি ধাড়া ও কল্যাণী দে।

দুই পুরুষ ঃ ম্যাকিন্স রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীরা কয়েক দিন আগে 'রবীন্দ্রসদনে' 'দুই পুরুষ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। গোপেন বসুর দক্ষ পরিচালনায় নাটকটি সামগ্রিকভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অভিনয় নৈপুণ্যের ব্যাপারে যাঁদের নাম প্রথমেই মনে আসে তাঁরা হোলেন অরুণ মুখোপাধ্যায় (সুশোভন), সবিতা মুখার্জি (বিমলা), অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় (গোপী মিত্তির), শাশ্বতী রায় (কল্যাণী)। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অলোক সেন, দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি দত্ত, নিতাই সরকার, মহাবীর সিং, প্রকাশ দাস, প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, মিহির দত্ত, ভূপেন চট্টোপাধ্যায়, মুরলী মজুমদার, হবিবর রহমান, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, সলিল দে, কৃষ্ণ সেন, গৌরী চক্রবর্তী, সুমিতা চ্যাটার্জি, সবিতা চক্রবর্তী, মালতী চৌধুরী। নাটকটিতে আবহসঙ্গীত পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে প্রশংসার দাবী রাখে।

মৃত্যু দিয়ে কেনা ঃ মৃত্যুর মূল্যেই কিনতে হয় মুক্তি। এই গভীরতর সত্যের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে 'মৃত্যু দিয়ে কেনা' নাটকটি। সুনীল সুরের নির্দেশনায় এই নাটকটি সম্প্রতি অভিনীত হোল কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। প্রযোজনা করলেন 'মিলনী সংঘে'র শিল্পীরা। নাটকটির সুতীব্র সংলাপ ও সংঘাত দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। আর অভিনয়ও হয়েছে বেশ হৃদয়গ্রাহী। নাটকটির মুখ্য কয়েকটি ভূমিকায় যাঁরা অংশ নেন তাঁরা হোলেন শ্যামলাল সাহা, সুনীল সুর, কল্যাণব্রত চন্দ, কালিদাস দে, অশোক চ্যাটার্জি, তপন সেন, অনিমেষ সাহা, অপ্রদ বসাক, নারায়ণ দত্ত, রবীন নন্দী, অরবিন্দ সাহা, কবিতা বণিক, বীণা দাশগুপ্তা, বুলা রায়।

কঙ্কাবতীর ঘাট ঃ মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকটি যে এখনো দর্শকমনকে আনন্দ বেদনায় ভরিয়ে দিতে পারে, সে সত্যটা সেদিন 'রঙ্গনা'র মঞ্চে প্রমাণ করে দিলেন বয়েজ ওন ক্লাবের সদস্যরা। তাঁদের এই প্রযোজনা নানা বৈশিষ্ট্যে যে চিহ্নিত হোতে পেরেছে, তার মূলে আছে শিল্পীদের আন্তরিক অভিনয়ধারা ও নির্দেশক প্রবীণ স্বভিনেতা শ্রীমণি শ্রীমানীর সুপরিকল্পিত নির্দেশনা। প্রায় প্রতিটি শিল্পীই তাঁদের স্ব স্ব চরিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন। তবু এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মিঃ মুখার্জির ভূমিকায় এস সেনের নিখুঁত অভিনয়। আবেগদীপ্ত মুহূর্তগুলোতে তাঁর অভিব্যক্তি ভোলা যায় না। লালমোহন অন্তুর চরিত্রটিকেও মিঃ গুপ্ত প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। 'চামেলী' চরিত্রের দৃঢ়তা শাশ্বতী রায়ের অভিনয়ে সবটুকুই মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সোনাই দীঘি ঃ ন্যাশনাল এন্ড গ্রীনলেজ ব্যাঙ্ক (চিত্তরঞ্জন শাখা)-এর কর্মীরা বিখ্যাত যাত্রাপালা 'সোনাই দীঘি'র মঞ্চরূপ পরিবেশন করলেন স্টার থিয়েটারে। শক্তি মুখার্জি নির্দেশিত এই প্রযোজনায় অংশ নেন স্বপন মৈত্র, বাসুদেব মুখার্জি, প্রতাপ মিত্র, দীপক ভৌমিক, নীহার ব্যানার্জি, অরুণ চৌধুরী প্রণব চন্দ্র, বিমল সাহা, মায়া ঘোষ, ললিতা দে, শিবানী ভট্টাচার্য, বিশু মুখার্জি, প্রভাত চন্দ্র, মধুসূদন কর্মকার, মানিক ব্যানার্জি।

শিলায়নের নবতম প্রচেষ্টা মারীগুটিকা ঃ ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে শিলায়ন নাট্য গোষ্ঠী তাদের নবতম প্রচেষ্টা মারীগুটিকা মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার ভবেশ চক্রবর্তী। আলোকসম্পাত ও আবহ সংগীতে ছিলেন যথাক্রমে আশুতোষ বড়ুয়া এবং নেপাল দাস ও সম্প্রদায়। অভিনয়াংশে ছিলেন সংস্থার কৃতী শিল্পিবৃন্দ।

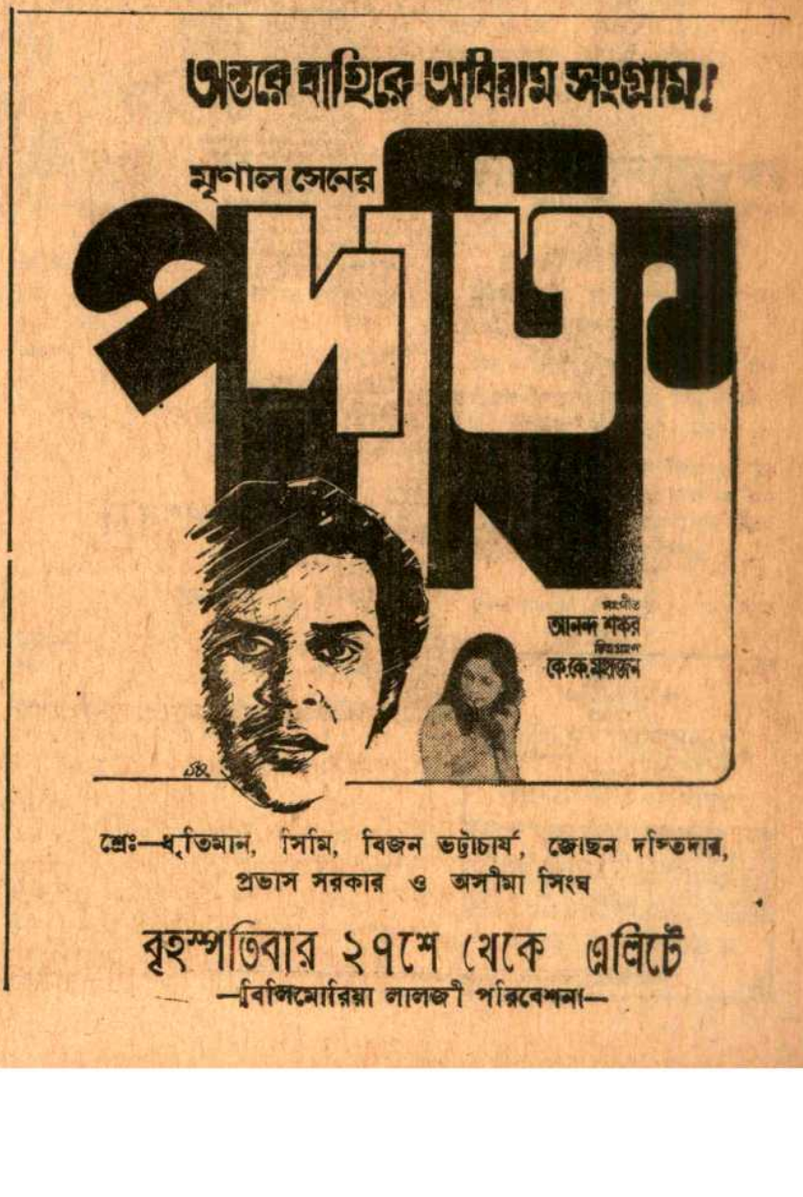

চাঁদির কৌটাঃ জন গল্‌সওয়ার্দির 'সিলভার বক্স' অবলম্বনে রচিত উৎপল দত্তের চাঁদির কৌটা নাটকের মূল বিষয়বস্তু সেই চিরন্তন সামাজিক বৈষম্য। অর্থাৎ এখানেও আমরা দেখি ধনীদের জন্যে এক রকম আইন, দরিদ্রের জন্যে ঠিক তার বিপরীত। তাই বিধানসভার সদস্য জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদরের দুলাল—মদ্যপ ও আনুষঙ্গিক চারিত্রিক দোষে দুষ্ট—জয়ন্ত যে অপরাধে বেকসুর খালাস ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে—ঐ বাড়ীর ঝি মেনকার বেকার স্বামী জনার্দন দাস সেখানে তিন মাস কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত। গল্পাংশ দুর্বল হলেও পরিচালক মমতাজ আহমেদ খাঁর নিপুণতায় নাটকটি রসোত্তীর্ণ। গত ২৭ আগস্ট সোমবার স্টার রঙ্গমঞ্চে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক মেন ব্রাঞ্চ কর্মাশিয়াল কারেন্ট এ্যাকাউন্ট কলচারাল ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চীফ ম্যানেজার শ্রীবি কে ঘোষ ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববরেণ্য নৃত্য গুরু শ্রীউদয় শংকর। আঙ্গিক ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও অভিনয়গুণে হাসির নাটক হিসেবে দর্শকচিত্ত জয় করে। প্রধান তিনটি পুরুষ চরিত্রে নিত্য চক্রবর্তী (জীবন), প্রতাপ দাঁ (জয়ন্ত) ও প্রদীপের (জনার্দন) সুষ্ঠু অভিনয়ে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুললেও দর্শকমন আরও কিছু প্রত্যাশা করেছিল। মিসেস বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা / রীতা ভাদুড়ী। ফটো অমৃত

রূপে কল্যাণী অধিকারী নিজ খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মেনকা চরিত্রে মায়া ঘোষ অপূর্ব। দুটি টাইপ চরিত্রে রমেন চট্টোপাধ্যায় ও অমিয় রায়চৌধুরী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "টীম ওয়ার্ক" খুব সুন্দর হওয়ায় শেষ পর্যন্ত দর্শকাসন পরিপূর্ণ ছিল।

রঙ্গনা নান্দীকার
৫৫-৬৮৪৬ প্রযোজিত

॥ শারদীয় নাট্যোৎসব ॥
২রা মহাষষ্ঠী মঙ্গলবার ৩ ও ৬॥টায়
শের আফগান
৩রা মহাসপ্তমী বুধবার ৩ ও ৬॥টায়
৪ঠা মহাঅষ্টমী বৃহস্পতিবার ৩ ও ৬॥টায়
তিন পয়সার পালা
৫ই মহানবমী শুক্রবার ৩ ও ৬॥টায়
৭ই একাদশী রবিবার ৩ ও ৬॥টায়
১১ই লক্ষ্মীপুজো কেবলমাত্র ৩টেয়
নটী বিনোদিনী
নির্দেশনা ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

•ঘড়ি•
•জড়োয়া গহনা•
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

বাঙলা চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম দিকপাল মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় গেল বৃহস্পতিবার শেষ রাত্রে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর।

পরিবেশক প্রতিষ্ঠান রীতেন কোম্পানীর কর্ণধাররূপে তিনি চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন তিরিশ দশকে। চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি চলচ্চিত্রের প্রযোজনা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত এম. পি. প্রোডাকসন্স নামই খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহন করে। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডস্থ ন্যাশনাল সাউন্ড স্টুডিওটি তিনি অধিকার করে কয়েক বছর ধরে তিনি ছবির পর ছবি তৈরী করতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে একজিবিটার্স সিণ্ডিকেটের ম্যানেজিং ডিরেকটাররূপে তিনি উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা প্রভৃতি চিত্রগৃহেরও কর্তৃত্ব অর্জন করেন। তাঁরই প্রযোজনাধীনে প্রস্তুত হয় অগ্নিপরীক্ষা, সবার উপরে, বিদ্যাসাগর, বসু পরিবার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, বাবলা প্রভৃতি সফল চিত্র। অগ্রদূত, অগ্রগামী, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ চিত্র-পরিচালক ও পরিচালকগোষ্ঠী তাঁরই অধীনে কাজ করে যশস্বী হয়েছেন, উত্তরকুমার, সুচিত্রা সেন তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা। দীর্ঘ ১৫ বছর তিনি বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া

কলামন্দিরের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ইউথ পাপেট থিয়েটার, ইণ্ডিয়া নানা ধরনের

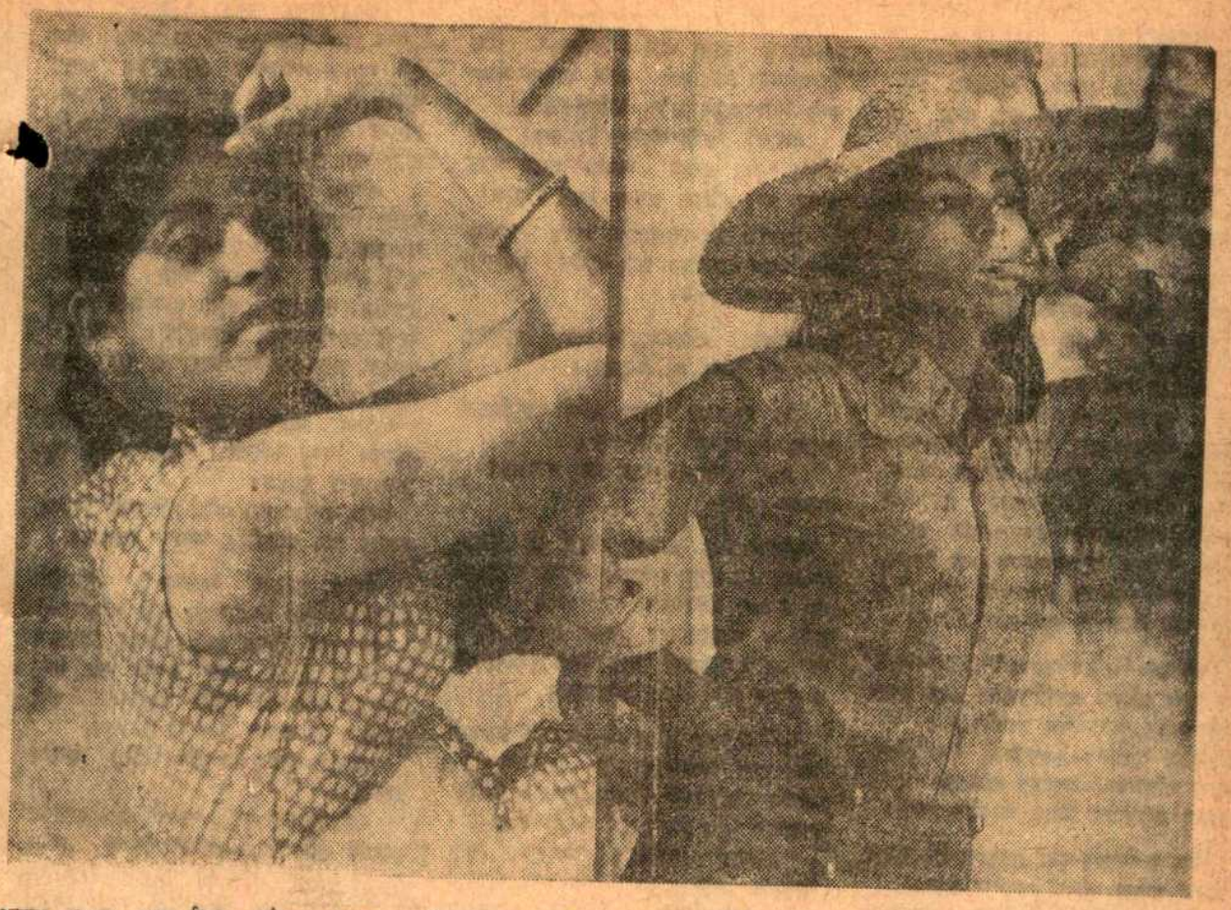

পুতুল নাচের মধ্যে দিয়ে তাঁদের দশম বার্ষিক উৎসব পালন করলেন ১৫ সেপ্টেম্বর, ৭৩। 'ফিঙ্গার পাপেটস', 'গ্লাভস', 'রড' ও 'ম্যারিওনেটস' সব রকম প্রয়োগ কৌশল অনুসরণ করে বিভিন্ন গল্প ও নাটক তাঁরা যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তোলেন সুশ্রাব্যসঙ্গীত, সুন্দর দৃশ্যসজ্জা ও রুচিসঙ্গত আলোকসম্পাত তার সঙ্গে যোগ করে।

নতুন প্রযোজনা 'ছোট্ট লাল টুকটুকি' পুতুলগুলির গতিবিধি, মধুর সঙ্গীত ও ও 'সেটস'-এর ছন্দে মিলেমিশে অপরূপ হয়ে ওঠে, এতে পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোণেরও হদিশ পাওয়া গেল।

এই বিস্মৃতপ্রায় শিল্পকলার উন্নতি, ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের চেষ্টা করে অন্যান্য মঞ্চশিল্পানুষ্ঠানের সমস্তরে আনার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের প্রথমে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শিশির-কুমার বিশ্বাস জনসাধারণ ও সরকারকে এগিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ জানান। প্রধানা অতিথি, কানন দেবী পৃথিবীর বিভিন্ন পুতুল নাচের অগ্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করে ইউথ পাপেট থিয়েটারের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। সুকোমল-কান্তি ঘোষ, তাঁর সভাপতির ভাষণে ইউথ পাপেট থিয়েটারের ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রশংসা করে বলেন যে, যে বীজ দশ বছর আগে এরা বপন করেছেন, তার আজকের চেহারা দেখে তিনি আশান্বিত হয়েছেন এবং তাঁর (শ্রীঘোষের) দৃঢ়বিশ্বাস—অদূর ভবিষ্যতে এই সংস্থা অনেক উন্নতি করতে সক্ষম হবে, ও নিজস্ব মঞ্চে তারা তাদের সুন্দর পুতুল নাচ ছোট বড় সকলের জন্যে পরিবেশনের দায়িত্ব নেবে।

ফেন্টিভ্যাল অব ম্যাজিক : গত ৯ সেপ্টেম্বর সরলা মেমোরিয়াল হলে যাদুকর অরুণ ব্যানার্জি বিবি ও সম্প্রদায় যাদু প্রদর্শনীর এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'ফেস্টিভ্যাল অব ম্যাজিক'। এই অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটি পরিবেশনাই খুব আকর্ষণীয় ও চমকপ্রদ হয়। এর মধ্যে বিশেষ করে রেডিও অদৃশ্য, সময় ও গতি, জিগজ্যাগ লেডী বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জলসা

গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদ অর্ঘ্য : গ্রামোফোন কোম্পানীর পুজোর গান শুরু হয়েছে ই পি ডিস্কে গোবিন্দগোপাল ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের যুগ্মকণ্ঠে শ্রীশ্রীদুর্গা-ধ্যানম ও মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে শ্রীশ্রীদুর্গাস্তোত্রম দিয়ে। বর্তমান যুগে কত অভাবনীয় পট পরিবর্তন। তবুও ভারতের সেই চিরন্তন স্তোত্রগীতি দিয়ে পুজো বেদীর ভাবগম্ভীর পরিবেশের পবিত্রতা যেন চিত্তে শান্তিবারি ছিটিয়ে দেয়।

পুজোর পটভূমিকা রচনায় একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে আগমনী গানের একটি ই পি ডিস্ক। সংকলন শ্যামল গুপ্ত। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় গানগুলি গেয়েছেন অনুপ ঘোষাল, দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনা মুখোপাধ্যায়, ললিতা ঘোষ, শংকরদয়াল

আবর্ত বেরিয়েছে মহালয়ার দিন
দাম—এক টাকা
শারদীয়া সংখ্যা/১৩৮০
এই বিশেষ সংখ্যায় যাঁরা লিখছেন :
নারায়ণ গঙ্গোঃ, আহমদ সলীম (পাঃ প্যাক-স্থান), দাউদ হয়দার, কয়াসিমোদো (ইতালী) গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোঃ, পূর্ণেন্দু পত্রী, মতী নন্দী দিবেন্দু পালিত, শংকর চট্টোঃ, শক্তি চট্টোঃ, জোছন দস্তিদার, কেদার ভাদুড়ী ইকবাল হাসান, অমিয় সিংহ, প্রবীর রায় অনিমেষ মুখোঃ, আরতি সেন, প্রভাতচন্দ্র কর, অনিলকুমার চক্রঃ, বীণা রায়, রবি ভাদুড়ী, স্বপন সেনগুপ্ত, শংকর ব্রহ্ম জয়ন্ত দত্ত শ্রীপার্থ অর্চনা মিত্র চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন দত্ত ও অভিক সেন।
২/৪৩ নাকতলা, কলকাতা—৪৭

মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু এবং সমরেশ বসু। বহুকাল আগে শারদপ্রাতে ও সন্ধ্যায় বাংলার গ্রামের আকাশ ও বাতাস গিরিরাজ, উমার বার্তা শিউলীফুলের গন্ধ ভরা গানে যে আগমনীর আভাস মুখরিত হয়ে উঠত। সেই ছবিই ভেসে উঠেছে 'আবার শরৎ এলো' 'গিরিরাজ গমন করিলে', 'ছিলি উমা' গানগুলিতে।

কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে চারখানি অতুলপ্রসাদের গানে বাংলা গানের এক মধুর ঐতিহ্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

ছোটদের জন্য আছে (ই পিতেই) একদিকে 'ঘোড়ার ডিমের আমলেট' দ্বিতীয় দিকে 'ভূতপেত্নীর বিয়ে' পরিবেশনায় রঞ্জিত মল্লিকসহ সুপ্রভাত মল্লিক, অনিলকুমার মল্লিক, সুনীলকুমার মজুমদার, সুস্মিতা রায়, নমিতা মুখোপাধ্যায়, রুপেন মল্লিক, অরিন্দম গঙ্গোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক। ছোটদের উপযোগী কাহিনী ও সুর রচনা করেছেন উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক।

৪৫ আর পি এম ডিস্কে মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আপনাপন সংগীতমানে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। একজনের আত্মনিবিষ্ট ভাবুক পরিবেশনা—অপরের কলোচ্ছল কণ্ঠের উচ্ছ্বাস শ্রোতাদের মনকে আকর্ষণ করে।

নির্মলা মিশ্রের গান এবারেও গতবছরের পুজোর গানের মতোই সমাদৃত হবে।

ইলা বসু তাঁর উল্লসিত ভঙ্গিমায় 'কাঁচের চুড়ি ভালবাসা' ও 'জ্বলে জ্বলে জোনাকীতে' গান দুটি জীবন্ত করে তুলেছেন।

আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠদ্যুতি এবার যেন আরো উজ্জ্বল। সুধীন দাসগুপ্ত গানগুলির সুরও দিয়েছেন সুন্দর।

বনশ্রী সেনগুপ্তর গান দুটি তাঁর স্বভাবানুগ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে পরিবেশিত। পরিশীলিত কণ্ঠমাধুর্য ও সুদক্ষ গায়কীতে মুগ্ধ করে দিয়েছেন ঊষা মুখোপাধ্যায়। অন্যদিকে তাঁর কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন মীনা খাদিলকার।

মাধুরী চট্টোপাধ্যায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে। এবারে শ্যামল মিত্রের সুরে গাওয়া গান দুটিতে রয়েছে তারই স্বাক্ষর।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে গাওয়া রাণু মুখোপাধ্যায়ের গান দুটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মতই।

ললিতা ধরচৌধুরীর গান দুটিতে ললিতোর স্পর্শ সু-অনুভূত।

ভি বালসারা সুরের প্রতি সুবিচার করেছেন শ্রাবন্তী মজুমদার।

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান সুগীত। নিজের সুরে—

পুরুষকণ্ঠের ওজস্ মাধুর্য ও অনুধাবনের এক নতুন পথরেখা খুঁজে পাওয়া যায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দুটি গানে 'জবাব নেই' ও 'সহেলি গো তোরা বললি বটে'। স্বরচিত সুর বলেই আপন সংগীতচিন্তাকে যথাযোগ্য রূপ দিতে পেরেছেন।

এই অস্থির পরিবেশেও আপন আদর্শে স্থির হয়ে আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। নিজের সুরেই সেই পরিচিত বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে গেয়েছেন 'তুমি চলে গেলে' ও 'না যেয়ো না'।

এবারের পুজোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—কিশোরকুমার। পাশ্চাত্য মডালিং ও 'লিগ্যাটো'-র নিখুঁত ছোঁয়ায় রঙ্গিন তাঁর স্ব-রচিত সুর। সবার ওপর রয়েছে দরাজ মধুর কণ্ঠ ও প্রাণবন্ত পরিবেশনা। আর এই সবেরই যোগফল কিশোর কণ্ঠের কিশোরকুমার।

শ্যামল মিত্রও নিজের সুরে গেয়েছেন শ্যামল ছায়ামাখা দুটি গান। নিজেরই গান-দুটিতে তাঁর অজস্র ভক্তবৃন্দ তাঁদের প্রিয় শিল্পীকে খুঁজে পাবেন।

অন্যের সুরে—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সুরে নির্মল মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া ভক্তির গান দুটি স্বর্গত পান্নালাল ভট্টাচার্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যেমন কণ্ঠ তেমনই পরিবেশনা। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে দুটি গান গেয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

এবারে গ্রামোফোন কোম্পানী সবাইকে চমকে দিয়েছেন মঞ্চ ও চিত্রজগতের তারকা সবিতাব্রত দত্ত ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের দুটি রেকর্ড উপহার দিয়ে। প্রচলিত এ্যান্টনী কবিয়ালের দুটি গান সবিতাব্রতর কণ্ঠে আপনভাবেই রসোত্তীর্ণ। গানদুটি হোলো 'জয়া যোগীন্দ্র জায়া' ও 'কেন অংগ অবশ হইল'।

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের রেকর্ড হয়ত ষ্টার্লিং। কিন্তু গাইবার আন্তরিকতায় সুশ্রাব্য হয়ে উঠেছে।

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় গীত নচিকেতা ঘোষের সুরের গান যথারীতি আনন্দ দিয়েছে।

পিন্টু ভট্টাচার্য স্বভাবতই সুকণ্ঠ। অনুশীলনীতে উজ্জ্বলতর তাঁর পরিবেশনা—প্রতিবছরই উন্নত মানে এগিয়ে চলেছে। নচিকেতা ঘোষের সুরে গাওয়া তাঁর গান গাইবার শক্তিতেই কথার দুর্বলতাকে জয় করেছে। এইখানেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

অনুপ ঘোষালের গান দুটিও ভালো হয়েছে।

অমিতকুমার নবীন শিল্পী এবং এবারের রেকর্ড তাঁর প্রথম রেকর্ড। কিন্তু নবীন হলেও গাওয়ার ঢংটি পরিণতমান শিল্পীর মতই। কিশোরকুমারের ছাঁচের গলা। কিন্তু একেবারে কার্বণকপি নয়—নিজস্বতাও আছে। প্রতিশ্রুতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনি তাঁর গানে। প্রতিভার অধিকারী বলেই বলছি নিছক আমোদ দেবার মত হাল্কা ঢং-এ সীমিত না থেকে ইনি যদি ভাবগভীর গানে আত্মনিয়োগ করেন শিল্পীখ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে এঁর দেরী হবে না।

সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই কয়েকটি রেকর্ড করে সুনাম অর্জন করেছেন। এবারের পুজোর রেকর্ড তাঁর সেই খ্যাতিকে সুনিশ্চিত করবে।

দুটি লোকসংগীতে—পরিবেশকে উল্লসিত করে তোলে নির্মলেন্দু চৌধুরীর গাওয়া দুটি গান। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিক 'কলকাতা ও ভদ্রতা' বুদ্ধিদীপ্ত সরস অভিনয়ে বর্তমান কোলকাতার মেকী রূপকে তুলে ধরেছে। মিন্টু দাসগুপ্তর স্ব-রচিত কমিক গান-দুটি উপভোগ্য।

সুরকার ও গীতিকারদের মধ্যে যাঁরা গানের ডালিকে ভরিয়ে তুলেছেন তাঁরা হলেন সলিল চৌধুরী, মুকুল দত্ত, বরুণ বিশ্বাস, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, স্বপন চক্রবর্তী, মানস মুখোপাধ্যায়, বিমল দত্ত, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপী লাহিড়ী, নচিকেতা ঘোষ, বিশ্বপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যবরণ ব্যানার্জি, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সরিৎ শর্মা, শ্যামল মিত্র, শ্যামল গুপ্ত।

—চিত্রাপদা

EMPLOYMENT PROBLEM ?

HAVE YOU APPEARED ONCE IN A BANK RECRUITMENT TESTS ?

The following five guides By **KHANNA & KAPOOR** will help you to get a job :

RADHA GUIDE TO

Banks' Recruitment Tests (With Objective Type Question)	Rs 5.50
Model Test Papers for all Bank Examinations	Rs. 4.25
Psychological & Intelligence Tests for All Competitive Examinations	Rs. 4.25
Bank Examinations (Questions Paper Unsolved)	Rs. 1.50
Master Guide to Banks' Competitive Exa.inations. (For All Banks Perticularly State Bank)	Rs. 10.00

Available Everywhere

or

I A B BOOKS

9/1, Tamer Lane, (Junction of College St.), CALCUTTA-9.

খেলাধুলা

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৩ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা (লীগ খেলা) শেষ হয়েছে। লীগের 'এ' গ্রুপ থেকে ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং 'বি' গ্রুপ থেকে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব এবং মোহনবাগান মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। সেমি-ফাইনালের একদিকে খেলেছে 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল এবং 'বি' গ্রুপের রানার্স-আপ মোহনবাগান। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান পিয়ং ইয়ং সিটি দলের বিপক্ষে খেলেছে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ ইস্টার্ন রেলওয়ে।

আই এফ এ শীল্ডের লীগ খেলার 'এ' গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—২টো খেলায় ৪ পয়েন্ট, ৬টা গোল দিয়ে একটা গোলও খায়নি। এই গ্রুপে রানার্স-আপ হয়েছে ইস্টার্ন রেলওয়ে—২টো খেলায় ২ পয়েন্ট, তিনটে গোল দিয়ে তিনটে গোল খেয়েছে। ইরানের তাজ ক্লাব শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় 'এ' গ্রুপের তিনটি দল—ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং মালয়েশিয়ার ট্রেঙ্গানু ক্লাব দুটি করে ম্যাচ খেলেছিল।

'বি' গ্রুপের লীগ খেলায় উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়—৩টে খেলায় ৪ পয়েন্ট ৬টা গোল দিয়ে একটা গোলও খায়নি। 'বি' গ্রুপের লীগের খেলায় মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং উভয় দলই সমান ৩ পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু মোহনবাগান গোল এভারেজের জোরে শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এই গ্রুপে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং ক্লাবের খেলা খুবই দর্শনীয় হয়েছিল—খেলোয়াড়দের পারস্পরিক বুঝা-পড়া, ম্যাপা শট এবং ফ্রিকিক সৌষ্ঠব দর্শকদের আকর্ষণ করেছিল। তবে দলটি যে মোটেই দুর্ধর্ষ নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগানের বিপক্ষে খেলায়। এই দুটি খেলাই গোল-শূন্যভাবে ড্র যায়।

২য় পর্যায়ের লীগ খেলা
চূড়ান্ত তালিকা

গ্রুপ 'এ'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ বিঃ	পঃ
ইস্টবেঙ্গল	২	২	০	০	৬ ০	৪
ই আই আর	২	১	০	১	৩ ৩	২
ট্রেঙ্গানু	২	০	০	২	০ ৬	০
তাজ*						

* শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে।

গ্রুপ 'বি'

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ বিঃ	পঃ
পিয়ং ইয়ং	৩	১	২	০	৬ ০	৪
মোহনবাগান	৩	১	১	১	৪ ২	৩
মহমেডান	৩	১	১	১	২ ২	৩
পোর্ট কমিশনার্স	৩	১	০	২	৩ ১২	২

খেলার ফলাফল

গ্রুপ 'এ'

ইস্টবেঙ্গল ৩ : ই আই আর ০
ইস্টবেঙ্গল ৩ : ট্রেঙ্গানু ০
ই আর আর ৩ : ট্রেঙ্গানু ০

দ্রষ্টব্য : তাজ ক্লাব (ইরান) শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে।

গ্রুপ 'বি'

মোহনবাগান ৪ : পোর্ট কমিঃ ১
মোহনবাগান ০ : মহঃ স্পোর্টিং ১
মোহনবাগান ০ : পিয়ং ইয়ং ০
পোর্ট কমিঃ ২ : মহঃ স্পোর্টিং ১
মহঃ স্পোর্টিং ০ : পিয়ং ইয়ং ০
পিয়ং ইয়ং ৬ : পোর্ট কমিঃ ০

বিবি রিগস (আমেরিকা) : মেয়ে খেলোয়াড়দের ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই টেনিস খেলার আসরে এই বিচিত্র সাজে নেমেছেন।

মেয়ে-পুরুষের টেনিস খেলা

আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুত মহিলা টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিং তাঁর স্বদেশের বর্ষীয়ান পুরুষ টেনিস খেলোয়াড় ববি রিগসকে ৬-৭, ৬-৩ ও ৬-৩ গেম হারিয়ে রিগসের দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছেন। টেনিস খেলার আসরে মেয়েদের ক্রীড়া-মনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ববি রিগস যেভাবে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছিলেন আজ শ্রীমতী কিংয়ের কাছে হেরে তার সমুচিত উত্তর পেলেন। এই খেলায় যে ১০০,০০০ ডলারের বাজী ধরা ছিল শ্রীমতী কিং তার সবটাই পেয়েছেন। তাছাড়া টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের স্বত্ব বাবদ তাঁরও ১০০,০০০ ডলার পেয়েছেন। দু ঘন্টারও কম সময়ের খেলায় তাঁর এই ২০০,০০০ ডলার রোজ-গার—মেয়েদের পক্ষে একটি খেলার সর্বাধিক অর্থ উপার্জনের বিশ্বরেকর্ড। তাছাড়া এই খেলায় যে বিপুল সংখ্যক (৩০,৪৭২ জন) দর্শক সমাগম হয়েছিল তাও একটি খেলায় সর্বাধিক দর্শক সমাগমের বিশ্বরেকর্ড। আমেরিকায় মেয়ে খেলোয়াড়-দের মধ্যে শ্রীমতী কিংয়ের উপার্জনের

পরিমাণই আজ সব থেকে বেশী। ইতিপূর্বে এক মরশুমের টেনিস খেলা থেকে ১০০,০০০ ডলার উপার্জনের নজির তিনিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেন।

শ্রীমতী কিংয়ের কাছে হেরে ববি রিগস সব মিলিয়ে পেয়েছেন ১০০,০০০ ডলার—শ্রীমতী কিংয়ের রোজগারের অর্ধেক।

আন্তর্জাতিক টেনিস আসরে অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান—এই চারটি টেনিস প্রতিযোগিতা প্রধান হিসাবে গণ্য। এই চারটি প্রধান টেনিস আসরে বব রিগসের তুলনায় শ্রীমতী বিলি জিন কিংয়ের সাফল্য অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য। বব রিগস উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন মাত্র একবার (১৯৩৯ সালে) এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব ২ বার (১৯৩৯ ও ১৯৪১ সালে)। ১৯৩৯ সালে উইম্বলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি তাঁর যোগদানের প্রথম বছরেই সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে দুর্লভ 'ট্রিমুকুট' খেতাব পেয়েছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদানের বছরেই দুর্লভ 'ট্রিমুকুট' খেতাব জয় আর কারও ভাগ্যে জোটে নি—রিগসের সাফল্য আজও একমাত্র নজির হয়ে আছে। অপর দিকে শ্রীমতী বিলি জিন কিং উইম্বলেডন সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন এ পর্যন্ত ৫ বার—এর মধ্যে 'ট্রিমুকুট' খেতাব ২ বার (১৯৬৭ ও ১৯৭৩) এবং উপর্যুপরি জয় ৩ বার (১৯৬৬—৬৮)। অস্ট্রেলিয়ান সিঙ্গলস খেতাব ১ বার, ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস খেতাব ১ বার এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব ৩ বার। এই চারটি প্রধান প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী কিংয়ের ডাবলস এবং মিকসড ডাবলস খেতাবের হিসাব ধরলে বব রিগস অতল জলে তলিয়ে যাবেন।

শ্রীমতী কিংয়ের বর্তমান বয়স ২৯ অপর দিকে বব রিগসের ৫৫ বছর। কুমারী জীবনে শ্রীমতী কিং ছিলেন বিলি জিন মেফিট। ১৯৬৫ সালে লরী কিংয়ের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতা

বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার ১৪টি নতুন রাজ্য রেকর্ড হয়েছে। রেকর্ডের মধ্যে আছে বালক বিভাগের একটি সর্বভারতীয় রেকর্ড। প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন বালক বিভাগে (১৬ বছরের অনূর্ধ) আশিস দাস এবং মহিলা বিভাগে নাফিসা আলি। এঁরা দুজনেই চারটি করে নতুন রাজ্য রেকর্ড করেছেন। বালকদের (১৬ বছরের অনূর্ধ) ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক সাঁতারে আশিস দাস ১ মিঃ ১১·৮ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর পুরস্কার

শেষ সংবাদ

আই এফ এ শীল্ডের সেমি-ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ং সিটি ক্লাব ২—০ গোলে ইস্টার্ণ রেলওয়েকে এবং ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

(জুনিয়র স্টেটসম্যান ট্রফি) লাভ করেছেন বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির আশিস দাস।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশীপ

পুরুষ বিভাগ : বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি (৫০ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি (৫১ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ (১৬ বছরের অনূর্ধ) : বৌবাজার বি এস (৬৭ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ (১২ বছরের অনূর্ধ) : ছাতরা সুইমিং ক্লাব এবং পদ্মপুকুর ইয়ং মেন্স এসোঃ (যুগ্ম বিজয়ী—১৮ পয়েন্ট)।

বালিকা বিভাগ (১৪ বছরের অনূর্ধ) : পদ্মপুকুর ইয়ং মেন্স এসোঃ (১৫ পয়েন্ট)।

বালিকা বিভাগ (১২ বছরের অনূর্ধ) : পদ্মপুকুর ইয়ং মেন্স এসোঃ (১৫ পয়েন্ট)।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

এশিয়ান জুনিয়র টেনিস

তেহেরানে আয়োজিত ৬ষ্ঠ এশিয়ান জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে ভারত ৩—০ খেলায় ইরানকে হারিয়ে দলগত খেতাব পেয়েছে। এই ফাইনালে ভারতের পক্ষে খেলেছিলেন অশোক অমৃতরাজ নিমিশ দেশাই এবং ডাবলসে অশোকের সঙ্গে রাজেশ ব্যাটরা।

ব্যক্তিগত বিভাগের সেমি-ফাইনালে মোট চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ভারতেরই এই তিনজন খেলোয়াড় ছিলেন—অশোক অমৃতরাজ, রাজেশ ব্যাটরা এবং ইলিয়াস গাউস। একদিকের সেমি-ফাইনালে ভারতের ২নং খেলোয়াড় রাজেশ ব্যাটরা ৬—৩, ২—৬ ও ৬—২ গেমে অশোক অমৃতরাজকে পরাজিত করেন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে ইরানের আলি মর্দনি ৯—৭ ও ৭—৫ গেমে ইলিয়াস গাউসকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিলেন।

সিঙ্গলসের ফাইনালে আলি মর্দনি ৬—২ ও ৬—৪ গেমে রাজেশ ব্যাটরাকে হারিয়ে সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন। ডাবলসের ফাইনালে অশোক অমৃতরাজ এবং ইলিয়াস গাউস ৭—৫ ও ৮—৬ গেমে ইরানের আলি মর্দনি এবং মনসুর বাহরানি জুটিকে হারিয়ে ডাবলস খেতাব পান।

বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতা

তেহেরানে বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতার ফ্রিস্টাইল বিভাগে রাশিয়া ৯টি পদক (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ২ ও ব্রোঞ্জ ১) এবং ইরান ৪টি পদক (স্বর্ণ ৩ ও ব্রোঞ্জ ১) জয়ের সূত্রে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে স্বর্ণ পদক পেয়েছে তিনটি দেশ—রাশিয়া ৬টি, ইরান ৩টি এবং আমেরিকা ১টি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কী সুন্দর মধুর হাসি

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেষ্ট**

SD.6/70

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C-4352
Gram: AMRITA Calcutta 3

AMRITA

Friday 28th September, 1973
Phone: 55-5231 (14 Lines)

5 NOV 1973

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেল
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

১৩ বর্ষ ২২ সংখ্যা] শুক্রবার ১৮ আশ্বিন ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৪৯

প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কাশীকান্ত মৈত্রের নতুন গ্রন্থ

রাজনীতি বিপ্লব কূটনীতি ২০·০০

পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার গ্রন্থটিতে আছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের প্রায় সারা বিশ্বের রাজনীতি, বিপ্লব এবং কূটনীতির চাঞ্চল্যকর ইতিহাস, বিভিন্ন দেশে বিপ্লবে এবং স্বাধীনতায় কমিউনিস্ট পার্টির চরম বিশ্বাসঘাতকতা —তার পরিণতি হিসাবে হিটলার মুসোলিনী, ফ্রাঙ্কো প্রমুখের উত্থান—চীনের বিপ্লবে রাশিয়ার ভূমিকা—ফ্যাসিবাদী হিটলার এবং মার্কসবাদী স্ট্যালিনের এক-যোগে সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘৃণ্য চক্রান্ত—হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে—যুগে যুগে জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেম এবং গণতন্ত্র কিভাবে মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে তার এক অপূর্ব তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর সাবলীল লেখনীর দ্বারা। ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠকদের কাছে গ্রন্থটির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অসীম।

নিগূঢ়ানন্দের সার্থক রচনা

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

বইটি সম্বন্ধে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রদ্যেয় নারায়ণ সান্যালের অভিমত। "থোরবাড় এবং খাড়া"—অর্থাৎ নায়ক খলনায়ক এবং নায়িকা, এই বাঁধা ফর্মুলার পার্মুটেশন আর কম্বিনেশনই যে কথাসাহিত্য নয় এটা প্রমাণ করতেই যেন কলম ধরেছেন নিগূঢ়ানন্দ। লেখকের সম্প্রতি প্রকাশিত "হৃদয়ে নাবিক"-এ দেখলাম সেই প্রতি-শ্রুতি, প্রতীক্ষা-ক্লান্ত বিদগ্ধ নায়কের স্মৃতিচারণ এবং অনুচিন্তনই এ কাহিনীর মূল্য উপজীব্য। বিজ্ঞান-কলা-দর্শনের অনেক আলোচনাতেই পাঠক এই বিবহ-কাতর নায়কের সাথে একমত হবেন না—তবু এ গ্রন্থ তাঁকে ভাবাবে। প্রসঙ্গতঃ যাঁরা দিবানিদ্রার অনুপান হিসেবেই শুধু বইয়ের খোঁজ করেন তাঁদের পরামর্শ দিই ঃ সাড়াশি দিয়েও "হৃদয়ে নাবিক"কে ছোঁবেন না ! দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত হবে !!

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস

আর এক সাজে ৬·০০

মামুলী ছক-বাঁধা প্রেমের উপন্যাস এ নয়। এতে আহত মানবাত্মার আধার পেরিয়ে আলোয় উত্তোরণের যে ইতিবৃত্ত আছে, রসিক পাঠকমাত্রই তা পাঠ করে চমৎকৃত হবেন। চা-বাগানের পটভূমিকায় বিসর্পিল রহস্যময় মানব-মনের অন্তর্দাহের কথা এমন আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে আর কোথাও বলা হয়নি।

শঙ্কু মহারাজ-এর অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে

ব্রজ পর্ব ১০৲
বন পর্ব ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের নতুন উপন্যাস

মোগলসরাই জংশন ৪৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি

পূর্বপুরুষ
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫৲
নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

অন্তর্লীনা ৮৲
প্রথম খণ্ড ৮৲ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ১২৲
নিখিলচন্দ্র সরকারের নতুন উপন্যাস

দুঃখে সুখে বাঁচা ৫৲
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নতুন উপন্যাস

যুগ স্বাক্ষর ১০৲
প্রেমেন্দ্র মিত্রের গোয়েন্দা উপন্যাস

গন্ধ পেলেন পরাশর বর্মা ৫৲
শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

নয়া বসত ৮৲
নীলকণ্ঠের গল্পগ্রন্থ

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা ১০৲
সুবোধ ঘোষের গল্পগ্রন্থ

গল্প মণিঘর ১৪৲
ফণিভূষণ আচার্যের উপন্যাস

হারে কলকাতা ৬৲
শ্রীহংস-এর উপন্যাস

গাইনিক ওয়ার্ড ৮৲
নারায়ণ সান্যালের

গজ মুক্তা ৮·০০
প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাস

সুধা পারাবার ৬·০০
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অভিমানী আন্দামান ৪·০০
সমরেশ বসুর

উত্তরঙ্গ ৬·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃঃ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ও'র ইচ্ছাই হয় না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২

এখন ওঁকে দেখুন! কাজের কাজে ... ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয়
শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন
আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২···
সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে
প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

Shilpi-SPL 1A/73 bea

১৩শ বর্ষ

অমৃত

২২ সংখ্যা
মূল্য ·৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 5th October, 1973 শুক্রবার, ১৮ আশ্বিন, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	ঘটনার আয়নায়		—শ্রীসমদর্শী
১১	দুর্গাপূজায় কয়েকটি বিস্মৃতপ্রায় প্রথা		—শ্রীপ্রণব রায়
১৩	সতীনাথের বাবা ও আমি	(গল্প)	—শ্রীপ্রভাত দেব সরকার
১৬	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১৭	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
২৫	শিকার-শিল্পী জিম করবেট		—শ্রীবিশ্বনাথ বসু
৩২	ছবি	(কবিতা)	—শ্রীমৃণাল বসু চৌধুরী

যশোরের চিরুণী মানেই কিরণ

৪৬ বছরের বাজারের সেরা চিরুণী। মজবুত ও টেকসই বলে আপনার খরচ বাঁচবে চুল আঁচড়ে আরাম পাবেন।

কিরণের চিরুণী আপনার চিরুণীর সমস্যা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯

বাংলা সাহিত্যের বিশ্ব অবদান।
বিশ্ব গুণী জ্ঞানী মণীষীদের সমাদৃত লেখক (ভারতের ডক্টর রাধাকৃষ্ণান যুক্তরাষ্ট্রের রাজকবি জন ম্যাসফিল্ড ও যুক্তষ্টেটের পুলিটরাজ পুরস্কার প্রাপ্ত কবি কার্ল সাঁপিরো)
এন. মুখোপাধ্যায়ের

অপরিণীতা মূল্য ২৮ টাকা
উপন্যাস ৯৪৮ পৃষ্ঠা।
বৃহৎ চিন্তাধর্মী সামাজিক উপন্যাস। প্রেম ও প্রাণের মহান প্রকাশ। যৌবনের ঘাত, সংঘাত ও প্রতিঘাত।

অঞ্জলি গীতিকাব্য। মূল্য ৫৲
৩৫৪টি গানের সমাবেশ।
রবীন্দ্র প্রতিভাদীপ্ত সঙ্গীতের ধারা। সঙ্গীত সাধকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথের পরে এ ধরণের পুস্তক আর বাহির হয় নাই। বই দুখানি যুগান্তর ও আনন্দবাজার কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। সাধক ও মহাভারত এ দুটি ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে।

দি বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২।

মহাত্মা শিশিরকুমারের কয়েকখানি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ

কালাচাঁদ গীতা
৪র্থ সংস্করণ ৩·০০

নিমাই সন্ন্যাস
(নাটক) ২য় সংস্করণ ২·০০

নরোত্তম চরিত
৩য় সংস্করণ ২·০০

লর্ড গৌরাঙ্গ
(২২টি খণ্ডে) (ইংরাজী)
প্রতি খণ্ড ৩·০০

নরোত্তম চরিত
(হিন্দী) ২·০০

প্রাপ্তিস্থান :—
পত্রিকা ভবন—বাগবাজার ও বিশিষ্ট পুস্তকালয়

ক্লান্ত দিনান্তে ভরে দিক প্রাণ নেস্‌কাফে

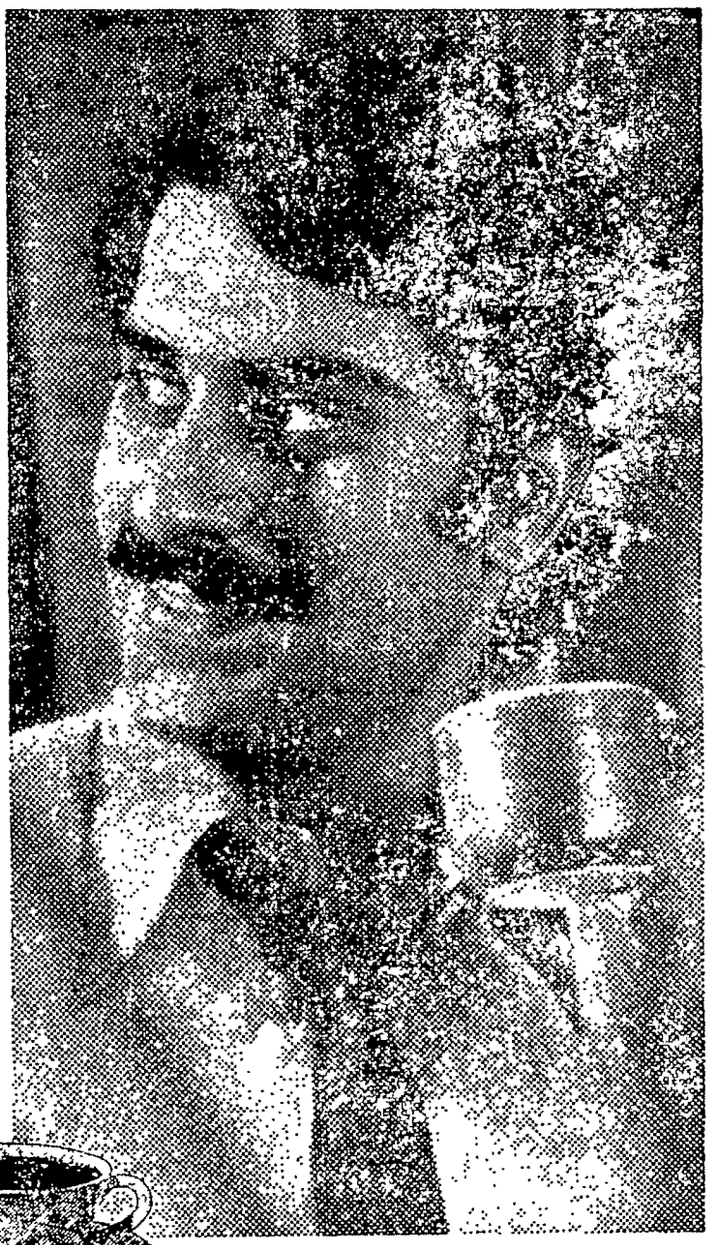

শ্রান্ত ক্লান্ত
দিন শেষ হ'ল।
বাড়ী ফিরে প্রাণ রসে
ভরপূর নেস্‌কাফের
উষ্ণ অভ্যর্থনা।

সেই একই কফি
যার জীয়নকাঠি
দিনান্তে সারা
পৃথিবীর মানুষকে
প্রাণবন্ত করে।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

AGIL-486-2416

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY CALCUTTA

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩২	অরণ্যশিকার	(কবিতা)	—শ্রীঅজিত বাইরী
৩২	ভরা কোটাল মরা কোটাল	(কবিতা)	—শ্রীশোভন পাঠক
৩৩	সত্য অথচ রূপকথা		—শ্রীপরিমল গোস্বামী
৩৬	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৩৭	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৪২	দিন কালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৪৪	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৪৬	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৪৮	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৪৯	দুধ পোড়ার গন্ধ	(গল্প)	—শ্রীঅশোককুমার সেনগুপ্ত
৫২	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৮	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৯	পাবলো নেরুদা		—শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী
৬২	সুলভ মূল্যের বই, পেপার ব্যাক ও পকেটবুক		—শ্রীঅনিলকুমার ভৌমিক
৬৪	লায়লাবানু ও কর্ণেল ন্যাজারেথ	(গল্প)	—শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৬৭	অন্ধকারের পেছনে ছোটা	(গল্প)	—শ্রীরাবীন্দ্রকুমার দাশ
৬৯	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৭১	জলসা		—শ্রীচিত্রাঙ্গদা
৭২	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলো		—শ্রীনর্শক

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম বি বি এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম বি বি এস

যৌবনের রহস্য

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৮এ সূর্য সেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠালে ডাকমাশুল ফ্রি

গৃহিণীদের রান্নার জন্য খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুঁড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ
১০০% খাঁটি হয়

'ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা

গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

সমস্তরে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন
নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলেও আর মাড়ি মালিশ করলেও ম্যাড়িতে গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন একজন অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন :

"বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী ফরহ্যান্স পেষ্ট সহজ প্রাপ্য করার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। পাঁচ বছরের ওপর হবে গেল আমি এই টুথপেষ্ট ব্যবহার করে আসছি। এই টুথপেষ্ট আমার দারুণ প্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, এই শহরে আমার কিছু বন্ধুরাও ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।"

—এম এ অনন্তরামন, বম্বে

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি। ফোটোস্ট্যাট। ব্রেডি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ-র যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

ভালোভাবে দাঁতের ময় মিশে ফেনা হয়ে মুখ ভরে যায়। সকালে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ও ফরহ্যান্স ফ্লুরাইড আকৃতির টুথব্রাশ ব্যবহার করুন—আর নিয়মিত আপনার দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

বিনামূল্যে। তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" পেতে হলে, এই কুপনের সঙ্গে ২০ পয়সার ডাকটিকিট পাঠান, এই ঠিকানায়—ম্যানার্স ডেন্টাল এডভাইসরী ব্যুরো পোস্ট বাক্স নং ১০০৩১, বম্বে ১। ১১টি ভাষায় পাওয়া যায়।

ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট-ব্রাশ
দাঁতের ডাক্তাররা উভয়ই

1945-102 Beng

চিঠিপত্র

অসাধু ব্যবসায়ী ও আমরা

গাঁয়ে গঞ্জে যাঁরা থাকেন তাঁরাতো ফটই, খাস কলকাতার মানুষও বুকের ওপর একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়েই ঘুরছে ফিরছে রাস্তাঘাটে ট্রামে বাসে। ফিস ফিসিয়ে নয়, সোচ্চারেই বিনিময় হচ্ছে সংলাপ। নেই, কিছু নেই। না মাখন নেই, পাউরুটি নেই, বিস্কুট নেই। নেই কেক ফ্রুডও। কেরোসিন বেপাত্তা, সরষের তেল উধাও। চাল তো সোনার হরিণ। আটা নেই, ডালডা নেই। চারিদিকেই শুধু নেই, আর নেই।

কিন্তু সত্যিই কি নেই? আছে, গোপন গর্ভে। 'বিধিবদ্ধত' কিছু ক্রেতা দ্বিগুণে তিনগুণে দাম দিলে সবই পাচ্ছেন। অর্থাৎ মোটা মাইনের চকুরে, আর কিছু রাজনৈতিক দাদারা অনেক মুস্কিলই আসান করেছেন।

আসলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলেছে ব্যবসায়ীদের নোংরা রাজনীতি। চাল, গম, সরষের তেল, কয়লা, রুটি, বিস্কুট নিয়ে চলছে নবমেধ যজ্ঞের রাজনীতি। গাঁয়ে মানুষ মরছে না খেয়ে, সোজা বাংলায় দুর্ভিক্ষের তাড়নায় আত্মহত্যায়। আর সবাই এখনো ব্যবসায়ীদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করছেন। কিন্তু যতই নেতারা সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হোন, বা সদিচ্ছা দেখান এ সমস্যা সমাধান শিবেরও অসাধ্য। যে মুষ্টিমেয় অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করে পশ্চিমবঙ্গকে ধ্বংস করতে চাইছে তাদের দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করে শাস্তি দিতে জনপ্রিয় সরকার কেন এত বিচলিত বা দ্বিধাগ্রস্ত তা বুঝি না। সরকার যখনই কোনো জিনিসের দাম বেঁধে দেন সঙ্গে সঙ্গে তা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। সরকার যখনই ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মূল্যে সরষের তেল, কয়লা, চাল বিক্রি করতে বলেন তখন বাজারে নেই নেই রব ওঠে। চেম্বার অব কমার্স একের পর এক প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর তা ভাঙছেন। এ যে একেবারে সহ্যের অতীত।

যাঁরা গ্রামের খবর রাখেন তাঁরা জানেন ইতিমধ্যেই কত মানুষ আত্মহত্যা করেছেন, না খেতে পেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন। না, এ কোন স্টান্ট নয়, এ হচ্ছে বাস্তব সত্য। গাঁয়ে ঘুরলেই মানুষের হাহাকার শুনতে পাবেন।

শহর কলকাতার বর্তমান চেহারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই অন্ধকারতম দিনগুলির চেয়েও কি ভয়াবহ নয়? চাল চার টাকা কিলোয় উঠেছে, ব্যবসায়ীদের হাতে পায়ে ধরে কানাকড়ি তেল জোগাড় করতে পারলেও তার জন্য কিলো পিছু নগদানগদি দশ-এগারো টাকা দিতে হয়। কেরোসিনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও শূন্য টিন নিয়ে ফিরে আসছে ঘরে। প্রত্যেক পরিবারেরই একাধিক লোককে স্কুল, কলেজ, আপিস আদালত কামাই করে নামমাত্র বেশনের জন্য, কেরোসিনের জন্য, পাউরুটির জন্য, কয়লা কিংবা সরষের তেলের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। না, এমন অবস্থা কখনো হয় নি। স্বাধীনতার পর এমন বীভৎস, বিধ্বস্ত কলকাতার চেহারা কেউ কখনো দেখেন নি।

তার ওপর পরিবহন সমস্যা। দিনকে দিন বাসের সংখ্যা কমছে, আর আপিসে দেরি করে পৌঁছনোর ফলে 'বসদের গায়ে জ্বালা মন্তব্য।

সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে গ্রাম বাংলা, শহর কলকাতা প্রচণ্ড এক অশান্তির মুখোমুখি। শুধু চিন্তা কঠোর পরিশ্রম বা সদিচ্ছা দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বা খাদ্যমন্ত্রী মুস্কিল আসান করতে পারবেন না। তাঁদের কাছে আলাদীনের প্রদীপ বা যাদুকরের দণ্ড নেই। সময়মত বাস্তব পন্থা নিতে অনুরোধ করি। অসাধু ব্যবসায়ীরা সব সময়ই সরকারের সুস্থ চিন্তা বা পরিকল্পনাকে বানচাল করবেই। এদের কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া মানেই ডাইনির হাতে জনসাধারণকে সঁপে দেওয়া। অন্ধকারের জীবদের বিরুদ্ধে জনতার শক্তি নিয়েই মোকাবিলা করা দরকার। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তের কাছে নতিস্বীকার না করে শক্ত হাতে এই ঘৃণ্যজীবদের মোকাবিলা করুন। গ্রামে খুদ-কুঁড়ো যা হোক কিছু পাঠান, শহরকে বাঁচান।

বিশ্বনাথ সাঁতরা
চুঁচুড়া
হুগলি

আফ্রিকা ! আফ্রিকা !

সম্প্রতি নাইরোবিতে হয়ে গেল আন্তর্জাতিক ধন ভাণ্ডার ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের বার্ষিক সম্মেলন। তার মধ্যে একদিনের অনুষ্ঠান সামগ্রিকভাবে বর্জন করে ভারত। বাংলাদেশ ও অন্যান্য কয়েকটি রাষ্ট্রও নেয় একই পন্থা। বলাইবাহুল্য ভারত সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আফ্রিকাবাসীদের কাছে পেয়েছে অভিনন্দন।

আমরা বরাবরই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। বর্ণবিদ্বেষ আসলে মানবিকতারই বিদ্বেষপ্রসূত, বর্ণবিদ্বেষ শোষণ করার ঘৃণ্য ব্যবস্থা। সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আজো দক্ষিণ আফ্রিকায়, নমিবিয়ায়, জিম্বাবোয়ে তাদের শাসন-শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের কয়েকটি বাধা বাধা রাষ্ট্রের সহযোগিতায়। ভারতের অর্থমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, আমরা আরো একবার আফ্রিকার বন্ধু রাষ্ট্রগুলির প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও সমর্থন জানালাম। কারণ এ সম্পর্কে তাদের মনোভাবের আমরাও ভাগিদার।

যাঁরাই বিদেশে ঘুরেছেন তাঁরা জানেন ভারতীয়দের প্রতি স্বদেশপ্রেমী আফ্রিকানদের কী গভীর ভালোবাসা। ঘানা, নাইজিরিয়া, জাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বদেশীপ্রেমী মানুষদের মনে ভারত, মহাত্মা গান্ধী, নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে কী অসীম শ্রদ্ধা। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজতন্ত্রী দলের যিনি নেতা সেই 'দাদু'কে ওখানে অনেকে নাকি আফ্রিকার গান্ধী বলে ডাকেন। ফলে নাইরোবি সম্মেলনে ভারতের ওয়াক আউট আরেকবার প্রমাণ করল আফ্রিকার মানুষের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা নিঃস্বার্থ এবং ভারত মানবিকতার পক্ষেই ছিল চিরকাল, থাকবেও ভবিষ্যতে।

প্রভাতকুমার মজুমদার
দুর্গাপুর বর্ধমান

তরুণ লেখকের বই কি করে বেরোবে ?

এখন, বিশেষ করে এই দশকের গোড়া থেকে বাংলা সাহিত্যের এক শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, হয়তো সাগর ডিঙিয়ে অন্য কোথাও থেকে সে ঢেউ এখানে আছড়ে পড়ছে— তা হল, একটু বিদ্রোহী হয়ে উঠতে না পারলে লেখক হিসেবে প্রেস্টিজ বুঝি আর বাড়ানো যায় না। ব্যাপারটা বেশ জমে উঠতে না উঠতেই সব আবার যে যেখানে ছিল ফিরে চলে যাচ্ছে—এইরকমই একটা সময়ে একদল তরুণ লেখক ধুন্ধুমার তুলে আবির্ভূত হলেন। নো পলিটিক্স, নো লাইক গোছের শ্লোগান তুলে। তা-ও প্রায় সিকিযুগ আসছে। নানা ইহ হট্টগোলের পর এখন বোঝা যাচ্ছে, অর্থাৎ কিছুটা সচেতন লেখকরা বুঝতে পারছেন, যা জানি, যা দেখি তার বাইরে যাবো না। এরাই একালের উদ্যত তরুণ লেখক, কখনও অভিমানী আবার অহঙ্কারীও।

সমস্যাটা এদের নিয়ে। কেন না, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র গবেষণাকে এঁরা সাহিত্যের সব থেকে বড় উপাদান করে নিয়েছেন, তার জন্য পরিশ্রম করেন অহোরাত্র, অথচ সে তুলনায় মর্যাদা আর কতটুকু?

বইয়ের বাজারের মোট হিসেব যদিও এখনই মাথায় নেই, তবু অনায়াসে বলে দেওয়া যায়, মগন তরুণ লেখকদের স্থান সেখানে খুবই বিরল। কারণটা কী?

প্রকাশকরা ঘরের টাকায় ঝুঁকি নেবেন, এমন মহানুভব হতে গেলে ব্যবসা অবশ্যই লাটে ওঠে, তাই প্রকাশক মশায়কে অনেক ভেবেচিন্তে প্রকাশের দায় নিতে হয়। তবু বলব, বাজারী বই-পত্তর কিনে চাব ডজন করে বার করে করে প্রকাশকরা যেন পাঠকদের বুঝিয়েই দিচ্ছেন সেটাই হল সাহিত্য। কিন্তু তাদের তো অনুরোধ করা যেতে পারে, তরুণ লেখকদের দায় তারা নিয়ে দেখুন না একটু। দু নম্বর কথা লেখকদের সমবায় নিয়ে। সমবায় সমিতি এদেশে গড়ে আর ভাঙে। কারণ সম্পাদক চান তাঁর বই আগে বেরোক। অতঃপর ঝগড়া। তারপর বন্ধ।

তাহলে উপায়।

প্রশ্নটাই তাই।

উদ্যোগী তরুণ লেখকরা কি তাঁদের একটা সমবায় সমিতি গঠন করতে পারেন না।

অরুণ দত্ত কলকাতা-৬

সম্পাদকীয়

বাঙালীর দুর্গোৎসব

বাঙালী হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবের দিনে আমাদের সকল পাঠকপাঠিকা ও অনুগ্রাহকদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। উৎসব মানুষের মনে নিয়ে আসে আনন্দের ঋতু। দুর্গোৎসব সেই আনন্দকে প্রসারিত করে দিক আমাদের জনজীবনে। শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় জগজ্জননীর পূজা সার্থক হয়ে উঠুক। এই উৎসবের জন্য সারা বৎসর সাধারণ মানুষ প্রতীক্ষায় দিন কাটায়। বাঙালীর সংস্কৃতিতে এই উৎসব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আমাদের শিল্পে ও সাহিত্যে দুর্গোৎসবের ভাবকল্পনা শাশ্বত সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। একে বাদ দিয়ে বাঙালীর জীবনচর্চার কথা ভাবাই যায় না।

শুধু একটি ধর্মানুষ্ঠানেই যদি এই উৎসব সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে শরতের এই উৎসব সকল মানুষের মনে এমন প্রেরণা জাগাত না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বাঙালীরা দিয়েছে সাংস্কৃতিক উৎসবের অতুলনীয় সার্থকতা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনের কল্যাণে নিবেদিত এই উৎসব শুভশক্তির উদ্বোধনে অত্যুজ্জ্বল। শুভ ও অশুভের সংঘাতে জনজীবন যখনই বিপন্ন হয়ে ওঠে তখনি আমরা শুভশক্তির আবাহন করি। দুর্গোৎসব সেই শুভশক্তিরই উপাসনা।

কল্যাণী মায়ের রূপে তিনি আবির্ভূতা হন। পৃথিবীকে তিনি সম্ভারসমৃদ্ধ করেন। অত্যাচারীকে তিনি দশপ্রহরণে পরাভূত করেন। আশ্রিতকে দেন অভয়। এই ভাবকল্পনায় আমাদের এই উৎসব সুন্দর ও অর্থবহ। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ—সমস্ত পৃথিবীর শান্তিকামনায় জগজ্জননীর পায়ে নিবেদিত হয় পুষ্পার্ঘ। শরৎ প্রকৃতির অনিন্দ্য মাধুর্য উৎসবকে উজ্জ্বল করে তোলে। পরবাসীরা এই সময় ফিরে আসে ঘরে। কৃষাণের চোখে দেখা দেয় নবান্নের স্বপ্ন। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে পারিবারিক আনন্দ উৎসবে বিশ্বজনের সঙ্গে একাত্মা অনুভব করে গৃহস্থ মানুষ। আমরা এই উৎসবের বন্দনা করি।

বাস্তব জগতের রুক্ষ কর্কশতা জীবনকে দুর্বহ করে তোলে। অতীতেও এমনি দুঃসহ অভিজ্ঞতা বার বার ফিরে এসেছে। কমলাকান্তের দুর্গোৎসবের অমর আলেখ্য বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেখিয়েছিলেন 'মা যা ছিলেন' এবং 'মা যা হইয়াছেন' কিন্তু সেখানেই তিনি লেখনী সম্বরণ করেন নি। আমাদের আরাধ্যা দেবীর, মাতৃরূপা মহামায়ার ভবিষ্যৎ রূপটিও তিনি দেশবাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন। সেখানেই আমাদের আশা, আমাদের সকল দুঃখের অবসান। অমানিশার পর প্রত্যাশার সূর্যোদয়।

এবারের উৎসব অভাব-অনটনের ছায়ায় কিছুটা ম্লান। প্রতিদিনের কুশাংকুরবিদ্ধ জীবনে তবুও উৎসব আসে। তাই আমরা ম্লান মুখে ফিরিয়ে দিতে চাই না বলেই আজ নিরন্নের ঘরেও উৎসবের ঋতু গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু আমরা যেন সংযতভাবেই এই উৎসব পালন করি। এক অভূতপূর্ব সঙ্কটে দেশবাসী বিপন্ন। অন্নের জন্য হাহাকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে সর্বত্র। গ্রামাঞ্চল থেকে অন্নের সন্ধানে ভিড় করছে মানুষ শহরে। যেন এক অদৃশ্য জাদুমন্ত্রবলে মানুষের খাদ্য, তার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী উধাও হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা কিভাবে দুর্গোৎসব করব? আমাদের আত্মআবাহন মন্ত্র কি জীবনের দুঃখতাপে নতুনতর সংজ্ঞা লাভ করবে? দুঃখ ও সুখের মালা-গাঁথা এই জীবন। দুঃখের দিনেই যেন আনন্দের স্মৃতিকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই। বিপদের দিনেই ফিরে পেতে চাই আত্মশক্তি।

দেশে কি সত্যিই খাদ্যাভাব? মানুষের লোভ এবং স্বার্থ যদি এত প্রকট না হত তাহলে কি আমরা সকলের সঙ্গে ক্ষুধার অন্ন ভাগ করে খেতে পারতাম না? মানুষের প্রতি মানুষের অবিবেচনাই আজ উৎসবের দিনে এমন ম্লান ছায়াপাত ঘটিয়েছে। এটাই বাস্তব ও নির্মম সত্য। এই অন্যায় অত্যাচার ও বঞ্চনার বিরুদ্ধেই আমাদের উৎসবের মন্ত্র উচ্চারিত হোক। নয়তো সবটাই হবে এক বিকৃত পরিহাসের মতো। জগতে আনন্দযজ্ঞে যার নিমন্ত্রণ তাঁকে আমরা উপোসী মানুষের নিরানন্দ কুটিরে যেন অভ্যর্থনা করে এনে বিড়ম্বিত না করি। উৎসবের দিনেই আমরা প্রতিদিনের দুঃখ ভুলতে চাই। প্রতিপদে আজ সেই দুঃখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে। তবুও আমরা আশা করব, উৎসবের আলোকসজ্জায় যেন বঞ্চিতদের মনের অন্ধকার সাময়িকভাবে হলেও আমরা দূর করে দিতে পারি। আমরা যেন সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই প্রার্থনাই করতে পারি, এই দুর্ভাগ্য দেশ থেকে যেন সব দুঃখ, ভয় ও যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে পারি। যিনি আনন্দময়ী, যাঁকে আমরা অন্নপূর্ণা জননীরূপে ধ্যান করি তিনি যেন তাঁর নিরন্ন, বিষণ্ণ সন্তানদের জীবন সুখে, স্বাস্থ্যে ও সমৃদ্ধিতে শ্রীমণ্ডিত করে তোলেন। আমাদের উৎসব যেন সার্থক হয়।

ঘটনার আয়নায়

নিজামশাহী আমলের 'মূলকি আইনের' প্রসঙ্গে দীর্ঘ দিনব্যাপী যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং অন্ধ্র প্রদেশের অখণ্ডতা বিনষ্ট হোতে চলেছিল, তার অবসানের আশায় নয়াদিল্লীতে তেরো দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে সি পন্থের সঙ্গে আলোচনার পর সম্প্রতি একটি ছয়-দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেদিন সমাধানের সূত্র আবিষ্কারের আলোচনায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন অন্ধ্র ও তেলেঙ্গানার কিছু কিছু পুরস্কার সাবির নেতা ও বিধানসভা ও পার্লামেন্টের সদস্য। এই ছয়-দফা প্রস্তাব কিন্তু অনিচ্ছুক নেতাদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে চাপিয়ে দেন নি, পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়েই তা গড়ে উঠেছে।

এই প্রস্তাবগুলোতে যে নতুন সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখলেই বোঝা যাবে যে অসল লক্ষ্য হোল অন্ধ্র এবং তেলেঙ্গানা, এই দুই অঞ্চলের দাবী এবং স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন। বিশেষ করে চাকরীর সুযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের অনগ্রসর অঞ্চলে আর্থিক সংস্কারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, একথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে এই ছয়-দফা প্রস্তাবে। সমস্ত বিরোধ, বিতর্কের মূল উৎস যে 'মূলকি আইন' তাকেও লোপ করা হবে। নতুন কাঠামোতে তেলেঙ্গানা আঞ্চলিক সমিতির কোন স্থান নেই, রাজ্যে একটি পরিকল্পনা বোর্ড গড়ে উঠবে এবং তার সঙ্গে থাকবে কয়েকটি উপ-সমিতি। এছাড়া একটি ট্রাইব্যুনালের গঠনের কথাও আছে এই প্রস্তাবে।

অন্ধ্রের অখণ্ডতাকে আবার অটুট করে তোলার জন্যই এই ছয়-দফা প্রস্তাবের অবতারণা হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকেই অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দৈনন্দিন ঘটনা যে খাতে বয়ে চলেছে, তা থেকে এ ধারণাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই ছয়-দফা সমাধানের প্রস্তাব সবার মনঃপূত হয়নি। যাঁদের কাছে এই সমাধানের প্রয়াস কোন সমাধান বলেই মনে হয়নি, তাঁরা কিন্তু আবার তাঁর প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের সুর নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। অন্ধ্র প্রদেশের অকমিউনিস্ট বিরোধী নেতারা, বিচ্ছেদপন্থী অন্ধ্র সেনা, নন-গেজেটেড কর্মচারীরা তীব্র ভাষায় এই ছয়-দফা প্রস্তাবের সমালোচনা করেছেন। এর প্রতিবাদে হায়দ্রাবাদ ও ওয়ারাঙ্গালে ছাত্ররা ক্লাশে আসছে না, ইতিমধ্যে জনসঙ্ঘের কর্মীরা সেক্রেটারিয়েটে ধর্ণা শুরু করেছে। কিছু আইনজীবীর দল সাবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সবচেয়ে বড়ো হোল বিচ্ছেদপন্থী দলের অন্যতম বড় নেতা ডাঃ চেন্না রেড্ডি এই ছয়-দফা প্রস্তাবকে সমর্থন জানান নি। তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথকীকরণই অন্ধ্র সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ; আর কোন সমাধানসূত্রের সাফল্য সম্পর্কে তিনি মোটেই নিশ্চিত নন। শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছেই নয়, সর্বসমক্ষে ডাঃ রেড্ডি বেশ জোরের সঙ্গেই বলছেন পৃথকীকরণ ছাড়া অন্ধ্র সমস্যার কোন দিনই বাস্তব সমাধান হোতে পারে না। যেহেতু তিনি নতুন দিল্লীতে গৃহীত প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন নি, তাই তিনি তাঁর পুরনো পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, আইন বা নীতিগত বাধা তাঁর নেই। ডাঃ রেড্ডী বলেছেন, অতীতের বহু অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে একথাই আমাদের মেনে নিতে হবে যে, পৃথকীকরণ আজকের এই অবস্থায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। তিনি আরো বলেছেন ছয়-দফা প্রস্তাব নিয়ে পরীক্ষা চালালে রাজ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে যার মধ্যে জনসাধারণ নতুন করে সংগ্রামের জন্য নিজেদের তৈরী করে নেবে।

একথা অস্বীকার করা যায় না বিচ্ছেদপন্থীরা খুব বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। আর অপরপক্ষে ছয় দফা প্রস্তাবের সমর্থকরা জনসাধারণকে তাদের যুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছেন না। প্রাক্তন দুই মন্ত্রী তাঁদের মুক্ত বিবৃতিতে যদিও বলেছেন—এই ছয়-দফা প্রস্তাবে অন্ধ্রবাসীর হৃদয়াবেগের মূল্য দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের প্রতি সমান দৃষ্টি দেওয়া হবে এ ইঙ্গিতও আছে প্রস্তাবে। কিন্তু সমস্যা এতো জটিল আকার ধারণ করেছে যে এই ধরনের ভাববাদী মন্তব্যের মধ্যে তার সমাধানের কোন আলো নেই। ডাঃ চেন্না রেড্ডী অভিযোগ করে বলেছেন অন্ধ্র সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সেখানকার সাধারণ লোকের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অভিযোগটি হয়তো আংশিকভাবে সত্য। নয়াদিল্লীর সবটুকু দৃষ্টি এতদিন পর্যন্ত শুধু উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এবং প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। সেখানকার কংগ্রেস কর্মীরা তাঁদের সাংগঠনিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনসাধারণের কাছে সমস্যার পরিপূর্ণ ছবিটি তুলে ধরতে পারেন নি এবং সেই জন্যেই অখণ্ডতার পক্ষে জনমত সংগ্রহ করার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাঁদের নেওয়া সম্ভব হয়নি। যাঁরা নতুন দিল্লীর নির্দেশ মতো কাজ করেছেন, তাঁরাও জনসাধারণের কাছে পরিষ্কার করে কোন ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। অর্থাৎ সমস্যা সমাধানের যে আলোটুকু পাওয়া গিয়েছে, তাকে জনসাধারণের কাছে ছড়িয়ে না দিলে এই দীর্ঘদিনের বিরোধ অবসানের সব প্রচেষ্টা যে কার্যকর হয়ে উঠবে না, এই বাস্তব সত্যটির দিকে খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

তাছাড়া নতুন প্রস্তাবগুলোকে কার্যকর করে তুলতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারকে খুব দ্রুত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত, সংবিধানে একটু সংশোধন করে রাষ্ট্রপতির হাতে এক বিশেষ ক্ষমতা দিতে হবে যাতে করে শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাবিত নতুন কাঠামোটিকে দৃঢ়তর করবার অধিকার তাঁর থাকে। দ্বিতীয়ত, অন্ধ্র প্রদেশের প্রতিটি লোকের শিক্ষাদানের সুবিধার্থে হায়দ্রাবাদে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আইনের দিক দিয়ে হয়তো এটাই ঠিক যে অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির পরিচালনাধীনে যে শাসনব্যবস্থা তার মধ্য দিয়েই এই ছয়-দফা প্রস্তাবের প্রাথমিক রূপায়ণের কাজ শুরু হোতে পারে, কিন্তু রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে সেদিনই যেদিন জনগণের সমর্থন পেয়ে একটি মন্ত্রিসভা সর্বসম্মতিক্রমে গড়ে উঠবে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ অন্ধ্র প্রদেশের দিকে তাকালে একজনকেও কি চোখে পড়বে যিনি সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারবেন।

* * *

মুখে শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেগ, কিন্তু অন্তরে তীব্র বিদ্বেষের বেগ—এই দুটি পরস্পরবিরোধী মনোভাব যুগপৎ কাজ করলে যে কোন বৃহত্তর মানবিক প্রয়াসের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। আজকের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে যে এই সত্যের চিরন্তনত্ব ও গভীরতাকে আজ আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এই সত্যকে স্বীকার করতে চান না, অন্ততঃ তাঁর আচরণ এরই সপক্ষে রায় দেয়। বলার জন্য বলবো, লেখার জন্য লিখবো, প্রয়োজনমত যা বলেছি, যা লিখেছি তার বিরোধিতা করবো—এই নীতিতেই তো বিশ্বাস করেন জনাব ভুট্টো। তাঁর এই চেনা চেহারাটি আবার নতুন করে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সদ্যসমাপ্ত মার্কিন সফরে। অনেক আশা নিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে পৌঁছে ছিলেন, মনে হয়েছিল পুরনো বন্ধুত্বের প্রতিদান হিসেবে আরো অনেক অস্ত্র দিয়ে খুশি করবেন তাঁকে, কিন্তু মার্কিন সরকারের এবারকার নিরুত্তাপ সমর্থন ভুট্টো সাহেবকে বড়ো হতাশ করেছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকসনের যে আলোচনা হয়েছে তাতে অনেক বিষয়ই এসেছে। জনাব ভুট্টোর মূল

কথা ছিল আরো অনেক অস্ত্র পাকিস্থানকে দিতে হবে, কিন্তু নিকসন জনাব ভুট্টোর এই দাবীকে মোটামুটিভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের একজন মুখপাত্র পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কোনপ্রকার অতিরিক্ত অস্ত্র সরবরাহ আর করা হবে না। বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে কয়েক দিন আগে ডাঃ কিসিংগার নতুন মার্কিন নীতির কথা ঘোষণা করে বলেন 'দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকা নতুন করে বেশী অস্ত্র সরবরাহ করবে না।' তিনি সেনেটের বিদেশ সম্পর্কিত কমিটির কাছে বেশ সোচ্চারে বলেছেন 'যদি সেখানে কোন যুদ্ধ বাধে, তাহলে তার পেছনে মার্কিণ অস্ত্র কিছুতেই থাকবে না। তাছাড়া ডাঃ কিসিংগার ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন সরকারের নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই প্রেসিডেন্ট নিকসন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোকে অস্ত্র সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। শুধু বলেছেন, প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগে আমেরিকা পাকিস্থানকে সাহায্য করবে আর পাকিস্থানের অখণ্ডতায় মার্কিন সমর্থন রইলো। সুতরাং ভুট্টোর অস্ত্র চাওয়ার ব্যাপারটা ব্যর্থই হোল, তিনি প্রেসিডেন্ট নিকসনকে বোঝাতে পারলেন না যে তাঁর দেশ প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ক্ষুব্ধ, হতাশ হোলেও প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো কিন্তু তাঁর স্বভাব থেকে বিচ্যুত হননি। নিউইয়র্ক এবং ওয়াশিংটন সফরের সময় একাধিকবার তিনি ভারতের উদ্দেশে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, আস্ফালনও করেছেন অনেক. আবার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান হিসেবে তিনি ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছেন। এই পরস্পরবিরোধী মনোভাব থেকেই ভুট্টোর আসল অভিসন্ধিই কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না?

রাষ্ট্রসংঘে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো বাংলাদেশের স্বীকৃতি নিয়ে যে কথা বলেছেন তা তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ যতোক্ষণ পর্যন্ত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার স্থগিত না রাখবে, ততদিন পাকিস্থান বাংলাদেশকে কোনমতেই স্বীকৃতি দেবে না। কিন্তু ভুট্টো সাহেব কি ভুলে গেলেন যে, কথা ছিল যে তিন দফা প্রত্যর্পণের কাজ শেষ হোলে ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যুদ্ধবন্দীদের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা হবে? কিন্তু তার আগেই ভুট্টো মুখর হয়েছেন—বিচার করা চলবে না কিছুতেই। এদিকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ তখনই অংশ নিতে পারে যখন পাকিস্থান বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেবে। অথচ ১৯৫ জন পাক-যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি না দিলে পাকিস্থান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানাবে না। আসল কথা হোল ভুট্টো সাহেবের এটা একটা কূটনৈতিক কারসাজি।

ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবের ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো আরো কিছু ক্ষুব্ধ হবার মতো মন্তব্য করেছেন। ডাঃ কিসিংগার বলেছেন আমেরিকা আশা করে বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে অশান্তি মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক। কিন্তু ভোজসভায় ভুট্টো সাহেব সোৎসাহে এই মত পোষণ করেছেন যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে একটি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। ভুট্টোর এই ধারণা থেকেই তো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সম্প্রতি ভারত-পাকিস্থানের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা তাঁর বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোন গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে নি। তিনি এখনো ভাবছেন দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও অখণ্ডতার জন্য মার্কিন সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। আশ্চর্য লাগে, যেখানে মার্কিন সরকার দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্কে তার নতুন নীতির কথা ঘোষণা করেছেন, সেখানে ভুট্টো এখনো সেই পুরনো সত্যে বিশ্বাস করছেন কি করে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হোল, যখন দিল্লী চুক্তিপত্রের কালিটা শুকিয়ে যায় নি, তখনই ভুট্টো সাহেব উপ-মহাদেশে বিরোধ বা সংঘর্ষের আভাস পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো অস্বীকার করেছেন ইরানের শাহ পাকিস্থানের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করতে তৎপর হয়েছেন। কিন্তু লাহোরের একটি উর্দু সাপ্তাহিকীর খবরে প্রকাশ, বালুচিস্থানে নিযুক্ত পাঁচ ডিভিসন পাকিস্থান সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করছে ইরান। ওদিকে রাষ্ট্রসংঘে ভুট্টো ঘোষণা করেছেন ১৯৫ জন পাক-যুদ্ধবন্দীর বিচার স্থগিত না রাখলে পাকিস্থান রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের প্রবেশের ব্যাপারে বিরোধিতা করবে।

মোট কথা এবারকার মার্কিন সফরে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা মোটেই ভারতীয় উপ-মহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে নয়। ভুট্টো সাহেবের এই চেহারা তো নতুন নয়, একথা মার্কিন কিছু রাজনীতিবিদও বলেছেন। কিন্তু ভারত সরকারের এ ব্যাপারে অনেক কিছু করণীয় আছে। সিমলা চুক্তি সম্পাদনের পরেও জনাব ভুট্টোর যে আচরণের নজীর মিলেছে তাতে কি খুব বেশী মনে হয়েছে ভারতের মতো পাকিস্থানও শান্তি প্রতিষ্ঠাতে আগ্রহী। সুতরাং দিল্লী চুক্তি

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিরীটী অমনিবাস

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দশ টাকা।

সুমথনাথ ঘোষের

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲

বিমল মিত্রের

আমি ১০৲ তিন ছয় নয় ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর

ওরা বড় হয়ে গেল ৫৲

শঙ্কু মহারাজের

গিরিকান্তার ৯৲ গঙ্গাসাগর ৮৷৷

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা—৯

স্বাক্ষরিত হয়েছে বলেই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে, আর কোন পদক্ষেপই ভাবতকে নিতে হবে না—একথা কোন বিজ্ঞ লোকই বলবেন না। এখন থেকে ভারত এবং তার সহযোগী বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সতর্ক এবং সচেষ্ট থাকতে হবে যাতে করে 'শান্তির ললিত বাণী' এই ভারতীয় উপমহাদেশে 'ব্যর্থ পরিহাসে' রূপান্তরিত না হয়।

* * *

ডাঃ আলেন্দের পর সামরিক শাসকরা যেভাবে চিলির আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেই গতিবিধি দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে তাঁরা কোনমতেই এখন জনসাধারণের হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নন। ইতিমধ্যে জেনারেল অগাস্টো পিনোচেট পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে চিলিকে এখন রাজনৈতিক নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ ধরনের ঘোষণায় অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই, যেহেতু সামরিক শাসনকর্তা কখনো গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের পথ প্রস্তুত করে দিতে আগ্রহী হন না এইটেই তো নিয়ম। চিলির সামরিক জান্তা অবশ্য অন্য কারণও ব্যক্ত করেছে। তারা দাবী করেছে বামপন্থী পার্টি নেতৃত্বের যাবার পর একটি বিরামের মুহূর্ত সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেখানে সংবাদপত্রের মুখও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 'লা সেগেনা' যা ডাঃ আলেন্দে ও তার কর্মপন্থাকে সমালোচনা করেছে কড়া ভাষায়, তাকেই পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এবং এই সঙ্গে আর একটি আলেন্দে-বিরোধী পত্রিকা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশের আলো দেখবে।

সকলেরই জানা যে, চিলির নতুন প্রেসিডেন্ট জেনারেল অগাস্টো পিনোচেট উগার্টে-এর মনোভাব সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদবিরোধী। তাই কমিউনিস্ট চিন্তাধারার সঙ্গে আপাততঃ কোন যোগসূত্র রচনা করা সম্ভব নয়। সামরিক জনতা শুধু চিলির বাহ্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ফিরিয়ে আনতে হয়তো আগ্রহী। কিন্তু একথা সত্য, চিলিতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অনেক সন্দেহ আর সংশয়ে ঢাকা। চিলির রাজনৈতিক দৃশ্যের পর্যবেক্ষকদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতেও সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসা খুবই শক্ত ব্যাপার।

সামরিক জনতার ঘোষণায় কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটরা প্রভাবিত হন নি। তাঁরা এমন কি নতুন সংবিধান রচনার বিরোধিতা করেছেন। এদের দলনেতা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, কোন ফরমান জারি করে রাজনৈতিক কোন দলকে দাবিয়ে রাখা যায় না। তিনি অবশ্য অল্প কিছু সময়ের জন্য চিলিতে সামরিক শাসনের পক্ষপাতী।

সব দিকে নজর রাখলে একথাই বলা যায় যে চিলির রাজনৈতিক চেহারা এখন মোটেই সুস্থ নয়। সাম্যবাদীভাবাপন্ন সমস্ত কার্যকলাপের আপাততঃ সমাধি হয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে সামরিক শাসকরা আশা করছেন, অত্যাচারের ও আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়ে তারা টিকে যেতে পারবেন।

* *

একথা এখন আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে সংগ্রহ অভিযানকে খুব জোরদার করে তোলা যায় নি বলেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি একটা জটিলতর অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। খুব সুখের বিষয় মুখ্যমন্ত্রী যাদের এই ভয়াবহ অবস্থার একটি অন্যতম কারণকে খুঁজে বার করে এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এ বছরের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে তিনি আগাম ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে করে পরবর্তী শস্যের মরশুমে সংগ্রহ অভিযানকে আগে ব্যাপকতর করে তোলা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে মনে হবে সংগ্রহ অভিযানের জন্য যে লক্ষ্য স্থির করা হবে বলে আলোচনা হয়েছে, তা কিন্তু খুব একটা বড়োরকম বা আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। একথা তো সবারই জানা যে এবার বর্ষা দেরী হয়েছে এবং সেচ শস্যের সম্ভাবনা এবার সত্যিই প্রোজ্জ্বল। যদি এবারকার পরিচিত ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নেওয়া যায় এবং এ ব্যাপারে রাজ্যের সরকারী শাসনযন্ত্র অনেক বেশী তৎপর হয় তাহলে কেন লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে না? ফসল কাটার সময় তার হয়তো কয়েক সপ্তাহ পরেই শুরু হবে, ঠিক এই সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আলোচনা শুরু করেছেন কিভাবে সংগ্রহ অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। খাদ্য সম্পর্কিত ক্যাবিনেট সাবকমিটির সভাদের সঙ্গে এ বিষয়ে নানা প্রস্তাব নিয়ে শ্রীরায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছেন সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি কংগ্রেস, সি পি আই নেতা এবং উদ্বৃত্ত জেলার এম এল এ-দের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে শ্রীরায় বলেছেন, যে লক্ষ্যই আমরা স্থির করি না কেন আমরা তাতে পৌঁছতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবো। এ বছরের এই খাদ্য সংকটের মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াস নিশ্চয়ই সময়োপযোগী এবং অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু সংগ্রহ অভিযান সম্পর্কে যে কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করা হোক না কেন তা করতে হবে সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। সেই সম্মেলনেই স্থির হয়েছে চালের পাইকারী ব্যবসা অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে বিভিন্ন রাজ্যসরকার। পশ্চিমবাংলায় চালের অধিগ্রহণ ব্যাপারটা বোধ হয় খুব সহজ জাগাতে পারবে না, তার কারণ এ রাজ্য তো এমনিতেই ঘাটতি রাজ্য। কিছু অধিগ্রহণ হোক কি না হোক একটা কথা কিন্তু খুব সত্য যে বন্টনব্যবস্থাকে আরো অনেক বেশি জোরদার করে তুলতে হবে। আর এতেই খোলাবাজারে মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা প্রতিহত হবে এবং মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সক্রিয় ভূমিকাকে বেশ কিছুটা স্তিমিত করে দেওয়া যাবে। এই কাজ করতে হলে ঠিকভাবে এবং শক্ত হাতে সংগ্রহ অভিযানকে ব্যাপকতর করে তুলতে হবে।

সংগ্রহ অভিযান যে ঠিক মতো চলানো যাচ্ছিল না তার একটা প্রধান কারণ হোল মূল্য নির্ধারণের সমস্যা। তবে সে অন্তরায় হয়তো সরে গিয়েছে, কেননা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সংগ্রহের মূল্যকে বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু শুধু ক্রয়ের ব্যাপারে খোলা বাজারের ওপর নির্ভর করে থাকলে সংগ্রহ অভিযানের নির্ধারিত সীমায় হয়তো পৌঁছনো যাবে না। এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীরা এবারে সচেতন ছিলেন বলেই, দিল্লীর সম্মেলনে মিল মালিক এবং কৃষকদের ওপর পর্যায়ক্রমে লেভী ধার্য করার একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

এ বছরে শস্যসংগ্রহের ব্যাপারে যে শিক্ষা হোল তাতে করে বলা যায় এই লেভীর ব্যাপারটা রাজ্যসরকারের সংগ্রহ অভিযানের নীতিতে একটা মুখ্য ভূমিকা নেবে। এই সংগ্রহের অভিযানে ক্রয়ের ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া ঠিক হবে কিনা, তা নিয়ে পূর্বাহ্নেই সুপরিকল্পিত আলোচনা করে নিতে হবে।

সবশেষে একটি কথা। শস্যসংগ্রহ অভিযানকে জোরদার করে তোলার জন্য যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক না কেন, এ বছরে সংগ্রহ অভিযানের ব্যর্থতার মূল কারণগুলোর কথা মনে রেখে যেন আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এইসব শৈথিল্যের দূরীকরণের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করছে আগামী অভিযানের সাফল্য। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরায় যে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়েছেন, তার জন্য তিনি নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য।

—সমদর্শী

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর প্রাচীন ধাঁচের দুর্গা প্রতিমা ও চালচিত্র

দুর্গাপূজায় কয়েকটি বিস্মৃতপ্রায় প্রথা

বাংলায় দুর্গোৎসব প্রধানত কালিকা, দেবী ও বৃহন্নন্দীকেশ্বর পুরাণের বিধান-মতে অনুষ্ঠিত হলেও আমাদের কোন কোন প্রাচীন রাজা-জমিদারবংশে শাস্ত্রবহির্ভূত কোন কোন আচার ও প্রথা সেযুগে প্রবর্তিত হয়েছিল উৎসব বা পূজোর এক অপরিহার্য অংগরূপে। সেসব প্রথা বা আচারের কত-গুলি কুলাচার আবার কতগুলি লোকাচার বলে বিশেষ পরিচিত হওয়ায় কালক্রমে তা একপ্রকার শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমমর্যাদা লাভ করতে থাকে। কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়তো সে সবের এককালে ছিল, কিন্তু আজ আর তা বোঝার কোন উপায় নেই। যদিও সম্প্রতিকালে ক্ষয়িষ্ণু কোন কোন জমিদার-রাজবংশে সেসব প্রথা বা আচারাদির অনুবর্তন আগের মতো সমানতালেই চলেছে দেখতে পাওয়া যায়। সেযুগের মানুষের কোন বিশেষ সংস্কার বা বিশ্বাস কোন বিশেষ প্রথা বা আচার সৃষ্টির জন্যে দায়ী বলে মনে করা যায়। মধ্যযুগের কুহেলীচ্ছন্ন ইতিহাস এ সম্পর্কে কোন আলোকবর্তিকা নিয়ে আমাদের পথ দেখাতে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই, সেযুগের মানুষের দেব-দেবীর ওপর একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে এবং কতকটা ভয়ভীতিসঞ্জাত বেড়াজালে পড়ে যে ভক্ত সেব প্রথাকে শাস্ত্রীয় মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, সেকথা অনুমান করা অসমীচীন হবে না। মংগলকাব্যের কবিরা যেমন কাব্যরচনার প্রেরণা পেয়ে থাকেন স্বপ্ন থেকে, কৌলিক আচার ও প্রথাও সেভাবে সৃষ্ট হয়েছিল বলে মনে হয়। এমনকি দেবীর মূর্তিতৈরিও হত স্বপ্নদেখা থেকে। যেমন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী মূর্তি, আর তাঁরও বেশ কয়েকশো বছর আগে বিষ্ণুপুরেরাজ জগৎমল্ল তাঁদের কুলদেবী মৃন্ময়ীকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। এখনকার দিনে বিস্মৃতপ্রায় কয়েকটি প্রথাও এভাবে সৃষ্ট হয়েছিল মনে হয়।

অবশ্য সেকালের কোন কোন প্রথা

প্রণব রায়

সত্যিই বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, যেমন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণভূমরাজবংশে দুর্গাপূজোর সপ্তম নবমীর রাতে নরবলি দিয়ে তার রক্তে রঞ্জিত বিল্বপত্রে দেবীর অর্চনা হত। এখন পশুরক্তে তা হয়ে থাকে। এটি অবশ্য কোন নতুন প্রথা নয়। বিগত শতকেও (এবং সম্ভবত এখনও) কোন কোন স্থানে, যেমন নবদ্বীপের পশ্চিমে জাননগরের ব্রহ্মাণীতলায় নরবলির কিছু কিছু লোমহর্ষক কাহিনী সেকালের কয়েকটি প্রখ্যাত সংবাদপত্রে যেমন সমাচার দর্পণে উল্লিখিত হয়েছে। কোন কোন দুর্গোৎসবেও যে এ ধরণের নরবলির প্রথা ছিল তা অনুমান করা যায়।

দুর্গোৎসব সুরু হওয়ার আগে সেকালের একটি পরিচিত প্রথা হল কৃপণ ধনীব্যক্তির ঘরে রাতের অন্ধকারে প্রতিমা রেখে আসা এবং তাকে এইভাবে যেন-তেন-প্রকারে পূজো করতে বাধ্য করা। কেউ কেউ দুর্গার পূজো করতেন নিরুপায় হয়ে আবার কেউ বা খুব বেগে গিয়ে দা হাতে নিয়ে প্রতিমাকে খান খান করে কেটে জলে ফেলে দিতেন। এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় সেকালের 'সমাচার দর্পণে'র পাতায়। এই পত্রিকার ১৮২০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় আছে, পূর্ব প্রথামত বেলঘরিয়ার এক ধনিগৃহে কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে 'দোমার্টীরা' প্রতিমা রেখে যাওয়ায় গৃহকর্তা খুব রেগে গিয়ে প্রতিমাকে কেটে খান খান করে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। এ সম্পর্কে 'দর্পণে'র একস্থানে আছেঃ

> 'পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সেখানে এইরূপে তাহার আগমন হয় সেখানে কোনমতে অন্যত্রে প্রস্থিতা হইয়া দশমীর দিবস জলে মগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমনমাত্রে [illegible] প্রস্থিতা হইয়া জলে মগ্না হইতে [illegible] মধ্যে কেহ দেখে নাই।'

অবশ্য ১৮৩৩ সালের ২রা নভেম্বরের 'দর্পণে' সম্পাদক এটিকে একটি কুপ্রথা বলে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে এক পত্রলেখক '. ঐ প্রথা বহুকালাবধি আছে পূর্বে যখন হিন্দু রাজা ছিলেন তৎকালে ভদ্রলোক দুর্গোৎসব না করিতেন এমত লোক অত্যল্প পাওয়া যাইত।' বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দর্পণ সম্পাদক ও সেকালের নব্যশিক্ষিত যুবকেরা যে এ প্রথার দারুণ বিরোধী ছিলেন তার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ঠাকুরগড়ার জন্যে একটি প্রথা হল মাটি তোলা। সেকালে অনেক বাড়ীতে বিজয়াদশমীর দিন সব কিছু কৃত্য শেষ করার পরেই আগামী বছরের পুজোর জন্যে বাজনা বাজিয়ে কোন বিশেষ স্থান থেকে প্রতিমাগড়ার জন্যে কিছু মাটি তুলে রাখা হত। সাধারণত কোন পুকুর বা সরোবরের পাড় থেকে এ মাটি নিয়ে আসা হত। আবার কোন কোন বাড়ীতে জন্ম অষ্টমী বা অন্য কোন শুভ তিথিতেই মাটি তোলা ছিল নিয়ম। এখনও এই ধরণের মাটি তোলা প্রথা অনেক বাড়ীতে দেখা যায়।

বনেদী ঘরের পুজোয় সেকালে একদিকে কুলাচার প্রতিপালিত হত। গৃহ ও স্থানভেদে এই কুলাচারগুলি ছিল নানা প্রকারের। এদের মধ্যে কোন কোনটি কৌতূহল উদ্দীপক। প্রসঙ্গক্রমে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামে রায়েদের প্রাচীন দুর্গোৎসবে একটি প্রচলিত কুলাচারের উল্লেখ করা যেতে পারে। রসপুর গ্রামে রায়-বংশের পূর্বপুরুষ যশশ্চন্দ্র রায় আনুমানিক ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এই পুজো প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত পুজোয় তিনটি নবপত্রিকা, একশটি ঘট স্থাপন ছাড়াও নবমীর দিন 'বহিত তোলা' নামে একটি কুলাচার পুজোর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে আজও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নবমীর দিন বাঁশের একটি নকল নৌকো তৈরি করে মাঝরাতে বাড়ীর মহিলারা বাজনা ও শাঁখ বাজিয়ে সেই নৌকোটিকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যান। এটাই হল বহিত (বহিত্র = নৌকা) তোলা। রায়বংশের এই পুজো সাত-খোরেদের পুজো নামে ঐ স্থানে বিশেষ পরিচিত। সম্ভবত বহিত তোলা প্রথাটি বংশের কোন কোন প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের স্মারকরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যশশ্চন্দ্র-প্রবর্তিত দুর্গাপুজোর একটি আলাদা পুঁথি ছিল। তাঁর পরবর্তী বংশধরেরা মূল পুঁথি থেকে বাংলা ১১৮২ সালে আরেকটি পুঁথি নকল করেন।

সতেরো শতকের শেষদিকে চেতুয়া-বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ সম্রাট ঔরংগজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর বংশে দুর্গোৎসবের সন্ধিপুজোর সময় দেবীকে পাঁড়শলা শ্যামবাতি ও বুঁদিয়ার মিঠাই নিবেদন করার রীতি আছে। নবমীর রাতে গোবচনীয় ও শিবাভোগও দেওয়া হয়। এগুলি কুলাচার। ঝাপড়দাহের (হাওড়া জেলা) ভট্টাচার্যবংশের পুজোয় ব্যবহার্য আলোচালের সঙ্গে ফলমূল, নাড়ু প্রভৃতি মিশিয়ে দেওয়া হয়। ভূতাপসারণ প্রভৃতির স্থলে আলোচালের বদলে তাই ছড়ানো হয়।

সন্ধিপুজোর সময়ে অনেক স্থানে কতগুলি অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শোনা যায়। যেমন বরদায় (মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরের কাছাকাছি) ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ বিশালাক্ষী মায়ের দুপাশে রাখা দুটি দীপশিখা সন্ধিক্ষণে এক হয়ে মিলে যায় বলে শোনা যায়। ধলভূমগড়ের রাজ-বাড়ীর পুজোয় ঐ সময় মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি বিরাট দামামা আপনিই বেজে উঠত, আর শিখরভূমের রাজবাড়ীতে মায়ের পদতলে রক্ষিত সিন্দুরপূর্ণ বেকাবীর সিন্দুরবস্তুরূপে দেবীর চরণকমলের ছাপ পড়ত। এগুলি লোকশ্রুতি এবং ঘটনা সত্য কিনা নিঃসন্দেহ বলা না গেলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেকালে সন্ধিপুজোর সময় পরিমাপ করার জন্যে তাঁরা বসানো এক নিয়ম চলিত ছিল। তাঁরি হল, একটি তামার বাটির নীচে একটি ছোট্ট ফুটো, একটি জলভরা মাটির হাঁড়িতে সেই বাটিটি ভাসানো হত। এটি একবার জলে ডুবে গেলে এক দণ্ড হত। এই ভাবে এই তাঁরির দ্বারা কোন সময়ে সন্ধিপুজোর সময় তা নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা হত। এখন এই তাঁরিবসানো প্রথাটি বিলুপ্তপ্রায়। হয়তো বা বাংলার কোন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়ীর পুজোয় এ প্রথাটি আজও চলে।

শুক্লা সপ্তমী তিথিতে প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপুজো আরম্ভ হলেও আগে পূর্ববর্তী কৃষ্ণা নবমী তিথি থেকে শুক্লা ষষ্ঠী তিথি পর্যন্ত 'কল্প' হত। এসময় প্রতিদিন দেবীর ঘট ডুবানো ও চন্ডীপাঠ এবং রাতে আয়ত শাস্ত্রীয়বিধি। কিন্তু কোন কোন বংশে এই কল্পকালে দেবীর প্রতিদিনের ভোগে পুঁই-শাক দিয়ে ঘুসো মাছের (ছোট চিংড়ির) তরকারি নিবেদন করার রীতি লক্ষ্য করা যায়। এখনও কোন কোন বংশে এই রীতিটি চলে।

এ ধরণের বহু কুলাচার ও প্রথা সেকালের দুর্গাপুজোয় চলিত থাকলেও ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা এর কোন কোনটি যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। উত্তর-কালে বংশপরম্পরাক্রমে সেটি পুজোর এক আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। আগে রাজা জমিদার ও বড়লোকদের বাড়ী ছাড়া দুর্গোৎসব হত না বললেই চলে। ধীরে ধীরে সেই উৎসব সাধারণ মানুষের আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন ব্যক্তি-বিশেষ প্রবর্তিত প্রথা বা আচারও সামাজিক প্রথা বা আচারে রূপান্তরিত হয়। উনিশ শতক থেকে আমাদের এই দুর্গাপুজো বড়লোকদের চন্ডীমন্ডপ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এক সার্বজনিক উৎসবরূপে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। এর ফলে কৌলিক আচার অনুষ্ঠানগুলি ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যেতে লাগলো নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদের ভীড়ে। অবশ্য এদের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে বনেদী ঘরের দুর্গাপুজোগুলিতে যে কিছু না কিছু কৌলিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিফলিত হত তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংরেজশাসিত মিশ্র কাল-চাব বিশেষ করে কলকাতার পুজোগুলিকে প্রভাবিত করেছিল উনিশ শতকের সুরু থেকেই। এ রচনায় উল্লিখিত প্রথা ও কৌলিক আচারগুলি বেশ প্রাচীন, গ্রামবাংলার জমিদার বড়লোকদের বাড়ীতে সেগুলি কোনক্রমে টিকে থাকলো—তারও অনেক পরে সেগুলি বিদায় নিল একেবারে।

---

* উল্লেখ্য : 'পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজো'—শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, 'প্রবর্তক' আশ্বিন, ১৩৬৭ পৃ—২০৩-২০৫

* প্রবন্ধের বক্তব্যের সমর্থনে কলকাতার নগরপাল শ্রীসমরেন্দ্র সিংহরায় কর্তৃক গৃহীত।

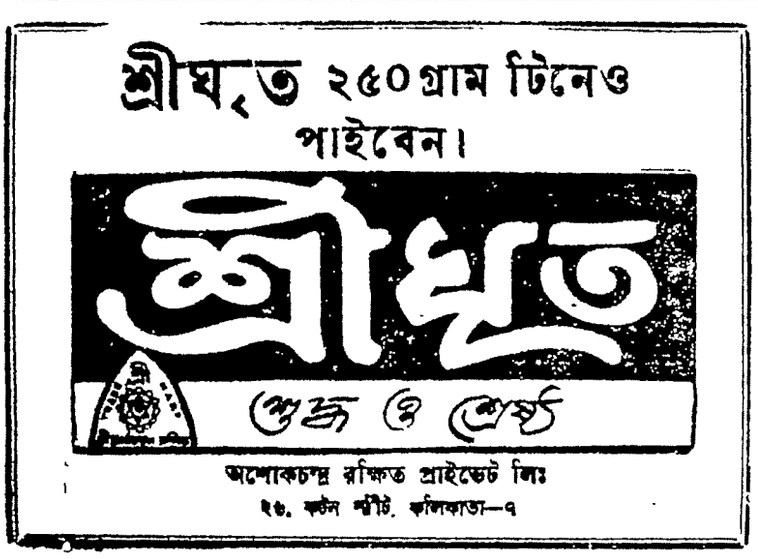

সতীনাথের বাবা ও আমি

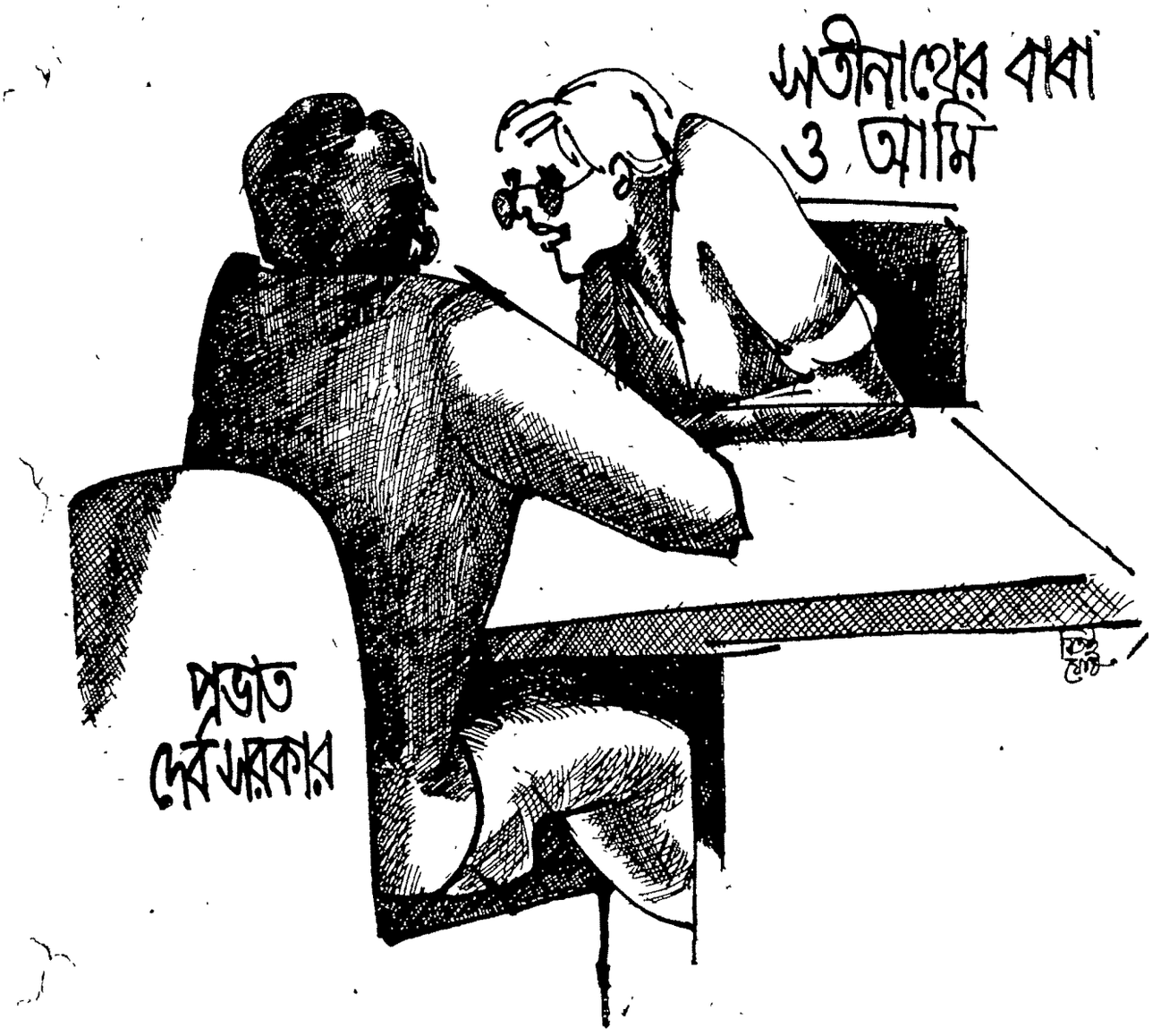

প্রভাত দেবসরকার

একদিন সতীনাথের বাবার গল্প আপনাদের শুনিয়েছি। ভদ্রলোক ছেলের চাকরির জন্যে আমাকে বড্ড ধরেছিলেন. ছেলের 'চাকরি চাকরি' করে প্রাণপাত করতে চেয়েছিলেন, আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। ভদ্রলোককে কিছুতে বোঝাতে পারি নি যে কাউকে চাকরি করে দেবার আমার কোন ক্ষমতাই নেই। একদিন আমার বাড়িতে তিনি রাস্তা ফেলে দিয়েছিলেন! তাই তাঁর ছেলের যখন আমার আপিসে চাকরি হল, তখন আমার লজ্জা রাখবার জায়গা ছিল না, তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলুম, কেন আপনারা তা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন—আমি নিজে থেকে সতীনাথের চাকরির জন্যে কোন সুপারিশই করিনি। আর কেন করিনি, তাও আশা করি, আপনারা বুঝেছেন। সতীনাথের চাকরির জন্যে তার বাবা যা করেছিলেন. আমি আমার ছেলের চাকরির জন্যে তার চারগুণ করেছি। এ আমার লজ্জাই বলুন, স্বাত্মীয়পোষণ দুর্নীতি ইত্যাদি যাই বলুন, এ দোষ আমাদের সবারই আছে—ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন সবার জন্যেই এ কাজ আমরা হামেশাই করছি —এই আশা বা কামনা আহা চাকরি-বাকরি করে ওরা সুখে থাকুক, ওদের মুখে হাসি ফুটুক!

কিন্তু আমাদের এ আশা বা ইচ্ছা সংসারে পনের আনা লোকের ক্ষেত্রে পূরণ হয় না। প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে গরমিল হয়ে যায়।...

সেই সতীনাথের বাবা আবার একদিন আপিস যাবার সময় আমার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভদ্রলোককে দোর গোড়ায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কি ব্যাপার! হঠাৎ এতদিন পরে?

সতীনাথের বাবা সেই পূর্বের মত ইতস্তত করতে লাগলেন।

বাড়ির সামনে গলিপথটা পেরিয়ে আবার বললুম, কিছু বলবেন?

বছর দু-তিন আগে সতীনাথের বাবাকে দেখে মনের মধ্যে যে ছবিটা আঁকা হয়ে গিয়েছিল আজ আবার তার পুনঃদর্শন ঘটলো : কাচু-মাচু মুখ, নিম্ন-ভূমি দৃষ্টি, হাত-জড়-করা দীনহীন ভঙ্গি!

তাড়া দিয়ে বললুম, যা বলবেন চট্-পট্ বলুন, আমার দাঁড়াবার সময় নেই!

সতীনাথের বাবা অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, তা হলে আর একদিন আসবো—

শুনে মেজাজ খিচড়ে গেল। বারবার এই সব লোকের দর্শন কে প্রত্যাশা করে? আবার এসে যেন চরিতার্থ করবেন!

কাট-ছাঁট করে বললুম, না না, যা বলবার এখনি বলুন। আবার আসবেন কেন ?

তেমনি অপ্রতিভ কণ্ঠে সতীনাথের বাবা বললেন. আপনার কি সময় হবে ?

বেশ বিরক্ত হয়ে রুক্ষ স্বরে বললুম, হবে, বলুন—

হঠাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সতীনাথের বাবা বললেন, কি আর বলবো!

হাত-ঘড়ির দিকে নজর দিয়ে খর খর পা চালিয়ে বললুম, তা হলে আর বলে কাজ নেই!

মনে হল সতীনাথের বাবা যেন স্বস্তি পেলেন। যা বলতে এসেছিলেন তা আপাততঃ বলতে না পেরে যেন বেঁচে গেলেন!

কিন্তু ভদ্রলোক আমার দুর্ভাবনার কারণ হয়ে রইলেন। অতঃপর বেশ বুঝতে পারছি, সতীনাথের বাবা আমার মাথার ওপর খাঁড়ার মত ঝুলে থাকলেন। আর যদি তিনি ছেলে বা মেয়ের চাকরির জন্যে এসে থাকেন তা হলে তো আর কথাই নেই। এখন থেকে কোথায় পালাব কি লুকোবো ভেবে অস্থির হয়ে উঠলুম। কি মুশকিলে যে পড়লুম বলবার নয়—সেই আবার দিনের পর দিন ভদ্রলোক আসবেন, সেই আবার দিনের পর দিন ভদ্রলোককে মিথ্যে স্তোক দিতে হবে! তারপর দৈবাৎ যদি ওঁর ছেলের চাকরি হয়ে যায় মুখ বুজে মিথ্যে প্রশংসা শুনতে হবে!

তার চেয়ে আগে থেকেই বলে দেওয়া ভাল, দেখুন, যদি ছেলেমেয়ের চাকরির জন্যে এসে থাকেন তা হলে ভুলে যান, আমাদের আপিসে কোন চাকরি খালি নেই। বৃথা চেষ্টা, মুখ নষ্ট!

কিন্তু আশ্চর্য, আমি মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই আমার মনের কথাটা যেন বুঝতে পেরেই সতীনাথের বাবা বললেন, চাকরির জন্যে আর আপনাকে জ্বালাতন করবো না! একদিন আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন—

তা না হয় হল, কিন্তু উপস্থিত সতীনাথের বাবার বক্তব্যটাই বা কী, কেনই বা তিনি এতদিন পরে আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে এমন দীন-হীনের মত অপেক্ষা করছেন? জানতে পারলে ভাল হয়।

কিন্তু সতীনাথের বাবা কিছু বললেন না, আমার পিছন পিছন ট্রাম লাইন পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন।..

সেদিন সতীনাথের বাবার পুনরাগমনে আমার ব্যস্ততা প্রকাশের যথেষ্ট কারণ থাকলেও তাতে ইচ্ছাকৃত রূঢ়তা প্রকাশ পেয়েছিল, তার জন্যে মনে মনে নিজেকে অপরাধী করেছি, ভেবেছি ভদ্রলোক যদি আবার আসেন সেই রূঢ়তার সাদর অভ্যর্থনার প্রলেপ দেব, তাঁর বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনবো, বুঝতেই দেব না, তাঁর আগমন আমার অভিপ্রেত নয়।

কিন্তু আমাকে সে-সব কিছুই করতে হল না। সতীনাথের বাবা আবার একদিন হঠাৎ এসে কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, আবার আপনাকে জ্বালাতন করতে এলুম!

বললুম, না না, আসুন আসুন—

আমি নিজে সহজ হতে যতই চেষ্টা করি না কেন, সতীনাথের বাবা কিছুতে সহজ হতে পারলেন না! আমার সামনে চেয়ারে বসবেন কি বসবেন না, ভাবতে যেন অনেকটা সময় নিলেন।

সাদরে বললুম, বসুন না! দাঁড়িয়ে আছেন কেন? সতীনাথের বাবা বসলেন না। চেয়ারের পিছনের কাঠটা ধরে দাঁড়িয়ে আমার বসবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, এতো আপনার নিজের বাড়ি!

এতদিন পরে এতবার আসা যাওয়া করার পর ভদ্রলোকের এ প্রশ্নের কি অর্থ বুঝলুম না। মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ! কেন?

সতীনাথের বাবা ঢোক গিলে বললেন, না, তাই বলছি!

উল্টে আমি প্রশ্ন করলুম, আপনার কি নিজের বাড়ি নয়?

ম্লান হেসে সতীনাথের বাবা বললেন, হুঁ, আমাদের আবার নিজের বাড়ি!

জানি না এতদিন পরে সতীনাথের বাবা আমাদের উভয়ের অবস্থার তারতম্য বিচার করছেন কি না। ছেলের চাকরি হয়ে অবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে জানাতে চান কি না, কে জানে।

বললুম, ভাড়া বাড়িই ভাল! নিজের বাড়ির আজকাল অনেক হাঙ্গামা!

সতীনাথের বাবা আর কোন কথা বললেন না, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

ইতিপূর্বে সতীনাথের বাবাকে কোনদিন ঘরের মধ্যে ডেকে এনে বসাইনি, উমেদারের মত বাইরে দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে কথা বলেছি। ভদ্রলোক কিছু মনে করেন নি, কেন না তখন ওঁর একমাত্র কামনা ছিল, আমার আপিসে ছেলের একটা চাকরি, তাতে যদি আপন ব্যক্তিত্ব, সম্মান খুইয়ে তৃণাদপি তৃণ হয়ে থাকতে হয়, তাতেও ভদ্রলোক স্বীকার ছিলেন। কিন্তু আজও ভদ্রলোক অমন হীনতা প্রকাশ করছেন কেন? কি বলতে চান যা এখনো উনি মুখ ফুটে বলতে পারছেন না?

নিজেকে আরো সহজ করে আপ্যায়িত সুরে বললুম, বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি?

নিজের কানে কথাটা কেমন কৃত্রিম, শঠতাপূর্ণ মনে হল। চেয়ারটাকে আলতো ভাবে ঠেলে, বোধ হয় বসবেন মনে হল, সতীনাথের বাবা বললেন, সতীনাথ আপিসে কেমন চাকরি করছে?

এক আপিস হলেও সতীনাথের আমি কোনই খবর রাখি না, তাছাড়া পদমর্যাদায় আমরা ভিন্ন। মুখে বললুম, কেন, ভালই তো!

উদ্গত নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে সতীনাথের বাবা বললেন, ভাল হলেই ভাল! জিজ্ঞেস করলুম, কেন আপনাকে কেউ কিছু বলেছে নাকি?

সতীনাথের বাবা মাথা নেড়ে আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙ্গানো অয়েল পেন্টিং একটা ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, কার ছবি?

সতীনাথের বাবা হঠাৎ এতটা অন্যরকম হয়ে উঠবেন আশা করিনি, শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলুম, আমার বাবার।

সতীনাথের বাবা যেন খুশী হয়ে বললেন, বাঃ বেশ সুন্দর ছবি! মনে হয় যেন সব দেখছেন!

বাবার মৃত্যুর পর ছবিটা অনেক পয়সা খরচ করে সাহেব বাড়ি থেকে করিয়েছিলুম, পিতৃভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের এ একটি নিদর্শন. আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই দেখে প্রশংসা করেছেন, জানি না জীবন্ত এই প্রতিকৃতি দর্শনে তাঁরা মনে মনে আমার পিতৃভক্তির পরিমাপ করেছেন কিনা। আমি কিন্তু তৃপ্ত যেন একটা যথার্থ কর্তব্য কর্ম করেছি!

উদাস কণ্ঠে বললুম, দেখলে তো বেঁচে যেতুম! সেই কবে বাবা মারা গেছেন—

সতীনাথের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, খুব ছোট বেলায় পিতাকে হারিয়েছেন বুঝি!

না, ছেলেবেলায় নয়। তবে কি জানেন, বাপ-মা যতদিন সংসারে বেঁচে থাকেন ততদিন ভাল, কথায় বলে না পাহাড়ের আড়াল!

সতীনাথের বাবা কোন উত্তর করলেন না।

হঠাৎ আমাকে পিতৃ-ভক্তিতে পেয়ে বসল, সংসারে পিতার মর্যাদা এবং তাঁর উচ্চাসন শাস্ত্রোক্ত বচন উদ্ধৃতি দিয়ে যেন কত অপরাধ করেছি, বললুম, কোন কর্তব্যই করা হয় নি।

ছবি থেকে চোখ নামিয়ে সতীনাথের বাবা বললেন, আপনারা অনেক করেছেন, আজকালকার ছেলেরা যদি তার সিকিও করতো!

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর সহসা রুদ্ধ হয়ে এল, বুঝলুম, ক্ষোভের বা অভিমানের কারণ কিছু এদিক থেকে ঘটেছে।

জিজ্ঞেস করলুম, সতীনাথ কি আপনাকে মান্য করে না?

প্রশ্ন শুনে সতীনাথের বাবা যেন থতমত খেয়ে গেলেন, আমতা আমতা করে বললেন, না না, তা নয়—

তা হলে এতদিন পরে উনি আমার কাছে ছেলের চাকরির বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে এসেছেন কেন?

আমার আপিসের সতীনাথের প্রশংসা করে বললুম, সতীনাথ আজকালকার ছেলেদের মত নয়!

সতীনাথের বাবা কোন উত্তর করলেন না।

পিতার সামনে পুত্রের সুখ্যাতি করে বললুম, সতীনাথ খুব ভাল ছেলে!

লক্ষ্য করলুম এতেও সতীনাথের বাবার মুখাবয়বের কোন পরিবর্তন হল না কেমন যেন নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ হয়ে বসে রইলেন।

কিন্তু কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়। মনে হল সতীনাথের বাবা আপন বক্তব্য

বিষয়ের খেই হারিয়ে মনের মধ্যে হারাণ সূত্রটা ধরবার চেষ্টা করছেন।

তারপর বোধ হয় ওঁর খেয়াল হল, আমার সময় নষ্ট করছেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আপনাকে মিছিমিছি ব্যস্ত করলুম !

মনে মনে স্বস্তি পেলেও মুখে বললুম, না, ব্যস্ত আর কি!

অতঃপর ওঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, সতীনাথকে আপিসে বলব'খন।

সতীনাথের বাবা যেন ভয় পেয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি বললেন, না না, তাকে কিছু বলবেন না ! সে যেমন আছে তেমনি থাক!

স্পষ্টই কথার সুরে ছেলের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ পেল, কিন্তু তা কি এবং কেন জিজ্ঞেস করে ভদ্রলোককে বিব্রত করতে ইচ্ছা হল না।...

কিন্তু আমি না চাইলেও সতীনাথের বাবা কয়েকদিন পরে আবার একদিন বাড়ির গলির মুখে ল্যাম্পপোস্টের ছায়ায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কি ব্যাপার এত রাত্রে উনি কি করতে এসেছেন ? এখন দেখছি ছেলের চাকরি হয়েও ভদ্রলোকের নিস্তার নেই। ভদ্রলোককে দেখে কষ্ট হয় !

সামনে এসে জিজ্ঞেস করলুম, কতক্ষণ এসেছেন ?

অপ্রস্তুত হয়ে সতীনাথের বাবা বললেন, এই মাত্তর!

কিছু বলবেন ?

যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, ভূমিকা মাত্র না করে সতীনাথের বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আপিসে সতীনাথ কত মাইনে পায় ?

কেন আপনি জানেন না !

না, আমাকে সে সত্যি কথা বলে না!

অনুপস্থিত সতীনাথকে দোষারোপ করে বললুম, ভারি অন্যায় ! বাপ-মা কি তোর মাইনের টাকা কেড়ে নেবে ?

সায় দিয়ে সতীনাথের বাবা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, এতদিন চাকরি করছে—বলে শুনি মাত্র দেড় শ' টাকা পায় ! বলুন বিশ্বাস হয় ?

বিশ্বাস না হবারই কথা। কিন্তু সতীনাথের বাবার হঠাৎ এ সন্দেহ কেন? ভদ্রলোককে আশ্বস্ত করতে বললুম, আজকালকার ছেলেরাই অমনি, বাপ-মাকে লুকিয়ে ভাবে বাহাদুরী হচ্ছে ! এই আমার ছেলে দেখুন না, কোনদিন বলে কি কত মাইনে পায়, কি করে, কোথায় যায় ? আমিও কিছু জিজ্ঞেস করি না, কে তোর টাকার প্রত্যাশা করে ! মানুষ করবার দায়, মানুষ করে ছেড়ে দিয়েছি—

এবার সতীনাথের বাবা প্রায় কেঁদে ফেললেন, বাড়িতে বলে দেড় শ' টাকা মাইনে পাই, তার থেকে না কি প্রভিডেন্ট ফন্ড, কোয়াপারেটিভ আর সব কি যেন কেটে নেয় ! —ক'মাস ধরে বাড়িতে একটি পয়সা দিচ্ছে না। যদি বলি টাকা দেবে না, নিজের ব্যবস্থা করে নাও, ওর গর্ভ-ধারিনী কান্নাকাটি জুড়ে দেন, ইচ্ছে করে—

ভদ্রলোক একেবারে ভেঙে পড়লেন, কথাটা শেষ করতে পারলেন না, চুপ করে দুঃখের কথা শোনা ছাড়া আর কি বলবো ভেবে পেলুম না।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে সতীনাথের বাবা বললেন, আপনি ওকে চাকরি দিয়েছেন, আপনি বললে হয়তো শুনবে, আপনি যদি সতীনাথকে বলে দেন—

আচ্ছা মুশকিলে পড়েছি ! সতীনাথ আমার কথা শুনবে কেন, চাকরিটা কি আমার জমিদারী !

তবু নিজের মান রাখতে বললুম, আপনি যান, সতীনাথকে আমি বলে দেব! ...

সপ্তাখানেক পরে সতীনাথের বাবা আবার একদিন এলেন। আমি লক্ষ্য করি নি, আমার ছোট মেয়ে লক্ষ্য করে আমাকে দেখাল। দেখি সতীনাথের বাবা চুপ করে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন, সাড়াশব্দ করছেন না, কত যেন সংকোচ !

অভ্যর্থনা করে বললুম, আসুন, আসুন !

সতীনাথের বাবা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে চেয়ারে এসে বসলেন। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনটা কেমন করে উঠলো, মনে হল এই মাত্র যেন শ্মশান থেকে উঠে আসছেন।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার কি হয়েছে ?

সতীনাথের বাবা হাউ-মাউ করে বলে উঠলেন, আমার সর্বনাশ হয়েছে!

চমকে উঠলুম, হঠাৎ ! শুনেছিলুম সতীনাথের মা অনেক দিন ভুগছেন !

আর কিছু বলার আগেই সতীনাথের বাবা বললেন, সতীনাথ লাভ ম্যারেজ করেছে !

এ আর নতুন কথা কি, যেদিন থেকে উনি আমার কাছে আসছেন সেদিন থেকে ঐরকম একটা কিছু যে হবে আন্দাজ করে-ছিলুম। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ছেলে-মানুষ করে ফেলেছে—

ভদ্রলোক সজল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, বাড়িও আর আসছে না, তার মাকে বলেছে—

শেষ করতে না দিয়ে বললুম, লজ্জা হচ্ছে তাই, ওকিছু না— দুদিনে ঠিক হয়ে যাবে। আমি ডেকে বলে দেব'খন।

সতীনাথের বাবা যেন ফেটে পড়লেন, বললেন, না না, ও হাবামজাদাকে আপনি আর কিছু বলবেন না, আমি ওর মুখদর্শন করতে চাই না !

তারপর একটু থেমে গলা নিচু করে সকাতরে বললেন, আপনি দয়া করে আমার ছোট ছেলে উমানাথের একটা চাকরি করে দিন, সে অনেক ভাল, বাপমার দুঃখু দেখে !

বলেই সতীনাথের বাবা চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। পা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গিয়ে বললুম, ছি ছি একি করছেন ?

সতীনাথের বাবার সেই এক আর্জি (যেমন উনি একদিন বড় ছেলে সতী-নাথের চাকরির জন্যে করেছিলেন) উমা-নাথ খুব ভাল ছেলে, বাপমার দুঃখু দেখে, দয়া করে তার একটা যা হোক চাকরি করে দিন ! ভদ্রলোককে শান্ত করতে বললুম, আচ্ছা, দেখবে।

সতীনাথের বাবা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই লোকটি

তার নাম কি আদতে জানি না। তবে, পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে ডাকত 'সাহেব' বলে। না, সাহেবের মত ফুটফুটে রঙ নয় তার। ঘোর তামাটে চেহারা, অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা। এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে মনে হয়, ডান পায়ের হাঁটুতে চোট আছে। শরীরের ফ্রেম খুব চওড়া, মাংস শুকিয়ে হাড়-পাঁজর কামড়ে ধরেছে। খুব ছোট্ট একখানা মুখ, একদম গোল মাথা—ফলে বেশ একটু বোকা বোকা লাগে সাহেবকে। বোকা তো বটেই, সাত চড়ে বা কাড়ে না, ঝগড়া-তর্ক করে না, দশ-বিশ পয়সা দিলেই যার যেমন কাজ করে দেয়। কারও জল তুলে দিচ্ছে রাস্তার কল থেকে, কারও রেশন টানছে, বিয়ে-বাড়ির এঁটো জঞ্জাল সাফ করছে, শ্রাদ্ধ-বাসরের খুঁটি পুঁতছে, বাসা-বদলের চেয়ার-বাকস-তক্তপোষ চালাচালি করছে—এভাবেই ওকে দেখে আসছি ছোটবেলা থেকে। পাখা ছাড়া পাখি, জল ছাড়া মাছ বাঁচতে পারে হয়তো, কিন্তু এ পাড়ার লোকজন সাহেব ছাড়া একেবারেই বিশ-বাঁও জলে। মানে, সাহেবকে বাদ দিলে সিঁথির বেণী কলোনী, গোপাল বসু লেন—ভাবা যায় না।

সাহেবের দেশ কোথায়, কোথায়ই বা আদি নিবাস কেউ বলতে পারে না। ওর কথাবার্তা হরেকরম্বা ভাষায় মেশানো, খানিকটা তেলেগু টান আছে বলে মনে হয়, তবে সাহেব কথা বলে যতটুকু, তার চেয়ে শব্দ করে অনেক বেশি। তাছাড়া প্রায় সব কথাতেই মাথা নাড়ে ও, না করার ব্যাপারটা বোধহয় ওর স্বল্পবুদ্ধি-শরীরের চৌহদ্দির মধ্যে নেই।

মা ওকে খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে এটা-ওটা খেতে দেন। ফলে সাহেব সাত হাটের হাটুরেপনা শেষ করে আমাদের বাইরের বারান্দায় বসে বসে ঝিমোয়, কখনো বা দিব্যি হয়ে শুয়ে থাকে। একটা ছেঁড়া হাফশার্ট, হাফপ্যান্ট পরনে — এর বেশী [illegible] দেখি নি সাহেবকে। এখন নিদেনপক্ষে ওর বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হল, অথচ সাবেককাল থেকে দেখে আসছি একই হাল, ওঠা-বসায় একই শালগ্রাম শিলা—আমাদের সাহেবকে।

শোনা কথা যে, যৌবনে যুদ্ধে গিয়েছিল সাহেব। ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে পেনাঙে না কোথায়। দেশে ওর বউ ছিল, মা-বাপ ছিল, বাল-বাচ্চাও ছিল দু-তিনটে। যুদ্ধ-বিগ্রহের এলাহি ব্যাপারস্যাপার নাকি শান্তিপ্রিয় সাহেবের সয় নি। বেপ্পুনে জাপানীদের সঙ্গে আগুপিছু জবর লড়াই-এর কোন এক ফাঁকে টুক করে সাহেব নাকি বেমালুম নিপাত্তা হয়ে যায়। চারপাশে, খোঁজা-খুঁজির বহর লেগে যায়। কিন্তু সবাই যখন বিফল হল, তখন মিলিটারী দপ্তর থেকে তাকে 'যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত' বলে ঘোষণা করা হল। সেই ঘোষণার দৌলতে দক্ষিণ ভারতের কোন এক গাঁয়ে বসে গত ২৭।২৮ বছর ধরে সাহেবের বৌ নাকি এখনও নিয়মিত টিপছাপ দিয়ে মৃত সৈনিকের বিধবা হিসেবে পেন্সন গুনে নিচ্ছে।

সেই সাহেব কবে শশুকের মত ভু-উ-শ করে আমাদের বেণী কলোনী-গোপাল বসু লেনের ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ জীবনের পুকুরে ভেসে উঠল জানি না। পুরোনো দিনের কোন কথাবার্তা তার মুখ থেকে ভুলক্রমেও শোনা যাবে না—বড়জোর সে ফ্যালফ্যালিয়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখ খুলে চেয়ে থাকবে আপনার সপ্রশ্ন মুখের দিকে। কালো-কেলো-ফাঁদা নাকের রুপোর নথ জবরদস্ত চেহারার একটি জীবনসঙ্গিনী সংগ্রহ করে নিয়েছে তার এই ডিউপার্টের জীবনে, যথারীতি তিনটি সন্তান-ও সাহেবকে উপহার দিয়েছে এই বয়সটিতে। বড় দুটি মেয়ে, ছোটটি ছেলে।

মেয়ে দুটি আগে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো, ফাই-ফরমায়েশ খাটত লোকের বাসন-টাসনও মাজত। এখন রীতিমত বড় হয়েছে, দু বোনের চেহারাতেই এক ধরনের ভিনদিশি বুনো লাবণ্য আছে। চোখে হাল্কা নীল ছায়া, তামাটে গায়ের রঙ, লালচে, বেণীবাঁধা চুল, মুখের গড়ন খানিকটা চৌকো মতন, লম্বাটে ছিপছিপে শরীর, ঢালু কোমর, আধখোলা বুক—অভাবী মেয়ে দুটোর নষ্ট হয়ে যেতে খুব বেশী সময় লাগল না। এ নিয়ে সাহেব বা তার বউ—কারোরই কোনো তাপ-উত্তাপ ছিল না। মেয়ে দুটি মাঝে মাঝে পাড়ায় আসত আবার মিলিয়ে যেত। সাহেবের একমাত্র ছেলেটা হয়েছিল চোর। ওকে দেখলেই যে-যার সাবধান হয়ে যেত, কেননা বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোনো ছিল ওর বারণ। সাহেব ঘুমুতে থাকলে ওর জামা কি প্যান্টের এধার-ওধার হাতড়ে যা দু-চার পয়সা পাওয়া যায়, নির্ঘাৎ মেরে নিয়ে কেটে পড়ত ছেলেটি। ঘুম ভেঙে পয়সা খুঁজে না পেয়ে অনেক দিন নীরবে হাঁটুতে মাথা দিয়ে অশ্রুপাত করতে দেখেছি সাহেবকে।

কলকাতার সেই ভয়ঙ্কর সত্তর-একাত্তরের অবিরাম রক্তক্ষয়ী দিন-রাত-গুলোতে যখন উত্তর শহরতলীর এই বিপজ্জনক এলাকাটিতে বিনা নোটিশে কুলুপ পড়ে যেত, পাড়া-কে-পাড়া রাস্তার লাশের চেয়েও ঠাণ্ডা, চুপচাপ হয়ে থাকত, তখনও সাহেব নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াত এ গলি থেকে ও গলি। এ তল্লাট থেকে ও তল্লাট। ছেলে তার অচিরাৎ ছুরি, পাইপগানের মস্তাদ হয়ে গেল এবং একদিন তার তাজা নিহত শরীর বুকে চেপে বতনবাবুর ঘাটের দিকে ভরদুপুরে একা একা হাঁটতেও দেখা গেল তার সর্বংসহ বাপকে। কিছু দিন অতিবাহিত হলে এবং পাড়া কিছুটা জুড়িয়ে এলে হঠাৎ সবাই আবিষ্কার করল, সাহেব আর সে সাহেব নেই। রাস্তার মোড়ের বড় বাড়ীটার রোয়াকে বসে থাকে। সারা দিন নিজের মনে বিড় বিড় করে। বিকেল হলে একটা পুরোনো বুরুশ ও জলে ভর্তি টিন নিয়ে দেয়ালে যেখানে যা কিছু লেখা দ্যাখে, অশেষ যত্নে ঘষে ঘষে ধুতে থাকে, ক্লান্তিবিহীন ধুতেই থাকে। শিকড়ে শিরাবহুল ঠ্যাং তুলে বাজারের মোড়ে চিৎ হয়ে মরে পড়ে থাকার আগে পর্যন্ত এভাবেই বেণী কলোনী-গোপাল বসু লেনের চোখের ওপর জীবনের থার্ড বা ফাইনাল পার্টটা কাটিয়ে দিয়েছিল আমাদের সাহেব।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

সাগরের জল নীল, সব সাগরের জল নীল। যেখানে যখন সমুদ্র আলাদা নামে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক সেখানে তারা এমন কিছু দেখতে পায় না, যা দেখে সমুদ্রকে আলাদা নামে চেনা যায়। সেই নীল রঙ, সেই শান্ত নিবিবিলি আকাশ, সেই উড়ুক্কু মাছেদের উড়ে উড়ে জলের ওপর খেলা। তীরের মতো ওরা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আবার জলে ডুবে যায়। এবং সমুদ্র-পাখিরা কখনও কখনও দেখা যায় পেছনে উড়ে আসছে। ঝড়ের সময়ও ঠিক তেমনি। যেন এক ভয়ংকর তোলপাড় সমুদ্রের ভেতরে। ভয়ংকর সব ঢেউ আর মেঘলা আকাশের নিচে জাহাজ ছোট কাগজের নৌকার মতো। জাহাজের ওপর দিয়ে ঝড়ের দাপট, অথবা ঢেউগুলো কি আশ্চর্য ভাবে যে ডেকের ওপর দিয়ে কখনও বোট-ডেকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। যেন সমুদ্র আর জাহাজের এক খেলা, মায়ার খেলা, অথবা লুকোচুরি খেলা। জাহাজ কখনও কখনও ঢেউয়ের ভেতর হারিয়ে গিয়ে বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে তামাসা করে। আবার ভেসে উঠলে, প্রচণ্ড রোষ সমুদ্রের, সে প্রবল বেগে আছড়ে পড়তে চায়। আর সামান্য মানুষেরা তখন স্টোক-হোলডে বয়লারের সঙ্গে, আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কত সহজে এইসব রোষ থেকে জাহাজকে যে রক্ষা করে থাকে। মানুষ এ-ভাবে সমুদ্রের সমস্ত অহংকার ভেঙে দেয়। সে তার ঢেউ ফালা ফালা করে একদিন ঠিক শান্ত আকাশের নিচে চলে যায়। মনেই হয় না সমুদ্র সেদিনও জাহাজটাকে কি যে দুর্গতির ভিতর ফেলে দিয়েছিল। সমুদ্র ভালমানুষের মতো একবারে সরল সহজ হয়ে গেলে, জাহাজিরা কাজের শেষে বেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। অবসর সময়ে ছোটবাবুর সমুদ্র দেখা বাদে যেন আর কাজ থাকে না তখন। অথবা বনময় দ্বীপের অসংখ্য গাছপালা।

এবং এভাবে ছোটবাবু কখনও ডেকে কখনও ফক্কায় অথবা মধ্যরাতে ঘুম না এলে সে একাকী উঠে আসে। সবাই ঘুমোচ্ছে। কেবল ডগ-ওয়াচে ওয়াসিন কিংবা অন্য কোন ডেক-জাহাজী পাহারায় আছে। আর ব্রীজে ছোট-মালোম। স্টোক-হোলডে ফায়ার-ম্যান, টিণ্ডাল। ফানেলের গুঁড়িতে উঠে গেলেই দেখা যাবে, যেন পাতালে কজন ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ, ফানেসের দরজা ঠেলে ব্যাগ মেরে ওল্টেপাল্টে দিচ্ছে আগুন। ওদের মুখগুলো আগুনে ঝলসে উঠলে বোঝা যায় মধ্যরাত্রিতে কেউ জেগে থাকে না, শুধু ওরা জেগে আছে। এনজিনে জেগে আছেন তিন নম্বর মিস্ত্রি। সে চুরুট খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে স্টিম ঠিক আছে কিনা দেখছে। জেনারেটর ঠিকমতো কাজ করছে কিনা লক্ষ্য রাখছে। ব্রিজ পাম্প চালিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। চারপাশটায় লক্ষ্য রেখে, যেমন সে মাঝে মাঝে সার্কুলেটিভ পাম্পে হাত দিয়ে দেখছে খুব বেশি গরম হয়ে গেল কিনা জলটা—এ-ভাবে শুধু জেগে থাকা। অনেক উপরে ঠিক স্কাই-লাইটের ফাঁকে দেখা যায় আকাশটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। কখনও মনে হয় আকাশটা ভীষণ দুলছে। এ-ভাবে জাহাজ ক্রমাগত চলছে।

ক্রমাগত দিনের পর দিন এ-ভাবে শুধু চলা। জাহাজের চেহারা ওয়াচে ওয়াচে পাল্টে যায়। ডগ-ওয়াচের চেহারা যেন সবচেয়ে নিঝুম। এবং এ-সময় কাপ্তানের ঘরে কোন আলো জ্বালা থাকে না। পোর্ট-হোল দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় বড়মিস্ত্রি একজন অসহায় বালকের মতো কম্বলের নিচে পা মুড়ে শুয়ে আছে। এনজিনের শব্দ কেবল উঠে আসে ভিতর থেকে, আর সব আলো জ্বালা ডেকে, উইংসের আলো-গুলো মায়াবী এক জগত তৈরি করে দেয়, গভীর নীল সমুদ্রে সাদা জ্যোৎস্নায়, একটি সাদা জাহাজ গভীর রাতে যখন যায়, তখন এক ছোট্ট সচল নগরী, অথবা যেন এক ঈশ্বর আপন মহিমায় ঘুমোচ্ছেন, জাহাজের সুন্দর সুচারু গতি দেখলে ঈশ্বরের পৃথিবীকে ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছা করে।

ছোটবাবুর এই ডগ-ওয়াচে কখনও কখনও ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগে। সহসা কেউ দেখলে ভূত টুত বলে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারে। কারণ কোয়ার্টার মাস্টার মহসীনের বিশ্বাস জাহাজে যেমন সবাই আছে, তেমনি ভূতও আছে। জাহাজে মানুষ থাকবে, ভূত থাকবে না, সে বিশ্বাস করতে পারে না। সে তার সফরের কত এমন সব ভূতের যে গল্প করেছে। এবং এ-সব গল্প শুনলে, ডেকে একা ঘুরে বেড়াতে সত্যি ভয় লাগে। যেমন একটা ভূত ছিল, সিটি অফ পানামাতে। সে ডেকে একা রাতে কোন জাহাজি পেলেই একেবারে ঠেলে সমুদ্রে হারিয়ে করে দিত। যেমন একবার একটা ভূত একজন জাহাজির গলায় দড়ি লাগিয়ে একেবারে মাস্তুলের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কাপ্তান নানা-ভাবে ভূতটাকে খুঁজে বেড়ালেন। তারপর দেখা গেল, কাপ্তান নিজেই একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন এনজিন ঘরে এনজিনের সিলেণ্ডারে। জ্ঞান ফিরে এলে সে বলেছিল, কেউ তাকে যেন, একটা বাতাস টাতাস হবে, ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছে।

এবং ছোটবাবু ঠিক ডগ-ওয়াচে একা একা ঘুরে বেড়ালে—সেই সব ভূতের নানা-রকম কীর্তি-কাহিনীর কথা মনে করতে পারে। এমন তা যে না হয়, তা নয়, তবু এই নিঃসঙ্গতায়, এবং সমুদ্রের গভীরে, অর্থাৎ হাজার হাজার মাইল এ-ভাবে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যাওয়া এবং মধ্যযামিনীতে কখনও কখনও একা দাঁড়িয়ে থাকা এক ভীষণ রোমাঞ্চ সে বুঝতে পারে। এইসব মধ্যযামিনীতে সে কি যে একটা লোভে পড়ে যায়! তার মনে হয় সে এ-ভাবে একদিন ঠিক এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ঘরে ফিরে যাবে। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় কি আছে। কারণ সে জানে ঘরে ফিরে গেলে, কত সব গল্প, মা চুপচাপ কুপি জেলে বলবে, তারপর! ভাইবোনগুলো বলবে, তারপর?

তারপর কি, সে নিজেও জানে না। কখন, কোন চিঠি কোথাও থেকে না এলে সে একাকী, মা বাবা সবাই নিরুদ্দেশে, দেশে ফিরে গেলে, সে বুঝতে পারবে ওরা কোথায় আছে। তখন ডেকে দাঁড়িয়ে তার কেমন গলা ধরে আসে। তার এত অহংকারের উপার্জন কোন কাজে এল না। মানি-অর্ডারের টাকা কোম্পানীর ঘরে ফিরে গেছে।

সকালে বেশ, কি যে বোদ, আর ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডায় জাহাজিরা কাঁপছে, সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। গ্যালি থেকে কেউ যেতে চাইছে না। বুড়ো মানুষ ভাণ্ডারী, সে, সবাই এসে গ্যালিতে ভিড় করলে ভীষণ বিরক্ত হয়। একে তো ছোট জায়গা, তার ওপর সবাই এসে আগুনে যদি হাত রাখে তবে সে দাঁড়ায় কোথায়। তবে যে কত কাজ! সে একটা উনুনে ডাল বড় তামার ডেকচিতে ডাল, বড় তামার ডেকচিতে গোস্ত সেদ্ধ করছে, আর ভাত। একটা বড় কড়াইয়ে সে চর্বি দিয়ে রুটি ভাজছে। যে যার মতো তুলে নিচ্ছে, এবং বোদে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে।

এবং চড়ুই পাখি দুটো বসে আছে, ওরাও শীতে কাঁপছে। এদের জন্য ছোটবাবু ভেবেছে একটা বাক্সো বানাবে। বাক্সোটাতে খড়কুটো দিয়ে এমন একটা গরম জায়গা করবে, যাতে ওদের থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। ছোটবাবু বুঝতে পারল না বোট-ডেকের রেলিঙে ওদের কি দরকার বসে থাকা। এখন এনজিন ঘরে বেশ গরম। কয়লারের ওপর কেন রেলিঙ টেলিঙে বসে থাকলেই হয়ে যায়। না তা না। সে ভেবেছিল, ওয়াচে নমাজ আগে সে তাদের তাড়িয়ে এনজিন ঘরে নিয়ে যাবে। অবসর সময়ে সে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে থাকে। ওর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয়, তখন জ্যাক আসে, মেজ-মালোমও আসে। কখনও কখনও জ্যাক পাখি দুটোকে, বিশেষ করে মেয়ে-পাখিটাকে জাহাজে তোলা করতে চায়। কি দরকার, এমন একটা পাখি থাকার। যেন ফেরে-মরতে জাহাজে তোলা করছে, জ্যাকের ভীষণ রাগ এই মেয়ে পাখিটাকে নিয়ে, আর মেজ-মালোম এক সে শুধু সে কেন, এখন তো জাহাজে এত একঘেয়েমী, যে এ-দুটো পাখি জাহাজে ভীষণ বৈচিত্র্য বয়ে এনেছে।

যারাই জাহাজে আছে, তাদের মতো এ কদিনে ভেবে ফেলেছে, পাখি দুটোও জাহাজের যাত্রি। এদের জন্য কখনও কখনও জাহাজিরা খাবার রেখে দিতে ভালবাসে। খেতে খেতে মনে পড়ে গেল, আরে মিঃ ফেরো মিসেস ফেরো কোন দানার কোন নেই। ওরা শুধু খুঁটে খুঁটে খায়, তাতেই চলে যায়। গ্যালিতে অসতে ভয় পায়, এত লোক দেখলে ভয় তার স্বাভাবিক। মানুষের মতো খাবারের ভাবনা ওদের নেই। তবু জাহাজে যে কি হয় খেতে কখনও মনে পড়ে গেলে, কখনও আপেল টুকরো কখনও কাঁচা মাংস, কখনও রুটির ভগ্নাংশ রেখে দিলে যেন মনে করে থাকে এটা ঠিক জাহাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো আর একটা কাজ। ওরা যেতে যেতে চারপাশে পাখি দুটোকে খুঁজে বেড়ায়। চারপাশ খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে না দেখতে পেলে, ভাবে, কি হল, কোথায় গেল। যেন তখন তোলপাড় পড়ে যায় কোথায় কোথায়! পাখি দুটোকে তো আর দেখা যাচ্ছে না।

তখন হয়তো কাপ্তানের ছেলে পাখি দুটোকে নিয়ে ঠিক ব্রীজের নীচে বসে আছে। সে বসে রয়েছে একটা টিনের চেয়ারে। সে পরে আছে লম্বা সাদা ট্রাউজার। সে পরে আছে লম্বা সার্টের ওপর ঢোলা পুলওভার, সে পরে আছে একটা হোয়াইট শর্টসের জলদস্যুদের টুপি, ওর পায়ে নীল রঙের জুতো, এবং বাদামী মোজা। ওর হাতে দস্তানা সাদা রঙের, চুল আবার বড় হয়ে গেছে। সে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার পায়ের চারপাশে পাখি দুটা উড়ে বেড়াচ্ছে। সে পাখি দুটোকে ওর আপেলের কিছু অংশ ছোট ছোট টুকরো করে, কখনও রুটির অংশ সে ছুড়ে দিচ্ছে। পাখিগুলো খেয়ে যাচ্ছে। এটা একটু এখন জ্যাকের খেলা হয়ে গেছে। সে যেন জাহাজে সময় কাটানোর পক্ষে বেশ একটা কাজ পেয়ে গেছে। পুরুষ পাখিটাকে সে বেশী খাওয়াতে ভালবাসে।

পাখিদের খাওয়ানোর সময় হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। দস্তানা সে কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখে। সে কেমন এক অতীব সুন্দর ছবি তৈরি করে ফেলে তোলে। জাহাজে থাকলে চুল চোখ কি মানুষের ক্রমে নীল হয়ে যায় বুঝতে পারে, পাখি দুটো কি রঙীন হয়ে যায় বুঝতে পারে না, তবে এমন সুন্দর গন্ধ কি করে হয়, সে তো কিছু মনে না। লোকের শরীরে এই যে ঘ্রাণ, যেন সব জাহাজিদের চেয়ে আলাদা। কাছে গেলে নড়তে ইচ্ছা হয় না। জ্যাকের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। পাখি দুটো চারপাশে তখন উড়ে বেড়ায়, আর কিচ কিচ করে ডাকে।

জ্যাক একদিন দেখেছিল, ছোটবাবু চুপচাপ বসে গ্যালির প্যাসে কি করছে। সে ছুটে গেলে দেখেছিল, ছোটবাবু ঠুক ঠুক করে কাঠে প্যাসেক মেরে যাচ্ছে। কি হবে, এই বাক্সো দিয়ে সে বুঝতে পারছে না। ছোটবাবুও কিছু বলছে না। তারপর জ্যাকের কেমন অভিমানে লাগলে, সে পা বাড়াল কেবিনের দিকে। তখন ছোটবাবু ডাকল, জ্যাক!

এ-ডাক জ্যাক কেন যে অবহেলায় মাড়িয়ে যেতে পারে না কেমন সরল অনাড়ম্বর ডাক সে ফিরে এলেই ছোটবাবু বলল, তুমি একটা কাজ করবে জ্যাক?

জ্যাক প্রথম বুঝতে পারে না।

সে বলল, হাতুড়িটা বড়। একটা ছোট হাতুড়ি থাকলে ভাল হত। আমি চাইলাম, দিল না। তুমি যাবে, আমাকে এনে দেবে।

জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন আবার ছোটবাবু ডাকল, আর শোন, তুমি কটা কাঠ, কিছু প্যাসেক আরও আনতে পারো কিনা দেখবে। আমাকে দিল না। বলল, মেজ-মিস্ত্রি বকবে। তুমি যদি পারো।

জ্যাক যখন ফিরে এল, ছোটবাবু [illegible] কাঠপকে চেনা যায় না, কাঠ বেঝাই হয়ে কাঠপ চলে এসেছে। এবং একটা হাতুড়ি জ্যাকের হাতে, এত দিয়ে কি হবে, সে বুঝতে পারছে না।

ছোটবাবু বলল, আর এটা করেছ কি! জ্যাক পাশে কাঠ রেখে বসল। বলল, বেশ বড় করে বানাব।

কাঠপ দাঁড়িয়ে আছে। সে জ্যাক না বললে নামতে পারছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

ছোটবাবু বলল, চলো গোলো নিয়ে যাও। লাগবে না। জ্যাক যা এনেছে ওতেই হয়ে যাবে।

—তোমার প্যাসেক লাগবে না।

—জ্যাক আনে নি।

—এনেছে। আমার কাছে ভাল প্যাসেক আছে। তিনটে হাতুড়ি এনেছি, কোনটা লাগবে বল।

—লাগবে না। জ্যাকের হাতুড়িটা হলেই হবে। তুমি বরং এটা নিয়ে যাও। বলে সে হাতের হাতুড়িটা দিতে গেলে দেখল, নেবার মতো ক্ষমতা ওর নেই। এই কাঠগুলো যেন বয়ে নিতেই কষ্ট হবে। সে উঠে দাঁড়াল। কাঠগুলো সব নমাল। বলল, তুমি হাতুড়িটা নিয়ে চলে যাও। কাঠগুলো যা লাগে নেব, বাকীটা আমি রেখে আসব।

এখনই কেন জানি ছোটবাবুর জন্য সবার মায়া। এটা সে জানে, মানুষের কোথায় সব নরম জায়গা থাকে সে নিজেও একটা দুঃখের ইতর পাড় গেছে সে-জন্য কারু সঙ্গে ছোটবাবু খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। শৈশব থেকেই সে এমন একটা স্বভাবের ভিতর মানুষ হয়েছে।

এবং এ-ভাবে ছোট এক জাহাজি, আর জ্যাক অথবা বনি, কেউ জানে না, একটা ঘরে ছোল সাজ করে, চলিয়ে যাচ্ছে কাপ্তান এরপর আবার জোর করে বনির চুল ছোঁট দেবে বলে বনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। চুল ছেঁটে দেবার সময় জাহাজে এক দৃশ্য তৈরী হয়। বনিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাপ্তান, সারেঙ, বড়-মালোম সবাই মিলে তখন কেবল খোঁজে। বনি কোথায় যে লুকিয়ে থাকে তখন!

ছোটবাবু তখন বাক্সের কাজ করছিল। এখন কেউ এখানে আসবে না। একটা লম্বা বাদের [illegible] ঢোলা কুলুপ কাপড়। [illegible] মুখেই ঢুকাই নিকে নেই হয়ে যায়। তখন থাকে একটা লম্বা সুরঙ্গ। সুরঙ্গের ভিতরে, বাংলাদেশকে কয়লার খনি বাদে আর কিছু ভাবা যায় না। সে অন্ধকারে একা গাড়িতে কয়লা ভরে যাচ্ছে। শীতকাল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও

সে ঘামছে। ওর মুখে কয়লার কালো হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে বেলচায় কয়লা ওপর থেকে টেনে নামাচ্ছে। বড় বড় পাথরের মতো কয়লার চাঙ এখন নেই। কয়লা কিছুটা ইংলিশ কোলের কাছাকাছি। খুব পরিশ্রম হবার কথা না। তবু সে তাড়াতাড়ি সুট ভরে ফেলতে পারলেই ছুটি পেয়ে যাবে। সে-জন্য সে এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে। আর তখনই ফিস ফিস গলায় কে ডাকলে, ছোটবাবু আমি।

মহসীন মিঞার ভূতের গল্প সারা জাহাজে একটা ভয় ছড়িয়ে রাখে। ছোট-বাবুও মাঝে মাঝে একা বাংকারে ঢুকতে ভয় পায়। জাহাজের ভিতর এটাই সবচেয়ে বোধ হয় অন্ধকার জায়গা। মাল গুদাম ছাড়া এত অন্ধকার আর কোথাও নেই। সে ভয়ে সহসা সোজা হয়ে গেলে দেখল, জ্যাক ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, শ্লিজ ছোট।

ছোটবাবু কিছুই বুঝতে পারে না। সে বলল, কি!

—আমি এখানে লুকিয়ে থাকব।

—কেন?

—বাবা চুল কেটে দেবার জন্য খুঁজছে।

—আমাকে তবে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে না!

—না। আমি বলছি তোমাকে কিছু বলবে না।

এ-ছাড়া সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে খনির মুখে ভীষণ কণ্ঠের ছাপ ছোটবাবুকে কেমন কাতর করে ফেলে। সে বলল, ঠিক

আছে। ওদিকে চল যাও। আমি এলে বলব, এখানে কেউ নেই।

—ওরা তবে খুঁজে বের করে ফেলবে!

—তবে কি করতে চাও?

—তুমি আমাকে বেলচেটা দাও। আমি কয়লা ফেলতে থাকি।

—আমি কি করব?

—তুমি স্টোক-হোলডে নেমে যাও।

—কিন্তু...।

—কিন্তু না। তুমি শোন, একটা কাজ করবে, এই মানে...। মনে হয় বনি কিছু বলতে লজ্জা পাচ্ছে। সে নিজের পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে। খুব সাদা পোশাক। এমন সুন্দর পোশাকে কেউ বাংকারে ঢোকে না। ওরা দরজায় উঁকি দিলেই, বুঝতে পারবে এমন সাদা ধবধবে পোশাকে কেউ বাংকারে কয়লা ফেলতে আসে না। সে নিক ধরা পড়ে যাবে। তবু কি যে সংকোচ, কি যে সে বলতে চায় ছোটবাবুকে ঠিক বুঝতে পারে না. সে বলল, ছোট, তোমার পোশাকটা দেবে। আমি পরে নেব।

—আমার...মানে আমার নোংরা পোশাক! তোমার ভীষণ ঢোলা হবে।

—তা হোক। তুমি দাও।

—আরে না না, সে কি করে হয়। ভীষণ নোংরা।

—কিছু হবে না। এখনেই বোঝা যায় জ্যাক জেদি। সে বলল, তুমি দাও। আমারটা তুমি পরে নাও।

—তুমি কি বলছ জ্যাক! তোমারটা আমার ভীষণ খাটো হবে।

—হোক খাটো। তুমি দাও। দেরী কর না। দেরী করলে ধরা পড়ে যাব।

ছোটবাবু কিছু ভাবতে পারে না। ঘামে গেঞ্জি ভিজে গেছে। প্যান্টালুন তেমন ভেজে নি। সে বনির সামনেই জামা খুলে ফেলল, প্যান্ট খুলে ফেলল। আর শীত, সে তো এখন কাজ করছে না, শীতটা আবার জাঁকিয়ে বসেছে। সে বলল, এই খুলে দাও। আমার ভীষণ শীত করছে জ্যাক। ও-তুমি আবার ওদিকে কোথায় চললে! জ্যাক!

—এদিকে এস না ছোট, প্লিজ।

—আরে তাড়াতাড়ি করে ফেল। আমার ভীষণ শীত করছে।

—প্লিজ, এদিকে এস না। আমার হয়ে গেছে। অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে জ্যাকের গলা পাওয়া গেল।

—জ্যাক তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। খালি গায়ে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। জ্যাক, আমি শীতে মরে যাব। জ্যাক, তোমরা এত লজ্জা কেন।

মনে হয় অন্ধকারে জ্যাকও শীতে ভীষণ কাঁপছে। সে ছোটর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। সে কেমন অধীর হয়ে পড়ছে। যেন সে ছোটর কাছে গেলেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। কি সুন্দর, পবিত্র যীশুর মতো। সে যে কি করে ফেলতে পারে তখন! আশ্চর্য সুন্দর শরীর ছোটবাবুর। বাহুল্য নেই। সোজা সবল বৃক্ষের মতো ছোট দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। বনি কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে।

ছোটবাবু চিৎকার করে বলছে, কি হচ্ছে জ্যাক? বলে সে লম্বা বাংকারের মাথায় ছুটে গেলে বনি বলল,—এই যে আসছি। আমার হয়ে গেছে ছোট।

গলা এত কাঁপছে কেন? ছোটবাবু বুঝতে পারছে না, জ্যাকের গলা কেমন ধরে আসছে।

—আমি শীতে মরে যাচ্ছি ছোট। বলে, মাথার টুপি টেনে এগিয়ে আসছে জ্যাক। তারপর জ্যাক কাছে এসে বলল,—আর দাঁড়াবে না। একেবারে নীচে নেমে যাও। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক।

ছোট বলল, জ্যাক, তুমি আশ্চর্যভাবে ছোটবাবু হয়ে গেলে। আর একটু লম্বা হলে কেউ এমনিতেও ধরতে পারত না।

বনি কোন কথা না বলে গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গেল। আসলে এখন বনি ছোটবাবু বাদে আর কিছু জানে না। সে যে কি সুন্দর হয়ে যেন জীবনের এক আশ্চর্য মোহ অথবা ঘ্রাণ বলা যেতে পারে, অথবা রাজার রাজা ছোটবাবু, এবং শরীরের সর্বত্র মহিমময় ঈশ্বর কোন কৃপণতা রাখেন নি। নাভির নীচে সে এক আশ্চর্য বনরাজীলীলা, এক আশ্চর্য মোমের শরীর, অথবা পাথরের মূর্তি, ছোটবাবুর হাতের পেশী, কোমরের ভাঁজ, উরুর দৃঢ়তা তাকে পাগল করে দিচ্ছে। সে যে কতক্ষণ এভাবে ছোটর সুন্দর শরীরের ভিতর ডুবে ছিল, জানে না। ঠিক বারোটা, বারোটা, কেন, ঠিক এগারোটা পার করে দিতে পারলেই বাবা আর তাকে চুল ফেলতে জোরজার করবে না। বারোটা ত্রিশে ডাইনিং হলে লাঞ্চ। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেলে বাবা অন্য সব রকমের কাজ বাদ দেন।

কাপ্তান-বয় সারা ডেক খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছোট সাবকে কেউ দেখেছে কিনা বলতে পারছে না। ক্যাপ্টেন ব্রীজে কাঁচি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। কাপ্তান-বয় একবার খবর দিয়ে গেছে, ডেকের ওপরে নেই ছোট সাব।

ফোকসালে খুঁজলে হয়! তখন কাপ্তান-বয় ছুটেছে, ফোকসালে। না, সেখানেও কেউ দেখে নি। এই মেয়েটা মাঝে মাঝে কি যে হয়ে যায়—কাপ্তান হিগিনস বুড়ো মানুষ। নীচে নামতে হবে, সে কাপ্তান-বয়কে এক কড়া ধমক লাগাল, কোথায় যাবে, ভাল করে খুঁজে দ্যাখো। এনজিন রুমে পালিয়ে থাকতে পারে। সে এবার থার্ডকে ডাকল। দ্যাখ তো জ্যাক কোথায় পালাল।

—আবার!

—চুল ফেলতে গেলেই পালিয়ে যায় কোথায়।

সুতরাং থার্ড অফিসার আর কাপ্তান-বয় তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। এসে বলল—না নেই।

কাপ্তানের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে বলল, ওর কেবিন দেখেছ? তার পরই মনে হল বনির কেবিনে ওদের ঢোকা ঠিক না। সে এবার বলল, দাঁড়াও দেখছি। কিন্তু আশ্চর্য, বনি কেবিনেও নেই। কেবিনে থাকার কথা না। বনি এ-সময় ডেকে পাখি দুটোকে খাওয়ায়। তবু যদি থেকে যায়। কাপ্তান এবার বললেন, এনজিন রুমে দ্যাখো।

—স্যার, সব জায়গা খুঁজেছি। কোথাও নেই।

—বয়লারের ওপরে, স্মোক-বকসের পাশে?

—সব দেখে এসেছি।

—স্টুয়ার্ডের ঘরে ওর বরফ-ঘরে?

—দেখে এসেছি, নেই।

সে এবার নিজেই নেমে ডাকতে থাকল, জ্যাক, ভালো হবে না। আমি তোমার চুল ফেলব না! কোথায় পালিয়ে আছ বল।

দলবল নিয়ে এবার নীচে নেমে গেল কাপ্তান। বাংকারে উঁকি দিলে দেখল, কোলঝয়েরা কয়লা ফেলে যাচ্ছে। কি যে হবে! কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এবং জাহাজে ভীষণ উত্তেজনা। খবর রটে যেতে থাকল, জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোটর বুক ভীষণ ঢিপ ঢিপ করছে। সে তার সাদা পোশাক পরে অমিয়র বাংকারে ঢুকে গল্প করছে। অমিয় এটা খেয়ালই করে নি, ছোটবাবু বেশ ছিমছাম পোশাকে আছে, মুখে কালি, এও হতে পারে, এ-ঘরে লম্ফ জ্বলছে, লম্ফের আলোতে সব স্পষ্ট নয় বলে, সে খেয়াল করে নি। অমিয় বলল, শুনেছিস?

—কি?

—জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যাপ্টেন, বড়-মালোম সবাই ওকে খুঁজছে।

—অঃ। এবং তারপর ছোটবাবু এক লাফে নিজের বাংকারে ঢুকে বলল, জ্যাক ভীষণ কান্ড। শিগগির উঠে যাও। ডেকের ওপর এবার কিন্তু কাপ্তান মাস্টার দিতে বলবে সবাইকে। সাইরেন বেজে উঠল বলে।

এবং সে দেখল ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে। সে আবার বলল, তাড়াতাড়ি প্যান্ট জামা খুলে দাও। তারপর কি ভেবে বলল, ঠিক আছে। সে তাড়াতাড়ি কি যে করতে যাচ্ছে। তোমার প্যান্ট জামা পাঠিয়ে দেব।

—আমার কি হবে?

—কেন তুমি পরে চলে যাবে!

—আরে বাংকারে অন্ধকারে কেউ টের না পেতে পারে। ওপরে উঠলে সবাই টের পাবে।

—অঃ।

আবার যে যার পোশাক পালটে নিল। আগের মতোই জ্যাক চলে গেল অন্ধকারে। ছোটবাবুর এ-ব্যাপারে কোন লজ্জা নেই। সে আর অমিয় একসঙ্গে বাথরুমে স্নান

করে থাকে। তাড়াতাড়ির সময় একটা বাথরুম বলে ওরা একই সঙ্গে স্নান করে নেয়। জাহাজে উঠে ছোটার লাজলজ্জা কিছুটা কমে গেছে। অথবা জাহাজে উঠলে বুঝি মানুষের ভিতর অনেক কৃত্রিমতা মুছে যায়। সব কেমন খোলামেলা। জামা পাল্টে প্যান্ট সে জ্যাককে দিয়ে দিল। যখন উঠে যাচ্ছে জ্যাক, তখন জ্যাক আবার যেন শীতে কাঁপছে! জ্যাকের মুখটা কেমন নীল হয়ে গেছে।

আর ঠিক তারপরই জাহাজে সেই ভয়ঙ্কর কঠিন শব্দ। দুবার লম্বা সাইরেনের মতো শব্দ।

এবং যখন জাহাজে সবাই মাস্তার দিচ্ছে, কাপ্তানের চোখ মুখ সেই দুটু মেয়েটির জন্য অধীর হয়ে আছে, কিছু বলতে পারছেন না, যেন তিনি ভিতরের সব দুঃখটা জোর করে চেপে রেখেছেন, এবং ছুটে যাচ্ছেন, বলতে সাহস পাচ্ছেন না, কোন রকমে যেন বড়-মালোম কাপ্তানের হয়ে বলছে, জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তোমরা দেখেছ?

ছোটবাবু মাস্তার থেকে বের হয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, এইতো দেখলাম। এনজিন রুম থেকে যখন উঠে আসছিলাম, দেখলাম।

—কোথায়? কাপ্তান ছুটে কাছে চলে গেলেন।

একোমডেসান ল্যাডারের নিচ দিয়ে চলে গেল।

—ঠিক তুমি দেখেছ? জ্যাককে!

—হ্যাঁ মাস্টার।

সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তান ছুটে গেলেন। একোমডেসান ল্যাডারের নিচেই বনির কেবিন। কাপ্তান হিগিনস ছুটে যেতে থাকলেন। তিনি নীল রঙের সুট পরেছেন। হাতে চাবটা সোনালি স্ট্রাইপ, কাঁধেও চারটা। স্ট্রাইপগুলো কি ভীষণ চকচক করছে। মাথায় এংকোরের ছবি আঁকা নীল জাহাজী টুপি। তিনি ভিতরে ঢুকেই অবাক। একটা সাদা কম্বলের ভিতর বনি শুয়ে আছে।

তিনি ধীরে ধীরে ডাকলেন, বনি!

—বাবা।

—তুমি কোথায় ছিলে!

—এখানে বাবা।

—আমি তোমাকে খুঁজে গেলাম না।

—আমি তখন বোধহয় চড়ুইদের বাসাটা তৈরি করছিলাম।

—শুয়ে আছ কেন?

তখন পেছন থেকে কে ডাকল, স্যার, পেলেন!

তিনি ভুলে গেছিলেন, খবর দেওয়ার দরকার। এতগুলো লোক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একবার দরজায় মুখ বার করে বললেন, যেতে বল। জ্যাককে পাওয়া গেছে।

ওরা আর কিছু জানতে পারে না। এর চেয়ে বেশি জানার অধিকার তাদের নেই। ওরা বোট-ডেক থেকে নেমে গেল। জাহাজের ভোঁ আবার বাজছে। এটা বোধহয় ক্লিয়ারিং সিগনাল। হিগিনস বনির কেবিনে বসেই শুনতে পেলেন সব। বড় উদ্বিগ্ন চোখে মুখে বললেন, বনি, তুমি অসময়ে শুয়ে আছ!

—আমার খুব শীত করছে বাবা।

—জ্বর আসবে মনে হয়? বলে তিনি বনির কপালে হাত রাখলেন।

—আমার ভীষণ শীত করছে।

—ডেবিডকে ডাকি। তোমাকে দেখুক। অষুধপত্র যদি দিতে হয়।

বনি বাবাকে কিছু বলল না। কেবল তাকিয়ে থাকল। হিগিনসের মনে হল, বনির বয়স বাড়ছে। বয়স বাড়লে কখনও কখনও ভীষণ শীত করতে থাকে। তিনি ডেবিডকে ডাকতে পাঠালেন না। শীতটা কিছুক্ষণ পর হয়তো কেটে যাবে। তবু মেয়েটার জন্য কি যে কষ্ট থাকে ভিতরে। তিনি পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন চুপচাপ। কেউ কোন কথা বললেন না। ডেবিডকে ডেকে পাঠালে হয়তো বনির বয়স ধরা পড়ে যাবে। ওর ভিতরের কষ্টটাও ধরা পড়বে। কার জন্য বনি ভিতরে এমন কষ্ট পায়! তিনি বুঝতে পারলেন না।

হিগিনস মেয়েটাকে কিছুতেই আর কিছু বলতে পারেন না। উঠে দাঁড়ান। ব্রীজে উঠে গেলে সমুদ্র চারপাশে। ব্রীজের উইংসে তিনি দাঁড়ান। অনবরত জাহাজটা জল কেটে যাচ্ছে। দু পাশে সাদা ফেনা, অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। নীল পোশাক পরে কোয়ার্টার মাস্টার হুইলের হাতল ধরে রেখেছে।

সন্ধ্যার সময় বনি ওপরে উঠে গেল। বনি বেশ কালো রঙের সুট পরেছে, নীল রঙের টাই, সে টুপি পরেনি। কাজের সময় সে কখনও কখনও সাদা দস্তানা হাতে পরে নেয়, এখন তার তাও নেই। শীতটা বেশ ক্রমে বাড়ছে। একটা ঠান্ডা বাতাস সকালের দিকে ছিল, এখন নেই। জাহাজ ক্রমে দুশো পঁচিশ ডিগ্রিতে নেমে যাচ্ছে। জাহাজ ক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা অতিকায় সাদা তিমি মাছের মতো জল কেটে ভেসে যাচ্ছে। এ-সময়ে তাকে বাবা ডাকেন না। সে এ-সময়ে আজকাল পাখি দুটোর পেছনে ঘুরে বেড়ায়। সে একা ঠিক না। মেজ-মালোম, ছোটবাবু আর সে। অন্যরা কেউ কেউ আসে। ওরা ঠিক এদের মতো পাখি দুটোকে নিয়ে মজা পায় না। যেন ওরা তিনজন এখন সমবয়সী বন্ধু। শীতের জন্য পাখি দুটিকে ওরা খড়কুটো বিছিয়ে দিয়েছে বাকসোটাতে। বাবা এ-সময়টাতে অনাদিন একা একা চুপচাপ বসে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখেন, তাকে ডাকেন না, আজ কেন যে ডেকেছেন!

সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হিগিনস বললেন, বোস।

বাবার গলা খুব নরম। বাবার এমন গলা শুনলে ওর ভিতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। কেমন বাবা ক্রমে ভীতু স্বভাবের হয়ে যাচ্ছেন। সে প্রথম ভেবেছিল, বাবা তাকে আজ ভীষণ বকবে। বাবা ওকে একা পেতে চান। কিন্তু ব্রীজে বাবা একা থাকতে পারেন না, সেখানে এখন কোয়ার্টার মাস্টার এবং থার্ড অফিসার আছে। ওদের ওয়াচ। বাবা সেখানে তাকে কোন মন্দ কথা বলতে ডাকতে পারেন না। সে বসে পড়ল। চুলগুলো সে হাত দিয়ে দেখল, বেশ বড়, চুল বড় না থাকলে সে একেবারে ষোলআনা পুরুষের মতো হয়ে যায়। ছোটবাবু তখন ওর পাশে একেবারে ঘেঁষতে চায় না।

বসার পরও বাবা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। এনজিনের শব্দটা এখানে তেমন প্রবল নয়। ধীরে ধীরে কথাবার্তা বললেও স্পষ্ট শোনা যায়। ওর ভাল লাগছে না। কেমন সে বসে উসখুস করছে। বাবা হয়তো টের পেয়েছেন। তিনি বললেন, বনি শান্ত হয়ে বোস।

বনি একেবারে স্থিরভাবে বসে থাকল।

হিগিনস বললেন, তুমি নোয়ার নাম নিশ্চয়ই জানো।

—হ্যাঁ বাবা।

—নোয়ার আর্কই হচ্ছে পৃথিবীতে প্রথম জাহাজ। এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে জাহাজ টাহাজের খবর আর পাওয়া যায় না। তখন পৃথিবীর বয়স পনেরশো বছরের মতো। এ-সব খবরও হয়তো রাখো।

—হ্যাঁ বাবা।

—কিন্তু তুমি কি জানো তোমার পূর্ব-পুরুষরা কি-ভাবে আগে সব সমুদ্র সফরে বের হত!

—কারা বাবা।

—এই আমাদের আগে যারা সমুদ্রে এসেছিলেন।

—তোমাদের আগে, মানে ডারউইন ফোর্ডের কথা বলছ?

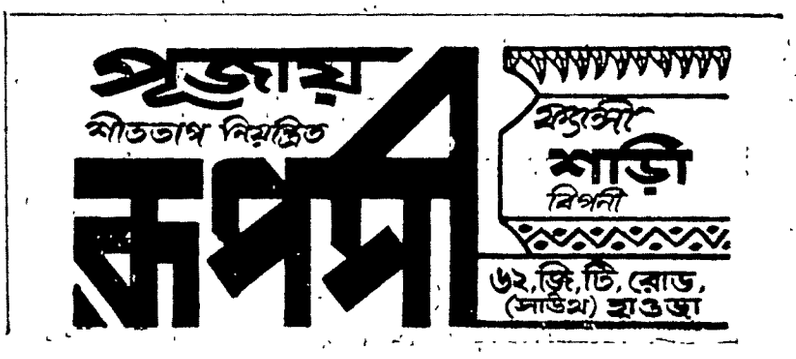

—আরে না। না। এই যেমন হোমারের বীর নায়কেরা সমুদ্রে ঘুরে এসে কি সব বলত!

—না বাবা।

—তারা সব নানারকমের গল্প বলত। অথবা তখন যাবাই সমুদ্রে গেছে, কিছু দূরে গিয়ে ফিরে এসে নানারকম গল্প বলতো। সে-সব গল্প বলে ঠাকুমারা পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে আমাদের ঘুম পাড়াতো। তখন সমুদ্র ছিল আমাদের কাছে একেবারে অজানা। আমাদের কথাই ধর না, যারা ভূমধ্যসাগর এবং বে অফ বিসকের কাছাকাছি ছিল, অর্থাৎ যারা এ-সব অঞ্চলে বসবাস করত—ওরা আটলান্টিক বলে যে একটা সাগর আছে জানত না। ওদের কতরকমের বিশ্বাস ছিল। যেমন হোমারের বীর নায়কেরা ইথাকাতে ফিরে কত বিচিত্র গল্প যে বলেছিল! ওরা নাকি সমুদ্রে এক আশ্চর্য ধ্বনি শুনতে পেত—প্রায় সেটা অবিকল সাইরেন বাজানোর মতো। শুনতে পেতো সমুদ্র কানা ক্রমান্বয়ে সুন্দর মিউজিক বাজিয়ে যাচ্ছে। আবার তারা নানা-রকম দৈত্য দানবের গল্প বলত, মায়া-বিনীদের গল্প বলত। কুহকিনীরা, সমুদ্রের ওপর নজর করে বেড়াচ্ছে। বড় বড় পাথর সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে, কুহকিনীরা তার ওপর নিচে বেড়াচ্ছে। নাবিকেরা জাহাজ নিয়ে কিছুতেই আর তখন এগুতে পারত না।

—অথবা কিংবদন্তি ছিল, দক্ষিণ অঞ্চলে, অর্থাৎ সূর্যের দেশে, বিষুবরেখার দক্ষিণে জাহাজ যাবার নিয়ম নেই। সেখানে সমুদ্র বলে কিছু নেই। একধরনের মানুষ সেখানে বাস করে—যারা কেবল পাকা ফসলের মতো সাফায। ওদের আহার নিদ্রা বলে কিছু নেই। অথবা কেউ কেউ বলত, সেখানে বড় বড় ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়। ওদের নিঃশ্বাসে আগুন লক লক করত।

বনি বুঝতে পারছে না, বাবা হঠাৎ এমন সব প্রাচীনকালের গল্প বলে যাচ্ছে কেন। বাবা অবশ্য সফর শেষে ফিরে গেলেই, যখন যেখানে গেছে বনিকে নিয়ে, সব সময় সমুদ্রের নানারকম অভিজ্ঞতার কথা, দ্বীপের কথা বলতেন। কখনও সমুদ্রের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বাবার মাথাব্যথা ছিল না।

তখনও হিগিনস বলে যাচ্ছে, সমুদ্রে কিছুদূর গেলেই এক শয়তানের কালো হাত দেখা যেত। সে হাত ওপরে ভেসে সাপের মতো দুলত। বলত, আর না। ফিরে যাও। অথবা একাকমের শামুকের খোল ভেসে বেড়াতো হাওয়ায়, তাদের ভিতরে সব বিষদন্ত ধোঁয়া। জাহাজ আর এগুতে পারত না। ভিতরে ঢুকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত জাহাজীদের। অবশ্য আমাদের প্রাচীন অভিজ্ঞতা সমুদ্র সম্পর্কে ক্রমে ভেঙে যায়। আমরা জানতে পারি সমুদ্র বিশাল, জানতে পারি, আটলান্টিক বলে এক মহাসাগর আছে, আমেরিকা সব নাবিকেরা ক্রমে বের হয়ে যায়, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় সমুদ্র কি-ভাবে আত্মগোপন করে আছে দেখতে।

কাপ্তান-বয় কফি খেয়ে গেল। দু কাপ। সামান্য ফল। কাপ্তান সামনের সমুদ্র দেখছেন। মাস্তুল পর হয়ে জাহাজের মাথা কেমন সোজা একটা টেপোডো ঘোড়ের মতো, আর পেছনে আফটার-পিক পর হয়ে প্রপেলার জল ভেঙে ক্রমাগত সাদা ফেনা এ জেণ্ডেলরও দেখা যায়। তখনই মনে হয়, সমুদ্র মনোহারিণী। তিনি বোধ হয় সমুদ্র মনোহারিণী বলার জন্য, এতসব পুরানো কথা বনিকে বলে যাচ্ছেন। অথবা তিনি কি বলতে চান, বনি, জীবন হচ্ছে মনোহারিণী। তাকে অবহেলায় নষ্ট করে দিও না। তোমার ইচ্ছা যখন ভিতরে পাগল ঘোড়ার মতো দামাল হয়ে যায়, তখন সমুদ্র দ্যাখো। সমুদ্র দেখলে ভিতরের কষ্ট একেবারে মুছে যাবে। বেননা, সমুদ্র সেই করে থেকে, কেউ বলতে পারে না, পৃথিবীতে অথবা সৌরজগতে বড় সে একা! একা সে আছে তার মতো, সে কখনও উঠল তরঙ্গমালার ভিতর আকাশের নক্ষত্র-দের ছুঁয়ে দিতে চায়, তার কি যে প্রলোভন তখন সে কখনও চুপচাপ। নীরিহ শান্ত। আকাশের নক্ষত্ররা তার বুকে প্রতিবিম্ব হেনে সারারাত জেগে থাকে। অথবা দর্পণে নিজের মুখ দেখতে পায় বেধহয়। অথবা ভেবে দ্যাখো, কত গ্রহপালী পৃথি, সমুদ্রের উপকূলে, কত দীর্ঘকাল ধরে নির্জনে তাদের ছায়া ফেলে যাচ্ছে। একটা ফড়িঙ অথবা প্রজাপতির ছায়া পর্যন্ত বাদ পড়ে না। কত রঙিন দ্বীপমালা নীশিথে উত্তাল তরঙ্গমালার ভিতর ডুবে থাকে। পৃথিবীর সব সুন্দরীদের গলায় যে মুক্তামালা মণিমাণিক্য ঝলমল করছে, সমুদ্রের কোন গহন অন্ধকারে তাদের জন্ম হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এরা জন্মাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের কিছু আসে যায় না। অথচ সেইসব মনোহারিণী যারা এখনও সমুদ্রের ওপরে ভেসে ওঠেনি বাবা সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না—কে জানে, কত অতিকায় তারা। সীমিত অভিজ্ঞতায় তার কতটুকু খবর আমরা রাখি। সমুদ্রের শান্ত গভীর অন্ধকারে কি মহিমায় যে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। অথবা বনি, চারপাশে দ্যাখো, সমুদ্র তার বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে জেগে আছে। সে পৃথিবীর এতটুকু ক্ষতি করে না। সে তো ইচ্ছা করলেই যা ডাঙা আছে নিমেষে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কিন্তু কি মায়া দ্যাখো বনি, সে ডাঙার চারপাশে নিয়ত ফুঁসে বেড়াচ্ছে, কখনও অতীব শান্ত প্রায় করজোড়ে যেন বলছে, আমাকে নাও, চঞ্চল হলে বলছে, আমার কি আছে, কেবল তুমি আছো।

—অথবা বনি, অবো আশ্চর্য দ্যাখো, সমুদ্র তার নিজের মতো অসীমতা নিয়ে জেগে আছে। তার অস্তিত্ব কখনও কমে না, বাড়ে না। জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘেরা ভেসে বেড়ায়, যেন বাদাম তুলে চঞ্চলা তরুণীর মতো। সে তখন নিজের বুকে নিজেই ভাসতে ভাসতে চলে যায়। চারপাশে যা কিছু ডাঙা আছে, সেখানে তার বৃষ্টিপাত ফসল ফলায়, যত আবর্জনা ফেলে, সে, নদী উপনদী ধরে তাকে বুকে বহন করে আনে। এর জন্য তার কোন দুঃখ নেই বনি। পৃথিবীর জন্য তার কি যে মায়া। সব কিছু সে দিয়ে পৃথিবীর হয়ে গেছে আছে। বলেই তিনি সহসা মুখ ফেরালেন। তোমার কোন কষ্ট আছে?

—না বাবা।

—কষ্ট থাকলে, এই সমুদ্র দেখবে। পৃথিবীতে এর চেয়ে উদার, মহৎ এবং নিরিবিলি স্বভাবের আর কিছু নেই। আর সমুদ্র যে-ভাবে পৃথিবীকে ভালবাসতে জানে, আর কে আছে তেমন। তোমার যদি কিছু ভাল লেগে থাকে, তুমি যদি মনে করে থাক, ঠিক করছ, আমার কোন অমত থাকবে না। তবে যাই করবে, ভেবে করবে, বুঝতে না পারলে, অনেকক্ষণ, যত বেশি সময় হয় ততই ভাল, দাঁড়িয়ে থাকবে রেলিঙে। দেখবে, কেমন সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার ছায়া লম্বা হয়ে সমুদ্রের অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তখন একবার সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করতে পার, ঠিক করছ কিনা, সে কাউকে বলে না, মিথ্যা বলে না।

বনি বুঝতে পারল, সে বাবাকে মিথ্যা কথা বলেছে। বাবা টের পেয়েছেন। বাবা মনে মনে ওর ব্যবহারে হয়তো কষ্ট পেয়েছেন। সমুদ্রের কথা বলে, বাবা তাকে শাসন করছেন। বাবাকে সে কখনও ওর প্রতি কঠোর হতে দেখেনি। এ জন্য বাবা তাকে ডেকে এনেছিলেন। সে ফুঁপিয়ে উঠে পড়ল। বেশ রাত হয়েছে। ডাইনিঙ হলে ডিনার সাজানো হচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্না বাবার পায়ের কাছে পড়েছে। বাবাকে এখন খুব একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। বাবাকে ফেলে বেন জানি তার যেতে ইচ্ছা হল না। সে বাবার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সমুদ্র দেখতে দেখতে বলল, আমি তোমাকে কখনও কষ্ট দেব না বাবা। বলে আমার চুল কেটে দিও। আমি আর পালিয়ে থাকব না।

(ক্রমশঃ)

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলো, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রাজপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

মনের খবর

মানসিক রোগ—(৬)

উৎকণ্ঠা (অ্যাংজাইটি) সকলেরই আছে। কারও বা কম কারো বেশী এই যা তফাৎ। কিন্তু এই কম-বেশীতেই ব্যক্তিত্ব জীবনে অনেক প্রভেদ ঘটায়, অনেক অঘটন ঘটায়। ব্যক্তিত্বের রকমটাই পালটে যায়। যাদের উৎকণ্ঠা কম, অন্তত একটা সাধারণ সীমার মধ্যে থাকে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা বাধাবিপত্তি, সমস্যা রোগ-শোক আঘাত ইত্যাদি অবস্থায় একেবারে বিহ্বল করে দিতে পারে না। সাময়িক কিছু অস্থিরতা দেখা দিলেও একটা সঙ্গত সময় সীমার মধ্যে তারা নিজেদের আবার সামলে নিতে পারে। রোজকার জীবনের সহজ অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। এমন কিছু লোক আছে যারা কোনও বিশেষ আঘাত পেলে তা সহজে ভুলতে পারে না। উৎকণ্ঠা বা বেদনার পরিমাণ কিছু কিছু করে কমে আসতে থাকলেও, ঠিক মত সামলে নিতে বেশ সময় লেগে যায়। এমনও দেখা যায়, তারা তখনকার মত চুপচাপ থেকে গেলেও ভেতরে ভেতরে তাদের মন আন্দোলিত হতে থাকে। এক সময় কোনও একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে তাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়ে থাকে। উৎকণ্ঠা একবার দেখা দিয়ে ক্রমে তা থেমে গেলেও সুযোগ পেলে আবার তা ফুটে বেরোয় এবং এইভাবে বারে বারে ঘুরে ফিরে দেখা দিতে থাকে এমনও দেখা যায়। তবু এই রকম উৎকণ্ঠা যদি সাধারণের স্বীকৃত সীমার মধ্যে থাকে তবে তাকে স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা বলা যেতে পারে। কিন্তু যখন সেই উৎকণ্ঠা ঐ সীমা পেরিয়ে যায় তখন তাকে মানসিক রোগ হিসেবে গণ্য করা হয়। সব মানুষেরই যে উৎকণ্ঠা, কম হোক, বেশী হোক, আছে তা বলা হয়েছে। সুতরাং মানসিক যে কোনো রোগেই যে উৎকণ্ঠা কিছু না কিছু আছেই একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। বায়ুরোগেও উৎকণ্ঠা থাকে বাতুলতাতেও থাকে। তবু দুটো পৃথক শ্রেণীভাগ মানসিক রোগের কথা হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। বায়ুরোগের এই উৎকণ্ঠার প্রকাশ কেমন হয় তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

(ক) করুণের বয়স ১৮।১৯ বৎসর। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। হাসি খুশী, আমুদে প্রকৃতির ছেলে। পড়াশোনা ভালই বলা যায়। ইস্কুল কলেজের যতগুলি পরীক্ষা দিয়েছে প্রত্যেকটিতেই প্রথম বিভাগে পাশ করে এসেছে। স্নাতক স্তরে এসে প্রথম বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার ৩।৪ মাস আগে থেকে তার পরীক্ষার সম্বন্ধে নানা রকম উৎকণ্ঠা দেখা দিতে থাকে। ক্রমে যত পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসতে থাকে তার উৎকণ্ঠা তত বাড়তে থাকে। তার কেবলই মনে হতে থাকে হাতে আর সময় নেই, পড়া শেষ হয়নি, পরীক্ষা দেবে কি করে, পাশ করতে পারবে না ইত্যাদি। দিনে দিনে যত উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে পড়বার সময় তার তত বাড়াতে হয়। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। একপাতা পড়তে তার অনেক সময় চলে যায়। বইয়ের অক্ষর চোখে দেখে পড়ে যায় কিন্তু বক্তব্য বিষয় কিছু বুঝতে পারে না। কী যে পড়ল তা বুঝতে পারে না। তখন আবার সেই পাতাটাই ফিরে পড়তে হয়। তবু যেন মাথায় কিছু ঢোকে না। কিছুক্ষণ চেষ্টার পরে সে বই ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা বই নিয়ে বসে কিন্তু সেটাতেও সুবিধে কিছু করতে পারে না। আবার অন্য বই খুলে বসে। কিন্তু ঐ বই নিয়ে বসাই সার হয়। পড়া আর হয় না। সামনে বই খোলা থাকে, চোখ বইয়ের অক্ষরের উপর ছুটে চলতে থাকে বা কোথাও এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মন এটা ওটা কত কি ভেবে চলতে থাকে। পড়ার কত বাকি, সময় আর নেই, কি করে সব পড়া শেষ করবে, কোনটা বাদ দিয়ে কোনটা পড়বে ইত্যাদি ভাবনায় অস্থির হতে থাকে। এক সময় তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যে পড়ছে না, বই খোলা পড়ে আছে। হয়ত বা নিয়ম মত অভ্যাস মত পাতা উল্টে যাচ্ছে কিন্তু কিছুই তার মাথায় ঢোকে নি। সে যে সাত-পাঁচ কত কি ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছে তা এক সময় তার কাছে ধরা পড়ে। আবার জোর করে পড়া শুরু করে, কিন্তু আবারও সেই একই অবস্থা ঘটতে থাকে। কেবলই মনে হতে থাকে সময় চলে যাচ্ছে তার পড়া কিছু হচ্ছে না—পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না, তখন কি করবে? পরীক্ষা এবার দেবে না। না দিলে বাড়ীতে মানবে না। পরীক্ষা দিতেই হবে। কিন্তু ফেল করা যেন কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর তাই নিয়ে লজ্জা অপমান, উৎকণ্ঠার অন্ত থাকে না। যত বেশী করে করুণ পড়বার চেষ্টা করে তত যেন সে বিফল হতে থাকে। তার উৎকণ্ঠা তত বেশী বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সে আর বসে বসে পড়তে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। তাতেও কাজ হয় না। তখন শুরু হয় বই হাতে ঘরে পায়চারি করা। তাতেও যখন মনের উৎকণ্ঠা বাগ মানে না তখন জোরে জোরে উচ্চারণ করতে থাকে। উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় বহুক্ষণ এইভাবে পায়চারি করতে করতে এক সময় দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর ওদিকে মনও উৎকণ্ঠায় ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে। করুণের সেই অসহায় অবস্থায় সে যে কী করবে তা কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না—। কেবল ছটফটানি বেড়ে যেতে থাকে। কখনো নিজে গড়িয়ে এনে জল খায়, কখনো স্নানের ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে আসে, কখনো চোখে জল দেয়, ভিজে হাতে কানের পিঠে জল দেয়। রাত্রে ঘুমোতে পারে না; বিছানায় শুয়ে ছটফট করে, একটু পরে পরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ে, ঘড়ি দেখে, আবার ঘুমোতে চেষ্টা করে। খাওয়া কমে যায়, দৈহিক প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় অনিয়মিত হতে থাকে। কখনও পেট খারাপ, কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো হজমের দোষ, অম্বল, চোয়া ঢেকুর ইত্যাদি নানা উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। করুণ বলে ছোটবেলা থেকেই তার পরীক্ষার আগে উৎকণ্ঠা হতে থাকত। যত বড় হচ্ছে তত নাকি এই উৎকণ্ঠা তার বেড়ে যাচ্ছে। আর সে কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। বুঝতে পারে এত

উৎকণ্ঠা হতে থাকলে তার পড়ার ক্ষতি হয়, কিন্তু নিজেকে সে সামলাতে পারে না। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই উৎকণ্ঠা তাকে পেড়ে ফেলে সবকিছু একেবারে বানচাল করে দেয়।

(খ) খগেনবাবু আপিসে কাজ করেন। অনেক দিনের পুরোনো কর্মী। সব কাজ তাঁর জানা। ক্রমে তাঁর পদোন্নতিও হয়েছে। তবু আপিস যাবার বেশ কিছু আগে থেকেই তাঁর উৎকণ্ঠা হতে থাকে, দেরী হয়ে যাবে। বাড়ী থেকে ৯-৩০ সময় বেরুলেও ১০টায় আপিস ঘরে বসতে তাঁর দেরী হয় না। তবু সকাল ৭টা ৭-৩০টা থেকেই তাঁর বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাতে হয়। খবরের কাগজটা সামনে মেলে ধরে একটু চোখ বুলিয়েই আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন, দেরী হয়ে গেল না ত। দেখলেন আগের বার দেখার পরে মাত্র তিন-চার মিনিট কেটেছে। আবার খবরের কাগজের দিকে মন দেন। হঠাৎ মনে হয় অনেক সময় কেটে গেছে, নিশ্চয় দেরী হয়ে গেছে। ঘড়িতে দেখলেন মাত্র পাঁচ মিনিট কেটেছে। এই রকম হতে হতে এক সময় উঠে পড়েন। দাড়ি কাটতে হবে, স্নান করতে হবে, খেতে হবে, জামা-কাপড় পরতে হবে—অনেক কাজ বাকি। আর বসে থাকা চলে না। কিন্তু ঐ প্রত্যেকটা কাজ করতে করতে তাঁর বারে বারে মনে হতে থাকে দেরী হয়ে গেল বুঝি দাড়িটা যেন সহজে কাটতে চাচ্ছে না। এক একদিন তিনি ক্ষুরের ব্লেড বদল করে নিয়ে তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটবার চেষ্টা করেন। তবু মনে হয় কানের নিচে গলার পাশটায় যেন দাড়ি রয়ে গেছে। ঝুলপিটা যেন ঠিক মত কাটা হল না। দু'দিকটা যেন দু রকম হয়ে গেল। আবার দুদিক সমান করতে লেগে যান। এই করতে সময় চলে যায়। তখন নাওয়া খাওয়ার আর সময় থাকে না মনে করে—তাড়াতাড়ি যা হোক করে মাথায় গায়ে কিছু জল ঢেলে, গপ-গপ করে ডাল-ভাত, মাছ-তরকারি যা হয় মুখে পুরে দিয়ে খাওয়া শেষ করে জামা-কাপড় পরতে যান। বারে বারে ঘড়ি দেখার বিরাম নেই। এই বুঝি দেরী হয়ে গেল! ট্রাম যদি ঠিক সময় না আসে, বাসে যদি উঠতে না পারা যায়—যে ভিড় —তবে কি হবে? রাস্তায় ত প্রায়ই 'ট্রাফিক জ্যাম' লেগেই থাকে। যদি বেশী দেরী হয়ে যায়, যদি ওপরওয়ালা খোঁজ করেন আর দেরী করার কথা জানতে পারেন—তবে? কি জানি কি করবেন, চাকরিটা—? না, অনেক দিনের পুরোনো কর্মী চাকরি হয়ত যাবে না। কিন্তু প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাবে। ছুটি না মঞ্জুর করে দিতে পারেন। আরও কী জানি কত কি-ই ত হতে পারে। তার ফিরিস্তি কি করা যায়? আঃ ট্রামটা আসছে না কেন? দোহাই মা কালী, ট্রামটা তাড়াতাড়ি এনে দাও, অথবা ট্রামে উঠতে পারলে বলতে থাকে—হে মা কালী, তাড়াতাড়ি করে পৌঁছে দাও মা। ট্রামটা পথে একটু বাধা পেয়ে দাঁড়ালে মন বলে—এ্যাইরে। সেরেছে, গেল গেল দেরী হয়ে। আর সব ঝামেলা কি এই সময় এসে জোটে! পুলিশগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখে কি? রোজই একই উৎকণ্ঠা ঘুরে ফিরে আসে। খগেনবাবু অন্য যাত্রীদের দিকে চেয়ে দেখেন সবাই বসে বা দাঁড়িয়ে চলেছে দেরীর জন্যে কারও যেন ভ্রূক্ষেপ নেই! আশ্চর্য! আরে বাবা একটু জলদি চল না! তোমাদের আর কি, যখন হোক ডিপোতে পৌঁছলেই হল। দেরী হলে রাস্তার ভিড়ের দোহাই আছে। কিন্তু আমাদের? ওপরওয়ালা—রাস্তার ভিড় মানবে? রাস্তার জল দাঁড়িয়ে গেলে ত উৎকণ্ঠার আর অবধি থাকে না। ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে খগেনবাবুর আপিস যাওয়া চলছে—

(গ) গীতা—সবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া কোনও মতে শেষ করেছে। বিয়ের চেষ্টা চলছে। গীতা বিয়ে করতে রাজি নয়। সে সমাজের উন্নতির জন্য কিছু কাজ করবে এই তার ইচ্ছা। কিন্তু কি করে যে সে উন্নতি সে সাধিত করবে তা ভেবে পায় না—দিন কাটতে থাকে।

অবস্থা ভালই। বাড়ীতে বাবা-মা আর এক ছোটভাই। এই নিয়ে ছোট তাদের পরিবার। অভাব কিছু নেই। কিন্তু গীতার মনে শান্তি নেই। বাবা যদি নিচতলা থেকে জোরে কাউকে ডাকেন গীতার ভয় হয়—বাবার বুঝি কিছু হল। তাড়াতাড়ি ছুটে যায়। বলে 'কি হয়েছে বাবা?' বাবার কিছু হয়নি জেনে একটু আশ্বস্ত হয়। বলে 'বাবা, তুমি এমন করে ডাক যে পেটের পিলে চমকে যায়।' বাজারের থেকে যদি ঠাকুর মাকে বা ঝিকে কিছু জোরে বলে, গীতা ছুটে এসে জানতে চায় কি হল। কড়াইয়ে তরকারি বা মাছ ছাড়লে গীতা চমকে ওঠে, কী বুঝি হল? বাবা মা বা ভাই বাড়ীর বাইরে গেলে গীতার মন অস্থির হতে থাকে। বাইরে যাবার আগে কে কখন বাড়ী ফিরবে সে সময়টি ভাল করে জেনে নেয়। রাস্তায় যেন সাবধানে চলে। গাড়ী যেন জোরে না চালায়। রাস্তায় আজকাল ত' হাজার রকমের গোলমাল লেগেই থাকে। তেমন কিছুর সম্ভাবনা দেখলে যেন সে রাস্তায় আর না যায়, অন্য রাস্তা দিয়ে যাবে। তা সম্ভব না হলে যেন বাড়ীতে ফিরে আসে। ভাইকে বারে বারে বলে দেয় কলেজের ক্লাশ শেষ হতেই যেন বাড়ী চলে আসে। আজকাল কলেজে ছেলেদের নানা দল হয়েছে, সে যেন কোনও দলে না মেশে। গোলমাল দেখলে যেন বাড়ী চলে আসে। সংবাদপত্রে যেদিন কোনও ছাত্র বিক্ষোভের খবর বেরোয় তবে ভাইকে সেদিন আর কলেজে যেতে দিতে চায় না। নানা-রকমের ওজর আপত্তি তুলতে থাকে। ঠিক সময় মত বাড়ী না ফিরলে গীতার উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। যে যখন বাড়ী ফিরবে বলে যায়—তার আধ ঘন্টা আগে থেকে বারে বারে ঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে— এই ৩০ মিনিট পরে আসবে, ২০ মিনিট পরে আসবে, ১০ মিনিট পরে আসবে, ৫ মিনিট পরে, এই আসবার সময় হয়েছে। দরজায় ঘন্টা বাজল না! আসছে না কেন? কি হল? কোনও বিপদ ঘটে নি ত! আর বসে থাকতে পারে না। ঘর বারান্দা করতে থাকে। এক-একবার মাকে গিয়ে বলে 'কি করছে বলত? বাবা আসছে না কেন? এত দেরী হচ্ছে কেন?' 'এত কেন দেরী হচ্ছে, কিছু হল না ত?' মা যদি তার উৎকণ্ঠায় যোগ না দেন তবে গীতার উৎকণ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাগ বেড়ে যেতে থাকে। মাকে বলে, 'তোমার কী বলত। বাবা কেন আসছে না তার একটুও ভাবনা নেই। বেশ আছ বসে, একটু খবর নিতে পার ত! কোনও হুঁস নেই তোমার। কী তুমি?' বাড়ীর সকলেই গীতার এই উৎকণ্ঠার কথা জানে। তারা তার অভিযোগে কান দেয় না। বেশী যখন বলতে থাকে, ছটফট করতে থাকে, তখন মা হয়ত ধমক দিয়ে তাকে বসে থাকতে বলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয় না। গীতা রেগে যায়—আর সকলকে দোষ দিতে থাকে—বাবার জন্যে তাদের কোনও ভাবনাই নেই। নিজেদের নিয়েই সবাই ব্যস্ত আছে, বেশ ডুবে আছে। আর কারও জন্যে কিছু দেখবার নেই। কী মানুষ সব হয়েছে! গীতার উৎকণ্ঠার আর শেষ নেই। কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ মনে হল আকাশে যে মেঘ জমছে, হয়ত একটা প্রবল ঝড় প্রলয়কান্ড ঘটাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে তার সাবধানতার তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। একে ডাকে ওকে ডাকে। জানলা বন্ধ করতে বলে নিজেও ছুটে ছুটে এটা ওটা করতে থাকে, সকলকে এক ঘরে এসে বসতে বলে। আসতে দেরী করলে বিরক্ত হয়ে হাঁকডাক করতে থাকে। বাড়ীর অন্যেরা যদি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে তার ফল হয় উল্টো। গীতার রাগ বেড়ে যায়, খুব বাড়াবাড়ি হলে তখন ছটফট করতে করতে এক সময় কাঁদতে শুরু করে। তখন তাকে সামলাতে বাড়ীর লোকের হৈ-চৈ লেগে যায়। মা বাবা এ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু এর প্রতিকারও করতে পারেন না। বলেন—যে বুঝেও বোঝে না তাকে কি করা যাবে? তবু গীতার উৎকণ্ঠা দূর হয় না। এক-একদিন এই উৎকণ্ঠা তার খুব বেড়ে যায়। সেই ঝোঁকটা কেটে গেলে কদিন একটু কম থাকে। এই নিয়ে গীতা দিন কাটাচ্ছিল। বাড়ীর অভিভাবক আর কোনও উপায় না দেখে মনঃসমীক্ষণের সাহায্য নিতে এলেন। আরও অনেক দিন আগে যদি চিকিৎসা করানো হত রোগী এত কষ্ট পেতো না আর বাড়ীর অন্যদেরও এত কষ্ট ভোগ করতে হত না।

আরও অনেক রকমের উৎকণ্ঠাবস্থা আছে। সেগুলির কিছু কিছু উদাহরণ ক্রমে দেওয়া হবে। এবারের মত এই বলে শেষ করি যে উৎকণ্ঠাবস্থা মানেই রোগাবস্থা নয়। অর্থাৎ সব উৎকণ্ঠাকেই রোগ লক্ষণ মনে করলে ভুল করা হবে। উৎকণ্ঠা এক প্রকারের মানসিক প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার কতক-গুলি অবস্থাকে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে চলি আর কতকগুলিকে অস্বাভাবিক বা ব্যাধির পর্যায়ে ফেলা হয়। বিশেষ কোনও উৎকণ্ঠার মাত্রা সাধারণ সীমা অতিক্রম করলে তাকেও রোগ লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

শিকারশিল্পী জিম করবেট

বিশ্বনাথ বসু

"আমার জীবনে এই প্রথম একজন, হয়ত বা একসঙ্গে দুজন মানুষের জীবনকে আমি বিপদগ্রস্ত করতে উদ্যত হয়েছি। মাটি থেকে মাত্র ছ'ফুট উঁচু মাচান। বাঘ শিকারের মত বিপজ্জনক প্রোগ্রামে এরূপ নীচু মাচানে যেখানে, এমনকি, নিজের কোন পরিচিত নির্ভরযোগ্য শিকারীকে পর্যন্ত বসাতে সাহস পেতাম না, সেখানে বসিয়েছি এমন একটি বাচ্চা মেয়েকে যার বয়স মাত্র ষোল বছরের কিছু বেশি।"

একটি বেঞ্চভাবের ওপর বসে আমেজ করে ধূমপানে নিরত জিম করবেটের মনে দুর্ভাবনাটা ধীরে ধীরে জেঁকে বসছে।

সংশিলষ্ট দুজনের রাইফেলের লক্ষ্যভেদ দক্ষতা সম্বন্ধে করবেটের কোন ধারণা নেই। অবশ্য দুজনেই যথেষ্ট সাহসী বোঝা যায়। কারণ বলামাত্রই ওরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে অতটা নীচু মাচানে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে বাঘ শিকারের মত বিপজ্জনক কাজে সাহসিকতাই যথেষ্ট নয়। হাতের নিশানার নিশ্চয়তাও দরকার।

তাই ঝোঁকের মাথায় দুজনকে মাচায় বসিয়ে দিয়ে এসে করবেটের মন এখন দুর্ভাবনায় দুলছে। জঙ্গল খেদানো সুরু করার আগে হাতীগুলো নিয়ে মোহন এসে পৌঁছে গেছে। কিন্তু করবেট তখনও তাঁর করণীয় সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেননি।

বৃটিশ ভারতের বড়লাট স্বয়ং লিনলিথগো এসেছেন শিকারে। এসেছেন সপরিবারে। স্ত্রী, তিন কন্যা, পার্শ্বচর, পারিবারিক ও সরকারী সচিব ও দেহরক্ষী ফৌজাদি সহ প্রায় তিনশ লোকের দঙ্গল নিয়ে।

প্রতি বছর গরমের সময় বড়লাটের দিল্লীর দপ্তর গুটিয়ে সিমলায় নিয়ে গিয়ে বসানো হতো। মধ্যে ছুটি থাকতো দশদিনের। এই দশদিন বড়লাটরা বরাবর দক্ষিণ ভারত সফরে বেরুতেন। এবং এই সফরের রেওয়াজ একটা স্থায়ী প্রথায় পরিণত হয়েছিল। কি জানি কেন সে প্রথাটা লিনলিথগোই এই প্রথম ভাঙলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন সিমলার পথে এবার উত্তর ভারতের কোথাও দিন দশেকের জন্য সপরিবারে শিকারে যাবেন।

জিম করবেট তখন নৈনিতালে তাঁদের কালাধুঙ্গির বাড়ীতে। ভাইসরয়ের মিলিটারী সেক্রেটারী হিউগ স্টেবলের একটি জরুরী টেলিগ্রাম একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর হাতে এসে পৌঁছুলো। টেলিগ্রামে লেখা—

"মহামান্য ভাইসরয় তাঁর দক্ষিণ ভারতের সফর প্রোগ্রাম বাতিল করেছেন। গরমের সময়টায় সিমলায় যাবার আগে দিন দশেক থেকে কিছুটা শিকার খেলতে পারেন এরূপ একটি উপযুক্ত এলাকার খোঁজ তুমি দিতে পারো কি?"

দক্ষ ও দায়িত্বশীল শিকারী হিসেবে জিম করবেটের নাম তখন সরকারী ও বেসরকারী মহলে সুবিদিত। তাই উত্তর ভারতে বড়লাটের শিকার প্রোগ্রামের কথা উঠতেই সরকারী মহলের প্রথমেই মনে হয়েছে জিম করবেটের নাম।

বড়লাটের দপ্তরের টেলিগ্রামটা হাতে আসতেই জিম করবেট যেমন বিস্মিত হলেন, খবরটা রটে যেতেই আশপাশের মহল্লায় তেমনি হৈ চৈ পড়ে গেল।

পাখী শিকার ও মাছ ধরার মতলবে এবং বন ও বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের সখে সকাল সন্ধ্যে বন-পাহাড় টহল দিয়ে বেড়ানো জিম করবেটের সারা জীবনের অভ্যাস। কাজেই এ অঞ্চলে বাঘ থেকে আরম্ভ করে সর্ব প্রকারের পশুপাখীর চলাচল ও আবাসস্থলের হদিস করবেটের নখদর্পণে।

হিমালয়ের পাদদেশে সংলগ্ন অরণ্যছাদিত এই কালাধুঙ্গি এলাকা অপর্যাপ্ত বন্যপ্রাণী সম্পদে যেমন সুসমৃদ্ধ, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য

মনজুড়ানো স্নিগ্ধ আবহাওয়ার সেই-রকম আকর্ষণীয়ও বটে। কাজেই বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর মত শিকারপ্রিয় মহামান্য অতিথির অবসরকালীন চিত্ত-বিনোদনমূলক সফরের জন্য স্থান নির্বাচনে জিম করবেটের মনে আর আশৈশবের পরিচিত ও প্রিয় শিকার-ক্ষেত্র কালাধুঙ্গির নামটাই যে অগ্রাধিকার পাবে সেইটেই ছিল স্বাভাবিক। অবশ্য এটাও করবেট বিলক্ষণ জানতেন যে এই স্থান নির্বাচনে নাক গলাতে গিয়ে শিকার প্রোগ্রামের যাবতীয় স্থানীয় ব্যবস্থাদি করা ও সম্মানীয় অতিথিদের শিকার করিয়ে দেবার অলিখিত নৈতিক দায়িত্বটাও তাঁর ঘাড়ে এসে পড়বে।

সারা জীবনে বহু সফল শিকার-অভিযানের অধিকারী জিম করবেট। আত্ম-বিশ্বাসে ভরপুর তাঁর মনটা। সেই বিশ্বাসে করবেট কালাধুঙ্গি থেকে ষোল মাইল দূরে হলদোয়ানী পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দিল্লীতে বড়লাটের দপ্তরের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে কালাধুঙ্গি এলাকাতেই লাটসাহেবের ক্যাম্পিং-এর সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেললেন।

পথিমধ্যে করবেট তরাই ও ভাবরের সরকারী এস্টেটের স্পেশাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ জিওফের সঙ্গে দেখা করে বড়লাটের প্রস্তাবিত প্রোগ্রামের কথা বললেন এবং প্রোগ্রামের সফলতার উদ্দেশ্যে দুটি ফরেস্ট ব্লক ও রিজার্ভ করালেন। পার্শ্ববর্তী সরকারী ফরেস্টের দাচুয়াবী ব্লকটি জিওফ নিজের জন্য রিজার্ভ রেখেছিলেন। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি সে ব্লকটিও করবেটের হেফাজতে ছেড়ে দিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সহজ ও সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হচ্ছে দেখে করবেট বেশ উৎফুল্ল মনেই বাড়ীতে ফিরে এলেন।

দিল্লীর সরকারী ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চপদস্থ অফিসারদের একটি অগ্রগামী তদারকি দল দু-চার দিনের মধ্যেই করবেট নির্দিষ্ট কালাধুঙ্গি এলাকায় এসে হাজির হলেন। হাতে মাত্র পনের দিনের সময়। সরকারী উদ্যোগ এবং জিম করবেটের পরামর্শ ও নেতৃত্বাধীনে স্থানীয় অধিবাসীদের আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতায় সর্বরকমের বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হোল।

যথাসময় মহামান্য অতিথিরা—লর্ড ও লেডী লিনলিথগো, তাদের তিন কন্যা—অ্যানি, জোয়ান এবং ডোরিন হোপ, ওবফে বান্টী এবং পারিবারিক তদারকি কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে কালাধুঙ্গি এসে পৌঁছলেন।

পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী চারটি বিট (জঙ্গল খেদানো) সফলভাবে শেষ হয়েছে। চারটি বাঘও মারা পড়েছে। মেরেছেন লর্ড ও লেডী লিনলিথগো ও উপরের দুই কন্যা। প্রত্যেকে একটি করে। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা বান্টির বরাত শিকার এখনও হয়নি।

তাই বান্টির শিকারের জন্য করবেট একটা অর্ধবৃত্তাকার জঙ্গলখণ্ড বেছে নিয়ে বিট-এর ব্যবস্থা করলেন। এলাকাটা ছিল বোর নদীর একটি পুরানো চর। কালক্রমে স্থানটা গাছ ও আগাছার ঘন-জঙ্গলে ভরে গেছে। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে আছে বন-কমলার ঝোপ-ঝাড়।

পাঁচটি বৃক্ষ-মঞ্চ তৈরী হয়েছে নদীর পুরানো পাড় বরাবর। জঙ্গল পিটিয়ে বাঘকে শিকার-মঞ্চের দিকে খেদিয়ে আনা হবে।

নির্দিষ্ট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে শিকারীকে পথ দেখিয়ে এনে মাচায় বসাতে গেলে ব্যাপারটা বাঘের কাছে জানাজানি হয়ে যেতে পারে। তাই জিম করবেট শিকারীদের বহু দূরের ঘুর পথে মঞ্চের পেছন দিক দিয়ে নিয়ে এলেন।

বিতাড়িত বাঘ যাতে নির্দিষ্ট ট্র্যাক ছেড়ে অন্য দিকে পালাতে না পারে তার জন্য শিকার-মঞ্চের আশপাশে ভাইনে-বাঁয়ে স্টপ্‌ওয়ালাদের জন্য কয়েকটি গাছ নির্দিষ্ট করা ছিল। তারা সন্তর্পণে গিয়ে নিজের নিজের গাছে বসলো।

করবেটের এখন দায়িত্ব হলো আমন্ত্রণকারী অতিথি শিকারীদের তাদের নির্দিষ্ট গাছে বসিয়ে দেওয়া। স্থানীয় শিকারসঙ্গী বাহাদুর ও বড়লাটের এ-ডি-সি মিঃ পিটার বোরউইককে সঙ্গে নিয়ে করবেট ১নং মঞ্চে বসালেন লাটকন্যা অ্যানীকে, ২য় মঞ্চে লাট-সাহেবকে। তার পাশে একটি বন-খেজুরের গুঁড়ির ওপরে তৈরী হয়েছিল ৩নং মঞ্চ।

করবেটের ইচ্ছে ছিল বাহাদুরকে এই মাচায় স্টপ হিসেবে বসাবেন। তাঁর হিসেবে এই পর্যন্ত এসে বাহাদুরের কাছ থেকে ডাক খেয়ে বাঘ বাঁ দিকেই ঘুরবে। কাজেই বান্টির জন্য বাঁ দিকেই ৪নং মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। কারণ অন্য সকলের হলেও বান্টির হাতে এখনও পর্যন্ত বাঘ শিকার হয়নি।

কিন্তু তিনি জানতেন বাঘ কোন ঝোপে শুয়ে আছে। পূর্বোক্ত গেম-ট্র্যাকটি নদীর পাড়ের দিকে গিয়েছে ঠিক ৩নং মঞ্চের পাশ দিয়ে।

করবেট নিশ্চিতভাবেই বুঝেছিলেন যে বাঘ তাড়া খেয়ে পূর্বোক্ত গেম-ট্র্যাক ধরেই এগুবে। ৩নং মাচানের উচ্চতা ছিল মাত্র ছয় ফুট। কাজেই এরূপ স্বল্প উচ্চতায় একজন দক্ষ স্টপকে না বসিয়ে একজন শিকারীকে বসানোতে বেশি বিপদের ঝুঁকি ছিল।

যা হোক, বড়লাট-দুহিতা দুজন এবং পিটার ও বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে করবেট ৩নং মঞ্চের কাছে এসে পৌঁছলেন পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী বাহাদুর মঞ্চে উঠতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে করবেট তাঁর সিদ্ধান্ত পালটে মৃদুস্বরে বললেন—বিপজ্জনক হলেও তিনি চেয়েছিলেন যে পিটারকে সঙ্গী করে বান্টিই এই মাচানে বসুক। বিপদের কথা শুনেও বান্টি বিনা দ্বিধায় রাজি হোল এবং পিটারকে নিয়ে মাচায় চড়ে বসলো।

করবেটের সঙ্গে জঙ্গল খেদানোয় অংশ নেবে বলে পিটার খালি হাতেই এসেছিল। মাচায় বসতে গেলে করবেট তাঁর নিজের '৪৫০।'৪০০ বোরের দোনলা রাইফেলটা পিটারের হাতে দিলেন নিরাপত্তার প্রয়োজনে। এবং বান্টিকে বললেন—তিনি যে নিশানা রেখে যাবেন, বাঘ সেই পর্যন্ত এলেই যেন গুলি করা হয়।

এবপর করবেট গেম-ট্র্যাক ধরে মাচান থেকে কুড়ি ফুটের মত এগিয়ে গিয়ে ট্র্যাকের ওপর আড়াআড়িভাবে একটি শুকনো কাঠ রাখলেন। বান্টি নিশানাটা দেখে নিয়ে পূর্বোক্ত উপদেশ পালনের সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

করবেট তখন বান্টির বোন জোয়ানকে নিয়ে বাহাদুরের সঙ্গে ৪নং মঞ্চের ধারে গেলেন। এই মঞ্চটা ছিল মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচুতে এবং ৩নং মঞ্চ থেকে ত্রিশ ফুট দূরে। উভয় মঞ্চের মধ্যে কোন আড়াল না থাকায় একটি থেকে অপরটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। জোয়ানকে মঞ্চে তুলে দেবার সময় করবেট অনুরোধ করলেন—৩নং মঞ্চের শিকারীরা যদি রুখতে না পারে, তাহলে বাঘকে যেন তিনি কোন অবস্থাতেই তিন নম্বরের দিকে এগুতে দিবেন না। উত্তরে উচ্ছল হাসিতে ভেঙে পড়ে জোয়ান জানালেন যে তিনি ফেরার বন্দুক চালাবেন না।

৩নং ও ৪নং মাচানের লাইনে নদীর পাড়ের দিকে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গাছ ছাড়া অন্য কোন ঝোপঝাড় ছিল না। কাজেই করবেটের বিশ্বাস ছিল যে প্রায় ফুট পঞ্চাশ দূরের জঙ্গল থেকে বেরুলেই বাঘকে পরিষ্কার দেখা যাবে এবং বান্টির গুলিতে নিশ্চয়ই নিহত হবে।

বাহাদুরকে স্টপ হিসাবে ৫নং মাচানে বসিয়ে দিয়ে করবেট পিছু হটে নির্দিষ্ট জঙ্গলটা এড়িয়ে ঘুর পথে বোর নদীর দিকে সরে গেলেন।

জঙ্গল খেদানোর জন্য ষোলটা হাতী জোগাড় হয়েছিল। নদীর ভাটিতে প্রায় সিকি মাইল দূরে হাতীগুলো মোহনের হেফাজতে অপেক্ষা করছিল। মোহন করবেটের দীর্ঘদিনের বন্ধু, এবং তার মত বাঘ-বিশারদ সমসাময়িককালে ভারতে খুব কমই ছিল। মোহনকে হাতী নিয়ে আসতে ইসারা করে করবেট একটা পাথরের ওপর ধূমপানের উদ্দেশ্যে বসলেন।

ধূমপানে নিরত অবস্থায় জিম করবেট জঙ্গল খেদানোর পরিকল্পনাটা পুনরায় বিশ্লেষণ করবার সময় পেলেন।

বিশেষ করে বাঘ সম্বন্ধে করবেটের আজীবনের কৌতূহল। শৈশব থেকে বাঘের জঙ্গলের বাসিন্দা তিনি। বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে বাঘকে তিনি বিভিন্নরূপে দেখেছেন। অসাধারণ শক্তি ও শৌর্যের আধার এই বন্য পশুটির হালচাল ও মনস্তত্ত্ব তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে শত-সহস্রবার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তার শান্ত-শিষ্ট ও নির্লিপ্ত রূপ, বনরাজোচিত গাম্ভীর্য, প্রচণ্ড সাহস ও বিক্রম; ক্ষেত্র-বিশেষের ছল, চাতুরী ও প্রতিহিংসায় ভরা বীভৎস রক্তলোলুপতা। কিন্তু সর্বোপরি স্বাভাবিক খাদ্যের প্রাচুর্যে ও স্বস্তিতে-ভরা পরিবেশের মধ্যে বাঘকে জিম করবেট সম্প্রদ্ধায় অভিহিত করেছেন—'জেন্টলম্যান অব দি ফরেস্ট' রূপে।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে আহত বাঘ যদি তার শত্রুকে একবার চোখে দেখতে পায়, তবে প্রতিহিংসার জ্বালায় তার স্তিমিত প্রাণশক্তি ক্ষণকালের জন্য হলেও কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং নেহাৎ চলৎশক্তিহীন হয়ে না পড়লে তদ্দণ্ডে সে সমস্যকার দুর্বার প্রতিআক্রমণ কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে।

করবেট বাঘের এই প্রতিহিংসা-প্রবণতার খবর রাখতেন বলে রান্টি ও পিটারকে বাঘ শিকারের জন্য মাত্র ছফুট উচ্চতার বসিয়ে দিয়ে এসে বড্ড অস্বস্তি বোধ করছিলেন। দীর্ঘকালের আরণ্যক জীবনে তিনি এমন একটি স্পর্শকাতর অন্তর্মনের অধিকারী হয়েছেন যে ভাবী বিপদ আপনা থেকেই তাঁকে ভাবিয়ে তোলে।

কালাধুঙ্গিতে পৌঁছেই লর্ড লিনলিথগো করবেটকে উপদেশ দিয়েছিলেন শিকার কার্যক্রমের জন্য এক ফিরিস্তি নিয়মকানুন চালু করতে। চালু হয়েও ছিল সে নিয়মকানুন। নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই তা পালনও করেছিল। ফলে গত কয়েক দিন ক্যাম্পের কাজকর্ম ও শিকার প্রোগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনশত লোকের মধ্যে কারো গায়ে একটা কাঁটার আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি—যার জন্য করবেট বেশ মানসিক স্বস্তিতেই ছিলেন।

কিন্তু বাঘ শিকার অভিযানের অঙ্কের এই শেষ প্রোগ্রাম ৩নং মঞ্চের শিকারীদের জন্য করবেটের অন্তর্মনটায় যেন অমঙ্গলের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যার বিচার-বুদ্ধির ওপর সবাই সরল মনে নির্ভর করেছে তার পক্ষে এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করা যেন উচিত হচ্ছে না। বাঘ যদি বিদ্যুৎগতিতে সোজা তেড়ে আসে সেক্ষেত্রে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলি চালিয়ে তাকে রুখে দেওয়া যেকোন শিকারীর পক্ষে অতি কঠিন কাজ।

এদিকে মোহন যখন হাতী নিয়ে এসে হাজির হোল, করবেট তখনও মনস্থির করে উঠতে পারেননি পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী জঙ্গলে 'বিট' চালু করবার ব্যাপারে। অবস্থাটা তিনি মোহনকে খুলে বললেন। কথাটা শুনে মোহন পাণ্ডিত্যেভরা ভারিক্কি চালে বললে—'সাব, ঘাবড়াইয়ে মৎ। সব ঠিক হো যায়গা।'

মোহনের কথায় উৎসাহিত হয়ে করবেট সব হাতীর মাহুতদের ডেকে নির্দেশ দিলেন যে এমন ধীর ও শান্তভাবে জঙ্গল বিট করতে হবে যাতে বাঘ আতঙ্কিত অবস্থায় স্থান ত্যাগ করার চেষ্টা না করে। তাকে আস্তে আস্তে খেদিয়ে বের করতে হবে। এবং তা করতে হলে হাতীগুলোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ইসাবা মত মাহুতরা একবারমাত্র সকলে মিলে মুখে চীৎকার করে কয়েক মিনিটের জন্য হাততালি দেবে। এইভাবে কয়েক দফায় সাড়া দেওয়ায় যদি কোন কাজ না হয় তাহলে অতি ধীরে হাতীর লাইন জঙ্গল ভেঙ্গে সামনে এগুবে।

আলোচ্য জঙ্গলটা ছিল পাঁচশ গজ লম্বা ও তিনশ গজ চওড়া।

ইসাবা মত প্রথমবার শব্দ করার পর শম্বর, চিতল, কাকর হরিণ ও বন-মোরগ বেরুতে আরম্ভ করলো। করবেট কান খাড়া করে আছেন বাঘের স্থান ত্যাগের ফলে জঙ্গলের কোন সাড়া মেলে কিনা। কিছুই মিললো না। মিনিট পাঁচেক নীরবতার পর বিটের লাইন থেকে মাহুতরা দ্বিতীয়বার হল্লা করলো। এই সাড়ার দু-এক মিনিটের মধ্যে একটি গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল।

জিম করবেট উদগ্রীব হয়ে দ্বিতীয় গুলির অপেক্ষা করছেন এবং মনে মনে এক দুই তিন করে সেকেণ্ড গুনছেন দুটি গুলির মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বোঝবার জন্য। সময়ের এই ব্যবধান বিশ্লেষণের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতা থাকলে, পরিস্থিতির অনেক কিছু জানা ও বোঝা যায়।

পাঁচ পর্যন্ত গোনার পর জিম করবেট যখন পুনরায় দম নিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ড গণনা সুরু করবেন ঠিক এই সময় পর পর আরো দুটো রাইফেলের শব্দ কানে এলো। পরক্ষণে আরো দুই পর্যন্ত গুনতে না গুনতেই ৬।৭টি গুলির শব্দ হোল।

গুলির শব্দের ধরনের ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণে করবেট অনুমান করলেন ১ম ও ৪র্থ গুলি হয়েছে রাইফেলের নল সামনের দিকের নিরিখে বেখে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুলি হয়েছে তাড়াহুড়োভাবে নিম্নমুখী নিরিখে।

লাটসাহেবের মাচা থেকে রাইফেল ছোড়ার মাচা নজরে আসে না। কাজেই গুলির শব্দ বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিশেষ কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে জোয়ানকেই হয়ত রাইফেল ছুড়তে হয়েছে। এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে ওদিকে কোন বিপদ ঘটেছে।

কথাটা মনে হতেই মহা আতঙ্কে করবেট বিটের দায়িত্ব মোহনের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাহন হাতীর মাহুত আজমতকে বললেন—যেদিক গুলির শব্দ হয়েছে সেই দিকে হাতী ছোটাতে। আজমত নিজে যেমন অভিজ্ঞ ও ডেয়ারেল মাহুত, তার হাতীও সেই রকম শিক্ষিত ও সাহসী। বড় বড় গাছের ডাল, ঝোপঝাড় ও পাথরে ভরা ভাঙ্গাচোরা জমিন ভেঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে হাতী ছুটলো নির্দিষ্ট দিকে।

বনবাদাড় ঠেলে এসে প্রায় বারো ফুট উঁচু একটা নল বনের ফাঁকি ভেঙ্গে এগুতেই হাতী থমকে গেল। আজমত ফিসফিসিয়ে করবেটকে জানাল—হাতীর হাবভাবে বোঝা যাচ্ছে সে বাঘের গন্ধ পেয়েছে। কাজেই সাহেব যেন শক্ত হয়ে বসে থাকেন। কারণ তিনি এখন নিরস্ত্র। সামনে এখনও শতখানেক গজ এগুতে হবে।

ইতিমধ্যে আর কোন রাইফেলের শব্দ হয়নি। তাছাড়া সব শিকারীকেই একটা করে বেলের বাঁশি দেওয়া ছিল বিপদ বুঝে বাজাবার জন্যে। সেই বাঁশির কোন আওয়াজ কানে আসে নি। কিন্তু একরকম দৃষ্টান্তও তো কম নয় যে বাঘ শিকারে বসে উত্তেজনার সময় বাঁশি কেন, তার চেয়েও বড় জিনিস শিকারীর হাত থেকে মাটিতে পড়ে যায়।

কিছুটা এগুতেই গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল জোয়ান তার রাইফেলটাকে আড়াআড়িভাবে হাঁটুর ওপর রেখে

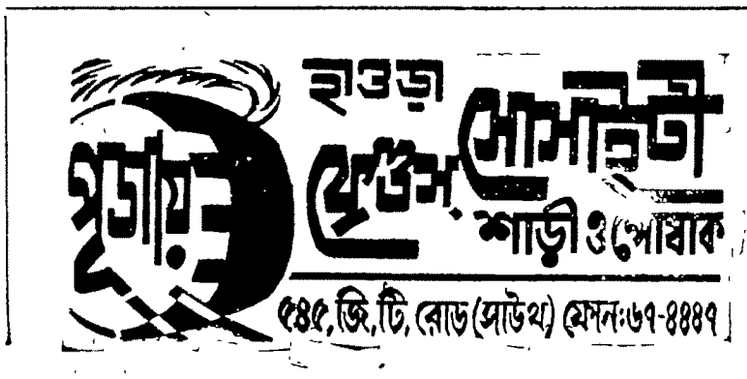

নিরুদ্বেগে মাচায় বসে আছে। করবেটকে দেখেই নিজের হাত প্রসারিত করে দেখিয়ে বান্টির মাচানের সামনের জমিনটার দিকে ইসারা করলে—যার স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে—বিরাট বাঘ বান্টির মাচানের দিকেই।

জোয়ানের হাবভাব ও ইসারায় বোঝা গেল বাঘ নিহত হয়েছে এবং ৩ নং মাচানের সামনেই পড়ে আছে। ফলে করবেটও চরম দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন।

ঘটনাটা পরে যা জানা গেল তা এই রকম—

বিটারদের প্রথম হল্লার পরেই বাঘ ৩ নং মাচানের প্রায় ষাট গজ সামনে ফাঁকায় বেরিয়ে গেম-ট্র্যাক ধরে ধীর-পায়ে এগুতে থাকে। সে যখন নদীর কিনারে প্রায় পৌঁছে গিয়েছে তখন বিটিং লাইন থেকে দ্বিতীয়বারের হল্লার শব্দ কানে এল। বাঘ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো এবং তাড়াহুড়োর দরকার নেই ভেবে মিনিটখানেক ধরে থেমে থেকে হল্লাটা শুনলে। তারপর আবার নদীর দিকে চলতে শুরু করলো।

পিটার ও বান্টি পরিষ্কার লক্ষ্য করছে বাঘ এগুচ্ছে। বাঘ শিকারে হাতে-খড়ি হয়নি ওদের কারো তখনও। ৩ নং মঞ্চে এ বিটে বান্টিই মুখ্য শিকারী। পিটার এ ক্ষেত্রে নিছক তার দেহরক্ষী। যদিও দায়িত্বটা কিন্তু তার নিছক মামুলী নয়।

বাঘ ও ওদের মধ্যবর্তী দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। তবুও পরম নিষ্ঠাভরে ওরা জিম করবেটের উপদেশটা স্মরণে রেখেছে। বন্য পরিবেশে বান্টি এই প্রথম বাঘ দেখছে। দু চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি নিবদ্ধ তার কালো-হলুদে চিত্রিত এই মহাপরাক্রমশালী পশুটির দিকে। কিন্তু তার সম্মুখ পদক্ষেপের করবেট নির্ধারিত শেষ সীমাটি কোথায়? মুহূর্তের জন্য বান্টি গেম-ট্র্যাক বরাবর দৃষ্টি নামিয়ে এনে করবেটের নিজের হাতের রাখা নিশানাটা একবার দেখে নিলে। রাইফেল উদ্যত, ট্রিগারেও আঙুলের স্পর্শ।

বাঘের গলায় গুলি করাই ছিল করবেটের উপদেশ। কিন্তু বাঘ এগুচ্ছে মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে। নিরুদ্বেগে পদচারণার সময় এটা বাঘের স্বভাব। তা হোক। কিন্তু এক্ষেত্রে বান্টির মুস্কিল হয়েছে ওভাবে এগুনোতে বাঘের গলা রাইফেলের নিশানায় আনা যাচ্ছে না। এবং বান্টির বিবেচনায় করবেটের রাখা চিহ্ন পর্যন্ত আসার মধ্যে বাঘের গলা রাইফেলের লক্ষ্যে আনা যাবেও না। নবীশ শিকারী হলেও বুদ্ধিমতী বান্টি বেশ বুঝতে পারছে বাঘকে বেশী কাছে এগুতে দেওয়া বিপজ্জনক হবে বলেই করবেট হিসেব করে দূরত্বের শেষ সীমা বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন।

এখন প্রতিটি মুহূর্তই জরুরী। দৈহিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এ-ক্ষেত্রে বাঘের বুকটাই রাইফেলের নিরিখে আনা সহজ। বান্টি তাই করলে, এবং রাইফেল স্থিরবদ্ধ রেখে বাঘকে করবেটের রাখা সেই শুকনো কাঠির সীমা-রেখা পর্যন্ত পৌঁছুনোর সুযোগ দিল।

বাঘ বেশ আমেরী চালেই হেঁটে আসছে। প্রতিদিনের চলাফেরার পথের সব কিছুই তার ভালভাবে চেনা। এর মধ্যে নতুন কিছু নজরে এলে সন্দিগ্ধ-চেতা সে সেপথ এড়িয়ে যাবেই। এমনই সতর্ক সে।

জিম করবেটও তার চাইতে কম সতর্ক নন। তাই নিজের পদচিহ্ন যাতে চোখে না পড়ে এইভাবে পাশ কাটিয়ে এসে, অন্য কিছু নয়, জংগলেরই একটি শুকনো কাঠি গেম-ট্র্যাকে রেখে গিয়েছিলেন যাতে বাঘের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক না ঘটে। বাঘ সেই নির্দিষ্ট চিহ্ন পর্যন্ত পৌঁছুতেই বান্টির রাইফেল গর্জে উঠলো 'গুডুম'।

অতি শক্তিশালী রাইফেল বান্টির হাতে। তার বিদ্যুৎগতি বুলেটের আঘাত অনুভব করার আগেই বাঘ চোখ তুলে চেয়েই দেখে নিয়েছে শত্রুর অবস্থান-স্থল। পরমুহূর্তে গাঁক করে একটি ডাক ছেড়ে উল্কাবেগে ছুটে গেল সে ৩ নং মঞ্চ লক্ষ্য করে। চোখের নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে যাওয়ায় বান্টি আর প্রথম গুলির পিঠ পিঠ দ্বিতীয় গুলির সুযোগ পেল না।

জোয়ান সতর্ক হয়েই বসেছিল ৪ নং মঞ্চে। বিটারদের হল্লা শুনে সে প্রথম থেকেই নজর রেখেছিল সামনের দিকে। কিন্তু মাত্র ছ ফুট উঁচু ৩ নং মঞ্চে উপবিষ্ট ছোট বোন বান্টির জন্য নিরাপত্তামূলক করবেটের উপদেশ জোয়ান ভোলে নি। তাই ত্রিশ গজ দূরে বসে সামনের দিকে বান্টির রাইফেল উদ্যত হতে দেখেই জোয়ান বুঝে নিয়েছিল বাঘ বেরিয়েছে এবং বান্টির দিকেই এগুচ্ছে। তাই উদ্বিগ্ন চিত্তে নিজের গুলিভরা রাইফেলকে সে এমন পজিশনে রেখেছিল যাতে জরুরী প্রয়োজনে সে মুহূর্তমধ্যে ওদিকে লক্ষ্যবদ্ধ করতে পারে।

বান্টির প্রথম গুলি ও পরক্ষণেই বাঘের গর্জন কানে আসতেই জোয়ান বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে দেখে নিমেষের মধ্যে বাঘ ৩ নং মঞ্চের নীচে পৌঁছে গেছে, এবং পেছনের দুপায়ে দাঁড়িয়ে সামনের পায়ের বিস্ফারিত নখে আঁকড়ে ধরে তলার দিক থেকে শিকারী সমেত মঞ্চটিকে টেনে মাটিতে নামিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। আর উপরে দাঁড়িয়ে বান্টি ও পিটার মাচানের ডাণ্ডাগুলোর ফাঁক দিয়ে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে বাঘকে গুলি করার চেষ্টা করছে।

কি লোমহর্ষক পরিস্থিতি। আর এক মুহূর্তের বিলম্বে বান্টি ও পিটারের জীবন সংশয় অবধারিত। স্থির লক্ষ্যে জোয়ান তার ত্রিশ গজ দূরের মাচান থেকে পাঁজরে গুলি করে বাঘকে মাটিতে পেড়ে ফেললে এবং ঐ অবস্থায় আরও একটি গুলির আঘাত হানলে তার ওপর।

জোয়ানের দ্বিতীয় গুলি খেয়ে একটু দম নিয়ে বাঘ যে জংগল থেকে এসেছিল সেই জংগলের দিকেই আবার পালাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু সম্ভব হল না। পথিমধ্যেই বান্টি বাঘের মাথার পেছন দিক দিয়ে একটি গুলি মেরে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

যতই শক্তিশালী, ক্ষিপ্রগতি ও প্রতি-হিংসাপরায়ণ হোক না কেন বাঘ তার জানোয়ারী বুদ্ধির দোষে অনেক সময় নিজে মরে ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ বাঁচে। নইলে আলোচ্য ক্ষেত্রে মাত্র ছ'ফুট উঁচু মাচার উপরে সে পাশ থেকেই আক্রমে উঠে গিয়ে শিকারীদের হত্যা করতে পারতো, এবং সুযোগ বাঘের এত অনুকূল ছিল যে সে হত্যাকাণ্ড হয়ত জোয়ানের গুলিতেও রোধ করা যেত না। নিজে মরবার আগে সে শিকারীদেরও মেরে যেত।

অনেক কারণেই জিম করবেটের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। প্রথমত ভাইসরয়ের মত মহামান্য অতিথির শিকার প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপক ও উপদেষ্টা হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দ্বিতীয়ত সমস্ত শিকার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে ষোল আনা সফলতায় সম্পন্ন হওয়া গর্বের ব্যাপার বৈকি। তৃতীয়ত বান্টির মত শিকারে নবীশ বালিকার সাহস ও স্থিরলক্ষ্য ও তার দিদি জোয়ানের মত ধীরমস্তিষ্ক, দায়িত্ব-জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি, সর্বোপরি পিটারসহ ওদের তিনজনেরই আত্ম-বিশ্বাস, উপদেশনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাপরায়ণ-তার দৃষ্টান্ত অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। অন্য দিক দিয়ে নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত পরিকল্পনার ফলে যে জীবনহানির দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল, ঘটলে পর তা জিম করবেটের ক্ষেত্রে গভীর অনুতাপে ভরা আজীবনের ফল্গুধারায়ক ট্রাজেডি হয়েই থাকতো।

কিন্তু একথা সর্বজনবিদিত যে জিম করবেটের মত দায়িত্বশীল ও দরদী শিকারী আজ পর্যন্ত কমই দেখা গেছে। নরখাদক বাঘের হাত থেকে নিরস্ত্র, অসহায় অরণ্যপল্লীর দরিদ্র অধিবাসী-দের রক্ষার জন্য তিনি যে নিরলস কষ্ট-সাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না।

অতুলনীয় অভিজ্ঞতা ও অগাধ আত্ম-বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন করবেট। নরখাদক বাঘের পেছনে অনেকদিন হাতে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত

ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, একলা ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়। সহযোগিতা বা সাহায্য অপরিহার্য হলে নিষেছেন তা যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই, অতি সতর্কতা সহকারে। বিপজ্জনক বন-পরিক্রমা বা বাঘের খোঁজে অপরকে উপযাচক হয়ে টেনে আনেননি তিনি কখনও আপন স্বার্থে বা খেয়ালে।

সাংসারিক জীবনে সমাজসেবামূলক কাজে অর্থ, সময় ও শ্রম দানের নজীর যথেষ্টই মেলে। কিন্তু হিংস্র ও দুর্ধর্ষ মানুষখেকো বাঘের দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ দৌরাত্ম্য থেকে দুরধিগম্য উপদ্রুত এলাকার মানুষকে বাঁচাবার জন্য আত্মত্যাগের প্রবণতার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে একান্তই বিরল। বিরল বলেই জিম করবেটের সে দৃষ্টান্তকে স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক করে রাখবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণমূলক জাতীয় উদ্যান হিসাবে উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত 'করবেট ন্যাশন্যাল পার্ক'।

অ্যাডভেঞ্চার বা রোমাঞ্চপ্রিয় দুঃসাহসী লোক সমাজে বহু মেলে। কিন্তু নাওয়া খাওয়া নেই, সুস্থ অসুস্থতার ভাবনা নেই বুভুক্ষিত জানোয়ারের ক্ষয়ক্ষতির পরোয়া নেই—একমাত্র ধ্যানজ্ঞান নরখাদকের নিধন, পরের জন্য এরকম মারাত্মক ও বিস্ময়কর অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তার ঝোঁক হয়ত একমাত্র জিম করবেটের চরিত্রেই স্বাভাবিক ছিল। তাইতো বলা যায়—চম্পাবতের মানুষখেকো শিকারে প্রবৃত্ত হয়ে করবেট স্বইচ্ছায় জীবন-মৃত্যুর যে খেলায় মেতেছিলেন অন্য যে কোন সখের শিকারীর কাছে তা দুঃস্বপ্নের মতই মনে হবে।

কারণ চম্পাবতের মানুষখেকোর বেপরোয়া হালচালের যে খবরাখবর সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল সে যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে। নেপালে দুশো মানুষ সাবাড় করার পর তাড়া খেয়ে সে এসে ঢোকে কুমায়ুনের জঙ্গলে।

অফুরন্ত স্বাভাবিক খাদ্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও নরমাংসে তার বিন্দুমাত্র বিতৃষ্ণা ছিল না। তাই কুমায়ুনে ঢুকে সে নিশ্চেষ্ট বসে রইল না। একটার পর একটা মানুষ মেরে সংখ্যা শতকের ঘরে এনে দাঁড় করালে। অরণ্য-পল্লীর অধিবাসীরা দিশেহারা, সরকারও উদ্বিগ্ন ও বিব্রত।

মিলিটারী কাইদাকানুনধারী শিকারীরা হেঁদো বাঘ মারতে। জানোয়ার জানোয়ার তথাকথিত বিশেষজ্ঞ-শিকারী অভিযানে নামলেন। কিন্তু কিছুতে কিছু হোল না। পরিস্থিতি যে কে সেই।

জিম করবেটের কর্মস্থল ছিল সুদূর মোকামায়। নৈনীতালেও বাড়ী ছিল। ভগ্নী থাকতেন সেখানে। বন্যজন্তুতে ঠাসা অকর্ষণীয় শিকার এলাকা। সর্বদা হাতছানি দিয়ে ডাকতো করবেটকে। করবেটও ফাঁক পেলেই ছুটে যেতেন। কারণ শিকারপ্রিয় উপাসনী মনটি যেন তাঁর সর্বদা উসখুস করতো মোকামায়। তাছাড়া মানুষখেকো সামলানোর আহ্বান তো আসতোই মধ্যে মধ্যে।

চম্পাবতের মানুষখেকোটির পেছনে শিকারী লেগেছে খবর ছিল। জানোয়ার শিকারী। কাজেই বাঘটার আয়ুও শেষ হয়ে এসেছে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু চার বছর পরও নৈনীতালে ফিরে করবেট শুনলেন জানোয়ারটা তখনও মরেনি। বরং ভয়ে ভাবনায় সরকারী ও বেসরকারী মহলকে সর্বক্ষণের জন্য আড়ষ্ট করেই রেখেছে।

করবেট ফিরেছেন খবর পেয়ে উপায়ান্তর না দেখে নৈনীতালের ডেপুটি কমিশনার বার্থুড সাহেব যেদিন করবেটের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, চম্পাবতের নরখাদকের হাতে কুমায়ুনের

মানুষ হত্যার সংখ্যা তার আগেই দুশো চৌত্রিশে এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ নেপাল ও কুমায়ুন মিলে সর্বসাকুল্যে চারশো চৌত্রিশ। কি ভয়াবহ পরিস্থিতি।

ডেপুটি কমিশনারের অনুরোধে করবেট নরখাদকটির নিধনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন দুটি শর্তে। প্রথমত আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। কারণ আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন যে কোন শিকারীর কাছে ওটা অপমানের। দ্বিতীয়ত এই এলাকায় একাধিক শিকারীর টহলদারিতে সেম-সাইডের ভয় আছে। কাজেই অন্য শিকারীদের সরিয়ে নিতে হবে। দুটি শর্তই সরকার মেনে নিলেন ও সেই-মত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

বার্থউড সাহেবকে করবেট অনুরোধ করলেন পরবর্তী মানুষ মারার খবরটি যেন স্থানকালসহ যথাসময়ে জানানো হয়।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই খবর এলো দাবিধুরা এবং ধুনাঘাটের মাঝে পালি নামে একটি গ্রামে একটি মেয়ে বাঘের হাতে মারা পড়েছে।

কুমায়ুনের পাহাড়ী এলাকার অভ্যন্তরে পল্লীঅঞ্চলে যেতে হলে পায়ে হেঁটে ছাড়া উপায় নেই। বার্থউড সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দেবার পর থেকে করবেট তাই ক্যাম্পের মালবাহক সব ঠিক করে সর্বক্ষণের জন্য তৈরী হয়েই থাকতেন।

নৈনীতালে খবর পৌঁছুতে লেগেছিল দুদিন। তৃতীয় দিন ভোরে রওনা হয়ে পথে দু রাত্রির জন্য যাত্রাবিরতি করে তৃতীয় দিনের দিন অর্থাৎ মেয়েটি মারা যাওয়ার পাঁচদিনের মাথায় করবেট পালি গ্রামে পৌঁছে গেলেন।

গ্রামটির বাসিন্দা সব বয়সের স্ত্রী-পুরুষ মিলে জনা পঞ্চাশেক হবে। করবেট যখন পৌঁছলেন তখনও গাছের মাথায় রোদ আছে। কিন্তু গ্রাম জনশূন্য। ব্যাপার কি? ব্যাপার আর কিছুই নয়। বাঘের ভয়ে সবাই বেলাবেলি ঘরের দরজা বন্ধ করেছে।

গত কয়েকদিন ধরে বাঘের ভয়ে কেউ বাড়ীর বার হয়নি। এমনকি প্রাতঃকৃত্যাদিও ঘরের উঠোনে করে চত্বরটিকে কলুষিতময় করে ফেলেছে। এ থেকেই বোঝা যায় তারা কি সাংঘাতিক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। অনশনে থাকবার মত অবস্থা।

দূর দূরান্তরের অরণ্যপল্লীর সংস্কারান্ধ অশিক্ষিত অধিবাসীরা বিপজ্জনক বন্যপ্রাণীর দৌরাত্ম্যকে তাদের অদৃষ্টের লিখন বলেই মনে করে। দেশে যে একটা সরকার আছে এবং সে সরকারের আইনগত দায়িত্বও আছে সকল মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার, অতশত ব্যাপার-স্যাপার তলিয়ে বুঝবার মত জ্ঞানগম্যি নেই ওদের। বড় জোর লোকের মুখে মুখে শহরে একটা খবর পাঠিয়ে দেবে ফলাফলের প্রত্যাশা না রেখেই। কোন সখের শিকারী বা শিকারপ্রিয় কোন সরকারী কর্মচারী দয়া করে এসে তাদের বিপদমুক্ত করলেন তো ভালই, নইলে দুর্ভাগারা ধীরে ধীরে অনাহারে বা অপঘাতে জীবন দিয়ে রেহাই পাবে। যেকালের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে তখন বনবাসী পশ্চাদপদ শ্রেণীর মানুষের আত্মচেতনা বোধ ঐ পর্যায়েই ছিল।

পালিগ্রামের বাসিন্দারা এতটা কল্পনা করেনি যে একজন সাহেব শিকারী স্বয়ং তাদের গ্রামে এসে আস্তানা গাড়বেন। তাই ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে সাহস পেয়ে একে একে তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

গ্রামবাসীদের কাছ থেকে যতটা খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হোল তাতে বোঝা গেল বাঘ এখনও গ্রামের আশপাশে ঘোরাঘুরি করছে। গত তিন রাত গৃহস্থবাড়ীর একশ গজের মধ্যে তার ডাক শোনা গেছে। এমন কি ঐ দিনই নিকটবর্তী ফসলের ক্ষেতে সে পায়চারি করে বেড়িয়েছে। হয়তো বা মানুষ শিকারের লোভে।

গ্রামের মোড়ল শিকারীসাহেবকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলো এবং তাঁর ব্যবহারের জন্য গ্রামের একটা ঘর ছেড়ে দিল। ঘরের একটি মাত্র দরজা পোবা উঠোনের দিকে এবং করবেটের তল্পিবাহকের সংখ্যাই কম করে আটজন। এই অবস্থায় তিনি ঠিক করলেন তাঁর লোকদের ব্যবহারের জন্য ঘরটা ছেড়ে দিয়ে নিজে রাতে কাটাবেন বাইরে। এবং করলেনও তাই।

মানুষখেকো বাঘের আশায় রাতের বেলায় খোলামেলা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে ঠায় বসে রাত কাটানো নিঃসন্দেহে এক মারাত্মক হঠকারিতা। আর এই হঠকারিতার জ্বালা জিম করবেট সারারাত ধরে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন।

বাঘটা নাকি পাশের রাস্তা দিয়েই যাওয়া-আসা করতো। শুক্লপক্ষের রাত্রি। দেখা পেলে চাঁদের আলোয় গুলি করার সুযোগ মিলতে পারে। তাই এই দুঃসাহসের বাড়াবাড়ি। ফলে জ্যোৎস্না রাতের আলোছায়ার খেলায় আশপাশে ওদ্দণ্ড বাঘের আচমকা আবির্ভাবের আতঙ্কে ভোর পর্যন্ত করবেটকে কনকনে ঠাণ্ডায় চরম অস্বস্তিতে সময় কাটাতে হোল।

বাঘের অপেক্ষায় বাইরে রাত কাটিয়েছেন করবেট এর আগেও।

মানুষের জন্য বুকভরা দরদ ছিল। তাইতো তাঁর মত একজন শহুরের শিকারীর পক্ষে নিজের জীবনের এত বড় ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, নরখাদক শিকারের উদ্দেশ্যে যে ঝুঁকি তিনি এর আগে আর কখনও নেন নি।

নিহত মেয়েটির সঙ্গীদের কাছ থেকে তার মৃত্যুকাহিনী উদ্ধার করা গেল।

সকালে দল বেঁধে বেরিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় মাইলটাক দূরে জঙ্গলে গিয়ে পাতা কাটবার জন্য ওরা গাছে চড়ে। মৃতা মেয়েটি তার দুজন সঙ্গীসহ চার ফুট গভীর একটি নালার ধারের পাতা কাটছিল। পাতা কাটা শেষ হলে ঐ মেয়েটিই আগে নামতে থাকে। এমন সময় নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বাঘ পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পা কামড়ে ধরে নালার মধ্যে টেনে নামায়। মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল তখন বাঘ পা ছেড়ে দিয়ে গলা কামড়ে ধরে তাকে মেরে ফেলে ও টেনে নিয়ে গিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢোকে। গাছের ওপরের সঙ্গী দুজনের চোখের সামনেই এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

বাঘ জঙ্গলে ঢুকলেই সুযোগ বুঝে অন্যান্য মেয়েরা ভীত বিহ্বল অবস্থায় ছুটে গ্রামে এসে ঘটনাটা বিবৃত করে। দুপুরের খাবার সময়। পুরুষরা সব কাজ থেকে ফিরেছে। খবর শুনে হৈ-হল্লা করতে করতে দল বেঁধে তারা সবাই চললো মৃতদেহ উদ্ধারে। ধারেকাছে যেতেই জঙ্গলের ভেতর থেকে বাঘ গর্জে উঠলো। গ্রামবাসীরা পড়ি কি মরি করে পালিয়ে এল জানের ভয়ে। গ্রামে ফিরে আবার জল্পনা, নিজেদের মধ্যে কমিটি-তমিটি, আবার দল বেঁধে উদ্ধার কার্যে এগুনো। আবারও বাঘের তাড়া খেয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

তৃতীয় দফায় একজন নিজের বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই বাঘ জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকায় তেড়ে এল। তারপর গ্রামবাসীদের আর সাহসে কুলোয় নি মৃতদেহের খোঁজে যেতে।

পৌঁছনর পরদিন সকালে করবেট কয়েক ঘন্টার জন্য জঙ্গল পরিক্রমায় বেরুলেন। খুব সন্তর্পণভাবে ইতস্তত চক্কর দিয়ে বেড়িয়েও বাঘের দেখা মিললো না।

গ্রামের মোড়ল নিবেদন পেশ করলে যে হুজুর যদি হাতিয়ার হাতে দয়া করে একটু পাহারায় থাকেন, তাহলে তাদের পক্ষে ক্ষেতের ফসলগুলো কেটে আনা সম্ভব হয়। করবেট রাজি হলেন এবং ফসলও প্রায় সব তোলা হোল। গ্রামটাও ইতিমধ্যে সাফসাফাই হয়ে গেল।

ক্যাম্পের জন্য মাংস সংগ্রহ করা দরকার। পাহাড়ের ঢালুতে টুকরো ঘাস জমিনগুলোতে প্রচুর 'ঘুরাল' (এক-জাতীয় পাহাড়ী ছাগল) চরতে নামে। মাংসের লোভ দেখিয়ে গ্রামের তিনজন লোক নিয়ে গিয়ে করবেট অল্প সময়ের মধ্যেই তিনটে ঘুরাল মেরে নিয়ে গ্রামে ফিরলেন। ক্যাম্পের প্রয়োজন মিটিয়েও গোটা গ্রামের ভোজের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

তিনটি ঘুরালকে করবেট এমন পাঁজিসনে পেয়েছিলেন যে গুলির চোটে তিনটেই মরে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে তাঁর পায়ের কাছে একই স্থানে এসে জমা হোল। ব্যাপারটায় গ্রামবাসী সঙ্গী তিন ব্যক্তির তো তাক লেগে গেল। তাদের বিবেচনায় একমাত্র অলৌকিক শক্তি ছাড়া এরূপ অব্যর্থ গুলি চালিয়ে জানোয়ার মেরে সব কটিকে একসঙ্গে একই স্থানে এনে জড়ো করে ফেলা যে সে লোকের কম্ম নয়। ভাস্কর ব্যাপারটা তারা গ্রামে এসে খুব জমিয়েই গল্প করলো। ফলে করবেটের খুব সুবিধেই হোল।

সংশ্লিষ্ট জঙ্গল এলাকাটা করবেটের বিন্দুমাত্র চেনা নয়। গ্রামবাসীদের সাহায্য ছাড়া এই এলাকায় বাঘের তল্লাসী চালানো অসম্ভব। যাদু বলে ঘুরাল শিকারের পর সাহেব-শিকারীটির হাতে ও হাতিয়ারের ওপর গ্রামবাসীদের অগাধ বিশ্বাস এসেছে এবং তারা সকলেই এখন সাহেবের তল্লাসীর কাজে সঙ্গী হতে রাজি বলে মোড়ল জানালো। রাজি যখন আছে তখন দেরী না করে করবেট দুপুরে খাবার পরই, বেশী নয়, ঘুরাল শিকারের সঙ্গী তিনজনের মধ্য থেকে দুজনকে নিয়ে জঙ্গল পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়লেন।

চোখ কান খোলা থাকলে দেখা ও শোনার মাধ্যমে জঙ্গলকে পড়া যায়। শৈশব থেকেই কৌতূহলী করবেট জঙ্গলের সেই পাঠে অভ্যস্ত—যে পাঠে তাঁর আজীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে অভূতপূর্ব রূপে সমৃদ্ধ করেছিল।

নিহত মেয়েটির সঙ্গীদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা গিয়েছিল সেগুলি যাচাই করা এবং তার চাইতে অনেক খাঁটি খবর সংগ্রহ করার প্রয়োজনে করবেট প্রথমে গেলেন ঘটনাস্থলের সেই গাছটির তলায়। মিহি ধুলোর ওপর পুরনো পায়ের দাগ বিশ্লেষণে প্রমাণ হোল সেটি ছিল একটি বাঘিনী এবং আকারে মধ্যম বয়সের চাইতে কিছুটা বড়ই হবে। অন্যান্য সূত্র থেকে এও আবিষ্কৃত হোল যে বাঘিনীটি দশ গজ দূরের একটি বোল্ডারের আড়ালে ওৎ পেতে ছিল মেয়েটির নামার অপেক্ষায়। তারপর সুযোগ বুঝে গুঁড়ি মেরে এসে মেয়েটিকে ধরে। হতভাগিনী বাঁচবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারে নি।

রক্তের দাগ অনুসরণ করে করবেট জঙ্গলে ঢুকে, বাঘ মেয়েটিকে যেখানে খেয়েছে সেখানে পৌঁছুলেন। দেহাবশেষ বলতে কয়েক টুকরো হাড় ও রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। সৎকারের জন্য সঙ্গীরা তাই কুড়িয়ে নিয়ে গ্রামে ফিরল।

আর একটি ঘটনাস্থল করবেট পর্যবেক্ষণ করলেন। একটি অতি দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী তার বড় বোনকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে ঘাস কাটতে যায়। এমন সময় আচমকা বাঘ এসে বড় বোনটিকে মুখে করে নিয়ে পালাতে থাকে। ছোট বোন কাস্তে বাগিয়ে ছোটে বাঘের পেছনে। মুখে তার আকুল আর্তনাদ—'বাঘ যেন দয়া করে তার বোনকে ছেড়ে দিয়ে তাকেই নিয়ে যায়।'

বাঘও তার আকুলতায় বুঝি সাড়া দিয়েছিল। তাই না শতখানেক গজ গিয়ে শিকার মাটিতে রেখে ফিরলো সে ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ধরবার উদ্দেশ্যে। মেয়েটি ততক্ষণে ফিরে দৌড়চ্ছে গ্রামে খবর দেবার জন্য। ঘটনাটা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যে দল বেঁধে এগুলো সাহায্যে। বাঘ পিছু হটলো তার প্রথম শিকার মুখে করে। কিন্তু ভীত বিহ্বল ছোট বোনটি এদিকে অসহনীয় মর্মজ্বালায় বাকশক্তি হারিয়ে বোবা হয়ে গেল। ঘটনাটা বছর খানেক আগেকার। ব্যথাভরা চাহনি ছাড়া সব দিক দিয়ে সুস্থ মনে হলেও বাকশক্তি তার আড়ষ্ট হয়েছিল তখনও।

করবেট মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলেন এবং বললেন—তার দিদির হত্যাকারী বাঘটিকে মারবার জন্যই তিনি এসেছেন। শুনে আনত মস্তকে প্রণাম করল সে।

ওটা ছিল তাড়া খাওয়া শেয়ানা বাঘ। তাই হয়ত সে একস্থানে একাধিকবার মানুষ মারে না, একবার বই ভুক্তাবশিষ্ট মৃতদেহে সে দ্বিতীয়বার মুখ দেয় না। সর্বোপরি তার দৌরাত্ম্যভূমির চৌহদ্দি ছিল বহু মাইল বিস্তৃত। এ হেন বাঘকে 'মারতে এসেছি' কথাটা কারো কাছে বলা যেন নিজেকে নিজের প্রবঞ্চনা করারই সামিল।

তা সত্ত্বেও একথা বলা হয়ত অন্যায় হবে না যে বাঘ যত চতুর নরখাদকই হোক না কেন, সে তার কুকীর্তি ও লুকোচুরির কম বেশী এমন অনেক চিহ্ন অনেক সময় রেখে যায় যা থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তি এবং সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার মাধ্যমে তাকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। এর যথার্থতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হচ্ছে নিষ্ঠাবান প্রকৃতিবিজ্ঞানী জিম করবেটের অতুলনীয় শিকারপাণ্ডিত্য এবং তাঁর কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী।

করবেটের শিকার চাতুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা সেই সময় রটে গিয়েছিল যে তিনি নাকি পাহাড়ী মেয়েছেলের পোশাক পরে বাঘকে আকৃষ্ট করে কাস্তে কুড়ুল দিয়েই হত্যা করতেন। করবেটই বলেছেন—এটা নেহাৎই গুজব। তবে তিনি শাড়ী পরে পাতা কাটতে গাছে উঠে বা ঘাস কাটতে জমিতে নেমে বাঘকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। দুবার মাত্র বাঘ পাথর বা কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখে গেছে। কিন্তু কখনও গুলি করার সুযোগ হয়নি।

পালিগ্রামে অযথা আর বসে থেকে লাভ নেই বুঝে করবেট ক্যাম্প তুলে নিয়ে মাইল পনেরো দূরে চম্পাবতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বাঘের ভয়ে এ অঞ্চলের লোক দল বেঁধেই পথ চলতো। পথের মধ্যে ধুনাঘাট নামক গ্রামটি পেরিয়ে যাবার পর বহু পথচারী শিকারী দলের সঙ্গী হওয়ায় দল বেশ ভারীই হোল। এদের মধ্যে কয়েকজন মাস দুয়েক আগে চম্পাবতে যাবার পথে একটা মর্মান্তিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। ঘটনাটা এই রকম—

চম্পাবতের যাস্তাটা পাহাড়তলীর পঞ্চাশ গজ উপরে পাহাড়ের দক্ষিণ পিঠ বরাবর গিয়েছে। ওরা জনা কুড়ি লোক চম্পাবতের বাজারে যাচ্ছিল। দুপুর নাগাদ পাহাড়তলীর দিক থেকে একটি মানুষের আর্তনাদ ক্রমশ উপরের দিকে আসছে শুনে ওরা ভয়ে আড়ালে অস্ত্রগোপন করে এবং ব্যাপারটার দিকে নজর রাখে। একটু পরেই দেখা গেল একটা বাঘ একটি মেয়েছেলের নগ্ন দেহ মুখে করে ঝুলিয়ে আনছে। বাঘ মেয়েটির পিঠ কামড়ে ধরেছিল—আর হতভাগিনী করুণ আর্তনাদে বুক চাপড়ে মানুষ ও ভগবানের কাছে সাহায্য চাইছিল। বাঘটা কিছুদূরে থেকে ভীতবিহ্বল লোকগুলির সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকগুলো মেয়েটির সাহায্যে এগুলো না—এমনই কাপুরুষ তারা। ওদের মানবিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা শুনে করবেট তাজ্জব বনে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ছবি ॥

মৃণাল বসুচৌধুরী

অনুগত শীর্ণ হাত
বিচ্ছিন্ন বালিশ ছিঁড়ে
সংগোপন বুকের বাড়ায়
পড়ে থাকে হালে বাঁধা গরু
পূর্ণিমায়
পঙ্গু হওয়া চাষীর দুহাত
নিভৃতে শুকোয় মাটি
আলগা সুতোর টানে
ভিড় করে ভিখারিরা
নিরুপায় তর্জনী কাঁপিয়ে
অভিশাপে বিদ্ধ করে মেঘ
ক্ষোভহীন
নিস্পৃহ শৈশব থেকে
ফিরে আসে পল্লীনি
জলে ঝড়ে
নষ্টপ্রায় বারুদের গুঁড়ো
আর
অবজ্ঞায়
তুলোর পোশাক পরা
শেষ তোলা ছবি

অরণ্য-শিকড় ॥

অজিত বাইরী

আর দ্যাখো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল
প্রতিটি মুখ প্রাত্যহিক পরিবর্তনে হয়ে যাচ্ছে দুর্ভেদ্য অন্ধকার;
জলপাত্র তুলে নিতে গিয়ে ভুলক্রমে তুলে নিচ্ছে
এক একটা বোবা পাথরের চাঙড়; মসৃণ
রাস্তা ভেবে যেদিকেই যেতে চায় লতার সাঁকো
ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত খাদ, গভীর বিবর;
জীবনের সহজ সমাধান সে চেয়েছিলো, সে
ভেবেছিলো সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের নিয়মে মেলাবেই উত্তর.
অথচ এই যে দেশ, দেশের মাটি
মানুষজন ঘনিষ্ঠ লোকালয় বসত
রাস্তা ঘাট, নগর বন্দর অজস্র ক্ষেত ও খামার
কার জন্য এ-সব, যদি বুকের নিচে নামে অরণ্য-শিকড়।

ভরা কোটাল, মরা কোটাল ॥

শোভন পাঠক

হাঁটুজলে আছাড়-পিছাড়
সারাজীবন কাটলি সাঁতার—
সাবধানে, ভয় কখন ভেঙে চুর—
মাঝ-দরিয়ায় দামাল স্রোতে
ঝাঁপ দিলি না; ভোর না-হতে
সোহাগাটগর কুঁড়িতে নির্মূল।

ঘাট বাছতেই ভরা বয়েস
কাটলো; পথের ঘরকুনো রেশ
মাড়িয়ে যেতে জোয়ার জলের টান
মন্দা হলো; আলসে ভাটা
আস্তে ছুঁলি ডুবিয়ে পা-টা
করবি কবে অবগাহন স্নান?

ওঠ, কন্যে, ডাঙায় তবে
ঘাটে বসেই গুনতে হবে
আবার কবে কোটাল হবে ভরা,
ঘুণধরা বুকে স্বপ্ন পাঁজর
খুশির আলোয় চমকাবে তোর—
সেদিন না হয় সাজবি স্বয়ম্বরা।

সত্য অথচ রূপকথা

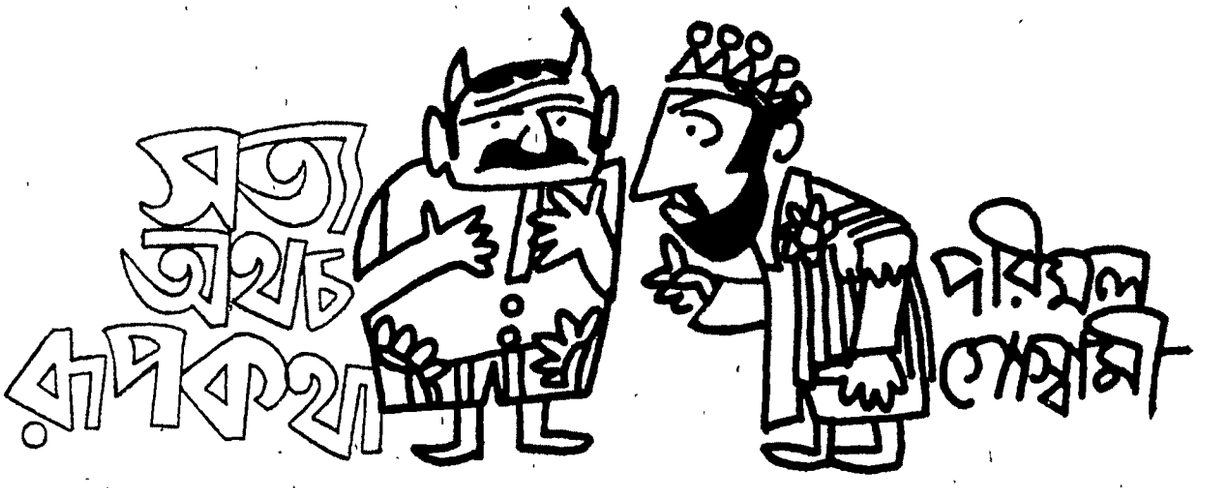

স্থানটি স্বর্গও নয় নরকও নয় (কারণ স্বর্গে থাকেন পুণ্যবানেরা এবং নরকে থাকেন নরাধমেরা), এটি একটি আমাদের অপরিচিত গ্রহ। পৃথিবী থেকে সাত লক্ষ মাইল দূরে এর অবস্থান। গ্রহটি আমাদের অপরিচিত, কারণ আমাদের চোখে এটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার মানুষেরাও তাই। ওরা এই গ্রহের নাম দিয়েছে অপগ্রহ (গ্রহ আর উপগ্রহের মাঝামাঝি)। এদের রাজার নাম অপরাজা, মন্ত্রীর নাম অপ-মন্ত্রী। এরা আমাদের মতোই দেখতে, তফাৎ শুধু এই যে, এদের মাথায় ছোট ছোট দুটি করে শিং আছে, যদিও তা চুলের আড়ালে ঢাকা থাকে। মেয়েদের শিং নেই।

কিন্তু এরা সবাই আমাদের পৃথিবীর মানুষদের ঘৃণা করে। হেতু—পপুলেশন এক্সপ্লোশন, স্থানাভাব ঘটছে দ্রুত। তাই ওদের ইচ্ছা, আমাদের ধাপে ধাপে ধ্বংস করে, আমাদের নিশ্চিহ্ন করে এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করে। ধ্বংসের কাজে ওদের বহু কর্মী নিযুক্ত আছে। সব দেশেই ওদের কাজ চলছে, অ্যামেরিকায় চলছে সবচেয়ে বেশি, আমাদের দেশে ঠিক তার পরেই। এই ধ্বংসের কাজটি খুব কৌশলপূর্ণ, সোজাসুজি সরল পথে নয়। ওরা মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের এমন সব কাজে প্রবৃত্ত করায় যাতে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে মানুষরা নিজে-দের ধ্বংস নিজেরাই করছে। ওদের দিক থেকে একটা মস্তবড় সুবিধা হয়েছে এই যে, আমাদের গ্রহ ও ওদের অপগ্রহ একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে সূর্যের প্রতিপালিত সন্তানরূপে, এবং ওদের বায়ুমণ্ডল, আর আমাদের বায়ুমণ্ডল এক, প্রাণের বিবর্তন-ধারাও এক। অতিরিক্ত সুবিধা—ওরা আমাদের চোখে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

ওদের সেই অপগ্রহের একটি দৃশ্য বর্ণনা করছি আগে, তাতে ব্যাপারটা অনেকখানি স্পষ্ট হবে। একটা বিষম কোঁদল চলছিল বাংলাদেশ ধ্বংসে নিযুক্ত কর্মীদের বৌদের মধ্যে। তাদের স্বামীরা যথাকর্তব্য করে ফিরে এসেছে অপগ্রহে, তাদের কৃতিবিচার হবে রাজদরবারে, কিন্তু তার আগে তাদের বৌদের মধ্যে ছোটখাটো একটা (প্রাইভেট লিমিটেড) ঘরোয়া আলোচনা-সভা বসে-ছিল। কিন্তু প্রথমে ভালভাবে কথা আরম্ভ হতে না হতে ঈর্ষা হঠাৎ এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল যে, ওরা নিজেদের আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। ওদের ভাষা সামান্য অমার্জিত, এবং সে ভাষা বাংলা ভাষা নয়। আমি যতদূর সম্ভব তার বাংলা করে শোনাচ্ছি। শুনলে অনেকটা আমাদের দেশের অনুকরণ বলেই মনে হবে। কার স্বামী কত বেশি ভাল কাজ করেছে তাই নিয়ে ঝগড়া।

একজন বলছে, রেখে দে তোর সোয়ামীর কথা। ভারী তো লাউড স্পীকারের আওয়াজ। ওতে ছোটদের মাথা খাওয়া হয়, বড়রা আধমরা হয়, কিন্তু তাতে মানুষ তখন-তখন ধ্বংস হয় কটা? বিকট আওয়াজের ফল ফলতে অনেক দেরি হয়। আর আমার সোয়ামী—

আরে রেখে দে তোর সোয়ামীর কথা। লাউড স্পীকারে মানুষের আয়ু কমে, তার কাছে আর কিছু লাগেই না। আমার উনি বাংলাদেশের কত মানুষের মনে ঢুকে এই ধ্বংসের কাজ আরম্ভ করেছেন, তোর তা ধারণাই হবে না। ছেলেদের অসভ্য বানাচ্ছেন, এ কি কম কথা? বড়রা যে কত পাগল হয়ে গেছে তা জানিস?

আর একজন বলল, ওলো তোর গলাটাই তো দেখেছি লাউড স্পীকারকে হার মানায়। কিন্তু বিস্তর চেঁচালেই হয় না। আমার উনি ছোটদের পাঠ্যপুস্তক লেখকদের মাথায় ঢুকে যা সব বই লেখাচ্ছেন না, তাতে লেখাপড়ার একেবারে গোড়ায় কোপ মারা হচ্ছে। ক্রমে তারা গুণ্ডিতে বাড়ছে আর লেখাপড়া ভুলে পরীক্ষায় নকল করছে। ওলো, লাউড স্পীকারের বৌ, দেশ কিসে বেশি অসভ্য হচ্ছে, তুই কি তা বুঝতে পারবি?

আর এক বৌ বলল, তোদের কথায় হেসে বাঁচিনে, বলে আধমিনিট ধরে হাসল। তার-পর বলল, আমার উনি যা করেছেন তা শুনলে হাঁ হয়ে যাবি। উনি করপোরেশনে ঢুকে এমন গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছেন যে, সমস্ত কলকাতা শহর আবর্জনার দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে। মানুষ মরছে কত কলেরা বসন্তে। এটা একটা জবরদস্ত কাজ। তার উপর আবার নতুন করে ম্যালেরিয়ার মশা এসে পড়েছে শহরে, সেও তো আমার কর্তাই এনেছেন।

আর এক বৌ এ কথায় দপ করে জ্বলে উঠল। বলল, আমার সোয়ামী দেখ গিয়ে কত লোককে ডাকাত বানিয়েছে ওখানে। রাত্তির দিন ডাকাতি হচ্ছে, রেলকামরায়, পথে, ঘাটে, বাড়িতে। আতঙ্কে মানুষের টাকা নিয়ে পথে চলা কঠিন হয়েছে, আতঙ্কে আয়ু কমে যাচ্ছে। দেখিস এই ডাকাতদেরই রাজত্ব হবে সেখানে।

আর এক বৌ বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, ওলো, ডাকাতির মন্তব-দেওয়া মিনষের বৌ, তুই বিস্তর চেঁচাসনে। বলল আমার সোয়ামী সমস্ত দেশে লাখ লাখ ভেজালদার বানিয়েছে। ভেজাল আর নকলের কাছে ওসব কেরামতি কিছুই না। একটা জাতকে গোল্লায় দিতে এর কাছে আর কিছু লাগে? বুঝে দেখ কথাটা।

চুরি-উৎকানিদাতার বৌ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, চুলোয় যাক তোদের ডাকাতি আর ভেজাল নকল। চুরির কাছে ওসব খড়কুটো। চুরি হল গিয়ে একটা উঁচুদরের শিল্পকাজ। ও তোদের বোমাবন্দুক নিয়ে হামলা করাও নয়, কারখানা খুলে ভেজাল মেশানোও নয়, নকল করাও নয়। তোরা যে যা বললি, ভেবে দেখ, সমস্তের মূলে আছে চুরি। চুরি হচ্ছে রাজা, আর এরা সব প্রজা। চুরি হচ্ছে হাওয়া। আর ভেজাল, নকল, জাল, জোচ্চুরি লাউড স্পীকার, ভুল পাঠ্যপুস্তক লেখা—যাই বলিস, এরা সবাই ঐ চুরির হাওয়া নাকে টেনে তবে বেঁচে আছে।

কিন্তু এ কথায় সবাই মিলে একসঙ্গে এমন হল্লা করতে আরম্ভ করল যে, শেষ পর্যন্ত ঐ সঙ্গে হাতের ব্যবহারও আরম্ভ হয়ে গেল। ডাকাতি-গুরুর বউ-এর গলা আর সবার গলা ছাড়িয়ে উঠল, সে কেবলি বলতে লাগল চোরের মার বড় গলা, মাগীর অংকার দেখে আর বাঁচিনে, বলে তার চুল ধরে টেনে তাকে কত করার চেষ্টা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তুমুল লড়াই। মীমাংসা কিছুই হল না, শুধু প্রত্যেক বৌএর মাথার চুল কিছু কমে গেল মাত্র।

এদিকে রাজা সব রিপোর্ট শুনলেন কর্মীদের কাছ থেকে, কিন্তু তিনিও ধাঁধায় পড়ে গেলেন। অনেক চিন্তার পর মন্ত্রীকে বললেন, ওহে, এ তো বড় মুশকিলে পড়া গেল, চল পৃথিবীতে গিয়ে দেখাই যাক এদের কার দাবি কতটা সত্য। শুনে তো মনে হচ্ছে সবারই প্রথম হবার গুণ আছে, তাই নিজ চোখে একবার না দেখলে ভাল লাগছে না।

।। দুই ।।

ওঁরা এসেছেন পৃথিবীতে। এবং সোজা কলকাতা শহরে। মন্ত্রী এর আগে দু-একবার এসেছিলেন, পথঘাট তাঁর খুব পরিচিত। ওঁরা দিন সাতেক অনেকগুলি লোকাল ট্রেনে বেড়ালেন। এবং এই কদিনের মধ্যে পাঁচটি ট্রেন ডাকাতি প্রত্যক্ষ করলেন। রাজা তো দেখে ভীষণ মুগ্ধ। বললেন, এত সহজ কৌশলে এবং আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে এরা যাত্রীদের কাছ থেকে সব কেড়ে নেয়। কিছু বোমা দেখায়, ছোরা দেখায় পিস্তল দেখায় যাত্রীদের। বলে চেঁচিও না, যার কাছে যা আছে সব দিয়ে দাও। টাকা, অলঙ্কার, ঘড়ি এই সবের উপরেই ওদের লক্ষ্য। বয়স ওদের বেশি না, সবাই তরুণ যুবক। যাত্রীদের কাছ থেকে যা নেবার সব নিয়ে মাথার উপরের চেন টানে। গাড়ি তার ফলে থামবার জন্য গতি শিথিল করে, তখন ওরা সেই চলতি গাড়ি থেকে নেমে চলে যায় নিশ্চিন্ত মনে। ওরা চলে যাবার পর যাত্রীরা চেঁচাতে থাকে, কেউ বা কাঁদতে থাকে। ভারী ভাল লাগল। ওহে মন্ত্রী, এ বিভাগে বেশ ভাল কাজ হয়েছে কি বল?

মন্ত্রী বললেন, আরো দেখুন আগে। এ কাজ তো অবশ্যই ভাল, কিন্তু একটা তো নয়, সব দেখা দরকার।

রাজা বললেন সে তো ঠিক। চল তা হলে এর পর কি দেখাবে সেইখানে।।

ওঁরা এর পর একটু এগিয়ে যেতেই হঠাৎ এক বিয়েবাড়িতে এমন জোর লাউড স্পীকার বেজে উঠল যে, রাজা প্রায় দশ হাত লাফিয়ে উঠলেন শূন্যে। জিজ্ঞাসা করলেন এরই অংওয়াজ কি আমরা আমাদের গ্রহে বসে মাঝে মাঝে শুনতে পাই? মন্ত্রী বললেন, ঠিক তাই। বিয়ে বা কোনো উৎসবে আমাদের লোক এসে এদের মনে প্রবেশ করে এইভাবে প্রলুব্ধ করেছে—উৎসব উপলক্ষে যদি চারদিকের লোকদের কান ফাটানো যায় একমাত্র তা হলেই সবাই বুঝতে পারবে এরা শিক্ষিত না হলেও টাকা আছে বটে। আন্যবাড়ির ভিত্তিসম্মত কাঁপিয়ে দিতে না পারলে সামাজিক সম্মান বাড়ে না এদের। তাছাড়া ছোটদের কানের তালা ফাটিয়ে খুব খারাপ রুচির গান যদি মর্মে বিঁধিয়ে দেওয়া যায় তা হলে তিন দিক দিয়ে আমাদের লাভ। প্রথমত ওরা লেখাপড়া ভুলবে, দ্বিতীয়ত সে জন্য ওরা অসামাজিক হবে উঠবে ভবিষ্যতে এতে আমরা যা চাই অর্থাৎ এ দেশের চরম অনিষ্ট তা হবে। কিন্তু এদের একমাত্র প্রেরণা হল নিজেদের ফুর্তি প্রকাশ করা। অসভ্য আওয়াজে অন্যের বাড়ি কাঁপছে এটা কল্পনা করার যারা আরাম পায় তাদের কানে আমাদের মন্ত্র দেওয়া সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে এ বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু এই যে বিকট আওয়াজ হচ্ছে এ বস্তুটি কি?

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, এটা সঙ্গীত।

রাজা বললেন, তুমি ঠাট্টা করছ মন্ত্রী। এর নাম যে আদৌ সঙ্গীত এ ধারণা এদের জন্মাল কিসে?

আপনার কি মনে নেই যে, এ কাজ আমাদের মন্ত্রণারই ফলে?

বল কি! এমন অসভ্য উৎকট বীভৎস আওয়াজ যারা সঙ্গীত বলে কারো মাথায় ঢোকাতে পারে তাদের বাহাদুর বলতে হবে। আমাদের পরিকল্পনার এমন সাফল্য —দেখে তো খুবই ভাল লাগছে।

কিন্তু মহারাজ, এখানেই থামা চলবে না, মুগ্ধ হবার আরো কিছু কিছু আছে, চলুন সবটা ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।

না, শোন। ঐ যে ওদিকে কি দেখা যাচ্ছে—অত লোক হাতজোড় করে প্রার্থনা করছে কেন?

মন্ত্রী সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়েই বুঝতে পারলেন সব। বললেন, ওরা এই বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রিতদের দল। ভোজ খাওয়ার আগে সবাই প্রার্থনা জানাচ্ছে ভগবানের কাছে তারা খাওয়ার পরেও যেন বেঁচে থাকে। খাদ্যে এত ভেজাল, বিশেষ করে তেলে, যাতে কে কখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তার তো ঠিক নেই। খাদ্যে বিষক্রিয়া তো যখন-তখন হচ্ছে, তেল খেয়ে কত-লোক পঙ্গু হয়ে পড়ছে—আর এ সবও কিন্তু আমাদেরই কীর্তি। খাদ্যে ওষুধপথ্যে ভেজাল মেশানোর মন্ত্র তো আমরাই দিয়েছি। ঐ দেখুন এক রোগীও ওষুধ খাওয়ার আগে প্রার্থনা জানাচ্ছে, হে ভগবান, এটা যেন নকল ওষুধ না হয়। ঐ দেখুন একটু দূরে শ্রমিকপল্লীতে কত লোক ভেজাল ধেনোমদ খেয়ে মরে পড়ে আছে। খুশি হচ্ছেন তো?

ভীষণ খুশি হয়েছি। আর কি কি দেখাবে চল।

এর পর ওঁরা গেলেন এক ছোটদের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বই লেখকের বাড়িতে। দেখলেন একজন দুর্দশাগ্রস্ত লোক, কাগজ কলম নিয়ে বসে চোখ বুজে কি ভাবছে, আর কিছুক্ষণ পর পর চোখ খুলে কাগজে দু চার লাইন লিখছে। রাজার কৌতূহল হল। মন্ত্রী বললেন, এ লোকটি পাঠ্য-পুস্তক লেখক। নিচের ক্লাসের জন্য বই লেখে।

তা হলে চোখ বুজছে কেন?

জ্ঞান নেই বিশেষ, তাই চোখবুজে ধ্যান করে যা মনে আসে তাই লেখে। ওদের মতো গ্রন্থকারে প্রাথমিক শিক্ষাজগৎ বোঝাই।

রাজা খুব তৃপ্তিলাভ করলেন একথা শুনে। বললেন দেখাও তো দু একখানা বই। মন্ত্রী একখানা ছাপা বই খুলে রাজাকে দেখালেন এই দেখুন লেখা আছে হরিণ চোখ দিয়ে নিশ্বাস নেয়।

সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ ঘটনা

রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক
জীবনানন্দ দাশের প্রথম উপন্যাস

মাল্যবান

প্রকাশিত হ'ল। দাম—দশ টাকা

শিল্পীদের মনে কি প্রতিচ্ছায়া পড়ে জানবার জন্য আমরা বিভিন্ন বিভাগের দুজন সাহিত্যিককে উপন্যাসের প্রুফ কপি দেখিয়েছিলাম। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীঅমলেন্দু বসু বলেন :—ইদানীং বিশ্বসাহিত্যে অনেক খ্যাতনামা উপন্যাসের মতো 'মাল্যবান' মহাকাব্যের বিশাল বিস্তৃতির পথ না গিয়ে সংহত জীবনচক্র অঙ্কিত করেছে এবং এই সীমিত চিত্রের মধ্যে আশ্চর্য শিল্পশক্তির প্রমাণ রেখেছে চরিত্রায়ণে কথোপকথনে কাহিনীর গতিতে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ এই উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিকী কৃতিত্ব এবং এই কৃতিত্ব পরিচ্ছন্ন রচনাশৈলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসটিকে তার স্বাধীন নিজস্ব মূল্য দিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ছায়া-চিত্র-শিল্পী সত্যজিৎ রায় বলেন :—শুধু জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস বলেই নয়, সাহিত্যগুণ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই 'মাল্যবান' রসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ লেখা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল ভাবতে অবাক লাগে।

নিউ স্ক্রিপ্ট : এ১৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

রাজা বললেন, তাই না কি? হরিণ তো আমাদের অপগ্রহেও আছে, কিন্তু তারা তো নাক দিয়ে নিশ্বাস নেয়। এখনকার হরিণ তো অদ্ভুত। মন্ত্রী বলেন, হরিণ অদ্ভুত নয়, এ কথা যে লিখেছে সে অদ্ভুত, এবং এখানে যে সব লোক ছোটদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই লেখে, তাদের অধিকাংশই অদ্ভুত। এই দেখুন, লিখেছে গাছের পাতা থেকে কুইনিন তৈরি হয়।

এমন হল কি করে?

এ সবই তো আমাদের পরিকল্পনার অঙ্গ।

এতে ছাত্রকুলের সর্বনাশ হবে তো ঠিক?

হবে মানে কি মহারাজ, হয়ে এসেছে। আরো বই খোল, দেখি দু-চারটি।

পাঁচশ দেখাতে পারি। কিন্তু মহারাজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমাদের কাজ সফলভাবে এগিয়ে চলছে। আরো একটা বড় জিনিস দেখবেন চলুন।

একটু এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, একটি নতুন ছোট বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তার জন্য গুঁড়ো গুঁড়ো পাথরকুচি সিমেন্টের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন এত গুঁড়ো পাথর কেন?

মন্ত্রী বললেন, কম খরচে হচ্ছে। যাদের বাড়ি তারা যতদূর সম্ভব শস্তায় কাজ সারছে। ওরা গত তিন বছর ধরে চাল থেকে কাঁকর আলাদা করে জমাচ্ছিল এই উদ্দেশ্যে।

কিন্তু এর সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার সম্পর্ক কোথায় বুঝিয়ে দাও।

এটুকু বুঝলেন না? ভেজালে নকলে দেশ ছেয়ে ফেলেছি তো আমরাই। পাথর মেশানো, এই খাদ্যে ভেজালেরই একটা বড় অংশ। চলুন তো হলে দেখাই আরো কিছু।

রাজা বললেন, কিন্তু একটি কথা। পাথর তো সেদ্ধ হয় না, তবে তা চালের সঙ্গে মেশায় কেন?

মন্ত্রী বললেন, আপনি বলতে চান এমন জিনিস মেশানো দরকার যা বোঝা যাবে না? তবে শুনুন। অনেক চাল আছে সে চালও তো সেদ্ধ হয় না। এবং সেদ্ধ হয় না তিন ঘন্টা উনুনে রাখলেও, বাবার মতো শক্ত এবং টিপলে লাফিয়ে ওঠে আঙুলের নিচে থেকে। লোকে তো খাচ্ছে তা, এবং এও তো আমাদেরই ব্যবস্থা। এই বাংলার জমিতে যেসব চাল জন্মে তা যাতে বাঙালীর পেটে বেশি না যায়, অন্য দেশের খরাপ ভেজালে মেশানো চাল যাতে এরা কিনতে বাধ্য হয় সে তো আমাদেরই অদৃশ্য হাতের কাজ।

ওঁরা ভেজাল ও নকলের কারখানাগুলি পরিদর্শন করলেন। দেখলেন, এতে কত বুদ্ধিমান লোকেরা সব কাজ করছে। লাখ লাখ টাকা লাভ হচ্ছে এই কারবারে। নকল ওষুধ তৈরি হচ্ছে নকল লেবেল লাগিয়ে। অ্যামপুলে শুধু জল আর না হয় শাদা চকের গুঁড়ো। নকল মশলা তৈরি হচ্ছে। ভেজাল ঘি মাখন তৈরি হচ্ছে। আর এক জায়গায় পুরোনো জুতোর চামড়া কুচি কুচি করা হচ্ছে চায়ে ভেজাল দেবার উদ্দেশ্যে। আর এক স্থানে গিয়ে দেখলেন হাজার টিন রেড়ি ফুত, ডালডা সরষের তেল মজুত রাখা হয়েছে। চাল ডাল সবই গোপন গুদামে জমা করা হয়েছে। এবং এসব গোপন পথেই অন্যান্য স্থানে অনেক বেশি দামে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে ওঁদের চোখের সামনেই।

বড় বড় লরি এই সব চোরাচালান বোঝাই হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে প্রকাশ্য পথেই। এই প্রকাশ্য পথই ওদের গোপন পথ, কারণ, ধরে কার সাধ্য। বিশেষ করে রাত্রির পথ।

ওঁরা একটা পুরানো দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় দেয়ালের ফাটল দিয়ে চাপা গলায় কে বলে উঠল সময় হয়েছে? ওঁরা চমকে উঠলেন শুনে, বিশেষ করে রাজা। ওঁরা অদৃশ্য থাকলেও ওঁদের দেহ আছে স্পর্শ আছে, তাই দেয়ালে সাড়া জাগল স্পর্শ পাওয়ামাত্র। মন্ত্রী বললেন, এইটি আমাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। হঠাৎ চমকে উঠলেও এ আমার জানা জিনিস। আলিবাবা আর চল্লিশজন দস্যুর গল্প আপনি জানেন। ডাকাতরা পিপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। মরজিনার সাড়া পেয়ে, তাদের নিজেদের লোকের ইঙ্গিত ভেবে বলেছিল সময় হয়েছে?

রাজা বললেন, হাঁ, মনে আছে।

মন্ত্রী বললেন, এইবার আসুন আপনাকে এই জিনিস আরো দেখাই।

ওঁরা ঘন্টাখানেক ধরে নানা স্থানের দেয়ালে পিঠ লাগানো মাত্র ঐ একই চাপা গলার শব্দ শুনতে পেলেন। এমনকি একটা গাছে হেলান দিয়েও তাঁদের ঐ একই অভিজ্ঞতা লাভ হল।

রাজা বললেন, মন্ত্রী, ব্যাখ্যা কর, কি ব্যাপার।

মন্ত্রী বলতে লাগলেন, যে কথা দেয়ালের ভিতর থেকে শুনতে পেলেন, তা কোনো চোরের নয়। ও হচ্ছে চৌর্য বা অপহরণ বৃত্তির আত্মিক স্বরূপ।

তার মানে?

মানে, এ শহরের বদ্ধে বদ্ধে — ছিদ্রে ছিদ্রে, হাওয়ায় হাওয়ায় লক্ষ কোটি চৌর্যবৃত্তি অহরহ কাজ করছে। ব্লটিং কাগজ যেমন তরল পদার্থ শোষণ করে, এই শহরের প্রতিটি ইঞ্চি জমি তেমন চৌর্যাত্মাকে শোষণ করে পরিপুষ্ট হয়ে আছে, স্যাচুরেটেড হয়ে আছে। সমস্ত স্থান থেকে কেবল প্রশ্ন উঠছে সময় হয়েছে?— সময় হয়েছে? এ প্রশ্ন শুধু আমাদের কানই শুনতে পাচ্ছে, অন্যের কানে এ প্রশ্ন অশ্রুত। শুনুন মহারাজ, আপনার কোনো চিন্তা নেই, একটা দেশ যখন ছিদ্রে ছিদ্রে চোরে পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেদেশ যে ধ্বংস হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশ আগে এরকম ছিল না। পৃথিবীর সব দেশেই এখন আত্মধ্বংসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এবং এদেশে ও বিদেশে এই যে পরিবর্তন ঘটেছে, এ সবই আমাদের এজেন্টদের গুপ্ত হস্তের কাজ। বলুন, তৃপ্তিলাভ করছেন কিনা।

রাজা দীর্ঘ একটি তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, সম্পূর্ণ। কিন্তু প্রথম পুরস্কার কাকে দেওয়া যবে সেটা তো ভেবে পাচ্ছি না।

ওঁরা নিজ গৃহে ফিরে গিয়েও কোনো মীমাংসা করতে পারলেন না। সবাইকেই প্রথম পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করছিল রাজার। দিলেনও তাই। এবং এ রকম যে হবে, তার ইঙ্গিত, ওখানকার সেই স্ত্রীলোকদের ঝগড়ার পরিণতি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।

আর কতদিনে পৃথিবী খালি করা যাবে? রাজা প্রশ্ন করলেন।

মন্ত্রী বললেন বছর পঁচিশের মধ্যে আমাদের গ্রহের অর্ধেক লোককে ওখানে স্থানান্তরিত করা যাবে আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি।

রাজা আনন্দে অভিভূত হয়ে নিজের গলা থেকে শ্রেষ্ঠ মণিহারটি মন্ত্রীর গলায় পরিয়ে দিলেন।

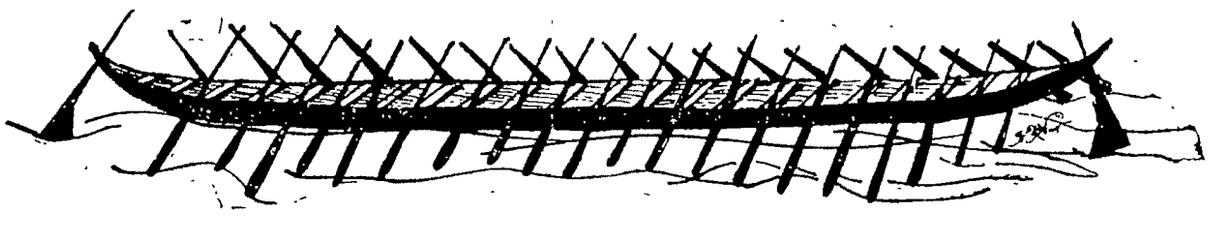

কথায় কথায়

কি কুক্ষণে নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম।

গিয়েছিলাম দু একটা উপহারের টুকিটাকি জিনিস কিনতে। কিন্তু মার্কেটে গিয়ে কিছু কেনাকাটার আগেই আমার ছেলে বললো, 'পাখি কিনবো।' সে নাকি কোথায় শুনেছে এখানে চমৎকার সব পাখি পাওয়া যায়, কথাবলা পাখি।

উপহার কেনা মাথায় উঠলো, যেতে হলো পাখির বাজারে। অনেক রকম পাখি, একেক জাতের পাখির একেক রকম দাম। কোনো কোনোটার দাম অবিশ্বাস্য রকম বেশি, প্রায় সোনার ওজনে দাম। এরই মধ্যে একটি বাকপটু পাখিকে আমার ছেলে পছন্দ করে ফেললো। তার অন্নপ্রাশনের মুখদেখার দর্শনী থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নগদ উপহার সর্বসমেত আমার কাছে তার নাকি তিনশো সাতান্ন টাকা পঁচিশ পয়সা পাওনা (এ হিসাব তার মা তাকে বুঝিয়েছে), সেই টাকা থেকে শ্রীমান আমাকে দাম দিতে বললে।

কত দাম দিতে হয়েছিলো সেই বাক্য-বাগীশ পাখিটার জন্যে, সে কথা আমি বলবো না। কারণ আমার মত সামর্থ্যের লোকের পক্ষে, নোট জ্বালা না করে সামান্য পাখির জন্যে অত টাকা খরচ করা অকল্পনীয় ব্যাপার। শুধু এইটুকু বলি দামটা তিন অঙ্ক দিতে হয় নি, প্রায় দেড় ঘন্টা দাম-দর করে, পাখিটার হাজার রকম গুণাগুণ বর্ণনা শুনে এবং বুঝে, মাথার দাম পায়ে ফেলে তিন অঙ্কে থেকে দামটা দুই অঙ্কে নামাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আসলে আমি নিজেও খুব অভিভূত বোধ করেছিলাম পাখিটার বাক্যালাপ শুনে। তিনটে ভাষায় পাখিটা আমার সামনে অন্ততঃ তিরিশটা ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করলো। 'বেতমিজ' এবং 'খামোশ' এই দুটি হিন্দি শব্দ বোম্বাই ফিল্মের বাইরে এই প্রথম এই পাখিটির কণ্ঠে শুনলাম। এছাড়াও শুনলাম চমৎকার সাহেবি ইংরেজিতে, 'গুড মর্ণিং', 'থ্যাঙ্ক ইউ', এবং 'গুড লাক'। একবার মনে হলো 'রাস্কেল' ও 'সাভাইন'-ও বলছে, কিন্তু পাখিওলা তার আগেই থামিয়ে দিলো, বললো ও কিছু না নেপালি ভাষায় কথা বলছে। এ ছাড়াও পাখিটা বাংলায় বললো, 'আসুন', 'বসুন', 'ধন্যবাদ' 'কেমন আছেন', 'চা খান', 'চোর-চোর', এবং দুই একটি ইতর শব্দ। বাংলা ইতর শব্দ-গুলি ব্যবহারের সময়ও পাখিওলা পাখিটাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলো, পারে নি; কিন্তু একই রকম সপ্রতিভ ভাবে আমাকে বোঝালো এগুলো বাংলা শব্দ নয়, এক নাগার কাছ থেকে নাকি এই শব্দগুলো শিখেছে, নাগা ভাষায় এসবের মানে হলো, 'কেমন আছেন?' 'অনেক দিন ধরে দেখা হলো', ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পাখিটাকে খাঁচার ঝুলিয়ে ট্যাকসি করে বাড়ি এলাম। দুঃখের বিষয়, আমার এর পরের অভিজ্ঞতা অতি করুণ।

পাখিটা আমাদের বাসায় প্রবেশ করার পর থেকে একেবারে যাকে বলে মৌনী হয়ে গেলো, আমার ছেলের ভাষায় স্পীকটি নট্। তিনচারদিন এই রকম চললো, তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যখন অফিস থেকে এসে বাসায় ঢুকলাম, আমাকে দেখে সে 'চোর-চোর' 'ধরো ধরো' বলে চেঁচিয়ে

উঠলো। বলা বাহুল্য, এই ধরণের সম্ভাষণ বা অভ্যর্থনের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না; বিশেষ করে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর নিজের বাড়িতে ফিরে বন্ধুজন কর্তৃক টাকায় কেনা এই বিহঙ্গমটির এই ব্যবহারে আমি খুব দুঃখিত হলাম, কিন্তু আমার ছেলে ও তার মা 'কথা বলছে', 'কথা বলছে' বলে রীতিমত হাততালি দিয়ে এমন উল্লাসিত হয়ে উঠলো যে আমি কোনো রকম প্রতিবাদ করতে সাহস পেলাম না।

আমাদের বাড়িতে মাত্র দুটো ঘর। একটা বাইরের বসার ঘর আর একটা ভিতরের শোবার ঘর। বাকদ্দা-টাকদ্দা কিছু বিশেষ নেই। ফলে বাইরের ঘরেই পাখিটাকে রাখতে হয়েছিলো। আর সেটাই হলো মুশকিল।

আমাদের বাইরের ঘরে প্রায়ই দুচারজন বাইরের লোক আছেন। আর তাঁদের সামনে এই পাখিটা 'চোর-চোর' থেকে শুরু করে আমাকে যা নয় তাই বলে গালাগাল করে।

একেক সময় আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আমারই পয়সায় পাকা কাঁচা লঙ্কা আর শৌখিন সাদা ছোলা খেয়ে আমাকেই গালিগালাজ করবে, এ আমার সহ্য হবার কথা নয়। কখনো মনে হয় পাখিটাকে গলা ছিঁড়ে মেরে ফেলি আবার কখনো ভাবি খাঁচার দরজা খুলে উড়িয়ে দিই।

কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্রের উপস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয়। তাই অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হলো। আমি বুঝতে পারলাম, এই পাখিটা আমাকে গালাগাল করা থামাবে না, এর বাক্যস্ফূর্তি বন্ধ করতে পারি এমন ক্ষমতা আমার নেই। তবে আমি যদি এমন কিছু করতে পারি যে এ যা বলাবে বলুক অন্য লোকে বুঝতে পারবে না তা হলেই আমার চলবে।

পাখিটাকে এক বালতি ফ্রিজের জল দিয়ে স্নান করালাম যাতে ঠান্ডায় সর্দি হয়ে গলা ভেঙ্গে আর কথা না বলতে পারে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না, বর্ষার দিনে বরফ ঠান্ডা জলে স্নান করে হি-হি শীতে কাঁপতে কাঁপতে পাখিটা আমাকে হিন্দিতে 'বেতমিজ', 'বেয়াদপ' এবং পরে কম্পিত মন্দ্র কণ্ঠে ইংরেজিতে 'স্টুপিড, রাস্কেল' বলে গালাগাল করতে লাগলো।

পরের দিন বাজার থেকে বুনো ওল এনে চাকা চাকা করে কেটে কাঁচা অবস্থায় ছোলার সঙ্গে দিলাম, গালাগালি এবং ছটফটানি আরো বেড়ে গেলো। যত ছটফটায়, তত চেঁচিয়ে গালাগাল করে, এমন সমস্ত কথা পাড়ায় আর মুখ দেখানো চলে না। সব দেখেশুনে, একজন পরামর্শ দিলেন 'বরফ খাইয়ে দেন, গলা বসে যাবে আর চেঁচাতে পারবে না।' কিন্তু পাখি শুধু শুধু বরফ খেতে যাবে কেন খাঁচার বাটিতে বরফ গলে জল হয়ে গেলো তবু ছুঁলো না।

অবশেষে স্ত্রী পুত্রের বাধা সত্ত্বেও পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু এখনো পরিত্রাণ পাই নি। রোজই উড়ে যায় সকাল সন্ধ্যা আমাদের বাড়ির কার্নিশে এসে বসে থাকে, আর আমার যাতায়াতের পথে আমার পিছনে 'চোর-চোর' বলে চেঁচায়।

তারাপদ রায়

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(২৯)

জীবন প্রবাহের সহকারী সম্পাদক যে আমার জীবনের ওপর আচমকা এতোবড়ো একটা প্রবাহ এনে দেবেন যাতে আমি ভেসে যেতে বসবো, এমন কথা কদিন আগেও কে ভেবেছিল ?

ও আবার এলো, আমার সেই গল্পটা নিতে আবার এলো সে গল্পের প্রশংসা করতে, আবার এলো পরের মাসের মানে সেই গল্প সম্বলিত জীবন প্রবাহ দিতে, আবার এলো, আবার এলো, আসতেই থাকলো।

ছুতো অবশ্য একটা থাকেই, কিন্তু সেটা মাঝে মাঝেই এতো হাস্যকর রকমের তুচ্ছ হয়ে যায় যে, লজ্জা করে। মানে মেজদার কাছে লজ্জা করে। মনে হয় মেজদা না জানি কী ভাবছে!

মেজদার তো আবার বোধশক্তিটা ভীষণ।

তবু ও এলেই বাইরের দিকের এই বসবার ঘরটায় চলে না এসে পারি না। শতবার ভাবি, মেজদা যদি ডাকে তো যাওয়া যাবে, নিজে থেকে যাবোনা হ্যাংলার মত, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রাখা সম্ভব হয় না। কে যেন এক অদৃশ্য দড়ি দিয়ে টানে।

দিদি কী ভাবছে, মা অপছন্দ করছেন, এসব প্রতিরোধ দাঁড়াতেই পায় না।

আমি উন্মুখ হয়ে থাকি ওদের গল্প তর্ক আলোচনা আবৃত্তি এই সবের জন্যে। আমার জীবনে যে এমন দিন আসবে, বাইরের আকাশের আলো এসে ঢুকবে, বাইরের জগতের বার্তা এসে আছড়ে পড়বে, তা কি কোনো অলীক কল্পনার মধ্যেও ছিল।

জানি মেজদার উদারতায় অথবা, প্রশ্রয়েই এ সুযোগ আসছে, এই ভাগ্যের প্রসাদ জুটছে, তাই মেজদাকে মাঝে মাঝে দেবতা মনে হচ্ছে।

মেজদা আস্তে আস্তে যেন নিজ স্বভাবেই ফিরে আসছে। সেই প্রসন্ন বাক-চতুর শিল্পে সাহিত্যে আগ্রহী, যেটা মাঝখানে বেশ কিছুদিনের জন্যে চলে গিয়েছিল।

একটা রাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে পড়ে মেজদা রুক্ষ শুকনো স্বল্পভাষী আর কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর আরো গম্ভীর আর গভীর হয়ে গিয়েছিল, এই এক কবি বন্ধুর সংস্পর্শে এসে যেন কোনো একটি জানলা খুলে গেল।

ভগবান জানেন এটা শুধুই কবি সংস্পর্শের ফল, না আরো কিছু ?

কে জানে মেজদা কোনো প্রেমের গাড্ডাতেই পড়ে বসে আছে কিনা।

একমাত্র ওতেই তো মানুষের হুড়মুড়িয়ে পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রেমে পড়েমরাদের চোখে পৃথিবীর রং বদলে যায়, পুরানো চেনা মানুষগুলো রং হারায়, জীবনের মানে বদলায়।

মেজদা সম্পর্কে আমার বাপু সন্দেহ হতে শুরু করেছে।

তা বলে আমার সম্পর্কে দিদি যে সন্দেহ পোষণ করছে, সেটা ঠিক নয়। 'সহকারী সম্পাদকের' প্রতি আমার আকর্ষণটা তীব্র একথা অস্বীকার করি না। নিজের সম্পর্কে আমি কোনো দিন অবোধ নই, কিন্তু এ আকর্ষণ ওই একটা মাত্র অর্থের কাছেই আত্মসমর্পণ করছেনা।

ও আমার একান্ত সংগোপনের এবং পরম ভালবাসার বস্তুগুলিকে অন্ধকার থেকে বার করে এনে আলোর মুখ দেখাচ্ছে, ও আমাকে একটা সত্যি মানুষের মর্যাদা দিচ্ছে।

সেদিন যদি মেজদা ওকে বাড়িতে নিয়ে না আসতো যদি ওকে আমার কবিতা না দেখাতো, হয়তো এসবের কিছুই হতো না। আমার কোনো দিনই গল্প লেখা হতো না, আমার কবিতার খাতা চিরদিনই দেরাজের মধ্যে ঘুমোতো।

সেই দিনটা আমার পক্ষে একটা পরম শুভদিন ছিল।

এই প্রথম দেখছি—মেজদা বাড়িতে আড্ডা বসাচ্ছে। শুধু যে ওই সহকারী সম্পাদকটিই আসেন তা নয়, ওই সূত্রে আরো কিছু কবি সাহিত্যিক আসেন ওনার সঙ্গে। যাঁরা নিতান্তই উদীয়মান। যাঁরা একজন সহকারী সম্পাদককেই সহকার তরু-স্বরূপ ধরে লতার মত জড়িয়ে থেকে উর্ধ্বে উঠে আকাশে মাথা তুলতে চান।

অনেক জন এলে অবশ্য আমি সে আসরে নাক গলাতে যেতামনা, তবে দু একজন হলে যেতাম। মেজদা ডাকলে তো যেতামই। এমনিও যেন হঠাৎ গিয়ে পড়েছি, এই ভাবে গিয়ে হাজির হতাম। অথবা সকলে প্রবেশ করে বলে উঠতাম, 'আপনাদের তর্ক আলোচনা শুনতে শুনতে আর লোভ সামলাতে পেরে উঠলাম না—'

তেমন সুবিধে পেলে তর্কে ফোড়ন কেটেও বসতাম।

এঁরা কবি টবি হলেও রাজনীতির তর্ক এসে পড়তোই। কারণ ওটা তখন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। অনেকেই জানে না গান্ধীবাদ বিপ্লববাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং আরো নানাবিধ মতবাদকে বাদ দিয়ে কোনো মজলিশ জমতে পারে। সেই অনেকের মধ্যে আসতোই কেউ কেউ।

কিন্তু মেজদাকে খুব উদ্দাম উত্তেজিত হতে দেখতাম না। মেজদা আত্মস্থ। বাবার মৃত্যুর পর থেকে আরো। যে অবস্থায় পড়লে দাদা হয়তো রাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে যেতো, সে রকম অবস্থায় মেজদা বলে, 'এ তর্কের শেষ কোনোদিনই হবে না। পৃথিবীটাকে একটা তপ্ত মতবাদের কড়াইতে চাপিয়ে, আর চেষ্টার অনুনে গলিয়ে ফেলে, কোনো একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করে ফেলবার বাসনাটা কারুর কোনো দিনই মিটবে না।'

নীরেন তো আবার উত্তেজিত হওয়া দূরে থাক, হাসে। হেসে বলে, 'তবু বাসনাটাও থাকবে, চেষ্টাটাও চলবে। কেউ স্বপ্ন দেখেছে সমগ্র পৃথিবী ক্রীশ্চানিটির কাছে মাথা নোয়াচ্ছে। কেউ কল্পনা করেছে সমস্ত পৃথিবীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ছেড়েছে, কেউ বিশ্বাস করেছে, পৃথিবী অহিংসে বৌদ্ধ ধর্মের শরণ নেবে। ...যাঁরা সমগ্র বিশ্বচিন্তায় মাথা ঘামায় না তারা খন্ড, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিশ্বের একটু টুকরোকে নিয়েই আকাশকুসুম রচনা করেছে—'সব স্বপ্ন হিন্দুস্থান', অথবা 'সব মানব পিওন বৈষ্ণব'। .....তার মানে লড়াইটা চাই। মানুষের সৃষ্টিকর্তা তার মধ্যে ওই লড়াইয়ের প্রবৃত্তিটা দিয়েছেন বেশ ঠেশ ঠেশে। তাই নিজের সঙ্গেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অহরহ। সে যা বলে তা বিশ্বাস করেনা, যা বিশ্বাস করে তা বলে না, যাতে শ্রদ্ধা নেই, তাকেই প্রাণপণে শ্রদ্ধা দেখায়। যা ভাল লাগে তার দিক থেকে মন সরিয়ে নেবার চেষ্টায় ত্রাহি ত্রাহি করে।'

হ্যাঁ, এইরকমই।

এর বেশী জোরালো কথা ওদের সভায় নিক্ষেপ হতো না এখন যা ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু তখন? তখন মুগ্ধ বিমোহিত চিত্তে ওই সব কথা শুনতাম, হৃদয়ে গ্রহণ করতাম, আর স্বর্গীয় বাণী বলে মনে করতাম।

কিন্তু তা ছাড়া কী করবো? এমন ভালো ভালো কথা, (তাও বৈঠকখানায় পুরুষদের সভায় বসে) কবে শুনেছি? .. এই যে আমার মামাতো, ভাইরা আসে অজুদা-বিজুদা তারাও তো এই বয়েসেরই প্রায়? গড়িয়ে গড়িয়ে আই-এ বি-এ পাশও করেছে, তাদের মুখে শুনেছি কোনোদিন এমন কথা?

বিজুদা তো অনায়াসেই বলতে পারে 'বটিশ তাড়াবি? তাড়িয়ে কদিন বাজারটাকে চালাতে পারবি? এক কোম্পানীকে তাড়াবি, অন্য এক কোম্পানী এসে খাবোল্লা দেবে। এই নেটিভরা ভারতবর্ষের আবার স্বরাজের স্বপ্ন! স্বাধীনতার বাসনা!'

দাদার জেলে যাওয়ার উপলক্ষেই ওঠাতো এসব কথা।

কিন্তু অজুদা?

সে তো বিনা উপলক্ষেই আরো অদ্ভুত অসভ্য কথা বলে।

কথার পিঠে কথায় যখন তখন বলে বসে, 'আর ওই এক রবি ঠাকুর হয়েছেন। দেশ সুদ্ধু ছেলেকে মেয়ে বানাবার কারখানা খুলেছেন। .. .. ঘাড়ে লতানো মেয়ে মেয়ে চুল, মিহি মিহি গলা, লতিয়ে লতিয়ে চলা, ন্যাকা ন্যাকা চাউনি এসব ছেলেদের দ্বারা কিছু হবে? আমি বলে দিচ্ছি পিসি, ওই রবিঠাকুরটিই দেশের সর্বনাশ করে ছাড়বেন। .. ছেলেতে মেয়েতে এক জায়গায় পড়া। হুঁ। তাই কি সত্যি পড়ালেখা হয় কিছু? পাঠ্য বিষয় কী? না নাচ গান, কবিতা আওড়ানো, ছবি আঁকা আর গাছতলায় বসে হাওয়া খাওয়া।'

আমার ওই অজুদাটার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করতো না কিন্তু গায়ে আদরের ছোটপো বড় আদরের সেজদার স্থানে তাকে তোলাতে কম বা জলখাবার খাওয়াতে হবে না? আর সে তো আমাকেই হবে। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমিই যখন আছি সংসারে।

আমি যে রবীন্দ্রভক্ত আমি যে কবিতা টবিতা লিখি, এ তথ্য ওনার ছোট পিসির কাছে সংগ্রহ করেই বোধকরি অজুদার এই আক্রমণ।

এক একজনের কাছে, এইটি বড় মুখ-রোচক কাজ।

অন্যের প্রিয় বা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তার সামনে খাটো করার চেষ্টা, নস্যাৎ করার চেষ্টা।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ছেলেবেলা থেকে অনেক শুনেছি কারণ ওটা এক শ্রেণীর লোকের কাছে ফ্যাসান ছিলো। কিন্তু তারা তবু বয়স্ক লোক, সেকেলে সেকেলে, অজুদা তো তা' নয়?

অজুদা দাদার থেকে মাত্র দু তিন বছরের বড়। অবশ্য ইত্যবসরে বিবাহকার্য সমাধা হয়ে গেছে। বিজুদার আর হয়ে ওঠেনি এখনো। দেশে যে ঢেউ উঠেছে, নিজের পায়ে না দাঁড়ালে বিয়ে করা উচিত নয়—, বিজুদা সেই ঢেউয়ের বলি হয়ে বসে আছে। মানে বিজুদার বাবাই নাকি এ ঘোষণা করে ছেলেকে দাবিয়ে রেখেছেন। বোধহয় বড়ছেলের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার ফল।

আগে ওরা এতো আসতো না, কারণ বাবা যে ওদের তেমন পছন্দ করতেন না, তা ওরা বেশ বুঝতে পারতো। এর জন্যে মার প্রাণে বেশ ক্ষোভ ছিল। মাকে বলতেও শুনেছি, 'আমার দিকের কেউ এলেই তোদের 'গরিষ্ঠের' মুখ বেজার। ছেলে দুটো আসে, ডেকে একটা কথাও বলেন না।'

বাবা শুনতে পেলে হাসতেন।

বলতেন, 'আমার কাছে তো আসে না, আসে ওদের পিসির কাছে, তুমি তো কথা বলো। দুজনের মতো কথা একাই বলো, আর কি দরকার?'

'শুধু তাই হলেই হবে? তোমার ভাগ্নে-ভাগ্নী ভাইপো ভাইঝিরা এলে আমি আদর যত্ন করি না?'

বাবা অনায়াসে এই আক্রমণকে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'তারাও তাদের মামী-কাকীর কাছেই আসে।'

যাক, সে কলহের তো সমাধি হয়ে গেছে। এখন বাবা মারা যাওয়ার পর, হয়তো কর্তব্যবোধেই অথবা সেজ মামার ঠ্যালায় পড়ে ওই দাদাদুটি বেশী বেশী আসে। সেজমামা আজাদ হয়ে এসে নিজে যে নতুন বাড়ী বানিয়েছেন, সেটা আমাদের এ বাড়ি থেকে বেশ কাছে।

এরা আসে, কিন্তু ভুলেও বৈঠকখানার দিকে যায় না। যদি দেখেও মেজদা বসেছে বন্ধু টন্ধু নিয়ে, পাশ কাটিয়ে পালিয়ে আসে।

একদিন আমি বসেছি সেজদাদাদের সভায় দেখি বিজুদা বড়ো অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে দরজার পর্দার ওপর থেকে একটু উঁকি দিয়ে চলে গেলো। মনটা একটু ধক্ করে উঠলো না তা বলতে পারি না, পরক্ষণেই বেশ শক্ত হয়ে আত্মস্থ চিত্তে বসলাম।

হবেটা কী?

নিন্দে?

করবে কে?

ওই বিজুদা কোম্পানী? করুক।

ও নিয়ে বিচলিত হবার কিছু নেই।

এ সাহস কি আমার বয়েস বাড়ার দরুণ?

নাঃ! ভেবে ভেবে দেখেছি বোধহয় স্বীকৃতিই সাহসের জন্মদাতা। —আচ্ছা—

নিজেকে নিয়ে বিশ্লেষণ করা আমার একটা রোগ, ভেবে ভেবে দেখেছি, কবি নীরেন স্যান্যাল আমার গল্প পড়ে প্রশংসা করে, নিজেদের কাগজে আগ্রহ করে ছাপায়, আবার নতুন লেখার জন্যে উৎসাহ দেয়, এর জন্যে কি আমার অহঙ্কার জন্মেছে?

ভেবে দেখেছি অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের শক্তি। যা তুচ্ছকে অবহেলা করতে শেখায়। ...আমি যেন আর একটা জগতের সন্ধান পেয়ে গেছি; সে জগতে আমার এই 'আমি'টা নেহাৎ তুচ্ছ নয়।

অতএব আমার এতোদিনের এই জানা পৃথিবীর কোনটা মূল্যবান আর কোনটা মূল্যহীন, সেটা যেন আপনিই চোখে ধরা পড়ে যাচ্ছে। তুচ্ছ কে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার শক্তি জন্মাচ্ছে।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলাম।

ভাবলাম, দিদি তো রয়েছে দেবে অখন চা টা তৈরী করে।

আমাদের তখন কথা চলছে যে লেখকের মধ্যে কোনো জোরালো বক্তব্য রয়েছে, তার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে কী হওয়া উচিত? উপন্যাস না নাটক?

আমি অবশ্যই বক্তা নই, শ্রোতাই, তবু ওই নীরেন কবি, আর তার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে থাকা উদীয়মান কবি সুকুমার দাস মাঝে মাঝেই আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছিল, 'আপনি কী বলেন?' কাজেই আমায় কিছু বলতে হচ্ছিল সাবধানে গুছিয়ে গাছিয়ে।

তবে আমার ভাগ্যটা এমনই জোরালো চলছিল তখন, যে আমি যেটা বলে ফেলছিলাম সেটাই নাকি মৌলিক হয়ে যাচ্ছিল।

পরে বুঝেছি কারণটা কি।

ওরাও আমাদেরই মতো নেহাৎ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের ছেলে, ওদের ঘরে আমার বয়সের একটা মেয়ে, হয় দু ছেলের মা হয়ে বসে আছে, নয়তো বিয়ে হয়ে উঠছে না বলেই মায়ের রান্নাঘরে কাজের সাহায্য করে করে দিন যাপন করছে। পুরুষের কথার মধ্যে নাক গলাতে আসেন না তারা।

অতএব একটা মেয়ের মুখে ভাষা দেখেই ভাবে মৌলিক।

কিন্তু ওদের ঘরের সেই মেয়েরা যে বোবা হয়ে থাকে সেটা কি তাদেরই ত্রুটি?

আমার কাছেই কি এটা এমন সহজ হয়ে উঠতো যদি আমি প্রশ্রয় না পেতাম? ওরা কি মেয়েদের সে প্রশ্রয়টুকু দিতে শিখেছে?

সে যাই হোক, ত্রুটি যারই হোক, ওদের কাছে এটা একটা নতুন বিস্ময়ের স্বাদ। তাই ওরা আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করে

বলে; 'আপনি কি বলেন?'.....তারপর বলে 'ঠিক।'

বিশেষ করে সুকুমার।

আমি যদি বলি, 'নাটকের কাজটা হয়তো খুব তাড়াতাড়ি হয়, নাটক একসঙ্গে অনেকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু সেটাতো কেবলমাত্র নাট্যকারের স্বাধা হয়ে ওঠেনা। নাটক যতই জোরালো হোক, তার অভিনয়টিও তেমনি জোরালো না হলে, কিছুই হয় না। নাটকের জন্যে অনেক আয়োজন অনেক আড়ম্বরের দরকার, উপন্যাসে তো তা নয়? সেখানে শুধু কালি আর কাগজ—এবং মন।'

সুকুমার উদ্ভাসিত মুখে বলে, 'ঠিক।'

আবার আমি যদি বলি, 'তেমনি আবার উপন্যাসের বক্তব্য কেবলমাত্র শিক্ষিত লোকেদের কাছেই পৌঁছয়, সাধারণ নিরক্ষর লোকেদের কাছে পৌঁছতে পারে না—'

সুকুমার আরো উদ্ভাসিত মুখে বলে 'ঠিক।'

আমার বিশ্বাস এই আলোচনা সভার পর সুকুমার বাসায় গিয়ে মরে থাকে।

নীরেন স্যান্যাল অবশ্য মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে। খুব সম্ভব সুকুমারের ওই নির্বিচারে 'ঠিক' বলাতেই ওর প্রতিবাদের প্রেরণা আসে।

তবে আমার বাবা মাত্রাজ্ঞান আছে; যেই দেখি একটু বেশী কথা বলা হয়ে যাচ্ছে: সেই বলে উঠি, 'যাই আপনাদের জন্যে একটু চা নিয়ে আসি।'

সুকুমার ব্যাকুল প্রতিবাদ করে ওঠে; 'থাক না থাক না; আবার চায়ের কী দরকার?'

নীরেন স্যান্যাল বলে ওঠে; 'খুব দরকার আছে। এতোক্ষণ ওই দরকারটাই অনুভব করছিলাম।

'জীবন প্রবাহের' সহকারী সম্পাদক আর তার কাছে শরণার্থী এক কবিযশপ্রার্থীর এই হৃদয় রহস্য আমার কাছে বেশ কৌতুকের হয়ে ওঠে।

কিন্তু অন্তঃপুরে ক্রমশঃই যা ঘটছিলো: মানে প্রতিবাদের যে তীব্র চেহারা ফুটে উঠছিল সেটা আদৌ কৌতুকের নয়। বিজুদা যেদিন পর্দার ওপর থেকে উঁকি মেরে সুট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল; আমি তার পিছু পিছু গেলাম না, অগ্রাহ্য করলাম, সেদিন সেই ধূমায়িত বহ্নি জ্বলে উঠলো।

মা মেজদাকে আর আমাকে এক সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন 'তোমরা কী ভেবেছো কী?'

এটাই অগ্নিতুল্য।

মা ফেটে পড়ে বকাবকি করলে বরং উত্তাপটা কম হতো।

মেজদা বললো, 'তুমি কী নিয়ে বলছো মা?'

কি জানি হঠাৎ সেদিন কী হলো: মা আর তাঁর বিজ্ঞ মেজছেলেকে ভয় করলেন না বললেন: 'ন্যাকা সেজো না বিনু যা নিয়ে বলছি তুমি বুঝতে পারছো না? তা হলে পষ্ট করেই বলি—বাড়িতে গাচ্ছের বেটা-ছেলে ডেকে এনে এতোবড়ো ধাড়ি আইবুড়ো মেয়েকে [illegible] দেবার মানেটা কী সেটাই জানতে চাইছি।'

মেজদার মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

মেজদা চড়া গলায় বললো, 'সামনে ধরে দেওয়া মানে?'

'তাছাড়া আর কী। তোমাদের গুষ্ঠিতে কখনো এসব দেখেছো? আজ তিনি নেই বলেই এতো সাহস বেড়েছে তোমার! সুনী কোন ছোটবেলায় অমুর একটা বন্ধুর সামনে গান গেয়েছিল বলে, কতো লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিল তাকে তোমাদের বাপও কম করেননি; আর আজ ওই, অতোবড়ো ধিঙ্গী মেয়েকে তুমি কিসের অধিকারে—'

মার গলার স্বর বুজে এলো। থেমে গেলেন।

অর্থাৎ মা শক্তি ছাড়া কাজ করতে বসেছিলেন। নেহাৎই অপরের প্ররোচনায়; আর পেরে উঠলেন না।

মার বিরক্তি বা অপছন্দের অভিব্যক্তি। চিরদিনই দেয়ালকে অথবা বাতাসকে শুনিয়ে এভাবে বিচারকের আসনে বসে জবাবদিহি চাইতে বসা মার পক্ষে শক্তিছাড়া কাজই।

তাই শেষ অবধি আর পেরে উঠলেন না।

বুঝতে দেরী হলো না; মাকে শিখিয়ে পড়িয়ে আসামীদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কে দিয়েছে তাও বুঝলাম। বিজুদার তিক্ত বা ব্যঙ্গ মন্তব্য থেকেই যে দিদির এই হাল ধরার প্রচেষ্টা; তা সহজেই বোঝা মেলে।

কিন্তু মেজদা বোধহয় অতো তলিয়ে বুঝতে পারলো না। মেজদা মার মুখে এরকম সরাসরি কৈফিয়ৎ তলবের ভাষা শুনে বিচলিত হলো। মেজদার মুখটা বেশ জ্বরের মুখের মতো লাল আর থমথমে হয়ে উঠলো। মেজদা বললো, 'অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না মা; তাই ভুল হয়ে গেছে।'

আর কোথায় যাবে, শেখানো কথা আর কতোক্ষণ টিকবে।

মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন; নিজস্ব প্রকৃতিতে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তোদের আর কী? পাঁচজনে কী বলছে না বলছে সে তো আর তোদের কানে আসে না? যতো নিন্দে মন্দ আমাকেই সইতে হয়।'

মেজদা স্থির ভাবে বললো: 'ওই সব ছোঁড়ালোকের ছোঁড়া কথাকে যদি অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে না পারো: তা হলে তোমার মেয়েকে তুমি চাবি দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিও মা।'

চলে গেল মেজদা।

আমাকে অসহায় রেখে।

কিন্তু আশ্চর্য; আমি যেন তেমন অসহায় বোধ করলাম না; কোথায় যেন একটা সহায় রয়েছে আমার।

তাই আমি মার দিকে তাকিয়ে খুব ধীর গলায় বললাম, 'জজ যদি কেঁদে ভাসায়, তাহলে আসামীদের শাস্তির ব্যবস্থা হয় না।'

মা তেমনি কেঁদে কেঁদে বললেন: 'কী করবো মা, তোমার মতন বুকের পাটা তো নেই। পেটের ছেলের সঙ্গেও উঁচু নীচু কথা কইতে ভয় পাই—।

বললাম 'সেই কথাগুলো নীচু লোকের শেখানো বলে মা।' নিজে থেকে ভেবে চিন্তে যদি বলতে: এমন ভেস্তে যেতো না। বিজুদা বুঝি যাতা বলে গেছে?'

'বলবে নাই বা কেন?'

মা আবার বীরাঙ্গনার ভূমিকায় আসেন; 'সে এসে দেখলো: 'একঘর অচেনা পরের মাঝখানে তুমি চেয়ারে বসে আড্ডা দিচ্ছো।—'

'একঘর নয় মা তিনজন আর অচেনাও নয় তার মধ্যে একজন মেজদা, আর দুজন মেজদার বন্ধু: আমারও বন্ধু।'

'কী বললি?'

মা ফোঁস করে উঠলো· 'ওই বেটাছেলে-গুলো তোর বন্ধু? ত্রিভুবনে কেউ শুনেছে এমন কথা?'

গম্ভীরভাবে বলি: 'ত্রিভুবনে কেউ শোনেনি নয় মা: তোমাদের কানেই এসে পৌঁছয় নি। জগতের কোনো কথা কোনো আলো বাতাস: তোমাদের এই গণ্ডির মধ্যে ঢুকতে পায় না তো। ওই বিজু কোম্পানীর দল গণ্ডির দরজা পাহারা দিচ্ছে যে। নিজের চোখ দিয়ে দেখতে শেখো মা' নিজের কান দিয়ে শুনতে।'

মাও রুখে দাঁড়ালেন।

বললেন 'কী করে হবে সেসব এই বুড়ো বয়েসে? জ্ঞানাবধিই তো কানে তুলো আর চোখে ঠুলি দিয়ে রেখেছে সমাজ।'

মার জন্যে দুঃখই হলো।

সত্যি ওঁর কাছে এছাড়া আর কীই বা আশা করা যায়?

যে যার উপাদানে তৈরী।

মার এই কেঁদে ভাসানো মূর্তিকে আর ভয় করবো কী? বরং একটু হেসে বললাম, 'ভগবান রেখেছে' না বলে যে সমাজ বললে, এতেই বোঝা যাচ্ছে তোমার বোধ-শোধ জন্মেছে, তাহলেই বলি, ওই কানের তুলো আর চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করো মা। অনেক শান্তি পাবে।'

সেবারে মেয়াদ না ফুরোতেই চলে যেতে হয়েছিল বলে, দিদিকে আবার কদিন থাকবার পারমিশান দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল ওরা, দিদি ঘরে ছিল।

আমায় দেখে বললো, 'খুব তো লেকচার দেওয়া হচ্ছিলো, ওই সব বাক্যবাগীশদের সঙ্গে মিশে মিশে বাকি তো বেশ শেখা হয়েছে, মার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখিস?'

চুপ করে শুয়ে পড়ে বললাম, 'সবাই মিলে ভেবে আর কী হবে? তুই তো ভাবছিস।

দিদি উত্তেজিত হলো, 'আমি আবার কী ভাবতে যাবো? আমার জন্যে মার কী লোকসান হচ্ছে? তোকে নিয়ে যে মা জ্বলে-পুড়ে মরছেন।'

উঠে বসে বললাম, 'আচ্ছা দিদি, ধর মার জ্বলাপোড়া নিবারণ করতে আমি উচিত নিয়মে হারেমেই ঢুকলাম আবার, কিন্তু গ্যারান্টি দিতে পারিস তাতে মার জ্বলুনি-পোড়ুনি নিবারণ হবে? 'শান্তির নিশ্বাস' ফেলবেন মা?'

দিদি সতেজে বললো, 'সেটা আর কী করে হবে? যতোক্ষণ না তোকে পার করতে পারছেন ততোক্ষণ শান্তি আছে?'

'তবেই দ্যাখ' আমি আবার শুয়ে পড়ে বলি, 'মাকে তো শান্তি দেওয়া আমার হাতে নয়। তাহলে আর নিজের সুখ শান্তিটুকু ঘোচাই কেন?'

'ওইটাই তাহলে তোর পরম সুখ? ওই বাইবের বেটাছেলের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া।'

'আমি শুয়ে শুয়েই দিদির পিঠটা জড়িয়ে ধরে বলি, 'ভীষণ সুখ রে দিদি! সে সুখ বলে বোঝাবার নয়। তুই যদি একদিন ওই আড্ডায় যোগ দিস, পরদিন থেকে রোজ দিন ঘন্টামিনিট গুনবি, কখন আসে ওই আড্ডাবাজরা।'

দিদি আমায় মারলোও না, ঠেলেও ফেলে দিলো না, শুধু রুদ্ধ গলায় বললো, 'আমি না হলে আর বৈঠকখানার আড্ডায় যোগ দেবে কে? বলে বড়সড় দ্যাওরদের সঙ্গেই কথাবলায় হুকুম নেই।'

'তা সেটা আর দুঃখের কী?'

আমি খুব গম্ভীরভাবে বলি।

দিদি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, 'তা বলবি বৈ কি। নিজে স্বাধীনতার সুখ পাচ্ছিস কি না। এই এখানে এসেই যা একটু হাঁফ ফেলে বাঁচি, নইলে রাতদিন যে ভাবে থাকি, তা আমিই জানি। এই তো বিজুদা এসেছিল, তবু দুটো গল্প করে বাঁচলাম, ওখানে এক-দিন গিয়েছিলুম বিজুদা, শাশুড়ীই বসে বসে গল্প করলেন ওর সঙ্গে, চা জলখাবারটা পর্যন্ত ঝিয়ের ওপর ভার পড়লো। আমি বোকার মত ঘোমটা দিয়ে শাশুড়ীর পিছনে বসে থাকলাম। আর বলছিস কি না সেটা আর দুঃখের কী?'

'দিদি', আমি দিদির মুখটা দু'হাতে তুলে ধরে বলি, 'তাহলে স্বীকার করছিস, স্বাধীনতাই সুখ?'

'সেটা আবার নতুন করে বলবার কী আছে রে?' বললো দিদি।

'না একটু যাচাই করে নিলাম। তাহলেই দেখ বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিতে পাওয়া সুখ কি না। আসলে 'সুখ' জিনিসটা কেউ স্বেচ্ছায় তোর হাতে তুলে দেবে না দিদি, নিজে তুলে নিতে হবে। তা নইলে মরে পচে।'

দিদি মুখ ভার করে বলে, 'তুমি এখন গল্প লিখছো, কবিতা লিখছো, কাগজে ছাপা হচ্ছে, তোমার সঙ্গে কি আর আমি কথায় পারবো?'

আমি দিদির অভিমান হেসে উড়িয়ে দিই। বলি, 'কবেই বা পারতিস? চিরদিনই তো—আমি কথার জাহাজ, আর তুই নুনের নৌকো!'

দিদি একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তা হলেও আমি তোকে খুব গম্ভীর ভাবতাম, এমন হালকা ভাবিনি কোনোদিন।'

'এটা আবার কী হলো? আমি কি ওদের সঙ্গে ছ্যাবলামি করি না কি? দস্তুর-মতো 'আপনি আজ্ঞে' করে কথা বলে ওরা আমার সঙ্গে—'

'তা জানি—'

বললো দিদি।

আমি হেসে উঠে বলি, 'তা তো জানবিই। নিষ্ঠা সহকারে আড়ি পাতিস তো।'

'আড়ি পাতি আমি?'

দিদি ক্রুদ্ধ, 'এ কি তোর ফুলশয্যের ঘর, —যে আড়ি পাতবো?'

'আহা তা নাই হলো, আড়ালে বান পাতারই অন্য এক নাম আড়ি পাতা দিদি।'

'বেশ তাই পাতি, হলো তা?'

'হলো।'

দিদি গভীর গম্ভীর গলায় বলে, 'যা দেখছি ওই দুটো ছোঁড়াই তো তোকে দেখে মজেছে—'।

আমি অবিচলিত গলায় বলি, 'আমারও তাই ধারণা। তবে ওরা তোকে দেখতে পেলে কি আর'। আমার এই ভাগ্যি হতো রে? ভাগ্যিস দেখে নি।

'রুচি। দিন দিন তোর মুখের কী দশা হবে? কিছু আটকায় না? আমার বিষয়ে ওই কথা বলছিস?'

'ওমা বলবো না কেন?' তুই আমার থেকে দশগুণ সুন্দরী নয়?

দিদি আহত গলায় বলে, 'রুচি মনে রাখিস আমি একজন বিবাহিতা মেয়ে। এক-জনের স্ত্রী।'

আমি মাথায় হাত দিয়ে বলি, 'কী সর্বনাশ। বিবাহিতা মেয়ে বা একজনের স্ত্রী হলে, সুন্দরী বলা চলবে না?'

দিদি মলিন গলায় বলে, 'ঠাট্টা রাখ রুচি, ওই নিয়ে একদিন যা ঘেন্নার কান্ড হয়েছিল, তক্ষুনি শাড়ি পাকিয়ে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিলাম। দোষের মধ্যে আমার এক পিসতুতো দ্যাওর বলে ফেলেছিল, 'অমুকদার বৌয়ের মত রূপ খুব কম দেখা যায়—। শুধু এই। তাই না শুনে তোদের জামাইবাবু তাকে এই মারে তো সেই মারে। ডাক ছেড়ে বলে কিনা, 'ওকে খুন করে ফাঁসি যাবো। এতো বড়া আসপর্দা ওর—বড় ভাজের রূপের ব্যাখ্যা করে?' ...কেলেঙ্কারীর চরম পিস-শাশুড়ী ছেলের হাত ধরে ফরফর করে চলে গেলেন, 'জীবনে আর এ বাড়ির ছায়া মাড়াবো না' বলে। ...আর শেষ পর্যন্ত সব দোষ আমার ঘাড়ে পড়লো। বেটাছেলের সামনে মুখ খুলে রূপ দেখিয়েছি বলে। ...এতে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হয় কি না?'

আমি অক্লেশে বলি, 'খুব হয়। দিলি না কেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।'

দিদি ক্ষুব্ধ গলায় বললো, 'চিরকাল মানুষের মর্মান্তিক দুঃখকষ্ট নিয়ে তোষ ঠাট্টা।'

আমি অনুতপ্ত গলায় বলি, 'কিছু মনে করিস না দিদি, ওই আমার এক রোগ। লোকেদের মর্মান্তিকগুলো আমার হাস্যকর মনে হয়। কিন্তু আসল কথাটার কী হলো? আমাকে তোর হঠাৎ হালকা মনে হলো কেন?'

দিদি খুব ভারী গলায় বললো, 'কেন তা বুঝতে পারছো না? বলি শুধু কী ওই ছোঁড়া দুটোই তোমায় দেখে মজেছে? তুমি নিজে?'

আমি বিছানায় এক পাক গড়িয়ে নিয়ে করুণ গলায় বলি, 'আমিও তাই এই বলছিস?'

'একজনকে দেখে তো বটেই। ওই কেলেটাকে দেখে তো চোখের পলক পড়ে না।—'

'দিদি! আড়ি পাতার মধ্যেই এসে দেখে ফেলেছিস তুই?'

দিদি বলে, 'চোখ থাকলেই দেখা যায়। কিন্তু তোর কি মনে একটু বাধলোও না?'

'কেন বাধবে কেন? কালো বলে?

'থাম! রুচি তুই আনন্দর কথা এইভাবে নির্মূলে ভুলে যাবি, তা ভাবিনি।'

'আনন্দ!'

আমি আকাশ থেকে পড়ি।

'আমার সঙ্গে আনন্দর কি সম্পর্ক?'

'তোর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই বলতে চাস?'

'কোথায়?' আমি বলি, 'সম্বন্ধটা আর পাকলো কই? যদি পাকতো, তাহলে অবিশ্যি ভালই হতো। 'জামাইবাবু' বলতে পাওয়ার সুখে প্রাণ আহ্লাদে নেচে উঠতো। কিন্তু ভগবান আর সে আহ্লাদটা দিলো কই?

দিদি বসে ছিল।

শুয়ে পড়লো।

বালিশটা মাথার নীচেয় দিয়ে বললো, 'আবোল তাবোল বকে আমায় ভোলাতে পারবি? তুই তাকে ভালবাসিসনি?'

'একশোবার।'

আমি বললাম 'কে বলেছে বাসিনি? অমন একখানা ছেলের মত ছেলে, কে না ভালবাসবে? এখনো বাসি।'

'তবে?'

দিদি ধিক্‌কারের গলায় বলে, 'তবে, তুই কোন লজ্জায় আর একজনকে ভালবাসতে বসেছিস?'

গম্ভীর ভাবে বলি, 'তুই যে লজ্জায় জামাইবাবুকে—'

ভেবেছিলাম, দিদি হয়তো মুখ ফসকে বলে ফেলবে, 'ওকে কি আমি ভালোবাসতে যাচ্ছি? ও কি ভালবাসার যুগ্যি?'

দিদি তা বললো না। দিদি বালিশটা মুখ থেকে সরিয়ে বলে উঠলো 'কী তুলনায় ছিবি। যার সঙ্গে গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়েছি, তাকে ভালো না বেসে উপায়?'

আমিও নিরুপায়ের গলায় হতাশ ভাবে মুখে বলি, 'আমিও তো তাই বলছি, গাঁট-ছড়ায় বাঁধা পড়লে ভালো না বেসে উপায় নেই তো। আমিও ওই কালো লোকটার সঙ্গে কোনো একখানে সেই বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছি। তাই নিরুপায়।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের নব রূপায়ণে
এখন আপনাদের
মলয় চন্দন সাবান

মনোরম মোড়ক
ছিমছাম গড়ন
গন্ধে বা ওজনে?
একেবারে আগের
মতই

মলয় চন্দন সাবান-এর সুগন্ধি
আপনার শরীর ও মনকে শুচিস্নিগ্ধ করে

কলিকাতা কেমিক্যাল-এর তৈরী
অভিজাত সাবান

দিনকালের হিসেব

নেই নেই ও স্ট্যাগফ্লেশান

নাই নাই কব কেন, এস মোর এতে
হবে নাকো অসুবিধে জিনিসটি পেতে।
ভুলেও কাহারে যেন আনিও না সাথে।
কিছুটা অধিক দাম লইব বা হাতে।

পারলাম না। সুকুমার রায়ের 'খাই খাই'-এর অনুসরণে কয়েক লাইন ছন্দোবদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আর ঐ চার লাইনের মধ্যেই বোধহয় ছন্দপতন ঘটে গেল। জীবনে কখনও কবিতা লিখিনি। কুম্ভকারের হঠাৎ কর্তরী গড়বার সাধ হলে যে রকম অবস্থা হয় আর কি। কবিতা লেখার সাধ হয়েছিল বর্তমানের নেই, নেই অবস্থা দেখে এর সঙ্গে যেন খাই খাই-এর বস্তুত মিল আছে। কিন্তু মিল থাকলেই যে কবিতা লেখা যাবে, আর সবাই যে তা পারবে—এরকম কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কি? অন্তত আমি খুঁজে পাইনি। তাই ঐ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে যে-পথে হাঁটতে শিখেছি তাতেই ফিরে এলাম। তবুও যে চার লাইন লিখে ফেলেছি, তা আর নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। জানি না সম্পাদকীয় বিভাগের করাত শেষ পর্যন্ত কি করবে।

অনেকেই হয়ত ভাববেন, নেই নেই কব কেন এস মোর এতে,'— এখানে 'এতে'র মানে কি? মানেটা বলে দেওয়াই বোধহয় ভাল। 'এতে' মানে হাট-বাজার বা দোকান বা বুকিং কাউন্টার—ঐ রকম কোন চিরাচরিত ক্রয়-বিক্রয়ের জায়গায় নয়, কোন গোপন স্থানে। এই গোপন স্থান কারও ডেরা হতে পারে, গুদাম হতে পারে, সাধারণ ভোজনালয় হতে পারে, হাওড়া স্টেশন বা গুড়ের মাঠও হতে পারে। অতএব গোপন স্থান বলেই কি সর্বসাধারণের গম্য হবে না, এমন কোন কথা নেই। সময়-বিশেষে সাধারণ দোকানপত্রও ঐ গোপন স্থান হয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে তখন প্রবেশের ব্যবস্থা হল সামনের দরজা দিয়ে নয়—পেছনের দরজা দিয়ে।

এই সব গোপন স্থানেই পাওয়া যায় সেই সব জিনিসপত্র যার সম্বন্ধে বিক্রেতাদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নেই নেই।'

নেই নেই:

ভেবে দেখা যাক, 'নেই নেই' আজ কতদূর প্রসারিত—অর্থাৎ বাজারে কোন কোন জিনিসপত্র নেই। বেবী ফুড নেই, গুঁড়ো দুধ নেই কেরোসিন তেল নেই, সিলিন্ডার গ্যাস নেই, বেশন-দোকানে চাল-গম অনেক সময়ই নেই, বনস্পতি তেল নেই, অনেক সময় সরষের তেলও থাকে না, আর গম থাকে না বলে পাউরুটিও থাকে না। আরও নেই নিউজ প্রিন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের কাগজ। পুজোর সময় বাইরে যাবার রেল-টিকিটও নেই। অন্য বছরও বাইরে যাবার এই রেল-টিকিট বিশেষ থাকে না, এবারে কিন্তু একদম নেই। অনেক ওষুধও বাজারে নেই।

আছে কিন্তু নেই:

কয়েক প্রকারের জিনিসপত্র আছে কিন্তু আবার নেইও। যেমন ধরুন বৈদ্যুতিক শক্তি ও তৎপ্রসূত সুবিধা। আপনার আমার বাড়ীতে আছে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা, ফ্রীজ ইত্যাদি। কিন্তু অনেক সময়ই তা বিদ্যুতের অভাবে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। এই কারণে জ্বলও অনেক সময় থেকেও থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ওবিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী বর্তমান আছে কিন্তু গ্যাস সরবরাহ করা হয় না মাসের মধ্যে ১০ দিন, এবং বাকী ২০ দিনের অধিকাংশ সময় চাপ এত কম যে কোন কাজেই লাগে না। উপরন্তু সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে কম চাপের সময় গ্যাস জ্বালানো বিপজ্জনক। সংখ্যা গণনায় রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পরিবহণের অধিকাংশই আছে কিন্তু পেট্রোলের অভাবে অথবা টায়ার বা অন্য অংশের যোগান ঘাটতির ফলে ঐ সব গাড়ীর অনেকগুলোই চালু নেই। বহুলাংশে একই দরুন দীর্ঘ অপেক্ষার পর যখন একখানা ট্রাম বা বাস এসে হাজির হয় তখন দেখা যায় কোনরকমে একটা পা রেখে ঝোলবার অবস্থাও নেই। চালু ট্যাকসিতেও অনেক সময় যে পরিবহণের ব্যবস্থা নেই তা 'ডিফেকটিভ' বা 'গ্যারেজ' নিশানা লটকানো ট্যাকসিখানা সামনে দিয়ে হু হু করে চলে গেলেই বুঝতে পারা যায়। স্কুল-কলেজ অনেক আছে কিন্তু অধিকাংশতেই 'কর্মখালি নেই'-এর মত তাতে 'জায়গা নেই' নোটিশ লটকানো।

নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থা:

যখন এই রকম আছে কিন্তু নেই-এর অবস্থার উদ্ভব হয় তখন নিয়ন্ত্রণ ও রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু বন্টনের প্রয়াসই হল আধুনিক অর্থনীতির নির্দেশ। স্মরণ রাখতে হবে যে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ বা দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে না সঙ্গে সঙ্গে রেশন-ব্যবস্থাও অবলম্বন করতে হবে। অন্তত্রমধ্যে প্রবেশ না করে ব্যবহারিক জীবনের ওপরই দৃষ্টিপাত করা যাক। কয়েক সপ্তাহ আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বেশ কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেঁধে দিয়েছিলেন কিন্তু ঐ দামে মাল পাওয়া গিয়েছে কি? সুতরাং শুধু প্রাইস কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ নৈতিক প্রলোভনেরই মত।

এই প্রসঙ্গে আমার একজন স্কুল শিক্ষককে মনে পড়ছে। ভদ্রলোকের জীবন-বোধের ভিত্তি ছিল সুনীতি ও সুরুচি। ক্লাসে গোলমাল হলে তিনি কে ঠিক গোলমাল করছে তা বের করবার চেষ্টা করতেন না, কোন সমষ্টিগত শাস্তির ব্যবস্থাও করতেন না—শুধু বলতেন: যারা গণ্ডগোল করছ একে একে এসে নীল-ডাউন হও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন দেখতেন কেউই নতজানু হবার জন্যে আসছে না তখন মন্তব্য করতেন: কি আশ্চর্য কেউই তা হলে গোলমাল করোনি!

শুধু দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকলে এই রকম মনকে চোখ ঠারা ছাড়া কিছু করবার থাকে না। জিনিসপত্র বেচা-কেনা হয় ঠিকই কিন্তু তা খোলা বাজারে নয় গোপন বা কালো বাজারে। সুতরাং মূল্য-নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হল রেশন-ব্যবস্থা।

কিন্তু রেশন-ব্যবস্থাকে কতদূর প্রসারিত করা যায়? আর বিশেষ ব্যাপক রেশন-ব্যবস্থার ফলে অর্থ-ব্যবস্থার বা ইকনমির প্রকৃতি কি পরিবর্তিত হয় না? সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপক রেশন-ব্যবস্থা সম্ভব, আমাদের মত আধা স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমাদের সেই মেসিনারী কোথায়? শুধু বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকাতেই পণ্যের জিনিসের সরবরাহ বজায় রাখতে সরকার হিমশিম খাচ্ছে, এর ওপর যদি রেশনিং-এর পরিধি বাড়ানো হয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তা ভাবা যায় না। তাই রেশনিং-এর পরিধি বিস্তারের দিকে না গিয়ে দাম-নিয়ন্ত্রণের ওপরই মোটামুটি নির্ভর করা হয়েছে। এর ফলে 'নেই নেই' অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

মৌল কারণ কি?

কিন্তু এই অবস্থার মৌল কারণ কি? দাম-নিয়ন্ত্রণ না হয় অবস্থাকে সঙ্গীন করে তুলেছে, সূচনা নিশ্চয়ই করেনি। আবার যে সব সেবা বা সার্ভিস থেকেও নেই—যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি বা পরিবহণ—তাদের ক্ষেত্রে ত দাম-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এই সব সেবার দাম না বাড়লে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝাঁপ বন্ধ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। অনেক সময় এই ভীতি প্রদর্শনে কিছুটা ফলও হয়েছে—অর্থাৎ দাম বাড়ানো হয়েছে কিন্তু ঠিক যাকে দাম-নিয়ন্ত্রণ বলা হয় তা পাওয়া যায়নি। কারণ এই সব ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের সাধারণ নীতি দ্বারা নির্ধারিত স্বতঃস্ফূর্ত দামের যখন কোন ভূমিকা নেই তখন দাম-নিয়ন্ত্রণের

কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে অনেক সময় রেশনিং বা বরাদ্দ-ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে—যেমন দেশের অনেক অঞ্চলেই বিদ্যুৎ রেশনিং করা হয়েছে।

মোট কথা দাম-নিয়ন্ত্রণ ও বরাদ্দ 'নেই নেই' অবস্থার মৌল কারণ নয়, মৌল কারণ হল স্ট্যাগফ্লেশান।

স্ট্যাগফ্লেশান :

'স্ট্যাগফ্লেশান' শব্দটি শুনে অনেকে হয়ত ভাববেন যে 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপের' মত কোন কিছু ব্যাপার। তা ঠিক নয়, স্ট্যাগফ্লেশান অতি সাম্প্রতিক অর্থনীতির অন্যতম ধারণা। অর্থ হল বন্ধ অর্থ-ব্যবস্থায় মূল্যস্ফীতি—ইনফ্লেশান ইন স্ট্যাগন্যান্ট ইকনমি।

টাকার দাম বা মূল্যস্ফীতির আলোচনার অমৃতেরই এক সংখ্যায় একটা প্রশ্ন তুলেছিলামঃ টাকার দাম একদিকে যেমন নিয়মিত কমছে অপর দিকে তেমনি কলকারখানার ঝাঁপও বন্ধ হচ্ছে এবং বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে— এ কি রকম ব্যাপার? পাঠ্য-পুস্তকে ইনফ্লেশনের ব্যাখ্যা যা পড়েছিলাম তার সঙ্গে এই অবস্থা ত মোটেই খাপ খায় না। সংক্ষেপে পাঠ্য-পুস্তকের ব্যাখ্যাটির পুনরুদ্ধার করা যেতে পারেঃ দাম বাড়তে শুরু করলে উৎপাদকরা উৎপাদনবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। ফলে উৎপাদনের অলস উপকরণগুলো নিযোজিত হতে থাকে। এইভাবে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থার উদ্ভব ঘটে—তখন আর উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব নয়। এর আগের স্তর প্রতিবারই মূল্যস্তরবৃদ্ধির অর্থ হল উৎপাদনবৃদ্ধি। এইভাবে উৎপাদনবৃদ্ধি না ঘটে শুধু যদি মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে—অর্থাৎ বন্ধ অর্থব্যবস্থায় যদি শুধু দামই বাড়তে থাকে তাকেই বলা হয় স্ট্যাগফ্লেশান। অবশ্য অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে কিছুটা সম্প্রসারণের পথে চলতে পারে কিন্তু মূল্যস্তরবৃদ্ধি যদি সম্প্রসারণকে বহু পরিমাণে ছাড়িয়ে যায় তাকেও স্ট্যাগফ্লেশান বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির হার হল ৩ শতাংশ কিন্তু সম্প্রসারণ বা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ৩ শতাংশের বেশী নয়। ফলে ঐ দেশ আজ স্ট্যাগফ্লেশান-কবলিত।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা আমাদের দেশ নয় স্ট্যাগফ্লেশানের প্রকোপ আজ মোটামুটি বিশ্বজনীন। তাই আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) প্রভৃতি সংস্থা থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে এর বিরুদ্ধে বিশেষ এবং ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের।

আমাদের সমস্যা :

অধিকাংশ দেশ স্ট্যাগফ্লেশান দ্বারা বিড়ম্বিত হলেও আমাদের মত সম্প্রসারণ-অভিমুখী অর্থ-ব্যবস্থার কাছে এ হল সমূহ বিপদের লক্ষণ। অবস্থা এইভাবে চললে হয়ত সবকিছুই বানচাল হয়ে যাবে—রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়বার আশঙ্কা হয়েছে।

টুকরো খবর

পশ্চিমবঙ্গ

আলোছায়া :

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে নিয়তই আলোছায়ার খেলা চলছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে পর পর দুদিন দুটি সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ঃ (১) পঞ্চম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্যে সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, (২) রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর তদবিরের ফলে ছাঁটাই করা খাদ্য-বরাদ্দের সামান্য অংশ মাত্র পুনরুদ্ধার। প্রথম সংবাদটিতে উল্লাসের কারণ থাকলেও দ্বিতীয়টি হল সম্পূর্ণ আশাভঙ্গের সূচক।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্যে সেচ ও বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ করা হয় মাত্র ৮২ কোটি টাকা। পঞ্চম পরিকল্পনায় এই বরাদ্দকে বাড়িয়ে নাকি ২৮০ কোটি টাকায় নিয়ে যেতে পরিকল্পনা কমিশন রাজী হয়েছে। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার তুলনায় পঞ্চম পরিকল্পনায় এই খাতে বরাদ্দ হবে সাড়ে তিন গুণের মত বেশী। এ ছাড়া বন্যা-নিয়ন্ত্রণ খাতেও বরাদ্দ আড়াই গুণের মত বৃদ্ধি করা হবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত যদি কার্যকর হয় তবে সেচ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। তবে সাড়ে তিনগুণ, আড়াই গুণের মত নয়। কারণ, টাকার দাম যে হারে কমছে তাতে এই ধরনের গাণিতিক হিসেব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করন করতে পারে।

এই সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ছটি জেলায় যখন বন্যার প্রকোপ তখন পশ্চিমবঙ্গের জন্যে বরাদ্দ গম থেকে ৩৫ হাজার টন হঠাৎ কমানো হয়। এর ফলে রাজ্যকর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রী ও খাদ্য বিভাগ, দিশেহারা হয়ে পড়েন। খাদ্যমন্ত্রী সদলবলে দিল্লী ছোটেন তদবিরের জন্য। সেখানে খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত কয়েকজন সংসদ-সদস্য। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ইত্যাদি সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁরা ছাঁটাই করা ৩৫ হাজার টন গমের মধ্যে ১০ হাজার টনের মত পুনরুদ্ধারে রাজী হয়েছেন বলে সংবাদে প্রকাশ। তাও আবার ৫ হাজার টন মাইলো দিয়ে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ছাঁটাই করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কথাটা হয়ত একদিক দিয়ে সত্যি। কিন্তু তীব্র সংকটের সময় হঠাৎ ছাঁটাই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সব দিক দিয়ে ফলাফল কি হতে পারে তাও ভেবে দেখা উচিত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও সামনে যে বাঙালীর জাতীয় উৎসব—তাও স্মরণ রাখতে হবে। ইতিমধ্যে রাশানে চালও কমানো হবে এই গুজবের ভিত্তিতে ব্ল্যাশনিং এলাকার খোলা বাজার থেকে চাল হঠাৎ উধাও হয়েছে। সুতরাং ছাঁটাই করা বরাদ্দের আরও কিছুটা পুনরুদ্ধার করা যায় কিনা, সে সম্পর্কে আরও একবার বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

ভারত

পরিবার পরিকল্পনা :

বিগত জনগণনা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা ঐ সালে (১৯৭১) ছিল ৫৪-৭৯ কোটি; আজ ১৯৭৩ সালের মধ্যভাগে—তা ৫৯-২২ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। এই জনবিস্ফোরণের অবস্থাতেই ১৯৭৩-৭৪ সালের জন্যে পরিবার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ হ্রাস করে মাত্র ৩৮-৪৬ কোটি টাকায় ধার্য করা হয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৬ কোটি টাকা।

এই বরাদ্দ হ্রাস সরকারের বর্তমান ব্যয়-সংক্ষেপে নীতিরই প্রতিফলন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বরাদ্দ হ্রাস যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যা হোক, এই বরাদ্দ হ্রাসের দরুন চতুর্থ পরিকল্পনার জন্মহারকে হাজার করা ৩৯ থেকে ৩২-এ এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় ২৫-এ নিয়ে যাওয়া যে সম্ভব হবে না সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। একটি বিখ্যাত বিদেশী পত্রিকায় পরিবার পরিকল্পনা খাতে উক্ত ছাঁটাইকে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলেই অভিহিত করা হয়েছে।

বিশ্ব

পশ্চিম আফ্রিকায় খরা :

খরাও কাম্য নয়, বন্যাও কাম্য নয়। তবে এই দুই-এর মধ্যে যদি বাছতে হয় তবে বন্যাকেই বাছতে হবে। অন্তত পশ্চিম আফ্রিকার ছটি দেশের খরায় বিবরণ পড়ে তাই মনে হয়। দেশ ছটি হল—চাদ, নাইজার, মরিটানিয়া আপারভোল্টা, মালী এবং সেনেগাল। বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নেই, শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আপার ভোল্টা অধিবাসীদের অনেক সময় গোময় ইত্যাদি থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়েছে। তবে কিন্তু ব্যাপক মহামারী দেখা দেয়নি। কারণ, ত্রাণের জন্য বিশ্বব্যাপীন প্রচেষ্টা। ত্রাণকার্যে হাত মিলিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পশ্চিম জার্মানী, ব্রিটেন ফ্রান্স, কানাডা বেলজিয়াম ইতালী স্পেন এবং হল্যান্ড। বর্তমানে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে এলেও জাতিপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংগঠন (এফ এ ও) সতর্ক করে দিয়েছে যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে ১৯৭৪ সাল আরও ভয়ংকর হতে পারে। এ বছর দেশ কিছুটা কৃষিউপযুক্ত হয়েছে তবে সার কম দিয়ে ফসলের খরচ প্রতিবিধান হিসেবে তা যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের কথা

* মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি ?
*প্রাণের অস্তিত্ব—মঙ্গলে ও মঙ্গল ছাড়িয়ে অন্যত্র

সূর্য থেকে দূরত্বের হিসেবে মঙ্গল হচ্ছে চতুর্থ গ্রহ—বুধ, শুক্র ও পৃথিবীর পরে। মঙ্গলের আকার পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝামাঝি। মঙ্গলের ব্যাস প্রায় ৬,৮০০ কিলোমিটার—পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক ও চন্দ্রের ব্যাসের দ্বিগুণ। মঙ্গলের উপরিতল পৃথিবীর উপরিতলের প্রায় সিকিভাগ। মঙ্গলের মোট ভর পৃথিবীর মোট ভরের দশ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলের উপরিতলে জিনিসের ওজন প্রায় আড়াই গুণ কম। অর্থাৎ, আড়াই মণ ওজনের একজন মানুষ মঙ্গলে গেলে এক মণ হয়ে যাবে। এ কারণে মঙ্গল থেকে রকেট আকাশে তোলাটা অপেক্ষাকৃত সহজ, আরো কম শক্তিশালী রকেটের সাহায্যেই মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করা যেতে পারে।

মঙ্গলের অক্ষ-আবর্তনও পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের খুব কাছাকাছি। নিজের অক্ষের চারদিকে একটি পাক দিতে মঙ্গলের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ২২-৬২ সেকেন্ড। কক্ষের সমতলের ওপরে মঙ্গলের অক্ষের ঝুঁকে থাকাটাও অনেকটা পৃথিবীর মতো, ফলে মঙ্গলেও একই ধরনের ঋতু। মঙ্গলের একটি বছর সম্পূর্ণ হয় পৃথিবীর হিসেবে ৬৮৭ দিনে, মঙ্গলের হিসেবে ৬৬৯ দিনে। উত্তর গোলার্ধের চেয়ে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষাকৃত বেশি গরম ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী।

মঙ্গল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি তখন দুই গ্রহের মধ্যে দূরত্ব হয় ৫-৫ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে তখন ৩৫ কোটি কিলোমিটারেরও বেশি।

গত দশ বছরের মহাকাশ অভিযানে মঙ্গলগ্রহ নিয়ে যতো অনুসন্ধান হয়েছে তার ফলে এই গ্রহটির উৎপত্তি ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক ধারণাই বদলে গিয়েছে।

এখন একথা নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, মঙ্গল একটি জটিল গ্রহ এবং চন্দ্রের চেয়ে উন্নত। তার ভূতত্ত্বের ইতিহাস কৌতূহলজনক। তার বহু এলাকাতেই থেকে গিয়েছে গড়নগত প্রক্রিয়া, আগ্নেয়গিরির তৎপরতা ও উল্কাপিণ্ডের আঘাতের ছাপ।

মঙ্গলের বিষুব অঞ্চলে ও উত্তর গোলার্ধের মাঝামাঝি অক্ষাংশে এমন সব পর্বতের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেগুলো আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্ভূত। তাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে চারটির আয়তন পৃথিবীর সমজাতীয় পর্বতের দ্বিগুণ। গহ্বরের সৃষ্টি উল্কাপিণ্ডের আঘাত কিংবা আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ফলে।

মেরু অঞ্চলে সহজেই আবিষ্কার করা যেতে পারে পাতসদৃশ স্তরবিভাগ। পাললশিলা থেকে এগুলো তৈরী। মেরু-টুপি গলতে শুরু করলে এই শিলাগুলো বেরিয়ে পড়ে। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, এই স্তরগুলোর মধ্যে আছে তরলীভূত গ্যাস, ধুলো বা আগ্নেয়গিরির ছাই।

মঙ্গলগ্রহে প্রচুর পরিমাণে বরফ বা তরল জল আছে কিনা, সেটা ভাবনার বিষয়। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অকসাইড, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চেয়ে একশো গুণ হালকা, তাপমাত্রা মাঝামাঝি অক্ষাংশের এলাকায়-৭০ থেকে +২০ সেন্টিগ্রেডের মধ্যে (কম-বেশি হয়ে থাকে দিন-রাত্রি ভেদে বা ঋতু ভেদে)। এ অবস্থায় মঙ্গলের উপরিতলে তরল জলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে জলের অস্তিত্ব সামান্য—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যতোখানি তার চেয়ে প্রায় ১০০০ ভাগ কম। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের চাপে জল জমে বরফ হয় (হিমাঙ্ক)-৭০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, এ অবস্থায় এমন হওয়াও সম্ভব যে প্রচুর পরিমাণ জল উপরিতলের কাছাকাছি স্তরে জমাট অবস্থায় থেকে গিয়েছে। মেরু টুপিতে যে কিছু জল আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে মাপ নিয়ে দেখা গিয়েছে, মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ঋতুতে ঋতুতে যথেষ্ট বাড়ে-কমে।

মঙ্গলগ্রহে যে একসময়ে আগ্নেয়গিরির প্রচুর তৎপরতা চলেছিল, এমন সাক্ষ্য প্রচুর রয়েছে। অনুমান করা চলে, সে সময়ে প্রচুর পরিমাণ জলও আগ্নেয় গ্যাসের সঙ্গে অভ্যন্তর থেকে উঠে এসেছিল। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মঙ্গলের সেই জল গেল কোথায়? এমন অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এক সময়ে প্রচুর জলের ধারা মঙ্গলের উপরিতল দিয়ে বয়ে গিয়েছে। মঙ্গলের কোনো কোনো উপত্যকার আলোকচিত্রেও দেখা যায় শুকিয়ে যাওয়া নদীর মতো

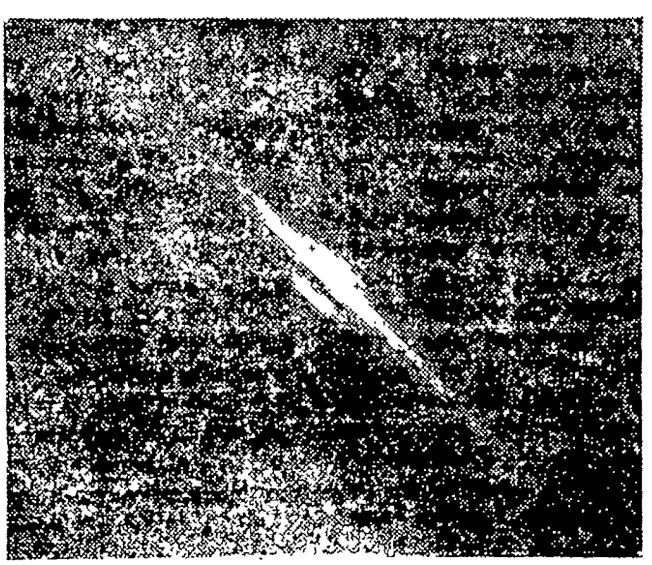

দূরের একটি গ্যালাক্সি। দূর থেকে আমাদের গ্যালাক্সিরও এমনি চেহারা।

কিছু লক্ষণ। তাই যদি হয় তাহলে এমন অনুমান করার কারণ ঘটে যে মঙ্গলে লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রাণের তৎপরতা ছিল। তবে এখনো পর্যন্ত তার লক্ষণ অতি সামান্য।

ঋতুতে ঋতুতে মঙ্গলের রং বদলে যাওয়া, বসন্ত শুরু হলে মেরু থেকে শুরু করে বিষুব পর্যন্ত একটা গাঢ় রং ছড়িয়ে পড়া—এ ব্যাপারটাকেই এতদিন উপস্থিত করা হত প্রাণের তৎপরতার লক্ষণ হিসেবে। বলা হত, মঙ্গলের উপরিতলে উদ্ভিদের প্রলেপ পড়ছে। এখন একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, মঙ্গলের উপরিতলের রং গাঢ় হয়ে বায়ুপ্রবাহে পরিবর্তন ঘটার ফলে। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মেরু এলাকা থেকে বাতাস বয়ে আসে আর সেই বাতাসে সরে যায় গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো। এই ধুলো অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখায়, ধুলো সরে যাবার ফলে বেরিয়ে পড়া উপরিতল অপেক্ষাকৃত গাঢ়।

উপগ্রহের মাপ থেকে ধারণা হয়, মঙ্গলগ্রহের সম্ভবত নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। হিসেব করে দেখা যায়, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্র ৫০০ ভাগ কম জোরালো। তবে মঙ্গলের চৌম্বক ক্ষেত্র যতো কমই হোক, তার অস্তিত্ব যদি থাকে তাহলে এই সামান্য ঘটনাটুকু থেকেই মঙ্গলের আভ্যন্তরিক গড়ন ও বিবর্তন সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণা হতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে মঙ্গলগ্রহের রহস্য সবেমাত্র ধরা দিতে শুরু করেছে। আশা করা চলে, মহাকাশ-অভিযানে সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের তৎপরতার ফলে কিছুকালের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানা যাবে।

প্রাণের সন্ধান

মঙ্গলে ও মঙ্গল ছাড়িয়ে অন্যত্র

পৃথিবীর বাইরে অন্য কোনো গ্রহে কি প্রাণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব আরো বহু গ্রহেই থাকা সম্ভব—শুধু এই পৃথিবীতে নয়। তবে সৌরমণ্ডলের অন্য আটটি গ্রহে যে উন্নত প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়— এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত। কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাইরে? আমাদের এই নিজস্ব বিশ্বেই আরো কোটি কোটি গ্রহ-মণ্ডল থাকা সম্ভব, অতএব এইসব গ্রহ-মণ্ডলের কোনো কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকাই বা কেন অসম্ভব হবে? এমনকি মানুষের চেয়েও উন্নত জীব?

বিজ্ঞানীরা তাই বলেন, মানুষের মতো জীব বা মানুষের চেয়ে উন্নত জীব যদি এই

মঙ্গলগ্রহ। উত্তর গোলার্ধের সাদা আচ্ছাদনটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরবীক্ষণযন্ত্রে মঙ্গলগ্রহের ছবি উল্টো দেখাচ্ছে। হাতে আঁকা ছবি।

বিশ্বের অন্য কোনো গ্রহে থেকে থাকে তাহলে তারা হয়তো অন্য গ্রহের উন্নত জীবদের উদ্দেশে সংকেত পাঠিয়ে যাচ্ছে। অতএব এই সংকেত ধরার চেষ্টা করা যাক। বিজ্ঞানীদের দুটি সম্মেলন থেকেও এই কথাটি বলা হয়েছে। একটি সম্মেলন সোভিয়েত ইউনিয়নে, সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞান আকাদেমির উদ্যোগে (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল এই প্রশ্ন : অন্য জগতের বার্তা ধরার চেষ্টা কি মানুষের করা উচিত? এক-বাক্যে বিজ্ঞানীরা জবাব দিয়েছিলেন—হ্যাঁ। আমেরিকান, সোভিয়েত, চেক, হাঙ্গেরীয় ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা একযোগে প্রস্তাব নিয়েছিলেন—'পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান নেওয়া সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিদের উচিত কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।' অপর সম্মেলন সান ফ্রানসিস্কোয়। এই সম্মেলনের প্রতিনিধিরা আলোচনা করেছিলেন বিশেষ একটি প্রকল্প নিয়ে : প্রজেক্ট সাইক্রপস। বলা হয়েছে, কয়েক শত কোটি ডলার ব্যয়ে পৃথিবীর তিন স্থানে খাড়া করতে হবে তিনটি বিরাট রেডিও-টেলিস্কোপ এবং তার সাহায্যে অন্য জগৎ থেকে প্রেরিত বার্তা ধরার চেষ্টা করতে হবে। তাঁরা বলেন, এই বিশ্বে প্রাণের সাড়া থাকা উচিত অতি বিপুল ধরনের, তার সন্ধান অবশ্যই করা উচিত। তবে এ-বিষয়ে তাঁরা একমত হন যে সৌরমণ্ডলের অন্য আটটি গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের কোনো অস্তিত্ব নেই, প্রাথমিক ধরনের প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের সন্ধান পাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এতকাল সবচেয়ে বেশি নজর দিয়েছিলেন মঙ্গলগ্রহের ওপরে। মঙ্গলগ্রহের দুই মেরুতে রয়েছে দুটি সাদা আচ্ছাদন—ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়ে কমে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে মঙ্গলগ্রহের উপরিতলে অন্য যে ব্যাপারটি দেখা যায় তা আরো চমকপ্রদ : বসন্তকালে গাঢ় একটি ছোপ ছড়িয়ে পড়া। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, মেরু-অঞ্চলের সাদা বরফ গলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের জন্ম হচ্ছে।

ষাটের দশকে আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মেরিনার মারফৎ প্রথম যখন মঙ্গলগ্রহের আলোকচিত্র পাওয়া গেল তখনই বোঝা যায় যে বিজ্ঞানীদের এই সমস্ত ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। মঙ্গলের উপরিতলের দৃশ্য মোটেই মনোহর নয়। তা অনেকটা চন্দ্রের মতো, চারদিকে গহ্বর ছড়ানো, সাগর বা উদ্ভিদের কোন চিহ্নই নেই। মেরিনারের যন্ত্রপাতিতে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ল যে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা এবং তার বেশির ভাগটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সামান্য জলীয় বাষ্প। মেরিনারের যন্ত্রপাতিতে আরো ধরা পড়ল, পৃথিবীর

বায়ুমণ্ডলে যেমন একটি ওজোন-স্তর আছে —যার দরুন সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি বাধা পায়—তেমন কোনো ওজোন-স্তর মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে নেই। তার মানে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি অবাধে মঙ্গলের উপরিতল পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে। তাহলে এই প্রাণসংহারী রশ্মির মধ্যে কি করে প্রাণের অস্তিত্ব থাকে? কিছুতেই নয়।

আরো কথা আছে। মেরিনারের যন্ত্র মঙ্গলগ্রহে কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্ব টের পায় নি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও জোর করে বলতে পারেন নি যে মঙ্গলগ্রহে চৌম্বকক্ষেত্র আছেই। যদি না থাকে (থাকলেও অতি যৎসামান্য) তাহলে ধরে নিতে হয় যে মঙ্গলের গোলকের কেন্দ্রে পৃথিবীর মতো গলিত লৌহ নেই (যেটি থাকার দরুন পৃথিবীর চুম্বকত্ব)। তার মানে, মঙ্গল কোনো সময়েই এমন গলিত অবস্থায় ছিল না যার ফলে ভারী বস্তু ভিতরের দিকে যায় ও হালকা বস্তু ওপরের দিকে উঠে আসে। এই হালকা বস্তুগুলো ওপরে উঠে আসার ফলে পৃথিবীর যে ভূ-ত্বক তৈরি হয়েছে তা প্রাণের পরিপোষক। মঙ্গলে প্রাণ তৈরি হওয়া ও টিকে থাকার এই প্রাথমিক অবস্থাটিই নেই।

তবে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এত সহজে হার মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, এই যুক্তি মেনে নিলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। ধরা যাক, মঙ্গলগ্রহের জীব পৃথিবীতে রকেট পাঠিয়ে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর হাজারটা ফটো তুলে নিয়ে গিয়েছে। এই হাজারটা ছবির একটাতেও পৃথিবীর প্রাণের অস্তিত্ব ধরা পড়বে কি? পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে, অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রাণ টিকে থাকে। প্রাণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে গভীর তুষারের মধ্যে উঁচু পর্বতের চূড়োয়, গভীর সমুদ্রের নিচে, এমনকি উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যেও। মঙ্গলগ্রহের অনুরূপ আবহাওয়া তৈরি করে পরীক্ষাকার্য চালিয়ে দেখা গিয়েছে, এই পৃথিবীর কোনো কোনো জীবাণু সেই আবহাওয়াতেও দিব্যি টিকে থাকে। তাহলে মঙ্গলে কেন থাকবে না?

তাছাড়া, এই বিজ্ঞানীদের মতে, মঙ্গলে সম্ভবত এখন একটা হিমযুগ চলছে। সম্ভবত আজ থেকে দশ হাজার বা বারো হাজার বছর পরে এই হিমযুগ কেটে যাবে, সূর্য থেকে আরো বেশি তাপ পাবে এই গ্রহ। তখন বরফ গলে গিয়ে বেরিয়ে আসবে বিপুল পরিমাণ জল এবং যে-সব জীব এখন মড়ার মতো পড়ে আছে তারা আবার ফিরে পাবে সচল জীবন।

অসম্ভব মনে হচ্ছে? এই বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর জীবন সম্পর্কে অন্ধ দম্ভ যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে—না।

মেরিনারের আরো একটি আবিষ্কারের কথা এখানে উল্লেখ করা চলে। পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ (চন্দ্র), মঙ্গলগ্রহের তেমনি দুটি (ডিমোস ও ফোবাস)। কিছুকাল আগে একজন সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে ফোবোস-এর কক্ষ-পরিক্রমায় ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় এটি একটি ফাঁপা গোলক। অতএব এটি একটি কৃত্রিম উপগ্রহ—মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের তৈরী। এ ঘটনাটি মেনে নিলে, এখন না হোক, অতীতে কোনো এক সময়ে মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। কিন্তু মেরিনারের সাক্ষ্য থেকে নির্ভুলভাবে জানা গিয়েছে, ফোবোসও নিরেট গোলক।

যাই হোক, প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষাবলম্বী বিজ্ঞানীরা বলছেন, মঙ্গলে না হোক শুক্রে, শুক্রে না হোক বৃহস্পতিতে, সৌরমণ্ডলের কোনো গ্রহে না হোক এই বিশ্বের অন্য কোনো নক্ষত্রের গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছেই, সম্ভবত বুদ্ধিমান জীবেরও। যে-যে কারণে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে তা কোনো আকস্মিক যোগাযোগের ফলে নয়।

—অয়স্কান্ত

আপনি কেমন আছেন

* ব্রণ খুঁটবেন না
* লিভার সম্পর্কে সাবধান হোন

জীবনে কখনো কোন দিনই মুখে একটা-দুটো ব্রণ বেরোয় নি একথা হলপ করে বলা কঠিন। প্রত্যেক মা-বাবাই জানেন, বিশেষ এক বয়সে তাঁদের মুখেও দু-চারটে ব্রণ উঠেছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই সেরে গিয়েছে। অথচ এই সহজ সত্য কথাটা ছেলেমেয়েদের কাছে চেপে গিয়ে অনেক সময় বেশ কিছু জটিলতা সৃষ্টি করি আমরা।

সাধারণত যৌবনের প্রারম্ভে, কখনো পরেও ব্রণ উঠতে পারে। শুধু মুখে নয়, বুকে কিংবা পিঠেও—ত্বকে তৈলগ্রন্থি যেখানে বেশী। কারও বা হয় দু-চারটে, কারও মুখ ভর্তি। সারে, আবার হয়—কোন ওষুধে কাজ দেয় না। টোটকা-টুটকি, ক্রীম-ওষুধ সব কিছু উপেক্ষা করে অসীম মনোবেদনার কারণ হয়ে ওঠে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। অপূর্ব সুন্দরী কারো কারো মুখশ্রী কাল কাল মেচেতার দাগে ভরে যায়।

ব্রণের উৎপত্তি যৌন-হরমোন থেকে। বয়ঃসন্ধির কালে দেহের যৌনগ্রন্থি থেকে স্বাভাবিকভাবেই হরমোন ক্ষরিত হতে থাকে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম। এই হরমোনের জোয়ার এসে পৌঁছায় রক্তস্রোতে। তার প্রভাব যেমন দেহেতে প্রতিফলিত হয় যৌবনের লক্ষণ নিয়ে, তেমনি ছোঁয়া লাগে মনেও। ছেলেমেয়েরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় সৃষ্টির আবেগ নিয়ে। জীবধর্মের প্রকৃতিই এই। যৌন হরমোন ক্ষরণের ফলে মনের সম্পর্কটি মনে রাখার মত।

বর্ষাস্রোত যখন নদীর দুকূল ছাপিয়ে যায়, তখন দেখা দেয় প্লাবন। যৌন হরমোনের অতিক্ষরণও ত্বকের নীচে, লোমকূপের নীচে তৈলগ্রন্থিগুলির ক্ষরণও বাড়িয়ে দেয়। সেই অতিরিক্ত তৈলাক্ত পদার্থ লোমকূপের ফুটোগুলি বন্ধ করে দেয় চামড়ার কোষ থেকে পরিত্যক্ত বস্তুগুলির সঙ্গে একত্রে। ফলে ত্যাজ্য বস্তুগুলি বেরোতে পাবে না, লোমকূপের নীচে ঘটে যায় উত্তেজনা ও প্রদাহ—দেখা দেয় ক্রুদ্ধ আরও ফুসকুড়ি। রাসায়নিক পরিবর্তনের মুখটা হয় কাল।

এদিকে ত্বকে থাকে নানা রোগ-রীজাণু। এমনিতে তারা হয়ত কোন ক্ষতি করতে পাবে না। কিন্তু যেই দেখা গেল কোন একটা এলাকায় কেটে-ছড়ে গিয়েছে কিংবা প্রদাহ সৃষ্টি হয়েছে, অমনি তারা ঝাঁপিয়ে গোলমালের মধ্যে ঢুকে পড়ে আরও অরাজকতা সৃষ্টি করতে। ঠিক সমাজবিরোধীদের মত। ফুসকুড়িটা তখন ফুলে আরও লাল হয়ে

ওঠে, কোষের অবক্ষয় থেকে পুঁজ সৃষ্টি হয়, পেকে ওঠে ব্রণটা, ব্যথায় টনটন করে।

এই যে মুখে ব্রণ দেখা দিল, এর পরে তাকে দুষ্টক্ষতে পরিণত করার ব্যাপারটা কিন্তু মানুষের নিজের কেরামতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নখ দিয়ে টিপে পুঁজ বের করে দিলে তাড়াতাড়ি সেরে যাবে এই আশায় নখের মসৃণ ব্রণটাকে বিষাক্ত করে তুলি আমরা। তা না করে যদি অন্যান্য ফোড়া বা প্রদাহের মত গরম জলের সেঁক দিয়ে আলতোভাবে অ্যান্টিসেপটিক মলম বা ক্রীম লাগান হয়, স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হত ওরা। অবশ্য সেরে যাওয়ার পরও কাল দাগটা বা ক্ষতাঙ্কটা কিছু দিন মনঃপীড়ার কারণ হয়ে থাকলেও সেই ক্ষতাঙ্কও সেরে যেতে পারে এবং সেরে যায়ও আপনা থেকেই।

ব্রণ কেন হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীমহল সম্পূর্ণ একমত না হলেও পেট গরম বা কোষ্ঠ সাফ না হওয়াটা ব্রণের কারণ বলে প্রচলিত যে ধারণা আছে সেটা ঠিক নয়। অনবরত যাদের ব্রণ হচ্ছে, বুঝতে হবে তার দেহে যৌন হরমোনের ক্ষরণ হচ্ছে অতিরিক্ত। আগেই বলা হয়েছে, মনের সঙ্গে ব্রণের সম্পর্ক আছে। মানুষ ইচ্ছা করলে তার মস্তিষ্কের সাহায্যে করতে পারে অনেক কিছু। ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণও অবদমিত করা সম্ভব। যৌন উত্তেজক যে-কোন অবস্থা-দৃশ্য অথবা চিন্তা, তা সে সিনেমা দেখেই হোক কিংবা গল্প পড়ে বা গল্প শুনেই হোক, ব্রণের উদ্ভবে প্ররোচনা দিতে পারে। পেট গরম, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা ইত্যাদি তার অপ্রত্যক্ষ কারণ হওয়া অসম্ভব নয়। সুতরাং ব্রণ প্রতিষেধ করতে হলে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শিখতেই হবে। কাজটা নিশ্চয়ই সহজ নয়—বিশেষ করে আধুনিক সমাজে উত্তেজনা সৃষ্টির উপাদান যখন অঢেল। চিকিৎসা ও মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু এ-ব্যাপারে মোটামুটি একমত যে, ব্রণের আসল কারণটা লুকিয়ে রেখে ছেলেমেয়েদের আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, কঠোর শারীরিক শ্রম, গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত থাকা, হাল্কা পুষ্টিকর খাদ্য, সুনিদ্রা, উত্তেজক পানীয় পরিহার করা ব্রণ থেকে নিষ্কৃতি পেতে সাহায্য করে। অনেকে চকোলেট এবং ফ্যাটও বন্ধ করার পক্ষপাতী।

তা সত্ত্বেও যদি ব্রণ হয়, প্রথম করণীয় হল নখ দিয়ে না খোঁটা। অনেক ক্ষেত্রেই আপনি সেরে যায় ওগুলো। যদি খুব বিরক্তিকর হয়ে ওঠে, চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। আত্মচিকিৎসার চেষ্টা না করাই ভাল। কোন্ ক্ষেত্রে উত্তেজনা প্রশমনকারী ওষুধ চাই, কোথায় এ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য কোন ওষুধ দরকার সে সিদ্ধান্ত চিকিৎসকের ওপর ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

* * *

হয়ত অনেক দিন পরে দেখা—জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছেন? মুখ ব্যাজার করে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, বিশেষ ভাল না, লিভারটা ভাল যাচ্ছে না। মানে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, ঠিকমত কোষ্ঠ সাফ হচ্ছে না, খিদে নেই, একটা আবছা অবসাদ ভাব।

কারও হয়ত হঠাৎ পেটের ডান দিকে পাঁজরের কাছ বরাবর ঐ রকম আবছা ব্যথা, নড়তে-চড়তে বাথা বাড়ে, হয়ত পাতলা দাস্ত, ক্ষুধামান্দ্য। সন্দেহ করলেন, লিভারটা ঠিক আছে তো?

কারও বা শুরু হয় ক্ষুধামান্দ্য দিয়ে, সঙ্গে দুর্বলতা, কমি-কমি ভাব, জ্বর, চোখটা একটু পীতাভ, প্রস্রাবের রং হলুদ বর্ণ। ছুটলেন ডাক্তারের কাছে—জণ্ডিস হল নাকি? লিভারের কথা হয়ত মনে পড়ে না প্রথমে। কিন্তু আসলে তাই।

কোন মা হয়ত ডাক্তারখানায় ঢুকেই বললেন, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, বাচ্চার লিভারটা—সাদা-সাদা পায়খানা করছে, খাচ্ছে না, দিন-রাত ঘ্যান-ঘ্যান করছে, গাটাও গরম। কালমেঘ খাওয়ার?

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি এগুলো। সত্যিই হয়ত লিভার ঠিকমত কাজ করছে না—মৃদু ও স্বল্পস্থায়ী বিকার হয়েছে, কিংবা কঠিন কোন রোগের পূর্বাভাস। প্রথম অবস্থায় মানুষ ঘুরে-ফিরে বেড়ায়, কাজকর্মও করে, করে খাওয়ার ধরাকাট, কিংবা নিজে থেকেই খায় একটু লিভার-টনিক। কারও সেরে যায়, কারও বেড়ে যায়।

ডাক্তাররা কিন্তু যের বেশী গুরুত্ব দেন লিভারকে। আমাদের দেহযন্ত্রটির পরিচালনায় মস্তিষ্ক ও হৃদপিণ্ডের মত অসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে লিভার। লিভার খারাপ হতে পারে নানা কারণে, নানাভাবে। ক্ষেত্রবিশেষে আমরা কল্পনা করতে পারি না এমন মারাত্মকও হতে পারে। কিন্তু সে আলোচনায় যাওয়ার আগে লিভারের কাজটা কি, মোটামুটি জেনে রাখা ভাল।

(১) আমরা যে সব খাদ্য খাই, তার মূল উপাদান প্রোটিন, ফ্যাট ও শর্করার বিপাক ক্রিয়া সাধিত হয় লিভারে। লিভার খারাপ হলে খাদ্যের প্রোটিন দেহ-প্রোটিনে রূপান্তরের কাজ বিঘ্নিত হয়, স্নেহপদার্থ বিশ্লিষ্ট ও অবশোষিত হবে না, রক্তে বেশী চিনি দেখা দিতে পারে।

(২) শর্করা, কিছু প্রোটিন এবং ভিটামিন এ, ডি ও বি-১২ সঞ্চিত থাকে লিভারে। প্রকৃতপক্ষে লিভারকে বলা হয় দেহের পুষ্টি উপাদানের ভাঁড়ার ঘর। ঘাটতির সময়, জ্বরজারিতে, কঠোর শ্রমে হঠাৎ বাড়তি প্রয়োজন মেটানোর দরকার হলে লিভার তার সঞ্চয় থেকে মুক্ত করে দেয় এগুলোকে।

(৩) রক্তের কিছু লোহিত কণিকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরী হয় লিভারে।

(৪) লিভারই পিত্তের জন্মস্থান। পিত্ত বিনা খাদ্য হজমই হবে না।

(৫) বাইরে থেকে অসা এবং দেহের ভিতরে উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থগুলিকে নির্বিষ ও ধ্বংস করে প্রধানত লিভার।

(৬) লিভার কিছু কিছু হরমোনকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(৭) দেহের রক্ত চলাচলের জংশন স্টেশন লিভার।

যেহেতু লিভার অধিকাংশ খাদ্য উপাদানের আধার, তাই মেটুলি রা লিভার একটি উৎকৃষ্ট ও মুখরোচক খাদ্য। প্রোটিনের ঘাটতিতে, দুরন্ত পারনিশাস অ্যানিমিয়ায়, ভিটামিনের অভাবজনিত বিভিন্ন ব্যাধিতে পথ্য ও ওষুধ হিসাবে লিভার ব্যবহৃত হয় ব্যাপকভাবে।

নানা কারণে নানাভাবে লিভার বিকল হতে পারে। মৃদু অথবা গুরুতর, অস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এই বৈকল্য। সামান্য প্রদাহ থেকে কোষগুলির আংশিক বা ব্যাপক ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নয়। ভাইরাস সংক্রমণে যে জণ্ডিস বা কামলা রোগ দেখা দেয় আসলে তাতে লিভারের কোষগুলির প্রদাহ ও অবক্ষয় হয়ে থাকে। আমাশার কীটাণু হিস্টোলিটিকা অনেক সময় লিভারে বাসা বেঁধে লিভারে ফোড়া বা লিভার অ্যাবসেসের প্রযোচনা দেয়। অত্যধিক মদ্যপান লিভারের প্রদাহ ও কোষের অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে। তেল-ঘি বেশী খেলে লিভার তা বিশ্লেষ করতে পারে না বলে সেই ফ্যাট লিভারে জমা হয়েও প্রদাহ ঘটিয়ে থাকে। অনাহারে বা অর্ধাহারে শর্করার ঘাটতি পড়লে লিভারে সঞ্চিত চিনি (গ্লাইকোজেন) খরচা হয়ে গিয়ে দেহের সঞ্চিত শক্তি উপাদানে টান পড়তে পারে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের নিরবচ্ছিন্ন ঘাটতি থেকে হয় মারাত্মক সিরোসিস—যাতে লিভার কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। লিভারের ক্যান্সার দুরারোগ্য।

লিভার ভাল রাখার প্রকৃষ্ট পথ হল শর্করা, প্রোটিন ও টাটকা শাক-সবজিসহ সুষম খাদ্য, নিয়মিত কোষ্ঠ সাফ রাখা এবং মাঝে মাঝে পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে চেক-আপ করান। লিভারের অসুখে লিভার বড় হতে পারে ছোট হয়েও যেতে পারে, ব্যথা হতেও পারে, নাও পারে। সুতরাং আত্মচিকিৎসার চেষ্টা না করাই ভাল।

—অশ্বিনী সামন্ত

পুনশ্চ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বর্তমান বৎসরে নানা সভা-সমিতি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে নানাবিধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে তাঁর সম্পর্কে নূতন গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি। মাইকেল জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন।

যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের এই ক্ষণজন্মা কবির জীবনের কীর্তি-কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি অনন্যসাধারণ তাঁর কাব্যের বিভাব। নিজে সুপণ্ডিত হলেও এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয়বিধ রচনাতে অসামান্য দক্ষতা ও মাধুর্য প্রদর্শন করলেও, ব্যবহারিক জীবনে বিদেশে ও স্বদেশের মাটিতে তাঁকে নানা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাহলেও, তাঁর মনোবল ছিল অসাধারণ এবং এই মনোবলের জন্যই তিনি তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের নানা বৈপরীত্যের মাঝেও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোথাও শৈথিল্য প্রকাশ করেন নি বা তা ব্যাহত হতে দেননি।

১৮৬১ সালটি মাইকেলের জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় কাল বলে ধরা যায়। এই বছরের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং এই বছরের-ই ১২ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী সভার উদ্যোগে মাইকেল সাড়ম্বরে সংবর্ধিত হন। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য দেশের এক শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি তাঁর সাহিত্য-গুণবত্তার জন্য যথোচিত মর্যাদা না পেলেও, এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা তাঁর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছিল, মধুসূদনের জীবনে তা এক বিশেষ স্মরণীয় এবং প্রকাশ্যভাবে সর্বপ্রথম সম্মাননার ঘটনা।

এই সভায় মধুসূদনকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। সেই মানপত্রটির বিষয়বস্তু দীর্ঘকাল আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে, অধ্যাপক শ্রী জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ১৮৬১ সালের ২০-এ ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোম-প্রকাশ' পত্রিকা থেকে এই মানপত্রটির প্রতিলিপি কপি করে ব্রজেনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং এটি তিনিই প্রথম ৪১ বছর পূর্বে 'প্রবাসী'তে (১৩৩৯, শ্রাবণ) প্রকাশ করেন। তাছাড়া ঐ বৎসরেরই ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-সভায় উক্ত মানপত্রটি বহু বিদ্বজ্জনের সমক্ষে পঠিত হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচয়-জ্ঞাপক একটি পরিচ্ছেদ-সহ বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক মাইকেলকে প্রদত্ত মানপত্রটির পূর্ণ বয়ান আমরা এখানে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য যথাযথ উদ্ধৃত করে দিলাম।

বিদ্যোৎসাহিনী সভায় মাইকেল
মধুসূদন দত্তের সংবর্ধনা

'কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভা কবিবর মধুসূদন দত্তকে ১৮৬১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে একখানি মানপত্র দেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য মাইকেলের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাংলায় সংক্ষেপে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—তাহার কথা গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি মানপত্রখানির নকল আমার হস্তগত হইয়াছে। মাইকেলের চরিতকারদের কেহই বহু চেষ্টা করিয়াও এই মানপত্রখানি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এই কারণে আমরা নিম্নে তাহা মুদ্রিত করিলাম।

এড্রেস—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু। কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-কল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্তা তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃত-কার্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপূর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষার এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎ-সাহিনী সভা-সংস্থাপক যৌথ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন, তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিত রূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ত্রুটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা-আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শন জনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যত-দিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি আপনি উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্তৃক যেন ভারি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজি ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এসকল মহাদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণ-গ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

বিদ্যোৎসাহিনীসভা সভ্যবর্গাণাম
কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দ।

—ক্ষপণক

ঘুঘোড়ার গন্ধ

অশোককুমার সেনগুপ্ত

উপমাটা ধূর্ত বিড়ালের সঙ্গে নয় একটা অন্নবস্ত্র হিংস্র বাঘের সঙ্গে দেওয়া চলে। বে কি না পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছে নিঃসাড়ে নিশ্চিন্ত শিকারের দিকে।

যেন মানুষ নয় তারক সরকার। কালো লম্বাটে চেহারাখানায় একটা ইস্পাতের মত টান টান ভাব লাল চোখ দুটিতে তীব্র জেদের জ্বালা। রোগা শিরওঠা হাত দুখানায় একটা বিশ্রী কাঠিন্য। ঢিলে পাজামা, হাত কাটা গেঞ্জিতে স্পষ্টতঃই তাকে রেল কোম্পানীর কেরানী বা একটা নৃশংস খুনী বলেই বোধ হয়। এতক্ষণে তার বুকে অজস্র শব্দ বাজার কথা এবং ক্লান্ত হবারই কথা। মুখে ঘাম। গায়ে জ্বালা। তবু কি না তারক সরকার এমন পাথর এবং পা টিপে টিপে খরেরী কোয়ার্টারের বাঁদিকের জানলা ঘেঁষে পিছন দিয়ে এমন চমৎকার চলেছে যেটা কি না একটা মারাত্মক খেলার চরম উত্তেজনাকর মুহূর্ত।

পায়ের নীচে একটা ভাঁড়, শব্দ করে ভেঙ্গে যেতে তারক সরকার থমকে গেল। এ ধারটাই নোংরা। দু' পাশের কোয়ার্টারের যত আবর্জনা পড়ে। বুনোগাছ, কাঁচ, ভাঙ্গা টিন, ছেঁড়া কাগজ, পাতায় একেবারে ভর্তি। ভ্রূ তার বিরক্তিতে কুঁচকে উঠল। ঘাড় একটু বেঁকিয়ে সে দেখে নিল ডানার এক একপাশটা। ঠিক বসে আছে।

হ্যাঁ, কি করে বুঝল মুরগীটা তার হাতের ছুরি গলায় চেপে দেবে। ঠোঁট কামড়ে তারক সরকার ভাবল। ধরা দিতে বিশেষ বেগ দেয় না কোনদিন। হাতে অবশ্য ধরে না। উঠোন থেকে সন্ধের মুখে তাড়া দিলেই কাঠের বাক্সের খুপরিতে তরতরিয়ে ঢুকে পড়ে। আজ ঘাড় বেঁকিয়ে তার ছোরার দিকে লক্ষ্য করে কি খুনের গন্ধ পেয়ে গেল পাখিটা। তাহলে হত্যাকারীর শরীর

থেকে কি বিশেষ কোন গন্ধ ওঠে! একটু সতর্ক হলেই কি ঈশ্বরের জীবেরা এটা বুঝতে পারে! আরও দু পা এগুলে তারক সরকার। ভূপতি বাজার গিয়েছে। কাটা ছাঁটা ও আসার আগেই করতে হবে। ও এলে ওকে বাটনা বাটতে বসাবে।

বেলাও পড়ে এল। অদূরে ষ্টেশন এলাকায় হলুদ রোদ পড়েছে। কেমন যেন মরা বেলা। পুজোয় গন্ধ মুছে যেতে চারিদিকের শস্যক্ষেতে এখন রঙ লেগেছে। ক্ষুদে সহর থেকে এই ষ্টেশন এলাকাটা কিছু দূরে মনোরম প্রকৃতির মধ্যে। ঋতু আবর্তন পরিষ্কার ছুঁয়ে যায়। এখন দিন যে শীতের মোড়কে নিঃশব্দে গা ঢাকা দিচ্ছে তাও ধরা পড়ে। পাঁচটার ডাউন প্যাসেঞ্জার গাড়ী এবার পাস করবে। ষ্টেশন চত্বর তাই শব্দ মুখর। ছোঁড়া ছোঁড়া হয়ে প্ল্যাটফর্মে মানুষজন দেখা যাচ্ছে। নিশ্চল একটা মালগাড়ী ওদিকের লাইনে। ডাউন পেরুলে ওকে ছাড়া হবে। বর্ধমান থেকে এদিকে সিগ্নেল লাইন। একটাকে ষ্টেশনের ডবল লাইনে আটকে রাখতে হয়।

ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়ল পাশের কোয়ার্টারের অ্যাসিস্টেন্ট ষ্টেশনমাস্টারের মেয়ে মৌ জানলায় মুখ রেখে ড্যাবডাবে বড় বড় চোখে তাকে দেখছে। দু চোখে মেয়ের ফেটে পড়ছে উত্তেজনা। মুরগীটার আর্ত চিৎকার উঠোনে ছোটাছুটি শুনেই নিশ্চিত ও এসেছে। ওর মা, দীপা। দীপা দত্ত। সুব্রত দত্তর স্ত্রী। মহিলাটি সুন্দরী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, এক ঢাল চুল, চমৎকার চোখ। হাসিখানা—হ্যাঁ শরতের শিউলীর উপমাটা এখনও নষ্ট হয়নি।

ওই হাসি শুনেই একদিন চমকে জানলায় চোখ বাড়িয়েছিল তারক সরকার। ওপাশের জানলায় তার স্ত্রী রত্না ওর সঙ্গে কথা বলছিল। হাসি আর এক ঝলক দেখাতেই পরিষ্কার হয়েই গিয়েছিল তার কাছে। দীপা। সেই দীপা। সেই মুখ সেই চোখ সেই হাসি। হ্যাঁ, সেটা ওদের আসার তৃতীয় দিন।

তারপর বেশ কয়েকবার পরস্পরের চোখে চোখ পড়েছে। পাশাপাশি কোয়ার্টার। কিন্তু দীপা কোন কথাই বলে নি তার সঙ্গে, স্মিত হাসিও না। তারক সরকার নিজে এগিয়ে যাবার সামান্য চেষ্টাও করতে পারে নি। কেননা যুবতীর চোখে মুখে এমন একটা প্রশান্ত নির্লিপ্ততা এবং ঘরের মধ্যে চলাফেরা করাতেও জানায় রত্নার সঙ্গে কথা বলার মধ্যে অদ্ভুত সরলতা যেটা কিনা পরস্পরের কাছে অচেনাই প্রকাশ করে ভয়ংকরভাবে।

বিনয়ের প্রেমিকা দীপা। তার বন্ধু বিনয়। সেই হাওড়ার বিনয়। চাকরী পেয়েছিল মার্টিন বার্ণে। ওদের বিয়েও হত। বন্ধুবান্ধবদের ভিড়ে দীপা তাকে বহুবারই দেখেছে সন্দেহ নেই। মুখ-খানা ভোলার কথা নয়। একবার 'আনন্দম' রেস্টুরেন্টের ভিতর সে দীপার দিকে সামান্য ঝুঁকে বলেছিল, 'দেখুন বিনয় ছাড়া আমরা চারজন রয়েছি। আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আপনার শিপ্রা গোপা চন্দনা বন্দনা এরকম চারজন বন্ধু আছে।' গলার স্বর পর্দায় বলেছিল, 'আমাকে কি আরও বলতে হবে।' দীপা ছোট্ট রুমালে মুখ ঢেকে শব্দ করে হেসেছিল। সেই হাসি যাতে শিউলি ঝরে। সে বিনয়ের কাছে বলেও ছিল একদিন, 'তোর দীপার একটুই বিউটি—হাসি'। বিনয় দীপাকে নিয়ে পুরী গিয়েছিল। বাড়ীতে দীপা, বান্ধবীদের সঙ্গে যাচ্ছে বলেছিল। ওর বেলুড়ের এক বান্ধবীই সাহায্য করেছিল। বিনয় ফিরে দীপার আপত্তি তারপর রোমাঞ্চকর সব ব্যাপারই তাদের কাছে শুনিয়েছিল। পুরী থেকে ফেরার পনের দিনের মধ্যে বিনয় বাস এ্যাকসিডেন্টে মারাত্মক আহত হয়। হাওড়া ষ্টেশনের মুখে বাস থেকে দ্রুত নামতে গিয়ে ধুতি পায়ে লেগে একেবারে চাকার তলায় চলে যায়। হাসপাতালে সেইদিন রাত্রেই বিনয়ের মৃত্যু ঘটে।

একমাসের মধ্যে তারপর দীপার বিয়ের সংবাদও তাদের কানে আসে।

তারপর এখানে এ্যাসিস্টেন্ট ষ্টেশন মাস্টারের বৌ হয়ে আসতে দেখল তারক সরকার। কিন্তু না, একদিনও কথা বলেনি। পাঁচ বছরের এপাশের ঘটনা, কিন্তু সবই তো পরিষ্কার মনে আছে। তাছাড়া মৌ নামে মেয়েটির সঙ্গে চমৎকার মুখের মিল বিনয়ের। তবে এমন একটা রসঘন ব্যাপার রত্নার কাছে বলতেও ভার সাহস হয়নি!

হ্যাঁ মেরেটা সবু গলা বাজালেই হল! ভেতর থেকে দীপা ছুটে আসবে। তারপর তার ছায়া দেখেই, সরে এস মৌ, বলে চাপা গলা বাজাবে। মুরগীটা তো তা বুঝবে না। আবার উড়ে গিয়ে অন্য জায়গায় বসবে। তারক সরকার ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চোখে নিষেধ করল মৌকে, শব্দ করো না।

মুরগীটা খাবার জন্যেই কেনা। ছাটে একটা গাঁয়ের মানুষের কাছে সাড়ে তিন টাকায় কিনেছে। তবে রত্না আসা অব্দি অপেক্ষা করার কথা। বাপের বাড়ী গিয়েছে। আজ চিঠি পেলে আরও কিছুদিন থাকবে। তখনই মুরগীটার কথা চকিতে মনে হল। অনর্থক আর খোরাক চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি সে খুঁজে পেল না। তাছাড়া মুরগী কি খাসির মাংস রত্না বিশেষ পছন্দ করে না।

কিন্তু মুরগীটা এমন বেয়াড়াপনা শুরু করে দিল। হাত বাড়াতেই চিৎকার, উঠোনে ছোটাছুটি বেড়ায় চাপার চেষ্টা তারপর উড়ে চালু চালে বসা। তার ফলেই জেদ রক্তের মধ্যে উত্তেজনা এবং এখন তারক সরকার ভূপতিকে দেখে যাওয়া সেই মানুষটি নেই, একেবারে ভিন্ন, কেমন যেন একটা ঘোর তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। রক্ত যেন ক্রমাগত ফুটছে এবং চোখেমুখে এক তীব্র জ্বালা।

মুরগীটাকে হাতে ঝুলিয়ে আনতে রত্না বুকের আঁচল সামলে বলেছিল, 'কি সুন্দর গো! একেবারে সোনার মত রঙ। পুষবে একে। খেও না।'

'মাংসাশী প্রাণীকে, বলছ কি। বেটা যখন হাতে উঠেছে আমার তখন রক্ষে নেই।' হাতের মধ্যে নাচাতে নাচাতে তারক সরকার বলেছিল, 'সাতশ' সাড়ে সাতশ' গ্রাম মাংস হবে। সাড়ে তিনে সোকসান হয়নি!'

রত্না একরাশ ঝাঁজ নিয়ে বলেছিল 'তোমার একটুও মায়াদয়া নেই।'

রাবসু বলেছিল, 'বাবা কখন কাটবে?'

তারক সরকার শব্দ করে হেসে উঠেছিল, 'দেখ ছেলের কথা শোন।'

রত্নার মুখের কোন পরিবর্তন হয়নি। বলেছিল, 'তোমারই তো ছেলে। প্রাণ কাটতে দেখছে। বলবে না!'

তবু মুরগীটা থেকে গেল। অন্য বারের চেয়ে ব্যতিক্রম এটা অবশ্য। এক সপ্তাহ নয়, পুরো তিন সপ্তাহ নির্বিঘ্নে মুরগীটা কাঠের বাক্সে বাস করতে থাকল। এর পিছনে কি যে কারণ তারক সরকার নিজেই জানে না।

তবে আজ আর ছাড়ান নেই। কত খেলা দেখাবে চাঁদবদনী! তারক সরকার অমরও দু'পা এগুলে। তারপর উঁচু হয়ে একটা ইটের উপর পা তুলতেই পা ফসকাল। একটা জ্বালা সঙ্গে সঙ্গে বেদনার তীক্ষ্ণ ধ্বনি তার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল। কাঁচের টুকরোয় পা কেটেছে। পা তুলতেই ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত ঝরে পড়তে থাকল।

জানলায় মেয়ের পাশে অ্যাসিস্টেন্ট

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪
কলকাতা দেখেছিরু
লেখক দীপঙ্কর দে-র নতুন উপন্যাস।
ডি এম, লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি | লিপিকা ৩০।১ কলেজ রো

স্টেশন মাস্টারের বৌ। বোধ করি যন্ত্রণার শব্দ শুনেই এসেছে। কিংবা আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। চোখে রক্ত পড়তেই গলা বাড়িয়েছে 'কি হল সরকারবাবু!'

ঘাড় তুলে তারক সরকার স্বরূপকে নীরব। তারপর নীচু হয়ে বলল, 'পা কাটল।'

ঠোঁট 'ইস' শব্দে বাঁক খেল দীপার। কপালে বড় টিপ, লাল পেড়ে ঘোমটা। বলল, 'আসুন ডেটল তুলো সব আছে, লাগিয়ে নেবেন। কি থেকে কি হয়ে যাবে ঠিক নেই।'

তারক সরকার ব্যস্ততা দেখাল না। হাতের আঙুলে রক্ত মাখল। বলল, 'ও কিছু হবে না।'

দীপা অল্প থেকে জানলার বড়ে মুখ লাগিয়ে ব্যস্তস্বরে বলল, 'কি আশ্চর্য রক্ত পড়ছে এখনও, তবু মুরগী ধরা চাই। ব্যান্ডেজ করে না হয় মুরগী ধরবেন।'

মুরগী ছেড়ে তারক সরকারকে যেতেই হল। রক্ত পড়ছে এখনও। পা ভাসছে। পাজামাটায় রক্ত লেগেছে। হাতের রক্ত বিশ্রী রকমের শক্ত হয়ে গিয়েছে। তুলো দিয়ে ধোয়ামোছা, ব্যান্ডেজ বাঁধা নিজে হাতেই করল। ঘরে হলে চুণ লাগাতে হত। রত্না পান খায়। কাটলে ও চুণই লাগায়। জলে হাত ধুয়ে পাজামাতেই বগলাল তারক সরকার। মেয়েটা বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছে। কি মনে হতে বলল, 'মুরগীটা চালেই থাকবে?'

শব্দ করে হাসল তারক সরকার, 'না এক্ষুনি নামাব।'

'চা চাপিয়েছি। চলে যাবেন না।' দীপা বলে ঘরের মধ্যে এলুমিনিয়ামের মগ নিয়ে ঢুকল। তারপর ফিরে এল আবার। বলল, 'সাবান দিয়ে পাজামার রক্ত তুলে ফেলবেন। দেখুন ওঠে কিনা। পাতিনেবু ঘষলে কিন্তু..।'

'রক্তের দাগ ঠিক তুলে ফেলব।' পায়ের দিকে তাকাল তারক সরকার। অনেকখানি কেটেছে। ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে। চেপে বাঁধা। ওষুধও পড়েছে। রক্তপাত নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যাবে। ডাক্তারখানা যাবে নাকি! থাক। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল ওদিকের চালের উপর মুরগীটা একভাবে বসে। হলুদ রোদ উঠে যাচ্ছে। পাঁচটার ডাউন গাড়ী কি পার হয়ে গেল। কই সে তো শব্দ পেল না। যাক। তবে সে টের পেল তার বিক্ষিপ্ত রক্তপাত সব উষ্ণতা উত্তেজনাকে তার ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

দীপা বলল, 'রাস্তায় মুরগীর পালক উড়লেই সকলে বলে সরকারবাবুর কাজ।'

তারক সরকার ঘাড় তুলল না. 'তাহলে একদিকে নাম কিনেছি।'

দীপা মিষ্টি করে হাসল। স্মিত অনুচ্চ স্বরে। বলল 'না কেন আপনার কাজের প্রশংসা তো উনিও করেন। আপনার আজ নাকি একেবারে নিখুঁত।'

'যাক ভাগ্যিস পা কাটল তাই কথা বললেন। তাই এমন সুখ্যাতিটা শোনার সৌভাগ্য হল।' তারক সরকার চোখ তুলল। ঠোঁটে তার হাসি জড়ান।

'জানেন কথা বলতে সাহস হত না। বাব্বাঃ, ছুরি হাতে মুরগী কাটতে তো আপনাকে দেখেছি। গা শিরশির করে ওঠে।' দীপা শরীরে ঝিরঝিরানির ভঙ্গী করল, 'আপনাকে ভয় করত!'

তারক সরকার যেন তুলে নিল কথাটা, 'আজ আমারই পা কাটতে ভয় গিয়ে মায়া এল বুঝি!'

দীপা লজ্জার হাসি হাসল। তারপর কথা বদলাতে বলল, 'আজ তো মুরগী কাটা হল না। বেলা পড়ে এল।'

তারক সরকার চায়ের কাপ নেবার সময় দীপার চোখের গোল তারায় চোখ গেঁথে রাখল। আশ্চর্য পরিচিতের কোন নিশ্চিত রশ্মি যে দেখতে পেল না।

অন্ধকার নেমে এলে আশা করা গিয়েছিল মুরগীটা ঠিকই খোঁপে ঢুকবে। কিন্তু কি যে ভয় পেয়েছে' এল না। শুধু চালের উপর থেকে একটা তীক্ষ্ণ স্বর ছুড়ে যেন জেনে নিতে চাইল, তারক সরকারের এখনও ছুরি চালানর বাসনা আছে কিনা। তারক সরকার অবশ্য ভূপতির চাপান ডিমের ঝোলের গন্ধ নিতে নিতে বলল, 'নেমে আয় বেটা, নইলে শেয়ালের পেটে যাবি!'

পরের দিন দীপা জানলা দিয়ে বলল, 'ব্যথা হয়নি তো?' আটপৌরে কাপড় কষে কোমরে বাঁধা। হাঁটুর ওপর থেকে জানলার বড় ভেঙে শরীর যেন বাইরে এসেছে।

'না। ব্যথা নেই।'

'যাক বাবা! আমি কত ভাবছিলাম। একলা আছেন।' দীপা নিশ্চিন্ততার হাসি হাসল।

যুবতীর হাসিখানা শিউলী তো বটেই এখন চমৎকার স্বাস্থ্যের একটা ঘন কামনা-মদির গন্ধ যেন উঠে আসতে দেখল তারক সরকার। এতদিনকার চেনা নয়, যেন এই সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে গতকালই তার আলাপ হয়েছে। এবং সে দীপার মধ্যে পূর্বপরিচিতের কোন রশ্মি না পেয়েও সুখী বোধ করছিল। বলল, 'সময়ে ওষুধ পড়েছে। হ্যাঁ, সুব্রতবাবু ঘরে নেই?'

গলা টেনে দীপা বলল, 'সেই কখন বেরিয়েছে! ও তো ডিউটি ছাড়া কিছু জানে না।'

তারক সরকার হাসল, 'সব বৌদের এক অভিমান।'

লাল মুখ করে গমক গমক হাসি। নাকের পাটা ফুলল, চোখের তারা জ্বলজ্বল করতে থাকল দীপার। বলল, 'ওমা বাবলুর মা-ও ওই কথা বলে বুঝি।' তারপরই বলল, 'হ্যাঁ, বাবলুর মা কখন আসবে?'

তারক সরকার ঠোঁট উল্টে বলল, 'কি জানি!'

এক গাল হাসি নিয়ে দীপা বলল, 'চিঠিপত্রে ঝগড়া চলছে বুঝি। নিয়ে আসুন। কত কষ্ট করবেন!'

তারক সরকার অবাক হবার ভান করল, 'কষ্ট কোথায়! বেশ তো আছি।'

দীপা চোখে অদ্ভুত ভঙ্গী করে বলল, 'আহা!' তারপরই বলল, 'হ্যাঁ, শুনুন, কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটু মাছের ঝোল পাঠাতাম। ও আজ একটা মাছ নিয়ে এসেছে।'

তারক সরকার চোখ তুলে বলল, 'কি আশ্চর্য, মনে করব কেন। পাঠিয়ে দেবেন।'

হাট থেকে বেছে বেছে সেরা একটা লাল ঝুঁটি মোরগ ঝুলিয়ে তারক সরকার একদিন ঘরে ফিরল। তারপর হাঁক পাড়ল, 'এই ভূপতি দেখে যা একবার।'

ভূপতি শুধু নয়, ওদিকে পার্টিসানে বুনো লতানে গাছের উপর মা-মেয়েকেও ঝুঁকতে দেখা গেল। বড় করে টিপ পরেছে দীপা। মাথায় ঘোমটা নেই। ঘন কালো উজ্জ্বল চুল। সুন্দর চোখে কৌতূহল। কিশোরীর মত এক বেণী। মেয়ে এক কোলে। ডোরাকাটা কালো শাড়ীতে শরীরখানা আলাদা একটা ঐশ্বর্য পেয়েছে।

তারক সরকার অহঙ্কারীর ভঙ্গীতে হাসল।

'কি ব্যাপার! ওটার ওপর মায়া পড়ল বলে বুঝি আর একটা আনলেন।' দীপার গলা বাজল।

তারক সরকারের হাসিটা সামান্য বাতাস পেয়ে পাতা নড়ার মত নড়ল।

'এটা আজই কেটে ফেলবেন তো?'

পাঞ্জাবী-পাজামা হাতে ঘড়ি তারক সরকার গলা লম্বা করল, 'না, এটা মোরগ। মুরগীটার একলা কষ্ট হচ্ছিল বলে আনলাম। কি ভাল নয়?'

দীপার হাসি নেই। উত্তর দিল না।

ওধারে খানিকটা হেঁটে গলা সামান্য নীচু করে তারক সরকার বলল, 'ছুরি না চালিয়ে বলুন কি চমৎকার—মুরগীটা ডিম দেবে।'

'ওমা, আমি যে উনুনে দুধ বসিয়ে এসেছি।' ঝটপট ডানার শব্দ তুলে দীপা সরে গেল।

তারক সরকারের দীপার মুখ দেখার অবসরও হল না। বেশ কিছু পরে তার নাকে শুধু পোড়া দুধের কটু গন্ধ এসে ঢুকল।

চতুর্থ পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

পার্ল হারবার আক্রমণ

'সকাল ৮-১০, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সময়। বেলা ১-৪০ মিঃ পূর্বদেশীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময়। রবিবার, ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১।

এই সময় একজন তরুণ বালককে দেখা গেল বাইকে চড়িয়া অতি দ্রুত হনুলুলু থেকে পার্ল হারবারের দিকে যাইতে—যে পার্ল হারবার উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় নৌঘাঁটি। বালকের হাতে ওয়াশিংটন থেকে প্রেরিত একটি জরুরী বার্তা ছিল। মার্কিন সেনানী-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল জর্জ মার্শাল এই জরুরী বার্তায় জানাইয়াছিলেন যে, জাপানের সঙ্গে আলোচনা ভাঙিয়া গিয়াছে, অতএব পার্ল হারবার যেন সামরিক দিক থেকে সতর্ক (এ্যালার্ট) থাকে। আমি বোডও মারফৎ এই বার্তা পাঠানো সম্ভব হয় নাই (খারাপ অবস্থার জন্য) বলিয়াই 'কমার্শিয়াল চ্যানেল' মারফৎ হনুলুলুতে এই বার্তা পাঠানো হইয়াছিল এবং হনুলুলু আফিস থেকে বার্তাটি বালকের হাতে দিয়া তাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যথাসম্ভব দ্রুত এটি পার্ল হারবারে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য। বালকটি তাই বাইকে চড়িয়া তাগাইয়া যাইতেছিল কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বোমা পড়িতে লাগিল। বালকটি তখন রাস্তার ধার এমনি [illegible] কিছুক্ষণ [illegible] সেখানেই চুপ অপেক্ষা করিল।'

এই নাটকীয় কাহিনীটি উল্লেখ করিয়াছেন জনৈক মার্কিন ইতিহাসবিদ—অধ্যাপক স্নাইডার তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত পুস্তকে। (১)

তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ঐদিন সকাল ৬-৪৫ মিনিটে নৌঘাঁটির অদূরে পাহারারত একটি মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ছোট্ট একটি জাপানী সাবমেরিনকে ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু ডেস্ট্রয়ারের লোকেরা কল্পনাও করেন নাই যে, ওই ক্ষুদ্র জাপানী সাবমেরিন আক্রমণোদ্যত কোন শত্রু নৌবহরের অংশ হইতে পারে।

কেবল তাই নয়। আরও আশ্চর্য ঘটনা আছে। ঐদিনই সকাল ৭টার কিছু পরে হনুলুলুর এক স্থানে স্থাপিত র‍্যাডার যন্ত্রে কতকগুলি বিমানের ছায়া ভাসিয়া উঠিল—১৩৭ মাইল দূর থেকে বিমানগুলি যেন ঝাঁক বাঁধিয়া আগাইয়া আসিতেছে। র‍্যাডারে এই দৃশ্য ধরা পড়ার পর কর্তব্যরত মার্কিন সৈন্যদ্বয়ের একজন তৎক্ষণাৎ তথ্য-কেন্দ্রের অফিসার লেঃ কারমিট টেইলারকে টেলিফোনে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। লেঃ টেইলার মনে করিলেন যে, ঐগুলি 'বি-১৭' মার্কিন বোমারু হইবে। কারণ, ওই শ্রেণীর বোমারুগুলির তখন মূল মার্কিন ভূখণ্ড (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে হাওয়াই দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে আসার কথা ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তথ্যকেন্দ্রের অফিসারের এই ভুল ধারণাত্মক ছিল। কারণ, কিছুক্ষণের মধ্যেই কিম্বা মাত্র আধঘণ্টা পরেই ১৮৯টি জাপানী বম্বার আকাশের সাদা মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পার্ল হারবারের উপর বোমা বর্ষণ করিতে লাগিল। (২)

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের মুহূর্তের এই ধরনের অদ্ভুত ঘটনা ও ভুলের সমাবেশ ঘটে নাই। ওয়াশিংটন ও টোকিওর মধ্যে কেমন এক বিভ্রান্তিকর এবং রহস্যজনক নাটকের যেন অভিনয় চলিতেছিল। যদিও পরবর্তীকালে আলোচনার নামে এই নাটকের অভিনয় চলিতেছিল ৯ মাস ধরিয়া তবু শেষের দিকে জাপানের আক্রমণাত্মক মতলব সংক্রান্ত গোপনীয় সাঙ্কেতিক বার্তাগুলি ওয়াশিংটনের আদৌ অজ্ঞাত ছিল না। বরং তাঁরা এই গোপনীয় বার্তাগুলি প্রায় নিয়মিতভাবে ধরিতেছিলেন এবং মার্কিন নৌবিভাগের 'ম্যাজিক' নামীয় সংশ্লিষ্ট শাখা দপ্তর সেগুলির পাঠোদ্ধার করিতেছিলেন। কেবল টোকিও-ওয়াশিংটনের মধ্যেই নয়, টোকিও-বার্লিনের মধ্যে প্রেরিত গোপনীয় বার্তাও মার্কিন সরকার ধরিয়া ফেলিলেন। টোকিও থেকে ৩০শে নভেম্বর বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেওয়া হইল রিবেন্ট্রপ ও হিটলারকে একথা জানাইয়া দেওয়ার জন্য যে, 'জাপান ও এ্যাংলো-স্যাক্সন জাতিগুলির মধ্যে যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ বাধিবার ভয়ঙ্কর বিপদ দেখা দিতে পারে!' —(চার্চিলের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৩)

কিন্তু এই সমস্ত গোপন তথ্য জানা সত্ত্বেও আলোচনায় ভাঁটা পড়িল না।

* * *

আরও স্মরণীয় যে, যদিও জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বৃটিশ ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আঘাতের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তথাপি একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারই যেন এঁদের সকলের হইয়া জাপানের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। জনৈক ঐতিহাসিক এজন্য কিছুটা বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে মন্তব্য করিয়াছেন—

> By an act of curious diplomatic self-abnegation Churchill and his cabinet seemed quite ready to leave negotiations with Japan, in a matter affecting Australia and New Zeland as much as Malaya and Hongkong, to the good sense of Americans
> (Richard Storry — A. History of Modern Japan, P. 211.

অর্থাৎ এক বিচিত্র কূটনৈতিক আত্ম-ত্যাগের দ্বারা চার্চিল ও তাঁর মন্ত্রিসভা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালয় এবং হংকংয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাপানের সহিত আলোচনার জন্য একমাত্র আমেরিকার সুবুদ্ধির উপর ভরসা করিয়াই যেন নিশ্চিন্ত ছিলেন।... ..

এদিকে নভেম্বরের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতে নোমুরার আলোচনায় সাহায্য করার জন্য বার্লিনের প্রাক্তন জাপানী দূত মাবুরু কুরোসো আসিয়া হাজির হইলেন। অতএব কূটনৈতিক নাটক বেশ জমিয়া উঠিল। কিন্তু তার আগেই ৫ই নভেম্বর তারিখ জাপানী নৌবিভাগের খুব গোপনীয় এক হুকুমনামার দ্বারা ('কম্বাইণ্ড ফ্লিট টপ্ সিক্রেট অপারেশন্যাল অর্ডার নাম্বার ওয়ান'—স্নাইডারের পূর্বোল্লিখিত পুস্তক) পার্ল হারবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছিল। ২৫শে নভেম্বর এক বিরাট

---

(1) The World 1890-1945 — Louis L Snyder P. 249-50

(২) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৫১

জাপানী নৌবহর কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের এক নির্জন স্থান থেকে প্রায় নিঃশব্দে উত্তর প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল। ইম্পিরিয়েল জাপানীজ নেভী'র প্রধান সেনাপতি এডমিরাল ইসোরোকু ইয়ামামোতো স্বয়ং পার্ল হারবার আক্রমণের এই পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার বিরুদ্ধে তাঁর গভীর বিদ্বেষ ছিল। তার কারণ নাকি এই যে, তিনি ছোটবেলা তাঁর পিতার সঙ্গে ঘুমাইবার সময় 'কালো জাহাজসহ আগত বিদেশী 'বর্বরদের' দ্বারা জাপানের 'পবিত্র ভূমি কলুষিত' হওয়ার (অর্থাৎ ১৮৫৩ সালের কমোডোর পেরির অভিযান) কাহিনী শুনিতেন। (৩)

যদিও জাপানের দিক থেকে আক্রমণের পরিকল্পনা আগেই স্থির হইয়া গিয়াছিল, তবু টোকিও এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে আলোচনার দীর্ঘ ধুম্রজালের সৃষ্টি হইল। দীর্ঘকাল টানাহেঁচড়ার পর ২০শে নভেম্বর ১৯৪১, জাপান যে শেষ প্রস্তাব পেশ করে, তার মর্ম এই—

(১) একমাত্র ফরাসী ইন্দোচীনের যে অংশে জাপানী সৈন্য রহিয়াছে, সেখানে ছাড়া জাপানী ও মার্কিন গবর্নমেন্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সসৈন্যে প্রবেশ করিবে না. (২) জাপান ও চীনের মধ্যে কিম্বা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ফরাসী ইন্দোচীন থেকে জাপানী সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবে। (এই মীমাংসা ব্যবস্থায় রাজী হইলে জাপান ইতিমধ্যে ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ হইতে উত্তরাংশে সৈন্য সরাইয়া নিতে প্রস্তুত আছে।), (৩) ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপান ও আমেরিকার যে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, উভয় গবর্ণমেন্টের পারস্পরিক সহযোগিতায় সেগুলি সংগৃহীত হইবে. (৪) সম্পত্তি ও টাকাকড়ি আটক করার আগে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের যে সম্পর্ক ছিল, তা পুনরুজ্জীবিত হইবে। জাপানের প্রয়োজন মত মার্কিন গবর্নমেণ্ট তৈল (পেট্রোল) সরবরাহ করিবেন এবং (৫) জাপান ও চীনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বিঘ্নজনক কোন কার্য মার্কিন গবর্নমেন্ট করিতে পারিবেন না।

বলা বাহুল্য যে, আপোষরফার সর্ত হিসাবে জাপানের এই প্রস্তাবগুলি আমেরিকার নিকট আদৌ গ্রহণের যোগ্য ছিল না। অতএব ২৬শে নভেম্বর মার্কিন সরকার পাল্টা প্রস্তাব দাখিল করিলেন—

(১) প্রশান্ত মহাসমুদ্র এলাকায় যাঁদের স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সমস্ত গবর্নমেন্টের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি, (২) ইন্দোচীনের ভূমিগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার ও কোন প্রকার অর্থনৈতিক বিশেষ সুবিধা গ্রহণ না করা, (৩) চীনের জাতীয় গবর্নমেন্ট ছাড়া অন্য কোন গবর্নমেন্টকে স্বীকার না করা, (৪) চীনে সমস্ত বিদেশী শক্তির রাষ্ট্রাতিরিক্ত অধিকার পরিত্যাগ, (৫) পারস্পরিক সমঅধিকার সম্পন্ন ব্যবসাবাণিজ্যের সর্ত, (৬) পারস্পরিক টাকা-পয়সা ও সম্পত্তি আটকের আদেশ প্রত্যাহার, (৭) ডলার ও ইয়েন মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করা ইত্যাদি। (৪)

চার্চিল বলিয়াছেন যে, আমেরিকার এত পাল্টা প্রস্তাব পাঠ করিয়া জাপানী দূতেরা 'স্তম্ভিত' হইয়াছিলেন। অতএব এই পাল্টা প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

আসলে জাপান ওয়াশিংটনের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা তার আক্রমণের গূঢ় মতলবকে গোপন করিয়া রাখিতেছিল মাত্র। কেননা, আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পার্ল হারবার আক্রমণের সিদ্ধান্ত ৫ই নভেম্বর তারিখেই স্থির হইয়াছিল। অথচ ২০শে নভেম্বর তারিখ বাস্তবে নোমুরা কার্ডল হালের নিকট আপোষরফার সর্ত পেশ করেন এবং ২৭শে নভেম্বর হোয়াইট হাউজে রুজভেল্ট, হাল, কুরুসো ও নোমুরা এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। এদিকে ২২শে নভেম্বর তারিখেই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো গোপন সাঙ্কেতিক বার্তায় নোমুরাকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ২০শে নভেম্বরের প্রস্তাবই কিন্তু 'শেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তাব' এবং ২৯শে নভেম্বরই উহার সময়সীমা। জাপানের পক্ষ থেকে এটাকে 'আলটিমেটাম' বা চরমপত্ররূপেই বিবেচনা করা উচিত।

মার্কিন নৌবিভাগের 'ম্যাজিক' দপ্তর টোগোর এই গোপন বেতার সাঙ্কেতিক বার্তা ধরিয়া ফেলিল এবং পাঠোদ্ধার করিল। কিন্তু তবু হোয়াইট হাউজে আলোচনা চলিল। (৫)

এই পারস্পরিক আলোচনা চলিল একেবারে শেষ মুহূর্তে। এমন কি আক্রমণের সময় পর্যন্ত। অথচ ৩রা ডিসেম্বর টোকিও থেকে গোপন সাঙ্কেতিক বার্তা আসিল— 'East winds, raining' —যার অর্থ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সমস্ত জাপানী দূতাবাসের গোপনীয় দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলার জন্য নির্দেশ। বলা বাহুল্য যে, তখন ভাইস-এডমিরাল চুইচি নগুমোর নেতৃত্বে কয়েকটি ব্যাটলশিপ, ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ, সাবমেরিন (২৫টি), ডেস্ট্রয়ার (১৬টি) এবং অন্যান্য নৌপোতসহ মোট ৭২টি যুদ্ধজাহাজের এক বিশাল নৌবহর সমুদ্রবক্ষে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল পার্ল হারবার অভিযানের জন্য।

৫ই ডিসেম্বর আবার জাপানীদের সাঙ্কেতিক রেডিও বার্তা— Climb Mount Niitaka" অভিযানকারী নৌবহরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হইল। এই বার্তাটিই ছিল আক্রমণের চরম নির্দেশ। (৬)

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, জাপানের যে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদ্বয় ওয়াশিংটনে আপোষ-মীমাংসার কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, তাঁরা তাঁদের গবর্নমেন্টের আসল মতলব বা আক্রমণের পরিকল্পনার কথা জানিতেন না। (৭)

এদিকে ৬ই ডিসেম্বর জাপানী সৈন্যেরা ইন্দোচীনে ঢুকিয়া পড়িল। পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতেছিল। তখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতের কাছে একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠাইলেন—

> I address myself to your Majesty at this moment in the fervent hope that your Majesty may, as I am doing, give thought in this definite emergency to ways of dispelling the dark clouds I am confident that both of us, for the sake of the peoples not only of our great countries but for the sake of humanity in neighbouring countries, have a sacred duty to restore traditional amity and prevent further death and destruction in the world'. (8)

পর দিন রবিবার ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ রুজভেল্টের এই মর্মস্পর্শী আবেদনের জবাব টোকিও থেকে পাওয়া গেল না। সেদিন বেলা ১টার সময় (ওয়াশিংটন টাইম) জাপানের দূতদ্বয় কুরোসো ও নোমুরা পররাষ্ট্র দপ্তরে কার্ডল হালের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। মিঃ হাল ১টা ৪৫ মিনিটের সময় সাক্ষাতে রাজী হইলেন। দূতদ্বয় আসিয়া হাজির হইলেন ২টা ৫ মিনিটের সময়। অর্থাৎ ২০ মিনিট বিলম্বে। তাঁরা বিসেপসন রুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন নাটকীয় মুহূর্ত কোন দেশের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। কারণ, সেই মুহূর্তে কার্ডল হাল বেতার বার্তা পাইলেন যে, জাপানীরা পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছে।

কর্ডল হাল কুরুসো ও নোমুরাকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এডমিরাল নোমুরা মার্কিন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করিয়া জাপান সরকারের একটি দীর্ঘ জবাব কার্ডল হালের হাতে অর্পণ করিলেন। সেই জবাবের মধ্যে 'অনেক মিথ্যা ও মার্কিন গবর্নমেন্টের প্রতি যুদ্ধ

---

(৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৫৩

(4) American-Japanese Documents

১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত মার্কিন সরকারী দলিল এবং গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' (১৯৪৫) থেকে উদ্ধৃত।

(5) Rosevelt & Hopkins—Sherwood, P 506

(6) The War — Snyder P 250

(7) Sherwood — 503

(8) The War Snyder P 250

বাধাইবার দোষারোপ' ও অভিযোগ ছিল। কার্ডল হাল গম্ভীর মুখে সেই জাপানী জবাব পড়িলেন এবং তার পর দূতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে এমন বাক্য বিস্ফোরণ ঘটাইলেন যে, 'আমেরিকার কূটনৈতিক ইতিহাসে তার কোন নজির নাই।' (৯)

পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্ডল হাল ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং জাপানী দূতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলিলেন—

I must say that in all my conversations with you during the last nine months I have never uttered one word of untruth. This is borne out absolutely by the record. In all my 50 years of public service I have never seen a document that was more crowded with infamous falsehoods and distortations — infamous falsehoods and distortations on a scale so huge that I never imagined that any government on this planet was capable of uttering them'.

অর্থাৎ 'আমি অবশ্যই আপনাদের বলবো যে, গত ৯ মাস ধরে আপনাদের সঙ্গে যে সমস্ত কথা আমি বলেছি, তার মধ্যে এক বর্ণও মিথ্যা ছিল না। নথিপত্র দেখলেই আমার এই কথার সত্যতা নিশ্চিত মিলবে। গত পঞ্চাশ বছরে আমার জন-জীবনে আমি এত জঘন্য মিথ্যা ও বিকৃতিতে ভর্তি এমন কুৎসিত দলিল আর কখনও দেখি নি— এমন বিপুল আকারে এই জঘন্য মিথ্যা ও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যে, আমি কখনও কল্পনা করতে পারি নি যে, এই ভূমণ্ডলে কোন গবর্নমেন্ট সেগুলি উচ্চারণ করতে পারেন।' —(১০)

অতঃপর জাপানী কূটনীতিকদ্বয় নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।...

এমন অভাবনীয় ঘটনা এবং এমন অভাবনীয় দৃশ্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কদাচিত দেখা গিয়াছে। স্মরণীয় যে, পার্ল হারবারের উপর ৭ই ডিসেম্বর তারিখ যখন জাপানী আক্রমণ আসন্ন তখনও উভয় পক্ষের আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব উভয় গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার ভান চলিতেছিল।

জনৈক সোভিয়েত ঐতিহাসিক এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন—

Even then, just before Japan attacked us possessions, isolationists in the USA still wanted to induce Roosevelt to mediate between Japan and China hoping that this would lead to a deal with the Japanese Militarists A few hourn's before Japan attacked Pearl Harbour the State Department and the Government were still discussing a draft for a 90 days armistice in China and the establishment of a Modus Vivendi-11

অর্থাৎ 'মার্কিন ঘাঁটিগুলির উপর জাপানী আক্রমণের পূর্বাহ্ণে পর্যন্ত আমেরিকার নিলিপ্ততাবাদী রাজনীতিকগণ রুজভেল্টের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছিলেন চীন ও জাপানের মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতা করার জন্য। তাঁরা আশা করিতেছিলেন যে, এর দ্বারা জাপানী জঙ্গীবাদীদের সঙ্গে একটা মীমাংসা হইবে। এজন্য পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেও চীনে ৯০ দিনের যুদ্ধবিরতি ঘটাইবার জন্য একটা খসড়া পরিকল্পনা এবং চূড়ান্ত মীমাংসার আগে কাজ চালানো গোছের একটা আপোষ প্রস্তাব তৈয়ার হইয়াছিল, যাকে বলা যাইতে পারে "Modus Vivendi'

আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সেদিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যা কম ছিল না এবং তাঁরা অধিকাংশই জঙ্গীবাদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। এই বিরোধী শক্তিগুলির চাপ সৃষ্টির ফলেই জাপান ও আমেরিকার মধ্যে এমন অদ্ভুত আলোচনা চলিতেছিল একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

কিন্তু যে "Modus Vivendi'-এর কথা সোভিয়েট ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই 'সাময়িক কার্যকর খসড়া পরিকল্পনা' লইয়া শেষ পর্যন্ত জাপানী দূতদ্বয়ের সঙ্গে আর আলোচনা হয় নাই। কেননা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে এই পরিকল্পনার অনুলিপি পাঠানো হইলে তিনি এবং চীনের পক্ষ থেকে চিয়াং কাইসেক প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন। কেননা, এই পরিকল্পনায় চীনের অসুবিধা ঘটিত। অতএব কার্ডল হালও সেই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। (১২)

অর্থাৎ আসন্ন জাপানী আক্রমণের পটভূমিকায় এবং টোকিওর গোপন সাঙ্কেতিক বার্তাগুলি ওয়াশিংটনের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও এই অদ্ভুত কূটনৈতিক সংলাপ চলিতেছিল মাসের পর মাস।

* * *

কিন্তু এত কাণ্ড কীর্তনের পরেও পার্ল হারবারের উপর জাপানী আক্রমণকে 'অতর্কিত' এবং 'বিস্ময়কর' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে প্রামাণ্য ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক ইতিহাসগুলিতে। কেননা, বৃটেন ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জাপান আক্রমণ করিতে উদ্যত বটে, তবে, সেই আক্রমণ ঘটিবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে—উত্তর পার্ল হারবারের দিকে নয়।

বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক রবার্ট ই শেরউড যিনি সেই সময়কার ঘটনাবলী সম্পর্কে একজন 'অথরিটি' তিনি বলিতেছেন—

'In London, as in Washington, on the eve of Pearl Harbour, the best informed thinking was that further Japanese aggression was imminent and that it would come in the south west Pacific ..

অর্থাৎ 'লন্ডনে এবং ওয়াশিংটনে যাঁরা সবচেয়ে বেশী খবর রাখিতেন, তাঁদের চিন্তা ছিল এই যে, জাপানের পক্ষ থেকে আরও আক্রমণ আসন্ন বটে, তবে, সেই আক্রমণ ঘটিবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে...

'এবং সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপের সংযোগকারী যোজকের দিকে, যেটা পার্ল হারবার থেকে ৬ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। ৭ই ডিসেম্বরের আগে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া হোয়াইট হাউজে যে সমস্ত সরকারী সামরিক প্রতিবেদন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি পাঠানো হইতেছিল, সেগুলির কোথাও আমি একবারও এমন কথার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই যে, আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জও হইতে পারে।'

পার্ল হারবারের আক্রমণ সম্পর্কে চীফস অফ স্টাফ জেনারেল মার্শালের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশনের রিপোর্টেও (৬ সপ্তাহ পরে প্রকাশিত) শেরউডের উপরি-উদ্ধৃত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।(১৩)

স্বয়ং চার্চিলও বলিতেছেন যে, বৃটেন ও আমেরিকার এবং সম্ভবত বাশিয়ার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া জাপান ধ্বংসের পথ বাছিয়া লইবে, এটা 'অসম্ভব' বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেননা যুক্তির দ্বারা এটা বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। তবে পাগলামির এক রকমের যন্ত্রণা এবং যুদ্ধের মধ্যে সেই যন্ত্রণা surprise বা অতর্কিত আক্রমণের বিহ্বলতা সৃষ্টি করে। (১৪)

এই অতর্কিত আক্রমণের বিহ্বলতাই ঘটিল ৭ই ডিসেম্বর, রবিবার, ১৯৪১ পার্ল হারবার নৌঘাঁটিতে—যার অবস্থান জাপান থেকে ৩,৫০০ মাইল (সামুদ্রিক) দূরে এবং যেটা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সেই 'সুন্দর সকালবেলা' নৌঘাঁটির অনেক লস্কর ও সৈন্য নিদ্রা কিম্বা ছুটি উপভোগ করিতেছিল। অর্থাৎ এই ধরনের আক্রমণ তাদের কাছে যেন স্বপ্নের অগোচর ছিল। ফলে প্রচুর সংখ্যায় তারা মারা পড়িল। তখন নৌঘাঁটিতে ৭০টি রণপোত ছিল, এগুলির মধ্যে ৮টি ছিল ব্যাটলশিপ বা বড় যুদ্ধজাহাজ।

(৯) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২৫৬

(১০) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৫৬।

(11) The Anti Hitler Coalition — Israian Moscow, P 93

(12) The Second World War— Churchill Vol. P. 530-531

(13) Roosevelt and Hopkins — Sherwood P 510. 512.

14 Second World War—Vol 3, P. 526

অধিকাংশ যুদ্ধজাহাজই ধ্বংস হইয়া গেল, ডুবিয়া গেল, কিম্বা বিস্ফোরিত হইল—মাত্র একটি ব্যাটলশিপ দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিল, আর বাকী সমস্তই ঘায়েল বা অকেজো হইয়া গেল।

'সকাল ৮-২৫ মিনিটে প্রথম জাপানী বোমারু দল হানা দিল—বিমান থেকে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইল, ছোঁমারা বিমান (ডাইভ বম্বার) প্রচণ্ড বোমা ও মেসিন-গানের গুলী বর্ষণ করিল। সকাল ১০টার মধ্যেই তারা এই যুদ্ধ শেষ করিয়া সরিয়া পড়িল। আর পিছনে পড়িয়া রহিল ধোঁয়ায় ও অগ্নিকুণ্ডে আচ্ছন্ন বিধ্বস্ত একটা নৌবহর। একটি আঘাতেই প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভুত্ব জাপানীদের হাতে চলিয়া গেল এবং সারা পৃথিবীর রণনীতিক ভারসাম্য আপাতত মূলগতভাবেই পরিবর্তিত হইয়া গেল!' —(চার্চিলের মন্তব্য)।

'মেজর জেনারেল ফুলার লিখিতেছেন—পর পর তিনটি তরঙ্গের মত জাপানী বোমারুর দল দেখা দিল, এই অতর্কিত আক্রমণে তারা জাহাজ, বিমানঘাঁটি ও বারাকের উপর অবতরণ চালাইল। ১৯টি জাহাজ ঘায়েল হইল, তবে, সৌভাগ্যক্রমে কোন বিমানবাহী মার্কিন জাহাজ সেই সময় নৌঘাঁটিতে ছিল না। কিন্তু ক্ষতি হইল সর্বনাশকর, ২৭৯৫ জন সৈন্য ও অফিসার নিহত হইলেন, ৮৭৯ জন আহত হইলেন, ২৫ জন নিখোঁজ হইলেন, ৬টি জাপানী বিমানবাহী জাহাজ থেকে ৩৬০টি রণবিমান এই আক্রমণ চালাইয়াছিল। আর এই আক্রমণে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জাপানী অধিবাসীরা পঞ্চম বাহিনীর কাজ করিয়াছিল (জাপানী বাসিন্দাদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৭ হাজার)—এই অভিযোগ করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন নৌসচিব কর্ণেল নকস। আমেরিকানদের মতে মাত্র ৬০ খানা জাপানী বিমান ধ্বংস হইয়াছিল।(১৫)

কার্যত মাত্র দুই ঘণ্টার অতর্কিত বিমান আক্রমণে মার্কিন নৌবহরের বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। জাপানী বৈমানিকদের এই দুঃসাহসিক কাজ লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং চার্চিল তাদের দক্ষতাকে 'ruthless efficiency' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মার্কিন লেখক স্নাইডার তাদের নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিয়া devastatingly accurate বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমগ্র প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার নৌশক্তির যে ক্ষতি হয় নাই, তারচেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছিল এবারের জাপানীদের মাত্র এক ঘণ্টার আক্রমণে। ১৯১৬ সালের ৬ই এপ্রিল থেকে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত আমেরিকার সামান্য খানদশেক ছোট ছোট রণপোত ও নৌপোত নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু একখানা বড় যুদ্ধজাহাজও খোয়া যায় নাই। কিন্তু এবার জাপানীদের একটিমাত্র অকস্মিক আঘাতেই সমগ্র মার্কিন নৌবহরের অর্ধেক খোঁড়া হইয়া গেল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌশক্তি কার্যত অবশ হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, সেদিন রবিবার অপরাহ্ণে আমেরিকার জনগণ (১৩ কোটি ২০ লক্ষ বাসিন্দা) পার্ল হারবারের এই আকস্মিক বিপর্যয়কর সংবাদ শুনিয়া প্রথমে বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল। পরে অবশ্য তারা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল এবং জাপানীদের উদ্দেশে—the yellow bas'ards (পীত বংশের বেজন্মা) বলিয়া গালাগালি দিল! (১৬)

●

নিঃসন্দেহে আমেরিকার ইতিহাসে এমন বিপর্যয়কর ঘটনা খুব কমই হইয়াছে। বিশেষতঃ জাপানের তুলনায় আমেরিকা অনেক বেশী শক্তিমান ছিল। সুতরাং আক্রমণের ক্ষতির চেয়েও অপমানের আঘাতটা অনেক বেশী গুরুতর হইয়াছিল। মেজর-জেনারেল ফুলার মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই অতর্কিত ঘটনার পর 'আমেরিকানরা যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিল যে, তারা আদম এবং ইভের মত উলঙ্গ এবং তারা এতদিন তাদের কাল্পনিক মুখের স্বর্গে বাস করিতেছিল।' অর্থাৎ পাঁচ মাস আগে জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করার পরেও জাপান পাল্টা সামরিক আঘাত হানিবে না, এমন ধারণা করাই আমেরিকার পক্ষে প্রচণ্ড ভুল হইয়াছিল। (১৭)

পার্ল হারবারের ঘটনা নিয়া অনেক তদন্ত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে খোদ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিশন তদন্ত ও অনুসন্ধানের কিছু বাকী রাখেন নাই। ৪০টি খণ্ডে বিরাট রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাতে পার্ল হারবারে আমেরিকার বিপর্যয়ের মূল কারণস্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামরিক বিভাগগুলির মারফৎ উপযুক্ত সময়েই 'সতর্কতার সুনিশ্চিত নির্দেশ' পাঠাইতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন—

'the failure to send positive 'Alert' orders through the military departments—(চার্চিলের মন্তব্য)।

অবশ্য এই ব্যর্থতার জন্য এই রিপোর্টের মেজরিটি অংশে উচ্চতম মার্কিন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা হয় নাই বটে, কিন্তু মাইনরিটি রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট থেকে শুরু করিয়া সংশ্লিষ্ট উচ্চতম সামরিক সেনাপতি ও মন্ত্রীদিগকে দায়ী করা হইয়াছে। জাপানী-মার্কিন আলোচনার মর্মকেন্দ্র ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হাল, কূটনৈতিক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ গুরুদায়িত্বের কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। (১৮)

●

কিন্তু পার্ল হারবার আক্রমণের সংবাদে সেদিনের পৃথিবীতে বোধহয় সবচেয়ে বেশী 'উল্লসিত' হইয়াছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বয়ং মিঃ উইনস্টোন চার্চিল। তিনি তাঁর এই আনন্দের কথা গোপন তো রাখেন নাই বটেই, বরং জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন তাঁর মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাসে বা স্মৃতি গ্রন্থে (তৃতীয় খণ্ড)।

হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হইয়াছিল ২১শে জুন, রবিবার এবং সেদিনও চার্চিল যেভাবে এবং যে অবস্থায় সেই ঐতিহাসিক মহা-আক্রমণের খবর পাইয়াছিলেন, পার্ল হারবারের সংবাদও তিনি অনুরূপভাবেই পাইয়াছিলেন। ঘটনার এই সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর বটে। তাঁর স্মৃতিচারণের মর্ম এই—

'৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, রবিবার সন্ধ্যা। চেকার্সে (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারী পল্লীভবন)) আমি একাই একটি টেবিলের ধারে (বসেছিলাম উইনান্ট (মার্কিন রাষ্ট্রদূত) এবং আডেবিল হ্যারিমানের (বিশেষ মার্কিন প্রতিনিধি) সঙ্গে। রাত ৯টার সময় খবর বলা শুরু হলে আমি অন্যান্য ছোট্ট রেডিও সেটটি খুলে দিলুম। (হপকিন্স লিখেছেন যে, ১৫ ডলারের এই রেডিও সেটটি তিনিই চার্চিলকে উপহার দিয়েছিলেন)। রুশ ও লিবিয়া রণাঙ্গনের কিছু কিছু যুদ্ধের খবর শুনা গেল এবং একেবারে শেষে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন জাহাজ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ জাহাজের উপর জাপানী অতর্কিত আক্রমণ সম্পর্কে দু' চারিটি কথা বলা হলো। আমার ঠিক পরিষ্কার মনে নেই। কিন্তু আডেবেল হ্যাবিসনও অনুরূপ কথা বললেন। যদিও আমরা তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম, তবু চেয়ারের উপর ওঠে বসলুম।

(15) The Second World War—Fuller, P. 134

(16) The War—Snyder, P. 254

(17) The Second World War—Fuller, P 132

(18) The War—Snyder, P. 255

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

এমন সময় 'বাটলার' পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন এবং বললেন—'হাঁ, হাঁ, আমরাও শুনেছি, জাপানীরা আমেরিকানদের আক্রমণ করেছে।' .. আমি তখন টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ আমার মনে পড়লো যে, ১১ই ডিসেম্বর আমি ঘোষণা করছিলাম যে, আমেরিকা আক্রান্ত হওয়ার একঘণ্টার মধ্যেই আমরাও যুদ্ধ ঘোষণা করবো। আমি অফিস ঘরে ঢুকলাম এবং আতলান্তিকের ওপারে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিলুম। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই টেলিফোনে রুজভেল্টের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। আমি জিগ্যেস করলুম—'মিঃ প্রেসিডেন্ট, জাপান সম্পর্কে এইসব কি শুনছি?' তিনি জবাব দিলেন—'যা শুনেছেন খাঁটি সত্য। ওরা পার্ল হারবারে আমাদের আক্রমণ করেছে।

—We are all in the same boat now'!

'আমরা সকলেই এখন একই নৌকোয়? ...আমি জবাব দিলুম—'তা হলে ব্যাপারটা এখন সোজা হয়ে গেল। ভগবান আপনার কল্যাণ করুন!' —এই গোছেরই কিছু কথা আমি বলেছিলুম।'..

তারপর চার্চিল বলিতেছেন—'আশা করি কোন আমেরিকানই আমাকে ভুল বুঝবেন না যদি আমি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি যে, আমেরিকাকে দলে পেয়ে সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ (greatest joy) হয়েছিল। ..১৭ মাস আমাকে একক যুদ্ধ করতে হয়েছে, আর ১৯ মাস ধরে দুঃসহ দায়িত্বের বোঝা (ডিনকার্কের ঘটনা ও ফ্রান্সের পতনের পর) বহন করতে হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা জয়ী। ইংলণ্ড বাঁচবে, ব্রটেন বাঁচবে, কমনওয়েলথ অব নেশন্স এবং সাম্রাজ্য বাঁচবে'। *

আমার শিরায় মার্কিন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। আমার মনে পড়ে গেল এডওয়ার্ড গ্রের একটি মন্তব্যের কথা। প্রায় বহুবছরও বেশী আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন—'আমেরিকা যেন একটা প্রকাণ্ড বয়লার। একবার যদি এর তলায় আগুন ধরানো যায়, তবে কি পরিমাণ শক্তি এ উৎপাদন করতে পারে, তার ঠিকঠিকানা নেই।' ভাবাবেগে ও উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে আমি সেদিন ঘুমুতে গেলাম এবং স্বস্তির সঙ্গে এমন নিদ্রা দিলুম যে, মনে হলো আমি যেন রক্ষা পেয়ে গেছি!'

(ব্যক্তিগত জীবনে চার্চিলের নিদ্রা ও মদ্য মহাযুদ্ধের ইতিহাসেও বিখ্যাত হইয়া আছে।)

পরদিন সকালে (৮ই ডিসেম্বর) ঘুম থেকে উঠিয়াই চার্চিল স্থির করিলেন যে, তিনি ওয়াশিংটনে রুজভেল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরামর্শ করিতে যাবেন। বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু কূটনৈতিক নিয়মকানুনের খুব কায়দামাফিক এই যুদ্ধ ঘোষণায় কেউ কেউ আপত্তি করিয়াছিলেন। জবাবে চার্চিল বলিলেন—'যাকে তোমার হত্যা না করে উপায় নেই, তার সম্পর্কে একটু ভদ্র হলে ক্ষতি কি?' (১৯)

এই অবস্থাতেও চার্চিলের রসিকতাবোধ ছিল, সন্দেহ নাই।

* * *

কিন্তু ইতিহাসের পরিহাস এই যে, চার্চিলের মত স্বয়ং রুজভেল্টও পার্ল হারবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে 'স্বস্তির নিঃশ্বাস' ফেলিয়া বসিয়াছিলেন। কেননা, রুজভেল্টও দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিলেন যে, যদি জাপান একমাত্র বৃটিশ বা ডাচ উপনিবেশগুলি আক্রমণ করে, তবে, তিনি কি করিবেন? আমেরিকার হস্তক্ষেপ ছাড়া বৃটিশ, ডাচ কিম্বা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই। এমন কি, জাপান ভারতবর্ষ বা মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত ধাওয়া করিতে পারে। সেই অবস্থায় আমেরিকা কি করিবে? যদি খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত না হয়, তবে কংগ্রেস বা নিরপেক্ষতাবাদীগণ, এমন কি আমেরিকার জনগণও কি ওলন্দাজ বা বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে রাজী হইবে? ১৯৪২এর ফেব্রুয়ারী মাসে লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন যখন এই ধরনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মিঃ হপকিন্স তখন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। অথচ স্বয়ং রুজভেল্টই একদিন প্রচার করিতে-ছিলেন যে, হিটলারের জার্মানীই আসল শত্রু। তাহার ওলন্দাজ বা ইংরাজের উপনিবেশ রক্ষার জন্য আমেরিকানরা জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে যাইবে কেন?

উপরে কীর্তিত রুজভেল্টের এই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের কথা লিখিয়াছেন রবার্ট ই শেরউড তার বিখ্যাত পুস্তকে। (২০)

কিন্তু পার্ল হারবারের উপর জাপানী আক্রমণের ফলে রুজভেল্ট তার এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পাইয়া গেলেন। কেননা, এক্ষণে আমেরিকা তার সমগ্র শক্তি নিয়া ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইল।...

পার্ল হারবার আক্রমণের কয়েক ঘণ্টা পর জাপানের সম্রাট হিরোহিতো সরকারী-ভাবে আমেরিকা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।..

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন তাঁর অফিস কক্ষে হপকিন্সের সঙ্গে লাঞ্চ খাইতেছিলেন, তখন বেলা ১-৪০ মিনিটের সময় (৭ই ডিসেম্বর) নৌসচিব কর্নেল নক্স তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, পার্ল হারবারের উপর বিমান আক্রমণ শুরু হইয়াছে এবং এটা কোন 'ড্রিল নয়'! (অর্থাৎ আমেরিকান-দের নিজেদের মহড়া নয়!) হপকিন্স তখনও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপানীরা হনুলুলু আক্রমণ করিতে পারে! তিনি মনে করিলেন নিশ্চয়ই এই খবরের মধ্যে কোথাও ভুল আছে! তবে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করিলেন, 'খবরটি সত্য হইতেও পারে'।

অবশেষে 'খবরটা পাকা' বলিয়া জানাইলেন এডমিরাল স্টার্ক বেলা ২-২৮ মিনিটের সময়। তখন রুজভেল্ট তাঁর 'পাত্র মিত্র' নিয়া জরুরী বৈঠক করিলেন, তবে, বৈঠকে 'খুব একটা উত্তেজনা' ছিল না—একথা লিখিয়াছেন হপকিন্স তাঁর দিনলিপিতে। (২১)

সন্ধ্যাবেলা ক্যাবিনেট মিটিং অনুষ্ঠিত হইল এবং পরদিন বেলা সাড়ে ১২টার সময় কংগ্রেসের উভয় পরিষদের সম্মিলিত বৈঠকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই স্মরণীয় কথাগুলির দ্বারা তাঁর ঘোষণা শুরু করিলেন—

yesterday, December 7, 1941—a date which will live in infamy

'৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, গতকল্যের এই তারিখটি ইতিহাসে কুখ্যাত হইয়া থাকিবে...।'

রুজভেল্টের এই ঘোষণার উপলক্ষে কংগ্রেসে কোন বিতর্ক হইল না। অথচ ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহিলেন, তখন কিন্তু বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় কোন বিতর্ক হইল না, কোন মাননীয় সদস্য একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না। সেনেটে সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষিত হইল, আর 'হাউজে' বা প্রতিনিধি পরিষদে একটিমাত্র ভোটে ভিন্নমত ধ্বনিত হইল। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মণ্টানার 'শান্তিবাদী' রিপাবলিকান মহিলা প্রতিনিধি জিনেট রাঙ্কিন বিরুদ্ধে ভোট দিলেন। তিনি এই একক প্রতিবাদের কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন,

"...Somebody should go on record to indicate that a 'good democracy" does not always vote unanimously for war'.

* লক্ষ্য করার এই যে সম্প্রতি আগাগোড়াই চার্চিল বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। —লেখক

(19) Churchill Vol 3. P. 543

(20) Hopkins & Roosevelt — P. 516-18

(২১) পূর্বোল্লেখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ৫৪০

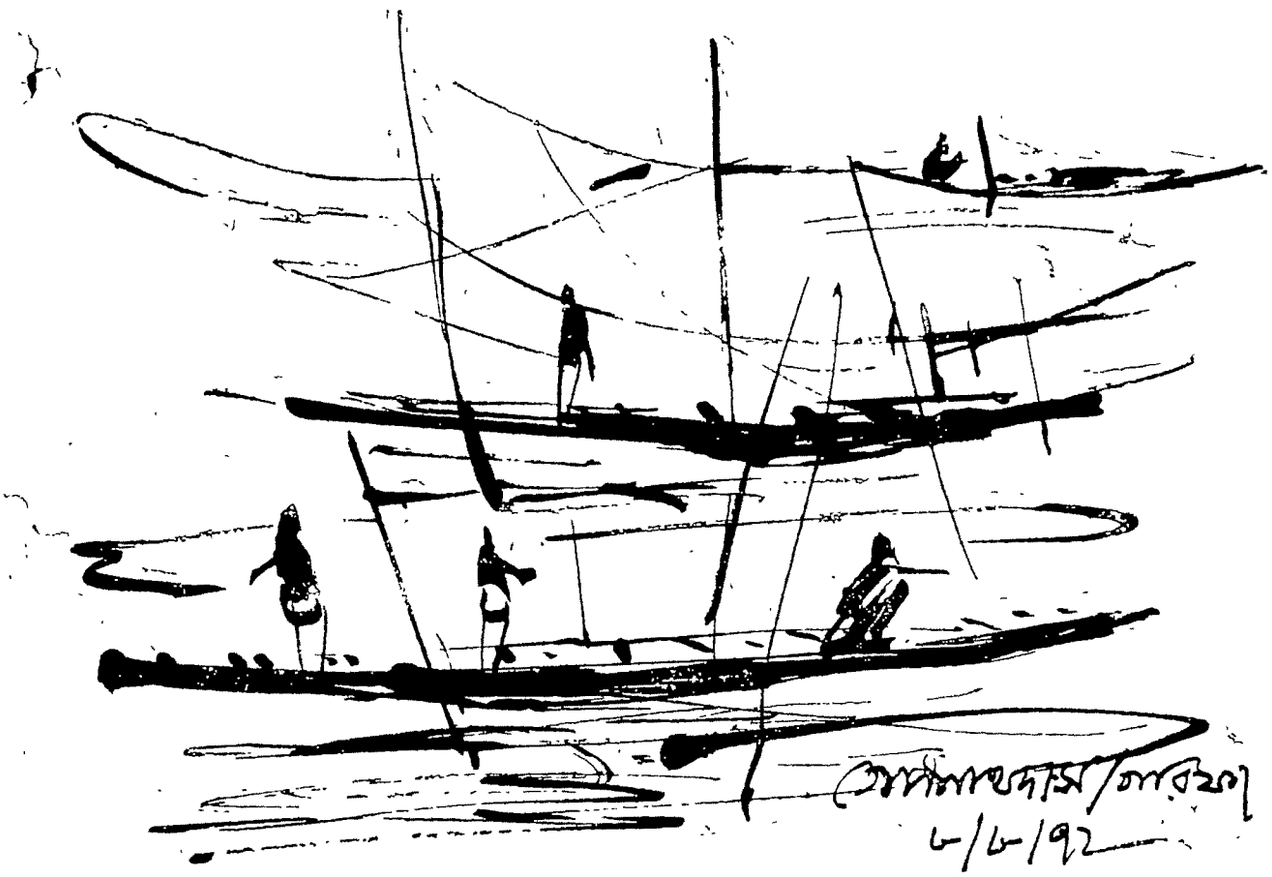

অর্থাৎ কোন 'উৎকৃষ্ট গণতন্ত্রে' সকলে সর্বদাই যে একমত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে না, এই কথাটা রেকর্ড করার জন্যও কাহারও কাহারও ভিন্নমত প্রকাশ করা উচিত।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শান্তিবাদী মহিলা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। (২২)

সেদিন জাপানের বিরুদ্ধে আমেরিকা-ব্যাপী প্রবল ক্রোধ ও উন্মাদনার দিনে একজন মহিলার পক্ষে এভাবে বিপক্ষে ভোট দেওয়া নিশ্চয়ই তাঁর মতবাদের প্রতি সততা ও নিষ্ঠার পরিচায়ক ছিল।

* * *

৮ই ডিসেম্বর সকালে মার্কিন কংগ্রেসের সামনে রুজভেল্ট যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাতে নিশ্চয়ই চার্চিলের মত বাগ্মীতার চমক ছিল না, কিন্তু রুজভেল্ট যেন তাঁর প্রাণের কথা স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় বলিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, তিনি ইতিহাসের পরীক্ষার সামনে দাঁড়াইয়াছেন এবং বোধহয় এজন্যই কংগ্রেসে ভাষণ দেওয়ার সময় কেবল সস্ত্রীক যান নাই, সঙ্গে নিয়া গিয়াছিলেন মিসেস উডরো উইলসনকে—প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেন্টের বিধবা পত্নীকে। সেদিন যেন সমগ্র মার্কিন জাতির পক্ষ থেকেই রুজভেল্ট তাঁর বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং হপকিন্স লিখিয়াছেন যে, জাপানীরা যে যুদ্ধ ও শান্তির কঠিন প্রশ্নটির এমন সহজ মীমাংসা করিয়া দিবে, তাতে রুজভেল্ট যেন 'স্বস্তির নিঃশ্বাস' ফেলিয়া বাঁচিয়াছিলেন। (২৩)

কিন্তু তবু এদিক-ওদিক দু'চারজন গোড়া নিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন যাঁরা সুযোগ পাইলেই রুজভেল্ট-প্রশাসনকে আক্রমণ করিতেন। অতএব পার্ল হারবারের মার্কিন বিপর্যয়ের কিছুকাল পরেই কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম থেকে জনৈক বেতার-ভাষ্যকার (এলমার ডেভিস) যেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মন্তব্য করিলেন—

'কিছু কিছু স্বদেশপ্রেমিক মার্কিন নাগরিক আছেন, যাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা যুদ্ধে জয়ী হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা এই আশা করেন যে, রাশিয়া পরাজিত হইবে। আবার কেউ কেউ আশা করেন যে, আমেরিকা জয়লাভ করিবে, কিন্তু ইংলণ্ড হারিয়া যাইবে। আবার এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা আশা করেন আমেরিকা যুদ্ধ জয় করিবে বটে, কিন্তু রুজভেল্ট হারিয়া যাইবেন!' (২৪)

এভাবে রুজভেল্টের বিরুদ্ধবাদী কিছু কিছু রাজনীতিক, সাংবাদিক, লেখক ও ঐতিহাসিক—যেমন, ডবলিউ এইচ চেম্বারলিন, জর্জ মর্গানস্টার্ন, হ্যারি এলমার বার্নস, জন টি ফ্লিন, চার্লস সি ট্যানসিল প্রমুখ ব্যক্তিগণ তীব্র ও তিক্ত সমালোচনার সুরে বলিলেন—

'প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর পরামর্শদাতাগণ মুখে শান্তির কথা বলিয়া মার্কিন জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমেরিকাকে যুদ্ধের দিকে নিয়া গিয়াছেন। তিনি শান্তি ও যুদ্ধ সম্পর্কে দুমুখো নীতি অনুসরণ করিয়াছেন এবং বিরোধী নিরপেক্ষতাবাদীদের সঙ্গে তিনি যখন আর পারিয়া উঠিলেন না, তখন কৌশলে জাপানকে পার্ল হারবার আক্রমণে প্ররোচিত করিয়াছেন। রুজভেল্ট এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের আচরণকে ক্ষমা করা যায় না। কেননা, তাঁরা কেবল দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার জন্যই অপরাধী নন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দায়িত্ব পালন করিতে চাহেন নাই। তাঁরা বিচার-বিবেচনা করিয়াই এই কার্য করিয়াছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বাইরে রাখিতে এবং জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ এড়াইতে চাহেন নাই!' (২৫)

(22) The War — Snyder P. 260.

(23) Sheewood — P. 526-27

(২৪) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫২৭।

(25) The War — Louis L Snyder. P. 266.

(ক্রমশঃ)

সম্প্রতি আকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে শ্রীমতী অসীমা মুখার্জির পুতুল-প্রদর্শনীতে এই অসামান্য পুতুলটি প্রদর্শিত হয়েছে। আগামী সংখ্যায় সে সম্পর্কে সচিত্র আলোচনা থাকবে। ফটো : অমৃত

অঙ্গনা

একটু প্রস্তুতি

দুর্গাপুজোর শেষ দিনটি আমাদের বিশেষ উৎসবের দিন। পরস্পর আলিঙ্গন স্নেহ-প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়েই আমরা এই দিনটি উদ্‌যাপিত করি। এই নিয়ম বহু বছর আগে থেকেই চলতে শুরু করেছে। বিজয়ার শুভ দিনটিতে বাঙালী মেয়েদের আর কর্মব্যস্ততার শেষ নেই, ঘরে ঘরে চলে নানারকম খাবার প্রস্তুতির সমারোহ। এই দিনটিতে শুষ্কমুখে কারো বাড়ী থেকে ফেরার উপায় নেই সামান্য একটু মিষ্টিমুখ না করে। এই মিষ্টিমুখের গুরুত্ব খুব বেশী। অবস্থাপন্ন বা বিত্তবানদের এ ব্যাপারে আসে জনের বহুল ঘটা আছে। যাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত তাঁরা সাধ্যমত সামান্য এতিথিকে আমন্ত্রণ জানান।

এই বিজয়াকে কেন্দ্র করে প্রবাসী বাঙালীরাও উৎসবে মেতে ওঠেন। আজকের বাঙালী মেয়েরা শুধু মিষ্টিমুখ করিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তাঁরা বিভিন্ন প্রদেশের সংমিশ্রণে নানাবৈচিত্র্যময় খাবারের আয়োজন করতে শিখছেন। এই দুর্মূল্যের বাজারে যেখানে দৈনন্দিন খাবারের জন্য চাল-গম যোগাড় করতে সকলেই বিব্রত, সেখানে এ দুটো জিনিসকে বাদ দিয়ে বা যথাসম্ভব কম ব্যবহার করে মুখরোচক খাবার তৈরী করতে গৃহবধূরা অগ্রণী হয়েছেন।

ভজাভুজি খেতে মোটামুটি সকলেই ভালবাসেন। তাছাড়া সামান্য টক-ঝাল খাবার তৈরী করে তা চা বা কফির সঙ্গে সুন্দরভাবে পরিবেশন করা চলে। ঘরে তৈরী খাবারের সবচেয়ে সুবিধা অল্প খরচে প্লেট ভর্তি খাবার অতিথিকে পরিবেশন করা যায়, অথচ সেই খরচে দোকান থেকে খাবার এনে (মিষ্টি বা নোনতা) প্লেট সাজালে তা অতিথির সামনে হাজির করতে গৃহকর্ত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হবেন। তাছাড়া সীমাবদ্ধ একটা আয়-ব্যয়ের মধ্যে আমাদের সকলকে চলতে হয়। আসুন অর্থনৈতিক একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই আমরা কয়েকটা অল্প খরচে মুখরোচক খাবারের আলোচনা করি।

সামি কাবাব

উপকরণ—ভেড়ার মাংসের কিমা ১ কিলো ১০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ১১০ গ্রাম, পেঁয়াজ ১১০ গ্রাম, রসুন কয়েক কোয়া কাঁচা লঙ্কা ২০ গ্রাম, আদা বড় এক টুকরো, গোল মরিচ আন্দাজ মতো, হলুদ ১০ গ্রাম ধনে গুঁড়া সামান্য লঙ্কা গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো দারচিনি গুঁড়ো চিনি লেবুর রিণ্ড আন্দাজ মতো ডিম ২টি ঘি ৬০ গ্রাম নুন ২০ গ্রাম ধনে পাতা অল্প।

ছোলার ডাল ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার একটা পাত্রে ঘন্টা দুতিন ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর অন্য একটি পাত্রে মাংসের কিমা ধুয়ে নিন। এবার উনুনে একটা ডেকচিতে মাংস ও ডাল এক সঙ্গে সেদ্ধ চাপিয়ে দিন। পেঁয়াজ রসুন আদা কাঁচা লঙ্কা ও ধনে পাতার অর্ধেকটা কেটে রাখুন আর বাকিটা ভাল করে বেটে নিন। এবপর সেদ্ধ মাংস, ছোলা ডাল ও বেটে নেওয়া মশলা একসঙ্গে আবার ভাল করে বেটে নিন। এবার বাটাপুর ডিম দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সমান ভাগে ভাগ করে কাটা মশলার সঙ্গে একত্রে বলের মতো করে, শেষে আন্দাজমতো চ্যাপ্টা করে লাল করে ভেজে রাখুন। কুচিকুচি কাঁচা পেঁয়াজ আর ধনে পাতা ছড়িয়ে দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। গরম গরম না খেলে সামি কাবাবের ঠিক আস্বাদ পাওয়া যায় না। সুতরাং জলখাবার বা অতিথি এলে আগে থেকে সব প্রস্তুত রেখে ঠিক সময়টিতে গরম গরম পরিবেশন করুন, উপরে পরিমাণ মতো প্রস্তুত করলে আট-নয়জনকে স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করা যাবে।

গাজরের হালুয়া

উপকরণ গাজর ২২৫ গ্রাম, চিনি ১১৫ গ্রাম দুধ ১২০ গ্রাম ঘি ৫৫ গ্রাম শুকনো ফল ও বাদাম ২০ গ্রাম দারচিনি একটুখানি।

গাজর ধুয়ে কোয়ানিতে ঘসে সরু সরু করে কেটে নিন। কম দিয়ে গাজর সেদ্ধ করুন। দুধ শুকিয়ে গেলে সেই গাজর ঘি দিয়ে ভাজতে হবে। ভাজতে ভাজতে গাজর আঠা আঠা হলে চিনি, ফলের টুকরো ও দারচিনি গুঁড়ো দিয়ে নামান। গাজরের হালুয়াও গরম অবস্থাতে পরিবেশন করুন।

—অঞ্জলি চৌধুরী

পাবলো নেরুদা

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পাবলো পিকাসো এবং পাবলো নেরুদা—এ যুগের দুই কীর্তিমান নাম, দুজনেরই মাতৃভাষা স্পানিশ, দুজনেই যুগযন্ত্রণায় জর্জরিত। একজন চিত্রশিল্পী, আরেকজন কবি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ একজনের হাত থেকে তুলি এবং আরেকজনের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়েছিল। ঠিক কেড়ে নেয় নি। তুলি এবং কলমের বদলে দুজনের হাতে দুটি জ্বলন্ত মশাল গুঁজে দিয়েছিল, এবং আঁকিয়ে বা লিখিয়ে নিয়েছিল নক্ষত্রের ভাষায় উল্কার সংগীত। পিকাসোর মতো নেরুদার শিল্পীজীবনও বৈচিত্র্যে ধনী, ব্যঞ্জনায় গরীয়ান। লাতিন আমেরিকার ভূগোলের মধ্যে তিনি এক ইতিহাস-সত্তা স্থাপন করলেন, স্মরণ করলেন তুসেয়াঁ লুভারতিয়র প্রমুখ শহীদদের আত্মদানের কাহিনী, সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা ব্যক্তিত্ববান হয়ে নেরুদার কলমে কথা কয়ে উঠলো। নেরুদা হলেন লাতিন আমেরিকার সর্বোচ্চ শিল্পিত প্রতিবাদ। তিনি একটি যুগোত্তীর্ণ ধারণ করলেন তাঁর বচনস্বয় এবং সেখানে বিস্ফোরণ ঘটালেন শব্দে, বাক-প্রতিমায় এবং শব্দপ্রতিমা সমুদ্রধ্বনিতে। বিপ্লব এবং প্রেম, সংগ্রাম এবং দেহকামনার সৌরভ তাঁর কাব্যে এমন এক উত্তেজনা ও উন্মাদনা ছড়ায় যে কোনো বাঁধাধরা সমালোচনার বুলিতে তিনি আর ধরা থাকেন না। প্রকৃতি থেকে প্রতীকে এবং প্রতীক থেকে প্রকৃতিতে তাঁর যাতায়াত অবাধ। জীবন্ত সমকালীন মানুষকে তিনি রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সোজা তুলে আনেন কবিতার মধ্যে—বাস্ত্রো, স্তালিন, মাও সে তুং, মিগুয়েল—তখন আর তাঁরা মানুষ নন তাঁরা নেরুদার কাব্যে নতুন করে উপ্ত ও অঙ্কুরিত প্রতীক বৃক্ষের সারি। চিলির দুঃখার্ত স্বদেশের জন্য তাঁর মমতা তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে ইয়োরোপ ও এশিয়ার সংগ্রামী কিষাণ ও শ্রমিকদের সগোত্র সংগ্রামে। তাঁর জন্মনাম—রিকার্দো নেফতালি রেয়েস বাসোয়াল্তো—যেমন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি নেরুদা এই পুরোনো চেক কবির নামের মধ্যে, তেমনি তাঁর স্বদেশচেতনা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশে দেশে ছড়ানো তাঁর অসংখ্য স্বদেশে। শ্রমিকসন্তান নেরুদা, তাঁর বাবা চান নি তিনি কবিতা লেখেন, তাই প্রতিবাদে নেরুদা নিজের নামই বদলে নিয়েছিলেন, চেক কবির নামে নামকরণ করেছিলেন নিজের। সেদিন থেকেই তিনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণের অধিকারী। তাঁর নিজের ভাষায়, 'আমি যেমন নিঃশ্বাস না নিয়ে বাঁচতে পারি না, তেমনি আমি না লিখেও বাঁচতে পারি না।' কাজেই তিনি পিতৃদত্ত নামের বিনিময়ে অর্জন করতে চাইলেন লেখকসত্তায় পুনর্জন্ম। ইলা নেগ্রার সমুদ্র-উপকূলে তিনি কাটিয়েছেন বহু বৎসর, দেখেছেন দূর থেকে ভাঙা রেল এঞ্জিন, মনে হয়েছে যেন হুইটম্যান দাঁড়িয়ে আছেন বাগানে! সমুদ্রকুলীন চিলির সুরা যেন উপচে পড়েছে তাঁর গীতিকবিতায়, ঢেউগুলি কল্লোল তুলেছে পংক্তিতে পংক্তিতে। নেরুদা ভারতবর্ষেও কনসুলেটে কর্মচারী হিসেবে এসেছিলেন। এই অচেনা দেশ তাঁকে অবাক করেছে, অভিভূত করেছে, আবার দুঃখও দিয়েছে কম নয়। তিনি ভারতবর্ষের তুকতাক যাদুবিদ্যার কথা অনেক শুনেছিলেন, কিন্তু সে সবে তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন এক বিরাট নিরন্ন জনতা সাম্রাজ্যবাদের পেষণে পিষ্ট হচ্ছে দেখে। স্বদেশী যুগের নেতাদের সঙ্গেও তিনি পরিচিতিও হয়েছিলেন। তিনি যখন 'হৃদয়ে স্পেন' নামক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তখন তাঁর অনুভূতি স্পেন ছাড়িয়ে সমগ্র নিযাতিত মানুষের খণ্ড খণ্ড স্বদেশে বিস্তৃত হয়েছিল, ছুঁয়েছিল ভারতভূমিকেও। তাঁর কাব্য বিষাদিজম, সিম্বলিজম, সাবরিয়ালিজম সব রীতিই যুগপৎ গ্রহণ ও বর্জন করে নিজস্ব একটি দীপ্তিময়, ধারালো ভাষিতমনস্কতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৯৫০ খৃঃ আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার এবং ১৯৫১ খৃঃ লেনিন পুরস্কারবিজয়ী পাবলো নেরুদা অসুস্থ শরীরে যখন ১৯৭৩ খৃঃ জীবনের শেষদিনটির প্রতীক্ষা করছিলেন তখনই এল তাঁর প্রিয় চিলি, তাঁর প্রিয় স্বদেশের উপর এক ছায়া যবনিকা। কিন্তু স্বদেশের এই নতুন দুঃখ ও গ্লানিকে কাব্যের আগুনে ঝলসাবার আগেই তাঁর চোখের আলো নিভে গেল। মাতৃভূমি যেন আরেক অর্থে তাঁর বাক-স্বাধীনতা হারালো। প্রেয়সীর চোখের পল্লব, হৃদয়ের লাল প্রজাপতি, নরম কোমল দুই ডানার স্পর্শ তাঁকে তৃপ্তি ও অতৃপ্তির [illegible]

দিন, কখনো ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দূরে জীবনের ছেঁয়া অনুসরণ করিয়ে। তিনি বুঝেছেন, মৃত্যুও পল্লবের মুকুট পরে জীবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায়, মৃত্যুর সঞ্চ জীবনের সুতো খুঁজে বেড়ায়। জীবন ও মৃত্যু, দুঃখ ও বেদনা তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন সহোদরের মতো সহজ ও সহ-অবস্থিতি এমনটি খুব কম কবির রচনাতেই দেখা যায়। বিপ্লবী শ্লোগান মুখে করেও তিনি দুঃখের, বিষণ্ণতার চিরন্তনতাকে অস্বীকার করবার কোনো গরজ দেখান নি। চিলির সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি তখন বলেন, 'তোমার ঊর্মিল পায়ের পাতা ছড়ান দূরে দূরান্তে/তোমার সুদীর্ঘ সমুদ্র-সৈকত ছুঁয়ে/আমি মত্ত, নির্বাসিত, দেখ আমার চোখে জল', তখন মনে পড়ে অহংকারী দশাননের ক্ষুব্ধ উচ্চারণ লংকার সমুদ্রের প্রতি, মাইকেল মধুসূদনের মহাকাব্যে যা চিরপ্রসিদ্ধ। কবি সব দেশের সব মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন, 'আমি চাই মাটি, আগুন, রুটি, গম, সমুদ্র এবং গ্রন্থ/চাই সবার জন্য।/আর তাই আমি গৃহহারা/ভ্রাম্যমাণ যাযাবর।/হিংস্র হায়েনার মতো ঘাতকের বিচার তাই আমাকে অনুসরণ করে।' 'মিগুয়েল ওতারো সিলভাকে লেখা চিঠি' নাম দিয়ে নেরুদা যে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন তাতে বলেছেন, 'আমি জীবনকে গ্রহণ করেছি/দাঁড়িয়েছি জীবনের মুখোমুখি, তাকে চুম্বন করেছি, জয় করেছি। তারপর এগিয়ে গেছি খনি-গহ্বরে,/ দেখেছি তারা কেমন করে অতিবাহিত করে জীবন।/যখন গহ্বর থেকে উঠে এসেছি, দু হাতে আমার ময়লা আর বিষণ্ণতা।' তিনি সমুদ্র-চিলদের ডেকে তার অর্ণী বিলিয়ে দেন, দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবার জন্য। কখনো কখনো কবি সাংবাদিকের ভূমিকা অতিক্রম করতে পারেন না, তবু তাঁর সোজা বক্তব্যের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ বুকের স্পর্শ পাওয়া যায়। যেমন তিনি সোভিয়েতভূমিকে লক্ষ্য করে বলেন, 'উরালের গন্ধবিধুর পাইন বন থেকে/আমি তাকিয়ে দেখি/সারা রুশদেশ জুড়ে গজিয়ে উঠছে/পাঠাগার/নিঃশব্দে চলেছে গবেষণা।' অ্যান্ডিজ পর্বতমালার উপর পাহাড়ী শহর মাচ্চু পিচ্চুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতায় তিনি বলেন, 'মাচ্চু পিচ্চু/তুমি কি সাজিয়েছ পাথরের পর পাথর/আর স্তম্ভের গোড়ায় এই ছিমবাস?/প্রবাল এবং প্রবাল এবং তারপর অশ্রু?/স্বর্ণদেহে অগ্নিশিখা/এবং তার গহনে/রক্তের লাল বৃষ্টিবিন্দু?' গভীর আবেগের সঙ্গে তিনি বলেন, 'ওঠো, আমার সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হও, সহোদর।/তোমার আকীর্ণ দুঃখের ভিতর থেকে। আমার হাতে হাত দাও।' পাবলো নেরুদার প্রসারিত হাত চিলির কবর ফুঁড়ে আকাশের দিকে উত্তোলিত থাকবে চিরদিন, অনেক ঋতু, জলস্রোত, বারুদগন্ধ ও অশ্রু অতিক্রম করে আগামীকালের আবির্ভাবকে জানাবে স্বাগত।

কাব্যতত্ত্ব ।। অনুবাদ—বিষ্ণু দে

ছায়া আর আকাশ, কেল্লা আর কল্যাণের মধ্যে,
একক হৃদয় আর শোকাবহ স্বপ্নের দারুভাগ নিয়ে,
ধূরিতে পাণ্ডুর, কপালে ত্রিবলিরেখা,
এবং তিরিক্ষি বিপত্নীকের মতো জীবনের প্রতিদিনের শোচনায়,
হায়, ঘুমের ঘোরে যে জল খাই তার প্রতিটি অদৃশ্য বিন্দুর
আর ধবোধরো যা শুনি সেই প্রতিটি শব্দের জন্যে
আমার একই অবিদ্যমান তৃষ্ণা আর সেই একই হিমজ্বর,
সম্ভূত এক কাল, এক অপ্রত্যক্ষ বেদনা.
যেন চোরের বা ভূতের দল আসন্ন,
এবং পরিমিত ও গভীর আয়তনের এক কোষের মধ্যে.
লাঞ্ছিত এক পরিচারকের মতো; ঈষৎ স্বরভাঙা ঘন্টার মতো,
পুরোনো আয়নার মতো, নির্জন ঝড়ীর গন্ধের মতো
যার রাসিদারা রাত্রে আসে মদে চুর হ'য়ে.
আর মেজের ছড়ানো কাপড়চোপড়ের একটা গন্ধ বেরোয় আর
ঘরে ফুল নেই কিছু,
হয়তো ঝ আর কোন ভাবে আরো কম বিষণ্ণ.
কিন্তু, কদ্ভুত, হঠাৎ, ঝতাস কাপট হানে আমার বুকে,
আমার শোবার ঘরে ঝুরে পড়া অসীম সত্তার রাত্রিগুলি,
আর আত্মবলির জ্বলন্ত দিনের কোলাহল,
তারা দাবি করে, বিষাদে, চায় আমার মধ্যে যা কিছু আছে
বিদগ্ধস্রষ্টা,
তখন বস্তুতে বস্তুতে সংঘাত লাগে, তারা ডাকে, সাড়া পায় না,
আর তখন একটি অন্তহীন আন্দোলন থাকে.
আর তখন একটি অন্তহীন অন্দোলন থাকে, এবং একটি
অসংলগ্ন নুড়ি।

যারা আবিষ্কার করেছিল ।।

অনুবাদ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিল কোঁচকানো বিস্ময়,
সারা ভূখণ্ড যেন বিছানো কোনো নকসা
বিস্ফোরণে আর গোধূলিতে এমনি করে দিনরাত
হুমড়ি খেয়ে সে পড়ে থাকত।

মাটির চোট-খাওয়া রণকৌশল দেখতে দেখতে
সেই হিস্পানী তার শুষ্ক মূর্তিকে মিলিয়ে দিত
কাঁটাবনের ছায়া, শিরিস আর কন্টিকারির ছায়ায়।
রাত্রি, তুষার আর বালুকা দিয়ে গড়া
আমার তন্বী স্বদেশ,
এর দীর্ঘ বেথায় শুধু নৈঃশব্দ,
এর সামুদ্রিক কিনারা থেকে উঠে-আসা শুধু ফেনা,
রহস্যময় চুম্বনে একে ভরে দেয় শুধু কলা।

জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরোর মতো এর আঙুলে ফোস্কা পড়ায় সোনা
সোনা
আর রুপো এর ভারী গৃহসদৃশ কঠিনীকৃত ছায়াকে করে
সবুজ চাঁদের মতো আলোকিত।

তেলের কাছে, মদিরার কাছে, পুরনো আকাশের কাছে একদিন
গোলাপের কাছে বসে সেই হিস্পানী
সামুদ্রিক চিলের পুবীষ থেকে জাগা রুক্ষ পাথরের
এই স্থলটি
ধারণায় আনতে পারে নি।।

রমণীর শরীর ।। অনুবাদ—জগন্নাথ চক্রবর্তী

রমণীর শরীর, শাদা পাহাড়, শাদা উরু,
যেন এক পৃথিবী, শুয়ে আছো আত্মসমর্পিতা।
আমার ঢাষীর শরীর—কর্কশ—তোমাকে খোঁড়ে
এবং মাটির তলা থেকে তুলে আনে সন্তান।

আমি ছিলাম সুড়ংগের মতো একা। পাখিরা উড়ে গিয়েছিল
আমায় ছেড়ে
এবং রাত্রির বিধ্বংসী আক্রমণে আমি দিশাহারা,
টিকে থাকার প্রয়োজনে তোমায় বানিয়েছিলাম আমার আয়ুধ
যেন আমার ধনুকের তীর আমার ক্ষেপণাস্ত্রের পাথর।

কিন্তু প্রতিহিংসার প্রহর আগত, এবং আমি তোমায় ভালবাসি।
ত্বকে ঢাকা দেহ, গুল্মে ঢাকা দেহ, ব্যগ্র দুগ্ধবতী দেহ।
আহা বুকের ওই বর্তুল, আহা অমনস্ক ওই চোখ,
আহা কটিগহ্বরে ওই গোলাপ, আহা তোমার
ধীর করুণ কণ্ঠস্বর।

আমার রমণী, তোমার শরীর, তোমার সৌন্দর্য আমি
আঁকড়ে থাকবো
আমার তৃষ্ণা, আমার সীমাহীন ঈপ্সা, আমার
পরিবর্তমান পথ!
অন্ধকার নদীগর্ভ, যেখানে চিরদিনের তৃষ্ণা প্রবহমান
এবং পিছনে কুটিল এবং অন্তহীন যন্ত্রণা।

সুলভ মূল্যের বই

পেপার ব্যাক ও পকেট বুক

অনিলকুমার ভৌমিক

সম্প্রতি কালে সমগ্র পৃথিবীতে পেপার ব্যাক ও পকেট বুক সংস্করণের বই খুবই জনপ্রিয়। পাঠক মহলে এর চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সুলভ মূল্যেই এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। পাঠকের কাছে বইয়ের দাম একটা বড় প্রশ্ন। আর্থিক সংগতিতে না কুলালে ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় বই কেনা যায় না। পেপার ব্যাক ও পকেট বুক আগ্রহী পাঠকের এই সমস্যা অনেকটা দূর করতে পেরেছে।

পেপার ব্যাক ও পকেট বুক সংস্করণকে অনেকে সমার্থক বলে মনে করেন। কিন্তু কয়েকটি সাধারণ মিল থাকলেও পেপার ব্যাক ও পকেট বুকের চরিত্র আলাদা। খুবই বিস্ময়ের কথা যে, বইয়ের জগতে পেপার ব্যাক ও পকেট বুকের কোন যুক্তিসিদ্ধ সংজ্ঞা নেই। বই বিষয়ের কোন গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। ১৯৬০ খৃঃ লণ্ডনে থেকে প্রকাশিত গ্লোসারি অফ দি বুক গ্রন্থে পেপার ব্যাক বা পকেট বুকের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র পকেট এডিশন সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে,—সাধারণত ফুলস্কেপ আট পেজি থেকে আকারে বড় নয় এমন ছোট বই। লক্ষ্য করার বিষয় উক্ত গ্রন্থে 'পকেট বুক' কথাটি ব্যবহার না করে 'পকেট এডিশন' বলা হয়েছে। ১৯৭১ খৃঃ প্রকাশিত এল এম হ্যারোড প্রণীত 'দি লাইব্রেরিয়ানস গ্লোসারি' গ্রন্থে পকেট বুকের আকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে পকেট বুকের আকার ৬¾" × ৪¼" ইঞ্চির বেশি বড় হবে না। আর পেপার ব্যাক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—কাগজের মলাটে বাঁধাই বইকে পেপার ব্যাক বলা হয়। এই দুরকম বইয়ের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা একথা বলতে পারি যে, কাগজের মলাটে বাঁধাই সমস্ত পকেট বুকই পেপার ব্যাক কিন্তু সমস্ত পেপার ব্যাকই পকেট বুক নয়।

পকেট বুকের আকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ করা চলে যে, তা পকেটে বহনযোগ্য ক্ষুদ্রাকৃতির হবে যা পেপার ব্যাক সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। পকেট বুকের মূল্য সুলভ হয় এবং এই সিরিজে প্রকাশিত সব বইয়ের দাম প্রায় একই রকম থাকে। এর জন্য পকেট বুকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার প্রয়োজন হয়। কম দামের কাগজে দৃষ্টি-সহনীয় ক্ষুদ্রতম অক্ষরে ছাপা হয় এবং বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেও ব্যয় সঙ্কোচনের কথাই বিবেচনা করতে হয়। সাধারণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ব্যয় সঙ্কোচনের কথাই বিবেচনা করতে হয়। সাধারণ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অংশের চারদিকে যে সাদা অংশ থাকে পকেট বুকের বেলায় তা থাকে না। এতে এক পৃষ্ঠায় বেশি অক্ষর ধরিয়ে বইয়ের কলেবর ছোট করা যায়। অর্থাৎ বাঁধাই কিংবা মুদ্রণ পরিপাট্য পকেট বুক প্রকাশনার প্রধান বিবেচ্য নয়—পকেট বুক প্রকাশনার প্রধান লক্ষ্য দামে সস্তা করার জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং প্রচুর পরিমাণে ছাপা।

পকেট বুকের আকারই শুধু বড় বইয়ের আকারের চেয়ে ভিন্ন তা নয়—এর চরিত্রও অন্য প্রকার। গবেষণামূলক সৃজন-ধর্মী বই এই সিরিজে সাধারণত প্রকাশিত হয় না, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। হাল্কা রসের গল্প-উপন্যাস এবং রম্য বিষয় পকেট বুকে লেখকের প্রধান লক্ষ্য। ভ্রমণে চিত্ত বিনোদনকারী সঙ্গী হিসেবে পকেট বুকের ব্যবহার খুব বেশী। পাঠকের মনে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারলেও কোন ক্ষতি নেই, এর তাৎক্ষণিক মূল্যই বেশি। পকেট বুক সংস্করণের লেখককে স্বল্প-পরিসরে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ করতে হবে।

পকেট বুকের ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর প্রচলন শুরু হয়। সে সময় জার্মানীতে রম্য-সাহিত্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচুর বই 'পকেট বুক' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। মজার কথা এই যে, প্রথম যুগে এর পাঠক ছিল মহিলারাই। সে সময় এর জনপ্রিয়তা মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এটা মনে করা হয় যে, নারী জাতির চিন্তার মুক্তি ঘটাতে পকেট বুক যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। প্রায় সমসাময়িক কালেই কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের বই পকেট বুক নাম নিয়েও প্রকাশিত হয় এবং উনিশ শতকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে পকেট বুকের পরিধি অন্যত্রও বিস্তৃত হয়। সেদিন জার্মানীতে এবং অন্যান্য দেশের বইয়ের জগতে এভাবেই পকেট বুকের সূচনা হয়।

পেপার ব্যাক সংস্করণেরও প্রথম এবং প্রধান শর্ত—সুলভ মূল্য। পকেট বুকের মতোই পেপার ব্যাকেও বইয়ের দাম সস্তা করার জন্য উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হয়। মুদ্রণ পারিপাট্য, অংগসজ্জা কাগজ বাঁধাই প্রভৃতি বহিরাবরণ হার্ড কভার বইয়ের তুলনায় নিম্ন-মানের হয়। হার্ড কভারে যে বইয়ের দাম পঁচিশ টাকা, সে বইয়ের পেপার ব্যাক সংস্করণ দশ-পনের টাকায় পাওয়া যায়। ফলে আগ্রহী পাঠক বই কিনতে উদ্বুদ্ধ হন।

সাধারণত হার্ড কভারে প্রকাশিত যে বই পাঠক সমাজে সমাদৃত হয় সে বইয়েরই পেপার ব্যাক সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। অনেকের ধারণা পেপার ব্যাক বই হার্ড কভার বইয়ের বাজার নষ্ট করে। অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারা যায় যে, এ ধারণা ঠিক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতার কথা বলা যেতে পারে। সুলভ মূল্যের পেপার ব্যাক সংস্করণের জন্য শোভন সংস্করণের সঞ্চয়িতার চাহিদা মেটেই কমেনি।

গ্রন্থজগতে পেপার ব্যাকেরও একটি সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে যে, তার মধ্যে বিশেষ কতগুলি প্রবণতা, কতগুলি যুগলক্ষণ বা কতগুলি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে এগুলি আমাদের অনুধাবন করা দরকার।

পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপে এমন কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে যা দেখলে মনে হয় প্রকাশকদের উদ্দেশ্য ছিল যে, বইগুলো যাতে পাঠকদের কাছে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বইয়ের উল্লেখ করা যায়। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে আগসবার্গে, হানস সোনসপারজার নামে এক ভদ্রলোক সাধারণের ব্যবহারোপযোগী একটি স্বাস্থ্য বিধির বই প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটির বহিরঙ্গের সঙ্গে আজকের দিনের পেপার ব্যাকের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মীয় বিতর্ক চলার সময় যে সব দ্রুত মুদ্রিত পরিবেশিত অজস্র বই প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির কথা স্মরণ করা যেতে

পাবে। মিল্টন রচিত অ্যারিও প্যাগিটিকা বইটির কথা এখানে উল্লেখ করি। বইটি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে এক ধরনের পেপার ব্যাক হিসেবেই প্রকাশ করা হয়েছিল। মুদ্রণ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতার স্বপক্ষে এই প্রসিদ্ধ ভাষণটিকে বর্তমানকালে বহুল প্রচলিত উচ্চমানের এবং সুলভ সংস্করণের সূচনা বলা যেতে পারে। এই ধরনের ঘটনা প্রায় সবদেশের গ্রন্থ-প্রকাশনার ইতিহাস অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। বাংলা ভাষার প্রকাশনা সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি।

বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার ইতিহাস সু প্রাচীন নয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামরাম বসুর সুপরিচিত গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" দিয়ে বাংলা প্রকাশনার ইতিহাস শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে প্রকাশনা-ব্যবসা শুরু হয় উনিবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বটতলায়।

> 'কিন্তু উনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বটতলার বই সুলভতার জন্য রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' যখন ১৮২৩ সালে বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ছাপা হয় তখন তার দাম ছিল ছয় টাকা, তখনকার মূল্যমানে যথেষ্ট বেশি। কিন্তু ১৮৫৬ সালে 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' যখন কমলালয় প্রেসে ছাপা হয়, তখন তার দাম হয় মাত্র এক টাকা। ১৮৩২ সালে সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসে ছাপা কালিদাস কবিরাজের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থের দাম ছিল দু টাকা, পরে ১৮৫৬ সালে, সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা বইয়ের দাম হয় চার আনা। ১৮৩১ সালে রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেসে ছাপা কৃত্তিবাসের 'আদি পর্বের' দাম ছিল তিন টাকা, পরে ১৮৫৬ সালে সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা বইয়ের দাম হয় মাত্র দু' আনা। এই সুলভ মূল্যের জন্য বটতলার প্রকাশকদের বই গ্রামাঞ্চলের পাঠকদের হাতে পৌঁছায় এবং গ্রামের পাঠকরাই বটতলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে।'
> (বটতলার প্রকাশক—বিনয় ঘোষ, গ্রন্থ জগৎ, আগস্ট—সেপ্টেম্বর ১৯৭২)।

বটতলার এই সুলভ মূল্যের বইকে শুধু বাংলা দেশে নয় ভারতে গ্রন্থ-প্রকাশনার ইতিহাসে পেপার ব্যাকের সূচনা বলা যেতে পারে। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ'-এ সুলভ মূল্যে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, নেজাতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ লেখকের গ্রন্থাবলী বাংলা প্রকাশনা জগতে পেপার ব্যাকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আজও বটতলার প্রকাশিত বই গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুলভ মূল্যই এর প্রধান কারণ। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলের পাঠকদের বই পাঠের মানসিকতার স্তর অনুযায়ী প্রকাশিত বই-ই বেশি জনপ্রিয়। তাই প্রতি বছর "লক্ষ্মীর পাঁচালী" প্রভৃতি বই লক্ষ লক্ষ কপি গ্রামের হাটে বাজারে বিক্রী হয়। দামে সস্তা করলেও 'বনলতা সেন'-এর পেপার ব্যাক সংস্করণ, এই হারে সেখানে বিক্রী হওয়া সম্ভব নয়।

আধুনিক পেপার ব্যাক ও পকেট বুক প্রকাশনা শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে—ইংল্যান্ডে। স্যার অ্যালেন—এর উদ্ভাবক। দেশব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের সময় তিনি সস্তায় চমৎকার সব রম্যরচনার বই (হালকা বিষয়ের গল্প-উপন্যাস ইত্যাদি) পাঠকদের হাতে তুলে দেবার এক পরিকল্পনা করেন। এরই ফলশ্রুতি আধুনিক পেপার ব্যাক ও পকেট বুক। প্রকাশনা শিল্পের গতানুগতিক পথে না গিয়ে আধুনিক আঙ্গিকে পেপার ব্যাক ও পকেট বুক প্রকাশ করে সম্পূর্ণ এক নতুন পথের সন্ধান তিনি দেন। পেঙ্গুইন সিরিজের পকেট বুক, বইয়ের জগতে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ছয় পেন্স দামের পেঙ্গুইন বই সারা পৃথিবীতে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কাগজের মলাটের এই বইগুলি স্বল্পস্থায়ী হলেও একটি মাগাজিনের মতো কেনা যেত বলে প্রচুর বিক্রী হত। বইয়ের ব্যবসায়ের এই নতুন পথ স্যার অ্যালেন প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে অসামান্য কৃতিত্ব প্রকাশ করেন। পেঙ্গুইনের দেখাদেখি পাশ্চাত্য জগতে প্যানথার, প্যান, কর্গি ফনটানা প্রভৃতি অন্যান্য পকেটবুক সিরিজ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

প্রসঙ্গত এখানে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পকেট বুক সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করি। পেঙ্গুইন বই প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স 'আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা' প্রকাশ করে। বইগুলির আকার ছিল পকেট বুকের সংজ্ঞা নির্দিষ্ট —৬"×৪¼" ইঞ্চি এই গ্রন্থমালা সম্বন্ধে সে সময়কার একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করছি।

'আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা'

—মূলবান সংস্করণের মতই— কাগজ, ছাপা বাঁধাই—সর্বাঙ্গ সুন্দর—আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখকের পুস্তকই প্রকাশিত হয়—

বঙ্গদেশে যাহা কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই ইহার প্রথম প্রবর্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে—সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা নূতন সৃষ্টি। বঙ্গ সাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, সেই মহান উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 'আট-আনা-সংস্করণ' প্রকাশ করিয়াছি।'

তখনকার দিনের খ্যাতিমান ও আধুনিক সাহিত্যিকদের বই এই সংস্করণে প্রকাশিত হত। ১৯২৬ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত তালিকায় এই সিরিজের একশটি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। তালিকা থেকে কয়েকজন লেখক ও বইয়ের নাম দিচ্ছি।—রায় জলধর সেন বাহাদুর (অভাগী, বড়বাড়ী, কাঙ্গালের ঠাকুর), শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ (ধর্মপাল মযুখ), শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পল্লীসমাজ অরক্ষণীয়া চন্দ্রনাথ বিষ্কৃতি চরিত্র) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ (কাঞ্চনমালা), শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল (সত্য ও মিথ্যা), শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (আলেয়া), শ্রীমতী অনুরূপা দেবী (মধুমল্লী), রায় বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট (নীল মাণিক), শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বসুমতী সম্পাদক (প্রত্যাবর্তন), শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ ডি-এল (দ্বিতীয় পক্ষ বক্তের ঋণ), শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রেমের কথা, মোহিনী) প্রভৃতি।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত পকেট বুক এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পেপার ব্যাকের এই ধারা বাংলা ভাষার প্রকাশন শিল্পে অব্যাহত থাকেনি। নানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

পেপার ব্যাক বা পকেট বুকের দাম কম রাখতে হলে বেশি সংখ্যক ছাপা ও বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নত ধরনের যন্ত্রকে কলা-কৌশল ও কারিগরিক নৈপুণ্যের সুবিধা গ্রহণ না করতে পারলে এবং মুদ্রণের উপাদানগুলি অর্থাৎ কাগজ, ছাপা বাঁধাই ও বিজ্ঞাপন সন্তোষ না পেলে নিয়মিতভাবে পেপার ব্যাক বা পকেট বুক প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এর ওপর সুলভ মূল্যের বইয়ের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে।

লায়লা বানু ও কর্নেল ন্যাজারেথ

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

১৯৭০ সাল। এপ্রিলের শেষ। এই সময়ে লু বইতে থাকে সিনাই-এর মরু প্রান্তরে। তারই কি একটা ঝাপটা এসে লাগলো জেরুজালেমের আরব-বস্তিতে।

ভোর থেকেই অসহ্য গুমোট গরম; একটু বেলা বাড়লেই শুরু হয়ে যায় প্রচণ্ড আঁধি। আগুনের হলকায় যেন ঝলসে যেতে থাকে সবকিছু! এই গরম বাতাসের ছোঁয়া থেকে গা বাঁচাতে সকলেই আশ্রয় নিতে চায় কোন না কোন ছাউনির নীচে, আশ্রয় নেয় দখলদার ইজরায়েলী ফৌজ।

যেমন অসহ্য আবহাওয়া, তেমনই থমথমে পরিবেশ। প্রতি মুহূর্তেই আরব কমান্ডোদের হামলার আশঙ্কা। বড়োই নাছোড়বান্দা এই সন্ত্রাসবাদীরা। যেন ছায়ার মত লেগে আছে পিছনে। একটু অন্যমনস্ক হলেই রক্ষে নেই। কোন একটা ভাঙ্গা গলির বা অন্ধকার গলির আড়াল থেকে ছুটে আসবে একটা গ্রেনেড অথবা এক ঝাঁক বুলেট! এই আচমকা হামলার ভয়ে একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে ইজরায়েলী সামরিক দপ্তর। বেশ কিছুদিন হল জেরুজালেমের এই এলাকাটা অধিকার করে নিয়েছে তারা। তবু কমান্ডোদের তৎপরতা বন্ধ করা যাচ্ছে না কিছুতেই!

আশ্চর্য সাহস এই গেরিলা মুক্তি বাহিনীর। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এদের জুড়ি নেই। মাতৃভূমির জন্যে অকাতরে প্রাণ দিতে পারে তারা, প্রাণ নিতেও পারে হাসতে হাসতে। এরা যেমন চটপটে তেমনই কষ্টসহিষ্ণু। কাজ শেষ করে এমন সুকৌশলে মিশে যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে যে এদের ধরে কার সাধ্য!

তবু হাল ছেড়ে দেয়নি ইজরায়েলী গোয়েন্দা দপ্তর। তাদের চরেরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও খুঁজে বেড়াচ্ছে এই কমান্ডোদের। এই দপ্তরের আড়াকাঠিরা এখন ছড়িয়ে আছে জেরুজালেমের সর্বত্র। এদের হাতে হরদমই নিগ্রহ ভোগ করছে নির্দোষ আরব উদ্বাস্তুরা।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা যুদ্ধবিধ্বস্ত জেরুজালেম। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। প্রায় সবাই তখন আশ্রয় নিয়েছে ঘুমের কোলে। শুধু ঘুম ছিল না তিনজন মানুষের চোখে। তারা আবদুল, ইমতিয়াজ আর লায়লা। অধীর প্রতীক্ষায় একজনের পথ চেয়ে চুপচাপ বসে ছিল তারা। বসে ছিল জেরুজালেমের উপকণ্ঠে একটি জরাজীর্ণ কুটিরের ভেতর। সাবরন্দী খেজুরের ঘর। তারই একটিতে ইসতিয়াজের বাস। সেইখানেই অপেক্ষা করছিল তারা।

গির্জের পেটা ঘড়িতে বারোটা বেজে গেছে এই কিছুক্ষণ। এখন যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে তাদের বহু প্রতীক্ষিত অতিথি। তবু সবুর যেন আর কাটতেই চায় না। বার বার বন্ধ দরজার দিকে তাই তাকাচ্ছে তিনজন। মাঝে মাঝে চোখ পড়ছে নোনাধরা দেয়ালটার ওপর। মোমবাতির ক্ষীণ শিখাটা কেঁপে কেঁপে দুলছে

ছায়া ফেলছে সেখানে। আর অদূরের রাজপথ থেকে মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে মিলিটারী জিপের চলাচলের শব্দ।

—টক্! টক্। টক।

সন্তর্পণে কে যেন ঘা দিল দরজায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো ইমতিয়াজ; এক ঘুঁয়ে নিভিয়ে দিল বাতিটা। তারপর খুব সাবধানে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

—কে?'

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

—'আমি হামিদ!'

—'পাশ ওয়ার্ড!'

—'খুফু!'

—'দাঁড়াও, দোস্ত, দরজা খুলছি!'

খুব সাবধানে আগলটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো ইমতিয়াজ; তারপর একটা পাল্লা খুলে ধরলো নিঃশব্দে। ছায়ার মত ঘরে এসে ঢুকলো দীর্ঘকায় এক আগন্তুক। তৎক্ষণাৎ দোর বন্ধ করে দিল ইমতিয়াজ। এর মধ্যে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে লায়লা বানু; সে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। খোঁচা খোঁচা এক মুখ ভর্তি দাড়ি, জরাজীর্ণ পোষাক; শীর্ণ ক্লান্ত হামিদ শেখ ধপ করে বসে পড়লো পায়াভাঙ্গা খাটিয়ার ওপর, ঐটাই ছিল ঘরের একমাত্র আসবাব। আর তার বসার সঙ্গে সঙ্গেই সাগ্রহে এগিয়ে গেল লায়লা।

—'ভালো আছো তো, বাপজান?'

তার কণ্ঠে ঝরে পড়লো উদ্বেগ আর বেদনা!

—'হ্যারে, বেটি, ভালোই আছি আমি!' লায়লার মাথায় সস্নেহে হাত রাখলো হামিদ শেখ। তারপর ঢোল্লা, শতছিন্ন আলখাল্লার গোপন পকেট থেকে বার করলো একটা ছোট্ট মানচিত্র। পার্চমেন্ট কাগজে সযত্নে চিহ্নিত করা ইজরায়েলী সৈন্য ঘাঁটির নকসা! মোমবাতির স্তিমিত আলোয় ভালো করে কিছুই নজরে আসে না। তাই আলোর দিকে আরো ঝুঁকে বসলো সবাই। সাগ্রহে সকলেই ঝুঁকে পড়লো ঐ ম্যাপটার ওপর। হাইফা থেকে সুয়েজ, আকাবা থেকে সিনাই—যেখানে যত গোপন ইজরায়েলী সৈন্য ঘাঁটি আছে তার নিখুঁত নিশানা পাওয়া যাবে এই মানচিত্রে। বহু চেষ্টায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এটা সংগ্রহ করেছে হামিদ শেখ। কমান্ডো দলের বহু কর্মকাণ্ডের নায়ক এই হামিদ! এখন সে এটা পাচার করতে চায় কায়রোয়। গেরিলাদের সদর দপ্তরে!

—'আমাদের হাতে কিন্তু সময় নেই আর!'

ক্লান্ত হামিদ ম্যাপটা মুড়তে মুড়তে বলে ইমতিয়াজকে।

—'তাহলে হুকুম করো, কাজে লেগে যাই এক্ষুণি!'

সামনে এগিয়ে এলো দুঃসাহসী আবদুল। আবছায়া অন্ধকারে জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো!

—'উহু, ব্যস্ত হলে মাটি হবে সবকিছু, কাজ করতে হবে ঠাণ্ডা মাথায়! জানই তো ছিনেজোঁকের মত আমার পেছনে লেগে আছে ইজরায়েলী চরগুলো; একবার যদি ধরতে পারে তো কুত্তার মত গুলী করে মারবে আমাকে, আমাদের সবাইকে! তাই খুব হুঁসিয়ার!'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো কমান্ডো সর্দার; তারপর ফিরে তাকালো কন্যার দিকে।

—'চলিরে বেটি, আবার যে কবে দেখা হবে কে জানে! তাই একটু সাবধানে থাকিস এ কটা দিন!' কথা বলতে বলতে দুঃসাহসী হামিদ শেখ-এর চোখ দুটো হয়ে উঠলো অশ্রুসজল; কিশোরী লায়লার চোখও শুখনো রইলো না, তখন সে গিয়ে দাঁড়ালো বাপজানের পাশে।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মানচিত্রটা শেষবারের মত দেখে নিল হামিদ খান। তারপর সেটা তুলে দিল কিশোরী কন্যার হাতে।

—'তোর ওপরই দিয়ে যাচ্ছি, সবচেয়ে কঠিন কাজের দায়িত্ব! মনে থাকে যেন এই দামী ম্যাপটা পৌঁছে দিতে হবে ঠিক জায়গায়। কাল ভোর পাঁচটায় বোরখা পরে তুই সোজা চলে যাবি আরমানী পাড়ার কুয়োতলায়। সেখানে থাকবে কালো জোব্বা পরা ফকির। সে এসে জল চাইবে তোর কাছে; জল দেবার ছলে সবার অলক্ষ্যে তার হাতেই তুলে দিবি এই মানচিত্রটা। খুব হুঁসিয়ার। কেউ যেন দেখতে না পায়! দেখতে পেলেই সব কিছু মাটি! ধরা পড়তে হবে আমাদের!'

মানচিত্রটা সযত্নে ভাঁজ করে একটা ছোট্ট প্লাসটিকের থলির ভিতর রাখতে রাখতে ঘাড় নাড়লো লায়লা—'কোন ভয় নেই বাপজান! এটা ঠিকই পৌঁছে যাবে কায়রোয়। আল্লার কসম!'

কিন্তু লায়লার কথা শেষ হবার আগেই রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ কোথায় যেন বেজে উঠলো একটা হুইসিল (বাঁশি)। তীক্ষ্ণ একটানা শিসের মত ছিন্নভিন্ন করে দিল অমাবস্যার অন্ধকার।

—'কি সর্বনাশ, এ যে পুলিশ!'—আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে গেল চারজন। সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দেওয়া হল মোমবাতিটা।

—'হুঁসিয়ার লায়লা। বিদায় বন্ধুগণ!'

ঘরের পিছনে আস্তাকুড়। নিঃশব্দে জানালা খুলে সেখানেই লাফিয়ে পড়লো হামিদ শেখ। কিন্তু সেই আবর্জনার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল একটা নেড়ি কুত্তা। আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ভয় পেয়ে ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে ডেকে উঠলো সেটা।

—'এই যে এদিকে!'

কে যেন চিৎকার করে উঠলো অন্ধকারে। মুহূর্তে চোখের উপর এসে পড়লো এক ঝলক আলো। চমকে কোমরে হাত রাখলো হামিদ শেখ। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে তখন।

ঝক! ঝক! ঝক।

সাবমেশিনগানের গুলীতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল গেরিলা সর্দারের দেহ। কোমরবন্ধ ঝোলানো গ্রেনেডটা আর কাজে লাগাতে পারলো না সে।

চারিদিকে ত্রস্ত কলরব। বাঁশির শব্দ, গুলীর আওয়াজ। নানা জনের প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি। সেই ডামাডোলের মধ্যেই সামরিক বাহিনীর লোকেরা এসে ঘিরে ফেললো ইমতিয়াজ আলির আস্তানা।

—'এই যে আছিস ভিতরে! দরজা খোল!'

একটা কর্কশ চিৎকার ছুঁড়ে দিল কে যেন! কিন্তু অন্ধকারে কুঁড়েটা যেন নির্জনতার কফিন।

ধমাস্!—ভারী বুটের এক লাথিতেই ভেঙ্গে পড়লো নড়বড়ে কাঠের দরজা। ভিতরে, অন্ধকারে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে তিনটি প্রাণী। আচমকা শব্দ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো লায়লা বানু। ভয়ে বিবর্ণ ইমতিয়াজের মুখ। আবদুলও হতবাক।

শক্তিশালী টর্চের আলো ফেলে ঘরের ভেতরটা এক নজরে দেখে নিলেন কর্ণেল নাজারেথ। ঐ তো, ঘরের কোণে, দাঁড়িয়ে আছে দুই জোয়ান। সশস্ত্র সৈনিকেরা সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর। বিনা প্রতিবাদে মুখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে যার খেল ইমতিয়াজ আর আবদুল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো তাদের সংজ্ঞাহীন দেহ।

খাটিয়া, তোরঙ্গ, গৃহস্থালীর নানা উপকরণ ভেঙ্গে ছড়িয়ে সামরিক পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলো চারিদিক। না সন্দেহজনক কোন কিছুই পাওয়া গেল না সেই ঘরে। তখন কর্ণেল নজর দিলেন লায়লার দিকে।

—'এই, কি নাম তোর?'

—'লায়লা বানু!'

—'এই শয়তানগুলোর সঙ্গে জুটেছিস কেন?'

—'ইমতিয়াজ আলি আমার চাচা!'

—'চুপ কর মিথ্যেবাদী!'

ধমকের চোটে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো লায়লা।

—'আরে, এযে দেখছি নিতান্তই খুকি'

তবু একবার ভালো করে পরখ করা দরকার। কথা বলতে বলতে তাই একটানে কর্ণেল ছিঁড়ে দিলেন লায়লার বোরখাটা। ছিন্ন বোরখার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো এগারো বছরের এক কিশোরী। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তার ঠোঁট। কেঁদে কেঁদেই বুঝি ফুলে উঠেছে তার চোখ দুটো। এযে সরলতার প্রতিমূর্তি।

—'নাঃ, কোন কাজেই বোধহয় লাগবে না এই ছুঁড়িটা!'

হতাশ কর্ণেল বেরিয়ে গেলেন হাউনি থেকে। তবু তাঁর আদেশ মত সার্চ করা হল বস্তির সবাইকে। সার্চ করা হল লায়লা বানুকেও। কোন আগ্নেয়াস্ত্র, সন্দেহজনক কোন দলিল বা চিঠিপত্র যদি পাওয়া যায় কারও কাছে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই পাওয়া গেল না সেখানে। কোন যাদুমন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে সমস্ত।

শেষ পর্যন্ত হতাশায় ক্ষোভে সারা বস্তিটাতেই আগুন লাগিয়ে দিল ইস্তরায়েলী সৈন্যরা। লায়লাদের ঘরের চালেও পেট্রোল ঢেলে দিল কয়েকজন। সজল চোখে ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে সে দেখলো সব কিছু। মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও শেষ পর্যন্ত গ্রাস করছে লেলিহান অগ্নিশিখা।

পরের দিন কোর্ট মার্শাল। বিচার নয়, বিচারের প্রহসন। সামরিক আদালতের সামনে হাজির করা হল তিনজন আসামীকে। ওদের অপরাধ নিতান্তই গুরুতর। ষড়যন্ত্র আর সন্ত্রাসবাদের নায়ক হামিদ শেখকে আশ্রয় দিয়েছে তারা, তাই দেওয়া হল চরম শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড।

এখন ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাদের। একটা ট্রাকে করে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হল হাবতুভায়। গোলায় বিধ্বস্ত একটি মসজিদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গাড়িটা। একে একে নেমে পড়লো সবাই। জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন কর্ণেল ন্যাজারেথ। এখন আসন্ন প্রমোশনের চিন্তায় মনে তাঁর ফূর্তির জোয়ার।

কর্ণেলের আদেশে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো তিনজন। আবদুল, ইমতিয়াজ আর লায়লা বানু। ঘাতকটি শেষবারের মত পরখ করে নিল তার মেশিনগানটি। অবশেষে একটা কালো রুমাল হাতে নিয়ে কর্ণেল এগিয়ে গেলেন লায়লার দিকে—এটা চোখের ওপর বেঁধে নে তাড়াতাড়ি।

ন্যাজারেথ কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কিন্তু আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মেয়েটি। সেই কান্না দেখে বুঝি একটু দয়া জাগলো তরুণ সেনাপতির মনে।

—'কিরে, খুব ভয় করছে না কি!'

—'ভয়?'

কান্না থামিয়ে ম্লান হাসলো লায়লা—'ভয় কাকে বলে তা জানে না লায়লা বানু। তবে সে কাঁদছে তার বদনসীবের কথা ভেবে।'

—'বদ নসীব?'

—'হ্যাঁ, কোথায় কায়রো; আর কোথায় হাবতুভা। শেষে কিনা মরতে হল এই কাফেরের দেশে! গোরে গিয়েও তাই শান্তি পাবে না আমার প্রাণ!'

উদ্গত ক্রোধে এক লহমার জন্যে জ্বলে উঠলো ইহুদী কর্ণেলের চোখ। তবু সে রাগ চেপে রেখে মাখন নরম গলায় তিনি ফের সুধালেন লায়লাকে—'তা বল না তোর কি চাই! এই কাফেরের অসাধ্য না হলে তা পূরণের চেষ্টা করবে সে।'

আজ এই বাচ্ছা মেয়েটার কাছে কিছুতেই হার মানবেন না কর্ণেল ন্যাজারেথ। তাই শেষ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল এ প্রতিশ্রুতি।

—খোদার অশেষ দোয়া বর্ষিত হোক আপনার মাথায়—মিনতিভরা চোখে কর্ণেলের দিকে চাইলো লায়লা—'কায়রোর কাছেই আমাদের গ্রাম। সেই গ্রামের গোরস্থানে পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে আমার মা আর বাপজান। তাদের পাশে শুয়েই ঘুমোতে চাই আমি।'

—'তথাস্তু, তোর কফিনটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেখানে, আর কিছু?'

—'না, অশেষ ধন্যবাদ!'

কয়েক সেকেন্ড বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কর্ণেল ন্যাজারেথ। তারপর হুকুম দিলেন —'ফায়ার!' গর্জে উঠলো মেসিনগান। মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো তিনটি রক্তাক্ত দেহ।

এক সপ্তাহ পরে কায়রো বিমানবন্দরে এসে নামলো একটি সুইস যাত্রীবাহী বিমান। সেই বিমানটি বয়ে এনেছে এক সন্ত্রাসবাদীর কফিন। কর্ণেল ন্যাজারেথ তাঁর কথা রেখেছেন, লায়লা বানুর দেহ শেষ পর্যন্ত তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তার ভায়ের ঠিকানায়। এর জন্যে অবশ্য বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে রেডক্রসের সহযোগিতায় কথা রাখতে পারা গেছে কোনক্রমে।

কিন্তু লায়লার কফিন এসে পৌঁছবার আগেই হাইফা থেকে পৌঁছে গিয়েছিল এক সাংকেতিক বার্তা। এসে পৌঁছেছিল কায়রোর গেরিলা দপ্তরে—'গোপনীয় মানচিত্রটা খুঁজে পাইনি। ওটা লায়লার কাছেই সন্ধান করো—যাভেদ!'

যাভেদ খান লায়লারই ভাই। আর ওপরেই ভার ছিল মানচিত্রটা বয়ে আনবার। সে হতভাগ্যই খবরটা জানিয়ে দিয়েছে ওখানে।

গেরিলা সদর দপ্তরই তাই সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল লায়লা বানুর। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাকে ফিরে পাওয়া গেল না আর। তার কফিনটাই অগত্যা নিয়ে যাওয়া হল সদর কার্যালয়ে।

সব দিক ভেবে, আগে থেকেই খবর দেওয়া হয়েছিল এক শল্য চিকিৎসককে। শবব্যবচ্ছেদের কাজে হাত পাকিয়েছেন তিনি। ভালো করে পরীক্ষা করার পর লায়লার দেহটা শোয়ানো হল ডিসেকসান টেবলের ওপর। সে মুহূর্তে সজল হয়ে উঠেছে সকলের চোখ। কিন্তু এখন তো ভেঙ্গে পড়ার সময় নয়। বরং বদলা নিতে হবে লায়লার মৃত্যুর। চাই প্রতিশোধ।

তাই নিপুণ হাতে ছুরি চালাতে শুরু করলেন সার্জেন। অবশেষে পাকস্থলীর ভেতরেই পাওয়া গেল সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত কস্তুটি। বিপদের মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাতেই লায়লা লুকিয়ে ফেলেছিল সেই ম্যাপটা। মুখে পুরে চালান করে দিয়েছিল পেটের ভেতর। সেখানে ছোট্ট প্লাস্টিকের থলির মধ্যে তখনও অবিকৃত ছিল সেই মানচিত্রটা।

রবীন্দ্রনাথ দশ অন্ধকারের পেছন ছোটা

যেখানে যাবো সেটা একটি বড়ো রাস্তা। খুব চওড়া রাস্তা। ঝকমকে রাস্তা। সে রাস্তায় নতুন জমকালো গাড়ি চলে অসংখ্য। যাত্রীবোঝাই বাস চলে। ট্যাকসি অনেক। ফুটপাথের দু পাশে দোকানের পর দোকান। যখন যা কিছু দরকার সব ধারে কাছেই পাওয়া যায়। বাজারও আছে, মস্তো বড়ো বাজার। সেখানে কেনাকাটা করতে শহরের নানা জায়গা থেকে সবাই আসে। যা কোথাও পাওয়া যায় না, ওই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ওখানে পুরো জীবনটাকে দেখা যায়। ব্যস্ত কর্মচাঞ্চল্য, মন্থর বার্ধক্য, বেপরোয়া তারুণ্য, কলকণ্ঠ কৈশোর, নানা রকম পোশাক, নানা বয়েসের পুরুষ ও মেয়ে। দিনেরবেলায় ব্যাঙ্ক আছে, সন্ধেবেলার ব্যাঙ্কও আছে, মধ্যবয়েসী পুরুষ ও মহিলারা সেখানে ঢোকে, সেখান থেকে বেরোয়। সিনেমা হল আছে, অভিজাত অনভিজাত সব রকম রেস্তরাঁ আছে, অল্প বয়েসী ছেলে ও মেয়েরা সেখানে ভিড় করে সন্ধেবেলা। একটি ছোট পার্ক আছে। সেখানে বিকেলে ছুটোছুটি করে ছোটো বাচ্চারা। সন্ধ্যের পর গাছতলায় বেঞ্চিতে বসে থাকে কয়েকজন পেনশান পাওয়া বৃদ্ধ।

সে পাড়ায় অনেক উঁচু উঁচু বাড়ি আছে। অনেক নতুন হয়েছে। চারতলা, পাঁচতলা, ছ'তলা। আরো আছে। উপরের ফ্ল্যাটগুলো থেকে দক্ষিণ অনেকদূর দেখা যায়। আলো আছে হাওয়া আসে। অনেকখানি আকাশ আছে। অন্যান্য পাড়া থেকে এ পাড়ায় জলের অসুবিধে অনেক কম। প্রবল বর্ষাতেও বিশেষ জল জমে না। জীবনের যে কোনো দিকে যাওয়ার বাস ট্যাকসি এখানে পাওয়া যায়।

আমি একটি ফ্ল্যাট খুঁজছি। ছোটো ফ্ল্যাট। দুখানা ঘর হলে আমার চলে যাবে। আমার শুধু হাওয়া চাই, নিরিবিলি চাই, আকাশ চাই। হাতের কাছে দোকানপাট বাজার ডাক্তার ব্যাঙ্ক চাই। সকালে এ পাড়ার খবর আমি জানতাম না। দুপুরে এ পাড়ায় কাছাকাছি আমি এসেছি, তখনও আমায় কেউ বলেনি। বিকেলে আমি খবর পেয়েছি। আমাকে একজন একটি ঠিকানা দিয়েছে। ওখানে ফ্ল্যাট খালি আছে। যে খবর দিয়েছে, সে ফোন করে বলে দিয়েছে বাড়িওয়ালাকে, আমি গেলেই হয়ে যাবে। আমি যখন দেখবার জন্যে রওনা হলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সারাদিনের ছুটোছুটির শেষে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তবু যে মনের মতো জায়গায় আমি মনের মতো একটা থাকবার জায়গা পাবো যেটা আমার কাছে স্বর্গের মতো, সেই প্রত্যাশা আমাকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছে। কারণ অন্ধকার রাত্রি সেখানে শান্তিতে কাটবে।

সে অঞ্চলে পেঁছানোর আগে একটা ঘিঞ্জি অঞ্চল। পুরোনো বাড়ি, দোতলা তেতলা। নোংরা চট। ছোটো ছোটো দোকান কারখানা মোটর গ্যারাজ। নোংরা ফলপট্টি। রাস্তার উপর অনেক সবজিওলা, হকার। একধারে একটি বস্তি। ছোটো ছোটো মাটির ঘর। রাস্তার ধারে টিউব-ওয়েল। ভিড়। ঝগড়া। খালি গা, ছেঁড়া প্যান্ট, ময়লা হাত পা নিয়ে অনেক ছোটো ছোটো ছেলে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, খেলছে। চারদিকে অনেক ঠেলা, ডাস্টবিনের ধারে অনেক রিকশা। রাস্তার ধারে উনুন। চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া।

এই ধূসর অঞ্চলের ভেতর দিয়েই অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে হবে। তারপর পৌঁছাবো সেই আলোয় ঝলমল ঝকঝকে অঞ্চলে যেখানে আমি থাকবার জায়গা চাই কাজের দিনের শেষে নির্ঝঞ্ঝাট অবসরের জন্যে। সেখানে পৌঁছানোর আগে এই ধূসর অঞ্চলে পথ খুঁজে ঘোরাঘুরি করছি, কারণ এই অঞ্চল তিনটে চারটে রাস্তাকে নিয়ে আর আমি ঠিক জানি না কোন রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে আমি ওই ঝলমলে অঞ্চলে পৌঁছাবো। এদিক ওদিক

ঘুরছি, একে ওকে তাকে জিজ্ঞেস করছি। আমার প্রশ্ন শুনে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে থাকছে। কেউ কোনো উত্তর দিচ্ছে না। কেউ শুধু মাথা নাড়ছে। তাদের চোখে মোলায়েম চাউনি। চেহারা নিস্পৃহ। একজন রিকশওয়ালা শুধু বললো, ওই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, পৌঁছে যাবেন। তবে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। সে বোধ হয় চাইলো যে আমি তার রিকশায় উঠি। আমি বললাম, —না, আমি হেঁটেই যাবো। যতোটা পথ হেঁটে আমি হাঁটবো। কেউ যে আমায় বয়ে নিয়ে যাবে, আমার গন্তব্যস্থলে সেটা আমি চাই না।

আমি হাঁটছি। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। রাস্তার ধারে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে টিউবওয়েলের হাতল পাম্প করছে কলসিতে জল ভরার জন্যে, তাও তাকিয়ে দেখছি। ওধারে দোতলার বারান্দায় আধময়লা শাড়ি পরে একজন চুল আঁচড়াচ্ছে, সেদিকেও চোখ ফেরাতে ভালো লাগছে। রাস্তার ধারে একজন আলুকাবলি বেচছে। তার কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। এই বয়েসে ওসব আর খেতে পারি না, কারণ হজম হয় না। তবু খেতে ইচ্ছে হলো। কিনলাম, খেলাম, শালপাতার ঠোঙাটা রাস্তার ধারে ফেলে দিলাম। পথ চলতে এসব করতে একটু দেরি হয়ে গেল। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। বোঁয়ায় সে আলো আরো ঝাপসা লাগছে। চোখ জ্বালা করছে। ঘড়ি দেখলাম। বেশ দেরি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে। জোরে জোরে পা ফেলতে লাগলাম। বেশ হন হন করে হাঁটছি। আর কতোটা পথ রে বাবা! অনেকক্ষণ ধরেই তো হাঁটছি। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আর কদ্দুর?

সে বললো, আরো অনেক দূর। আমি বললাম, আজ রাত্তিরেই সেখানে পৌঁছাতে পারবো তো। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম ভাবলাম সে হাসবে। কিন্তু সে হাসলো না, গম্ভীর হয়ে রইলো। তারপর বললো,—নাও পৌঁছাতে পারেন এই রাত্রে, অনেকে তো পৌঁছাতেই পারে না, এ অঞ্চলেই চিরকালের জন্যে থেকে যায়।

শুনে আমি একটু ভয় পেলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি অন্ধকার কোণে-কানাচে মুখে রংচং মাখা কয়েকটি রোগা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাদের রোগা শরীরে গোলাপী কুঁচলির স্ফীত বড়ো অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমি আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। তখন একজন লোক ছুটে এলো। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হলো সে বোধ হয় ওই মেয়েদের দালাল। কিন্তু সে ওসব কিছু বললো না। সহানুভূতি দেখিয়ে বললো, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? এই সোজা পথ বড় দীর্ঘ। অনেক সময় লাগবে। এদিকে আসুন, একটা শর্টকাট দেখিয়ে দিচ্ছি। বেশ তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।

শর্টকাট একটা সরু গলি। আঁকা-বাঁকা গলি। ডাইনে দেওয়াল, বাঁয়ে দেওয়াল। খানিকটা এগিয়ে মনে হলো শর্টকাট না করলেই হতো। না হয় লাগতো সময়। সোজা রাস্তায় আছে রাস্তার আলো, এই গলিতে আলো নেই। যতো ভেতরে ঢুকছি, ততো অন্ধকার হচ্ছে। দুর্গন্ধ লাগছে নাকে।

আমি ভাবলাম, থাক শর্টকাট। আমি খোলা রাস্তায় ফিরে যাই, সেখানে ধোঁয়া আছে, কিন্তু আলোও আছে। তবু ফিরে যেতে পারলাম না। মনে হলো ওরা আমায় ফিরে আসতে দেখলে হাসবে।

তাই এগিয়ে চললাম। যতো এগোচ্ছি ততো অন্ধকার বাড়ছে। ততো দুর্গন্ধ বাড়ছে। ততো ভয় বাড়ছে। অনেক রকম ভয়। ছিনতাই রাহাজানির ভয়। বাজে মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ার ভয়। হোঁচট খেয়ে রাস্তার পাশের নোংরার মধ্যে গড়িয়ে পড়ার ভয়। তাছাড়া আরো একটা ভয়। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় ছিলো। এখন বয়েস হয়েছে, ভূতের ভয় আর নেই। কিন্তু তবু একটা গা-ছমছমানো ভয় এমন একটা কিছুর সম্বন্ধে যার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত নই, যা চোখে দেখতে পাই না, যা সত্যি সত্যি ভয়ের কোনো কারণ কিনা জানি না, তবু ভয়, অনিষ্টের ভয়, অনিশ্চয়তার ভয়। আরো বেশী করে ভয় পাই এজন্যে যে এই অজানা মিথ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো মনের জোর আমার নেই, কারণ আলোর সামনে আমার সংস্কার একরকম, অন্ধকারে আমার সংস্কার আরেক রকম। অন্ধকারে আমার ভয় বাড়ে, ক্রমশ বাড়তে থাকে।

তাই সরু নির্জন গলির জমাট অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমি ছুটতে শুরু করলাম। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পথের ধারের নোংরার মধ্যে পড়ে যাই তাও ভালো, সেখান থেকে তো আবার উঠতে পারবো। কিন্তু বদলোকের হাতে পড়লে আমার যা কিছু সম্বল

সবই যাবে। যদি অন্ধকারে কোনো গর্তের মধ্যে পা পড়ে, তাহলে পড়ে গিয়ে পা মচকে যাবে। আজ আর আমার গন্তব্য ওই ঝলমলে অঞ্চলে পৌঁছাতে পারবো না। যদি পায়ের হাড় ভেঙে যায় তাহলে সারা রাত এই অন্ধকারে এই শর্টকাটের মধ্যেই পড়ে থাকতে হবে। কেউ টের পাবে না, কারণ এ পথে বাস্তবে কেউ যাওয়া-আসা করে বলে মনে হলো না। তাই ছুটতে লাগলাম, মনে হলো চারদিকে ফিস ফিস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হলো, আমায় কেউ ডাকছে, আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি আরো ভয় পেলাম। আরো জোরে ছুটতে লাগলাম। পায়ে আবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিলাম। ঘামে সারা শরীর ভিজে উঠেছে। গলা শুকিয়ে গেছে। পা দুটো অবশ হয়ে যাচ্ছে। তবু ছুটতে লাগলাম।

এক সময় কানে অন্য একটা আওয়াজ এলো। চলতি ট্রাম বাস গাড়ির আওয়াজ। রাস্তার ভিড়ের আওয়াজ। দোকান-পাট নিয়ন আলো সিনেমা রেস্তরাঁ বাজারের আওয়াজ। তাহলে কাছেই। তাহলে প্রায় এসে গেছি। পা দুটো আর চলতে চাইছে না। এত দীর্ঘ পথ সোজা রাস্তায় হাঁটি-ছিলাম। অতো ক্লান্ত হই নি সারা দিনের কাজের শেষে এই সন্ধেবেলায়, কিন্তু এই শর্টকাট করতে গিয়েই যেন আমার সারা বয়েস ফুরিয়ে গেল।

পৌঁছে গেছি। সামনে বড় রাস্তা। বিরাট চওড়া রাস্তা, ট্রাম বাস গাড়ি ট্যাকসি স্কুটার। দোকান, নিয়ন আলো, সিনেমা, রেস্তরাঁ। দেখতে পাচ্ছি সেই পাঁচতলা কাঁড়িটি, যার একেবারে উপর তলায় আমার জন্যে একটি ফ্ল্যাট অপেক্ষা করছে। ভিড়। লোকজন। পুরুষ। মেয়ে। বলিষ্ঠ। সুন্দর। নির্ভয়। নিশ্চিন্ত।

অন্ধকার গলি থেকে আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম বড় রাস্তায়। পৌঁছে গেছি। আমার ভালো লাগছে। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তবু ভালো লাগছে। আমি এদের সবারই একজন। এ পাড়ারই একজন।

হঠাৎ সব আলো চারদিকে এক সঙ্গে নিবে গেল। চারদিকে সবাই বললো,—কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে। লোড শেডিং। মোমবাতি, টর্চ।

আর আমি হঠাৎ হোঁচট খেলাম। এবার আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ফুটপাথের ধারে, একরাশ আবর্জনার মধ্যে। উঠতে পারলাম না। বিধাতাকে ডেকে বললাম, আমাকে আমার ফেলে-আসা বিকেল ফিরিয়ে দাও।

সাতদিনের শুভাশুভ

—শুভাচার্য

গ্রহসন্নিবেশ : বাঁধ কন্যায়, শুক্র বৃশ্চিকে, বুধ তুলায়, শনি ও কেতু মিথুনে রাহু, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল যথাক্রমে ধনু, মকর ও মেষে অবস্থান করছে।

মেষ : শুভ সম্ভাবনা। সাংসারিক শুভ-অনুষ্ঠান, কাজকর্মে স্বীকৃতির সম্ভাবনাও আছে। আয়-ব্যয়ে সমতা থাকবে। শরীর ভাল। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল। শুভ তারিখ ৯, ১২, অক্টোবর।

বৃষ : নতুন বন্ধু, আত্মীয়ের দ্বারা উপকৃত হবেন। আয় ভাল। ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ আছে। কাজকর্মে মোটের উপর ভাল। শরীর মন্দ নয়। মেয়েদের পক্ষে অস্বস্তির লক্ষণ। শুভ তারিখ : ৭, ৯, ১০ অক্টোবর।

মিথুন : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক বিষয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকছে। কাজকর্ম বাধা এলেও সাফল্য অব্যাহত থাকবে। মেয়েদের শরীর সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ১০ অক্টোবর।

কর্কট : শরীর মোটের উপর চলনসই। আর্থিক উন্নতি, ব্যবসায়ে সাফল্যের লক্ষণ আছে। সাংসারিক অস্বস্তি এবং কাজকর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৭, ১১ অক্টোবর।

সিংহ : শরীর ভালই। পারিবারিক দুশ্চিন্তা থাকছে। আয় ভাল। ব্যবসায় চলনসই। কাজকর্ম আশানুরূপ। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল। শুভ তারিখ : ৯ অক্টোবর।

কন্যা : শরীর সুবিধার না। পারিবারিক ক্ষেত্র অনুকূল। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় আশানুরূপ। কাজ কর্মে অস্বস্তির লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ : ৮ অক্টোবর।

তুলা : শরীর ও মন ভাল নয়। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকছে। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কাজকর্মে শুভ সম্ভাবনা। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ ৬, ১০, ১২ অক্টোবর।

বৃশ্চিক : সমষ্টা ক্রমশ ভাল। শারীরিক ও পারিবারিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। আয় বৃদ্ধি, ব্যবসায়ে অস্বস্তির লক্ষণ আছে। কাজকর্মে শুভ ফল পাবেন। মেয়েদের মানসিক অস্বস্তি কমবে। শুভ তারিখ : ৯, ১৩ অক্টোবর।

ধনু : শরীর ও মন ভাল। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় ভাল। কাজকর্ম শুভ। বেকার কাজ পেতে পারেন। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ৯ অক্টোবর।

মকর : শরীর একপ্রকার। পারিবারিক অস্বস্তি কমবে। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় একপ্রকার। কাজকর্মে সাফল্য পাবেন। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ৭, ১০ অক্টোবর।

কুম্ভ : শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। আয় বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্মে সাফল্যের লক্ষণ আছে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১০, ১৩, অক্টোবর।

মীন : শরীর ভাল। পারিবারিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। আয় ভাল। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্মে সুখ্যাতির সম্ভাবনা। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ৫, ৮ অক্টোবর।

প্রশ্নের উত্তর

রানা হাজরা : ২৩ বছর বয়সে আপনার মতে বিবাহ সম্ভব।

রঞ্জিত গুহ : বিদেশ গমন যোগ নেই। উচ্চশিক্ষিত হতে পারবেন।

গোবিন্দ দে : আগামী কার্তিক মাসের মধ্যে হতে পারে।

চৈতালী মুখোপাধ্যায় : ১৯৭৫ সালে বিবাহ সম্ভব। দাম্পত্যজীবন সুখেরই হবে।

সোমা মুখার্জি : ৫মস্থ শনি এবং ৫মে বাহুর পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় বিদ্যায় বাধা আসবে।

এন, কে (শিলিগুড়ি) : সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে।

অনিরুদ্ধ গুপ্ত : জন্ম সন তারিখ সময় জানাবেন।

সন্দীপ সাহা : ২৮ বছর বয়সের পর বৃহস্পতির দশায় দৈহিক অসুস্থতা কমবে।

সুশীল রায় : ৪৬ বছর বয়সের পর উন্নতি হবে।

সুকল্যাণ বসু : ২৯ বছর বয়সে চাকরী পেতে পারেন।

তাপস পাল : আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করবেন।

যীশু রায় : বিদ্যাস্থান মধ্যম। বাধা-পূর্বক একটা পাশ করার যোগ।

ইন্দ্রজিৎ দত্ত : ১৯৭৪ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্ভাবনা কম।

শ্যামল সেনগুপ্ত : বিদ্যা বিষয়ে শুভ ফলও আশা করতে পারেন।

শ্রীবিশ্বজিৎ বসু (কলিকাতা) : ১৯৭৩ মার্চ থেকে জুনের মধ্যে কর্মপ্রাপ্তির যোগ প্রবল। ভবিষ্যৎ বিদ্যাবিষয়ে চিন্তা আছে।

শ্রীসীতা গুহঠাকুরতা (কলিঃ) : ১৯৭৩ সালেই বিবাহ সম্ভব। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

শ্রীমতী গীতশ্রী মোহন (জলপাইগুড়ি) : বিবাহিত জীবন সুখের হবে। স্বামী পরিবারে অশান্তি ঘটবে। পরীক্ষায় কৃত-কার্য হবার যোগ আছে।

শ্রীমতী শিখা (বাংলাদেশ) : বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা কম।

অনিতা বাষ (কলিঃ-৩) : সঠিক জন্ম সন তারিখ সময় না থাকায় সূক্ষ্ম বিচারে অসুবিধা। আগামী ১৩৮১ সালে বিবাহের সম্ভাবনা।

পার্থপ্রতিম বসু (মধ্যপ্রদেশ) : বৃশ্চিক রাশি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার যোগ আছে। ভবিষ্যৎ ভাল।

জবা বসু (মধ্যপ্রদেশ) : চাকুরী যোগ কম। ভবিষ্যৎ জীবন ভাল চলবে।

অমরনাথ দত্ত (কলিঃ-৫) : আগামী অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে চাকুরী প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

চুনীলাল পাল (জলপাইগুড়ি) : চাকুরীতে বিশেষ উন্নতি হবে না। ৪৫ বছর বয়স থেকে ব্যবসায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান বিচারে গোমেদরত্ন ধারণ ও পতাকা কোষ্ঠী বিচার্য।

পঞ্চানন ঘোষ (কলিঃ-১২) : প্রতিকূল গ্রহ থাকায় বর্তমানে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না। ডিসেম্বরের মধ্যে চাকুরী হতে পারে।

তুষারকান্তি দাশগুপ্ত—(শিলং) : ৩২ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা। ৩৫ বছর বয়স থেকে বেশ উন্নতি হবে।

কমলা রায়—(কলিঃ) : জন্ম সন তারিখ সময় না থাকায় উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

পার্থ আচার্য—(সোদপুর) : বাধাপূর্বক মধ্যম শিক্ষিত হবে।

শ্রীচন্দনেশ্বর ঘোষ—(জামসেদপুর) : সপ্তমস্থ রাহু বিবাহে বিঘ্ন এবং বিলম্ব। ১৩৮০ সালেই বিবাহ যোগ প্রবল। গোমেদ-রত্ন ধারণীয়।

দিবেন্দু চট্টোপাধ্যায়—(কলিঃ) সম্ভাবনা কম।

তপনকুমার নাহা—(নব ব্যারাকপুর) : প্রতিকূল গ্রহ থাকায় আশা কম।

অঞ্জলি ব্যানার্জি—(হাওড়া) : ১৯৭৪ জুনের মধ্যে কর্মপ্রাপ্তির প্রবল যোগ।

দীপককুমার সেনগুপ্ত—(শিলচর) : জুন ১৯৭৪ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে বদলীর সম্ভাবনা।

অনুরাধা সেনগুপ্তা—(শিলচর) : চাকুরী করবার যোগ আছে।

আশীষ মুখার্জী—(শিবপুর) : গ্র্যাজুয়েট হবার যোগ আছে। ২৩ বছর বয়সে কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বর্তমান বছরে ভ্রমণের যোগ আছে।

রূপক দাস—(সি, আই, টি রোড) : তুলা রাশি, দেবারিগণ।

বাবুলাল মতিলাল—(বেহালা) : বাধা-পূর্বক গ্র্যাজুয়েট হবার যোগ আছে। ২২ বছর বয়স থেকে কর্মজীবন আরম্ভ।

দীপঙ্করঞ্জন বসু—(যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়) ভরণী নক্ষত্র, মেষ রাশি, ক্ষত্রিয় বর্ণ নরগণ বৃষলগ্ন বিং শুক্রের দশায়।

রঘুনাথ অধিকারী—(হাওড়া) : ২৩ বছর বয়সে কর্মারম্ভ। ২৫ অথবা ২৭ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা, আশা কম।

নির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত—(১২৩) : ৪০ বছর বয়স থেকে প্রকৃত ভাগ্য অর্থ কর্মোন্নতি আরম্ভ হবে এবং ৬৫ বছর পর্যন্ত বেশ ভালই চলবে। অধ্যাপনা অথবা সাংবাদিকতা কর্মের যোগ প্রবল। উচ্চ শিক্ষার যোগ আছে।

রবীন সরেন—(চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান) : ২৮ অথবা ৩০ বছর বয়সে, একবার। কন্যা রাশি।

সুমিত্রা ব্যানার্জী—(কলিঃ) : স্বাস্থ্য বিষয়ে গোমেদরত্ন ধারণীয়। ২৪ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা।

হরিপ্রিয়া দত্ত—(কলিঃ) : ২৩ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা এবং সুখেরই হবে। প্রবালরত্ন ধারণীয়।

সুমা মুখার্জী—(ডায়মন্ডহারবার) : ১৯৭৪ সালে বিবাহের সম্ভাবনা এবং বিবাহিত জীবন মধ্যম। প্রবালরত্ন ধারণ কর্তব্য।

ছায়া ব্যানার্জি—(কলিঃ-১৪) : ১৩৮১ সালে নিজের মতেই বিবাহ যোগ প্রবল।

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

জলসা

ভালবাসার গান

রবীন্দ্রসদন মঞ্চে "উদ্গাতা" প্রতিষ্ঠান নিবেদিত "ভালবাসার গান" অনুষ্ঠানে বিভিন্ন যুগের মানুষের চিত্তে সেই চিরন্তন ভালবাসার প্রতিফলন ও কাব্যে ও সুরে সেই অনুভবের প্রতিবিম্বনের একটি চিত্র মেলে ধরার মহৎ প্রয়াস অভিনন্দনীয় নিশ্চয়ই। কিন্তু তার চেয়েও বেশী অভিনন্দনের দাবী রাখে সেদিন সন্ধ্যায় সংগৃহীত অর্থ দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হবার পরিকল্পনা।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীধর কথক, নিধুবাবু, দৌলত কাজী থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, অতুলপ্রসাদের সংগীতে ছুঁয়ে গানের ধারা এলো প্রণব রায়, অময় ভট্টাচার্য, গৌরীপ্রসন্ন তথা বর্তমান যুগের তটে।

অনুষ্ঠানে মধ্যমণির মত জ্বলজ্বল করেছিলো ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গান। ধনঞ্জয়বাবুর ভরাট গম্ভীর কণ্ঠে অনুভব নিবিড়তা চিত্তহারী রূপ পেয়েছে কখনও উচ্চগ্রামের পর্দার উচ্ছল আবেগে, কখনও বা সূক্ষ্ম মীড় গুঞ্জনের নিভৃত আলাপনে। তাঁর কণ্ঠে যৌবনলাস্য আলোড়নকারী "যদি ভুলে যাবে মোরে" ও "বলো বলো নিরুপমা" আজও ঠিক তেমনই মধুর তেমনই চিত্তহারী সৌন্দর্যে ভরপুর।

উদ্যোক্তাদের অব্যবস্থায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান অবহেলিত হলেও জনপ্রিয়তার উচ্চমানে তিনি অবহেলিত নন। অনুষ্ঠানের শেষ অবধি প্রতীক্ষিত তাঁর অজস্র ভক্তবৃন্দের আগ্রহে সময় দীর্ঘায়িত করার বাধ্যতায় ছিলো তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সকলের ব্যাকুল অনুরোধে তাঁকে গাইতেই হোলো অহির ভৈরবের মধুর বিনতিভরা "না মেয়োনা গো"। বোঝা গেলো রাগাশ্রিত গানের শিল্পীকে আজকের পপ-মিউজিকের শ্রোতারা কিভাবে খুঁজছে। এখানে বাংলাদেশের শ্রোতার উচ্চমানের নজীর রয়ে গেলো।

রামকুমারের রসসমৃদ্ধ ঠুংরি ও টপ্পা নাটকীয় মাধুর্যে সিক্ত।

রাধারাণী দেবী ও উৎপলা সেন কত-দিনের শিল্পী। কিন্তু সময়ের স্থূল হস্তক্ষেপ তাঁদের গায়নশৈলীর আকর্ষণকে এতটুকুও ম্লান করতে পারে নি।

দৌলত কাজীর গান সুন্দর গেয়েছেন দীপ্তিপ্রকাশ মজুমদার।

জ্ঞানপ্রকাশের ঘোষের গান সামগ্রিক অনুষ্ঠানের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে।

অনুষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন যেসব শিল্পী তাঁরা হলেন সর্বশ্রী চণ্ডীদাস মাল, অংশুমান বিনেন চৌধুরী, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী গুপ্ত, চন্দ্রকান্ত শীল, মৃগাল চক্রবর্তী, ললিতা ঘোষ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, চিত্রলেখা চৌধুরী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনা মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ দাসগুপ্ত। ভাস্কর বসু লিখিত ভাষ্য পাঠ করেছেন জনপ্রিয় আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষ ও তৎপত্নী গৌরী ঘোষ।

রবীন্দ্র-সদন আয়োজিত প্রাচীন বাংলা গানের আসরঃ অন্য সকল দেশের মতই এবং অন্য সকল দেশের চেয়ে আলাদা বাংলা গানেরও একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। মার্গসংগীতের সংগে সমান্তরাল ছন্দে বয়ে চলেছে এই ধারা। কখনও এতে রাগ-সংগীতের রঙীন ছায়া পড়ে রামধনুর মত বর্ণবৈভব সৃষ্টি করেছে, কখনও বা বাংলার সজল শ্যামল মৃত্তিকাজাত অনুভবে সরস। বাইরের নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বাঙালী তার এই প্রাণের সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে এইখানেই তার শিল্পী-চিত্তের জয়। আর আজকের নানা সমস্যায় বিভ্রান্ত বাঙালীর সামনে সেই উজ্জ্বল অধ্যায়টি মেলে ধরে রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করেছেন।

ডাঃ তপতী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান বাংলা সংগীতের স্বতন্ত্র রসাস্বাদনের আনন্দে মন ভরিয়েছে। মঞ্চের পটভূমিকায় সোনার কাজে নাট-মণ্ডপের ছাঁচে বাংলার অতি পরিচিত গ্রামীণ পরিবেশকে তুলে ধরার রূপকল্পনায় কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে ছিলো শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘোষ ও সম্প্রদায়ের কীর্তন। বিষয় "তিমিরাভিসার"। শ্রীরাধার শতবর্ষ-ব্যাপী বিরহ বৈষ্ণব কাব্যের প্রাণ। তারই ফাঁকে ক্ষণিক মিলনের অপরূপ রংবাহার শ্রীঘোষের আপনহারা গান ও অভিনয়ে নূতন করে স্মরণ করিয়ে দিলো বাংলারই এক কবির উচ্ছাসঃ—

"কীর্তন আর বাউলের গানে
আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে, নিভৃত ভুবনে
যার ছিলো যতগুলি।"

দ্বিতীয় সন্ধ্যায় ছিলো শ্যামাসংগীত ও টপ্পা। শ্রীমতী ইন্দুবালার গান দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু আঙ্গুরবালা দিয়ে শেষ। মাঝে ছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য থেকে ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় অবধি।

আঙ্গুরবালা ও ইন্দুবালা দেবীর উপস্থিতিটাই দর্শকদের কাছে যথেষ্ট আনন্দের কারণ হয়েছে।

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে এবং হৃদয়ের উত্তাপে সারা মিঞার টপ্পা অংগের শ্যামাসংগীত টপ্পা ঠুংরির সমন্বিত "বাঁশী আর ভালবাসিনা" কখনও লাস্যে কখনও ভক্তিভাবে কখনও বা অভিমানে জীবন্ত কিন্তু সব গানকে ছাপিয়ে জনে উঠেছিলো তাঁর কৌতুক রসের ছোঁয়া-লাগা গুঞ্জনেলী রাগাশ্রিত গানটি—

"তোমায় ভালবাসি বলে
তুমি বুঝি মনে ভাব
তোমার চন্দ্রমুখ না দেখিলে
আমি বুঝি মরে যাব।"

গানকে ভাল না বাসলে এ গান গেয়ে কৌতুকের সংগে সংগে হৃদয়ের উতলাভাবকে এমন মূর্ত করে তোলা সম্ভব নয়।

শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় উচ্চাংগসংগীতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সংগে সংগে বাংলার পুরাতনী গানের ধারা অনুশীলনে ইতি-মধ্যেই রসিকসমাজে নিজের একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন। এবারের অনুষ্ঠান সেই পরিচয়কেই দৃঢ় করেছে। প্রথমেই দরবারী কানাড়ার ডাবসাঙ্গীর্ণে 'লম্বিত গলে মুণ্ডমালা' গানটির অনুপ্রাসের জাঁকজমক তাঁর দরাজ কণ্ঠের পরিবেশনায় সেই ভয়ংকরীর ভয়ংকর সৌন্দর্যকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে।

ধ্রুপদ অংগের পরেই খাম্বাজ রাগের কাঠামোয় তাঁর টপ্‌ঠুংরি "কথা কব কিরে"র পরই পিলুর কোমল ছোঁয়া-লাগা "ভালবাসার জানি না ফল" টপ্পার সেই আনন্দমধুর যুগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

ডাঃ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় এখনকার যুগে নজরুল সংগীতে খ্যাতনামা শিল্পী-দের অন্যতমা এ খবর অনেকেই জানেন। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল গানের ভিত্তিতে কণ্ঠ-সৌকর্য সৃষ্টি করে নিয়ে অন্য গানেরও চর্চা তিনি করেছেন এবং সেখানেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয় রেখেছেন। সেদিনের গানে এই বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্না শিল্পীর কণ্ঠে শোনা গেলো "মাগো ভ্রান্ত দিয়ে কেন ভুলিয়ে রাখ", ভৈরবীতে বাঁধা টপ্‌ঠুংরি "আমি জানতাম যদি নিরবধি" "কেন কেঁদে ওঠে প্রাণ"। শুধু পরিমার্জিত কণ্ঠ নয়—ভাবগ্রাহিতার কারণেই সেদিনের গানগুলি রসোত্তীর্ণ।

চণ্ডীদাস মাল আগমনী ও শ্যামা-সংগীতের জনপ্রিয় শিল্পী। এ জনপ্রিয়তা ফাঁকি দিয়ে পাওয়া নয়, সাধনা দিয়ে অর্জন করা। এই কথাটিই অনুভব করলাম যখন তিনি গাইলেন 'তারে ভুলিব কেমনে', "বিরহে যায় যাবে প্রাণ" ও বেহাগের গভীর ব্যঞ্জনায় অনুরণিত "ভুলেছ ত শ্যামা"।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় 'কালিপদ পাঠকের ধিষা লুপ্তপ্রায় টপ্পার পুনর্জীবনদানে যাঁর অবদান অমর হয়ে আছে। তাঁর গাওয়া 'কে তোমাকে শিখায়েছে', 'কি করে কলংক' মনে করিয়ে দিয়েছে গুরুর সেই উদার, প্রাণখোলা গায়কী।

লোকসংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী ও অমর পাল। শ্রীচৌধুরীর উল্লাস ও উদ্দামতায় কিছু আমোদ হয়ত বা পাওয়া গেছে। কিন্তু মনে দাগ কেটেছে অমর পালের গান যার মধ্যে বাংলার মাটির গন্ধ হাওয়ার আদর ও উদাসী বিষণ্ণতা ছবি হয়ে উঠেছে।

—চিত্রাংগদা

প্রেক্ষাগৃহ

জীবন এ-রকম চিত্রে ওয়াহিদা রহমান।

ফটো : অমৃত

চিত্র-সমালোচনা

(১) পদাতিক (বাঙলা)

পদাতিক কথাটির একটি অর্থ হচ্ছে যে-সৈন্য পায়ে হাঁটিয়া লড়াই করে। **মৃণাল সেন প্রোডাকসন্স-এর বর্তমানে এলিট সিনেমায় ছবিটির নাম 'পদাতিক'** এই বিশেষ অর্থেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পদাতিকের যোদ্ধাটি কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে? ছবিটি এ-বিষয়ে যথেষ্ট সোচ্চার। বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না, যোদ্ধাটি তার নেতার—সৈন্যাধ্যক্ষের নির্দেশ ভারতের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত।

ছবির নায়ক সুমিত স্পষ্টই নকশাল-পন্থী। পুলিশের হাত এড়িয়ে সে প্রথমে যে-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানে সে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। অতএব দলপতি নিখিলদা ব্যবস্থা করলেন তার থাকবার জন্যে চৌরঙ্গীপাড়ার এক বহুতলবিশিষ্ট অট্টালিকার নবমতলের একটি প্রশস্ত ফ্ল্যাটে। তাঁর আজ্ঞাবহ বিমল সুমিতকে যখন সেই ফ্ল্যাটে নিয়ে এল, তখন ফ্ল্যাটকর্ত্রী মিসেস শীলা মিত্র কর্ম-ব্যপদেশে দিল্লীতে। দু দিন বাদে ফিরে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর ফ্ল্যাটে এমন একজন পুরুষ অতিথি, যাকে রাজ-নৈতিক কারণে বাধ্য হয়েই ঐ ফ্ল্যাটে চব্বিশ ঘন্টাই আত্মগোপন করে থাকতে হবে। অপর দিকে সুমিত আবিষ্কার করল, শ্রীমতী মিত্র স্বামী থেকে পৃথক হয়েই আছেন এবং তাঁর একমাত্র ছেলে দার্জিলিংয়ের কোনো মিশনারী স্কুলে পড়ে। আরও জানলে, শ্রীমতী মিত্র বাঙলাতেই কথাবার্তা বললেও আসলে পাঞ্জাবী মেয়ে এবং কোনো একটি প্রচার-প্রতিষ্ঠানের সাফল্যমণ্ডিত দক্ষ কর্মী। প্রায় সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্ম-গোপন করবার সময়ে স্বাভাবিকভাবেই সুমিত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্পর্কে চিন্তা করে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলই ভারতের আপামর জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয় নি, অথচ গণ-বিপ্লব ছাড়া ভারতের সামনে দ্বিতীয় কোনো রাস্তা খোলা নেই বর্তমানের অসহনীয় অবস্থা

থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে। অবশ্য হত্যার রাজনীতি, পুলিশের গুলীতে দলীয় কর্মী খুন, পুলিশ খুন ফরোয়ার্ড ব্লকের হেমন্ত বসু নিহত, বরানগরে সন্ত্রাস, কেরোসিন উধাও, ইউনিয়নে ইউনিয়নে সংঘর্ষ, কিছুৎ সঙ্কট প্রভৃতি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বহুর দু-একের ঘটনার কথা খবরের কাগজ আফিসের চলন্ত রোটারী মেশিনের পটভূমিকায় যেন খবরের কাগজের 'হেড লাইন' করে দেখানো হয়েছে। রাজনৈতিক চিন্তাগুলিকেও বহু স্থলেই নেপথ্য কণ্ঠ মারফত শোনানো হয়েছে। আমাদের দেশের শ্লোগান বহনকারী মিছিলের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ভিয়েতনামের নারী-পুরুষদের কর্মনিরত প্রতিরোধবাহিনীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে, আফ্রিকার জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্যে সর্বাত্মক লড়াই। ময়দানে বিরাট জনসমাবেশ ঘটাবার জন্যে শহরতলীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লরী করে লোক নিয়ে আসা হয় তাদের খেতে দেবার এবং অর্থপ্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নেতাদের শুধু মঞ্চে উঠে গলাবাজিই সার, একথাও বলতে পরিচালক ভোলেন নি। শ্রীসেন বলতে চেয়েছেন বর্তমানের মেকী রাজনীতি মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আনছে, তাকে বিপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বিপদেও ফেলছে এবং অনেক সময়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু এর থেকে ঢের খাঁটি ছিলেন তাঁরা যাঁরা একদা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ইস্পাত-কঠিন ছিল তাঁদের মন, কোনো প্রলোভনেই তা টলে নি। উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীসেন দেখিয়েছেন নায়কের বাবাকে। একদা স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক আজ সাংসারিক দায়িত্ব বহন করে চলেছেন বার্ধক্য সত্ত্বেও। কিন্তু আজ উন্নতশির। নায়ক যখন মৃত্যুশয্যাশায়ী মাকে দেখতে গিয়ে তাঁকে আর দেখতে পায় না, দেখে তাঁর মৃত দেহটি পড়ে রয়েছে, তখন ছেলেকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাবা তাকে জানান, দিন পনেরো আগে তাঁর কর্মস্থলে সদাচরণের মুচলেখা (গুডবিহেভিয়ার বণ্ড) সই করবার জন্যে সকল কর্মীকে আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তিনি তাতে সই দেন নি। এর পরে তিনি তাঁর হতবাক ছেলেকে অভয় দিয়ে বলেন, 'ঠিক আছে—বী ব্রেভ, মাই বয়' (সাহস সঞ্চয় কর, বৎস)। —নায়ক সুমিতের চোখ যেন খুলে যায়—একেই বলে নৈতিক দৃঢ়তা—এই অনমনীয় দৃঢ়তা নিয়ে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি থাকলেই না নেতৃত্ব করা সাজে! নইলে সব ঝুটে হায়, সব ঝুটে হায়।

শ্রীমতী শীলা মিত্রের ভূমিকায় সিমির সংযত, পরিচ্ছন্ন অভিনয় উচ্চ প্রশংসনীয়। অল্প কয়েক স্থান ছাড়া প্রায় সর্বত্রই তাঁর সংলাপ সাবলীল—মনে হয়, এ-সংলাপ তাঁর মুখে 'ডাব' করা। নায়ক সুমিতরূপে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়ের বাচনভঙ্গী সুন্দর, কিন্তু তাঁর মুখাবয়ব যথেষ্ট ভাবপ্রকাশক-ময় যার প্রয়োজন ছিল এই ভূমিকায় যথেষ্ট। নায়কের পিতার চরিত্রটি অপরূপ-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের দ্বারা। অপরাপর চরিত্রে জোছন দস্তিদার (নিখিল), প্রভাস সরকার (বিমান), অসীমা সিংহ প্রমুখ উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন। আধুনিক সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান সম্পর্কিত আলোচনাচক্রের ন্যায় স্থান এই ছবিতে কতখানি, তা বিচার্য হলেও যাঁরা এতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাজ প্রশংসনীয়।

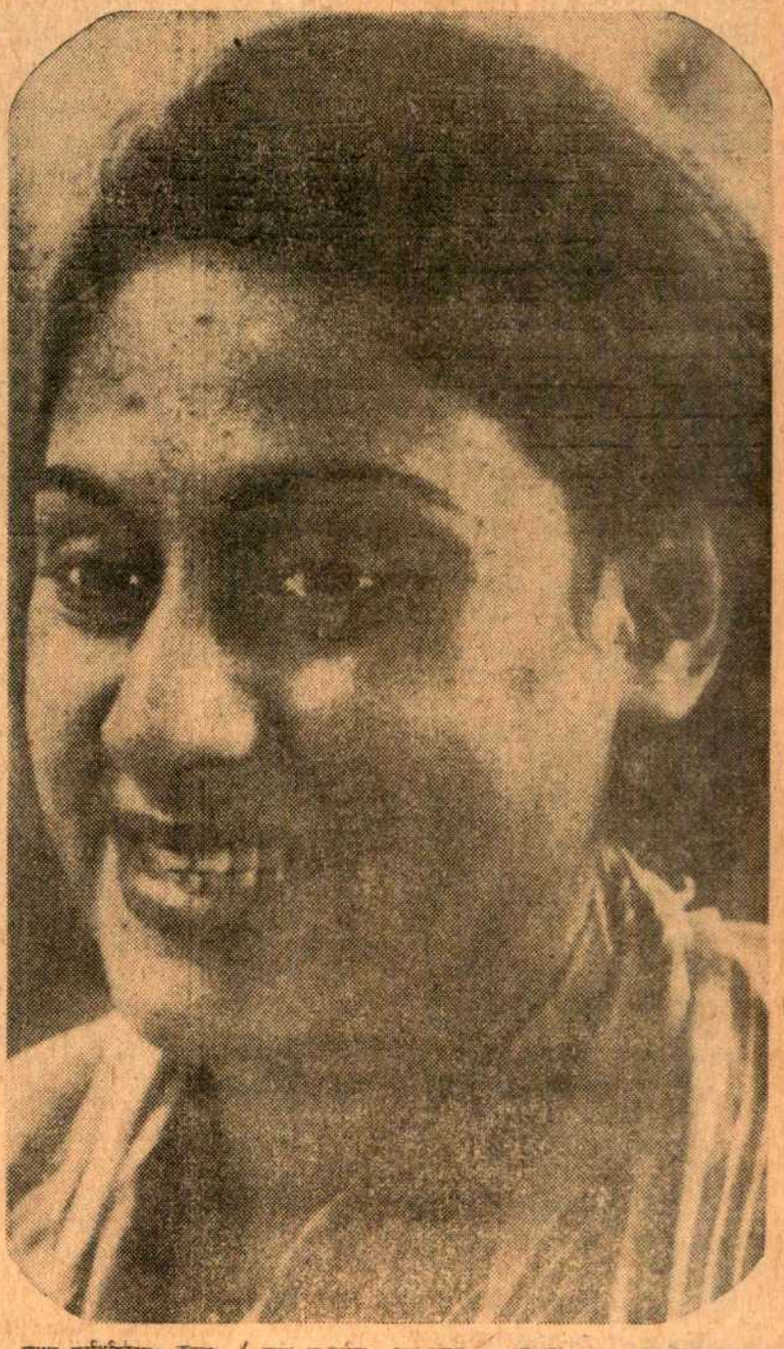

সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা / জয়া ভাদুড়ি। পরিচালনা ঃ একলব্য। ফটো ঃ অমৃত

ছবির কলাকৌশলের কাজে উচ্চাঙ্গের। দাহ্যমান সংবাদপত্রের মাঝ দিয়ে ছবির পরিচয়লিপির প্রকাশটি লক্ষ্যণীয়ভাবে অভিনব। সম্পাদনা যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ। আবহসঙ্গীতের রচনা ও প্রয়োগে আনন্দ-শঙ্কর তর্কাতীতভাবে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

(২) রিকশাওয়ালা (হিন্দী)

সত্য মুভীজ (মাদ্রাজ) নিবেদিত, আর-এম-ডি লিখিত ও প্রযোজিত এবং কে, শঙ্কর দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত 'রিকশাওয়ালা' ছবির রিকশাওয়ালা হচ্ছে সমাজশিক্ষক; সে বি-এস-সি ডিগ্রীধারী সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক হয়েও রিকশাওয়ালার বৃত্তি গ্রহণ করেছে যেমন একদিকে 'পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়', এই উক্তির যথার্থ প্রমাণ করতে, অন্যদিকে তেমনই 'শিক্ষা ও শ্রম যদি একত্র হয়, তাহলে উভয়েরই মর্যাদা বর্ধিত হবে', এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে। কিন্তু শ্রীমান গোপীর এই সৎ চেষ্টাকে চিরায়ত করবার জন্যে এমন এক দুর্বৃত্তের সৃষ্টি করতে হয়েছে, যে নারীর রূপ-যৌবনের মূল্য নিরূপণ করে অর্থের অঙ্কে, সুরা ও নারীর অঙ্কে ভাসমান থেকেও যে কলেজ কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করে, যে তারই কোনো কর্মীর সাধ্বী স্ত্রীকে হরণ করিয়ে এনে পাপ ব্যবসায় লিপ্ত করাতে সচেষ্ট হয় এবং সেই কর্মীর তীব্র প্রতিবাদকে বরদাস্ত করতে না পেরে তাকে তারই শিশু কন্যার সামনে হত্যা করে তার দেহটাকে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে দেয়, যে তার এক আইনজীবী বন্ধুর স্ত্রীকে হত্যা করায় নিজের ভগ্নীর সঙ্গে তার বিবাহ দেবার অভিপ্রায়ে এবং যে আরও অগণিত সম্ভাব্য এবং অসম্ভাব্য কাজ করে। একদিন এক কলেজে-পড়া মেয়ে—যার নাম কিরণ, সে—ঐ খাবার-ওয়ালীর সঙ্গে দেখা করে ফিরবার মুখে ঐ সাইকেল-রিকশাতে আরোহী থাকা অবস্থায় এক দুর্বৃত্ত দল দ্বারা আক্রান্ত হয়। গোপী প্রাণপণ লড়াই করে আরোহিনীকে রক্ষা করে। দেখা যায়, ঐ দুর্বৃত্তেরা ঐ বৃহৎ দুর্বৃত্তের চেলাচামুণ্ডা। তখন গোপীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধে ঐ বৃহৎ দুর্বৃত্তের। ক্রমে প্রকাশিত হয়, কিরণ হচ্ছে সেই আইনজীবীর কন্যা, যার স্ত্রীকে দুর্বৃত্ত হত্যা করায় এবং খাবারওয়ালী পার্বতী হচ্ছে ঐ আইনজীবীর শ্যালক-পত্নী এবং কিরণের মাসীমা। নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে সকলকেই দুর্বৃত্তের গোপন অড্ডায় গিয়ে মরণ-যন্ত্রণা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে সকল বিবাদের সমাপ্তি টানে।

—দেখা যাচ্ছে, হিন্দী ছবির সাধারণ কাহিনীকারেরা নূতন চিন্তাভাবনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও কাহিনী বিস্তারে প্রায়ই গতানুগতিকতাকে পরিহার করতে পারেন না, যেমন পারেন নি বর্তমান ছবির ক্ষেত্রে কাহিনী-রচয়িতা আর এম ডি এবং চিত্র-

অপবাদ / পরিচালনা : বাবুল চৌধুরী।
উজ্জ্বল ও ফতেহ লোহানী

নাট্যকার কে এ নারায়ণ। ফলে, নায়ক গোপীর ভূমিকাটি কিছু আকর্ষণীয় হলেও সম্পূর্ণ ছবিটি হয়েছে চিরচরিত প্রথামত মামুলী এবং তার ওপরে নয়।

ছবিটিতে সবচেয়ে ভালো অভিনয় করেছেন আইনজীবী কৈলাশের ভূমিকায় প্রাণ, সুন্দর তাঁর ভাবাভিব্যক্তি, সুন্দর তাঁর বাচনভঙ্গী, সুন্দর তাঁর গতিবিধি। নায়ক গোপীর ভূমিকায় রণধীর কাপুর তাঁর অভ্যাসমত কিছুটা তড়বড়ে ভাব প্রকাশ করেছেন, তাড়া মেরে তাড়াতাড়ি কথা বলা তাঁর আর একটি অভ্যাস। পার্বতীর ভূমিকায় মালা সিংহ আন্তরিকভাবে চরিত্র-চিত্রণ করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। নায়িকা কিরণরূপী নীতু সিংয়ের অভিনয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। নৃত্যেও তিনি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। জনৈক রিকশাওয়ালা-বেশে মোহন চটি কিছুটা লঘু হাস্যরস বিতরণের চেষ্টা করেছেন। অপরাপর ভূমিকার অভিনয় হয়েছে যথাযথ।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে চোখে পড়ল দৃশ্য রচনায় চিত্রপরিচালক এস কৃষ্ণরাওয়ের অসামান্য দক্ষতা। রাহুল দেববর্মনের সুরে গীত গানগুলি অভিনব ও চিত্তগ্রাহী।

সত্য মুভিজ-এর 'রিকশাওয়ালা' সাধারণ হিন্দী ছবির দর্শকদের খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

স্টুডিও থেকে

সলিল দত্তের 'অসতী'র চিত্রগ্রহণ শুরু! শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের অসতী ছবির চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন পরিচালক সলিল দত্ত স্বয়ং। ছবিটির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও অপর্ণা সেন। পূজোর পর ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছবিটির পরিচালক সলিল দত্ত সদলবলে কালিম্পং যাবেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে—বিজয় ঘোষ, অমিয় মুখার্জি ও সন্তোষ রায়চৌধুরী—নবগঠিত পরিবেশক সংস্থা সংহিতা চিত্রম ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

অঙ্গীকার ছবির শুভমহরৎ : ২৬ সেপ্টেম্বর (মহালয়ার পুণ্য দিনে) নারিকেল-ডাঙ্গা নর্থ রোডস্থ অরোরা স্টুডিওতে কথাচিত্রম-এর প্রথম ছবি 'অঙ্গীকার'-এর শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়।

ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন প্রবীণ কথাশিল্পী প্রবোধ সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে সুধীর বেরা,

(বিধানসভার সদস্য) এবং শৈলেন্দ্রকুমার মহান্তি।

ছবিটিতে সুরারোপ করছেন—অধীর বাগচী। পরিচালনা করছেন এক দল অভিজ্ঞ কলাকুশলী। চরিত্রচিত্রণে থাকবেন—নবাগতা শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জি ও নবাগত শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে চিত্র, মঞ্চ, সঙ্গীত ও যাত্রা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চাভিনয়

মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের 'বিজয়িনী' : কলকাতার যে সব মঞ্চে নিয়মিত নাটকের অভিনয় হয়, তার মধ্যে বোধ হয় এখন মিনার্ভা থিয়েটারেরই প্রাণচাঞ্চল্য কমে গিয়েছে। নানারকম প্রতিবন্ধকতা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার প্রায় গ্রাস করতে বসেছিল দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যসমন্বিত এই নাট্যমঞ্চকে। কেন জানি না বেশ কিছুদিন নাট্যানুরাগীদের অকৃত্রিম ও আন্তরিক সহযোগিতা থেকে মর্মান্তিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে এই থিয়েটার।

এবার বিজয়ী হবার অন্তরতম কামনা নিয়ে 'বিজয়িনী' নাটক এলো। মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদ এই নাটক দিয়ে হয়তো অবহেলিত এই থিয়েটারকে প্রাণচঞ্চল করে তুলতে পারবে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, এ নাটকের প্রযোজনা কিন্তু সম্প্রতিকালে মিনার্ভায় প্রযোজিত নাটকের ব্যতিক্রম। নাটক দেখতে দেখতে একটু দুঃখ যে লাগেনি তা নয়, যখন ভেবেছি 'অংগার' ঐতিহাসিক একটি নদীর নাম', 'কল্লোল' যে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে সেই মঞ্চে এ নাটক কেন? মনে প্রশ্নও করেছে কেন এই প্রযোজনা দর্শকদের চলতি রুচির কাছে আত্মসমর্পণ করলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলবো, না করে কি-ই বা হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কতদিন আর্থিক সংকটের বোঝাকে বইতে হবে!

'বিজয়িনী' নাটকটি লিখেছেন দুলাল মিত্র। কর্মী সংসদেরই তিনি একজন সদস্য। নাটকটির মধ্যে শ্রীমিত্রের সুগে জীবনবোধের পরিচয় মেলে। তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে দেখাতে পেরেছেন সৎ ভাবে যারা জীবন চালাতে চায়, তারা প্রতিষ্ঠা পায় না সমাজে। আর যারা অসৎ, অসাধু উপায়ে জীবন চালায় তারাই পায় প্রতিষ্ঠা, সম্মান স্বীকৃতি, অর্থ সব। সুস্থ জীবনবোধদীপ্ত সৎ সাহিত্য রচনা করতে চায় অজয়, এবং এ কাজে তাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করে তাঁর স্ত্রী অলকা। অলককে এমন অনেক কাজ করতে হয় যা সামাজিক দৃষ্টিতে খুব ভালো দেখায় না। চাকরী সে করতো, কিন্তু তা চলে গেছে। অজয় কোন কাজ করে না, অলকার স্বপ্ন অজয় একদিন বড়ো সাহিত্যিক হবে, এই স্বপ্নকে সফল করে তুলতেই তার যে কোন কাজকে সে গ্রহণ করে নিতে পারে। ও দিকে প্রকাশকের বুদ্ধিতে অশ্লীল সাহিত্য লিখে অজয়ের কিছু বিত্ত প্রচুর অর্থ, সম্মান কুড়িয়েছে। প্রকাশকের বুদ্ধিতে কিন্তু অজয় কিছুতেই সায় দিতে চাইছে না, সাহিত্যকে সে কিছুতেই সঁপে দেবে না অর্থের কাছে। এই মানসিক আবর্তের মাঝখানে এলো আন্ট্রা মর্ডান মেয়ে চীনা, অজয়ের সে সহপাঠিনী ছিল। রচনা তার উচ্ছলতা দিয়ে অনেককেই বশ করিয়ে অজয়ের পথ সুগম করে দেয়, সৎ সাহিত্যের ভিত্তিতে অজয় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের সম্মান নিতে চলে। হয়তো অজয়ের জীবনে বিজয়িনী দুজনই—অলকা ও রচনা।

নাটকটির গল্পের মধ্যে খুব একটা চমক না থাকলেও মোটামুটিভাবে জীবন বিশ্লেষণের ছবিটি ধরা পড়েছে ভালোভাবেই। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই মোটামুটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে নাটকটির মধ্যে, তবে বিপ্লবী, ঠাকুরপোর অবতারণা বড়ো বেশী হয়ে গেছে এবং অনেক সিরিয়াস মুহূর্তে এই চরিত্রের সংলাপ শ্রুতিকটু লেগেছে। দর্শক হেসেছে ঠিকই কিন্তু নাটকের সেই মুহূর্তের প্রত্যাশিত গভীরতা যথেষ্ট ব্যাহতই হয়েছে বলতে হবে। অজয়ের মুখে সংলাপ মাঝে মাঝে মর্মগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীকান্ত মুখার্জি। বলতে হবে তিনি তাঁর গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পেরেছেন। তবে 'রচনা'র নাচের দৃশ্যটার উপযোগিতা সম্পর্কে, তাকে একবার নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, অপ্রয়োজনে কিছু চাপালে নাটকের

উকুনের জন্য আপনার মনের শান্তি নষ্ট করবেন না!

ছোট ছেলেমেয়েদের এবং মেয়েদের কাছে উকুন একটি সমস্যা। উকুন হওয়া খারাপ কিন্তু বিষাক্ত পাউডার ব্যবহার আরও খারাপ।

শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থেকেই আপনি উকুন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন না। আপনার ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে এদের বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। মেয়েদের মধ্যেই সাধারণতঃ এরা সংক্রামিত ছড়ায়। ভুলে যাবেন না বিষাক্ত পাউডার আপনার চুল, মাথার তালু ও চামড়ার সমূহ ক্ষতি করে। নব আবিষ্কৃত এই আধুনিকতম উকুন-নাশক সুবাসিত তেল মাসে মাত্র একবার ব্যবহার করে আপনি উকুন ও নিকি থেকে নিশ্চিন্ত থাকুন। এ খুসকীও হতে দেয় না।

লাইসিল®

সুবাসিত উকুন-নাশক

EXPRESSO/70

সুজানিল কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ, পুনা-১৯

পরিবেশক : দেশাই এজেন্সিজ

বি-৩৮ বঙ্গবাসী মার্কেট, কলিকাতা।

ফোন : ৩৩-৭৫৬১

পক্ষ সেটা বোঝাই হয়, প্রাণময়তার ইঙ্গিত তা বহন করে না।

অভিনয়ের ব্যাপারে যিনি আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি হোলেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। শান্ত, সংযত ভংগিমায় অসাধারণ নৈপুণ্যের সংগে 'অজয়' চরিত্রের মানসিক যন্ত্রণাকে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। তাঁর উচ্চারণের স্পষ্টতা ও অভিব্যক্তি সত্যিই বারবার প্রশংসা করার মতো। মঞ্চে তাঁর খ্যাতি আগে থেকে ছিল, এই চরিত্র-চিত্রণ তাঁকে আরো প্রোজ্জ্বল করে তুললো। শ্রীমুখোপধ্যায়ের কাছে, তুলনায় শ্রীঅলোকরা ভূমিকায় শেলী পানকে ভীষণ নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। রচনার চটুল ভংগিমা রীনা ঘোষের অভিনয়ে সুনাম পেয়েছে। পকাশকের ভূমিকাভিনেতা একটি আশ্চর্যজনক চরিত্র উপহার দিয়েছেন। রুমেলা সরকারের 'পলা' একটি বিশেষ স্টাইল তুলে ধরেছে। অসহ্য লাগলো 'বিভাস' চরিত্রের রূপকারকে। শিল্পী হয়তে ভুলে গিয়েছিলেন তিনি কোন্ চরিত্র রূপ দিতে চলেছেন।

অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ দে, অরবিন্দ চক্রবর্তী, বিভু দত্ত, সুধাংশু কাবাসী, সুকু ঘোষ নীলরতন ঘোষ, তপন মুখার্জি নীলাঞ্জন বসু, দেবীতোষ চট্টোপাধ্যায়, অচ্যুতানন্দ পাল, কমল দাস, অশ্বিনী প্রামাণিক, কালাচাঁদ সোম, কমল মুখার্জি শীতল চক্রবর্তী। আলোক-সম্পাতে শ্রীতাপস সেন তাঁর পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

সব শেষে একটি কথা। নানারকম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার কর্মী সংসদের 'বিজয়িনী' নাটকের প্রযোজনা শুরু করেছেন, এর জন্য নাট্যানুরাগীদের কাছ থেকে সর্বতোভাবে ধন্যবাদ পাবেন তাঁরা। কিন্তু সংগে সংগে তাঁদের কাছে প্রস্তাব রইলো, তাঁরা যেন আরো বলিষ্ঠতর কোন নাটক, (যে সাধারণতঃ পেশাদারী মঞ্চে হয় না) নিয়ে চিন্তা করেন।

দুটি কিশোর নাট্য

(১) লক্ষ্মণের শক্তিশেল

সাধারণ রংগমঞ্চে ছোটদের নাটক মঞ্চস্থ করবার প্রচেষ্টা আগেও দুবার হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম রাজ চৌধুরী মশাই তাঁর থিয়েটারে অভিনয় করিয়েছিলেন অখিল নিয়োগী রচিত 'বিষ্ণুশর্মা'। এর পরে বিশ্বরূপা রংগমঞ্চে অভিনীত হয় মৌমাছি বিরচিত একখানি কিশোরনাট্য।

কিন্তু গেল রবিবার, ২৩ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টায় স্টার থিয়েটারের ৯০ বৎসরের ইতিহাসে প্রথম দেখা গেল ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্যে একটি সার্থক নাট্য-প্রচেষ্টা, অবিস্মরণীয় শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের অমরকীর্তি 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-কে মঞ্চস্থ করবার মাধ্যমে। এর জন্যে আমরা স্টার্সের নৈশমশীল কর্মকর্তা মঞ্জিতমল সাংকারিয়াকে অজস্র সাধুবাদ দিচ্ছি।

জনপ্রিয়া শিল্পী অপর্ণা সেন

সাঙ্গনী
পরিচালনা : দীনেন গুপ্ত
অনুপকুমার ও চিন্ময় রায়

সুপরিকল্পিত দৃশ্য সজ্জা এবং রূপ-সজ্জায় মণ্ডিত করে, সুন্দর আবহ-সঙ্গীত-সহযোগে যেভাবে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' মঞ্চস্থ হয়েছে, তা বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীদের প্রচুর আনন্দদান করবে। সকল চরিত্রের অভিনয়ই প্রীতিপদ হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রাবণ, সুগ্রীব, হনুমান ও যমের অভিনয়। এঁদের পরে উল্লেখ করা যেতে পারে জাম্বুমান, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, রাম ও যমদূতদ্বয়ের। সাধারণভাবে বানরকুলের অভিনয়ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল।

আমরা এই কিশোর নাট্যাভিনয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

(২) আবোল-তাবোল

গেল ২৫ সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদনে মল্লার সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু-শিল্পীরা মঞ্চস্থ করলেন সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'। চমৎকার মঞ্চপরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, সুরসৃষ্টি ও নৃত্যছন্দের মাধ্যমে অর্ধশতাধিক শিশুশিল্পী যে উল্লাসিত ভঙ্গীতে 'আবোল তাবোল'-এর বিভিন্ন ভূমিকায় ও সমবেত নৃত্যগীতে প্রেক্ষাগৃহকে মুখরিত করে তোলে, তা বহুকাল স্মরণ থাকবে। পেঁচা-পেঁচনীকে কোন দিনই ভুলতে পারব না। জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত সুর রত্না বিশ্বাস ও নিভা ঘোষালের তত্ত্বাবধানে গীত হয়ে অপূর্ব ছন্দ সুষমার সৃষ্টি করেছিল।

বিবিধ সংবাদ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে 'অশনি সংকেত' :

বার্লিনে অনুষ্ঠিত ২৩তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে স্বর্ণ ভল্লুক পুরস্কারপ্রাপ্ত সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' পৃথিবীর নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে প্রদর্শিত হবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছে :

১। ১৯৭৩-এর ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অকটোবর পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী নিউ ইয়ক চলচ্চিত্রোৎসব।

২। ১৯৭৩-এর ১৬ অকটোবর থেকে অনুষ্ঠিতব্য কানাডা ফিল্ম ইনস্টিটিউট দ্বারা আয়োজিত ফিল্ম একসপো।

৩। ১৯৭৩-এর ১৭ অকটোবর থেকে ২৮ অকটোবর পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী সানফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্রোৎসব।

৪। '৭৩-এর ২০ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৬ দিনব্যাপী লণ্ডন চলচ্চিত্রোৎসব। এবং ৫। '৭৩-এর নভেম্বর মাঝে অনুষ্ঠিতব্য চিকাগো ফেস্টিভাল।

'অশনি সংকেত'-এর প্রযোজক সর্বানী ভট্টাচার্য ছবিটির উপযুক্ত সাব- টাইটেলিং করবার এবং এই সব উৎসবে বিশেষ প্রচার-মূলক পত্রাদি যথাসময়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর পূজো ডিস্কের বিশেষ উপহার 'আলিবাবা' : এবার পূজোয় এল, পি ডিস্কে গ্রামোফোন কোম্পানীর একটি বিশেষ উপহার হোলো 'আলিবাবা'। যে 'আলিবাবার নৃত্যাভিনয় বাংলা মঞ্চে ও পর্দায় কোনো এক যুগে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবার তারই নতুন রূপ নতুন

জয়শ্রী

রাজশ্রী

যুগল

শিল্পীদের গানে ও অভিনয়ে। অধুনা-কালের সকল জনপ্রিয় শিল্পীই এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। আর এক বিশেষ আকর্ষণ ছোলো প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ভূমিকা (কণ্ঠস্বরে) লিখেছেন শ্রীমতী কানন দেবী ও সুবিখ্যাত সমালোচক এন, কে, জি। ২২শে সেপ্টেম্বর সাড়ে ৯টায় রেডিওতে প্রচারিত হবে।

পলিডোরের পূজা-উপচার : পলিডোরের যে ১২খানি পূজা ডিস্ক আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জহর রায়ের কৌতুক নক্সা বটুক নন্দীর বেহালা ও কার্তিক কুমারের সেতার।

কৌতুকরাজ জহর রায় "নাই নাই নাই" রেকর্ডে বর্তমান যুগের প্রতিদিনের সমস্যাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে নিছক আমোদ সৃষ্টির কৌতুকই নেই, সংঘাতাক্রান্ত জীবনের অসহায় কারুণ্যে যে কৌতুক সিক্ত। হাসতে গিয়েও চোখে জল এসে পড়ে বলেই এর মধ্যে শিল্পীর সংবেদনশীল অন্তরটি অনুভব করি।

বটুক নন্দীর সুরভরা গীটারে শচীন দেববর্মণ, রাহুল দেববর্মণ ও লক্ষ্মীকান্ত পিয়ারীলালের হিন্দী গানের সুরা ("ছুপা রুস্তম," "দাগ" "জোসিলা" ও "বাবি") পরিবেশনার মাধুর্যে উপভোগ্য।

ই পি ডিস্কে রবিশঙ্করের শিষ্য কার্তিককুমারের সেতারে পরিবেশিত মিশ্র পিলু ও বাংলা কীর্তন রবিশঙ্করের বাদন-শৈলীকে মনে করিয়ে দেয়।

অন্যান্য কোম্পানীর মত চিত্রতারকার কণ্ঠে গান পরিবেশনের প্রচলনে এঁরাও বিশ্বাসী। শিল্পী মালা সিংহ। গলাটি এঁর সত্যিই ভালো। গায়কীর আন্তরিকতাও লক্ষ্যণীয়। কুমকুম চট্টোপাধ্যায় এর আগেও সুন্দর কণ্ঠ ও অনুশীলনে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবারের দুটি গানে সুরপ্রয়োগ আরো পরিমার্জিত।

এইচ. এম. ভি.

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুবন্দোবস্ত আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৩১, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪১৭৩

সুরকার ও গীতিকাররূপে প্রশান্ত ভট্টাচার্যের নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচয় ছিলো। এবারের ডিস্ক গায়করূপেও তিনি সমাদর পাবেন। কাজি নজরুল ইসলামের দুটি গান সুকুমার মিত্র ভারী মিষ্টি করে গেয়েছেন।

সনৎ সিংহ বহুদিনের শিল্পী এবং তাঁর জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত এবারের গান দুটিতে সেই পরিনতমনেরই সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

বাপী লাহিড়ীর স্ব-রচিত সুর ও কথায় প্রতিশ্রুতির আভাস আনন্দদায়ক।

শ্যামলী বসুর রবীন্দ্র জৈন সুরায়িত ও ভবেশ গুপ্ত রচিত গান দুটি সু-গীত।

জপমালা ঘোষের ছড়া গানে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে। রচয়িতা ও সুরকার যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মৃণাল বন্দোপাধ্যায়।

একধারে সুরকার, গীতিকার ও শিল্পীর সমন্বয় ঘটেছে মানস মুখার্জি পরিবেশিত গান দুটিতে।

বাঙলাদেশের ছবি

অন্তরালে কবরী নেই

সাইফুল আজম পরিচালিত 'অন্তরালে' কবরী অভিনয় করবেন না বলে জানা গেছে। এ ছবিতে সুচন্দা একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদান করছেন।

কবরীর বক্তব্য, সুচন্দার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোনও আলাপ নেই। তার কানে নাকি এসেছে যে, কবরী এ ছবিতে অভিনয় করলে সুচন্দা অভিনয় করবেন না। কাজেই এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ ছবিতে অভিনয় করতে কবরীর মন টানছে না।

খুন খুন

অশোক ঘোষ তার নতুন ছবির নাম রাখলেন 'খুন খুন'। যুব মানসের মানসিক দ্বন্দ্বের অবক্ষয়ের চিত্র পরিচালক তুলে ধরবেন প্রধান ভূমিকায় রজাক। অন্যান্য চরিত্রে কবরী ও মিনু রহমন প্রমুখ থাকবেন। সুরকার আজাদ রহমান কাহিনীকার আহমদ জামান চৌধুরী।

গুণ্ডা

কবরী চৌধুরী 'গুণ্ডা' ছবিটি প্রযোজনা করবেন। নায়ক নায়িকা রাজ্জাক ও কবরী। কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন জহিরুল হক। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে এ ছবির সুটিং শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে।

তিতাস পুনর্বার সম্পাদিত হবে

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন ছবিঘরে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু ছবিটির মুক্তি পাবার পরও এ ছবির প্রযোজক এফ-ডি-সি-র সম্পাদনা কক্ষটি ছেড়ে দেননি। শোনা যাচ্ছে ছবিটি আবার সম্পাদিত হবে।

আমার তোরা মানুষ হ

খান আতা তাঁর এ ছবির মাধ্যমে ছয়টি নতুন ছেলে উপহার দেবেন বলে জানা গেছে। সাতজন যুবককে কেন্দ্র করে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে। এই সাতজনের মধ্যে একজন পুরনো। ছবির সুটিং চলছে।

মুস্তাফিজ সমাচার

চিত্রনায়িকা সুজাতা তার সুজাতা প্রোডাকসনের আগামী ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন মুস্তফিজকে। মুস্তাফিজ স্বাধীনতার পর এই প্রথম ছবি পরিচালনা করছেন। সুজাতা আজিমের সঙ্গে মুস্তাফিজের একটা মধুর সম্পর্কও রয়েছে। ওদের বিয়েব ঘটক ছিলেন তিনি। সুজাতা মুস্তাফিজকে মামা এবং আজিম ওস্তাদ বলে ডাকেন।

বেঈমান

রাজলক্ষ্মী প্রোডাকশন নিবেদিত গল্প-চিত্রের দ্বিতীয় ছবি 'বেঈমানের' নায়ক-নায়িকা রাজ্জাক-কবরী। অন্যান্য শিল্পীরা-হলেন সুজাতা, খলিল, রাজু, মেহফুজ, মায়া হাজারিকা, আলতাফ প্রমুখ। সুর দিয়েছেন আনোয়ার পারভেজ। পরিচালনায় রুহুল আমিন। কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন জহিরুল হক। ছবিটি আগামী কোরবানি ইদে মুক্তি পাবে বলে প্রযোজক মজনু জানিয়েছেন।

অঙ্গীকার

আবদুল্লাহ তল্লা মামুন পরিচালিত ছবিটির নাম 'অঙ্গীকার'। নায়ক-নায়িকা কবরী ও বুলবুল ইসলাম। অপরাপর ভূমিকায় রয়েছেন খান জয়নুল, বেবী জামান ও হাসমত প্রমুখ। ছবিটি পরিবেশনায় রয়েছেন আলোছায়া। ছবিটির সুটিং দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

পিঞ্জর

শাহজাহান চৌধুরী পরিচালিত ও এ, টি, এম, ইসহাক কর্তৃক চিত্রায়িত 'পিঞ্জর' ছবিটির পঞ্চাশ ভাগ কাজ শেষ হয়ে গেছে। নায়ক-নায়িকা উজ্জ্বল-কবিতা সহ এতে আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন, মুস্তাফা, রানী সরকার, শওকত আকবর, আনোয়ারা নার্গিস, খান জয়নুল হাশমত, টেলী সামাদ, বেবী ঝর্ণা ও ফতেহ লোহানী।

খন্দকার নুরুল আলম সুরারোপিত এ ছবির সংলাপ রচয়িতা মাহফুজ সিদ্দীকি। সম্পাদক দেবব্রত সেনগুপ্ত।

দুঃস্বপন

নীলম মুভীজ ছায়াপথের ব্যানারে অয়েশা বেগম ও আলতাফ আলী জানীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'দুঃস্বপন' ছবিটি তৈরী হচ্ছে। কাহিনীকার ভারতের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। ভারত-বাংলাদেশের তারকারা এ ছবিতে অভিনয় করছেন।

আনোয়ার আহমদ

১৯৭৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল : খেলার আগে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়াং সিটি ক্লাবের খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছবির বাঁদিকে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ।

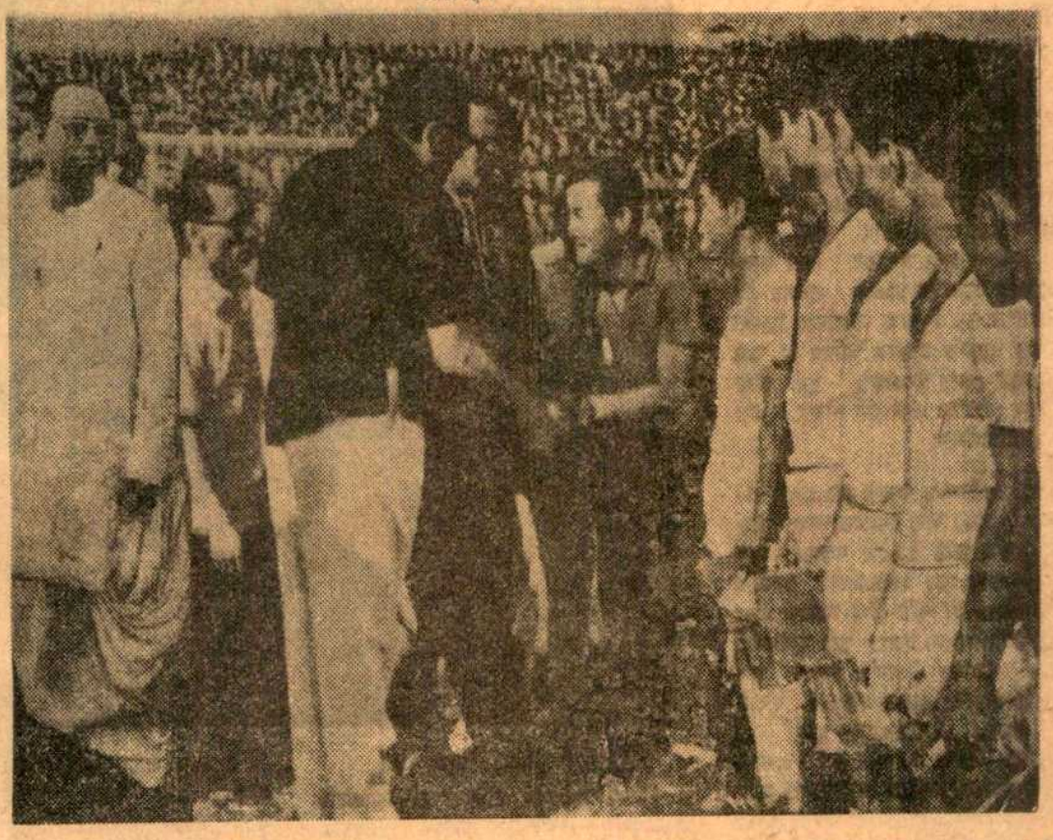

খেলাধুলা

দর্শক

আই এফ এ শীল্ড

১৯৭৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ৩—১ গোলে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়াং সিটি ক্লাবকে শোচনীয়ভাবে হারিয়ে মোট ১২ বার আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য ইস্টবেঙ্গল ১৯৭০ সালে আই এফ এ শীল্ড জয়ের সূত্রে সর্বাধিকবার আই এফ এ শীল্ড জয়ের যে রেকর্ড (১০ বার) করেছিল তা আজ বেড়ে দাঁড়াল ১২ বার। তাদের পরই মোহনবাগানের ৯ বার এবং কালীঘাটা ফুটবল ক্লাবের ৮ বার আই এফ এ শীল্ড জয় উল্লেখযোগ্য।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল বিপক্ষের থেকে ভাল খেলে যোগ্য দল হিসাবেই যে শীল্ড জয়ী হয়েছে তা পিয়ং ইয়াং সিটি দলের কর্মকর্তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। পিয়ং ইয়াং দলের খেলায় কোরিয়ার নিজস্ব ঘরওয়ানার ছাপ সুস্পষ্ট। তাদের খেলায় যথেষ্ট মনোহারিত্ব আছে, কিন্তু গোল করার যথেষ্ট দক্ষতা নেই। আই এফ এ শীল্ডের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগ খেলায় তারা পোর্ট কমিশনার্সকে ৬—০ গোলে হারালেও মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগানের সঙ্গে গোলশূন্যভাবে খেলা ড্র করেছিল। সেমিফাইনালে তারা ইস্টার্ন রেল দলের বিপক্ষে দুটো গোল দিয়েছিল এবং ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে একটা গোল। তারা যেখানে আই এফ এ শীল্ডের ৫টি খেলায় ৯টা গোল দিয়ে ৩টে গোল খেয়েছে। সেখানে ইস্টবেঙ্গল ৪টি খেলায় ১২টা গোল দিয়ে মাত্র একটি গোল খায়—প্রত্যেকটি দলকেই তারা ৩টে করে গোল দেয়।

ফাইনাল খেলায় প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল দুটো গোল দেয়—৫ম মিনিটের মাথায় আকবর এবং ১০ম মিনিটের মাথায় সুভাষ ভৌমিক। বিরতির সময় ইস্টবেঙ্গল ২—০ গোলে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ২৭ মিনিটের মাথায় পিয়ং ইয়াং দলের ওয়ান চ্যাং গ্যাপ ১টা গোল শোধ করেন। এর কয়েক মিনিট পর আকবর নিজের দ্বিতীয় তথা দলের তৃতীয় গোলটি করেন।

ইস্টবেঙ্গল এই নিয়ে ২০ বার আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠে শীল্ড পেল মোট ১২ বার। ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করেছে তারা ৫ বার এবং ফাইনাল খেলা পরিত্যক্ত হয়েছে ৩ বার (সবই মোহনবাগানের বিপক্ষে)। ১৯৫৯ সালে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলাই হয়নি। মোহনবাগানের বিপক্ষে তাদের ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালের ফাইনাল খেলা স্থাক্রমে ৯—১ ও ০—০ গোলে ড্র যাওয়ায় পর শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

একই বছরে লীগ ও শীল্ড

ইস্টবেঙ্গল একই বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেতাব এবং আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়ে এই ডাবল খেতাব পেয়েছে এ পর্যন্ত ৮ বার (১৯৪৫, ১৯৪৯-৫০, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭২-৭৩)। তারা এই 'ডাবল' খেতাব উপর্যুপরি দু বছর করে পেয়েছে দুবার (১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৭২-৭৩)। এখানে উল্লেখ্য, ইস্টবেঙ্গলের এই ৮ বার 'ডাবল' খেতাব জয় সর্বাধিকবার 'ডাবল' খেতাব জয়ের রেকর্ড। ইস্টবেঙ্গলের এই সর্বাধিকবার (৮ বার) 'ডাবল' খেতাব জয়ের পরই মোহনবাগানের ৫ বার এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ৩ বার 'ডাবল' খেতাব জয় উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ব ভারোত্তলন প্রতিযোগিতা

হাভানায় আয়োজিত ২৭ তম বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ৯৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দলগত চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছে। চূড়ান্ত তালিকায় বুলগেরিয়া ৭৮ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থান পেয়েছে।

সুপার হেভীওয়েট বিভাগে ১৯৭২ সালের অলিম্পিক স্বর্ণ পদক বিজয়ী রাশিয়ার ভ্যাসিলি আলেকসিয়েভ মোট ৪০৩-৫ কেজি ওজন তুলে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে আলেকসিয়েভ বিশ্বের

ভারোত্তোলকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ৬০০ কিলোগ্রাম ওজন তোলার গৌরব লাভ করেছিলেন।

ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ক্রিকেট দল

আগামী ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই ১৯৭৪ সালের ইংল্যান্ড সফরের প্রথম খেলা সুরু হবে ২৭শে এপ্রিল এবং সফরের শেষ খেলা আরম্ভ ১৫ই জুলাই। ১৯৭৪ সালের এই সফরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের তিনটি টেস্ট খেলা আরম্ভ হওয়ার তারিখ : ১ম টেস্ট ৬ই জুন (ওল্ড ট্রাফোর্ড), ২য় টেস্ট ২০শে জুন (লর্ডস) এবং ৩য় টেস্টে ৪ঠা জুলাই (এজবাস্টন)।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত তার প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামে ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে ১৯৩২ সালের ২৫শে জুন। সেই সময় থকে ইংল্যান্ডের মাটিতে এই দুই দেশের যে ৭টি টেস্ট সিরিজ এবং ২২টি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের সিরিজ অর্থাৎ রাবার জয় ৬ বার এবং ভারতের রাবার জয় ১। ২২টি টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের জয় ১৫, ভারতের জয় ১ এবং খেলা ড্র ৬। এখানে উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারত গত দুটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজেই 'রাবার' জয়ী হয়েছে —১৯৭১ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে ১—০ খেলায় (ড্র২) এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতের মাটিতে ২—১ খেলায় (ড্র২)।

বর্তমানে ভারত-ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ এবং টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল এই রকম : ১২টি টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের 'রাবার' জয় ৭, ভারতের 'রাবার' জয় ৩ এবং সিরিজ অমীমাংসিত ২। অপরদিকে ১২টি টেস্ট সিরিজের ৪৫টি টেস্ট খেলার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ১৯, ভারতের জয় ৬ এবং খেলা অমীমাংসিত ২০।

শ্রীমতী বিলি জিন কিং (আমেরিকা)

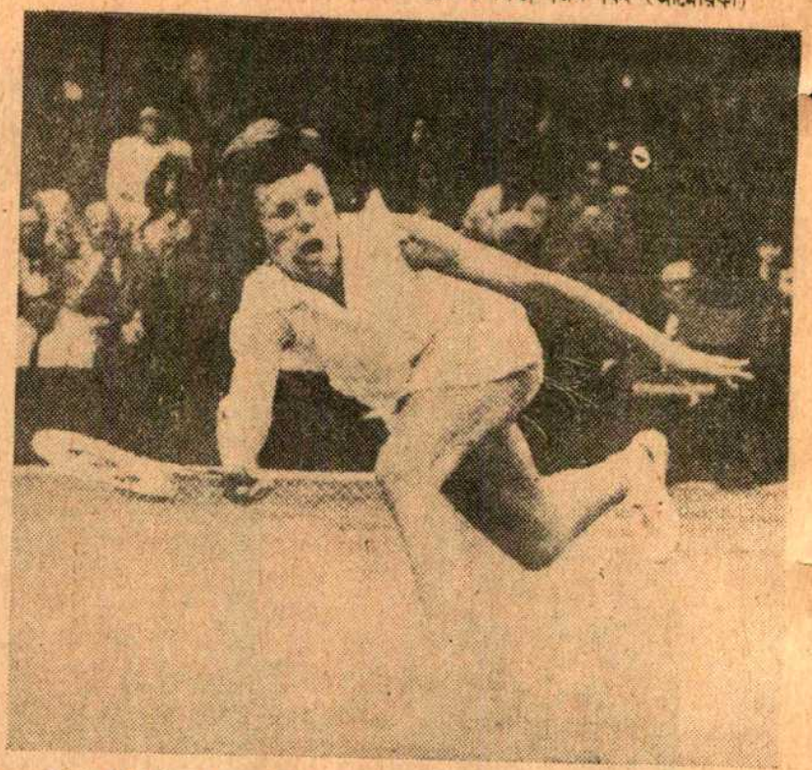

শ্রীমতী বিলি জিন কিং

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় আমেরিকার বিশ্ববিশ্রুতা টেনিস খেলোয়াড় শ্রীমতী বিলি জিন কিং এ পর্যন্ত ৮ বার মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলে ৫ বার সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছেন—উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৬৬-৭০) ফাইনালে খেলে উপর্যুপরি সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন ৩ বার (১৯৬৬-৬৮)।

জয় : ৫

১৯৬৬ সালে ৪নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ২নং বাছাই এবং তিনবারের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ব্রেজলের মারিয়া বুনোর বিপক্ষে।

১৯৬৭ সালে ১নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ৩নং বাছাই বৃটেনের শ্রীমতী অ্যান হেডেন জোন্সের বিপক্ষে।

১৯৬৮ সালে ১নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ৭নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার কুমারী জুডি টেগার্টের বিপক্ষে।

১৯৭২ সালে ২নং বাছাই খেলোয়াড় হিসাবে ১৯৭১ সালের চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার ইভন গুলাগংয়ের বিপক্ষে।

১৯৬৩ সালে ১নং বাছাই অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট স্মিথ (বিবাহিত জীবনে মার্গারেট কোর্ট), ১৯৬৯ সালে ৪নং বাছাই বৃটেনের অ্যান জোন্স এবং ১৯৭০ সালে ১নং বাছাই মার্গারেট স্মিথের কাছে পরাজিত হন। এখানে উল্লেখ্য, শ্রীমতী কিং ১৯৬৩ সালের বাছাই তালিকায় কোন স্থান পাননি এবং ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালের বাছাই তালিকায় পেয়েছিলেন ২য় স্থান।

শ্রীমতী কিং ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সালে মেয়েদের ডাবলসে স্বদেশের কুমারী রোজমেরী ক্যাসালস এবং মিক্সড ডাবলসে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েন ডেভিডসনের সহযোগিতায় 'ত্রমুকুট' সম্মান লাভ করেন।

উইম্বলেডন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী বিলি জিন কিং এ পর্যন্ত ১৭টি খেতাব পেয়েছেন—সিঙ্গলস ৫টি, ডাবলস ৯টি এবং মিক্সড ডাবলস ৩টি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেবা।

SMM-1/69

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস, (কলি) - আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C-4352 AMRITA Friday 5th October, 1973
Grams: AMRITA Calcutta-3. Phone: 55 5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লেবেল
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

অমৃত

সম্পাদক
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[১৩ বর্ষ ২৩ সংখ্যা] শুক্রবার ২ কার্তিক ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ পয়সা

অধরা রূপ ধরা দিল, আধফোটা রূপ ফুটলো,
ফিরে এল হারানো রূপ।

ফেমিলা রো

চোখ ধাঁধানো মন মাতানো রূপের জলুস
দেখাতে হলে অবশ্য চাই ফেমিলা-ল্নো

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের

দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য:—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও কিশোরদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই কলম পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অনুবাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস চমৎকারিত্ব এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটার্জ্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮১

কাশীকান্ত মৈত্র-এর অভাবনীয় সৃষ্টি

রাজনীতি বিপ্লব

কূটনীতি ২০·০০

নিগূঢ়ানন্দের সার্থক উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮·০০

নারায়ণ সান্যালের নবতম সৃষ্টি

গজমুক্তা ১০·০০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয় রচনা

আর এক সাজে ৬·০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

বিশ্বাসের বাইরে ৫·০০

নিমাই ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

মোগলসরাই জংশন ৪·০০

শঙ্কু মহরাজের শ্রেষ্ঠতম ভ্রমণকাহিনী

মধু-বৃন্দাবনে ব্রজপর্ব ১০·০০ বনপর্ব ১০·০০

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সার্থক রচনা

পর্ব পুরুষ ১ম খণ্ড ৮·০০ ২য় খণ্ড ১২·০০

চিরঞ্জীব-এর নতুন খেলার বই

জয় থেকে জয় ক্রিকেটে ১২·০০

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব (২য় সং) ২০·০০

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাস

যুগস্বাক্ষর ১০·০০

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

যদি জানতেম ১০·০০

নীলকণ্ঠের রম্য রচনা

নীলকণ্ঠ বিচিত্রা ১০·০০

সুনীলকুমার ঘোষের

কারা প্রাচীর ১০·০০

আব্দুল জব্বারের

জনপদ-জীবন ৮·০০

শ্রীহর্ষ-এর

গাইনিক ওয়ার্ড ৮·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়নের

উত্তরাংশ ৯·০০

রমাপদ চৌধুরীর

অন্বেষণ ৫·০০

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

নিঃসঙ্গ পদাতিক ৮·০০

নিখিলচন্দ্র সরকারের

দুঃখে সুখে বাঁচা ১০·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গোধূলির কুমকুম ৮·০০

সুবোধ ঘোষের

গল্প মণিঘর ১৪·০০

পরিতোষ মজুমদারের

আলোর সন্ধান ৪·০০

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

রূপসী প্রতিবেশী ১২·০০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ঃ ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

নতুন-ফসফোমিন নির্মাতাদের দ্বারা তৈরী আরেকটি উৎপাদন

ফসফোমিন আয়রন

...কারণ মেয়েদের জন্যে আয়রনের বেশী প্রয়োজন হয়

মেয়েদের জন্যে আয়রনের দরকার অনেক বেশী। কারণ প্রতি-মাসে তাঁদের শরীর থেকে আয়রন বেরিয়ে যায়। শরীরের পক্ষে আয়রন খুবই দরকার। তাই আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করাও প্রয়োজন।

গর্ভাবস্থায় আর শিশুকে স্তন্যপান করাবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোকের আরো বেশী আয়রনের প্রয়োজন হয়। কারণ সন্তানের জন্যেও তো আয়রনের দরকার!

আয়রনের এই ঘাটতি পূরণ করতে আর শরীরে যথাযথ মাত্রায় আয়রন বজায় রাখতে আপনি নিন ফসফোমিন আয়রন—প্রতিটি নারীর জন্যে একটি অত্যাবশ্যক টনিক।

ফসফোমিন আয়রন স্বাস্থ্যকর লাল রক্ত-কণিকা গড়ে তোলে আর আপনার যৌবনশ্রী ফিরিয়ে আনে।

ফসফোমিন আয়রনে সব ভিটামিন ও খনিজ পদার্থও পাবেন। ফলে আপনি হয়ে উঠবেন যেমন কর্মঠ তেমনি প্রফুল্ল।

আজ থেকেই ফসফোমিন আয়রন খেতে শুরু করুন। প্রত্যেক দিন নিন ফসফোমিন আয়রন।

সব কেমিস্টের দোকানে ২টি সাইজে পাওয়া যায়: ২৫০ মি. লি. ও ৪৮০ মি. লি.।

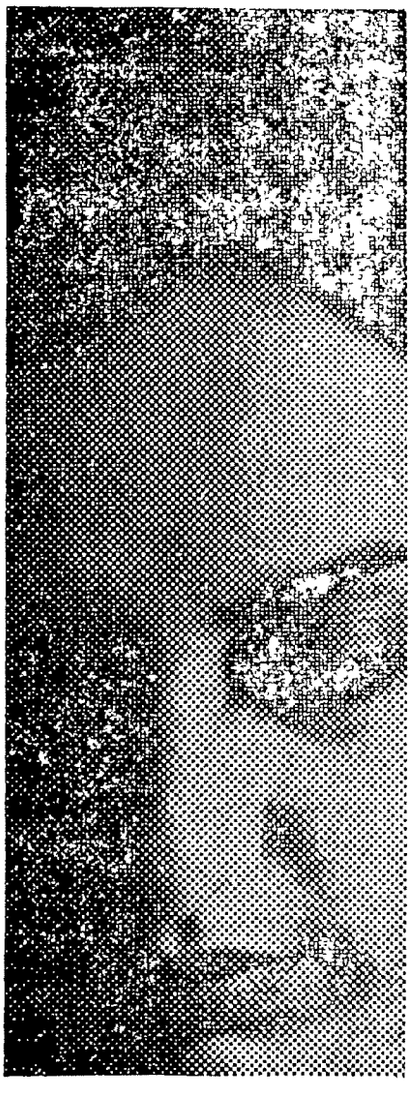

নতুন! ফসফোমিন আয়রন-মেয়েদের জন্যে বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী প্রথম টনিক

SQUIBB SARABHAI CHEMICALS

ফসফোমিন ফর্মুলাটি প্রেমঠাদ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।
® ই আর. স্কুইব অ্যাণ্ড সন্স ইনকর্পোরেটেডের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক আর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকর্তা হলেন কে পি পি এল।

Shilpi-HPMA-7A/73 Ben

১৩শ বর্ষ

অমৃত

২৩ সংখ্যা
মূল্য ·৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইষ্টার্ণ নিউজ
পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 19th October, 1973. শুক্রবার, ২ কার্তিক, ১৩৮০ **50 Paise**

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	চিঠিপত্র		
৭	সম্পাদকীয়		
৮	ঘটনার আয়নায়		—শ্রীসমদর্শী
১১	সেই লোকটি		—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১২	শিকারশিল্পী জিম করবেট		—শ্রীবিশ্বনাথ বসু
১৮	দশমী	(কবিতা)	—শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত
১৮	বার বার	(কবিতা)	—শ্রীসুচেতা মিত্র
১৮	কোথাও যাবার নেই	(কবিতা)	—শ্রীকমল চক্রবর্তী
১৯	সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ		—শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
২৩	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		

যশোরের চিরুণী মানেই কিরণ

৪৬ বছরের বাজারের সেরা চিরুণী।
মজবুত ও টেকসই বলে আপনার খরচ
বাঁচবে চুল আঁচড়ে আরাম পাবেন।

কিরণের চিরুণী আপনার চিরুণীর সমস্যা মেটাবে

কিরণ প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯

বিদ্যোদয়ের বই

অনন্ত সিংহের
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ১১·০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের
অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫·০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিপ্লবের সন্ধানে ১৩·০০

মোহিতলাল মজুমদারের
কবি শ্রীমধুসূদন ১২·০০

নিখিল সেনের
এশিয়ার সাহিত্য ২৮·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর উপন্যাস
গৃহকপোতী ৬·০০

গোলাম মুরশিদ সম্পাদিত
বিদ্যাসাগর ১১·০০

কানাই সামন্তের
চিত্রদর্শন ২৫·০০

মোহিতলাল মজুমদারের
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১২·০০

সুপ্রকাশ রায়ের
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১৯·০০

শ্রীমন্তকুমার জানার
রবীন্দ্র মনন ৮·০০

মনীশ ঘটকের উপন্যাস
কনখল ৭·০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস
নীল ঘূর্নি ৭·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৪-৩১৫৭

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ভাল লাগে না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২

আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

Shilpi-SPL 1A/73 ben

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৭	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৩২	দিনকালের হিসেব		—শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়
৩৪	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৩৫	এখানে অন্ধকার	(গল্প)	—শ্রীপরিতোষ মজুমদার
৩৯	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৪১	বাংলা গানে পাখী		—শ্রীহেনা হালদার
৪৩	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৫০	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৫১	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৫৪	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৭	পরমার সুখ-দুঃখ	(গল্প)	—শ্রীকামাল হোসেন
৬০	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬১	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৬২	পাবলিক থিয়েটারে নটী		—শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত
৭১	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধুলা		—শ্রীদর্শক

সদ্য প্রকাশিত

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ জীবন, সাহিত্য ও সাধনা

ডঃ শিবদাস চক্রবর্তী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় গৌরবোজ্জ্বল স্বদেশী যুগ-এর সর্বজনবরেণ্য দেশনায়ক লাল-বাল-পাল-এর অন্যতম, দেশবিশ্রুত বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের স্বদেশচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্যচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও কর্মাদর্শের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়সমৃদ্ধ। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীদের চিত্রে সমৃদ্ধ। পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় সাড়ে পঁচিশ। মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা।

আনন্দ প্রকাশের প্রতীক্ষায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ

ডঃ রামদুলাল বসু

১৮৬৫ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বঙ্কিমযুগের পটভূমিকায় আড়াই শতাধিক ঔপন্যাসিকের উপন্যাসসমূহের আলোচনায় সমৃদ্ধ। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে পর্যাপ্ত আলোকপাত এই প্রথম। সুবৃহৎ গবেষণা-গ্রন্থ। বাংলাসাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের অপরিহার্য সঙ্গী হবার যোগ্য। সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য সংযোজন।

চলন্তিকা প্রকাশক ঃ ৪, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

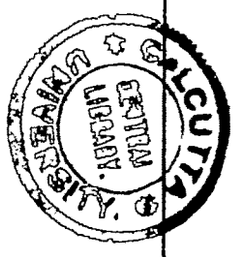

সুকুমার সমগ্র রচনাবলী
২ খণ্ডের গ্রাহক চাঁদা মাত্র ২৫,
গ্রাহক হন ৫, দিয়ে

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী
২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৭·৫০
গ্রাহক হন ৭·৫০ দিয়ে

লুইস ক্যারল সমগ্র রচনাবলী
৩ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৯,
গ্রাহক চাঁদা ৫,

হ্যান্স অ্যান্ডারসন সমগ্র রচনাবলী
২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২০,
গ্রাহক চাঁদা ৫,

গ্রিমসের সমগ্র রচনাবলী
২ খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ২৫,
গ্রাহক চাঁদা ৫,

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী
প্রথম খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ১০,
গ্রাহক চাঁদা ৫,

এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী
গ্রাহক চাঁদা ৭, গ্রাহক হন ২, দিয়ে

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-বারো থেকে

চিঠিপত্র

এই আমাদের দেশ

'এই আমাদের দেশ' পর্যায়ে কলকাতার কথায় যোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'এক কলীঘাটের মন্দির ছাড়া এই শহরে বা উপকণ্ঠের কোন প্রতিষ্ঠান, প্রাসাদ বা সংস্থার বয়স দু'শ বছরের বেশী নয়।'

অথচ আপনাদের 'অমৃত' পত্রিকায় ৪র্থ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যায় সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'কলকাতার প্রাচীন মন্দির ও মসজিদের কাহিনী' রচনাতে লিখেছেন 'ঠনঠনিয়া কালীমন্দির—কলকাতার ঠনঠনিয়ার কালীমন্দির সকলেই জানেন। এ মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল প্রায় ২৭০ বছর আগে। এখন এ অঞ্চল যেমন ঘনবসতিপূর্ণ তখন ছিল তেমনি গভীর-জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলের মাঝে খানিকটা ফাঁকা-জায়গায় সামান্য একখানি চালাঘরে দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উদয়নারায়ণ ব্রহ্মচারী নামে সেকালের এক তান্ত্রিক সাধক.. পরে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেই জায়গাতেই বর্তমান এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন ঐ পল্লীরই বিশিষ্ট-ধনী শঙ্কর ঘোষ।

নবরত্নেশ্বর মন্দির—ঠনঠনিয়া ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে চাঁপাতলার মোড়ে বহুবাজার অঞ্চলে সে কালের প্রাচীন নবরত্নেশ্বর শিবের মন্দির। এ মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এবং তৈরী করিয়েছিলেন সেকালের ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের দেওয়ান ত্রৈলোক্যরাম (বা ত্রিলোকরাম) পাকরাশী।'

এছাড়া 'চিত্তেশ্বরী বা চিত্রেশ্বর—কলকাতার উত্তরে গঙ্গার তীরে কাশীপুরে প্রসিদ্ধ মন্দির..। প্রাচীনতার দিক দিয়ে কালীঘাটের কালীমন্দিরের পরেই এ-মন্দিরের নাম করতে পারি। এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেকালের নামজাদা বাঙালী ডাকাত 'চিতে' বা 'চিতু' সর্দার।..শোনা যায়—চিতে বা চিতু ডাকাতের দলবলের লুণ্ঠনের অর্থেই নাকি এ মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়েছিল। মন্দির 'চিত্তেশ্বরী' বা 'চিত্রেশ্বরী' দেবীর নাম থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছে চিৎপুর।'

এই বচনাতে এরকম প্রাচীন মন্দিরের কথা আরও আছে। সে সব প্রতিষ্ঠার সঠিক খবর কেউ দিতে পারেন না। যেমন—নিমতলায় নোঙেরেশ্বর বা নগরেশ্বর মন্দির এবং 'শ্মশানেশ্বর' মন্দির আর বাগবাজারের 'মদনমোহন মন্দির' ও 'আনন্দময়ী মন্দির'। এ সব মন্দির সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক তথ্যও লিখেছেন লেখক সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কিন্তু আমরা পাঠক। কোনটা মেনে নেব? এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করলে খুশী হব।

নির্মলকুমার বিশ্বাস
বনগাঁ : ২৪ পরগণা

(২)

'অমৃত' ১৩ বর্ষ ১৬—১৭ সংখ্যায় 'এই আমাদের দেশ' পর্যায়ে লেখক মেদিনীপুর (১—২) জেলা সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান রেখেছেন তাতে বেশ কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। অনেকক্ষেত্রে তিনি সাম্প্রতিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন নি। যেমন ১৬ সংখ্যায় ৪০ পাতায় জেলার মোট বনভূমির উল্লেখ করেছেন ১৯৬৯—৭০ সালে ২,৯০,৪৪৭ একর। কিন্তু ১৯৭২ সালে ঐ বনভূমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩,৭২,৬১৫ একরে। ঐ পাতায় ১৯৭১এর লোকগণনা অনুসারে জেলার লোকসংখ্যা ৫৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৩২০ লিখেছেন। এটা ঠিক নয়। মোট সংখ্যা থেকে ১ হাজার কম হবে। নারী ও পুরুষের সংখ্যা যা দিয়েছেন সেগুলিও ঠিক নয়। লিখেছেন পুরুষ ২৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ও নারী ২৬ লক্ষ ৭৯ হাজার। ঐ সংখ্যা দুটি হবে পুরুষ ২৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৯৫ জন এবং নারী ২৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৪২৫ জন। স্কুল-কলেজের হিসাবে তিনি ১৯৬৯ সালের পরের অবস্থা উল্লেখ করতে পারেন নি। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট ৬,৪৭০, মাধ্যমিক ১০৯৬ এবং সব রকম মিলিয়ে কলেজের সংখ্যা ৩২। ১৭ সংখ্যায় ২৮ পাতায় জেলার মোট গ্রামের সংখ্যা লিখেছেন ১০,৬১৮ কিন্তু হবে ১০,৬৩২টি। তারপর লিখেছেন ১০,৬১৮টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ গেছে মাত্র ৩৬টি গ্রামে। এ তথ্যও ঠিক নয়। সরকার সীমিত সামর্থ্যে যেটুকু করতে পেরেছে তার যথাযথ সংখ্যা উল্লেখের জন্য নিবেদন করি—ঐ সংখ্যা হবে ১০,৬৩২টি গ্রামের মধ্যে বিদ্যুৎ গেছে ৪০৭টি গ্রামে। আমার ধারণা, ১০,৬১৮ গ্রাম না হয়ে মৌজা হবে। সেচ ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন—পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৪ জন এবং মেদিনীপুরে শতকরা ৭৬ জন কৃষি নির্ভর। সঠিক তথ্য হবে—পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৫৭-৪৬ এবং মেদিনীপুরে শতকরা ৭৯-৫০ ভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর। ১৯৭০—৭১ সালে জেলার মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এবং তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন হুগলী ২ লক্ষ একর আর বাঁকুড়া ২ লক্ষ ৮০ হাজার একর সেচ ব্যবস্থাধীন হয়েছে। ঐ তিনটি সঠিক তথ্য হবে—মেদিনীপুর ২ লক্ষ ৭১ হাজার ২৮৫ একর, হুগলী ২ লক্ষ ৮৭ হাজার একর এবং বাঁকুড়া ২ লক্ষ ২ হাজার ২২৬ একর সেচ ব্যবস্থাধীন হয়েছে। অন্যত্র লিখেছেন—জেলার মোট ৩৩,২২,৪৭২ একর মধ্যে চাষের জমি পাওয়া যাবে ৪৫,৪২,৭০৭ একর। তা কি করে সম্ভব? ৬৭—৬৮ সালের হিসাব তুলে গমের জমি জানাচ্ছেন ২৮০০ একর। ৭১—৭২ সালে কিন্তু ঐ গমের জমির পরিমাণ হয়েছে ৩৮,৮৩৩ একর। শিল্পের অবস্থা লিখেছেন বাইস মিল আছে ৭৬টি হবে ৭২টি। তেলকল ১৬টি নয়—আছে ৯টি। এছাড়াও এই বিরাট জেলার বহু তথ্য বহু বিষয়ে অনুপস্থিত—বিশেষত নেই নেই করেও সরকার যেটুকু করতে পেরেছেন আলোচনা করলে অনুসন্ধিৎসুদের সুবিধা হত।

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কোতবাজার, মেদিনীপুর।

তিতাস একটি নদীর নাম

'তিতাস যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয় স্বীকার করবেন বাংলাদেশের কপাল, এ-ধরনের একটি ছবি এখানে তৈরী হয়েছে, (অমৃত, ২৮ ভাদ্র ১৩৮০)—ভাগ্যের অজুহাত মানি না, তবে স্বীকার করি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উন্নত মানের জীবনস্পর্শী ছবি। শব্দের শিথিল অপব্যবহার না করলে ক্ষুব্ধের হাত থেকে রেহাই পেতাম। দর্শককুলকে এমনভাবে আঘাত না করলেই কি চলতো না? ঋত্বিক ঘটকের চিত্রপটুতা দর্শককুলের অনুভূতিকে নাড়ায় ঠিকই কিন্তু এমন কতক দৃশ্য সংযোজিত হয়েছে যা চিন্তাভাবনার পরই কেবল সঠিক মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব। যেমন (১) পাগলের সেয়ানা প্রখরতা, (২) মাথা নেড়া ডাব গাছ, (৩) তিতাসের বালুর চরে লুকানো পানি, (৪) সজীব সবুজে বাঁশি বাজিয়ে শিশুর আগমন ইত্যাদি। গ্রাম-বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জেলে পরিবারকে কালের আবর্ত চাকায় অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে আসতে হয়েছে তা কেবল সমাজকুশলীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব। তাই সাধারণ দর্শককুলদের অবজ্ঞা না করে এবং সত্যকে মেনে নিয়ে আস্তে আস্তে মনোবিজ্ঞানীদের দায়িত্বে দর্শককুলকে চিন্তাভাবনার মধ্যে ন্যায়বোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই প্রযোজক, পরিচালক সর্বোপরি চিত্রকুশলীদের কর্তব্য। দর্শকদের ন্যায়বোধে সাড়া জাগাতে ঋত্বিক ঘটক যে সমাজ-বিজ্ঞানীর পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই বাংলায় বোধসম্পূর্ণ মানুষ স্মরণে রাখবে।

ঋত্বিক ঘটকের কাছে কতগুলো অভিযোগ আছে। যেমন (১) জেলেরা কি এত ধবধবে পরিষ্কার ধুতি পড়ে, (২) কোন জেলের কি জুলফি এতবড় থাকে (মোস্তফা), (৩) মাথার চুলের সঙ্গে কি বুকের লোমও পেকে যায় না (মোস্তফা), (৪) গ্রামের এতো সাধারণ ব্যাপারে কি পুলিশ '৩০৩' রাইফেল নিয়ে এইভাবে হানা দেয় (চৌকিদারকে কি ঘটনায় সাদৃশ্যমান নেই। তাছাড়া পুলিশদের গ্রামের মাতব্বরদের যে খাতির দেখায় তা এখানে অনুপস্থিত। বরং জুড়িগাড়ীর পিছনে পিছনে পুলিশদের হেঁটে যাওয়া গ্রাম-বাংলায় নিতান্তই বেমানান।)

ঋত্বিক ঘটককে অভিনন্দন। তিনি তিতাস নদীকে জীবন্ত মহিমায় দর্শককুলের সামনে সেলুলয়েড ফিতেয় হাজির করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা ছবির একঘেয়েমী অস্বস্তি থেকে ঋত্বিক ঘটক অবশ্যই দর্শককুলদের মুক্তি দিয়েছেন।

নাজমুল হুদা
রানীবাজার
রাজসাহী

সম্পাদকীয়

উৎসবের শেষে

শারদীয় উৎসবান্তে আমরা সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি জানাই বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ। বিশ্বজনের কল্যাণে মাতৃপূজার আয়োজন করা হয়। বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনায় উৎসব উদযাপন এবং তার সমাপ্তি। এই শুভকামনা সার্থকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। আবার আগামী বৎসরের এই উৎসবের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব। প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতা উৎসবের আনন্দস্পর্শে সুন্দর ও সহনীয় হয়ে উঠবে এই আশায়।

এবারের উৎসব এসেছিল দেশব্যাপী অভাব ও অনটনের ছায়া সঙ্গে নিয়ে। পশ্চিমবাংলায় কিছুটা খরা এবং পরিশেষে বন্যার জন্য মানুষের দুর্ভোগের মাত্রা হয়েছে ব্যাপক। সাধারণ মানুষ, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী এবং গৃহস্থের সংসারে এবার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা মেলেনি। দ্রব্যমূল্য অনিয়ন্ত্রিত বেগে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমরা দেখেছি এবার দোকান-বাজারে কেনাকাটার ভিড় ছিল কম। পুজোর সময় সাধারণ মানুষ কাপড়চোপড় কেনে সম্বৎসরের জন্য। কাপড়ের দাম অন্তত দেড়গুণ বেড়েছে পুজোর মরশুমে। চিনি, কয়লা, কেরোসিন, সরষের তেল দুর্মূল্যই শুধু নয়, দুষ্প্রাপ্য হয়ে মানুষের কষ্ট বাড়িয়েছে। বাঙালীর প্রিয় মাছের বাজার আগুন। দশ টাকার কমে কোনো রকম মাছই মুখে তোলা যায়নি। ক'জন সীমিত আয়ের মানুষ এই খরচের ধাক্কা সামলাতে পেরেছে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

সারা ভারতে খাদ্য-পরিস্থিতিও সংগীন। সরকার বাধ্য হবে ধানের সংগ্রহমূল্য সত্তর টাকা কুইন্টাল ধার্য করেছেন যাতে লুকোনো খাদ্যশস্য বাজারে আসে। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য সরকার অতি মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সবটা বিদেশের বাজারে পাওয়া যাবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ, উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিদেশের বাজারেও খুব বেশি নেই। চাল তো কোথাও পাওয়া যাবে না। গমের ওপরই যা ভরসা। এই দুঃসময়ে আমাদের মিত্র সোভিয়েট রাশিয়া তার সংগৃহীত খাদ্যশস্য থেকে কুড়ি লক্ষ টন ভারতকে স্বেচ্ছায় দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। রাশিয়ায় গত বৎসর খরার জন্য নিজেদেরই খাদ্যের টানাটানি। আমেরিকা ও কানাডার বাজার থেকে প্রচুর খাদ্যশস্য তাঁরা কিনছেন। সেই খাদ্যশস্য থেকেই ভারতের জন্য কুড়ি লক্ষ টন খাদ্য নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন বিপদের দিনে সত্যিকারের বন্ধুর কর্তব্য করল। ইতিমধ্যেই সোভিয়েট ইউনিয়নের খাদ্যবাহী জাহাজ ভারতের বন্দর অভিমুখে যাত্রা করছে। স্মরণ থাকতে পারে যে, কিছুদিন আগে বাংলাদেশের খাদ্য-সংকটের সময়ে অনুরূপভাবেই সোভিয়েট খাদ্যবাহী জাহাজ দেশে না গিয়ে বাংলাদেশের বন্দরে গিয়ে ভিড়েছিল। মৈত্রী ও সহযোগিতার এই নিদর্শন আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখব। খাদ্যাভাবের জন্য বিধিবদ্ধ বেশনিং এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গম ও চালের বরাদ্দ আংশিক হ্রাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুজোর সময়ে গমের কর্তিত বরাদ্দ খানিকটা পুনর্বহাল করা হয়েছে। আশা করা যায়, সোভিয়েট খাদ্যশস্য এসে পৌঁছলে খাদ্যাবস্থার এই সংকট খানিকটা কেটে যাবে। মজুতদারেরাও এবার লুকোনো খাদ্যশস্য বাজারে আনবার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবে। কারণ, এবার ফসলের আশা খুব ভাল। মনে হয় আর একমাস-দেড়মাসের মধ্যেই বর্তমান নিদারুণ সংকটের ভাব দূর হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, সংকট কেটে যাচ্ছে। প্রকৃতিনির্ভর আমাদের কৃষিব্যবস্থা এভাবেই প্রায় প্রতি বৎসর আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান হবে দেশবাসীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ বাড়ায়। তা সত্ত্বেও একথা আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সামান্য পাঁচ শতাংশ খাদ্য ঘাটতির জন্য সারাদেশে এতটা হাহাকার হবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। মজুতদারদের লোভ এবং সরকারী বণ্টনব্যবস্থার ত্রুটি সংকটকে তীব্রতর করেছে। এসম্পর্কে সরকারকে সতর্ক হতে হবে। কষ্ট স্বীকার করতে আমাদের দেশবাসী অভ্যস্ত। কিন্তু তারা যদি দেখে যে, দেশের প্রকৃত খাদ্যাভাব না থাকা সত্ত্বেও তাদের দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তাহলে বিক্ষোভ বাড়বেই। মহীশূরে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত খাদ্যহাঙ্গামা তারই হুঁশিয়ারী। আমাদের উন্নয়নযোজনার লক্ষ্য, দেশের সার্বিক উন্নতিসাধন। উন্নয়নের সুফল যদি মুষ্টিমেয় অতিলোভীদের মুনাফাতুষ্টি করে তাহলে সরকারের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। দেশবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজন—খাওয়া-পরার সমস্যা না মিটলে অন্যান্য সমস্ত উন্নয়ন-প্রকল্পই অর্থহীন। সাধারণ মানুষের এই ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক, এই আশা নিয়ে সকলকে আবার উৎসবান্তিক শুভেচ্ছা জানাই।

ঘটনার আগুনায়

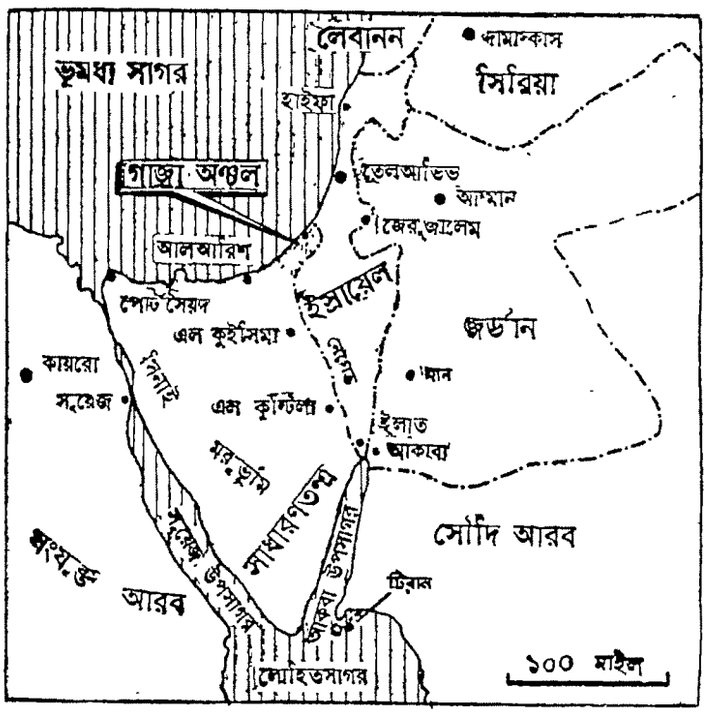

মধ্যপ্রাচ্যে আবার আগুন জ্বলেছে। সুয়েজের জল এবং সিরিয়ার গোলান হাইট আবার রক্তাক্ত ও রণবিধ্বস্ত হয়ে উঠেছে। কায়রোতে ও দামাস্কাসে বোমা পড়েছে, ইস্রায়েলী সৈন্যবাহিনীও প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন। লড়াই চলেছে এখন জলে, স্থলে ও আকাশে। গোটা পশ্চিম এশিয়া এখন রণদামামার উত্তেজনায় ভরপুর। কিছু কিছু সাংবাদিকদের মতে ১৯৬৭-র পর এই যুদ্ধই নাকি সবচেয়ে সাংঘাতিক ধরনের। একটা কথা হয়তো ঠিক যে, এই যুদ্ধের জন্যে বিস্ময় বোধ করা উচিত নয়। ১৯৭১ ছিল প্রেসিডেন্ট সাদাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বছর, কিন্তু '৭১ পেরিয়ে গেলো, কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হোল না। ১৯৭২-ও অতিক্রান্ত হোল, কিন্তু 'না যুদ্ধ না শান্তি' নীতির কোন পরিবর্তন হোল না। শুধু একটা আতঙ্ক, একটা দুর্যোগের আভাস রয়ে গেল বিশেষ করে বিমান ছিনতাই-এর অনেকগুলো ঘটনা তারই সাক্ষ্য দেয়।

এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় না যে যতক্ষণ পর্যন্ত ১৯৬৭-তে অধিকৃত আরব অঞ্চল ইস্রায়েল ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে, ততদিন পর্যন্ত মিশরে কোন রাজনৈতিক স্থিরতা আসা সম্ভব নয়। বেশ কিছু সময় আগে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী মিশরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সে-ব্যাপারে তিনি অপর পক্ষ থেকে তেমন কোন সাড়া পাননি। এই ধরনের আলোচনার অর্থ হোল বিজয়ী আক্রমণকারীর সঙ্গে আক্রমণের শিকারের আলোচনা। একথা খুব সহজেই অনুমেয় যে, প্রেসিডেন্ট সাদাত কোনমতেই অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁর নিজের দেশের লোক ও লিবিয়ার চাপ সহ্য করতে পারবেন না।

এবারকার যুদ্ধের আগুন কে জ্বালালো সে বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা করে কোন লাভ নেই। মিশরীয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছেন, ইস্রায়েল সুয়েজের পশ্চিম পাড়ে কিছু অঞ্চল অধিকার করে আছে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সিরিয়া বলেছে, গোলান হাইটসের কয়েক মাইল পশ্চিমে ইস্রায়েলী সৈন্যরা বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছে আগেই। যুদ্ধ শুরু হয়েছে বেশ পুরোদমেই। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আরব রাষ্ট্র মিশরের সরকার ও জনসাধারণকে সমর্থন জানিয়েছে। যদি তারা সত্যি সত্যি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিশর ও সিরিয়াকে সাহায্য করতে আসে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট দুঃসহ অন্ধকারে ভরে যাবে।

যে আমেরিকা ইস্রায়েলকে সমর্থন ও শক্তিশালী করে তোলবার সবরকম চেষ্টা করেছে, যে রাশিয়া মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে বেশীর ভাগ অস্ত্র সাহায্য করেছে, তারা কেউ চাইছে না মধ্যপ্রাচ্য আবার নতুন করে একটি যুদ্ধের দৃশ্য তুলে ধরুক। ইস্রায়েলী সরকার ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘ, বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে এই যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু ইস্রায়েলের স্পর্ধিত মনোভাব রাষ্ট্রসংঘের হাত তো কমজোর করে দিয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলোর যেমন বোঝা উচিত ইস্রায়েলের স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকার আছে তেমনি ইস্রায়েলকেও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বিরোধের মনোভাব মধ্যপ্রাচ্যের শান্তিই শুধু বিনষ্ট করবে না, সারা পৃথিবীই তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ-সত্যটা নতুন করে উপলব্ধি করার সময় আজ নিশ্চয়ই এসেছে।

*

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলী ভুট্টো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সামরিক সম্মিলনের প্রস্তাব করেছেন, সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন শ্রীভুট্টোর এই প্রস্তাব নিশ্চিতভাবে ভারতবর্ষের বহুত্বের স্বার্থের পরিপন্থী। এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, এই দুই দেশের মধ্যে কোন সামরিক সম্মিলন থাকতে পারে না, তার কারণ, ভারতবর্ষ পাকিস্তানের চেয়ে বড়ো দেশ, তার সীমানাও অনেক বড়ো। তিনি শ্রীভুট্টোকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বড়ো সীমানার অধিকারী হওয়া ছাড়াও ভারতবর্ষ দুটি দেশের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। যে-দেশ পর পর তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণে লিপ্ত হয়েছে, তার পক্ষে আবার আক্রমণকারীর ভূমিকা নেওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে শ্রীভুট্টোর সাম্প্রতিক মন্তব্যের মধ্যেই এই আশঙ্কার আভাস হয়তো কিছুটা আছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিজেই তো বলেছেন, যদি কাশ্মীর সমস্যার সমাধান তাড়াতাড়ি না হয়, তাহলে আর একটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষের পক্ষে কাশ্মীর এখন কোন সমস্যা নয়, তার কারণ কাশ্মীর এখন ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ।

ভারত পাকিস্তানের সীমানার এক ইঞ্চি দখল করে নেই, সিমলা চুক্তির সময়ে ৫০০০ হাজার বর্গমাইল পাকিস্তানী অঞ্চল সে ছেড়ে দিয়েছে। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, পাকিস্তানের সামরিক

শাসকদের অবিশ্বাস্য যুক্তি ও নির্বুদ্ধিতার জন্য দেশটি নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি সেনাপতি টিক্কা খান স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ লোক পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের অগুল অধিকৃতির বিপক্ষে ছিল। এদিকে সিমলা ও দিল্লী চুক্তি উপমহাদেশে ভারত ও বাংলাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্তরিক ইচ্ছাকেই প্রকাশ করেছে। চিরন্তন শান্তি যদি কাম্য হয়, তাহলে এই তিনটি রাজ্যের অখণ্ডলিক অখণ্ডতা অটুট রাখতে হবে। বহু বৎসর আগে স্বর্গত জওহরলাল নেহরুর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ না হওয়ার চুক্তি প্রস্তাব এখনো বলবৎ আছে। যদি শ্রীভুট্টো অস্ত্র কমানোর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় কমাতে চান, তাহলে তাঁকে ভারতের এই প্রস্তাবকে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে।

কিন্তু জনাব ভুট্টো কি করছেন! তিনি তো একই মুখে দু'কথা বলতেই অভ্যস্ত, আর তাতেই ভারতবর্ষ বিস্মিত। দিল্লী চুক্তির প্রস্তাব অনুযায়ী ত্রিমুখী বন্দী প্রত্যর্পণের কাজ চলাকালীন ভুট্টোসাহেব আমেরিকায় গিয়ে নিকসনের কাছে অস্ত্র সাহায্য চেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হোল শ্রীভুট্টোর খেয়ালের খেসারত ভারত কতদিন দেবে?

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, ভারত তার শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিযান চালিয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার কাজেও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রতী হোতে হবে।

*

সুখে-দুঃখে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু। সহমর্মিতার এই সেতুবন্ধনের দৃঢ়তা ও প্রোজ্জ্বলতা সম্প্রতি আবার স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। খুবই দুঃসময়ে সোভিয়েট সরকার ভারতকে কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য ধার হিসেবে দিতে চেয়েছেন। ভারত নিজে কিছু সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছ থেকে চায়নি, বন্ধু ও সহমর্মী রাষ্ট্র ভারতের খাদ্যের অনটনের কথা চিন্তা করেই এই সাহায্যের কথা জানিয়েছেন। ভারতও সানন্দে গ্রহণ করেছে মিত্র রাষ্ট্রের এই সাহায্যের সিদ্ধান্তকে। প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগের জন্য ভারতবর্ষে এবার যে খাদ্যের অনটন দেখা দিয়েছে তার খবর পেয়েই সোভিয়েট সরকার নিজের দেশে খাদ্যের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ-প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, কেননা এরই মধ্য দিয়ে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর হোল।

সবারই জানা আছে, গত বছর সোভিয়েট ইউনিয়নে খাদ্যের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে এবং সেই অভাব মেটাবার জন্য আমেরিকা ও কানাডা থেকে প্রচুর গম তাদের কিনে নিতে হয়। এই কুড়ি লক্ষ টন খাদ্যশস্য হয়তো সেই আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের থেকেই ভারতে আসবে। বাংলাদেশের দুর্দিনেও গত বছর সোভিয়েট সরকার একটি খাদ্যশস্যবাহী জাহাজ নিজের দেশে না এনে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের এসব কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর পথে এক-একটি উজ্জ্বলতর পদক্ষেপ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সাহায্যের কথা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার বেশ কিছুটা চিন্তার ভার কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন। প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যশস্য বিদেশে কেনা যাবে কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাছাড়া এটা তো খুবই স্পষ্ট যে, সম্পূর্ণ ঘাটতি খাদ্য বিদেশী মুদ্রায় কিনতে গেলে ভারতের আর্থিক অবস্থাটা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়বে। ঠিক এই সময়ে সোভিয়েট খাদ্যশস্য সাহায্যের ঘোষণা দেশের ভিতরকার বাজারে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক মুনাফার আশায় যেসব মজুতদারেরা খাদ্যশস্য সঞ্চয় করে রেখেছিল, তারা এখন তাদের চিন্তাধারাকে পাল্টে ফেলতে পারে। কারণ সরকারী সরবরাহ ব্যবস্থার বেশ কিছু উন্নতি এখন নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, দেশের দুঃসময় কেটে যাচ্ছে। ভালো বর্ষা হওয়ায় খারিফ শস্যের ফলন এবার বেশ আশাপ্রদ হয়েছে। এখন দেখতে হবে দেশে খাদ্য যতোটা মজুত আছে তার বণ্টন ব্যবস্থায় যেন সুষ্ঠু হয়। একথা তো অস্বীকার করে কোন লাভ নেই যে, এক শ্রেণীর অতিলোভী মজুতদারের জন্য দেশের খাদ্যসংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। সোভিয়েট সাহায্য পাবার পর তার যাতে সুষ্ঠু বণ্টন ঘটে, এটাও ভেবে দেখতে হবে। বেশন এলাকায় খাদ্যশস্যের বরাদ্দ কিছু বৃদ্ধি হয়তো এই সাহায্যের প্রস্তাবে আশ্বস্ত হবার ফল। সোভিয়েট সাহায্যের মধ্যে কিছুটা চাল আসছে জানা গেছে, সেই চালের কিছু অংশ নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারে।

সুমথনাথ ঘোষের
ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫, আশাপূর্ণা দেবীর ওরা বড় হয়ে গেল ৫.

বিমল মিত্রের
তিন ছয় নয় ৮, জরাসন্ধের পরশুরাম ৫॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
সূর্য তপস্যা ১০, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লগ্ন ৪.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
বাজীকর ৮, বিমল করের যাদুকর ৫॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
বঙ্গে বাজে বাঁশী ৪, আশাপূর্ণা দেবীর ঝিনুকে সেই তারা ৫,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী অসনিবাস
তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। প্রথম দুটি খণ্ড অবিলম্বে সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রতি খণ্ড দশ টাকা

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলি—৯

শিল্পীরা লক্ষ্মীসরায় শেষ রঙের আঁচড় টানতে ব্যস্ত। লক্ষ্মীপূজায় এই সরা লাগে।

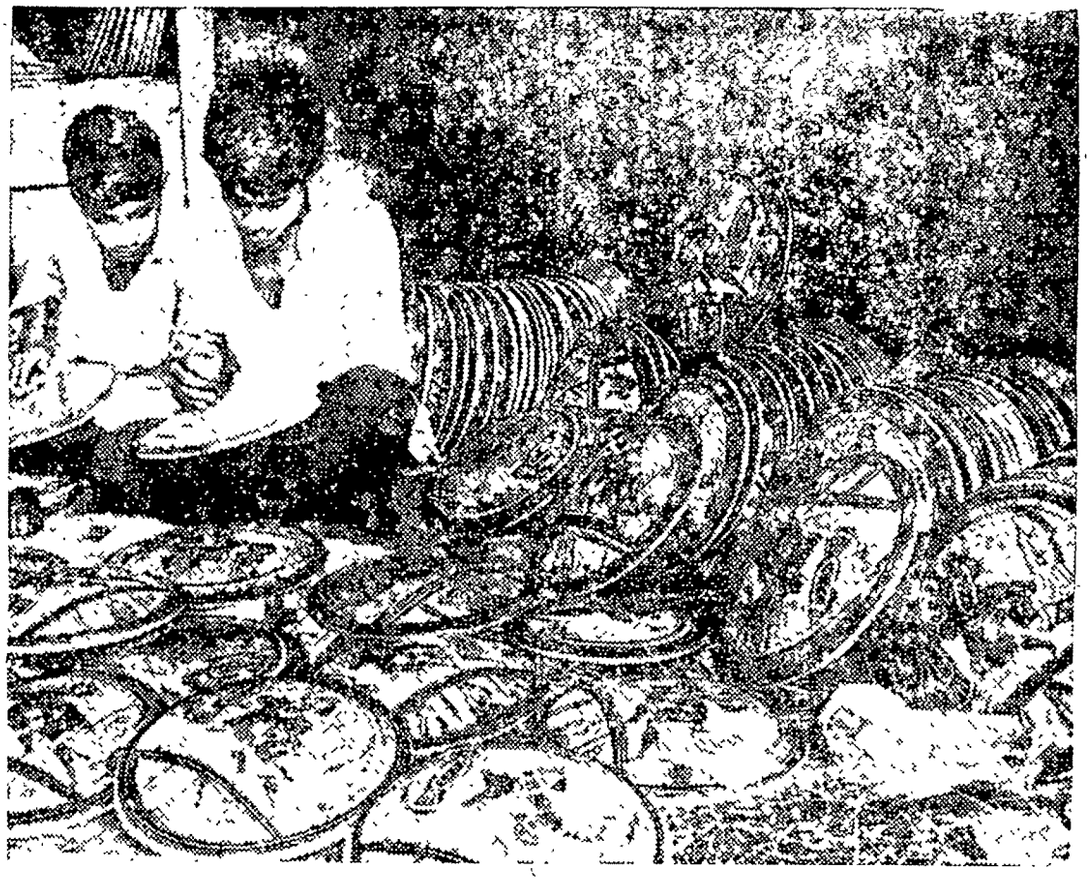

কেন্দ্রীয় খাদ্যসচিবের ঘোষণা থেকে জানা যায় যে, কুড়ি লক্ষ টন সোভিয়েট খাদ্য-শস্যের মধ্যে তের লক্ষ টন ইতিমধ্যেই এসে গেছে এবং আরো আসবার পথে।

•

শারদীয়া পূজোর আগে থেকেই কর্ম-ব্যস্ত কলকাতার আনাচে-কানাচে তো বটেই উন্মুক্ত রাজপথে প্রচুর আবর্জনা ও জঞ্জালের স্তূপ জমে ছিল এবং সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট বেগ পেলেও শেষ পর্যন্ত 'ভারত রক্ষা বিধি' প্রয়োগ করে কলকাতা শহরকে বেশ কিছুটা জঞ্জালমুক্ত করতে পেরেছেন। ইতিপূর্বে এই বিধি প্রয়োগের হুমকিতে বাসচালকদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়া হয়েছিল। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, জনসাধারণের সুবিধার্থে যেসব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করা উচিত, তা সংঘটিত করানোর জন্য এই ধরনের চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। যেসব পৌরকর্মীদের ওপর আবর্জনা পরিষ্কার করানোর দায়িত্ব ছিল, তারা তাঁদের নৈতিক কর্তব্যকেও ভুলতে বসেছিলেন, একথা তো ঠিকই।

ধারাবাহিকভাবে সমস্ত ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগের সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত কালোপ-যোগী বলেই মনে হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, এই সিদ্ধান্তটি আরো আগে নেওয়া উচিত ছিল, অন্ততঃ পরিস্থিতির গুরুত্বের কথা চিন্তা করে। যাই হোক মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের দৃঢ়তার সঙ্গে ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগের ঘোষণার নেপথ্যে আছে কলকাতা-বাসীর অশেষ দুর্গতির কথা এবং এই ঘোষণার ফলেই কলকাতা শহরের জঞ্জালের স্তূপ সরিয়ে কর্মীরা শহরটিকে একটি সুন্দরতর রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই বিভাগের পৌরকর্মীদের দাবী সম্পর্কে পৌরমন্ত্রী বলেছেন যে, কর্মীরা অকারণে চাপ সৃষ্টি করে সাধারণ জীবনযাত্রার গতিকে শিথিল করে তুলতে চেয়েছেন। তাদের প্রায় সব দাবীই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবুও তারা যে কেন এই ধরনের আন্দোলনে নামলেন তা বোঝা যায় না।

কলকাতা শহরে যে প্রচুর জঞ্জাল জমে ছিল, তাতে যেমন যানবাহনের অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি নানারকম সংক্রামক ব্যাধিরও সম্ভাবনা দেখা দিয়ে-ছিল। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগ করে কলকাতা শহরকে জঞ্জালমুক্ত করা, এই ছিল একমাত্র পথ, যখন অনেক আবেদন ব্যর্থতায় পর্য-বসিত হয়েছিল। কিন্তু একটি কথা। সাময়িকভাবে কর্তব্যচ্যুতির ব্যাপারে ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগ হয়তো একটি সঠিক পদ-ক্ষেপ সন্দেহ নেই; কিন্তু দীর্ঘদিনের ট্রাকের যে সমস্যা তা কি এই বিধি প্রয়োগে মিটে যাবে? অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে।

সব শেষে একটি বিষয়ে কিছুটা আলোকসম্পাত করা প্রয়োজন। ভারত রক্ষা বিধি যেমন কলকাতা শহরকে জঞ্জালমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল তেমনি আরো অনেক ব্যাপারে এই চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ঠিক একই গভীরতার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে এই ভারত রক্ষা বিধি প্রয়োগ করা যায় কিনা, সেটাও সরকারকে খুব নিবিষ্ট মনে চিন্তা করে দেখতে হবে।

—সমদর্শী

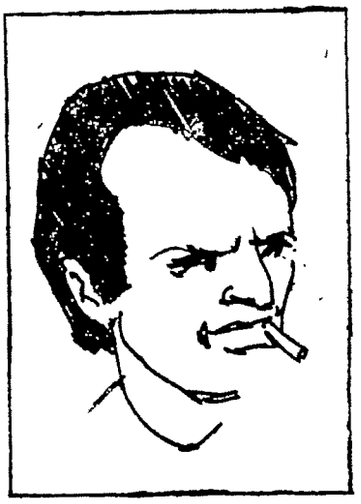

সেই লোকটি

তখন আমার নাকের ডগায় ইন্টার-মিডিয়েট পরীক্ষা। টেবিলে বসে পড়তে পড়তে মাথা গরম হয়ে ওঠে। ছাদের কুঠরি-ঘরে তোষকের তলা থেকে লুকোনো সিগ্রেট বের করে আনি—দু-চারটে জোরালো টান দিই, তারপর হিম মাথায় নিয়ে ছাদভর পায়চারি করতে থাকি। মাথার ওপর আঁচড়-পাঁচড় করতে থাকে লজিকের সিলজিসম, অর্থনীতির গ্রেশামস্ ল, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধের দুন্দুভি বাজাতে থাকে স্পার্টা আর এথেনস্।

রাত আরও একটু গভীর হলে তাঁর আসার সময় হয়। শশিভূষণ নিয়োগি গার্ডেন লেনের যে মাথাটা একটু বাঁ দিকে ব্রেক নিয়ে টবিন রোডের পাঁজর ছুঁয়ে দিয়েছে, সেই অসমান, খোয়া-ওঠা পথ বেয়ে কুয়াশার ঠনঠনি-আঁটা গ্যাস-লাইটের ম্লান আলোয়-ছায়ায় লম্বা লম্বা পা ফেলে দুলকি চালে এগিয়ে আসতেন তিনি। ব্যাকব্রাশ করা বড় বড় চুল, খাদির পাঞ্জাবির ওপর খাদির চাপা জহর-কোট, ঠোঁটে ঘন ঘন হস্ত টানের ফুলকি-তোলা সিগ্রেট, পরনে ধুতি বা পা-জামা, পায়ে কাবলি—দু-হাত বুকের কাছে জড়ো করে শীতকাতুরে মানুষের মত দেখতাম তাঁকে মাথা গুঁজে শন শন এগিয়ে আসতে। প্রতি রাতে, প্রায় একই সময়ে।

আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের বাড়িটার দোতলায় থাকতেন তিনি, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান একটি তিন-চার বছরের শিশু। কাক-ভোরে সবুজ ঢোলা কার্ডিগান পরে ভদ্রমহিলা বেরিয়ে যেতেন রোজ—পরে শুনেছি শ্যামবাজারে এক মেয়ে-স্কুলে পড়াতেন তিনি। বাচ্চাটা অদ্ভুত—কাঁদে না কাটে না, চেঁচামেচি তো নেই-ই। একটি বুড়ি, সেই বোধহয় দেখাশোনা করত ও বাড়ির, তাকে দেখতাম মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে। এক আশ্চর্য, চুপ-চাপ পরিবেশ, মনে হত দিনরাত বাড়িটার চারপাশে যেন পুরু ভেলভেটের পর্দা টানানো রয়েছে, যা বাইরের দুনিয়াকে নৈঃশব্দ্য ছাড়া আর কিছুই উপহার পাঠায় না।

ভদ্রলোক বসতেন ঠিক আমার পড়ার ঘরের মুখোমুখি তাঁদের জানলার সামনে। টেবিলময় ছড়ানো থাকত তাঁর ডাঁই করা বই-খাতা-কাগজপত্তর। যতক্ষণ বসে থাক-তেন, হয় লিখতেন, নয় পড়তেন। এক আধদিন কি তাঁকে দেখিনি টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের এককোণে রাখা গ্রামোফোনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড চাপা সুরে বাজাতে বা আলতো নরম গলায় দু-চারটে গানের কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে? যদিও তা নিশ্চিতই কানে-ভদ্রে, তবু সেসব দিনে, মনে হত, ভদ্রলোকের লম্বা, বাদামি, বোগাটে শরীর বেয়ে মৃদু আনন্দের লহর যেন তির তির করে বয়ে যাচ্ছে।

রাত্তিরে ফিরে এসে তিনি জানলার পর্দা টান মেরে খুলে দিতেন। তা কৃষ্ণপক্ষই হোক আর শুক্লপক্ষই হোক। আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টার পর প্রায়ান্ধকার ঘরে তাঁর টেবিলকে কেন্দ্র করে একটি গোল আলোর দ্বীপ জেগে উঠত। দু-তিনটে সিগ্রেট পর পর খেয়ে ফেলতেন তিনি। একটি মোটা বই নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেন। তারপর থুতনিতে কলম ঠেকিয়ে বসে থাকতে থাকতে তারই ভেতর মাঝে মাঝে বেশ সন্তর্পণে কয়েকটা লাইন লিখতেন। লেখা হয়ে গেলে কাগজটি ভালোভাবে ভাঁজ করে একটি ফুলার-ফাইলের মধ্যে রেখে দিতেন।

তখন ঘরের ওপাশে কাদা হয়ে ঘুমোতে থাকতেন তাঁর ফর্সা গোলগাল স্ত্রী, শান্টিনের বালিশ বুকে নিয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকত তাঁর একমাত্র শিশু। লেখা সেরে উঠেই ভদ্রলোক টুক করে আলো নিভিয়ে দিতেন। আমিও খানিকটা অপ্রস্তুতভাবে আবার লজিক কি অর্থনীতির বইয়ের পাতায় ফিরে আসতাম।

শুধু একদিন দেখেছিলাম। জানি না, পাপ হয়েছিল কিনা। বা এরেই বলে কিনা পাপ। মাঝরাতে নির্ঘুম গরম মাথায় বিছানা থেকে উঠে পড়ে বয়ঃসন্ধির এক দুঃসহ প্রহরে ছাদে এসে দাঁড়াতেই ঠান্ডা হাওয়া চারপাশ থেকে আমাকে মায়ের মত জড়িয়ে ধরল। জল হয়ে এল স্নায়ু, শিরা-উপশিরা, সারা শরীর যেন ধুয়ে গেল।

হঠাৎ খুব মিহিন কাঁচ ভাঙার শব্দের মত গুঁড়ো গুঁড়ো হাসির চাপা, কাটা-কাটা ধ্বনি ইথার ভেদ করে আমার কানে এসে বাজল। ও বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, দোতলার একমুঠো ঘরটা ফিকে আলোয় সবুজ স্যাভানার মত জ্বলছে। ভদ্রমহিলা বসে আছেন, আঁচল লুটোচ্ছে খাট ছেড়ে মেঝেয়, অমন নরম আলোতেও সোনার থামের মত জ্বলজ্বল করছে তাঁর কাপড় উঠে আসা পায়ের নরম পুরুষ্টু গুঁড়ি। আর ঠিক সেখানেই ভক্তপ্রবরের মত বারবার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আমার কাছে রহস্য-ময় সেই ভদ্রলোকটি। মহিলা মাঝে মাঝে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছেন, অথচ ফলের ওপর নাছোড়বান্দা মাছির মত বারবার তাঁর হাত এসে বসছে পায়ের সেই জায়গাটিতেই। প্রায় হিস্টেরিক গলায় রিন রিন করে হেসে যাচ্ছেন মহিলাটি, হেসেই যাচ্ছেন। তারপর একসময় ভদ্রলোক একেবারে কুমায়ুনের ম্যান ইটারের মত.....।

পরে শুনেছিলাম, এক খবরের কাগজে কাজ করেন তিনি। আরও শুনেছিলাম, তিনি বেশ নাম-করা কবি। নাম জেনে-ছিলাম তাঁর, বেডিওতে কয়েকবার তাঁর ভাবী চমৎকার গলায় কবিতা পাঠও শুনেছিলাম।

একদিন কলেজ থেকে এসে দেখি, বিনা-নোটিশে চলে গেছেন তাঁরা। এখন আমার বয়স হয়েছে, সেন্টিমেন্টাল গন্ধও বেরোয় না গা থেকে। তবু সেই রাত—সেই সবুজ স্যাভানার কথা আজও ভুলতে পারি না আমি।

—অমিতাভ দাশগুপ্ত

শিকারশিল্পী জিম করবেট

বিশ্বনাথ বসু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরে খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে মেয়েটি চম্পাবতের পাশের গ্রামের বাসিন্দা। সঙ্গিনীদের সঙ্গে কাঠ কুড়োবার সময় তাকে বাঘে ধরে। অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে খবর পেয়ে গ্রামের অধিবাসীরা যখন তল্লাসীতে বেরুবার তোড়জোড় করছে তখন প্রত্যক্ষদর্শী কুড়িটি লোক গিয়ে হাজির হয়। বাঘের গমনপথ এদের জানা বলে এরাও তল্লাসী দলে যোগ দিল। দলে কয়েকটি বন্দুকও ছিল। ঢাক ঢোল পেটাতে পেটাতে এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ ও হৈ-হল্লা করতে করতে পঞ্চাশ ষাট জনের সেই খোঁজারু দল পাহাড়তলীর শেষ সীমায় গিয়ে মেয়েটির মৃতদেহ আবিষ্কার করলে। একটা পাথরের ওপর মেয়েটির দেহ চিত করে শোয়ানো ছিল। মেয়েটি অল্পবয়সী। দেখে মনে হোল যেন ঘুমিয়ে আছে। বাঘ রক্তটুকু চেটেপুটে পরিষ্কার করে রেখে গেছে। মৃতদেহ খাবার সময় পায় নি।

জিম করবেট চম্পাবতের বাংলোয় পৌঁছুলে পর স্থানীয় তহসিলদার এসে দেখা করলে এবং জানালে যে এই বাংলোটার আশপাশে অনেকগুলো লোক বাঘের হাতে মারা পড়েছে। স্থানটা মোটেই নিরাপদ নয়। কাজেই করবেটকে সে ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরের অন্য একটি বাংলোয় সরে যাবার জন্য পরামর্শ দিলে। করবেট অগত্যা ক্যাম্পের অন্য লোকদের নিরাপত্তার কথা ভেবে পরামর্শ মত অন্য বাংলোয় চলে গেছেন।

চম্পাবতের বাঘ শিকারের সময় করবেটের বয়স ও অভিজ্ঞতা খুব বেশী ছিল না। তবুও শিকারী হিসেবে তাঁর দক্ষতার খ্যাতি ছিল সব মহলে। হাতের হাতিয়ার ছাড়াও করবেটের অন্য যে মূল্যবান হাতিয়ার ছিল তা হচ্ছে তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং সহজাত সুতীক্ষ্ণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্তর্মনের প্রভাব।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও করবেট চম্পাবতের আরণ্যক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কয়েকটা দিন বাস করার পর মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন, দিনের পর দিন সর্বক্ষণের জন্য নরখাদক বাঘের রাজ্যে বাস করাটা কি অসহনীয় আতঙ্কের ব্যাপার। তিনি দশকের ওপর একটানা বহু রকম আরণ্যক ঘটনাবলীর মোকাবিলায় থেকে এবং দেখে শেষ বয়সে তাঁর সেই উপলব্ধি বেড়েছিল বই কমেনি। তাইতো ব্যাঘ্র উপদ্রুত অসহায় পল্লীবাসীর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদতো এবং তাদের বিপন্মুক্ত করাটা মহাপুণ্যের কাজ বলেই তিনি মনে করতেন।

নতুন বাংলোর আশপাশে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে করবেট অন্য বাঘের চলাচলের কিছু হদিস পেলেন। কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁর সর্বক্ষণের ধ্যানজ্ঞান তখন একমাত্র আলোচ্য নরখাদকটির নিধন।।

চম্পাবতের তহসিলদার এসেছেন। করবেট আলাপ করছেন তাঁর সঙ্গে। সামনে পাহাড়ের ঢালু পিঠটার গায়ে দু-একটা ছোট ছোট পল্লীও চোখে পড়ে। হঠাৎ করবেটের নজরে পড়লো দূর থেকে একটা লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে

ছুটতে বাংলোর দিকেই আসছে। কোন কিছু জরুরী ব্যাপার অনুমান করে করবেট ছুটে এগিয়ে গেলেন খবরটা জানবার জন্যে। খবরটা যা মিললো তা হচ্ছে—একটু আগেই গ্রামের একটি মেয়েকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে।

শোনা মাত্রই দেরী না করে রাইফেল কার্তুজসহ তহসিলদারকে নিয়ে লোকটির সংগে যত সত্বর সম্ভব তিনি গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন।

গ্রামবাসীরা উদগ্রীব হয়েই অপেক্ষা করছিল। ভীষণ উত্তেজিত তারা। হুড়বড় করে একসংগে সবাই কথা বলতে চায়। ফলে বোঝা যায় না কিছুই। একটি শান্ত প্রকৃতির ধীর মস্তিষ্কের লোক পাওয়া গেল যাকে একপাশে ডেকে নিয়ে করবেট আসল বৃত্তান্তটা শুনলেন।

পাশের পাহাড়ে একটা ওক গাছের নীচে দশ-বারোটি মেয়ে শুকনো লকড়ি কুড়োচ্ছিল। এমন সময় তাদের সংগী বোল সতের বছরের একটি মেয়েকে বাঘে নিয়ে চম্পট দেয়। তাদের সাহস হোল না একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখবার যে মেয়েটিকে সত্যিই বাঘে নিল কিনা, বা নিয়ে থাকলে বাঘটা কোন্ দিকে গেল। যাই হোক, যে লোকটি ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল তার বউও সেই দলে ছিল এবং যে গাছটির তলায় মেয়েটি আক্রান্ত হয়েছিল গ্রাম থেকে সেই গাছটি দেখা যায়। বউটি আঙুল দিয়ে করবেটকে সেই গাছটি দেখিয়ে দিল।

ঘটনাস্থলটি এখুনি পরীক্ষা করা দরকার। করবেট একাই রওনা হলেন, এবং গ্রামে বলে গেলেন হৈ চৈ না করতে ও তিনি না ফেরা পর্যন্ত সবাইকে অপেক্ষা করতে।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে করবেট দেখলেন আশপাশটা একেবারে খোলা-মেলা। এই রকম ফাঁকা জায়গায় বাঘের মত একটা বৃহৎ জানোয়ার কি করে এল এবং অতজন কাঠকুড়োনীর চোখে ধুলো দিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল, সেটা বিস্ময়কর বৈকি!

বাঘ মেয়েটিকে যেখানে মেরেছে সেখানকার মাটি রক্তে লাল হয়ে গেছে। আর তারই পাশে চকচক করছে দুর্ভাগা যুবতীটির গলার নীল পাথরের একটি ছেঁড়া হার। এই জায়গা থেকে একটি সর্পিল বনপথ পাহাড়ের গা বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেছে।

বাঘের গন্তব্যপথ আবিষ্কার করতে অসুবিধা হোল না। কারণ সারা পথেই রক্তের চিহ্ন ও ঝুলন্ত মেয়েটির পায়ের টানা দাগ ছিল। বাঘ টাটকা 'কিল' করেছে এবং ইতিমধ্যে হয়ত বেশীদূর যেতেও পারেনি। পিছু নিলে পাত্তা মিলতেও পারে। বিচক্ষণ ও সাহসী শিকারী হিসেবে করবেটের মনের গঠনই এরকম যে, জরুরী ক্ষেত্রে তাঁর মানসিক স্থৈর্য ও উদ্যোগের অভাব হয় না।

কাজেই উপরোক্ত চিহ্ন ধরে করবেট সামনে এগুলেন। পথের মধ্যে মেয়েটির কাটা গাছে আটকে থাকা শাড়ী ও একটু পরে সায়াটা পাওয়া গেল। বোঝা গেল, নরখাদকটি এবারও একটি নগ্ন নারীকে বহন করে নিয়ে গেছে। সান্ত্বনা এইটুকু যে মৃত্যু তাকে নারীসুলভ সরমের হাত থেকে রক্ষা করেছে। পাহাড়ের চড়াইয়ের দিকটা কাঁটা গাছের অগাছায় ভরা। মেয়েটির মাথার ছেঁড়া চুল কোথাও কোথাও কাঁটায় জড়িয়ে আছে দেখা গেল। কাঁটা ঝোপ পেরিয়েই সামনে পড়লো একটা বিছুটি বন।

বিছুটি বনটা কি করে পেরোনো যায় করবেট যখন এই চিন্তায় মগ্ন তখন গ্রাম থেকে একটি লোক এসে তাঁর সংগে মিলিত হোল। হাতে তার রাইফেল, পায়ে বুট জুতো।

আসবার সময় করবেট গ্রামে বার বার নিষেধ করে এসেছিলেন যে কেউ যেন তাঁকে অনুসরণ না করে।

এই নিষেধের যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে আত্মনির্ভরশীল বিচক্ষণ শিকারী মাত্রেই তা জানেন। বিপজ্জনক শিকারে দ্বিতীয় লোক সংগী থাকলে নিরাপত্তার ব্যাপারে মুখ্য শিকারীর দায়িত্ব বাড়ে, মনের একাগ্রতা ও সদা-সতর্কতা বিঘ্নিত ও নিঃশব্দ অনুসরণে অসুবিধা হয় এবং আচমকা প্রয়োজনে বন্দুক রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি ছোঁড়ায় নিজেদের দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে।

প্রশ্নোত্তরের জানা গেল তহসিলদারই পাঠিয়েছেন তাকে শিকারী সাহেবকে সাহায্যের জন্য। তহসিলদার-এর মত মাতব্বরের আদেশ অমান্য করা তার পক্ষে নাকি সম্ভব নয়। বোঝা গেল—অতি পশ্চাদপদ গ্রাম্য এলাকার তহসিলদারের শিকারের বৈজ্ঞানিক রীতিনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানগম্যি খুবই কম। এ হেন ব্যক্তির আদেশ নেহাতই যখন বাধ্যতামূলক তখন যুক্তি তর্ক বৃথা। অগত্যা করবেট লোকটিকে তার সরু ভারী বুট জোড়া খুলে লুকিয়ে রেখে খালি পায়ে পেছনে নজর রেখে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন এবং বিছুটি বনকে গ্রাহ্য না করে তিনি সিধে সামনে এগুলেন।

বিছুটি বনের শেষে রক্তের দাগ নীচের দিকে নেমে একটি সরু ও গভীর ভসকা পাথর ও মাটির নালা ধরে বেশ কয়েকশ গজ এগিয়েছে। এখানে একটি উঁচু ও নিরাপদ ঢিবি পাওয়া গেল।

তহসিলদার প্রেরিত রাইফেলধারীর উৎসাহে ইতিমধ্যে যথেষ্টই ভাঁটা পড়েছে এবং পথিমধ্যে অনবরত সে তার আশ-পাশে বাঘের উপস্থিতি সন্দেহ করছে। কাহিল অবস্থা লক্ষ্য করে করবেট লোকটিকে সেই ঢিবিটার উঠে তিনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। প্রস্তাবে লোকটি যেন হাঁফ ছেড়ে বাচলে।

ঢিবিটা থেকে শতখানেক গজ নীচে পূর্বোক্ত নালা ও একটি খাদের সংযোগ-স্থল এবং তার পাশেই একটা ডোবা। ডোবার কিনারে পৌঁছে করবেট দেখলেন জলের ধারে বেশ খানিকটা রক্তের দাগ। মেয়েটিকে এখানে এনে বাঘ ভোজ্য অংশগুলি ছিল। ইতস্ততভাবে কিছু হাড়-গোড় পড়ে আছে। আর পড়ে আছে একটি যুবতী নারীর হাঁটুর নিম্নাংশ থেকে দন্তাঘাতে বিখণ্ডিত একটি সুগোল কোমল পা। পা থেকে তখনও টাটকা রক্ত চুইয়ে পড়ছে। বহু বোমারু বিমান কৃতিত্বের অধিকারী বাঘ শিকারী জিম করবেটের জীবনে এ এক অভূতপূর্ব হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা।

আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জিম করবেট অসাধারণ সূক্ষ্ম ও সদাজাগ্রত অন্তর্মনের অধিকারী ছিলেন এবং চম্পাবাতের নরখাদকের পেছনে তিনি এক জীবনমরণ খেলায় মেতেছিলেন। পূর্বোক্ত ডোবার ধারে আমার সে উক্তির সত্যতা আর একবার প্রমাণিত হোল।

নিষ্ঠুরভাবে নিহত নারীর ছিন্ন ও রক্তাক্ত পায়ের দিকে করবেট অশ্রুসজল চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এই লোমহর্ষক দৃশ্যের সামনে তিনি যেন ক্ষণকালের জন্য তাঁর সমগ্র পারি-পার্শ্বিককেই ভুলতে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর অন্তর্মনই যেন তাঁকে চাবুক মেরে চমকে দিলে। হুঁস হোল যে তিনি তখনও একটি দুর্ধর্ষ নরখাদকের নাগালের মধ্যেই অবস্থান করছেন।

ডোবার পাড়টা প্রায় পনের ফুট উঁচু। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত প্রবণতায় রাইফেল উঁচিয়ে সেই উঁচুর দিকে চোখ ফেলতেই এক টুকরো মাটি পাড় থেকে গড়িয়ে এসে ডোবার জলে পড়লো। কি সর্বনাশ! বাঘ চুপিসাড়ে পাড়ে এসে ওৎ পেতে বসে শিকারীকে লক্ষ্য করছিল। ঝাঁপ দেবার ঝোঁকে পূর্বমুহূর্তে শিকারীর রাইফেলের নল উপরের দিকে উঠতেই বাঘ টাল সামলে নিয়ে পিছু হটেছে এবং তার পায়ের চাপে মাটির টুকরোটা স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়েছে।

বাঘ ও শিকারী এখন পরস্পরের নাগালের মধ্যে। শিকারী খুঁজছে বাঘকে। বাঘ হানতে চাইছে প্রতিরোধমূলক আকস্মিক প্রত্যাঘাত। প্রথম রাউন্ডে বাঘ পশ্চাদপসরণ করেছে। শিকারীরও জেদ বেড়েছে। বাঘকে নাগালছাড়া করা হবে না।

পনেরো ফুট খাড়া পাড়ে ওঠা মুস্কিল। শিকারী বিপরীত পাড়ের উঁচুর দিকে পিছু হটে গিয়ে এক দৌড়ে নেমে এসে সেই রোখে রোখে এগিয়ে গিয়ে কিছু আগাছা টেনে ধরে উপরে উঠে গেলেন।

পাড়ের কিনারে লতাপাতার ওপর বাঘের সদ্য অবস্থানের টাটকা চিহ্ন

রুপালী পর্দার
ফেলে আসা দিনগুলির পর
আমাদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।
কিন্তু আপনি?
ডিজাইনের বুকে বেপরোয়া
নবীন ধারা—
আধুনিক ফ্যাশানে আপনায়
করবে আত্মহারা!
বিনী
শার্টিংস এবং
সুটিংস:
মহাকাশ-যুগের
মতই নির্ভীক ও
সুদূরপ্রসারী
বিনী
TERENE বিশ্লেষণ
Interpub/BB/43/73 ben

সুস্পষ্ট। চিহ্নের সূত্রে এও দেখা গেল অদূরে একটি পাথরের ধারে মৃতদেহটি নামিয়ে রেখে বাঘ পিছু-লাগা শিকারীর খোঁজে ডোবার পাড়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে শিকার মুখে করে আবার সটকে পড়েছে।

আলোচ্য ঘটনাটি নিয়ে কুখ্যাত এই বাঘিনীর মানুষ শিকারের সর্বোচ্চ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তখন চারশো চৌষট্টি। করবেট একান্তভাবেই কামনা করছিলেন এইটেই যেন তার শেষ শিকার হয় এবং হয়ত মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন যে, ঐ সংখ্যার যাতে স্থায়ী পূর্ণচ্ছেদ টানা যায়, তার জন্য এই যাত্রায়ই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। ডোবার মধ্যের বীভৎস দৃশ্য দেখবার পর তার দরদী মনের সেই জেদ যে দৃঢ়তর হয়েছিল তার পরবর্তী কার্যকলাপে তার প্রমাণ মেলে।

সামনের বেশ খানিকটা এলাকা ঝোপঝাড়ে ভরা। মাঝের ফাঁকাগুলো সব লতাঝোপে ঠাসা। বাঘ এগিয়েছে এর মধ্য দিয়ে। জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে সম্ভব হলেও এ-পথে চলা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। আছাড় খেয়ে জখম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু করবেটের জেদি মন পশ্চাদপসরণে রাজি নয়। এগিয়ে দেখতেই হবে বাঘকে এক মুহূর্তের জন্য রাইফেলের নিশানায় আনা যায় কিনা।

বাঘ বিলক্ষণ বুঝেছে এক নাছোড়-বান্দা শিকারী তার পিছু নিয়েছে। লাশ নামিয়ে খেতে বসেও স্বস্তি নেই। লোকটার এগুনোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বিরক্তিকর। এরকম বিরক্ত আগেও যে কখনও তাকে না হতে হয়েছে এমনও নয়। কিন্তু এরকম ছিনেজোঁকের মত সর্বক্ষণ পেছনে লেগে থাকেনি কেউ কখনও। ধমক দিয়ে দেখলে হয় লোকটা ভয় পায় কিনা। বাঘ গর্জনাতে আরম্ভ করলো। 'আর এগুলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—হুঁশিয়ারিটা যেন এই রকমই আর কি!

আহারে বিরক্ত করলে বাঘের মেজাজ যে গরম হয় এবং হাঁকডাকে আপত্তি জানায়—করবেটের তা বিলক্ষণ জানা। তাঁর এও জানা আছে যে, উভয় পক্ষের এই পাশবতার পরিণতিতে হঠাৎ শিকারীরও জীবনহানি ঘটতে পারে। তা জেনেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তিনি একান্তভাবেই চাইছিলেন—আজই এই মুহূর্তে এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, এবং বেগেকুদে আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে বাঘ তার রাইফেলের নাগালের মধ্যে তেড়ে আসুক। আসছে না দেখে তাকে ক্রমাগত প্ররোচিত করতে করতে করবেট অচঞ্চল দৃঢ়তার অতি সতর্ক ও ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন।

ভুক্তভোগী ছাড়া এই সময়কার মানসিক অবস্থা অন্য কারো পক্ষে বিন্দুমাত্র কল্পনা করাও সম্ভব নয়। চম্পাবতের মত দুর্ধর্ষ নরখাদককে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি ক্ষিপ্রতাবস্থায় মোকাবিলা করার মত দুঃসাহসিকতার কথা বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে যে, বাঘ শিকার হয়ত অনেকে করতে পারেন, কিন্তু বাঘের গর্জন সহ্য করবার মত স্নায়ুশক্তির জোর খুব কম শিকারীরই আছে।

বাস্তব অন্ধকারে স্বরূপ দর্শনে বাঘের ক্রমাগত বিকট গর্জনে মাটিতে অবস্থানরত মানুষের মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা গেছে এরকম দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

করবেটের স্নায়ু ছিল ইস্পাতের মত শক্ত। তাই আলোচ্য ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল ঐরকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও উত্তেজিত বাঘকে ক্রমাগত তারস্বরে প্ররোচিত করতে করতে এগিয়ে যাওয়া।

পেটের খিদেয় হয়ত জ্বালা ধরছিল। তাইতো রক্তের দাগে প্রমাণ হয়েছিল বাঘ দশ বারো বার মৃতদেহ মাটিতে রেখে খেয়েছে। আবার তাড়া খেয়ে তুলে নিয়ে পালিয়েছে। সামনের ঝোপঝাড় নড়তে দেখা গেছে কয়েকবার। কিন্তু বাঘ নজরে পড়েনি একবারও।

বাঘ যখন বুঝল, লোকটা নেহাতই বেপরোয়া ও একরোখা এবং তাকে শায়েস্তা করা সম্ভব নয় তখন সে নিজে আপনা থেকেই চুপ করলো।

প্রায় ঘন্টাচারেক ধরে করবেট বাঘের পেছনে লেগে আছেন। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে। হিসেব মত তখনই রওনা না হলে সন্ধ্যার আগে গ্রামে ফেরা সম্ভব হবে না। এই অবস্থায় অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অনুসরণ স্থগিত রেখে করবেট ফিরলেন। সংকারে লাগতে পারে বলে মেয়েটির পাখানা ডোবার মধ্যেই মাটি চাপা দিয়ে রেখে এলেন, যাতে পরদিন খুঁজে পাওয়া যায়।

মানুষখেকো বাঘের পেছনে লেগে ফিরতে এতটা দেরী হলে, অধিকন্তু নির্দিষ্ট দিক থেকে বাঘের গর্জন কানে এলে স্বভাবতই মনে হবে শিকারী নির্ঘাত বাঘের হাতে মারা পড়েছে।

তাইতো টিবির ওপর বসিয়ে রেখে যাওয়া রাইফেলধারী মানুষটা করবেটের মৃত্যু আশঙ্কা করে একা একা জঙ্গল পথে গ্রামে ফেরার দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিল। করবেট সশরীরে জীবিতাবস্থায় ফিরে এসে যখন তাকে টিবি থেকে নামালেন তখন বেঁচোবার ধড়ে প্রাণ এলো।

লোকটি রাইফেলধারী হলেও সে শুধু দুর্বলচিত্তই নয়, রাইফেল হাতে চলাফেরায়ও একের নম্বরের আনাড়ী তা বোঝা গেল। এরকম লোকের সামনে চলা বিপদ আছে বুঝে করবেট একটু পরে তাকেই সামনে দিলেন। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। পথের মধ্যে একবার পা হড়কে পড়ে যাবার পর দেখা গেল তার রাইফেলের ব্যারেল করবেটের দিকেই উদ্যত। কি সাংঘাতিক অবস্থা! এইভাবে চললে সঙ্গীর গুলিতেই যে কোন সময় প্রাণ যেতে পারে।

এই লোকের পাল্লায় পড়েই কলকেতে সারা জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এবং সে কথা মনে রেখে ভবিষ্যতে কখনও বাঘ শিকারে গেলে সঙ্গী নিতেন না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু গাড়োয়ালের কমিশনার সতর্ক শিকারী মিঃ ইবট্‌সনের ক্ষেত্রে। আনাড়ী সঙ্গী নিরস্ত্র হলে তার নিরাপত্তার বাড়তি দায়িত্ব ঘাড়ে চাপে। সশস্ত্র হলে তার অসতর্ক গুলিতে নিজের জীবন যেতে পারে।

লোকটির জুতো খুঁজে পরে নিতে বলে করবেট একটা সিগারেট মুখে দিয়ে পরের দিনে প্ল্যান ছকে নিতে বসলেন।

বাঘিনীর যেরকম রাক্ষসী খিদের আভাস পাওয়া গেছে তাতে সে তার শিকারের অবশিষ্ট ভাগটুকু সেই রাত্রের মধ্যেই শেষ না করে ছাড়বে না। ফলে কাল সারাদিন সে সমানে বিশ্রাম নেবে। তার বিশ্রামের ডেরা খুঁজে বের করে গুলি করা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। গুলি ব্যর্থ হলে তাড়া খাওয়া বাঘের ভবিষ্যতে খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে। এই পরিস্থিতিতে তাকে জঙ্গল খেদিয়ে বের করে গুলি করাই সহজ।

করবেট যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে লক্ষ্য করলে উত্তর পাহাড়ের গায়ে এক মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ একটা গভীর জঙ্গল চোখে পড়ে। আশপাশের চাইতে এই এলাকাটিই বাঘের আরামদায়ক বিশ্রামস্থল বলে মনে হোল। এর নীচের দিক পশ্চিম দিক থেকে আসা পূর্বমুখী একটি ছোট নদী তারছাভাবে নেমে গিয়ে পাথরের গায়ে বাধা পেয়ে একটি সরু খাদ বেয়ে এগিয়ে গেছে। পারিপার্শ্বিক বিচার করলে করবেটের মনে হোল তাড়া খেয়ে বাঘ নিশ্চয়ই ঐ সরু খাদটা পেরোবার চেষ্টা করবে এবং গুলি করার সুযোগও মিলবে।

গ্রামে ফিরে তহসিলদারকে পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বলে করবেট বিটার

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম বি বি এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম বি বি এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬.
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫৩ সূর্যসেন স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৩.৩০ দিলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়

সংগ্রহ সম্ভব হবে কেনা জিজ্ঞেস করলেন তহসিলদার ভবরা দিলেন. গ্রামের মোহোট যে গাছতলায় মাথা পড়োছল পরদিন সকাল দশটা নাগাদ সবাইকে সেখানে জড়ো হতে বলে করবেট বাংলোয় ফিরে গেলেন।

পরদিন সকাল সকাল ভরপেট ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে করবেট বেরিয়ে পড়লেন এবং ক্যাম্পের লোকজন বলে গেলেন তল্পিতল্পা বেঁধে নিয়ে তারা যেন চম্পাবতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। কারণ করবেটের বিলক্ষণ জানা ছিল আজকের জংগল খেদানো যদি বিফল হয়, তবে বাঘ নিশ্চিতই দীর্ঘদিনের জন্য চম্পাবতের জংগল ছেড়ে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে তথা আর এদিকে থাকার দরকার হবে না।

সকালে বেরিয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকাটা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে পরিকল্পনার নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে করবেট নির্দিষ্ট গাছতলায় এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাঘটা একে তো নরখাদক, তায় তার দৌরাত্ম্যে গ্রামবাসীরা এত আতংকিত যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিটার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা করবেটের সন্দেহ ছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তহসিলদারের প্রভাবে গণ্ডি-মুদ্দি করে এলেও প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে অনেক তাঙ্গনী ও বেআইনী বন্দুক ছিল। সেগুলির জংগল খেদানোর কাজে আসার পর কোন শাস্তি দেওয়া হবে না। উপরন্তু বিনা পয়সায় প্রয়োজনীয় গুলি-বারুদ দেওয়া হবে—তহসিলদারের পক্ষ থেকে ঐরূপ ঘোষণার ফলেই সেদিন বেআইনীসহ অত বন্দুকের আমদানি হয়েছিল।

নির্দিষ্ট লাইনে নিয়ে গিয়ে লাইন করিয়ে শিকারী বিটারদের উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা মস্ত পাইন গাছ দেখিয়ে বললেন—সেখানে দাঁড়িয়ে ইসারা দিলে পর তারা যেন যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে, ঢাক-ঢোল পেটায়, বন্দুকের শব্দ করে এবং উপর থেকে বড় বড় পাথর নীচের দিকে গড়িয়ে ফেলে। উপদেশটা ঠিকমত বুঝিয়ে দিয়ে করবেট নির্দিষ্ট পাইন গাছটার দিকে রওনা দিলেন।

বোধহয় আপন নিরাপত্তার কথা ভেবেই তহসিলদার শিকারীর সংগ ছাড়তে চাইলেন না। কিন্তু গোল বাধালো তাঁর জুতো জোড়া। মোটা শক্ত ও কর্কশ চামড়ার জংলি নাগরা। তহসিলদারের পায়ে ফোস্কা পড়ে তাঁর হাঁটার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। অগত্যা তিনি জুতো খুলতে বসলেন। কি ঝকমারি। তহসিলদারের মত গ্রাম্য মাতব্বর যাঁর সহযোগিতার ওপর এ ধরনের শিকার পরিকল্পনা প্রধানত নির্ভরশীল, বিরক্ত হলেও করবেট তাঁকে কিছুই বলতে পারছেন না. শুধু মনে মনে-জ্বলছেন। উপায় কি?

ঠিক এইসময় শিকারী ইসারা দিতে ভুলে গেছেন মনে করে পাশ উপদেশ সব ভেস্তে দিয়ে বিটাররা ওদিক থেকে অসময়ে বাঘ খেদানো সোরগোল শুরু করে দিল। উপায়ন্তর না দেখে করবেট তহসিলদারকে জেছনে ফেলে রেখেই গাঁটি নেবার জন্য ছুটলেন। পূর্বোক্ত খাদটার ধারে-কাছে কোথাও ঘাঁটি নেবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে খাদ এখনও হাতেড়ক গজ দূরে। সে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে সুবিধাজনক কোন স্থান নির্বাচনের আর সময় নেই, এবং সে চেষ্টা করতে গেলে ব্যাপারটা বাঘের নজরে পড়ে যেতে পারে। আছাড়িপিছাড়ি ছুটে গিয়ে সামনে একটা ছোট ঘাস-জমিন দেখে করবেট, সুগতা পেছনে পাহাড়ের আড়াল রেখে, সেই ঘাসের মধ্যেই বসে পড়লেন। খাদটার অবস্থান রইল তখন শিকারীর বামপার্শ্বের ঈষৎ পেছন দিকে তেরছা-ভাবে। মুট দুই উঁচু ঘাসে শিকারীর দেহের অর্ধেকটা মাত্র আড়াল হোল। তবুও বলা যায়, এই অবস্থায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলে বাঘের নজর এড়ানো হয়ত সম্ভব হবে।

ওদিকে বিটারদের প্রচন্ড সোরগোল চলছে। করবেটের হাতে পাঁচশো পয়েন্টের কর্ডাইট লং-রেঞ্জ রাইফেল। উপরের ঘন জংগলের নীচকার খোলামেলা এলাকাটা তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তন্নতন্ন করে খুঁজছেন। এমন সময় দেখা গেল তিনশো গজ আন্দাজ দূরের একটুকরো ঘাস-জমিন ভেঙে বাঘটা নেমে আসছে। শিকারী থৈর্য ধরে আছেন তার খাদ পর্যন্ত নেমে আসার অপেক্ষায় এদিকে তহসিলদার জুতো খুলে রেখে এগিয়ে এসে যে কিছুটা উপরের দিকে লুকিয়ে বসেছিলেন শিকারী তা জানতেন না।

বাঘটা ঘাসবনের পথে সবে কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় উল্টো দিকের একটু উঁচু স্থান থেকে পর পর দুটো গুলির শব্দ হোল। আসলে শব্দ হোল তহসিলদারের বন্দুকের। অর্থাৎ বাঘ দেখেই ভয়ই হোক বা সাহসেই হোক, তহসিলদার বন্দুক তুলেই হুড়বড় করে দুটো ফায়ার করে দিয়েছেন।

সামনের দিক থেকে বন্দুকের শব্দ শুনেই বাঘ পেছন ফিরেই ছুট দিল যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকে। তহসিলদারের কাণ্ডকারখানায় করবেট হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তবুও পলায়নপর বাঘ জংগলে ঢোকার আগেই তিনি অভ্যস্ত হাতে রাইফেল তুলেছেন।

নরখাদক হিংস্র বাঘ ফিরেছে বিটারদের দিকে। করবেট ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন ওদিকে কি অঘটনই না ঘটে ভেবে। তিন গুলির আওয়াজ কানে যেতেই বিটাররা ভাবলে বাঘের দফারফা নিশ্চয়ই। অতি উৎসাহে তারা শেষবারের মত প্রচন্ডভাবে হল্লা করে উঠলো। সেই হল্লায় বিরক্ত বাঘ আচমকা বাঁ দিকের একটা ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এসে নদীর জলটা টপকে খাদের দিকে এগিয়ে গেলো মুহূর্তে শিকারীর হাতের রাইফেলও গর্জিয়ে উঠলো। বাঘ থমকে গিয়ে একটু ঘুরে দাঁড়ালো। মাত্র তিন গজের মাঝায় সে তখন। খুবই জরুরী পরিস্থিতি। ফলাফলের হিসেব-নিকেশ পরে হবে। বাঘ এবার বেশ ভাল টারগেটই দিয়েছে। এ-সুযোগ ছাড়া চলে না। শিকারী গুলি চালালেন বাঘের ঘাড় বরাবর। তৃতীয় গুলি খেয়েও বাঘ শুধু কান ভেঙে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

শিকারীর রাইফেলের গুলি শেষ। তিনটি মাত্র গুলি এনেছিলেন তিনি। এই ধরনের শিকারে দুটোর বেশী গুলি করার সুযোগই মেলে না। তৃতীয় গুলিটি নেহাতই আত্মরক্ষার জরুরী প্রয়োজন।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকেও সৌভাগ্য-বশত শিকারীকে আক্রমণ না করে বাঘ ধীরে ধীরে ডাইনে ঘুরে জল পেরিয়ে চড়াই ভেঙে সম্ভবত আশ্রয়ের খোঁজে এগোতে থাকলো। বাঘতো আবার নাগালের বাইরে যাবার উপক্রম করছে। হাতে গুলিশূন্য রাইফেল। এখন কি করা?

একটা ঝোপের ধারে পৌঁছে বাঘ মহা-আক্রোশে গাছগাছড়ার উপর দাপট দেখাতে আরম্ভ করলে। অভিজ্ঞ শিকারীর বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে এই আস্ফালন বাঘের দৈহিক যন্ত্রণার লক্ষণ। অর্থাৎ গুলির আঘাত বেশ মারাত্মকই হয়েছে। এখনি ওকে ঘোঁটা দরকার।

আহত বাঘকে সামনে রেখে নড়াচড়া বা শব্দ করা উচিত নয়। বিপদ ঘটতে পারে। তবুও শিকারের সেই অলিখিত অবশ্যপালনীয় রীতিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমান্য করে করবেট তহসিলদারকে চেঁচিয়ে বললেন তাঁর বন্দুকটা পৌঁছে দিতে। উত্তরে তহসিলদার কি যে বললেন বোঝা গেল না। তহসিলদারের কথা বোঝা না গেলেও তিনি যে তখনও অনড় হয়ে বসে আছেন এটা বুঝতে শিকারীর অসুবিধা হোল না। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে তিনি ছুটে গিয়ে তহসিলদারের হাত থেকে বন্দুকটা, বলতে গেলে, ছিনিয়েই নিয়ে গেলেন।

নীচে নেমে জল পেরোতে গিয়ে করবেট দেখলেন বাঘটা তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় মুখব্যাদান করে তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। গুলি করবার জন্য বন্দুক তুলতে গিয়ে শিকারী অবাক বিস্ময়ে দেখলেন বন্দুকের নল ও বাঁটের সংযোগস্থলে বেশ খানিকটা ফাঁক। এহেন বন্দুক ছুঁড়লে নির্ঘাত বন্দুকটাই ফাটবে, নইলে গুলি বেপথে ছুটবে। বাঘ ইতি-মধ্যে প্রায় বিশ ফুটের মাথায় পৌঁছে গেছে। আর বাঁচোয়া নেই।

নড়বড়ে বন্দুকটি সম্বন্ধে ভরসা এইটুকুই যে একটা আগে তহসিলদার যখন একসঙ্গে দুটো গুলি ছুঁড়েছিলেন তখনও সে ফাটেনি। তবে প্রচন্ড ধাক্কা যে অনিবার্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যা থাকে কপালে বলে শিকারী বাঘের হাঁ-করা মুখের নিরিখে গুলি

করলেন। গুলি মুখে না ঢুকে আঘাত করলো গিয়ে বাঘের ডান থাবায়। তবু বক্ষে যে গুলি তার আপন লৌহাধারকে না ফাটিয়ে বেপথে ছুটে গিয়ে বাঘের থাবার যেটুকু আঘাত করেছে তাতেই সে মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর ওঠেনি। অর্থাৎ প্রাণশক্তি তার আগেই নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। থাবার শেষ আঘাতটা ছিল উপলক্ষ মাত্র।

কুখ্যাত বাঘিনীটা শেষপর্যন্ত সত্য সত্যই মারা পড়েছে দেখে কিটারদের সবাই যেন আনন্দের আতিশয্যে পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। তারা এতটা উত্তেজিত হয়েছিল যে শিকারী ও তহসিলদার উপস্থিত না থাকলে হয়ত জানোয়ারের দেহটা টুকরো টুকরো করে কেটেই ফেলতো। অবশ্য তাদের উত্তেজনার কারণও ছিল। বাঘিনীটার দীর্ঘদিনের দৌরাত্ম্যে ওদের প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন দিক দিয়ে কষ্ট পেয়েছে। এমনকি এমন একজন হতভাগ্যকেও পাওয়া গেল, যার স্ত্রী ও দুটো ছেলেই বাঘিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

বাঘিনীটাকে চম্পাবতের গ্রামে আনা হলে খবর পেয়ে চতুর্দিকের গ্রাম গ্রামান্তর থেকে অজস্র লোক এসে হাজির হোল নিহত নরখাদকটিকে দেখবার জন্যে। সে যেন এক মহাসমারোহের আনন্দমেলা। হবেই বা না কেন। ডাইনী বাঘের আবির্ভাবের পর থেকে এঅঞ্চলে বিভীষিকার রাজত্ব করেছে হয়েছিল। সেই দুঃস্বপ্নের দিন আজ শেষ হয়েছে। যে পথের ধুলো বাঘিনীর দন্তাঘাতে নররক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই পথ আজ মুক্ত। সেই পথের যাত্রীরা আজ থেকে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত।

অস্বাভাবিক কোন অবস্থার বিপাকে পড়ে সাধারণত বাঘ মানুষখেকো হয় এই হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কোন্ সে অবস্থা যার বিপাকে পড়ে চম্পাবতের বাঘিনী মানুষখেকো হয়েছিল? কৌতূহলী করবেট পরীক্ষা করে সে প্রমাণও আবিষ্কার করেছিলেন। বাঘিনীর মুখের একদিককার দুটো কেনাইন দাঁতের উপরেরটার অর্ধেক এবং নীচেরটার সম্পূর্ণই ভাঙ্গা ছিল। তার ফলে সে দাঁতের জোরে বনের জন্তু জানোয়ার শিকারের ক্ষমতা হারিয়ে কমজোরী ও সহজলভ্য মানুষ হত্যায় অভ্যস্ত হয়েছিল।

কোন অনভিজ্ঞ ও নির্বোধ শিকারীর নিক্ষিপ্ত গুলিই যে বাঘিনীর এই দৈহিক অক্ষমতা এবং চারশো চৌষট্টিটি অসহায় নির্দোষ মানুষের মৃত্যুর কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অন্যদিকে সেই মৃত্যুর আতঙ্ক থেকে সেদিন শত-সহস্র আবালবৃদ্ধবনিতাকে মুক্ত করে জিম করবেট সকলের ধন্যবাদ ও আশী-র্বাদের পাত্র হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন, তাও অবিসংবাদী সত্য।

নৈনীতালে ফেরার পথে বাঘিনীর মাথা ও চামড়াটা পালি গ্রামের ভস্মীভাবা সেই বোবা মেয়েটিকে দেখানো মাত্রই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সে তার বাকশক্তি ফিরে পেয়েছিল। এটাও কর-বেটের জীবনে এক মহাবিস্ময়কর ঘটনা।

বাঘিনীটাকে শিকারের কাজকর্মে মূল্যবান সহযোগিতা দেবার স্বীকৃতি হিসাবে চম্পাবতের তহসিলদার এবং সর্ব-শেষ নিহত মেয়েটির অনুসন্ধান শিকারীর সঙ্গী জোকটিকে সরকারের তরফ থেকে যথাসৌজন্যভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

মেয়েটির হাতের কয়েকটি আঙুল অবিকৃত অবস্থায় বাঘিনীর পেট থে-ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। জিম করবে। সেগুলি পরম যত্নে স্পিরিটে ডুবিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে নৈনিতাল হ্রদের ধারে নন্দা-দেবীর মন্দিরের পাশে কবরস্থ করে-ছিলেন, দুর্ভাগা মেয়েটির আত্মার সদ্-গতির উদ্দেশ্যে।

- স্যানজাইম নিলে সব খাবার হজম হয়ে যায় আর শরীরের সঙ্গে মিশে যায় আর খিদে বাড়ে।
- স্যানজাইমে রয়েছে কেনা তৈরী হতে দেয়না এমন একটি বিশেষ উপাদান। তাই বায়ু ও ব্যথা দূর হয় নিমিষে।
- স্যানজাইম এক মুহূর্তে অম্লের উপশম করে।

আজই স্যানজাইম পরখ করুন। মাত্র ৪৯ পয়সায় ৪টি ট্যাবলেটের নমুনা প্যাক পাবেন

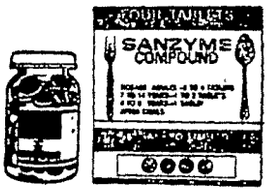

ভালো হজম মানে ভালো স্বাস্থ্য

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাসহ পুস্তিকা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায়, সব সম্ভ্রান্ত দোকানে পাবেন।

ইউনি-স্যানক্যো লিঃ
বোম্বাই-৪০০০২৬

PRATIBHA 1215-11-LOV

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক : মেসার্স প্রিমিয়ার মেডিসিন কোম্পানী, ৭৯/৮০, কলুটোলা স্ট্রীট কলিকাতা—১
কলিকাতার পরিবেশক : মেসার্স আনন্দ মেডিক্যাল এজেন্সীজ এন্ড স্টোরস, ৪, এজরা স্ট্রীট কলিকাতা—১

দশমী ।।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

যুক জুড়ানো বৃষ্টি বৃষ্টি মধ্য রাতে
দামাল হাওয়ায় ঝাউয়ের বনে লুটোপুটি
এমনি দিনে হৃদয় থেকে কে নেয় ছুটি,
তিমিরঘন রহস্যকেশ জড়ায় হাতে;

ঝড়ের প্রহর দু'চোখ জুড়ে অভীক আলো
রেশমিটানে হৃদয় কাঁপায়,—সেই তো ভালো
চোখ জুড়ানো অন্ধকারের অচিন ভাষা
হৃদয় খুঁড়লে ঝর্ণা নামে সহজ সুরে;
বৃষ্টি নামলে মধ্য রাতে ভালোবাসা,
চকিত চমক থির্‌বিজুরি হৃদয় জুড়ে!

বারবার ।।

সুচেতা মিত্র

অজস্র পথ হাঁটার পর
কেন আমার পায়ে পায়ে আসে সে
বিষণ্ণতা
তার হাত ধরে পথে বেরোই
ঘুরে ফিরে হাত ছেড়ে দিয়ে বলি
তোমাকে তো চাইনি।
সে আমার আঙুলে আঙুল জড়িয়ে
লেগে থাকে
তীব্র ঘ্রাণের মতো
পায়ের ওপর পা চেপে রেখে বার বার
পথ আগলায়
বার বার বিষণ্ণতা
বার বার আত্মনিগ্রহের মতো
আঙুলে আঙুল
পায়ে পায়ে জড়িয়ে আমার সঙ্গে আসে।

কোথাও যাবার নেই ।।

কমল চক্রবর্তী

সমুদ্রেও যেতে ভয় করে, তাহলে কোথায় যাবো?
হাবালে শঙ্খের ডাক, অন্ধকারে ঘাড় চাটে লুপ্ত সরীসৃপ
পুরনো কথকুরা কেউ ফিরবে না, সিন্ধুঘোড়ার পিঠে গাঢ় রাত
কাজু ফুলে মগ্ন বালিয়াড়ী।
তবুও সকাল হয়, প্রবাল দ্বীপের ছাদে জাগিয়া শুকোয়
এক বিদেশী নাবিক
ডানা ছেড়ে শঙ্খচিল
মানুষের ভ্রাম্যমাণ ব্যথা, তাহলে কোথায় যাবো?

অরণ্যে গাছের শব্দ, পাতার দু'ধারে তার নাম,
লিখে লিখে চলে গ্যাছে
অঞ্চল প্রধান এক সুগভীর চাঁদ, ভেজাপাতা মুখের দুধার ছুঁয়ে নারী
অদ্ভুত জ্যোৎস্নার এক ফাঁদ শরীরে জড়িয়ে হরিণ ও শিকারী
মুখোমুখি চেয়ে থাকে আহা দীর্ঘ রাত
তবু সেই কচি ডালপালা, চাঁদের কোমল গালে
ব্লেসিয়ার মেলে রাখে নারী
হায় অত্যাচারী, শরীর সাজারে বলে, বনে বনে আগুন জ্বেলেছ?

পাহাড়ে যার না ভুলে, মৃগনাভি ভোরের বাতাসে
তুমি চলে যাবে জানি নাভি খুলে দক্ষিণের ঘাসে
আজও অন্ধকার ঘরে ভাসে দেওদার বন
লণ্ঠন-লণ্ঠন ভেঙে অস্থির মৃগী ছোটে পূর্ব-পশ্চিম
আমি বেঁচে আছি। সকালের বোদে এক আশ্চর্য নূপুর
রাত্রি দিন। আমি বেঁচে আছি।
কোথাও যাবার নেই, মন্দিরেও যেতে ভয় করে।

সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ

সুখময় ভট্টাচার্য

(১)

অলংকারশাস্ত্রে একটি অলংকারের নাম হচ্ছে—'অনন্বয়'। কোনো উপমেয়ের উপমানও যদি সেই উপমেয় ছাড়া আর কিছু খুঁজে না পাওয়া যায়, তবে তেমন কথাতেই 'অনন্বয়' অলংকার হয়। 'সাগর সাগরেরই মত'। রবীন্দ্রনাথের উপমানও রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেরই মতো।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে জগতে দেশে দেশে অনেক মহাকবির আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের বিষয়ে উত্তম লেখাও রয়েছে। পরন্তু একাধারে মহাকবি, নাট্যকার, গল্পরচয়িতা, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধলেখক, গীতিকার, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রকর, সমালোচক, শিক্ষাবিদ, আদর্শ শিক্ষক এবং বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠাতা আর কেহ আবির্ভূত হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কোনো একজন মনীষীর রচনায় এরূপ বিপুল বিচিত্র ঐশ্বর্যের সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁর জীবনের সংখ্যাতীত কৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার স্পর্শে অসংখ্য বিষয় উজ্জ্বল হয়েছে। তাঁর রচনায় ভারতীয় সাহিত্য ও তার সমালোচনা অজস্র ধারায় প্রবহমান। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, মন্ত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্য, মন্বাদি সংহিতা, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাসপুরাণ, বেদান্তদর্শন, কালিদাসাদি মহাকবির কাব্য—এসকল সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও পালি, প্রাকৃত, অবদান, ভক্তমাল, মারাঠী এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা ও তন্মূলক কবিতা তিনি প্রচুর লিখেছেন।

'এই লেখাগুলি কোন এক বিশেষ সময়ে লিখিত হয়নি। মনস্বী মহাকবির জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি প্রকাশ পেয়েছে। মহামানবের লোকোত্তর প্রতিভার দীপ্তিতে অনেক কিছুই যেন অভিনবত্ব লাভ করেছে। পরন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতমূলক সকল রচনাই যে মুক্তানুগ বা বিতর্কাতীত, সম্ভবতঃ এরূপ বলা চলে না।

সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করে সংস্কৃতনির্ভর বা সংস্কৃতউপজীবক তথা সংস্কৃতগন্ধী যেসব গদ্যপদ্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, আমরা শুধু সেগুলিই আলোচনা করব।

আলোচ্য বস্তুর বিপুলতা ও গুরুত্ব এবং নিজের অনধিকারের কথা চিন্তা করে ভীত হয়েছি, তথাপি কারো সমর্থ লেখনী ভবিষ্যতে এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করে বিস্তৃত আলোচনা করবে, এই আশা পোষণ করে লিখতে সাহসী হয়েছি। এই ধৃষ্টতার কৈফিয়ৎরূপে মহাকবি কালিদাসের একটি উক্তি স্মরণ করছি—

'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।'

কালিদাস রঘুবংশের মহাপুরুষগণকে চোখে দেখেননি, পরন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং তাঁরই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে জীবন কাটাচ্ছি। অতএব আমাদের শুধু ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় নয়, কিছুটা সৌভাগ্যগর্বও রয়েছে।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-প্রীতির উৎস-সন্ধান সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সংস্কৃতের বিদ্যার্থী ও অধ্যাপকপোষণেও তাঁর উৎসাহ এবং দান উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত জানতেন, সন্তানদেরও সংস্কৃত শেখাতে তাঁর আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভালই শিখেছিলেন। পিতার এই সংস্কৃতপ্রীতি রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ গৃহশিক্ষকদের নিকট থেকে নানা বিদ্যা গ্রহণ করছিলেন। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে তিনি তাতে রস পাননি। উপনয়নের পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে সংকলিত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে প্রত্যহ তাঁকে আবৃত্তি করানো হোত। উপনয়নের পরের ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—'নূতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়িল। আমার বেশ মনে আছে, আমি 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করিতাম"।

রবীন্দ্রনাথের অনেক চিন্তাতেই এই গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়: গায়ত্রীমন্ত্রের প্রসূতিতেও হয়তো এই আত্মসমর্পণাত্মিকা মন্ত্রময়ী দেবীর মহিমা অল্প নয়।

মেঘোদয়ে তাঁর বড়দাদার মেঘদূত আবৃত্তির সময় শুধু মন্দাক্রান্তা-ছন্দের অনুকরণই শিশুকবির অন্তরকে দোলা দিত। একদা কবি তাঁর পিতার বইগুলির মধ্যে গদ্যরীতিতে ছাপানো একখানি 'গীতগোবিন্দ' পেয়ে সানন্দে সেখানি বহুবার পড়েছেন। নিজের চেষ্টায় জয়দেবের বিচিত্র ছন্দগুলি আবিষ্কার করতে তাঁর বিশেষ আনন্দ হোত। কাব্যখানির অর্থবোধে অসমর্থ হলেও শব্দঝংকারে বালকের চিত্ত ভরে উঠত। তাই তিনি সেই বইখানি একটি খাতায় নকল করে নিয়েছিলেন।

মহর্ষি সকৌশলে তাঁর এই পুত্রটিকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রতিও আকৃষ্ট করেছিলেন। পিতার নির্দেশে শিশু রবীন্দ্রনাথ 'ঋজুপাঠ'—দ্বিতীয় ভাগ ও উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করেছেন। ভাল বাংলা জানার ফলে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতশিক্ষার পথ যে সুগম হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তখন থেকেই সংস্কৃতভাষায় রচনা লিখতে মহর্ষি তাঁকে উৎসাহ দিতেন। যথেচ্ছ ভুল করলেও পিতা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। পিতার সহিত হিমালয়ে অবস্থানের সময়ও বার বছরের বালক রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে শব্দরূপ মুখস্থ করতে হোত এবং পিতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্র পাঠ করতে হোত।

একজন গৃহশিক্ষক বাংলায় তর্জমা করে রবীন্দ্রনাথকে 'কুমারসম্ভব' পড়িয়েছিলেন। প্রথম তিন সর্গ তাঁর সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ হয়েছিল। অপর একজন পণ্ডিতমহাশয় তাঁকে ব্যাকরণ শেখাবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হননি। অনিচ্ছুক ছাত্রটিকে ব্যাকরণ শেখাবার দুঃসাধ্য উদ্যমে ভঙ্গ দিয়ে পরে তিনি 'শকুন্তলা' পড়িয়েছিলেন।

এর পর রবীন্দ্রনাথ আর গুরুমুখে সংস্কৃত পড়েননি। সতেরো বছর বয়সে বিলাত যাবার পথে তিনি তাঁর মেজদাদার সঙ্গে আমেদাবাদ যান। তাঁর দাদা আমলাতে চলে গেলে পর প্রকাণ্ড বাড়ীতে একাকী বসে দাদার গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করতেন। গ্রন্থাগারে একখানি 'সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ' ছিল। সম্যক্ অর্থবোধ না হোলেও সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার ও ছন্দোমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলি পড়ে তিনি আনন্দ পেয়েছেন—তা তাঁর জীবনস্মৃতি-পাঠকদের জানা আছে।

গুরুমুখে সংস্কৃতশিক্ষা আর অল্পসব না হোলেও প্রচলিত উপনিষদাবলী, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস ভবভূতি ও বাণভট্টের কাব্যসমূহ, ভর্তৃহরির রচনা ও সুভাষিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি আনন্দের সহিত অধ্যয়ন

করেছেন। তাঁর রচনাতে এই পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। বিশেষতঃ অনবদ্য অননুকরণীয় প্রবন্ধসৃষ্টিতে তাঁর সংস্কৃতের অনুশীলন যে সর্বাধিক আনুকূল্য করেছে, তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

সংস্কৃতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা তথা অনুরাগও লক্ষ্য করবার বিষয়। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃতভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে।"

'প্রাচীন সাহিত্য'-গ্রন্থে কাদম্বরীর আলোচনায় এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

'সকলেই জানেন ভাব সত্যের মতো কৃপণ নহে। সত্যের নিকট যে ছেলে কানা ভাবের নিকট তাহার পদ্মলোচন হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবের সেই রাজকীয় অজস্রতার উপযোগী ভাষা সংস্কৃতভাষা।'

কবি সংস্কৃতকে বলেছেন—'স্বভাব-বিপুল ভাষা।' তিনি আরও বলেছেন—'সংস্কৃতভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য ধ্বনি-গাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানা যন্ত্রের এমন কনসর্ট বাজিয়া উঠে—তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে..।"

"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি-কাল থেকেই সংস্কৃতভাষার সহিত তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটেছে। এই কারণে যে বাংলা রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃতভাষার প্রভাবান্বিত তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হোতে পারবে না—এতে সন্দেহ নেই।' কবির সম্পাদিত (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত) 'কুবুপান্ডব'গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবির এই মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইটালীতে কবিকে সেখানকার বিদ্বন্মণ্ডলী সংস্কৃত কবিতা রচনা করে স্বাগত সম্ভাষণ ও বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিদেশের সুধীবৃন্দও সম্ভবতঃ কবির রচনা পড়ে তাঁর সংস্কৃতপ্রীতি তথা প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা বুঝতে পেরেছিলেন।

১৯৩১ খৃঃ ২০শে সেপ্টেম্বর, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে রবীন্দ্রনাথকে 'কবিসার্বভৌম' উপাধি দেওয়া হয়। সেই অধিবেশনেও কবি বলেছেন—যে শক্তি বাংলাভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, সে শক্তি সংস্কৃতভাষারই অমৃত উৎস থেকে সে পেয়েছে।

১৯৪০ খৃঃ ৭ই আগস্ট, অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিবর্গ শান্তিনিকেতনে এসেই কবিবরকে ডি-লিট উপাধি দিয়েছেন। সেই উপলক্ষ্যেও তিনি সংস্কৃতেই প্রতিভাষণ রচনা করেছিলেন।

আরও বহু প্রসঙ্গে তাঁর সংস্কৃতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয় পরে বিস্তৃত আলোচিত হবে।

সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে কবির একটি উক্তি 'প্রাচীন সাহিত্যে' শোনা যায়। তিনি বলছেন—'সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই।'

এই উক্তির দুটি অংশই কিতর্কের অতীত নয়। সংস্কৃত যে একদা ভারতীয় দ্বিজগণের কথ্য ভাষা ছিল, রামায়ণে (সুন্দর ৩০।১৮) তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। রামের দূত হনুমান সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় গিয়ে অশোকবনে সীতার দেখা পেয়েছেন। কোন্ ভাষায় সীতাকে সম্ভাষণ করবেন—এই ভেবে তিনি চিন্তিত হলেন। দ্বিজাতির পক্ষে সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু হনুমান্ ভাবলেন—সংস্কৃতে কিছু বললে সীতা তাঁকে মায়াবী রাবণ মনে করে ভয় পাবেন।

'যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব
সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা
ভবিষ্যতি।।'

রামায়ণের এই শ্লোক থেকে বোঝা যাচ্ছে—একদা সংস্কৃতভাষাই ভারতীয় দ্বিজাতিগণের কথ্য ভাষা ছিল। আর সংস্কৃত-ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণরূপে বলা হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। উপনিষদাদি অধ্যাত্ম শাস্ত্র, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতিসংহিতা কাব্য বিশেষতঃ রামায়ণ ও মহাভারতে যাহা বলা হয়েছে তাতে ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কিছু বাদ গিয়েছে বলে তো মনে হয় না। আজ পর্যন্ত একমাত্র জড়বিজ্ঞান ছাড়া চতুর্বর্গের অন্য যে-কোন বিষয়কে অবলম্বন করে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় যা-কিছু লেখা হয়েছে—তা আমাদের পূর্বপিতামহদের সংস্কৃতলব্ধকে অতিক্রম করতে পেরেছে কি না—সুধীজনের বিচার্য।

(২)

সংস্কৃতভাষায় রচনাসমূহের অনেক বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পড়েছে। প্রথমতঃ আমরা তাঁর বেদানুশীলনের আলোচনা করব। মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের গ্রন্থিবন্ধনের যে প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি।'

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশে মানবকগণকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'প্রত্যহ অন্ততঃ একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করো।'—এই বলে তিনি সপ্রণব-ব্যাহৃতি গায়ত্রীমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছেন।

মন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে। তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের

বাড়ির সকলের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী খাবারই দেওয়া উচিত

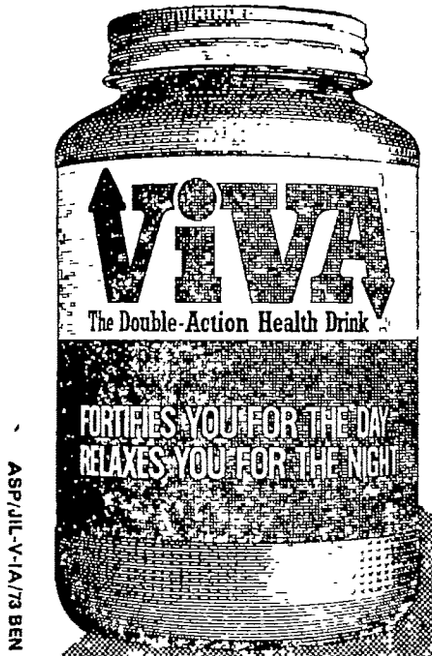

ASP/JIL-V-IA/73 BEN

বাড়ির লোকেদের ভিভা খাওয়ান.

সর্বাধুনিক খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ভিভা। এর পেছনে আছে পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণা। আর পাঁচটা খাদ্য পানীয়ের মত ভিভাতেও আছে পুরো নলীযুক্ত বাঁটি দুধ ও বাদি মল্ট। কিন্তু ভিভাই শুধু একমাত্র যাতে আছে হুইট মল্ট।

হুইটমল্ট কেন?

কারণ হুইট মল্টে রয়েছে সহজপাচ্য আকারে প্রকৃতিগত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ।

হুইট মল্ট যোগ হওয়ায় আরও নানা দিক থেকে ভিভা হয়েছে বহুগুণে ভালো। এর স্বাদ ঢের ভালো রং গাঢ় সোনালী এবং জলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওলে যায়।

সেইজন্যেই আপনাদের দৈনিক আহারের যাবতীয় ঘাটতি পূরণে ভিভার জুড়ি নেই।

আপনার হাতে এখন বেছে নেবার উপায় রয়েছে। আপনার পরিবারের পক্ষে যে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়টি আজকের সবচেয়ে ভালো সেইটি বেছে নিন।

ভিভা কিনুন।

ভারতে তৈরী করছেন:
জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভিভা
অফুরন্ত জীবনী শক্তির উৎস

ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগ সাধন করে। এই জন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম কার্যপ্রণালীর ভিতর কবির এই বিশদ ব্যাখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে। 'ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা। ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত সহজ। তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতাপরিশূন্য। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোন স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থেও একাধিক স্থানে এই গায়ত্রীমন্ত্রের মর্মার্থ প্রকাশ করেছেন। 'ভক্ত' প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন—'একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের চেতনা—এই দুইয়ের মধ্যে এক শান্তি বিকীর্ণ করছে। তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে—গায়ত্রী।'

কবি তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যের একটি কবিতায় লিখেছেন—

'প্রভাতে হে দেব তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
নিখিল কিরণে গাঁথা—
তখন ভাবতে শুনি চারিদিকে
গিরি কান্তারে বিহঙ্গপিকে
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
উঠে গায়ত্রীগাথা।'

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের কথা স্মরণ করে বলেছেন—গায়ত্রীমন্ত্রের অর্থপূর্ণ চিত্রের কাব্যের তাঁর মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এঁকে দিয়েছিল।

ঋগ্বেদসংহিতা শুক্লযজুর্বেদসংহিতা এবং সামবেদসংহিতায় গায়ত্রীমন্ত্রটি পাওয়া যায়। কবিকৃত ব্যাখ্যায় ভাবের ঐশ্বর্য থাকলেও সায়ন ও পূর্বাচার্যগণের ব্যাখ্যার সহিত তা মেলে না। ব্যাহৃতি হচ্ছে ব্যাকরণ বা উচ্চারণের ধ্বনি। ব্রহ্ম বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীকরূপে এই তিনটি মহাব্যাহৃতি ঔচ্চারণিক ধ্বনি। ইহাতে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের ইঙ্গিতও রয়েছে। সকল সংস্কার কর্মে পৃথকভাবে ও মিলিতভাবে তিনটি মহাব্যাহৃতি উচ্চারণপূর্বক আহুতি দিবার বিধান। ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি ব্যাহৃতি হলেও প্রথম তিনটি মহাব্যাহৃতি। যৌগিক স্থানবাচক অর্থ পরিত্যাগ করে এখানে বাচ্য অর্থের গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত। কূর্মপুরাণে ব্যাহৃতির আলোচনা রয়েছে। তাতেও এগুলির মন্ত্রাত্মকতাই পরিস্ফুট।

আচার্য সায়ন 'ভর্গ' শব্দে অবিদ্যা ও তৎকার্যের ভর্জনকারী বা বিনাশক স্বয়ংজ্যোতি পরব্রহ্মকেই গ্রহণ করেছেন। 'ধীমহি' পদের অর্থ তাঁর মতে—নিজের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যান করি। অর্থাৎ সেই তেজই আমি। 'সবিতুঃ' আর 'দেবস্য' উভয় পদে ষষ্ঠীবিভক্তির অভেদরূপ অর্থও পূর্বাচার্যপ্রসিদ্ধ। আচার্য সায়ন যে তিন প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন, তার কোনোটিই রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেন নি।

কবির ব্যাখ্যা থেকে একটি সিদ্ধান্ত পরিষ্কার হচ্ছে যে, দার্শনিক পরিভাষায় তিনি দ্বৈতবাদী।

'উদ্বয়ং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্।'
'অপ ত্যে তায়বো যথা, নক্ষত্রা
যন্ত্যক্তুভিঃ সুবায় কিরচক্ষসে।'
'অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ
পিপৃতা নিরবদ্যাৎ'।

অথর্ববেদের এই তিনটি মন্ত্রের শুধু আক্ষরিক অনুবাদ কবির 'তপতী' নাটকের পরিশিষ্টে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি এগুলির ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ প্রকাশ করেন নি।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ প্রজাপতিসূক্তটির কবিকৃত পদ্যানুবাদে দেখা যাচ্ছে—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'-অংশটির অনুবাদ—সেই কোন্ দেবতারে হবি মোরা করি সমর্পণ। পাঠান্তর—আর কোন্ দেবতারে দিব মোরা হবি।

সায়নাচার্য বলেছেন—'ক' শব্দের অর্থ প্রজাপতি। সৃষ্টির নিমিত্ত যিনি কামনা করেন—এই অর্থে 'কম্' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয়ের যোগে 'ক' শব্দটি নিষ্পন্ন। চতুর্থীর একবচনে 'স্মৈ' আদেশ ছান্দস। অর্থ হইতেছে—প্রজাপতয়ে। অর্থাৎ প্রজাপতির উদ্দেশে হবি সমর্পণ করি। এই ভাষ্যের মতে 'কস্মৈ' পদের অর্থ অজ্ঞাতস্বরূপস্বভাবায় দেবায়। 'কস্মৈ' পদটিকে 'কিম্' শব্দের চতুর্থীর একবচন মনে করায় রবীন্দ্রনাথকে অনুবাদে 'সেই' ও 'আর' শব্দটি যোগ করতে হয়েছে।

'ধর্ম' গ্রন্থে কবি এই সূক্তটির 'যস্য ছায়ামৃতং' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে অনুবাদে বলেছেন—'অমৃত যাহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব?' এই অনুবাদে কবির বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট। পরন্তু 'তিনি ছাড়া' এই কথাটি মূল সূক্তে নাই। ইহা একান্তই কল্পনা।

'পিতা নোঽসি—ইত্যাদি শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। শান্তিনিকেতনের প্রাতঃকালীন উপাসনায় এই মন্ত্রটি সমস্বরে উচ্চারিত হয়। মন্ত্রটির কবিকৃত পদ্যানুবাদ—'তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি, তোমায় নত হয়ে যেন মানি'—ইত্যাদি গানটি সকলেরই জানা আছে।

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে 'মন্ত্রের বাঁধন', 'প্রাণ ও প্রেম' এবং 'ভয় ও আনন্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশদরূপে এই মন্ত্রটির তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন—'জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে। ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বিভিন্ন সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি-কিছু স্থির করে নিতে হবে। মস্ত জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। .... এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না। সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—'পিতা নোঽসি।' পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। অতএব এই গভীর আত্মীয়-সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না। কেবল ভক্তির দ্বারা ও ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।'

তিনি আরও বলেছেন যে, মাতার সম্বন্ধও যেন একদিকে ওজন কম আছে। সন্তান সম্পর্কে মাতার সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাব-নিবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করে। পরন্তু পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। পিতা সন্তানকে দুঃখও দেন, শাসন করেন। এইজন্য—'পিতা নোঽসি'।

মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় কবি ঈশ্বরের পিতৃরূপের যে তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন তা অপূর্ব। মন্ত্রটির এরূপ নিগূঢ় ব্যঞ্জনা তার কেহ আবিষ্কার করেন নি। সন্তানের প্রতি অধিকাংশ মাতাপিতার আচরণ দেখেই তিনি এরূপ তাৎপর্য প্রকাশ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি ব্যাকরণের কথা বলেছেন, তা সম্ভবতঃ সুপ্রযুক্ত হয় নি। তিনি বলছেন—'যাঁকে পিতা বলে নমস্কার করেছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে শুধু পিতা বলেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা গেছে 'পিতরৌ' বলতে পিতা ও মাতা উভয়কে বুঝিয়েছে।'

আমরা বলব—শুধু মাতাপিতা কেন, একশেষ দ্বন্দ্বসমাসে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ সকল শব্দই পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ গ্রহণ করে এবং একবচনে প্রয়োগ হয়। মন্ত্রে যেহেতু 'পিতা' পদটি একবচনান্ত, সেইহেতু কবির এই কল্পনার অবকাশ কোথায়?

এই প্রণাম মন্ত্রটির সম্পূর্ণ অনুবাদই গানটির ভিতরে রয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'দ্বিধা' প্রবন্ধটিতে কবি মন্ত্রটির শেষাংশের তাৎপর্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—'অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে। দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।'

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন

বিগত ৪—৯ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত কাজাখস্তানের রাজধানী আলমা-আতায় আফ্রিকা ও এশিয়ার ৬৫টি দেশের বহু খ্যাতনামা লেখক এক সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়প্রতিষ্ঠা এবং প্রগতির সংগ্রামে এক দেশ কি ভাবে অন্যদেশের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে—লেখকগণ এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণাটি অনুমোদন করা হয় ঃ 'আমরা লেখকরা উপলব্ধি করি যে, বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রাম, মানবজাতির মুক্তির লক্ষ্যে চালিত মহান ঐতিহাসিক সংগ্রাম, সামাজিক ন্যায়ের জন্য চালিত সংগ্রাম যাকে অবধারিতভাবে গিয়ে পৌঁছতে হয় সমাজতন্ত্রে, তা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সাধারণ সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাসের সকল রকম উদ্যোগকে আমরা স্বাগত করি এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাই সোভিয়েত উদ্যোগকে।'

আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার 'লোটাস পুরস্কার' এ বছর পেয়েছেন জনপ্রিয় হিন্দি-কবি হরিবংশ রায় 'বচ্চন'। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত কবিতা-মেলায় অন্যান্যগণের মধ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বাংলার কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় রুশ কবি ইয়েভতুশেংকো, হরিবংশ রায় 'বচ্চন' ও বাংলাদেশের কবি মহাহারুল ইসলাম।

সম্মেলনের শেষে ভারতীয়, রুশ, পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীয় লেখকরা এক পৃথক মৈত্রীসভায় মিলিত হয়ে এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন ঃ আমরা আশা করছি যে, সে দিনটি আর খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন সারা এশিয়া এক স্থায়ী শান্তির অঞ্চলে পরিণত হবে এবং সমস্ত বিশ্বে শান্তিকামী শক্তিগুলির সমর্থনে এশিয়ার দেশগুলি নিজেরাই নিজেদের নিরাপত্তা বিধান করবে।

অমর মনীষী অল্-বিরুনি

সমগ্র মানবসমাজ যে এক এবং অখণ্ড তা সম্যকভাবে অনুভব করা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রসঙ্গে। গোষ্ঠীগত বা দেশগত বাধাগুলি যে কৃত্রিম এবং ক্ষণস্থায়ী তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় বিশেষ করে প্রাচীন চিন্তাবীর মনীষী এবং স্রষ্টাগণের জীবন পর্যালোচনায়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও লেনিনের শতবর্ষ এবং তার কিছু পূর্বে শেকসপীয়রের চারশতবর্ষপূর্তি প্রায় উৎসবের পর্যায়ে সারা পৃথিবীর সভ্য দেশগুলিতে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে। এঁদের চিন্তার ফসল দেশকালের সীমানা অতিক্রম করে সারা মানবজাতির কল্যাণের জন্য উদ্দিষ্ট। প্রতিটি মানুষ তাই এঁদের একান্ত আপনারজন বলেই মনে করে থাকেন।

এঁদেরই একজন ছিলেন অল-বিরুনি। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নানা বিষয়ে মানুষের জ্ঞানের পরিধির সম্প্রসারণ করাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন এবং সাধনা। এ সাধনায় তাঁর সিদ্ধিলাভও হয়েছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। আজকের দিনের একজন পেশাদার লেখকও যেখানে পনরো কি বিশখানা গ্রন্থ রচনা করতে পারেন না সারা জীবনে, সেখানে হাজার বছর পূর্বে অল-বিরুনি অন্ততঃ ১২০খানা সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন, কথাটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। যে বহু-বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে অল-বিরুনি গবেষণা ও চর্চা করে গিয়েছেন তা যথার্থই বিস্ময়কর। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ভূতত্ত্ব, ভেষজ-বিজ্ঞান এবং প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে একাদশ শতাব্দীর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন অল-বিরুনি। এ-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁর রচিত বিশ্বকোষে বিজ্ঞানীর নিষ্ঠা ও তথ্যনির্ভরতার সাক্ষ্য এ যুগের বিজ্ঞান সাধকদেরও বিস্ময় উদ্রেক করেছে।

তাঁর পুরো নাম ছিল আবু-অল-রায়হান মুহাম্মদ ইবন আহমেদ অল-বিরুনি।

অল-বিরুনির জীবন দু অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের কর্মস্থল ছিল প্রধানত আজকের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেকিস্থানে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের কর্মস্থল ছিল ভারতবর্ষ। অর্থগৃধ্নু, দুর্ধর্ষ লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদ ষোড়শ অভিযানের পর সোমনাথের স্বর্ণমন্দির লুণ্ঠন করেছিলেন ১০২৬ খৃস্টাব্দে এবং পরের বছর জাঠদের পরাজিত করে স্বল্পায়াসেই ভারতের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজসভায়, ঘটনাচক্রে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির নিয়মিত সমাগম হত যেমন 'শাহ্নামা' রচয়িতা কবি ফিরদৌসী, দার্শনিক ফারাবী, ঐতিহাসিক উৎবী এবং সর্বোপরি মনীষী অল-বিরুনি।

প্রতিভার সংস্পর্শে যে-কোন বিষয়ই বিশিষ্টতা অর্জন করে থাকে। অল-বিরুনি ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু-দর্শন শিক্ষা করেন। তাঁর রচিত 'তহ্কিক্-ই-হিন্দ' দশম ও একাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও রসায়ন প্রভৃতি নানাবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। তৎকালীন ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্মাচার তথা সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে অল-বিরুনির গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তথ্যনিষ্ঠ, এবং শ্রদ্ধাযুক্ত বর্ণনা আজকের সমাজতত্ত্ববিদগণের পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

নানাশ্রেণীর খনিজ দ্রব্যাদি তথা আকরিক প্রস্তর ও সংকর ধাতু, কাচ, পাত্র নির্মাণের মাটি এবং এনামেল ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ অল-বিরুনি তাঁর বিশ্বকোষে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। ভারতের কোনও পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে

দিগন্তের গতির কোণ মেপে পৃথিবীর পরিধির সঠিক নির্ণয় করেছিলেন তিনি। এবং পৃথিবীই যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে অন্ততঃ প্রাচ্যদেশে এ অভিমত অল-বিরুনিই সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন।

এ বছর তাঁর সহস্রবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পৃথিবীর নানা দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষকগণ নানা স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প নিয়েছেন। এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে খাস উজবেকিস্থানে। উজবেকিস্থান প্রকাশক সংস্থা ইতিমধ্যেই 'মহান চিন্তানায়ক বিরুনি' নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর দার্শনিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে আর এক-খানি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

তামিল ভাষার রুশ বিশেষজ্ঞ

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রুশীয় বিদগ্ধ-জনের আগ্রহ দেখা গেছে। ক্রমশঃ এই আগ্রহ যে বেড়েই চলেছে এটা অবশ্যই খুশীর কথা। সাত বছর আগে দ্রাবিড়বিদ্যা বিশেষজ্ঞ মস্কোর মিখাইল আন্দ্রোনভ রচিত 'তামিল ব্যাকরণ (১৯৬৬ সালে প্রকাশিত) ঐ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সর্বাধুনিক পরিচয়। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ভাষাসমূহের প্রতি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণের, এমনকি শিক্ষিত জনের মনেও একটা রীতি-মতো ভীতি দেখা যায়। অথচ এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি ভাষাই কমবেশী মানুষকে আকৃষ্ট করে থাকে। অধ্যবসায় এবং অনুশীলনের ফলে যে কোনো ভাষা যে কোনো মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা যে সম্ভব তার প্রমাণ পাওয়া যায় আন্দ্রোনভের জীবনে।

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়েই আন্দ্রোনভের মধ্যে ভাষা শিক্ষার একটা ঝোঁক দেখা গিয়েছিল এবং কয়েক মাসের চেষ্টায় তিনি দেবনাগরী লিপি আয়ত্ত করেন। তার-পর মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন ইনস্টি-ট্যুটের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে মাত্র চার বছরের চেষ্টায় বাংলা ভাষা শিখে ফেলেন। তারপরে তিনি বেছে নেন কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা—কানাড়া, মালয়ালম ও তামিল। এর মধ্যে তামিল ভাষাই তাঁকে আকৃষ্ট করে বেশী। ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি একটি বৃত্তি নিয়ে ভারতে এসে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক বি সি লিপ্তম এবং আরো কয়েকজনের তত্ত্বাবধানে গবেষণাকার্য সুরু করেন এবং তারপর স্বদেশে ফিরে গিয়ে একনিষ্ঠ সাধনার ফলে তামিল ভাষায় রীতিমতো বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাঁর 'তামিল ব্যাকরণ' সম্পর্কে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন : 'ডঃ আন্দ্রোনভ তামিল ভাষায় সুপণ্ডিত...তাঁর বইটি অত্যন্ত মূল্যবান ও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি।

তামিল ব্যাকরণ ছাড়া ডঃ আন্দ্রোনভের লেখা দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে রচিত নিবন্ধগুলিও বিদগ্ধসমাজে প্রশংসা লাভ করেছে।

১৯৭১ সালে তিনি দ্রাবিড় ভাষা তত্ত্বে রুশীয়গণের মধ্যে প্রথম ডকটরেট ডিগ্রি পান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ধারক ও বাহক হিসেবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আশী বৎসর পূর্বে। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কয়েকটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম হলো : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিত-গণ। প্রতিষ্ঠার সময়ে পরিষদের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল : 'বিবিধ উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন।' বলাই বাহুল্য যে এ ব্যাপারে পরিষদের সাফল্য ও সার্থকতা গোটা বাঙালী জাতির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১৫ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ৬৫ বৎসর পূর্বে যে 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান' সংকলন করেছিলেন, পরিষদ কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত সে-অভিধান অধুনা দুষ্প্রাপ্য। তাই পরিষদের একাশী-তম প্রতিষ্ঠা দিবসে (৮ই শ্রাবণ, ১৩৮০) সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে বাংলা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ তথা বিজ্ঞানসম্মত অভিধান বা মহাকোষ সংকলন করা হবে। এ গ্রন্থ সব দিক দিয়েই যাতে ইংরেজী ভাষার পক্ষে যেমন অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী (ডঃ জনসন সম্পাদিত) বাংলা ভাষার পক্ষেও তেমনই প্রামাণ্য মহা-কোষ হতে পারে, পরিষদ কর্তৃপক্ষ সেজন্য প্রত্যেকটি বাঙালীর উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচার করেছেন। তাঁরা বলেছেন : 'অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী প্রস্তুতে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিত সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ইংরেজী ভাষার প্রামাণ্য অভিধান প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গ-ভাষার সমস্ত সেবককে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই দুরূহ শ্রমসাধ্য ব্যয়বহুল কাজে আহ্বান করিতেছেন।'

বিগত হাজার বছর ধরে বাংলা ভাষার বিকাশে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলায় যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—সাধু, চলিত, মৌখিক বা আঞ্চলিক ভাষায় তার সবই প্রয়োগের উদাহরণসহ স্থান পাবে এই বিরাট মহাকোষে। এজন্য গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, লেখক তথা বঙ্গভাষানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির সহায়তাই সাদরে গ্রহণ করা হবে। এ-ছাড়া ২৫০৲ টাকা করে দুটি এবং ১৫০৲ টাকার একটি বৃত্তিতে তিনজন গবেষকও নিযুক্ত করা হবে।

পরিষদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরাও বহু ভাষানুরাগী প্রত্যেকের নিকট আবেদন জানাচ্ছি আমাদের ভাষার মহাকোষ সংকলনের মহৎ উদ্দেশ্যে যে যে-ভাবে সম্ভব যথাসাধ্য সহায়তা করুন।

—শ্রীজয়ন্তকুমার

নতুন বই

রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা (প্রবন্ধ)। অশোক সেন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

রবীন্দ্র-প্রতিভা আন্তর্জাতিক মেঘের মত। উনিশ ও বিশ শতক একই সঙ্গে ধরে রাখায় রবীন্দ্রমনন যেন অনেক কাল এগিয়ে আধুনিকোত্তম হয়ে আছে। শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে ও-দেশে, এ-দেশে রবীন্দ্র-আলোচনা তেমন অনুপাতে হচ্ছে না। তাই কোন রবীন্দ্র-আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হলে খুশী হবারই কথা। অশোক সেনের 'রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা'-র প্রকল্প আমাদের খুশি করেছে। কেবলমাত্র কাব্য নিয়ে এই গ্রন্থালোচনা। ইতিপূর্বে যে সমস্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, এ-গ্রন্থের বহু মন্তব্য তাতে নতুন ভাবনার যোগান দেয়। কিন্তু সমস্ত রবীন্দ্র কাব্যধারার পূর্ণ আলোচনা গ্রন্থেই দেখা যায়, কবির শেষ বয়স নিয়ে কেউ বিস্তৃত আলোচনা করেননি। কারণ কি? অশোক-বাবুও করেননি। এ-গ্রন্থে আমরা সেই অভাব তীব্রভাবে বোধ করছি। পূরবী-মহুয়া থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত বিস্তৃত আলোচনা থাকা উচিত ছিল। তবু লেখক গ্রন্থে নিষ্ঠাবান।

শারদ সাহিত্য

তুষার গ্রাম (অনুবাদ)। য়াসুনারী কাওআবাতা, অনুবাদক ঃ সন্দীপকুমার ঠাকুর। রূপা এ্যান্ড কোম্পানি, ১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছ' টাকা।

য়াসুনারী কাওআবাতা একজন বিশ্ব-খ্যাত জাপানী কথাকার। সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। কিছুকাল আগে এঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রায় তিয়াত্তর বছর এঁর বয়স হয়েছিল। এই দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য-সাধনায় কাওআবাতা কয়েকটি দুঃসাহসিক উপন্যাস লিখে গেছেন। 'তুষার গ্রাম' 'সহস্র সারস' ইত্যাদি সেরকম উপন্যাস। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পেরও লেখক তিনি। 'তুষার গ্রাম' উপন্যাসের তিন প্রধান চরিত্র—নায়ক শিমামুরা, দুই নারী কোমাকো ও য়োকো। উষ্ণ জলাধার পাশে যে সরাইখানা, তা-ই শিমামুরার প্রধানত আকর্ষণ। এখানেই দেখা হয় তরুণী কোমাকোর। কিন্তু দুজনের মন দেখা-নেয়ার মধ্যে আসে য়োকো। উপন্যাসের শেষে য়োকোর মর্মান্তিক আত্মদান ট্রাজেডির অত্যদ্ভুত বিষাদকে মেঘচ্ছন্ন আকাশের মত ঘনায়মান ও ভয়াবহ করে তোলে। কাওআবাতার উপন্যাস এক জ্বলন্ত জীবনবাসনা ও প্রেমকামনার ছবি। অনুবাদক সন্দীপকুমার ঠাকুর যথাসাধ্য ক্ষমতার সঙ্গে মূলের রস বজায় রেখে তুষার গ্রাম অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ এত সহজ, সবল ও ঝরঝরে যে বাংলাভাষার পাঠকদের কাছে আপন অন্তরঙ্গ বলেই মনে হবে উপন্যাসের চরিত্রমালা ও কাহিনীকে। মূলত এই সাহিত্যকৃতির অনুবাদে অনুবাদক অভিনন্দনযোগ্য।

যুদ্ধ যখন শুরু হয়। হেইনরিখ বোল। অনুবাদক ঃ নীহার ভট্টাচার্য। সনন্দা প্রকাশন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাত টাকা।

হেইনরিখ বোলের জন্ম উনিশশ' সতেরো সালে। উনিশশ' পঞ্চাশ এঁর প্রথম গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হলে সারা জার্মান দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বোল যে জার্মান সাহিত্যের এক ক্ষমতাবান কথাকার, আলোচ্য সংকলনের গল্পগুলি তা প্রমাণ করে। বোলের চরিত্রগুলি বাস্তবিকই এ্যান্টি-হিরো। বোল নিজেও স্বীকার করেছেন—'যাদের কথা আমরা লিখেছি তাদের জীবন কেটেছে ধ্বংসস্তূপ আর জঞ্জালের মধ্যে।' 'যুদ্ধ যখন শুরু হয়', 'যুদ্ধ যখন শেষ হয়', 'পোস্ট কার্ড', 'এটা টিবটেন' ইত্যাদি গল্পে তার প্রমাণ আছে। অনুবাদক নীহার ভট্টাচার্য অত্যন্ত সততার সঙ্গে গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন। বোলের অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে কম ছিল। ইদানীং অনূদিত হয়ে বাঙালী পাঠকদের কাছে পরিচিত হওয়ায় এদেশীয় পাঠক অনুবাদকদের কাছে যথার্থ অর্থে ঋণী থাকছেন। অনুবাদক নীহাররঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে আমাদের ঋণ সেই অর্থে স্বীকার্য।

লেখা ও রেখা ঃ ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত লেখা ও রেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকাটিতে যেসব রচনা সাধারণত প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ যেন কিছু বেশী। সাহিত্যকে এঁরা কেবলমাত্র বিনোদন বা শিল্পরূপের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্র হিসাবেই দেখেন না, এঁদের মতে সাহিত্য হবে জীবনসংগ্রামেরই হাতিয়ার। কবিতা, একাঙ্ক নাটক, প্রবন্ধ ও আলোচনা, ছোটগল্পের সমন্বয়ে প্রকাশিত শারদ সংকলনে লিখেছেন বিষ্ণু দে, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নীলরতন সেন, নেপাল মজুমদার, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, অমল দাশগুপ্ত, শচীন বিশ্বাস এবং আরো অনেকে। সম্পাদকীয় দপ্তর—১২।১সি, পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭। দাম দু' টাকা।

মহাদেশ ঃ দিলীপ সেনগুপ্ত সম্পাদিত মহাদেশের বর্তমান শারদীয় সংখ্যায় প্রবন্ধ ছাড়া কবিতা লিখেছেন নিখিলেশ দাশ, ঋত্বিক ঘটক, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দ্রনাথ মিত্র, অশোককুমার সেনগুপ্ত, দিলীপ সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং আরো কয়েকজন। ২-এ, সুরেন্দ্র এভিনিউ রোড থেকে প্রকাশিত।

কৃত্তিবাস ঃ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার ঐতিহ্য মননশীল পাঠক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন। বর্তমান শারদ সংকলনের রচনা নির্বাচন, মুদ্রণ, বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবনানন্দ দাশের দুটি অপ্রকাশিত কবিতা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিদের অনেকেই লিখেছেন। মণীন্দ্র রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং বাঞ্ছিত সিংহের তিনটি আলোচনাই বিদগ্ধ পাঠককে ভাবিত করবে। ৬, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের এই সংখ্যাটির দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সারস্বত ঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত সারস্বত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রগতিশীল ও সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন [illegible] কবিতা, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য সম্ভারে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। বর্তমান সংখ্যাটিও আগেকার সংখ্যাগুলির তুলনায় বহু গুণে বেশী আকর্ষণীয় হয়েছে। অশোক ভট্টাচার্যের [illegible] প্রবন্ধ এবং কার্তিক লাহিড়ীর উপন্যাসটি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু দে স্মরণ মিত্র, সুশীল রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, মৃগাঙ্ক রায়, তরুণ সান্যাল, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন। কয়েকটি প্রবন্ধ ও গল্প আছে। সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ পিকাসোর কয়েকটি স্কেচ। ২০৬, বিধান সরণি থেকে প্রকাশিত এই বিশেষ সংখ্যাটির দাম দু' টাকা।

ছুটি ঃ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ছুটির সম্পাদক কনকেন্দু মজুমদার। লিখেছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রভাত দেবসরকার, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র আচার্য, সুনীলচন্দ্র সেন, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাধনা মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। ৩৭, রসা রোড। সাউথ থার্ড লেন। কলকাতা-৩৩, দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সপ্তাহ ঃ নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি মূল্যবান আলোচনা স্থান পেয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমন্ত ভট্টাচার্য, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নারায়ণ কল্যাণ কৃষ্ণান, কল্যাণ দত্ত, সুনীল সেন, বিমান মিত্র, অমিয়া

নতুন উপন্যাস!

প্রফুল্ল কুমার সিংহের **জনপদ** ৮৲

এ যুগের কসমোপলিটন সমাজের দিকভ্রান্ত মানুষের অন্তরের চলচ্চিত্র

অদ্রীশ বর্ধন অনূদিত কোনান ডয়ালের বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনী

শার্লক হোম্‌স্‌ ফিরে এলেন ১০৲

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা ১০৲

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ ॥ হেনা চৌধুরী ১০৲

সকল প্রকার বই-এর সুষ্ঠু প্রকাশনা, পরিবেশনা ও প্রচারের জন্য লিখুন ঃ—
অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌ লিঃ, ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২

দেব, নির্মল সেনের আলোচনাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। দুটি কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং প্রদ্যোৎ গুহ। কবিতা লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্ত ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন এবং আরো কয়েকজন। ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দাম দুটাকা।

গ্রন্থ জগৎ : সম্পাদক—অনিলকুমার ভৌমিক। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতির মুখপত্র গ্রন্থ জগতের বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশন-শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষক উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাটি গ্রন্থপ্রেমী ও সংস্কৃতিবান প্রত্যেকেরই সংগ্রহ করা উচিত।

বিশ্ববার্তা : সম্পাদক কালীপদ চক্রবর্তী। প্রতি বছরের মত এবারও বিশ্ববার্তা অসংখ্য রচনা সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ৪৪।৪ গরচা রোড। কলকাতা-১৯। দাম দুটাকা।

বিচিন্তা : নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সম্পাদিত বিচিন্তায় লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অরুণ মিত্র, সুনীল সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত চক্রবর্তী, কৃত্তিবাস ওঝা, পবিত্রোষ রায়, চিত্ত ঘোষ, ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এবং মণিভূষণ ভট্টাচার্য। এভ্‌তুশেঙ্কোর একটি কবিতা অনুবাদ করেছেন চিত্ত ঘোষ। রেবটস্ট রেশটের একটি নাটকের প্রথম অংশ অনুবাদ করেছেন অশোক সেন। ৪৭ শশিভূষণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সূত্রধার : শ্রীরাজিৎ দত্ত সম্পাদিত নাটক ও পত্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক সূত্রধারের বর্তমান সংখ্যায় নাটক ও নাটক বিষয়ে লিখেছেন কল্লোল মজুমদার, শিশিরকুমার দাস, নীতীশ সেন, হরিহর ভট্টাচার্য, জগমোহন মজুমদার, অজিত দত্ত। ৭০ প্রেস রোড, নয়াদিল্লী-১১০০০১। দাম দুটাকা।

মূল্যায়ন : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার এবং নরহরি কবিরাজ। মূল্যায়ন রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছেন দেবেন দাস, রণধীর দাশগুপ্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুব্রত রায়, বিভাস ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, পরিমলচন্দ্র ঘোষ এবং নির্মাল্য বাগচী। ১০ বন্ডেল রোড, কলকাতা-১৯। দাম তিন টাকা।

কালি ও কলম : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধই বর্তমান সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটি উদ্ধার যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে। করেকটি গল্প এবং কবিতা লিখেছেন প্রখ্যাত এবং স্বল্পপরিচিত লেখকেরা। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

সীমান্ত : গণেশ বসু ও দীপেন রায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা সীমান্তের বর্তমান সংখ্যায় কবিতা লিখেছেন প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবিরা। জর্জ টমসনের 'মার্কসবাদ ও কবিতা' প্রসঙ্গে আলোচনাটির একটি অংশ আছে বর্তমান সংখ্যায়। ৩১।২ হরতকীবাগান লেন, কলকাতা-৬। দাম এক টাকা।

তরুণতীর্থ : তরুণসাথী সম্পাদিত এবং ১৮।২ ছকুখান সামা লেন, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিশু মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক এবং আরো অনেকে। দাম দুটাকা।

নহমৎ : সম্পাদকমন্ডলী সম্পাদিত। অশোকনগর ও বারাসাত থেকে প্রকাশিত। গল্প কবিতা ও প্রবন্ধের সমাবেশে আকর্ষণীয়। রুচিশীল পত্রিকাটিতে একালের ভাবনাচিন্তার ছাপ স্পষ্ট। দাম দুটাকা।

সাহিত্য চিন্তা : কিরণশঙ্কর সেন সম্পাদিত সাহিত্য চিন্তার বর্তমান সংখ্যাটিতে দুটি গল্প লিখেছেন অমল দাশগুপ্ত এবং সত্যপ্রিয় ঘোষ। জীবনানন্দ দাসের অগ্রন্থিত কবিতাসহ একালের বহু প্রতিষ্ঠিত ও তরুণ কবির কবিতা আছে। কয়েকটি অনুবাদ কবিতা এবং আলোচনা আছে। এজরা পাউন্ডের কয়েকটি চিঠি অনুবাদ করেছেন বিজয় সেন। ৩১১ গাঙ্গুলী-বাগান, কলকাতা-৪৭। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অশেষ : সম্পাদকমন্ডলী সম্পাদিত। ২৬ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৪। দাম ষাট পয়সা।

স্বরবর্ণ সংলাপ : সুভাষ কর সম্পাদিত মননশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৫ সোদপুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা-৪২। দাম দুটাকা।

অজন্তা : দীপক গাস্তগীর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। বেশির ভাগ লেখকই স্বল্পপরিচিত। ২৩৬ বৌবাজার স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা ত্রিশ পয়সা।

বোম্বাই বিচিত্রা : সম্পাদকমন্ডলী সম্পাদিত। কেবল রচনা বৈচিত্র্যে নয় সুসম্পাদনায় পত্রিকাটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোক ধরের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদে সমৃদ্ধ। ফ্ল্যাট-২১ মানবমন্দির। ৩৪ গুরুলীহিল এস্টেট। বোম্বাই ৪০০০১৮। দাম দুটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নবতমা : সুতপা চক্রবর্তী সম্পাদিত। এবারের নতুনতম শারদ-সাহিত্য সংকলন 'নবতমা'। আকারে আঙ্গিকে, রেখায়, লেখায় এবং আলোকচিত্রে নবতমা নিঃসন্দেহে নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই সংকলন-খানিতে যেমন লিখেছেন প্রবীণ সাহিত্য-রথীরা, তেমনি এতে উপস্থিত আছেন শক্তিসম্পন্ন নবীন-লেখকগোষ্ঠী, যাদের রচনা সংকলনখানিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এতে রয়েছে উপন্যাস, গল্প, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা, ব্যঙ্গ রচনা, ছায়াছবি, নাটক ও খেলাধূলা বিষয়ক আলোচনা। আর্ট প্লেটে ছাপা ছবিগুলি পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মূল্য মাত্র সাড়ে তিন টাকা।

কৃশানু : দীনেশচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত মননশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক কৃশানু মূলত গল্প পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পগুলি পাঠককে আকৃষ্ট করবে। ৫৯।২ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম—এক টাকা।

মানব মন : ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটিতে কয়েকটি সুচিন্তিত আলোচনা আছে। সমাজসচেতন পাঠক এই পত্রিকাটিতে নতুন চিন্তার সন্ধান পাবেন। ১৩২।১এ বিধান সরণী, কলকাতা—৪। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আন্তর্জাতিক : কমল সমাজদার সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের মুখপত্রটিতে বিশ্বপরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কবিতা, গল্প ও রম্যরচনায় সমৃদ্ধ। ১৪৪ লেনিন সরণী। দাম—তিন টাকা।

গুপবার্তা : সুখময় চক্রবর্তী সম্পাদিত। অন্যবারের মত মূল্যবান প্রবন্ধ সমৃদ্ধ না হলেও বর্তমান সংখ্যাটিও রাজনীতি সচেতন পাঠককে ভাবিত করবে। প্রবন্ধ ছাড়াও আছে কবিতা এবং ব্যঙ্গ রচনা। ৩৭ বিপণ স্ট্রীট কলকাতা-১৬। দাম তিন টাকা।

সংবর্ত : সৌমেন ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ বিষয়ক ত্রৈমাসিক। বর্তমান সংখ্যার জীবনধর্মী গল্পগুলি সব থেকে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ আছে। দুর্গাপুর সাহিত্য পরিষদ। প্রোজেক্ট প্রেসভবন। দুর্গাপুর-১৩। দাম এক টাকা।

নামনেধু : উত্তরণগোষ্ঠীর সাহিত্য পত্রিকা। নানাধরনের বৈচিত্র্যময় রচনায় সমৃদ্ধ। খ্যাত ও অখ্যাত সব ধরনের লেখকের সমাবেশে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ৩২।৩ চন্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা-৪০। দাম দুটাকা।

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(৪০)

ঠাট্টা করে কথার পিঠে কথায় দিদিকে যা বললাম, সেই কথাটাই মনের মধ্যে পাক খেতে লাগলো।

পাক খেতে লাগলো গানের লাইন হয়ে—

'তোর সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ,
সুরেরি বাঁধনে—'

হ্যাঁ, এ এক অপূর্ব বাঁধন।

'প্রেম-ট্রেম' নিয়ে মনে মনে অনেক গবেষণা করেছি এযাবৎ (অকালপক্কদের যা হয়) এখন একটা সিদ্ধান্তে এলাম।

'প্রেম' মানে রুচির মিল।

রুচিই তো সুর।

মার সেদিনের কথায় মেজদা বোধহয় এই সংকল্পে স্থির হয়েছিল, বাড়িতেই বেশী থাকবে না আর, অতএব আড্ডাও বসবে না বাড়িতে। অর্থাৎ আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

মার অবশ্য এতেও অনুযোগ অভিমান থেমে উঠছিলো, 'কী পৃথিবীই হয়েছে! কারুর আর এতোটুকু 'ন্যা' সয় না। পেটের ছেলে, তাকেও একটা ন্যায্য-অন্যায্য বোঝা-বার জো নেই। কথা কইলেই ফাঁসির হুকুম। আর আমরা? কতো লোকের কতো কথাই সয়েছি!'

এটা অবশ্য দারুণ সত্যি।

এই তো চোখের ওপরই দেখলাম।

আবার দিদিকেও দেখছি, মানে শুনছি, শ্বশুরবাড়ির জ্বালাটাই তো ওর গল্পের একমাত্র বিষয়বস্তু।

শুধু শাশুড়ী-পিসশাশুড়ীই নয়, নাকি যে পায় একহাত নেয় ওকে। চেহারে মার মারার মতো আর কি। 'মার যখন খাবেই পড়ে পড়ে' তখন আমিও একটু হাতের সুখ করে নিই।' এই আর কি!

আসলে একাল সেকাল বলে কিছু নেই। যে যার স্বভাবে চরে খায়, করে খায়। কেউ মরে, কেউ মার খায়।

তবে আশ্চর্য এইখানেই, মার যারা খায়, তারা সেইটাকেই এমন স্বাভাবিক বলে মনে করে যে, পরবর্তীকালে অহরহ নিজের সেই মার খাওয়া অবস্থাটাকেই আসল আদর্শ বলে চালাতে চেষ্টা করে, চালাতে না পারলে সমালোচনা করে।

মাও তাই আক্ষেপ করেন, 'আমরা কতো সয়েছি!'

আমার আবার এমন দুষ্ট স্বভাব যে, ঘতেই প্রতিজ্ঞা করে মরি মার মুখের ওপর কিছু বলবো না, ঠিক এক সময় বলে বসি।

একদিন অমনি মার ওই আক্ষেপের সময় বলে বসলাম, 'তা এই তো তোমার বেশ ভালো হয়েছে মা। বাড়িতে আর আড্ডা-ফান্ডা-র বালাই নেই, অশান্তিও নেই। নিশ্চিন্দি আছো।'

মা যথারীতি কাঁদলেন, কপালে করাঘাত করলেন, ধাড়ি আইবুড়ো মেয়ের মা হওয়ার যে কী জ্বালা, সে-জ্বালা যেন আমায় ভবিষ্যতে বুঝতে হয়, এই রকম একটা অভিশাপজাতীয় বাণীও উচ্চারণ করলেন, এবং বাবাকে ডেকে ডেকে বকা-বকি রাগারাগি করতে লাগলেন।

সরে এলাম। নিজের অসহিষ্ণুতার জন্যে নিজের কান মলে দিতে ইচ্ছে হলো। সত্যি, ভেবে দেখলে মারই কি দুঃখের শেষ আছে?

জীবনের প্রারম্ভে কতো আশা, ভবিষ্যতের ছবিতে কতো ঔজ্জ্বল্য।...পরিচিত সমাজের কাছ থেকে অনেক নিন্দে কুড়িয়ে আলাদা' হয়ে এসেছিলেন একটু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবেন বলে, কারণ, তাঁর নিজের সংসারটি ছিলো ছোট্ট। তাঁর সমকালিনী-দের মতো দশটি বারোটি তেরোটি আটটি সন্তানের ভারে ভারাক্রান্ত জীবন নয়, মাত্র দুটি ছেলে দুটি মেয়ে, যাকে বলে 'সুখী পরিবার'।

একটি ছেলে অবিশ্যি শৈশবে মারা গেছে, কিন্তু সে আর কী করা যাবে? আশেপাশে অহরহই তো এ-ঘটনা দেখে-ছেন। দশ-বারো-তেরো-আটের মধ্যে দু'-একটি যাবে না, এতো কি আর হয়?

গিন্নীদের তো হামেশাই বলতে শুনেছি, 'গাছের ফল কি আর সবকটি থাকে?'

কাজেই ওই শৈশবে হারানোটির জন্যে মাকে খুব বেশী দুঃখিত দেখিনি।

দুটি মেয়ে দুটি ছেলে, এইটিই মার সাজানো ছক।

মেয়েরা সুন্দরী-টুন্দরী, ছেলেরা মেধাবী স্বাস্থ্যবান, স্বামী ভালো উপার্জনশীল, আবার কৃপণ নয়, রগচটা নয়, মেজাজী নয়, বরং শৌখিন, দরাজ-হাত। মাকে রাখবে ভালো বাড়িতে রেখে-ছেন, ঝি-রাঁধুনী রেখেছেন, এই হচ্ছে সংসারের পটভূমিকা।

এর থেকে সুন্দর আর কী হবে?

কিন্তু কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল।

এখন ভাঙা নৌকোর মতো জীবনখানাকে নিয়ে লগি ঠেলে ঠেলে চলেছেন, কোন্ লক্ষে তা জানেন না।

মার আঁকা ছবিতে ছিলো মেয়েদুটির খুব সকাল সকাল বিয়ে হয়ে যাবে (যেহেতু তারা দেখতে ভালো, এবং বাবা খরচা করবেন, অতএব জামাইরা ভালো ভালো হবে), ছেলেরা টকাটক করে দু'-তিনটে করে পাশ করে ফেলে মোটা মোটা মাইনের চাকরীতে ঢুকে পড়বে, রাজ্য উজাড় করে অনেক মেয়েকে রিজেক্ট করে করে ছেলেদের জন্যে অল্পবয়সী প্রকৃত সুন্দরী দুখানি বৌ আনবেন, আর বৌদের সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করবেন যে, তারা 'দুষ্টু বৌ' হবার অবকাশই পাবে না।

তারা মার পায়ে পায়ে ঘুরবে, হাতে হাতে কাজ করবে, শ্বশুরের সেবা করবে, বরকে লজ্জা করবে, ননদরা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে, তাদের যত্নআত্তি করবে, এবং ক্রমশঃ সংসারের দায়দায়িত্ব সব নিতে শিখবে।

অবশ্য 'গিন্নী' হয়ে মাথায় চড়ে বসবে না।

তাছাড়া—নিজস্ব একখানি বাড়ি মার হবে।

ছোটবেলা থেকে মার কথায় বার্তায়, ইচ্ছাবাসনার প্রকাশে, যখন তখনই এই ছবি-খানি দেখতে পেয়েছি।

এই ছিলো মার কাছে, হয়তো জগতের সব মায়ের কাছেই, 'সার্থক জীবনে'র ছবি।

বৌমা লক্ষ্মী, ছেলেরা বাধ্য, মেয়েরা সুখী ঝি-চাকররা নিমক, স্বামী উদার।

লক্ষ্যটা তো এই।

এটুকুও চাইবে না মেয়েমানুষ? সারাটা জীবন তাহলে কিসের জন্যে খেটে মরছে? কিসের পিছনে ছুটছে?

মার প্রথম জীবনে এই ছবির পেন্সিল স্কেচটি আঁকা হয়েছিলো নিখুঁৎভাবেই। ভাগ্যই একে দেখিয়েছিলো, কিন্তু ভাগ্য সেই রেখার উপর যখন রঙের তুলি বোলালো?

তখন চোখ তাকিয়ে কী দেখতে পেলেন সেই চারুহাসিনী দেবী?

অনেক বাড়ি বদল হয়ে হয়ে নতুন বাড়িতে গেছেন, কিন্তু 'নিজের বাড়ি' এক-খানি হয়নি।...আর কখনো হবার আশাও নেই।

মেধাবী ছেলেদের মধ্যে একজন জীবনকে আঁকা লাইন থেকে ছিটকে ফেলে দিয়ে জেলে পড়ে পচছে, আর অন্যজন সব প্রত্যাশার প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে ঘোরতর স্বাধীন হয়ে বসে আছে। বিয়ে করে মাকে 'দাসী' এনে দেবে, এ-স্বপ্ন বাতুলতা।

আর সুন্দরী মেয়েদের পরিণতি?

পরমাসুন্দরীটি অকালে অথবা 'সকালে' একখানা প্রেম বাধিয়ে হৃদয় ভেঙে, গলায় দড়ি দিতে দিতে রয়ে গিয়ে, যদিবা একটা স্বাভাবিক বরের গলায় মালা দিলো তো, তার 'জ্বালায় জ্বালায় অস্থির মা।

আর বাকি মেয়েটা?

সে তো বলার অযোগ্য।

তার জন্যে মার রাতে ঘুম নেই, ভাতে রুচি নেই, বেঁচে সুখ নেই, লোকের কাছে মুখ নেই।

সেই বেয়াড়া মেয়েটা চারুহাসিনী দেবীর গলার কাঁটা, বুকের পাথর। সে তার অহরহর আতঙ্ক।

চারুহাসিনী দেবী যেন মাথার ওপর খাঁড়া নিয়ে বাস করছেন।

অতএব তিনি যদি এখন তাঁর এই সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অংশীদারটিকে হাতের কাছে না পেয়ে, কোনো এক অদৃশ্য-লোকের দরজায় মাথা কুটে কুটে নালিশ জানান, দোষ দেওয়া যায় না।

এদিকে বেচারী 'আমি'টার জন্যেও তো দুঃখ উথলে উঠছে।

মাত্র কটা দিনের জন্যে এক অনির্বচনীয় স্বর্গলোকের স্বাদ পেয়েছিল বেচারী, এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে গিয়েছিল তার, অগাধ আলোর আভাস এসে পড়েছিল তার জীবনে, অকরণে ভেঙে গেল সেই স্বর্গসুখ, মুছে গেল সেই আনন্দের স্বাদ, বন্ধ হয়ে গেলো সেই সদ্য উন্মুক্ত দরজা।

আর সব থেকে বড়ো কথা একেবারে 'ছোটো' হয়ে গেল সে পৃথিবীর কাছে। ভারী ছোটো!

এটাই মনের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ওরা কী ভাবলো! ওরা কী ভাবছে!

মেজদা নির্ঘাৎ বাড়ির পরিস্থিতির কথা ওদের জানিয়েছে। নীরেনকে, সুকুমারকে, আরো যারা আসতো তাদেরকে।

তারা অতএব মুখ টিপে হেসে ভাববে, 'জানতাম! এতো 'প্রগতি' আর হতে হয় না। নিশ্চয় অভিভাবকদের অজান্তে এসব 'প্রগতি' দেখানো হচ্ছিল, যেই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, বাস! ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন প্রগতির ডানাকে।

নাও এখন যেমন খাঁচায় থাকবার, তেমন থাকো।

ওরা অনেক সময় আমাদের বাড়ির উদার মনোভাবের কথা নিয়ে সপ্রশংস মন্তব্য করেছে এখন সেই কথা ভেবে কী ব্যঙ্গ হাসিটাই হাসবে।

ভেবে ভেবে সারাক্ষণ যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে।

দুঃখের থেকেও লজ্জাটাই বেশী জ্বালার।

আর দুঃখ? সেটাও কম নয়।

বিরাট একটা শূন্যতায় সবদাই তো প্রাণের মধ্যে হাহাকার করছে।

যখন এই হাহাকারটা বড়ো বেশী উদ্বেলিত করে তোলে, তখন আর ওই চারুহাসিনী দেবীর প্রতি সহানুভূতি আসে না। তখন কেবলই মনে হতে থাকে এই সমস্তই ওই মহিলাটির করাল খেয়ালের জন্যে, অহেতুক নিষ্ঠুরতার জন্যে। হয়তো ঈর্ষার জন্যেও।

উনি নিজে যে স্বাধীনতার স্বাদটাদ পাননি, তা আর কাউকে পেতে দেখে ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করছেন।...

বয়েসকালের উত্তপ্ত রক্তে তখন এই রকমই সব মনে হতো।

পরে অবশ্য বুঝতে পারতাম, ঈর্ষাও নয়, নিষ্ঠুরতাও নয়, এ শুধু একটা অন্ধ সংস্কারের নৈবেদ্য সাজানো।

তাছাড়া—বোধহীনতা।

আমি যে কতোটা হারালাম, সে-বোধটাই যে নেই। নেই, কারণ আমার কাছে ওই 'পাওয়া'টাও যে কতোখানি পাওয়া ছিলো, তাও তো জ্ঞান ছিলো না।

এটা যে নিষ্ঠুরতা হয়েছে, তা কি তাঁর বোধের জগতে পৌঁছেছে?

জগতে যতো শাসন, যতো পীড়ন, যতো অত্যাচার সংঘটিত হয়, তার অধিকাংশই তো এই বোধহীনতা থেকে। যে শাসন করে, পীড়ন করে, অত্যাচার করে, অধিকার খর্ব করে পঙ্গু করে রাখে, সে কি জেনে বুঝে করে?

মনে হয় না।

নিতান্ত প্রিয়জনের প্রতিও মানুষ নিতান্ত নিষ্ঠুরতা করে, সেটা কি ইচ্ছাকৃত?

কিন্তু তখন এতোটা বুঝতে জানতাম না।

তখন চারুহাসিনী দেবীর প্রতি বেশী-ক্ষণ সহানুভূতি রাখতে পারতাম না।

দিদি চলে গেছে।

আমার সম্পর্কে হতাশ হয়েই গেছে কতকটা।

বেচারী একটু বোকাসোকা হলেও এটুকু বুঝতে পারতো তার দুঃখের কাহিনী আমার মনকে স্পর্শ করছে না। আর তার 'জ্বালার' কাহিনীতে আমি সহানুভূতির প্রলেপ না দিয়ে এমন জ্বলে উঠছি যে তাকেই যাচ্ছেতাই করছি, ওইসব সহ্য করে বলে।

তার মানে টের পেয়ে গেছে, তার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমি।

মাঝে মাঝে বলতো, 'তোকে আর বলবো কি, তুই তো এখন এক ঊর্ধ্ব-লোকের জীব। আমাদের মত তুচ্ছদের কথা তোর কানেই ঢুকবে না।'

অথচ এর প্রতিবাদের জোরও খুঁজে পাই না।

বলি বটে, 'হ্যাঁ ভীষণ উচ্চলোকের লোক। একেবারে তালগাছের!'

কিন্তু নিজের কানেই ফিকে ফিকে লাগে।

তাছাড়া দিদির কাছে লেগে পড়ে থাকতেও তো পারি না। যখন আস্তার আসরে গিয়ে বসতাম, তখন তো কথাই নেই, সবদাই মন উড়ু-উড়ু, সবদাই মনে হয়, 'ওই বুঝি বাঁশী বাজে।'

অতএব মনস্থির করে বসে থাকতে পারতাম না। আর বাঁশী সত্যি বেজে উঠলে? অন্তঃপুরে আটকে রাখে কার সাধ্যি!

তা বোধহীন আর কে নয়? মানে নিজের সম্বন্ধে?

অন্যের চোখে যে দৃশ্যটা রীতিমত দৃষ্টিকটু, তা কে বুঝেছে তখন?

সুখস্বর্গের অবসান হবার পরেও যে দিদির কাছে গড়িয়ে পড়ে থাকতাম তা নয়। প্রকৃতিতে যেন কেমন একটা চঞ্চলা এসে গিয়েছিল।

গল্প করতে করতে যেন ছটফটিয়ে উঠে পড়তাম, বৈঠকখানা ঘরটা একবার ঘুরে আসতাম।

কেন? কিসের আশায়? তা কে জানে?

দিদি ভুরু-টুরু কুঁচকে প্রশ্ন করতো, 'হঠাৎ উঠে গেলি যে? কেউ এসেছে?'

আমি অম্লান বদনে বলতাম, 'কেউ নয় 'কিছু' এসেছে কিনা দেখে এলাম? আসেনি।'

গেরস্তবাড়িতে 'লেটার বক্সে'র চলন তখন এতো হয়নি।

বেশীর ভাগ বাড়িতে পিয়ন বাইরের দিকের জানলা দিয়ে চিঠি-পত্র ফেলে দিয়ে যেতো।

দিদি বলতো, 'তোর ভাব-ভঙ্গী দেখলে মনে হয়, যেন নতুন বিয়ে হয়েছে, বরের চিঠি আসার আশায় ছটফটিয়ে বেড়াচ্ছিস!'

কাজের ফাঁকে বিশ্রামে
চাই স্বাদু নেস্‌কাফে

টেলিফোন বাজে।
কাজে বাধা পড়ে।
এক কাপ
নেস্‌কাফের জন্য
ব্যাকুল হয়ে
ওঠে মন।

মধ্যদিনে শরীর মনকে
তাজা করে
তুলতে সারা
পৃথিবীতে
নেস্‌কাফের তুলনা নেই।

সব সময়েই লাগবে ভাল দেখুন খেয়ে নেস্‌কাফে

ACIL/86 2416

হেসে যা হোক একটা উত্তর দিয়ে কেটে পড়তাম।

এখন তো দিদি চলেই গেছে।

এখন কী অখণ্ড অবসর।

এখন মুহুর্মুহু ওই বাইরের দিকের ঘরটায় যেতে ইচ্ছে করে। যেন ঘরটায় সেই উপস্থিতির স্বাদ লেগে আছে।

তাই ঘরটা লক্ষ আকর্ষণে টানছে।

এবারে 'জীবনপ্রবাহে'র কপি এলো মেজদার হাতে।

বুকটা ধুক্ করে উঠলো।

এইটুকুই শেষ আশা ছিলো। স্বপ্ন দেখি পত্রিকাটা বেরোলে, 'একদিন আসতেই হবে,' এমনি একটা প্রত্যাশা ছিলো।

সেটি ঘুচলো।

এতোবড়ো উপলক্ষটাই যখন গেল তখন আর আশা কোথায়?'

পত্রিকাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মেজদা বললো, 'জীবনপ্রবাহ' কার্যালয়ে তোর এবারের গল্পটার খুব প্রশংসা হচ্ছিলো।'

এই সুযোগ!

আমি যেন ন্যাকা।

যেন বুঝি না মেজদা ওদের বারণ করে দিয়েছে।

তাই সেই অবোধের ভানে বলে উঠি, 'আজকাল বুঝি তোমাদের আড্ডা পত্রিকার কার্যালয়েই বসছে?'

মেজদা আমার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। ওটাই সুবিধে।'

এই কথার পর আর কোন ভানে কোন কথা বলা যাবে? কাজেই ভানটা ছাড়লাম। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'ওদের বোধহয় এডিটরে চৌকাঠ ডিঙোতেও বারণ করে দিয়েছো?'

বলেই লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। মনে হলো মেজদা বুঝি আমার মনের ভিতরটা সব স্পষ্ট দেখে ফেললো। দেখে ফেললো—

আমার শূন্যতা, আমার হাহাকার।

তাই আমার নির্লজ্জতাও ধরা পড়ে গেল ওর চোখে।

মেজদা কিন্তু সে ভাবে উত্তরটা দিলো না। মেজদাও খুব শান্ত গলায় বললো, 'বারণ না করলে ওরা বুঝতে পারবে কী করে আমাদের অসুবিধেটা কোথায়।'

আমার ভিতরকার তার্কিকটা বলে উঠতে চাইলো, কী দরকার ছিলো বোঝাবার? বাড়িতে না হয় তুমি মার সঙ্গে তর্ক করতে জোর করতে, অথবা মার অবাধ্যও হতে, বাইরের লোকের কাছে অপদস্থ হওয়ার থেকে তো সেটা ভালো?

কিন্তু বলতে পেরে উঠলাম না।

ব্যাপারটা তো শুধুই তর্কের বিষয়-বস্তু নয়? ওর মূল কেন্দ্রে যে আমি নিজে বসে আছি!

অতএব ঘাড় হেঁট।

নতুন পত্রিকাখানাই উল্টোতে থাকি।

মেজদা সেদিকে তাকিয়ে বলে, 'নীরেন বলে দিয়েছে সামনের মাসের জন্যেও একটা গল্প চাই।'

নীরেন!

মাথা থেকে পা অবধি যেন বিদ্যুতের শক্ খেয়ে গেলো।

যেন একটা তারের বাজনার উপর কে তার ছড়িটা বুলিয়ে দিলো।

অজস্রবার তো মেজদার মুখে নীরেন শব্দটা শুনেছি। শুনলেই অবশ্য বেশ একটা মধুর আবেশময় ভাবের উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক তেমন নয়।

এটা অন্য রকম।

এ যেন ধরা পড়ে যাওয়ার অনুভূতি। ওই নীরেন শব্দটা যে আমার মনের ওপর আছড়ে এসে পড়বে এটা যেন মেজদা বুঝে ফেলেই বলেছে।

কী লজ্জা।

তবু—

সহজে হার মানতে রাজী নই।

তাই শক্ খাওয়া স্নায়ুদের স্ববশে এনে সহজভাবে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে বলি, 'ভারী লেখিকা, তাই পর পর দু মাস একই জনের লেখা ছাপা হবে। পাঠক-পাঠিকা পড়বেই না।'

মেজদা বললো, 'পড়বে কি না পড়বে সেটা এডিটারই ভালো বোঝে। ...হ্যাঁ একটা সুখবর, সামনের মাস থেকে নীরেন আর সাবএডিটার থাকছে না, এডিটার হয়ে যাচ্ছে।'

প্রবল একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস ভিতরটা আলোড়িত করে তুললো। কিন্তু বুঝতে পারলাম না অনুভূতিটা কিসের।

আহ্লাদের? না লজ্জার?

মেজদা আমায় ডেকেই বা বলতে গেল কেন এই সুখবরটি?

আসলে ব্যাপারটা কিছুই নয়।

খুবই স্বাভাবিক এই খবর দেওয়াটা। কিন্তু কথাতেই আছে 'চোরের মন ভাতা বেড়ায়'। আমার হচ্ছে 'চোরের মন', তাই 'স্বাভাবিক' কথাকেও কারণপ্রসূত মনে হলো।

এই উচ্ছ্বাসটা সামলাতে সময় লাগবে, তাই খুব যেন মন দিয়ে পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাতে লাগলাম।

মেজদা আর একবার বললো, 'আমায় দিয়ে বলে দিয়েছে, তবে সম্পাদকের 'অনুরোধপত্র' আসবে যথারীতি। আর আর গল্পের দক্ষিণাটাও।'

'দক্ষিণা!'

দক্ষিণা মানে কী?

দক্ষিণা কাকে বলে?

তার মানে টাকা।

তার মানে লেখার দাম ধার্য হওয়া।

যেখানে লেখাটাকে ছাপার অক্ষরে দেখেই বিগলিত হচ্ছি, সেখানে কিনা এই বার্তা। দাম নেওয়া মানেই তো 'দামী' বলে স্বীকার করা। আর আর্থিক মূল্যটাই তো উৎকর্ষের মাপকাঠি।

সত্যি বলতে এমন দিশেহারা ভাব আমার বড় একটা হয় না। ওই দিশেহারা হয়ে যাওয়াতেই নেহাৎ বোকার মতো একটা কথা বলে বসলাম। একেবারে বোকা আহ্লাদী মেয়েগুলোর মতো বলে ফেললাম, 'য়্যাঃ!'

মেজদাও অবশ্যই আমার অবস্থা বুঝলো, তাই একটু হাসলো। হেসে বললো, 'তাহলে —সম্পাদকমশাইকে তাই বলে দেবো। বলবো, তোমাদের লেখিকা 'দক্ষিণা'-টক্ষিণা চায় না, বলেছে 'য়্যাঃ'।'

'ভালো হবে না বলছি মেজদা! বলবে না এসব কথা। তুমি সব পারো।'

মেজদা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললো, 'কী আর পারি।'

'তা পারো বৈকি।' আমি এখন ধাতস্থ হয়ে গেছি, বলি, 'না হলে মার ওপর রাগ করে নিজেদের বাড়িকে অন্যের কাছে অপদস্থ করতে পারতে না।'

মেজদা একটু চকিত হয়ে বলে, 'কী অপদস্থ করলাম?'

'করেছো কিনা নিজেই জানো।'

মেজদা বললো, 'তোরও ধারণা মার ওপর রাগ করে?'

'না হয় অভিমান করে।'

'দূর! রাগও নয়, অভিমানও নয়, শেষে ভেবে দেখলাম, মার বলার ভঙ্গীটা ভালো না হলেও, বক্তব্যটা হয়তো ঠিকই। মাকে তো মার ওই সব তিনকুলের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়েই থাকতে হবে? তাদের কাছে মাকে বিব্রত করার অধিকার আমার নেই। তার থেকে আমার নিজজনের কাছে আমি কিছুটা বিব্রত হই।'

মেজদা একটু চুপ করে থেকে বললো, 'ওরা কেউ কিছু ভাবেনি। ...ওরা বললো, 'তা ঠিক।'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু খুব খারাপ লেগেছে। সুকুমারবাবু তো আবার একটু সরল-টরল—'

মেজদা হেসে ফেলে বলে, 'শাদা বাংলায় বল না বাবা, বোকাসোকা—'

আমিও হেসে ফেলি।

'তা তাই। আর বোকারাই অল্পে মনে আঘাত পায়।'

মেজদা আর একটু হাসলো।

বললো, 'আমাদের মাও তাই বটে! আর অল্পেই আঘাত পান। মার থেকে বেশী আপন তো ওরা নয়।'

এবার আবার মাথাটা হেঁট করতে হলো।

আমার চোখে জল এলো।

আমার অবাক লাগলো। মেজদার এদিকটা ঠিক এভাবে দেখিনি কোনোদিন। মেজদা তার প্রতিটি কাজই ভেবে করে। প্রতিটি বস্তুরই মূল্যায়ন করে।

মেজদার আর একদিনের কথা মনে পড়ে গেল।

'ওই আচার নিয়মগুলোকে না মানি, বাবাকে তো মানি!'

ঘরে এসে পত্রিকাখানা খুললাম।

বলা বাহুল্য, নিজের গল্পটাই পড়তে বসলাম। আশ্চর্য, ঠিক গল্প গল্পই লাগছে। যেমন অন্য লেখকদের লেখা লাগে।

নিজে পড়ে ফেলার পর আর একবার পড়লাম 'জীবন প্রবাহ'র সম্পাদকের চোখ দিয়ে।

একটা আনন্দলোকের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। শুধু সে জগতের মধ্যে একটি ঘণ্টা-ধ্বনি ধ্বনিত হতে থাকে।

'যথারীতি সম্পাদকের অনুরোধপত্র আসবে।'

কী সেই পত্র?

ছাপানো কার্ডমাত্র?

না হাতের লেখা চিঠি?

কতোক্ষণ এভাবে ভাবছিলাম জানি না, হঠাৎ মা এসে ভীতত্রস্ত গলায় বলে উঠলেন, 'রুচি, দেখ, বাইরে কে একটি মেয়ে এসে অমুর খোঁজ করছে।'

মেয়ে!

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শাড়ির আঁচলটা ঠিক করে নিয়ে বললাম, 'মেয়ে? তা এতো ভয় পাচ্ছো কেন?'

'আমার সবেতেই ভয়ে হাত-পা কাঁপে মা। অমুর খোঁজ করছে কেন?'

আমাকেই এখন বাড়ির, মানে মেজদার অনুপস্থিতিতে, অভিভাবকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। কারণ মা তো মরে গেলেও বাইরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলতে পেরে উঠবেন না 'কাকে চাই?'

আমি পারি। পারতেই হয় বলে তো বটেই, পারতে ভালবাসি বলেও।

এখন অবশ্য গিয়ে একথা জিগ্যেস করলাম না। 'আসুন, আসুন' বলে মেয়েটিকে বসালাম।

কালো রোগা একটুখানি মেয়ে, বয়েস হয়তো আমারই মতো, হয়তো দু-এক বছরের বড়ও হতে পারে, দেখতে ক্ষীণ কিশোরী-কিশোরী প্যাটার্নের। চুলগুলো রুক্ষ, মুখ শুকনো, পরণে একটা শাদা খদ্দরের শাড়ি ব্লাউস। ...মুখটা যেন উদভ্রান্ত উদভ্রান্ত।

বললো, 'অমলবাবু নেই?'

অবাক হয়ে বললাম, 'অমলবাবুকে আপনি চেনেন?'

'চিনি না?'

ওর মুখে যেন একটা আলো জ্বলে উঠলো। আর ও যেন সেটা টের পেলো। তাই মাথাটা নীচু করে বললো, 'আমরা তো একসঙ্গেই কাজ করেছি।'

বললাম, 'অথচ জানেন না, ওঁর সন্ধান পেতে হলে আলিপুর জেলে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত।'

আমার কথার স্বরে হয়তো একটু ব্যঙ্গ ছিলো। মেয়েটি বোধ হয় একটু আহত হলো।

মুখ তুলে বললো, 'জেলে ছিলেন তা জানি। কিন্তু ওঁর তো এগারো তারিখে ছাড়া পাবার কথা ছিলো!'

'ছাড়া পাবার কথা ছিলো?'

আমার ব্যঙ্গ বুদ্ধি উপে গেলো, বুঝলাম এ কিছু জানে।

বললাম, 'কই আমরা তো কিছু—'

ও বললো, 'আমায় বলে দিয়েছিলেন তেরো তারিখে আমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করো। এই যে ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিলেন।'

ও ওর হাতের ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে দেখালো।

দাদার হাতের লেখা।

বাড়ির ঠিকানা।

বড় লজ্জা পেলাম। কিন্তু দাদার সঙ্গে দেখাটা হলো কখন? কীভাবে?

মেয়েটা বললো, 'আমিও তো জেলেই ছিলাম! গত তিন তারিখে আমার ছুটি হয়ে গেছে।'

মুহূর্তে যেন মরমে মরে গেলাম।

জেলে ছিলো! সত্যিকার জলজ্যান্ত একজন জেলখাটা মেয়ে আমার সামনে! আর আমি তাকে আজেবাজে ভাবছি।

ওই রোগা কালো মেয়েটা আমার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেলো, আমার চোখে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জ্বলতে লাগলো।

কী ক্ষুদ্র কীটানুকীট আমি!

অনামী একটা পত্রিকায় দুটো গল্প কবিতা ছাপা হয়েছে বলে আহ্লাদে ভাসছি, আনন্দে বিভোর হচ্ছি। আর মনে করছি—জীবনের পরম সার্থকতাকে বুঝি পেয়ে গেলাম মুঠোর মধ্যে।

আর এই মেয়ে!

এই রোগা একটুখানি মেয়ে! দেশের কাজ করেছে, জেল খেটেছে।

একটু আগে 'দাম' পাওয়ার খবরের আহ্লাদে নিজেকে যে বেশ দামী দামী মনে হচ্ছিলো তার জন্যে এতো লজ্জা করতে লাগলো।

আবেগটা বোধহয় একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিলো নইলে হাত বাড়িয়ে ওর একখানা হাত ধরে ফেলতাম না।

ধরে ফেলে বললাম, 'জেলে আপনারা একসঙ্গে ছিলেন?'

ও একটু হেসে বললো, 'না। মেয়েদের আলাদা ওয়ার্ড! তবে দেখ-টেখা হওয়ার অসুবিধে হতো না।'

কথা শুনে অবশ্য মনে হলো আসলে দেখা হওয়াটা আইনসঙ্গত নয়।

নরম গলায় নাম জিগ্যেস করলাম।

বললো 'সবিতা'।

আস্তে আস্তে অনেক কথা জিগ্যেস করে ফেললাম ওকে। জেলজীবনের অভিজ্ঞতাটি তার কী রকম? আরও কতো মেয়ে ছিলো জেলে? অন্য সব মেয়ে-কয়েদী মানে খারাপ-টারাপ অপরাধী আসামী এক-সঙ্গেই থাকে কিনা। কী জন্যে জেল হয়েছিলো, কতোদিনের মেয়াদ ছিলো, এইসব নানা ঘটনা।

সবিতা সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলো বেশ ধীর ভাবে।

তারপর মলিন ক্ষুণ্ণ গলায় বললো, 'ছাড়া পেলেন না কেন বুঝতে পারলাম না।...আচ্ছা যাই।'

মেয়েটা যে দাদার প্রেমে পড়ে বসে আছে, তা ওর মুখের রেখায় আঁকা রয়েছে। ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'যাবেন কী? মায়ের সঙ্গে আলাপ করবেন চলুন! বাড়িতে এলে একটু মিষ্টিমুখ না করে ছাড়বো নাকি —একেই তো আপনি দাদার বন্ধু, তাছাড়া—আপনাদের দেখলেও পুণ্য হয়!...আমরা কী, আর আপনারা কী!

সবিতা তাড়াতাড়ি আমার হাতে হাত দিয়ে বললো, 'এ কী বলছেন ভাই। আপনি অমলবাবুর নিজের বোন, এই ভেবেই আপনাকে দেখে আমার—'

মার কাছে নিয়ে যাবার আগে, মাকে অবহিত করিয়ে এলাম, যাতে আড়ষ্ট না হন। তবু মা আড়ষ্ট হতে ছাড়লেন না।

তাছাড়া দাদার পরশু এসে যাবার কথা অথচ এলো না, এতে এতো বিমনা হয়ে গেলেন যে কথার মধ্যে কোনো প্রাণের স্পর্শ পাওয়া গেল না।

অবশ্য মিষ্টি খাবার জন্যে পীড়াপীড়ি একটু করলেন।

আর মেয়েটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মার আড়ষ্ট ভাবের খোলশ ভেঙে বেরিয়ে এলো একটি স্পষ্ট পরিষ্কার মন্তব্য।

'যা বুঝছি, বিয়ে যদি কখনো করে অমু, তো এই মেয়েকেই করবে। এই কালো রোগা জেলখাটা মেয়ে।'

আরো অনেকবারের মত আর একবার স্বীকার করলাম, মাকে আমরা যতো অবোধ ভাবি, তা নয় মা।

তবু নিজেই আবেগের ভান করে অবাক হয়ে বললাম, 'তার মানে? একবার দাদাকে একটু খোঁজ করতে এসেছে বলেই, অমনি এতো সব ভেবে নিলে তুমি?'

মা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'আমাকে আর এখন ভেবে ভেবে বুঝতে হয় না রুচি, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।'

তার মানে এর আগেও সেই চেনাচেনা হয়ে গেছে।

সবিতার খাওয়া প্লেটটা পেয়ালাটা সরাতে যাচ্ছি মার ঘর থেকে, মার তো আবার অস্বস্তি বাতিক আছে। হয়তো নিজেই সরাতে বসবেন।

না, তা' বসতেন না, কারণ আমাকেই 'হাঁ-হাঁ' করে উঠলেন। বললেন, 'ওটা আবার তুই এখন হাত দিতে যাচ্ছিস কেন? জেল-খাটা মেয়ে, ওদের কী আর জাত-ধর্মের কিছু আছে?'

'মা!'

স্তম্ভিত হয়ে বলি, 'অথচ তুমি এ-ও ভাবছো, তোমার ছেলে ওকে বিয়ে করতে পারে।'

মা গম্ভীর গলায় বললেন, 'করলে করবেই। তার জন্যে আমি কি ওকে বরণ করে ঘরে তুলতে যাবো?'

(ক্রমশঃ)

দিনকালের হিসেব

ন জাতু কামঃ

—না, নিবৃত্তি বলে কিছু নেই—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, যোগেনবাবু শ্লোকটি আর শেষ করলেন না। তিনি ঐ রকমই করেন—আলোচনার মাঝখানে কোন একটি শ্লোকের একাংশ উদ্ধৃত করেই থেমে যান। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ কিনা জানি না, তবে অনেক সংস্কৃত শ্লোকই যে তাঁর মুখস্থ সে পরিচয় আমরা সবাই পেয়েছি।

যোগেনবাবু আমাদের পাড়ায় নবাগত হলেও আমাদের মজলিসভুক্ত হয়ে পড়েছেন। মজলিস হল গঙ্গার ঘাটে—উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর গঙ্গার ঘাটে কয়েকজন আধশতকোত্তর ব্যক্তির প্রাত্যহিক বৈঠক। এই রকম বৈঠকে সব কিছুর না হলেও অনেক কিছুরই আলোচনা হয় এবং মোটামুটি প্রত্যেকেই তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার যে কত সমৃদ্ধ সে-বিষয়ে আমার সকলকে অবহিত করার প্রচেষ্টা করে থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ্য এই জ্ঞান মূলত সংবাদপত্র থেকে আহৃত, তবে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ এবং নিজস্ব ব্যাখ্যা যে কিছু থাকে না, তাও নয়। যোগেনবাবু কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের ব্যতিক্রম। আলোচনায় তিনি বড় একটা যোগ দেন না—কোন বিষয়ে তর্ক করা বা কোন ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করা যেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অপরের আলোচনার মাঝখানে তিনি হঠাৎ কোন একটা সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ উদ্ধৃত করেই চুপ করে যান। এই সাধারণ-বহির্ভূত আচরণও অনেকের ঠিক ভাল লাগে না—এ যেন অন্যদের ছাপিয়ে যাওয়ার এক প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি। তবুও কিন্তু সবাই যোগেনবাবুকে সহ্য করেন। কারণ বোধহয় যোগেনবাবুর স্বল্পভাষিতা। সেদিন তখন আলোচনা হচ্ছিল ধর্মঘট নিয়ে। উৎস সন্নিহিত এক কারখানার স্ট্রাইক। কে একজন মন্তব্য করলেন, যাই বলুন, পুজোর ঠিক আগে এইভাবে স্ট্রাইক করা ঠিক হয়নি।

—নিশ্চয়ই, আর একজন সমর্থন করলেন—কিন্তু ঐ কটা টাকা দিয়ে দিলেই হত।

এই সময়ই যোগেনবাবু বলে উঠলেন : না, নিবৃত্তি বলে কিছু নেই।

যোগেনবাবুর এইরকম বাধাদানে আমরা সকলে অভ্যস্ত হলেও সেদিন যেন তাঁর আচরণ অনেকের কাছেই খাপছাড়া ঠেকল। একজন ত বেশ একটু বিরক্তি সহকারেই জিজ্ঞাসা করলেন : তার মানে?—তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন,—কি বলতে চান খুলেই বলুন না।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে যোগেনবাবু খুলেই বলতে শুরু করলেন : বলছিলাম কি, ঐ কটা টাকা দিলেও কিছু হত না। হয়ত, পুজোর আগে গোলমাল মিটত। তারপর কিছুদিন পরে আবার উঠত দাবী, আবার আরম্ভ হত আন্দোলন...যতই দিন মশাই, তৃষ্ণা মেটানো যাবে না।...

যোগেনবাবু হয়ত আরও কিছু বলতেন, কিন্তু থেমে গেলেন একজনের প্রত্যক্ষ আক্রমণে : আপনি যে দেখছি মালিকপক্ষের লোক, নিজে কোনদিন মালিক ছিলেন কিনা।

উক্তিটির শেষাংশ সত্যেরই বিকৃতি—যোগেনবাবু এক পাওয়ার লুমের মালিক ছিলেন বলেই শুনেছিলাম। তারপর দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার ধর্মঘটের জন্যে সেই পাওয়ার লুমের দরজা চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। তবুও কিন্তু এইভাবে একজন বৃদ্ধলোককে সরাসরি আঘাত করা সেদিন আমাদের অনেকেরই খারাপ লেগেছিল।

লাঠিটি হাতে নিয়ে যোগেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। যাবার সময় ধীরে ধীরে বললেন : হ্যাঁ, মালিক আমি একদিন ছিলাম। ধর্মঘটের জন্যেই সে কারখানা উঠে গেছে, তবে ধর্মঘটের কারণ বেতনবৃদ্ধি বা বোনাসের দাবী নয়, কারণ সম্পূর্ণ অন্য।

সেই অন্য কারণটা যে কি তা জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা আমাদের কারোরই হল না। যোগেনবাবু চলে গেলেন।

শ্রম-বিরোধের কারণ :

সেইদিনই রাত্রে ভারতীয় বর্ষপঞ্জীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে শ্রম-বিরোধের কারণে এসে থেমে গেলাম। দেখলাম যোগেনবাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবেই সমর্থিত হয়েছে বর্ষপঞ্জীতে—সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রেই শ্রম-বিরোধের কারণ মজুরি ভাতা বা বোনাস নয়। ঐ বর্ষপঞ্জীতে দেখান হয়েছে যে মোটামুটি ৬০ শতাংশ শ্রম-বিরোধের কারণের সঙ্গে শ্রমিকের অর্থনৈতিক দাবীর কোন সরাসরি সম্পর্ক নেই। নীচের ছকটা থেকে শ্রম-বিরোধের বিভিন্ন একটা মোটামুটি ধারণা করা যাবে :

বিভিন্ন কারণ	শতাংশ
১। মজুরিবৃদ্ধির দাবি	৩২'০
২। বোনাস	৭'০
৩। ছাঁটাই ও শ্রমিকের আচরণ	৩৫'০
৪। ছুটি ও কাজের সময়	১০'০
৫। অন্যান্য কারণ	১৬'০
	১০০'০

পঞ্চম দফা বা 'অন্যান্য কারণের' ব্যাখ্যা ঠিক করা হয়নি। অনুমান করলাম এই অন্যান্য কারণ হবে রাজনৈতিক, দলীয় নেতৃত্বের জন্যে সংঘর্ষ, ইত্যাদি। তারপর দিন দুখানি বিদেশী পত্রিকায় তিনটি দেশের সাম্প্রতিক শ্রম-বিরোধের বিবরণ পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য কারণ সম্বন্ধে মনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। দেশ তিনটি হল চিলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম জার্মানী। সেই বিবরণই আজ শোনাব।

চিলি

গত সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ছিল চিলিতে যুগাবসান—'এণ্ড অফ অ্যান এরা ইন চিলি'। কি এই-যুগ এবং কেন এর অবসান ঘটল? প্রথম প্রশ্ন থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। চিলিতে যে যুগের অবসান ঘটল বলে বলা হয়েছে তা হল তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী সরকারের যুগ। চিলির রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসন-ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর চতুর্থবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (১৯৭০) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন মার্কসবাদী স্যালভেডর অ্যালেনডে গোসেনস্ (৬৫), সংক্ষেপে যিনি অ্যালেনডে নামেই পরিচিত ছিলেন। অ্যালেনডের নির্বাচনের পর অন্তত ল্যাটিন আমেরিকায় অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, বহুদলীয় ব্যবস্থার ব্যালট-পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু এই ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেখা গেল যে, এখনও তা সম্ভব নয়। চিলির সামরিক চক্রদল অ্যালেনডেকে অপসারিত করে সামরিক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও মার্কসবাদী শাসন-ব্যবস্থার পতনের ফলে ১৯৭০ সালে যে যুগের সূচনা হয়েছিল, তার অবসান ঘটে। কিন্তু কেন? বলা হয়, মূল কারণ হল পরপর কতকগুলো পঙ্গুকারী ধর্মঘট। এইসব ধর্মঘটের ডাক বামপন্থী শ্রমিক-সংঘগুলো দেয়নি, দিয়েছিল রাষ্ট্রপতি অ্যালেনডের অপ্রশম্য শত্রু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। উদ্দেশ্য : অ্যালেনডের পতন ঘটানো।

বর্তমান বছরের শুরুতে পৃথিবীর বৃহত্তর তাম্রখনির শ্রমিকরা আপাতদৃষ্টিতে মজুরিবৃদ্ধির দাবীতে লাগাতার ৭৪ দিনের ধর্মঘট চালিয়েছিল। অথচ ঐ সময়ই দেখা দিয়েছিল বিশ্বের তামার বাজারে বিশেষ মন্দা। ধর্মঘটের ফলে সরকারের ৭·৫ কোটি ডলারের মত রাজস্বের ক্ষতি হয়। (১ ডলার ৮'৫০ টাকার মত।)

তাম্রখনির ধর্মঘট মিটতে না মিটতেই শুরু হয় লরী-ধর্মঘট। লরী-মালিকদের

অভিযোগ ছিল যে, অ্যালেনডে সরকার দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ভঙ্গ করেছে। যা হোক, ঐ ধর্মঘটের ফলে দৈনিক ৬০ লক্ষ ডলার করে ক্ষতি এবং বাজার থেকে খাদ্য, জ্বালানী ইত্যাদি একরকম অন্তর্হিত হয়। এর পরই ঘটে বন্দর-কর্মী, দোকানদার, ট্যাকসি-চালক ও বাস-চালকদের মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্মঘট। চিলিতে ১৯৭৩ সালের প্রথম ছ' মাসের মূল্যস্ফীতির পরিমাণ ছিল ৩০০ শতাংশ।

এই রকম অবস্থায় অ্যালেনডেকে অপসারিত করবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং শুধু সামরিক চক্রান্তের ধাক্কার অপেক্ষা করবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ক্রাইসলার মোটর কারখানায় ইউনাইটেড অটো ওয়ার্কার্সরা ঐকতানের মধ্য দিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে এবং দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ৬৮টি কারখানায় ১ ২৫ লক্ষ কর্মী কাজ থেকে বিরত থাকে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৩ সালের শিল্প-শান্তি বিঘ্নিত হয়।

পাঁচ দফা দাবীর সমর্থনে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল স্বেচ্ছামূলক অতিরিক্ত কাজ—ভোলানটারী ওভারটাইম। ক্রাইসলারের কর্মীদের দিনে ৯-১২ ঘন্টা কাজ করতে হত, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহে ছুটি বলে কিছু ছিল না। অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্যে মজুরীর হার শুনলে আমরা চমকে যাব—গড়ে ঘন্টায় ৫ ৫৫ ডলার। কিন্তু আপত্তি হল বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত কাজের বিরুদ্ধে। যখন বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা নেই, ছুটির কোন ব্যবস্থা নেই—শ্রমিকের নিজস্ব জীবন বলে কিছু নেই, তখন বেশী মজুরী নিয়ে কি হবে? এই ছিল ধর্মঘটদের প্রশ্ন। সুতরাং ন জাতু কামঃ অর্থাৎ বস্তুগত দ্রব্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই জীবন-পদ্ধতির চূড়ান্ত নির্ধারক নয়। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের উক্তি মনে পড়ে ঃ সুখের অন্যতম আঙ্গিক উপাদান হল বিশ্রাম ও অবসরভোগের ব্যবস্থা।

পশ্চিম জার্মানী

পশ্চিম জার্মানীতে যে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানী পুনর্গঠনের কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নীতি হিসেবে ধর্মঘটের পথে পা না বাড়ানোরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বিরোধবিহীন-নীতির জন্যে পশ্চিম জার্মান শ্রমিকদের অনুতাপ করবার বিশেষ ছিল না। মজুরীর হার যখন গড়ে ঘন্টায় ৩'১৮ ডলার, বছরে যখন চার সপ্তাহ সবেতন ছুটি, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার যখন ব্যাপক ব্যবস্থা তখন পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিকরা যে সমগ্র ইয়োরোপের শ্রমিকদের ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

তবুও কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক-শ্রেণীর তলায় তলায় বিক্ষোভ জমে উঠছিল। গত বসন্তের সময় হঠাৎ কয়েকটি ধর্মঘটের ফলে ঐ অর্থ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত না হলেও বেশ আহত হয় বলা চলে।

বিক্ষোভের প্রধান কারণ হল মূল্যস্ফীতি। কয়েক বছর ধরে জীবনযাত্রার ব্যয় মোটামুটি ২·৫ শতাংশ হারে বাড়তে বাড়তে গত বছর হঠাৎ ৭·২ শতাংশে গিয়ে পৌঁছয়। এর ছ' সপ্তাহ পরই ঘটে ডোর্টমান্ডের হুচেশ প্ল্যান্টে মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট। ভয় পেয়ে পশ্চিম জার্মানীর মালিকরা অনতিবিলম্বেই বোনাস দিতে শুরু করেন এবং এর ফলে গড়ে মজুরীর হার ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত মজুরী আবার ব্যয়ের স্রোতে ফিরে মূল্যস্তর বৃদ্ধিতেই সহায়তা করে। তৃতীয় পর্যায়ী ফল হিসাবে এর দরুন যে আবার ধর্মঘটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে।

এর সঙ্গে আবার সংযুক্ত হয়েছে শ্রমিক-সংঘের নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব। যেখানে প্রবীণদের সরিয়ে দিয়ে নবীনরা নেতৃত্ব অধিকার করতে সমর্থ হচ্ছেন সেখানেই তাঁদের দাবি হল ঃ আরও সবেতন ছুটির ব্যবস্থা, ১৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি এবং ১৫ মাস অন্তর নতুন চুক্তি। একজন নবীন নেতার ভাষায়, 'এই দাবীও আমাদের অনেকের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে মনে হয় না।'

তা হলে বেশী মজুরী, ছুটি, সামাজিক নিরাপত্তাই যথেষ্ট নয়। ভোগের দ্বারা যেমন কামনার উপশম হয় না, তেমনি বেশী দিয়েও সন্তুষ্ট করা যায় না। শ্রমিক ও মালিক—এই দুই শ্রেণী যতদিন থাকবে, শ্রম-সংঘর্ষের বিরতিও ততদিন ঘটবে না। সেই জন্যে সাম্যবাদীদের গোষ্ঠীর বাইরেও অনেকে মনে করেন যে, মাত্র শিল্প-গণতন্ত্র (ইন্ডাসট্রিয়াল ডেমোক্রেসী) প্রবর্তনের মাধ্যমেই শিল্পে চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কিন্তু এ পথে এ পর্যন্ত কোন স্বাতন্ত্র্যবাদী অর্থ-ব্যবস্থাই চলেনি, আমাদের দেশেও নয়।

—শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

বিনামূল্যে!

একেবারে নতুন
ফরহ্যান্স পুস্তিকা
"দাঁত ও মাড়ির যত্ন"

তথ্যপূর্ণ এই রঙীন পুস্তিকাটি নিন, বিনামূল্যে! এই কুপনটি আজই ভরে পাঠিয়ে দিন।

ম্যানার্স ডেন্টাল ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বম্বে—১
অনুগ্রহ করে আমাকে বিনামূল্যে এক কপি "দাঁত ও মাড়ির যত্ন" নামে ফরহ্যান্স পুস্তিকাটি পাঠান। এই সঙ্গে ডাক খরচ বাবদ ২০ পয়সার টিকিট পাঠালাম।

নাম _____ বয়েস _____
ঠিকানা _____ এ—৭ বি এ

অনুগ্রহ করে যে ভাষার চার্ট চান তার নিচে দাগ কেটে দিন : ইংরিজি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি, উর্দু, বাংলা, অসমিয়া, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী।

ফরহ্যান্স-টুথপেষ্ট—এক দাঁতের ডাক্তারের তৈরী

কথায় কথায়

কয়েক বছর আগে এক প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের একটি চিঠি দেখেছিলাম। ভদ্রলোক অতি কষ্টে এবং বহু চেষ্টায়, বেশ পরিমাণ টাকা সেলামি দিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় পণ্ডিতিয়ায় একটি ফ্ল্যাট সংগ্রহ করেছিলেন। বসবাসও শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত থাকতে পারলেন না। বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হলেন। এই নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর থেকে তাঁর বিশ্রামের শান্তি, রাতের ঘুম সমস্ত কিছু দুর্ব হয়ে গিয়েছিলো।

এর জন্য অবশ্য সাংঘাতিক বাড়িওলা, দুর্দান্ত প্রতিবেশী বা পাড়ার মাস্তান কাউকেই তিনি দায়ী করেননি। তাঁর এই পাড়া ছাড়ার প্রধান কারণ হয়েছিলো এক দঙ্গল কুকুর। অসংখ্য কুকুর তাদের চীৎকার, মারামারি, পরস্পর খেলাধুলো ও আলোচনা-কালে গর্জন এবং কখনোসখনো পথচারী-দের তাড়া করে যাওয়া—এই সব নৈমিত্তিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁকে শান্তিতে তিষ্ঠোতে দেয়নি।

সেই সময় এই চিঠি 'সম্পাদক সমীপেষু' স্তম্ভে পাঠ করে আমি হেসেছিলাম, মনে হয়েছিলো একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন ভদ্রলোক। রাস্তার কুকুরের অত্যা-চারে বাসায় থাকতে পারবো না এ কেমন কথা? একটু-আধটু বিরক্ত লাগতে পারে, কিন্তু তার জন্য সেলামি দিয়ে ভাড়া করা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হবে, এ একে-বারে অবিশ্বাস্য।

তখন হেসেছিলাম, কিন্তু এখন আর হাসি না। কারণ এখন আমি নিজেই এ পাড়ায় থাকি।

এ পাড়ার যাঁরা প্রাচীন বাসিন্দা তাঁদের কারো কিন্তু এই কুকুরগুলো নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই। তাঁদের পুরো ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। লোড-সেডিং-এর সময় অন্ধকার রাস্তায় সন্ধ্যাবেলা ক্লান্তদেহে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় দশ-বারোটা কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়ে অন্যের অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া, মাসে দু-মাসে এক-বার গোড়ালিতে, হাঁটুতে বা কোমরে কুকুরের কামড় খাওয়া, সারারাত ধরে জানলার নিচে কুকুরশিশুদের আর্ত ক্রন্দন এবং তাদের মা-মাসী বাবা-কাকাদের আত্মকলহ, এ-নিয়ে এ পাড়ার আদি অধিবাসীদের কোনো অভি-যোগ নেই। রেল ইঞ্জিনের প্রবল ঘটাং-ঘটাং হুশ-হুশ ইত্যাদির মধ্যে ড্রাইভার-ফায়ার-ম্যানরা যে রকম সাবলীলভাবে গল্প-গুজব করেন কিংবা সুখে ঘুমোন, তেমনিই এ পাড়ার পুরনো লোকদেরও এইসব গোল-মাল অভ্যাস হয়ে গেছে। এই কুকুরকুণ্ডলীর বিরক্তি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না।

মুসকিল হয়েছে আমার। এবং আমার মত যাঁরা মূলত এ পাড়ার বাইরের লোক, বাড়ি ভাড়া করে এখানে বসবাস করতে এসেছেন, তাঁদের। আমাদের ভীষণ কষ্টে পড়তে হয়েছে।

আমি প্রথমে এসেই লক্ষ্য করেছিলাম, এই কুকুরগুলো, আমরা যারা বাইরের লোক এ পাড়ায় এসেছি, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে মনে করে। এই কুকুরদের তর্জন-গর্জন, লম্ফ-ঝম্প ইত্যাদির অনেক-খানিই আমাদের মত নবাগতদের প্রতি।

তাই আমি এ পাড়ায় এসেই প্রথাসিদ্ধ নানাবিধ উপায়ে এই কুকুরদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করেছি। এই উপায়গুলির প্রধান দুটি হলো বিস্কুট-পাউরুটি-বাসিরুটি উচ্ছিষ্ট-উদ্বৃত্ত ইত্যাদি খাওয়ানো এবং মধ্যে মধ্যে সময়ে-অসময়ে দুই ওষ্ঠ কুঞ্চিত করে সেই ফাঁকের মধ্যে জিহ্বাগ্র দিয়ে 'চুচু-চুচু' করা। নিয়মিত অভ্যাসে সিটি দেওয়ার মতই এই 'চুচু' ধ্বনি-নিক্ষেপ বহুদূর পর্যন্ত তরঙ্গায়িত করা যায়। এবং মধ্যে মধ্যেই কিছুটা তাগিদে এবং কিছুটা নতুন অভ্যাস-বশত আমি আজকাল তীব্র 'চু-চু' ধ্বনি করে উঠি। আমার এই চু-চু ধ্বনি শুনে অনেক লোক গলির মোড় থেকেই বুঝতে পারেন আমি বাড়িতে আছি কিনা?

শুধু চু-চু বা তু-তু করে নয়, জানলার পাশে চেয়ার নিয়ে বসে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেছি এই কুকুরদেব নিয়ে এবং আজ অনায়াসে আড়াইশ পৃষ্ঠার একটা গবেষণাগ্রন্থ লিখে ফেলতে পারি যার নাম হতে পারে, 'পণ্ডিতিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের পথ-বাসী কুকুরসমাজের রীতি ও নীতি'।

দশটা কুকুর চমৎকার অলসভাবে ফুট-পাথে শুয়ে বসে ঘুমিয়ে আছে এ ওর কোলে মাথা গুঁজে, রাস্তা দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া, মানুষজন যাচ্ছে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তাকিয়েও দেখছে না। বেশ চলছে সব। হঠাৎ কি হয়ে যায়, একটা কুকুর অসংখ্য গাড়ির মধ্যে কেন যে একটার দিকে পাগলের মত ছুটে যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, তার পিছে পিছে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় তার সঙ্গীসাথীরা।

এত লোক যায় কাউকে কিছু বলে না, হঠাৎ একেকটা লোককে দেখে তেড়ে যায় দশটা কুকুর দল বেঁধে। কিন্তু সেই লোকটাকে হয়তো এতদিন কিছুই বলেনি, প্রতিদিনই দেখছে। হঠাৎ আজকেই তেড়ে গেলো কেন?

এ বিষয়ে কেউ কখনো ভাবেন নি, তলিয়ে দেখেন নি, ভালো করে গবেষণা বা তদন্তও হয়নি। তাই কেউ কিছু বুঝতে বা ধরতে পারেন না। কিন্তু আমি গভীর অধ্যবসায় সহকারে লক্ষ্য করে কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি। একটি মাত্র উদাহরণ আজ দিচ্ছি।

যেমন কুকুরেরা পালিশ করা জুতো একদম পছন্দ করে না। ধবধবে কাচা ধুতি-পাঞ্জাবিও ভীষণ অপছন্দ। চকচকে জুতোর সঙ্গে ধোপদুরস্ত জামাকাপড় এদের দু চোখের বিষ। এই রকম পোষাকে কেউ আমাদের পাড়ায় এলে শতকরা নব্বুই ভাগ সম্ভাবনা কুকুরের তাড়া খাওয়ার। আবার খুব ময়লা বা ছেঁড়া জামা-কাপড় বা কাঁধে ঝোলা (পুরনো কাগজওয়ালা) ইত্যাদিও এরা প্রবল সন্দেহের চোখে দেখে। রাস্তায় ঝগড়া বা কথাকাটাকাটি করলেও এরা খেপে যায়, প্রথমে চুপচাপ দুই বিবদমান দলের মুখ-চোখ নিরীক্ষণ করে তারপর হঠাৎই এদের মধ্যে সবচেয়ে বুড়ো, লোমওঠা একটা কুকুর বিনাবাক্যব্যয়ে যাকে সবচেয়ে দোষী বলে মনে করবে তাকে খাঁক করে কামড়িয়ে দেয়। অবশ্য এই কুকুরটা কামড়ানোই মঙ্গল, কারণ এর দাঁত নেই।

এর পরের অধ্যায় কিন্তু বড় গোলমেলে। দাঁতহীন কুকুর মাড়ি দিয়ে কামড়িয়ে রক্ত বার করে দিলে তাতে জলাতঙ্ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা এবং সেই ভয়ে তল-পেটে একুশটা চাব ইঞ্চি ইঞ্জেকশান নেওয়া প্রয়োজন কিনা— এ নিয়ে শুনেছি গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু সে গবেষণা আমার জন্যে নয়, সেটা ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরাই করছেন।

তারাপদ রায়

পরিতোষ মজুমদার

এখানে অন্ধকার

জীবনটা যেন হঠাৎ এখানে এসে থেমে গেছে। অন্ততঃ সানড্রার তাই মনে হয়। ছোটবেলায় শুনেছিলো, ভাবনাচিন্তাগুলো নাকি বিরাট সমুদ্রের মতো। দিক্‌হারা। একবার দাঁড় বাইতে শুরু করলে উপকূল মেলা ভার। কিন্তু আজ, জীবনের এই মুহূর্তে মনে হয়, কথাটা নিছক মিথ্যে। সত্যের ছিটেফোঁটা তাতে নেই। যদি সত্যি থাকতো, তাহলে আজ সানড্রা কিছু ভাবতে পারছে না কেন? আসলে ভাবনাচিন্তার জগতেই ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। বয়েস হওয়ার পর থেকে চিন্তা তো কম করে নি। কিন্তু তাতে লাভ কি হয়েছে? বরং জীবনের বল্‌গাটাকে আলগা করতে পারে নি। মনটাকে যেদিকে ইচ্ছে ছোটানো যায় নি। কিন্তু কেন?

পাশের ঘর থেকে ঝগড়ার শব্দ ভেসে আসছে। মা ঝগড়া করছে। হয়তো কোন খদ্দেরের সঙ্গে। এমনিতেই মার পড়ন্ত বয়েস। সুতরাং নতুন কোন খদ্দের তো আসে না। পুরোন খদ্দেররাই যা এখানে ঢুঁ মারে। কিন্তু মা চায় এই লাইনের উপযুক্ত বয়েসের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতে। কিন্তু বোঝে না যে পরের চোখে সাময়িকভাবে ধুলোও কাজল লাগাবার ক্ষমতা মার আর নেই। এই সহজ সত্যটা মাকে কে বোঝাবে? সানড্রা যে গিয়ে কিছু বলবে, তারো তো উপায় নেই। —বাস্টার্ড। বুড়ো শকুনের দল সব। বলি, ভাগাড়ের মড়া পেয়েছো?

মার উচ্চগলার পরিচিত গালাগালগুলো ভেসে আসছে। অর্থাৎ, ঠেসে পুরো বোতলটাই গিলেছে মা। এখন রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত চলবে এই একটানা গালাগাল। থামাতে যাওয়া মানে, তুষের আগুনে ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া বাড়ানো।

সানড্রা এগিয়ে এসে নিজের ঘরের দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দেয়। সাময়িক রাগ হলেও পরে রীতিমতো দুঃখ লাগে। মায়েরই বা দোষটা কী? সারাটা দিন তো একেবারে অন্যমানুষ। ও অফিসে কি খেয়ে যাবে, এসে-ই বা কি খাবে, এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ, সানড্রাই ঘিরে থাকে ওর মনটা। কিন্তু সন্ধ্যের পর সেই মানুষটাই কেমন যেন বদলে যায়। বিকেলের রোদ পড়তে না পড়তে সাজগোজ করতে বসে। উগ্র সাজে সাজায় নিজেকে। জানলার ধারে বসে অপেক্ষা করে। পুরোন কোন খদ্দের

এলে ছুঁতোনাতা কিছু একটা নিয়েই গালা-গাল শুরু করবে। আবার কেউ না এলেও অসুবিধে। রাতে বাইরে বেরোবে। পার্ক স্ট্রীট অথবা পার্ক সার্কাসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। ওর কাছ থেকেই পয়সা চেয়ে নিয়ে গিয়ে ছোটখাটো কোন বারে বসে বিয়ার খাবে। যখন ফিরে আসে, তখন সানড্রা দেখেছে, মার চোখে মুখে কী ভীষণ ক্লান্তি। দেখে তখন সানড্রার নিজেরই মায়া হয়। কিন্তু বারণ করলেও কি শুনবে? বরং হৈ চৈ করে বাড়ী মাথায় করে তুলবে। সেই ভয়েই ইচ্ছে থাকলেও সানড্রা কিছু বলে না। আসলে মার প্রবাহিত জীবনযাত্রায় কোন-রকম নিষেধের বাঁধ তুলতে চায় না। যেভাবে জীবনটা কাটিয়ে আনন্দ পায় পাক, সুখের মুখ তো কখনো দেখেনি।

অফিসের এই চাকরীটা পাওয়ার পর সানড্রা ভেবেছিলো, পার্ক স্ট্রীট পাড়ার বাড়ীটা ছেড়ে দেবে। বালগঞ্জ বা টালিগঞ্জের কোন মধ্যবিত্তপাড়ায় চলে যাবে। কিন্তু মাকে বলতেই মা একেবারে মুখিয়ে উঠেছে, —ভাবছিস ওগুলো ভদ্রপাড়া? আবে যতো নষ্ট পুরুষ তো ওসব পাড়া থেকেই আসে। কয়েক ঘণ্টা মজা লুটে নিয়ে ভদ্দরলোক সেজে পাড়ায় ফিরে যায়। পুরুষজাতটাকে তো আজ নতুন দেখছি নে? হাড়ে হাড়ে ও-গুলোকে চিনি। নবকের কীট সব, বুঝলি?

মা বেশে ঢেকে কথা বলে না। আসলে মার নিজের জীবনটাই বেশে ঢেকে কথা বলতে শিখায় নি। এই লাইনে ভদ্র হলে পুরুষগুলো যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। মার কথাগুলো শুনতে বুঢ় হলেও সত্যি যে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের জন্য এপাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় চলে যেতে চাইছে, সেখানে গেলেও কি কিছু লাভ হবে? কিন্তু এখানে থাকতেও যে মন চায় না। হোক না পার্ক স্ট্রীট। পায়রার খোপের মতো ছোট ছোট ঘরগুলো। চারতলার নড়বড়ে বাড়ীটায় অসংখ্য ভাড়াটিয়া। বেশীর ভাগই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। বাইরের সাজপোশাক দেখলে কে বলবে যে কী রকম পরিবেশে এরা থাকে! সুট টাই-য়ে একেবারে ছয়লাপ। সেই মানুষগুলোই আবার সকালে বিকেলে উঠোনের কর্পোরেশনের নলের এক বালতি জলের জন্য যে খিস্তি খেউরি ভাষায় ঝগড়া-ঝাঁটি করে, তখন কে বলবে মানুষগুলো সভ্য জগতের। সানড্রা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে, এই পরিবেশে বড়ো হয়েও কেন ওদের মতো মনটা হয়নি। হলে অন্ততঃ সানড্রা বেঁচে যেতো। নিজের চারপাশে যে পরিবেশ-বলয় ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার মতন যন্ত্রণা সংসারে খুব কমই আছে। কিন্তু সানড্রা কি করবে? এই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কথা চিন্তা করলেও মনটা বি-বি করে ওঠে।

ওদের পাশের ফ্ল্যাটে যেসব মেয়েরা থাকে, যেমন রডা, ক্রিশ্চিয়ানা কী চমৎকার পরিবেশের সঙ্গে মিলে মিশে গেছে। প্রতি সন্ধ্যেবেলাতেই রং-চং মেখে ছেলেদের সঙ্গে কোমর ধরে বেরোয়। ভিকটোরিয়া বা হেস্টিংসের গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে ঢোকে পার্ক স্ট্রীটের কোনো বারে। গোগ্রাসে গেলে যতোটা পারে; তারপর রাতের অর্ধেকটাই সেইসব বারেটারে কাটিয়ে এসে ঘরে ঢোকে। কদিন পরে সেই সব বয়-ফ্রেন্ডরাই হাতছাড়া হয়ে পাশের ফ্ল্যাটের অন্য কোন মেয়ের কোমর ধরে। তখন আবার রডা আর ক্রিশ্চিয়ানার দল যেসব ভাষায় খিস্তি করে, ভাবলেও গা-টা গুলিয়ে ওঠে সানড্রার। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু মুখে গালাগাল নয়, শেষ পর্যন্ত ধ্বস্তাধ্বস্তি, হাতাহাতিতেও গিয়ে পৌঁছোয়। একটা ছেলের জন্য নিজে-দের এরকম নির্লজ্জ প্রকাশ, ভাবতেও পারে না সানড্রা। লজ্জাসরমের বালাই বলে যেন কিছু নেই। এরপর দিন কয়েক ঘরের মধ্যে মুখ গোমড়া করে পড়ে থাকে। তারপর আবার কাউকে একটা জুটিয়ে নিয়ে যে কে সেই। ছোটবেলা থেকে এসব দেখে এলেও কেন জানি মনে দাগ কাটে নি। আসলে জীবন সম্পর্কে ওর ধ্যান-ধারণাই আলাদা। যেটা পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। বরং উল্টো।

সানড্রার ঘরের দরজার সামনে এসে মা গলা খাঁকারি দিচ্ছে। এ গলা খাঁকারির মানে সানড্রা বোঝে। অর্থাৎ মার কটা টাকার দর-কার হয়েছে। সিগারেট কেনার জন্য। নেশার জিনিস, হাতের কাছে নেশার সময়ে না পেলে কি অবস্থা হয় সানড্রা তা' বোঝে। মাথার ঠিক থাকে না। তবু ওর কাছে সোজাসুজি মুখ ফুটে চায় না। লজ্জা পায়। চাকরী পাওয়ার পর নিয়মিতই সানড্রা মাকে হাত-খরচা দিয়ে আসছে। মা ঢোক গিলে নীচু গলায় ডাকে,—বেবি ঘরে আছিস?

—হ্যাঁ মা, এসো।

মা ঘরে ঢোকে।

—আমি একটু বেরোব।

অন্যদিকে তাকিয়েই কথা কটা বলে মা।

সানড্রা বলে—ড্রয়ারটা খুলে দেখো টাকা আছে। যা দরকার হয় নিয়ে যাও।

সানড্রা জানে, মা প্রয়োজনের বেশী একটা টাকাও নেবে না।

মা এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে টাকা কটা বার করে নিয়ে আবার ড্রয়ারটা বন্ধ করে দেয়। বেরিয়ে যেতে যেতে বলে,—বেবি, তুই কিন্তু আমার জন্য বসে থাকিস নে। কিচেনে খানা ঢাকা দেওয়া আছে। একটু গরম করে নিয়ে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়িস। কাল আবার অফিস আছে। শরীরটাকে তো একটু বিশ্রাম দিতে হবে।

সানড্রা বলে,—ঠিক আছে মা। তুমি চিন্তা করো না।

জানে মা এখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে। ও শুয়ে পড়লে রাত গভীর করে বাড়ী ফিরবে। কদিন বারণ করে দেখেছে। সানড্রা বারণ করলে অবশ্য মা বেরোয় না। তবে সারাটা সন্ধ্যে ঘরের ভেতরে ছটফট করে। বারবার খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্ণ মুখে। অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সানড্রা সেটা সহ্য করতে পারে না। সে মুহূর্তগুলোয় মাকে অত্যন্ত দুঃখিনী দেখায়। তার চেয়ে সানড্রা ভাবে, জীবনের বাকী কটা দিন মা যেভাবে আনন্দ খুঁজে পায়, পাক। অতীতের যে একমুখী স্রোতটা মাকে এমন একটা জীবন-গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলেছিলো, তার হাত থেকে চেষ্টা করলেও মুক্তি পেতো না। বরং মেনে নিয়ে একরকম ভালোই করেছে।

মা নাকি নদীয়া কেষ্টনগরের হাঁড়িয়া পাড়ার মেয়ে। দু'একবার খুব ছোটবেলায় গেছে সানড্রা। সেসব স্মৃতি অবশ্য স্পষ্ট মনে পড়ে না। আবছা আবছা। কোলকাতা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে যেতে হ'তো। সকালের দিকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে গাড়ী ছাড়তো। দুপুর পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছতো কেষ্টনগর স্টেশনে। তখনকার কেষ্টনগর আজকের মতো এমন জমজমাটি ছিলো না। স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ী করে ঘণ্টি পার হয়ে বেশ কিছুটা দূরে যেতে হ'তো। মুসলমানপ্রধান পাড়া। দিদিমা নাকি কেষ্টনগরের সরকারী হাসপাতালে নার্সের কাজ করতো। অবশ্য সানড্রা দিদিমাকে চোখে দেখে নি। ও বাড়ীর কেউ দিদিমার কথা খুব বেশী একটা তুলতোও না। বরং দিদিমার সম্পর্কে রাখাঢাকা একটা ভাব ছিলো বাড়ীর আবহাওয়ায়। মামাদের অবস্থা পড়তির দিকে। কোনরকমে দিনের রোজগারে দিন-টাকে টায়টোয়ে পার করতো। যার জন্য মা যেতে চাইতো না। আসলে মার তখন তেমন পয়সা না থাকলেও মেজাজে যে বড়োলোকী-পনা ছিলো, সেই কারণে টানাটানির সেই সংসারে গিয়ে মা কিছুতেই স্বচ্ছন্দ অনুভব করতো না। বরং দূরে দূরে থাকতেই ভাল-বাসতো। এই কেষ্টনগরের হাঁড়িয়া পাড়ায় থাকতে থাকতেই মার বিয়ে হয়েছিলো। আনোয়ার নামে একটা ছেলের সঙ্গে। পাশের পাড়ার ছেলে। খুব ছোটবেলায় নাকি আনো-য়ার ঘর পালিয়ে কোলকাতায় চলে এসে-ছিলো। তারপর খিদিরপুর থেকে জাহাজে চেপে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলো। বেশ কয়েক

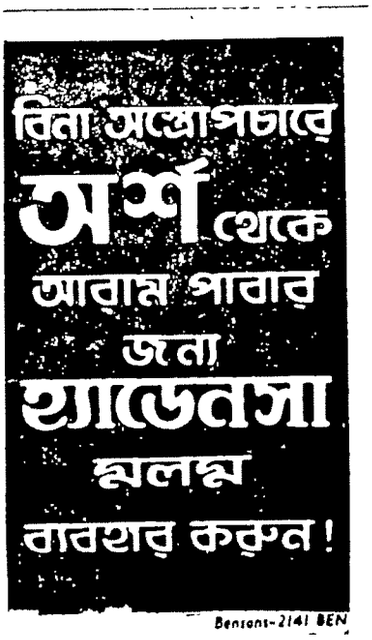

বছর পরে বিভিন্ন বন্দরে বন্দরে ঘুরে স্বদেশে ফিরে এসেছিলো। যদিও আনোয়ার কেন্টনগরে আর ফিরে যায়নি, ডেরা বেঁধেছিলো কোলকাতার মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে। মাঝে মধ্যে আসতো হাঁড়িয়াপাড়ায়। তবে কে জানে মা কাকে ভালোবেসেছিলো? নিত্য নূতন ইম্পোর্টেড কাপড়জামা, কসমেটিক, নাকি আনোয়ারকে? বিয়ে করে মা এসে উঠেছিলো মেটিয়াবুরুজে, বড়োজোর বছর-খানেক। তারপরেই শুরু হলো মারধোর অত্যাচার। সায়েন্স তখন নোঙর তুলে অন্য বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। আর মা? কোথায় সেই নিশ্চিন্ত বন্দর! যার হাতছানিতে কেষ্টনগরের হাঁড়িয়াপাড়ার ঘাট ছেড়ে মেটিয়াবুরুজে নৌকো ভিড়িয়েছিলো। কিন্তু তখন? মা শেষে একদিন আর সহ্য করতে না পেরে অজানা দরিয়ায় ভাসলো। উপকূলের নেশা তখন হারিয়ে গেছে। কোনরকমে বেঁচে থাকার দায় এ দুনিয়াতে। আর একলা হলে না হয় কথা ছিলো; সঙ্গে সান্ড্রা। মাত্র কয়েক মাসের কোলে। শুধু নিজে বাঁচলে হবে না। সেই সঙ্গে আরেকজনকেও বাঁচাতে হবে।

ভালো করে জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সান্ড্রা ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। বাবা বলেই জানতো। নার্সারী স্কুলে পড়ার সময় থেকে নামের পদবীটা মা জুড়ে দিয়েছিলো বুদ্ধি করে। যাতে লোকে বুঝতে না পারে! কিন্তু একটু বড়ো হয়ে ব্যাপারটার আগাপাস্তালা সবটা না বুঝলেও কিছু কিছু বুঝতে পারতো সান্ড্রা। দু'জনের ঝগড়া লাগলে কেউ-ই রেখেঢেকে কথা বলতো না। বিশেষ করে, মা'র মুখের আগল তো কোনদিনই নেই। তখনো ছিলো না। আর মনে যাই থাক্, রেখেঢেকে কথা বলতে মা কোনদিনই পারে না। এতোগুলো বছর তো দেখলো সান্ড্রা।

আজ সমস্ত ব্যাপারগুলো বিশ্লেষণ করে বোঝে, অমিয় দস্তিদার লোক হিসেবে খারাপ ছিলো না। বরং সংসারে নিত্য নিয়মিত যে ধরনের পুরুষ দেখছে, তারচেয়ে অনেক উঁচু। নইলে আজ সান্ড্রারা কোথায় ভেসে যেতো। দেখতে শুনতেও অমিয় দস্তিদার সাধারণ আরো দশটা পুরুষের চেয়ে সুন্দর ছিলো। মনটাও উদার। বড়োলোকের একমাত্র ছেলে। বাবার নাকি বিরাট লোহার কারখানা। অঢেল পয়সা। কোনো একটা পার্টিতে মা'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো। প্রথম নজরেই অমিয়র ভালো লেগে গিয়েছিলো। বিশেষ করে, মার সরলতা।

বিয়ে না করলেও পার্ক স্ট্রীটের মতো পস্ অঞ্চলে দু কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলো। বাড়ী ভাড়া, সংসার খরচ প্রভৃতির অংশ নেহাৎ কম ছিলো না। হাসি মুখেই সবকিছু বহন করতো অমিয়। বাইরের লোককে বলে না দিলে বোঝার উপায় ছিলো না যে ওরা স্বামী-স্ত্রী, বা সান্ড্রা অমিয়র মেয়ে নয়। নতুন ফ্ল্যাট্ নেওয়ার পর চারদিকের সবকিছু বিচারবিবেচনা করে, অমিয়ই প্রস্তাবটা দিয়েছিলো,—সান্ড্রাকে কোনো কনভেন্টে রাখার। মাও আপত্তি করেনি তাতে। মেয়েটা মানুষের মতো মানুষ হোক্। দশজনের ভীড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক। সব বাপ-মা-ই এটা চায়। তা যে ধরনের পরিবেশ-বলয়ই ঘিরে থাক না। মা রাজী হওয়াতে অমিয়ই খুঁজে খুঁজে বার করেছিলো চন্দননগরের কনভেন্টটা। গঙ্গার পাড়ে। পড়াশোনা করার জন্য আদর্শ জায়গা। নির্জন। বিরাট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

অমিয় গাড়ী করে মা'র সঙ্গে গিয়েছিলো সান্ড্রা। কনভেন্ট বিল্ডিংটাকে দূর থেকে দেখে ভালো লেগেছিলো। মাদার সুপিরিয়র রেজিস্টারটা বার করে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলো,—তোমার নামটা বলোতো?

ও কিছু উত্তর দেবার আগেই অমিয় বলেছিলো,—ওর নাম হলো সান্ড্রা দস্তিদার।

ওর নাম লিখে অমিয়র দিকে তাকিয়ে মাদার সুপিরিয়র আবার জিজ্ঞাসা করেছিলো —ইওর রিলেসন্সিপ্ প্লিজ?

—ফাদার।

—প্রফেশন?

—ইন্ড্রাস্টিয়ালিস্ট।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলো, ইওর নেম্ প্লিজ?

—রেবেকা। রেবেকা দস্তিদার। হাউস ওয়াইফ। অমিয় সান্ড্রার মা'র কথাগুলো সংশোধন করে দেয়নি। চুপ করে থেকেছে।

তখনো ব্যাপারটা পুরো হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি সান্ড্রা। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছে। অমিয়র সমুদ্র-হৃদয়ের প্রশংসা না করে পারেনি। বড়ো হয়ে চোখ মেলে তো দেখেছে পৃথিবীটাকে। সঙ্গ দিতে পুরুষের অভাব হয় না। সেও অন্ধকারে। দিনের আলোয় অপরের সামনে স্বামী বলে পরিচিত হ'তে খুব কম পুরুষই রাজী। বরং এড়িয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়। সেদিক থেকে অমিয় সত্যি ব্যতিক্রম। যদিও এ সবের জন্য ওকে কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়নি। পয়সাওয়ালা বাপ ব্যাপারটাকে সহজে স্বীকার করে নেয়নি। ওর মায়ের নামে পুলিশ কেস্ পর্যন্ত করেছে। মা বছরের পর বছর অমিয়র সঙ্গে কথা বলেনি। তবুও অমিয় টলে নি। নতিস্বীকার করে নেয় নি। মুখে সব সময় এককথা, অন্যায় তো কিছু করিনি। বরং পৃথিবীতে এটাই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক। এমনকি রেগেমেগে বাবা মায়েরবাড়ীর কাছে কারখানা বিক্রী করে দিয়ে অমিয়র মাকে নিয়ে তীর্থে চলে গেছে। তবু অমিয় নিজের পথ ছাড়েনি। কিন্তু মার কাছে ও শান্তি পায় নি। ছুটিছাটায় যখনই সান্ড্রা বাড়ীতে এসেছে, দেখেছে মা ছুতোনাতায় অমিয়র সঙ্গে তুলকালাম কান্ড করছে। এমন কি সান্ড্রাকে যে অমিয় আদর করে, তাও পর্যন্ত মা সহ্য করতে পারে না। আজ অবশ্য বোঝে সমস্ত বিষয়টা মার পারসপেকটিভে দেখলে মাকেও খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। মা'র নিজের জীবনটাই ভালবাসা শব্দটার ওপর ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছিলো। নতুন করে কাউকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতাও তাই হারিয়ে ফেলেছিলো। অমিয়র হাত ধরেছিলো, স্রেফ নিশ্চিন্ত দিনগুলোর জন্য। একান্তই অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু অমিয়? ওর কাছে জীবনটা তখনো রঙীন। যে রঙের নেশায় মানুষ জীবনের সঙ্গে কোনরকম মুষ্টিযুদ্ধে পেছু হটে না।

তবু, আজ বুঝতে পারে সান্ড্রা যে অমিয় অনেক চেষ্টা করেছে মানিয়ে নিতে। কিন্তু পারেনি। আসলে জীবনের হাতে মার খেতে খেতে মার চিন্তাধারাটাই ততোদিনে কেমন বদলে গেছে।

সান্ড্রা বড়ো হয়েছে। কনভেন্ট শেষ করে কলেজে পড়ার জন্য এসেছে কোলকাতায়। অমিয় না থাকলে হয়তো বা বাঁচার পথ খুঁজতে সান্ড্রাকেও মার পথ ধরেই নীচে নেমে যেতে হ'তো। সেদিক থেকে সত্যি সান্ড্রা অমিয়র কাছে কৃতজ্ঞ। যেটুকু দাঁড়া-

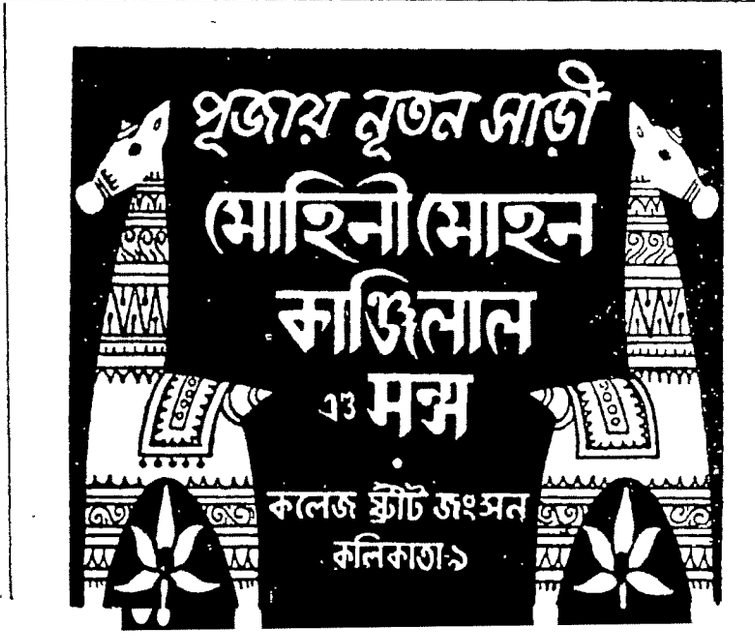

বার ঠাঁই জুটেছে, সেটুকুও জুটতো কিনা সন্দেহ।

কলেজে পড়তে পড়তেই ঘটনাটা ঘটে গেলো। এর জন্য সানড্রা অবশ্য এতোটুকুও প্রস্তুত ছিলো না। সংসারে অনেক ঘটনাই তো অভাবনীয় ভাবে ঘটে থাকে। এটাও তার মধ্যে একটা। অন্যতমও বলা যায়।

কলেজে ঢুকে চাকরীর জন্য এদিক ওদিক সবেমাত্র দরখাস্ত ছোঁড়াছুড়ি শুরু করেছিলো। লাগবে যে না, এ তো জানা কথা। তবু দরখাস্ত লেখার হাতটা তো আসুক। অবশ্য যেদিন থেকে সংসারটাকে বুঝতে শিখেছে, সেদিন থেকেই মনের কোণে গোপন একটা ইচ্ছে: কলেজটা পেরিয়ে মোটা-মুটি গোছের একটা চাকরী জুটিয়ে নেবে। তারপর মাকে নিয়ে এ অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে শহরের অন্য কোন অঞ্চলে ছোট্ট একটা সংসার পাতবে। অহরহ প্রতিটি মুহূর্তে যে ক্লেদ-গুলো জীবনের বলরটাকে ঘিরে রয়েছে, তার হাত থেকে নিজেও বাঁচবে, আর মাকেও বাঁচাবে। এমন একটা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াবে, যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে ঝড়-বাদলের আশংকায় কাঁপতে হয় না। তার-পর? তারপর দেখা যাবে। জীবনটা আগে স্থিতু হয়ে নিক্ তো।

'পিটার এন্ড সিমসন' কোম্পানির ইন্টারভিউ লেটারটা পেয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিঠিটাকে উল্টেপাল্টে দেখেছিলো সানড্রা। বিশ্বাস করতে মন চায়নি। এও কি সম্ভব? কিন্তু সংসারে অসম্ভব ঘটনাও তো কিছু ঘটে। শেষপর্যন্ত কলেজে যাওয়ার বদলে নির্দিষ্ট দিনে ডালহৌসি পাড়ায় অনেক খুঁজে খুঁজে ঠিকানাটা বার করেছিলো। চারতলায় হেড অফিস। দরজার পাশে পিত-লের নেমপ্লেটে জ্বলজ্বল করছে নামটা। হাত পায়ে কাঁপন ধরলেও বুকে জোর করে সাহস এনে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছিলো সানড্রা।

এতোটার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলো না। টেলিফোন অপারেটরের চাকরী। সামনের মাস থেকেই যোগ দিতে হবে। মাইনে? ছ'টা মাস ট্রেনটুনে কোনরকমে পার করে দিতে পারলেই হলো। তারপর তো রীতিমতো গ্রেড শুরু। আনন্দে নেচে উঠেছিলো মনটা। পেছনে ফেলে আসা জীবনটাকে সেই মুহূর্তে সুদূর অতীত বলে মনে হয়েছিলো।

বাড়ীতে ফিরে এসে পুরোটা রাত ঘুমোতে পারে নি সানড্রা। এই জীবনটাকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছে, তাই আজ সত্য হতে চলেছে। ভাবতেও কেমন শিহরণ লাগে। অন্ধকারের পথ দীর্ঘ হলেও পথপরিক্রমা তো শেষ।

অফিসে আরো মেয়ে থাকলেও বাঙ্গালী বলেই কেউ এগিয়ে আসেনি পরিচয় করতে। ব্যতিক্রম একমাত্র সুশান্ত। জুনিয়ার ইঞ্জি-[illegible] জিজ্ঞাসা করেছিলো—আপনি বুঝি আজকেই জয়েন করলেন?

সানড্রা জড়োসড়ো হয়ে হেসে উত্তর দিয়েছিলো,—হ্যাঁ।

—টেলিফোন অপারেটর?

সুশান্তর জিজ্ঞাসায় সানড্রা উত্তর দিয়েছিলো,—আপাততঃ তাই।

—আমার নাম হলো সুশান্ত। সুশান্ত বসু। আমি জয়েন করেছি মাস তিনেক।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। পাশ করে বসে না থেকে ঢুকে পড়েছি। একসপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা এখন, বকমারী মেসিন তো হাতড়াতে পারবো। এই লোভেই এখানে ঢোকা।

কথা বলতে বলতেই দু কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিলো। চা এলে সানড্রার দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিয়ে, নিজে আরেকটা কাপ টেনে নিয়েছিলো। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে জিজ্ঞাসা করেছিলো—ডু ইউ স্মোক?

সানড্রা বিনীত জবাব দিয়েছিলো,—না, আমি খাই না। আপনি খান্।

কয়েকদিনের মধ্যেই অফিসের আব-হাওয়াটা বুঝে নিয়েছিলো সানড্রা। দলাদলি, রেষারেষি। কে কাকে কতোটা মাড়িয়ে কতো-খানি ওপরে উঠতে পারে। ওপরে যদি নাও ওঠা যায়, চেয়ারটায় তো একটু ঝাঁকুনি দেওয়া হবে। চাকরীর এদিকটা সানড্রার জানা ছিলো না। বাঙ্গালী মেয়েরা সানড্রা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে দূরে দূরে থাকতো। কথাবার্তায় যতোখানি সম্ভব এড়িয়ে যেতো। কিন্তু একটু ত্রুটি পেলে পর রক্ষে নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম সুশান্ত। দিলদরিয়া ধরনের ছেলে। দীঘল চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ। অনেকটা যেন অমিয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু প্রথম দিকে কথাবার্তায় যা হোক্, ব্যবহারে সানড্রা দূরে দূরে থেকেছে। কিন্তু এক অফিসে চাকরী করে, কতোদিন আর সে দূরত্ব বজায় রাখা যায়? সুশান্ত এগিয়ে এসে বলেছে,—আজকে এলিটে ভালো একটা ইংরেজী বই চলছে। দুটো টিকিট কিনেছি। ইভিনিং শোয়ের। আপনাকে কিন্তু যেতে হবে মিস দস্তিদার।

মুখের ওপর আর কি করে না করা যায়। রাজী হতেই হয় বাধ্য হয়ে। আর সুশান্তর কথা বলার ধরনটাই এতো নিকট যে ইচ্ছে থাকলেও না করা যায় না। কয়েক-বার বাধ্য টানতে চেষ্টা করেছে সানড্রা। কিন্তু পারেনি। বরং বিপুল বেগে ভেসে গেছে। শেষ পর্যন্ত এক সময় হাল ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে ভেসে চলুক। সানড্রা কি করবে? ইচ্ছে করলেই কি আর স্রোতে পড়া নৌকোর হাল ঘোরানো যায়? নাকি সম্ভব?

কখনো গড়ের মাঠে ইডেন পেরিয়ে [illegible] ধরে কখনো বা রেড রোড ধরে [illegible] সবই হলে বলছে সুশান্ত। মাস্তুদিয়াতে ওদের বিরাট বড়ো জমিদারী ছিলো। বাপ ঠাকুরদা কোনদিন চাকরীর মুখ দেখেনি। হয়তো বা সুশান্তও দেখতো না। অন্ততঃ জমিদারী থাকলে তো দেখার প্রয়োজন-ই পড়তো না। কিন্তু গভর্ণমেন্ট জমিদারী বাজেয়াপ্ত করায় বাধ্য হয়েই সুশান্তকে চাকরীজীবী হতে হয়েছে। তবে সে আর কদিন? আসলে টাকা বা চাকরীর লোভে সুশান্ত 'পিটার এন্ড সিমসন্' কোম্পানীতে ঢোকে নি। জমিদারী নিয়ে নেওয়ায় গভর্ণমেন্ট যে বিরাট অংকের টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এক ছেলে হওয়াত সবই তো সুশান্তর। সে টাকা দিয়ে সুশান্ত কারখানা খুলবে। আর সেই উদ্দেশ্যেই এ চাকরীতে ঢোকা। দেশবিদেশের নানারকম মেসিনপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে রপ্ত হয়ে নিয়ে তবে কারখানায় বসবে। বানাবে নতুন মেসিন অর্থাৎ ইমপোর্ট সাবসস্টিশন্। গ্র্যান্ড মার্কেট। কেমন ঠিক বলিনি? সুশান্তর আবেগে সানড্রাও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। আরো জোরে চেপে ধরেছে ওর হাত।

তবু সংসারে সব ঘটনাই সরলরেখা নয়। সব নদী-ই কি আর সাগরে গিয়ে মেশে? সুশান্ত বলেছিল, যে করেই হোক বাবার মত আদায় করবে। তারপর শুরু করবে সত্যিকারের জীবন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই আশাতেই সানড্রা অফিস থেকে আগে বেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার কাছে এসে-ছিলো। সেদিনের সকালের ট্রেনে এসেছে সুশান্ত। মাস্তুদিয়া থেকে। ওর চোখে-মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। সানড্রা ওকে দেখেই চমকে উঠে বলেছিলো,—কি হয়েছে তোমার?

—আমার? একটু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুশান্ত বলে-ছিলো,—কই কিছু না তো। ট্রেনে এসেছি বলে বোধহয় একটু টায়ার্ড দেখাচ্ছে।

এর পর সুশান্ত বলেছিলো, ওর বাবা নাকি এ-বিয়েতে রাজী নয়। একেবারে বেঁকে বসেছে। সুশান্তকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে, এ-বিয়ে হলে সমস্ত টাকা-পয়সা কোন আশ্রমকে দিয়ে দেবেন।

—তাহলে তোমার কারখানা? উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলো সানড্রা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুশান্ত বলে-ছিলো,—এর জন্যে ভেবো না। বাবার তো বয়েস হয়েছে। সে-কটা দিন না হয় আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকবো। বিয়ে করবো না। মনের মিলই তো সবচেয়ে বড়ো। মাস্তুদিয়া থেকে কোলকাতায় আর কে দেখতে আসছে। তারপর—।

মার মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে সানড্রার। সুশান্তকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উঠে পড়ে। সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। অন্ধকারের একটা হাল্কা চাদর মাঠের ওপরের গাছপালাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে। সেই অন্ধকারের দিকে পা বাড়ায় সানড্রা।

আপনি কেমন আছেন

বাঙালীর খাদ্যাভ্যাস

।। এক ।।

আমাদের মা-ঠাকুমা-দিদিমারা তাঁদের ঠাকুমা-দিদিমা-শাশুড়ি- দিদিশাশুড়ির কাছে শত শত বছরের অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে খাদ্য নির্বাচনের এবং রান্নার এমন সব পদ্ধতি শিখেছিলেন যা দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমাদের ক্ষুধা ও রসনা তৃপ্তি করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত পারিবারিক অভ্যাসের ধারা বেয়ে জীবনের অচ্ছেদ্য অংগ হয়ে উঠেছে। বহু ক্ষেত্রেই পরিবারের সীমানা ছাড়িয়ে সেগুলি রূপ নিয়েছে গোষ্ঠি বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির অংশ হিসাবে। কোথাও ভাত, কোথাও লুচি-পরোটার আদর; কোথাও পছন্দ ফ্যান-ভাত, কোথাও পান্তা-ভাত, কোথাও মিষ্টি-মিষ্টি রান্না, কোথাও ঝাল-ঝাল; কোথাও যৎসামান্য মশলা কোথাও তেলে-ঝালে রগরগে।

মোটামুটি বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে কতকগুলি দেখা যাচ্ছে পুষ্টিরক্ষার বেশ অনুকূল, কতকগুলি দুর্বোধ্য, আবার কতকগুলি সুনিশ্চিত ভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। প্রথম পাতে তিতো লালা ক্ষরণ বাড়িয়ে শ্বেতসারকে বিশ্লিষ্ট হতে সাহায্য করে। বিস্ময়কর মনে হলেও, নিম্নপাতায় দেহ-গঠনের উপযোগী প্রোটিন আছে উচ্চ হারে—শতকরা ১১ ভাগ। শেষ পাতে দুধ-ভাত-গুড়। চালে ডালে গমে লাইসিন কম, দুধে তা বেশি। গুড়ে আছে পর্যাপ্ত লোহা ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। অর্থাৎ একদিকে বিভিন্ন অ্যামাইনো-অ্যাসিডের সংমিশ্রণে দেহ-প্রোটিন সংশ্লেষ হচ্ছে, অন্যদিকে এ্যানিমিয়ার প্রতিষেধক গুড়ের লোহা। বাড়ন্ত শিশু ও প্রসূতিদের চমৎকার খাদ্য। চাল-দুধ-গুড় মেশান পায়েস-পিঠে সত্যিই পরমান্ন। একইভাবে ডালের সঙ্গে নারকেল-আলু-কড়াইশুঁটি সিম-ডাঁটা ইত্যাদি সবজি কিংবা মাছের মাথা, সবজির সঙ্গে বড়ি বা ছোলা-মুগ-মুগ, কিংবা খিচুড়ি, নানারকম অসম্পূর্ণ প্রোটিনকে সম্পূর্ণ প্রোটিনে রূপান্তরিত করে দেহ গঠনের ও ক্ষয়-পূরণের পথ সুগম করে। প্রাচীনারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু নানারকম উদ্ভিদের তেলের মধ্যে সরষের তেলে রান্না করা মাছতরকারি শুধু যে সুস্বাদু হয় তা নয়, সরষের তেল বস্তু কোলেস্টেরল বাড়ায় না, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আজ তা ধরা পড়েছে। কলে ছাঁটা ধবধবে সাদা সরু চাল খেয়ে বি-ভিটামিনের ঘাটতি থেকে বেরিবেরির উদ্ভব—এই তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় ১৮৭৮ থেকে ১৯১১ সনের মধ্যে। পূর্ব বাংলার (অধুনা বাংলা দেশের) যশোহর-খুলনা জেলায় লাল চালের ফ্যান-ভাত খাওয়ার যে প্রথা বি-ভিটামিন রক্ষার প্রকৃষ্ট পথ, সে-প্রথা চালু হয়েছে কত শতাব্দী আগে তা আমাদের জানা নেই। লোহার কড়াইতে রান্না করা তরকারিতে কড়ার লোহা যুক্ত হয়ে অ্যানিমিয়া প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে, সারা পৃথিবীর সমস্ত পুষ্টিবিদ তা স্বীকার করেন। মাঝে মাঝে অবাক হতে হয় আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য দেখে।

অবশ্য চাঁদের অপর পিঠও আছে। অমুক বারে বেগুন খেতে নেই, মাংসের সঙ্গে দুধ খেতে নেই, মায়ের অম্বল হলে শিশুকে বুকের দুধ দিতে নেই, গর্ভাবস্থার সময় ডিম খেলে পেট গরম হয়, রাতে দই খেলে অম্বল হয়—এসব বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। অপর দিকে শিশুর পেটের অসুখে দুধ বন্ধ করে বার্লি খাওয়ান, অম্লাশায় কাঁচকলা সিদ্ধ বা চিঁড়ের মণ্ড খাওয়ান, বাচ্চাদের পাতে ডালের বদলে ডালের জল, সর পড়ানর জন্যে নরম আঁচে দুধ গরম রাখা, থোড়, মোচা, ডুমুর ইত্যাদি সবজির জল ফেলে দিয়ে রান্না করা স্বাস্থ্যের পক্ষে নিশ্চয়ই হানিকর।

।। দুই ।।

একথা ঠিক যে পুরুষ-পরম্পরায় মজ্জাগত খাদ্যাভ্যাসগুলি পুষ্টির ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর বললেই তা সহজে ছাড়া যায় না—বিশেষ করে যখন সেই সব প্রথা ও অভ্যাস সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার ও বিধি-নিষেধের সঙ্গে মিশে মিশে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিতদের পাতে লুচি ও ঘি-ভাত দিতেই হবে। না দিলে নিমন্ত্রণ-কর্তার প্রেস্টিজ ক্ষুণ্ণ হয়। দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক জেনেও অর্থাভাবে ভেজিটেবল্ ঘিয়ে ভাজা লুচি, ঘি-ভাত ও মিষ্টান্ন খেতে বাধ্য করা হয় অভ্যাগতদের। তাঁরাও চোর্বচোষ্য খেয়ে যান। প্রেস্টিজের খাতিরেই অতিথিকে রুটি-তরকারি দেওয়া চলবে না, চা-বিস্কিট দেওয়া যায়, কিংবা শুধু চা। অনেক পরিবারে চার-পাঁচ পদের কমে রান্না হয় না, অথচ মাছ-ডিম আসে নামমাত্র। বহু পরিবারে ডিমের কিংবা মুরগীর ডিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মাংস সম্পর্কে ধর্মীয় বাছ-বিচার যে কত কুফল তা সকলেরই জানা আছে। নিরামিষ খাওয়া তো ছোঁবেনই না, মসুর ডালও নিষিদ্ধ। সঙ্গে পাঁড়নও আছে। সাধারণতঃ একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারের মেয়েরা খান পুরুষদের পরে, বউরা খান সবার শেষে। বিয়ের আগে থেকেই মেয়েদের কঠোরভাবে সচেতন করে দেওয়া হয় এই প্রথা মেনে চলার জন্যে; রং চড়ান হয় প্রেম ভালবাসা ভক্তির। মেয়েরা মেনে নেন, পুরুষরা থাকেন নির্লিপ্ত। ফলে সকলের খাওয়ার পর মাছ-ডিম দুধের মত পুষ্টিকর খাদ্য থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হন জীবনভোর।

।। তিন ।।

ভাল-মন্দে মেশান নানারকম সংস্কার সত্ত্বেও সব দেশের খাদ্য সংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। তার জন্যে তারা গর্বিত। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে তারও কিন্তু রূপান্তর ঘটে। আমাদের দেশেও ঘটছে। অর্থাৎ রুচি বদলাচ্ছে। সেটা পুষ্টিরক্ষার সহায়ক কিনা সেইটাই বিবেচ্য।

জমির ওপর চাপ বৃদ্ধি এবং শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিহীন কৃষকেরা দলে দলে শহরে আসছেন। সঙ্গে আসছে পরিবারও। শহুরে পরিবেশে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় গ্রামীণ খাদ্যাভ্যাস। সকালে ভরপেট ফ্যান-ভাত বা পান্তার বদলে শুরু হয় একপিস পাঁউরুটি কিংবা দুখানা জিলিপি বা দুখানা বিস্কিটের সঙ্গে চা। ঢেঁকিছাঁটা চালের বদলে প্রধান খাদ্য হয় কলে ছাঁটা ভিটামিন ও খনিজ হারান চাল। ডিমের টাটকা শাকসবজি, খাল-বিলের মাছ, বাগানে কুড়োন আম-জাম-পেয়ারা আর মেলে না বলে প্রোটিন-ভিটামিনের ঘাটতি হতে থাকে নিরবচ্ছিন্ন। গুড়ের বদলে চিনি। শিশুর জন্যে হরলিক্স বা ডবল-টোনড দুধ। গাঁয়ে থাকতে খাওয়ায় যা খরচা হত, তার একটা মোটা অংশ চলে যায় ঘর ভাড়ায়, রাহা-খরচে, জামা-কাপড়ে, চা-সিগারেটে ওষুধে, সিনেমায়। বোনাসের টাকা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পুষ্টির জন্যে সঞ্চয় না করে বেশির ভাগই বেরিয়ে যায় নতুন ঝকমকে জামা-কাপড় জুতোয়। ওভার-টাইমের একটা অংশ সে বৈকালিক টিফিনের ছলে কারখানার ক্যান্টিন থেকে বাড়তি হওয়া উচিত বাড়তি শ্রমের জন্যে বাড়তি ক্যালরি যে একান্ত প্রয়োজন, এ-দাবী আজও ওঠেনি। দুধ সরবরাহের ব্যাপারে শিশুদের অগ্রাধিকার পাওয়া সম্পর্কে চেতনা আজও স্বচ্ছ নয়।

শুধু নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত কেন, শিক্ষিত মহলের খাদ্য রুচিতেও পুষ্টি-চেতনার ধারণা আশাজনক ফলও তো মনে হচ্ছে না। চা আজকাল জীবনের অচ্ছেদ্য অংগ। ধীরে ধীরে চায়ের আসন নিচ্ছে কফি। অথচ চা-কফির দুধ-চিনিটুকু ছাড়া কোন পুষ্টিমূল্য নেই। সঙ্গে আসছে আইস-ক্রীম। গরীবের ছেলেমেয়েরা সানন্দে চোষে চিনি মেশান বরফ। লজেন্স মানে ঐ চিনিই—ভিটামিনই শিশুদের প্রিয়। আজকাল ফ্যাশান হল টফি, বাপ-মা আদর করে তুলে দেন ছেলেমেয়েদের হাতে। পুষ্টির নামগন্ধ নেই—শুধু দাঁতে কেবীজ হওয়ার সহায়ক।

টিফিনের সময় স্কুলগেটে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় ঝাল-মশলাওলাকে ঘিরে। রেস্ট্‌-রেন্টে বসে শুধু একপেয়ালা চা কিংবা একটা শীর্ণ কাটলেট নিয়ে সান্ধ্যকালীন সময় কাটান তরুণদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কাটলেটের চেয়ে ডিমসিদ্ধ ভাল, অথবা চায়ের পয়সায় একটা ফল কিনে খাওয়া যায় সামনাসামনি একথা বলতে যথেষ্ট সাহসের দরকার। আলোকিত মহলে কলা শসা-পেয়ারার বদলে আপেল খাওয়াই ফ্যাসান। অথচ বহু দূরের থেকে চালানি আপেলের চেয়ে তাজা পেয়ারায় ভিটামিন কিন্তু মোটেই কম নয়। একই ওজনের মর্তমান ও কাঁচালি কলার পুষ্টিমূল্য একই। মুড়ি-ছোলা বা দই চিড়ে এখন অসভ্যতা। ওদের হটিয়ে দিয়ে পোক্ত আসন কায়েম নিয়েছে পাউরুটি—জ্যাম-জেলি। হামবারগার, চাইনীজ পিরপ্যাস, স্যান্ডুইচ, মোগলাই, ফুচকা চকোলেট, কোলড ড্রিংকস এখন শহুরে তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন; আধুনিকতার নিক্তি।

আলোকপ্রাপ্তির এইসব ব্রণ-উপসর্গ দমনের জন্যে স্কুলপাঠ্যের সিলেবাসে কোন পরিবর্তনের কথা কেউ ভাবছেন কি? পুষ্টি-অপুষ্টির তারতম্য দেখানর জন্যে জন্তু-জানোয়ারের ওপর বাস্তব পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে কটা স্কুলে? খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বাংলা ডকুমেন্টারী ফিল্ম আছে কটা? গল্পের ও ছবির বই প্রকাশিত হয়েছে কখনো? আমাদের পুষ্টি

চেতনা পুরুষ পরম্পরায় পাথর-চাপা পড়ে আছে কেন বুঝতে খুব কষ্ট হয় না।

।। চার ।।

খাদ্যাভ্যাস গড়ে ওঠে শৈশব থেকে; বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সুদৃঢ় হয়ে থাকে। খিদে পেলে আমরা খাই; কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই একটা রুচি আছে তাও ঠিক। একঘেয়ে অরুচিকর খাদ্য যতই পুষ্টিকর হোক, তাতে খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিয়ে অপুষ্টি ডেকে আনে। আমাদের জিবে আছে অনেকগুলি স্বাদকোষক—যার বৈশিষ্ট্যের জন্যে কেউ ভালবাসে মিষ্টি, কেউ নোনতা, কেউ টক কেউবা ঝালঝাল। স্বাদ-কোরকগুলি বিকশিত হয় শৈশবেই; বৃদ্ধ বয়সে এবং অতিরিক্ত পানদোক্তার বা ধূমপানে সেগুলি ভোঁতা হয় বা ক্ষয় পায়। সাধারণতঃ শিশুরা ভালবাসে ঈষদুষ্ণ খাবার, বড়রা কেউ কেউ চান খুব গরম। ঠাণ্ডা খাবার শক্ত ও স্বাদহীন হয়ে পড়ে, গরম খাবার হয় নরম ও সুগন্ধী। রোজ রোজ ডিম সিদ্ধ কিংবা রুটি-গুড় দিলে কারই বা ভাল লাগে! কোনদিন পেচে, কোন দিন নরম ওমলেট, কোন দিন রুটির সঙ্গে ডাল বা সবজি দিলে ছেলেমেয়েরা পেট ভরে যদি খেতে পারে, সেইটাই কাম্য। সমুদ্রের মাছ যদি সস্তা হয়, ছোটবেলা থেকেই অভ্যাস করান উচিত, আর বড়দের যদি অরুচি থাকে, ডাল বা সবজির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে দেখা যেতে পারে পছন্দ হয় কিনা। যে ছেলেমেয়ের ডালে অরুচি তাকে ডালের বড়া বা বরফি দিলে চেয়ে চেয়ে খেতে পারে। অঙ্কুরিত ছোলায় যদি আপত্তি থাকে, সে আপত্তি সম্ভবতঃ ভিজে ছোলার বিস্বাদ খেসোয়। বিকল্পে ছোলার ছাতু গুড় দিয়ে মাখা লাড্ডু বেশ পুষ্টিকর। মোট কথা, রুচিটা উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। খাদ্যের ও রান্নার রকমফের করে রুচি সৃষ্টি করা সম্ভব। অবশ্য সঙ্গে চাই ব্যাখ্যা অর্থাৎ শিক্ষা।

।। পাঁচ ।।

ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয় প্রবৃত্তির তাড়নায়, খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য হল দেহ গঠন ও ক্ষয় পূরণ। গঠন বলতে শুধু আকার নয়, সৌষ্ঠব, কান্তি, লাবণ্য সবই বোঝায়। সেই সৌন্দর্য সাধনায় চাই পুষ্টি ও শ্রম। কিন্তু খাদ্যের উদ্দেশ্যে বা আদর্শ সম্পর্কে সচেতন না করে সুস্থ খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা বা হানিকর অভ্যাস পরিবর্তন করান প্রায় অসম্ভব। এই আদর্শ বহুমুখী; এক-এক বয়সে এক-এক রকম।

কিশোর বয়স থেকেই ছেলেরা স্বপ্ন দেখে ভাল খেলোয়াড় হওয়ার, আর মেয়েরা উপাসনা করে সৌন্দর্যের। ছেলে-মেয়ে উভয়ের জীবনেই আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য হল ছাত্রজীবনে ভাস্বর হওয়া। তাছাড়া নতুন কিছু জানার ও শেখার উগ্র কৌতূহল থাকে তাদের মধ্যে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অসীম পৃষ্ঠপটটি খুলে দিতে পারলে সহজেই আকৃষ্ট হয় ওরা। কোন কিশোরকে যদি বোঝান যায়, ডিম-দোলা-ডাল-আটার প্রোটিন তার মেধা ও স্মৃতি স্ফুরণে এবং পেশী গঠনের উপাদান জোগাবে, টাটকা শাক-সবজি ও ফল তার হাড়ের ও দাঁতের ক্যালসিয়াম-ফরফরাস-ভিটামিনরূপী সার হিসাবে কাজ করবে, এবং সব মিলিয়ে দীর্ঘদেহী ও শক্তিশালী খেলোয়াড় হওয়ার সম্ভাবনা খুলে দেবে, তবে এই সব খাদ্যাভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করা হয়ত সহজ হয়। তেমনি কিশোরীকে বোঝান যেতে পারে—সম্ভব হলে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যেতে পারে যে, আধপেটা খেয়ে সুন্দর চেহারাও শীর্ণ জীর্ণ কংকাল-সার হয়, তন্বী হওয়া যায় না, '৩৬-২৬-৩৬' হওয়া যায় না। মা তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়েই মেয়েকে শেখাতে পারেন যে, নিয়মিত ছোলা-ডাল-পাঁই-পালং-গুড় খেলে অ্যানিমিয়ায় রং ফ্যাকাশে হয় না, নাচের ক্লাসে বা ভলিবলের মাঠে হাঁফ ধরে না, গাজরে ও গাঢ় সবুজ শাকে যে ক্যারটিন থাকে, তা থেকে হাত-পা নিটোল হবে, দাঁতের এনামেল হবে মুক্তোর মত। ছবির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে মুখে টফি-লজেন্স রাখলে কীভাবে দাঁতে কেবীজ হয়ে সুন্দরীকেও কুশ্রী করে দেয়।

বর্ষায় পাহাড়ী নদী উছল ও টইটম্বুর হওয়া অসম্ভব নয়। যৌবনে এমন এক-একটা সময় আসতে পারে যখন বিশেষ করে ছেলেরা হয় বেপরোয়া। তবে কৈশোরে ও প্রাক-যৌবনে পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাসের ভিতটা পোক্ত করে গেঁথে দিতে পারলে ভবিষ্যতে জোয়ারের টান দু-কূল ছিন্ন করে বাধাও সম্ভব। কলেজ ক্যানটিনে ও হোস্টেলে মাঝে মাঝে পুষ্টি শিক্ষার আসর ও প্রদর্শনী এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

মায়েদের খাদ্য সম্পর্কে সচেতন করা তুলনায় সহজ। কারণ সহজাত প্রবৃত্তিতেই এঁরা স্বামী ও সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত থাকেন। প্রয়োজন শুধু এই কথাটি বোঝান যে, আর্থিক ও সামাজিক নিষেধের শত বেড়াজাল সত্ত্বেও নিজের পুষ্টির দিকে সজাগ থাকলে তবেই দাম্পত্য-জীবন ও মাতৃত্ব—দুই-পুষ্ট ও হৃষ্ট থাকবে।

—অশ্বিনী সামন্ত

বাংলা গানে পাখী

বাংলা কবিতায় যেমন গানেও তেমনি পাখীর প্রথাসিদ্ধ উপস্থিতি লক্ষ্য করার মতন। বাংলা গানকে যদি একটি বিরাট বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে তার প্রাচীন ভাণ্ডমূল থেকে নিয়ে নবীন শাখা-প্রশাখায় কত যে বকমারি পাখীর বাস, দেখলে চমৎকৃত হতে হবে। জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাদের অমল থেকে আজকের অতি আধুনিক গীতিকার পর্যন্ত সকলেই পাখী সম্পর্কে দুরন্ত ভ্রমণেসনগ্রস্থ স্বীকার করতেই হবে। বাংলা গানের রচয়িতারা গান বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে পাখীকেও বেঁধে ফেলেছেন সুরের জালে।

সেই কবে উপনিষদের উদ্গাতার দুই সুপর্ণা পাখীর সুন্দর আইডিয়াটি কবিদের মুগ্ধ প্রলুব্ধ করেছিল, অদ্যাবধি তার রঙ্গ টেনে চলেছেন উত্তরসূরীরা। বৈষ্ণব মহাজনদের গানে ত পাখী এক সর্বজনপ্রিয় উপাদের উপকরণ। নপুণ সুপকারের মত সুকারেরা পাখীকে সর্বরসের ব্যঞ্জনে ব্যবহার ও পরিবেশনে উপভোগ্য ও উপজীব্য করে তুলেছেন।

শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা থেকে শ্রীকৃষ্ণের গুণাগুণ গাইবার ক্ষেত্রে পাখী শুধু প্রয়োজনীয় নয় প্রায় অপরিহার্য। রাধার চোখের সঙ্গে 'খঞ্জন পাখীর', স্তনের সঙ্গে 'চাকুচকেরা' (চক্রবাক) এবং গতিভঙ্গের সঙ্গে 'গজরাজের উপমা ত' বারংবার ব্যবহারে অত্যন্ত পরিচিত এবং ম্লান। পদাবলী কীর্তনে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, আক্ষেপানুরাগ সম্ভোগ, মিলন বিরহ, সর্বাবস্থায় পাখীর ডাক পড়েছে। অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রত্যেকেরই পাখীকে উদ্দেশ্য করে বিলাপ ও বসোদ্গার। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি উল্লেখ্য :

'গগনে গরজে মেহ ঘুকারে ময়ূর'
—(বিদ্যাপতি)

'কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি
কোন রন্ধ্রে কেবা নবে নাচে ময়ূরিণী
কোন রন্ধ্রে কোকিস পঞ্চম স্বরে গায়
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়।'
(জ্ঞানদাস)

'মাধব ভন রমণীমন চোর নিকর ফন্দে'
(মাধব দাস)

'শারী পড়ত অতি অনুপ, যৈছন রস
অমৃত কূপ—রাধারূপ বর্ণনা
(গোবিন্দ দাস)

'হংস সারস রবকি তাণ্ডব,
ডাহুকী শবদ মনোহর'—
(সালবেগ)

হেনা হালদার

'শারী শুক পিক করত গান,
ভমরা ভমরী ধরত তান
ময়ূর-ময়ূরী করত নাট
কোকোৎকণ্ঠ কলাপে হে—'
(গোপাল ভট্ট)

'নচত শিখিকুল কুঞ্জকুটীরে' (নবকান্ত)
রমণী চাতক মনোলোভা (ধরণী দাস)
'ময়ূর চাতক ভ্রমরগুঞ্জিত হংসকলকল
জোর,
কীর সারস কোকিল ডাহুক দাদুরী
রব ঘোর।'
(মোহনরাম)

'রাই জাগো রাই জাগো শারী শুক বলে
কত নিদ্রা যাও কালো মানিকের কোলে?
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক।
(বংশীবদন)

বর্ষাভিসার, বসন্তাভিসার, কৃষ্ণাভিসার, শরদাভিসার, রাস ও দোললীলা কোনটাই পাখীকে বাদ দিয়ে নয়। এমনকি মহারাসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণকেও 'গোষ্ঠজনমানস মরাল' বলে বৈষ্ণবপদকর্তা সম্বোধন করেছেন। প্রিয় বিরহের নিগূঢ় যন্ত্রণাকে বলা হয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাখীকে সাক্ষী মেনে। ঋতু অনুযায়ী সে-পাখী কখনো দোয়েল, শ্যামা কোকিল পাপিয়া, কখনো বা ময়ূর, চাতক, ডাহুক, চক্রবাক সারস ইত্যাদি। কালিদাসের মেঘদূতের মতন হংসদূতও প্রেরিত হয়েছে বার্তাবাহী হয়ে। পরবর্তীকালের আউল বাউল ফকীর দরবেশদের দেহতত্ত্বমূলক গানে 'পাখী' ও 'খাঁচা'র দ্ব্যর্থবোধক প্রয়োগ ত প্রায় প্রথাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। লালন ফকীরের বিখ্যাত গান 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায় / ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখীর পায়' ইত্যাদির অনুকরণে গদাধর দাস গেয়েছেন :

'শ্যাম-শুকপাখী সুন্দর নিরখি
ধরিলাম নয়ন ফান্দে.
হৃদয় পিঞ্জরে রেখেছিলাম তারে
মনের শিকল বেঁধে।'

প্রাচীন বাংলা গানের রচয়িতারা প্রত্যেকেই প্রতীক ও চিত্রকল্প হিসেবে পাখীকে বারংবার উপস্থাপন করেছেন। এবং এটাই শেষপর্যন্ত ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

হরঠাকুর লিখেছেন, 'হয়ে বিহঙ্গম যাই সে-ধাম, দেখি, গিবা বংশীবদনশ্যাম।' মাইকেল মধুসূদনের 'সুধাকর প্রেমাধীনী অতিসুখী চকোরিনী / কভু হয় বিষাদিনী বিরহ শরে।' ইত্যাদি। রাম বসুর

'সহেনা কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর
ডাকিস না শ্রীকৃষ্ণ বলে।
ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন জলে।
এ সময়ে স্বপক্ষ হও পক্ষী হে,
বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়—
হয়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপী সকলে।'

নিধুবাবুর :

'নীর ত্যজে ক্ষীর যেমন হংসে করে গ্রহণ
তেমনি আমার প্রাণ তার পানে ধায়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'মেঘদরশনে হায় চাতকিনী ধায়রে—'

গিরীশচন্দ্র ঘোষের :

'এল কৃষ্ণ এল ওই বাজলো বাঁশরী
সুখে শুকসারী মুখোমুখি করি
হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী।'

দাশরথী রায়ের 'কিবা নাচাইছে নয়ন খঞ্জন।'

দীনবন্ধু মিত্রের

'কোথা গেল শ্যাম আমারি
জানো যদি বল আমাকে,
তমাল কোকিল শুকসারী।'

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের :

'বিহঙ্গম আদি করে উন্মাদন
বন্ধু দরশনে চিত্ত বিনোদন
আমার কপালে বিরহ বেদন
বিধাতা বুঝিবা ঘটালো।'

আরো পরবর্তীকালের দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছেন 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।' মাত্র একটি পংক্তির মধ্য দিয়ে তিনি দিনরাত্রির সমস্ত সময়টাকেই পাখীর ডাকে ভরে নিয়েছেন। আর রবীন্দ্রনাথের ত কথাই নেই। বাংলা গানের সুরে ও কথায় আঙ্গিকে ও আবেদনে সর্বত্র পুরাতনকে পরিহার করেও পাখীর প্রাচীন প্রচলনকে এড়াতে পারেন নি। বরং নতুন নতুন পদ্ধতি ও প্রকরণে গানের অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন। নানান ঋতুর নানা ফুল এবং পাখি তাঁর গানে স্থান করে নিয়েছে। এবং সেই পাখি কখনো বন থেকে খাঁচায় কখনো খাঁচা থেকে বনে উড়ে গিয়ে কবিসত্তাকে বন্ধন ও মুক্তির দ্বৈত প্রেরণায় আকর্ষিত বিকর্ষিত করেছে। জীবনের এপার ওপার দুই পার হয়েছে কুহু ও কেকাধ্বনিময়। ঈশ্ববিশ্ববাসী কবিগায়ক রজনীকান্ত সেন তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে পাখীর উপমা আরোপ করেছেন গানে

'এই মোহের পিঞ্জর ভেঙে দিয়ে হে
উধাও করে লয়ে যাও এ মন।
গগনে চাহিয়া দেখি অনন্ত অপার হে
আজন্ম বন্দীপাখী পক্ষপুট ভার হে
বাঁধো তব প্রেমসূত্র অবশ পাখায় হে
ধীরে ধীরে তব পানে টেনে তোল তায়হে
তুলে নিয়ে প্রেমহস্ত খলকে বুলাও হে
তব প্রেম-সুধাফল খাওয়ায়ে ভুলাও হে।'

কাজী নজরুল ইসলামের গানের বুলবুল অগণিত শ্রোতার মন-বাগিচায় দোল দিয়ে গেছে। এবং এখনো দেয়। নজরুলের গানে কত যে অসংখ্য পাখীর আনাগোনা। কোকিল পাপিয়া, বৌকথাকও, চাতক চাতকী ডাহুক, চক্রবাক, ময়ূর কেউ অপাংক্তেয় নয়। এমনকি সারস পাখিকে লক্ষ্য করে কবি বলেছেন : 'সারস, পাখি, সারস-সারস পাখি আকাশ গাঙের শেষ কমল'—পাখির স্বপক্ষে ওকালতি করে কবি বলেছেন 'কোকিল পাপিয়া বুলবুল এরা হল সুন্দরের বৈতালিক, বেদনার ঋত্বিক।' আরো বলেছেন, 'কোকিলের গানকে খারাপ বল্লেও কোকিল গান গাইবেই, গায়কও তাই। সে সৃষ্টির আনন্দে গান গেয়ে যায়। নিন্দা প্রশংসার ধার ধারে না।' পাখীর চিত্রকল্প নিয়ে তাঁর বেদনাবিধুর গান শ্রোতার মনে গভীর আলোড়ন জাগায় :

'গানগুলি মোর আহত পাখীর সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম
বাণবেঁধা মোর গানের পাখীরে,
তুলে নিও প্রিয় তব বুকে ধীরে
তোমার চরণে লভিবে মরণ সুন্দর,
অনুপম।'

কিন্তু পাখীর সম্মোহে বোধহয় সর্বাধিক আক্রান্ত হয়েছেন বিরহ বিষাদাচ্ছন্ন কবিগায়ক অতুলপ্রসাদ সেন। তাঁর গানের প্রিয় প্রতীক পাখী, যে স্বতোৎসারে গান গাইতে পারে, যার কোনও দাবীদাওয়া নেই। ('পাখীরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে নাই বা যদি কেহ শোনে গেয়ে যা' মন অকারণ।') এমনকি পাখীর গানে কবি খুঁজে পান মরমীর গীতিময় প্রতিদান (ও আমার নবীন শাখী ছিলে তুমি কোন বিমানে / আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে তোমার ঐ আকুল গানে ইত্যাদি) পাখী যেন তাঁরই নিঃসঙ্গ আত্মা। শুধু আনন্দ নয় যার কণ্ঠে নিহিত তাঁর জীবনের কান্না-ও। পাখী তাঁর শুধু গানের দোসর নয় প্রাণের সহোদর। 'প্রভাতে যারে নন্দে পাখী' কবিও তাঁকে নন্দিত করেন। সন্ধ্যায় 'যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়' তিনিও সেই পথে যেতে চান। তাঁর অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা চাতকের মত আকাশে আকাশে তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। তাই শ্রোতাদের কাছে কবি আর তাঁর পাখীর নৈঃসঙ্গ এক হয়ে গেছে বিরহের মূর্ত বেদনায়।

বাঙালীর জীবনের সঙ্গে গান আর গানের সঙ্গে পাখী বোধহয় অবিচ্ছেদ্য। এমনকি আধুনিক গানের উদ্দাম চটুল সুরেও 'এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা, আকাশের নিঃসীম রোদ্রে' উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ে শ্রোতাদের গানের বৈঠকে, মেহফিলে, জলসায়। পাখীর কাছ থেকে প্রথম গানের হাতেখড়ি বলেই বোধহয় গানে গানে এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

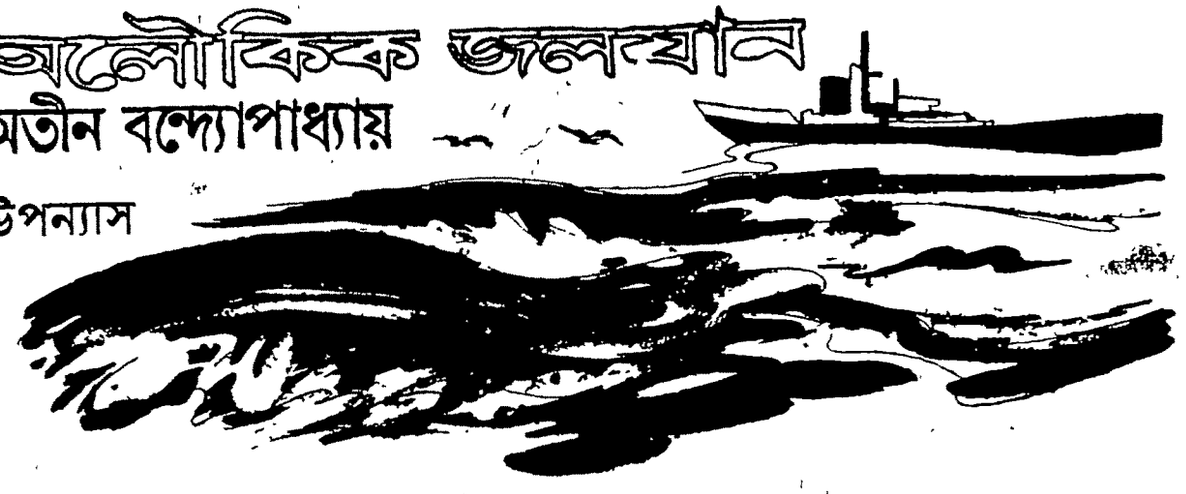

(১১)

রাতে রাতে বন্দরে ঢুকেছিল জাহাজ। সেন্টিসে রসদ, মন্টিভিডিওতে কয়লা, জল আর কিছু না—জাহাজিরা অন্ধকার রাতে বন্দর স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কেমন পাহাড়ী ছায়ায় লাল-নীল আলোর মালা, কেউ জাহাজ থেকে নামতে পারেনি। সবাই অন্ধকারে বন্দরের দৃশ্য দেখেছিল। অন্ধকারে বন্দর ঠিক চেনা যায় না। কেমন একরকমের মনে হয়। কোনটা সেন্টিস, কোনটা মন্টি-ভিডিও বোঝা যায় না। ওরা অন্ধকারেই আবার সমুদ্রে নেমে এসেছিল, ভোর রাতে জাহাজ গভীর সমুদ্রে নেমে গেছে। খুব একটা গভীরে যায়নি, উপকূলের আশে-পাশে জাহাজ সারাদিন চলেছিল, দু দিনের বেশি জাহাজের মানুষেরা দেখেছে ছায়া ছায়া উপকূল ভাগ। কেমন মেঘের মতো সমুদ্রের দিগন্তে ঝুলে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই সব পাহাড়ী উপকূল কেমন স্থাবির। গাছপালা চোখে পড়ে না। পাথর আর পাহাড়। দক্ষিণে, যত এগিয়ে যাচ্ছে, শীত তত আরও বাড়ছে। প্রায় হাড়-কাঁপুনি শীত। পোর্ট এলিজাবেথ থেকে সাতাশ দিনের বেশি জাহাজ ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকার কেপ-হর্ণের দিকে যাচ্ছে। প্রায় একশো আশি ডিগ্রী বরাবর দক্ষিণে এখন জাহাজ নেমে গেছে। যেন এভাবে আর কিছু দূরে গেলেই জাহাজ দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাবে। মৈত্র শীতে ভীষণ কাঁপছে। সে মোটা কম্বল গায়ে পোর্ট-হোল দিয়ে কিছু দেখছে। গ্যাস-পাইপের গরম, ফোকসালে গরম রাখতে পারছে না।

সামনের বন্দরে ওরা কিছুদিন থাকতে পারবে। এদের পক্ষে এটা আশার কথা শুধু জল আর মাঝে মাঝে দ্বীপ, অথবা সমুদ্রে কেবল চলা নিশিদিন এনজিনের ঝ্যাঁক ঝ্যাঁক শব্দ, স্টিয়ারিং এনজিনের কক্ কক্ শব্দ বিরক্তিকর। মাঝে মাঝে একেবারে অসহ্য। সুতরাং বন্দরে জাহাজ ঢুকে গেলে জাহাজি-দের মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষেরা ডাঙ্গায় বেঁচে থাকে। ডাঙ্গায় নেমে গেলেই মনে হয়, মাটির মতো প্রিয় আর কিছু নেই।

জাহাজিরা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বন্দর আসছে বন্দর দেখা যাচ্ছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত অনেক জাহাজি জেগে ছিল, বন্দর দেখতে পাবে বলে। ডেক-সারেঙ বলে গেছে, বারোটার আগে দেখা যাবে না। তবু প্রত্যাশা, কখন যে কে দেখে ফেলবে, অনেক দূরে ছায়া ছায়া মেঘের মতো ডাঙ্গা, অথবা সেই সন্ধ্যা থেকে হল্লা করছে জাহাজিরা, ঐ দ্যাখো। সারেঙও হেসে বলেছে, আরে না, ওটা দ্বীপ টিপ কিছু হবে। সময় না হলে জাহাজ বন্দর পায় না। সময় না হলে যেমন ও'র দেখা মেলে না, এও বাবুরা তেমনি।

অমিয় বলল, তা চাচা যা বলেছেন।

ডেক-সারেঙও তার দলবল নিয়ে জেগে আছে। একটা দেড়টায় জাহাজ বন্দরে ঢুকে যাবে ওদের বাঁধা-ছাঁদার কাজ। ডেক-জাহাজিরা এখন ঘুমোচ্ছে। সারেঙও ঠিক ঘুমোতে পারছে না। যদি বেচাল কিছু হয়ে যায়। সে একেবারে জাহাজের বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে ঘুমোতে যাবে।

এবং এ-সময়ে ছোটবাবু খবর নিয়ে এল, দেখা যাচ্ছে।

এখন বাথরুমে স্নান করা। মৈত্র একটু আগে উঠে এসেছে। সে স্নান করে নিচে পোর্ট-হোলে কেবল কিছু দেখছে। অমিয় ঢুকে বলল, মৈত্র তুই জেগে আছিস, বললি যে শরীরটা ভাল না।

অমিয় এবং ছোটবাবু স্নান সেরে এসেও দেখল, মৈত্র পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে কি দেখছে! কেমন ঘোলা ঘোলা। ছোটবাবু কখনও মৈত্রকে এভাবে দেখেনি। জাহাজে এই মানুষটাকে সে প্রায় সারেঙসাবের মতো ভেবে এসেছে। সেই মানুষ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন ভয় পাবার কথা।

অমিয় বলল, ছোটবাবু, শুয়ে পড়। সে মৈত্রকে বলল, হ্যারে তুই ক দেখছিস।

—কিছু না।

এবার অমিয় বলল, ছোটবাবু কি মজা! কাল থেকে ওয়াচ থাকবে না। ও-ভাবতে কি ভাল লাগছে! কাঁদন থাকবে জাহাজ!

মৈত্র পোর্ট-হোল থেকে নড়ছে না। নিচের বাংকে ছোটবাবু, ওপরের বাংকে অমিয়, কখনও কখনও ওরা পাল্টে নেয় বাংক। এ-ফোকসালে ওদের তিনজনের। এ-ফোকসালে একটা বাংক বেশি। মৈত্রের ওপরের বাংক খালি। মৈত্র এখনও পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্র কখনও কখনও ওপরের বাংকে শুয়ে থাকে।

অমিয় স্নান করায় হিহি করে কাঁপছে। সে লেপ, কম্বল, যা আছে সব নিয়ে একে-বারে জাম্বুবানের মতো শুয়ে পড়েছে। মাথায় মাংকি ক্যাপ পরে শুয়েছে। সব একেবারে বরফ হয়ে থাকে। সে দেখল মৈত্র তখনও নড়ছে না। অমিয় বিরক্ত হয়ে বলল, ধ্যেস শালা, কি যে দেখে! এই মৈত্র, ঘুমোলে ঘুমো, না হয় ওপরে গিয়ে বন্দর দ্যাখ। আলো নিভিয়ে দেব।

মৈত্র এবার তাকাল।

অমিয় বালিস থেকে মাথা তুলে বলল, হ্যারে তুই কি দেখছিস?

—কিছু না।

—কিছু দেখছিস ঠিক।

—একটা তিমি মাছ।

—হ্যাঁ, তিমি মাছ। বলে কি রে! আবে ছোটবাবু, অঃ ছোটবাবু তুমি ঘুমোলে নাকি! শুনছ ছোটবাবু, সে লাফ দিয়ে সব লেপ কম্বল ফেলে দিয়ে একেবারে নিচে নেমে গেল, সে মৈত্রকে সরিয়ে এনে পোর্ট-হোলে মুখ এগিয়ে দিল, দেখল সামনে শুধু অন্ধকার সমুদ্র, অনেক দূরে বন্দরের আলো দেখা যাচ্ছে। নীল অন্ধকারের ভিতর যেন আলোর অজস্র মালা। এবং দূরে লাইট-হাউসের আলো, ঘুরে ঘুরে লাইট-হাউস সমুদ্রের জাহাজগুলোকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে।

এবং অন্ধকারের ভিতর কিছু জাহাজ সমুদ্রে ইতস্তত নোঙর ফেলে রেখেছে দেখতে পেল।

অমিয় এবার পোর্ট-হোলে চিৎকার করতে থাকল, কোথায়, কোনদিকে। অন্ধকারে তুই তিমি মাছ দেখবি কি করে। বসে অমিয় সরে এল।

মৈত্র আবার যথারীতি পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দেখতে থাকল।

অমিয় পাশে দাঁড়িয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছিস!

—হ্যাঁ।

ছোটবাবু এখন কি করবে ভেবে পেল না। ঠাণ্ডায় পা গরম হচ্ছে না ছোটবাবুর। পা গরম না হলে ওর ঘুম আসে না। কিন্তু কি যে শীত! পায়ের হাঁটু পর্যন্ত একেবারে ঠাণ্ডা বরফ। সে স্নানের সময় গরম জল হাঁটু পর্যন্ত ঢালে। সে পায়ে গরম উলের মোজা পরে শোয়। জ্যাক ওকে দুটো দামী দস্তানা দিয়েছে উলের। শীতে হাত বরফের মতো। মাঝে মাঝে অসাড় লাগে। সে দস্তানা পরে থাকে। কাজ করার জন্য জ্যাক ওকে দুটো ভারি চামড়ার দস্তানা দিয়েছে। এবং পারলে যেন জ্যাক তাকে সব দিয়ে দেয়। সে এখন যা কিছু পরে আছে প্রায় সবই জ্যাকের দেওয়া। বেশ গরম। অমিয় অথবা মৈত্রর মতো সে শীতে তেমন কষ্ট পায় না। পা গরম হলেই ঘুম চলে আসবে। কিন্তু মৈত্র আর অমিয় পোর্ট-হোলে কি যে দেখছে বার বার!

অমিয় ফের পোর্টহোল থেকে মুখ তুলে আনল। —সব বাজে কথা। গুল!

মৈত্র বলল, তুমি হতভাগা কিছু দেখতে পাবে না। তুমি একটা আস্ত ষাঁড়।

—আমি আর কি দেখতে পাব! কেবল অন্ধকার সামনে, কিছু জাহাজ নোঙর করা। জ্বলে ফসফরাসের লাল ফুলকি। তুমি একটা মরুভূমির উট।

—তা হলে তিমি মাছ দেখতে পেলি না।

—না।

—তা হলে বড় একটা বাঁশ দ্যাখো। ওতে একটা তিমি মাছের কঙ্কাল ঝোলানো আছে।

—পাগল আর কি! বলে সে এক লাফে আবার ওপরের বাংকে উঠে গেল। আসলে মৈত্র ওর স্ত্রী শেফালীর চিঠির কথা বলছে। বন্দরে এলেই বোধহয় ওর বারবার কথা বেশি মনে হয়। ওর ঘুম আসে না। অমিয় মুখে মাথায় লেপ কম্বল যা আছে সব দিয়ে ঢেকে দিল। শেফালি চিঠিতে সব সময় একটা তিমি মাছের কথা লেখে। বোধহয় মৈত্র জাহাজ নোঙর ফেললেই তিমি মাছটা দেখতে পায়।

পরদিন সুবোধ বালকের মতো ঘুম থেকে উঠেই মৈত্র চা করে আনল। কাজ-কাম সেরে বাথরুমে স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। পোশাক খুলে ফেললেই আয়নায় নিজের শক্ত শরীর দেখার ইচ্ছা, কিন্তু শীতে সে দাঁড়াতে পারে না। সে গ্যাস জ্বেলে দেখতে দেখতে কেমন শরীরে অনবরত গরম জল ঢালতে থাকে। হাতের পেশী দেখতে দেখতে সে শেফালীর কথা মনে করতে পারে। শেফালী উঁচু লম্বা মেয়ে। সহবাসে শরীর বড় মনোরম। দস্যুর মতো তুমি, দস্যুর মতো আমাকে মেরে ফেলতে পার না—শেফালীর দুটো একটা কথা কিনারায় এলেই সে মনে করতে পারে। আমাকে তুমি মেরে ফেল আর পারছি না অথবা কেন যে এখন মৈত্রের মনে হয় শরীরের কষ্ট শেফালীর বড় বেশি উগ্র। বাথরুমে অথবা কম্বল গায়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে শেফালীর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খালি চোখে দেখতে পায়। তখন মৈত্রের শরীরে শীতটা বাড়ে।

বস্তুত মৈত্র বন্দরে এলেই শেফালীর কথা বেশি মনে করতে পারে। বন্দরের গাঢ়-পালা, পার্বসিমন লতার গুচ্ছ অথবা স্কাই-লার্ক ফুলের হলদ রং ওকে মাতাল করে ফেলে। মৈত্র, সুখী এবং সৎ মৈত্র থাকতে পারে, তার জন্য কি যে ওর চেষ্টা!

স্নান সেরে বের হলে মৈত্র দেখল, অমিয় ছোটবাবু, টেবিলে থালা সাজিয়ে বসে আছে।

খাবার সময় মৈত্র অমিয়কে বলল, দেখ অমিয় তুই নতুন এসেছিস। শহর বন্দর সম্পর্কে তোর কোন ধারণা নেই। লবেঞ্জো মরকুইসে, ডারবানে যা সব করেছিস, এখানে যেন এসব না হয়। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

—আমি কি করেছি!

থাকগে, বলে দিলাম, যদি সাবধানে চলাফেরা না করে তবে কে কাকে রক্ষে করে। তারপর কেমন সে সহসা উত্তেজিত হয়ে গেল, শালা তুই এটা কলকাতার মদ পেয়েছিস! ঢক ঢক করে এতটা খেয়ে ফেললি!

—জানতাম না।

মৈত্র মাংসের হাড় চিবুচ্ছিল। সে ছোট-বাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে ছোটবাবু?

—ভাল।

—দেখেছ, কি সব পরীদের মতো মেয়েরা গাছের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার-পরই বলল, তোমাকে নিয়ে আমার ভয় নেই ছোটবাবু। যত ভয় অমিয়কে নিয়ে। একটু থেমে বলল, এখানে মেয়েদের কি বলে জানো?

ওরা মুখ তুলে তাকালে বলল, চেংগে-রিভা। শালা চেংগোবিভাই বটে। যেমন রং, তেমনি বাহার। আর শালার ক থাই! গাউনের নিচে কেবল.....।

ছোটবাবু সকালে ঘুম থেকে উঠলে, সত্যি অবাক হয়ে গেছিল। জেটির পাশেই নানা রকম ফুল ফলের গাছ, বড় বড় গাছ সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র এখানে লেগুনের মতো নয়, অথবা নদী ধরে ভিতরে ঢুকেও বন্দর নয়, একেবারে সমুদ্রের ধারে শহর। জেটি থেকে একটু এই ফার্লং-এর মতো হাঁটলে শহরের ভিতর ঢুকে যাওয়া যায়। এবং পিছনে তাকালে বিশাল সমুদ্র, শান্ত, নীল রঙের ভিতর এই সব সারি সারি জাহাজ, এবং জাহাজের পাশে যে সব গাছেরা ফুলেরা ছড়িয়ে আছে তাদের ভিতর এমন সব সুন্দর সুন্দর মানুষদের ঘুরে বেড়াতে দেখে ছোটবাবু ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে-ছিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপার। সে হাজারের বোট-ডেকে উঠে গেলে সব দেখতে পায়। এবং বড় কাঁসো এসফল্টের পথ ধরে গোলাপী আঙা মুখে মেয়েরা, ঠিক গোলাপী বললে ভুল হবে কিছুটা যেন নীল রং ফুটে বের হচ্ছে চোখের নিচ থেকে, সে ভেবেছিল দেব-দেবীদের মুখ চোখ এমন হবার কথা, মানুষের মুখ চোখ এমন সুন্দর হয় সে জানত না।

সুতরাং মৈত্র বলল, খুব খারাপ জায়গা বাপু। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। একা একা বের হবে না। বের হলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অমিয় এবং ছোটবাবু এই প্রথম সমুদ্রে বের হয়েছে, প্রথম প্রথম যতটা অবাক হবার কথা তার চেয়েও বেশি অবাক সব কিছু দেখে। মৈত্র স্পেনীশ মেয়েদের এমন সব গল্প বলছে যে, নেমে গেলে আর ফিরে আসা যায় না। কি যে মোহ থাকে। টাকা পয়সা সব রেখে একেবারে ন্যাংটা হয়ে ফিরতে হয়।

ওরা দু'জন শিশুর মতো চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।

অমিয় শুধু যেমন বলে থাকে, একটু বলে ফেলা যেন, যত বাজে কথা।

মৈত্র বলল, একবার খপ্পরে পড়লে বুঝতে পারবে।

অমিয় কি ভাবল, তারপর বলল, তুই বের হবি না?

—পাগল! বের হয়ে সব টাকা গচ্ছা দিই আর কি! এখন আমার খুব টাকার দরকার। আমাকে বে-হিসেবী হলে চলে!

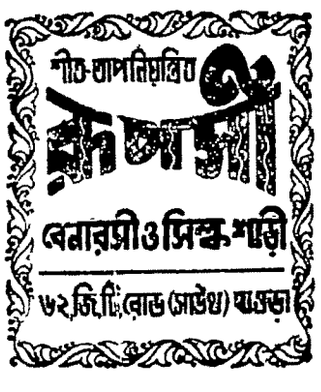

রাজু আবার সবচেয়ে বেশী স্কোর করেছে!
'হরলিক্স' তাকে সববিষয়ে চটপটে ও চৌকস ক'রে রাখে

রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে আর স্বাস্থ্য রক্ষা করে দিনের পর দিন।

"খেলার মাঠে রাজু দারুণ চটপটে আর চৌকস। ও তো আমাদের দলের একটি রত্ন" বলে রাজুর ক্যাপ্টেন।

এই রকম কর্মঠ দেখার জন্যে তার মা প্রতিদিন খেতে দেন দুধের সঙ্গে ভরপুর 'হরলিক্স' —জীবনী শক্তির উৎস কোটোজের পুষ্টিগুণ শরীরে সঞ্চার করে বল, রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি গড়ে তোলে আর সেই সঙ্গে যোগায় কর্মঠ শক্তি।

মায়েদের একমাত্র ভরসা 'হরলিক্স'। আর আজ প্রায় ১০০ বছর ধরে ডাক্তারেরাও এটিই খেতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কেবল তাই তো নয় দুনিয়ার সর্বত্র।

পরিবারের সকলকে কর্মক্ষম, শক্তিসবল ও প্রাণচঞ্চল রাখতে প্রতিদিন তাদের খেতে দেন 'হরলিক্স'। হ্যাঁ আপনিও আপনার পরিবারের সকলকে খেতে দিন 'হরলিক্স'।

'হরলিক্স'—
পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

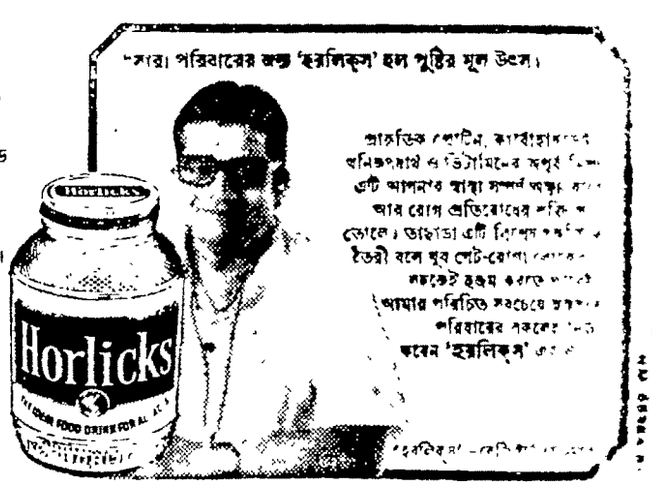

ওরা তাড়াতাড়ি খেতে থাকল তারপর। কিছু জাহাজি রেলিঙে ভর করে গাছের ছায়ায় যুবক যুবতীদের দেখছে। কিছু জাহাজি কলম্বো থেকে যে-সব কাঠের হাতি, ময়ূরের পাখা কিনে নিয়েছিল বিক্রির জন্য —তারা ফোকসালে বসে সেই সব হাতী, পাখা সাফসোফ করছে। কারণ বিকেলে বন্দরে কত যে পাখি উড়বে। বন্দরে সব টিউলিপ গাছে কত ফুল ফুটে থাকবে। আর কত যুবক যুবতী হেঁটে হেঁটে বন্দরে চলে আসবে হাওয়া খেতে। আশ্চর্য এই বন্দর। আসলে সব বড় বড় বার্চ জাতীয় গাছ চারপাশে। এবং গাছে সব হলুদ রঙের পাতা। নিচে লাল নীল স্কার্ট পরা যুবতী। হাতে কালো দস্তানা। মাথায় কালো টুপি। ষণ্ড ওদের পাকা আপেলের মতো। মুখে ওদের সরল হাসি। আর কি অসামান্য রূপ। স্পেনীশ যুবতীদের চোখ কালো চুল কালো—সোনার হরিণের মতো পরম লোভের বস্তু। খেতে খেতে মৈত্র বন্দরের সব খবর দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধান! মাথা পড়বে। রাম বাবণের যুদ্ধের কথা মনে আছে? সোনার হরিণের জন্য রাম যে রাম যে শালা রাম পিতৃ আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত বনে গিয়েছিল, যে শালা রাম মনুষ্য নয়, দেবতা, সে পর্যন্ত সোনার হরিণের লোভ সামলাতে পারে নি রে অমিয়। আর ছোটবাবু তুমি তো মনুষ্য জাতির অপোগন্ড।

অমিয় বলল, কোথাও একা যাচ্ছি না। তোর সঙ্গে যাব।

ছোটবাবু বলল, আমিও।

তখন গ্যালিতে ভান্ডারি, গলা বাড়িয়ে ওদের কথা শুনছে। বুড়ো মানুষ। রোগা। হাত পা কাঠির মতো। সে গলাটা কচ্ছপের মতো বের করে রেখেছে যেন। এটা শীতকাল, গ্যালিতে পর্যন্ত ঠান্ডা। ওর চোখ মুখ ঠান্ডায় সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মৈত্র বলল, কি শুনছ চাচা?

—আপনেগ রসের কথা শুনছি।

—আমি ঠিক বলি নি!

—ঠিক বেঠিক জাহাজ না ছাড়লে বোঝা যাবে না। বলেই ভান্ডারি গলাটা টেনে নিল ভিতরে।

ওরা তিনজনই শেষ পর্যন্ত ভয়ে জাহাজ থেকে নামে নি। ঠিক নামে নি বললে ভুল হবে। ছোটবাবু মাটি দেখলে না নেমে থাকতে পারে না। সে একটু সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে এসেছে। একটু ভিতরে ঢুকলে লেদেরা-এলেন, সে ঠিক জানে না কতদূরে গেলে লেদেরা-এলেন, তবু সে কিছুদূর গিয়ে বুঝতে পেরেছিল এমন শীতে সে বেশিদূর হাঁটতে পারবে না। সমুদ্র থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস একেবারে সব হিম করে দিচ্ছে। অথচ এ-দেশের মেয়েরা ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে টেনিস খেলছে। ওদের শরীরে যেন শীত লাগছে না। সে ওদের দেখে অবাক না হয়ে পারছিল না।

রাতের বেলা মনে হল ঠান্ডা আরও বেড়েছে। কেমন জ্যোৎস্নার মতো সারাদিন ঠান্ডা রোদ। বোদে দাঁড়ালে মনে হয় না রোদ। তবু যতক্ষণ বোদ ছিল জাহাজিরা ওপরে উঠে দাঁড়াতে পারছে, সন্ধ্যা হলে কেউ আর ওপরে থাকছে না। যারা বের হবার এ-শীতেও বের হয়ে যাচ্ছে। বড় মিস্ত্রি সেই এক পোশাকে ব্রাচে ভর করে নেমে যাচ্ছে। মাঝ বয়সী মেমসাব ওকে ধরে ধরে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। জ্যাক বিকেলের দিকে ওর বাবার সঙ্গে এজেন্ট-অফিসে গেছে। হয়তো কোথাও ওর বাবার পার্টি আছে। সেখান থেকে ফিরতে রাত হবে। চিঠিপত্র এসেছিল। ওর কোন চিঠি নেই। সে আর চিঠির আশাও করে না। আত্মীয় স্বজন কিছু কলকাতায় আছে। ওদের ঠিক ঠিকানা ওর জানা নেই। সে মানুষ হিসেবে অগোছালো—তার কিছু ঠিক-ঠাক থাকে না। এমন কি জাহাজে ওঠার আগে যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ভীষণ সদাশয় ছিলেন, সে তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারত। কিন্তু সেটাও সে এখন খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই সে আর কিছু করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিকানা লিখে বাকসে রেখেছিল তো। এখন কিছু মনে করতে পারছে না। আসলে এ-কাজটার সঙ্গে ওর মনের কোন সংযোগ নেই। যেন কোনরকমে সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে ওপরে ওঠা। ঠিকমতো উঠতে পারে কিনা জানে না। জাহাজে এখন জ্যাক আছে বলে, মৈত্র এবং অমিয়, সাবেরসাব, ইয়াসিন অনিমেষ বস্কু সবাই ওর হয়ে যেন আছে—ওদের জন্য ওর কষ্ট তেমন হয় না। সে এখন জ্যাকের কাছ থেকে নানারকম সমুদ্র বিষয়ক বই নিয়ে আসে। সমুদ্রের ওপর পড়াশোনা করতে ওর ভাল লাগে। এখন সে মার্কো-পলোর ভ্রমণ কাহিনী পড়ছে। আসলে মানুষ এ-সব বই পড়লে মনে মনে সমুদ্রে না গিয়েও সমুদ্রে ভেসে চলতে পারে। অনেক সময় ওর ইচ্ছা হয় সেও লিখবে এমন একটা কাহিনী। কারণ মার্কো-পলোর চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় তার এই সমুদ্রযাত্রা।

রাত এভাবে জাহাজে বেড়ে যায়। স্টিয়ারিং এনজিনে কোন শব্দ নেই। ওপরে সমুদ্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তার শব্দ, এবং সমুদ্র থেকে ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে পড়ছে। এ-বাদে কিছু শব্দ নেই। ফ্রেনগালো কাল থেকে এদিকে ঠিক ফল্কা বরাবর দাঁড়িয়ে যাবে। কাল থেকে মাল খালাস আরম্ভ হবে। ফল্কার কাঠ তোলা হবে কাল। কিনার থেকে মানুষ জন দলে দলে উঠে আসছে। এমন নিঃশব্দ, নির্জন তখন থাকবে না জাহাজ। দীর্ঘদিন পর জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়লে কেমন সব চুপচাপ হয়ে যায়। সমুদ্রে জাহাজের পিচিঙের বিরাম থাকে না, কম বেশি, এনজিনের শব্দ সব সময়, সেটা সহসা বন্ধ হয়ে গেলে কেমন ভুতুড়ে মনে হয় জাহাজটাকে। কেমন একে-বারে সব কিছু থেমে যায় যেন। কেউ সিঁড়ি ধরে নেমে এলে জুতোর শব্দ এত স্পষ্ট যে তখন ভীষণ অস্বস্তি লাগে।

যারা হাতী এবং ময়ূরের পালক নিয়ে দোকানের মতো ওপরে সাজিয়েছিল, তারা পর্যন্ত নেমে এসেছে। কিনার থেকে তেমন কেউ আজ ওপরে উঠে আসে নি। কাল খবর রটে যাবে শহরে। ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ এসেছে। ওরা প্রতিবারের মতো এবারেও ময়ূরের পালক, কাঠের হাতী নিয়ে এসেছে। সুন্দর সুন্দর সব চাক-চিক্যময় হাতী, কালো রঙের, আর ময়ূরের পালক ড্রইংরুম সাজাবার পক্ষে কি যে দরকারী। আর কি সস্তা! কেবল যমুনা-বাবুর গ্যালিতে ডেফ-ভান্ডারির গলা পাওয়া যাচ্ছে। সে বোধহয় উনুনের ছাই ঝাড়ছিল। সে বোধহয় উনুন পরিষ্কার করে রাখছে। অথবা এও হতে পারে—সে রাতে বন্দরে নেমে যাবে বলে সব ঠিকঠাক করে রাখছে। বেশি রাতে ফিরলে সকাল সকাল উঠতে কষ্ট হবে। হাতের কিছু কাজ সে সেরে রাখছে আগে থেকে।

মৈত্র শুয়ে শুয়ে চিঠি পড়ছিল। ওর বৌ যথানিয়মে চিঠি লিখে থাকে। বন্দরে এলে সবাই চিঠি না পেলেও যেন কথা থাকে সে চিঠি পাবে। কি যে লেখা থাকে চিঠিতে! ছোটবাবু দেখেছে অনেক সময় মৈত্র পালিয়ে পালিয়ে বৌর চিঠি পড়ে। কেউ এলেই সে লুকিয়ে ফেলে। অথবা ধরা পড়ে গেছে মতো চোখ মুখ করে রাখে। ছোটবাবু জানে, সে ঘুমিয়ে পড়লেও মৈত্র বৌর চিঠি পড়বে। যখন মৈত্র চিঠি পড়ে তখন অমিয় কিছু বলে না। সে একটা ক্রাইম নভেল পড়তে থাকে শুয়ে শুয়ে। কারণ সে হয়তো জানে চিঠি পড়া মৈত্রের সারা রাতেও শেষ হবে না। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিটা পড়ে। তারপর চিঠি লিখতে বসে। শীতের জন্য সে মাঝে মাঝে চা করে আনে। চা খেতে খেতে কত কি যে ভেবে সে চিঠি লেখে!

অমিয় মাঝে মাঝে ধুস্ শালা বলছে। কাকে ধুস শালা বলছে বোঝা যাচ্ছে না। মৈত্রকে না শীতের জন্য ধুস শালা বলছে ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। মৈত্র আলো জ্বালিয়ে রেখেছে বলে অমিয়র ঘুম নাও আসতে পারে, অথবা শীতের জন্য, না কি সে ক্রাইম ফিকশানে কোন এমন চরিত্র পেয়ে গেছে যাকে মাঝে মাঝেই ধুস শালা বলা যায়। ধুস শালা বললে, শীত কমে যায়, মৈত্রকেও বুঝিয়ে দেওয়া যায়, আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য ঘুম আসছে না।

মৈত্র দেখল তখন ছোটবাবু পাশ ফিরছে। ছোটবাবু ঘুমোবে এখন হয়ত। এক কাপের মতো চা করে এনেছিল, সে, তবু বলল, কি রে খাবি, যা ঠান্ডা। চা খেলে ভাল লাগবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই লাফ দিয়ে উঠল। গলায় মাথায় মাফলার ঢেকে,, কম্বল, লেপ মুড়ে একেবারে দুজন এসকিমোর মতো উঠে বসেছে। হাত বের করছে না পর্যন্ত। পারলে যেন মৈত্রকে এখন

চা খাইয়ে দিতে হবে। আর উঁ হুঁ হুঁ এমন শব্দ, মুখ থেকে বাষ্প বের হচ্ছে গাদা গাদা।

মৈত্র চা খেয়ে বাংকে উঠে গেল। এত তাড়াতাড়ি ওর ঘুম আসে না। তবু বাজি ধরার মতো সে বন্দরে না নেমে থেকেছে। ওর জন্য ছোটবাবু অমিয় নামে নি। ছোটবাবু একটু ঘুরেই উঠে এসেছে জাহাজে। কিন্তু বন্দরে এলে জাহাজ থেকে না নেমে থাকা ভীষণ কষ্টের। ওর চিঠি পড়তে পড়তেই মনে হল, কতকাল থেকে সেও মাটি না ছুঁয়ে আছে। ওর বাবা বলত, মাটির ওপর হেঁটে বেড়ালে, ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে, মানুষের কোন অসুখ থাকে না। কলকাতায় সে এত অসুখ, রোজ এত মানুষ মরে যায় অসুখে, সে শুধু একটু মাটির ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটতে পায় না বলে। ওর এ-সময় বাবার কথা খুব সত্যি এমন মনে হল। সে তো মানুষ। সে কি করে ডাঙ্গায় না নেমে থাকে! জাহাজে থাকলেই সে শেফালীর কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। সে শেফালীর মুখ ভাবতে ভাবতে অথবা ওর চিঠি পড়তে পড়তে সত্যি একটা অসুখে পড়ে যায়। সে কম্বলের নিচে তখন হি হি করে শীতে কাঁপতে থাকে। আর তখন মনে হয় শেফালীর ভীষণ অবিশ্বাস মৈত্রকে। সে ফিরে গেলেই ভূতে পাওয়া বুগীর মতো ছিঁড়ে খেতে চায়, সে সমুদ্রে ভাল মানুষ থাকে কি করে!

সময়-অসময় পর্যন্ত বোঝে না মানুষটা। পাগলের মতো ভালবাসার জায়গাগুলো নিয়ে পড়ে থাকে। তখন একেবারে সরল মানুষ। শেফালীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। দু দণ্ড কোথাও দেরি করে না। শেফালীর চারপাশে কেবল ঘুর ঘুর করবে। যেন শেফালীর শরীর পেলে মৈত্রের আর কিছু লাগে না। আর কি আছে শেফালীর! লম্বা যুবতী শেফালী। শরীরের সর্বত্র মহিমময় ঈশ্বর সবকিছু ভরে দিয়েছেন। শেফালীকে মনে হলেই মৈত্রের শেফালীর সবকিছু মনে হয়ে যায়। এবং এভাবেই মৈত্র জাহাজে তার সফর শেষ করে দেয় ভেবে ভেবে।

অথচ সে আবার একনাগাড়ে বেশি দিন ঘরে থাকতে পারে না। এক সময় কেমন চারপাশের জীবন বর্ণহীন মনে হয়। শেফালীকে আর তেমন ভাল লাগে না। বরং শেফালীকেই মনে হয় ভীষণ বেপরোয়া। সে শেফালীর কাছে এতটা আশা করে না। তখন শেফালীকে ভীষণ ওর বাজে লাগে। আবার নোনা জল, সমুদ্রে সফর। জাহাজের জন্য উঠে পড়ে লাগা। টাকা কমে আসে, কতদিন বসে খাওয়া যায়, সে শেফালীকে নানাভাবে বোঝাতে থাকে, এবার সমুদ্রে বের হওয়া দরকার। বের হয়ে গেলেই যত মায়া ফের গড়ে ওঠে শেফালীর জন্য। সে শেফালীকে ছেড়ে সত্যি বেশিদিন সমুদ্রে থাকতে পারে না।

কখনও শেফালী বলবে, তুমি থাকো কি করে? কষ্ট হয় না?

মৈত্র হেসে বলত, তোমার কথা ভেবে ভেবে সফর শেষ করে দিই।

শেফালীর তখন বলার ইচ্ছা হত, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমাকে সত্যি কথা বলছ না। অথচ শেফালীর বলার সাহস হত না। মানুষটি যা একগুঁয়ে, কখন কি করে বসবে কে জানে! তাই চিঠিতে সেই যেন মায়ের মতো লেখা, অথবা সেই জাহাজ-ডুবির গল্প মনে করতে পারে মৈত্র, যেন শেফালী প্রত্যেক চিঠিতে লিখতে চায়, সাগরে জাহাজডুবি হয়েছে। সমুদ্রে সাঁতার কাটছে বাবা এবং ছেলে। ছেলে কিছুতেই আর পারছে না। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে। তখন যেন বাবা বলছেন, তুমি নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছ, ঐ যে দূরে আকাশে নক্ষত্র, ঠিক তার নিচে তোমার মা একটা ঘরে বসে রয়েছেন। আমাদের জন্য গরম খাবার টেবিলে সাজিয়ে বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন, কতক্ষণে আমরা যাব। তুমি তবু তলিয়ে যাচ্ছ কেন জলে। জলের নিচে সব বড় বড় হাঙর, জোরে হাত-পা নাড়তে পারছ না। আমরা এসে গেছি, ঐ তো সেই পাহাড়টা, তুমি কতদিন তার ওপর দাঁড়িয়ে দূরের জাহাজ দেখেছ। দেখতে পাচ্ছ পাহাড়ের মাথায় আলো জ্বলছে। আর একটু কষ্ট করতে পারলেই আমরা সেখানে আহার এবং উত্তাপ পাব জন। তুমি আর কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় কর, সামান্য ধৈর্য, অধৈর্য হলে আমরা উভয়ে তলিয়ে যাব।

শেফালীর যেন এভাবে বলার ইচ্ছা আমরা উভয়ে তলিয়ে যাব শুভেন্দু। আমি তোমার জন্য আহার এবং উত্তাপ সবই সঞ্চয় করে রাখছি। ঘরে ফিরলে আহার এবং উত্তাপ যা খুশি তোমার, যতটুকু ইচ্ছা সব চেঁটেপুটে নিও। এই উত্তাপের জন্য অন্যত্র হেঁটে যাবে না কথা দাও। আমার আছে এক বাতিঘর সম্বল। সমুদ্রে ডুব দেবার প্রলোভন জাগলে নিজের বাতিঘরটির কথা ভেবো। শেফালীর চিঠিতে এমন অজস্র কথা থাকে। যার উত্তর দেবার সময় মৈত্র ভীষণ ভাবনায় পড়ে যায়।

মৈত্র ডাকল, অমিয়, বাত কত হয়েছে খেয়াল আছে?

—তোর বৌকে চিঠি লেখা শেষ!

—শেষ।

—ছোটবাবু কি করছে?

—ঘুমোচ্ছে।

—তুই শুয়ে পড়। আর একটু বাকি আছে, ওটুকু হলেই শুয়ে পড়ব। তুই ঘুমিয়ে পড় না।

—ঘুম আসবে না।

—কেন, আলো জ্বালা বলে?

—না। বৌটার বাচ্চা হবে। টাকা পাঠানো দরকার।

—টাকা পাঠাতে লিখেছে?

—হ্যাঁ।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!
গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ
১০০% খাঁটি হয়
'ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।
ডাটা
গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ
জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

—তাহলে সারেঙসাহেবকে বলে টাকা তুলে নিবি। কাল তো শুনলাম, কে কত তুলতে চায় একটা লিস্ট চেয়েছে।

মৈত্র আর কিছু বলল না। সে কম্বলের নিচে হাত রেখে, হাত-পা গরম করার চেষ্টা করল। কখনও হুষত ঘসে ঘসে কানে হাত চেপে ধরেছে। কিছুটা এভাবে ওর শরীর গরম হয়। তারপর সে মুখে মাথায় কম্বল টেনে দেবার সময় দেখল, ছোটবাবুর লেপ কম্বল পা থেকে সরে গেছে। এই হয়েছে জ্বালা। ঘুমালে ছোটবাবুর কোন হুঁস থাকে না। সে উঠে লেপ-কম্বল টেনে দিল। ছোটবাবুকে দেখলেই বোঝা যায়, খুব ছেলেমানুষ। ঘুমিয়ে থাকলে ওকে আরও বেশি ছেলেমানুষ লাগে। ছোটবাবুকে নিয়ে ভয় আছে। এ-বয়সটা খুব ভয়ের। অতি সহজে কোন যুবতী ওকে সম্বল করে বনবাসে চলে যেতে পারে। পোর্টহোল বন্ধ। দরজা বন্ধ। ঘরে, বাইরের ঠাণ্ডা ঢুকতে পারছে না। আলো জ্বালা থাকলেই যেন ভাল। যতটুকু উত্তাপ পাওয়া যায়। ছোটবাবু পায়ে মোজা পরেই শুয়ে পড়েছে। হাতে দস্তানা। ছোটবাবু যে ভীষণ শীতকাতুরে এই থেকে বোঝা যায়।

এক সময় অমিয় দেখল, বড় টিণ্ডাল মৈত্রও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে বইয়ের পাতা ভাঁজ করে শুয়ে পড়বে ভাবল। ঘুমিয়ে থাকলে মৈত্রের মুখ সে তার বাংক থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে ওপরের বাংকে থাকে। মাঝে মাঝে মৈত্র ঘুমের ভিতর হাসলে টের পায় অমিয়, মৈত্র স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখলে সাধারণত বৌকেই দেখতে পায়। ওরা একসঙ্গে সেই কলকাতা বন্দর থেকে আছে। নানাভাবে দেশের কথা উঠলে মৈত্র, ওর বৌ সম্পর্কে বলেছে। ওদের ভালবেসে বিয়ে। মৈত্রের স্ত্রী সুন্দরী এ-কথাও মৈত্রের কাছ থেকে শোনা। এবং দেখতে ভালো। আর শেফালীর ভালবাসার জুড়ি নেই। সে প্রায় মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলার মতো মুখ করে বসে থাকত, স্ত্রীর কথা মনে হলেই মৈত্র একেবারে চুপচাপ। কথা প্রসঙ্গে মৈত্র কত যে কথা বলে—আর জাহাজে আসছে না, এমনও বলে মাঝে মাঝে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এ-বয়সে একটা কাজ ডাঙায় খুঁজে না নিলে সারাটা জীবন সমুদ্রে কাটবে। সফরে সফরে সে টাকা জমাচ্ছে।

মৈত্র এভাবে কত রকমের পরিকল্পনা করে থাকে। সে কতবার যে বলেছে, টাকা সওয়া করছি অমিয়। চিরটাদিন জাহাজে কাজ করতে ভাল লাগবে না। তুইও জমা। টাকা অযথা নষ্ট করবি না। জাহাজের একটা পয়সাও আমি নষ্ট করছি না। মদ খাচ্ছি না। কার্নিভেলে যাচ্ছি না। জুয়া খেলছি না। কিনারায় এক খলাসের ধরতে হবে শুধু। কথা আছে মানুষটা জাহাজেই আসবে। যদি জাহাজ থেকে নির্বিঘ্নে নামাতে পারি, তবে দু' পয়সা হয়ে যাবে। যা সামান্য আয় এতে বাড়ে। আমি এজন্য কাঠের হাতী আনিনি, ময়ূরের পালক আনিনি।

অমিয় বলেছিল, একটা কেলেঙ্কারী না হয়।

—কি আর হবে। ধরা পড়লে চুপ মেরে যেতে হবে। কার জিনিস কে খোঁজ রাখে।

—আমার এসব ভাল লাগে না মৈত্র।

—সুন্দরী যুবতী আর টাকা থাকলে মানুষের আর কিছু লাগে না।

—সামান্য সুখের জন্য এত বড় রিস্ক নিচ্ছিস!

—সুখ অসামান্য বস্তু। এর জন্য সব দিতে পারি।

—সব দিতে পারি না মৈত্র।

—ওটা অহঙ্কারের কথা। আমার কোন পেটি অহঙ্কার নেই অমিয়। আমি এবং শেফালী আমার সুখের জন্য। এ-কাজ আমার সুখের জন্য। সামান্য বস্তুটি অসামান্য সুখের জন্য।

মৈত্রের ঐ অভ্যাস। নিজের কাজের জন্য সে সবরকমের যুক্তি-তর্ক খাড়া করে রাখে। না পারলে চুপ। কোন কথা বলবে না। চুপচাপ কাজ করবে। তখন মনে হবে, ছোটবাবু এবং অমিয় জাহাজে সত্যি কয়লাওয়ালা, সে বড় টিণ্ডাল। আস্কারা দিয়ে মাথায় তুললে যা হয়। কথা না বলে সে মনে করিয়ে দেয় সে জাহাজের বড় টিণ্ডাল। অমিয় এবং ছোটবাবু এখন একেবারে ঠিক ঠিক কয়লাওয়ালার মতো ব্যবহার করতে থাকে। টিণ্ডাল সাব, খানা রেডি।

মৈত্র আরও গম্ভীর হয়ে যায়।—খুব মজা, হারামজাদা, পঙ্গপালের দল। সে তেড়ে যায় ছোটবাবুকে। ছোটবাবু আর অমিয় তখন ডেকের ওপর ছুটে গিয়ে হা-হা করে হাসতে থাকে।

অমিয়র ঘুম রাত থাকতে ভেঙে গেল। বন্দর এলে ওয়াচ থাকে না। কাজের চাপ কম। সাতটা থেকে কাজ আরম্ভ। অমিয়র ইচ্ছা ছিল ছটা পর্যন্ত ঘুমাবে। একঘণ্টার ভিতর বাকি কাজ অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া, বাথরুমের কাজ এবং অন্যান্য, যেমন চর্বি ভাজা, রুটি-চা এসব খাওয়ার কাজ সেরে ফেলতে পারবে। তারপর টাণ্ডু বললেই লাফিয়ে কাজে বের হয়ে যাওয়া। অথচ ঘুম যে কেন রাত থাকতে ভেঙে গেল। বেশ রাত। সকাল হতে হতে সাতটা বেজে যাবে। তবু তখন কিছুটা অন্ধকার থাকে। অন্ধকারে এনজিনরুমে নেমে যেতে হবে। সে ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বাজেনি। সে ফের লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না। সে কম্বল গায়ে উঠে বসল। বাথরুমে যেতে হবে। শীতের সময় যতক্ষণ পারা যায় চেপেচুপে পড়ে থাকার স্বভাব। সে বুঝতে পারল এর জন্য ঘুম ওর ভেঙে গেছে। সে নেমে ওপরে ওঠার সময় ভাবল, দরজাটা বন্ধ করে আসেনি। সিঁড়ির মুখে, আলোটা সবসময় জ্বালা থাকে। দরজা খোলা রাখলে ঘরে অন্ধকার থাকে না। সে নেমে গিয়ে দরজা ঘের বন্ধ করে দিল।

তারপর ধাপে ধাপে ওপরে উঠতেই মনে হল, পুবের দিকটা বেশ ফর্সা মতো। সে রাতে এটা লক্ষ্য করেনি। এখন সূর্য ওঠার কথা না। দূরে কোথাও একটা দ্বীপটিপ থাকবে। সেখানে আলো থাকতে পারে, নানাভাবে চারপাশের আলো মিলে এমন দেখাতে পারে। নতুন বন্দর। সামনে জেটি পার হলে বড় বড় গাছ। আলো-অন্ধকারে গাছগুলোকে বড় রহস্যময় লাগছিল। মৈত্র বলেছে, জেটি পার হলে শহরের পার্ক। সমুদ্রের বুক থেকে এই পার্ক উঠে এসেছে যেন। এই পার্কে টিউলিপের ফুল প্রচুর ফোটে। ফুলের লোভে শহরের সব উঠতি বয়সের মেয়েরা এখানে বিকেল হলেই চলে আসে।

এইসব মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই জাহাজিদের ভীষণভাবে মাতাল করে দেয়। এবং এখানে এক কার্নিভেল আছে, কার্নিভেলে গুহাপথ আছে অথবা রিঙের খেলা, মোটর বেস আছে যা মৈত্র এবং নাবিকদের পক্ষে ভীষণ লোভের। মৈত্র বলেছে, মাথা ঘোরাবার পক্ষে জুয়োখেলায় যে-কোন রমণীই যথেষ্ট।

সুতরাং ঠাণ্ডায় ওর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লে ওর শীতে

হাওড়া
কুষ্ঠকুটীর
সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা ফুলা, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা: পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন খুরুট, হাওড়া। শাখা: ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন: ৬৭-২৩৫৯।

ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন সে কেবল চা খেয়ে কিছুটা শরীর গরম করতে পারে। সে গ্যালিতে ঢুকে দেখল, উনুনে আঁচ আছে কিনা। সে দেখল আছে। ছাই ঝেড়ে সামান্য কয়লা দিয়ে দিল। ভাণ্ডারির এখন ওঠার সময়। ভাণ্ডারি উঠে খুশিই হবে দেখে।

সে চা নিয়ে নিচে এসে দেখল, মৈত্র আলো জেবলে ঘরে বসে আছে। মুখে-চোখে ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর রেখা ফুটে উঠেছে। ওর হাতে চা দেখেও একটা কথা বলল না। ভয়ঙ্কর কিছু হলে এমন হয়। অমিয় বলল, কি রে, কি হয়েছে। শরীর খারাপ!

সে কেমন আরও ক্ষেপে গেল। কথা বলল না। তোয়ালে মগ নিয়ে ওপরে উঠে গেলে অমিয় হেসে ফেলল, শালা আমার নীতিবাগীশ। মৈত্র নেমে এলে বলল, বন্দরে ভিড়তে না ভিড়তেই!

—হ্যাঁ ভিড়তে না ভিড়তেই। সে একবার অমিয়র দিকে তাকাল না পর্যন্ত। শরীর সাফসোফ করে এসে শীতে আরও কাবু হয়ে গেছে। সে কোনরকমে কম্বলের নিচে ঢুকে যেতে পারলে যেন বাঁচে। সে আণ্ডার-ওয়্যারটা লকারের মাথায় শুকোবার জন্য ছড়িয়ে দিল।

—নীতিবাগীশদের এই হয়। অমিয় চা খেতে খেতে ব্যঙ্গ করল।

মৈত্র জবাব দিল না।

—সারাদিন কৌ কৌ। আর শালা মানুষ বিয়ে করে না বুঝি!

—বিয়ে না করলে এসব কথা মানায় না। তুমি তো বাউণ্ডুলে। বাপের খেয়েছ, বনের মোষ তাড়িয়েছ। ইচ্ছে করেই মৈত্র বন না বলে বোন বলল।

অমিয় ও-কথায় কান দিল না। বলল, আমার হলে বেশ ভাল লাগে। আরাম লাগে। বলে সে বেশ জোরে জোরে কথা বলতে চাইলে মৈত্র বলল, আস্তে, ছোটবাবু ঘুমোচ্ছে। ওরও ঠিক হয়ে যাবে। স্বভাবে ঘুমোচ্ছে!

লেপের নিচে ঢুকে বলল, তুই কার মুখ দেখিস অমিয়?

—কত মুখ। কেবল দেখতে পাই একটা ফ্রক-পরা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি তার পেছনে ছুটছি। তারপর কোনরকমে ছুঁয়ে দিলেই আমার হয়ে যায়। খুব বেশি দূরে যেতে পারি না। তারপর আর মুখটা মনে পড়ে না। সে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে চলে যায়। আমার আর তখন কোন মুখের কথা মনে থাকে না। সকালে উঠে কাকে দেখে রাত্রে কলিসানটা হল কিছুতেই মনে করতে পারি না।

মৈত্র বলল, আমার সব মনে থাকে।

—কি দেখলি আজকে।

—দেখলাম.....এই দেখলাম...।

—বলতে চাস না?

—না, তোর এই আর কি, শেফালীকে দেখলাম। না বললে কি আর হবে। তোদের তো সবই বলি। তবে তোরা পঞ্চপাণ্ডবের দল, কিন্তু করিসনি, তোদের বলা ঠিক না। তোরা তবে খারাপ হয়ে যাবি।

—ধুস শালা। তুই খারাপ করার কে রে? বাদ দে! চা খাবি?

—খাওয়াবি!

—মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অনেকটা গেছে? চা খেলে আরাম পাবি।

—অনেকটা। মৈত্র বলতে গিয়ে মুখ গোমড়া করে ফেলল।

ওরা বসে বসে দুজন বেশ অনেকক্ষণ কথা বলল। এখন আর মনে হচ্ছে না, ওরা চার মাস আগেও ছিল অপরিচিত। কত সহজে সব কথা বলে ফেলতে পারে সবাই। মৈত্রের যা-কিছু বলা দরকার, সব এদের সঙ্গে। এরা মৈত্রের বন্ধু আবার সহকর্মী। আবার একেবারে অধস্তন মানুষের মতো ব্যবহার করতেও ছাড়ে না। তথাপি এই বাংকে অথবা ফোকসালে এলে ওরা বুঝতে পারে, যত দেশ ছেড়ে ক্রমে দূরে সরে যাবে, তত ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হবে। জাহাজ তো সবেমাত্র চলতে আরম্ভ করেছে। বলতেই বলে ব্যাঙ্ক লাইনের সফর। সহজে শেষ হয় না।

সকাল হলে অমিয় পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল, সাতটা কখন বেজে গেছে। অথচ সারেঙ টান্টু বলছে না। কাকে কোথায় কাজ করতে হবে বলছে না। অমিয় অবশ্য জানে তাকে কোথায় কাজ করতে হবে। কারণ, ছোট টিণ্ডালের সঙ্গে স্মোক-বক্সে তার কাজ আছে। বন্দরে এলেই বয়লারের সব স্মোক-বক্স পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। এবং এ-কাজটা একমাত্র কোলবয়দের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়। ছোটবাবু হয়তো ডেকে কাজ করবে। ডেকে কাজ দিলে ছোটবাবু বেশ সব দেখে বেড়াতে পারবে।

সিঁড়িতে এখন জাহাজিদের ওঠানামার শব্দ। জেটিতে লোকজনের ভিড়। বড় বড় ক্রেন সব এগিয়ে আসছে। ওরা ফোকসালে বসে দেখতে পাচ্ছে। সামনের পোর্ট-হোল ধোলা। কিনারায় মানুষ জড় হচ্ছে। সব গ্যাঙওয়ে দিয়ে উঠে আসছে। কেউ কেউ দল বেঁধে, কাজের পোশাকে গাছের নিচে জটলা করছে। বেশ একটা উৎসবের মতো মনে হয়, যেন সাড়া পড়ে যাবার মতো। ডেক-জাহাজিরা ফস্কায় কাঠ খুলে দিচ্ছে। ছুঁড়ে ছুড়ে ফেলছে কাঠ। আর হাজার হাজার পাখি উড়ছে মাথার ওপর। সমুদ্র-পাখি। এদের ডানা তেমন বড় নয়। পাখি-গুলো প্রায় কবুতরের সামিল। ওদের ডানার শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অমিয় বসে বসে পোর্ট-হোলের হুলঘ-দিয়ে বন্দরের দৃশ্য দেখতে থাকল। বড়-মিস্ত্রিকে খুব ভয়। সে খুব সাবধানে চলাফেরা করছে। এবং বক্ষে বড়-মিস্ত্রি কোনদিন ডেকে বের হয় না। এতদিন পর দেখলে নাও চিনতে পারে। তবু আরও কিছুদিন সাবধানে থাকা ভালো।

এভাবে কেন যে বন্দরের দৃশ্য দেখতে দেখতে কখনও বড়-মিস্ত্রির গোলগাল মুখ এবং অবরুদ্ধ চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সে দৃশ্যটা ভুলে যেতে চায়। বরং ভাল লাগে, সেইসব বড় বড় গাছ, টিউলিপ ফুলের গাছ, গাছে সাদা অথবা মেরুন রঙের ফুল—বন্দরে ফুলের ছবি, মেয়েরা সোনালী গাউনে ঢেকে চুপচাপ হেঁটে চলে আসবে, ওদের কালো চোখ, নীল চুল, সুষমায় ভরা মুখ, সে একটু ছুঁয়ে দেখবে তাদের—আর কিছু না। বন্দরে এর চেয়ে বেশি কিছু চায় না।

(ক্রমশঃ)

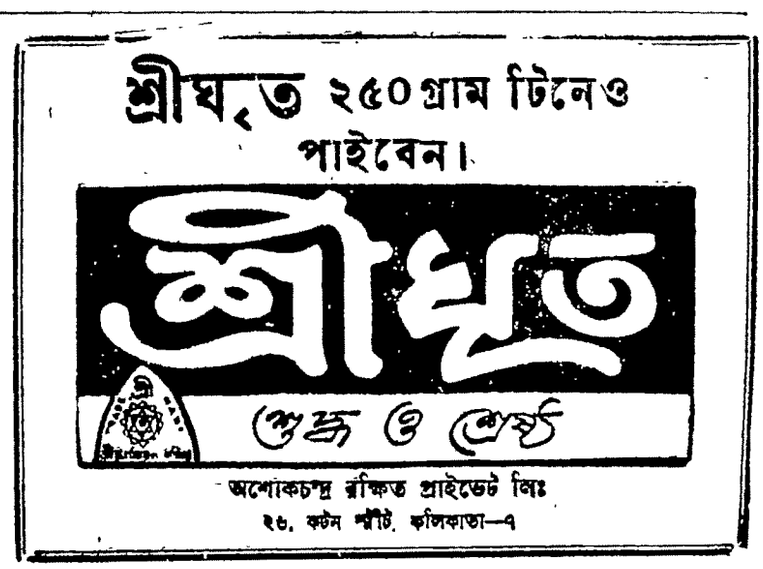

পুনশ্চ

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ডঃ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের এক অসামান্য কীর্তি। ১৯০১ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর জন্যে তিনি নিয়মিত সরকারী বৃত্তি পান। এতদব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল বাংলা বিভাগে 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক পদে থাকাকালীন তিনি বহু প্রাচীন গ্রন্থের ও পুঁথির সম্পাদন কার্য করে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' গ্রন্থ দুখানিও পূর্ববঙ্গের লৌকিক গীতিকাব্যসমূহের সংকলন হিসাবে তার খ্যাতির পরিপোষক। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত 'বৃহৎ বঙ্গ' ও 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' তাঁর বিশেষ গবেষণা-মূলক কার্যের নিদর্শন।

গবেষণামূলক সাহিত্য কার্য ছাড়াও দীনেশচন্দ্র ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর গল্প-উপন্যাস এবং ইংরেজী গ্রন্থও রচনা করেন প্রচুর। এবং সেকালে এই সকল গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ হয়। বাংলা বইগুলির মধ্যে গৃহশ্রী, তিনকড়ি, নীলমণির কথা, বেহুলা, জড়ভরত, ফুল্লরা, সতী, ধ্রুবাদ্রোণ ও কুশধ্বজ, সুকথা ও বাগরঙ্গ প্রভৃতি অধিক প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতও তিনি সম্পাদনা করেন।

দীনেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালের ২০শে নভেম্বর। 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে তিনি তাঁর আত্মকথার মধ্যে লিখেছেন, 'আমি বৈদ্যবংশসম্ভূত। পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস যশোহর জেলার সেনহাটি গ্রামে। আমরা হিংগু সেন, শকাত্রি গোত্র এবং আমাদের সমাজে কুলীন পদবাচ্য। ১৭৮৮ শকের কার্তিক মাসের ১৭ই তারিখ শুক্রবার রাত্রি ৪ দণ্ড থাকিতে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জের অধীন বগজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। আমার মাতামহ ঠাকুর 'গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী' ঢাকা জেলার তৎসাময়িক লোকদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। এখনও (মানে তিনি যখন লিখেছিলেন) ঢাকা জেলার লোকের মুখে এই চারি পঙক্তি কবিতা শুনা যায়—

'গুণি মিশ্রার ঘড়ি,
নীলাম্বরের বড়ি
গোকুল মুন্সীর গোফে তা
গল্প শুনবি তো মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা।"

তিনি আরও লিখেছেন, 'আমার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজী ও বাঙ্গালায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে ইংলিশম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্মে গভীর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কোনরূপ আহারাদির উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকায় তিনি সমাজে নিগৃহীত হন নাই। তিনি প্রথম জীবনে ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।...

'আমার ১১টি সহোদর ছিল, তন্মধ্যে তিনটি মাত্র জীবিত। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র, আমি এবং আমার এক ভগ্নী যমজ; সে ভগ্নীর নাম মৃণ্ময়ী দেবী। আমাদের চেহারা অনেকটা এক রকমের। এতগুলি মেয়ের মধ্যে এক ছেলে হইলে, সে ছেলে রাজচক্রবর্তীর মত আদর ও যত্ন লাভ করিয়া থাকে। শৈশবে আমি মাতার অতিরিক্ত আদরের বলিয়া, দুর্নিবার হইয়া পড়িয়াছিলাম—সেই আদর যে সর্বদাই মধুর ছিল, তাহা নহে, তাহা প্রায় অম্লের চাটনি সংযোগে ভিন্ন বসাশ্রিত হইত কোনও সময়ে বিবিধ খেলনা, বাক্স, মিষ্টদ্রব্য এই সকলের মধ্যে রাজা হইয়া বসিয়া থাকিতাম।'

অতঃপর রায় বাহাদুর তাঁহার শিক্ষার কথা যা বলেন, তার কিয়দংশ হল—'শৈশবে অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে আনন্দ করিয়া ২০ বৎসর পর্যন্ত আমি যে কত কবিতা লিখিয়াছি, তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ছাপা হইলে তাহা ছোটখাট একখানি এনসাইক্লোপিডিয়ার মত হইত। কবিতা দেবীর এত সাধ্যসাধনা করিয়াও তাঁহার যখন মন পাইলাম না, তখন গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার সর্ব-জ্যেষ্ঠা সহোদরা বৈষ্ণব সাহিত্য ও বংলা প্রাচীন পুঁথির প্রতি আমার অনুরাগ আকর্ষণ করেন।'

পরবর্তীকালে এই অনুরাগের ফলপ্রদ ও সার্থক নিদর্শন আমরা পাই তাঁর ইংরেজী 'চৈতন্য এন্ড হিজ কম্পেনিয়নস' 'মিডাইভেল বৈষ্ণব লিট্রেচার অব বেঙ্গল' এবং বাংলায় লেখা 'রাগবঙ্গ', 'বাখালের রাজগি', 'কানু-পরিবাদ' প্রভৃতি বইগুলির মধ্যে। সম্ভবতঃ এই বইগুলি ইংরেজী ১৯১২-২০ সালের মধ্যে অথবা তার কাছা-কাছি কোন সময়ে রচিত। এগুলির অধিকাংশই তাঁর 'কৃষ্ণলীলাপঞ্চকের' অন্তর্ভুক্ত।

'রাগবঙ্গ' গ্রন্থখানি সম্পর্কে পণ্ডিত-প্রবর স্বর্গত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এক সময় লেখেন 'রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই প্রকার আখ্যান দ্বারা আমাদের সাহিত্যের একটি নূতন ধারা প্রদর্শিত হইয়াছে—এই ধারায় বঙ্গসাহিত্য প্রাচীন নির্মল রসসৃষ্টি দ্বারা এক নূতন আনন্দের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই আখ্যান পাঠ করিলে প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি নব্য শিক্ষিত সমাজের সাধারণ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে বঙ্গসাহিত্যে যে অস্বাভাবিক বৈদেশিক ভাব-বাহুল্য ঘটনাচক্রে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা দেশের মঙ্গলের জন্য অনেক পরিমাণে অপসারিত হইবে।'

রাধা-কৃষ্ণের মান-অভিমান, সোহাগ-প্রেমের কথায় ভরা লালিত্য, বিশাখা প্রভৃতি সখীদের চটুল-চপল মাধুর্যপূর্ণ বাচন-ভঙ্গী, সঙ্গ-সাহচর্যে শ্রীরাধাকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করার ঘটনায় প্রাণবন্ত রসাশ্রিত 'রাগরঙ্গ' গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

আজ কৃষ্ণ কুঞ্জে আসেননি, তাই রাধা ভাবছেন। এটি গ্রন্থের প্রথম দিকের অংশ পঞ্চম পরিচ্ছেদ। রাধা ভাবছেন—

'কালও তো এসেছিলেন। যেদিন ইচ্ছা সেদিন আসেন, আমার ইচ্ছায় তো আসবেন না! এজন্যই তো স্ত্রীলোকের এত দুঃখ! সে আর কি করতে পারে? পথের দিকে দুটি চোখ ফেলে রাখতে পারে, মনে মনে তপস্যা করতে পারে, দীপ জেলে বসে থাকতে পারে; —কিন্তু আসা তো তার দয়া?

রাধা ভাবছেন, কালও তো তিনি এসে-ছিলেন। বাড়ীর তাঁরা নিমন্ত্রণ খেতে গিছলেন, দুপুরবেলা ছুটি পেয়ে তার সংকেত শুনে এসেছিলেম। এসে দেখি দুপুরবেলা বোদ পেয়ে রাস্তা তেতে উঠেছে। তিনি জল ঢেলে আমার পথ শীতল করে রেখেছেন।

সখীরা দূরে চলে গেছলো। আমায় দেখে ছলছল চোখে ছুটে এসে পায়ে পড়লেন, এবং বল্লেন, 'আজ আমার জীবন সফল হোল—কি ভাগ্যে বিধি তোমায় পথে আজ মিলিয়ে দিলেন! রোদে মুখ ঘেমেছে, আহা কত কষ্ট পেয়েছ!' এই বলে ময়ূর পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন, আর তাঁর দুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে গণ্ড ভাসিয়ে দিল।

এত স্নেহ তাঁর! যাঁর স্নেহের পরশমণি পেলে কাঠ সোনা হয়ে উঠে, তিনি কি জন্য আবার আমার পায় ধরে কাঁদেন? আমার মত তপস্যা কে কবে করেছে? তিনি আমার পায়ে ধরেন! বিদায়ের সময় সে যে কি দুঃখ! না খেয়ে উপায় নাই। 'তবে এখন আসি' বলে চলতে যেয়ে থমকে দাঁড়ান। আবার এসে 'আসি' বলে আমার চিবুক ধরে কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমার হাত দুখানি চেপে ধরে আবার দেখা পাবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করেন! আধ পা হেঁটে যেয়ে আবার পাল্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন,—তাঁর চাঁদমুখ চোখের জলে ভেসে যায়।

ঐ কুঞ্জে বেছে বেছে ফুল এনে বোঁটা ফেলে শয্যা তৈরী করেন,—সে যে কত যত্ন করে শয্যা প্রস্তুত হয় তা আর কি বলব? তাঁর স্নেহের স্পর্শ পেয়ে সে যে সোহাগের বাসর হয়ে থাকে! সারা রাত কিভাবে যায়, তা কি বলব! সে কি দণ্ড যায়, না দিন-রাত যায়, না মুহূর্ত যায়, না চোখের পলক পড়তে পড়তে ফুরিয়ে যায়, আমি কিছুই জানি না, কিন্তু সেই মিলনের মুহূর্ত মনে বড় দাগা দিয়ে যায়।".....

—রূপক

মনের খবর

মানসিক রোগ—(৭)

উৎকণ্ঠাবস্থার আরও অনেক রকম দেখতে পাওয়া যায়। এবার তার কয়েকটা উদাহরণ উল্লেখ করছি।

(ঘ) ঘনশ্যামবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁকে বয়সের কথা জিজ্ঞেস করলেই বলেন 'এই ধরুন না পঞ্চাশ ছোঁয় ছোঁয় আর কি, বুঝতেই ত পারছেন আর হয়ে এলো আর কি: করবার আর কি আছে বলুন, এখন যে কোনদিন হয়ে গেলেই হল আর কি, এই—যৌবনকাল থেকেই তাঁর সমস্যা দেখা দেয়—যৌবন ত পেরিয়ে যাচ্ছে—তার পরেই প্রৌঢ়, আর তা দেখতে না দেখতে বৃদ্ধ—ব্যস। প্রতিদিন আমরা মৃত্যুর দিকে যে এগিয়ে চলেছি একথা ত আর অস্বীকার করা যায় না! কিন্তু তাই নিয়ে যদি সব সময় একটা উৎকণ্ঠা আর হতাশার অবসাদ মনকে ছেয়ে থাকে তবে সে অবস্থাটাকে স্বাভাবিক বলা চলে না। ঘনশ্যামবাবুর অবস্থাটা সেই রকম। কোনও প্রশ্ন করলেই এই একসুরে তার উত্তর আসে: যেমন জিজ্ঞাসা করা হল 'আজ কী খেয়েছেন। উত্তর আসে 'খাওয়া আর কি বলুন, বাকি দিন কয়টা পার হতে যা দেরী। কিছু খেতে হয় তাই খাওয়া। আর ত হয়ে এলো।' যেখানেই থাকুন না কেন, মনের একটা অংশ ঐ ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত টক্ টক্ করে আয়ুটাকে যেন চিহ্নিত করে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। হাসতে হয় হাসেন—চলতে হয় চলেন কিন্তু মূল চলনটার গতি যে মৃত্যুর দিকে সে কথা একটু সময়ের জন্যেও যেন তিনি ভুলতে পারেন না। ভেতরে ভেতরে একটা চাপা উৎকণ্ঠা তাঁকে যেন চুঁটি টিপে ধরেছে। বাড়ীর লোকেরা তাঁকে কত করে বোঝায়, বন্ধুদের তিনি এড়িয়েই চলেন, কিন্তু কোনও কথাতেই কাজ হয় না। মন তাঁর দিক-নির্ণয়ন যন্ত্রের কাঁটার মত ঐ মৃত্যুর দিকেই মুখ ফিরিয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে ছটফট করে ওঠেন যেন—মৃত্যু এলো বলে! চোখ বড় বড় করে এর ওর দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন বলেন তবে কি এলো! আত্মীয়-স্বজন সকলেই দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে গেছে। একজন নাকি বলেই ফেলেছিল—'ঘনশ্যাম তুমি যতদিন হল সর্বদা মরছ তার চেয়ে মরে গেলেই অনেক সহজ হত!' এ কথা শুনে তাঁর দুঃখ হয়, বলেন আমার আপনজনও এখন আমার মৃত্যু-কামনা করে। তাদের অভিসম্পাতে আমার আয়ু ক্ষয়ে যাচ্ছে। কদিনই বা আর বাকি! ইত্যাদি। ছাত্রাবস্থা থেকে মাদুলি, তাবিজ জমতে জমতে দুই হাতে কোমরে, গলায় নানা আকারের, নানা আয়তনের বহু মাদুলি তাবিজ ঝুলিয়ে, এখানে ওখানে মানত করে, পাজো দিয়ে, গ্রহ-স্বস্ত্যয়ন করিয়ে বহু চেষ্টায় মরণটাকে একটু সরিয়ে রাখতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছেন। পরমায়ু বাড়াতে যে যা বলে তাই করতে থাকেন—। তবু তাঁর মনোযন্ত্রের কাঁটাটি দৈবাৎ দিকভ্রম করেও অন্যদিকে ঘোরে না।—

(ঙ) উং-সান, বেশ গাট্টাগোট্টা মজবুত চেহারার মাঝারি উচ্চতার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের অভারতীয় মানুষ। তার পরিবার জীবিকার সন্ধানে এক সময় ভারতে আসে। সেই সঙ্গে সেও আসে। কিন্তু যানবাহনে উঠতে হলেই তার প্রাণ উড়ে যায়। হেঁটে চলতে পারে অনেক দূরে। গাড়ীঘোড়া দেখলেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। এদেশে আসবার সময় যখন সে জাহাজে ওঠে তখন তার প্রায় অজ্ঞান অবস্থা। জাহাজ ছাড়বার আগে ইঞ্জিনের শব্দ শুরু হতেই তার বুকের কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। আর যতদিন জাহাজে ছিল ততদিন বিছানা ছেড়ে প্রায় ওঠেইনি। প্রায় সব সময় চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত। কলকাতায় এসেও তার অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন কিছু হল না দেখে চিকিৎসক দেখিয়ে ঔষধ খাওয়ান চলল। অবস্থার পরিবর্তন খুব কিছু হল না। কখন একটু ভাল থাকে আবার উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। এখানে এসে কাজের চেষ্টা করে এক সময় কাজ পেয়েও যায়। কিন্তু বাড়ী থেকে হেঁটে সে কর্মস্থানে যায় আসে। অসম্ভব না হলে গাড়ীতে চড়ে না। কলকাতার রাস্তায় জল দাঁড়ালে তার সুবিধেই হয়। সকলেই তখন জল ভেঙ্গে হেঁটে চলে। সুতরাং কেউ আর তাকে কিছু বলতে পারে না। অন্য সময় পরিচিতদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে—হাঁটলে শরীর ভাল থাকে, আয়ু বাড়ে ইত্যাদি। যারা কিছু বুঝতে পারে তারা তাকে গাড়ীতে ওঠাবার জন্য এক একদিন জেদ ধরে। কিন্তু সে কিছুতে রাজি হয় না—তাদের শান্ত করতে বেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে চা-জলখাবার খাইয়ে দেয়। তবু গাড়ীতে চাপতে পারে না—এমনকি সিনেমায় যখন মোটরগাড়ী বা রেলগাড়ী খুব জোরে ছুটে আসতে থাকে তখন সে চোখ বুজে থাকে। যদি দ্রুতগতির শব্দটা প্রবল হয়ে ওঠে তখন সে দু হাতের আঙ্গুল দিয়ে কান চেপে ধরে শব্দ শোনা বন্ধ করে দেয়। রেলগাড়ীতে যদি কখনো চড়তে হয় তবে গাড়ীর গতিবেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে অস্থির হয়ে ওঠে। এই বুঝি কি হয়ে যাবে, ট্রেনটাই হয়ত উলটে যাবে, বা কোথায় গিয়ে ধাক্কা লেগে যাবে। পা-দুটো তখন নিজের নিজের ইচ্ছামত তাদের চালানো যায়। কিন্তু যতই হোক যন্ত্র যন্ত্রই, নিজের অধিকারে যে থাকবে তার কোনও মানে নেই। কখন বিগড়ে যাবে তার ঠিক কি! আর তার ফলে কি অঘটন ঘটবে তা কি কেউ বলতে পারে! বলতে বলতে উং-সানের মনে পড়ে যায়—যখন তার বয়স চার কি পাঁচ বছর হবে—তখন একবার এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাচ্ছিল গরুর গাড়ীতে চড়ে। আমাদের দেশের গরুর গাড়ী যেমন হয় ঠিক তেমনটি না-হলেও তাদের সেই গরুর গাড়ীতেও মাথার উপর 'ছই' দেওয়া ছিল। গাড়ী চলেছে—সামনের দৃশ্য দেখতে দেখতে গাড়ীর দুলুনীতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ একসময় প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনিতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার মাথায় গায়ে খুব চোট লাগে, যন্ত্রণায় সে কেঁদে ওঠে—, আর যারা সঙ্গে ছিল তাদেরও বেশ চোট লেগেছে। ভয়ে উৎকণ্ঠায় উং-সানের যেন আর জ্ঞান ছিল না। গাড়ীটা কি করে যেন উঁচু রাস্তা থেকে গড়িয়ে নিচে এক পাশের গর্তে গিয়ে পড়ে তার ফলেই ঐ কাণ্ড। পরে সে শুনেছে কি দেখে নাকি গরু ভয় পেয়ে রাস্তা ছেড়ে নীচে নেমে পড়ে আর গাড়ীটা উল্টে নেমে যায়। তারপর থেকেই নাকি তার গাড়ীতে উঠতে দারুণ উৎকণ্ঠা হয়। কিছুতেই সে স্থির থাকতে পারে না—বড় হয়ে সে অনেক করে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যুক্তি দিয়ে। তার উৎকণ্ঠা হবার যে কারণ নেই, তা সে বুঝতে পারে। কত লোক রোজ রোজ গাড়ীতে ট্রেনে যাতায়াত করছে। কলকাতার পথে চলাই দায় ঐ গাড়ীর জন্যে। তবু সব যুক্তি তার কাজের সময় ফেল করে যায়, উৎকণ্ঠা যে হঠাৎ কোত্থেকে এসে তাকে

চেপে ধরে যে সে কিছুই বুঝতে পারে না। এমনও কতবার হয়েছে—যখন উৎকণ্ঠা হচ্ছে তখনও সে ভেবে চলছে—এ উৎকণ্ঠা বাজে এর কোনও কারণই নেই সবই তার মনগড়া, কিন্তু তবু তার উৎকণ্ঠার হাত থেকে রেহাই নেই। উপায় না পেয়ে সে তার উৎকণ্ঠাকে মেনে নিয়েই চলে। এতে করে তার কাজের অনেক ক্ষতি হয় শরীরও ক্লান্তি আসে, সময় নষ্ট হয়, কিন্তু তবু সব জেনে-বুঝেও সে উৎকণ্ঠার সম্বন্ধে কিছু করতে পারে না। দুর্ভোগ পুইয়েই চলেছে। একবার মনঃসমীক্ষণের জন্যও আসে, কিন্তু নিতান্ত চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের কাছে আসতে হলে তার অনেক সময় ধরে বলে সে আজ চিকিৎসা করতে আসেনি। হয়ত আজও সে ভুগছেই।

(চ) চিত্রার বয়স ২৭।২৮ বছর হবে। লেখাপড়া জানা ভাল অবস্থার ঘরের মেয়ে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে নাকি পিটু-পিটে এই এত্তা হল এটা হল—এই নিয়ে তার উৎকণ্ঠা। কখন মাথা ধরছে, কান কট্-কট্ করছে গলা ব্যথা করছে চোখ জ্বালা করছে—হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জলবৎ চলছে—ইত্যাদি শরীরের ব্যাধির আর শেষ নেই। সুতরাং কেবল শরীর শরীর করে বাস্ত হয় আর অন্য সকলকে ব্যস্ত করে তোলে। বয়স যত বেড়েছে রোগের নাম জেনেছে তাতে আরও অবস্থার অবনতি ঘটেছে। মাথা একটু ধরছে আর ঘাড়ের কাছে যেন কেমন কেমন করছে, তবে কি মেনিন-জাইটিস হবে নাকি! এই নিয়ে মা-বাবাকে উদ্‌বাস্ত করে তোলে। ভাল ডাক্তার ডাকতে বলে, না ডাকা হলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়, বলে তাই যেন তারা কেউ পাত্তা দেয় না। কষ্টভোগ ত সেই করে তাতে অন্যের আর কি? তারা মাথা ধামাতে যাবে কেন। এই রকম অনবরত অভিযোগের অন্ত নেই। ভোগুৎ কিছু না কিছু চলেছে। একটু সর্দি হলেই স্যাটোমেনিয়া হয়ে যাবার উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে পড়ে। দুবার কাশলেই অমনি ব্রঙ্কাইটিস হল কিনা সেই ভাবনায় কাতর হয়ে পড়ে। কোন কারণে যদি পেটে একটু কামড় দেয় বা একটু অস্বস্তি হয় অমনি পেটে আলসার হওয়ার ভয়ে সে অস্থির হয়। ডাক্তারের কাছে গিয়ে নানা ভঙ্গি করে প্রশ্ন করতে করতে তাকে অস্থির করে তোলে। পারিবারিক চিকিৎসক—একটু রসিক লোক—চিত্রাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করেন কী, আজকে তোমার কোনটা হয়েছে টি-বি, না টাইফয়েড, কোনটা দেখতে হবে বল!' চিত্রা এতে ক্ষুণ্ণ হয়—বলে, ডাক্তারবাবু আপনি তো আমার কোনও রোগই দেখতে পান না, সবই ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন, কিন্তু আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে, তা আপনি কী বুঝবেন। নিজের না হলে কেউ বুঝতে পারে না। আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না—তাড়াতাড়ি কিছু ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু—আর পারছি না। নেহাৎ অসহ্য না হলে ত আপনাকে ডাকি না—জানেন তো আপনি।' ইত্যাদি অনেক রকমের রোগের তালিকা নিয়ে সে হাজির হয়। ডাক্তারবাবু একদিন বলেছিলেন, তুমি ত রোগের ডিকসেনারী (অভিধান) তৈরি করে নিজের মধ্যে জড় করেছ, আর আমি আমার ডিস্‌পেনসারির সব ওষুধ তোমাকে খাইয়ে শেষ করেছি। তাতেও যখন কিছু হচ্ছে না—তখন এক কাজ কর, তুমি এবার এক মনোরোগ চিকিৎসকের কাছে যাও। আমি বাবস্থা করে দিচ্ছি।' এতে চিত্রা খুব অপমানিত বোধ করে, রেগে বলে—আপনি রোগ সারাতে পারেন না—সে কথাটা স্বীকার করতে পারেন না বলে আমাকে এখন পাগল ঠাওরাতে চাচ্ছেন' বলে সে সেই ঘর থেকে চলে যায়। কিন্তু এতে তো তার রোগযন্ত্রণা কমে না' আবার তাকে ডাক্তারের কাছে আসতেই হয়। পরে সে ডাক্তার ছেড়ে অন্য ডাক্তার, তার পরে আরেক ডাক্তার—এই করে ডাক্তার বদল করতে করতে কয়েক বছর কেটে গেল। রোগ আর কমে না—লেখাপড়া করছে বহু কষ্টে—মধ্যে মধ্যে কেবল ওষুধের উপর নির্ভর করে দিন কাবার করেছে। বিয়ের কথা উঠলে সে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে, বলে, এই শরীর নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাওয়া যায়! বিয়ে সে করবে না ঠিক করেছে। বিয়ে করার যে তার সাধ কত সে কথাও বলে, কিন্তু শরীর না সারলে বিয়ে কি করে করবে! শরীরের উৎকণ্ঠা তার আর যায় না। পেটের গোলমাল, হজমের গোলমাল, এখানে ওখানে এ যন্ত্রে সে যন্ত্রে রোগ যন্ত্রণার আর অবধি নেই। চিত্রার স্বাস্থ্যও ক্রমে অবনতির দিকে চলেছে। রোগা হয়ে যাচ্ছে—দেহের রং ময়লা হয়ে যাচ্ছে, চেহারা রুক্ষ হয়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে মেজাজও বেশ তরিক্ষি হয়ে উঠছে। অনেক ভুগে শেষে মনঃসমীক্ষকের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছে।

(ছ) ছন্দার মনে শান্তি নেই। যৌবনা-রম্ভ থেকে তার কেবলই মনে হয় চেহারা বুঝি তার খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রোদে বেরুলে বুঝি দেখতে খারাপ হয়ে যাবে। সর্বদা উৎকণ্ঠা হতে থাকে, দেখতে ভাল দেখাচ্ছে তো! বারে বারে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, চুল, ভ্রু, মুখের এ-পাশ ও-পাশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, দেখতে ভাল লাগছে তো! চুলটা বারে বারে ঠিক করে নেয়, শাড়ীটা ঠিকমত গুছিয়ে নেয়। এই করে করে তার কলেজের পড়া আর শেষ করা হল না। কেবলই মনে হয় এই বুঝি তাকে দেখতে খারাপ দেখাচ্ছে। ওরে বুঝি তাকে আর ভাল লাগছে না। কিন্তু কে যে তাকে দেখছে, আর কাদেরই বা তাকে ভাল লাগছে না—তার কোনও ঠিক নেই। নিজেই ভাবছে তাকে যেন আর ভাল দেখাচ্ছে না। আর অমনি উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে পড়ে। বাইরে বেরুতে হলে বহু আগে থেকে নিজেকে নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোন্ সাড়ী পরবে, কোন্‌টাতে তাকে মানাবে। ঠিক মানাবে তো? নাকি অন্য কোনও সাড়ী পরবে? সাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ কোন্‌টা পরবে, বং মিলিয়ে পরলে বেশী ভাল দেখাবে নাকি কনট্রাস্ট রংয়ের জামা পরলে বেশী খুলবে? এই নিয়ে বহু সময় কেটে যায়। শেষ পর্যন্ত যেটা পরে বেরোয় সেটাতে কেমন মানাচ্ছে এই ভাবনায় মনে স্বস্তি পায় না। উৎকণ্ঠা হতে থাকে কি জানি কে কি বলবে—। বাড়ীর অন্যেরা তার এই অনুৎকণ্ঠাকে স্বভাবের জন্য বিরক্ত হয়ে উঠছে। বলে যা হোক কাপড় একটা কিছু ঠিক করে নিয়ে পরে ফেল—আর পাবা যায় না। এতে ছন্দারও মেজাজ বিগড়ে যায়, বলে যা হোক একটা পরে ফেললেই হল না। বেশ মেহনতী মেহেরবানীর মত বাস্তায় বেরুলে তখন তোমাদের খুব আনন্দ হবে, না? মজা দেখতে চও আমাকে নিয়ে—' কথায় কোন তরফই হার মানে না—অশান্তিই কেবল বাড়ে। কিন্তু ছন্দার কেবলই উৎকণ্ঠা হতে হতে থাকে এই বুঝি তাকে কেউ থাকে এই বুঝি তাকে কেউ অসুন্দর বা বদরুচির মানুষ বলে। রাত্রে শোবার সময়ও সে এমনভাবে মুখ ঘাড়ের উপর এলিয়ে শোয় যাতে, তার মতে, তাকে সুন্দর দেখায়। তা না হলে তার মনের স্বস্তি হয় না—ঘুম আসে না—উৎকণ্ঠা বাড়তেই থাকে। আত্মীয়-স্বজন এসে মাকে পরামর্শ দেয় মেয়ের বয়েস হয়েছে, বিয়ে দিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের চেষ্টাও হয় কিন্তু ছন্দা কোন ছেলে—সে-সে মানুষকে সে বিয়ে করবে না। বিয়ে করলে যদি তার চেহারা খারাপ হয়ে যায়, সন্তান হলে দেহের গঠন নষ্ট হয়ে যায়, কেমন ঢিলে-ঢালা হয়ে যায়, ছিঃ! ও রকম চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আগেই মরে যাওয়া ভাল। বিয়ে সে করবে না। তার মা সুন্দরী। বয়েস হয়েছে। তিনটি সন্তানের মা হয়েছেন। এখনও তাঁর চেহারার শ্রী নষ্ট হয়নি। বয়স ত বাড়েই, সে তো ধরে রাখা যায় না! এ সব বোঝাতে গেলে ছন্দা আরও বেঁকে বসে। বলে তোমার একটা উদাহরণ দেখলেই তা চলবে না। আরও হাজারটা দেখ। বলে তার মাসি পিসি, প্রতিবেশী জানাশোনা কত লোকের নজির দেখিয়ে সে

বলে—দেখছ ত সকলেরই কী অবস্থা হয়েছে। ঐ দেখেও আমি বিয়ে করব, আর তোমরা তাই বলছ! তোমরা ভাবছ কি বলত! বেগে গেলে ছন্দার মুখে যেন কথার খই ফুটতে থাকে। কোথা থেকে কোন ব্যাঙ্ক কোন নজির এনে যে খাড়া করে তা আগে থেকে কেউ ধরতেই পারে না। বিরক্ত হয়ে অন্যরা গজ গজ করতে করতে থেমে যায়। ছন্দা তার নিয়মিত প্রসাধন চালিয়ে যাচ্ছে। মনঃসমীক্ষণের করানর কথা উঠলে জ্বলে ওঠে। বলে আমি কি পাগল, না আমার মানসিক রোগ হয়েছে যে আমি মনঃসমীক্ষকের কাছে যাবো চিকিৎসা করাতে! ও সব আমি জানি—। আমাকে তোমরা পাগল সাজাতে চাও! ও সব বুজরুকী আমার চলবে না। কুৎসিৎ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। মা গোঃ!

এই উৎকণ্ঠা নিয়ে সে আজও ভুগে চলেছে। অভিভাবকরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। জোর করে এনে একদিন ডাক্তারের কাছে উপস্থিত করানো যায়, কিন্তু তাতে তো আর নিয়মিত চিকিৎসা করানো যায় না! ছন্দার উৎকণ্ঠায় অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তোলে। এই করেই দিন কাটছে।

আরও অনেক রকমের উৎকণ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। সে-সব তাদের পরিচয় দেওয়া যাবে।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

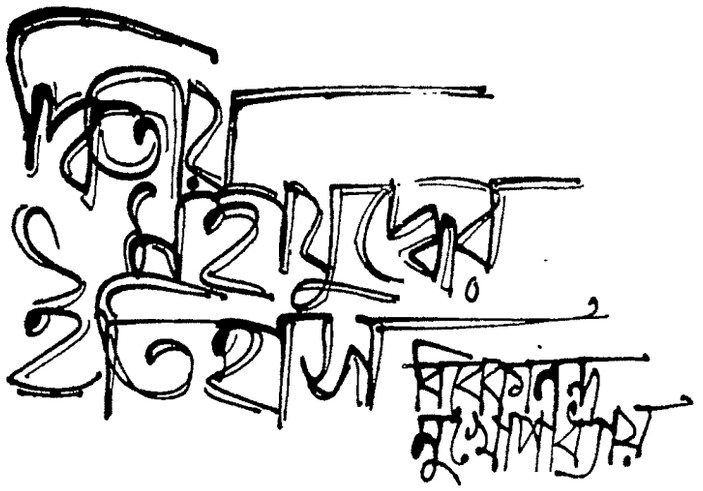

চতুর্থ পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

পার্লহারবার আক্রমণে হিটলারের বিস্ময়

জাপান-জার্মানী ও রাশিয়ার বিচিত্র সম্পর্ক

জাপান কর্তৃক অতর্কিতে পার্ল হারবার আক্রমণের ফলে পৃথিবীর চারিদিকে যে বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলিয়া গেল, সেটা কেবল ইংগ-মার্কিন মহল কিম্বা তাঁদের সমর্থকদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, খোদ হিটলারী দপ্তরেও এই বিস্ময় দেখা দিল। যদিও ইতালী, জার্মানী ও জাপান অ্যান্টি কোমিন্টার্ন প্যাক্টের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং এই তিন শক্তির মধ্যে একটা বাহ্যিক বুঝাপড়া ছিল, তবু হিটলার বিস্মিত হইয়াছিলেন কেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াই বা কি হইয়াছিল?

চার্চিল তাঁর মহাযুদ্ধের ইতিহাসে (তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪৬) লিখিয়াছেন—

'বার্লিনের জাপানী রাষ্ট্রদূতের রিপোর্টে দেখা যায় যে, তিনি পরদিন বেলা ১টার সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেণ্ট্রপের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং অবিলম্বে আমেরিকার বিরুদ্ধে জার্মানী ও ইতালীর যে যুদ্ধ-ঘোষণা প্রয়োজন, একথা তাঁকে জানাইলেন।

'রিবেণ্ট্রপ উত্তর দিলেন যে, হিটলার এখন পূর্ব প্রুশিয়াতে তাঁর সদর দপ্তরে কনফারেন্সে ব্যস্ত আছেন। কিভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলে জার্মান জনগণ খুব খুসী হইতে পারে, সে-কথাও তিনি চিন্তা করিতেছেন।

'সেনাধ্যক্ষ জড্‌ল নুরেমবার্গের মামলায় বলিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের খবরে হিটলার এবং তাঁর স্টাফ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। 'রাত্রি দ্বি-প্রহরে তিনি (হিটলার) আমার চার্ট-রুমে প্রবেশ করিলেন আমাকে ও ফিল্ডমার্শাল কাইটেলকে এই খবর দেওয়ার জন্য। তিনি সম্পূর্ণরূপেই অবাক হইয়াছিলেন।' (১)

'যদিও জার্মান নৌ-বিভাগ মার্কিন জাহাজগুলি আক্রমণের হুকুম দিয়াছিল, পরদিনই ৮ই ডিসেম্বর তারিখ, তবু কিন্তু হিটলার সরকারীভাবে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন তিনদিন পর।'

সুতরাং এখানেই প্রশ্ন ওঠে, জাপানী আক্রমণের সংবাদে হিটলারের এমন অভিনব প্রতিক্রিয়ার কারণ কি এবং জার্মানী ও জাপানের মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক ছিল?

—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্যের মত এই তথ্যটাও কম কৌতূহলকর ছিল না। আসলে হিটলার চাহিয়াছিলেন জাপানকে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভয় দেখাইবার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্য —প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাকে আক্রমণের জন্য নয়। অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর হাতে ঘায়েল হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন কাজ করা ঠিক নয় যাতে আমেরিকা জার্মানীর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের ফলে জার্মানীর যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথা মনে রাখিয়াই হিটলার চাহিতেছিলেন আমেরিকাকে আপাততঃ দূরে রাখিতে। কিন্তু জাপানকে কাজে লাগাইতে হইবে দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং জাপান সেখানে আক্রমণ করিলে বৃটেন যেমন বিপন্ন হইবে তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগও পশ্চিমে অতলান্তিকের বদলে পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে নিবদ্ধ হইবে—অন্ততঃ গোড়ার দিকে হিটলার এই ধরনের কূটনৈতিক কৌশলই খাটাইতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং ৫ই মার্চ, ১৯৪১ তারিখের 'একটি টপ সিক্রেট' বা সর্বাধিক গোপনীয় এক নির্দেশনামায় তিনি হুকুম দিলেন—

'ত্রিশক্তি চুক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে জাপানকে দিয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'দূরপ্রাচ্যে বাস্তব অবস্থা' অবলম্বন করানো' এবং এর দ্বারা বৃটিশ সামরিক শক্তি সেখানে আটক পড়িবে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোযোগ প্রবাহিত হইবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দিকে।

...দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ শক্তির চাবিকাঠি হইতেছে সিঙ্গাপুর। সেটা দখল করিতে পারিলে ত্রিশক্তির যুদ্ধ-পরিচালনায় একটা চূড়ান্ত জয় হইবে।'

মনে রাখা দরকার, হিটলার তখন সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। 'সুতরাং পিছনের দিকে বৃটেনকে অজেয় রাখা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। এজন্য জাপানকে দিয়া তিনি বৃটেনকে দুই ফ্রন্টের যুদ্ধের বিপাকে ফেলিতে চাহিয়াছিলেন।' (১)

এজন্য নাৎসী নেতারা জাপানকে বড় বড় গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেন, যখন ১৯৪১ বসন্তকালে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুয়োকা বার্লিনে গিয়াছিলেন। তখন তাঁরা এমন ভরসাও দিয়াছিলেন যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিলে জার্মানী তৎক্ষণাৎ 'উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন' করিবে। 'আর রাশিয়া যদি জাপানকে আক্রমণ করে, তবে সে-ক্ষেত্রেও জার্মানী অবিলম্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানিবে।' (২)

অর্থাৎ জার্মানীর অনুকূলে জাপানকে যুদ্ধে নামাইবার জন্য জাপানকে ক্রমাগত উস্কানি দেওয়া হইল। কিন্তু জার্মান নেতারা যেমন তাদের রাশিয়া আক্রমণের গূঢ় সামরিক পরিকল্পনার কথা আজো জাপানের নিকট বিশ্বাস করিয়া কোনদিন ফাঁস করেন নাই, জাপানও তেমনি তার আসল মতলবের কথা জার্মানীকে জানিতে দেয় নাই। অথচ ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকালে রাশিয়া আক্রমণের পর জার্মানী বার বার জাপানকে তাগাদা দিতেছিল পিছন থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে আঘাত হানিয়া ব্লাডিভোস্টক বন্দর দখলের জন্য। এমনকি পরবর্তী দুই বছর ধরিয়া রিবেণ্ট্রপ জাপানকে একই তাগাদা দিতেছিলেন। কিন্তু জাপান সরকারও বার বার সেই অনুরোধ এড়াইয়া গিয়া খুব ভদ্র ভাষায় জবাব দিতেছিলেন—"So sorry Please" 'খুব দুঃখিত, মাপ করবেন।' (৩)—

অর্থাৎ জার্মানী ও জাপান দুই ফ্যাসিস্ট শক্তির মধ্যে বাহ্যিক মিত্রতা থাকিলেও, বিপদের দিনে একে অপরের বন্ধু ছিলেন না। বরং এই দুইয়ের সম্পর্কের (১৯৪০ সাল থেকে) ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, জাপান চাহিয়াছে জার্মানী কর্তৃক ইউরোপীয় যুদ্ধারম্ভের পুরা সুযোগ নিতে, আর জার্মানী

(1) Hitler's War Directives — edited by H R Trever Roper London, 1966, Pass Books P 104-5,

(2) The Rise and Fall of the Third Rich —W. L. Shirer P. 1046

(৩) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক-পৃষ্ঠা ১০৪৯।

চাহিয়াছে পাল্টা জাপানকে নিজের সামরিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজে লাগাইতে। এজন্য রাশিয়াকে খতম করার উদ্দেশ্যে হিটলার যেমন চাহিতেছিলেন জাপানের সামরিক সহযোগিতা, তেমনি সেই সময় আমেরিকার সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যও হিটলার যথাযোগ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এমনকি, ৯ই জুলাই, ১৯৪১, রুজভেল্ট বৃটেনের হাত থেকে অতলান্তিক মহাসমুদ্রের আইসল্যান্ড দ্বীপ দখল করিয়া নিলেও এবং ফুরার কর্তৃক এটা মার্কিন 'আক্রমণাত্মক' কাজ (কেননা, জার্মানী বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত ছিল এবং ওই সমুদ্রপথ 'লড়াইয়ের এলাকা' বলিয়া বিঘোষিত ছিল) বলিয়া বর্ণিত হইলেও হিটলার জার্মান নেতাকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন কোন পাল্টা আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য। হিটলারের এই 'সংযম' লক্ষ্য করার মত। কিন্তু এই সংযম সত্ত্বেও জার্মানীর সহিত আমেরিকার অঘোষিত যুদ্ধ অনেক আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিম অতলান্তিকে মার্কিন ধনভষগুলির উপর জার্মান সাবমেরিনের আক্রমণ ও মার্কিন জাহাজগুলির পাল্টা আক্রমণেই এই অঘোষিত যুদ্ধের সূচনা করিয়াছিল এবং অক্টোবর মাসের (১৯৪১) সংঘর্ষে উভয় পক্ষের লস্করেরা হতাহত হইয়াছিল। কিন্তু 'কে প্রথম গুলী চালাইয়াছিল—এই অতলান্তিকের সংঘর্ষে।'—এই প্রশ্নের জবাবে নিরপেক্ষ ইতিহাস বলিবে—'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।' কেবল অক্টোবর মাসের ঘটনাবলীতে নয়, তারও আগে এবং ১০ই এপ্রিল তারিখ একটি জার্মান ইউবোটের উপর মার্কিন নৌবহরই প্রথম 'জলবিস্ফোরকের' সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল—একথা মার্কিন পক্ষই তাঁদের নৌ-ইতিহাসে স্বীকার করিয়াছিলেন। (৪)

কিন্তু হিটলারের জার্মানী বুশ যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আমেরিকাকে তেমন কোন উস্কানি দিতে চাহে নাই এবং জাপানকেও সে চাহিয়াছিল আমেরিকার বদলে বৃটেন বা রাশিয়াকে আক্রমণের জন্য। এমন কি ওয়াশিংটনে যখন জাপানী দূত নমুরা ও মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হালের মধ্যে সেই ইতিহাস-বিখ্যাত জাপ-মার্কিন আপোষ আলোচনা শুরু হইয়াছিল (মে মাস, ১৯৪১) তখন জার্মানীর পক্ষ থেকে [illegible] করার [illegible] কোন ত্রুটি হয় নাই। মার্কিন ঐতিহাসিক চার্চিলিয়ান জীবনীকার লিখিয়াছেন—

'In fact, the Germans did their best to sabotage the Washington talks'

অর্থাৎ 'ওয়াশিংটনের আলোচনার ভরাডুবি ঘটাইবার জন জার্মানী যথাসাধ্য তার চেষ্টা করিয়াছিল। টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত জেনারেল ওট শেষ পর্যন্ত এমন প্রস্তাবও দিয়াছিলেন যে, যদি আমেরিকার সঙ্গে জাপানের আলোচনা চালাইতেই হয়, তবে জাপান যেন এই মর্মে একটি সর্ত উত্থাপন করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বৃটেনকে সাহায্য দেওয়া চলিবে না, অধিকন্তু জার্মানীর বিরুদ্ধে অমেরিকার শত্রুতা বন্ধ করিতে হইবে। আবার যখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি স্বয়ং জাপানের প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মধ্যে সাক্ষাৎ আলোচনার প্রস্তাব হইয়াছিল, তখনও জার্মানী প্রমাদ গণিয়াছিল এবং জার্মান রাষ্ট্রদূত পুনরায় জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রকের নিকট এই আলোচনার বিরুদ্ধে 'বার্লিনের অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। (৫)

মজার কথা এই যে, হিটলার এবং তাঁর অতিবুদ্ধিমান্ পরামর্শদাতাদের মনে এই কথাটা একবারও উদয় হয় নাই যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে আপোষ-আলোচনা ভাঙিয়া গেলে আমেরিকার পক্ষে এই মহাযুদ্ধে যোগদানেরই নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল। যে-সম্ভাবনা হিটলার এড়াইতে চাহিতেছিলেন।

১৮ই নভেম্বর যখন জাপ-মার্কিন আলোচনার সংকটজনক পর্যায়ে চলিতেছিল, তখন হঠাৎ টোকিও বার্লিনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, জার্মানী ও জাপানের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত যে, 'সাধারণ শত্রুর' সঙ্গে উভয়ের কেহ পৃথক সন্ধি করিবে না। কিন্তু রিবেন্ট্রপ্ তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, 'শত্রু' বলিতে জাপান কাকে বুঝাইতেছে? তাঁর ধারণা ছিল যে, জাপান রাশিয়াকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং 'নীতিগতভাবে' তিনি এই নূতন প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন।

এর পর যখন বার্লিনে সংবাদ পৌঁছিল যে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে জাপানের আলাপ-আলোচনা ভাঙিয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ রিবেন্ট্রপ্ জাপানকে ভরসা দিলেন যে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবামাত্র জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। জাপানও জার্মানীর কাছে এই প্রতিশ্রুতির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। (৬)

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বলা যায় যে জাপান সম্পর্কে জার্মানীর কোন সুসংবদ্ধ নীতি ও দৃঢ় মনোভাব ছিল না। নাৎসী নেতারা যেন রোলারকে গড়াইয়া এক-এক সময় এক-এক পরিস্থিতি দিয়াছেন। কিন্তু জাপান নৌ সংক্রান্ত ও মনোভাবে জার্মানীর কেননা তুলনায় অধিক স্থির। এর কারণ এই যে জাপান [illegible] চিরদিন [illegible] পার্ল হারবার [illegible] পর্যন্ত [illegible] জার্মানীর [illegible] কোনদিনও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিল এবং পৃথক সন্ধি করার জন্য একটি নূতন চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। মুসোলিনীও সন্ধি বাজী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিটলারের সম্মতি চাহিতেছিলেন। এদিকে বিবেচনা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কেন আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধঘোষণা জার্মানী কর্তৃক লিখিত প্রতিশ্রুতি দাবি অর্থ গত দুই বছরের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ (অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়ার নীতি) জার্মানীর এই ইতস্ততঃ লক্ষ্য করিয়া টোকিও কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হইল যে ফুরার বোধ হয় 'quid pro quo' নীতি অনুসরণ করিতে চান। অর্থাৎ জার্মানী যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধযাত্রায় যোগদান করে, তবে জাপানকেও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতে হইবে —(৭)

এই সন্দেহ টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না। সুতরাং টোকিও এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব এড়াইয়া যাইতে চাহিল।

টোকিওর সৌভাগ্যক্রমে বার্লিন হিটলার এই প্রশ্ন নিয়া আর মাথা ঘামাইলেন না। তখন ৬ই ডিসেম্বর মস্কো যুদ্ধে হিটলারেরও সঙ্কট দেখা দিয়াছিল আর জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ একেবারে অত্যাসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল অথচ কেন যে, হিটলার সেই সন্ধিক্ষণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার জন্য জেদ প্রকাশ করিলেন না, টোকিও জঙ্গীবাদীরাও এই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন কি অন্য কেহও এর কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। —(৮)

(৪) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ১০৫৪।

(৫) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৫৬।

(৬) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৬০।

(৭) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, ১০৬ পৃষ্ঠা।

(৮) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক ১০৬ পৃষ্ঠা।

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গোমাক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৪৪৪৭

আসলে হিটলার বুঝিতেই পারেন নাই যে, জাপান ৭ই ডিসেম্বর তারিখ হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া বসিবে। কেন না, তাঁর আগাগোড়া ধারণা ছিল যে, জাপান হয় সিঙ্গাপুর, কিম্বা ব্লাডিভোস্টক, অথবা যুগপৎ বৃটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবে। নাৎসী নেতারা জাপানকে বরাবর সেদিকেই প্ররোচনা দিয়া আসিতেছিলেন। জাপানীরা কিন্তু আগাগোড়া পার্ল হারবার আক্রমণের মতলবের কথা জার্মানীর নিকট অত্যন্ত সযত্নে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিবেলা বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তর যখন বিদেশী রেডিও মারফৎ এই সংবাদ শুনিলেন, তখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই। এমন কি যখন রিবেণ্ট্রপকে এই সংবাদ দেওয়া হইল, তখন তিনি তো প্রথমে রাগিয়া আগুন হইলেন—কেন এমন আজগুবী খবর তাঁকে এত রাত্রে দেওয়া হইল।

এ জন্যই হিটলারও তাঁর সদর দপ্তরে দীর্ঘ রাত্রে পার্ল হারবার আক্রমণের সংবাদ পাইয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

তবু হিটলার জাপানের এই অতর্কিত আক্রমণের প্রতি সমর্থন জানাইলেন। জাপানী সমর শক্তির উপর তাঁর আস্থারিক বিশ্বাস ছিল এবং জাপানের পরাক্রমে খুশী হইয়া ১৪ই ডিসেম্বর বার্লিনস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতকে সম্মানসূচক জার্মান ঈগল পদক উপহার দিলেন।

১১ই ডিসেম্বর হিটলার জার্মান রাইখস্টাগে বক্তৃতা দিয়া রুজভেল্টকে 'যুদ্ধবাজ' ও 'ইহুদীদের' দ্বারা প্ররোচিত বলিয়া তীব্র নিন্দা করিলেন এবং তাঁর নিজের 'প্রেস্টিজ রক্ষার' জন্য আগেই আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হিটলারের প্রতি উল্লাস প্রকাশ করিলেন। —(৯)

অতঃপর সেদিনই জার্মানী ইতালী ও জাপানের মধ্যে এই মর্মে একটি নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল যে, তাঁরা একত্রে 'সাধারণ শত্রুর' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন এবং কেহ কোন পৃথক সন্ধি স্বাক্ষর করিবেন না। —(১০)

●

জাপানী সমরনেতাগণ অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ জড়াইয়া পড়া বুদ্ধিমানের কার্য হইবে না। এ জন্য জার্মানীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও জাপান রাশিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি (১৩ই এপ্রিল ১৯৪১) ভঙ্গ করে নাই। কিন্তু বহুৎ শক্তির বিরুদ্ধে একই সময়ে যুদ্ধ করা জাপানী সমর শক্তির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ছিল। কিন্তু কোন কোন সোভিয়েত ঐতিহাসিক মনে করেন যে, রাশিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া জার্মানীর ব্যর্থতার সঙ্গে জাপান সোভিয়েতকে আক্রমণ করা থেকে ক্ষান্ত ছিল। এমন কি, ওয়াশিংটনের সঙ্গে আপোষ আলোচনার ব্যর্থতার জন্যও জাপান রাশিয়া আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। (১১)

অর্থাৎ সোভিয়েত লেখকের মতে ওয়াশিংটনের সঙ্গে টোকিওর আপোষ আলোচনা সার্থক হইলে জাপান যেমন পার্ল হারবার আক্রমণ করিত না, তেমনি জাপানের মাঞ্চুরিয়াস্থিত কোয়ান্টাং আর্মি রাশিয়াকে আক্রমণ করিত। কিন্তু এই মতবাদের স্বপক্ষে কোন নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ [illegible] এডাইতে চাহিতেছিল বলিয়াই জাপান রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল—যদিও ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রনেতারা পর্যন্ত এই চুক্তি পছন্দ করেন নাই, কেন না তাঁদের আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এর ফলে জাপানী সৈন্যেরা রাশিয়ার দিক থেকে নিশ্চিন্ত হইয়া সাংহাই [illegible] অধিকারগুলির উপর আক্রমণ চালাইবে। —(১২)

অপর পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়াও সেই সময় জাপানের সঙ্গে কোন যুদ্ধ চাহে নাই। ষ্ট্যালিন চার্চিলের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় (৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪১) জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, জাপানের সহিত স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি রাশিয়ার পক্ষে ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। তবে, জাপান আক্রমণ করিলে সোভিয়েত রাশিয়া তার উপযুক্ত জবাব দিবে। —(১৩)

কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাইবার জন্য বৃটেনের পক্ষ থেকে চেষ্টা হইয়াছিল জাপান কর্তৃক ডিসেম্বর মাসে বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ইডেন যখন মস্কোতে ইঙ্গ-সোভিয়েত সহযোগিতা নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন এই প্রসঙ্গ তিনিই তুলিয়াছিলেন। কিন্তু রুশ-জার্মাণ রণাঙ্গণের অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল ছিল। সুতরাং ষ্ট্যালিন জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

—(১৪)

(ক্রমশঃ)

(৯) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৭৪

(১০) ওই পুস্তক, পৃষ্ঠা ১০৭৫

(11) The Anti-Hitler coalition — V Issraeljon 1971, Moscow, P. 80-82

(12) The Rise and Fall of the Third Reich — P. 1047

(13) Correspondence — (Stalin — Cnurchill—Roosevelt Moscow, P.21-22.

(১৪) দি এ্যান্টি হিটলার কোয়ালিশন্—পৃষ্ঠা ৮৭

পরমার সুখ দুঃখ

কামাল হোসেন

অথচ সময় নাকি একভাবে কাটে না। পরিবর্তনের চাকা নিত্য ঘুরে চলে। স্বাস্থ্যনিবাসের একক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষের পত্রবিন্যাস ক্রমশ হলুদ হয়। তারপর পরিপূর্ণ রিক্ততা। পরিশ্রমের কেঁপে ওঠা স্পন্দন। এবং সবুজ।

তবু পরমার আঠার বছরের সব অশান্তি সব উৎসাহ নিজস্ব প্রহরে এসে থমকে দাঁড়ায়। চারপাশের সবকিছু যেন বিবর্ণ। জীবন মানে তার কাছে একটি যুবতী মেয়ের উথালপাথাল কৈশোরের হা-হুতাশ—যৌবনের নতুন কিছু প্রাপ্তির ব্যাকুলতা। এ সবকিছুই স্বাভাবিক, কিন্তু বড়ো বিষাদমাখা। অনেক কিছু স্বপ্নের বঙবেরঙের বেলুনগুলি আকাশে উড়তে উড়তে একে একে ফেটে যাচ্ছে। শূন্য মনে শব্দের চিহ্ন নেই। সম্পূর্ণ নিঃশব্দ পরমার বুকে হৃদস্পন্দন ছাড়া নেই অন্য কোনো অভিব্যক্তি। শব্দের স্রুগতের কণামাত্র অংশের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ।

বাড়ীটির নাম 'পরমা কুটীর'। কোনো মফঃস্বল শহরে এরকম নামের বাড়ি বিরল নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় অল্পবয়সী পত্নীবিয়োগে বিরহবেদনায় ম্লান শাহ্-জাহানের প্রতিচ্ছবিরা অবচেতনে একটি করে মিনিয়েচার তাজমহল সৃষ্টির প্রয়াসে এরকম নামকরণ করে থাকেন। পরবর্তী প্রজন্ম সাগ্রহে সে-নামের অর্থ বিশ্লেষণে ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ পায়।

কিন্তু না—সেরকম কিছু নয়। পরমা দেবী পরমা-র ঠাকুমা। পরমার বাবা মৃত্যু মায়ের নামটি সস্তা মার্বেল পাথরের শরীরে অঙ্কিত করে বাড়ির ফটকে সযত্নে সাজিয়ে রেখেছেন। নামের সঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ।

একতলা বাড়ি। সামনের দিকটা প্লাস্টার করা। বাড়ি তৈরীর সময়ের কলি'র পোঁচড় দেওয়া অস্পষ্ট হলুদ আভা। রাস্তার দিকে বারান্দা গ্রীল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির ভেতরে কয়েকটি ঘর ছোট্ট উঠোন তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি। মফঃস্বল শহরের মধ্যবিত্ত সংসারের গন্ধ সর্বত্র অনুভব করা সহজসাধ্য। পরমার বাবা এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির ক্লার্ক। অল্প মাইনে। বাঁহাতের উপার্জন প্রসঙ্গে তাঁর সামান্য দুর্নাম আছে। পরমার ছোট তিনটি বোন আছে। তার থেকে অনেক ছোট। পর পর চারটি মেয়ে নিয়ে পরমার মার আক্ষেপের শেষ নেই।

প্রতিদিন বিকেলে গ্রীল-ঘেরা বারান্দায় পরমা দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে দিয়ে পিচ-ঢালা রাস্তা। সারাক্ষণ রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাওয়া-আসার বিরাম নেই। এর একটি দিক শহরের মধ্যপ্রান্তে চলে গেছে—যেখানে স্কুল কলেজ অফিস বাজার—সবকিছু আছে। আর একদিক গেছে এ-শহরের প্রমোদ উদ্যানে, প্রতিটি বিকেলে যেখানে এখানকার মানুষ বেড়াতে যায়।

পরমার ঘুম ভাঙে কাকের চিৎকারে। কর্কশ অশোভন ধ্বনি সকালের ঝরে-পড়া উজ্জ্বল আলোয় অবগাহনে যেন আমন্ত্রণ জানায়। মুখ হাত ধুয়ে স্টোভে চায়ের

জল সে চাপিয়ে দেয়। তারপর বোনেদের টেনে তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মা উঠে পড়ে। বাবা অবিশ্যি আর একটু বেলা করে ঘুমায়। তারপর পরমার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নেবার আগে তাড়াতাড়ি কলতলায় মুখ ধুয়ে আসেন।

এরকমই সবকিছু কাটে। পরমা-র বাবা বাজার যান। পরমারা পড়তে বসে। বোনদের পড়া বুঝিয়ে দেয়। ওদিকে মা কয়লার উনানে আঁচ দেয়। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার অগ্রগমন গতি পরমাদের ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ে। তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে ঘড়ির দিকে তাকায় পরমা।

মফঃস্বল শহরে এমনিতেই উত্তেজনার রেশ যেন স্বল্প। একটা খুন কিংবা নিদেনপক্ষে বিধবা মাস্টারণীর পদস্খলন - এরকম উত্তেজক খবর অবিশ্যি মুহূর্তে আবহাওয়ায় পরিবর্তন এনে দিতে পারে। নইলে সব সময় একঘেয়ে বর্তমানের চর্বিতচর্বণ।

পরমা এ-বছর থেকে স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে কলেজ যাওয়া শুরু করেছে। বাবার বাজার আনা হলে মার সঙ্গে তরকারী তৈরীতে সে সামান্য সাহায্য করে। তারপর স্নান। এবং পার্থিব কিছু সৌন্দর্যের উপকরণ শরীরে সাজিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় পরমা। তারপর পথে নেমে আসতে আসতে চলে। নম্র সুবিন্যস্ত দেহবল্লরী বাতাসে কাঁপে। দর্পণে নিত্য দেখা মিষ্টি মেয়েটি ময়দা-কলের পাশ দিয়ে, ছেলেদের স্কুলের দুয়ার ঘেঁসে, স্টেশনারী দোকানের মোড় দিয়ে কলেজ বয়। পথ চলতে চলতে কোনো সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা হলে কপাল ভালো। সামান্য দু-চার কথা বলতে বলতে কলেজে পৌঁছায়। এমনিতে খুব কম কথা বলে সে। কলেজে বন্ধুরা তাদের উচ্ছলিত যৌবনের তরঙ্গবিন্যাস ছিটিয়ে ছড়িয়ে দিতে দিতে তাকে বলে—লজ্জাবতী লতা। পরমার মাথা আরো হেঁট হয়। মৃদু [illegible] ছেলেরা অফিসার বলে ডাকে—তখন ডাগরদিগ ছুটিটা একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে মাইরী!

প্রতিদিন বিনত নেত্রে পরমা কলেজ যায়। ঠিক সময়ে বাড়ি ফেরে। কোনদিন কলেজ ফাঁকি দিয়ে সিনেমা দেখার চিন্তা সে করতে পারে না। আকর্ষণীয় যুবক দেখলে মাথা নিচু করে। করে যেন সেই প্রথম দিনে মা তাকে সযত্নে গোপনে বলে দিয়েছিল—এবার থেকে সাবধান হবার পালা এল পরমা। নিজেকে সামলে নিয়ে চলা এখন তোর কর্তব্য।

আঠার বছরের ঋতুচক্রে পরমা হাসি ভুলে বিষণ্ণ বোধ করে। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে সে বেড়াতে যায় না। ফের তো সেই অসভ্যতা! উঃ মেয়েরাও এত বেহায়া হতে পারে। পরমা গ্রীলদেরা বারান্দার [illegible] সাগ্রহে লক্ষ্য করে মানুষের চলাফেরার বিচিত্র গতি।

দিনের পর দিন একটি শীর্ণ ফ্যাকাশে তরুণীর এরকম নিস্পৃহভাবে পথ চেয়ে তাকানোতে যেন কোনো ক্লান্তি নেই। অবসরের প্রশ্ন ভিন্ন।

সন্ধ্যে হতে মা ডাকে। আকাশের আবছায়া পটে উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে সেদিনের মতো ঘরে ঢোকে। তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ সাজিয়ে নিজের বিছানায় এসে বসে। পড়াশুনো শুরু করে। সামনের দেওয়ালে টাঙানো রামকৃষ্ণদেবের ছবিঅলা একটি ক্যালেন্ডারে মাঝে মাঝে তারিখ লক্ষ্য করে।

অতসীর কাছে কাল সে শুনেছিল—রাতের বেলায় পড়তে বসে অতসী নাকি সাবধানে বইয়ের ফাঁকে অশোকের ছবি দেখে। পরমার আঠার বছরের নিঝুম শরীর অন্য রকম ব্যথায় বইয়ের ছাপা অক্ষরে মিলিয়ে যেতে চায়। অক্ষরগুলো মিলমিশে একটি নতুন কোনো ছবি হয়ে যেন চিক্ চিক্ করতে পারে না।

একদিন হঠাৎ কেমন করে যেন বাতাসের নতুন পরিবেশে শরতের আবির্ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোটা শহরে মুঠো মুঠো আনন্দের ফুল ছড়িয়ে পড়ল। পুজোর ছুটির বেশী দেরী নেই। কলেজে মেয়েদের মধ্যে অন্য রকম আলোচনার সাড়া। কমনরুমের টেবিলের ওপরে ছেলেদের মতো পায়ের ওপরে পা তুলে ক্লাশের ডেপো মেয়ে সুজাতা সিগারেট ধরাল। সাংঘাতিকভাবে টান দিয়ে সিগারেট-ধোঁয়া অশ্রুধারাভাবে বাতাসে মিশিয়ে সুজাতা বলল—এবার সাউথ ইণ্ডিয়া যাব ভাবছি।

—সাউথ ইণ্ডিয়া মানে মাইশোর—না মাদ্রাজ আই মিন টামিলনাড়ু—অস্পষ্ট অদরে স্মার্ট মোজাইক করা গলায় বর্ষীয়সী জিজ্ঞেস করল।

—আই মমতা তোর দেবাদুনঅলার এনগেজমেন্ট নিউজ কী? খুব তো ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস!

এসবই সব গল্প। নতুন কত জিনিসের সুগন্ধ আলোচনার শব্দে ভেসে আসে। পরমা এক কোণে মাথা নিচু করে বসে থাকে। সে কোথাও যাবে না। আঃ—মহীশূরে চন্দন বৃক্ষ কি খুবই সুলভ?

সে সময় তারা এল। কৈশোরের চাবিকাঠি সদ্য হারিয়ে ফেলার অপরাধবোধ কারুর চোখে-মুখে প্রখর। আশ্চর্য তারুণ্যের দীপ্তিতে তারা ভাস্বর।

গোটা শহর নতুন কিছু আলোচনার সুযোগ পেল। পুরো হল শহরের উৎসব। ছেলে দুটি নাকি কোনো বড়ো শহর থেকে এসেছে। সবচেয়ে আধুনিক ফ্যাশানে ওরা উজ্জ্বল।

দুরন্ত বন্যার বাঁধ যেন ভেঙে গেল। বিশেষ করে অনুপযোগী মেয়েদের মধ্যে শুরু হল বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব। করে নাকি শহরের প্রমোদ উদ্যানে ওরা সুমিত্রার পেছনে পেছনে ঘুরেছিল। অনেক রকম মজাদার কথা ওরা বলতে জানে। একদিন তনিমার দিকে তাকিয়ে নাকি তার নতুন শাড়ির প্রশংসা দুজনে করেছিল। এবং সেই সঙ্গে শহরের উঠতি নায়কদের ঈর্ষিত চক্ষু ওদের অনুসরণ করে চলল।

ছেলেদুটিকে পরমা খুব ভালো করে চেনে। প্রতিদিন বিকেলে তার গ্রিলঘেরা বারান্দার সামনে দিয়ে দুজনে যায়। উচ্চস্বরে হাসে। অনেক রকম গল্প করে। আর পরমার পক্ষে যেটা পুলক—ছেলেদুটি রোজ সামনের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় গ্রীলের লোহা-ঘেরা আড়ালে দাঁড়ানো নীরব পরমার চোখে চোখ রাখে। তিনজনের মধ্যে এ যেন অন্য ধরনের সম্পর্ক। এ তাদের গোপন খেলা। কেউ কারোর কাছে স্পষ্ট নয়, অথচ কত ঘনিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি।

ওদের নিয়ে সকলে অনেক রসালো আলোচনা করে। যদিও তার জন্য পরমা মোটেই দুঃখিত নয়। এরকমই যেন সে আশা করেছিল। ওদের রক্তমাংসের ছোঁয়া লাগা আবেগ শুধু মাথা বৃদ্ধি করে না, স্বয়ং বড়ো পার্থিব।

ওরা প্রতিদিন তাকে দেখে। চোখে রাখে চোখ। সে নিঃশব্দে ওই দৃষ্টির আমন্ত্রণ গ্রহণ করে। ওরা যেন অন্য রকম। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে ওদের দৃষ্টি-সংকেত তার কাছে অপরিচিত নয়।

সন্ধ্যের সময় ওরা আবার ফিরে আসে এ-পথ দিয়ে। ওদের হাসি ওদের কথা মিলেমিশে, নিত্যনতুন বিচিত্র সুরতরঙ্গের পশরা হয়ে পরমার গোপন সিন্দুকে জমা হয়।

ছুটির আগের দিনের কলেজ। কিছুদূর পথ চলতেই সুজাতার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মফস্বলের সামনে এসে হঠাৎ সে আবিষ্কার করে ফেলল সেই ছেলেদুটিকে। পরমাদের পেছনে ওরা আসছে। কেমন যেন মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ল সে। তার মনে হল ছেলেদুটি বুঝি তাদের শরীরের সৌন্দর্য দেখবার জন্য পেছন পেছন আসছে। এক অন্য রকম আবেশে সুজাতাকে সে বলে ফেলল—দেখেছিস, সেই ছেলেদুটো আমাদের পেছনে আসছে!

—কোন ছেলেদুটো?—ওঃ ওরা। হেসে ফেলল সুজাতা।

হাসল পরমাও। এ যেন অন্য হাসি। পাতার ওপরে প্রথম আলোর স্বর্ণকাতর নৃত্য। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। এতদিনের চাপা থাকা পাথরের অবরোধ দূর হয়ে স্রোতস্বিনী যেন মুক্তি পেল। আচ্ছা, ছেলেদুটোর শিল্পী হতে দোষ কী? শিল্পীরা নাকি মেয়েদের সবকিছুতে সৃজনের অনুভূতি লক্ষ্য করে!

সময়ের বিদেহী চক্রান্তে আস্তে আস্তে পুজোর দিনগুলি চলে এল।

অষ্টমী নবমী দশমী তিন দিন বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে সুজাতাদের সঙ্গে শহরের সমস্ত মণ্ডপে মণ্ডপে সে প্রতিমাদর্শন করল। ওদের পেছনে পেছনে সেই দুটি ছেলে।

সুজাতাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পরমা হাসে। অনাস্বাদিত আনন্দদ্যুত সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাস। সুজাতারা নিজেদের আরো সুন্দর করে সাজাতে চুলের বেণী নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আঁচলটা আর একটু ঠিক করে নেয়। অকুণ্ঠিত কৌতুকে পরমার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। হায় ওরা জানে না—তার সঙ্গে ছেলেদুটির কী সম্পর্ক। উজ্জ্বল রঙিন আলোর মণ্ডপে যখন তার সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হয়, বুকের ভেতরের সমুদ্রে এক সুন্দর ঝড় কখনো দ্রুত কখনো বিলম্বিত লয়ে ছন্দ সৃষ্টি করে। আচ্ছা কোন্ ছেলেটা তার দিকে বেশী তাকায়? লাল জামা, না নীল জামা? না-না দুজনেই তার দিকে সমানভাবে তাকায়। কারোর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারবে না পরমা।

লাল জামা হাসল—তুমি যেন একেবারে অন্যরকম।

মৃদু হাসির প্রলেপ মুখে ফুটিয়ে নীল জামা বলল—সত্যি, এ-শহরে তুমি এত নিঃসঙ্গ কেন?

পরমার বিনত চক্ষু বিস্ফারিত হল—তোমরা কেন এখানে এসেছ?

—আমরা...মানে আমরা এসেছি কিছু জানতে কিছু স্পর্শ করতে নতুন কিছু জিনিস দেখবার তাগিদে। যেমন তোমাকে জানলাম, তোমাকে স্পর্শ করলাম। এই স্পর্শের কিছু সুগন্ধি শরীরে বয়ে নিয়ে চলে যাব আমাদের নিজস্ব প্রদেশে।

—আমাকে তোমরা স্পর্শ করেছ? সেই পুরোনো আতঙ্ক পরমার চারপাশ ঘিরে ধরল।

—কতবার! দেখ—তোমার ক্ষীণ সুন্দর তনু কেমন রক্তিম আমাদের স্পর্শে। সত্যি তুমি কেমন মিষ্টি মেয়ে! ঠিক আছে—আজ থেকে তোমায় আমরা 'মিষ্টি মেয়ে' বলে ডাকব।

—না-না, আমি তেমন মিষ্টি নয়। আমি...আমি...নিজের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে পরমার গলায় শব্দ আটকে গেল।

আচ্ছা আচ্ছা, তবে 'ভালো মেয়ে' ছাড়া আমরা তোমায় কিছু ভাবব না। তুমি বড়ো ভালো—আমরা তোমায়...

আসলে হয়তো এরকম সপ্রতিভ আলাপ-পরিচয় পরমার জন্য নয়। সে শুধু স্বপ্ন দেখে। মনে মনে পাত্রপাত্রী সাজায়। সংলাপ দেয়। তারপর কোন মুহূর্তে যেন সবকিছু রূপালী বুদবুদ হয়ে আকাশে মিশে যায়।

এর মধ্যে পরমার বাবা তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে শুরু করেছেন। চার-চারটি মেয়ে—বড়ো মেয়েকে এখন থেকে শ্বশুর-বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা না করলে পরে অসুবিধা দেখা দেবে। একদিন বাবার পরিচিত এক সহকর্মীর বন্ধুর ছেলে পরমাকে দেখে গেছল। রোগা মতো ময়লা রঙের ছেলেটি কোন স্কুলের মাস্টার। দুজন বন্ধু নিয়ে ভবী বধূ পর্যবেক্ষণে এসেছিল। তবে পরমার ঠাণ্ডা ব্যবহার নাকি ওদের হতাশ করেছিল। বাড়ি ফিরে তারা জানিয়ে দিয়েছিল—ছেলের বিয়ে অন্য জায়গায় দেবে।

ছুটির শেষ দিকে সেদিন প্রমোদ উদ্যানে সুজাতাদের সঙ্গে সে গেল। সোনালি বিকেলের অদ্ভুত রূপ রস বৈচিত্র্য কৃত্রিম উদ্যানের ছায়াঘেরা আঙিনায় ঘনিষ্ঠ হল। সারা বিকেল পরমা ছোটাছুটি করল। হাসল গল্প করল শব্দের উৎসব বসাল। সবুজ ঘাসের ওপর জোড়া শালিখ দেখে মনে মনে একবার নমস্কার করে ফেলল পরমা। তারপর হঠাৎ বিস্মিত চক্ষুর দৃষ্টিকোণে সেই ছেলেদুটিকে সে দেখতে পেল। প্রতিদিনের মতো ওরা তাকালো। পরমার প্রতিষিক্ত প্রতিবিম্ব হল বিভ্রান্ত। ওদের চোখ অমন কেন বিষণ্ণ?

পরের দিন ছেলেদুটি এল না।

পরের দিনও না।

গ্রীলঘেরা বারান্দায় প্রতীক্ষার পঞ্চপ্রদীপ সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরমা। সুখ-দুঃখের সহবাস বুকের ভেতরে হলস্থূল জাগায়। শব্দের নিশ্চেতন কম্পন ওষ্ঠের আর্দ্রতায় আশ্চর্য উদাসীন। ঝিকিমিকি আলোর প্রভাসে স্মৃতির অধিবাস। বিষণ্ণ চিবুকে আঙুল রেখে পরমা কল্পনা করে এক্ষুনিই হয়তো তারা আসবে। এবং তাদের অমল উল্লাস রাস্তার দুপাশের বাড়িঘরের অন্দর অন্দরে পৌঁছাবে। পরমা ভাবতে চেষ্টা করে—ছেলেদুটি কি তার সেই ক্ষণিক উচ্ছল চলাফেরায় দুঃখিত হয়েছে? প্রমোদ উদ্যানের সেই উজ্জ্বল বিকেলে তার কালো চুলের খোঁপায় নবদল বেলফুলের কুঁড়ি কি তাদের খুব হতাশ করেছে? অথচ ওদের সে একান্তভাবে এ-পথ ধরে আসা উচিত। অপরাহ্নের মিষ্টি হলুদ আলো আলেপাশের বাড়িগুলির শরীর স্পর্শ করে গোধূলির আবছায়ায় মিলিয়ে যায়। পরমা বাড়ির ভেতরে আসে।

ছুটি ফুরিয়ে এল। শিগগিরই কলেজ খুলবে। পরমা বন্ধুদের মুখে নিশ্চয়ই মাইসোর ম্যাডরাস কিংবা কাশ্মীরের গল্প শুনবে। অথচ এই নিশ্চিন্ত অবকাশের লম্বিত ছায়ায় তিনটি ছেলেমেয়ের এমন সুন্দর হারিয়ে যাওয়ার মুখর খেলার প্রমাণটুকু তার মুঠোর মধ্যে নেই।

এ প্রেম নয়। নয় কোনো রোমাঞ্চিত অবেশমুগ্ধ কিশোরীর রঙিন বেদনা। আঠার বছরের পরমার বুকের ভেতরে এ শুধু অনেক দিনের অক্লান্ত প্রতীক্ষার নিঃসঙ্গ তৃপ্তি।

অঞ্জনা

জীবনের পুতুল

ভারতের বিভিন্ন জলহাওয়ায়, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ-এর রূপ কত বিচিত্র। কত বিচিত্র তাদের ভাষা আর কত বৈশিষ্ট্য তাদের আচার অনুষ্ঠানে। ইতিহাস পড়ে শুধু তাদের কল্পনা করা যায়—সে কল্পনা কিছু বা বাস্তবের সঙ্গে মেলে, কিছু বা থাকে অস্পষ্ট। কৌতূহলী মানুষের শুধু ইতিহাস পড়ে আকাঙ্খা মেটে না। সেই দূরান্তের পাহাড়, শীত আর গরমে ঘেরা মানুষকে চাক্ষুস দেখার সাধ্য সকলের হয় না। তবুও সে সবের কিছু সজীব রূপ দেখতে পাই পুতুলে। পুতুল যেন প্রায় স্বয়ম্ভু, যুগযুগান্তরের স্থানীয় অঞ্চলের সঙ্গে তার আছে নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাসের চলন্ত স্বাক্ষর বহন করে চলেছে পুতুল। শ্রীমতী অসীমা মুখার্জীর তৈরী পুতুল তেমনি অনেক কাল আগের আর বর্তমানের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোকেদের প্রতিচ্ছবি সাধারণ মানুষের আকাঙ্খিত দৃষ্টি আর মনের সামনে এনে হাজির করে দিচ্ছে। সেই মুঘলযুগে নর্তকীরা নাচের ছন্দে ছন্দে কেমন করে সম্রাটের মনোরঞ্জন করতো তাও তিনি পুতুল নাচে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু পুতুল কেন পরিবেশ রচনায়ও তাঁর দক্ষতা রয়েছে যথেষ্ট। মুঘল খিলানের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন তদানীন্তন কালের স্থাপত্যের বিরাটত্বকে।

সম্প্রতি একাডেমী অব ফাইন আর্টসে শ্রীমতী মুখার্জী এক সুন্দর পুতুল প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীমতী মুখার্জী পুতুলের মধ্য দিয়েই ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নাচ, বিভিন্ন উৎসব, দৈনন্দিন কাজ, বিশ্রাম সব কিছুকেই বর্ণনা করেছেন। তিনি পুতুল প্রদর্শনীকে দুটি ভাগ করে অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন নাচ ও অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখিয়েছেন। কোথাও পাহাড় বা সমতলের নারীপুরুষের সম্মিলিত লোকনৃত্য—গায়ে বিচিত্র পোষাক, মাথায় কড়ি, পুঁতি, পালক, শৃঙ্গের অলংকার অথচ এক অনাবিল প্রশান্তিতে তাদের মুখে গ্রাম্য সরলতা ফুটে উঠেছে, আবার কোথাও বা ক্লাসিক্যাল নৃত্যের কঠিন ভঙ্গিকে অনায়াসে প্রকাশ করেছেন। 'ভারত নাট্যম'এর প্রাণবন্তরূপ দেখে দর্শকমাত্রই অভিভূত হয়েছেন। পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্যের ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুখোশ ও যথাযথ পোষাকের উপস্থাপনায়।

শ্রীমতী মুখার্জীর পুতুল নাচের জগতের সমপর্যায়ভুক্ত অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য। ঐক্য রয়েছে স্থান-কাল ভেদে মায়েদের মধ্যে। তাই তাদের দেশ পৃথক হলেও চলার গতি আর সন্তান স্নেহে রয়েছে অপূর্ব সাদৃশ্য। মিল রয়েছে আসামী, মিশনারী, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ আর বঙ্গজননীর মধ্যে। ঢাকীর বাস্তব রূপায়ণ প্রকাশিত হয়েছে পায়ের ছন্দে ছন্দে। রাজস্থানী, মহারাষ্ট্রের জেলেনী ও হরিয়ানার গোয়ালিনীর নিখুঁত পোষাক-আসাক বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গোয়ালিনীর বিশ্রামের সহজ ভঙ্গি এলোমেলো দুধের-কলসী, ঘাগড়ার অসতর্ক ছড়িয়ে থাকা সব মিলিয়ে এমন মনোরম পরিবেশ রচনা হয়েছে যা দর্শকদের দীর্ঘদিন মনে থাকবে।

শ্রীমতী মুখার্জী বাস্তবের এত সুন্দর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন যা দেখলে তাঁর অধ্যবসায়, অনুসন্ধিৎসা ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ দক্ষতার কথাই মনে হয়। তিনি বাস্তবকে ভালবাসেন। তাই বোধহয় কোন পুতুল গড়তেই তাঁর টুকিটাকি জিনিসও বাদ পড়ে নি। পুতুলগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় চিন্তাধারায় গড়ে উঠেছে এবং সমৃদ্ধ হয়েছে শ্রীমতী মুখার্জীর শিল্পরসে।

—অঞ্জলি চৌধুরী

সাতদিনের শুভাশুভ

(২৬ আশ্বিন হইতে ২ কার্তিক)

গ্রহসন্নিবেশ : রবি তুলায়, শুক্র ও বুধ বৃশ্চিকে, শনিও কেতু মিথুনে, রাহু ধনুতে, বৃহস্পতি মকরে এবং মেষে মঙ্গল।

মেষ : রবি, শুক্র ও শনির শুভ প্রভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে সম্পদ-সম্পত্তি। ধন লাভ এবং পারিবারিক প্রীতির প্রসারের সম্ভাবনা আছে। কাজকর্ম মোটের উপর ভাল। আয় ও ব্যয়ে সামঞ্জস্য থাকবে। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮, ২০, ২২ অক্টোবর।

বৃষ : বৃহস্পতি, রবি ও বুধের শুভ প্রভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য ও সুখ্যাতি লাভের যোগ আছে। নতুন বন্ধু লাভের যোগ আছে। কাজকর্ম শুভ। শরীর ভাল। আর্থিক ক্ষেত্র আশানুরূপ। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮, ২১ অকটোবর।

মিথুন : বিবিধ বাধা, অস্বস্তি ও শত্রুতার মধ্য দিয়ে সময়টা কাটবে। আর্থিক ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তা অবশ্যম্ভাবী। ব্যবসায় চলনসই। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির কথা চলবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা ভাল। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮, ২০ অকটোবর।

কর্কট : কাজকর্মে সাফল্য আসবে। পারিবারিক ক্ষেত্র শুভ। শরীরটা অবশ্য বিশেষ সুবিধার নয়। আয় বৃদ্ধি পাবে। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮, ২৩ অকটোবর।

সিংহ : শরীর ও মন মাঝে মাঝে খারাপ হলেও আপনি বিভিন্ন ব্যাপারে সাফল্যলাভ করবেন। কাজকর্ম বা চাকরী ক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। মেয়েদের মনের কোন আশা পূর্ণ হবে। শুভ তারিখ : ১৬, ২২ অকটোবর।

কন্যা : শুক্র, বুধ ও বৃহস্পতির শুভ প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় আপনার পক্ষে আশানুরূপ শুভ ফল পাওয়া কঠিন। তাই শত্রুরা আপনাকে বিচলিত করবে, আপনিও হতাশাগ্রস্ত হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাফল্য আপনার অনুকূলে আসবে। মেয়েদের পক্ষে সময়টা সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ১৭, ১৯, ২০ অকটোবর।

তুলা : ব্যয়াধিক্যজনিত দুশ্চিন্তা, স্নায়বিক ও মানসিক অস্বস্তির সম্ভাবনা প্রবল। এতো অসুবিধার মধ্যেও বন্ধুজনের দ্বারা উপকৃত হবেন। মেয়েদের পক্ষে মানসিক অস্বস্তির সম্ভাবনা আছে। শুভ তারিখ : ১৭, ১৮, ২১ অকটোবর।

বৃশ্চিক : শরীর ভাল, মানসিক অস্বস্তি কমবে। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। সম্পদ-সম্পত্তি সংগ্রহের সুযোগ আসতে পারে। কাজকর্ম ভালই। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ : ১৩, ২০ অকটোবর।

ধনু : বৃহস্পতির শুভ প্রভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ করবেন। দূরদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শরীর চলনসই। আয় মন্দ নয়। মেয়েদের পক্ষে অনুকূল সময়। শুভ তারিখ : ১৬, ২২ অকটোবর।

মকর : শরীর মন্দ নয়। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা ক্রমশ কমবে। আর্থিক ক্ষেত্র শুভ। কিন্তু ব্যয়াধিক্যের চাপ প্রবল। ব্যবসায় শুভ। কাজকর্ম অনুকূল। মেয়েদের জীবনে সুখকর ঘটনা ঘটতে পারে। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮ অকটোবর।

কুম্ভ : শরীর ভাল নয়। পারিবারিক অস্বস্তি থাকবে। আর্থিক ব্যাপারে দুশ্চিন্তার ভাব থাকবে। কাজকর্মে অবশ্য কিছু উন্নতি ও আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। মেয়েদের আচরণে সাবধানতা বাঞ্ছনীয়। শুভ তারিখ : ১৬, ১৮ অকটোবর।

মীন : শরীর সুবিধার নয়। ব্যয়াধিক্যের সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় একপ্রকার। কাজকর্মে শুভ ফল পাবেন। সম্পদ-সম্পত্তি সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। মেয়েদের পক্ষে সাংসারিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ১৮, ২০ অকটোবর।

—শুদ্ধাচার্য

প্রেমিক-প্রেমিকাদের বৈঠকে ৪.
কলকাতা দেখেছি
লেখক দীপক দে-র নতুন উপন্যাস।
ডি এম, লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণি | লিপিকা ৩৩।১ কলেজ রো

পাবলিক থিয়েটারে নটী

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

আধুনিককালে অভিনেত্রী বোঝাতে নটী শব্দটির প্রচলন নেই। শব্দটির এক আভিধানিক অর্থ হল নর্তকী বা অভিনেত্রী। শব্দটির আরেক অর্থ বারাঙ্গনা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে নটীশব্দ নাটকসম্বন্ধীয় অর্থে ব্যবহৃত হত। সংস্কৃত নাটকে নান্দীর পর সূত্রধার ও নটীর আবির্ভাব ঘটে এবং নটী অভিনেয় নাটকের নাম ঘোষণা করেন। উনিশ শতকের প্রথম দিকের বাংলা নাটকেও এই ধারা বর্তমান ছিল। রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে দেখি সূত্রধার নটীকে আহ্বান করছেন এই বলে—"প্রিয়ে যদি তোমার কেশবিন্যাস হইয়া থাকে, ত্বরায় আইস।"

গত শতকের রঙ্গালয়ে স্ত্রীভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই বারাঙ্গনা ছিলেন। তখন থেকেই বোধকরি বাংলাভাষায় নটী ও বারাঙ্গনা শব্দটি একার্থক হয়ে যায়। সংস্কৃত নাটকের 'নটী' এক সম্মানিত নাট্যব্যক্তিত্ব। তাকে 'আর্যা' বলে সম্বোধন করা হত। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের সূত্রধার বলছেন, 'আর্যে, তুমি চমৎকার গান করেছ।' কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের 'নটী' অভিধা খুব সম্মানিত অর্থ বহন করে না। 'নট' শব্দ সম্মানবহ ছিল, কিন্তু তার স্ত্রীলিঙ্গরূপ নটী তেমন ছিল না। ব্যবহারিক জীবনে অবশ্য নট-নটী কারোরই সামাজিক সম্মান ছিল না। গিরিশচন্দ্রের প্রথমজীবন এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে। সাহিত্যে নট-নটী শব্দ দুটির খুবই প্রচলন ছিল; আজকাল অবশ্য অভিনেত্রী অর্থে নটী শব্দের প্রয়োগ হয় না। অমৃতলাল বসু তাঁর 'নটনাথ' কবিতায় লিখেছেন, "নটনটী বেশে কেবলি প্রবেশে/ রঙ্গমঞ্চ ভরে যায়।"

নর্তক ও নর্তকীর পেশা যাঁরা গ্রহণ করতেন প্রাচীনকালেও সাধারণ্যে তাদের শ্রদ্ধাই ছিল। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ থেকে জানতে পারি, বিচারালয়ে নটের সাক্ষ্যের কোন মূল্য ছিল না, ব্রাহ্মণেরা নটের অন্ন গ্রহণ করতেন না, তাদের নীতিবোধও নাকি উন্নত ছিল না। কিন্তু প্রাচীনকালে নৃত্যও নাটকশাস্ত্রের অঙ্গীভূত ছিল বলে ধর্মীয় সম্মান তাঁরা লাভ করেছিলেন নিশ্চয়ই। মন্দিরে যে দেবদাসী নর্তকীরূপে জীবনযাপন করতেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যেমন হোক না কেন, তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধার মনোভাব থাকা সম্ভব ছিল না। সমাজে তাদের উচ্চাসন ছিল না, কিন্তু শিল্পী বলে তাদের মূল্য ছিল। রাজা হর্ষবর্ধনের সখী ছিলেন একজন নটী। রাজগৃহে বুদ্ধের সম্মুখে নাটকাভিনয় হয়েছিল বলে বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে বর্ণনা আছে। যশস্বিনী নটী কুবলয়ার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে অনেক শিষ্যের পদস্খলন হয় বলে বুদ্ধ তাকে বিরূপা করে নির্বাণের পথে টেনে নেন।

প্রাচীন ভারতে নারীর ভূমিকায় নারীর অভিনয়ের উল্লেখও আছে। নারীর ভূমিকায় পুরুষ বা পুরুষের ভূমিকায় নারীর অভিনয়ের উল্লেখও পাওয়া যায়। ভবভূতির 'মালতীমাধব নাটকে' সূত্রধার কামন্দকীর ভূমিকা আর তাঁর শিষ্যা অবলোকিতার ভূমিকা নিয়েছেন।

কিন্তু সব দেশেই নটনটীদের সামাজিক ঘৃণা ও অবজ্ঞার মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়েছে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। কিন্তু চার্চের নির্দেশে মৃত্যুর পর তাঁর দেহ উপযুক্ত পারলৌকিকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। রোমান ক্যাথলিক জেসুইটদের মধ্যেও অভিনয় প্রথা প্রচলিত ছিল। অথচ তারাও নটদের ঘৃণা করতেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'অভিনেতার যেমন আদর— সেইরূপ অনাদর।.....যে সকল অভিনেতার ভাগ্যে রাজকরে সুসজ্জিত হওয়া ঘটিয়াছিল— তাহাদের নামে অনেকে এখন কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন।"

উনিশ শতকের সাধারণ বাংলা থিয়েটারে প্রথম স্ত্রীলোক দিয়ে অভিনয় করালেন বেঙ্গল থিয়েটারের শরৎচন্দ্র ঘোষ। "ছাতুবাবুদিগের বাড়ীর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্ত্রীঅভিনেত্রী দেখিয়া শরৎবাবু এব্যাপারে সাহসী হয়েছিলেন' (বিশ্বকোষ/ ষোড়শ খন্ড রঙ্গালয়)। তাঁর আগে অবশ্য হেরাসিম লেবেডফ এবং শ্যামবাজারের নবীন বসুর থিয়েটারে স্ত্রীভূমিকায় নটীরা অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু পেশাদারী থিয়েটারে প্রথম অভিনেত্রী নামালেন বেঙ্গল থিয়েটার। তার আগে যাত্রা, ঢপ পাঁচালীতে স্ত্রীলোকের অংশ নিতেন। কিন্তু তারা যেহেতু ধর্মীয় ভাবমূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন তাই তাদের প্রতি খুব একটা ঘৃণা বা বিদ্বেষ ছিল না।

কিন্তু পেশাদারী রঙ্গালয়ে যখন স্ত্রীলোকেরা অংশ নিলেন তখন 'গেল' 'গেল' রব উঠল। কেননা এঁরা সবাই বারাঙ্গনা। এরা নাটকে অংশ গ্রহণ করবার ফলে নটী ও বারাঙ্গনা শব্দটি সমার্থক হয়ে গেল। নটী শব্দটির 'নর্তকী বা অভিনেত্রী' অর্থ লোপ পেয়ে গেল। শব্দটির জাত গেল।

অথচ উপায় কি ছিল? বালকদের দিয়ে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়? তার বিরুদ্ধেও তো তীব্র প্রতিবাদ উঠেছিল! বিদ্যাসাগর তাঁর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ভোলানাথ বসুকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তার অপরাধ সে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকে বিদ্যা সেজেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজে 'বেণীসংহার' নাটকে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে ছাত্রদের মধ্যে "যাহাকে দুর্যোধন করিয়াছিলাম সে ক্লাসের মধ্যেই প্রেয়সী বলিয়া ডাকিতে লাগিল এবং কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে লাগিল।"

এমন অবস্থায় সাধারণ রঙ্গালয়ের সংগঠকদের সম্মুখে দুইটি উপায় ছিল। হয় রঙ্গালয় বন্ধ করে দেওয়া আর না হয় বারাঙ্গনাদের নিয়ে থিয়েটার করা। বাংলা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখবার এবং তাকে যুগোপযোগী করে তোলবার স্বার্থে তারা দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলেন। এজন্যে তাদেরও কলঙ্কভাগী হতে হয়েছে। আর কলঙ্ক হয়েছে থিয়েটারের। কিন্তু যাদের নিয়ে এত কান্ড তাঁরা সেই নটীরা কখনো কখনো লজ্জা, ভয় বা প্রলোভনে থিয়েটার

থেকে সরে যাননি। নিশ্চিত বারবনিতা জীবন ত্যাগ করে আধো-আলোকিত মঞ্চে শ্রদ্ধায় নম্রতায় বিনয়ে মাথা নত করে এসে দাঁড়িয়েছেন বেঙ্গল থিয়েটারে। এইভাবেই একদিন বাংলা রঙ্গালয়ের নটী বৃত্তান্ত শুরু হল।

(২)

অথচ উনিশ শতকের বাঙালীর নৈতিকতার মান যে খুব উঁচু ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। সমসাময়িক সাহিত্য ও ইতিহাসে তার অজস্র প্রমাণ আছে। বারাঙ্গনাদের নাটকে অংশ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁরা হয়ত পুরুষ-প্রধান সমাজের এই ত্রুটি ঢাকতেই সচেষ্ট হয়েছিলেন; তাই বারাঙ্গনাদের সংস্কৃতির পাদপ্রদীপের আলোয় আত্মপ্রকাশে হাহাকার করে উঠেছিলেন। অথচ উনিশ শতকের সমাজ, বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ, বারাঙ্গনা প্রভাবিত সমাজে পরিণত হয়েছিল। তার প্রমাণ সেকালের সাহিত্য, সংবাদপত্র, সামাজিক ইতিহাস। বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীচর্চিন্ডকাসুন্দরী দেবীর' পত্রে সেকালের বাবুদের মেকী নীতিবোধের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন—"আমরা লেখাপড়া শিখি নাই বলিয়া আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের ধর্মের বন্ধন বড় দৃঢ়, কেননা, তোমাদের সে বন্ধনের দড়ি একদিকে শুঁড়ি, আর একদিকে বারস্ত্রী টানিয়া আঁটিয়া দিতেছে।" বিবিধ প্রবন্ধ/ প্রাচীনা ও নবীনা)।

দীনবন্ধুর ভাষা আরও তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। 'সধবার একাদশীর' অটলবিহারী 'তিনশ' টাকায় বেশ্যা কাঞ্চনকে রেখেছে। এই কাঞ্চনের প্রতি নিমচাঁদের করজোড়পূর্বক বন্দনা :

"দণ্ডধার কীটকুণ্ডবাসিনী!
বার বার লক্ষ জার নাশিনি!
নৃত্যগীত হাবভাব শালিনী!
পাপতাপ পুষ্প মাল মালিনি!
ফেটনাখ্য গাড়ি ঘোড়ি হাঁকিনি।
উলসনের ভোগরাগ চাকিনি!
ফ্রান্স দেশ জাত মদ্য লোভিনি!
পেশয়াজ সাজ অঙ্গ শোভিনি!
পাপ দণ্ড বিত্ত মত্ত রঙ্গিনি!
লালমুণ্ড হাড়ভিসার অগ্নিনি!
(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

কোলকাতার বারাঙ্গনা-নির্ভর সমাজের এক বাস্তব চিত্র দেখতে পাই উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত আর একখানি গ্রন্থে। বস্তুতপক্ষে কোলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বকাল পর্যন্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেশ্যালয় ছাড়া রঙ্গ-পিপাসা মেটাবার আর কোনো উপায় ছিল না। সঙ্গীত ও নৃত্যচর্চা যা কিছু হত তা এদেরই মধ্যে এবং এদেরই কেন্দ্র করে। 'দেবগণের মর্তে আগমন' গ্রন্থে দুর্গাচরণ রায় নিখুঁত এক চিত্র এঁকেছেন—

"এই সময় বেশ্যা বাড়ীতে তবলার চাঁটি সহ সঙ্গীত আরম্ভ হইল। কোন বেশ্যা গান ধরিল:—

ঐ আসছে যৌবনী রূপসী।
আড় নয়নে মুচকি হাসি
প্রাণ করে খুশি,
তাতে দাঁতেতে মিশি।।

দেবগণ দেখেন চতুর্দিক হইতে ধনী লম্পটদিগের ফেটিং, জুড়ি আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীস্থিত বাবুদিগকে দেখিয়া দুই একটি লম্পট এমনভাবে লুকাইতেছে যেন কোন রাজা ওমরাহের নাতি; কলিকাতার সকলেই ইহাদের চেনে, গাড়ীস্থিত বাবুরা দেখিলে লজ্জা পাইবে—যেহেতু ইহারা পদব্রজে এসেছে।

ইন্দ্র। বরুণ, ইহাদের লুকাইবার ঢং দেখ! এরা কারা?

বরুণ। ইহারা ৮৲ টাকা বেতনের কেরাণীর দল। ইহারা পোষাক ভাড়া করিয়া এমন বাবু সাজিয়া আসে যে দেখিলে বোধ হয় কোন বড়লোকের সন্তান। ইহাদের বাটীর অবস্থা এমনি যে মা কাটনা না কাটলে হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে। কিন্তু ইহাদের এমনি গুণ, মাতার নিকট হইতে কাটনা কাটার পয়সা নিয়ে, ভাঁড় হাতে করিয়া তেল কিনে প্রত্যাগমনের সময় সম্মুখে যদি কোন বেশ্যাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দূরে ফেলিয়া দেয়; কারণ পাছে ঐ বেশ্যা বলে, 'তুমি তেজচন্দ্র বাহাদুরের নাতি হয়ে তেল কিনতে এসেছ।" শেষে হতভাগ্যেরা বাটি গিয়ে মাতার নিকট ধকুনী খেয়ে মরে।

এই সময় দেবগণ দেখেন চারি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান আসিল এবং গাড়িখানি ধীরে ধীরে চালাইয়া কোন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে দেখিতে লাগিল।" (পৃষ্ঠা ৫৩২।৩৩)

উনিশ শতকের শেষার্ধই শুধু নয়, ফলতঃ গোটা উনিশ শতকের বাঙালীর নীতিবোধই এইভাবে উচ্ছন্নে গিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী এর কারণ রূপে নির্দেশ করেছেন প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষ। অন্য-ভাবে বলতে গেলে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক গ্রামাশ্রয়ী নীতিবোধের অবক্ষয় এবং রূপান্তর, এবং নগরকেন্দ্রিক নীতিবোধের উদ্ভব। গোটা উনিশ শতকই এই অস্থির-তার পটভূমি। তারপর রামমোহন ও বিদ্যা-সাগরের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত রেনেশাঁর উচ্ছ্বসিত প্রবাহ যতদিন সুস্থিত হয় নি ততদিনই এই অবস্থা চলেছে। তারপর এক সময় জাতীয়তাবোধ তীব্র হয়েছে, ১৮০৫ খৃঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার কাল থেকে ১৯০৫ খৃঃ বঙ্গভঙ্গের কাল পর্যন্ত একশো বছরে জাতীয়তাবোধের ধারা পুষ্ট হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত উনিশ শতকী ভাঙন-গড়ন এবং তার ফলস্বরূপ নীতিবোধের অবক্ষয় অবসিত হয়েছে জাতীয়তাবোধের মধ্যে। ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যে বারাঙ্গনা-দের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে। উচ্ছ্বাস এবং ঘৃণা—এ দুটো মনোভাবই লোপ পেয়েছে। তার পরিবর্তে এদের এক মানবিক মূল্যায়ন হয়েছে। নবীনচন্দ্র এবং শরৎ-চন্দ্রের মানবমমতা এর মূলে অনেক কাজ করেছে।

একদিকে যেমন বারাঙ্গনাদের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল, অপরদিকে গৃহিণী-দের প্রতি ঔদাসীন্য। স্ত্রীস্বাধীনতার কথা তো উঠেই না। মেয়েদের গঙ্গাস্নান করতে হলে পাল্কীসহ তাদের ঢুকিয়ে তোলা হত। ঘর থেকে বার হয়ে ফিটনে উঠতে গেলে ঘরের রাস্তা থেকে গাড়ীর দরজা পর্যন্ত দুপাশে ঘেরাটোপ দেওয়া হত, তার মাঝখান দিয়ে গৃহিণীকে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হত। উনিশ শতকের প্রথম দিকের একখানি কাব্য 'দূতীবিলাসে' লেখা হয়েছে—

"তামাসা দেখিতে যদি কোন মেয়ে চায়।
ভাতারের মত নৈলে যেতে নাহি পায়।।
আপন খুশিতে কেহ দেখিবার তরে।
যে যায় তাহাতে স্বামী ঝাঁটা পিটা করে।'
(পৃঃ ৭৩)

ফলে নারী সমাজের নৈতিক অধঃপতনও ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। সমসাময়িক সাহিত্যে তারও প্রমাণ আছে। সমাজচ্যুতা হয়ে গৃহস্থ বধূগণ অনেকে বারাঙ্গনা হয়েছে। তথাপি সমাজে বারাঙ্গনাগণ ঘৃণিতই ছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত উদারপন্থী মনীষীও লিখেছেন, 'অন্যান্য প্রদেশের তো কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্রসন্তানেরা প্রকাশ্যভাবে দূষিতচরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। এখনও কি করিতেছেন? এখনও প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে কলিকাতা শহরের ভদ্রপরিবারের যুবকগণ ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।"

(৩)

লেবেডফের নাট্যশালাতেই বাঙালী অভিনেত্রীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তবে তাদের বিবরণ সংগ্রহ করা আজ আর সম্ভব নয়। লেবেডফ তাঁর ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ (এ গ্রামার অফ্ দি পিউর এ্যান্ড মিকস্ড ইন্ট ইণ্ডিয়ান ডায়ালেক্ট) লিখেছেন যে তিনি তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলোকনাথ দাসকে নিযুক্ত করেছিলেন—'টু প্রিকিউর নেটিভ অ্যাক্টরস্ অফ বোথ্ সেক্সেস।'

বাঙালীর থিয়েটারে নটীদের সর্ব-প্রথম আবির্ভাব ঘটে নবীন বসুর থিয়েটারে। ১৮৩৫ খৃঃ অক্টোবর মাসের ৬ তারিখ নবীন বসুর শ্যামবাজারের বাটীতে বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করেন। স্ত্রীলোক। স্ত্রীচরিত্রে যেসকল অভিনেত্রী অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন রাধামণি বা মণি, জয়দুর্গা ও রাজকুমারী বা রাজু। রাধামণি বিদ্যার ভূমিকায়, জয়দুর্গা রাণী ও মালিনীর ভূমিকায় এবং রাজকুমারী বিদ্যার সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে-ছিলেন। রাধামণির বয়েস ষোল এবং কণ্ঠস্বর মধুর ছিল। জয়দুর্গা ছিলেন

শিঙ্গার

এইসব উৎসবের দিনগুলি আমাদের মধুর ঐতিহ্যেরই অংশ বিশেষ...

শিঙ্গার কুমকুমও তাই...
ভারতীয় সৌন্দর্যের প্রতীক

শিঙ্গার সুন্দর সুন্দর কুমকুম্ তৈরী করে···সোনালী ও রূপোলী থেকে আরম্ভ করে মোট ১৫ রকমের মনোহর রং পাওয়া যায়···যা আপনার সাজ পোষাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে···আর আপনার মন জয় করে। সিঁদুর পাউডার ও পেস্ট—ম্যাট ও গ্লসী ফিনিশের মধ্যে যা পছন্দ বেছে নিন।

প্যারামাউন্ট প্রডাক্টস্, বোম্বাই-৪০০ ০০৪

everest/597/SP-bn

প্রোঢ়া। 'সে সংগীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।' রাধামণির অভিনয় উল্লেখ করে 'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' সংবাদপত্রে লেখা হয়—'সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুলালিত অঙ্গভঙ্গী মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী, তাহার নিজের এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞান লাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মত অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। অন্যান্য স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ও খুব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।"

'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীদের আবির্ভাবের একটি সামাজিক তাৎপর্যের দিকেও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। বালিকার অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দেশবাসীকে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে সংবাদপত্রটি আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাধামণি অশিক্ষিতা ছিলেন। 'এই বালিকাটি শুধু কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া গিয়াছে মাত্র।' পত্রিকাটি লিখেছেন যে, 'সমাজের স্ত্রীলোকদের মানসিক শক্তির এই মহান ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও মস্তিষ্ক আবর্জনাপূর্ণ বলিতে হইবে।'

বাঙ্গালীর এই নাট্যচর্চা, বিশেষ করে স্ত্রীলোকের নাট্যাভিনয় ইংরেজদের সংবাদপত্র ভালো চোখে দেখেনি। 'ইংলিশম্যান এন্ড মিলিটারী ক্রনিকাল' পত্রিকায় লেখা হয়, 'এই সকল অভিনেত্রী কোন নূতনত্ব, উপকার, এমনকি, শালীনতাও নাই।'

(৪)

নবীন বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ে স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করলেও তাতে খুব হইচই হয়নি। বিদ্যাসুন্দর নাটক হলেও আসলে পাঁচালী যাত্রা। তাছাড়া অভিনয় হয়েছিল নবীন বসুর বাড়ীতে, সাধারণ কোনো রঙ্গালয়ে নয়। সমসাময়িক কালের যাত্রা পাঁচালী, নাচ, ঝুমুর, কীর্তন প্রভৃতিতে স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করত। তাই বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ে স্ত্রীলোকেরা

উনিশ শতকে অভিজাত বাঙালীর গৃহে বাঈনাচ

অংশ গ্রহণ করায় বিশেষ সামাজিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়নি। তাছাড়া রঙ্গতামাসা ইত্যাদি মনোরঞ্জক অনুষ্ঠানে বারাঙ্গনাদের অংশ গ্রহণ সে কালের সমাজে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এমনকি সমাজে বারাঙ্গনাদের ভূমিকাকে স্বাভাবিক বলেই সবাই স্বীকার করে নিয়েছিল। পুরুষের অন্তরঙ্গ জীবন বা সামাজিক জীবনে বারাঙ্গনাদের স্বাভাবিক ভূমিকা সম্পর্কে কারো মনে বিশেষ কোনো প্রশ্ন জাগেনি।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নানা প্রশ্ন জাগল। সংস্কৃতির নেতৃত্ব সেদিন সামন্ত ও অন্যান্য উঠতি ধনীদের হাত থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে যেতে শুরু করেছে। তারাই প্রশ্ন তুললেন। বারাঙ্গনাদের সামাজিক ভূমিকা সংবাদপত্র, নাটক, কাব্য উপন্যাসের উপজীব্য হল। এই আলোচনার দুটি ধারা ছিল। একটি ছিল নির্মম, ঐ প্রথার বিরোধী এবং উৎসাদনমুখী আর একটি ছিল উদার, সহানুভূতিশীল ও সংস্কারপন্থী। সামাজিক চিন্তার এই দুই ধারাই সরব হয়ে উঠল উনিশ শতকের শেষভাগে। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশীর' কাঞ্চন, অমৃতলাল বসুর 'তরুবালার' পারুল, মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের বারাঙ্গনাগণের চরিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত নাটক প্রহসনে বারাঙ্গনাদের অবশ্য সামাজিক অধঃপতনের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের প্রহসন 'গাধা ও আমি' (১৮৮৯ খৃঃ) বেশ্যাবিবাহের ঘটনা নিয়ে লিখিত। লালমনি ও তার কন্যা ল্যাভেণ্ডারকে বিয়ে করতে গিয়েছিল সারদা দাস ও বরদা দাস নামে দুই ধনী পুত্র। নানা ঘটনাক্রমে তার পরিণতির কাহিনী প্রহসনটিতে বর্ণিত। আবার হরিহরবাবুর (যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভণ্ড দলপতি ভণ্ড') ফিরিঙ্গি রক্ষিতা লুসি বাঙ্গালী বেশ্যাদের কার্তিকপুজো করতে দেখে নিজেও ঐ পুজো করতে চায়, পুরোহিত দক্ষিণাস্বরূপ ব্রান্ডি লাভ করেন, পুজো শেষ হয় লুসির নৃত্যগীত ও মদ্যপানের মধ্য দিয়ে। ১৮৬৩ খৃঃ প্রকাশিত হয় রাধামাধব হালদারের 'বেশ্যানুরক্তির বিষম বিপদ'। প্রহসনের এই নামকরণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় এই প্রসঙ্গ তখন সমাজে কতটা গুরুত্ব লাভ করেছিল।

বিপরীত ধারায় দেখতে পাই সমাজের এই মানহারা মানবীদের প্রতি একশ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উদার সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করতেন। নানা নাটক-প্রহসনে তার প্রমাণ পাই। এই রকম একটি নাটক লেখেন সুকুমারী দত্ত। ইনিও ছিলেন বারাঙ্গনা শ্রেণী থেকে আগত। ১৮৭৩ বেঙ্গল থিয়েটারে যে কজন অভিনেত্রী অবতীর্ণ হন সুকুমারী তাদের একজন। তাঁর ষ্টেজের নাম গোলাপসুন্দরী। সুকুমারীর নাটকের নাম অপূর্ব সতী (১৮৭৫ খৃঃ)। সুকুমারী নিজে যে সমাজ থেকে এসেছিলেন, সেই সমাজের হাসি-কান্নার কথা এই নাটকের বিষয়বস্তু। বেশ্যার প্রেমের গভীর আন্তরিকতা ও পবিত্রতা প্রমাণই এই নাটকের উদ্দেশ্য।

গিরিশচন্দ্রও বারাঙ্গনাদের উদ্দেশ্য করে মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন। গিরিশ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর আর অমৃতলাল মিত্র এঁরাই বাংলা থিয়েটারের নটীদের সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। শিখিয়ে

থিয়েটারে সখীর দল

পড়িয়ে এদের যোগ্য করে তুলেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কথা স্মরণ করে বিনোদিনী লিখেছেন, 'রঙ্গালয়ে আমি গিরিশবাবু মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলাম। তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা ছাত্রী বলিয়া একসময়ে নাট্যজগতে আমার গৌরব ছিল।' তারা-সুন্দরীকে থিয়েটারে এনেছিলেন অমৃতলাল মিত্র (বেলবাবু)। অমৃতলাল বসুর কাছেও এঁরা শিক্ষা পেয়েছিলেন। অমৃতলাল স্ত্রীভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করতেন। নীলদর্পণে তিনি সৈরিন্ধ্রর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম যুগে তিনি স্ত্রীভূমিকাতেও অভিনয় করতেন। তিনকড়ি তো গিরিশেরই আবিষ্কার।

নটীদের জীবনগুলি শিল্পের মোহিনী-মূর্তিতে গড়ে তুলেছিলেন গিরিশচন্দ্র আর তাঁর পাত্রপাত্রীগণ। কিন্তু এঁরাও এই নটীদের জীবনে পরিপূর্ণতা আর মাধুর্য এনে দিয়েছিলেন। জীবন যদি মধুর না হয়, শিল্প তা হলে মধুর হয় কি করে? যৌবনের যে আবেগের মুখে সমাজ সংসার ভেসে যাচ্ছিল নারী যদি তার দুই তট ধরে না রাখত সে অন্ধ আবেগের স্রোত কোন অন্ধকার নরকে নিয়ে যেত কে জানে! তিনকড়ি বিনোদিনী না থাকলে মত্ত ঐরাবত গিরিশের যৌবনকে কে আর শিল্পশ্রীমণ্ডিত করতে পারত? নটী-জীবনের যবনিকার পশ্চাতে এঁরা ছিলেন গিরিশ [illegible] অর্ধেন্দুর সখী, সহচরী, অনুগামিনী। তাই বাংলা থিয়েটার সেকালে এমন পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

অমৃতলাল একটি কবিতায় যা লিখেছেন তাতে নটনটীদের সখ্যের সম্পর্কটুকু সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনীর বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার।।
প্রভাতে ধরেছি গ্লাস সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
দ্বিযামা ত্রিযামা পুন ঊষা দেখা গেছে।।
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।
আমার স্মরণে গেল 'কাল' কিম্বা 'আজ'।।
উঠি উঠি বধা পড়ে—'আর এক পাত্র'।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র।।

(অমৃতমদিরা।অমৃতলাল বসু)

'বিনি'—বিনোদিনী, গুরু—গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

এজন্যে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের সংগঠকদের কম নিন্দা সহ্য করতে হয়নি। অমৃতলাল বসু ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে 'বিচিত্র বর্ণবোধের অভিনব প্রণালীর নমুনায়' একজন লিখেছেন, 'বাঙ্গালায় অ-কারের দুই রকম উচ্চারণ আছে, সেই জন্যে দুইটি নামই চাই (যথা অমর, অমৃত)। আর তাছাড়া উভয়েই নটরাজ, উভয়েই থিয়েটারের শিরোমণি, কাকে ফেলে কাকে লই?...যাহাতে বালক বালিকাগণ ইহাদিগকে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পারে.....ইহাদিগের হাবভাব, কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ঘনঘন থিয়েটার দেখাইতে হইবে।... ফল কথা, থিয়েটার দেখাইলে শিশুদিগের গীত, বাদ্য, লাস্য, বক্তৃতা এই চারি বিষয়ে সম্মিলিতভাবে [illegible] পরিমাণে পরস্পর কিঞ্চিৎ সৌন্দর্য বোধও হইবে। ...তবে যদি বেশ্যার কথা তোলেন, তাহার উত্তরে বলিব—যতদিন আমাদের দেশে, অন্ততঃ আমাদের সমাজে অদ্যকার মেসেরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নাচ, গান, বক্তৃতা না করেন ততদিন এ অসুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইবে।' (পাগলা ঝোরা। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।কলিকাতা ১৩২৩ সংস্করণ)

সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে বালকদের রুচিহীনতার জন্যে নীতিবাগীশ অনেকে থিয়েটার এবং বারাঙ্গনাদের অভিনয়কে দায়ী করেছেন। এই বারাঙ্গনাদের দ্বারা এনেছিলেন তাঁরা তো সবচেয়ে বেশী অপরাধী। অথচ রুচিহীনতা, গার্হস্থ্যধর্মচ্যুতি, উগ্রতা সে যুগের একাংশের চরিত্রবৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) বাঙ্গালী ছেলেদের কথা লিখেছেন—

'সাবাস সাবাস তোরে বাঙ্গালীর ছেলে।।
ইষ্ট ভক্তি মিষ্টিরিতে, নবেলে বিহ্বল,
হোটেলেতে খেতে পেলে সপ্তস্বর্গ ফল,
মেয়েছেলের বিয়ে পর্বে গলা ভাঙ্গেন আগে
থিয়েটারে সাজের ঘরে ঘোরেন অনুরাগে.....।"

(পেঁচু ঠাকুর। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলি।তৃ-স।১৩১৬ বঙ্গাব্দ)

মডেলভগিনীর প্রণেতা যোগেন্দ্রনাথ বসুও কট্টর রক্ষণশীল ছিলেন। নৈতিক অধঃপতনের জন্যে থিয়েটারের দোষ দেননি বরং দায়ী করেছেন সামাজিক শিক্ষাকে। 'বাঙ্গালী চরিতে' তিনি লিখেছেন, 'তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, থিয়েটার কুরুচি, বাঈ-নাচ কুরুচি। রঙ্গালয়ে সীতা দেখিলে যাঁহার মনের ভাব বিকৃত হয়, বাইজীর হস্তদোলন দেখিলে যাঁহার হৃদয় ভয়ে থর থর কাঁপে, তাহাতে মনুষ্যত্ব কম—পশুত্বের প্রাধান্যই বেশী।' (বাঙ্গালী চরিত।'কুরুচি')

হয়তো থিয়েটারে নটী নাচবার জন্যে বাঙ্গালীর সামাজিকতায় কিছু চাঞ্চল্য এনে থাকবে। কিন্তু তার জন্য গিরিশ অর্ধেন্দু অমর দত্ত বিনোদিনী তিনকড়ির দায়িত্ব কতটুকু? পক্ষান্তরে, তাঁরাই বাঙ্গালীর মানসলোক চৈতন্যপ্রেমের, স্বাদেশিকতার, নাগরিকতার ধারা এনেছিলেন। উনিশ শতকের বাঙ্গালীর বিশীর্ণ প্রাণধারায় উচ্ছলিত আবেগ ও উত্তাপ সঞ্চার করেছিলেন। এই বারাঙ্গনাগণ ছিলেন সেই কর্মময় ধর্ম-সাধনের সমিধ। অমৃতলাল একটি কবিতায় এই ভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

'নাট্যশালা হল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার।
বাজে শিঙ্গা বাজে খোল রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নর্তাশর আঁখিজলে ভেসে যায়।
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হলেন ধন্যা
গণিকা গুণীর গণ্যা কেঁদে লুটে
কৃষ্ণ-পায়।।'

(৫)

বেঙ্গল থিয়েটার সর্বপ্রথম নটীদের আনল সাধারণ রঙ্গালয়ে। বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গালয়ের সামনে থিয়েটারের কাছে খোলার ঘর তৈরী হল। এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরগুলো কি কাজে লাগবে?' ভদ্রলোককে বলা হল যে থিয়েটারের কাজেই লাগবে। ভদ্রলোক বললেন, 'তাই বলুন, আমি ভেবেছিলাম বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেত্রীদের আতুর ঘর।'—আতুর ঘরই বটে। বেঙ্গল থিয়েটারের বাড়ীতেই জন্ম নিল বাংলাদেশের সার্থক পেশাদারী থিয়েটার।

এই সামাজিক পটভূমিকায় সাধারণ রঙ্গালয়ে নটীদের সর্বপ্রথম নিয়ে এলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ তাঁর বেঙ্গল থিয়েটারে। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এই ঘটনা অতীব

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অমৃতলাল বসু

গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে, প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে (ন্যাশনাল থিয়েটার, ১৮৭২ খৃঃ) স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম রজনীতে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে সরলা, ক্ষেত্রমণি ও সৈরন্ধ্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেল বাবু) এবং অমৃতলাল বসু। স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় সকলেরই মোটামুটি ভালো হয়েছিল। কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেতারা যতই পারদর্শিতা দেখান, রমণীসুলভ গুণাবলীর অভাব থাকবেই। এই ত্রুটির নির্মম সমালোচনা করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ন্যাশনাল থিয়েটারে আত্মপ্রকাশের কালে মনান্তর ও মতান্তরের জন্যে গিরিশ দল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। প্রথম অভিনয়ের পর 'এ ফাদার' এই নামের আড়ালে গিরিশচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লিখিত এক পত্রে সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'হার উইপিং ওয়াজ আননেচারাল'। ১৮৭২ খৃঃ ১৯শে ডিসেম্বর গিরিশের প্রথম পত্রখানি প্রকাশিত হয়। ঐ একই পত্রিকায় ২৭শে ডিসেম্বর এ স্পেকটেটর নামে গিরিশ আরও নির্মম ভাষায় স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয়কারীদের সমালোচনা করলেন। তিনি লিখলেন,

> 'The only actress who had something feminine besides her 'saree' was Sorolata, but unfortunately our lady was dumb. Svrendri, it seemed, belonged to some extinct race of mortals whose weeping tone some antiquary might recognize, and it was a curious sight to see her drawing with the upper lip curved and the head beating time'.

এই সকল সমালোচনা এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনবোধ থেকেই বোধ করি সাধারণ রঙ্গালয়ে নটীদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এর পেছনে আর একজন আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন মনীষীর অনুপ্রেরণাও কাজ করেছিল। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদন ছিলেন, কাব্যে যাকে বলে, অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ। তিনি বুঝেছিলেন স্ত্রীলোকের আবির্ভাব ছাড়া রঙ্গালয় জীবননির্ভর হবে না। বিলাতী রঙ্গালয়ের আদর্শও তাঁর মনে ছিল।

মধুসূদন বুঝেছিলেন যে, অভিনেত্রী ছাড়া নাটকাভিনয় স্ফূর্তি লাভ করতে পারবে না। রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন, 'মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটারে অভিনেত্রী লওয়া ঠিক হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল, আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব, স্ত্রীলোক না হইলে কিছুতেই ভালো হইবে না।.....যে চারিজন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম—জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।' (বিপিনবিহারী গুপ্ত।পুরাতন প্রসঙ্গ)। বেঙ্গলী থিয়েটারের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে এঁরা সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করলেন।

ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হতে বিলম্ব হল না। স্ত্রীলোকের অভিনয়ে আপত্তি ছিল না। তবে বারাঙ্গনাদের পাদপ্রদীপের আলোকে নিয়ে আসায় আপত্তি উঠল। অথচ

তিনকড়ি

ভদ্রসমাজের স্ত্রীলোকদের রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হবার সুযোগ কিন্তু একেবারেই ছিল না। কাজেই এই প্রতিবাদ রক্ষণশীল মানসিকতারই ফলশ্রুতিমাত্র। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অবতরণ শুধুমাত্র রঙ্গালয়ের ইতিহাসেরই এক তাৎপর্যময় ঘটনা নয়, বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাসেরও এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মধ্যযুগীয় সামাজিক বন্ধন থেকে নারীজাতির বন্ধন-মুক্তির সূচনাও এই ঘটনার মধ্য দিয়েই হয়েছিল।

তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি বিরূপ মন্তব্য করলেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখলেন,

> 'We wish this dramatic crops had done without the actresses'.

'ভারত সংস্কারক' লিখলেন, 'বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত একাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের এই অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম।'

মধ্যস্থ, অমৃতবাজার প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গালয় আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের আত্মপ্রকাশ ও সাফল্যের মূলে এদের অনুপ্রেরণা যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। সেই 'মধ্যস্থ' পত্রিকাও লিখেছিলেন, 'এতদিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রসমাজে সমানাধিকার প্রাপ্ত হইল।' অমৃতবাজার নটীদের আবির্ভাবে সন্তুষ্ট হননি। তবে অমৃতবাজার পত্রিকা এতে সমাজ ও নাটকের মঙ্গল হয় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন।

সমসাময়িক কালে কোনো কোনো শ্রেণীর নাটক, নাটকাভিনয় এবং বারাঙ্গনাদের প্রতি প্রসিদ্ধ মনীষীদেরও বিরূপ ধারণা ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনীতে লেখা আছে যে তিনি প্রথমে নাটকাভিনয়ের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন কিন্তু অভিনয়ে বারাঙ্গনাগণ অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলে তিনি আর কোনো দিন থিয়েটার দেখেন নি। 'সধবার একাদশীর' সমালোচনা প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর 'ফ্রাইডে রিভিউ' পত্রিকায় লিখলেন,

> 'If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons.

(বঙ্গভাষার লেখক।হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ।পিতা-পুত্র)। শিবনাথ শাস্ত্রী চুরি করে এনে উপেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিধবা বিবাহে সহায়তা করেছিলেন আর লালবিহারী নবাশিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত মানসিকতার মানুষ। তবু বারাঙ্গনাদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন। আর মনোমোহন বসু উনিশ শতকের এক খ্যাতিমান নাট্যকার। তিনি বলেছেন, 'যেখানে পতিতা নিয়ে অভিনয় সেখানে আমি নেই। কেবল আমি কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তো প্রথমে পাবলিক থিয়েটারের সম্পর্কে এসেছিলেন,

আর এ জন্যে তাঁর উৎসাহও কম ছিলনা। কিন্তু থিয়েটারে পতিতাদের আগমনের কথা শুনেই তিনি পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (যাঁদের দেখেছি।হেমেন্দ্রকুমার রায়)

(৬)

বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগ করা হল। বলা বাহুল্য শিক্ষিত ভদ্রপরিবারের মহিলারা নাট্যাভিনয় দেখবার সুযোগও পেতেন না। রাহু! মহিলারা সে যুগে শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রবর্তিনী ছিলেন। ১৮৭৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে কয়েকজন রাহু! মহিলা বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। এই ঘটনায় 'সাধারণী' নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে লেখা হয় কতকগুলি স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গিকা বেঙ্গল থিয়েটারে নাট্যাভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারে দুইটি বেশ্যা অভিনেত্রী আছেন বলিয়া 'সমাজ' তাঁহাদিগকে পুনরায় তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন।' আরও একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ন্যাশনাল থিয়েটার 'জামাই বারিকের' অভিনয় দেখবার জন্যে মহিলাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু 'ন্যাশনাল পেপার' এ ব্যাপারে তাদের সাবধান করে দেন।

এই যখন সামাজিক অবস্থা তখন ভদ্রঘর থেকে গৃহস্থ কন্যা বা বধূ থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে আসবেন, একথা কল্পনাই করা যায় না। স্বভাবতঃ থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি পড়ল সেই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি, নৃত্যগীতাদির দ্বারা পুরুষের মনোরঞ্জন করাই যাদের জীবিকা। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ এগিয়ে এসেছিলেন বলেই সেদিন বাংলা পাবলিক থিয়েটার বিকাশ লাভ করতে পেরেছিল। বাংলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে এঁদের অবদান ভুলবার নয়। তাঁরা পেশা হিসাবেই অভিনয় জীবন বেছে নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিশ্চিত এবং গতানুগতিক সুস্থির জীবিকার মোহে আবদ্ধ না থেকে তাঁরা যে অনিশ্চিত একটি জীবিকা গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন—এ ঘটনা তাদের শিল্পপ্রীতির পরিচায়ক। বিনোদিনী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি প্রমুখ রঙ্গালয়ের বিখ্যাত তারকাগণ বহু প্রলোভন সত্ত্বেও সামান্য বেতনের অভিনেত্রী-জীবন পরিত্যাগ করেন নি, এ কথাও আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

যাই হোক বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে অন্যান্য থিয়েটারও স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে নটী নিয়োগ করলেন। প্রথমে সে দ্বিধা ছিল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের পর গোলাপীর খ্যাতির ফলে নটী শ্রেণী অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। এদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আজকার অনেকে অপরিচয়ের অন্ধকারেই রয়ে গিয়েছিলেন। নবীন বসুর শ্যামবাজারের নাট্যশালা থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্রের কাল পর্যন্ত যে সকল স্ত্রীলোক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছিলেন, তাঁদের নাম,—যে যে নাটকে তাঁরা অভিনয় করেছিলেন এবং থিয়েটারের নাম নীচে দেওয়া হোল :

রাধামণি	নবীন বসুর নাট্যশালা	বিদ্যাসুন্দর	গঙ্গামণি	স্টার থিয়েটার	দক্ষযজ্ঞ, নিমাই সন্ন্যাস ও অন্যান্য
জয়দুর্গা			নরীসুন্দরী	ঐ	পারস্যপ্রসূন ও অন্যান্য
রাজকুমারী			রাণীমণি	ক্লাসিক থিয়েটার	মনের মতন ও অন্যান্য
জগত্তারিণী	বেঙ্গল থিয়েটার	শর্মিষ্ঠা ও অন্যান্য	সরোজিনী	মিনার্ভা থিয়েটার	তপোবল ও অন্যান্য
গোলাপ (সুকুমারী)			রাণীসুন্দরী	ঐ	বলিদান ও অন্যান্য
এলোকেশী			সুশীলাবালা	মিনার্ভা থিয়েটার	সীতারাম ও অন্যান্য
শ্যামা			কুসুমকুমারী	ঐ	ম্যাকবেথ ও অন্যান্য
কাদম্বিনী	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	সতী কি কলঙ্কিনী?	তিনকড়ি	ঐ	জনা, ম্যাকবেথ ও অন্যান্য
ক্ষেত্রমণি			তারাসুন্দরী	ঐ	চন্দ্রশেখর, দুর্গাদাস, জনা প্রভৃতি
বাদুমণি					
হরিদাসী			প্রমদা	সিটি থিয়েটার	বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধচরিত
রাজকুমারী			মানদা		
বিনোদিনী	ঐ	শত্রুসংহার, হেমলতা, নীলদর্পণ ও অন্যান্য অসংখ্য	হরিমতী (ব্ল্যাকী)	মিনার্ভা থিয়েটার	ফণীর মণি ও অন্যান্য
লক্ষ্মী	ঐ	নীলদর্পণ ও অন্যান্য	প্রকাশমণি	ঐ	শান্তি কি শান্তি?
নারায়ণী			হেমন্তকুমারী		নূরজাহান ও অন্যান্য
চারুশীলা	মিনার্ভা থিয়েটার	নপোবল ও অন্যান্য	সরোজিনী (ন্যাড়া)	মিনার্ভা থিয়েটার	শঙ্করাচার্য ও অন্যান্য
তিনকড়ি (ছোট)			ভুবনেশ্বরী	ক্লাসিক থিয়েটার	অভিশাপ ও অন্যান্য
নীরদাসুন্দরী			বিনোদিনী (হাঁদী)		
শশীমুখী	ঐ	শান্তি কি শান্তি? ও অন্যান্য			
ছিপানবালা	স্টার	প্রভাস যজ্ঞ ও অন্যান্য			
বনবিহারী (ভূলী)	স্টার থিয়েটার	চৈতন্যলীলা ও অন্যান্য			

[অভিনেত্রীগণ অনেকেই থিয়েটার পরিবর্তন করেছেন; বিভিন্ন নাটকে তাঁরা অভিনয় করেছেন; আবার একই নাটক বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। মোটামুটিভাবে একজন অভিনেত্রীর নাটক ও থিয়েটারের সঙ্গে সংযোগের পরিচয় দেওয়াই তালিকার উদ্দেশ্য]

(৭)

বিনোদিনী সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী; অভাজনীদের নাট্যচর্চা সম্পর্কে সেকালীন ইংরেজী সংবাদপত্রের যথেষ্ট উন্নাসিকতা ছিল। কিন্তু এ'রাই বিনোদিনীকে 'ফাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' 'প্রাইমা ডোনা অব দি বেঙ্গলী স্টেজ, 'মুন অব দি স্টার কোম্পানী' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। বিনোদিনীর পূর্বে অনেক নটী অভিনয় করলেও বিনোদিনীই বাংলা থিয়েটারের প্রথম স্টার। তাঁর অপূর্ব অভিনয়ের ফলেই তাঁর নাম গেলমার-যন্ত্র হয় এবং অভিনেত্রীর জীবিকা কিছুটা সম্মানিত হয়।

বিনোদিনীর জীবন নাটকের মতই

চমকপ্রদ। স্বীয় প্রতিভার বলে ধীরে ধীরে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। নানা প্রলোভন নানা ভীতি ও বাধা সত্ত্বেও অভিনয়-জীবনকেই তিনি আঁকড়ে ধরে-ছিলেন। এদিক থেকে তিনি ছিলেন অভিনয়-সাধিকা। 'আমার অভিনেত্রী জীবন' স্মৃতিকথায় বিনোদিনী লিখেছেন, 'আমাকে নিয়ে এখানে (লাহোরে) একটা ভারী মজার ব্যাপার হয়েছিল, ঠিক যেন গল্প। গোলাপ সিং বলে এক মস্ত বড়লোক সেখানে ছিলেন. তাঁকে সবাই রাজা বলে ডাকত। তাঁর খেয়াল হল আমায় তিনি বিয়ে করে জাতে তুলে নেবেন। মাকে তিনি ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দেশে পাঠাতে চাইলেন, আর এ কথাও বললেন, মা যদি সেখানে থাকতে চান, তাতেও তাঁর আপত্তি নেই; মাকে তিনি মাসে ৫০০ করে টাকা দেবেন। .....আমি সিংজীকে দেখেছিলুম, খুব সুন্দর, কিন্তু যে তার লম্বা দাড়ি! দেখেই ভয় হত, আমি ছোটবেলা থেকে দাড়ি-ওয়ালা লোক মোটেই দেখতে পারতুম না। হাঁ, একটা কথা বলা হয়নি,—সতী কি কল্পিকনীতে আমি রাধিকা সেজেছিলাম, সেই সাজে আমায় দেখে তাঁর বিয়ে করতে খেয়াল হয়েছিল।

শেষটা গল্পের মতই হল, আমাদের বিয়ে আর হল না।'

শুধু এই ঘটনাই নয়, বিনোদিনীর নটীজীবনে এরকম আরো অনেক ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু রূপ-যৌবনে গরবিনী হয়ে তিনি তাঁর সাধনা ত্যাগ করেননি। বিনোদিনী লিখেছেন, 'এ ত সামান্য টাকা— আমার এই অভিনেত্রী জীবনে দু'তিনবার পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার হাতে এসেছিল, থিয়েটারের মায়ায় আমি তা ধুলোমুঠির মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলাম।'

বিনোদিনীর জীবনকাহিনী নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনায় যাবার, তাই, প্রয়োজন নেই। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। বিনোদিনীদের বাড়ীতেই থাকতেন গঙ্গা-বাঈজী। গায়িকা-অভিনেত্রী হিসাবে তাঁর নাম ছিল। এই গঙ্গা-বাঈজীর কাছেই ছোটবেলা গান শিখেছিলেন বিনোদিনী। গঙ্গামণির এক 'বাবু' বিনোদিনীকে নিয়ে এলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। প্রথম ছোটখাট পার্ট। তারপর 'হেমলতা' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করলেন। চারিদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

আর বিনোদিনীর ভক্তের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। কোলকাতার ধনীবাবুদের কাপ্তেন ছেলেরা বিনোদিনীকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। এক ধনী বাবু তাকে রক্ষিতা রাখতে চেয়েছিল। সর্ত ছিল এই বিনোদিনী আর পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয় করতে পারবেন না। কিন্তু থিয়েটার তখন বিনোদিনীর ধ্যানজ্ঞান। তিনি তাতে রাজী হলেন না। এ প্রস্তাব বিনোদিনীকে আরেকজনও দিয়েছিল। সে হল গরাণহাটা রায়। সে বলেছিল বিনোদিনী তার একার হয়ে থাক। প্রতিদানে সে বিনোদিনীর নামে

বিনোদিনী

থিয়েটার খুলবে। সে থিয়েটার অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীর নামে হল না। থিয়েটারের নাম হল 'স্টার'।

বিনোদিনী বাংলা পাবলিক থিয়েটার মাতিয়ে দিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, একথা তো সবাই জানেন। সেই পরমপুরুষ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দর্শক পর্যন্ত ধন্য ধন্য করতে লাগল। বিনোদিনীর এই অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন যে বিনোদিনী 'চৈতন্যলীলা' নাটকে যদিও পুরুষের ভূমিকায় অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অভিনয় করেছিলেন, তথাপি তাঁর মোহিনী নারীস্বভাব গোপন থাকত না। তাঁর চৈতন্যের ভূমিকাভিনয় দেখে দর্শকেরা ভাব-রসে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। গিরিশচন্দ্র এই সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাঙ্গালায় যখন চৈতন্যলীলার অভিনয় হয়, যদিচ পুরুষ-বেশধারিণী লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী ভাবুক-বৃন্দের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছিল, যদিও অভিনয় দর্শনে তাহার হীনাবস্থা ভুলিয়া, অনেক সাধু ব্যক্তি ভাবাবেশে তাহার পদধূলি লইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যদিও অপর সাধারণ তাঁহার সহিত গভীর গর্জনে হরিনামের ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল, তথাপি সে অভিনয় পুরুষোপযোগী হয় নাই। ... ...অভিনেত্রী নারীভাব গোপন করিতে পারেন নাই।' (পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী ।গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সাপ্তাহিক বঙ্গালয়। ২রা চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

অভিনয়ের সঙ্গে বিনোদিনী এইভাবে একাত্ম হতেন। দর্শকেরা যখন বিনোদিনীকে দেখতেন তখন তাঁর পতিতাকুলের কথা কেউ ভাবতেন না, বরং তাঁর শিল্পশ্রীসত্তাকেই দেখতে পেতেন। বিনোদিনী যখন ভাবাপ্লুত কণ্ঠে কীর্তন গাইতেন, তখন দর্শকদের, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেত। এই অভিজ্ঞতার কথা বিনোদিনী লিখেছেন, 'শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সংকীর্তন কালে, 'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাওগো দেখা প্রাণসখা রাখ পায়।।' এ গানটি গাহিবার সময়ে মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরিপাদ-পদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত।' এই অনুভূতি নিয়ে অভিনয় করতেন বলে একেকদিন অভিনয় করতে করতে বিনোদিনী ভাবাবেশে অচৈতন্য হয়ে পড়তেন। একই নাটকে একাধিক ভূমিকায় এবং বিভিন্ন রসাশ্রয়ী নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়েও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। মেঘনাদ নাটকে তিনি একই সঙ্গে সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

বিনোদিনী এত দিলেন বাংলাদেশকে, বাঙালীকে, তার সংস্কৃতিকে, অথচ সম্মানটুকু পেলেন না। নিজের একমাত্র মেয়েকে ভর্তি করতে নিয়ে গেলেন মেয়েদের স্কুলে। কিন্তু সব স্কুলের দরজা থেকেই ফিরে আসতে হয়েছে। বারবনিতার মেয়ের জন্য কোনো স্কুলের দরজা সেদিন খোলা ছিল না।

(৮)

থিয়েটারের মায়ায় বিনোদিনী ঘর বাঁধতে পারলেন না। গোলাপ সিংকে ফিরিয়ে দিলেন। এক বাবুর আশ্রিতা হলেন, কিন্তু থিয়েটার ছাড়লেন না। আর একজন কিন্তু ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়লেন। তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের গোলাপী বা গোলাপসুন্দরী। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথম দল অভিনেত্রীর তিনি অন্যতম। ভালো

সুকুমারী দত্ত (গোলাপী)

অভিনয় করতেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে তাঁর অভিনয়ের প্রশংসাও হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল সুকুমারী। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ছোট-বেলায় 'বেঙ্গল থিয়েটারে' সুকুমারীর অভিনয় দেখেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্রুমতীতে সুকুমারী সেজে-ছিলেন মলিনা। ঠাকুরবাড়ীর সবাই সে অভিনয় দেখে ধন্য ধন্য করেছিলেন। (ঘরোয়া। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নাটকে বিমলা, 'পূর্ণচন্দ্র' নাটকে পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় করেও সুকুমারী খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

সুকুমারীর বিবাহ দিয়েছিলেন উপেন্দ্র-নাথ দাস। যে-যুগের বাংলা নাটকের বিদ্রোহী নাট্যকার। তারই কলম দিয়ে বার হয়েছিল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' 'শরৎ-সরোজিনীর' মত বিদ্রোহাত্মক নাটক। নাটকের ওপর পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটল যে THE POLICE OF PIG AND SHEEP' নামক প্রহসন উপলক্ষে, তারও অভিনয়-সংগঠক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। নাটকের জন্য কারাদণ্ড লাভও তাঁর হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথের মধ্যে সে যুগের বাংলার অগ্নিগর্ভ যৌবনের প্রকাশ ঘটেছিল। বিপ্লবাত্মক নাটক লিখেছিলেন, নিজে বিধবা বিবাহ করেছিলেন, আবার তারই উদ্যোগে বারাঙ্গনা অভিনেত্রী গোলাপীর বিবাহের উদ্যোগ হল। পাত্র গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্ত। 'এডুকেশন গেজেটে' খবর বার হল—' গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোলাপমোহিনীর সহিত উক্ত নাট্যশালার অন্যতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দত্তের বিবাহ ১৮৭২ অব্দের তিন আইন অনুসারে আগামী মঙ্গলবার নির্বাহ হইবে, এমত কথা আছে।'

বিয়ে হয়ে গেল। কোলকাতার লোক মজা ছড়া বানাল—

'আমি সাধের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রীপুরুষে একত্র করি
দুনিয়ার লোক দেখে যাবে!'

সুকুমারী একখানি নাটকও রচনা করে-ছিলেন। এই নাটক রচনায় তাঁর সহায়তা করেছিলেন আশুতোষ দাস। নাটকখানি সর্বপ্রথম গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয় ১৮৭৫ খৃঃ ২৩শে আগস্ট।

(৯)

বেঙ্গল থিয়েটার ও অন্যান্য থিয়েটারে স্ত্রীলোক দিয়ে অভিনয় করাবার ফলে প্রবল সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু সে সমালোচনার মূলে ছিল অর্থহীন নীতি-বোধ এবং এই নীতিবোধের সঙ্গে বাস্তব সামাজিক অবস্থার কোন সামঞ্জস্য ছিল না। শিল্পের দৃষ্টিতে কেউ সমস্যাটিকে বিচার করেননি। শিল্পের প্রয়োজনে স্ত্রীভূমিকায় অভিনেত্রী অপরিহার্য একথা কেউ উপলব্ধি করেন নি। একথা ঠিক যে বেঙ্গল থিয়েটার বা অন্যান্য থিয়েটার বারাঙ্গনাদের দিয়ে স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করিয়েছিলেন প্রধানত অর্থকরী স্বার্থের বিচারে। কিন্তু শিল্পের বিচার যে একেবারেই ছিল না তা নয়। মেয়ে-দের দিয়ে থিয়েটার করাবার বিরুদ্ধে যে প্রবল সমালোচনা সে যুগে হয়েছিল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিভিন্ন প্রবন্ধে তার জবাব দিয়ে-ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের এই জবাবে শিল্পের দৃষ্টিতে সমস্যাটির বিচার করা হয়েছে। কোন এক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ৯ই চৈত্র-সংখ্যা 'রঙ্গালয়ে' অভিনেত্রীদের সমালোচনামূলক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে অভিনেত্রীরা অভিনয়কালে ঈষৎ কুটিল হাস্যচ্ছটা ও নেত্ররাগ বিকীরণ করিয়া দর্শকের চিত্ত চুরির চেষ্টা দেখিতেছেন।' এর উত্তরে 'অভিনেত্রী সমালোচনা' নিবন্ধে বিভিন্ন আলোচনার প্রসঙ্গে দুইটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। অভিযোগকারীর অবশ্য স্ত্রীভূমিকায় নটীদের অংশ গ্রহণে আপত্তি ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, 'রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোকের অংশ সামান্য রমণীগণ কর্তৃক অভিনীত হয়, ইহা অনেকের আপত্তির কারণ বটে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না।' তার আপত্তি অভিনেত্রীদের অভিনয়কলা সম্পর্কে। গিরিশের উত্তরের ভাষা বেশ কঠোর। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'দর্শকের দোষে, বাংলার অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সহযোগী অভিনয়কারীর প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দর্শকের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে হয়,— যদি কেহ বিদ্যার অনুরোধে দর্শকের দিকে না চান, তিনি তাহা হইলে 'এনকোর' 'একসেলেণ্ট'-উচ্চারী করতালি-প্রদানকারী দর্শকের ঘৃণার ভাজন হন। অতএব দর্শকের তুষ্টির জন্য (দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইরূপ দর্শকই অধিক), দর্শকের তৃপ্তির নিমিত্ত সকলকেই দর্শক-বৃন্দের প্রতি ফিরিয়া অভিনয় করিতে হয়।' .....আর একটি কথা। হাবভাবশালিনী কুটিলকটাক্ষী সাজিয়া সেকসপীয়র রচিত 'ক্লিওপেট্রা' অভিনয় করিতে হয়, সেই অভিনয়ে যদি প্রতি দর্শক হাবভাব ও কুটিলকটাক্ষ দেখিতে না পান, তাহা হইলে ঐ উচ্চশ্রেণীর নাটকাভিনয় অসম্পূর্ণ হয়। .....সমালোচকেরা প্রায়ই ইংরাজী অভি-নয়ের সঙ্গে তুলনা করিয়া, বাঙ্গালা রঙ্গালয়কে ঘৃণা করেন। কিন্তু যিনি কলিকাতায়ও ইংরাজী অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালা রঙ্গালয়ের ছিদ্র অনুসন্ধানী হইলেও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, তিনি যাহাকে হাবভাব কুটিলকটাক্ষ বলেন, তাহা বাঙ্গালা রঙ্গালয় অপেক্ষা ইংরাজী রঙ্গালয়ে শতগুণ দৃশ্যমান।' এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র এক বেশ্যা ও সাধুর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। দুজনের বাড়ী মুখোমুখি। বেশ্যার ঘরে কতজন লোক আসত ভজনারত সাধু তা গুনে রাখত। বারাঙ্গনার হত অনুতাপ। সাধুর বাড়ীর সামনে তাকে ঘৃণ্য জীবনযাপন করতে হত বলে তার অনুশোচনার শেষ ছিল না। উভয়ের একই সঙ্গে মৃত্যু হল। সাধুর দেহ চন্দন কাষ্ঠে দাহ হল আর বেশ্যার দেহ শিয়ালকুকুরের ভোজ্য হল। কিন্তু যমদূত এসে সাধুর আত্মা নরকে নিয়ে চলল। বিষ্ণুদূতের দিব্যরথে বেশ্যার আত্মা চলল স্বর্গে। যমদূত সাধুকে বলল, 'বেশ্যার উপপতি গণনায় তোমার বেশ্যাবৃত্তি হয়েছে আর উপপতি সঙ্গলাভ করেও বেশ্যার ঈশ্বর-ভাবনা ছিল। তাই এই বিচার।' এই কাহিনীর শেষে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 'আমরা এই নিমিত্ত বলি যে, রঙ্গালয়ে আসিয়া যিনি রাম, সীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি দেখিবার সাধ করেন, তাহা তিনি পাইবেন। কিন্তু যাহার কুটিল কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি, তাহার হৃদয় সেই কুটিলার ন্যায় হইবে।'

প্রকাশমণি ও হেমন্তকুমারী

স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীলোকের অভিনয়ে যদি আপত্তি হয় তবে স্ত্রীভূমিকায় পুরুষের অভিনয় বা পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের অভিনয়ও রুচির বিচারে শ্লীল হতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভূমিকায় পুরুষের অভিনয়ের প্রমাণ পাই স্বয়ং চৈতন্যদেবের জীবনীতে। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে— শ্রীচৈতন্যদেব লক্ষ্মীবেশে অপূর্ব নৃত্য করে-ছিলেন। শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলংকার পরিধান করে অপরূপ লাস্যময়ী নারীবেশে নৃত্য করেছিলেন। তাতে কামনার উদ্রেক হতে পারত। তাই চৈতন্যদেব পূর্বাহ্নেই সাবধান করে দিয়েছেন,

'প্রকৃতিস্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় তার অধিকার।।'

(মধ্যম খণ্ড। অষ্টাদশ অধ্যায়)

(আগামীবারে সমাপ্য)

গত ৩রা অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বাংলা সিনেমার একদা জনপ্রিয় উজ্জ্বল তারকা **সাধনা বসু**। আগামী সংখ্যায় বেরুবে এই লোকান্তরিত শিল্পী সম্পর্কে বিশেষ নিবন্ধ।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) শ্রীমান পৃথ্বীরাজ

কে এল কাপুর ফিল্মস-এর সাম্প্রতিকতম নিবেদন 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'এর কাহিনীটি শ্রীমান রসিকলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে 'রস্‌কে' নামে একটি দুরন্ত, দস্যি কিশোরকে ঘিরে। গোলকপুর হাইস্কুলের একটি ছোটখাটো ক্ষুদে দস্যুদলের—যার মধ্যে আট দশ থেকে চোদ্দ পনেরো বছরের স্কুল পড়ুয়া ছেলেরা আছে—সেই হচ্ছে দলপতি। লেখাপড়ায় লবডঙ্কা হলেও ভারতেতিহাসের পৃথ্বীরাজ চরিত্রটিকে তার মনে ধরেছিল। এমন নইলে রাজা! কেমন জয়চন্দ্রকে কলা দেখিয়ে স্বয়ংবর সভা থেকে তার মেয়ে সংযুক্তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে এল ঘোড়ায় চেপে। অতএব সে নিজেকে ঘোষণা করল পৃথ্বীরাজ বলে। হোঁৎকা অন্তা কিন্তু তাকে মানতে পারল না; সে বললে ঃ আমি আলেকজাণ্ডার। লেগে গেল যুদ্ধ। হোঁৎকা অন্তা, সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রস্‌কের মুখে থুতু দিয়ে বাহাদুরী নেয় এবং ক্লাশের শিক্ষকের কাছে রস্‌কে ও তার দক্ষিণ হস্ত মাখনের নামে মিথ্যে করে লাগিয়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে। রস্‌কে কিন্তু ছেড়ে কথা কয় না। স্নানরত অন্তাকে গুলতি মেরে জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়ে। আবার বুদ্ধিপরায়ণ অন্তা সখন গ্রামের দুঃখী বুড়ির একটি ছাগলছানাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাকে খাড়া দিয়ে কাটতে উদ্যত হয়, তখন [illegible] এই অন্যায় [illegible]

দেয়। কিন্তু এতদিন তার দুই মা (সৎমা এবং আপন জননী) এবং তাঁদের উপর বৃদ্ধা ঠাকুরমার অন্তহীন স্নেহ তাকে তার খড়্গহস্ত বাপের হাত থেকে রক্ষা করলেও এবার আর তার নিস্তারের পথ নেই। কাজেই 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' একেবারে পরিব্রাজকের বেশ ধারণ করল; সঙ্গে নিল খাবার জন্যে চিঁড়ে থেকে শুরু করে সব রকম প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। বাড়িতে বাবার নামে চিঠি লিখে গেল, তার মৃত্যুসংবাদ পেলে বোস-পুকুরের ধারে যেন তার একটি স্মৃতিমন্দির তৈরী করা হয়।—তিব্বত যাওয়ার জন্য সে বেরিয়েছিল বটে কিন্তু রেল পুলিশ তাকে বেশী দূর এগুতে দিল না। বাড়ী তাকে ফিরতেই হল এবং তার সম্বন্ধে গুরুজনদের চূড়ান্ত ব্যবস্থামতো তাকে গিয়ে দাঁড়াতে হল ছাদনাতলায় দ্বিয়ের পিঁড়ির পরে। অমলা [illegible] থেকে বয়সে ছোট হলে কি হবে, সে [illegible], লেখাপড়ায়

ও বুদ্ধিতে তার ঢের উঁচুতে। শুধু কি তাই! 'হরিদাসের গুপ্তকথা'তে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে যেসব কথা লেখা আছে, তার অনেকখানিই তার জানা আছে, সে রীতিমত **ভয়ানক**। শ্বশুর রায়সাহেব পান্নালাল চৌধুরী জামাই শ্রীমান পৃথ্বীরাজের আখেরের ব্যবস্থা করবার জন্যে তাকে ইংরাজীতে পোক্ত করতে চান। কিন্তু শ্রীমান সুন্দরী বৌয়ের গায়ে ঠেস দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত 'হরিদাসের গুপ্তকথা' পড়ে সাবালক হতে চেষ্টা করে; অতএব সাহেব মাস্টারের কাছে পড়তে এসে তার নাক ডাকতে থাকে। এরপরেও এমন সব অঘটন ঘটতে থাকে, যার ফলে শ্রীমানকে পগার পার হতে হয়। অবশ্য যাবার আগে সে তার মিষ্টি বউ অমলাকে বলে যায়, সে ওকে পৃথ্বীরাজের মতোই উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। পান্নালাল ঘোষণা করেন, অমন বাঁদরের গুষ্টির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বেয়াইয়ের কথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন বনমালী মুখুজ্জে। একেবারে বংশ তুলে গালাগাল! ঠিক আছে। ছেলের আবার বিয়ে দেব—বহালেন বনমালী। পাত্রী হচ্ছে সেই বিদ্‌কুটে অন্তার বোন। রসিক—শ্রীমান পৃথ্বীরাজ কিন্তু এ বিয়েতে নারাজ। অমলার মতো বউকে কি ত্যাগ করা যায়? —আসল কথা তো রায়সাহেবের ঐ গালাগালের শোধ নেওয়া! তা নিতে আর কতক্ষণ। বীর পৃথ্বীরাজ ইতিহাসের পৃথ্বীরাজের মতোই তার পিতৃপুরী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল মোটর গাড়ী করে। পান্নালালের 'স্টপ্ স্টপ' বলে তর্জন-গর্জনকে সে ধোড়াই কেয়ার করল। এবং ফলে হল উভয় পক্ষের পুনর্মিলন।

—কাহিনী সূত্রটি থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে, 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' হচ্ছে একটি হাসির ছবি। এবং ১২ রীল দীর্ঘ ছবিটির মধ্যে এমন বহু পরিস্থিতিই আছে, যা প্রেক্ষাগৃহে হাসির তরঙ্গ তোলে। কিন্তু তবু বলব, ছবিটি একটানা এবং অবিমিশ্র হাসির ছবি হয়ে উঠতে পারে নি অন্তত তিনটি কারণে : এক, বিশ্বজিৎ অভিনীত স্বদেশী উগ্রপন্থী চরিত্রটির অবতারণা; দুই, লোককে হাসাতে হবে, এই উদ্দেশ্যে জোর করে কতকগুলি কৃত্রিম পরিস্থিতির অবতারণা (ইংরাজীতে যাকে বলি, ফোর্সড্ সিচুয়েশন) এবং তিন, বনমালীর চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিছু কিছু অন্য শিল্পীর অত্যন্ত উচ্চগ্রামে সংলাপ কথন। ভারতী সিনেমার যে বিশেষ প্রদর্শনীতে আমরা উপস্থিত ছিলুম, তারই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর প্রচুর সংলাপ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর না হওয়া ছবিটিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার পথে যথেষ্ট অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছিল।

অভিনয়ে কিশোর শিল্পী অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিক ওরফে 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'-এর ভূমিকায় খুব সাবলীল ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছে। ভূমিকায় সে বালকোচিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছে। স্ত্রী অমলার প্রতি তার গাম্ভীর্যপূর্ণ আদেশগুলি মনে রাখবার মতো। অমলার ভূমিকায় আয়তলোচনা, সুন্দরী মহুয়া রায়চৌধুরীকে মানিয়েছে চমৎকার; 'বালিকা বধূ' একেই বলে। স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়েছে তার অভিনয়। রসিকের দক্ষিণ হস্ত মাখন এবং তার কূটবুদ্ধিপরায়ণ হোঁৎকা প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তা রূপে যথাক্রমে ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দ্রনীল দত্তও চরিত্রোচিত অভিনয় দ্বারা উপভোগ্যতার সৃষ্টি করেছে। রায়সাহেব পান্নালাল চৌধুরীর ভূমিকায় উৎপল দত্তের অভিনয় হয়েছে অসামান্য; কমেডি চরিত্র চিত্রণে তিনি যে অতুলনীয়, একথা অনস্বীকার্য। ক্রমাগত ভুল ইংরাজী বলার সঙ্গে তাঁর সাহেবদের পায়ে তৈল মর্দনের অপরূপ ভঙ্গী প্রেক্ষাগৃহে তুমুল হাস্যের রোল তোলে। বনমালী মুখুজ্জের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন অত্যন্ত চড়া পর্দায় এবং বড্ড বেশী গম্ভীর ভঙ্গীতে; ফলে, তাঁর অভিনয় তেমন উপভোগ্য হয়নি। বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত বিপ্লবী চরিত্রটি সু-অভিনীত হলেও এ-ছবিতে কেমন যেন বেমানান, এ-কথা আগেই বলেছি। অমলার বয়স্থা, বিবাহিতা বন্ধুর ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। অপরাপর ভূমিকায় নিভাননী (ঠাকুরমা), ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (রসিকের সখা), সন্তোষ দত্ত (রসিকের ক্লাশের শিক্ষক), রবি ঘোষ (হরিদাস), সাইমন উড (রসিকের ইংরাজী শিক্ষক), শ্যাম লাহা (গুরুদেব) প্রমুখ অনেকেই সু-অভিনয় করেছেন। প্রায় ২০০ জন শিল্পীসমন্বিত এই ছবিতে প্রত্যেককে নিজের ভূমিকা অনুযায়ী অভিনয় করানো এবং বহু শিল্পীকে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার কৃতিত্ব অবশ্যই পরিচালক তরুণ মজুমদারের প্রাপ্য; এ ব্যাপারে তিনি প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন বললেই হয়।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সমগ্রভাবে প্রশংসনীয়। চিলের চিঠি ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়ার শটটি গ্রহণে কৃতিত্ব আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একটি চিলের চিঠি ছোঁ মারার ঘটনাটি প্রশ্নাতীত নয়। ছবির ছ'খানি গানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুগীত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' গানখানি। কিন্তু এখানেও কথা আছে; অমলাকে যে বয়সের মেয়ে বলে দেখানো হচ্ছে, সে বয়সের মেয়ের মুখে 'সখি, ভালবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়, সে কি কেবলই চোখের জল?' ইত্যাদি বাণী সমীচীন কি?

কে এল কাপুর ফিল্মস নিবেদিত শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উপভোগ্য।

(২) এক যে ছিল বাঘ

দি ক্যালকাটা প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন 'এক যে ছিল বাঘ'-কে আমরা অভিনন্দন জানাই এই কারণে যে, একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এ ছবির নায়ক এবং ছবির প্রথম সিকিভাগ বাদে বাকী সবখানি জুড়ে রয়েছে তার অখণ্ড প্রভাব। একটি বাঘকে নায়ক করে প্রথম বাংলা ছবি করবার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই কাহিনীকার-পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্রের প্রাপ্য। পরিচালক শ্রীমৈত্রকে আরও বেশী প্রশংসা করব তাঁর এই প্রথম উদ্যমে তিনি যথেষ্টই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন বলে।

ছবির শুরু কুসুমপুর গ্রামের সুদখোর মহাজন তারিণীর মেয়ে বাতাসীর পিতার অমতে গ্রাম্য যুবক ফেলুকে ভালোবাসা এবং তার বিরুদ্ধে তার পিতার অভিযানের ঘটনাকে ঘিরে। তারিণী চায় গ্রামের প্রেসিডেন্ট, স্বার্থান্ধ রসরাজের হাবলা-গোবলা ছেলে গজাননের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। ফেলু পরোপকারী, উদারপ্রাণ যুবক ভোলার সাহায্য চায় বাতাসীকে বিবাহ করবার ব্যাপারে। এই সময়ে গ্রামে এল এক সার্কাস পার্টি। কর্তৃপক্ষের অসাবধানতায় ঐ গ্র্যান্ড ওরিয়েন্টাল সার্কাসের এক খেলোয়াড় বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের পথে। সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। ভোলা সেই খবর শুনে বাঘের খোলস গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের সব অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে। এদিকে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে আসল বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে নিয়ে গ্রামের পথে ঘোরাফেরা করে, তাকে দুধ খাওয়ায় এবং দুষ্টু লোকের পিছনে লেলিয়ে দেয়। আসল এবং নকল বাঘের দাপটে সব লোক সন্ত্রস্ত। প্রেসিডেন্টের লোকেদের চুরি ধরা পড়ে, স্ত্রীকে

সম্প্রতি কলামন্দিরে অসমীয়া গীতী নৃত্যানুষ্ঠানে একটি বিশেষ দৃশ্যে কুমারী ইন্দ্রাণী দাস

অবহেলাকারী মাতাল হিপীর চৈতন্য ফিরে আসে, গাছের ডালে আশ্রয় নিয়ে তারিণী পুরোহিতের সাহায্যে বাতাসীর সঙ্গে ফেলুর বিবাহ দিতে বাধ্য হয়। সার্কাসের দল যখন বহু অনুসন্ধান চালাবার পরে বাঘ শঙ্করকে ধরে ফেলে, তখন গ্রামবাসী তার প্রতি অজস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাকে মাল্যভূষিত করে নমস্কার জানায়; শঙ্করও সামনের পা তুলে তাদের অভিবাদন করে।

অবাক লাগে পিকাই, শান্তনু, রাণা, বাপ্পা প্রমুখ বালক শিল্পীদের অসম সাহসিকতায়। তারা দিব্যি বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে, তাকে দুধ খেতে দিয়েছে, অকুতোভয় তারা। মাত্র এই বাচ্ছাদের দেখাই হচ্ছে একটি অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। বাচ্ছারা সুন্দর কথা বলেছে, নেচেছে গেয়েছে। বাঘের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও ছবির একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। মাতাল, গোঁজেল হিপীরূপী নির্মল ঘোষ শুধু অভিনয়ই চমৎকার করেন নি, তিনি যেভাবে বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে বসে কথাবার্তা কয়েছেন, তার লেজ ধরে চলেছেন, তাও রীতিমত অবিশ্বাস্য। শেষ পর্যন্ত মোহমুক্তি ঘটার পরে স্ত্রী-বেশিনী সুলতা চৌধুরীর প্রতি প্রেম নিবেদনের দৃশ্যেও তিনি অতুলনীয়। নায়ক-নায়িকা ফেলু ও বাতাসীর ভূমিকায় যথাক্রমে পার্থ মুখোপাধ্যায় ও জয়শ্রী রায়ের অভিনয় উপভোগ্য। সবচেয়ে উপভোগ্য তাঁদের বিবাহ দৃশ্যটি। তারিণী বেশে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন; বাঘের ভয়ে তাঁর ত্রিশঙ্কুর অবস্থা কৌতুকাবহ। ঐ সঙ্গে ব্রাহ্মণরূপী শিল্পীটির কথাও প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ্য। স্বামী-স্ত্রী রূপে শমিত ভঞ্জ ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সু-অভিনয় করেছেন, বিশেষ করে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়। বাঘ পালানোর খবর শুনে পুলিশ অফিসাররূপী জহর রায় আতঙ্কিত ভাবটি চমৎকার ফুটিয়েছেন। সার্কাস 'জোকার' বেশে চিন্ময় রায়ও যথেষ্ট উপভোগ্য। এছাড়া বাসবী নন্দী, অশোক মিত্র, গীতা দে, রেবা দেবী, অসীম চক্রবর্তী প্রমুখের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের

পিঞ্জর : কবিতা ও মোস্তফা / পরিচালনা : শাহজাহান চৌধুরী

ত্রিপুরা সরকারের তথ্যচিত্র 'অরণ্যের ঘুম ভাঙছে' চিত্রের একটি দৃশ্য

উত্তমকুমার / ফটো : অমৃত

মধ্যে চিত্রগ্রহণের কাজ নিশ্চয়ই দুঃসাহসিকতাপূর্ণ স্বীকার করে নিয়ে বলব, ছবিতে রাত্রি দিনের পার্থক্য ঠিক বোঝা গেল না। সম্পাদক পরিচালকের সহযোগে বাঘের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অংশটিকে আরও সংক্ষেপিত করতে পারতেন। ছবির প্রায় প্রতিটি গানই উপভোগ্য; বিশেষ করে 'এবার তোরে কে বাঁচাবে, ওরে ব্যাটা মূর্খ পাঁঠা' গানখানি তো ইতিমধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জোকার-বেশী চিন্ময় রায়ের মুখের শেষ গানটিও চমৎকার।

দি ক্যালকাটা প্রোডাকসন্স নিবেদিত 'এক যে ছিল বাঘ' বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরী মহলে তো বটেই, সর্বসাধারণের কাছেও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠবে অবধারিতভাবে ছবিটিতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে শিশু শিল্পীদের উপস্থিতির দরুন।

(৩) **অরণ্যের ঘুম ভাঙ্গছে (তথ্যচিত্র—২ রীলের)**

ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন বিভাগের প্রযোজনায় তোলা ২ রীলের 'অরণ্যের ঘুম ভাঙ্গছে' অশিক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের মধ্যে আধুনিক জীবনযাত্রার নব প্রবর্তন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র। দক্ষিণ ত্রিপুরার অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চল কারবুকে যেদিন প্রথম বুলডোজার এসে গাছপালা উৎপাটন করে জমিকে সমতল করবার কাজে লাগল, সেদিন আদিবাসীদের মাতব্বর ২০০ বছর বয়স্ক রিয়াং সর্দার এই যন্ত্রদানবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, তাকে অভিসম্পাত করল। কিন্তু যখন ঐ বুলডোজারের সাহায্যে জমি হল কর্ষণযোগ্য, টিলা কেটে হল রাস্তা, নালা কেটে এল চাষের জল, জঙ্গল সাফ করে গড়ে উঠল বসত জমি, গড়ে উঠল ঘরবাড়ী, তখন ঐ রিয়াং সর্দার তাকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামবাসী। তারা আজ নূতন জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে চলেছে কুসংস্কারকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।

এই তথ্য সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করেছেন পরিচালক বিভূতি রায় তাঁর 'অরণ্যের ঘুম ভাঙ্গছে' ছবিটির মাধ্যমে।

মঞ্চাভিনয়

রাত্রি : অন্তর্মুখী অনুভবের একটি নাটক। সংলাপ সংঘাতে অন্তরেরই গভীরতম আন্দোলনের স্পন্দন। একাকীত্বের দুঃসহতম যন্ত্রণা বুকে বেঁধেও নায়িকা প্রবাতী মাত্রার শক্তির সঙ্গে সমকক্ষবিলা করে। সবশেষে তারই উজ্জ্বলতা জয়ের সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য পায়। জীবনের প্রগতির অনন্তকালে প্রাণময়তার ছন্দেই সে মানবিক সম্ভাবোধের নতুন আলো আবিষ্কার করে নিতে পারে। রাত্রির সেতারেই সে অরুণালোকিত প্রভাতের সুর তোলে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা প্রযোজিত 'রাত্রি' নাটক সম্প্রতি রসল পলস্ কাথিড্রালের প্যারিস হলের মঞ্চে পরিবেশিত এই নাটকটি আরম্ভের এক নিম্নবর্তন-এর 'এ ডিগ্রি' অবলম্বনে লেখা হয়েছে। নাটকটির অনুবাদ করেছেন শ্রীআশোক মুখোপাধ্যায়। প্রযোগ পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন মহেশ সিংহ। প্রথমেই বলি বেশ কয়েকটা গ্লাস-এর নির্দেশকের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনার পরিচয় তুলে ধরেছে।

শিল্পীদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে যে প্রযোজনা কতো সম্পদশালী হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ সেদিনকার নাটক। নাটকে অংশগ্রহণকারীদের কেউই নিছক শিল্পী নন, কিন্তু আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের গভীরে যেন অবতরণ করতে পেরেছেন। এবং তাইতেই নাটকটির টিমওয়ার্ক একটি বিশিষ্ট শৈল্পিক ছন্দে অটুট থেকেছে।

নায়িকা স্বাতীর ভূমিকায় আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন মিতালী চক্রবর্তী। প্রতিটি অভিব্যক্তি তাঁর প্রাণময়তায় মর্মস্পর্শী। অভীক ও স্বাতীর বাবার চরিত্রে সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও অদ্ভুত সিন্‌হা দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন স্বপন দত্ত, বাহ্যি ভট্টাচার্য, পাপিয়া দাশগুপ্ত, সঞ্জয় শিকদার, সুধীর কর্মকার, সুধাংশু বিশ্বাস, চিত্ত দেবনাথ।

ঘণ্টা ফটক : প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টা ফটক' নাটকটি কয়েকদিন আগে রবীন্দ্রসদনে অভিনীত হোল। নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন টেস্টিং ডিপার্টমেণ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব (সি ই এস সি পি)-এর শিল্পীরা রহস্যঘন এই নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেন অমিয়কানাই চন্দ্র। সুঅভিনীত এই নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জি, প্রবীর রাহা, সুমিত মিত্র, সোমনাথ ব্যানার্জি, দুলাল মুখার্জি, দীনেন ব্যানার্জি, সরোদিন্দু পাল, সুকৃতি চৌধুরী, শ্যামল গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর দাস, গোপেন্দু বক্সী, শিবপদ দে, দেবাশীষ ব্যানার্জি, গোলক মল্লিক, দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যানার্জি, পরিমল ভট্টাচার্য, এষা ব্যানার্জি, কাজল মুখার্জি, গৌরী আঢ্য, সুস্মিতা মুখার্জি।

'সংগঠনী'র আগামী প্রয়াস : বারাসতের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী সংগঠনীর শিল্পীরা এবার যে নাটকের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন, তা হোল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ।' এই মঞ্চসফল নাটকটির নির্দেশনায় রয়েছেন দিলীপ মৌলিক। বিভিন্ন ভূমিকায় থাকবেন বরুণ চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ দে, শক্তি গাঙ্গুলী, আশু ঘোষাল, শৈল ঘোষাল, শিশির চ্যাটার্জি, অরুণ দে, মালা দাস, সীমা দে, গীতা কর্মকার ও দিলীপ মৌলিক।

দেবযানী শর্মিষ্ঠার অভিনয় : গত ২১ সেপ্টেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং মাননীয় শ্রীঅজিতকুমার সরকার মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে প্রতিষ্ঠানের সপ্তদশ বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি মহাশয় প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির ১ম বর্ষ ও জুনিয়ার ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্র ছাত্রীদের রৌপ্য পদক বিতরণ করেন। তারপর নৃত্য গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে প্রতি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের নৈপুণ্য দেখিয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। পরিশেষে শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয়ের পরিচালনায় দেবযানী শর্মিষ্ঠা নাটকটি ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত হয়। অভিনয়াংশে অকুণ্ঠ প্রশংসনীয় ও উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের জন্য সর্বাগ্রে নাম করতে হয় দেবযানী শর্মিষ্ঠা, মদন রতি, মলয় ও পুনিকার ভূমিকায় যথাক্রমে কুমারী লালিমা ঘোষ, বীনা পাল, সুদত্তা দাস, বৈশালী রায়-

সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় / ফটো : অমৃত

চৌধুরী, রেশমী চৌধুরী ও আল্পনা মিত্র ও অন্যান্য ভূমিকার শিল্পীরাও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয়। মনোগ্রাহী নৃত্য পরিচালনার জন্য শ্রীমতী বেলা অর্ণব ও পরিচালক শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্তী ধন্যবাদার্হ।

বিবিধ সংবাদ

সুর-বাহারের বার্ষিক উৎসব : সুর-বাহার সঙ্গীত সংস্থার ৭ম বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর একাডেমী অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। প্রথম অংশে পরিবেশিত হয় 'ঋতু বাহার'। প্রধানতঃ রাগসঙ্গীত ভিত্তিক এই প্রযোজনায় 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' ও 'লঙ্গার ছাড়িয়া (সারি)' গান দুখানির প্রয়োগ উপস্থিত দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নৃত্যাংশে প্রদীপ্ত নিয়োগী ও অনুরাধা মৈত্র সাবলালিতার স্বাক্ষর রাখেন। দ্বিতীয় অংশে পরিবেশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধের' নৃত্যনাট্য রূপ। (সাধন গুহ (বজ্রসেন) ও মধুমিতা মৈত্র (শ্যামা) নিজ নিজ ভূমিকায় মুন্সীয়ানা দেখান। নির্দেশক শম্ভু ভট্টাচার্যের প্রয়োগশৈলী প্রশংসনীয়। দৃশ্যনন্দন

আলোকসম্পাতে সুশীল দাশ এবং আবহ-সঙ্গীতে কমলেশ মৈত্র দুটি নৃত্যনাট্যেরই মান বাড়িয়ে তোলেন। সঙ্গীতাংশে রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণা সমদ্দারের ভূমিকা ছাড়াও সম্মেলক কণ্ঠশিল্পীদের এক বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নৃত্যাচার্য উদয়শঙ্কর এবং সংগঠকের কার্য সম্পাদন করেন সুনীল সাহা।

রাসমণি নগর পল্লীমঙ্গল সমিতির উৎসব : গত ২৬।৯।৭৩ ইং বুধবার মহালয়ার শুভলগ্নে রাণী রাসমণিনগর পল্লীমঙ্গল সমিতির মান-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন বৃটিশ ভারতের স্বাধীন আজাদ-হিন্দ সরকারের সহ-অধিনায়ক ও বর্তমান পঃ বঃ বিধানসভার উপাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়।

উপস্থিত বরেণ্য সুধিবৃন্দ তাঁদের ভাষণে পল্লীর রাস্তাঘাট, আলো, স্কুল, ক্রীড়া, পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। বিভিন্ন বস্তা এলাকার উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। নাটাগড় ত্রিশক্তি সংঘ ও সোদপুরের ১ম স্কাউট ও গাইড দল কর্তৃক গার্ড অফ অনার প্রদর্শন, সোদপুরের ১ম স্কাউট ও গাইড দল কর্তৃক নৃত্যনাট্য ঋতুরঙ্গ, বারাকপুরের নবীন সংঘ কর্তৃক 'রাজার বাড়ী কতদূর' নাটকাভিনয় ও সর্বশেষে বিশিষ্ট ও বেতারশিল্পী সমন্বয়ে সংগীতের আসর জনসাধারণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। পরদিন ২৭।৯।৭৩ তারিখে মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সৌজন্যে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, লায়ন্স রেঞ্জ শাখার রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক এক মনোরম পরিবেশে 'রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা' উদযাপিত হয় শনিবার ২২ সেপ্টেম্বর '৭৩। অনুষ্ঠানে রাগাশ্রয়ী নজরুল-গীতি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন শ্রীগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন শ্রীনির্মাল্য বসু। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী পরেশ ভট্টাচার্য, স্বপন দাস, গীতা চক্রবর্তী ও অনিতা ভদ্র। সঙ্গতে ছিলেন সর্বশ্রী শক্তি ঘোষ ও সুশান্ত চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবিতাটির হিন্দীতে সারাংশ বুঝিয়ে দেন শ্রীভানুপ্রতাপ সিং।

মীরাবাঈ নৃত্যনাট্য

কালকাটা ড্যান্স এন্ড ড্রামা একাডেমীর উদ্যোগে 'মীরাবাঈ' নৃত্যনাট্য মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন নাট্যের রচয়িতা শ্রীশান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মীরার ভূমিকায় দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রণতি চট্টোপাধ্যায়, কানাই মজুমদার, বীথি দাঁ, সাগরিকা ভৌমিক, জয়শ্রী দাঁ, অনুরাধা দত্ত, বাণী দাঁর নামও উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত।

অনুষ্ঠানের আগে পরলোকগত নমিতা দত্তের আত্মার প্রতি এক মিনিট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়।

বাঙলাদেশের ছবি

ঢাকার ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর

ভারতের সাড়া-জাগানো চিত্র নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর অক্টোবর মাসের শেষে ঢাকা আসছেন। 'নতুন নামে ডাকো', 'নতুন ফুলের গন্ধ', 'রক্তাক্ত বাংলা' ছবির পরিচালক মোমতাজ আলী বর্তমানে কয়েকটি ছবি পরিচালনা করছেন। 'তিন টেক্কা' ছবির একটি অন্যতম মুখ্য চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর অভিনয় করবেন এবং সে কারণেই তিনি ঢাকা আসবেন বলে পরিচালক সূত্রে জানা গেছে।

মোমতাজ আলী জানিয়েছেন শর্মিলা ঠাকুরের কোন কারণে ঢাকায় আসা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তিনি তার ইউনিট নিয়ে বোম্বে গিয়ে হলেও শর্মিলাকে নিয়ে সুটিং করবেন। সেলিম চৌধুরী 'তিন টেক্কা' ছবিতে সংগীত পরিচালনা করছেন।

সোনার খেলনা

মোমতাজ আলী বর্তমানে অন্য যে আর একটি ছবি পরিচালনা করছেন, তার নাম 'সোনার খেলনা'। ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শাবানা, মোস্তফা, আনোয়ার হোসেন, মঞ্জু দত্ত ও জসিম প্রমুখ। ছবিটি পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন অজন্তা ফিল্মস।

শেষলগ্ন

এ হুক প্রযোজিত ও আলী কাশেম পরিচালিত ছবি "শেষ-লগ্নে"র কাজ এখন সমাপ্তির পথে। ছবিটি প্রজাপতি কথাচিত্রের প্রথম অবদান এ-ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সুবল দাস। ছবির জন্য সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জহিরুল হক। চিত্রগ্রহণে আছেন আওলাদ। ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছেন শাবানা, জাফর ইকবাল, রাণী সরকার, আলতাফ, কবির চৌধুরী, আয়েশা, ফতেহ লোহানী, খলিল খান জয়নুল, রবিউল প্রমুখ।

রাজ্জাকের বিবিধ সংবাদ

চিত্রনায়ক রাজ্জাক সম্প্রতি বলেছেন "দুঃস্থ শিল্পীদের কল্যাণের জন্য আমি বাংলাদেশের চিত্রশিল্পী সমিতি গঠন করতে চাই।"

তিনি বলেন, "শিল্পীরা কেউ আমার কথায় কান দেন না।"

তিনি বলেন, "সমিতি গঠন করার ফলে সুবিধা হবে যে, শিল্পীরা বিভিন্ন সমস্যার শিকার হবেন না।"

বাংলাদেশের জনপ্রিয় ও অন্যতম নায়ক রাজ্জাক কি পশ্চিমবঙ্গের নায়ক উত্তমকুমারের ছবিতে অভিনয় করবেন?

সম্প্রতি উত্তমকুমারের ছোট ভাই তরুণকুমার কোলকাতা থেকে টেলিফোনে রাজ্জাককে নাকি এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন।

উত্তম ও তরুণ নাকি কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্জাকের সাথে এব্যাপারে কথা পাকাপাকি করার জন্য ঢাকা আসছেন।

উল্লেখ থাকে যে, উত্তমকুমারের পরিচালিত আগামী ছবি বিমল মিত্রের 'বেগম মেরী বিশ্বাস"। এ-ছবির ক্লাইভের ভূমিকায় উত্তমকুমার এবং সিরাজের চরিত্রে রাজ্জাক অভিনয় করবেন।

আরো উল্লেখ থাকে যে, রাজ্জাকের কাছে ইতিমধ্যে কোলকাতার কয়েকজন পরিচালক সেখানকার ছবিতে অভিনয় করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মীয়মাণ ছবি সুশীল মজুমদার পরিচালিত "অন্যান্য" ছবিতে অভিনয় করার জন্য রাজ্জাক ইতিমধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

বোম্বের পরিচালক শক্তি সামন্তও নাকি রাজ্জাককে বোম্বের একটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এইচ. এম. ভি.

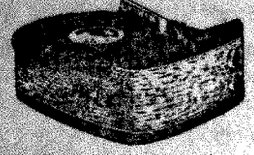

রেকর্ড প্লেয়ার

রেডিও, রেডিওগ্রাম, রেকর্ড প্লেয়ার, ট্রানজিস্টার রেডিও ও রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড, পাখা, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি নগদ ও কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়।
মেরামতেরও সুব্যবস্থা আছে।

রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
১৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩।
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

সাকিলা

কবরী

উল্লেখ থাকে যে, রাজ্জাক খুব শীঘ্র নিজেই ছবি পরিচালনায় হাত দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি ছবি পরিবেশনায় হাত দিয়েছেন। তার পরিবেশনার নাম রাজলক্ষ্মী প্রোডাকসন্স। 'লক্ষ্মী' রাজ্জাকের স্ত্রীর নাম। রাজলক্ষ্মী প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি রাজ্জাক-কবরী অভিনীত, মজনু ফরিদ প্রযোজিত 'রংবাজ' ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন করেছে। রাজলক্ষ্মী প্রোডাকসন্স-এর নির্মীয়মান দ্বিতীয় ছবির নাম "বেইমান"। ছবিটি প্রযোজনা করছেন মজনু ফরিদ। নায়ক রাজ্জাক, নায়িকা কবরী। ছবির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ছবিটি সম্ভবতঃ কোরবাণী ঈদে মুক্তি পাচ্ছে।

নায়ক রাজ্জাক কি ক্লান্ত?

মিলনান্তক নয়, বিয়োগান্তক ছবিতে অভিনয় করে আমি বেশি আনন্দ পাই। মিলনান্তক ছবিতে অভিনয় করতে আর ভালো লাগে না। মিলনে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী। বিয়োগে ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী। কথা কটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ নায়ক রাজ্জাকের।

রাজ্জাক কি একটানা অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? রাজ্জাক বলেন, "আমি সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করতে চাই।"

উল্লেখ থাকে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে নির্মীয়মাণ প্রায় সব ছবিরই নায়ক রাজ্জাক।

সুমিতা দেবীর কাহিনী

বাংলাদেশের সাবেক নায়িকা বর্তমানে প্রযোজিকা ও চরিত্রাভিনেত্রী সুমিতা দেবী দীর্ঘদিন পরে আবার ছবি প্রযোজনায় হাত দিচ্ছেন। ছবির নাম "মা"। এ-ছবির কাহিনী সুমিতা দেবী নিজেই লিখেছেন। ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন জয়নুল আবেদীন। সংগীত পরিচালনায় থাকছেন সত্য সাহা। সংলাপ লিখেছেন খান জয়নুল। চিত্রগ্রহণে আবদুল লতিফ বাচ্চু। 'মা' ছবিটির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন খসরু নোমানি। এ-ছবিতে সম্ভবতঃ অভিনয় করবেন মোস্তাফা, ফতেহ লোহানী, খান জয়নুল, আলতাফ, রাণী সরকার, মেসবাহ, গুলজার, মায়া হাজারিকা, মঞ্জু দত্ত প্রমুখ।

পরিচালক সূত্রে জানা গেছে, এ-ছবির নায়ক-নায়িকা হিসেবে এক জোড়া নতুন মুখ থাকবেন।

সুচন্দনার ছবি পরিচালনা

নিখোঁজ জহীর রায়হানের স্ত্রী নায়িকা সুচন্দনা নিজে ছবি পরিচালনা করবেন, এখন পুরনো খবর। নতুন খবর হল, না, আপাততঃ তিনি কোন ছবি পরিচালনায় হাত দিচ্ছেন না।

উল্লেখ থাকে যে, জহীর রায়হানের কাহিনী "বরফ গলা নদী"র চিত্ররূপ তিনি দিতে চেয়েছিলেন। ছবিটি তিনি নিজেই পরিচালনা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতি, প্রযোজনা করার মতো প্রচুর টাকা এবং পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদির কারণে বর্তমানে তাঁর এ সিদ্ধান্তের মৃত্যু হয়েছে।

তবে ভবিষ্যতে তিনি ছবি পরিচালনা করবেন, এমন ইচ্ছার মৃত্যু আজও হয় নি।

হীরা-সমাচার

মোহর-চাঁদ পরিচালিত ছবি 'হীরা'র কাজ বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ছবিটি সম্ভবতঃ এ মাসেই মুক্তি পাচ্ছে।

এ-ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কবিতা, আলমগীর, মোস্তাফা, শুভ্রা, মালতী, সাইফুদ্দিন ও তুলিপ প্রমুখ।

মোহর-চাঁদ পরিচালিত পরবর্তী ছবির নাম 'ড্রাইভার'।

চলচ্চিত্র ও সমাজজীবন

প্রথম যেদিন সবাক ছবির আবিষ্কার হয়েছিল, সেদিন তার জনক বা দর্শক, কেউই তার ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারেন নি। বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদান হিসাবে সেদিন চলচ্চিত্র বিরাট এক চমক সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু তার শিল্প সম্ভাবনার কথা, সাধারণ মানুষের মনের ওপর তার প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা বা অনাগত ভবিষ্যতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আনন্দ-পরিবেশনার মাধ্যমরূপে এর স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি সেদিন ছিল কল্পনার বাইরে।

গত দুই দশকে চলচ্চিত্র নিয়ে দেশে-বিদেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রতিভাবান শিল্পীদের গভীর অনুশীলনের ফলে সাম্প্রতিককালে চলচ্চিত্র শিল্প-কলার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। শিল্পসৌন্দর্য আর সুষমামণ্ডিত বর্তমান দশকের চলচ্চিত্র চারুশিল্পের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। আর সেই আন্তর্জাতিক ছায়াছবির জগতে আজকের বাংলা ছবির স্থান যথেষ্ট অগ্রণী। আমাদের বেশ কয়েকটি ছবি সাম্প্রতিক কালে নানা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলা ছবির কয়েকজন পরিচালক আজ বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত—এ একান্তই আমাদের গৌরব।

কিন্তু আমাদের আজকের আলোচনা তাঁদের নিয়ে নয়, আগেই বলেছি, এ যুগের সাধারণ মানুষের মনের ওপর চলচ্চিত্রের প্রচণ্ড প্রভাব অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার ওপর যে কোন সমীক্ষা থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যায় যে আজকের নানা সমস্যা জর্জরিত মানুষের কাছে—তা যে বয়সের বা সমাজেরই হোক না কেন, ছায়াছবির আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশী। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সবার কাছেই এর সমান আবেদন। দৈনন্দিন জীবনের অবসাদ থেকে মুক্তির আনন্দের সন্ধানে মাঝে মধ্যে অন্তত ছায়াছবি দেখেন না, এমন লোক আজকের সমাজে বিরল। যে শিল্পের জনপ্রিয়তা এত বিরাট এবং ব্যাপক, মানুষের মনের ওপর, বিশেষ করে তরুণ ও যুব মানসে যার প্রভাব এত গভীর, সমাজের স্বার্থেই আজ তার একটা

সারদেশ্বরী আশ্রমে শ্রীদুর্গামাতার জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে আশ্রমের ছাত্রীদের 'বৃন্দাবনলীলা' নাটকা অভিনয়ের একটি দৃশ্য।

সামাজিক মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। যে মননশীল শিল্পীরা 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী নন, পরন্তু যে কোন শিল্পসৃষ্টিকেই সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার কথা ভাবেন, তাঁদের আজ বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন—এই প্রভাবশালী শিল্পমাধ্যমকে সমাজের কল্যাণে বর্তমানে কতখানি কাজে লাগানো হচ্ছে। বিদেশের দিকে না তাকিয়ে আমাদের দেশের ছবির মানদণ্ডে এ প্রশ্নের বিচার করা যাক। সত্যিকার শিল্পসুষমামণ্ডিত ছায়াছবির সংখ্যা সব দেশেই সীমিত। প্রতিদিন যে অসংখ্য ছবি সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যে দেখানো হয়, শিল্প-বিচারের মাপকাঠিতে তাদের কিছুতেই উপরোক্ত ছবির সঙ্গে এক বন্ধনীভুক্ত করা যায় না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে সমস্ত ছায়াছবি প্রতিদিনের আসর জমিয়ে রাখছে, অগণিত দর্শকের আনন্দের খোরাক যোগাচ্ছে, শিল্পবিচারের মাপকাঠিতে তার মান যাই হোক না কেন, দর্শকমনে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না। তার প্রমাণ এই কোলকাতা শহরেই অনেক নীচুমানের ছবির রজত অথবা সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন। ধরে নেয়া যাক, এ সমস্ত ছবির একমাত্র উদ্দেশ্য আনন্দ দান, শিল্পের উৎকর্ষ সাধন নয়। সেক্ষেত্রেও এধরনের ছবির সামাজিক প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে, ভবিষ্যত নাগরিকদের ওপর তার প্রভাব কি ধারায় প্রভাবিত হচ্ছে, কোন সমাজ সচেতন শিল্পীর পক্ষেই তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক চিন্তাধারার সংঘাতে আমাদের আজকের সমাজ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। পুরানো মূল্যবোধ ধ্বসে যাচ্ছে, কিন্তু তার স্থান পূরণ করেনি কোন নতুন মূল্যবোধ। আমরা এখন একটা নতুন সমাজ গড়ার প্রাথমিক স্তরে আছি বলা যেতে পারে। যে যুব সমাজের ওপর এই সমাজ গড়ার মূল দায়িত্ব তাঁদের মধ্যে একটা আদর্শবোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন এই মুহূর্তে সব চাইতে বেশী। চলচ্চিত্রকে এই কাজে লাগাবার কোন আন্তরিক প্রয়াস এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি। অনেক একনিষ্ঠ শিল্পী হয়ত বলবেন, শিল্পের কাজ সমাজসংস্কার নয়, আদর্শের অনুপ্রেরণা যোগানোও তার দায়িত্ব নয়। কিন্তু এর উত্তরে একটি কথা সবিনয়ে বলা যেতে পারে যে বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে যদি এই বৈষম্য ও ব্যাভিচার, দুর্নীতি আর মিথ্যাচার থেকে মুক্ত করা না যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে যত মহান শিল্প-সৃষ্টিই হোক না কেন, তার যথাযথ মর্যাদা দেবার মত লোক সমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আজকের চলচ্চিত্র যদি প্রয়োজনে সাময়িকভাবে তার শিল্প আদর্শকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেও এই মহান দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন, তাহলে ভবিষ্যতে অনেক মহত্তর শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনাকেই তাঁরা বাস্তবে রূপায়িত করতে সাহায্য করবেন।

এই প্রসঙ্গে গত তিরিশ-চল্লিশ দশকের বাংলা ছবির একটু আলোচনা করা যাক। আধুনিককালের অনেক অত্যুৎসাহী চলচ্চিত্রানুরাগীর মুখে শুনতে পাই, শিল্পবিচারে সে যুগের ছবিকে নাকি কোন স্থানই দেয়া যায় না। এদের সঙ্গে স্বভাবতঃই আমি একমত নই। শিল্পের বিচারে অবশ্যই ওসব ছবির সঙ্গে আজকের ছবির কোন তুলনাই চলতে পারে না। কিন্তু তাই বলে পূর্ব-সূরীদের সেই প্রয়াসকে তুচ্ছ জ্ঞান করার অর্থ নিজের অতীতকেই অস্বীকার করা। প্রথম যিনি সচল ছবি আবিষ্কার করেছিলেন, আজ তাঁর কল্পনাতীত অগ্রগতি সত্ত্বেও তিনিই এর প্রাথমিক কৃতিত্বের অধিকারী সেকথা নিশ্চয়ই সত্য। ঠিক তেমনিভাবেই বলা যায়, পূর্বসূরীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অনুশীলনের ফলেই আজকের সার্থক চলচ্চিত্রের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। সেই ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই এ যুগের নব নব সৃষ্টির প্রয়াস সম্ভব হয়েছে, এটা নিশ্চয়ই সে কালের ছবির সব চাইতে কঠোর সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আবার আমাদের মূল বক্তব্যে আসা যাক। সে যুগের ছবির শিল্প-মান যাই থাক না কেন, তার কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে নানা সামাজিক কল্যাণ ও আদর্শের ইঙ্গিত থাকতো। আনন্দ বিতরণের নামে নিছক যৌন আবেদনের নগ্ন প্রয়াস সেদিন বিশেষ দেখা যেতো না। পরিচালক-প্রযোজকদের এই সামাজিক দায়িত্ববোধের ফলে সে যুগের ছবি প্রত্যক্ষ-ভাবে সমাজগঠনের কাজে সহায়তা করেছিল; তরুণমনে আদর্শবোধের প্রেরণা যুগিয়েছিল। আজকের ছায়াছবির ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের যুগে তাকে অনেক বেশী কাজে লাগাবার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ যুগের বেশীর ভাগ চিত্র-নির্মাতাই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন অথবা মুনাফার লোভে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত সমাজের যে কোন ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত।

তাই আজকের ছায়াছবির জগতে যে সব শিল্পী পরিচালক বিশেষ গৌরব আর সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের কাছে সমাজের প্রত্যাশা, এই প্রভাবশালী শিল্পকে তাঁরা যেন কেবলমাত্র মুনাফার ব্যবসায়ে পরিণত হতে না দেন, অথবা বর্তমান সমাজের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থেকে কেবলমাত্র আদর্শ শিল্পসৃষ্টির সাধনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে না রাখেন। তাঁদের বিরাট প্রতিভার স্পর্শে চলচ্চিত্র ভাবীকালের সমাজ গঠনে যোগ্য ভূমিকা নিক, নতুন পথের দিশারী হোক। তার জন্যে যদি শিল্পের আদর্শকে সাময়িক-ভাবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করতে হয়, তাহলেও ভাবীকালের মানুষ তাদের কোন অভিযোগ না জানিয়ে বরং অভিনন্দন জানাবে।

নেপাল নাগ

আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে 'রিনি কাপ' বিজয়ী সাউথ ইস্টার্ন রেলদলের খেলোয়াড়বৃন্দ।

খেলাধুলা

দর্শক

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার

কলকাতায় বেলেঘাটার সুভাষ সরোবরে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এছাড়া তাদের হাতে এসেছে ওয়াটার পোলো এবং ডাইভিংয়ের খেতাব। দীর্ঘ ১৭ বছর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দিল।

ব্যক্তিগত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ছাত্র বিভাগে গুরুনানক বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশীল কোহলি এবং ছাত্রী বিভাগে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কুমারী স্মিতা দেশাই। এঁরা দুজনেই পাঁচটি করে অনুষ্ঠানে খেতাব জয় করেছেন। সুশীল কোহলি (গুরুনানক) প্রথম স্থান পেয়েছেন ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এবং ১০০ ও ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতারে। অপরদিকে কুমারী স্মিতা দেশাইয়ের প্রথম স্থান ১০০, ২০০ ও ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে। তাছাড়া সুশীল কোহলী ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক সাঁতার ২ মিঃ ৫৫-১ সেকেন্ডে শেষ করে এবং কুমারী স্মিতা দেশাই ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতার ১ মিঃ ২৩-২ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড করেছেন।

এবছরের প্রতিযোগিতায় ৬টি নতুন রেকর্ড হয়েছে—ছাত্র বিভাগে ২টি এবং ছাত্রী বিভাগে ৪টি।

দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ

ছাত্র বিভাগ : ১ম কলকাতা (৪৫ পয়েন্ট), ২য় গুরুনানক (৩১ পয়েন্ট), ৩য় পুণা (২১ পয়েন্ট) এবং ৪র্থ বোম্বাই (১৮ পয়েন্ট)।

ছাত্রী বিভাগ : ১ম বোম্বাই (৫৫ পয়েন্ট), ২য় পুণা (২৭ পয়েন্ট), ৩য় গুজরাট (১৬ পয়েন্ট)।

ওয়াটার-পোলো ফাইনাল

কলকাতা ১৬—১ গোলে গত বছরের বিজয়ী বোম্বাই দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

নতুন রেকর্ড

ছাত্র বিভাগ

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : ইয়াং চিন সিন (পুণা) সময়—১ মিঃ ৫-৯ সেঃ

২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক : সুশীল কোহলি (গুরু নানক) সময়—২ মিঃ ৫৫-১ সেঃ

ছাত্রী বিভাগ

১০০ মিটার বাটারফ্লাই : স্মিতা দেশাই (বোম্বাই) সময়—১ মিঃ ২৩-২ সেঃ।

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে : পুণা বিশ্ববিদ্যালয় সময়—৫ মিঃ ৫৫-৭ সেঃ

৪০০ মিটার মেডলি রিলে : বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সময়—৬ মিঃ ৭-৪ সেঃ

৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলে : পুণা বিশ্ববিদ্যালয় সময়—৫ মিঃ ৫৫-৭ সেঃ

আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল

খড়্গপুরের সেরা স্টেডিয়ামে ১৯৭৩ সালের আন্তঃ রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের চাম্পিয়ান সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ৪—০ গোলে পোর্ট কমিশনার্স দলকে হারিয়ে মোট ৮বার 'রিনি কাপ' জয়ের (ফাইনালে বিজয়ী দলের পুরস্কার) গৌরব লাভ করেছে।

পরলোকে পাভো নুরমি

বিশ্ববিশ্রুত অ্যাথলীট পাভো নুরমি (ফিনল্যান্ড) তাঁর ৭৬ বছর বয়সে গত অকটোবর ১ তারিখে হেলসিঙ্কিতে দেহত্যাগ করেছেন।

পৃথিবীর অ্যাথলেটিক্স আসরে পাভো নুরমি একটি অবিস্মরণীয় নাম। আপন মহিমায় তিনি জনসমাজে 'ফ্লাইং ফিন'

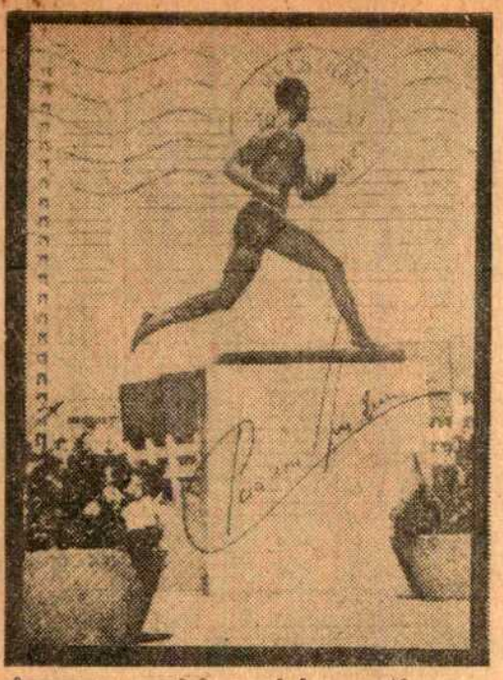

পাভো নুরমি (ফিনল্যান্ড) ঃ হেলসিঙ্কির অলিম্পিক স্টেডিয়ামের সামনে এই মূর্তিটি সগৌরবে দণ্ডায়মান।

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিক গেমসের আসরে (১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯২৮) নেমে নুর্মি মোট ১২টি পদক জয় করেন—স্বর্ণ ৯টি এবং রৌপ্য ৩টি। অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড তাঁরই। এবং এ রেকর্ড এপর্যন্ত একমাত্র স্পর্শ করেছেন রাশিয়ার মহিলা জিমন্যাস্ট শ্রীমতী লারিশা লাটিনিনা।

পাভো নুর্মি ২০টি বিশ্বরেকর্ড করার সূত্রে আদর্শ দৌড়বীরের সম্মান লাভ করেন। তাঁর সময়কালে তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর।

১৯২০ সালের অলিম্পিক গেমসের আসরে তিনি তাঁর প্রথম যোগদানের বছরে চারটি পদক জয়ী হন—১০,০০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণ, ৫০০০ মিটার দৌড়ে রৌপ্য এবং ১০,০০০ মিটার ক্রসকান্ট্রি রেসে ব্যক্তিগত ও দলগত স্বর্ণপদক।

১৯২৪ সালের অলিম্পিক গেমসে তিনি ৫টি স্বর্ণপদক জয় করে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর স্বর্ণপদক জয়—১৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, টিমরেস ক্রসকান্ট্রি রেসে ব্যক্তিগত ও দলগত। ১৯২৪ সালের অলিম্পিকে পুরুষদের অ্যাথলেটিক্সের মোট ২৭টি স্বর্ণপদক এইভাবে এই পাঁচটি দেশ পেয়েছিল—আমেরিকা ১২, ফিনল্যান্ড ১০, গ্রেটবৃটেন ৩, ইতালী ১ এবং অস্ট্রেলিয়া ১। ফিনল্যান্ডের ১০টি স্বর্ণপদকের মধ্যে নুর্মি একাই ৫টি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ১৯২৪ সালের অলিম্পিক গেমসের আগেই নুর্মি ১৫০০ মিটার, ২০০০ মিটার, ৩০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার এবং ১০,০০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন—অলিম্পিক গেমসের কয়েক সপ্তাহ আগে ১,৫০০ মিটার এবং ৫,০০০ মিটার দৌড়ে নতুন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন একই দিনে। ১৯২৪ সালের অলিম্পিকে একই দিনে দুঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে ১,৫০০ মিটার এবং ৫০০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক জয়ী হন। তাঁর নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময় দাঁড়ায় ১,৫০০ মিটার দৌড়ে ৩ মিনিট ৫২-৬ সেকেণ্ড এবং ৫,০০০ মিটার দৌড়ে ১৪ মিনিট ৩১-২ সেকেণ্ড। অপরদিকে এই দুই বিষয়ে তাঁর বিশ্বরেকর্ড ছিল—১,০০০ মিটার দৌড়ে ৩ মিনিট ৫২-৬ সেকেণ্ড এবং ৫,০০০ মিটার দৌড়ে ১৪ মিনিট ২৮-২ সেকেণ্ড। এখানে উল্লেখ্য, নুর্মির ৫,০০০ মিটার দৌড়ের বিশ্বরেকর্ড (১৪ মিঃ ২৮-২ সেঃ) ১৮ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৯২৮ সালের অলিম্পিক আসরে নুর্মি তিনটি অলিম্পিক পদক পেয়েছিলেন—১০,০০০ মিটার দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণ (সময় ৩০ মিঃ ১৮-৮ সেঃ) এবং ৫,০০০ মিটার দৌড় এবং স্টিপলচেজে রৌপ্যপদক। এই সময় ৫,০০০ মিটার দৌড়ে নুর্মির ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড অক্ষুণ্ণ থেকে যায়—তাঁর বিশ্বরেকর্ড ১৪ মিনিট ২৮-২ সেকেণ্ড এবং অলিম্পিক রেকর্ড ১৪ মিনিট ৩১-২ সেকেণ্ড। ১৯২৮ সালে ৫,০০০ মিটার দৌড়ে অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন ফিনল্যান্ডেরই ভি রিটোলা (সময় ১৪ মিঃ ৩৮ সেঃ)। ১০,০০০ মিটার দৌড়ে নুর্মি নতুন অলিম্পিক রেকর্ড (৩০ মিঃ ১৮-৮ সেঃ) করলেও তাঁর ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড (৩০ মিঃ ০৬-২ সেঃ) ভাঙতে পারেন নি।

১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক গেমস উপলক্ষে পাভো নুর্মির এক বিরাট ব্রোঞ্জমূর্তি হেলসিঙ্কি অলিম্পিক স্টেডিয়ামের সামনে স্থাপন করা হয় এবং পাভো নুর্মি এই ১৯৫২ সালের অলিম্পিক গেমসের বিশেষ আধারে পুতাশিখা প্রজ্বলিত করেন।

হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতা

ক্যালকাটা হার্ডকোর্ট টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে রমানাথন কৃষ্ণান ৬—৪ ও ৬—০ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রতিযোগিতায় তাঁর এই প্রথম যোগদান। পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৬—২ ও ৭—৫ গেমে গৌরব মিশ্র এবং চিরদীপ মুখার্জিকে পরাজিত করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেষ্ট**

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যাপক ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C-4352
Gram : AMRITA, Calcutta-3.

AMRITA

Friday 19th October, 1973
Phone: 55-5231 (14 Lines)

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

5 NOV 1973

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের লোগো
কুকমী নামের সঙ্গে অন্য
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত নেই

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

আনন্দমেলা

আশাক চৌধুরী

[১৩ বর্ষ ২৪ সংখ্যা] শুক্রবার ৯ কার্তিক ১৩৮০ বঙ্গাব্দ [মূল্য ৫০ প

অধরা রূপ ধরা দিল, আধফোটা রূপ ফুটলো,
ফিরে এল হারানো রূপ।

ফেমলো গ্লো

চোখ ধাঁধানো মন মাতানো রূপের জলুস
দেখাতে হলে অবশ্য চাই ফেমিলা-গ্লো

ছোট বড় সকলের মনের মত বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণ করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্যঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম. সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন ৩৪-১৭৮৯

।। শারদ সাহিত্যের সমারোহ ।।

মিত্র ঘোষ বাংলা পকেট বই

পাঁচদফায় পঁয়ত্রিশখানি বই বেরিয়েছে। শ্রেষ্ঠ লেখকদের নূতন বই। ভাল কাগজ, মনোহরণ ছাপা, আকর্ষক প্রচ্ছদ।

উপন্যাস : ভ্রমণ : প্রবন্ধ

আশাপূর্ণা দেবী—রেললাইন; দূরের জানালা। **অবধূত**—সাচ্চাদরবার। **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত**—অধরামাধুরী। **আশুতোষ মুখোপাধ্যায়**—মালবী মালঞ্চ। **উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**—গুপ্তেশ্বর। **গজেন্দ্রকুমার মিত্র**—তারা ভৈরবী; তবু মনে রেখো। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**—সপ্তপদীঠাকরুণ। **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য**—স্বর্ণাংকুর। **নরেন্দ্রনাথ মিত্র**—সূরের বাঁধনে। **তারাপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী**—জীবনের ওপার থেকে। **নীহাররঞ্জন গুপ্ত**—নিরালা প্রহর; কাগজের ফুল। **এন আর গুপ্ত**—কন্যা কেশবতী; রূপ ও প্রসাধন **পরিমল গোস্বামী**—বেনামী চিঠি ও হীরের আংটি। **প্রমথনাথ বিশী**—শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ; হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স। **বিমল কর**—স্বপ্নের নবীন ও সে। **বিমল মিত্র**—ফুল ফুটুক; যে যেমন। **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়**—আরো একটি। **ভৃগুজাতক**—নিজের ভাগ্য নিজে দেখুন; ভাগ্য কখন খুলবে? **প্রেমেন্দ্র মিত্র**—অষ্টপ্রহর। **প্রবোধকুমার সান্যাল**—রূপে রঙে রসে। **সুবোধকুমার চক্রবর্তী**—তারা ভেসে চলেছে। **বাণী রায়**—অর্গানের দিন। **লীলা মজুমদার**—ফেরারী। **সন্তোষকুমার ঘোষ**—অপার্থিব। **শম্ভু মহারাজ**—কেঁদুলীর মেলায়। **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়**—নীললোহিতের চেনা অচেনা। **সুমথনাথ ঘোষ**—ফাগুন কখনো যাবে না। **হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**—স্বর্ণচাঁপার দিন।

প্রত্যেকটি—২৲। গ্রাহকদের পক্ষে যে কোন তিনখানা—৪·৮০
সাধারণ ক্রেতা একত্রে ৫ খানি—৮·৫০।

ভৃগুজাতকের সেই আশ্চর্য বই

১৯৭৪ কেমন যাবে ও ভৃগুজাতক পঞ্জিকা ২৲

পেপার-ব্যাক ক্লাসিক্‌স্

প্রায় অর্ধেক দামে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে
সুন্দর কাগজ, সুন্দর ছাপা, দুদিকে মোড়া ঝকঝকে মলাট।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের	গজেন্দ্রকুমার মিত্রের	অবধূতের	বনফুলের
পথের পাঁচালী ৪৲	**কলকাতার কাছেই** ৪৲	**মরুতীর্থ হিংলাজ** ৪৲	**স্থাবর** ৬৲
প্রমথনাথ বিশীর	প্রবোধকুমার সান্যালের	অন্নদাশংকর রায়ের	
কেরী সাহেবের মুন্সী ৬৲	**মহাপ্রস্থানের পথে** ৩॥	**পথে প্রবাসে** ৩৲	

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
নতুন উপন্যাস
প্লাবন ৬॥

বিমল করের
নতুন উপন্যাস
সেতু ৪৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
হার মানলেন পরাশর বর্মা ৪॥

আশাপূর্ণা দেবীর
যার যা দাম ৫৲ দ্বিতীয় মুদ্রণ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সারি তুমি কার ৫৲ দ্বিতীয় মুদ্রণ

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অশান্ত ঘূর্ণি ৮৲ কোমল গান্ধার ৮৲

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২; ৩৪-৩৪৯২; ৩৪৮৭৯১

সোভিয়েত দেশ

গ্রাহক হোন এবং পড়ুন

১২টি ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজিতে প্রকাশিত এই সচিত্র পত্রিকাটি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী গড়ে তোলার আদর্শে নিবেদিত। পত্রিকাটি মানবিক প্রয়াসের সর্বক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্রুত ও বিস্ময়কর প্রগতির চিত্র তুলে ধরে; সোভিয়েত জাতিসমূহের জীবন ও শ্রম, শিল্প ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচয় উপস্থিত করে; আপনার হাতে তুলে দেয় বিশিষ্ট সোভিয়েত লেখকদের প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা প্রভৃতি; সোভিয়েত ইউনিয়নের নিঃস্বার্থ সহায়তায় অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে তোলার কাজে ভারতের অগ্রগতির অন্তরঙ্গ চিত্র পরিবেশন করে।

১ অক্টোবর ১৯৭৩ থেকে ৩১ মার্চ ১৯৭৪ তারিখের মধ্যে সোভিয়েত দেশ অথবা ইউথ রিভিউয়ে গ্রাহক তালিকাভুক্ত প্রত্যেকেই উপহার হিসেবে ১৩ পৃষ্ঠার একটি বহুবর্ণরঞ্জিত ক্যালেণ্ডার পাবেন।

চাঁদার হার

	১ বছর	২ বছর	৩ বছর
সোভিয়েত দেশ (পাক্ষিক) বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ও অন্য নটি ভারতীয় ভাষায়	টাঃ ৬·০০	×	টাঃ ১২·০০
ইংরেজি	টাঃ ৭·০০	×	টাঃ ১৪·০০

আপনার নাম, ঠিকানা ও ভাষা উল্লেখ করে সরাসরি নিচের ঠিকানায় মনি অর্ডার অথবা পোস্টাল অর্ডারে চাঁদা পাঠিয়ে রেজিস্টারি ডাকে ক্যালেণ্ডার নিন; কিংবা আমাদের অনুমোদিত এজেণ্টের কাছে চাঁদা জমা দিয়ে তাঁর কাছ থেকেই ক্যালেণ্ডার নিন।

সার্কুলেশন ম্যানেজার,

সোভিয়েত দেশ অফিস

১/১ উড স্ট্রীট, কলকাতা — ১৬

১৩শ বর্ষ

অমৃত

২৪ সংখ্যা
মূল্য ·৫০ পয়সা

"ইণ্ডিয়ান জ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 26th October, 1973 শুক্রবার, ৯ কার্তিক, ১৩৮০ 50 Paise

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	
৬	চিঠিপত্র	
৭	সম্পাদকীয়	
৮	ঘটনার আয়নায়	—শ্রীসমদর্শী
১২	সেই লোকটি	—শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত
১৩	ভালো আছো ?	(উপন্যাস) —শ্রীগোপাল সামন্ত
১৯	পাবলিক থিয়েটারের নটী	—শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

নতুন প্রকাশিত হল :

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর (ছোটদের বই)

এক যে ছিল বাঘ ৩

হরপ্রসাদ মিত্র-এর (কবিতার বই)

ঝাউয়ের শব্দ ৪

নিশাচর-এর — **জীবনরহস্য ৫** — অনিল রায়-এর — **নগ্ন প্রহর ৭**

কুহেলিকা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর

৫ — ৭

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-এর — **পাপ ৫** — গজেন্দ্রকুমার মিত্র-এর — **রাতের বাসা ৫**

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস (ছায়াচিত্রে রূপায়িত হচ্ছে)

তিন পরী ছয় প্রেমিক ৩

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯

বিদ্যোদয়ের বই

অনন্ত সিংহের
অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম ১১·০০
প্রথম খণ্ড

অমরেন্দ্র ঘোষের
একটি সংগীতের জন্মকাহিনী ৫·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা ৪·৫০

শ্রীমন্তের
নাম তার রূপসী ৩·৫০

সৌরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দুই স্বপ্ন ৩·৭৫

মনীশ ঘটকের
কনখল ৭·০০

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর
মধুমিতা ৬·০০
জীবনে প্রথম প্রেম ৪·৫০
ময়ূরাক্ষী ৪·০০
সোমলতা ৪·০০

গৃহকপোতী ৬·০০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
চাহার দরবেশ ৩·৫০
চলমান জীবন ৫·০০

সুশীল জানার
বেলাভূমির গান ৬·০০

কে, এম, পাণিক্করের
কেরল সিংহম্ ৬·০০

সুধীর করণের
অরণ্যপুরুষ ৪·০০

গুণময় মান্নার
লখীন্দর দিগার ৫·০০

বেদুইনের
বেগম নাজমা ফ্রাংকাইন ৩·৫০
যশাইতলার ঘাট ৩·০০

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের
পুরুষিকা ৩·২৫

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিপ্লবের সন্ধানে ১৩·০০

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৪-৩১৫৭

পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক

ভোরের স্নিগ্ধ পরশের আমেজে সারাদিন আপনাকে ঘিরে রাখে

শীতল জলে স্নানে যেমন সুখের শিহরণ জাগে···শিশির-ধোয়া ভোরে যেমন খুশীর পরশ লাগে···পণ্ডস ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালক মাখলে তেমনি মনে হবে ঝরঝরে মনোরম···সারাদিন, সারাক্ষণ। হালকা-সুবাস জড়ানো এই ট্যালক ঘাম টেনে নেয় নিমেষে আর অপূর্ব সৌরভ আপনাকে ক'রে তোলে প্রিয়-সঙ্গিনী! এই ট্যালক সারা বছর সারা শরীরে মাখা যায়।

৩ রকম সাইজে পাওয়া যায়: ম্যামিলি, লার্জ, মিডিয়াম

পণ্ডস ফেস পাউডার
এর ফেস পাউডারের চেয়ে পণ্ডসই ভালোবাসে বেশি।

নিখো-পণ্ডস ইনকর্পোরেটেড

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
২৫	আন্দ্রে মালরো		—শ্রীবিজয় দেব
২৯	সাহিত্য ও সংস্কৃতি		
৩৪	কথায় কথায়		—শ্রীতারাপদ রায়
৩৫	মধু মাস		—শ্রীদেবল দেববর্মা
৩৯	আপনি কেমন আছেন		—শ্রীঅশ্বিনী সামন্ত
৪১	অলৌকিক জলযান	(উপন্যাস)	—শ্রীঅতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৬	মনের খবর		—শ্রীতরুণচন্দ্র সিংহ
৪৮	বিজ্ঞানের কথা		—শ্রীঅয়স্কান্ত
৫১	দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস		—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৫৯	কখনো দিন কখনো রাত	(উপন্যাস)	—শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
৬০	পুনশ্চ		—শ্রীক্ষপণক
৬২	অঙ্গনা		—শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৬৩	শেকল	(গল্প)	—শ্রীশিশির দাস
৬৮	এভাবেই কাল্পনিক খেলা	(কবিতা)	—শ্রীশান্তনু দাস
৬৮	ফুরিয়ে গেছি	(কবিতা)	—শ্রীগিরিধারী কুণ্ডু
৬৮	নদী	(কবিতা	—শ্রীইরা সরকার
৬৯	সাতদিনের শুভাশুভ		—শ্রীশুভাচার্য
৭১	সাধনা বসু		—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়
৭৪	প্রেক্ষাগৃহ		—শ্রীনান্দীকর
৭৯	খেলাধূলা		—শ্রীদর্শক

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক আলোচনার
ত্রৈমাসিক
ত্রয়োদশ সংকলন
শারদ সংখ্যা : তিয়াত্তর

শ্লোক

কবিতা : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুদ্ধসত্ত্ব বসু গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় রাজলক্ষ্মী দেবী কবিতা সিংহ কৃষ্ণ ধর সুনীল বসু পবিত্র মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা গৌতম গুহ মাণিক লাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুষ্পেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় সুমিতকুমার ঘোষ সুনীল হাজরা তুষার রায়চৌধুরী দেবী রায় সুধীরঞ্জন ঘোষ রঞ্জিতকুমার সরকার আবদুস সামাদ কল্যাণ দাস ভোলানাথ শীল শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ রমাব্রত ভট্টাচার্য বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত বাদল ভট্টাচার্য।

ফাউস্ট : [অনুবাদ] গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া : সুজাতা প্রিয়ংবদা
মধুক্রম মধুমুখ [কাব্যোপন্যাস] : শিপ্রা ঘোষ
অন্ধকার যন্ত্রণা আধুনিক বাংলা কবিতা : মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী
দাম ॥ দেড় টাকা

শ্লোক ॥ সম্পাদনায় : শিপ্রা ঘোষ । মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

শ্লোক কবিতা প্রকাশনী । এল পি ১৯৭ শ্রীমা পল্লী বেহালা কলকাতা ৬০

ভ্রম সংশোধন

অমৃতর ১৩ বর্ষ ১৬ সংখ্যায় [illegible] পৃষ্ঠায় বাংলা ছোটগল্পের [illegible] সূচীতে সুনীল মজুমদারের [illegible] সুনীথ মজুমদার হবে।

গৃহিনীদের
রান্নার জন্য
খাঁটি খবর!

গৃহিণীরা
সবসময় রান্নায়
আগমার্ক গুড়ো
মশলাই ব্যবহার করুন
কারণ আগমার্কের
জিনিষ
১০০% খাঁটি হয়

ডাটা গুঁড়ো মশলা শুধু আগমার্ক যুক্তই নয় এর পেছনে রয়েছে ভারতের শ্রেষ্ঠ মশলা ব্যবসায়ী কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃর চার পুরুষের অভিজ্ঞতা। ডাটা গুঁড়ো মশলা অতি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটারীতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষিত হয়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। ফলে ডাটা গুঁড়ো মশলা সব সময় খাঁটি ও উন্নত মানযুক্ত।

ডাটা
গুঁড়ো মশলা
রান্নায় ১০০%
নিরাপদ

জনস্বার্থে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি।

চিঠিপত্র

পশু-চিন্তা, সেকালে-একালে

আমি প্রবাসী বাঙালী। অমৃতের পাঠক। 'পশু-চিন্তা সেকালে-একালে' শীর্ষক আলোচনা (শুক্রবার, ২১ ভাদ্র, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ) আমার খুব ভাল লেগেছে। প্রাচীন কালে ভারতে ও বিদেশের রাজারাও পশু-পক্ষীর বিষয় চিন্তা করতেন এখবর এবং চিড়িয়াখানা কোন দেশে কত সালে স্থাপিত হয় সেই বিষয় অবগত হলাম।

লেখক শ্রীমুখোপাধ্যায় ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন—চিত্রিকা বা চিতার অভাব সেকালে মধ্য-পশ্চিম ভারতে ছিল না। বর্তমানে তাদের বংশ ভারত থেকে লোপ পেয়ে গেছে। সে যুগে রাজারা শিকার খেলায় এই চিতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। চিতা বলতে লেপার্ড, প্যান্থারকেও বুঝায়—যেমন জিম করবেটের লেখা—রুদ্রপ্রয়াগের চিতা (ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ)। চিতা এখনও ভারতের জঙ্গলে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে তাদের গায়ের রঙে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় যে চিত্রিকা বা চিতার নাম উল্লেখ করেছেন তার নাম 'শিকারী চিতা' হবে।

সে যুগে রাজারা শিকার খেলায় এই চিতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সে যুগে রাজারা শিকার খেলার জন্যে এই চিতাকে পোষ মানাতেন ও শিকার করা শেখাতেন—সেই জন্য এই চিতার নাম হয়—শিকারী চিতা এবং এ জন্তুটি আজ পর্যন্ত সেই নামেই পরিচিত। চিতা নামটা গুলবাঘকেও বুঝায়, বাংলা ও ইংরাজি অভিধান (আশুতোষ দেব) অনুযায়ী। লেখক যে চিত্রিকা নামটা উল্লেখ করেছেন, সেটা কি স্ত্রী-চিতার নাম? যদি এ বিষয় জানান খুব উপকার হয়। বাংলা অভিধান (আশুতোষ দেব) খুঁজে চিত্রক নাম পেয়েছি। সংস্কৃত বই থেকে পেয়েছি একটা নাম চিত্রকঃ। বাংলা অভিধান (আশুতোষ দেব) অনুযায়ী—

চিতা—বাঘ; কাপড় হইতে যে ছাতা পড়ে তাহা; মেচেতা; গাছের পাতার শেওলা। চিত্র২। গুল্ম বিঃ (রাং—)। চিত্রক।

চিতা, শিকারী চিতা ও কালো চিতার গায়ে, কাপড়ে যেমন ছাতা পড়ে বা ছোপ-ছোপ দাগ পড়ে তেমনি দাগ থাকে। লেপার্ডের গায়ে গোলাপ-ফুলের মত, শিকারী চিতার গায়ে ফোঁটার মত দাগ সেইজন্যে বোধহয় এদের চিতা বলা হয়। তবে তাদের শরীরের গঠন অনুযায়ী লেপার্ড ও শিকারী চিতার আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন শিকারী চিতাকে বাংলায় —শিকারী চিতা, হিন্দীতে—শিকারী চিতা; ইংরাজিতে—হান্টিং লেপার্ড; ল্যাটিনে—অ্যাসিনোনীক্স জুবাটাস্ শেব জহ-এর লেখা বাংলায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনূদিত, 'মানুষখেকোর খোঁজে'—পৃষ্ঠা ৬৫-তে ফেলিস জুবাতা নামে শিকারী চিতার উল্লেখ আছে। এটা ভুল কি সত্য জানি না। একটি ইংরাজী পুস্তিকা থেকে শিকারী চিতার বিষয় উল্লেখ করছি, শিকারী চিতা ও চিতার মধ্যে যে প্রভেদ, আছে সে বিষয় খুব সুন্দরভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ—

The Hunting Leopard (Cheetah)

The fastest Animal on earth and a very remarkable hunter, the Cheetah is now believed to be extinct in the Wild in India.

It had established itself in the plains and lower hills of Northern and Central India, Straggling Southwards upto Mysore. It lived on Gazelle and Antelope, Small Animals and Birds, and sometimes attacked Goats and Sheep. The Cheetah hunted in pairs, rushing on its prey with astonishing pace, overtaking the victim by Sheer speed as high as 70 Kilometres an hour.

The Cheetah it may be pointed out, is not a leopard. Its unsheathed claws are less retractile Unlike those of the Panther, its Spots are Spots not Rosettes. The body is also more slender and limbs longer and slighter. It stands high and has a small, round haired tail and a tawny grey coat. It used to be trained and led about on a leash like a dog and employed for game hunting. The sport lay in watching its astonishingly swift attacks in capturing fleet-footed prey like Antelope. Emperor Akbar is stated to have kept 1,000 Cheetahs as pets.

RESERVE WILD LIFE)
(NATURE'S PRICELESS GIFT TO INDIA)

কলিকাতার (আলীপুর) চিড়িয়াখানার মূলে একজন বাঙালী পশু-প্রেমিকও ছিলেন (রায়বাহাদুর রামব্রহ্ম সান্যাল)। তাঁর বিষয় লেখক উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু পশু-প্রেমিক ছিলেন না, তাঁর প্রকৃতি পর্যালোচনায় খুব জ্ঞান ছিল এবং এইজন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন।

অমৃতে 'পুনশ্চ' ক্ষপকের লেখা থেকে তাঁর বিষয় (১২ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৪০ সংখ্যা শুক্রবার, মাঘ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ; পৃষ্ঠা—৬২) পড়লেই জানা যায়।

সুরেশ্বর গুপ্ত
(জয়রামপুর (মুন্সেফ)
বিহার।

বাহাদুর শা' জফর

গত ২৮ ভাদ্রের সংখ্যায় বাহাদুর শা' জফরের প্রবন্ধটির জন্য প্রথমতঃ আপনাকে ও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দু' একটি কথা যোগ করছি।

বাহাদুর শা' যদি শেষ 'মোগল সম্রাট' (তথাকথিত) নাও হতেন তবু তিনি বিস্মৃত হতেন না, কেননা উর্দু কাব্য-সাহিত্যে তিনি নিজের আসন স্থায়ী করে গেছেন। কোনো উর্দু কাব্যসংকলনই তাঁর কবিতা ব্যতীত পূর্ণ হতে পারে না। নিজে উল্লেখযোগ্য কবি হওয়া ছাড়াও উর্দু সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অপর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে। তাঁর সময়ে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে উর্দু সাহিত্যের যে ফোয়ারা গড়ে উঠেছিল, ঐ সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তার কথা লেখা আছে। তিনি নিজে, তাঁর কাব্যগুরু জওক এবং মির্জা গালিব ছিলেন এই ফোয়ারার তিন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে গালিবই ছিলেন শ্রেষ্ঠ, তবে বাহাদুর শা'র কবিতাও কখনো গালিবের কবিতার উচ্চমান স্পর্শ করেছে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার অবস্থা গালিবের কবিতায় অল্প পাওয়া গেলেও বাহাদুর শা'র কবিতায় তা বেশি এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় পাওয়া যায়। কেননা এর ফলভোগ তিনি যেমন করেছেন, আর কে তেমন করেছে? এদিক দিয়ে তাঁর কবিতার একটি ঐতিহাসিক মূল্যও আছে।

তাঁর কবিতায় প্রেম, ভালোবাসা, ইতিহাস, বিষাদ, ভগবদ্ভক্তি, উপদেশ প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মোগল বংশের সন্তান হয়েও, তাঁর মনে এতটুকু গর্ব ছিল না।

আমরা জানি রেঙ্গুনে নির্বাসনে ৮৭ বছর বয়সে ১৮৬২'র নভেম্বরে তাঁর মৃত্যু হয়। বিদেশে মৃত্যুপথযাত্রী বাহাদুর শা' দেশের দু'গজ জমির জন্য কেঁদেছিলেন।

বাহাদুর শা'কে স্বাধীনতা সংগ্রামী বলতে সকলে রাজী হবেন কিনা জানি না, তবে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রামী তাঁরই মতো বাইরে থেকে ভারতের মাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে ছিলেন এবং এই সহমর্মিতার কথা স্মরণ করেই বাহাদুর শা'র দীন কবর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি নেতাজী সুভাষ।

বাহাদুর শা'র বহু বিপদীর মৎকৃত কাব্যানুবাদ বহু পত্রপত্রিকায় গত কয়েক বছর ধরে বেরিয়েছে। গত বছর 'সম্রাট কবি বাহাদুর শা এবং কবি-সম্রাট মির্জা অসদুল্লা খাঁ গালিব' নামে আমার একটি বৃহৎ প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে কয়েকমাস একটি মৈত্রিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

সত্য গঙ্গোপাধ্যায়,
ভবানীপুর, চুঁচুড়া।

সম্পাদকীয়

পশ্চিম এশিয়ার অশান্তি

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইস্রায়েল আরব জগতের এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে নেবার পর পশ্চিম এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হয়। মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের জমি গ্রাস করে ইস্রায়েল দম্ভের সঙ্গে বলে যে, কোনো কারণেই সে এই অধিকৃত জমি ছেড়ে দেবে না। ইস্রায়েলের নিরাপত্তার জন্যই নাকি তার এই জমিটা দরকার। দুই বিঘা জমির জমিদারবাবুর মতোই তার বক্তব্য ছিল 'পেল্লো দুই বিঘে প্রস্থে ও দীর্ঘে সমান হইবে টানা।' রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত নির্দেশ সে প্রত্যাখ্যান করে। বিশ্বজনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ইস্রায়েল তার সামরিক ক্ষমতার জোরে আরব ভূমি দখল করে রাখে।

বৃটিশ সরকার প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রদত্ত 'বালফোর ঘোষণা' অনুযায়ী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে আরব ভূমিতে নতুন ইহুদী রাষ্ট্র ইস্রায়েল প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দেয়। আরবদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে দেশ-বিদেশ থেকে ইহুদীদের পাঠিয়ে ইস্রায়েলে ইহুদী সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইস্রায়েল রাষ্ট্রের উচ্ছেদ করার প্রশ্ন এখন আর নেই। কিন্তু ইস্রায়েলের জঙ্গীপনা এবং তার আগ্রাসী নীতি গোটা আরব দুনিয়ার পক্ষে একটা স্থায়ী বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা ভাবা যায় না যে, এই সময়ে একটা রাষ্ট্র শুধু তার সামরিক শক্তির জোরে অপর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শুধু দখল করেই রাখবে না, তার জন্য বড়াইও করবে।

১৯৬৭ সালে ইস্রায়েলী আক্রমণের সামনে মিশর ও সিরিয়া পরাজিত হয়েছিল। সিনাই উপদ্বীপ, গোলান মালভূমি এবং জেরুজালেম শহরসহ জর্ডান নদীর পূর্বতীর জঙ্গী ইস্রায়েলের দখলে চলে যায়। ইস্রায়েলী বাহিনী সুয়েজের পূর্বতীরেও শক্ত সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে, বলতে গেলে, মিশরের বুকের ওপর কামান উঁচিয়ে বসে থাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশে সেবার যুদ্ধবিরতি হলেও ইস্রায়েল তার অধিকৃত এলাকা ছাড়তে অস্বীকার করে। বর্তমান যুদ্ধ তারই প্রতিক্রিয়া এবং বলা বাহুল্য ইস্রায়েলের জঙ্গী এবং অনমনীয় মনোভাবই পশ্চিম এশিয়ার এই অশান্তির জন্য দায়ী।

ইস্রায়েলী বিমানবাহিনী বেপরোয়াভাবে মিশরে ও সিরিয়ায় অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে বহু নিরপরাধ নাগরিক ও বিদেশীদের হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে ভারতীয় নরনারীও আছেন। রুশ দূতাবাসের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা চল্লিশজন রুশ নাগরিককে হত্যা করেছে দামাস্কাসে। আশ্চর্য এই যে, এর জন্য ইস্রায়েল সরকার কোনো দুঃখ প্রকাশও করেন নি। এমনি তাঁদের শক্তির দম্ভ। ইস্রায়েলের সমর্থক আমেরিকা ও তার অনুচররা বলছেন, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় উভয় দল ফিরে যাক। তাতেই নাকি পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অথচ রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে অনেক আগেই ইস্রায়েলকে তার অধিকৃত এলাকা ছেড়ে ১৯৪৮ সালের সীমারেখায় ফিরে যেতে বলেছিল, সে প্রস্তাবের কথা তাঁরা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন। এভাবে একটি আগ্রাসী শক্তিকে তোয়াজ করার অর্থ পশ্চিম এশিয়ায় অশান্তি জীইয়ে রাখা এবং আরবদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা। এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এবারের ইস্রায়েলী আক্রমণ মিশরীয় বাহিনী সার্থকভাবে প্রতিহত করেছে। গত বারের যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনী সিনাই উপদ্বীপ পরিত্যাগ করে সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এবারের যুদ্ধে মিশর সেই পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পেরেছে। সুয়েজ খালের পূর্বতীরে ইস্রায়েলীদের শক্ত সামরিক ঘাঁটি সম্পূর্ণভাবে মিশরীয় বাহিনীর দখলে। তাঁদের অগ্রগতি প্রতিহত করা সম্ভব হয় নি। স্থলযুদ্ধে কাবু হয়ে ইস্রায়েলীরা বিমান আক্রমণের দ্বারা প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো সুফল লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ, রণাঙ্গনের বাইরে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর বেপরোয়া বিমান আক্রমণ চালিয়ে সামরিক বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করা যায় না। লক্ষ্যণীয় যে, এবার সমস্ত আরব দেশই মিশর ও সিরিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আরব জাতির হাতে আরেকটি অমোঘ অস্ত্র আছে—তেল। আমেরিকাকে তার কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

তা ছাড়া আরব জাতির পাশে রয়েছে বিশ্বজনমত। বৃহৎ শক্তি হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন ও সহযোগিতাও রয়েছে তার পক্ষে। সুতরাং আমেরিকা ইচ্ছা করলেই ইস্রায়েলের স্বপক্ষে সেখানে এত সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। দুঃখের বিষয় আমেরিকার নেতিবাচক ভূমিকার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বস্তিত পরিষদ এই যুদ্ধ অবসানে কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারছে না। ইস্রায়েলের বোঝা উচিত যে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে যে আরব ভূমি সে দখল করেছে তা না ছাড়লে সে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। এমনকি মহাশক্তিধর আমেরিকাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। বিশ্বজনমত তার এই জঙ্গীপনার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার দেয়। এই অশান্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার।

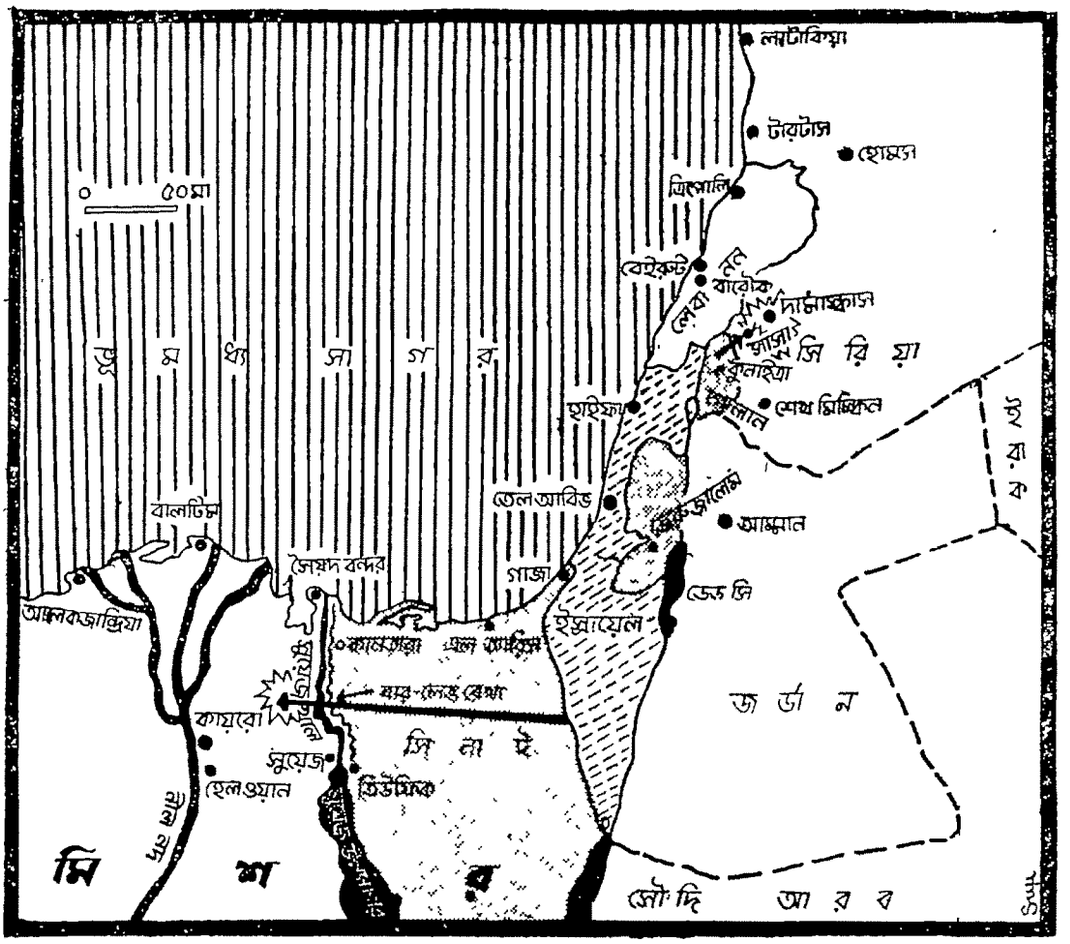

ঘটনার আয়নায়

যুদ্ধের অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান ঘটিয়ে স্বস্তির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করাই তো স্বস্তি পরিষদের লক্ষ্য এবং ব্রত। শুরুটা মোটামুটি ঠিকই হয়। কিন্তু শেষটা? যুদ্ধের দামামা বাজলেই চারদিকে যখন গর্জন এবং হুংকার ছড়িয়ে পড়ে তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বসে স্বস্তি পরিষদের জরুরী অধিবেশন। এই বৈঠকে শুরু হয় নানা আলোচনা। যুদ্ধরত পক্ষগুলির সমর্থকদের মধ্যে দেখা দেবে নানা সংঘর্ষ। যাদের অনেকরকম সুবিধা ভোগ করে তারা বলে যুদ্ধ চলুক, যারা অসুবিধায় পড়ে তারা অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিতে বলবে পরিষদকে। তারপর স্বাভাবিক পর্যায়ে আসে সাময়িক যুদ্ধবিরতির নির্দেশ। অর্থাৎ যে যেখানে অবস্থান করছে, সে সেখানেই থাকবে। তারপর ক্রমপর্যায়ে চলবে দীর্ঘতর আলোচনা কি করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। এবারকার আরব-ইস্রায়েলের যুদ্ধে স্বস্তি পরিষদের এই চেনা শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের কোন ব্যতিক্রম এখনো পর্যন্ত ঘটে নি। আশ্চর্যের বিষয় বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে কেউই স্বস্তি পরিষদের জরুরী অধিবেশনের জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করে নি। কারণটা হয়তো স্পষ্টই। মিশর এবং সিরিয়ার একমাত্র লক্ষ্য কি করে অতি অল্প সময়-সীমাতে হারানো অঞ্চল ফিরে পাওয়া যায়। ওদিকে প্রতিপক্ষ ইস্রায়েলের সঙ্কল্প—দ্রুততর বেগে শত্রুপক্ষকে পুরনো জায়গায় আবার ঠেলে দিতে হবে। সুতরাং এবারে পরিস্থিতি খুব সহজ নয়। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের নির্দেশ, কিম্বা যুদ্ধবিরতি—কি ঘটবে তা পূর্বাহ্নে বলা সম্ভব নয়। কেননা একথা সবারই জানা, ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত সময়ের সীমান্ত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক আবহাওয়ার অনেক রং বদল হয়েছে। সুতরাং ফয়সালা হয়ে গেল বলাতেই ফয়সালা হতে পারে না। রক্তক্ষয়ের যুদ্ধের হুংকারের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই আসে আরবের তেলের একাধিপত্যের প্রশ্ন। তাও আশ্চর্যের কেউ নয়। কেমন স্বস্তি পরিষদ নয়, তেমনি আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপও নয়।

একথা ঠিকই, চিন্তার ভার কিন্তু এখন বেশী করে বইতে হচ্ছে আমেরিকাকে। মার্কিন যত্নে লালিত ও অস্ত্রে গর্বোদ্ধত ইস্রায়েল আজ জটিলতর প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে। মিশরীয় বাহিনী একেবারে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল সুয়েজের পূর্ব পাড়ে। আগুন জ্বলছে সিরিয়ার গোলান হাইটসেও। প্রচণ্ড লড়াই হয়তো হবে এখানে, ইস্রায়েল কোনমতেই এই অঞ্চলকে তাদের হাত ফসকে যেতে দিতে চাইবে না, যদিও আপাতত তা হাত-ছাড়াই হয়ে গেছে। বিপদের কালো মেঘ আরো ঘনীভূত হবে পশ্চিম এশিয়ায়, যদি যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। অসম্ভব রণোন্মাদনায় মত্তীয়া হয়ে উঠবে ইস্রায়েল, তার সমব্যথী আমেরিকাও এগিয়ে আসতে পারে সাহায্যের ডালি নিয়ে। তখনই আরব রাষ্ট্রগুলি হয়তো বন্ধ করবে তেল রপ্তানি। তাতে যেমন অসুবিধা হবে আমেরিকার, তেমনি ইউরোপে দেখা দেবে তীব্রতম শিল্পসঙ্কট। একটা লক্ষণ কিন্তু ঘটনার গতিবিধি থেকে মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে যে, পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো মার্কিনী প্রয়াসের সঙ্গে সুর মেলাবে না। তাই সঙ্গত কারণেই এ ব্যাপারে বেশ কিছুটা তৎপর হয়ে উঠতে হয়েছে আমেরিকাকে। মার্কিনী অনুরোধেই স্বস্তি পরিষদের জরুরী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমেরিকাই প্রস্তাব দিয়েছে স্বস্তি পরিষদ অবিলম্বে নির্দেশ দিক যুদ্ধ-

বিরতির এবং বিবদমান পক্ষগুলিকে যুদ্ধপূর্ব সীমানায় ফিরে যেতে। কিন্তু আমেরিকাও খুব ভাল করে জানত যে প্রস্তাবটা গৃহীত হওয়া খুব সহজ নয়। কারণ সত্যিই আসল সমস্যাটা আরো জটিলতর। এখন যে জায়গায় যুদ্ধ চলছে সেটা ইস্রায়েলের নিজস্ব কোন অঞ্চল নয়, ওটা সে দখল করে নিয়েছিল ১৯৬৭-র যুদ্ধে। স্বস্তি পরিষদ সে সময় ইস্রায়েলকে নির্দেশ দিয়েছিল অধিকৃত আরব অঞ্চল সে ছেড়ে দিক। কিন্তু সেই নির্দেশে কান দেয় নি ইস্রায়েল। এবারকার স্বস্তি পরিষদের অধিবেশন যদি মার্কিন প্রস্তাব অনুমোদন করতো তাহলে ১৯৬৭র নির্দেশ কি শুধু নির্দেশেই ফুরিয়ে যেত না? তাই খুবই যৌক্তিকতার সঙ্গে আমেরিকার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে রাশিয়া। রাশিয়া বলেছে, স্বস্তি পরিষদের যে কোন নতুন প্রস্তাবেই ১৯৬৭র নির্দেশ থাকতে হবে। আসল কথা হোল, আরবের যে অঞ্চল ইস্রায়েল ছিনিয়ে নিয়েছিল তাকে অবিলম্বে ছেড়ে দিতে হবে। রাশিয়ার নিশ্চিত ধারণা, ইস্রায়েলের রণোন্মত্তার প্রচণ্ডতম অহংকারই পশ্চিম এশিয়ার আকাশে বাতাসে আবার নতুন করে যুদ্ধের বিষ ছড়িয়েছে।

যে যুদ্ধ পশ্চিম এশিয়ায় শুরু হয়েছে তার প্রতিটি মুহূর্তেই সত্যি গুরুত্বপূর্ণ, এর প্রতিক্রিয়া অনেক দেশের গভীরেই আন্দোলন তুলবে। ইস্রায়েল যদি মিশরীয় বাহিনীকে প্রতিহত করে সুয়েজের ওপারে তাকে হটিয়ে দিতে পারে, তাহোলে তো পশ্চিম এশিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দেবে। যেমন, সে ঘটনা ঘটার আগেই হয়তো রুখে দাঁড়াতে পারে রাশিয়া। ওদিকে ইস্রায়েলও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যাবে, এটা আমেরিকা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। কিন্তু তাহোলে কি সোভিয়েট-আমেরিকার কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে? না। এই দুই পক্ষই প্রত্যক্ষভাবে কোন পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী নয়। তবে যুদ্ধের প্রতিটি দিকে থাকবে সোভিয়েট ও মার্কিনের সতর্ক দৃষ্টি। একের লক্ষ্য থাকবে অন্যের ওপর। এবং সারা পৃথিবী রুদ্ধশ্বাসে সময় গুনবে, কখন শান্তি ফিরে আসে।

* * *

সবারই জানা যে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অনেক আগেই নানা প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় শাসনভুক্ত এলাকায় বিভক্ত হয়েছে। এর পর আরো বিভাগের প্রশ্ন এলে সামগ্রিক অখণ্ডতাই যে বিপর্যস্ত হবে, এ সত্যও যথেষ্ট যুক্তির দৃঢ়তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বেশ কিছু বিচ্ছেদপন্থী মনোভাব যে এখনো সক্রিয় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসাম সফরের সময়। গৌহাটিতে তিনটি পার্বত্য প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়েছেন যে, সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক উন্নতির পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁরা সব সময়েই উপেক্ষিত হয়ে এসেছেন। যদিও তাঁরা নতুন কোন প্রদেশের জন্য সোচ্চার দাবী তোলেননি, তাহোলেও তাঁদের আলোচনা ও বক্তব্য প্রকাশের ধারা থেকে বোঝা যায় যে চলতি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কাঠামোয় তাঁরা সন্তুষ্ট নন। মিকির পার্বত্য জেলা পর্ষদ তো জোর দিয়ে বলেছে বিচ্ছেদপন্থীদের আন্দোলন একটি সময়োপযুক্ত পদক্ষেপ। যে স্মারকলিপি এরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ের পার্বত্য লোকদের তুলনায় আসামের পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা প্রাধান্য পেয়েছে কম।

দাবী যাই হোক, যুক্তি যে আলোতেই স্পষ্ট হয়ে উঠুক না কেন, প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলকে আরো বিচ্ছিন্ন করেকটি অঞ্চলে কিছুতেই ভাগ করা হবে না। তিনি বলেছেন, বিচ্ছেদপন্থী মনোভাব শুধু হতাশার কথাই মুখর করে তোলে। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, প্রতিনিধিদের এই মনোভাব বা এই নিয়ে কোন আন্দোলন পার্বত্য অঞ্চলের লোকদের কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান করতে পারবে না। তাদের আসল সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা আছে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার দরুন। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই কেন্দ্রীয় সরকার সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ়তর করার সংকল্প নিয়েছেন এবং নানা রকম পরিকল্পনার কাজও এদিকে লক্ষ্য রেখেই এগিয়ে চলেছে। এরই জন্য তৈরী হয়েছে উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক পর্ষদ। এই পর্ষদের দায়িত্ব অনেক গুরুত্বের এবং এটা সবাই আশা করে যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলবে এই পর্ষদ।

কোন্ প্রদেশ বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের প্রয়োজন যে কতোটা, সে সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও অখণ্ড দৃষ্টি দিতে হবে পর্ষদকে। অবশ্য একথা ঠিকই, প্রয়োজন সবারই প্রায় এক—সেটা হোল অর্থনৈতিক

আমার শৈশব

জন্ম থেকে শৈশব পর্যন্ত শিশুটির প্রতিটি উল্লেখ্য ঘটনায় নথী ও ছবি রাখার বাঙলায় একমাত্র বই।

● জন্মদিনে ও অন্নপ্রাশনে উপহারে অনন্য ● যে-বই উপহার দিয়ে খুশি হবেন ○ যে-বই শিশুটির সঙ্গী থাকবে সারা জীবন।

বহু বর্ণের বহু ছবি, ছাপা বাঁধাই ও পরিসাজে অদ্বিতীয়

আমার শৈশব

শিশুদের মনে জাগাবে সুন্দর জীবন গড়ার কল্পনা!

মূল্য : পনর টাকা

শোভন : পঁচিশ টাকা

[উপহারে যোগ্য সুদৃশ্য বাক্স সমেত]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯ [৩৫-৭৬৬৯]

কাঠামোর আসল সংস্কার। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বারবার গৌহাটির জনসভায় জোর দিয়ে বলেছেন, এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে সংঘবদ্ধ শিল্পোন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দিকে। শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন বর্তমান অবস্থায় এই অঞ্চলে ছোট ছোট শিল্পপ্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এতে ফলও পাওয়া যাবে অনেক বেশী কেননা, বড় শিল্পের দিকে নজর এখনই দিলে অনেক বেশী আর্থিক ঝুঁকি নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। মিকির এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি আসামের একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। আসাম সরকারকে একথা এইসব পার্বত্য অধিবাসীদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে মেঘালয়ের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে না যাওয়ায় তারা কোন প্রকারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কেননা তারা যদি প্রত্যাশিত মানবিক ব্যবহার না পায় স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে নতুন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবী তুলবে। ইতিমধ্যে অভিযোগ তো উঠেইছে যে সর্বপ্রকার 'অর্থনৈতিক উপেক্ষার শিকার' হোচ্ছে তারা। আমাদের কথা হোল যে কোন ধরনের ক্ষোভ এবং জানাক না কেন, সেগুলো সম্পর্কে একটু সতর্ক এবং সহানুভূতি-শীল দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আসাম সরকার তো নিশ্চয়ই এটা চান না যে পার্বত্য জাতিদের বিরুদ্ধে একপেশে নীতির ফলে তাদের অখণ্ডতা আবার বিপন্ন হোক।

• • •

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে পশ্চিমবঙ্গের দুরূহ খাদ্যসমস্যা সমাধান-কল্পে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং 'রাজ্য খাদ্য কর্পোরেশন' গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর নতুন করে প্রচেষ্টা তারই প্রমাণ তুলে ধরে নিশ্চয়ই। নির্দিষ্ট কোন মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর যে আলোচনা হয়েছিল, তা ফলপ্রসূ না হোলেও এ ব্যবসায়ীদের প্রতি খাদ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস বোধ হয় বিপর্যস্ত হয়নি। তাঁর প্রতিশ্রুতি এ ব্যাপারে রক্ষিত না হোলেও তিনি সম্প্রতি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ীরা সরকারকে তাদের পথ অনুসরণ করবার জন্য কোন 'চ্যালেঞ্জ' জানাচ্ছে না। তাই তিনি স্থির করেছেন যে এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে খাদ্য কর্পোরেশনের ব্যাপার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরীর চেষ্টা করবেন।

একথা তো ঠিকই খাদ্যমন্ত্রী সরকার ব্যবসায়ীদের যে সহযোগিতা চেয়েছেন তা এই বর্তমান খাদ্যসংকটের মোকাবিলার একান্তভাবে প্রয়োজন। মনে হয় এই গোষ্ঠীকেই বর্তমান অবস্থায় এক প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। যদিও কয়েকটি সিদ্ধান্ত রূপায়িত হয়নি, কথায় ও রূপায়ণে পার্থক্য থেকেছে অনেক, তবুও খাদ্যমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা সম্পর্কে আগ্রহী। কারণ তা না হলে যে উপায় বাকী থাকে তা হোল—খাদ্য ব্যবসাকে সরকারী আয়ত্তাধীনে নিয়ে আসা। কিন্তু বর্তমান জটিলতর অবস্থায় এ পদক্ষেপ নিশ্চয়ই সুচিন্তিত হবে না। কিন্তু একটু শক্ত হাতে এই খাদ্য ব্যবসায়ীদের সহযোগিতাটা আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। ব্যবসায়ের অসাধুতা দূরীকরণের যে নিয়ম বা আইন সরকার প্রচলন করেছেন তার একটু কঠোর প্রয়োগ করলেই অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশখানিকটা উদ্বিগ্ন হবেন এবং সেই সূত্রে এ ব্যাপারে সৎ যশা তাঁরা উৎসাহবোধ করবেন। তার ফলেই সম্ভবত স্বতোৎসারিত সহযোগিতা আসবে।

খাদ্যমন্ত্রী আশা করেন, প্রস্তাবিত রাজ্য খাদ্য কর্পোরেশন কেন্দ্রের অনুমোদন লাভ করবে, কেননা এর অর্থ দেবে ব্যাঙ্ক। এই কর্পোরেশন কিছু জিনিস পশ্চিম-বঙ্গের বাইরে থেকে ক্রয় করবে এবং তা বিলি করা হবে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে। যদিও বর্তমান খাদ্যমন্ত্রীর পূর্ব-সূরীর আমলে খাদ্যদপ্তরের নতুন শাখাটির কর্মতৎপরতা তেমন স্পষ্ট হয়নি, তবুও বলবো, এবারে এই প্রচেষ্টাকে বোধহয় বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে এ পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করতে গেলে যে প্রশাসনিক দৃঢ়তার প্রয়োজন তা গ্রহণ করতে কোন দ্বিধাবোধ করলে চলবে না। কেননা এটা তো সত্য অনেক ভালো এবং বড়ো বড়ো পরিকল্পনা নানা দুর্নীতি এবং অসাধুতার চাপে একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

• • •

মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্পিরো অ্যাগনিউকে নিয়ে যে বিতর্ক ও নানারকম জল্পনাকল্পনা বেশ কিছুদিন ধরে চলছিল তার অবসান হয়েছে। প্রথম দিকে বেশ দাপটে কথা বললেও, শেষের দিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের চাপে তাঁকে বেশ খানিকটা বিপর্যস্ত হোতে হয়। স্পর্ধিত কণ্ঠে কথা বলা সমীচীন না মনে করে অ্যাগনিউ শেষ পর্যন্ত নাটকীয় সংঘাতের যবনিকা টেনে দিলেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি পদত্যাগ করলেন। অ্যাগনিউ-এর সিদ্ধান্ত মার্কিন জন-সাধারণ, সরকারী মহল, ও সংবাদপত্রের জগতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কেউ হয়েছেন ক্ষুব্ধ, কেউ ফেলছেন স্বস্তির নিঃশ্বাস। প্রেসিডেন্ট নিকসন খুব কথিত হয়ে বলেছেন অ্যাগনিউ-এর পদত্যাগ তাঁর পক্ষে একটা সুগভীর ব্যক্তিগত ক্ষতি। অ্যাগনিউর স্টাফ সেক্রেটারী তো চোখের জল ফেলতে ফেলতেই ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। যাই হোক, এ কথা নিশ্চয়ই সত্য যে অ্যাগনিউকে হার মেনেই কিনায় নিতে হয়েছে।

অ্যাগনিউকে নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী যখন প্রেসিডেন্ট নিকসনের মাথার ওপর আকস্মিকভাবে ভাবী একটি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল, যখন তিনি প্রায় নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই নতুন করে আবার বিপদ এসে দাঁড়ায়। সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাগনিউর বিরুদ্ধে দুটি গুরুতর অভিযোগ আছে। এই দুটি অভিযোগ হোল ঘুষ নেওয়া ও আরকর ফাঁকি দেওয়া। এই চাঞ্চল্যকর খবরটি ফাঁস হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনী মহলে বেশ উত্তেজনা দেখা দেয়। কিন্তু নিকসন প্রথমে এই খবরের ওপর বিশেষ একটা গুরুত্ব দেননি এবং অ্যাগনিউও সরাসরি অস্বীকার করেছেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু করলে কি হবে। তথ্যফাঁসকারী সংবাদপত্র তো নাছোড়বান্দা। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রচার চলতেই থাকে। অ্যাগনিউ সংবাদপত্রকে তাঁর ভাষায় হুঁশিয়ারও করে দেন। এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য আদালতেরও সাহায্য নেন। কিন্তু মার্কিন গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে সংবাদপত্র তার সংকল্পে অটুট থেকে যায়, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর নজীর দেখিয়ে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অ্যাগনিউ-বিরোধী আন্দোলন অপ্রতি-হতভাবেই চালিয়ে যেতে থাকে।

একথা স্বীকার করে নিতেই হবে যে নতিস্বীকার করতে হয়েছে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্টকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অকপটে তিনি স্বীকার করেছেন ১৯৬৭ সালে যে অর্থ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা তিনি রাজনৈতিক কারণে ব্যয় করেননি, এবং সেইজন্য দেয় আয়কর তিনি সরকারকে জমা দেননি। এই স্বীকারোক্তির পর অ্যাগনিউ পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর দশ হাজার ডলার জরিমানা আদালত ধার্য করেছেন এবং তিন বছরের প্রোবেশন থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যান্য অভিযোগের তদন্ত চলবে এবং আদালতে তাঁকে হাজির হোতে হবে সাধারণ নাগরিকের মতোই।

অ্যাগনিউ তো মোটামুটিভাবে সরে গিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু নিকসন? আপাত-দৃষ্টিতে মনে হবে তিনি এক অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে ছাড়া পেলেন। কিন্তু এতে তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার ভার কি কিছু কমলো? মনে হয়, মোটেই না। হোয়াইট হাউস এখন থেকে সবার সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে থাকবে। ওয়াটারগেটের কেলেঙ্কারীর মামলার যতোদিন পর্যন্ত না একটা সুষ্ঠু

সমাধান হয় ততদিন পর্যন্ত সবাই সতর্ক দৃষ্টিতে দেখবে নিকসনকে। কি সংবাদপত্র, কি সাধারণ, সবার সামনেই বেশ সতর্কভাবে চলতে হবে মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে। অ্যাগনিউ মামলা হয়তো ওয়াটারগেটের উত্তেজনা কিছুদিনের জন্য প্রশমিত করেছিল, কিন্তু অ্যাগনিউ-এর পদত্যাগের পর আবার সেই ঝড়ের দিকেই ছুটে যাবে মার্কিন সমালোচকদের দৃষ্টি। বোঝাই যাচ্ছে ভাগ্যবিধাতা নিকসনের ওপর মোটেই সুপ্রসন্ন নন। এমন বেকায়দায় বোধহয় আর কোন মার্কিন প্রেসিডেণ্টকে পড়তে হয়নি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, অ্যাগনিউ-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এবং তাঁর স্বীকারোক্তি মার্কিন প্রেসিডেণ্টের ওপর জাতির সামগ্রিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা মর্মান্তিকভাবে শিথিল করে দিয়েছে। সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়ে প্রেসিডেণ্ট নিকসন কি করে এমন একজন সহকারী নিযুক্ত করলেন যিনি সাধারণ অর্থলোভী রাজনীতিবিদের মতো নির্বাচনের সব টাকা আত্মসাৎ করলেন এবং বেমালুম আয়কর ফাঁকি দিলেন। এর পরও কি প্রেসিডেণ্ট নিকসন মার্কিন জনসাধারণের কাছ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি আশা করতে পারেন?

এ ছাড়াও আর একটি চিন্তাও নিকসনকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করছে। অ্যাগনিউ-এর জায়গায় আর একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তাঁকে এখনই নিযুক্ত করতে হবে। যে ব্যক্তিকেই তিনি মনোনীত করুন না কেন মার্কিন কংগ্রেসের দুপক্ষেরই সমর্থন তাঁকে পেতে হবে। ওদিকে ডেমোক্রাট দল মনোনীত প্রার্থী সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন। তাই নিকসন এখন মোটামুটি নিরাপদ।

অ্যাগনিউকে কেন্দ্র করে মার্কিন সংবাদপত্রের যে প্রয়াস চলছিল তাকে শেষ পর্যন্ত আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে থাকা যায় না। গণতন্ত্রের কাঠামোকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে সংবাদপত্রের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, সেটা এ ব্যাপারে প্রোজ্জ্বলভাবে হোল। নির্ভীকতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার যে উজ্জ্বল নজীর তাঁরা স্থাপন করলেন, তাকে প্রশংসা জানাতেই হবে। সত্য এবং ন্যায়ের খাতিরে এইভাবে দিনের পর দিন দেশের প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে তাঁদের দুর্নীতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ এবং সতর্ক করে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়। পরিশেষে অবশ্য এটা যোগ করা দরকার, অ্যাগনিউও পদত্যাগ করে গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি সম্মান জানালেন।

* * *

তৃতীয় বেতন কমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। এবং এরই সঙ্গে উঠছে ক্ষোভের সুর। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা বেতন কমিশনের প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে যতো প্রতিকূল মনোভাব প্রকাশ করুন না কেন, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করলে কমিশনের মনোভাব ও প্রয়াসকে খুব একটা অনুদার বা অমানবিক বলে মনে হয় না। এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের প্রস্তাবগুলোকে কিছু বদলদল করেছেন এবং সেই পরিবর্তনে কর্মচারীদের মঙ্গলই হয়েছে। সর্বনিম্ন বেতন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বেতন কাঠামোর রূপান্তর করে কেন্দ্রীয় সরকার এটাই প্রমাণ করছেন যে, সব নীতিরই মূল লক্ষ্য হোল সুষ্ঠু সামাজিক বিচার। মহার্ঘ ভাতা ও বাড়ী ভাড়ার ভাতা সম্পর্কে ফর্মুলা অন্যান্য কর্মচারীদের মতো তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষেও প্রযুক্ত হয়েছে।

হোতে পারে, যা প্রত্যাশা ছিল, সরকার তার অনেক কম পূরণ করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের এটা সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে সরকারী চাকরীর আওতার বাইরে অনেকেই আছে যারা নীরবে শুধু দুঃখ সহ্য করে যাচ্ছে, এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতনের কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

তা ছাড়া বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারতবর্ষের সম্পদের কথাও ভাবতে হবে, ভাবতে হবে এই পরিস্থিতিতে সবদিক নজর রেখে কতটা সরকার দিতে পারেন। সবারই বোধহয় জানা যে, চলতি বছরের বাজেটে ৮৫ কোটি টাকার মতো ঘাটতি দেখানো হয়েছে এবং এতে তৃতীয় বেতন কমিশনের প্রস্তাবের ওপর দেয় কিছুর উল্লেখ নেই। অর্থাৎপক্ষে বেতন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে আরো ২৯৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত বোঝা ঘাড়ে নিতে হবে। এতে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে যাবে স্বাভাবিক ধীতিতেই। এর জন্য নানারকম উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাকে হয়তো সংক্ষিপ্ত করে দিতে হোতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করতে হবে। যদি অতীতের অভিজ্ঞতা কোন পথপ্রদর্শক হয় তাহোলে বলা যায় নানা রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের তরফ থেকেও দাবী উঠবে। এই দাবী পূরণের প্রশ্ন বিবেচনা করতে গেলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলোকে রাজ্যের সিকেও সঞ্চালিত করতে হবে।

তৃতীয় বেতন কমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত কর্মচারীদের কিছু ভালো করলেও সামগ্রিকভাবে স্থায়ী কোন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য শুধু বেতন কমিশন বসিয়েই মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপদমুক্ত করা সহজ নয়। সর্বপ্রথম দ্রব্যমূল্য সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করতে হবে। এবং এতেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিহিত আছে।

১২ অকটোবর পর্যন্ত খবর যা জানা যায়, তাতে ইস্রায়েলী সৈন্যরা এখন দামাস্কাস থেকে আর মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে এবার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মুখোমুখি। দিকে সিরিয়া তার রাজধানী রক্ষায় প্রচুর সৈন্য মোতায়েন করেছে। সিরিয়াও খবরই প্রকাশ গোলান হাইটস অঞ্চলে ইস্রায়েলী সৈন্যের সঙ্গে প্রচণ্ডরকমের ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলছে। 'গোলান হাইটসের সবটাই এখন আমাদের হাতে,' দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন একজন ইস্রায়েলী অফিসার। একজন সামরিক মুখপাত্রের মতে গোলান হাইটসের ওপরে সিরিয়ার অনেক বিমানকে প্রতিরোধ করে নামানো হয়েছে। ইস্রায়েল দাবী করছে মিশর এবং সিরিয়া মিলিয়ে বিপক্ষের ২০০ বিমানকে তারা ভূপাতিত করেছে। কিন্তু দামাস্কাসের একজন সামরিক অফিসারের মতে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই দামাস্কাসের আশেপাশে ১৬টি ইস্রায়েলী বিমানকে ভূপাতিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে সিরিয়া-ইস্রায়েল সংঘর্ষে এ পর্যন্ত তিনটি ইস্রায়েলের যুদ্ধজাহাজ বন্দরের কাছে নিমজ্জিত হয়েছে।

ওদিকে ইস্রায়েল-মিশর সীমান্তে চলছে প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধ। মিশরীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল সাদ এল চাজলি বলেছেন, সিনাই অঞ্চলে ১০০০ ট্যাঙ্ক আনা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৮০০ই লাগানো হয়েছে যুদ্ধে। যুদ্ধস্থল পরিদর্শন করে তিনি আরো জানিয়েছেন ৪০০ ইস্রায়েলী ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়েছে। মিশর আরো দাবী জানিয়েছে যে সিনাই অঞ্চলে দুটি ইস্রায়েলী রেডার স্টেশন চুরমার করে দিয়েছে এবং সুয়েজের ওপরে একটি ইস্রায়েলী নৌবহরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। প্রথম মিশরীয় সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যে মিশরের নৌবাহিনী শত্রুপক্ষের তিনটি মিসাইল বণতরীকে চিনতে পেরে প্রথমেই তার মধ্যে একটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এবং পরে রকেট ও নৌবহরের সাহায্যে দুটিকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। মিশরীয় সেনাদল হাম মাটন ও বিরাট শত্রুপক্ষের ওপর রকেট আক্রমণ চালিয়েছে। এবং সব শেষে সেখানে তাণ্ডিনস্ফলিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। দুটি ইস্রায়েলী প্যাটন ট্যাঙ্কও চালকসহ ধরা পড়েছে।

বলা হয়েছে, কয়েক হাজার মিশরীয় সৈন্য সুয়েজ পার হয়ে সিনাই অঞ্চলে জমায়েত হয়েছে। খবরে প্রকাশ, এই সৈন্যরা তাদের খাদ্যদ্রব্য বা অন্যান্য অস্ত্র পেতে কোন অসুবিধা বোধ করছে না। সুয়েজের পাশ দিয়ে তাদের যানবাহনকে খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারছে না ইস্রায়েলী সৈন্যরা।

—সাগরময়ী

সেই লোকটি

কোনো কারণে আমাকে প্রায় মাস দেড়েক থাকতে হয়েছিল উত্তর বাংলার গড়ালবাড়ি নামে একটি গাঁয়ে। আশ্রয় নিয়েছিলাম শহিমুদ্দিনের বাড়ি। ঠিক ভাগচাষী নয়, আবার যাকে বলে মাঝারি কৃষক, তাও নয়। শহিমুদ্দিনের ছিল বিঘে সাত-আট জমি, খানিক খানিক মাটি কুপিয়ে আবাদ করত তরি-তরকারীর। বাকিটা ধানের। অবসরের সময়টা আধি খাটত পাশের গাঁয়ের ছোট জোতদার এবাদুলের জমিতে। বউ তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে—ছেলেমেয়েরা সবাই প্রায় গুঁড়ি গুঁড়ি,, চলে যেত এক-রকম। তারই বাইরের ঘরে আমি থাকতাম। নামেই বাইরের ঘর। বেড়া আর শনের ছাউনি, ভেতরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে আর বাঁশ চিরে একটা মাচা বানানো হয়েছিল, তার ওপরেই খড় বিছিয়ে কম্বল পেতে ছোট্ট তেলচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে শয়নপর্ব সমাধা হত। আমার সঙ্গে ঐ একই আস্তানায় থাকত যশোর থেকে আগত এক ছুতোর—নাম জিজ্ঞেস করলে যে সগর্বে বলত—হবিশ আর্শেস্টার। সারা দিন এ তক্তা ও তক্তাটে কাজ করে বেড়াত হরিশ, রাতে এসে নিজের হাতে সেদ্ধ-ভাত ফুটিয়ে নিত। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আমারই পাশে এসে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে তোল, সান্নিধ্যে, খোল ছাইতেও দেখেছি হরিশকে।

খুবই রক্ষনশীল ধর্মভীরু লোক ছিল শহিমুদ্দিন। অদ্ভুত ফর্সা তার গায়ের রং, মোদে যখন বীজ বুনত, মনে হত সারা শরীর ফেটে ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে আর কি। শক্ত সোমত্থ শরীর, মাথার তালু ঘেঁষে নির্মমভাবে ছাঁটা চুল, চোখ নাক মুখের অবাঙালীসুলভ চোখামোখা গড়ন—ঐ মুসলমানপ্রধান এলাকার অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে তার চেহারার প্রভেদ একনজরেই ধরা পড়ত। তার বউ, যাকে আমি ডাকতাম 'ভাবী' বলে এবং যার দেখা পেতে পেতে এক সপ্তাহের মধ্যে থেকেও আমার প্রায় দিন-কুড়ি কেটে যায়, সেও ছিল আশ্চর্য গৌরী, দীর্ঘল গড়নের, তার চোখের পক্ষ্ম ছিল গভীর, দীর্ঘ ও ভালো মিশমিশে। মনে হত, পান খেয়ে তার কণ্ঠনালী দিয়ে প্রবাহিত লাল রক্তের চাপা দ্যুতি যেন দেখা যায়।

শহিমুদ্দিনের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা সারাদিন মুরগীর বাচ্চার মতই উঠোনে দিগম্বর আধা-দিগম্বর খেলে বেড়াত, শুধু বড় মেয়ে, বছর দশেকের আয়েষা আমাকে বাড়িয়ে দিত কখনো আধ মগ চা, ছোট থামায় ক'রে লঙ্কা-মুড়ি আর দুবেলা দু-সানকি ভাত একটু তরকারী, একখণ্ড পেঁয়াজ, হঠাৎ হঠাৎ দু-চার টুকরো বড় গোস্ত সমেত। সব সময়ই আয়েষার মুখে লেগে থাকত সকুণ্ঠ হাসি, মাঝে মাঝে বিবর্ণ কালো পর্দা অল্প ফাঁক ক'রে একরাশ বিস্ময় নিয়ে দেখত আমার শোয়া-বসা, দাড়ি-কামানো বা বই পড়া। বড় মেয়েটি ভাবী আদরের ছিল শহিমুদ্দিনের—যতক্ষণ বাড়িতে থাকত, ঘর-দোর মুখরিত হয়ে উঠত তার মোটা, ভরাট গলার 'মা-ই' 'মা-ই' ডাকে।

ক্ষেতি-বাড়ি গরু-বাছুর পরিচর্যা, হাট-বাজার সবই আর পাঁচটা গাঁয়ের লোকের মত করত শহিমুদ্দিন, তবু লোকটি ছিল পরিবেশের থেকে বেশ খানিকটা স্বতন্ত্র ধরনের। উর্দু জানত অল্পবিস্তর, এমনকি ফার্সিও পড়তে পারত। ছোট ছোট কিস্‌সার বইয়ে ওর ঘরের একটা তাক ছিল ঠাসা। যে বইয়ের নাম শুনেছি আবাল্য, সেই গোলে-বকাওলি প্রথম পড়েছি ওর কাছ থেকেই। রূপবান যাত্রার একটা ছোট্ট দল ছিল শহিমুদ্দিনের—ও ছিল একাধারে নিজেই তার পালাকার, গীতিকার ও সুরকার। ধান ওঠার পর মাসদুয়েক খুব মেতে থাকত যাত্রা নিয়ে, গরুর গাড়িতে কাসি ওঠা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাত-বিরেতে তার ছোট্ট গানের দলটি নিয়ে চলে যেত এ-গাঁয়ে-ওগাঁয়ে। ফিরে এসে রাতজাগা লাল চোখ তুলে কয়েকবার জার্মাণ সিলভারের কয়েকটি মেডেলও সগর্বে সে দেখিয়েছে আমাকে। মাঝে মাঝে শোলার পাখি তৈরি ক'রে বিক্রি করত হাটে—ওর চারপাশে তখন ছেলেপিলের ঢল নামত। শবেবরাতের সময় লাল আর সোনালি রং দিয়ে বানাতো চমৎকার ছোট ছোট টুক-টুকে লাঠি, শেষে একটি একটি ক'রে সবই বিলিয়ে দিত লোলুপ বাচ্চাদের হাতে। কথা বলত খুব কম, মেজাজও ছিল একটু চড়া পাটের, তবু হঠাৎ যখন হাসত, চারপাশের সব কিছু যেন ডগমগ ক'রে উঠত। কখনো কখনো গোলা রং দিয়ে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকত হাতে-তৈরি কাগজের ওপর। প্রশ্ন করতাম—কি করছ শহিম ভাই? সে বলত—তস-বীর আঁকছি। শাহজাদা-শাহজাদীর তসবীর। আরব্য-রজনীর গল্প-পুজব দিন-রাতের মধ্যে একেবারে টিকি অব্দি ডুবেছিল শহিমুদ্দিন।

অসীম শ্রম করার ক্ষমতা ছিল বটে তার। একদিন দেখি, কাঁধে চাপিয়ে ঘোর বর্ষার সন্ধেবেলা একটি নধরকান্তি বাছুর নিয়ে ঢুকল শহিমুদ্দিন। বলল, গৌরীহাট থেকে অনেক দরকষাকষির পর কিনে নিয়ে এসেছে। বাসে তো নেয়ই না, ট্রাকও ধরতে পারেনি চলমান, ফলে হেঁটে হেঁটেই ন'ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়েছে ঐ নতুন জীবন্ত সওদা কাঁধে নিয়ে! তারপর প্রায় সারারাত হ্যান আনো ত্যান আনো এটা কর ওটা কর—সেই নবাগতের তদ্বিরের চোটে আর শহিমুদ্দিনের ঘন ঘন হুকুমজারিতে বাড়ি-শুদ্ধ লোকের প্রাণ যায় আর কি।

আর এক দিন। সারা বেলা ধরে জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তার তিন বছরের বাচ্চা ছেলেটির। প্রচণ্ড শীত ধরেছে তার, ঘরে যা কিছু ছেঁড়া ত্যানা-কাঁথা ছিল, দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছে, তবু কাঁপুনি যাচ্ছে না। বারান্দায় বসে এক মনে তামাক খাচ্ছে শহিমুদ্দিন। আপাত চিন্তাশীল, কেবল কপালে উদ্বিগ্নতার মোটা ভাঁজ পড়েছে দু-একটা। সন্ধ্যে হতে না হতে আকাশ ফুটো হয়ে বৃষ্টি নামল। একে শীতকাল, তায় উত্তর বাংলার চোয়াড়ে বৃষ্টি, ঠাণ্ডায় একেবারে জমে কাঠ আমরা সবাই। দু-চারটে কাঠ-কুটো জ্বালা হয়েছিল, নিভে যেতে আরও দ্বিগুণ শীত। হঠাৎ শহিমুদ্দিন আমার ঘরে ঢুকে বলল বেশ খানিকটা মরীয়া গলায়—দাসবাবু, আপনার কম্বলটা দ্যান। বাচ্চাটার কথা ভেবে আগেই দেওয়া উচিত ছিল, লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে দিলাম। দেখি, অন্দরমুখো না হয়ে ও সটান এগিয়ে যাচ্ছে গোয়ালঘরের দিকে। কৌতূহল হল। ওর পিছু পিছু যেয়ে দেখি, কম্বল দিয়ে খুব সযত্নে ঢেকে দিচ্ছে সদ্যক্রীত বাছুরটাকে। বললাম—তোমার ছেলে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, আর এ কী করছ তুমি শহিম ভাই! শহিমুদ্দিন কিছু বলল না। খালি একবার আমার মুখের দিকে বড় চোখে চাইল। ওর চোখের ভাষায় এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, একজন চাষীর ঘরে দশটা-বিশটা রুগ্ন বাচ্চার প্রাণের চেয়ে একটি গাই-বাছুরের প্রাণের দাম হাজার আশরফি বেশি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

উপন্যাস

গোপাল সান্যাল

ভাঙা আয়না

সুহাস বাড়ি থেকে বের হয়ে এল। আজ অফিসের পিক্‌আপ্‌ ভ্যানটা আসবে না। একটু আগে টেলিফোনে খবর এসেছে ওটাকে মেরামতের জন্য কারখানায় নিয়ে যাওয়া দরকার। ফোনটা পেয়ে ভালোই হয়েছে। এখনও তাড়াতাড়ি মোড়ে পৌঁছোতে পারলে ট্যাকসি হয়তো পাওয়া যাবে।

মনের মধ্যে দ্রুততার ভাব নিয়ে রাস্তায় এসে পড়তেই সুহাসকে একটু পিছিয়ে আসতে হলো। বাবান্দায় কেউ যেন দাঁড়ালো। সামনেই দুজন লোক রাস্তায় একটা বাঁশ ঘোরাচ্ছে। সুহাস তাকিয়ে দেখল ওদের সামনের বাড়ির দেয়ালে আরও বাঁশ দাঁড় করানো রয়েছে। ভারা বাঁধা হচ্ছে—রঙ মিস্ত্রিদের হাল্কা রকমের ভারা। বাড়িটায় চুনকাম কিংবা রঙ হবে। পুজো কাছে এসে গিয়েছে। অনেক বাড়িতেই রঙ-কলি ফেরানো হচ্ছে। কালই তো মহালয়া, না?

বাঁশটা ঘুরে সামনে খালি হতেই সুহাস এগিয়ে যায় ছোট্টুলালের দোকানের দিকে। আফিসে যাওয়ার সময় রোজ সে ওখান থেকে নিজের ব্রান্ডের দু-প্যাকেট সিগারেট তুলে নেয়।

দোকানের সামনেটায় একটু ভিড়ের মতো। প্রতিদিনই এমনি সময়ে ও-রকম থাকে এই জায়গাটা। সুহাস জানে এই ভিড়ের সব মানুষ কিছু কিনতে এখানে আসে নি। এখানে দাঁড়ানো পাড়ার সব বেকার ছেলেদের অভ্যাস। দোকানটার সামনে টিনের বড়ো ঝাঁপটাই হয়তো সেজন্য দায়ী—গ্রীষ্মের রোদ, বর্ষার বৃষ্টি থেকে দরকার মতো মাথা বাঁচিয়ে বছরের বারোটা মাস এখানে দাঁড়িয়ে গল্প আড্ডা অব্যাহত চলে। তারই ফলে অভ্যাস। সেটা বেকার ছেলেদের। কিন্তু স্কুলের ছেলেরাও আছে। জলে জল টানে, ভিড়ে ভিড় টানে। তাই হয়তো ছোট্টুলালের দোকানের সামনে সব সময় এরকম ভিড়।

সুহাস এগিয়ে যেতে ছেলেরা তার জায়গা ছেড়ে দেয়। দু একটা জ্বলন্ত সিগারেটও আড়াল হয়ে যায়। এটুকু সম্মান আজও সুহাসের এ-পাড়ায় অব্যাহত আছে। এককালে সে এখানকার সব কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলো—পাড়ার ক্লাব-এর সেক্রেটারী, দুর্গাপুজো, কালীপুজো কমিটির, বস্তির নাইট-স্কুলের উদ্যোক্তাদের একজন—এমনি আরও কতো কিছু ব্যাপারে—

কিন্তু সে অনেককাল আগেকার কথা। তখন সুহাস কলেজে পড়তো। শেষে পাশ করে চাকরি পাবার পরেও কিছুকাল সে সবকিছু চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তারপর নিজের জীবনে জড়িয়ে একটু একটু করে সরে এসেছে। এখন সব ছেড়ে বজায় আছে শুধু হাল্কা একটা সম্পর্ক তার পাড়ার সঙ্গে—বিশেষ করে পুরনো মানুষদের।

সুহাস দোকানের কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানী ছোট্টুলাল পিছন ফিরে সরষের তেলের টিনের মধ্যে হাতা ডুবিয়ে তেল তুলে একটা কৌটোর মধ্যে ঢালছে। ওদিকে দোকানের বাচ্চা ছেলেটা দাঁড়িপাল্লায় ঠোঙায় ভরে ডাল ওজন করছে। সুহাস একটু অপেক্ষাই করবে। ওদের কারও হাতের কাজটা শেষ হলে সে সিগারেটের জন্য বলবে।

সুহাসের ডানদিকে কাউন্টারের বেড়ায় হেলান দিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ সেদিকে পড়তেই মনে হয়—ওকে যেন চেনে সে। কিন্তু কোথায় দেখেছে তা ঠিক মনে পড়ছে না। মেয়েটির খালি পা। একটু ময়লামতো শাড়ি—তবু বেশ ঝকঝকে চেহারা। এ পাড়ারই কোনো বাড়ির মেয়ে হয়তো হবে।

সুহাস তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু সে সুহাসের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে। মামাবাবু, ভালো আছেন?—সে বলল।

মুহূর্তেই সুহাসের মনে পড়ে যায়—আরে! এ তো—ওর মা সুহাসদের বাড়িতে কাজ করতো! এ তখন খুবই ছোট্ট ছিলো। ইজের পরে খালি গায়ে মায়ের সঙ্গে আসতো। নামটাও মনে পড়ছে—কে, বুটি, না?

হ্যাঁ, ভালো আছি রে—সুহাস প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলে—তোরা সব ভালো তো? তোকে কিন্তু অনেকদিন দেখিনি।

এখানে তো ছিলাম না, ভবানীপুরে কাজ করছিলাম, এখন তো আবার আপনাদের পাড়ায় এসেছি. আজ কদিন হলো—বুটি মুখ ঘুরিয়ে হাত তুলে দূরের কোনো বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলে—ওই বাড়িতে খাওয়া পরার কাজ করছি।

তোর মাকেও অনেকদিন দেখিনি। একদিন আসতে বলিস তো।

ছোট্টুলালের তেল মাপা তখনও শেষ হয়নি, সুহাসের গলার শব্দে সে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, সুহাসকে দেখেই ব্যস্তভাবে কৌটোটা নামিয়ে দুটো প্যাকেট সুহাসের দিকে বাড়িয়ে দেয়। অন্য সব খরিদ্দারকে দাঁড় করিয়ে সুহাসের সিগারেট প্রতিদিনই একটু তাড়াতাড়ি দেয় ছোট্টুলাল—সুহাসকে সে একটু আলাদা খাতির করে। মাঝে মধ্যে টাকায় ঠেকলে সুহাসের কাছে সে বিনা-সুদের ধার পায়—হয়তো সেজন্যই।

সুহাস হাতের অ্যাটাশিটা খুলে একটা প্যাকেট তার মধ্যে ভরে আরেকটা খুলে একটা সিগারেট ওখানে দাঁড়িয়েই ধরিয়ে নেয়। ছোট্টুলাল ততক্ষণে খুচরো গুনে ওর হাতের মধ্যে দিয়েছে। সেগুলো পকেটে ফেলে সে বের হয়ে আসে। ছেলেরা পথ করে দিয়েছে আগের মতোই আবার।

সেই ছোট্ট মেয়েটা! বুটি, এখন বড়ো হয়ে কতো বদলে গিয়েছে, ওকে দেখলে আর ঝিয়ের মেয়ের মতো লাগে না, সুহাস ভাবছিল, ওর মা কিন্তু খুব ভালো মানুষ ছিলো, একবার সুহাসের মাইনের টাকা ভর্তি ব্যাগটা সিঁড়িতে পড়ে গিয়েছিল বাড়ি ফেরার সময়। সেটাকে দেখে তুলে এনে ফেরত দিয়েছিল—সেই ঘটনাও মনে পড়ে যায়। সে নিজে না দিয়ে সুহাস

কিছুতেই বুঝতে পারতো না ব্যাগটা সে কোথায় হারিয়েছে।

সুহাস আর কিছুটা এগিয়ে যেতে রাস্তার কয়েকটা ছেলে একটু সরে ওকে যেন পথ ছেড়ে দেয়। তাদের মধ্যে থেকে একজন সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছে—কুট্টি। ভালো নাম সুব্রত—সুহাসের অনেক দিনের প্রিয় ছেলে এ পাড়ায়।

কিরে কুট্টি ভালো আছিস? —সুহাস একটু হেসে বলে।

হ্যাঁ সুহাসদা। একটু আগে আপনার কাছে গিয়েছিলাম, বৌদি বললেন, আপনি স্নান করতে গিয়েছেন—

অজ একটু তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম, গাড়িটা আসবে না খবর আসতেই—তা কি জন্যে গিয়েছিলি বল?

কথা বলতে বলতে ছেলেদের ভিড়টুকু পার হয়ে সুহাস থেমে দাঁড়ায়। কুট্টির সঙ্গে তার অনেকদিনের সম্পর্ক। ওর সেকালের ক্লাবের ফুটবল টিমের সেন্টার ফরোয়ার্ড কুট্টি। দারুণ খেলতো সেই বয়সে—তখনও গোঁফ দাড়ি ওঠেনি। শিশুর মতো নরম একটা মুখ তবু চাবুকের মতো শরীর। মুখের ভাবটা এখন বদলে গিয়েছে। একহারা সেই শরীরটা বয়সে ভরাট হয়ে কী সুন্দর না হয়েছে। এরকমের চওড় কাঁধের স্বাস্থ্যবান ছেলে সুহাস বরাবর ভালবাসে। অফিসে যাওয়ার তাড়া যতোই থাক ওর জন্যে কয়েকটা মুহূর্ত খরচই করবে সে।

মুখটা একটু অপ্রস্তুত ভাব করে কুট্টি বলে গিয়েছিলাম বলতে একটা কিছুতে লাগিয়ে দিন না সুহাসদা, বসে বসে যে পচে গেলাম একেবারে।

ঠিক এইখানে সুহাসের ভয়। ও একটু ভালো চাকরি করে তা পাড়ায় অনেকেই জানে। কতো ছেলে যে ওর কাছে আসে—একটা চাকরি করে দিন। একটা কিছুতে লাগিয়ে দিন। কিন্তু কী চাকরি সুহাস করে দেবে? কোথায়?

এ কথার উত্তর সে অনেকবার দিয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি করে যতোদূর সম্ভব মোলায়েম সুরে ম্লান হেসে বলে—আমার তো তেমন কোন ক্ষমতা নেই কুট্টি, না হলে শুধু তোর কেন, এ পাড়ার সব ছেলেরই আমি যা পারতাম করে দিতাম।

একটু থেমে সুহাস আবার বলে—জানিস তো আমি পারচেজ অফিসারের পোস্টে আছি? চাকরি দেবার কোনো ক্ষমতা নেই, তবে কেউ কিছু সাপ্লাইয়ের কাজ করলে—মানে আমাদের লাইনের—আর আমার সঙ্গের মধ্যে থাকলে—যে সব জিনিস আমাদের অফিস কেনে—

বিজনেস্? —কুট্টি যেন চমকে উঠে বলে।

একরকম তা-ই বলতে গেলে, তবু—

কিন্তু আপনার তো দেরি হয়ে যাচ্ছে অফিসের, না?

না এমন কিছু নয়, তবু চল হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলি বরং।

সুহাস চলতে শুরু করে। কুট্টি তার পাশাপাশি চলতে চলতে বলে—ও আমার ক্ষমতায় কুলোবে না সুহাসদা—

কেন?

টাকা কই যে বিজনেস করবে?

সব ব্যবসাতে যে টাকা লাগে এমন কোন কথা নেই। অন্যের দোকান থেকে মাল নিয়ে অর্ডার সাপ্লাই করা যায়, কমিশনড্ এজেন্টের কাজ আছে। ব্রোকারেজ, রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর কাজ আছে—তুই আয় না একদিন আমাদের অফিসে তোকে বুঝিয়ে দেবো, দেখিয়েও দেবো আমাদের পারচেজ লিস্ট।

কুট্টির মুখের দিকে চেয়ে সে এবারে একটু হেসে বলে—তারপর সব কিন্তু তোর ওপর। মানে দামে কম্পিটিটিভ না হলে, কোয়ালিটি ভাল না হলে আমার আর কিছু করার নেই—কেননা পারচেজ অফিসারের চেয়ারে বসে আমাকে শুধু অফিসের স্বার্থই দেখতে হয়—

বলতে বলতে সুহাস থামে—তার মনে হয় একটা কথার উত্তরে সে অনেক বেশি বলে ফেলেছে কুট্টিকে। শেষে কুট্টির দিকে একটু হেসে বলে, আফিসে একদিন আয়, দ্যাখ আমাদের লিস্ট, তারপরে বলিস—

কবে আসবো বলুন?

যে কোন দিন আসতে পারিস্, তবে হ্যাঁ, বিকেলের দিকে এলেই ভালো হয়, তিনটের পর থেকে মোটামুটি একটু ফ্রী থাকি—

ঠিক আছে, বিকেলেই আসবো। এখন তাহলে আসি সুহাসদা?

হ্যাঁ আয়।

কুট্টি ফিরে চলে আসে ছোটুলালের দোকানের সামনে। সুহাস ততক্ষণে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে।

পাড়ার পরিচিত পথ সে পার হয়ে যাচ্ছে। একটু দূরেই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। পাশের বারান্দা থেকে দ্রুত পায়ে নেমে আসছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। হাতে সুহাসের মতোই কালো একটা অফিস-এ্যাটাচি। তিনি গাড়ির মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বারান্দায় একটি মহিলাও বেরিয়ে এলেন। তাঁর কোলে ছোট্ট একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে।

স্টিয়ারিংয়ে বসে বসেই ভদ্রলোক তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—আও বেটি, সাথতী হোকর যায়েগা—

মহিলাটি বারান্দা থেকে নেমে বাচ্চাটাকে তাঁর সামনে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক ওকে আদর করছেন। চিৎকারটা থেমেছে। তখনই গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল—আর কী চিৎকার ওই মেয়েটির। মায়ের কোলের মধ্যে আছাড় পাছাড় করছে—রাস্তায় যেন ছিটকে পড়বে মেয়েটা—সুহাসের ভয় লাগে। কিন্তু না, ভদ্রমহিলা ওকে সামলে বারান্দায় উঠে গেলেন—সুহাস দেখেছে মহিলাটির ঠোঁটে গালে একটু বেশি রঙ মাখা। মেয়েটির সারা মুখ কান্নায় ভেজা—সুহাসের মনে পড়ল তার মেয়ে বিনকর কথা। একটু আগে, ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে তার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময়।

গাড়িটা অনেক এগিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বাচ্চাটিকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছেন হয়তো, তবু তার কান্নার শব্দ সুহাস এখনও শুনতে পাচ্ছে। রিনকু কী কাঁদছে এখনও? না, সুস্মিতা তাকে ভোলাতে পেরেছে?

সামনের রাস্তাটা প্রায় সবটা জুড়ে দাঁড়িয়ে একটা লরি ইঁট খালাস করছে। ইটের ধুলো উড়ছে দেখে মাথা বাঁচানোর চেষ্টায় সুহাস পথের অন্য পাশে চলে এল, কিন্তু থেমে দাঁড়াতে হলো। উল্টো দিক থেকে একটা রিকসা ঠিক সেই সময়েই ঢুকে পড়েছে। লরিটার পিছনের দিকে সরে এল সে। রিকসাটা পার হয়ে যেতে আবার এগিয়ে গেছে—সামনেই একজন চেনা মানুষ—সত্যসুন্দরবাবু। লাঠি হাতে পথের দিকে চোখ রেখে তিনি আস্তে আস্তে হাঁটছেন।

সুহাস বলে ওঠে, কাকাবাবু, ভালো আছেন?

হ্যাঁ বাবা—তিনি যেন অভ্যাসের সুরেই বলেন, তারপর চোখ তুলে সুহাসের মুখে তাঁর পুরু চশমার দৃষ্টি ফেলে বলেন—কে, সুহাস না?

হ্যাঁ কাকাবাবু—।

সে থামতেও পারছিল। তখনই মনে পড়ে যায় অফিসের কথা—না এখন আর দাঁড়ানো চলবে না। তাঁকে পার হয়ে সে আবার হাঁটতে থাকে। চেহারাটা বড্ডো খারাপ হয়ে গেছে সত্যসন্ধবাবুর। ওঁদের বাড়িতে সে অনেকদিন যায় নি—খুব ভালো মানুষ—সুহাসকে খুবই ভালোবাসতেন। এবারে একদিন ওঁদের বাড়িতে যাবে সে। কিন্তু কবে? পুজোর ছুটিটা হোক—তার মধ্যে যে কোন একদিন যাবে সে—

সামনের মোড়টা ঘুরে বাঁদিকে ফিরতেই আর একটা বাধা। ছেলেদের ফুটবল খেলা হচ্ছে রাস্তার ওপরে—শুধু পেনাল্টি কিক-এর খেলা। দুটো ইঁট রাস্তাটার দুদিকে বসানো। মাঝখানে একজন গোলকীপার হাঁটু ভাঁজ করে দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার উল্টোদিকে আরেকটি ছেলে বল মারতে উদ্যত। ঠিক এখনই ওখানটায় ঢোকা উচিত নয়। সুহাস থেমে দাঁড়ালো—সেটা হয়ে যাক, তারপরে সে যাবে।

পিছনের দিকে, উৎসাহী দর্শক অনেক ছোট বড়ো ছেলে। সুহাসও ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সটটা মারা হলো ঠিক তখনই, আর চমৎকার একটা গোলও হয়ে গেল সুহাসের চোখের সামনে। বলটা ওর গা ঘেঁষে চলে গেছে। সুহাস আবার দ্রুতপায়ে চলতে শুরু করে। গাড়িয়াহাটায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছে সে।

ওই ছেলেগুলোর একজনকেও সুহাস চেনে না। পাড়ার এ দিকটায় সবই নতুন নতুন বাড়ি। ঠিক এখানেই সেই বিশাল মাঠটা ছিলো—সুহাসের মনে পড়ে—একটা বড়ো পুকুরও ছিলো উত্তরের কোণে। সুহাস তাতেই সাঁতার কাটা শিখেছিল। মাঠে ওরা ফুটবল খেলতো। ক্রিকেট। তার আগে খুব ছেলেবেলায়—ঢিল্... ঢিল্... ঢিলোরিয়া। আরও এক নাম ছিলো সেই খেলাটার—চোর-পুলিশ খেলা।

চোরেরা তো ঢিলোরিয়া শব্দ তুলেই দূরে পালিয়ে যেতো। শব্দের নিশানা ধরে পুলিশ ছুটে এসে তাদের দেখতে পেতো না, তখনই দূর থেকে আবার শব্দ উঠতো—ঢিল্ ঢিল্ ঢিলোরিয়া। কিন্তু ওরকম শব্দ করে পালানোর মানে কিছু ছিলো? না, সাঁতারের চোরদের পক্ষে তা কখনও সম্ভব?

কথাটা মনে আসতে সুহাসের একটু হাসি পায়, তবু বিস্ময়ও লাগে সেই দিনগুলোর জন্যে যখন মানে না ভেবেও যা খুশি সে করতে পারতো—কোন মানে খোঁজার বয়সও তখন নয়। সুহাসের সে সময় বয়স কতো? ও তো আজন্ম এখানেই কাটিয়েছে—এ-পাড়ায় তার শৈশব বাল্য কৈশোর সবই কেটেছে। এই শহরে।

কী হয়ে গিয়েছে আজ সেই শহরটা। ছেলেদের এখন রাস্তার মধ্যে খেলতে হয়। ক্রিকেট তো সব পাড়াতেই রাস্তায় খেলা চলছে। ফুটবল আজ প্রথম দেখল সুহাস।

দাদা আজ হেঁটে যাচ্ছেন যে?—একটা প্রশ্ন শুনে সুহাস তাকিয়ে দ্যাখে ওদেরই পাড়ার বীরেন ওকে প্রশ্নটা করছে। রাস্তার একধারে বস্তা বিছিয়ে সে আলু সাজিয়ে বসে আছে। সুহাসের চোখ তার দিকে পড়তে সে বলে—অফিসের গাড়ি আসে নাই আপনার?

না—সুহাস বলে। তারপর প্রথা মতো প্রশ্ন করে—তোমাদের খবর সব ভালো তো বীরেন?

মুখভর্তি এক বিনীত হাসি নিয়ে সে উত্তর দেয়—হ্যাঁ সব ভালোই দাদা আপনাদের দয়ায়—

সুহাস বীরেনকে পার হয়ে চলে এসেছে। বীরেনের কাছে আলু সে একদিনও কেনেনি, তবু সে বলল—আপনাদের দয়ায়। কীসের দয়া ওকে সে দেখিয়েছে কবে? দয়া কেউ কাউকে করে না—তবু বিনয়ে ভদ্রতায় মানুষ সে কথা বলে।

দূর থেকে একটা ট্যাকসি দেখতে পেয়ে সুহাস ছুট দিয়ে সেটাকে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে একজন ওটার দরজা খুলে বসে পড়ল সুহাসের সামনেই। শুধু একটুখানির জন্যে ট্যাকসিটা ধরতে সে পারলো না।

এবারে ফুটপাথের পাশ ঘেঁষে সে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে সামনে অথবা পিছনের যে কোন রাস্তা দিয়ে ট্যাকসি বেরিয়ে এলে তার চোখে পড়ে যায়। কিন্তু কোথায় ট্যাকসি? সুহাস হাতঘড়ির দিকে দেখল—সোয়া নটা। আশা এখনও আছে। তবে বড়ো জোর আর পনেরো মিনিট। সতর্কভাবে সবদিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখতে লাগল। ওদিক থেকে কে আসছে ওই মেয়েটি? সত্যসন্ধবাবুর মেয়ে টুনু না? হ্যাঁ, সে-ই তো। হাতে একটা র‍্যাশন ব্যাগ ঝুলিয়ে টুনু সুহাসের দিকে এগিয়ে আসছে। মাটির দিকে চোখ তাকিয়ে হাঁটছে সে। কাছাকাছি এসে চোখ তুলল একবার, সুহাসকে দেখেই বলে উঠল—সুহাসদা ভালো আছেন?

হ্যাঁরে টুনু। তুই?

আছি একরকম—

তা এতো সকালে কোথায় বেরিয়েছিলি?

সুহাস এই প্রশ্নটা করতো না তার থলির দিকে তাকালে। টুনু যে বাজার করতে বের হয়েছিল তা ওর হাতের থলি থেকে বেরিয়ে থাকা মুলো শাকের পাতা দেখেই বুঝতে পারা যায়। তবু করতোও হয়তো—কেননা কোথায় সেই ঢাকুরিয়ার বাজার প্রায় ওদের বাড়ির কাছাকাছি। আর এ তো গড়িয়াহাটা পুলের কাছাকাছি—একেবারে উল্টোদিকের জায়গা।

বাজার শেষ করে একটা ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছিলাম।

ওষুধ? কেন, কার অসুখ?

বাবার জন্যে, অসুখ কিছু নতুন করে নয়, তবু বারোমাসই ওষুধ চলছে জানিস তো হার্টের অসুখে ভুগছেন সেবারে সেই স্ট্রোক হবার পর থেকেই—

একটু আগেই তো তোর বাবার সঙ্গে দেখা হলো।

বাবা। বাবাকে দেখলেন? ঠিক কোথায় বলুন তো?

টুনুর কথার মধ্যে একটা ঝাঁঝ ওঠার সুর শুনে সুহাস কিছুটা অবাক হয়ে বলে—ওই তো সেই রাস্তার বাঁপাশে ইঁট পড়ছে, ভেতরের দিকে বাড়ি হচ্ছে, ওখানেই—

টুনু আর প্রশ্ন করে না। কী যেন ভেবে সে গম্ভীর হয়ে গেছে—সুহাসের মনে হয়। কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে বলে—বাজারেই চলো আর ওষুধ কিনতে হোক তুই কেন যে টুনু—তোর দাদা থাকতে?

দাদা!—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই টুনুর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে তারই মধ্যে ক্লান্তস্বরে সে বলে—ওর কথা আর বলবেন না সুহাসদা—

কথা বলতে বলতে সুহাসের চোখদুটো রাস্তার দু দিকে ট্যাকসির খোঁজ করেই যাচ্ছিল। দূরে ওই ট্যাকসিটা কী খালি? না—একটু অন্যমনস্ক হয়ে সেদিকেই তাকিয়ে সুহাস আরেকটা প্রশ্ন করেছিল টুনুকে—কী পড়ছিস এখন? কোন কলেজে?

কলেজে!

টুনুর সেই একটা কথার মধ্যে এমন এক তীক্ষ্ণ সুর, পাল্টা প্রশ্ন আর চমকে

সেই নিশান—যার রং লাল চিরঞ্জীব সেনের

নিশানটা লাল ৫·০০

রূপশংকরের দুখানি সার্থক সৃষ্টি উপন্যাস

বিনিদ্র ৮·০০

আঁধার আমার ৭·০০

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসামান্য উপন্যাস

ললিত পয়ার ৪·০০

প্রকাশক দীপিকা । পরিবেশক কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলি-৭৩

ওঠার ধ্বনি আছে যা সুহাসকেও চমকে দেয়। সে চোখ ফিরিয়ে টুনুর দিকে তাকায়। তীব্র একটা আঘাতের চিহ্ন সরে গিয়ে যেন বিষণ্ণতার ভাব ফুটে উঠেছে—খুব আস্তে নিচু গলায় সে একারে বলছে—কলেজ কোথায় সুহাসদা, আপনি জানেন না যে, আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি?

সেকি রে' পড়া ছেড়ে দিয়েছিস?

হ্যাঁ, সে তো অনেকদিন। তা প্রায় চার বছর হয়ে গেল—

কি করে জানবো বল? তোদের বাড়িতে তো অনেকদিন যাই না, সুহাস একটু কৈফিয়তের সুরে বলে। আর কোনো প্রশ্নও করতে সে চায় না। একটু আগে সে সত্যসন্ধবাবুকে দেখেছে, তখন তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি, এখন মনে পড়ছে বেশ ময়লা একটা খাটো ধুতি আর একটা আধময়লা ফতুয়া তিনি পরে ছিলেন, তাঁর ছেলে টুকলাকেও দেখেছে পথে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রতিদিনের মতো—সে যে কিছু করে না তা তো জানাই কথা, তারপর টুনুর এই পড়া ছেড়ে দেওয়া—সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অনুমানই করা যায়। আর, লাভই বা কী আরও বেশি শুনে। শুধু একটু সহানুভূতি জানানো ছাড়া আর কিছুই কি করতে পারে সে?

টুনু সুহাসের মুখের থেকে চোখ নামিয়ে বাজারের থলিটা হাত-বদল করে নেয় তারপরে বলে—আচ্ছা, আমি এখন আসি সুহাসদা?

হ্যাঁ আয়—সুহাস বলে একটু স্বস্তির সুরে যেন।—

টুনু ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে। সুহাস ট্যাকসির খোঁজে রাস্তায় চোখ বুলিয়ে আরেকবার টুনুর দিকে তাকায়। টুনু একটু দূরে চলে গিয়েছে। বেশ সুশ্রী একটি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে যেন প্রায় একজন মহিলার মতো ধীর চালে হাঁটছে। হাতে বাজারের থলি—মূলোর পাতাগুলো তার ওপরে বের হয়ে আছে।

এমনিভাবে দূরে থেকে দেখা শুধু ভালো। তার চেয়ে বেশি জানতে গিয়ে একটু ভুলই করেছে সে। এই সকালবেলায় অফিসে বেরোনোর সময়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

যখন কিছু পাওয়ার থাকে বেশি খুঁজতে হয় না। সুহাসের পিছন দিক থেকে একটা ট্যাকসি এসে তার পাশেই থেমেছে। ড্রাইভার ডাক দিয়ে বলে—কাঁহা যাইয়েগা সাব্—ডালহৌসী?

ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেছে। সুহাস ভাবছে টুনুর কথা,—সেই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা। পড়াশোনায় ভালো ছিলো, ভালো গান গাইতো। নাচে তো খুবই ভালো—সুন্দর পড়ন্ত পড়ন্ত পড়ন্তালে ওর নাচ দেখে বাইরের একটা দল ওকে নেবার জন্যে সুহাসকেই ধরেছিল। রাজি হননি সত্যসন্ধবাবু। তাঁর উত্তরটা আজও মনে আছে—নাম হবে, টাকা পাবে। এ তুমি কি বলছো সুহাস? মা সরস্বতীর সাধনার মধ্যে লক্ষ্মীর কথা ভাবতে হবে?

শুনে লজ্জা পেয়ে সুহাস চুপ করে গিয়েছিল।

টুনু বেশ ভালো আবৃত্তিও করতো।

সেই টুনু আজ পড়া ছেড়ে দিয়েছে চার বছর। তার মানে, হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল এ-সব দরজাও পার সে হয়নি। বিয়ে তো হয় নি—বাড়িতে বসে বসে ও তবে করছে কি? ঠিক বসে অবশ্য বলা যায় না,—টুনু তো বাজার করছে, বাবার ওষুধ কিনে আনছে,—এগুলো ভালো, মেয়েদের সব বাইরের কাজে এগিয়ে আসতে দেখলে সুহাসের ভালো লাগে। তবু শুধু ওটুকুতে টুনুকে যেন মানায় না। নাচ-গান আবৃত্তি এসবেও যদি বা হতো, তাহলে শুনে খুশি হতো সুহাস।

ও-সব গুণগুলো টুনু তার বাবার কাছে পেয়েছিল। সত্যসন্ধবাবুর মধ্যে সুরের ব্যাপার সবকমই ছিলো—উনি গান করতেন, আড়বাঁশী বাজাতেন। সেই সূত্রেই সুহাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। সুহাসেরও সখ হয়েছিল বাঁশি বাজানো শেখার—গিয়েছিল ওঁদের বাড়িতে। বাঁশি বাজানো সুহাসের খুব বেশি দূর এগোয়নি, তবু আসা-যাওয়ার ফলে সত্যসন্ধবাবুকে সে কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিল—চিনতেও পেরেছিল।

আজ যে মানুষটাকে দেখে একটু আগে সে—'কাকাবাবু ভালো আছেন?' বলে তারপর প্রায় পাশ কাটিয়েই চলে এসেছে—তাঁর ওই হাতে লাঠি আর চশমার মধ্যে হলদে কৌচকানো চোখদুটো দেখে কে চিনতে পারবে সেদিনের গানে আর সুরে উচ্ছল সেই উজ্জ্বল মানুষটকে?

সত্যি, এরকমও বদলে মানুষ যায়!

সুহাসও বদলে গিয়েছে অন্যরকম-ভাবে। ওর গলায় বাঁধা ডবল নট-এর এই টাই আর বিদেশী যে টাইপিনটা বুকের ওপরে ঝুলছে—তার নীচে যে টেরিলিনের প্যাণ্টটা চৌরঙ্গীর গোলাম আহম্মদের দোকানে তৈরি করানো—এ-সব শরীরে নিয়েও ও কী আজও সেই সুহাস যে কলেজে পড়তে নিজের হাতে কাচা আর ইস্ত্রী-করা জামা-কাপড় পরতো? যে বস্তির একটা ঘরে চাঁদা তোলা টাকায় স্কুল তৈরি করে রোজ সেখানে পড়াতে যেতো সন্ধ্যায়? যে সেদিন এ-অঞ্চলের প্রতিটি কাজের মধ্যে থাকতো?

সেই সুহাসও আর কোথাও আজ নেই।

ট্যাকসিটা এবারে পার্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলছিল। এতো পথ কখন পার হয়েছে সুহাস তা খেয়ালই করেনি, ট্যাকসিটা, হঠাৎ থেমে দাঁড়াতে তাকিয়ে দেখল—ওয়েলেসলী। বাঁদিকে উড স্ট্রীটের মোড়। সামনে ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলছে। বাঁদিকে ফুটপাথের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একজন লোক—ময়লা পাজামা, তার চেয়ে একটু পরিষ্কার সাদা সার্ট—মুখটায় যেন কতোকাল আগেকার কোন্ চেনা মুখের আদল।

কোথায় চেনা? কবেকার? সুহাস তার স্মৃতির মধ্যে খুঁজছিল। হঠাৎ মনে পড়তে চেঁচিয়ে ওঠে—কে? অনুপ না?

শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছে সে। হ্যাঁ, অনুপই। সুহাসের ভুল হয়নি। আবার সে চেঁচিয়ে ডাক দেয়, এই যে এদিকে, এই অনুপ!

শূন্য একটা দৃষ্টি সুহাসের মুখের ওপরে থেমে যেন বিস্ময় নিয়ে খুঁজছে, সুহাস গলা চড়িয়ে ডাকে, আয়, শিগ্গির উঠে আয়।

কিন্তু সে তখনও একইভাবে চেয়ে আছে।

ট্রাফিকের লাল বদলে গিয়ে হলুদ আলোটা জ্বলে উঠেছে, ড্রাইভারও পিছনে মুখ ঘুরিয়ে ট্যাকসি ছাড়ার অনুমতির অপেক্ষায়, সুহাস আর অপেক্ষা না করে দ্রুত হাতে দরজাটা খুলে ফেলল—থোড়া রোক্না ভাইসাব্! পরমুহূর্তে ফুটপাথে সেই অবাক মানুষটার হাত ধরে টান দিলো—আয়, উঠে আয়, তাড়াতাড়ি—

সে সুহাসের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলো যেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাকে গাড়িতে টেনেও তুলেছে সুহাস, তবু তার মধ্যে পিছনের গাড়িগুলোর হর্ন-এর শব্দে ভয়ে গিয়েছে বাতাস—তাদের সব ব্যস্ততাকে আটকে ধরেছে সামনের যে ট্যাকসিটা তাকেই তীব্র চিৎকারে শাসন করছে সবাই।

এতো শব্দের মধ্যে তবু সুহাসের সামনে স্তব্ধ এক কবেকার অতীত—এ সেই অনুপ।

সুহাস ট্যাকসিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ড্রাইভার দ্রুত গীয়ার ফেলে এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। ছিটকে একটা লাফ দিয়ে যেন পিছনের জায়গা, সে খালি করে দিয়েছে। তবুও পিছনে তখনো হর্নের শব্দ চলেছে—পার্ক স্ট্রীট ওয়েলেসলী উড স্ট্রীট সব মুখরিত হয়ে আছে। সেই সব শব্দের মধ্যে গলা একটু চড়িয়ে সুহাস বলে— কি রে, চিনতে পারছিস না তো! কিন্তু তোকে আমি ঠিক চিনেছি কিনা বল?

সীটের ধার ঘেঁষে থাকা সেই মানুষটার চোখে মুখে তখনও বিস্ময়—তার মনের মধ্যে সন্ধান যেন চলেছেই—সে বলে ওঠে, আপনি?

বাড়ির সকলের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে উপকারী খাবারই দেওয়া উচিত

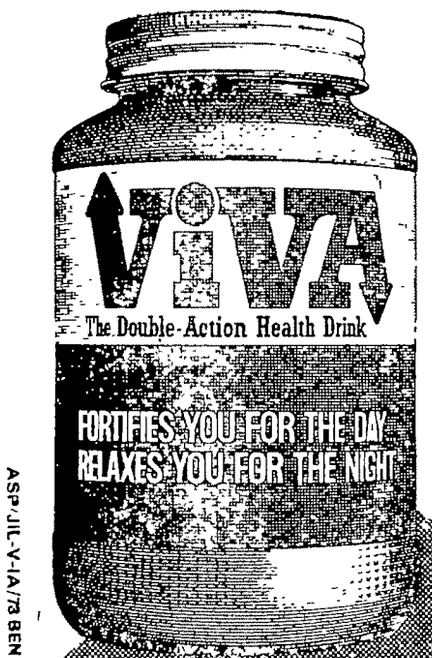

ASP/JIL-V-IA/73 BEN

বাড়ির লোকেদের ভিভা খাওয়ান.

সর্বাধুনিক খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যার ফল ভিভা। এর পেছনে আছে পুষ্টির ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের গবেষণা। আর পাঁচটা খাদ্য পানীয়ের মত ভিভাতেও আছে পুরো মনীষুক্ত খাঁটি দুধ ও বার্লি মল্ট। কিন্তু ভিভাই শুধু একমাত্র যাতে আছে হুইট মল্ট।

হুইটমল্ট কেন?

কারণ হুইট মল্টে রয়েছে সহজপাচ্য আকারে প্রকৃতিদত্ত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন আর খনিজ।

হুইট মল্ট যোগ হওয়ায় আরও নানা দিক থেকে ভিভা হয়েছে বহুগুণে ভালো। এর স্বাদ ঢের ভালো রং গাঢ় সোনালী এবং জলে মেশার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

সেইজন্যেই আপনাদের দৈনিক আহারের স্বাবশ্যক খাটতি পূরণে ভিভার জুড়ি নেই।

আপনার হাতে এখন বেছে নেবার উপায় রয়েছে। আপনার পরিবারের পক্ষে যে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয়টি আজকের সবচেয়ে ভালো সেইটি বেছে নিন।

ভিভা কিনুন।

ভারতে তৈরী করছেন:
জগতজিৎ ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ভিভা
অফুরন্ত জীবনী শক্তির উৎস

এখনও চিনতে পারলি না? আমি সুহাস।

বলতে বলতে তার কাঁধটা ধরে ঝাঁকুনি দেয়—বল, কেমন আছিস? ওঃ কতোকাল পরে দেখা!

এবারে সুহাসকে সে চিনেছে, চোখে-মুখে পরিচয়ের ঝলকে-ওঠা আলো, ও তাই বল।

ভালো আছিস? সুহাস আবার বলে—

হ্যাঁ, ভালোই। তুই?

আছি একরকম, সুহাস উত্তর দেয়, কিন্তু, আশ্চর্য, তুই আমাকে চিনতে পারলি না অনুপ?

এ-কথাটা সুহাস বলতেই পারে। মাঝখানের পনেরো বছরের ব্যবধানেও তাকে চিনতে না পারার মতো বদলায় নি সে। শরীরটা এখন একটু ভারী হয়েছে, মুখে গালে আরেক প্রস্থ মাংসও লেগেছে, চোখে একটা চশমা—তবু অনেকেই বলে সুহাস আজও সেই একই রকম রয়ে গেছে।

অনুপ বদলেছে অনেক। প্রথমে তো পোশাক, তারপরে মুখ- কোথায় তার সেই কালো রঙের মুখে আলো-জ্বালা সেই দুটো চোখ যা সুহাসদের সবাইকার ঈর্ষার বিষয় ছিল? মুখের চামড়াটা আজ ফ্যাকাসে, শিথিল। চোখ ঘোলাটে—তারই কোল ঘেঁষে কতো অগুনতি সরু-মোটা খাঁজ। ওর একহারা শরীরের সেই টান বাঁধুনিটাও কোথায় চলে গেছে। সুহাসের সামনে আজ এই আধময়লা পোশাক-পরা অনুপ এক হপ্তা আগে দাড়ি কামানো ভাঙা চেহারার মানুষটাকে দেখে কি চিনতে পারবে সেদিনের সেই অনুপকে?

তবু সুহাস চিনেছে ওর চোখের ওপরে মাঝখানে ঠেকে-যাওয়া জোড়া ভ্রু আর ডানদিকে কপালের ওপরে সেই কাটা দাগটা দেখে। ওটার ইতিহাস সুহাসের জানা। ঘটনাটা তার চোখের সামনেই ঘটেছিল।

অনুপ এখন সুহাসের সারা দেহের ওপরে চোখ বুলিয়ে দেখছে। সুহাস যা দেখার দেখেই নিয়েছে। সে বলে উঠল—বল, কী করছিস এখন?

বলতে গেলে কিছুই প্রায় নয়।

তার মানে?

মানে, বলার মতো এমন কিছু নয়—কখনও এটা কখনো ওটা, বেশির ভাগই দালালী—জমির, বাড়ির, কখনও বা অন্য কিছুর—

দালালী তো ভালোই একটা লাইন—

অনুপ একটু ম্লান হাসি হাসে—হ্যাঁ, খুবই ভালো। তা তুই কী করছিস, বিজনেস?

না রে, একটা চাকরিতেই আছি আমি।

বলতে বলতে আরেকটা কথা যেন মনে পড়েছে—বিয়ে করেছিস? সেই অলকাকে? অলকা কেমন আছে?

বিয়ে আমি কাউকেই করি নি—

বলিস কিরে! তাহলে অলকার—

অনুপ ধীরে মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে—ওকথা বাদ দিয়ে অন্য কিছু বল।

তবুও সেই একই কথা আবার বলে সুহাস—অলকা কেমন আছে? সে তার—

চলন্ত ট্যাকসির শব্দে কিছু কথা হয়তো শোনা যায় নি, বাতাসে কিছুটা উড়েও গিয়েছে হয়তো বা—সুহাস শুধু দুটো মৃদু শব্দ শুনতে পায়—অলকা নেই—

নেই! কী বলছিস তুই অনুপ? সুহাস প্রায় চিৎকার করে ওঠে—কোথায় নেই?

অনুপ মুখ ঘুরিয়ে বলে—অতো চেঁচাস না সুহাস। চেয়ে দ্যাখ, চারপাশের সব লোক চোখ কান দিয়ে গিলছে।

সুহাস চোখ ফিরিয়ে দ্যাখে দু'পাশেই গাড়িগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটা মুখ বেরিয়ে এসেছে—সবারই চোখে যেন একই কৌতূহলের রঙ। তবু তাতে কী আসে যায় ওর। সে আরও চেঁচিয়ে বলবে, আবার বলতে যায়, কিন্তু উত্তর আসে তার আগেই—নেই মানে নেই, কোথাও নেই—

লাল আলোটা সরে যেতে এখন গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করেছে। পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর মোড়। বাঁদিকে গান্ধীজী লাঠি হাতে চলেছেন। সুহাস চলছে অফিসের পথে—গাড়িটা ময়দানের রাস্তায় ঢুকল, তখনই অনুপ বলে ওঠে—ট্যাকসিটা থামা, আমি এখানেই নামবো।

অলকা নেই। মানেটা বুঝতে পেরেছে সুহাস—অলকা নেই মানে সে কোথাও নেই।

সুহাসকে নিরুত্তর দেখে অনুপ বলে ওঠে—এই ট্যাকসি, রোকো ইঁহা।

ড্রাইভার ব্রেক কষে গাড়িটাকে বাঁদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সুহাস বলে ওঠে—কী হয়েছিল অলকার?

সে অনেক কথা, আজ নয়, যদি আর কোনোদিন দেখা হয়, তবে বলবো—

কেন এখন বলতে ক্ষতি কী?

অনুপের চোখে মুখে বিরক্তির স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সে বলে—বলছি আজ নয়। আমার কাজ আছে—

সেটা কী খুবই জরুরী? না হলে চল, না আমার অফিসে একটু—

—কাজ? হ্যাঁ, তা আছে, কিন্তু ঠিক সেজন্যে নয়, আমার এখানেই নেমে যাওয়া ভালো।

এত হেঁয়ালি সুহাসের সহ্য নয় ঠিক এই সময়—কাজ আছে, তবু সেজন্য নয়। অলকা নেই, তবু তার কী হয়েছিল তা বলবে না। সুহাস আর একটুও পেড়াপেড়ি করবে না। মনের বিরক্তিটা প্রকাশ করতেই সে যেন খুব শান্তভাবে নিচু গলায় বলে—ঠিক আছে। তাই বরং যা—

অনুপ কোন উত্তর দেয় না।

সুহাস দ্যাখে সে নেমে যাওয়ার জন্য তৈরি। ওর বিরুদ্ধে উষ্মাটা সুহাসের তোলাই থাক এখন। অনুপ চলে যাবার আগে অন্তত আর একবার দেখা হওয়ার সূত্রটা না রেখে দিলে খুবই ভুল করা হবে। তাই এ্যাটাশিটা খুলে সে নিজের একটা নেম-কার্ড বের করে অনুপের হাতে দেয়—এইটে রেখে দে, আমার ঠিকানা, ফোন-নম্বর সবই আছে, যদি কোন দিন দেখা করতে চাস—

একটু থেমে সে আবার বলে—এবারে তোর ঠিকানাটা বল, লিখে রেখে দিই—

আমার ঠিকানা আমি কাউকেই দিই না—অনুপ বলে। সে নিচের দিকে তাকিয়ে পা ঘষছে ট্যাকসির মেঝেতে। এবারে সীট ছেড়ে উঠল। দরজা খুলে বাইরে গিয়ে সুহাসের চোখের সামনে এক পাটি জুতো তুলে ধরে বলে, দ্যাখ এই জন্যে তোর অফিসে গেলাম না। শালা এই গিঁটটা মাঝে মাঝে এমন খুলে যায়—

সুহাস দেখল সেই জুতোটার দিকে। ওটা একটা সরু সরু স্ট্রাপ দেওয়া কাবলি জুতো ছিলো। গোড়ালির দিকটা চেপ্টে এখন একটা চটিজুতো—কিন্তু বুড়ো পুরনো। ওপরে দুটো স্ট্রাপ খুলে বেরিয়ে এসেছে—সে-দুটোকে একটা তার দিয়ে বেঁধে বাঁধা হয়েছিল, সেটাই খুলে গিয়েছে আবার। জুতোটার গোলের চামড়া আঙুলের জায়গাগুলোতে ক্ষয়ে গিয়ে নিচেকার শাদা রবারের রং বেরিয়ে এসেছে।

অনুপ সুহাসের সামনেই তারটা আবার আটকে নিয়ে বলে—পারতিস আমাকে তোর অফিসে নিয়ে যেতে? কেউ জিগ্যেস করলে পরিচয় দিতে পারতিস? কী বলতিস—বন্ধু?

কথা শেষ করে অনুপ চলে যাচ্ছে। সুহাস পিছনে ডেকে বলে—না আসতে চাস, ফোন করিস যেন—

অনুপ ফিরে দাঁড়ায়।

সুহাস বলে—করে করবি বলে যা।

এতক্ষণে প্রথমবার একটু নরম সুরে উত্তর আসে—তার কোনো ঠিক নেই, তবে করবো একদিন—

আর কোনো কথা না বলে অনুপ আবার হাঁটতে শুরু করে। সুহাস চেয়ে থাকে তার দিকে। অনুপের হাঁটার চালটা কিন্তু সেই আগেকার মতোই আছে। আর, ওই তার-বাঁধা জুতোটাও পায়ে যেন এতোই সহজ যে হাঁটার ভঙ্গিতে তার একটুও বেচাল নেই।

অব ছেড়ে সার্?

ট্যাকসি ড্রাইভারের গলার শব্দে সুহাস চমকে উঠে বলে—হ্যাঁ চালিয়ে।

(ক্রমশঃ)

পাবলিক থিয়েটারে নটী

বিশ্বরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাছাড়া পুরুষের ভূমিকায় স্ত্রীলোকের অভিনয় শিল্পের বিচারেও সঠিক নয়। গিরিশচন্দ্র অপর একটি প্রবন্ধে (পুরুষের অংশে নারী অভিনেত্রী। বঙ্গালয়। ২রা চৈত্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) এই প্রসঙ্গে ফরাসী অভিনেত্রী ম্যাডাম বার্নহার্টের অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন। ম্যাডাম বার্নহার্ট হ্যামলেট নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু হ্যামলেটের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হতে পারেননি। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'এই আশ্চর্য ছদ্মবেশের সাহায্যেও একজন স্ত্রীলোক, পুরুষ সাজিয়া রঙ্গমঞ্চে আসিয়াছে, সমস্ত নাটক অভিনয়ের কোন অঙ্কে তাহা গোপন করিতে বা দর্শকচক্ষে ক্ষণিক বিভ্রম জন্মাইতে সক্ষম-অভিনেত্রীও অক্ষম হইয়াছিল। ইহাতে কেবলমাত্র প্রকাশ পায়, যাহা হইবার নয়, তাহা হয় নাই। পুরুষের স্বাবা নারীচরিত্র অভিনয় বা নারীর স্বাবা পুরুষ চরিত্র অভিনয় সুসম্পন্ন হইবার নয়, এই নিমিত্ত বার্নহার্টেরও হয় নাই।'

আসলে নাটকে কোন ভূমিকায় কে অভিনয় করল, স্ত্রী না পুরুষ, নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য বিচারে তা কখনও মুখ্য বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। মুখ্য বিবেচনার বিষয় হল নাটকের বক্তব্য প্রচারে অভিনয় কতখানি সার্থক হল। বিশেষতঃ থিয়েটার যখন সমাজের দর্পণ, তখন সমাজচিত্র নাটকে এবং তার অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীদের ওপর প্রতিফলিত হবেই। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যদিও সুনীতির পক্ষপাতি, তবুও তিনি এজন্য স্বাধা নাটকওয়ালাদের দোষী করেন নি। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পৌষ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় লিখেছেন—'যে দেশে মাঠে ঘাটে, কলবাজারে, মন্দিরে, নাট্যশালায়, বৈঠকখানায়, বেশ্যালয়ে চাষাভুষো নটনটী বাবু বেশ্যা ইতর সাধারণ সকলেই অহরহ কৃষ্ণগীতি গায়িতেছে—সেখানে গৃহচিত্র কৃষ্ণ, গাত্রবস্ত্র কৃষ্ণ, দোকানের খাতায় পর্যন্ত কৃষ্ণ, সেখানে একা যাত্রাওয়ালার প্রাণ বধিয়া কি ফল?'

এ সম্পর্কে শেষ কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধর্মভাবের কথা হলেও শিল্পভাবেরও ঐ একই কথা। 'শ্রীম' রামকৃষ্ণের চৈতন্যলীলা নাটক দর্শনের বিবরণ দিয়েছেন এইভাবে :—

'[থিয়েটার ও বেশ্যার অভিনয়—পূর্বকথা. . .]

ঠাকুর আজ কলিকাতায় ষ্টার থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দেখিতে যাইবেন। মহেন্দ্র মুখুজ্যের সঙ্গে তাঁহার গাড়ী করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইবেন। কোন্‌খানে বসিলে ভালো দেখা যায়, সেই কথা হইতেছে। কেউ কেউ বললেন, এক টাকার সিটে বসলে বেশ দেখা যায়। রাম বললেন, কেন উনি বক্সে বসবেন।

ঠাকুর হাসিতেছেন। কেহ কেহ বলিলেন, বেশ্যারা অভিনয় করে। চৈতন্যদেব, নিতাই এ সব অভিনয় তারা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদিগকে)—আমি তাদের মা আনন্দময়ী দেখবো। 'তারা চৈতন্যদেব সেজেছে, তা হলেই বা। শোলার আতা দেখলে সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়।' গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই সকল বঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদিগকে দেখিয়া 'মা আনন্দময়ী' বলিয়া প্রণাম করিতেন।'

(১০)

বিনোদিনী মাত্র ১২ বৎসর অভিনয় করেছেন। অর্ধশতাধিক নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। স্বদেশী মনীষীরা তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। বিদেশীরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ফাদার লাফোঁ, এডুইন আর্নল্ড, কর্নেল অলকট প্রমুখ বিনোদিনীর অভিনয় দেখে প্রশংসা করেছেন। আর্নল্ড তার 'ট্রাভেলস্ ইন দি ইস্ট' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

রঙ্গালয়ে রাণী-সাজা নায়িকা-সাজা বিনোদিনীর শেষ জীবন নিদারুণ দুঃখে ও হতাশায় কেটে যায়। তাঁর আশ্রয়দাতা 'বাবুর' মৃত্যু হল, নানা কারণে রঙ্গমঞ্চের সাথে সম্পর্কও ঘুচে গেল, মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর একমাত্র কন্যারও মৃত্যু হল। শেষতী রোগ হয়েছিল বলে শোনা যায়। অভিনয় ছাড়লেও শেষ জীবনেও

হরিণতী (ব্ল্যাকী)

থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়েননি। অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতি কাহিনী 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন, কিন্তু থিয়েটার দেখবার আগ্রহটা যায়নি। নতুন বই হলে ত' উনি আসতেনই, এ কর্ণার্জুন যে কতবার দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

... এসে উইংসের ধারে বসে পড়তেন। অমনি, আমাদের মেয়েরা, যে যেখানে থাকতো সবাই আসতো ছুটে, একটা মোড়া এনে পেতে দিতো, আর 'দিদিমা' বলে ওঁকে একেবারে ঘিরে ধরত।'

অভিনয় ছেড়ে দিলেও সাহিত্য-চর্চা ছাড়েন নি বিনোদিনী। সে যুগের বিচারে তিনি এক আশ্চর্য কবি-প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। নিজে সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলেন। থিয়েটারে নাটকাভিনয়, নাটক পাঠ ও আনুষঙ্গিক নাট্যচর্চা তাঁর এই সামান্য সাধারণ শিক্ষার পুষ্টি ঘটিয়েছিল। ফলে বিনোদিনী এক বিরুদ্ধ মহিলায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর কবিতা এবং আত্মজীবনী এর সাক্ষ্য দেবে। তাঁর আত্মজীবনীতে এক বিরল শিল্পীমনের প্রকাশ ঘটেছে। সে যুগের বিচারে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথায়' তিনি লিখেছেন, 'আশা, উদ্যম, ভরসা, উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখময়ী কল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! অহরহ শুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন। আমি এই অসীম সংসার প্রান্তরে একটি সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া কতক্ষণে চিরশান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয়স্থান। আমার

ক্ষতরব্যথা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আমি ইহা লিখিলাম। কেননা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আর আমার ভয় নাই। লোকেই সে ভয় দূর করিয়াছে।' (বিনোদিনী দাসী। আমার কথা ও অন্যান্য রচনা। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত)

আত্মজীবনী এবং আরো কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া, বিনোদিনী 'বাসনা' এবং 'কনক ও নলিনী' নামক দু'খানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন 'বাসনা' (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) কবির জননীর উদ্দেশ্যে এবং 'কনক ও নলিনী' (১৩১২) কবির 'স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত।'

(১১)

বিনোদিনীর 'বাবু' কালীপদ ঘোষ সে যুগের কোলকাতার একজন ডাকসাইটে পুরুষ। ধন ও বীর্যে পুরুষের মত পুরুষ। দুঃসাহসী, বেপরোয়া। তার ভালোবাসাও তেমনি। অসুরের মত চেহারা। রাহুর মত তাঁর ভালোবাসা। সারাজীবন বিনোদিনীর পায়ে নূপুরের মত শিঞ্জিত হলেন। শ্যামপুকুরের বনেদী পরিবার। মানসম্মান ত্যাগ করলেন, হরির লুটের বাতাসার মত পয়সা আর যৌবন লুটিয়ে দিতে লাগলেন। জন ড্রিংকিনসনের বড়বাবু। সমাজে খ্যাতি প্রতিপত্তি অনেক। আগে এসেছিলেন কালীপদ ঘোষের স্ত্রী। তারপর রামকৃষ্ণের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লেন স্বয়ং কালীপদ, বিবেকানন্দ যাঁর নাম রেখেছেন দানাকালী। গিরিশ তাকে পাঠিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে মদ চাইতে। ঠাকুর তাকে মদ দিলেন। ঈশ্বরবোধের কারণবারি। 'শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপদকে স্পর্শ করলেন। আর অসুরের মত বিকট অয়স্কান্ত চেহারা.....সে শিশুর মত কাঁদতে লাগল।'

বিনোদিনী তো আগেই ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছেন। কালীপদর জীবনের দুই পুণ্যবতী নারী তাকে নিয়ে এলেন রামকৃষ্ণের কাছে। দানা-কালী আবার গিরিশচন্দ্রেরও বন্ধু। গলায় গলায়। গেলাসে গেলাসে ভাব। রামকৃষ্ণ-ভাবনা ঘিরে রইল বিনোদিনীর বাবুকে। এমন ভয়ংকর বিনোদিনীর বাবুর ভালোবাসা যে তাঁর প্রেমিকা গুর্মুখের আশ্রিতা হবেন শুনে তরবারি নিয়ে কাটতে গেলেন। তারপর নিজের ব্যর্থতার বোধে শিশুর মত কাঁদতে লাগলেন। বিনোদিনী অনন্যা ছিলেন না। তবু তাঁর বাবু রঙ্গ-নটীকে তিনি ত্যাগ করেননি কোনোদিন। বিনোদিনী তাঁর স্মৃতিকথার মুখবন্ধে ('উপহার—আমার আশ্রয়স্বরূপ প্রাণময় দেবতার চরণে এই ক্ষুদ্র উপহার প্রাণের কৃতজ্ঞতার সহিত অর্পিত হইল) লিখেছেন —'এই পুস্তক লেখা শেষ করিয়া যাঁহার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ভূমিকা লিখিত হয়, তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি যে, 'আমার জীবনী লিখিয়া আপনাকে উপহার দিব, কেমন?' তিনি তখন সহাস্যবদনে বলেন যে, 'বেশ। তোমার যখন সকল ভাব বোঝাগুলি বহিতেছি, তখন ও পাগলামির কালের আঁচড়গুলিও বহিব।' যাহার উদ্দেশে উপরোক্ত উপহার প্রদত্ত হয় সেই দয়াময় দেবতা এক্ষণে আর ইহসংসারে নাই। (চিরদিন এ সংসারে কেহ থাকে না বটে) কিন্তু স্বর্গে আছেন! স্বর্গ ও নরক, ইহজন্ম ও পরজন্ম, হিন্দু নরনারীগণ অকপট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকেন বোধহয়। .....আমিও বলিতেছি যে তিনি এই পৃথিবীতে না থাকিলেও স্বর্গে আছেন। অবশ্যই সেইখান হইতে সব দেখিতেছেন! এ হতভাগিনীরও হৃদয়ব্যথা বুঝিতেছেন। অবশ্য যদি আমাদের হিন্দু-ধর্ম সত্য হয়, দেবদেবী সত্য হয়, জন্ম জন্মান্তর যদি সত্য হয়।'

বেঁচে থাকতে জীবন যৌবন যার পায় উৎসর্গ করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিতে কবিতা কুসুমাঞ্জলি দিলেন। কবিতা হিসাবে সেগুলি কতখানি সার্থক হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। সে কবিতার অন্তরিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর 'বাসনা' কাব্যের প্রায় সব কয়টি কবিতা তাঁর প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে লেখা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভালোবাসার পুরুষের মৃত্যু হয়। তারপরও দীর্ঘকাল তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি প্রেমের স্মৃতি হৃদয়ে অম্লান রেখেছিলেন।

বিনোদিনীর গুরুভক্তি তাঁর বাবুকেও রামকৃষ্ণের পায়ে পৌঁছে দিল। বিনোদিনীর এ দান কম নয়। প্রতিদান দিলেন দানাকালী। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন রোগশয্যায়। বাঁচার আশা নেই। তাঁর কাছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। দরজায় ঠাকুরের সন্তানেরা পাহারা। বিনোদিনী ধরলেন বাবুকে। ঠাকুরকে শেষবারের মত একবার দেখবেন। কিন্তু সে তো অসম্ভব। বিনোদিনী একে স্ত্রীলোক, তায় নটী। তাকে কিছুতেই ঢুকতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বিনোদিনীর তাঁকে দেখা চাই। শেষ পর্যন্ত বাবু রাজী হলেন।

বিনোদিনী খুব ভালো মেক-আপ নিতে পারতেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর এই ক্ষমতার বিশেষ প্রশংসা করতেন। বলরাম বসু একবার বিনোদিনীর সাজসজ্জা দেখে অবাক হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব নাটকে তিনি সেজেছিলেন গোপা। পরে একদিন অসজ্জিতা বিনোদিনীকে দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে এই নারী কি করে অমন অপূর্ব সুন্দরী সেজে-ছিলেন! থিয়েটারে যখন তাঁর নাম হল তখন নিজের মেক-আপ তিনি নিজেই করতেন। গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'সঙ্গীত হইতে শেখা অভিনয়কার্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিলেন।'

ভুবনেশ্বরী ও বিনোদিনী (হাঁদী)

সেদিন ঠাকুরের ঘরের দরজায় দানাকালী এলেন। সঙ্গে এক ইংরেজ বন্ধু। সাহেবভক্ত শুনে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ দরজা ছেড়ে দিলেন। হ্যাট কোট পরা সাহেব ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে কালীপদর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন। ঘরে ঢুকেই সাহেবী হ্যাট ফেলে দিয়ে যিনি ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, তিনি বিনোদিনী, নটী বিনোদিনী।

ভক্তরা রুষ্ট হলেন। দানাকালী আর তাঁর বক্ষিতার স্পর্ধা দেখে আস্তিন গুটিয়ে এলেন। ঠাকুর বালকের মত হাসছেন। বিনোদিনীর সঙ্গে সস্নেহে কথা বলছেন। কালীপদর চিবুক ধরে আদর করছেন। বলছেন, 'চৈতন্য হও, চৈতন্য হও।'

সেই মত্তহস্তী বাঁধা পড়েছিল শৃঙ্খলে। একটা প্রেমের বাঁধন। সে বাঁধন বিনোদিনীর। আর এক বাঁধন ঈশ্বরের। তাঁর হাতে এ বাঁধন যে পড়িয়েছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিনোদিনীর প্রেমিকের মৃত্যু হয়। অনেক বঞ্চনাও পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকে। তাছাড়া বিনোদিনীর জীবনে তিনিই একমাত্র পুরুষ ছিলেন না। তিনি নিজেও তা স্বীকার করেছেন অকপটে। তথাপি তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও বিনোদিনী তাঁর জীবনের প্রধান পুরুষের প্রেমের স্মৃতি বহন করেছেন। 'বাসনা' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় চিরন্তন প্রেমিকা নারীর সেই হাহাকার শুনতে পাই—

'বহুদিন শুনি নাই সে মধু বচন।
বহুদিন দেখি নাই উজ্জ্বল নয়ন।।
বহুদিন পাই নাই প্রাণের আদর।
বহুদিন হেরি নাই সরল অন্তর।।
বহুদিন হারায়েছি প্রেমের চুম্বন।
বহুদিন ছিঁড়িয়াছে হৃদয় বন্ধন।।
এখন হৃদয় মন পাগল আমার।
আর একবার দেখি এই শেষবার।।

(আর একবার)

(১২)

প্রলোভন তিনকড়িরও কম ছিল না। কোলকাতার বাবুরা তাকেও কিনে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনকড়ি সে বন্ধন মানেননি। থিয়েটারের ডাক তাকে ঘর বাঁধতে দেয়নি। গিরিশচন্দ্র তাকে একরকম হাতে ধরেই থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন। এই নটভৈরবের পায়েই তিনি তার জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

এ জন্যে তিনকড়িকে কম মূল্য দিতে হয়নি। বাবুরা এসেছিলেন তাকে 'আশ্রিত' করতে। তিনকড়ির মায়েরও সম্মতি ছিল। বাধা রোজগার। নিশ্চিন্ত জীবন। কিন্তু বাবুর একমাত্র শর্ত থিয়েটার ছাড়তে হবে। নির্দিষ্ট দিনে বাবু এলেন কোঁচা দুলিয়ে এসেন্স মেখে। কিন্তু তিনকড়ি তাঁর মা এবং প্রতিবেশিনী সবাইর পরামর্শ ঠেলে ফেলে থিয়েটারে চলে গিয়েছেন। বিরক্ত হয়ে বাবুটি চলে গেলেন। বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে নিদারুণ প্রহার জুটল। মায়ের চোটে তিনদিন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে রইলেন। সেরে উঠে আবার গেলেন থিয়েটারে। এবার আর মায়ের দিক থেকে প্রবল বাধা রইল না।

থিয়েটারে ছোটখাট পার্ট করলেও, বড় থিয়েটারে তাঁকে নিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র। 'সিটি' থিয়েটারের সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়েছেন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে। সেইখানেই গিরিশ ওঁকে আবিষ্কার করলেন। গিরিশ তিনকড়িকে নিয়ে এলেন মিনার্ভায়।

তারপর তিনকড়ির জীবনের সেই অবিস্মরণীয় ঘটনা। গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাটকের মহলা চলছে। নামকরা অভিনেত্রী প্রমদা লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় কিছুতেই গিরিশের মনের মত পার্ট বলতে পারছেন না। গিরিশের প্রতিভা আবিষ্কারের ক্ষমতা ছিল। তিনি তিনকড়িকে সেই পার্ট দিলেন। কেউ কেউ বলেছেন; তিনি মোটেই লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তিনকড়ির নিজের বিবরণী থেকে জানা যায় সামান্য লেখাপড়া তিনি জানতেন। রাত জেগে তিনকড়ি পার্ট মুখস্থ করলেন। গিরিশচন্দ্র মহলা দেখে খুশি হলেন। নায়িকার ভূমিকায় তিনকড়ি বহাল হলেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যাকবেথের অভিনয় হল। গিরিশ ম্যাকবেথ, আর তিনকড়ি লেডী ম্যাকবেথ। অসামান্য অভিনয় হল। তিনকড়ির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। ম্যাকবেথের অভিনয় ইংরেজী কাগজেও বিশেষভাবে প্রশংসিত হল। ইংলিশম্যান ও ডেইলি নিউজ পত্রিকায় এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা হল।

মুবারক মঞ্জুরা, আবু হোসেন, জনা, করমেতিবাই প্রভৃতি আরও নানা নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনকড়ি। প্রতিটি ভূমিকায় আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মুগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে জনা, লেডী ম্যাকবেথ আর করমেতির ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করতেন। তিনকড়ি সুন্দরী ছিলেন, তারপর তাঁর গানের গলাও ছিল অপূর্ব। 'জনা'র ভূমিকায় তিনি এত অপূর্ব অভিনয় করতেন যে, যতকাল তিনকড়ি বেঁচে ছিলেন, ততকাল ঐ ভূমিকায় আর এক প্রখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও কোনোদিন অভিনয় করেননি।

তিনকড়ি তাঁর সাধনা দিয়েছিলেন থিয়েটারকে, জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নটনাথ গিরিশচন্দ্রের পায়। গিরিশ তিনকড়িকে খনিগর্ভ থেকে তুলে তাকে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড করে তুলেছিলেন, তিনকড়িও সারাজীবন গিরিশের কণ্ঠে অলংকৃত হয়ে রইলেন। গিরিশের জীবনে তিনকড়ি অনন্যা নয়, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বলতম প্রিয় শিষ্যা ললিতকলাসঙ্গিণী সখী।

এই তিনকড়ির জন্যেই গিরিশের জীবনও বিপন্ন হয়েছিল একবার। কোলকাতার এক বড়লোক তিনকড়িকে রাখবার প্রস্তাব দিলেন। তিনকড়ি সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। বাবু বুঝলেন, গিরিশকে তিনকড়ির জীবন থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে তাকে তিনি কোনদিন পাবেন না। ষড়যন্ত্রের জাল পাতলেন। সিঁথির বাগানবাড়ীতে বাবু এক মাইফেল দিলেন। গিরিশ-তিনকড়িও নিমন্ত্রিত হল। গিরিশের এক প্রিয়পাত্র গুণ্ডাদের কাছ থেকে খবর পেলেন সেই রাতেই গিরিশকে খুন করা হবে। এই ভদ্রলোকই কৌশলে আসর থেকে গিরিশ আর তিনকড়িকে বাইরে নিয়ে এসে পিঠে করে আমগাছের ডাল বেয়ে একে একে তাদের পাঁচিলের ওপাশে পৌঁছে দিলেন।

প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনকড়ি। থিয়েটারে তাঁর অশেষ খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু নিজের হীন সামাজিক অবস্থানের কথা কখনও বিস্মৃত হন নি। গিরিশচন্দ্রকে তিনকড়ি বললেন, 'অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই হীনস্থানে জন্ম হয়েছে। বলতে পারেন কি করলে, আর এখানে জন্মাতে হবে না?' গিরিশ বললেন 'ভগবানের এক নাম পতিতপাবন। যদি মনেপ্রাণে তাঁকে ডাকার মত ডাকতে পার, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পতিতাকে চরণে আশ্রয় দেবেন।

বাংলা থিয়েটারের আর এক নামকরা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অন্তর্গত ছিলেন। তারাসুন্দরী ছিলেন ব্রহ্মানন্দের ভক্ত। ছোটবেলায় বিনোদিনীই প্রথম তাঁকে বেলুড় মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারাসুন্দরী লিখেছেন, 'অতি শৈশবে যখন সাত বৎসর বয়সে রঙ্গালয়ে প্রথম প্রবেশ করি, তখন ইনি (বিনোদিনী) আমায় নাট্যশালায় লইয়া যান, মঠেও ইনি আমার প্রথম সঙ্গিনী।'

তারাসুন্দরীও থিয়েটার ছাড়েননি। নানা বাধা-বিঘ্ন, শত প্রলোভন সামনে, তারাসুন্দরী তবুও আজীবন নাট্যসাধনা করে গিয়েছেন। দেখতেও খুব সুন্দরী ছিলেন না, প্রায় নিরক্ষর, তবু অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে তিনি রঙ্গনীয়া হয়ে উঠেছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা অমরেন্দ্রনাথ, এই নারীর পায়ে সর্বস্ব অঞ্জলি দিলেন। তাঁর ঘর গেল, স্টেজকে দুবে সরিয়ে দিলেন, বিপুল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল। অমরেন্দ্রনাথের তারাসুন্দরীর প্রতি অপার মুগ্ধতা শেষ হল না।

যেমন জীবন-নাটকের হাসিকান্না, তেমনি থিয়েটারের হাসিকান্নায় রাণীসাজার ভূমিকায়ও তারাসুন্দরীর জুড়ি ছিল না। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, 'তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখে আর তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি বাংলাদেশের অভিনেত্রীদের

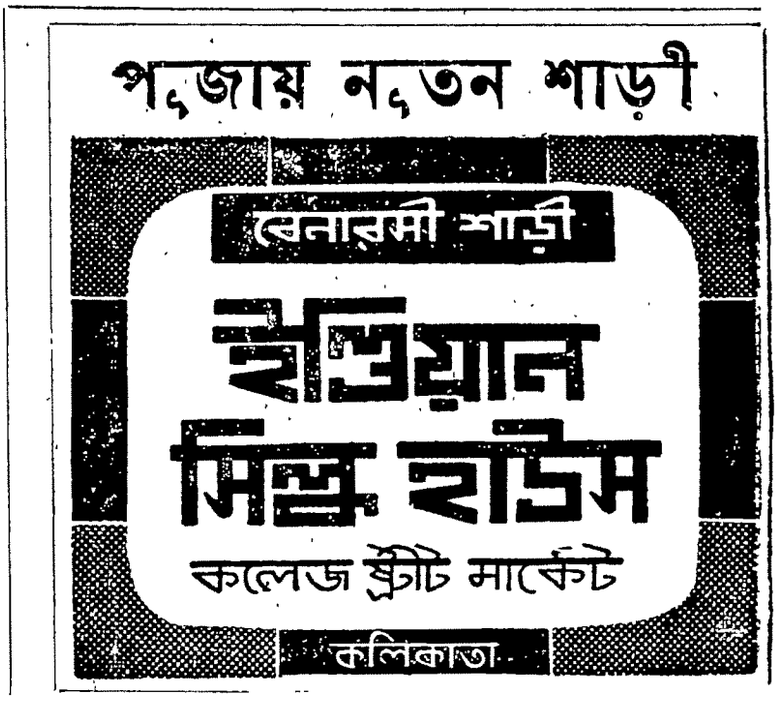

সম্পর্কে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি।' (যাদের দেখেছি) তারাসুন্দরীর অভিনয়ের আর একজন ভক্ত ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বলেছিলেন, 'তারাসুন্দরী আশ্চর্য প্রতিভা। ওঁর ওপরে একটি কবিতা লেখার ইচ্ছে আছে।' তারাসুন্দরীর অভিনয়ের প্রশংসা করে বিপিনচন্দ্র পালও ইংরেজীতে এক সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

তারাসুন্দরীও গিরিশেরই আবিষ্কার। তখন এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে স্টার থিয়েটারে এসেছেন গিরিশচন্দ্র। একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সামনে প্রণাম করেই গিরিশচন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, একটি মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

গিরিশচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন, 'তুই কে রে?'

মেয়েটি মাথা একটু নীচু করল। বলল, 'আমি তারা।'

গিরিশচন্দ্র বললেন, 'তুই বুঝি গোপাল সাজিস?'

'হ্যাঁ।' সরলা নাটকে তারাসুন্দরী গোপাল সাজে।

তারাসুন্দরীর মাথায় হাত রাখলেন গিরিশচন্দ্র। কাছেই বসেছিলেন অমৃতলাল মিত্র, গিরিশচন্দ্র বললেন—'অমৃত, এই মেয়েটিকে যত্ন করিস। এর কিছু হবে। (সাজঘরইন্দ্র মিত্র) এই অমৃতলালের যত্নে আর গিরিশের শিক্ষায় তারাসুন্দরী যশস্বিনী হয়েছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা, প্রতাপাদিত্যের কল্যাণী, সিরাজদ্দৌলার জহরা, চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী, সাজাহানের জাহানারা, দুর্গাদাসের গুলনেয়ার, রাখীবন্ধনের ধারা, অযোধ্যার বেগমের বেগম, কিন্নরীর উৎপল প্রভৃতি ভূমিকায় তারাসুন্দরী অসামান্য অভিনয় করেছিলেন। 'কিন্নরী' নাটকে উৎপলের ভূমিকায় অভিনয় করে মিনার্ভা থিয়েটারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। 'জনা' নাটকের নামভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করতেন, সে-রকম অভিনয় বিদেশের রঙ্গালয়েও হত কিনা সন্দেহ। তিনকড়িও জনার ভূমিকায় অভিনয় করে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তারাসুন্দরীর জনা সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের জন্যে অধিকতর ভাবগম্ভীর হয়েছিল। চন্দ্রশেখর নাটকে শৈবলিনী এবং ওথেলোর ডেসডিমোনার ভূমিকায়ও তিনি চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

তারাসুন্দরী কবিস্বভাবের অধিকারিণী ছিলেন। প্রায় নিরক্ষরা হলেও পরবর্তী জীবনে বিদ্যাচর্চা করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'সৌরভ' পত্রে তারাসুন্দরীর দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা দুটির নাম 'প্রবাহের রূপান্তর' এবং 'ক্ষুস্ন ও ভূমর'। এই রকম কবিস্বভাব

সরোজিনী (ন্যাড়া)

ছিল বলেই তাঁর অভিনয় শিল্পগুণ লাভ করেছিল।

(১৩)

সেকালের অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই সুগায়িকা ছিলেন। বিনোদিনী, তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী ভালো গাইতেন। ভালো গান না জানলে সে-যুগে কোনো অভিনেত্রী নাম করতে পারতেন না। অবশ্য যাঁরা বঙ্গালয়ে অভিনয় করতে আসতেন, সে-যুগের সেরকম অভিনেত্রীই এমন ঘর থেকে এসেছিলেন নৃত্যগীত দিব চর্চা ব্যবসায়িক কারণেই তাদের করতে হত। তাই সেকালের থিয়েটারের সব অভিনেত্রীই কমবেশী গান জানতেন।

এঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় গঙ্গাবাঈ ও কাদম্বিনীর। গঙ্গাবাঈয়ের কাছেই বিনোদিনীর সঙ্গীত শিক্ষা। ছোটবেলায় তাঁর সঙ্গে বিনোদিনী 'গোলাপফুল' পাতিয়েছিলেন। চিরকাল এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিনোদিনী লিখেছেন যে গঙ্গামণি সুন্দর গায়িকা ও অভিনেত্রীর উপরন্তু [illegible] অহংকারশূন্যা ছিলেন।'

গঙ্গাবাঈজী বয়সে বিনোদিনীর চেয়ে বড় ছিলেন। তাঁর ঘরে বাবুরা আসতেন। গঙ্গাবাঈয়ের দুই বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ সীতার বিবাহ' গীতিনাট্য অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। বিনোদিনীদের সংসারে তখন নিদারুণ অভাব। গঙ্গাবাঈজী বিনোদিনীর মাতামহীকে প্রস্তাব দিলেন যে, কিছু জলপানির বিনিময়ে বিনোদিনী থিয়েটারে নামতে পারে। তাঁর প্রস্তাবমত বিনোদিনীকে দশ টাকা বেতনে ভুবনমোহন নিয়োগীর ন্যাশনাল থিয়েটারে ভর্তি করে দিলেন।

গঙ্গাবাঈজী সামান্যমাত্র লেখাপড়া জানতেন। তথাপি সঙ্গীতের দুরূহ কৌশল সহজেই আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মার্জিত ও ভরাট। দরাজ গলা না থাকলে সে-যুগের থিয়েটারে গান গাওয়া যেত না। ধ্রুপদী গানেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছিল। গঙ্গাবাঈ (থিয়েটারের গঙ্গামণি) শুরু থেকেই স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিডন স্ট্রীট থেকে স্টার থিয়েটার হাতীবাগানে উঠে গেলে তিনি সেখানে যোগ দেন। দক্ষযজ্ঞে ভৃগুপত্নী, নিমাই সন্ন্যাসে শচী, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরে পাগলিনী, নসীরামে সোনা, বনবীরে ধাত্রী পান্নার ভূমিকায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। মুরলার ভূমিকায় (কালাপাহাড়) গঙ্গামণির গান খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর ভূমিকায় 'ধবা মাঝে উন্মাদিনী ধাই' এবং অন্যান্য গানে তিনি দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন। গঙ্গামণির মৃত্যুর পর অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিতে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির নাম 'স্মৃতির আদর' (স্টারে প্রখ্যাত গায়িকা ও অভিনেত্রী গঙ্গামণি দাসীর স্বর্গলাভ উপলক্ষে)। কবিতাটির বক্তব্যাংশ—

(১)
ভেঙেগেছে ভেঙেগেছে বীণা ছিঁড়ে গেছে তার
আর না শুনিবে কেহ সে মধুঝংকার।
জাগ ইয়া হৃদি তান,
কে আর করিবে গান,
আকাশ ভরিয়া গান উঠিবে গো কার।
গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই আর।।

(৭)
শুধু নয় অভিনয় প্রকৃতি মধুর।
মধু তানে মধু প্রাণে বাঁধা এক সুর।।
স্থিরা ধীরা লজ্জাবতী,
দেবপদে দৃঢ়া মতি,
কত অর্থ প্রলোভন করে দিল দূর।
বাঈ গঙ্গা চলে গেল হেসে স্বর্গপুর।।

(৮)
কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে
শিষ্যা সখী সহচরী সব পড়ে মনে।।
রঙ্গমঞ্চে বার বার
সম্পর্ক হয়েছে আর
সুখে দুঃখে সমসাথী প্রবাসে সদনে।
নিমেষে ভুলিনি গঙ্গা দেখিয়া সমনে।।

(৯)
কেনরে নিঠুরা হয়ে হলি বিসরণ।
দ্বাবিংশ বর্ষের আজ বন্ধুত্ব বরণ।।
পবিত্র সখীত্বভাবে,
কার পানে প্রাণ চাবে,
বৌবনের হাসিখেলা ভাতেছ স্মরণ।
ছি ছি গঙ্গা আমি দেখি তোমার মরণ।।

(১৩)
[redacted]
আরে রে পাষাণী তুই আসিবি না আর।
ঝংকারে দিবিনে ঢেলে প্রাণে সুধাধার।।

'যাইগো বাজায়ে বাঁশী'
আর কি গাবি নে আসি,
মা মা বলে তুলিবিনে প্রাণে হাহাকার।
নে তবে নে তবে গঙ্গা অশ্রু উপহার।।

গানের ভাষা এবং সুরের বিচারে সে-কালের থিয়েটারী গানে খুব একটা উচ্চ রুচির পরিচয় মিলত না। বিশেষ করে সামাজিক নাটক ও প্রহসনে হালকা মেজাজের গান খুব হালকা সুর, যথা খেমটা, আড়খেমটা, কাহারবা ইত্যাদিতে গাওয়া হত। স্বভাবতঃই এই জাতীয় গানে বারাঙ্গনা সমাজ থেকে আগতা অভিনেত্রীগণ পারদর্শিনী হতেন। অবশ্য ধ্রুপদী সঙ্গীতেও কয়েকজন নটী বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন।

সিরিয়াস ধরনের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকেও সঙ্গীতের মধ্যে লঘুচিত্ততার আভাস পাওয়া যায়। 'নিত্যানন্দ বিলাস' নাটকে নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে বলেছেন, 'দেখ, তোমাদের টানাটানিতে আমি আর যাব না।' উত্তরে উদ্ধারণের গান— (ঝিঁঝিট, দাদরা)

'আমাদের চিরদিন টানাটানি।
কে জানে মন গলেছে, হেরে তোর বদনখানি।
কেবল নিরানব্বুইয়ের ধাক্কা,
জান হয়েছে অক্কা,
মনে করি সুখ পাব,—
তায় পেয়েছি ফক্কা;
তুই আয়না ঘরে দুদিন না হয় খাওয়াব—
তায় কি হানি।'

এ-গানের প্রতিটি রেফ্ র-এর উচ্চারণ কৌতুক সৃষ্টির জন্য 'ড়'-এর মত করা হত। 'নিত্যানন্দ বিলাস' নাটক এবং এই গান গিরিশচন্দ্রের রচনা। গিরিশচন্দ্রের প্রায় প্রতিটি নাটকেই এই রকম হালকা চালের গান রয়েছে। অমৃতলাল বসুর নাটকেও তাই। অমৃতলাল বসুর 'সতী কি কলঙ্কিনী?' বা 'কলঙ্কভঞ্জন' নাটকের সিরিয়াস পৌরাণিক নাটকেও অধিকাংশ গানের সুর খেমটা বা আড়খেমটা বা ঐ জাতীয়। অমৃতলালের গানের ভাষাও তেমনি লঘু,—। অমৃতলালের 'বাবু' নাটকে স্বাধীনা মহিলাগণের গান—

'পতি মলে হাতের বালা
খুলবো না লো খুলবো না।
বিচ্ছেদ আগুন প্রাণে আর তো
জ্বালব না লো জ্বালব না।।
আমরা সবাই বিদ্যাবতী,
আসলে পরে দোসরা পতি
টানলে প্রাণ তার প্রাণে সই কেন
চলব না লো চলব না।'

গিরিশচন্দ্রের 'বেদেনী' নাটকে একটি গান আছে, এনেছি ভাতার-ধরা ফাঁদ।' এই গানটি গেয়েছিলেন সে-যুগের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী হরিমতী (ব্ল্যাকী)। এই জাতীয় গানের সঙ্গে নৃত্য থাকত। ফলে সঙ্গীত এবং নৃত্যপটু না হলে সে-কালের থিয়েটারে কেউ অভিনয় জমাতে পারত না। একমাত্র নটীদের মধ্যেই সেকালে নৃত্য-গীতাদির চর্চা ছিল। তাই থিয়েটারে এই সমস্ত ভূমিকায় নটী না হলে চলত না।

১৮৭৪ খৃঃ কাদম্বিনী দাসী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন, কয়েকমাস পরেই আবার পুরাতন দলে ফিরে আসেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার 'সতী কি কলঙ্কিনী?' মঞ্চস্থ করেন। এই নাটকেই কাদম্বিনীর প্রথম আত্মপ্রকাশ। কাদম্বিনী ন্যাশনাল থিয়েটার ও স্টার থিয়েটারেও অভিনয় করেছিলেন। এই কয়েকটি ভূমিকায় তিনি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন : লীলা (আনন্দকানন), রাণীভবানী (পলাশীর যুদ্ধ), মন্দোদরী (মেঘনাদ বধ), সাবিত্রী (আদর্শ সতী), সুনীতি (ধ্রুব চরিত্র)।

কাদম্বিনী অভিনেত্রী হিসেবে সেখানে খুবই নাম করেছিলেন। বিনোদিনী যখন থিয়েটারে নামেন, তখন কাদম্বিনী ও ক্ষেত্রমণি তাঁর অভিনয়ের আদর্শ ছিল। বিনোদিনীর স্মৃতিকথায় কাদম্বিনীর একটুকরো ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পশ্চিমে ভ্রমণকালে আগ্রা থেকে বৃন্দাবন যাত্রার বিবরণ প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন, 'মা, ক্ষেতুদিদি এরা নীচেই বসল— কাদম্বিনীও তাদের সঙ্গে বসল। তিনি আমাদের সঙ্গে বড় মিশতেন না, একটু গম্ভীর হয়েই থাকতেন, একে গায়িকা, তাতে আবার তখনকার বড় অভিনেত্রী—।'

যাদুমণি, সুশীলাবালা, নবীসুন্দরী সে-যুগের রঙ্গালয়ের গায়িকারূপে যশস্বিনী হয়েছিলেন। যাদুমণি যন্ত্রসংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। নবীসুন্দরী স্টার থিয়েটারে অভিনীত বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর নাটকে দুটি মাত্র গান গেয়ে প্রসিদ্ধা হয়ে ওঠেন। সুশীলাবালার খ্যাতি ছিল আরও বেশী। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে জয়ন্তীর ভূমিকায় 'উদার অম্বর শূন্য সাগর' সুমধুর বেদান্ত সঙ্গীতে প্রথমে ইনি সাধারণের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেন।' (গিরিশচন্দ্র। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

(১৪)

থিয়েটারে নটীযুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। গত শতকের সমাজের ঘৃণা অবজ্ঞা উপহাস এবং তৎসহ লালসার দুর্ভাব বহন করে একে একে নটীরা চলে গিয়েছেন। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) একবার বলেছিলেন, 'সিনেমাওয়ালীরা দেবীর জাত মেরে দিয়েছে।' সে যুগের অভিনেত্রীরা কিন্তু দেবীত্ব চাননি। সবাই নামের শেষে দাসী লিখতেন।

পেশায় বারাঙ্গনা রঙ্গালয়ে নটী, কিন্তু ধর্মভাবনায় সাধিকা। এমন অপূর্ব কল্যাণময়ী জীবন উনিশ শতকের কজন গৃহস্থ মহিলা যাপন করেছেন! ঘরে ঘরে অনাচারের স্রোত বয়ে চলেছে। সে পাপের স্রোতে কত গৃহবধূ ভেসে গিয়েছে। ভ্রূণহত্যা, উপপতিসঙ্গ অনেক বড়মানুষের বউঝিরাও করতেন। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' গ্রন্থে তার লেখক এমন অসংখ্য সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন। 'গাড়ীখানির দ্বার বন্ধ। ভিতরে একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতেছে—'দাদা, আমাকে চোরের মত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'...

'চুপ কর...। আমি তোকে বাগানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'দাদা, বল কি? কেউ তো কখনো বোনকে বাগানে নিয়ে যায় না।'

'দরকার হলে সকলেই নিয়ে যায়। তোর পেটের ওটাকে নষ্ট করতে হবে। নচেৎ ছেলে হলে কি মুখ দেখাতে পারবি?'

সমাজ এদের রক্ষা করেছে। কিন্তু যারা তাদের ভ্রান্তি গোপন করতে পারেনি সমাজ তাদের ত্যাগ করেছে। উনিশ শতকের সমাজের এই অন্যায়ের ধিক্কার দিয়েছিলেন দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়। আত্মজীবন চরিতে কয়েকটি গার্হস্থ্যধর্মচ্যুত নারীর উল্লেখ করে লিখেছেন, 'সতীত্বহারা হইলে স্ত্রীজাতি যেরূপ ঘৃণাভাজন হন, যদি পুরুষজাতিও পরদারগমনে সেইরূপ ঘৃণিত ও সমাজ-বর্জিত হইত, তাহা হইলে ব্যভিচার দোষ তিরোহিত হইয়া যাইত।'

এই পাপস্রোতের পাশাপাশি প্রবাহিত ছিল তীব্র এক ধর্মস্রোত। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় উৎসারিত এই ধর্মস্রোতে সেকালের জ্ঞানী গুণী পুরুষ অনেকে অবগাহন করে ধন্য হয়েছেন। কিন্তু অন্তঃপুরের দ্বার তখনও রুদ্ধ। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণির ধর্মস্রোতের আগমনে বিজয়শঙ্খ স্ত্রীলোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাজিয়েছিলেন এই বারাঙ্গনাগণ। বিনোদিনী রামকৃষ্ণগতপ্রাণা ছিলেন। তারাসুন্দরীকেও রামকৃষ্ণের ধর্মমাধুর্যে আকৃষ্ট করেছিলেন তিনিই। তিনকড়িও রামকৃষ্ণ সারদামণির ভক্ত ছিলেন। সে ভক্তির মাধুর্যই বা কত! গরবিনী ভক্তি নয়, দীনা ভক্তি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়, 'এরা, তারাসুন্দরী আর তিনকড়ি, ঠাকুরঘরে ঢোকে না, মা-ঠাকরুণের পা-ও স্পর্শ করে না। গলবস্ত্র হয়ে বাইরে থেকে প্রণাম করে। মা তাদের প্রসাদ দেন, পান দেন। প্রসাদের উচ্ছিষ্ট জায়গা তারা নিজেরাই পরিষ্কার করে, মার হাতের পান আলগোছে নেয় যাতে ছোঁয়া না লাগে।'

নবীসুন্দরী, বসন্তকুমারীও ভক্ত ছিলেন। ভক্ত ছিলেন সবাই। নিজেদের হীন জীবিকার গ্লানি তারা কখনো ভোলেন নি।

চাবই মধ্যে তাদেব হৃদয়েব গবল থেকে অমৃত উঠেছে। এবং সেই অমৃতেব টীকা পবিয়েছেন বাংলা থিয়েটারেব ললাটে।

তাদেব চিনতে পেবেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মহামানব মহামানবী। শুধু তাঁবাই বুঝেছিলেন এঁদেব মনুষ্যত্ব কিছু দীন যে। 'চৈতন্যলীলা' দেখতে গিয়েছেন ভাবাদেবী। বিনোদিনী নিমাই, আব সুশীলাসুন্দবী নিতাই। অভিনয় দেখে সাবদা বললেন, 'মেয়েটিকে দেখলুম ভক্তিমতী। ভক্তি না থাকলে কি হয় গা? নিমাই—তা ঠিক নিমাই, কে বলবে মেয়েমানুষ?'

তবু—হীনবস্থাব কথা তাঁবা কখনও ভোলেন নি। অভিমান হয়তো ছিল, সমাজেব প্রতি বিবাগ ছিল না। থিয়েটারে অত বড় নামকরা অভিনেত্রী হবাব পরও বিনোদিনী গোটা গোটা অক্ষবে নাম সই কবতেন 'শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।' সমাজে যাব যেটুকু পাওনা, বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিজেদেব প্রাপ্যটুকু পাননি। তার, অভিমান নীববে সয়েছেন। তবু জীবনেব সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে এঁবা সে যুগেব বাংলা থিয়েটাবেব পাদপ্রদীপ জ্বালিয়ে বেখে গেলেন। সেই প্রদীপ আজও ভাস্বব।

অভিনেত্রী হিসাবে কে কতখানি বড় ছিলেন, নিজেবা দর্শক ছিলাম না বলে একালের আমবা তার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিতে পাবব না। কিন্তু মানুষ হিসাবে এঁবা মহৎ ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনিশ শতকেব সমাজে যে মানবীয় মূল্যবোধ অনেক পুরুষেরই ছিল না, এদেব যে তা বিশেষভাবেই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমাজ-পবিত্যক্তা এবং নিন্দিতা, অথচ এদেব অনেকেই সেই সমাজেব মূল্যবোধেব মর্যাদাবক্ষায় বহু প্রলোভন জয় কবেছিলেন। পাঞ্জাবী ধনী যুবক গুর্মুখ রায় বিনোদিনীর অনুবাগী ছিলেন। গুর্মুখ নোতুন থিয়েটার কববেন। সর্ত বিনোদিনীকে তাঁর একান্ত আশ্রিতা হতে হবে। বিনোদিনী বাজীও হলেন। শেষ পর্যন্ত গুর্মুখ একদিন বললেন, 'দেখ বিনোদ, আব থিয়েটাবের গোলোযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজাব টাকা আমার নিকট লও! আমি একেবাবে তোমায় দিতেছি'—এত বলিয়া কতকগুলি নোট বাহিব কবিলেন। আমি থিয়েটাব ভালোবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বাবনাবী হইয়াও অর্ধলক্ষ টাকাব প্রলোভন তখনই ত্যাগ কবিয়াছিলাম।'

শুধু অভিনেত্রী জীবনেব বিচাবেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনের বিচাবেও এঁবা মহিয়সী ছিলেন। একথা সত্য যে বারাঙ্গনা জীবন এঁরা কখনও ত্যাগ কবেন নি। কিন্তু বারাঙ্গনা নটী হয়েও নাবীব শাশ্বত ধর্মবোধ সম্পর্কে এঁবা সচেতন ছিলেন। এব প্রমাণস্বরূপ একটি ঘটনাব উল্লেখ কবা যাক। মিনার্ভা থিয়েটাবে সেদিন 'কবমেতিবাঈ' নাটকেব প্রথম অভিনয়। নামভূমিকায় তিনকড়ি। কিন্তু সাজঘরে দারুণ চাঞ্চল্য শুরু হল। তিনকড়ি কবমেতিবাঈয়েব বেশ পববেন না। কবমেতি বিধবা। বিধবার বেশ পবতে তিনকড়িব আপত্তি। সকলেব অনুনয় বিনয় তিবস্কাব, গুরু গিরিশচন্দ্রেব ধিক্কাব, নটীদেব বাঙ্গ-বিদ্রূপ সব ব্যর্থ হল। কিছুতেই বিধবাব সাজ পববেন না তিনকড়ি।

মিনার্ভা থিয়েটাবের মালিক নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় রসিক লোক। তিনি তাঁব লোকজনকে বললেন—'দ্যাখ্ তো তিনকড়িব 'বাবু' আজ থিয়েটার দেখতে এসেছেন কিনা।' অনুমান সত্য। তিনকড়ির বাবু বক্সে বসে আছেন। নাগেন্দ্রভূষণ গেলেন বাবুটির কাছে। সবিস্তাবে সমস্যার কথা বললেন। বাবু একটু হেসে বক্স ছেড়ে উঠে বাইবে গিয়ে জুড়ি গাড়ীতে চলে গেলেন। তিনকড়ির কানে সে খবব পৌঁছতেই তিনি তাড়াতাড়ি বিধবার মেক-আপ নিতে লাগলেন। অভিনয় শুরু হবব অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল।

গোলাপী তো গৃহস্থ বধূই হয়ে গেলেন। শরৎ-সরোজিনী নাটকে সুকুমারীর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় কবে তাঁব নামই হয়ে গেল সুকুমারী। শবৎ-সবোজিনীব নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস নিজে বিবাহ কবেছিলেন এক বিধবাকে। সুকুমারীব বিয়ে দিলেন বেঙ্গল থিয়েটাবেব এক অভিনেতা গোষ্ঠবিহাবী দাশেব সঙ্গে। বিয়েব কিছুকাল পব গোষ্ঠবিহাবী জাহাজেব চাকুবী নিয়ে বিদেশ চলে গেলেন। ফলে ছেলেমেয়ে বাঁচাবার জন্যে সুকুমাবীকে আবার থিয়েটাব করতে হয়েছিল। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন আব তিনি ছাড়েননি।

বধূরূপে প্রেয়সীরূপেই শুধু নয়, মাতারূপেও তাঁবা বরণীয়া ছিলেন। নাবী যখন তাঁর নিজ সন্তানকেই শুধু ভালোবাসে তখন সে শুধু মা। নারী যখন তার স্নেহ ভালোবাসা বিশ্বজগতেব সকলেব জন্যে ছড়িয়ে বাখেন, তখন তাব মধ্যে বিশ্বজননীব রূপ প্রতিভাসিত হয়। এমন মাতৃরূপ দেখিয়েছিলেন বনবিহাবিণী (ভুনী)। বেঙ্গল থিয়েটাব সেবার চুয়াডাঙ্গা অভিনয় করতে যাচ্ছিল। বিজার্ভ কামরায় সবাই উঠেছেন। মাঝখানে এক বড় স্টেশনে গাড়ী থামলে থিয়েটাবেব মালিক শবৎচন্দ্র ঘোষের আত্মীয় উমিচাঁদবাবু জল আনতে ছুটলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল। উমিচাঁদ দৌড়ে এসে গাড়ীতে উঠলেন। জল আনা হল না।' গাড়ীতে উঠেই উমিচাঁদ অবসন্ন হয়ে পড়লেন। সবাই 'জল, জল দাও ওকে' বলে চীৎকাব কবতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত গাড়ীখানার একজনেব কাছেও এক বিন্দু জল ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রীব দিকে সবাই অসহায়েব মত তাকিয়ে বইল। মৃত্যুকালেও কি শৈষবাবের মত গলা ভেজাতে পাববে না। বনবিহাবিণী একটু ইতঃস্তত করলেন। কিছুদিন আগে তাঁব একটি মেয়ে হয়েছে। একটানে কাঁচুলি খুলে ফেললেন। তাবপব সব লজ্জা বিসর্জন দিয়ে স্নেহময়ী জননীব মত উমিচাঁদের তৃষার্ত কণ্ঠে স্তনের সবটুকু দুধ ঢেলে দিলেন।

আঁদ্রে মাল্‌রো

বিজয় দেব

১৯৭২ সালের জওহরলাল নেহরু স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত আঁদ্রে মাল্‌রো। এ. যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক মনীষী ও মানব প্রেমিক আঁদ্রে মাল্‌রো। এখানে আঁদ্রে মাল্‌রোর সাহিত্য কীর্তিকেই আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ছাড়াও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পসমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

জেনেথ ফ্রেনাবস্‌ তাঁর 'ম্যান অ্যান্ড মনুমেন্টস্‌' গ্রন্থে আঁদ্রে মাল্‌রো সম্বন্ধে যেসব উপকথা ছড়িয়ে রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। যেমন সতেরোটি ভাষার ওপর তাঁর দক্ষতা আলোকচিত্রের মতো তাঁর স্মৃতিশক্তি যেন অপূর্ব চমক সৃষ্টি করে অবশ্য বছরে নির্দিষ্ট তাঁর জন্মদিনটির কথা তিনি অনায়াসে ভুলে যান।। সেখানে তিনি যেন মহাকালের সঙ্গেই ছুটে চলেছেন।

মাল্‌রোর জীবনী কদাচিৎ কেউ এড়িয়ে যেতে পারে। কারণ, তাঁর সমগ্র রচনার পশ্চাৎপট ব্যাপী প্রসারিত হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের সুখ দুঃখ, উপলব্ধি। সেখানে তিনি সেসব ঘটনাবলীকে শিল্পের মাধুর্যে রমণীয় করে তুলেছেন।

আঁদ্রে মাল্‌রো নামটি আজ সারা বিশ্বে শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক এবং শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌ হিসেবেই পরিচিত নয় মূলতঃ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মানব-প্রেমিক বলেও সর্বত্র পরম শ্রদ্ধেয়।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সোচ্চার এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের নারকীয় হত্যালীলায় সেখানে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রায় উন্মত্ত, তখন বাধর্ক্যের শেষ সোপানে এসে আঁদ্রে মাল্‌রোর বলিষ্ঠ কণ্ঠ প্রতিবাদের চীৎকারে মুখর হয়ে ওঠে। তিনি সেখানে মুক্তিসেনায় যোগদান করার জন্যে তাঁর জরাগ্রস্থ দেহ নিয়ে এগিয়ে আসেন। সমগ্র বিশ্ববাসী বিস্ময়ে তখন আবিষ্ঠ। মাল্‌রো এখানে যেন আর্ত-চীৎকারে অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েন। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবনের রচনা যেন মানব ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দলিলরূপে লিপি-বদ্ধ হয়ে আছে।

আঁদ্রে মাল্‌রোর জীবনী পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই সাহায্য নিতে হয় ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক তিন খণ্ড সমাপ্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'এন্টিমেমোয়ার্স'। বাকী দু'খণ্ড প্রকাশিত হবে তাঁর মৃত্যুর পর। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই দেখা যায় মাল্‌রোর চিন্তাজগতে যে মহা-পুরুষ প্রভাব বিস্তার করে রয়েছেন তিনি দার্শনিক নীটশে। এখানে জরথুষ্ট্র পর্বতের শীর্ষদেশ হতে অবতরণ করে বলছেন : তোমরা সবাই দেখ—এই পাত্র আবার শূন্য হয়ে যাবে— এবং জরথুষ্ট্র পুনরায় এই বিশ্বে মানবরূপে অবতীর্ণ হবেন।' ১৯৫৮ সালের পরবর্তী যুগের এই রচনা ফরাসী সাহিত্যের প্রথম দৃশ্য মাল্‌রোর প্রত্যাবর্তনা-কেই সূচিহ্নিত করে। তাছাড়া এই রচনাটি সেরা শিল্পকর্ম বলে যেমনি সম্মানিত হবে তেমনি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলেও পরিচিতি লাভ করবে। এই রচনা ব্যক্তিগত দেশ ভ্রমণের দলিল নয়। গোপন ইতিহাস বলেও নির্দিষ্ট নয়। বরং সেখানে যা প্রত্যক্ষ তাহলো লেখক এখানে মহাকাব্যের দুঃখ-জনক পরিস্থিতির নায়ক ওডিসির মতোই চল্লিশ বছরের জরিপকার্য সম্পাদন করছেন। মূলতঃ অধিবিদ্যামূলক এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কিত ব্যক্তিগত আত্মজিজ্ঞাসার পশ্চাৎ-পটে রাজনৈতিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য ভবিষ্যদ্বাণীই সেই জরিপের অয়তনে উপ-স্থিত। সেখানে যেসব সাক্ষাৎকার বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তাহলো নেহরু, হো-চি-মিন, মাও-ৎসে-তুং, হিটলার এবং পরিশেষে দ্যগলের সঙ্গে নিভৃত সংলাপ।

এখানে মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে যে শেষ বক্তব্য দেখা যায় তা যেন জাতিবিজ্ঞানী মলবার্গের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। যার একনিষ্ঠ অনুসন্ধান এবং নিরীক্ষা তাঁকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছে তাহলো 'মানুষ' বলে সত্যিই কোন বস্তু নেই।

আঁদ্রে মাল্‌রোর উপন্যাসের জগৎ থেকে সংগৃহীত বিষয়বস্তু যেন 'এন্টিমেমোয়ার্সের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। এবং যা অনিবার্য ভাবে লক্ষ্যণীয়, তাহলো মানুষ এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যকরীয় দুরূহতা। মলবার্গের নৈরাশ্যময় পৃথিবীর আলোকে যেন 'আত্মানাং বিদ্ধি' সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় রূপান্তর লাভ করে।

ফরাসী গিয়েনার রাজধানী 'কেইন'এর নিশিমগ্ন আকাশ রহস্যে আবৃত হয়ে আছে। এবং এখানেই আঁদ্রে মাল্‌রোকে বিখ্যাত শিল্পী গষার বিদগ্ধ চরিত্রকার হিসেবে স্পষ্ট করে রাখে। সেই সঙ্গে যেন মাস্ত ৎ সেতুং হয়ে উঠেছেন এক শক্তিমান রাজা।

মাল্‌রোর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে যা সুচিহ্নিত হয়ে আছে তাহলো বাস্তবকে অতিবাস্তব কাব্যে তিনি সার্থকভাবে নিবাসিত করেছেন। যদিও উত্তরাধিকারসূত্রে তা রোমান্টিক প্রেরণাকে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু এখানে মাল্‌রোর দিগ্‌দর্শন পরাবাস্তববাদে (সুররিয়েলিজম) সমর্পিত। এবং মূলতঃ তার প্রথম যুগের রচনায় তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত।

'এন্টিমেমোয়ার্স' চীনদেশে কম্যুনিষ্টদের 'ইয়েনান'-এ সুদীর্ঘ অগ্রগমনের বর্ণনা নিঃসন্দেহে রসোত্তীর্ণ এবং বৈশিষ্ট্যমূলক। তাছাড়া যে জ্ঞাতিতত্ত্ব বংশধর হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় বলে শাতোব্রিয়াঁ তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন সেই জ্ঞাতিতত্ত্বই মাল্‌রোর রচনায় উপস্থিত। এখানে লেখকের সাহিত্য এবং জীবনভাষ্যও যেন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া যা অঙ্গীভূত হয়ে আছে তাহলো মুক্তপূর্ব উপন্যাস ও শিল্প। এখানে তাই যেন স্মৃতিচারণের আয়তনে সমর্পিত হয়ে রয়েছে।

পর্যবেক্ষণের অন্তে দেখা যায় মাল্‌রোর বিশ্ব এবং 'এন্টিমেমোয়ার্স' আমাদের সামনে বিয়োগান্ত বলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বিয়োগান্ত পরিণতি কোন নাটকীয় রহস্য উন্মোচনের চেয়ে বরং চিরায়ত অস্তিত্বকেই উদ্ঘাটিত করে।

যদি মৃত্যু এবং প্রচন্ডতা আঁদ্রে মাল্‌রোকে আবিষ্ট করে রাখে তবে তা প্রধানতঃ রোমান্টিসিজমের পুঁথিগত ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং বাস্তব জগৎকে রূঢ়ভাবে উপযোগী করে তুলেছে। মাল্‌রোর পিতা দাদা-মশায় দুজনেই আত্মহত্যার মাধ্যমে জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। আপন ভাইকেও মৃত্যু ছিনিয়ে নেয়। দ্বিতীয়া পত্নী লেলওয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান। মাল্‌রোর আপন প্রিয় দুই ছেলে উন্মুক্ত রাজপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই কারণেই যেন সেই বন্ধু তাঁকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। কুড়ি বছর ধরে তিনি লিখেই চলেছেন মহাকাব্য সদৃশ 'এন্টিমেমোয়ার্স'। সেখানে তিনি বলেছেন : 'আমি সেই মৃত্যু শিবিরকেই ভেবে চলেছি।'

আঁদ্রে মাল্‌রোর বিখ্যাত উপন্যাস 'দি রয়েল ওয়ে'র প্রথমেই কাম্বোডিয়ার খ্মের মন্দির সংলগ্ন রয়েল রোডের ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানে রত রুদ। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অবশিষ্ট ভাস্কর্য সরিয়ে নিয়ে য়ুরোপের বাজারে লাভজনক দরে বিক্রি করা। নিয়তির চরম সীমা পর্যন্ত সংগ্রামে লিপ্ত পারকেন। আপাতদৃষ্টিতে অন্যের ওপর তার ইচ্ছাশক্তির জয়লাভ ঘটলেও সফলতার অন্তিম মুহূর্তে সে অধিবাস্তব অধিকার আরোপ করে তাকে হত্যা করে। এই উপন্যাস মৃত্যুতে সমাপ্ত। প্রথম খন্ডে রয়েছে জিবুতি থেকে সমুদ্র ভ্রমণ। তখন রুদ পারকেনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এবং অর্ধেক লাভের বিনিময়ে তার সঙ্গে অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য নাম অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। বিচিত্র সংলাপের মধ্যে তাদের নিবিড় সখ্যতা গড়ে ওঠে। তাছাড়া এখানে যৌনমূলক অধিবাস্তব, সময়ের বিলয় প্রভাব 'ময়' এবং 'অশ্রুই' এর মধ্যে এক গূঢ় সম্পর্ক নিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় খন্ডে প্রথমেই বিফলতা। তারপর দুজনেই বিরাট পাথরের মধ্য থেকে ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের লোভনীয় ভাস্কর্য আবিষ্কার করে এবং পৃথক করে রাখে। এখানে পার্থিব সাফল্যই প্রধান। তৎক্ষণাৎ যে বাধা এসে সামনে দাঁড়ায় তাহলো কাম্বোডিয়ান চাষীরা। রুদ যাদের নিয়োগ করেছিলো তারা তাদের পরিত্যাগ করে চলে যায়। এখন তারা অরণ্যের গভীরে। ফরাসী সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কোন জিনিসই সরানো বারণ। রুদ ও পারকেন ঠিক করে ফেলে যে আবিষ্কৃত জিনিস যদি ঠেলে নিয়ে শ্যামদেশের অধিকৃত অশান্ত জায়গায় ফেলে তবে সেখান থেকে য়ুরোপে চালান দেয়া অতি সহজ হবে। সেই সময় পারকেনের ইচ্ছে গ্যাবোৎ এর অনুসন্ধান চালানো যে তার মতোই অন্য এক দুঃসাহসিক অভিযানকারী যে গুজব প্রচলিত তাহলো সে নাকি কোন এক আদিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছে। অথচ তার কাছ থেকে বেশ কিছু দিন হলো কোন খবর এসে পৌঁছয়নি। এখান থেকেই তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত। প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল থেকে বিষয় অতিদ্রুত অধিবিদ্যায় রূপান্তরিত হলো। 'ময়' লস্কর সৈনিকদের গ্রামে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাবোৎকে দেখা যায়। এখানে গ্যাবোৎকে তাদের প্রধান হিসেবে দেখা যায় না এবং পদচালিত বলিবিশেষে নিযুক্ত অন্ধ দাস হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং আদিবাসী দ্বারা আক্রমণের মুহূর্তে প্রতিপক্ষের উপযোগী প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় পারকেন এগিয়ে যায়। এবং তাদের যাত্রার সঙ্গেই গ্যাবোৎ এর মুক্তির ব্যবস্থা করে। আপাতদৃষ্টিতে নিয়তির ওপর সাফল্য দেখা গেলেও অদৃষ্টের পরিহাসে সেই মুহূর্তে আদিবাসীদের সম্মুখে যেতেই ভূমিতে স্থাপিত যুদ্ধবর্শার ওপর হোঁচট খেয়ে পড়ে। হাঁটুর ক্ষত মারাত্মকভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এই সময় অপর দুজন এবং কাম্বোডিয়ান ভৃত্য থাইল্যান্ডে পৌঁছে যায়। পারকেন সেখানে দন্ডপ্রাপ্ত। মৃত্যুচেতনা থেকে মুহূর্তের হলেও তার পলায়নের কোন সুযোগ নেই। চরম অভিজ্ঞতার জন্য পারকেন তখন একটি বমশী সংগ্রহ করে।

পারকেন ঠিক করে সে উত্তর থেকে নিজের জায়গায় যাবে কিন্তু পথে যে নিষ্ফল অভিজ্ঞান প্রদর্শন করা হয় তাহলো তার আত্মসম্মানের পতন। এবং পরে যে ক্ষয় যায়। রুদ গভীরভাবে তা লক্ষ্য করে। মৃত্যুই এখন বিমূর্ত ধারণা এবং চিরায়ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অধিকার করে রাখে।

'দি রয়েল ওয়ে' উপন্যাস যেন এক সংকল্পের ধারণায় স্থির হয়ে আছে। সেই সঙ্গে নীটশীয়ান সম্পর্কও প্রতীয়মান হয়। পারকেন ও রুদ দুজনেই সংকল্পে সংগঠিত। সেখানে মনস্তাত্ত্বিক বা জৈবিক দিক স্পষ্ট হলেও তা যেন মনে হয় সম্পর্কহীন। আমরা এখানে রুদের দৃষ্টি দিয়ে ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। এমনকি ভাস্কর্য আবিষ্কারের মুহূর্ত পর্যন্ত। তখন আঁদ্রে মাল্‌রো পারকেনের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা আরোপ করেছেন। উপন্যাসের গঠনে অবয়বে মূলতঃ কয়েকটি দৃশ্যে সংকল্পের ভূমিকা যেন ঘনিষ্ঠ। সেই সঙ্গে তা হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ। বিশেষ করে রুদের মন্দিরের বহির্ভাগে কণ্ঠকর আরোহণ। তাছাড়া যেসব দৃশ্য উল্লেখযোগ্য তাহলো ভাস্কর্যের আবিষ্কার ও স্থানান্তর, গ্যাবোৎ এবং পারকেনের 'ময়' এর ওপর আধিপত্য বিস্তার। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত পরিণতিতে যতক্ষণ মৃত্যুর অধিকার না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পারকেনের দৃঢ় সংকল্পের অনুশীলন যেন আঁদ্রে মাল্‌রোকে বিয়োগান্ত পরিণতি গ্রহণে সাহায্য করেছে। সহস্র বাধার পৃথিবী এখানে অসংখ্য প্রতিমায় ঘনিষ্ঠ। বিশেষ করে যখন রুদ পাথরের বিরাট ব্যাপ্তির দিকে তাকিয়ে ভাস্কর্য আবিষ্কারের সংকল্পে স্থির হয়ে আছে।

মাল্‌রোর উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে নিয়তির সঙ্গে মানুষের অবিরাম প্রচন্ড সংগ্রাম। তাছাড়া যা লক্ষ্যণীয় তাহলো সুবিবিষেলিণ্ট রচনার মধ্যেও এই উপন্যাস শ্রেষ্ঠ।

সাহসের বাস্তব দিক এখানে প্রধান। কাহিনী গড়ে উঠেছে বুদ্ধিবৃত্তির ধারণায়। এখানে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলো প্রকৃতি এবং আদিবাসী যারা বিশ্ব প্রকৃতির অংশবিশেষ মাত্র। অথবা সেই সঙ্গে অজ্ঞানী। অথবা কীটপতঙ্গ, পশু। পরিশেষে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যে মানুষ তা যেন মালরোর নায়কদের পটভূমিকায় নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

'দি কন্ডিশন্স' মূলতঃ বিশ শতকের রাজনৈতিক, অভিযানকারীদের মনস্তত্ত্বকেই স্পষ্ট করেছে। 'দি রয়েল ওয়ে' যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিন্তু সেখানে তিনি নিজেকে রাজনৈতিক পরিবেশে স্থাপন করেন। পরিণামে যেমনি নিজকে উগ্রকর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করেন তেমনি প্রচেষ্টা দ্বারা জীবনের বাস্তব দিক থেকে তার নিয়তিকেও গ্রহণ করেছেন। যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বর্তমান তার সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রতিশ্রুত বলেই তাঁর চৈতন্যের জগৎকে আরও গভীরভাবে আবিষ্কার করা যাবে।

এই উপন্যাস উত্তম পুরুষে বিবৃত। কাহিনীকার কোন নামে পরিচিত নয়। এখানে [illegible] নাটকীয় দিক থেকে এসেছে

অভিযানকারী গ্যারিন চরিত্র। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই উপন্যাস। প্রথম পর্যায়ে কাহিনীকার ভারত মহাসাগর পেরিয়ে প্রাচ্য অভিমুখে সমুদ্রযাত্রা করেছে। তার কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু হলো ক্যান্টনের চীনা জাতীয় সরকারের ভাগ্য। হংকং-এ ব্রিটীশদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হরতাল। ১৯২৫ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবেই মালরো এখানে কাহিনী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। প্রথমে জাহাজ এসে নোঙর করে সিঙ্গাপুর, সায়গন এবং শেষে হংকং। কাহিনীকার যখন জাহাজ তীরে ভিড়িয়েছেন তখনই বিপ্লবের পরিস্থিতি উদ্ঘাটিত হয়। বেতারের মাধ্যমে ঘটনার অগ্রগতি লক্ষ্য করার সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে বর্ণনাকারীর ভাবনা। ক্যান্টনের জাতীয়তাবাদী সরকারের সোভিয়েত উপদেষ্টা বোরোদিনের কমিশনার গ্যারিনই এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। জাহাজ যতই পূর্ব দিকে এগোতে থাকে ততই চাপা উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দ্বিতীয় অংশে কাহিনীকার গ্যারিনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার মধ্যেও যোগ দিয়েছেন। যেমন ইংরেজ অনুগত জেনারেল ত্যাং-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত সফল যুদ্ধে অংশগ্রহণ। উপন্যাসের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু এখানেই স্থির হয়ে আছে। উপসংহারে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক বিবর্তনের পটভূমিকায় গ্যারিনের ব্যক্তিত্ব প্রায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। শেষে অসুস্থ মৃত প্রায় গ্যারিন তার ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে বিষাদে জড়িয়ে পড়ে এবং চীন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

গ্যারিনের চরিত্র এই উপন্যাসে মুখ্য অংশ গ্রহণ করে। কাহিনীকার এখানে ছায়া সদৃশ। গ্যারিনের সহকারী হিসেবে তার ঘটনাবলীর সাক্ষীমাত্র। আঁদ্রে মালরো সেখানে বর্ণনাকারীর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যাগুলো উত্তমপুরুষে বিবৃত করে তা সমাধান করতে চেয়েছেন। গ্যারিনকে প্রায়ই মালরোর ব্যক্তিগত চরিত্রের অভিক্ষেপ বলে ধরা হয়। সমান্তরালভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গ্যারিনের ছ'মাসের জন্য কারাবাস, যা মালরোর কাম্বোডিয়ায় বিপদে জড়িয়ে পড়া অবস্থাকে তাৎপর্যময় করে তুলে। মালরোর উপন্যাসে কারাবাস হলো অবনত অবস্থান একটি রূপ মাত্র। সেখানে গ্যারিনের বিচার অধিবাস্তবের ধারণায় প্রকাশিত।

রাজনীতি এখানে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেনি বরং মিথ্যে ওজরকে দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে তা বস্তুগত দিক থেকে ঐক্য ঘটানোতে সাহায্য করেছে।

উপন্যাসে সংযুক্ত প্রতিটি চরিত্রই বুদ্ধিদীপ্ত। এখানে চীনা দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন হুচেঙ-দাই এবং হোঙ-কে কদাচ চীনের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হুচেঙ-দাইকে মূলতঃ চীন ভূমিতে গান্ধীর রূপান্তর হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সে এখানে অহিংসা এবং ন্যায়ের প্রতীক। কম্যুনিস্টদের জন্যই তার মৃত্যু অপরিহার্য হয়ে উঠলো।

অভিযানকারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেন গ্যারিন থেকে শুরু করে অন্যান্য চরিত্রে ও প্রসারিত হয়ে আছে। এবং সম্ভবতঃ তা মালরোর নিজ চরিত্রের উপলব্ধিজাত বিশ্বের দিক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে জীবনী এবং জৈবিক দিক থেকে আত্মসচেতনতাই প্রধান হয়ে ওঠে।

এখানে চরিত্র বা কাহিনী প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারেনি। তাছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়তির সঙ্গে ব্যক্তিগত সংগ্রামের ধারণায় বিয়োগান্তক পরিণতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যা অসন্তোষভাবে ক্যান্টনের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত। এই কাহিনীতে যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তা হলো সময় বয়স এবং মৃত্যু। যা মালরোর রচনায় সর্বব্যাপী। এবং সেই সঙ্গে প্রচণ্ড প্রক্রিয়া বা ঘটনায় আবিষ্ট ব্যক্তিগত ঝোঁককেও সেখানে আরোপ করা হয়েছে।

সত্যিকার মহানুভবতার চেয়ে গ্যারিনের বৈপ্লবিক কার্যাবলীর প্রতি অনুরক্তি যেন বৈশোরের লক্ষণকেই প্রমাণ করে। তার জীবন সেখানে আধুনিক বীরত্বের প্রতিনিধি স্বরূপ নয় বরং মনে হয় সে প্রতিভাহীন ব্যর্থ।

'দি কণ্ডিশন্ড' উপন্যাস রাজনৈতিক ঘটনামাত্র নয় বরং বিশ্বজনীন মানুষের অবস্থার বিবৃতি মাত্র। কাহিনী থেকেই গড়ে ওঠেছে (১) দি এপ্রেন্টিস, (২) দি পাওয়ার্স, (৩) দি ম্যান। গ্যারিন যতই বিজয়ের সান্নিধ্যে এসেছে ততই সে অতি মাত্রায় আভ্যন্তরীণ শত্রুতার ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া বাইবের এবং রাজনৈতিক বিপদ অপসারণ করে আত্মিক অস্তিত্ব এবং বিশ্বজনীন মানবিক ট্র্যাজেডির উদ্ঘাটন ঘটিয়েছে।

ট্র্যাজেডি এই উপন্যাসের সঙ্গে জড়িত বলে আমরা বলতে পারিনে গ্যারিন এখানে বিজয়ী না বিজিত।

মালরোর ট্র্যাজিক নায়ক ফাউস্টের মতো বিপ্লবে উদ্দীপ্ত করে। প্রত্যক্ষ করে দৈত্যসদৃশ অস্তিত্ব যা মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অবশ্য মানবিক আদর্শের মৃত্যুর বিনিময়ে। গ্যারিন এখানে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিবাদী। নিজের দেশের বাইরেও তার প্রভাব অস্বাভাবিকভাবে দেখতে হচ্ছে। উপন্যাসের শেষে গ্যারিনকে দেখা যাচ্ছে মৃতের মুখোসের মতো প্রতীকে স্থির। তাই সে ছোট আয়নায় নিজকে সনাক্ত করার জন্য দ্বিধাগ্রস্ত।

আঁদ্রে মালরোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'দি ম্যানস ফেইট' ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নাম নির্বাচন করতে গিয়ে মঁতেন অথবা পাসকেলের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এখানে বিশ্বজনীন কাহিনী এবং উক্তিই প্রত্যক্ষের বিষয়। ঘটনা এবং মানবচরিত্র এই উপন্যাসে সর্বদিক থেকে সর্বকালের বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৯২৭ সালের সাংহাই-এর গৃহযুদ্ধের ঘটনা এখানে বিস্তৃত। প্রথমে যদিও উপন্যাস রাজনৈতিক পটভূমিকে নির্ভর করে এগিয়েছে কিন্তু মূলতঃ তা অধিবিদ্যামূলক। চরিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নিয়তিসদৃশ। এইসব চরিত্রের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবী নয়। যা রয়েছে তাহলো বিপ্লবের পরিবেশ। ষড়যন্ত্র, গোপন চক্রান্ত, উদ্বেগ সর্বোপরি হিংস্রতা সেখানে প্রসারিত। মালরো এখানে সাংহাই-এর পরিস্থিতির মধ্যে অখণ্ডভাবে মানবিক অভিজ্ঞতার রূপকেই স্পষ্ট করে তুলেছেন। 'দি ম্যানস ফেইট' আন্তর্জাতিক উপন্যাস হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে মালরোর চিন্তার বিকাশ যেন উল্লেখযোগ্য ভাবে লক্ষ্যণীয়।

ষড়যন্ত্রকারীদের তৈরী রেকর্ড 'কিও' শুনছে। যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো বিদেশীভাষা শিক্ষাদান। কিন্তু মূলতঃ তা গোপন বার্তা প্রেরণ করে। 'কিও' নিজের কণ্ঠস্বর রেকর্ডে চিনতে না পেরে ভাবে যে হয় রেকর্ড বদলে দেওয়া হয়েছে নতুবা ধ্বনি নির্দেশক বর্ণকে বিকৃত করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি তৎক্ষণাৎ চাপা পড়ে। মালরো এখানে 'কিও'র সত্তাকে ভূতাবিষ্ট করে রেখেছেন। সেই সঙ্গে কিও অনুসঙ্গীদেরও। সে তার বাবা গীসরকে বলছে বিচ্ছিন্ন কণ্ঠস্বরের কথা। যেমন : 'আমরা সকর্ণে অন্যের কণ্ঠস্বর শুনেছি।' সেই সঙ্গে বিস্ময়করভাবে যুক্ত হয় : 'আফিম ও পৃথিবীর অংশ যা আমরা কানে শুনতে পাই না।' এই ভাবেই বীজাণু সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা গভিবেগ সংগ্রহ করে যা অখণ্ডতার মধ্যে ও মানসিক অবস্থা প্রতীকে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। গীসর আফিমে আসক্ত। এবং দেখা যায় প্রায় প্রত্যেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নির্জনতার ভিন্ন অবস্থায় পরিণত হবার আশংকায় অভিভূত। এখানে মানুষের উপলব্ধির জগৎ শিল্পীর মতো দ্বিতীয় জন্ম সদৃশ। পৃথিবী ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে সেখানে নির্দিষ্টভাবে মানবিক স্বরাঘাত আরোপ করে।

এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ। কেউই উপেক্ষণীয় নয়। প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে বিস্ময়করভাবে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত। 'কিও' তার কণ্ঠস্বর সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়। হুচেন তার হাত চিনে নিতে পারে না। গীসর অনুক্ষণ আত্মকরুণ নির্জনতা সম্বন্ধে সতর্ক। কর্মঠ 'কিও' তার পিতার অনধিকার প্রবেশের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। মৃত্যু মালরোর চরিত্রকে বিস্ময়করভাবে অভিভূত করে রাখে। সেখানে সে প্রতীক সদৃশ। যারা ব্যতিক্রম তারাও মুক্ত নয়।

'দি ম্যানস ফেইট'-এর চরিত্র মালরোর অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে উন্নতমানের। পরিবেশ এবং বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তনশীলতা আরও প্রসারিত। সেই সঙ্গে প্রতিটি চরিত্র মালরোর একান্ত নিজস্ব। কারণ তারা প্রত্যেকেই নিজেদের সৃষ্ট অতিপ্রাকৃত মূল্যের মাধ্যমে মানবিক অবস্থা থেকে মুক্তি খুঁজছে। তাদের মূল্যবোধ পৃথক হলেও মুক্তির অনুসন্ধান প্রত্যেকের কাছে সর্বজনীন। যেমন গীসর মুক্তির উপায় খুঁজছে আফিমের মাধ্যমে। সবাইকে, সমভাবে দেখলেও এখানে 'কিত্ত' ব্যতিক্রম। 'কিত্ত' এখানে চীনের প্রধানমন্ত্রী চু-এন-লাই এর চরিত্র অবলম্বনে রচিত। চু তখন সাংহাই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

'কিত্তর' চিন্তাশীল ধারণার মৌলিক উপাদান হলো মানবিক উৎকর্ষতা। মানবিক মর্যাদাকে দেখা হয়েছে অপমানিতের মেরু থেকে। সেখানে 'কিত্ত'তে শুধু নয় ফেরেলের সঙ্গে নারীর সম্পর্কেও বাস্তবগ্রাহ্য।

নিঃসন্দেহে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে সাংহাই বিপ্লবের কমরেড এখানে অনুপস্থিত। কারণ মালরো ১৯৩১ সালের পূর্বে সত্যিই সেখানে ছিলেন কিনা তা সন্দেহজনক। মালরো এখানে সাংহাই ঘটনার মাধ্যমে জড়িত থেকে অধিবিদ্যামূলক অবস্থায় তা আবিষ্ট করে তুলেছেন। চূড়ান্ত পরিণতিতে তীব্র হিংসাত্মক ঘটনা এবং বিবেচনাশীল ধ্যানের সংযোগ যেন মালরোর বিশ্বের প্রতীকস্বরূপ দর্শনকে সৃষ্টি করে।

উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে দেখা যায় একজন লোক হত্যায় উদ্যত। সে তার ঘুমন্ত প্রতিকৃতি সদৃশ শিকারকে অনুচ্চারিত জেরায় প্রত্যক্ষ করে। তার একখানি পা দৃশ্যমান বাকী অংশ মশারির কাপড়ে অস্পষ্ট। হত্যাকারী ৎচেন-এর শিকার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনে। মালরো এখানে দ্বীপ প্রতিম ভাবনার বাইরের পৃথিবীর প্রত্যেকটি অধিবাস্তব অনধিকার প্রবেশকে ধরে রেখেছেন। যেমন হত্যাকারীর অবশ্যম্ভাবী কার্যের দিকের প্রবণতাঃ "পাশের বাড়ী থেকে আলো আসছিলো। জানালার শিকের জন্য অস্পষ্ট বিজলী আলো যেন সমকোণী চতুর্ভুজের মতো। পায়ের নীচে বিছানায় ডোরাকাটা দাগের মতো আলো পড়ছিলো যেন জীবন এবং তার নিঃসঙ্গতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোন অধিবাস্তব ধারণাকে সে দাখিলও করে যা প্রত্যাহার করা অসাধ্য এবং তাই যেন মনের ওপর অনধিকারভাবে প্রবেশ করেঃ সেই পা যেন কোন ঘুমন্ত প্রাণীর। সত্যিই কি তা অবয়বে যুক্ত ছিলো? 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?' সে সেই দেহ দেখছিলো মাথা পর্যন্ত।'

ৎচেনের চৈতন্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য তা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে না। যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলো বহিরাগত এবং অধিবাস্তবের বুননে 'মানুষের পৃথিবী।'

ৎচেন মর্মান্তিকভাবে ব্যক্তিগত পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে সেই সঙ্গে মানবিক পরিচয়। তার মানবিক অস্তিত্বের অনুভূতি পীড়নকর অমানুষিক পরিবেশের জন্যে বঞ্চিত হয়েছে মাত্র।

ৎচেন এখানে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। তার চারদিকে যেসব বিকৃত ছায়া প্রতিমা ঘিরে রেখেছে তার জন্যেই সে মানুষকে অস্বীকার করবে।

'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশম্যান্টের' রাসকলনিকভের সঙ্গে ৎচেন-এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রাসকলনিকভ কেন বন্ধকী কারবারীকে হত্যা করলো? হত্যার পর সে দেখতে পেল তার কোন জিনিষই তার প্রয়োজন নেই। ৎচেন কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যা করেছে। তবুও দেখতে পাই হত্যার পর আবার তার মনে এসে সে প্রবেশ করেছে। দুটো ক্ষেত্রেই আত্মার শক্তি পরীক্ষাই মুখ্য। রাসকলনিকভের নৈতিক নৈরাশ্য ও ৎচেনের রাজনীতি দুটোই যেন এখানে মাধ্যমিক প্রসঙ্গ মাত্র।

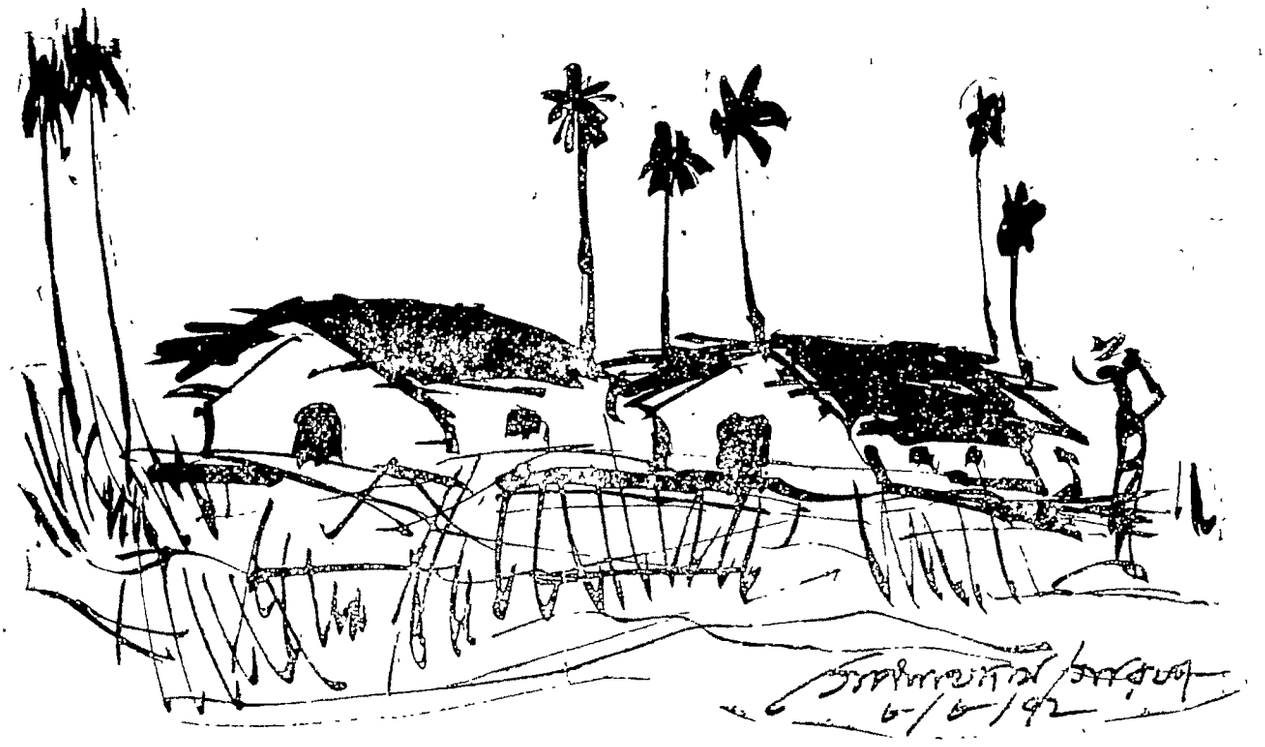

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

যে সমস্ত মহামানবের জীবন এবং কর্মপ্রয়াসকে সাধারণ অনুভবের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা অসম্ভব, তাঁদের স্বভাবতই আমরা একটা প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত করে নিই। এর ফলে তাঁদের চিন্তা এবং কর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার কাজটা সহজ হয়। দু হাজার বছর আগের সেই ক্রুশ চিহ্নের প্রতীকটি এ যুগে যীশু হতে যোগ্য স্থান লাভ করত তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী। কবিগুরু দেখিয়েছিলেন জীবন কতদূরে শ্রীমন্ডিত হতে পারে, আর মহাত্মাজী দেখিয়েছিলেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমরা কত মহীয়ান হয়ে উঠতে পারি।

ইতিহাস বিধাতার দুর্লভ সৃষ্টি মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসের এক আশ্চর্যতম পুরুষ। তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শায়িত জীবন শুধু ভারতবর্ষের প্রতিই নয় সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির প্রতিই ছিল উৎসর্গীকৃত। মানুষের প্রতি সেবায় এমন উদার আত্মত্যাগ—এমন নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদন বারবার আমাদের তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। স্বদেশবাসী হিসেবে শুধু আমরাই নই, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বহু মনীষীই বিভিন্ন সময়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সে ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন। যেমন করেছিলেন আর এক চিহ্নিত পুরুষ আলবার্ট আইনস্টাইন।

মহাত্মা গান্ধীর ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্মের সাধনা জগতের রাজনীতির সীমানায় এক অভিনব পদ্ধতির সংযোজন। প্রাচীন ভারতের রাজনীতিতে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল সুস্পষ্ট—যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। আধুনিক জগতে গান্ধীজীই সেই প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির নবমূল্যায়ন ঘটিয়ে তাকে প্রয়োগ করার প্রয়াস চালালেন। তাঁর এই আদর্শবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসাধনা এক অভাবনীয় তাৎপর্য এবং সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব লাভ করেছিল। ভরতবর্ষের সমগ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন নিবিড় করে তার আত্মাটির মঙ্গল প্রয়াসে এমন ক্ষান্তিহীন প্রচেষ্টার নজীর বোধকরি খুব কমই মিলবে।

সম্প্রতি গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি প্রবর্তিত গান্ধী স্মৃতি পুরস্কার অর্পণ করা হোলো লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে। অপর পুরস্কার-প্রাপকের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা পরলোকগত শ্রীবিতনমোহন চট্টোপাধ্যায়। শ্রীরায়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'গান্ধীতে গান্ধীত্বের মত এবং পথ সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তার

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়কে 'গান্ধীস্মৃতি পুরস্কার' অর্পণ করছেন গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র।

স্বীকৃতি হিসেবেই তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। খেতাব কিতবণের দ্বারা গুণীজনকে সম্মান প্রদর্শনের একটা রীতি ইদানীং আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। আজও পর্যন্ত শ্রীরায় সেই ধরনের কোনো গ্রহণ করেননি। ইতিপূর্বে মনে পড়ছে একমাত্র মৌচাক পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য ছিল গান্ধী স্মৃতি পুরস্কারেরই সমান মূল্যের। 'গান্ধী স্মৃতি পুরস্কারের' আর্থিক মূল্য নগদ পাঁচশত টাকা। যাচাকাছি অন্যান্য পুরস্কারের আর্থিক মূল্যের তুলনায় অনেক বেশী দুর্বল, সেই হোক গুণ এবং কর্মের স্বীকৃতিই সেখানে পুরস্কার প্রদানের মূল উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে আর্থিক মূল্য যাই হোক না কেন বিষয়ের এ পুরস্কারপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে বিবেচ্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর 'গান্ধী' শীর্ষক যে প্রবন্ধগুলি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিল সেগুলি পরবর্তীকালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক পটভূমিকায় একজন বহুদর্শী মননশীল এবং সাহিত্যরসিকের গভীর শ্রদ্ধা-সান্নিধ্য-ধন্য সাহিত্যসেবীর গড়ীর উপলব্ধি নানা ঘটনার সূত্রে এ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে। মূলতঃ এ গ্রন্থ গান্ধীবাদের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। সাধারণতঃ জীবনী বলতে যা বোঝায়, এ গ্রন্থ সঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। মোহনদাস করমচাঁদের জীবনের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং উক্তি সমূহের সঙ্গে জীবন শিল্পী শ্রীরায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ-পরিচয় ও শ্রদ্ধা এবং মননের মিশ্রণ ঘটিয়ে, কিছুটা 'মোয়ার'-এর রসও নীরস বিশ্লেষণের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন।

গান্ধীজীর যথার্থ মূল্যায়ন সম্পর্কে দুর্বার অবকাশ থাকলেও, বহু মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মহান আদর্শের উদ্গাতা মহাত্মাকে পুরুষোত্তম বলতেও সংকোচ বোধ করেননি গ্রন্থকার। এই প্রসঙ্গে প্রথমদিকে ২৪ পরগণার সোদপুর অঞ্চলে মহাত্মাজীর দর্শন-প্রত্যাশী গ্রন্থকারের সেখানে যাওয়া এবং প্রত্যক্ষ করার বর্ণনাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীরায় লিখছেন 'বুদ্ধের মতো পদ্মাসনে মুদ্রিত নেত্র গান্ধী। একান্ত গম্ভীর। হয়ত বিশ্বের বেদনায় কাতর। সামনে কি আছে কে জানে। বেদীর উপরে তিনি, তলায় তাঁর পরিজন। ভজন চলছিল, কিন্তু ওতে তাঁর যোগ ছিল না। তিনি বিগ্রহের মতো নিশ্চল। তবে চাদরের আড়ালে তাঁর ডান হাত নড়ছিল। অনুমানে বুঝতে পারলুম মালা গড়ান হচ্ছে। তখন তিনি কর্মযোগী নন ভক্তিযোগী। তিনি গীতার সেই ভক্ত যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।' এর পরেও আছে, 'মহাত্মা যে উচ্চতার শিখরে উপনীত হয়েছেন, সেখানে তিনি সব মানুষের নমস্য। যেমন বুদ্ধ। যেমন যীশু।'

তা হলেও এ ভক্ত অন্ধ ভক্ত নয়। যাচাই করে নেবার পক্ষপাতী। সে কারণেই মহাত্মার পদরজ-সংগ্রহ করা তাঁর অনুমোদন পায় না। তিনি বলেন, এতে মানবাত্মার অবমাননা। অকপটে এমন অনেক আত্মসচেতন বলিষ্ঠতার কথা এ গ্রন্থে আছে যা বিদগ্ধ মানুষকে খুশি করবে, নিরীশ্বরবাদীকে চিন্তান্বিত করে তুলবে।

গ্রন্থের এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছে দেশ-বিভাগ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা। এই দেশবিভাগে গান্ধীজীর ভূমিকাও বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে। স্বদিও মহাত্মাজী নিজেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পরিণতিকে পুলোরিয়াস গ্লোরিয়াস ইনগ্লোরিয়াস এন্ডিং' বলে-ছিলেম, কিন্তু এই গ্রন্থ রচনায় অন্নদা-শঙ্কর যে ব্যক্তিত্ব সংযম ও অপক্ষপাত

ঐতিহাসিকের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর এই প্রয়াসকে আমরা নিশ্চয়ই স্পোরিয়াস স্টাগলের স্পোরিয়াস এন্ডিংই বলব।

গত ২ অক্টোবর 'গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটি' সমিতির চৌরঙ্গীর সভাকক্ষে শিল্পী সাহিত্যিক সমাজসেবীদের এক সুন্দর সমাবেশে ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে কমিটির সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র উজ্জ্বল তাম্রপত্র, উত্তরীয় এবং নগদ পাঁচ শত টাকার এই পুরস্কার শ্রীরাবের হাতে তুলে দেন। স্বর্গত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের পুরস্কারটি গ্রহণ করেন তাঁর এক আত্মীয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীবিজয় সিং নাহার ও শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির সম্পাদক শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কবিগুরুর সংগীত ও কাব্য সমন্বিত একটি সুন্দর গীতিকা এই উপলক্ষে পরিবেশিত হয়। এমন সুন্দর এবং মহৎ একটি প্রয়াসের জন্য গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির নিশ্চিতভাবে বহু সাধুবাদ প্রাপ্য।

নেহরু পুরস্কার

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোঝাপড়ার জন্য সুপরিচিত ফরাসী সাহিত্যিক এবং চিন্তাবিদ শ্রীআঁদ্রে মালরো ১৯৭২ সালের জন্য নেহরু পুরস্কার পেলেন। মানবিক স্বাধীনতা এবং মূল্যবোধের দিশারী শ্রীমালরো সেই সব বিশ্বনেতাদের পুরোভাগে ছিলেন যাঁরা গত বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে মুক্তি-পিপাসু লড়িয়ে মানুষদের সর্বপ্রকারে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছিলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ক্ষেত্রেও শ্রীমালরোর সক্রিয় যোগাযোগের কথাও উল্লেখ্য। বিশ্বের অন্যতম মানবতাবাদী আমাদের প্রাক্তন পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমালরো সম্পর্কে এক সময় বলেছিলেন যে শ্রীমালরো তাঁর শক্তিশালী বিশ্লেষণী মন নিয়ে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকেই সত্য আহরণে প্রস্তুত ছিলেন। ব্যক্তিগত উন্নতি এবং প্রতিপত্তিতে বিন্দুমাত্র মনোযোগী না থেকে শ্রীমালরো তাঁর সমগ্র জীবনকেই একমুখীন করে রেখেছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের দিকে। এ সম্পর্কে তিনি আশাবাদীও ছিলেন পুরোপুরি। তাঁর এই উদার মানবসম্প্রীতির প্রয়াসের জন্য তিনি সমগ্র এশিয়া এবং আফ্রিকার জীবন এবং সংস্কৃতির খুব কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকার জন্যই কমিটি তাঁকে এই পুরস্কার প্রদান করেছেন।

কমিটি আরও ঘোষণা করেছেন যে ১৯৭১ সালের নেহরু পুরস্কার প্রেসিডেন্ট টিটো গ্রহণ করেছেন। পূর্ববর্তী যাঁরা এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁরা হলেন, শ্রী উ থান্ট, শ্রী মার্টিন লুথার কিং, খান আবদুল গফফার খান, শ্রীইন্দুদী মেনহুইন, আলবার্ট শ্বাইৎসার এবং শ্রীকেনেডি। চার্বাক

বন্যা অন্তরে-বাহিরে

প্রকৃতি দেবী আজ যথার্থই কিছুটা খেয়ালী হয়ে উঠেছে। পাঠ্যপুস্তকে লেখা অনেক নিয়মই আজ অ-তথ্যের সামিল মনে হয়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসবে এবং বিদায় নেবে, কাদা-পাঁকের ঝামেলা চুকে যাবে, হাঁটু-পা ধুয়ে সবাই নতুন জামা-কাপড়-জুতো পরে বেশ নিশ্চিন্তে বেরোবে, তবে না শরতের আনন্দ! কিন্তু না, সেটি আজকাল আর কোনোমতেই হবার জো নেই। বর্ষা চলছে তো চলছেই, শরৎ গড়িয়ে হেমন্তের মাঝামাঝি এসে গেল, কিন্তু বর্ষা এখনো চলছে। এখনো মাঝে মাঝে এ-নদীর কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে, বা সে-নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার খবর খবরের কাগজের মূল্যবান জায়গা দখল করে রাখছে। ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতো যদি না দেখা যেত যে এ সময়টাই যেন বন্যার জন্যে নির্ধারিত হয়ে আছে। কাব্য বন্যা বন্যা। আপাততঃ নাই বা তুললাম। যেমন বাইরে, তেমনি অন্তরে।

অন্তরের এ-বন্যার সংবাদ এতক্ষণে নিশ্চয়ই সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। পুজো সংখ্যাগুলির কথা বলি। বন্যা অন্তরে রীতিমতো একটা ভাবের বন্যা দেখা না দিলে দৈন্য-দুঃখ-রোগ-বেকারত্ব হাজার সমস্যার পীড়নে নিষ্পিষ্ট এই দেশের রাজ্যটিতে এতোগুলি পুজো সংখ্যা বেরোতে পারতো না। পুজো সংখ্যাগুলির মোট সংখ্যা কতো তা লালবাজারের প্রেস সেকশনে গেলেই হয়তো জানা যায়। কিন্তু সে নীরস সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়ে বরং স্টলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখা যাক।

ক'দিন আগে কৌতূহলের চাপে কাজটা আমি করেছিলাম। কলেজ স্ট্রীটের মোড়, ধর্মতলা এবং হাজরার মোড়, এই তিনটি জায়গার স্টলগুলি ঘুরে পুজো সংখ্যার কোয়ানটিটি যাচাই করে দেখছিলাম।

বলাই বাহুল্য, অতো নাম একবার দেখেই স্মরণে থাকবার কথা নয়। তাই একটা স্লিপে লিখে রেখেছিলাম নামগুলি।

বলাই বাহুল্য, যে নামগুলি চোখে পড়ল তাই সব নয়। আরো অনেক দরদীয়া সংখ্যা বেরিয়েছে, যেগুলি হয়তো এখনো স্টলে এসে পৌঁছয় নি, বা আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে কিম্বা, অন্য পত্রিকা তলায় স্টলকর্তারা চাপা দিয়ে রেখেছেন। তাছাড়া জেলায় জেলায় বেরিয়েছে আরো অনেক, যেগুলি বিপননের উদ্দেশ্যে কলকাতার স্টলে আদৌ পাঠানো হয় না। এবার পরিস্থিতিটা একটু অনুভব করবার চেষ্টা করুন। পুজো সংখ্যাগুলিতে মোট কতগুলি উপন্যাস ছাপা হয়েছে বলে মনে হয়? আমার ধারণা দেড়শ'র উপর। "উপন্যাসোপম বড় গল্প" নামক যে চিজটির উদ্ভাবন হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তাও অন্ততঃ একশটি হবে, তারপরে বড় এবং ছোট মিলিয়ে গল্প আট-নশ'র কম নয়, প্রবন্ধও ঐ রকম। কবিতা মুদ্রিত হয়েছে অন্ততঃ দু'হাজার। হয়তো তার অনেক বেশীও হতে পারে। কাগজগুলি নেড়েচেড়ে আমার মোটামুটি এই রকম ধারণা হল। একটা ফুলফ্লেজেড ভাবের বন্যা ব্যতীত এ-হেন সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব হতো কি?

তাই বলছিলাম : বন্যা অন্তরে বাহিরে। যে দৃঢ়তার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে বাইরের বন্যার বিরুদ্ধে বাঙালী রুখে দাঁড়ায়, শরতের সমাগমে ঠিক তেমনি অন্তরের বন্যায় তারা গা-ভাসিয়ে দেয়।

যা হক, এতক্ষণ কেবল কোয়ানটিটির কথা বললাম। কোয়ালিটির কথা সুযোগ এলে পরের এক সংখ্যায় আলোচনা করা যাবে।

চন্দননগর পুস্তকাগারের শতবর্ষপূর্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় নবজাগরণের সময় থেকেই এ-দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইতিহাস সম্পর্কে জনমানসে নিস্পৃহতার লক্ষণ দেখে কতু না আক্ষেপ করে গিয়েছেন। সে-সবই যে অরণ্যরোদন হয়ে যায় নি, তার একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করছে চন্দননগরের পুস্তকাগার। একে যাকে বলে লাইব্রেরী কাম আর্কাইভ। এধরনের বেসরকারী প্রচেষ্টা এতদিন ধরে কেবল যে নামে টিকে আছে তা নয়, উত্তরোত্তর এর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে—এটা কেবল এই পুস্তকাগারের উদ্যোক্তা বা বর্তমান পরিচালকদের পক্ষে নয়, গোটা বাঙালী জাতির পক্ষেই আশার কথা।

সম্প্রতি এই পুস্তকাগারের শতবর্ষপূর্তি উৎসব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। তিনি তাঁর সুচিন্তিত ভাষণে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এই শ্রেণীর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে যথোপযুক্ত সরকারী অর্থসাহায্য পায়।

এই পুস্তকাগারের বর্তমান সম্পাদক শ্রীআবু সঈদ এই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষণেই আমরা জানতে পারলাম যে ঠিক একশ' বছর আগে (১লা অক্টোবর, ১৮৭৩), কয়েকজন উৎসাহী যুবক তাঁদের অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবের আসবাবপত্র তথা সিনসিনারী বিক্রয় করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এই পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কাজেই একটি মহৎ প্রয়াস তা যতো সামান্যভাবেই সুরু হক না কেন, তা যে ক্রমশঃ জনসমর্থন এবং সহায়তালাভ করে কালে কালে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে তা এই পুস্তকাগারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। কেবল মুদ্রিত পুস্তক বা পাণ্ডুলিপিই নয়, বহু পুঁথি ও দলিলও এই পুস্তকাগারে সংরক্ষিত আছে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থা-

গারের গ্রন্থাগারিক মহাশয় পুস্তকাদি সংরক্ষণের নানা সমস্যা সম্পর্কে এই অনুষ্ঠানে বিশদভাবে আলোচনা করেন।

পাঞ্জাবী সাহিত্যের কীটসের অকাল প্রয়াণ

অভাব অনটনক্লিষ্ট বাঙালী কবি মুকুন্দদাস এক সময় ক্ষোভের সঙ্গে গেয়েছিলেন "...আমি ম'লে তোমরা আমার চিতায় দেবে মঠ!" অর্থাৎ জনপ্রিয়তার উচ্চ-শিখরে উঠেও যে-ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কাটাতে হয় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, মৃত্যুর পরে তাঁরই সমাধি-স্থলে মন্দির উঠলো কি উঠলো না, তাতে অন্ততঃ সে হতভাগ্য ব্যক্তির কিছু যায় আসে না।

মাস কয়েক আগে ঠিক এমনি দুর্ভাগ্য-জনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন এ-যুগের পাঞ্জাবী কাব্যের কীটস্ শিবকুমার বাটালভি। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে শিবকুমার সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৭ সালে।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে চণ্ডীগড়ে এক সম্বর্ধনা সভায় কথাপ্রসঙ্গে শিবকুমার বলেছিলেন : "২০,০০০ শ্রোতার সামনে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, কিন্তু তবু আমি ভবিষ্য-দ্বাণী করছি, আপনারা দেখবেন, আমার মৃত্যুর পরে কুড়িটা কুকুরও আসবে না আমাকে সৎকারের জন্যে।"

সৌভাগ্যের বিষয় যে, শিবকুমারের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ, এবছর ৬ই মে ছোট্ট শহর বাতালায় তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতসর, জলন্ধর, চণ্ডীগড় এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য শহর-নগর থেকেও দলে দলে মানুষ, সাহিত্যপ্রেমিক কাব্যামোদী নরনারী শিবকুমারের অন্তিমযাত্রায় এসে যোগ দিয়েছিলেন। অনেকের মতে এ অনুগমনে অন্ততঃ ৩০,০০০ নরনারী যোগদান করেছিলেন। স্বনামধন্য পাঞ্জাবী লেখক সন্ত সিং সেখন বলেছিলেন : 'শিব ছিল পাঞ্জাবী কাব্যের কীটস্।' কবি মোহন সিং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠে-ছিলেন : "একটি সত্যিকারের ক্ষণজন্মা প্রতিভার অকালপ্রয়াণ হলো, এ ক্ষতি পূরণ হবার নয়।' সুলেখিকা অমৃতা প্রীতম আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন : 'যুগ-যন্ত্রণার কবি, নিঃসঙ্গতার প্রতীক গায়ক-পাখী আজ নীরব! আমি যে কাঁদতেও পারছি না!'

সমবেত জনসমষ্টির মধ্য থেকে কয়েক-জন গুণমুগ্ধ উৎসাহী নরনারীর চেষ্টায় তৎক্ষণাৎ ত্রিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল স্বর্গত কবির ২৩ বছর বয়স্কা বিধবা পত্নী ও দুটি শিশু সন্তানের জন্য।

শিবকুমার ক্ষয়রোগে ভুগছিলেন বলতে গেলে প্রায় কিশোর বয়স থেকেই। তাই, অনেকটা আমাদের সুকান্তর মতো একটা বেপরোয়া ভাব তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছত্রে ফুটে বেরোতো, বিশেষ করে এই ভাবটির জন্যে পাঞ্জাবী কাব্যের সর্বাধুনিক রচয়িতা-গণের মধ্যে তিনি পুরোগামী হিসেবেই গণ্য হতেন। অনেকে শিবকুমারকে গ্রীক ট্র্যাজেডীর নায়কদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ কিনা, ক্ষয়রোগগ্রস্ত সুবাসন্ত কবির অনিবার্য পরিণামটা যে কি হওয়া সম্ভব, তা সকলেরই জানা, কিন্তু তবু তাঁকে ভালো না বেসে উপায় নেই। মনোবীণার এমন একটা তন্ত্রীতে তিনি আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা প্রকৃতই সর্বজনীন। আমি নিজ দায়িত্বে তাঁর একটি প্রিয় কবিতা কয়েকটি ছত্র তর্জমা করছি :

পূর্ণ এ বসন্ত বনে
বিদায় নেবো আমি;
শ্রান্ত আমি, ক্লান্ত আমি
জীবন পর্যটনে।
প্রস্ফুটিত যৌবনে যারা যায়—
তারকার ভাস্বরতায়
মহাকাশ ছেয়ে ফেলে তারা
প্রেমদীপ নয় পথহারা।
ভাগ্যের একি পরিহাস!—
যে ভালো বেসেছে জীবনে
মৃত্যু যেন তারই অন্বেষণে
অনুক্ষণ ফেলে দীর্ঘশ্বাস!

বাঁচতে হলে লাইন দাও

পুজোর ছুটির কয়েকদিন আগে পশ্চিম বাংলার প্রকাশক তথা মুদ্রকগণ সম্মিলিত-ভাবে একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকে এ-রাজ্যে বই ছাপাবার উপযুক্ত কাগজের অভাবের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর কয়েকদিন আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস্টার প্রিন্টার্স এ্যাসোসিয়েশনের একটি মুদ্রিত পুস্তিকা 'বিচার চাই' হাতে এলো। এ পুস্তিকায় বলা হয়েছে মুদ্রণশিল্পের নানা সমস্যার কথা : কাগজ নেই, কালি কখনো নেই, কখনো দুর্মূল্য, সর্বোপরি আছে সর্বনাশা লোড শেডিং। কাজেই আগামী দিনগুলিতে কি পাঠ্যপুস্তক আর কি সাধারণ সাহিত্য-গ্রন্থ সবই তৈরী করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। অনেক স্বল্প পুঁজির প্রকাশক তথা মুদ্রককে হয়তো ব্যবসা গুটিয়েই ফেলতে হবে। সবাই জানেন, আমরা বাঙালী, 'মন্বন্তরেও মরিনি আমরা'—চাল নেই, গেহুঁ নেই, সক্কর নেই, তেল নেই, রুটি নেই, নেই কেরোসিন—তবু বেঁচে আছি; কিন্তু পড়বার বইয়ের অভাব হলে বাঙালী বাঁচবে কি করে?

প্রশ্নটা শুনে আমার ছোট্ট মেয়েটি বলে উঠলো : 'কেন বাবা, লাইন দেবো।'

—জরৎকারু

নতুন বই

শ্রীমায়ের দিব্যজীবন ও সাধনা। হরেন্দ্রনাথ মজুমদার। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা। শ্রীঅরবিন্দ ভবন, ৮, শেকস-পিয়র সরণি, কলিকাতা—১৬।

ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের ধ্যানের আলোয় মাতৃমূর্তির যে রূপ ধরা পড়েছিল সেই রূপকে শ্রীঅরবিন্দ ধ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বিশ্বকে, মানবতাকে, স্বীয় অধ্যাত্ম সত্তা দিয়ে দিব্যনির্ধারিত প্রগতির পথে অল্প সময়ে অনেকটা এগিয়ে দেওয়ার জন্যে শ্রীমাকে গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-সত্তা সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীমায়ের মধ্যে রয়েছে এবং শ্রীমা এক আশ্চর্য দিব্যযন্ত্ররূপে নিঃশব্দে শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়ে চলেছেন। গ্রন্থকারের ভাষায়, 'মা আমাদের সত্যকার মা-ই—মাকে ধরে ওঠা খুব সহজ ও সরল। মায়ের কাছে সব আবদার অনুরোধ চলে—সবাই মায়ের সন্তান—শুধু মা মা বলে সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকলেই মা আসেন পথ দেখান, কোলে তুলে নেন—এ সবই পরীক্ষিত সত্য।'

সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশ শ্রীমা তত্ত্বকথা হয়ে পড়ছিলেন। যাঁরা পণ্ডিচেরী আশ্রমে যাবার সৌভাগ্যলাভ করেন নি তাঁদের কাছে শ্রীমার সহজ, সরল, স্নেহময়ী রূপটি এখনও পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি, তাঁর জীবন ও সাধনা সম্পর্কে একটি সহজবোধ্য প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাবে। এই বইটি সেই অভাব দূর করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রন্থকার শ্রীমায়ের পরমস্নেহধন্য বলেই এই দুরূহ কাজটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা আগ্রহী পাঠকদের কাছে যথাযোগ্য সমাদর পাবে।

সুহৃদগোপাল দত্ত

জনপদ (উপন্যাস)। প্রফুল্লকুমার সিংহ। আল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশনস্, কলিকাতা-১২। আট টাকা।

প্রেম এবং কাম—এ-দুয়ের মধ্যে কি তফাৎ—তারই একটি সবল জিজ্ঞাসা সামনে রেখে লেখক প্রফুল্লকুমার সিংহ তাঁর 'জনপদ' উপন্যাসটি লিখেছেন। নায়ক নাদুবাবু নাস্তিক শান্তা। উপন্যাসিকা বহুভোগ্যা নারী অলুনি। কুরাল মোড়

একটি স্থান—যেখানে বহুদিনের পুরনো একটি বটগাছ তার হাজার হাজার ঝুরি নামিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। এরই চার-পাশে বহুবিধ লোকজন—নাদুবাবু শান্তা, আলুনি, গোপাল সিং ইত্যাদি। নাদু শান্তাকে বিবাহ করে, কিন্তু আলুনি নাদুর ঘৃণা সত্ত্বেও তার অজ্ঞানে তাকে ফাঁদে ফেলে তারই ঔরসে গর্ভবতী হয়। একথা শান্তাকে বলে গোপাল সিং। আলুনির সন্তান নাদুর মত দেখতে শান্তা যখন বোঝে নাদুর যাবতীয় কৃতকর্ম তার সজ্ঞানে নয়, তখন স্বামীর বুকে আশ্রয় নেয় নতুন করে। এই সমস্ত কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়েছে বহু কামুক পুরুষ চরিত্র। ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্রায়ণে লেখক তাঁর ক্ষমতার পরিচয় রেখেছেন। ভাষা সহজ সরল। ঘটনা মেলোড্রামাটিক হলেও যাঁরা উপন্যাসে গল্প ভালবাসেন, এ-উপন্যাস তাঁদের তৃপ্ত করবে।

শারদ সাহিত্য

কবিপত্র—তুষার চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত ও পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিপত্রে মণীন্দ্র রায়, বাম বসু, তুষার চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, সামসুল হক, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, তরুণ সান্যাল, শান্তনু দাস, অনন্য রায় এবং আরো অনেকে কবিতা লিখেছেন। জীবনানন্দ প্রসঙ্গে লিখেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলকাতা—২৬। দাম এক টাকা।

পরিচয়—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ সান্যাল সম্পাদিত। এবারের পরিচয়ে অসংখ্য উল্লেখযোগ্য রচনা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ত্রিশ দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রসঙ্গে ধরণী গোস্বামীর আলোচনা এবং চিন্মোহন সেহানবীশের রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ আলোচনাটি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ গল্পটি বর্তমান জীবনের এক অসামান্য আলেখ্য। দুটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন মণীন্দ্র রায় এবং তরুণ সান্যাল। অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ দত্ত, অজিত-নারায়ণ বসু, শংকর চক্রবর্তী, অসীম রায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিব-শংকর মিত্র, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মিহির সেন, সৌরি ঘটক, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অন্নদাশংকর রায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোসাঁয়ি কুন্দুস, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কিরণশংকর সেন-গুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র-নাথ রক্ষিত, মিত্র ঘোষ, বাম বসু, কৃষ্ণ ধর, লোকনাথ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, ধনঞ্জয় দাশ, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সনৎ বন্দ্যো-পাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দীনেন রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অনন্ত দাশ, দীপেন রায়, শিবশম্ভু পাল, বত্রেশ্বর হাজরা এবং আরো অনেকে।

সপ্তম দশক—জিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজন সেন সম্পাদিত। ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা সপ্তম দশকে গল্প, কবিতা লিখেছেন এবং বিবিধ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, উজ্জ্বল মজুমদার, দীপেন্দু চক্রবর্তী, দিবেন্দু পালিত, ধরেশ্বর হাজরা, জিতেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অরুণ ঘোষ, প্রলয় শূর, বলরাম বসাক, চন্ডী মণ্ডল, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, তুলসী সেনগুপ্ত, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, বার্ণিক রায়, জীবন সরকার, তুলসী মুখোপাধ্যায়, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শান্তনু দাশ এবং আরো অনেকে। ৭৮।২ বিনোদ রায় রোড ওয়েস্ট। কলকাতা—৬১। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্য—বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কবিতা ও কবিতার আলোচনা আছে। কলেজ স্কোড। হাইলাকান্দি। কাছাড়। আসাম। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সাহিত্যসাথী—সমীর পালচৌধুরী সম্পাদিত। সাহিত্য সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক। মাকড়দহ। হাওড়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

খেয়া—সম্পাদক—মৃণালকান্তি চ্যাটার্জি। গিরিশ নিকেতন। নিউ ডাঙ্গালপাড়া। সিউড়ী।

দাবী—সম্পাদক—দিবেন্দু সেন। আলি-পুরদুয়ার। জলপাইগুড়ি।

সাপ্তাহিক আর্যাবর্ত—বিমল ঘোষ সম্পা-দিত। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস। খালপাড়া। শিলিগুড়ি। পঁচাত্তর পয়সা।

শ্লোক—শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টো-পাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কবিতা ও কবিতাবিষয়ক আলোচনা পত্রিকা। লিখেছেন শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কৃষ্ণ ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাজলক্ষ্মী দেবী, কবিতা সিংহ, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, সুনীল বসু এবং আরো অনেকে। এল।পি ১৯৭ শ্রীমা পল্লী। কলকাতা—৬০। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শারদ স্মরণী পঁচিশ পল্লী—সমর দত্ত ও বিজয় বসু সম্পাদিত। বেশ আকর্ষণীয়। ৩২এ হরিসভা স্ট্রীট। কলকাতা—২৩।

সাহিত্য ভারতী—তাপসকুমার মণ্ডল সম্পা-দিত। শ্যামসুন্দর পাটনা। মেদিনীপুর।

ঋক—শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক। লিখেছেন কৃষ্ণ ধর, শিশির ভট্টাচার্য, জীবন সরকার, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বোম্মানা বিশ্বনাথন, বলরাম বসাক এবং আরো অনেকে। ৬৫ রায় বাহাদুর রোড। কলকাতা—৩৪। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সীমান্তিক—দেবাশিষ ঘোষ ও বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত সম্পাদিত উত্তর বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা। শারদীয় সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয়। উত্তরবঙ্গ প্রেস। জলপাইগুড়ি। দাম একটাকা।

জাগৃতি—সুশান্ত দত্ত সম্পাদিত। গ্রাম-বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ত্রৈমাসিকের রচনা নির্বাচনে রুচি-শীলতার ছাপ রয়েছে। গোবরডাঙা। ইছাপুর। ষাট পয়সা।

বৃষ্টি—জয়দেব রায় সম্পাদিত ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শান্ত চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, পবিত্র মুখো-পাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, কবিতা সিংহ, তুষার চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাশ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, চন্ডী মণ্ডল এবং আরো অনেকে। বাওয়ালী-বথতলা। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দিবারেফ—সমর দত্ত সম্পাদিত এই পত্রিকাটি রচনাবৈচিত্র্যে যেমন আকর্ষণীয় তেমনি লেখকসূচীতে আছেন নামী অনামী লেখকেরা। রুচিশীল পত্রিকা। ১৩ গোপাল ঘোষ লেন। কলকাতা—২৩। দাম দু' টাকা।

বীরভূমি—বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মুখ-পত্র এবং কৃষ্ণনাথ মল্লিক সম্পাদিত। পত্রিকাটি সংগ্রহযোগ্য। সিউড়ী, বীরভূম। দাম একটাকা।

জাগরি—অপূর্বকুমার সাহা সম্পাদিত। ৭৪।৫এ বাগবাজার স্ট্রীট। কলকাতা—৩। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শতদ্রু—সম্পাদনায় লোকেশ হোমরায় এবং গৌতম গোস্বামী। ৫৩ডি হরমোহন ঘোষ লেন। কলকাতা—১০। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ধরিত্রী—সম্পাদক দাশরথী রায়। বি এল চৌধুরী রোড। বর্ধমান। দাম এক টাকা।

নদীয়া মুকুর—সমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়। শিবালয়। কৃষ্ণনগর। নদীয়া।

রূপবতী—সম্পাদক গৌতমকুমার চক্রবর্তী। হেমেন্দ্র স্মৃতি আসর। ১১।১ বৈঠকখানা ফার্স্ট লেন। কলকাতা—৯। দু' টাকা।

মুখপত্র—সম্পাদক তারাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। বাঁশবেড়িয়া। হুগলী। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

ফাল্গুনী—সম্পাদক মনোরঞ্জন দাশ। হিংগলগঞ্জ আনন্দ সম্মিলনী। হিংগলগঞ্জ। ২৪ পরগণা। দাম এক টাকা।

নবাঙ্কুর—বিকাশচন্দ্র দাশ সম্পাদিত এই শারদ সংকলনটিতে লিখেছেন নবীন ও প্রবীণ লেখকেরা। ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড। ব্লক ডি, ফ্ল্যাট ১৫। কলকাতা—৫৪। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিদগ্ধ—শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাসাকপুর বিদগ্ধ পরিষদ। স্কুল রোড। সোদপুর। ২৭ পরগণা। কুড়ি পয়সা।

কিশোর বাংলা—সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হুগলী। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

ছোটদের কাগজ—কল্পনা শূর সম্পাদিত পত্রিকাটি হাতে নিয়ে কিশোর পাঠক মাত্রেই পুলকিত হবেন। রচনাবৈচিত্র্য এবং অলংকরণ সৌকর্যে আকর্ষণীয় পত্রিকাটি কলকাতার বাইরে থেকে প্রকাশিত হলেও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ২ সাহেবতলা রোড। ময়ূরমহল। বর্ধমান। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবিকণ্ঠ—অসীমকৃষ্ণ দত্ত সম্পাদিত কবিতা পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, মৈত্রেয়ী দেবী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, বাসুদেব দেব, দেবী রায় এবং আরো অনেকে। ১০।১ ইব্রাহিমপুর রোড (ত্রিতল)। কলকাতা -৩২।

তরুণের অভিযান—সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ দেবনাথ সম্পাদিত তরুণদের এই পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটিতে কলকাতা সম্পর্কে কবিতা আছে। এই সংগে আছে ছোটদের জন্য আকর্ষণীয় পুজোর ডায়েরী। ১৭ জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড। কলকাতা—২০। দাম একটাকা।

অনুক্ষণ—সম্পাদনা রথীন ভৌমিক। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আলোক সরকার, বুদ্ধদেব হাজরা, ফণিভূষণ আচার্য, কবিতা সিংহ, মৃণাল বসুচৌধুরী এবং আরো অনেকে। মল্লিকপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

মহুয়া—সম্পাদক সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯৩বি৭ গোয়ালপাড়া রোড। কলকাতা—৬০। দাম দু' টাকা।

সমাচার—অনিল ভট্টাচার্য সম্পাদিত ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটিতে লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, আবদুল ফজল, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আশীষ লাহিড়ী, গৌরাংগ ভৌমিক, সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, সামসুল হক, শিবশম্ভু পাল, পরেশ সাহা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গংগোপাধ্যায়, মানস দেববর্মণ, প্রফুল্ল রায়, সুনীল গংগোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, অজয় বসু, নবেন্দুনাথ মিত্র এবং আরো অনেকে। ইমপ্রেস। ত্রিপুরা। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গংগোত্রী—শান্তনু দাস সম্পাদিত সচিত্র কবিতা পত্রিকাটির সুসম্পাদনা এবং উন্নতমানের রচনা সমাবেশ নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। বর্তমান সংখ্যাটিও পত্রিকা ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বর্তমান সংখ্যায় কয়েকজন খ্যাত ও অংশপরিচিত কবির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শান্তনু দাশের দীর্ঘ কবিতাটি দার্শনিক ভাবনা ও জীবনোপলব্ধির এক বিস্ময়কর প্রকাশ। কবিতা লিখেছেন কবিতা সিংহ, রঞ্জিত সিংহ, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎসুনীল নন্দী, রুদ্রেশ্বর হাজরা, সত্য গুহ, গৌরাংগ ভৌমিক, অনিলবরণ গংগোপাধ্যায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, রুদ্রেন্দু সরকার এবং আরো কয়েকজন। অমিতাভ চৌধুরী এবং পবিত্র গোস্বামীর রচনা দুটি আকর্ষণীয়। ৪।১ আফতাব মসজিদ লেন। কলকাতা—২৭। দাম দু' টাকা।

তরুণিমা—হরিদাস ঘোষ সম্পাদিত তরুণিমার শারদ সংকলনে লিখেছেন হরিদাস ঘোষ, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, গোবাচাঁদ নন্দী, সুবোধ দাস, সরোজেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুষ্পনাথ বিশী, তপন চৌধুরী, মন্মথ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, অসীম মণ্ডল, অমরেন্দ্র ঘোষ, সৌমিত্র ঘোষ, সৌগত রায় পুরোহিত, চট্টোপাধ্যায় মানস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫৮।১ বনমালী সরকার স্ট্রীট। কলকাতা—৫। দাম দু' টাকা।

শ্রীমা সরদা—স্বামী তপানন্দ সম্পাদিত ও শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্র। লিখেছেন স্বামী অসিতানন্দ, ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকণা দাশ, আশীষকুমার সিংহ, শান্তিসুধা দেবী, প্রভা রায় ও আরো অনেকে। ভট্টনগর। লিলুয়া। হাওড়া। দাম একটাকা।

গন্ধরাজ—ফণিভূষণ আচার্য সম্পাদিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকায় তার প্রসংগে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন আলোক সরকার। এছাড়া লিখেছেন তুলসী মুখোপাধ্যায়, সুবোধ গংগোপাধ্যায় দীপালি দাশ এবং সুব্রত সেনগুপ্ত। কবিতা লিখেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল বসু, শিবশম্ভু পাল, তুলসী মুখোপাধ্যায়, শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উৎপলকুমার গুপ্ত, সাধনা মুখোপাধ্যায়, তমিস্রাভ দাশগুপ্ত, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, রুদ্রেশ্বর হাজরা, মৃণাল বসুচৌধুরী, কাত্যিক সাহা এবং আরো অনেকে। পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ একটি কাহিনী ধারাবাহিক উপন্যাস। ১৪জি স্টেশন রোড। কলকাতা -৩১। দাম তিন টাকা।

প্রফুল্লকুমার সিংহের নতুন উপন্যাস

জনপদ ৮,

দুর্বাদল চ্যাটার্জীর নতুন নাটক
এ লড়াই বাঁচার লড়াই ৩·০০

ডঃ অসীম বর্ধনের

বাঁচতে সবাই চায়	৩·৭৫
কেটে যাবে মেঘ	২·৫০
অবাঞ্ছিত শিশু	৩·০০
বিয়ের আগে ভালবাসা	৩·০০

হেনা চৌধুরীর প্রশংসাপ্রাপ্ত বই

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন-বেদ ১০-০০

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশনস লিঃ ৫৫-১ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা—৭০০০১২

কথায় কথায়

'জ্ঞানের প্রদীপ।'

এই সপ্তাহে আমার আলোচ্য বিষয় 'জ্ঞানের প্রদীপ'।

পরপর ষোলো সপ্তাহ 'কথায় কথায়' লিখে আমার যা কিছু লেখা সম্ভব ছিলো কুকুর-বিড়াল থেকে পাগলা শুয়োর পর্যন্ত সব বিষয়েই চেষ্টা করলাম, এমনকি আমার পরমপূজনীয় পিতৃ-পিতৃব্য-পিতামহদের গোপন বৃত্তান্ত বর্ণনা করলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুতেই কিছু হলো না।

হাল ছাড়বার আগে দু-একটা সামান্য জিনিস নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে বসেছি। তারই একটা হলো জ্ঞানের প্রদীপ।

সরলচিত্ত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আপনারা হয়তো কেউই এই জ্ঞানের প্রদীপ নামক দ্রব্যটির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নন। এতে দোষের কিছু নেই. আমিও জানতাম না জিনিসটা কি। আমাদের ছোটবেলায় এরকম কোনো জিনিস ছিলো না, আর থাকলেও আমাদের সেই দূর মফঃস্বল শহরে 'জ্ঞানের প্রদীপ' পৌঁছয় নি।

আমার কনিষ্ঠ শ্যালক শ্রীমান ভজগোপাল তার ভাগিনেয় অর্থাৎ আমার ছেলেকে একটি 'জ্ঞানের প্রদীপ' কিনে দিয়েছে। জ্ঞানের প্রদীপ হলো একটি ঐ জাতীয় আধুনিক খেলনা যাতে শিক্ষা ও খেলা একই সঙ্গে হয়ে থাকে। আরো ভালোভাবে বলা উচিত, এর মাধ্যমে খেলাচ্ছলে শিক্ষা লাভ হয়। এই শিক্ষালাভ শুধু শিশুরাই করে থাকে তা নয়, যেমন আমার ক্ষেত্রে হয়েছে, অনেক সময় যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্কেরাও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন।

আমার কনিষ্ঠ শ্যালক কি ভেবে তার ভাগিনেয়কে এই রকম একটি জিনিস উপহার দিলো তা আমার পক্ষে বলা কঠিন। কিন্তু এর জন্যে আমাকে যা শিক্ষা পেতে হয়েছে তা পূর্বাহ্নে জানা থাকলে তার দিদির কথা চিন্তা করে সে নিশ্চয় এরকম একটা প্রাণঘাতী খেলনা উপহার দিতো না।

'জ্ঞানের প্রদীপ' আসলে একটি সুদীর্ঘ প্রশ্নমালা, যার প্রতিটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অসংখ্য উত্তর। একটি চৌকো কাঠের বাক্সে এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পর্যায়ক্রমে সাজানো রয়েছে, সেই কাঠের বাক্সের প্রান্ত থেকে লাল ও নীল এই দুই রঙের দুটি তার বেরিয়ে রয়েছে, আর তার অপর প্রান্তে রয়েছে একটি লম্বা তার ও প্লাগ। প্লাগটি ইলেকট্রিক সুইচে লাগিয়ে খেলাটি শুরু করতে হবে। বহুবিধ প্রশ্ন এবং বহুতর উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক প্রশ্নের গায়ে লাল তার এবং সঠিক উত্তরের গায়ে নীল তার লাগাতে পারলে বাক্সটির কেন্দ্রস্থলে একটি ইলেকট্রিক বাল্ব আছে সেটা জ্বলে উঠবে।

জ্ঞানের প্রদীপের প্রশ্নগুলি এইরকম ঃ

ক) ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্রই লাফ দেয় কি?

খ) সিংহের বাচ্চা জন্মাবার সময় চোখ ফোটা থাকে কি?

গ) কুমীরের ডিম হয় কি?

বুদ্ধিমান পাঠক (এবং পাঠিকা) অনায়াসেই অনুমান করতে পারবেন যে এই প্রশ্নগুলি প্রায় সমার্থক কিন্তু তার কারণ এই যে, 'পশু-শিশু' নামক একটি মাত্র সিরিজ থেকে আমি প্রথম তিনটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছি।

'পশু-শিশু' প্রশ্নমালার উত্তরে এবার আসা যাক। প্রথমেই (গ) প্রশ্নের উত্তরে আমি আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। কোথায় যেন একবার পড়েছিলাম (নাকি শুনেছিলাম), এই নগরে হোটেল-রেস্তোরাঁয় যে মাংস এবং ডিম ব্যবহার করা হয় তা যথাক্রমে মোষের এবং কুমীরের। আমার এই ধারণা সম্পর্কে আমি এত বদ্ধমূল ছিলাম যে কুমীরের ডিম হয় কি প্রশ্নে আমি নিঃসন্দেহে হ্যাঁ সূচক উত্তরের গায়ে নীল তার এবং প্রশ্নের গায়ে লাল তার লাগিয়ে দিলাম।

আমার প্রশ্নের উত্তর শুদ্ধ হয়েছিলো কিনা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, সেই মুহূর্তে সমস্ত অঞ্চলের আলো ঝুপ করে নিবে গেলো।

চল্লিশ পয়সা দামের চারটি মোমবাতি আপাদমস্তক নিঃশেষিত হওয়ার পর যখন গভীর রাতে আলো আবার ফিরে এলো, আমার ছেলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে; আর আমারও সাহস হলো না পুনর্বার পরীক্ষা করে জানার যে, কুমীরের ডিম সত্যি হয় কিনা। জানতে পারলে হিসেব করতে পারতাম কত সহস্র কুমীর সন্তান ওমলেট, ডেভিল, মোগলাই পরোটা ইত্যাদি মারফৎ হোটেল রেস্তোরাঁ গুলির কল্যাণে আমার পেটের মধ্যে কিলবিল করছে।

সে যা হোক, পরদিন সকালে আমার ছেলে ঘুম থেকে উঠেই বায়না ধরলো, 'জ্ঞানের প্রদীপ।' সম্ভবত সে তার বাবার বিদ্যের দৌড় যাচাই করে দেখতে চায়। তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সুতরাং এবার (ক) প্রশ্ন শুরু করলাম, ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্রই লাফ দেয় কি?

এই প্রশ্নটি দেখে যত সোজা মনে হয় উত্তর কিন্তু খুবই জটিল। (ক) প্রশ্নের প্রথমত দুটি উত্তর (১) না এবং (২) হ্যাঁ। আমি সাহস অবলম্বন করে হ্যাঁ উত্তরে তার লাগালাম এবং সেই বিদ্যুতের বাল্বটি জ্বলে উঠলো, সুন্দর আলো দেয় বাল্বটি। কিন্তু সমস্যার এখানেই সমাধান হলো না, এইবার সূক্ষ্মতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। যদি (ক) প্রশ্নের উত্তর (২) হয় তবে জন্মানো মাত্র ক্যাঙারুর বাচ্চা কতটা লাফ দেয়? আবার (ক) থেকে শুরু; ক) ছয় ইঞ্চি, খ) এক ইঞ্চি, গ) আধ মাইল, ঘ) সাড়ে তিন ফুট, ঙ) পাঁচ গজ—এইভাবে এত পর্যন্ত।

এইসব দেখে আমার মাথা কেমন যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিলো, নাকি ইলেকট্রিকের দোষ, আমি যেই গ) উত্তরে অর্থাৎ ক্যাঙারুর বাচ্চা জন্মানো মাত্র আধ মাইল লাফ দেয় এইখানে তার লাগিয়েছি, কোথায় কি যে হলো, মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেলাম মেজেতে।

বারো ঘন্টা পরে সন্ধ্যাবেলা জ্ঞান হতেই দেখি, মাথার কাছে টেবিলে একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। এ জিনিস আমাদের বাড়িতে কখনো ছিলো না। স্ত্রীর দিকে চোখ মেলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, ওটা সেই জ্ঞানের প্রদীপ। আবার অজ্ঞান হতে যাচ্ছিলাম। স্ত্রী জানালেন আর ভয় নেই, সামান্য বুদ্ধি খরচ করে তিনি জ্ঞানের প্রদীপকে টেবিল প্রদীপ করেছেন, সত্যিকারের নতুন ডিজাইনের ল্যাম্প হয়েছে।

—তারাপদ রায়

দেবল দেববর্মা

মধুমাস

ওরা চলে গেল। সুহাসিনী গেটের কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এখন ফাল্গুন মাস প্রায় শেষ। যাই-যাই করে শীত সম্পূর্ণ যায়নি। নিশিকুটুম্বের মত গভীর রাতে তার আনাগোনা চলছে। জায়গাটা বিহারের কাছাকাছি। দিনমানে গরম অথচ রাত্তিরে ঠাণ্ডা। আর সন্ধ্যের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলে কথা নেই। তখন রাত একটু ঘন হ'লেই শীত। ভোরের দিকে লেপ-কম্বলের প্রয়োজন হতে পারে।

এতক্ষণ তার কোয়ার্টারে বসে অনর্গল কথা হচ্ছিল। প্রায় এক ঘন্টা ধরে। ওরা বলছিল, সুহাসিনী চুপ করে শুনছিলেন। শেষেও তিনি বলে যাচ্ছিলেন, ওরা মুখ গম্ভীর করে শুনছিল। মাঝে মাঝে কথা-বলার হাওয়া ভঙ্গী, ঈষৎ গুমোট হয়ে আসছিল, কিন্তু সুহাসিনী স্থির, একটুও বিচলিত হননি। নইলে ব্যাপারটা হয়তো বিশ্রী হতে পারত। কারণ ঘটনাটি ঠিক সুখকর নয়। তাঁর স্কুলের এক ছাত্রীর কেচ্ছা-কাহিনী আর এইসব জটিল ভুল বোঝা-বুঝির বিষয় আলোচনায় বসলে একটু অস্বস্তিকর অনমনীয় ভাব কিম্বা উত্তেজনার ভাব ঝগড়ার দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সুহাসিনী অনুদ্বেজিত এবং প্রায় অতি শান্ত। তবে সিদ্ধান্তে অটল। বিচলিত হোন নি। অবশ্য ওরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি। প্রথমে অনুনয়-বিনয়, সুহাসিনীর পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে নানাভাবে তাঁকে কাবু করা। কমলার ভবিষ্যত? এই আচমকা সরিয়ে নিলে মেয়েটার সামনের বছর ওর হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা। এখন এই শেষবেলায় মানে অসময়ে তাকে অন্য স্কুলে ভর্তি করা যাবে? আর ভর্তি হতে না পারলে কমলার সামনে অন্ধকার সমুদ্র। তিনি নিশ্চয় সেকথা মানবেন। এতকাল ধরে মেয়েদের ভালোমন্দ, হিতাহিত চিন্তা করেছেন। শিখিয়ে পড়িয়ে কত মেয়েকে বড় করে তুললেন। আর এখন কমলার অবস্থা বিবেচনা করে সুহাসিনী কী এমনি নির্মম হতে পারবেন?

কমলার বাবা অর্থাৎ পরিতোষ দত্ত একা নয়। সঙ্গে আরো দু'জন। একজন তার বন্ধু হেমাঙ্গ সেন। জামসেদপুরে বাড়ি। লম্বা চেহারা, চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতের আঙুলে পাথর বসানো দু-তিনটে আংটি। আর একজন এই শহরের ছেলে। বেশী বয়স নয়। কাঁইশ-তেইশের মধ্যে। লম্বা চুল, আজকালকার

ছেলেদের মত জুলপির বাহার, পরনে শাদা পাংলুন। গায়ে গেরুয়া শার্ট। সুহাসিনীর মনে হ'ল তিনি ওকে দেখেছেন। বোধহয় অল্পস্বল্প রাজনীতি করে। শহরের কোনো উঠতি যুব-নেতা হবে। তাঁর মনে পড়ল, এই স্কুলে ও আরো একবার এসেছে। চার-পাঁচটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বেশ তেরিয়া ভঙ্গি। একটি মেয়ের অ্যাডমিশনের জন্য খুব চেঁচামেচি করল। অবশ্য সুহাসিনী তাকে ভর্তি করেন নি। ভীষণ কাঁচা, তাঁর স্কুলে অনুপযুক্ত। ছোকরা অনেক চেষ্টার পর শেষে ধুত্তোর এমনি গোছের একটা ভঙ্গি করে দলবল নিয়ে উঠে গেল।

কমলার বাবার সঙ্গে ওদের দেখে সুহাসিনীর মুখখানা একটু শক্ত হ'ল, মুহূর্তের জন্য ভ্রূ কোঁচকাল। মনের ভিতর খটকা লাগল। ভদ্রলোকের মতলব কী? ওই ছেলেটিকে সঙ্গে করে আনবার অর্থ? নিশ্চয় একটা ঝগড়া বাঁধাতে চায়। তাই একা নয়। তিনজনে মিলে তাঁর সিদ্ধান্তের মোকা-বিলা করতে এসেছে।

তবে ভদ্রতা আছে। তাই মৃদু হেসে আপ্যায়িত করতে হয়। চোখ তুলে সুহাসিনী বললেন,—'বসুন, বসুন। চিঠি পেয়ে চলে এসেছেন তাহলে।'

'হ্যাঁ।' পবিত্রতোষ দত্ত অর্থাৎ কমলার বাবা হাসল। দেরি করতে সাহস হ'ল না। এমনিতে মেয়েটার ব্যবহারে চটে আছেন। বিনয়ে গ'লে আর ক্ষমা চাইবার সুযোগ পর্যন্ত পাব না।'

—'তাড়াতাড়ি এসে ভালো হয়েছে।' সুহাসিনী গম্ভীর মুখে তাকালেন, প্রসঙ্গ শুরু করবার জন্য বললেন,—'মেয়েদের হস্টেলে কমলাকে আর একটি দিনও রাখা চলে না। মানে ছোট জায়গা, বুঝতেই পারছেন, এইসব ঘটনা জানাজানি হতে একটুও দেরি হয় না। তারপর যা হয়। সকলের কৌতূহল, নানা ধরনের প্রশ্ন। উত্তর দিতে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি।'

পবিত্রতোষ চুপ করে রইল।

সুহাসিনী এবার আসল কথা জানতে চাইলেন—'মেয়েকে নিয়ে যাবেন কখন? আজ রাত্রিরে না কাল সকালে?'

পবিত্রতোষ নির্বাক, তার বন্ধু হেমাঙ্গ সেন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল,—'অনু-মতি দিলে আমি দু'-একটা কথা বলতে পারি?'

—'নিশ্চয় বলবেন, আমি প্রস্তুত শুনতে—'

হেমাঙ্গ কিছুটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে শুরু করল,—'দেখুন, কমলা যা করেছে তা নিঃসন্দেহে খুব অন্যায় কাজ, এবং এরপর ওকে স্কুলে রাখা অবশ্য কঠিন। কিন্তু ওর বাবা মানে পরিতোষের অবস্থাটা একটু বিবেচনা করুন। এখন মার্চ মাসে স্কুল থেকে ট্রান্সফার নিলে মেয়েকে আর কোথাও ভর্তি করতে পারবে? তার মানে পুরো বছরটা নষ্ট। সামনের বছর কমলা হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় বসতে পাবে না। অথচ একটা ভুল করে ফেলেছে বলেই ওর সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে?'

হেমাঙ্গ সেনের গলা ভালো। পরিবেশন করবার ঢঙ নিখুঁত। ভদ্রলোক উকিল নাকি? অবশ্য কথার সুর শুনে ওর বক্তব্য তিনি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছেন। যা ঘটেছে তা একটি অল্পবয়সী মেয়ের ভুল-চুক বৈ তো নয়। সুতরাং সুহাসিনী নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। এখন স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলে কমলা আর কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। তার অর্থ সাংঘাতিক। সামনের বছর পরীক্ষা নষ্ট। তার অর্থ সাংঘাতিক আর কমলার যা উড়ু-উড়ু স্বভাব, একবার হোস্টেল থেকে ফের কী পড়াশুনতে মন বসবে?

টেবিল থেকে একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে সুহাসিনী হাতের মুঠোতে চেপে ধরলেন। ভ্রূ কুঞ্চকে খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন,—'কমলার ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। সমস্ত ঘটনা আপনি বোধহয় জানেন না।'

হেমাঙ্গ একটু ইতস্ততঃ করে জবাব দিল,—'মানে আপনার চিঠিতে যা লেখা ছিল, তা জানতে পেরেছি। অর্থাৎ সোমবার বাকিরে কমলা হস্টেল থেকে পালাবার চেষ্টা করে—।'

—'হ্যাঁ, চিঠিতে সে কথা লিখেছিলাম। অরুণ রাত প্রায় এগারোটা হবে। হস্টেলের মেয়েরা সব খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ছে। এমন সময় কমলা একটা সুটকেস হাতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। অরুণ মানে সেই ছেলেটি তখন প্রাচীর টপকে স্কুলের কম্পাউণ্ডে ঢুকেছে। কাছেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল। লক্ষ্য করবেন, পশ্চিম দিকে প্রাচীরটা বেশ নীচু, ওরা দুজনে সেখান দিয়ে পালিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু মানদা দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

—'তারপর?' হেমাঙ্গ বাকিটুকু আগ্রহ করে শুনতে চাইল।

—'আবার কী? মানদার চিৎকার শুনে নাইট গার্ড, দারোয়ানরা ছুটে আসে, অরুণ তখনি প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। তবে কমলার নার্ভ আছে। চেঁচামেচিতে ঘাবড়ায় নি। সে সুটকেস হাতে ফের নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে শুয়ে পড়ে। রাত্তিরে অনেক ডাকাডাকি করলেও দরজা খোলেনি।' একটু থেমে সুহাসিনী আবার বললেন,—'ইচ্ছে করলে সেই রাত্তিরে আমি থানায় খবর দিতে পারতাম। মানদা অরুণকে স্বচক্ষে দেখেছিল। অভিযোগ করলে পুলিশ হয়তো তাকে অ্যারেস্ট করত। তারপর কোর্টে কেস উঠত। সাক্ষী-সাবুদ, এজাহার, জেরা, সব যেমন হয়, কিন্তু তাতে বোধহয় কেলেঙ্কারী বাড়ত তাই না, হেমাঙ্গবাবু?'

—'নিশ্চয়।' হেমাঙ্গ সেন কৃতজ্ঞতা জানাল। 'পুলিশে খবর না দিয়ে আপনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তাহলে আর কিছু বাকি থাকত না। এসব ভদ্রঘরের কুৎসা। মামলা একবার শুরু হ'লে কতদিন চলত তার ঠিক আছে? তারপর কমলাকে নিশ্চয় সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হত। তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ। ওই মেয়ের আর কোনো-দিন বিয়ে হত ভেবেছেন?'

সুহাসিনী চুপ করে শুনছিলেন।

হেমাঙ্গ সেনকে ঈষৎ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। সে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ, গাল এবং গলা মুছে নিয়ে আরো কিছু বলবার জন্য তৈরি হ'ল। বেশ নরম গলায় নিবেদন করল,—'দেখুন, আপনার কাছে বলতে সংকোচ হয়, মেয়েটা যা কাণ্ড করেছে তারপর আমাদের কিছু বলার মুখ নেই, তবু কমলা আপনার ছাত্রী। ওর অনেক দোষ, কিন্তু গুণও আছে। মেয়েটা ভালো নাচে, গান গাইতে পারে। লেখাপড়াতে আহা-মরি না হ'লেও চলনসই। আপনি ওকে এবারের মত ক্ষমা করুন। মনে হয় সুযোগ পেলে কমলা হয়তো শুধরে যেতে পারে।'

—'শুধরে যাবে?' সুহাসিনী ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চকে বাঁকা হাসলেন।

হেমাঙ্গ ধীরে ধীরে বলল,—'আপনার নিশ্চয় বিশ্বাস হবে না, কিন্তু কমলা নিজের ভুল এখন বুঝতে পেরেছে। একটু আগেই আমরা ওর সঙ্গে কথা বলছিলাম। অমন চটপটে চালাক চতুর মেয়ে। কিন্তু আমাদের তিনজনকে দেখে এখন লজ্জায় জড়সড়। মুখ তুলে কথা বলতেই পারে না। আসলে স্কুলের হস্টেল থেকে এভাবে পালিয়ে যেতে সে চায়নি। কিন্তু অরুণ? ওই ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া। কমলার জীবনের দুষ্টগ্রহ। নানারকম মিষ্টি কথা বলে মেয়েটাকে সে ভুলিয়েছিল। তারপর বুঝতেই পারছেন। কাঁচা বয়স। সহজেই মনে রঙ ধরে। মোহ-ভ্রান্তি, চোখের নেশা যা ইচ্ছে বলতে পারেন। অথচ জীবনের গলিঘুঁজি কিছুই জানল না। তবে এখন ভীষণ অনুতপ্ত। আসবার সময় চোখের জল ফেলে বলল,—'আমার জন্য তোমার মাথা হেঁট হয়েছে বাবা। অনেক দুঃখ-কষ্ট আর লজ্জা দিয়েছি। পারলে আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো।'

সুহাসিনী বীতিমত অবাক। 'কমলা অনুতপ্ত আপনি বলছেন কী?'

হেমাঙ্গ হাসল। 'জানেন মেয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আমার খুব হচ্ছিল, বেচারী। না বুঝে একটা ভু করে ফেলেছে। তাই এখন অনুশো জ্বলছে। আমি ওকে বললাম,—তোর রাধের কথা আমরা কেউ মনে রাখ কমলা। শেষ পর্যন্ত তুই সেই ছেলেটার চালাকি বুঝতে পেরেছি যথেষ্ট। জীবনে ভুলচুক সকলের হ কম আর বেশী। নিজেকে শুধরে আর কোনো দোষ থাকে না।'

সুহাসিনী নির্নিমেষ মনে শু সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে অদ্ভুত ল আজকালকার ছেলেমেয়েরা এমনি দিন-রাত্তিরের মত তাদের মন এত বদলায়? মাত্র তিন দিন! এরই মধ্যে

মত পালটে ফেলেছে? আশ্চর্য মেয়ে! সোমবার রাত্তিরে সে অরুণের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভাগ্যিস স্কুলের ঝি মানদা তাদের হঠাৎ দেখতে পায়। নইলে কমলা আর অরুণ এতদিনে কলকাতায়। হয়তো কোনো ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের কাছে বিয়েটা সেরে পুরোপুরি স্বামী-স্ত্রী হতে পারত। আর এখন মোটে তিনদিন পরে কমলা ভীষণ অনুতপ্ত? নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় পুড়ছে!

ব্যাপারটা কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না। সুহাসিনী তাই সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন,—'আপনি ঠিক বলছেন? মানে এর আগেও কিন্তু কমলা একটা কাণ্ড করেছিল—।'

—'তাই নাকি?' হেমাঙ্গকে ঈষৎ চিন্তিত দেখালো।

—'হ্যাঁ। মাস দুই আগের ঘটনা। শনিবার। সকালে কমলা আমার কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে এল। সাদা কাগজে কয়েকটা লাইন টাইপ করা। নীচে অবিকল পরিতোষবাবুর সই। চিঠির বক্তব্য পরিষ্কার। কমলা একদিনের জন্য বাড়ি আসবে। তাকে যেন হস্টেল ছেড়ে আসবার অনুমতি দেওয়া হয়।'

—'তারপর?'

মানদা চায়ের কাপগুলি টেবিলের উপর রেখে গেল। সুহাসিনী হাতে করে পেয়ালা কাপ অতিথিদের দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজে একটা নিয়ে বললেন,—'সইয়ের অত ঘোরপ্যাঁচ আমি বুঝিনি হেমাঙ্গবাবু। সুতরাং শনিবার স্কুল ছুটির পর কমলাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দিলাম। তারপর দিন অর্থাৎ রবিবার বিকেলে সে ঠিক সময়ে হস্টেলে ফিরে এল। ব্যাপারটা হয়তো কোনোদিন প্রকাশ হ'ত না, কিন্তু কমলার কপাল মন্দ, দু-দিন পরে পরিতোষবাবু কী কাজে এখানে এসেছিলেন। হস্টেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমার অফিসে হাজির। তাঁকে চিঠির কথা বলতেই তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে আমি তো চমকে উঠলাম। আশ্চর্য কাণ্ড! চিঠির সইটা জাল? কমলা তাহলে এক রাত্তির কোথায় কাটিয়ে এল?'

চায়ের কাপে চুমুক দিলেন সুহাসিনী। গলা ভিজিয়ে নিয়ে ফের বললেন,—'কমলাকে ডেকে এনে খুব বকাবকি করলাম। কিন্তু মেয়েকে তো চেনেন, ভীষণ জেদী আর শক্ত। ভাঙবে তবু মচকাবে না। অনেকক্ষণ বাদে অবশ্য স্বীকার করল দরখাস্তে তার বাবার সই সে নিজেই নকল করেছে, কিন্তু সেদিন বিকেলে হস্টেল থেকে কমলা বাড়ি যায়নি, কোথায় গিয়েছিল সে কথা আমার কাছে ভাঙল না।

হেমাঙ্গ চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে রাখল, মৃদু হেসে বলল,—'যা ঘটে গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আসলে মানুষ ঠেকে শেখে। কমলারও তাই হয়েছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে অরুণ ছেলেটি অতি বাজে,—নেহাৎ সাধারণ। তার সঙ্গে পালিয়ে গেলে কমলার জীবনে শুধু একটা কলঙ্কের দাগ পড়ত, কোনো লাভ হ'ত না।'

সুহাসিনীকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল, বেশ চিন্তিত মুখ। মনের ভিতরে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন। বিষধর কেউটে সাপের মত সব ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। তারা দুলছে, হেলছে, কিছুতেই শান্ত হয় না।

মুখ তুলে সুহাসিনী বললেন,—'আপনার কথা না হয় মানলাম। কমলা অনুতপ্ত। নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু অরুণ? তার কথা কেউ ভাবছেন না কেন? সে কি নিঃশব্দে সব কিছু মেনে নেবে? কমলা বেঁকে বসলে একটা ঝামেলা বাধতে কতক্ষণ? তাছাড়া এসব প্রেম-ভালবাসার ব্যাপার। কোথা থেকে কী ঘটবে কিছু বলা যায়?'

—'ঝামেলা করতে অরুণের সাহস হবে না।' হেমাঙ্গ নির্ভাবনায় জানাল। পাশের সেই পাতলুন-পরা ছোকরার দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে বলল,—'রতনকে আপনি দেখেছেন হয়তো। এখানেই থাকে। সম্পর্কে আমার ভাগনে হয়। শহরের বহু ইয়ংম্যান মানে ছেলে-ছোকরাদের উপর ওর ইন-ফ্লুয়েন্স। সবাই বেশ মানে-টানে। ওর দলের ছেলেরা অরুণকে পরিষ্কার জানিয়ে দেবে, আপনার স্কুলের মেয়েদের পিছনে লাগলে তার পরিণাম ভালো হবে না।'

সুযোগ পেয়ে রতন এবার মুখ খুলল। খানিকটা থিয়েটারী ঢঙে বলল,—'সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কাল সকালে চাঁদু আর ঘোৎনাকে পাঠিয়ে দেব। অরুণকে তারা কড়কে দিয়ে আসবে। ওসব রঙবাজী চলবে না। ফের স্কুলের মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে চাইলে পিঠের হাড় কখানা গুঁড়ো হবে।'

হেমাঙ্গ তার আসল কথার পুনরাবৃত্তি করল। 'কমলাকে আপনি এবারের মত ক্ষমা করুন। কাঁচা বয়স। এখনও সংসারের ভালো-মন্দ, বাঁকা-সোজা বোঝে নি। মোহে পড়ে একটা অন্যায় কাজ করতে গিয়েছিল। ভাগ্যিস সেদিন রাত্তিরে মানদা ওদের দেখতে পায়।'

পরিতোষ নিজে বলল,—'আপনি ওকে অন্য শাস্তি দিন। ইচ্ছে হলে দশ-ঘা বেত মারুন। কিন্তু স্কুল থেকে নিয়ে যেতে বলবেন না। আর কমলার কথা নিশ্চয় একটু ভাববেন, তাছাড়া সে যখন তার ভুল বুঝতে পেরেছে।'

কিন্তু সুহাসিনী অটল। কেমন নিরুত্তাপ এবং জমাট মন। খুব অনুত্তেজিত এবং ঠাণ্ডা গলায় বললেন—'ব্যাপারটা আমি ভালো করে চিন্তা করেছি। যা ঘটে গেছে তারপর কমলাকে আর হস্টেলে রাখা যায় না। ওকে অন্য স্কুলে নিয়ে যেতে হবে।'

সেই পাতলুন-পরা ছোকরা রতন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'কমলাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে স্কুলের মেয়েরা কিন্তু আন্দোলনে নামবে। তখন কিন্তু ঝামেলা আপনাকে সইতে হবে।'

হেমাঙ্গ তাড়াতাড়ি বলল,—'প্রগেস নাকি? কমলা অন্যায় করেছে, গুরুতর অন্যায়। এই নিয়ে আবার আন্দোলন করে? ইচ্ছে করলে উনি কমলাকে তাড়িয়ে দিতে পারেন বৈকি—'

তবু যাবার আগে পরিতোষ বলল,—'বাড়িরে আপনি একটু ভেবে দেখবেন। যদি কোনো উপায় থাকে। তাহলে মেয়েটার ভবিষ্যৎ আর নষ্ট হয় না।'

গেটের কাছে সুহাসিনী কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্যোৎস্না তারো পাতলা, চালধোয়া জলের মত। গাছপালার ফাঁকে ফাল্গুনের দখিনা বাতাস চোরের মত সন্তর্পণে যায়, আসে। চতুর্থী কিম্বা পঞ্চমী তিথি। আকাশের চন্দ্রমার ক্ষীণ তনু। যেন ক্ষয়রোগে শীর্ণ। বড় একটা কুসুম গাছের পিছনে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। সুহাসিনী কেমন আচ্ছন্নের মত নির্বাক দাঁড়িয়ে। মনে জ্যোৎস্নায় নয়,—তিনি আরো দূরে কোথায় গাঢ় তমিস্রার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছেন। কানের কাছে বরফের মত শীতল গলায় কে যেন ডাকে, ফিসফিস করে কথা বলে।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ঘটে গেল। ঠিক কমলার মত। সুহাসিনী তার মেজদির হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য দোষটা নিজের, আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল না-কি? অতনুর চিঠিখানা তাঁর জামার মধ্যে রেখে-ছিলেন সুহাসিনী। বিছানায় মেজদির পাশে তিনি চুপ করে শুয়ে, চোখ বোজা। কিন্তু ঘুম আসেনি। আসবার কথা নয়। মনের ভিতর কী ভীষণ উত্তেজনা। যেন ঝড়ের দাপাদাপি। শেষ রাত্তিরে সুহাসিনী চুপি চুপি বেরিয়ে পড়বেন। অতনু তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। দুজনে পালিয়ে যাবেন। প্রথমে শিলিগুড়ি,

—অতনুর এক বন্ধুর বাড়ি। তারপর অন্য কোথাও। সব ব্যবস্থা অতনু করবে।

বুকের কাছে চিঠিখানার অস্তিত্ব মেজদি কেমন করে যেন টের পেয়ে গেল। বোধহয় বাগজের খসখস শব্দ হয়ে থাকবে। মোটে দু বছর বিয়ে হয়েছে মেজদির। পরের চিঠিতে এখনও অগাধ কৌতূহল। ধরা পড়ে সুহাসিনী মরীয়া হয়ে উঠলেন। কিছুতেই কাগজ দেবেন না। কিন্তু মেজদি নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত জোর করে তার বুকের ভিতর থেকে চিঠিখানা টেনে বের করল।

সব শুনে মা সাপের মত হিসহিস করে গজরাতে লাগল। চাপা গলায় বলল,—'কী সর্বনাশীর পেটে ধরেছিলাম গো। ভবানীপুরের অত বড় ঘর। কুলে মানে তুলনা হয় না। অমন রাজপুত্তুর ছেলে। আজ বাদে কাল তারা ওকে দেখতে আসবে। আশা চাল নেই, চুলো নেই। হতচ্ছাড়ি কিনা সেই মাগপয়সী ছোড়াটার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল?

যতদূরে বাবা একটি কথাও বললেন না। বিচারকের মত ভাবলেশহীন মুখ। তার কঠোর দৃষ্টি সুহাসিনীকে বার বার বিদ্ধতে লাগল।

দূরসম্পর্কের কী একটা আত্মীয়তা ছিল, সেই সুবাদে অতনুর যাওয়া-আসা। এ বাড়িতে হেমনলিনীকে মাসীমা বলে ডাকত। কিন্তু সুহাসিনী ভাবতে পারেন নি, আচ্ছা মানুষ। আগের রাত্রিরে অত কাণ্ড। আর সে কিনা পরদিন সকালে বাক্সপুরীতে রাজকন্যার সন্ধানে হাজির হবে?

অতনুকে দেখে তার বাবা একটা তাজা বোমার মত রাগে ফেটে পড়লেন। বাপের অমন চণ্ডমূর্তি সুহাসিনী জন্মে দেখেন নি। বুকের মধ্যে তাঁর হৃদপিণ্ড দ্রুততালে ওঠানামা করছিল। বাবা চিৎকার করে বললেন—বেরিয়ে যাও। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নির্লজ্জ, বেহায়া ছোটলোক।'

অপমানে অতনুর মুখখানা একটুকু দেখাল। সে গম্ভীর গলায় বলল,—'বেশ তো চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে সুহাসের সঙ্গে শুধু একটা কথা বলে যেতে চাই।'

—'সুহাসের সঙ্গে?' তারপর বাবা যেন ক্ষেপে উঠলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন অতনুর সামনে। বললেন,—'এই অসভ্য বেহায়াটাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে বল। আর কোনদিন যেন ও তোর সামনে এসে না দাঁড়ায়। নইলে তুইও দুঃখ পাবি। জানবি আমার মেয়ে নেই। সে মরেছে—।'

রাগে উত্তেজনায় বাবা ঠকঠক করে কাঁপছিলেন। সকালবেলায় বাড়িতে ঝি-চাকর, আরো লোকজন। চেঁচামেচি শুনে পাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। সাতসকালে বাবার কি বুদ্ধিভ্রংশ হল। শেষ পর্যন্ত অতনু আর তাকে নিয়ে এমন একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারী করবে? সুহাসিনী ভয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে রইলেন। মানুষটাকে লক্ষ্য করে কোনমতে বললেন,—'ছি, ছি! এখনও দাঁড়িয়ে আছ? চলে যাও এখান থেকে। আর কোনদিন এ বাড়িতে এস না। কোনদিন নয়।'

কলকাতা থেকে এলাহাবাদে। সেই রাত্তিরেই। মেয়েকে বাবা রেখে গেলেন মাসীর কাছে। প্রায় তিন মাস কাটিয়ে সুহাসিনী আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। এলাহাবাদে থাকতে অতনু গোটা তিন-চার চিঠি লিখেছিলেন তাকে। কত গোপনে, লুকিয়ে-চুকিয়ে। সেদিনকার ব্যবহারের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে। কিন্তু সুহাসিনী ক্ষমা পান নি। কে তাকে ক্ষমা করবে? কলকাতায় ফিরে দুঃসংবাদটা শুনলেন তিনি। অতনু নেই। সে কাউকে ক্ষমা করে নি। তাই হস্টেলে নিজের ঘরে পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

গাছপালার ফাঁকে শীর্ণ চাঁদখানাকে আর দেখা গেল না। কখন অস্ত গেছে। রাত দশটা হবে। কিন্তু এরই মধ্যে শহরটা কী চুপচাপ। চারপাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। এই ফাল্গুনে কুসুম গাছের নতুন গজিয়ে-ওঠা পাতাগুলি অদ্ভুত লাল। দিনের আলোয় কী চমৎকার দেখায়।' সুহাসিনী একদিন মানদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—'পাতাগুলো অমন লাল হয় কেন বল দিকি?'

—'ই বাবা! হবেক নাই? ইটা যে মধুমাস গো।' মানদা হেসে উত্তর দিয়েছিল।

মধুমাস! সুহাসিনী অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, কিন্তু কমলার ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। আজকালের মেয়েরা ফানুস নাকি? এত তাড়াতাড়ি মত বদলায়? জীবনে প্রেম-ভালবাসা কী জলের দাগ? বোদ উঠলেই মিলিয়ে যাবে? কমলা নিশ্চয় ভুল করছে। শেষে তার মত সমস্ত জীবন অনুতাপের আগুনে জ্বলবে, পুড়বে।

অন্ধকারে আচ্ছন্নের মত সুহাসিনী হাঁটছিলেন। ধীরে ধীরে। মাঠের উপর দিয়ে নরম পা ফেলে। কুসুম গাছটার চারপাশে এখন জোনাকিরা খেলা করছে। বিন্দুর মত স্নিগ্ধ আলো, টপ করে জ্বলছে, ফের নিভছে।

হস্টেলের মেয়েরা অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ রাত। শুধু কমলার ঘরে আলো জ্বলছিল। সুহাসিনী ভিতরে ঢুকতেই সে কেমন ভয় পেয়ে বলল,—'বড়দিমণি আপনি?'

সমস্ত ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো। কমলা তার বাক্স গোছাচ্ছিল। সুহাসিনী ভ্রু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই জবাব দিল,—'কাল সকালে বাবা জামসেদপুরে নিয়ে যাবেন। তাই আজ রাত্তিরেই গুছিয়ে নিচ্ছি।'

সুহাসিনী সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন,—'জামসেদপুরে যাবে সেকথা অরুণ জানে?'

কমলা চুপ করে রইল। সুহাসিনীর ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল মেয়েটার গালে সশব্দে একটি চড় মারেন। হেমাঙ্গ তাহলে ঠিকই বলেছে। কমলা অনুতপ্ত। অরুণের সম্বন্ধে তার কোন মোহ নেই। নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে। অথচ সোমবার রাত্তিরে এই মেয়েটাই অরুণের সঙ্গে হস্টেল ছেড়ে পালাতে গিয়েছিল। ভাবলেও অবাক লাগে। কমলার মন বলে কোন বস্তু আছে নাকি?

সমস্ত রাত্তির ঘুম এল না চোখে। বিছানায় সুহাসিনী ছটফট করছিলেন। মনের ভিতরে বৃশ্চিক দংশনের মত একটা জ্বালা। একবার উঠলেন। অন্ধকারে জানালায় মুখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কুসুম গাছটার চারপাশে জোনাকিরা তখনও খেলা করছে। বিন্দু বিন্দু আলোগুলি জ্বলছে, নিভছে। কমলার কথা ভাবলেই একটা কটু তিক্ততা তার মনে ভাসে। কাল সকাল হলেই ওকে স্কুল থেকে বিদায় করবেন তিনি। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে তার কেন যেন প্রার্থনা জানালেন। হে ঈশ্বর! অতনুর মত আবার না একটা অঘটন ঘটে।

সকালবেলায় মানদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল তাঁর। দরজায় সে ঘন ঘন কড়া নাড়ছে। সুহাসিনী উঠলেন। নিশ্চয় কমলার বাবা আর হেমাঙ্গবাবু। কিন্তু তিনি দৃঢ়সংকল্প। কমলাকে স্কুলে রাখবেন না। শত অনুরোধেও নয়।

দরজা খুলতেই মানদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'দিদিমণি সর্বনাশ হয়েছে।'

সর্বনাশ! সুহাসিনীর বুকটা আতঙ্কে ঢিপঢিপ করে উঠল। তাহলে তিনি যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই? কাল রাত্তিরেই একটা অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কে? অরুণ কিম্বা কমলা?

সুহাসিনী নির্বাক। কী বলবেন তিনি? মানদা যা বলছে সব সত্যি? তাই কি সম্ভব? কাল রাত্তিরেও তিনি কমলাকে বাক্স গোছাতে দেখেছেন। জামসেদপুরে যাবার জন্য তৈরী।

মানদা ফের বলল,—'হ্যাঁগো দিদিমণি। কমলা নেই। কাল রাত্তিরে অরুণের সঙ্গে সে হস্টেল ছেড়ে পালিয়েছে।'

হাওড়া কুষ্ঠকুটীর

সর্বপ্রকার চর্মরোগ, বাতরক্ত, অসাড়তা, ফুলো, একজিমা, সোরাইসিস, দূষিত ক্ষতাদি আরোগ্যের জন্য সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত জগন্নাথ শর্মা কবিরাজ, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। শাখা : ৩৬, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ফোন : ৬৫-২০৫১।

আপনি কেমন আছেন

অ্যালার্জী

অ্যালার্জী কথাটি আজকাল চালু হয়েছে খুব। এমনকি চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিধি ছাড়িয়ে আচারে-ব্যবহারে, মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি হিসাবেও বহুল-প্রচলন হয়েছে এই শব্দটির। যাকে দেখলেই গা-জ্বালা করে তার প্রতি অ্যালার্জী; যে বেশ-বাস ভাবভঙ্গিতে তীব্র বিতৃষ্ণা সে-সম্পর্কে অ্যালার্জী। অর্থাৎ কোন কিছুর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রতিশব্দ।

কথাটি প্রথম চয়ন করেন Von Pirquet যক্ষ্মারোগীদের দেহে টিউবারকুলিন টেস্ট করতে গিয়ে যে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারই নামকরণ করেন উনি অ্যালার্জী। আজকাল অবশ্য ব্যাপক অর্থে যে-কোন জৈব বা অজৈব পদার্থের প্রতি এমনকি স্পর্শ গন্ধ স্বাদ কিংবা মানসিক আবেগের প্রতি দেহের যে-কোন অংশের অতি-সংবেদনশীলতাকে অ্যালার্জী নামে অভিহিত করা হয়।

কাঁকড়া চিংড়িমাছ মাংস দুধ বা অন্য যে-কোন খাদ্য খেয়ে, মুখ দিয়ে বা ইনজেকসন মারফৎ কোন ওষুধ প্রয়োগে, কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা পশুর লোম বা পাখীর পালকের সংস্পর্শে এসে, নাকে ধুলো-ধোঁয়া বা ঘাসের চূর্ণ মুকুল ঢুকে, ফুলের রেণু বা সুবাসিত তেলের গন্ধ শুঁকে, পাউডার মেখে, নাইলন বা প্লাস্টিকের মত কৃত্রিম পলিমার দিয়ে তৈরি মোজা, জামা, খোঁপার টাসল, চুড়ি, ঘড়ির ব্যান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে, কিংবা কোন কারণে অত্যধিক আবেগে আপ্লুত হলে অ্যালার্জী দেখা দিতে পারে। গরমে, ঠাণ্ডায় কিংবা আলোতেও কারও কারও অ্যালার্জী হয়ে থাকে। গায়ের চামড়ায়, ফুসফুসে, নাকের বা অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লীতে অথবা অন্য কোন উপাঙ্গে দেখা দেয় মৃদু অথবা তীব্র প্রতিক্রিয়া। কারও ত্বকে লাল লাল চাকা-চাকা দাগ বা ফুসকুড়ি এবং সঙ্গে অস্বস্তিকর চুলকানি; কারও হয় একঘেয়ে কারও শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট; কারও নাক দিয়ে জল ঝরতে থাকে, কারও চোখ রক্তবর্ণ, কারও অবিরাম হাঁচি-কাশি, মাথার যন্ত্রণা; কারও সুবু হয় ঘন ঘন পাতলা দাস্ত; কারও বা স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনা থেকে ফিট বা আক্ষেপ ও চৈতন্যলোপ। প্রোটিন জাতীয় কোন পদার্থ, ডিপথিরিয়া বা টেটেনাস-বিরোধী সিরাম কিংবা কোন কোন ওষুধের প্রতি অতি-সংবেদনশীলতায় তীব্র শক— এমনকি আকস্মিক মৃত্যুও অসম্ভব নয়। অবশ্য সাধারণ অ্যালার্জী এবং শকের মধ্যে চরিত্র ও মাত্রাগত পার্থক্য আছে। সে কথায় আমরা পরে আসছি।

কিন্তু কেন এমনটা হয়? এ-সম্পর্কে শেষ কথা আজও বলা হয়নি। অ্যালার্জীর বিশদ কার্যকারণ ও প্রতিক্রিয়া আজও কিছুটা অস্বচ্ছ থেকে গিয়েছে।

আমাদের দেহকোষগুলির মধ্যে নানা-রকম প্রোটিন জাতীয় পদার্থের মধ্যে একটির নাম হল হিস্টামিন। আসলে এটি একটি অ্যামাইনো-অ্যাসিড—ছড়িয়ে আছে দেহের বিস্তৃত অংশে। তবে বেশি পাওয়া যায় চামড়ায়, অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লীতে এবং ফুসফুসে—অর্থাৎ দেহের যে অংশগুলি বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে, প্রধানতঃ সেই-খানে। মৌমাছি, কোন কোন পিঁপড়ে ও কীটের হুলে বেশ কিছুটা হিস্টামিন থাকে।

দেহ-কোষগুলির এমনি চরিত্র যে, (১) শরীরের কোন অংশে আঘাত লাগলে, (২) কোন উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে এলে, (৩) দেহের মধ্যে সেরকম কোন পদার্থ সৃষ্টি হলে, কিংবা (৪) অ্যাড্রিনাল নামে যে গ্রন্থিটি আমাদের ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে তার উত্তেজনায় দেহকোষের মধ্যে অথবা উপরে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে মুক্ত হয় হিস্টামিন। বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে একমত যে হিস্টামিনের মুক্তি ও অতি-ক্ষরণই অ্যালার্জীর কারণ।

ত্বকের কোন অংশে হিস্টামিন ইনজেক-সন দিয়ে দেখা গিয়েছে, সেই এলাকার ছোট ছোট ধমনী এবং তার আশেপাশে বড় ধমনী-গুলি প্রসারিত ও শিথিল হয়ে পড়ে, তাদের দেয়াল হয় সহজভেদ্য, এবং ফলে গা দিয়ে প্রোটিন জাতীয় তরল পদার্থ সহজেই চুঁইয়ে পড়ে: এলাকাটি ফুলে ওঠে। পুড়ে গেলে, কোন উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শে এলে কিংবা প্রদাহ সৃষ্টি হলে সেই এলাকাটি লাল হয়ে ওঠার আংশিক কারণ হল হিস্টামিনের ক্ষরণ বা মুক্তি।

হিস্টামিন মুক্ত হলেই অ্যালার্জী হয় না। প্রদাহে বা দহনে প্রদাহের অন্যান্য বিশেষ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হয়ে যায়। অ্যালার্জীর ক্ষেত্রে কোন লোক বিশেষ কোন পদার্থের প্রতি অতি-সংবেদনশীল থাকলে তার প্রভাবে খুব বেশি হিস্টামিন মুক্ত হয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

হিস্টামিন প্রয়োগে চামড়া যেমন লাল হয়ে ফুলে ওঠে বা ফুসকুড়িতে ভরে গিয়ে চুলকোতে থাকে, তেমনি পাকস্থলীর রস-ক্ষরণও প্রচুর বাড়িয়ে দেয়। হাঁপানির রোগীকে হিস্টামিন ইনজেকসন দিলে ফুস-ফুসের শ্বাসনালীগুলির পেশীর টান বেড়ে গিয়ে আরও বেশি শ্বাসকষ্ট হয়। হাঁপানির সময় হিস্টামিন-বিরোধী ইনজেকসন দিয়ে কিন্তু বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ হাঁপানির কারণ আরও কিছু। অথচ এও দেখা গিয়েছে যে হাঁপানি রোগীদের বিশেষ পদার্থে বা আবহাওয়ায় রীতিমত অ্যালার্জী আছে।

লক্ষ্য করা গিয়েছে, ডিমে যার অ্যালার্জী ধুলোয় বা পশমে তার হয়ত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। কারও বা নাইলনে অ্যালার্জী দেখা দেয় কিন্তু ডিমে কাঁকড়ায় কিছু হয় না। আবার কারও কারও একাধিক পদার্থে অ্যালার্জী তো থাকেই, তার মধ্যে কোনটাতে কম, কোনটায় বেশি। কেউ কেউ আবেগাভিভূত হলেই অ্যালার্জীতে আক্রান্ত হন। হাঁপানি রোগীদের মধ্যে প্রায়ই এই লক্ষণ দেখা যায়। এমন লোকও দেখা যায় যিনি মিটিং-এ বক্তৃতা দিতে উঠলেই গা চুলকোতে থাকেন। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। নিজে বা পরিবারের কেউ বাড়ি থেকে বিদেশ যাত্রার সময় আবেগের তাড়নায় কেউ কেউ ঘন ঘন বাথরুমে যেতে বাধ্য হন। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির উত্তেজনাপ্রসূত এও এক ধরনের অ্যালার্জী। মহা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

রোগ-বীজাণু থেকেও অ্যালার্জী হয়ে থাকে। সেপটিক টনসিল বা কেরীজে আক্রান্ত দাঁত ফেলে দিলে অ্যালার্জীও দূর হতে পারে। শরীরের কোন অংশ থেকে অনেকদিনের পুঁজ বা স্রাব বন্ধ হলে একই সুফল পাওয়া সম্ভব। দেহে কোন বীজাণু প্রবেশ করলে রক্তে তৈরী হয় বিরোধী পদার্থ। বীজাণুর বিষের ক্রিয়াতেও বিরোধী পদার্থ তৈরি হবে। বীজাণু বা তাদের বিষকে বলা হয় অ্যান্টিজেন বা অ্যালার্জেন, আর বিরোধী পদার্থের নাম অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন - অ্যান্টিবডির ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষয়িত হয় হিস্টামিন, তা থেকে অ্যালার্জী। অ্যান্টিজেন দূরে হলে অ্যালার্জীও সেরে যাওয়া সম্ভব।

শুধু বীজাণু বা তার বিষ (টক্সিন) নয় যে-কোন বহিরাগত প্রোটিন বা সিরাম (তাও প্রোটিন) অ্যান্টিজেন হিসাবে কাজ করতে পারে এবং সৃষ্টি হতে পারে অ্যালার্জী।

পেনিসিলিন, সালফা, স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মত জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, কাইনাইন, মরফিন পেথিডিন ইত্যাদি জৈব-রাসায়নিক বা রাসা-য়নিক বিভিন্ন ভেষজেও অ্যালার্জী হতে দেখা যায়।

প্রোটিনে, সিরামে ও বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গিয়েছে। কারও হয়ত প্রথম প্রয়োগেই মৃদু অথবা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। বোঝা গেল এঁর এই ওষুধে অ্যালার্জী আছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চার-পাঁচবার প্রয়োগে কিছু হল না কিন্তু তারপর হঠাৎ দেখা গেল তীব্র প্রতিক্রিয়া। হয়ত বা মর্মা-ন্তিক দুর্ঘটনা। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে কোষগুলি ঐ ওষুধে ক্রমে ক্রমে সংবেদনশীল হতে হতে এক পর্যায়ে পৌঁছে অতি-সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। তা থেকে হতে পারে শক। রক্ত-সংবহন ও শ্বাস-ক্রিয়া বিকল হয়ে এই ধরনের অ্যানাফি-ল্যাক্‌টিক্ শকে মৃত্যুও ঘটতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে অ্যালার্জী হল সহজাত বা জন্মগত; আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অতি-সংবেদনশীলতা হল অর্জিত। কোন কোন পরিবারে অ্যালার্জী প্রকাশ পায় বংশানুক্রমিক ভাবে। সেখানে প্রথম প্রয়োগেই শক্ হওয়া অসম্ভব নয়।

ডিম খাওয়ার পর যে-ডিম বাস পেটে। ফুলের রেণু নাক দিয়ে ঢোকে ফুসফুসে। কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গায়ে চুলকানি হওয়া বিচিত্র নয়। এরকম হওয়ার কারণ কি? কেউ কেউ মনে করেন, দেহের বিভিন্ন টিস্যুতে অ্যান্টিবডির

কী পরিমাণ সমাবেশ হয়েছে, কোন কোষগুলি পূর্ণ মাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে আছে এবং কতটা হিস্টামিন মুক্ত করছে, তার ওপর নির্ভর করে অতি-সংবেদনশীলতার প্রতিক্রিয়া। আবার কারও কারও মতে যে-উত্তেজনা হিস্টামিনকে মুক্ত করে, স্নায়ুতন্ত্রী মারফৎ প্রবাহিত হয়ে তা বিভিন্ন হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন দেহযন্ত্রকে প্রভাবিত করে থাকে। মনে হয়, দুটি তত্ত্বই একে অন্যের পরিপূরক।

আজকাল বিভিন্ন ধরনের ওষুধ—বিশেষ করে সিরাম খুব কম মাত্রায় প্রয়োগ করে লক্ষ্য করা হয় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। রোগীর নিজের বাতাবরণে অ্যালার্জী আছে কিনা সে খবরটা আগেই নেওয়া উচিত। অবশ্য অ্যালার্জীর উৎসটি—অর্থাৎ কার কী থেকে অ্যালার্জী হয়, খুঁজে বের করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং ধৈর্যসাপেক্ষ। পেনিসিলিন ইনজেকসন দেওয়ার সময় ডাক্তাররা আজকাল হিস্টামিন-বিরোধী ওষুধও সঙ্গে রাখেন, কারণ কে কী পরিমাণ সংবেদনশীল হয়ে আছেন সব সময় তা জানা থাকে না, জানা সম্ভবও নয়।

কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া গেল না। অ্যালার্জী কি বাড়ছে? সে কি আমাদের সভ্যতার মাসুল? অথবা কৃত্রিমতার প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তির সেলামী?

—অশ্বিনী সামন্ত

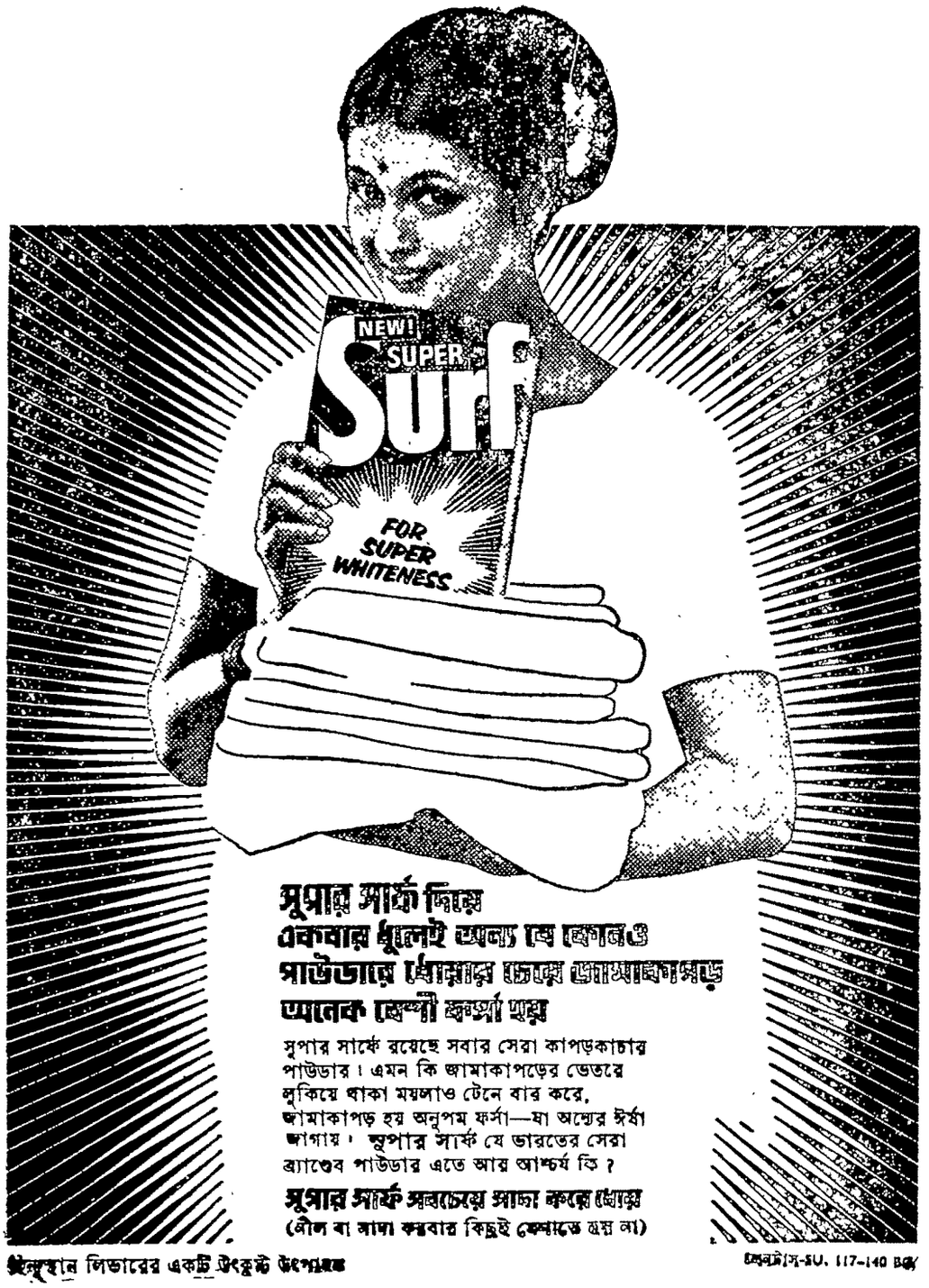

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাস

।। বারো ।।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেই জেটি, সেই প্রশস্ত পথ সামনে। অদূরে ওরা শহরের ভিতর স্কাইস্ক্রেপার তেমনি দেখতে পাচ্ছে। ডেকে দাঁড়ালে চার পাশে অজস্র জাহাজ। জাহাজের চিমনি। সব চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠে না আজকাল। মোটর ভেসেলে কোন ধোঁয়া থাকে না। কিন্তু ওদের জাহাজে অথবা অন্য অনেক জাহাজ যেখানে বয়লার কয়লায় অথবা তেলে চলে, সেখানে চিমনিগুলোর অল্প ধোঁয়া। বাকি চিমনিগুলো ঝকঝকে। মাস্তুলে সব নানা বর্ণের পাখি। ডেকে মানুষের ভিড়। সারি সারি ট্রাক, অথবা মালগাড়িতে ক্রেনে মাল নামানো হচ্ছে। এবং গাদাবোটগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট মোটর বোট। নানা রকমের পতাকা উড়ছে চারপাশে। এবং জাহাজের সিটি বাজছে কোথাও। সব জাহাজেই জাহাজিরা এখন সুখী পায়রার মতো উড়ছে। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন ওরা ছুটি পাবে, ছুটি পেলেই সেজে গুজে লারে লারে গান গলায়, অথবা শিস দিতে দিতে ওরা নেমে যাবে বন্দরে।

অমিয় বলল, মৈত্র, এমন বন্দরে না নেমে থাকা যায়।

—নামব না বলিনি তো, আমাকে একদিন নামতেই হবে।

—সে তো তোর মালের জন্য। অমিয় ফিসফিস গলায় বলল, আমার একা নামতে ভয় লাগে। ওর যেন বলার ইচ্ছা এবার নামলেই ঠিক বড় মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। দেখা হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে। সে যদি কোন রকমে মৈত্রের সঙ্গে যেতে পারে, তবে তার আড়ালে আবডালে ঠিক নেমে যাওয়া যাবে।

মৈত্র বলল, নামব, কিন্তু খবরদার কোথাও যাবি না আমাকে ফেলে। আমি যা বলব তা করবি। কোথাও ঢুকতে পাবে না, কোন কার্নিভেলে ঢুকতে পাবে না।

—তুই তো আচ্ছা লোক মৈত্র। তোর জন্য শেষ পর্যন্ত রাস্তায় হাঁটতে পারব না, কোন রেস্তোরাতে ঢুকতে পাবব না।

—তা আমি বলছি না।

—বলতে বাদ রেখেছিস কি! কার্নিভেলে ঢুকব না। তবে খাব কি, দেখব কি! জাহাজে আসার মজাটা কোথায়!

—ঘুরে দ্যাখো। পথ ধরে হেঁটে যাও। সুন্দরী মেয়েদের গন্ধ পাবে। পার্কে কত সব ফুল, বাড়িগুলোর সামনে কত যে ফুল! এসব তোমার কিছু ভাল লাগবে না। লোন্দ্রাএল্যান ধরে গেলে বিচ পাবি সমুদ্রের। বিচে ওরা ন্যাংটা হয়ে শুয়ে থাকে।

—আর কি দেখব?

—যদি তুই না বের হস, জাহাজেই যদি থাকিস, তবে দেখবি, সামনের পার্কটায় শহর থেকে কচিকাচা মেয়েরা এসে বিকেলে ভিড় করবে। রং-বেরঙের ফ্রক গায়ে, আর কি সুন্দর পা। পা দেখলেই মনে হবে সারা জীবন এই পা জড়িয়ে পড়ে থাকি। কোথাও আর যেতে ইচ্ছে হবে না।

অমিয় ডেকের ওপর দু' হাত ছুঁড়ে বলল, ফাইন। কবে যাবি?

—তোর খুব লোভ অমিয়। তোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

—আমি ভাল ছেলে হয়ে থাকব মাইরি। তুই বিশ্বাস কর আমি হাবামিপনা করব না।

—তোর স্বভাব ভাল না।

—গঙ্গার জলে মুখ ধুয়ে নেব। স্বভাব ভাল হয়ে যাবে।

—নোনা জলে ভাসলে গঙ্গার জলে স্বভাব ভাল হয় না।

—ধুস শালা। তোর সঙ্গে আমি বের হচ্ছি না। একাই বের হব।

—আরে না না। আমি যাব তোর সঙ্গে।

—ঠিক।

—ঠিক

—কথা দিচ্ছিস তবে।

—হ্যাঁ, বার বলছি। সব চিনিয়ে দিতে হবে না। সব সফরে তো আমি আর তোর সঙ্গে যাচ্ছি না। কোথায় কে বেকুব বানিয়ে দেবে কে জানে।

আর তখন জাহাজের ওপর ডেক-সারেঙ, এনজিন-সারেঙ যে যার দল নিয়ে নিচে ওপরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মৈত্র এনজিনে নামার আগে এসব গল্প করছিল। দুটো বয়লার নেভানো। একটা বয়লার সামান্য চালু রাখা হয়েছে। জেনারেটার চালু রাখার জন্য স্টিমের দরকার।

ডেক-জাহাজিরা জল মারছে ডেকে। বড় বড় পাটের গাঁট নেমে যাচ্ছে এখন। ডেবিকে পাটের গাঁট নামানো হচ্ছে। ফল্কাব একটা ক্রেনও কাজে লেগে গেছে। যত তাড়াতাড়ি করা যায়। বিশ বাইশ দিনের আগে তবু জাহাজ খালাস হচ্ছে না। অন্ততঃ এবা একটা দিন এ-বন্দরে থাকতে পাববে, ঘুরে বেড়াতে পারবে। তারপর জাহাজে কি বোঝাই হবে জাহাজিরা বলতে পারে না। মাল বোঝাই হলে আরও ক'দিন। তারপর ফের সমুদ্রে ভেসে পড়া।

বন্দরে প্রথম দিন বলে জাহাজিদের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। বারোটায় খানা খেতে এসে সবাই শুনল, ছুটি। সবাই এখন হল্লা করছে বাথরুমে। একসঙ্গে স্নান করা যায় না। গরম জলের অভাব। যে যার গরম জলের টব টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই মাজাঘসা করছে। এবং স্নান করার সময় কিছু অশ্লীল গান, যা কানে শোনা যায় না। বে গাইছে। গাইছে অনিমেষ। ডেক-জাহাজি। সে ইয়াসিনের গলা জড়িয়ে নেচে নেচে গাইছে, ওলো সখি সলিতে, যাচ্ছি আমি গলিতে। সে এটা ধুয়া দিচ্ছে নেচে নেচে। নেচে নেচে সে মেয়েদের মত গাইছে। এবং কেউ হয়তো ওরই ভিতর অনিমেষের পাছা টিপে দিয়ে মজা লুটছে। অনিমেষের মুখ চোখ কিছুটা মেয়েলি ধরনের। শ্যামলা রং। জাহাজে থেকে আরও উজ্জ্বল হয়েছে এবং

ডেক-জাহাজিরা ওকে জড়িয়ে ধরে রঙ্গরস করে থাকে। মাঝে মাঝে অনিমেষ ক্ষেপে যায়। তখন সবাই হা হা করে হাসে।

মৈত্র, অমিয়, ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। ছোটবাবুর জন্য মৈত্র পোশাক বের করছে। ওর ভালো পোশাক সে দিচ্ছে ছোটবাবুকে পরতে। এবং ছোটবাবু পরেছে, সাদা কটনের ফুলসার্ট, চকলেট কালারের প্যান্ট, নীল রঙের কোট, সবুজ টাই, এবং সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে, শস্য-শ্যামলা বাংলা-দেশের যে ছবি ফুটে ওঠে, এই পোশাকের ভিতর ছোটবাবুকে তেমন মনোরম লাগছে দেখতে। এত ভাল লাগছে ছোটকে যে মৈত্র একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তোকে ছুঁলে মনে কোন পাপ থাকে না। তোর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে, আমরা ভাল হয়ে যাব।

অমিয় উদাস গলায় বলল, ছোটকে যে কেন নিয়ে যাওয়া। তুমি বাপু ক্যাপ্টেনের গোলাডার লগে যাও না ক্যান!

ছোট বলল ওপরে যাচ্ছি। তোরা আয়। সেও ওকে বিদ্রূপ করতে পারত কিন্তু করল না।

সে ওপরে উঠে গেল। মৈত্র, অমিয়, দ্রুত ওপরে উঠে গেল। আহা কতদিন পর এই মাটি! সে শহরের ভিতরে ঢুকে যাবে ওদের সঙ্গে। ওর সব কিছু মনে হচ্ছে মনোহারিণী। সে দেখল, তখন জ্যাক ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক বোধ হয় পাখি দুটোর বাকসে এখন খাবার দিচ্ছে। পাখি দুটোর জন্য এখন জ্যাক সবচেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে। সে আরও কিছু লক্ষ্য রাখতে পারে। মাঝে মাঝেই সে পিছিলের দিকে তাকাচ্ছে।

ছোট জানে, ওখানে গেলে ওর দেরি হয়ে যাবে। সে সেদিকে একেবারে গেল না। ওরা তিনজন শিস দিতে দিতে নেমে গেল। এখন তিনটে বাজে। সূর্য হেলে গেছে। চারটা বাজলেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রোদে কোন উত্তাপ নেই। সোনালী রোদ, এবং চারপাশে যেন অতীব মায়াবীন মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলা এইসব ফুল-ফল, পাখি আর আশ্চর্য রূপবান মানুষের বাজত্বে জ্যাক যে তাকে লক্ষ্য করছে ছোট দেখছে না।

আকাশ স্বভাবতই পরিচ্ছন্ন। পার্ক থেকে ফুলের সুন্দর গন্ধ আসছে। সবুজ ঘাস চারপাশে, মাঝখানে কালো এ্যাসফালটের রাস্তা। সোজা শহরের দিকে গেছে। নানা বর্ণের গাড়ি চারপাশে। জেটিতে অনেক সৌখিন মানুষেরা দাঁড়িয়ে জাহাজের মাল নামানো দেখছে। আশ্চর্য, ওরা কোন ক্রিস্টমসের ঝামেলা অথবা বেড়াজাল এখানে দেখতে পেল না। সামনের পার্কটা মেলার মতো হয়ে গেছে। মানুষের ভীষণ ভিড়। ছোট বড় ছেলে যুবা এবং বৃদ্ধারাও আছেন। মৈত্র এসময় ওদের নিয়ে শহরের দিকে উঠে যেতে থাকল। মৈত্র খুব সাদাসিদে পোশাক পরেছে। ট্রাউজার, মোটা উলেন জামা, গলায় মাফলার, ওপরে লম্বা কোট, ও টাই লাল রঙের পরতে ভালবাসে। বড় রাস্তা, প্রশস্ত ফুটপাথ, মাঝে মাঝে এভিনিউ, ভিন্ন ভিন্ন গাছের সমারোহ। গাছের নিচে সুন্দরী যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে।

তখন আপেলয়ালা হাঁকল, আ...পে. ল।

কেউ হাঁক দিল, এমিগা! কোমো ইস্তা ওস্তে।

ওরা এদেশের মানুষদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। ইংরেজি বললে কেমন এ-দেশের মানুষেরা হাবাকালা হয়ে থাকছে। সাধারণ মানুষ একেবারেই ইংরেজি জানে না। ওরা দুটো একটা স্পেনীশ কথাবার্তা শিখে নিয়েছে। ফলে ওরা প্রায় সময়ই এ-দেশের মানুষদের কাছে বাংলা বলছে। বাংলা-উর্দু এবং পৃথিবীর যে কোন ভাষা ওরা বলে গেলেও কিছু বুঝবে না। ওরা সেজন্য নিজের খুশি মতো যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছে। এবং অমিয়র যা স্বভাব। সে খুব খারাপ কথা মেয়েদের বলছে। ওরা অমিয়র কথা শুনে হাসছে। কারণ মৈত্র, অমিয় বিদেশী মানুষ, ওদের কথা বুঝতে না পারলে কেবল হাসতে পারে।

ওরা দেখল সামনে একটা টাওয়ার। মৈত্র ঘুরে ফিরে সব দেখেছে বলে, সে জানে কোথায় কিভাবে যাওয়া যায়। ঠিক টাওয়ারের নিচে স্টেশন। ওরা আণ্ডার গ্রাউণ্ড ট্রেন ধরে ফ্লোরিডাতে যখন পৌঁছল, তখন রাত হয়ে গেছে। তখন শহরে সব আলো জ্বলে গেছে। আর সব কাচের সো-কেসে দামী শহরটা মনে হয় ঢুকে গেছে। বড় বেশি কৌতূহলী করে রাখে। মানুষগুলোকে সব স্বপ্নের দেশের মতো মানুষ মনে হয়। এমন সাজানো গোছানো শহর পৃথিবীর আর কোথায় আছে ওরা জানে না। কোন চার্চ থেকে ধর্মীয় সঙ্গীত ভেসে আসছে। আর পথ জুড়ে তখন কোলাহল। ওরা হাটতে শিস দিচ্ছে বাংলা গান গাইছে। কোথাও ঢুকে কফি খাচ্ছে। ঠাণ্ডা মসকরা করছে মেয়েদের সঙ্গে। মৈত্র মাঝে মাঝে অমিয়কে সাবধান করে দিচ্ছে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অমিয়—এতটা ঠিক না। সে ভাবছে এখন সেই মানুষটার বাড়ি খুঁজে বের করতে হবে। যেখানে গেলে সে দেশে টাকাটা পাঠিয়ে দিতে পারবে। এখানে সে সেই মানুষের নামে একটা একাউন্ট করে নেবে। সেই সব করে দেবে ওর হয়ে। কিন্তু মৈত্র ওর বাড়িটা ঠিক খুঁজে পেল না।

মৈত্রকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার। অথচ সে জানে এখানেই সেই সাহেব লোকটা থাকত। সে বিনিময়ে কিছু টাকা নেয়। আর একবার সে বাড়তি টাকা এ-ভাবে পাঠিয়েছে। এবারেও বাড়তি টাকা তার হবে।

ওরা তিনজনই আবার হাঁটতে থাকল। কাল দুটো কাজ একসঙ্গে করতে হবে। মাল নামানো হবে, টাকা পাওয়া যাবে, সে মাল, যে নেবে ওর কাছে আবার ঠিকানাটা চেয়ে নেবে। এসব ভেবে সে ভাবল, এখন ফেরা দরকার। শীত তেমন করছে না। হাঁটলে শরীরে শীত থাকে না।

অমিয় হাঁটতে হাঁটতে বলল, কত পাঠাচ্ছিস?

তা হাজার পাঁচেক পাঠানো দরকার।

—এত পাবি কোথা থেকে?

—আজ কিছু দিয়ে যেতাম। বলতাম, সে যেন আমার নামে করে দেয়। বাকিটা কাল দোব। ওরাই আমাকে দেবে।

ছোটবাবু সব শিশুর মত দেখে যাচ্ছে। ওর মাঝে মাঝে নানাভাবে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু মৈত্র লোকটার বাড়ি ঠিক হদিস না করতে পারায় কোনো কথা বলছে না। কেবল অমিয়কে পারে না বলে, মৈত্র অমিয়র জবাব দিচ্ছে।

—মোটামুটি বৌর কাছে খুব বড় মানুষ হয়ে বেঁচে থাকিস।

—তাছাড়া কি। যা টাকা পাই এতে শেফালীর মতো মেয়ে বিয়ে করা যায় না। কম পাঠালে আমার সম্মান থাকবে না।

—তার মানে!

—মানে, বৌ বলবে, আমি ছোটখাটো একটা কাজ করি। ঠিকমতো টাকা পাঠাতে পারি না।

—তার মানে তুই বৌকে বড় কাজটাজ করিস বলেছিস।

—হ্যাঁ, তাই। শেফালী আমায় জানে, জাহাজে আমি এনজিন রুমে ভাল কাজ করি। অনেক টাকা পাই।

—এভাবে মিথ্যা বলে লাভ!

—লাভ, শেফালীর মতো মেয়েকে কাছে পাওয়া। বলে মৈত্র অমিয়কে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, সামনে শো-কেস-টার পাশে দ্যাখ।

—কিছু দেখছিস না! একটা ওভার-কোট ঝুলছে না!

—হ্যাঁ।

—নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে?

—মা-মা! চারটা পা। বলেই অমিয় ছুটতে চাইল। মৈত্র হাত ধরে ফেলল ধীরে অমিয়। ওদিকে চলা। সে টেনে অমিয়কে অন্য রাস্তায় নিয়ে গেল।

এবারে মৈত্র বলল সেবারে, এভা-পেরুনকে নিয়ে কি একটা উৎসব চলছিল! ওঃ কি জাঁকজমক।

ওরা তিনজনই দেখল, এভা পেরুনের একটা বড় মূর্তি। এবং কিছুটা মা মেরীর মতো মুখ চোখ।

ছোটবাবু বলল, এখানে একটু বসলে হয় না। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে। বেশ সুন্দর জায়গা। ছায়া ছায়া, শীতটাও কম মনে হচ্ছে।

মৈত্র তখন একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে বলল, এ গাছটার নাম জানিস? সে পাতাটা দু আঙুলে পিষে ওদের নাকের কাছে নিয়ে গেল, কেমন সুন্দর গন্ধ দ্যাখ। এটা বুনো মুকসো দাইন।

অমিয় বলল, সামান্য খাব।

ছোটবাবু বলল, আমিও।

মৈত্র বলল, পয়সা কে দেবে?

—কেন তুমি! এত টাকা কামাবে, আর খাওয়াবে না।

—ঢুকলে যে বের হতে চাইবে না। ভেতরে হাড়ের খেলা দেখাবে। সব বাঁদরের হাড়। আমার পকেটের সব ফাঁকা করে দেবে। তোমরা বাবা সুবোধ বালকের মতো হেঁটে এস তো। কোবিএন্দুজ হয়ে সোজা জাহাজে ফিরে যাব।

অমিয় বলল, আসলে শালা তুমি চিম্পুস। তারপরই সে চিৎকার করে উঠল, মৈত্র, দ্যাখ, দ্যাখ!

মৈত্র তাকাল ডান দিকে। ঠিক মোড়ের মাথায় একটা স্টেশনারী দোকান। দোকানের সামনে একটা সেলস-গার্ল, খুব সরলভাবে অমিয়কে দেখে হাসছিল। অমিয় বলল, কি চমৎকার হাসে রে! মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।

—যা দ্যাখ, কি বলে।

অমিয় গেলে মৈত্র বলল, কিরে কিছু বলছে?

—না। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছে না।

—মাগীকে আচ্ছা খিস্তি লাগা।

—খিস্তি করলে হাসছে। আর কিছু বলছে না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে রে। তবু কিছু বলছে না।

মৈত্র বলল, ছোটবাবু যাবে নাকি! মেয়ে মানুষের হাসি দেখে আসতে পার।

ছোট বলল, তুমি বরং যাও। রেলিঙে একটু বসছি আমি। হাঁটতে হাঁটতে কোমর ধরে গেছে। একটা ট্যাকসি নিতে পারতে। বাসে উঠে যেতে পারতাম।

—হাঁটাপথে সব চিনি। কিন্তু বাস-গুলো কোথায় যায় জানি না। লেখা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। হেঁটে হেঁটে আমি শহরটাকে ঘুরতে পারি, কিন্তু গাড়িতে উঠলে, কিছুতেই বোঝাতে পারি না জাহাজ-ঘাটায় যাব। ওরা যে জাহাজঘাটাকে কি বলে!

অমিয়র মনে হল এটাও একটা মৈত্রের বুজরুকি ভাঙ্গবে। ছোটবাবু আর অপেক্ষা না করে রেলিঙে বসে পড়ল। মৈত্র তখন বলছে, আমি যাচ্ছি। দ্যাখো কি বলে! সে গিয়েই বলল, ঢেঙ্গেরিতা। আরও কি বলল, তার-পর একটা ইটালিয়ান ব্যাগ পর্যন্ত দর-দাম করে কিনে ফেলল। মৈত্র হ্যান্ডশেক পর্যন্ত করল। অমিয় ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সেও হাত বাড়িয়ে দিল। ওর সঙ্গেও হ্যান্ডশেক করছে। বেশ মজা লাগছে। সে বলল মৈত্রকে বলা তুমি ভোজবাজি জানো। তুমি আমাদের রাজা।

মৈত্র এবার ঘড়ি দেখল। রাত খুব বেশি হয়নি। ওরা যদি ট্রেনে যায় তবে সামান্য পথ। এই ফালর্ং-এর মত হবে। ইচ্ছা করলে হেঁটেও যাওয়া যায়। কিন্তু বেশি রাত করে জাহাজে ফেরা মৈত্রের পছন্দ নয়। একবার পার্কে ঢুকে গেলে অমিয়কে তোলা যাবে না। বরং যাবার সময় ছোটবাবুকে একবার কার্নিভেলটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সে ট্রেনে উঠে গেল। এক সময় ঠিক জায়গায় নেমে গেল। পাতাল রেলে চড়তে পেরে ছোটবাবু খুব খুশি। পাশেই বোধহয় কার্নিভেলের সদর দরজা। কোনটা কি সে বুঝতে পারে না। তার কাছে সব এক রকমের মনে হয়।

ওরা কার্নিভেলের গেটে দেখল, উর্দি-পরা দারোয়ান। মাথায় উটপাখির পালক গোঁজা। গেটের ওপরে নিয়নের বড় হরফে লেখা নাম। বড় বড় সিংহ, বাঘের মুখোস ঝুলানো। পাশে ক্লাউনের কায়দায় নাচতে নাচতে একটা সাহেব ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে। পাশে সারি সারি চারটা টিকিট ঘর। খুব বড় লাইন নেই অথবা এখন রাতের বেলা বলে যে যার মতো আগেই ঢুকে গেছে। যারা গেছে তাদের অনেকে বের হয়ে আসছে। ওরা তাড়াতাড়ি টিকিট পেয়ে গেল। ওরা ভিতরে ঢুকে দেখল, বেশ হল্লা, মদ খেয়ে কেউ কেউ বেলাল্লাপনা করছে। এখানে ইচ্ছা করলে দু পেগ করে মেরে নিলে মন্দ হয় না। খালি চোখে দেখার চেয়ে, যেন সামান্য গোলাবী নেশা করে দেখলে জমে ভাল। এবং চারপাশে নীল আলো। ছোটবাবুকে এক পেগের বেশি দেবে না। কারণ ও বোধহয় খেলে জীবনে প্রথম খাবে। খেয়ে স্ট্যান্ড করতে পারবে কিনা কে জানে!

ঢোকার মুখে দেখল ঘুরে ঘুরে একটা আলোর মুরগি, নিচে এক বুড়ো, হাতে ছোট বাসকেট, একটা করে বুড়ো বাসকেটে রেখে দিচ্ছে। এটা হয়তো কোন বিজ্ঞাপন। কিসের বিজ্ঞাপন ওরা বুঝতে পারল না। ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মুরগির ডিমপাড়া দেখল। দেখতে দেখতে মৈত্র বলল, হাফ পয়সা উসুল।

অমিয় বলল, উসুল।

মৈত্র ছোটবাবুকে বলল, এদিকটাতে একটা টানেল আছে। ভিতরে ভীষণ অন্ধ-কার। গুহা, ঝর্ণা, বরফের পাহাড় আর মাঝে মাঝে নকল সাপ, বাঘ, হরিণ, মানুষের কংকাল ঘোরাফেরা করছে। একটা কাঠের গাড়িতে উঠে গেলে, বেশ আধঘন্টার মতো নিচে ঘুরিয়ে আনবে।

ওরা টানেলের ভিতর ঢুকল না। সামনের দুটো মাঝারি তাঁবু পার হয়ে গেল। মৈত্র অথবা ছোটবাবু না বললে, সে কোন পারে ঢুকবে বলে আশা করে না। যে কোন সময় মৈত্র বলতে পারে।

একটা তাঁবুতে তখন কে যেন সুর করে মিঠে গান গাইছে। এবং ওরা দেখতে পেল, ঠিক গানের সঙ্গে সঙ্গে একটা করে পুতুল ওপরে উঠে যাচ্ছে, তার ঠিক ফাঁকে মানুষেরা গোল চাকতি বসিয়ে দু এক বোতল মদ জিতে নেবার চেষ্টা করছে। অনেকে পারছে না, কেউ কেউ পারছে। এটা একটা জুয়া খেলার তাঁবু। দু একজন বোতল জিতে সেখানে দাঁতে কামড়ে লেবেল ছিঁড়ে ঢক ঢক করে খাচ্ছে। এরা কোন জাহাজের জাহাজি হবে। মৈত্র খেলার মতো করে দশটা চাকতি সোজা তুলে নিল। মাত্র চার প্যাসুর বাজি। সে দশটা চাকতি ছুঁড়ে সহজেই তিনটে চাকতি পুতুল নামা-ওঠার ফাঁকে জায়গামতো বসিয়ে দিল। অমিয় দেখল, হাতের টিপ মৈত্রের অসামান্য। সে সহজেই তিনবার জিতে দু বোতল, এই আট আউন্সের মতো করে হবে, বেশ পেয়ে গেলে বলল, নে। খাব খাব করছিলি, বসে বসে খা। মাগনায় যখন পেয়ে গেলাম—বলে মৈত্র ওদের দুজনকে নিয়ে একটা বসার মতো জায়গা খুঁজে নিল। সামনেই গোল গম্বুজের মতো তাঁবু। এক

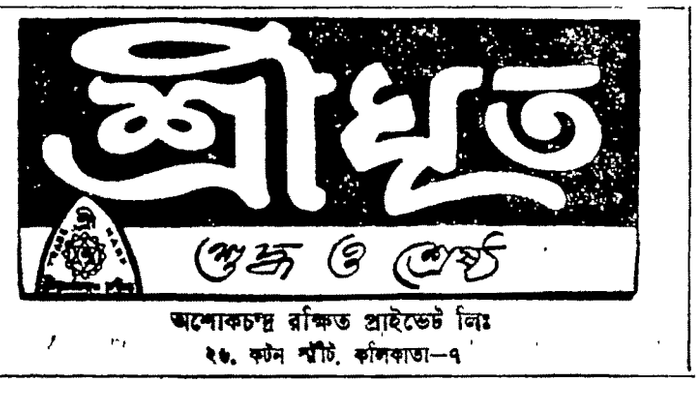

প্যাসু দিলেই লাল নীল চেয়ার পাওয়া যায়। এক প্যাসু দিলে গ্লাস। ওরা সেখানে বসে গ্লাস নিল। ছোট বড় হলুদ রঙের টেবিল আর ছোট বড় মাঝারি মানুষের কোলাহল। মেয়েরা যেন বেশি মাতাল। কখনও খেতে খেতে গাইছে, কিসব এটটিন পেটটিন..... তারপর তোতলামিতে পেয়ে যায়। আর গাইতে পারে না। মৈত্র বলল, খাও বাপু। কিন্তু বেশ্যা মেয়েরা বেশ অক্লেতক্কে আছে। একেবারে বেহুঁশ হবে না। ছোট, তুমি কি খাবে, দ্যাখো। এটুকু খাও। তোমার শীত থাকবে না। রাতে ভাল ঘুম হবে। সকালে বাউয়েলস্ একেবারে ক্লিয়ার। ও শালীর শালীরা যে কি গাইছে।

এভাবে মৈত্র নিজে খেতে থাকল। সে খেতে থাকল, একাই খেয়ে ফেলল একটা, অন্যটা ওরা দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। বেশিটা অমিয়, কমটুকু ছোটবাবু। ছোটবাবু গলায় ঝাঁঝ পাচ্ছে। বড় বিদ্ঘুটে ব্যাপার, কেন যে লোকে খায় সে বোঝে না। এটা যে মৈত্রদা কি করছে! সে টাকা দিয়ে আরও দু বোতল নিজে কিনে এনেছে। সে যে খুব বেশি সাবধান ছিল, একটুতেই কেমন সে এখন একগুঁয়ে হয়ে গেছে। মৈত্রদা এমন মদ খেতে পারে, জাহাজে ছোট একেবারে বুঝতে পারেনি।

এভাবেই মৈত্র জাহাজী মৈত্র হয়ে যায়। এভাবেই সে তার সংসারের কথা ভুলে গেল। শেফালীর কথা ভুলে গেল। মৈত্র, জাহাজী মৈত্র, এখন ঘাসের ওপর দু পা ছড়িয়ে মদ খাচ্ছে। সামনে সব নীল লাল স্কার্টপরা মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে। ওদের উরু দেখা যাচ্ছিল। পুরুষ্টু উরু। কোথাও নাচ হচ্ছে। কোথাও থেকে ব্যান্ডের বাজনা ভেসে আসছে এবং ব্যান্ড বাজলেই মেয়েরা ওর চোখের ওপর ফুলের মতো হয়ে যায়। যেন ঈশ্বরের বাগানে এরা সব সদ্য ফোটা ফুল। ওর কেন যে সব ফুল তুলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। এবং একটা একটা করে ফুলের পাপড়ি ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে। পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে কেবল।

জায়গাটা এখন প্রায় উৎসবের মতো। কচি কচি মেয়েরা প্যাসের বেলুন বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বালিকারা কোল্ড ড্রিংক খেয়ে মৈত্র এবং অমিয়কে দেখছে। ওরা দেখে অবজ্ঞব, এমন একটা দৈত্যের মতো মানুষ এখানে বসে হামেসা মদ খেয়ে যাচ্ছে কেন। ওদের মায়েরা তখন এত বেশি উরু খালি রেখেছে যে মৈত্র বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারছে না। অমিয় এবং ছোটকে ধাক্কা মেরে প্রায় সেন উঠে গেল। এবং বালিকাদের মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন কথা বলার চেষ্টা করল। শীতের ঠান্ডায়ও ছোটবাবুর কান লাল হয়ে উঠল মৈত্রের কথা শুনে।

অমিয় রেগে গিয়ে নিজের পছন্দসই আরও চার আউন্সের বোতল কিনে ফেলল। সে স্টুয়ার্ডের কাছে যে পয়সা পেয়েছে সবটাই এখন পকেটে। মৈত্র কি ভেবেছে!

অমিয় যাতে মৈত্র না দেখে, একটু দূরে বসে খাচ্ছিল। আর আকাশ দেখছিল। মনে হয় ওর কাছে আকাশটা খুব নিচে নেমে এসেছে। বাত বাড়ছিল। মৈত্র দেখল, অমিয় পাশে নেই। ছোট সামান্য খেয়েই শরীর ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দিয়েছে। সে দেখল, ভারি ঝামেলা। ওর নেশা কেটে যাবার মতো। সে তাড়াতাড়ি উঠে গেল ছোটর কাছে, কি বাবু ভাল লাগছে না। ছোট মাথা ঝাঁকাল। মৈত্র ভাবল, এখন জাহাজে ফেরা দরকার। কি যে মোহের ভিতরে পড়ে যায় সে।

মৈত্র অমিয়কে বলল, এই কি হচ্ছে!

—কি আবার হচ্ছে।

মৈত্র দেখল, এখন আধ বোতলের মতো বাকি। সে দেটা উপুড় করে দিল। তারপর অমিয়কে ভীষণ মাতলামি করতে দেখে বলল, এক থাপ্পড় মারব মাতলামি করলে। পা ঠিক রাখবি।

কে কার পা ঠিক রাখে! অমিয়র ঠিক রাখতে গিয়ে নিজের পা ঠিক রাখতে পারছে না।

অমিয় বলল, তুই আমার সঙ্গে এমন করিস কেনরে! আমি কি করেছি তোর সঙ্গে।

—তুমি শালা মুখ উঁচু করে রেখেছ কেন! কি দেখছিস ওপরে।

—কিছুই দেখছি না। তবে আমরা দেশে ফিরব মৈত্র।

—আমি তার কি জানি!

—তুই আমাকে একা ফেলে যাবি না।

মৈত্র ওর হাত ধরে টেনে তুলে দিল। মৈত্র এবং ওরা দুজন প্রায় টলতে টলতে, কেবল ছোটবাবু টলছে না, কিন্তু কেমন যেন বমি বমি পাচ্ছে, ভিতরে অস্বস্তি হচ্ছিল. এখন সে আর কোথাও যেতে চাইছে না, জাহাজে ফিরে যেতে চাইছে। তবু সে, মৈত্র অথবা অমিয়কে ফেলে যেতে পারে না। সে ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকল। ওরা সোজা ডেনহিগোর দিকে যাচ্ছে। ওরা নকল এরোপ্লেনে চড়ল না। নকল মোটরে উঠে দাপাদাপি করল না। সামনের একটা মঞ্চের দিকে ওরা হেঁটে গেল। সামনের মঞ্চটায় উঠে গেলে কেবল ঘুরতে থাকে, উড়তে থাকে, ওপরে উঠলে বেশ একটা মেজাজ আসে। তখন মনে হয় এই সংসার, যুবক যুবতী সহবাস সব এই কার্নিভেলের মতো। নিছক ছলনা। গত সফরে ওখানে উঠে মৈত্র বমি করে দিয়েছিল।

ফেরার পথে মৈত্র বলল, কিরে এবার যাবি? তুই ছোটবাবু?

অমিয় বলল, আমি যাব না। গেলেই শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে ঠিক দেখা হবে যাবে।

মৈত্র বুঝতে পারল না, অমিয় কাকে গালাগাল করছে।

—শুয়োরের বাচ্চা খুব জ্বালাচ্ছে।

—সে শুয়োরের বাচ্চা?

—আছে। ওকে শালা এমন শিক্ষা দেব না।

মদ খেলে নানাভাবে ভেতরের দুঃখ উগলে ওঠে। এটাও এমন একটা কিছু হবে। মৈত্র কথাটার তেমন গুরুত্ব দিল না। সে ছোটবাবুকে বলল, চল, ওদিকটা ঘুরে যাই। শর্টকার্ট হয়ে যাবে। জুয়ার আড্ডাগুলোর পাশ দিয়ে সামনের রাস্তায় পড়তে পারব।

অমিয় ধরা গলায় বলল, কোনদিকে।

মৈত্র বলল, ওদিকে। খেলতে পারবি না কিন্তু।

অমিয় বলল, তুই না খেললে, আমি খেলছি না।

—ছোটবাবু সাবধান।

—আমার টাকাই নেই।

অমিয় বলল, তুমি ছোটবাবু ভীষণ চালাক লোক। একটা প্যাসু তুললে না।

মৈত্র বলল, কিছু তোমাকে তুলতে হবে ছোটবাবু। তোমার দুটো সুট কেনা দরকার। সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেটে খুব সস্তায় পেয়ে যাবে।

ছোট বলল, অনেকদিন এখানে আছি তো। কাল তুলব ভাবছি।

—তোমার শরীর কেমন লাগছে।

—খারাপ না। বেশ ভাল লাগছে। আগের মতো খারাপ লাগছে না।

মৈত্র বলল, কেমন সস্তায় মদ খাইয়ে দিলাম।

অমিয় বলল, অনেক ধন্যবাদ। বলে, অমিয় হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন সে মৈত্রকে আশীর্বাদ করছে। ওর হাত শিথিল। হাওয়ায় যেন হাত টলছে। ছোটবাবু বলল, এভাবে হেঁটে যাওয়া যাবে না। বরং একটু বসে গেলে হয়। অমিয়র নেশাটা যদি কমে।

—এখানে কোথায় বসবি! শালা সব সোনার ঈগলেরা উড়ছে। চল একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসি।

সুন্দরী যুবতীদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না অমিয়র। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে শিস মারছে। মৈত্র এবং ছোটবাবু এখন জাহাজে ফেরার জন্য আকুল। হয়তো গিয়ে দেখবে, শেফালীর চিঠি এসেছে আবার। বন্দরে সে তিনটে চারটে চিঠি পেতে পারে। শুধু এক খবর। টাকা। খরচ শেফালী দুহাতে করতে ভালবাসে। এখন তো শেফালীর দরকারেই লাগবে টাকাটা। শেফালীর সব চিঠিই নতুন মনে হয়, তাজা মনে হয়। যত পুরানো থাকুক, এতদূরে দেশে এসে সে সব সময় চিঠিতে শেফালীর শরীরের ঘ্রাণ পায়। শেফালীর শরীরের গন্ধ চিঠিটাতে যেন লেগে থাকে।

সে শেফালীর চিঠি পেলে সব ভুলে থাকতে পারে। বন্দরে নেমে এদিক-ওদিক ঘোরার আকর্ষণ বোধ করে না। কোন বারে, বেস্তোরাঁয় বেশ্যালয়ে ঘোরার নিদারুণ অভ্যাস ওর মনের ভেতর থেকে মুছে যায়।

মৈত্র এবার বলল, অমিয় তুই থাক, আমরা চলে যাই।

—আমাকে ফেলে চলে যাবি! আমি একা যেতে পারব!

—তবে চল। বেশ রাত হয়ে গেছে। সামনে অনেকগুলো জুয়ার আড্ডা পড়বে।

—তুমি আমার জী-গুরু-দোস্ত। তোমার কথা না শুনলে চলে!

তারপর ওরা সেই নকল মণ্ড পার হয়ে গেল। ডানদিকে আর একটা বড় হলঘর। ভিতরে নাচ হচ্ছে। ক্ল্যারিওনেট বাজছে। এবং একটা লোক ম্যান্ডোলিন বাজিয়ে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে গাইছে। এইসব চেঁচামেচি অথবা গান ভীষন উত্তেজিত করে রেখেছে চারপাশটা। ডেনছিগোর বাইরে যেসব ফুলের গাছপালা, অথবা সারি সারি পামগাছের নকল জংগল, বনের ভিতর মাঝে মাঝে লাল আলোর সংকেত, অর্থাৎ ওখানে কেউ কেউ যুবক যুবতীরা শুয়ে নীল আকাশ দেখছে, অথবা নতুন নক্ষত্রের জন্ম দিচ্ছে, লাল আলোর সংকেত, এদিকে না, এদিকের জায়গা দখল, অন্যদিকে, অন্যদিকে খুঁজে নাও। জায়গা পেয়ে যাবে। এখানে এসে মৈত্র বলল ভালুকছেলের মতো চোখ বুজে থাক। তাকাবি না।

—খুব মজা। হোঁচট খাই আর কি! তুই চোখ বুজে হাঁট না। অমিয় বরং লাল আলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। যেন কে এর ভিতর একটা জায়গা খুঁজতে এসেছে। আসলে ওর দেখা চাই, কে কিভাবে কিসব চালাচ্ছে। এটা যে কি শহর! সে বুঝতে পারে না এমনভাবে এসব হয়। ও কেমন ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

ছোটবাবু বলল আমার ভয় করছে মৈত্রদা, এর ভিতর দিয়ে আসা ঠিক হয়নি। কেউ কিছু বলতে পারে।

—আরে আয়তো। এরা কেউ কিছু বলবে না। মায়াবিনি আলো চারপাশে, ছোটবাবুর মনে হচ্ছিল, সে একেবারে কেমন হাবা-কালা হয়ে যাচ্ছে। সব এত স্পষ্ট, সে নিজে তাকাতে পারছে না, কেমন এক অপরাধবোধ, এবং ভেতর থেকে আবার শীত উঠে আসছে। সে ভাবল, এমনসব দৃশ্য পৃথিবীর কোন খোলামেলা জায়গায় হয়, সে জানত না। চারপাশে নানাবর্ণের ফুলের ভিতর ওরা শুয়ে আছে। কেউ ওভারকোট পেতে নিয়েছে, কেউ কিছুই পেতে নেয়নি। দেখে মনে হয়, শীতার্তিত ওদের শরীরে লাগে না। সে প্রায় দু লাফে জায়গাটা পার হয়ে গেল যেন। অমিয়কে টানতে টানতে নিয়ে আসছে মৈত্র। কলার ধরে টেনে আনছে।

জুয়া খেলার মেলায় ঢুকে মৈত্র অমিয়র কলার ছেড়ে দিল। এবং মৈত্র এসব জায়গায় গত সফরে বেশ গচ্ছা দিয়ে গেছে। তখন মৈত্র একা ছিল, দায়দায়িত্ব কম ছিল। জুয়া খেলার আসরটাই মৈত্রের কাছে কার্নিভেলের মজার জায়গা। এখানে দোকানগুলো ওর সব চেনা। সে মুখগুলো পর্যন্ত মনে করতে পারে। কিন্তু এখন সে দেখছে সব কেমন বদলে গেছে। নানাবর্ণের রেলুন কাগজের ফুল উড়ছে হাওয়ায়। সে আগের কাউকে দেখল না। দুজন বেশ বলবান মানুষ, ওদের কোমরে মোটা বেল্ট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত বুট, এবং হাতে লম্বা চামড়ার দস্তানা, ওরা খেলছে। দুজন মেয়ে দুপাশে দাঁড়িয়ে ওদের রিভলবারে গুলি ভরে দিচ্ছে। ওদের দেখেই বুঝল, এরা ঠিক জাহাজী। ওরা আসলে পাশের মেয়েদুটোকে ধরার জন্য জুয়া খেলে পয়সা নষ্ট করছে। রাত বাড়লে, এরা ঠিক মেয়েদুটোকে কোথাও নিয়ে যাবে। মৈত্র একবার দেখে অবাক হল, আগের বয়সী যুবতীরা একজনও নেই। খুব অল্পবয়সের ফুলের মতো নরম মেয়েরা এখন দোকান আগলাচ্ছে। আর এভাবে কি যে হয়ে যায় মানুষের, মৈত্র যেতে যেতে নীল লাল রঙের কাঠের বল, গড়িয়ে দিতে পারলেই বাজি মাত, এক প্যাসুতে একটা নতুন কোট মিলে যাবে ....যেন এখন ইচ্ছা মৈত্রের একটা কোট এক প্যাসুতে মিলে গেলে মন্দ হয় না, মাত্র এক প্যাসু। ওর হাত ভীষণ পাকা। সে পাকা জুয়াড়ীর মতো অল্পবয়সের মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এই শহর, এত বড় শহর, আর এখানে মেয়েরা এখন জুয়ার বিঙে বসে থাকে ভাবতেই শরীরের ভিতর কেমন শিহরণ খেলে গেল। সে এবার হামলে পড়ে দুটো কাঠের বল বাজীকরের মতো তুলে নিল। বল দুটো ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আরও তিনটে লাল নীল বল বাতাসে এক এক করে পাঁচটা বল খেলাতে থাকল। পাঁচটা, ক্রমে আরও তিনটা তারপর চারটা টপাটপ তুলে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখল। দুটো হাতে বারোটা বলের খেলা! অমিয়, ছোটবাবু এমনকি রিঙের মেয়েটা পর্যন্ত তাজ্জব বনে গেল।

অমিয় চিৎকার করে বলল, শুয়োরের বাচ্চা তুমি সার্কাসে তবে সিংহের খেলা দেখাতে।

মৈত্রের ইচ্ছা হল, গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু মদ খেলে হুঁশ থাকে না। শিশুর মতো সরল কথাবার্তা। তাছাড়া এমন এক তাজা মেয়ে সামনে। এমন একটা আশ্চর্য খেলার সব তামাসা মাটি। সে খুব সহজভাবে বলল, সিংহের খেলা নয় রে! এটা রিঙের খেলা দেখাচ্ছি। এবং এভাবে সে কখনও বারোটা বল পেছনে হাতের ভিতর অদৃশ্য করে ফেলছে, আবার কেমন সব এক এক করে হাতে নামিয়ে ট্রেতে রেখে দিচ্ছে। সংগে সংগে মেয়েটি হাততালি দিয়ে উঠল এবং বুপোর স্টিকে একটা বল এগিয়ে দিল মৈত্রের কাছে।

মৈত্র বলল, না। আজ না মেমসাব। অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল খেলব। তারপর আঙ্গুল তুলে অমিয়কে দেখাল। যেন বলা, মাতাল। একেবারে মাতাল।

মেয়েটি কিছু বুঝল না। শুধু বুপোর স্টিক দিয়ে আরও দুটো বল মৈত্রের দিকে এগিয়ে দিল। সেই সবল হাসি। এবং এখন আর এ-মেয়েটিকে কম বয়সী মনে হচ্ছে না। খাটো স্কার্টের ভিতর ওর উরু দেখে সে বুঝল, খুব সেয়ানা মেয়ে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

—না মেমসাব। ঘরে আমার বিবি আছে। ও জানতে পারলে রাগ করবে।

মেয়েটি কিছু বুঝতে পারছে না। বোকার মতো হাসছে। মেয়েটি বোধ হয় বুঝেছে মানুষটা জাহাজি। রাত হলে সব জাহাজীদের ভিড় এখানে। মৈত্রকে ভীষণ লোভী দেখাচ্ছে। মেয়েটি ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। মৈত্রের যেন সাহস নেই এখন রিং ছেড়ে যায়। মাত্র এক প্যাসুর খেলা। সে না খেললে, মেয়েটার কাছে ছোট হয়ে যাবে। সে এবার এক প্যাসু ছুঁড়ে দিল। দুটো বল, রুপোর স্টিক হাতের কাছে। ট্রেতে এমন অনেক বল। সে বল গড়িয়ে দিল। বল গড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেল, সে ঠিকমতো জায়গায় বল গড়িয়ে দিতে পারল না।

মেয়েটি মৈত্রকে হেরে যেতে দেখেও হাততালি দিল। খুব খেলা দেখানো হচ্ছিল। এখন সব ভোজবাজি শেষ। মেয়েটি যেন এবার ওকে শেখাতে পারে। সে বাইরে বের হয়ে মৈত্রের পাশে দাঁড়াল। বোধ হয় বলল, এই দ্যাখো সাঁইয়া। সে দুটো বল ঠিক ঠিক জায়গায় গড়িয়ে দিল। খুব সহজ।

মৈত্র এবার দু প্যাসু দিয়ে চারটি বল নিল। কোন দিকে তাকাল না। ছোটবাবু একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্রের টিপ দেখছে। মৈত্র এবার খুব সহজে একটা বল জায়গামতো পৌঁছে দিল। ছেলেবেলায় মৈত্র টিপ্পি খেলত। খেলাটা হুবহু একটা আধুনিক টিপ্পি খেলা। সে অনেকগুলো টিপ্পি বাঁচিয়ে সহজেই রাজা টিপ্পিটাকে গর্তে ফেলে দিতে পারত। সুতরাং মৈত্র একবার জিতেই ভেবেছে, মেয়েটার ঠিক জামা-কাপড় খুলে নিতে পারবে। কিন্তু পরে চারবার মেরে একবার। সে ফের পাঁচ প্যাসু দিয়ে দশটা। একটাও গেল না। মেয়েটা তেমনি ঠোঁট টিপে হাসছে। বড় মিষ্টি, বড় সুস্বাদু খাদ্যের মতো হাসিটা ওকে প্রলোভনে ফেলে দিচ্ছে। সে ইতিমধ্যে দশ প্যাসুর মতো হেরে গেছে। অমিয় নাইটের মতো এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল মৈত্রকে, খেল মেমসাব। তোমারে উলঙ্গ কইরা দিমু। অমিয় দেশের ভাষায় এবার কথা বলতে লাগল।—যা খেইল দেখামু, বেজবা কারে কয় বাঙ্গাল! বলে, অমিয় আট প্যাসুতে বোলটা কাঠের বল তুলে খেলতে গিয়ে দেখল সব কটা কাঠের ট্রেতে উঠে গেছে। সুতরাং এক ধাক্কায় ওকে আবার সরিয়ে সামনে দাঁড়াল মৈত্র। হা হা করে হাসল। সে এবার ষোল প্যাসুতে বত্রিশটা বল কিনে ফেলল।

(ক্রমশঃ)

মনের খবর

মানসিক রোগ (৮)

উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। কত রকম কারণে অকারণে যে মানুষ উৎকণ্ঠায় ভোগে তার ইয়ত্তা নেই। একজনের কথা বলি। (জ) জয়ার বয়স কম নয়। প্রায় কুড়ি বছর হল। ভদ্র পরিবারে ভদ্র পরিবেশে মানুষ হয়েছে। লেখাপড়াও করে যাচ্ছে নিয়মমত। আর্থিক অবস্থা ভাল। বাবার বাড়ী আছে। গাড়ী আছে। অভাব বলতে তেমন কিছু নেই। তবু জয়ার উৎকণ্ঠা দূর হয় না। থেকে থেকেই তার মনে হয় বাবা গেলে তাদের কী অবস্থা হবে। তখন বাড়ী গাড়ী ত কিছুই আর থাকবে না—এই উৎকণ্ঠা তার কথায় ব্যবহারে প্রকাশ পেয়ে যায়। বাড়ীর খরচ কমানোর দিকে তার তীক্ষ্ণ নজর। মাকে বারেবারে বলে—এত খরচ করা মোটেই ঠিক নয়। বাবার একার রোজগার, ভাল-মন্দ কিছু ঘটে গেলে তখন দিন কি করে চলবে? এখন থেকে ভেবে চলা উচিত। মা তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এসব নিয়ে তার দুশ্চিতা করার কারণ নেই। সব ঠিকঠাক চলছে। সব ব্যবস্থাই ঠিক করা আছে। বাবার কাছে বলে—মায়ের শরীর মোটেই ভাল না—সে তা বুঝতে চায় না, তাকে বুঝিয়ে বল। কিছু একটা ঘটে গেলে তখন কি হবে? জয়ার বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ দুটি। প্রধান হচ্ছে স্নেহ-ভালবাসা হারানোর উৎকণ্ঠা। আর দ্বিতীয় হল আর্থিক দুরবস্থার উৎকণ্ঠা। মা-বাবা না থাকলে সে বাঁচবে কেমন করে? তার মা তাকে অনেক বোঝান— বাপ-মা কারো চিরকাল বেঁচে থাকে না। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে নিজেদের সংসার গড়ে ইত্যাদি। জয়াও বিয়ে করে স্বামীর সংসারে যাবে, সেখানের সব ভার নিয়ে সংসার করবে ইত্যাদি। কিন্তু জয়া বলে—সে তো না হয় এক রকম করে হবে কিন্তু বিয়ে করলেই যে স্বামী তাকে ভালবাসবে তার ঠিক কি আছে। কত লোকের তো বিয়ে অশান্তিতে ভরে ওঠে। জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ভালবাসা না থাকলে কি সংসার টেঁকে? বাবা মা তাকে নিজে দেখে পছন্দ করে বিয়ে করতে বলেন, তাতেও জয়ার ভরসা হয় না। কি জানি আজ যে ভালবাসবে—পরেও যে সে ভালবাসবে তার নিশ্চয়তা কি! আবার বলে, ভাল না হয় বাসবে, কিন্তু টাকা কড়ি যে থাকবে তার ঠিক কি! ভাল অবস্থার ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া হবে বললেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। আজ টাকা আছে বলে যে কালকেও টাকা থাকবে তার কি মানে আছে। বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা। আজ আছেন কাল নেই—তখন? যেমন করে যত করে তাকে বোঝানো যাক না কেন জয়ার মনের উৎকণ্ঠা যায় না। সে ঐ অবস্থায় পড়লে কী করবে। সে যে বড় সাংঘাতিক অবস্থা। ভাবতে গেলেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি মা বা বাবার কাছে এসে বসে, আর প্রায় একই কথা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে থাকে। ব্যাঙ্ক যদি ফেল পড়ে! দেশ স্বাধীন হয়েছে। যুদ্ধ বিগ্রহ তো হবেই, তখন কে কোথায় ছিটকে পড়বে। বোমা পড়ে যদি ব্যাঙ্ক উড়ে যায়, কাগজপত্র সব যদি পুড়ে যায় তখন কি হবে? নিজের লোকের সঙ্গে যদি সেই ডামাডোলে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, আর খুঁজে না পাওয়া যায় তখন! এই সব নানা রকম অবস্থার কল্পনা করে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে মাকে ডাকতে থাকে—। কেমন তার মনে হয় মা যেন বাড়ীতে নেই। সে বুঝি বাড়ীতে একা আছে। মা পাশের ঘর থেকে এসে আলো জেবলে জানতে চান কি হয়েছে। ডাকছে কেন? জয়া বলে বাড়ীটা একেবারে খালি জনশূন্য মনে হচ্ছিল—তাই ডাকছিল—মাও তাকে ছেড়ে কোথাও চলে গেছেন কিনা তাই দেখতে। এরকম ঘটনা খুব বেশী ঘটে নি। তবু মা বাবা এই অকারণ উৎকণ্ঠার জন্য মেয়েকে তিরস্কার করেন। বোঝান। কিন্তু কিছুতেই জয়ার মন শান্ত হতে পারে না। তখনকার মত একটু চুপ করে থাকে কিন্তু আবার আরেক রকমের উৎকণ্ঠা জেগে ওঠে। কিছুতেই এর হাত থেকে সে উদ্ধার পায় না।

(ঝ) ঝগড়ুর আবার আরেক রকমের উৎকণ্ঠা। অবাঙ্গালী ১৫।১৬ বছরের ছেলে। বিহার থেকে কলকাতার শহরে এসেছে—কিছু বুর্জিরোজগারের আশায়। দেশে বুড়ো মা বাপ আছেন। আর আছে ছোট ছোট দুই ভাই-বোন। জমি বিশেষ নেই। দিনকাল খারাপ, সংসার চলে না, তাই ঝগড়ুকে বাড়ী ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে উপার্জনের চেষ্টায়। দেশের এক-জনের সঙ্গে এসেছে কলকাতায়। তার সঙ্গেই একটা ঘরে থাকে। বাড়ী থেকে বেরুতেই তার ভয় করে: এত বড় শহর, এত গাড়ী, লোকজন, সে যেন কোথায় হারিয়ে যাবে। গ্রাম থেকে হঠাৎ কলকাতার মত শহরে এলে এ রকম মনোভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তার দেশের সেই সোকটি, চাচেরা ভাই, ঝগড়ুর একটা কাজ জুটিয়ে দিল। এক বাড়ীতে ভৃত্যের কাজ। বাড়ীর ভেতরে থেকে সব রকম কাজ করতে তার বাধে না। কদিনের মধ্যেই বাড়ীর হালচাল বুঝে নিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু মুস্কিল বাধল ঝগড়ুকে বাইরে থেকে কিছু আনতে বললেই সে যেন কুঁকড়ে যায়। তার কেবলই মনে হয় সে বুঝি হারিয়ে যাবে। এক টুকরো কাগজে বাড়ীর নম্বর লিখে দিয়ে তাকে সোজা রাস্তার মোড়ের দোকানে পাঠালেও তার ঐ উৎকণ্ঠায় বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। কয়েকবার সঙ্গে অন্য লোক দিয়ে দোকান, দোকানের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার পরেও ঝগড়ুর ঐ হারিয়ে যাবার ভয় যায় না। দেশে সে মাঠে মাঠে একা ঘুরে বেড়াত। রাত বেরাতে গ্রামের এক প্রান্তের ছোট্ট দোকান থেকে জিনিস কিনে আনতে এটুকু ঘাবড়াতো না। কিন্তু কলকাতায় এসেই যেন তার মনে কেমন এক ধাক্কা লেগে গেল। বাড়ীর কাছে থেকে দূরে সে যেতে চায় না। সামান্য কয়েক পা গিয়ে পথের ধারের এক রোয়াকে সে শক্ত হয়ে এঁটে বসে অসংখ্য লোকের চলাফেরা দেখতে থাকে। ভালও লাগে। কিন্তু পথে চলতে হলে তার কেবল মনে হতে থাকে যেন স্রোতের টানে সে হারিয়ে যাবে। আর বুঝি বাড়ী ফিরে আসতে পারবে না। বাড়ীর নম্বর রাস্তার নাম সব তার জানা হয়ে গেছে, তবু ঐ এক অসম্ভব উৎকণ্ঠা। একদিন ঐ বাড়ীর বাবু তাকে গড়ের মাঠের একখানে বসিয়ে রেখে একটু দূরের দোকান থেকে সিগারেট কিনতে গেলেন। ঝগড়ু আপন মনে বসে বেশ গ্রাম্য সুরে গান জুড়ে দিয়েছে। ভয় ভাবনা কিছু তার নেই। কিন্তু একা তার হেঁটে চলতে গেলেই যত গোলমাল যত উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। অনেক প্রশ্ন করেও বাড়ীর লোক বিশেষ কিছু বুঝতে পারে নি। ঝগড়ু কেবল বলে হাঁটতে গেলেও সে হারিয়ে যাবে। পারবে না ঠিক থাকতে। কোথায় কোথায় চলে যাবে, আর ফিরতে পারবে না। ঠিকানা জানা আছে কিন্তু তবু? এই হারিয়ে যাবার উৎকণ্ঠায় ঝগড়ু কিছুতেই আর সহজ হতে পারে না। ক্রমে মালিক পক্ষ বিরক্ত হতে লাগলেন। পরিশেষে তার সেখানের চাকরীতে একদিন জবাব হয়ে গেল। ঝগড়ু বিপদে পড়ে গেল। এখন সে যায় কোথায়? সেই চাচেরা ভাইয়ের বাসায় যাবার ক্ষমতা তার নেই। তবে এখন উপায়! বাড়ীর সামনের ফুটপাথে বসে সে কাঁদতে লাগল। লোকের ভিড় জমল। অনেক কথার পর সে ওদের বোঝাতে পারল যে ঐ বাড়ীতে সে চাকরী করত, এখন তার চাকরী গেছে। সে তার চাচেরা ভাইয়ের বাসায় যেতে চায়, কিন্তু যেতে পারছে না। ঠিকানাও ঠিকমত জানে না। একজন লোক সাহায্য করতে রাজি হল। কিন্তু ঝগড়ুর হেঁটে যেতে বড় ভয়। সে ভদ্র-লোকের একেবারে পা ঘেঁষে চলতে লাগল। অনেক ঘুরে ফিরে যখন ঝগড়ু তার চাচেরা ভাইয়ের বাসায় এল তখন বাসায় কেউ ছিল না। সে ঐ বাসার দরজায় বসে রইল সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত। কোথাও উঠে যেতে পারল না—কিছু খাওয়া হল না সারাদিন: খেতে হলে উঠে দোকানে যেতে হয়—একা পথে চলা অসম্ভব! তার সব কথা শুনে চাচেরা ভাই মহা চটে গিয়ে গালাগাল করল। পরে বলেছিল ওর মাথাখারাপ হয়েছে। সত্যি একদিন তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে

চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলে। ঝগড়ু এখন ভাল আছে। আর দশজনের মত কাজ করছে।

(এ) মিয়াজানের আবার অন্য রকমের অসুবিধা। ছেলেবেলা কেটেছে পূর্ববঙ্গে। পাকিস্থান হবার সময় তাদের পরিবার দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে তার পরিবারের অনেকেই অনেক জেল খেটেছে, শাস্তি ভোগ করেছে। কিন্তু তারপরেও যখন দেশ ভাগ হল তখন আর তার বাপ-মা ওদেশে থাকবে না ঠিক করে কলকাতা চলে আসে। সে অনেক দিনের কথা। মিঞাজান তখন ছোট শিশু। ছেলেবেলায় অনেক ঝড়-ঝাপটা তাদের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। সহ্য করতে না পেরে তার এক আত্মীয়ের মানসিক রোগ দেখা দেয়। বাতুল অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। মিঞাজানকে এক সময় সেই আত্মীয় খুব ভালবাসত। মিঞাজানও তাকে ভালবাসত। সেই চাচা যখন বাতুলতা রোগে বিকৃত আচরণ আরম্ভ করল, তখন মিঞাজানের বয়স ১৩।১৪ বছর মাত্র। তার মনে এতে খুব ধাক্কা লাগে। তার মনে হতে থাকে পাগল হয়ে যাওয়া কত সহজ। কে যে কখন পাগল হয়ে যাবে তার কিছুই ঠিক নেই। আগে থেকে কিছুই তা বুঝতে পারা যায় না। তার ক্রমে ভয় হতে থাকে সে পাগল হয়ে যাবে না ত? একবার মনে হতেই কেমন যেন তাকে এই অশুভ সম্ভাবনাটা পেয়ে বসল। মাঝে মাঝেই তার মনে হতে লাগল--পাগল হয়ে যাবে না তা একরাত্রে তার ঘুম আসতে দেরী হচ্ছিল। তার ছোট ভাই তার পাশেই শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে সে কি যেন বলে উঠল। মিঞাজানের মনে হল সে যেন বলছে 'আমি খেলব, আমি খেলব।' ভাইয়ের এই ঘুমের মধ্যে কথা বলা শুনে মিঞাজানের বুক ছাঁৎ করে উঠল। তবে কি ভাই পাগল হয়ে গেল? ঘুমের মধ্যেও ভুল বকছে। তার ভয় হল, হয়ত সে নিজেও ঘুমের মধ্যে কত কি বকতে থাকে। নিজে বুঝতে পারে না। সাবধান হতে হবে। পাগল হয়ে যাচ্ছে নাকি সেও। তবে কি করবে? তার উৎকণ্ঠার ফল হল এই যে, তার রাতের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। সহজ ভাবে সে আর ঘুমোতে পারে না। মনে উৎকণ্ঠা থেকে যায়। ঘুমের ঘোরে বুঝি সে আজে বাজে কথা বকতে থাকে। না পাগল সে কিছুতেই হবে না। ক্রমে তার ঘুম কমে আসতে লাগল। দিনের বেলায় পড়াশোনা করতে করতে হঠাৎ মনে হয় সে ঠিক ঠিক বইয়ের লেখা পড়ছে ত? অন্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে থাকে তারা কেমন করে চলে, বলে। নিজের সঙ্গে মেলায় —সব ঠিক আছে ত? উৎকণ্ঠা তার বেড়েই চলে। যত সে চেপে রেখে নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে থাকে তত তার অস্বাভাবিকতা সব দিকেই বেড়ে যেতে থাকে। মনের অস্থিরতা ক্রমে চলাফেরায় প্রকাশ পেতে থাকে। বাড়ীর লোক তাকে এক-এক সময় বলে এরকম পাগলের মত করছিস কেন?' শুনে মিঞাজানের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। তবে সে বুঝি পাগলই হয়ে যাবে। এই উৎকণ্ঠার ফলে তার আহার কমতে থাকে, শরীর দুর্বল হতে থাকে। দুশ্চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলে কাজকর্মে অমনোযোগী হতে থাকে। ভয় হয় সে পাগলা হয়ে যাবে না তো! সব সময় নিজের উপর কড়া নজর রেখে চলে। কোথাও কোনও চলা বলা করার মধ্যে যেন অসংগতি দেখা না দেয়। এত বেশি নিজের দিকে সর্বদা নজর দেওয়ার ফলে ব্যবহার তার আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। সহজ হাসি আনন্দ যেন শুকিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থায় সে নিজেই একদিন বাড়ীতে বলতে থাকে একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। বড় অস্বস্তি হচ্ছে। ঘুমোতে পারে না ইত্যাদি। বাড়ীর লোকও রকম সকম দেখে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। এক সময় তার চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এতে তার যেন খানিকটা স্বস্তি বোধ হতে থাকে। তার মনে হতে থাকে—চিকিৎসা যখন হচ্ছে তবে হয়ত সে আর পাগল হবে না। তবু সে উৎকণ্ঠা তাকে ছাড়তে চায় না। এক সময় তার মনে হতে থাকে আর বুঝি তার ঘুম হবে না। কোন দিনই সে আর ঘুমোতে পারবে না। এমন অনেক উৎকণ্ঠা তাকে জর্জরিত করতে থাকে।

অনিদ্রা (ইনসমনিয়া) রোগে যাঁরা ভোগেন তাঁদের মনে উৎকণ্ঠা বাসা বাঁধে বলেই ঘুমোতে পারেন না। এই উৎকণ্ঠা থাকার দরুন বিছানায় শুয়েও শরীরের পেশীগুলিকে শিথিল করে এলিয়ে দিতে পারেন না। সব যেন কেমন আঁট হয়ে থাকে। শরীর মন শ্লথ (রিলাকস) করতে না পারলে ঘুম আসতে পারে না। যাদের উপর গুরু দায়িত্বের বোঝা চেপে থাকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেই বোঝার চাপ থেকে নিজেকে সরায় না, অর্থাৎ ঘুমের সময়ও তা দিতে পারেন না। সেই জন্যই সহজে তাদের ঘুম আসে না। অনেকেরই এই জন্যই ঘুমের ওষুধ নিয়মিত ব্যবহার করার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। তারপর এক-এক জনের এক এক রকমের উপসর্গ দেখা দেয়। সেকথা এখানে আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। সময় মত এই প্রসঙ্গ যখন আসবে তখন আলোচনা করা যাবে।

উৎকণ্ঠার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এই উৎকণ্ঠা আরও বহু রকমের রোগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। আগেও যা বলেছি এখনও আবার সেই কথারই উল্লেখ করে বলব যে, সব মানসিক রোগের মূলেই আছে উৎকণ্ঠা। সুতরাং ক্রমে আমরা সেসব মানসিক রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করব. সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠার প্রকাশ দেখা যাবে। সুতরাং পৃথকভাবে এ সম্বন্ধে আর উদাহরণ দেবার দরকার হবে না।

উৎকণ্ঠার একটা মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা কথা বলে এই নিবন্ধ শেষ করব। উৎকণ্ঠা সব সময়ই ভবিষ্যতে কিছু একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট অপ্রীতিকর কষ্টকর বিপদ ইত্যাদির সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকে। বর্তমানে যা ঘটছে তা নয়, ভবিষ্যতের বিপদের মানসিক পূর্বাভাস বা সংকেতকে উৎকণ্ঠা বলা হয়। সে (কাল্পনিক) বিপদ অহং গ্রহণ করতে রাজি নয়। আর সেই বিপদের সম্ভাবনাকে প্রায়শই শতগুণ বাড়িয়ে দেখা হয়। তার ফলে উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। আর এই উৎকণ্ঠার অবস্থায় প্রতিকারের কোন উপায় স্থিরভাবে বিচার করে নিয়ে গ্রহণ করা ও সেই অনুসারে কাজ করা সম্ভব হয় না। উৎকণ্ঠাবস্থার এটা এক বড় রকমের ক্ষতি, যা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কি করে উৎকণ্ঠার বেড়াজাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় আর তার চেয়েও বড় কথা কি করলে এই উৎকণ্ঠার কবলে পড়তে হয় না সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এবারের মত এই থাক।

—তরুণচন্দ্র সিংহ

বিজ্ঞানের কথা

* মানুষ বুড়ো হয় কেন?

* বাতাস চালিত টারবাইন

আমরা আজকাল অনেক বেশি বুড়ো হচ্ছি। আমরা মানে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। আগে যতো অল্প বয়সে পৃথিবীর মানুষের জীবন শেষ হত এখন আর তা হয় না। অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে, অর্থাৎ অনেক বেশি বুড়ো হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে শুধু যে রোগ সহজে সারে তাই নয়, রোগ যাতে আদৌ না হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়। শারীরিক বৈকল্য পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসে আর কোনো সময়ে মানুষ এত বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকেনি। এ অবস্থায় জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কাছে সমস্যা দেখা দিয়েছে—মানুষ বুড়ো হয় কেন? এই সমস্যাটিও আর কখনো এমন প্রকট হয়নি। জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা তাই এমন একটি উপায় উদ্ভাবন করতে চাইছেন যাতে বুড়ো হওয়ার প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। বয়স হতে হয় হোক কিন্তু তাই বলে বুড়ো হতে হবে কেন? ব্যাপারটি সহজ নয়, কেননা মানুষ কেন বুড়ো হয় এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে খোদ বিজ্ঞানীরাই এখনো তেমন কিছু জানেন না। মানুষ মরবে ঠিকই, কোনোকালে বুড়ো হবে না তাও নয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা যা চাইছেন তা হচ্ছে বুড়ো হওয়ার ব্যাপারটিকে বহুকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা। অর্থাৎ মানুষকে বহুকাল পর্যন্ত কর্মক্ষম রাখা। ব্যাপারটা ঘটতে এখনো অনেক বাকি। বিজ্ঞানীরা সবে পথ হাতড়াচ্ছেন।

প্রথমে মানুষের শরীরটার দিকে তাকানো যাক। কীভাবে দেখব? দেখা যেতে পারে সম্পূর্ণ একটি জীব হিসেবে বা পৃথক পৃথক অঙ্গের সমাবেশ হিসাবে, বা—আরও সরলভাবে দেখতে হলে—কোষের সমাহার হিসেবে। মানুষের বুড়ো হওয়ার ব্যাপারটিকেও দেখা যেতে পারে এই তিনভাবে দেখার যে কোনো একটির দিক থেকে।

বুড়ো হলে সমন্বয় ও কর্মক্ষমতা থাকে না, এটা গোটা শরীরের লক্ষণ। এই বিষয়টির বিচার হওয়া দরকার মানুষকে সম্পূর্ণ একটি জীব হিসেবে দেখে।

বুড়ো হলে চামড়ায় ভাঁজ পড়ে ও চামড়া শক্ত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন ঘটছে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে। এই বিষয়টির বিচার চওয়া দরকার মানুষের শরীরকে পৃথক পৃথক অঙ্গের সমাবেশ হিসেবে দেখে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশী নজর দিয়েছেন পৃথক পৃথক কোষের ওপরে। কোষ কেন বুড়ো হয়? প্রশ্নটা শুনতে সহজ কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট গোলমেলে। বিভিন্ন দেশে এ-বিষয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে কিন্তু স্পষ্ট কোনো জবাবে কেউ-ই পৌঁছতে পারেননি।

অতি ক্ষুদে আকারের কতকগুলো জীব আছে—যেমন, অ্যামিবা—যাদের বলা হয় এককোষী। তত্ত্বের দিক থেকে এই এককোষীরা অমর। কেননা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ওই একটি কোষ দুটিতে বিভক্ত হয়ে। যে উপকরণে গোড়ার এককোষী জীবটি তৈরী, সেই উপকরণই থাকছে বিভক্ত হয়ে যাবার পরের দুটি পৃথক এককোষীর মধ্যে। প্রথমে একটি, তা থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি—এমনি চলতে থাকে। যে আদি থেকে শুরু তা এমনিভাবে বহু হচ্ছে বটে কিন্তু মরে যাচ্ছে না। কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের শরীরের কোষ ঠিক এই রকমটি নয়। সেটি মরণশীল।

কিছুকাল আগে শোনা গিয়েছিল ভ্রূণের শরীর থেকে নেওয়া কোষ কৃত্রিম লালনের অবস্থায় রেখে বার পঞ্চাশেক বিভক্ত করা সম্ভব। তারপরে কোষটি মরে যায়। এখানে বলার কথা এই যে কৃত্রিম লালনের অবস্থায় রেখে কোনো কোষকে পর্যবেক্ষণ করাটাই একটা কৃত্রিম ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কোষ শরীরের মধ্যে থাকে অন্য নানা বিভিন্ন প্রকারের কোষ পরিবৃত হয়ে। সেটাই তার স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক কোষের আচরণ কৃত্রিম লালনের অবস্থায় রাখা কোষের মতো হবে এমন নাও হতে পারে। তাছাড়া এমন কোষও আছে—যেমন, নার্ভের কোষ—যা সাধারণত বিভক্ত হয় না। এ কারণে কৃত্রিম লালনের অবস্থায় রাখা কোষের পর্যবেক্ষণের ফল দিয়ে স্বাভাবিক কোষকে বিচার করা চলে না। তবুও এই যে ব্যাপারটি—বারকয়েক বিভক্ত হবার পরে কোষ মরে যাওয়া—তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

একটি তত্ত্বে বলা হয়েছে, কোষের গড়নই এমন যে ধ্বংস হওয়ার দিকেই তার অনিবার্য গতি। তার মানে, ধরে নিতে হয় যে স্তন্যপায়ীদের কোষে সেই গড়নগত সামর্থ্য নেই যার দ্বারা সেটি অমর হতে পারে। প্রজননগত দিক থেকেই সেটি এমনভাবে তৈরী যে বারকয়েক বিভক্ত হবার পরে ধ্বংস হবেই।

আবার অনেকের মত এতটা চূড়ান্ত

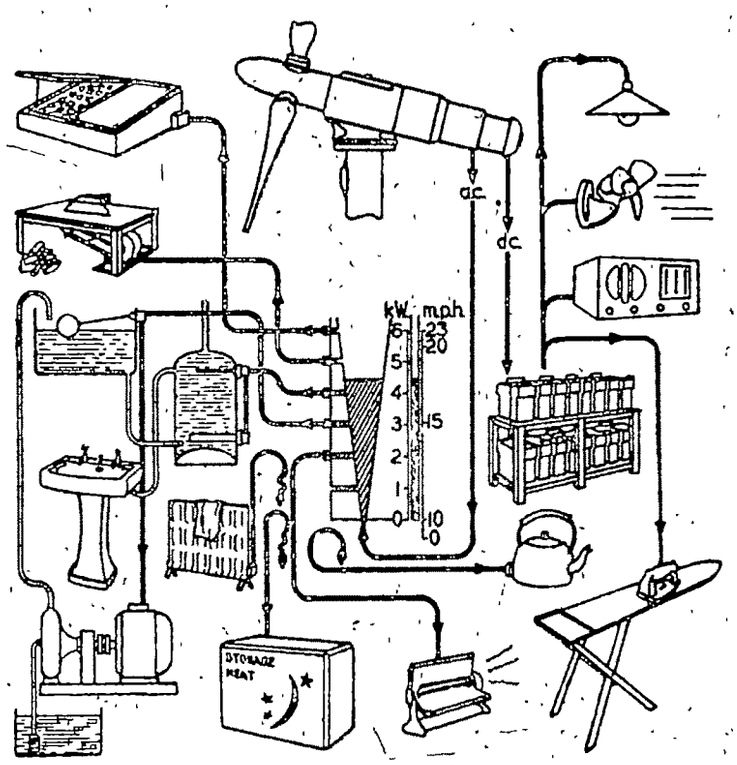

এই রেখাচিত্র... হয়েছে, বাতাস-চালিত টারবাইনের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কত কাজে লাগানো যেতে পারে। বাতাসের বেগ যতো বেশি, বাজও ততো বেশি।

নয়। তাঁরা বলেন, গড়নগত আত্মহননকারী স্বভাবের জন্য নয়, কোষ ধ্বংস হয় দুর্ঘটনার ফলে—এমন এক দুর্ঘটনা যা প্রায়শই ঘটে থাকে। তাই যদি হয় তাহলে এই দুর্ঘটনাকে চেনা দরকার। চিনতে পারলে তাকে এড়িয়ে চলবার উপায়েরও হদিশ পাওয়া যেতে পারে। পুরোপুরি না হোক, কিছুটা। এটুকু হলেই বুড়ো হওয়ার প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা আপাতত এইটুকুই অর্জন করতে চান।

এখন এই বিশেষ দিকেই বিজ্ঞানীদের অধিকাংশ প্রয়াস নিবদ্ধ। প্রশ্ন ওঠে, দুর্ঘটনা কেমনধারা? তার বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যবস্থাই বা কী?

কোষের প্রজননগত গড়নটি জানা যায় তার নিউক্লিয়াস থেকে। এই নিউক্লিয়াসটি নানাকারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, কোনো এক ধরনের বিকীরণ বা কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া। আর এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতেই কোষ একসময়ে মরে যায়। এমনও হতে পারে কোষের ক্ষতি এমন সরাসরি কোনো কারণে নয়। কোষের অভ্যন্তরেই হয়তো এমন সব অ্যাসিড তৈরি হয় বা প্রোটিনের এমন সব সংশ্লেষণ ঘটে যা কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক।

এখনো পর্যন্ত এ-ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলার মতো অবস্থায় বিজ্ঞানীরা পৌঁছতে পারেন নি, সাক্ষ্যপ্রমাণের খুবই অভাব। কিন্তু কিছু কিছু ওষুধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা নাকি, দাবি করা হচ্ছে, উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোকে উলটে দিতে পারে এবং কোষকে বুড়ো হতে দেয় না।

কোষের বয়স যতো বাড়ে ততোই কোষের ভিতরে বা চারদিকে জড়ো হতে থাকে এমন সব পদার্থ যাকে বলা চলে 'আবর্জনা'। কোষের ভিতরে জমে-ওঠা আবর্জনার দরুনও কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোষের ভিতরের এই আবর্জনা কোত্থেকে আসে আর তার ক্রিয়া কি ধরনের সে-সম্পর্কে এখনো নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় নি। আবর্জনা থাকার ক্ষতি হচ্ছে, না, ক্ষতি শুরু হয়েছে বলে আবর্জনা —সে-সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন। তবে এক্ষেত্রেও এমন একটি ওষুধের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যেটি নাকি, বলা হয়ে থাকে, কোষের ভিতরে আবর্জনা জমা বন্ধ করে। এই ওষুধটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় মানসিক বৈকল্য রোগ সারাবার জন্যে। আর গিনীপিগের ওপরে প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, বুড়ো গিনীপিগের মস্তিষ্কের কোষও তার ফলে আবর্জনা থেকে মুক্ত থাকছে। এই দুয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

অপর একদল বিজ্ঞানীর মতে কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ কোষের ভিতরকার বিশেষ একটি পদার্থ যার নাম লাইসোসোম। অধিকাংশ কোষের ভিতরেই এটি থাকে। এটি একটি পেটিকার মতো, ঝিল্লীতে মোড়া। ভিতরকার পদার্থ সাধারণত কোষের উপাদানের সংস্পর্শে আসে না। কিন্তু যদি কোনো কারণে এসে যায় তাহলে কোষে ভাঙন ধরাতে পারে। এমন বহু ভিটামিন ও হরমোনের কথা বিজ্ঞানীদের জানা আছে যেগুলো ঝিল্লীকে সচ্ছিদ্র করে তুলতে পারে, আবার এমন কিছুও আছে যেগুলো উল্টোটি ঘটিয়ে থাকে। কোনো কোনো বিজ্ঞানী অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, কোষ বুড়ো হয় লাইসোসোমের পেটিকা ফেটে গিয়ে ভিতরকার পদার্থ বেরিয়ে আসার ফলে। এই মতটি যদি সঠিক হয় তাহলে এমন ওষুধের সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে যার সাহায্যে ঝিল্লী অটুট থাকবে। তখন আর বয়স বাড়লেও মানুষ বুড়ো হবে না।

সম্ভাব্য কারণ এখানেই শেষ নয়। কোষ যে টিসু-ব্যবস্থার ওপরে স্থাপিত সেখানে নানা গন্ডগোল দেখা দিতে পারে এবং সেটাও হতে পারে অন্যতম কারণ। বুড়ো হলে চামড়া কুঁচকে যাওয়ার ব্যাপারটিও হয়তো এই গন্ডগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা এখনো পথ হাতড়াচ্ছেন। কোথাও কোথাও পথের কিছুটা আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, এমনকি কিছুটা অগ্রগতিও। আশা করা চলে, এমন দিন আসবে যখন বুড়ো হওয়া বন্ধ করার ওষুধ অ-লভ্য থাকবে না। তখন মানুষের বয়স বাড়বে কিন্তু মানুষ বুড়ো হবে না।

এখানে একটি বিষয়ে স্পষ্ট করে বলার আছে। কোনো বিজ্ঞানী কখনো বলেন নি যে মানুষকে অমর করা যাবে বা তার আয়ু আরো বাড়ানো যাবে। বিজ্ঞানের দিক থেকে তা সম্ভব নয়, সামাজিক দিক থেকে তা প্রযোজনীয়ও নয়। বিজ্ঞানীরা চান, মানুষের পরমায়ু এখন যা আছে তাই থাকুক কিন্তু মানুষ বুড়ো হোক আরো অনেক দেরিতে। মানুষের যেটা মধ্যবয়স—যখন মানুষ যথেষ্ট কর্মক্ষম থাকতে পারে এবং বুড়োবয়সের রোগপীড়ায় ভোগে না—এই বয়সটা বহুকাল বজায় থাকুক। বিজ্ঞানীদের প্রয়াস সফল হলে আমরা তখনো এখনকার মতোই বছর সত্তর বাঁচব কিন্তু সেই বাঁচাটা হবে অনেক বেশি আনন্দের, অনেক বেশি কর্মতৎপরতার।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ একাশি বছর বয়সেও বুড়ো হন নি। বরং কবিতা লিখে কবুণা করে গিয়েছেন সেই অভাগাকে যে বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে মরে। বয়স হলেও বৃদ্ধ হননি এমন মানুষের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আরও আছে (আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও এমনি আরো কয়েকজন)। এমনকি আমাদের দেশের যে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ী হতেন তাঁদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ পেরিয়েও কেউ কেউ তারুণ্য ও লাবণ্যমণ্ডিতা থাকছেন।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানীদের গবেষণা সফল হবার আগেই বুড়ো না হবার রহস্য অনেকের জানা। তাঁদের শরীরের কোষ আশিতেও অটুট, পঞ্চাশ পেরিয়েও তাজা। জেনেশুনে এ-ব্যাপারটি তাঁরা ঘটিয়েছেন তা হয়তো নয়। যেভাবে তাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তার সঙ্গে এ-ব্যাপারটির সম্পর্ক থাকার কথা। যাঁদের বয়স হয়েছে বা হচ্ছে তাঁরা এই দিকেও নজর দিতে পারেন।

*

বাতাস-চালিত টারবাইন

মানুষের ইতিহাসে বাতাসের শক্তি কাজে লাগাবার দৃষ্টান্ত প্রচুর—সেই প্রাচীন কাল থেকে এখনো পর্যন্ত। তবে একটানা নয়, মাঝেমধ্যে ছেদ পড়ে এমনসব কাজ চালানোর জন্যে—যেমন, গম বা দানাশস্য ভাঙার জন্যে যাঁতাকল চালনা, জল তোলার জন্যে পাম্প চালনা ইত্যাদি। এসব কাজে শুধু যে ছেদ পড়ে তাই নয়, খুব বেশি শক্তিরও প্রয়োজন হয় না। ভারী যন্ত্র বা একটানা চলা চাই এমন যন্ত্র চালনার জন্যে বাতাসের শক্তি কাজে লাগাবার কথা এতদিন ভাবা হয়নি। সেজন্যে কয়লা বা তেল পোড়ানোকেই প্রশস্ত মনে করা হয়। কিন্তু এখন যখন শোনা যাচ্ছে যে কয়লা বা তেল পুড়িয়ে কলকারখানা চালাবার ফলেই নাকি পৃথিবীর বাতাস এতখানি দূষিত, তখন বাতাসের শক্তি কয়লা বা তেলের স্থান নিতে পারে কিনা সেটা একটা ভাববার বিষয়। আর সম্প্রতি এ-ব্যাপারে আরো সুবিধে হয়ে গিয়েছে খুব শক্তপোক্ত অথচ খুব হালকা উপকরণ আবিষ্কৃত হবার ফলে, যার দরুন ভারী কাজ করবার জন্যেও যন্ত্র তৈরি হতে পারে হালকা উপকরণে। আর যন্ত্র বাঁধ

ভারতের রাজ রন্ট্রি ও কানাডার পিটার সাউথ এই বাতাস-চালিত টারবাইনটি তৈরি করেছেন। এটি খাড়া দণ্ডের চারদিকে ঘোরে, বাতাসের শক্তিকে টারবাইনে পৌঁছাবার জন্যে কোনোরকম চাকা ও গীয়ারের প্রয়োজন হয় না।

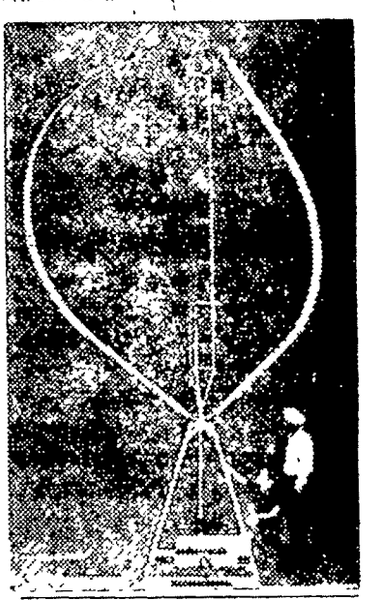

হালকা হয় তাহলে বাতাসের শক্তিতে চালিত হতে না পারার কোনো কারণ নেই।

বিদ্যুৎ তৈরির জেনারেটর কি হাওয়া-কলে চলতে পারে? বিদ্যুতের চাহিদা, কি উন্নত কি উন্নয়নশীল, সবদেশেই বাড়ছে; অথচ মজুদ তেল কমছে। অনেক দেশেই বিজ্ঞানীরা তাই ভাবছেন, হাওয়া-কলে জেনারেটর চালিয়ে বিচ্ছিন্ন এলাকার জন্যে প্রয়োজনীয় অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় কিনা। দূর এলাকার কোনো বসতিতে বা সামরিক শিবিরে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রে এমনিভাবে বিনা কয়লায় বিনা তেলে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করাটা অবাস্তব ব্যাপার নাও হতে পারে।

চেষ্টা শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। আমেরিকানরা তৈরি করেছিল হাওয়া-কল চালিত সবচেয়ে বড়ো জেনারেটর (১২৫০ কিলোওয়াট)। কিন্তু একশো ঘন্টা চলবার পরেই হাওয়া-কলের ব্লেডে চিড় ধরে যেতে জেনারেটর বন্ধ করতে হয়েছিল। বাতাস-চালিত টারবাইন আরো দু-একটি সে-সময়ে যা তৈরি হয়েছিল কোনোটাই সফল হয়নি।

এখন ইঞ্জিনিয়ারদের প্রত্যয় হয়েছে, আমাদের জ্ঞান অনেক উন্নত ও বাতাসের ঝাপটাকে কাজে লাগিয়ে এখন আমরা প্রচুর পরিমাণ শক্তি পেতে পারি।

একটি হাওয়া-কল থেকে কতখানি শক্তি আমরা পেতে পারি তা নির্ভর করে বাতাসের বেগের ওপরে এবং ব্লেডের কতখানি এলাকা বাতাসের দিকে পাততে পারা যাচ্ছে তার ওপরে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, বাতাসের শক্তি আমরা কাজে লাগাতে পারি ২৭ ভাগের ১৬ ভাগ। প্রচলিত হাওয়া-কলে কিন্তু কাজে লাগানোর মাত্রা আরো অনেক কম, কেননা প্রথমত সেখানে ব্লেডের পুরো অংশ বাতাসে পাতা থাকে না এবং দ্বিতীয়ত বাতাসের শক্তিকে যন্ত্রে আনা হয় একাধিক হুইল ও গীয়ারের মাধ্যমে। বাতাসের পুরো শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে যতোখানি পাওয়া যেত, প্রচলিত হাওয়া-কলে তার পনেরো শতাংশের বেশি পাওয়া যায় না। এখন এমন হাওয়া-কল তৈরি হয়েছে যার সাহায্যে ৩৫ শতাংশ পাওয়া যেতে পারে। তবে দেখা দরকার, বাতাসের বেগ যেখানে ঘন্টায় দশ মাইল সেখানে ঘন্টায় পনেরো মাইল বেগসম্পন্ন বাতাসের উপযোগী হাওয়া-কল বসানো না হয়। ইঞ্জিনীয়াররা বলছেন, সিধে পাতের ব্লেড দিয়েও কাজ চলতে পারে এবং তার খরচও খুব কম। তবে বাঁকানো পাতের ব্লেড থেকে কাজ পাওয়া যায় আরো বেশি, যদিও খরচ বেশি।

ইঞ্জিনিয়ারদের পরিকল্পনা থেকে জানা যায়, বাতাস-চালিত টারবাইন তৈরি হতে পারে তিন ধরনের। সবচেয়ে যেটি ছোট তার সাহায্যে ২৫০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে। ব্যাটারি চার্জ করা, টেলিফোন বা রেডিও-টেলিফোন চালু রাখা ইত্যাদি সেসব কাজে শক্তির প্রয়োজন খুবই কম সেখানে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাঝারি আকারের টারবাইনটির সাহায্যে উৎপন্ন হতে পারে ৫০০ থেকে ১০০০ ওয়াট। এটির সাহায্যে আলো জ্বালানো সম্ভব। সবচেয়ে বড়োটির উৎপাদন-ক্ষমতা ১০ থেকে ২০ কিলোওয়াট। এটির সাহায্যে আলো ও হীটার জ্বালানো এবং পাওয়ার-টুল চালানোর কাজ চলতে পারে।

অন্য সমস্যাও আছে। বাতাস কখনো কখনো থেমে যায়, তখন আর হাওয়া-কল চলে না। কাজেই বিকল্প শক্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। ছোট টারবাইনের বেলায় ব্যাটারির সাহায্যেই কাজ চলতে পারে। বড়ো টারবাইনের বেলায় ব্যাটারি অসুবিধা-জনক। সেখানে দিনের বেলা টারবাইন চালু রেখে জল তোলা যেতে পারে পাহাড়ের চূড়োয় আর রাত্রিবেলা সেই জল নামতে পারে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে। তারই তোড়ে চলতে পারে জল-চালিত টারবাইন।

ইঞ্জিনিয়াররা বলছেন, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশগুলির পক্ষে বাতাস-চালিত টারবাইন খুবই উপযোগী। বিশেষ করে সেচের কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি এই উপায়ে একরকম বিনা খরচে পাওয়া যেতে পারে। আমাদের মতো বিরাট দেশে এমন বহু দূরের এলাকা রয়েছে যাকে পাওয়ার-গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা অসুবিধা-জনক। এই সমস্ত এলাকায় বাতাস-চালিত টারবাইনের সাহায্যে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে, খুবই শস্তায়।

আর সেচের কাজের জন্যে তো গোটা দেশ জুড়েই বাতাস-চালিত টারবাইন চালু করতে কোনো বাধা থাকা উচিত নয়। তবে আমাদের দেশ বলেই কথাটা এত সহজে বলা চলে না। অনেকেই হয়তো জানেন, ডঃ কৌশম্বী প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেচের কাজের জন্য সৌর পাম্প ব্যবহার করা হোক। বছরের বেশির ভাগ সময়েই আমাদের দেশে সূর্যের আলো প্রচুর, কাজেই বেশির ভাগ সময়েই (এবং সবচেয়ে প্রয়োজনের সময়ে) সৌর পাম্প চালু থাকতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়নি। আখের ছিবড়ে থেকে (যা আমাদের দেশে কোনো কাজে লাগানো হয় না) জ্বালানী ও সার তৈরির একটা পরিকল্পনাও তাঁর ছিল—তাও কাজে লাগে নি।

যাই হোক, বাতাস-চালিত টারবাইন স্থাপনের প্রস্তাব করছেন সবচেয়ে উন্নত একটি দেশের ইঞ্জিনিয়াররা। হাতে-কলমে করেও দেখিয়েছেন। এই লেখার সঙ্গে একটি রেখাচিত্র ও একটি আলোকচিত্র ছাপানো হল। রেখাচিত্রটি দেখে পাঠকরা বুঝবেন, বাতাস-চালিত টারবাইনে উৎপন্ন বিদ্যুতে প্রায় সবকিছুই হতে পারে এবং বাতাসের বেগ যতো বাড়ে ততো বেশি কাজ করার উপযোগী বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর আলোক-চিত্রটি দেখে পাঠকরা এজন্য খুশি হবেন যে ভারতের একজন ইঞ্জিনিয়ার বিদেশে এই প্রকল্পটি নিয়ে কাজ করছেন।

—অয়স্কান্ত

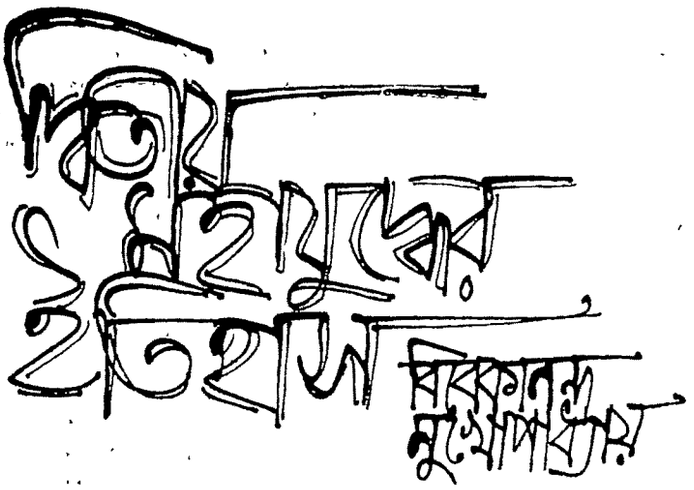

চতুর্থ পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী অভিযান

মালয়-সিংগাপুর এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ যেন এক সামুদ্রিক হিংস্র জন্তুর মত তার অক্টোপাশের বাহু বিস্তার করিল প্রশান্ত মহাসমুদ্রের চতুর্দিকে—১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর থেকে। আর ১৯৪১ সাল ছিল বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের একটি প্রকাণ্ড দুর্বৎসর। ১৯৪১ সালে নাৎসী জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়ার 'অন্তহীন' ভূমিপথে যেভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সেটি যেমন ছিল অভাবনীয়, তেমনি পূর্ব পৃথিবীতে জাপান সাগর, মহাসাগর দ্বীপ, উপদ্বীপ যোজক, প্রণালী, অরণ্য, পর্বত ও তটভূমি ইত্যাদি ডিঙ্গাইয়া যেভাবে দেশদেশান্তরে নিজের হিংস্র থাবা বিস্তার করিল, সেটাও ছিল অভাবনীয়। অর্থাৎ ১৯৪১-৪২ সালের ইউরোপে বা এশিয়া খণ্ডে মহাযুদ্ধের এমন অভিনব 'মহাকাব্যের' রূপ বোধহয় আর কখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই। আর কী বিশাল সাম্রাজ্য জাপানের দখলে আসিল মাত্র ৬ মাসের মধ্যে? ৩০ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত এক মহা-সাম্রাজ্য, আর ১৫ কোটির অধিক অধিবাসীর এলাকা জাপানের জঙ্গী মুঠির মধ্যে আসিয়া গেল! দেশ, জাতি, মানুষ, প্রকৃতি এবং ভূগোলের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য ইউরোপের নব অধিকৃত হিটলারী সাম্রাজ্যেও দেখা যায় নাই। জাপানী অভিযানের এই বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই স্মরণে রাখার মত। কেননা এক অবিস্মরণীয় ভৌগোলিক পটভূমিকা ছিল এই দ্রুতগতি জাপানী অভিযানের পিছনে, যে বৈশিষ্ট্যের কথা লেখা হইয়াছিল অন্তত ৩০ বছর পূর্বে 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে :

'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহা-সাগরের মানচিত্র যদি পাঠকবর্গ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে সহসা মনে হইবে যে, তাঁহারা যেন নিশীথ রাত্রির নভোমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। অসংখ্য ছোটবড় বিন্দু আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মত পূর্ব এশিয়ার তটভূমি হইতে আমেরিকার পশ্চিম তট পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মহাসমুদ্রের বিস্তার এখানে কোথাও ৪ হাজার (টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্কো সাড়ে চার হাজার মাইল), কোথাও বা ৫।৬ হাজার মাইল কিংবা বেশী হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর যেন আকাশের মতই বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্রের মত অসংখ্য দ্বীপ মানচিত্রের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বীপ-গুলি কোথাও বা মৌচাকের মত ঝাঁক বাঁধিয়াছে, কোথাও বা ছায়াপথের মত দ্বীপের সারি বসিয়াছে আবার কোথাও বা বহু দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহের মত একটি আর একটির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় হইতে যদি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত তাকানো যায় তবে মনে হইবে কোন দুষ্ট বালক যেন কলি ছিটাইয়া দিয়া দুরূহ মানচিত্র বিদ্যার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে। দ্বীপগুলি এত কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেঁষি যে বোধহয় বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথের উপর দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিলেই মালয় হইতে অনায়াসে অস্ট্রেলিয়া বা নিউগিনি বা অন্য যে কোন দ্বীপান্তরে যাওয়া যাইবে। মহাসমুদ্রের বুদ্বুদের মত এই দ্বীপগুলি আজ বজ্রসমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে এবং উহাদের বুক আজ বোমায় বিদীর্ণ ও গোলায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এই দ্বীপের সংখ্যা কত, তাহা গণিয়া লাভ নাই। কারণ, একা জাপানেরই নাকি আড়াই হাজার দ্বীপ রহিয়াছে। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এমন মানচিত্র লইয়া ভৌগোলিক সঙ্কটে পড়িবেন।

'তথাপি বলা যাইতে পারে, মালয়, সুমাত্রা ও জাভা যেন তিনটি লম্বা কোদালের মত লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বোর্নিও দ্বীপকে যেন অগ্রভাগ কর্তিত শশার মত উহার পাশেই হেলাভরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। আজিকার জাপ সংগ্রামের পক্ষে ঠিক এই স্থানটিই মর্মঘাতী। মালয় উপদ্বীপ যেখানে সুমাত্রা দ্বীপের মাঝা-মাঝি পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আমাদের বহু বিজ্ঞাপিত ও বহু পরিচিত সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব কোণ ধরিয়া তির্যক রেখা টানিলে ফিলিপাইনে পৌঁছানো যাইবে। এই ফিলিপাইন ও উহার রাজধানী ম্যানিলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমানঘাঁটি।

'কিন্তু সমুদ্রপথের সামরিক ভূগোল এখানেই শেষ হইল না। ম্যানিলা হইতে সোজা পূর্বদিকে সরল রেখা টানিলে গুয়াম্ দ্বীপ পাওয়া যাইবে। বৃটেনের পক্ষে যেমন সিংগাপুর, আমেরিকার পক্ষে তেমনি গুয়াম। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে এই দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধের চরম মীমাংসা এই দুই কেন্দ্রে ঘটিতে পারে। গুয়াম হইতে ঈষৎ ঈষাণ কোণের দিকে রেখা টানিলে ওয়েক দ্বীপ হাতে আসিবে এবং ইহাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি। আবার এখান হইতে একেবারে পূর্বদিকে সোজা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত পার্ল হারবার (পোতাশ্রয়) এবং বাঙালী পাঠকের উদ্ভট কল্পনায় সিঞ্চিত হনলুলুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। হনলুলু হইতে মাত্র আড়াই হাজার মাইলের একখানা লাফ দিতে পারিলেই আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে পৌঁছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে! সিংগাপুর হইতে ম্যানিলা হইয়া যদি স্যানফ্রানসিস্কো পর্যন্ত দীর্ঘ রেখা টানা যায়, তাহা হইলে বোদ্দুলামান সেতুর মত উহা কৌতূহলকর রূপ ধারণ করিবে এবং এই সেতুর এক একটি প্রকাণ্ড ধাপকে বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন জঙ্গী যুদ্ধের এক একটি প্রাণকেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে অবশ্যই পূর্বে এশিয়ার তটভূমিস্থিত হংকং বন্দর এবং উহারই পার্শ্ববর্তী ফরমোসা দ্বীপকে স্মরণে রাখিতে হইবে। কারণ, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের যুদ্ধে ইহারাও নিতান্ত অশান্ত মূর্তি ধারণ করিবে। যুদ্ধকে সহজভাবে বুঝিতে হইলে এই জটিল মানচিত্রের সরল রূপটা চোখের সামনে রাখিতে হইবে।' (১)

---

(১) গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' ১৯৪৩, মার্চ।

কিন্তু উপরের এই রণনৈতিক মানচিত্রের বর্ণনাও সম্পূর্ণ নয়। কেন না, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস এই বর্ণনার সঙ্গে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্যন্ত যোগ করিলে (অর্থাৎ জাপানী আক্রমণের চরম সীমা পর্যন্ত) ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, বঙ্গোপসাগর এবং সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছিতে হইবে। জাপানী আক্রমণের থাবা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

* * *

মেজর-জেনারেল ফুলার বলিতেছেন যে, জাপানের এই আক্রমণাত্মক অভিযান আসলে ছিল অর্থনৈতিক সংগ্রাম। কেন না, ১৯৪১, ২১শে জুলাই জাপান যখন পরাজিত ফ্রান্সের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের দ্বারা ফরাসী উপনিবেশ ইন্দোচীন 'সামরিকভাবে' দখলের জন্য সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইল, তখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জাপানকে প্রতিনিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে জাপানের ৩৩ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের অর্থনৈতিক সম্পদ 'ফ্রীজ' বা আটক করিলেন এবং বৃটিশ ও ওলন্দাজ সরকারও জাপানের বিরুদ্ধে অনুরূপ অর্থনৈতিক শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ফলে, তখন থেকেই জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু হইয়া গেল এবং 'এবই পাল্টা প্রতিরোধ হিসাবে জাপানের পক্ষেও যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল না।'

এই অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রসঙ্গ মিলিবে 'আক্রমণের উদ্বোধনের' পূর্ব মুহূর্তে সামরিক অধিনায়কদের নির্দেশের মধ্যে। যেমন আর্মি ও নেভির প্রধান সেনাপতিদ্বয়ের হুকুমনামায় এই কথাগুলি ছিল :

'বৃটেন ও আমেরিকা আমাদের শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যের পথ সকল প্রকার উপায়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক চূড়ান্তরূপে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। ফলে, আমাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়াছে। . . এই অবস্থায় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ না করিয়া উপায় নাই।' (২)

অতএব জাপান অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়া আক্রমণ করিতে গেলে নৌবহর ও বিমানবহর ছাড়া উপায় কি? পার্ল হারবারের উপর বিমানবাহী জাহাজ থেকে টর্পেডো-বোমারু ও ছোঁমারা বিমানযোগে হানা দিয়া এই আক্রমণের বোধন করা হইল এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই যুদ্ধে মূলতঃ বিভিন্ন দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটি, বিমানবহর ও নৌবহর প্রাধান্য অর্জন করিল।

'জাপানের এই রণনৈতিক পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ ছিল মালয়, ব্রহ্মদেশ, সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও দখল করা। কেন না, শ্রমশিল্পের উৎপাদনে জাপানের স্বয়ম্ভরতা অর্জন করার পক্ষে এই দেশগুলি দখল করার প্রয়োজন ছিল। কেবল তাই নয়, যদি শেষ পর্যন্ত চীন থেকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়, তবে, এই দেশগুলির সম্পদই সেই ক্ষতি পূরণ করিবে।

'এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য যুদ্ধের সময় ফিলিপিন্স, সেলিবিস ও নিউগিনি দখল না করিয়াও উপায় ছিল না। কেন না, এর দ্বারা জাপানের পূর্ব পার্শ্বদেশ নিরাপদ হইবে এবং যদি আমেরিকার সঙ্গে কোন আপোষফায়সলাক শান্তি চুক্তি ঘটে, তবে, এই দেশগুলির বিনিময়ে দরকষাকষি করা যাইবে।'

'এই আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া ('অফেনসিভ অপারেশন') মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। জাপানী আর্মি বা সৈন্যবাহিনীর উপর ভার দেওয়া হইল মালয়, ব্রহ্মদেশ সুমাত্রা ও লুজন (উত্তর ফিলিপিন্স) দখলের জন্য। আর নৌবহরের উপর দায়িত্ব দেওয়া হইল পার্ল হারবারের উপর হানাদারি এবং দক্ষিণ ফিলিপিন্স, বোর্নিও, সেলিবিস, জাভা, নিউগিনি, বিসমার্ক, সলোমোন, গিলবার্ট, গুয়াম এবং ওয়েক—এই সমস্ত দ্বীপ অধিকারের জন্য। এই আক্রমণের সবচেয়ে বড় উপাদান গতিবেগ বা স্পীড। অতএব বিমানবাহিনীই ছিল সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।' (৩)

আর সংখ্যায় এবং আক্রমণের দক্ষতায় জাপানী বিমানবাহিনী গোড়ার দিকে ইঙ্গ-মার্কিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১, যখন জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে পার্ল হারবারের উপর আঘাত হানিল, তখন হাওয়াই দ্বীপ থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাদের হাতে ছিল মোট ২৬২৫টি বিমান এবং সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, জাপানী বিমান বাহিনী জাপানের স্থল ও নৌবাহিনীর অঙ্গীভূতরূপেই বা শাখা-রূপেই পরিচালিত হইত। অর্থাৎ এই বিমানবহর কোন আলাদা 'রণনৈতিক হাতিয়ার' হিসাবে স্বাধীন ও পৃথকভাবে পরিচালিত হইত না—(বৃটিশ বা মার্কিন বিমানবহর স্বাধীন ও পৃথকভাবে পরিচালিত হইত)।

এই সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে —পার্ল হারবার থেকে অস্ট্রেলিয়া-মালয় পর্যন্ত মার্কিন-বৃটিশ-ওলন্দাজ বা মিত্রপক্ষের হাতে ছিল মোট ১২৯০টি প্লেন এবং এগুলির অধিকাংশই ছিল আবার সেকেলে অকেজো ধরণের। (৪)

বিমানে যখন ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ দুর্বল ছিল, তখন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-শক্তিতে মিত্রপক্ষের কি অবস্থা ছিল? সেই সময় বৃটিশ, মার্কিন, ওলন্দাজ—এই তিন পক্ষের মিলিত নৌশক্তি ছিল—বড় যুদ্ধ জাহাজ ১১, বিমানবাহী জাহাজ ৩, বড় ক্রুজার ১৪, হাল্কা ক্রুজার ২২, ডেস্ট্রয়ার ১০০ এবং সাবমেরিন ৬৯ খানা।

আর জাপানের ছিল বড় যুদ্ধ জাহাজ ১০, বিমানবাহী জাহাজ ১০, বড় ক্রুজার ১৪, হাল্কা ক্রুজার ১৮, ডেস্ট্রয়ার ১১৩ এবং সাবমেরিন ৬৩ খানা।

বাহ্যিক বিচারে উভয় পক্ষই প্রায় সমান সমান ছিল বটে, কিন্তু গুণগত ও অন্যান্য দিক দিয়া জাপান শ্রেষ্ঠ ছিল ও সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। যেমন, জাপানের বিমানবাহী জাহাজের ও বিমান-বহরের শক্তি বেশী ছিল। ফলে, আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে বিমানশক্তি সে বেশী প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিল। আর হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান ছিল মিত্রপক্ষের ঘাঁটি-গুলির মধ্যে, যেমন পার্ল হারবার ও সিঙ্গাপুর এই দুই ঘাঁটির মধ্যে সমুদ্রপথের দূরত্ব ছিল ৬ হাজার মাইল। অপরপক্ষে জাপানের যুদ্ধ জাহাজগুলি অনেক বেশী আধুনিক, বেশী অস্ত্রসজ্জিত এবং অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন ছিল। একমাত্র বৃটেনের 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এই দিক দিয়া উৎকৃষ্টতর জাপানী বড় যুদ্ধ জাহাজের সমকক্ষ ছিল। (৫)

জাপানের যে সৈন্যবাহিনী বা আর্মি ছিল, তার মোট সংখ্যা ছিল ৫১ ডিভিসন। এর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহা-সাগরীয় যুদ্ধে সে মাত্র ১১ ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। অর্থাৎ আড়াই লক্ষের কিছু কম 'লড়িয়ে সৈন্য' বা ফাইটিং গ্রুপস নিয়োগ করা হইয়াছিল। তবে, সৈন্যবাহিনীর প্রশাসনিক লোকজনসহ এই সংখ্যা মোট প্রায় ৪ লক্ষ দাঁড়াইতে পারে। জাপানীদের মতে বৃটিশ পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল হংকংয়ে ১১ হাজার, মালয়ে ৮৮ হাজার, বর্মাতে ৩৫ হাজার—মোট ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। আর আমেরিকানদের ছিল ফিলিপিন্সে মার্কিন সৈন্য ৩১ হাজার, ফিলিপিনো সৈন্য ১ লক্ষ ১০ হাজার, ডাচ ২৫ হাজার, আর স্থানিক কাহিনী বা মিলিশিয়া ৪০ হাজার।

উভয় পক্ষের এই রণনৈতিক অবস্থান ও সামরিক শক্তি বিবেচনা করিয়া ক্যাপ্টেন

(2) The Second World War— 1939-1945 P. 128

(3) The Second World War — Maj. General Fuller P. 132.

(4) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক। পৃষ্ঠা ১৩২।

(5) History of the Second World War — Liddell Hart, P 208

কখনো কখনো কাজের কথা ভাবতে ওঁর ইচ্ছাই হ'তো না

তখন উনি খেতে শুরু করলেন

ভিনকোলা-১২ আয়রন-ভিটামিন টনিক

এখন ওঁকে দেখুন! কাজে কতো উৎসাহ, মনে কতো ফুর্তি!

কখনো কখনো আপনারও নিশ্চয় মনে হয় শরীরে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই। তখন আপনার জন্যে দরকার ভিনকোলা-১২··· সুস্বাদু আয়রন-ভিটামিন টনিক যা আপনাকে প্রফুল্ল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ক'রে তুলবে।

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল্‌স লিঃ

Shilpi-SPL 1A/73 ben

লীডেল হার্ট মন্তব্য করিতেছেন যে, জাপানের পক্ষে এই ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযান একটা দুঃসাহসিক জুয়াখেলার সমান ছিল। তবে, আক্রমণের প্রারম্ভে তার সুবিধা ছিল অনেকরকম এবং তার সবচেয়ে যে বড় বিপদ ঘটিতে পারিত মার্কিন নৌবহরের পক্ষ থেকে, সেই বিপদ দূর করার জন্য সে গোড়াতেই পার্ল হারবারের উপর আঘাত হানিল। এডমিরাল ইয়ামামোতো ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে যখন সমগ্র জাপানী নৌবহরের প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন, তখনই তিনি অতি দ্রুত অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করিলেন। কারণ, তাঁর মতে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌবহর ছিল জাপানের গলার কাছে উদ্যত ছোরার মত।

প্রশান্ত মহাসাগরের বহুদূরে বিস্তৃত এলাকায় আক্রমণ করিতে হইবে বলিয়া এই অভিনব অভিযানের টাইম টেবিল নির্ধারিত হইল গ্রীনউইচ মীন টাইম অনুসারে। কারণ, হাওয়াইতে যখন ৭ই ডিসেম্বর, মালয়ে তখন ৮ই ডিসেম্বর! (৬)

লীডেল হার্ট বলিতেছেন—জাপানী রণনৈতিক পরিকল্পনা দুইরকম উদ্দেশ্যে প্রতি নজর রাখিয়া রচিত হইয়াছিল—আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক। অধিকৃত অর্থনৈতিক সম্পদ রক্ষা করা ও সাফল্যের সঙ্গে আমেরিকার চ্যালেঞ্জের (জাপান জানিত যে, আমেরিকার শক্তি অনেক বেশী) সম্মুখীন হওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে জাপানের কোন ভয়ের কারণ ছিল না। কেননা, গোটা ইউরোপ ছিল অক্ষশক্তিবর্গের পদানত আর সেই মুহূর্তে রাশিয়া ছিল জার্মানীর সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন। অতএব জাপান যদি উত্তরে অলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত আংটির মত একটি বিরাট বেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারে, তবে, আমেরিকা সেই বেষ্টনী ভাঙিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত জাপানের এই নূতন দখলদারি এবং বহুতর পূর্ব এশিয়ার তার 'কো-প্রোসপারিটি' পরিকল্পনা মানিয়া নিতে বাধ্য হইবে। তদনুসারে চিটলারও চাহিয়াছিলেন রাশিয়ার আর্চেঞ্জেল থেকে অস্ট্রিয়ান পর্যন্ত একটি আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষার বিরাট পাঁচীর গড়িয়া তুলিতে।

নৌ ও বিমানবাহিনীর অসাধারণ কৃতিত্ব ও দুঃসাহস এবং সেই সঙ্গে জাপানী ধর্মের ও কৃচ্ছ্রসহিষ্ণুতার আশ্চর্য দৃষ্টান্ত দেখাইল জাপানী সৈন্যেরা। নিঃসন্দেহে এর পিছনে ছিল দীর্ঘদিনের সযত্ন প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনীর সযত্ন প্রশিক্ষণ। বৃটেন বা আমেরিকা জাপানের এমন আকস্মিক বিদ্যুৎগতি আক্রমণের জন্য যেমন সামরিকভাবে প্রস্তুত ছিল না, তেমনি তারা জাপানী সামরিক শক্তিকেও তুচ্ছ করিয়াছিল।

ইংরাজীতে তখন A B C D Powers কিম্বা আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ নামে যারা পরিচিত ছিল, তাদের সবলের বিরুদ্ধে জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এমন ধারণা লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে ছিল না। সুতরাং পার্ল হারবার আক্রমণে বিস্ময়-বিহ্বল প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিকে মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই, আরও নাটকীয় এবং আরও চমকপ্রদ খবর পাওয়া গেল—দুইটি ভগ্নিকায় বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়া খবর। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪১, 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস' নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিল সিঙ্গাপুরে নৌ দুর্গের ঘাঁটিতে। মালয় উপদ্বীপে জাপানীদের অবতরণ ও অগ্রগমন রুখিয়া দেওয়াই ছিল এই দুইটি বাটিকা বহরের উদ্দেশ্য। তার হাতের টেনে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' বাটলশিপ এবং ৩১ হাজার টনের বাটল-ক্রুজার 'রিপালস' যেন সমুদ্রের ভাসমান বিশাল নৌ-দুর্গের মত ছিল। এতে ১৪ ইঞ্চি ও ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের কামান ও অস্ত্রসজ্জা যেমন ছিল, তেমনি ১৬ ইঞ্চি পুরু ইস্পাতের বর্মের দ্বারা 'প্রিন্স অব ওয়েলস' যুদ্ধ জাহাজের দুই পার্শ্বদেশ আচ্ছাদিত ছিল। প্রায় সিঙ্গাপুরে নৌ-দুর্গের মতই এই দুই জাহাজ দুইটিও 'দুর্ভেদ্য' এবং সমুদ্রে ওদের নিমজ্জন 'অসম্ভব' বলিয়া 'বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল। কিন্তু এই অসম্ভবও সম্ভব হইল জাপানী বোমারুদের দুঃসাহসিক আক্রমণ এবং অত্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যভেদের ফলে।

১৯৪১, ৮ই ডিসেম্বর মালয় উপদ্বীপে জাপানীদের অবতরণের খবর পাওয়া মাত্র দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এডমিরাল স্যার টম ফিলিপস দুইটি ভগ্নিকায় যুদ্ধজাহাজ নিয়া জাপানীদের মোকাবিলা করার জন্য রওনা হইলেন। তিনি সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু অনভিজ্ঞ ছিলেন। বিমানবহরের উপযুক্ত পাহারা ছাড়া এত বড় যুদ্ধ জাহাজ নিয়া যে শত্রুর ঘাঁটির কাছি যাইতে নাই, আধুনিক নৌ-যুদ্ধের এই মূল তথ্য তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। (৭)

ফলে, মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। যখন সিঙ্গাপুর থেকে এই নৌবহর মাত্র ১৫০ মাইল এবং মালয় উপকূল থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে ছিল তখন জাপানী পর্যবেক্ষণকারী বিমান এদের সন্ধান পাইল। খবর পাইয়া জাপানী বোমারুর দল বৃটিশ নৌবহরকে ধরিয়া ফেলিল। শত্রু পিছনে লাগিয়াছে টের পাইয়া 'প্রিন্স অব ওয়েলস' এবং 'রিপালস' সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের দিকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে লাগিল ঘণ্টায় ৩০ নট (সামুদ্রিক মাইল) বেগে গতিতে। কিন্তু পরদিনে অঘটন ঘটিল।

দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের রিপোর্ট প্রচারযন্ত্রের এই যুদ্ধে অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেই দুটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মিঃ পিটার ওয়ালটন সিঙ্গাপুর থেকে বেতারযোগে লণ্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রে এই মর্মে কথা পাঠাইলেন—

'এডমিরাল ফিলিপস সিঙ্গাপুর থেকে জাহাজ দুটি নিয়ে যাত্রা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল জাপানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি উত্তর মালয়ে ও দক্ষিণ থাইল্যান্ডে, যেখানে জাপানীরা অবতরণ করছে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবেন। আবহাওয়া প্রথম দিকে আমাদের সহায়ক হয়েছিল। বৃষ্টি ও মেঘের আড়াল ধরে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু মঙ্গলবার অপরাহ্নে সূর্যাস্তের কিছু আগে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সময় একখানি জাপানী পর্যবেক্ষণকারী বিমান যুদ্ধ জাহাজটিকে লক্ষ্য করে গেল। 'রিপালস' থেকে লাউডস্পীকারযোগে কমাণ্ডারের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'শত্রুবিমান আমাদের ছায়ার মত অনুসরণ করছে।' খানিক পরে ঘোষণা করা হলো যে, যে লড়াইয়ের জন্য আশা নিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম তা ত্যাগ করা হলো এবং যুদ্ধ জাহাজ সিঙ্গাপুরে ফিরে যাচ্ছে।

'পরদিন সারা রাত ধরে জাহাজ দুটি বাহির সমুদ্রে চলতে লাগলো। পরদিন সকালে আরও পর্যবেক্ষণকারী জাপানী বিমানের আবির্ভাবের পর বোমারুর দল দেখা দিল।

'বোমারুগুলি ঝাঁক বেঁধে এলো, অধিকাংশই টর্পেডো নিক্ষেপ করলো। আমি যতটা দেখতে পেয়েছি, তাতে মনে হলো যে, একটিমাত্র বোমাই একটা জাহাজে পড়েছিল। কিন্তু এর দ্বারা খুব একটা মারাত্মক ক্ষতি হয় নি। তবে, টর্পেডোগুলিই আসল ক্ষতি করছে। মোট ৬০ খানা জাপানী বিমান এসেছিল, ১৭ হাজার ফুট বা ৩ মাইলেরও অধিক ঊর্ধ্ব থেকে (মতান্তরে ১০ হাজার ফুট উপর থেকে—লেখক) তারা আক্রমণ করে। 'প্রিন্স অব ওয়েলসের' উপর তিনঘণ্টা ধরে আক্রমণ চালানো হয়। জাপানী টর্পেডো বিমানগুলি বন্ধুজাহাজ দুটির গতিপথে টর্পেডো ছুঁড়তে থাকে। 'প্রিন্স অব ওয়েলস' সিগন্যালযোগে 'রিপালস'কে জিজ্ঞাসা করে যে সে আহত হয়েছে কিনা?

'উত্তরে 'রিপালস' বলে, এই পর্যন্ত ১৯টি টর্পেডো এড়িয়েছি। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ!'

(৬) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২০৮, ২০৯, ২১০।

(7) The War — 1939-1945 — L. Snyder P. 275.

কলম্বিয়া বেতারের সিসিল ব্রাউন নিউইয়র্ককে বার্তা পাঠাইলেন—

'মালয়ের তীর থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ চীন সাগরে যখন জাপানীদের দুরন্ত আক্রমণে বলতাণী 'বিপালস' ডুবে যায়, তখন আমি ওর আরোহী ছিলুম। জলের উপর পড়ে পেট্রোলের (জাহাজ থেকে নির্গত) ভিতর দিয়ে যখন সাঁতার কাটছিলুম, তখন আধ মাইল দূরে 'প্রিন্স অব ওয়েলস'কেও সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যেতে দেখলুম। একারের মহাযুদ্ধে বৃটিশ নৌ-বহরের এত বড় সাংঘাতিক ক্ষতি আর হয়নি। 'বিপালস' যখন একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছিল, তখন অন্যান্য শত শত লোকের মত আমিও ২০ ফুট লাফ দিয়ে জলের উপর পড়লুম এবং পেট্রোলমিশ্রিত জল যাতে নাকে-মুখে না ঢোকে ও বিস্ফোরণের ধাক্কা না লাগে, তার জন্য যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সাঁতার দিয়ে যেতে লাগলুম। ইতালীর ট্যারান্টোতে* বৃটিশ বৈমানিকরা যে দুঃসাহসিকতার সহিত ইতালীয় নৌবহর আক্রমণ করেছিল, জাপানীরাও ঠিক তেমন দুঃসাহসের সঙ্গে খুব কাছে এসে আক্রমণ করলো। ৫০০ গজ দূরে দেখলুম ৬ খানা জাপানী প্লেন গুলীবিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে সমুদ্রে পড়ে যাচ্ছে। এডমিরাল স্যার টম ফিলিপস ও ক্যাপ্টেন লীচকে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' জাহাজের রেলিঙ থেকে জলে গড়িয়ে পড়তে দেখলুম—সেই শেষ দেখা!

'বিপালসের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম টেন্যান্ট রক্ষা পেয়েছিলেন। তখন স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, 'রিপালস' ডুবছে এবং কামান-সমূহের ধারে অনেকগুলি মৃতদেহ পড়ে আছে, তখন আমি ফ্ল্যাগ ডেকের উপরে দাঁড়িয়েছিলুম। সে-সময় জাহাজের মাইক্রোফোন মারফৎ ক্যাপ্টেন টেন্যান্টের নির্দেশ শুনা গেল।

'All hands on deck Prepare to abandon ship. God be with you'

—'সকলে ডেকের উপর যাও। জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।" কারুর কোন ত্রাসের ভাব ছিল না। এক-একটি আঘাতে 'রিপালসে'র আয়ু শেষ হয়ে আসছিল এবং প্রতি আঘাতেই প্রত্যেকটি মানুষ শান্ত ও স্থির চিত্তে স্ব স্ব কাজ করছিল। আমার স্নাতের খাতা রক্ষা পেয়েছিল। তবে, সেগুলি তৈলসিক্ত হয়ে গেছিল। একটা ডেস্ট্রয়ার আমাদের তুলে নিল। কিন্তু অনেকের মত আমিও সম্পূর্ণ উলঙ্গ হলাম। কারণ, তেলের জন্য জামাকাপড় সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই জাহাজডুবির করুণ দৃশ্য ভোলবার নয়। 'রিপালস' থেকে যখন মাত্র ৫০ ফুট দূরে ছিলুম, তখন বজ্রাঙ্ক বীভৎস ক্ষতের মত ওর হালটা একবার ঊর্ধ্বে উঠলো এবং অতি দ্রুত অতলে তলিয়ে গেল! 'প্রিন্স অব ওয়েলস' একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছিল। রক্তবর্ণটি মিনিট দশেক আন্দোলিত হলো। একটা বিরাট দৈত্যের খোঁড়া পায়ের মত ওর একটা অংশ ঊর্ধ্বোত্থিত দেখা গেল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল!' (৮)

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালের পরিষ্কার সূর্যালোকে জাপানী বোমারু দলের দুঃসাহসিক আক্রমণের ফলে বৃটিশ নৌবীর গৌরব এবং ভীমকায় যুদ্ধজাহাজ দুটি মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রগর্ভে সমাধিলাভ করিল। মালয়ের অদূরবর্তী সমুদ্রে এই ভয়াবহ কাণ্ড ঘটিল এবং এই অঞ্চলের নৌ-আত্মরক্ষার প্রাচীর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সিপাই, লস্কর ও অফিসারসহ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপলস্ জাহাজ দুটিতে মোট প্রায় ৩ হাজার লোক ছিল। প্রধান নৌ-সেনাপতি স্যার টম ফিলিপস এবং ক্যাপ্টেন জে সি লীচসহ ৬ শতাধিক লোক সমুদ্রে প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুই হাজার তিনশতজনকে উদ্ধার করা হইল।

বৃটিশ রয়েল নেভীর অতিকায় এই দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ-জাহাজের এভাবে ডুবির খবর মিত্রপক্ষীয় মহলে যতই দুর্ভাবনা, অসম্মান বোধ এবং আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়া থাকুক না কেন, সেদিন পরাধীন ভারতে কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে চাপা উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য মহাযুদ্ধের সেই অস্বাভাবিক দিনে সংবাদপত্রে বা প্রকাশ্যে এই উল্লাস প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী পূরণে অসম্মতির জন্য বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জনগণের স্বভাবতঃই তীব্র বিরোধিতা ছিল এবং সেজন্য জাপানের হাতে ইংরাজের মার খাওয়ার ফলে জনগণ যেন খানিকটা তৃপ্তি বোধ করিতেছিল!

বলা বাহুল্য যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে প্রায় বসিয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তার মর্ম্ম এই :

'১০ই ডিসেম্বর সকাল বেলা আমার বিছানার ধারের টেলিফোন বেজে উঠলো। নৌ-সচিবের কণ্ঠস্বর, কিন্তু কণ্ঠস্বর জন্য কিছুটা অস্পষ্ট। তিনি বললেন—'প্রধানমন্ত্রী মহাশয়, আমি আপনাকে জানাতে বাধা হচ্ছি যে, জাপানীরা প্রিন্স অব ওয়েলস্ এবং রিপালস্ ডুবিয়ে দিয়েছে..'

—'আপনি কি নিশ্চয় জানেন যে, এই খবর সত্যি?'

'এই সংবাদ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই।'

'আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ যে, আমি একা ছিলুম। সারা যুদ্ধের মধ্যে আমি আর কখনও সরাসরি এত বড় আঘাত পাইনি। বিছানায় গড়িয়ে শুইয়ে পড়ে এই সংবাদের পরিপূর্ণ ভয়াবহতা (full horror) আমি চিন্তা করতে লাগলুম। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভু এবং আমরা কর্ষিত দুর্বল ও উলঙ্গ!' (৯)

চার্চিলের এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের শক্তি সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে যেন 'উলঙ্গ' হইয়া পড়িয়াছিল। পার্ল হারবার থেকে শুরু করিয়া জাপান একই সঙ্গে হংকং, গুয়াম, ওয়েক, ফিলিপিন্স, থাইল্যান্ড ইতালীতে আক্রমণ চালাইল ও সাংহাই দখল করিল। ৯ই ডিসেম্বর গিলবর্ট দখল, ১০ই ডিসেম্বর দুইটি বিখ্যাত বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ খতম, ১১ই ডিসেম্বর গুয়াম দখল, ১২ই ডিসেম্বর ফিলিপিনের দক্ষিণ সুলুতে অবতরণ, ১৬ই ডিসেম্বর বোর্ণিও দ্বীপের সারাওয়াকে অবতরণ, ১৮ই ডিসেম্বর হংকংয়ে অবতরণ, ২১শে ডিসেম্বর মিন্দানাওতে (ফিলিপিন্স) অবতরণ, ২২শে ডিসেম্বর ওয়েক দ্বীপ দখল, ২৩শে ডিসেম্বর রেঙ্গুনে বিমান আক্রমণ (ফলে কলিকাতা পর্যন্ত আতঙ্কের কিতাব), ২৫শে ডিসেম্বর হংকংয়ের আত্মসমর্পণ এবং ২৬শে ডিসেম্বর ম্যানিলাকে খোলা শহররূপে ঘোষণা—পর পর এই সমস্ত বিষম উত্তেজনাপূর্ণ কাণ্ড ঘটিয়া গেল যেন বিদ্যুৎগতিতে এবং এভাবে ১৯৪১ সাল শেষ হইল।...

---

* ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০ ভূমধ্যসাগরের বৃটিশ বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ থেকে টর্পেডো-বিমানযোগে ট্যারান্টোর ইতালীয় নৌবহরের উপর অত্যন্ত দুঃসাহসিক আক্রমণের দ্বারা পাঁচখানা যুদ্ধজাহাজ ও ২খানা সাহায্যকারী পোতকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

(৮) গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের [illegible]

(9) Churchill — Vol 3, P 551

বেনারসী
সিল্ক ও তাঁতবস্ত্রের
বৈচিত্র্য
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

৪। মালয় ও সিঙ্গাপুরের পতন

ম্যানিলা, হংকং ও সিঙ্গাপুর—এই ত্রিভুজের তিনটি বাহু ছিল দূরপ্রাচ্যের ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তির তিনটি কেন্দ্র-বিন্দুর মত। কিন্তু দ্রুতগতিতে এগুলির পতন ঘটিল।

১৭ দিন অবরোধের পর বৃটিশ ঘাঁটি ও সুবিখ্যাত বন্দর হংকং ১০,৯৪৭ জন সৈন্যসহ জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ফলে, মালয় উপদ্বীপ এবং পৃথিবী-বিখ্যাত বৃটিশ নৌঘাঁটি ও দুর্গ সিঙ্গাপুরের অবস্থাও কাহিল হইয়া পড়িতে লাগিল। মালয়ে এবং সিঙ্গাপুরে উপনিবেশের ঐশ্বর্যে ও বিলাসে লালিত ইংরেজরা বেশ স্ফূর্তিতে ছিল—বিশেষ-ভাবে রাত্রিগুলি কাটাইতেছিল। মদ ও আনুষঙ্গিক উপকরণের কোন অভাব ছিল না। আর প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহা-সাগরের মিলনস্থলে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রহরীরূপে দাঁড়াইয়া ছিল প্রাচ্যের 'জিব্রাল্টার দুর্গের' মত দুর্ভেদ্য সিঙ্গাপুর। অতএব বৃটিশ সামরিক ও অসামরিক মহলে দুশ্চিন্তার, এমনকি বিশেষভাবে রণপ্রস্তুতিরও তাগিদ ছিল না। পৃথিবীর সেরা নৌ-দুর্গরূপে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের নির্মাণকার্য শেষ হয়। প্রতিরক্ষার অস্ত্রসজ্জাসহ মোট খরচ পড়িয়াছিল ৬ কোটি পাউন্ড (মেজর জেনারেল ফুলারের মত অনুসারে)। সিঙ্গা-পুরের পোতাশ্রয়ে বৃহত্তম রণপোত আশ্রয় নিতে পারিত এবং এর উপকূলভাগে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের বৃহত্তম কামান-শ্রেণী সাজানো ছিল—প্রতিরক্ষার দিকে থেকে। তৈলের ট্যাঙ্কগুলি অধিকাংশই ছিল মাটির তলায় এবং তটভূমির অধিকাংশ পাহাড় কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা ছিল। (১০)

কিন্তু জাপানীরা চতুর, দক্ষ ও দ্রুত ছিল। তারা সম্মুখভাগ দিয়া সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হয় নাই—অথচ অস্ত্রসজ্জার মূল লক্ষ্য ছিল সম্মুখভাগ। তারা পিছনের দিক থেকে মালয়ের জঙ্গল দিয়া আগাইয়া আসিল—অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে।

'এই পিছনের দিকে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, দক্ষিণ থাইল্যান্ড থেকে ১১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ এবং যে-পথ ভয়ঙ্কর জঙ্গলে সমাকীর্ণ, সেই পথ দিয়া কোন সৈন্যদলই অসহ্য উত্তাপ ও কষ্ট সহ্য করিয়া আগাইয়া আসিতে পারিবে না। সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, এমন দুরধিগম্য হাঁটা পথ দিয়া জাপানী সৈন্যদের থাইল্যান্ড থেকে সিঙ্গাপুরে পেঁছিতে অন্ততঃ বছরখানেক সময় লাগিবে। আর সমুদ্রপথে সম্মুখভাগ দিয়া সিঙ্গাপুর জয় করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু চার্চিলের বিশ্বাস ছিল যে, সিঙ্গাপুরের পশ্চাৎভাগের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা প্রস্তুতই আছে। কিন্তু আসলে কোন ব্যবস্থাই ছিল না এবং চার্চিল এই কথাটা জানিতে পারিয়াছিলেন মাত্র ১৯শে জানুয়ারী (১৯৪২) তারিখ জেনারেল ওয়েভেলের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক টেলিগ্রাম থেকে। একথা সত্যই অবিশ্বাস্য ছিল যে, সিঙ্গা-পুরের বৃটিশ সেনানীদের মধ্যে কাহারও মাথায় এই প্রতিরক্ষার প্রশ্নটা আদৌ আসে নাই, এমনকি সেই সম্পর্কে তাঁরা কোন রিপোর্টও দেন নাই। এজন্যই জাপানী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে এত অপ্রত্যাশিত সুবিধা ঘটিয়াছিল।'

—উপরের এই কথাগুলি বলিয়াছেন (সংক্ষেপে উদ্ধৃত) সিঙ্গাপুরের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধের জাপানী পক্ষের অন্য-তম সেনানী কর্ণেল মাসানোবু তিসুজি, যিনি সামরিক পরিকল্পনায় একজন নির্দেশক ছিলেন। (১১)

ব্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত বা দক্ষিণতম প্রান্ত থেকে মালয় উপদ্বীপ যেন দীর্ঘ পুচ্ছের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই পুচ্ছের সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়াছে থাই-ল্যান্ড বা শ্যামদেশের সরু এক ফালি জমি। জাপানী সৈন্যবাহিনী জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে থাইল্যান্ডে এবং মালয়ের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলভাগে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে পেনাং, মেলাংগড়, সিঙ্গোরা, কোটা-বারু, কুয়ালটান ইত্যাদি দখল করিয়া একে-বারে সিঙ্গাপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মাত্র ৫৫ দিনের মধ্যে গোটা মালয় উপদ্বীপ জাপানীরা সাম্রাজ্যবাহিনীর হাত থেকে ঝাড়িয়া লইল। জাপানীরা মালয় আক্রমণে জঙ্গল যুদ্ধের এবং অনুপ্রবেশের যে কৌশল দেখাইতে লাগিল, তার তুলনা নাই। জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ বা infiltration এবং পার্শ্ব-দেশ বেষ্টন বা outflanking জাপানীদের এই রণকৌশল তখনকার দিনের পৃথিবীতে নূতন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল এবং মালয়রক্ষী সাম্রাজ্যবাহিনী কোথাও দাঁড়াইতে বা আত্ম-রক্ষা করিতে পারিল না। এই রণদুর্মদ জাপানী সৈন্যেরা অত্যন্ত সাহসী, চতুর, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কষ্টসহিষ্ণু ছিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিবার সময় তাদের রেশন (বরাদ্দ খাদ্য) ছিল ভাজা বা শুকনো ভাত এবং এভাবে দিনের পর দিন তারা অরণ্য-অভিযানে অভ্যস্ত ছিল। কষ্ট সহ্য করার দিক থেকেও তাদের তুলনা ছিল না।

কিন্তু এই অভিনব জঙ্গল-যুদ্ধে বিভ্রান্ত, বিহ্বল এবং ক্লান্ত ও পরাজিত হইয়া সাম্রাজ্যবাহিনী একেবারে সরিয়া গেল দক্ষিণদিকে জোহোর বারুতে যেখানে শুরু হইয়াছে সিঙ্গাপুরের সীমানা। সেখানে ৩১শে জানুয়ারী মালয় যুদ্ধের অবসান ও সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম শুরু হইল।

মালয়ের ঐশ্বর্য অপরিমিত। রবার, টিন, সোনা ও লোহার খনি, চাউল এবং কাঠ ইত্যাদির যে প্রলোভনে একদা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই উপদ্বীপ করায়ত্ত করিয়াছিল, ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে নূতন জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সেটাকে যেন থাবা মারিয়া কাড়িয়া লইল। তারপর যে সিঙ্গাপুর দ্বীপ ও নৌ-দুর্গ প্রায় 'অজেয়' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, মাত্র ৭ দিনের যুদ্ধে সেই সিঙ্গাপুরকে 'বিনা-সর্তে' আত্মসমর্পণ করিতে হইল জাপানী আক্রমণকারীদের নিকট! মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়—প্রধানতঃ এই তিন জাতি-গোষ্ঠীরাই ছিল এই উপদ্বীপের বাসিন্দা। মালয়ে এই জনসংখ্যা ছিল ৫৫ লক্ষ এবং সিঙ্গাপুরে ৭ লক্ষ। দৈর্ঘ্যে মালয় ছিল ৭০০ মাইল লম্বা, আর চওড়ায় ১৮০ মাইল এবং সিঙ্গাপুর ২৭ মাইল লম্বা ও প্রস্থে ১৪ মাইল। কিন্তু জাপানী আক্রমণ-কারীদিগকে বাধা দেওয়ার কোন সংকল্প বা ইচ্ছা এই উপদ্বীপের জনগণের ছিল না। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের এটাই ছিল পরিণতি। অর্থাৎ 'প্রভু বদলের' এই খেলায় তারা যেন ছিল নিস্পৃহ দর্শক। কেবল মালয়ে নহে, গোটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতেই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানকে প্রতি-রোধ করার তেমন কোন ইচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে ছিল না। এমনকি যে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটিতে ১২ হাজার শ্রমিক কাজ করিত, যুদ্ধ বাধিবার পর সেখানে ৮ শতের বেশী শ্রমিককে পাওয়া যায় নাই।*

---

(১০) গ্রন্থকার প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' (১৯৪৩)—পৃঃ ১০৫-৬

(11- Decisive Battles of the Second World War — edited by Brigadier Peter Young Arther Barker Ltd., London, 1967, P. 100

*লেখক প্রণীত 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' পৃঃ ১২৯

ঘড়ি
জার্মেনী গহনা
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
এগ্রেলার্স এণ্ড ওয়াচমেকার্স
৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১

অপরপক্ষে মিত্রবাহিনীর মোট সৈন্যশক্তি জাপানীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও উত্তর মালয়ের জঙ্গল থেকে সিঙ্গাপুরের [illegible] কোথাও এরা দাঁড়াইতে পারিল না। এমনকি, সিঙ্গাপুরে কোন প্রত্যাশিত অবরোধ যুদ্ধও ঘটিল না—যদিও অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, অন্ততঃ ৬ মাস এই বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে। উত্তর বা পিনাঙ দিক থেকে সিঙ্গাপুর দ্বীপের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ ঘটিল এবং ৮।৯ই ফেব্রুয়ারী ঘাত্রিবেলা প্রবল গোলাবর্ষণের পর জাহাজ প্রণালী পার হইয়া [illegible] সিঙ্গাপুরের মর্মকেন্দ্রে আঘাত হানিল। পার্শ্ববর্তী ফরাসী ইন্দোচীনের ঘাঁটিগুলি আগেই জাপানীদের দখলে ছিল। সুতরাং মালয় ও সিঙ্গাপুর অভিযানে তারা প্রচুর বিমান-সহযোগিতা পাইল। কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষের তেমন কোন বালাইও ছিল না। ফলে, মিত্রবাহিনীর অবস্থা বিশেষভাবে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল।

অপরদিকে সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির প্রচণ্ড শক্তিশালী কামানসমূহ এবং প্রতিরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল সমুদ্রের দিকে। যে কোন সমুদ্র দিয়া জাপানীদের আক্রমণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু জাপানীরা চতুর রণনীতি রচিয়া লইল বিপরীত পথ, পিছনের মালয়ের জঙ্গল পথ দিয়া তাদের অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ ঘটিল। [illegible] 'অজেয়' নৌ-দুর্গের অস্ত্রসজ্জা ও রক্ষা-ব্যবস্থা বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসিল না। ফলের বহু বিজ্ঞাপিত মাজিনো লাইনের মত এক মর্মান্তিক প্রহসনে পরিণত হইল।—(মেজর জেনারেল ফুলারের ইতিহাস, পৃঃ ১৩২)

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২, সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের পতন ঘটিল এবং লেঃ জেনারেল এ ই পার্সিভাল বৃটিশ অস্ট্রেলিয়ান ও ভারতীয় সৈন্য নিয়ে গঠিত মোট ৮৫ হাজার সৈন্যবাহিনীসহ বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। (এই সৈন্যসংখ্যার মধ্যে ১৫ হাজার ছিল অ-লড়িয়ে)। সিঙ্গাপুরের গবর্নর স্যার সেণ্টন টমাসও সস্ত্রীক জাপানীদের হাতে বন্দী হইলেন।

বৃটিশ সরকারী মতে এই সমগ্র মালয় যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীর [illegible] হত হইয়াছিল ৮৭০৮ জন, কিন্তু বন্দী হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। সিঙ্গাপুর নৌ-দুর্গের এমন 'অপ্রত্যাশিত' ও দ্রুত পতনের ফলে জাপানী পক্ষের প্রধান সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ামামিতা ও জাপানী সেনাবাহিনীর খ্যাতি যেন বিদ্যুৎগতিতে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। জাপানের সমরকর্তৃপক্ষের বিবেচনায় সিঙ্গাপুর জয় 'জাপানের ভাগ্য' এবং 'এশিয়ার বিধানের' যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে সম্রাটের [illegible] প্রসাদে যে অপূর্ব সুন্দর প্রসাদ অজস্র অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল) জেনারেল ইয়ামামিতার সদর ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের পতন সংবাদে টোকিওর ইম্পিরীয়েল দপ্তর উল্লসিত হইয়া উঠিল এবং সম্রাটের অভিনন্দন বাণী তারযোগে আসিয়া পৌঁছিল। জেনারেল ইয়ামামিতা আনন্দে সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—'তোমরা প্রায় একশো দিন চমৎকার লড়াই করেছ। তোমাদের ধন্যবাদ এখন তোমরা প্রাণভরে 'সাকে' (জাপানী মদ্য) পান করতে পারো!'

অতএব সদর দপ্তরে সিঙ্গাপুর জয়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। সৈন্য ও অফিসারেরা দূর থেকে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'উত্তর-পূর্ব' দিকে মুখ করিয়া পানপাত্র ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন। (অর্থাৎ টোকিওর দিকে সম্রাটের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে) কিন্তু সেই মুহূর্তে আর্মি কমান্ডার আনন্দে ও আবেগে এত ভাবাপ্লুত হইলেন যে, তার চোখের জল দুই গণ্ড বহিয়া মদের পাত্রে গড়াইয়া পড়িল'—এই বর্ণনা জাপানী সেনাপতি কর্নেল মাসানোবু তাসুকির হইতে।—(১২)

কিন্তু অপর দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মিত্রপক্ষীয় মহলে প্রায় আর্তনাদ ধ্বনিত হইল। কেননা, সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা কার্যতঃ দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার কিম্বা ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবেশদ্বার একেবারে খুলিয়া গেল। অর্ধ পৃথিবীর অধীশ্বররূপে বৃটেনের যে সাম্রাজ্য-গরিমা এতদিন সগৌরবে বিজ্ঞাপিত হইয়া আসিতেছিল, পর পর জাপানের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সেই ইম্পিরীয়েল মহিমা ও প্রেস্টিজ যেন ধূলায় গুড়াইয়া গেল! ইংরাজদের লিখিত সামরিক ইতিহাসেও এই অপমানের কথা গোপন করা হইল না। সেই সময় বৃটিশ সামরিক সংবাদদাতাদের প্রেরিত বার্তায় এবং লেখকদের রচনায় সিঙ্গাপুরের পতনকে ....

> . 'the most humiliating and impressive disaster which the British Empire had suffered for more than a century... '

বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল এবং বৃটিশ সৈন্যাপত্যের তীব্র নিন্দা করিয়া জাপানীদের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছিল—

> "The five or six Japanese divisors had shown themselves first rate soldiers in attack, disciplined, bold and resourceful and most ably led They had used their advantages with rare skill, the co-ordination of their military effort by land, sea and air had produced the maximum effects (Hutchinson's Quarterly Record of the war', Vol 10) 13

(12) Decisive Battles of the Second World War — edited by Peter Young, P. 133

(১৩) জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, পৃঃ ১২৯, ১৯৪৫

সিঙ্গাপুরের পতনকে শর্বিস্মরণীয় বৃটিশ রণপণ্ডিত মেজর জেনারেল ফুলার তাঁর ইতিহাসে—

> 'the most disastrous campaign fought by Great Britain since Cornwallis's capitulation at York Town in 1781

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। *

ব্রিগেডিয়ার পিটার ইয়ং তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে মন্তব্য করিয়াছেন -

> 'In Britain's long military annals there is no more shameful chapter than the fall of Singapore. It is a sort of anthology of all that is worst in British military history.'(14)

আর বৃটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার স্বয়ং উইনস্টোন চার্চিল তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের পতন ছিল 'বৃটিশ ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয় এবং বৃহত্তম আত্মসমর্পণের ঘটনা।'

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ১৫ই ফেব্রুয়ারী চার্চিল এক বেতার বক্তৃতা দিয়া বুঝাইতে চাহিলেন যে, জাপানীদের এই জয়লাভের মূল কারণ তাদের দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাপক যুদ্ধযাত্রার সামগ্রিক প্রস্তুতি। চার্চিলের মতে জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা, জলে-স্থলে তাদের শক্তি অদ্ভুতপূর্ব, তারা নৃশংস, বেপরোয়া এবং এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তিনি একটি তুলনা দিয়া বলিলেন যে, জাপানী সমরশক্তি যেন প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ইংগ-মার্কিন বাঁধ ভাঙিয়া বন্যার

* উত্তর আমেরিকার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিতে গিয়া কর্ণওয়ালিশ ইয়র্কটাউনে যে পরাজয়বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন রণপণ্ডিত ফুলার সেই ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ পরবর্তী কালে ভারতের গবর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—লেখক।

(14) Decisive Battles of the Second World War -- P. 97

হাওড়া
ফ্রেণ্ডস্
সোসাইটী
বেনারসী·সিল্ক·তাঁত
মিলবস্ত্র·গেঞ্জীক
৫৪৫, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোনঃ ৬৭-৪৪৪৭

মত সমস্ত কিছু ভাসাইয়া নিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কিম্বা পর্বতগাত্র থেকে স্খলিত ভয়ঙ্কর তুষারস্তূপের মত এই সমরশক্তি চারিদিকে ধ্বংসলীলা কিতাপ করিতেছে।

অতঃপর চার্চিল তীব্র ও তিক্ত কণ্ঠে সকলকে হুঁসিয়ার করিয়া দিয়া বলিলেন—

"No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land they have already proved themselves to be the most formidable, deadly and I am sorry to say, baroarous antagonists'.

—(জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী, পৃঃ ১২৫)

জাপানীদিগকে 'বর্বর প্রতিদ্বন্দ্বী' বলিয়া গালাগালি দেওয়ার মধ্যে সাম্রাজ্য-গর্বী চার্চিলের কণ্ঠে পরাজয়ের অপমানের জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তবু তিনি জ্বলন্ত ভাষায় আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া-সহ পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ মানুষ মিত্রপক্ষের দলে এবং 'সমগ্র মানব জাতির ভাগ্য আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে'—অতএব পরিণামে মিত্রপক্ষের জয় সুনিশ্চিত। (১৫)

* * *

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

সিঙ্গাপুরের পতন ছিল দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের চূড়ান্ত যুদ্ধগুলির (decisive battles) অন্যতম—অন্ততঃ এশিয়া বা প্রাচ্য খণ্ডে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহা-সাগরের মানচিত্রের উপর চোখ বুলালেই বুঝা যাইবে সিঙ্গাপুর ছিল এই সমগ্র দ্বীপময় অঞ্চলের রণনৈতিক চাবিকাঠির মত। এই চাবিটি অতি দ্রুত জাপানীদের করায়ত্ত হইল এবং এই বিরাট এলাকার দুর্গদ্বার যেন সহজেই খুলিয়া গেল। বিশাল ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও উত্তর ব্রহ্ম ইত্যাদি একে একে জাপানীদের হাতে আসিয়া গেল এবং জাপানী সমরশক্তি যেন ভারতবর্ষ অভিমুখে হাত বাড়াইল! সাধ্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সে কি উত্তেজনাপূর্ণ দিন! আজ সেকথা অবশ্য কল্পনা করাও কঠিন। এমন কি, সেই সমস্ত কাহিনীর সবিস্তার উল্লেখও সম্ভব নয়। এজন্য অত্যন্ত সংক্ষেপে মাত্র একটা রেখা-চিত্র দেওয়া যাইতেছে :

আজ যে দেশ ইন্দোনেশিয়া নামে সর্বত্র পরিচিত, আগে তার নাম ছিল ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ। অর্থাৎ পূর্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ—হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী ইউরোপের ক্ষুদ্র শক্তি হল্যাণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল সুদূর প্রাচ্যের এই দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া। ১৬০২ খৃষ্টাব্দ থেকেই ওলন্দাজ বা ডাচদের দখলে আসিল জাভা, সুমাত্রা, সুন্দা, মালক্কা, সেলিবিস, বোর্ণিও, নিউগিনি ইত্যাদি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর আগে প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত এই মহাসমুদ্রে পৌঁছিয়াছিল এবং বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিহ্ন আজও রহিয়াছে যবদ্বীপে, বলি-দ্বীপে, যেমন রহিয়াছে শ্যাম দেশে ও কাম্বোডিয়ায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় দুঃসাহসিক শক্তিবর্গ পাল-খাটানো জাহাজে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হইয়া এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র যেন হানা দিল। অন্ততঃ সাড়ে তিনশত বছর ধরিয়া ওলন্দাজ বণিক ও শাসকদের একাধিপত্য ছিল এই 'দ্বীপময় ভারতে'। এই বিশাল সম্পত্তির স্থলভাগের আয়তন ছিল ৭ লক্ষ ১৫ হাজার বর্গমাইল এবং অর্থনৈতিক সম্পদ ছিল অতুলনীয়। সোনা, লোহা, কয়লা, টিন, পেট্রোল, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি খনিজ সম্পদ, চা, চিনি, কফি, চাউল, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি মশলা, সেগুন লোহাকাঠ, ওক ইত্যাদি বৃক্ষ ও কাষ্ঠ সম্পদ এবং বিশাল অরণ্যের অসংখ্য জন্তু-জানোয়ারের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ যে কোন সাম্রাজ্যকামীর পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল এবং একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভি-যানের পিছনে জাপানীদের অন্যতম মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক।

'এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের প্রধান শাসন-কেন্দ্র ছিল জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এবং ইহার প্রধান নৌঘাঁটি ছিল সুরাবায়া। ১৯৪১, ডিসেম্বর মাসে চার্চিল-রুজভেল্টের ওয়াশিংটন বৈঠকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাইপ্রাসের যে রণপরিকল্পনা স্থির হইয়াছিল, জেনারেল ওয়েভেল নিযুক্ত হইলেন উহার সর্বপ্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন সুরাবায়া নৌ-ঘাঁটিতে। জাপানীরা প্রায় একযোগে আক্রমণ চালাইল বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, নিউগিনি ইত্যাদির উপর। তাহাদের আক্রমণ পরিকল্পনা যেন পাখীর মত ছড়াইয়া পড়িল দ্বীপ হইতে উপ-দ্বীপে, দেশ হইতে দেশান্তরে, সমুদ্র হইতে প্রণালী পথে এবং প্রণালী হইতে তীর-ভূমিতে—জাহাজ ও এরোপ্লেন হইল ইহার প্রধান বাহন। ম্যানিলা হইতে সুরাবায়া, ভিকটোরিয়া পয়েণ্ট হইতে পোর্ট মোরসবি, —এই বিশাল দ্বীপময় সামুদ্রিক দেশে জাপানী সমরশক্তি প্রথমতঃ আকাশ হইতে নামিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত। তারপর সেই ঝড় বণতরী, সৈন্য এবং গোলাগুলীর আশ্রয় করিয়া সমগ্র তটভূমি ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল অতি দ্রুত—বজ্র ও বিদ্যুতের মত ইহা ফাটিয়া পড়িল সমগ্র ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে!'—(১৬)

অবশ্য এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য লাখখানেক 'দেশীয় সৈন্য' ছিল, কিন্তু তাদের অস্ত্রসজ্জা ছিল সেকেলে এবং ওলন্দাজদের নৌ-শক্তিও ছিল সামান্য। এই নৌ-শক্তির সঙ্গে বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও মার্কিন নৌ-বহরের সামান্য কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ একত্র হইয়া বাধা দিতে চাহিল বটে এবং ম্যাকাসার প্রণালীর নৌ-যুদ্ধে (২৩—২৮ জানুয়ারী ১৯৪২) কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিল, কিন্তু ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে তিন দিন ধরিয়া জাভা সাগরে যে নৌ-যুদ্ধ হইল, তাতে জাপানী নৌ-বহরের হাতে মিত্রপক্ষের সমগ্র নৌবহর (৫ খানা ক্রুজার, ৬ খানা ডেষ্ট্রয়ার ও অন্যান্য পোত) একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল। জাভা অভিযানে জাপানী নৌবহরে ছিল আনুমানিক ১৪টি ক্রুজার, ১১টি বিমান-বাহী জাহাজ, ৫৫টি টর্পেডো পোত এবং ১৫টি সাবমেরিণ। এই নৌবহর ৫০টি জঙ্গী সৈন্যবাহী জাহাজকে চৌকি দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। জাভা সমুদ্রের এই বিখ্যাত নৌ-যুদ্ধে মিত্রপক্ষ ঘায়েল হওয়ার পর ৯ই মার্চের মধ্যে ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ জাপানীদের অধিকারে গেল এবং ওলন্দাজ গবর্ণর জেনারেল ডঃ ভ্যান মুক পলাইয়া অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া গেলেন।

অর্থাৎ নতুন সাম্রাজ্যবাদ পুরানো সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করিল।

আর এদিকে পরাজিত জেনারেল ওয়েভেল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ABDA নামে পরিচিত চতুঃশক্তির (আমেরি-কান, বৃটিশ, ডাচ ও অস্ট্রেলিয়ান) রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমান্ডারের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন এবং প্রধান সেনাপতির নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন, ৩রা মার্চ, ১৯৪২।

(ক্রমশঃ)

(15) The Second Great War, Vol v, P. 261b—Sir John Hammerton.

(১৬) জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী—পৃঃ ১৩২—১৩৩

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.বি.এস
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য ৬৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও কয়েকটি চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ
মোহন লাইব্রেরী ৩৫৩, সুরেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬
অগ্রিম ৬৲ টাকা পাঠাইলে অক্ষমাশুল ফ্রি

কখনো দিন কখনো রাত

আশাপূর্ণা দেবী

(উপন্যাস)

(৪১)

'জীবন প্রবাহের' পৃষ্ঠা খুলে রেখে চলে গিয়েছিলাম, এবং তক্ষুণি এসে 'সম্পাদকীয়'টা গোগ্রাসে গিলে ফেলবো এই রকমই একটা ব্যস্ততা ছিলো। এবারে 'সহকারী সম্পাদক' তার সহকারিত্বের দৈন্য থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অতএব ওটা দেখা দরকার।

কিন্তু সবিতা চলে যাওয়ার পর ফিরে এসে সেই উৎসাহ সেই আগ্রহ যেন বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল।

নিজেকে ভারী তুচ্ছ-তুচ্ছ লাগলো।

যতোদিন 'জীবন প্রবাহের' প্রবাহে ভাসছিলাম, নিজের সম্পর্কে বেশ একখানি মূল্যবোধ গড়ে উঠছিলো। অনেক 'তুচ্ছ'দের মধ্যে আমি একজন 'বিশেষ' এ ধারণাটিকে 'অহঙ্কার' বলে যতই দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলাম, সে ততই মনের মধ্যে শিকড় গাড়ছিলো।

হঠাৎ ওই কালো রোগা মেয়েটা (মা যার 'জাতধর্ম' সম্পর্কে অনায়াস মন্তব্য করে বসলেন) যেন সেই শিকড়টাকে ধরে উপড়ে দিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দাদার উপর দারুণ একটা অভিমান এলো।...লোকেদের মেয়ের সঙ্গে তুমি 'কাজ' করতে পারো, তাকে জগতের আলো বাতাসের সন্ধান দিতে পারো, আস্ত একটা মানুষ বলে গণ্য করতে পারো, আর নিজের বোনটার সামনে এতোটুকু একটু জানলা খুলে দিতে পারনি! সে বেচারা পাথরের প্রাচীরের আড়ালে দমবন্ধ হয়ে পড়ে থাকলো।

আমায় যদি দাদা তার সহকর্মির পোস্টটা দিতো, তাহলে আমিই কি কিছু কম কাজ করতে পারতাম?

আমি পারতাম না জেলে যেতে? পারতাম না কষ্ট সইতে?

ভাবতে ভাবতে মাথার রক্ত গরম হয়ে উঠলো, অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হতে থাকলো ভিতরে।

দেশে কত কী ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কত আলোড়ন, কতো মৃত্যু কতো কারাবরণ, কতো সর্বস্বত্যাগের মহিমা, আর আমি তলিয়ে আছি কিছু প্রেমের কবিতা আর একটু প্রেম দৃষ্টির নেশার মধ্যে।

যেন জীবনে আর কিছু চাওয়ার নেই আর কিছু পাওয়ার নেই।

'জীবন প্রবাহে' লেখা ছাপা, আর কবি নীরেন সান্যালের সপ্রশংস দৃষ্টি এই হলো সুরুচি গঙ্গোপাধ্যায় নামের মেয়েটার জীবনের চরম সার্থকতা। ছি ছি।

কী ঘোরে পড়েছিলাম এতোদিন?

খবরের কাগজ পড়িনি কতোদিন?

দেশে কোথায় কী ঘটছে তার সন্ধান রাখিনি কতোদিন?

ওরা যখন এ বাড়িতে এসে আড্ডা জমাতো, তখন তবুও বা ওদের তর্কের মধ্যে, এসব কথা কিছুটা আসতো, কিন্তু আড্ডা ভেঙে যাবার পর থেকে?

শুধু অন্ধকার।

এক প্রেমিক কবিকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি, আর শূন্যতার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি।

ওদিকে আমারই মতো সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে কী অসম সাহসিকতা দেখাচ্ছে, কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, কী দুঃসহ যন্ত্রণার আনন্দে উদ্দীপ্ত হচ্ছে।

তারা জেলে যাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট খুন করছে, পুলিশের মার খাচ্ছে, আর এইসবের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর রাখছে।

মনের ভিতর নানা নামের ভীড়। বীণা কমলা শান্তিসুধা প্রীতিলতা, তার সঙ্গে কালো রোগা একটা মেয়ে। সবিতা।

বেশ বুঝতে পারছি সবিতার উপর আমার হিংসে হচ্ছে। ও যদি শুধুই একটি দেশকর্মী মেয়ে হতো, হয়তো এমন জ্বালা অনুভব করতাম না।

ও আমারই দাদার স্নেহছায়ায় বর্ধিত হয়ে এতোটি হয়ে উঠেছে একী কম কষ্ট?

দাদা এতোটুকু চেষ্টা করেছে তার বোনেদের জন্যে? একবার ফিরে তাকিয়ে দেখেছে তাদের মধ্যে কোনো বস্তু আছে কিনা?

বোনের লেখা একটা কবিতাকে বাহবা দিয়ে সেটিকে পকেটে পুরে শেষে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলা ছাড়া, আর কী করেছো তুমি দাদা?

যদি তুমি তোমাদের ওই 'কাজে'র মধ্যে আমায় টেনে নিয়ে যেতে, তোমার ওই প্রিয় বান্ধবী সবিতার থেকে অনেক বেশী কাজ করে দিতাম আমি একথা ঘোষণা করে বলতে পারি।

কল্পনায় ভাবতে চেষ্টা করি, সেই শুভ-লগ্ন যেন আমার জীবনে এসেছিলো, আমিও এগিয়ে গিয়েছিলাম জেলের গেটের দিকে।

ঘুরে ফিরে ওই জেলটার কথাই মনে আসছে।

তুচ্ছ এই 'জীবন প্রবাহে'র সুচীপত্রে নামের স্বাক্ষর! এ স্বাক্ষর কী কোনোদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠাভুক্ত হবে?

কতোক্ষণ ভেবেছি জানি না, কতোটা চোখের জল পড়েছে তাও জানি না, সান্ত্বনা দিতে পারে বালিশের তুলোরা, অনেকক্ষণ পরে দাদার ওপর আছড়ে পড়া ওই তীব্র অভিমানের বেগটা কিছুটা প্রশমিত হলো।

ভাবলাম দাদার কী দোষ!

দাদার বোনেরা তো শুধু তার বোনই নয়, তারা রমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আর চারুহাসিনী দেবীর মেয়ে।

অর্থাৎ তাদেরই সম্পত্তি।

অন্যের সম্পত্তি নিয়ে কোন কাজ করা যায়?

এইতো মেজদা?

সেও তো ভাব নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে, এনে দিয়েছিলো কিছু নতুন বাণী, খুলে দিয়েছিলো একটা নতুন জানলা, শেষ রক্ষা হলো কী?

চারুহাসিনী দেবী তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করাতে দিলেন না।

'আবার যে অন্ধকার সেই অন্ধকার।

দাদার ওপর থেকে অভিমান চলে গেলে, চিন্তাটা এলো।

(ক্রমশঃ)

পুনশ্চ

দশপ্রহরণধারিণী, দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা হয়ে গেল। তবে সব কিছুই যে মা'র নিরঞ্জনকার্য এখনো সম্পন্ন হয়েছে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। দশমী হয়ে গেলেও এর কোন নিয়ম-নীতি, আচার-বিচার আমরা অধুনা পালন করি না। মাকে আনা হয় একটা সময়ে বটে, তবে বিসর্জনের কোন সময় নেই।

এমনি খুশি-খেয়াল মত প্রতিমার রূপও আমরা দিয়ে থাকি। শাস্ত্র-বিহিত মত মা দুর্গার রূপকল্পনা খুব কম স্থানেই অধুনা দেখা যায়। বিশেষ করে বারোয়ারি বা সর্বজনীন পূজার ক্ষেত্রে বহু স্থানে এই মূর্তির যে বৈচিত্র্য নজরে পড়ে তা যেমন অভিনব, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। কোথাও মা দুর্গাসহ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সব ছাড়া ছাড়া দাঁড়িয়ে আছেন বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। কোথাও অসুর মহিষের অঙ্গ থেকেই নির্গত হয়েছে, আবার কোথাও মহিষের কেবলমাত্র মুণ্ডু কাটা পড়ে আছে আর মহিষাসুর বীরদর্পে বসে আছে হাঁটু গেড়ে। সিংহকেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম পোজে ও আকৃতিতে দেখা গেছে। দশপ্রহরণধারিণী মাথা হতেও শাস্ত্রমত আয়ুধের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া যে হাতে যে অস্ত্র থাকার কথা, তারও কোন ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায়নি।

আসলে পূজা উপলক্ষ করে একটা হইহুল্লোড় ও নানাপ্রকার আলোক জলুস দেখিয়ে এ-ওকে টেক্কা দেবার প্রতিযোগিতাই যেন চলে এর মধ্যে। প্রতিমার গড়নেও যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস, সেও এই প্রতিযোগিতারই নামান্তর ব্যতীত আর কিছু নয়। কোথাও কেউ সোলা দিয়ে, কিনুক দিয়ে, কাচ দিয়ে, রঙতা দিয়ে, সাটিনের কাপড় দিয়ে, কাঠকুটো দিয়ে মা দুর্গার দারুময় মূর্তি গড়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ প্রচেষ্টা, এই শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের চেষ্টা, কোন প্রদর্শনীর মাধ্যমে হলে ক্ষতি ছিল না এবং শোভনও হত। কিন্তু ভক্তি-সহকারে এই মাতৃপূজার ক্ষেত্রে মাটির চিরাচরিত স্বাভাবিক মূর্তিই সর্বত্র বিধেয়, এবং সেটাই শাস্ত্রসম্মত যে তাতে আর সন্দেহ নেই।

মূর্তিশিল্প সম্বন্ধে নানা স্থানে শাস্ত্রকারেরা নানা নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ [illegible] সম্বন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি মা দুর্গা দশভুজার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষভাবে দেবতার রূপ-দর্শনে যাতে দর্শকের মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক হয়, সেই দিকেই প্রতিমা-শিল্পীরা যেন অধিকতরভাবে নজর দেন শাস্ত্রকারেরা তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাছাড়া এই নিয়মকানুন মেনে না চললে যে সমূহ ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা, তা বলতেও তাঁরা দ্বিধা করেন নি।

এই 'প্রতিমা' সম্পর্কে একটি প্রাচীন রচনা 'অর্চনা' (আশ্বিন, ১৩২১) পত্রিকা থেকে এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি। রচনাটির লেখক পণ্ডিত শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ। বেদান্ততীর্থ মহাশয় রচনাটির 'প্রতিমা' নামকরণ করলেও, প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে চিত্রাঙ্কনের স্থান ও কলাবিদ্যা সম্বন্ধেও বহুবিধ বিষয় এর মধ্যে আলোচনা করেছেন।

প্রতিমা

'বর্তমান সময়ে আমরা জলের কলে কুকুরের অথবা বাঘের মুখ হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য শিল্পের নৈপুণ্য অনুভব করি। কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট কাদম্বরীর ভবন যে ভাবে সাজাইয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের তুলনায় প্রাচীন প্রাচ্যশিল্পের ন্যূনতা অনুভূত হয় না। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—কোথাও স্ফটিক নির্মিত বলাকাশ্রেণীর মুখ হইতে ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে, কোথাও কলের সাহায্যে কৃত্রিম মেঘমালা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাতে আবার ইন্দ্রধনু (রামধনু) শোভা বিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে কলের ছোট ছোট গাছ বড় বড় জলবিন্দু বর্ষণ করিতেছে কোথাও বা উড়ন্ত কলের পাখী পাখা নাড়িয়া জলকণা মিশ্রিত ঠান্ডা হাওয়া যোগাইতেছে। সুতরাং কলের পুতুল চালাইয়া বাহাবা পাওয়ার প্রবৃত্তি এবং সফলতা পূর্বকালে কম ছিল বলিয়া বোধ হয় না।

এখন যেমন চিত্রে প্রিয়ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া রাখা হয়, পূর্বকালেও এই রীতির বহুল প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'বর্তমান সময়ে অন্যের দ্বারাই প্রায় চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্বকালে রাজা-রাণী প্রভৃতি নায়ক-নায়িকাগণ নিজেই এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে সমর্থ হইতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত প্রিয়তমের বা প্রিয়তমার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া তদ্দর্শনে বিরহের দুঃখ প্রশমিত করিতেন।

রাজা দুষ্মন্ত নিজের হাতেই শকুন্তলার মনোহর-মূর্তি অঙ্কিত করিয়া শকুন্তলার মনোহর-মূর্তি অঙ্কিত করিয়া ছিলেন।

সাগরিকা বৎস রাজার চিত্র স্বহস্তেই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। (রত্নাবলী ২য় অঙ্ক) কাব্যের দ্বারাও ফরমাইশ মত চিত্র প্রস্তুত করান হইত। শ্রীহর্ষের বর্ণনায় জানা যায় যে, নলরাজের রূপগুণ শ্রবণে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা দময়ন্তী লীলাগৃহের ভিত্তিতে কারুতরের দ্বারা নলের এবং নিজের চিত্র আঁকাইয়া উভয়ের সখ্য-দর্শন করিয়াছিলেন।

ভবভূতির লেখনী-প্রসূত রাম-বনবাসের বিস্তৃত চিত্রে অতীব নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্র-দর্শনে দ্রষ্টা রামচন্দ্র অতীত ঘটনাবলীকে উপস্থিত মনে করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। (উত্তর-চরিত ১ম অঙ্ক)।

সেকালে চিত্রাঙ্কন অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রেও দৃষ্টান্তস্থলে চিত্রের বর্ণনা দেখা যায়। সুতরাং কূটতর্কপ্রিয় দার্শনিকগণও যে শিল্পশাস্ত্রের খবর রাখিতেন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পঞ্চদশীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদীপ, এই পরিচ্ছেদে পরমাত্মাতে অধ্যস্ত সংসারকে চিত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এই প্রসঙ্গে সেকালের চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—চিত্রপটে যেরূপ চারিটি অবস্থা দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে।

চিত্রের চারিটি অবস্থা যথাক্রমে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই চারি নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বভাবতঃ অর্থাৎ কেবল বস্ত্ররূপে অবস্থিত শুভ্রবস্ত্র 'ধৌত', অন্যের দ্বারা বিশেষরূপে লিপ্ত 'ঘট্টিত', মসীর দ্বারা (কালীর দ্বারা) আকার রূপে অঙ্কিত 'লাঞ্ছিত' এবং সেই দাগের অনুসারে বিবিধ বর্ণের (রঙের) পূরণ অর্থাৎ সন্নিবেশ হইলে 'রঞ্জিত' নামে অভিহিত হয়।

এই উক্তিতে বুঝা যায়, কাপড়ের উপর ভাতের মাড় লাগাইয়া তাহাতে প্রথমতঃ পেন্সিলের মত পদার্থের দ্বারা দাগিয়া তাহাতে নানা রঙের সন্নিবেশ করা হইত।

আমাদের শিল্পশাস্ত্রে চিত্রবিদ্যা চতুঃষষ্ঠী কলার যে নাম নির্দেশ দেখা যায়, তাহাতে আলেখ্য (চিত্র) চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। কামসূত্রের টীকাকার যশোধর চিত্রকে 'ষড়ঙ্গ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ চিত্রনির্মাতাকে ছয়টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। সেই ছয়টি অঙ্গ যথাক্রমে রূপভেদ, প্রমাণ, ভাবযোজন, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। যশোধর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীত হইতে চিত্র পর্যন্ত যে কয়টি কলা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজন অন্যের অনুরাগ জন্মান এবং নিজের চিত্তবিনোদন।

আমরা কিন্তু চিত্রকলার আরও অনেক প্রয়োজন অনুভব করি। চিত্র না হইলে শিল্পের স্বরূপ জ্ঞাপন করা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ছাত্রকে বুঝাইবার সময়ে চিত্রের সাহায্যে যতটা ভাব প্রকাশ করা যায়, কেবল ভাষার দ্বারা তাহা হইয়া উঠে না। টীকাকারগণ 'পুষ্পবিশেষঃ' 'জন্তু-বিশেষঃ' এইরূপ উক্তির দ্বারা মূলের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, আমরাও সেইরূপ বৈজাত্য-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বকই শিষ্য বুদ্ধির বৈশদ্য সম্পাদন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রাচীন যুগের রীতি এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ শিবধর্ম্মের একটি বচন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, যিনি সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা এবং দেশভাষা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা শিষ্যকে উপযুক্তরূপে বুঝাইতে পারেন, তিনি গুরু নামে অভিহিত হন। উক্ত বচনস্থ আদি পদের দ্বারা চিত্র প্রভৃতির গ্রহণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আদি শব্দের অর্থ 'গ্রন্থ করণাদি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাতেও 'আদি' শব্দ দেখা যায়, সুতরাং তাঁহার সহিত একমত হইয়াও আমরা তৎপ্রযুক্ত আদি শব্দের বলে চিত্র প্রভৃতি উপায়কে ধরিতে পারি।

কারণ আমাদের মত শাস্ত্রব্যবসায়িগণও সেকালে কলাজ্ঞানে নৈপুণ্যলাভ করিতেন। আমরা ভারতী মাতার নিকট যে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করি, তাহাতে নৃত্য-গীতাদি কলারও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি
নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি!
তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।।'

সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র রাঘবভট্ট আত্মপরিচয়-দানাবসরে নিজেকে কলা-কুশল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন. সুতরাং চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি কলা যে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বিশেষ আদরণীয় ছিল, এবং বিবিধ প্রয়োজন সম্পাদন করিত, তাহা বুঝা যাইতেছে।

মূর্ত্তিশিল্প আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই যে জগদম্বা সংবৎসরান্তে দশভুজাকারে ভক্তের মণ্ডপ শোভিত করিয়া আসিতেছেন, তাহার মহাপূজার যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তন্মধ্যে অভিরূপ প্রতিমাও একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, পূজকের তপোবল, পূজোপকরণের অতিশয়, এবং প্রতিমার অভিরূপ্য

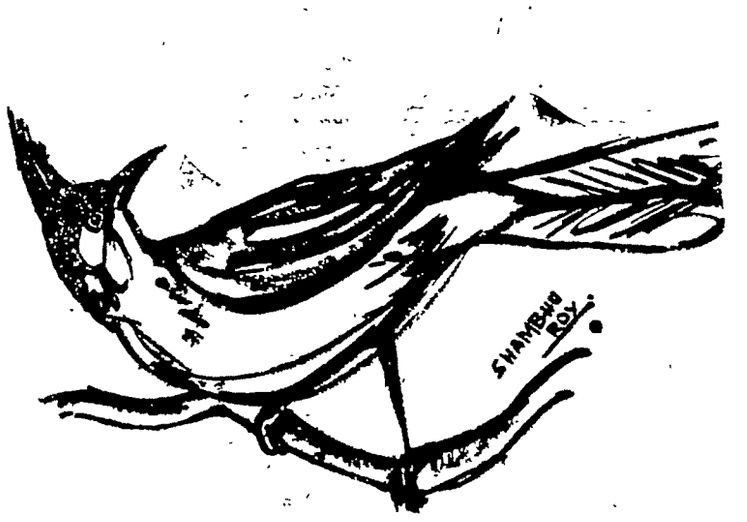

অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, এই কয়টি কারণে দেবতার সান্নিধ্য হইয়া থাকে।১

ধ্যানকার্য্যে প্রতিমার বিশেষ প্রয়োজন। শুক্রনীতিসারে কথিত হইয়াছে যে, প্রতিমা-কারক মানব যেরূপ ধ্যানরত হইতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারে না।২

ধ্যানোপযোগিনী প্রতিমা শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী অবয়ব-সন্নিবেশানুসারে নির্ম্মিত হইলে, মনোহারিণী সেই প্রতিমা পুণ্য প্রদান করেন, অবয়ব-সন্নিবেশের ব্যতিক্রম ঘটিলে সাধকের আয়ুধন বিনাশ করেন, এবং দুঃখ বৃদ্ধি করেন।৩

প্রতিমার পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। দেবতাভেদে প্রতিমার পৃথক পৃথক পরিমাণ বিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়টি মাত্র দেবতার পরিমাণ এই স্থানে প্রদর্শিত হইল, যথা—চণ্ডী, ভৈরব, বেতাল, নরসিংহ ও বরাহ এই সকল ক্রূর দেবতার মূর্ত্তি নবাদশ তাল পরিমিত হইবে।৪

১। অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতি
শায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং
দেবঃ সান্নিধ্য মৃচ্ছতি।।
(তিথিতত্ত্বে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

২। প্রতিমাকারকোমর্ত্ত্যো
যথাধ্যান-রতোভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেন
প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।।
(৪র্থ অ ৪ প্রকরণ)

৩। যথোক্তাবয়বৈঃ পূর্ণা পুণ্যদা
সুমনোহরা।
অন্যথায়ুর্ধন-হরা নিত্যং দুঃখ
বিবর্দ্ধনী।।
(৪।৪।৭৩ শুক্র)

৪। চণ্ড ভৈরব বেতাল নরসিংহ-বরাহকাঃ।
ক্রূরা দ্বাদশতালাঃ স্যু
হয়শীর্ষাদয়স্তথা।।
(৪।৪।৮৬ শুক্র)

শাস্ত্রান্তরে দেবতা - প্রতিমা - দর্শন মাত্রই প্রণামের উপদেশ আছে। এই বিধি লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—

'দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা
ন্যূনং দৃষ্টবাপ্যদণ্ডিতম্।
নমস্কারং নকুর্য্যাদ্যঃ
প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ।।'

দেবতা - প্রতিমা - ভঙ্গকারীর গুরুতর দণ্ডের বিধান দেখা যায়।

'দেবতা-প্রতিমা-ভেদক শ্চোত্তম সাহসং
দণ্ডনীয়ঃ।' (বিষ্ণু সং ৫।৬৭)

এই সকল প্রমাণানুসারে বুঝা যায় যে, আর্য্য জাতির সহিত প্রতিমার পরিচয় নূতন বা আগন্তুক নহে, আর্য্যধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ধরণীমণ্ডলে প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

দেশভেদে এবং যুগভেদে প্রতিমা-পরিমাণের পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশভেদে মূর্ত্তির সপ্ততাল প্রভৃতি উচ্চতা হইয়া থাকে।৫ সত্যযুগে দশতাল, ত্রেতা যুগে নবতাল, দ্বাপরে অষ্টতাল এবং কলিযুগে সপ্ততাল পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৬ সুতরাং আমাদের মূর্ত্তির পরিমাণ - প্রভৃতির সহিত দেশান্তরের শিল্পশাস্ত্রের কোনও সম্বন্ধ নাই। মৎস্য-পুরাণ হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থে মূর্ত্তিশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়, এই সকল গ্রন্থের মৌলিকতায় পরবর্ত্তী অনেক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। দু' চারিটি প্রবন্ধের দ্বারা মূর্ত্তিশিল্পের বা চিত্রকলার সমগ্র বিবরণ প্রকাশ অসম্ভব, সুতরাং এই প্রবন্ধে অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত হইল না।'

—ক্ষপণক

৫। সপ্ততালাদুচ্চতা বা মূর্ত্তীনাং
দেশভেদতঃ।
৪।৪।৮৪ শু

৬। দশতালা কৃতযুগে ত্রেতায়াং
নবতালিকা।
অষ্টতালা দ্বাপরেতু
সপ্ততালা কলৌযুগে।।
৪।৪।৮৯

অঞ্জনা

প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

হাল-আমলের ফ্যাসানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জনৈক মহিলার গুঞ্জন শুনেছিলাম। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই তিনি এ-গুঞ্জন তুলেছিলেন। তাঁকে আমি বহুদিন যাবৎ চিনি। তাঁকে এমন চিনি যে তাঁর গুঞ্জন শুনে আমি প্রথমে বিস্মিত, পরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সহজ, সরল, এককথায় সাদামাটা মানুষ ছিলেন। হালে তাঁর কিছু পরিবর্তন হয়েছে—পরিবর্তনটা হয়েছে যুগের হাওয়ায়। অনেকদিন বাদে তাঁরই সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছি। সার-সার আমার মতো অনেকেই বাসের অপেক্ষায় উদ্গ্রীব। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সমবেত ভিড়। হঠাৎ নজর পড়লো সেই মহিলাটির দিকে। তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন মহিলা। সবাই একটু উৎকট সাজে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশে ব্যস্ত। আমার পরিচিতাও তার ব্যতিক্রম নন। অথচ এর আগে বরাবরই তাঁকে আমি সরল, রুচি-সম্মত পোষাকে দেখেছি। স্বাভাবিক একটা আকর্ষণে আমি খানিক এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ভদ্রমহিলা তাঁর পাশের মহিলার কথার জবাব দিচ্ছেন, 'আর ভাই বলো না। দর্জিরা দামী কাপড়ের জামাটাকে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আমি যে এ-জামাটা পরে বেরিয়েছি তাই লজ্জা করছে। পাশের মহিলা পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, 'আপনি দর্জির দোকানে এত তাড়া দিলেন তাই বোধহয় এমন হলো।' আমার পরিচিতা অপ্রসন্ন গলায় বললেন, 'তাহলে আমার আর এ-শাড়ীতে বাইরে বেরুনো হতো না।'

আমি আর ওদের কথার সংযোগ না দিয়ে প্রথম সাক্ষাতের ভাষা বিনিময় করলাম। এরই ফাঁকে লক্ষ্য করলাম পাকা ঘাস-রঙা মোটা ফ্রেমের চশমার সঙ্গে শাড়ী, ব্লাউজ, চটির অদ্ভুত সাদৃশ্য। কপালের টিপটিও মিলিয়ে পরতে ভোলেননি। ব্লাউজের ঝুল বেশ সংক্ষেপ করেছেন, সেই সঙ্গে মাথা ছাপিয়ে খোঁপাটা অত্যধিক নজরে পড়ছে। আপত্তি তাতে খুব কিছু করা যায় না। কারণ, দিনকালের হাওয়াকে উপেক্ষা করতে পারে এমন জোর সকলের থাকে না।

মহিলার সঙ্গে বিদায়পর্ব সমাধা হলেও তাঁরই একটা কথা আমার মনে বারবার ঘুরছিল। শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউজ ম্যাচ করে পরতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় তা এমন তৈরী হল যা গায়ে দিতে ভদ্রমহিলা অস্বস্তির সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হচ্ছেন। রান্নার কাজ যেমন মেয়েদের একটা স্বাভাবিক নেশা, তেমনি সেলাইটাও মেয়েদেরই বিশেষ একটা গুণ। অপ্রয়াসে কিন্তু চলনসই, পছন্দমাফিক জামাকাপড় সব মহিলারাই তৈরী করতে পারেন। একদল মহিলা আছেন যাঁরা দর্জির দোকান ছাড়া বাড়ীতে তৈরী জামা-কাপড় পরতে লজ্জিত হন, আরেক দল আছেন যাঁরা পারি না, সময় নেই বলে গর্ববোধ করেন। নিছক দায়ে হয়তো বোতামটা, হেম খুললে একটু হেম-এর কাজ চালিয়ে নেন। এঁরা কিন্তু সেলাই করতে জানেন অথচ মনের সংকীর্ণতা বা কুণ্ঠেমিতে তা করেন না। অভাবের সংসারেও এ-ধরনের গৃহিণী ও কন্যারা প্রচুর আছেন।

কোন কোন গৃহিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে মাঝে মাঝে বলে ফেলেন, 'সেলাই-টেলাই ওসব আমার ধাতে সয় না, যাদের কোন কাজ নেই, অফুরন্ত সময় আছে, তারা করুক গে।'

অফুরন্ত বা অঢেল সময় পাওয়া খুব অল্প সংখ্যকের ভাগ্যেই সম্ভব। ব্যয় সংক্ষেপ করতে অনেক কিছু কাজই নিজের হাতে সেরে নিতে হয়। সব সময়ের জন্য মাইনে-করা লোক বাঁধা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

বালিশ, লেপ-তোষকের ঢাকা এগুলো সাধারণতঃ সকলেই ঘরে তৈরী করে নেন। এগুলো তৈরী করতে সকলে এত বেশী অভ্যস্ত যে এতে কারুরই কোন জড়তা নেই। এই প্রয়াসটাই যদি ফ্রক, ব্লাউজ, সায়া তৈরীতে ব্যবহার করা হয় তবে অনেক ঝামেলারই মীমাংসা হয়। যাদের সেলাই সম্বন্ধে কোনরকম ধারণা নেই বা যাঁরা সেলাই করতে ভয় পান তাঁরা অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে একটু একটু সেলাই দেখে নিতে পারেন। কাগজে কেটে কেটে খানিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন। কাগজে কেটে কেটে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো তা আপনি অনায়াসে কাপড়ে ফলাতে পারেন। নতুন কাপড় প্রথমবার কাটতে ভয় ভয় করলে পুরনো কাপড়ে সে কাজটা চালিয়ে নেওয়া ভাল। পুরনো কাপড়কে ভাল করে মাড় দিয়ে শক্ত করে নিন, তার ওপর একবার গরম ইস্ত্রি বুলিয়ে নিলে সেটা টানটান হয়ে যাবে। কোনরকম ভাঁজ থাকবে না। কাঁচি চালাতেও আপনার বেশ নতুন কাপড়ের মতোই আরামবোধ হবে।

অনেকে হয়তো বলবেন যে এত পুরনো কাপড় কেটে নষ্ট করতে পারবো না। কিন্তু কোন জিনিসই আপনার ফেলনা যাবে না কারণ পুরনো কাপড়ে কোন কিছু ছেঁটে তা সেলাই করে ফেলুন। দেখুন কোথায় একটু ঢিলে বা আঁট হলো। সেইমত ঠিকঠাক করে নিন। এবার সেই সেলাই করা জিনিসটাকে আপনি আসবাবপত্র মোছা, বাসন পোঁছা, কড়াই ধরা, ইস্ত্রি ধরার কাজে অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারেন, আর ছাঁট-কাঁটের কাগজগুলোকে নষ্ট করে ফেলে না দিয়ে অন্ততঃ উনুন ধরাবার কাজে লাগাতে পারেন। কাগজ কেটে আর পুরনো কাপড়ে সেলাই করে এত দক্ষ হয়ে উঠবেন যে নির্ভাবনায় আর নির্ভয়ে আপনি নতুন কাপড়ে জামা-প্যান্ট তৈরী করতে পারবেন। দরকার পড়লে তৈরী জামার প্যাটার্নের সেলাই খুলে ছাঁটকাট দেখে নিন।

অনেকে নিজে জামা তৈরী করলেও সোফার ঢাকা তৈরী করার সময় দর্জির শরণাপন্ন হন। এক্ষেত্রে ভাবেন দামী কাপড়ে কোন কিছু ভুল হলে অনেক টাকাই নষ্ট হয়ে যাবে। ভুল হলে যে নষ্ট হবে এতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু ভুলটা এড়ানোই সবচেয়ে বড় কাজ। এবারও সেই পুরনো কাপড় কেটে অভ্যস্ত হয়ে উঠুন। শুধু ব্লাউজ, ফ্রক কেন পাজামা, বুশশার্ট তৈরী করাও কোন কঠিন কাজ নয়। একটু সাহস, পরিশ্রম করার ইচ্ছা, সেই সঙ্গে উৎসাহ থাকলেই আপনি অনেক টাকা বাঁচাতে পারেন যেটা আপনার সংসারের অন্য খাতে খরচ করে আপনি একটু বিশ্রাম নিতে পারেন, তৃপ্তি পেতে পারেন।

ঘরে তৈরী পোষাকের সবচেয়ে সুবিধা পোষাককে বারবার গায়ে পরিয়ে মাপে মাপে তৈরী করতে পারবেন। দরকার পড়লে খুলে বা ছেঁটে নিখুঁত করার সুযোগ পাবেন। দর্জির দোকানে যে সে সুবিধা নেই তা বলছি না তবে বারবার দোকানে যাওয়া সময়ের বা খরচা করা এটা সত্যিই অপ্রীতিকর ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা পোষাক তৈরীতে একটু দক্ষ হয়ে উঠলে নতুন নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করতেও আপনি দিনকে দিন উৎসাহী হয়ে উঠবেন। আপনার হাতে তৈরী পোষাক কারো গায়ে সুন্দর ফিট করলে মনে যে তৃপ্তি পাবেন সেটা কেনাতে কোনদিনও সম্ভব নয়।

—অঞ্জলি চৌধুরী

শেকল

শিশির দাস

গঙ্গার ধারে গিয়ে নিরিবিলি জায়গা বেছে দুজনে বসলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে সুগত বলল, তুমি রুশোর ঐ কথাটা মানো, স্বাধীন হয়ে আমরা জন্মাই, কিন্তু আমাদের সর্বত্র শৃঙ্খল?

—না. আমাদের জন্মেও স্বাধীনতা নেই। রুগ্ন মা-বাবার সন্তান আর স্বাস্থ্যবান মা-বাবার সন্তানে তফাৎ আছে। অতএব জন্মে কোনো স্বাধীনতাই নেই।

সুগতর পরণে প্যান্ট হাওয়াই সার্ট, সুগঠিত সুন্দর চেহারা, মাথায় বকের পালকের মতো ঘন অবিন্যস্ত চুল। ও আবার বলল, ক্রীতদাস প্রথা পৃথিবী থেকে চলে গেছে বলে, কিন্তু আমি এখন তা বিশ্বাস করি না।

বললাম, ঠিক আছে, মোটামুটি ভূমিকা তো হল, এবার ব্যাপারটা কি বল।

ও বলতে লাগল, তুই বোধহয় জানিস না, আমি মাস চারেক হল একটা সোস্যাল সার্ভিসের ট্রেনিং নিচ্ছি। শালা, এম-এ বি-টি পাশ করে বসে আছি, আজ পর্যন্ত একটা চাকরি জুটল না। এই আন্তর্জাতিক সমাজসেবক সংস্থা আশ্বাস দিয়েছে, ট্রেনিংয়ের পর চাকরি দেবে।

ও একটু চুপ করে থেকে বলল, প্রথম থেকে বলি শোন্। আসল ব্যাপারটাই বলব শাখাপ্রশাখা বাদ দিয়ে। আমরা জনা-ত্রিশ ছেলেমেয়ে যেদিন প্রথম এই ট্রেনিংয়ে যোগ দিলাম সেদিন থেকে দিন-পনের খালি বক্তৃতা শুনতে হল, যাকে বলে থিয়োরিটিক্যাল ক্লাস। মাইরি, মানুষ এত ভান ভড়ং কায়দা অভিনয় যাকে বলে বক্তৃতা পছন্দ করে তুই ভাবতে পারবি না।

আমার বস্ দুজন। একজন এক অসামান্যা মহিলা, কোটিপতির মেয়ে আর লাখপতির বৌ হয়েও সমাজসেবিকা বলে কমদামী শাড়ি ব্লাউজ পরেন। কিন্তু তুখোড় ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারেন, বার-দশেক ইউরোপ আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। বয়েস সাতাশ-আটাশ হবে, শ্যামবর্ণা, যাকে বলে অনুপমা। তাঁকে দেখে মনে হয় রাজ-রানী যেন গরিবিপণার অভিনয় করছেন, সুসজ্জিত বেশেও দেখেছি অবশ্য, ওঁর বাড়িতে, সিংহবাহিনীর মতো পাশে এ্যাল-সেসিয়ান কুকুর নিজে রাজেন্দ্রানী। একে আমরা মিসেস ব্যানার্জি বলি। আর পর-বর্তী বস্ মিস্টার মজুমদার, রাসভারি সুন্দর চেহারার ভদ্রলোক।

যাক্‌গে, দিন পনের ধরে বক্তৃতাপর্ব শেষ হবার পর একদিন মিসেস ব্যানার্জি এই সংস্থার স্কীমের লিস্ট লেখা বোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, এই বোর্ড দেখে ঠিক করুন কে কি কাজ করতে চান।

সেই লিস্টের মধ্যে একটা ব্যাপার ছিল বেশ্যাদের পুনর্বাসন। আমার কাছে ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং মনে হল।

আমি বললাম, আমি এইটে নোব।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিসেস ব্যানার্জি, মিস্টার মজুমদার এবং মিস সরকার বলে আর একজন জুনিয়ার অফিসার। তিনজনের কপাল কুঁচকে গেল। মিসেস ব্যানার্জি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন ঠিক আছে।

আমাদের বলা হল, প্রতিদিনের কাজের রিপোর্ট লিখতে হবে এবং অফিসে জমা দিতে হবে।

তারপর একদিন মিসেস ব্যানার্জি আমাকে এবং আমার আরও পাঁচজন কলিগকে ওঁর জিপে তুলে নিলেন। এই পাঁচজন কলিগের মধ্যে দুজন মেয়ে।

উৎসব কলকাতার একটা বস্তিতে গিয়ে একটা চা-পান-বিড়ির দোকানের সামনে জিপ থামল। দোকানের মালিক চেকলুঙ্গি আর গেঞ্জিপরা একটা গুন্ডা মতো লোক রাস্তায় এসে দাঁড়াল, আমরাও সবাই জিপ থেকে নামলাম।

মিসেস ব্যানার্জি তাকে বললেন, গোলাম, এইসব আমাদের ছেলেমেয়ে, ওরা তোমাদের এখানে এবার কাজ করতে আসবে, সাহায্য-টাহায্য করবে ওদের চিনে রাখো।

গোলাম সেলাম জানাল, আমরাও সেলাম করলাম।

তারপর ফের জিপে ওঠা হল। এবার জিপ গিয়ে দাঁড়াল বস্তির শেষে একটা একতলা বাড়ির সামনে। জিপে বারকয়েক হর্ন বাজাতে প্যান্ট-জামা-পরা মাঝারি বয়েসের এক যুবক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

মিসেসের সঙ্গে আমরা জিপ থেকে নেমে দাঁড়ালাম। সেলাম বিনিময় হল।

মিসেস বললেন, আনিউল ভাই, এই ব্যাচে এইসব ছেলেমেয়েরা তোমাদের এখানে কাজকর্ম করতে আসবে, দেখো কিন্তু।

আনিউল বলল, কোনো অসুবিধা হবে না দিদি, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর, জিপ ফিরিয়ে বস্তির মধ্যে ঢুকে বস্তির এক এক জায়গায় আমাদের এক এক জনকে নামিয়ে দিয়ে মিসেস ব্যানার্জি অফিসে ফিরে গেলেন।

আমাকে গোলামের চায়ের দোকানের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। এমনি করে এক একটা দলকে এক একটা আলাদা বস্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। বস্তি নিয়েই আমাদের কাজ।

জিপ চলে যেতে নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল। যতদূর চোখ যায় বিরাট এলাকা জুড়ে টালি আর খাপরার নিচু নিচু লম্বা লম্বা ব্যারাক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলে গেছে। চারদিকেই কেমন একটা নোংরা কদর্য পরিবেশ। পায়জামা, চেকলুঙ্গি সার্ট বা গেঞ্জি মানুষদের পোশাক। বোরখা হেঁটে গেল দু একটা। ঘেয়ো কুকুর ঘুরছে। জঞ্জাল ডাই করা আছে, তার থেকে গন্ধ ছাড়ছে, কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ নাকে আসে। তখন মে মাস। গরমে চারদিক ধূলিধূসর নোংরা বীভৎস দেখাচ্ছে। আমার প্রথমেই মনে হল, নিষ্ঠুর দারিদ্র্য ও বর্বরতা এখানে ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষগুলোকে নিয়ে বাঁদরনাচ নাচাচ্ছে।

আমাদের শেখানো হয়েছিল, যে কোনো বাড়িতে নক করে কথা শুরু করবে, আমিও তা পারতাম, কিন্তু গোলামকে সামনে পেলাম বলে ওর দোকানেই ঢুকে পড়লাম।

গোলাম বলল, আসুন বাবু আসুন।

ওদের উচ্চারণ অদ্ভুত, সব 'শ'ই ওদের দন্ত্য স, উচ্চারণে বিশ্রী একটা হিন্দুস্থানী ছোয়াচ টান আছে।

আমি একটা বেঞ্চিতে বসলাম। ওদিকের বেঞ্চে দুটো ছোকরা নিচু গলায় কি নিয়ে যেন ঠারে-ঠোরে উত্তেজিত আলোচনা করছে। সামান্য যেটুকু কানে এল তাতে 'জাহাজ' শব্দটা শুনলাম, মনে হল, 'স্মাগলিং' ব্যাপারে কথা হচ্ছে। পরে ভালো করে জেনেছিলাম, কলকাতার এইসব বস্তি স্মাগলিং জোন, ভয়ঙ্কর জায়গা। কোনো নতুন লোক বস্তিতে ঢুকলেই ওরা সন্দেহের চোখে দেখে।

গোলাম শুধলো, চা খাবেন?

—হ্যাঁ

ও চা করে আমাকে দিল। আমি গোলামকে দেখছিলাম। সামান্য ভুঁড়ি থাকলেও ষাঁড়ের মতো চেহারা। পানের ছোপওয়ালা লালচে দাঁত। ছোটো করে ছাঁটা চুল।

মনে মনে একটু ইতস্তত করে আমি 'তুমি' বলেই কথা শুরু করলাম, আচ্ছা গোলাম, তোমাদের এই বস্তিতে কি কি অসুবিধা আছে?

মনে হল গোলাম এসব মামুলি প্রশ্নে সিজনড্ হয়ে আছে, গড়গড়িয়ে বলে গেল, কাঁচা ড্রেন, খাটা পায়খানা, পায়খানাও খুব কম, জলের অভাব, ইস্কুল নেই, আর সবাই বেকার বাবু, কাজ চাই, চাকরি।

আমি বললাম, তা গভর্নমেণ্ট তো আজকাল বস্তির উন্নতির খুব চেষ্টা করছেন।

—লেকিন, গভর্নমেণ্ট রুজিরোজগারের কি ব্যবস্থা করছে বাবু, চাকরি হলেই তো আর দুঃখ থাকে না।

আমি শুধোলাম, এখানে শতকরা কতজন বেকার?

—তা বাবু শয়ে ষাটজন হবে।

আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশ্যাদের পুনর্বাসন এবং সেই প্রসঙ্গেই আমি যেতে চাইছি। তাই খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, আচ্ছা এ বস্তিতে মেয়েরা রুজি-রোজগার করে?

—হ্যাঁ, কিছু মেয়ে কারখানায় খাটে, কিছু মেয়ে বাসন ফিরি করে, কয়লা কুড়োয়, ঘুঁটে দেয় এই সব করে।

—শতকরা কতজন মেয়ে বেকার?

—হ্যাঁ তা শয়ে সত্তরজন।

—তাদের তো স্বামী ছেলে আছে, তারাই দেখে নাকি?

—সে আছে কিছু, অনেকেরই মরদ নেই।

—তারপর চলে কেমন করে?

এবার গোলাম খানিকক্ষণ গুম খেয়ে থাকল, তারপর বলল, তারা বেশ্যা হয়ে বাঁচে।

—এই বস্তিতে!

—হ্যাঁ বাবু!

একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনাকে দিদি দিয়ে গেল, তাই বলছি।

আমি বললাম, শোনো গোলাম, তুমি ওদের সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করতে পার না?

গোলাম অনেকক্ষণ কি ভাবল, তারপর বলল, বলুন না, আপনি ঠিক জানতে চান?

—দেখো গোলাম, তোমার কাছ থেকে জানলে ঠিক জানা হবে না। আমরা বস্তির প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ শুনতে চাই। তুমি অবশ্য লীডার লোক, সবই জানো, তবু সকলেরই তো নিজের নিজের দুঃখ থাকতে পারে?

গোলাম সেই ছোকরা দুটিকে বলল, কি রে ছালিয়া, লাল, বাবু কি বলছে শুনছিস, তা তোদের জানাশোনার মধ্যে ফুলবন্তী তো বেশ খাপসুরত, বলতে কইতে পারে, ওর কাছে বাবুকে নিয়ে যা।

ছালিয়া, লালের বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। শক্ত লোহার মতো চেহারা। মাথায় চবচবে তেল-ভেজা চুল পাট করে আঁচড়ানো। মুখ চেঁয়াড়ে, বিশ্রী পানের বসে বাঙানো ঠোঁট, লালরঙের কালো ছোপ-ধরা দাঁত। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি আর ফুলহাতা সার্ট, পায়ে রবারের জুতো।

লাল বলল, তা মাসীকে তো বলতে হবে।

গোলাম বলল, বলবি।

ছালিয়া হঠাৎ বলে বসল, ফুলবন্তীর এক পেয়ারের লোক আছে বাবু। ওর নাম আছে ওসমান। এদের এসব আসনাই ভালো নয়। আমরা সব জানি, কিছু বলি না। ওসমান তো লিয়ে ভাগতে পারবে না, তো বা পারিস কর না।

আমি বললাম, তাহলে তোমরা ব্যবস্থা করতে পারবে?

লাল বলল, কেন পারব না, চলুন, এখন ফুলবন্তী ফাঁকা আছে, এখুনি চলুন।

আমি গোলামকে চায়ের দাম দিয়ে বিদায় নিয়ে লাল-ছালিয়ার সঙ্গে বস্তিতে নামলাম। ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চললাম।

লাল শুধলো, বাবু কতদূর লিখাপড়া করেছেন?

বললাম, এম-এ পাশ করেছি।

—আরে ব্বাপ্

শুধোলাম, তোমরা কতদূর পড়েছ, পড়তে জানো?

—না বাবু, বস্তির মানুষ আমরা।

ওরা একটা খাপড়ার চালের লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। একটা ঘরের দরজার কড়া নেড়ে ডাকল, মাসী, মাসী

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া বেরিয়ে এল। মোটাসোটা চেহারা, পরনে ছাপা শাড়ি, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে বয়সের রেখার কাটাকাটি। ঠোঁট পানের রসে রাঙা। বলল, কি ব্যাপার রে?

—এই বাবুকে ফুলবন্তীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

—বাবু!

—হ্যাঁ, বস্তির ভালোর জন্যে সারা আসে।

তারপর আমাকে বলল, চলেন বাবু।

ছালিয়া সেইখানে দাঁড়িয়ে থাকল। লাল আমাকে নিয়ে একটা গলি পথ দিয়ে আর একটা গলি পথে ঢুকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল।

ভিতর থেকে মিষ্টি গলায় সাড়া এল, কে?

—আমি লাল।

দরজা খুলে গেল, শালোয়ার আর কামিজ-পরা এক মেয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

লাল বলল, এই বাবু তোর সঙ্গে কথা বলবে।

তারপর আমাকে বলল, কথা বলেন, আমি চলি।

মেয়েটা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল।

আমি শুধোলাম, ভেতরে যাব?

মৃদু মিষ্টি গলায় জবাব দিল সে, আসেন!

উচ্চারণে সামান্য হিন্দুস্থানী টান আছে।

আমি ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। মেঝেটা বাঁধানো। মেঝে থেকে ফুট চারেক ইঁটের দেওয়াল তারপর মুলীবাঁশের দরমা দিয়ে তৈরী ঘর। ওপরে খাপরার চাল। ঘরে একখানা দড়ির চারপায়া। তার ওপরে বিছানা বালিশ। ছোটো ঘর। ঘরের কোণে একটা কুঁজো আর এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস। দেওয়ালে নানান দেবদেবীর বাঁধানো ছবি টাঙানো। কালীঘাটের কালী, শিব, দুর্গা এইসব আর ল্যাংটো মেয়েমানুষের ছবি-ওয়ালা গাদা গাদা ক্যালেন্ডার দেওয়ালময় ঝুলছে।

আমি শুধোলাম, খাটিয়াতে বসব?

ও বলল, বসেন।

একটু গা ঘিন ঘিন করে উঠল তবু বসলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল। খাটিয়াতে বসে অবশ্য দেখলাম দরজার কপাটের পাশে একটা মোড়া আছে, আমি আগে দেখি নি।

স্বাভাবিকভাবেই আমি দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। আমার সমস্ত ভিতরটা কাঁপছিল। ঐ গোলাম, আলিউল, লাল, ছালিয়া, মাসী কাউকেই আমার ভালো মনে হয় নি। আমার মনে হয়েছিল ওরা সবাই অন্ধকার ভয়ঙ্কর এক জগতের অধিবাসী। নিষ্ঠুর, বীভৎস এবং বিপজ্জনক মানুষ সব। আমার মনে হয়েছিল, ওরা অবলীলাক্রমে ছুরি চালাতে পারে, খুন করতে পারে, ওদের প্রত্যেকের যৌন-ব্যাধি আছে এবং মোষ যেমন কাদায় মাখামাখি করে সুখ পায় ওরা তেমনি কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

আমি আর ফুলবন্তী দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। এই পরিবেশ এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমাকে বিহ্বল করে ফেলছিল। আমি বিস্ময় ও ভয় দমন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছছিলাম আমি। তারপর মেয়েটির দিকে তাকালাম। দরজা দিয়ে আলো আসছিল, একটা ছোটো জানলা ছিল ঘরে, তার থেকেও আলো আসছিল। তাছাড়া ঘরের আলো-আঁধারি ভাবটা তখন আমার চোখে সয়ে গেছে। মেয়েটি সুন্দরী। একটু বর্ণনা দোব নাকি? বলে সুগত একটু হাসল, বলল, বয়েস কুড়ি বাইশ হবে। ধবধবে ফর্সা রঙ। খুব মিষ্টি গড়নের সুন্দর চোখ, সরু ভুরু, লম্বা নাক, সরু সরু ঠোঁট, সুন্দর চিবুক, লম্বা গলা, উন্নত বুক, সরু কোমর যাকে বলে ক্ষীণমধ্য, নীচের দিকটা ভারি, শাঁখের মতো মনে হয়। আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল।

আমি শুধোলাম, তোমার নাম কি?

—ফুলবন্তী।

খুব মৃদুস্বরে জবাব দিল ও। ওর গলার স্বর খুব মিষ্টি এবং মৃদু।

আমি প্রশ্ন করে চললাম, এই বস্তিতে কতদিন আছ?

—দশ বছর।

—তুমি লেখাপড়া জানো?

—না

—এখানে তোমার কি অসুবিধা হয়? জল, বাথরুম, পায়খানা এসব ঠিক মতো আছে?

—পায়খানা কম, লাইন দিতে হয়।

—কেন, ভোরে উঠে গেলেই পার?

—আমরা ভোরে উঠতে পারি না।

—কটার সময় ওঠো?

—এগারোটা বারোটা

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ও চুপ করে থাকল।

শুধোলাম, কেন, অত দেরিতে ওঠো কেন?

মেয়েটা মুচকি হেসে মুখ ফেরাল।

বললাম, আচ্ছা, তোমার চোখের তলায় কালি কেন? কোনো অসুখ আছে? কি অসুখ?

ও মুখ ফিরিয়েই বলল, বাবু সবই তো জানেন তাহলে কেন এসব শুধোচ্ছেন? আমাদের সারারাত জাগতে হয়, তাই ভোর থেকে অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে হয়।

—অ, তা তোমার রোজগার কেমন হয়?

—তিনশ টাকা মতো।

—খরচ?

—সবই খরচ হয়ে যায়।

—কেন?

—ঘরভাড়া লাগে, মাসীকে দিতে হয়, ডাক্তারকে দিতে হয়, একটু দুধ মাছ না খেলে চলে না।

—লোক পিছু কত করে নাও?

—তিন টাকা।

—প্রত্যেক রাতে ক'জন খদ্দের?

—চার পাঁচজন।

—একটা লোক যদি অনেকক্ষণ থাকে?

—প্রত্যেকবারের জন্যে তিন টাকা করে। বেশিক্ষণ থাকলে কনট্রাকট করে নিই, তখন চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা পাই, তেমন খদ্দের খুব কম আসে।

—ডাক্তারের কাছে যাও কেন?

—প্রত্যেক হপ্তায় হপ্তায় দেখানো নিয়ম, একজন কম্পাউন্ডার এসে দেখেশুনে ইনজেকসন দিয়ে টাকা নিয়ে যায়।

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নানান কথা ভাবতে লাগলাম। ও চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ বললাম বসো তুমি, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, ঐ মোড়াটাতে বসো।

মেয়েটি একবার বাইরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে মোড়াতে বসে আড়চোখে আমাকে দেখতে লাগল। হয়তো অবাক হচ্ছিল, এতরকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত আমিই না ওর খদ্দের হয়ে যাই।

আমি বললাম, তুমি আমার কাছে মন খুলে কথা বলো, আমি বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছি। তাতে তোমার কিছু উপকার হবে।

আমার উপকার!

বলে ও হাসল। সে হাসি দেখলে বুক কেঁপে ওঠে।

তবু বললাম, ভয় নেই, তোমার কোনো দাদা ছিল তার সঙ্গেই কথা বলছ।

ও এবার মিষ্টি করে হাসল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দেশ কোথায় ছিল?

—ছাপড়া

—দেশে অবস্থা কেমন?

—ভালো ছিল না, বাবা চাষ আবাদ করত।

—এখানে এসে পড়লে কেমন করে?

একটু চুপ করে থেকে ও বলল, তখন আমার চাচা-চাচী কলকাতায় ছিল। দেশে খরা হল। মা-বাবা আমাকে নিয়ে কলকাতায় এল। চাচার কাছে কদিন থেকে আমাকে রেখে মা-বাবা দেশে চলে গেল। চাচা খারাপ লোক। চাচীকে চাচাই এ লাইনে নামিয়েছিল। তারপর চাচা একদিন চাচী আর বাচ্চাকে ফেলে অন্য মেয়ে নিয়ে ভাগল। তারপর আমাকেও নামতে হল।

এখানে আমার চাচীও থাকে। আমারই বয়েসী। একসঙ্গেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া।

বললাম, ফুলবন্তী, তোমার নাকি ভালোবাসার লোক আছে একজন?

ফুলবন্তী বিস্ময়ের ভান করে বলল, না, না, কে বলল?

—জালাল ছালিয়া আমাকে বলেছে, তার নাম ওসমান।

ফুলবন্তী মুখে ওড়না চাপা দিয়ে একটু বুঝি হাসল। তারপর ওড়না সরিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে পেয়ার করি।

—সেও নিশ্চয়ই তোমাকে ভালোবাসে?

ঘাড় নেড়ে কেমন যেন সংশয় এবং লজ্জিত জানাল ফুলবন্তী।

আমি দুম্ করে বলে বসলাম, যদি ওসমান তোমাকে বিয়ে করে বৌ করতে চায়?

আমি স্পষ্ট দেখলাম, ফুলবন্তী কেঁপে উঠল। চোখ বড় বড় হয়ে গেল। মনে হল, যেন অবিশ্বাস্য উদ্ভট কোনো কথা শুনেছে ও। যেন কোনো মহারাজা ওকে রাণী করে নিয়ে যেতে চায়, এমনি কোনো খবর ও পেয়েছে।

ফুলবন্তী বলল, কি বলছেন বাবু! না, না, তা কেমন করে হবে!

—ধরো যদি আমি ব্যবস্থা করতে পারি?

—না, না, ওর বাড়ির লোক রাজি হবে কেন? ঐ বা রাজি হবে কেন? আমি তো—

আমি বললাম, ফুলবন্তী, অভাবে পড়ে, মহাবিপদে পড়ে পেটের দায়ে তুমি এদ্দিন এ কাজ নিয়েছিলে। কিন্তু ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর-সংসার করবার ইচ্ছা কি তোমার নেই?

ফুলবন্তী চুপ করে রইল।

হঠাৎ আমার এই দেশ ও মানুষ নিয়ে বীভৎস কোনো বেদনা আমাকে কাতর করছিল। এই মেয়েটির ভবিষ্যৎ ভাবছিলাম। জীবন কত তুচ্ছ ও অর্থহীন। কিংবা হয়তো জীবন মানেই এই। তবু মানুষের এই ভয়ঙ্কর দুঃসহ দুঃখ তো মিথ্যে নয়। মনে হল, এই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দার্শনিক হওয়া যায় না, তার জন্যে পেটে ভাত চায়, নিশ্চিন্ত অবসর দরকার হয়।

বললাম, তোমার ওসমানের সঙ্গে আমি দেখা করব। আর তুমি ভাবো, ভেবে দেখো, বিয়ে থা করে ঘর সংসার করবে কিনা। আমি এখন প্রতিদিন এই বস্তিতে আসব, তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব।

বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল্লাম তাহলে।

পরের দিন বেলা দেড়টা নাগাদ গেলাম ফুলবন্তীর ঘরে। দরজা বন্ধ। টোকা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে পা দিয়েই দেখি একটা লোক, লোক বলা ঠিক হল না, একজন যুবক ওর বিছানায় শুয়ে আছে। আমি ঢুকতেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। সুন্দর চেহারা ছোকরার। ফর্সা তামাটে রঙ। মাথায় বড় বড় অবিন্যস্ত ঘন চুল, ওপর দিয়ে আঁচড়ানো, টানা টানা ঘন ভুরু, সুন্দর চোখ, লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ গড়ন, ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা।

ফুলবন্তী লাজুক হেসে বলল, এই ওসমান

ওসমান আমাকে সেলাম করল, আমিও সেলাম ফিরিয়ে দিলাম।

ওসমান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে বলল, বসুন।

আমি খাটিয়াতে বসলাম, বললাম, তুমিও বসো।

ওসমান মোড়াটাতে বসল। ফুলবন্তী দাঁড়িয়ে রইল।

প্রথমে সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ টানলাম। গম্ভীর রহস্যময় স্তব্ধতা জমাট বেঁধে থাকল।

আচমকা বললাম, ওসমান, তুমি কোথায় থাকো?

—এই বস্তির লাগাও রাস্তার ওপারে একটা বাড়িতে।

—কি করো তুমি?

—আমি? কারখানাতে চাকরি করি, পাকা চাকরি।

—তোমার কে কে আছে?

—বুড়ো বাবা আর একটা বোন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তা ওসমান তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কখন দেখা হবে?

—সন্ধ্যের সময় যদি যান।

ও আমাকে ওর বাসার নির্দেশ দিয়ে দিল।

আমি বললাম, আজ তাহলে চলি।

ওদের দুজনকে রেখে আমি চলে এলাম।

সন্ধ্যেবেলায় গেলাম ওসমানের কাছে। ওসমান আমারই জন্যে ওর ঘরের সামনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল। যেতেই সাগ্রহে অভ্যর্থনা করল। দুজনে হেঁটে হেঁটে একটা পার্কে গিয়ে ঢুকলাম। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের কুয়াশার মতো আলো আকাশে মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। চারদিকের কোলাহল আর হৈ-হট্টগোলের মাঝখানে সেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা গাছ, ঘাস আর খোলা আকাশ আমার ভালো লাগছিল।

আমরা দুজনে মুখোমুখি বসলাম। খানিক চুপচাপ বসে থেকে বললাম, ওসমান ফুলবন্তীকে তুমি ভালোবাসো?

ওসমান বলল হ্যাঁ।

—তাহলে ওকে ওখানে ফেলে রেখেছ কেন?

—কি করব? মাসী আর মাসীর মুরুব্বি আনিউল আর মাসীর পোষা দুই গুন্ডা লাল ছালিয়া ওকে ছাড়বে না।

—ছাড়বে না কেন?

—বাঃ মাসীর ব্যবসা তো ঐ। কেউ কি মূলধন ছাড়তে চায়? ফুলবন্তীরা চলে গেলে মাসীর ব্যবসা-রোজগার তো বন্ধ হয়ে যাবে। আর ফুলবন্তীর মতো খাপ-সুরত মেয়ে।

আমি বললাম, যাক্ গে, তুমি কি ফুলবন্তীকে বিয়ে করে ঘর করতে রাজী আছ?

—আলবৎ।

—তাহলে ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করি।

—করুন, যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করে দিন।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমাদের বিয়েতে খরচ কত হয়?

ওসমান বলল, মসজিদের মৌলভী কিছু টাকা নেয় আর একটু খাওয়া-দাওয়া, তা শ-দুয়েক টাকা খরচ হবে।

—কে দেবে?

—কেন, আমার বিয়ে, আমি দেব।

আমি তো ভেতরে ভেতরে অবাক হয়ে যেতে লাগলাম। ওসমান, এই বস্তির মূর্খ নিরক্ষর ওসমান, সে এতবড় প্রেমিক যে, বস্তির সস্তা বেশ্যা জেনেও ফুলবন্তীকে ও বিয়ে করতে চায়!

বললাম, আচ্ছা ওসমান, তুমি যে রকম পাত্র, তাতে অনেক ভালো মেয়ে তুমি বিয়ে করতে পার, ওকে কেন বিয়ে করতে চাইছ? তোমার মন কি বলে?

ওসমান রেগে উঠল, কেন? ওর দোষটা কি? ও দেখতে-শুনতে ভালো, ভালো মেয়ে, ও আমাকে ভালোবাসে, ও আমার বৌ হলে আমার ভালো লাগবে।

—কিন্তু তুমি সুন্দরী কুমারী মেয়ে পেতে।

ওসমান খেপে উঠল, কি যে বলছেন আপনি! এসব কথা ছেড়ে দিন। বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা বলুন। আমি যদি ওকে পাই, আমার মনে কোন দুঃখ থাকবে না।

ভারপর থেকে আমি প্রায় প্রতি দিন দুপুরবেলা ফুলবন্তীর কাছে যেতাম। নানান কথাবার্তা হত। ক্রমশঃ আমাদের মধ্যে রীতিমত বন্ধুত্ব তৈরী হয়ে গেল। ওসমানের সঙ্গেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। বিয়ের কথা ক্রমশঃ পাকা হতে লাগল।

ফুলবন্তী ওসমান তখন মশগুল হয়ে আছে। ফুলবন্তী ভাবত, আর কি, এই নরকে থেকে হাজার লোকের সঙ্গে আর ওকে রাত কাটাতে হবে না। এবার নিজের স্বামী, নিজের ঘর হবে। ভবিষ্যতের নানান ভাবনায় ও রোমাঞ্চিত হয়ে থাকত। কিন্তু তবু ভয়ে কাঁপত। ভাবত, সবই হয়তো মিথ্যে হবে, মাসীকে সে চিনত।

আমি বলতাম, কোনো ভয় নেই, তোমরা ঠিক থাকো কারও সাধ্যি নেই কোন রকম বাধা দিতে পারে।

শেষে দিনস্থির করবার জন্যে একদিন শেষ দুপুরে ফুলবন্তীর ঘরে ওসমান, ফুলবন্তী, আমি আমার এক মহিলা কলীগ আর মিস সরকার মিলিত হলাম। কথা ঠিক হল, পরের দিন বিয়ে হবে। মিস সরকার সেদিন অফিসের জীপ নিয়ে এসেছিলেন সেই জীপে করে ওসমানকে নিয়ে মৌলভীর কাছে গেলাম। ফাইনাল কথা হয়ে গেল। ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে আনিউলের কাছে যাওয়া হল। আনিউল তো প্রথমটা গম্ভীর করে সব শুনল, তারপর হেসে ওসমানের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, বাঃ বলিহারি নওজোয়ান, বেশ!

আমার দিকে ফিরে বলল, আমি আগেই সব শুনেছি, এ বস্তির সব খবরই আমার কানে আসে। তা এতো খুব আনন্দের কথা, আমরাও তো এই-ই চাই। দেশে তো এ ব্যবস্থা আমরা বেআইনী করে দিতেই চেয়েছি।

আমি অনুরোধ করলাম, স্থানীয় নেতা হিসেবে বিয়েতে আপনাকে থাকতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়ই, তা থাকব না!

আনিউলের কাছ থেকে বিদায় নিতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আনিউল আমাদের অনেকক্ষণ দেরী করিয়ে দিল, আমাদের বসিয়ে রেখে বাইরে কার সঙ্গে কথা বলে এল, আমাদের চা না খাইয়ে ছাড়ল না।

ওসমানকে বললাম, একবার আমাদের অফিসে চলো, মিসেস ব্যানার্জি আর মিস্টার মজুমদার তোমার সঙ্গে একবার কথা বলতে চান।

তা ওসমানকে নিয়ে আমরা জীপে উঠে বসলাম। বস্তির এলাকাটা পেরিয়ে একটু এসেছি, হঠাৎ দেখলাম সামনে লাল আর ছালিয়া হাত তুলে জীপ থামাতে বলছে। জীপ থামাতে বললাম ড্রাইভারকে।

গাড়ী থামতেই লাল আর ছালিয়া এসে ওসমানের কলার ধরে হেঁচকা টান মেরে নীচে নামিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড মারতে লাগল।

লাল হঠাৎ আমার বুকের কাছের জামা খামছে ধরে বলল, হেই বাবু, তুইও নেমে আয়।

আমি নেমে গেলাম। আমার জামার কলার মুঠি করে টিপে ধরে বলতে লাগল, ফের যদি কখনো এই বস্তিতে এসেছ তো তোমাকে শালা খুন করে ফেলব, জান লিয়ে লোব। মনে থাকবে?

বলে দাঁতে দাঁত পিষে আমাকে টুঁটি ধরে কটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বেশ্যার বিয়ে দিতে এসেছো! নিজের বোনের বিয়ে দেগা যা, মনে থাকে যেন পেট ফাঁসিয়ে দোব, টুঁটি ছিঁড়ে লোব

বলে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ওসমানকে টুঁটি টিপে ধরল, আর যাবি ফুলবন্তীর কাছে? জান লিয়ে লোব শালা!

ওসমানকে দুজনে মিলে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম। স্বভাবতই মহিলা দুজন ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে গাড়ীতে বসেছিলেন। আমি গাড়ীতে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দিল।

মিস সরকার বললেন, থানায় চলো।

মিস সরকার ভীত সন্ত্রস্তভাবে থানার ও-সিকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেন।

ও সি গম্ভীর অবিচলিতভাবে বললেন, ডায়রী করে যান।

—আপনি এখন কিছু করবেন না?

—না এখন কিছু করা যাবে না, আপনারা ডায়রী দিয়ে যান, আমি দেখব।

অগত্যা চলে আসতে হল।

তখনই গাড়ী নিয়ে গেলাম আনিউলের কাছে। লাল ছালিয়ার ব্যাপারটা বললাম। শুনে আনিউল আমার উপরেই রেগে উঠল, আপনারা এসব করতে যান কেন? ড্রেন করছেন, পায়খানা করছেন, দুধ পাউরুটি বিলি করছেন, করুন, হঠাৎ বেশ্যার বিয়ে দেবার কি দরকার হল আপনার?

—সেই বলে? আপনি তো ওসমানকে উৎসাহ দিলেন?

—রাখুন রাখুন, এ বস্তিতে আপনি যাতে আর না ঢুকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব।

অগত্যা জীপে উঠে বসলাম।

অফিসে মিসেস ব্যানার্জি, মিস্টার মজুমদার আমাদের জন্যেই বসেছিলেন।

সব শুনে মিসেস ব্যানার্জি চীৎকার করে উঠলেন, আপনাকে আমি ট্রেনিং থেকে ছাড়িয়ে দোব। কেন এসব ঝামেলার মধ্যে গেলেন আপনি?

আমি বললাম, কিন্তু আমাদের তো এ সম্পর্কে স্কীম আছে।

—থাকুক, আপনি আর কোনদিন ও বস্তিতে যাবেন না, আপনাকে আমি অন্য বস্তিতে পাঠাব।

এত দুঃখে বলে চুপ করে গেল সুগত।

আমি বললাম, তারপর?

তারপর আর কি, বেশ্যা বেশ্যাই থেকে গেল!

—আর ফুলবন্তী বা ওসমানের সঙ্গে তোর দেখা হয় নি?

খেঁকিয়ে উঠল ও, দেখো, আমি বহু দিন বেকারীর জ্বালা সহ্য করছি তাই মিসেস ব্যানার্জির কথা অবহেলা করবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি চাকরী করতে গেছি, রামমোহন বা বিদ্যাসাগর হতে যাই নি।

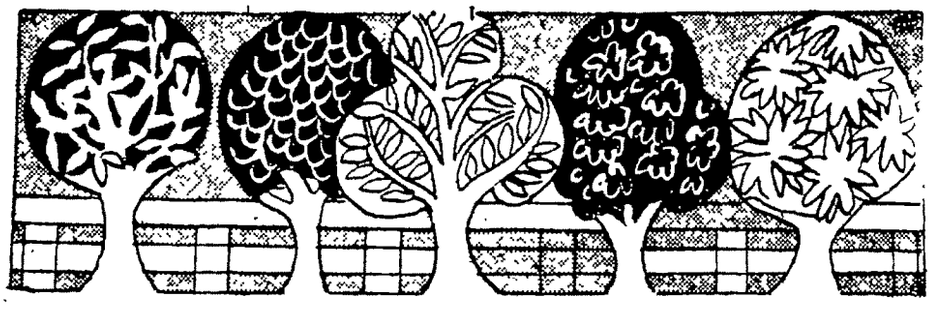

এভাবেই কানামাছি খেলা ॥

শান্তনু দাস

কতো দূর হাঁটছো সময়, বল্গাহীন, আয়ুহীন
কামক্রোধ মাৎসর্যবিহীন
এক মানুষের মতো।
তুমি হেঁটে গেলে
শব্দময় অতীতের ভয়।
তুমি থেমে গেলে
ঝরে যাওয়া ফুলফুল দু-মুঠোয় চেপে নিয়ে ভাবি
বেঁচে আছি—

আছি?

এভাবেই কানামাছি
ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছোঁ
এ কেমন রসিকতা
এ আবার কি মরণ খেলা।

এই অবেলায়
ঠাঁ ঠাঁ রোদে চুঁয়ে পড়ে ঘাম,
জামরুল আকাশ পেঁচিয়ে
দিনমান, মাথার ওপরে জমে
মেঘ—
বল্গাহীন আয়ুহীন মাৎসর্যবিহীন
এক দুর্মর আবেগ
জ্বলন্ত তুষের বুকে হেঁটে যায়
পায় হয়—
ঘর দেয় কত গৃহস্থালী।।

ফুরিয়ে গেছি ॥ গিরিধারী কুন্ডু

সমানে
ক্ষয়ে যায় নরম এ বয়স
প্রয়োজন সবচেয়ে এখন
তোমাকে।

সারাক্ষণ
পাশে পাশে নিজের ছায়া নিয়ে
ঝিলে বসে
জ্বান সয় নি কি জানি কি ভেবে!

বুকে পিঠে ত
এতটুকু রোদ লাগে নি ভাব
জন্ম নাচানো পাগলামি শুধু
পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে!

তোমার চোখেতে
নির্নিমেষ আমি জড়িয়ে যেতে
মুখ ফিরিয়ে জল-আয়নায়
কাঁপিয়ে পড়লে।

হয়ত ফুরিয়ে গেছি বলে!

নদী ॥ ইরা সরকার

এখানে ডুবেছে জানি শান্তনুর সাতটি সন্তান—
প্রশ্নহীন নির্বিচার;
জন্ম নিল দেবব্রত, তারপর, বলেছে পুরাণ
প্রতিজ্ঞা-তৎপর—
সে পুরুষ ভীষ্ম হয় পিতামহ মহাভারতের
যে পেয়েছে শরশয্যা অর্জুনের,
পিপাসায় চেয়ে নেয় শরাঘাতে জল
যে জলে সে ডুবতে পারত মায়ের হাতেই
উষ্ণ ও কোমল—
অদৃষ্ট সে উত্তরাধিকার
আমরা চলেছি বয়ে দহন তুষার।

সাতদিনের শুভাশুভ

(৩ কার্তিক হইতে ১ কার্তিক)

গ্রহসন্নিবেশ : রবি তুলায়, শুক্র ও বুধ বৃশ্চিকে, শনি ও কেতু মিথুনে, রাহু ধনুতে, বৃহস্পতি মকরে এবং মেষে মঙ্গল।

মেষ : শুভদিন আগত। সতর্ক ও সংযমশীল থেকে সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করুন। আয় মন্দ নয়। শরীর ও মন ভাল। কাজকর্ম অনুকূল। মেয়েদের পক্ষে আনন্দের সময়। শুভ তারিখ : ২০, ২২, ২৪ অকটোবর।

বৃষ : শুভাশুভমিশ্রিত ফল লাভ। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকলেও কোনপ্রকারে আয়-ব্যয়ে সামঞ্জস্য আসবে। কাজকর্ম মন্দ নয়। শরীরের প্রতি যত্ন দিন। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ২১, ২৬ অকটোবর।

মিথুনে : বাধাবিঘ্ন থাকলেও সময়টা ক্রমশ ভাল হচ্ছে। শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক দুশ্চিন্তা কমবে। কাজকর্ম ততটা অনুকূল নয়। আর্থিক ক্ষেত্র চলনসই। মেয়েদের শরীর সুবিধার নয়। শুভ তারিখ : ২০, ২৩, ২৫ অকটোবর।

কর্কট : শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও কাজকর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা প্রবল। পুত্রসন্তানের উন্নতিতে মন উৎফুল্ল থাকবে। আয় একপ্রকার। ব্যবসায় সুবিধার নয়। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ২৩ অকটোবর।

সিংহ : সাফল্য আসছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। শরীর ও মন অবশ্য সুবিধার নয়। কিন্তু কাজকর্ম ভালই চলবে। আয় একপ্রকার ভালই। ব্যবসায় চলনসই। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ২২, ২৬ অকটোবর।

কন্যা : শত্রুতাজনিত আতঙ্ক, শারীরিক কষ্ট, ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকলেও কাজকর্মে অগ্রগতি ঘটবে। বিবিধ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। মেয়েদের শরীরের প্রতি কড় নেওয়া দরকার। শুভ তারিখ : ২১, ২৭ অকটোবর।

তুলা : বিবিধ বাধা ও অশান্তির মধ্যেও আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য আসবে। শরীর সুবিধার নয়। পারিবারিক ও আর্থিক দুশ্চিন্তা থাকবে। কিন্তু কাজকর্মে, ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। মেয়েদের পক্ষে মানসিক অস্বস্তির লক্ষণ আছে। শুভ তারিখ : ২১, ২৪ অকটোবর।

বৃশ্চিক : বিবিধ ক্ষেত্রে সাফল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ আছে। শরীর ও মন ভাল। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। কাজকর্মে সুখ্যাতি পাবেন। মেয়েদের পক্ষে সময়টা অনুকূল নয়। শুভ তারিখ : ২০, ২৬ অকটোবর।

ধনু : নতুন বন্ধুজনের দ্বারা উপকৃত হবেন। শরীর ও মন ভাল। আয় বৃদ্ধির যোগ আছে। ব্যবসায় মন্দ নয়। বেকার কাজ পেতে পারেন। মেয়েদের পক্ষে শুভ সময়। শুভ তারিখ : ২২, ২৪, ২৫ অকটোবর।

মকর : মানসিক দুশ্চিন্তা থাকলেও শরীর একপ্রকার। আর্থিক দুশ্চিন্তা কমবে। ব্যবসায় অনুকূল। কাজকর্ম শুভসূচক। মেয়েদের পক্ষে সময়টা চলনসই। শুভ তারিখ : ২৫, ২৯ অকটোবর।

কুম্ভ : শরীর সুবিধার নয়। মানসিক ক্ষেত্র ভাল। ব্যয়াধিক্যের চাপ থাকবে। ব্যবসায় সুবিধার নয়। কিন্তু কাজকর্ম স্যাটের উপর ভাল। মেয়েদের পক্ষে ভাল সময়। শুভ তারিখ : ২৬, ২৯ অকটোবর।

মীন : শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটবে। ব্যয়ের উপর নজর রাখুন। ব্যবসায় মন্দ নয়। কাজকর্মে সাফল্যের লক্ষণ আছে। মেয়েদের মনের কোন বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শুভ তারিখ : ২০, ২৯ অকটোবর।

প্রশ্নের উত্তর

মন্টুমোহন জানা (মেদিনীপুর) : চাকুরীতে পরিবর্তন যোগ কম। ১৯৭৬ সালে উন্নতির সম্ভাবনা।

নীলমণি নাথ (মাকড়দহ) : ২৫ বছর বয়স থেকে রোগের উপশম হবে। শ্বেত-প্রবাল রত্ন ধারণ কর্তব্য।

মিনতি ঘোষ (কলি-৫৬) : ধনু রাশি, নরগণ। ৩২ বছর বয়স থেকে সময় ভাল। প্রবালরত্ন ধারণীয়।

সবিতা মণ্ডল (সিংভূম) : বিশাখা-নক্ষত্র, তুলারাশি দেবারিগণ, কর্কটলগ্ন।

পতাসচন্দ্র বসু (কলি:-৩০) : ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ৩০ বছর বয়স থেকে ভাল চলবে।

কিরণময়ী রায় (হুগলী) : আগামী বর্তমান বছরেই প্রবলযোগ।

আরতী দে (চন্দননগর) : প্রবালরত্ন ধারণে মানসিক ব্যাধির অনেক উপশম হবে।

দেবযানী নাগ (করিমগঞ্জ, কাছাড়) : গ্রাজুয়েট হবার যোগ আছে। সম্মান-পরিচিতি প্রতিষ্ঠার যোগ ভালই।

শঙ্করী মৈত্র (বাঁকুড়া) : আয়ুষ্কাল ৬৪ বছর। অপারেশন যোগ আছে।

শ্রীমতী এস চক্রবর্তী (কলিঃ) : একটি পুত্র সন্তান যোগ আছে।

মে এন ভট্টাচার্য (শিলং আসাম) : ৫৭-৫৮ বছর বয়সে বাড়ী হবার প্রবল যোগ আছে।

জগন্ময় ভট্টাচার্য (শিলং আসাম) : বিদ্যা বিষয়ে যথেষ্ট বাধাবিঘ্ন আছে। ১৭ বছর বয়স থেকে কিছুটা ভাল। গোমেদধারণ করা যেতে পারে।

পার্থ মিত্র (কলিঃ) : ২৩ বছর বয়সে চাকুরী লাভের সম্ভাবনা।

মেধা মিত্র (কলিঃ) : ১৩৮০ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। অতঃপর মধ্যম প্রকার।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য (পাটনা) : বাধা-পূর্বক মধ্যম শিক্ষিতা হবেন। ২০ অথবা ২২ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা।

বিজয়ভূষণ পাল (বিবাটী) : ২৫ বছর বয়সে চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

কানিজ বতুল (বাংলাদেশ) : ১৯৭৪ সালের জুলাই-এর পর থেকে সব দিক থেকে শুভ সময়।

কনিজ ফতেমা (বাংলাদেশ): বাংলা বর্তমান বছরেই বিবাহ সম্ভব।

আলী আশরাফ (বাংলাদেশ) : সাময়িক মিথ্যাপবাদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন দুর্ঘটনা নেই।

কানিজ কুলসুম (বাংলাদেশ) : ১৯৭৫ সালেই সম্ভাবনা বেশী।

প্রবীর চৌধুরী (যাদবপুর) : ১৯৭৪ সালে পদোন্নতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।

শীলা চৌধুরী (যাদবপুর) : আয়ু-স্কাল ৬৬ বছর। বর্তমান সময় ভাল নয়। প্রবালধারণ করা যেতে পারে।

অশোক চৌধুরী (যাদবপুর) : আয়ু-স্কাল ৬৯ বছর। মাঝে মাঝে বায়ুজ ও রক্তের চাপজনিত পীড়া এবং চক্ষু পীড়ার আশঙ্কা আছে। মানসিক শান্তি রক্ষা। নীলাধারণ ও গোমেদধারণ কর্তব্য।

সুভাষচন্দ্র বৈদ্য (বহরমপুর): মূলা-নক্ষত্র, ধনু-রাশি তুলালগ্ন।

ধীরেন্দ্রনাথ দেবনাথ (ডিগবয়, আসাম): ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

আরতি দেবী (নিউ দিল্লী): জন্ম তারিখ সময় পাঠিয়েছেন, কিন্তু কারও নাম উল্লেখ না করায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না।

শিশিরকুমার পাল (তিনসুকিয়া) : ১৯৭৩ সালেই চাকুরী লাভের যোগ প্রবল।

অরবিন্দ সেন (কলিঃ) : আপনার রাশিচক্র অনুসারে ১৯৭৪ সালে আপনার মাতৃবিয়োগের আশঙ্কা আছে।

সুমন্ত সাহা (নাগেরবাজার): মকর রাশি। প্রতিকূল গ্রহ থাকায় আগামী বছরে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে কিনা সন্দেহ।

দীপালী পাল (বিবাটী) : বাংলা এ বছরেই বিবাহের সম্ভাবনা। পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে না।

রঞ্জনকুমার সাহা (কালীচক) : ১৩৮০ সালেই বিবাহের সম্ভাবনা।

অপর্ণা রায়চৌধুরী (ব্যারাকপুর) : এম-কম পাশ করবার যোগ আছে। ১৯৭৪ সালেই বিবাহের সম্ভাবনা।

শুভ্রাবর্মন রায় (গৌহাটি) : পরীক্ষার ফল আশানুরূপ নয়। ২৪ বছর বয়সে বিবাহের সম্ভাবনা।

অরূপকুমার নন্দী (বেলেঘাটা) : মিথুন রাশি নরগণ, মকর লগ্ন। ১৯৭৫ সালে চাকুরী লাভের যোগ।

সবিতা সেনগুপ্তা (কলিঃ) : প্রতি-কূল গ্রহ থাকায় পরীক্ষার ফল আশানু-রূপ নয়। আগামী অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুনের মধ্যে বিবাহের যোগ।

প্রদীপকুমার দে (বরাহনগর) : পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার যোগ আছে। ১৯৭৪ সালের জুনের মধ্যে চাকুরী লাভের সম্ভাবনা।

সুশান্ত সেন (বিবাটী) : কর্কট রাশি, বর্তমান চাকুরীই স্থায়ী হবে।

অনিতা দে (হাওড়া): ১৩৮০ সালের শেষের দিকে বিবাহের সম্ভাবনা। পাত্র সুপ্রতিষ্ঠ বংশজাত হবে।

সুব্রত দে (হাওড়া) : বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক গ্রাজুয়েট হতে পারেন।

রণজিৎ বিশ্বাস (বাঁকুড়া) : ৩৫ বছর বয়স থেকে ভাল সময় আরম্ভ হবে। ব্যবসায়ে উন্নতির যোগ বেশী। দাম্পত্য জীবনে কিছুটা অশান্তি ভোগ করতে হবে।

অনুপকুমার মুখার্জি (আসানসোল) : চাকুরীজীবী হবেন। ভবিষ্যৎ মধ্যম প্রকার।

প্রদীপ ব্যানার্জি (কলিঃ-১৪) : পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হলেও কৃত-কার্য হবার যোগ আছে।

কমল চক্রবর্তী (হাওড়া) : পরীক্ষায় সুফল হবে কিনা সন্দেহ। ১৯৭৪ সালের জুনের পর চাকুরী লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসা না করাই ভাল।

কৌশিক রায় (বোকারো) : ২১ বছর বয়সে চাকুরীপ্রাপ্তির সম্ভাবনা।

—শুভাচার্য

অমৃত

ভাগ্য গণনার কুপন

নাম ... ...

জন্ম সময় ও তারিখ কিম্বা রাশি ও লগ্ন ... ...

আপনার প্রশ্ন ... ...

[কুপনটি কেটে প্রশ্নের সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে অমৃতের ঠিকানায় খামের ওপর শুভাশুভ লিখবেন।]

সাধনা বসু ও
প্রীতি মজুমদার

সাধনা বসু

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

অসমাপ্ত অনুষ্ঠানসূচীর সাধনা বসু পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন গেল দুর্গা-সপ্তমীর দিন, ৩ অক্টোবর, বুধবার বেলা ১০টার সময়ে। শরীর তাঁর ইদানীং ভালো যাচ্ছিল না, মাঝে মাঝেই সর্দি-কাশিতে ভুগছিলেন, দিনকে দিন তাঁর দেহ কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে আসছিল, এ সবই সত্যি। কিন্তু তাই বলে বমে মানুষে টানাটানি হচ্ছে, এমন কোনো মরণাপন্ন অসুখে তিনি শয্যাগত হয়ে থাকেননি। কয়েকদিন আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় তিনি দুর্বলতা অনুভব করছিলেন, এই মাত্র। তেসরা সন্ধ্যায় একটি নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছিল; বা কিছুই খেতে দেওয়া হয়, তাই বমি করে ফেলতে থাকেন এবং সহসা তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তার আর্টিফিসিয়াল রেস্পিরেশন ও হার্ট ম্যাসাজের।

১৯১৪ সালের ২০ এপ্রিল (বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস) তারিখে তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন সমবায় ম্যানসন-এর (ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিং—বর্তমানে ফুটনার্দি চেম্বার) দক্ষিণ-পূর্ব ভাগের একটি ফ্ল্যাটে সেদিন যেমন তাঁকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরই পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজন, ঠিক তেমনই তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে আচার্য জগদীশ বসু রোডস্থ কারনানী এস্টেটের ৭৭ নম্বর বাটিতে শোকাচ্ছন্নচিত্তে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরই ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী এবং শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কীয় নিতান্ত আপনজনেরা তাঁর মরদেহটুকু শেষবারের মতো দিদার জানাবার জন্যে। বাহিরাগতের মধ্যে একমাত্র লেখক ছাড়া দ্বিতীয় কোনও শরিকে কারনানী এস্টেটের দ্বিতলের ঐ ফ্ল্যাটটির সামনে উপস্থিত হতে দেখা যায়নি। শ্রীমতী বসুর মরদেহ বহনকারী শকট কেওড়াতলা শ্মশানাভিমুখে রওনা হবার পরে কারনানী এস্টেটে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া এক সংবাদ শোনা মাত্র তিনি শ্মশানে গিয়েছিলেন শিল্পীর উদ্দেশ্যে শেষ অভিনন্দন জানাবার জন্যে।

ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পৌত্রী, ব্যারিস্টার সরল সেনের দ্বিতীয়া কন্যা সাধনার পাঠ্যজীবন শুরু হয়েছিল তাঁরই ঠাকুরদাদার প্রতিষ্ঠিত ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশন-এ। পরে তাঁকে ভর্তি করা হয় লোরেটো কনভেন্ট-এ। কিন্তু অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণের নীরস জগৎ থেকে সুরের সরল লোকের প্রতি তাঁর মন অধিকতর আকৃষ্ট হয় বাল্যকাল থেকেই। প্রথমে সঙ্গীত-সঙ্ঘ ও পরে সঙ্গীত-সম্মিলনীর ছাত্রী রূপে তিনি যোগ দেন মাত্র বারো বছর বয়সেই এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখের কাছ থেকে গান শিখতে করেন। গানের চেয়েও নাচের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল

বেশী এবং তারই জন্যে কত্থক নাচের তালিম নেন তিনি তারকনাথ বাগচীর কাছে। তাঁর ছোট বোন নীলিমা যখন একাগ্রচিত্তে মার্গসংগীত শিক্ষার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রেওয়াজ করতেন তখন সাধনা সেন মাত্র বছর চৌদ্দ বয়সেই 'সনাতন নৃত্য শিল্পের সঙ্গে কিছুটা নিজস্বতার পরশ বুলিয়ে তাকে এক নবরূপ দিয়ে তার মধ্যে থেকে নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবার উন্মাদনায়' মেতে উঠেছিলেন।

ঠিক এই সময়েই ১৯২৭ সালের শেষের দিকে ব্যারিস্টার সরল সেনের বাস-গৃহ আপার সার্কুলার রোডস্থ (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) লিলি কটেজ-এ (কমল কুটির-এ) এসে উপস্থিত হলেন সদ্য ইয়োরোপ প্রত্যাগত মধু বসু তাঁর মেজদিদি সুরমা রায়ের সঙ্গে। উদ্দেশ্য, স্বর্গীয়া সরলাবালা রায় প্রতিষ্ঠিত গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের সাহায্যের জন্যে তিনি যে আলিবাবা অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন, তারই সখী সঙ্ঘের জন্যে নাচের মেয়ে সংগ্রহ করা। শ্রীবসু কিশোরী—কিংবা নবযৌবনাও বলতে পারা যায়—সাধনা ও তার ছোট ভগ্নী নীলিমাকে নির্বাচন করলেন তাঁর নাচের দলে। ১৯২৮-এর ১৭ জানুয়ারী মধু বসু প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স'-এর প্রথম নিবেদন 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হয় এম্পায়ার থিয়েটার-এ (বর্তমানে রকসী) অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে। কিন্তু অভিনয় শেষ হলেও মধু বসুর লিলি কটেজ-এ যাওয়া অব্যাহত রইল এবং শ্রীমতী সাধনা বসুর ভাষায় 'আমার সেই অনেক পিছনে ফেলে আসা কোমল-স্বচ্ছ, কুমারী-কিশোরী মনের আনাচে কানাচেও যাতায়াত আরম্ভ করল মধু।.....আজকের সাধনার চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠছে সেদিনকার সাধনা যখনও মধুকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে, কখনও বা সমস্ত বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে এক মনে শুনছে মধুর গাওয়া গান। গানের মধ্যে দিয়ে পরস্পরকে জানাতুম আপন অনুভূতি।'

এরই মাঝে সি এ পির দ্বিতীয় নিবেদন 'দালিয়া' মঞ্চস্থ হল এম্পায়ার-এ ১৯৩০-এর ১৬ এপ্রিল। নায়িকা ভিন্নির ভূমিকায় সাধনা সেন এবং 'দালিয়া' বেশে অবতীর্ণ হলেন মধু বসু। দর্শক ও সমালোচক বৃন্দ অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এই বছরেরই ১৫ ডিসেম্বর তারিখে নব-বিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মবান্ধব কেশবচন্দ্রের পৌত্রী সাধনা হিন্দু-ধর্মাবলম্বী প্রমথনাথ বসুর চতুর্থ পুত্র সুকুমার ওরফে মধুর গলায় বরমাল্য অর্পণ করেন। ১৬ বছর বয়স্কা সাধনার সঙ্গে ৩১ বছর বয়স্ক মধুর বিবাহ অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়।

এরপরে মধু ও সাধনার যুগ্ম প্রচেষ্টায় ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স (পরে ১৯৩৬ থেকে যার নাম হয় কালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স) ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে প্রায়ই মাঝে মাঝে মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন করে সাফল্যমণ্ডিতভাবে। দালিয়া, জোঁরিনা, আলিবাবা, মন্দির, ওমর খৈয়াম সাবিত্রী, বিদ্যুৎপর্ণা, রাজনটী, রূপকথা প্রভৃতি প্রতিটি মঞ্চাভিনয়ই সি এ পিকে দিয়েছে অর্থ ও যশ। প্রথম প্রথম যতদিন সি এ পি মাত্র কোনও বিশেষ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্যে নাট্যানুষ্ঠান করত, ততদিন এর পুরো নাম ছিল ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স। কিন্তু যখন এই দল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মতোই সাধারণের মধ্যে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখাতে শুরু করল তখন দলের মধ্যে এবং দলের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেকেই 'অ্যামেচার' কথাটায় আপত্তি জানালেন; অথচ সি এ পি নামটার প্রতি সকলেরই দুর্বলতা ছিল। তখন মধু বসুই সি এ পি নামটিকে বজায় রাখলেন দলের পুরো নামটিকে ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-এ রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ সি এ পি একটি পেশাদার সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। সি এ পির অনুষ্ঠান-পত্রে (প্রোগ্রামে) লেখা থাকত—ক্যাপ (সি এ পি) ইট-অল।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাঙ্গালী জন-সাধারণ মনে-প্রাণে অভিনয়কে ভালোবাসলেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে অভ্যস্ত নয়। এবং ১৯৩০-এর দশকে অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব যুগে কি মঞ্চে এবং কি চলচ্চিত্রে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্যে অভিনেত্রী সংগৃহীত হত সমাজে যারা পতিতা, সেই বারাঙ্গনা কুল থেকে। নর্তকী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন তখন গহরজান, মালকাজান প্রমুখ বাইজী সম্প্রদায়ভুক্ত নারী। যতদূর মনে পড়ে অভিজাত শ্রেণী থেকে রেবা রায়ই প্রথম নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন কোনও একটি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যার্থ এবং আরও মনে পড়ে, দিলীপ রায়ের সহযোগিতায় তিনিই 'মীরাবাঈ' নৃত্যনাট্যের প্রদর্শনী করেন এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ঐ একই কারণে। ভারত-জার্মান সহযোগিতায় নির্মিত নির্বাক ছবি 'থ্রো অব এ ডাইস'-এ শিল্পী চারু রায়ের স্ত্রী মায়া রায়ই গৃহস্থ ঘরের বধূ হয়েও প্রথম চলচ্চিত্রশিল্পীরূপে যোগদান করেন। কিন্তু এঁরা কেউই নৃত্য বা অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। মধু বসুর ভাষায় 'সাধনাই হচ্ছে শিক্ষিত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত বিবাহিত মেয়ে, যে চলচ্চিত্র শিল্পকে (অভিনয় ও নৃত্যকে) প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল।' এ ব্যাপারে সাধনা বসু নিজে আরও সোচ্চার। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন : সমাজের চোখে রঙ্গমঞ্চ সেদিন খুব একটা প্রশংসার বস্তু ছিল না; আজকের মতো রঙ্গমঞ্চ সেদিন সমাজের সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টিচ্ছায়ায় পুষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেদিন রঙ্গমঞ্চ ছিল অনভ্যস্ত অনাদরের অতি উপেক্ষার আধার। শিল্পের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে, কলার সঙ্গে এর সম্পর্ক যতই ওতঃপ্রোত ঘনিষ্ঠ মিবিড় থাক না, অন্ধশ্রদ্ধা ছাড়া সমাজের কাছে সেদিন আর কিছুই তার পাওনা ছিল না। তারপর আবার ভদ্র পরিবারের মেয়েদের রঙ্গমঞ্চে অবতরণ—তা সে পেশাদারীভাবেই হোক বা অপেশাদারীভাবেই হোক—সে তো এক কথায় ছিল যাকে বলে—স্টুকচার্টলি প্রহি-বিটেড। এরই মধ্যে দিয়ে আমাদের করে নিতে হয়েছে পথ, অজস্র ঝোপঝাড়, কাঁটা সরিয়ে নির্মাণ করতে হয়েছে চলার পথ, যে-পথে ভবিষ্যতের অসংখ্য নরনারীর পড়বে মিলিত পদস্পর্শ। নিন্দা-বাধা-কটূক্তির ঢক্কানিনাদের মধ্যেও স্থির রাখতে হয়েছে আপন আপন সঙ্কল্প, ধৈর্যশীল পরি-বারের ও কয়েকটি স্থানীয় পত্র-পত্রিকার শাণিত অসিতে ও রক্তিম নেত্রে বিচলিত না হয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে আদর্শ, বুক দিয়ে আগলে রাখতে হয়েছে স্বপ্নসৌধ, চালিয়ে যেতে হয়েছে অভিযান।'

কিন্তু মাত্র সি-এ-পি'র নাট্যাভিনয়ে অভিনেত্রীরূপে যোগ দিয়েই সাধনা বসু নিজেকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন নি। তিনি নিজস্ব নৃত্য-সম্প্রদায় বা ব্যালে ট্রুপ তৈরী করলেন এবং কখনও বা বিখ্যাত ইম্প্রেসারিও হরেন ঘোষ কিম্বা কখনও বা এস আর হেমাদ পরিচালিত এম্পায়ার টকী ডিস্ট্রিবিউটার্স-এর সহযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে—উত্তরে দিল্লী সিমলা থেকে পশ্চিমে বোম্বাই আমেদাবাদ এবং দক্ষিণে মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর পর্যন্ত প্রায় আসমুদ্র হিমাচল—তাঁর নৃত্যকলা প্রদর্শন করে প্রভূত খ্যাতি ও যশ লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের আভিজাত্য বজায় রাখবার জন্যে অত্যধিক পরিমাণ ব্যয় হওয়ার জন্যে খ্যাতি ও যশের তুলনায় অর্থলাভ হয় যৎসামান্যই, এমন কি, কোথাও কোথাও ব্যয়বাহুল্যের চাপে তাঁকে আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে। নিজেকে নৃত্যনিপুণা করবার অদম্য বাসনা ছিল সাধনা বসুর মধ্যে। ব্যালে ট্রুপ গঠন করবার সময়ে শ্রীমতী বসু মণিপুরের রাজকুমার সেনারিকের কাছ থেকে মণিপুরী টাণ্ডিপ্পকোরিয়ান নৃত্য শিক্ষা করেছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। এরই মাঝে কণ্ঠসঙ্গীত বিষয়ে তিনি পাঠ নিয়ে-ছিলেন সুরশিল্পী কুমার শচীনদেব বর্মণের কাছে।

নাট্য প্রযোজনা করতে করতে মধু বসু বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লেন তাঁর সি-এ-পি'র বিজয় বৈজয়ন্তী 'আলিবাবা'র চিত্ররূপ দেবার জন্যে। মনোগত অদম্য আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করতে বিলম্ব হল না। শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর বাবুলাল চোখানীর আর্থিক সহযোগিতা ও প্রযো-জনায় ১৯৩৬ সালে 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রের রূপ পেল সম্পূর্ণভাবে সি-এ-পি'র শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয়ে এবং ১৯৩৭-এর ১৩ ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করায় সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করল। দর্শকদের সবচেয়ে বেশী অভিভূত করল সাধনা বসুর নাচ, গান, অভিনয় এবং দৈহিক সৌন্দর্য। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলতে পারি, এমন একাধারে রূপগুণসম্পন্না অভিনেত্রী বাঙলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে আমরা দ্বিতীয় কাউকে দেখি নি। 'আলিবাবা'র পরে হয় 'অভিনয়'। ১৯৩৯-এ

সুরেন্দ্র দেশাইয়ের (বুলবুল) আমন্ত্রণক্রমে মধু বসু সদলবলে গেলেন সাগর মুভী-টোনের হয়ে দ্বিভাষী চিত্র 'কুমকুম' করতে। এই ছবিতেও শ্রীমতী সাধনা দর্শকদের কাছ থেকে প্রচুর অভিনন্দন লাভ করেন। কিন্তু যে-কোনও কারণেই 'সেদিন সাধারণের দেওয়া সম্মান' সাধনার মনে রেখাপাত করতে পারে নি।' এ ব্যাপারে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'নিজেকে সরিয়ে রাখার স্পৃহা আমার বাল্যকাল থেকে, এক কথায় চিরকাল। যে কোন ব্যাপারে নিজে সম্পূর্ণভাবে জড়িত থেকে, ওতঃপ্রোতভাবে তার সঙ্গে মিশে থেকে, আশ্চর্যভাবে তারই মধ্য থেকে আবার সরিয়ে রাখা, আমার স্বভাবই বলুন, ইচ্ছাই বলুন বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বলুন। স্নায়বিক চঞ্চলতাও এর জন্যে কম দায়ী এমন কথা জোর দিয়ে আমি বলতে পারি না।' আমরা জানি, অগণিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সাধনা ছিলেন স্বতোৎসারিত প্রস্রবনের মতোই দরাজ, মুক্ত হৃদয়, কিন্তু সেই অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর বাইরের জগৎকে তিনি একান্তভাবে পরিহার করে চলতেন—বহুজনের সম্মেলন থেকে তিনি নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪০-এ মধু বসু করলেন ইংরাজী, হিন্দী ও বাঙলায় দ্বিভাষী চিত্র 'কোর্ট ড্যান্সার', যার বাঙলা সংস্করণের নাম হয়েছিল : রাজনর্তকী। ছবিটি ছিল নৃত্যপ্রধান এবং বলা বাহুল্য সাধনা বসুর ছিল প্রধান ভূমিকা। মণিপুরের রাজনর্তকীর ভূমিকাভিনেত্রীকে নৃত্যশিক্ষা দিয়েছিলেন কেরল কলামণ্ডলম-এর জয়শঙ্কর এবং মণিপুরের সেনাপতি রাজকুমার। 'কোর্ট ড্যান্সার'ই হচ্ছে প্রথম ভারতে প্রস্তুত ইংরাজী সংলাপবিশিষ্ট ছবি, যা কলম্বিয়া পিকচার্স-এর পরিবেশনায় আমেরিকার নিউইয়র্কে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুক্তিলাভ করেছিল। এবং এই কারণেই শ্রীমতী সাধনা সম্পূর্ণরূপে ভারতে নির্মিত প্রথম আন্তর্জাতিক ছায়াছবির তারকারূপে অভিহিত হবার সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। এর পরেই তাঁর দ্বিভাষী ছবি হচ্ছে নিউ থিয়েটার্সের 'মীনাক্ষী'। ১৯৪২-এর আগস্টের গোড়াতেই সাধনা বসু পাড়ি দিলেন বোম্বাই শহরে, সেখানে এস, সি দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অমর পিকচার্স-এর 'পরদেশ' ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে। এই প্রথম শ্রীমতী সাধনা মধু বসুর পরিচালনার বাইরে ছবিতে অভিনয় করলেন। ১৯৪৩-এ রঞ্জিত পিকচার্স-এর 'লঙ্কার-পার্বতী' এবং 'বিষকন্যা'তেও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন সাধনা অন্যের পরিচালনাধীনে। এই ১৯৪৩ সালেই সাধনার জীবনে একটি দৈশিক পরিবর্তন আসে—মধু এবং সাধনার মধ্যে হয় দীর্ঘদিনব্যাপী কিছেদ দুজনের মন কষাকষির ফলে। সাধনার চারপাশে তখন বহু স্তাবক এবং সুনামের শীর্ষজলে তখন সে আসীন। অপরদিকে মধু বসুর তখন হাতে কোনও কণ্ট্রাক্ট নেই, হাতেও নেই পয়সা। ইনফরমেশন ফিল্মস-এ অতি কষ্টে শ্রীবসু যোগাড় করেছেন একজন পরিচালকের কাজ মাসিক ১,০০০ টাকা মাহিনায়। সাধনা তখন ব্যক্তিগত সাফল্যে গর্বিতা। যিনি স্বামী-স্ত্রীর এই বিচ্ছেদকে দূরে সরিয়ে দিয়ে উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারতেন, সেই সরল সেনও আকস্মিকভাবে ১৯৪৩-এর ৮ ডিসেম্বর অকস্মাৎ ইহধাম ত্যাগ করলেন।

১৯৪৪-এর গোড়ায় জয়ন্ত পিকচার্স-এর 'উর্বশী' ছবির নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে সাধনা চুক্তিবদ্ধ হল। কিন্তু নানা অনির্দেশ্য কারণে ছবির কাজ শুরু না হওয়ায় সাধনা সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন নৃত্যপ্রদর্শনী করতে। যুদ্ধের পরিস্থিতি তখন ভারতের পূর্বাঞ্চলে এনেছে অকল্পনীয় দুর্ভিক্ষ—না খেতে পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাচ্ছে। নিয়ন্ন মানুষের এই আর্তনাদকে কেন্দ্র করে সাধনা পরিকল্পনা করলেন 'ভুখ' নৃত্যনাট্যের এবং তারই সঙ্গে ঈশ্বরে আস্থাস্থাপন করাবার জন্যে 'ডিভাইন সোর্স'। দুটি নাচই অভূতপূর্বভাবে অভিনন্দিত হল। নৃত্য-প্রদর্শনীগুলি সমাপ্ত হবার পরে সাধনা ফিরে গেলেন বোম্বাইয়ে 'উর্বশী' ছবি করবার জন্যে। কিন্তু কিছুদিন শুটিং হতে না হতেই তিনি পড়লেন কঠিন অসুখে এবং সারতেও লাগল প্রচুর দেরী। কাজেই 'উর্বশী' ছবি কোনোদিনই শেষ হতে পেল না। যখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন, তখনও ছবি তৈরী করবার জন্যে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত। শ্রীমতী সাধনা রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'অজন্তা' নামে একটি খসড়া চিত্রনাট্য তৈরী করিয়ে ছিলেন এবং তার চলচ্চিত্র রূপ দেবার জন্যে প্রয়োজনীয় লাইসেন্সও পেয়েছিলেন। কিন্তু বহুরকম তোড়জোড় সত্ত্বেও, অনেক দিন ধরে নাচের মহলা চালাবার পরেও 'অজন্তা'র চিত্রগ্রহণ কার্য শুরু হয়নি তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ায়। কঠিন নিউমোনিয়া রোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তিনি সিমলা যান। সেখান থেকে ফিরে কিছুদিন কলকাতায় থেকে তিনি চলে গেলেন বোম্বাই এবং সেখান থেকেই আবার নাচের দল তৈরী করবার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। যুক্তপ্রদেশ ও পূর্ব পাঞ্জাব অঞ্চলে নৃত্যানুষ্ঠানের জন্যে তিনি তৈরী করলেন 'বার্থ অব ফ্রীডম', 'উইদাউট নাউ?', 'সমর্পণ' এবং 'অজন্তা'। এ-ছাড়া ছিল তাঁর একক নৃত্য 'দ্রৌপদী'। বলা দরকার ইতিমধ্যেই ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এ-ছাড়া বোম্বাইয়ে 'জোশাশঙ্কর' (ফেমাস পিকচার্স), 'নন্দকিশোর' (জোগেলকার পরিচালিত), 'শিন শিনাকী বুবলা বু' (পি. এল. সন্তোষী) এবং 'তিতলী' (জেমিনী দেওয়ান প্রযোজিত) ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। ১৯৫৩ সালে সাধনা ফিরে এলেন কলকাতায় এবং এসে উঠলেন গড়িয়াহাটা রোডে তাঁর মায়ের বাড়ীতে। বাবুলাল ঢোখানীর নির্মীয়মান ছবি 'মা ও ছেলে'তে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মধু বসু পরিচালিত 'শেষের কবিতা'র 'কেটি'র ভূমিকাটির অনবদ্য রূপ দান করলেন। মধু বসুর অন্য ছবি 'বিক্রমোর্বশী'র নৃত্যপরিচালনার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করলেন এবং রাণী উশীনরীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হলেন। তাঁর চিত্রাভিনেত্রীর জীবনের এইখানেই যবনিকাপাত হল।

অ্যাস্টোরিয়া থেকে মধু বসু কারখানী এস্টেটের ৭৭ নম্বর ঘরে আসেন ১৯৫৮র ১ এপ্রিল 'অমৃত' এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের সহায়তায়। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত মধু বসু তাঁর আদরের স্ত্রী সাধনাকে যথাসম্ভব মর্যাদার সঙ্গে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। কিন্তু শ্রীবসুর মৃত্যুর পরে মধুহীন সাধনার জীবন হয়েছিল বিষাদে ভরা। অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর কোনো না কোনো কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখার জন্যে। এক সময়ে একটি 'নাচের ক্লাশ'ও খুলেছিলেন এবং সেই সময়ে দেখেছি অপটু দেহ নিয়েও তাঁকে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা দিতে। 'সাধনা বোস নিউ আর্ট প্রোডাকসন্স'-এর নামে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে তিনি উড়িষ্যা রূপার গহনা সম্পর্কে 'টুইংক্লিং স্টার্স' নামে একটি রঙীন তথ্যচিত্রও প্রযোজনা করেছেন। তাঁর সর্বশেষ শিল্পকৃতীর পরিচয় রয়েছে স্টারে কৃত বর্তমানে অভিনীত 'জনপদবধূ' নৃত্য পরিকল্পনার মধ্যে। শুনেছি, অসুস্থ দেহ নিয়েও তিনি বেটুকু নাচ শিখিয়েছেন, তার তুলনা নেই।

সাধনা বসু এবং মধু বসুর মৃত্যুর মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাকে বিস্মিত করেছে। ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের বেলা ১০-৩০ মিনিটে যখন শ্রীবসুর মৃত্যু হয়, তখনও হয়েছিল অসম্ভব বৃষ্টি এবং ১৯৭৩-এর ৩ অক্টোবরের বেলা ১০টায় যখন সাধনা বসুর মৃত্যু হয়, তখনও আকাশ ছিল কর্ষণমুখর। দুজনেরই মৃত্যু হল আশ্বিনে বেলা ১০ থেকে ১০-৩০ এর মধ্যে। —কেমন যেন দুজনেরই জীবনে এবং মরণে একটি মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ওতো সাধনা নয়, ও হচ্ছে মধুর মাধবী'—দুজনেই যেন পরস্পরের জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন, একজন চলে যাওয়াতে অপরজন মনে করল নিজেকে রিক্ত, একাকী—তাই অপরজনও মাত্র চার বছরের ব্যবধানে প্রথমের অনুসরণ করলেন।

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা

(১) রৌদ্রছায়া

এস বি এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত এবং বিমল কর লিখিত কাহিনীনির্ভর রৌদ্রছায়ার চিত্রনাট্যটি ঠিক যেন ছবিটির নায়ক চরিত্রাভিনেতা উত্তমকুমারের নাট-নৈপুণ্য প্রকাশের সর্বাংশে উপযোগী করে রচিত হয়েছে। এবং কাহিনী সংস্থাপনায় একটা গতানুগতিকতার ছক থাকলেও নায়ক পিয়ারীলাল বার্জ চরিত্রটি অবশ্যই বাংলা চলচ্চিত্রে যথেষ্ট নূতনত্ব-পূর্ণ। ট্রেণ দুর্ঘটনায় বাপ-মা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরে (অবশ্য জীবন্ত ছেলে অমন ধনী পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কি করে তার কোনও কৈফিয়ৎ নেই) একটি অল্পবয়স্ক বালক মিশনারীদের দ্বারা লালিত পালিত হয়। কিন্তু কুসংসর্গে পড়ে সে যখন সংশোধনের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তখন মিশনের 'ফাদার' তাকে মিশন ত্যাগ করবার আদেশ দেন। ছেলেটি ক্রমে পরিণত হয় এক ওয়াগন ব্রেকার দলের দুর্ধর্ষ সর্দারে। দলের চার্লি নামে এক যুবকের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে 'ওস্তাদ' সর্দার যখন পুলিশের কু-নজরে পড়ে, তখন সে গত্যন্তর না দেখে পালিয়ে আসে উড়িষ্যার রাজগাংপুরে এবং সেখানে তার নব-পরিচিত পঞ্চুদার চেষ্টায় সিমেন্ট কার-খানায় এক চাকরী পেয়ে যায়। পঞ্চু ও তার ভগ্নী যমুনার সান্নিধ্যে এসে পিয়ারীলাল বার্জ—এই নামই তখন ওস্তাদ গ্রহণ করে-ছিল—তার অতীতের অন্ধকারময় দিন-গুলিকে ভোলবার চেষ্টা করে এবং সৎ জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যখন প্যান্ডে, হাবু সিং, কেষ্ট মাইতি প্রমুখ গোষ্ঠীকে সে অসাধু উপায়ে সিমেন্ট পাচা-রের জন্যে সন্দেহ করে কোম্পানীর ম্যানে-জিং ডিরেকটার মিঃ মুখার্জির কাছে জানাতে যায়, তখন ঐ গোষ্ঠীর কার-সাজিতে উল্টে সে-ই মিঃ মুখার্জির চোখে সন্দেহভাজন হয়ে পড়ে। পরে যখন সে হাতেনাতে ওদের ধরিয়ে দেয়, তখন মিঃ মুখার্জি ওর তারিফ করেন এবং ওকে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। বেশই চলছিল; কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক ওয়াগন-ব্রেকার চার্লি হঠাৎ ওখানে এসে উপস্থিত হল এবং পিয়ারীলালের—এখন অবশ্য ওর নাম সাদেব—বিরুদ্ধবাদী পান্ডে প্রমুখের সঙ্গে যুক্তি করে পুলিশের কাছে ওর অতীত প্রকাশ করে দেয়। ফলে যখন ও পুলিশের গুলীতে মারা যায়, তখনই প্রকাশ পায় ওই হচ্ছে মিঃ মুখার্জির সেই হারানো ছেলে, রেল দুর্ঘটনা যার হারিয়ে যাওয়ার কারণ হয়েছিল।

কাজল গুপ্ত

একদা দুর্বৃত্ত ছিল, আজ সৎ হতে চায়, কিন্তু দুর্বৃত্তদের সঙ্গে রেষারেষিতে মাঝে মাঝে দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে, অতীত অন্ধকারময় জীবনকে কিছুতেই ভুলতে পারে না, ভুলতে পারে না যে, ওর নামে একদিন পুলিশের হুলিয়া বেরিয়েছিল এবং যে-কোনোও দিন সনাক্ত হবার ফলে সে পুলিশ দ্বারা ধৃত হয়ে বিচারার্থ চালান যেতে পারে—এমন একটি চরিত্র, পিয়ারী-লাল বার্জ নিশ্চয়ই বাঙলা চলচ্চিত্র অভিনব এবং আকর্ষণীয় নায়ক। তার ওপর হিন্দী ছবির নায়কের মতো তার অসমসাহসিকতা, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে যুদ্ধে—জুডো-যুদ্ধে—তার অপরাজেয়তা, বাইরে একটা বেপরোয়া ভাব অথচ অন্তরে একটি শিষ্টতার ছাপ চরিত্রটিকে দর্শকদের কাছ থেকে অপর্যাপ্ত ভালোবাসা পাবার যোগ্য করে তুলেছে। চিনাট্যকার অত্যন্ত সুকৌশলে পিয়ারী লালকে অপর সকল বিষয়ে বেপরোয়া করে তুলেও তাকে নারীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতনভাবে পরিচ্ছন্ন করে তার প্রতি দর্শক সহানুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তুলে-ছেন। হরু সিংয়ের পালিতা কন্যা কৌশ-ল্যাকে মনে মনে পছন্দ করলেও সে বার-বার তাকে দূরে রেখেছে নিজেকে তার ভালোবাসা পাবার অযোগ্য বলে। আবার সুলতা চৌধুরী অভিনীত লঘু চরিত্রের নারীর প্রণয়নিবেদনকেও সে অনায়াসে উপেক্ষা করেছে। 'অর্থ উপার্জনই তার জীবনের একমাত্র কাম্য'—এই কথা জাহির করে সে বহুবার অসাধুদের দলে মিশবে বলে ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু বারবারই সে অসাধুতা থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করেছে—সত্যিই পিয়ারীলাল বার্জ চরিত্রটি বাঙলা চলচ্চিত্রে অদৃষ্টপূর্ব।

এবং এই অভিনব চরিত্রটি আরও বেশী করে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে উত্তমকুমারের অতি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ স্বাভাবিক অভিনয় গুণে। একমাত্র একেবারে শেষ দৃশ্যে গুলীর পর গুলী দ্বারা বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তার বহুক্ষণ চলাফেরা করা এবং ভূপাতিত হবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকার অস্বাভাবিকতাকে বাদ দিয়ে চরিত্রটিকে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাস্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন। 'পিয়ারীলাল বার্জ' চরিত্রচিত্রণ উত্তমকুমারের চলচ্চিত্র জীবনে নাটনৈপুণ্যের স্মরণীয় নিদর্শন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। একটি সস্তা চরিত্রের যথাযথ-

রঞ্জিত মল্লিক　　সুচিত্রা সেন　　দেবী চৌধুরানীর বহির্দৃশ্যে। ফটো: অমৃত

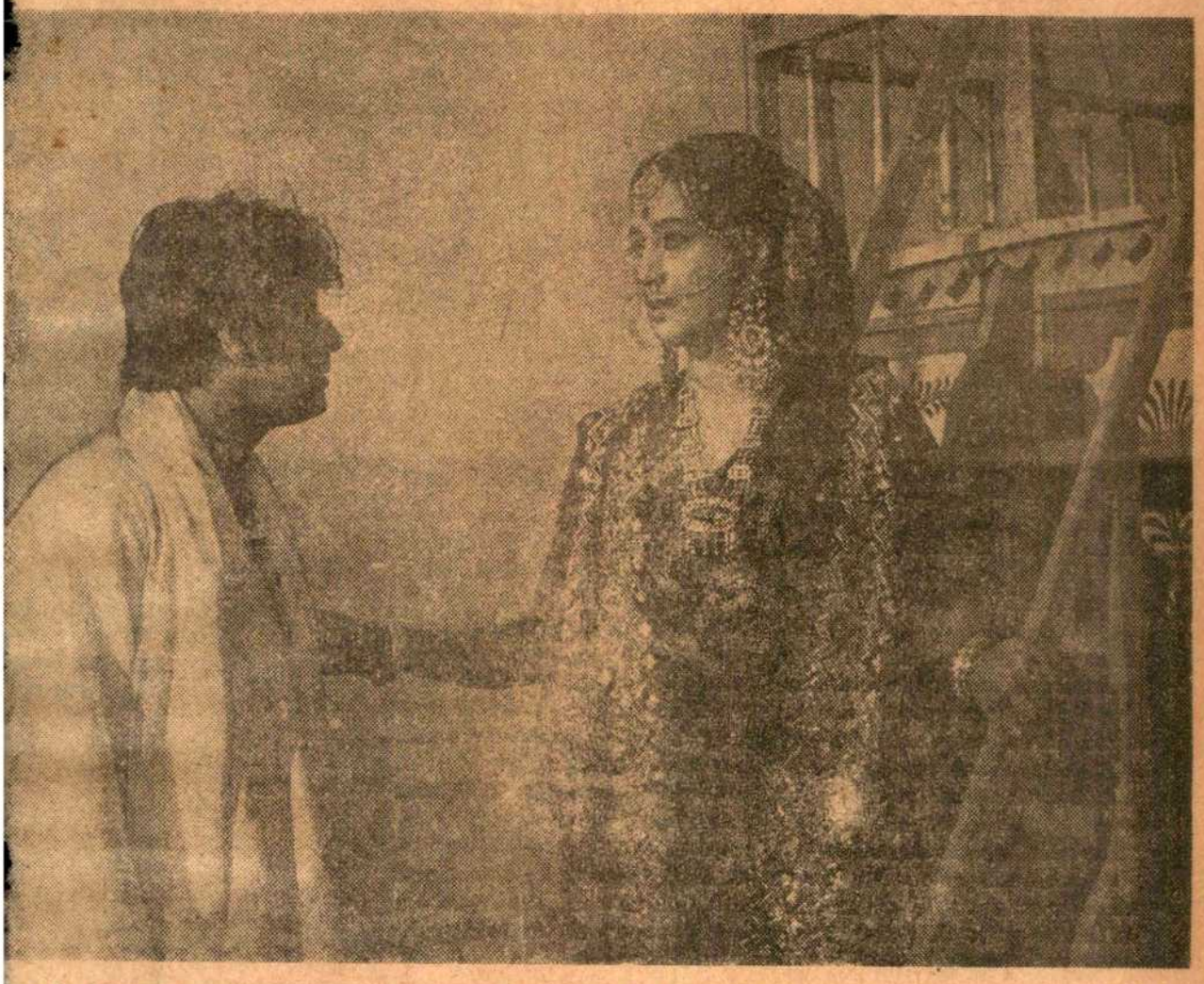

দেবীরাণীর ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী বাচনে, ভঙ্গিভঙ্গীতে মোহনীয় হয়ে উঠেছেন; বিশেষ করে, তাঁর নৃত্যভঙ্গিমা দর্শক দৃষ্টিকে বারংবার আকৃষ্ট করেছে। যমুনা ভাবীর ভূমিকায় সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়ের মিত, অথচ দরদী অভিনয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর এই ভূমিকাভিনয় দেখে আমাদের মনে ক্ষণে ক্ষণে প্রশ্ন জেগেছে, এঁকে নায়িকার ভূমিকায় কোনও প্রযোজক বা পরিচালক মনোনয়ন করেন না কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নায়িকার ভূমিকায় তিনি বিস্ময়কর নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখেন। নায়িকা কৌশল্যার ভূমিকায় অঞ্জনা চক্রবর্তী দর্শক সহানুভূতি লাভ করেছেন স্বাভাবিকভাবে সংলাপ বলে; তাঁকে বিশেষ কোনও নাটনৈপুণ্য প্রকাশ করতে হয়নি। অন্যান্যদের ভূমিকায় ছায়া দেবী, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, রসরাজ চক্রবর্তী, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী প্রমুখ শিল্পী চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের মধ্যে প্রথমেই যা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হচ্ছে কাহিনীর পটভূমিকা সম্বলিত বাস্তব ও চিত্তবেশ রচনা। ছবির শুরুতেই পশ্চাদ্ধাবনকারী পুলিশের হাত এড়াবার জন্যে যেখানে ওস্তাদ এখান থেকে ওখানে ছুটে গা-ঢাকা দিচ্ছে, সেই বাস্তব পরিবেশের পরে রাজগাংপুরের পথঘাট, ফ্যাক্টরী, দোকান প্রভৃতি ছবির একটি বিরাট অংশ বহির্দৃশ্যে গৃহীত হয়ে ছবির কাহিনীটিকে একটি জিনিষ্ট রূপ দান করেছে। দর্শক মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে এর দান সামান্য নয়। আলোছায়া সৃষ্টিতে চিত্রকাহিনীর রাত্রির দৃশ্যগুলি অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজিয়ে কাহিনী বিস্তারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেল, কোনো দৃশ্যই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় স্থায়ী হয়ে অযথা স্থান জুড়ে নেই; এ-ব্যাপারে সম্পাদক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ছবির অন্যতম একটি আকর্ষণ হচ্ছে এর কণ্ঠসঙ্গীতাংশ। অনিলভূষণ নাহার রচনার মধ্যে যেমন একটি অনাবিল অভিনবত্ব আছে, তেমনই অভিনবত্ব আছে সুকুমার মিত্রের সুরযোজনায়। সুলতা চৌধুরীর মুখে শুধু শুধু চমক জিয়া গানটিতো রীতিমত আলোড়নসৃষ্টিকারী। অপর গান তিনখানিও যথেষ্ট শ্রুতিসুখকর ও চিত্তগ্রাহী।

এস বি এন্টারপ্রাইজ নিবেদিত, জে কে ফিল্মস্ পরিবেশিত এবং শচীন অধিকারী পরিচালিত 'রৌদ্রছায়া' উত্তমকুমারের বলিষ্ঠ অভিনয়গুণে, কাহিনীর অভিনবত্বে এবং শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের চিত্তগ্রাহিতায় দর্শকদের আদরণীয় হয়ে উঠবে সুনিশ্চিতভাবে।

(২৯) শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিমল মিত্রের 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' উপন্যাসটি যখন সাময়িকপত্রের পূজা সংখ্যায় পাঠ করেছিলুম, তখন তার নায়ক লোকনাথ রায়ের মনোবেদনা অবধারিতভাবে আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু কাহিনী পাঠের সময়ে মনের মধ্যে একটা গ্রহণ বর্জন নীতি কাজ করতে থাকে, যার প্রভাবে কাহিনীগত সকল পরিস্থিতির সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোনো চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু ঐ উপন্যাসের ওপরই নির্ভরশীল, প্রতিভা জিয়েশাস্ নিবেদিত এবং সলিল দত্ত পরিচালিত 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' ছবিখানি যখন দেখলুম, তখন মনের মধ্যে সম্ভাব্যতা অসম্ভাব্যতার প্রশ্ন স্বতঃই জাগ-

রিত হল। কারণ ঘটনার পরে ঘটনা সাজিয়ে যখন চিত্র-কাহিনীটি রচনা করা হয়, তখন চিত্রনাট্যকার যে গ্রহণ-বর্জন নীতি অবলম্বন করেই সে কাজ করবেন, এইটেই আশা করা যায়। চিত্রনাট্যকাররূপে সলিল দত্ত নিশ্চয়ই তা করেছেন, কিন্তু তাঁর গ্রহণ-বর্জনের কাজটি প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠেনি। তিনি অদ্ভুত এক মানসিক চিন্তার কুড়ুনক হয়ে গেছেন। ফলে, তাঁর নায়ক তাদেরই কারখানার গোপন পাপকে আবিষ্কার করে এই পাপবোধের সঙ্গে হিরোশিমার ওপর অ্যাটম বোমা ফেলা, ভিয়েৎনামের নিরীহ মানুষদের ওপর বোমা ফেলা প্রভৃতির সমন্বয় সাধন করল এবং নিজে দায়দায়িত্ব-বোধহীন হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মানুষের অন্ধত্ব সে ঘোচাতে চাইল একটি অন্ধ মেয়ের দৃষ্টিশক্তিকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে। কিন্তু মানুষের অকারণ হিংসার শিকার হল সে নিজে।

চিত্রে ঘটনার পরে ঘটনা, পরিস্থিতির পরে পরিস্থিতি সাজিয়ে কাহিনীর যে-ভাবে বিস্তার সাধন করা হয়েছে, তাতে লোকনাথ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সম্পূর্ণ অবাস্তব চরিত্র। ঠাকুরমার (দিদিমা?) সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হল সে কি কারণে? তাঁর স্নেহের প্রতিদান দেবার জন্যে কি? কিন্তু ঠাকুরমার মৃত্যুর পরে সেত অনেক কিছুই করতে পারত। কর্মীদের সঙ্গে যৌথ প্রতিষ্ঠান করে সেত সৎভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার আদর্শকে তুলে ধরতে পারত এবং তখন তো তার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠিনী সরযূকে ঘৃণাপথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারত এবং আরও বহুতর কাজ করতে পারত সমাজের অন্যতম অংশীদার হিসেবে। জোলো নাটকীয়তা সৃষ্টির চেয়ে জীবনকে সার্থক করে তোলার চিত্র আঁকা ঢের বেশী কঠিন। ঐ কঠিন পথে কাহিনীকার বিমল মিত্র বা চিত্রনাট্যকার সলিল দত্ত —কেউই পা বাড়াতে ভরসা করেননি। তাই অবাস্তব চরিত্র লোকনাথকে অকারণে বোমার শিকার করা ছাড়া অন্য কোনো পথ রইল না।

এই অবাস্তব লোকনাথ চরিত্রটিকে রূপায়িত করবার সাধু প্রচেষ্টা করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রি-অ্যাকসান বা প্রতিক্রিয়া তাঁর মুখে চোখে সুন্দরভাবে অভিব্যক্তি হয়; এ-ছবিতেও তা হয়েছে। কিন্তু যেখানে চরিত্রটিই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত নয়, সেখানে একটি অখণ্ড প্রত্যয়শীল চরিত্রচিত্রণ হয় কি করে? বরং সরযূর চরিত্রটি অনেক বেশী বাস্তব; বুদ্ধিদীপ্ত মেয়েটি যখন দেখল, এ পৃথিবীতে সৎভাবে বাঁচবার কোনোই উপায় নেই, তখন সে উপার্জনের প্রশস্ত পথটিই বেছে নিল। এই চরিত্রটিকে জীবন্তভাবে রূপায়িত করেছেন অপর্ণা সেন; তাঁর বাচন এবং অঙ্গভঙ্গী চরিত্রটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে। অপরাপর ভূমিকায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অমর মুখোপাধ্যায়, তরুণকুমার, জহর রায়, প্রমুখ শিল্পী চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বহির্দৃশ্য এবং অন্তর্দৃশ্য—উভয় ক্ষেত্রেই চলচ্চিত্রশিল্পী বিজয় ঘোষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্পনির্দেশনা বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গীতে মান্না দে সুরযোজনা করেছেন। হিপ্পিদের 'গোবিন্দ গোপালা' গানখানি হয়েছে সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য। আরতি মুখোপাধ্যায় গীত 'ও আমার সমাজপতি' গানটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

প্রতিভা ক্রিয়েশান্স নিবেদিত, চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত এবং সলিল দত্ত পরিচালিত 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' বর্তমান পটভূমিকায় রচিত জনচিত্তগ্রাহী চিত্র।

(৩) অভিমান (হিন্দী)

অমিয়া প্রোডাকসন্স নিবেদিত পবনকুমার ও সুশীলা কমাত প্রযোজিত এবং হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় লিখিত ও পরিচালিত 'অভিমান' ছবিটি দেখবার পরে প্রথমেই মনে হয়েছে, বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে আমরা যখন বোম্বাই-ছবির অনুকরণে ছবির মধ্যে ক্যাবারে নৃত্য ও মারপিট প্রভৃতির স্থান করে দিতে ব্যস্ত, তখন খাস-বোম্বাই শহরে বসে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এমন একখানি সর্বাংশে পরিচ্ছন্ন বাঙলা মার্কা হিন্দী ছবি তৈরী করলেন কোন চিন্তার বশবর্তী হয়ে? কাহিনীর কোথাও নেই যৌন নামক পদার্থের ছড়াছড়ি, নেই কোনো হিংসাত্মক ঘটনা, একটি খল চরিত্র পর্যন্ত নেই। স্রেফ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অভিমানের ঘটনাকে অবলম্বন করে কি আশ্চর্য মর্মস্পর্শী ছবি তৈরী করে পরে, তারই একটি জাজ্বল্যমান নিদর্শন হচ্ছে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় 'অভিমান' ছবিটি। দেখলে ভুলতে পারবে না, এমনই ছবি।

বিখ্যাত গাইয়ে সুবীরকুমার জনপ্রিয়তার তার উচ্চ শিখরে আসীন। তার গান-পাগল চিত্রা তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কয়ে ধন্য হয়। এ-হেন সুবীরকুমার তার দূরসম্পর্কের দুর্গা মাসীর অনুরোধে এক গ্রামোফোন কোম্পানীর হয়ে গাইতে গেল এবং মাসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখা পেল গ্রাম্য মেয়ে উমার। প্রথম দর্শনেই সে হল তার গানে মুগ্ধ, পরে ব্যবহারে কোমলতায় এবং শেষ পর্যন্ত সে তাকে বিবাহ করে শহরে ফিরল। সুবীরের মোসাহেব মারী-বন্ধু চন্দ্রু কৃপাপ্রার্থিনী উমাকে সাদর অভ্যর্থনা করল এবং শুনে বিস্মিত হল উমা গান জানে। উমার গান শুনে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বর্ধিত হল। অতঃপর সুবীর এবং উমা দুজনেই একসঙ্গে গান শুরু করে দিল। দেখা গেল, উমা দ্রুত প্রিয়তার পথে এগিয়ে গেল সুবীরকে পিছনে ফেলে। এমন দিন এল, যে উমাকেই চায়, সুবীরকে নয়। এর ভালো হল না। সুবীর হয়ে পড়ল মদ্যপ। হয়ত উমা সম্বন্ধে তার মনে জাগল সন্দেহ। থিটিমিটি যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, দুঃখিতচিত্তে চলে গেল দেশে। না যাওয়ার জন্যে সুবীরের অভিমান বেড়ে গেল। ওদিকে উমা অন্তঃসত্ত্বা। বন্ধুজনের পরামর্শে সুবীর ছুটে তাকে আনতে। হাসপাতালে উমা সন্তান প্রসব করল। এর পরে উমা যেন চুপচাপ—সে যেন পাথর। এই আবার প্রাণ এল, যখন আবার দুজনে সঙ্গে গান গাইল।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় স্বরচিত কাহিনীর বিস্তারে কোনো রকম ধাঁধানো কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সূক্ষ্ম রসবুদ্ধিকে জাগ্রত করে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে গেছেন একেবারে শেষের উজ্জ্বল দৃশ্য পর্যন্ত। 'গিমিক' বর্জিত পরিচ্ছন্ন চিত্রনাট্য আমাদের বাঙলা ছবিতেও অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।

অভিনয়ে অমিতাভ বচন ও ভাদুড়ী—দুজনেই নায়ক নায়িকার চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলতে যত্নের ত্রুটি করেননি। শেষের দিকে মৃত সন্তানের জন্মের পরে মূর্তিমতী বিষাদ প্রতিমার রূপ গ্রহণ করেছিলেন জয়া ভাদুড়ী—তিনি যে আশ্চর্যভাবে এই বিষাদ চরিত্রটিকে দৃশ্যের পর দৃশ্যে একভাবে ধরে রেখেছিলেন, তা বিস্ময়কর। অন্যান্য ভূমিকায় বিন্দু (চিত্রা), আসরণী (টারী (চন্দ্রু), ডোভিড (ব্রজেশ্বর), হাঙ্গাল (উমার বাবা সদানন্দ) দুর্গা খোটে (দুর্গা মাসী) প্রমুখের অভিনয় প্রশংসনীয়।

ছবির কলাকৌশলের মধ্যে ইন্দ্র রায়ের কাজটি যথাযথ হয়নি। পাথারের মতো ক্যামেরাম্যান থাকতে এমন হল, তা বোঝা দুষ্কর।

এ্যাকাডেমি মঞ্চে
৬ই নভেম্বর ॥ সন্ধ্যা ৭টায়
ক্যালকাটা আর্ট থিয়েটারের
পিঞ্জর
নাটক/নির্দেশনা
পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত ॥ পুলেন্দু রায়
আলো ॥ কণিষ্ক সেন

ঔদার্য প্রয়াসের
ব্রহ্মচর্যময়
আদ্বিতীয়
VISTA
Cosmetics.
CALCUTTA — INDIA.

ও গান রচনা, দুইই প্রশংসনীয়। সেববর্মণ সুরে দর্শকদের ছুবিয়ে ন। একখানি রাবীন্দ্রিক সুরে গাওয়া ছবির থীম-সং। এবং আবহসঙ্গীত-ীর নিজের গাওয়া গানটি অনবদ্য। পর আছে 'তেরি বিন্দিয়ারে' গানটি, মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মিয়া প্রোডাকসন্স নিবেদিত এবং ল মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'অভি-এমন একখানি রসসমৃদ্ধ ছবি, যা সমস্তদারকে আনন্দে মাতিয়ে তুলবে।

—নান্দীকর

ট্যুডিও থেকে

ানা-পূর্ব-প্রাচীর পরবর্তী ছবি
অচেনা অতিথি

করী কুন্দু প্রযোজিত সারা প্রোডাক-জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সুখেন পরিচালিত 'অচেনা অতিথি' রাধা, প্রাচী এবং অন্যান্য চিত্রগৃহের ী আকর্ষণ। কাহিনী ও চিত্রনাট্য করেছেন—সুখেন দাস। রমেশ বোশী ক দাস যথাক্রমে সম্পাদনা ও চিত্র-দায়িত্বে ছিলেন। অজয় দাস াপিত ছবির গান লিখেছেন—পুলক াধ্যায়। প্রধান চরিত্রলিপিতে আছেন প দত্ত, জয়শ্রী রায়, সুখেন দাস, াষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, অজিতেশ াধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শমিত অজয় গাঙ্গুলী, শেখর চট্টো, অজয় াধ্যায়, রত্না ঘোষাল, মেনকা দাস, অপর্ণা, গীতা রেকী, শান্তি, গীতা , অনিল রেকী, প্রমুখ শিল্পী। চিত্র ছবিখানির একমাত্র পরিবেশক।

প্রতীক্ষায় : 'রোদন ভরা বসন্ত'

পার প্রযোজিত এম্পার ফিল্মসের মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি য়া বসন্ত' সেন্সার ছাড়পত্র পেয়ে ন্য অপেক্ষা করছে। সলিল সেন নাট্য রচনা করেছেন। সুর দিয়েছেন মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার ও বাসবী এই ছবির নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য আছেন—দিলীপ রায়, উৎপল দত্ত, সান্যাল, অলীপদ চক্রবর্তী, য়ম, পারিজাত বসু, সাধনা রায়-, শোভা সেন, বাসন্তী চট্টো, এন ন, সন্ধ্যা বন্দ্যো, কামু মুখো, ষ, শম্ভু, মন্মথ, গৌর শী, মমতা সাহা, জয়শ্রী রায়। নৃত্যে শেফালী দাস। সংগীত গাঙ্গুলী ই দে যথাক্রমে সম্পাদনা ও চিত্র-ছেন। ঘটনাবৈচিত্র্যে, অভিনয়ে ও লার 'রোদন ভরা বসন্ত' বাংলা তে নতুনত্বের ইঙ্গিত বহন করে ল্লেখ করা যেতে

পর প্রযোজিত দ্বিতীয় ছবির

থাকছে। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন —শেখর চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনায় আছেন— সুশীল মুখোপাধ্যায়। উত্তমকুমার ও বাসবী নন্দী এই ছবিরও নায়ক-নায়িকা চরিত্রে থাকবেন।

'ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র'-এর শুভ মহরৎ

গেল ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় রিট্জ্ কনটিনেন্টাল ব্যাংকোয়েট হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাশ প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র ছবিটির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে প্রবীণ চিত্র-সাংবাদিক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ও পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। তরুণ প্রযোজক তুষারকান্তি দাস প্রযোজিত এই ছবিটি পরিচালনা করছেন—শচীন সেনগুপ্ত। চিত্রনাট্য রচনা, আবহসঙ্গীত ও সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আশু মৈত্র।

পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের ছবি 'জলপতি' : বহুদিন পর চিত্রপরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য যে ছবিটির কাজ শুরু করতে চলেছেন তার নাম হলো—'জলপতি'। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করছেন পরিচালক শ্রীভট্টাচার্য স্বয়ং। 'আমি সিরাজের বেগম'-এর প্রযোজক শ্রীমানিক রায় এম, আর প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে উক্ত ছবিটি প্রযোজনা করছেন।

সলিল দত্তের পরবর্তী ছবি 'অগত্যা' সঙ্গীত গ্রহণ : গত ৩০ সেপ্টেম্বর ট্রেকনি-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

"পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি"

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি আবশ্যক সংকলন গ্রন্থ

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

॥ বিষয় ও লেখক-সূচী ॥

বাংলার লোক-সাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ০ বাংলার লোকনাট্য—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ০ পশ্চিমবঙ্গের লোকনৃত্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ০ লোকসংস্কৃতি বিকাশের পশ্চাৎপট ও বঙ্গদেশ—ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় ০ লোক-সাহিত্যের ভাষা—ডঃ সুকুমার সেন ০ বাংলার লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য—শ্রীগোপাল হালদার ০ বাংলার লোকসঙ্গীত—শ্রীরজেশ্বর মিত্র ০ পশ্চিমবঙ্গের লোক-উৎসব—ডঃ প্রবোধকুমার ভৌমিক ০ বাংলার লৌকিক ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ০ বাংলার লৌকিক দেব-দেবী—শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বাংলার লোক-শিল্প—ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ০ বাংলার লোককর্ম—ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ ০ বাংলার মুর্শিদাবাদের সমাজতত্ত্ব—শ্রীবিনয় ঘোষ ০ পশ্চিমবঙ্গের নবপর্যায়ের গ্রন্থির চর্চা (১৫ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ—১৯০০) উৎস সন্ধান ও চরিত্র বিচার—শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল ০ বাংলার লোক-সংস্কার ও কিম্বদন্তি প্রসঙ্গে—ডঃ সমীরকুমার ঘোষ ০ পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সংস্কৃতির ধারা—ডঃ অমলকুমার দাস ০ পশ্চিম সীমান্ত-অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি—ডঃ সুকুমারকুমার করণ উত্তরবঙ্গের লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য বাংলার লোক-সংস্কৃতি ও প্রচার-বাংলা—শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন-বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়

৩৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭০০০০৭

●

প্রকাশন বিভাগ-কলকাতা, সিটি কালেক্টরিয়েট

৯, ডিরোজিও প্লেস, কলিকাতা—৭০০০০১

বোম্বাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব/শিবাজী পার্ক

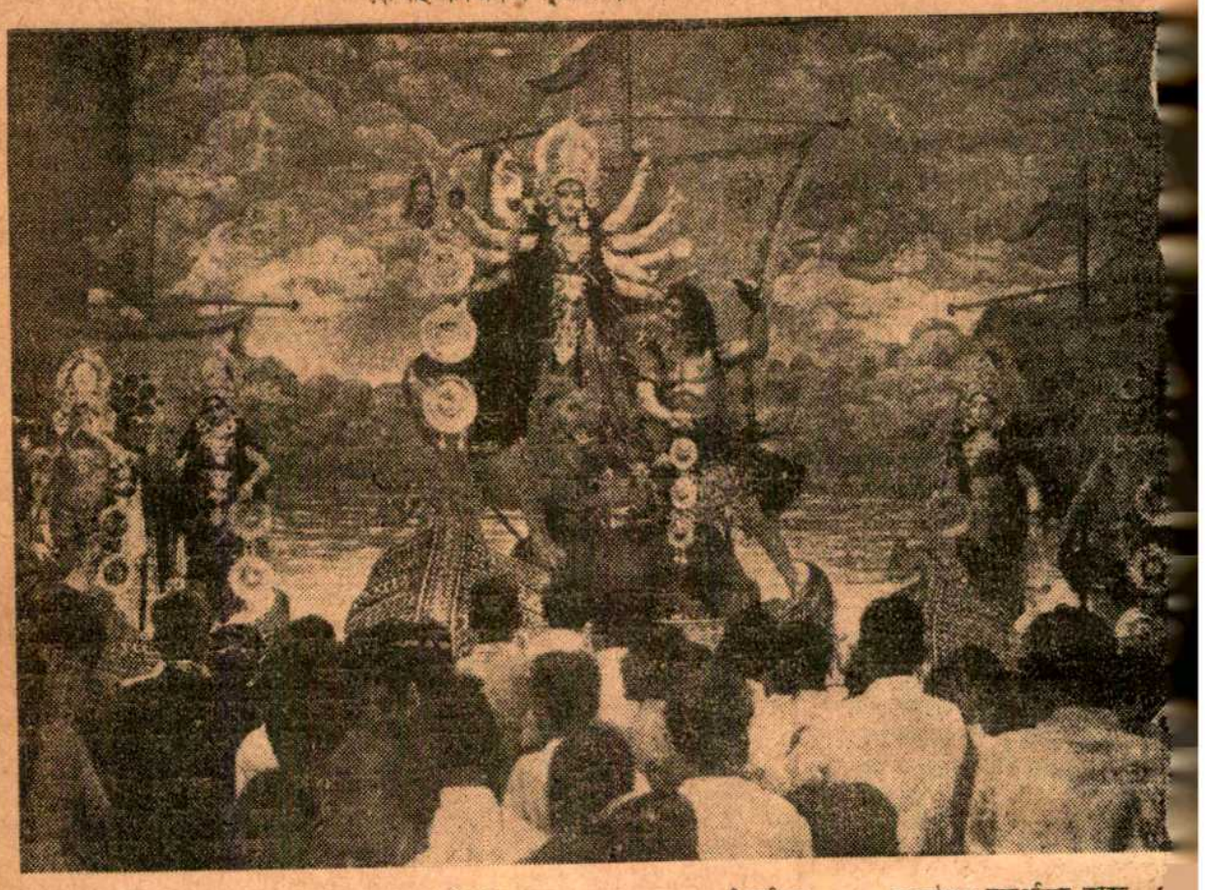

সিয়ান্স স্টুডিওর সঙ্গীত গ্রহণ কেন্দ্রে চিত্রপরিচালক সলিল দত্তের পরবর্তী ছবি 'অসতী'র জন্য কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানগুলিতে সঙ্গীত পরিচালক মান্না দের সুরে কণ্ঠদান করেন—আরতি মুখার্জি ও দুরকম মান্না দে স্বয়ং। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত গীতালি পিকচার্সের 'অসতী' ছবির প্রধান দুটি চরিত্র রূপদান করছেন—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন।

'দাবী' মুক্তিপ্রতীক্ষায় : দেবনারায়ণ গুপ্তের মঞ্চসফল নাটকের সার্থক চিত্ররূপ 'দাবী' কতমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায়। কল্পনা মুভীজ প্রঃ লিঃ নিবেদিত ছবিটি পরিচালনা করেছেন—কনক মুখার্জি। সুরারোপ করেছেন—অমর মুখার্জি। চরিত্রচিত্রণে আছেন—মৌসুমী চ্যাটার্জি, শমিত ভঞ্জ, বিকাশ রায়, সন্ধ্যারাণী, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, দিলীপ রায়, অজিতবরণ, জহর রায়, শেখর চ্যাটার্জি, দীপ্তি রায়, অমূল্য সান্যাল, সাধনা রায়চৌধুরী, কল্যাণ চ্যাটার্জি, বাসন্তী চ্যাটার্জি, মৃণাল মুখার্জি, গজা বসু ও রঞ্জনী গুপ্তা। এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

'ছন্দপতন' ছবির মুক্তি আসন্ন : একটি কুমারী মেয়ের জীবনের ছন্দপতনের কাহিনী অবলম্বনে নবরূপা নিবেদিত 'ছন্দপতন' ছবিটি বর্তমানে শ্রী, ইন্দিরা, প্রাচীতে মুক্তির দিন গুনছে। পুলক মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—ছবিটির সম্পাদক অজয় মুখার্জি।

গুরু বাগচী ছবিটির পরিচালক। সুরারোপ করেছেন—শৈলেশ রায়। শিবদাস ব্যানার্জি রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জি, আরতি মুখার্জি, অনুপ ঘোষাল ও সুমিত্রা সেন। চরিত্র-চিত্রণে আছেন—শমিত ভঞ্জ, নন্দিনী মালিয়া, অনিল চ্যাটার্জি, সন্ধ্যারাণী, লিলি চক্রবর্তী, অনুভা ঘোষ, শিবানী বসু, জহর রায়, সীতা মুখার্জি, অসিতবরণ, আনন্দ মুখার্জি, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, মাঃ অরিন্দম, কুমারী শর্মিলা ও মলিনা দেবী। এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মঞ্চাভিনয়

একটি সার্থক নাট্যানুষ্ঠান 'ফাঁস' : গত ৩০ সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে ওয়াকসপেন ইণ্ডাস্ট্রীজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দ শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফাঁস' নাটকটি অভিনয় করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন : নাথ রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথির অলঙ্কৃত করেন জনপ্রিয় চিত্র পঞ্চানন দত্ত (জে, পি)। সন্তোষ গ পরিচালিত 'ফাঁস' নাটকটি একটিম অভিনীত হয়। কারণ স্থায়ী (ঘূর্ণায়মান) ছাড়া ছোট্ট একটি বারবার সেট সেটিং পরিবর্তন কর নাটকের গতি ব্যাহত হয়। একথা ন পরিচালক সুন্দরভাবে নাটকের ঠিক মুহূর্তে একটি দৃশ্যের অবতারণ কুশীলবদের দিয়ে জানিয়ে দেন দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠে শিল্পীর সুঅভিনয়ের জন্য। আবহ ও আলোকসম্পাত এককথায় অ 'ফাঁস' নাটকটির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছেন—রাসবিহারী মান্না (সুভাষ), ধর (তপন), সূর্যকুমার দাস (সো অনিলকুমার দে (বিমান), শশধর (কপিল) ও মলিনা ঘোষ (ম ডেপুটির চরিত্রে প্রিয়রঞ্জন দের বাচ সুন্দর কিন্তু গলার জোর নেই। ঘোষ সোনালীর চরিত্রটি প্রাণবন্ত তোলেন। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অ করেন—সুবীর চ্যাটার্জি, শশাং প্রামাণিক, হেমন্ত বেরা, ব্রজেন ভোলানাথ মুখার্জি, নিমাই বসুই

সরলাবালা ফুটবল ট্রফি বিজয়ী অমৃত পত্রিকা দল

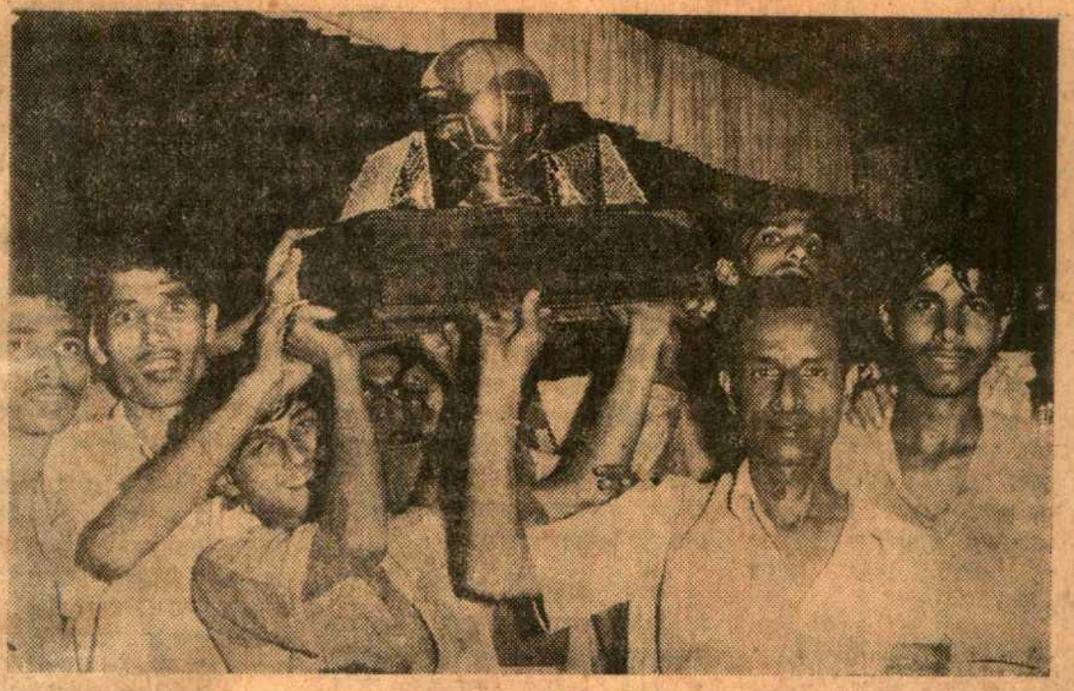

খেলাধূলা

দর্শক

অমৃতের সরলাবালা কাপ জয়

অসাংবাদিক কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ...লা সহকার ফুটবল প্রতিযোগিতার ...লে অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা ১-০ ...ই ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পাবলিসিটি দলকে ...য়ে সরলাবালা কাপ জয়ী হয়েছে। ...ল খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়ী দলের ...কি জয়সূচক গোলটি দেন রাইট আউট ...াক দাস। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পাবলিসিটি ...লে দলের কয়েকজন খ্যাতনামা প্রবীণ ...লোয়াড় যোগদান করেছিলেন। অপর ...কে অমৃত সাপ্তাহিক পত্রিকা দলে ...লছিলেন নবীন খেলোয়াড়রা। অমৃত ...ট ৪-০ গোলে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ...ং সেমি-ফাইনালে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ...ক ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ...পরদিকে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পাবলিসিটি ...নালে যাওয়ার পথে ৪-০ গোলে ...ান্তর পত্রিকা এবং সেমি-ফাইনালে ...গোলে দেশ সাপ্তাহিক পত্রিকা দলকে ...ছিল।

...ইনাল খেলার অনুষ্ঠানে রাজ্যের ...ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ ...ত্ত্ব করেন এবং স্টেটসম্যান পত্রিকার ...সম্পাদক শ্রীসচী সহায় অনুষ্ঠানের ...তিথি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ

...ত্রের এই সাফল্যের পথে দলের ...াড়বৃন্দ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন সর্বশ্রী প্রফুল্লরতন গাঙ্গুলী, বরুণ ঘোষাল, বিশ্বনাথ মুখার্জি, গোপাল বসু, শ্যামল চৌধুরী এবং বাসুদেব রায়-চৌধুরী।

দুই দলের খেলোয়াড়বৃন্দ

অমৃত পত্রিকা : বি রায়, টি ঘোষ, সোমনাথ দাস, বি ব্যানার্জি এবং পি ঘোষ, কে দাস এবং এইচ মণ্ডল, রবি সেন বরাট (অধিনায়ক), পি রায়, এ ঘোষ এবং অলোক দাস (পি চ্যাটার্জি)।

ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পাবলিসিটি অজিত নন্দী, ডি মজুমদার, এস বিশ্বাস, এস পাল এবং এস ঘোষ, জে চ্যাটার্জি এবং স্বরাজ ঘোষ (অধিনায়ক), এ সেন, বি কর্মকার, এস কর এবং এস দাস। রেফারী প্রতুল চক্রবর্তী।

জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা

জয়পুরে ৩০তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস (গতবারের চ্যাম্পিয়ান), মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র (গতবারের চ্যাম্পিয়ান), বালক বিভাগে পশ্চিম বাংলা এবং বালিকা বিভাগে মহারাষ্ট্র দলগত খেতাব জয়ী হয়েছে। তাছাড়া মহারাষ্ট্র ২য় স্থান পেয়েছে পুরুষ ও বালক বিভাগে। অপর দিকে পশ্চিম বাংলাও দুটি বিভাগে ২য় স্থান পেয়েছে—মহিলা এবং বালিকা বিভাগে। প্রতিযোগিতায় মোট চারটি নতুন ভারতীয় রেকর্ড হয়েছে—পুরুষ বিভাগে ৩টি এবং বালক বিভাগ একটি।

দলগত সাফল্য

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৫২ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৫৯ পয়েন্ট) এবং ৩য় পাঞ্জাব (৫৮ পয়েন্ট)

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৯১ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৪২ পয়েন্ট) এবং ৩য় রাজস্থান (২৯ পয়েন্ট),

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা (৮৭ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৫১ পয়েন্ট) এবং ৩য় সার্ভিসেস (৩৪ পয়েন্ট)।

বালিকা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৫৮ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৩৮ পয়েন্ট) এবং ৩য় রাজস্থান (২২ পয়েন্ট)।

ওয়াটার পোলো ফাইনাল : সার্ভিসেস ৮-৫ গোল মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

নতুন ভারতীয় রেকর্ড

বালক বিভাগ

১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক : আশিস দাস (বাংলা) সময় ১ মিঃ ১০-৩ সেঃ (হিট)।

পুরুষ বিভাগ

৪X১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলে : সার্ভিসেস দল সময় : ৪ মিঃ ৫-২ সেঃ (হিট)।

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : জি সি নায়ার (সার্ভিসেস) সময় : ৫৯-৪ সেঃ (হিট)।

২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল : এম এস রাও (সার্ভিসেস) সময়—২ মিঃ ১২ সেঃ

জাতীয় অর্চারী প্রতিযোগিতা

মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার অন্তর্গত ধরমপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলা দলগত এবং ব্যক্তিগত উভয় খেতাবই জয় করেছে। পশ্চিমবাংলা দলগত খেতাব পেয়েছে মোট ১৯৩৪ পয়েন্ট।

অপরদিকে পশ্চিমবাংলার কুশলী তীরন্দাজ ধনপতি ঘোষ ৭২০ পয়েন্টের মধ্যে ২৯২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত শ্বেতাব জয়ী হয়েছেন।

৩০, ৪০, ৫০ ও ৭০ মিটার এই চারটি দূরত্বের তীর নিক্ষেপ অনুষ্ঠানে মোট ১২টি পদকের মধ্যে বাংলা ১০টি এবং মেঘালয় ২টি পদক জয়ী হয়।

দলগত ও ব্যক্তিগত সাফল্য

দলগত : ১ম পশ্চিমবাংলা (১৯৫৪ পয়েন্ট), ২য় মেঘালয় (১০৯৭ পয়েন্ট), ৩য় ওড়িশা (৪২৪ পয়েন্ট), ৪র্থ বিহার (২৫৭ পয়েন্ট), ৫ম মহারাষ্ট্র (১৯১ পয়েন্ট) এবং ৬ষ্ঠ মধ্যপ্রদেশ (১৯৭ পয়েন্ট)।

ব্যক্তিগত : ১ম ধনপতি ঘোষ (২৯২ পয়েন্ট), ২য় সনৎ মুখার্জি এবং ৩য় দীনবন্ধু ভড়। এঁরা তিনজনই পশ্চিমবাংলার—ধনপতি ঘোষ এবং দীনবন্ধু ভড় হুগলী জেলার এবং সনৎ মুখার্জি হাওড়া জেলার প্রতিনিধি।

এশিয়ান টেনিস সার্কিট প্রতিযোগিতা

জাপানের ওসাকা এবং টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান টেনিস সার্কিটের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে।

ওসাকা ওপন টেনিস টুর্নামেন্টে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই ৩৯ বছরের অস্ট্রেলিয়ান টেনিস খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল ৬—২ ও ৬—৪ গেমে জাপানের তোশিরো সাকাইকে হারিয়ে ৫,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেছেন। সাকাই পেয়েছেন ২,৫০০ ডলার।

টোকিওতে এশিয়ান টেনিস সার্কিটের দ্বিতীয় টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতার ২নং বাছাই কেন রোজওয়াল পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে ১নং বাছাই স্বদেশের জন নিউকম্বকে ৬—১ ও ৬—৪ গেমে পরাজিত করে ১২০০০ ডলারের প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, জন নিউকম্ব যেখানে ৩ বার (১৯৬৭ ও ১৯৭০-৭১) উইম্বলেডন সিঙ্গলস শ্বেতাব জয়ী হয়েছেন, কেন রোজওয়াল তা একবারও পাননি। তাছাড়া নিউকম্ব ১৯৭৩ সালের আমেরিকান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান।

ওসাকা ওপন টেনিস টুর্নামেন্টে ভারতের বিজয় অমৃতরাজ, আনন্দ অমৃতরাজ এবং জগজিৎ সিং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ৪নং বাছাই বিজয় কোয়ার্টার ফাইনালের আগের রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার পল ক্রোনকের কাছে হেরে যান। ডাবলসে বিজয় এবং আনন্দ অমৃতরাজ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলেছিলেন। কিন্তু টোকিওর দ্বিতীয় টেনিস টুর্নামেন্টে ভারতীয় খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন।

প্রদর্শনী টেনিস

ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত আমন্ত্রণমূলক নৈশ টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে প্রবীণ খেলোয়াড় রমানাথন কৃষ্ণান ৬-০, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে হারিয়ে রিজেন্ট কাপ জয়ী হয়েছেন। পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ৯-৭ ও ৬-৪ গেমে চিরদীপ মুখার্জি এবং গৌরব মিশ্রাকে পরাজিত করেন। আলোচ্য প্রতিযোগিতায় বিজয় এবং আনন্দ অমৃতরাজ বাদে ভারতের সমস্ত নামকরা টেনিস খেলোয়াড়রা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

পাঞ্চো নুরমি পুরস্কার

হেলসিঙ্কিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বিশ্ববিখ্যাত দৌড়বীর পাঞ্চো নুরমির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ত রক্ষার্থে অলিম্পিয়ান ইন্টারন্যাশনা এক বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ দৌড়বীরকে হেলসিঙ্কি অবস্থিত পাঞ্চো নুরমির বিরা একটি ছোট প্রতিকৃতি দিয়ে পুর হবে। ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট এ অনুমোদন করেছেন।

উইলফ্রেড রোডস

ইংল্যাণ্ডের সর্বকালের অন্যত টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পরলোকগ উইলফ্রেড রোডস সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য নীচে দেওয়া হল। ইতিপূ সম্পর্কে অমৃতের গত ১১ স উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রকাশিত হয়েছে

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতি পর্যন্ত মাত্র ৬ জন খেলোয়াড় ত ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ২ এবং ১০০ উইকেট পূর্ণ করা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে রোডস এই দুর্লভ 'ডাবল' শ্বেত ২০০০ রান ও ১০০ উইকেট) পান। তিনি তাঁর ৪৪তম টে টেস্টের 'ডাবল' শ্বেতাব পেয়েছি

প্রথম শ্রেণীর খেলা

(১৮৯৮—১৯৩০)

ব্যাটিং : ইনিংস ১৫৩২, নট অ মোট রান ৩৯৭৯৭, এ সর্বোচ্চ রান ২৬৭ নট আউ লিস্টারসায়ার, ১৯২১), সে এবং গড় ৩০·৭০

বোলিং: ৪,১৮৭ উইকেট (৬৯ গড় ১৬·৭১

এক মরশুমে উইকেট

১০০ উইকেট : ২৩ বার
২০০ উইকেট : ৩ বার

এক মরশুমে ১০০০ রা

২১বার (১৮৯৮—১৯৩০)

এক মরশুমে সর্বাধিক উই

২৬১ উইকেট (গড় ১৩·৮১),

এক মরসুমে

১০০০ রান এবং ১০০
১৬ বার (ইংলিস ক্রিকেটে অদ

এক মরসুমে

২০০০ রান এবং ১০০

বছর	মোট রান
১৯০৯	২০৯৪
১৯১১	২২৬১

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা:—৩ হইতে প্রকাশিত।

আজকার জীবনযাত্রা

নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মব্যস্ততা, ক্লেশ, কঠোরতা ও দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাদের আজকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমাদের জীবনীশক্তি ও কর্মতৎপরতা দ্রুত হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায়, বহুগুণবিশিষ্ট দেশজাত ভেষজাদির সংমিশ্রণে অতি আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত, সুপরীক্ষিত, সদ্য ফলপ্রদ, এই দুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ হয় জীবনীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

চায়ের চামচের ৪ চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে ২ চামচ মৃতসঞ্জীবনী সম পরিমাণ জলসহ প্রত্যহ দুবার আহারের পর সেবা।

SMM-1/69

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন) এফ.সি.এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র : ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি) ও আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. C-4352
Gram : AMRITA, Calcutta-3.

AMRITA

Friday 26th Oc
Phone : 55-5231

5 NOV 1973

জীবন সাথী
বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
আসল জিনিষটিও বেছে নিন

কুকমি
গুঁড়ো মশলা

হলো সেই
আসল জিনিষ যার
পেছনে রয়েছে ১২৪
বৎসরের অভিজ্ঞতা

কেনার সময়
মনে রাখবেন
কুকমীর প্যাকেটের
কুকমী নামের সঙ্গে
কোন ব্র্যাণ্ডের নাম যুক্ত

আমাদের অন্য কোন ব্রাঞ্চ নেই

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর, ফোন ঃ ৩৩-০৯৯৫

iaa/KCD